DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 15th April 1961.

২৮ বর্ষ ॥ ২৪ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২ বৈশাখ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

নববর্ষ

পয়লা বৈশাখ বর্ষবোধন[illegible] বাঙালীর জীবনে অন্যতম প্রধান উৎসব। বিলাতি নববর্ষের সঙ্গে আ[illegible]র সম্পর্ক অনেকখানি রাষ্ট্রিক [illegible]। বাংলা নববর্ষের সঙ্গে [illegible] আমাদের একান্তভাবে সম্পর্ক[illegible]। বর্ষশেষ আর বর্ষারম্ভ—সময়ের চিরপ্রবহমান নিরবচ্ছিন্ন স্রোতধারায় সংকে[illegible] দুটি সাংকেতিক চিহ্নমাত্র। তবু, একটি [illegible] বিশেষ একটি দিনকে [illegible] আমাদের আচার, অনুষ্ঠান, [illegible] পৃথিবীর সঙ্গে যেন [illegible] পরিচিত হয়, আত্মীয়তা স্থাপন করে। সময়ের ছেদ নাই, কিন্তু [illegible] পর্যায়ের আছে। নববর্ষ এই [illegible] শুভ সূচনা, [illegible] এবং পবিত্র সংকল্প।

নববর্ষ যেমন [illegible] তেমনি পুরাতনকে বিদায় [illegible] বর্ষশেষ আর নববর্ষ—এই দুটি দি[illegible] বিশ্ববীণার একই তারে বাঁধা। [illegible] হারিয়েই আমরা পাই নূতনকে। [illegible] বৈশাখের এই যে বর্ষবোধন [illegible] আমাদের অনন্তকালের আত্মী[illegible] প্রতিদিন যে প্রকৃতির পরিবেশে [illegible] ঋতুচক্রের আবর্তনে [illegible] সে-প্রকৃতির নব-জাগরণ, নূতন [illegible]স্পন্দন। এই চির-নূতনের ডাক [illegible] আছে তাই বৈশাখ "হে রুদ্র বৈশা[illegible]" আমাদের নববর্ষের আগমনী সংগীত[illegible]। বৈশাখী নববর্ষে নবজীবনের [illegible] লাগে আম-[illegible] কৃষ্ণচূড়ার শাখায় [illegible] বৈশাখের অগ্নি-[illegible] কালো মেঘ, [illegible] না জুড়োলেও [illegible] জাগায় সান-[illegible] কোণে কোণে [illegible]-কান্তর গ্রামের [illegible]শাখের সঙ্গে [illegible] অনন্তকাল ধরে। [illegible] পুরাতন বৎসরের জীর্ণ জঞ্জালের স্তূপ; বৈশাখ পুড়িয়ে দিতে চায় পুরানো অভ্যাসের পুঞ্জীভূত গ্লানি। বৈশাখের অগ্নিস্নানে প্রকৃতির শুচিস্নিগ্ধ নবঅভিষেক, বৈশাখের আগমনে আমাদেরও কর্মে ও কল্পনায়, উৎসবে, অনুষ্ঠানে নবজীবনের অভিনন্দন।

রাষ্ট্রিক নববিধানে নববর্ষ যদিও এখন পয়লা চৈত্র থেকে শুরু, বাংলা নববর্ষারম্ভে পয়লা বৈশাখের আহ্বান তবু এখনও আমাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে স্বচ্ছন্দে সাড়া জাগায়। বৈশাখী নববর্ষ উৎসব আমাদের বড় আদরের ঐতিহ্য। হাল-খাতা—শুভমহরতের বহুকাল প্রচলিত অনুষ্ঠান যেমন এই ঐতিহ্যের প্রাচীন অংশ তেমনি ক্রমে ক্রমে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাঙালীর সাংস্কৃতিক অনুরাগ-সমৃদ্ধ শারীরিক ক্রীড়াকৌশল, নববর্ষের কুচকাওয়াজ এবং গুণীজন সম্মেলন। বৈশাখে নববর্ষের উদ্বোধন আমাদের কাছে আরো মহিমান্বিত, কারণ বৈশাখেই শতবর্ষ পূর্বে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। বৈশাখী নববর্ষ তাই আমাদের জীবন-সাধনার শুভলগ্ন, সিদ্ধির সোপান। রবীন্দ্রনাথের অপরূপ মন্ত্রপূত ভাষায় এই শুভলগ্নে উচ্চারণ করি নববর্ষের, বৈশাখের প্রার্থনা, "হে রুদ্র, বৈশাখের প্রথম দিনে আজ তোমাকেই প্রণাম করি। তোমার প্রলয় লীলা......জীবনবীণার সমস্ত আলস্যলুপ্ত তারগুলোকে কঠিন বলে আঘাত করুক, তাহলেই...তোমার সৃষ্টিলীলায় নব আনন্দসংগীত বিশুদ্ধ হয়ে বেজে উঠবে।"

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সংখ্যা

আগামী ২৩শে বৈশাখ ১৩৬৮ (৬ই মে ১৯৬১) 'দেশ' পত্রিকা বিশেষ রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইবে। প্রায় দুইশত পৃষ্ঠার এই সংখ্যা রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে খ্যাতনামা লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ লাভ করিবে। রবীন্দ্র-জীবনের বহু আলেখ্য এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ।

পুস্তক প্রকাশকদের নিকট অনুরোধ যে ১লা বৈশাখ, ১৩৬৭-র **পর যে সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার একটি তালিকা অবিলম্বে** আমাদের নিকট পাঠাইয়া সংখ্যাটিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে অনুগ্রহ করিয়া সহায়তা করিবেন।

—সম্পাদক 'দেশ'

স্মরণে

বৎসরের শেষ দিনটি আমাদের একান্ত স্বজন বিয়োগবেদনামণ্ডিত। ষোল বৎসর পূর্বে ৩০ চৈত্র আনন্দবাজার পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ও আনন্দবাজার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় লোকান্তরিত হন। বৎসরের এই দিনটি তাঁর বিচ্ছেদবেদনা আমরা বিশেষভাবে অনুভব করি। সান্ত্বনার বিষয় যে, বেদনাই তাঁর স্মৃতির একমাত্র সম্বল নয়। প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আমরা বঞ্চিত হলেও তাঁর মহৎ কর্মময় জীবনের অসংখ্য স্বাক্ষর থেকে আমরা প্রতিদিন প্রেরণা লাভ করি।

প্রফুল্লকুমারের জীবনসাধনার পরিচয় নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে বিস্তৃত এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ। আদর্শ-নিষ্ঠা ও বলিষ্ঠ আত্মবিশ্বাস জীবনের প্রতিটি পর্বে তাঁর চিন্তা ও কর্মধারাকে অপূর্ব

শ্রী ও সার্থকতামণ্ডিত করেছিল। জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ভাবসাধকরূপে তিনি ছিলেন দেশসেবা ও দেশহিতব্রতের আদর্শ প্রচারে, অনুশীলনে অক্লান্ত কর্মী; তাঁর বাণী ও বাচনভঙ্গী জনচিত্তের উপর যে অগ্নিময় প্রভাব বিস্তার করেছিল ভারতীয় সংবাদপত্রজগতে তার তুলনা বিরল।

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক প্রফুল্লকুমারের মননশীলতা ও রচনানৈপুণ্য যেমন অতুলনীয় তেমনি অবিস্মরণীয় তাঁর চরিত্রমাধুর্য। প্রফুল্লকুমার কায়মনোবাক্যে প্রকৃতই ছিলেন খাঁটি বৈষ্ণব, খাঁটি দরদী মানুষ। খ্যাতি, ক্ষমতা পদমর্যাদা, প্রতিষ্ঠা কোন কিছুই কখনও তাঁর অন্তরের স্বাভাবিক উদারতা, বিনয়নম্র প্রীতি ও মমত্ববোধকে আবৃত করতে পারে নি। একদিকে তিনি ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষসম্পন্ন, অন্যদিকে বৈষ্ণবোচিত মানবপ্রীতি ও ক্ষমাশীলতা ছিল তাঁর হৃদয়ের ভূষণ।

প্রফুল্লকুমারের সপ্তদশ স্মৃতিবার্ষিকে আমরা তাঁর পুণ্য জীবনের আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করি, প্রার্থনা করি তাঁর এই মহান সত্তার ধারা প্রতিনিয়ত, আমাদের সংকল্প ও প্রয়াসকে সঞ্জীবিত করুক।

রবি-প্রণাম

অজিত দত্ত

আলো, দীপ্ত আলো আনো, ছিন্ন করো কৃষ্ণ আচ্ছাদন
দৃষ্টির সম্মুখ হতে, মুক্ত করো আত্মা-প্রাণ-মন
তমসা বিদীর্ণ ক'রে!—এ-প্রার্থনা জাগে নিত্যকাল
বিশ্বমানবের কণ্ঠে। তাই কভু জ্যোতির মশাল
প্রাণের আগুনে জ্বেলে নেমে আসে মাটির ধরায়
কোনো দীপ্ত মানবাত্মা—মেঘাচ্ছন্ন শর্বরীসীমায়
যেন সূর্যোদয়। তার আলো আসে নভোতল ছেয়ে
দেবতার আশীর্বাদরূপে, আর সে-প্রেরণা পেয়ে
জাগে তৃণ, জাগে পৃথ্বী, স্বপ্ন ভেঙে জাগে নির্ঝরিণী;
ঘুম-ভাঙানিয়া সেই আত্মার ভাস্বর রূপ চিনি।
আমরা দেখেছি তারে নবজাত সুপর্ণের মতো
তমো হতে জ্যোতির্লোকে, মৃত্যু হতে অমৃতে সতত
জীবনেরে নিয়ে যেতে, মানুষেরে জানাতে আহ্বান,
শোনাতে সম্মুখপথে চিরদিন এগোবার গান।
হতাশার দৈন্যেরে সে ছিন্ন করে, মুক্ত করে ভয়,
নির্জীব প্রসুপ্ত প্রাণে নিয়ে আসে বলিষ্ঠ প্রত্যয়।
গগনে তপন সম, তথাপি সে হৃদয়ের কাছে,
সমুদ্রপর্বত তারে রুধিল না, তবুও সে আছে।
সেই সূর্যপ্রভ দীপ্ত প্রতিভার গাঢ় অনুরাগে
রূপে-রসে-গন্ধে-স্পর্শে এ-জীবনে নব স্বাদ জাগে।
সব মানুষের সাথে হৃদয়ে হৃদয়ে সেতু বাঁধি,
আলোর প্রলয়-স্রোতে তমিস্রার নিশ্চিহ্ন সমাধি।
এত যে বেসেছি ভালো এই পৃথিবীর ফুল, পাখি,
বিষণ্ণ শ্রাবণ আর ঝঞ্ঝামত্ত উদ্দাম বৈশাখী,
এত যে মাটির মায়া, এমন যে নভোচারী মন,
সবি এক উৎস হতে প্রাণরস করে আহরণ।
যত দূরে দিগন্তের যত দিকে দু' চোখ ফেরাই
সূর্য তার দীপ্তি হতে কারেও বঞ্চিত করে নাই।
জগতেরে, জীবনেরে, সে-আলো দিয়েছে সত্য দাম,
যুগান্তের তন্দ্রাহরী জ্যোতির্ময় সূর্যেরে প্রণাম।

কংগোর পরিস্থিতি এবং সেখানে প্রেরিত ভারতীয় যোদ্ধ, সৈন্যদলকে যে-অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে সে সম্বন্ধে নানারকম উল্টোপাল্টা খবর আসছে। এ খবরগুলি যেমন বিভ্রান্তিকর তেমনি উদ্বেগজনক। যাদের কেবল খবরের কাগজের উপর নির্ভর করতে হয় তাদের পক্ষে অবস্থার সঠিক ধারণা করা সম্ভব হয়ত নয় কিন্তু ভারত সরকারের নিকট কংগোর প্রকৃত অবস্থা এবং সেখানে ভারত থেকে প্রেরিত সৈন্যদের "ভারতীয়" বলেই যে-সব বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে সে সম্বন্ধে ভারত সরকারের ওয়াকিফহাল না থাকার কোনো কারণ নেই এবং ছিল না। কংগোর ব্যাপারে ইউনাইটেড নেশন্‌স-এর প্রথম হস্তক্ষেপের সময় থেকেই কংগোর পরিবর্তনশীল অবস্থার সংগে সামরিক, অসামরিক বিভিন্ন পর্যায়ের ভারতীয়ের সাক্ষাৎ পরিচয় অবিচ্ছিন্ন আছে। সুতরাং কংগোতে কী ঘটছে এবং কী ঘটতে পারে সে বিষয়ে একটা মোটামুটি সঠিক ধারণা ভারত সরকারের নিশ্চয়ই থাকা উচিত। ভারতীয় যোদ্ধ, সৈনাদের কংগোতে পৌঁছানোর পরে ইউ-এন কমান্ডর অধীনে তাদের প্রয়োগ এবং গতিবিধি সম্পর্কে যে-সব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাতে মনে হয় যে ভারত সরকারের সেরূপ সঠিক ধারণা ছিল না এবং যোদ্ধ,সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে ভারত সরকার যথোচিত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেন নি। কারো কারো মতে কংগোর গোলমেলে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া, বিশেষ করে যোদ্ধ,সৈন্য পাঠানো ভারতের পক্ষে আদৌ সুবুদ্ধির কাজ হয়নি। সম্প্রতি যে-সব খবর এসেছে তাতে এই মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁরা আরো জোরের সংগে সেই মত প্রকাশ করবেন।

কংগোর ব্যাপারে শেষপরিণতি যাইহোক, আর একটা প্রশ্ন উঠেছে যেটা এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। সেটা হচ্ছে পার্লামেণ্টের অনুমতি না নিয়ে বিদেশে ভারতীয় সৈন্য পাঠানোর প্রশ্ন। আচার্য কৃপালনী ও অন্য কেউ কেউ এই প্রশ্নটি পার্লামেণ্টে তুলেছেন। তাঁদের মতে পার্লামেণ্টের অজ্ঞাতে এবং বিনা অনুমতিতে বিদেশে

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

ভবঘুরে (৪)

ইয়োরোপ তখনো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এর বর্ণনা সে মহাদেশের কবি, চিত্রকার, বস্তুত চিন্তাশীল তথা দরদী ব্যক্তি মাত্রেরই দেওয়া সত্ত্বেও বলতে হয়, না দেখলে তার আংশিক জ্ঞানও হয় না। তুলনা দিয়ে এদেশের ভাষায় বলা যেতে পারে, বন্যা ও ভূমিকম্পের ধকল যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন এর জের দেশকে কতদিন ধরে টানতে হয়।

মোড় নিতেই দেখি, বাঁ দিকের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে নাসপাতি-ভর্তি ঠেলা গাড়ি ঠেলাতে ঠেলতে রাস্তা-আল ধরে আসছে একটি বয়স্ক লোক। সর্বপ্রথমই চোখে পড়ল, তার ডান হাতখানা কনুই অবধি নেই। হাতের আস্তিন ভাঁজ করে ঘাড়ের সঙ্গে পিন করা। বড় রাস্তায় সে উঠলো ঠিক আমি যেখানে পৌঁচেছি সেখানেই। আমি প্রথমটায় 'গ্রুস্‌ গট' বলে তার অনুমতির অপেক্ষা না করেই গাড়িটায় এক হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলুম। এ অভিবাদনে লোকটি প্রথম চাষার মত মোটেই হকচকালো না, এবং প্রত্যুত্তরে 'গ্রুস্‌ গট' না বলে আর পাঁচজনেরই মত 'গুটেন টাখ'—'সুপ্রভাত' জানালে। তারপর বলল, 'ও গাড়ি আমি একাই ঠেলতে পারি নাসপাতিগুলোর প্রতি তোমার যদি লোভ হয়ে থাকে তবে অত হ্যাঙ্গামা পোহাতে হবে না—যত ইচ্ছে তুলে নাও।' আমি এই অন্যায় অপবাদে চটিনি—পেলুম গম্ভীর লজ্জা। কী যে বলবো ঠিক করার পূর্বেই সে বললে, 'হাত না দিলেও দিতুম।' আমি তখন ফাঁকা পেয়ে বললুম, 'নাসপাতি খেতে আমি ভালোবাসী নিশ্চয়ই, এবং তোমারগুলো যে অসাধারণ সরেস সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ঠেলা দেবার সময় আমার মনে কোনো মৎলব ছিল না, এবং তুমিও যে স্বচ্ছন্দে ছোট রাস্তা থেকে বড় রাস্তার উঁচুতে গাড়িটাকে ঠেলে তুললে সেও আমি লক্ষ্য করেছি। আমি হাত দিয়েছিলুম এমনি। পাশাপাশি যাচ্ছি, কথা বলতে বলতে যাবো, তখন দুজনাই যে একই কাজ করতে করতে যাবো সেই তো স্বাভাবিক—এতে সাহায্য লোভ কোনো কিছুরই কথা ওঠে না।' চাষা হেসে বললে, 'তোমার রসবোধ নেই। আর তুমি জানো না, এবারে নাসপাতি এত অজস্র একই সঙ্গে পেকেছে যে এখন বাজারে এর দর অতি অল্পই। ওই সামনের গ্রামগুলোর ভিতর দিয়ে যখন যাবে তখন দেখতে পাবে গাছতলায় নাসপাতি পড়ে

আছে—কুড়িয়ে নিয়ে যাবার লোক নেই। যত ইচ্ছে খাও, কেউ কিছু বলবে না।' আমি বললুম, 'আমাদের দেশেও এই রেওয়াজ।' কোথায়, কোন দেশ, ইণ্ডিয়ান আর রেড-ইণ্ডিয়ানে পুনরায় সেই গুবলেট, তারপর আশ-কথা পাশ-কথা সেরে সর্বশেষে নিজেই বললে, তার হাতখানা গেছে গত যুদ্ধে। হেসে বললে, 'লোকে বলে, তারা করুণার পাত্র হতে চায় না; আমার কিন্তু তাতে কোনো আপত্তি নেই। হাত গিয়ে কত সুবিধে হয়েছে বলবো। গেরস্তালীর কোনো কিছু করতে গেলে বউ বেটি হা হা করে ঠেকায়, যদিও আমি এক হাত দিয়েই দুনিয়ার চোদ্দ আনা কাজ করতে পারি। চাষ-বাস, ফলের ব্যবসা, বাড়ি মেরামতী সবই তো করে যাচ্ছি—যদিও মেয়ে-জামাই ঠ্যাকাবার চেষ্টা করেছিল এবং শেষটায় করতে দিলে, হয়তো এই ভেবে যে কিছু না করতে পেলে আমি হন্যে হয়ে যাব।'

আমি বললুম, 'তোমরা তো খৃষ্টান; তোমাদের না রববারে কাজ করা মানা।'

লোকটা উত্তর না দিয়ে হকচকিয়ে শুধলে, 'তুমি খৃষ্টান নও?'

—'না।'

'তবে কি?'

'হীদেন'।

আমি জানতুম, পৃথিবীর খৃষ্টানদের নিরানব্বই নয়া পয়সা বিশ্বাস করে, অখৃষ্টান মাত্রই হীদেন। তা সে মুসলমান হোক, হিন্দু হোক আর বৌদ্ধই হোক। নিতান্ত ইহুদীদের বেলা হয়তো কিঞ্চিৎ ব্যত্যয়, অবশ্য সেটা পুষিয়ে নেয় তাদের বেধড়ক ঠেঙিয়ে। তাই ইচ্ছে করেই বললুম, হীদেন।

লোকটা অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে বললে, 'আমি গত যুদ্ধে ঈশ্বরকে হারিয়েছি। তবে কি আমিও হীদেন?' নিজের মনে যেন নিজেকেই শুধলে।

আমি বললুম, 'আমি তো পরমেশ্বরে বিশ্বাস করি।'

'এবারে সে স্তম্ভিত। এবং শব্দার্থে। কারণ গাড়ি ঠেলা বন্ধ করে আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালে। শেষটায় বললে, 'এটা কিন্তু আমাকে সোজা করে নিতে হবে। আমাদের পাদ্রী তো বলে, তোমরা নাকি গাছ, জল এই সব পুজো করো, পাথরের সামনে মানুষ বলি দাও।'

আমি বললুম, 'কোনো কোনো হীদেন দেয়, আমরা দিনে। আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বরকে ভক্তি দিলেই যথেষ্ট।'

বোকার মত তাকিয়ে বললে, 'তবে তো তুমি খৃষ্টান! আমাকে সব-কিছু বুঝিয়ে বলো।'

আমি বললুম, 'থাক। ফেরার সময় দেখা হলে হবে।'

তাড়াতাড়ি বললে, 'সরি, সরি। তুমি বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। ঐ তো সামনে গ্রাম। আমার বাড়িতে একটু জিরিয়ে যাবে?'

আমি টেরমেরের স্মরণে শুধালুম, 'তোমার বউ বুঝি টেরেমেরের [illegible]ডিয়ের মত খাণ্ডার নয়?'

সে তো অবাক। শুধালে 'ওকে তুমি চিনলে কি করে?' আমি সব-কিছু খু[illegible] বললুম। ভারী ফুর্তি অনুভব করে বললে, 'টেরমের একটু দিল-দরিয়া গোছ লোক আর তার বউ একটু হিসেবী—এই যা। [illegible]ার এ-সব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করলেই চিন্তা বাড়ে। যুদ্ধের সময়, আমার এক জর্মনের সঙ্গে আলাপ হয়—সে বুলগেরিয়াতে বিয়ে করে বসবাস করছিল। তিন বছর সুখে কাটাবার পর একদিন তার স্ত্রীর এক বান্ধবী তাকে নির্জনে পেয়ে শুধলে, "তুমি তোমার বউকে ভালোবাসো না কেন—অমন লক্ষ্মী মেয়ে।" সে তো অবাক। শুধোলে, "কে বললে? কি করে জানলে?" বান্ধবী বললে "তোমার বউই বলেছে, তুমি তাকে তিন বছরের ভিতর একদিনও ঠ্যাঙাওনি!" শোনো কথা!'

আমি অবাক হয়ে শুধলুম আমি তো বুঝতে পারছিনে।'

সে বললে, 'আমিও বুঝতে পারিনি, প্রথমটায় ঐ জর্মন স্বামীও বুঝতে পারেনি। পরে জানা গেল, মেয়েটা বলতে চায়, এই তিন বছর নিশ্চয়ই সে কোনো না কোনো পর-পুরুষের সঙ্গে দু'একটা হাসিঠাট্টা করেছে, স্বামী দেখেছে, কিন্তু পরে ঠ্যাঙায়নি। তার অর্থ স্বামী ওকে কোনো মূল্যই দেয় না। সে যদি কাল কোনো পর-পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যায় তবে স্বামী কোনো শোক করবে না, নিশ্চিন্ত মনে আরেকটা নয়া শাদী করবে। ভালবাসলে ওকে হারাবার ভয়ে নিশ্চয় ওকে ঠেঙিয়ে সোজা রাখতো।'

আমি বললুম, 'এতো বড় অদ্ভুত যুক্তি!'

'আমিও তাই বলি। কি[illegible] ঐ করে বুলগেরিয়া চলছে। আর দেশে বউকে কড়া কথা বলেছে কি সে চলল ডিভোর্সের জন্য! তাই তো তোমায় বললুম, ওসব নিয়ে বড্ড বেশী ভাবতে নেই। লড়াইয়ে বহু দেশের জাত-বেজাতের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। অনেক [illegible]ছি। অনেক শিখেছি।'

আমার মনে পড়ল [illegible] দেশবাসী রেমার্কের 'পশ্চিম রণাঙ্গন [illegible]চুপ' বইখানার কথা। সেখানে তো সব [illegible] সেপাই বাড়ি ফিরেছিল—অর্থাৎ যে ক[illegible]াদপেই ফিরেছিল—সর্বসত্তা তিক্ততায় [illegible]ঞ্জিত করে। আদর্শবাদ গেছে, ন্যায়-[illegible]-বোধ গেছে; যেটুকু আছে সে শুধু [illegible] সঙ্গে কাঁধে

কাটিয়েছে অহরহ মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে তাদের জন্য। দেশের জন্য আত্ম-দান, জাতির উন্নতির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ, স্বদেশকে পরাজিত করার জন্য জীবন-দান—এর বদলে মারমুখো হয়ে বেআইনী পিস্তল নিয়ে তাড়া লাগায়।

নাসপাতিওলাকে শুধোতে সে বললে সে বইটই পড়ে না। খবরের কাগজ পড়ে কাদের খবর জানবার জন্য, আর নিতান্তই যদি কোনো রগরগে খুন কিংবা কেলেঙ্কারী কেচ্ছার বয়ান থাকে। তবে হ্যাঁ, ওর মনে পড়ছে ফিল্মটা নাকি জর্মনিতে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল—ওর মেয়ের মুখে শোনা। আমি শুধোলুম, 'ছবিটা দেখে ছেলেছোকরা-দের লড়াইয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা হবে বলে?' বললে 'না, ওতে নাকি জর্মনদের বড় বর্বর-রূপে দেখানো হয়েছে বলে।' তখন আমার মনে পড়ল, ফ্রান্সেও দেখাবার সময় যে অংশ ফরাসী নারীরা ক্ষুধার তাড়নায় জর্মন সেপাই-দের কাছে রুটির জন্য দেহ বিক্রয় করার ইঙ্গিত আছে সেটা কেটে দেওয়া হয়।

অনেকক্ষণ দুজনাই চুপচাপ। নাসপাতি-ওলা ভাবছে। হঠাৎ বললে, 'পিছন পানে তাকিয়ে আর লাভ কি? যারা মরেছে তারা গেছে। যারা পাগল হয়ে গিয়েছে, যাদের মুখ এমনই বিকৃত হয়েছে যে দেখলে মানুষ ভয় পায়, যাদের হাত-পা গিয়ে অচল হয়ে আছে নিছক মাংসপিণ্ড, তাদের বড় বড় হাসপাতালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে আর আত্মীয়স্বজনদের বলা হয়েছে তারা মারা গিয়েছে—এরাও নাকি ফিরে যেতে চায় না। আর আমার হাল তো দেখছ।

আমাদের গ্রামের সব কিছু থিতিয়ে যাওয়ার পর একটা ট্র্যাজেডি দিকে সকলেরই নজর গেল। একটা ছেলে গ্রামে ফিরে এসে শোনে, তার অবর্তমানে তার বাগদত্তা মেয়েটি পরপুরুষের সংগে প্রণয় করেছিল। এতে আর নূতন কি? লড়ায়ের সময় সব দেশেই হয়েছে এবং হবে। মেয়েটা তবু পাপে মজেছে—জারজ সন্তান হয়নি। আর সে দুদিনের প্রেমিক কবে কোথায় চলে গেছে কে জানে।

এ অবস্থায় আর পাঁচটা দেশে অন্য মেয়ে কিংবা ক্ষেমাঘেন্না করে আগেরটাকেই বিয়ে করে। এ হয়ে গেল উলটো। সমস্ত দিন ছায়ের মত ঘরে বেড়ায়, কারো সংগে কথাবার্তা কয় না, আমাদের পীড়াপীড়িতেও বিয়ার খেতে আসে না। মেয়েটা নাকি একাধিকবার তার পায়ে ধরে কেঁদেছে। সে কিছু বলে না।

ছোট গাঁ, বোঝো অবস্থাটা। গির্জেয়, রাস্তায়, মুদির দোকানে প্রতিদিন আমাদের একে অন্যের সংগে যে কতবার দেখা হয় ঠিকঠিকানা নেই। মেয়েটা করুণ নয়নে তাকায়, ছেলেটা ঘাড় ফিরিয়ে নেয়। আমরা যারা তখন সামনে পড়ি, বোঝো আমাদের অবস্থা। ছেলেটা সামনে পড়লে আমাদের মুখ গম্ভীর, মেয়েটা সামনে পড়লে অন্যদিকে তাকাই, আর দুজনা সামনে পড়লে তো চরম। ছেলেটা যখন মুরুব্বী, পুরনো দিনের ইয়ার-বক্সী ইস্তেক পাদ্রী সায়েব কারো কথায় কান দিলে না তখন মেয়েটাকে বলা হল সে যেন অন্য একটা বেছে নেয়। যদিও বরের অভাব তবু সুন্দর এবং পয়সাওয়ালার মেয়ে বলে পেয়েও যেতে পারে। দেখা গেল, সেও নারাজ।'

নাসপাতিওলা রাস্তায় থেমে বলল, 'এই যে বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি। চলো ভেতরে।'

আমি বললুম, 'না ভাই, মাফ করো' 'তবে ফেরার সময় খবর নিয়ো। বাড়ি চেনা রইল।' আমি বললুম, 'নিশ্চয়। কিন্তু ওদের কি হল?'

'কাদের? হ্যাঁ, ঐ দুজোর। একদিন ঐ হোথাকার (আঙ্গুল তুলে দেখালে) ডোবায় পাওয়া গেল লাশ।'

আমি শুধালুম, "ছেলেটার?"

'না মেয়েটার।' 'আর ছেলেটা?' 'এখনো ছায়ের মত ঘরে বেড়ায়। এক্ষুনি আসবে। থাকো না—আলাপ করিয়ে দেব।' আমি পা চালিয়ে মনে মনে বললুম, এ গ্রাম বিষবৎ পরিত্যজ্য।

শতবার্ষিকী-সমীক্ষা

হিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯৬১ সালের সমগ্র দেশ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করতে উৎসুক হয়ে উঠেছে। এই সূত্রে বর্ষব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর বিশ বছর যাবৎ ২৫শে বৈশাখের দিন যে দীপ্ত মুখর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে আজ বৎসরব্যাপী অনুষ্ঠানে তারই চরম রূপ ফুটে উঠেছে। মহাপ্রাণ মহাকবির প্রতি দেশব্যাপী, এমন কি বিশ্বব্যাপী, এই স্মৃতি-তর্পণকে রবীন্দ্রানুরাগী মাত্রেই নিঃসন্দেহে অভিনন্দিত করবেন। রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর মুগ্ধ হৃদয়ে আপন গৌরবে সমাসীন আছেন, এ কথার এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কী হ'তে পারে?

কিন্তু সন্দেহ করবার কারণ ঘটেছে যে এই মহোৎসব শ্রদ্ধেয় হলেও সম্পূর্ণভাবে সত্য কি না। অর্থাৎ শ্রদ্ধার জাতীয় এই প্রকাশ থেকে আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের যতখানি মূল্য সূচিত হয়, রবীন্দ্রনাথকে সত্যই আমরা ততখানি মূল্য দিই কি না? সংশয়ের অবকাশ ঘটেছে যে একদিকে যেমন আমরা রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির সৌধকে গগনচুম্বী ক'রে তুলছি, অন্যদিকে তলে তলে সেই সৌধের ভিত্তি জীর্ণ হয়ে পড়ছে, হয়তো একদিন সমস্তটাই ধ্বসে পড়ে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। এই সংশয়ের মূলে এই সন্দেহটি রয়েছে যে ওপরে ওপরে আমরা যতই রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূজা করি না কেন, তলে তলে আমরা হয়তো এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে ভুলতে, এমন কি—অস্বীকার করতে শুরু করেছি। শত-বার্ষিকী জয়ন্তীর এই মহাসমারোহের মধ্যে এ কথা অবশ্য নিতান্তই বিসদৃশ মনে হবে। তাই বক্তব্যটি পরিষ্কার করা প্রয়োজন। কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

যে বাঙলা ভাষাকে সারাজীবনের সাধনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন, একদল সাহিত্যিক তাকে নানাভাবে অক্ষম ও অসম্পূর্ণ বিবেচনা করে তার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়ে তার মধ্যে নানা বিজাতীয় দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করতে লেগেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষাই বাঙলা ভাষার শেষ পরিণতি ও চরম উৎকর্ষ কিনা সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র আলোচনা সাপেক্ষ। সর্ববিষয়েই সতাকার প্রগতি কাম্য ও শ্রেয়, এ কথাও স্বীকার্য। কিন্তু যে অশোভন তৎপরতা ও ধৃষ্টতার সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সংস্কার সাধনের চেষ্টা চলেছে সেইটেই আক্ষেপজনক। আবার অপর পক্ষে কিছু অতি আধুনিকের দল রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে 'সেকেলে' নাম দিয়ে তার মধ্যে দুঃসহ লঘুতা ও প্রগলভতার সঞ্চার করে তাকে 'হাল-ফ্যাশানী' করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

বর্তমান বাঙলা কাব্যকে ধরা যাক। রবীন্দ্র কাব্যের 'মিস্‌টিসিজম' ধোঁয়াটে, তার আশাবাদ অবাস্তব ও আধ্যাত্মিকতা প্রতিক্রিয়া-ধর্মী—এসব সমালোচনা আজ নতুন নয়, বরঞ্চ অনেক পুরোনো। এসব বাদানুবাদ সত্ত্বেও পনেরো কুড়ি বছর পূর্বেও এমন সংস্কৃতিমান বাঙালী কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ যাঁর সত্তা ও স্বপ্ন অন্তত আংশিকভাবেও রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় ক'রে গড়ে ওঠেনি। আজ এমন তরুণ তরুণী বিরল নয় যে রবীন্দ্র-কাব্যে নিজের জীবনের প্রাণীন উপাদান খুঁজে পায় না। আজকের দিনের বাঙলা কাব্যে রবীন্দ্র-নাথকে সহজে খুঁজে পাই না। হয়তো সেখানে রবীন্দ্র-কাব্যের আত্মার অগোচর ছায়া-সম্পাত ঘটে থাকে, কিন্তু তার স্থূল চেহারাটার কোনো পরিচয়ই পাই না। রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা-কাব্যের গুণাগুণ বিচার করার এ স্থান নয়। আমার শুধু এই প্রশ্ন যে বাঙালীদের জাতীয় মানস-প্রকৃতি কি কয়েক বছরের মধ্যে এতই বদলে গেছে যে রবীন্দ্র-কাব্যের বিশাল জগতকে বর্জন করে তার বাইরে নতুন দুনিয়ার সন্ধান না করলেই নয়? আমাদের কাব্যেও কি স্পুটনিক-যুগপ্রবর্তন করার কোনো অনিবার্য কারণ ঘটেছে? এখানেও ব'লে রাখি, বাঙলা-কাব্য-প্রকৃতি রবীন্দ্র-কাব্যে এসেই স্থবিরত্ব লাভ করে ক্রমে মুমূর্ষু হয়ে পড়ুক, তার
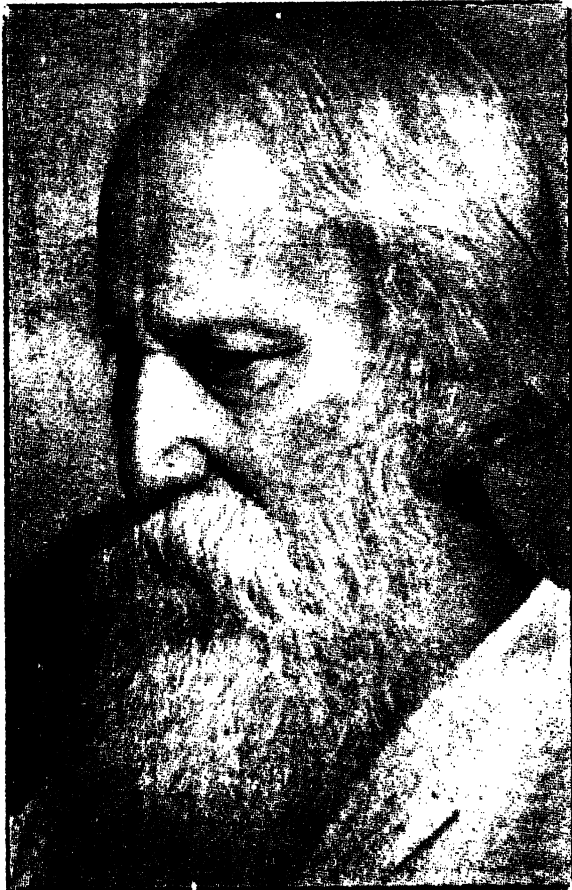
মধ্যে নবীন সৃষ্টি চেতনা উৎসুক হয়ে উঠবে না—এমন কোনো উৎকট রকমের অতীত-পূজা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার প্রশ্ন, বাঙলা-কাব্যের এই নূতনের অভিসারের পিছনে কতখানি সত্যকার অনুপ্রেরণা আছে, এবং এই অনুপ্রেরণার যথার্থ মূল্য কী, এবং এই নবীনতা বিলাস বাঙলা-কাব্যের দিক থেকে কতখানি শুভ? এবং এই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন জাগে, রবীন্দ্রনাথ সত্যই কি আমাদের কাছে এতখানি অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছেন? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে সত্যকার অপূর্ণতা কার, রবীন্দ্র-কাব্যের না আমাদের?

রবীন্দ্র সংগীতের পরিস্থিতিও খুব গৌরবজনক নয়। রবীন্দ্র-সংগীতের প্রসার নানাকারণে পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সে সত্ত্বেও বেশ বুঝতে পারা যায় বাঙলার সংগীতানুরাগী জনসাধারণের সত্যকার আকর্ষণ কোনদিকে। ফিল্ম সংগীতের সার্বভৌম একচ্ছত্র আধিপত্যের কথা ছেড়ে দিলে এ যুগের শিক্ষিত বাঙালী ছেলে-মেয়ের আন্তরিক টান 'আধুনিক' গানের দিকে যার মধ্যে সব কিছুই মেশানো আছে, নেই কেবল রবীন্দ্র-সংগীতের অননুকরণীয় 'পিউরিটি' ও আভিজাত্য, নেই তা'র নিটোল রসোত্তীর্ণ সম্পূর্ণতা। আজ 'অনুরোধের আসর'-এ রবীন্দ্র-সংগীতের জন্যে ক'জন অনুরোধ পাঠান সে হিসেব করলেই এ প্রশ্নের সমাধান হবে। আর্টের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সংগীতেও জাতির নবনব উন্মেষশালিনী প্রতিভার বিকাশ হোক, এ কামনা খুবই সংগত; বাঙালীর সাংগীতিক সৃষ্টি রবীন্দ্র-সংগীতে এসে থেমে যাক, এ আমারও কাম্য নয়। কিন্তু বিবর্তন 'ডেকাডেন্স'-এ পর্যবসিত হলে আক্ষেপ হয় বৈকি। উত্তমের অনাদর আর অধমের সমাদর বেড়ে ওঠাই তো 'ডেকাডেন্স।' স্বল্পদিন হোলো, এক সাংস্কৃতিক অধিবেশনে কিছুক্ষণ রবীন্দ্রনাথের গান ও আবৃত্তির পর একজন শ্রোতা কিছুটা অধৈর্যের সুরে বলেছিলেন, "আজ কি কেবল রবি-ঠাকুরই হবে?" কিন্তু আজকের পালা যদি এর উল্টো হ'তে থাকে, অর্থাৎ সবই থাকবে, কেবল থাকবেন না রবি ঠাকুর, অথবা থাকলেও থাকবেন কার্য-সূচীর এক ছোট্টো ভগ্নাংশ জুড়ে, তাহলে বলতেই হবে "মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে।"

এই পরিস্থিতির পটভূমিকায় শতবার্ষিকী জয়ন্তীর একটি বিশেষ তাৎপর্য প্রতীয়মান হবে। এই মহৎ অনুষ্ঠান যদি কেবল বাহ্যিক সমারোহেই পর্যবসিত ও পরিসমাপ্ত হয় তাহলে তা অনেকখানি ব্যর্থ হবে। এর একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত আমাদের সেই মূল্যবোধকে জাগ্রত ক'রে রাখা, সেই রসবোধের কষ্টি-পাথরকে অম্লান রাখা, যার পরখে রবীন্দ্র সৃষ্টির যা কিছু সোনা তা আমাদের চোখে উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে ফুটে উঠতে পারে। বাঙালীর সংস্কৃতিকে যেসব মহান স্রষ্টার সৃষ্টি এতাবৎকাল নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে তাঁদের প্রতি আমাদের যথাযোগ্য শ্রদ্ধা অটুট থাক। বাঙালীর সৃজনী প্রতিভা পূর্বসূরীদের অঙ্কিত পথে নব নব সৃষ্টির অভিযানে উদ্যমশীল হোক। এ তো সকলেরই কাম্য। কিন্তু আমাদের বিশাল ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করার মতো মূঢ়তা বা দীনতা যেন আমাদের না আসে। এবং এই ঐতিহ্যের যা পরমোৎকর্ষ, রবীন্দ্রনাথের সেই বহুমুখী আশ্চর্য অবদানকে আধুনিকতার অন্ধ মোহে আমরা যেন অনাদর না করি। কোনো বিরাট প্রতিভার, সে সাহিত্যে শিল্পে দর্শনে ধর্মে যে দিকেই হোক—অন্তর্ধানের পর একটা প্রতিক্রিয়া জেগে ওঠা অবশ্য অস্বাভাবিক বা বিরল নয়। এই প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যা অসার ও অলীক তার অচিরাৎ সমূহ মৃত্যু ঘটে, যা যথার্থ ও সারবান তা থেকে যায়। কিন্তু যিনি মহান পূর্বসূরী, তিনি আপন প্রাণধর্ম ও সত্যের বলে আবার যুগে যুগে আবিষ্কৃত ও সমাদৃত হন। রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃজন সম্ভারে যেটুকু অকিঞ্চিৎকর তা আপনা থেকেই ঝ'রে পড়বে। সে বিষয়ে সবচেয়ে নির্মোহ ছিলেন তিনি নিজে। কিন্তু তার যা খাঁটি সোনা তা কালের সংঘাতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে থাকবে। অতএব রবীন্দ্রনাথের জন্য দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। দুশ্চিন্তা আমাদের নিজেদের জন্যে। কারণ তাঁর অনাদরে অবজ্ঞায় ও বিস্মৃতিতে বঞ্চিত হব আমরাই। যে অমিত সুধাভাণ্ড তিনি আমাদের জন্যে ভরে রেখে গেছেন তা'র বিন্দু বিন্দু আহরণ করে আমাদেরই জীবন অমৃতে ভরে উঠতে পারে। যে-দিব্য-আলোকময় আকাশ তিনি রচনা ক'রে গেছেন তা'র উত্তাপ নিশ্বাস গ্রহণ ক'রে আমরাই অক্ষয় জীবনীশক্তি সঞ্চয় করতে পারি। আজীবন সাধনায় যে উদাত্ত ছন্দ তিনি ধ্বনিত ক'রে গেছেন তা উদ্দীপ্ত করবে আমাদেরই চিত্তকে, আমাদেরই প্রাণে আনবে শান্তি, প্রেমে আনবে মদিরতা, কর্মে আনবে কল্যাণের স্পর্শ। তাই এক মহান স্বার্থের চিন্তা নিয়েই এই শতবার্ষিকীর উৎসব আমরা যেন অনুষ্ঠিত করি। আমাদের অন্তরের আকুতি, গভীর হৃদয়ের আহ্বান, পবিত্র আত্মনিবেদন তাঁর অমর আত্মাকে আমাদের চেতনায় নিত্যজাগরূক ক'রে রাখবে। কারণ তিনিই তো আশ্বাস দিয়েছেন:

> "আবার যদি ইচ্ছা করো আবার আসি ফিরে
> দুঃখসুখের ঢেউ খেলানো এই সাগরের
> তীরে।"

শতবার্ষিকী উৎসবের জয়ধ্বনির মধ্যে দিয়ে সমগ্র জাতির সম্মিলিত ইচ্ছা ও আবেদন ধ্বনিত হোক দেবলোকে আর নেমে আসুক আমাদের সকলের অন্তরে তাঁর অকৃপণ চন্দনের আশীর্বাদ।

নলে ধো[illegible] মেয়ে, নেমি

খগেন দেসরকার

গোলাপী রঙের রেশমী শাড়িটা নিচ থেকে উপরে যেন প্যাঁচ খেয়ে খেয়ে উঠছে, দেহের স্তর ভরতে ভরতে। বেশ এক নরম ছোঁয়ায়, চমৎকার এক ভালো-লাগায় নেমির মনটাও ভরে উঠছিল।

পায়ের পাতার উপর ভর করে নেমি নিজেকে দেখে; দেয়ালে টাঙানো, ময়লা, আড়াআড়ি-ভাঙা, ছোট একটা আয়নাতে নেমি নিজেকে দেখে আর ভাঙা জায়গায় চোখ ঠেকলেই তার বিশ্রী লাগে।

যৌবন নেমির দেহ ভরেছে। মন ভরতে পারেনি এখনও। বারে বারে সে নিজেকে দেখে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দু একবার আরও যেন কিছু বেশী দেখতে চেষ্টা করে।

ঘরের ওপাশে, বেড়ার আড়াল থেকে ওর মা নেমিকে ডাকে।

নেমি শুনেও শোনেনি। ওর সারা গায়ে এখন দামী তুলতুলে গোলাপী শাড়ি। যে শাড়ি তার শরীর ঢেকেও ঢাকে না।

—ঐ নেমি, বলি শুনছিস না? তোর বাপ যে ডাকছে; গিয়ে কাপড়গুলো ধর।

নেমির চোখে তখন সুধীর। মোটাসোটা ফ্যাল-ফ্যাল-চোখ সুধীর। এই দামী রেশমী শাড়িতে সুধীর ওকে দেখলে যা দেখত, নেমি নিজেই যেন তা দেখছিল। শুধু সুধীরই কেন। সুধীরদের পাশের বাড়ির পরেশ, বেঁটে লিকলিকে, গলার উঁচু তিন-কোণা হাড়টা জল খাওয়ার সাথে সাথে যার ওঠানামা করে।

নেমি জানে সুধীর এলে ঘরের ঐ কোনটায় বসবে, বসবে গাদা করা কাপড়ের পাহাড়ের ওপর। তার পাশে কাঠের বড়ো সিন্দুক, উপরে টানাটানা ভাঁজ করা কাপড় বিছানো। ইস্ত্রির কাজ হয় ওখানটায়। আর রাত্রি হলেই সব ধোয়া-না-ধোয়া কাপড়ের গাদা ঢুকে যায় সিন্দুকের ভেতর। নেমির বাবা পাড়ার নামকরা ধোপা; বড় ভলো মানুষ। সিন্দুকের উপর রাত্রে শোবে। কখন কি হয় বলা যায় কি? চোর ডাকাত তো আশেপাশে ঘুরছে; আর অতো কাপড় চোপড়; তার উপর বাবুদের বাড়ির দামী শাড়ি কাপড়!

পেকাটির বেড়ার আর কতো আড়াল। ন্তি হাতে নেমির মা, নলিনী, যাকে পাড়াসুদ্ধ সকলে ডাকে 'নলে' বলে, [illegible] নানারকম গালাগালির ফোয়ারা ছুটিয়ে মেয়ের কাছে এল। নলে পাকা সজনে কাঠির মতো। নেমির বাবার মতোই হাত-মুখ-পা রোদে পোড়া। ছড়ানো পায়ের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে জল ভেজার সাদা ঘা।

তোর বাবা যে ডেকে ডেকে সারা, কাজে গিয়ে হাত দেনা, হারামজাদী। ও,—আবার ঐ শাড়ি পরেছিস? তোকে কদ্দিন বলেছি পরবিনি। ছিড়লে ফাটলে দাম দিবি, দিতে পারবি না-কি বাবুদের?

মেয়েও কম নয়। জবাবে সে শোনায়: তা, তোর কী? কে ধোয়? কে ইস্ত্রি করে? তুই না আমি? হাজারবার পরব। নেমি কি কাপড় কামড়াচ্ছে? একটু পরেছি, আর অমনি তুই পেছনে লাগলি। তা' দে না একটা শাড়ি, কদ্দিন বলছি দে দে একটা ভাল কাপড় কিনে দে, আমার নিজের একটা কাপড়। সে-বেলায় নেই। একশোবার পরব, যা তুই।

নেমিটা অমনি। একটিমাত্র সন্তান, ঐ ছেলে ঐ মেয়ে। শান্তশিষ্ট গোবেচারী নেমির বাবা একলা আর কতো খাটে। নেমি বাপের সঙ্গে পুকুর-ঘাটে নেমে, [illegible] করার কসুর করে না। বিশেষ করে দামী জামা কাপড়। ওসবের সমস্ত ভার নেমির উপর। ধোবে, শুকুবে, ইস্ত্রি করে, ভাঁজ করে, দরকার হলে বাপের সঙ্গে গিয়ে পোঁছে অবধি দেবে।

ওর যে কী হয়েছে, দিনরাত ঐ শাড়ি শাড়ি। ফ্যাসন-দুরস্ত কোনো মেয়েকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখলে নেমি ফিরে ফিরে দেখে, মেয়েটাকে নয়, তার শাড়িকে। কী রঙ, কেমন করে পরেছে, কেমন মানিয়েছে—মনের কোণায় ঐ-সব কথা। কতো না কুশ্রী মেয়ে গায়ে পয়সার কতো বাহারই না দেখায়। জবুথবু চলে, যেমন-তেমন মতে দামী রঙচঙ শাড়ি গায়ে জড়িয়ে চলে সাজানো ব্যাঙ!

—কী সং গো! নেমি একবার বলেই ফেলল রাস্তায় এক মেয়েকে দেখে। বাপের
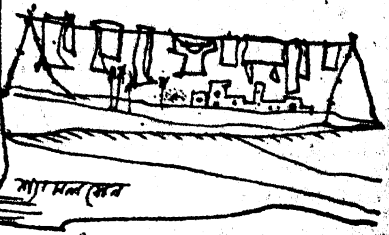
সেজে নেমি যাচ্ছিল ও-পাড়ায়। সে-মেয়েও ছাড়বে কেন, শুনে ফেলেছে যখন। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কী ঝগড়া। "ধোপার মেয়ের মুখে কথা শোনো না!"

"ধোপার মেয়ে হয়েছি তো তোমার কি [illegible]?"

নন্দ মেয়েকে চেনে। বেশি ঘাঁটাতে সাহস করে না। মেয়ের অদ্ভুত স্বভাব দেখে মাঝেমাঝে প্রমাদও গোনে। এই হেসে কুটিপাটি, এই রেগে আগুন; কাজে লাগল তো থামবে না, আবার বসে রইল তো রইলই। কী যেন ভাবে তখন মাঠের দিকে চোখ রেখে; নয়ত পায়ের নখ খোঁটে।

নন্দর মুখ থামেনি। ঢক্কানিনাদে ঘোষণা করে গেল, কে বা কারা তার মেয়েকে নষ্ট করছে, এবং ইচ্ছা করলে নেমির বাবা, যে নাকি অপ্রিয় কথার গোড়াতেই কানে আঙুল গোঁজে, সে নেমিকে এখন কাঁধে করে যে-তালে খুশি সে-তালে, কি বেতালে, ধেইধেই নৃত্য করতে পারে।

মেয়ে ততক্ষণ রেশমী কাপড় ছেড়ে পরে নিয়েছে ময়লা সাধারণ একটা ডুরে শাড়ি। নিজের নয়; গাদা করা অন্যদের একটা।

ডেরাঘরের কোণায় সাবধানে বোস বাড়ির মেজবৌদিদির গোলাপী রেশমী শাড়িটা রাখতে রাখতে নেমির একবার মনে হল— ভাবভরা চোখ, ভাল মানুষ, নেমি-পাগলা সুধীরকে একবারটি দেখাতে পারল না ঐ রেশমের গোলাপীতে কী খোলতাইটা না হয় নেমি!

এবার পুকুর-ঘাটে ধাপা ঘাটে যেতে হবে। বাপ রাস্তা চেয়ে দাঁড়িয়ে, বাসার কাছেই। একটার পর একটা কাপড়, ধোয়া সাদা কাপড়, দুজন ধরবে, টানটান করবে দু পাশ থেকে দুজনে, একবার এই কোণা ধরে, আরেকবার অন্য কোণা ধরে। তারপর ঘাসের উপর শুইয়ে দেওয়া। বাঁশের তে-কাঠিতে টানা দড়িতে ঝোলাবে সার্ট, পাঞ্জাবি, ব্লাউজ, কতো কিছু। তখন চারদিকে যেন রঙের বাহার! কতো যে রঙ, লোকের কতো না শখ, কতো না পয়সা।

কাজ করতে করতে বাপকে অনুযোগ করে বলে ঃ কদ্দিন থেকে বলছি, আমায় একটা কাপড় কিনে দাও। ভাল একটা শাড়ি। নিজের একটা শাড়ি। লোকের কথা শুনে শুনে আমার আর ভাল লাগে না।

—কানুরে, কী হল আবার! দেব বই কি, দাঁড়া, বোসবাবুরা পুজোয় কিছু দিলেই, তোকে তোর পছন্দ মত একটা কিনে দেব। কী বলিস!

—হ্যাঁ, তুমি আর দিয়েছ। তোমাকে তো আর ঠেস দিয়ে কথা শুনতে হয় না!

নেমির খুব লেগেছিল পরেশের বোন টুনির খোঁটা দিয়ে কথা। টুনি আর নেমির মাখামাখির অন্তরালে বাড়তিমুখী একটা আক্রোশের জ্বালাও ছিল। নেমির শরীরের বাঁধুনিটাই এমনি যে, ও যা পরে, যা গায় দেয়, তাতেই মানায়; একটু ভাল কাপড় আরো মনোহারী করে তোলে পাড়ার ছেলেদের কাছে। সুধীরের কাছে তো বটেই। অথচ টুনিদের দুটো পয়সা আছে; এবং নিজের কেনা, নিজের জামাকাপড়েও সে অতটা মন-টানা মেয়ে হতে পারেনি। খানিক আক্রোশ সুধীরকে নিয়েও।

পরেশের কাছে হামেশাই আসে সুধীর। প্রায় বাড়ির লোকের মতো। আর টুনির ধারণা নেমি অন্যায়ভাবে সুধীরকে আকর্ষণ করে নিয়েছে, এমন কি খেলিয়ে বেড়াচ্ছে ওর ঐ শরীর দুলিয়ে।

টুনি তাই ঠেস দিয়ে সেদিন বলেছিল ঃ ওমা, একেবারে রাজকন্যে সেজে যে! তা, তোর রাজপুত্তুর কোথায় রে?

—তার খোঁজেই এলাম। বের করে দে—

—বের করব আমি কেন রে? সে তো নাকি তোর আঁচলের গেরোতে।

—কী যে বলিস; আমরা হলাম গরীব লোক, পরের ময়লা ঘাঁটি, পরকে বলে [illegible], রাজকন্যে সাজাই। আমাদের আবার আঁচল, তারও আবার গেরো!

—ওরে সে কথা বলছিস আজ, নেমি।

—না, তাই বলছিলাম। গেরো থাকবে তোদের; বড় বড় গেরোতে বড় বড় রাজপুত্তুর। তোদের পয়সা আছে, পয়সা [illegible] পরের ময়লা কাচা করে ছাড়তে দিয়েছিস। তোর সঙ্গে আমার তুলনা!

টুনি গলায় এক প্রলেপ মিষ্টি বেশি মাখিয়ে বলল, তা বল, সাধ মিটিয়ে বল। আমরা তো পরের জিনিস গায়ে চড়িয়ে তার সুন্দরী সাজিনে, পরের মন ভোলাতে বেরুই নে। আর যা-কে ভোলাতে বেরোস, সেও দেখিস তোর মতন মেয়েকে কোন ঘাটে নিয়ে যায়! সুধীরের মাকে তো চিনিসনি। তোকে ঝাঁটাপেটা করে তাড়িয়ে দেবে!

নেমির সর্বাঙ্গে যেন, বারবার আগুনের ঝাঁকা লাগছিল। [illegible] দুলে দুলে আঁচলে উঠল। এ মেয়ের মুখের কাছে দাঁড়ানোও মুশকিল, তার জিব যেন অসাড় হয়ে গেল সেদিন, যখন চোখে আঙুল দিয়ে তাকে জানিয়ে দেওয়া হল যে, পরের ময়লা ঘাঁটলে ময়লা হয়েই থাকতে হয়।

কথাটি না বলে নেমি বারান্দা থেকে নেমে সোজা চলে গেল নিজের বাসায়। সেই স্তূপীকৃত জামাকাপড়, ধোঁয়াটে ইস্ত্রির সোডা, গন্ধ-ওঠা ভাতের মাড়, আর ঐ আড়াআড়ি কাটল-খাওয়া আয়নাটার কাছে।

আর কোনোদিন অন্যলোকের ভাল জামাকাপড় পরে নেমি বেরোয়নি। বাপকে হামেশা তাগাদ দিত ঃ আর কতো বলব, একটা ভাল শাড়ি-কাপড় কিনে দাও। পরের জামাকাপড়ে আমি আর বেরুতে

পারব না, বলে দিচ্ছি। আমার আর লজ্জাশরম নেই!

তবুও একলা হলে মাঝে মাঝে পারে। ঘরের ভিতর। সুন্দর, রঙিন শাড়ি ব্লাউজ ঘরে এলে গোপনে একবার দুবার পরে। ভাঙা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রূপকে অপরূপে মনে করে।

আগে এমনি হয়েছে যে, সুধীরকে নিজেদের ঘরে একলা পেলে, ভাল একখানা শাড়ি পরে ওকে দেখাবে। প্রথম প্রথম সামনে এসে ঘুরে যেত, সুধীরের চোখের দিকে এক পলক চেয়ে। সুধীর অনুরোধ করবে : "তা দাঁড়া না একটু।" "আহা!" বলে নেমি হাসবে।

শেষে এমনও হয়েছিল যে, নেমির ওটা যেন একটা খেলা হয়ে দাঁড়াল। সুধীরকে ঘরের কোণায় বসিয়ে ওকে শাড়ির পর শাড়ি বদলিয়ে দেখাত। কোনোবার নীলাম্বরী, কোনোবার কচুপাতা-সবুজে রঙ, না হয় তো ডগডগে পাকা লঙ্কার ঝাঁঝালো রঙ। একটার পর একটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরত। বদলানোর সময় সুধীরকে শাসন করে বলত : "ঐ দিকে চেয়ে থাক।" বদলানোরও বেশ কায়দা নেমির। উপর থেকে জড়িয়ে নিয়ে এমনভাবে বদলানো শেষ করবে যে, কোথাও কেউ একটু বেয়াদবি পাবে না।

সুধীরকে শেষটায় বলতেই হবে কোন্ শাড়িটাতে সব চাইতে বেশি মানিয়েছে নেমিকে। কী যে মুশকিল হত বেচারার। "সবগুলোতেই তো ভাল দেখলাম। কী করে বলি বল?"

"তা হবে না, বলতেই হবে তোকে।"

"ঐ নীলটায়"।

"তুই একটা গরু" বলে নেমি চলে যেত সুধীরের গায়ে বাতাস ঠেকিয়ে।

পরের শাড়িতে কতো অপরূপই না সেজেছে কতদিন। লোকে দেখল কিনা, চুরি দেখল কিনা শাড়িটা পরের। নেমি নিজের দুঃখকে গায়ের জোরে আমল দেয়নি অনেকদিন। আর পারে না।

ওর মা-ই কি কিছু কম কথা শুনিয়েছে? কবে শাড়ি, দামী শাড়ি খোঁচা লেগে একটু ছিঁড়ে গিয়েছিল। কতো কথা! শুধু মারতে বাকি রেখেছিল। নিজের হাতে যত্ন করে রিপু করে দিয়ে না নেমির রেহাই।

নেমি বাপের সঙ্গে ঘাটে কাজের লেঠা চুকিয়ে তামা-পোড়া মুখে বাসায় ঢুকে দেখল সুধীর বসে আছে সেই কাপড়ের গাদার উপর। এক কোণায় আলগোছে ছাড়া রয়েছে বোস বাড়ির বৌদিদির গোলাপী রেশমী শাড়ি।

—কখন এলি? নেমি বলে।

—এই তো।

—তোর হাতে কীরে?

—পেয়ারা। নে না।

—আর কিছু পেলি নে। পেয়ারা? যেমনি তুই তেমনি পেয়ারা। দে।

কচকচ খেতে লাগল নেমি। আরেকটা সুধীরকে এগিয়ে দিয়ে হুকুম করল : খা।

সুধীরের না খেয়ে উপায় নেই।

বাইরে, একটু দূরে, নলে বড় গোল উনুনে কাপড়ের ভাটি চড়ানোর বন্দোবস্ত করছিল। একবার মুখ তুলে এদিকে চাইল, সুধীরের গলা শুনে।

নেমি আবার কথা পাড়ে।

—তুই রোজ রোজ আসিস কেন রে?

—এমনি, আবার কী। তোকে দেখতে।

—দ্যাখ না, ভাল করে দ্যাখ। কে না করেছে।

নেমি ইচ্ছে করে সুধীরের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

—অমন হাঁ করে চেয়ে থাকিস কেন? আর কিছু বললেই খালি হেঁ-হেঁ করে হাসিস।

—কী যে বলিস।

...ভেঙিয়ে নেমি কথা কাটে ঃ এদিক ...ক খালি তোক ছোঁক করিস, বেড়ালের ...তো। মুখ দিয়ে কথা সরে না, না রে?

—হেঁ হেঁ, কী যে বলিস তুই নেমি?

সুধীর আর নেমির ঐ রকম। মোটা শরীর, মোটা-বুদ্ধি সুধীর। কিন্তু মনটা ভাল। দাদা পয়সা করে লন্ড্রী দিয়েছে। সুধীরও সেই দোকানে বসে।

নেমি রেশমী শাড়িটার একটা কোণা আলগোছে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করে, বলতো, আমাকে কেমন মানাবে এটায়? তোর ভাল লাগবে?

—হেঁ হেঁ কী যে বলিস। তা ভাল লাগবে না? পর না দেখি।

—আহা, কী আমার শখরে! আমার আর কাজ নেই, তোর জন্যে সাজতে বসি। নেমি শাড়িটা তুলে ওর গলা থেকে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দেয় পা অবধি ঢেকে। আবার ছেড়ে দিয়ে জড়ো করে রাখে ডেরা-ঘরের কোণাটায়।

বলে ঃ 'তাও তো দেখিসনি বোস বাড়ির মেজবৌদিদি যখন ওটা পরে বেরোয়। তুই ঠাস করে অজ্ঞান হয়ে যাবি। তারপর জানিস, ও বাড়িতে কী একটা আয়না আছে মাগো। গোটা শরীর, জানিস, দেখা যায়!

নেমি কতবার যে ঐ বড়আয়নার কথা বলেছে ঠিক নেই। সুযোগ পেলেই বলে। বাবাকে বলেছে, মাকে বলেছে; সুধীর, টুনি, পরেশ কাউকে না বলে ছাড়েনি।

নেমি ছোটবেলা থেকে বোসবাবুদের বাড়ি যায়। প্রথমটায় বাপের সঙ্গে, বাপের হাত ধরে ছোট্ট একটি মেয়ে। এই পরের পাড়াটাতেই। বহুকাল নেমির বাবা ঐ বাড়ির কাপড় ধোয়। আর যত্ন করে ধোয় বলে, দিন-তারিখ মোটামুটি ঠিক রাখে বলে বাবুদের কাছে সুনামও আছে।

ছোট নেমি কবে বড় হয়ে গেছে। বেশিদূর কাপড়ের বাণ্ডিল নিয়ে একলা আর যেত না বাবা সঙ্গে না থাকলে। যেত শুধু ঐ বোস বাড়ি। আলতা পায়ে, মাথায় পুঁটুলি এক হাতে তুলে ধরে যখন ঐটুকু রাস্তা চলত, দু পাশে লোকদের চোখের তখন বিশ্রাম নেই। তা ঠেলাগাড়িওয়ালাই হোক, লেখাপড়া জানা ভদ্দরলোকই হোক, কি দোকানদারই হোক। তাদের চোখ কোণা-খামচি ঠুকরে বেড়ায়। কারোর চোখে ছুরি; কারোর চোখে আগুন; কারোর চোখে নেমন্তন্ন চিঠি।

বলে ধোপানীর মেয়ে নেমি অতোশতো দেখেওনি, ভাবেওনি। শুধু মাঝে মাঝে চেয়ে চেয়ে দেখেছে কে ওকে দেখছে। আর বলে বেশ বোসবাড়ির মেজবৌদিদি ঃ "ওমা, নেমি, তুই কবে অতো বড় হলি রে! বেশ তো হয়েছিস দেখতে।" ছোট-জাকে ডেকে দেখাত।

খাতির ওকে মেজবৌদিদিই বেশি করত। রোজ থেকে আসছে যাচ্ছে। ডেকে ওকে শোবার ঘরে নিয়েও কাপড় চোপড় ছেড়ে বলে, "নিয়ে যা, ভাল করে ধুবি।"

মেজবৌদিদির ভাল ভাল সব শাড়িগুলো নেমির মুখস্ত। "বৌদিদি, তোমার বেগুনে রঙেরটা তো অনেকদিন ধোয়াওনি।" কিম্বা "ওটা তো দিলে না, সেই যে ময়ূরের পাখার মতো রঙ বদলে বদলে যায়"। মেজবৌদিদি ঠাট্টা করত। "অতও দেখিস! বল দিকি আর কী কী রঙের আছে?"

এমনি একদিন গিয়ে দেখে মেজবৌদিদি গোলাপী রেশমী শাড়ি পরে কোথায় বেরুচ্ছে। "এই বেলা এলি? আয় আমার ... জামাকাপড় কয়েকটা শিগগির ... না।"

সেই ঘরে ঐ আয়না। তিনটে আয়না, বড় ... সঙ্গে ... আবার আলমারির দরজাতেও এই বড় একটা।

... দেখাতে না, তো ঠিক ভিরমি খেতিস। নেমি সুধীরকে আবার স্মরণ করিয়ে দেয়। 'আর কী আয়না রে! পা থেকে মাথা অবধি দেখা যায়। কিন্তু ... পথ নেই।'

সুধীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ঘন ঘন উবু, দুটো নাচায় শব্দ করে ঢোক গিলে।

গোলাপী মেজবৌদিদি ওকে একলা রেখে পাশের ঘরে কয়েকখানা ধোয়ার কাপড় আনতে গেল। অল্পক্ষণ। নেমি অসহায়, একলা, গোটা নিজের সামনে। হঠাৎ করে যেন আবিষ্কার করল নিজের দেহ-সৌষ্ঠবকে। কে আবার দেখে ফেলে, সেই লজ্জায় ভয়ে সরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে বৌদিদি পাঞ্জাবি পাজামা ধুতি দিয়ে বলল ঃ 'ভাল করে ইস্ত্রি করিস। ছোটবাবু সেদিন রাগ করেছে। কী ভাজপড়া ইস্ত্রি ছিল পাঞ্জাবিতে।'

—আর কী সুন্দর যে দেখায় মেজ বৌদিদিকে, যদি দেখতিস্,. যেন পরী! বাবা, কতো যে জামাকাপড় কতো বাহারের। ট্রাঙ্ক ভরা, সিন্দুক ভরা।

তোকে বল্। কতোবার তোর বাপকে বলি, যাও না গো, সাহস করে একবার সুধীরের মাকে বলগে। শুধু মাথা নাড়বে আর বলবে, না-না হয় না। লোকের মাথামুণ্ডু; হয় না, হয় না।"

শাড়িটার রঙ ঠিকরে মা-মেয়ের রোদ-পাকা মুখে ছোপ-ছোপ লেগে থাকে। নলে শাড়ির গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'তুলে রাখ; আসছে বুধবার ফেলুর বৌভাত। পরে যাবি।'

নেমির সঙ্গে সঙ্গে যেন সিদ্ধান্ত হয়ে গেল। বুধবার ফেলুর বৌভাত, সেই-দিনই তাহলে ঠিক রইল। সুধীর রোজ একবার দুবার তাগিদ দেয়ঃ "কী রে, কী হল? যাবি যে বলেছিলি।"

—যাবো তো বলেছিই। মায়ের ভয়ে তুইই আবার পিছ-পা হস্‌নে।

—রাখ রাখ, আমি কাকেও ডরাই না।

নেমির প্রস্তাবই ঠিক হল। যেদিন ফেলুর বৌভাত, সেদিন ঐ শাড়িটা পরে ওখানে যাবে। সুধীরও যাবে। তারপর হৈ-চৈ ডাকাডাকির ভিতর এক সময় দুজনে গা ঢাকা দেবে।

সুধীর মাথা নেড়ে ফোলা-গালে হেসে সায় দেয়, "তাই বেশ।"

হুড়মুড় করে বুধবারটা এসে গেল। বিকেলে নেমি মাকে আগে থেকে ফেলুদের বাড়ি পাঠিয়ে দিল। 'আমি চান করব, চুল বাঁধব। মাঠে দেওয়া কাপড়গুলো তুলে যাব। তুই চলে যা আগে। না হলে ফেলুর মা রাগ করবে।"

বেশ ধীরে আস্তে ঘাটে বসে ঝামা ঘসে ঘসে সাবান দিয়ে চান করল নেমি। ভাবনা ভাবতে বসেনি। কী আছে? ঐ তো কালিঘাট। নালাটা পেরিয়ে ডান-দিকে, দোকানপাট রাস্তা ভিড় ছাড়িয়ে। তারপর, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে আবার চলে আসবে সুধীরের সঙ্গে। ঐ চান্ করার মতই সহজ যেন। কোনো বিঘ্ন-চিন্তা মনে আসে না।

ভাঙা আয়নায় আজ যেন মুখখানা ধরে না। চুলে চিরুনি টানে। এব মুখ ভাবে, ওর মুখ ভাবে। এই একটা পুরোনো কথা নদীর স্রোতে কুটোর মতো তরতর করে ভেসে যায়, তলিয়ে যায়, নয়ত অন্য একটা কথা হয়ে পারের কাছে আসতে চায়।

সুধীর যেন একটা নিমিত্ত। গোপনে, শাড়িটা সুধীরের চাইতেও বড় হয়ে গেছে কখন।

সুধীরটাই বা কী? গেলেই পারতিস্ টুনির কাছে। এবার টুনি আরো রেগে যাবে। তা নেমি আর কী করতে পারে? রাগুক।

তোরঙ্গ থেকে শাড়িটা খুলে যত্ন করে পরল নেমি। এখানে ওখানে গোঁজে, ওখানটায় টান্‌টান্ করে। নেমি যেন গোলাপ হয়ে উঠল। ভাবল, একটিবার যদি ঐ মেজ-বৌদিদের আয়নাটায় দাঁড়াতে পারত।

অতো খুশি নেমি কোথায় রাখে। শুধু আঁচলের কাজকরা দিকটা কি করে ঘুরিয়ে ঘিরিয়ে রাখা যায়, নেমি অনেকক্ষণ সেটাতে ব্যস্ত থাকল। কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ওর শরীরের ছন্দ।

মুখখানা গামছা দিয়ে রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে আরো তাজা করল শেষটায়। এবার বেরুবে। সন্ধ্যে হয়ে এল। পুকুর ঘাট থেকে বাবাকে ডেকে বলে যাবে, "আমি ফেলুদের বাড়ি গেলুম, মা ফিরলে তুমি চলে এস।"

নেমি ডগমগ: ঢেউএর মাথায় ভরা নৌকোর মত। নেমি শাড়ি পরেনি; শাড়ি নেমিকে গিলে নিয়েছে।

ফেলুদের বাড়িতে নিমির শাড়িটার হঠাৎ যেন ঘরদোর ভরে গেল। টুনি, হেমমাসী, ক্ষেমদা পিসি, কমলা, সদু—সব মেয়েদের চোখ নেমির গায়ে। টুনি তেরচা করে চায়। ক্ষেমুপিসির কানে কানে ফিসফিস করে। বিট্‌লেমি করে হাসে।

একথা ওকথার ভিতরে ক্ষেমুপিসি এগিয়ে এসে নেমির শাড়ির আঁচল তুলে ধরে। পাড়ার মুখ-কাটা ক্ষেমুপিসি। বলেঃ "কী লো! খুব সাজগোজ নিয়েছিস যে! দেখিস্, সাবধানে হাঁটিস ফিরিস। কার শাড়িতে কোথায় আবার দাগ লেগে যায়।"

অন্যদের দিকে চেয়ে, খাটো অথচ শোনা- গলায় বলল ঃ "পরের জিনিসে আবার সাজ কী গো!"

নেমির বুকটা ধক্ করে উঠল। 'তোমরা তো সবই পরের দেখ গো। এটা আমার নিজের গো, নিজের।'

—নাকি! বলতে হয়। রাজ্যিসুদ্ধ লোকের জিনিসই তো তোর নিজের। ক্ষেমুপিসি দাঁতের ভিতর দিয়ে কথা কয়টা বিষের মতো ছড়িয়ে দিল। কোথা থেকে টুনির সেই বিটলেমি হাসি।

নেমি জলের তলে ডুবে গেল। আচ্ছন্ন মন শুধু বলল,—যা-ই পর, যা-ই কর, তোমার গায়ে ভাল শাড়ি তোমার নিজের বলে মানবে না লোকে। —ভাল শাড়ি, সুন্দর শাড়ি, সাজের শাড়ি, আমার নিজের আর হতে পারবে না। ছেঁড়া ময়লা হলে হবে,—নেমি বুঝল।

আর দাঁড়াল না। না-খেয়ে চলে এল নিজের ছেঁড়া কাপড়টা দড়ি থেকে তুলে কাপড়ের গাদার কাছে। শাড়িটাকে টেনে ছিঁড়ে খুলে ফেলল। লাথি মেরে ফেলে দিল ঘরের কোণাটায়।

নিজের ছেড়া কাপড়টা দড়ি থেকে তুলে কোনোমতে পরে নিল।

সারা রাস্তা সুধীর ওর পেছন-পেছন আস্তে, আস্তে, এসেছে, নেমি জানে। কিন্তু একবারটিও নেমি ওর দিকে পেছন ফিরে চাইল না।

জালিয়ানওয়ালা বাগ

চাণক্য সেন

শিখদের স্বর্ণ-মন্দিরে পবিত্র অমৃতসহরের প্রাচীনতম অঞ্চলে জালিয়ানওয়ালা-বাগ এমনভাবে লুকিয়ে রয়েছে যে, হঠাৎ একটি সরু, বহুজনাকীর্ণ, বিপণি-সংকুল, কোলাহলমুখর রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আপনি তার অস্তিত্বের কোনও সংকেত পাবেন না। অসংখ্য সাইকেল, সাইকেল-রিক্সা, বয়েল-গাড়ির ভিড় অগ্রাহ্য ক'রে অবিরাম হর্নের চীৎকার তুলে মোটর-গাড়ি সে সরু রাস্তা পার হ'তে দুর্বার চেষ্টা করছে, পদে পদে গতি তার প্রতিহত। সেখানে সে এসে থামবে, সেখানে নেমে আপনি দেখতে পাবেন সংকীর্ণ প্রবেশপথের ওপরে আর্চের মত বাঁকানো ইতিহাসের প্রতিধ্বনি : "জালিয়ানওয়ালাবাগ মেমোরিয়াল"। গলি-পথে দুদশ কদম এগিয়ে গেলে, যদি আপনি বাঙ্গালী হন, আপনার বিস্মিত চোখের সামনে প্রস্তর-ফলকে খোদাই করা, অন্যান্য কথার সঙ্গে, ভেসে উঠবে বাংলা-হরফে কয়েকটি কথা : "বলিদান দিবস, ১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯।" দেখতে পাবেন, বাংলায় লেখা রয়েছে "জালিয়ানওয়ালাবাগ শহীদ-স্মৃতি।" আপনি চমকিত, পুলকিত হবেন, শুধু এ জন্যে নয় যে বাংলার বহু দূরে মাতৃভাষায় খোদিত সামান্য কয়েকটি কথার বিদ্যুৎ আপনাকে স্পর্শ করবে; এ জন্যে, যে বঙ্গের এই অনাদর-যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিয়াল্লিশ বছর আগে যে নির্মম ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে অভিনব বৈপ্লবিক পথে হঠাৎ মোড় নিয়েছিল, সে ঘটনার সঙ্গে বাংলার আত্মিক সংযোগ দীর্ঘস্থায়ী স্বীকৃতিতে ভাস্বর।

গত বৃহস্পতিবার, ১৩ই এপ্রিল, জালিয়ানওয়ালাবাগে নবনির্মিত শহীদ-স্মৃতির সালংকার উদ্ঘাটন করলেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ। পত্র-পত্রিকা-বেতার মাধ্যমে পশ্চাৎগামী ইতিহাসের প্রধানতম ঘটনার ছায়া পড়ল ভারতবর্ষের অগ্রগামী মানসে। সে ঘটনার প্রত্যক্ষ দর্শকদের সংখ্যা এখন বেশী নেই; যাঁরা এখনও জীবিত, তাঁদের অনেকেই দেশবাসীর স্মৃতির বাইরে। স্বাধীন ভারতবর্ষ যে নতুন গতিতে অগ্রসর, প্রাচীন ও পুরাতনের শুধু ছায়াই তার ওপর প্রতিফলিত; পথিমধ্যে বৃক্ষছায়ে ব'সে স্মৃতি রোমন্থনের 'সময় যে নাই'।

কিন্তু মহাকাল যাঁদের খানিক দীর্ঘ রেহাই দিয়েছেন, স্বাধীনতার সরব আসরে যাঁরা স্বস্থান গুছিয়ে নেননি, তাঁরা এখনও পুরাতন ইতিহাসের স্মৃতি বহন ক'রে বেঁচে আছেন; পশ্চাৎ দৃষ্টিবিমুখ জলুসী নতুন যুগের প্রতি স্তিমিত, বিষণ্ণ, উদাসীন। তাঁদের কচিৎ চাহনি। এইরূপ দুচারটি লোক অমৃতসহরে এখনও জীবিত। ক'দিন আগে তাঁদের জানবার সংক্ষিপ্ত সুযোগ হ'ল। তাঁদের কথা বাংলাদেশের মানুষদের জানানো এ নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমেই বলতে হবে যাঁর কথা তিনি বাঙ্গালী। আজ তাঁর বয়স নব্বুই বছর। এখনও তিনি, সামান্য সাহায্য নিয়ে, দিনে পাঁচ সাতবার জালিয়ানওয়ালাবাগ প্রদক্ষিণ করেন। তাঁর সঙ্গে যখন দেখা হল, শহীদ-স্মৃতির মুখ্যাংশ তখন প্রায় সমাপ্ত। সাড়ম্বর উদ্বোধনের মাত্র দিন পনের বাকী। তিনি সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত জালিয়ানওয়ালাবাগের সামনাসামনি তাঁর বাড়ির একতলার আপিস ঘরে শক্ত কাঠের চেয়ারে বসে থাকেন, ঘণ্টা দু ঘণ্টা বাদে একবার বাগ প্রদক্ষিণ করেন। লোকের পর লোক আসে, তাঁদের কথা শোনেন, নিতান্ত যা বলা প্রয়োজন শুধু সেটুকুই বলেন। ফাইল ঘেঁটে চিঠিপত্রের জবাব লেখেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, তিনি সেগুলো পড়েন, সই করেন; 'তার' পাঠাতে হয় প্রয়োজন মত, তিনি শব্দ-নির্বাচন করেন। কিছুক্ষণ পরে পরে শহীদ স্মৃতি নির্মানের ভারপ্রাপ্ত এঞ্জিনীয়র ও কণ্ট্রাক্টরদের সঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা হয়; তিনি অনেকক্ষণ ধ'রে শোনেন, উত্তরে নিজের বক্তব্য সবটা বুঝিয়ে বলতে পারেন না, ছেলের সাহায্য ছাড়া। মাঝে মাঝে সব কিছু ভুলে যান; স্তিমিত চোখে উদাসীন বিষণ্ণতা নিয়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু তিনি কি বলতে চান, সবাই কেমন যেন সাঙ্কেতিকভাবে বুঝে নেয়।

এ বঙ্গ-সন্তানের নাম শ্রীষষ্ঠীচরণ মুখো-পাধ্যায়। সমস্ত অমৃতসহরের 'দাদা'। পঞ্জাবে দু চারজন বাঙ্গালী স্বাধীনতার পূর্ব-যুগে সর্বজনীন শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করেছিলেন। এখনও কালীনাথ রায় ও অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলতে প্রত্যেক পঞ্জাবী গর্ব বোধ করে। বাংলার প্রতি পঞ্জাবের যে স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধা তার অনেকখানি কারণ সেসব বঙ্গসন্তান যাঁরা পঞ্জাবকে ভালোবেসেছিলেন, ঐকান্তিকভাবে পঞ্জাবের সেবা করেছিলেন। পঞ্জাবের মানুষ দেশ বিভাগের পর দিল্লীতে "এস এন দাশগুপ্ত কলেজ" তৈরী করেছে, ভারত-বর্ষের বর্তমান আঞ্চলিক ভাবসংঘাতের যুগে এ বড় কম কথা নয়।

ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায় আজ সমস্ত পঞ্জাবে প্রিয়তম, সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় জীবিত বাঙ্গালী। যারাই জালিয়ানওয়ালাবাগ জানে, তারাই জানে ডাঃ মুখার্জিকে। ডাঃ মুখার্জি না হ'লে হয়তো জালিয়ানওয়ালাবাগের চিহ্নটুকু পর্যন্ত থাকতো না। অমৃত

জালিয়ানওয়ালাবাগে নবনির্মিত শহীদ স্মৃতি। রাজস্থানের লালপাথর ও মহীশূরের স্ফটিক পাথরে তৈরী ৪৫ ফিট উঁচু "স্বাধীনতার দীপশিখা।" একপাশে সাইপ্রাসের চারাগাছ পোতা হয়েছে.

সহরের জনাকীর্ণ শীর্ণ-পথ বাজার প্রসারিত হত সংলগ্ন এই উন্মুক্ত বাগানে। শুধু তা যে হয়নি সে প্রধানত ডাঃ ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়ের জন্যে। পঞ্জাবের লোকেরা একথা জানে বলেই 'দাদা'কে তারা শ্রদ্ধা করে, দাদার প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা এতো গভীর, নিখাদ। পঞ্জাবী, বিশেষ ক'রে শিখ, বড় আবেগময় মানুষ। আপনি তার অন্তর স্পর্শ করুন, সে আপনাকে মাথায় তুলে রাখবে। আপনার আন্তরিকতা একবার বুঝতে পারলে সে এতো উদার, এতো সাহায্যপরায়ণ হবে যে আপনি অভিভূত হ'য়ে পড়বেন। কালীনাথ রায় ও সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে এজন্যই এখনও সে শ্রদ্ধা করে। ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়ও তার কাছে একই কারণে শ্রদ্ধেয়।

অথচ বাংলাদেশের ক'জন এই অতি-বৃদ্ধ শতাব্দী-সন্নিকট মানুষটির খবর রাখেন?

আরও আশ্চর্য হবেন আপনারা যখন বলবো ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায় নব্বুই বছর বয়সেও পরিপূর্ণ বাঙ্গালী। তাঁর মনের প্রায় সবটুকু জুড়ে আছে জালিয়ানওয়ালাবাগ। যা একটু ফাঁক যদি-বা আছে, সেখানে সন্নিবদ্ধ তাঁর বঙ্গ-চেতনা। আজ পর্যন্ত তিনি অমৃতসহরে নিজস্ব গৃহ নির্মান করেননি; একবার ছেলেরা এক-টুকরো জমি কিনেছিলেন, তিনি নিজেই বেচে দিয়েছেন। ছেলেদের চাকুরী বা অন্য কোনও জীবিকা সুযোগের জন্য কোনও মন্ত্রীকে অনুরোধ করেননি; নিজের জন্য মুখ খুলে কোনওদিন কিছু চাননি। চল্লিশ বছর তিনি পঞ্জাবে বাস করছেন; ছেলেমেয়েরা পঞ্জাবী বলেন মাতৃভাষার মতোই, নাতি-নাতনিরা তো বুঝি পঞ্জাবীই হ'য়ে গেল; কিন্তু ষষ্ঠীচরণ বিদায় নেবার সময় ভাঙ্গা চিন্তা ভাঙ্গা ভাষায় কণ্ঠে রূপান্তরিত করে যে ক'টি কথা বললেন তার মধ্যে প্রকাশ পেল তাঁর সেই বঙ্গ-চেতন মন, যা তিনি দীর্ঘকাল গোপনে ব'য়ে বেড়িয়েছেন, মুখ ফুটে বড় একটা কাউকে বলেননি।

বিদায় নেবার সময় বলছিলুম, জালিয়ানওয়ালাবাগের কাজ তো শেষ হ'য়ে এলো; এবার আপনি অনেকখানি তৃপ্তি পেলেন।

দীপ্তিহীন চোখে ষষ্ঠীচরণ তাকালেন। কিসের একটা অব্যক্ত আবেগে দীর্ণ ছোট্ট দেহখানি কেঁপে উঠল। কষ্ট ক'রে গলায় জোর এনে বললেন, "আমার কথা বাংলাদেশের মনে আছে?"

মাঝে মাঝে সামান্য মানুষও কেমন হঠাৎ অসামান্য মাধ্যমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে পড়ে। আমারও তাই হল। মনে হল, বাংলা দেশ থেকে তেরোশত মাইল দূরে, এক আদর্শনিষ্ঠ বাঙ্গালীর আজীবন সাধনার সার্থকতা মুহূর্তে এই যে নিতান্ত ঘটনা-চক্রে আমি উপস্থিত, আমার বোধহয় একটা দায়িত্ব আছে, যতো ক্ষুদ্রই না কেন আমি হ'য়ে থাকি, সমস্ত বাঙ্গালীর হ'য়ে এ'কে প্রশ্ন করবার, এ'র উত্তর বাঙ্গালী পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার।

"বাংলাদেশকে কিছু কি বলবার আছে আপনার?" আমি হয়তো ধৃষ্টতা, হয়তো নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে প্রশ্ন করলুম।

ষষ্ঠীচরণ আবার জ্যোতিঃহীন উদাস চোখে তাকিয়ে রইলেন। মিনিট খানেক কোনও কথা বললেন না। আমি ভাবলুম, যে মানুষটি একটি মাত্র বৃহৎ আদর্শ, মহান কর্ম আলিঙ্গন ক'রে বিয়াল্লিশ বছর কাটিয়ে আজ শতাব্দীর শেষ দশকে পা দিয়েছেন, যিনি যশ চাননি, মান চাননি, বিত্ত চাননি,

আজ ঐতিহাসিক পরিপূর্ণতার দ্বারে দাঁড়িয়েও যিনি একান্ত উদাসীন, তাঁকে এই প্রশ্ন করা আমার ভুল হল, অন্যায় হল।

কিন্তু হঠাৎ সেই নিবে-যাওয়া চোখে ক্ষীণ আলো জ্বলল। আবেগে কেঁপে উঠল শীর্ণ দেহ। দু তিনবার চেষ্টা ক'রে ষষ্ঠীচরণ বললেন, "অনেকদিন আগে মহাত্মাজীকে বলেছিলাম, একমাত্র বাঙ্গালীই জালিয়ানওয়ালাবাগকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। তিনি মেনে নিয়েছিলেন। এই শহীদ স্মৃতিতে কয়েকটি বাংলা কথা খোদাই করা রয়েছে, বাঙ্গালীর স্বাক্ষর। আমি শুধু চাই দেশ জানুক, এই বিয়াল্লিশ বছরের ইতিহাসের পেছনে একজন বাঙ্গালীর অক্লান্ত, অপরাজেয় প্রচেষ্টা রয়ে গেছে। মহাত্মাজীকে বলেছিলাম, ইংরেজ অন্ধকূপ হত্যার মতো বিরাট মিথ্যে একটা কলংক বাঙ্গালীর বুকের ওপর একদিন চাপিয়ে দিয়েছিল। পৃথিবীর সর্বত্র সে মিথ্যে কলংককে প্রচার করেছিল; বছরের পর বছর বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের স্কুলে কলেজে পাঠ নিতে বাধ্য করেছিল অন্ধকূপ হত্যা নামক ভয়ংকর কলংকের। আজ এই অমৃতসহরে পৃথিবীর খোলা চোখের সামনে, ইংরেজের নৃশংস বর্বরতার যে প্রমাণ পনের শত ভারতবাসীর রক্তে, প্রায় চারশত ভারতবাসীর প্রাণ বলিদানে, চিরদিনের জন্য লিখিত হয়ে রইলো, একমাত্র বাঙ্গালীই পারবে তাকে রক্ষা করতে, প্রচার করতে, জীবন্ত রাখতে। এটা বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এক মিথ্যে অপবাদ ধুয়ে দেবার সুযোগ আজকের এই জ্বলন্ত বর্বরতার সরব প্রমাণ। জালিওয়ালাবাগকে দেশের জন্যে, জাতির জন্যে, জীইয়ে রাখার দায়িত্ব কংগ্রেস যখন গ্রহণ করেছেন, এ দায়িত্ব পালনের ভার নিতে চাই আমি, সামান্য একজন বঙ্গসন্তান।"

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চাণক্য, যিনি প্রতিটি কুশ আহরণ করছেন একটি কুশের রক্তক্ষয়ী দংশনের প্রতিশোধ নিতে!

বলা বাহুল্য, ষষ্ঠীচরণ তাঁর বক্তব্য এমন গুছিয়ে বলতে পারেননি। কিন্তু এ বাক্যগুলির মর্ম কথাটা তিনি বলেছিলেন। তাঁর শেষ কথা কয়টি ছিল, "বাঙ্গালীর এইটুকু কথা দেশ কি জানে?"

এবার একটু পেছনে যেতে হয়। জালিয়ানওলাবাগের ইতিহাস এখন আমাদের স্মৃতিপট থেকে প্রায় মুছে গেছে। সে ইতিহাস নতুন ক'রে লেখার সময় এসেছে, কেননা আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এত বড় ঘটনা আর নেই। এ ঘটনা বা দুর্ঘটনা থেকেই মহাত্মা গান্ধীর নন কো-অপারেশনের জন্ম, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরু। 'সিপাহী বিদ্রোহ' যেমন ইংরেজ শাসনের এক বিরাট অধ্যায়ের

জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়

রক্তাপ্লুত সমাপ্তি, জালিয়ানওয়ালাবাগ তেমনই আর এক অধ্যায়ের। বর্তমান প্রবন্ধে এ ইতিহাসের অবতারণা সম্ভব নয়। আমার প্রধান বক্তব্য বিষয় জালিয়ান-ওয়ালাবাগ নয়, তার সংগে সুদীর্ঘ সম্পর্কিত একটি বঙ্গসন্তান।

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল ছিল বৈশাখী অর্থাৎ নববর্ষ। অমৃতসহরে বড় একটি মেলা হয় বৈশাখীতে, চতুর্দিকের গ্রাম থেকে হাজার হাজার লোক আসে। সেদিন আরও একটি মেলা ছিল—গরু-মহিষের মেলা। জনসমাগমে অমৃতসহর মুখর। কিন্তু একদিকে যেমন আনন্দ—বৈশাখীর পরেই এ অঞ্চলের চাষী মাঠে পাকা গম কাটবে—অন্যদিকে তেমনি চাপা উত্তেজনা। রাওলাট আইনের প্রতিবাদে এম কে গান্ধী ৩০শে মার্চ সারা দেশে হরতাল ঘোষণা করেছিলেন; দিল্লী শহরে সেদিন উত্তেজিত জনতার ওপর পুলিস গুলী চালিয়েছিল। গণ-অসন্তোষের আগুন তৎক্ষণাৎ ছড়িয়ে পড়েছিল পঞ্জাবের বড় বড় শহরে। পঞ্জাবের লেফটানেন্ট গভর্নর ছিলেন স্যার মাইকেল ও'ডায়ার—আইরিশ সিভিলিয়ন, পাকা সাম্রাজ্যবাদী। যুদ্ধের সময় ও'ডায়ার ছলে-বলে-কৌশলে এত বেশী পঞ্জাবী গ্রামবাসীকে সৈন্যদলে ভর্তি করিয়েছিলেন যে, তৎকালীন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অর্ধেকই ছিল পঞ্জাবী। কিন্তু পঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলে এতে সৃষ্টি হয়েছিল খাদ্যাভাব, ক্ষুধা, অসন্তোষ। রাজনৈতিক চেতনা পঞ্জাবে সে সময় খুব বেশী একটা ছিল না, যদিও ও'ডায়ার তাঁর "India As I Knew It" বই-এ (১৯২৫ সালে প্রকাশিত) এমন একটা ছবি এঁকেছেন যেন পঞ্জাব তখন যেন বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে। কেবল পঞ্জাবে নয়, সমস্ত

ভারতবর্ষেই তখন গভীর অসন্তোষ; সেই সিপাহী বিদ্রোহের দশ বারো বছর পরে ইংরেজ সেনাপতি জেং লরেন্স বলেছিলেন, ভারতবর্ষ শান্ত, বারুদের মতো শান্ত—"India is quiet as quiet as gunpowder."

—আবার তেমনই অবস্থা।

অমৃতসহরে, রাজনৈতিক আন্দোলন তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে দুই তরুণ নেতার নেতৃত্বে। একজন ডাঃ সত্যপাল,

দ্বিতীয় জন ডাঃ সইফুদ্দিন কিচলু। বারুদে আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মত এ আন্দোলন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বেশ ব্যাপক ও গভীর হ'য়ে উঠল। স্যার মাইকেল ও'ডায়ার অমন ডাকসাইটে 'লৌহ-মানুষ' হলে কি হবে, স্নায়বিক জোর তাঁর কমই ছিল তাই শান্তিপূর্ণ গণ-আন্দোলনের মধ্যে তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের মতো ভয়ংকর কিছু দেখতে পেলেন। তাঁর সুপারিশে ভারত সরকার পাঞ্জাবের পাঁচটি শহরে "সামরিক আইন" ঘোষণা করেন। অমৃতসহরে অবশ্য মার্শাল ল ঘোষণার পূর্বেই জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ও'ডায়ার সাহেব অমৃতসহরের শাসনভার সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন। যে লোকটির হাতে এ দায়িত্ব দেওয়া হল তার নাম ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল বি আর ডায়ার। ডায়ার সাহেব আরামবাগে শিবির স্থাপন করলেন।

১৩ই এপ্রিল বৈশাখী মেলা বসল স্বর্ণ-মন্দিরে, যেখান থেকে জালিয়ানওয়ালাবাগ পায়ে হেঁটে পাঁচ মিনিটের পথ। অমৃতসহরে হঠাৎ ঘোষিত হল, সেদিন বিকেল সাড়ে চারটায় জালিয়ানওয়ালাবাগে জনসভা হবে। কারা এ সভার উদ্যোগ করেছিল আজ পর্যন্ত কেউ সঠিক জানে না। মুখে মুখে সভার বার্তা সারা শহরে পড়ল ছড়িয়ে। ডায়ার সাহেব সকাল সাড়ে ন'টায় টমটম বাজিয়ে শহরের কিছু কিছু এলাকায় "সভা-নিষেধ" আদেশ প্রচার করলেন। অমৃতসহরের অধিকাংশ লোক অবশ্য এ আদেশের কিছুই জানতে পারে নি। পৌনে একটায় ডায়ার আবার খবর পেলেন সভার আয়োজন চলছে। সভা যাতে না হ'তে পারে তার আর কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করবার দরকার আছে তাঁর মনে হল না।

সাড়ে চারটেয় সভা শুরু হল। এর দু একদিন আগেই ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ কিচলুকে গ্রেপ্তার ক'রে ধরমশালায় চালান করা হয়েছে। সভার মুখ্য উদ্দেশ্য এ ঘটনার প্রতিবাদ করা। প্রায় বিশ হাজার লোক সভায় সমবেত হল। বেশির ভাগ পুরুষ, কিন্তু স্ত্রীলোক ও শিশুও যে একেবারে নেই তা নয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নাম শুনলে মনে হয় বুঝি কোনও উদ্যান বা পার্ক। আসলে তা নয়। অমৃতসহরের অভ্যন্তরে একটা বিরাট পতিত জমি ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ। এর আদি মালিক ছিল যে শিখ তার 'জাত' হল 'জালে'। পরে মালিকের সংখ্যা একাধিক হ'লে 'জালে' বহুবচনে হয়ে দাঁড়াল 'জালিয়ান।' 'জালিয়ানদের' বাগ, তাই জালিয়ানওয়ালাবাগ। চতুর্দিকে ছোট-বড় দ্বিতল ত্রিতল বাড়িতে ঘেরা ছিল এই পতিত জমি। ঠিক চৌ-কোণ নয়, তবে অনেকটা। বাগের মধ্যে ছিল তিনটে বড় গাছ, একটা পুরাতন ভাংগা সমাধি, একটা দেওয়ালহীন পতিত কূপ। একটিমাত্র পাকাপোক্ত প্রবেশ-পথ, সরু, গাড়ি চলার মতো প্রশস্ত নয়। বাড়িগুলি যে দেওয়াল রচনা করেছিল তার ফাঁকে ফাঁকে চার পাঁচটি সরু পথ ছিল, প্রধানত বাইরে যাবার। আসল প্রবেশ-পথটা ছিল বেশ একটু উঁচু, তাতে ডায়ার সাহেবের সুবিধে হয়েছিল।

ডায়ারের হাতে শ' খানেক সৈন্য ছিল। মিটিং বসেছে খবর পেয়ে সৈন্য নিয়ে ডায়ার হাজির হলেন জালিয়ানওয়ালাবাগে। সরু প্রবেশ পথে সাজোয়া গাড়ি ঢুকল না। ডায়ার এ পথটি বন্ধ ক'রে দিলেন। এক পাশে দেওয়াল ভেংগে পথ তৈরী ক'রে ঢুকলেন জনাকীর্ণ ময়দানে। লালা হংসরাজ অথবা ডাঃ গুরুবক্স সিং বক্তৃতা করছিলেন। "সভাপতিত্ব করছিলেন ডাঃ কিচলুর একখানা মাঝারি সাইজের ফটো। ডায়ার সৈন্যদের নিয়ে সভা-মঞ্চে আরোহণ করলেন। হুকুম দিলেন জনতাকে সভাস্থল ত্যাগ করতে। কিন্তু হুকুম জনতার কানে পৌঁছবার সংগে সংগেই গুলীবর্ষণ শুরু হল। ছত্রভংগ হ'য়ে জনতা ইতস্তত ছুটতে লাগল; যেখানে বেশী মানুষের ভিড়, ডায়ার সৈন্যদের ব্যাপক গুলীবর্ষণের হুকুম দিলেন। কয়েকশত লোক পতিত কূপে আত্মরক্ষার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করল। পাঁচ মিনিট পুরো গুলী চলল, সবশুদ্ধ ১৬৫০ রাউণ্ড; তখন দেখা গেল সৈন্যদের আর বারুদ নেই। সরকারী হিসেবে ৩৭৯ জনের মৃত্যু হল, ১২০০ জন আহত হলেন। মৃতদেহ গণনা করলেন না ডায়ার, আহতদের হাসপাতালে পাঠালেন না, সোজা শিবিরে গিয়ে বেশ খানিকটা মদ্যপান ক'রে উপরিওয়ালার কাছে রিপোর্ট লিখলেন।

অমৃতসহর তখন গরল-তিমিরাচ্ছন্ন। সন্ধ্যা নামল। দোকানপাট সব বন্ধ। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। শুধু হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে মিটিং-এ যারা গিয়েছিল তাদের আত্মীয়-স্বজনরা ছুটে গেছে অন্ধকার মৃতদেহ সংকুল, আহতের আর্তনাদে বিদীর্ণ জালিয়ানওয়ালাবাগে। মৃতদেহ সরাবার, আহতদের হাসপাতালে নেবার কোনও ব্যবস্থা হল না সে ভয়ংকর রাত্রিতে। ভয় পেয়ে সবাই যার যার ঘরে চলে গেল।

গেল না শুধু একটি যুবতী। তার নাম আতর কৌর। অমৃতসহরে তার সংগে দেখা হল।

আতর কৌর-এর কথা বলা দরকার। এমন সাহসী নারী কোনও দেশেই বেশী নেই।

আজ ষাট বছর বয়স হয়েছে আতর কৌর-এর। রুক্ষ-কঠিন চেহারা, শক্ত, কোমলতা-হীন। চুল পেকেছে। প্রশস্ত কপাল থেকে

চিবুক পর্যন্ত সমস্ত মুখখানায় প্রতিরোধ জমাট হ'য়ে আছে। বিয়াল্লিশ বছর আগে আতর-এর বয়স ছিল আঠারো। তার স্বামী ভাগমল ভাটিয়ার জ্বালানী-কাঠের দোকান ছিল জালিওয়ানওয়ালাবাগের সন্নিকটে। ১৩ই এপ্রিলের কাল-বৈশাখী দিনে অন্য একজন ব্যবসায়ীকে দেবার জন্যে স্ত্রীর কাছ থেকে ভাগমল সাতশ' টাকা চেয়ে নেয়; বলে, সন্ধ্যা নাগাদ ঘরে ফিরবে। জালিওয়ানওয়ালা-বাগে সভা দেখে সেও গিয়ে জনতার সংগে ভিড়েছিল। সাড়ে চারটার সময় ডায়ারের গুলীবর্ষণে চতুর্দিক যখন কেঁপে উঠল, অনেকের সংগে আতর কৌরও ছুটে এল রাস্তায় আতঙ্কিত কৌতূহলে। দেখতে পেল রক্তাক্ত দেহে যে যেখান দিয়ে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে হল, তার স্বামী তো ঐ জনতার মধ্যে নেই! ছুটে গেল আতর কৌর জালিয়ানওয়ালাবাগে। তখন সেখানে মৃত্যুর তান্ডব। জনতার উন্মত্ত প্রাণরক্ষা প্রয়াসে আতরের গতি বার বার প্রতিহত হল। যখন সে বাগে পেণছল, মৃত ও আহতের রক্তে কঠিন মাটি রঞ্জিত হ'য়ে গেছে। আতরের প্রধান কর্তব্য স্বামীকে খোঁজা; কিন্তু আহতদের আর্তনাদে বার বার সে বিহ্বল হল। কেউ একটু জলের জন্যে চীৎকার করছে, কেউ গভীর বেদনায় 'মা' 'মা' ডাকছে, কেউ আতরকে দেখে কেঁদে বলছে, বোন, আমাকে ঘরে নিয়ে চল। মরতে মরতে একজন আতরকে চিনতে পেল, শেষ নিঃশ্বাসে বলল, সুরিন্দরকে আমার খবরটা পেণছে দিয়ো।

অনেক খুঁজে আতর তার স্বামীকে পেল। স্বামীকে নয়, তার দেহকে। ডায়ারের গুলী ভাগমলের বক্ষ ভেদ করে গেছে, রক্তে-ভেজা মাটিতে তীব্র যন্ত্রণায় বিকৃত-মুখ সে চিরনিদ্রিত। আতর দেখতে পেল আর একটি নারীও স্বামী সন্ধানে এসেছে। এর নাম রতন দেবী, একজন আশী বছরের বৃদ্ধা। রতন দেবীও তার স্বামীকে পেল, জীবিত নয়, মৃত। সে মহাশ্মশানে বৈশাখী সন্ধ্যায় আর একটি মাত্র লোক ছিল। তার নাম আজ কারুর মনে নেই। আতর কৌরের ভাষায়, "আমরা দেখতে পেলাম, সে লোকটি আহতদের জল এনে দিচ্ছে, শুশ্রূষা করছে, প্রবোধ দিচ্ছে। সে যে কে, কেউ জানে না।"

"ঐ বীভৎস দৃশ্যের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকারে স্বামীকে খুঁজে পাচ্ছি না," আতর কৌর অতীতের অম্লান স্মৃতি থেকে খানিকটা আমাকে দিল, "অথচ আমার মন বলছে, তিনি এখানেই আছেন। ক্লান্ত হ'য়ে আমি এসে কুয়ার পাশে ব'সে পড়লাম। কুয়ার জল মৃত ও অর্ধমৃত মানুষের দেহভারে কানাকানি ফুলে উঠেছে। দেখতে পেলাম, এক পাশে ছটি পুরুষ ও চারটি শিশুর মৃতদেহ পাশাপাশি প'ড়ে আছে। তাদের তিনজনের গায়ে এক রকমের জামা।

জালিয়ানওয়ালাবাগে পন্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ, শ্রীষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

হয়তো পুরো একটি পরিবার বৈশাখী মেলা দেখতে এসেছিল। আর ঘরে ফিরল না। আর একটি গুরুতর আহত লোক আমাকে দেখতে পেয়ে কাতর কণ্ঠে বলল, বহিন, একবার দেখো তো, আমার ছেলেটা—এই যে, আমার পাশেই,—বেঁচে আছে, না ম'রে গেছে? আমি দেখলুম, ছেলেটা বেঁচে নেই। তবু লোকটাকে বললুম, 'আপনি স্থির হোন, ও বেঁচে আছে।' কিন্তু বলেই আমার আর দাঁড়াবার শক্তি রইল না। জ্ঞান হারিয়ে আমি প'ড়ে গেলুম। যখন জ্ঞান ফিরল, চতুর্দিকে ভীষণ অন্ধকার, আমার কামিজ-উনী রক্তে ভেজা। সেই অন্ধকারে খুঁজে খুঁজে আমি আমার স্বামীকে পেলুম। একটা দেওয়ালের পাশে তিনি শুয়ে ছিলেন। গুলী ভেদ করেছে তাঁর বক্ষ, দুখানা পাও। একটা কানও তাঁর হারিয়ে গিয়েছিল। আমি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলুম, কিন্তু আমার নিজেরই মনে হল এ কান্নার কোনও অর্থ নেই। অনেক চেষ্টা করেও স্বামীর দেহকে বাগ থেকে আমার এতো-কাছে বাড়িতে আনতে পারলুম না। কেউ সাহায্য করতে রাজী হল না। তখন বাগ থেকে বেরিয়ে কোন-মতে একটা চারপায় জোগাড় করলুম। তার ওপর স্বামীকে শুইয়ে সারারাত বসে রইলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই মহাশ্মশানে। গভীর রাত্রে কুকুর ঢুকল মাংসের লোভে। চতুর্দিক থেকে আহতদের চীৎকার আমাকে ঘিরে রইল। এমনই ক'রে কাটল সেই কালরাত্রি।"

আজও এই বিয়াল্লিশ বছর পরেও, আতর কৌর সে কথা বলে আর কাঁদে। ইংরেজ সরকার আতরকে এক লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিতে চেয়েছিল "ক্ষতিপূরণ" হিসাবে। আতর তা ঘৃণাভরে অগ্রাহ্য করেছে। "আমি চেয়েছিলাম ডায়ার সাহেবের বিচার আর উপযুক্ত শাস্তি। তা নইলে আমা[র] 'ক্ষতিপূরণ' হ'তু না" স্বাধীনতার পর আতর কৌর পঞ্জাব সরকারের কাছ থেকে মাসিক একটা ভাতা পাচ্ছে। পঞ্চাশ টাকা সে তাতেই সন্তুষ্ট।

জালিয়ানওয়ালাবাগের আরও একজ[ন] বীরের সংগে দেখা হল। নাম রূপলা[ল] পুরী। বয়স এখন তিরাশি। ১৩ই এপ্রিলে মিটিং-এ সভামণ্ডে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে রূপলাল পুরী অন্যতম। তাঁকে খুঁ[জে] বার করা গেল অমৃতসহরে এক টেক[নি]ক্যাল স্কুলের প্রিন্সিপালের বাসগৃহে। একতলায় ছোট্ট একখানা ঘরে প্রিন্সিপ[াল] মহাশয় এঁকে বাস করতে দিয়েছেন, কিন্তু

শ্রদ্ধায়, কিছু করুণায়। রাস্তার ওপরে ঘরখানা। দুটো চারপায় একমাত্র আসবাব। এক পাশে তোলা বালতির উনুন, বাসনপত্র। বিধবা দৌহিত্রী রূপলালের দেখাশোনা ---।

---র ঢুকে দেখা গেল রূপলাল এক প্যাকেট তাস নিয়ে 'ধৈর্য' খেলায় মগ্ন। টাইফয়েড রোগের পর একখানা পা হাঁটু পর্যন্ত কেটে বাদ দেওয়া হ'য়েছে। তাই তিনি বেশীর ভাগ সময়ই বিছানায় কাটান। যখন শুনলেন আমি বাঙ্গালী, এসেছি জালিয়ানওয়ালাবাগের অন্যতম বীর পুরুষ রূপলাল পুরীর দর্শন অভিলাষে, হতভম্ব হ'য়ে তাকিয়ে রইলেন, তারপর অশ্রুধারা নামল দুগাল বেয়ে। "আমাকে দেখতে এসেছেন? আমি তো বেঁচে থেকেও মৃত! কেউ আমার খোঁজ করে না। এই তো কত বড় বড় মানুষরা এ শহরে আসেন। আমাকে কেউ একবার উঁকি মেরেও দেখে যান না।"

জালিয়ানওয়ালাবাগের কথা উঠতে রূপলাল উত্তেজিত হ'লেন। তিরাশি বছর বয়সেও গলায় বেশ জোর আছে। জামা তুলে দেখালেন গুলীর দাগ। "বেশী লাগেনি আমার, মাত্র একটা বুলেট এই পিঠে লেগেছিল। আমার ছেলের কিন্তু তিন তিনটে বুলেট লেগেছিল। ভগবানের কৃপায় সেও বেঁচে গিয়েছিল।" ১৩ই এপ্রিলের কথা অনেক বললেন। আরও বললেন, "সব খবর পাবেন ডাঃ মুখার্জ্জির কাছে। তিনি যক্ষের ধনের মতো জালিওয়ানওয়ালাবাগকে এই বিয়াল্লিশ বছর রক্ষা করেছেন।"

সত্যিই তাই। হত্যাকাণ্ডের পরেই জাতীয় কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করলেন জালিওয়ানওয়ালাবাগকে জাতীয় স্মৃতি হিসাবে রক্ষা করতে হবে। একটি কমিটি তৈরি হল। সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, সম্পাদক ডাঃ ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়। কমিটির প্রধান কর্তব্য হল জালিওয়ানওয়ালাবাগ কিনে নেওয়া। ডাঃ

মুখার্জি গেলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর কাছে। তিনি বললেন, অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেন একমাত্র সেই "ব্রাহ্মণ-ভিখারী"—মদনমোহন মালব্য। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং বিধান দিলেন, মালবাজী ও মুখার্জি কারাবরণ করবেন না, তাঁদের কাজ হবে জালিয়ানওয়ালাবাগের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা।

ডাঃ ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায় ১৯১৩ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন, প্রায় মহাত্মা গান্ধীর সংগে। এলাহাবাদে মামা বাড়িতে মানুষ, ছোটবেলা থেকে মতিলাল নেহেরুর সংস্পর্শে আসার সুযোগ হ'য়েছিল। কি একটা সরকারী কাজ করতেন, কংগ্রেসে যোগ দিয়ে সে কাজে ইস্তফা দিলেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মৃতি-সমিতির সম্পাদক হ'য়ে চলে এলেন অমৃতসহরে। কয়েক বছরে মালবাজীর উদ্যোগে অনেক অর্থ সংগৃহীত হল। ষষ্ঠীচরণ জালিয়ান-ওয়ালাবাগের প্রবেশপথে একখানা বাড়ি ভাড়া ক'রে চৌকিদার হ'য়ে বসলেন। এখনও তিনি তাই আছেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগ জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা সহজ কাজ ছিল না। পঞ্জাবের তৎকালীন অবস্থার আন্দাজ পাওয়া যাবে একটি অর্থপূর্ণ ঘটনা থেকে। হত্যাকাণ্ডের পর জেনারেল ডায়ারকে স্বর্ণমন্দিরের মহান্ত সাড়ম্বরে "সম্মানিত" করেছিলেন। ১৯১৯ সালে অমৃতসহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়া সত্ত্বেও দমননীতি সমস্ত পঞ্জাবে দারুণ আতংকের সৃষ্টি করেছিল। কংগ্রেসের উদ্যোগে সাহায্য করার মতো সাহস অনেকেরই ছিল না। ইংরেজ সরকার নানা রকম বাধা সৃষ্টি করলেন, জালিয়ানওয়ালা-বাগ যাতে কংগ্রেস না কিনতে পারে। এ সব বাধা ষষ্ঠীচরণকেই পরাজিত করতে হল। আগেই বলেছি, বাগ ছিল কয়েকজন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ১৩ই জুলাইর পূর্বে অমৃতসহরে ব্যবসায়ীরা এখানে একটা কাপড়ের বাজার স্থাপন করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। জমির দাম ঠিক হ'য়েছিল অন্যূন দেড় লাখ টাকা। দশ হাজার টাকা বায়নাও দেওয়া হয়েছিল। হত্যাকাণ্ডের পর ব্যবসায়ীরা মিলে মিশে, সরকারী উৎসাহে, এমন অবস্থার সৃষ্টি করল যে স্মৃতিরক্ষা সমিতিকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে জালিওয়ানওয়ালাবাগ কিনতে হল! তারপরও স্মৃতিরক্ষা উদ্যোগ বার বার নানারকম বাধা পেতে লাগল। কোনও বাধাই যে দাঁড়াতে পারেনি তার কারণ ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়।

একজন বাঙ্গালীকে এই স্মৃতিরক্ষা সমিতির সেক্রেটারী ক'রে রাখা প্রথম প্রথম পঞ্জাবীরা ভালো চোখে দেখেনি। অনেকবার তাদের প্রতিবাদ পেঁচেছে মহাত্মা গান্ধীর দরবারে, পণ্ডিত মোতিলাল নেহরু ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের কাছে। একবার লালা লাজপৎ রায় স্বয়ং এই আপত্তি উত্থাপন করে-ছিলেন গান্ধীজীর নিকট। কিন্তু গান্ধীজী তাতে কান দেননি। "ইয়ং ইণ্ডিয়ায়" একটি প্রবন্ধে তিনি ষষ্ঠীচরণকে এই তাৎপর্যপূর্ণ পদে নিযুক্ত রাখবার কারণ ব্যাখ্যা করেন। বলেন, বাঙ্গালীই এই স্মৃতিরক্ষার দায়িত্বের জন্যে সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত। ষষ্ঠীচরণের সেই অন্ধকূপ হত্যার কথাটা মহাত্মার মন থেকে কোনওদিন মুছে যায়নি।

আজ, এতো দীর্ঘ বছর পরে, ষষ্ঠীচরণের কাজ শেষ হয়েছে। তিনিও জীবনের শেষ-প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর তিনি কংগ্রেসের সংগে সংযুক্ত। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে যেসব চিঠি লিখেছেন তার থেকে বোঝা যায় কতখানি শ্রদ্ধার সংগে এই অতি-বৃদ্ধ দেশসেবককে তিনি ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছেন। ষষ্ঠীচরণের তিনপুত্র, এক কন্যা। বড় ছেলে, উপেন্দ্রনারায়ণ মুখো-পাধ্যায় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী ছিলেন, আজ পঞ্চাশ বছর বয়সে, জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মৃতি সমিতির সহকারী সম্পাদক; দপ্তরের নানাবিধ কাজ-কর্ম তিনিই দেখেন। দ্বিতীয় পুত্র দেবেন্দ্র-নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ও জালিয়ানওয়ালাবাগ নিয়ে অনেক ঐতিহাসিক চর্চা করেছেন।

ষষ্ঠীচরণ ইচ্ছে করলে ছেলেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কিন্তু কোনওদিন মুখ ফুটে কারুর কাছে নিজের জন্য তিনি কিছু চাননি। উপেন্দ্রনারায়ণকে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করার বিষয়েও তিনি একদিন একটি কথাও বলেননি। অমৃতসহরে তাঁর বাড়ি নেই, একটুকরো জমি নেই। স্বাধীনতার পরে পঞ্জাবে যে চমকপ্রদ সমৃদ্ধি গ'ড়ে উঠেছে, ষষ্ঠীচরণের সন্তানগণ তা থেকে নিজেদের ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নিতে পারতেন। করেননি, পিতার আদর্শ চোখের সামনে রয়েছে বলে। পঞ্জাবের সমাজে আজ তাঁরা মিশে গিয়েও পুরোপুরি মিশতে পারেননি। তিন পুত্রই বিবাহ করেছেন বাংলা দেশে। কিন্তু অমৃতসহরের পঞ্জাবী সমাজে তাঁদের জন্য স্নেহ, প্রীতি ও খানিকটা শ্রদ্ধাও রয়েছে। ষষ্ঠীচরণ এটুকুই তাঁদের দিয়ে যাবেন।

প্রায় ত্রিশ বছর আগে ষষ্ঠীচরণের স্ত্রী বিয়োগ হয়। সেই থেকে তিনি একাহারী। সারাদিন উপবাস থেকে সন্ধ্যার সময় সামান্য আহার করেন। প্রথম প্রথম দিনে নির্জলা উপবাস করতেন, কয়েক বছর হল কন্যার অনুরোধে সকালে এক কাপ চা পান করেন। এই নিরাসক্ত, নিঃস্বার্থ মানুষটির বেশভূষা অত্যন্ত সাধারণ, অভাব বোধ নিতান্ত সামান্য। নিজেকে একেবারে বিলুপ্ত ক'রে দিয়েছেন বলেই এত বড় আদর্শকে তিনি সারাজীবন আঁকড়ে ধরে থেকেছেন, নিজের জন্যে পাঞ্জাবী হৃদয়ে অকৃত্রিম শ্রদ্ধার আসন তৈরী করতে পেরেছেন, বাংলার জন্যে অনেকখানি শ্রদ্ধা রেখে যাচ্ছেন এই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রাজ্যে।

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ জালিয়ান-ওয়ালাবাগের স্মৃতিরক্ষা পছন্দ করেননি। তাঁর বক্তব্য ছিল, এটা আমাদের জীবনে এক মহাকলঙ্ক, একে জীইয়ে রাখা পৌরুষের লক্ষণ নয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজ তার কলঙ্ক নানাভাবে স্মৃতিস্তম্ভ বা ভাস্কর্য দ্বারা জীইয়ে রেখেছিল, জালিয়ান-ওয়ালাবাগে স্মৃতিরক্ষাকে কবি সেই মনোভাবের অনুকরণ মনে করেছিলেন। কিন্তু ডায়ারের হত্যাকাণ্ডের একটা বিরাট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। যে ১৬৫০ রাউণ্ড গুলী ডায়ার চালিয়েছিলেন, তার প্রত্যেকটি আঘাত পড়েছিল ইংরেজ শাসনের দ্বিশতাব্দী পুরাতন ভিত্তিতে। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের রক্তাপ্লুত মাটিতে আমাদের অহিংস গণসংগ্রামের জন্ম। সিপাহী-বিদ্রোহে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি প্রথমবার ভীষণভাবে নড়ে গিয়েছিল। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের পর তা টলটলায়মান হল।

আজ আধুনিক নির্মাণ নীতিতে জালিয়ানওয়ালাবাগে নতুন স্মৃতি সম্ভার তৈরী হয়েছে। রাজস্থানের লালপাথর ও মহীশূরের লোহ-কঠিন স্ফটিক প্রস্তরে নির্মিত ৪৫ ফিট উঁচু "স্বাধীনতার দীপ-শিখা" জালিয়ানওয়ালাবাগের মধ্যস্থলে আজ প্রতিষ্ঠিত। চারশ' সাইপ্রাস চারা-গাছ লাগান হয়েছে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। সাঁতারের পুকুর তৈরী হয়েছে শিশুদের জন্যে। নাগরিকদের বিশ্রামের জন্যে বড় দুটো চত্তর তৈরী হয়েছে। স্মৃতিরক্ষা কমিটির আরও অনেক প্ল্যান আছে; দিনে দিনে সব বাস্তবে পরিণত হবে।

এ সবই সুন্দর, এ যুগের উদ্ধত নমস্কার অতীতের উদ্দেশ্যে।

তবু, কি যেন একেবারে বিলীন হ'য়ে গেল। জংলি গাছে গাছে জালিয়ান-ওয়ালাবাগ সবুজ ছিল বহু বছর। তিন চারটি বড় গাছের কোমল ছায়া পড়ত তার বুকে। মাঝখানে নিঃসঙ্গ সমাধিটি মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিত। চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত শহরের আবর্জনা এনেছিল দীন-ম্লান আবহাওয়া। শহীদ কূপের পাশে দাঁড়ালে সেই নির্জন বাগের মধ্য থেকে একটা সকরুণ আর্তনাদ যেন কান পেতে শোনা যেত। বৃষ্টির জল দাঁড়াত জালিয়ান-ওয়ালাবাগের নীচু গহ্বরে। তাতে পড়ত গাছের শোকার্ত ছায়া। আগন্তুক এসে দাঁড়ালেই বিষন্ন সকরুণ অতীত তাকে বিহ্বল করত।

আজ আর তা নেই। জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখে আজ আর মন বিষন্ন হয় না। অতীত আজ অবলুপ্ত।

১৯২৮ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখে সুভাষচন্দ্র বসু দর্শক বইএ লিখেছিলেন, "জীবনে আজ আমি প্রথম জালিয়ানওয়ালা-বাগ দেখলাম"—

সেদিনই অপরাহ্নে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল।

আর কেউ জালিয়ানওয়ালাবাগ দেখে অমন ভাবাবেগপূর্ণ কিছু লিখবে না। হয়তো লিখবেন, "সুন্দর নির্মাণশিল্প দেখে মুগ্ধ হলাম।" ডায়ারের বুলেট দেওয়ালে দেওয়ালে যে দাগ কেটেছিল, আজও তা সযত্নে রক্ষিত। কিন্তু এই নতুন স্মৃতি-স্তম্ভের নব-পরিবেশে কেমন যেন বে-মানান।

মনে হল ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায় এ কথা জানেন। যদিও তিনি চার বছর ধরে স্মৃতি-সৌধ নির্মাণে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, পুরাতনের প্রতিটি চিহ্ন বিলুপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন কেঁদে উঠেছে। আজ সেই বিষন্ন, করুণ, বেদনাতুর ছায়াস্নিগ্ধ বাগের বদলে ঝকঝকে নতুন রৌদ্রদীপ্ত মেমোরিয়েল দেখে তাঁর চোখে কেমন যেন নিরাসক্তি, অব্যক্ত ব্যথা।

তাই বুঝি বিদায়ের সময় তিনি বললেন, যদি মনে রাখতে চাও এখানকার কথা, তাহ'লে শুধু এটুকু মনে রেখো, একজন বাঙ্গালীর আজীবন নিষ্ঠা এখানে জমাট হয়ে রয়েছে। অন্ধকূপ হত্যার মিথ্যে কলঙ্ক জালিয়ানওয়ালাবাগের বাস্তব ভয়ংকর কলঙ্ক দিয়ে মুছে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে একজন সামান্য সাধারণ বাঙ্গালী এ কাজ প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে গ্রহণ করেছিল। সে বাস্তুশাপ আজ মুক্তি পেয়েছে।

এ অসামান্য বৃদ্ধ বাঙ্গালী আর বেশী দিন বাঁচবেন না। এ'কে সম্মান দেখানোর কি কোনও দায়িত্ব আমাদের নেই? পশ্চিম-বঙ্গের কংগ্রেস নেতারা প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীদের সম্মানিত করেন। এ বছরের অনুষ্ঠানে ডাঃ ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায়কে প্রধান সম্মান দেখালে আমাদের এক বড় কর্তব্য পূর্ণ হবে।

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১১৬ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আমার চিঠিগুলো চিঠি কিম্বা চিঠি নয় এই তর্ক উঠেচে। আমি নিজে অনেকবার স্বীকার করেছি যে আমি চিঠি লিখ্‌তে পারি নে। এটা গর্ব করবার কথা নয়। আমরা যে জগতে বাস করি সেখানে কেবল যে চিন্তা করবার কিম্বা কল্পনা করবার বিষয় আছে তা নয়, সেখানকার অনেকটা অংশই ঘটনার ধারা; —অন্তত যেটা আমাদের চোখে পড়ে, সেটা একটা ব্যাপার, সে কেবল হচ্চে চলচে আসচে যাচ্চে; অস্তিত্বের সদর রাস্তা দিয়ে চলাচল; তার ভিতরকার সব আসল খবর আমাদের নজরে পড়ে না। মাঝে মাঝে যদিবা পড়ে, তাদের ধরে রাখিনে, পথ ছেড়ে দিই; সমস্ত ধরতে গেলে মনের বোঝা অসহ্য ভারি হয়ে উঠত। আমাদের ঘরের ভিতর দিকটাতে সংসারের সঙ্কীর্ণ দেয়াল-ঘেরা সীমানার মধ্যে আমাদের অনেক ভাবনার জিনিস, অনেক চেষ্টার বিষয় আছে তার ভার আমাদের বহন করতে হয়। কিন্তু যখন জানলায় এসে বসি তখন রাস্তায় দেখি চলাচলের চেহারা। ভালো করে যদি খোঁজ নিতে পারতুম তাহলে দেখতুম তার কোনো অংশই বস্তুত হাল্কা নয়,—ট্রাম হুহু করে চলে গেল কিন্তু তার পিছনে মস্ত একটা ট্রাম কোম্পানি,—সমুদ্রের এপারে ওপারে তার হিসেব চালাচালি। মানুষটা ছাতা বগলে নিয়ে চলচে, মোটর গাড়ি তার সর্বাঙ্গে কাদা ছিটিয়ে গেল—তার সব কথাটা যদি চোখে পড়ত তাহলে দেখতুম বৃহৎ কাণ্ড—সুখে দুঃখে বিজড়িত একটা বিপুল ইতিহাস। কিন্তু সমস্তই আমাদের চোখে হাল্কা হয়ে ঘটনা প্রবাহ আকারে দেখা দিচ্চে। অনেক মানুষ আছে যারা এই জানলার ধারে বসে যা দেখে তাতে একরকমের আনন্দ পায়। যারা ভালো চিঠি লেখে, তারা মনের জানলার ধারে বসে লেখে—আলাপ করে যায়—তার কোনো ভার নেই, বেগও নেই, স্রোত আছে। এই সমস্ত চল্‌তি ঘটনার পরে লেখকের বিশেষ অনুরাগ থাকা চাই, তাহলেই তার কথা-গুলি পতঙ্গের মত হাল্কা পাখা মেলে হাওয়ার উপর দিয়ে নেচে যায়। অত্যন্ত সহজ বলেই জিনিসটি সহজ নয়—ছাগলের পক্ষে একটুও সহজ নয় ফুলের থেকে মধু সংগ্রহ করা। ভার-হীন সহজের রসই হচ্চে চিঠির রস। সেই রস পাওয়া এবং দেওয়া অল্প লোকের শক্তিতেই আছে। কথা বলবার বিষয় নেই অথচ কথা বলবার রস আছে এমন ক্ষমতা ক'জন লোকের দেখা যায়? জলের স্রোত কেবল আপন গতি সংঘাতেই ধ্বনি জাগিয়ে চলে, তার সেই সংঘাতের উপকরণ অতি সামান্য তার নুড়ি, তার বালি, তার তটের বাঁকচোর, কিন্তু আসল জিনিসটা হচ্চে তার ধারার চাঞ্চল্য। তেমনি যে মানুষের মধ্যে প্রাণ-স্রোতের বেগ আছে সে মানুষ হাসে আলাপ করে, সে তার প্রাণের সহজ কল্লোল, চারদিকের যে কোনো কিছুতেই তার মনটা একটু মাত্র ঠেকে তাতেই তার ধ্বনি ওঠে। এই অতিমাত্র অর্থভারহীন ধ্বনিতে মন খুসি হয়—গাছের মর্মরধ্বনির মতো প্রাণ-আন্দোলনের এই সহজ কলরব।

যদি না মনে কর আমি অহঙ্কার করচি তাহলে সত্য কথা বলি, অল্প বয়সে আমি চিঠি লিখ্‌তে পারতুম, যা-তা নিয়ে। মনের সেই হাল্কা চাল অনেকদিন থেকে চলে গেছে। তাই আজ চিঠি লিখিনে স্বগত উক্তি করে যাই। জীবনের জানলায় বসে বাইরের দিকে তাকাবার অভ্যাস চলে গেছে—এখন মনের ভিতরের দিকে তাকিয়ে বক্তব্য সংগ্রহ করে চলি। চিন্তা করতে কল্পতে কথা কয়ে যাই—দাঁড় বেয়ে চলিনে, জাল ফেলে ধরি। উপরকার ঢেউয়ের সঙ্গে আমার কলমের গতির সামঞ্জস্য থাকে না। যাই হোক্ এ্যকে চিঠি বলে না। পৃথিবীতে চিঠি লেখায় যারা যশস্বী হয়েচে তাদের সংখ্যা অতি অল্প। যে দু-চারজনের কথা মনে পড়ে তারা মেয়ে। আমি চিঠি রচনায় নিজের কীর্তি প্রচার করব এ আশা করিনে।

নীলমণি দ্বিতীয়বার এসে বললে চা তৈরি। চা বিলম্ব সয় না—পোস্ট আফিসের পেয়াদাও নয়। অতএব ইতি ৪ শ্রাবণ ১৩৩৬

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি তাঁর পুরাতন ভৃত্য বনমালীকে সস্নেহে "নীলমণি" বলে ডাকতেন ও সকলের কাছে উল্লেখ করতেন। এই বনমালী কবির জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সেবা করেছিল। তাঁর মৃত্যুশয্যার কাছে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অক্লান্ত নিষ্ঠায় এই ভৃত্যটির হাজির থাকা চিরকাল স্মরণে থাকবে।

॥ ১১৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু,

সকাল থেকেই আজ বাদলা। চারদিক ঝাপসা। ঘোর ঘনঘটা বল্‌লে যা বোঝায় তা নয়। মেঘদূত যে দিন লেখা হয়েছিল সেদিন পাহাড়ের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সেদিনকার নববর্ষায় আকাশে বাতাসে চলার কথাটাই ছিল বড়ো। দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছিল মেঘ, পুবে হাওয়া বয়েছিল "শ্যামজম্বুবনান্ত"কে দুলিয়ে দিয়ে, যক্ষনারী বলে উঠ্‌ছিল, মাগো, পাহাড়সুদ্ধ উড়িয়ে নিলে বুঝি! তাই মেঘ-দূতে যে বিরহ সে ঘরে বসে থাকার বিরহ নয়, সে উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ। তাই তাতে দুঃখের ভার নেই বললেই হয়, এমন কি তাতে মুক্তির আনন্দ আছে। প্রথম বর্ষাধারায় যে পৃথিবীকে, উচ্ছল ঝরণায়, উদ্বেল নদীস্রোতে, মুখরিত বন-বীথিকায় সর্বত্র জাগিয়ে তুলেছে সেই পৃথিবীর বিপুল জাগরণের সুরেলায়ে যক্ষের বেদনা মন্দাক্রান্তাছন্দে নৃত্য করতে করতে চলেচে। মিলনের দিনে মনের সামনে এত বড়ো বিচিত্র পৃথিবীর ভূমিকা ছিল না—ছোটো তার বাসকক্ষ, নিভৃত—কিন্তু বিচ্ছেদ পেয়েচে ছাড়া নদীগিরি অরণ্য শ্রেণীর মধ্যে। মেঘদূতে তাই কান্না নেই, উল্লাস আছে। যাত্রা যখন শেষ হোলো, মন যখন কৈলাসে পৌঁচেছে, তখনি যেন সেখানকার নিশ্চল নিত্য ঐশ্বর্যের মধ্যেই ব্যথার রূপ দেখা গেল—কেননা সেখানে কেবলি প্রতীক্ষা। এর মধ্যে একটা স্বতোবিরুদ্ধ তত্ত্ব দেখতে পাই। অপূর্ণ যাত্রা করে চলেছে পূর্ণের অভিমুখে—চলেছে বলেই তার বিচ্ছেদ নব নব পর্যায়ে গভীর একটা আনন্দ পায় —কিন্তু যে পরিপূর্ণ সে তো চলে না, সে চির যুগ প্রতীক্ষা করে থাকে—তার নিত্য পুষ্প, নিত্য দীপালোক, কিন্তু সে নিত্যই একা, সেই হচ্চে যথার্থ বিরহী। সুর বাঁধার মধ্যেও বীণায় সংগীতের উপলব্ধি পর্বে পর্বে শুরু হয়েছে, কিন্তু

অগীত সঙ্গীত অসীম অব্যক্তের মধ্যে অপেক্ষা করেই আছে। যে অভিসারিকা তারই জিৎ, কেননা আনন্দে সে কাঁটা মাড়িয়ে চলে। কিন্তু বৈষ্ণব এইখানে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলবে যার জন্যে অভিসার তিনিও থেমে নেই। সমস্তক্ষণ বাঁশি বাজাচ্চেন, প্রতীক্ষার বাঁশি—তাই অভিসারিণীর চলা আর বাঞ্ছিতের আহ্বান পদে পদেই মিলে যাচ্ছে—তাই নদী চলেছে যাত্রার সুরে সমুদ্র দুলচে আহ্বানের ছন্দে—বিশ্বজোড়া বিচ্ছেদের আসর মিলনের গানে জমজমাট হয়ে উঠেচে,—অথচ পূর্ণ অপূর্ণের সে মিলন কোনো দিন বাস্তবের মধ্যে ঘটচে না, সে আছে ভাবের মধ্যে। বাস্তবের মধ্যে ঘটলে সৃষ্টি থাকত না—কেননা সৃষ্টির মর্মকথাই হচ্ছে চির অভিসার চির প্রতীক্ষার দ্বন্দ্ব। এভোল্যুশন বলতে তাই বোঝায়। যাকগে, আমার বলবার কথা ছিল, বাদলার দিন মেঘদূতের দিন নয়—এযে অচলতার দিন—মেঘ চলচে না, হাওয়া চলচে না, বৃষ্টি যে চলচে তা মনে হয় না, ঘোমটার মতো দিনের মুখ আবৃত করেচে, প্রহর চলচে না, বেলা কতো হয়েচে বোঝা যায় না। সুবিধা এই চারদিকে বৃহৎ মাঠ, অবারিত আকাশ, প্রশস্ত অবকাশ। চঞ্চল কালের প্রবল রূপ দেখচি নে বটে কিন্তু অচঞ্চল দেশের বৃহৎরূপ দেখা যাচ্চে—শ্যামাকে দেখলুম না কিন্তু শিবের দর্শন মিলল। ইতি ৮ই শ্রাবণ ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভুল করে কল্যাণীয়াসুর বদলে কল্যাণীয়েষু লিখেছেন।

॥ ১১৮ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমাকে সায়াটিকায় কষ্ট দিচ্চে শুনে ভালো লাগচে না। চিকিৎসা নিঃসন্দেহেই হচ্ছে। মনের মধ্যে একটা অন্ধ এবং অসঙ্গত তাড়না চলে, মনু বলে যে উপস্থিত থাকলে যেন একটা কিছু করা যেতে পারত। আমরা মনে করি আমাদের অবর্তমান বশতই আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বুঝি দুর্যোগ ঘটতে পারে। ইতিহাসের আদিম কালে মানুষকে প্রতিদিনই নিজের গায়ের জোরে আপনার এবং আপন লোকের সংকট ঠেকাতে হোত—আজকের দিনের অকারণ উদ্বেগটা সেদিনকার সকারণ সতর্কতারই পরিশিষ্ট। এ দুদিন অবকাশ ছিল না। প্রমথরা এসেছিল তাদের নিয়ে এবং ছোটখাটো আরো অনেক ঝঞ্ঝাট নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম। সবচেয়ে এইটেই আমাকে দুঃখ দেয়, জীবনে কাজের চেয়ে ঝঞ্ঝাটের পরিমাণটাই বেশি। দুশ্চিন্তাজনক কাজকে ঝঞ্ঝাট বলচি তা নয়। সত্যিকার কাজের গুণ এই যে, তাতে সমস্ত মনকে টেনে নেয়, তাতে মনের উদ্বৃত্ত বড়ো বেশি থাকে না। ঝঞ্ঝাট বলতে বোঝায় এমন কিছু যেটা পুরো কাজ নয়, অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের মতো, তাকে হাতে ধরে চালিয়ে নেওয়া যায় না, কোলে পিঠে করে বইতে হয়, এই জন্যেই দেখতে সে হাল্কা কিন্তু ভারী মানুষের চেয়ে আসলে ভারী। থেকে থেকে ইচ্ছে করে ঝাঁকুনি দিয়ে এগুলো ঝেড়ে ফেলি—কিন্তু মুস্কিল এই যে, বড়ো বোঝাকে ঝাড়া দিয়ে ফেলে দেওয়া যায়, ক্ষুদে জিনিসগুলো পড়ে না, দেহে লেগে থাকে। মনে ভেবেছিলুম এবার শান্তিনিকেতনে এসে নিভৃত কোণ আশ্রয় করে নির্লিপ্ত নিরাসক্ত মনে, দুটি একটিমাত্র বড়ো জাতের কাজ বেছে নিয়ে তারি উপর নিবিষ্ট হয়ে থাকব। এসেছি শান্তিনিকেতনে, আগেকার মতো বিদ্যালয়ের কাজের দায় আর নিই নি। কিন্তু খুচরোদের ঠেকাবে কে? তারা চিহ্নহীন পথে বিনা আহ্বানে কোথা দিয়ে ভিড় করে আসে কেউ জানে না। পাউরুটি শিকেয় তোলা, কুকুর নেই, বেড়াল নেই, ইঁদুর নেই—কিন্তু নামিয়ে সেটা কাটতে গিয়ে দেখা যায় তার ভিতরটা ক্ষুদে ক্ষুদে পিঁপড়েয় ফোঁফরা করে দিয়েচে। আমার অবকাশটা তেমনি—বাইরে থেকে দেখতে গোটা এবং বেশ বড়ো, ভিতরটাতে বহু ক্ষুদের দল ঢুকে খাদ্য সংগ্রহ করচে।

শিশুবিভাগের ছেলেরা এল, তাদের আবদার আছে। যাই। অপূর্ব কাল যাবে তার কাছ থেকে মহুয়ার কপি পাবে। নতুন গান ক্রমে ক্রমে কপি করে পাঠাব। রথীও কাল কলকাতায় যাবে। বর্ষামঙ্গলের আয়োজনে নিবিষ্ট থাকতে হবে। ইতি ১২ শ্রাবণ ১৩৩৬।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১১৯ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

প্রশান্তর চিঠিতে তোমার ভরপুর বিশ্রামের খবর শুনে আমার লোভ হচ্ছে। লিখেচে তোমার বিছানা ঘিরে দেশী বিদেশী নানা জাতের নানা বই। সংসারে কর্তব্য না করা ছাড়া তোমার কোনো কর্তব্যই নেই। যে বদ্‌-মেজাজি লোকটা অন্তরে বাহিরে সর্বদাই কাজের জবাবদিহী তলব করে, শুনুচি তোমার ঘরে তার না কি দরওয়াজা বন্ধ। কর্তব্যবুদ্ধির এমনতরো নির্বাসন একমাত্র দেবলোকেই সম্ভব। এই পরিপূর্ণ চুপচাপ রসের নিবিড় স্বাদ আমিও একদা ভোগ করেচি। চার সপ্তাহ শয্যালীন অবস্থায় ছিলেম শুশ্রূষালয়ে। তখন একটি সত্য আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়েছিল সেটি হচ্ছে এই যে নদীটাকে পান করা যায় না, তার চেয়ে এক গ্লাস জলে অনেক সুবিধে। কিছুদিনের জন্যে যখন জীবনটাকে চারটে দেয়ালের মধ্যে সংকীর্ণ করে এনেছিলুম, তার পদার্থভার যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন সেই হাল্‌কা জিনিসটাকে হাতে তুলে নিয়ে বেশ চেখে চেখে ভোগ করবার সুযোগ হয়েছিল। ভোগের সামগ্রীটি আর কিছুই না, কেবলমাত্র একখানি মন, আর একখানি প্রাণ। সে মন সে প্রাণ আপনার শেষ প্রান্তে—আপনার অতীত দেশের-গায়ে-ঠেকা। লণ্ডনের ডাক্তার পাড়ায় সে বাড়িটা। ছোটো ঘর, বিছানা ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। দেয়ালের উপরিভাগে একটি বাতায়ন, তার থেকে কিছুই দেখা যেত না, কেবল কোনো একসময়ে আসত একটুখানি রোদ্দুর, আর বাকি সময়ে আসত কেবল পরিমিত আলো। আকাশভরা রোদ্দুরকে এমন করে কখনো দেখেনি—এটিকে পেতুম যেন এক টুকরো পরশমানির মতো, আমার মনের সমস্ত ভিতরটাকে সোনার আভায় পরিপূর্ণ করে দিত। এমনি টুকরো করে পাওয়াতেই আমি যেন আকাশের সমস্ত আলোককে সত্য করে পেয়েছি—উদাসীন অঞ্জলি উপছিয়ে আঙুলের ফাঁকের ভিতর দিয়ে একটুও গলে পড়ে যায় নি। দীর্ঘকাল নিস্তব্ধ হয়ে থাকার দরুণ মনের ধারণাশক্তি বোধ হয় বাড়ে। তাকে ঠিক ধারণাশক্তি নাম দেওয়া যায় না—আত্মানুভূতি বলা যেতে পারে। অহরহ নানা বিষয়ে চিত্ত যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়ায় তখন সে আপনার কাছে আসবার অবকাশ পায় না—কিছুকাল দায়ে পড়ে যখন চলাবলা বন্ধ করে স্থির হয়ে থাকা যায় তখন ক্রমে সমস্ত আবিলতা থিতিয়ে গিয়ে চিত্ত আপনাকে আপনি স্বচ্ছ করে জানতে পায়—সেই জানাতে নিবিড় একটি আনন্দ আছে। সেই আনন্দটি কেন ও কি, স্পষ্ট করে বলা শক্ত। ইংরেজী ভাষায় যাকে mystic বলে যদি সেই জাতীয় একটা ব্যাখ্যা চিঠির মধ্যে দিলে নিতান্ত অসঙ্গত না হয় তাহলে বলা যেতে পারে যে, বিশ্বজগতের গভীরতার মধ্যে একটি নিস্তব্ধ বিশুদ্ধ আনন্দময় আত্মানুভূতি আছে। কোনো উপায়ে যদি বাহিরের অবিশ্রাম নানা গোলমাল থেকে ছুটি পাওয়া যায়, তাহলে আপন সত্তার নির্মল উপলব্ধিকে পরম সত্তার সেই ধ্রুব আনন্দে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই। আমরা যখন নানাখানাকে

কেবলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াই তখনই সমগ্রবোধটা হারিয়ে যায়,—সেই অখণ্ডই হচ্ছে উপনিষৎ যাকে বলেন ভূমা। এই ভূমার মধ্যে অভিনিবিষ্ট হবার যে আনন্দ তার তুলনা হয় না। তখনি চারিদিকের সমস্ত ছোট ছোট জিনিসকে আমরা অসীমের ভূমিকার মধ্যে দেখতে পাই। ঐ যে বললেম, আমার শুশ্রূষালয়ে অল্প খানিকটা সূর্যের আলো দেখতে পেতেম, কিন্তু সেইটুকুই আমাকে অখণ্ড জ্যোতিস্বরূপের স্পর্শ দিত—যে জ্যোতি আনন্দময়। মাঝে মাঝে কোনো ইংরেজ বন্ধু আমাকে দেখতে আসতেন—সাধারণত বহুলোকের মাঝখানে তাঁদের ঠিক মূল্যটি পাইনি—কিন্তু এই ঘরটির মধ্যে যখন তাঁরা আসতেন তখন একেবারে পূর্ণভাবে তাঁদের পাওয়া যেত—অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ স্বভাবতই অসামান্য, সে একান্তই বিশেষ, কিন্তু তাদের আমরা অনেকের সঙ্গে তাল পাকিয়ে দেখি, এই জন্যে ঠিক মতো দেখিনে। কিন্তু জনহীনতার বৃহৎ অবকাশের মধ্যে যখন কাউকে দেখি তখন তাকে বিশেষভাবে সত্য করে দেখার আনন্দ পাই, তাকে ধাঁ করে এড়িয়ে যাবার জো থাকে না, তখন সে আপন ঐকান্তিকতার মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠে। বড়ো হয়ে ওঠে বললে ভুল বলা হয়, সে যথার্থ হয়—অন্য সময়ে আমাদের দৃষ্টির জড়তায় সে ছোটো হয়ে থাকে। কথাটা একটু অদ্ভুত শোনায় কিন্তু সেই আরোগ্যশালার নিঃশব্দতা ও নিস্তব্ধতার মধ্যে আমি যে নিরবচ্ছিন্ন গভীর আনন্দ পেয়েছি জীবনে তেমন আনন্দ বেশিবার পাইনি। প্রথমবার যখন আমেরিকায় যাত্রা উপলক্ষ্যে আটলাণ্টিকে পাড়ি দিয়েছিলুম, জাহাজটা ছিল জীর্ণ, সমুদ্র ছিল অশান্ত, অসুস্থ শরীর নিয়ে ক্যাবিনের মধ্যে অবরুদ্ধ ছিলুম। তখন সেই স্বাস্থ্যের অভাব ও স্থানাভাবের সংকীর্ণতার মধ্যে একটি নিবিড় আনন্দের উৎস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল—নিতান্তই অকারণ আনন্দ—অস্বচ্ছন্দতাকে প্লাবিত আবৃত করে দিয়ে। শরীরের কষ্টটাই তখন বাহিরের বহুবৈচিত্র্যকে ঠেকিয়ে রেখেছিল—বেদনার সেই খিড়কির দরজার ভিতর দিয়ে একটা মুক্তির ক্ষেত্রে এসে পড়েছিলুম, সেই ক্ষেত্রে আলোতে, আনন্দে এবং আমার সত্তায় কোনো ভেদ নেই। বিজ্ঞান যখন বস্তুর অন্তরতম লোকে প্রবেশ করে, অনির্বচনীয় আলোকের নৃত্যশালায় গিয়ে উপস্থিত হয়, দেখে যে সেখানে রূপের বৈচিত্র্য প্রায় বিলীন হয়েচে, রূপলোকের সেটা প্রত্যন্ত ভূমি, তার পরেই অরূপ—সেই অরূপের কথা বিজ্ঞান কিছু বলতে পারে না, উপনিষৎ তাকেই বলচেন আনন্দ। প্রাণ এ জতি নিঃসৃতং—সেই অরূপ আনন্দ থেকেই নিঃসৃত হয়ে প্রাণ নিরন্তর কম্পিত হচ্ছে। নিজের গভীরতার মধ্যে গিয়ে পড়তে পারলে সেই রকমই একটি নির্বিশেষ পূর্ণতার তীরে এসে যেন পৌঁছই। সেখানে শরীর মনের দুঃখও দুঃখ নয়, কেননা সেখানে শরীর মনের গণ্ডিটাই নেই। ইতি ১৪ শ্রাবণ ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১২০ ॥

ঔঁ

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু,

ক্লান্তিতে শরীর বিজড়িত। মজ্জার মধ্যে ক্লান্তি। আজ সকালে অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়ে পড়ে ঝিমিয়ে কাটিয়েছি। হঠাৎ মনে হল নাটকটা কপি করানো উচিত—অনেক আগেই এ কাজটা সেরে রাখব স্থির করেছিলুম কিছুতেই সুবিধা হয়নি। খুঁজতে গিয়ে পেলুম না। তাই ফোন করেছিলুম।

কাল যাব। কেমন অবসাদ বেড়ে চলেছে। ক্ষুধা গেছে, বিশ্রাম গেছে,—মস্তিষ্কের মধ্যে এসেছে অসাড়তা। অতএব দেবদত্ত যা বলেছিল—অতএব কাল এগারোটার গাড়িতে। মুদ্রিত একটা পাখির ও একটা তরুণীর ছবি প্রশান্তর কাছে আছে। সে দুটো এই লোক মারফৎ পাঠিয়ে দিয়ো। সন্ধ্যের দিকে যাব। ইতি বুধবার।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বোধহয় সেপ্টেম্বর ১৯২৯।

ঔঁ

বর্ষামঙ্গলের গান

ঝড় নেমে আয়, আয়রে আমার
শুকনো পাতার ডালে—
এই বরষায় নবশ্যামের
আগমনের কালে।
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন,
যা' আনন্দহারা,
চরম রাতের অশ্রুধারায়
আজ হয়ে যাক্ সারা
যাবার যাহা যাক্ সে চলে
প্রলয় নাচের তালে॥

আসন আমার পাততে হবে
রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে
সিক্ত বুকের পরে।
নদীর জলে বান ডেকেছে
কূল গেল তার ভেসে,
যূথীবনের গন্ধবাণী
ছুটল নিরুদ্দেশে,
পরাণ আমার জাগ্‌ল বুঝি
মরণ অন্তরালে॥

বলা বাহুল্য বর্ষামঙ্গলের গানগুলি একটা একটা করে রচনা করা হয়েচে। যারা বইয়ে পড়বে, যারা উৎসবের দিনে শুনবে তারা সবগুলিকে একসঙ্গে পাবে। প্রত্যেক গান যে অবকাশের সময় আত্মপ্রকাশ করেছিল সেটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে তারা দেখবে। আমার বিবেচনায় এতে একটা বড়ো জিনিসের অভাব ঘটল। আকাশের তারাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে হার গাঁথলে সেটা বিশ্ব-বেনের বাজারে দামী জিনিস হতেও পারে কিন্তু রসিকেরা জানে, যে ফাঁকা আকাশটাকে তৌল করা যায় না বটে কিন্তু ওটা তারাটির চেয়ে কম দামী নয়। আমার মতে যেদিন একটি গান দেখা দিলে সেইদিনই তাকে স্বতন্ত্র অভ্যর্থনা করে অনেকখানি নীরব সময়ের বুকে একটিমাত্র কৌস্তভমণির মতো ঝুলিয়ে দেখাই ভালো। তাকে পাওয়া যায় বেশি। বিক্রমাদিত্যের সভায় কবিতা পড়া হত, দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে—তখন ছাপাখানার দৈত্য কবিতার চারদিকের অবকাশকে কালি দিয়ে লেপে দেয় নি। কবিও প্রতিদিন স্বতন্ত্র পুরস্কার পেতেন—উপভোগটা হাইড্রলিক জাঁতায় সংক্ষিপ্ত পিণ্ডাকারে এক গ্রাসের পরিমাণে গলায় তলিয়ে যেত না। লাইব্রেরিলোকে যেদিন কবিতার নির্বাসন হয়েছে, সেদিন কানে-শোনার কবিতাকে চোখে-দেখার শিকল পরানো হোল, কানের আদরের ধন পাব্লিশরের হাটের ভিড়ে হোলো নাকাল। উপায় নেই—নানা কারণে এটা হয়ে পড়েচে জটলা পাকানোর যুগ—কবিতাকেও অভিসারে যেতে হয় পটলডাঙার কলেজ পাড়ার অগ্নি-বাসে চড়ে। আজ বাদলার দিনে আমার মন নিঃশ্বাস ফেলে বলেচে "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে"—দুর্যোগে জন্মালুম ছাপার কালি-দাস হয়ে—মাধবিকা মালবিকারা কবিতা কিনে পড়ে—জানলার পাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে না। ইতি ৬৫ শ্রাবণ ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

মালগাড়ি ধিকুতে ধিকুতে আসছে। যেটা ছিল এক ঘণ্টা সেটা দেড় ঘণ্টা করে নিয়ে গাড়ি ছাড়ল আমাদের। দাবা খেলতে বসেছি অদৃষ্টের সঙ্গে, সে যেন মুচাক হেসে একটা মোক্ষম ঘুটি সামনে ঠেলে দিলে। মুচাক হেসেই আরও একটা মারাত্মক চাল যে এর আগেই টিপে দিয়েছিল, সেটা টের পেলাম অনেক পরে।

গাড়িটা আসতে উঠে গিয়ে গোছগাছ করে বসেছি, ডিউটির পোশাকে রমেশ এসে উপস্থিত। আমাদের আত্মীয় এবং এখানকার সহকারী স্টেশন মাস্টার হয়ে রয়েছে বছর দুই থেকে।

এবারে দেখলাম আমায় দেখে ওর মুখটা বেশি রকম দীপ্ত হয়ে উঠেছে। বললাম—"উঠে এস, খবর ভালো তো সব? তোমার এখন এই শিফটে ডিউটি চলেছে?" উঠে এসে আমার সামনা-সামনি বসল।

খবরটা খুবই ভাল অপ্রত্যাশিত রূপে। কয়েকদিন হ'ল সহকারী থেকে খোদ স্টেশন মাস্টারের ডিউটি পেয়েছে। ব্যাপারটা জানতাম লালফিতার জটিলতার মধ্যে চাপা পড়ে আছে, আশাও কম, সহায়-সম্বল তো নেই কিছু, হঠাৎ এই অর্ডারটা বেরিয়েছে।... বাড়ি থেকে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে এমন একটা জাঁদরেল খবর, অথচ বলতে হবে যাত্রা ঠিক হয়নি।

স্বভাবতই ঐ আলোচনাই চলল আমাদের। কেমন করে ফাইল চাপা পড়ে গিয়েছিল, কাদের কারসাজি তার মধ্যে কি করে উদ্ধার হলো। তারপর ভবিষ্যৎ। ঐই যে একটা নূতন পথ খুলল এর গতি কোন দিকে? এটা আপাতত অস্থায়ী ব্যবস্থা, তার পর স্থায়ীটা কি আকারে দেখা দেবে।

নূতন দায়িত্ব, ওকে নেমে যেতে হলো শীঘ্র।

এধরনের ব্যাপারকে কি বলা যায়? এত নিবিড় আনন্দ, আর তাই নিয়ে ঐ-টুকুর মধ্যে এমন যতি-বিরতিহীন নিশ্ছিদ্র আলোচনা হলো আমাদের যে, ঐ সময়ের নিতান্ত দুটো দরকারী কথা (আর নিতান্তই স্বাভাবিক) একেবারেই বাদ পড়ে গেল: ও আমায় জিজ্ঞেস করবে—হঠাৎ যাচ্ছি কোথায়? একটা প্রশ্ন যা কেউই এমন হঠাৎ সাক্ষাতে না করে পারেনি এ আগে। আমি জবাব দেব—"পাটনায়।"

তা হলো না।

মিলিয়ে দেখেছি—তা হয়ই না প্রায়।

আসল কথা কি জান? এই বিরাট বিশ্বনাটের রচয়িতা—The Greatest of Playright—তাঁর চেয়ে বড় শিল্পী তো আর হতে নেই। কি করলে effect অর্থাৎ প্রভাবটা ঠিক কি ভাবে ফুটবে, পরিণামটা কতখানি স্পষ্ট হয়ে উঠবে তা তাঁর চেয়ে বেশি করে কে জানে বলো। তাই তিনি এত বিরোধ-বিলাসী, Fond of Contrasts। সুখকে নিবিড় ভাবে ফোটাবার জন্যে এনে ফেলেন তীব্র ব্যথা—The darkest hour before the dawn; তেমনি আবার দুঃখ নিরাশাকে ফোটাবার জন্যে এনে ফেলেন সুখের মায়া। কাগজটা দুগ্ধ ফেনের মতো শুভ্র না হোলে খুলবে কেন কালির আঁচড়?

দুঃখ-দুর্ভাবনা সব মনে থেকে ঝরে গেছে; সুখবরের এই সুখটুকু নিয়ে বেরুনো গেল সমস্তিপুরের স্টেশন ছেড়ে। ছোট শহর, গাড়ি সেটাকে পেছনে ফেলে আসতে, মনটা দুধারের মাঠে দিলাম ছড়িয়ে। ঠিক নিজ মিথিলা বলতে যা বোঝায় সে জায়গা ছেড়ে আমরা ক্রমেই দূরে গিয়ে পড়ছি। এদিক'কার জমি খুব উর্বর নয়। অন্তত আমাদের ওদিকের মতো নয়। ফসল আছে, এই ক'দিন মাত্র হল বর্ষা গেছে, আর বর্ষাটা ছিলও ভাল এবারে, তবু মাঝে মাঝে খালি জায়গা আসে পড়ে। কোনটা থেকে হয়তো সদ্য কোন ফসল কেটে নেওয়া হয়েছে, কোনটা একেবারেই বন্ধ্যা। মনটা প্রফুল্ল থাকলে সবকিছুরই ওপর তার আলো এসে পড়ে; এই যে হরিৎ-বিহীন উষরতা এটাও আমার লাগছে বড় মিষ্ট। মন বলছে—নিত্য প্রসূতির মতো ধরিত্রী শুধু ফসল নিয়েই থাকবে, তার অবসর থাকবে না কোনখানে একটু নিঃশ্বাস ফেলবার, এই বা কেমন কথা!......এর উপর বোধ হয় salt-peter বা সোরার সংমিশ্রণ বেশি থাকায় এদিককার মাটি বেশ সাদাটে। তাইতে আমার দুদিকে যে দৃশ্যাবলী গাড়ির বেগের সঙ্গে দ্রুত এসে দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তাতে চমৎকার একটি অভিনবত্বই এনে দিয়েছে—ওপর আর নীচে চমৎকার একটি মিল, তফাতের মধ্যে ওপরে অর্থাৎ শরতের আকাশে নীলের পাশে সাদা নীচের সবুজের পাশে পাশে। উভয়ত্রই মধ্যাহ্ন সূর্যের আলো পড়েছে ঠিকরে। মনটা এত ভাল আছে যে, অমন যে গাড়ি সেটাকেও ক্ষমা করতে পারছি। গতিবেগটা বাড়িয়েও দিয়েছে, গতির হিল্লোলে আমার প্রসন্ন, ক্ষমার্দ্র মন থেকে সব গ্লানি যেন ঝরে গিয়ে মনটাকে আরও স্বচ্ছ করে দিচ্ছে।

এমন কি, গতিটা হঠাৎ নিরুদ্ধ হয়ে

যেতেও তাতে বিশেষ ইতর বিশেষ হল না। ......চেন টিনে দিয়েছে কে।

এই এক ব্যাপার। এদিককার মতো নির্বিচারে চেন টেনে দিয়ে খেয়াল খুশি মতো গাড়ি থামিয়ে দেওয়ার হিড়িক আর কুত্রাপি দেখলাম না। সেই স্বাধীনতার পর থেকেই। সর্বত্র কণ্ট্রোল, শুধু এটাকে আনা গেল না কণ্ট্রোলের আওতায়। একবার কিউল থেকে পাটনার মধ্যে সাতবার এই দুর্বিপাক। চেন টানে, নির্বিকারভাবে নেমে চলে যায় ইঞ্জিন থেকে হাতুড়ি-বাটালি নিয়ে লোক আসে, নির্বিকারভাবে ঠিক করে দেয় গাড়ি চলে আবার নির্বিকারভাবে, পঞ্চাশ টাকা জরিমানার নোটিশটা নির্বিকারভাবে চেয়ে থাকে, আবার কারুর দরকার হয় থেমে যায় গতি;......

কিন্তু থাক এসব কথা এখন। যা বলছিলাম। গাড়িটা থেমে গিয়ে কিন্তু আমার মনের সেই প্রসন্নতাকে নষ্ট করতে পারল না এবার। তার একটু কারণ হয়েছে অবশ্য, গাড়িটা দাঁড় করিয়েছে গণ্ডকী নদীর সেই সাঁতিটার একেবারে কাছাকাছি এসে, ইঞ্জিনটা খানছয়েক গাড়ি নিয়ে উঠেই পড়েছে পুলটার ওপর।

এই সাঁতিটাকে আমি ভালবাসি। চারিদিকের দৃশ্যাবলীর মধ্যে যেমন এটা বিশিষ্ট, যাকে বলা যায় ল্যাণ্ডমার্ক (Landmark), আমার জীবনেও তেমনি। কৈশোর থেকে আরম্ভ করে কতরূপেই বা দেখলাম একে। একদিন দেখেছি গণ্ডকীর একটা শাখানদী রূপেই। নিত্য প্রবাহমানা, পূর্ণতোয়া। বাবার কর্মস্থান মহম্মদপুরে গণ্ডকীর কথা বলেছি আগেই, তার সংগে আমার সেই নিবিড় সম্বন্ধ, এখানে এসে আবার যেন সেই গণ্ডকীকে কতকটা ফিরে পেতাম।......যেন রেলগাড়িতেই হঠাৎ একটি মেয়ে উঠে আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল, মিটি মিটি হেসে প্রশ্ন করছে—"আমায় চেনেন?"

কার সংগে যেন মিল, কোথায় যেন মিল —গায়ের রঙে, চোখের চাউনিতে। না ঠোঁটের হাসিতে?—অবাক হয়ে চেয়ে আছি।

"আমি হচ্ছি আপনাদের অমুকের (ধ'রে নেওয়া যাক পুষ্পলতার) মেয়ে যে!"

"তাই নাকি?......তাইতো দেখছি!"

—তারপরে যেন আরও অবাক।

এমনি অবাক করলে আমায় এই সাঁতিটাও। যেদিন প্রথম পরিচয় পেলাম সেদিন তো বটেই, নবপরিচয়ের বিস্ময়ে— "ও, গণ্ডকীর মেয়ে নাকি তুমি? আদর করে আমরা যে তাকে বলি বুড়ি-গণ্ডকী গো!"

তারপরেও অবাক হয়েছি, কিন্তু আনন্দ-বিস্ময়ে নয়। বেদনায়।

বহুদিন পরে একবার যেতে যেতে দেখলাম সাঁতির জল প্রবাহহীন। বুঝলাম মায়ের সংগে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে মেয়ের। সাঁতি এসেছে ভরাট হয়ে, যেখানে ছিল টলটলে জল, সেখানে শুকনো ডাঙার জবর-দখল; ঘাস বিছিয়ে দিয়েছে, ফসল ফলিয়ে দিয়েছে। কষ্ট হয়।

তোমরা নব্য ভারতের Grow-more-food অর্থাৎ 'খাদ্য-বাড়াও' তন্ত্রের উপাসক, বলবে ভালোই তো। এত একার (acre) জমি বেরিয়ে এল, এত টন খাদ্য বাড়বে। পেটে ক্ষুধা, 'না' বলতে পারি না। তবুও কোথায় একটা প্রশ্ন যেন অতৃপ্ত থেকেই যায়। মানুষ কি কোথাও কিছু আর থাকতে দেবে না? তার শুধু আননের সংখ্যা যাবে বেড়ে, পৃথিবীতে থাকবে শুধু ক্ষুধা আর খাদ্য! মানুষকে দোষ দিই না, উপায় কি? শুধু ভাবি কী অভিশপ্ত আমরা এই মানবজাতি! কী অভিশপ্ত এই পৃথিবী! একদিন যাকে গর্ভে ধরেছে, যাকে জন্ম দিয়েছে, একদিন শুধু তার ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করতে তারই জঠরে প্রবেশ করতে হবে বেচারিকে! নদী যাবে, পাহাড় যাবে, সাগর যাবে, মরুভূমি যাবে, কানন যাবে, প্রান্তর যাবে। সৃষ্টির ওঁ-কার গিয়ে ধ্বংসের একটি মাত্র হুংকার থাকবে জেগে—গ্রো মোর ফুড!! কী অভিশাপ-গ্রস্ত পরিণাম!!

যাই হোক, সাঁতিতে এবার জল রয়েছে, আমার সংগে সেইটুকুই সম্বন্ধ। আমি ওমরখৈয়ামে বিশ্বাসী; অত মাথা ঘামিয়ে হবে কি? নগদ যা পাচ্ছ তাই আদর করে মাথায় তুলে নাও— Take the cask in hand and waive the rest. সাঁতিতে জল রয়েছে এবার। বর্ষায় এখনও খানিকটা করে ঢোকে, তবে এবার বর্ষা ছিল

প্রবল, গণ্ডকী-বুড়ি ক্ষেপে উঠেছিল, সাঁতিতে পুরো জল, এমন কি স্রোত পর্যন্ত চলছে এখনও।......ওর এত সুখে খোঁজা, আর এমন যোগাযোগ হবে যে গাড়ি যাবে ঠিক এইখানটিতে থেমে, আমি দুচোখ ভরে দেখব—এ যে একেবারে অভাবনীয় ব্যাপার।

...একটু শ্বেতাভ জলের রাশি দুকূলে চেপে যাচ্ছে আস্তে আস্তে বয়ে, সূর্যের আলোয় ঝলমল। গাংচিলদের ভীড়, মাঝে মাঝে এক একটা ধনুকের মতো বৃত্তাভাসে নেমে এসে গাঙের গায়ে ছোঁ মেরে আবার উঠে যাচ্ছে। জলের পর থেকেই সবুজের রাজ্য, ফসলে ফসলে দুখানি তীর ঢাকা। সাঁতি এবারে নিজেও পেয়েছিল প্রচুর, আঁজলা ভরে ঢেলেও দিয়েছে প্রাচুর্য।......দুখানা ডোঙা দাঁড় ঠেলে চলেছে পাশাপাশি, দুজন করে লোক, একজন দাঁড়ে, একজন জাল নিয়ে। প্রায় উলটে গিয়ে যখন তেকোনা জালটা তুলছে, আটকাপড়া ছোট ছোট মাছের ঝাঁক চিক চিক করে উঠছে সূর্যের আলোয়। চারিদিকেই মধ্যাহ্ন শান্তি, তার গায়ে একটি মাত্র শব্দ; টানা, করুণ; কি একটা পাখির বোধহয় কাব্য জেগেছে মনে, সঙ্গিনীকে ডাকছে। সঙ্গিনীই না সৌন্দর্যের ষোলকলা? ...কে আজ চেন টেনে দিয়ে আমার গাড়িটা থামালে, এমন করে? শতদিনের শতজনের অপরাধ একটি দিনের প্রসাদে যেন নিঃশেষ করে মুছে দিয়েছে।

তাকে দেখলামও সঙ্গে সঙ্গেই। এই নাটকীয় অপ্রত্যাশিতগুলো ঘটে বলেই তো বিশ্বাসটা বেঁচে থাকে যে এই বিরাট পুতুল-নাচের পেছনে বসে কেউ টেনে যাচ্ছেই নাচের দড়ি। ইঞ্জিনের লোকটা ঠোকাঠুকি শেষ করে ফিরে যাচ্ছিল, প্রশ্ন করলাম—"ব্যাপারটা ছিল কি?"

"দেখিয়ে না, চলে যা রহে হ্যায়"...... অর্থাৎ দেখো না ঐ চলে যাচ্ছেন।

গাড়ির পেছন দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখি তখন রেলের বাঁধ থেকে নেমে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে; একটি যুবা আর একটি কিশোরী বলাই ঠিক; পরিচ্ছদের হিসেব ধরে আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় একটি বর আর একটি বধূ। নূতন বিয়ে নয় অবশ্য; হয়তো দ্বিরাগমন।

বর হাত দুয়েক এগিয়ে। পরনে হলদে ধুতি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবির ওপর ঐ চাদর, পায়ে লাল মোজা, মাথায় চুমকি বসানো, রঙীন টুপি। কনের পায়ে রঙীন জুতা, আলতা বা মেহদি আছে নিশ্চয়, তবে এতদূর থেকে দেখা যাচ্ছে না, বড় ফাঁদের মলগুলো শুধু উলটেপালটে দুপুরের রোদ ঠিকরে চলেছে। রঙীন রেশমী শাড়ি, তার ওপর কাঁধ-পিঠ ঢেকে একটা উড়ানি, শাড়ি দিয়েই মুখের বেশ খানিকটা পর্যন্ত ঘোমটা টানা। নদীর তীরের উঁচু-নীচু জমির ওপর দিয়ে যে সরু পায়ে-হাঁটা রাস্তাটা। লতিয়ে লতিয়ে এগিয়ে গেছে—সেইটে ধরে চলেছে দুজনে। চারিদিকে রোদ-মাখা সবুজ আর সবুজ। সামনের গ্রামটা দূরে ঝিলিক করছে। ......চিত্রের সম্মুখভাগে আর লোক নেই, নদীর সেই চারটি মাল্লা ছাড়া, তারাও স্রোতের টানে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। পেছনে পুল, তার পাশে আমাদের এই টানা গাড়িটা। সহস্র চক্ষু হয়ে চেয়ে রয়েছে ঐদিকে......বাঁশি বাজিয়ে ছেড়ে দিল গাড়িটা।

আরও দূরে চলে গেছে ওরা। একবার ডুবেই গেল সবুজের মধ্যে, নদীর মাঝামাঝি এসে আবার দেখতে পাচ্ছি। ঘোমটাটুকু এর মধ্যে কখন খসিয়ে দিয়েছে কনে-বৌ, ঘুরে ঘুরে চাইলও দু-তিনবার গাড়ির দিকে। আর অত লজ্জা কিসের? মনে হলো যেন পাশাপাশি হয়ে চলছেও দুজনে।......গাঁয়ের কাছে গিয়ে আবার ঘোমটা টেনে আগু-পিছু হয়ে গেলেই হবে।

তারপরেও আছে গল্প। গল্পই তো বাস্তবকে করে পূর্ণ। আজই বোধহয় ফুলশয্যা। বর বলবে—"দেখলে তো, গাড়িটা দিলাম কেমন থামিয়ে?"

চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠবে কনের—"আশ্চর্য বাপু! আমার এত ভয় করছিল। কেউ এসে কিছু না বলে। গাড়ির লোকেরাও তো একটু টুঁ শব্দটি করল না! আশ্চয্যি!"

"করলেই হোল আর কি! আমারি বাড়ি এখানে, কখন স্টেশনে আসবে সেই ভরসায় থেকে তিন কোশ ঘুরে আসতে গেলাম অমনি!"

এবার আর কথাও ফোটে না; শুধু ডাগর চোখদুটিই বলে—"আশ্চয্যি!!"

এইটুকু পুরস্কারের জন্যই তো নেওয়া ঝুঁকিটুকু। নৈলে স্টেশনে পাল্কি ছিল, লোক ছিল, তিন কোশ দূরের কোন্ ব্যবস্থাই বা ছিল না?

কে এই চেন টেনে গাড়ি থামাবার ব্যবস্থাটা করেছিল? বেচারিকে কত অভিসম্পাতই না দিয়েছি এর আগে; আজ অভিনন্দিত করলাম।

সাঁতি পেরিয়ে প্রায় ক্রোশদুয়েক এসে পুষা-রোড স্টেশন। আজ সাঁতির মতোই হৃত-গৌরব। একসময় কী বোলবোলাও সে! পুষা ছিল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কৃষি-গবেষণা কেন্দ্র। একে কৃষি-গবেষণা, তায় আবার সে-যুগের ইংরাজ সরকারের; আরও কিছু করবার ছিল না হাতে, সুতরাং সুদূরে বেহারের মাঝখানে বসে কেন্দ্র-সরকারের রোয়াব খেলাবার প্রচুর অবসর পেতেন কর্তারা। দিল্লির নজর থেকে এত দূরে, আই এন এ বা সত্যাগ্রহ না করেও তো পূর্ণ স্বরাজ। প্রায় প্রতি গাড়িতেই দেখতাম কেউ হোমরা-চোমরা আসছেন বা যাত্রা করছেন দিল্লি অভিমুখে। সমস্ত স্টেশনটা হয়ে রয়েছে থমথমে। বালিকণার ওপর সূর্যের মতো পুষার গায়ে দিল্লি উঠত ঝকমকিয়ে।

এখনও শুনেছি কি একটা আছে এখানে, বোধহয় কৃষিবিভাগেরই কিছু, তবে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের অধীনেই নাকি, দিল্লি ছিল দূরে; এখন পাটনা, সে তো গংগা পেরুলেই। চোখ তুললেই দেখতে পাবে কি হচ্ছে, কাজেই মুক্তচ্ছন্দ জীবনের সে জলুস কি বজায় রাখা যায় এখন?

তাই পুষা এখন পুরোপুরিই চাষা।

পরের স্টেশন ঢোলিতে এসে শোনা গেল, গাড়ি ছাড়তে দেরি হবে। বাধা সমস্তিপুরের মতোই; সামনের স্টেশন থেকে গাড়ি ছেড়েছে, না পৌঁছলে পথ খালি পাওয়া যাবে না। এবার অবশ্য প্যাসেঞ্জার গাড়ি।

কিন্তু মালগাড়ি হলেও আপত্তি ছিল না আর, বরং খুশিই হতাম। দেখছি তো, বাইরের বিরূপতার ছদ্মবেশে কে বরাভয় রূপে রয়েছে দাঁড়িয়ে আমার পাশে। স্মৃতির পাড়েও দেখলাম, এখনও তাই। গলা বাড়িয়ে দেখি দূরের সিগন্যালটা নামানো রয়েছে বটে, তবে ইঞ্জিনের ধোঁয়া দেখা যায় না।......বহুদিন ছোঁয়া হয়নি ঢোলির মাটি। কত স্মৃতি যে জড়িত এর সংগে! তা ছাড়া বাবার পায়ের ধূলি আছে মিশে, মারও।... নেমে পড়লাম। বাবার কর্মস্থান গণ্ডকী-তীরের সেই মহম্মদপুর, তার এই রাস্তা। এখান থেকে প্রায় তিন মাইল পড়ে।

নেমে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম। যেন একটি স্বপন-রাজ্যের মধ্যে এসে পড়েছি। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ওদিককার কথা, সে স্বপন কথাই হবে বৈকি। আমি তখন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তোমাদের এখনকার নবম আর কি, ম্যাট্রিক থেকে দু' শ্রেণী নীচে। গরমের ছুটিতে বাবার কাছে এসেছিলাম স্বাস্থ্য শুধরে নিতে, স্কুল খুলবে এবার তাই ফিরছি।

বাবা সংগে আছেন। আশ্চর্য লাগছে ভাবতে, বাবা তখন আমার চেয়েও ছোট। এখনকার তুমি যা, তার চেয়েও তোমার বাবাকে একদিন ছোট তো নিশ্চয়ই দেখেছ; আমি সেই কথাই বলছি।......ও চিন্তাটা বড় কৌতুকজনক। যাঁরা গত হয়েছেন, তাঁদের শেষ দিকের চেহারাটাই আমাদের স্মৃতিতে শাশ্বত হয়ে থাকে, বাবা, মা, আরও যাঁরা ছিলেন। তাই আমি এক এক সময় বসে বসে তার ওদিককার চিত্রটাকে স্পষ্ট করবার চেষ্টা করি। যতখানি তাঁদের দেখেছি —সেই শৈশবের চৈতন্য-উন্মেষ থেকে, ততটুকুই নয়; সে তো সুলভ, সবাই করে। আমি মনটাকে পাঠিয়ে দিই আরও দূরের অভিযানে, যখন আমি জন্মাই নি। যিনি বরাবরই ছিলেন সৌম্য, গম্ভীর, এক সময় যে তিনি যে-কোন বালকের মতোই ছিলেন চঞ্চল; বাধ্যতা আদায় করতেই যাঁকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি, তাঁর নিজেরও যে একটি অবাধ্য রূপ ছিল, বাপের কাছে তাড়না খেয়ে মায়ের আঁচল জড়িয়ে আবদার করতেন—এ বড় অপূর্ব চিত্র। কল্পনাকে একেবারে মুক্তি দিয়ে দেখো, বড় মিষ্টি লাগে। মায়ের বেলায় মেয়ে বলেই যেন আরও মিষ্টি।......তোমার চেয়ে ছোট, মা আটহাতী শাড়িটি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পায়ে আলতা—বিস্ময়কর চিত্র নয় কি একটি?

স্টেশনের বাইরের দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি আমি। অনেক দিনের মধ্যে একটি দিন যেন বেশি পা বাড়িয়ে থাকে, সেইটি এসে পড়ল কালের অলিন্দ বেয়ে। দুই বলদে টানা কুঠির শাম্পানী-গাড়িটা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। হৃষ্টপুষ্ট বলদ দুটোর গলা দুলছে, গলার ঘণ্টি বাজছে টিং টিং করে। সামনে এসে দাঁড়াল তেজী বলদ, চলার ঝোঁকে বোধ হয় চঞ্চল হয়ে উঠেছে একটু, বাহালমান্ (গাড়োয়ান) নেমে একটার পিঠে দুটো আদরের চড় বসিয়ে বলল —"হও, হও"। অর্থাৎ ঠাণ্ডা হ'।......কিম্বা হয়তো অন্য ব্যাপার, ঘোড়ার বেলায় কোচম্যান্‌রা যখন করে তখন ওই বা করবে না কেন? সাওয়ারি কুঠির খোদ কেশিয়ার বাবু, তাঁর ছেলে; কম কি?

পেছনের দরজা দিয়ে বাবা আর আমি নামলাম।

চিত্রটিকে যেন দাগে দাগে বুলিয়ে যাওয়ার জন্যেই আমি—অর্থাৎ এই এখনকার আমি বারান্দা ছেড়ে স্টেশনের ভেতরের দিকে এলাম। এ আমি যেন লুপ্ত হয়ে গেছি, বয়স থেকে পঞ্চাশটা বছর গেছে খসে, বাবার পেছনে পেছনে স্টেশনের ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলাম।......আজ ভীড় বড্ড বেশি, স্টেশন মাস্টার, বুকিং ক্লার্কের খটখটানি আর থামতেই চায় না। ওদিকে টেলিফোনের ঘটাং ঘটাং। তখন এত সব কিছু ছিল না। যাত্রীও ঢের কম, ওদিকে একা ধন নীলমণি স্টেশন মাস্টার। একাই সর্বত্র টিকিট কাটতে, টেলিগ্রামের কলের টকাটক ধরতে, তারপর গাড়ি এলে আবার টিকিট আদায় করে নিতে।

সে সময় স্টেশনমাস্টার ছিলেন একজন বাঙালী, নামটা ভুলে যাচ্ছি।

টুলে বসে লিখছিলেন, বাবাকে দেখে স্বাগত করলেন—"এই যে, আসুন, আসুন। তারপর? —বাড়ি-মুখো-নাকি?"

ঘুরে বসলেন।

"আরে! তম্বাকু ভর্।"

বাবা গিয়ে একটা টুলে বসলেন। যতদূর মনে পড়ছে চেয়ারের বালাই ছিল না এসব ছোটখাটো স্টেশনে। বি এন ডব্লিউ আর ছিল শুনেছি নাকি খোদ ইংলণ্ডের রাজার সম্পত্তি —অন্তত "সিংহের ভাগ"টা তাঁরই। বেনিয়া রাজা, বলাই বাহুল্য হিসাবে খুব দড়। বাড়তি লোক ছিল না একটা; যেখানে দাঁড়িয়ে চলে সেখানে টুল থাকত না, যেখানে টুলে চলে সেখানে চেয়ার থাকত না। মালগাড়ি করেই যদি শোনপুরের মেলাটা (পৃথিবীর বৃহত্তম) সামলে নিতে পারা যায় তো তাই চলুক না। সিন্দুকে তুলেছিলও তেমনি টাকার কাঁড়ি। প্রায় শূন্য ঘর, তাই মনে হচ্ছে, এখনকার
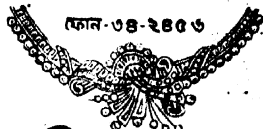
চেয়ে যেন অনেক বড়। তামাক এল, ওঁদের গল্প চলাতেই লাগল। বেশ মনে পড়ে স্টেশন-মাস্টারমশাইকে। বেঁটে, একটু স্থূলে, টুকটুক করছে রং, আর একটু গল্পপ্রিয় ছিলেন। বাবাও ছিলেন কতকটা তাই। অল্পের মধ্যেই জমে উঠত ও'দের গল্প।

আমি আস্তে আস্তে গিয়ে বসলাম একটি ছেলের পাশে; মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে পড়ছে। আমাদের গল্পও জমে উঠতে দেরি হলো না।

ও হচ্ছে, মাস্টারমশাইয়ের বড় ছেলে, নাম যতীন। মজঃফরপুরের মুখার্জি সেমিনারিতে ঐ নবম শ্রেণীতে পড়ে। ছুটির জন্যে কতগুলো অনুশিলনী (Exercise) দিয়েছে স্কুলে, নেস্‌ফীল্ডের গ্রামার থেকে, সেইগুলো করছে। সেদিন ছাত্রজীবনের একটা যেন রোমান্স তুলে ধরেছিল যতীন আমার চোখের সামনে।

দ্বারভাঙ্গায় আমরা তখন অনেকটা গে'য়ো গোছের ছিলাম। ছোট শহর, মাত্র দুটি স্কুল, তার একটি টিম টিম করছে, কলেজ নেই। রেলের দিক থেকেও জায়গাটা তখন বাইরে থেকে আরও বিচ্ছিন্ন। তার জায়গায় ও মজঃফরপুরের ছাত্র, তাও মুখার্জি সেমিনারি, খুব বিস্মিত করে দিয়েছিল। মজঃফরপুর তখন উত্তর বিহারের আদর্শ শহর (অবশ্য, এখনও অনেকটা), শিক্ষা-দীক্ষা খেলাধুলো—সব তাতেই অগ্রণী। সেই মজঃফরপুরের ছাত্র একজন আমার সামনে বসে জ্ঞান চর্চায় রত; তাও যে সে স্কুলের ছাত্র নয়, একেবারে মুখার্জি সেমিনারীর; মজঃফরপুরের মধ্যে যার জায়গা স্কুলের মধ্যে একেবারে শীর্ষে। একটা অচিন্তানীয় ব্যাপার। যতীন যেন অন্য লোকেরই মানুষ।

বড় শহরের ছেলেরা কেমন বেশ চট্‌ করে ধরেও ফেলে ছোট শহরের গোঁয়োদের, আর কিছু গুণ থাকুক বা নাই থাক মুরুব্বিয়ানা-টুকু বেশ রপ্ত করে ফেলে তাড়াতাড়ি। এর পর উত্তর জীবনে ঐ মজঃফরপুরে থেকেছি বহুদিন, ঐ মুখার্জি সেমিনারিতেই মাস্টারি করেছি, ঐ যতীনের সংগেই। জটলা করে আড্ডা মেরেছি। জ্ঞান-তপস্বী না আরও কিছু। ঘোর আড্ডাবাজ ছোকরা। গল্পের ফুলঝুরি। বড় বড় চোখ দুটোতে কৌতুক আর হাসি উপচে পড়ছে। এত কথা জমা পেটে যে বলবার সময় যেন যথেষ্ট নেই হাতে। তাই থেকেই একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে—কোন বাক্য (Sentence) পুরো-পুরি উচ্চারণ করতে পারে না। টুকরো টুকরো কথায় কাজ সেরে যায়, চোখ দুটো থাকে নাচতে। যদি অভ্যস্ত না থাক, বা কান দুটো যথেষ্ট সজাগ না থাকে তো কিছু ধরতেই পারবে না অনেক সময়।

মজঃফরপুরে ছিলামও অনেকদিন, ওর সামাজিক জীবনের সংগে জড়িয়ে, কাজেই রোমান্স ভেঙেই গিয়েছিল, অতিপরিচয়ে যা হতে বাধ্য। কিন্তু সেদিনের যতীন যে কী মায়ার সৃষ্টি করেছিল, সবটুকু গিয়েও এটুকু যেন অমর-অম্লান হয়ে রয়েছে আমার মনে। কী করে যে এটা হয়!

এর চেয়েও কিন্তু যেন আরও আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে গেল সদ্য সদ্য। এসবই বা কি করে হয়? শুধুই চান্স—অন্ধ যোগাযোগ একটা, না, সত্যই তোমাদের এই ফিজিক্যাল প্ল্যান বা পঞ্চভূতের স্তরের অন্তরালেও ঘটে কিছু—মন টানে মনকে?

ট্রেনের আওয়াজ পাচ্ছি যেন। ঘরে বেরুতে যাব ঘর থেকে, একেবারে মুখোমুখি, হ্যাঁ, যতীনের সংগেই!

নিশ্চয় ওর কথাটাই ভাবছিলাম বলে আমিই আগে চিনলাম। বললাম—"আরে যতীন না! তোমার কথাই ভাবছিলাম......"

"মোস্ট ওবিডিয়েন্ট সারভেন্ট" খেদমতে হাজির। কিন্তু......"

আরম্ভ করে দিল যতীন। চেনেনি, কিন্তু ফাজলামির সুযোগ পেলে তো চেনা-অচেনা বাছত না। মুখের দিকে চেয়ে আছে, চোখ দুটোয় চিকচিক করছে কৌতুক আর কৌতূহল। অবশ্য কয়েক সেকেন্ড মাত্র, তারপরেই—"ও!......আরে আমাদের......"

সংগে সংগেই গম্ভীর হয়ে গিয়ে আমার হাতের ওপরটা টিপে টিপে দেখল বার দুই, বলল—"দাঁড়াও, দেখে নি জ্যান্ত কি......না, আর সেটা মুখে আনতে হলো না। রিয়েল হাড্ডি আর মাস।......পঁচিশ বচ্ছর হে, না, আরও বেশি?......ও'রা মায়ার টানে মাঝে মাঝে ওপর থেকে নেমে আসেন যে, পুরনো জায়গা তো......দ্যাখো, অবাক চেয়ে আছে লোকটা! সেই পুরনো অবাক চাউনি!"

অবাক হয়েই আছি চেয়ে। কত বদলে গেছে, এক বয়সীই তো, দীর্ঘদিনে অনেক কিছুই তুলে দিতে হয়েছে কালের হাতে, কিন্তু কি ঘুষ দিয়ে যে সেই বিদ্যুৎটাকে আটকে রেখেছে যতীন—চোখে, মুখে, কপালে, ভ্রূতে; সারা দেহের গ্রন্থিতে। কিম্বা হয়তো ঘুষ দিল না বলেই পেরেছে, হাল্কা তুড়ির ওপরই তো চালিয়ে নিয়ে এল জীবনটাকে এতদূর।

"আরে, এ যে......"

হাতটা তুলে একটা চড় বসিয়ে সংবিৎটা ফিরিয়ে আনল আমার; বলল—"চলো বাইরে—ভীড় বাড়াচ্ছ—বিনি টিকিটের যাত্রা দেখছে সবাই।"

বাইরে এসে, যাত্রা দেখবার ভীড় নেই এই-রকম একটা জায়গা দেখে দাঁড়ালাম দুজনে। প্রশ্ন করল—"তারপর, তুমি এখানে?"

এতদিন পরে ওকে হঠাৎ এভাবে পেয়ে সত্যিই আহ্লাদে অভিভূত হয়ে গেছি যেন। এখানে নামার কারণটা তো দেখছেই, স্টেশনের ভেতরে যাওয়ার কারণটাও বললাম, তারপর প্রশ্ন করলাম—"হ্যাঁহে, তোমার সেই সেদিনের কথা মনে পড়ে? সে তো আবার পঞ্চাশ বছরেরও বেশি। সেই আমরা এলাম, মহম্মদপুরে থেকে, তুমি মাদুরে বসে স্কুলের টাস্ক্‌ করছ......"

চোখ দুটো আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে, সেই হাসিটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে যেন মাথার বিস্তীর্ণ টাক পর্যন্ত, বলল—"শোন কথা! ভোলা যায় যেন প্রথম প্রেম! —পঞ্চাশ বছর ধরে এক নাগাড়ে পঞ্চাশখানা

প্রেম করে গেলেও! কোনটা. আগে জিগ্যেস ......আজ্ঞা করছ কি তাই বলো।"

বলে জিগ্যেস করলাম—"আর তুমি? মাস্টারি, ওকালতি, কণ্ট্রাক্টারি তারপর এখন?"

"বেশ কথা। তা—চলছে?"

"গড়গড়িয়ে।"

"তামা—" —জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম তামাসা করছে নাকি; মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে চোখ নাচিয়ে বলল—

"তামাক নয়, ভাজাভুজি।"

মাথানা বলে এ প্রান্তে একরকম জলজ উদ্ভিদের ব্যবসা চলে উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত, পদ্মবিচির মত গোলগাল বিচি, ভেজে খেতে হয়, চালানও ভাজা অবস্থাতেই। স্তম্ভিত করে দিয়ে যতীন বুঝেও নিয়েছে ঐ আন্দাজই করব,—"যা ভেবেছ তা নয়—ভ্যারাণ্ডা ভাজা!" —বলে কাঁধে একটা চড় মেরে হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বলেই চলল ওর ইতিহাস।

(ক্রমশঃ)

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৬৬)

দীপঙ্কর বললে—তুমি শেষ পর্যন্ত এখানে এসে উঠলে?

সতী কোনও কথা বললে না। তেমনি চুপচাপ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল।

দীপঙ্কর বললে—আজকে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতেও আমার লজ্জা হচ্ছে সতী—তুমি এত নিচে নামতে পারো, এত ছোট হতে পারো আমি ভাবতেও পারিনি—

সতী বললে—তুমি যা বলবে বলো আমাকে, কিন্তু দয়া করে গালাগালি দিও না—

তা তো বটেই—কথাগুলো গালাগালি বলে আজকে তো তোমার মনে হবেই—

সতী বললে—না, সে-জন্যে নয় তোমার মুখে গালাগালি শোভা পায় না দীপু,—তুমি চরিত্রবান, তোমার চরিত্রের দাম আছে—পরস্ত্রীর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করলে তোমার চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় বলেই বলছি—

—তা বলে আর কোনও জায়গা পেলে না, মিস্টার ঘোষালের ফ্ল্যাটে এসে উঠতে হলো? এত অধঃপতন তোমার?

সতী সোজা কঠোর হয়ে উত্তর দিলে—অধঃপতন আমার, না তোমার?

—কেন?

সতী বললে—হ্যাঁ, যেদিন তোমাদের কথায় বাড়ির চাকর-ঝি-দরোয়ান সকলের চোখের সামনে অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে মুখ বুজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলাম, সেদিন তো তুমি এগিয়ে আসো নি আমাকে বাঁচাতে? সেদিন আমার অধঃপতন দেখে তোমাদের বুক তো জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়নি? সেদিন তো আমার সেই অধঃপতন দেখে তোমরা সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে বেঁচেছিলে! পালাও নি? চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও?

কথাগুলো বলে সতী সেইখানে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগলো।

তারপর একটু থেমে আবার বললে—আর আজকে এসেছ তুমি তোমার সহানুভূতি দেখাতে—? আজকে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে এখানে এসেছ চোখ রাঙাতে? কোথায় আমার অধঃপতনটা দেখলে? আমার কীসের অভাব এখানে? কীসের দুঃখ? আমার কীসের জ্বালা? কোনও দুঃখই তো নেই আমার আর! ওই দেখ আমার বিছানা, ওই দেখ আমার ড্রেসিং টেবল্, ওই দেখ আমার সোফা-সেট্—ওইখানে বসে বসে আমার দিন কেটে যায় আরামে, এখানে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না আমাকে—রাত্রে আমার এখানে ঘুমের ব্যাঘাত করবারও কেউ নেই—জানো, আমি এখানে পরম নিশ্চিন্তে আছি—সুখে আছি—শান্তিতে আছি—

দীপঙ্কর তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে—

সতী আবার বলতে লাগলো—আর, এ না করে যদি প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের শ্বশুর-বাড়ির সামনে ঘর ভাড়া নিয়ে মজলিস জমাতুম সেইটেই কি ভালো হতো? তাতেই কি তোমাদের সম্মান বাঁচতো? অথচ আমার কাছেই তো সে-জন্যে তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সেদিনের সেই ঘটনার পর তাই করলেই তো আমার চরম প্রতিশোধ নেওয়া হতো—! আমাকেই তো তোমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে, তোমাদের ভাল-বাসার মর্যাদা রেখেছি আমি। আর শুধু তোমরা কেন, আমার শাশুড়ি, আমার স্বামী দেবতা—তাদেরও তো কৃতজ্ঞ থাকা উচিত আমার ওপর—

দীপঙ্কর নিরুত্তর হয়ে চেয়ে রয়েছে তখনও।

সতী বলতে লাগলো—তুমি বলবে এ অবৈধ, এ ইল্লিসিট্! বলতে তো তোমাদের ট্যাক্স লাগে না! বলতে তো তোমাদের পয়সা খরচ নেই! কিন্তু আমি যে এতদিন অকারণে এত অত্যাচার সহ্য করে এলুম, অকারণে এত ট্যাক্স্ দিয়ে এলুম, কই তার জন্যে তো সমাজ আমাকে এক পয়সাও রিবেট্ দিলে না—

তারপর হঠাৎ কী হলো, সতী হাসলো। যেন এতক্ষণ কিছুই হয়নি। একেবারে মুখের ভাব বদলে গেল এক নিমেষে। হঠাৎ দীপঙ্করের হাতটা ধরে ফেললে। বললে—যাক্ গে এ-সব বাজে কথা, এতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা, আর আমি তোমাকে কড়া-কড়া কথা শোনাচ্ছি কেবল, এসো এসো বোস—

বলে সতী দীপঙ্করের হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিলে।

দীপঙ্কর বসলো। ঘরের চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

সতী বললে—কী দেখছো?

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—মিস্টার ঘোষাল কোথায় থাকে?

সতী হাসলো। প্রথমে মুচকে মুচকে, তারপর খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—হাসছো কেন?

সতী বললে—তবু ভাল, তোমার হিংসে হচ্ছে ঘোষালের ওপর! তা সে-ভয় তোমার নেই দীপু, মিস্টার ঘোষালের ফ্ল্যাট আলাদা—এর পাশের ফ্ল্যাট্‌টা—! তোমার মতন তার চরিত্র অত দুর্বল নয়, অনেক স্ট্রং ক্যারেক্টারের লোক মিস্টার ঘোষাল—তাকে হিংসে করে লাভ নেই তোমার—

দীপঙ্কর বললে—আমি হিংসে করতে আসিনি, তাঁর সঙ্গে আমার হিংসের সম্পর্ক নয়—

সতী শুধরে দিলে। বললে—প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক—এই তো?

তারপর দীপঙ্করের মুখের চেহারা দেখে বলে উঠলো—তুমি আবার কথাটা শুনে রেগে যেও না যেন! নিজে চাকরি না-করলেও আমি জানি চাকরির ক্ষেত্রে এ-সম্পর্ক লজ্জারও নয়, অপমানেরও নয়,—অযোগ্য লোকের আন্ডারে কাজ করে অপমান-বোধ করলে আখেরে তাকে পস্তাতেই হয়—তাতে রাগ করতে নেই—চাকরিক্ষেত্রে ওটাই নিয়ম—

দীপঙ্কর বাধা দিয়ে বললে—চাকরির কথা যাক্‌, আমি এসেছি অন্য কথা বলতে—

সতী বললে—তোমার চেহারা দেখে বুঝতে পারছি মাসীমা মারা গেছেন—তা ভালোই হয়েছে, বেঁচে থাকলে আমার এই ব্যাপার শুনে তিনি কষ্ট পেতেন—

দীপঙ্কর বললে—তিনি না-হয় বেঁচে গেছেন কষ্ট থেকে—কিন্তু আমি যে কষ্ট পাচ্ছি সতী—

সতী বললে—না, আর কষ্ট পেও না—! যে-কষ্ট থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি, সেই কষ্টটার কথা মনে করেও তোমার আনন্দ পাওয়া উচিত!

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু কথা তো তা নয়—তুমি জানো না, একটা সংসার আজ ভেঙে যেতে বসেছে তোমার জন্যে! তোমার জন্যেই একটা বংশ ছারখার হতে চলেছে—শম্ভুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল, সে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে চারদিকে—

সতী অবাক হলো। বললে—কেন? তারা এখনও জানে না আমি কোথায় আছি?

দীপঙ্কর বললে—শম্ভু অন্তত জানে না—

সতী বললে—ঠিক আছে, আমি কালকেই জানিয়ে দেব টেলিফোন করে, কিংবা চিঠি লিখে। তাদের জানা উচিত যে, ঘোষ-বংশের কুললক্ষ্মীকে তাঁরা কোথায় ঠেলে ফেলে দিয়েছে। এটা না-জানালে আজ রাত্তিরে আমার ঘুমই হবে না—

দীপঙ্কর বললে—তোমার কাছে এটা হাসির ব্যাপারই বটে—কিন্তু নির্মল পালিত, তোমাদের বাড়ির ব্যারিস্টার, এর মধ্যে উস্কানি দিচ্ছে তোমার শাশুড়িকে—তোমার নামে মামলা করবে বলছে—

—আমার নামে না মিস্টার ঘোষালের নামে? কিসের চার্জ?

দীপঙ্কর বললে—তুমি দশ হাজার টাকার গয়না চুরি করে পালিয়ে এসেছ, এই চার্জে—

তারপর একটু থেমে বললে—শুধু তাই ই নয় তোমার শাশুড়ির সঙ্গে তোমার স্বামীর কথা বন্ধ—দুজনে দুজনের মুখ-দর্শন করে না। সমস্ত সংসারটা তোমার জন্যে ছারখার হয়ে যাচ্ছে জানো। আর তারই সুযোগ নিচ্ছে নির্মল পালিত তোমাদের সংসারে.....

সতী বাধা দিয়ে বললে—আমাদের সংসার বলছো কেন? আমি ও সংসারের আর কেউ নই—

—কিন্তু তুমি এ-সময়ে না গেলে যে সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে। তোমার শাশুড়ি সমস্ত সম্পত্তি উইল করে দিয়ে যাচ্ছেন ট্রাস্টের নামে—আর নির্মল পালিতই হবে সেই ট্রাস্টি-বোর্ডের চেয়ারম্যান!

সতী বললে—একবার তোমাদের কথা শুনে আমি যা-ভুল করেছি, আর সে-ভুল করছি না দীপু, তুমি যদি এই কথা বলবার জন্যেই আমার কাছে এসে থাকো তো এবার তুমি যেতে পারো—আমি আর ফিরে যাবো না—

—কিন্তু সনাতনবাবুর কথাটা একবার ভাববে না? তিনি কী দোষ করলেন?

সতী রেগে উঠলো। বললে—তার নাম আর কোর না তুমি—তিনি মানুষ নন, জানোয়ার—

দীপঙ্কর বললে—তুমি জানো না বলেই এত কথা বলছো, জানো, তুমি চলে আসার পর তিনি কী করেছেন, অত যে শান্ত শিষ্ট মানুষ, তাঁরও ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, তিনিও আজ মা'র সঙ্গে ঝগড়া করে অসুখে পড়ে আছেন—

অসুখ?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, তাঁকেও ডাক্তার

এসেছিল দেখতে। ভাবো তো তাঁর দশাটা একবার।

সতী হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে উঠলো! জিজ্ঞেস করলে—কে তোমাকে বললে অসুখের কথা? তুমি নিজে গিয়েছিলে?

দীপঙ্কর বললে—না, নিজেই যাচ্ছিলুম তাঁকে দেখতে, কিন্তু শম্ভুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, সে-ই বললে—

—কিন্তু আজ পর্যন্ত কখনও অসুখ তো হয়নি—অসুখ তো হতে দেখিনি কখনও তাঁর!

দীপঙ্কর বললে—সেই জন্যেই আমি তোমাকে একবার যেতে বলছি, তোমার একবার যাওয়া উচিত সেখানে, অন্তত সনাতনবাবুকে দেখতেও একবার যাওয়া উচিত—

—কিন্তু এর পরেও আমাকে তুমি যেতে বলছো? এত কাণ্ডর পরেও আমার যাওয়া উচিত? তুমি কি সব ভুলে গেলে?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু সে-ঘটনার পর যে সবকিছু বদলে গেছে, সে বাড়ি যে আর সে-রকম নেই, সেই সনাতনবাবুও যে আর সেই মানুষ নেই, তোমার সেই শাশুড়িও যে এখন অন্যরকম হয়ে গেছেন,—সবাই অবাক হয়ে গেছে তাঁকে দেখে—জানো, তোমার শাশুড়ি কাঁদেন আজকাল?

—কেন?

—নিজের মনে তো সব বুঝছেন নিজের মনে অনুতাপ এসেছে হয়ত। তার ওপর নির্মল পালিত এসে দিন রাত তাঁর কানের কাছে মতলব দিচ্ছে নানারকম—এখন যদি না-যাও তুমি তাতে তোমারও ক্ষতি আর সনাতনবাবুরও ক্ষতি—সনাতনবাবু নিরীহ ভালো-মানুষ, ওই মা মারা যাবার পর, সনাতনবাবুকে হয়ত পথে বসাবে নির্মল পালিত—। সনাতনবাবু তো সংসারে মা ছাড়া আর কাউকে জানতেন না—তাঁর দশা কী হবে তখন ভাবো?

সতী কিছু কথা বললে না। কী যেন ভাবতে লাগলো।

দীপঙ্কর বলতে লাগলো—তারপর তোমার বাবার কথা—

সতী হঠাৎ বললে—আমি বাবাকে চিঠি দিয়েছি একটা—

—কোনও রিপ্লাই পেয়েছ?

সতী বললে—না, প্রায় এক মাস হলো আমি চিঠি লিখেছি, কিন্তু কোনও উত্তর নেই, অথচ আমার চিঠি না-পেলে বাবা বড্ড ভাবনায় পড়েন—

দীপঙ্কর বললে—আমিও টেলিগ্রাম করেছিলাম, সে টেলিগ্রামও ফেরত এসেছে, লিখেছে, বি মিত্র বলে কোনও লোক সেখানে নেই—নির্মল বললে, ওআরের জন্যে ও'র ফ্যাক্টরি বাড়ি সব বোধহয় মিলিটারিতে নিয়ে নিয়েছে, উনি বোধহয় ঠিকানা বদলিয়েছেন—এদিকে বর্মা রোডও বন্ধ করে দিয়েছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট—

সতী তখনও চুপ করে ভাবছিল। বললে—বাবার চিঠি পেলে আমি তো সেখানেই চলে যেতাম—সেইজন্যেই তো চিঠি লিখেছিলাম—সে-ও হলো না—

—সেখানে গেলেই তোমার ভালো হতো সতী! সব দিক থেকেই ভালো হতো! তাহলে আজ আর এখানে এসে উঠে এই অবস্থায় তোমায় থাকতে হতো না!

সতী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—ওরা কি আমার খোঁজ করছে?

দীপঙ্কর বললে—ওদের ব্যারিস্টার তো খোঁজ পেয়েছে, নির্মল পালিত খোঁজ পেয়েছে, তা না-হলে আমি কী করে খোঁজ পেলুম। সেখান থেকেই তো শুনলুম তুমি এখানে আছো, মিস্টার ঘোষাল আমাকে কিছু বলেন নি তোমার সম্বন্ধে!

সতী বললে—কিন্তু আমি তো তোমার খোঁজ করতেই তোমার অফিসে গিয়েছিলুম—তোমাকে সেদিন পেলে তো আর মিস্টার ঘোষালের কাছে যেতুম না—

দীপঙ্কর বললে—আশ্চর্য, আমি সেই দিনই অফিসের কাজে বাইরে গিয়েছিলাম কয়েক ঘণ্টার জন্যে, আর তারই মধ্যে সব ঘটে গেল, আর এতদিন মা মারা যাবার জন্যে ছুটিতে ছিলাম, আমি এ-সব কিছুই জানতে পারিনি। পারলে আমি আগেই সব মিট-মাট করে দিতাম—

সতী বললে—আর মিট্-মাট্ হবে না দীপু, তুমি আর সে-চেষ্টা কোরও না—

—কিন্তু সনাতনবাবুর অসুখ শুনেও তুমি যাবে না? অসুখের ব্যাপারে এত রাগ থাকা কি ভাল?

—কিন্তু আবার যদি সেই রকম অপমান করে আমাকে?

দীপঙ্কর বললে—আর সে-রকম অপমান করবার অবস্থা নেই এখন ওদের, তোমাকে বলেছি তো, সব হাল-চাল বদলে গেছে ও-বাড়ির—

সতী বললে—তাহলে মিস্টার ঘোষালকে একবার জিজ্ঞেস করে যাওয়া ভাল।

—কেন? তোমার কি সে-স্বাধীনতাটুকুও নেই?

—আমার বিপদের দিনে মিস্টার ঘোষালই আশ্রয় দিয়েছে মিস্টার ঘোষাল না-হলে সেদিন আমি যে কী করতুম বলা যায় না—

মনে আছে দীপঙ্কর তখনই উঠে গিয়ে টেলিফোন করেছিল মিস্টার ঘোষালকে। আর টেলিফোনে দীপঙ্করের গলা শুনেই মিস্টার ঘোষাল একেবারে রেগে ক্ষেপে চিৎকার করে উঠলো। কেন? কেন তুমি আমার ফ্ল্যাটে গেছ? কার পারমিশন নিয়েছ? কে তোমাকে ঢুকতে দিয়েছে? আমার ফ্ল্যাট আর মিসেস ঘোষের ফ্ল্যাট—ও তো একই কথা। তুমি ওখান থেকে

এখনি চলে যাও! দিস্ ইজ্ ট্রেস্‌পাস, দিস্ ইজ্ ক্রিমিন্যাল! মিস্টার ঘোষাল টেলিফোনের রিসিভারটা মুখে দিয়ে যেন ধ্বংস করতে লাগলো! তুমুল ঝড় বয়ে গেল টেলিফোনের তারে। দীপঙ্করের মনে হলো যেন দীপঙ্করকে সামনে পেলে ছিঁড়ে-খুঁড়ে একেবারে গ্রাস করে ফেলবে মিস্টার ঘোষাল। শেষকালে রিসিভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে—আমি এখুনি যাচ্ছি—ওয়েট্—

দীপঙ্করের মনে আছে সেদিন মিস্টার ঘোষালের চিৎকারে শুধু হেসেছিল সে। শুধু হাসি পেয়েছিল দীপঙ্করের। সত্যি, সে কতদিন আগেকার কথা। কতদিন আগের সেই সব ঘটনা। ঘটনার নিবিড় জালে জড়িয়ে গিয়েছিল তখন দীপঙ্কর। সেই সনাতনবাবু! সেই নয়নরঞ্জিনী দাসী। সেই নির্মল পালিত! সেই লক্ষ্মীদি!

প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের ঘোষ-বাড়ির ভেতরেও তখন অনেক অদল-বদল হয়েছে। মা-মণি তখন ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে

গেছেন একেবারে। ড্রাইভার ছাড়িয়ে দিয়েছেন, গাড়ি বেচে দিয়েছেন। চাকর-বাকরও ছাড়িয়ে দেবার মতলব করেছেন। বউবাজারের বাড়ি, শ্যামবাজারের তিনখানা বাড়িও বেচে দেবার তোড়জোড় করছেন।

নির্মল পালিত বলে—কিন্তু টাকা বাঁচিয়ে আপনার লাভ কী মা-মণি?

মা-মণি বলেন—না বাবা, আমি ছেলের জন্যে কিছুছু রেখে যাবো না, আমার গাড়ি আমার বাড়ি আমি যা খুশি করবো, তাতে কারো কিছু বলবার নেই—

নির্মল পালিত বলতো—কিন্তু ক্যাশ টাকা নিয়েই বা আপনি কী করবেন?

মা-মণি বলতেন—আমি খরচ করবো—

—কীসে খরচ করবেন?

মা-মণি বলতেন—আমি কলকাতা ছেড়ে কাশীবাস করবো, শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে থাকবো, আমার কীসের দরকার কলকাতায় থাকার, আমার কে আছে? আমি কার ওপর ভরসা করবো—?

—কেন? আপনার টাকা আছে, আপনার ভাবনা কীসের? টাকা থাকলেই তো সব থাকা হলো, টাকা থাকাই তো সব থাকা। আপনি কেন এত ভাবছেন? আর তাছাড়া, আমি তো আছি—আপনার টাকা-কড়ির ব্যাপারটা, আপনার প্রপার্টির ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে আপনি চুপ করে বসে থাকুন না—

—কিন্তু বাবা, আমি চাই না যে বুড়ো বয়েসে ছেলে আমাকে লাথি-ঝাটা মারবে! সারা জীবন সব কিছু নিজে চালিয়ে আমি বুড়ো বয়েসে পরের মুখ-নাড়া সইতে পারবো না—

নির্মল পালিত বলতো—সেই জন্যেই তো বলছি আপনি ট্রাস্ট করে যান, আমি সেই ট্রাস্টের ভার নিচ্ছি—

সে ট্রাস্টে কী হবে?

—তাতে আপনি সারা-জীবন, যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন নিজের মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারবেন!

মা-মণি বলতেন—কিন্তু আমি মেয়ে-মানুষ, কাউকেই যে আমার বিশ্বাস হয় না বাবা, আমার যে ভয় করে—

নির্মল পালিত বলতো—কিন্তু আমাকে? আমাকেও আপনি বিশ্বাস করেন না?

—না বাবা, তোমার কথা আলাদা! কিন্তু সবাই তো আর তোমার মত নয়!

নির্মল পালিত—তা আমিই তো চালাবো —আমি তো এত শিগ্‌গির মারা যাচ্ছি না—

—তা কী করতে হবে?

নির্মল পালিত বলতো—কিছুই করতে হবে না আপনাকে, এইখানে একটা সই করতে হবে শুধু—

মা-মণি একটু দ্বিধা করতেন। নির্মল পালিত বলতো—এখনি সই করতে হবে না, পরে ধীরে সুস্থে বিচার বিবেচনা করে সই করলেও হবে—সই করবার আগে একবার সনাতনবাবুকে জিজ্ঞেস করে নেবেন —হাজার হোক ছেলে তো—একমাত্র সন্তান—

—ছেলে?

ছেলের নাম শুনেই মা-মণি জ্বলে উঠতেন। বলতেন—তুমি আমার ছেলের নাম মুখে এনো না বাবা, ছেলে আমার শত্রু— খবরদার বলছি, তার নাম মুখে আনতে পারবে না তুমি—

নির্মল পালিত বোঝাতো। বলতো— এখন মুখে বলছেন ওই কথা, কিন্তু নিজের ছেলে তো হাজার হোক, দু'দিন পরে সব মিটে যাবে আপনাদের—তখন আমাকেই দোষ দেবেন আপনারা—

—তুমি থামো দিকিনি, ও ছেলের মুখ-দর্শন আমি আর করবো না প্রতিজ্ঞা করেছি —তা জানো তুমি?

নির্মল পালিত তাতেও দমতো না। বললে—না মা-মণি, তাহলেও আমিও তো আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি, এতগুলো টাকার ব্যাপার—একটা-দুটো নয় লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যাপার— আমারও তো লোভ হতে পারে। কিছুই বলা যায় না—তাই বলছিলুম একবার সনাতনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে আপনার সই করাই ভাল—

মা-মণির আর তবু সইল না। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—তুমি আমাকে দাও তো কাগজখানা—দাও—

নির্মল আস্তে আস্তে দলিলখানা বাড়িয়ে ধরলে। বললে—না মা-মণি, আমার তবু সন্দেহ যাচ্ছে না, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন ঠকিয়ে নিচ্ছি আপনার কাছ থেকে—

মা-মণি তৎক্ষণাৎ কাগজের ওপর সই করে দিয়েছেন। মোটা-মোটা অক্ষরে লিখে দিয়েছেন—শ্রীমতী নয়নরঞ্জিনী দাসী।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন রং লাগানো শুরু হয়ে গেল। নেপোলিয়নের পর পৃথিবীর আর কোনও ডেসপট এমন করে মানচিত্রের মূল ধরে নাড়া দিতে পারেনি। নরওয়ে থেকে স্পেন পর্যন্ত যত পোর্ট যত সী-কোস্ট আছে সব বেহাত হয়ে গেল একে-একে। ইটালী মেডিটারেনীয়ান-এর রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। লিবিয়া আর ইথিওপিয়ার ইটালীয়ানরা ঈজিপ্ট দখল করবার তোড়-জোড় করছে। ঈজিপ্ট দখল করে সুয়েজ নেবে। সুয়েজের পর নেবে এডেন। তারপর নেবে টিউনিস্, তারপর ফ্রেঞ্চ মরোক্কো। সেই মুহূর্তেই মাথায় হাত দিয়ে বসেছে বিটিশ। লণ্ডন সাদাম্পটন লিভারপুল, গ্লাস্‌গোর খাবার-দাবার আনার পথ বন্ধ

হয়ে যাবার জোগাড়। হল্যাণ্ড ফ্রান্স নর্থ আফ্রিকা থেকেই আসতো লোহা আর কাগজ, মাখন আর ডিম—সব বন্ধ হয়ে গেল। কী হবে তাহলে? তাহলে কী হবে? চার সপ্তাহে গেছে পোল্যাণ্ড। তিরিশ মিলিয়ান লোকের দেশ। আর সব জড়িয়ে ষাট মিলিয়ন লোকের দেশ নরওয়ে, ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ডস্, বেলজিয়াম আর ফ্রান্স—তা যেতে সময় লেগেছে মোটে আট সপ্তাহ। আর কতদিন টিঁকে থাকবে গ্রেট ব্রিটেন? আর ঠিক সেই মুহূর্তে স্যার স্টইনস্টন্ চার্চিহিল্ এসে গ্রেট ব্রিটেনের হাল ধরে বসলেন। আর রক্ষে নেই। আর বিশ্বাস নেই কাউকে। বাঁচতেই হবে। নয়নরঞ্জিনী দাসীকে বাঁচতেই হবে। দরকার হলে নির্মল পালিতকে আঁকড়ে ধরেও বাঁচতে হবে। তিনি মোটা-মোটা অক্ষরে নিজের হাতে নিজের নাম সই করে দিলেন। লিখে দিলেন নিজের দাসখৎ।

আর সেই মুহূর্তেই নিজের ঘরের বিছানায় সনাতনবাবু যন্ত্রণায় কাতর শব্দ করে উঠলেন—মা মাগো—

আর সেই মুহূর্তেই মিস্টার ঘোষাল এসে ঢুকলো সতীর ফ্ল্যাটের ভেতরে। রেগে আগুনের মত এসে ফেটে পড়লেন। বললেন—কেন এসেছো তুমি এখানে? হু দি হেল্ টোল্ড ইউ টু কাম্ হিয়ার? হু?

দীপঙ্কর বসে ছিল সোফাটার ওপর। মিস্টার ঘোষাল ঘরে এসে ঢুকতেই দাঁড়িয়ে উঠলো।

বললে—আমি নিজেই এসেছি এখানে, সতী আমাকে ডাকেনি—

—কিন্তু কেন? কেন? হোয়াই? আণ্ডার হুজ অর্থরিটি?

দীপঙ্কর বললে—আপনি বসুন, আমি সমস্ত খুলে বলছি—

মিস্টার ঘোষাল বসলো না। বললে—আমি সমস্ত কিছু জানতে চাই না। মিসেস ঘোষের সংগে তোমার কিসের সম্পর্ক আমি সেইটে জানতে চাই? মিসেস্ ঘোষের লাইফ্ ইজ্ ইন্ ডেন্জার, মিসেস্ ঘোষের প্রেস্টিজ্ ইজ্ য়্যাট্ স্টেক্, আমি মিসেস ঘোষের কাছ থেকে সব ঘটনা শুনেছি। মিসেস ঘোষের কোনও দোষ নেই—সি ইজ্ এ চেস্ট্ লেডী। তাকে এ-রকমভাবে অপমান করবার কী রাইট্ আছে তোমাদের? জানো, আমি তোমার নামে ট্রেসপাসের চার্জ আনতে পারি? তোমাকে মিসেস ঘোষের মডেস্টি আউট্‌রেজের চার্জে প্রসিকিউট্ করতে পারি?

—কিন্তু সে তো মিথ্যে কথা!

মিস্টার ঘোষাল গর্জে উঠলো। বললে—কে বললে মিথ্যে কথা? জানো, টাকা খরচ করলে মিথ্যেকে সত্যি করা যায় মডার্ন ওয়ার্ল্ডে? আমার টাকা আছে, আমি টাকার জোরে তোমাকে মিথ্যেবাদী লায়ার প্রমাণ করতে পারি? সে-রকম য়্যাড্‌ভোকেট্ আছে কলকাতা শহরে—টাকার জোরে সাক্ষী, ল'য়্যার, প্রসিকিউশন সব পাওয়া যায়—তা জানো? আই ক্যান বাই জাস্টিস—বিচার কেনা যায় তা জানো তুমি?

দীপঙ্কর চুপ করে রইল।

মিস্টার ঘোষাল বললে—যদি ভাল চাও তো চলে যাও অ্যাণ্ড ডু নেভার কাম হিয়ার। আর কখনও এসো না।

দীপঙ্কর তবু নড়লো না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনিই দাঁড়িয়ে রইল।

—ডু ইউ হিয়ার মী অর নট্? বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও—আর এক মিনিট তুমি এখানে থাকতে পাবে না—

দীপঙ্কর তবু নড়লো না।

—তুমি জানো আই পজেস্ এ রিভলবার? আমার রিভলবার আছে তা তুমি জানো? বিফোর আই ইউজ দ্যাট্, আই ওয়াণ্ট ইউ টু লীভ দি রুম! আদার-ওয়াইজ আমি পুলিশ ডাকবো! আমি তোমাকে য়্যারেস্ট করাবো! আমি তোমার চাকরি খতম করতে পারি তা জানো?

মিস্টার ঘোষাল যেন বাঘের মত ঘরের ভেতর ছুটোছুটি করতে লাগলো। অস্থির হয়ে পায়চারি করতে লাগলো। যেন দীপঙ্করকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাবে। আঁচড়ে কামড়ে নিঃশেষ করে ফেলবে।

তবু দীপঙ্কর ধীর স্থির হয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে।

ঘোষাল চিৎকার করে বললে—এখনও যাবে না? তবু যাবে না তুমি?

এতক্ষণে দীপঙ্করের মুখে কথা ফুটলো। গম্ভীর গলায় বললে—নো, আই ওণ্ট্—

আর সংগে সংগে যেন বজ্রপাত হলো ঘরের ভেতর। মিস্টার ঘোষালের মুখের ওপর এমন করে কথা বলার সাহস রেলের আফিসের ইতিহাসে কখনও হয়নি। মিস্টার ঘোষাল যেন একটা প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে আত্মসম্বিত ফিরে পেলে। তারপর বললে—অল্ রাইট্—

বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর তারপর এক মুহূর্তের মধ্যেই আবার ফিরলো। হাতে তখন তার খোলা রিভলবার। দীপঙ্করের দিকে মুখ ঠিক করে চিৎকার করে উঠলো—গেট্ আউট্—গেট্ আউট্—

দীপঙ্কর সেই দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে উত্তর দিলে—নো, আই ওণ্ট—

আর সংগে সংগে কী ঘটতো বলা যায় না।

—দীপু—

হঠাৎ সতী আর থাকতে পারলো না।

একেবারে দীপঙ্করের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো হঠাৎ। বললে—তুমি করছো কী দীপু—তুমি করছো কী—তুমি যাও এখান থেকে যাও—

দীপঙ্কর সতীর মুখের দিকে চাইলে একবার। তারপর বললে—না—

সতী দীপঙ্করের হাত ধরে টানতে লাগলো। দীপঙ্করকে টেনে বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। বললে—পাগলামি কোর না দীপু, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? তুমি যাও না, চলে যাও—

দীপঙ্কর তবু বলতে লাগলো—না, আমি যাবো না—

ততক্ষণে দীপঙ্করকে ঠেলে বাইরে নিয়ে এসেছে সতী। ঘরের বাইরে। বারান্দায়।

—তুমি চলে যাও এখান থেকে। কী পাগলামি করছো, বলো তো!

দীপঙ্কর বললে—পাগলামি আমি করছি না তুমি করছো?

—বেশ, তোমার কথাই সই, আমিই পাগলামি করছি, কিন্তু তোমার পায়ে পড়ি তুমি চলে যাও দীপু, এখন আর কথা বাড়িও না, চলে যাও—

দীপঙ্কর সতীর মুখের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে। বললে—কিন্তু তোমাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে কী করে চলে যাই তাই বলো?

সতী তখনও ঠেলছে দীপঙ্করকে। বললে—তুমি আর কথা বাড়িও না দীপু, তুমি চলে যাও—

দীপঙ্কর বললে—যেতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু মিস্টার ঘোষাল ভাববে আমি ওর বিভলবার দেখে ভয় পেয়েছি—

সতী বললে—ওসব কথা থাক, তুমি যাও, এখন চলে যাও—দেখছো না ও-একটা জানোয়ার, একটা পশু, ও—ও সব করতে পারে—

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—কিন্তু তুমি? ওই জানোয়ারের কাছেই তো থাকবে তুমি!

সতী বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও দীপু। এই-ই আমার কপাল—আমার কথা তুমি ভেবো না। আমার যা-হয় হোক, কিন্তু তুমি চলে যাও—চলে যাও তুমি—আর কখনও এসো না—

বলে দীপঙ্করকে ঠেলে একেবারে বারান্দার শেষ প্রান্তে নিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ দীপঙ্করকে রেখে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

দীপঙ্কর সেইখানে দাঁড়িয়ে অন্ধকার বারান্দার দিকে চেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল।•

কোথাও যেন কোনও শান্তি নেই। কোথাও যেন কোনও সান্ত্বনাও নেই। শুধু অলস অকর্মণ্য দেহটাকে কোনও রকমে বয়ে বেড়ানো। এমন করে এত আগ্রহ করে কার ভালো সে চেয়েছিল? কার মঙ্গল সে কামনা করেছিল? কার ভালোর জন্যে সে দিনরাত নিজের বিশ্রাম, নিজের স্বাচ্ছন্দ্যকে জলাঞ্জলি দিয়েছে? সে কি সতী? সে কি সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের সেই প্রথম দেখা মেয়েটি?

রাস্তায় ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার। কোথায় কত দূরে যুদ্ধ বেধেছে টাকার, যুদ্ধ বেধেছে প্রতিষ্ঠার, যুদ্ধ বেধেছে অস্তিত্বের, যুদ্ধ বেধেছে প্রতিযোগিতার, দম্ভের আর ক্ষমতার। এখানে এই ভারতবর্ষের কলকাতা শহরেও তার ছোঁয়াচ এসে লেগেছে। ট্রামে-বাসে তারই নির্লজ্জ প্রমাণ। কলকাতা থেকে পালাতে হবে। এখানে জাপানীরা বোমা ফেলবে। শহর ভাঙবে, গুঁড়ো হয়ে যাবে। অস্বাস্থ্যকর গুজবে ভরে গেছে কলকাতার বাতাস। কোথাও শান্তি নেই। কোথাও সান্ত্বনাও নেই। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন দীপঙ্করের অন্তরাত্মার মত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

লক্ষ্মীদির কথা মনে পড়লো।

সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে লক্ষ্মীদিই যেন কেবল এ-অবস্থায় তাকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারে। সত্যিই তো, লক্ষ্মীদি ছাড়া আর কে আছে তার? গাঙ্গুলীবাবু নেই, মিস মাইকেল নেই, মা ছিল, তাও নেই। সতীর চিন্তা ছিল—তাও মুছে গেল। এখন আছে শুধু লক্ষ্মীদি।

লক্ষ্মীদি হয়ত এখন এই মুহূর্তে খুব

ব্যস্ত। এখন সেই সব এসে হয়ত জড়ো হয়েছে লক্ষ্মীদির ঘরে। সেই গভর্নমেণ্ট অফিসার সুধাংশু, সেই চৌধুরী। সকলের নাম জানে না দীপঙ্কর। হয়ত সেদিনকার মত ফাউল-রান্না হচ্ছে, মাংসের গন্ধে ভরে গেছে বাড়ি। আর সেই দাতারবাবু হয়ত পাশের ঘরে কোট-প্যাণ্ট পরে সেজে-গুজে পুতুলের মত বসে আছে।

তা হোক, তবু আজকের সতীর এই ঘটনাটা লক্ষ্মীদিকে বলা ভাল। লক্ষ্মীদিকেও খবরটা দেওয়া উচিত।

সেই গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং। সেই ভূষণ গেটম্যান। লাল সিগন্যালটা জ্বালিয়ে গেটটা বন্ধ করে জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত সেভেনটিন আপ আসবে। এই তো সেভেনটিন আপ আসবার টাইম হয়ে গেছে।

কিন্তু লক্ষ্মীদির বাড়ির সামনে যাবার আগেই দূর থেকে জায়গাটা দেখে দীপঙ্কর থমকে দাঁড়াল। এত লোক সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী হলো ওখানে? কী হলো? কোনও বিপদ হলো নাকি? কোনও দুর্ঘটনা? যাবে কি যাবে না দ্বিধা হতে লাগলো। যদি দাতারবাবুর কোনও দুর্ঘটনা হয়ে থাকে। যদি লক্ষ্মীদির কোনও বিপদ হয়ে থাকে। যদি......

—দীপু!

ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল লক্ষ্মীদি! দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল লক্ষ্মীদিকে দেখে! যেন আর চেনা যায় না। আবার যেন সেই আগেকার মত চেহারা হয়ে গেছে। সেই কলেজে পড়বার সময়কার মত। শাড়িতে গয়নায় ঝলমল্ করছে লক্ষ্মীদি। পান খেয়েছে জর্দা দিয়ে। হাতের কব্জিতে ঘড়ি। খোঁপায় ফুল, ঠোঁটে রঙ।

—আর একটু পরে এলেই দেখা হতো না!

তারপর পাশের একজনকে ডেকে বললে—এই দেখ, কে এসেছে দেখ—

—আরে দীপুবাবু!

একেবারে হাত জড়িয়ে ধরেছে দাতার-বাবু। দীপঙ্করও দাতারবাবুকে দেখে অবাক হয়ে গেল। এই সেই দাতারবাবু। এমন চেহারা হয়ে গেছে। কোট, প্যাণ্ট, টাই—সিগারেট খাচ্ছে দাতারবাবু সেই আগেকার মত!

দাতারবাবু বললেন—কী হয়েছে তোমার দীপুবাবু?

লক্ষ্মীদিও একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে দীপঙ্করের দুটো কাঁধে হাত রেখে বললে—কীরে, কী হয়েছে তোর?

অন্য যারা দাঁড়িয়ে ছিল পাশে, তারাও একদৃষ্টে দেখতে লাগলো দীপঙ্করের দিকে। দীপঙ্করের যেন কেমন অস্বস্তি লাগলো।

সুধাংশু এগিয়ে এল দীপঙ্করের দিকে। হাতের সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিলে দীপঙ্করের দিকে। বললে—নিন মিস্টার সেন—

লক্ষ্মীদি বললে—আরে, তুমি কাকে কী দিচ্ছ, দীপঙ্কর স্মোক করে না—

সবাই অবাকই হয়ে গেছে। সিগারেট খায় না! এমন ভদ্রলোকও আছে নাকি এ-যুগে।

সুধাংশু বললে—আমিও আগে খেতুম না মিসেস দাতার—কিন্তু যেদিন থেকে ড্রিঙ্ক করছি, সেইদিন থেকেই স্মোক করতে আরম্ভ করলুম—

দাতারবাবু বললেন—দীপুবাবু বরাবর গুড্ বয়—

লক্ষ্মীদি বললে—তুমি তো জানো না, দীপু এখন রেলওয়ের মস্ত অফিসার—

সুধাংশু বললে—আপনি মিস্টার ঘোষালকে চেনেন মিস্টার সেন? আমার ফ্রেণ্ড—আমরা কণ্টিনেণ্টে একসংগে ছিলুম—শেষে......

দীপংকর বললে—আমি এখন আসি লক্ষ্মীদি—

লক্ষ্মীদির শাড়িতে দামী সেণ্টের গন্ধ বেরোচ্ছে। বললে—তুই যাবি?

দীপংকর বললে—হ্যাঁ, আর একদিন আসবো—

লক্ষ্মীদি বললে—কিন্তু একটু সকাল-সকাল আসিস, আজকাল সন্ধেবেলা রোজ বাড়িতে থাকি না। এই দেখ, এই গাড়িটা কিনলুম—

গাড়ি! দীপংকর আকাশ থেকে পড়লো।

লক্ষ্মীদি বললে—পনেরো হাজার টাকা পড়লো। কিনলে ভালো জিনিসই কেনা উচিত, কী বল? দেখ্ না নাইনটিন ফর্টি মডেল, সুধাংশুর এই মডেলটাই পছন্দ হলো—

সুধাংশু বললে—কী বলেন মিস্টার সেন, মিসেস দাতার বলছিলেন মেরুন কালারটাই ভাল, আমি বললাম বটল-গ্রীন—গ্রীনটাই মিসেস দাতারকে মানায় না? আপনি কী বলেন?

দীপংকর একটু হাসলো। তারপর বললে—আমি তাহলে আসি লক্ষ্মীদি—

—তুই যাবি?

লক্ষ্মীদি দীপংকরের সংগে একটু এগিয়ে এল। দল ছাড়িয়ে একটু দূরে। বললে—কিছু কণ্ট্রাক্ট পেয়েছি, মিলিটারি কণ্ট্রাক্ট জানিস—সুধাংশু এখন সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের ডাইরেক্টর হয়েছে। যত কণ্ট্রাক্ট পাচ্ছে, সব আমাকে দিচ্ছে, টাকা আসছে তাই গাড়িটা কিনলুম, আর দেখছিস তো দাতারবাবুও কেমন ভালো হয়ে গেছে—

—আমি তাহলে আসি লক্ষ্মীদি—

—কিন্তু আসিস তুই আবার। আজকে তো তোর সংগে আর কথাই হলো না। নাইট-শো'তে সিনেমায় যাচ্ছি এখন সবাই মিলে, টিকিট কাটা হয়ে গেছে, তা না-হলে তোকেও নিয়ে যেতুম!

দীপংকর বললে—তাতে কী হয়েছে, আমি যাই—

—মাসীমা কেমন আছেন?

দীপংকর বললে—মা নেই—

—সে কীরে কবে? কী হয়েছিল?

অনেক কথা! অনেক কথা জিজ্ঞেস করলে লক্ষ্মীদি। অনেক সহানুভূতি, অনেক সান্ত্বনা, অনেক বাঁধা বুলি। দীপংকর সব কথার জবাব দিলে সংক্ষেপে। বললে—আমি যাই তাহলে লক্ষ্মীদি—

—হ্যাঁ, ভালো কথা, সতীর খবর কী?

দীপংকর তখন যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে। পেছন থেকেও সুধাংশুর দল তখন তাগাদা দিচ্ছে। দীপংকর যেন সে-কথার উত্তর না দিতে পেরে বেঁচে গেল। সিনেমার টিকিট কাটা হয়ে গেছে ওদের। দেরি হয়ে যাচ্ছে। দীপংকর তাড়াতাড়ি পা বাড়িয়ে দিলে।

খানিক পরেই লক্ষ্মীদির নতুন-কেনা নাইনটিন ফর্টি মডেলের গাড়িখানা দীপংকরের পাশ কাটিয়ে সোঁ-সোঁ করে চলে গেল। ভালোই হলো। সতীর কথা শোনবার মত সময় লক্ষ্মীদির তো এখন নেই। আর শুনলেও তো কোনও প্রতিকার করতে পারবে না।

অনেক রাত্রে বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে গেল ভেতর থেকে।

সাধারণত কাশী এসেই দরজা খুলে দেয়। বেশি রাত হলেও কাশীই খোলে। ঘুমিয়ে পড়লেও জেগে উঠে দরজা খুলে দেয়।

আজ কিন্তু দীপংকর লজ্জায় পড়ে গেল। সন্তোষকাকার মেয়ে নিজে দরজা খুলে দিয়ে পাশে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দীপংকর কী করবে বুঝতে পারলে না। আস্তে আস্তে ওপরে গেল। ওপরে গিয়ে নিজের জামা-কাপড় বদলালে। তারপর নীচেয় কলতলায় এসে হাত-মুখ ধুয়ে আবার ওপরে উঠে গেল। সবাই ঘুমোচ্ছে। অন্ধকার সারা বাড়িটা। কাশীটা একতলার বারান্দায় পড়ে পড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সন্তোষকাকারও নাক-ডাকার শব্দ আসছে একতলার ঘর থেকে। দীপংকর কি নীচেয় যাবে? নীচেয় গিয়ে খাবার দিতে বলবে? সমস্ত বাড়িটাতে কেউ জেগে নেই। হয়ত কাশীকেই ডাকবে, সন্তোষকাকার মেয়ে। কাশীকেই ডেকে তুলবে। সাধারণত কাশীই খেতে ডাকতে আসে। দীপংকর খাবার জন্যে তৈরি হয়ে চুপ করে টেবিলের সামনে বসে রইল।

—আপনার খাবার কি এখানে এনে দেব?

বড় মিষ্টি গলা। দীপংকর পেছন ফিরে দেখলে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সন্তোষ-কাকার মেয়ে তাকে লক্ষ্য করেই কথাগুলো বলছে।

দীপংকর তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বললে—না, না, আমি নীচেই খাবো—ওপরে আনবার দরকার নেই—

তারপর তাড়াতাড়ি নীচেয় এসে দেখলে তখনও খাবার দেওয়া হয়নি। দীপঙ্কর সেখানে দাঁড়িয়েই কী করবে ভাবতে লাগলো। সন্তোষকাকার মেয়ে ততক্ষণে তাড়াতাড়ি ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে জায়গাটা মুছে দিয়েছে। একটা আসন পেতে দিয়েছে। তারপর এক'গ্লাস জলও দিলে। দীপঙ্কর লক্ষ্য করলে সন্তোষকাকার মেয়ে যেন থর থর করে কাঁপছে। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে যেন আর সামলাতে পারছে না নিজেকে।

তারপর ভাতের থালাটা এনে রাখতে গিয়েই কী যে হলো! হাত থেকে থালাটা পড়ে গিয়ে ঝন্ ঝন্ করে একটা শব্দ হলো। আর থালার অর্ধেক ভাত ছড়িয়ে ছিটকে ছত্রখান হয়ে গেল চারিদিকে।

এক মুহূর্তে যেন বিপর্যয় ঘটে গেল হঠাৎ।

আর সন্তোষকাকার মেয়ে সেই দৃশ্য দেখে একেবারে লজ্জায় সংকোচে এতটুকু হয়ে গেছে।

দীপঙ্কর দেখলে—সন্তোষকাকার মেয়ের চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

আর সেই শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে কাশীর। ঘুম ভেঙে গেছে সন্তোষকাকার। সন্তোষকাকা ঘর থেকে চিৎকার করে উঠেছে—কে রে? কে রে? কী পড়লো ওখানে?

কাশীও উঠে এসেছে। সন্তোষকাকাও কাছা-কোঁচা সামলাতে সামলাতে একেবারে সামনে এসে হাজির। এসে একবার দীপঙ্করের মুখের দিকে, আর একবার ক্ষিরির মুখের দিকে চাইলে।

—কী হলো? ভাত পড়লো কী করে?

তারপর দীপঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে কী যেন সন্দেহ করলে। বললে—কী করেছ, বলো? তুমি মেরেছ ক্ষিরিকে? তুমি মারলে আমার মেয়েকে?

ক্ষিরি তাড়াতাড়ি গিয়ে বাবার হাতটা ধরলে। বললে—না বাবা, না, আমার হাত থেকে পড়ে গেছে থালাটা—

—কিন্তু পড়লো কেন?

—এমনি পড়ে গেছে বাবা, আমি বুঝতে পারিনি।

সন্তোষকাকা দীপঙ্করের মুখের দিকে চাইলে আবার। তারপর বললে—এখন কী খাবে?

দীপঙ্কর চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার ওপরের সিঁড়ির দিকে উঠে গেল। বললে—আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমার ক্ষিদে নেই—

—ব্যস্ত হচ্ছি কেন? বেশ তো কথা, আমার মেয়ে রান্না বান্না করলে, খাট্‌লে খুট্‌লে, আর তুমি খেতে পেলে না, আমি ব্যস্ত হবো না? আমি ভাববো না তো কে ভাববে, শুনি? আমার মেয়ে যে দিনরাত ঝি-এর মত খাটছে, রাঁধুনির মত উনুনের ধোঁয়ায় দেহ কালি করে ফেলছে—তার বেলায়? তার বেলায় তো তুমি ভাবছো না? এই যে রান্না বান্না করে এত রাত ওব্দি ভাত আগলে বসে থাকে—তার বেলায় তো আমি ছাড়া ভাববার আর কেউ নেই?

—আঃ—

ক্ষীরোদা বাবাকে জোর করে থামিয়ে দেয়। সন্তোষকাকা তখন গজ্ গজ্ করতে করতে গিয়ে আবার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। শুতে শুতেই আবার নাক ডাকতে শুরু করে সন্তোষকাকার। কাশীটাও উঠেছিল। সে-ও খানিক পরে গিয়ে শুয়ে পড়লো। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। ক্ষীরোদা তখনও কী করবে বুঝতে পারলে না। একটা বেড়াল পাঁচিল টপকে এসে দাঁড়ালো উঠোনের মধ্যে। তারপর ক্ষীরোদাকে দেখে যেন একটু সংকোচ করতে লাগলো। তারপর আরো একটু এগিয়ে এলো। তারপর আবার। ক্ষীরোদা চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের কথাই ভাবছিল। হঠাৎ নজর পড়লো বেড়ালটার দিকে। বেড়ালটা আরো এগিয়ে এল। একেবারে ভাতের কাছাকাছি। আস্তে আস্তে পা বাড়িয়ে ভয়ে ভয়ে এগোতে লাগলো। ক্ষীরোদা তখনও একদৃষ্টে দেখছে। বেড়ালটা ভাত-গুলো খাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে। ক্ষীরোদার মতই ভীরু বেড়ালটা।

নিজের ঘরে গিয়েও দীপঙ্করের মনে হলো সন্তোষকাকার মেয়েও বোধহয় এখন না-খেয়ে আছে। হয়ত সে-ও খাবে না আজ। দীপঙ্করের খাওয়া হলো না বলে, সে-ও হয়ত সারারাত না খেয়ে কাটাবে। কী করবে বুঝতে পারলে না দীপঙ্কর। শুতে গিয়েও শোওয়া হলো না। আবার উঠলো। আবার বারান্দায় বেরিয়ে এলো। সন্তোষকাকার মেয়ে হয়ত শুয়ে পড়েছে এতক্ষণে। কিন্তু নিচের বারান্দায় তখনও আলো জ্বলছে। নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দীপঙ্কর দেখলে—আশ্চর্য কাণ্ড। সন্তোষকাকার মেয়ে তখনও ঠিক সেই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আছে—আর একটা বেড়াল আরাম করে তার সেই পড়ে যাওয়া ভাতগুলো খাচ্ছে এক মনে নির্ভয়ে। কেউ বাধা দিচ্ছে না, কেউ আপত্তি করছে না। নিষ্পন্দ নিথর পাথরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে সন্তোষকাকার মেয়ে।

দীপঙ্করের পায়ের শব্দ পেতেই সন্তোষকাকার মেয়ে চমকে উঠে পেছন ফিরেছে।

হয়ত দেখতে পেয়েছে দীপঙ্করকে। কিংবা হয়ত দেখতে পায়নি। কিন্তু দীপঙ্কর তার আগেই গিয়ে নিজের ঘরের দরজায় খিল বন্ধ করে দিলে। (ক্রমশ)

একুশ ॥

ওদের যাত্রার দিন হু-হু করে এগিয়ে আসছে। আর পুরো সাতদিনও হাতে নেই। কিন্তু কী সর্বনাশ, এখনও যে প্রচুর কাজ বাকি। বেচু চাটার্জি স্ট্রীটের ঘর দুখানা রকমারি জিনিসে ভরে গেছে। রোজই মাল আসছে। কিন্তু কী সর্বনাশ, এখনও যে প্রচুর জিনিস আনা বাকি। আর কবে আসবে, কে আনবে জিনিস-গুলো?

আই-সি এস-এর অফিস থেকে অ্যালকাথিনের ফিল্মটা এখনও এসে পৌঁছাল না। ওয়াটারপ্রুফ গাত্রাবরণ তৈরি করতে হবে। আর কবে হবে? ধ্রুব, পিলজ, ওদিকটা দেখ। অবশেষে এল অ্যালকাথিনের থান। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আই-সি-আই-এর মিঃ কর নিজেই পৌঁছে দিয়ে গেলেন মাল। কিন্তু বিস্কুট কই? কোলে কোম্পানী বিস্কুট দেবে। এখনও এসে পৌঁছাল না? ওহে নিমাই, কোয়ার্টার মাস্টার, ব্যাপার কি? কোলে কোম্পানীর কাছে দৌড়ায় নিমাই। খালি হাতে ফিরে আসে। কি ব্যাপার নিমাই? বিস্কুট কই? নিমাই গম্ভীরভাবে বসে, বিস্কুট ত রেডি। কোথায় বিস্কুট? নিমাই তেমনি-ভাবেই জবাব দেয়, কোম্পানীর ঘরে। কেন? ভাল র‍্যাপিং পেপার পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলা দেশের ছেলেরা পাহাড়ে উঠতে যাচ্ছে, যে সে কাগজ দিয়ে ত আর বিস্কুট প্যাক করে দেওয়া যায় না। কলকাতার বাজার কোলে কোম্পানী কাগজ খুঁজতে চষে বেড়াচ্ছে। যাচ্চলে, এদিকে আর সব প্যাকিং যে আটকে গেল। তার কি? অবশেষে কোলে বিস্কুটও পাওয়া গেল। ওরা চেয়েছিল পঞ্চাশ পাউন্ড। কোম্পানী ওদের উপহার দিল প্রায় আশি পাউন্ড বিস্কুট আর প্রচুর টফি। আর সত্যিই সে এমন প্যাকিং, খুলতে গেলে হাত ব্যথা হয়ে যায়।

ওরা কাজন একদণ্ড বসতে পারছে না সুস্থির হয়ে। ভোরের আলো না ফুটতে বেরিয়ে পড়ে ওরা, টো-টো করে ঘোরে, জিনিসপত্র আনতে। এক ফাঁকে অফিসের হাজরে খাতায় রেখে আসে। আবার জিনিস জিনিস করে পাগলের মত ছুটোছুটি করে। রাত বারটা একটায় বাড়ি ফেরে। খাওয়া-দাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই। ওদের ওজন কিছু কিছু কমে গেল।

এখনও ত আসল কাজ বাকি। জিনিস-গুলো সর্ট করা হয়নি। কোন্ কোন্ জিনিস বেস ক্যাম্পের জন্য লাগবে, কোন্ জিনিস উপরে যাবে, সেগুলো বাছ বাছাই হয়ে ওঠেনি এখনও। প্রথমে এসব জিনিস বাছাই করতে হবে, তারপরে ঠিক সেইভাবে প্যাক করতে হবে। কাজ আশি জনের, লোক ওরা ছয়জন। পারবে কেন সামলাতে? সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল অমিতাভ দাশগুপ্ত, এলেন আরেকজন হিমালয়-প্রেমিক—গোষ্ঠীপতিবাবু। যদিও সমুদ্রের কাছে গোষ্পদ, তবুও লোকবল যে বাড়ল, ওরা এতেই খুশী।

দার্জিলিঙ থেকে খবর এল, শেরপা আজীবাকে পাওয়া গেছে। তাঁর ছুটির সমস্যা মিটেছে। তবে শরীরটা তাঁর ভাল নেই। জানা গেল, সর্দার আঙ শেরিং আর আজীবা দিন চারেক আগেই কলকাতায় এসে পৌঁছবেন। অন্যেরা কাটিহার লখনউ হয়ে সোজা পিপুলকোটি চলে যাবে। সেখানেই এদের সঙ্গে দেখা হবে তাদের।

এর মধ্যে ওদের ডাক্তারি পরীক্ষা হয়ে গেল। ডাঃ কর নিজেই পরীক্ষা করলেন। ডাঃ করের দিনলিপিতে এ সম্পর্কে লেখা আছে:

"আমাদের যাত্রার আর সপ্তাহখানেক বাকি। অভিযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হল। বলতে বাধা নেই প্রত্যেক সহযাত্রীরই কোন-না কোন রোগ পাওয়া গেল। তবে কোনটাই খুব মারাত্মক রকমের নয়। তাই বাতিল করলাম না কাউকেই। সমস্যায় পড়েছিলাম একমাত্র গৌরকিশোর ঘোষকে নিয়ে। পরীক্ষায় দেখা গেল, তাঁর রক্তচাপের আধিক্য আছে। এবং সেটা বহুদিনের। বয়সেও তিনি আমাদের চেয়ে কিছু প্রবীণ। ওজনে আমার দ্বিগুণ। থপথপে চেহারা। উচিত ছিল তাঁকে বাতিল করা। কিন্তু তাঁর অসম্ভব দৃঢ় মনোবলের কাছে আমাদের নতি স্বীকার করতে হল। এ লোককে বাতিল করা যায় না। দলের
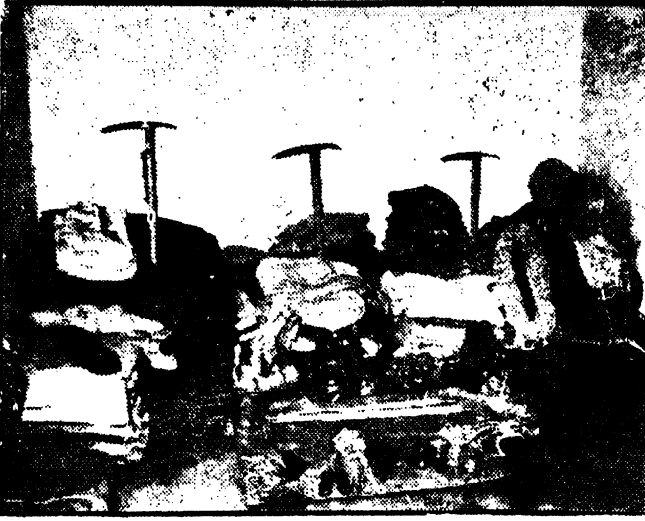
কলকাতায় বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটের ঘরে পর্বতারোহণের সরঞ্জাম মজুত করা হচ্ছে

ম্যানেজার শ্রীধ্রুব মজুমদারের সমস্যা শ্রী ঘোষের সমস্যার বিপরীত। তিনি একটু অতিমাত্রায় ক্ষীণকায়। এই অল্প ওজন সম্বল করে পর্বতে তিনি সাবলীল-ভাবে চলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে আমার সন্দেহ থাকল। তবে আমাকে অবাক করেছেন আনন্দবাজার পত্রিকার ফটোগ্রাফার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সিংহ। দলের মধ্যে তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ। একান্ন বছর বয়েস, কিন্তু তাঁর ফিটনেস দেখে মনে হয়, তিনি এখনও তরুণ, ইয়ংম্যান অব ফিফটি ওয়ান।"

যাত্রার চার-পাঁচ দিন আগে সর্দার আঙ শেরিং আর শেরপা আজীবা কলকাতায় এসে হাজির হলেন। ও'দের মালপত্রের প্যাকিং তখনও শুরু হয়নি। আজীবা অসুস্থ থেকে উঠে এসেছেন। দেহে তখনও বল আসেনি। তবুও আসামাত্র কাজে লেগে গেলেন আজীবা। রান্না করার জন্য যেসব বাসনপত্র কেনা হয়েছিল, তার কিছু কিছু তাঁর পছন্দ হল না।

—বদল লো সব। ইসসে কাম নেহি চলেগা।

আজীবা দিলীপকে সংগে নিয়ে বের হল। ঘুরে ঘুরে পছন্দমাফিক জিনিস কিনে আনল। রোপ ল্যাডার (দড়ির মই) তৈরি করতে দিয়েছিল ওরা। দেশি কারিগরকে অনেক বক্তৃতা-টক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, জিনিসটা আদতে কি? বিদেশীরা দড়ির মই তৈরি করে নাইলনের দড়ি আর অ্যালুমিনিয়মের রড দিয়ে। তাতে জিনিসটা যেমন মজবুত, তেমনি হাল্কা হয়। ওরা এখানে নাইলনের দড়িই বা পাবে কোথায় আর অ্যালুমিনিয়মের রডই বা ওদের কে বানিয়ে দেবে? তাই ওরা ঠিক করেছিল, ম্যানিলার পোক্ত দড়ি আর হাল্কা অথচ মজবুত কাঠ দিয়ে দড়ির মই বানাবে। সেইভাবেই কারিগর জিনিসটা বানালে। ওরা ডেলিভারি নিতে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। দুজনে টেনে তুলতে পারে না, এমন ভারি। সর্বনাশ এ-মই বইবে কে? অনেক মাথা খাটিয়ে ওরা কিছুটা ওজন কমাবার পরামর্শ দিয়ে এল। তবু যা থাকল, তাও ঢের।

সোয়েটার সকলের জন্য জোগাড় করতে পারা যায়নি দার্জিলিঙে। কলকাতার বাজার তোলপাড় করেও প্রয়োজনীয় সোয়েটার পাওয়া গেল না। এমন কি, পর্বতারোহণের উপযুক্ত মোজাও ওরা জোগাড় করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত ঠিক করল, হরিদ্বার অথবা দেরাদুন থেকে ওগুলো কিনে নেবে।

এবারে আরেকটা সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মালবাহকের সমস্যা। যা মাল এ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে, তার ওজন প্রায় ষাট মণে দাঁড়াবে। তবু ত সব মাল এসে পৌঁছায়নি। যতই কাটছাট করুক, ষাটজন মালবাহকের কম হলে ত চলবে না। এত লোক জোগাড় করা সোজা কথা নয়।

সর্দার আঙ শেরিং আর মদন বললেন, ওরা দুদিনের পথ এগিয়ে যাবেন। চমোলি, পিপুলকোটি অথবা যোশীমঠ—যেখান থেকে হোক অন্তত ষাটজন মালবাহক ওরা নিযুক্ত করবেন। আর একজন অভিজ্ঞ গাইডও ও'দের খুঁজে বের করতে হবে।

এর মধ্যে কলকাতা প্রেস ক্লাবের তাঁবুতে এক সাংবাদিক বৈঠক হল। সাংবাদিকেরা অন্তর থেকে এই নবীন অভিযাত্রীদের শুভ-কামনা জানালেন। ফিল্ম ডিভিশন ছবি তুলে নিয়ে গেল। সম্বর্ধনা জানান হল ওদের দু-তিন জায়গায়। আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও'দের সম্বর্ধনা জানালেন। আঙ শেরিং আর মদন রওনা দিলেন হরিদ্বার অভিমুখে। নন্দাঘুণ্টি অভিযাত্রী দলের আডভান্স পার্টি রওনা হয়ে গেল। তবু ওদের প্যাকিং শেষ হল না।

দুবার আর দুদিন সমানে প্যাক করে ধ্রুব, দিলীপ, নিমাই, বিশ্বদেব যখন বাড়ির দিকে রওনা দিল, তখন ওদের ট্রেন ছাড়তে আর দশটি ঘণ্টাও বাকি নেই। সকলেই কিছু না কিছু সাহায্য করেছে, তবু প্যাকিং-এর কাজ করতে হয়েছে দিলীপ আর আজীবাকেই।

ক্লান্তিতে শ্রান্তিতে অবসন্ন দেহটা কোনমতে টেনে নিয়ে দিলীপ বাড়ি ফিরল। ওর প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছিল। শরীরটা এলিয়ে দেবার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠছিল। কিন্তু সে না পারল ঘুমাতে, না পারল বিশ্রাম নিতে। মালগুলো পৌঁছাতে হবে হাওড়ায়। লাগেজ ভ্যানে বুক করাতে হবে। কাজ অজস্র বাকি রয়েছে এখনও। বাড়ির কারো সংগে ভাল করে কথা বলতে পারল না।

দিলীপের মাথায় তখন এক চিন্তা ঘুরছে। কিছু ফেলে ত গেল না। কোন দরকারি জিনিস ত পড়ে থাকল না।

২৫শে সেপ্টেম্বর। পঞ্চমী। আগামী-কাল দেবীর বোধন। পুজোর ছুটি হয়েছে। হাওড়া স্টেশনে লোকের ভিড়ে আর জায়গা নেই। ছুটি কাটাতে সবাই বাইরে ছুটেছে। এই ভিড়ে নন্দাঘুণ্টি অভিযাত্রী দলও মিশে গেছে। প্রত্যেক সদস্যেরই আত্মীয়স্বজন এসেছেন। এসেছেন বন্ধুর দল, শুভানুধ্যায়ীরা। ফেস্টুন, ফটোগ্রাফার, রিপোর্টার। মায়েদের শঙ্কাকুল মুখ, বন্ধুদের সহর্ষ পিঠ-চাপড়ানি।

এ সম্পর্কে ধ্রুব লিখেছেঃ

হাওড়া স্টেশনে বিদায় সম্বর্ধনায় রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সত্যি বলতে কি, আমার জীবনে এ-আস্বাদ আমার এই প্রথম। ট্রেন আসার বহু আগে থেকেই আত্মীয়স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধুবান্ধবের দল এসে স্টেশনে ভিড় করেছেন। ওদিকে গাড়ির প্যাসেঞ্জার, তাদের লটবহর, বিদায়-জানাবার লোক। সেই ভিড়ে বোঝার উপায় নেই, কারা আমাদের জন্য এসেছেন, আর কারা অন্যদের জন্য। ফলে সর্বঘটে একটি বিরাট বিশৃঙ্খলা। যাঁরা আমাদের জন্য এসেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের হাতে মালা, মুখে অফুরন্ত উৎসাহ বাক্য। কত যে ফ্ল্যাশ বালব্ জ্বলছে ক্যামেরার, তার বুঝি হিসাব নেই। এই আমার হাত ধরে একজন হ্যাঁচকা টান মেরে ওধারে নিয়ে গেলেন। আমার গলায় ঝপাঝপ মালা পড়ল। শুনলাম, "বাঙালীর ছেলের এই ত কাজ, বেশ বেশ। মুখ রাখবেন মশাই।" মুহূর্তে আবার আরেক হ্যাঁচকা টানে আরেক ধারে চলে গেলাম। কিছু বোঝবার আগেই কানে ঢুকল, "এদিকে তাকান, স্মাইল প্লিজ, থ্যাংক য়ু।" ফস্ করে ক্যামেরার বাল্বের তীব্র ফ্ল্যাশে চোখে ধাঁ-ধা লাগল। বাড়ির লোক যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা উৎসাহের এই দাপট দেখে এক কোণে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর অসহায়ভাবে দেখতে লাগলেন: আমাদের নিয়ে কী লোফালুফিটাই না চলেছে! এর মাঝখানে হঠাৎ হুড়মুড় করে ট্রেনখানা এসে পড়ল। ধাক্কাধাক্কি, গুঁতোগুঁতি, জয়ধ্বনি আর প্রচণ্ড গোলমালের সঙ্গে মিলেমিশে আমরাও একাকার হয়ে গেলাম। এতক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টায় তবু মালগুলোর উপর নজর রেখেছিলাম। আর বুঝি পারিনে। একবার দেখলাম আজীবা (বেচারি আজীবা) চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে মালের কাছে। পরমুহূর্তেই দেখলাম, একদল ভলান্টিয়ার (কোথাকার ভলান্টিয়ার, কে ওদের পাঠালে, ঈশ্বর জানেন) আমাদের মালগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওদের একজনকেও আমি চিনিনে। ছুটে এগিয়ে আসছি মালের দিকে, হঠাৎ এক হ্যাঁচকা টানে হুমড়ি খেয়ে অন্যদিকে ছিটকে পড়লাম। "এই যে আরেকজন নন্দাঘুণ্টি দাদা, দে পেঁচো মালাটা দিয়ে দে। নইলে আবার পেইলে যাবে মাইরি।" কথাটা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, একটা বিরাট ভিজে মালা ঝপ করে আমার গলায় এসে পড়ল। জামা-কাপড় নোংরা হয়ে গেল। চোখের সামনে সিনেমার হিরোর মত মত ছাঁট দেওয়া উত্তরে একখানা মুখ চকিতে দাঁত বের করল। "আমরা দাদা বাংলার নবীন যৌবনের দূত।" ওদের হাত ছাড়িয়ে এসেই ভলান্টিয়ারদের ধরলাম।

হাওড়া স্টেশনে বিদায় যাত্রা। শ্রীঅশোককুমার সরকার অভিযাত্রীদলের নেতা শ্রীসুকুমার রায়ের হাতে পতাকা বাঁধা তুষার গাঁইতি তুলে দিচ্ছেন

কি করছেন, কি করছেন বলতে না বলতেই, আমি বাধা দেবার আগেই, দেখলাম ও'রা আমাদের মোটগুলো তুলে "নন্দাঘুণ্টি মাঈকি জয়" বলে একটা রেল-কামরার মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছেন। আমার ভয় হল, এই ডামাডোলে আমাদের রুকস্যাক আর কিটব্যাগ না পাখা মেলে উড়ে যায়। আমি হাল ছেড়ে এলিয়ে পড়লাম। এ অবস্থায় আমি আর কী-ই বা করতে পারতাম।"

ওরা শুধু ঘাবড়েই যায়নি, সত্যি বলতে কি, যথেষ্ট পরিমাণে অভিভূতও হয়ে পড়েছিল। একটু বা গর্বিতও। এত লোক, মালা, অভিনন্দন, ফটো তোলা—সব ওদের ঘিরে। অখ্যাত, অজ্ঞাত অবস্থায় ছিল যারা, তাদের নিয়ে এত টানাটানি। আর কত সব বিশিষ্ট লোকের আগমন হয়েছে স্টেশনে! প্রখ্যাত লেখক প্রবোধকুমার সান্যাল এসেছেন ওদের বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে। এসেছেন অশোককুমার সরকার।

সমস্ত হাওড়া স্টেশনটা যেন একটা নূতন রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে ওদের সামনে। এত লোক ওদের শুভাকাঙ্ক্ষী। এত হৃদয়ে ওদের জন্য স্নেহ-ভালোবাসা রয়েছে! দলে দলে লোক আসছে। কেউ জড়িয়ে ধরছে বুকে। কেউ ঝাঁকানি মারছেন হাতে। কেউ পিঠে দিচ্ছেন থাপ্পড়। কেউ অটোগ্রাফের খাতায় সই চাইছেন।

আর, ঐ যে সমস্ত গোলমাল, হৈ-চৈ, উৎসাহ, উদ্দীপনার বড় বড় ঢেউ-এর পাশ কাটিয়ে, এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন অভিযাত্রীদের স্বজন পরিজনেরা। মুখে তাঁদের হাসি, চোখে জল। আর মনে মনে আকুল প্রার্থনা, হে ঈশ্বর, এদের রক্ষা কর। নীরবে উপদেশ দিয়ে চলেছেনঃ দেখে শুনে সাবধানে চল, গোয়ার্তুমি কর না। ভালয় ভালয় ফিরে এস।

কাজের চাপে এতদিন ওরা এত ব্যস্ত ছিল, বাড়িতে দুদণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারেনি। মা-বাবা, মাসি-পিসী, বোন, কারোর সঙ্গে কথা বলার ফুরসতও পায়নি। স্টেশনে এসে শেষ সময়ে কাছে দাঁড়াবে—তাও পারল না। ওরা বুঝতে পারছে, কী আশঙ্কায় ওদের বুক দুরুদুরু করছে। বুঝতে পারছিল, কিছুক্ষণ ওঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ও'রা একটু সান্ত্বনা পেতেন। কিন্তু সুযোগ কোথায়?

অশোকবাবু সুকুমারের হাতে ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা বাঁধা একটা তুষার-গাঁইতি তুলে দিলেন। সুকুমারের বুকটা কেঁপে উঠল। জয়ধ্বনি হল। এক ভদ্রলোক মাঙ্গলিকের চিহ্নস্বরূপ গোটা কতক নারকেল ওদের হাতে তুলে দিলেন। জয়ধ্বনি হল। গার্ড সিটি দিলেন। ইঞ্জিন হুইশিল দিল। ট্রেন ছাড়ল।

॥ বাইশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকেঃ

২৭শে সেপ্টেম্বর। হরিদ্বার এসে পৌঁচেছি। ট্রেন অনেক লেট ছিল। সারা পথ গাড়ির লোক খাওয়ার কষ্টে ভুগেছে।

একে পুজোর ভিড়, তায় হরিদ্বার জনতা এক্সপ্রেস। গাড়িখানার যেন মা-বাপ নেই। এ-গাড়ির যাত্রীরা যেন সব অনাহূত। অন্তত রেল কোম্পানীর ব্যবহার দেখলে তাই মনে হয়। আগে এই লাইনে খাবার কষ্ট কেউ কখনও ভোগ করেনি। কতবার ত এ-পথে যাতায়াত করেছি। তখন কেলনার কোম্পানী ছিল, বল্লভদাস ছিল। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল। যাত্রীরা গাড়িতে বসে থাকতেন। খাবারওয়ালারা তাঁদের কাছে খাবার নিয়ে আসত। এখন সরকার কেটারিং-এর ভার গ্রহণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ। কোন স্টেশনে খাবার-ওয়ালা গাড়ির কাছে এসেছে বলে ত মনে পড়ে না। এখন খাবার সংগ্রহের জন্য যাত্রীদেরই ছুটতে হয়। তার উপর গাড়ি-খানা যাচ্ছেও বড় বেয়াড়া টাইমে। স্টেশনের কেটারিং-এর ভাঁড়ারে যা কিছু খাবার ছিল আগের গাড়িখানার যাত্রীরা তা নাকি সাবড়ে দিয়ে গেছে। কাজেই আমাদের বেলায় অস্টরম্ভা।

আমাদের কোয়ার্টার মাস্টার নিমাই আর সহ-নেতা বিশ্বদেবকে ধন্যবাদ। ও'দের দুজনের "দস্যুবৃত্তির" জন্যই আমাদের হরিমটর চিবিয়ে থাকতে হয়নি। কোনক্রমে ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়েছে।

হাওড়া স্টেশনের সম্বর্ধনার হট্টগোলের মধ্যে বাবার সঙ্গে ভাল করে কথা পর্যন্ত বলতে পারিনি। প্রায় দশসেরি এক মালার ঘায়ে আমার সত্যিই প্রায় মূর্ছা যাবার অবস্থা হয়েছিল। মালার ধারাল মোটা তারের খোঁচায় আমার ঘাড় ফুটো হয়ে গিয়েছিল।

পরে দেখি, সম্বর্ধনার গুঁতোয় সকলেই লবেজান। বাড়ির লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারিনি, এরাও তাই। ঘ্যান ঘ্যান

করছিল। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, এখন ত দুঃখ করলে চলবে না ভাই। তোমরা এতদিন আপন আপন মাতার সন্তান ছিলে। সেটা প্রাইভেট প্রপার্টি। তাই কেউ তোমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করেনি। কিন্তু এই নন্দাঘুণ্টি অ্যাফেয়ারে মাথা গলিয়ে তোমরা হয়েছ বঙ্গমাতার সন্তান। এখন তোমরা পাবলিক প্রপার্টি। লোকেরা তোমাদের নিয়ে যা-ইচ্ছে তা করবে। ধ্রুব বলল, সেটা একদিনেই টের পেয়ে গেছি দাদা। ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হচ্ছি।

সত্যি বলতে কি, আমার হিংসে হচ্ছিল আজীবাকে দেখে। ওকে নিয়ে টানাটানি করার কেউ ছিল না বলে ও দিব্যি বেঁচে গেছে। ওখানে একদিকে অভিযাত্রীদের নিয়ে যখন টানাটানি চলেছে, ছবি তোলার জন্য, তখন হঠাৎ দেখি, কারা আমাদের মালগুলো গাড়ির কামরার মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে। আজীবাকে ডেকে বললাম, তুমি মালের কাছে দাঁড়িয়ে থাক আজীবা, নইলে কোথায় কোন্‌টা চলে যাবে। আজীবা বলল, আচ্ছা। আমি কামরার ভিতরে এসে ঢুকলাম। যথাশক্তি মালগুলোকে একদিকে জড় করার চেষ্টা করলাম। তবু মাল দুদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

আমরা অনেক চেষ্টা করেও কামরা রিজার্ভ করতে পারিনি। পারলে আমাদের মাথাব্যথা অনেক কমে যেত। বীরেনদা, দিলীপ—ওদের সঙ্গে দামি দামি সব ক্যামেরা ছিল। সেগুলোকে চোখে চোখে রাখা সত্যিই কষ্টকর। রিজার্ভ কামরার ব্যবস্থা ইস্টার্ন রেল করে দিতে পারলেন না। রেলওয়ে কনসেশান, সিঙ্গল ফেয়ার ডবল জার্নি, তার ব্যবস্থাও হল না। রেল-কর্তৃপক্ষের কেউ আইন আউড়ে বললেন, অথরাইজড প্রতিষ্ঠান ছাড়া এ-কনসেশান দেওয়া যায় না। আপনাদের নন্দাঘুণ্টি ক্লাব ত অথরাইজড্ নয়। বিনীতভাবে জানিয়েছিলাম, আজ্ঞে নন্দাঘুণ্টি ক্লাব নয়, ওটা একটা এক্সপীডিশন। বাঙালী পর্বতারোহীদের প্রথম অভিযান। তিনি বললেন, দেখুন, আপনারা বড় প্রাদেশিক। সব ব্যাপারে বাঙালী বাঙালী করা বাঙালীদের একটা বদভ্যাস। এইজন্যই ত সবাই আপনাদের উপর হস্টাইল হয়ে যায়। আরে মশাই, প্রভিন্সিয়ালিজম্ পরিহার করুন, Say, we are Indians। বললাম, আজ্ঞে বলব। আমাদের রেলওয়ে কনসেশানটা। বাধা দিয়ে তিনি বললেন, ওটার জন্য রেলওয়ে বোর্ডের কাছে দরখাস্ত করুন। আচ্ছা, আপনাদের সাফল্য কামনা করি। আরেকজন অফিসার চোখ টিপে বললেন, শুনলাম, আনন্দবাজার ফাইন্যান্স করছে। তবে আর ভাবনা কি? I think, Anandabazar is solvent enough to pay the full fare.

শেষ পর্যন্ত জনসংযোগ অফিসের দ্বারস্থ হলাম। ২৫শে সেপ্টেম্বর হরিদ্বার-জনতা এক্সপ্রেসে দশটা শ্লিপিং একোমোডেশনের ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন জানালাম। ঐদিন যদি যাত্রা করতে না পারি, তবে অভিযান ভেস্তে যাবে, এমন আশংকা ছিল, তাই আমরা বেশ ভাবিত হয়ে পড়েছিলাম। পূর্ব রেলের জনসংযোগ বিভাগের কোন অফিসারস্থানীয় ব্যক্তি অনেকক্ষণ ভেবে একটা মোক্ষম উপায় বাতলে দিলেন। বললেন, যা পুজোর ভিড়, দু-তিন দিন আগে থেকে লাইনে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করবেন। আচ্ছা, নমস্কার। আপনারা সফল হোন, দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন, এই কামনা করি।

শেষ পর্যন্ত সাধারণ একজন রেল-কর্মচারী কি কৌশলে যে এই অসাধ্য সাধন করলেন, আমাদের কজনের জন্য শ্লিপিং বার্থে সীট জোগাড় করে দিলেন, তা তিনিই জানেন। তাঁর নাম আমি জানিনে, দিলীপ জানে, দিলীপেরই বন্ধু তিনি। গাড়ির অবস্থার কথা বিবেচনা করে, মনে মনে তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ জানালাম।

শ্লিপিং কামরার দুই প্রান্তে আমাদের সীট পড়েছিল। এক পাশে আমি আর আজীবা, অন্য প্রান্তে আর সবাই স্থান নিয়েছিলাম।

আমার দুটো দুশ্চিন্তা। একটা পায়ের, একটা মাথার। কলকাতার শান-বাঁধান ফুটপাথে ভারি মাউন্টেনীয়ারিং বুটজোড়া ট্রায়াল দেবার জন্য, ঐ জুতো পরে আমি আমাদের যাত্রার দিন দুই আগে বেচু চাটার্জি স্ট্রীট থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত হেঁটে এসেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে পায়ে ফোস্কা। সে ফোস্কা রীতিমত এক ক্ষত সৃষ্টি করল। ট্রেনে ডাক্তারকে ক্ষতটা দেখালাম। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে দেখে বললেন, ভাবনার কিছু নেই, পায়ের ঘা পায়ে সেরে যাওয়াই বেস্ট। কাজেই একটা ভাবনা তক্ষুনি গেল। গেল না মাথার ভাবনাটা। তার কারণও ছিল।

যখন ঠিক হল, আমি এঁদের সঙ্গে যাব, সেই সময় একদিন নিউজ এডিটারের ঘর থেকে আমার ডাক এল। ঘরে ঢুকেই দেখি, শ্রদ্ধেয় এক হিমালয়-প্রেমিক লেখক। আমাকে দেখেই তিনি বললেন, ওহে তুমি পাহাড়ে যাচ্ছ? দেখি, তোমার হাঁটু দেখি। বলেই আমার হাঁটু টিপতে লাগলেন। আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। তিনি বললেন, যাচ্ছ যাও। তবে সাবধান, তোমার হাঁটু রসস্থ। প্রাণ বেরিয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, বরফে যা ঠান্ডা, এক লাইন যদি লিখতে পার, বুঝব বড় বাহাদুর। তার উপর যদি তুষার ঝড়ের পাল্লায় পড়, তবে ত আর দেখতে হবে না। নাকটি খসে পড়বে। মুখের চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে। তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

এই ভয়াবহ পরিণতি রাত দিন আমাকে তাড়া করে বেড়াতে লাগল। ট্রেনের মধ্যেই দুঃস্বপন দেখলাম। পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে আমার হাঁটু ভেঙে রস গড়িয়ে পড়ছে। আর তুষার মানবরা সেই রস খেয়ে বলছে, আরে এযে ফাস্ট কেলাস খেজুর রস। এ-জিনিস অনেকদিন খাইনি। নে ও হাঁটুটাও ভাঙ। সে হাঁটুটা বাঁচাতে দৌড়ে পালাচ্ছি। তুষার ঝড়ে আমার নাকটি খসে পড়ল। ভয়ে শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। ঘুম ভেঙে দেখি, গাড়ির দোলানিতে ওয়াটার বোটল থেকে জল গড়িয়ে পড়ে আমার হাঁটু ভিজে গেছে। হাঁটু ফিরে পেয়েও আমার ভয় গেল না। আজীবা সেই গুমোট গরমেও শ্লিপিং ব্যাগের ভিতর ঢুকে দিব্যি ঘুমুচ্ছে। ও প্রান্ত থেকে বড়দার (বীরেন্দ্র সিংহ) গানের আওয়াজ পেলাম "জয় শিব শংকর, জয় ত্রিপুরারি......" ওদিকে গিয়ে বসলাম।

বারানসী স্টেশনে একাশী বছরের এক বৃদ্ধ আমাদের আশীর্বাদ করে গেলেন। বিশ্বনাথের প্রসাদী ফুল সুকুমারকে দিলেন। তিনি সারাদিন উপোস করে বিশ্বনাথের পুজো দিয়েছেন। বেশ বুঝি

পড়েছে এখানে। লখনউয়েও আমরা বৃষ্টি পেলাম। সেখানকার বাঙালীরাও এসেছিলেন সম্বর্ধনা জানাতে।

হরিদ্বার স্টেশনেও আবার আমাদের শুভকামনা জানান হল। জানালেন কলকাতা পৌরসভার কাউন্সিলার শ্রীসুশীল রায়, বিখ্যাত স্পোর্টস রিপোর্টার শ্রীরাখাল ভট্টাচার্য। আরও ক'টি চেনা মুখের দেখা পেলাম। এ'রা কলকাতা থেকে একই ট্রেনে এসেছেন। যাবেন কেদার বদরি।

ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানীর এজেণ্ট স্টেশনেই দেখা করলেন। হোটেলের ঠিকানা নিয়ে গেলেন। মালবাহকদের খাওয়ার জন্য সিগারেট দিয়ে যাবেন। কলকাতার অফিস থেকে নির্দেশ এসেছে।

আজ শেরিং আর মদনের খোঁজ করা হল। কোন খবর পাওয়া গেল না। অন্য শেরপারা এসেছে কি না, জানা গেল না। ধ্রুব আর নিমাই আজই ঋষিকেশ চলে গেল। পিপলকোটি যাবার জন্য বাস ভাড়া করবে ওখান থেকে।

আমরা আগামীকাল ঋষিকেশ রওনা দেব।

(ক্রমশ)

(২০)

সৌরেন ভয়ে ভয়ে পাশের ঘরে ঢুকে চুপ করে কাঠের মত এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। এ ঘরে সে আগেও এসেছে, কিন্তু আজ মনে হল এ জায়গা তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। ছোট্ট শোবার ঘর। ঘরের আয়তন অনুযায়ী একটুকরো জানালা, মোটা পর্দা দিয়ে ঢাকা। আগে থেকেই এ ঘরে আলো জ্বলছিল, গোলাপী রঙের কাগজের শেডের ভেতর দিয়ে রঙীন আলো সিলিংএর ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। তবু সৌরেনের মনে হল বড় যেন ফাঁকা ফাঁকা। নীচু চওড়া খাট তার উপর ইঁট রঙের সিল্কের চাদর। ঘরের কোণে একখানা বেতের চেয়ার।

মলিনা দাস ঘরে ঢুকেই নরম বিছানার উপর তার ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়েছিল। তখনও পা দুটো মাটি ছুঁয়ে রয়েছে, শরীরটা বিছানায়, মাথাটা বালিশে, আঁকা বাঁকা সরীসৃপের মত দেহ। মুখে তার দুর্বোধ্য হাসি, মিষ্টি স্বরে ডেকে বলে, আয় সৌরেন, আমার কাছে এসে বোস।

সৌরেন কিন্তু তবুও এতটুকুও নড়ল না, সে অনুভব করল হাত দুটো তার কাঁপছে, মনে হল এ যেন এক স্বপ্ন। পুরুষের মনের মধ্যে নারী দেহ সম্বন্ধে যেসব কামনা বাসা বেঁধে থাকে তা যেন নিমেষে অন্তর্হিত হয়েছে। সেইখানে উপস্থিত থেকেও সৌরেন মনে মনে ভুলে যেতে চাইল যে সে সেখানে রয়েছে। সেই নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে থেকে সে নিজের সত্তাকে বার করে নিয়ে যেতে চাইল জনবহুল রাস্তায়, ডুবিয়ে দিতে চাইল অতীতের কোন সুখ স্মৃতির মধ্যে। তার মনের কল্পনার সঙ্গে তাল রেখে কোথায় যেন মধুর যন্ত্রসঙ্গীত বাজছে, যা সে শুনতে পাচ্ছে একা। তার আর মলিনা দাসের মাঝে যেন একটা স্বচ্ছ পর্দা নেমে এসেছে, মলিনা দাসকে সে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু আগের মত স্পষ্ট নয়।

—ওরকম বোকার মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? জুতো, কোট, খোল। এখানে এসে বোস।

মলিনা দাসের কথাগুলো আদেশের মত শোনাল, সৌরেনের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। বেতের চেয়ারে বসে জুতো দুটো খুলে এক পাশে সরিয়ে রাখে, ইচ্ছে না থাকলেও কোর্ট আর টাই খুলে চেয়ারের হাতলে ফেলে দেয়।

—এখানে আয়।

সৌরেন অতি সন্তর্পণে আড়ষ্টভাবে মলিনা দাসের পাশে গিয়ে বসে।

এতক্ষণে নেশা যেন আরও পেয়ে বসেছিল মলিনা দাসকে। আচ্ছন্ন ভাবটা কাটাবার জন্যে কোন রকমে সে বিছানার উপর উঠে বসে। সৌরেনের হাতের উপর মৃদু চাপ দিয়ে হাসল, অর্থহীন হাসি।

—তুই একেবারে ছেলেমানুষ। মলিনা দাস মাথাটা নীচু করে ব্লাউজের বোতামগুলো খোলে, তার মুখের ওপর চুলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে কালো মেঘের মত। কিন্তু বেশীক্ষণ সে বসে থাকতে পারল না, আবার বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

নির্বোধের মত সৌরেন তাকিয়ে রইল মলিনা দাসের দিকে, দেখল তার নেশা ধরা চোখ, মুখ, তার দেহ, তার চুল কিন্তু তাকে স্পর্শ করার কোন বাসনা তার মনে এল না। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল এর পর কি হবে তাই জানবার জন্যে।

মলিনা দাস জড়ানো গলায় বললে, তোর আজ খুব বরাত ভালরে সৌরেন, আজ তুই আমায় যে অবস্থায় দেখলি, সচরাচর পুরুষ মানুষ সেভাবে আমায় দেখতে পায় না। তারা দেখতে চায়, মলিনা দাস মাতাল, বোতলের পর বোতল দামী মদ এনে খাওয়ায়, কিন্তু দেখতে পায় না, কেন জানিস?

মলিনা দাস থামে, চোখে মুখে তার বিজয়িনীর হাসি, মদ খেয়ে তাদের অবস্থা হয় সোম সাহেবের মত, নিজেই মাতাল হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু আমায় কিছু হয় না। আজ দুপুর থেকে তো কত খেয়েছি, কিন্তু এখনও আমার নেশা হয়নি। মাথার মধ্যেটা মাঝে মাঝে চিন চিন করছে, ব্যস্, তার বেশী আর কিছু নয়।

মলিনা দাস সৌরেনের হাতটা টেনে নিয়ে কপালের ওপর ছোঁয়ায়, বুকের ওপর রাখে, বলে, শরীরটা বোধহয় একটু গরম হয়েছে না? তোর হাতটা বেশ ঠাণ্ডা। অত দূরে কেন, আরও কাছে আয়।

সৌরেন কিন্তু পাথরের মত বসে থাকে।

মলিনা দাস এবার বিরক্ত হয়, এ আবার কি আদিখ্যেতা হচ্ছে, আমার কথা বুঝি কানে যাচ্ছে না?

সৌরেনের বুক ধড়ফড় করছিল। শুকনো গলায় বললে, আমার ভয় করছে।

—কিসের ভয়?

সৌরেন কোন উত্তর দেয় না।

—ও বুঝেছি, সোম সাহেবকে ভয় পাচ্ছিস, দূর বোকা, ও এখন বেহেড মাতাল, ডাকাডাকি করলেও ওর ঘুম ভাঙবে না। তুই নিশ্চিন্ত মনে রাত্রি দুটো তিনটে পর্যন্ত আমার সঙ্গে শুতে পারিস। আর, শো—

সোরেনের সেই এক কথা, আমার ভয় করছে।

—ভয় কাকে? মলিনা দাসের কণ্ঠস্বর বিকৃত শোনায়। নিমেষের মধ্যে সে যেন ফণা তুলে ওঠে. ভয় কি তোর আমাকে?

সোরেন ঘামতে শুরু করে, কোন উত্তর খুঁজে পায় না।

মলিনা দাস কর্কশ কণ্ঠে বলে, এতই যদি ভয় কেন আসিস্ আমার কাছে? বেরিয়ে যা এখান থেকে।

সোরেন বুঝতে পারে, তার ব্যবহারে মলিনা দাসের অহমিকায় আঘাত লেগেছে। যে মলিনা দাসকে পাবার জন্যে সোম সাহেবের মত নামজাদা বড়লোকরা অকাতরে পয়সা খরচা করে, যে মলিনা দাসের সংগে রাত কাটাবার লোভে বিবাহিত পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের উপেক্ষা করে চলে আসে, সেই মলিনা দাসের সাদর আমন্ত্রণ সোরেন প্রত্যাখ্যান করেছে। এ অপমান মলিনা দাস সহ্য করবে কি করে। এও বোধ হয় তার জীবনের এক নতুন অভিজ্ঞতা, যাতে সে বুঝতে পারল, সংসারে এমন পুরুষও আছে যে মলিনা দাসকে দেখে ভয় পায়।

সোরেন আর অপেক্ষা করল না, নিঃশব্দে উঠে গিয়ে জুতো দুটো পরে নিল। কোট আর টাই হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

মলিনা দাস তখনও তার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, সমস্ত শরীর তার রাগে কেঁপে উঠছে।

সোরেন কোনরকমে বলল, আমি চলি।

সংগে সংগে কঠিন উত্তর এল, যাও।

সোরেন কল্পনাও করতে পারেনি মলিনা দাসের কণ্ঠস্বর এতখানি কর্কশ হতে পারে, শুনল সে বলছে, আর কখনও আমার কাছে এস না।

এতক্ষণ সোরেনের মনে হচ্ছিল এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে পারলেই সে সবচেয়ে খুশী হবে. কিন্তু দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে একবার সে থামল, মনে হল মলিনা দাসের শেষের কথাগুলো যেন বড় বিষণ্ন শোনাচ্ছে।

মলিনা দাসের দিকে ফিরে তাকিয়ে যতদূর সম্ভব সহজ গলায় বলল, আমি বিশেষ দুঃখিত।

—আমি কোন কথা শুনতে চাই না, তুমি চলে যাও।

—পরে তোমার সংগে দেখা করব।

—না।

—টেলিফোনে খবর নেব?

—প্রয়োজন নেই।

—এই কি তবে আমাদের শেষ দেখা?

—হ্যাঁ।

সোরেন আর কথা না বাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এল। তখনও সোফার উপর আগের মতই সোম সাহেব শুয়ে রয়েছে।

একবারে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে ফাঁকা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে সোরেন স্বস্তি বোধ করল। এতক্ষণে যেন দুঃস্বপ্ন কেটে গেল।

পরের দিন কিন্তু ঘুম থেকে উঠে সোরেনের নিজেকে বড় ছোট মনে হল। কেন সে কাল মলিনা দাসকে এত ভয় পেয়েছিল? মলিনা দাস তার কী ক্ষতি করতে পারতো? কিছুই না। তবে কেন সোরেন তার কথা শুনলো না কেন তার মোহিনী রূপকে অপমান করে চলে এলো? ছিঃ ছিঃ মলিদি তাকে কী ছেলেমানুষই না ভেবেছে। চিন্তা করতেই সোরেনের বিশ্রী লাগলো। মনে মনে ঠিক করলো, মলিনা দাসের সংগে সে টেলিফোনে কথা বলবে। প্রয়োজন হলে তার সংগে দেখা করে কালকের ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চাইবে।

কিন্তু সারাদিনে দু' তিনবার চেষ্টা করেও মলিনা দাসকে ধরতে পারলো না। বার বার নো রিপ্লাই হ'ল।

পরের দিনও তাই।

সোরেন ভেবেছিল মলিনা দাসের বাড়ি গিয়ে খবর নেবে। কিন্তু সময়ের অভাবে পেরে উঠেনি, বিশেষ করে আরও এনিজা-

মেথের জন্যে। এলিজাবেথ তার অফিস থেকে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে দেশের বাড়িতে যাচ্ছে। বাবা মা'র সঙ্গে দেখা করতে। দু' একদিনের মধ্যে ওর কাকারও যাবার কথা। সেখানেই ওদের পারিবারিক মিলন ঘটবে।
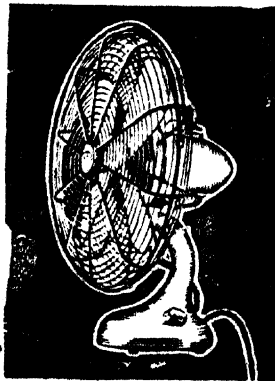
এলিজাবেথের টুকিটাকি বাজার করবার ছিল, সেইজন্যে অফিসের পর সৌরেনকে নিয়ে সে বেরল। লণ্ডনে অবশ্য বেশীর ভাগ দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে। সপ্তাহে এক আধদিন লোকের সুবিধের জন্য সাতটা পর্যন্ত খোলা থাকে। তাই বাজার করার খুব যে বেশী সময় পেল এলিজাবেথ তা নয়, তবু তারই মধ্যে বাড়ির লোকজনের জন্যে যে জিনিস-গুলো না কিনলে চলবে না তাই সে চটপট করে কিনে ফেলল। এ দুদিন ওরা সন্ধ্যে-বেলা আর বাড়ি ফেরেনি। খাওয়া পর্ব বাইরে চুকিয়ে তবে প্রায়রী রোডে ঢুকেছে।

সৌরেন লক্ষ্য করেছে, এ দুদিনই এলিজাবথ খুশীতে ভরে আছে। তার মধ্যে এতখানি উচ্ছলতা সে আগে দেখেনি। এতদিন পর্যন্ত এলিজাবেথ পারতপক্ষে নিজের বাড়ির কথা বলত না, শুধুমাত্র তার কাকার সঙ্গে যে অন্যদের বনিবনা হয় না সেটুকুই জানিয়েছিল। কিন্তু এই শেষের দুদিন তার মুখে আত্মীয় স্বজনদের কথা এত শুনেছে সৌরেন যে, মনে হচ্ছে তারা সকলেই যেন সৌরেনের পরিচিত।

মনে হচ্ছে, এলিজাবেথের বাবা প্রৌঢ় চার্লস হোপকে সে দেখেছে, সারাদিনের কাজের পর ড্রইং-রুমের ইজিচেয়ারে বসে থাকতে। রোজ করে তিনি পাইপ টানছেন, চোখে নিকেলের চশমা লাগিয়ে পড়ছেন 'পাঞ্চ'-এর পুরোনো সংখ্যা। পায়ের কাছে শুয়ে রয়েছে বাদামী রঙের বড় বড় লোম-ওয়ালা তাঁর আদরের কুকুর জেসপার। বাইরে খুটখাট সামান্য শব্দ হলেও সে কান খাড়া করে শুনছে।

এলিজাবেথের মা এখনও সুন্দরী, সাজ-পোশাকের শখ আছে পুরোমাত্রায়। বাড়ির কাজ ছাড়া অবসর কাটান ধর্মসম্বন্ধীয় বই পড়ে। মনে প্রাণে উনি খৃষ্টান। নিয়ম করে গির্জায় যান, গান করেন, পুরোহিত-দের বাণী শোনেন। গল্প উপন্যাস পড়ার অভ্যাস ওঁর ছোটবেলা থেকে নেই। উনি পড়তে ভালোবাসেন যীশু এবং তাঁর শিষ্য-দের বিষয় 'মিরাকল' কাহিনী।

মতান্তর দুজনের মধ্যে যাই থাক না কেন, এঁরা সুখী দম্পতি। এঁদের দীর্ঘদিনের দাম্পত্য জীবন সুখ, শান্তি ও সন্তৃপ্তির সুধা স্বাদে ধন্য হয়েছে। তাই বোধ হয় এলিজাবেথ বাবা মার কথা বলতে এত গর্ব বোধ করে। এত আনন্দ পায়।

যাবার সময় এলিজাবেথ বলে গেল, সৌরেন তোমার কথা আমি মাকে চিঠিতে

লিখেছিলাম, এখন সামনাসামনি দেখা হলে সব কথা গুছিয়ে বলব।

সৌরেন দুষ্টুমি করে জিগ্যেস করেছে, কি বলবে?

—তা বলবো না, শুনলে পরে তোমার মেজাজ গরম হয়ে উঠবে।

—সত্যি

—কেন তুমি বুঝতে পারো না?

—কী জানি।

এলিজাবেথ স্পষ্ট করে বলে, তোমার সঙ্গে পরিচয় না হলে, লণ্ডন বাস আমার কাছে দুর্বিসহ মনে হত। শহরের এই দম বন্ধ করা জীবন মোটেই আমি পছন্দ করি না। You were so kind to me.

সৌরেন এলিজাবেথের হাতটা টেনে নিয়ে গাঢ় স্বরে বলে, আর তুমি? সত্যি লিজি, এই ক'মাস মাত্র তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, অথচ মনে হচ্ছে কতদিনের যেন পরিচয়।

—আমারও ঠিক তাই মনে হয়, সৌরেন।

—তুমি এই ক'দিন লণ্ডনে থাকবে না। আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না সন্ধ্যেগুলো কিভাবে কাটাবো।

—কেন তোমার পুরোনো বন্ধু-বান্ধবীদের কাছে যাও।

—আর ভাল লাগে না।

এলিজাবেথ যেন এই কথাটুকু শোনবার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। মৃদুস্বরে বলে, বেশ তোমার জন্যে আমি দু'দিন আগে ফিরে আসবো।

সৌরেনের চোখ দুটো খুশীতে ঝলমল করে। কথা দিচ্ছ, লিজি।

এলিজাবেথ স্নিগ্ধ উত্তর দেয়, দিচ্ছি।

এলিজাবেথকে স্টেশনে তুলে দিয়ে সৌরেন বাড়ি ফিরে আসেনি, গিয়েছিল মলিনা দাসের ফ্ল্যাটে। ক'দিন থেকে চেষ্টা করে টেলিফোনে ধরতে না পেরে মনটা কেমন যেন অস্থির হয়েছিল। ভেবেছিল, আজ দেখা না হলেও অন্তত একখানা চিঠি লিখে রেখে আসবে, নিজের ব্যবহারে সে যে অনুতপ্ত সে কথা জানিয়ে। কিন্তু মলিনা দাসের ফ্ল্যাটে পৌঁছে সৌরেনকে হতাশ হতে হল।

পরিচারিকা জানাল, মিস্ দাস কণ্টিনেণ্টে বেড়াতে গেছেন।

সৌরেন বিস্মিত হয়, কবে?

—যে সন্ধ্যেবেলা আপনি এসেছিলেন, তার পরের দিন। কেন, আপনি জানেন না?

না, আমায় কিছু বলে নি।

সৌরেন চলে আসছিল, কি ভেবে প্রশ্ন করল, কবে ফিরবেন?

—বলে গেছেন দেড় সপ্তাহ বাদে।

—আশ্চর্য।

মলিনা দাস যে এভাবে না বলে কয়ে হঠাৎ কণ্টিনেণ্টে চলে যাবে তা সৌরেন ভাবতে পারেনি। সে রাত্রেও তা মলিদি কোন আভাস দিল না। তবে কি হঠাৎ কোন কাজে চলে গেছে। কিন্তু এমনই বা কি কাজ থাকতে পারে মলিদির। মনে মনে সৌরেন স্বীকার না করে পারল না, সত্যিই আশ্চর্যময়ী এই মলিনা দাস।

বাড়িতে একলা ফিরে এসে চুপচাপ বসে থাকতে কেমন যেন বিরক্ত লাগল সৌরেনের। গত ক'মাসের মধ্যে একদিনও বোধ হয় সে এভাবে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা কাটায় নি। সরোজদার পিঠচাপড়ানো সমিতি উঠে যাবার পর তার বেশীর ভাগ সন্ধ্যা কেটেছে এলিজাবেথের সঙ্গে। হৈ হৈ হাসি গল্পের মধ্যে দিয়ে স্বপ্নের মত পাতলা দিনগুলো কেটে গেছে। সেইজন্যেই বোধ হয় আজ সৌরেনের এত বেশী করে মনে হচ্ছিল চলতে চলতে সময় যেন হঠাৎ থেমে গেছে। বড় ভারী, বড় ক্লান্তিকর।

নীচে নেমে গিয়ে সৌরেন মীনাক্ষীকে ফোন করল।

ফোন ধরল মীনাক্ষী, সৌরেনের গলা শুনে বলল, কি ব্যাপার? অনেকদিন তোমার কোন খবর পাইনি যে?

সৌরেন ছোট্ট উত্তর দিল, নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

—এলিজাবেথের খবর কি? ভাল আছে?

—হ্যাঁ।

সৌরেন ইচ্ছে করেই বলল না এলিজাবেথ দেশে গেছে, প্রশ্ন করল, সন্ধ্যেবেলা বাড়ি আছ?

—কেন?

—তাহলে যেতাম।

মীনাক্ষী সহজ গলায় বলে, না, আমাকে পীয়েরের কাছে যেতে হবে, ওর শরীরটা ভাল নেই।

সৌরেন উদ্বেগ প্রকাশ করে, কি হয়েছে ওর?

—এমনি জ্বর।

—তুমি কি মনে কর আমার দেখা করা উচিত?

মীনাক্ষী স্পষ্ট উত্তর দিল, না, সেরকম কিছু নয়।

দু'চারটে মামুলী কথা বলে টেলিফোন রেখে দিল সৌরেন। বুঝল, মীনাক্ষী চায় না তার সঙ্গে দেখা করতে।

টেলিফোন রেখে দিয়ে সৌরেন উপরে না উঠে নীচে নেমে এল। অনেক সময় বিকেলের ডাকে যে চিঠিগুলো আসে করিডোরের টেবিলে তা সাজিয়ে রাখা হয়। খানকয়েক চিঠি পড়েও ছিল কিন্তু তার মধ্যে সৌরেনের কোন চিঠি নেই। পাশের বড় ঘর থেকে মেয়েলী কণ্ঠের হাসি শোনা যাচ্ছে, নিশ্চয় রবিন্সদের গেস্ট এসেছে।

রান্নাঘরের দরজা খুলে মিসেস হেরিং বেরিয়ে এল, গুড্ ইভনিং মিঃ লাহিড়ী। এ সপ্তাহে দুধের দামটা বোধ হয় আপনি দিতে ভুলে গেছেন।

সৌরেন বলল, আমার ঠিক মনে ছিল না, কত হয়েছে বলুন তো।

—সাত শিলিং।

সৌরেন পকেট থেকে একটা দশ শিলিং-নোট বার করে এগিয়ে দিল, চেঞ্জটা আপনার কাছে রাখবেন।

—ধন্যবাদ মিঃ লাহিড়ী।

বাইরের দরজায় কেউ বেল টিপলো, মিসেস হেরিং দরজা খুলতে গেলেন। সৌরেন আর অপেক্ষা না করে উপরে ওঠার জন্যে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায় কানে ভেসে এল কেউ যেন তার নাম বলছে। মুখ ফিরে তাকাতেই মিসেস হেরিং সহাস্যে বলে, মিঃ লাহিড়ী, আপনার গেস্ট এসেছে।

(ক্রমশ)

বাংলার সঙ্গীত সংস্কৃতি ও বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন

শ্রীতপনকুমার সেন

জনপ্রিয়তা বহু বাঞ্ছিত সৌভাগ্য। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন জনগণের মনোরঞ্জনপূর্বক এই সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হয়েছেন। প্রতি-বারই তাঁদের অনুষ্ঠানসূচীতে বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত হয় বিবিধ মনের পরিতৃপ্তির জন্য। এবারেও এই সম্মেলন জনসাধারণের বিপুল সমাবেশে ধন্য হয়েছে।

সার্থকতার পরিমাপের জন্য জনপ্রিয়তার যেমন বিশেষ আবশ্যকতা রয়েছে তেমন সার্থকতার মাননির্ধারণের জন্য জনপ্রিয়তার লঘুতর মোহ থেকে মুক্ত হওয়াও প্রয়োজন। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের সর্বাধিক উদ্যোগ এবং সর্বোৎকৃষ্ট মণ্ডসজ্জা যেদিন আধুনিক গান উপলক্ষ্যে সংগীত ব্যবসায়ীদের প্রচারের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হতে দেখি সেদিন সন্দেহের উদ্রেক হয় এই মোহ তাঁদের যথার্থ সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা থেকে বিচ্যুত করবার জন্য সহস্র সহস্র বাহু নিয়ে অগ্রসর হয়ে আসছে কি না। এই বিপত্তি থেকে একমাত্র তাঁদের বিবেক এবং শুভবুদ্ধিই তাঁদের রক্ষা করতে পারে।

এবারকার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে—(১২ই মার্চ—৫ই এপ্রিল) অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের তিরোধান বিশেষভাবেই অনুভূত হল। বঙ্গ সংস্কৃতির এ যাবৎ তিনিই সভাপতিত্ব করেছিলেন। তাঁর সৌম্য উপস্থিতির অভাব সম্মেলনকে বিষাদযুক্ত করেছে।

উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, শ্রীসুধীরঞ্জন দাস এবং শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু। এঁরা প্রত্যেকেই মূল্যবান কথা শুনিয়েছেন। অধিবেশনের প্রারম্ভে উদাত্ত কণ্ঠে মঙ্গলাচরণ অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকটি সুনির্বাচিত সম্মেলক গানও এই অধিবেশনের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান।

এ বৎসর পঁচিশদিনব্যাপী অনুষ্ঠান-সূচীতে প্রথম দশ দিন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ, সংগীত, নাটক এবং নৃত্যনাট্য প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করবার এইটিই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। এদিক দিয়ে ত্রুটি হয়নি তবে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সর্বত্র সুরক্ষিত হয়েছে বললে সত্যভাষণ হবে না। অধিকাংশ গায়ক গায়িকার অনুষ্ঠান নিষ্প্রাণ—শুনলে মনে হয় তাঁরা যেন সুর করে স্বর-লিপি পাঠে নিযুক্ত আছেন। কোনও কোনও শিল্পী তাঁদের গানের ভঙ্গী কি রকম হবে সে সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত নন। টপ্পার নাম করে অনেকে গলার অনিয়মিত কম্পনকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এই ত্রুটি মহিলাশিল্পীদের কণ্ঠেই সর্বাধিক পরিদৃষ্ট হয়েছে। বহু শিল্পীর বিভিন্ন পদ্ধতিতে গাওয়া গানগুলি থেকে মনে হল অনেকেরই কোন গান কী পদ্ধতিতে কী লয়ে গাইতে হবে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অভাব আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর যুগের এবং তাঁর পূর্ববর্তী যুগের সংগীতকলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ গায়ক-গায়িকার সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা দূরে থাকু ধারণারই অভাব—ফলে শৈলীগত বহু ত্রুটি পরি-লক্ষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পুরাতন গানগুলি গাইবার দিকে অনেকের ঝোঁক দেখা গেছে, কিন্তু সেগুলি যে মুখস্থ করে গাইবার বস্তু নয় তা শিল্পীদের বোঝা আবশ্যক। আরও ব্যাপক সংগীত বোধ ব্যতিরেকে এ প্রচেষ্টায় প্রকৃত সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের সুপ্রচলিত গানগুলি যাঁরা সহজভাবে গেয়েছেন তাঁদের গান আমাদের ভাল লেগেছে। কথা হচ্ছে, সাধারণ পারগতার পক্ষে অসাধারণের অভিমুখী না হওয়াই ভাল।

যে সম্মেলক গীতি বিশ্বভারতীর বিশেষ গৌরব ছিল, যাতে রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুত প্রেরণা সঞ্চার করতেন, সেই সম্মেলক গীতাংশগুলি নৃত্যনাট্যাদি থেকে বর্জন করে এককভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে শিল্পীর নানাপ্রকার দুর্বলতা ধরা পড়ছে এবং অনুষ্ঠানের সামগ্রিক সার্থকতা (যা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কাম্য ছিল) বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। বিশ্বভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা যে দুটি অনুষ্ঠান এই সম্মেলনে করেছেন তার কোনটিই এই ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। বিশেষ করে শ্যামা নৃত্যনাট্যের সংগীতাংশ বিশেষ দুর্বল বোধ হল। অভিনয়ের উপযুক্ত প্রাণের স্পন্দন এঁদের গানে অল্পই পাওয়া গেছে। মোট কথা, কবির জীবৎকালে তাঁর গানে যে একটা ব্যক্তিত্ব এবং অসাধারণ গৌরবের পরিচয় পাওয়া যেত তা এখন স্মৃতিতে পর্যবসিত হতে চলেছে।

রবীন্দ্র সংগীতে আলোচনার অনুষ্ঠান মাত্র একটি—শান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের—"রবীন্দ্র সংগীতে লোকসংগীতের প্রভাব"। মাইক্রোফোনের গোলযোগে বার বার বাধা-গ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সংগীত সহযোগে একটি সংক্ষিপ্ত মনোহর ভাষণ প্রদান করেন। এ বিষয়ে উদ্যোক্তাদের উদাসীন্য দেখে মনে হল তাঁদের সম্মেলনে আলোচনা আজ উপেক্ষিত। অথচ প্রথম পর্যায়ে আলোচনার প্রতি এঁরা বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেছিলেন। আলোচনা তথাকথিত জনপ্রিয়তার পক্ষে অন্তরায়—এ সত্য তাঁরা হয়ত বহু অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছেন।

নাট্যানুষ্ঠানের মধ্যে গোরার নাট্যরূপ জনসমাদর লাভ করেছে।

বাকী পনেরো দিনের অনুষ্ঠানে নাটকেরই প্রাধান্য দেখা গেল। বোঝা যাচ্ছে নাট্যশিল্পের উন্নতি বিধান বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের কাম্য, কিন্তু কয়েকটি সদ্য অঙ্কুরিত গোষ্ঠী নিয়ে এইভাবে নাট্যশিল্প কতখানি অগ্রসর হবে সেটা চিন্তার বিষয়। মহানগরীতে ভাল প্রেক্ষাগৃহের অভাব নেই

যাঁরা যথার্থ নাট্যানুষ্ঠানে উদ্যোগী তাঁরা অভিনয় ব্যাপদেশে এইসব প্রেক্ষাগৃহই অবলম্বন করেন। বস্ত্রাগারের অন্তর্বর্তী স্থিরত্ব রহিত লঘু কাষ্ঠকুট্টিমে নাতিবিদগ্ধ কুশীলবদের কার্যকলাপকে নাট্য সংস্কৃতির উন্নতি বিধায়ক বলা চলে না এবং ঈদৃশ পরিকল্পনা একমাত্র পরিকল্পনার দৈন্যকেই উদ্ঘাটিত করে। তথাপি সহস্র সহস্র ব্যক্তি নাকি করতালি দ্বারা পূর্ববর্তী অনুষ্ঠান-গুলির সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি ঘটিয়ে এই নাট্যানুষ্ঠানগুলি উপভোগ করেছেন। অনেকে হয়ত বলবেন—অল্পব্যয়ে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন এতগুলি নাটক প্রদর্শন করবার দায়িত্ব গ্রহণ করে দর্শকদের সুযোগ প্রদান করেছেন। সুযোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু উন্নিত-সাধন অথবা প্রকৃত রূপায়ণের নিদর্শন কি?—তা যদি না হয় তবে এ প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকাই ভাল কেননা এই সম্মেলনের আদর্শ দর্শকদের কৌতুকের সন্ধান প্রদান করা নয় তাদের রুচির উন্নয়ন করা। এতে একদিকে যেমন নাট্যরূপের বিকৃতি ঘটছে অপরদিকে তেমন যাত্রাভিনয় নাট্যরূপের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যাচ্ছে—তার ঐতিহ্যও বজায় থাকছে না। প্রচার্য বিষয়ের পরিচয় যদি সার্থক এবং সম্পূর্ণ না হয় তবে সেই প্রচার পুষ্টিহীন খাদ্যের মতই অপকারী হয়ে থাকে।

এবারকার সংগীতানুষ্ঠানের মধ্যে নজরুল ইসলামের গান আমাদের ভাল লেগেছে। পরিচালকের কণ্ঠে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বলবার কথা এই যে গীতনির্বাচন সুরকারের সামগ্রিক পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের যে একটি স্বকীয় ভাব ছিল বা আবেগ প্রকাশের একটি বিশেষ ভঙ্গী ছিল তার পরিচয় কোনও গানেই পাওয়া গেল না। "বাহবা নন্দলাল"—এই হাসির গানটি অবশ্য উপভোগ্য হয়েছে।

রজনীকান্তের গানগুলি সুপরিবেশিত হয়েছে। পরিচালকের বিষয়টিতে অধিকার আছে বোঝা গেল। অতুলপ্রসাদ প্রসঙ্গে পরিচালকের ভাষণটি ঘরোয়া এবং মনোরম। গানগুলি সাধারণভাবে ভালই লেগেছে।

বিবিধানুষ্ঠানের মধ্যে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দরের গানগুলি হারিয়ে যাওয়া এক যুগের গানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মাইকেল মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যটির গীতরূপায়ণ সার্থকতায় উত্তীর্ণ হতে পারলে ভালই হত, কিন্তু যিনি এই পরিকল্পনা করেছেন তাঁরা এ বিষয়ে যথেষ্ট যোগ্যতা এবং প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেল না। তাঁর পক্ষে এই ধরনের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকাই ভাল। আধুনিক পূর্বধারার গান-গুলি যাঁদের কণ্ঠে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাঁদের কারুর কারুর কোনও বিশেষ ধারার সঙ্গেই পরিচয় আছে বলে মনে হয় না। এই জাতীয় শিল্পদের কাছ থেকে তা আশা করাও উচিত ছিল না।

এবারকার সংগীতানুষ্ঠান থেকে হিমাংশু দত্ত সম্পর্কীয় আলোচনা বাদ গেছে। গতবার উদ্যোক্তারা এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

এবারের সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত বিষয় হল লোকসংগীত। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন এই লোকসংগীতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেই একদা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বহু আয়াসে দূরবর্তী বিভিন্ন জনপদ থেকে তাঁরা বিবিধ গোষ্ঠীকে আনয়নপূর্বক শহর-বাসীকে তাঁদের সংগীতের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলেন। আজ সেই নিষ্ঠার নিদর্শন অন্তর্হিত হয়েছে এবং তার স্থান অধিকার করেছে কৃত্রিম নাগরিক প্রমোদ পরিবেশনের মোহ। যে দর্শকগণ আগ্রহের সঙ্গে এইসব অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতেন তাঁরাও সাধারণ আমোদলিপ্সু করতালি প্রদানরত দর্শকদের জন্য তাঁদের স্থান মুক্ত করে বিদায় নিয়েছেন বলেই মনে হল। মানভূমের উৎকৃষ্ট গায়ন সম্প্রদায় এবার অনুপস্থিত। তবে সংশ্লিষ্ট প্রদর্শনীতে মানভূম অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের সজ্জিতোপকরণ দেখবার মত হয়েছিল। বিভিন্ন পুঁথি, লোকসংগীতে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি তাঁরা সযত্নে প্রদর্শন করেছেন। এই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রকৃত দ্রষ্টব্য সাংস্কৃতিক উপকরণের পরিচয় পাওয়া গেল। উত্তরবঙ্গ মালদহ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে যেসব গোষ্ঠী আসতেন তাঁরাও এবার অনুপস্থিত। বীরভূমের বাউল যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা উক্ত অঞ্চলের বাউল-দের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন কি না সন্দেহ। কেউ কেউ বাউলদের যে নৃত্য প্রদর্শন করলেন তা বাউলদের নৃত্যকে উপহাস করেছে মাত্র। তবে বলা প্রয়োজন যে সত্যিকারের বাউলরা বাইরে আসতে চান না—তাঁদের কাছে আসা যাওয়া করলে তবে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়। তাতেও যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সবাইকে অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হয়নি। কী কারণে কর্তৃপক্ষ কেবলি তাগাদা করে তাবৎ অনুষ্ঠানকেই খর্ব করে দিচ্ছিলেন তা তাঁরাই জানেন। বোধ করি নাট্যানুষ্ঠানের জন্যই তাঁদের এই ব্যস্ততা। ঢাক, ঢোল, খোলবাদ্য মাঝে মাঝে ফাঁক পূরণের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। অপরাপর যে সমস্ত সাধারণ অনুষ্ঠান বিক্ষিপ্তভাবে হয়েছে তার নমুনা রেডিওযোগে আমরা প্রতিনিয়তই পেয়ে থাকি। এবারকার কবিগানও নাকি আশানু-রূপ হয়নি। এবারকার লোক-সংগীতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপভোগ্য অনুষ্ঠান মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর রামায়ণ গান। ইনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। পুতুল নাচের অনুষ্ঠানটি মন্দ হয়নি।

উচ্চাঙ্গ সংগীতানুষ্ঠান সম্পর্কে আমরা কোনও সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলাম না কারণ এটি বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের বৃহৎ কর্ম-সূচীর একটি পরিপূরক অনুষ্ঠান। তবে অনুষ্ঠানটি অন্যত্র যেমন হয় এখানেও সেই রকমই হয়েছে। অসাধারণ কিছু না হলেও মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। ইতিপূর্বে এই সম্মেলনে ধ্রুবপদের একটি মনোরম অনুষ্ঠান হত। বাংলায় ধ্রুপদের একটা ঐতিহ্য ছিল সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বোধ করি এটি করা হত। এবারে কর্তৃপক্ষের কাছে তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে বলে বোধ হল।

অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি করেছেন শ্রীদিলীপকুমার রায়। এই মনীষীর মনোজ্ঞ, মূল্যবান ভাষণে এবং সুললিত গীতে সকলেই প্রীত, পরিতৃপ্ত হয়েছেন।

এই তো গেল পঁচিশ দিনের সুদীর্ঘ বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন। কিন্তু খতিয়ে দেখলে এই পঁচিশ দিনের আয়োজনের অনুপাতে লাভের অঙ্ক অকিঞ্চিৎকর। দু-একটি অনুষ্ঠান মাত্র মনে রেখাপাত করে। একমাত্র চলচ্চিত্রের আলোচনাটি নানাদিক থেকে সুপরিকল্পিত এবং সার্থক হয়েছে। একটু অভাব থেকে গেছে। চলচ্চিত্রে প্রযুক্ত সংগীত বিষয়টি আলোচনার অন্তর্গত হলে অনুষ্ঠানটি অধিকতর মূল্যবান হত। রাইচাঁদ বড়াল মহাশয় সংগীত সম্বন্ধে যা বললেন, তার মূল্য আছে কিন্তু সে তাঁর নিজস্ব স্মৃতিচারণ। বর্তমান চলচ্চিত্রে সংগীতের অধোগতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ খোলাখুলি আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

পরিশেষে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনকে আত্মসমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে অনুরোধ করি। একদা তাঁরা কতকগুলি উচ্চ আদর্শ নিয়ে এই সম্মেলনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেদিনকার আদর্শবাদ লোকরঞ্জনের প্রলোভনে ধীরে ধীরে কেমনভাবে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে তা তাঁদের চিত্তে অগোচর থাকবার কথা নয়।

গল্প সংকলন

শত বর্ষের শত গল্প। প্রথম খণ্ড। সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত। বেঙ্গল পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা—১২। দাম পনেরো টাকা।

বাংলা ছোটোগল্প অত্যন্ত দ্রুত পরিণতি লাভ করেছে। এখনকার গল্পলেখকরা ভীরু হাতে কলম ধরেন না। রীতিমত নতুন নতুন টেকনিক এবং বক্তব্যের দিকে দুঃসাহসিক অগ্রগতি দেখিয়ে চলেছেন অথচ আশ্চর্যের বিষয়, বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাস এমন কিছু পুরোনো নয়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ থেকে অর্থাৎ গত শতকের শেষ দশক থেকেই বাংলা গল্পের আরম্ভ বলে ধরা হয়। পূর্বসূত্র হিসাবে বঙ্কিমের 'রাধারানী' এবং সঞ্জীবচন্দ্রের 'দামিনী' উল্লিখিত হয়ে থাকে। শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'শত বর্ষের শত গল্প' পড়লে পাঠক অন্তত এটুকু ভালোভাবেই আন্দাজ করতে পারবেন যে, এই ধারণার পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথের আগে আরও কয়েক-জনের মধ্যেই ছোটোগল্পের অস্পষ্ট এবং অস্ফুট প্রেরণা কাজ করছিল। গল্প বলা এবং গল্প শোনার সঙ্গে আধুনিকতার সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক বিশিষ্ট রূপরচনার। বর্তমান সংকলনে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালী-প্রসন্ন সিংহ, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই আছেন। চরম মাপকাঠিতে এঁদের রচনা হয়তো আদর্শ গল্প বলে স্বীকৃত হবে না। কিন্তু নক্‌শা-নাটক-উপন্যাস-বিবরণ-ধর্মী রচনার মিশ্র রূপের ভিতর থেকেই ছোটোগল্প অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে। সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রচলিত গল্প না নিয়ে যে দুষ্প্রাপ্য রচনা 'ভিখারিনী'কে গ্রহণ করেছেন এতে তাঁর উদ্দেশ্যের সূক্ষ্মতাই প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যে গল্পগুলি পরিণত ও নিটোল সেগুলি বাংলা ছোটোগল্পের ধারায় এক আকস্মিক পূর্ণতার বিস্ময় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যে রচনাটির মধ্যে সেকালের অন্যদের মতোই গল্পের প্রয়াস মাত্র ব্যক্ত হয়েছে, তাই বাংলা ছোটো-গল্পের ইতিহাস-ধারা অনুধাবনে সহায়তা করে। রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা গল্প কাহিনীর জটিলতায় সেকালের রোমান্টিক উপন্যাসেরই সগোত্র। সেকালের সুলভ রীতি 'নক্‌শা' অবলম্বন করেও ছোটোগল্পের আভাস পাওয়া যায়। দীর্ঘতর কাহিনীর অংশ বিশেষ সংকলন করার সার্থকতা এখানেই। রবীন্দ্রনাথের পর প্রভাত কুমার থেকে বাংলা গল্প মোটামুটি একই রীতি-প্রকৃতি অনু-সরণ করে এসেছে। মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী বাঙালীর সাংসারিক জীবনের করুণস্নিগ্ধ গভীর সমস্যাহীন মন্থর কাহিনী লেখা হয়ে এসেছে কল্লোলগোষ্ঠীর আবির্ভাব পর্যন্ত। এই পর্যায়ের গল্প সংকলন করতে গিয়ে স্বভাবতই সার্থক লেখকদের সার্থক গল্প বাছাইয়ে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখতে হয়েছে। 'কল্লোলগোষ্ঠী'র পর বাংলা ছোটোগল্পের বৈচিত্র্য এতই বেশি যে, সে-পর্যায়ের জন্যই সম্পাদককে আলাদা আর একটি খণ্ড করতে হয়েছে। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডটির জন্য উৎসুক হয়ে থাকলাম।

ইতিপূর্বে বাংলা ছোটোগল্পের একাধিক সংকলন বেরিয়েছে। কিন্তু বর্তমান বিপুলায়তন গ্রন্থটি পাঠকদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যই একসঙ্গে চরিতার্থ করবে। ঐতিহাসিক ক্রমানুসরণে সাহায্য তো করছেই, বাংলা গল্পের রীতিপ্রকৃতি স্বাধীনভাবে বোঝবার এবং বিচার করবার প্রচুর উপকরণও সংগ্রহ করে দিয়েছে। পঞ্চান্নটি গল্পের এই সংগ্রহ সাধারণ পাঠক এবং ছাত্রদের অপরিমেয় সাহায্য করবে। সুখপাঠ্য ভূমিকায় সম্পাদক গল্পের উদ্ভব এবং বাংলা সাহিত্যে গল্পের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরিশিষ্টে সংক্ষেপে লেখক পরিচয় থাকাতে গ্রন্থের উপযোগিতা বেড়েছে। একটি বিষয়ে সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। লেখকদের গ্রন্থের তালিকায় প্রকাশ কাল দেওয়া থাকলে ভালো হত।

যে কোনো গ্রন্থাগারে এবং সাহিত্য-রসিকের গ্রন্থসংগ্রহে এই বই অবশ্যরক্ষিতব্য তাতে সন্দেহ নেই। **ভবতোষ দত্ত**

৩০।৬১

আগে কহ আর—অচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্ত। টি এস বি প্রকাশক, ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। তিন টাকা।

অচিন্ত্যকুমার সাহিত্যিক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত; জনপ্রিয়তায় অন্যতম। তাঁর গ্রন্থ প্রকাশ সে কারণে অনুরাগী পাঠকের কৌতূহল মেটায়। বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর স্বকীয়তায় বিশিষ্ট দশটি ছোট গল্পের সুন্দর সংকলন; যদিও তারতম্যের বিচারে সবগুলিই সমান গুণের নয়। সম্ভবত সব কটি গল্পই ইতিপূর্বে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থাকারে তাদের মূল্য বৃদ্ধি পেল।

অচিন্ত্যকুমারের নৈপুণ্যে ও শক্তিমত্তার

পরিচয় কমবেশি সকলেরই জানা আছে। গ্রন্থবদ্ধ দশটি গল্প তাঁর যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করতে হয়তো পারবে না; তবু বলা বাহুল্য, রসোত্তীর্ণ এবং সে কারণেই সুখপাঠ্য। 'স্বভাবের স্বাদ' গল্পটিতে স্বামী সুদক্ষিণ ও স্ত্রী ইন্দিরার মনোমালিন্য দূর করবার জন্য নন্দনের অতর্কিত আবির্ভাব অতি-নাটকীয় মনে হ'তে পারে; কিছুটা যেন ঘটনার প্রয়োজনে আরোপিত। তবু গল্পটিতে 'পারফেক্টনেসের' অভাব নেই। 'দৈব', 'ছাত্রী', 'অপাপবিদ্ধ', 'কটাক্ষ' ইত্যাদি গল্পগুলিও রমনীয়। অচিন্ত্যবাবুর ভাষায় কোথাও কোথাও অতিকথন রয়েছে, কথা সাজানোর মোহ রয়েছে। ভাষায় যাঁর অসামান্য দখল, তিনি অবশ্য এই সামান্য ত্রুটি ছাড়িয়ে যেতে পারতেন। ৫৯২।৬০

প্রবন্ধ-সাহিত্য

বই পড়া—সরোজ আচার্য—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। চার টাকা।

'বইপড়া' বইপড়ার জগতে একটি নতুন স্বাদ এনে দিল। প্রবন্ধ রচনায় সরোজ বাবুর কৃতিত্ব এবং দক্ষতা পাণ্ডিত্য নয়; তাঁর লেখার মধ্যে অনেকগুলি গুণ আমরা এক সঙ্গে দেখতে পাই। রম্যতা এবং দৃষ্টিগতত্ব কেবল নয়, কবিসুলভ এবং দার্শনিক সম্ভব নির্লিপ্ত এবং স্বাতন্ত্র্য একই সঙ্গে তাঁর রচনাবলীতে বিচ্ছুরিত। তাঁর কালির রঙ ঘনঘোর নয় কিন্তু গভীর, বর্ণের দিক থেকেও স্পর্শের দিক থেকেও। অনেক গুরুতর এবং অমীমাংসনীয় ব্যাপারকেও এমন লঘুপাকে ধরে দিয়েছেন যে মনে হয়েছে পাণ্ডিত্যও একপ্রকারের শিল্প, কারণ আত্মগোপনেই তার আত্ম-প্রকাশ।

বইপড়া, না-পড়া, লেখা, না-লেখা, সাহিত্য-সাহিত্যিক প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এমন উপভোগ্য স্ব-চিন্তা এবং স্ব-কাল-চিন্তা আমরা খুব বেশী পড়িনি। পাণ্ডিত্য আমরা অনেক দেখেছি এবং সেই সঙ্গে পণ্ডশ্রমও। বুদ্ধিজীবী লেখক হলেও সরোজবাবুর লেখায় একটি স্বচ্ছ অন্তর-প্রবাহ চোখে পড়ে। তাঁর লেখনী মসৃণ, সাবলীল এবং সর্বচারী। উপভোগ এবং উপেক্ষা করতে সমান ক্ষমতা। মোট কথা তাঁর লেখাগুলি পড়তে পড়তে একটি ঘরোয়া মেজাজ, লাইব্রেরী ঘরের বললেই বোধহয় ভালো হয়, এবং পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্য এবং সাহিত্যিক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সরোজবাবু কিঞ্চিৎ একপেশে দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন। কোন বিশেষ একদল সমাজ সচেতন বাস্তব-বাদী কবি এবং লেখকই তাঁর চোখে পড়েছে, মনে ধরেছে। প্রকৃত কবিত্ব এবং সাহিত্য যে কেবলমাত্র তথাকথিত প্রগতিশীলতার মধ্যে এবং বিশেষ ধরনের জীবনাকাঙ্ক্ষার মধ্যেই সীমিত নয়, এবং তীব্র ঘোষণাই আন্তরিকতার লক্ষণ নয় একথা তিনি নিজেও কি ভালো করেই জানেন না? তবে 'বই-পড়া' একজন পাঠকের ব্যক্তিগত রুচি এবং আস্বাদন, সুতরাং এ বিষয়ে কিছু বলা বাহুল্য মাত্র।

এটিকে দ্বিতীয় সংস্করণ না বলে দ্বিতীয় এবং নতুন মুদ্রণ বলা যেতে পারে। সামান্য সংযোজন আছে, তবে সংস্করণ চোখে পড়ে না। হয়ত মত না বদলালে কবিতার মতই এই জাতীয় প্রবন্ধের কখনোই সংস্করণ হয় না।

রুচিবান পাঠক মাত্রেরই গ্রন্থটি ভালো লাগবে। ৮৩।৬১

আজ ও আগামীকাল—ডঃ সুব্রতেশ ঘোষ। শান্তি লাইব্রেরী; ১০-বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মূল্য আড়াই টাকা।

তেরোটি প্রবন্ধের ভিতর লেখকের রাজ-নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ-চিন্তার প্রতিফলন সুপরিস্ফুট। প্রবন্ধগুলি মৌলিকত্বের দাবি রাখে। সমকালীন যুগের মনন ও বীক্ষণকে বিধৃত করে লেখক তাঁর নিজের চিন্তার ছাপ রাখতে সমর্থ হয়েছেন। প্রবন্ধের মৌল সূত্র যদি হয় ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি, তবে একটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব এখানে অনুল্লেখিত নয়। সুতরাং সাহিত্য হিসেবেও এর আবেদন যথেষ্ট। সমাজ-বীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে লেখক ব্যক্তি জীবনের সংকট সমস্যাগুলিকে সন্ধানীর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রতিফলিত করতে সমর্থ হয়েছেন। সুতরাং ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে সাহিত্য সমালোচনা করার অভীপ্সা যাঁরা রাখেন তাঁদের এ বইখানি যথেষ্ট সাহায্য করবে। তবে লেখকের মতের সঙ্গে অনেকে একমত নাও হতে পারেন, কেননা সমাজ-চিন্তাও ব্যক্তিনির্ভর, বিশেষত এ যুগে। ৬৩।৬০

বিদেশী গ্রন্থ

Growth of the Soil by Knut Hamsun; Pan by Knut Hamsun; Rupa & Co., Calcutta 12, Rs. 5: and Rs. 2.

শিক্ষিত পাঠককুলের কাছে নুট হাম্-সুন্ এবং প্রাগুক্ত গ্রন্থদ্বয়ের নতুন পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। বিশ্বসাহিত্যের কতিপয় স্মরণীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে হামসুনের আসন সুনির্দিষ্ট। নরওয়ে দেশের সাহিত্যিক হ'লেও, সাধারণ মানুষের সহগামী হামসুনের জীবনবাদ একদা সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল; ফলত প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বসাহিত্যে তিনি বিপুলে

প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আরো স্মর্তব্য যে, রবীন্দ্রপরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যে যে পালাবদল ও নবজীবনের জোয়ার এসেছিলো, কল্লোল-গোত্রীয় সেইসব তরুণ, অধুনা প্রখ্যাত, সাহিত্যিকদের প্রেরণার মূলেও ছিল হামসুনের আদর্শ। হামসুন সম্পর্কে প্রধান কথা তিনি জীবনবাদী, অখণ্ড মানবতা ও সংগ্রামে বিশ্বাসী।

আলোচ্য উপন্যাস দু'টি বহুপঠিত, বাংলাভাষায় ইতিপূর্বে অনূদিতও হয়েছে। 'গ্রোথ্ অফ্ দি সয়েল' দীর্ঘায়তন; এবং নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত। এই উপন্যাসে পবিত্র মাটির কথা বর্ণিত, আইসাক্ এর প্রধান ও অবিস্মরণীয় চরিত্র; মাটি, মানুষ ও জন-জাগরণের কাহিনী। 'প্যান' অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র উপন্যাস; একটি সুন্দর প্রেমের কাহিনী। অরণ্য ও পর্বতবাসী এক শিকারী টোমাস গ্লাহুন্ ও এদ্ভারদা এর নায়ক-নায়িকা। বলা বাহুল্য, হামসুনের শক্তিমত্তার উদাহরণ প্রাচুর্যে উভয় গ্রন্থই অনবদ্য।

সুন্দর, সুমুদ্রিত এই উপন্যাস দু'টি সুলভ মূল্যে ভারতীয় পাঠকের হাতে পৌঁছে দেবার ভার নিয়ে রূপা কোম্পানী আমাদের ধন্যবাদভাজন হলেন। হামসুন-সাহিত্যের প্রয়োজনে গ্রন্থ দু'টি অবশ্যপাঠ্য।

৬৩২।৬০, ৬৩১।৬০

জীবনী

আচার্য যোগেশচন্দ্র—শ্রীসুখময় সরকার। প্রকাশিকাঃ শ্রীমতী লাবণ্য সরকার, কুলটি, বর্ধমান। মূল্য ১ টাকা ২৫ নয়াপয়সা।

আচার্য যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধির প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের খ্যাতি প্রায় কিংবদন্তীতে পর্যবসিত হতে চলেছে। তাঁর প্রাত্যহিক খুঁটিনাটি কাজের বিবরণের মধ্য দিয়েও যে একটি বৈজ্ঞানিক নিয়মানুবর্তিতা ও কাব্যিক ছন্দ ছিল তা সকলেরই জানা উচিত। তিনি কিভাবে বিরাট পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন কিংবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গোঁড়া প্রতিষ্ঠান কি কারণে শেষ পর্যন্ত নিজের সম্মান রক্ষার জন্য বিদ্যানিধির ঘরের ভেতর গিয়ে তাঁকে ডি লিট উপাধিতে ভূষিত করে এলেন—এর অতি সামান্য কথাই সাধারণ পাঠক জানেন।

উপরোক্ত গ্রন্থে শ্রীযুক্ত সরকার যোগেশচন্দ্রের জীবনী লিখেছেন স্বল্প পরিসরে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত না বিদ্যানিধির সম্যক জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে—ততদিন গোষ্পদে আকাশ দর্শন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই ভার জাতীয় সরকার কিংবা সরকার-পৃষ্ঠপোষিত কোনো প্রতিষ্ঠান স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করে একটি জাতীয় সম্পদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন। ৫৪৩।৫৯

বিবিধ

দি ফেডার্যালিস্ট পেপার্স—হ্যামিল্টন, ম্যাডিসন এবং জন জে। অনুবাদক: রেখা বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য ৩ টাকা ৫০ নয়া-পয়সা।

নিউইয়র্ক রাজ্যে নতুন সংবিধান নিয়ে যে তুমুল সমালোচনার সূত্রপাত হয়েছিল—তারি পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি যুক্তি এবং ব্যাখ্যার সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারায় সন্নিবেশিত হয়েছে। হয়তো এ দেশের পাঠক প্রবন্ধগুলির দ্বারা উপকৃত হতে পারে—সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থটির অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদ মোটামুটি মন্দ নয়। তবে যত্র তত্র মুদ্রণ প্রমাদ লক্ষ্য করা গেল।
২৯১।৬০

Humn Life In The Eternal Religion—Swami Yogananda, "Jayasree Niketan", 58 Kailash Bose Street, Calcutta-6. Bound Rs. 2.50 nP.

গ্রন্থটি ইংরেজিতে রচিত। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, হিন্দু সংস্কৃতি ও সনাতন ধর্ম এবং মানবজীবন। লেখক পৌরাণিক তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে চারি ভাগে বিভক্ত জাগতিক সমস্ত প্রাণীর যে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন তা যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনি প্রাঞ্জল। ঈশ্বর তত্ত্বের সহিত মাননীয় সদ্‌গুণের সম্পর্ক ও সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য লেখকের আকুল আকাঙ্ক্ষা ধর্মপিপাসুদের আকৃষ্ট করবে বলে মনে হয়।
৫৯৩।৬০

কল্পতরু শ্রীশ্রীচণ্ডী—শ্রীসুধীরচন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক অনুদিত। মহেশ লাইব্রেরী ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১·৫০ নয়া পয়সা।

চণ্ডীর গদ্যে এবং পদ্যে অনুবাদ। অনুবাদক সেনগুপ্ত মহাশয়ের গীতার পদানুবাদ ইতিপূর্বে জনসমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে। তাঁহার চণ্ডীর অনুবাদ পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিলাম। অনুবাদে মূলের ভাবের সহিত সর্বত্র সংগতি রক্ষিত হইয়াছে। ভাষা সহজ এবং সুন্দর।
৭।৬১

নিরুক্তম্—(দ্বিতীয় খণ্ড) অমরেশ্বর ঠাকুর এম এ, পি এইচ ডি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ) কর্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—৯্।

বৈদিক শব্দের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে নিরুক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বেদাচার্য যাস্কের নিরুক্তের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হওয়াতে আমরা সুখী হইলাম। কয়েকটি শব্দার্থে বাংলা অনুবাদ তৎসহ অন্বয়যুক্ত মন্তব্য প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানি বেদানুশীলনকারীদের সহায়ক হইবে, শুধু তাহাই নয়, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রানুসন্ধানকারীরা শব্দের গূঢ়ার্থ বিনির্ণয়ে আলোচ্য গ্রন্থ হইতে বিশেষ সাহায্য লাভ করিবেন। ছাপা, বাঁধাই সুন্দর।
১৬।৬১

প্রাপ্তি স্বীকার

বারো দীঘির রায় বাড়ি—
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য।

ব্রহ্মপুত্রের পারে—কল্যাণী ঘোষ।

অন্ধকারের বেদনা থেকে—
রবীন্দ্র অধিকারী।

আর-এস-পি'র কথা (জলাভাবের রূপরেখা)—ত্রিদিব চৌধুরী।

আমারি আঙিনা দিয়া—
সমরেশেখর মজুমদার।

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পূজা বিধি—
শ্রীমোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে যাত্রার শুরু হইতে আমরা বহুদূরে অগ্রসর হইয়াছি এবং আমাদিগকে আরও বহু দূরে পর্যন্ত অগ্রসর হইতে হইবে।—

"কিন্তু দূরে যাওয়ার বিপদ হলো পর্যাপ্ত যানবাহনের অভাব; আবার ওদিকে পথ হলো শ্বাপদসংকুল"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

ডাঃ রায়ের অন্য একটি ঘোষণা বা নির্দেশ—আমাদের স্বপ্নের বাংলা গড়িয়া তুলিতে হইবে। —"স্বপ্ন দিয়ে তৈরি এবং স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ভারত তো কতবারই দেখলাম, এইবার একটু ইট-সুরকি সিমেন্টের ইমারত হলেই ভালো হতো"—এই মন্তব্যটি শ্যামলালের।

লোকসভায় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর ঘোষণা হইতে জানা গেল যে গম চলাচল সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। —"এতদিনে গম্ ধাতুটা সত্যিকারের অর্থে সার্থক হলো"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

খাদ্যমন্ত্রী এক সভায় ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহারা যেন খাদ্যের ব্যবসায়ে অতিরিক্ত মুনাফা তুলিবার চেষ্টা না করেন; খাদ্য মানুষের প্রাণ, অন্য এক সহযাত্রী বলিয়াছেন—"শুনেছিলাম ধর্মের কাহিনী যারা শোনে না তাদের যেন কী একটা নাম আছে!!"

এক সংবাদে শুনিলাম যে, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর আগামী ১৯৬২ সালের মার্চ মাসের শেষে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। খুড়ো বলিলেন—"শুধু খাদপূরণে চরৈবতি হয়ে না থাকাই ভালো। তবে আশা করব দপ্তরের পুনর্বাসন ব্যবস্থা ১৯৬২ সালের আগেই যা হয় একটা কিছু হয়ে যাবে।"

শুনিলাম মার্কিন দেশের পেশাদার নাচিয়ে শ্রীহোলস্তেন কলিকাতা আসিয়াছেন এবং তিনি বাংলা দেশের নাচ

শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"কর্তায় হালার ভাই বললে আনন্দে গদগদ হয়ে আমরা যে নাচ নাচি অর্থাৎ সেই মর্কটকচ্ছ নাচ, এটি আর হোলস্তেনকে শিখতে হচ্ছেন না!!"

পশ্চিমবঙ্গে মশক ধ্বংসের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।—"খুব ভালো কথা। এখন
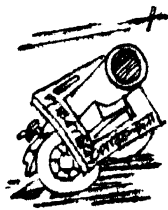
মশা না মেরে শুধু গালে চড় না হলেই বাঁচি—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

শ্রীনেহরু বলিয়াছেন ভারত দুঃসাহস দেখাইতে চায় না, তবে চীনের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত। খুড়ো বলিলেন—
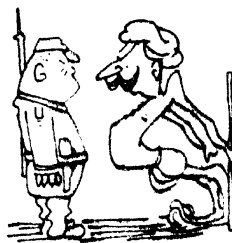
"সেই যে কবে পড়েছিলাম—দুঃসাহসে দুঃখ হয়, দুঃশীলের নিঃসংশয়!!"

সহকারী সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী নাকি জানাইয়াছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার সাতটি নদী বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন।—"আমাদের তের নদীর জন্য তেরটি বোর্ডেরই প্রয়োজন; আর ঐ সঙ্গে সাত সমুদ্রের জন্য সাতটি বোর্ড, বেতন বোর্ড সহ"—বলেন বিশু খুড়ো।

বলা হইয়াছে বাংলায় অনুবাদ সাহিত্য ততটা হয় নাই, যতটা হইয়াছে হিন্দীতে।—"শুধু যতটা ততটা নয়, এমন জোরাল অনুবাদও বাংলায় হয়নি, এই যেমন ধরুন 'বালুডাকিনী'"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

পাকিস্তানে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।—"হায়, হায়, এদিকে যে কত বিবিজান চলে জান লবেজান করি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

শহর কলিকাতাকে নানা রকম কোলাহলের দাপট হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা নাকি চলিতেছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু কোলাহলের তালিকায় দাম্পত্য গর্জন, ঘরে ঘরে পরিবার পরিকল্পনার অরণ্যে রোদন, পথে পথে নানা দাবির আস্ফালনও কি ধরা হয়েছে!!"

চন্দ্রশেখর

বিচার বিভ্রাট

এ বছরে যে সব ছবিকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে গুণের বিচারে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। অনেকের মতে, বাংলা দেশ থেকে যে তিনখানি ছবি আঞ্চলিক কমিটি কর্তৃক মনোনীত হয়েছিল তাদের ধারে-কাছে ঘেঁষবার যোগ্যতাও ১৯৬০ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে সম্মানিত "অনুরাধা"-র নেই। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের বহু পাঠক এবিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে পত্র লিখেছেন। কয়েকটি চিঠি আমরা প্রকাশ করেছি। সবগুলির স্থান সংকুলান হওয়া সম্ভব নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। কারণ সকলের বক্তব্যই প্রায় এক। গুণবিচারের কী সে মানদণ্ড যার ফলশ্রুতিতে এতখানি বৈপরীত্য সম্ভব—"ক্ষুধিত পাষাণ"-কে ডিঙিয়ে "অনুরাধা" শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পায়, "দেবী" ও "গঙ্গা"-র মত ছবি আঞ্চলিক কোঠার মধ্যে কোণঠাসা হয়ে থাকে, এবং তাদের অতিক্রম করে "দৈব পিরাবি"-র মত একটি অতি সাধারণ তামিল ছবি (যার হিন্দী সংস্করণ হচ্ছে "বিন্দিয়া") সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে তৃতীয় স্থান অধিকার করে—অধিকাংশেরই এই জিজ্ঞাসা।

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবির শিল্পোৎকর্ষ সম্বন্ধে বাদানুবাদ এইবারই প্রথম নয়। প্রতি বছরই কিছুসংখ্যক চিত্রামোদী তাঁদের নিজেদের পছন্দমত ছবি নির্বাচিত না হওয়ায় রুষ্ট হয়েছেন, বিচারকমণ্ডলীর পক্ষপাতিত্ব সম্বন্ধে প্রকাশ্যে ইঙ্গিত করেছেন এবং কেউ কেউ এমন সন্দেহও প্রকাশ করেছেন যে সবটাই আসলে এক সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের ফল।

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের নির্বাচন নিয়ে এবারকার অসন্তোষ আরো ব্যাপক, আরো গভীর। বিশেষ করে বাঙালী চিত্রপ্রিয়দের মধ্যে। সব দিক দিয়ে নিরেশ "অনুরাধা"-কে বাঙলা ছবি কটির ওপরে স্থান দেওয়ায় চিত্রামোদীদের একটি বৃহৎ অংশের ধারণা জন্মেছে যে বাংলার চিত্রশিল্পকে খর্ব করবার অভিসন্ধিপ্রসূত এই নির্বাচন। যেখানে সুবিচারের আশা নেই সেখানে প্রতিযোগিতা প্রহসনেরই নামান্তর। তাই অনেকেই বাংলার চিত্রনির্মাতাদের পরামর্শ দিয়েছেন ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রতিযোগিতায় যোগ না দিতে। সম্মিলিত প্রতিবাদ জানানোর এর চেয়ে ভাল উপায় আর কি থাকতে পারে?

আমরা নিজেরাও "অনুরাধা"কে ১৯৬০ সালের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বলে মনে করি না। "অনুরাধা" নিঃসন্দেহে একটি পরিচ্ছন্ন ছবি, সাধারণ হিন্দী ছবির তুলনায় এর শিল্পমান যথেষ্ট উন্নত। তবুও একে শ্রেষ্ঠ বলতে বাধে এই কারণে যে এর চেয়েও ভাল একাধিক হিন্দী ছবি গত বছরে বোম্বাইতেই তোলা হয়েছে। নির্বাচিত বাংলা ছবিগুলির সঙ্গে "অনুরাধা"-র তুলনা নাই বা করলুম।

কিন্তু তবুও বাংলা ছবির অনুরাগীরা রুষ্ট হয়ে আজ যে কথা বলছেন তাতে সমর্থন জানাতে পারছি না। তার কারণ বাংলা ছবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের এটাই প্রকৃষ্ট উপায় নয়। তাতে শুধু সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জনের পথই রুদ্ধ হবে না, ভারতের বাইরে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকেও বাংলা ছবিকে সরে দাঁড়াতে হবে। কারণ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের ভিত্তিতেই সাধারণত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ছবি পাঠানো হয়ে থাকে। এবং অধিকাংশ বিদেশী সরকারই রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলি সম্বন্ধেই আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন।

তাছাড়া বাংলার শিল্প-প্রচেষ্টাকে খর্ব করবার যে অভিযোগ কেউ কেউ উত্থাপন করেছেন তাও যুক্তিসহ নয়। এই অভিযোগ যদি সত্য হত তাহলে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর সবচেয়ে বেশীবার বাংলা ছবি রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করতে পারত না। নীচের তালিকাটিতে চোখ বুলোলেই একথার প্রমাণ পাওয়া যাবে:

১৯৫৩—"শ্যামচি আই" (মারাঠী),
১৯৫৪—"মির্জা গালিব" (হিন্দী),
১৯৫৫—"পথের পাঁচালী" (বাংলা)
১৯৫৬—"কাবুলিওয়ালা" (বাংলা),
১৯৫৭—"দো আঁখে বারা হাথ" (হিন্দী),
১৯৫৮—"সাগর সঙ্গমে" (বাংলা),
১৯৫৯—"অপুর সংসার" (বাংলা),
১৯৬০—"অনুরাধা" (হিন্দী),

তবু যে বিচার বিভ্রাট ঘটে—যেমন এবারে ঘটেছে—তার প্রধান কারণ যেভাবে এই প্রতিযোগিতা পরিচালনা করা হয় তার মূলে পদ্ধতি। কেন্দ্রীয় সরকার নিজের হাতে বিচারের ভার রাখেন নি, যদিও বিচারে নিয়মকানুন তাঁরাই বিধিবন্ধ করে দেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সরকার একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ঘোষণা করেন। সুতরাং এবিষয়ে সরকারী দায়িত্ব সীমিত।

কমিটিতে কারা থাকেন? এই বছরের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাতালিকা দেখলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। সভাদের নাম

"ক্ষুধিত পাষাণ"-এর অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পী রাধামোহন ভট্টাচার্য উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের হাত থেকে স্মারক উপহার গ্রহণ করছেন। নিউ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বিতরণী সভায় ছবিটি গৃহীত।

এখানে উল্লেখ করছিঃ (১) শ্রী সি বি নাগরকর, (২) শ্রীমতী রাণু মুখার্জি, (৩) শ্রী এম সত্যনারায়ণ, (৪) শ্রী এম এন কাপুর, (৫) শ্রীমতী ভায়োলেট আলভা, (৬) শ্রীরাধারমণ (৭) শ্রী আর ডি সিংহ দিনকর, (৮) শ্রীমতী মারাগাথম চন্দ্রশেখর, (৯) শ্রীমতী আম্মু স্বামীনাথন, (১০) শ্রী জে বি এইচ ওয়াদিয়া, (১১) শ্রীঅর্ধেন্দু মুখার্জি ও (১২) শ্রী এ এল শ্রীনিবাসন। কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন দিল্লি ইউনিভার্সিটির উপাচার্য শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত। এ'রা ছাড়াও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অভিজ্ঞ ১৫ জন সদস্যকে কমিটিভুক্ত করা হয়েছিল সেই সব ভাষার ছবিগুলি সম্বন্ধে সভ্যদের সাহায্য করতে। এই তালিকায় বাংলা ছাড়া আর সব ভাষাবিদেরই নাম আছে। তাহলে কি বুঝতে হবে কমিটির সকল সভ্যই বাংলা ভাষায় সমান ওয়াকিবহাল?

কমিটিতে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিনিধি হিসাবে বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজ এই তিনটি কেন্দ্রের তিনজন সভ্য আছেন। তাছাড়া আছেন পার্লামেন্টের সদস্য, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, ললিতকলার পৃষ্ঠপোষক ইত্যাদি। অথচ দেশের ও বিদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে যার যোগ নিবিড় এবং অবিচ্ছিন্ন সেই চিত্র সমালোচকের কোন স্থান হয়নি এই কমিটিতে।

বহুজনের সমাবেশ যখন কমিটিতে তখন ভোটের দ্বারাই ছবির নির্বাচন সমাধা করতে হয়। যাঁদের ভোটের ওপর ছবির শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তাঁরা ছবির গুণাগুণ বোঝেন কিনা সে প্রশ্ন না তুলেও একথা অনায়াসেই জিজ্ঞাসা করা যায় তাঁরা সব ছবি দেখেছেন তো? এবং দেখে থাকলে ঠিকমত বুঝেছেন তো? সভাপতিকে নিয়ে তেরো জনের কমিটিতে বাঙালীর সংখ্যা তো মাত্র তিন এবং কো-অপ্টেড সদস্যের তালিকাতেও কোন বাঙালীর নাম নেই। তাহলে বাংলা ছবির ভাষা না বুঝেই কি অবাঙালী সভ্যেরা ভোট দিয়েছিলেন ধরে নিতে হবে?

এই সব জটিলতা যতদিন থাকবে ততদিন এমনিধারা বিচার বিভ্রাট কেউ রোধ করতে পারবে না। কিন্তু এই জটিলতা দূর করা কি অসম্ভব? বাংলা দেশের ব্যাপক বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের প্রশ্নটি ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

চিত্রালোচনা

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে এবার নতুন ছবির মেলা। মুক্তি-তালিকায় পাঁচখানি ছবির নাম। বাংলায় দুখানি—শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের "অগ্নিসংস্কার" ও জনতা পিকচার্স এণ্ড থিয়েটার্সের "স্বরলিপি"। হিন্দী ছবির সংখ্যা তিন—প্রসাদ প্রোডাকশন্সের "শশুরাল" ভি এম মুভিজের "লম্বে হাত", এবং নটরাজা প্রোডাকশন্সের "ফার্স্ট লভ"। শেষোক্ত ছবিটি আবার কেবলমাত্র বয়স্কদের জন্য।

এবারকার ছবিগুলির মধ্যে কয়েক বিষয়ে অসামান্য সাদৃশ্য। যেমন ধরুন, সুপ্রিয়া চৌধুরী "অগ্নি সংস্কার" ও "স্বরলিপি" দুটি ছবিরই নায়িকা। অনিল চট্টোপাধ্যায়

দুটি ছবিতেই দুটি মুখ্য চরিত্রে রূপদান করেছেন। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গানে এবং হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের সুরে দুটি ছবিই সমৃদ্ধ।

ছবি দুটির অবশ্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অভাব নেই। "অগ্নি সংস্কার"-এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন বিনয় চট্টোপাধ্যায়। সুতরাং নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের প্রাচুর্য অনায়াসেই আশা করা যায়। নায়কের ভূমিকায় আছেন উত্তমকুমার। তাঁর সহ-শিল্পীদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অগ্রদূত গোষ্ঠী পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন।

"স্বরলিপি"-র চিত্রনাট্য লিখেছেন এবং পরিচালনা করেছেন অসিত সেন। এক চিত্রশিল্পী ও এক সংগীত-সাধিকাকে ঘিরে এর গল্প। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এ ছবির নায়ক। অন্যান্য চরিত্রে চিত্রাবতরণ করেছেন সুরুচি সেনগুপ্তা, শ্যাম লাহা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়চৌধুরী, চিত্রা মণ্ডল প্রভৃতি।

দুটি ছবির মধ্যে আরো দুটি মিল উল্লেখযোগ্য। দুটি বিশিষ্ট পরিবেশক সংস্থা প্রযোজনার ক্ষেত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করছেন এই ছবি দুটির মাধ্যমে। অগ্রদূত এবং অসিত সেন প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করেন কলাকুশলী হিসাবে, তারপর তাঁদের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হয় পরিচালনার ক্ষেত্রে।

• • •

"লম্বে হাত" ও "ফার্স্ট লভ" এই দুটি ছবিতেও একই তারকা জুটিকে দেখা যাবে। তাঁরা হলেন মেহমুদ ও নাজ। এছাড়া, অন্য মিল অবশ্য বিশেষ কিছু নেই ছবি-দুটির মধ্যে। অবশ্য কাহিনীর বিন্যাসে হিন্দী চিত্রসুলভ নাচগান ও প্রণয়-চাপল্যের একই ধরনের বাড়াবাড়ি যে থাকবে সেকথা ছবি না দেখেও অনায়াসে বলা চলে।

"লম্বে হাত"-এর পরিচালক কৃষণ মালিক। ডেজি ইরাণী, নাজি ও জগদীশ শেঠী এর অন্যান্য মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করেছেন। জি এস কোহলি সুরকারের দায়িত্ব পালন করেছেন।

এক মুষ্টিযোদ্ধার প্রেমকে কেন্দ্র করে "ফার্স্ট লভ"-এর কাহিনী। তারকা-জুটি বাদে এর ভূমিকালিপিতে আছেন প্রীতি-বালা, অমর, রাজ মেহরা ও বৈজ শর্মা। বেদ ও মদনের যুগ্ম প্রযোজনা ও পরি-চালনায় ছবিটি তোলা হয়েছে। দত্তারাম সুর যোজনা করেছেন।

একটি জনপ্রিয় তেলেগু ছবি "শশুরাল"-এর আখ্যান-অবলম্বন। এল ভি প্রসাদের প্রযোজনায় এবং টি প্রকাশ রাও-এর পরি-চালনায় ছবিটি মাদ্রাজে তোলা হয়েছে। এ ছবিতেও মেহমুদ আছেন, তবে পার্শ্ব-চরিত্রে। প্রধান শিল্পীদের মধ্যে রাজেন্দ্র-কুমার, সরোজা দেবী, শুভা খোটে, আনোয়ার হুসেন, ওয়াস্তি, ধুমল, ললিতা পাওয়ার, বিপিন গুপ্ত, রণধীর ও জয়শ্রী গদকার-এর নাম উল্লেখযোগ্য। শংকর ও জয়কিষণ এই ছবিতে সুরারোপ করেছেন।

• • •

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবের প্রাক্কালে রবীন্দ্র কাহিনীর যে চিত্ররূপটি দেখবার

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের "অগ্নি-সংস্কার"-এর একটি দৃশ্যে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার।

জন্যে সবাই উদ্‌গ্রীব, সত্যজিৎ রায় প্রযোজিত ও পরিচালিত সেই "তিন কন্যা"-র মুক্তি নির্ধারিত হয়েছে আগামী ৫ই মে। "পোস্টমাস্টার", "মণিহারা" ও "সমাপ্তি"—রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি বিখ্যাত ছোট গল্প নিয়ে সত্যজিৎ রচনা করেছেন তাঁর "তিন কন্যা"। তিনটি গল্পেরই নায়িকা চরিত্রে যাঁদের দেখা যাবে ছবির জগতে তাঁরা নবাগতা—চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার ও অপর্ণা দাশগুপ্ত। অন্যান্য মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সীতা দেবী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে প্রভৃতি। "তিন কন্যা"-র সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—সত্যজিৎ রায় একাধারে এর প্রযোজক, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার ও সুরকার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে পরিচালক দেবকীকুমার বসু রবীন্দ্রনাথের "পূজারিণী", "অভিসার", "পুরাতন ভৃত্য" ও "দুই বিঘা জমী" এই চারটি কবিতার চলচ্চিত্রায়ণও সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। এই চিত্র-চতুষ্টয়ও রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের বিশিষ্ট আকর্ষণ। নৃত্যপটিয়সী মঞ্জুশ্রী চাকী (বর্তমানে সরকার) "পূজারিণী"-র প্রধান শিল্পী। দ্বিজু ভাওয়াল ও সন্ধ্যা রায় "অভিসার"-এর নায়ক-নায়িকা। "পুরাতন ভৃত্যে" অংশ গ্রহণ করেছেন অনুপকুমার, অমর গাঙ্গুলী ও অনিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। "দুই বিঘা জমী" সমৃদ্ধ হয়েছে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতির অভিনয়কুশলতায়। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, শ্যামল মিত্র প্রভৃতির কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত ছবিগুলির বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে।

সত্যজিৎ রায়ের প্রযোজনা ও পরিচালনায় ভারত সরকার রবীন্দ্রনাথের যে জীবনী-চিত্র তুলেছেন সেটিও কলকাতা ও বাংলার অন্যান্য শহরে পুরোপুরি দেখাবার ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে। ৫ই মে যে সপ্তাহের শুরু সেই সপ্তাহেই এটিও মুক্তিলাভ করবে।

• • •

প্রযোজক-পরিচালক ঋত্বিককুমার ঘটক জানিয়েছেন যে, বহুদিন বাদে স্বনামধন্য শিল্পী উদয়শংকর আবার চলচ্চিত্র প্রযোজনায় উদ্যোগী হয়েছেন। প্রেম ও আত্মত্যাগের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোন একটি বিখ্যাত বাংলা লোকগাথা হবে ছবিটির বিষয়বস্তু। উদয়শংকর ও ঋত্বিক ঘটকের যুগ্ম-প্রযোজনায় ছবিটি তোলা হবে এবং শ্রী ঘটক চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব বহন করবেন। শ্রী ঘটক মনে করেন যে, লোকগাথাটির বাস্তব ও কল্পনার দোলায়িত ছন্দ নৃত্য ও চিত্রশিল্পের নতুন দিক খুলে দেবার অবকাশ সৃষ্টি করবে।

কাহিনীর পটভূমি পূর্ববাংলা। তাই চেষ্টা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলার যৌথ প্রচেষ্টা হিসাবে ছবিটি তোলবার। আলোচনার স্তর পেরিয়ে আগামী বর্ষার মধ্যেই ছবিটির কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়।

আর একটি নতুন ছবির খবরে চিত্রামোদীরা উৎসাহিত হবেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের একটি দুঃসাহসিক কাহিনী অবলম্বনে পশ্চিমবঙ্গ শিশুচিত্র সমিতি ছোটদের উপযোগী একটি ছবি তুলতে ব্রতী হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত উক্ত প্রতিষ্ঠানের এইটিই প্রথম প্রয়াস। আগামী মে মাসের মধ্যেই ছবিটি সম্পূর্ণ হবে এবং ছোটদের জন্যে তোলা হলেও ছবিটি দেখে বড়রাও আনন্দ পাবেন—ছবির নির্মাতারা এই আশ্বাস দিয়েছেন। সিটিজ সিনেমা ক্যালকাটা-র প্রযোজনায় ছবিটি তোলা হচ্ছে।

নাট্যাভিনয়

গন্ধর্ব প্রযোজিত নাট্যোৎসব

শৌখিন নাট্যগোষ্ঠীগুলির মধ্যে গন্ধর্ব নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। তাঁরা এই মাস থেকে প্রতি মাসে দুটি করে একাঙ্ক নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে একটি নবনাট্য উৎসবের সূচনা করেছেন।

এই উপলক্ষে গন্ধর্ব যে বিবৃতি প্রচার করেছেন তাতে এই নবনাট্য উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, শৌখিন নাট্যগোষ্ঠীগুলি প্রতিষ্ঠালাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন দর্শকগোষ্ঠী

জন্মগ্রহণ করছে। ফলে নবনাট্য আন্দোলনের উন্মাদনার দিন কেটে গেছে, এখন তার 'ক্রিয়েটিভ' হবার সময় এসেছে। চোখ-ধাঁধানো উত্তেজনার হাতে খেলার পুতুল না সেজে নবনাট্য আন্দোলনের কর্মীরা আজ চাচ্ছেন জীবনকে ব্যাপক আবেগে এবং ব্যাপকতর বৈচিত্র্যের মধ্যে আলিঙ্গন করতে। গন্ধর্বের নবনাট্য উৎসবের মৌলিক প্রেরণা এই সংস্কারবিহীন জীবনাভিমুখীনতা।

এই বিবৃতিতে গন্ধর্ব আরো বলেছেন, "ট্র্যাডিশনকে বাদ দিয়ে জীবনের সঙ্গে যোগহীন উৎকর্ষ পরীক্ষামূলক নাটক করার মোহ আমাদের নেই। বাংলা নাটকের মৌল সুরের সঙ্গেই নবতর বুদ্ধিবাদী তথা জীবনবাদী নাটক সৃষ্টি করাকেই আমরা অভিষ্ট মেনেছি।"

ছটি নাট্যানুষ্ঠানে এ'রা মোট বারোটি একাঙ্ক নাটক পরিবেশন করবেন। ছ' মাস মিনার্ভা থিয়েটারে এই উৎসবের আসর বসবে। তারিখ ও অন্যান্য বিবরণ নীচে দেওয়া হলঃ

১৬ই এপ্রিল—অতনু সর্বাধিকারী রচিত "অন্য স্বর" ও কৃষ্ণ ধরের "এক রাত্রির জন্য"।

১৪ই মে—গিরিশংকর প্রণীত "রক্ত-করবীর পরে" ও অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের "সন্ধ্যার রঙ"।

১১ই জুন—সুরঞ্জন মিত্রের "নেপথ্য দর্শন" ও চিত্তরঞ্জন ঘোষ লিখিত "দেবরাজের মৃত্যু"।

৯ই জুলাই—রাম বসু রচিত "নীলকণ্ঠ" ও মনোজ মিত্রের "পাখির চোখ"।

১৩ই আগস্ট—কুমারলাল দাশগুপ্তের "যন্ত্রমানব" ও অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের "সূর্যের মত সমুদ্র"।

১০ই সেপ্টেম্বর—ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় বিরচিত "একচক্ষু" ও মমতা চট্টোপাধ্যায়ের "উড়ো পাখির ছায়া"।

সকাল দশটায় প্রতিদিনের নাট্যানুষ্ঠান আরম্ভ হবে।

অনুষ্ঠান সংবাদ

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বৈতান সংস্কৃতি পরিষদ মহাজাতি সদনে ১০ই থেকে ১২ই এপ্রিল পর্যন্ত তিনদিন-ব্যাপী নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। "জীবিত ও মৃত", "তাসের দেশ" ও "খেলার সাথী"—এই তিনটি বিখ্যাত রবীন্দ্র রচনা অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়।

হরিণঘাটা ফার্ম শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে গত ৩রা এপ্রিল স্থানীয় কৃষি-কলেজে মহাসমারোহে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। নৃত্যশিল্পী নীরেন্দ্র-নাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ছাত্রীবৃন্দ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সঙ্গে "নৃত্যবিচিত্রা" ও "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন।

দক্ষিণ শহরতলীর নবগঠিত সংস্থা 'ভরত সেনা' রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে কবিগুরুর "পোস্টমাস্টার", "ঠাকুর্দা", "ক্ষুধিত পাষাণ", "বাঁশি" এবং "শুভা" মঞ্চস্থ করবার সংকল্প গ্রহণ করেছেন।

গত ৮ই এপ্রিল রামমোহন লাইব্রেরী ভবনে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের "বসন্ত-গীতি-বিচিত্রা" পরিবেশন করেন।

জনতা পিকচার্স এন্ড থিয়েটার্সের "স্বরলিপি"-র দুই মুখ্য শিল্পী সুপ্রিয়া চৌধুরী ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

পার্থপ্রতিম চৌধুরীর রহস্যনাটক "ফিঙ্গার প্রিণ্ট" সুন্দরম্ নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক আগামী ১৯শে এপ্রিল সন্ধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হবে। নাট্যকার নিজে নির্দেশনার ভার গ্রহণ করেছেন।

সুখ্যাত সাংস্কৃতিক নাট্যসংস্থা শিল্পশ্রী গত ২৬শে মার্চ ১বি, দেওদার স্ট্রীটে "ক্ষত্রবীর" যাত্রাভিনয় করেন। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকের ভিত্তিতে শৈলেন দে রচিত এই যাত্রানাট্যের বিষয়বস্তু কর্ণ-উপাখ্যান। অভিনয়ে যাঁরা দর্শকদের মন জয় করেন তাঁদের মধ্যে শৈলেন দে (কর্ণ), চিত্রা মণ্ডল (রোহিণী) ও কার্তিক মুখোপাধ্যায় (শকুনি) সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

যাত্রানাট্যটি পরিচালনা করেন সুধামাধব চট্টোপাধ্যায় এবং সংগীত পরিচালনায় ছিলেন সতীশ সরকার।

গত ৩১শে মার্চ "দি হাউস"-এর বসন্ত উৎসব স্বকীয় শিল্প বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, নিখিল সেন, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানব মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, পান্নালাল ভট্টাচার্য, জহর রায়, নিখিল চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রভা সরকার, সুচিত্রা মিত্র, উৎপলা সেন, সুপ্রীতি ঘোষ, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মলা মিশ্র বাণী দাশগুপ্ত প্রভৃতির যোগদানে উৎসবটি সর্বাংগীন সাফল্য লাভ করে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শৈলেন্দ্র স্মৃতি সংগীত বিদ্যালয়

শৈলেন্দ্র স্মৃতি সংগীত বিদ্যালয়-এর একাদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে গত ৬ই ও ৭ই এপ্রিল মহাজাতি সদনে দু'দিনব্যাপী মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সুরকার ভি বালসারা। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পংকজকুমার মল্লিক এবং বিদ্যালয়ের সফলকাম ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন বর্ধমানের মহারাণী অধিরাণী।

চৌত্রিশজন শিল্পী সহযোগে "শিল্পী পরিচয়" নামে একটি সংগীতানুষ্ঠান দিয়ে প্রথম দিনের অধিবেশন শুরু হয়। এই সংগীতানুষ্ঠান পরিচালনা করেন ভি বালসারা। সমবেত একর্ডিয়ান ও গীটারের (পঁচিশটি করে) যন্ত্রসংগীত উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে একক ও সমবেত কণ্ঠ-সংগীতে অংশগ্রহণ করেন চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, ধুম্রাওয়াজ, মলয় মুখোপাধ্যায়, সৌরেন পাল ও সুষমা সিংহ। যোগেশ দত্ত'র "সীতা-হনুমান" মূকাভিনয় দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতিকবিতার ভিত্তিতে গানের ভেতর দিয়ে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ জ্ঞাপন করেন "সাজ-ও-আওয়াজ" নামে শিল্পীদল। এই গীতানুষ্ঠান পরিচালনা করেন বিমান ঘোষ। "সাজ-ও-আওয়াজ"-এর অন্যান্য গীতানুষ্ঠান এবং "মানুষ ও প্রকৃতি" নামে একটি রূপক সংগীতানুষ্ঠান দর্শকদের তৃপ্তি দেয়।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে "ঋতুরাজ", "চিত্রাংগদা" ও "বাসন্তিকা" নৃত্যনাট্য দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। এই নৃত্যনাট্যানুষ্ঠানগুলিতে বিদ্যালয়ের শিশু-শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে। তাদের নৃত্যাংশ খুবই উপভোগ্য হয়।

একলব্য

কলকাতার সাউথ ক্লাবে আয়োজিত ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেনিস টেস্ট খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে। তিনদিনব্যাপী এই খেলার প্রথম দিনের দুটি সিঙ্গলসের মধ্যে দুই দেশ একটি করে খেলায় বিজয়ী হয়। দ্বিতীয় দিন ডাবলসের খেলায় অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী হয়ে ২—১ খেলায় এগিয়ে থাকে। তৃতীয় দিনের দুটি সিঙ্গলসের প্রথম সিঙ্গলসে জয়ী হয় ভারত, ফলাফল থাকে ২—২। শেষ সিঙ্গলটি উপযুক্ত আলোকের অভাবে আর শেষ হয় না। অস্ট্রেলিয়া দুটি সেট পাবার পর তৃতীয় সেটটি ৯—৯ গেমে সমান সমান থাকবার সময় খেলার উপর যবনিকা পড়ে। নৈতিক দিক দিয়ে বিচার করলে এ টেস্ট অস্ট্রেলিয়াকে বিজয়ী বলে ধরা যায়। কারণ জয়পরাজয়ের নির্ণয়সূচক শেষ খেলাটি ছিল অস্ট্রেলিয়ারই অনুকূলে। তবে টেনিস সম্পর্কে আগে থাকতে কিছু বলা শক্ত। বিশেষ করে যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। শেষ খেলাটিতে ভারত শ্রেষ্ঠ আর কৃষ্ণন বব হিউইটকে পরাজিত করতে পারতেন না এ কথাই বা বলি কি করে? যাক সে কথা। খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থাকায় দুই দেশেরই সম্মান বজায় রয়েছে এবং দিল্লী ও মাদ্রাজের পরের দুটি টেস্টের আকর্ষণও বেড়েছে বহু পরিমাণে।

আগের সপ্তাহেই বলেছি সফরকারী অস্ট্রেলিয়ার টেনিস খেলোয়াড়রা বয়সে তরুণ। ৪ জনই অস্ট্রেলিয়ার উঠতি খেলোয়াড়। অবশ্য এদের মধ্যে বব হিউইট আন্তর্জাতিক টেনিস ক্ষেত্রে সুপরিচিত। বাকী তিনজন ফ্রেড স্টোলী, নিউকম্ব ও কেন ফ্লেচার আগামী দিনের আশা ভরসা। এরা শুধু ভারতের সঙ্গেই খেলতে আসেননি—অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য সারা টেনিস বিশ্ব সফর করাই এদের উদ্দেশ্য। উইম্বলডনের পর এদের শেষ গন্তব্যস্থল আমেরিকা।

যাই হক, অস্ট্রেলিয়ার ৪ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে নিউ কম্ব ও ফ্লেচার টেস্টের কোন খেলায় অংশ গ্রহণ করেননি। বব হিউইট ও ফ্রেড স্টোলী ভারতীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন রমানাথন কৃষ্ণন, জয়দীপ মুখার্জি ও প্রেমজিৎ লাল।

প্রথম দিন বব হিউইট ভারতের জয়দীপ মুখার্জিকে ৬-৪, ৬-২ ও ৬-২ গেমে পরাজিত করেন। আর কৃষ্ণন পরাজিত করেন ফ্রেড স্টোলীকে ৬-২, ৪-৬, ২-৬, ৬-৩ ও ৬-২ গেমে। দ্বিতীয় দিন ডাবলসের খেলায় কৃষ্ণন ও প্রেমজিৎলালকে অস্ট্রেলিয়ার হিউইট ও স্টোলীর কাছে ৬-৮, ২-৬, ৬-১ ও ৬-৮ গেমে হার স্বীকার করতে হয়। তৃতীয় দিন জয়দীপ মুখার্জি স্টোলীকে পরাজিত করেন ৪-৬, ৬-৩, ৭-৫ ও ৬-১ গেমে। হিউইট ও কৃষ্ণনের শেষ খেলাটিতে হিউইট ৬-৪ ও ৬-৪ গেমে দুটি সেট পাবার পর ৯-৯ গেমে তৃতীয় সেট অমীমাংসিত থাকে এবং আলোর অভাবে খেলার উ
যবনিকা পড়ে।

এখন খেলার কথা—অস্ট্রেলিয়ার ৪ ন
খেলোয়াড় বব হিউইট উন্নত টে
নৈপুণ্যের অধিকারী। সার্ভিস খ
জোরালো, কোর্টে রীতিমত ফাস্ট, হাতে
রকমের মার আছে, 'সবগুলি' দর্শক চো
আনন্দদায়ক। তাই দীর্ঘকান্তি হিউ
স্ট্রেট সেটে ভারতের তরুণ খেলো
জয়দীপকে পরাজিত করতে কোন
পান না। অনায়াস ভঙ্গীতে খেলেই তি
বিজয়ী হন। অবশ্য জয়দীপের তুল
হিউইটের অনায়াস জয়লাভের অন
কারণ। প্রথম, জয়দীপের সার্ভিসে
কম। সার্ভিস ফেরানো কষ্টসাধ্য
দ্বিতীয়, সার্ভিস করেই জয়দীপ এ
যেতে চেষ্টা করায় হিউইটের পক্ষে
মারের সাহায্যের তাকে এ
পয়েন্ট পেতে বিশেষ
পেতে হয় না। হিউইট ভারত
কৃষ্ণনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও
টেনিস নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। এখা
টেনিস বিশেষজ্ঞদের ধারণা ভারতে
পর্যন্ত যত এমেচার খেলোয়াড় খেলে গে
বব হিউইট তাদের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের স
তুলনীয়।

অস্ট্রেলিয়ার টেনিস ক্রমপর্যায়
খেলোয়াড় ফ্রেড স্টোলীর এতদিন কোন
ছিল না। তবে অস্ট্রেলিয়া দলের ম্যা
আলফ সেড বলেছেন এবার নাকি
ক্রমপর্যায় তালিকায় পঞ্চম স্থান
করবেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে
অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্টোলী
খেলায় প্রভূত উন্নতি করেছেন।
খেলাতেও এর প্রমাণ পাওয়া গেছে।

কলকাতার সাউথ ক্লাবে আয়োজিত ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেনিস টেস্টে দুই দেশের ডাবলস খেলার দৃশ্য। ভারতের আর কৃষ্ণন ও প্রেমজিৎ লালের সঙ্গে খেলছেন অস্ট্রেলিয়ার বব হিউইট ও ফ্রেড স্টোলী

ভারত সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের ৪ জন টেনিস খেলোয়াড়। বাঁদিক থেকে—কেন ফ্লেচার, ফ্রেড স্টোলী, বব হিউইট, আলক সেড (ম্যানেজার) ও জন নিউকম্ব

...ক্রুকনের মত খেলোয়াড় স্টোলীকে ...সেটে তো হারাতে পারেননি, হারতে ...বেঁচে গেছেনও বলা যায়। 'পাওয়ার' ...যাকে বলে ফ্রেড স্টোলী সেই টেনিস ...ছাত্র। ছাত্র বললে অবশ্য তাকে ছোট ...। বয়সে অবশ্য ছাত্র কিন্তু অধিগত ...প্রায় সিদ্ধ হস্ত। অধ্যয়নের পাঠ ...শেষ করে ফেলেছেন। এখন ...বিদ্যার প্রয়োগ।

...ফ্রেড স্টোলীর সার্ভিস ...কাঁপানো। অসম্ভব জোরালো ...। এ সার্ভিসে 'ফল্ট' অবশ্যম্ভাবী। ...ফল্টও কম হয় না। কিন্তু তার জন্য ...ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি একটুও ...হন না। তিনি জানেন সার্ভিস ...হলে তা ফেরানো অত্যন্ত কষ্টকর। ...ক্রুকনের সংগে প্রথম দিনের খেলায় ...প্রথম সেটটি ভাল খেলতে পারেননি। ...যেভাবে খেলে ক্রুকনের কাছ থেকে ...দুটি সেট নিয়েছেন তা অশেষ ...দাবি রাখে। ক্রুকনকে স্টোলীর ...সার্ভিস ফেরাতে হিমসিম খেয়ে উঠতে ...।

...দিন স্টোলী অবশ্য জয়দীপের ...হার স্বীকার করেছেন। টেনিস ...অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাবিত পাঁচ নম্বর ...খেলোয়াড় স্টোলীকে পরাজিত করার এই ...জয়দীপের উঠতি টেনিস জীবনের ...কৃতিত্বপূর্ণ ঘটনা সন্দেহ নেই। তবু ...এ খেলার ফলাফল দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর ...দক্ষতার প্রকৃত পরিচয় নয়। অত্যধিক ...মধ্যে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা দেশের ...খেলোয়াড় স্টোলী নিজ নৈপুণ্যের পরিচয় ...পারেননি। অপরদিকে তরুণ জয়দীপ ...অনেক উন্নত ধরনের টেনিস। ...স্টোলীর যে সার্ভিস ফেরাতে হিমসিম ...উঠেছেন সেই সার্ভিসই জয়দীপ ফিরিয়েছেন সহজ লাবণ্যে। ভাল খেলোয়াড়ের সংগে খেলে অল্প সময়ের মধ্যে কতখানি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যায় জয়দীপ তার প্রমাণ দিয়েছেন। তবে জয়দীপকে এগিয়ে যেতে হলে তাকে ভাল খেলোয়াড়ের সংগে খেলে অনুশীলন করতে হবে।

ক্রুকনের খেলা দেখে মনে হয় অনুশীলনের তারও যথেষ্ট প্রয়োজন। তবে দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বীর সংগে অনুশীলনে বিশেষ ফল হবে না। ডেভিস কাপে এবং উইম্বলডনে খেলে সুনাম অর্জন করতে হলে সমকক্ষ অপেক্ষাকৃত উন্নত নৈপুণ্যের অধিকারীর সংগেই তাকে খেলে খেলে হাত পাকাতে হবে। এলেক্স অলমেডো যখন এমেচার টেনিসে গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে ছিলেন তখন তাকে দুইবার ক্রুকনের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের সংগে ক্রুকনের খেলা দেখে মনে হল আগের ক্রুকনের সংগে এখনকার ক্রুকনের অনেক পার্থক্য।

• • • •

কলকাতা ফুটবল লীগের পুনর্গঠন সম্পর্কে নতুন প্রস্তাবের কথা শুনে ফুটবল রসিক এক বন্ধু বলছিলেন—'মরেও না মরে রাবণ এ কেমন অরি'? তাঁর এ কথা বলার অর্থ ফুটবল লীগে ১৫টি ক্লাবের বদলে তার সংগে আর ৫টি অযোগ্য ক্লাবকে জুড়ে দিয়ে মোট ২০টি ক্লাব নিয়ে প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগকে ঢেলে সাজবার যে প্রস্তাব আই এফ এর সভায় বাতিল হয়ে গিয়েছিল সেই প্রস্তাবই আবার নতুন করে তোলা হয়েছে। শুধু এ বছর নয়, বহুদিন থেকেই প্রথম ডিভিশনে কয়েকটি দুর্বল টিমের অবস্থান কায়েম করবার জন্য এই প্রস্তাব মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আবার দু' চারটি বড় ক্লাবের বিরোধিতায় ধামা চাপা পড়ে যায়। আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। প্রস্তাব মরে না। মরবে কি করে? কারণ রাবণরা তো সহজে মরে না। যুগে যুগে তাদের দেখা পওয়া যায়। ত্রেতা যুগের রাবণ, দ্বাপর যুগের কংস, কলির জগাই-মাধাই চিরদিনই ন্যায়কে অন্যায় এবং হিতকে অহিত বলে চালিয়ে এসেছে। আমাদের ফুটবলের জগাই মাধাইরাও বর্তমান ব্যবস্থার বদলে এমন এক ব্যবস্থা কায়েম করতে চাইছেন যা ফুটবলের উন্নতির পরিপন্থী। সংকীর্ণ বুদ্ধি, উৎকট ক্ষমতা সচেতন পরিচালকগোষ্ঠী চাপিয়া বসিলে যে অবস্থা হয়, আজ আমাদের ফুটবলেরও সেই অবস্থা।

কলকাতার ফুটবল খেলা সম্বন্ধে যাদের কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সবাই জানেন প্রথম ডিভিশনের ১৫টি ক্লাবের মধ্যে তিন চারটি, বড় জোর পাঁচ-ছয়টি ক্লাবের ক্রীড়ামান উচ্চস্তরের; বাকী সমস্ত ক্লাবের ক্রীড়ামান অতি সাধারণ পর্যায়ের। অবশ্য বড় ক্লাবের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছোট ক্লাব সময় সময় দৃঢ়তার পরিচয় না দেয়, এমন নয়। অনেক সময় অপ্রত্যাশিত ফলাফলও চোখে পড়ে। কিন্তু ক্রীড়ামানের মধ্যে থাকে বিপুল পার্থক্য। হয়তো দেখা যায়, শক্তিশালী ক্লাব শক্তিহীন ক্লাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করে একটানা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আংশিক দুর্ভাগ্য এবং আংশিক দুর্বল শুটিংয়ের জন্য কোন গোল করতে পারছে না, অপরদিকে দু' তিনটি আক্রমণ থেকে প্রতিপক্ষ একটি গোল করে বসেছে। এটা খেলার গুণাগুণ বিচারের আসল মাপকাঠি নয়। এ থেকে খেলার আনন্দও উপভোগ করা যায় না। খেলার আনন্দ উপভোগ করা যায় যোগ্যের সংগে যোগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে খেলোয়াড়ের নৈপুণ্য যাচাই হয়—খেলোয়াড় যত্নশীল হয় তার খেলাকে আরও সুন্দর আরও উন্নত করতে। তাই যোগ্যের সংগে অযোগ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমাবার জন্য যখন প্রথম ডিভিশন থেকে দলের সংখ্যা কমানোর দরকার সেই সময় দলের সংখ্যা বাড়াবার প্রস্তাব আসছে। এর চেয়ে আর আশ্চর্যের কি হতে পারে?

শুধু কি তাই? সবারই জানা আছে কয়েকটি শক্তিহীন দুর্বল টিমকে প্রথম ডিভিশনে টিকিয়া রাখবার জন্য নানা ছল করে লীগ খেলা থেকে তিন বছরের জন্য ওঠানামা অর্থাৎ 'প্রোমোশন রেলিগেশনের বিধান উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রোমোশন রেলিগেশন রহিত এবং রাহুগ্রস্থ লীগ খেলার' তিন বছর কেটে গেছে। এবার লীগের রাহুমুক্ত হবার কথা। কিন্তু লীগ থেকে আবার প্রোমোশন রেলিগশনের বিধান উঠিয়ে দেবার জন্য চেষ্টার অন্ত নেই। একই প্রস্তাবের দুটি অংশ। একটি লীগের প্রথম

ডিভিসনে দলের সংখ্যা ২০ করে তাকে দুই ভাগে ভাগ করে দু'টি গ্রুপে ফিরতি খেলার ব্যবস্থাশূন্য লীগ খেলা পরিচালনা করতে হবে। অপরটি লীগ থেকে প্রোমোশন রেলিগেশনের বিধান উঠে যাবে। আই এফ এ এখন কায়েমী স্বার্থান্বেষী যে সমস্ত সদস্যের কুক্ষিগত তারা ইচ্ছে করলে দু'টি প্রস্তাবই পাশ করে নিতে পারেন। আবার প্রয়োজন বোধে একটিও পাশ করতে পারেন। বাধা দেবার কেউ নেই। তবে এ ব্যবস্থা দু'টি বড় ক্লাব মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের অভিপ্রেত নয় বলেই এতদিন প্রস্তাবটি আটকে আছে। হয়তো এবারও আটকে থাকবে। কিন্তু প্রোমোশন রেলিগেশনের বিধান আবার নাকচ হতে পারে। একবার তো লীগ খেলা আরম্ভ হয়ে যাবার পর লীগ থেকে প্রোমোশন রেলিগেশনের ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

লীগে প্রোমোশন রেলিগেশনের বিধান না থাকা ফুটবল খেলার উন্নতির পক্ষে যে কতখানি ক্ষতিকর আশা করি তা বুঝিয়ে বলতে হবে না। এক চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের আকর্ষণ ছাড়া এ খেলার কোন আকর্ষণ থাকে না। খেলোয়াড়দের থাকে না ভাল খেলার বা প্রাণপণ সংগ্রাম করার আন্তরিকতা; উত্তাপবিহীন নীচের দিকের খেলা প্রায় ছেলে খেলায় পরিণত হয়। হারজিতের কোন মূল্য থাকে না। অথচ উঠানামার ব্যবস্থা থাকলে লীগের প্রতিটি খেলায় প্রতি পয়েন্টের জন্য সংগ্রাম করতে হয়। অবনমনের যেমন আশংকা থাকে তেমন থাকে উন্নয়নের আগ্রহ। ফলে খেলার মধ্যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। তাই আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের কাছে আবেদন তারা যেন ক্ষুদ্র স্বার্থে লীগ থেকে প্রোমোশন রেলিগেশন তুলে দিয়ে ফুটবলের বড় স্বার্থ নষ্ট না করেন।

• • •

দেশের খেলাধুলার উন্নতি সম্পর্কে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য নিখিল ভারত ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি পাতিয়ালার মহারাজা কয়েকদিন আগে কলকাতায় এসেছিলেন। রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ক্রীড়া প্রতিনিধিদের এক ঘরোয়া বৈঠকে তিনি কয়েকটি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রথম রাজ্যের সমস্ত ক্রীড়া সংস্থাকে এক ধাঁচে অর্থাৎ একটি নিয়ন্ত্রণ সমিতির অধীনে আনতে হবে। দ্বিতীয় বড় বড় শহরে দু'টি কি একটি বড় স্টেডিয়াম তৈরী করে ছোট ছোট বেশী স্টেডিয়াম তৈরী করতে হবে। তৃতীয়—রাজকুমারী অমৃতকুমারীর শিক্ষা পরিকল্পনার বদলে খেলোয়াড় ও 'কোচদের' জন্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী কোচিং ব্যবস্থার প্রয়োজন। চতুর্থ সরকারের অধিকতর সাহায্য ও সহানুভূতি অর্জনের জন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলির পরিচালনা ব্যবস্থাকে ত্রুটিশূন্য করতে হবে।

নিখিল ভারত ক্রীড়াসংস্থার সভাপতির উদ্দেশ্য মহৎ। খেলাধুলার উন্নতির জন্য তার চেষ্টা এবং আন্তরিকতায় সত্যই সন্দেহ করবার কিছু নেই। কিন্তু তার প্রস্তাবগুলি বর্তমান অবস্থায় বেশ কিছুটা অবাস্তব। প্রথম প্রস্তাবের কথাই ধরা যাক। রাজ্যের সমস্ত ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানকে তিনি এক ধাঁচে অর্থাৎ একটি বড় প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনবার পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু তা কি করে সম্ভব। অলিম্পিক বহির্ভূত খেলাধুলা, যেমন ক্রিকেট, টেনিস, টেবলটেনিস, ব্যাডমিন্টন পৃথক মর্যাদার অধিকারী। আই ও এ অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এসোসিয়েশন নিয়ন্ত্রিত খেলাধুলার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই সব ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে খেলাধুলার একটি বড় সমিতি গড়তে হলে সোভিয়েট রাশিয়ার ধাঁচে সরকারী সাহায্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। তা না হলে নানা মুনির নানা মতে সব কিছুই তালগোল পাকিয়ে উঠবে। সবাই চাইবে নিজের কোলে ঝোল টানতে। কাজের কাজ কিছু হবে বলে আশা কম।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে মহারাজা বড় বড় শহরে দু' একটি বড় স্টেডিয়াম তৈরী করে ছোট ছোট বেশী স্টেডিয়াম তৈরীর উপর জোর দিয়েছেন। যে দেশে কলকাতার মত বড় শহরে আজও একটি বড় আকারের স্টেডিয়াম গড়ে ওঠেনি সে দেশে বেশী স্টেডিয়ামের কথা চিন্তা করি কি করে? কলকাতায় বড় স্টেডিয়াম কেন? এতদিন কোন স্টেডিয়ামেরই অস্তিত্ব ছিল না। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের দৌলতে দক্ষিণ কলকাতায় একটি ছোট স্টেডিয়াম সম্প্রতি গড়ে উঠেছে। তার জন্যও কাঠ খড় পুড়েছে কম নয়। তাই শহরে শহরে দুই একটি বড় স্টেডিয়াম তৈরী করে তারপর ছোট ছোট বেশী স্টেডিয়াম গড়ার পরিকল্পনা অনেকটা আকাশ কুসুমের মতই অবাস্তব। কথাটা 'মেয়ে না রাঁধে না তার তপ্ত আর পান্তার' মতই শোনাচ্ছে।

রাজকুমারী অমৃতকুমারীর শিক্ষা পরিকল্পনার বদলে কোচিংয়ের জন্য অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনাকে স্বাগত জানাই। সত্যিই দুই কি তিন মাসের জন্য শিক্ষা দেবার কোন অর্থ হয় না। কিছু শিখতে না শিখতেই শিক্ষাকাল শেষ হয়ে যায়। শিক্ষাকেন্দ্রের আয়োজন, 'কোচদের' যাতায়াত ব্যয়, বিদেশ থেকে কোচ আমদানী ইত্যাদি কারণে খরচও হয় প্রচুর। তার চেয়ে স্থায়ীভাবে কোচ নিয়োগ করে তাদের দ্বারা দীর্ঘস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনায় সুফল পাওয়া যাবে অনেক বেশী।

চতুর্থ প্রস্তাবে পাতিয়ালার মহারাজা ক্রীড়া সংস্থাগুলির পরিচালন ব্যবস্থা ত্রুটিহীন করতে বলেছেন। এটা কোন নতুন কথা নয়। বহুদিন থেকেই একথা শুনে আসছি। ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানকে ত্রুটিমুক্ত করবার জন্য লেখালেখিও কম হচ্ছে না। কিন্তু যতদিন খেলাধুলার পরিচালকরা ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে না পারবেন ততদিন ক্রীড়াক্ষেত্র থেকেও [illegible] দূর হবে না। মহারাজার [illegible] স্বার্থান্বেষীরা রাতারাতি ভাল মানুষ হয়ে উঠবেন না। সুতরাং ক্রীড়া সংস্থা [illegible] স্বার্থান্বেষীদেরই কায়েমী শিকড় [illegible] ফেলতে হবে। তার উপায় কি? মহারাজা সে দাওয়াই বাতলাতে পারেননি।

দেশী সংবাদ

৩রা এপ্রিল—পাবলিক অ্যাকাউণ্টস কমিটি ...রক্ষা বিভাগের উপর উহার রিপোর্টে ...পরিকল্পনা ও আনাড়িসুলভ আচরণ, ...বারণযোগ্য বাজে খরচা, নিয়ম-বিরুদ্ধ আর্থিক ...ন-দেন ও কেরানীদের হাতে ভুলভ্রান্তির" ...ন কতকগুলি দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়াছেন, ...গুলির ফলে গবর্নমেণ্টকে ক্ষতি স্বীকার ...রতে হইয়াছে।

১৯৫৯ সালের বিধ্বংসী বন্যায় পশ্চিমবঙ্গের নয়টি জেলায় শস্যহানি ঘটে, সে নয়টি জেলার ...বস্ত এলাকাসমূহের অধিবাসিগণকে ঐ ...সরের খাজনা হইতে রেহাই দেওয়া স্থির ...য়াছে। ইহার ফলে রাজ্য সরকারের রাজস্বের ...এক কোটি টাকা ক্ষতি হইবে বলিয়া ...মান করা হইতেছে।

৪ঠা এপ্রিল—আজ দিল্লিতে সরকারীভাবে ...া হইয়াছে, বৈদেশিক মুদ্রা আইনের কয়েকটি ...ম (রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি ছাড়া ...দেশের ব্যাঙ্কে টাকা রাখা এবং খরচপত্র করা) ...ন করায় লোকসভার কম্যুনিস্ট দলের নেতা ...এস এ ডাঙেগকে ৭৫০০্ টাকা জরিমানা করা হইয়াছে।

এই বৎসর হইতেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ...এ, এম এস-সি এবং এম কম পরীক্ষায় ...য় শ্রেণীর বিলোপ সাধন করা হইতেছে।

...ই এপ্রিল—পুনর্বাসন ও সংখ্যালঘু দপ্তরের ...ী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না আজ লোকসভায় ...৬২ সালের মার্চ মাসের শেষে তাঁহার দপ্তর ...করিয়া দিবার আশা ব্যক্ত করেন। এই সময়ের ...া তাঁহার দপ্তরের কাজ শেষ হইয়া যাইবে ...অবশিষ্ট উদ্বাস্তুগণ বৃহত্তর সমাজের ...তে মিলিয়া যাইবে বলিয়া শ্রী খান্না আশা ...শ করেন।

৬ই এপ্রিল—গত মঙ্গলবার পাকিস্তানী ...ত পুলিস কর্তৃক ২৪ পরগণার সীমান্ত ...করা হইতে ভারতীয় সামরিক অফিসার ...ভট্টাচার্য অপহৃত হন। ঢাকাস্থ ভারতীয় ...টি হাই-কমিশনার এই ঘটনার বিরুদ্ধে ... পাকিস্তান সরকারের নিকট প্রতিবাদ ...ন করিয়াছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ...াদত আলী খাঁ আজ লোকসভায় ঘোষণা ...ন যে, পাকিস্তানের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভারত ...ক্কার ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণের কার্য চালাইয়া ...বেন।

৭ই এপ্রিল—দেশের ভিতর ও বাহির হইতে ...লীদের পৃথক রাজ্য দাবির উস্কানির ...মিকায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর ...র দার্জিলিং যাত্রা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ...া ওয়াকিবহাল মহল মনে করিতেছে।

...া উত্তর কলিকাতায় এক পরীক্ষা কেন্দ্র ... স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার্থীদের দুইটি দলের তুমুল মারপিটের সংবাদ পাওয়া যায়। ইহার ফলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের কিছু চেয়ার-বেঞ্চ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই হট্টগোলের মধ্যে গণিতের একটি উত্তরপত্র নিখোঁজ হইয়া যায়।

৮ই এপ্রিল—কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী আজ নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, এখন হইতে কংগ্রেস কোন সাম্প্রদায়িক অথবা প্রতিক্রিয়াশীল দলের সহিত নির্বাচনী আঁতাত করিবে না।

তিব্বত হইতে আগত জনৈক ব্যক্তি গতকাল গাংটকে বলেন যে, টিঙ্গরি এলাকায় সাম্প্রতিক সংঘর্ষে প্রায় পাঁচ হাজার তিব্বতী খাম্পা যোদ্ধা চীনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। উক্ত ব্যক্তি আরও জানান যে, গিয়াংসির চীনা কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি প্রকাশ্য সভায় তিব্বতীদের এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, কোন তিব্বতী যদি খাম্পাদের সহিত যোগ দেয় কিংবা তাহাদের সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহাকে হয় বন্দী নিবাসে প্রেরণ করা হইবে অথবা গুলী করিয়া হত্যা করা হইবে।

৯ই এপ্রিল—আজ সকালে বেরুবাড়ীর ১১৩ জন স্বেচ্ছাসেবক ট্রেনে হলদিবাড়ী হইতে শিলিগুড়ি আসিয়া পৌঁছিলে পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। এই স্বেচ্ছাসেবকেরা বেরুবাড়ীকে পাকিস্তানের নিকট হস্তান্তরের প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুকে কৃষ্ণ পতাকা প্রদর্শনের জন্য শিলিগুড়িতে আসিয়াছিলেন।

বিদেশী সংবাদ

৩রা এপ্রিল—প্রাভদার এক প্রবন্ধে আজ বলা হয় যে, আফগানিস্তান সীমান্তে পুস্তু উপজাতির উপর আধুনিক মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত আট ডিভিশন পাকিস্তানী সৈন্য আক্রমণ চালাইতেছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। পুস্তু জাতীয়তাবাদ দমনই ইহার উদ্দেশ্য।

৪ঠা এপ্রিল—রাইফেল ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হাজার হাজার আফ্রিকান আজ এলিজাবেথভিল বিমানবন্দরে আসিয়া হামলা করে। তাহারা রাষ্ট্রপুঞ্জের পতাকা ছিঁড়িয়া ফেলে, টেলিফোনের তার কাটিয়া দেয়, জানালাগুলি চুর্ণবিচুর্ণ করে।

দুই সপ্তাহ পূর্বে খাম্পা প্রতিরোধ বাহিনীর প্রায় তিন হাজার যোদ্ধা দক্ষিণ তিব্বতে এক দীর্ঘ চীনা সামরিক কনভয়ের উপর অতর্কিতে হামলা দিয়া শত শত চীনা সৈন্যকে নিহত এবং প্রচুর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র রসদ আটক করিয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পিকিং সরকারকে রাষ্ট্রপুঞ্জে গ্রহণ করিলে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যপদ ত্যাগ করাই কোন কোন কুওমিণ্টাং নেতা ও উপদেষ্টা ভাল মনে করেন বলিয়া আজ বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল।

৫ই এপ্রিল—কাতাঙগার তথ্য মন্ত্রণালয় হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গতকাল কাতাঙগা সরকার ও রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে এক চুক্তির ফলে একজন ভারতীয় সেনাপতি ও উচ্চপদস্থ কয়েকজন গোর্খা অফিসারকে লইয়া আগত রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি বিমানকে এলিজাবেথভিল বিমান-বন্দর হইতে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বেলজিয়াম আজ ঘোষণা করে, কঙ্গো হইতে তাহার সামরিক ও আধা-সামরিক লোকজন এবং রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের সরাইয়া আনার সিদ্ধান্তের কথা রাষ্ট্রপুঞ্জকে জানাইয়া দিয়াছে।

৬ই এপ্রিল—বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় যে, রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা সম্বলিত পাঁচ-দফা এক চুক্তি আজ রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং কাতাঙগার প্রেসিডেণ্ট শ্রীমোইসে টিশোম্বের মধ্যে সহিকৃত হইয়াছে।

বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ, লাওস গবর্নমেণ্ট বামপন্থী পাথেট-লো বাহিনীর সহিত অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতি আলোচনা শুরু করিতে প্রস্তুত আছেন। পাথেট-লো অস্ত্র সম্বরণের আদেশ দেওয়া মাত্র গবর্নমেণ্টও অনুরূপ আদেশ দিবেন।

৭ই এপ্রিল—চীন সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট কেনেডী ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীহ্যারল্ড ম্যাকমিলানের মধ্যে মত-বিরোধ ঘটিয়াছে বলিয়া আজ জানা গিয়াছে। প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট কেনেডী স্পষ্টতই জানাইয়া দিয়াছেন যে, "তিনিই" পাশ্চাত্ত্য জগতের নেতার ভূমিকা গ্রহণ করিবেন, বিশেষত রাশিয়া সম্পর্কে।"

সোভিয়েট সরকার গত দুই দিনে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার মূল্যের সাড়ে ১০ লক্ষ টন সোনা প্যারিসে পাঠাইয়াছেন। এই স্বর্ণ-পিণ্ডের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল ও উদ্দেশ্য এখনও অজ্ঞাত।

৮ই এপ্রিল—বাহেরিনের তিনশত মাইল পূর্বে পারস্য উপসাগরে বৃটিশ ইণ্ডিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ 'দারা'য় আজ আগুন লাগে এবং সরজাউ-এর ৫২ মাইল উত্তরে প্রজ্বলিত অবস্থায় 'দারা' পরিত্যক্ত হয়।

৯ই এপ্রিল—আজ ওয়াকিবহাল মহলে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপুঞ্জের ইথিওপিয়ান বাহিনী কাতাঙ্গা সৈন্যদলের ৩২ জন শ্বেতাঙ্গ ভাড়াটিয়া সৈনাকে বন্দী করিয়া নিরস্ত্র করিয়াছে। ঐ ৩২ জনের মধ্যে ৩০ জন দক্ষিণ আফ্রিকান ও দুইজন বেলজিয়ান।

পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
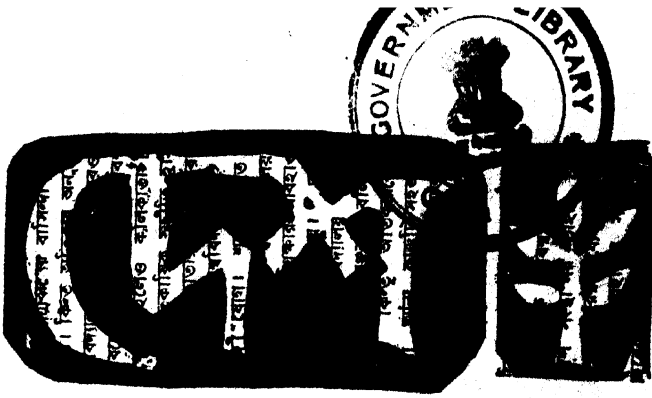
DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 22nd April, 1961

২৮ বর্ষ ॥ ২৫ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়াপয়সা
শনিবার, ৯, বৈশাখ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

মহাকাশে মানুষ

নেপোলিয়ন বলেছিলেন, আল্পস পর্বত লঙ্ঘনকালে, তাঁর অভিধানে "অসম্ভবের" ঠাঁই নেই। মানুষের ইতিহাসেরও সেই কথা। অজানাকে জানবার, অসম্ভবকে সম্ভব করবার নিরন্তর প্রয়াস মানবেতিহাসের শুরু থেকেই। জীব-জন্মের ধারায় যে-মানুষ এককালে গাছ থেকে মাটিতে নেমেছিল দুর্জয় প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার চেষ্টায়, দুখানা হাত ছাড়া তার আর কীই বা সম্বল ছিল? সম্বল ছিল বইকি, দুর্বার কল্পনা, অসীম কৌতূহল আর প্রখর উদ্ভাবন ক্ষমতা মানুষকে কোথায়ও থামতে দেয়নি, বিস্ময় থেকে বিস্ময়ে, রহস্য থেকে রহস্যের সন্ধানে কেবলই এগিয়ে নিয়ে চলেছে। রূপকথার যে রাজপুত্র তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে হাজার রকমের ভয় ও বাধা তুচ্ছ করে বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধারের জন্য সর্বস্ব পণ করেছে সে-রাজপুত্র ত নিছক কল্পনা নয়, মানুষের অপরাজেয় শক্তিরই প্রতীক।

মানুষের অপরাজেয় শক্তি এই বিংশ শতাব্দীর মানব-সংহিতায় নূতন সূত্র যোজনা করল। মর্ত্যের জীব মানুষ, কোটি কোটি গ্রহতারাময় মহানভঅঙ্গনের বিরাট বিশ্বলোক বহু যুগ ধরে তার পরম বিস্ময়ের সামগ্রী। মর্ত্যের মানুষ যুগ যুগ ধরে মহাকাশ পরিক্রমার স্বপ্ন দেখেছে; নব নব লোকে যাত্রার জন্য ব্যাকুল হয়েছে। মানবেতিহাসের প্রায় আদিকাল থেকে রূপকে কল্পনায়, পুরাণে, মহাকাব্যে মানুষের মহাকাশচারণ কামনার অসংখ্য নিদর্শন আছে ছড়িয়ে। আকাশপথে ভ্রমণের জন্য বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনী চেষ্টাও আজকের নয়, মধ্যযুগ কিম্বা তারও আগে থেকে মানুষ আকাশে উড়বার জন্য নানারকম উপায় আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়েছিল। আজ এই বিংশ শতাব্দীতে মহাকাশ পরিক্রমার যে প্রয়াস অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করল তার সূত্রপাত মানুষের বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসের সুদূর অতীতে। সোভিয়েট মহাকাশযানে মহাকাশচারী প্রথম মানুষের পৃথিবী প্রদক্ষিণ যেমন এক হিসেবে নূতন যুগের শুরু তেমনি যুগযুগবাহী বিজ্ঞান সাধনার সঞ্চিত ফলের সঙ্গে এর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আরও পরিষ্কারভাবে বলা যায়, মহাকাশ-অভিযানের সাফল্য একান্তভাবে সোভিয়েট বিজ্ঞান কিম্বা সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার নয়। রুশ বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য এবং অভিনন্দনীয়, কেবল স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বহু দেশে, বহু যুগ ধরে বিজ্ঞান-সাধনার গবেষণালব্ধ ফলের সদ্ব্যবহার করেই রুশ বিজ্ঞানীরা মহাকাশ অভিযানে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন।

মহাকাশচারী প্রথম মানব মেজর গাগারিনকে "বিংশ শতাব্দীর কলম্বাস" বলে অভিনন্দিত করা হয়েছে। এ-অভিনন্দন তাঁর যথার্থ প্রাপ্য। কলম্বাসের আবিষ্কার য়ুরোপের মানুষের দৃষ্টি-সীমাকে বিস্তৃত করে অপরিজ্ঞাত মহা-দেশের সন্ধান দিয়েছিল। মহাকাশে মানুষের অভিযান তার চেয়েও সুদূর-প্রসারী। প্রখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক লভেল বলেছেন, মানুষের মহাকাশ পরিক্রমা এবং পৃথিবী প্রদক্ষিণ এ যুগের বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক সাফল্য। মর্ত্যের সীমা অতিক্রম করতে পারা এতকাল মানুষের কল্পনার অতীত কিম্বা নিতান্ত কল্পনা-মাত্র ছিল। মর্ত্যের মানুষ মহাকর্ষের মহাবল প্রতিরোধবেষ্টনী ভেদ করে পৃথিবীর বাইরে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর পরি-পূর্ণ অবয়বটিকে প্রায় নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছে—মর্ত্যলোকের বন্ধন[illegible] এ-মানুষ যেন দৈবশক্তিসিদ্ধ বিদে[illegible] আত্মার মতই ভারহীন, স্বচ্ছন্দে বিচর[illegible] শীল। মহাকাশচারী মানুষ তাই কো[illegible] বিজ্ঞানের বিস্ময় নয়, মানবিকশ[illegible] বিশ্বজয়ী মহিমাকে এ যেন এক অভূ[illegible] পূর্ব পারমার্থিক তাৎপর্যে ম[illegible] করেছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষি[illegible] তত্ত্বে বিশ্বজ্যামিতির নূতন [illegible] আবিষ্কৃত — আমাদের আটপৌ[illegible] জগতের পরিচিত ত্রিমাত্রিক [illegible] প্রস্থ, ঘনত্বের সঙ্গে দেশ[illegible] জড়ানো "ফোর্থ ডাইমেনসন" অ[illegible] চতুর্থ মাত্রা সংযোজন। আইনস্টাইনে[illegible] আবিষ্কার সূত্র ধরেই পারমাণবিক শ[illegible] আজ মানুষের করায়ত্ত। দেশ-কালজড়া[illegible] চতুর্মাত্রিক বিশ্বজ্যামিতি আর পা[illegible] মাণবিক শক্তিচালিত মহাকাশতর[illegible] মহাবিশ্ব পরিক্রমাপথে প্রথম . পদক্ষে[illegible] দুইই আজ বিজ্ঞানের সম্মুখে অ[illegible] নব নব সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে[illegible]

লক্ষ্য করবার বিষয় যে, মহা[illegible] অভিযানে সোভিয়েট বিজ্ঞানের স[illegible] পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই অভিন[illegible] হয়েছে। এই ধরনের সর্বজনীন [illegible] নন্দন বিজ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে [illegible] দুর্লভ নয়। কিন্তু মহাকাশ অভি[illegible] পরিকল্পনা এবং প্রয়াস যে রাষ্ট্রে [illegible] বিরোধ সংশয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার [illegible] নানাভাবে জড়িত একথাও সহজে বি[illegible] হওয়া যায় না। মহাকাশ বিজয়ের, বিজ্ঞানের যে শক্তি এবং কৌশল কত[illegible] নিযুক্ত সামরিক প্রয়োজনেও সেশক্তি[illegible] কৌশল অনায়াসে ব্যবহৃত হচ্ছে

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সংখ্যা

এবারের এই বিশেষ সংখ্যার প্রধান আকর্ষণ হইতেছে "কবি-সংবর্ধনা"। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তিতে শান্তি-নিকেতনে জন্মোৎসব ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক দেশবাসীর পক্ষ হইতে কবি সম্বর্ধনা; নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তিতে সংবর্ধনা; ১৩২৮ সালে ইউরোপ পরি-ভ্রমণান্তে স্বদেশ প্রত্যাগমন উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক আনন্দোৎসবের বিস্তারিত বিবরণ এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইবে। গ্রন্থকারে অপ্রকাশিত বাংলা দেশের বহু মনীষীর ভাষণ এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হইবে—১৩২৮ সালের সংবর্ধনায় সভাপতি সারদাচরণ মিত্র ও অর্ঘ্যদান উপলক্ষে জগদিন্দ্রনাথের ভাষণ এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তর; নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি উপলক্ষে অভিনন্দনের উত্তরে পাবনায় উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা; ১৩২৮ সালের আনন্দোৎসবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির অভি-ভাষণ ও রবীন্দ্রনাথের উত্তর প্রকাশিত হইবে। এই সঙ্গে থাকিবে কবি-সংবর্ধনার বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্রাবলী। —সম্পাদক 'দেশ'

কোন কোন সোভিয়েট নেতা তার স্পষ্ট ইঙ্গিতও দিয়েছেন। রকেট এবং ক্ষেপণাস্ত্র চালনায় সোভিয়েট রাশিয়া এখন সবচেয়ে কুশলী, সবচেয়ে ক্ষমতাধর, ক্রুশ্চভ এ-কথা গোপন রাখেন নি। মহাকাশ অভিযানের সাফল্য একদিকে যেমন বিজ্ঞানের অসামান্য কৃতিত্ব ঘোষণা করছে তেমনি অন্যাদিকে "হিংসায় উন্মত্ত" পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংশয়ও কম সৃষ্টি হচ্ছে না। সংশয় এবং শঙ্কা। বিজ্ঞানের এই বিস্ময়কর সাফল্য যদি কেবল গ্রহান্তর যাত্রার প্রথম সোপান হত তাহলে কথা ছিল না। গর্কিকে একজন রুশ চাষী নাকি আক্ষেপ করে বলেছিল, মানুষ কত কী অসাধ্য সাধন করল, এমন কি পাখির মত আকাশে উড়তে পর্যন্ত শিখল, কিন্তু মাটিতে শান্তিতে স্বচ্ছন্দে বাঁচবার কৌশল মানুষ এখনও আয়ত্ত করতে পারল না। এ-আক্ষেপ সবকালের, সব দেশের। মহাকাশে মানুষের দুঃসাহসিক অভিযানের অলোকসামান্য সাফল্যের ত্রুটি ধরি না, কিন্তু প্রশ্ন এই, বিজ্ঞানের কল্যাণে সুদূরতম আজ যদিও নিকটতম, তবু নিকটতম মানবগোষ্ঠীর মধ্যের সম্পর্ক বিরোধ-বিদ্বেষজর্জর অকল্যাণের বিভীষিকাচ্ছন্ন কেন? দ্যুলোক যখন করায়ত্ত-প্রায় মর্তালোক কেন তখনও আশ্বাসহীন, সংশয়াকীর্ণ?

•

বিমলচন্দ্র সিংহ

মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে বিমলচন্দ্র সিংহ লোকান্তরিত হলেন। পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে তিনি অল্পবয়সেই নিজ প্রতিভা বলে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। মার্জিতরুচি, সুপণ্ডিত, সুলেখক এই ব্যক্তি জনসাধারণের কাছে সম্ভবত খুব পরিচিত ছিলেন না। করতালিমুখর

ভঙ্গিসর্বস্ব জনপ্রিয়তা অর্জনে তিনি কখনও উৎসাহ বোধ করেননি। তবে বিমলচন্দ্র সিংহের চিন্তাধারা ও কর্মজীবনের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা জানেন, প্রগাঢ় মননশীল উদারহৃদয় এই তরুণটির প্রকৃতই গভীর মমত্ববোধ ছিল জনসাধারণের প্রতি। "সমাজ-সচেতন" শব্দটি আজকাল যথেচ্ছ ব্যবহারে উপহসিত এবং প্রায় অর্থহীন; বিমলচন্দ্র সিংহের মনন সত্যসত্যই ছিল সমাজসচেতন। যে কালে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কে কংগ্রেসের মধ্যেও তীব্র মতভেদ দেখা দেয়, সেই তখনকার কালেও বিমলচন্দ্র সিংহ ফ্লাড কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্যদানের সময় সম্পূর্ণ নিজের বিচারবুদ্ধির প্রেরণায় জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। সম্ভ্রান্ত, সুপ্রাচীন জমিদার পরিবারের প্রতিভূ হওয়া সত্ত্বেও সমাজ-সচেতন বিমলচন্দ্র স্বশ্রেণী এবং নিজের স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা স্বদেশ ও সমাজের কল্যাণ সাধনকে কর্তব্য হিসাবে বরণ করতে দ্বিধা করেননি।

রাজনৈতিক পদমর্যাদা ও নির্ধারিত কর্তব্যের নিয়মশৃঙ্খলা দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের রাজস্বমন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহের কর্মজীবন সম্ভবত যথারীতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল, যার ফলে মনে হয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা স্বচ্ছন্দে বিস্তৃত হতে পারেনি। তবু মন্ত্রী হিসাবেও তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা ও কর্মকুশলতা দলমতনির্বিশেষে প্রায় সকলের সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। তবে প্রকৃতপক্ষে বিমলচন্দ্র সিংহ ছিলেন সেই জাতের ব্যক্তি দলীয় রাজনীতির মন্ত্রতন্ত্র যাঁদের উদারবুদ্ধি ও যুক্তিনিষ্ঠ মনকে সতত পীড়িত, সংকুচিত করে। অবস্থাচক্রে বিমলচন্দ্র সিংহের কর্মজীবনের অধিকাংশ রাজনীতি ক্ষেত্রে অতিবাহিত হলেও দলীয় রাজনীতি-সেবা ছিল, যাকে বলা যায় তাঁর "দ্বিতীয় প্রেম।" এই "দ্বিতীয় প্রেমের" সর্বগ্রাসী দাবি তাঁর প্রথম প্রেম সাহিত্য ও সমাজচিন্তা অনুশীলনের একান্ত প্রয়াসকে কোণঠাসা করেছিল এবং সেজন্য বিমলচন্দ্রেরও ক্ষোভের অন্ত ছিল না যে, তাঁর স্বধর্মচ্যুতি ঘটেছে। রাজনৈতিক কর্মকোলাহলের মধ্যেও তাঁর "প্রথম প্রেম" বাংলা সাহিত্য ও সমাজচিন্তার অনুশীলনে সংক্ষিপ্ত জীবনকালের মধ্যে তিনি যে কৃতিত্বের নিদর্শন রেখে গেলেন, তার মূল্য কখনই সামান্য গণ্য হবে না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মননশীল চিন্তাসমৃদ্ধ প্রবন্ধকাররূপে মুষ্টিমেয় যে কয়জন লেখক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, বিমলচন্দ্র সিংহ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দেশ এবং আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা স্মরণ করে বিমলচন্দ্র সিংহের অকাল মৃত্যুতে আমরা একান্ত স্বজনবিয়োগ বেদনার সঙ্গে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

কৃত্রিম উপগ্রহের সমতুল্য একটি যানের আরোহী হয়ে মহাকাশ দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে মানুষ জীবন্ত অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। প্রথম মহাকাশ-চারী কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টির কৃতিত্ব যাঁদের ছিল, এ কৃতিত্বও সেই সোভিয়েট-রাশিয়ার বৈমানিক কর্মীদের। কিছুকাল পূর্বে তাঁরা মহাকাশে কুকুর পাঠিয়ে জীবন্ত ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। সুতরাং মানুষের পক্ষেও যে এটা শীঘ্রই সম্ভব হবে সেটা বুঝা গিয়েছিল। মেজর গাগারিন যে ব্যোমযানে গিয়েছিলেন তার অক্ষপথের দূরত্ব পৃথিবী থেকে ১০৯ এবং ১৮৭ মাইলের মধ্যে ছিল, যানটি মহাকাশে ১০৮ মিনিট ছিল এবং পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে ৮৯ মিনিট লেগেছিল। মেজর গাগারিন বলেছেন যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আওতার বাইরে, শরীরের ভারহীন অবস্থায় তাঁর দেহমনের ক্রিয়াশক্তি ঠিকই ছিল। তার জন্য নিশ্চয়ই অনেক বৈজ্ঞানিক কৌশল তাঁর সহায়ক ছিল। মহাকাশ মানুষের গতায়াতের আরো আশ্চর্য পর্যায়ের খবর ভবিষ্যতে অবশ্যই শুনা যাবে।

এ ব্যাপারে রাশিয়ানরা ক্রমাগত আমেরিকানদের পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে, তার মূলে রকেট বিদ্যায় রাশিয়ানদের শ্রেষ্ঠতা। অবশ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কারো একচেটিয়া শ্রেষ্ঠত্ব চিরকাল বজায় থাকবে এরূপ কোনো কথা নেই। কিসে কে কখন এগিয়ে যায় সেটা পরিচালকদের লক্ষ্য এবং ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। যেসব ব্যাপার পরমাশ্চর্য বলে আমাদের লাগছে একদিক দিয়ে সেগুলিকে আশ্যাম্ভাবীও বলা যায়। কারণ পশ্চিমে বিজ্ঞানের গবেষণা ও প্রয়োগ যে ধারা নিয়েছে তাতে এইসব আবিষ্কার একটার পরে একটা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে চলেছে। কোনো প্রকরণ বা প্রসেস অনেক ক্ষেত্রে একটা বিশেষ মাত্রায় পৌঁছলে তার গতি দ্বিগুণ চতুর্গুণ হারে বাড়তে থাকে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের বয়স অল্প কয়েকশো বছর মাত্র—তার গোড়াপত্তনে যে-সময় লেগেছিল তার তুলনায় তার বর্তমান ঊর্ধ্বগতি অত্যন্ত ক্ষিপ্র। মানুষ হঠাৎ আগের চেয়ে খুব বেশি বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে তা নয়, ব্যক্তিগতভাবে বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক-গণের বুদ্ধি আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা-দের চেয়ে বেশি এরূপে মনে করার কোন

কারণ নেই। তফাৎ হচ্ছে এই যে, অনুশীলনের দ্বারা যে-সিঁড়ি তৈরী হচ্ছে তার ক্রমবর্ধমান উচ্চতার সুযোগ পরবর্তীরা পাচ্ছেন। পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে জ্ঞান-সঞ্চয় করে রাখার ব্যবস্থা আছে বলেই এটা সম্ভব। মানুষের মস্তিষ্ক যদি অধিকতর বুদ্ধির আধার হয় তবে মানুষের বুদ্ধির নিজস্ব বৃদ্ধির কোনো প্রমাণ নেই কারণ গত কয়েক হাজার বছরের মধ্যে মানুষের মস্তিষ্কের লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন কিছু ঘটেছে এমন কথা কোনো বৈজ্ঞানিকও বলেন না। কেবল যদি ব্যক্তির বুদ্ধি এই উদ্বোধনী শক্তির পরিমাপের কথা বলা হয় তবে নিউটন অথবা বর্তমানকালের শ্রেষ্ঠ নিউক্লিয়ার বৈজ্ঞানিকের তুলনায় প্রথম তীর-ধনুকের আবিষ্কর্তার বুদ্ধির প্রখরতা বা কল্পনার মৌলিকতা যে-কিছু কম ছিল তা বলা যায় না। সেই বুদ্ধি আধুনিক বিজ্ঞানের ধারা যখন নিল তখন সেই ধারার স্বাভাবিক বেগে বুদ্ধির ক্রিয়া চলল। তার সৃষ্টির যোগফল আশ্চর্যকর এবং মানবসমাজ ও "সভ্যতার" পক্ষে বিশেষ অর্থপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু অভিব্যক্তিবাদের দৃষ্টিতে মানুষের বুদ্ধি যার আধার মস্তিষ্ক তার কোনো মৌলিক পরিবর্তন গত ক'শো বছর কেন ক'হাজার বছরের মধ্যে হয়েছে এমন প্রমাণ নেই। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই বুদ্ধির প্রয়োগ যে-বিশেষ ধারা নিয়েছে সেইটাই তার বিশেষত্ব।

মানুষের বুদ্ধি, ইনটেলিজেন্স হঠাৎ যে বেড়ে গেছে বা তার "গঠন" বলতে যদি কিছু থাকে সেটা বদলে গেছে তা নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের পথে মানুষের বুদ্ধি যখন চলতে আরম্ভ করল তখন থেকে সেই পথের নিয়মেই তার বৈজ্ঞানিক কর্মের গতি, বেগ এবং লক্ষ্য যেন নির্দিষ্ট হয়ে চলেছে, তাকে থামানো বা এদিক-ওদিক করার মধ্যেও যেন সেই বুদ্ধির নেই। তার জন্য অন্য শক্তি আবশ্যক যা বুদ্ধির গতিকে খানিকটা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে অর্থাৎ বুদ্ধিকেও তার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করতে পারে। সেটা হয়ত শুভাশুভবোধের শক্তি; যার ক্রিয়া জ্ঞান অভিব্যক্তির পক্ষে হয়ত আরও সুদূর প্রসারী যদিও পরিমিত কালের দৃষ্টিতে তার চেয়ে নিছক বুদ্ধির দৌড় বেশী বলে মনে হতে পারে। এজন্য বুদ্ধির দৌড় দেখে যারা চমৎকৃত তারাও বেশ ভীত কারণ বুদ্ধির ক্রিয়ার দ্বারা মানুষের নিজের সমস্ত কিছু সৃষ্টি ধ্বংস করা সম্ভব এই চেতনাও মানুষের হচ্ছে। কিন্তু মুশকিল এই যে, তারাও ভাবছে যে বুদ্ধির ক্রিয়াকে নিছক বুদ্ধির দ্বারাই নিরাপত্তার গণ্ডীর মধ্যে রাখা সম্ভব অর্থাৎ বাহ্যিক ব্যবস্থা বা অরগ্যানাইজেশন ঠিকমতো করতে পারলেই আর বিপদ থাকবে না। বাহ্যিক ব্যবস্থা বা অরগ্যানাইজেশন মূল্যহীন নয় যেমন শান্তির চুক্তিপত্রেরও সাময়িকমূল্য থাকে। কিন্তু ইতিহাসে লক্ষ লক্ষ শান্তির চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। মানুষের নবতম বৈজ্ঞানিক কীর্তি যেমন বিস্ময়কর, হিংসাদ্বেষবিজড়িত বহুধাবিভক্ত বর্তমান মানবজাতির পক্ষে উহার দ্যোতনা তেমনি ভয়ংকর। সেই ভয়ংকরতাকে জয় করতে হবে। কিন্তু কেমন করে?

কেউ কেউ ইতরজনকে উপদেশ দিচ্ছেন, "দেখ মানুষের কী শক্তি! এখন সে গ্রহান্তরে যাবার উপায়ও প্রায় বার করে ফেলল, এখন তোমরা নতুনভাবে চিন্তা কর, আর ছোটখাটো ব্যাপারে মন দিও না।" যেন এই তাক-লাগানো বৈজ্ঞানিক কীর্তির কথা শুনলেই মানুষের "ছোটখাটো ব্যাপারে" প্রবৃত্তি নষ্ট হয়ে যাবে, পৃথিবী শান্তিময় হবে। কিন্তু আশ্চর্য করার মতো কৃতিত্ব মানুষ কি ইতিপূর্বে আর কখনও দেখেন নি? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই স্থূলে এবং সূক্ষ্মে কত বিষয়েই এমন আশ্চর্য আবিষ্কার হয়েছে যার চিন্তাতে মানুষের মন অভিভূত হতে পারে। কিন্তু তাতে কি অশান্তির মূল নষ্ট হয়েছে? বরঞ্চ অনেক আবিষ্কার যা বাহ্যত মানুষকে মানুষের নিকটতর করেছে। দেশ এবং কালের দূরত্বকে নষ্ট করেছে তা-ই অশান্তি এবং সংঘর্ষের বহরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ মানুষের মধ্যে অশান্তি ও সংঘর্ষের মূল যেখানে সেখানে যতদিন পর্যন্ত পরিবর্তন না হচ্ছে ততদিন বাহ্যশক্তির বুদ্ধির অনুপাতে অশান্তির ও সংঘর্ষের আয়তন ও ভয়াবহতাও বাড়বে। সেই ভয়াবহতা এমন এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, এই অনেকের আশা যে সর্বাত্মক বিনষ্টির ভয়েই এখন মানুষ সংঘর্ষ এড়াবে অর্থাৎ মানুষের ভিতরটার পরিবর্তন ছাড়াই বাহ্য অবস্থার চাপেই শান্তি আসবে অথবা বাহ্য অবস্থার চাপেই মানুষের ভিতরের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এসে যাবে।

কিন্তু এদুটো দুই স্তরের ব্যাপার এবং উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ থাকলেও বাহ্য অবস্থার চাপেই মানুষের ভিতরটা বদলে গিয়ে পৃথিবী শান্তিময় হয়ে উঠবে এরূপ আশা মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিও অনুমোদন করে না। মানুষের ভিতরটাও কিছুটা বদলানো চাই এবং তার জন্য বুদ্ধি ছাড়া অন্য রকম শক্তির কাজ আবশ্যক। বুদ্ধি নিজের শক্তির ভয়ংকরতা প্রমাণ করে ভয় দেখাতে পারে কিন্তু ভয়ের উপর শান্তির প্রতিষ্ঠা কি সম্ভব? বুদ্ধি শক্তির মঙ্গল এবং মনোমুগ্ধকর দিকের সাধনা সাধারণ ভাষায় যাকে নৈতিক ভাব বলা হয় তার সহযোগ ছাড়া হয় না। সেই ভাবের প্রকাশও তো কম আশ্চর্যকর নয়। জীবের "স্বাভাবিক" প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ যখন আত্মিক শক্তির পরিচয় দেয় তখন কি সেটা পরম আশ্চর্যকর নয়? বিজ্ঞানের তত্ত্ব সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয় কিন্তু প্রত্যেক মানুষই নিজের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি প্রবৃত্তির শক্তি জানে সুতরাং সাধারণ মানুষের তুলনায় বুদ্ধে, খৃষ্টে, চৈতন্যে, রামকৃষ্ণে যে কী পরমাশ্চর্যের প্রকাশ তা তার পক্ষে আন্দাজ করা সহজ। সেই পরমাশ্চর্যের বোধ মানুষের মধ্যে যত বেশী জাগ্রত করা যাবে মানুষ তত নির্ভয়তার দিকে এগুবে।

১৫-৪-৬১

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

ভবঘুরে (৫)

সিনেমার কল্যাণে আজকাল বহু নৈসর্গিক দৃশ্য, শহর-বাড়ি, পশুপক্ষী বিনা মেহন্নতে দেখা যায়। এমন কি বাস্তবের চেয়েও অনেক সময় সিনেমা ভালো। বাস্তবে বেল্‌কনি থেকে রানীকে আর কতখানি দেখতে পেলুম? —সিনেমায় তাঁর আংটি, জুতোর বকলস, হ্যাটের সিল্কটি পর্যন্ত বাদ গেল না। আলীপুরে গিয়ে বাঘ-সিঙি না দেখে সিনেমাতে দেখাই ভালো—ক্যামেরামেন যতখানি প্রাণ হাতে করে ক্লোজ-আপ নেয় ততখানি ঝুঁকি নিতে আপনি আমি নারাজ।

বিলিতি ছবির মারফতে তাই ওদের শহর, বার্, রেস্টুরেন্ট, নাচ, রাস্তা-বাড়ি, দালান-কোঠা আমাদের বিস্তর দেখা হয়ে গিয়েছে কিন্তু গ্রামের ছবি এরা দেখায় অল্পই। গ্রামের বৈচিত্র্যই বা কি, সেখানে রোমান্সই বা কোথায়? অন্তত সিনেমা-ওলাদের চোখে সেটা ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে এখনো আর্টিস্টদের কাছে। ইয়োরোপীয় গ্রাম্যজীবনের ছবি এখনো তাঁরা এঁকে যাচ্ছেন আর পুরনো দিনের মিইয়ে, ভান গখের তো কথাই নেই।

আমাদের গ্রামে সাধারণত সদর রাস্তা থাকে না। প্রত্যেক চাষা আপন খড়ের ঘরের চতুর্দিকে বাড়ি ঘিরে রেখেছে আম-কাঁঠাল-সুপুরি-জামের গাছ দিয়ে—কিছুটা অবশ্য ঝড় থেকে কুঁড়েগুলোকে বাঁচাবার জন্য। এখানে সে ভাবনা নেই বলে গ্রামে সদর রাস্তা থাকে, তার দুদিকে চাষাভূষো, মুদী, দর্জি, কসাই, জুতোওলা সবাই বাড়ি বেঁধেছে। আর আছে ইস্কুল, গির্জে আর পাব্—জর্মনে লোকাল্ (অর্থাৎ 'স্থানীয়' মিলনভূমি)। এইটেকেই গ্রামের কেন্দ্র বললে ভুল বলা হয় না।

রাস্তাটা যে খুব বাহারে তা বলা যায় না। শীতকালে অনেক সময় এত বরফ জমে ওঠে যে চলাফেরাও কয়েকদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যেতে পারে—আমাদের দেশে বর্ষাকালে যে রকম হয়। শুধু বাচ্চাদেরই দেখতে পাওয়া যায় তারই উপর লাফালাফি করছে, পেঁজা বরফের গুঁড়ো দিয়ে বল বানিয়ে একে অন্যকে ছুঁড়ে মারছে।

শুনেছি কট্টর প্রোটেস্টাণ্ট দেশে—স্কটল্যান্ড না কোথাও যেন—রবিবার দিন কাচ্চা-বাচ্চাদেরও খেলতে দেওয়া হয় না! এখানে দেখি, ছেলে এবং মেয়েরাও রাস্তার উপর একটা নিম্-চুবসে-যাওয়া ফুটবলে ধপাধপ কিক্ লাগাচ্ছে। এদের একটা মস্ত সুবিধে

যে জাতিভেদ এদের মধ্যে নেই। দর্জীর ছেলে মুচির মেয়েকে বিয়ে করতে পারে, ইস্কুল মাস্টারের মেয়ে শুঁড়ির ছেলেকেও পারে। পাদ্রির ছেলেকেও পারতো—কিন্তু ক্যাথলিক পাদ্রির বিয়ে বারণ। আফগানিস্থানে যে রকম মেয়েদের মোল্লা হওয়া বারণ— দাড়ি নেই বলে।

একে ট্রাম্প তায় বিদেশী, খেলা বন্ধ করে আমার দিকে যে প্যাট প্যাট করে তাকাবে তাতে আর আশ্চর্য কি। এমন কি ওদের মা বাপরাও। ওদের অনেকেই রবির সকালটা কাটায় জানলার উপর কুশন্ রেখে তাতে দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে, বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। প্রথম প্রথম আমার অস্বস্তি বোধ হত, শেষটায় অভ্যাস হয়ে গেল। সেটা অবশ্য পরের কথা।

ছবিতে দেখেছিলুম ছোঁড়াদের একজন চার্লির পিছন থেকে এসে একটানে তার ছেঁড়া শার্ট ফর ফর করে একদম দুটুকরো করে দিলে—সেটা অবশ্য শহরে। এবং আমার শার্টটা শক্ত চামড়ার তৈরী, ওটা ছেঁড়া ছোঁড়াদের কর্ম নয়। কিন্তু তবু দেখি গোটা পাঁচেক ছেলেমেয়ে এক জায়গায় জটলা পাকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে আর ফন্দি-ফিকির আটছে। একটি দশ বারো বছরের মেয়েই দেখলুম ওদের হন্টর-ওয়ালী, ফিয়ারলেস নাদিয়া, মিস্ ফ্রন্টিয়ার মেল, ডাকুকী দিলরুবা, জম্বুকী বেটী যা খুশী বলতে পারেন। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই সে দল ছেড়ে গটগট করে এসে প্রায় আমার রাস্তা বন্ধ করে মধুর হাসি হেসে বললে, 'সুপ্রভাত'। সংগে সংগে একটি মোলায়েম কার্টসিও করলে—অর্থাৎ বাঁ পাটি সোজা সটান পেছিয়ে দিয়ে, ডান হাঁটু ইঞ্চি তিনেক নিচু করে, দুহাতে দুপাশের স্কার্ট আলতো ভাবে একটু উপরের দিকে তুলে নিয়ে বাও করলে। এই কার্টসি করাটা প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর শহরে লোপ পেয়েছে, গ্রামাঞ্চলে তখনো ছিল, এখনো বোধকরি আছে।

এরা 'গ্রুস গট্' হয়তো জীবনে কখনো শোনেইনি। এদের জন্ম প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর। তাই 'গুটেন্ মর্গেন' বলার পূর্বে প্রথম ছাড়লুম একখানা মৃদু হাস্য—একান ওকান ছোঁয়া। আমার মুখখানাও বোম্বাই সাইজের। কলাটা আড়াআড়ি খেতে পারি। স্যান্ডউইচ খাবার সময় রুটির মাখম আকছারই দু'কানের ডগায় লেগে যায়।

ইতিমধ্যে মেয়েটি অতিশয় বিশুদ্ধ ব্যাকরণে আমাকে যা শুধালো তার যদি শব্দে শব্দে অনুবাদ করা হয় তবে সেটা বাইবেলের ভাষার মতই শোনাবে। 'আপনি ইচ্ছে করলে বললে হয়তো বলতেও পারেন এখন কটা বেজেছে।' পশ্চিম ইয়োরোপীয় ভাষাগুলোকে সবজাঙ্কটিভ মুড তথা কন্ডিশনাল্ প্রচুরতম মেকদারে লাগালে প্রচুরতম ভদ্রতা দেখানো হয়। বাঙলায় আমরা অতীতকাল লাগিয়ে ভদ্রতা দেখাই। শ্বশুরমশাই যখন শুধোন, 'বাবাজী তাহলে আবার কবে আসছ?' আমরা বলি, 'আজ্ঞে, আমি তো ভেবেছিলুম—' অর্থাৎ আমি যা ভেবেছিলুম কথাটা আপনার সম্মতি পাবে না বলে প্রায় নাকচ করে বসে আছি। তবু আপনি নিতান্ত জিজ্ঞেস করলেন বলে বললুম।

তা সে যাকগে। মেয়েটি তো দুনিয়ার কুল্লে সবজনক্টিভ একেবারে কপিবুক স্টাইলে, ক্লাস-টীচারকে খুশী করার মত ডবল হেল্পিং দিয়ে প্রশ্নটি শুধোলে। আমিও কটা সবজঙ্কটিভ লাগাবো মনে মনে যখন চিন্তা করছি এমন সময় গির্জার ঘড়িতে ঢং করে বাজল একটা। আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলল। কোনো কথা না বলে ডান হাত কানের পেছনে রেখে যেদিক থেকে শব্দ আসছিল সেই দিকে কান পাতলুম।

ইতিমধ্যে দু চারটে ছোঁড়া রাস্তা ক্রস্ করে মেয়েটার চতুর্দিকে দাঁড়িয়েছে। সে আস্তে আস্তে ফিস ফিস করে ওদের বললে, 'বোধহয় জর্মন-বোঝেন, কিন্তু বলতে পারেন না।'

আমি বললুম, 'বোধহয় তুমি জর্মন বলতে পারো, কিন্তু শুনতে পাও না।'

অবাক হয়ে শুধোলে 'কি রকম?'

আমি বল্লুম, 'গির্জার ঘড়িতে ঢং করে বাজলো একটা—বদ্ধ কালাও শুনতে পায়। আর তুমি আমায় শুধোলে কটা বেজেছে। গির্জার ঘন্টা যে শুনতে পায় না, সে আমার গলা শুনতে পাবে কি করে? তাইতো উত্তর দিই নি। তারপর ছোঁড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে বললুম, 'কি বলো, ভাইরা সব! ও নিশ্চয়ই লড়াইয়ে গিয়েছিল। সেখানে শেল্-শকে কালা হয়ে গিয়েছে—আহা বেচারী!'

সবাই তো হেসে লুটোপুটি। ইস্তেক মেয়েটি নিজে। একাধিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল; 'মেয়েছেলে আবার লড়াইয়ে যায় নাকি। তা-ও এইটুকু মেয়ে!' আমি গোবেচারীর মত মুখ করে বললুম, 'তা কি করে জানবো ভাই। আমি তো বিদেশী। কোন্ দেশে কি কায়দা, কি করে জানবো, বলো। এই তো তোমরা যখন ঠাহর করতে চাইলে, আমি জর্মন জানি কি না, তখন পাঠালে মেয়েটাকে। আমাদের দেশ হলে, মেয়েটা বুদ্ধি জোগাতো, কোনো একটা ছেলে ঠেলা সামলাবার জন্য এগোতো।'

একসংগে অনেকগুলো প্রশ্ন, 'আপনার দেশ কোথায়? যাবেন কোথায়?' ইত্যাদি।

আমার মাথায় তখন কলি ঢুকেছে। সংস্কৃতে বললুম, 'অহং বৈদেশিকঃ। মম কোঽপি নিবাসো নাস্তি। সর্বদা পরিভ্রমণমেব করোমি।'

দ্বিতীয়-মত

॥ রঞ্জন ॥

দিল্লীর সরকারী সাহিত্য আকদমীর সদম্ভ পদাঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বাঙালী 'বুদ্ধিমান'দের অশ্রু বিসর্জন ও বক্ষঃপীড়ন যদি সম্প্রতি শান্ত হয়ে থাকে, তবে সভয়ে নিবেদন করিঃ এ-কলংক বাঙালীর প্রাপ্য ছিল। আমি তো লেখক নই, সাংবাদিক মাত্র। সাহিত্যের সংবাদ সামান্যই রাখি; অতএব আমার মন্তব্যের ভিত্তি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নয়। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, বাঙলা সাহিত্য একবার যদি দিল্লীকে অধিকার দিয়ে থাকে, তাকে সম্মান করবার, তাহলে তাকে আমার অপমান করবার অধিকারও সেই সঙ্গে দেওয়া হয়ে গেছেঃ এবং অদাকার আর্তনাদ হাস্যকর। আশা করি, গত কয়েক সপ্তাহে বাঙলায় এ-ঘটনা উপেক্ষিত হয়নি যে উপহাস ছাড়া আর কিছু আমাদের মেলেনি এই লক্ষ-লিটার অশ্রুর বিনিময়ে।

"বাঙালীকে বাঙালী না মারিলে, কে মারিবে," এ-প্রশ্নের ব্যাপক পুনরুত্থাপন প্রত্যক্ষ করেছি। পুরস্কার বণ্টনে ও বঞ্চনায় সংস্কৃতি মন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের ভূমিকা সম্বন্ধে বিবিধ বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ এখানে ওখানে শুনেছি বা পড়েছি। বাঙালী লেখকদের ভগ্নহৃদয়ের অসংখ্য টুকরো এখনো কলকাতার পথে পথে ছড়ানো। গোষ্ঠীবিশেষের অপবাদ হয়তো একান্তই অর্জিত। কিন্তু আমি মূলে প্রশ্ন বিস্মৃত হইনি এক মুহূর্তের জন্যও: তাই আমার গোপন ব্যথা প্রত্যাখ্যান করেছে প্রকাশ্য বিলাপে অংশ গ্রহণ করতে।

*

সামান্য প্রশংসার দুর্লভ অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমি একেবারে অপরিচিত নই। নিন্দা তো আমার কপালে চন্দন। তাই জানি, আমাদের অধিকাংশের মধ্যে একটা সহজাত প্রলোভন আছে প্রশংসাকে নির্বিবাদে গ্রহণ করবার। প্রশ্ন করি, শুধু সমালোচকের যোগ্যতা সম্বন্ধে। নিন্দা পেলে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে অবজ্ঞা মিশিয়ে সোত্তর জিজ্ঞাসা করিঃ অমুকের মতামতের মূল্য কী? স্তুতির বেলায় শেষ কণাটুকু ভিখারীর মতো অঞ্জলি ভরে কুড়িয়ে নিয়ে অক্ষমতম সাহিত্যবেত্তাকে বলি— আহা, আপনার মতো রসজ্ঞ ব্যক্তিদের তুষ্টিসাধনের জন্যই না অধমের লেখনী-ধারণ! মনেও রাখিনে অধিকাংশ প্রশংসক প্রতারক। হয় সফল মন্ত্রী বা বড়ো সরকারী

চাকুরে বা স্বভাববিনয়ী, অর্থাৎ প্রিয়ভাষী। অনৃতভাষী বললে অপ্রিয়ভাষণ হতো।

আমার কথা এই যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বা প্রেমেন্দ্র মিত্রের আকাদমী পুরস্কার লাভে বাঙালী যদি একদা কৃতার্থ বোধ করে থাকে, তাহলে বর্তমান বৎসরের অবহেলিত অজন্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার অধিকার আজ আর নেই। আকদমীর বা তন্নিয়োজিত বিচারকদের সাহিত্যবুদ্ধি বা নিরপেক্ষতা একদিন যদি মেনে নিয়ে থাকি পুরস্কারের মূঢ় মোহে, আজ তাদের বিরূপ বিচার বাঙালীকে মাথা পেতে নিতে হবে। বিশেষ করে এইজন্যে যে, আর বছরে এমনি দিনে দিল্লী যখন উদার হস্তে কোনো ভাগ্যবান বাঙালী লেখককে আকদমী পুরস্কারের পাঁচহাজারী শিরোপা দেবেন, তখন তিনিই শুধু সলোল জিহ্বা প্রসারিত করে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করবেন না, সারা বাঙলাই নিজেকে অনুগৃহীত জ্ঞান করবে। কই, এত প্রতিবাদের মধ্যে একবারও তো এমন কথা শোনা যায়নি যে, এর পর থেকে কোনো বাঙালী লেখক আর আকদমী পুরস্কার গ্রহণ করবেন না?

*

বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও কথাটা সত্য যে, বাঙালীর আজ বড়ো দুর্দিন। সাহিত্যের জন্য আকদমী পুরস্কার না-পাওয়া তার দুর্ভাগ্যগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম। তার বৃহত্তম অভিশাপ এই যে, সে নিজেকে সম্মান করতে ভুলেছে, নিজেকে সমালোচনা করতে ভুলেছে। তার আত্মবিশ্বাস নেই; স্বমতে তার শ্রদ্ধা নেই। হুমায়ুন কবির বা তাঁর ক্রীড়নক আকদমিকে দোষ দেওয়া অতি সহজ; প্রমাণ করা আদৌ শক্ত নয় যে, শ্রী কবির কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বিরাজমান তাঁর স্বীয় গুণের কল্যাণে নয়, শুধু মাত্র তাঁর তথাকথিত 'ন্যাশনালিস্ট মুস্লিম' অতীতের জন্য (যেমন অন্যান্য বহু মন্ত্রী আছেন সমান অপ্রাসঙ্গিক কারণে), কিন্তু বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য কেন দাঁড়াতে গিয়েছিল মূর্খ বা স্বার্থান্বেষীর আদালতে? কারণ বাঙালীর চরিত্রহীনতা ও গৃধ্নুতা।

স্বীকার করা ভালো, সম্মান সুস্বাদু। পুরস্কার মুদ্রামূল্যে লোভনীয় হলে দুঃস্থতর লেখকের কাছে তার আকর্ষণ দুর্দম। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই নোবেল প্রাইজ পেয়ে যারপরনাই খুশি হয়েছিলেন; ইংরেজ সরকারের নাইটহুডও নিশ্চয়ই তাঁকে তৃপ্ত করেছিল, নইলে তিনি তা নিশ্চয়ই গ্রহণ করতেন না। একে আমি বলব, সাহিত্যিকদের অক্যুপেশনল ডিজীজ: পেশাগত ব্যাধি। তবু এমন ঘটনা ঘটে, যখন লেখক শুধু কল্পনাবিলাসী শিল্পী নন, মানুষ ও নাগরিকও। তখন তাঁর উপায় থাকে না পরিবেশের প্রতি উদাসীন থাকবার; তখন তাঁকে বলতে হয় তিনি ন্যায়ের পক্ষে না অন্যায়ের; কখনো বা তাঁকে ঘোষণা করতে হয়, তিনি শিল্প-বহির্ভূত এই জগৎ থেকে মানসিক অর্থে পদত্যাগপ্রয়াসী। তিনি শুধু Republic of Letters-এর নাগরিক।

*

এই বছরের অভিমান যদি অশ্রু আর অপবাদেই অবসন্ন হয়ে যায়, তাহলে আদৌ বিস্মিত হব না। আজকের বাঙালী চিন্তাধারায় চিন্তার পরিমাণ মর্মান্তিক-রূপে পরিমিত। আহত, স্বল্পায়ু আবেগ আজ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই চরিত্র-দৌর্বল্য আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে সঠিক প্রতিফলিত কি না জানিনে; বাঙালী সাহিত্যিকে এর প্রকোপ নিশ্চয়ই প্রকট। নইলে বর্তমান চিত্তদৈন্য অভাবনীয় হতো। নইলে একদল সাহিত্যিক অন্যের পুরস্কার-প্রাপ্তিতে বাদ সাধতেন না; অন্য দল পুরস্কার না পেয়ে আর্তনাদ করতেন না।

আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন বাঙালী লেখকের আশু কর্তব্য আত্মসমীক্ষা। রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দিল্লীতে কেন্দ্রীভূত হোক, ক্ষতি নেই। কিন্তু দেশের বিবেক ও বুদ্ধি কেন সেখানে আত্মবিক্রয় করবে? দিল্লীর অবহেলা অগ্রাহ্য করলে তার প্রশংসা প্রত্যাখ্যান করবার সাহস সঞ্চয় করতে হবে।

খড়ের চাল। দেওয়াল মাটির। গোবর-নিকনো মেঝে বাইরের জমি থেকে নীচুই হবে। ছোট ঘরখানার আসবাবও অতি সাধারণ। একদিকের দেওয়ালের গা ঘেঁষে একটা টেবিল। আধ-ময়লা টেবলক্লথের ওপর কেরোসিনের টেবল-ল্যাম্প একটি। আলোর সামনে, মোড়ার ওপর আনতমুখে যে-মেয়েটি বসে, বয়স তার পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। দুই গাল বেয়ে জলের রেখা মৃদু আলোয় চিকচিক করছে। অনেকক্ষণ ধরে নীরবে কেঁদেছে মেয়েটি। এখন শান্ত হয়ে এসেছে অনেকটা। কোলের ওপর দুই হাত জড়ো করে স্থির হয়ে বসে আছে আলোর দিকে তাকিয়ে।

পেছনের দেওয়ালে কালো ছায়া পড়েছে একটা—মেয়েটির ছায়া। অধিকাংশ সময় এই বোবা ছায়াটির দিকে তাকিয়ে থেকেছি আমি; মেয়েটির মুখের দিকে সরাসরি তাকাতে বড় মায়া হয়েছে। কখনো হয়ত দৃষ্টি ফিরিয়েছি খোলা দরজার বাইরে অন্ধকারের দিকে। পাইন গাছের পাতার তলা দিয়ে বহুদূরের আকাশে একটি জ্বলজ্বলে তারার দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছি অনেকক্ষণ। কিছুই বলবার নেই, কিছুই করবার নেই আমার। মেয়েটিরও সব কথা অশ্রুতে মুছে গেছে।......

এই একটি ছবি। অনেক বছর আগে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এ-ছবি দেখেছিলাম, আজও তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি স্পষ্ট মনে আছে। রঙের ঔজ্জ্বল্য এতটুকু ম্লান হয়নি। কালের প্রকোপে অস্পষ্ট হয়নি কোনো জায়গা। যে-হৃদয়াবেগে সেদিন আন্দোলিত হয়েছিলাম, ছবিটা মনে পড়লে, সেই একই অনুভূতিতে এখনও আপ্লুত হই।

মনের পর্দায় কি করে ছবি ধরা পড়ে, কি করে তা স্থায়ী হয়, জানা না থাকলেও, ছবি ধরে রাখবার বিজ্ঞানসম্মত আর এক উপায়ের চর্চা আমার অবসরের অবলম্বন। সেখানে রাসায়নিক প্রলেপ মাখানো পর্দার ওপরে ছবি ধরে, কি করে তাকে স্থায়ী করতে হয় সে-বিদ্যার শিক্ষানবিশী করেছি বহুকাল। সেখানে কোনো হেঁয়ালি নেই; কোনো নিরুত্তর প্রশ্ন নেই। সব কিছুই সেখানে কার্য-কারণ সূত্রে বাঁধা। বিশেষ পরিবেশের মধ্যে, প্রবহমান কালের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশকে বন্দী করে রাখবার সে এক নির্ভুল উপায়। কিন্তু, সময়ের ব্যবধানে, হৃদয়ের উত্তাপে, মনের-পর্দায়-ধরা ছবির অবয়বে যে নানা রঙের উন্মোচন হয়, তার তুলনা ফোটোগ্রাফীতে নেই।

এক এক সময়ে ভাবি, ফোটোগ্রাফীর খেয়াল মতে নিতান্ত মামুলী একটা খেলো নেশার দাসত্ব করছি আমি। বহু পরিশ্রমে দেশ-দেশান্তর ঘুরে যে রাশি-রাশি নেগেটিভ সংগ্রহ করে আনি তাদের মূল্য আর কতটুকু! অনেক অকিঞ্চিৎকর ঘটনা, অনেক অতি-সাধারণ বস্তুর তারা নিষ্প্রাণ দলিল মাত্র। গল্পে, কবিতায়, বর্ণসুষমাময় আলেখ্যে তাদের রূপান্তরিত করবার ক্ষমতা ফোটোগ্রাফীতে কোথায়!! আমার সযত্নরক্ষিত নেগেটিভের বাক্সগুলিতে হয়ত নানা রঙের কাহিনীর অনেক বীজ বন্দী হয়ে কাঁদে। পুষ্পিত তরুতে পরিণত হবার তাদের ক্ষমতাও নেই, দায়িত্বও নেই। মনের পরতে পরতে বহুদিন আগেকার-লাগা রঙ এতদিন পরে আবার হুবহু মেলে ধরতে পারে এমন কুশলতা আলোকচিত্রণ বিদ্যার নেই। কেননা, আমি যে-রঙের কথা বলছি, তা ত আর কেমিকেল রঙ নয়!

অনেক সময় আবার এমনও হয় [illegible] হৃদয়ের উত্তাপে লালিত যে-চিত্রটির চারি[illegible] দিকে একটি কাহিনী দানা বেঁধে আ[illegible] আমার মনে, সেই কেন্দ্রীয় ছবিটিরই কোনো [illegible] নেগেটিভ নেই আমার। যেমন, সেই বিষ[illegible] সন্ধ্যায় মৃদু-আলোয় দেখা ক্রন্দনর[illegible] মেয়েটির ছবি আর পেছনের দেওয়ালে [illegible] কালো একটা ছায়া। সে-দৃশ্যের কোনো [illegible] নেগেটিভ আমি সংগ্রহ করিনি; করবার [illegible] চিন্তাও করিনি। আছে রেটি, তাতে [illegible] মেয়েটি খুব হাসিখুশি মুখে বসে আ[illegible] তাদের চালাঘরের সামনে। তার কোলে [illegible] দুপাশে তিনটি শিশু। সকালের রোদ্দু[illegible] তির্যকভাবে এসে পড়েছে সকলের মা[illegible] আর পেছনের এবড়ো-খেবড়ো মাটি[illegible] দেওয়ালে। এ-ছবির সঙ্গে কোনো কাহিনী[illegible] সরাসরি যোগ নেই। তবু, নায়িকা এক[illegible] ব্যক্তি বলে, এই রাসায়নিক ছবিটি থেকে[illegible] প্রায়ান্ধকার ঘরের সেই রসঘন ছবিটিতে[illegible] মন উত্তীর্ণ হয় অবলীলাক্রমে। হ্যাঁ, মনের [illegible] পর্দায় আঁকা সেই ছবিটিকে ঘিরে কাহিন[illegible]

আছে একটা। কিন্তু বোস সাহেব যে সেরকম কিছু ধারণা করতে পারেন নি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পরোপকারী, বিচক্ষণ অফিসার মিঃ বোস। এই শৈল-শহরের ভদ্র সমাজে তিনি প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। খুব কাছ থেকে কয়েক বৎসর ধরে দেখেছিলেন মেয়েটিকে। তবু গল্পটার নাগাল তিনি পাননি।

বোস সাহেবদের এই শহরে কয়েকদিনের মেয়াদে এসেছি অন্য কাজে। ফোটোগ্রাফীটা এ-যাত্রা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। প্রধান কাজ শেষ হলে বাকি কটা দিন ধীরে সুস্থে অকাজ নিয়ে থাকব, এই ছিল পরিকল্পনা। এই শান্ত পরিবেশের মধ্যে ধূমকেতুর মত অকস্মাৎ আবির্ভূত হলেন বোস সাহেব।

যে-কাজে আমি এই শৈল-শহরে এসেছি, সেই একই উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন অনেকে। আগামী দু'দিন ভারী কনফারেন্স হবে এখানে। দুপুরে লাঞ্চ ও রাত্রে সমবেত ডিনারের ব্যবস্থা থাকবে প্রত্যহ। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে নিয়মিতভাবে চা, কফি ও কাজুবাদাম পরিবেশন করবে জমকালো পোশাক-পরা চাপরাশীরা। তারপরে, বহু লক্ষ কথা বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে, বহু কাগজপত্র ঘাটাঘাটির শেষে অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করে সভা ভঙ্গ হবে যথাসময়ে। অমনি, "সুভেনীর"-লোলুপ তাবৎ "ডেলিগেট" হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়বেন শহরের পণ্যবিপনিগুলিতে। অতঃপর, অতি গুরুদায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে, কর্মক্লান্ত দেহে যে যার ঘরে ফিরে যাবেন সরকারী খরচায়।

অভ্যর্থনা-বিভাগের ব্যবস্থা মত এক হোটেলে গিয়েই উঠেছিলাম প্রথমে। বিহার থেকে যিনি এসেছেন, তিনিও বাঙালী। তাঁর স্থান হয়েছে একই হোটেলে আমার পাশের ঘরে। হোটেলের ম্যানেজারের দফ্তরে আলাপ হয়ে গেল তাঁর আর তাঁর স্ত্রী ও বোনের সঙ্গে। মহিলারা এই সুযোগে বেড়াতে এসেছেন এই শৈল-শহরে। আমি ইতিপূর্বে একাধিকবার এখানে এসেছি শুনে অনেকটা স্বস্তি বোধ করলেন তাঁরা। টুরিস্টের দ্রষ্টব্য যাবতীয় বিষয়ের খবর আমার কাছ থেকে সহজেই সংগ্রহ করা যাবে।

দিনিসপত্র গুছিয়ে, মুখ হাত ধুয়ে পাশের ঘরে এসে বসেছি জোর্ট্র এক চায়ের নিমন্ত্রণে। প্রতিবেশীরা চা নিয়ে বসেছেন। আমাকে ডেকে এনেছেন সাদরে। শৈল-শহরের বিবিধ বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে। তার মধ্যে একটা অত্যন্ত জরুরী প্রশ্নের সদুত্তর তিন জনেই সন্ধান করছেন দেখলাম। তাঁরা শুনে এসেছেন এ-শহরের মেয়েরা নাকি ভাল নয়। মেয়ে বলতে তাবৎ মহিলা সমাজকে তাঁরা বোঝাতে চাইছেন না। তবে, সেই সব আদিবাসী জাতির মেয়ে যারা মিশনারীদের মাজাঘষায় খুব স্মার্ট হয়ে উঠেছে। এখানে নাকি সেজন্য সন্ধ্যার পরে বাইরে যাওয়া বিপজ্জনক। এমন কি, দিনে দুপুরেও......।

বেয়ারা এসে খবর দিলে, জনৈক মিস্টার বোস টেলিফোনে আমায় ডাকছেন। মিস্টার বোস? এ-শহরে ও এ-নামের আমার কোনো পরিচিত ব্যক্তি নেই। অভ্যর্থনা-বিভাগের কেউ হবেন এ-কথাই ভেবেছিলাম প্রথমে। কেননা, আমার আস্তানার খবর একমাত্র তাঁদের খাতাতেই লেখা আছে। কিন্তু সেই সংবাদ সংগ্রহ করে অন্য কোনো ব্যক্তি যে আমার মত অভাজনকে স্মরণ করবেন এতদূর কষ্ট-কল্পনা মাথায় আসেনি।

মিস্টার বোসের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করাটা এক অভিজ্ঞতা। "রিসিভার" কর্ণপটহ থেকে আধ হাত তফাতে রাখলে
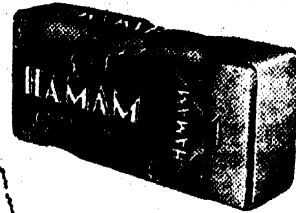
শ্রবণের কোনোই অসুবিধা হয় না, অথচ শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনা নিবারিত হয়। শুধু গলার আওয়াজ আর কথা বলার ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায়, অতিশয় স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, একরোখা প্রকৃতির লোক। কতদূর যে একরোখা, বুঝেছিলাম কিছুক্ষণ পরেই। টেলিফোনে একতরফা ভাবে তিনি গড়গড় করে বলে গেলেন--আমার আসার খবর তিনি পেয়েছেন; তাঁর পুত্র-পরিবার থাকেন কলকাতায়; গরীবের কুটিরে সাত আট খানা ঘর খালিই পড়ে থাকে। এ-অবস্থায় আমার মত একজন বাঙালীর হোটেলে ওঠাটা তিনি কিছুতেই সমর্থন করেন না। অতএব, আমাকে পাকড়াও করবার জন্য তিনি এখুনি আসছেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে বোস সাহেব উঠে এলেন আমার দোতলার ঘরে। ঘরে ঢুকেই, সম্পূর্ণ বিনা পরিচয়ে আমার প্রসারিত ডান হাতটা চেপে ধরলেন তাঁর বলিষ্ঠ দুই হাতে। যত্নে তৈরী করা দু'একটা সাফাই প্রবল বন্যায় ভেসে গেল তৃণখণ্ডের মত। সাদর নিমন্ত্রণ যে এরকম টানাহ্যাঁচড়ায় পরিণত হতে পারে এ আর দেখিনি। একবার ক্ষণিকের জন্য আমায় মুক্তি দিয়েছিলেন বোস সাহেব। সে শুধু আমার বিছানাটা গুটিয়ে হোল্ডলটা বেঁধে ফেলবার সময়ে। তারপরে, এক হাতে হোল্ডলটা ঝুলিয়ে যে-দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন সেই একই দৃষ্টিতে বাঘা উকিল প্রতিপক্ষের ছোকরা উকিলের দিকে তাকিয়ে দেখেন সওয়ালের শেষে।

অতি অল্প সময়ে বোস সাহেব তাঁর বাড়ির নির্দিষ্ট কক্ষে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কোথায় বাথরুম, কোথায় সুইচ, কোথায় কুঁজো, কোথায় জামা-কাপড়ের আলমারি, চরকির মত ঘুরে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে মহা এক দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত হলেন যেন। দুশ্চিন্তার তবু শেষ নেই। রান্নাঘরে চাকরবাকরেরা কি অনাসৃষ্টি করছে কে জানে! তাছাড়া শহরের দর্শনীয় স্থানগুলি কবে, কোন সময়ে আমাকে একবার দেখিয়ে আনবেন তার প্ল্যানও পাকা করে ফেলা দরকার।

যখন বললাম, ইমারত আর জলপ্রপাত, ঘোর দৌড়ের মাঠ আর "বিউটি স্পট" আমাকে তত আকর্ষণ করে না যত করে সাধারণ গরীব দুঃখী মানুষ--একটু আশ্চর্য হলেন বোস সাহেব। এই শহরেই কয়েক জাতের আদিবাসীর বাস। যদিও মিশনারীদের চেষ্টায় তাদের অনেকে খুব শহুরে, সভ্য হয়ে উঠেছে, তবু খোঁজ করলে কিছু সাদাসিধা মেয়ে-পুরুষ নিশ্চয়ই পাওয়া যেতে পারে। শহর থেকে দূরে এই আদিবাসীদের গ্রামে গিয়ে

থাকবার সময় যখন এ-যাত্রা হবে না, তখন শহরে বসেই বিকল্প ব্যবস্থার চেষ্টা করা ছাড়া গতি নেই।

স্পষ্টই বোঝা যায় এই ইতর-জনের রাজ্যে বিশেষ বিচরণ করেননি বোস সাহেব। তবু দমে যাবার পাত্র তিনি নন্। একটা কিছু ব্যবস্থা করতে পারবেন আশ্বাস দিলেন। সামনের দু'দিন আমি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকব। এরই মধ্যে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ তিনি করতে পারবেন।

যে-মেয়েটি এ কাহিনীর নায়িকা তার নাম যখন প্রথম উচ্চারিত হতে শুনেছিলাম, তখন টুং টাং করে নামটা যেন বেজে উঠেছিল মনের তারে তারে।

বোস সাহেব বলেছিলেন ড্রিম্ লামুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন আমার। চমৎকার মেয়ে। আদিবাসীদের পাড়ার তাদের সঙ্গেই থাকে। সকলেই খুব স্নেহ করে তাকে। লেখাপড়া শিখেছে কিছুটা
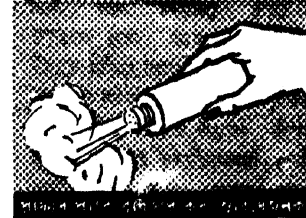
ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারে। তার চেনাশোনার মধ্যে আমার ফোটোগ্রাফীর উপাদান নিশ্চয় মিলবে।

ড্রিম লামুরে ......ইংরেজী ফরাসী মিশিয়ে যদি এ-দুটি শব্দের স্বচ্ছন্দ তর্জমা করি, তাহলে বাঙলা প্রতিশব্দটা দাঁড়ায় "প্রেমস্বপ্ন"। এত সুন্দর, এত সুরেলা নাম একটি আদিবাসী মেয়ের!......

মনে আছে, অনেকদিন আগে, নামের ঝঙ্কারে আর একবার এই রকম উচ্চকিত হয়েছিলাম। সিংহলে গিয়েছিলাম সেবার। উদ্যোগপর্বে, যখন ম্যাপ আর বই আর নোটখাতা নিয়ে গলদঘর্ম, তখন সহসা নানা নামের অরণ্য থেকে তীরের মত ছুটে এসেছিল দুটি নাম—ট্রিং কোমালী, মিহিনটালে। তার পরে, পিয়ানোর সুরের মত নাম দুটি সর্বক্ষণ বেজেছে আমার মনে। আজও কেন জানি না, সিংহল প্রসঙ্গে এই নাম দুইটি সর্বাগ্রে মনে এসে হৃদয়হরণ করে।

ড্রিম লামুরে বোস সাহেবের দফতরের "টি-গার্ল"। অর্থাৎ, বোস সাহেবের অফিসের সবাইকে অর্থমূল্যে চা যোগানো তার পেশা। এই শিল্প-শহরের হাত-কাঁপানো শীতের কথা কে না জানে। সব অফিসেই সেজন্য "টি-গার্লের" ব্যবস্থা আছে। দফতরের সংলগ্ন ছোট একটি ঘর তাদের হেপাজতে ছেড়ে দেওয়া হয় রান্নাঘরের মত ব্যবহারের জন্য। সেখানে, নিজস্ব সরঞ্জাম ও উপকরণে চা বানিয়ে তারা পরিবেশন করে সবাইকে। মাসের শেষে, প্রত্যেকে বিল চুকিয়ে দিলে কিছু লাভ থাকে। "টি-গার্ল"দের তাইতেই চলে যায়।

বাংলার বাইরে দুই চাকুরিয়া বাঙালী মিলিত হলে যে-প্রসঙ্গের আলোচনা অবশ্যম্ভাবী, নৈশ ভোজনের পর সেই বিষয়েই কথা হচ্ছিল বোস সাহেবের সঙ্গে। ভারতবর্ষের সর্বত্র ভদ্র জীবিকা থেকে বাঙালীরা কেন হটে আসছে এই আলোচনার সামান্য মোড় ঘুরিয়ে বোস সাহেব ফিরে এলেন ড্রিম লামুরের প্রসঙ্গে। বললেন, স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কিছু কিছু প্রবাসী বাঙালীর ব্যবহার এত গর্হিত যে সমস্ত বাঙালীরই তাতে মাথা হেঁট হয়ে যায়। এই ধরুন, ড্রিম লামুরের স্বামীর কথা।

ড্রিম লামুরের স্বামী! সে কি বাঙালী নাকি?

বাঙালী। তবে ঠিক স্বামী বলা যায় কিনা সন্দেহ!

ব্যাপারটা হেঁয়ালীর মত মনে হল। অথচ, হেঁয়ালী করবার ব্যক্তি বোস সাহেব নন। এই শহরের একটি আদিবাসী মেয়ে। জনৈক বাঙালী তার স্বামী, আবার স্বামীও নয়। আর একটু বিশদ করে বলতে বললাম বোস সাহেবকে।

অতঃপর যে-কাহিনীর তিনি উদ্ঘাটন করলেন, তা খুব আশ্চর্যও নয়, বিরলও নয়। তবে, বোস সাহেবের মনে যে সে-ঘটনা বিশেষ রেখাপাত করেছে তা সহজেই বোঝা যায়।

এখানকার আদিবাসীরা, বিশেষ করে আদিবাসী মেয়েরা, মিশনারীদের প্রযত্নে বহুদিন থেকেই বেশ সভাভব্য হয়ে উঠেছে। গাউন পরে, জুতো পরে, অল্পাধিকতর লেখা-পড়া জানে অনেকেই, পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায় স্বচ্ছন্দে। এইরকম মেয়ের দলের সাধারণ একটি মেয়ে ড্রিম লামুরে। স্বচ্ছন্দচারিণী ড্রিম্ লামুরে পড়ল এক তুখোড় বাঙালী ছোকরার খপ্পরে। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পাঁচ ছ বছর বাস করবার পর—ড্রিম লামুরের যখন দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে কোলে এসেছে—হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হল সেই বাঙালী ছোকরা। তারপরে আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি তার। সে প্রায় দুবছর আগেকার কথা। বোস সাহেব তখন এখানকার চাকুরিতে সবে বাহাল হয়ে এসেছেন।

প্রথম যেদিন বোস সাহেবের দফতরে ড্রিম্ লামুরের জন্য যে-কোন রকমের একটা চাকুরির উমেদারি করতে এসে তাঁর এক শুভাকাঙ্ক্ষী এই কাহিনী বোস্ সাহেবকে বলেছিল, রাগে, লজ্জায় সেদিন মাটিতে মিশে গিয়েছিলেন তিনি। মাথা একটু ঠান্ডা হলে, ড্রিম্ লামুরে ও তার তিনটি শিশু সন্তানের একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে দেবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, একজন বাঙালীর অপরাধ আর একজন বাঙালীর উদারতা দিয়ে মুছে দেবেন। সে-চেষ্টার ফল ফলেছে। ড্রিম্ লামুরে তাঁর অফিসে "টি-গার্লের" কাজে বাহাল হয়েছে স্থায়ী ভাবে। মাস গেলে, সে এখন একশো টাকার মত উপায় করে। ড্রিম্ লামুরের সংসার তাতেই মোটামুটি চলে যায়।

অনেকক্ষণ কোনো কথা বলিনি দুজনে। নানাবিধ অসংলগ্ন চিন্তা মনে আসছে, যাচ্ছে। এক সময়ে বোস সাহেব বলে উঠলেন, —কাল সকালে আসতে বলেছি লামুরেকে। দেখবেন, কী চমৎকার মেয়ে! আশ্চর্য আত্ম-নির্ভরতা। আমার স্ত্রী যখন এখানে ছিলেন, কত চেষ্টা করেছেন টাকাপয়সা দিয়ে জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করবার। কখনো কিছু নেয়নি মেয়েটা। দুই হাত জড়ো করে শুধু বলেছে—সাহেব আমাকে চাকরিটা দিলো; আর কিছু আমি নিলো না। এই-রকম ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে। বড় ভাল লাগে শুনতে।

একটু থেমে আবার শুরু করলেন বোস সাহেব। কতদিন ভোর রাত্রে আমার শোবার

ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে দেখেছি, সেই প্রচণ্ড শীতে কাঠের বোঝা পিঠে নিয়ে খালি পায়ে লামুরে ফিরে আসছে কাছাকাছি বন থেকে। এই শুকনো ডালপালা জড়ো করে রাখবে দফ্তরের চা-ঘরের এক পাশে। তার পরে ছুটবে দুমাইল দূরে তার বস্তিতে। তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করে, ছেলেপুলেদের স্নান করিয়ে, খাইয়ে, দুপুরটা তাদের আর কারো জিম্মায় রেখে, দশটার মধ্যে পৌঁছবে অফিসে। ছেলেমেয়েদের অসুখবিসুখ না হলে কোনোদিন তাকে লেট হতে দেখেনি।

ড্রিম্ লামুরের স্বামীর কথা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম বোস সাহেবকে। তাকে কি খুঁজে বার করবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছিল? একটু অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল বোস সাহেবের উত্তরে। একটা লম্পটের খোঁজ করতে যাওয়া যে তাঁর পক্ষে কতখানি সম্মানহানিকর সংক্ষেপে বললেন সে-কথা। বলে, গম্ভীর হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপরে, সহজ সুরেই বললেন, যদি ধরেও আনা যেত তাকে তা হলে সে যে আবার পালাত না তার কিই বা নিশ্চয়তা ছিল। লাভের মধ্যে হয়ত ড্রিম লামুরেকে আজ তিনটির জায়গায় চারটি শিশুর দায়িত্ব নিতে হত। নাঃ, এই ভাল হয়েছে—অনেকটা রায় দেবার ভঙ্গিতে বললেন বোস সাহেব। আপনিও ভেবে দেখুন, আপনিও ভেবে দেখুন, লামুরের স্বাধীনা হওয়া ছাড়া, নিজের পায়ে দাঁড়ানো ছাড়া এ-সমস্যার অন্য কোনো সমাধান নেই। তবে হ্যাঁ, গত দুবছর চলেছে বলেই যে বরাবর তার চলে যাবে এমন নাও হতে পারে। ছেলেমেয়েগুলি এখনও ছোট। লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের মানুষ করতে হলে, এখনকার আয়ে লামুরের কুলোবে না। মিশনারীদের সঙ্গে সেজন্য কথা বলেছি আমি। সামনের মাস থেকে বড় শিশু দুটিকে তারা অনাথ-আশ্রমে ভর্তি করে নেবে। অনেক নিরাশ্রয় শিশু এভাবে মানুষ হচ্ছে তাদের হেফাজতে। লামুরে প্রথমে অত্যন্ত অবুঝের মত কথা বলেছিল। বলেছিল, ছেলেমেয়েদের ছেড়ে সে থাকতে পারবে না। কাজ নেই তাদের লেখাপড়া শিখে, মানুষ হয়ে। তার উপার্জনেই যতটুকু হয় হবে। সে এক মহা যন্ত্রণায় পড়েছিলাম আমি। এত শক্ত, এত পরিশ্রমী মেয়ে। তবু এই প্রসঙ্গ উঠলেই ঝরঝর করে কাঁদে; কোনো কথা বলে না। যাই হোক, অনেক করে, অনেক বুঝিয়ে তার কাছ থেকে কথা আদায় করেছি। মিশনারীদের কাছে বড় ছেলেমেয়ে দুটিকে দিতে তার আর কোনো আপত্তি নেই।......

পরদিন বেশ ভোর ভোরই ড্রিম্ লামুরে এসে উপস্থিত। বাইরের বাগানে যে কাঠের বেঞ্চি পাতা তারই একপাশে বসেছিল জড়োসড়ো হয়ে। আমরা বাইরে আসতেই উঠে দাঁড়াল সসম্ভ্রমে।

ফর্সা রঙ, চ্যাপ্টা মুখ, খাঁদা নাক; কিন্তু

চোখ দুটি বড় সরল আর বড় উজ্জ্বল। নিতান্ত অপ্রস্তুতের মত মাটির দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। হাত দুটোকে নিয়ে যে কি করবে কিছুতেই স্থির করতে না পেরে অবশেষে ঢিপ্ করে এক নমস্কার করে বসল আমাদের।

বুঝতে কষ্ট হয় না অত্যন্ত সরল মেয়ে এই ড্রিম্ লামুরে। দু'চার পুরুষ ধরে মিশনারীদের চেষ্টা চললেও কিছুমাত্র কেতা-দুরস্ত হয়নি এখনও। আর তার শিক্ষক আছেন বোস সাহেব। লামুরের এই মেয়েলী সংকোচের ভাবটা তাঁর ভাল লাগে না। এরকম পায়ে পায়ে জড়ান মেয়ে দিয়ে দুনিয়ার কোন্ কাজটা হবে? বললেন সে কথা। বিশেষ করে, যে-কাজের ভার দেবার জন্য আজ তাকে ডেকেছেন তাতে চট্পটে না হলে যে কিছুতেই চলবে না।

অতি অল্প সময়েই কিন্তু সংকোচ কেটে গেল লামুরের। ফোটোগ্রাফী যে একটা উত্তেজনাকর ছেলেমানুষি খেলা তাতে তার আর সন্দেহ নেই। এইরকম অবস্থায় কাজে লাগে বলে আমার পকেটে সর্বদাই কয়েকটা মাউন্ট-করা রঙীন ফোটোগ্রাফ রাখি। সেগুলো দেখে, আনন্দে আকুলিবিকুলি করতে লাগল সরল মেয়েটা। ছবি উঠবে তার; ছবি উঠবে বস্তির আর সকলের। সাধারণ ছবি। রঙিন ছবি। তার কপি পাওয়া যাবে বাড়িতে বসে, বিনামূল্যে—এ এক আশ্চর্য প্রস্তাব। আজ সকাল দশটায় দফ্তরে হাজির হয়ে তাকে যে কাঠের আগুনে উনুন ধরাতে হবে একথা সে হয়ত সম্পূর্ণ বিস্মৃতই হত, যদি না বোস সাহেব মনে করিয়ে দিতেন যে তার আজ বারোটায় অফিসে গেলেও চলবে; ঘণ্টা দুয়েকের জন্য অন্য ব্যবস্থা তিনি করেছেন। আর, আগামীকাল ত রবিবার; ছুটি।

মাথার ওপর দিয়ে ঘোমটার মত যে কালো ওড়নাখানা কাঁধ বুক ঢেকে গাউনের ওপর এসে পড়েছিল, তাকে ঠিকঠাক করে নিয়ে মহা উৎসাহে উঠে দাঁড়াল ড্রিম্ লামুরে। এখুনি বেরিয়ে পড়বার জন্য সে তৈরী।

ছেলেমানুষি আনন্দে ড্রিম্ লামুরেকে যতই কেন না উচ্ছ্বসিত দেখি, যতই কেন না সরল মনে করি তাকে, তার স্বজাতীয়াদের কিন্তু এই শৈল-শহরের প্রবাসী ভদ্র বাঙালীরা কেউ সুনজরে দেখেন না। বড় সস্তা নাকি তারা; রাজি নাকি হয়ে যায় বড় সহজেই। কী ঘোরতর অন্যায় কথা! অনেক খেলিয়ে, অনেক অর্থব্যয় করিয়ে, দীর্ঘদিন ধরে অগণিত প্রার্থীর মধু আহরণ করে তবে রাজি হওয়াটাই ভদ্র প্রথা। এই বর্বর ললনারা নাকি তা করে না। দুষ্মন্তের এক কথায় শকুন্তলার মত রাজি হয়ে যায় সহজেই। অসভ্যতার চরম ছাড়া আর কি!

বোস সাহেবও এ-কেচ্ছা একদিন করেছেন এক ফাঁকে। তাঁর বাড়ির পথে কখনও কখনও একটা মাঠ পার হয়ে আসতে হয় তাঁকে। তারই এক প্রান্তে আদিবাসীদের বস্তি। সন্ধ্যার পরে সে-পথে কোনো ভদ্রব্যক্তি হাঁটতে পারেন না। খুবই সত্যি কথা হয়ত। সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে, পল-কাটা কাচের গেলাসে তারা মদ্যপান করে না; ছেঁড়া মাদুরে বসে মাটির ভাঁড় মুখে চেপে ধরে দুহাতে। আরও লজ্জার কথা, মদ্যপানজনিত আনন্দে নাকি তারস্বরে গান গেয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। কখনো বা মাঠে নেমে প্রতি-দ্বন্দ্বীর সংগে লড়াই করে আস্তিন গুটিয়ে। চুপচাপ করে সব করলেই ত পারে! ঢেকে-ঢুকে না করাটাই যে বর্বরতা একথা তাঁরা কতদিনে, হায় কতদিনে, বুঝবে!......

ভদ্র-জীবনযাত্রার এই গূঢ় তত্ত্বে বিব্রত না হয়ে, সেই আশ্চর্য সোনালী সকালে, ড্রিম লামুরেদের পাড়ার দিকে দুটুকরো হাল্কা মেঘের মত ভেসে চলেছিলাম দুজনে। একটু বিপত্তি ঘটল পথে। বড় রাস্তায় পড়েই মুখোমুখি দেখা সেই হোটেলের ভদ্রলোকের সংগে। সংগে তাঁর স্ত্রী আর ভগ্নী। অতিশয় সুসজ্জিত অবস্থায় তাঁরা বায়ু-সেবনে বেরিয়েছেন। আমাকে এই বহু-নিন্দিত আদিবাসী সমাজের এক যুবতীর সংগে দেখে, তিন মূর্তি স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন রাস্তার এক পাশে। বিস্ময়, সন্দেহ, হতাশার এরকম যুগপৎ নিরুচ্চার প্রকাশ আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাঁরা যে শুনে এসেছিলেন দিনে দুপুরেও এসব ঘটনা ঘটে এ-শহরে, সে তা হলে নিতান্ত কল্পনা নয়। কিছু দূর এগিয়ে, পিছন ফিরে তাকিয়েছিলাম একবার। তখনও তাঁরা চলৎ-শক্তি ফিরে পাননি; বাক্শক্তিও নয়। যখন হয়ত পেয়েছিলেন, ততক্ষণে আমরা লামুরেদের বস্তির দিকে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছি।

আদিবাসী পাড়ায় দুটো দিন যে কোথা

আমার স্বামীটা বড় ভাল ছিল সাহেব

দিয়ে কেটে গেল টের পাইনি। কত কৌতূহলে উদ্ভাসিত চোখ, কত আনন্দ-উজ্জ্বল মুখ। পৃথক করে এখন আর কাউকে মনে নেই। মনে আছে শুধু জনতার সামগ্রিক রূপটা আর এই অবিন্যস্ত জনতার মধ্যে সতত সঞ্চরণশীল ড্রিম্ লামুরেকে। কঠোর পরিশ্রম কত হাসিমুখে, কত অবলীলাক্রমে যে করা যায়, সেকথা বুঝি ড্রিম্ লামুরেকে না দেখলে বোঝা যায় না।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বোধ করেছি, লামুরেকে বলতে হয়নি সেকথা। কাজ থামিয়ে, জনতাকে অপেক্ষা করতে বলে, আমাকে আমন্ত্রণ করে এনেছে তার কুঁড়ে ঘরখানিতে। মাথার ওড়না দিয়ে পরিষ্কার করে, মোড়া এগিয়ে দিয়েছে বসতে। অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বলেছে ঘর-দোরগুলো বড় ময়লা রইল; সাহেবের অসুবিধা হল খুব।

ভাঙা ভাঙা বাংলা যে কত মিষ্টি শোনায় সেকথা বুঝেছিলাম ড্রিম্ লামুরের কথা শুনে। এক নিমেষের মধ্যে গরম চায়ের পেয়ালা হাজির করে যখন সে হাসিমুখে বলেছে—এইবার সাহেব এই চা'টা খেলো, তখন আপত্তি করবার কথাই ভাবিনি; ব্যাকরণের কথাও নয়। একটু থেমে হয়ত বলেছে—মানুষদের চা খাওয়ানোই ত আমার কাজ হল। আর, অনাবিল আনন্দে ভেসে গেছে তার মুখ আর তার উজ্জ্বল দুটি চোখ।

ড্রিম্ লামুরের সঙ্গে একটু অন্তরঙ্গ হতেই বুঝলাম, এ-সন্দেহ তার মনে বদ্ধমূল যে বোস সাহেবের কাছে তার পারিবারিক জীবনের সব কথা আমি নিশ্চয়ই শুনেছি। দ্বিতীয় দিনের কাজের শেষে, সন্ধ্যাবেলায় তার কুঁড়েঘরখানায় এসে বসেছি এক কাপ চায়ের নিমন্ত্রণে। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করে বসল কথাটা। আমি কি শুনেছি তার সব কথা বোস সাহেবের কাছ থেকে?

সত্য গোপন করলাম না, তবু এই মেয়েলী কুণ্ঠা আশা করিনি ড্রিম্ লামুরের কাছ থেকে। বোস সাহেবের অবিশ্রাম তালিম মাফিক সে আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে দৃঢ়ভাবে। আত্ম-প্রতিষ্ঠিতা সে। অন্তত, বোস সাহেব সেকথা বিশ্বাস করেন মনে প্রাণে। এখন তার বিগত দিনের কাহিনী অন্য কেউ জানুক বা না জানুক তাতে তার কী আসে যায় এইরকম একটা মনোভাবই তার কাছে আশা করেছিলাম।

চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে, আর একটা মোড়া টেনে ড্রিম লামুরে এসে বসল ছোট টেবিলটার কাছে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। কেরোসিনের একটা টেবল-ল্যাম্প জ্বলছে টেবিলটার ওপরে। খোলা দরজার বাইরে শীতার্ত অন্ধকার। পেছনের দেওয়ালে সেই কালো ছায়াটা।

দুই করতলে চিবুক রেখে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল ড্রিম্ লামুরে। তারপরে, ধরা গলায়, সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতের মত ধীরে ধীরে বলল—আমার স্বামীটা বড় ভাল ছিল সাহেব। ছ'টা বচ্ছর আমার কাছে রইল। আমার খুব ভাল লাগল। তারপরে, চলে গেল একদিন।......উদ্গত অশ্রু আর বাধা মানল না; ঝরঝর করে ঝরে পড়তে লাগল লামুরের দু'গাল বেয়ে।... ...

একটু শান্ত হলে, লামুরেকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন তার স্বামী চলে গেল এইভাবে। সমস্ত দোষটা সে দিল স্বামীর ইয়ার-বন্ধুদের ওপরে। তাদের পাল্লায় পড়ে মদ খেতে শিখেছিল শেষের দিকে। ধার-দেনাও করেছিল বিস্তর। নেশার ঝোঁকে কতদিন মারপিট করছে তাকে, মারপিট করেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে। তবু এরকম স্বভাব ত তার কখনো ছিল না। আরও কিছুদিন থাকলে, নিশ্চয়ই তাকে শোধরাতে পারত ড্রিম্ লামুরে।.....

সেদিন রাত্রে, জীর্ণ কুঁড়ে ঘরখানার বাইরে ড্রিম্ লামুরের কাছ থেকে যখন বিদায় নিয়ে এলাম, একটু বিষণ্ণ হাসি মুখে টেনে এনে সে বলেছিল—এসব কথা যেন বোস সাহেবকে আমি না বলি। পথে আসতে আসতে ভেবেছিলাম, বোস সাহেবের প্রতি অনুকম্পাবশতও এ-কাহিনী তাঁকে না শোনানই ভাল হবে। তিল তিল করে গড়া তাঁর এই স্বাধীনার অন্তরটা যে এখনও এত নরম একথা শুনলে তাঁর আর পরিতাপের অন্ত থাকবে না।

বোস সাহেবকে কোনো কথাই আমি বলিনি। এ-লেখা যে তিনি দেখবেন, সে-আশংকাও কম। —কেননা, বাঙলা সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে বাঙালী সাহেবসুবোদের সম্পর্ক যে অহি-নকুলের—এরকমই ত জনশ্রুতি।

(২১)

সৌরেন বিস্মিত হল, এ সময় তো কারুর আসবার কথা নেই, কে হঠাৎ আসতে পারে।

ততক্ষণে রজত বোস করিডোরে ঢুকে পড়েছে।

সৌরেন খুশী হয়ে বলল, আরে রজত, তুই?

রজত মিটিমিটি হাসল, কিরকম তোকে অবাক করেছি বল?

—তা করেছিস, এই বোধ হয় প্রথম তুই, আমার ঘরে এলি।

—তাও এলাম না বলে কয়ে। তবে একটু আগে ফোনে জিজ্ঞেস করে নিয়েছিলাম, তুই বাড়িতে আছিস্ কিনা।

—তাই নাকি?

দুই বন্ধুতে গল্প করতে করতে উপরে উঠে গেল। রজত জিজ্ঞেস করে, তোর সুন্দরী বান্ধবী তো এই বাড়িতেই থাকে, না?

হ্যাঁ, পাশের ঘরে।

রজত বাঁ চোখটা বড় করে তাকায়, মুখে তার অর্থপূর্ণ হাসি, দিব্যি আছিস্। কই ডাক্ না।

—এলিজাবেথ লণ্ডনে নেই, আজই দেশে গেছে।

—তাই বুঝি বিরহে মুখখানা শুকিয়ে গেছে। চল আমার সংগে।

—কোথায়?

রজত পাইপ ধরালো, 'মহাসাগরের নামহীন কূলে'—

সৌরেন বুঝতে পারে না, কি বলছিস্?

—জীবন দেখবি চল্।

সৌরেনের গলায় বিরক্তি ফুটে ওঠে, মিথ্যে হেঁয়ালী করছিস্ কেন, স্পষ্ট করে কথা বল্ না।

রজতের চোখে বিদ্রূপ চিক চিক করে, লণ্ডনে এতদিন এসেছিস দেখলি তো তার চাকচিক্য। যাকে অনন্ত যৌবনা উর্বশী বলে তোর মনে হচ্ছে, তাকে একবার ভালো করে কাছ থেকে দেখবি আয়, আর কিছু না হোক, মোহটা তোর কেটে যাবে।

—কি করে?

রজত জ্যোতিষীর মত গম্ভীর গলায় বলে, বুঝতে পারবি, যাকে তুই ষোড়শী ভাবছিলি সে বিগতযৌবনা।

সৌরেনের এসব কথা শুনতে যে খুব ভাল লাগছিল তা নয়, তবে একলা এ বাড়িতে বসে থাকা তার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিল। তাই রজতের প্রস্তাবে সে উৎসাহ দেখিয়ে বলে, চল, আজ তোর সংগেই বেরব।

রজত কিন্তু চেয়ার থেকে উঠল না, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, পকেটের অবস্থা কেমন?

সৌরেন ইংগিত বুঝতে পেরে বলে, আজ মাইনে পেয়েছি।

—পাউণ্ড তিনেক সংগে রাখিস্, খরচা লাগবে।

—আছে। বলে সৌরেন আড়চোখে রজতের দিকে তাকায়।

রজত হাসল, আমি আজ একেবারে 'ব্রোক', পকেট গড়ের মাঠ। তাইতো তোর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছি।

—আমি যদি তোর সংগে না বেরতাম?

—অগত্যা ধার চাইতে হ'ত।

সৌরেন তৈরী হয়ে নিয়ে রজতের সংগে বেরিয়ে পড়ল। বেশ অন্ধকার। রাস্তার আলো মনে হচ্ছে আরও বেশী হলে ভালো হ'ত। প্রায়ই বড় বড় গাছের ছায়া পড়েছে। এ যেন আলো আর আঁধারের খেলা। দিনের আলোর মধ্যে যেসব চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না, যেসব কল্পনাকে অবাস্তব বলে মনে হয় এমনি একটা পরিবেশে তারা যেন আরও দানা বাঁধে, মনে জাগিয়ে দেয় অজানাকে জানবার অতি উগ্র বাসনা। জমাট অন্ধকার হলে মনের এই দোলন থেমে যায়। সেখানে জেগে ওঠে সংশয়, যে প্রলোভন মাথা চাড়া দিয়ে উঁকি মারার চেষ্টা করে তার পেছনে লুকিয়ে থাকে ভয়। তাইতো জমাট অন্ধকারকে মৃত্যুর মত কালো মনে হয়।

এই আলো ছায়ার ঘেরা রাস্তায় তারা পাশাপাশি হাঁটছে। সৌরেন আর রজত। দুজনেই চুপচাপ। কারুর মুখে কথা নেই। কিন্তু মন তাদের মৌন নয়, মুখর। সৌরেনের জীবনের অনেকগুলো অন্ধকার জায়গা এই ক'মাসের মধ্যে আলোকিত হয়েছে। তাই অজানাকে জানবার আগ্রহ তার এত বেশী। কিন্তু রজতের মনে বিশেষ কোন কৌতূহল নেই। আলো দেখলে সে হাসে, জানে তার নীচেই অন্ধকার সবচেয়ে বেশী।

সৌরেন মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে, মারিয়া নেই বলে আজকাল বুঝি দু'হাতে পয়সা ওড়াচ্ছিস্?

রজতের সহজ উত্তর, পয়সা নেই তা আবার ওড়াব কি?

—কেন আজ মাইনে পাস্‌নি?

—চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

সৌরেন বিস্মিত হয়, কবে?

—কিছুদিন হ'ল।

—কেন?

—ভাল লাগে না। শুধু দুবেলা খাওয়ার জন্যে উদয়াস্ত চাকরি করা আমার কাছে ঘৃণা মনে হয়।

—না করেই বা উপায় কি?

রজত তার চলার গতি মন্থর করল, সম্পূর্ণ অচেনা-কণ্ঠস্বরে বলে ওঠে, মানুষ কেন চাকরি করে জানিস? কেন দিনরাত পয়সা বানাবার জন্যে খাটে? যাতে বুড়ো বয়েসটা তার সুখে কাটে, নির্ভাবনায়। তাই যৌবনটাকে সে উপেক্ষা করে, তার চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করে না। আমি ঠিক তার উল্টো দিক দিয়ে ভাবি সৌরেন, যৌবনটাকে আমি উপভোগ করতে চাই। হৈ চৈ আনন্দের মধ্যে দিয়ে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই। কোনরকম বিধি-নিষেধের মধ্যে আমি নিজেকে বেঁধে ফেলব না। আমি উদ্দাম, আমি চঞ্চল। কথাগুলো শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও সৌরেনের ভালো লাগছিল। তবু জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু তারপর?

রজত হাসল, ভাবছিস বুড়ো বয়েসের কথা? হয়ত কষ্ট পাব, কিন্তু সে আর ক' বছর। তখন এই যৌবনের স্মৃতিই আমায় বাঁচিয়ে রাখবে। আবার কে বলতে পারে, বুড়ো হবার আগেও তো মরে যেতে পারি।

—আশ্চর্য তোর ফিলসফি।

—আমি কিন্তু মনে প্রাণে এই ফিলসফিতেই বিশ্বাস করি, ওটা শুধু আমার মত নয়, পথও।

আবার ওরা চলতে শুরু করে। রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি জোরে চলে গেল, বোধ হয় ট্যাক্সী। ট্যাক্সীর গতি সৌরেনের মনে প্রশ্ন জাগাল, ওরা কি হেঁটেই যাবে? কিন্তু কতদূর তা তো রজত বলেনি, তাই জিজ্ঞেস করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি।

—মনে কর না নদীর ধারে কোথাও, টেমসের কাছে।

—বাস ধরবে?

—না 'টিউব' নেব।

—ওখানে কারা থাকে?

রজত পাইপের ছাইটা ঠুকে ঠুকে ফেলে দিল, সেখানে আমার বন্ধুদের সঙ্গে তোমার দেখা হবে। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই আমার ফিলসফিতে বিশ্বাস করে। ওমর খৈয়াম-এর মত বলে, নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক, দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।

সৌরেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রজত বুঝতে পারল ওদের আড্ডার কথা শুনে সৌরেন মনে মনে খুব আশ্বস্ত হতে পারছে না, তাই বুঝিয়ে দিয়ে বলে, ভয় নেই রে ওখানে তোর সঙ্গে দেখা হবে মাইকেলের, মাইকেল আর্টিস্ট, ছবি আঁকে। দেখা হবে লরা'র, খুব মিষ্টি দেখতে। পরিচয় হবে কানা জোনস্‌-এর সঙ্গে, ও বাজনা বাজায়। ওখানে আছে ফোটোগ্রাফার, আছে অভিনেতা অভিনেত্রী, আছে অনেকে, কিন্তু মজা কি জানিস, তুই যখন প্রথম আমাদের আড্ডায় পা দিবি তখন থেকেই মনে হবে, এখানকার লোকগুলো তোর বহুদিনের পরিচিত।

সৌরেন ছোট্ট উত্তর দিল, হয়ত হবে।

রজত জোর দিয়ে বলে, হয়ত নয়, হবেই। কারণ—

রজত অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে ধীর উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে,

"মহাসাগরের নামহীন কূলে
হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই
জগতের যত ভাঙা জাহাজের ভীড়।
মাল বয়ে বয়ে ঘাল হল যারা
আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির,
আর যাহাদের পাল পুড়ে গেল
বুকের আগুনে ভাই,
সব জাহাজের সেই আশ্রয়-নীড়।"

রজত দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কবি বোধ হয় এদের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এদের কোন দুঃখ নেই, এরাই সুখী। জীবনকে এরা উপলব্ধি করেছে। সৌরেন কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু রজতের গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল, কথা বলার সাহস পেল না।

চিত্রাঙ্গদা অভিনয়ের পর প্রায় দু' মাস কেটে গেছে।

মাত্র আট সপ্তাহের ব্যবধান অথচ এরই মধ্যে কত না পরিবর্তন ঘটেছে সরোজ রায়ের জীবনে। আজ তাকে দেখলে বোঝাই যায় না এ সেই সরোজ রায়, যে না থাকলে লন্ডনে কোন রকম ভারতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। ভাবা যায় না এরই ফ্ল্যাটে ক'দিন আগেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা রিহার্সাল আর আড্ডা চলতো; তাদের হৈ চৈ এর মাত্রা বেড়ে গেলে উপর আর নীচের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা মেঝের

উপর লাঠি ঠুকে সতর্কবাণী পাঠাতো। 'সুইস কটেজের' এই সুপরিচিত হট্টগোলের ফ্ল্যাট হঠাৎ যেন গৃহস্থের বাসাবাড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর সেই সদাব্যস্ত আমুদে সরোজ রায় বদলে গেছে। বড় বেশী গম্ভীর কেমন যেন মনমরা।

অনাদের চোখে এ পরিবর্তন বিসদৃশ মনে হলেও সরোজ রায়ের নিজের তা মনে হয়নি। সে ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়। তাদের যৌথ পরিবারের আনন্দোচ্ছল জীবনের উপর এমনি করেই একদিন পার্টিশানের কালো পর্দা নেমে এসেছিল, সেদিনও সরোজ এমনি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, আর ক'লকাতায় থাকতে তার এতটুকু ভাল লাগত না। লণ্ডনে এসে এতগুলো ছেলেমেয়েকে নিয়ে যে দল সে গড়ে তুলেছিল তা' যে এত তাড়াতাড়ি এমনি-ভাবে ভেঙে যাবে সরোজ রায় ভাবতে পারেনি, কিন্তু মনের কোণে কোথায় যেন একটা লুকোন আশংকা বরাবর ছিল। এ আশংকা 'ভাঙার' এ আশংকা 'হারানোর', এ আশংকা 'মিথ্যে হয়ে যাওয়ার'।

সরোজ রায় ছোটবেলা থেকে ছিল আদর্শ-বাদী। মানুষের মধ্যে যে মহত্ত্ব যে কারুণ্য অনেকের চোখে পড়ে না, সরোজ রায় তাকে খুঁজে বার করত, সশ্রদ্ধ চিত্তে তার কাছে মাথা নামাত। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতাকে কাটিয়ে সে চেয়েছিল মনুষ্যত্ব-লোকে উত্তীর্ণ হতে যেখানে সে বিচক্ষণতার নিষেধ না মেনে হৃদয়ের ডাকে সাড়া দিতে পারবে।

কিন্তু তার এই আদর্শবাদ হোঁচট খেল পারিবারিক দ্বন্দ্বের পাথরে। মনে সে কষ্ট পেয়েছে, পৈত্রিক বাড়িতে থাকতে না পেরে সে পালিয়ে এসেছে, তবু সে বিশ্বাস হারায় নি। লণ্ডনের সরোজ রায়কে আদর্শবাদী বলে চিনতে না পারলেও সে যে আশাবাদী একথা অতি বড় নিন্দুকেও অস্বীকার করতে পারেনি। সেইজন্যেই বোধহয় তাকে এভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে দেখে অন্যেরা এতখানি আশ্চর্য হয়েছে।

সরোজ রায় নিজেও বোধহয় কম আশ্চর্য হয়নি, একটা অতি সামান্য কারণ থেকে যে এত বড় ব্যথার সৃষ্টি হতে পারে তা সে ধারণাও করতে পারেনি।

আশাবাদী সরোজ রায় বাস্তবের মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল। বিশেষ করে আরও এই জন্যে, যাদের সে ভালো বেসেছিল, স্নেহ ও প্রীতির চোখে দেখেছিল, সেই লীলা আর প্রমীলা দুই বোনের মধ্যে যে মন কষাকষির কুয়াশা জমে ঘন হয়ে উঠল তাকে কেন্দ্র করে, সে অভিজ্ঞতা সরোজের কাছে যেমনি অপ্রীতিকর তেমনি পীড়াদায়ক।

দিনের পর দিন কাজকর্মের শেষে রাত্রে ফ্ল্যাটে বসে তার নিজেকে মনে হয়েছে বড় রিক্ত, বড় অসহায়। অবুঝের মত তার চোখে জল এসেছে, কিন্তু আত্মবিশ্লেষণ করলে সরোজ রায় দেখতে পেত এ চোখের জলের সবটুকুই তার নিজের জন্যে নয়, তার অনেকখানিই বোধহয় লীলা আর প্রমীলার জন্যে। এই প্রবাসী দুটিকে সত্যিই সে বোনের মত স্নেহ করত। সেই স্নেহের কোন রূপান্তর ঘটেছিল কিনা হয়ত বলা শক্ত, কিন্তু একথা সত্যি প্রমীলার চরিত্রের নির্ভীকতা, তার ঋজু বলিষ্ঠ মতামত সরোজকে অভিভূত করেছিল।

প্রমীলা সম্বন্ধে সরোজ যে আশংকা করেছিল তা যে নির্ভুল প্রমাণ হল কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। জোর করে সে যেন নিজেকে পৃথক করে ফেলল, পরিচিত জনের কাছ থেকে। স্থির করল 'কার্ডিফে' পড়তে যাবে সোস্যাল সায়েন্স, মাত্র কয়েকদিনের প্রস্তুতি, তারপরই তার যাওয়ার দিন নির্দিষ্ট হয়ে গেল। ইতিমধ্যে সে ক'লকাতা থেকে অনুমতি আনিয়েছে, হাই কমিশনার অফিসে প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করেছে, ভর্তি হয়েছে 'কার্ডিফে'র কলেজ।

তারপর এল বিদায় নেবার পালা।

সেদিন শনিবার। সরোজ রায় একলা ড্রইং রুমে বসে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিল। আজ ছুটি, তবু ঘণ্টাখানেক বাদে বেরতে হবে, এক বিদেশী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে।

দরজায় বেল বাজতে সরোজ রায় উঠে গিয়ে খুলে দিল, কিন্তু সামনে প্রমীলাকে দেখে তার আর বিস্ময়ের অবধি রইল না। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, একি প্রমীলা, তুমি!

প্রমীলার মুখে ক্লান্ত হাসি, দেখা করতে এলাম সরোজদা।

—ঘরে এস।

—চলুন।

প্রমীলা স্বচ্ছন্দ গতিতে ড্রইং রুমে এসে সোফার ওপর বসল। এতটুকু আড়ষ্টতা নেই, চারদিকটা তাকিয়ে বলল, আমাদের মত ভূতের উপদ্রব কমে যাওয়ায় ঘরদোর বেশ পরিষ্কার রেখেছেন দেখছি। সত্যি, কি হুটোপাটিই আমরা করতাম। এতদিনে বোধ হয় শান্তি পেয়েছেন।

উত্তর দেবার কিছু ছিল না। সরোজ প্রমীলাকেই লক্ষ্য করে। মাঝখানে, কিছুদিন প্রমীলাকে তার বয়েসের চেয়ে অনেক বড় মনে হচ্ছিল, চাল চলন কথাবার্তা সবের মধ্যে কিসের যেন গাম্ভীর্য। কিন্তু আজ যে এসেছে আগের সেই ছোট্ট মেয়েটির মত, যাকে দেখে সরোজ ঠাট্টা করে বলত খুকী তুমি একলা একলা এলে কি করে এত দূর দেশে।

প্রমীলা হেসে বলত, আমাকে খুকী বললে কি হবে, আপনি নিজেই যে বুড়ো খোকা।

কিন্তু সরোজ আজ কিছুতেই প্রমীলার মত সহজ হতে পারল না, আড়ষ্ট স্বরে জিজ্ঞেস করল, কিছু খাবে প্রমীলা?

প্রমীলা খিল খিল করে হাসল, কেন, তাহলে বুঝি আমার জন্যে রান্না করতে উঠবেন, আপনার যেমন বুদ্ধি। ঐ জন্যেই তো বুড়ো খোকা বলি।

গায়ের কোটটা খুলে এক কোণায় রাখা ডিভানের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রমীলা চঞ্চল ছন্দে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আপনি কিন্তু ধরেছেন ঠিক, সত্যি আমার খিদে পেয়েছে। দেখি আবার রান্নাঘরে কিছু আছে কিনা।

—কয়েকটা ডিম আর খানিকটা হ্যাম পেতে পার।

—তাহলেই হবে, আশা করি মাখন রুটি বাড়ন্ত নয়।

প্রমীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে অজান্তে সরোজের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। যে বন্ধুর কাছে যাবার কথা ছিল টেলিফোন করে জানিয়ে দিল আজ সে যেতে পারবে না। কিছুক্ষণ বাদে রান্নাঘরে ঢুকে দেখে প্রমীলা মহা উৎসাহে ডিম ফাটিয়ে তার মধ্যে হ্যামের টুকরো দিয়ে অমলেট তৈরী করছে। সরোজ ঠাট্টা করে বলল, রান্নাবাড়ার এত উৎসাহ তো আগে দেখিনি।

প্রমীলা কাজ করতে করতে উত্তর দিল, এখন থেকে একলা থাকতে হবে, লীলার ওপর ভরসা করলে তো চলবে না। এমন কি আপনার ওপরও না। অগত্যা হাত পুড়িয়ে রান্না শিখছি।

—কালকেই যাওয়া।

—হ্যাঁ, সকালের গাড়িতে।

সরোজ রায় সিগারেট ধরালো, যদিও কার্ডিফে আমি যাইনি, তবে শুনেছি জায়গাটা ভাল।

—ভাল হোক মন্দ হোক তাতে কিছু আসে যায় না, লণ্ডন নয়, ওটা অন্য জায়গা। তাইতেই আমি খুশী।

—সত্যিই তুমি খুশী প্রমীলা?

প্রমীলা মুখ ফিরে তাকাল, সহজ গলায় বলে, হঠাৎ মিথ্যে কথা বলতে যাব কেন?

—নিজেকে তোমার একলা মনে হবে না।

—আমি তো বরাবরই একলা।

শেষের কথাটা বিষণ্ণ শোনাল প্রমীলার গলায়। সরোজ এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, দেখে পেছন ফিরে প্রমীলা ডিম ভাজছে। ওর সাদা ব্লাউজের উপর মোটা, কাল বিনুনিটা স্পর্শ করে বলে, মেয়ের তো বেশ চুল হয়েছে দেখছি।

প্রমীলা দুষ্টুমি করে উত্তর দেয়, দোহাই আর নজর দেবেন না, একেই তো আধখানা হয়ে গেছে, শেষ পর্যন্ত না টিকটিকির ল্যাজ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রায় ঘণ্টাখানেক প্রমীলা সরোজের ফ্ল্যাটে ছিল, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও সে ভাব-প্রবণ হয়ে পড়েনি, বুঝতে দেয়নি সরোজকে এই কার্ডিফ যাওয়া নিয়ে তার মনে কোনরকম দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু প্রমীলা ধরা পড়ে গেল একেবারে বিদায় নেবার সময়। যা সে কোন-দিনই করেনি, হঠাৎ তাই করে বসল, বিনা ভূমিকায় সরোজের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল প্রমীলা।

প্রথমটা সরোজ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে প্রমীলাকে আস্তে আস্তে উঠিয়ে নেয় বলে, এ আবার কি ছেলেমানুষি।

প্রমীলা কথা বলল ধরা গলায়, কেন, প্রণাম করতে নেই বুঝি।

—তা নয়, তুমি তো কখনও কর না।

—বিদায় নেবার সময় তো আগে কখনও আসেনি।

সরোজ দীর্ঘশ্বাস চেপে বলে, প্রণাম যখন করলে আমিও তোমাকে আশীর্বাদ করি, যে পথে যাচ্ছ, তাতে পূর্ণতা লাভ কর, নিজেকে বিকাশিত করার যেন সুযোগ পাও।

প্রমীলা হাসবার চেষ্টা করে পারল না, চোখ তার ছলছল করছে মৃদুস্বরে বলল, এখন তাহলে আমি যাই।

—এস।

প্রমীলা আর সরোজের দিকে না তাকিয়ে দ্রুত পায়ে নীচে নেমে গেল, কিন্তু রাস্তায় নেমে একবার সুইস কটেজের এই অতি পরিচিত ফ্ল্যাটটার দিকে ফিরে না দেখে পারল না। মনে হল দোতলায় জানালার কাছে সরোজদা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারই দিকে দেখছে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ল প্রমীলার। কিন্তু মনে মনে সে খুশী হল এই ভেবে যে নিজের দুর্বলতাকে সে কিছুতেই প্রকাশ হতে দেয়নি সরোজদার সামনে। এত সহজে যে বিদায়ের পালা মিটে যাবে সে সত্যিই ভাবতে পারেনি।

মানুষ যা ভাবে বাস্তবে বেশীর ভাগ সময় তার উল্টোটাই হয়। এ যে কতখানি সত্য তা আরও বেশী করে প্রমাণ হল সেই রাত্রে লীলার সঙ্গে কথা বলার সময়। এ কদিন ধরে প্রমীলার সব কিছু গোছগাছ করেছে লীলা নিজে, যা কিছু দরকারী জিনিসপত্র কিনে এনেছে বাজার থেকে। বার বার করে সকলের কাছে বলেছে প্রমীলা যে তার পথ খুঁজে পেয়েছে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে যাচ্ছে সে কথা জেনে তার কত আনন্দ। সেইজন্যে প্রমীলা ভেবেছিল লীলার চোখকে সে ঠিকই ফাঁকি দিতে পেরেছে, কেন যে সে এখান থেকে সরে যেতে চাইছে তা লীলা বুঝতে পারেনি।

কিন্তু আশ্চর্য সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে প্রমীলা দেখল ঘর অন্ধকার করে লীলা

খাটের উপর মুখ গ'ুজে শুয়ে আছে। প্রথমটা প্রমীলা চমকে উঠেছিল।

আলো জেলে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, তোর শরীর খারাপ না কিরে?

লীলা কোন উত্তর দিল না।

প্রমীলা তার মাথার উপর হাত রাখল, কি হয়েছে, বল, এরকম করে শুয়ে আছিস কেন?

ছেলেমানুষের মত ফ'ুপিয়ে উঠল লীলা, ভাল লাগছে না।

—কেন?

লীলা মাথা নাড়ে, আমি একলা থাকতে পারব না।

প্রমীলা হাসবার চেষ্টা করে, কি বাজে বকছ।

লীলা এবার পাশ ফেরে, প্রমীলার হাতটা টেনে নিয়ে গাঢ়স্বরে বলে, আর কেউ না বুঝুক তুই তো জানিস প্রমী তোকে ছাড়া আমার একটা দিনও চলে না। তুইতো শুধু আমার ছোট বোন নোস, আমার বন্ধুও, আমার—

প্রমীলা থামিয়ে দেয়, এখন কেন মন খারাপ কচ্ছিস। কালকে যাওয়া।

লীলা অবুঝের মত বলে, না তুই যাস না।

প্রমীলা এবার সত্যিই হাসে, তুই বোকার মত কাঁদছিস কেন। লণ্ডনে তো সবাই রইলো, সরোজদা, মীনাক্ষীদি, অমিতাভ। আমিই তো বরং একলা পড়ে যাব কার্ডিফে। তাছাড় বেশী দূরও তো নয়, মাত্র চার ঘণ্টার রাস্তা। দরকার হলে তুই যাবি আমার কাছে। আর আমিও তো ছুটি থাকলেই চলে আসব।

লীলার কান্না কিন্তু থামল না। প্রমীলা তাকে আরও কত রকম করে বোঝাল, তবু তাকে শান্ত করতে পারল না।

লীলা সেই একই স্বরে বলল, আমার বড় ভয় করছে।

—কিসের ভয়?

—জানি না।

কথাগুলো বড় করুণ শোনাল। লীলাকে মনে হল বড় অসহায়।

'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়ের পর থেকে এতগুলোদিন লীলারও খুব ভালোভাবে কাটেনি। অনুভব করার শক্তি তার প্রমীলার মত সূক্ষ্ম না হলেও সে বুঝতে পারছিল প্রমীলা ইচ্ছে করে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। যদিও মুখে সে একথা কোনদিন বলেনি, একটি দিনের জন্যেও হাহুতাশ করেনি, তবু তার অন্তরের গোপন বেদনার স্থানটুকু সে যেন দেখতে পেয়েছিল অথচ তা চেষ্টা করেও দূর করতে পারেনি। কিন্তু এর কারণ কি।

একথা সত্যি 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়ের রাতে লীলা মনে কষ্ট পেয়েছিল, হয়তো অশিষ্ট ব্যবহারও করেছিল, কিন্তু সে সবই যে নিজের অক্ষমতার জন্যে। মাথা ঠাণ্ডা হবার পর পর সে কি এর জন্য অনুতপ্ত হয়নি? অনুশোচনার আত্মগ্লানিতে সে কি অস্থির হয়ে উঠেনি?

অথচ আশ্চর্য, কেউ তাকে বুঝতে পারলো না, না প্রমীলা না সরোজদা। প্রমীলা সেই-দিন থেকে প্ল্যান করতে শুরু করলো লণ্ডনের বাইরে চলে যাবার। শেষ পর্যন্ত গেলও তাই। আর সরোজদা একেবারে যেন বদলে গেছে, সব সময় ব্যস্ত আর কেমন যেন অন্যমনস্ক।

যে তাকে বুঝতে পারলো সে বোধহয় অমিতাভ, প্রতিটি সন্ধ্যায় সে নিয়ম করে আসতো লীলার সঙ্গে দেখা করতে। কাছটিতে বসে দরদভরাস্বরে বলতো, দিদি কেন তুমি এরকম চুপচাপ বাড়ির ভেতর বসে থাকো। কেন বেড়াতে বার হও না।

—ভালো লাগে না।

কেন—?

—একলা একলা আর কোথায় ঘুরে বেড়াবো?

এ ধরনের কথা শুনলে অমিতাভ কষ্ট পেত, বলতো, আজকাল তোমাদের কী হয়েছে বলতো, যে যার নিজেরটুকু নিয়ে থাকো, কেউ কারুর সঙ্গে মেশ না।

লীলা কোন উত্তর দেয় না।

—প্রমীলাদিও তো কত গম্ভীর হয়ে গেছে। আমি কিছু বুঝতে পারি না।

—ওকেই বরং জিগ্যেস করিস।

অমিতাভ মাথা নাড়ে। তাতে কোন লাভ হবে না। প্রমীলাদি আমার সঙ্গে ভালো করে কথাই বলে না।

—কেন?

লীলার পায়ের উপর হাত বোলাতে বোলাতে অমিতাভ বলে, প্রমীলাদি তো তোমার মত আমায় ভালবাসে না।

—একথা কেন বলছিস।

অমিতাভ ম্লান হাসে, আমি জানি। আমি যে বুঝতে পারি। শুধু তো এখানেই নয়। কলকাতাতেও যে দেখেছি, সকলেই আমায় এড়িয়ে যায়। কজন আর তোমার মত আমায় কাছে টেনে নেয়, বল? সেইজন্যেই তো ঘুরে ফিরে তোমার কাছে আসি। আসি, আসতে ভালো লাগে বলে।

কথা মিথ্যে নয়। অমিতাভ যদি সত্যি এভাবে দিনের পর দিন লীলার কাছে না আসত, তার মন ভোলানোর জন্যে, নানারকম গল্প না করত তাহলে বোধ হয় লীলার পক্ষে লণ্ডন বাস ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠত। লীলার ফরমাশ মত অমিতাভ তার জন্যে বাজার করে এনেছে, এ'টো বাসনপত্র পরিষ্কার করে দিয়েছে, প্রয়োজন মত রান্না করেছে, শুধু তাই নয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে লীলার দেখা না পেয়ে হয়ত ফিরে এসেছে, কিন্তু তার জন্যে পরে এতটুকু রাগারাগি করেনি।

প্রমীলা কার্ডিফে চলে যাবার পর অমিতাভকে আরও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে
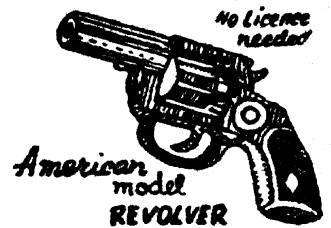
হয়েছে লীলার উপর। তাই প্রত্যেকদিন টেলিফোন করে সে লীলার খবর নিত, সকালে বাড়িতে, কিম্বা দুপুরে তার অফিসে। কতদিন দুপুরবেলা লীলা তাকে ডেকেছে অফিসের ক্যানটিনে লাঞ্চ খাবার জন্যে, কলেজের হাজারও পড়া থাকলেও সে তা অগ্রাহ্য করে ছুটে গেছে লীলাদের অফিসে। তারপর হয়ত আর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করেনি, কোন সিনেমায় ঢুকে ঘণ্টা তিনেক সময় কাটিয়ে আবার গিয়ে দেখা করেছে লীলার সংগে অফিস ভাঙ্গার পর। এক সংগে ফিরে গেছে লীলাদের বাড়ি, সেখানেই মুখ হাত পা ধোয়া, চা কফি এমন কি রাত্রের খাওয়া পর্যন্ত। বলতে গেলে এই এমন অমিতাভর দৈনন্দিন কর্মসূচী।

প্রথম যেবার প্রমীলা 'উইক এণ্ডে'র ছুটিতে 'কার্ডিফ' থেকে লণ্ডনে বেড়াতে এল সেদিন তার সংগে স্টেশনে দেখা করতে শুধু লীলা আর অমিতাভই যায়নি, সরোজ রায়ও গিয়েছিল। প্রমীলা ট্রেন থেকে নেমে ওদের তিনজনকে এক সংগে দেখে খুশী হল, জড়িয়ে ধরল লীলাকে, চোখে তার জল। অনেকদিন পরে দুই বোনে বোধহয় এমনি আন্তরিকভাবে আলিংগন করতে পারল। এতদিনের পুঞ্জীভূত অভিমান যা তারা মুখে ব্যক্ত করতে পারেনি, চিঠিতেও লেখেনি, এই আনন্দাশ্রুর মধ্যে দিয়ে তা যেন গলে নেমে গেল। এ দৃশ্য দেখে আনন্দ পেল সরোজ, মুগ্ধ হল অমিতাভ।

তারপর দুটো দিন যেন স্বপ্নের মত কোথা দিয়ে কেটে গেল। হৈ হৈ আনন্দের মধ্যে দিয়ে তারা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করল সেই অতি মধুর ফেলে আসা দিনগুলো। চারজন মিলে স্টেশন থেকে সোজা খেতে গেল রেস্তোরাঁয়। যত না খাওয়া হল গল্প হল তার চেয়ে অনেক বেশী। বেশীর ভাগই পুরোন দিনের কথা।

প্রমীলা বলল লণ্ডনের বাইরে না গেলে লণ্ডনকে বোঝা যায় না।

সরোজ ঠাট্টা করে, এই রে, মেয়ে যে জ্ঞানের কথা বলছে। লীলা তোমার বোনকে সামলাও।

—সত্যি বলছি সরোজদা, কার্ডিফে যাবার আগে আমি ভাবতেও পারিনি লণ্ডনকে আমি এতখানি ভালবেসে ফেলেছি। ওখানে সন্ধ্যে হলেই আমার মনে পড়ে পিকাডেলী'র আলোগুলোর কথা। খাবার সময় বীফ স্টেক খেতে গিয়ে মনে পড়ে এখানকার দিশী রেস্তোরাঁগুলোর রান্না। আর সেই সংগে আমাদের পিঠ চুলকানো সমিতির কথা।

—বেশ তো, ফলাও করে লেখনা। সম্পাদকের নামে পাঠিয়ে দাও ডেলী এক্সপ্রেসে, ভারতীয়দের চোখে লণ্ডন এই হেডিং দিয়ে ওরা তোমার চিঠি ছাপিয়ে দেবে। বলা যায় না এক গিনি পারিশ্রমিকও পেতে পার।

লীলা থামিয়ে দিয়ে বলে, যাই বলুন সরোজদা, আমারও লণ্ডন খুব ভাল লাগে। কিছুদিন থাকার পর আর বিদেশ বলে মনে হয় না।

সরোজ রায় জোর দিয়ে হাসে। তাইত তোমাদের দুই বোনকে আমি মেমসাহেব বলি।

প্রতিবাদ করল অমিতাভ, আমারও তো লণ্ডন ভাল লাগে, কিন্তু আমিতো আর সাহেব নই।

—কেন ভাল লাগে কারণ দাও।

—আমার মনে হয় লণ্ডনের সংগে কলকাতার অনেক মিল আছে, কলকাতার চৌরঙ্গী, রেড রোড, গভর্নমেণ্ট হাউস এর মত অনেক রাস্তা, অনেক জায়গা ছড়ানো আছে লণ্ডনে। তাই বোধহয় লণ্ডনে থাকলে কলকাতার কথা মনে পড়ে যায়। ভাল লাগে থাকতে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ওরা গেল সুইস্ কটেজে সরোজের ফ্ল্যাটে। আবার সরোজ রায়ের ফ্ল্যাট আগের মত হাসতে লাগল। সারাটা দিন তারা ঐখানে কাটাল। গান করল সরোজ, করল প্রমীলা, আবার চারজনে একসংগেও। সব গান যে একসংগে গাওয়া হ'ল তাও নয়, এক গান থেকে আর এক গানে চলে গেল। তাদের খেয়াল খুশির উচ্ছ্বাসে মূর্ত হয়ে উঠল কয়েকটা ঘণ্টা। ওদের চারজনেরই মনে আশঙ্কা ছিল এতদিন পরে তারা যে এই মিলতে যাচ্ছে, এই মিলনী সার্থক হবে কিনা, সকলে সহজ হয়ে তাতে যোগ দিতে পারবে কিনা। এত সহজে এই মিলে যাওয়া সম্ভব হ'ল দেখে তারা শুধু খুশীই হয়নি বুকের ওপর পাথরের মত যে চাপ জমা হয়েছিল তা সরে গেল।

রাত্রেও তারা খেল বাইরে, ফিরে গেল লীলাদের বাড়ি। সেখানেও আড্ডা চলল অনেক রাত পর্যন্ত। সরোজ আর অমিতাভ যখন বাড়ি ফিরেছে ভোর হতে আর বোধ হয় বেশী দেরী ছিল না অফুরন্ত গল্প করেছে তারা, কিন্তু এতটুকু ক্লান্তি বোধ করেনি।

পরের দিনই সকাল বেলা আবার তারা জড় হ'ল সরোজের ফ্ল্যাটে। চারজনে মিলে বেরিয়ে গেল রিজেণ্ট পার্কে বেড়াতে। সেখানে নৌকা চড়ে ঘুরল, মাঠের উপর পা ছড়িয়ে বসে গল্প করল, খেতে গেল দামী রেস্তরাঁয়। আজ রাত্রেই প্রমীলাকে কার্ডিফের ট্রেন ধরতে হবে, কাল সকাল থেকে আবার তার ক্লাশ। সেকথা মনে পড়লেই সকলের মন খারাপ হয়ে যায়। লীলা বলে, প্রত্যেক উইক্ এণ্ডে' তোকে আসতে হবে, তা না না হলে আমাদের ভাল লাগবে না।

প্রমীলা ম্লান হাসে, ইচ্ছে থাকলেও কি

আর প্রত্যেক সপ্তাহে কি আসা যায়। পড়া আছে, নতুন কোর্স, নতুন বন্ধু-বান্ধব, তাদের সঙ্গেও তো আলাপ করতে হবে, তাছাড়া কত খরচ—

—খরচের কথা তোকে ভাবতে হবে না।

প্রমীলা হাসে, তা আমি জানি, দুপুরে বেলা লাঞ্চ না খেয়ে তুমি আমার ট্রেন 'ফেয়ার' জমাবে, এইতো? আগে রোজগার করতাম, এখন তো আর রোজগার করছি না, ছেলেমানুষি করলে চলবে কেন?

এ দুদিন আনন্দের মধ্যে কাটলেও সরোজের ইচ্ছে ছিল অন্তত কিছুক্ষণের জন্য প্রমীলার সঙ্গে একান্তে কথা বলার। জানতে চাইছিল 'কার্ডিফে' গিয়ে সত্যিই প্রমীলা খুশী হয়েছে কিনা। কথা বলার সুযোগ তারা পেল রবিবার দুপুর বেলা। খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ি ফিরে লীলা গেল স্নান করতে। আর অমিতাভ ছুটল বাড়ি সেখানে বুঝি কেক কিনে রেখে আনতে ভুলে গেছে, আজ রবিবার, দোকান পাট সব বন্ধ। কেক না নিয়ে এলে চা খাওয়াটা ঠিক জমবে না।

প্রমীলা লীলার নামে লেখা মার চিঠিগুলো খাটের উপর শুয়ে শুয়ে পড়ছিল, কলকাতার বাড়ির কথা ভেবে, বাচ্চাদের দুষ্টুমীর কথা জেনে খিল খিল করে হাসছি। সরোজ পাশের ঘরের সোফা থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি মেয়ে, অত হাসি কেন?

প্রমীলা হাসতে হাসতে এ ঘরে উঠে এল, বুকের উপর আঁচলটা সামলে নিয়ে বলল, মা বেশ চিঠি লেখে, একখানা চিঠিতে রাজ্যের খবর। কুকুরের বাচ্চা হয়েছে থেকে শুরু করে আমাদের বুড়ো দরোয়ানের নাতনীর বিয়ে পর্যন্ত কোন খবর বাদ নেই।

সরোজ হাতের বইটার দিকে চোখ রেখে বলে, সে খবর না হয় পেলাম, এখন মেয়ে তোমার নিজের কথা বল দেখি।

—আমার আবার কি কথা?

—পড়াশুনোয় মন বসছে?

প্রমীলা দুষ্টুমী করে উত্তর দিল, মন বুঝি আপনার মত সুবোধ ছেলে যে বসতে বললেই বসবে। একটু জোর জবরদস্তি করে বসাতে হবে আর কি।

সরোজ বুঝল প্রমীলা কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে, বলল, হুঁ।

প্রমীলার চোখ দুটো হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কি ভাবছেন?

—না, ভাববার তো কিছু রাখনি।

কিছুক্ষণের জন্য দুজনেই চুপচাপ, কেউ কথা বলে না। অজান্তে প্রমীলার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। অন্য দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলে, আমার জন্যে অতকিছু ভাববার নেই সরোজদা, পথ আমি একটা পেয়েছি, কতদূর এগোতে পারব জানি না। কিন্তু মনে প্রাণে বুঝেছি এটা একটা পথ। আপনার সঙ্গে আলাপ না হলে এ পথের সন্ধান হয়ত আমি পেতাম না।

প্রমীলার কণ্ঠস্বর সরোজের হৃদয়ের স্পন্দন বাড়িয়ে দিল, সেই জন্যেই তো আমার এত ভয়, যদি অনেক দূরে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ তোমার মনে হয় তুমি ঠিক পথে আসনি, তখন কি আমায় ক্ষমা করতে পারবে প্রমীলা?

—যদি ঐ ধরনের ট্র্যাজেডীই ঘটে আমার জীবনে, বিশ্বাস করুন আপনাকে তার জন্যে দোষী সাব্যস্ত করব না, বুঝব ঐটেই আমার ভাগ্য।

তবু সরোজের মন মানে না, বলে, এখনও কি একবার যাচিয়ে দেখে নেওয়া যায় না, পথটা ঠিক না ভুল?

প্রমীলা সহজ উত্তর দেয়, তার সময় এখনও যায়নি সরোজদা।

সরোজ প্রমীলার হাতের ওপর নিজের হাতটা রেখে গাঢ় স্বরে বলে, আমার একটা অনুরোধ যদি কখনও মনে হয় পথ বদলানোর প্রয়োজন, কোন রকম দ্বিধা কর না, লোকে হাসবে বলে ভয় পেও না, নিজের স্বধর্ম অনুযায়ী নির্ভয়ে পথ বদলে নিও।

প্রমীলা চোখ বুজে কথাগুলো শুনছিল, দুকোণ বেয়ে তার জল নেমে আসে, আপনার উপদেশ আমার মনে থাকবে সরোজদা। যখনই ভাবি আমি কি ছিলাম, আর এখন কি হয়েছি, তখনই তো আপনার কথা মনে পড়ে। কলকাতার ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে যখন ফিরিঙ্গীআনার নকল করে ঘুরে বেড়াতাম, ভাবতাম সেইটেই বুঝি জীবন, এখানে এসে, আপনার সঙ্গে মিশে বুঝলাম ওটা জীবন নয়। জীবনের নকল।

প্রমীলা থামে। সরোজ তার দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি যখন এভাবে কথা বল প্রমীলা মনে হয় তুমি কত দূরের মানুষ।

মনে হয় সরোজের কথা প্রমীলার কানে যায় না, সে আগের সুরেই বলে যায়, আপনার হাত ধরে যে নতুন জীবনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম তাকে আমার বড় ভাল লেগেছে, একে আমি হারাতে চাই না। আবার যদি লীলার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যাই সেই ময়ূরের পালক লাগিয়ে দাঁড় কাকদের সঙ্গে মিশতে হবে, তা আর আমি পারব না। তাই তো নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইছি যাতে ভবিষ্যতে নিজের মত করে বেঁচে থাকতে পারি।

বাথরুম থেকে লীলা চেঁচিয়ে প্রমীলাকে ডাকল। এদের কথার ছন্দ গেল কেটে। প্রমীলা চোখের জল মুছতে মুছতে সাড়া দিল, যাই।

সরোজ তখনও প্রমীলার বাঁ হাতটা ছাড়েনি, নিজের কপালের উপর তার হাতটা রেখে বলল, আমি তোমাকে বুঝতে পারি প্রমীলা।

প্রমীলা মৃদুস্বরে উত্তর দিল, তা আমি জানি।

—যদি কখনও তোমার কোন প্রয়োজনে আসি আমাকে জানাতে সঙ্কোচ বোধ কর না।

—জানাব। একটু থেমে বলে, যাই, লীলা ডাকছে।

এরপর আর তাদের বিশেষ কোন কথা হয়নি। লীলা বেরিয়ে এল স্নান সেরে, অমিতাভ ফিরে এল কেক নিয়ে। শুরু হল চা পর্ব। আবার পাঁচ রকম গল্প গুজবে সময় কাটিয়ে পথে রাত্রের খাওয়া দাওয়া সেরে প্রমীলাকে সবাই মিলে তুলে দিয়ে এল 'কার্ডিফে'র ট্রেনে। হাসিমুখে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বসে রইল প্রমীলা। ট্রেন ছাড়লে রুমাল নাড়লো। প্ল্যাটফরমে ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে, লীলা কাঁদছে, অমিতাভর চোখ দুটোও ছলছলে, শুধু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সরোজ। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল প্রমীলার দিকে যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়। তার মনে হল, ট্রেন চলছে, সামনে তার রেল দিয়ে বাঁধা পথ, সোজা রাস্তা। পথ হারাবার ভয় নেই। প্রমীলাকে সে নিজে ঐ জীবনের ট্রেনে বসিয়ে দিয়েছে, নির্ভাবনায় হাসিমুখে সে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সরোজ নিজে কি পথ খুঁজে পেয়েছে। হঠাৎ ভেতরের দিকে তাকালে তার কি মনে হয় না সেখানে আলো আর আঁধারের খেলা, জানা আর অজানার দ্বন্দ্ব। যত দিন না মনের অন্ধকার ঘুচবে, ততদিন কি সে বুঝতে পারবে নিজেকে? তবে সে কোন ভরসায় প্রমীলাকে বলেছিল ভুল বুঝলে সে পথে না যেতে। কে জোর করে বলতে পারে এইটে ভুল, এইটে ঠিক। নিজেকেই না বুঝে অন্যকে বোঝবার ভান করি আমরা কেন? কেন অকপটে স্বীকার করি না, যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।

সরোজদা চলুন, বাড়ি যাবেন না!

লীলার কথায় সরোজের চমক ভাঙে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, চল।

(ক্রমশ)

মহাকাশ বিজয়ী মেজর গাগারিন পৃথিবীর মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া বলিয়াছেন: দেখিলাম পৃথিবীতে যখন দিবালোক তখন সমস্ত আকাশ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন; দেখিলাম, পৃথিবীর বর্ণ নীলাভ কিন্তু তাহা

হইলেও সমস্তই বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে—"তাহলে নীলের দিগন্তটাও কি পরিষ্কার দেখেছেন, দেখেছেন কি, নীল দিগন্তে ঐ বোমার আগুন লাগল"—রবীন্দ্রনাথের গানটির বিকৃত আবৃত্তি করিয়া খুড়ো মন্তব্য শেষ করিলেন।

পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেল।—"কিন্তু শ্রীগণেশ আর ডবল খাতা নিয়ে মন্ত্রীরা কেউ কালীঘাটে গেছেন কিনা তার কোন সংবাদ চোখে পড়েনি, গণেশ উল্টে দেবার সংবাদও পাইনি" বলে শ্যামলাল।

প্লাস্টিক পাউডারের পর্যাপ্ত সরবরাহের অভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্লাস্টিক সার্জারির অগ্রগতি ব্যাহত হইতেছে।

—"প্রগতিবাদে কি প্লাস্টিক পাউডারের চাহিদাও বেড়েছে না কি?"—প্রশ্ন করেন জনৈক সহযাত্রী।

হাসপাতাল কর্মীদের ধর্মঘটে যোগদানে প্রতিনিবৃত্ত থাকিতে ডাঃ রায় পরামর্শ দিয়াছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"এটা তো হলো ডাক্তারের পরামর্শ; হাতুড়েরা কী বলেন তাতো জানা গেল না!!"

করিমগঞ্জের এক সংবাদে শুনিলাম সেখানে সাড়ে সতর ইঞ্চি লম্বা একটি আম গাছে নাকি আটটি আম ফলিয়াছে। —"ইঁচড় বুঝি আর পাকানোর কেরামতি বজায় রাখতে পারল না"—বলিল আমাদের শ্যামলাল।

লণ্ডনে একটি সৈনিকবাহী জাহাজকে ভাসমান বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইয়াছে। ৭৫০ জন ছাত্রছাত্রী লইয়া জাহাজটি তেরো দিন সমুদ্র পরিক্রমা করিবে।—"এবং পরে সবাই বিদ্যার জাহাজ হয়ে ফিরবে"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

লণ্ডনের অন্য এক সংবাদে শুনিলাম সেখানে কোন এক ভদ্রলোকের একটি পোষা কুকুর নাকি এক হইতে দশ পর্যন্ত গুণিতে পারে এবং সহজ যোগ বিয়োগ ভাগ

পর্যন্ত করিতে পারে। শ্যামলাল বলিল—"দেখুন, অঙ্কপথের অভিযানের গণনায় যদি সারমেয় নন্দনটি কোনরকমে সবার মুখ রক্ষা করতে পারে!!"

শ্রী কেনেডি ও শ্রীম্যাকমিল্লান একটি যুক্ত বিবৃতিতে ঘোষণা করিয়াছেন,—আমরা পার্টনারের মতো আলাপ আলোচনা করিয়াছি। —"শেয়ার হোল্ডারদের যুক্ত বিবৃতি এখনো পাওয়া যায়নি"—বলেন বিশুখুড়ো।

আই এফ এ-র কর্মকর্তা নির্বাচন সভার কাজ না কি দুই মিনিটেই শেষ হইয়া গিয়াছে। —"হবেই। এ তো আর স্টেডিয়াম নির্মাণের সভা নয় যে দু'শ বছরেও শেষ হবে না"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

পাকিস্তানের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ভারত নাকি ফরাক্কা বাঁধের কাজ করিয়া যাইবে। —"শেষপর্যন্ত না সংকল্প ফক্কা হয়ে যায়; চোরাবালির ব্যাপার তো"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

এপ্রিলের গোড়ার দিকে মস্কো হইতে প্যারিসে দশ টন সোনা চালান দেওয়া হইয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"দ্য গলের নাক-

চাবির জন্য সোনা রপ্তানি করা হয়েছে কিনা তা সংবাদে বলা হয়নি!!"
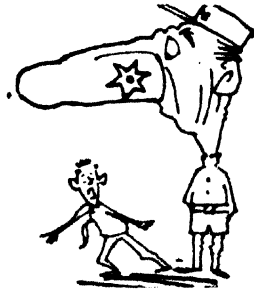
কংগ্রেস সভাপতি শ্রীরেড্ডি বলিয়াছেন যে কলিকাতাকে বাঁচাইতে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারের যথাযথ চাহিদা মেটান একান্ত প্রয়োজন। —"নূতন কথা নয়। বহুবার বলা হয়েছে কিন্তু তবু কেন্দ্র নির্বিকার। এখন একমাত্র পথ বাবা তারকেশ্বর। তাঁর দুয়ারে হত্যা দিলে যদি কলিকাতা বাঁচে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

করাচীর জ্যোতিষীরা মন্তব্য করিয়াছেন যে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে সাতটি গ্রহ রাশিচক্রের একটি ঘরে অবস্থান করিবে। ইহার পূর্বে একই ঘরে সাতটি গ্রহের অবস্থান দুইবার ঘটিয়াছে—প্রথমবারে ঘটে ভগবান বুদ্ধ যখন জন্মগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয়বার ঘটে যীশুখৃষ্টের সময়। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কিন্তু করাচীর জ্যোতিষীরা যা-ই বলুন, বুদ্ধ যীশুর মতো দূতদের পাকিস্তানে ভিসা সংগ্রহ করে দেবার ক্ষমতা গ্রহের বাবারও নেই!!!"

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১২২ ॥

শান্তিনিকেতন

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, এখন মনটা নতুন রাজ্য ও রাণীর ভাবনাকাশে সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। বান ডেকে এল, পুরোনোটাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল ঠিকানা নেই, রইল কেবল সাবেক ইমারতের ভিৎটা। যদি সম্পূর্ণ সময় পাওয়া যেত, তাহলে এতদিনে শেষ করতে পারতুম। কিন্তু সময় নানাখানা হয়ে গেছে, আমার লেখনযাত্রাটা হয়েচে ভাঙা রাস্তায় গোরুর গাড়ি চালানোর মতো, এক পোয়া রাস্তা এগোতে তিন প্রহর সময় লাগে। এতদিন আজ দ্বিতীয় অঙ্কের গোড়ায় এসে পৌঁছেচি—তৃতীয় অঙ্কে খতম করব সংকল্প করা গেছে। হেনকালে টেলিগ্রাম এলো আজ আসবেন "———" সকন্যক। তার মানে কাল রবিবারটাও পঞ্জিকা থেকে বাদ পড়বে। একথা কাউকে বোঝানো শক্ত, যে-অতিথি আমার মনোলোকে এসেচেন তাঁর দাবী সর্বাগ্রগণ্য। দিন যখন আমার হাতে অজস্র ছিল, তখন ঘণ্টাগুলোর বাজে খরচ গায়ে লাগত না। কিন্তু এখন আয়ুর সম্বল কম, অথচ দেখচি মন বলচে আমার সব বোঝা এখনো খালাস হয়নি। ভাবীকালের দাবী যথেষ্ট রয়েচে বর্তমান কালের ঝঞ্ঝাট তাকে রাস্তা ছেড়ে দিতে চায় না। রথ যাবে বড়ো শহরে, কিন্তু পাড়ার হাটে চলেচে সারি সারি গরুর গাড়ি—রাস্তার ফাঁক পাওয়া দায়—একটা যায়তো তখনি আর একটা এসে পড়ে। প্রশান্ত লিখেচে যে, রথীর কাছ থেকে বরণডালার পাণ্ডুলেখা পেয়েচে। এ নিয়ে তার মাথায় একটা বোঝবার ভুল আছে। এই কবিতাগুলিকেই মহুয়া নাম দেওয়া হয়েছিল। "———" এটাকে নিয়ে কিছুকাল খুব তাণ্ডব নৃত্য করলে—চেঁচিয়ে বললে, পাঠকদের সুবর্ণ সুযোগ, সুবর্ণ সুযোগ, গ্রন্থ প্রকাশ ব্যাপারে যুগান্তর—ক্রমে তার গলা মিহি হয়ে এসেচে, নীরব রবাব বীণা মুরজ মুরলী এমনি ভাগ্যের বিদ্রূপ, শেষকালে ছাপাবার ভার পড়ল কিনা সেই প্রশান্তর উপরে। কিন্ত নামটা সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা কী হল তা তো জানিনে, এই সেদিন এ নিয়ে ওর সঙ্গে বাদানুবাদ হয়েছিল—আমি বললুম সব কবিতাগুলির ভিতরেই একটা ভাবের সূত্র রয়েছে সেটাকে বলা যেতে পারে যুগল ভাবের সূত্র অতএব "বরণডালা" নামটাই ওর পক্ষে সার্থক হবে। কিন্তু অক্সোনিয়ন বললে, বড্ডো অবভিয়স এবং কিছু বেশি মিষ্টরসাক্ত—মিষ্টান্নমিতরে জনা—এই নামটাতে ইতর লোকের রসনাতেই রস নামবে। ওর মতে এরকম নামের বই রেলওয়ে স্টেশনের ফেরিওয়ালাদের পসরায় স্থান পাবার যোগ্য। শুনে ভয় পেয়ে গেলুম অবশেষে ও বললে, রথীদাদাকে সালিশ মানা যাক। কিছুক্ষণ বাদে আমাকে এসে বললে, তার রথীদাদার মতেও নামটা বারো-য়ারীর কান ভোলাবার মতো। শুনে আমি বললুম ভেরি গুড, অলরাইট, মহুয়া নামটাই মঞ্জুর। আজ প্রশান্তর চিঠি পড়ে বুঝতে পারচিনে অন্তিমে কোন্ নামটা গ্রাহ্য হবে। এ সম্বন্ধে তোমাদের অভিপ্রায় কি জানতে চাই। কিন্তু খুব সাবধানে মত দিও। কারণ, এই নামের নির্বাচনের উপর তোমাদের রুচির আভিজাত্য বিচার চলবে। প্রশান্ত দেখচি আমার হালের সব কবিতাকেই এক ঝুড়িতে হাটে চালান করতে চায়। সেটা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। ইতিহাসটা হয়তো তোমাদের মনে থাকতে পারে—আমাদের দেশে নব-বধূর যৌতুকে উপযুক্ত বই দেবার জন্যে বন্ধুবর্গের বিস্তর চিন্তা ও সন্ধান করতে হয়। একদা স্থির করা গেল আমারই পুরাতন কাব্যগুলোর থেকে প্রণয়াত্মক কবিতা সঞ্চয় করে বরণডালা নামে সেটাকে সচিত্র ছাপানো যাবে। তার সঙ্গে দুটো একটা নতুন কবিতা চালানো যেতে পারে। কর্মসচিব তার সমস্ত মুনাফা বিশ্বভারতীর খাতায় জমা করবেন বলে শাসালেন। প্রতিষ্ঠাতা আচার্য চিন্তা করে দেখলেন—মূলত এটা তাঁরই দান হলেও বস্তুত এ দানে তাঁর বদান্যতার স্থান রইল না—খাজনা আদায়ের মত এরপরে আইনসঙ্গত দাবী এসে চাপল। তখন আমি "——" আশ্বাস দিয়ে বললেম—মাভৈঃ, এ বইয়ের সব কবিতাই হবে অপূর্ব। তখন ছিলেম, চৌরঙ্গীতে, সময় ছিল প্রচুর—কলম ছুটল চার পা তুলে। লেখার বিষয়টা ছিল সংকল্প-করা বিবয়, প্রধানত প্রজাপতির উদ্দেশে—আর তাঁরই দালালী করেন যে-দেবতা তাঁকেও মনে রাখতে হয়েছিল। অতএব এ কবিতাকে ঠিক আমার হালের কবিতা বলে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে না। ভেবে দেখতে গেলে এটা কোনো কালবিশেষের নয়, এটা আকস্মিক। আমার সত্যিকার আধুনিক কবিতার সঙ্গে যদি এদের এক পংক্তিতে বসাও তাহলে তাদের বর্ণভেদ অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। এখনকার কবিতাগুলি প্রায়ই তরুলতা এবং ঋতু-বৈচিত্র্য নিয়ে। অর্থাৎ এরা বানপ্রস্থের উপযোগী—ক্ষণিকায় যে বানপ্রস্থের উল্লেখ ছিল সেটার কথা বলচিনে। এদের যদি এক-কোঠায় ফেল, তাহলে বাসর ঘরের ভিতে অশথগাছ রোপণের মতো হবে।

বর্ষামঙ্গল কবে হবে এখনো সম্পূর্ণ স্থির হয় নিন আজ অবন এখানে আসচেন, তিনি এলে পরামর্শ করে স্থির করা যাবে। তুমি দেখতে পাবে না—লোকমুখে বর্ণনা শুনবে। তুমি আসতে পারলে একলা দেখার দেখা দেখতে—কিন্তু তোমার শোবার ঘরে পাঁচজনের পাঁচ রকমের দেখা এসে মিলিত হবে। আমাদের দেশের লোকের একটা দোষ আছে, তারা যা দেখে একটু মোটামুটি করে দেখে বিশেষ করে দেখতে জানে না—তাই তাদের বর্ণনায় তাদের নিজের দৃষ্টির স্বাদ পাওয়া যায় না।

তোমার ছবিতে আজ সকালে যথাচিহ্নিত স্থানে পেন্সিল দিয়ে কবিতাটা লিখে দিয়েছি। লোকের হাতে ছাড়া দেওয়া চলবে না। "———" যদি আসে তার হাতে দেব। শুনচি আজ হাবল আসচে, তার হাতেও দিতে পারব। শরীর তোমার যখন আর একটু বল সঞ্চয় করবে তখন তোমাকে দেখতে যাব। ইতি ১৮ শ্রাবণ ১৩৩৬

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১২৩ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

শান্তিনিকেতন

দুই একখানি করে তোমার চিঠি সমুদ্র পার হয়ে ফিরে আসচে। যথা সময়ে যদি পেতুম তাহলেও এর সংবাদগুলি অতীতকালবর্তী হ'ত—কিন্তু চিঠিগতকাল ব'লে একটি বিশেষ কালে আমার মনের উপর বর্তমানের মতোই ক্রিয়া উৎপাদন করত। তার প্রধান কারণ তোমাদের আশ্রয় ক'রে সেই ক্ষণেই সেই চিঠি রচনার পরবর্তী যেকাল ক্রিয়াবান তাকে প্রত্যক্ষ জানতেই পারিনি। আজ তোমার চিঠি কোনো এক পূর্বতন বর্তমানকালের দূত হয়ে আমার কাছে ফিরে এলো, কিন্তু একে বর্তমান কাল বলে আর গ্রহণ করতে পারিনে। কেননা, তার পরবর্তী কালকে ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছি, এ চিঠি তার পশ্চাতে পড়ে গেছে। অথচ খবরটা সম্পূর্ণ নতুন—তুমি মীরার সঙ্গে দার্জিলিঙে চলেচ। এ চিঠি না পড়লে সংবাদটা আমার কাছে অব্যক্ত থাকত। তৎসত্ত্বেও এ সংবাদটাকে মন সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবার প্রয়াস করলে না—কল্পনা তহবিলের খরচ অনেকখানিই বাঁচালে। অথচ এই চিঠির এক অংশে তুমি মীরার একটি ক্ষণস্থায়িনী আয়ার যে বিবরণ লিখেচ, সে আমার কাছে বর্তমানের চেয়ে আরো বর্তমান হয়ে উঠল। তার দুঃখটা আমাকে ছাড়তে চায় না—সময় উত্তীর্ণ হয়ে তবু প্রতিকার করবার চঞ্চলতা মনের মধ্যে আবর্তিত হয়ে উঠচে। কোনো অন্যায় আমার কাছে কোনো মতেই যেন অতীত হতে চায় না। এত ব্যর্থ দুঃখ আমি পাই যে সেটাকে প্রকৃতির অপব্যয় বলেই গণ্য করা উচিৎ। জালিয়ানআলাবাগের অত্যাচারজনিত অধৈর্য-জনিত আমার শরীরকে রীতিমত পীড়িত করেছিল কিন্তু তখনো আমার কর্তব্যের কাল বর্তমান ছিল। বন্যা বা দুর্ভিক্ষে মানুষকে যে পীড়া দেয় তাতে আমাকে ততবেশী বিচলিত করে না—কিন্তু সংসারে অন্যায়ের জয় হোল এর দুঃখ আমার মন কিছুতেই ভুলতে চায় না। মীরার আয়ার ব্যাপারটা বার বার যখন তখন আমার মনে আসচে আর আমি কেবলি ভাবচি......। আমাদের শ্রেণীর অধিকাংশ লোকেরই অন্যায় বা অবমাননার আংশিক হোক বা সম্পূর্ণ হোক, কিছু না কিছু উপায় আছে এবং তার উপরে আমরা নির্ভর করি—কিন্তু যে দুর্ভাগাদের আইনের পথে বা বেআইনের পথে কোথাও কোনো পরিত্রাণের উপায়মাত্র নেই—উদাসীনভাবে নির্মম হিংস্রতার মুখে তাদের ত্যাগ করাকে আমার মন কিছুতেই ক্ষমা করতে চায় না—অত্যন্ত তীব্র ধিক্কার মনে জন্মায়। আগেকার মতো আমার মন যদি ছোটো গল্প লেখার অভ্যাসের মধ্যে বিরাজ করত তা হলে নিশ্চয়ই লিখে ফেলতুম। এই ঘটনার মধ্যে ভাগ্যবিধাতার একটা বিদ্রূপ আছে তাতে করে, এর স্বাদটা আরো যেন তীব্র হয়েছে। যাকগে। আরাম প্রয়াসী ছড়া-লেখক এক জায়গায় বলেচে, গতস্য শোচনা নাস্তি। কিন্তু একথা মানা যায় না। সংসারে অনেক অবিচার আছে যার বিশেষ উপলক্ষ্যগুলি স্থায়ী নয় কিন্তু যার মূলে পাপটা জগদ্দল পাথরের মতো সমাজের বুকের উপর চেপে আছে। চেপে আছে প্রধান দুটো আশ্রয়ের উপর—একদিকে ভীরুতা ও ঔদাসীন্য, অন্যদিকে দুর্বলতা, অক্ষমতা। আমাদের দেশে ষড়রিপুর মধ্যে মোহকেও একটা স্থান দিয়েছে, মোহটা অক্রিয়, যা নিতান্তই করা চাই সেটাকে সে করতে পারে না, নিজেকে নিরুপায় বলে কেবলি ক্ষমা করে, কিন্তু সেই দুর্বলতাটা মোহ। নিষ্ঠুরতা এর বিপরীত কোটির জিনিস—বিদ্যুতের পজিটিভ ও নেগেটিভ প্রান্তের মতো তারা পরস্পর সাপেক্ষ। এইজন্যেই অক্ষমতার সকরুণ দোহাই দিয়ে মোহকে ক্ষমা করা যায় না। তাকে যদি খোদিয়ে দেওয়া যায় তাহলে অন্যায়ের জড় মরে। আমাদের দেশে এই গর্তনিবাসী সুপ্ত-বিলাসী মোহ সর্বত্র সুড়ঙ্গ খুঁড়ে খুঁড়ে সাধারণের চিত্তকে একেবারে জীর্ণ করে দিয়েছে। প্রধানত এইজন্যে আমাদের দেশে কোনো অন্যায় অপসারিত হতে চায় না, কোনো বড় অনুষ্ঠান হয় গড়ে ওঠে না, নয় বিকৃত হয়, নয় স্থায়ী হয় না—ভিতের নীচে মোহের গর্ত॥

রাজা ও রানীকে শেষ করতে না পারলে কিছুতেই আমার পরিত্রাণ নেই। অপূর্ব যখন লেখবার জন্যে তাগিদ দিয়েছিল তখন আমার মন প্রতিবাদ করেছিল—না লেখবার পক্ষে তখন যতগুলো ছুতো পেয়েছি সবগুলিকেই দুর্নিবার বলে আরাম বোধ করচি। গড়িমসি করতে করতে লেখা শুরু করা গেল, কয়েক পাতা ভরে উঠল—এখন না লেখবার দিকে যতগুলো বাধা আসচে সবগুলোকেই দুঃসহ বোধ হচ্চে। আমাকে জলের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলে সাঁতার কাটতে বাধে না—কিন্তু যতক্ষণ ডাঙায় বসে অপেক্ষা করচি ততক্ষণ সেই অপেক্ষা করার সময়টাকে টেনে টেনে লম্বা করাই আমার সব প্রধান কাজ হয়ে ওঠে। এরমধ্যে প্রমাণ হয় আমার ভিতরকার লেখক এবং অলেখক এই দুটো মানুষের মধ্যে ভেদ আছে। সহস্র প্রমাণ সত্ত্বেও অলেখকের এ বিশ্বাস ঘুচল না যে, লেখকটা তারি মতই অভাজন, ওকে কালী কলম এনে দিতে চায় না। এই কারণেই আমার ভাগ্য আমাকে নানা উপায়ে দায়ে ফেলেই কাজ করিয়ে নিতে চায়।—এইমাত্র খবর পাওয়া গেল, আজ মরিস আসচে। তৎসম্পর্কীয় আমার মনের ভাব সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাইনে—স্থানও এত স্বল্প যে তার মধ্যে হৃদয়োচ্ছ্বাসকে ধরানো অসম্ভব হবে। শ্বাশুড়ী ননদ জেগে ওঠবার আধঘণ্টা আগে যদি শ্যামের বাঁশি বেজে ওঠে তাহলে তার মধ্যে অভিসারকে সেরে তোলার মতো দশা আমার হয়েচে, জানাতে পারব না বুকের মধ্যে কী দুর্দাম চঞ্চলতা। ২১ শ্রাবণ ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১২৪ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

শান্তিনিকেতন

পুত্র সন্তান লাভ হলে সে সংবাদ খুব উৎসাহ করে প্রচার করা হয়। গতকলা আমার লেখনী একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নাটককে জন্ম দিয়েচে—দশমাস তার গর্ভবাস হয়নি—বোধ করি দিন দশেকের বেশী সময় নেয়নি। সর্বাঙ্গসুন্দর বিশেষণটা পড়ে হয়ত তোমার ওষ্ঠাধর হাস্যকুটিল হয়ে উঠবে। ওর মধ্যে একটুখানি সাইকোলজির খেলা আছে। বাক্যটা যখন মনের মধ্যে রচিত হয়েছিল তখন কথাটা ছিল সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ, কিন্তু যখন লেখা হল তখন দেখি কথাটা বদলে গেছে। কেটে সংশোধন করা অসম্ভব ছিল না কিন্তু ভেবে দেখলুম যেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করি সেইটেই লেখা হয়ে গেছে। বিনয়টাকে তখনি সদগুণ বলতে রাজি আছি যখন সেটা অসত্য নয়। তোমরা বলবে নিজের লেখা সম্বন্ধে সত্য নির্ণয় করা লেখকের পক্ষে সহজ নয়। সে কথা যদি বলো তাহলে কোনো লেখা সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে সত্য নির্ণয় কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। টেনিসনকে খুব ভালো বলেছিল এক যুগে—অনতি পরবর্তী যুগে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ ভালো বলতে লোকে লজ্জিত হচ্চে। আমি যেদিন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ প্রথম লিখেছিলাম সেদিন ওটা লিখে আনন্দে বিস্মিত হয়েছিলুম—আজ ওটাকে যদি কোনো একটা নির্মলনলিনী দেবীর নামে চালিয়ে দিতে পারতুম কিছুমাত্র দুঃখিত হতুম না, এমন কি অনেকখানিই আরাম পাওয়া যেত। এমন অবস্থায়, না হয়, আজ যেটা ভালো লেগেছে আজই সেটাকে অসংকোচে ভালো বলা গেল। এ তো সত্যাগ্রহ নয়। নিজের লেখা খারাপ লাগতে যার বাধে না, এবং সেটাকে অকুণ্ঠিত ভাষায় স্বীকার করতে যার বেদনা নেই, নিজের লেখার

প্রশংসা করা তার পক্ষে অহঙ্কার নয়। অতএব খুব জোরের সঙ্গেই বলব নাটকটা সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েচে। যারা শুনেছিল তাদের মধ্যে সকলেরই মত আমার সঙ্গে মিলেছিল—বলা বাহুল্য তাদের মধ্যে-ও-ছিল না। তুমি হয়তো বলবে তোমাকে কলকাতায় গিয়ে এটা শোনাতে হবে। কিন্তু এতটা শোনার উত্তেজনা তোমার ডাক্তার কখনই ভালো বলবেন না—বিশেষত শেষ পর্যন্ত এতে উত্তেজনার উপকরণ যথেষ্ট আছে। অতএব অপেক্ষা করো, জ্বরের মাত্রা কমুক জোরের মাত্রা বাড়ুক, তারপরে ঢের সময় আছে। ঠিক এইখানটাতে খুব একটা ঘুমের বেগ এসে পড়ল মাথার মধ্যে—হঠাৎ প্রবল বর্ষণে যেমন চারদিক থেকে ঘোলা জলের ধারা নেমে আসে সেই রকমটা, বুদ্ধিটা একেবারেই স্বচ্ছ রইল না। অনেক সময়ে তৎসত্ত্বেও যে কাজটা হাতে নেওয়া গেছে সেটা আমি জোর করে সেরে ফেলি—টলমল করতে করতেই লেখা চলে—কেউ মদ খেয়ে নাচতে গেলে যে রকমটা হয়। আমার অনেক লেখার মাঝে মাঝে এইরকম ঘুমের প্রবাহ বয়ে গেছে—সেইসব জায়গায় হাতের অক্ষর দেখলে সেটা ধরা পড়ে। কিন্তু জাহাজ যেমন কুয়াশার ভিতর দিয়েও গম্য স্থানের দিকে এগোয় আমার লেখাও তেমনি কল একেবারে বন্ধ করে না। যাকগে। বিষয়টা ছিল আমার নতুন নাটক রচনা। রাজা ও রানীর পুনর্জন্মান্তরীকরণ। সেই নাম রইল, সেই রূপ রইল না। বিশ্বভারতীর কর্মসচিবকে খাজনা দিতে হবে না। যদি সাবেক নামটার জন্যে ভাড়ার দাবী করেন সেটাকে বদলাতে কতক্ষণ। সুমিত্রা নামই ঠিক করেচি। প্রশান্ত মাঝে মাঝে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যেন আমি নেড়া ছন্দে নাটক লিখি। আমি স্পষ্টই দেখলুম গদ্যে তার চেয়ে ঢের বেশি জোর পাওয়া যায়। পদ্য জিনিসটা সমুদ্রের মতো—তার যা বৈচিত্র্য তা প্রধানত তরঙ্গের—কিন্তু গদ্যটা স্থল দৃশ্য, তাতে নানা মেজাজের রূপ আনা যায়,—অরণ্য পাহাড় মরুভূমি, সমতল অসমতল, প্রান্তর কান্তার ইত্যাদি ইত্যাদি। জানা আছে পৃথিবীর জলময়রূপ আদিম যুগের—স্থলের আবির্ভাব হাল আমলের। সাহিত্যে পদ্যটাও প্রাচীন—গদ্য ক্রমে ক্রমে জেগে উঠচে। তাকে ব্যবহার করা অধিকার করা সহজ নয়, সে তার আপন বেগে ভাসিয়ে নিয়ে যায় না—নিজের শক্তি প্রয়োগ করে তার উপর দিয়ে চলতে হয়—ক্ষমতা অনুসারে সেই চলার বৈচিত্র্য কত তার ঠিক নেই, ধীরে চলা, ছুটে চলা, লাফিয়ে চলা, খুঁড়িয়ে চলা, নেচে চলা, মার্চ করে চলা,—তার পরে না চলারও কত আকার—কতরকমের শোয়া বসা দাঁড়ানো। বস্তুত গদ্য রচনায় আত্মশক্তির সুতরাং আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। হয়তো ভাবী কালে সঙ্গীতটাও বন্ধনহীন গদ্যের পুরুত্বের বন্দনাকে আশ্রয় করবে। কখনো কখনো গদ্য রচনায় সুর সংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবচ? মনে রাখা দরকার ভাষা এখন সাবালক হয়েচে—ছন্দের কোলে চড়ে বেড়াতে তার লজ্জা হবার কথা। ছন্দ বলতে বোঝাবে বাঁধা ছন্দ—গদ্য তার বয়সের গৌরবে দাবী করবে তার মুক্ত ছন্দ—ধাত্রীর বদলে প্রেয়সীর প্রতি যদি তার ঝোঁক যায় সেটাকে নিন্দে করতে পারব না। ইতি ২৩ শ্রাবণ ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১২৫ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আজ সুরুলে হলচালনা উৎসব হবে। লাঙল ধরতে হবে আমাকে। বৈদিক মন্ত্রযোগে কাজটা করাতে হবে বলে এর অসম্মানের অনেকটা হ্রাস হবে। বহু হাজার বৎসর পূর্বে এমন একদিন ছিল, যখন হাল-লাঙল কাঁধে করে মানুষ মাটিকে জয় করতে বেরিয়েছিল, তখন হলধরকে দেবতা বলে দেখেচে, তার নাম দিয়েচে বলরাম। এর থেকে বুঝবে নিজের যন্ত্রধারী স্বরূপকে মানুষ কতখানি সম্মান করেচে,—বিষ্ণুকে বলেচে চক্রধারী—কেননা এই চক্র হচ্চে বস্তুজগতে মানুষের বিজয় রথের বাহন। মাটি থেকে মানুষ ফসল আদায় করেছে এটা তার বড়ো কথা নয়—বড়ো কথা হচ্চে হাল লাঙলের উদ্ভাবন। এমন জন্তু আছে যে আপনার দাঁত দিয়ে পৃথিবী-বিদীর্ণ করে খাদ্য উদ্ধার করে—মানুষের গৌরব হচ্চে সে আপন দেহের উপর চূড়ান্ত নির্ভর করে না। তার নির্ভর যন্ত্র-উদ্ভাবনী বুদ্ধির উপর। এরই সাহায্যে শারীর কর্মে একজন মানুষ বহুমানুষ হয়েচে। গৌরবে বহুবচন। আজ আমরা একটা মিথ্যে কথা প্রায় বলে থাকি dignity of labour অর্থাৎ শারীরশ্রমের সম্মান। অন্তরে অন্তরে মানুষ এটাকে আত্মাবমাননা বলেই জানে। আজ আমাদের উৎসবে আমরা হাল লাঙলের অভিবাদন যদি করে থাকি, তবে সেটা আপন উদ্ভাবন কৌশলের আদিম প্রকাশ বলে। সেইখানে খতম করতে বলা মনুষ্যত্বকে অপমানিত করা। চরকাকে যদি চরম আশ্রয় বলি, তাহলে চরকাই তার প্রতিবাদ করবে—আপন দেহ-শক্তির সহজ সীমাকে মানুষ মানে না এই কথাটা নিয়ে চরকা পৃথিবীতে এসেচে—সেই চরকার দোহাই দিয়েই কি মানুষের বুদ্ধিকে বেড়ার মধ্যে আটকাতে হবে? আজ দেখলুম একটা বাংলা কাগজ এই বলে আক্ষেপ করচে যে, বেহারের ইংরেজ মহাজন কলের লাঙলের সাহায্যে চাষ সুরু করেচে, তাতে করে আমাদের চাষীদের সর্বনাশ হবে। লেখকের মত এই যে, আমাদের চাষীদের আধপেটা খাওয়াবার জন্যে মানুষের বুদ্ধিশক্তিকে অনন্তকাল নিষ্ক্রিয় করে রেখে দিতে হবে। লেখক একথা ভুলে গেছেন যে, চাষীরা বস্তুত মরচে নিজের জড়বুদ্ধির ও নিরুদ্যমের আক্রমণে। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-ব্যাপারে আর-আর অনেক প্রকারের আয়োজন করেছি—কিন্তু যে শিক্ষার সাহায্যে মানুষ একান্ত দৈহিক শ্রমপরতার অসম্মান থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে তার আয়োজন করতে পারলুম না। এই দুঃখ অনেকদিন থেকে আমাকে বাজচে। দেহের সীমা থেকে যে-বিজ্ঞান আমাদের মুক্তি দিচ্চে আজ য়ুরোপীয় সভ্যতা তাকে বহন করে এনেছে—একে নাম দেওয়া যাক্ বলরাম দেবের সভ্যতা। তুমি জানো বলরামদেবের একটু মদ খাবারও অভ্যাস আছে এই সভ্যতাতেও শক্তিমত্ততা নেই তা বলতে পারিনে—কিন্তু সেই ভয়ে শক্তিহীনতাকেই শ্রেয় গণ্য করতে হবে এমন মূঢ়তা আমাদের না হোক। শান্তিনিকেতনকে কেউ কেউ মনে করে পৌরাণিক যুগের জিনিস—তপোবনের বল্কলে আগাগোড়া ঢাকা। হায়রে দুরদৃষ্ট, শান্তিনিকেতন যে কী সেটা কিছুতেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল না। যারা প্রাচীন পন্থী তারা আমাদের ললাটে সনাতনের ছাপ না দেখে চটে যায়—যারা তরুণ, আমাদের মধ্যে পুরাতনের পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধা হারায়—কেউ আমাদের আমল দেয় না—কিছুই করে উঠতে পারলুম না—টানাটানি ঘোচেনা, মাথার পাগড়ি থেকে আরম্ভ করে পায়ের জুতোটা পর্যন্ত কোনোটা আঁট, কোনোটা ছেঁড়া, কোনোটা একেবারেই ফাঁক। কিছু যে করেছি দেশের লোক একথা মানে না—কিছু যে করতে পারি আমার উপরে এ ভরসাও রাখে না—অবশেষে এমন কথাও শুনতে হোলো যে আমার কবিতার ছন্দোভঙ্গ হয়। এতদিন মনে এই আশা ছিল যে, আর কিছুই না পারি অন্তত ছন্দ মেলাতে পারি এইটুকু বিশ্বাস আমার পরে দেশের লোকের আছে। যাবার বেলায় সেইটুকুও ভাসিয়ে যেতে হল। "আমার জন্মভূমি" আমাকে গ্রহণ করেছেন নগ্ন-দেহে, বিদায় দেবেন নগ্নসম্মানে। ইতি ২৫ শ্রাবণ ১৩৩৬।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদাসীর মাঠ

আরণ্যক

তুমি কি কুড়িয়েছিলে ছোট ছোট কথা,
আমার মনের যত আধফোটা কুঁড়ি?

চৈত্রের দুপুরে
দু'জনে কাটাই বেলা
নিরিবিলি ঘরে.

কথায় কথায় মিছে খেলি লুকোচুরি,
পড়েনি তোমার চোখে লালরঙা কুঁড়ি?

রাতের শিশির ভেজা রক্ত গোলাপ
আমার গোপন কথা, মনে আনা পাপ.
তোমার কানের পাশে
পারিনি পরিয়ে দিতে নরম খোঁপায়।
ফিস্‌ফিস্ করে কিছু জানাতে তোমায়।

তোমার ভাবনা ছিল কখন কি বলি.
যে কথা যায় না বলা
জানাতে জানতে চেয়ে কি বিপদে ফেলি।
কিছুই বলিনি।
মদালস মধুমাসে
একটু টলিনি।

উদাসীর মাঠে,
চৈত্রের পাগল হাওয়া ঘুরে ঘুরে ঘাঁটে
ছেঁড়া পাতা, খড়কুটো; ছোঁড়ে আকাশে।
আনমনে দেখি তাই পাশাপাশি বসে।

আর তো ছিল না কিছু,
শুধু চেয়ে থাকা।
গোছান কথার আড়ে
মুখ ঢেকে রাখা।

শেষ হোল বোবা মধুমাস,
উদাসীর মাঠে নেমেছে গভীর রাত
থেমেছে বাতাস।
ঝিঁঝিঁরা ধরেছে খেই সাজানো কথার,
একটানা বলে যায় শেষ নেই তার।
রাত জেগে তুমি কি খুঁজেছ
ঝিঁঝিঁদের এক ঘেয়ে সুরে
সেদিনের ছোট ছোট কথা?

উদাসী আকাশে
তুমি কি দেখেছ আরও
একা একা বসে
উড়ে যাওয়া খড়কুটো?
ঝরা কচি পাতা?

জীবন, তোমার কাছে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

১

জীবন, তোমার কাছে আমাদের দাবি
এই শুধু আছে যেন সময়ের চাবি
অন্য কারো হাতে চলে গিয়ে
দেয় তবু চিরন্তন অন্তর মিশিয়ে
আমার তোমার আর সবাকার চির ভালোবাসা
রেখে যাওয়া, যেন সর্বনাশাঃ
কোথাও অসার কোনো মেঘের কিনারে,
কোথাও আষাঢ় এনে যেন বারে বারে
নিয়ে তার শস্যের নিঃশ্বাস
ভরিয়ে দেয় তা দিয়ে স্বাস্থ্যের পরম
উত্তাপ আরাম আর দেহ মনোরম
দেশের অপূর্ব মৃদু স্বপ্নিল আরাবী।

২

দূরাগত ঘ্রাণ আমাদের
মাতালের মতো আনে অভিমান যতো
কোনো মানে নেই শত শত
প্রার্থনায় ঢেলে দিতে আকুতির জের
দিন অবসানে
কবে কোন্ দিনান্তের দানে
এসেছিল তোমার আমার
একান্ত মঙ্গলময় জীবন বিথার
তার আজ সঙ্কুচিত পরাজয়-গীতা
শুনি যেন গায় কোনো প্রীতা।
গেয়ে চলে মনের দুকূলে
যেন সব অশান্তিকে ভুলে।

৩

যেন কাল সৌন্দর্যের মহৎ কল্পনা
আত্মার সুরভি
আমাদের পরম পূরবী
ছিল কোন উজ্জ্বলতা নিয়ে
অমৃতের কতো মৃদু মন্ত্র দিয়ে দিয়ে
আমাকে সম্বিত দেয় কিন্তু তার আদি
জানা নেই জীবনের বিস্মিত সম্ভার
বারবার
আসে আর যায়
বিস্মৃতির প্রায়।
আজ তুমি কোথায় বলো না
কোথায় তোমার পত্রখানি
কোথায় সে জীবনের মন্ত্রগাথা বাণী
আসে এই দিকে
আসে জীবনের মন্ত্র দিয়ে যেতে যেন
কোনো দিন শুনবে সে কেন
ছিল এইখানে।
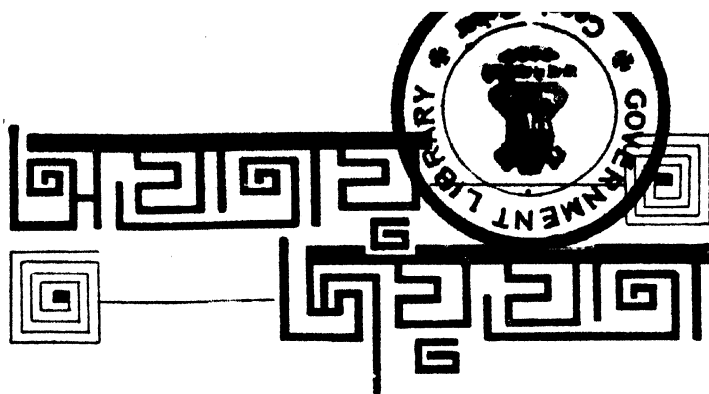
(৪)

এইখানেই একটা বাড়ি করেছে। তারপর দুনিয়ার সব দেখে শুনে এসে নিরিবিলি জীবনযাপন করছে। আর কেন? এতদিন পর্যন্ত যে টাকাগুলো জলাঞ্জলি দিয়েছে, সেগুলোয় আর যাই হোক অধিকার ছিল খানিকটা—বাবার টাকা, তারপর নিজের টাকা; এখন হাত দিতে হলে ছেলের টাকায় হাত দিতে হয়। .....কথায় বুঝলাম, ছেলেটি বেশ মানুষ হয়েছে। বিদেশ থেকে ঘুরে এসেছিল, এখন বেশ বড় কাজ নিয়েই রয়েছে।

মনের ওপর মনের টানের কথা একটু আগে বললাম না তোমায়? কথাটা যতীন নিজেই প্রশ্ন করল—"হ্যাঁ হে, এগুলো কি করে হয় বলতো?"

"কি গুলো?" —প্রশ্ন করলাম।

"এই দুপুরে টেনে আনল—দিলেই না ঘুমুতে—ঘুমই তো এখন সাধনা, বলো? তা স্রেফ দিলেই না—যেন নাড়া দিচ্ছে মনের দোরের কড়া ধরে (সাহিত্য করো তো এখনও?) —ওঠ্ ওঠ্—স্টেশন যেতেই হবে। ...অবাক কান্ড! আর আর সবাইকে ছেড়ে ঠিক তোমার পাশটিতে দাঁড় করিয়েছে! তুমি ঘুরলেই চার চোখের মিলন হবে! আর আগে স্টেজ সেট (stage set) —এখানে দুটো গাড়ির ক্রসিঙের (crossing) কথা নয়—আজ হবে—হতেই হবে—বিশ্বাস করনা এসব?"

আশ্চর্য হয়ে গেছি বৈকি; কিন্তু সবাই তো ওর মতো মন খুলে স্বীকার করবার ক্ষমতা রাখে না; বিজ্ঞানের যুগের মানুষ না আমরা? একটু যেন এড়িয়ে গিয়ে বললাম—"জায়গাটার যে একটা ট্রাডিশনই আছে, ভুলি কি করে সে কথা? দুপা এগিয়েই তো হরিহর ক্ষেত্র।"

"You have said it—(খাসা বলেছ)" বলে যতীন আর-একটা চড় বসালো কাঁধে।

—"আর কম কিসে? আমার চেয়ে বড় ভাগাবন্ড ছিলেন নাকি হর?...কিন্তু এই দেখো—আসল বাদ পড়ে গেল!"

"কি?"

"চলো—একবার ঝেড়ে আসতে হবে না পায়ের ধুলো—গরীবের আস্তানায়?"

সামনে আঙুল দেখালাম। গাড়িটা এসে গেছে বাইরের সিগন্যালের কাছে।

যতীন ওদিকে পেছন ফিরে ছিল ঘুরে দেখে নিয়ে বলল—"ওখানেই দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়—ঢোলি স্টেশন, হরের খাস এলাকা কী যে বলো ও......"

পা বাড়িয়েছিল স্টেশনের দিকে, —স্টেশন মাস্টারকে বলে আটকে দে[…] গাড়ি, আমি হাতটা ধরে ফেললাম। ...[…] হয় না, বিলম্বিত গাড়ি আমাদের জ[…] আরও দেরি করে বসবে, বাধে [...] বিবেকে। তা ভিন্ন আরও একটা ক[…] যার দেওয়ার, সে তো ঠিকই দেয়—যত[…] উচিত, যতটুকুতে পাত্রটা ভরে ওঠে। [...] বেশি হয়ও না সঞ্চয়, উপচে পড়ে [...] থেকে। ভরা পাত্রের আনন্দ নিয়ে বি[…] হওয়াই ভালো। কথা দিয়ে এলাম—আ[…] ওকে উদ্দেশ করেই আসব একদিন।

ভালোই করেছি। গাড়ি ছেড়ে প্ল্[…] ফরমের শেষে এলে ওর বাড়িটা ভা[…] করে দেখলাম। রেলের ধারেই অনেক[…] জায়গা নিয়ে একটা বাগান, তার মাঝ[…] গাছের আড়ালে কোটা বাড়ি; খানিক [...] যায়, খানিক নজরের বাইরে। অনেক [...] গাছ, বাংলারও কিছু কিছু; গোটা ক[…] আমের গাছে গুচ্ছে গুচ্ছে আম ঝুল[…] দেরির ফসল। ...ভালোই হলো, [...] জীবনের এই পূর্ণতার মাঝে মাঝে কে[…] সংক্ষিপ্ত মুহূর্তে বায় করে আসতে [...] শুধু একটা অতৃপ্তি নিয়েই ফিরে আ[…] হতো।...তার চেয়ে এই ভালো হয়েছে দেওয়ার রাজা। পাত্র আমার পূর্ণ ছলছল করছে।

তা করবেই কিনা। রাজা যে আবার [...] শিল্পী, বিরোধ-বিলাসী; পূর্ণতা না [...] শূন্যতার বেদনা ফুটবে কেন ভাব [...]

যখন মনে হবে ঠিক আছে, বিলকুল ঠিক, সেই সময়ই না বেঠিক এসে সামনে দাঁড়াবে তার বিদ্রুপের হাসিটি মুখে করে। ...সেই কথাই বলি এবার—

মজঃফরপুরে গাড়িটা এলে নেমে পড়লাম, দেখি, যদি একখানা টাইম-টেবিল মেলে এখানে। দুর্ভোগ রয়েছে কপালে, দুর্মতি এলে জুটবেই তো।

দুর্মতি ভিন্ন আর কি বলব? যে গাড়ি এক ঘণ্টার ওপর লেট, তা থেকে নেমে কেউ পুল পেরিয়ে টাইম-টেবিল কিনতে যায় না। তাও জেনে শুনে যে হুইলারের স্টল পড়ছে প্ল্যাটফরমের একেবারে ও-মুড়োয়। তাও আবার এ-লাইনের প্ল্যাটফরম। জান তো এ-লাইনের দৈর্ঘ্য আছে, ওসার নেই (মনে রাখতে হবে দুবার নাম পাল্টালেও এ সেই আদি অকৃত্রিম বি এন ডব্লিউ আর)। মজঃফরপুরের মতো স্টেশনে যেখানে পাশাপাশি অন্তত চারখানা প্ল্যাটফরম থাকা উচিত ছিল, সভ্য রকম সাইজের সেখানে দুখানা মাত্র বসিয়ে দিয়ে ছ'খানা করেছে। ফলে এ-লাইনের স্বভাবসিদ্ধ গোলমালগুলো আরও গেছে জটিল হয়ে।
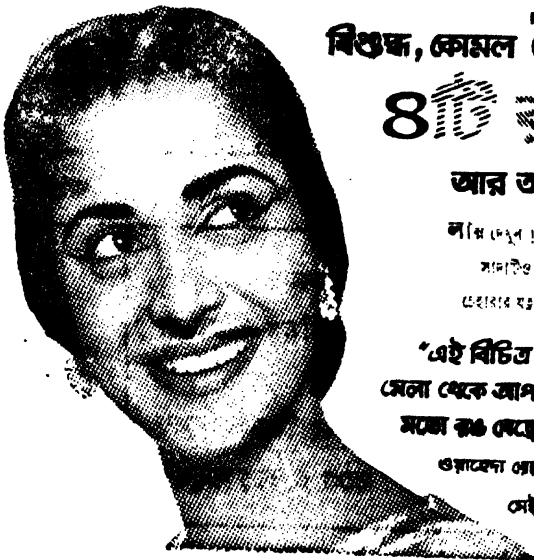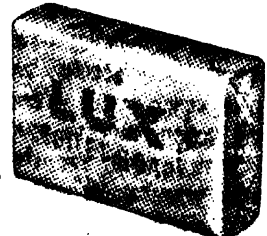
ভুলই করেছিলাম। তবে গুরুবল, কোন ক্ষতি হলো না। পুলে উঠে মাত্র কয়েক পা গিয়েছি, একেবারে হাতাহাতি হওয়ার গোত্র। না, আমার সংগে নয়। দুটি যুবা, বছর পঁচিশ থেকে সাতাশ-আঠাশের মধ্যে বয়স। ভদ্রসন্তানই, একজনের সাজগোজে একটু পাড়াগাঁয়ের ভাব আছে, একজনের শহর ঘেঁষাই, দুদিক থেকে আসছিল, দেখা হতেই অশ্রাব্য গালাগালির তুবড়ি দুজনের মুখে। নিজের তাগিদেই হন হন করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, কে আগে আরম্ভ করল, অত লক্ষ্য করিনি; যখন মনটা গেল ওদিকে দেখি, এ যা বলে, ও তার সুদে আসলে মিলিয়ে জবাব দেয়। এই করে এগুতে এগুতে দুজনে দুহাতে পাঞ্জা কষাকষি করে দাঁড়িয়ে পড়ে গালাগালের তুবড়ি ফোটাতে লাগল। হঠাৎ এক বিপরীত কাণ্ড: স্টেশনের লোকেরা নিজের ধান্ধায় থাকে ব্যস্ত, বিশেষ করে গাড়ির সময়, তবু দেখতে দেখতে কিছু লোক জমে একটু ভিড়ের মতো দাঁড়িয়ে গেল। পৃথিবীটা তামাশা খুঁজে বেড়াবার লোকেই প্রায় ভরাট, তবু প্রকৃত শান্তিকামীর ছিটেফোঁটা আছেই; কিন্তু এরা যতই নরম করবার চেষ্টা করে, ওরা যেন ততই উগ্র হয়ে ওঠে। এই করে করে যখন চরমের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে, পাঞ্জা ঠেলাঠেলি হতে হতে প্রায় বুকে বুকে ধাক্কা লাগে, একজন আর তাল রাখতে না পেরে হো-হো করে হেসে উঠল, বলল—"আপনারা যে যার কাজে যান, ও শা—আমার ভাইকে ওর বোন দিয়েছে না, দুটো মিষ্টি কথা বলে খাতির করছি।"

বাড়িয়ে যা উত্তর হলো তাকে ভদ্রবেশ সাজ পরালেও এই দাঁড়ায় যে, সেটা তো বিবাহই, ওর ভগ্নী—বিবাহ নয়—স্ব-ইচ্ছায়ই এর সংগে চলে এসেছে ঘর ছেড়ে।

বাঁচলাম। না, কথাটা যদি সত্যি হয় তার জন্যে নয়, বলছি, প্রচ্ছন্ন রসিকতায় যে মাঝপথে আটকে দিয়েছিল তাতে যে ভুলটা করে বসেছিলাম সেটা সামলে গেল। গাড়িটা যে ওদিকে আমার সংগে রসিকতা করবার জোগাড় করেছিল, পঁচিশ মিনিটের লম্বা বিরতি দশ মিনিটে সামলে নিয়ে সেটা খাটল না। কাছেই ছিলাম, হুইসিল দিতে ঘুরে পা বাড়ালাম।

ভীড়টা চারিয়ে পড়েছে দুদিকে। কারুর কারুর মুখে আছে কিছু কিছু মন্তব্য, তবে বেশির ভাগই নীরব, বোধহয় ভাবটা—এমন আর বেশি কথা কি? দুনিয়াটা যখন শ্যালক-ভগ্নীপতিতে ঠাসা তখন এ ধরনের রসঘন যোগাযোগ তো আখচারই হবে।...... তাড়াতাড়ি নেমে এসে গাড়িতে উঠে বসলাম।

ক্ষতি হয়নি বলেছি? ভুল বলেছি। রসিকতার হিড়িকে আটকে যাওয়ায় গাড়িটা হাতছাড়া হলো না বটে, কিন্তু গাড়ি ছেড়ে যাওয়ার জন্যে যে ক্ষতিটা হওয়ার সেটা হয়েই গেল। গাড়িতে বসে থাকলে যাত্রীদের কে কোথায় যাচ্ছে খানিক খানিক খবর পাওয়া যায়। হয়তো কারুর পরিচিত কারুর সংগে দেখা হয়ে গেল, নমস্কার করে প্রশ্ন—"কোথায় চলেছেন?" হয়তো আমাকেই কেউ প্রশ্নটা করতেন; হয়তো বা নেহাতই চুপ করে বসে থাকবার অস্বস্তিতে আমিই প্রশ্ন করতাম আমার পাশে নূতন যিনি এসে বসলেন তাঁকে। বড় স্টেশনে বেশি লোকের ওঠা-নামায় এর সম্ভাবনাটা সাধারণত বেশি থাকে, আমার পক্ষে আবার বিশেষ করে এইজন্যে ছিল যে, মজঃফরপুরে বাঙালী যাত্রীর যাতায়াত বেশি। অনুপস্থিত থেকে এই সুযোগটা নষ্ট করলাম, যখন এসে বসলাম তখন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পালা একরকম শেষ হয়ে গেছে গাড়ির মধ্যে।

অবশ্য আমার পক্ষে খানিকটা বাকিই আছে বলা যায়, কেননা আমার পাশেই একটি বাঙালী পরিবারই এসে বসেছেন। গন্তব্যের কথা জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় মনটা ছিটকে অন্যদিকে গিয়ে পড়ল—আমার জিনিসপত্রগুলো কোথায়!

খুব খোঁজাখুঁজি করবার আগেই অবশ্য পাওয়া গেল। পরিবারটি, মা-ষষ্ঠীর বিশেষ অনুগ্রহপুষ্ট: কর্তা, গিন্নী তারপর কোলেরটি পর্যন্ত নিয়ে সর্বসাকুল্যে তেরটি। আমার মালপত্র ওঁদের গুলোর মধ্যে চাপা পড়েছে, দু-একটা স্থানান্তরিত হওয়ায় (ওঁদের প্রয়োজনে) হঠাৎ একট বিভ্রাট ঘটিয়েছিল।

যখন দেখে শুনে নিয়ে আবার নিজে জায়গায় বসলাম তখন গাড়িটা স্টেশন ছেড়ে খানিকটা বেরিয়ে এসেছে।

প্রশ্নটা করলেনও। একটু "কিন্তু" হ পড়েছেন, প্রথমটা তারই জবাবদিহিই দিলে —"আপনাকেও খানিকটা বিব্রত করলা সমস্ত সংসারটি ঘাড়ে করে নিয়ে যে হচ্ছে তো।...কোথায় যেতে হবে আপনাকে

প্রথমে ভদ্রতা রক্ষাই করলাম, উত্তরা থাকল বাকি; বললাম—"না, বিব্রত কিসের মনে হচ্ছে যেন বদলি হয়ে যাচ্ছে কোথাও?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মোতিহারি, আস সেই......"

আমি একেবারে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের সোজা হয়ে বসেছি—"মোতিহারি? এ গাড়িতে!"

গৃহিণী, দু তিনটি মেয়ে, শিশু কো ওটি বোধ হয় পুত্রবধূ—ওরা তিনজনে চকিত হয়ে মুখের দিকে চেয়েছে, উনি আছেনই। কিন্তু, কেন জানি না, উত্তর উনি অন্যদিক দিয়ে দিলেন, বললেন—"বে এইটেই সুবিধের নয়? আমি আস ডালটনগঞ্জ থেকে, টাইমটেবিলে দেখ এইটেতেই বেশ দিনে দিনে পৌঁছে যাও যায়..."

কতকটা কানে যাচ্ছে, কতকটা

হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে, আমার অবস্থা তখন সঙ্গীন। প্রায় বলেই ফেলতে যাচ্ছিলাম, "কিন্তু এ গাড়ি তো মোতিহারির নয়, পাটনার।"—এমন সময় চোখের সামনে পাটনার নগ্ন লাইন জোড়া জেগে উঠল। মনের ধর্মই হচ্ছে বিপদকে টপ করে মেনে নিতে চায় না। কিন্তু ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই; পাটনার লাইনটা বহুদূরে বর্তুল আকারে ঘুরে গেছে স্টেশন থেকে, মোতিহারির লাইনটা সোজা, এই যা চলেছি; পাটনার লাইন বাঁয়ে, মোতিহারিরটা ডাইনে।

তার চেয়ে বড় প্রমাণ আমি 'অযাত্রায়' বেরিয়েছি বাড়ি থেকে, এ হতেই হবে।

আমায় যেন ঘাড় টিপে মানিয়ে ছাড়া আবার। অযাত্রায় বাড়ি ছেড়েছি, ভুল গাড়িতে না চড়ে গত্যন্তর নেই আমার।... এখন উপায় কি?

কিন্তু উপায়ের চিন্তাটা মনে উদয় হয়ে তখনই গেল মিলিয়ে। আজ এই নিদারুণ লজ্জার হাত থেকে পরিত্রাণ পাই কি করে? পৃথিবীতে যতগুলো আহাম্মকি আছে তার মধ্যে রেলগাড়ির এলাকায় বড় বড় দুটো পড়ে; ভুল গাড়িতে চেপে বসা আর ওভার-ক্যারেড (over carried) হওয়া, অর্থাৎ গন্তব্যের চেয়ে এগিয়ে গিয়ে পড়া। একটা কথা একটু মিলিয়ে দেখো, গাড়িতে চড়লে লোকে হঠাৎ একটু কৌতুক-প্রবণ হয়ে ওঠে। তার কারণ, বাড়ির ঝামেলার বাইরে থাকায় মনটা থাকে নিশ্চিন্ত, হালকা, তার ওপর গাড়ির গতিবেগ দেহমনে সুড়সুড়ি দিয়ে এক ধরনের যেন ছেলেমানুষীই জাগিয়ে তোলে খানিকটা। মনটা কৌতুক খোঁজে। আর, কৌতুক বস্তুটা সবচেয়ে উপভোগ্য হয় যখন সেটা পরের ঘাড় দিয়ে উপলব্ধ হয়; ইংরাজিতে চমৎকার কথাটি রয়েছে এর জন্যে —At the cost of others; জাতটা আমাদের চেয়ে রগুড়েই তো।

দুটো আহাম্মকির কথা যে বললাম তার মধ্যে একটির, অর্থাৎ ওভার-ক্যারেড হওয়ার খানিকটা মার্জনা আছে, কেননা ওটা প্রায় ঘটে নিদ্রাবস্থায়। অত হাসি নয়, আহা, লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছিল করবে কি? কিন্তু একটা লোক, বয়সের গাছপাথর নেই, চোখ চেয়ে (চশমাও যে নেই এমন নয়) পাটনার গাড়ি ছেড়ে একেবারে উলটোদিকে মোতিহারির গাড়িতে চেপে বসেছে, এর যেন আর রেয়াৎ নেই। কোথায় যাওয়ার কথা কোথায় চলেছি সে চিন্তা গিয়ে ভাবনা দাঁড়িয়েছে এতগুলি দৃষ্টির কৌতুক-উচ্ছলতা থেকে কি করে বাঁচাই নিজেকে এখন। বিশেষ করে ভয় করে মেয়েদের। একবার একটা ঘরোয়া আহাম্মকিতে আমার এক মাসতুতো বোন হেসে ফেলেছিল; মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে সাধ্যমতো সমীহ বজায় রেখেই হেসে ফেলেছিল বেচারি—প্রায় চল্লিশ বছরের কথা, এখনও তার লজ্জাটা মনে লেগে আছে।

গৃহিণী মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়েই নিজের হাসিটা গোপন করে মেয়েদের চোখ রাঙালেন; বধূটির আরও সুবিধা, সে কোলের ছেলেটির সঙ্গেই আলাপ জুড়ে দিয়ে হাসির মোড় ফিরিয়ে দেবে—আমায় বাঁচাবারই চেষ্টা; কিন্তু মন্দ যতই গুপ্ত ততই যে প্রাণঘাতী; আমি করি কি এখন?

দারুণ বিপদের মধ্যেই মানুষ নিজেকে নব নব ভাবে আবিষ্কার করে। কি করে যে স্খলিত হওয়ার মুখেই চেহারাটা বদলে নিয়েছি বলতে পারি না—অর্থাৎ এদিকে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে, তবে

সহজ ভাবটা কয়েকটা সেকেণ্ড বাদ দিয়ে প্রায় বজায় রেখেই গেছি। ও'র প্রশ্নটা অবশ্য এগিয়ে আনছি না; তবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছি তার জন্যে।

"আর কিছু কি খ‌ুঁজে পাচ্ছেন না আপনি?"—উনি প্রশ্ন করলেন নিশ্চয়ই ঐ কয়েক সেকেণ্ডের বিভ্রমতা লক্ষ্য করেই।

উত্তর করলাম—"না।...মনে হয়েছিল বটে তাই—ঐ গেলাসটা দেখছি, ঠিকই কুঁজোর মাথায়।"—বেশ গুছিয়েই তো বললাম।

"কতদূর যাবেন বললেন না তো।"

"যাব বেতিয়ায়। তবে আপাতত একবার পরের স্টেশনেই নামতে হবে।"—মোটেই দেরি হলো না আর জবাবটা দিতে। একটু কাজও এগিয়ে নিলাম, বললাম—"তাই ভাবছি জিনিসগুলো দরজার সামনেই জড়ো করে রাখি না হয়। গাড়ি থামে না তো বেশিক্ষণ, তায় ছোট স্টেশন, কুলিও পাব না।"

"সোহি নিজিয়ে। বহি অকিলমন্দিকা কাম হোগা।" (তাই করুন, সেইটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে)।

কথাটা শুনে বুকই ছাঁৎ করে উঠল; বলছেন পাশের বেহারী ভদ্রলোকটি। তবে কি "আকিলমন্দির" অন্য কোথায় অভাব হয়েছে সেটা ধরা পড়ে গেছে ও'র কাছে?

টের পেলাম, তা নয়। এমনি অযাচিত ভাবে একটা বুদ্ধিমত্তার কাজ সমর্থন করেছেন।...আমি নেমে গেলে উনি ধারের ভালো জায়গাটিকেও পাবেন। হোল্ড-অল, একটা বড় সুটকেস, একটা ব্যাগ, একটা জলের কুঁজো; দোরের কাছে নিয়ে যেতে সাহায্যও করলেন। মনটাকে গুছিয়ে নিয়ে বসলাম।

মঘা, সামলাবি কী ঘা?

আবার আরম্ভ হয়ে গেল।

গাড়ি থেকে নেমে মোটঘাট পায়ের কাছে জড়ো করে দাঁড়িয়ে আছি। প্ল্যাটফরমে নয়। প্ল্যাটফরমের দিকে গাড়ির যে দরজাটা সেটা একটা বরযাত্রীর নানারকম দ্রব্যসম্ভারে চাপা—কন্যাপক্ষের উপঢৌকন—বাঁশের বাতার ফুলপাখী বসানো বড় বড় চাঙারি, নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যে ভরা; চৌকি, বাক্স, তোরঙ্গ, আলপনা আঁকা বড় বড় দুটো হাঁড়িতে দই। একটা সঙ্গী গোছের লোক দরজা আগলে দাঁড়িয়ে, বেরুতেও দেবে না, ঢুকতেও দেবে না।

নালিশ নেই, বিচার নেই; উল্টোদিকেই নেমে দাঁড়িয়ে আছি।

তাও গাড়িটা যদি তাড়াতাড়ি ছেড়ে যায় তো বাঁচি। গাড়িসুদ্ধ লোক গলা বাড়িয়ে হাঁ করে দেখছে, (অন্তত চোখ তুলে দেখতে পারছি না বলে আমার তাই মনে হচ্ছে)—ভেবে পাচ্ছে না, এরকম অঘাটায় হঠাৎ একজন বাঙালী ভদ্রলোক কি করতে নেমে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আরও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার ভয়ে চেঁচিয়ে কুলি ডাকতে পারছি না।......আবার বুকটা ছাঁৎ করে উঠল; বেহারী ভদ্রলোকটি বলছেন "আপ্ গলতি কিয়া।" (আপনি ভুল করেছেন)

যার আগাগোড়াই 'গলতি' আর 'আকিল-মন্দির' অভাব আর সেটা ঢাকবার জন্যে যে গলদঘর্ম হচ্ছে তার বুকটা ছাঁৎ করে উঠবেই; আমি একটু হেসে বললাম—"নেহি, ইসি স্টেশনমে উৎরনা হ্যায়।" অর্থাৎ ভুল করিনি, এই স্টেশনেই নামবার কথা আমার।

ভদ্রলোক বোধ হয় একটু পাড়া গাঁ-ঘেঁষা, যেটা মনে আসে সাজিয়ে-গুছিয়ে না ব'লে সোজাই ব'লে দেন। একটু হেসেই জানালেন—সেকথা বলছেন না, এক জায়গার টিকিট কিনে অন্য জায়গায় নামবে এতটা 'আকিলমন্দির' অভাব কার হবে? ও'র বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এসব জায়গায় আগে থাকতে খবর না দিয়ে আসাটা......

আমি হেসে স্বীকার করে নিলাম—বেয়াকুবিই একটা, তাই তো দেখছি।

—অর্থাৎ যে ধরনের কথা ও'র মুখ দিয়ে বেরুতে পারত, আগেভাগেই ব্যবহার করে হাঙ্গামা মিটিয়ে রাখলাম। কেন জানি না, ভদ্রলোক এবার একটু ভালোভাবেই হেসে উঠলেন, জানালেন—না, বেকুবি কিসের? তবে কুলি পাওয়া যায় না, সাওয়ারি পাওয়া যায় না—আগে থাকতে জানিয়ে রাখলে এরকম নাকাল হ'তে হতো না......

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

গিন্নির কণ্ঠের ধমক কানে গেল—"তোদের অত খোঁজে কাজ কি?—কেন নামলেন, বেকুবি কাকে বলে!......"

ছেলেমেয়েগুলো নিশ্চয় অতিরিক্ত কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

তাহলে ভালো করে কি সবটা চাপা দেওয়া গেল না?......মরুকগে। সবটা ঝেড়ে ফেলে দিলাম মন থেকে। গাড়ি বেরিয়ে গেছে প্ল্যাটফরম থেকে।

বেহারী লোকটি সত্যিই সজ্জন; গলা বাড়িয়ে দেখছেন কি হল না হল।

ঝেড়েই ফেললাম কি? যা সমস্যা সামনে তাতে অন্য কোন চিন্তা মনে ঠাঁই পাবে কি করে? চারিদিক খাঁ খাঁ করছে. যা দু'-একজন লোক নেমে থাকবে, আগেই চলে গেছে। মাথার ওপর আশ্বিনের ঝাঁঝাল রোদ যেন চাবুক কষছে।

চারিদিকে ব্যাকুলভাবে চাইতে চাইতে নজর পড়ল স্টেশনেরই বারান্দায় থামের একটু আড়াল হয়ে একটি লোক একদৃষ্টে এইদিকে চেয়ে আছে। গায়ে একটা নীল রঙের জামা, মাথায় হাল্‌কা পাগড়ি দেখে কুলিই মনে হল। ডাক দিলাম; লোকটা বেরিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। বললাম—"এইটুকু নিয়ে গিয়ে ওয়েটিং রুমে পেঁছে দিবি?"

একবার স্টেশনের দিকে চেয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল—"পরতীচ্ছা ঘর?"

—মনে হল রাষ্ট্রভাষার একজন কট্টর গোঁসাই। বললাম—"হ্যাঁ। প্রতীক্ষা ঘর।"

জানালো—ও কিন্তু কুলি নয়।

পোশাকটার ওপর আপনিই একবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল, বললাম—"থাক তাহলে, নিজেই নিয়ে যাই একটা একটা করে।"

হোল্ডঅলটায় হাত দিতে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে হাতটা ধরে ফেলল আমার। জিভ কেটে বলল—"সে কি, ইজ্জতদার লোক আপনি, আপনার ইজ্জত যাবে...... আমি থাকতে?"

বললাম—"তাহলে নিয়ে চল্।"

একবার ঘাড় ফিরিয়ে স্টেশনের দিকে চেয়ে নিয়ে বলল—একটু গলা নামিয়েই বলল—"আর কোন কথা নয়তো বাবু, আমি কুলি নয়, পয়েণ্টস্‌ম্যান্, আমারও ইজ্জত আছে, যদি তার দাম পাই......"

"কত?" প্রশ্ন করলাম আমি, বললাম—"কুলি হলে আনা দুইয়ের বেশি হত না তো।"

"চার আনা দেবেন বাবু আমায়।"

ইজ্জত জিনিসটা যে এত সস্তার হবে আশা করিনি, ভেবেছিলাম অন্তত একটা টাকা দাবি করবে; প্রস্তুতও ছিলাম, বললাম—"নে, তোল্।"

প্ল্যাটফরম্ পেরিয়ে ওয়েটিং রুমে প্রবেশ করতে গিয়ে একটু বাধায় পড়ে যেতে হল। একটি ভদ্রমহিলা একটা দোর ঘেঁষে চৌকাঠের পাশেই বসে আছেন বাইরের দিকে চেয়ে। কুলিটাই আগে ছিল, একটু দ্বিধাগ্রস্তই হতে হল, বললাম—"বারান্দাতেই নামিয়ে রাখ এক পাশে।"

ভদ্রমহিলা মৈথিল ভাষাতে কুলিটাকেই বললেন—"ভিতর লেইথিন্ তো যাইত ন"—অর্থাৎ ভেতরে যেতে চান তো যান না।

দোরটা আর একটু চেপে পাশ কেটে বসলেনও।

এই একটি ঘর। বাইরে তাপটাও বেশি, আমি আর মতটা চক্ষুলজ্জার দিকে গেলাম না। উনি চারদিক ঘেঁষে বসেছিলেন, আমি কুলিটার পেছনে পেছনে বাঁদিক ঘেঁষে ভেতরে চলে গিয়ে একটা বেঞ্চে বসলাম। পয়সা নিয়ে কুলিটা চলে গেলে ভদ্রমহিলা আমার দিকে একটু ঘুরে বসে কোনরকমে গৌরচন্দ্রিকা না করে প্রশ্ন করলেন—"আপনি তো বাঙালী?"

জানালাম—হ্যাঁ, বাঙালীই আমি।

মৈথিল ভাষাতেই জানালাম, এবং আমার অনুমান, বোধ হয় সেইজন্যই ভালো করেই ঘুরে দোরে পিঠ চেপে বসলেন উনি। বেশ সপ্রতিভ প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—"চমৎকার মৈথিল ভাষা বলতে পারেন তো, কোথায় শিখলেন?"

সোজা চোখ তুলে নিঃসংকোচে প্রশ্ন। আমি বরং বেশ খানিকটা সংকুচিত হয়ে গেছি। আমার অবশ্য বয়স হয়েছে, তবু ত্রিশ-বত্রিশ বছরের একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোক, স্বজাতিও নয়, সে যে এই পরিবেশে এত অন্তরঙ্গ আলাপ জুড়ে দেবে এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তবু উত্তর তো দিতেই হবে, যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করেই বললাম, "এখানেই।"

"এখানেই থাকেন?"

"না।"

"তবে?"

"দ্বারভাঙ্গায়।"

"দ্বারভাঙগায়? তাহলে তো দেখছি আমারই দেশের লোক আপনি।" বেশ উৎসাহিত হয়ে একেবারে মুখোমুখি হয়ে বসলেন, বললেন—"জয়নগরের রামকে চেনেন নিশ্চয়, বেশ বড় আড়ৎদার। আমি হচ্ছি তাঁর ভাইঝি।"

উত্তর করলাম—"না, চেনা নেই। আমি থাকি দ্বারভাঙগা শহরে। জয়নগর তো অনেক দূরে।"

"দ্বারভাঙগাতেও তাঁর কারবার আছে, বেশ নামী লোকই আমার কাকা। সবাই জানে তাঁকে। মস্ত বড় ব্যাপারী সে।"

আজকের দিনটা কি পদে পদে এইভাবে বোকা সাব্যস্ত হওয়ার জন্যই? অবশ্য বলা চলত, আমি বাঙালী, কেরানি জাতের মানুষ, নিতান্তই আমার ব্যাপারী, জাহাজ, অর্থাৎ কারবারীদের খবর রাখি না। কিন্তু ও প্রসঙগ বাড়াতে আর সাহস হল না। একটু অজ্ঞতার লজ্জিত হাসি হেসে, কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম—"আপনি তাহলে মাড়োয়ারী, তা আপনিও তো চমৎকার মৈথিল ভাষা বলেন দেখছি।"

"কী যে বলেন! আমি মৈথিল বলতে পারব না? আমার মাড়োয়ারী কথা শুনেই বরং লোকে হাসে।"—চোখে মুখে কৌতুকের হাসি নিয়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে।

বললাম—"বুঝলাম না তো। কারণটা কি?"

"খজৌলির নাম শুনেছেন? জয়নগর থেকে নেপাল সরকারের যে ছোট রেলের লাইনটা জনকপুরে গেছে তারই একটা স্টেশন। এখন বোধ হয় মাড়োয়ারী বেড়ে থাকবে কিছু, কিন্তু আমাদের সময় আমরা একেবারে একটি ঘর। তাতেও লোক বেশি নেই; বা, মা, আমি আর আমার ঠিক ওপরের একটি ভাই, সে আবার মারাও গেল। চারিদিকেই তো মৈথিল, খেলার সাথী বলুন, প্রতিবেশী বলুন, দোকানের খদ্দের বলুন সবই তো মৈথিল, নিজের ভাষা বলি কার সঙ্গে? বলবেন—কেন, বাবা রয়েছেন, মা রয়েছেন......

বললাম—"সত্যিই তো।"

"সে বড় মজার কথা; তাহলে বলি শুনুন। মা ছিলেন আমার খাস মাড়োয়াড়ের মেয়ে। একমাত্র তাঁরই চেষ্টা ছিল বাড়িতে নিজেদের ভাষাটা কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখা। গোড়ায় গোড়ায় সবার সঙ্গে ঐ ভাষাতেই আরম্ভ করলেন। কিন্তু তা চলবে কেন বলুন? কিছু মাড়োয়ারী থাকলে লোকে শুনে শুনে তবু আন্দাজে একটু-আধটু বুঝে নেয়, খজৌলি তো সেদিক দিয়ে পরিষ্কার। শুধু যে কাজের অসুবিধে হতে লাগল তাই নয়। বাড়িতে একটা ঝি ছিল কাজকর্ম করবার জন্যে, এক নম্বরের হারামজাদা আমাদের দেখা শোনা করবার জন্যে তার একটা মেয়েও ছিল, মায়ের মতনই শয়তান, জেনেশুনে কাজ পণ্ড করতে লাগল।......আপনি সেই বদমাশবা আর হারামজাদাবার গল্পটা জানেন?"

এর মধ্যে কখন কি ভাবে একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে বড় গোছের। আমার সেই সংকোচের ভাবটা কেটে গিয়ে কখন যে একজন উৎকর্ণ শ্রোতা হয়ে পড়েছি তা বুঝতেই পারিনি। আসল কথা এত চমৎকার মৈথিলকথা, অনেকদিনই শুনিনি। একে মিঠে সুরেলা ভাষাই, তায় স্ত্রীকণ্ঠ, অপূর্ব লাগছে। প্রগল্ভতা দেখে এক সময় যে কথা কমিয়ে আনবার চেষ্টা ছিল, সেটা গিয়ে এখন যেন বলবার ঝোঁকই এসে গেছে। হারামজাদবা-বদমাশবার গল্প, দুটো বজ্জাত লোকের গল্প গৃহস্থের বাড়িতে চাকরি ধ'রে তাদের সুযোগ নিয়ে ক্রমাগত অঘটন ঘটিয়ে যাচ্ছে। কতকটা আমাদের ছেলেবেলার 'ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি' গল্পটার মতো জানা গল্প তবু ভদ্রমহিলার মুখে মৈথিলীতে শোনার লোভ সামলাবার জন্যে বললাম—"না, বৈ জানা নেই তো।"

"তাহলে শুনুন" —বলে আরম্ভ করে দিলেন।

সে যে কী মিষ্টি কি করে বোঝাই!
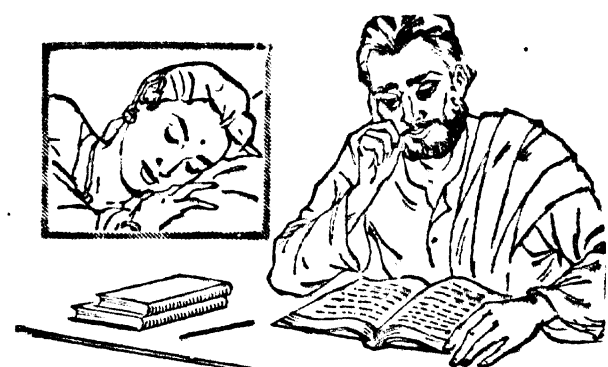
রবীন্দ্রনাথের "দুরাশা" গল্পটা মনে আছে তো? কবি দার্জিলিঙের ক্যালকাটা রোডের শিলাতলে বসে বদ্রাওনের নবাব-জাদীর আত্মকাহিনী শুনেছেন।......"বিবি-সাহেব যখন কথা কহিতেছিলেন আমার মনে হইতেছিল যেন শিশিরস্নাত স্বর্ণ-শীর্ষ স্নিগ্ধ শ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রভাতের ছন্দমধুর বায়ু হিল্লোলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার পদে পদে এমন সহজ নম্রতা, এমন সৌন্দর্য, এমন বাক্যের অবারিত প্রবাহ......"

এও যেন অনেকটা সেই ধরনের। সে যেমন ছিল "আমিরের ভাষা", এ তেমনি কবির ভাষা, বিদ্যাপতির ভাষা। আর একটা জিনিস যা ছিল তার জন্যে বদ্রাওনের নবাবপুত্রীর ভাষার চেয়ে বোধ হয় খজোরির অমুক রামের ভ্রাতুষ্পুত্রীর ভাষাতে অধিকতরই মাধুর্য এনে দিয়েছিল। তাঁর ছিল একটি বিষাদ সমাচ্ছন্ন জীবনের কাহিনী; বেদনাময়, গম্ভীর। এ'র কাহিনীটা নিতান্তই লঘু, চটুল একটা কৌতুক কাহিনী, যার জন্যে মাঝে মাঝে খানিকটা তরল হাসি ছলকে উঠে সমস্ত বাক্যস্রোতটিকে করে দিচ্ছিল সংগীতময়। জলতরংগ কথাটাকে এত সার্থক হয়ে উঠতে খুব কম দেখেছি। নবাবপুত্রী ছিলেন বিষাদময়ী, আত্মসমাহিতা; তার জায়গায় এ'র প্রগলভতাই যেন আরও উপভোগ্য করে তুলেছিল এ'র কাহিনীটিকে। হালকা সুরের সংগে তাল মানাবে কেন? গল্পটা শেষ হলে ভদ্রমহিলা পূর্বকথায় ফিরে এলেন। একটি তরল হাসির পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে একটু যেন দম নিলেন, তারপর বললেন—"আমার মার কথা যা বলছিলাম, ও'র সেই নিজের ভাষা চালাবার ঝোঁক। ঝি আর সেই মেয়েটার কাছে ভাষার গোল-মালে কয়েকবার নাকাল হয়ে—মেয়েটাতো মায়ের শেখানো মতোই চলছে—নাকাল হয়ে ছেড়ে দিলেন ওদিকটা। বাকি রইলেন বাবা......"

এবার ঘাড় উলটে একটু বেশি করেই হেসে উঠলেন, তারপর বললেন—বাবা আমার ছিলেন ভালোমানুষ। প্রথমটা মন জুগিয়েই চললেন মার, কিন্তু এমনই উঠে পড়ে গুরুগিরি লাগালেন মা যে তিনিও শেষ পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলেন। ও'র রোগ হল কথায় কথায় ভুল ধরা। তাও এমনি নয়, পাঠশালার পোড়োর মতন দাঁড় করিয়ে কয়েকবার বলিয়ে নিয়ে তবে ছাড়তেন। বাবা ভয়ে বাড়িতে আসা কমিয়ে দিলেন, এলেও কথা কমিয়ে দিলেন। আমা-দের তখন রগড়টা বুঝবার বয়েস হয়েছে, দেখতাম—বাবা কিছু নিতে বা অন্য কোন কাজে বাড়িতে ঢুকে যেই দেখলেন যে মা দাওয়ায় কিম্বা উঠানে দাঁড়িয়ে, অমনি যেন চোরের মতো একটু এদিক ওদিক করে সরে পড়লেন। মাকে দেখতাম যেন বাজ-পাখীর মতন ওত পেতে আছেন। এই করে যেতে যেতে একদিন একটা কথার উচ্চারণ নিয়ে দুজনে লেগে গেল। বাবা সেদিন যেন লড়াইয়ের জন্যে তৈয়ের হয়েই এসেছিলেন, নিজের বাড়িতে লোকে এভাবে কতদিন কাটাতে পারে বলুন না—নিজের স্ত্রীর কাছে ছোট হয়ে। একটা গালভরা কথা—তার বানান-উচ্চারণ দুরস্ত করে নিয়ে কি একটা কথা প্রসংগে ঝেড়ে দিলেন মার কাছে। বললেনও এমনভাবে কথাটার ওপর জোর দিয়ে যে মা একটু হতভম্ব হয়ে গেলেন। ভাবটা যেন—চেলা হঠাৎ এমন গুরুমারা বিদ্যে শিখে এল কোথা থেকে।

বললেন—"কি বলছ একটু ঠিক করে বলো।"

বাবা বললেন—"ঠিকই বলছি, তুমি তোমার বুদ্ধির মতন করে শুধরে নিয়ে বুঝে নাও।"

বইয়ের জোর আছে, এদিকে মেয়েরা কেতাবের সব কথাগুলো তো ঠিকভাবে উচ্চারণ করে না। তায় কথাও বেছেছেন বাবা তেমনি দেখে।

মা ভেবে নিয়ে বললেন—"তুমি বোধ হয় এই কথা বলছ মকাই আর মেড়ুয়ার দেশের ভাষার মতন করে।"

বাবা বললেন—"থাক, বালি, জওয়ার আর বাজরার দেশের খুব পরিচয় দিয়েছ একটা মামুলি কথার এই উচ্চারণে।"

"এই উচ্চারণ, আলবৎ।"

"কক্ষণও নয়।"

"আলবৎ। তোমার দফা সেরে দিয়েছে। ব্যবসা গুটিয়ে দেশে ফিরে চলো। তাও দেখো যদি ঢুকতে দেয় সেখানে।"

বাবা আর কিছু না বলে গটগট করে বাইরে চলে গেলেন। এত বাড়াবাড়ি কখনও হয় না, আমরা দুজনে দাওয়ার এক কোণে ভয়ে গুটিসুটি মেরে দাঁড়িয়ে রয়েছি, এক-খানা বই হাতে করে বাবা আবার ভেতরে এলেন। পাতাটায় আঙুল গোঁজাই ছিল, "আরে দেখাখো লেঠিন" বলে মায়ের চোখের নীচে ধরতেই মা বইখানা ছিনিয়ে একেবারে উঠানের ওদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হনহন করে ঘরের ভেতর চলে গেলেন।

আটদিন একেবারে কথা বন্ধ রইল দুজনের মধ্যে তারপর একদিন বাবা......"

(ক্রমশ)

বিমল মিত্র

(৬৭)

পৃথিবীর অন্য যায়গায় যে-নিয়ম, প্যালেস কোর্টের সে-নিয়ম নয়। প্যালেস্-কোর্ট পৃথিবী থেকে আলাদা। দিনের বেলাও পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, রাত্রেও তাই। এখানে বাস করলে কোথা দিয়ে সকাল হয়, কোথা দিয়ে রাত হয় টের পাবার দরকার নেই। যারা থাকে এখানে তারা এ-পৃথিবীরই মানুষ নয়। তাদের পৃথিবী খবরের কাগজের পৃথিবী, টেলিফোনের পৃথিবী। এ পৃথিবীটা যে মাটির, এ-পৃথিবীতেও যে যুদ্ধ হয়, মহামারী হয়, এ-খবর তারা জোর করেই ভুলে থাকতে চেষ্টা করে। এ পুরোপুরি বয় বাবুর্চি খানশামা আর চাপরাশির পৃথিবী। কোথায় কে কত ভোরে উঠে হগ্ মার্কেট থেকে ফাউল কিনে এনেছে, ভেজিটেবল্ কিনে এনেছে, কখন গ্যাসের উনুনে ধরিয়ে রান্না চাপিয়েছে তার খবর রাখবার প্রয়োজন এখানে কম। এখানে হুকুম আর হুকুম-তামিলের রাজ্য। কলিং-বেল্ টিপ্‌লেই বয় আসে, পৃথিবীর যাবতীয় জিনিস ঘরে এসে হাজির হয়। মুখের কথা খসানোটাই এখানে একমাত্র শারীরিক মেহনত্।

ভোরবেলা থেকে প্যালেস-কোর্টের সামনে সার সার গাড়ি ধোয়া হয়, মোছা হয়। ধুলো ঝাড়া হয়। কার গাড়ি, ভেতরে কারা থাকে তা কেউ জানতে পারে না। যে-যার ঘরের ভেতরে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন, যে-যার ঘরের ভেতরে পৃথিবীর সম্রাট। চালের দর যখন বাজারে চড়ে, কাপড়ের দর যখন দোকানে ওঠে, যখন বাজারে চিনি পাওয়া যায় না, নুন পাওয়া যায় না, সিগারেট, চা, বিস্কুটের জন্যে যখন কলকাতা শহরে হাহাকার পড়ে যায়, তখন প্যালেস-কোর্টের ভেতরে সে খবর পৌঁছায় না। প্যালেস-কোর্টের পৃথিবী তখন কলকাতা শহরের মধ্যে অনড় অচল স্তিতধী হয়ে মহাকালের অক্ষয় মহিমা ঘোষণা করে। প্যালেস-কোর্ট ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনও নয় যে কেউ কাউকে চিনবে। প্যালেস-কোর্ট ফ্রি-স্কুল স্ট্রীট নয় যে কেউ কাউকে ঈর্ষা করবে। প্যালেস-কোর্ট গড়িয়াহাটাও নয় যে কেউ কাউকে আকর্ষণ করবে, অন্যার প্যালেস-কোর্ট স্টেশন রোডও নয় যে কেউ কাউকে ভালবাসবে, প্যালেস-কোর্ট প্যালেস-কোর্টই। কলকাতা শহরে প্যালেস-কোর্টই প্যালেস-কোর্টের তুলনা।

প্যালেস-কোর্টের হদিস বলা শক্ত। চৌরঙ্গী থেকে বেরিয়ে কোন্ রাস্তায় ঢুকে কোন্ রাস্তার মোড়ে প্যালেস-কোর্ট তা প্যালেস-কোর্টের বাসিন্দারাই জানে। আর জানে তারা যারা প্যালেস-কোর্টের ফ্ল্যাট বাড়িতে প্রমোশন পাবার জন্যে উন্মুখ।

ছোট বেঁটে মত একটা লোক কিন্তু তর তর করে চেনা-লোকের মত ঢুকে পড়লো প্যালেস-কোর্টের ভেতরে। তারপর যথা-স্থানে গিয়ে বেল টিপতেই একজন বেয়ারা এল।

—কাকে চাই ?

—মিস্টার ঘোষালকে।

ড্রেসিং গাউন পরা মিস্টার ঘোষাল বেরিয়ে এল। মুখে চুরোট।

—হুজুর, আমি আসছি মিস্টার পালিতের কাছ থেকে, মিস্টার এন পালিত বার-য়্যাট-ল। আপনার কি একটু সময় হবে? বড় জরুরী দরকার ছিল তাঁর।

—হবে, কিন্তু সকাল ন'টার আগে, নট আফটার দ্যাট—

তা, তাই-ই সই। পরদিন কাঁটায় কাঁটায় ঠিক ন'টার সময় নির্মল পালিতের গাড়ি এসে ঢুকলো প্যালেস-কোর্টের উঠোনে। এক লাফে নামলো গাড়ি থেকে নির্মল পালিত। তারপর তর তর করে ভেতরে ঢুকে গেল সিগারেট ধরিয়ে। মিস্টার ঘোষাল খবর পেয়ে বেরিয়ে এল ড্রেসিং গাউন পরে। বললে—আমি কি মিস্টার পালিত বার-য়্যাট-ল'র সঙ্গে কথা বলছি ?

—ইয়েস মিস্টার ঘোষাল!

—বসুন, বসুন, আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুশী হলুম! বলুন, হোয়াট ক্যান্ আই ডু ফর ইউ ?

নির্মল পালিত তখন বসে পড়েছে। একবার চারদিকে চাইলে ভাল করে। হাতের ব্যাগটা রাখলে একধারে।

তারপর বললে—প্রথমেই বলে রাখি মিস্টার ঘোষাল, আমি এসেছি প্রফেশন্যাল কল্-এ। আমি প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের মিসেস ঘোষের অ্যাপয়ণ্টেড লয়্যার—আমি তাঁরই ব্রীফ নিয়েছি—

—আমি আপনাকে কী হেলপ্ করতে পারি বলুন? আই অ্যাম রেডি—

—বলছি মিস্টার ঘোষাল। আপনার সাহায্যের জন্যেই তো এসেছি, অবশ্য আপনি ভেরি বিজি ম্যান আমি জানি, আপনি রেলওয়ের এক রেস্পন্সিবল গেজেটেড অফিসার। আপনাকে বেশি বুঝিয়ে বলতে হবে না আমি জানি। তবু বলছি, আপনার সাহায্য পেলে আমি কৃতার্থ হয়ে যাবো—

—বলুন, কী সাহায্য দরকার ?

নির্মল পালিত আর ভূমিকা করলে না। বললে—মিসেস ঘোষ এখানে আপনার কেয়ারে আছেন? মিসেস সতী ঘোষ, ওয়াইফ অব মিস্টার সনাতন ঘোষ, ওনলি সন অব মিসেস নয়নরঞ্জিনী দাসী?

মিস্টার ঘোষাল এবার চুরোটে লম্বা একটা টান দিলে। তারপর বললে—কিন্তু একটা ভুল করছেন মিস্টার পালিত—

—কী ভুল বলুন?

—মিসেস সতী ঘোষ এখানে আছেন বটে, কিন্তু আমার কেয়ারে নয়, তিনি আছেন ...ের ফ্ল্যাটে, তিনি নিজেই ফ্ল্যাটের টেনেন্ট, আমার সঙ্গে তাঁর কোনও কনসার্ন নেই—

নির্মল পালিত বললে—ওয়েল ওয়েল ভেরি গুড, আমার খুব উপকার হলো মিস্টার ঘোষাল, আমার ধারণা ছিল তিনি আপনার কেয়ারে আছেন—আমার একটা মস্ত ভুল ভাঙলো—

বলে নির্মল পালিত আবার চুরোটে টান দিলে।

—আর একটা কথা মিস্টার ঘোষাল মিসেস ঘোষ যে এখানে আছেন, তার জন্যে আপনি তাহলে মোটেই দায়ী নন?

মিস্টার ঘোষাল হাসলো। বললে—না না, আমি দায়ী থাকবো কেন?

—না তাই জিজ্ঞেস করছি। আর একটা কথা। আপনি তাকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আসেননি?

—না না, আমি কেন তাঁকে এখানে নিয়ে আসতে যাবো? তিনি আমার কে?

—তাঁর সঙ্গে আগে আপনার কোনও পরিচয়ও ছিল না?

—না না, তা কী করে থাকবে?

নির্মল পালিত বললে—দেখেছেন, আমি সব ভুল ইনফর্মেশন পেয়েছিলুম। ভাগ্যিস আপনি সব সত্যি কথা বললেন—আদার-ওয়াইজ মিসেস ঘোষ তো বড় মুশকিলে পড়তেন, আর অকারণে আপনাকেও লিটিগেশনের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হতো!

—কেন? আমি জড়িয়ে পড়তুম কেন?

নির্মল পালিত বললে—তা বুঝি জানেন না, আমাকে যে কেস্ করতে হবে আপনার নামে, আমার পয়েণ্ট অব আর্গুমেণ্ট হচ্ছে আপনিই মিসেস ঘোষকে এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছেন—আর তাঁর সঙ্গে আছে দশ হাজার টাকার অর্নামেণ্ট! আপনি না বললে তো খুব মুশকিলে পড়েছিলাম!

বলে উঠলো নির্মল পালিত। বললে—আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্টার ঘোষাল, আপনার ভ্যাল্যুয়েবল সময় নষ্ট করলাম বলে—

মিস্টার ঘোষাল বললে—তাহলে মামলা আর করছেন না?

নির্মল পালিত বললে—করবো, কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে নয়, মামলা হবে মিসেস ঘোষের বিরুদ্ধে—

—কেন? কোন চার্জে?

নির্মল পালিত বললে—শাশুড়ীর দশ হাজার টাকার গয়না নিয়ে পালিয়ে আসার চার্জে! মিসেস ঘোষ স্বামীর অমতে শাশুড়ীর অমতে তো এখানে এসে উঠেছেন—

—কিন্তু সে আপনি প্রমাণ করবেন কী করে? হাউ?

—প্রমাণ আছে আমার হাতে মিস্টার ঘোষাল! প্রমাণ না থাকলে কি আর বলি! মিসেস ঘোষের হাসব্যাণ্ডই সাক্ষী দেবেন মিসেস ঘোষের বিরুদ্ধে—আর...

মিস্টার ঘোষাল বললে—কিন্তু শাশুড়ীর অত্যাচারে কোনও ম্যারেড লেডীর শ্বশুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার রাইট নেই বলতে চান?

—আছে, নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু গয়না চুরি করে নিয়ে আসার রাইট তো নেই তা বলে! কিছুই চুরি করবার রাইট নেই!

—কিন্তু মিসেস ঘোষ যে গয়না চুরি করেছেন, একথা আপনাকে কে বললে?

নির্মল পালিত বললে—বলেছে আমার ক্লায়েণ্ট! আর তাছাড়া আমি তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি তিনি এখানে আড়াই শো টাকার ফ্ল্যাট ভাড়া দিচ্ছেন—এ টাকা নইলে কোত্থেকে পাচ্ছেন তিনি? আপনি তো আর দিচ্ছেন না! আপনার কেয়ারে তো তিনি নেই! তাঁর তো অন্য কোনও সোর্স-অব-ইনকাম নেই!

মিস্টার ঘোষাল বললে—না, থাকলেও আমি জানি না—

—তিনি তো চাকরি করেন না কোথাও?

মিস্টার ঘোষাল বললে—বোধহয় না—

—চাকরি করলে অবশ্য আমার প্লীড করা শক্ত হতো! চাকরি করলে অবশ্য বলতে পারতেন যে তিনি অফিসের মাইনে থেকে ফ্ল্যাট ভাড়া দিচ্ছেন। আর তা না হলে ধরে নিতে হয় যে হয় তিনি গয়না বেচে-বেচে চালাচ্ছেন, আর নয়ত আপনি তাঁর হয়ে টাকাটা দিচ্ছেন মাসে মাসে—অর্থাৎ আপনার কেয়ারে তিনি আছেন—অর্থাৎ আপনার বিরুদ্ধেও এডাল্টারির চার্জ আসতে পারে!

নির্মল পালিত একটু থেমে বললে—আচ্ছা, আমি তাহলে আসি মিস্টার ঘোষাল, বিরক্ত করলুম বলে আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি—

বলে নির্মল পালিত চলেই যাচ্ছিল। হঠাৎ মিস্টার ঘোষাল বাধা দিলে। বললে—আচ্ছা মিস্টার পালিত—এসব কেসে কী হতে পারে? পানিশমেণ্ট কী হতে পারে?

নির্মল পালিত বললে—তা আমি কী করে বলবো মিস্টার ঘোষাল, সে ট্রাইং ম্যাজিস্ট্রেটই বলতে পারে—

বলে নির্মল পালিত চলে যাবার উদ্যোগ করতেই মিস্টার ঘোষাল আবার বললে—একটা কথা মিস্টার পালিত—

—বলুন।

—এ সম্বন্ধে আমরা একটা টার্মস অব সেটেলমেণ্টও আসতে পারি না?

নির্মল পালিত একটু থমকে দাঁড়ালো খানিকক্ষণ। তারপর বললেন—টার্মস অব সেটেলমেণ্ট! মানে আপনি টাকা দিয়ে মিটিয়ে দিতে চান? কিন্তু মিসেস ঘোষের শাশুড়ী তাতে রাজী না হতে পারেন, মিসেস ঘোষের হাস্-ব্যাণ্ডও রাজী না হতে পারেন। তবে আপনি যখন বলছেন, তখন আমি তাঁদের বলে দেখতে পারি! কিন্তু তাতে কোনও ফল হবে বলে মনে হয় না মিস্টার ঘোষাল, তাঁদের তো টাকার অভাব নেই—তাঁরা মিলিওনেয়ার লোক—

—কিন্তু আপনি?

—আমি?

নির্মল পালিত যেন চমকে উঠলো। বললে—আমাকে আপনি মিথ্যে ওবলিগেশনে ফেলছেন মিস্টার ঘোষাল। আমি এই কেসের জন্যে অলরেডি পেপার্স তৈরি করে ফেলেছি—এতে অনেক টাকা ইনভলভড্ হয়ে গেছে—

—কত টাকা?

নির্মল পালিত বললে—তা অন্ততঃ হাইক

থাউস্যাণ্ড—পাঁচ হাজার টাকার মতন জড়িয়ে পড়েছে অলরেডি!

—ধরুন যদি টাকাটা আমিই দিয়ে দিই আপনাকে?

নির্মল পালিত যেন চিন্তিত হবার ভাণ করলে।

মিস্টার ঘোষাল বললে—আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মিস্টার পালিত! আপনি একটু বুঝুন না! আসলে তো ওদের পেছনে কথা মেয়েমানুষ ছাড়া আর কেউ নেই—আপনি যদি কেসটা একটু ম্যানিপুলেট করেন, তাহলেই তো সব চুকে যায়। আর ফাইভ থাউজ্যান্ড যদি কম মনে করেন তো সিক্স থাউজ্যান্ড দিচ্ছি—আমি চাই না মিসেস ঘোষকে নিয়ে একটা কিছু পাব্লিক স্ক্যান্ডেল হয়—

—সেটা কি আমিই চাই?

—না, সেই জন্যেই তো বলছি, মিসেস ঘোষ একজন রেসপেক্টেবল লেডী, তাঁকে নিয়ে স্ক্যান্ডেল হলে পাব্লিকই হাসবে। আর সেই জন্যেই তো আমি তাঁকে এখানে ন্টার দিয়েছি। তাঁর অবস্থা যদি আপনি দেখতেন তো আপনার দয়া হবে, পিটি হবে র ওপর—! তাঁকে ডাকবো এখানে?

নির্মল পালিত বললে—না ডাকবার আর দরকার! বিশেষ করে একজন রেসপেক্টেবল লেডীকে আমি কোর্টে টানা-হেঁচড়া করতে চাই না। আর সেই জন্যেই কোর্টে কেস ফাইল করবার আগে আপনার কাছে এলাম—

মিস্টার ঘোষাল তারপর তাড়াতাড়ি ভেতরে উঠে গেল। তারপর একটু পরেই আবার বেরিয়ে এসে মিস্টার পালিতের হাতে একটা প্যাকেট গুঁজে দিলে। বললে—আমি ক্যাশই দিয়ে দিলাম—

ঘটনাটা ঘটলো অত্যন্ত গোপনে। প্যালেস-কোর্টের বাইরের পৃথিবীর লোক কেউ কিছু জানতে পারলে না। মিস্টার ঘোষালের মত লোকও মুখে হাসি এনে ঘটনাকে সহজ করবার চেষ্টা করলে। মিস্টার পালিতও টাকাগুলো গুণে গুণে ব্যাগে পুরে ফেললে। তারপর যাবার আগে বললে—কিন্তু একটা উপকার আমার করতে হবে মিস্টার ঘোষাল!

—বলুন, কী উপকার করতে পারি?

—আপনি মিসেস ঘোষকে কোনও চাকরিতে ঢুকিয়ে দিন। এনি কাইন্ড অব জব! মানে, যাতে নিজের একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স অব ইনকাম থাকে। অন্তত আমি বলতে পারি যে মিসেস ঘোষ নিজের রোজগারে নিজের লাইভলিহুড চালাচ্ছে—নইলে সমস্ত দোষটা আপনার ঘাড়ে পড়বে! তাতে আমারও উপকার, আপনারও উপকার—

—একটু চা খেয়ে যাবেন না?

কিন্তু কাজের পর নির্মল পালিত আর বসবার লোক নয়। উঠে যাচ্ছিল। হঠাৎ মিস্টার ঘোষাল বললে—দাঁড়ান, মিসেস ঘোষকে একবার ডাকি, বড় মুষড়ে পড়েছেন, আপনি একটু হোপ দিয়ে যান—

টাকাটা তখন ভেতরে পুরে ব্যাগের মুখ শক্ত করে আঁটা হয়ে গেছে। বললে—তা ডাকুন—

নির্মল পালিত চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ! একবার এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো। পয়সাওয়ালা লোক মিস্টার ঘোষাল। সিক্স থাউজ্যান্ড ক্যাশ বার করে দিয়েছে এক কথায়! টেন থাউজ্যান্ড বললেই হতো। একটা মিস-ক্যাল-কলেশন হয়ে গেছে!

হঠাৎ যেন ঝড়ের মত ঘরে ঢুকলো সতী!

—আপনি কেস করবেন আমার নামে?

নির্মল পালিত পেছন ফিরে দেখতেই চমকে উঠলো। এই মিসেস ঘোষেরই আর এক রূপ দেখেছে নির্মল পালিত। কিন্তু আজ যেন অন্যরকম দেখালো একেবারে। কোঁকড়ানো চুলগুলো পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে। একটা লাল নতুন শাড়ি পরেছে। ঘরের ভেতর যেমন অবস্থায় ছিল, তেমনি ভাবেই বেরিয়ে এসেছে। মিস্টার ঘোষালও পেছন-পেছন ভেতরে ঢুকেছে তার।

—আপনি কেস করবেন বলে ভয় দেখাতে এসেছেন এখানে?

নির্মল দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—আসুন মিসেস ঘোষ, বসুন—

সতী বললে—না, আমি বসতে আসিনি—আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি কি আমাকে ভয় দেখাতেই এসেছেন এখানে?

নির্মল পালিত বললে—এটা আপনি কী বলছেন মিসেস ঘোষ, আমি তো আপনার জন্যেই খবরটা দিতে এসেছিলাম। তাছাড়া আমার তো প্রফেশনই এই, কিন্তু কারো ক্ষতি হয়, কারো সর্বনাশ হয় এটা তো আমি চাই না। আমাকে মামলা করতে বলেছেন আপনার শাশুড়ি আপনার নামে, আমি ড্রাফ্‌ও তৈরী করেছি সেই রকমভাবে, কিন্তু ভাবলাম এও তো একটা স্ক্যান্ডাল! এত বড় একটা ফ্যামিলির নামে স্ক্যান্ডাল রটবে—সেটা কি ভাল!

সতী বললে—না আমি চাই, আমার নামে মামলা হোক।

—আপনি মামলা চান?

সতী বললে—হ্যাঁ চাই—

মিস্টার ঘোষাল এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—কিন্তু মামলা হলে যে
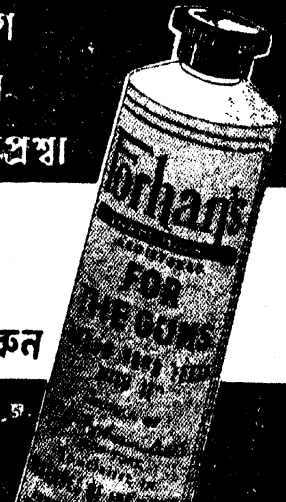
আমরা সবাই জড়িয়ে পড়বো মিসেস ঘোষ! নিউজ পেপারে যে সব ছাপা হবে—

সতী বললে—হোক ছাপা! ছাপা হলেই তো ভাল! লোকে জানুক বড়-বড় লোকের সংসারে কী কী ঘটে, কী ধরনের অত্যাচার হয়—বড়-বড় লোকেরা বাড়ির ভেতরে কী অশান্তিতে কাটায়। লোকে জানে তারা বড় আরামে থাকে, গাড়ি চড়ে বেড়ায় আর সুখে দিন কাটায়—কিন্তু তাদের জীবনেও যে কত অসহ্য অশান্তি থাকে—তা বাইরের লোকদের জানানো উচিত!

নির্মল পালিত বললে—কিন্তু তাতে আপনার কী লাভ মিসেস ঘোষ?

—আমার লাভ আছে বলেই বলছি!

মিস্টার ঘোষাল বললে—একজ্যাক্টলি সো, সেসব বাইরের লোকদের জানানো দরকার কী? বাইরের লোকরা বড়লোকদের স্ক্যান্ডাল শুনে মিছিমিছি হাসাহাসি করবে!

—আমি তো চাই তারা হাসাহাসি করুক! জানুক সব লোকে! আর কতদিন চাপা থাকবে? একদিন না একদিন সব তো জানাজানি হয়ে যাবেই!

—কিন্তু সে তো স্ক্যান্ডাল! স্ক্যান্ডাল কি প্রকাশ হওয়া ভাল?

সতী বললে—হ্যাঁ ভাল! আর এই স্ক্যান্ডাল হবে বলেই আমি বাড়ি থেকে চলে এসেছি প্যালেস-কোর্টে! স্ক্যান্ডাল না হলে ওদের কীসের শাস্তি হলো?

মিস্টার ঘোষাল বললে—কিন্তু তাতে তো আপনিও জড়িয়ে পড়বেন মিসেস ঘোষ? শুধু আপনি নয় আমিও!

সতী বললে—আমার কথা ভাববেন না আপনি, মিস্টার ঘোষাল! আমি সমস্ত স্ক্যান্ডালের ওপরে উঠে গেছি, আমার আশা ভরসা সব ফুরিয়ে গিয়েছে। আমি নিজের জন্যে আর ভাবি না। কিন্তু আমি চাই আমাকে যে কষ্ট ওরা দিলে, সে কষ্ট ওরাও পাক—আমাকে কষ্ট দিয়ে ওরা যেন পার না পায়—

নির্মল পালিত বললে—ঠিক কথা মিসেস ঘোষ, আমিও বলেছিলাম আপনার মাদার-ইন-ল'কে যে দিস ইজ রং—অ্যাবসলিউটলি রং—আপনার পুত্রবধূও একটা প্রপার্টি—আমি তো তাই একটা মিটমাট করবার চেষ্টাতেই আছি—

মিস্টার ঘোষাল বললে—না মিস্টার পালিত, মিটমাট আর হবে না—

সতী বললে—আমি আর মিটমাট করতে চাইও না—

নির্মল পালিত বললে—আপনার শাশুড়িও মিটমাট করতে চান না মিসেস ঘোষ—

মিস্টার ঘোষাল বললে—কিন্তু তাবলে যেন কোর্টে আপনি যাবেন না মিস্টার পালিত—

নির্মল পালিত বললে—তা কোর্টে কি আমিই যেতে চাই মিস্টার ঘোষাল, আপনি কোর্টকে যত ভয় করেন, আমি ভয় করি তার হাজার গুণে! কিন্তু আমার যে প্রফেশনই এই—

সতী বললে—না, আপনি কোর্টেই যান, আমি কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সকলের সামনে আমার কথা বলতে চাই—

নির্মল পালিত বললে—সবই তো বুঝলুম মিসেস ঘোষ—আপনার রাগের কারণও আমি জানি, কিন্তু আপনার হাসব্যাণ্ডের অসুখের কথাটাও একবার ভাবুন—জানেন তো তাঁর খুব অসুখ, মাদারের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তাও বন্ধ! এই অবস্থায় আপনি যদি তাকে এই আঘাত দেন, তাহলে তিনি কি আর বাঁচবেন?

সতী যেন হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্যে তার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরোল না।

মিস্টার ঘোষাল বললে—একজ্যাক্টলি সো, মিস্টার ঘোষের কথাটাও আপনার ভাবা উচিত মিসেস ঘোষ!

সতী বললে—না, তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আমার ঘুচে গেছে, মিস্টার ঘোষ আমার কেউ নয়, তাঁর ভালমন্দে আমার কিছু এসে যায় না—

নির্মল পালিত বললে—কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন মিসেস ঘোষ, তিনিই আপনার লিগ্যাল হাসব্যাণ্ড—

—নো—

হঠাৎ সতী চিৎকার করে উঠলো। বললে—নো, হি ইজ নো-বডি টু মি! আমার কোনও কনসার্ন নেই তার সঙ্গে—তাঁর অসুখই হোক, আর তিনি মারাই যান, ইট ম্যাটার্স ভেরি লিটল টু মি—

নির্মল পালিত আর দাঁড়াল না। বাইরে বেরিয়ে আসছিল। সতী বললে—আপনি ও'দের বার-স্র্যাট-স, আপনি ও'দের গিয়ে বলে দেবেন, আমি ও'দের মামলার ভয় করি না, আমি ওদের সামনে ফ্ল্যাট ভাড়া নেব, ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আই শ্যাল্ লিভ্ মাই ওন লাইফ—দেখি রিভেঞ্জ নেওয়া কাকে বলে—

নির্মল পালিতের কিছু বলবার ছিল না। আস্তে আস্তে বাইরে চলে এল। মিস্টার ঘোষাল এসে কাছে দাঁড়াল।

নির্মল পালিত বললে—ডোণ্ট বদার মিস্টার ঘোষাল, আমি আছি, আপনার ভাবনার কিছু নেই, মিসেস ঘোষ বড় একসাইটেড হয়ে উঠেছেন তো, তাই—তা আমি ওসব কথায় কিছু মনে করিনি—আফটার অল উইমেন আর উইমেন—আসলে তো মেয়েমানুষ!

বলে নির্মল পালিত নেমে গেল রাস্তায়। তারপর হঠাৎ আবার ওঠে এল ওপরে। কী যেন একটা কথা বলতে ভুলে গেছে। বললে—একটা কথা বলতে ভুলে গেছি মিস্টার ঘোষাল—

—বলুন!

—আপনি যেন মিসেস ঘোষকে আবার বলবেন না এই টাকার কথাটা। জানেন তো—

Men are women's playthings; woman is devil's.

বলে নির্মল পালিত একটা শয়তানি হাসি হেসে উঠলো হো হো করে।

কিন্তু প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে গিয়ে নির্মল পালিত আবার আর এক মানুষ। আর এক চেহারা তার। মস্ত বাড়িটা যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। সেই আগেকার মতন আর শৃঙ্খলা নেই যেন কোথাও। দরোয়ানটা গেটের পাশেই একটা খাটিয়া নিয়ে শুয়ে থাকে। আগে তার এমন সাহস হতো না। মা-মণি কোথায় তে-তলায় ঘরে চুপ করে বসে থাকে কেউ টের পায় না। আগেকার সেই ধমকানিও আর নেই। ঝি-চাকররা আগে উঠতে বসতে বকুনি খেত, গালাগালি খেত, এখন যার যা খুশি তাই করে। পাখীটা ছোলা খেতে পায় কি না, ঘর ঠিকমত ঝাট দেওয়া হলো কি না, বাগানে মালিটা কাজ করে কি না—কেউ দেখবার নেই।

সরকারবাবুরই জ্বালা। আস্তে আস্তে দরজার কাছে এসে বলে—মা-মণি—

—আবার কী সরকারবাবু?

—আজ্ঞে এসেছিলাম, ভাড়াটেদের কথা বলতে—

—ভাড়াটেদের কথা আবার বলতে এসেছো আমাকে? বলেছি না, ছাদ আমি সারাতে পারবো না, মামলা করুক আমার নামে—

—আজ্ঞে ছাদ নয়, ভাড়া দেয়নি দু'মাসের—

—দু'মাসের ভাড়া দেয়নি, তা তুমি কি আফিঙ্গ খেয়ে ঘুমোচ্ছিলে? তবে তোমাকে রাখা কেন? ভাড়া না পেলে তোমার মাইনে থেকে আমি কেটে নেব তা বলে রাখছি—যাও, এখন বিরক্ত কোর না আমাকে!

সরকারবাবু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটু থেমে বললে—আর একটা কথা—

—আবার কী কথা? আর কোনও কথা শুনতে চাই না আমি! আগে ভাড়া আদায় করে নিয়ে এসো, তবে কথা শুনবো, যাও এখন সামনে থেকে—এখন আমার কথা শোনবার সময় নেই—

সরকারবাবুর আর দাঁড়াবার সাহস হয় না। কোনও কাজকর্ম যদি হবার যো আছে। কী যে হয়েছে ঘোষ-বাড়িতে। আগে মা-মণি সব দেখতো, সব শুনতো, বকুনি দিত, গালাগালি দিত, সেও যেন ভাল ছিল এর চেয়ে। কাজ করে সুখ ছিল তখন!

ভাঁড়ার ঘরে ভূতির মা যা খুশি তাই করে। কেউ কিছু বলবার নেই। ঠাকুর যত ইচ্ছে তেল-ঘি খরচ করে, বাতাসীর মা ঘুমোয় বেলা পর্যন্ত। শম্ভু সেই যে আড্ডা দিতে বেরোয়, তার আর ফেরবার নাম নেই। সমস্ত বাড়িটা যেন ভূতের বাড়ি হয়ে গেছে এই ক'দিনের মধ্যেই।

সনাতনবাবু বিছানায় শুয়ে মাথার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ছটফট করে। বলে—মা, মা গো—

মা-মণির কানে মাঝে-মাঝে যায় কথাগুলো। তারপর শম্ভুকে দেখলেই বলেন—দরজাটা বন্ধ করে দে আমার—বন্ধ করে দে—

শম্ভু দরজা বন্ধ করে দেয়। দাদাবাবুর গলার শব্দটাও যেন বিষ লাগে মা-মণির কানে।

সনাতনবাবুর ঘরে গিয়ে শম্ভু বলে—ডাক্তারবাবুকে ডাকবো একবার দাদাবাবু?

শম্ভুর গলার শব্দ পেয়ে সনাতনবাবু চুপ করে যায়। বলে—এক গ্লাস জল দিতে পারো শম্ভু—

শম্ভু জল এনে দেয় তাড়াতাড়ি। বলে—জল তেষ্টা পেয়েছে, তা বলেননি কেন আমাকে দাদাবাবু, আমি তো এখানেই আছি।

তারপর শম্ভু আবার জিজ্ঞেস করে—ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দেব?

সনাতনবাবু বুঝতে পারে না তবু। বলে—খবর দিবি?

—আপনি যদি বলেন তো খবর দিচ্ছি—

—না থাক—

সনাতনবাবুর কাছে তাঁর অসুখ হওয়াটাই যেন একটা অপরাধের সামিল মনে হয়। শম্ভু দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর বলে—একটু মাথাটা টিপে দেব আপনার?

সনাতনবাবু বলেন—মাথা টিপলে কি সারবে?

—হ্যাঁ দাদাবাবু, দেখবেন আরাম হবে খুব—

মা-মণির ঘরের বন্ধ দরজার সামনে কৈলাস এসে ডাকে—মা-মণি—

—আবার কী? আবার বিরক্ত করতে এলি?

মা-মণির সব কথাতেই বিরক্তি। সব ব্যাপারেই রাগ। অথচ মা-মণি ছাড়া এ সংসারের কোন্ কাজটা কোনদিন হয়েছে তাও কেউ জানে না। তবু যতক্ষণ মা-মণি আছে, ততক্ষণ তাকে জিজ্ঞেসও করতে হবে, হুকুমও তামিল করতে হবে।

—উকীলবাবু এসেছেন নিচেয়, আপনাকে ডাকছেন!

মা-মণি বলেন—তা সেই কথাটা বলবি তো আমাকে!

বলে তাড়াতাড়ি নিচেয় আসেন। নির্মল পালিত বসে ছিল বৈঠকখানায়। মা-মণি ঢুকেই বললেন—কী হলো বাবা? সব তৈরি?

নির্মল পালিত বললে—হ্যাঁ মা-মণি, সব তৈরি করে এনেছি—এখন আপনি সই করলেই হয়—

তারপর ব্যাগটা খুলে কাগজটা বার করতে করতে বললে—বুঝলেন মা-মণি, আপনি যা বলেছিলেন তাই ঠিক,—

—কীসের ঠিক?

—আপনার ডটার-ইন-ল'র কথা বলছি, আপনি যা করেছেন, ভালোই করেছেন, আমি ভেবেছিলুম আপনিই বুঝি কিন্তু দেখলুম আপনার ডটার-ইন-ল'রই দোষ আসলে। আমায় টাকা দিতে এলো, বুঝলেন! আমাকে বলে কি ছ'হাজার টাকা দেব, আপনি মামলা করবেন না—!

মা-মণি অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—তুমি হতভাগীর কাছে গেছলে নাকি?

নির্মল পালিত বললে—গিয়েছিলুম বলেই তো বলছি। ভাবলুম আহা, তারই বা কী দোষ, যদি মিটিয়ে ফেলতে পারি ব্যাপারটা! কিন্তু দেখলুম এ মেটবার নয় মা-মণি! বললে কী জানেন?

—তুমি আর তার কথা আমায় বোল না বাবা, তার নাম শুনতেও আমার ঘেন্না হয়!

—আমারও ঘেন্না হলো মা-মণি তার কথা শুনে। দেখলুম—তোফা আরামে রয়েছেন তিনি, কোনও দুঃখ নেই। বললাম হাসব্যাণ্ডের অসুখ, ভ্রূক্ষেপ নেই। বড় হোপলেস হয়ে গেলাম সব দেখে শুনে। শেষে বললাম —মামলার কথা। শুনে কী করলে জানেন? আমার হাতে টাকা গুঁজে দিলে—ছ' হাজার টাকা। বললে—মামলা করবেন না, তাতে তাঁর বদনাম হবে, স্ক্যান্ডাল হবে—

—তুমি টাকা নিলে?

—আজ্ঞে, কী যে বলেন আপনি! আমি কি সেই রকম লোক? আমি আপনারও ব্রীফ্ নেবো, তারও ব্রীফ নেবো? আসামী ফরিয়াদী দু'পক্ষের টাকা খাবো? আমার বাবা আমাকে শিখিয়ে গেছেন—

Make money your God, it will plague you like the devil.

জানেন—

মা-মণি বললেন—ছাড়ো ওসব কথা বাবা। ও-কথা শুনলেও আমার গা ঘিন-ঘিন করে—

নির্মল পালিত বললে—তা তো করবেই—আমি বার-য়্যাট-ল, আমারই তাই করে তো আপনি—

মা-মণি বাধা দিয়ে বললেন—আমার আসল কাজের কী করলে বলো?

নির্মল কাগজগুলো সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে—এই উইল তৈরি করেছি—আর এই হলো মামলার নথি—

—ও তো হচ্ছে, কিন্তু বাড়ি বিক্রির ... করলে?

—সেও পার্টি ঠিক করে ফেলেছি। এ... দেখুন ডীড—

মা-মণি বললে—ও ডীড-ফিড আমি কী ... বা বুঝব—ইংরিজী আমি কী বুঝি? মু... বলো না কী করলে? কত দর পেলে?

নির্মল পালিত বললে—বেশ প্রফিটেব... দর পেয়েছি মা-মণি, দুটো বাড়ি কুড়ি হাজার—

—কুড়ি হাজার? কিন্তু আমার কেনা ... যে ষাট হাজার বাবা? ষাট হাজার দি... তোমার বাবাই আমাকে যে কিনিয়েছিলেন— তিনতলা বাড়ি, দু'খানা মিলিয়ে ... তিরিশেক ঘর—

নির্মল পালিত বললে—কিন্তু সময়... কী-রকম সেটা ভাবুন, আপনি যখন কিনে... ছিলেন তখন বাড়ির দর ছিল, এখন ... কেউ কেনে? কেনবার টাইম কি এটা... এখন সব মাড়োয়ারীরা পর্যন্ত বাড়ি বি... করে দিচ্ছে, আপনি এখন তো তবু কুড়ি...
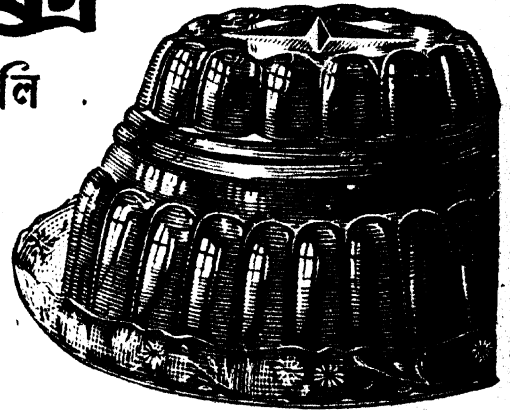
হাজার পাচ্ছেন, এর পর যে খদ্দেরই পাবেন না কেনবার! আর যুদ্ধের মধ্যে যদি একদিন কলকাতায় জাপানীদের বোমা পড়ে তো তখন আপনার বাড়ি কি থাকবে ভাবছেন: তখন তো আমাকেই দোষ দেবেন!

তারপর কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—দিন্, এই কাগজে তিনটে সই করে দিন্—আমি আপনার সব কাজ হাসিল করে দিচ্ছি—দেখুন না—

মা-মণি কলমটা নিয়ে সই করলেন—নয়নরঞ্জিনী দাসী। একটা, দুটো, তিনটে সই—

আর হঠাৎ পাশের বারান্দার দিকে নজর পড়তেই ডাকলেন—কে? কে ওখানে?

মা-মণির যেন মনে হলো বারান্দা দিয়ে কে যেন নিঃশব্দে ভেতরের দিকে চলে গেল।

—কে? কে ওদিকে গেল রে? কে?

নির্মল পালিত বললে—কই, কেউ তো যায়নি ওদিকে মা-মণি—

মা-মণি বললেন—মনে হলো কে যেন গেল ওদিকে—

তারপর ডাকলেন—শম্ভু, শম্ভু কোথায় গেলি? কৈলাস? কৈলাস কোথায়?

কৈলাস আসতেই মা-মণি বললেন—এখ্খুনি কে গেল রে ওদিকে?

কৈলাস বললে—বৌদিমণি!

বৌদিমণি! মা-মণি লাফিয়ে উঠলেন। বললেন—কোথায় গেল বৌদিমণি? কোন্ দিকে? ওপরে?

কৈলাস বললে—দাদাবাবুর ঘরে—

দাদাবাবুর ঘরে! আমাকে না বলে ভেতরে চলে গেল? তোরা সব মরে গিছলি না কী? চল্, দেখি কোথায় গেল! বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে হন্ হন্ করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল?

কিন্তু ততক্ষণে সতী একেবারে সনাতনবাবুর ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে। শম্ভু পাশে বসে সনাতনবাবুর মাথা টিপে দিচ্ছিল। সতী গিয়ে দাঁড়াতেই শম্ভু অবাক হয়ে চেয়ে রইল সতীর মুখের দিকে।

—কেমন আছো তুমি?

সনাতনবাবু এ-পাশ ফিরে চেয়ে দেখলেন। বললেন—ও, তুমি এসেছ?

সতী এগিয়ে গিয়ে মাথার কাছে বসলো। বললে—খুব কষ্ট হচ্ছে তোমার? হঠাৎ অসুখ হলো যে!

সনাতনবাবু বললেন—মাথাটায় বড্ড ব্যথা লাগছে—তুমি বোস, ভালো করে এখানে সরে বোস—

—তুমি এখান থেকে চলো, এখানে থাকলে তোমার অসুখ সারবে না—

—কোথায় যাবো?

সতী বললে—কেন, আমার কাছে, আমার কাছে যেতে তোমার আপত্তি আছে?

হঠাৎ পেছনে পায়ের শব্দ হলো। শাশুড়ী এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন—এ-বাড়িতে আবার ঢুকলে কেন শুনি? কাকে বলে ভেতরে ঢুকেছ? কে তোমায় ঢুকতে দিয়েছে?

সতী পেছন ফিরে তাকালোও না, এ-কথার জবাবও দিলে না। তেমন ভাবেই সনাতনবাবুর মাথায় হাত বুলোতে লাগলো। বললে—তুমি যদি যাও আমার সঙ্গে তো আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি—যাবে?

—বলি, কথার উত্তর দিচ্ছ না যে?

সতী এতক্ষণে মুখ ফেরালো। বললে—আমি আপনার কথার উত্তর দেব না, আপনি যা ইচ্ছে করুন গিয়ে—

শাশুড়ী এবার ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লেন। বললেন—বলি, এ কি তোমার নিজের বাপের বাড়ি পেয়েছ? ভেবেছ কী তুমি?

সতী বললে—যা বলবার আপনি বাইরে গিয়ে বলুন, রোগীর ঘরে চেঁচাবেন না।

শাশুড়ী আর থাকতে পারলেন না। বললেন—রুগীর ওপরে যে তোমার বড় টান্ দেখছি—এতদিন এ-টান কোথায় ছিল শুনি? তখন তো ঘরে হুড়কো এঁটে ভাতারকে বের করে দিতে! তখন তো এত আটা দেখিনি? এখন যে দেখছি আদরে একেবারে টইটুম্বুর—

সনাতনবাবুর মুখ দিয়ে একটা যন্ত্রণা-কাতর শব্দ বেরোল—আঃ—মা গো—

সতী বললে—আপনি এখন যান্ এখান থেকে, আমাকে যা বলবেন, পরে বাইরে গিয়ে বলবেন—

শাশুড়ী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন—তুমি কার সঙ্গে কথা বলছো জানো? জানো এখনি দরোয়ান ডেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে পারি?

—যদি বার করতে পারেন তো তাই করুন, বাজে বক্ বক্ করবেন না—

সনাতনবাবু হঠাৎ বাধা দিলে। বললে—তুমি কেন গোলমাল করছো সতী, তুমি কেন এসে? তুমি চলে যাও না এখান থেকে—

সতী হঠাৎ সনাতনবাবুর মুখ থেকে এই কথা শুনে থমকে গেল। বললে—তুমি বলছো কী?

—হ্যাঁ, তুমি চলে যাও, কেন তুমি এলে? আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে—

—তা শেষকালে তুমি আমাকে এই কথা বললে?

শাশুড়ী বললেন—তা বলবে না, গুণধরীর গুণের কথা জানতে তো আর কারো বাকি নেই! নিজের মুখ পুড়িয়ে আবার এখন সোয়ামীর মুখ পোড়াতে এসেছে—লজ্জাও করে না—

—তুমি চলে যাও সতী, আমি বলছি, তুমি আর এসো না, যাও এখান থেকে—

সতী যেন এতক্ষণে নিজের অবস্থাটা বুঝতে পারলে। বললে—আচ্ছা, আমি চলেই যাচ্ছি—

বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—থাকতে আমি এখানে আসিনি, থাকতে চাইও না আমি তোমাদের বাড়িতে—তোমাদের এখানে থেকে আমায় স্বর্গলাভও হবে না জানি। কিন্তু আজ একটা কথা বলে রাখছি, এতে কারোরই ভাল হবে না, তোমাদেরও না, আমারও না—তোমাদের আমি ভালোই চেয়েছিলাম, তোমাদের ভালোর জন্যেই আমি আমার ভালো চেয়েছিলুম—কিন্তু তোমাদের ভালো করা শিবেরও অসাধ্য—

শাশুড়ী বাধা দিয়ে বললেন—যাও যাও, ঢের হয়েছে—

সতী ততক্ষণে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। তারপর তর্ তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল নিচেয়। খবর পেয়ে বাতাসীর মা, ভূতির মা, কৈলাস, ঠাকুর, ড্রাইভার, সবাই সিঁড়ির নিচে খিড়কীর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। সবাই দেখলে বৌদিমণি কোনও দিকে না চেয়ে একেবারে সোজা সদর-গেটের দিকে বেরিয়ে গেল।

নির্মল পালিত বৈঠকখানা ঘরে একলা চুপ-চাপ মা-মণির জন্যে অপেক্ষা করছিল। অপেক্ষা করবার কিছু অবশ্য ছিল না। দলিলগুলোতে সই-সাবুদ যা করবার তা করে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তবু যাবার আগে কথা বলে যেতে হবে। বউবাজারের দুটো বাড়ির ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। শ্যামবাজারেরটাও ব্যবস্থা করতে হবে এবার। তারপর কিছু শেয়ার। শেয়ারেই বেশ কিছু মোটা রকমের আশা আছে।

হঠাৎ মনে হলো মিসেস ঘোষ তর্ তর্ করে বারান্দা দিয়ে বাইরের দিকে চলে যাচ্ছে।

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে ডাকলে—মিসেস ঘোষ—

সতী একবার নিজের নাম শুনে পেছন ফিরলে। তারপর আবার সোজা সদর গেটের দিকে যেমন যাচ্ছিল তেমনি এগিয়ে গেল।

বাইরে সদর গেটের সামনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। সতী দরজা খুলে তার ভেতরে গিয়ে উঠলো। উঠতেই শম্ভু দৌড়তে দৌড়তে এল কাছে। বললে—বৌদিমণি তুমি কোথায় যাচ্ছো?

সতী কিছু উত্তর দিলে না।

শম্ভু বললে—সেই নতুনবাবু এসেছিল একদিন তোমাকে খুঁজতে বৌদিমণি—

—কে? দীপু?

শম্ভু বললে—হ্যাঁ, আমায় জিজ্ঞেস করলে বৌদিমণি কোথায়? আমি বললুম—তা জানি না!

সতী হঠাৎ একটা টাকা বার করে শম্ভুর হাতে দিলে। বললে—এইটে নে, আর তোর দাদাবাবুকে একটু দেখিস্, বুঝলি, দেখিস্ একটু—

তারপর গাড়িটা চলতে আরম্ভ করতেই শম্ভু মাথাটা নিচু করে, একেবারে মাটির কাছাকাছি নামিয়ে প্রণাম করলে। কিন্তু যখন মাথা তুললো তখন বৌদিমণি অনেক দূর চলে গেছে—

নির্মল পালিত নিজের বাড়ির চেম্বারে কাগজ-পত্র গুছিয়ে উঠলো। বললে—ঠিক আছে, ওই কথাই রইল—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু এ-রকম করে কতদিন চলবে?

নির্মল বললে—তা আমি কী বলবো বল্, আমি তো মিট্-মাট্ করতেই গিয়েছিলুম, আমাকে সিক্স্ থাউজ্যান্ড রূপীজ্ ঘুষও দিতে এল, কিন্তু আমি গাছেরও পাড়বো তলারও কুড়োব, তেমন লোক নই ভাই, তেমন করতে পারলে আমি আজ কলকাতা শহরে অনেক প্রপার্টি করে ফেলতে পারতাম—তাহলে আমার প্রপার্টি আজ খায় কে?

দীপঙ্করও উঠলো।

নির্মল পালিত বললে—কিছু ভাবিসনি, যা হবার তা হবেই, একবার যখন বিষ ঢুকেছে তখন আর কেউ রোধ করতে পারবে না—মিসেস ঘোষ বলেছে ঠিক, ও শিবেরও অসাধ্য—দেখা যাক্ আমি কতদূর কী করতে পারি—

রাস্তায় এসেও দীপঙ্কর হাজরা রোডের মোড় খানিকক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হলো পৃথিবীটা যেন থেমে গেছে। এখন কোথায় যাবে সে? কার

কাছে গেলে মনটা শান্ত হবে! এতখানি বোঝা দীপঙ্করের মাথার ওপর, কে তার বোঝা নামিয়ে নেবে!

প্রাণমথবাবুর কথা মনে পড়লো। এমন করে সর্বস্ব দিয়ে কে দেশকে ভালবাসতে পেরেছে, কে মানুষকে ভালবাসতে পেরেছে প্রাণমথবাবুর মত। যেমন প্রাণমথবাবু, তেমনি প্রাণমথবাবুর স্ত্রী। যখন বৈঠকখানা ঘরে সবাই এসে জোটে, প্রাণমথবাবুর পাশে মামীমাও চুপ করে বসে থাকেন। প্রাণমথবাবুর মত তিনিও জেলে গেছেন সারাজীবন। কিরণের মাকে মাসকাবারি টাকা দেবার পর, আর একদিন প্রাণমথবাবুর বাড়ি গিয়েছিল দীপঙ্কর। সেদিন বৈঠকখানায় কেউই ছিল না। একলা বসেছিলেন। দীপঙ্কর গিয়ে প্রণাম করেছিল, তবু অন্য দিনের মত হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেন নি প্রাণমথবাবু। কেমন আছে দীপঙ্কর, মা'র কী হয়েছিল শেষকালে, কত কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। এক সময়ে বলেছিলেন—জানো বাবা, এ হলো বাঙলা দেশ, এ বেহার নয়, গুজরাট নয়, মাদ্রাজও নয়—এদেশে যে জন্মেছে তাকে লড়াই করে বাঁচতে হয়েছে—লোকে বলছে সুভাষ নাকি সাধু হয়ে গেছে—! কিন্তু তাকে তো আমি জানি, সে কি পালাবার ছেলে? সাধু হলে সে অনেক আগেই সাধু হয়ে যেত—

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন—দেখ বাবা দীপু, গাছপালা যত সহজে গাছপালা, মানুষ তত সহজে মানুষ নয়। এই মাদ্রাজ কি বেহারের কথাই ধরো না, রাজগোপালাচারীরা মাদ্রাজে যত সহজে রাজগোপালাচারী হয়েছে, রাজেন্দ্র প্রসাদ বেহারে যত সহজে রাজেন্দ্র প্রসাদ হয়েছে, সুভাষ কি বাঙলা দেশে তত সহজে সুভাষ হতে পেরেছে? না দেশবন্ধু হতে পেরেছে?

যেন অনেক দুঃখ পেয়ে কথাগুলো বলেছিলেন প্রাণমথবাবু! প্রাণমথবাবুর শরীর আরো খারাপ হয়ে গিয়েছিল ইদানীং।

চলে আসবার সময় বলেছিলেন—তুমি মাঝে মাঝে চলে এসো বাবা, আমি বড় ব্যস্ত আছি ক'দিন—

—খুব কাজ পড়েছে বুঝি স্কুলে?

—ইস্কুল নয় ইলেক্‌শন, আমাদের কংগ্রেসের ইলেক্‌শন নিয়ে খুব খাটছি ক'দিন ধরে। দেশবন্ধুর নিজের হাতে গড়া কংগ্রেস, আমরা গোড়া থেকেই আছি, তাই যার তার ওপর ভার ছেড়ে দিতে ভয় করে বাবা—

দীপঙ্কর সামনে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে উঠলো।

প্রাণমথবাবুকে এখন বিরক্ত করা উচিত নয়।

ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করলে—কোথায় যেতে হবে হুজুর?

—ডালহৌসী স্কোয়ার।

ডালহৌসী স্কোয়ারে বার্মা ইভাকুয়ীজ অফিস হয়েছে। সেখানে গেলে ভুবনেশ্বরবাবুর খবরটা হয়ত পাওয়া যেতে পারে। বিকেল হয়ে এসেছে। আর একটু পরেই হয়ত অফিস বন্ধ হয়ে যাবে। অফিসের সাইনবোর্ড ছিল, চাপরাশি ছিল সামনে দাঁড়িয়ে। অফিসের সামনেও খুব ভিড়। প্রচুর লোক বর্মার আত্মীয় স্বজনের খবর নেবার জন্যে ভিড় করেছে সামনে। দীপঙ্করও আর সকলের মত একটা ফর্ম চেয়ে নিলে। তারপর নাম-ঠিকানা ভর্তি করে এগিয়ে দিলে।

ভেতরের ক্লার্কটা ফর্ম নিয়ে একবার পড়ে দেখলে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কতদিন পরে খবর পাওয়া যাবে?

ক্লার্কটা বললে—আপনি এক সপ্তাহ পরে একবার আসবেন—

—অত দেরি হবে?

ক্লার্কটা বললে—এ কি আর একটা-দুটো লোকের ব্যাপার স্যার, লক্ষ-লক্ষ লোক—সকলের ট্রেস করা কি অত সহজ—?

পেছনে অনেক লোক তখন দাঁড়িয়ে আছে। সকলকে কাটিয়ে দীপঙ্কর বাইরে বেরিয়ে এল। সমস্ত পৃথিবীর মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালো যেন দীপঙ্কর। এত সকাল-সকাল বাড়ি গিয়ে কার সঙ্গে কথা বলবে? কে আছে? সেই সন্তোষকাকা আর সন্তোষকাকার মেয়ে!

সন্তোষকাকার মেয়ে সেদিনকার সেই ঘটনার পর যেন আরো জড়োসড়ো হয়ে গেছে।

সন্তোষকাকা মেয়েকে বলে—দরকার নেই তোর ক্ষিরি, তোর কিসের দায়, তোকে বিয়েও করবে না কিছু না, তুই কেন খাটতে যাবি গতর দিয়ে! গতর কি সস্তা?

তারপর রোয়াকের ওপর বসে মুড়ি চিবোতে চিবোতে বলে—আহা, কী যে দুর্মতি হয়েছিল আমার। কেন যে রসুলপুর থেকে এসেছিলাম সুখের দেশ ছেড়ে, ভীমরতি হয়েছিল রে ক্ষিরি, ভীমরতি হয়েছিল আমার—

তারপর আবার মুড়ি চিবোয় আপন মনে।

বলে—আর একটু গুড় আছে রে ক্ষিরি—আর একটু গুড় দিবি মা?

ক্ষিরি এক ডেলা গুড় ফেলে দিয়ে যায় বাটিতে।

সন্তোষকাকা হাঁ হাঁ করে ওঠে। বললে,—এ কী করলি? গুড় চাইলুম বলে এতখানি গুড় দিলি তাবলে? তাহলে দে, আর দুটি মুড়ি দে, দেখিস্ আবার যেন বেশি দিয়ে ফেলিস নে, তাহলে আবার গুড় দিতে হবে—

দীপঙ্কর যখন বাড়ি ফিরলো তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে পা দুটোকে টেনে নিয়ে বাড়ির দরজার কাছে আসতেই পেছনে একটা ট্যাক্সির শব্দ হলো। ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি থেকে নেমে দীপঙ্করকে দেখে জিজ্ঞেস করলে, দীপঙ্করবাবুর বাড়ি কোন্‌টা।

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। ট্যাক্সি করে এত রাত্রে কে আসবে তার বাড়িতে! বললে—আমারই নাম দীপঙ্করবাবু—

গাড়ি থেকে ততক্ষণে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক নেমে এসেছে। কোট, প্যান্ট, টাই—লম্বা চওড়া দশাসই চেহারা। দীপঙ্কর ভদ্রলোককে দেখেই এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—হুম্ ডু ইউ ওয়াণ্ট্ প্লিজ্?

—আই ওয়াণ্ট্ মিস্টার ডীপঙ্কর সেন—

—ইয়েস্, হিয়ার আই য়্যাম্!

—আর ইউ?

দীপঙ্কর তখনও অবাক হয়ে চেয়ে আছে। এত লোক থাকতে দীপঙ্করকে খুজতে কলকাতার এই প্রান্তে এসেছে কেন! কীসের দরকার? কী চায় তার কাছে? ভদ্রলোকের মুখে চুরোট, হাতে একটা পোর্টফোলিও ব্যাগ। ফরসা ধপ্ ধপ্ করছে মুখের রং।

সাহেবটা একেবারে দীপঙ্করের মুখের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বললে—আই য়্যাম্ কিরণ।

—কিরণ!!

একেবারে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল দীপঙ্কর।

কিন্তু কিরণ তার আগেই মুখে আঙুল চাপা দিয়ে দিয়েছে।

—চুপ!

(ক্রমশ)
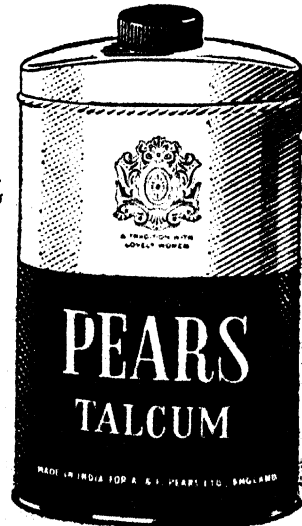
॥ তেইশ ॥

মদন ক্রমশ শঙ্কিত হয়ে উঠছিল। বারটার গেটে ঋষিকেশ থেকে যে বাসগুলো আসবে, তার কোন একটাতে ওরা যদি না আসে, তবে মদন যে কি করবে, তা বুঝে উঠতে পারছিল না। ও ছটফট করতে লাগল। ধর্মশালার পাকা যে ঘরখানা বাগিয়েছে মদন, তার পার্টির এক রাত্রের বিশ্রামের জন্য, সেই ঘরখানা দোতলায়। বেশ পরিষ্কার। নোংরা নেই। মাছিও নেই। একেবারে নতুন বাড়ি। বারান্দায় এসে একবার দাঁড়াল মদন। পিপুলকোটির ভিউটা মন্দ পাওয়া গেল না। ধ্যাত্তোরি ভিউ! মদন বিরক্ত হল।

সামনের রাস্তা দিয়ে একপাল ভেড়া চলেছে। গোটা কতক ভুটিয়া মেয়ে পিঠে বোঝা চাপিয়ে শিস্ দিতে দিতে ভেড়ার পালকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ধুলো উড়ছে। পিপুলকোটির বাস স্ট্যাণ্ডে সার সার বহু চকচকে মোটরকার দাঁড়িয়ে আছে। নেপালের রাজমাতা বদ্রীনাথ দর্শনে গেলেন। ঘণ্টা দুয়েক আগে তাঁরা রওনা হয়ে গেলেন। বিরাট পার্টি। সত্তর পঁচাত্তর জন মালবাহকই গেছে রাজমাতার পার্টিতে। এই গাড়িগুলো তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে। এই এখন মদন যেমন অপেক্ষা করছে তাদের পার্টির জন্য।

পাঁচজন শেরপা কাল সন্ধ্যাবেলাতেই এসে পেঁছে গেছে। বাকি শুধু কলকাতা-ওয়ালারা। তাদেরও ত কালই এসে পেঁাছানর কথা ছিল। কেন এল না, কে জানে? মদন অস্থির হয়ে উঠল। শেরপারা রান্নার জোগাড় করছে। ফাঁকে ফাঁকে তাস খেলছে। সর্দার আঙ শেরিং বাজারের দিকে ঘুরতে গেছে। মদন শুধু ছটফট করছে। একবার ঘরের ভিতর গেল। বিছানায় গিয়ে বসল। শুয়ে পড়ল। ভাল লাগল না। উঠে এসে আবার বারান্দায় দাঁড়াল। তারপর কি মনে করে, বাজারের দিকে বেরিয়ে গেল মদন। এগিয়ে গেল বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে।

মদন আর আঙ শেরিং দুদিন আগে পিপুলকোটি এসে পেঁাচেছে। ২৬শে সেপ্টেম্বর, সন্ধ্যাবেলা। হরিদ্বারে এসে কয়েকটা ঘাঁটিতে ওরা খোঁজখবর নিয়েছিল। শুনল, যাত্রীর সিজন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। সেপ্টেম্বরের হিড়িকটাই শেষ। এপ্রিল মাস থেকেই কেদারবদরীর তীর্থের যাত্রীদের মরশুম শুরু হয়। তখন সেইসব যাত্রীর মোট বইবার জন্য দক্ষিণ নেপাল থেকে প্রচুর মালবাহক আসে। ওরা যাত্রী-দের মালই শুধু বয় না, অশক্ত বা আয়েসী যাত্রীদেরও বহন করে ডাণ্ডি বা কাণ্ডিতে। অক্টোবরের গোড়া থেকেই মালবাহকেরা সারা মরশুমের কামাই নিয়ে ঘরে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

হরিদ্বারে ওরা শুনল, মালবাহকরা একজন দুজন করে নেমে আসতে শুরু করেছে। মদন তখনই একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। ঋষিকেশে এসে সর্দার আঙ শেরিং খোঁজখবর নিয়ে জানল, মালবাহকরা কিছু কিছু করে নামতে শুরু করলেও, উপরে এখনও অনেক লোক আছে। মাল-বাহকের অভাব ওদের হবে না। তাছাড়া, মাল বইবার জন্য খচ্চর বাহিনীও পাওয়া যাবে। মদন একটু আশ্বস্ত হল।

মালবাহকরা হল অভিযানের প্রাণ। এত মাল নিয়ে পেঁাছে দিতে হবে বেস্ ক্যাম্পে। তবে ত অভিযান শুরু হবে। আর মদনের উপর এই দায়িত্বটি এসে চেপেছে। এদিকটা সম্পর্কে মদনের ধারণা নেই বললেই চলে। তবু বন্ধুরা যখন তাঁর ঘাড়ে দায়িত্বটি চাপিয়েই দিল, তখন মদন আর কোনরকম গাইগুঁই করল না। সে স্বভাবও অবশ্য নয় তার।

ঋষিকেশ থেকে পিপুলকোটি যাবার পথে যে ঘাঁটিতেই ওদের বাস থেমেছে সেইখানেই নেমে মদন আর আঙ শেরিং জনে জনে মালবাহকের খবর নিয়েছে। রুদ্রপ্রয়াগে ওদের সঙ্গে সদ্য নেমে আসা কয়েকজন মালবাহকের সাক্ষাৎ হল। ওরা আর ফিরে যেতে রাজি হল না। তবে ওরাও জানাল উপরে এখনও অনেক লোক আছে। আর ওরা সেই সঙ্গে এমন আরেকটি সংবাদ দিল, যাতে ওদের দুর্ভাবনা আরও বেড়ে গেল। ওরা শুনল, নেপালের রাজমাতা ঠিক এই সময়েই বদ্রীনারায়ণ যাচ্ছেন। তাঁর পার্টির জন্য প্রচুর মালবাহক নিয়োগ করা হয়েছে। রাজমাতা একমাস বদ্রীনারায়ণে থাকবেন। তার মধ্যে একটি লোককেও তিনি ছাড়বেন না। মদনের ত বুক দুরু দুরু করতে লাগল। পাওয়া যাবে মালবাহক?

পিপলকোটি ক্যাম্পে আলোচনা : ম্যাপ দেখা হচ্ছে।

চামোলিতে গিয়ে শুনল, রাষ্ট্রপতি বদ্রীনাথে আসছেন। প্রায় ঐ একই সময়ে। যেটুকু আশা মদনের মনে জেগে উঠেছিল, এই খবরটা পাবার পর তাও যেন এক ফুৎকারে নিভে গেল। সর্বনাশ করেছে! মদন ভাবল। একে অফ্ সিজন, তার উপর নেপালের রাজমাতা, তারও উপর আবার খোদ রাষ্ট্রপতি। দু পাশে রাজরাজড়া আর তার মাঝখানে উলু খাগড়া শ্রীমান মদন মণ্ডল। নন্দাঘুণ্টি অভিযানের ট্রান্সপোর্ট অফিসার।

চামোলিতে, বাস স্ট্যাণ্ডের কাছেই গোটা কতক মালবাহককে ঘোরাফেরা করতে দেখেই মদন তাদের পাকড়াও করলে। মদনের আবেগময়ী এক ভাষণে ওরা এমন ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গেল যে, মদন ভাবল ওরা ভজে গেছে।

দ্বিগুণ উৎসাহে মদন ওর ভাষণের দ্বিতীয় কিস্তি শুরু করে দিল: এই এক্সপিডিশানকে উপর অনেক কিছু ডিপেণ্ড করতা হ্যায়। তুমলোগ নেই জানে সে এই এক্সপীডিশান কা ভরাডুবি হো জায়েগা সিওর। বিদেশী লোগ আকে আকে হামারা দেশকা পাহাড়মে চড়তা হ্যায় আর হামলোগ খালি ফ্যাল ফ্যাল করে দেখতা হ্যায়। হামারা দেশ কা, জাতি কা, ইজ্জৎ অ্যাণ্ড প্রেস্টিজ বাড়ানে কা লিয়ে হামলোগ এক্সপীডিশান মে যাতা হ্যায়। তুমলোগ নেহি যানে সে কেইসে হোগা।

মদনের তৃতীয় কিস্তি ভাষণ শোনার আগেই ওরা কথা দিয়ে ফেলল, ওরা যাবে। পরদিন পিপলকোটিতে গিয়ে দেখা করবে সাহেবের সঙ্গে। মদন এখন একটু ভাল বোধ করল।

মদন আর আঙ শেরিং পিপলকোটি পৌঁছে দেখল, সেখানে তিল ধারণের জায়গা নেই কোথাও। রেস্ট হাউস রিজার্ভ হয়ে গিয়েছে। রাজমাতা উঠেছেন। ডাক বাংলো ভর্তি। রাজমাতার পার্টি। শেষ পর্যন্ত কালি কমলিওয়ালার ধর্মশালায় ওরা একটু জায়গা পেল। ওরা দুজন না হয় ধর্মশালায় উঠল। কিন্তু শেরপারা এসে উঠবে কোথায়? কলকাতার পার্টি; ঐ বিপুল মাল, ওদের জায়গা হবে কোথায়? মদন ভাবনায় পড়ল। রাত থাকতে ঋষিকেশে বাসে উঠেছিল। সারাদিন উদ্বেগ আর জার্নির ধকল মন্দ যায় নি। কিন্তু মদন সে সব গ্রাহ্য করল না।

আঙ শেরিংকে জিনিসপত্রের পাহারায় রেখে প্রথম রাত্রির অন্ধকারে মদন সেই অপরিচিত শহরে বেরিয়ে পড়ল। মাল-বাহকের সন্ধান চাই। ওদের জন্য থাকবার জায়গা চাই। রাত প্রায় আটটা বাজে। বাজারের কাছে জনকয়েক মালবাহকের সঙ্গে দেখা। মদন ওদের পাকড়ালে।

ওরা বললে, আমাদের সর্দারের সঙ্গে কথা বল।

—কে তোমাদের সর্দার? যাও তাকে ডেকে আন।

একটু পরে ওরা একজন রোগা লম্বা বয়স্ক এক লোককে ধরে নিয়ে এল। দেশী মদের গন্ধে মদনের গা পাক দিয়ে উঠল।

একজন বললে, হুজুর, এই হচ্ছে শের সিং। আমাদের মেট্। এর সঙ্গে কথা বল।

শের সিং টলতে টলতে বললে, রাম রাম, গুড্ ইভিনিং, হুজুর।

শের সিং জানাল, মালবাহক পাওয়া যাবে।

মদন বলল, একটা থাকবার জায়গা চাই আমাদের। ঠিক করে দিতে হবে সর্দার।

—জরুর। আভি দেখা হুজুর। শের সিং হুজুরকো লিয়ে সব কুছ কর শকতা হ্যায়।

মদনের সঙ্গে শের সিং কালিকমলিতে গেল। তারপর মালপত্র নিয়ে মদন আর আঙ শেরিংকে ওর সঙ্গে যেতে বলল। শের সিংকে অনুসরণ করে অন্ধকারের মধ্যে একটা ঘরে গিয়ে উঠল। [illegible]। মানুষ সেখানে এক দণ্ডও তিষ্ঠোতে পারে না। আঙ শেরিং মদনের মুখের দিকে বোকার মত একবার চাইল।

মদন বলল, এ ঘরে থাকা যাবে না।

দ্বিরুক্তি না করে শের সিং বলল, ঠিক হ্যায়, ত চলিয়ে হুজুর, দুসরা মকান। আভি সরকারী মকান মে লে যায়েগা হুজুর।

মদন এতক্ষণে বুঝতে পারল মাতালের পাল্লায় পড়া কাকে বলে। ওর আশঙ্কা হল, সারারাত না পিপলকোটির রাস্তায় রাস্তায় কেটে যায়। তাই সরকারী মকানের কথা শুনে একটু আশ্বস্ত হল। ভাবল, ডাক বাংলোতেই নিয়ে যাবে বোধ হয়। কিন্তু কোথায় ডাক বাংলো? শের সিং ওদের পোস্ট অফিসে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। এখানে কী? মদনের চোখ কপালে উঠল।

শের সিং পোস্ট মাস্টারকে ডেকে বললে, তার দুজন অতিথি এসেছে বিদেশ থেকে, এবং যেহেতু অতিথিদের বিশেষ সম্মান-

ভাজন ব্যক্তি, তাই যেখানে সেখানে ওদের তোলা যায় না, তাই শের সিং ওর মানাবর অতিথি দ্জনকে নিয়ে পোস্ট মাস্টারজীর ন্যায় বিশিষ্ট এক ব্যক্তির আশ্রয়ে এসেছে। এখন পোস্ট মাস্টারজী যদি অনুগ্রহ করে এ দুজনকে তাঁর এই প্রাসাদতুল্য পোস্ট অফিস ঘরের একপাশে, যে পাশে পোস্টাল ব্যাগগুলো পড়ে আছে, ঐখানেই একটু ঠাঁই দেন আজ রাতের মত, তাহলে শের সিং পোস্ট মাস্টারজীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

পোস্ট মাস্টারজী একবার মদনকে আর আঙ শেরিংকে এবং পরক্ষণেই শের সিংকে দেখে নিলেন। তারপর বাক্যব্যয় বাহুল্য মনে করে, তর্জনী নেড়ে জায়গাটা ওদের দেখিয়ে দিলেন।

শের সিং খুশি হয়ে বললে, ঠিক হ্যায়। আজ রাতকো ঠর্ যাও ইঁহা। কাল সব কুছ ঠিক হো জায়েগা।

শের সিং চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, সকালে ও সমস্ত কুলিদের এনে লিস্টি করে দেবে। হুজুর যেন ভাবনা চিন্তা না করেন।

সেই যে চলে গেল শের সিং, আর তার পাত্তা নেই। কয়েকজন মালবাহক এসে ঘুরে গেল। তারাও শের সিং-এর নাগাল পাচ্ছে না। হঠাৎ শের সিং উদয় হল। এসেই মদনকে বলল, হুজুরের জন্য ঘর ঠিক করে এসেছে সে। এখন হুজুর যদি দয়া করে মকানটা দেখে আসেন। মদন ওর সংগে গিয়ে দেখল, না বাড়িটা সত্যিই ভাল। এটাও একটা ধর্মশালা। নতুন তৈরি হয়েছে। মদন গোটা দোতলাটা নিয়ে নিল ব্যবস্থা করে।

শের সিং বলল, এখানে মালবাহকদের এসোসিয়েশান আছে। তার মারফতে মালবাহক নিয়োগ করলেই ভাল হবে। রেট্ ঠিক করাই আছে। হুজুর যদি এসোসিয়েশানকে একটা চিঠি লিখে দেন, ব্যস্, আমি দশটার মধ্যে সব লোক এনে হাজির করব। আমি শের সিং! হুজুরের জন্য সব কিছু করতে পারি।

দশটায় আসবে, বলে গিয়েছিল শের সিং। বলেছিল মালবাহকদের নিয়ে আসবে। কিন্তু কোথায় গেল সেই সব মালবাহক? কোথায় বা শের সিং। অপেক্ষা করতে করতে বারটা বাজল, একটা বাজল, রোদের তেজ কমে আসতে লাগল। বেলা পড়ে এল। কোথায় শের সিং? মদন যেন অথৈ জলে পড়ল। তার চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এল। আঙ শেরিং-এর মুখও যেন শুকিয়ে এল। মালবাহক যদি সত্যিই পাওয়া না যায়?

আঙ শেরিং-এর সংগে পরামর্শে বসল মদন। আঙ শেরিং-ও শেষ পর্যন্ত বলল, শের সিং বোধ হয় কেটেই পড়ল। মালবাহক নিজেদেরই এখন সংগ্রহ করতে হবে। আঙ শেরিং বলল, এখান থেকে "মিডল"

হরিদ্বার স্টেশনে অভিযাত্রী দল।

আমি সংগ্রহ করতে পারব। মণ্ডল সাব্, তুমি একজন লোক্যাল লোক নিয়ে খুব সকালেই গ্রামের দিকে বেরিয়ে যেও। গ্রাম থেকে লোক আনতে হবে। সাতাশে সেপ্টেম্বরের হতাশ রাত্রিটা যে কী করে কাটল, মদনই জানে।

আটাশে সেপ্টেম্বর সকাল বেলাতে মদন আর আঙ শেরিং বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছে, এমন সময় মালবাহক এসোসিয়েশনের এজেণ্ট এসে হাজির। কনট্রাক্ট ফরম এনেছে। টার্মস্ এণ্ড কণ্ডিশনস্ জানাতে এসেছে। রেট ও নিয়ে এসেছে। এখন সাহেবদের যদি পছন্দ হয় ত ফরমে সই কর। মালবাহক পাবে। মদনের বুকে ভরসা ফিরে এল। এদের টার্মস্ এণ্ড কণ্ডিশনস্ মদনের মনোমতই হল। ওদের ফরমে সে সই করে দিল। সেই সংগে মদন বুদ্ধি করে নিজেও একটা চুক্তিপত্র তৈরি করল। কোন মালবাহক যদি নির্দেশ অমান্য করে, শৃংখলা ভাংগে, অসদাচরণ করে, তবে তার জন্য এসোসিয়েশান দায়ী থাকবে। এজেণ্ট এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দিলে।

বেলা ৪টার মধ্যেই পঞ্চাশ জন মালবাহক সংগে নিয়ে হাজির হল শের সিং। কিছু পরে আরও ষোল জনকে পাওয়া গেল। শের সিং হল এদের মেট্।

বেতন ছাড়াও এদের খোরাকি দিতে হবে। যতদূর পর্যন্ত লোকালয় থাকবে, খাদ্যবস্তু কিনতে পাওয়া যাবে, ততদূর পর্যন্ত ওদেরকে খোরাকি বাবদ নগদ টাকা দিতে হবে। লোকালয়ের নাগালের বাইরে যাবার পর খোরাকি বাবদ খাদ্যই দিতে হবে। ওরা বেস্ ক্যাম্প পর্যন্ত মাল বইবে, তার উপরে নয়। বরফে ওরা পা দেবে না। যেদিন ছুটি বা মাল বইতে হবে না, সেদিন ওরা আধা বেতন পাবে।

মদন সব কাজ পাকা করে রাখল। সবাইকে বলে দিল, আজ সন্ধ্যায় পার্টি এসে পৌঁছাবে। রাত্রে বাঁধা ছাঁদা হবে। কাল ভোর বেলাতেই মার্চ শুরু হবে।

কিন্তু ২৮ তারিখের সন্ধ্যাবেলায় যে কলকাতার পার্টি এসে পৌঁছাল না। মা...

বাহকরা যথাসময়ে উৎসাহ সহকারে মালপত্র বাঁধা ছাঁদা করতে এল। মদনকে বাধ্য হয়ে জানাতে হল, আগামীকাল মার্চ হবে না। পার্টি এসে পৌঁছায় নি। মালবাহকেরা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। গাঁইগুঁই করতে লাগল: ওদের একদিনের রোজগার নষ্ট হল বলে। যা হোক, মদনকে আবার লেকচার দিতে হল। মালবাহকেরা সেদিনের মত ফিরে গেল।

২৯ তারিখের সকাল বেলাতেই মালবাহকেরা দল বেঁধে মদনের কাছে হাজির হল। মদন বুঝল, হাওয়া সুবিধের নয়। মদন এক গাল হাসি নিয়ে সবাইকে জয় হিন্দ্ বলে স্বাগত জানাল।

তার উত্তরে মালবাহকদের একজন গোমড়ামুখে বলল, সাব্, তোমার অ্যাড্‌ভান্স ফেরৎ নাও।

সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরা সমর্থন জানাল, হাঁ হাঁ, ওয়াপস্ লে লো।

মদনকে অতর্কিতে এক ধাক্কা মেরে অতল গহ্বরে যেন ফেলে দিল ওরা। সেই শীতল আবহাওয়াতেও ওর মুখে চোখে ঘাম দেখা দিল।

—অ্যাড্‌ভান্স ফেরৎ নিতে হবে? কেন?

—হমলোগ নেহি জায়েগা।

একজন যেই বলল কথাটা, অমনি সবাই চেঁচিয়ে উঠল, নেহি জায়েগা, নেহি জায়েগা।

মদনের হৃদ্‌পিণ্ডে যেন আর স্পন্দন নেই। শ্বাস-প্রশ্বাসে যেন বায়ু নেই। যাবে না এরা? যাবে না! সর্বনাশ, তাহলে উপায়? কিন্তু মুহূর্তে সামলে নিল মদন। যাবে না! চালাকি পেয়েছে! তীরে এনে তরি ডোবাবে!

"যাবে না", মদন একটু ধমক দিল। "কেন?"

ওরা একটু থমকে গেল। একটুক্ষণ সব চুপ। তারপর একসঙ্গে সবাই কথা বলতে শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে মদন অসীম ধৈর্যে ওদের তালগোল পাকান বক্তব্য শুনল। প্রাণপণ চেষ্টায় যে অর্থ উদ্ধার করল তাতে সে বুঝল: কলকাতার পার্টি কাল না এসে পৌঁছানোর ফলে ওদের আজ "হল্‌ট্" করতে হচ্ছে। তার মানেই আজকের দিনটা পুরো লোকসান। এক পয়সাও মজুরি পাবে না ওরা।

ওরা বলল, দেখ সাব্, খবর পেয়েছি আমাদের দেশে রাজা আসছেন। দেখব বলে নেমে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মাঝ পথ থেকে আমাদের ধরে এনে তোমাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিলে। এখন দেখ আমাদের কি হাল হল। "মার্চ" না হলে ত তোমরা টাকা দেবে না। তবে, আজ খাব কি?

অ্যাসোসিয়েশানের এজেন্ট এসে মদনের সঙ্গে দেখা করল। বললে, ওরা বিগড়ে গেলে মুশকিল। আপনি ওদের একটা করে টাকা মিষ্টি খেতে দিয়ে দিন। টাকা আমিই আপনাকে দিচ্ছি, যে টাকা অগ্রিম দিয়েছেন, তার থেকে। আপনার বাড়তি খরচ হবে না। আর ওদের বুঝিয়ে বলুন যে, আজ বারটার গেটে পার্টি নিশ্চয়ই এসে যাবে।

মদন আবার একটা দেশাত্মবোধক ভাষণ দিলে। এবারে ঝাড়া এক ঘণ্টা। যখন দেখল, কারও মুখ দিয়ে আর বাক্য সরছে না, তখন একটা করে টাকা ওদের হতভম্ব হাতে মিষ্টি খেতে দিল আর বলল, ঘাবড়াও মৎ, বারটার গেট্‌সে দুস্‌রা দুস্‌রা সাব্ লোগ আসে গা।

মদন তখনকার মত ওদের ভাগিয়ে দিল বটে, কিন্তু নিজে সুস্থির হতে পারল না। বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে রওনা দিল।

॥ চব্বিশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকে:

২৯শে সেপ্টেম্বর। পিপুলকোটি পৌঁছালাম সন্ধ্যা ৭টায়। ঘোর অন্ধকার হয়ে গেছে। এক অন্ধকারে (ভোর ৫টায়) ঋষিকেশ থেকে যাত্রা করেছিলাম, আরেক অন্ধকারে গন্তব্যে এসে পৌঁছালাম। সারাটা দিন, একটানা চোদ্দ ঘণ্টা বাস জার্নি করে শরীরের হাড়গোড় প্রায় গুঁড়িয়ে যাবার যো হয়েছে। ঋষিকেশে দুটো খবর পেলাম। আমাদের দলের শেরপারা দুদিন আগে পিপুলকোটি চলে গিয়েছে। আর দ্বিতীয় সংবাদ, একটা ফরাসী পার্টি প্রায় মাসখানেক আগে নন্দাঘুণ্টি পাহাড় থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে। একটা হোটেলওয়ালা তাদের ছবিও দেখাল।

পাহাড়ের পথে বাসে জার্নি করলে যাওয়াটা দ্রুত হয় বটে, কিন্তু দেখাটা হয় না। দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগের মত সুন্দর জায়গার সৌন্দর্য এই তাড়াহুড়োর মধ্যে উপভোগই করা গেল না। বীরেনদা, দিলীপ আর বিশ্বদেব বাস থামা মাত্র ছবি তুলতে ছোটে। ধ্রুব আর সুকুমার ছোটে চায়ের সন্ধানে। বাকি থাকি আমি, ডাক্তার আর আজীবা। আমরা বেশির ভাগ বাসের কাছাকাছিই থাকি। কখনও এ দলে, কখনও বা ও দলে গিয়ে জুটি।

দুটো অন্ধকারের ঘটনা কখনও ভুলব না। একটা ঋষিকেশ ছেড়ে ও একটা পিপুলকোটি ঢোকার মুখে ঘটেছিল। কলকাতা থেকে টিকে নিয়েছিলাম, টি-এ-বি-সি'ও নিয়েছিলাম। কিন্তু তাড়াহুড়োয় সার্টিফিকেট ফেলে গিয়েছিলাম কলকাতাতেই। শুনলাম, ঋষিকেশ থেকে বেরুবার মুখেই জনস্বাস্থ্য দপ্তর থাপ পেতে বসে আছে। সার্টিফিকেট না দেখাতে পারলেই সুঁই ভরে দিচ্ছে। ধ্রুব, নিমাই, দিলীপ আর আমি একটা মতলব আঁটলাম। প্রায় ফার্লংখানেক আগে আমরা বাস থেকে নেমে পড়লাম। তারপর মার্চ করে এগিয়ে গেলাম। ফাঁড়াটা নির্বিঘ্নে উতরে গেল।

পিপুলকোটি পৌঁছুবার অনেক আগেই সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে হেড্‌লাইট্ জেলে বাস এগিয়ে চলেছে। একটা মোড় ফিরতেই দুজন লোকের উপর আলো পড়ল। যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল ওরা। বাসটা পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতেই চীৎকার শুনলাম, "নন্দাঘুণ্টি" পার্টি" মুখ বাড়িয়েই জবাব দিলাম, "হ্যাঁ।" আওয়াজ পেলাম, "থামাও, বাস থামাও।" বিশ্বদেব বলে উঠল, "আরে, এ যে মদন। নির্ঘাৎ মদন।" বাস থামল। হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এল মদন। পিছনে আঙ শেরিং।

মদন বললে, "যাক বাবা, এসে পড়েছ যে এই ঢের।"

"তার মানে?"

"মানে পিপুলকোটি পৌঁছে বুঝবে। কাল থেকে ভাত নষ্ট হচ্ছে।"

"কিন্তু নষ্ট হল কেন? আমাদের ত আজই পৌঁছবার কথা।"

মদন বলল, "তাই নাকি? তা হবে।" মদন চুপ করে গেল।

এখন রাত দশটা। একটা ধর্মশালার উপরের ঘরে আমাদের খাবার উদ্যোগ হচ্ছে। মালবাহকরা ওজন করে করে এক একটা বোঝা বানাচ্ছে। ৮০ পাউণ্ডের বেশি কেউ মাল বইবে না। শেরপারা ওদের সাহায্য করছে। দিলীপ সব ব্যাপারটা পরিচালনা করছে। মদন মাঝে মাঝে এসে তাকে ধমক মারছে।

সুকুমার, নিমাই আর ধ্রুব আমার কাছে বসে ম্যাপ খুলে শের সিং-এর সঙ্গে রুট সম্পর্কে পরামর্শ করছে। শের সিং অভিজ্ঞ লোক। টিলম্যানের সঙ্গে নন্দাদেবী অঞ্চলে ঘুরেছে। নন্দাকোটের পথও সে জানে। কিন্তু নন্দাঘুণ্টির এই পথ, আমাদের ম্যাপে যার নির্দেশ আছে, সে জানে না। ওদের কেউই জানে না। রিণি গ্রাম চেনে। তার উপরে আরেকটা গ্রাম আছে, নাম মোরুনা। তাও অনেকে চেনে। বাস্, তার উপর আর না।

শের সিং বলে উঠল, "দেখ সাব, যে পথ তোমরা চেন না, আমরা চিনিনে, সে পথে আমি কাউকে নিয়ে যেতে দেব না। জান্ আগে, পয়সা পরে। আমার বয়স অনেক হয়েছে সাব্, অনেক দেখেছি। পাহাড় বড় সাংঘাতিক জায়গা। আমি যেতে পারব না। আগেই বলে দিলাম।"

নিমাই বলল, "পথ আছে শের সিং। আমার নক্‌শা বলছে, জরুর আছে।"

"কে সে পথ চেনে?" শের সিং বলল, "যদি কেউ চেনে, আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে রাজি থাক ত তার পিছু, পিছু, যাব আমরা। নইলে এক পাও নড়ব না।"

(ক্রমশ)

দেশে এবং দেশের বাইরে বিক্রির জন্যে জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রে তৈরী সমস্ত সসেজ ১৯৬১ সালের শুরু থেকে শুধুমাত্র খাঁটি কাঠের ধূমের সাহায্যে ধূমায়িত ও সংরক্ষিত হচ্ছে। জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের নতুন আইন অনুসারে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। জার্মান সসেজ, জার্মান বিয়ার ও অন্যান্য আহার্য সামগ্রী যারা জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্র থেকে বিদেশে রপ্তানি করে, এবং যারা বিদেশের আহার্য সামগ্রী ও বিভিন্ন সৌখীন দ্রব্য জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রে আমদানী করে, তাদের সকলের প্রতি প্রযোজ্য এই নতুন আইন। সোভিয়েত রাশিয়ার ফিশারিগুলো ইতিমধ্যেই এই আইনের প্রথম পূর্বাস্বাদন পেয়েছে। নতুন আহার্য সামগ্রী আইন অনুযায়ী মাছ ও মাছের ডিম ভবিষ্যতে আর বোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে সংরক্ষণ করা চলবে না। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়ার কারখানাগুলি শুধুমাত্র বোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে মাছের ডিম সংরক্ষণ করে। এই ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন করতে রাজী নয় তারা। তাই ১৯৬১ সাল থেকে রাশিয়ার মাছের ডিম আর মোটেই বিক্রি করা হবে না জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রে। আমদানীকারকরা তাই বাধ্য হয়ে এখন ইরাণ থেকে মাছের ডিম আমদানী করছে।

স্পষ্টতা আর সত্যবাদিতা হলো এই নতুন আহার্য সামগ্রী-আইনের মূল কথা। যেসব বস্তু মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর অথবা যেসব বস্তুর ক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের কোনো সঠিক ধারণা নেই, খাদ্যদ্রব্যে সে ধরনের বাইরের কোনো বস্তু মেশানো সম্পূর্ণ বে-আইনী। মানব দেহের পক্ষে মোটেই ক্ষতিকর নয় এ ধরনের রঙ বা অন্যান্য জিনিস যদি আহার্য সামগ্রীর সংগে মেশানো হয়, তাহলে নতুন আহার্য সামগ্রী-আইন অনুসারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সেসব জিনিসের সঠিক বিবরণ দিতে হবে। তাছাড়া আবৃত আহার্য সামগ্রীর আবরণ এবং সংরক্ষিত আহার্য সামগ্রীর আধার সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণ প্রয়োজন।

দুনিয়ার যেসব দেশ জার্মানীর আহার্য সামগ্রী ও অন্যান্য সৌখীন দ্রব্য কেনে, জার্মানীর জিনিসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তারা এখন থেকে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে পারবে। রঙীন আবরণ দিয়ে জার্মানীর সসেজ আর আবৃত করা চলবে না। জার্মানীর বিয়ারেও আর কোনো স্যালিসাইলিক অ্যাসিড থাকবে না। চিনি মিশ্রিত মদ বিক্রিও বন্ধ করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। জার্মান পনির আর সসেজ-পটারের সাহায্যে সংরক্ষণ করা হবে না। জার্মান মাখনের সংগে রঙ, মার্গারিন অথবা অন্য কোনো বস্তু মেশানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
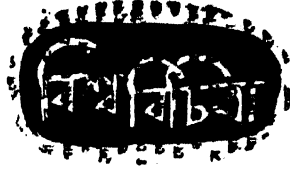
তাছাড়া মাখনে শতকরা আট ভাগের বেশী জল থাকা চলবে না। বিদেশ থেকে যেসব আহার্য সামগ্রী আমদানী করা হবে, সেসব আহার্য সামগ্রী সম্পর্কেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহের ফল-মূল ও অন্যান্য আহার্য সামগ্রীর বিদেশীয় ব্যবসায়ীরা যদি জার্মান ফেডারেল সাধারণ-তন্ত্রে তাদের জিনিসপত্র বিক্রি করতে চায়, তাহলে জার্মানীর এই নতুন আহার্য সামগ্রী আইন সম্পর্কে সব কিছু ভালোভাবে অবগত হতে হবে তাদের সবাইকে।

জার্মানদের কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, "বড়ো কড়া এদেশের আইন কানুন।" বস্তুত অনেক বছরের পরিশ্রমের ফল এই আহার্য সামগ্রী আইন। জার্মান রসায়নবিদ, চিকিৎসক আর আইনজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরে আলাপ-আলোচনা করেছেন এই আইন সম্পর্কে। দেশের আর বিদেশের মানুষকে নানারকম ব্যাধির হাত থেকে বাঁচাতে চায় জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্র। খাদ্যবস্তু ভক্ষণের ফলে জনসাধারণের স্বাস্থ্য যেন নষ্ট না হয়, তাই কর্তৃপক্ষ প্রণয়ন করেছে এই আইন। ১৯৬১ সাল থেকে যেসব বিদেশী জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রে বেড়াতে আসবে, হোটেলের মেনুর নীচে পাদটীকা দেখতে পাবে তারা। কোন খাদ্যবস্তুর সাথে কি জিনিস মেশানো হয়েছে, তা পরিষ্কার করে লেখা থাকবে সেখানে। কোন সুপের মধ্যে কতোখানি ফর্মিক অ্যাসিড আছে, তাও জানতে পারবে বিদেশী অতিথিরা।

দুনিয়ার অনেক দেশের মানুষের কাছে জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের এই খাদ্য-সামগ্রী-আইন নিতান্ত অযৌক্তিক মনে হতে পারে। কিন্তু স্বাস্থ্যের দিক বিবেচনা করলে এই আইন মোটেই অযৌক্তিক নয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ইতিমধ্যেই জার্মানীর এই আইনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছে। অনেক দেশই আপন আপন আহার্য সামগ্রী- আইন জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের আহার্য সামগ্রী আইনের ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা করছে।

*

কোলনের একটা বিশেষ শিল্প-মেলায় সম্প্রতি তেরটি দেশের ২৪৭টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান যোগদান করেছে। এই শিল্প-মেলার নাম হলো "শিশু-মেলা"। পৃথিবীর নয়া মানুষদের জন্যে আধুনিক শিল্প জগৎ যেসব জিনিসপত্র প্রস্তুত করেছে, বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান এই মেলায় সেগুলি প্রদর্শন করেছে। শিশুদের খাবার থেকে শুরু করে পেরাম্বুলেটার পর্যন্ত সব কিছুই মানুষের চোখে পড়ে এখানে। ছোট শিশু মাঝে মাঝে পায়ে হাঁটতে ভালোবাসে; মায়ের সাথে পথে বেড়াতে বের হয়ে সব সময় পেরাম্বুলেটরে চেপে থাকাটা তার মনঃপূত নয়। কিন্তু শিশুর দেহে তো আর খুব বেশী শক্তি নেই, তাই একটুখানি হাঁটার পর শ্রান্ত হয়ে পড়ে সে। শিশুর এই স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে এক শিল্প-প্রতিষ্ঠান নতুন এক ধরনের পেরাম্বুলেটার তৈরি করেছে। তরুণী মা ডান হাতে ছেলের হাত ধরে আর বাঁ হাতে একটা বাক্স নিয়ে কেমন করে পথ চলে, শিগগীর তা দেখতে পাবে সারা দুনিয়ার মানুষ। শ্রান্ত শিশু যখন আর হাঁটতে চাইবে না, মা তখন তার বাক্সটা খুলে, হাত দিয়ে এখানে ওখানে চাপ দিতেই সেই বাক্সটা একটা পেরাম্বুলেটারে পরিণত হবে। আর শিশু এই পেরাম্বু-লেটারে চড়ে মনের আনন্দে মায়ের সংগে সংগে পথ অতিক্রম করে যাবে।

*

জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের কাসেল শহরের অধিবাসীরা অশ্বারোহী পুলিসের ঘোড়ার জিনে এখন থেকে একটা বিশেষ থলি
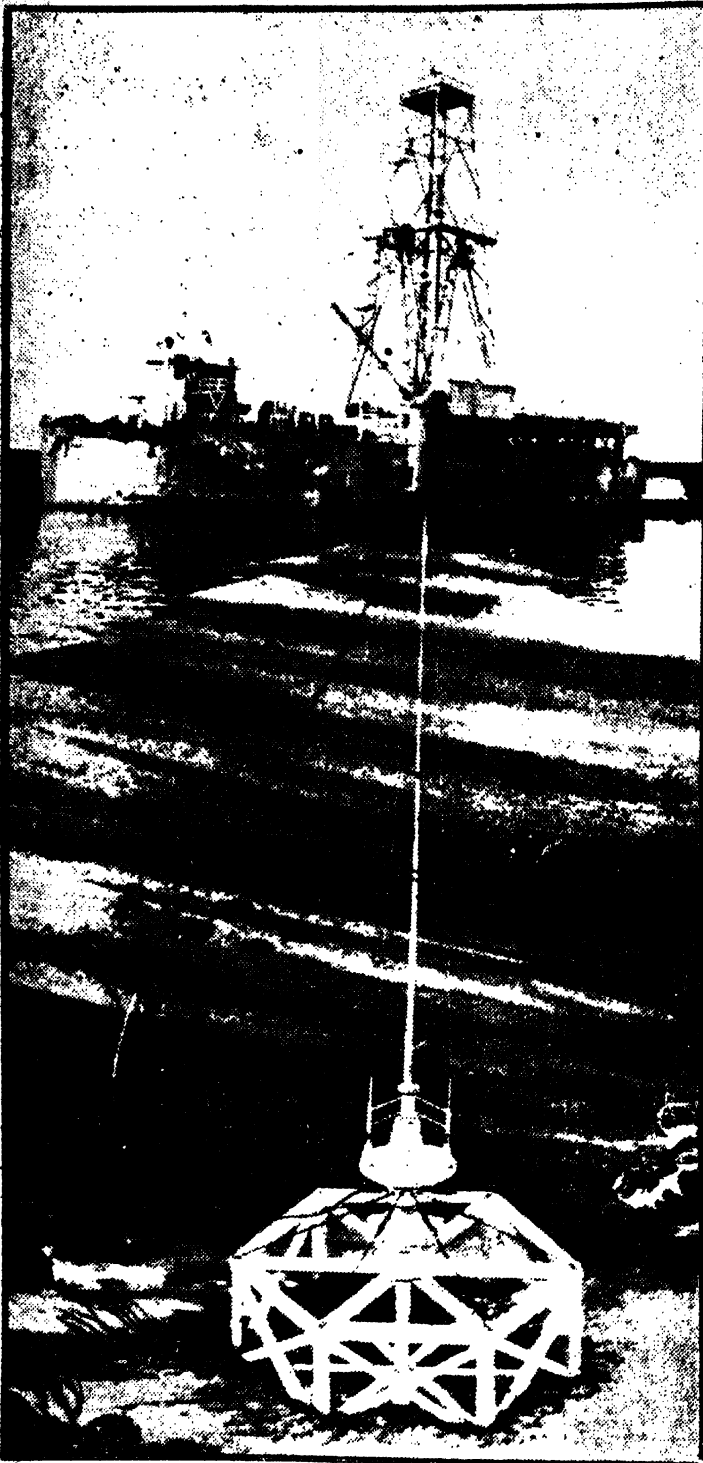
ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল থেকে ৩১০৭ ফি° দূরে ৩১০ ফিট সমুদ্রগর্ভে গর্ত করে মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে সম্প্রতি যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল উপরের ছবিটি তারই প্রতিলিপি

...তে পারে। কাসেলের পুলিসের পক্ষে ...ড়া বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মোটর গাড়ির ...ধ্যে সব কিছু করা সম্ভব নয়। কারণ ...ড়ার পিঠে চ'ড়ে কাসেলের পুলিস সব জায়গায় যেতে পারে, কিন্তু খারাপ রাস্তা-ঘাটে মোটর গাড়ি সম্পূর্ণ অচল। অবশ্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ছাড়া কোন দেশের পুলিসই সুষ্ঠুভাবে নিজের কার্য সম্পাদন করতে পারে না। তাই কাসেলের পুলিস ঘোড়াগুলোকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে সুসজ্জিত করবার ব্যবস্থা করেছে। ঘোড়ার জিনের সাথে যে থলিটা দেখতে পাওয়া যায়, সেই থলির মধ্যে একটা অতি আধুনিক বেতার-যন্ত্র লুকিয়ে রাখে কাসেলের অশ্বারোহী পুলিস।

•

জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের রেল-গাড়ির বুফে কারে সম্প্রতি একটা নতুনত্ব দেখতে পাওয়া যায়। পুনর্নিয়োগের ফলে দেশে কাজের লোকের অভাব দেখা দিয়েছে। রেলগাড়ির বুফে কারে কাজ করবার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক লোকজন খুঁজে পাওয়া মুশকিল। রেল কর্তৃপক্ষ তাই এক নতুন ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছে। জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের রেলগাড়িতে ভবিষ্যতে "নিজের সেবা নিজে করো" প্রথা প্রবর্তন করা হবে। বুফে কারের একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে যাত্রীরা খাবার আর পানীয় নিয়ে আসবে। সংগে সংগে খাবারের দামও তারা দেবে সেখানেই। তারপর বুফে কারের একটা টেবিলে বসে মনের সুখে ক্ষুন্নিবৃত্তি করবে এইসব অতিথিরা।

•

এতোদিন পর্যন্ত মানুষ জেনে এসেছে যে, উরুসন্ধির বিকৃতির ফলে যে যন্ত্রণাদায়ক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী কোক্সা আর থ্রোজে রোগের উৎপত্তি হয়, তা কখনো সারে না। যেসব নরনারী এই দুষ্ট ব্যাধির কবলে পড়ে, তারা অসুখের প্রথম অবস্থায় বহুকষ্টে একটু একটু হাঁটতে পারে। পরে শুধু ক্রাচের উপর ভর দিয়ে চলে এবং শেষে নিজে নিজে আর মোটেই চলাফেরা করতে পারে না। জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের সীমান্ত নগরী আখেনের অধ্যাপক ডক্টর ফ্রীডরিস পাউবেলস দুই দশক ধরে এই অসুখ সম্পর্কে গবেষণা করছেন। ২০ বছর আগে অসুখের এক নতুন চিকিৎসা সম্পর্কে মাথা ঘামাতে সুরু করেছিলেন তিনি। আজ সফল হয়েছে তাঁর সেই গবেষণা। ইতিমধ্যেই অধ্যাপক পাউবেলস ৩০০ জন রুগীকে সুস্থ করেছেন। তাঁর সাফল্যের কথা তিনি কেন এতোদিন পরে জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করছেন, সে সম্পর্কে অধ্যাপক পাউবেলস বলেন, "গেলেংক আর থ্রোজে ব্যাধির চিকিৎসার ব্যাপারে বারবার ব্যর্থতা আর হতাশা দেখা দিয়েছে। ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীকে আমি হতাশ করতে চাইনি। তাই সামান্য কয়েকজন বিজ্ঞানী আর আমার রুগীরাই শুধু জানতো এই নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতির কথা।" চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, অধ্যাপক পাউবেলস-এর নতুন চিকিৎসা-পদ্ধতি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটা মস্ত কীর্তি।

রবীন্দ্র-পত্রাবলী

গত ২৫ মার্চ-এর দেশ পত্রিকায় শ্রীযুক্তা রাণী মহলানবিশ কর্তৃক প্রকাশিত 'পত্রাবলী'র ১০৪নং পত্রের শেষাংশে এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই থেকে লিখছেন; "সুধাকান্ত আসবে কিনা জানি না। দৈবক্রমে তারই হাতে আমার সমস্ত বাক্সের চাবি। হোটেলে এসে নতুন চাবি সংগ্রহের কাজে লেগেছি।"

কবির সংগে, কবির একান্ত ইচ্ছায় এবং বিশপ এফ, বি, ফিশারের ইচ্ছায় কানাডা এবং আমেরিকা যাবার সব ব্যবস্থা ঠিক হয়েছিল। কিন্তু বিঘ্ন দেখা দিল আমার যাবার পথে। সেকালের ইংরাজি সরকারের তরফ থেকে কিছুতেই পাসপোর্ট বার হতে চায় না। ব্যাপার বেগতিক দেখে রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে ইংরিজিতে বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারিকে একটি পত্র দিয়েছিলেন। সেই পত্র চীফ সেক্রেটারিকে দেবার পূর্বেই খবর এল আমাকে কিছুতেই পাসপোর্ট দেওয়া যেতে পারে না। কাজেই সে চিঠি আমার কাছেই থেকে গিয়েছে। তারপর বড় লাটকে তার করে পাসপোর্ট পাওয়া গেলেও অন্য কারণে যাওয়া হয়নি। ইতি—

সুধাকান্ত রায়চৌধুরী
শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, গত ১৮ই চৈত্র, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত "রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি" শীর্ষক পত্রটি দেখিলাম। লেখিকাকে ধন্যবাদ।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষপূর্তির আর কয়েকদিন মাত্র বাকী আছে, সুতরাং ইহার পূর্বক্ষণে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য।

সমগ্র দেশ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদযাপনে কর্মমুখর। আপন প্রচেষ্টা কিরূপে সাফল্যমণ্ডিত হয় প্রত্যেকেরই সেই ইচ্ছা। সংবাদে প্রকাশ দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠায় যত্নবান। কিন্তু প্রতিকৃতি স্থাপনের পশ্চাতে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপ ছিল তাহা আমরা বিস্মৃত হইতেছি। ইহাতে বিস্তর আলোচনার অবকাশ আছে স্বীকার করি। কিন্তু তন্মধ্যে প্রবেশ না করিয়া কবিগুরু যাহা বলিয়া-ছিলেন তাহার কিছু উদ্ধৃত করিতে চাই।

"বলাকা" কাব্যগ্রন্থের "ছবি" কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "যাঁরা মূর্তি বা ছবির মাধ্যমে প্রিয়জনকে বেঁধে রাখতে চান তাঁরা ভ্রান্ত। তাঁরা আমাদের ভারতীয় আদর্শ হতে ভ্রষ্ট। পশ্চিম হতে আমদানী করা এই রোগ ঠেকাতে পারিনি। দিন দিন আমাদের দেশে এই বর্বর প্রথা প্রবল হতে প্রবলতর হয়ে চলেছে। এই জন্য মৃতের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা "পাথরে পিন্ডদান" বলে তীব্রভাবে একদিন আঘাত করেছি।"
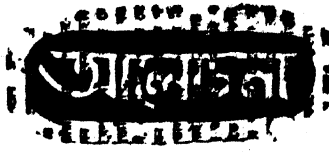
তিনি আরও বলেন, "এদেশে মানুষ চেয়েছে শ্রদ্ধায় ও প্রীতিতে পরলোকগতের আদর্শ ও তপস্যাকে বজায় রাখতে। মূর্তি দিয়ে জীবন্ত আদর্শকে চেপে মারা আমাদের পথ নয়। আমাদের দেশে বরং বহুকাল ধরে মহাপুরুষদের নামে দেবালয় রচনা করে দেবপ্রতিষ্ঠা ও দেবসেবা করা হতো। তাঁদেরই মর্মর মূর্তির প্রতিষ্ঠা ও পূজা তো চলতো না। সেটা হল হালের আমদানী বিলেতী দুর্গতি।"

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হইতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় (মূর্তিস্থাপন প্রসংগে) আমরা পরিচয় পাই। যাহাকে তিনি অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কোনদিনও তাহাকে সমর্থনও করেন নাই।

সেইজন্যই আমরা দেখিতে পাই, তিনি আপনার মূর্তি প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলেন এবং স্পষ্টই জানাইয়া দিয়া গিয়াছেন—

"এখন অপ্রাসংগিক হলেও এইখানে বলে রাখি, আমার পিতৃদেব খুব জোরের সংগে জানিয়ে গেছেন যেন মৃত্যুর পর তাঁর দেহভস্ম কোথাও প্রোথিত না হয়, তাঁর মূর্তি বা প্রতিকৃতি কোথাও প্রতিষ্ঠিত না হয়। আমারও সনির্বন্ধ অনুরোধ রইলো, আমার মৃত্যুর পরে এই দুর্গতি হতে আপনারা আমায় রক্ষা করবেন। যার বিরুদ্ধে আমি সারা জীবন যুদ্ধ করেছি, আমার জীবনান্তে সেই দুর্গতি যেন আমার কোনোমতে না ঘটে।"

আসন্ন শতবার্ষিকীর পূর্বমুহূর্তে, রবীন্দ্রনাথ যাহা আমাদের অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন এবং যাহার ভার একান্তরূপে আমাদেরই উপর ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা পালন করিতে চেষ্টিত হওয়া আমাদের কর্তব্য নয় কি। নমস্কারান্তে

ইতি—
সন্তোষকুমার চক্রবর্তী।
আসানসোল।

বংগের বাহিরে বাঙ্গালী

মহাশয়,

দেশ পত্রিকায় (৪ঠা চৈত্র, ১৩৬৭) আলী সাহেবের 'বংগের বাহিরে বাঙ্গালী' পড়ছিলাম। "শিলঙ, কটক ও পাটনায়—এই তিন জায়গায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের তিনটি বড় কেন্দ্র আছে" পড়ে একটু দ্বিধা বোধ করলাম। তাই এই লিখতে বসা।

প্রথমেই বলে রাখি আলী সাহেবের মূল বক্তব্যের সংগে আমার লেখার কোন সম্বন্ধ নেই, যা কিছু যোগসূত্র তা শুধু ঐ উক্তিটির সংগে।

শিলঙের সংগে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই, তাই সেখানকার কেন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বলতে পারলাম না। পাটনা সম্বন্ধে লেখকের মন্তব্য অনস্বীকার্য। বাকি থাকে কটক এবং এইখানেই আলী সাহেবের সংগে আমার মতের অমিল।

আমি জানি, কটকে তিনি এমন একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার রূপে বহু

দূরেক অতিবাহিত করেছিলেন যেখান থেকে ভাষা, সাহিত্য ও শিল্প সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক স্রোতটার কেন্দ্র বিন্দুতে সহজেই পৌঁছান যায়। তিনি হয়ত পৌঁছেও ছিলেন। আমিও বছর দুয়েক ধরে পৌঁছাবার চেষ্টা করছি। আমার ধারণাটা কিন্তু অন্য রকমের। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য একটা বড় কেন্দ্র করে বসে থাকলে তার অস্তিত্ব কটকের জীবনে নিশ্চয় কিছু প্রভাব বিস্তার করত। সেটা আমি দেখতে পাইনি। প্রকৃত ওড়িষ্যাবাসীরাই তাদের শিল্প ও সংস্কৃতিকে বহন করে চলেছে। পাটনায় (এবং এমনকি রাঁচিতে) একাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাঙলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়, বেশ বড় ধরনের বাংলা বই ও পত্র পত্রিকার বাজার আছে, নামকরা বাংলা পাঠাগার ও পুস্তকালয় আছে: কটকে অনুরূপ একটা বিদ্যালয় নেই একটাও বইয়ের দোকান নেই, পাঠাগার বা পুস্তকালয় নেই। বিহারের ঐ দুই জায়গায় বাঙালীর নাচ-গান-অভিনয়ের সমবেত প্রতিষ্ঠান অনেকগুলো আছে, কটকে সে ধরনের বাঙালী প্রতিষ্ঠান একটাও নেই। সারা বছরে এখানে উল্লেখ যোগ্য বাঙালী অনুষ্ঠান মাত্র একটি—নববর্ষ উৎসব। সে উৎসবে সকল অংশ গ্রহণকারী শিল্পীই কলকাতার।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। ওড়িষ্যা 'বাসী অনেককে আমরা বাঙালী বলে ভুল করি, যাঁরা "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" গোষ্ঠীতে আসেননা। একদা আমার এক ঐতিহাসিক বন্ধু এই প্রসঙ্গে আমাকে সচেতন করে দিয়েছিলেন। সেই ঐতিহাসিকের মতে, প্রবাসী বাঙালী বা "বঙ্গের বাহিরে বাঙালী" মুখ্যত তাঁরা যাঁরা ইংরেজের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ ছেড়ে ভারতের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছেন ও এখনও ছড়িয়ে পড়ছেন। বাঙলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে এরা অনেক জায়গায় জাগিয়ে রেখেছেন, সত্যিকারের কেন্দ্র রচনা করেছেন। উৎকল প্রদেশে কিন্তু বাঙালীর আবির্ভাব অনেক পুরাতন। আকবর বাদশা ওড়িসা জয় করার পর কিছু বাঙালীকে শাসনের প্রয়োজনে এদিকে আসতে হয়। আরও কিছু, তাঁদের অনুসরণ করেন শুধুমাত্র জীবিকার অন্বেষণে। আজকের ওড়িসা বা কটকে তাঁদের সংখ্যা যথার্থ প্রবাসী বাঙালীর (অর্থাৎ ইদানীন্তন বা ইংরেজ আমলে ঘর ছাড়া বাঙালীর) সংখ্যা অপেক্ষা কম নয়। এই পুরাতনীরা বাঙালী ছিলেন, আজ তাঁরা সত্যসত্যই ওড়িয়া। তাঁদের ছেলে-মেয়েরা ওড়িয়া ভাষায় লেখাপড়া শেখে, বাড়িতে তাঁরা ওড়িয়া ভাষায় কথাবার্তা বলেন। এ'রা কিন্তু সত্যিকারের—ইংরেজ আমলে বা ইদানীন্তন ঘরছাড়া—প্রবাসী বাঙালীর সঙ্গে অনায়াসে বাঙলা ভাষায় কথা বলতে পারেন ও বলেন। এটা একটা কারণ, অন্যটা হল এ'দের নামের আদি বা অন্তটা—এই দুইটা মিলিয়ে অনেক নবাগতই ভুল করেন যে কটকে বাঙালী তথা বাঙলা ভাষার একটি বিরাট কেন্দ্র আছে। আমি জানিনা, আলী সাহেব সেই ভুল করেছেন কিনা। ইতি—

ধ্রুবাচার্য, কটক-২।

আকবর মহিষী মরিয়ম-উজ-জমানী

সবিনয় নিবেদন,

দেশ পত্রিকায় উল্লিখিত শিরোনামার প্রবন্ধটি পড়বার পর ফতেপুর-সিক্রীর জেনানামহল সম্পর্কে প্রশ্ন জাগছে। শ্রীমতী সুনন্দা মল্লিক সাহস করে বলতে পেরে-ছিলেন' বলে আমারও বলতে লজ্জা নেই, থাকলে বলতাম না যে, 'বেগমদের পরিচয় শুনে ইতিহাসে পড়া অনেক কথা যেন তালগোল পাকিয়ে গেল'। লেখক শ্রীযুত শৈলেন দত্তের মত অনুসারে 'অশিক্ষিত গাইডদের' মতামতকে নস্যাৎ করে দিয়ে নির্বিবাদে স্বীকার করে নিতে পারি, বাদশাহ আকবরের কোন খৃষ্টান মহিষী ছিলেন না। কিন্তু তাতে করে প্রমাণ হয় না যে মরিয়ম-উজ্জ-জমানী ছিলেন অম্বররাজ-দুহিতা। আবুল ফজল লিখেছেন, অন্তত লেখক বলেন তিনি লিখেছেন, "মরিয়ম-উজ-জমানী" পদবীতে ভূষিতা হন জাহাঙ্গীরের মাতা'। দুটি কারণে এই 'মাতা' শব্দটির অর্থ 'বিমাতা' বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। প্রথমত, জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী থেকে মরিয়ম-উজ-জমানী সম্পর্কিত যে উদ্ধৃতি আমরা আলোচ্য প্রবন্ধটিতে পাই, তাতে এই বেগমের প্রকৃত নামের উল্লেখ যেমন কোনখানে নেই, তেমনি নেই 'মাতা' শব্দটির উল্লেখ। দ্বিতীয়ত, এবং প্রধানত, জাহাঙ্গীর-জননী আজীবন হিন্দু ছিলেন বলেই আমরা জানি। বেঁচে থাকতে যিনি স্বীয় ধর্মমতকে পরম নিষ্ঠায় আঁকড়ে ধরে রইলেন, মরবার পরে তাঁকে দাহ না করে কেন যে কবর দেওয়া হবে ঠিক বোঝা গেল না।

যোধবাই-মহলের 'নামের বিভ্রাট' দূরে করতে গিয়ে লেখক যে সাফাই গেয়েছেন তাতেও সায় দিতে মন কিছুতেই চায় না। দত্ত মহাশয় বোঝাতে চেয়েছেন, যোধবাই এবং যোধাবাই ছিলেন অভিন্না। কিন্তু ক্রমে নিজের বসবার জায়গাটি যাতে দাঁড়াবার জায়গা না হয়ে ওঠে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে এক সময় আমাদের একান্ত অনিচ্ছায় হলেও অতিকষ্টে রাত জেগে মুখস্ত করতে হত, এ'দের একজন ছিলেন জাহাঙ্গীরের জায়া এবং অন্য জন জননী। উদয়সিংহের কন্যার জন্মের অনেক আগেই যদি বাদশাহ আকবর যোধবাই-মহলটি তৈরী করে থাকেন, তাহলে এর অধিকারিণী জাহাঙ্গীর-জননীর নামানুসারেই মহলটির উপরোক্ত নামকরণ করা হয়েছিল এরূপ মনে করা যেতে পারে কি? আশা করি লেখক এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করবেন। ইতি—

আবুল হাসান মোল্লা,
বি টি ছাত্রাবাস,
শিলং, আসাম।

নন্দাঘুণ্টি

সবিনয় নিবেদন,

১১ই চৈত্র তারিখের 'দেশ' নন্দাঘুণ্টি অভিযাত্রী দলের সহিত শেরপা তেনজিং-এর ব্যবহারের কথা পড়ে মর্মাহত হয়েছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম যে এতে মর্মাহত হবার কিছু নেই। এটা হচ্ছে ক্ষমতাদানের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

হান্টের নেতৃত্বে যখন স্যার হিলারী এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেন, তখন শেরপা তেনজিং তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অন্ধ স্বদেশ প্রেমের তাড়নায় আমরা সেদিন জ্ঞান হারিয়ে তাঁর জন্য এভারেস্ট জয়ের গৌরব দাবি করি। তাকে Mountaineering Institute এর উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করি। তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী একথা সত্য কিন্তু ইনস্টিটিউটের উচ্চ পদের যোগ্য কিনা সেটা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

আর একটা কথা। টাকার বিনিময়ে তেনজিং অভিযাত্রী দলকে পর্বতারোহণের সাজসরঞ্জাম দিতে চেয়েছিলেন, অর্থাৎ কিনা, তাদের সঙ্গে তিনি ব্যবসা করতে চেয়ে-ছিলেন। সরকারী এ-রকম কোনো ব্যবস্থা আছে কি? ইতি—

সত্যব্রত ঘোষ।

শিক্ষার আদর্শ

শিক্ষাশিল্প ও কার্পাস বিজ্ঞানঃ— শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ। ওরিয়েন্ট লংম্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিও, কলিকাতা—১৩। দাম—৩·২৫ টাকা।

আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল, ইহার দ্বারা ছাত্রেরা মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে শেখে কিন্তু তাহাদের হস্তপদাদি অঙ্গ অপটু থাকিয়া যায়। নানাদিক ভাবিয়া গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন করেন। বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ হইল, কোনও একটি প্রয়োজনীয় শিল্পশিক্ষাকে আশ্রয় করিয়া ছাত্রগণের দেহ ও মনের বিকাশ সাধন করিতে হইবে। এতদুদ্দেশ্যে বস্ত্র-শিল্প, কৃষি বা কাগজের বাক্স গড়া অথবা ছুতার বা কামারের বিদ্যা প্রভৃতি যে-কোনও একটিকে শিক্ষার বাহন করা যাইতে পারে। গান্ধীজীর ইহাও লক্ষ্য ছিল যে, শিক্ষাকালে ছাত্র আংশিকভাবে স্বীয় শিক্ষার ব্যয় বহন করিতে পারিবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে যে-বিশেষ বৃত্তি শিখিয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিতেও পারিবে।

আমাদের দেশে যাঁহারা বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্ভবের সহিত প্রথম হইতে সংশ্লিষ্ট আছেন, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বদেশে এবং বিদেশে তিনি শুধু বিবিধ শিল্পেরই অভ্যাস করিয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু সেই সকল শিল্পকে ছাত্রগণের দেহ এবং মনের পটুত্ব লাভের আশ্রয়স্বরূপ ব্যবহার করা যায় কিনা, সে-বিষয়েও বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়াছেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানি লক্ষ্মীশ্বরবাবুর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরিপক্ব ফলস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুতা কাটার শিল্পকে আশ্রয় করিয়া শিক্ষাশিল্পকে কেমনভাবে বিকশিত করা যায়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পুস্তকখানির মধ্যে নিবদ্ধ আছে। তত্ত্বাংশের দিক দিয়া ইহা কিন্তু ভারাক্রান্ত হয় নাই, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে পুস্তকখানি যে অতিশয় ফলপ্রদ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপন্ন তুলা ও সুতা কাটার যাবতীয় সরঞ্জাম, কার্পাস শিল্পের ইতিহাস, প্রভৃতি বিষয় পুস্তকে সন্নিবেশিত হওয়ায় এবং মনোজ্ঞ ভাষায় পরিবেশিত হওয়ার ফলে এই সুচিত্রিত গ্রন্থখানি যথেষ্ট সমাদর লাভ করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ এবং কার্যকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান-বিস্তারের জন্য আমরা এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

সাহিত্য আলোচনা

শরৎ-সাহিত্য সমীক্ষা—ক্ষীরোদকুমার দত্ত। বসু সাহিত্য সংসদ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ছাত্রবোধ অধ্যাপকী রচনায় ভরপুর হয়ে প্রবন্ধ গ্রন্থের মলাটি নিয়ে যে সমস্ত বই ইদানীং প্রকাশিত হয়ে চলেছে আলোচ্য গ্রন্থের নামকরণ দেখে প্রথমে সেই শ্রেণীর রচনা বলে সন্দেহ হয়েছিল। কারণ বর্তমান দশকে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনজনই তথাকথিত সাহিত্য-'কর্ণ'ধার অধ্যাপকদের অন্যতম শিকার। ক্ষীরোদ-বাবুর রচনা এই প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম। শরৎ সাহিত্য, শরৎ সাহিত্যে সমাজ, পতিতা, নারী এবং শেষ প্রশ্ন ও পথের দাবী সম্পর্কে বিস্তৃত উদ্ধৃতি সম্বলিত আলোচনা করেছেন গ্রন্থকার। শরৎচন্দ্রের জীবন এবং পত্র-গুচ্ছকে তাঁর সাহিত্য ও সৃষ্ট চরিত্রাবলীকে আলোকিত করার কাজে ব্যবহার করেছেন। শরৎ সাহিত্য তাঁর জীবনে যে অসামান্য প্রভাব সঞ্চারী এবং স্মৃতিভারাতুর একথা তাঁর রচনা পড়ে মনে হয়েছে। নাট্যকারের মতই প্রবন্ধকার নির্লিপ্ত হবেন এবং যুক্তি-বাদী হবেন, ক্ষীরোদবাবু সে বিচারে নির্লিপ্ত নন, তাই তাঁর মূল্যায়নে এবং ব্যাখ্যানে যে কিছু আধিক্য ঘটেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিছু অতিকথনও আছে। কিন্তু সব মিলিয়ে একটি শ্রদ্ধাশীল অনহংকারী সাহিত্য আলোচনার সাক্ষাতই পাওয়া গেল! ৫৬০।৬০

ছন্দ ও অলঙ্কার—অতীন্দ্র মজুমদার। নয়া প্রকাশ, ২০৬, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। ২·৫০ নঃ পঃ।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন, "কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং স্কুল কলেজের গণ্ডির বাইরে যে সমস্ত সাহিত্যানুরাগী পাঠক ছন্দ বিভাগ এবং অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধে কৌতূহলী, তাঁদের জন্য যতটা সহজ, সরলভাবে আমার দ্বারা সম্ভব"—ইত্যাদি। কিন্তু গ্রন্থটিতে এমন কিছুই পার্থক্য নজরে পড়ল না যার ফলে এটি রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। ছন্দ-অলঙ্কার সম্বন্ধে যেসব নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ বাজারে চালু আছে অ-ছাত্র পাঠকের কাছে সেগুলি দুর্বোধ্য কেন বোঝা গেল না। নতুন কিছু করার মধ্যে লেখক

নিজের এবং তরুণ কবিদের প্রচুর উদ্ধৃতি এবং লঘু ভঙ্গী সংযোগ করেছেন। ৩৩১।৬১

বিজ্ঞান

মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা (প্রথম খণ্ড)—অরুণ ঘোষ। প্রকাশক—এডুকেশন এণ্টারপ্রাইজার্স, ১৬এ, ফার্ন রোড, কলিকাতা—১৯। দাম—৮৲ টাকা।

দীর্ঘকাল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা ও অনুশীলনের মাধ্যম ছিলো ইংরেজী ভাষা। এখন বাংলা ভাষায় সে-সব গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। ক্রমে বাংলা ভাষাতে এসব বই অত্যন্ত সুচারুরূপে লেখা হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন পর্যন্ত লেখকদের অনেক বাধা অতিক্রম করতে হচ্ছে। বহুকাল এক ভাষায় অনুশীলন করার ফলে অন্যতর ভাষায় সেই একই বস্তুকে ব্যক্ত করার পক্ষে নানাপ্রকার বাধা আসা স্বাভাবিক। বর্তমান লেখক এ-অসুবিধাকে অনুভব করেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছেন—পিছিয়ে যান নি। মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা যাতে অপূর্ণ না থাকে সেদিকে লেখক দৃষ্টি রেখেছেন এবং যতদূর সম্ভব সহজ ভাষায় বিষয়টিকে ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য, এ-গ্রন্থ লেখকের গবেষণাপ্রসূত ব্যক্তিগত মতামত নয়। বস্তুত গ্রন্থটি ছাত্রপাঠ্য। সেদিক থেকে স্বচ্ছন্দেই বলা যায়, এ-বই পড়ে ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই উপকৃত হবে। ২৯।৬১

পূর্বজন্মের স্মৃতি

জাতিস্মর-কথাঃ সুশীলকুমার বসুঃ মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, দি ঘাটশিলা কোম্পানী, ৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা—১। মূল্য ৪.৭৫

লেখকের নাম অশ্রুতপূর্ব, তাঁর ভাষা-বিন্যাসে সারল্য লক্ষ্য করা গেলেও, তিনি পুরাতন-পন্থী। কিন্তু, যে-বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি বক্ষ্যমান গ্রন্থে অবতীর্ণ হয়েছেন, তা' একেবারে অভিনব বলা চলে। পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে রেখেছে এমন কতকগুলি 'জাতিস্মর' মানব-মানবীর কথা তিনি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করেছেন। লেখক এই বিষয় নিয়ে বহুদিন ধরে গবেষণা করছেন বলে গ্রন্থে জানিয়েছেন এবং ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ ক'রে তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করছেন। এই সব জাতিস্মরদের কাহিনী অতীব চিত্তাকর্ষক, এবং লেখক শুধু কাহিনী বর্ণনাই করেননি, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও বিশ্লেষণেরও একটা স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আমরা লেখক ও তাঁর কাহিনী-বর্ণিত চরিত্রগুলিকে একসঙ্গে ঘটনাবলীর মধ্যে পাই, ফলে তাঁর কাহিনীগুলি একটা অন্তরঙ্গতার সুর লক্ষ্য করেছে। উদাহরণ-স্বরূপ লেখক-বর্ণিত জাতিস্মর-মহিলা 'শান্তিদেবী'র কাহিনীর উল্লেখ করতে পারি। লেখকের পথ-পরিক্রমা, তথ্যানুসন্ধান, শান্তিদেবীর সাক্ষাৎলাভ, এবং শান্তিদেবী সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশ্নাবলী, এসবই রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়বার মতো। দ্বিতীয়ত, লেখকের মূল্যবান ভূমিকাটিও পাঠকের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। আমাদের মনে হয় ভূমিকাটি বরং আরও বিস্তৃত হলে ভালো হতো। 'বাংলার প্রসিদ্ধ বীর বিপ্লবীত্রয় বিনয়-বাদল-দীনেশের মধ্যে দীনেশ জাতিস্মর ছিল' বলে লেখক ভূমিকায় যে মন্তব্য করেছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের একটা আগ্রহও সঞ্চার হয়, 'দীনেশ' সম্পর্কে তাঁর সবিশেষ আলোচনা জানতে ইচ্ছা করে। জাতিস্মর সম্পর্কে লেখক যে একটা বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করতে পেরেছেন, এখানেই তাঁর গ্রন্থের এক বিশেষ সার্থকতা বিদ্যমান। বইয়ের ছাপা ও পরিবেশনাদির ব্যাপারে প্রকাশক আরও একটু যত্ন নিলে পারতেন। ৪২৫।৫৯

কবিতা

একাম্বী—বাগেশ্রী। পরিবেশক—১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম—১.৫০ ও ২৲

কবিতার বই। প্রায় সবগুলো কবিতাই বিপ্লবাত্মক, কিন্তু, কবির বিদ্রোহ কার বিরুদ্ধে সে-সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। ভাবে বস্তুতে রচনা কয়টি নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণার অনুকরণ—ব্যর্থ অনুকরণও বলা যায়, যদিও কবিতাগুলোতে ছন্দচাতুর্য বর্তমান। ৩০৮।৬০

পদক্ষেপ—শ্রীঅতীন্দ্র রায়চৌধুরী। পরিবেশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—২৲ টাকা।

কবি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে জানেন এবং ভালো কবিতা লিখতে পারেন। ফলে এ-বই-এর প্রায় সব-কয়টি কবিতাই সুখপাঠ্য। 'গেঁয়ো সনেট' এবং 'বাদশাজাদা আমি' কবিতা দুটিতে নতুনত্ব সৃষ্টি করার প্রয়াস প্রত্যক্ষ, কিন্তু এ-চেষ্টাকে কাব্য-রসিকেরা সানন্দে গ্রহণ করবেন কিনা সে-সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। উপমা কবিতার একটি বড় অলঙ্কার। এখানে কবি সে-সব উপমার আশ্রয় নিয়েছেন, আধুনিক হওয়ার প্রলোভনে, সেগুলোকে তিনি যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। একজন কবির পক্ষে এ-ঘটনা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। প্রারম্ভে দীর্ঘ ভূমিকাটির প্রয়োজন ছিল না, বিশেষত এত দীর্ঘ রচনাতেও কবি তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে পারেন নি। ২০।৬১

আবার নতুন করে—পরিমল ঘোষ। প্রকাশিকা—শ্রীকমলারাণী দেবী, ২৩।১, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা—৯। দাম—১·৫০ নঃ পঃ।

একটি গদ্যকবিতার সংকলন। সব কয়টি কবিতাই আয়তনে ক্ষুদ্র, অতি ছোট-ছোট কয়েকটি অনুভূতির প্রকাশ। কয়েকটি কবিতা হৃদয়কে স্পর্শ করে। কিন্তু এমন কবিতাও এখানে স্থান পেয়েছে যা ভাবে বা ভঙ্গিতে কোনোরকমেই কাব্য হয়ে ওঠে নি। সংকলন প্রকাশের পূর্বে কবি তাঁর কবিতা-গুলোকে আর একটু মনোযোগ দিয়ে বাছাই করে নিলে পারতেন। ৮।৬১

অনেক মনের পাপড়ি ছুঁয়ে—দিলীপ দাশগুপ্ত। দীপালী গ্রন্থশালা; ১২৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৬। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নয়াপয়সা।

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত অনেক দিন ধরে লিখছেন। এই কাব্যগ্রন্থে তিনি নতুন ঢং-এর কবিতা রচনার প্রচেষ্টা করেছেন। কবির আর্তি প্রতিটি কবিতাতেই পরিস্ফুট, কিন্তু যে গভীরতার দীপ্তিতে প্রতিটি কবিতাই সকলের কাছে অর্থবহ হয়—তার কিছুটা অভাব আছে। তবু 'উত্তরসাধক', 'আত্মাশ্রয়ী : মিত্র', 'শান', 'বর্ণ-বিন্যাস' কবিতা ক'টি আমাদের ভালোই লেগেছে। ৫৪১।৫৯

উপন্যাস

মৃগতৃষা—শ্রীদেবপ্রিয় দে। নব বলাকা প্রকাশনী, ৪ নফরচন্দ্র লাহা লেন, কলিকাতা-৩৬। মূল্য টা ২·৫০ ন প।

উপন্যাসের আকারে মামুলি গল্প। অবশ্য লেখক কোথাও ঔপন্যাসিকের দাবি করেননি। কিন্তু যথার্থ সাহিত্য হিসেবে 'মৃগ তৃষা'র মূল্য কতোখানি সে সম্বন্ধে রীতিমতো সন্দেহ জাগে। ছকে বাঁধা চিরপ্রচলিত সিনেমার গল্পের অনুবর্তন রয়েছে 'মৃগ তৃষা'র কাহিনীতে। 'মেণ্টাল' হস্‌পিটালে' রয়েছে অনুরাধা। কিন্তু কোন কারণে তাকে এই হাসপাতালে আসতে হয়েছে, এবং তারি জের টানা হয়েছে বইটির আগাগোড়া।

কেরানী গোবিন্দের মেয়ে অনুরাধা স্বামী হারিয়েছে অকালে। অনুরাধার একমাত্র মেয়ে চিত্রা যে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে তাকে নিয়েই সমস্ত বিরোধ দানা বেঁধেছে গল্পটিতে। চিত্রা অতি আধুনিকা, শেষ পর্যন্ত সে বঞ্চিতা, এবং পুরুষোত্তম ঝুনঝুনওয়ালার দ্বারা প্রতারিত। এই কারণেই অনুরাধার জীবনে যে মানসিক দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে তারি ফলে তাকে যেতে হয় 'মেণ্টাল হসপিটালে।'

জানি না, এই গল্পের মধ্যে কোনো অভিনবত্ব আছে কিনা। ৪৮১।৬১

রূপান্তর—শচী মুখোপাধ্যায়। সন্ধ্যা লাইব্রেরী; ৩৯১।১, সার্কুলার রোড, হাওড়া। মূল্য টা ২·৫০ ন প।

উপন্যাসটির নামকরণেই ঘটনার পরিণতির কিছুটা ইঙ্গিত রয়েছে। তবে এ রূপান্তর ঘটেছে মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিবর্তে ঘটনার অনুবর্তনে। ডাঃ সোম তার কৃতীপুত্র সুকান্তকে মনের মতো তৈরী করে তুলতে চান। শিক্ষার সঙ্গে জীবন-দীক্ষার যথাযথ যোগ সাধন হোক—এই তার একমাত্র কামনা। পুত্রের বিয়ের ব্যাপারে তিনি কথা দিয়ে রেখেছেন জগদীশবাবুকে। কিন্তু আরো কিছুদিন অপেক্ষা করা প্রয়োজন—এই তার অভিমত।

শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, আত্মহারা সুকান্তের সঙ্গে সাধনার মিলন হয়। ডাঃ সোমের কামনা অপূর্ণই থেকে যায়। তারপর লেখক দেখিয়েছেন যে, এই কামনা অপূর্ণ থাকলেও সুকান্তের মৃতা মাতা শিবানীর আত্মা তৃপ্ত হবে। ডাঃ সোমের অতীত পাপেরও হবে প্রায়শ্চিত্ত। মোট কথা, এই উপন্যাসটি ছকে বাঁধা এবং মামুলি কথায় পরিপূর্ণ। যে জীবন জিজ্ঞাসা সামান্য লেখাকেও মহৎ করে তোলে তার বিন্দুমাত্র স্পর্শ নেই এই উপন্যাসে। ৫৬৯।৬০

রাত্রা—নবারুণ সান্যাল। সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিঃ, ৯ রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম তিন টাকা

প্রাক্‌ স্বাধীনতা যুগের পটভূমিকায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমসাময়িক ঘটনা এবং আগস্ট আন্দোলনের পর্বকে ভিত্তি করে এই উপন্যাসের কাহিনী রচিত হয়েছে। ডাঃ পরমানন্দ বিদেশিনী বিবাহ করেন। তার এক পুত্র, এক কন্যা। পুত্র অসীম—ইংরেজের যুদ্ধ জয় কামনা করে; কিন্তু কন্যা নীলা চায় স্বদেশের মুক্তি। পরমানন্দ খ্যাতনামা ডাক্তার, সর্বজনমান্য, ভূতপূর্ব দেশসেবী এবং ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। তবু নীলাকে একদা ঘর ছাড়া হতে হয়। সে রাত্রা। তাকে খুঁজে পাওয়া যায় গুরুদেবের আশ্রমে। নীলার বিয়ে হয় পার্টি ওয়ার্কার অরুণাভের সঙ্গে। এই বিয়ের পর সে হয় ওয়েলফেয়ার অফিসার। ডাঃ পরমানন্দও তাকে পেয়ে খুশী। কেননা অরুণাভ একদিকে যেমন শ্রমিক দরদী, অন্য পক্ষে তেমনি বড় চাকরী রক্ষার খাতিরে শ্রমিকদের পরোক্ষে বঞ্চনাই করে। এই ঘটনার টানা পোড়েনে নীলা চলে যায় পণ্ডিচেরির শেষ আশ্রয়ে।

উপন্যাসটিতে ঘটনার পারম্পর্য যথার্থ-ভাবে রক্ষিত হয়নি। উপন্যাসে ইতিহাসকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু ইতিহাসকে উপেক্ষা করাও বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা সবাই অরুণাভ কিংবা নীলা নয়। এই নীলাদের অনেকেই এখনো নিগৃহীত অবস্থায় আমাদের মাঝখানে রয়েছে শ্রীযুক্ত সান্যাল এটা উপলব্ধি করলে ভালোই করতেন। ২৪০।৬০

পূবের আকাশ—শ্রীঅবিনাশ সাহা। ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট কলিকাতা-১২। দাম আড়াই টাকা

পূবের আকাশ হয়তো শ্যামাদাস-ই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সে কৃতী ছাত্র, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপনার শ্রেষ্ঠ পদ তারই উপযুক্ত। তবু সে যেমন দুঃখের মধ্যে মানুষ হয়েছে, তেমনি দীন দুঃখীদেরও সে বড় করে তুলতে চায়—এই তার আদর্শ। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় নয়, বস্তিতে বিদ্যামন্দির গড়ে সেখানে বিদ্যা-দানের ভার নেয় শ্যামাদাস। তারি অনুপ্রেরণায় ধনী মধ্যবিত্ত সবাই এসে যোগ দিয়েছে তাকে সাহায্য করতে। উপন্যাসের এই গল্পের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব কিংবা ঘাত প্রতিঘাতের সৃষ্টি করেন নি লেখক। চরিত্র বিশ্লেষণের মুনশীয়ানাও কোথাও নেই। এক নাগাড়ে একটা মামুলি গল্প বলার দায় সেরেছেন যেন লেখক।

১০৬।৬০

সংগীত

রবীন্দ্রসংগীত-প্রসঙ্গ (প্রথম খণ্ড)—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস। জিজ্ঞাসা—১৩৩এ রাস-বিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৯; ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—১২। সাড়ে তিন টাকা।

রবীন্দ্রসংগীত আয়ত্ত করবার জন্য যে বিধিবদ্ধ শিক্ষার প্রয়োজন সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। লেখক জানিয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার্থিগণকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার সমাধানকল্পে রবীন্দ্রনথের সংগীত আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে, রাগ-সংগীতের ভিত্তিতে, গ্রন্থোক্ত পাঠক্রমগুলি পরিকল্পিত। সর্বসমেত আটটি পাঠক্রম এই খণ্ডে নির্ধারিত হয়েছে। প্রত্যেকটি পাঠ-ক্রমেই শিক্ষণীয় রবীন্দ্রসংগীতের সংগে রাগ-সংগীতাংশ যোজিত হয়েছে। এতে রাগ-সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রসংগীতের মূল্যায়ণ সম্ভবপর হবে। সপ্তম ও অষ্টম পাঠক্রমে লেখক দুটি তত্ত্বসিদ্ধ অংশ যোগ করে তাতে ভারতীয় সংগীতের সংগে রবীন্দ্রসংগীতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বিষয়ে আলোচনা করলেও লেখক পরিষ্কারভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণভাবে রাগসংগীতের অংগীভূত বিষয় হিসাবে বিচার করা সংগত নয়। মূল-ভারতীয় সংগীতের সংগে রবীন্দ্রসংগীতের যোগাযোগ এবং রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় ব্যক্তিত্বকে সুপরিস্ফুট করবার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা এই গ্রন্থের বিশেষত্ব। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অর্জনের সুবিধাও এই গ্রন্থে পাওয়া যাবে। লেখক রবীন্দ্রসংগীতে অভিজ্ঞ। তাঁর ব্যক্তি-গত অভিজ্ঞতাও তাঁকে ঈদৃশ পাঠ্যপুস্তক রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। গ্রন্থের ছাপা এবং অংগসজ্জা মনোরম।

৩১।৬১

কিশোর-সাহিত্য

লালনীল হলদে—রাজ সিংহ, গ্রন্থবিতান; ৭৩ দি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

ছোটদের জন্য লেখা সাতটি গল্প-সংগ্রহ। ছোটদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বিজ্ঞানের বিষয় এবং ইতর জন্তু প্রভৃতিকে উপাদান হিসেবে লেখক গ্রহণ করেছেন। গল্পগুলির মধ্যে "বান মাবার গল্প" "রূপ কনা আজও কাঁদে" "ফকির" মন্দ নয়। লেখকের এখনো সাধনার প্রয়োজন।

৩৩১।৬০

প্রাপ্তি স্বীকার

শ্রীশ্রীগুরুপূজা বিধি—

শ্রীমোক্ষদারঞ্জন ভট্টাচার্য।

দি মুন অ্যান্ড সিক্স পেন্স—

সমারসেট মম;

অনুবাদক—অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

মন্দা-নন্দার দেশে—শুভংকর।

মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড—জুল ভার্ন;

অনুবাদক—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৌতুকপুরের রূপকথা—তারকদাস চট্টোপাধ্যায়।

বিপ্লবী সরকারের আমলে পাকিস্তানের প্রগতি।

রবি-তর্পণ—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জানা।

অল ইণ্ডিয়া ফাইন আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফটস সোসাইটির পরিচালনায় কলকাতায় চতুর্থ আন্তর্জাতিক সমকালীন চিত্রকলা প্রদর্শনী শুরু হয়েছে গত ১৬ই এপ্রিল থেকে। প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে ক্যাথিড্রাল রোডে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে। মোট ২৭টি দেশ থেকে আড়াইশর উপর ছবি এসেছে। তবে এখানে সব ছবি প্রদর্শন করা সম্ভব হয়নি স্থানাভাবে। বাইরে থেকে দেখলে অ্যাকাডেমীর বাড়িতে যে স্থানাভাব হতে পারে তা বিশ্বাস হয় না, কিন্তু এটা সত্যি কথা। অ্যাকাডেমীর কর্তৃপক্ষ চিত্রপ্রদর্শনীর জন্য একফালি স্থান পর্দা দিয়ে আড়াল করে নিয়ে হল ঘরের বাকি সবটাই ভাড়া দিয়ে থাকেন ফিল্ম প্রদর্শন এবং নাচ-গান দেখানোর জন্যে। সেখানে চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনী বর্তমানে গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলকাতায় চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনীর উপযুক্ত স্থান নেই বললেই চলে। তাই যখন অ্যাকাডেমীর বাড়ি তৈরী হল, আমরা, কলকাতার শিল্পামোদী জনসাধারণেরা, আশা করেছিলাম সে অভাব পূরণ হবে। কিন্তু তা হয় নি। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য এখন অন্যদিকে। আলোচ্য প্রদর্শনীতে যোগ দিয়েছেন কুবা, পাকিস্তান, দঃ কোরিয়া, রুমানিয়া, আমেরিকা, আরব, ইংলণ্ড, সুইডেন, পোল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস, মঙ্গোলিয়া, মালয় জাপান, ইতালী, ইরাণ, ইন্দোনেশিয়া, ঘানা, ফ্রান্স, ফিনল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, ভিয়েতনাম, পূর্ব জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, চীন, বুলগেরিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া। বার্ণাড বুফে, ব্রাক, রুয়ো, করবুজিয়ের, মিশ্চকন প্রভৃতি শিল্পীদেরও মৌলিক ছবি দেখার সুযোগ পাওয়া গেল এখানে তবে ঐসব বিশ্ববন্দিত শিল্পীদের চিত্রকলার প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা এগুলিকে বলা চলে না। এমন বহু শিল্পীর রচনা এখানে আছে যাঁদের নাম আমরা শুনিনি অথচ কাজগুলি বাস্তবিকই রসোত্তীর্ণ, আবার এমন ছবিও অনেক আছে যা পথিকৃৎ শিল্পীদের পুনরাবৃত্তি বা নকল। নকল শিল্প কখনই সার্থক হতে পারে না কারণ আসল শিল্পী কোন্ পথে গিয়ে পরম মণিটি আবিষ্কার করেছেন তার অন্ধি-সন্ধি খুঁজে পাওয়া নকলনবিশের সাধ্য নয়। আমাদের দেশে উঠতি সমকালীন শিল্পীরা নকল করার মোহে পড়ে যেমন সব আবর্জনার সৃষ্টি করছে, বিদেশেও যে সেই রকম আবর্জনা কম সৃষ্টি হচ্ছে না তার প্রমাণ এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর বেশ কিছু ছবি। সমকালীন অত্যুক্তিবাদ বাড়তে বাড়তে বর্তমানে যে কোথায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে তা দেখে সত্যিই আশঙ্কিত হতে হয়। একটি রচনায় আছে শুধু সাদা ক্যানভাসের ওপর কয়েকটি ছুরির খোঁচ। এই রচনাটি নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ হৈচৈ পড়েছে,
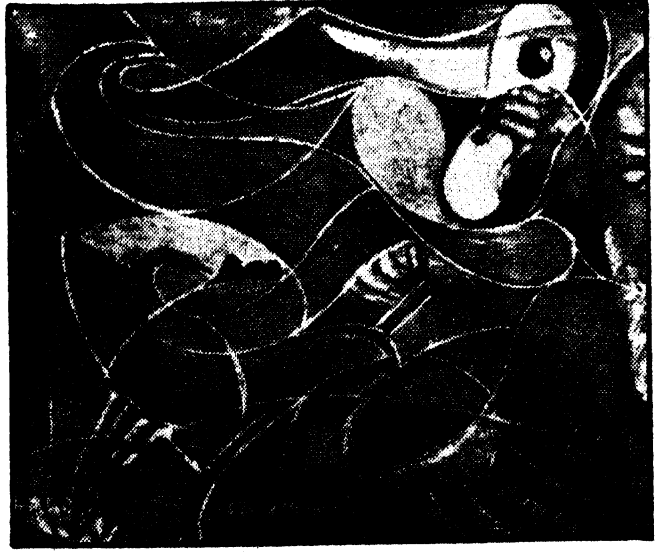
একটি রচনা

আইনস্টাইন

এমন কি দিল্লির লোকসভায়ও রচনাটি উপলক্ষ করে বিতর্ক হয়েছে। রচনাটিতে রঙ ও রেখা নেই বলেই এতটা হৈচৈ। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ঐ খোঁচগুলি অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহৃত। রচনাটির মধ্যে অবশ্যই একটি ডিজাইন উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু ভাবি এর পর শিল্পী যাবেন কোথায়? কুবার সারভাদো কাব্রেরা মোরেনোর 'ব্যাটল' রচনাটি উত্তম তবে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পিকাশোর প্রভাব প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা বুলগেরিয়ান ডানিয়েল ডিভেচ-এর 'উইন্টার' এবং বরিস ইভানভ-এর স্টিল লাইফ, চেকোশ্লোভাকিয়ার কারেল সুসেক-এর 'এ কাফে', জারমন ডিমক্র্যাটিক রিপাবলিক-এর বার্ট হেলারের 'হানস আইলার' ম্যাক্স লিঙ্গার-এর 'টু ওয়ারস—টু উইন্ডোজ, এবং এরিক গারলাক-এর 'মর্নিং'; ফ্রান্সের বার্ণাড বুফের 'তরেরো', করবুজিয়েরের 'সি গডস' এবং ব্রাকের 'লীভস, কলর্স, লাইট', হাঙ্গারীর য়ানোস ওরোসৎ-এর 'হলিডে অব সি পিজিয়নস' এবং ভিলমোজ আবা নোভাকের 'সার্কাস'; ইতালীর রেনেতো গুত্তুসোর 'রিক্লাইনিং ফিগার' এনিরেয়ো মোরলোত্তীর 'ক্যাক্টাস' যুক্তরাজ্যের ব্রায়ান উইন্টার-এর 'রেড কোস্ট' এবং হেনরী ক্লিক-এর 'থেটিস', যুক্তরাষ্ট্রের মিশ্চকন্-এর ব্যারন ফন জেড্ এবং ক্যুবার আমেলিয়া পেলায়েজ-এর 'স্টিল লাইফ' এবং মারিয়ানো রডরিগেজ-এর 'কক্'। প্রদর্শনীটি আগামী ৩২ই মে অবধি খোলা থাকবে প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত।

সব সময়.........................
সব জায়গায়...................
সব ব্যাপারে...............
আপনাকে সব চেয়ে সুন্দর দেখায়
খাটাউ
ভয়েল-এ

চন্দ্রশেখর

মধুরে ভয়ঙ্করে গ্রন্থিবন্ধন

ছায়াছবির দর্শকের কাছে ত্রিকোণ প্রণয়োপাখ্যানের আবেদন এমনিতেই স্বতঃসিদ্ধ। তার ওপর প্রণয়ের সঙ্গে যদি খলতা ও রোমাঞ্চরসও সমপরিমাণে পরিবেশিত হয় তবে দর্শকের প্রমোদ-বাসনা সহজেই তৃপ্তিলাভ করে। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স-এর "অগ্নি সংস্কার" ছবিটিতে দর্শকের এই তৃপ্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

বিনয় চট্টোপাধ্যায় রচিত এই ছবির নায়িকা সুমিতা। এক ধনীগৃহে সে লালিতা-পালিতা। বিধবা গৃহকর্ত্রী তার স্বামীর গড়ে তোলা কারখানার কর্তৃত্বভার তুলে নিয়েছেন নিজের হাতে। কারখানার কর্মাধ্যক্ষ রজত। সুশিক্ষিত, সজ্জন রজতকে ভালোবাসে সুমিতা, সুমিতাকে রজত। তাদের এই গোপন প্রণয়ের সংবাদ রাখেন না গৃহকর্ত্রী। তাঁর মনের সাধ, সুমিতাকে তিনি বিয়ে দেবেন তাঁর একমাত্র পুত্র অলকের সঙ্গে। অপ্রকৃতিস্থ অলক তখন মানসিক হাসপাতালে। অলকের এই অপ্রকৃতিস্থতার কথা গৃহকর্ত্রী গোপন রেখেছেন সুমিতার কাছে, রজতের কাছে তো বটেই।

এরই মধ্যে একদিন খবর পাওয়া গেল যে অলক হাসপাতালের চিকিৎসাধীনে থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং সেখান থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে। অলককে খুঁজে বের করার ভার পড়ে রজতের ওপর। বুদ্ধিমান রজত সুকৌশলে দায়িত্ব সম্পাদন করে অলককে ফিরিয়ে নিয়ে আসে তার মায়ের কাছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেই অলক ফিরে আসে বাড়িতে। কিন্তু সুমিতাকে দেখে নিজের বাড়িতে থাকার আনন্দ আবার সে খুঁজে পায়। সুমিতাকে পেতে চায় অলক, এবং তার মায়ের ইচ্ছা ও সম্মতিক্রমে অলক ও সুমিতার বিয়ে একরকম ঠিকই হয়ে যায়।

রজত তার প্রণয়ের বিড়ম্বনা মেনে নেয় শান্তমনে। সুমিতাকে বলে রায়বাড়ির প্রতি তার কৃতজ্ঞতার কাছে যেন সে তার সাধ-আহ্লাদকে বিসর্জন দেয়। রজত এই ঘটনার পর কারখানার কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু অজ্ঞান্তে অলকের মনে রেখে যায় সন্দেহ ও সংশয়। সন্দেহ ও সংশয়ের বিয়ে আবার অপ্রকৃতিস্থ হয়ে ওঠে অলক। যেদিন সে বুঝতে পারে যে রজতের প্রতি হিসাবেই সুমিতাকে তার গ্রহণ করতে হবে এবং সুমিতার মন-প্রাণ অধিকার করে থাকবে রজত, তখন এক জঘন্য জিঘাংসায় অলকের মন ভরে ওঠে। সে রজতকে হত্যা করবার চেষ্টা পর্যন্ত করে, এবং সুমিতাকে গলা টিপে মারতে। সুমিতা অলকের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং রজতের কাছে আশ্রয় নেয়।

প্রণয়ী-যুগল এতদিনকার সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছেড়ে বিবাহ-বন্ধনে মিলিত হবার জন্যে তৈরী হয়। এমন সময়েই চরম অঘটন ঘটায় অলক। নিজের আসুরিক জিঘাংসার পরিতৃপ্তির জন্যে এক কুটিল চক্রান্তের ভেতর দিয়ে সে আত্মহত্যা করে রজতকে খুনের দায়ে ফেলে যায়।

বিয়ের আসর থেকে রজত ও সুমিতা

'ভগিনী নিবেদিতা'-র প্রযোজক ও কলাকুশলীবৃন্দ : (ডান দিক থেকে) প্রযোজক অজিত বসু, পরিচালক বিজয় বসু, সুরকার অনিল বাগচী, সহ-পরিচালক অরুণ বসু ও বিবেকানন্দ ভূমিকায় অভিনেতা অমরেশ দাশ। —ফটো : অলক মিত্র

সবে বাসরঘরের দিকে বাড়িয়েছে, এমন সময় পুলিস এসে রজতকে ধরে নিয়ে যায় অলককে হত্যা করার অপরাধে। আদালতে রজতের ফাঁসির হুকুম হয় এবং শেষ পর্যন্ত কেমন করে তার নির্দোষিতা প্রমাণিত হয় ও ফাঁসির মঞ্চ থেকে সে জীবন নিয়ে ফিরে আসে তা নিয়েই কাহিনীর সুখপরিণতি।

ছবিতে রজত-সুমিতা-অলকের উপাখ্যান ব্যতীত আরও একটি ছোট উপকাহিনী রয়েছে। এতে রূপ নিয়েছে বিগত দিনের একটি মধুর প্রণয়ের সুখস্পর্শ ও বেদনাময় পরিণতি। অভিশপ্ত রায়বাড়ির কাহিনী ও কর্তার আত্মহত্যার ঘটনা দর্শকরা এই উপকাহিনীর ভেতর দিয়েই জানতে পারেন।

কাহিনীকার বিনয় চট্টোপাধ্যায় রচিত এ ছবির চিত্রনাট্য সুগ্রথিত। তাঁর রচিত সংলাপ বিশেষ কয়েকটি ঘটনায় ও দৃশ্যে দর্শকের মনে রেখাপাত করে। তবে কাহিনীর শেষ দিকে একটি নামকরা বিদেশী ছবির ছায়া পড়েছে।

কাহিনীর উপস্থাপনে এবং সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগ-নৈপুণ্যে অগ্রদূত এই ছবিতে যে নাট্যরসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা রসবেত্তাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করবে। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে ছবির গতি ও পরিণতিকে স্বচ্ছন্দ বাঁধুনিতে গেঁথে দেবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন পরিচালকগোষ্ঠী। এবং ছবির শেষাংশে রহস্য, রোমাঞ্চ ও "সাসপেন্স"-এর উপকরণ দিয়ে রুদ্ধশ্বাস ঘটনাপ্রবাহ সৃষ্টিতে তাঁরা ছবিটিতে প্রশংসনীয় প্রয়োগ-দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সুন্দর পরিমিতিবোধ ও রসজ্ঞানের ভেতর দিয়ে দর্শককে বিগত দিনের একটি ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন পরিচালকগোষ্ঠী। ছবির মূল প্রেমোপাখ্যানের বিন্যাসেও রসের সঙ্গে সংযমের যে সমন্বয় রয়েছে তা রসগ্রাহী ও রুচিবান দর্শকদের আনন্দ দেবে।

ছবির কাহিনী গঠনে ও উপস্থাপনে ছোট-খাটো কয়েকটি অসংগতি ও বৈসাদৃশ্য উপেক্ষণীয় নয়। রায়বাড়ির মাত্র ছেলে যে মস্তিষ্কবিকৃতির জন্যে মা ক হাসপাতালে ছিল সেটা নায়িকার ক জানতে না পারাটা অস্বাভাবিক ঠেকে বিশেষত যখন নায়িকা রায়বাড়িতেই আশ্রিতা। ছবিতে বলা হয়েছে নায়িকাকে রায়বাড়ির কর্ত্রী লেখাপড়া শিখিয়ে মে মত করে মানুষ করেছেন। তা কি শুধু তিন বৎসরের জন্যে অর্থাৎ বাড়ির ল মানসিক হাসপাতালে যাবার পর? য়বাড়ির যে একজন ছেলে আছে এবং সে দেশ এটা নায়িকা রায়বাড়িতে থেকেও নত বলে মনে হয় না। এটা ভাবতেও বাক লাগে যে নায়ক (রজত) জানত না তোর একমাত্র মনিবপুত্র জীবিত ও নিরুদ্দে এবং সব চাইতে অবাককান্ড হল রায়বা ছেলে যে তিন বছর মানসিক হাসপাতা কাটিয়ে এসেছে সেটা তার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতার পরও রজতের মত বুদ্ধি যুবকের বুঝতে বা জানতে না পারা। বির শেষাংশ —অর্থাৎ নাট্যপরিণতির পূ কিছুটা দীর্ঘায়িত এবং সম্পূর্ণ বাহুল্যবর্জিত নয়।

ছবির বিশেষ সম্পদ এ অভিনয়ের দিক। নায়ক (রজত) চরিত্রে উত্তমকুমার একটি সপ্রতিভ, সহৃদয় ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রচিত্রণে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রণয়ীরূপে ছায়াছবিতে যে তিনি অদ্বিতীয় সে প্রমাণও রেখেছেন তিনি র অভিনয়ে। ভাগ্যের নিদারুণ পরিহা মুহূর্তে (বিশেষত ফাঁসির হুকু পর) তাঁর অভিব্যক্তি স্মরণীয়।

ছবির উপনায়কের (অ) ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায় এই টল চরিত্রকে প্রাণোচ্ছলতায়, এবং জিঘাংসা ও ক্রূরতায় জীবন্ত করে তুলেছেন। মুহূর্তের মধ্যে ভাব ও অভিব্যক্তির পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে তিনি প্রশংসনীয় অভিনয়শৈলীর পরিচয় দিয়েছেন।

নায়িকা সুমিতার রূপসজ্জায় সুপ্রিয়া চৌধুরীর অভিনয় প্রণয়ের মুহূর্তে মনোগ্রাহী। প্রেমাস্পদের ফাঁসি হুকুমের পর তাঁর অভিনয়ে যে নিদারুণ অন্তর্দাহ ফুটে উঠতে পারত এবং কয়েদখানায় স্বামীর সঙ্গে শেষ দেখার সময় চরিত্রটির যে অন্তর-বেদনা দিয়ে তিনি দর্শককে কাঁদাতে পারতেন, শ্রীমতী চৌধুরীর অভিনয়ে তা অনুপস্থিত প্রধানত অপ্রয়োজনীয় সংলাপ ও পরিবেশ-বিরোধী সাজসজ্জার জন্যে।

ছবির দুটি প্রধান পার্শ্বচরিত্রে ছায়া দেবী ও ছবি বিশ্বাসের অভিনয় খুবই মনোজ্ঞ। এক কুচক্রীর চরিত্রে বিকাশ রায় তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি বিশিষ্ট পার্শ্বচরিত্রে প্রশংসনীয় অভিনয়-কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন পাহাড়ী সান্যাল ও শিশির বটব্যাল। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বীরেশ্বর সেন, সুশীল

দাস, শিশির মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায় ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের আবহ সুররচনা ছবির সব দৃশ্য ও ঘটনার ভাবমর্মটিকে অনুসরণ করতে পারেনি। ছবির গানগুলি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার কর্তৃক সুরচিত এবং সুন্দর সুরারোপিত। ছবির একটি গান—"আমার দুয়ারখানি"—অতিরিক্ত মাত্রায় রবীন্দ্র সংগীতের সুরে ও কথায় প্রভাবান্বিত। এই কারণেই হয়তো গানটি সব চাইতে বেশী মনকে নাড়া দেয়।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ ও সর্বাংগীণ অংগসৌষ্ঠবে ছবিটি বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। বিভূতি লাহা ও বিজয় ঘোষের চিত্রগ্রহণ, বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা ও যতীন দত্তের শব্দগ্রহণ প্রশংসনীয়।

শিল্পী জীবনের আনন্দ-বেদনা

পূর্বরাগের প্রেমোচ্ছ্বাস, অনুরাগের আত্মনিবেদন ও বিরহের বিচ্ছেদ অতিক্রম করে দুই শিল্পীর জীবন এসে মিলিত হয় মধুমিলনের বাসরঘরে। প্রেমের এই কড়িকোমল রাগিনী নিয়েই তৈরী "স্বরলিপি"—জনতা পিকচার্স এ্যান্ড থিয়েটার্স প্রযোজিত প্রথম ছবি।

জবা ও ভাস্কর দুই শিল্পী। জবা গান গায়, ভাস্কর ছবি আঁকে। বঞ্চনা ও বিড়ম্বনার এক বেদনাময় অতীত পেছনে ফেলে এসেছে জবা। সূর্যমুখীর মতো এসে দাঁড়িয়েছে ভাস্করের সামনে। কিন্তু তার জীবনে অকালে আঁধার নামে।

জবাকে ভুল বুঝে ও ব্যথা দিয়ে দূরে সরে যায় ভাস্কর। জবার বেদনা বাঙময় হয়ে ওঠে তার গানে। গানে গানে ঝরে পড়ে তার অভিমান, গানে গানে বেজে ওঠে তার অবমানিত অন্তরের অংগীকার। সারা দেশকে মাতিয়ে তোলে জবা তার গানে।

কিন্তু প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির মধ্যেও এক নিঃসীম শূন্যতা যেন ঘিরে ধরে জবাকে। বিপ্রলব্ধা জবার কাছে জীবন-যৌবন, সুরের সাধনা ও সিদ্ধি, সকল সুখ ও সাধ যেন মিথ্যা অর্থহীন হয়ে পড়ে।
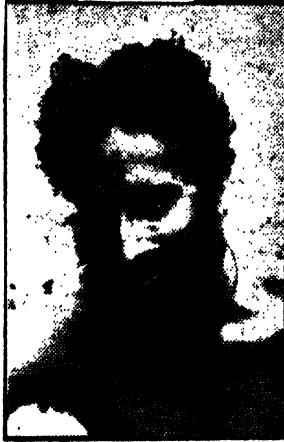
রূপান্তরী নাট্যগোষ্ঠী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্প 'প্রাগৈতিহাসিক' অবলম্বনে একটি পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র (৮ মিলিমিটার) তৈরি করেছেন। তারই এক মুখ্য ভূমিকায় জোছন দস্তিদার

সংসারে তখন জবার আপন বলতে রয়েছে শুধু দূর সম্পর্কের এক দাদা। সদানন্দ ও আপনভোলা এই দাদার কাছেই জবা ও তার মা দুর্দিনে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। জবার জীবন বিকাশের আগমনী গানটি যেদিন প্রথম রেডিওতে গান করে জবা—শুনেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন তার মা। তারপরে জবার জীবনে শুরু হয় বৈভবের খেলা, এবং সেই সংগে বিভ্রমের। সকল ঐশ্বর্যের মাঝে মাধুর্যের অভাবে শুষ্ক হয়ে ওঠে জবার জীবন। দাদাকে সে নিয়ে আসতে চায় নিজের কাছে। কিন্তু স্বভাব-বৈরাগীকে সে বাঁধবে কেমন করে?

রিক্ততার এক রুক্ষ ও বেদনার্ত মুহূর্তে অতর্কিতে ভাস্করের দেখা পায় জবা। ভাস্কর তখন সুখ্যাত শিল্পী। তাদের হারানো প্রেম পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং তা দিয়েই তারা সাজায় জীবনের নতুন বাসর।

বিয়ের পর গান ছেড়ে দিল জবা। দায়িত্বের সংগে মিলনের পথে ঐশ্বর্য ও খ্যাতির বাধাগুলো দুহাতে সরিয়ে দিল জবা। প্রেমের গৌরবে গরবিনী হয়ে সে ধরা দিল নিজেকে ভাস্করের কাছে। বিয়ের পরের মধুর দিনগুলির সব উন্মাদনা ছাড়িয়ে উঠে জবার মনে বাসা বাঁধল শুধু একটি সুখকামনা। সে জননী হবে—প্রেমে ও মাতৃত্বে সে পূর্ণ হয়ে উঠবে। কিন্তু নির্মম নিয়তি জবার মা হবার বাসনাকে বিদ্রূপ করে গেল তার প্রথম সন্তানপ্রসবের সময়ে। জবার প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে তার ছেলেকে বাঁচাতে পারল না চিকিৎসক। এবং সেই সংগে বন্ধ্যাত্বের অভিশাপ নিয়েই বেঁচে উঠল জবা।

জবার জীবনে নিষ্ঠুর ভাগ্যের নিদারুণ

পরিহাস তখনও শেষ হয়নি। দুঃসহ মানসিক আঘাতে সে কানে শোনার শক্তি হারিয়ে ফেলল। এক দুর্ভেদ্য নৈঃশব্দের জগতে চলে এল জবা। সেখানে সুর এসে তার অন্তরে কলতান জাগায় না, প্রিয়তমের কথা না-বলা-বাণী শুনিয়ে যায় না। ভাস্কর মরীয়া হয়ে ওঠে। জবাকে সে সারিয়ে তুলবেই।

তারপর একদিন অনেক বড় বেদনা জবার জীবনে ছোট আঘাতের অভিশাপটিকে মিথ্যা করে দিল। লক্ষ লক্ষ বন্যাপীড়িতদের জন্যে গান করার ডাক এল জবার কাছে। সর্বনাশা বন্যাই একদিন জবাকে ছিন্নমূলে করে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছিল দয়াহীন পৃথিবীর মাঝখানে। অসংখ্য মানুষের আর্তনাদ এসে ভেদ করল জবার নৈঃশব্দের জগতকে। জবা যেন শুনতে পেল তাদের ডাক। জবা ফিরে পেল তার শ্রবণশক্তি। দুর্গতদের জন্যে গাইল সে গান। গানে আর প্রেমে আবার ভরে উঠল জবার জীবন।

দি হউস অনুষ্ঠিত বসন্তোৎসবে সম্পাদক কল্যাণ দত্তের সঙ্গে প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পিদ্বয় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সুপ্রভা সরকার

কৃতিমান চিত্রপরিচালক অসিত সেনের এই সর্বাধুনিক ছবি প্রয়োগ-কর্মের চমৎকারিতায় উজ্জ্বল। ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতের বিচ্ছুরণে চলচ্চিত্রের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তোলার যে অনায়াস ক্ষমতা শ্রীসেনের করতলগত, এ-ছবিতে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তবে ছবিতে হৃদয়ের আবেগ বুদ্ধির শাসনে যেন অনেকখানি স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। বুদ্ধি এই ছবিতে হৃদয়কে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে পারেনি। পরিশীলিত বহিরঙ্গ শিল্প আবেগের সহজ স্বচ্ছন্দ গতিপথকে বার বার রুদ্ধ করে তুলেছে। তাই এই ছবি দর্শকের দৃষ্টিকে যতখানি বিমোহিত করে রাখে, মনকে ততখানি আবেগ-আপ্লুত করে তুলতে পারে না।

তবু একথা অনস্বীকার্য যে শ্রীসেন ছবিতে প্রণয়ের মধুমুহূর্ত রচনায় এবং দাম্পত্যসুখের আবেশ সৃষ্টিতে সুন্দর রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু পরিচালকের এই রসানুভূতি ছবির অন্যান্য বিশেষ আবেগের মুহূর্তে সমপরিমাণে সক্রিয় হয়ে ওঠেনি।

ছবির চিত্রনাট্য কিছুটা দীর্ঘায়িত এবং এর গতিও মন্থর। কিন্তু এই ত্রুটি যে দর্শকের মনে অস্বস্তি আনে না তার কারণ ছবিটির সর্বাঙ্গে চোখ ভরে দেখবার মত শিল্পসৌন্দর্য ছড়িয়ে রয়েছে। তাই দর্শকের চোখ তার মনকে ফাঁকি দিয়ে ছবির রূপসম্ভার উপভোগ করে চলে।

গল্প হিসাবে ছবির এই প্রেমোপাখ্যান মামুলী। সংগীত-সাধক পিতার কাছ থেকে সন্তানের সংগীত-সাধনার উত্তরাধিকার গ্রহণ, অসহায় রমণীর ওপর লালসাপরায়ণ পুরুষের কুদৃষ্টি, অনুরাগ মান-অভিমান-বিরহ-মিলন সমন্বিত প্রেম, মানসিক আঘাতের ফলে শ্রবণশক্তিলোপ (ছবিতে সাধারণত অবশ্য স্মৃতিশক্তিলোপ দেখা যায়) ও দ্বিতীয় আঘাতে তা ফিরে পাওয়া, এবং পরিণতিতে কাম্যের সমাধান প্রভৃতি উচ্চারণ বাংলা ছায়াছবির কাহিনীতে আখছার মেলে। এই সব বিবর্ণ উপাদানরাজিকে পরিচালক শ্রীসেন তাঁর প্রয়োগ-নৈপুণ্যের বাহ্য-অলংকারে সাজিয়ে দিয়েছেন বলে ছবিটির আখ্যান-অবলম্বন হঠাৎ করে দর্শকের কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করতে পারে।

ছবিটি অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয়ে সমৃদ্ধ। শ্রীচট্টোপাধ্যায় নায়িকার দাদার সদানন্দ ও আপনভোলা চরিত্রের রূপায়ণে যে অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর শিল্পী জীবনের অন্যতম কৃতিত্ব হয়ে থাকবে। চরিত্রটির প্রাণোচ্ছলতা, অনাসক্তি ও সদানন্দময় রূপ তিনি অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এক স্নেহশীল ভাইয়ের মরমী রূপটিও তিনি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন।

ছবির নায়িকার চরিত্রে রূপদান করেছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী। শ্রীমতী চৌধুরী চরিত্রটির বেদনা ও বিড়ম্বনার রূপটিকে তাঁর সুন্দর অভিনয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। বৈভব ও খ্যাতির মধ্যে শিল্পীর অন্তরের রিক্ত, অতৃপ্ত ও শূন্য মানুষটির সঙ্গে তিনি দর্শকদের সুষ্ঠুভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

নায়কবেশী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় চরিত্রটির মর্মস্থলে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। এবং সার্থক চরিত্রচিত্রণের ভেতর দিয়ে চরিত্রটির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সুখ-দুঃখের সঙ্গে দর্শকদের অনেকখানি একাত্ম করে তুলেছেন। একটি বিশেষ পার্শ্বচরিত্রে দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় কৃত্রিমতা এবং মুদ্রাদোষে দুষ্ট। নায়িকার জননীর চরিত্রে সুরুচি সেনগুপ্তার অভিনয় চরিত্রানুগ। ছবির কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রা মণ্ডল, রাজলক্ষ্মী দেবী ও দিলীপ রায়চৌধুরীর অভিনয় সন্তোষজনক।

সংগীত পরিচালনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এ ছবিতে গানের সুরারোপে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "যে বাঁশী ভেঙে গেছে" গানটি বার বার শোনবার মত। আবহ-সুররচনা পরিবেশানুগ।

আলোকচিত্র পরিচালনায় অনিল গুপ্ত ছবিটিতে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটির শিল্পশোভনতা ও রূপসম্ভারের মূলে তাঁর আলোকচিত্রের অবদানই প্রধান বললে বেশী বলা হয় না। সুষ্ঠু চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন জ্যোতি লাহা। সম্পাদনায় তরুণ দত্ত, শব্দ-গ্রহণে বাণী দত্ত (অন্তর্দৃশ্য) ও মৃণাল গুহ-ঠাকুরতা (বহির্দৃশ্য) এবং সংগীত গ্রহণে মিনু কাতরাক (বম্বে) প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

চিত্রালোচনা

"মধ্যরাতের তারা" ও "পিয়াসে পঞ্ছী"— এ সপ্তাহের এই দুটি নতুন ছবি। প্রথমটি বাংলা এবং দ্বিতীয়টি হিন্দী।

এম এম প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন "মধ্যরাতের তারা" একটি সাধারণ মেয়ের কাহিনী যার জীবন কেটেছে অপরিচয়ের অন্ধকারে। ছবির পর্দায় এই অবজ্ঞাত চরিত্রটিকে রঙে-রসে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন প্রণতি ভট্টাচার্য। অন্যান্য মুখ্য ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন অভি ভট্টাচার্য, মিতা চট্টোপাধ্যায়, জীবেন বসু, মলিনা দেবী, দীপক মুখোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি। একটি ছোট ভূমিকায় বোম্বাইয়ের বিখ্যাত তারকা কিশোরকুমার অতিথি-শিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। প্রতিভা বসুর কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিটির সুরকার।

শ্রীপ্রকাশ পিকচার্সের "পিয়াসে পঞ্ছী" একটি মিষ্টি মধুর প্রেমের কাহিনী শোনাবে সিনেমার রজতপটে। অমিতা, মেহমুদ, জীবন ও আগাকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি। হরসুখ ভট্ট ছবিটি পরিচালনা করেছেন, কল্যাণজী ও আনন্দজী সুরসৃষ্টির দায়িত্ব বহন করেছেন।

* * *

ভগিনী নিবেদিতার জীবনী অবলম্বনে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন যে ছবিটি তুলছেন তার স্টুডিওর কাজ মোটামুটি শেষ হয়েছে। এই পুণ্যশ্লোকা সাধিকা চরিত্রে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য অভিনয় তাঁকে নতুন গৌরবে ভূষিত করবে। বিবেকানন্দ সেজেছেন অমরেশ দাশ, যিনি ঐ চরিত্রেই অনন্য খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন "হে মহামানব" নামক ছবিতে। অসিতবরণ, শোভা সেন, রবীন মজুমদার, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী প্রভৃতি বহু জনপ্রিয় শিল্পীকে অন্যান্য বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে। ছবিটি পরিচালনা করছেন বিজয় বসু, সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন অনিল বাগচী।

এই সপ্তাহে পরিচালক বিজয় বসু সহকারী পরিচালক অরুণ বসু ও কর্মাধ্যক্ষ ডি পি দাঁকে নিয়ে বিলাত যাত্রা করেছেন লণ্ডনে, ওয়েলসে এবং সম্ভবত আয়ার্ল্যাণ্ডে "সিস্টার নিবেদিতা"-র বহির্দৃশ্য তুলতে।

গত শনিবার অরোরা স্টুডিওতে একটি প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয় এই উপলক্ষে। যে মহান প্রেরণা নিয়ে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন ছবিটি তুলতে ব্রতী হয়েছেন তা সংক্ষেপে বিবৃত করেন প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান কর্মী শব্দযন্ত্রী সমর বসু। পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে "মাদার"-এর আশীর্বাদ নিয়ে বিলাত যাত্রা করবেন বলে অরুণ বসু গত মঙ্গলবার কলকাতা থেকে রওনা হয়েছেন। তাঁর সহ-যাত্রীদ্বয় রওনা হয়েছেন দুদিন বাদে। কোচিন থেকে তাঁরা এক সঙ্গে যাত্রা করবেন।

* * *

বিশ্ববিখ্যাত সুরশিল্পী পণ্ডিত রবিশংকর নিজের প্রযোজনায় একটি বাংলা ছবি তোলবার সংকল্প করেছেন। ছবিটির নাম রাখা হয়েছে "ফাগুন আসিবে ফিরে"। এক সুরসাধকের আনন্দ-বেদনার কাহিনী এর মধ্যে রূপায়িত হবে। গল্পটি লিখেছেন রাজেন্দ্র শংকর। উৎপল দত্ত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। মুখ্য দুই নারী চরিত্রে নির্বাচিত হয়েছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী ও বোম্বাইয়ের উঠতি তারকা বিজয়লক্ষ্মী। কে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করবেন তা এখনও জানা যায়নি। ছবিটি কলকাতায় তোলা হবে এবং আগামী জুন মাস থেকে এর নিয়মিত সুটিং চলবে।

* * *

অগ্রদূত পরিচালক-গোষ্ঠী বর্তমানে পারশমল-দীপচাঁদের যুক্ত নিবেদন "উত্তরায়ণ" তুলছেন। তারাশংকরের এই বহু-পঠিত কাহিনীর চিত্র-রূপায়ণে অভিনেতৃ-সমাবেশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভূমিকা-লিপির পুরোভাগে যাঁদের নাম তাঁরা হচ্ছেন উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। অনিল চট্টোপাধ্যায় ও পাহাড়ী সান্যালকে দুটি বিশিষ্ট পার্শ্ব চরিত্রে দেখা যাবে। রবীন চট্টোপাধ্যায়কে সুরসৃষ্টির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অগ্রদূতের পরবর্তী ছবি "বিপাশা"-র আখ্যান অবলম্বনও তারাশংকরের ঐ নামের একটি মনোজ্ঞ গল্প। সুচিত্রা সেন ও উত্তম-কুমার এর মুখ্য ভূমিকা দুটি রূপায়িত করবেন। এই মাসেই এর সুটিং শুরু হবার কথা।

* * *

বালিগঞ্জের একটি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত রেস্টুরেন্টের অভ্যন্তরে গত ১লা বৈশাখ মিতালী ফিল্মসের "কাঁচের স্বর্গ"-এর চিত্র-গ্রহণ আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়েছে। যাত্রিক পরিচালকগোষ্ঠীর নির্দেশনায় ছবিটি গৃহীত হচ্ছে।

গত ১লা বৈশাখ আরো একটি নতুন ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। ছবিটির নাম "দুটি মুখ", ইউ এ এস প্রোডাকসন্সের পতাকাতলে এটি তোলা হবে।

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উৎসব

বিশ্বভারতী (সোসাইটি) মিউজিক বোর্ডের উদ্যোগে মহাজাতি সদনে পক্ষকাল-ব্যাপী রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই উৎসবে নাটকাভিনয় ও নৃত্যগীতের মাধ্যমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। তাসের দেশ, চণ্ডালিকা, ঘরে বাইরে, বৈকুণ্ঠের খাতা, ভানুসিংহের

পদাবলী, মায়ার খেলা, মুক্তির উপায়, বাল্মিকী প্রতিভা, গোরা, মালিনী, পুরাতন ভৃত্য, শাপমোচন, ত্যাগ, বসন্ত, ঠাকুরদা, শ্যামা, রথের রশি, রাসমণির ছেলে, রবি বাউল ও মুক্তধারা অভিনয়-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আগামী ৯ই মে থেকে ২৪শে মে পর্যন্ত এই উৎসব চলবে, শুধু ২২শে মে কোন অভিনয় হবে না। বিক্রয়লব্ধ অর্থের তিন-চতুর্থাংশ মহাজাতি সদনে দেশনেতা ও বীর শহীদদের প্রতিকৃতি স্থাপনের জন্যে ব্যয় করা হবে।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে গীতবিতান একটি বর্ষব্যাপী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তদনুসারে এই প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন শহরে গিয়ে নৃত্যগীতের আসর বসাবেন। ইতিমধ্যেই বাটজনের একটি দল গত ১৫ই ও ১৭ই এপ্রিল বোম্বাইতে স্থানীয় বেঙ্গল ক্লাবের উদ্যোগে 'মায়ার খেলা' ও 'বাল্মিকী প্রতিভা' অভিনয় করে এসেছেন। আগামী ২৯শে এপ্রিল রাঁচিতে স্থানীয় ঠাকুর সোসাইটির উদ্যোগে এঁরা 'মায়ার খেলার' পুনরভিনয় করবেন। দিল্লি, পাটনা ও অন্যান্য জায়গায়ও এঁরা যাবেন। কলকাতার বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উৎসবগুলিতেও এঁরা যোগদান করবেন। আগামী নভেম্বর মাসে সাতদিন-ব্যাপী একটি নৃত্যগীত ও নাট্যোৎসবের আয়োজন করে গীতবিতান এই বর্ষব্যাপী উৎসবে ছেদ টানবেন।

হাওড়া যুবসভা সংগঠিত রবীন্দ্র সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোগে আগামী ২৫শে বৈশাখ থেকে দশদিনব্যাপী রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব হাওড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসবে শৌভনিক কর্তৃক 'গোরা', রূপকার কর্তৃক 'শান্তি', প্রান্তিক কর্তৃক 'মুক্তির উপায়', থিয়েটার ইউনিট কর্তৃক 'যোগাযোগ', যুবসভা কর্তৃক 'তপতী' ও 'ডাকঘর', হাওড়া এমেচারস কর্তৃক 'শেষরক্ষা' এবং সাহিত্যিকবৃন্দ কর্তৃক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কৃত কবিগুরুর ছোটগল্পের নাট্যরূপ অভিনীত হবে। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত নাটক আকাদামী 'চণ্ডালিকা' এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত সংসদ গীতালেখ্য পরিবেশন করবেন।

রঞ্জিত গুহঠাকুরতার প্রযোজনা ও পরিবেশনায় আর্ট সেণ্টার অব দি ওরিয়েণ্ট-এর ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছেন কবিগুরুর 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করে। গত ১৪ই এপ্রিল নিউ এম্পায়ারে এর প্রথম অভিনয় হয়ে গেছে। এর পরে বিভিন্ন তারিখে শিবপুর ভবানীপুর বালিকা বিদ্যালয়ে, ভবানীপুরে আশুতোষ কলেজ হলে, হাওড়া গার্লস হাই স্কুলে ও মহাজাতি সদনে এর পুনরভিনয় হবে।

একলব্য

আর একটি বছর পার হয়ে গেছে। নতুন বছর এসেছে বাঙালী তথা ভারতবাসীর কাছে জাতীয় জীবনের নতুন প্রতিশ্রুতি নিয়ে। বিগত বাঙলা বছর বাঙালীর খেলা-ধূলার ক্ষেত্রে কি দিয়েছে আর কি দেয়নি তার হিসাব আজ করবো না। আজ শুধু এই কামনাই করব—পেছনের দিকে না চেয়ে বাঙালী শুধু ক্রীড়াক্ষেত্রেই নয়, সর্ববিষয়ে এগিয়ে যাক সামনের দিকে। বাঙলার মাঠ ময়দান খেলাগৃহ, ক্রীড়াঙ্গন, সমাজ জীবন আনন্দে ভরে উঠুক।

নববর্ষের প্রথম দিনের প্রভাতে পার্কে পার্কে হাজার হাজার প্রাণোচ্ছল কিশোর-কিশোরীর দলও এই কামনাই করেছে পরম ঈশ্বর জগদীশ্বরের কাছে। সর্বশক্তিমান ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে পত্রে পুষ্পে, ফুলে ফলে আর সোনার ধানে ভরে উঠুক বাঙলা দেশ।

হাজার হাজার ছেলেমেয়ের এই প্রার্থনা এবং সামরিক বাদ্যের তালে তালে পা ফেলে কুচকাওয়াজের মাধ্যমে সুসংবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার অঙ্গীকার, এর নাম নববর্ষ উৎসব। ভারতে বৃটিশ শাসনের আমলে ইংরাজী নববর্ষের তুলনায় বাঙলা নববর্ষের তেমন আড়ম্বর ছিল না। পয়লা বৈশাখ ব্যবসায়ীদের হালখাতা, জমিদারদের রাজস্ব আদায় প্রভৃতি অর্থনৈতিক দিকটার গুরুত্ব ছিল বেশী। কোন কোন জায়গায় অবশ্য যৎসামান্য আয়োজনের মধ্যে বর্ষ আবাহন উৎসব পালিত হয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষকে সে অনুষ্ঠান নতুন ভাবধারায় তেমন উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। বৃটিশ শাসনের শেষদিকে দেশহিতৈষী কতিপয় ক্রীড়াসংগঠক বাঙলা নববর্ষ উৎসবের এক আয়োজন আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ক্রমে কলকাতার বিভিন্ন পার্কে, হাওড়া ময়দানে ছেলেমেয়েদের ব্যায়াম ও কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে নববর্ষ উৎসব পালিত হতে থাকে। পরে জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘ গঠিত হয় এবং তারা বিরাটভাবে বাঙলার সর্বত্র নববর্ষ উৎসবের আয়োজন করে। জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘের নির্ধারিত কর্মপন্থায় এবং তাদেরই নির্দেশে এখন বর্ষ আবাহনের মধ্য দিয়ে খেলাধূলা, সমাজসেবা ও জাতীয় উন্নতির নতুন অঙ্গীকার গ্রহণ করা হচ্ছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কলকাতায়, হাওড়ায়, শহরতলীর এখানে ওখানে বাঙলার গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে নতুন বছরের নতুন প্রভাবে নবভারত গঠনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যৎ ভারতের ভাবী নাগরিক-দের এ প্রতিজ্ঞা সার্থক হয়ে উঠুক, এই কামনা।

*   *   *

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে খেলাধূলার কর্ম-কর্তাদের ঘরোয়া বৈঠকে নিখিল ভারত স্পোর্টস কাউন্সিলের সভাপতি পাতিয়ালার মহারাজা যখন খেলাধূলার উন্নতি ও পরি-চালনা সম্পর্কে তাঁর মতামত ও ভবিষ্যৎ কর্ম-পন্থার কথা ব্যক্ত করছিলেন তখন আই এফ এর সম্পাদক শ্রী এম দত্ত রায়ও কয়েকটি বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে দ্বিধা করেননি। শ্রীদত্ত রায় খেলাধূলার দর্শনী থেকে প্রমোদ কর তুলে দেওয়ার আবেদন করে কলকাতায় একটি খেলোয়াড় আবাস নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। বহু কক্ষ বিশিষ্ট এই আবাস হবে কলকাতায় বিভিন্ন খেলাধূলার জন্য আগত খেলোয়াড়-দের আবাস স্থল। তাছাড়া খেলাধূলার বিভিন্ন দপ্তরও সেখানে রাখা যেতে পারে।

সত্যি বিষয়টির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। মানুষে ঠাসা কর্মচঞ্চল মহা-নগরীতে এখন একজন আগন্তুকের স্থান করা কষ্ট। হোটেলে সব সময় লোকের ভীড়। বাইরের যেসব ক্লাব ফুটবল, হকি, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার অংশ গ্রহণ করতে আসে তাদের থাকবার যায়গার ব্যবস্থা করতে কর্তৃপক্ষকে অনেক সময় হিমসিম খেতে উঠতে হয়। হোটেল খরচাও হয় প্রচুর। তাই খেলোয়াড়দের জন্য বহু কক্ষ বিশিষ্ট একটি বাড়ি তৈরী হলে একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়। এই ধরনের একটি বাড়ি তৈরীর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ফুটবল বা ক্রিকেটের কর্মকর্তারা সে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন না একথা আমি বিশ্বাস করি না। শুধু ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা থেকে যে অর্থ সংগৃহীত হয় তা দ্বারা অনায়াসেই খেলোয়াড়দের আবাসস্থল নির্মিত হতে পারে। সরকারের কাছে ধর্না দেবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সে সদিচ্ছা কোথায়?

নতুন বাড়ি তৈরীরই বা প্রয়োজন কি? এলেনবরো কোর্সে স্টেডিয়াম তৈরী হলে তার প্রকোষ্ঠে বহু আগন্তুক খেলোয়াড়ের থাকবার ব্যবস্থা হতে পারে। ইডেন গার্ডেনের রনজি স্টেডিয়ামের যে একটি ব্লক তৈরী হয়েছে সে ব্লকটিও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা চলে। কিন্তু সে ব্লকটির থাকবার মত যায়গা তো সাউথ ইস্টার্ন রেলকে ভাড়া দিয়ে রাখা হয়েছে। রেলের এক প্রধান দপ্তর এখন রনজি স্টেডিয়ামে। তাই বলছিলাম সরকারের কাছে শুধু আবেদন নিবেদন আর অসুবিধার কথা না বলে খেলা
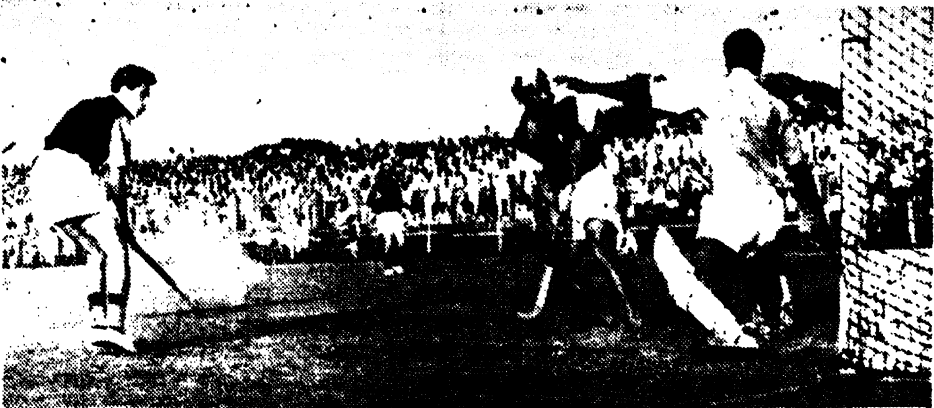
মোহনবাগান ও কাস্টমস দলের প্রথম ডিভিশন হকি লীগের প্রদর্শনী খেলায় মোহনবাগানের পিয়ারা সিং গোল করছেন। খেলায় অবশ্য কাস্টমস ২—১ গোলে বিজয়ী হয়

বেংগল হকি এসোসিয়েশন আয়োজিত প্রথম বার্ষিক আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় হকি প্রতিযোগিতায় এম এল মিত্র কাপ বিজয়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হকি টীম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়কে ৪—১ গোলে পরাজিত করে

ুলোর কর্তারা খেলাধুলো থেকে সংগৃহীত অর্থ সেই প্রয়োজনেই ব্যয় করতে পারেন। ইচ্ছে থাকলেই কাজ হয়। ইচ্ছেরই যে অভাব।

বিদেশের বিশেষ করে ইউরোপের ফুটবল খেলার সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্য আই এফ এ সম্পাদক শ্রীদত্ত রায় রাত্রিকালীন ফুটবল খেলা প্রবর্তনের উপর জোর দিয়েছেন। রাত্রিকালীন ফুটবলের সুবিধা অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় খেলোয়াড়রা বেশী সময় খেলার সুযোগ পাবেন। অফিসের কাজকর্ম এবং স্কুল-কলেজের পড়াশুনা ছেড়ে খেলোয়াড় ও দর্শকদের তড়িঘড়ি মাঠে এসে হাজির হতে হবে না। বলা বাহুল্য, বিকেল পাঁচটার সময় ফুটবল খেলা আরম্ভের জন্য খেলোয়াড় ও দর্শকদের বেশ একটু আগে অফিস পালিয়ে মাঠে ছুটে আসতে হয়। কলকারখানার কর্মীদেরও একই অবস্থা। এতে কাজেরও ক্ষতি হয়। খেলোয়াড়রাও বেশী সময় ধরে খেলার সুযোগ পান না, সুযোগ পেলেও উষ্ণ আবহাওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। এই কারণেই সোভিয়েট রাশিয়ায় ফুটবল খেলা হয় রাত্রিতে। শুধু ছুটির দিনে দিনের বেলায়।

আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার স্থায়িত্বকাল ৯০ মিনিট। কলকাতায় আমরা লীগ খেলি মাত্র ৫০ মিনিট। ফলে ৯০ মিনিট সমান-তালে খেলবার শক্তি আমরা পাব কোথা থেকে? তাই শ্রীদত্ত রায় রাত্রিকালীন ফুটবলের উপর জোর দিয়েছেন। ভাবছি রাইটার্স বিল্ডিংয়ে শ্রীদত্তরায়ের এই প্রস্তাবের পরেই কলকাতায় বিজলী সংকট দেখা দিল না কি? এখানে রাত্রিকালীন ফুটবল খেলার ব্যবস্থা সুদূর পরাহত। তবুও বলি, যদি একান্তই কোনদিন সে ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় তবে ইলেকট্রিক ফেল হলে কি ব্যবস্থা করা হবে সে কথাটাও যেন ভাবা হয়।

* * *

এ সপ্তাহের খেলাধুলোর আলোচনার মধ্যে প্রধান আলোচ্য বিষয় বিশ্ব টেবল টেনিসের অনুষ্ঠান। সম্প্রতি নয়াচীনের রাজধানী পিকিংয়ে বিশ্ব টেবল টেনিসের ২৬তম অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। খেলাধুলোর ক্ষেত্রে নয়া চীনের এ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কারণ এর আগে চীনে কোন বিশ্ব প্রতিযোগিতার আসর বসেছে বলে মনে পড়ে না। তাছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থা ফরমোসা চীনকে স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে 'নয়াচীন আন্তর্জাতিক খেলাধুলো থেকে দূরে রয়েছে। কিন্তু টেবল টেনিসের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা। এখানে নয়া চীন আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস সংস্থার অন্তর্ভুক্ত।

টেবল টেনিসে প্রজাতন্ত্র চীনের অগ্র-গতির কথা কারো অবিদিত নয়। নানা-রকমের খেলাধুলোর মধ্যে টেবল টেনিসকেই চীন জাতীয় খেলা হিসাবে গ্রহণ করেছে। নয়া চীনে এখন লক্ষ লক্ষ টেবল টেনিস খেলোয়াড়। নিয়মিত প্রতিযোগিতামূলক খেলায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করে থাকেন তাঁদের সংখ্যা দশ লক্ষের কম নয়। এই হিসাব থেকেই আন্দাজ করা যেতে পারে টেবল টেনিস চীনে কতখানি জনপ্রিয়। গতবার ডর্টমণ্ডের বিশ্ব প্রতিযোগিতায় চীনের খেলোয়াড় জাং কুয়ো তোয়ান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে এই খেলায় তাঁদের দেশের অগ্রগতির যে স্বাক্ষর রেখেছিলেন এবার পুরুষ ও মেয়েদের ব্যক্তিগত প্রতি-যোগিতায় এবং পুরুষদের দলগত প্রতি-যোগিতায় চীনের খেলোয়াড়রা বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে সেই প্রাধান্যের পর্যাপ্ত প্রমাণ দিয়েছেন। নয়াচীনের নতুন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন অখ্যাত তরুণ চুয়ান সে তুং, মেয়েদের বিভাগে বিজয়িনী হয়েছেন তন্বী তরুণী চুই চাং হুই।

পিকিংয়ের বিশ্ব প্রতিযোগিতায় এবার যোগ দিয়েছিল ৩০টি দেশের আড়াইশোরও বেশী প্রতিযোগী। প্রথমে দলগত প্রতি-যোগিতা সোয়েদলিং কাপ ও কর্বিলন কাপের খেলায় চীন সোয়েদলিং কাপ এবং জাপান কর্বিলন কাপ লাভ করে। পরে আরম্ভ হয় ব্যক্তিগতভাবে বিশ্ব প্রাধান্যের লড়াই।

টেবল টেনিসে জাপানই ছিল এতদিন বিশ্বশ্রেষ্ঠ দেশ। কি ব্যক্তিগত প্রতি-যোগিতায় কি দলগত প্রতিযোগিতায় কোন দেশই এতদিন জাপানের সঙ্গে এটে উঠতে পারেনি। স্পঞ্জ র‍্যাকেট আর পেন হোল্ড গ্রিপে টেবিলের উপর মারের বন্যা ছুটিয়ে জাপান জয়ের রথ চালিয়ে গেছে। ১৯৫২ সালে বোম্বাইতে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় জাপান সর্বপ্রথম অংশ গ্রহণ করে এবং আক্রমণাত্মক খেলার উন্নত নৈপুণ্যে বিশ্বের সকল খেলোয়াড়কে স্তম্ভিত করে দিয়ে লাভ করে বিশ্বজয়ীর সম্মান। ইউরোপের খেলোয়াড়রা প্রাচ্যের এই জয় সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না এবং স্পঞ্জ র‍্যাকেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে জাপানী খেলোয়াড়দের উপর উত্তেজক ওষুধ সেবনের কাল্পনিক অপবাদ আনে। ইউ-রোপের কয়েকটি পত্র-পত্রিকাতেও জাপানী খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয়। সম্ভবত এই কারণে বিরক্ত হয়ে জাপান ১৯৫৩ সালের বিশ্ব প্রতিযোগিতা হতে দূরে সরে থাকে। সুতরাং এ বছর তাঁদের জয়ের প্রশ্ন ওঠে না। এই বছর এবং গতবারের প্রতিযোগিতা ছাড়া জাপানের কাছ থেকে কেউ বিবশ্বজয়ীর সম্মান ছিনিয়ে নিতে পারেনি। ১৯৫৪ সাল থেকে সোয়েদলিং কাপ এবং ১৯৫৭ সাল থেকে কর্বিলন কাপও আছে জাপানের দখলে। ১৯৫৬ সাল থেকে মেয়েদের ব্যক্তিগত প্রতি-যোগিতায়ও জাপানের রয়েছে একটানা আধিপত্য। এছাড়া এ কয় বছর ডাবলস, মিক্সড ডাবলস ও মেয়েদের ডাবলসেও জাপানের প্রাধান্যের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। এই বছরই সর্বপ্রথম জাপানী প্রাধান্যের ব্যতিক্রম ঘটলো। এবার মেয়েদের বিভাগে কর্বিলন ও মিক্সড ডাবলসের পুরস্কার ছাড়া জাপান আর কোন পুরস্কার ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারেনি।

অপর দিকে প্রজাতন্ত্র চীনের সাফল্য শুধু জয়ের হিসাব দিয়ে পরিমাপ করলে ভুল হবে। পুরুষদের সিংগলস, মেয়েদের ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসের রানার্সের পুরস্কারও রয়েছে নয়া চীনের নিজের ঘরে। সবচেয়ে বড় কথা পুরুষদের বিশ্বপ্রাধান্য প্রতিযোগিতার ব্যক্তিগত লড়াইয়ে কোয়ার্টার ফাইন্যালের ৮ জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৬ জনই ছিলেন চীনের অধিবাসী।

বিশেষজ্ঞদের অভিমতে গতবারের বিজয়ী জাং কুয়ো তুয়ানই ছিলেন একবারকার সম্ভাবিত চ্যাম্পিয়ন। তাই সিডিং অর্থাৎ বাছাই তালিকায় জাংকে প্রথম স্থানে রাখা

হয়েছিল। এর পর স্থান ছিল ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন হাঙ্গেরীর খেলোয়াড় জোল্টান বার্জিকের। ১৯৫৪ ও ১৯৫৬ সালের বিজয়ী ওগিমুরাকেও সম্ভাবিত বিজয়ী বলে কল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু কেউই বিজয়ী হতে পারেননি। বিজয়ীর সম্মান পেয়েছেন ১৯ বছরের চীনের ছেলে প্রতিযোগিতার সপ্তম বাছাই খেলোয়াড় চুয়াং সে-তুং। ব্রেজিলের ১৫ বছর বয়স্ক উঠতি খেলোয়াড় বিরিবা দা'কস্টার কাছে গতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জাং কুয়ে তুয়ানকে চতুর্থ রাউণ্ডে হার স্বীকার করতে হয়। এখানে বলা প্রয়োজন, দা'কস্টা পেনহোল্ড গ্রিপ ও স্পঞ্জ ব্যাটের খেলোয়াড়। ডর্টমাণ্ডে বিশ্ব প্রতিযোগিতার সময় যখন তার বয়স ১৩ বছর তখনই তিনি বহু ধুরন্ধর খেলোয়াড়কে হারিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন। ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন জোল্টান বার্জিককেও এবার চতুর্থ রাউণ্ডে ক্যান্টনের ১৮ বছরের এক তরুণ খেলোয়াড়ের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে। বার্জিক এবার মোটেই ভাল খেলতে পারেননি। সোয়েদলিং কাপের খেলার সময় দুবার তাঁকে স্ট্রেট গেমে চুয়াং সে-তুং-এর কাছে হার স্বীকার করতে হয়। তখনই চুয়াং সে-তুং-এর প্রতিভার পরিচয় মেলে। পরে তিনি মারমুখী খেলার অপূর্ব নৈপুণ্যে দেশ বিদেশের খেলোয়াড়দের একে একে পরাজিত করে বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভ করেন।

ফাইন্যাল খেলাগুলির ফলাফল:—

পুরুষদের সিংগলস—চুয়াং সে-তুং (চীন) ২১-১৫, ১৯-২১, ২১-১৭ ও ২১-১২ পয়েণ্টে লী ফু-জাংকে (চীন) পরাজিত করেন।

মেয়েদের সিংগলস—চুই চাং-হুই (চীন) ১৯-২১, ২১-১৯, ১৪-২১, ২১-১৮ ও ২১-১৯ পয়েণ্টে ইভা কর্কজিয়ানকে (হাঙ্গেরী) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস—নবুয়া হোসিনো ও কোজি কিমুরা (জাপান) ২১-১৮, ২৫-২৭, ২১-১৯ ও ২১-১৩ পয়েণ্টে জেরেঙ্ক সিডো ও জোল্টান বার্জিককে (হাঙ্গেরী) পরাজিত করেন।

মেয়েদের ডাবলস—মেরিয়া (আলেকজান্ড্রু) ও গীতা পিটিকা (রুমানিয়া) ২১-১৪, ১২-২১, ২১-১৮, ১৭-২১ ও ২১-১৩ পয়েণ্টে চিউ চাং-হুই ও সান মেই-ইংকে (চীন) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস—ইচিরো ওগিমুরা ও কিমিও মাৎসুজাকী (জাপান) ২১-১৭, ২১-১৪, ১৬-২১ ও ২১-৯ পয়েণ্টে লী ফু জাং ও হ্যান উ-চেনকে (চীন) পরাজিত করেন।

* * *

ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার টেনিস টেস্টে অস্ট্রেলিয়া রাবার পেয়েছে। কলকাতার প্রথম টেস্টে জয়-পরাজয় অমীমাংসিত থাকবার পর দিল্লী ও মাদ্রাজের টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ভারতকে পরাজিত করেছে। তবে এ জন্য ভারতের আক্ষেপ করবার কিছু নেই। কারণ অস্ট্রেলিয়া অ্যামেচার টেনিসে এখন সর্বাগ্রগণ্য দেশ। অনেকের মতে টেনিস নাকি অস্ট্রেলিয়ায় এখন প্রায় ক্রিকেটের মতই জনপ্রিয়। সেই অস্ট্রেলিয়ার উঠতি খেলোয়াড়রা ভারতকে পরাজিত করে রাবার পেয়েছেন এতে আক্ষেপের কিছু নেই। বরং ভারত যেভাবে অস্ট্রেলিয়ার ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তাতে ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্রশংসাই প্রাপ্য। দিল্লী এবং মাদ্রাজ দু' জায়গাতেই অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ডাবলস খেলার ফলাফলে। অর্থাৎ ডাবলসের খেলায় কোথাও তাঁরা পরাজিত হয়নি। সিংগলসে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার জয়-পরাজয়ের সংখ্যা রয়েছে সমান সমান। আর সবচেয়ে উল্লেখ করবার মত ঘটনা ভারত চ্যাম্পিয়ন আর কৃষ্ণন সিংগলসের কোন খেলাতেই হার স্বীকার করেননি।

কলকাতায় ফ্রেড স্টোলীকে পরাজিত করবার পর কৃষ্ণন ও হিউইটের খেলা সময়াভাবে অমীমাংসিত থাকে। দিল্লীতে কৃষ্ণন পরাজিত করেন ফ্রেচার ও হিউইটকে। মাদ্রাজে হিউইট ও স্টোলীকে কৃষ্ণনের কাছে স্ট্রেট সেটে হার স্বীকার করতে হয়।

অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা উঠতি খেলোয়াড় বব হিউইটকে দুইবার পরাজিত করা কৃষ্ণনের পক্ষে খুব বড় কথা না হলেও এর মধ্যে কৃতিত্বের পরিচয় আছে। কলকাতায় কৃষ্ণনের খেলায় অনুশীলনের অভাব অনুভব করেছিলাম। কিন্তু কৃষ্ণন প্রতিটি খেলায় উন্নতির পরিচয় দিয়ে হিউইটকে পরাজিত করেছেন।

ভারতের তরুণ খেলোয়াড় জয়দীপ মুখার্জি, যিনি কলকাতায় ফ্রেড স্টোলীকে হারিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, দিল্লীর খেলায় তিনি অংশ গ্রহণ করেননি। সিংগলস ও ডাবলস খেলেছেন প্রেমজিৎ। মাদ্রাজে স্টোলীর কাছে জয়দীপের হার স্বীকার করতে হলেও স্টোলীর জয় সহজলভ্য হয়নি। পাঁচটি সেটে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়দীপকে হারাতে হয়েছে। তাই বলছিলাম টেনিস সম্বন্ধে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারতের এ পরাজয় মোটেই অগৌরবের নয়। বরং এ খেলা টেনিস ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। ভারতের খেলোয়াড়রা অর্জন করেছেন মনোবল ও অভিজ্ঞতা। সে মনোবল ও অভিজ্ঞতা তাঁদের আগামী দিনের কাজে লাগবে।

দেশী সংবাদ

১০ই এপ্রিল—পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ আজ লোকসভায় বলেন যে, কলিকাতা নগরীর উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের পাঁচটি অল্ডারম্যান পদের নির্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত পাঁচজন প্রার্থীই অধিক ভোট পাইয়া নির্বাচিত হন। এই পাঁচজনকে লইয়া কর্পোরেশনে এক্ষণে কংগ্রেস একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল।

অদ্য প্রত্যূষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুগ্ধ বিতরণের একখানি মোটরভ্যান বাগবাজারের ফুটপাথের উপর দিয়া গিয়া একটি স্টেশনারি দোকানে ঢুকিয়া পড়ে এবং ঐ ভ্যানের তলায় পিষ্ট হইয়া তিনজন মারা যায়। ইহা ছাড়া একটি অন্ধ বালিকাসহ দুইজন আহত হয়।

১১ই এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু দার্জিলিং হইতে দিল্লি প্রত্যাবর্তনের পথে অদ্য মধ্যাহ্নে কয়েক ঘণ্টার জন্য কলিকাতায় আসেন। প্রধানমন্ত্রীর দমদম বিমানঘাটি হইতে কলিকাতায় রাজভবনে যাইবার পথে কয়েকটি স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। বিক্ষোভকারীরা 'প্রধানমন্ত্রী ফিরিয়া যাও' ও অন্যানারূপ ধ্বনি দিয়া বিক্ষোভ প্রদ[illegible] করে। পুলিস এই সম্পর্কে ১৬জনকে গ্রেপ্তার করে।

১২ই এপ্রিল—আসামে আবার নূতন করিয়া জনগণনার যে দাবি উঠিয়াছে সেই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কোন আশ্বাস পাওয়া যায় নাই। পুনরায় লোকসংখ্যা গণনা করা সম্ভব নহে বলিয়াই সরকার জানাইয়া দিয়াছেন।

অদ্য পরিবহণ কর্পোরেশনের (সরকারী) বাস চাপায় আরও দুইটি জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। শিয়ালদহ স্টেশনের সম্মুখে আপার সার্কুলার রোডে একজন মহিলা নার্স (৩৫) এবং শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ের অদূরে পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স্ক অপর এক ব্যক্তি মারা যায়।

১৩ই এপ্রিল—প্রখ্যাত সাংবাদিক ও পরম বৈষ্ণব আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকারের সপ্তদশ তিরোভাব দিবস উপলক্ষে অদ্য অপরাহ্নে আনন্দবাজার পত্রিকাভবনে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তাঁহার গুণমুগ্ধ দেশবাসী, সহকর্মী ও অনুরাগীবৃন্দ তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্য অর্পণ করে।

পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলিকে ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করিয়া আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার এক উদ্যোগ এই রাজ্যের কোন কোন রাজনৈতিক মহলে শুরু হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৪ই এপ্রিল—কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ ঘাটতির ফলে শুধু যে সাধারণের জীবনযাত্রায় সংকট দেখা দিয়াছে তাহা নহে, শিল্পকেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের ক্ষেত্রেও ইহা অদূরভবিষ্যতে গুরুতর সংকটের সূত্রপাত করিতে পারে এইরূপ আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

গতকল্য সকালে বাগনান থানার অন্তর্গত খাদিনান গ্রামে থানা হইতে প্রায় এক মাইলের মধ্যে একটি বাঁশবাগানের ভিতর এক যুবতীর মস্তকহীন মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

১৫ই এপ্রিল—১৬০৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় মহাভারত মহাকাব্য রচনা করিয়া একদা যিনি কবিকীর্তির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন, সেই প্রখ্যাত বাঙালী কবি কাশীরাম দাসের স্মৃতিরক্ষাকল্পে তাঁহার জন্মভূমি কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত সিংঘী গ্রামে নবনির্মিত লাইব্রেরী ভবনের আজ উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

১৬ই এপ্রিল—কলিকাতার পথেঘাটে দুর্ঘটনার সংখ্যা, বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া পরিবহণ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এই সম্পর্কে একটি রিপোর্ট চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

নেপালের পত্রিকাগুলি আবার প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বিরুদ্ধে বিষম কুৎসা রটনা আরম্ভ করিয়াছে এবং কয়েকটি পত্রিকা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নেপালের অবস্থা সম্পর্কে "দোমুখো নীতি" অনুসরণের অভিযোগও আনিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১০ই এপ্রিল—পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, সম্প্রতি পাক সরকারের ডিক্লারেশন অর্ডিন্যান্স জারী হওয়ার ফলে বিভিন্ন শহর হইতে প্রকাশিত কয়েকশত মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক এবং অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আজ সরকারীভাবে প্রকাশিত হিসাবে, জানা যায় যে, গত শনিবার "দারা" নামক জাহাজে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২৪২জন নিখোঁজ হইয়াছে। জাহাজখানি আজ উপকূল হইতে দশ মাইল দূরে নিমজ্জিত হয়।

১১ই এপ্রিল—কঙ্গোলী সংবাদ-সংস্থা জানাইতেছেন, গত শনিবার অপরাহ্নে দক্ষিণ কাসাইয়ের বাকওয়াঙ্গায় রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় সেনা এবং দক্ষিণ কাসাইয়ের প্রেসিডেন্ট কালনজীর সৈন্যদের মধ্যে এক গুরুতর সংঘর্ষ ঘটে। কেহ হতাহত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

একদা যিনি লক্ষ লক্ষ ইউরোপীয় ইহুদীর জীবন-মৃত্যুর চাবিকাঠি হাতে লইয়া সদর্পে নাৎসী রঙ্গমঞ্চে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, আজ ইহুদীদের "নিজ বাসভূমিতে" সেই অ্যাডলফ আইখম্যানের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। অভিযোগ-ব্যাপক নরহত্যা, অমানুষিক নির্যাতন, "মানবধর্মকে পদাঘাত করিয়া" ইহুদী নরনারী ও কিশোর-কিশোরীর প্রাণ হরণের বীভৎস ষড়যন্ত্র।

১২ই এপ্রিল—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান তাস জানাইতেছেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ একজন মানুষকে মহাকাশে প্রেরণ করিয়াছে এবং তাঁহাকে জীবন্ত ও সুস্থ অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে। সাড়ে চার টন ওজনের একখানা মহাকাশ-যানে ১০৮ মিনিটে মহাকাশে ২৭ বৎসর বয়স্ক ইউরি আলেক্সিভিচ গ্যাগারিন একবারের সামান্য একটু বেশী পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিক্রমা করেন।

প্রাক স্বাধীনতা দিবসে "সীমান্ত গান্ধী" নামে পরিচিত খান আবদুল গফফর খানকে আজ সকালে ডেরা ইসমাইল খাঁ জেলার পানিইয়ালো নামক স্থানে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১৩ই এপ্রিল—মহাকাশ বিজয়ী মেজর গ্যাগারিন পৃথিবীর মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াই গতকল্য জানাইয়াছেন যে, পৃথিবীতে যখন দিবালোক, তখন মহাকাশ-যান হইতে অনন্ত আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম উহা অন্ধকার, গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আর আমাদের পৃথিবীর বর্ণ নীলাভ, তৎসত্ত্বেও সমস্ত কিছু পরিষ্কারভাবেই দেখা গিয়াছে।

১৪ই এপ্রিল—বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী বৈমানিক ইয়ং পাইওনিয়ার্স দলের অবৈতনিক সদস্য, অর্ডার অব লেনিন সম্মানভূষিত ২৭ বৎসর বয়স্ক সোভিয়েট বীর মেজর গ্যাগারিনকে তাঁহার অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের জন্য সম্মান প্রদর্শনার্থে রাশিয়ার লক্ষ লক্ষ নাগরিক আজ মস্কোর অন্তস্তল রেড স্কোয়ারে সমবেত হয়।

গতকাল রাত্রে উত্তর অ্যাঙ্গোলার কুইটেক্সের গ্রামে সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় ৪ জন শ্বেতাঙ্গ নিহত ও ২০ জন আহত হয়। পক্ষান্তরে ২৪ জন আক্রমণকারী নিহত ও বহু আহত হইয়াছে। পরে সৈন্যদল গ্রামটি দখল করিয়া লয়।

১৫ই এপ্রিল—নিউইয়র্কের নিকটবর্তী একটি প্রস্তর-খনি খননের কালে একটি অজ্ঞাতপরিচয় সরীসৃপের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, যাহার বয়স ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ বৎসর হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

কঙ্গোর ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী প্যাট্রিস লুমুম্বা ও তাঁহার সহকর্মিগণের কি অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক তদন্ত দাবি করিয়া ভারত আজ কঙ্গো সম্বন্ধে একটি নূতন প্রস্তাব পেশ করিয়াছে।

১৬ই এপ্রিল—প্রতিদিন পৃথিবীর রাজপথে অন্তত ১ হাজার লোক মারা যায় বলিয়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষণা করিয়াছেন। অন্যান্য দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর তুলনায় রাজপথের দুর্ঘটনায় অনেক বেশী লোক মারা যায়।

বেলজিয়ান এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ-বহির্ভূত বিদেশী সেনা এবং রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের কঙ্গো ত্যাগের জন্য আজ রাত্রে সাধারণ পরিষদ পূর্ব দাবির পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। আফ্রো-এশিয়ান দল অবশ্য একুশ দিনের মধ্যে কঙ্গো ত্যাগের জন্য সময় বাঁধিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
প্রতি সংখ্যা – ৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বলে : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
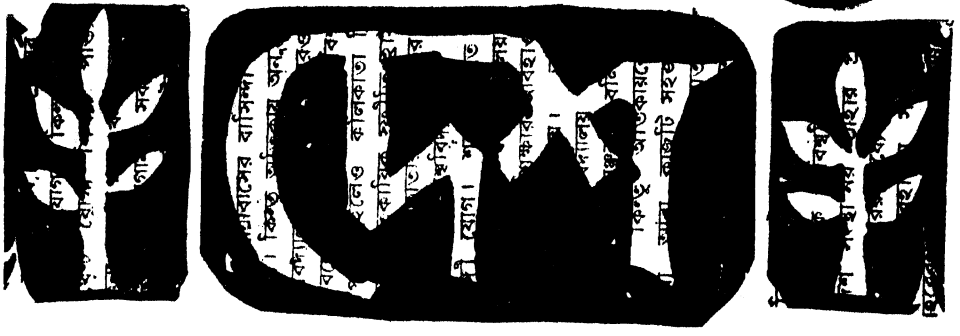
DESH 40 Naye Paise.
SATURDAY, 29TH APRIL, 1961

২৮ বর্ষ ॥ ২৬ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৬ বৈশাখ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসবের সূচনাতেই রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান মহানগরী কলকাতা ম্রিয়মান। নিদারুণ দুর্গতির সম্মুখীন। এই বিংশ শতাব্দীতে কলকাতার এমন দুরবস্থা ঘটতে পারে কল্পনাও করা যায় নি।

অনাবিল সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নীড় কলকাতা কোনকালেই ছিল না, একথা ঠিক, তবু অনেক দুর্ভোগ সয়ে অসংখ্য ক্ষয়-ক্ষতি ও গ্লানির ক্ষতচিহ্ন ধারণ করেও কলকাতা কখনও অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় নি।

"দুঃস্বপ্ন নগরী", "মিছিলের শহর" ইত্যাদি নিষ্ঠুর শ্লেষোক্তিও কলকাতা উপেক্ষা করতে পেরেছে; কিন্তু কলকাতা কী করে ক্ষমা করতে পারে তাদের যারা এই মহানগরীতে, যন্ত্রসমৃদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল এই বিংশ-শতাব্দীতে, হতবুদ্ধিকর "অন্ধকার যুগ" সৃষ্টি করেছে?

দুঃস্বপ্নকে এই মহানগরীতে যাঁরা বাস্তবে পরিণত করেছেন তাঁদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অপ্রতিরোধ্য হতে পারে, কিন্তু কলকাতা কী করে শ্রদ্ধা করবে তাঁদের কর্মনিপুণতায়, কী করে আস্থা রক্ষা করতে পারে তাঁদের দূরদর্শিতায়?

অবস্থা অসহনীয়; বিদ্যুৎসঙ্কট এবং পানীয় জলসংকটের জাঁতাকলে পিষ্ট কলকাতার নাগরিক জীবনে স্বস্তি নেই। বিদ্যুৎসংকট নতুন উপসর্গ, পানীয় জল সংকট অনেক কালের। কলকাতার ভাগ্য-বিধাতাদিগের নির্বিকল্প ধ্যানদৃষ্টিতে দুই-ই সমান। বিদ্যুৎসংকট সমাধানের আশু সম্ভাবনা নেই; অতএব জনগণ-বিধাতাদের মতে ভাগ্য এবং ভগবানই একমাত্র ভরসা।

"ইনসারমাউণ্টেবল ডিফিকালটি" অর্থাৎ অনতিক্রমণীয় বাধা সম্পর্কে যুরোপবাসীর বাঁধাবুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথ

"দুঃস্বপ্ন নগরী!"

যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছিলেন এখানে তা অনায়াসে স্মরণ করা যায়।

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে" ইংরেজ এদেশে যে "লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনা"-কে ফেলে রেখে গেছে তার উপরেই চৌদ্দ বৎসরে দুর্নীতি, অপদার্থতা, ক্ষমতালোলুপতা অতিকায় এক জঞ্জালস্তূপ রচনা করেছে। এই কলকাতাতেই রবীন্দ্রনাথ সেই পুঞ্জীভূত আবর্জনার পূতিগন্ধময় পরিচয় লাভ করতে পারতেন; আর তিনি নিশ্চয়ই পরম বিজ্ঞ দার্শনিকের ভান করে প্রতিকারযোগ্য মানবিক দুর্মতি অথবা দুর্গতির জন্য ভাগ্য এবং ভগবানের দোহাই দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করতেন না।

কলকাতার লজ্জা, কলকাতার চরম অগৌরব যে শতবর্ষ পরে এই মহানগরী তার শ্রেষ্ঠ সন্তানের জন্মদিবসের উৎসব অনুষ্ঠানকে সুস্থ স্বচ্ছন্দ পরিচ্ছন্ন পরিবেশে যথোচিত শ্রীমণ্ডিত করতে অক্ষম।

ইংলণ্ডের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের আগমন উপলক্ষে এই মহানগরীতে আলোকসজ্জায় ত্রুটি ঘটে নি; বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের উৎসাহ, তৎপরতা এবং দাক্ষিণ্য আশাতীত, এমন কী, মাত্রাতিরিক্তভাবে, রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সংবর্ধনায় নিয়োজিত হতে দেখা গেছে। অথচ বৈশাখের শুভারম্ভে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকের সূচনাতেই বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কলকাতার এক একটি অঞ্চলে পালাক্রমে "অন্ধকার যুগ" প্রবর্তন করেছেন।

কলকাতার নাগরিকবৃন্দ অসহায় এবং বিমূঢ়; কিছু পরিমাণে বিস্মিত এবং রুষ্টও। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিক উৎসব-দিবসে কলকাতা দীপমালাসজ্জিত হবে, ভবনে ভবনে, উৎসবমণ্ডপ ও মঞ্চে আলোকিত, আনন্দিত পরিবেশে রবীন্দ্রানুরাগী নরনারীগণ মিলিত হবেন, অনেকেই তাই আশা করে আছেন। বিদ্যুৎসংকটের বিপর্যয় বর্তমানে সে-আশার প্রতিবাদী।

এই সংকট সৃষ্টির পেছনে অন্ধ ক্ষমতাগর্ব এবং কুটিল স্বার্থপরতা সক্রিয়, সে-সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নেই। যুদ্ধ, এবং মন্বন্তরের আপৎকালীন অবস্থার অভিজ্ঞতা কলিকাতার নাগরিকবৃন্দ বিস্মৃত হয় নি। কিন্তু চরম আপৎকালীন অবস্থাতেও যা কখনও ঘটতে পারে নি তাই বর্তমানে ঘটিয়েছেন কিম্বা ঘটবার সুযোগ সৃষ্টি করেছেন আমাদের পরম বিজ্ঞ আত্মসন্তুষ্ট অঘটনঘটনপটীয়ান পরিকল্পনা পরিচালকগণ।

জলাভাব আর নিষ্প্রদীপের আতঙ্কে ম্রিয়মান অসংখ্য ব্যাধিজর্জর এই মহানগরীতে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদযাপনের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহে, আয়োজনে সংকটের ছায়াপাত সত্যই অত্যন্ত মর্মপীড়াদায়ক একটি দুর্লক্ষণ। সাময়িকভাবে নানারকম জোড়াতালি দিয়ে সংকটের পীড়ন কিছুটা লাঘব করা হয়ত সম্ভব; কিন্তু যেভাবে একটার পর একটা সংকট কলকাতার নাগরিক জীবনের সামগ্রিক নিরাপত্তাকে জীর্ণ, দীর্ণ-বিদীর্ণ করছে তাতে এই মহানগরীর মহতী বিলুপ্তি অনিবার্য হওয়া অসম্ভব নয়।

রবীন্দ্রজন্মের শতবর্ষ পরেও এই মহানগরী যে তার ভাগ্যবিধাতাদের অপদার্থতা ও নির্বুদ্ধিতা সত্ত্বেও টিঁকে রয়েছে এ-ও একটি পরমাশ্চর্য, আর সে পরমাশ্চর্য ঘটনার মূলে আছে মহানগরীর নাগরিকবৃন্দের অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও দুর্জয় সহনশীলতা।

রবীন্দ্রজন্মশতপূর্তি সংখ্যা

১৩৬৮

॥ এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ ॥

কবি সংবর্ধনা

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বর্ষপূর্তিতে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে শান্তিনিকেতনে জন্মোৎসব ও কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক দেশবাসীর পক্ষ থেকে কবিসংবর্ধনা; ১৩২০ বঙ্গাব্দে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তিতে সংবর্ধনা; ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ইউরোপ পরিভ্রমণান্তে স্বদেশ প্রত্যাগমন উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক আনন্দোৎসবের বিস্তারিত বিবরণ এই সংকলনে মুদ্রিত হবে। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত বাংলাদেশের বহু মনীষীর ভাষণ এই সংকলনের অঙ্গীভূত হবে। ১৩১৮ বঙ্গাব্দের সংবর্ধনায় সভাপতি সারদাচরণ মিত্র ও অর্ঘ্য দান উপলক্ষ্যে জগদিন্দ্রনাথ রায়ের ভাষণ এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তর; নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে অভিনন্দনের উত্তরে শান্তিনিকেতনে ও পাবনায় উত্তর বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা; ১৩২৮ বঙ্গাব্দের আনন্দোৎসবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির অভিভাষণ ও রবীন্দ্রনাথের উত্তর এই সংকলনে প্রকাশিত হবে। এছাড়া ৭০ বৎসরের রবীন্দ্র-জয়ন্তী ও ৮০ বৎসর বয়সে রবীন্দ্র-জীবনের শেষ জন্মোৎসবের পূর্ণ বিবরণী প্রকাশিত হবে।

কবি-সংবর্ধনা ও জন্মোৎসবের বহু দুষ্প্রাপ্য চিত্র এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ।

নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত রবীন্দ্র-পত্রাবলীর কয়েকটি মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ পত্র প্রকাশিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবি নিশিকান্তর লেখা একটি সুদীর্ঘ কবিতা শিল্পী ইন্দু দুগারের অলংকরণে শোভিত হয়ে প্রকাশিত হবে।

॥ লেখকসূচী ॥

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, প্রমথনাথ বিশী, পুলিনবিহারী সেন, নিশিকান্ত, হারীতকৃষ্ণ দেব, সৈয়দ মুজতবা আলী, শান্তিদেব ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডঃ শশধর সিংহ, রঞ্জন, দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, অমিতা রায়, বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রিচার্ড চার্চ, কপিলা কাশীপতি, মৃণাল ঘোষ প্রভৃতি।

প্রত্যেকটি প্রবন্ধই সচিত্র এবং জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপির প্রতিকৃতি, 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের অঙ্গীভূত একাধিক বহুপরিচিত স্বদেশী সংগীতের পাণ্ডুলিপির প্রতিকৃতি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হবে যা ইতিপূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত হয়নি।

মূল্য ৮০ নয়া পয়সা

৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১

কিউবার কাস্ত্রো সরকারকে বিতাড়িত করার জন্য যে-সশস্ত্র "অভিযান" শুরু হয়েছিল, সেটা সাময়িকভাবে প্রতিহত হলেও ব্যাপারটা মেটে নি। এবং শেষ পর্যন্ত সেটা কোন্ পরিণামে গিয়ে পৌঁছবে, তাও কেউ নিশ্চিত বলতে পারে না। এখন পর্যন্ত সাক্ষাৎ-সংঘর্ষ যা হয়েছে, তা কিউবানে কিউবানে, অর্থাৎ বাহ্যত সংঘর্ষের রূপটা গৃহযুদ্ধের। কিউবাতে কিছুসংখ্যক লোক নিশ্চয়ই আছে, যারা ডক্টর ফিদেল কাস্ত্রোর শাসনের অবসান চায়। কিন্তু বাইরে থেকে সাহায্য এবং সমর্থন না পেলে তাদের পক্ষে বিশেষ কিছু করা সম্ভব ছিল না। কিউবার অর্থনৈতিক জীবনের উপর থেকে মার্কিন প্রভাব হটিয়ে দেবার জন্য কাস্ত্রো সরকার যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, তাতে কিউবার জাতীয় মনের খুশী হওয়াই স্বাভাবিক। তবে সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিস্ট ব্লক বিশেষ করে সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর কাস্ত্রো সরকারের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি অনেকের মনে উদ্বেগ ও কিছুটা অসন্তোষ সৃষ্টি অবশ্যই করেছে। তবে সেই অসন্তোষকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার যথেষ্ট ব্যবস্থাও কাস্ত্রো সরকার করে রেখেছিলেন। ক্ষমতা-লাভের পূর্বে ডক্টর কাস্ত্রোকে তাঁর পূর্ববর্তী ডিক্টেটরের সঙ্গে কয়েক বছর ধরে লড়তে হয়েছিল; কর্নেল বাতিস্তার আমলে ডক্টর কাস্ত্রো এবং তাঁর অনুগামীদের জীবন যেমন নিরাপদ ছিল না, তেমনি কাস্ত্রো সরকারের বিরুদ্ধাচারী বা সম্ভাব্য বিদ্রোহীদের সম্পর্কেও কঠোর সতর্কতার কোনো অভাব ছিল না। নিজে বহুকাল বিদ্রোহীর জীবন যাপন করে ডক্টর কাস্ত্রো এবিষয়ে সিদ্ধহস্ত হয়েছেন। সুতরাং দেশের ভিতর থেকে সহসা সফল বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা অতি সামান্যই ছিল। সেইজন্যই কাস্ত্রো-বিরোধী কিউবান যারা বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের দ্বারা "অভিযানের" সংঘটনের এই চেষ্টা।

দেখা যাচ্ছে, এই "অভিযানের" নায়করা কিউবার অভ্যন্তর অবস্থা সম্বন্ধে দুটি বিষয়ে ভ্রান্ত ছিল। বাইরে থেকে "অভিযান" আরম্ভ হলেই কিউবার ভিতরে যত লোক কাস্ত্রো সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে বলে তাঁরা আশা করেছিলেন, তার চেয়ে অনেক কম লোক সেরূপ করেছে।

অর্থাৎ কিউবার অভ্যন্তরে কাস্ত্রো-সরকার সম্পর্কে যতটা অসন্তোষ বর্তমান বলে তাঁদের ধারণা ছিল, অসন্তোষের পরিমাণ তার চেয়ে কম। অথবা যারা অসন্তুষ্ট, তারাও কাস্ত্রো-সরকারের দমন-নীতির ফলে এরূপ ভীত যে, সহজে তারা আত্মপ্রকাশ করবে না। "অভিযানের" নায়কদের দ্বিতীয় ভুল ধারণা ছিল, কাস্ত্রো-সরকারের সামরিক বল সম্পর্কে। কাস্ত্রো-সরকার যে গত এক বছরের মধ্যে তাঁদের সামরিক শক্তি এতো বাড়িয়ে ফেলেছেন, সেটা বোধহয় "অভিযান"-কারীদের ঠিকমতো জানা ছিল না। অথবা কম্যুনিস্ট ব্লকের নিকট থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের দ্বারা কাস্ত্রো-সরকারের সামরিক বল দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, এ-খবর তাঁরা রাখতেন এবং আরো দেরি করলে এই ধরনের "অভিযান" দ্বারা কাস্ত্রো-সরকারকে হঠানো একেবারেই অসম্ভব হবে, এই ভেবে তাঁরা এখনই জুয়াড়ি-সুলভ মনোভাব নিয়ে এই কাণ্ডটা ঘটিয়েছেন।

"অভিযানটা" সফল হয়নি, কিন্তু এই অর্থে নয় যে, সব চুকে গেল। পাহাড়ে-জঙ্গলে কী পরিমাণ "গেরিলা" যুদ্ধ এখন হচ্ছে বা হবে, তার উপরই সব নির্ভর করছে, তাও নয়। তার চেয়েও অনেক গুরুতর প্রশ্ন এই ব্যাপারের মধ্যে নিহিত আছে। ধরে নেওয়া থাক যে, এই "অভিযানটা" কিউবানরাই করেছে, এটা কিউবার গৃহযুদ্ধেরই একটা অংশ। কিন্তু তারা তো চন্দ্রলোক থেকে আসেনি, পৃথিবীরই কোনো দেশে এই "অভিযানের" প্রস্তুতি চালাতে হয়েছে, এর জন্য অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন সংগ্রহ করতে হয়েছে, লোকদের শিক্ষা দিতে হয়েছে। এ সমস্তই মার্কিন সরকারের আনুকূল্যেই হয়েছে, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। "অভিযানে" সাক্ষাৎভাবে কোনো মার্কিন সৈন্য অংশ গ্রহণ না করতে পারে, কিন্তু সামরিক, বে-সামরিক অন্য অনেক রকমের মার্কিন সাহায্য ছাড়া এরূপ অভিযান সম্ভবই হতো না।

এসব সাহায্য মার্কিন সরকার করেননি, এমন কথা মার্কিন সরকারও বলছেন না, সেকথা বলা হাস্যকর হতো। তাঁরা বলছেন, এটা কিউবানদেরই ব্যাপার। তবে যে-"স্বদেশপ্রেমিক" কিউবানরা অত্যাচারী কাস্ত্রো-সরকারকে হঠিয়ে কিউবাতে গণ-তান্ত্রিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদের লক্ষ্য এবং প্রচেষ্টার প্রতি মার্কিন সরকার ও জাতির পূর্ণ সহানুভূতি আছে। প্রেসিডেন্ট কেনেডি কিউবার কাস্ত্রো-সরকারকে "বিদেশী প্রভাবাধীন" সরকার বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন যে, কিউবার ব্যাপারে যদি বাইরে থেকে, অর্থাৎ আমেরিকান গোলার্ধের বাইরে থেকে কোনো সামরিক হস্তক্ষেপ হয়, তবে মার্কিন সরকার তৎক্ষণাৎ তাতে সশস্ত্র বাধা প্রদান করবেন। আসল প্রশ্ন, কিউবা থেকে মার্কিনবিরোধী কাস্ত্রো-সরকারকে সরাবার জন্য মার্কিন সরকার কতদূর যেতে প্রস্তুত হয়েছেন এবং অন্য পক্ষে কিউবাতে কম্যুনিস্ট শক্তি পা রাখার যে ঠাঁই পেয়েছে, সেটা রক্ষা করার জন্য সোভিয়েট সরকার কতদূর যেতে রাজী আছেন?

শ্রী খ্রুশ্চভ এবং শ্রী কেনেডি ইতিমধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রকাশ্যে যে-সব উক্তি নিক্ষেপ করেছেন, আগেকার কালে দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে এরূপ উক্তি বিনিময় হলে লোকে ধরে নিত যে, যুদ্ধ আরম্ভ হতে আর বিলম্ব নেই। জগতে নিউক্লিয়ার অস্ত্রের আমদানির পর থেকে এ বিষয়ে একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আরো যে-সব কথা বলার পরে যুদ্ধ অনিবার্য বলে ধরে নেওয়া হতো, এখন সে-সব কথা বলার পরেও কর্তাদের পেছিয়ে আসতে দেখা যায়। একেই আজকাল "ব্রিংকম্যানশিপ" বলা হয়। এর জন্য পরলোকগত ডালেসকে অনেক সমালোচনা শুনতে হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখন দু পক্ষেরই বড়কর্তারা মাঝে মাঝে "ব্রিংকম্যানশিপের" খেলা দেখান এবং পৃথিবীও তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এর মূলে হচ্ছে নিউক্লিয়ার অস্ত্র সম্বন্ধে সচেতনতা। আগে যে কথা বললে অপরিবর্তনীয় চ্যালেঞ্জ বলে গণ্য হত, এখন তার চেয়ে শক্ত কথা বলার পরেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়াটা আত্মমর্যাদার পক্ষে অনিবার্য মনে করা হয় না। কারণ চ্যালেঞ্জকারীরাও নিজেদের হাতের অস্ত্রের ভয়ে ভীত।

কিউবা সম্পর্কে মার্কিন গভর্নমেণ্ট এবং প্রেসিডেন্ট কেনেডি যে-কথা বলেছেন, তার অর্থ কাস্ত্রো-সরকারের উচ্ছেদ সাধন না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা শান্ত হবেন না। এই ব্যর্থ "অভিযানের" ফলে মার্কিন সরকার উপহাসাস্পদও হয়েছেন। মার্কিন সরকার ব্যাপারটাকে এইখানে থেমে থাকতে দেবেন, এরূপ আশা করা যায় না। আমেরিকার এই মুশকিলের সময়ে ইংরেজদের মধ্যে যেন একটা চাপা উল্লাস দেখা যাচ্ছে। সুয়েজ হাঙ্গামার সময়ে আমেরিকা বৃটেন ও ফ্রান্সের কাজ সমর্থন করেনি, সেইজন্য তাদের অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হয়। এখন আমেরিকার "ভুল" দেখে অনেক ইংরেজ মনে মনে খুশী হচ্ছে। তাছাড়া অল্প কয়েকদিন মাত্র আগে শ্রী কেনেডি নাকি শ্রী ম্যাকমিলানকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, পশ্চিমা ব্লকের নেতৃত্বের রাশ এখন তাঁর একলার হাতেই তিনি রাখবেন, শ্রী ম্যাকমিলানের আর "গো-বিট্‌ইন" দালালের কাজ করার আবশ্যক হবে না। সুতরাং আমেরিকার "ভুলের" সমালোচনা করতে পেরে ইংরেজরা খুশী। আলজেরিয়া নিয়ে ফ্রান্সের যে নূতন সংকট উপস্থিত হয়েছে, তাতে আমেরিকাকে সমালোচনা করার আনন্দ উপভোগ করার অবসর তার এখন নেই। কিন্তু সুয়েজ হাঙ্গামার সময়ে আমেরিকার সম্মতি-অসম্মতির উপর বৃটেন ও ফ্রান্স যেরকম নির্ভরশীল ছিল, বর্তমান ক্ষেত্রে আমেরিকার পক্ষে বৃটেন ও ফ্রান্সের মুখাপেক্ষী হওয়ার তেমন কারণ নেই।

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে, কিউবার "গৃহ-যুদ্ধে" আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়ন একে অপরের হুঁশিয়ারী অগ্রাহ্য করে কে কতদূর হস্তক্ষেপ করতে প্রস্তুত। সম্ভবত মার্কিন সরকার কাস্ত্রো-সরকারকে সরাবার, অর্থাৎ তাঁদের মতে কিউবা থেকে কম্যুনিস্ট ঘাঁটি উচ্ছেদ করার জন্য যতদূর যেতে প্রস্তুত হবেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন বন্ধু কাস্ত্রোকে রক্ষা করার জন্য ঠিক ততদূর যেতে রাজী হবেন না, যদি তাতে আমেরিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ-সমরের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কারণ কিউবার ব্যাপারে আমেরিকা এখন এগোক বা পিছাক, যাই করুক, তাতেই তার বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা করার এতো মাল-মশলা পাওয়া যাবে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন আশা করে যে, কিউবা থেকে সোভিয়েট-দরদী কাস্ত্রো-সরকারের যদি উচ্ছেদও হয়, তাহলেও সারা জগতের ঠাণ্ডা লড়াইয়ের জমা-খরচের হিসাবে কম্যুনিস্ট ব্লকের লোকসান হবে না, লাভ হবে।

* * *

আলজিয়ার্সে বিদ্রোহী ফরাসী সেনাপতির দলকে "সোজা" করার জন্য প্রেসিডেণ্ট দ্য গল ফরাসী রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। বোধহয় ইতিপূর্বে কোনো জাতির এমন ব্যাপক আন্তরিক সমর্থন পেয়ে কেউ নিজেকে ডিক্টেটর ঘোষণা করেননি।

২৪।৪।৬১

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

ভবঘুরে (৬)

কী উল্লাস! কী আনন্দ তাদের!

আমি ইণ্ডিয়ান, আমি রেড্ ইণ্ডিয়ান, আমি চীনেম্যান এমন কি আমি নিগ্রো ইস্তেক। যে যার মত বলে গেল একই সঙ্গে চিৎকার করে।

আমি আশ্চর্য হলুম, কেউ একবারের তরেও শুধোলে না, আমি কোন্ ভাষায় কি বললুম সেটা অনুবাদ করে দিতে। তখন মনে পড়ল, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তাঁর বাল্য বয়সে শিশুসাহিত্য নামক কোনো জিনিস প্রায় ছিল না বলে তিনি বয়স্কদের জন্য লেখা বই পড়ে যেতেন এবং বলেছেন, তাতে সব-কিছু যে বুঝতে পারতেন তা নয়, কিন্তু নিতান্ত আবছায়া-গোছের কি একটা মনের মধ্যে তৈরি করে সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বেঁধে তাতে ছবিগুলো গেঁথেছিলেন—বইখানাতে অনেক-গুলো ছবি ছিল বলে তিনি নিজেই না বোঝার অভাবটা পুষিয়ে নিয়েছিলেন। কথাটা খুবই খাঁটি। বাচ্চারা যে কতখানি কল্পনাশক্তি দিয়ে না-বোঝার ফাঁকা অংশ-গুলো ভরে নিতে জানে তা যাঁরা বাচ্চাদের পড়িয়েছেন তাঁদের কাছেই সুস্পষ্ট। অনেক স্থলেই হয়তো ভুল সিদ্ধান্তে পেঁছয় কিন্তু তাতে কি এসে যায়। আমি চীনেম্যান না নিগ্রো তাতে কার ক্ষতিবৃদ্ধি। তারা বিদেশী, অজানা নূতন কিছু একটা পেয়েই খুশী। আর আমি খুশী যে বিনা মেহন্নৎ বিনা কসরৎ আমি এতগুলো বাচ্চাকে খুশী করতে পেরেছি—কারণ আমি বিলক্ষণ জানি, আমি সোনার মোহরটি নই যে দেখামাত্রই সবাই উদ্বাহু হয়ে উল্লাসে উল্লম্ফন দেবে।

তা সে যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত স্থির হল আমি রেড্ ইণ্ডিয়ান। তার কারণটা একটু পরেই আমার কাছে পরিষ্কার হল। এরা কয়েকদিন পর ইস্কুলের শো-তে একটা রেড-ইণ্ডিয়ান নাচ, তীর ছোড়া এবং 'শান্তির পাইপ খাবার' অভিনয় করবে—আমি যখন স্বয়ং রেড্ ইণ্ডিয়ান উপস্থিত তখন আমি রিহার্সেলটি তদারক করে দিলে পাশের গ্রামের ছেলেমেয়েরা একেবারে থ মেরে যাবে। ওঃ! তাদের কী সৌভাগ্য!

আমি নৃতত্ত্বের কিছুই জানিনে। রেড ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নির্জলা নিল্। তাদের 'শান্তির পাইপ' কি, সে সম্বন্ধে আমার কণামাত্র জ্ঞান নেই। বুশ-মেনের বেশ-পোষাক আর রেড-ইণ্ডিয়ানের ঐ বস্তুতে কি তফাৎ তাও বলতে পারবো না। অথচ ওদের নিরাশ করি কি প্রকারে?

যাক্। দেখেই নি ওরা কতদূর এগিয়েছে। তখন দেখি, ইয়াল্লা, এরা জানে আমার চেয়েও কম! ছোট্ট ইস্কুল বাড়ির একটা ঘর থেকে বেঞ্চি ডেস্ক্ সরিয়ে সেখানে রিহার্সেল আরম্ভ হল। রেড-ইণ্ডিয়ান মাথায় পালক দিয়েছে বটে কিন্তু বাদবাকি তার সাকুল্য পোষাক কাও বয়দের মত। আরো যে কত 'অনাছিষ্টি' সে বলে শেষ করা যায় না।

তখন আবার বুঝলুম রবীন্দ্রনাথের সেই কথাই আপ্তবাক্য। অল্প বয়স্করা কল্পনা দিয়েই সব-কিছু পুষিয়ে নেয়। তদুপরি এদের প্রাণশক্তি অফুরন্ত। এরা পেট ভরে খেতে পায়। জামা-কাপড়ে এদের মধ্যেও কিছু কিছু দামী সস্তা ছিল বটে কিন্তু ছেঁড়া জামা-জুতো কারোরই নয়। আট বছর হতে না হতে এরা খেত খামারের কাজে ঢোকে না। কোথায় এদের গ্রামের কাচ্চা-বাচ্চারা আর কোথায় আমার গ্রামের কাচ্চা-বাচ্চারা! এই বাচ্চাদের হাসিখুশী দেখে এদের যে কোন একটির মাথায় হাত রেখে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা যায়;—

তুমি একটি ফুলের মত মণি
এমনই মিষ্টি এমনই সুন্দর
মুখের পানে তাকাই যখনি
ব্যথায় কেন কাঁদায় অন্তর!

শিরে তোমার হস্ত দুটি রাখি
পড়ি এই আশিস মন্তর,
বিধি তোরে রাখুন চিরকাল
এমনই মিষ্টি এমনই সুন্দর!

ডু বিস্ট্ ডী আইনে ব্লুমে
জো হোল্ট্ উন্ট্ শ্যোন উন্ট্ রাইন;
ইষ শাও' ডিষ আন, উন্ট্ ভেমুট
শ্লাইষ্ট্ মীর ইন্স্ হের্ৎস্ হিনাইন।

মীর ইস্ট্ আল্স্ অপ ইষ ডি হ্যান্ডে
আউফ্স্ হাউপ্ট্ ডীর লেগেন জল্ট,'
বেটেন্ড, ডাস্ গট্ ডীর এরহাল্টে
জো রাইন উন্ট্ শ্যোন উন্ট্ হোল্ট্।

এই গ্রামের পাশের বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হাইন্‌রিষ হাইনে যাঁর ছোট্ট কবিতার বইটি, 'বুক ড্যার লীডার' পকেটে নিয়ে বন্ থেকে বেরিয়েছি এই কবিতাটি তার থেকে নেওয়া।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে পরম বিস্ময় বোধ হয় এই কথা স্মরণ করে যে তিনিই প্রথম বাঙলাতে অনুবাদ করেন—এবং খুব সম্ভব ভারতের সব ভাষা নিলে বাঙলাতেই প্রথম—হাইনের কবিতা। এবং তাই হাইনের মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর যেতে না যেতেই! এবং মূল জর্মন থেকে—ইংরিজি অনুবাদ মারফতে নয়! পরবর্তী কবিদের অধিকাংশই অনুবাদ করেছেন ইংরিজি থেকে। মাত্র সত্যেন দত্ত ও যতীন্দ্র বাগচীরই অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের কিছুটা কাছে আসতে পারে। রবীন্দ্রনাথই যে প্রথম হাইনের বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন সেদিকে হালে শ্রীযুক্ত অরুণ সরকার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন, কারণ রবীন্দ্রনাথের চলিত অচলিত কোনো রচনাবলীতেই এ অনুবাদের উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

হাইনের সঙ্গে চন্ডীদাসের তুলনা করা যায়। দুজনাই হৃদয় বেদনা নিবেদন করেছেন অতি সরল ভাষায়। দরদী বাঙালী তাই সহজেই এ'র সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে।

গ্যোটে যে সংস্কৃতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার অন্যতম কারণ সংস্কৃত এবং গ্যোটের দেশ ও জাতের ভাষা দুটোই আর্য ভাষা। কিন্তু হাইনে জাতে ইহুদি। আর্য-সভ্যতা এবং ইহুদিদের সেমিতী সভ্যতা আলাদা। তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন নিছক ভারতবর্ষের নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনা পড়ে এবং শুনে:

তাঁর যে গুরু ফন্ শ্লেগেল তাঁর মাথায় সর্বপ্রথম কবির মুকুট পরিয়ে দেন তিনি ছিলেন বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক।

দ্বিতীয় মত

॥ রঞ্জন ॥

স্পষ্টভাষী আম্বেদকর একবার ভারতের সংবিধান সম্বন্ধে বলেছিলেন, পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যে এর পূর্ণ বিপ্লবগর্ভ তাৎপর্য সম্বন্ধে স্পষ্ট উপলব্ধি অতি সামান্য। এই সংবিধানের আদিগুরু জওহরলাল নেহরু এবং এর রচয়িতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আম্বেদকর নিজে। এমন কথা বললে অন্যায় হবে না যে দেশের জনসাধারণ এবং তাঁদের প্রতিনিধিরা যখন নিদ্রিত বা অন্যমনস্ক ছিলেন তখন ওই দুই ব্যক্তি সকৌশলে তাঁদের মনোমত সংবিধান পাশ করিয়ে নিয়েছেন। একজন সদস্য অবশ্য বলেছিলেন যে ভারতীয় সংবিধানে তিনি বিদেশী ব্যান্ডের বাজনা শুনতে পান, শুনতে পান না শুধু ভারতীয় বীণার ধ্বনি। কিন্তু পরে যাঁরা সংবিধানের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সমালোচক হয়েছেন তাঁদের পুরোভাগে স্থান স্বয়ং রাষ্ট্রপতির, যিনি কিনা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সভাপতি ছিলেন। রাজেনবাবু শুধু রাষ্ট্রপতির জন্য অধিকতর ক্ষমতা দাবী করেননি ঃ তারও আগে এলাহাবাদে এক বক্তৃতায় সংবিধানের অন্যান্য ত্রুটির উল্লেখ ছিল। যথা, প্রতি বয়স্কের ভোট থাকা উচিত কিনা; নির্বাচ্য সদস্যদের আবশ্যিক গুণ ও যোগ্যতার নির্দেশ সংবিধানে থাকা উচিত ছিল; সংবিধানে শুধু সাধারণের অধিকারের বিধান আছে, কর্তব্যের নির্দেশ নেই, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সংবিধান নিয়ে ব্যাপক আলোচনার অনুপস্থিতিতে আমি ক্ষুব্ধ হইনি কেননা, কবুল করি, নেহরু-আম্বেদকর চক্রাতে আমার প্রচণ্ড সম্মতি ছিল। আমি জানতেম আমার দেশবাসীর নিহিত পরিবর্তন-বিমুখতা, আমি জানতেম আমাদের সংবিধানের অনুচ্চারিত বিরোধিতা প্রাচীন হিন্দু সমাজের নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি। (হিন্দু বিবাহবিধি, জাতি প্রথা, নরনারীর অসাম্য—এর একটাও আইনগত ভিত্তি আর অবশিষ্ট নেই যদিও অভিশাপ-গুলি একেবারে বিদায় নেয়নি আজও।) ভেবেছিলেম, কারো জেনে কাজ নেই, সংবিধান বয়স্কের সম্মান লাভ করুক আর আমরা ইতিমধ্যে বিংশ শতাব্দীতে এসে পেঁছুই কোনোমতে।

*

হায়, চালাকির স্বারা মহৎ কার্য সাধ্য নয়। তাই সংবিধান প্রণয়নের একাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হতে না হতেই, নেহরুর বর্তমানে,

সংবিধান আজ বিপন্ন। সংবিধানের মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা তো হোলোই না, মন্দিরের বিরুদ্ধেই আজ সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ ত্রিবিধ শক্তি। এক রাজেন্দ্র নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী হিন্দু শ্রেষ্ঠিকুল। দুই, আরো সংরক্ষণশীল সরাসরি হিন্দু-শিখ সাম্প্রদায়িক দলগুলি। তিন, প্রাক্তন সমাজতন্ত্রী, বর্তমানে বুদ্ধিবিভ্রান্ত এবং ক্ষমতার বাইরে থেকে ভগ্নহৃদয় শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ। (কম্যুনিস্টদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কেননা খাঁটি হলে তাঁরা শুধু একটি সংবিধানই মানতে পারেন; ইঙ্গ-মার্কিন সংবিধানের ককটেলের সঙ্গে চলে শুধু সাময়িক সহাবস্থান।)

জয়প্রকাশ তাঁর স্বপ্নের ভারতের প্রস্তাবিত কাঠামো প্রথম প্রকাশ করেছিলেন ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে। অনেকে তাঁকে "ভুল বুঝেছিল"। তাঁর সাম্প্রতিক বিস্তৃত থীসিসের যে-অংশে ভারতীয় গণতন্ত্রের সমালোচনা আছে তা বহুলাংশে সত্য। ব্যাধির আরোগ্যের জন্য তিনি যে দাওয়াই বাৎলেছেন তা ব্যাধির চেয়েও ভয়াবহ।

*

জয়প্রকাশ দেশটাকে ঢেলে সাজবেন। পার্লামেণ্টে তাঁর অরুচি; চাই পঞ্চায়েৎ রাজ—শুধু পাড়ায় নয়, গ্রামে নয়, রাজ্যে নয়, সোজা নয়াদিল্লী পর্যন্ত। রাজা চাইনে, মন্ত্রী চাইনে, সিভিল সার্ভিস চাইনে। কাজ করবে কে? জনগণের বাছা—নির্বাচন নেই, অন্তত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই—স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ। ক্ষমতা থাকবে কার হাতে? আরে রাম, জয়প্রকাশের রাজ্যে যে ক্ষমতার বালাইই নেই! সবায়ের আছে শুধু কর্তব্য। সকলের সেবা ধর্ম। কেন্দ্রের ক্ষমতা অত্যধিক, অসহ্য। ক্ষমতা কেড়ে নাও কেন্দ্রের হাত থেকে। কেন্দ্র তাতে দুর্বল হবে না? নারায়ণী লজিক বলছে, না। তার বাড়া যুক্তি চেয়ো না। কোনো রাজ্য যদি বেরিয়ে যেতে যায়? জয়প্রকাশ বলছেন, তাঁর ব্যবস্থায় এমন কথা কেউ ভাববেই না। প্রমাণ চেয়ো না। বিদেশী আক্রমণ? নারায়ণ, নারায়ণ!

এই জয়প্রকাশই নাকি একদা কার্ল মার্কস পড়েছিলেন, একদা মার্কিন মুলুকে বাস করেছিলেন, একদা ভারতের কনগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিলেন। বর্তমানে তিনি নাকি রাজনীতির বাইরে; ভূদান, গ্রামদান, শ্রমদান, জীবনদান ইত্যাদিতে নিয়োজিত। জানতে ইচ্ছা হয় তিনি বুদ্ধিদান করলেন কার কাছে।

*

পঞ্চাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি য়ুরোপে সত্যকার রেনেশাঁসের শুরু। বহুবার তার গতি রুদ্ধ হয়েছে, তার অগ্রসর ব্যাহত করেছে নেপোলিয়ন থেকে হিটলার পর্যন্ত বহু ব্যক্তি ও তাদের শিষ্যবৃন্দ। রোমান ক্যাথলিক গীর্জার বিরোধিতা তো আজো বিরাজমান। তবু একথা বোধহয় সত্য যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর সেই বিদ্যার পুনরুজ্জীবন য়ুরোপে এমন শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল যে তার প্রভাব আজ য়ুরোপীয় জীবনের অঙ্গীভূত অংশ। আমাদের দুর্ভাগা দেশে—যা আসলে মহাদেশ—বুদ্ধিমুক্তির সামান্য স্পর্শ মাত্র লেগেছিল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। কিন্তু সমাজের একটি মাত্র স্তরের ক্ষুদ্র একটি অংশে মাত্র তার ছোঁয়া লেগেছিল আশীর্বাদ হয়ে, মাত্র কয়েক দশকের জন্য। সমাজের সে স্তর দ্রুত বিলীয়মান, সে অংশ বিদায় নিয়েছে অনেকদিন।

মনের যে-মধ্যযুগ থেকে সত্যকার মুক্তি আমরা আসলে কখনো পাইনি, সেই যুগে সর্বজনীন প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি আজ সম্পূর্ণ। এই "জয়যাত্রার" জন্যও নেতৃত্ব চাই বৈকি ঃ জয়প্রকাশ নারায়ণ তাই তো দিতে চাইছেন। তাঁর এ দাবী আদৌ মিথ্যা নয় যে ভারতীয় গণতন্ত্র ভারতীয় নয়, বাইরে থেকে ধার করা। তিনি আয়োজন করছেন ঋণ পরিশোধের। ভারতীয় প্রকৃতি—বিশেষ করে পঞ্চায়েতী পর্যায়ে—এ-পরিশোধের সমর্থক। পূর্বেই বলেছি, সংবিধান-নিধনযজ্ঞে জয়প্রকাশ একমাত্র পুরোহিত নন ঃ তাঁর সঙ্গী বহু। নিঃসঙ্গ শুধু জওহরলাল। ছেলেবেলার যাত্রায় বিবেকের ভাষায় বলি ঃ হায় জওহরলাল! হায় ভারত!!
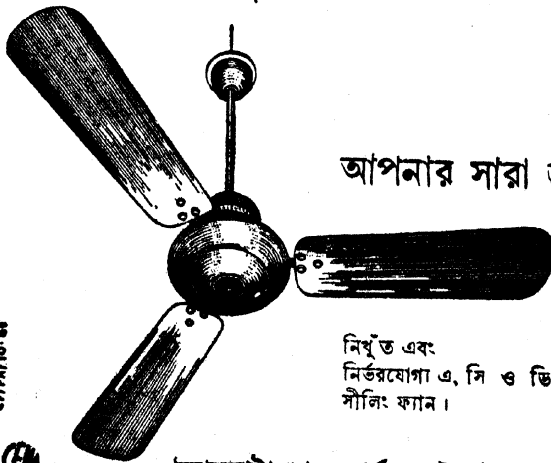
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৫

"আরে, আপনি এখানে কি করে!"

ঘাড় তুলে দেখি চৌকাঠের পাশে বারান্দায় একটি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। বেহারী বলেই বোধ হল, চেনা মুখও, কিন্তু কোথায় দেখেছি ঠিক ধরতে পারছি না। প্রায়ই এই রকম হয়, বয়সের সঙ্গে আজকাল একটু বেড়েছেই বরং, তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি যিনি বয়স দিয়েছেন বাড়িয়ে তিনিই কৃপা ক'রে সামলেও দেন। একটু যে থতমত খেয়ে গেছি তার মধ্যে উনিই বললেন—"আমায় চিনতে পারছেন নিশ্চয়। আমি হচ্ছি কমলের বাপ। দ্বারভাঙ্গায় আপনাদের পাশেই বাড়ি ভাড়া করে আছি আমরা..."

বললাম—"বিলক্ষণ! আপনাকে চিনব না? অত পরিচয় দিতে হবে? কমল সর্বদাই বাড়িতে যাতায়াত করছে, আমার ভাইপোর বন্ধু—বাড়ির ছেলের মতনই। তা আপনি হঠাৎ এখানে?"

"আমি এখানে স্টেশন মাস্টার যে। আপনি নিশ্চয় ভাবতে পারেননি এখানে দেখবেন?"

"মোটেই নয়।"

"তাই মনে হল—যেমন দেখেই হকচকিয়ে গেলেন দেখলাম।"

যাক হকচকিয়ে যাওয়ার জবাবদিহিও ওদিক থেকে পেঁৗছে গেল।...নামটাও জিগ্যেস করবার আগে আপনিই বললেন—। নিশ্চিন্দি। যে ধরনের কাজ, সে হিসাবে মানুষটি বেশ একটু বেশীই মিশুকে এবং আলাপী বলে মনে হ'ল।

আসল কথা স্টেশন মাস্টাররা—শুধু স্টেশন মাস্টার বলি কেন, স্টেশন সংলগ্ন মানুষ মাত্রেই বড় স্টেশন-বন্ধ। ঐখানেই ও'দের সমাজ, ঐখানেই ও'দের সব কিছু। ঐটুকু বৃত্তের বাইরে ও'দের বড় একটা পাওয়া যায় না। খুব স্বাভাবিকও, যে ধরনের সর্বদা সামাল-সামাল কাজের ধারা। ছুটিছাটার জন্যেও অসুখে পড়তে হবে, বা অসুখের নাম নিতে হবে; নয়তো পালেও নেই, পার্বণেও নেই। মেশবার সুযোগ কোথায় যে মিশবেন?

নিয়মের মধ্যে ব্যতিক্রমটাই হ'ল—চিত্র-শিল্পীর ভাষায় বলতে গেলে হাই-লাইট (High-light): দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশী, মনের মধ্যে জেঁকে বসে। বেশ ভালো লাগল। অনেকটা একতরফা হলেও ভদ্রমহিলা আমার বর্তমান পরিস্থিতি ভুলে যে আলাপের মুডে (mood) এনে ফেলেছিলেন, —বাবুকে পেয়ে খুশীই হলাম। অপরিচিত স্ত্রীলোক বলে একটা সঙ্কোচের বেড়া তো ছিলই দাঁড়িয়ে মাঝখানে।

আরও দু'একটা প্রাথমিক কথার পর—বাবু বললেন—"তা আপনি এখানে এভাবে বসে থাকবেন? আসুন আমার ঘরে।"

হাঁক দিয়ে লোক ডাকতে সেই ইজ্জৎ-দার পয়েণ্টসম্যানটাই এল। জিনিসগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় একটা করুণ দৃষ্টিতে সে চাইল আমার দিকে তার কারণ নিশ্চয় এই যে, চারগজের মেহনতের জন্যে চার আনা আদায় করার কথাটা যেন ফাঁস না ক'রে দিই, ফেরত না দিতে হয়, ইজ্জতের পয়সা ক'টা।

এ'কে দেখে ভদ্রমহিলার সঙ্কোচের ভাবটা তেমন কিছু বাড়েনি, মাথার কাপড়টা আরও আঙুল দুয়েক নামিয়ে দিয়েছেন মাত্র। বললাম—"আমি আসি তাহলে। বড় চমৎকার লাগছিল আপনার কাহিনীটি।"

একটু হেসে বললেন—"শেষটা তো শুনলেন না, সে আরও মজার।"

আর থাকা চলে না ভাঙা আসরে। বললাম—"সত্যি নাকি? স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, শেষ পর্যন্ত না থাকাই ভালো কিন্তু তার মধ্যে, নয় কি?

...তাহলে আসি, কি বলেন?

বেশ খিলখিল করেই হেসে উঠলেন, বললেন—"যেমন-তেমন ঝগড়াও নয়।...বেশ, আসুন।"

কপালে হাত তুলে বললেন—"নমস্তে।" ঐ সঙ্গে—বাবুকেও নমস্কার জানিয়ে একটু হেসে বললেন—"বহীনজীকে কিন্তু শীগ্গির শীগ্গির আনিয়ে নিন মাস্টারবাবু। যতই ঝগড়া হোক, দুলহা দুলহীন (বর-কনে) এক সঙ্গে থাকেন সেই ভালো।"

"তাতো বটে—নৈলে শাক্ত-বৈষ্ণবে এত মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে কি করে?" দুজনের মধ্যে একটু যে হাসি উঠল তার তাৎপর্যটা বুঝতে পারলাম না। আমরা স্টেশন ঘরে এসে বসলাম।
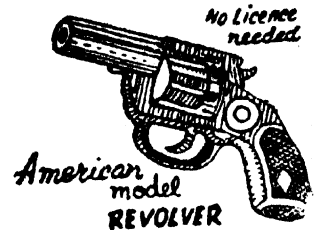
মনে যে ধোঁকাটা লেগেছিল তার কথাটাই আগে তুললাম, প্রশ্ন করলাম—"ভদ্রমহিলা আপনাকে চেনেন দেখছি। আচ্ছা, মাথায় কিছু ছিট আছে কি?"

...একটু যেন অদ্ভুতভাবেই আমার মুখের দিকে চেয়ে অল্প হাসলেন বললেন—"আছে, এবং আপনাদের মতন সঙ্গী পেলেই সেটা বাড়ে।"

"বুঝলাম না তো।"—বিস্মিতভাবে চাইলাম আমি।

"আপনি তো বেশ মৈথিল ভাষা বলতে পারেন। ঐটেই ও'র মাথার ছিট।"

সেই রকম রহস্যজনকভাবে হেসেই বললেন কথা কটা। তারপর প্রশ্ন করলেন—"উনি যে মৈথিল নয় সে কথা বলেছেন আপনাকে?"

"হ্যাঁ, একজন মাড়োয়াড়ী শেঠের মেয়ে।

"কিন্তু মানুষ হয়েছেন একেবারে মৈথিলদের মাঝখানে, জনপুরের কাছে। তারপর বিয়ে হয়েছে, মজঃফরপুর থেকে এগিয়ে গোটা তিন স্টেশন পরে একটা জায়গায়। স্টেশনের কাছাকাছি ও'র স্বামীর একটা আড়ৎ আছে। অবস্থা বেশ ভালোই, বাড়িঘর, বাগান, লোকজন; কিন্তু জীবনে সুখ নেই ভদ্রমহিলার..."

"কেন?"—আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম।

"যেহেতু সেখানে মৈথিল কথা বলবার বা শোনবার সুযোগ নেই। অন্তত উনি তাই বলেন আমাদের। আর, কথাটা মিথ্যেও নয় মোটেই। কি যে ভালবাসেন এই মৈথিল ভাষা! একটু বলবার জন্যে, একটু শোনবার জন্যে সে যে কি আকুলি-বিকুলি, তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আমাদের সঙ্গে ও'র যোগাযোগ ঐ মৈথিল ভাষা নিয়েই। আমি অবশ্য ছাপরা জেলার করণ-কায়স্থ, তবে আমার স্ত্রী হচ্ছেন মিথিলার মেয়ে। অনেকটা ও'র মতনই। আমার শ্বশুর বালিয়া জেলা থেকে উঠে গিয়ে দ্বার-ভাঙ্গার কাছাকাছি সোহো-ডুমর বলে একটা গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন, শ-খানেক বিঘে জমি নিয়ে। আমি তখন ও'দের স্টেশনে বসেছি, একদিন গাড়িতে আসতে ওদের দুজনের আলাপ হয়। তারপর থেকেই ঘনিষ্ঠতা। সেদিন থেকেই বলা ঠিক বরং, ভুলব না আমি সেদিনের কথা। সন্ধ্যের পর স্টেশন থেকে বাড়িতে গিয়ে পা দিতেই কানে এল বিদ্যাপতির গান। শোনা গান একটা, মহাদেবের বিবাহের। আমার শ্বশুর বাড়ি তো ঐদিকেই। আগে আগে যখন বেতাম পাড়ার মেয়েরা জোট বে'ধে গাইতো আশেপাশে দাঁড়িয়ে, ওদিক ওটা চলে তো। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি এখানে হঠাৎ এল কি করে! আর একজনের গলা নয়। আমার স্ত্রী রয়েছেন, আর একটি অপরিচিত কণ্ঠও...গাইছেন..."

আবেগের সঙ্গে কাহিনীটা বলতে বলতে হঠাৎ একটু অপ্রতিভ হয়ে থেমে গেলেন—বাবু, আমি হেসে বললাম—"বলুন না, জানা থাকে তো। বিদ্যাপতিরই গান বলছেন যখন।"

"সবটা মনে নেই, অনেকদিন আগে শোনা তো। গোড়ার দিকটা হ'ল—

'বিয়াহে চলল শিবশঙ্কর, হর ভঙ্কর হে।
মাই হে করে লেলে ডমরু বাজাবত'
শিরে শোভে বিষধর (বিষধর) হে...'

আমার একটা কি বিশেষ দরকার ছিল। এদিকে একটা মালগাড়ির লাইন ক্লিয়ার দিয়ে এসেছি, দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, একটু গলা খাঁকারি দিয়ে ভেতরে গিয়ে দাঁড়াতেই উনি ঘুরে চাইলেন। মাড়োয়াড়ীদের পর্দা প্রথা ঠিক আমাদের মত নয় এটা জানেনই, তার ওপর প্রথম পরিচয়েই লক্ষ্য করে থাকবেন পুরুষ দেখলেই যে একটা বাড়াবাড়ি সঙ্কোচ এসে পড়বে, সে ভাবটা নেই ভদ্র-মহিলার। উনি বেশ সোজাসুজিই আমায় দেখে নিলেন, তারপর আমার স্ত্রীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—"পাহুন?"

......কথাটার অর্থ আপনি জানেনই—ভগ্নীপতি অর্থাৎ ও'র ভগ্নীপতি আর কি। আমার স্ত্রীর তো বোন হয়েছেন উনি। আমার স্ত্রী মাথা দোলালে বেশ সপ্রতিভ-ভাবেই বললেন—'নমস্তে। "তারপর একটু হেসেই বললেন—আপনি আমাদের দেশের জামাই, বহীনজীর দুলহা, লজ্জা শরম করতে পারব না আমি; বলে রাখলাম।"

আমার স্ত্রী পরিচয় দিলেন। সেই থেকে যাওয়া-আসা আমার বাড়িতে। দুই তরফ থেকেই। দিনে একবার করে দেখা হওয়া চাই-ই, কোনও বাড়িতে। স্ত্রীর ফুরসত না রইল ও'কে ডেকে নিলেন, ও'র ফুরসত না রইলো স্ত্রীকে ডেকে নিলেন। কথাবার্তা মৈথিলিতে। আমার কাছে গোড়া থেকেই কোন সঙ্কোচ নেই। স্বভাবটাও মৈথিল মেয়েদের মতন। মৈথিল মেয়েরা একটু বেশি রঙ্গ-প্রিয়, পাতান সম্বাদ ধরে প্রায়ই এক আধটা বিদ্রূপের ঝাপটাও এসে পড়ে আমার ওপর; একটা নমুনা তো শুনলেন এখুনি।"

একটু হাসলেন—বাবু।

বললাম—"স্বভাবটা বড় মধুর বলে মনে হচ্ছে এখন। বুঝতে পারিনি, ভাবলাম হয়তো দোষ আছে মাথার।"

"তার কারণ, একেবারে অরিজিনাল (Original) চরিত্র তো। আপনিও তো ওদিককার মানুষ, মনে হয় না মিথিলা আর মাড়োয়ার একত্র হয়ে মিলেছে ও'র মধ্যে?"

বললাম—"আমার তো বরং মনে হয় মিথিলা মাড়োয়ারকে গ্রাস করে ফেলেছে"।

—দুজনেই হেসে উঠলাম। আমি প্রশ্ন করলাম—"তা এখানে হঠাৎ—এভাবে?"

বললেন—"বদলি হয়েছি, দূরত্বটা বেড়েছে, কিন্তু অভ্যেসটা যায়নি ও'র। শুধু ও'রই বা বলি কেন, কমলের মাকেও তো একেবারে দলে টেনে নিয়েছেন। আর দৈনিক হওয়ার যো নেই, তবে-হপ্তার মধ্যে অন্তত বার দুই দেখা হওয়া চাই-ই। কখনও উনি গেলেন, কখনও ইনি এলেন। একটা কি দুটো ট্রেন ছেড়ে দিয়ে মৈথিলী চর্চা হয়। একদিন রুক্মিনী দেবী বললেন (ও'র নাম রুক্মিনী)—"পাহুন, এমন মাস্টার ঘরে, কি ছাপরাইয়া বুলি নিয়ে পড়ে আছেন? 'আবং হৈ—জাৎবানি'—শিখে ফেলুন আমাদের মৈথিল ভাষা। আমি জবাব দিই—"হ্যাঁ, বড়কী বহীন, শেঠজীর ভাষা তো আরও কড়া—'কট্টো, গয়ো?—কীদ্দি আয়োহে'—' মাস্টার তো আরও ভালো, তাঁকে শাকরেদ করবার কি করছেন?' উনি একেবারে হাত তুলে শিউরে উঠলেন, বললেন—'গুরুগিরি করতে

গিয়ে বাবা-মার মধ্যে যা অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তাঁদের মেয়ে হয়ে আমি আর ওদিক মাড়াচ্ছি আর কি!

সে গল্প করেছেন উনি আপনার কাছে? অনেকক্ষণ ধরে তো কথা হচ্ছিল।"

হেসে বলল—"করছিলেন সেই গল্প, এমন সময় আপনি এসে পড়লেন।...তা উনি এখানে ওয়েটিং রুমে বসে যে একলা?"

"আমার স্ত্রীকে বাড়ি থেকে একটা খবর পেয়ে হঠাৎ আজ সকালে চলে যেতে হল। খবরটা স্টেশনে ফোন ক'রে জানিয়ে দিয়েছিলাম শেঠজীকে, জানালেন—তার আগেই রুক্মিনী দেবী বেরিয়ে পড়েছেন।"

আমি যে একটু প্রশ্নের দৃষ্টিতে চাইলাম তার উদ্দেশ্যটা বুঝে বাবু বললেন—"ও, বুঝেছি, ও'রা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এ বিষয়ে খুব লিবারেল আইডিয়ার (Liberal Idea)—একলাও যে না আসেন এমন নয়, যদিও প্রায়ই একজন লোক সঙ্গে থাকে, চাকর, গদির মুনিম, যেই হোক। নিজেও ক্বচিৎ কখনও সঙ্গে এলেন, ব্যবসাদার মানুষ। সব সময়ে পারেন না। সন্তানাদি কিছু হয়নি এ'দের। সেদিক দিয়ে ঝাড়া হাতপা। উনিও এসেছেন এই গাড়িতেই। সোজা নেবেই আমার বাসায় চলে যান ঐদিক দিয়েই; ইতিমধ্যে ট্রেনটাও ছেড়ে যায়। ওদিকে গিয়ে দেখেন—বাড়ি খালি আমার।"

"তাই মনমরা হয়ে বসে আছেন এখানে?"

"তা আর হতে দিলেন কোথায় আপনি? এরপর আপনার গল্পই চলবে কতদিন—বাঙালী এমন মৈথিল বলতে পারেন, একটা দুর্লভ আবিষ্কার তো। বলে কুলিয়ে উঠতে পারবেন উনি কখনও ভেবেছেন?"

"অ্যাঁ, কি বললেন?"—অযথা প্রশ্নটা যে করলাম তার কারণ 'দুর্লভ আবিষ্কার'—কথাটা হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক করে দিয়েছিল। লেখক মানুষই তো—দুর্লভ আবিষ্কারের আশায়ই দুনিয়া ঘেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছি?...পেয়েছি এমন কটা?

ও'কে নিয়েই কথাবার্তা চলল আমাদের। বাসায় কমলের মা নেই, কাজে রুক্মিনী দেবী স্টেশনে ওয়েটিংরুমে বসে আছেন একা। এসেছেন এবার ও'দের গদির বৃদ্ধ মুনিমকে সঙ্গে করে। তার বাড়িও এখানেই কাছাকাছি একটা গ্রামে, ঘুরে আসতে গেছে নিশ্চয়। ও'র গাড়ির এখন দেরিও আছে।

বাবু মাঝে মাঝে এসে কথা কয়ে যাচ্ছেন একটু-আধটু। তবে, কাজ রয়েছে, অভিন্ন যদিও শেঠজী আর এ'দের দুটি পরিবারে সব দিক দিয়ে এক পরিবারের মতই হয়ে গেছে, তবু সদর জায়গায় বসে বসে তো একটানা গল্প করা যায় না।

চায়ের কথা বলে দিয়েছিলেন, পয়েন্টস-ম্যানই তৈরি করে নিয়ে এল। দুকাপ। হয়তো মনটা বেশি করেই রুক্মিনী দেবীর দিকে থাকায় আমি প্রশ্ন করলাম—আর উনি,—খান না চা?

বললেন—"না, আমাদের বাড়িতে জলস্পর্শ করেন না।"

"সে কি!! বলছেন প্রায় এক পরিবার..."

"আমরা যে মাছ খাই।"

এমনভাবে কথাটা বলে ফেললেন, দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলাম।—বাবু বললেন—"আরও আছে। শেঠজীর কিছু বাছ-বিচার নেই, অবশ্য মাছটা আর খান না..."

"বনে কি করে দুজনের?"

বাবু একটু গূঢ় হাসি নিয়ে আমার মুখের দিকে চাইলেন, বললেন—"কমলের কাছে শুনেছি আপনি অবিবাহিত.....বনে কি করে বললে বুঝবেন কি কথাটা?"

এবার একটা ছাত ফাটানো হাসি উঠল। বললেন—"তখন যে আমি ও'র ঠাট্টা ফিরিয়ে দিলাম—'শাক্ত-বৈষ্ণবের' মাথামাথির কথা বলে, তার ভেতর এই কথাটাই ছিল। আরও বলি ও'কে—"বড়কী বহীন, আপনার রক্তে দাম্পত্য-কলহের বীজ আছে—পিতাজী আর মাতাজীর যেমন গল্প করেন, সুতরাং সাবধান হওয়া উচিত নয় কি? শেঠজী দয়া করে আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন, সুতরাং তাঁকে কড়া বৈষ্ণব করে নেওয়ার কথা বলব না নিজের মতন; আমি বলি আপনিই বরং একটু শান্ত হয়ে যান, গরমিলের জরটা কেটে যাবে।"

উনি বলেন—"পাহুন, আমার মা বাবাকে শেষ পর্যন্ত কিরকম নিজের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছিলেন সেটাও তো দেখা আছে। সুতরাং ধরে নিতে পারি না কি, সে শক্তিটাও আছে আমার রক্তের মধ্যে?"

(ক্রমশ)

খোলো, খোলো হে আকাশ

কিরণকুমার রায়

এতক্ষণ ধরে মেয়েটা কত কথা বলছিল, দাপাদাপি করছিল। এখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিঃসাড়ে। বালিশের পাশে দুটো তাজা আপেল। সকালে ঘুম ভাঙলেই মোটা সোটা নরম হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে একটা আপেল টেনে আনবে, ছোট ছোট দাঁতে কামড় বসিয়ে চুষতে থাকবে। ইয়েলেনা আপেল ভীষণ ভালোবাসে। গালাও ঘুমিয়ে আছে। সাতদিন বয়স হয়েছে মেয়েটার। মোটে কাঁদে না, শুধু হাসে। বাচ্চা পিশি এসে দোলনাটা জোরে জোরে দোলায়, চিমটি কাটে। মাঝে মাঝে বকে, একটু কাঁদতে পারো না বাছা, না কাঁদলে হৃৎপিণ্ডে জোর হবে কি করে?

সাতদিনের শিশু গালা কিন্তু তবু কাঁদে না। সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে কচি কচি হাত পা ছুঁড়তে থাকে। সে হাসি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ঘুমন্ত দুই মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছিল ইয়ুরি আলেক্সেয়েভিচ। ইয়েলেনার গালে আদর করে গালাকে চুমো খেল। ঠিক তখনই পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ভালেন্তিনা। এসে আস্তে আস্তে পিঠে হাত রেখে ঘষতে থাকল।

ইয়ুরি তেমনি দাঁড়িয়ে, না পেছন ফিরল, না এগিয়ে গেল। পেছনে পিঠে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে স্ত্রী, সামনে ঘুমন্ত দুই শিশু-মেয়ে। ইয়ুরির ঠোঁটের কোণে বিচিত্র মধুর হাসি সমুদ্রের ঢেউএর মত আস্তে আস্তে বড় হতে লাগল।

ঠিক তখনই কৃষি ফার্মের স্টেশনওয়াগণ-গুলো গর্জে ওঠল। কোথাও হয়ত যাবে তাই গর্জন তুলে রাস্তায় নেমে ছুটল। মোটরের ভর্‌ভর্‌ শব্দ দূরে মিলাবার আগেই আকাশের দূর প্রান্ত থেকে আস্তে আস্তে ভেসে আসতে লাগল অনেকগুলো বিমানের ঐকতান। কয়টা বিমান? একটা, দুটো, তিনটে, চারটে না আরো বেশি?

ভালেন্তিনার দিকে ঘুরে দাঁড়াল ইয়ুরি। দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। ঠোঁটের উপর ঠোঁট নামাল। বললে, চল বারান্দায় যাই।

রাত গভীর হয়েছে। বাবা মা'র ঘরে বাতি নিভে গেছে অনেকক্ষণ। ভাই-বোনদের ঘরেও নিঝুম অন্ধকার।

অন্ধকার আকাশেও। অজস্র তারা বিছানো কালো যবনিকার বুকে কয়েকটি বিমান লাল আলো জ্বালিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ইয়ুরি তাকিয়ে আছে বিমানের দিকে, আকাশের দিকে। চোখে বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টি।

ভালেন্তিনা এ দৃষ্টি চেনে। সে যখন ওরেনবুর্গ শহরে মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রী, চার বছরের কোর্স শেষ করে কিছুদিনের মধ্যেই পুরোদস্তুর নার্স হয়ে বেরোবে, তখন পরিচয় হয়েছিল এ মানুষটার সঙ্গে। ইয়ুরি আলেক্সেয়েভিচ গাগারিন তখন বিমান বিদ্যালয়ের ছাত্র। ছোট বড় নানা ধরনের বিমান সেই বিদ্যালয়ের বিরাট বিমানক্ষেত্রে শুয়ে থাকত, গড় গড় করত, আকাশে ঘুরে বেড়াত। অবসর সময়েও ইয়ুরি এসে বসে থাকত বিমানক্ষেত্রের অফিসবাড়ির ক্যান্টিনে বা বারান্দায়। বিমানগুলোকে দেখত, বিভিন্ন পার্টস নিয়ে নাড়াচাড়া করত, নীল নভঅঙ্গনের স্তব্ধতা ভেঙে মানুষের সদর্প আকাঙ্ক্ষার উঁচু থেকে উঁচুতে উঠার উচ্চকিত শব্দ কান পেতে শুনত।

ভালেন্তিনা তাই অবাক হল না। বললে, বিমানগুলো বোধ হয় মস্কো যাচ্ছে।

হুঁ। অন্যমনস্ক ইয়ুরি যেন আপন মনেই বলল।

তারপর খুব আস্তে আস্তে ডাকল, ভালেন্তিনা?

বলো।

দেখছ ঐ আকাশ, তাকাও, দূরে অনেক দূরে। আকাশ মানে মহাশূন্য, কত দূরে আছে বলো ওই গ্রহ তারাগুলো। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ ওই মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াতে চায়, যেতে চায় চাঁদে, মঙ্গলে, শুক্রে। হয়ত কোনদিন লক্ষ লক্ষ মাইল পাড়ি দিয়ে তারাগুলো কাছে থেকে দেখেও আসবে।

তা তো বটেই। আমাদের বিয়ের আগেই তো প্রথম স্পুৎনিক আকাশে উড়েছে! কয়েক মাসের মধ্যেই হয়ত মানুষও যাবে আকাশযানে।

হুঁ। আচ্ছা বলো তো মানুষ কবে আকাশে উড়তে পারবে?

তা ঠিক বলতে পারছি না। আমাদের বৈজ্ঞানিকরা আশা করছেন খুব শীগগীর।

আচ্ছা, আমিই যদি আকাশের মহাশূন্যে পাড়ি দেই কেমন হয়?

ভালেন্তিনা জবাব দিল না। বুকটা একটু কেঁপে উঠল, তাকাল স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে। বেশ কিছুকাল ধরেই ইয়ুরি ট্রেনিং নিচ্ছে। কিসের ট্রেনিং কথাটা কখনো ভাঙেনি সে। হয়ত ক্ষেপনাস্ত্র চালনার বা অন্য কিছু। সমরায়োজনের অকল্পনীয় উন্নতির ফলে ট্রেনিং এখন সাধনার মত। সমস্ত মনপ্রাণ তাতে সমর্পণ করতে হয়। তাই ইয়ুরি যে ট্রেনিং সম্পর্কে সর্বসময় ব্যস্ত, তার ভাবনায় চিন্তায় যে এই ট্রেনিং ছাড়া অন্য কোন বিষয় নেই, তা বুঝলেও ভালেন্তিনা কখনো জিজ্ঞেস করেনি। যদি বলার হয় তাহলে ইয়ুরি নিজেই তাকে বলবে, যদি বলার না-হয় তাহলে জিজ্ঞেস করা মানে অনর্থক বিব্রত করা। তাই সে প্রশ্ন করেনি কিছু। এখন হঠাৎ মনে হল এই ট্রেনিং কি অসম্ভবকে সম্ভব করার দুঃসাহসিক ব্রত সম্পর্কে?

তুমি—

হ্যাঁ, ভালেন্তিনা, তোমাকে এতদিন কথাটা বলা হয়নি। আজ বলার সময় এসেছে। আমাকে সরকার ও পার্টি নির্বাচন করেছে মহাশূন্যে শূন্যযান নিয়ে ঘুরে আসার জন্য। খুব সম্ভবত কিছু-দিনের মধ্যেই আমি আকাশে উড়ব।

ভালেন্তিনা আকাশের দিকে তাকাল। নিস্তব্ধ নীল আকাশের বুকে একফালি চাঁদ আর মুঠি মুঠি তারা। কোনটি উজ্জ্বল, কোনটি মিটমিটে, কোনটি স্থির বিন্দুর মত। সকাল হলে দৃশ্যপট বদল হবে, জ্বলতে থাকবে একমাত্র সূর্য। দিনরাত্রির এই আজন্ম অভ্যাস, দ্রুত ছুটে চলা সময় স্রোত, ঘাজাৎস্ক শহরের এই বাড়ি শহর মস্কো, ইয়েলেনা গালা ইয়ুরি, এই লাল পশমী ওভারকোট, খুশ্চভ, স্তালিন, লেনিন, জার, হাজার হাজার বছরব্যাপী মানুষের মিছিল, সব সব, আকাশ তুমি কত বড়, পৃথিবী তোমার বয়স কত, আয়তন কি?

ভালেন্তিনা?

হুঁ।

জানো, মানুষ অপরাজেয়। প্রকৃতিকে মানুষ পুরোপুরি জয় করে নেবে। পরম সত্যকে নিশ্চয় সর্বতোভাবে জানবে।

হুঁ।

ভালেন্তিনা তুমি কি ভয় পেলে?

হাসল ভালেন্তিনা। আশ্চর্য হাসি, ঠোঁটের ফাঁকে মিষ্টি হাসির অপ্রগলভ প্রকাশ, চোখের কোণে জল। বলল, না, ভয় কিসের? চলো মেয়েদের কাছে যাই।

চলো। তুমি তো জান ভালেন্তিনা, আকাশ আমাকে ছোটবেলা থেকে আকর্ষণ করে। মহাশূন্যে পাঠাবার জন্য আমাকে নির্বাচিত করায় সরকার ও পার্টির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তুমি যদি ভয় পাও ভেবে এতদিন কথাটা বলিনি। গালার এখনও জন্ম না হলে কথাটা আদপে বলতে পারতাম কিনা কে জানে।

ইয়েলেনা ও ভালেন্তিনা, মা আর মেয়ে

দুজনে এসে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে। ইয়েলেনা তখনও তেমনিভাবে ঘুমিয়ে আছে। গালাও। দুটি বাচ্চা মেয়ের ঠোঁটে নির্ভয় প্রশান্তির অনুচ্চারিত হাসি স্থির হয়ে আছে।

ভালেন্তিনা সেদিন ভাল করে ঘুমুতে পারল না। সারা সন্ধ্যে থেকে বাড়িতে উৎসবের ভিড়। বন্ধুবান্ধবী এসেছিল, আত্মীয়-পরিজনও কেউ বাদ ছিল না। গালার জন্ম ও ইয়ুরির জন্মদিন উপলক্ষে বাড়িতে পার্টির আয়োজন হয়েছিল। অবশ্য ঠিকঠাক তারিখ মত হতে পারেনি, কেননা, ওই তারিখে সে তো হাসপাতালে। তাই তারিখে না মিললেও উপলক্ষটাই বিশেষ। উপহার, গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টা, মদ আর ভদকা, রাশি রাশি খাবার, সারা সন্ধ্যে থেকে শরীরের উপর দিয়ে ধকল বড় কম যায়নি। তাই শরীরটা ক্লান্ত। অথচ ক্লান্তিও এখন সে অনুভব করতে পারছে না। বারে বারে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে তার। তাকিয়ে থাকছে ইয়ুরির দিকে। ইয়ুরি, ইয়ুরি আলেক্সেয়েভিচ, ভবিষ্যৎ অনির্দিষ্ট, আমি দেখছি তোমাকে, এই মুহূর্তগুলো আমার কাছে ধ্রুব সত্য।

ভালেন্তিনা জানে, ইয়ুরির কাছে আকাশও তেমনি নিশ্চিত সত্য। জুলে ভার্নের সবগুলো বই সে কয়েকবার করে পড়েছে, কনস্তান্তিন জিওল্কভস্কি তার গুরু। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বৈজ্ঞানিক জিওল্কভস্কি মহাশূন্যে যাওয়ার একটি রকেটের নক্সা করেন, পৃথিবীর উপগ্রহ তৈরীর পরিকল্পনা করেন। তিনি তাঁর স্মরণীয় বইয়ে লিখেছেন: 'মানুষ আর কেবলমাত্র পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আলোক অনুসরণ করে ও মহাশূন্যে অভিযান চালিয়ে নিয়ে, এই অভিযাত্রা প্রথম দিকে খুব উল্লেখযোগ্য না হোক তবু, পরিশেষে মানবজাতি সূর্যমণ্ডলের সর্বত্র আপন বিজয়-বৈজয়ন্তী ঘোষণা করবে।' পঁচিশ বছরেরও আগে তাঁর মৃত্যু হয়, মৃত্যুর সময় তাঁর সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা-গ্রন্থগুলো সোবিয়েৎ সরকারকে দান করে আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে যান যে, তাঁর স্বপ্ন সফল করার জন্য যেন সরকার ও পার্টি কিছুমাত্র কার্পণ্য না করে।

না, কার্পণ্য করা হয়নি। কুড়ি বছর ধরে বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ারদের সম্মিলিত চেষ্টায় মানুষের মহাকাশ অভিযান আর অসম্ভব থাকেনি। তাদের বিয়ের আগেই ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর সোবিয়েৎ রাশিয়ার প্রথম স্পুৎনিক আকাশে নিক্ষিপ্ত হয়। সমগ্র বিশ্ব চমকিত হয়ে বিজ্ঞানের এই সাফল্য প্রত্যক্ষ করে। ৫৬০ মাইল উপরে উঠে ১৮৪ পাঃ ওজনের এই কৃত্রিম উপগ্রহটি পৃথিবীকে বেষ্টন করে ৯২ দিন ঘোরে। এক মাস পর সোবিয়েতের আরো বিরাট ও শক্তিশালী দ্বিতীয় স্পুৎনিক প্রথম মহাকাশযাত্রী কুকুর লায়কাকে নিয়ে মহাশূন্যে উঠে যায়। অবশ্য লায়কা মহাকাশের প্রথম শহীদও বটে।

তারপর আমেরিকা থেকেও কৃত্রিম উপগ্রহ নিক্ষিপ্ত হয়। এই দুই দেশের মধ্যে মহাকাশ জয় নিয়ে যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাতে সোবিয়েৎ শুধু অগ্রণী নয়, অনেকখানি অগ্রসর। চাঁদের অপর পিঠের ছবি তুলে এবং মহাকাশ থেকে কৃত্রিম উপগ্রহ নির্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়ে এনে সোবিয়েৎ বিজ্ঞানীগণ বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম ও মহত্তম বৈজ্ঞানিক অভিযানকে সফল করে তোলেন। এতদি[ন] পর্যন্ত মহাশূন্য থেকে উপগ্রহকে ফিরি[য়ে] আনাই ছিল সব থেকে বড় সমস্যা। গ[ত] বছর আগস্ট মাসে বেল্কা ও স্ত্রেল্কা কুকুর[কে] মহাকাশে পাঠিয়ে পৃথিবীর চারদি[কে] বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে আবার নিরাপ[দে] ফিরিয়ে আনার পর থেকে সমগ্র মান[ব] জাতি মহাকাশের প্রথম মানুষ অভিযাত্রী[র] জন্য প্রতীক্ষা করছে। প্রতীক্ষা কর[ছে] ভালেন্তিনাও। সেই পরম প্রতীক্ষি[ত] মানুষটি কি তারই স্বামী ইয়ু[রি] আলেক্সেয়েভিচ। কিন্তু স্বামী বলে[ই] বুঝি তার এত দুর্ভাবনা, এত উদ্বেগ।

না, না, কেন এই দুশ্চিন্তার এলোপাথা[রি] ঢেউয়ে বিপর্যস্ত হবে ভালেন্তিন[া]। সারা দেশময় যে বিরাট কর্মকাণ্ড ব[য়ে] চলেছে, তাতে ইয়ুরি খুব গৌরব[ময়] ভূমিকায় অংশ নিচ্ছে। স্ত্রী ও মেয়ে[...]

তার প্রিয়, [illegible]. কিন্তু দেশ ও সমাজের প্রতি কর্তব্য তো আরো মহান। ইয়ুরি রাষ্ট্রের সংগে সে কর্তব্য পালন করুক।

—খুব সকালে ইয়ুরির ঘুম ভাঙার আগেই ভালেন্তিনা গরম জলে হাত-মুখ ধুয়ে এল। পাউডার মাখল চোখের নিচে, ঠোঁটে খুব পাতলা লিপস্টিক রাঙাল। অনিদ্র রাত্রির শেষ চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলে ইয়ুরির দিকে তাকিয়ে হাসতে হবে। যে হাসি সাহসের, যে হাসি তৃপ্তির।

সকাল বেলাই ইয়ুরিকে চলে যেতে হবে ট্রেনিং সেণ্টারে। বিকেলের দিকে ভালেন্তিনা দুই মেয়েকে নিয়ে যাবে মস্কো শহরতলীর ছোট ফ্ল্যাটে। দু' শ মাইল পাড়ি দেবে বাড়ির গাড়িতে। সংগে যাবেন শাশুড়ি আম্মা। তিনি আবার ফিরে আসবেন ঘণ্টা তিনেক বিশ্রাম করে।

সেই চরম লগ্নটি আসার বোধহয় বেশি বাকি নেই। এরই মধ্যে যতক্ষণ ইয়ুরিকে পাওয়া যাবে, ততক্ষণই সে হাসিখুশি নিয়ে থাকবে। কিছুতেই মন খারাপ করবে না ভালেন্তিনা। কেন করবে? জীবনের বিশাল বিরাটরূপে জীবনভোর মুগ্ধ ইয়ুরির পরম ব্রত উদ্‌যাপনে সে কেন সহায় হবে না?

ইয়ুরি খেলোয়াড়, বাস্কেটবল ও ভলিবলে ওস্তাদ। বিলিয়ার্ডও কারো থেকে খারাপ খেলে না। শুধু খেলোয়াড় নয়, জীবন-প্রেমিক। সবচেয়ে তার প্রিয় গানই হচ্ছেঃ

হে জীবন, তোমার প্রেমে মাতাল আমি
জানি তোমার মন পেয়েছি—

পৃথিবী, জীবনের বিচিত্র রূপ তাকে মুগ্ধ করে, মাতোয়ারা করে। কাস্পিয়ান সাগরের তীরে বেড়াতে গেছে তারা, বেড়াতে গেছে সোবিয়েৎ-ভূমির নানা শহরে, গ্রামে। সাগরের ঢেউ, সমবায় কৃষির বিরাট প্রান্তর, জংগলাকীর্ণ বন, প্রাকৃতিক পার্ক, হ্রদ, পাহাড়—যেখানে গেছে ইয়ুরি, প্রকৃতির সমস্ত রূপ তাকে মুগ্ধ করেছে, আনন্দ দিয়েছে। সৎ, সপ্রতিভ ও বিবেকবান ইয়ুরির প্রতি কৃতজ্ঞ ভালেন্তিনা। তাকে ভালোবেসে জীবনের সার্থকতাকে সে নিজের মধ্যে অনুভব করেছে।

ইয়ুরি হয়ত প্রতিভাবান নয়, হয়ত বড় বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার, দেশনেতা, শিল্পী বা সেনাপতি হবার মত যোগ্যতা নেই তার, সে-রকম স্বপ্নও সে দেখে না। তার জন্য কিছুমাত্র খেদ নেই ভালেন্তিনার, সাধারণ মেয়ে সে, স্বামীর অসাধারণত্বে লোভ নেই। সন্তান আর স্বামীকে নিয়ে সাধারণ সুখে সে বেঁচে থাকতে চায়। ইয়ুরি সে-সুখ তাকে অফুরন্ত দিয়েছে।

ক'দিন পর এল সেই পরম বিচিত্র দিন ১২ই এপ্রিল। সকাল থেকে বুক দুরু দুরু করে কাঁপছে ভালেন্তিনার। রেডিও খুলে বসে আছে। সকাল ৯-৭ মিনিটে পাঁচ টন ওজনের মহাশূন্যযান প্রাচ্য (ভস্টক) মহাকাশে উঠে যাবে, তার আরোহী ও চালক ইয়ুরি আলেক্সেয়েভিচ গাগারিন। মানুষ আগে যা কখনো ঘটায়নি, যা অসম্ভব স্বপ্নের মত মনে হয়, তার স্বামী সেই মহা-ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছে। হ্যাঁ, রেডিওতে এই আশ্চর্য মহাকাশ অভিযানের কথা ঘোষণা করা হল, ইয়ুরির নামও উল্লেখ করা হল। কিন্তু মাত্র ত্রিশ-চল্লিশটি শব্দে সংক্ষিপ্ত ঘোষণা কেন? কেন আর কিছু বলছে না। আর কি কিছু বলবে না রেডিও, আর কিছু সংবাদ দেবে না? গতানুগতিক সংগীত আর সুরলহরী, আর প্রাসঙ্গিক ভাষণ, অন্য বার্তা। একটা মানুষ যে মহাশূন্যে নিদারুণ দুঃসাহসে উড়ে গেল, কেউ কি তার আর কোন খবর এনে দেবে না?

রেডিওটা বন্ধ করে ভালেন্তিনা এসে দাঁড়াল জানলার ধারে। বড় বড় বাড়ির মাথা উপরে উঠে গেছে, আকাশ এখানে খণ্ডিত, সীমিত। তবু যতখানি দেখা যায়, যতদূর দেখা যায়, ভালেন্তিনা তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। নির্মেঘ নীল আকাশ অনুত্তেজিত সূর্যের অরুণ কিরণে উদ্ভাসিত। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ দুটো ঝিম ঝিম করতে থাকে ভালেন্তিনার। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাইরে, আরো উপরে, আরো উপরে উঠে গেছে ইয়ুরি, যেখানে বিশ্বের হাওয়া বয় না, যেখানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশাল বিরাট জগৎ। যে-জগতের আয়তন হিসাব করা যায় না, সীমা আছে কি নেই কেউ জানে না, মানুষের কল্পনা যাকে ধরতে
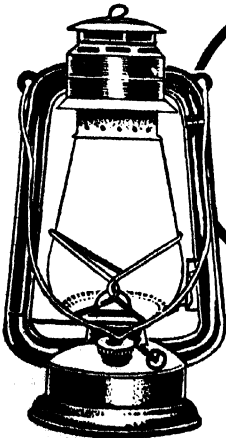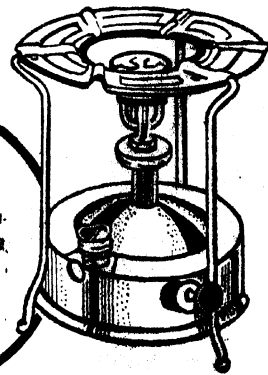
পারে না। বুদ্ধি আর অঙ্ক হয়ত কিছুটা হদিশ পেতে পারে।

কতদূর এই মহাশূন্যের আয়তন, কতদূর, কতদূর? বিজ্ঞানীরা বলেন পৃথিবীর জগৎ ছাড়িয়ে শূন্যে ভেসে একটা স্তরে পেঁাছলে পৃথিবীকে বেষ্টন করে ঘুরতে থাকবে। যেমন চাঁদ ঘোরে পৃথিবীর চারপাশে, পৃথিবী ঘোরে সূর্যের অক্ষপথে, সূর্যও কি ঘোরে? সেই হাওয়াহীন বিষাক্ত গ্যাসময় উত্তপ্ত তাপ-বিকিরণের পথে ইয়ুরি দ্রুতবেগে পৃথিবীকে চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে। কে যেন কাঁদছে, গালা, এক মাসের মেয়ে গালা কাঁদছে, যে কখনো কাঁদে না, পিসির চিমটি খেয়েও হাসতে থাকে, সে কাঁদছে কেন? কাঁদুক, কাঁদতে মানা করো না কেউ। ভালেন্তিনা, তোমার কান্না সবলে রোধ করে থাক, তুমি কেঁদো না, কেঁদো না। গালা কাঁদুক, ইয়েলেনা কাঁদুক, কিন্তু তোমার বুকটা তুমি কঠিন শাসনে বেঁধে রাখো, বন্ধ করে রাখো অশ্রু-ভাণ্ডার। তুমি শুধু তাকিয়ে থাক আকাশের দিকে, যতদূর চোখ যায় দেখ, ভাবতে থাক, এই বিশাল বিরাট বিস্তৃত মহাশূন্যতা। তোমার চোখ জ্বলতে থাকুক, তোমার মন ভাঙতে থাকুক, কিন্তু তুমি কেঁদ না, কেঁদ না—

ভালেন্তিনা, ভালেন্তিনা?

কে যেন ডাকছে। ডাকুক, তাদের ডাকতে দাও। অনেক অনন্ত ডাকা শুনেও তো অনেক সময় আমাদের অনুভূতি জাগে না, দেহে চাঞ্চল্য ফোটে না, তাতে কি এসে যায়?

ভারী দরজা খুলে কে যেন ছুটে আসছে। শ্রীমতী মিকিয়োভা আসছেন হন্তদন্ত হয়ে। কিন্তু তিনি তো জানেন না, ভালেন্তিনা এখন অন্য কিছু শুনতে চায় না, আর কিছু বুঝতে চায় না। যার স্বামী বিপুলবেগে এখন পৃথিবীর চক্রপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার আর কি ভাবনার আছে?

আরে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছো, রেডিও খুলে দাও, রেডিওতে তোমার স্বামীর কথা বলছে—

অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে কথাগুলো বলে তিনি নিজেই রেডিও খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে যেন মহোৎসবের আনন্দিত কলরব ঘরে ঢুকল। প্রমত্ত হাওয়ার মত ঘরের স্তব্ধ বিষণ্ণতাকে এক মুহূর্তে উড়িয়ে নিয়ে গেল। রেডিওতে বিদ্যুৎ-সঞ্চারণী কণ্ঠে ঘোষণা হচ্ছেঃ মানুষের প্রথম মহাকাশ যাত্রার খবর শুনুন। তাস এইমাত্র সংবাদ প্রচার করছেন, ইয়ুরি গাগারিন দক্ষিণ আমেরিকার উপর দিয়ে চলেছেন। রেডিও-সংযোগে তিনি বলেছেন, সবকিছু স্বচ্ছন্দে কাজ করছে। আমি বেশ ভাল আছি। ভারহীন অবস্থায়

প্রথম মানব মহাকাশ অভিযাত্রী গাগারিন

কিছুমাত্র অসুবিধে হচ্ছে না, বেশ মানিয়ে চলছি।

ঘোষণা শেষ হল, কিন্তু উৎসবের বুঝি শুরু। রেডিওতে বহু মানুষের উচ্চকিত ধ্বনি শোনা গেল, বিজয়, বিজয়। তারপরই শুরু হল জাতীয় সংগীত, প্রাণোদ্দীপনাময় সংগীত, তারপর ঘোষক পড়তে লাগলেন ইয়ুরির জীবনী। আরো কিছুক্ষণ পর ঘোষক বললেন, তাস এই-মাত্র সংবাদ প্রচার করছেন, ইয়ুরি গাগারিন আফ্রিকার উপর দিয়ে চলেছেন। রেডিও-সংযোগে তিনি বলেছেন, আমি ভাল আছি। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছি, সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমার প্রদক্ষিণ স্বাভাবিকভাবে চলছে। যন্ত্রপাতি-গুলি চমৎকার কাজ করে যাচ্ছে।

এ যেন কথা নয়, গান। শুধুমাত্র বার্তা নয়, আনন্দলহরী। নোট বইটা খুলে ভালেন্তিনা বিশ্ব-প্রদক্ষিণরত ইয়ুরির কথাগুলি লিখতে লাগল। আঙুল কাঁপছে, সারা মুখে সুখ ও চাঞ্চল্যের উজ্জ্বল দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে। হ্যাঁ, এবার তুমি

কাঁদতে পারো ভালেন্তিনা, এবার অনায়াসে কাঁদতে পারো। চোখের বেয়ে বিন্দু বিন্দু আনন্দাশ্রু আস্তে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়বে, মু মত সে অশ্রু নামতে থাকবে। ইচ্ছে কর তোমার চাঁপাকলির মত তর্জনী দিয়ে মুছে নিতে পার। তোমার সরু ঠোঁ ফাঁকে হীরের মত উজ্জ্বল হাসি এবার বাঁধ নাইবা মানল।

১০-৫৫ মিনিটে ইয়ুরি গাগ নিরাপদে পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে অব করলেন। এ-সংবাদ ঘোষণা করে রেডি আনন্দ আর থামতে চায় না। উত্তে
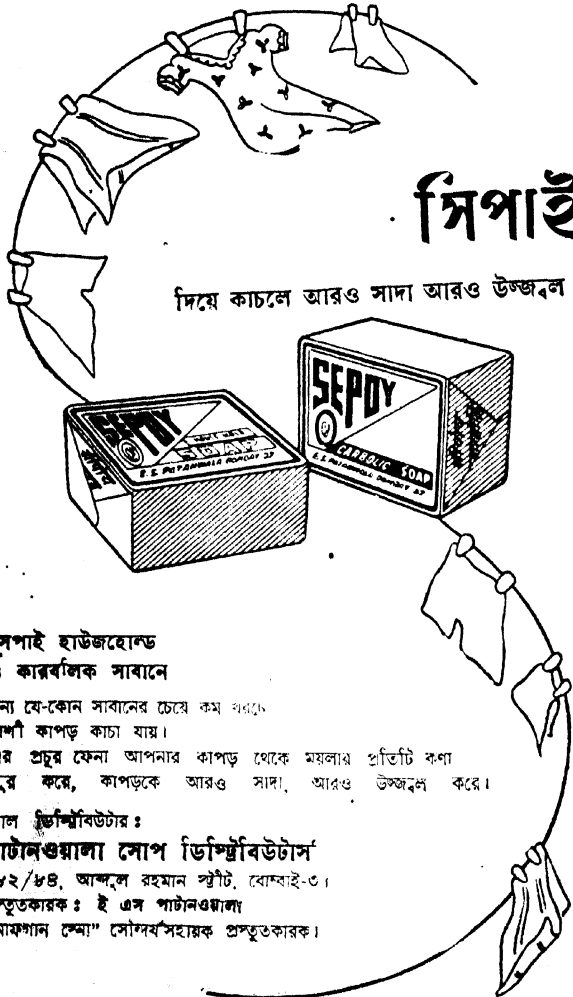
গান আর বিজয়ধ্বনি। শ্রীমতী মিকিয়োভা গাঢ় আলিঙ্গন করে ভালেন্তিনার গালে চুমোর পর চুমো খেতে লাগলেন। তার আগেই সারা ঘর ভরে গেছে পুরুষে নারীতে। ইয়েলেনা কিন্তু নির্ভাবনায় তখনও আপেল চুষছে।

মস্কো নগরী ততক্ষণে উৎসবের আকার ধারণ করেছে। রেড স্কোয়ারে কাতারে কাতারে লোক, ছাত্রদের মিছিল, দ্রুত লিখে-আনা বড় বড় পোস্টার আর ফেস্টুন। পথচারীরা পরস্পরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে 'গাগারিন, আকাশবিজয়ী' বলে। পোস্ট-অফিস, টেলিগ্রাম অফিসে ভিড়। মানুষের ঐতিহাসিক প্রকৃতি-বিজয়ের কাহিনী সংবাদ হয়ে তারে-বেতারে ছুটে যাচ্ছে দেশ-বিদেশে। পৃথিবীময় পরদিনের সকল সংবাদপত্রের সব থেকে সেরা খবরের কাহিনী লিখে চলেছেন সাংবাদিকরা। শিল্পী, ভাস্কর, কবি, সাহিত্যিকরাও পেছনে পড়ে নেই, তাঁদের শিল্পমাধ্যমে মানবজাতির এই অবিস্মরণীয় কীর্তিও রচিত হয়ে চলেছে অবিশ্রাম ধারায়।

দুপুরে টেলিভিশনে ইয়ুরির ছবি প্রদর্শিত হল। ইয়েলেনা আপেল ফেলে চিৎকার করে উঠল, বাপি, বাপি। সে চিৎকার শুনে গালা ঘুম ভেঙে তাকিয়ে দেখল দিদিকে।

কে যেন একজন বললে, ইয়েলেনা তোমার বাপি কোথায়?

ওমা, তুমি জান না? বাপি যে ট্রিপ দিতে গেছে। মাগো, বাপিকে ফোন করে দাও, শীগগির যেন চলে আসে। কিছু ভাল লাগে না।

এবার আনন্দাশ্রু আর বাধা মানল না। ভালেন্তিনা কাঁদছে। কান্না যে কত সুখের হতে পারে, কত গৌরবের, এ কথা সে কি আগে কখনো জানত।

হে আকাশ, তোমার স্তব্ধ নীল যবনিকা আর ভয়ের নয়, দূর-দূরান্তের এই সূর্য-মণ্ডলের মধ্যে যত গ্রহ উপগ্রহ আছে, সব জায়গায় মানুষ এবার পাড়ি দেবে। ভালেন্তিনা তাকাল আকাশের দিকে, সেখানে একদঙ্গল সাদা পাখি নির্ভয়ে পাখা উড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার উপরে একটা এরোপ্লেন জেট বিমান তো আরো উপরে উঠে, আরো আরো উপর দিয়ে যায় রকেট। তারো অনেক উপর দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এল ইয়ুরি আলেক্সেয়েভিচ গাগারিন। মহাকাশের নতুন কলম্বাস!

আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে ভালেন্তিনা এবার চোখ বুজল। মনের পটে ভেসে উঠল ইয়ুরির হাসিমুখ, দূরপ্রসারিত দৃষ্টি। খুব আস্তে আস্তে সে বলল, আমার ইয়ুরা, ইয়ুরা—

ক্ষণিকার বিয়ে, এলাহাবাদের বর।

কাশী ভেলুপুরার বাড়িতে সকাল থেকে কলরব জেগে উঠল, মাধবী আর থাকবে না, সে বাপের বাড়ি চলে যাবে, লোক চিঠি নিয়ে হাজির, আজ সকাল আটটার ট্রেনে সে রওনা হবে।

কস্মিনকালেও মাধবীর তিনকুলে কেউ নেই। বাঙালীটোলা কেদারঘাট সারা কাশী রাজ্য জুড়ে অনেক দিদি মাসী ভাই'তার গজিয়েছে। কিন্তু এদের ছেড়ে কোথাও সে কোনদিন রওনা হবে এ কেউ আজো ভাবে নি।

নন্দ বলল, এ বেলার রান্নাটা তবে উমাই সারুক। স্ত্রীকে নন্দ নাম ধরেই ডাকে।

উমা ঘোমটা নামিয়ে আয়না মেলে সাদা চুল গজাল কিংবা কালোগুলো সাদাটে হল তাই খোঁজ করছিল।

উমা আয়না নামিয়ে রেখে ক্ষেপে উঠে বলল, তোমার নন্দী ভৃঙ্গীকে তবে পাঠিয়ে দাও, জল তুলে বাটনা বেটে গুছিয়ে দিক।

বিশ বছরের ক্ষণিকা প্যাডে চিঠি শুধু করল। তার বান্ধবী মণিকা ফুলশয্যার চমকগুলো লিখে পাঠিয়েছিল। গতকাল থেকে সে চিঠির জবাব মনে মনে ছকছিল। ভোর হতে মাধবী আবার এ কি ফ্যাসাদ বাঁধাল।

চিঠি খামে পাঠাবে অথবা পুরো প্যাডটাই পার্শেল করবে এ সমস্যায় পৌঁছাতেই ফের তাকে কান সজাগ করতে হল।

উমা বলল, তোমার কচি-মেয়েটিকে হে'শেলে পাঠিয়ে একটু ডাটো কর বাপু, পরের বাড়ি বেতারের রান্নায় হাঁড়ির চাল ফুটবে না।

ক্ষণিকা যা আশা করল তাই ঘটল। তবু নন্দ বলল, ওর কলেজ রয়েছে, সামনে পরীক্ষা, ওকে আর নড়তে বলো না, ও বেলায় আমি বামনী যোগাড় করব।।

ক্ষণিকা কলম ছেড়ে বেরিয়ে এলো। বলল, চালাকীর আর জায়গা পাওনি? কালু তোমার কিসের ভাই পো? চিরকাল তুমি কাশীর মেয়ে, কালুর বয়স চোদ্দ পনের। বাড়ি বলল বর্ধমানে, তোমরা পরস্পর দুজনার হদিস পেলে কি করে?

কথা শুনে সবাই চুপ।

মণিকার ফুলশয্যার জবাবে ক্ষণিকা তের পাতা লিখেছিল, কিন্তু মাধবী পুনশ্চর ক'পাতা আর লিখতে দেয়নি, ক্ষণিকা তার ঝাল ঝাড়ল। 'মাধবী এখানে হাজারটা আছে, পথ ভুল করে কালু বলে কে একটা ছোঁড়া সদরে এসে দাঁড়াল আর অমনি তুমি তার সাথে পা বাড়ালে? কোন দুষ্টু লোক তো ওকে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠাতে পারে?'

ভাই পো কালু এবার কেঁপে উঠল।

ক্ষণিকা বলল, মা-র অসুখ, আমার কলেজ। এসব জেনে শুনেও তোমার অদেখা গাঁ বড় হল? একটু মায়ার আঁচড়ও কি তোমার থাকতে নেই?

নন্দর বুকটা হঠাৎ মুষড়ে উঠল, সে অন্য-দিকে মুখ ফেরাল।

২

পুরনো কথা মনে পড়ছিল নন্দর। তখন নন্দ সবে পাশ করে বেরুল, কলকাতার পৈতৃক-ভবনে কলি ফেরান হচ্ছে। ঘটকের আনাগোনায় বাড়ি সরগরম।

কাশী থেকে নায়েব সখারাম পত্র দিল, দাদামশায় কাশীপ্রাপ্ত হলেন, নন্দ কাশীর বিষয়-সম্পত্তির মালিক। সে এখন সব দেখে শুনে নিক।

নন্দ কাশী এলো। ভেলুপুরার গৃহে সখারাম তাকে আদর-আপ্যায়ন জানাল।

সখারামের বাসা থেকে মাধবী এলো।

নন্দ খেতে বসলে মাধবী পাখা নিয়ে বসল। এটা ওটা এগিয়ে দিতে লাগল।

নায়েব সখারাম বলল, সব দেখে শুনে নিন, আমি আর ক'দিন।

নন্দ বলল, আমি কালই কলকাতায় ফিরব, দু'দিনও থাকা চলবে না।

বিকেলে নন্দ দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়া... চলল, বাসায় ফিরলে তাড়াতাড়ি। মা... এসে দরজা খুলল। ফাঁকা বাড়ি... এতোক্ষণ আগলাচ্ছিল।

ইজিচেয়ারে শুয়ে হাত বাড়ালেই প... থেকে আর দেশলাই হাতে এসে পে... না, মাধবী ছুটে এসে দেশলাইটা দি...

চৌকাঠের দিকে চেয়ে নন্দ বলল, ... বাড়ি যাওনি?

মাধবীর মুখে কথা ফুটল না।

তুমি নায়েবের বাসায় থাক না? প... মহল্লায়? নন্দ জানতে চাইল।

না, মাধবী জবাব দিল।

দাদামশাইকে তবে কে দেখতো?

কাশীর দশখানা বাড়ির মালিক ... দাদামশাই। ঐ সম্পত্তি তিনি ... দেখাশুনা করতেন, কিন্তু তাঁকে ... দেখাশুনা করত, সে খবর নন্দর ... ছিল না।

নন্দ আবার প্রশ্ন করল, তুমি একা ... শুনা করতে?

মাধবী বলল, বুড়োমানুষকে ... আর ক'জন লাগবে?.

নন্দ হেসে ফেলল, বলল, তা ... বেশ, কিন্তু তোমাকে কে দেখাশুনা ...

কথাটা মুখ থেকে বেরুতেই নন্দ ... দশখানা বাড়ির মালিকের ওজন ... সে লাভ করেনি।

আমার মা'র কাজ আমি পেলুম, বলে ধবী দূরে সরে গেল।

মা'র চাকরি?

হ্যাঁ, মা ঐ-বাড়ির বামনী ছিলেন, এখন মি বহাল হলুম।

সন্ধ্যার পর সখারাম এলো। বলল, কর বাড়িগুলো অনেক পুরোনো, ওগুলো রামত করা এখুনি দরকার, ভাড়াটেদের থে আমার কথা হল, তারা ভাড়াও শী দেবে।

বেশ তো মেরামত করান। নন্দ কদানিটা দূরে সরিয়ে রেখে উত্তর দিল।

নন্দ কলকাতায় চিঠি দিল, তার সপেপেশিয়া এখন অনেক কম। এখানকার ল-হাওয়া কলকাতার বিলেত-ফেরত ক্তারকে হার মানিয়ে দেয়। দাদামশাইয়ের পত্তি ঝাড়াই-বাছাই করলে তার দুমুঠো টবে।

কলকাতায় চোখের জল নিয়ে কাশীর নগুলো অনেকদিন ধরে অনর্থক টোছুটি করল।

রাতে মাধবী নন্দর মশারি গুঁজে দিয়ে রায়ানের সাথে গণেশ-মহল্লায় সখারামের ায় চলে যায়, আবার ভোরে এসে ারি তুলে নন্দর মুখের কাছে চা'র বাটি ল ধরে।

শীতের সন্ধ্যায় নন্দ জড়সড় হয়ে লঙের উপর শুয়ে।

মাধবী এসে বলল, সখারাম বুড়ো হল। নকগুলো কাচ্চাবাচ্চা। এতোদিন বিষয়-পত্তি আগলালো। ওকে একটু দেখলে র্ম হয় না। আমার হাতে এই কাগজ । শুধু কষ্ট করে একটা সই করে ল চলবে।

ন্দ অবাক হল। বলল, সখারামের চাবাচ্চাদের নিয়ে তোমার মাথাব্যথা ? নিজের জন্যে মাথাব্যথা তো হয়নি?

ুখখানি আঁধার করে মাধবী সন্ধ্যা ীপ জ্বালতে চলে গেল।

ন্দ ডাকল, শোন।

বালানো প্রদীপ হাতে নিয়ে মাধবী এসে দাঁড়াল।

ন্দ বলল, এতে তোমার লাভ কি?

উনি আমার মাকে অনাহার থেকে লেন, তাই আমিও বাঁচলুম।

দীপের শিখায় মাধবীর চোখের ফোঁটা জল চিক-চিক করে উঠল।

রন্তর নন্দ বালিশের তলা থেকে কের থলিটা টেনে বার করল।

শ্বনাথের দয়া সম্বল করে নিঃসম্বল াম একদিন অনাথা কামিনীকে ভর কাশীবাসী হয়। সে অনেক দিনের । সখারাম আর কামিনী ছত্রীর প্রসাদ আর কেদার ঘাটে শুয়ে কাটায়।

কামিনী মোটা-সোটা আঁটো-সাঁটো গড়নের বুদ্ধিসর্বস্ব মেয়ে।

নন্দর দাদামশাই সদাশিব একজন নিষ্ঠাকাষ্ঠা মানুষ খুঁজছিল তার ঠাকুর সেবার জন্যে।

সখারাম রাজী হল। তার থাকার ব্যবস্থা হল গণেশ-মহল্লার বাড়িতে। সে দেখা-শুনোর ভার পেল সদাশিবের ভাড়াটেদের।

আর ঠাকুর সেবার ভার পড়ল কামিনীর উপর।

এর পর কামিনীর ঠাকুর সেবার উপছানো সময় বরাদ্দ হল সদাশিবের নিজের সেবার জন্যে।

শীতের রাত। ঘনান্ধকার ঘরের দিকে তাকিয়ে নন্দ বলল, তোমার কাজকর্ম সব সারা হল?

আমাকে রেখে আসতে শীতে দরোয়ানের খুব কষ্ট হয়, এখন দেব ভাত? দূরে থেকে কথাটা বলে মাধবী সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল।

মাধবীর ঝকঝকে হাত-পা, সুপুষ্ট বুক। বার বার আঁচল টেনে নিজেকে লুকোতে সে গলদ্ঘর্ম হয়ে উঠে।

তবক-দেওয়া জর্দা সেদিন মাধবী নন্দর হাতে ঢেলে দেবার সময় নন্দর আঙুল মাধবীর আঙুলে ছোঁয়া দিল।

মাধবীর বুকটা কেঁপে উঠল।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কলকাতা থেকে লোকজন কাশী এসে হাজির। বিধবা মা কেঁদে কেটে শয্যা নিলেন। ছেলে না ফিরলে তিনি বাঁচবেন না। অন্তত বিয়ে করে তাঁর প্রাণটা নন্দ বজায় রাখুক।

নন্দ কলকাতা ফিরল। মাকে বুঝাল, সংসারে তার মন যখন নেই, তখন অনর্থক বিয়ে করা। চিরকাল সে যা ভেবে এলো, বাকি জীবন তাই ভেবে কাটাবে। পুঁথি-পত্তর ঘাঁতিয়ে আর বাবা বিশ্বনাথের পা ছুঁয়ে পড়ে থাকবে।

নন্দ সব মায়ামোহ কাটিয়ে, মা'র চোখের জল উপেক্ষা করে কাশী ফিরে এলো।

আবার সেই কাশী। রাতে মশারি গুঁজে মাধবী আলো নেবায়। সে দরোয়ানের সাথে যাবে। গিয়ে গণেশ-মহল্লার ঠাণ্ডা পাথরের মেঝেতে দেহটি এলিয়ে দিয়ে অঘোরে ঘুমুবে।

আর ভেলুপুরার পালঙ্কে পুরু গদির উপর পশমী লেপের নীচে নন্দ এখন জেগে থাকবে। সারারাত চোখে তার ঘুম নামবে না। ভোরে মাধবী এসে মশারি তুলে তার কুঁচকে-যাওয়া লেপ টেনে দিয়ে ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাবে।

উনুনে আঁচ দিয়ে ঘরের কাজকর্মে ব্যস্ত হবে। একটু পরে গরম জল এনে পাশের টুলে রাখবে। পিকদানিটা সামলাবে, যাতে মুখ ধোবার জল ছিটকে মেঝেতে না পড়ে।

মাধবীর গায় পাতলা একটা ব্লাউস। সুতীর চারদটা সে শুধু পথে বেরুবার সময় গায় জড়ায়।

নন্দ মাধবীকে একটা পশমী কিছু কিনে দেবে।

কিন্তু দোকান থেকে তাকে টাকা ফিরিয়ে আনতে হল। দরকরা জিনিস কেনা হল না। ঝি'কে দামী শাল কেউ দেয় না।

কিন্তু সুতীর দিলে তো কেউ নিন্দে করবে না।

না থাক।

নন্দ বিশ্বনাথ গলি আর চক-বাজার ঘুরে বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে গৃহে ফিরল।

রাতে আহার শেষ হলে নন্দ ইজিচেয়ারে শুয়ে একটু বিশ্রাম করছিল। মাধবী রান্নাঘরে তালা দিতে গেল।

ছোকরা চাকরটি এসে বলল, নায়েব দেখা করবেন।

নন্দ অবাক হল। বলল, রাতে? কেন? আচ্ছা আসতে বল।

সখারাম এসে দাঁড়াল।

নন্দ বলল, বলুন?

সখারাম শান্ত মানুষ, শান্তস্বরে বলল, ক্যাণ্টনমেণ্টে চা'-র দোকান। ছেলেটি দেখতে শুনতে ভাল, দোকানে খুব বিক্রি, ও গাঁজা ভাঙ খায় না, না খেয়ে মরবে না।

নন্দ জিজ্ঞেস করল, কে না খেয়ে মরবে না?

মদন আর মাধবী। মদন শুধু দু'শো টাকা চায়, টাকা দিয়ে সে মিষ্টির দোকান খুলবে, ওদের কোন কষ্ট হবে না। সখারাম এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো শেষ করল।

নন্দ চুপ করে থাকল।

ধীরে ধীরে সখারাম বেরিয়ে গেল।

মাধবী ঘরে ঢুকল, নন্দ ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ল, মাধবী নিঃশব্দে দূরে টুলের উপর বসে থাকল। নীচে দরোয়ান খৈনি ঠোঁটে দিয়ে লাঠি পাশে রেখে মাধবীকে গণেশ মহল্লায় পৌঁছে দেবার জন্যে গাল-পাট্টা জড়াচ্ছিল।

কতোক্ষণ নন্দ মাধবীকে বসিয়ে রাখবে। বাইরে শীতের হাওয়া।

নন্দ নিশ্চল দেহটা বাঁকিয়ে মাধবীকে কাছে ডাকল। মাধবী কাছে এসে দাঁড়াল।

নন্দ বলল, জানালার সার্সিটা খুলে দাও, গরম হচ্ছে।

মাধবী বলল, বাইরে বড্ড হাওয়া, ঠাণ্ডা লাগবে। ক'দিন খুব হিম পড়ছে।

আমার হিম লাগলে তোমার কি? তুমি তো আর দেখবে না। তুমি তো এবার চলে যাবে।

ভৃত্য মনিব সম্বন্ধ নন্দ ভুলতে বসল।

কোথায় যাব? বলেই মাধবী তার ফোলা চোখ দুটো লুকাল।

ক্যান্টনমেণ্টে, তোমার শ্বশুরবাড়ি। তীর্থকামীদের মিঠাই বিলোবে। আচ্ছা মাধবী, তোমরা ঝি হয়ে জন্মাও কেন বল তো?

ঝাঁটা লাথি খাব বলে।

একটু পরে মাধবী আবার বলল, ঘর পরিষ্কার হল এবার। এ-ঘরে লক্ষ্মী আসবে, কথাটি শেষ করে মাধবী মুখ ফেরাল।

নন্দ উঠে দাঁড়াল। মাধবীর কাছে এল। নন্দ ফের বলল, কেন তুমি ঝি হলে মাধবী?

মাধবীর উন্দেবল দেহটির দিকে নন্দ তাকাল, দৃষ্টির পরশ দিয়ে নন্দ তাকে শান্ত করতে চায়।

পরে নন্দ হাত দু'খানি বাড়াল, কিন্তু ছোঁয়া হল না।

মাধবীর বিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

সোনারপুরার ভাড়াটে বাড়ির মেরামতী তদারক করতে গিয়ে সখারাম ভারা থেকে পড়ে পা ভাঙল।

ছ' মাস লাগল তার ডাক্তারী হেফাজত থেকে খুঁড়িয়ে চলার অনুমতি আদায় করতে।

সখারাম খুঁড়িয়ে চলাফেরা শুরু করল। মাধবীর বিয়ে হয়ে গেল।

মাধবী আর মদন এসে নন্দকে প্রণাম করল। মেয়েলী শাল, বেনারসী শাড়ি, ব্লাউস আর দু'শো টাকা দিয়ে নন্দ তাদের আশীর্বাদ করল।

কাশী শহরটা বড় নির্জন নিরিবিলি, ঘরটাও গুমোট।

মাধবী আর এ মুখো হয় না।

ক্যান্টনমেণ্টে মদনের দোকানে গিয়ে নন্দ চা খেয়ে আসবে। কথায় কথায় মাধবীর কুশলটাও সে জানতে পারবে।

না, এ তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ঠিক করল, বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে সকাল সন্ধ্যায় হাজিরা দেবে, এতে মনের পাঁক অনেকটা তলাবে।

দশাশ্বমেধ ঘাটে কত লোকজন আনাগোনা করে। কারুর চোখের দৃষ্টি শান্ত, কারুর বা অশান্ত, নন্দ সবার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের দুষ্ট যন্ত্রণা ভোলার চেষ্টা করে। আর কেউ তার দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবে না তো! দূরে রামনগরের দিকে সে তাকিয়ে থাকে। ঐ তো রাজঘাট।

ঘুরতে ঘুরতে সে অহল্যা ঘাটের চাতালে এসে বসে পড়ে। রানাদের প্রাসাদের ছায়া গঙ্গার বুকে ভাসছে।

ঐ তো ব্রিজের ওপর দিয়ে ট্রেন ধোঁয়া ছড়িয়ে ক্যান্টনমেণ্টের দিকে চলে গেল।

এতোক্ষণে অনেক তৃষ্ণাকাতর যাত্রী মদনের চা'র দোকান ঠিক জাঁকিয়ে তুলল।

একখানা নতুন টাইম টেবিল নন্দর দরকার, কাল সে ক্যান্টনমেণ্ট স্টেশনে যাবে। মদনের দোকানের সামনে দিয়ে তার এক্কা ছুটে যাবে কিন্তু পিছনের অন্ধকার কুটিরে মাধবী তো তখন ঘনকন্নায় তন্ময়।

টাইম টেবিল আর আনা হল না।

রাত বাড়ল, দরোয়ান পিছনে দাঁড়িয়ে। সামনে এসে বলল, বাবু বহুত ঠাণ্ডি হ্যায়।

নন্দ নিজের স্থান ফিরে পেল। বলল, চল।

হিম শীতল অহল্যাঘাটের পাথর থেকে নিঝুম রাতে নন্দ দরোয়ানের নির্দেশে সতর্ক পা ফেলে গৃহে ফিরল।

আমার কাজ ঘর ঝাঁট দেওয়া, তোমার কাজ ঘরে লক্ষ্মী আনা। আমার কাজ সারলুম এবার তোমার পালা। মাধবীর কথাটা নন্দর মাথার মধ্যে জট পাকাল।

সকালে রোদে বসে নন্দ। খবরের কাগজখানি বারান্দায় লুটোচ্ছে।

সখারাম এসে অপরাধীর মত দাঁড়াল। কি বলুন? নন্দ চোখ তুলল।

দুর্গাবাড়ির যাদব রায়ের বড় মেয়ে উমা, তাকে এ ঘরে আনতে চাই, কাজে কর্মে মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। এ শুধু গরীবের জাত উদ্ধার।

নন্দ মুখ নামাল, কোন জবাব দিল না।

ক'দিন পরে ভেলুপুরার সদাশিবের নাতিকে দুর্গাবাড়ীর যাদব এসে আশীর্বাদ করে গেল।

বিয়ের দিন ভোরে সখারাম ঝোড়োপাখির মত নন্দর দোরগোড়ায় এসে হাজির। তার খোঁড়া পা আর হাতের লাঠি ঠক ঠক করে কাঁপছে।

নন্দ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হল আপনার? অসুখ-বিসুখ হল নাকি?

না। কপালের ঘাম মুছে সখারাম কি বলার চেষ্টা করল কিন্তু কণ্ঠে স্বর ফুটল না।

এখুনি পড়ে চৌকাঠে সখারামের কপাল ফাটবে, নন্দ ছুটে গিয়ে তার কাঁপা দেহটিকে দু'হাতে জাপটে ধরে টেনে এনে মেঝেতে রাখল।

কি হয়েছে আপনার? বলুন? নন্দ অস্থির হয়ে উঠল।

মাধবীকে মদন তাড়িয়ে দিয়েছে। মাধবীর মুখে সে লাথি মেরেছে। বৃদ্ধ এবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

মাধবীর অপরাধ? নন্দ এবার উঠে দাঁড়াল।

তার একটা মেয়ে হয়েছে।

মাধবীর মেয়ে? নন্দ কথাটা বার দুই আওড়াল।

হ্যাঁ, বৃদ্ধের চোখ মুখ এবার লাল। 'মেয়েটাই তো কাল হল।'

কাল হল, তার মানে?

মেয়েটি মদনের মত দেখতে নয়। তাই মদন—।

তাই মদন লাথি মেরেছে তার মুখে।

ওদের বিয়ে ত মাত্র পাঁচ মাস। একথাও মদন ডেকে ডেকে বলছে।

এখন মাধবী কোথায়?

কাল অনেক রাতে বাচ্ছাটিকে সাথে করে মদন আমার ওখানে ওদের ছেড়ে দিয়ে গেছে। যাবার সময় আমাকে অনেক কটু কথা বলল, শাসাল, আমি কোন কথার জবাব দেবার সময় পেলুম না। ততোক্ষণে মা-শ চেথ মুখের রাঙা ছোপ মুছিয়ে ডাক্তার ডাকতে ছুটলুম।

নন্দ মেঝেতে একটু হাঁটল। একটু চলাফেরা করে সখারামের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। বলল, কোতোয়ালীতে খবর এসেছেন? না থাক। মদনের দাঁত ভাঙবে মাধবীর ভাঙা দাঁত জোড়া লাগবে না। মদনের কোন অপরাধ নয়।

নন্দর বিয়ে। বাসর ঘর নিরিবিলি হতে নন্দ উমাকে বলল, একটা কথা বলব?

উমা নন্দর চোখের দিকে তাকিয়ে অবাক হল।

থর-থর কেঁপে কোনমতে উমা সাড়া দিল, কি বল?

মাধবীর মেয়েটিকে তোমায় নিতে হবে।

এতোক্ষণের স্নিগ্ধ উমা রুখে উঠে বলল, মাধবীর মেয়েকে আমি কেন কোলে নেব?

তবে ওটাও কি ছড়া-ঝাঁটে যাবে? নন্দ বলল।

এবার আড়ষ্ট উমার, আর কোন সাড়া মিলল না। বিয়ে বাড়ির সব আলো এসে একে তার চোখে নিবে এলো।

শেষরাতে উমার চোখের জল যখন নন্দর বুক ভিজিয়ে ফেলেছে, তার হুঁশ হল। নন্দ উমার মুখখানি সাদরে তুলে ধরে বলল, পারলে তোমার চোখে জল নামাতুম না।

বর কনে গৃহে এলো। প্রমদা বরণ করা সুন্দর অকলঙ্ক শিশুমুখ দেখে উমা চোখ ফেরাতে পারল না। বুকে তুলতে মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল, এর নাম থাক ক্ষণিকা।
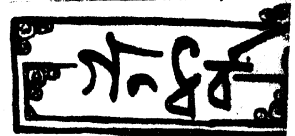
ক্যাণ্টনমেণ্ট স্টেশনে মদনের চা-মিষ্টির দোকান এখন খুব বাড়-বাড়ন্ত, বহু যাত্রী সেখানে পিপাসা মেটায়।

আজ সকালে একটা হাটানো ছেলের হাত ধরে মাধবী আর কোন তীর্থে যাবে।

ক্ষণিকা তাকে ফের বলল, এ অসময়ে কেন তুমি চলে যাবে?

মণিকাকে লেখা চিঠির প্যাড ক্ষণিকার হাতে দুমড়ে গেল।

সারাজীবন বুঝি ঘর ঝাঁট দেব আমি? মাধবী ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল।

ক্ষণিকা এসে মাধবীর পথ আটকাল। 'মা'র শরীর ভাল নয়। মা একা কি করে থাকবে?'

আমি যেমন করে থাকব, মাধবী বলল। বলেই দরজার দিকে এগোল।

মাধবী সদর দিয়ে ধীরে ধীরে রাস্তায় নামল। ছল ছল চোখ। নন্দ আর উমার দিকে ফিরে ক্ষণিকা অবাক। বলল, ঝি চাকরের জন্যে আবার মায়া। তোমাদের যত......

(২২)

চিঠিটা এসেছিল সকালের ডাকে। মীনাক্ষী অবশ্য পড়ল রাত্রে বাড়ি ফেরার পর। এ সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দাদুর চিঠি। যে চিঠি পাবার আশায়, মীনাক্ষী দিন নেই রাত নেই ছটফট করেছে, পাছে দাদু তাকে ভুল বোঝেন, চিঠিতে মত না দেন এই আশংকায় মনে মনে অস্থির হয়ে পড়েছে, এমন কি এক সময় ভেবেছে, হঠাৎ এভাবে আবেগের বশে দাদুকে 'পীয়েরে'র কথা জানিয়ে চিঠি লেখা তার উচিত হয়নি।

শুধু তো মীনাক্ষী নয়, পীয়েরের মনেই এই চিঠির জন্যে কম দুর্ভাবনা ছিল না। সে শুকনো মুখে প্রায়ই মীনাক্ষীকে জিজ্ঞেস করত, তোমার দাদু যদি অবুঝ হন, এ বিয়েতে মত না দেন, তাহলে আমাদের কি হবে।

মীনাক্ষী কোন স্পষ্ট উত্তর দিতে পারত না, বলত, দেখ না উনি কি লেখেন।

—আমি জানি তাঁর অমতে তুমি কোন কাজ করবে না।

একথায় মীনাক্ষী নীরব হয়ে যেত। দাদুর অমতে যে কোন কাজ করা সম্ভব তা সে আগে কখনও চিন্তাই করেনি, অবশ্য, চিন্তা করার কোন প্রয়োজনও হয়নি তাই হঠাৎ আজ সে পীয়েরকে কি উত্তর দেবে?

পীয়ের চুপচাপ কিছুক্ষণ সিগারেট টেনে উপরের দিকে ধোঁয়ার রিং ছেড়ে বলত, আমার কথা অবশ্য আলাদা, জানি এ ধরনের বিয়েতে আমার বাবা মা কিছুতেই রাজী হবেন না। কিন্তু সেজন্যে আমি পরোয়াও করি না। তোমাকে ভালবেসেছি, বিয়ে করব, তাতে বাবা মা সম্মতি দিলে আমি খুশী হব, না দিলে আমি নিরুপায়। মীনাক্ষী মৃদুস্বরে জানাল, তোমার মত বলতে পারলে আমি খুশী হতাম পীয়ের কিন্তু আমরা বাংলাদেশের মেয়ে, জাননা সেখানকার মাটি কত নরম। এরপর থেকে ওরা প্রত্যেকদিন চিঠির আশায় বসে থাকত। দিনে তিনবার মীনাক্ষী পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করত তার নামে কোন চিঠি এসেছে কিনা। পত্র পাঠ যদি দাদু উত্তর দিতেন তাহলে অন্তত দিন চারেক আগে পাবার কথা। তাই বোধহয় চিঠির জন্যে ওরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

আজ শনিবার। সারাদিন ওরা বাইরে কাটিয়েছে। এই একটু আগে মীনাক্ষীকে বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে পীয়ের ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে গেলে তার ফ্ল্যাটে।

মীনাক্ষী ক্লান্ত শরীরে উপরে এসেই দেখল টেবিলের উপর তার নামে আসা খামের চিঠি। বেশ পুরু, ভারতের স্ট্যাম্প, পেছনে দাদুর নাম লেখা। উত্তেজনায় মীনাক্ষীর বুক কেঁপে উঠল। যে চিঠির জন্যে এতদিন সে উন্মুখ হয়ে বসেছিল, সেই চিঠিই আজ তার হাতে। এরই মধ্যে আছে দাদুর মনের কথা। যার উপর নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ। কাঁপা হাতে খাম ছিঁড়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মীনাক্ষী চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

আদরের মীনা বাই,

হঠাৎ আমাকে ইংরিজীতে চিঠি লিখতে দেখে তুমি নিশ্চয় অবাক হবে। তবু লিখলাম এই ভেবে হয়ত তুমি এই চিঠিটা পীয়েরকে পড়াতে চাইবে।

যদি আমার চিঠি দিতে দু' একদিন দেরী হয়ে থাকে, সে অপরাধ আমার এই বয়েসের। বুড়ো হয়েছি, সব কথা গুছিয়ে লিখতে বেশ সময় লাগে। এই দেরী দেখে মোটেও মনে করো না আমার মনস্থির করতে দেরী হয়েছে। একবার ভেবেও ছিলাম তোমার মনের চঞ্চলতাকে থামাবার জন্যে টেলিগ্রামে আমার সম্মতি জানাই। পরে ভেবে দেখলাম, না, কয়েকটা কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার।

প্রথমেই বলি পীয়ের সম্বন্ধে এত কথা তোমার লেখবার দরকার ছিল না। তুমি তার সঙ্গে দীর্ঘদিন মিশে তাকে পছন্দ করেছ, তাই থেকেই আমি বুঝতে পেরেছি পীয়েরের মধ্যে এমন অনেক গুণ আছে যা সাধারণ ছেলের মধ্যে দুর্লভ। তা না হলে তুমি বোধহয় তাকে এতখানি আপনারজন বলে মনে করতে পারতে না। তোমাকে আমি যেভাবে মানুষ করেছি, তোমার পরিণত বুদ্ধির কথা যতটুকু আমি জানি তা থেকে বুঝেছি কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ, কোনটা সৎ কোনটা অসৎ তা বোঝবার জ্ঞান তোমার যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছে। অতএব তুমি যখন পীয়েরকে পছন্দ করেছ আমার দিক থেকে তার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তোমার পছন্দের উপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছ এ ধরনের আন্তর্জাতিক বিবাহ সুখের হয় কিনা। তুমি বুদ্ধিমতী, কেন এ প্রশ্ন তোমার মনে উঁকি মেরেছে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি তো মনে করি দাম্পত্য জীবনের সুখ নির্ভর করে প্রেম, প্রীতি ও সহানুভূতির উপর, তার সংগে স্থান, কাল, পাত্রের কি সম্বন্ধ? আমার তো মনে হয় ক্রমবর্ধমান সভ্যতার বিকাশ ক্রমশ আমাদের জীবনকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে।

আমি তোমায় অনুরোধ করব কিছুক্ষণের জন্যে অন্তত চোখ দুটো বন্ধ করে কয়েকটা কথা ভাবতে। ভাব দেখি স্থান (space)-এর কথা, এ যে অনন্ত। আমরা দিশা হারিয়ে ফেলি, তাই তো নিজেদের বোঝবার সুবিধের জন্য সেই অখন্ড spaceকে খন্ড খন্ড করে ভাগ করেছি, শুধু পৃথিবীর কথা বলতে গেলে আমরা সৃষ্টি করেছি পাঁচটা মহাদেশের, তাকে আবার ভাগ করেছি বিভিন্ন রাজ্যে, তার মধ্যে প্রদেশ, আরও ছোট করে, জেলা, গ্রাম। সেখানেও আমরা ক্ষান্ত হইনি, আরও ছোট করে এনে বলি আমাদের পাড়া, নিজেদের বাড়ি, আমার ঘর।

ঠিক তার উল্টো দিক দিয়ে একবার ভাব দেখি মীনাবাই। সুদূর লন্ডনে যে ঘরে তুমি বসে রয়েছ চারটে দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে, তুমি বুঝতে পারছ না তোমার পাশের ঘরে কি ঘটছে, মাঝখানে একটা দেয়ালের ব্যবধান। ভেংগে ফেল ঐ দেয়াল, তখনই তোমার ঘর আর পাশের ঘর এক হয়ে যাবে।

এমনি করে যদি আমরা দেয়ালগুলো সরিয়ে নিতে পারতাম বাড়ির দেওয়াল, প্রদেশের দেওয়াল, রাজ্যের দেওয়াল। তখন শুধু পাঁচটা মহাদেশ ছাড়া আর কিছু থাকত না। তারপর ঐ মহাদেশের দেওয়ালগুলোও তুলে দিতে পারলে, আবার সেই অখন্ড space আমাদের চোখের উপরে ভেসে উঠত, যার একপ্রান্তে থাকতে তুমি আর একপ্রান্তে থাকতাম আমি। দেশ-বিদেশের বাধা অতিক্রম করে একই ভূখন্ডের উপর।

সময়ের বেলাও তো ঐ এক কথা। আমরা সবাই জানি কাল নিরবধি। তবু আমাদের বোঝবার জন্যে তাকে আমরা যুগ হিসেবে ভাগ করেছি, ভাগ করেছি বর্ষপঞ্জীতে। তাতেও শান্ত না হয়ে সময়কে বেঁধেছি ঘণ্টা আর মিনিটের কাঁটায়, যেন আমাদের তৈরী ঘড়ির ধমক শুনে সময় চলছে।

যদি এইভাবে স্থান ও কালের অখন্ডতা স্বীকার করতে পার তখন বুঝতে পারবে মানুষে মানুষে যে বিচ্ছেদের কথা আমরা ভাবি সেটাও শুধু এই দেওয়ালের ব্যবধান। এখানে অবশ্য দেওয়াল হল দেহ। দেহের ব্যবধানকে অতিক্রম করতে পারলেই একাত্মা পরমাত্মায় গিয়ে মিলিত হয়। একজনের চৈতন্যের সংগে আর একজনের চৈতন্যের মিলন হয়। সৃষ্টি হয় অখন্ড চৈতন্যের।

জানি না সব কথা তোমায় গুছিয়ে বোঝাতে পারলাম কিনা, তবে আমার আসল কথা হল এই যে, মানুষে মানুষে সত্যিকারের ভেদ কোথাও নেই। সমাজ আর পরিবেশের দেওয়াল তুলেই আমরা স্বতন্ত্রতার গণ্ডি টানার চেষ্টা করেছি। যে কোন আন্তর্জাতিক বিবাহে পুরুষ ও নারীকে এই গণ্ডির উপরে উঠতে হবে। যেখানে স্থান, কাল, পাত্রের কোন ব্যবধান থাকবে না, তাদের একমাত্র পরিচয় হবে একজন পুরুষ আর একজন নারী।

তোমার চিঠির শেষের দিকে পরিহাসচ্ছলে এক জায়গায় লিখেছ ওদেশে ডির্ভোসএর সংখ্যা এত বেশী যে মাঝে মাঝে মনে সন্দেহ জাগে ওদেশের জল হাওয়ায় প্রেম আদৌ বাঁচতে পারে কিনা? আমি কিন্তু তোমার সংগে একমত হতে পারলাম না। আমার মনে হয় ইওরোপীয় প্রেমের নাম দেওয়া উচিত রূপজ প্রেম, অর্থাৎ রূপ থেকে যে প্রেমের উৎপত্তি। "লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট"। সেইজন্যেই বোধহয় রূপের নেশা যেই কাটে আর তাদের ঘর করতে ইচ্ছে করে না, ঘর ভেংগে বেরিয়ে যায়, এই পর্যন্ত পড়ে মনে হতে পারে তোমার বক্তব্য নির্ভুল, ওদেশে প্রেম বাঁচে না। কিন্তু আমি প্রশ্ন করব আমাদের দেশেই বা তার ব্যতিক্রম দেখলে কোথায়, এ দেশে অবশ্য প্রেম রূপজ নয়, দেহজ। দেহ থেকে প্রেমের উৎপত্তি। দু'টি সম্পূর্ণ অজানা যুবক যুবতীর বিবাহ স্থির করলেন, তাদের অভিভাবকরা, ফুলশয্যার রাত্রে প্রথম যে আকর্ষণ তারা অনুভব করে তা বোধহয় দেহের। সেই-জন্যেই তো দেহের নেশা কেটে গেলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রেমও উবে যায়। ঘর হয়ত আমরা ভাঙ্গি না, কিন্তু যেভাবে ক্লান্তিকর দাম্পত্য জীবন যাপন করি সেটা খুব সুখের নয়।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস শুধু ও দেশে নয় আমাদের দেশেও প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনের ফলে ক্রমশ অবাঞ্ছিত সন্তানের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আজ যে পৃথিবী জোড়া ব্যাভিচার, সংশয়, সন্দেহ, নির্মম কামনার প্রকাশ তা এদেরই জন্যে। মাতৃগর্ভ থেকে তারা অনুভব করেছে এ পৃথিবীতে তাদের কেউ চায়নি, জন্ম তাদের কাছে যন্ত্রণা বলে মনে হয়েছে। তাই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ, প্রচলিত রীতি নীতির ক্ষেত্রে আনতে চায় তারা বিপ্লব। তাদের চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য নেই বলে এ বিক্ষোভের প্রকাশ বিষময় হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। বিংশ শতাব্দীর এই বোধহয় সব চেয়ে বড় অভিশাপ।

মোটেও মনে কর না আমি নৈরাশ্য-বাদীদের দলে নাম লিখিয়েছি। ভেব না

আমি বলছি নর ও নারীর মধ্যে পবিত্র প্রেম অসম্ভব। প্রেম তখনই সার্থক হয়ে ওঠে যখন রূপ ও দেহকে অতিক্রম করে গুণকে আশ্রয় করে। আমি তার নাম দিয়েছি গুণজ প্রেম। যদি পুরুষ ও নারী পরস্পরের মধ্যে দেখতে পায় গুণের প্রকাশ। তাকেই বিকশিত করার জন্যে দু'জনে দুজনকে সাহায্য করে, লাখো অভাব অনটনের মধ্যে বাস করলেও সেই সুখী দম্পতি প্রেমের বন্যায় ভেসে চলে। তারাই এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক।

এক কথায় বলতে গেলে 'রূপ' আর 'দেহ' বাঁচে না, কিন্তু 'গুণ' বেঁচে থাকে। তাই গুণজ প্রেম অমর। একথা সত্যি আমাদের দেশের দেহজ প্রেম অনেক সময় গুণজ প্রেমে রূপান্তরিত হয়, যে রকম ওদেশে রূপ দেখে বিয়ে হলেও পরস্পরের মধ্যে তারা গুণকে খুঁজে বার করে।

আমি বিশ্বাস করি তোমার ও পীয়েরের মধ্যে যে প্রেম গড়ে উঠেছে তা ঐ শেষোক্ত গুণজ প্রেম। সেকারণ আমার দিক থেকে কোন ভাবনার কারণ নেই।

কায়মনবাক্যে আমি আশীর্বাদ করছি তোমরা সুখী হও। সুখী দাম্পত্য জীবনের মধ্যে দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে বিকশিত কর।

যদি প্রয়োজন বোধ কর, জানালে পীয়ের এবং তার পরিবারবর্গকে চিঠি লিখতে আমি রাজী আছি।

তোমরা আমার প্রীতি ও ভালবাসা নিও।

ইতি

নিত্য আশীর্বাদক

দাদু।

পুনঃ—যদি চাও এ চিঠিটা অতুলকে দেখাতে পার। আশা করি সে আমার সঙ্গে একমত হবে।

চিঠি পড়তে পড়তেই মীনাক্ষীর চোখ বয়ে জলের ধারা নেমে আসে। আনন্দে উত্তেজনায় তার শরীর থর থর করে কাঁপছে। দাদুর মতামত যে উদার তা সে জানত, কিন্তু সে উদারতার ক্ষেত্র যে কতখানি বিস্তৃত তা সে আগে বুঝতে পারেনি। তা না হলে কি করে সে ভাবতে পেরেছিলো দাদু হয়তো মত নাও নিতে পারেন। কেন তার মনে সংশয় জন্মেছিলো যে দাদু বোধ হয় আন্তর্জাতিক বিবাহের পক্ষপাতি নন।

চিঠি পড়ে আনন্দে বিহ্বল মীনাক্ষী পীয়েরকে জানাবার জন্য টেলিফোন করল। কিন্তু কেউ ধরলো না, বেজে বেজে নো রিপ্লাই হয়ে গেল। এখনও বোধহয় পীয়ের বাড়ি পৌঁছায়নি।

পীয়ের দাদুর চিঠি পড়ে নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে, এত সুন্দর করে উনি লিখেছেন, পীয়ের যা ছেলেমানুষ হয়তো এখুনি বলবে রেজিস্ট্রারকে নোটিশ দেবার জন্যে। একথা ভাবতে কেন জানা নেই মীনাক্ষী মনের থেকে বিশেষ সাড়া পেল না। সত্যিই যদি পীয়ের-এর সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে যায়, আর তাহলে সে দেশে ফিরতে পারবে না। সম্পূর্ণ বিদেশিনী হয়ে যাবে। লন্ডন বা ব্রাসেলস যেখানেই থাকুক না কেন দেশের সঙ্গে আর কতটুকু যোগসূত্র রাখা সম্ভব হবে। হয়তো দু'তিন বছর অন্তর একবার সে দেশে যেতে পারে। কিন্তু সে তো শুধু বেড়াতে যাওয়া।

একলা নির্জন ঘরে বসে দেশের জন্যে তার মন কেমন করতে লাগলো, খারাপ লাগলো ভাবতে আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে আর হয়তো বিশেষ দেখা হবে না। আজ কতজনের কথা তার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে দাদুর কথা, মামাদের কথা। চোখের উপর ভাসছে কলেজের বান্ধবীদের ছবি, কতদিন কত রাত তারা এক সঙ্গে কাটিয়েছে। মনে পড়ছে বর্ষার দিনের গঙ্গার কথা, কত না সাঁতার কেটেছে সেখানে। মনে পড়ছে পৌষ মেলার উৎসব মুখর শান্তিনিকেতন, কত না মধুর স্মৃতি তার সঙ্গে জড়ানো রয়েছে। মনে পড়ছে শরৎএর মেঘমুক্ত দার্জিলিঙ পাহাড়, সেখানকার স্বপ্নভরা রঙীন দিনগুলো।

টেলিফোনের আওয়াজে মীনাক্ষীর চিন্তার সূত্র কেটে গেল। কে আর এত রাত্রে ফোন করবে? রিসিভার কানে তুলতেই পীয়েরের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। মীনাক্ষী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, হঠাৎ তুমি ফোন করলে যে?

পীয়ের স্নিগ্ধ স্বরে উত্তর দেয়, এমনি। তোমাকে ট্যাক্সী থেকে যখন নামিয়ে দিলাম আদর করতে ভুলে গিয়েছিলাম। সারা রাস্তা ঐ কথাই ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরেছি, তাই এসেই ফোন করলাম। মীনা, তুমি আমার হাজার হাজার চুমো নিও।

মীনাক্ষী হাসল, সত্যি, তুমি আজও ছেলেমানুষ।

—তাইতো তোমাকে পেলাম। বুড়ো মানুষ হলে কি আর তুমি আমার দিকে ফিরে তাকাতে।

মীনাক্ষী একটু চুপ করে থেকে বলল, জানো একটু আগে আমিও তোমাকে ফোন করেছিলাম।

—বিশ্বাস করি না। নিজে থেকে ফোন করা তোমার স্বভাব বিরুদ্ধ।

মীনাক্ষী না হেসে পারে না, সত্যি আমি ফোন করেছিলাম পীয়ের।

—হঠাৎ?

—দাদুর চিঠি এসেছে।

পীয়ের নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না, তোমার দাদুর চিঠি এসেছে, সত্যি বল? এতক্ষণ বলনি কেন? কি লিখেছেন উনি?

মীনাক্ষী পীয়েরের কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারে তার মনের চঞ্চলতা। তাই সোজা উত্তর দেয়, দাদু মত দিয়েছেন।

পীয়েরের বিস্ময়ের অবধি থাকে না, মত দিয়েছেন! দেরি দেখে আমি কিন্তু ভয় পেয়েছিলাম। কি লিখেছেন আমাকে বল না।

—খুব সুন্দর চিঠি, মস্ত বড় ইংরাজীতে লেখা, কাল এসে তুমি নিজে পড়তে পারবে।

পীয়ের ব্যস্ত হয়ে বলে, আমি এখুনি আসব মীনা?

মীনাক্ষী মৃদু স্বরে বাধা দেয়, পাগলামি করো না। খবর যখন ভাল, কালকে এসে ধীরে সুস্থে পড়।

—বেশ, কখন যাব বল।

—ন'টার পর। ততক্ষণে আমি অতুল মামার বাড়ি থেকে ডিউটি সেরে ফিরে আসব।

পীয়ের হাসল, ও্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম কাল রবিবার। আমার কিন্তু রাত্রে ঘুম আসবে না।

—বেশ তো। শুয়ে শুয়ে আমার কথা ভেব।

দু'জনেই খিল খিল করে হেসে ওঠে।

(ক্রমশ)

শার্ঙ্গদেব

স্বরচিত পল্লীগীতি

কিছুকাল থেকে দেখা যাচ্ছে আকাশবাণী স্বরচিত পল্লীগীতির সমর্থন করছেন। তাঁদের প্রচারিত কিছু কিছু এই পদের পল্লীগীতি আমরা শুনেছি, কিন্তু আমাদের মনে হয়, পল্লীগীতির প্রতি আকর্ষণের পরিচয় এইভাবে না প্রদান করাই ভাল। এক-একটা রূপ আছে, যা স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই বিকৃত হয়ে পড়ে—তার যথাযথ আবেদনটি আর থাকে না। পল্লীগীতির চেহারা হচ্ছে সেই রকম। ঠিক যে পরিবেশে তার প্রতিষ্ঠা, সেখানে তাকে না পেলেই তার মর্যাদা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয় এবং এক-এক সময় তাকে চেনাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। আমি একজন খুব নামকরা শিল্পীকে জানি, যিনি একজন পল্লীগায়কের কাছ থেকে গান সংগ্রহ করে সেগুলি রেকর্ড করেছিলেন। তাঁর গানগুলি একদা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, কিন্তু সে রেকর্ডগুলি শুনতে ভাল হলেও যথাযথ পল্লীগীতি নয়—কোনও কোনও ঢঙ শিল্পীর গলায় ওঠেনি, আর পরিবেশনের পদ্ধতিকে কিছু কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছিল বাধ্য হয়েই। অতএব তাঁর কণ্ঠে পল্লীগীতি বেশ খানিকটা যে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তথাপি তিনি অসাধারণ শিল্পী, তাই অনেকটা মানিয়ে নিয়েছেন এবং পল্লীগীতির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ও তাঁর ছিল। ...পড়ুতা গায়ক-গায়িকার কাছ থেকে ততটা নৈপুণ্য আশা করা যায় না, অথচ পল্লীগীতি সম্বন্ধে প্রচারের যথেষ্ট মোহ তাঁদের থাকতে পারে। এই সব ক্ষেত্রেই পল্লীগীতির বিকৃতি বা তার অনুকরণে নানাবিধ গান প্রচলিত হয়ে থাকে। অতএব স্বরচিত পল্লীগীতি কতটা সমর্থনযোগ্য, সেটা ভেবে দেখা দরকার।

পল্লীগীতি বস্তুটা আর পাঁচটা গানের মত নয়। এক-একটা জনপদে ধীরে ধীরে এক-একরকম গীতরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই রূপের মধ্যে উক্ত জনপদের লোক-সংস্কৃতির এমন একটা পরিচয় আছে, যা বহুকালের এবং বহুমানবের সমান অনুভূতি থেকে উৎপন্ন। অধিকাংশ পল্লীগীতির কোনও ভণিতা নেই—অর্থাৎ কে কারা যে এই সব গান রচনা করেছেন, তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাঁরা ঠিক আত্ম-প্রচারের জন্য এই সব গান রচনা করেননি, তাঁদের মনোভাব এবং অনুভূতিকে প্রকাশ করে অপরের গোচর করেছেন মাত্র। এক একটি পল্লীগোষ্ঠী বহুকাল ধরে এক একটি সমাজে পরিণত হয়েছে এবং তার সঙ্গে এক একটি গীতরূপ স্বীয় বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পল্লীগীতি এইরকম একটি অখণ্ড শিল্প যা পল্লীজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। দর্শনের ভাষায় একই বলে—তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্বা, তদসত্ত্বে তদসত্ত্বা। যে সামাজিক পরিবেশে লোক-সঙ্গীত গড়ে উঠেছে সেই সত্ত্বার উপস্থিতিতেই উক্ত সংগীতের সত্ত্বা বর্তমান থাকতে পারে নতুবা নয়।

প্রকৃত পল্লীগীতির পরিচয় লাভ করতে হলে যথার্থ লোকসংগীতের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এটা আজও সম্ভব কিন্তু কিছুকাল পরে আর সম্ভব হবে না। পূর্ববঙ্গের বিপুল লোক-সংগীতের মূলধারার সঙ্গে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। যাঁরা পশ্চিমাঞ্চলে বসতি-স্থাপনের কালে পূর্ববঙ্গীয় জনপদের লোকসংগীত সংগ্রহ করে এনেছেন তাঁদের বংশধরের কাছে একমাত্র এই সংগ্রহই থেকে যাবে। পশ্চিমবঙ্গ যেভাবে শিল্পপ্রধান হয়ে পড়েছে তাতে পল্লীগুলি দ্রুত শহরে পরিণত হচ্ছে এবং বহুজনপদ থেকে লোক-সংগীতগুলি অচিরে বিলুপ্ত হবে—এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রচলিত লোকসংগীতগুলির সংরক্ষণে বিশেষ যত্নবান না হলে সংগীতসংস্কৃতির একটি বৃহৎ অংশ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে। এই রকম যেখানে অবস্থা সেখানে মূল লোকসংগীতের পরিবেশনকে উৎসাহিত না করে স্বরচিত পল্লীগীতি প্রচারে উৎসাহ প্রদান করাটা সুচিন্তিত বলে আমাদের মনে হয় না। লোকসংগীত একটা উৎকৃষ্ট আর্ট; তার আসল রূপটি যতদিন পারা যায় ততদিন উজ্জীবিত রাখাই শ্রেয়। কালধর্মে লোকসমাজ পরিবর্তিত হবে কিন্তু এক একটা আর্ট ক্লাসিকাল হয়ে থাকবে আর্টের গৌরবই হচ্ছে এইখানে। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত মনে করি যে এই বিষয়টি একবার পাঠকদের কাছে তোলা হয়েছিল। অনেকেই লোকসংগীতে মিশ্রণ বা নিজস্ব রীতির প্রয়োগ পছন্দ করেননি। এতে বোঝা যায়—লোকসংগীতের আসল রূপটিই বেতার শ্রোতারা পছন্দ করেন।

এ সম্পর্কে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—নতুন সৃষ্টি সব সময়েই কাম্য—তাহলে লোকসংগীতের ক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টিতে আপত্তি হবে কেন? এর একটা উত্তর আমরা প্রথমেই দিয়েছি যে লোকসংগীত লোকসমাজের পরিণতির সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আচমকা একটা সৃষ্টি লোকসংগীতে স্বীকৃত হয়নি। পল্লী-সংগীতেও নতুন সৃষ্টি হয়েছে বৈকি কিন্তু তা অনুকূল পরিবেশে স্বাভাবিক নিয়মে পল্লীগায়কদের মধ্যেই হয়েছে—অপর কোথাও হয়নি। শহরের মাঝখানে অপেক্ষাকৃত তরুণ সম্প্রদায় পল্লীগীতির নামে যা সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছেন তাকে পল্লীগীতি বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। পল্লীর সঙ্গে এঁদের যোগ কতটুকু? এবং আদৌ আছে কিনা সন্দেহ। যে কোন লোককে গেরুয়া পরিয়ে দিলেই সে সন্ন্যাসী হয় না—সেটা কেবল ভেক ধারণ মাত্র। স্বরচিত পল্লীগীতি অনেক ক্ষেত্রে এইরকম পল্লীগীতির ভেক ধারণ করে শ্রোতাদের বিভ্রান্ত করে চলেছে। আরো একটু সত্য কথা বাধ্য হয়েই বলতে হয়—যদিচ সেটা অপ্রিয় সত্য। এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা পল্লীসংগীতে অভিজ্ঞ এবং তাঁরাও পল্লীগীতি রচনা করে থাকেন। কিন্তু সে রচনা তাঁরা পল্লীতে শোনাতে বাসনা করেন না, প্রচার করতে চান শহরে। যখনই তাঁরা শহরের উদ্দেশ্যে পল্লীর গান বাঁধেন তখনই তার মধ্যে শহরের উপযোগী কিছু ভাবভঙ্গী এসে পড়ে বৈকি। তখন রাগপ্রধানের মত একজাতীয় গান রচিত হয় যা পল্লীপ্রধান আখ্যা গ্রহণ করতে অবশিষ্ট থাকবে না। এতে প্রচার এবং পল্লীপ্রধানেরও কোন কূলের প্রাধান্যই অবশিষ্ট থাকে না। এতে প্রচার এবং প্রফেসন বজায় থাকবে—থাকবে না কেবল মূল বৈশিষ্ট্য।

স্বরচিত পল্লীগীতির সঙ্গে কিন্তু পল্লীগীতির প্রভাবে রচিত সংগীতের সম্বন্ধ নেই। কাব্যসংগীতে পল্লীগীতির প্রভাব অনেকের ওপর পড়েছে এবং তাঁদের রচনাকে বিচিত্র করে তুলেছে। এখানে একটা আর্টের প্রভাব আর একটা আর্টের ওপর পড়ছে যার ফলে একটা বৈচিত্র্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এই উদ্যমে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়;—কিন্তু অপর উদ্যমটি নেহাৎ নকল ছাড়া আর কিছু নয় এবং সে-নকল বহুল পরিমাণে স্বার্থ-প্রণোদিত।

পত্রাবলী।

নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১২৬ ॥

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে মিশ খায় এমন একটি মনের ভাব আছে—তাকে বলা যেতে পারে উজ্জ্বল প্রসন্নতা। বর্ষার মেঘপুঞ্জ যখন কিছুক্ষণের জন্যে দিগন্তে তালবন শ্রেণীর মধ্যে কালো তাঁবু ফেলে জমিয়ে বসে তখন যে শান্ত স্নিগ্ধ আলোটি এখানকার মাঠে মাঠে ঝলমল করে ওঠে সেই আলোর মতো স্নান করা উদার বিস্তীর্ণ দীপ্তি যখন মনকে অধিকার করে থাকে তখন এখানে থাকাটি সার্থক হয়ে ওঠে। কিছুদিন থেকে সেই রকমের একটি পরিব্যাপ্ত পরিতৃপ্তি আমার মনে বিরাজ করছিল—জানলা থেকে বাইরের দিকে চাইলেই সমস্ত কিছুর সঙ্গে একটি সহজ মিলনের অনুভূতি সেই মুহূর্তেই আমার চেতনাকে কচিধানের কোমল সবুজ প্রাণের রঙে রাঙিয়ে দিত। লিখতুম বা ছবি আঁকতুম বা চুপচাপ কেদারায় ঠেস দিয়ে নিষ্কর্মা বসে থাকতুম এই আভাটি তার পিছনে সর্বদাই থাকত। আমার মনে হয় যে-সপ্তকে আমার জীবনের গান বাঁধা এইটিই তার মূল সুর। এইটে চাপা পড়ে তখন প্রাণটাকে বেয়ে নিয়ে যাওয়া যেন তুফানের টলমলে নৌককে দাঁড় টেনে চালানোর মতো অত্যন্ত ক্লান্তিকর ব্যাপার হয়ে ওঠে। অর্থাৎ তখন টানাটানি করতে করতে মন হাঁপিয়ে পড়ে অথচ নৌকাও বেশি এগোয় না। আমার একটি কবিতার প্রথম লাইনে আছে "সুখ অতি সহজ সরল"—সেই দুর্লভ সুখের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে—সেই সুখের স্পষ্ট হিসেব দেওয়া যায় না, সেই সুখটা বিশেষ কোন্ জিনিস নিয়ে তার সুনির্দিষ্ট জবাব অসম্ভব। যে-বীণার ঠিক তার বাঁধা হয়েছে সে-বীণা বাজুক না বাজুক তার নিজের সঙ্গে নিজের যে সামঞ্জস্য—এই সুখটিও তারি মতো। আপনার মধ্যে আপনি বাধা না পাওয়ার সুখ। আমার একটা মুস্কিল এই যে, আমার মন দেয়াল দেওয়া বাড়িতে বাসা পায়নি—চারদিকের ভিড়ের মনটা তার ঘাড়ের উপর এসে পড়ে। আমাদের দেশের যে ভিড়ের আড্ডাটা কলকাতার শহরে তার ধারাটা আমার মনের ধারার প্রতিকূলে—এই জনোই ভিতরে ভিতরে সে আমাকে ক্লান্ত করে—আমার চিন্তার ও কর্মের ব্যাঘাত করে। চারিদিকের স্পর্শ আমার কাছে এত প্রবল বলেই এখানকার সুবিস্তীর্ণ খোলা আকাশ আমার পক্ষে এত অত্যন্ত আবশ্যক। বিদেশে যখন থাকি তখনো এই আকাশের উদার বেষ্টনের জন্যে আমার মন উৎসুক হয়ে থাকে। কিন্তু সেখানে মানুষের মন বড়ো করে গভীর করে সত্য করে চিন্তা করে, এইজন্যে সেখানকার চিত্তের টানে আমার চিত্তকে সহজেই চিন্তা করায়—চারিদিকের অগোচর আনুকূল্য আমার মনকে সম্পূর্ণ জাগিয়ে রাখে—মন নিজের ফসল সেখানে ষোলো আনা ফলাতে পারে—জাপানে যে কয়দিন ছিলুম কত সহজেই কত ভেবেচি কত বলেচি কত লিখেছি তার ঠিকানা নেই। আমাদের দেশের ভিড়ের মন কেবলি মাৎলামি নয় তোৎলামি করে, তার প্রকাশ, হয় অসম্পূর্ণ, নয় বিকৃত—তার অপরিসীম দম্ভ মূঢ়তা থেকে, প্রাদেশিকতা থেকে—সে জানেই না যে, সে কত অভাজন, কেননা যেখানে মানুষের চিন্তার উদার ক্ষেত্র সেখানে তার প্রবেশ নেই, তার আনন্দ নেই। আমার সঙ্গে এই মনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ অতি অল্পই, কিন্তু অজ্ঞাতসারে চারদিকের মনঃপ্রকৃতির আবহাওয়া, এড়িয়ে চলা যায় না;—অন্তত আমার মন চৌমাথায় থাকে—এইজন্যে তাকে ঠেলা খেতেই হয়, এই জন্যে এক এক সময়ে মন নিরতিশয় উত্তেজিত হয়ে থাকে—কেবল মাত্র স্থূলহস্তাবলেপের তাড়নায়—অথচ হস্ত দেখা যায় না। যারা আমাকে এই বলে গাল দেয় যে, দেশের সঙ্গে আমার মনের সুর মেলে না তাদের অপবাদ মানতে রাজি আছি যদি বর্তমান কালের তারাই আমার দেশ হয়। কিন্তু দৈবক্রমে তারা উনবিংশ কিম্বা বিংশশতাব্দীতে দেশে জন্মেছে বলেই তারাই সমস্ত দেশ একথা স্বীকার করার মতো লজ্জার কারণ কিছুই নেই। আর যদি তাদের সঙ্গেই আমার বেমালুম মিল হ'ত তাহলে আমার জন্মের মতো ব্যর্থতা কী হতে পারত? যে মরা বীজ মাটিকে একান্ত স্বীকার করে নিল সেইত হ'ল মাটি—যে বীজ স্বীকার করে নি, মাটিকে বিদীর্ণ ক'রে ঠিক তার বিপরীত দিকে মাথা তুলেচে—সেই পারে ফল দিতে, ছায়া দিতে। আমার দিকটা এই মাটির উল্টো দিক—আকাশের দিক—একথা জোর করে বলুব। কিন্তু সে যেন গেলো। কাল সকালে তাই বলে তোমার জ্বরের তাপ ৯৯·৪° হবার কি কারণ ঘটল? আশা করি আবার টেম্পারেচারের নূতন অধ্যায় সুরু হল না। এখানে রিহার্সালের জন্যে সবাই তাগিদ দিচ্চে। ইতি

৫ ভাদ্র ১৩৩৬

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুনয়নীর সেই ছবিটা চাই।

ওঁ

॥ ১২৭ ॥

শান্তিনিকেত[ন]

কল্যাণীয়াসু,

আমি যেদিন এসেছি, সেই দিন থেকে খুব বৃষ্টি। কা[ল] রাত্রিশেষে বৃষ্টি থেমেচে। আজ সকালে উদয়নের সামনেক[ার] রাস্তায় পায়চারি করছিলুম। পথের ধারের টগর গাছের শ্রে[ণী] ফুলে ছেয়ে গেছে। ছাতিম গাছের উপর যে মালতী ল[তা] উঠেচে—সেটা শাদায় সবুজে বিচিত্র। জবা ফুল ঝরে পড়ে[ছে] কাঁকর-বিছানো পথে। দক্ষিণে শান্তিনিকেতনে ঘন সব[ুজ] তরুসঙ্ঘের মাঝে মাঝে দেখা যায় সেগুন গাছের শিখরগু[লি] অপর্যাপ্ত মঞ্জরীতে তরঙ্গিত। ঘাসের মাঝে মাঝে মে[হেদি] গুল্মের গাঁঠে গাঁঠে বেগুনি ফুলের কণিকা। কেবলম[াত্র] আয়তনে ছোটো বলেই তাদের কেউ স্বতন্ত্রভাবে লক্ষ্য ক[রে] না—কিন্তু বর্ষার সভার আস্তরণে যে প্রচুর বর্ণের সঙ্গতি ত[ার] মধ্যে ঐ বেগুনির ফুটকিগুলির পরে ওস্তাদের বিশেষ [...] দেখতে পাই। কাদম্বরীতে প্রভাত বর্ণনায় আছে প[...] দিগন্তের বর্ণ শুক্তির ভিতরকার রঙের মতো কো[মল] গোলাপী। আজ সকালে আকাশের অল্প একটুখানি [...] সেই আভাটুকু ধরা পড়েছিল—দেখতে দেখতে মিলিয়ে গে[ল।] টেনিস প্রাঙ্গণের তারদেওয়া বেড়ার উপরে এক জোড়া শা[লিক] পাশাপাশি বসে ডানার পালখগুলি ফুলিয়ে তা'তে হা[ওয়া] লাগাচ্ছিল—ক'দিন বৃষ্টির উৎপাতে ভিজে গিয়েছিল—[...] হচ্চে ওদের নীড়ের মধ্যেও শুকনো জায়গা পায়নি—[...] সকাল হবামাত্র আকাশ প্রশন্ন দেখে পাখী শুকোতে বে[...]

আমিও সকালে সূর্য ওঠবার আগে মেঘমুক্ত আকাশের নীচে আমার মনের পাখা ফুলিয়ে দিয়ে তাতে হাওয়া লাগাচ্ছিলুম। মনে মনে ভাবছিলুম কাজকর্ম লেখাপড়া অনেক করেছি—আর কেন? জীবনটা আরম্ভ করেছিলুম লক্ষ্যবিহীন দিন নিয়ে—কেবলমাত্র হয়ে ওঠবার উদ্যম ও আনন্দ নিয়ে—অর্থাৎ তখন জীবজন্মের সর্বপ্রথম কাজে প্রবৃত্ত ছিলুম—নিজের সঙ্গে বাইরের পরিচয় সাধন। চেয়ে দেখচি, ঘুরে বেড়াচ্চি, খেলা করচি। তারপরে এলো উদ্দেশ্য—শেখা চাই, করা চাই, দেওয়া চাই। তখন চেয়ে দেখবার আর সময় পাওয়া যায় না। বেশ ভরপুরভাবে বাইরের সঙ্গে মুখোমুখী করে বসা অনেক দিন থেকে বন্ধ। আচ্ছা ভালোই, প্রায় পঞ্চাশ বছর থেকে কিছু সঞ্চয় করা গেলো—কিছু দান করা গেল, কিছু গড়ে তুলতে পারলুম—দেনা পাওনা বোঝাপড়ার হাটে ভীড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি কম হয়নি—বস্ এবারে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে দোষ কি? একথাটা অনেকবার বলেচি—আরো বারবার বলতে হবে—কেননা মনের মধ্যে প্রায় প্রতিদিনই ছুটির ঘণ্টা বাজে, কিন্তু মনিব আপিসের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। সে মনিব যে আমার নিজেরই ভিতরে—তার সঙ্গে যতই ঝগড়া করি তাড়াতে পারিনেত। কিন্তু একথা মনে রাখাই চাই যে, জীবনের আরম্ভে ছিলুম তীরে, সেখানে আপন মনে চলেছি, ফিরেছি, দেখেছি শুনেছি—তারপরে যাত্রা করা হল জল পথে, তখন প্রাণপণে দাঁড় টানা, লগি ঠেলা, তুফানের ধাক্কায় নাকাল হওয়া। সেও স্বীকার করা গেল, কিন্তু উপসংহারে আর একবার তীর আছে—নৌকো ভিড়িয়ে আবার উঠ্‌তে হবে ডাঙায়; প্রথমকার তীর পেতে আমাকে চেষ্টা করতে হয়নি—এবারকার তীর পেতে আমাকেই চেষ্টা করতে হবে। তার দরকার আছে। বাল্যকালে নিযুক্ত ছিলুম হয়ে ওঠা নিয়ে—ক'রে-তোলাটা এলো মাঝে—তারপরে আর একবার ভিতরের দিক থেকে হয়ে-ওঠার দরকার খুব বেশি। আর একবার পরিচয় সাধন চাই—এবার খুব বড়ো করে। গ্রন্থের ভূমিকায় একটা পরিচয় ছিল উপসংহারে তার চেয়ে বিচিত্রতর পরিপূর্ণতর পরিচয় থাকা চাই। এই কথাটা কেবলি মনে আসে। তরণী পরিনামের ঘাটে ভিড়লেই হয়—তার গা দিয়েই চলেছি—তবু দাঁড়টানা থামে না। আত্মপ্রকাশের দুষ্কর পালা এখন শেষ করলেই হয়—এখন আত্মসমর্পণের সময় এল—তবু কেরাণী ডেস্ক ছাড়ে না—সে ওভারটাইম কাজ করে বাহাদুরী করতে চায়। কিন্তু স্পষ্ট দেখচি অন্তর-মহলে তা নিয়ে নালিশ উঠ্‌চে। যেমন একদিন ছিল যখন কর্তব্য না করাটাই ছিল অপরাধ—এখন দেখ্‌তে পাচ্চি অপরাধ, কর্তব্য করাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষকে কাজ করাই চাই একথাটা সম্পূর্ণ বাজে কথা—কাজ করাটা যত বড়োই হোক কাজ না করাটাও তার চেয়ে কম বড়ো নয়।—বরণডালার কপি পাঠাচ্চি। "রাখী" নামটা কি রকম লাগে? "সানাই" "সাহানা" "রাগিণী" "আটছড়া"? ইতি ৭ ভাদ্র, ১৩৩৬

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১২৮ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আমার মনের মধ্যে বিশেষ এক একটা ঋতুর মতো আসে—তা কিছুকাল থাকে—তার হাওয়ার গতিতে উত্তাপে ক্রিয়ায় একটু বিশেষত্ব আছে—তার মেয়াদ ফুরোলে সে চলে যায়। সে চলে যায় বলেই তাকে মিথ্যা বলা ভুল। এই ঋতুগুলি আমারই মনের প্রকৃতিগত। শীত বসন্ত বর্ষা পরস্পর পার্থক্য, এমন কি, বিরোধ সত্ত্বেও এই পৃথিবীর, ক্ষণিকত্ব সত্ত্বেও তারা চিরকালীন। এও তেমনি। কয় দিন থেকে মনের ভিতরে একটা কথা ঘুরে বেড়াচ্চে। একটা বিদ্রোহ। পৃথিবীতে আমার নিন্দুকের অভাব নেই তৎসত্ত্বেও একটা জনশ্রুতি প্রচলিত হয়েছে যে, আমি বড়ো লোক। পরের চাপানো এই অমূলক কথাটার বোঝা আমার উপর থেকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে আমার মন প্রায়ই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। যারা বড়ো লোক, তারা লোকসমাজের লোক—প্রত্যক্ষভাবে মানুষের সঙ্গে তাদের ব্যবহার—তাদের যে-সৃষ্টি, কেবল যে তার লক্ষ্য মানুষ, তা নয়, তার উপাদান মানুষ। মানব সম্বন্ধের পরে তাদের প্রভাব,—মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে তবেই সেটা সম্ভবপর হয়। অধিকাংশ সময়েই তারা তাদের স্থানিক ও সাময়িক লোকের প্রিয় হয় না, কিন্তু তবু তাদের আসন কণ্টকময় হলেও লোকালয়ের মাঝখানেই তাদের সেই আসন। উপাদান হিসাবে মানুষের মতো এমন কঠিন আর কিছুই নেই। এদের নিয়ন্ত্রিত করতে দুর্জয় ইচ্ছাশক্তির দরকার;—ভালো পথে এদের নিয়ন্ত্রিত করতে গেলে অত্যন্ত বিশুদ্ধভালো হওয়া চাই, মোহবর্জিত ভালো, নিষ্কাম ভালো, সহজে ত্যাগশীল ভালো—এমন ভালো যা নিন্দাকে ক্ষতিকে, ভুল-বোঝাকেও অনায়াসে স্বীকার করে নিতে পারে যা সত্যে অবিচল, কর্মে অক্লান্ত। আমি এ জাতের মানুষ একেবারেই নই। আমাকে যারা ভাববিলাসী বলে গাল দেয়, তাদের কথাটার মধ্যে খানিকটা সত্য আছে। আমি ভালো কাজও যদি করি সে ভাবের প্রেরণায়, চারিত্রের প্রেরণায় নয়—এই জন্যেই প্রশংসা আমি পেয়েছি, মানুষকে পাইনি। আমি আমার জনবহুল কাজের মধ্যে একলাই রয়ে গেছি। এই একাকিত্ব আমার পক্ষে সুখকর নয়, কেননা, মানুষকে নিয়ে যে-কাজ সে হচ্ছে একলা থাকা একটা বিরুদ্ধতা—সে কাজে মানুষকে পাওয়ার নিতান্তই দরকার ছিল। কিন্তু যা দিয়ে মানুষকে পাওয়া যায়, সেই সম্বল আমার প্রচুর নেই—অথচ যে-কাজ আমি এত দীর্ঘকাল বহন করছি তার প্রতি আমার ভাবের তাগিদ দুর্নিবার বেগেই আমাকে ঠেলে রেখেচে। ছেলেদের শিক্ষা বল্‌তে যা বোঝায়, তার একটি কল্পমূর্তি বহুকাল থেকেই আমার মনের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে আছে—বাইরে তাকে সুস্পষ্ট না করতে পারলে মন শান্তি মানে না। গ্রাম সংস্কার কাজের মূল্য বহুদিন থেকেই আমার মনকে আকর্ষণ করেছে—সে সম্বন্ধে শুধু চিন্তা করে বা প্রবন্ধ লিখে আমার বাঁচবার যো ছিল না। কাজে নামতেই হোলো—আমার অর্থসামর্থ্য ঢেলে দিয়েছি, কঠিন বাধাবিপত্তিতেও নিবৃত্ত হইনি। কিন্তু মানুষকে নিয়ে কাজ করবার যোগ্যতা আমার নেই। সংক্ষেপে—আমি বড়লোক নই। পালের নৌকো ছিল আমার, স্রোতের নৌকো ছিল আমার, সে আমার একলা চলার খেয়া, সে আমার সাহিত্য, আমার কবিত্ব—কিন্তু একদিন ভাসাতে হোলো উজানে বাওয়ার নৌকো—উপযুক্ত সংখ্যক দাঁড়ী যদি পেতুম ভাবনা ছিল না—কিন্তু কেউ তাকে শুনলে না, পুরো পরিমাণ পারিতোষিক দেবার মতো তহবিলও জমলে না—সুতরাং একলাই লগি ঠেল্‌তে হচ্চে। এ দুঃখ মানতেই হবে শেষ পর্যন্ত—তা হোক, তাই বলে বড়োলোকের খ্যাতিটা আমার এতই অবাস্তব হয় যে, ওটাতে আমাকে নিতান্ত কুণ্ঠিত করে। আমি চাই, একেবারেই সহজ লোক হ'তে—অর্থাৎ সকালে উঠে দেখ্‌বে আমার গাছগুলি বর্ষার জলে প্রফুল্ল হয়ে উঠেচে, পুষ্প সদাঃস্ফুট চামেলি এবং পাখীর কাকলীতে রচিত একটি পরম বিস্ময়ের মতো, নিস্তব্ধ প্রভাতে আমার ঘরের মধ্যে ঢুকে দাদামশায় বলে যাতা বকুনি জুড়ে দিয়েচে, আমার ভালো লাগবে কল্পনা করে হারাস্যার মীরার ওখানে গেছে অনিমণ্ডে প্রয়াসে আমার জন্যে গজা তৈরি করে দিতে, দিগন্ত সংলগ্ন আনীল বনরাজীর গায়ে গায়ে

সাঁওতালদের গ্রাম দেখা যাচ্চে, বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে সংগ-বিহীন এক একটা তালগাছ মেঘের ছায়া জড়িত বর্ষার মধ্যাহ্ন রৌদ্রে আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে—এরই ফাঁকে ফাঁকে লিখচি পড়চি ভাবচি, দুচারটি লোকের সংগে দেখাশুনো বলাকওয়া চলচে—সত্য করে বলতে পারচি জগৎটাকে ভালো লাগল, আপন অন্তরের মধ্যে পেয়েছি রস, কৃপণের মতো কিছু আঁকড়ে ধরিনি, যা কিছু পেয়েছি সমস্তই দিয়ে শেষ করে গেছি—বাস্—জীবনের পাত্রে যতটুকু ধরে সবটুকু ভর্তি করতে পেরেছি, নিজের পেট ভরাবার জন্যে নয়, যে চেয়েছে, যে কাছে এসেছে তাকে খুসি করে দেবার জন্যে।—এই সহজলোকের জীবনযাত্রার সুযোগটা আর নেই, আর বড়োলোকের জীবন যজ্ঞের আয়োজনটাও ক্ষমতার অভাবে একান্ত কৃচ্ছ্রসাধ্য হোলো, অথচ আমার যা-কিছু দেবার তার চেয়ে বেশি বই কম দেওয়া হোলো না।

যাক্‌গে, আপাতত কেমন আছ সে খবরটা দিয়ো। বুঝতে পারচি এ খবরের মধ্যে নূতনত্ব দেখা দিচ্চে না, ৯৯কে কেন্দ্র করে তার চারদিকে দুই থেকে ৮ পর্যন্ত পয়েণ্টগুলো আবর্তন করচে—প্রোটোনের চারদিকে ইলেকট্রোন কণার মতো।—আমার ঘাড়ে চেপেছে রিহার্সাল—তোমার জ্বরের মতোই সেটা সায়াহ্নিক এবং সেই রকমই সন্তাপজনক। ইতি ৯ ভাদ্র, ১৩৩৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১২৯ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার শরীর ভালো নেই অথচ আমি আপন মনে যেন সমুদ্রের অন্য পারে বসে যা মনে আসে তাই বকে যাই অবস্থার সংগে এটা ঠিক খাপ খাচ্চে কিনা বুঝতে পারচিনে। দুর্বল শরীরে মানুষ সেবা ইচ্ছা করে, অর্থাৎ ব্যক্তিরূপের দান—এমন কিছু একটা চেষ্টা যেটার সংগে রোগার্তের আশু প্রয়োজনের অব্যবহিত যোগ আছে। অর্থাৎ চিঠিটা হওয়া উচিৎ কলম দিয়ে লেখা নয়, লেখনী দিয়ে লেখা;—কলমের লেখা হয়তো চিন্তার খোরাক দেয়, কিন্তু লেখনী দেয় সংগ। আমার এক এক সময় মনে হয় জোর কলমের উৎপাতে আমার লেখনী গেছে আমাকে ত্যাগ করে। গাঁয়ের পাশে খেয়া পারাপারের যে নদীতে এ কূল ও কূল পরস্পর কাছাকাছি—এমন কি যেখানে ধুতি গুটিয়ে হেঁটে পার হওয়াও চলে, যেখানে ডাক পাড়লে তখনি ওপারের বাঁশতলার রাস্তা থেকে প্রতিধ্বনি ফিরে আসে আমার পাড়ার সেই নদীটি একদা কোন্ চৈত্র মাসের শেষে বৈশাখের অনাবৃষ্টির দিনে শুকিয়ে গেছে—আছে গ্রামের দিগন্ত পেরিয়ে ঐ বড়ো নদীটা—সেখানে ভারী ওজনের পণ্য নিয়ে মহাজনী নৌকোগুলো চলে। প্রতিদিনের ফুল ফল শাক সব্জির ডালি সে নৌকোকে ভয়ে পরিহার করে। উপায় নেই, আজকাল আমার চিঠিতে আলাপ থাকে না, আলোচনা থাকে। কিন্তু তবু একটা কথা মানতে হবে আমার এই চিঠিগুলো বিশুদ্ধ প্রবন্ধ নয়। বাতাস যখন উত্তরে বয়, তখন সেটা শীতের হাওয়া, যখন দক্ষিণে বয়, তখন সেটা বসন্তের। তেমনি, কোন্ দিকে মুখ করে লেখা তার উপরেই লেখার বিশেষত্ব দাঁড়িয়ে যায়। জ্যোতির্বিদ দেখতে পেলেন একটা গ্রহ চলচে তার সরকারী রাস্তা থেকে একটুখানি পাশ কাটিয়ে—অমনি তিনি হিসাব করে আন্দাজ করতে পারেন যে, কাছাকাছি কোথাও আর একটা গ্রহ আছে, সাধারণ পথকে সে আপনটানে একটুখানি অসাধারণ করে দেয়। প্রবন্ধের ওজনের মোটাকথাওয়ালা চিঠিও পড়ে দেখলে বোঝা যায় প্রবন্ধের বাঁধা রাস্তা কাটিয়ে সে আড় চালে চলচে। এটা হয় স্বতই। প্রবন্ধ যখন লিখি তার দায়িত্ব হচ্চে ভেবে চিন্তে ঠিক কথাটি লেখা। অর্থাৎ যেটা যুক্তি তর্ক গবেষণায় মজবুৎ করে গাঁথা। আর অপ্রবন্ধ রচনা সেও ঠিক কথা, অর্থাৎ ঠিক আপন কথা। প্রতিবাদ করে আর সবই তার উড়িয়ে দিতে পারো কেবল তার আপনত্বটুকু। আমার নিজের মত হচ্চে ঐ আপনত্বটুকু নিয়েই সাহিত্য। আমের আপনত্বটুকু হচ্চে আমের স্বাদে গন্ধে বর্ণে। বস্তুর বিচারে তার পরিচয় নয়। এই কারণেই নিতান্ত কর্তব্যের দায় না পড়লে প্রবন্ধ লিখতে আমার ইচ্ছাই করে না। যদিও প্রবন্ধেও খানিকটা আপনত্ব এসে পড়ে—কিন্তু সেটা মুখ্য নয় গৌণ। চিঠিতে যা লিখি সেটা পুরোপুরিই আপন কথা। একেই বলে আত্মপ্রকাশ—নিজের অব্যক্তকে ব্যক্ত করে যাওয়া। এর একটা রস আছে, সেটা অহমিকা নয়। এক হিসাবে বৈজ্ঞানিক তার বীক্ষণাগারে বস্তুর আত্মস্বরূপ দেখে যে-রস পায় এও সেই জাতের। প্রকাশ করতে করতে নিজেকে দেখি—সেই নিজেটি সংকীর্ণ পদার্থ নয়—সেটা যদি সত্য হয় তার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতি আছে, সেই জন্যেই অন্যলোকেরও সেটা ভালো লাগে। বৈজ্ঞানিকের পক্ষেও সেই একই কথা—সে যখন বস্তু-বিশেষের বাস্তবরূপ দেখে তখন এমন কিছু দেখে যা সেই বস্তুর সংকীর্ণ বিশেষত্বের অতীত। নিজের কবিতার মধ্যে কবি নিজেকেই একান্ত করে দেখে তা নয় নিজের ভাবরূপের মধ্যে একটি বিশ্বরস পায়। তাই সে মনে করে এটা রয়ে গেল হয়তো ভুল মনে করে কিন্তু এই তার প্রতীতি—সেই নিজে তার গৌরব অনুভব। চিঠিতে যে স্বগতউক্তি প্রকাশ হয় সে যদি ঠিকমতো হয় তবে তার মধ্যেও আত্মানুভূতি একটি সত্য ভূমিকা পেয়ে খুসি হতে থাকে। তোমাকে চিঠি লেখার সুযো চিত্তের প্রকাশের এই একটি বিশেষধারা আমি পাই। চি লেখার পথ ছাড়া এধারা অন্য কোনো পথে বইতে পারত না কিন্তু এই কথা শুনে যদি আমার সংগে ঝগড়া করবার এক ছুতো পাও, যদি ফস্ করে বলে বসো যে তাহলে আপনা চিঠিগুলো নামমাত্র আমাকে লেখা, তবে অন্যায় হবে। এ চিঠি লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্য দুইই তুমি একসংগে। রোগশয্যায় চি পেলে হয়ত তুমি খুসি হবে এইটেই হল লেখার মূল কারণ—এই কারণ না থাকলে চিঠি লিখতুমই না। কিন্তু যখন লিখ বসি তখন চিরকালের অভ্যাসবশত তোমাকে লেখার স সংগেই নিজেকে লিখি। এর মধ্যে যদি কোনো সংবাদ থা তবে সে সংবাদ তুমিও যেমন পাও আমিও তেমনি। ও আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। মহুয়ার কবিতা যখন লিখতে প্রবৃ হলুম তখন তার প্রবর্তনা ছিল কর্মসচিবের প্রতি জেদ ক বিবাহে উপহারযোগ্য কবিতা লেখা, কিন্তু যে-মুহূর্তে লিখ বসা যায়' সেই মুহূর্তে অন্য সমস্ত ভুলে লেখা আপ প্রকৃতিতে ভর করেই চলতে থাকে। ওড়বার ফরমাস গো ছিল বলেই পাখি যে ফরমাসী ডানা আমদানি করে, এক টম্‌সন সাহেবের সমালোচনার মতোই অশ্রদ্ধেয়। এই কারণে রচনার আনুষঙ্গিক বাইরেকার ঘটনাগুলো না জানাই ভা —কেননা, যারা অরসিক তারা বাইরেকার জিনিষটা স্পষ্ট দৃশ্যমান বলেই সেইটার দ্বারাই ভিতরকার রসের ব্যাখ্যা বিচার করে। মাটির উপরে বীজের পতনটা বাতাসের দ্বার হতে পারে মানুষের দ্বারাও হতে পারে—কিন্তু অঙ্কুর হয় সেটা বীজের আপন স্বভাবের প্রেরণায়। তবুও মা স্বহস্তে বীজকে বপণ করে এ তথ্যটি সামান্য নয়, এর হবে মানুষের ইচ্ছার মূল্য—সেই রকমই যে চিঠি তোম বিশেষ করে লিখ্‌চি তার রচনার মধ্যে নির্বিশেষত্ব থাক এই ইচ্ছেটুকুর মূল্য যাবে কেন? বনমালী খবর দিলে খা প্রস্তুত।' তার থেকে বুঝবে ঘড়িতে এখন বারোটা বা কুড়ি মিনিট। আশা করি এখন তোমার দেহতাপের মাত্রা থেকে বেশি উচ্চে নয়। ইতি ১২ ভাদ্র ১৩৩৬

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকু

সতী-মা

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

সন ১৩৬৭। ১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতি-বার। আজ পূর্ণিমা, শুধু পূর্ণিমা নয়, ফাল্গুনের দোলপূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ। এইদিন এক মহা শুভদিন, এক পরমস্মরণীয় পুণ্যতিথি।

আজ থেকে পৌনে পাঁচশত বৎসর পূর্বে এই পরম তিথিতে ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছিলেন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ। সেদিনও চন্দ্রগ্রহণ। সহস্র সহস্র নবদ্বীপবাসী ভাগীরথীর তীরে সমাগত হয়েছেন। গ্রহণের আর বিলম্ব নেই। সহসা জগন্নাথ মিশ্রের অন্তঃপুর শঙ্খহুলুধ্বনিতে রণিত হলো।

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥
এত জানি রাহু কৈল চন্দ্রেরে গ্রহণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি নামে ভাসে ত্রিভুবন॥

জড়তার ও ধর্মান্ধতার, বিদ্বেষ-কলুষ ও পাপ কালিমার রাহুগ্রাস থেকে মানবচৈতন্য-চন্দ্রকে বিমুক্ত করার সাধনা সূচিত হয়েছিল নদীয়ার নিমাই-এর আবির্ভাবে। তাই তাঁর নাম চৈতন্য,—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

আটচল্লিশ বৎসর বয়সে চৈতন্যদেব নীলাচলে লীলা-সংবরণ করেন। দেড়শত বৎসর পরে চৈতন্যের দিব্যভাতি ললাটে গ্রহণ করে আর এক পরম সাধক নদীয়ার উলা-বীরনগর গ্রামে আবির্ভূত হন। তিনি আউলচাঁদ ফকির। ভক্তগণের বিশ্বাস স্বয়ং শ্রীচৈতন্যই নীলাচলে অন্তর্ধ্যানের পর আউলচাঁদ রূপে পুনরাবির্ভূত হন। তাঁর স্মৃতিচিহ্নপূত এই ঘোষপাড়ায় প্রতি বৎসর গৌরপূর্ণিমায় বহু ভক্ত ও সাধক সমাগম। সেই সঙ্গে এখানকার শ্যামস্নিগ্ধ আম্রকানন জুড়ে সহস্র যাত্রীর এক বিরাট মেলা।

কোথায় এই ঘোষপাড়া? কেমন করে যেতে হবে? দুর্গম পথের আয়াসে যাঁদের নেশা লাগে, তাঁরা অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হবেন। এ স্থান ভারি নিকটে, এ পথ নিতান্ত সহজ। চিঁড়েগুড়ের পুঁটলি বেঁধে পিঠে ফেলতে হবে না, হাঁটতে হবে না আলভাঙা মাঠে ডালভাঙা মাইলের পর মাইল। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে সোজা চলে যান রাজপথ যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই ব্যারাকপুর। ব্যারাকপুর থেকে ভাগীরথীর পূর্বতীর ধরে চলেছে আর এক পাকা সড়ক—নাম ঘোষপাড়া রোড। এই উত্তরগামী সড়কও যেখানে ফুরিয়েছে সেখানেই ঘোষপাড়া। এই রাস্তা গ্রেটার ক্যালকাটার প্রাণশিরা। হালিশহর পর্যন্ত গঙ্গার ধারে ধারে বিশাল বিশাল পাটকল কাগজকল বিদ্যুৎকল। লক্ষ মিল-শ্রমিকের আবাস। আবার কতো বাঁধাঘাট, কতো বৃদ্ধ বট, কতো প্রাচীন দেবমন্দির। এই পথেই বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতির মহা-সাধনক্ষেত্র ভট্টপল্লী, এই পথেরই পাশে রাম প্রসাদ-সিদ্ধপীঠ কুমারহট্ট হালিশহর।

ব্যারাকপুর থেকে এই ঘোষপাড়া রোডের উপর দিয়ে কাঁচড়াপাড়া স্টেশন পর্যন্ত বাস চলে। মেলার সময় এই বাস ঘোষপাড়া পর্যন্ত যায়। অন্য সময় বাগের মোড়ে গিয়ে কাঁচড়াপাড়া স্টেশনের দিকে বাঁক নেয়। বাগের মোড় একটি জনবহুল কোলাহলমুখর চৌমাথা। দক্ষিণে হালিশহর, উত্তরে কল্যাণী, পূর্বে কাঁচড়াপাড়া রেল স্টেশন। পশ্চিমে ভাগীরথীতটে অধুনা-বিলুপ্ত রানী রাসমণির ঘাট। কাঁচড়াপাড়া থেকে কল্যাণী পর্যন্ত আলাদা একটি বাসরুট আছে। এই বাগের মোড় চব্বিশ পরগণা জেলার উত্তর সীমান্ত। তার মাইল দুই উত্তরে কল্যাণী ও তার অন্তর্ভুক্ত ঘোষপাড়া। নদীয়া জেলার অন্তর্গত। থানা চাকদহ। কলকাতা থেকে দূরত্ব বড়োজোর পঁয়ত্রিশ মাইল।

দোলপূর্ণিমার আগের দিন সন্ধ্যা থেকে মেলা জমে। মন্দিরে তিনদিনব্যাপী উৎসব। মেলায় ভাঙন ধরে সপ্তাহ খানেক পরে। এই উৎসবের সময় কলকাতা থেকে কাঁচড়াপাড়া ও কল্যাণীগামী ট্রেনের দুঃসহ ভিড় দুঃসহতর হয়ে ওঠে। ঘোষপাড়া রোডের বাসের সংখ্যা ও ট্রিপ বাড়ানো হয়। বাগের মোড়ে সাইকেল-রিক্সাওয়ালাদের মরসুম লাগে। মেলার ঢেউ অদূরবর্তী পি এল ক্যাম্পের সর্বহারা নারীদের মনেও হিল্লোল জাগায়।

২

ঠিক এগারো মাস আগেকার কথা। গত বৎসর চৈত্র পূর্ণিমার গভীর রাত্রি। বর্ধমান জেলার একটি গ্রাম্য মেলা। আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে পূর্ণচন্দ্রের শ্বেতচন্দনধারা। খড়ের চালের পাশে নিকানো-মাটির দাওয়া। সেই দাওয়ায় বসে রাত্রের শেষ প্রহর কা[illegible] কাটবে। ঘুমের কথাই ওঠে না,—গল্প করা কানাই বাউলের সঙ্গে।

এই দীনদয়ালের মেলাতেই কানাই বাউলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। এ মেলা বড়ো কঠিন মেলা। বহুৎ সাধক-সিদ্ধের আমদানী। পরে জেনেছি কানাই বাউল বড়ো কঠিন লোক। দুরূহ-কঠিন যোগ সাধনের মধ্য দিয়ে তিনি পরিপক্ক হয়েছেন। বয়স পঁয়ষট্টি হবে। কিন্তু দেহে বার্ধক্যের স্পর্শ লাগেনি এতোটুকু। শুধু চুড়ো বাঁ[illegible]

হিমসাগর ঘাটমণ্ডপ

চুল আর দাড়িগুলি কাঁচাপাকা। ঘর নেই তার মনের মানুষ অন্তরে। সেই সাঁইকে বুকে ধরে যৌবন থেকে বার্ধক্য সীমার এতোগুলি বছর পায়ে পায়ে পথে পথে অতিবাহিত করেছেন। আমাকে ডেকে আলাপ করেছেন তিনি। ক্ষণকালের মধ্যেই অন্তরঙ্গতা।

বাংলার বাইরে তিনি বিশেষ যাননি। নানা তীর্থের কাহিনী তিনি আমার কাছে শুনলেন। শিশুর মতো নানা প্রশ্ন, শিশুর মতো বিহ্বলতা। এই শিশুসুলভতার অন্তরালে বহু সাধনপক্ক একটি পরিণত মনের পরিচয় তখন আমি ধরতে পারিনি। বাউল অনুমান মানে না, বাউলের কাছে সবই বর্তমান। বাউল সংস্কার-বিমুক্ত কঠোর রিয়ালিস্ট। বাউলের ভাব আছে, ভাবালুতা নেই। তাই বোধহয় তাঁর মনের কথা আমি ধরতে পারিনি যখন তিনি বললেন,—

তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াও, এই বয়সে বড়ো ভক্ত তুমি হয়েছ দেখি হে!

আমি বলেছিলাম,—না, কানাইদাদা, ভক্তি আমার নেই, পুজোও আমি করতে পারিনে। আমি শুধু দেখি।

কী দেখ?

ভক্তিকে দেখি। ঠাকুরকে পুজো আমি করতে নাই পারি, অসংখ্য পুজার্ঘ্য যেখানে গিয়ে পেঁছয় সেই স্থান আমার পুজনীয়। বিগ্রহের মধ্যে ভগবানকে না পাই, অসংখ্য ভক্তিমান যাত্রীর সম্মিলিত ভক্ত হৃদয়টির মধ্যে আমি তাকে সন্ধান করি।

সাদামাটা স্বীকৃতি বোধহয় তাঁর মন্দ লাগেনি। তবু আবার বাজিয়েছিলেন,—সেই ভক্তি যদি অনুভক্তি হয়?

কাব্য করে বসেছিলাম,—

চোখ বন্ধ না করলে তো ভক্তি হয় না দাদা। ভক্তি মানেই তো অন্ধ! যমুনা পুলিনে যখন বাঁশি বাজে তখন শ্রীরাধিকা অন্ধ-আঁখি হয়েই দৌড় মারে। চোখ খোলা থাকলে কুলবধূ নিজের হাতেই নিজের ঘরে আগল দিত।

তারিফ করে মাথা নাড়লেন কানাই বাউল। বললেন,—শহুরে লোক, খাশা কথা বলো তো হে! আচ্ছা ঘোষপাড়ায় একবার যেয়ো। ভক্তির বন্যা দেখে এসো। আগামী বছর গেলে আমার সংগেও দেখা হবে।

ঘোষপাড়ার এই ভক্তিস্রোত একদা সমগ্র বাংলাদেশকে প্লাবিত করেছিল। অখণ্ড বাংলার সমস্ত জেলা থেকে এখানকার দোল-পূর্ণিমার মেলায় কাতারে কাতারে লোক সমাগম হতো। পশ্চিমে বীরভূম বর্ধমান বাঁকুড়া মেদিনীপুর থেকে পূর্ববংগের প্রত্যেকটি জেলার সব জায়গা থেকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে যাত্রীরা আসত। ভাগীরথী তখন ঘোষপাড়ার প্রায় গা দিয়েই প্রবাহিত হতেন। যাত্রীরা আসত পদব্রজে, গোরুর গাড়িতে, রেলে, নৌকায় ও স্টীমারে। কলকাতা থেকে ঘোষপাড়া পর্যন্ত হোর মিলার কোম্পানির স্পেশাল স্টীমার চলত মেলার সময়। আসত ব্যাপারীরা, শিষ্যেরা, ভক্তেরা। আর আসতেন আউল বাউল ফকির দরবেশ প্রভৃতি সহজিয়া পন্থী সাধকরা।

আজ যুগ বদলেছে। ঘোষপাড়ার গ্রামীণ রূপের সমস্ত চিহ্ন মুছে গেছে। বংগ ব্যবচ্ছেদের পর পূর্ব বাংলার জনস্রোত ব্যাহত হয়েছে। তবু এখনো পর্যন্ত এই মেলায় প্রতিদিন পাঁচ থেকে সাত হাজার লোকের ভিড় জমে। এই জনসমাগমকে আজও আকর্ষণ করে চলেছে ভক্তি ও বিশ্বাসের চুম্বক শক্তি। ভক্তির অভাবনীয় অকল্পনীয় প্রকাশ আজও এই ঘোষপাড়ায় দেখা যায়।

এই দেশব্যাপী ভক্তিস্রোতের মূল উৎস সতী-মা। বৈষ্ণব ভক্তরা তাঁকে নিমাই জননী শচীমাতারূপে কল্পনা করে। শাক্ত ভক্ত ধ্যান করে বাগীশ্বরী নিত্যভাগিণী জগজ্জননীরূপে। হিন্দু মুসলমান উভয়েই জানে তিনি মহাশক্তিময়ী পরম সাধিকা। তাঁর কৃপায় দীনজনের সকল বাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

সিদ্ধ মহাপুরুষ আউলচাঁদ ঘোষপাড়ায় সদ্গোপবংশোদ্ভূত রামশরণ পালের সংগে মিলিত হন। এখানে নিভৃতে অবস্থান কালে বাইশজন ভক্ত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই বাইশ ফকিরের মেলার প্রধান নির্বাচিত হন রামশরণ পাল। ভক্তগণ কর্তাবাবা নামে তাঁকে অভিহিত করেন। সহজপন্থীগণের মধ্যে কর্তাভজন সম্প্রদায়ের সূচনা করেন এই আদিকর্তা রামশরণ। সতী-মা এই রামশরণের পত্নী। পিতৃদত্ত নাম
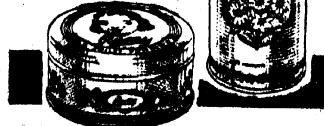
সতী-মার প্রাঙ্গণে ডালিমতলা

সরস্বতী। আউলচাঁদকে তিনি পুত্রজ্ঞানে স্নেহসেবা করেন। আউলচাঁদও তাঁকে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে ত্রাণ করেন। ১১০১ সনে আবির্ভূত হয়ে ১১৭৬ সনে আউলচাঁদ অন্তর্ধান করেন। বিশ্বাস যে ছয় বৎসর পরে দুলালচাঁদ রূপে সতী-মার গর্ভে তিনিই পুনরাবির্ভূত হন। এই দুলালচাঁদ বা লালশশী কর্তাভজন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক।

আউলচাঁদের আশীর্বাদে ও আপন সাধন বলে সতী-মা অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী হন। তিনি বাক্‌সিদ্ধা ছিলেন। ভক্তের মনস্কামনা তাঁর বরে পূর্ণ হতো। তাঁর স্পর্শে রুগ্ন হতো সবল, খঞ্জ হতো সচল। অন্ধ পেত দৃষ্টি, মূক বধির লাভ করত বাক ও শ্রবণশক্তি,—বন্ধ্যা মৃতবৎসার কোলে আসত সুলক্ষণযুক্ত সন্তান।

এ প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর আগেকার কথা। সতী-মার অসীম শক্তি ও অপার করুণার প্রতি ভক্তগণের বিশ্বাস আজও অক্ষয় হয়ে আছে। তাঁকে নিয়ে কতো যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তার ইয়ত্তা নেই। হিমসাগরের বাঁধাঘাটে কিছুক্ষণ বসলে এই সব কিংবদন্তী শোনাবার লোকের অভাব হবে না।

সতী-মার মন্দির ও কর্তাদের সমাজগৃহের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে দুই বিরাট আম ও লিচু বাগান। উত্তর-পূর্ব দিকে মন্দির থেকে কয়েকশো গজ দূরে সতী-মার হিমসাগর। ছোট্ট একটি পুকুর,—পরিচ্ছন্ন পাড়, পরিষ্কার টলটলে জল। সতী-মা ঘোষণা করেছিলেন এই হিমসাগরের গভীরে সকল পুণ্যতীর্থ নিহিত। এই জলে অবগাহন সর্বপাপঘ্ন। হিমসাগরে স্নান করে ভক্তেরা যান সতী-মার ডালিমতলায়। একটি প্রাচীন ডালিম গাছ—চারপাশে উঁচু রেলিং দিয়ে ঘেরা একটি মৃত্তিকা-প্রাঙ্গণ। এই ডালিমতলায় সতী-মা সিদ্ধ হয়েছিলেন—এখানে হত্যা দিলে মায়ের করুণা হলে সকল মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। ডালিমতলার ডান হাতে দোলমঞ্চ। পিছনে কর্তাদের সমাজগৃহ। একটি ঘরের মধ্যে সতী-মার সমাধি ও শয্যা। জানালা দিয়ে ভক্তরা এই সমাধি দর্শন করে ধন্য হন। সতী-মার এই স্মৃতিমন্দির ঘিরে একতলা দোতলা পাকা বাড়ি। এই বাড়িগুলি পরবর্তী যুগের কর্তাদের সমাজগৃহ। দুলালচাঁদ আর তাঁর পুত্র সাধক ঈশ্বরচন্দ্রের সমাধি আছে। ফকির আউলচাঁদের কয়েকটি নিদর্শনও রক্ষিত আছে। অদূরে আমবাগানের প্রান্ত ছাড়িয়ে একটি অর্ধভগ্ন চালা। এই চালায় পঞ্চ দেবীর শিলাসন,—অধিষ্ঠাত্রী দেবী রক্ষাকালী।

সতী-মার জানালা ধরে দাঁড়িয়ে ডালিমতলার চারপাশে ঘুরে আর হিমসাগরের ঘাটে বসে বসে সারা দিনমান আমার কাটল। সহস্র সহস্র যাত্রী হিমসাগরে স্নান করছে। সদ্যস্নাত হয়ে ডালিমতলায় ও সতী-মার মন্দিরে গিয়ে পূজো করছে। এই নিত্য চলমান জনস্রোত দেখছি। আর দেখছি—ঐ কানাই বাউলকে যা বলেছিলাম—অন্ধভক্তির উদ্দাম তরঙ্গলীলা।

শহরের খানদানি বাবু গিলে-কর পাঞ্জাবি আর চুনট-করা কাঁচি ধুতি ঘাটে মেলে রেখে খাটো গামছা পরে মা-মা রবে দিকবিদিক সচকিত করে ঝাঁপ দিয়েছেন হিমাসগরের জলে—দামী হাতঘড়িটা যে হাতেই রয়ে গেছে সে খেয়াল নেই। আরে খেয়াল নেই যে চাপাচাপি গা ঘেঁষে হাপু হুপুস করে ডুব দিচ্ছে টিটাগড়ের লাই ধারের এক বয়স্কা বারবণিতা। নবদ্বীপে বৈষ্ণবী আর ভট্টপল্লীর ব্রাহ্মণ, চাকদহে চাষী আর নৈহাটির শ্রমিক, তিলকধার পশ্চিমী মিশ্র আর ঝাঝাদিয়ার মুসলমা কলু—একত্রে অবগাহন করছে এই হিম সাগরের জলে। অন্ধ বিকলাঙ্গ ও ব্যা গ্রস্তের ভিড়ে স্নানমণ্ডপে তিলধারণের স্থা নেই। সিক্তবস্ত্রে অর্ধ-উলঙ্গ বৃদ্ধ তরু পুরুষ নারীর দল দণ্ডী কেটে কেটে কা মাটি মেখে হিমসাগর থেকে চলেছে ডালি তলার দিকে। মুখে তাদের ভাষা নে চোখে উন্মাদ দৃষ্টি, মনে অপার বিশ্বা নিরম্বু উপবাসে জ্যান্তে মরা হয়ে ডালি তলায় তারা হত্যা দিয়ে পড়ে থাক যতক্ষণ না, যতোদিন না সতী-মার হয়, প্রাণের মধ্যে মায়ের আদেশ বাজে।

ডালিমতলার রেলিং-এ শত শত আর কাপড় বাঁধা। ভক্তরা সংকল্প বেঁধে গেছেন। যে আসে সে কোঁচড় থে মুঠোতে আবীর নিয়ে ডালিমগাছে মারে; সামান্যপত্র শীর্ণ ডালগুলি

লাল। প্রচন্ড ঠেলাঠেলি ভিড়, কিন্তু ওর মধ্যেও সাবধানে পা ফেলতে হয়—মাটিতে ওরা সবাই হত্যা দিয়ে পড়ে আছেন যে।

সতী-মা'র জানলার সামনে একজনের ভাব হয়েছে। মাথায় জটা, পরনে রক্তাম্বর। রক্তচক্ষু—মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে। সার্থক ভক্ত ভাবাবেশে বিহ্বল—তাঁকে ঘিরে একদল উন্দাম উল্লাসে ভাবের গীত গাইছে।

৩

চায়ের দোকানে বসে পেণ্টুল আব বুশ শার্ট-পরা নব্য ছোকরাটি বলেছিল এক কথা।

বললে—এই তো ক-সাল আগেকার এক তামাশা। সে কি রাম মার মশাই! চোদ্দ-পনেরো বছরের অবোলা একটি মেয়ে, সবাই মিলে পুকুরের জলে একবার করে চুবোয় আর একবার করে তুলে নিয়ে হাঁক ছাড়ে, বল্ সতী-মা বল্! আর সঙ্গে সঙ্গে মার। চুবুনির শেষ নেই, দমাদ্দম মারেরও শেষ নেই। পরনের কাপড়টা ফালা ফালা হয়ে গেল, কাঁধ পিঠ ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল দরদর করে। বোবা একটা জন্তু—ছটফট করছে আর আঁউ-আঁউ করছে। ঘাটে হাজার লোক চিৎকার করছে —জয় সতী-মার জয়, জয় দুলাল চাঁদের জয়! সেই জয়ধ্বনির মধ্যে চাপা পড়ে গেছে বোবা মেয়েটার আর্তনাদ! খালি মিনিটে মিনিটে জল থেকে ভেসে আসছে পরম বিশ্বাসীদের রুদ্ধ গর্জন—বল্, সতী-মা বল্!

তারপর?

প্রায় ঘণ্টাখানেক এই নৃশংস নিষ্ঠুর অত্যাচারের পর হঠাৎ চিৎকার উঠল—বলেছে বলেছে, কথা ফুটেছে, সতী-মা বলেছে। কে বলেছে ভগবান জানেন, অর্ধ-উলঙ্গ জ্ঞানহারা মেয়েটাকে ঘাটে এনে ধড়াস করে ফেলল, মাটি রগড়ে রগড়ে টানতে টানতে দেহটাকে টেনে নিয়ে চলল ডালিমতলায়!

সর্বনাশ! তারপর?

তারপর আর জানিনে মশায়! থানা পুলিস হয়তো জানে, তাদের জিজ্ঞাসা করুন।

না-না, এ আমি বিশ্বাস করিনে, এমনি কান্ড হতেই পারে না। এ-বর্ণনা অতি-রঞ্জিত, মিথ্যা। এই রিপোর্টের সামান্যতম প্রতিধ্বনিও আমি বাগবাজারের মাসিমার বর্ণনায় খুঁজে পাইনি। মাসিমা কলকাতার মেয়ে, কলকাতার বধূ। বাগবাজারের মদন-মোহনতলার কাছে তাঁর বনেদী শ্বশুরগৃহ। একবার স্বামীর সঙ্গে বিষ্ণুপুর গিয়ে ছিলেন। সেখানে গুরু কৃপালাভ করেন। গুরু প্রতি বৎসর এই সময় ঘোষপাড়ায় আসেন। গুরুসন্দর্শন মানসে মাসিমাও আসেন। অনেক বছর থেকেই আসছেন।

মাসিমা বললেন—এই হিমসাগরের মাহাত্ম্য শোনো বাবা। এ আমার মুখের কথা নয়, সতী-মার এক পরম ভক্তের বই-এ ছাপার অক্ষরে লেখা। সতী-মা মন্ত্র দিতেন, সত্য মন্ত্র—তাঁর কাছে সত্যধর্মে দীক্ষা নিত তাঁর শিষ্যেরা। এই হিমসাগরে স্নান করলে মনের ময়লা ধুয়ে যেত। তখন শিষ্য সত্যধর্মে দীক্ষিত হবার উপযুক্ত হতো। তাঁর আশীর্বাদে সব সংকল্প পূর্ণ হতো ভক্ত শিষ্যের। একবার এক ডাকাত দল ছদ্মবেশে এল সতী-মার কাছে। নিষ্ঠুর এক ডাকাতি করতে তারা যাবে—লুঠ করবে, আগুন জ্বালাবে, সতীত্বনাশে, প্রাণ-নাশে কার্পণ্য করবে না। তার আগে সতী-মাকে এসে বললে—মা আমরা এক কঠিন ব্রতে চলেছি। আশীর্বাদ করো, মনস্কামনা যেন সিদ্ধ হয়। মা সর্বজ্ঞা, ডাকাতদের ব্রতের কথা জানতে এক লহমা লাগল না। মুচকি হেসে বললেন—বেশ তো বাবারা, আশীর্বাদ তো করবই। তার আগে ঐ হিমসাগরে স্নান করে এসো। হিমসাগরের জলে ডুব দিতেই ডাকাতদের মনে এক প্রবল আলোড়ন জেগে উঠল। ঘুচে গেল তাদের অসৎ অভিলাষ, মুছে গেল তাদের পাপ প্রবৃত্তি। ডাকাতির অভিপ্রায় আর তাদের মনেও রইল না।
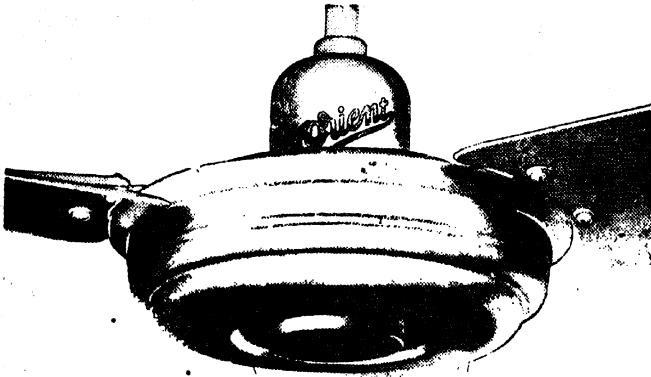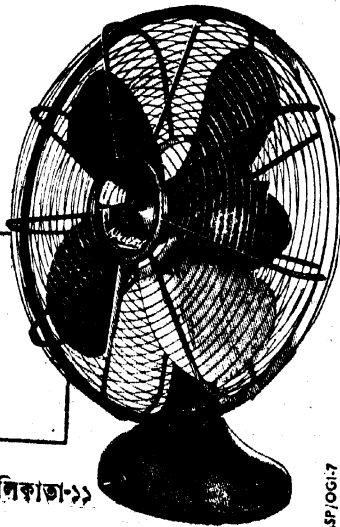
অন্তর ভরে গুন গুন করতে লাগল বৈরাগ্য-মধুকর। মা তাদের সত্যধর্মে দীক্ষা দিলেন।

আমি বললাম—মাসিমা, এই কাহিনীর অর্থ কিন্তু বুঝলাম না।

অর্থ অতি সোজা বাবা। সারাদিন ঘাটে বসে কতো যাত্রী, কতো ভক্ত তো দেখলে। কিন্তু ভাবো তো, দেহের ময়লা ধোবার জন্যে সাবান আছে, তেল আছে, অষুধ আছে, ইঞ্জেকশন আছে—তার জন্যে হিমসাগরের দরকার কী? মনের ময়লা ধোবার জন্যেই এই হিমসাগর। এই হিমসাগরে স্নান করলে নতুন ইন্দ্রিয়শক্তি লাভ হয় বৈকি! অন্ধ পায় অন্তর্দৃষ্টি, বোবা জপ করে সত্যমন্ত্র, কানে যে শোনে না, তার প্রাণে বাজে প্রেমের মোহনবাঁশী!

সত্যি বলছেন মাসিমা? এ আপনি বিশ্বাস করেন?

শোনো বাবা, আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ, বড়ো বুদ্ধির কথা বলতে পারিনে। কিন্তু ধরো, এই শালগ্রাম, সামান্য কালো পাথরের একটা নুড়ি বৈ তো আর কিছু নয়!

নয়ই তো!

তবু দ্যাখো, এই নুড়ির মধ্যেই নারায়ণ বিরাজ করছেন। তাঁকে যে দেখতে পায়, তাকে চশমাও পরতে হয় না, চোখের ছানিও কাটাতে হয় না। চোখ বন্ধ করেই সে দেখতে পায়। তাই না?

তাই। এই অন্ধভক্তির সন্ধানেই আমি তীর্থে তীর্থে ঘুরি। ঘোষপাড়ায় আসা আমার সার্থক হয়েছে।

৪

কিন্তু স্বীকার করব, মেলা দেখে মন ভরল না। এই মেলায় আজ কোনো শ্যামল লাবণ্য নেই, পল্লীশ্রী এই মেলার মুখ থেকে মুছে গেছে। বেশিদিন মোছেনি—কিন্তু এমনভাবে মুছেছে যে, চিহ্নমাত্র নেই।

গত মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত এই ঘোষপাড়া অঞ্চল ছিল শ্যামস্নিগ্ধ পল্লীগ্রাম। চব্বিশ পরগণা ও নদীয়ার সীমান্তের এই অঞ্চল ফল ও ফসলের জন্যে বিখ্যাত ছিল। কতো যে আমবাগান, লিচুবাগান ছিল, তার ইয়ত্তা নেই। আর ছিল কুমড়া, লাউ, ডাঁটা ও অন্যান্য তরি-তরকারির অপর্যাপ্ত ভাণ্ডার। এখানকার আনাজ ফসল কলকাতা শহরে চালান হতো। গ্রামবাসীরা ছিলেন সম্পন্ন গৃহস্থ।

১৯৪১ সালে মহাযুদ্ধের মধ্যে মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষের অধীনে এই অঞ্চল চলে যায়। সামরিক প্রয়োজনে শিঙে-ভবানীপুর, ঘোষপাড়া, কাঁটাগঞ্জ, গোকুলপুর, শরহাটি, গ্রাম-কাঁচড়াপাড়া প্রমুখ ছাব্বিশটি গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। বিরাট মার্কিন সামরিক কেন্দ্র রুজভেলট্ নগরের পত্তন হয়। ঘোষপাড়ার মন্দির, আমবাগান ও লিচুবাগান সমেত মাত্র বিঘা চল্লিশ জমি প্রাক্-যুদ্ধকালীন গ্রামীণ সংস্কৃতির ম্লান চিহ্নরূপে কাঁটাতারের আড়ালে টিম টিম করতে থাকে।
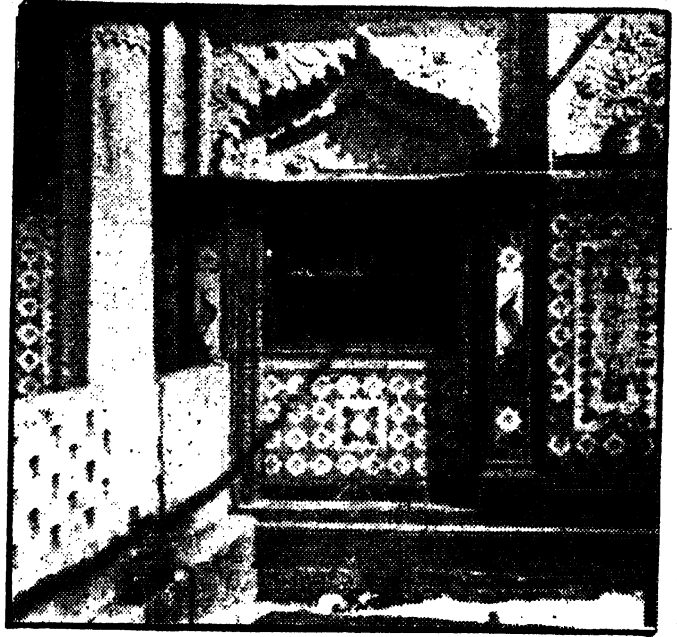
সতী-মার সমাধি মন্দির

যুদ্ধের পর হৃতসর্বস্ব এই অঞ্চল মরুভূমিতে পর্যবসিত হয়। না গ্রাম, না শহর। জনশূন্য শ্মশানক্ষেত্র। বর্তমানে এই পরিত্যক্ত রুজভেলট্ নগরে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের মানস-কন্যা কল্যাণী নগরী গড়ে উঠছে। পূর্বতন ঘোষপাড়ার প্রায় সমস্তটাই সরকার স্থায়িভাবে অধিকার করে কল্যাণীর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। এক কোণে পড়ে আছে সতী-মার এই তীর্থ।

ঘোষপাড়ার গ্রাম্যজীবন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। আশে পাশে কোনো গ্রাম নেই, কোনো গ্রাম্য শিল্প নেই। কাছাকাছি কোনো জনবসতি নেই, কোনো দোকানপাট নেই। কল্যাণী নগরী এখনো বন্ধ্যা। তাই সামান্যতম বাজারহাট করতে আসতে হয় কাঁচড়াপাড়া শহরে, না-হয় অন্তত বাগের মোড়ে। মেলার মুখে গরুর গাড়ির জায়েয়ত নেই—বাস, লরী আর সাইক্‌-রিকশার ভিড়। অন্নভোগের চাল আর জ্বালানি কাঠ গ্রামান্তর থেকে আসে না,—সাপ্লাই করে বাগের মুদী না-হয় কাঁচড়াপাড়ার আড়তদার।

মেলার স্থান অত্যন্ত সংকীর্ণ, নোংরা ধূলিমলিন। দোকান-বাজার মন্দ নয়। কিন্তু কিছু পাটি মাদুর এবং বাঁশ ও বেতের কাজ ছাড়া হস্তশিল্পের কোনো নিদর্শন নেই—অবশ্য করি, সিঙাড়া রসগোল্লা, মণ্ডা বাদ দিয়ে। বাকি সব কলকারখানায় তৈরি পণ্যদ্রব্য। পল্লী জীবনই মেলার প্রাণ। পল্লীমেলায় একটু ছুটির বাঁশী বাজে, একটা খুশীর সুর জাগে। সে ধ্বনি সে সুর এই খুচরো দোকানদারির ভিড়ে নেই।

মেলায় যাত্রী আসে বিভিন্ন প্রকারের কলকারখানায় দোল আর হোলি নি[...] পাশাপাশি দুদিন ছুটি। সস্তা মনোহা[...] দোকানগুলি ঘিরে শ্রমিকদের ভি[...]

বাঙালী হিন্দুস্থানী—মেয়ে পুরুষ। তারা বাসে চড়ে দলে দলে আসে আর যায়, ম্যাজিক দেখে, চর্কিতে চড়ে, টুকটাক জিনিস কেনে। মন্দারা চা-সিগারেট খায়, নির্বিবন্ধ মজার সন্ধানে ফেরে। পায়ে পায়ে প্রচুর ধুলো উড়িয়ে সারা আমবাগান তারা চষে বেড়ায়—তাদের ধাক্কাধাক্কিতে মেলার পথগুলি সরগরম।

আসেন কর্তাগোষ্ঠীর শিষ্যবৃন্দ। সতী-মা ও দুলালচাঁদের পরিবারের শিষ্যসন্ততির অবধি নেই। কর্তাভজন ধর্ম অনুসারে নররূপী গুরুমূর্তিকে ঈশ্বর জ্ঞানে আরাধনা করতে হয়। মানবরূপী গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি ও অটুট বিশ্বাসই ইষ্ট-দর্শনের পন্থা। গুরুই সত্য, গুরু-উপাসনাই সত্যধর্ম। দুলালচন্দ্রের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের আমলের অবসানে ঘোষপাড়ার কর্তৃত্ব কয়েকটি শরিকে ভাগ হয়ে যায়।

এখন তিনটি শরিক। কর্তাগণ দেব-মোহান্ত নামে ভূষিত। শিষ্যগণের এক বিশেষ অংশ আসেন কলকাতা ও অন্যান্য শহরাঞ্চল থেকে। খানদানি নাগরিক। সতী-মার বংশধর কোনো না কোনো কর্তার কাছে তাঁরা মন্ত্র নিয়েছেন। সপরিবারে তাঁরা এসেছেন ও সমাজগৃহের দোতলা একতলায় আশ্রয় পেয়েছেন। প্রণামী-উপঢৌকনের উপচার ও মহার্ঘতা দেখবার মতো। এঁদের আবার কোনো কোনো দল সমাজগৃহের কাছাকাছি খোলা জায়গায় আখড়া বসিয়েছেন। আখড়ার জমির বাঁধা বিলি বন্দোবস্ত আছে। এক একটি দল বহু বৎসর ধরে একই বাঁধা জায়গায় প্রতি-বার আখড়া বসাচ্ছেন। সতী-মার মন্দির, ঘাট, তোরণদ্বার, দোলমঞ্চ প্রভৃতি বহুদিনের অযত্নে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়েছিল। কয়েক বৎসর হলো উদ্যোগী শিষ্যবৃন্দ সত্যধর্ম সেবক সংঘ নামে এক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছেন এবং এই সব প্রাচীন জীর্ণ আলয়-গুলি সুন্দরভাবে নবনির্মিত করেছেন।

সাধারণ ভক্তরা আসেন প্রান্তবর্তী গ্রামাঞ্চল থেকেই। তাঁদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও শিশুর সংখ্যা প্রচুর। তাঁরা কর্তাদের প্রত্যক্ষ শিষ্য নন, সমাজগৃহের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। আমবাগান ও লিচুবাগানের কোনো কোণে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন। মাটি খুঁড়ে উনুন সাজিয়ে অন্ন ভোগ চড়িয়েছেন। পরম বিশ্বাস ও ভক্তি ভরে হিমসাগরে স্নান করে মন্দিরে প্রণাম করেছেন। অনেকেরই মানত আছে—দু-তিনরাত্রি বাস করে ফিরে যাবার সময় সংকল্প করে যাবেন মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ামাত্র আবার মার চরণে এসে পুজো দেবেন।

আর আসেন বাউল।

৩

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের আনুমানিক একশত বৎসর পরে বাংলায় বাউল সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। চৈতন্য লীলায় প্রেমবন্যায় লোকায়তরূপ বাউল। সমগ্র বাংলার প্রতিটি জেলায় নিভৃত পল্লী-অঞ্চলে এই বাউল আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আউল বাউল ফকির দরবেশ কর্তাভজা নেড়া-নেড়ী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে তারা পরিচিত। সকলেই একই সহজিয়া-সাধনের পথিক। এই বাউল সম্প্রদায় বর্তমানে অন্তর্হিত প্রায়। বীরভূমের জয়দেব-কেন্দুলি ও নদীয়ার ঘোষপাড়ার মেলায় আজও বাউলরা সমবেত হন। তবে উভয় মেলাতেই প্রতি বছরই তাদের সংখ্যায় ভাঁটা পড়ছে।

চৈতন্যদেবের আহ্বান ছিল জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি। বাউলের সহজ-সাধনের ইঙ্গিত চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যে মেলে। বাউলরা চৈতন্যদেবকে তাদের মহাগুরু বলে মান্য করে। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সমাজে যারা হীন দরিদ্র ও অপাংক্তেয় ছিল তাদের নিয়েই প্রধানত বাউল সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল। উচ্চ-বর্ণের ঘৃণা ও বীতরাগকে উপেক্ষা করে তারা নিভৃতে সারা বাংলা জুড়ে একটি মহাভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলেছিল। বাউলরা স্বভাবত উচ্চ সমাজের কাছে ঘেঁষতে চায় না, নিভৃতে সাধন-ভজন করে। ভোগবিলাসে তারা উদাসীন। তারা আপনভোলা। তারা মনে করে যে এমনই এক অনির্বচনীয় আনন্দ-রসের তারা সন্ধানী যে তার কাছে বাস্তবিক ভোগের আসক্তি তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে বাউল জীবন-বিমুখ কল্পনাবিলাসী নয়। বাউল কঠিন বাস্তববাদী রিয়ালিস্ট। মানুষ মানুষে যে কোনো ভেদ নেই, বাউলের কাছে একথা সহজ সত্য;—এ জন্যে বাউল কোনো দার্শনিক আপ্তবাক্যের শরণ নেয় না। বাউল কোনো প্রচলিত ধর্ম মানে না, মন্দির মসজিদে উপাসনা করতে সে চায় না। হিন্দুধর্মের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর কোনোটিই বাউলের উপাস্য নয়। বাউল সাধনা করে তার দেহস্থিত আত্মাকে—যে আত্মা তার অধর মানুষ—দেহ বিনা থাকে ধরা যায় না। বাউলের কাছে সবার উপরে এই দেহধারী মানুষই সত্য—কেননা বাউল যে দেহাতীত মনের মানুষকে সন্ধান করে সে মানুষ রসের মানুষ। দেহ ছাড়া রস নেই।

অন্যান্য ধর্মমত যেখানে দেহকে ও দেহ-বৃত্তিকে পরিহার করে মোক্ষ বা নির্বৃত্তির কল্পিত দর্শনকে উচ্চস্থান দিয়েছে, ইন্দ্রিয়-বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করে নিষ্কাম সাধনার পন্থায় নির্দেহী আত্মাকে অক্ষয় স্বর্গের পথে পরিচালিত করেছে, বাউল সেখানে বলছে—দেহ ছাড়া কোনো সাধনা নাই, যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। বাউল সাধক চণ্ডীদাস অপূর্ব সাধনা বলে যে পরমাশ্চর্য প্রেমে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, সেই প্রেম নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়। কিন্তু সেই প্রেম-সাধনের পথ নিবৃত্তির পথ নয়, প্রকৃতি-সাধনের পথ। শুদ্ধ প্রেম সাধলে যদি কাম-রতিকে রাখলে কোথা?

বাউলের সাধনা অতি কঠোর সাধনা। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ক্ষণিক অথচ পরমতম পুলক-রোমাঞ্চময় অনুভূতিকে নিত্যানন্দের উপলব্ধিতে রূপান্তরিত করার সাধনা। এই সাধনা কেবল ধ্যানের দ্বারা সম্ভব নয়, শুধু ভক্তির পথের অধিগম্য নয়। কঠোর প্রচেষ্টা ও একাগ্র যোগাভ্যাসের ফলেই বাউল সুখকে আনন্দে রূপান্তরিত করার সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করতে পারে। এই নিত্যানন্দ, মনের মানুষ বা ভাবের মানুষ—দেহানুভূতি পারের আত্মোপলব্ধি—এই অধর মানুষকে ধরার সাধনাই বাউলের পরম কাম্য। এই সাধন-প্রক্রিয়া পথপ্রদর্শক গুরু ছাড়া সম্ভব নয়। এই গুরুপদে বাউল তার মনের সমস্ত শ্রদ্ধা সমস্ত আকুতি সমর্পণ করেছে।

আউল ও বাউল দুটি শব্দের একই অর্থ।

বাউল যদি বাতুল বা ব্যাকুলের অপভ্রংশ হয়, আউল শব্দটিও আকুল শব্দ থেকেই এসেছে। সহজপন্থী মুসলমান সাধকদের আউল বা আউলিয়া বলা হয়।

আউলচাঁদ ফকির একজন সহজিয়া পন্থী সম্ভবত মুসলমান সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। হিন্দু রামশরণ পালের পরিবারে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন ও হিন্দু সাধবা রমণী সতী-মা তাঁকে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে প্রতিপালন করেন। রামশরণ প্রমুখ বাইশ ফকিরকে তিনি সহজিয়া ধর্মে অনুপ্রমাণিত করেন। উত্তরে নবদ্বীপ ও দক্ষিণে হালিশহর ভট্টপল্লী, ভাগীরথী বিধৌত এমনি উচ্চবর্ণ প্রধান অঞ্চলের মাঝখানে একজন মুসলমান বাউল ফকিরের আবির্ভাব,—এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। এবং তাঁর অনুপ্রাণনায় এমন এক সমাজের প্রতিষ্ঠা যার প্রধান কর্তা এক নিম্নশ্রেণীর সদ্‌গোপ—এ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই ঘটনার স্মৃতি-তীর্থরূপেই ঘোষপাড়া আজ বাংলার সমস্ত বাউলের এক মহাতীর্থ।

॥ পঁচিশ ॥

শের সিং তার লিকলিকে হাতদুটো প্রবল বেগে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। অস্থির-ভাবে মাথা নাড়ল।

উত্তেজিতভাবে বলল, "নেহি সাব্ হামসে নেহি হোগা।"

শের সিং-এর দিকে ধ্রুব নিঃশব্দে ক্যাপস্টেন সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল। শের সিং একটা সিগারেট বের করে ধরাল। প্যাকেটটা ধ্রুবকে ফেরত দিতে গেল।

ধ্রুব শান্তভাবে বললে, "ওটা তুমি রাখ শের সিং, ওটা তোমার।"

শের সিং-এর উত্তেজনা একটু কমে এল। সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে পুরে ফেলল। তারপর জ্বলন্ত সিগারেটটা মুঠোর মধ্যে পুরে নিঃশব্দে টানতে লাগল।

সমস্ত হলটাই স্তব্ধ হয়ে গেল। মাল-বাহকেরা ওজন করে করে বোঝা ঠিক করে নিচ্ছে। কয়েকজন শেরপা তাদেরকে সাহায্য করছে। দিলীপ, মদন আর বিশ্বদেব প্রত্যেক অভিযাত্রীর রুক স্যাক আর কিট ব্যাগ থেকে মাল মেঝের উপর ঢেলে ফেলেছে। নতুন করে মিলিয়ে নিচ্ছে। দিলীপ ফর্দ পড়ছে, আর ওরা দুজন সেই ফর্দের সঙ্গে মাল মিলিয়ে নিচ্ছে।

দিলীপ বলল, "এবার ডাক্তারের পার্সোন্যাল কিট।"

বিশ্বদেব খুঁজে পেতে একটা কিটব্যাগ বের করল। দেখল এক কোনায় পেন্সিল দিয়ে নাম লেখা আছে—ডাঃ অরুণকুমার কর।

বিশ্বদেব বলল, "হ্যাঁ, ডাঃ অরুণকুমার কর।"

দিলীপ : কিট্ ব্যাগ একটা?

বিশ্বদেব : কিট্ ব্যাগ একটা।

দিলীপ : অ্যালকাথিন কভার?

বিশ্বদেব অ্যালকাথিন কভারটা কিট্-ব্যাগের ভিতর ভরে দিল। ওয়াটারপ্রুফ হয়ে গেল কিট্ ব্যাগ।

বিশ্বদেব : হ্যাঁ, অ্যালকাথিন কভার।

দিলীপ তালিকা দেখে আবার নামতা পড়তে শুরু করল।

—মাউন্টেনীয়ারিং বুট?

বিশ্বদেব একজোড়া মাউন্টেনীয়ারিং বুট কিট্ ব্যাগে ভরল।

—হ্যাঁ, মাউন্টেনীয়ারিং বুট এক-জোড়া।

"ফেদার ট্রাউজার?"

"হ্যাঁ ফেদার ট্রাউজার।"

"ফেদার জ্যাকেট?"

"হ্যাঁ ফেদার জ্যাকেট।"

"উইন্ডপ্রুভ ট্রাউজার?"

"না, উইন্ডপ্রুভ ট্রাউজার নেই।"

"নেই কি রে!" দিলীপ ধমকে উঠল। "আলবাৎ থাকতে হবে। দেখ, কোথায় গেল?"

"এই মদনা", বিশ্বদেব বলল, "দেখ্ ত, কার কিট্ ব্যাগে দুটো উইন্ডপ্রুভ ট্রাউজার ঢুকেছে।"

মদন কিট্‌ব্যাগ হাতড়াতে লাগল। আঙ ফুতার, খোকা-খোকা চেহারার এক শেরপা, কফি দিয়ে গেল। সুকুমার কফির মগটি মুখে তুলেছে অমনি শের সিং আবার চেঁচিয়ে উঠল।

"নেহি সাব্, হামসে নেহি হোগা। যে রাস্তার সঙ্গে আমার জান পহ্চান নেই, সেই রাস্তায় আমি আমার এতগুলো আদমিকে নিয়ে যেতে পারব না। আমার সাফ কথা।"

শের সিং কথাটা এত জোরে বলল যে হলঘরের লোক মাত্রেই কথাটা শুনতে পেল। মালবাহকেরা কাজ বন্ধ করে শের সিং-এর মুখের দিকে চেয়ে রইল। দিলীপ, মদন, বিশ্বদেবও চুপ মেরে দাঁড়িয়ে গেল। নিস্তব্ধ ঘরটায় ক্ষণিকের জন্য দুটো পেট্রোম্যাক্স আলোর চাপা অবিশ্রান্ত গর্জন ছাড়া আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। রাত এগারোটা বেজে গেল। বাইরে চাঁদের আলো কুয়াশার সঙ্গে মিশে মহা-নবমীর অদ্ভুত মায়া বিস্তার করেছে। দূরের পাহাড়গুলো কোনটা স্পষ্ট, কোনটা আবছা। মনে হয় যেন অভিযাত্রীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটতে বসেছে।

ধ্রুব, নিমাই এমন কি সুকুমারও খানিকটা ঘাবড়ে গেল। যদিও তারা কেউই মুখে সে ভাব প্রকাশ করল না। শের সিং লোকটাকে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না ওরা। কি চায় শের সিং? মতলবটা কি ওর? সত্যিই পথ চেনে না? না কি চাপ দিয়ে বেশি টাকা আদায়ের মতলব?

সর্দার আঙ শেরিং দেখল ব্যাপারটা ক্রমশ ঘোরাল হয়ে যাচ্ছে। সে প্রথমেই ধমক দিল মালবাহকদের।

"এই, কেয়া দেখতা তুমলোগ, চুপচাপ খাড়া হ্যায় কিউ কাম কর, কাম কর। কাল জলদি জলদি নিকাল নে পড়েগা।"

ধমক খেয়ে মালবাহকেরা একবার শের সিং-এর দিকে চাইল। আঙ শেরিং গর্জন করে উঠল।

"হাথ্ চালাও জলদি। ফুর্তি ফুর্তি

সুকুমার   আঙ্ শেরিং

নিমাই ডাঃ কর

কাম কর। সব কাম জলদি ফিনিস কর।"

মালবাহকেরা ধীরে ধীরে যার যার কাজে ভিড়ে গেল।

বিশ্বদেব হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। "কিরে মদনা, জমে গেলি নাকি? ডাক্তারের উইন্ডপ্রুফ ট্রাউজার কই?"

মদন তাড়াতাড়ি করে উইন্ডপ্রুফ খুঁজতে গিয়ে সমস্ত কিট্ ব্যাগের মাল মেঝেয় ঢেলে ফেলল। দেখা গেল, একটা কিট্ ব্যাগের ভিতর দুটো উইন্ডপ্রুফ ট্রাউজার ঢুকে গিয়েছে। মদন একটা বের করে দিল। মদনের এই লণ্ডভণ্ড কাণ্ড দেখে বিশ্বদেব খুব চটে গেল।

বিশ্বদেব গরম হয়ে বলল, "এটা কি হল, মদন?"

মদন অম্লান বদনে বলল, "কেন শর্ট কাট্।"

"বলি, এগুলো এখন আবার ভরবে কে?"

"কেন, তুই? তুই ভরবি।"

"সাধে কি তোকে জি মদন বলে।"

দিলীপ জিজ্ঞাসা করল, "জি মদনটা কি?"

বিশ্বদেব বলল, "গাড়ু মদন।"

"গাড়ু মদন। গাড়ু কেন?"

"এই রকম গাড়ুর মত কাজ মাঝে মাঝে করে ফেলে কি না, তাই।"

বিশ্বদেব হাসে। দিলীপ হাসে। মদনও হাসে।

দিলীপ বলে, "নে, নে, অনেক রাত হল। কাজগুলো সেরে ফেল। মদন কিট্ ব্যাগগুলো ভর।"

দিলীপ আবার নামতা পড়ে। বিশ্বদেব জবাব দেয়।

—"লেদার প্লাভস্?"

—"না, নেই।"

বিশ্বদেব মদন

—"থাক, ওটা আর ডাক্তারের দরকার লাগবে না। মাত্র দু জোড়াই আছে।"

—"নাইলন প্লাভস?"

—"না, নেই।"

"আচ্ছা ওটাও ডাক্তারকে দেওয়া যাবে না। ওটা বেশি নেই। যে-কয় জোড়া আছে, হাই অল্টিটিউডে লাগবে। দেখ ত উলেন প্লাভস্ আছে কি না?"

বিশ্বদেব বলল, "আছে।"

"স্লিপিং ব্যাগ।"

"স্লিপিং ব্যাগ?"

"এয়ার ম্যাটরেস্?"

"এয়ার ম্যাটরেস।"
"স্নো গগলস্?"
"স্নো গগলস্।"

"দেখ সাব্", শের সিং বলল, "নন্দাদেবী যেতে চাও, নিয়ে যাব। পথ চিনি। যোশীমঠ, তপোবন, রিণ্ডি, লতা লতা-খড়ক, ধর্মাসি হয়ে চলে যাব। ত্রিশূলে চল, নন্দকোট চল। নিয়ে যাব। পথ চিনি। কিন্তু নন্দাঘুণ্টির পথ চিনিনে। যে পথ চিনিনে, সে পথে আমার লোকেদের নিয়ে যাব না। পাহাড় বড় ভয়ংকর জায়গা। একা হতাম, পরোয়া করতাম না। কিন্তু এত লোকের দায়িত্ব নিয়ে—নেহি সাব্, হামসে নেহি হোগা।"

"আইস অ্যাকস্?"
আইস অ্যাকস্।"
"উলেন ড্রয়ার?"
"উলেন ড্রয়ার।"

"দেখ সাব্" শের সিং বলল, "সব কথা, প্রথমে বলে নেওয়াই ভাল। মাঝ রাস্তায় গিয়ে এসব কথা তুললে, তোমরা বলবে, শের সিংটা পাজী বদমাশ। এ কথা আগে বল নি কেন?"

—"এই কেয়া করতা তুমলোগ। হাথ্ চালাও। ফুর্তি ফুর্তি কাম কর।"
"ফুল মোজা এক পেয়ার?"
"ফুল মোজা এক পেয়ার।"
"হাফ মোজা এক পেয়ার?"
"হাফ মোজা এক পেয়ার।"

"দেখ সাব্" শের সিং বলল, "টিলম্যান সাহেবের সঙ্গে আমি নন্দাদেবী গিয়েছিলাম। কেউ রাস্তা চিনত না। এক ভারি চটানে (পাহাড়ে) উঠে আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। কেউ পথ চিনিনে। চারিদিকে শুধু বরফ। চারদিন তাব উপর অন্ধের মত শুধু ঘুরপাক খেয়েছিলাম। আমাদের খাবারও ফুরিয়ে গিয়েছিল। দেখ সাব্ শের সিং নিজের জানের পরোয়া করে না। কিন্তু এত লোকের জিম্মাদারি নিয়ে কোন অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া আমার দ্বারা হবে না। সাফ বলে দিলাম।"

"ওয়াটার বটল একটা?"
"ওয়াটার বটল একটা।"
"অ্যালুমিনিয়মের থালা?"
"হ্যাঁ, অ্যালুমিনিয়মের থালা।"

॥ ছাব্বিশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকে:
৩০শে সেপ্টেম্বর। গুলাবকোটির ডাক বাংলো। পিপুলকোটি থেকে পৌঁছাতে প্রায় ৫টা বেজে গেল। এদিন আমরা মার্চ শুরু করেছি দেরিতে। বেলা ১২টায়। দুপুরের খাওয়ার পাট পিপুলকোটিতেই চুকিয়ে নিয়েছিলাম। যে সব মালবাহকদের মাল বইবার জন্যই নিয়োগ করা হয়েছিল, মদন তাদের মধ্য থেকে বেছেগুছে দুজনকে "কুক" বানিয়ে দিলে। হরি সিং হেড্ কুক আর লালু তার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। ৬৫ জন অপরিচিত ধোটিয়ালদের ভিতর থেকে দুজন "কুক" খুঁজে বের করা সহজ নয়। মদনের ক্ষমতা আছে।

গৌরকিশোর ধ্রুব

প্রথমদিন "কুকের" রান্না খেয়ে ত আমরা থ বনে গেলাম। খাব কি, আমরা হেসেই বাঁচিনে। "অপূর্ব" এক স্বাদ সঞ্চারিত হল রসনায়। অবশেষে সর্দার আঙ শেরিং আমাদের কিচেনের খবরদারির ভার গ্রহণ করল। ভরসা পেলাম।

শের সিং-এর সঙ্গে সারা সকাল আলোচনা হল আমাদের। রুট সম্পর্কে শের সিং-এর ঐ এক কথা। তোমাদের এই নক্শার রাস্তা আমার জানা নেই সাহেব। যে রাস্তা আমার অজানা অচেনা, সেই রাস্তায় এতগুলো লোকের দায়িত্ব নিয়ে আমি যেতে পারব না সাহেব। শের সিং-এর হাতে ক্যাপস্ট্যান সিগারেটের প্যাকেট গুঁজে দেওয়া হল, মগ ভর্তি রম তুলে দেওয়া হল, বকশিশের আভাস দেওয়া হল। শের সিং ঐ এক কথা উচ্চারণ করল বারবার। হামসে নেহি হোগা।

আমি জানতাম, সুকুমাররা একটা নতুন রুটে নন্দাঘুণ্টি যাচ্ছে। নিমাই কয়েকবার আমাকে সেই রুটের ম্যাপও দেখিয়েছে। উড্ সাহেবের বিবরণও আমি পড়েছিলাম। আমার, পাহাড় সম্পর্কে যদিও কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না, শের সিংকে সুবিধের লোক বলে মনে হল না। ভাবনা হল ব্যাটা আবার মালবাহকদের না বিগড়ে দেয়।

এটা বুঝতে পেরেছিলাম, শের সিং বিগড়ে গেলে অভিযানের বারটা বেজে গেল।

আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলাম, এ অবস্থায় কি করা যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, শের সিং যতদূর পর্যন্ত যেতে রাজি, ততদূর পর্যন্তই আমরা যাব। যাবার পথে গাইড একজনকে সংগ্রহ করেই নিতে হবে, যে করেই হোক। যদি শেষ পর্যন্ত গাইড না পাওয়া যায়, তখন মালবাহকদের ভরসা ছেড়ে, নিজেরাই রুটের সন্ধানে বের হব। এবং এ বছরকার মত নন্দাঘুণ্টির পথটাই আবিষ্কার করে আসতে হবে। এ ছাড়া আর উপায় কি? পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছবার পথ আবিষ্কার যে পাহাড়ে চড়ার মতই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এটা কজন লোক বুঝবেন, আমরা সেই চিন্তাই করতে লাগলাম। শের সিং বলল, সে আমাদের রিনি গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে যাবে। তারপর সেখানে যদি কোন শিকারি বা মেষপালক পাওয়া যায় যে রণ্টি হিমবাহ পর্যন্ত পথটা চেনে, তবে তাকে গাইড্
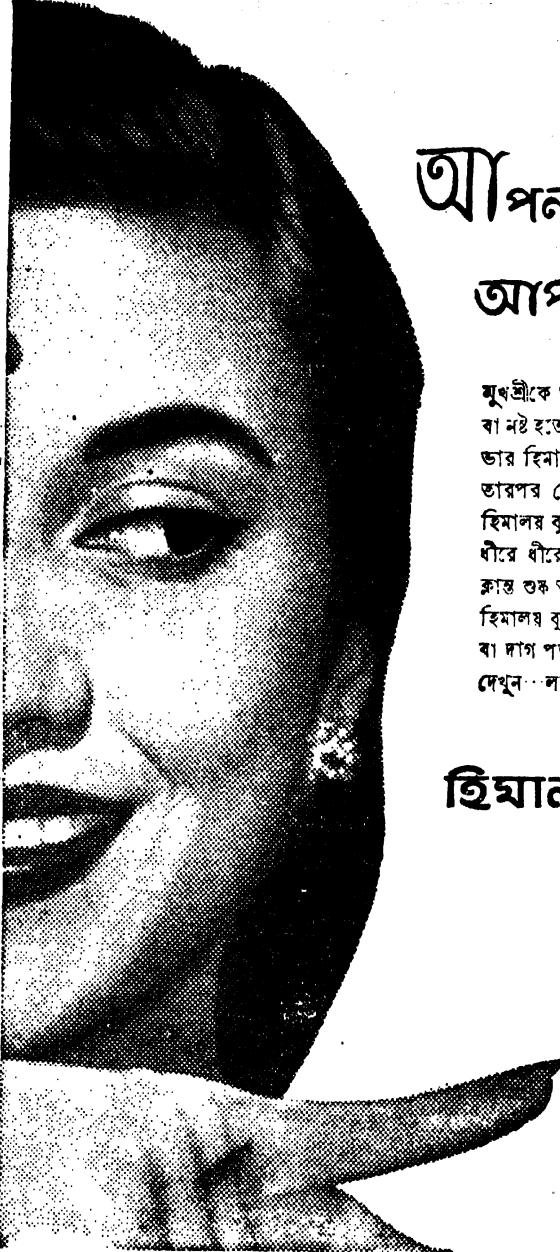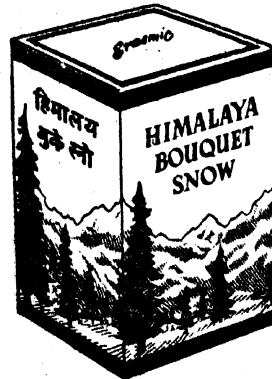
দিলীপ বীরেন

হিসাবে নেওয়া হবে। সেই গাইড্ পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলে শের সিং যেতে আর আপত্তি করবে না। আঙ শেরিং একটা কথা বললে, সাব্, আর কখনও এমন সব লোকের সঙ্গে রুট্ নিয়ে আলোচনা কর না। বলবে যে, পথ আমরা চিনি, ব্যাস্।

শের সিং-এর সঙ্গে কথাবার্তা চুকলে যাত্রার তোড়জোড় শুরু হল। আমি পোস্টাফিসে গেলাম খবরটা কলকাতায় পাঠাতে। আমরা যে অনিশ্চিত এক অবস্থার মধ্যে পড়েছি, রুট নিয়ে, এ সংবাদ পাঠাব কিনা তা নিয়ে আলোচনা হল। কেউ বললেন, একথা এখন জানান ঠিক হবে না, লোকে আমাদের ভুল বুঝবে। আবার কেউ বললেন, এতে ভুল বোঝার কি আছে? পৃথিবীর সব দেশের পর্বতারোহীদেরই ত এই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এমন নয় যে, আমাদের ঘাড়েই এ সমস্যা চাপল। শেষে সবাই মত করল, পাঠিয়েই দেওয়া হোক খবরটা।

অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে রিপোর্ট লিখতে বসেছিলাম। টেবিলের বদলে প্যাকিং বাক্সে ভর দিয়ে লিখতে হল। ঘরের মধ্যে পুরোদমে মালপত্র গোছগাছ চলেছে। সব ঢেলে সাজা হচ্ছে। কাল রাত একটা পর্যন্ত কাজ চলেছিল। আজ আবার অন্ধকার থাকতেই কাজ শুরু হয়েছে। অনবরত হাতুড়ির শব্দ কানে আসছে।

যেখানে বসে আমি লিখছিলাম, তার সামনেই তিনটে পাহাড় সুন্দর একটা জ্যামিতিক ত্রিকোণ সৃষ্টি করেছে। বাতাস একটা মিঠে মিঠে ঠান্ডা বিলি করে বেড়াচ্ছে। কী পরিষ্কার রোদ! আহ্লাদে যেন এখানে ওখানে ঢলে ঢলে পড়ছে। এত যে অনিশ্চয়তা, গাইড্ পাব কিনা ঠিক নেই, পথ পাব কিনা জানা নেই, তবু তা মনকে হতাশ করতে পারল না। এ আবহাওয়ার এমনি গুণ। এ পরিবেশের এমনি মায়া।

গুলাবকোটির পথে দল বেঁধে যখন যাত্রা করলাম, তখন পরিবেশের কোমল স্নিগ্ধতা অন্তর্হিত হয়েছে। মধ্যাহ্ন গগনে সূর্যদেব তখন বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। এই প্রথম আমাদের হাঁটাপথে যাত্রা শুরু হল। কলকাতার পোশাক ছেড়ে আমরা গরম পোশাক পরেছিলাম। একমাত্র দিলীপ একটি সুতির শর্টস পরেছিল। অভিজ্ঞতায় দেখা গেল দিলীপই বুদ্ধিমান। সেই গরমে গরম পোশাকে ঘেমে নেয়ে উঠছিলাম। তবু আমার ভালই লাগছিল। আমার পিঠে রুকস্যাক্। ওজন পঁয়ত্রিশ পাউন্ড। দুটো কাঁধই টনটন করছিল। তবু ভাল লাগছিল। চড়াই-এর পথ। ধীরে ধীরে চলছিলাম। সবার শেষে, সবার পিছে। সকলের আগে বেরিয়ে গেল দিলীপ আর বীরেনদা। ওরা ছবি তুলছে। ঘণ্টাখানেক চলার পর দেখা গেল, কী এক আশ্চর্য যোগাযোগে সব জোড়া বেঁধে গেছে। দিলীপ-বীরেনদা, বিশ্বদেব-মদন, সুকুমার-নিমাই, ধ্রুব-ডাক্তার আর আমি—আঙ-ফুতার। আমার চলার টাইলটি যে দেখে, তারই খুব মজা লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি "মোটা সাব" নামে পরিচিত হয়ে গেলুম। মোটা সাব! যাব্ বাবা!

সংসীতে এসে মালুম পেয়েছিলাম, পাহাড়ি পথে চলা কাকে বলে। এতক্ষণ আমরা মোটর-চলা সড়ক দিয়েই আসছিলাম। যোশীমঠ পর্যন্ত বাস-চলা

দা তেম্বা আঙ ফুতার

রাস্তা তৈয়ারি হচ্ছে। সংসীতে এসে মোটর-পথটা অনেকটা ঘুরে গেছে। শর্ট-কাট পথ যেটা, সেটা পাকদণ্ডির। আমি দেখলাম, আমাদের সব লোক পাকদণ্ডির পথ বেয়েই উঠে যাচ্ছে। আমিও ওদের অনুসরণ করলাম। সরু পথ, এমন সরু—একসঙ্গে দুটো পা রাখা যায় না। খাড়া চড়াই। একটু একটু করে উঠছি। খানিকটা ওঠার পর দম ফুরিয়ে গেল। বুকটা এত ধড়ফড় করছে, মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। গলা শুকিয়ে কাঠ। গলগল করে ঘাম ঝরে ঝরে চশমা আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। চশমা মুছব, সে

তাসি গরবু

উপায় নেই। হাতে যে আশ্রয় ধরে আছে, তা ছেড়ে দিলেই গড়িয়ে পড়ে যাব নিচেয়। হাতের আইস-অ্যাকসটাকে তখনও পর্যন্ত রপ্ত করতে পারিনি। সুকুমার আমাকে পই পই করে বলে দিয়েছিল সূচল দিকটা শরীর থেকে দূরে রাখতে, নইলে পেটের ভিতর ঢুকে যাবার সম্ভাবনা। আমি তাই যত রকমে পারি তুষার-গাঁইতির তীক্ষ্ণ ডগাটা বাইরের দিকে রাখবার চেষ্টা করছিলাম, আর সেই ডগাটা ততই আমার তলপেটের দিকে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছিল। আচ্ছা ফ্যাসাদ! এই রকম বিব্রত, অতি-ব্যস্ত অবস্থায় খাড়া চড়াইটার মাঝামাঝি উঠে আমার মনে হল, আমি বোধহয় মাউণ্ট এভারেস্ট ছাড়িয়ে উঠেছি। আর আমার একটুও দম নেই। বুকে একটা ব্যথা টের পেলাম। উপরের দিকে চেয়ে দেখলাম শেষ লোকটিও চড়াইটার উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। নিচে চাইবার সাহস হল না। কারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। মনে হল, আমি একাই পিছিয়ে পড়েছি। তাড়াতাড়ি করে কয়েক ধাপ উঠতে চেষ্টা করলাম। ঘাড়ের পাশ দিয়ে রক্তস্রোত মাথার দিকে বইছে বলে মনে হল। চোখে কালো কালো বিন্দু ফুটে উঠতে লাগল। পা টলতে লাগল। একটা পাথর থেকে আরেকটা পাথরে—দূরত্বটা একটু বেশিই ছিল—পা বাড়িয়ে দিলাম। বুঝলাম আমার পা সে-পাথরটার নাগাল পেল না। শরীরটা টাল খেয়ে গেল। গোঁত্তা খেয়ে পড়ছিলাম। কে যেন খপ্ করে আমাকে চেপে ধরল। নিশ্চিত পতনের হাত থেকে বেঁচে গেলাম।

পিছন ফিরে দেখি, আঙ-ফুতার। এক হাতে আমার জামার কলারটা চেপে ধরেছে। একগাল হেসে বললে, "নিচু নেহি মোটা সাব, অভি উপর যানে হোগা। থোড়া হ্যায়।"

কোথায় ছিল আঙ-ফুতার, কেমন করে আমাকে ধরে ফেলল ঠিক সময়মত, সে কথা ভাববার মত অবস্থা আমার তখন ছিল না! আচ্ছন্নের মত উঠতে লাগলাম। এক সময় দেখ উপরে উঠে পড়েছি। দু-পা এগুলেই এক ইস্কুল-বাড়ির বারান্দা। টলতে টলতে এগিয়ে গেলাম। তারপর বারান্দায় উঠেই চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লাম। চোখ দুটো আপনিই বুজে এল। কতক্ষণ পড়েছিলাম জানিনে। আঙ-ফুতার ডাকল, "সাব্, মোটা সাব!" চোখ মেলে চাইলাম। আঙ-ফুতার একটা মগ এগিয়ে দিল। একগাল হেসে বললে, "পিও। লেমন পানি। আচ্ছা।" চোঁ চোঁ করে এক মগ লেমন পানি খেয়ে নিলাম। আঙ-ফুতার খিল খিল করে হাসতে লাগল। আমিও হেসে ফেললাম।

গোলাবকোটি পৌঁছতে আমাদের

গ্যালদিন আজিবা

পাঁচটা বেজেছিল। নয় মাইল এসেছি পাঁচ ঘণ্টায়। প্রথম দিন, তাই ধীরে ধীরে হেঁটেছে সবাই। মালবাহকেরাও খুব সচেতন হয়েছে আজকাল। এটা নাকি ওদের এক পড়াও (একদিনের রাস্তা)। ডাকবাংলোয় উঠেছি। ভারি সুন্দর জায়গাটা। তীর্থযাত্রাপথের উপরই গোলাবকোটি। এখন মোটর-রাস্তা অনেক নিচে দিয়ে চলে যাওয়ায় এর আর আগের দিন নেই।

সবাই খুব ফূর্তিতে আছে। মাউণ্টেনীয়ারিং এক্সপিডিশনে এসেছে না বনভোজনে, এদের দেখে বোঝা যায় না। পথ চলছে হৈ-হৈ করে। গান করছে। মজার মজার টিপ্পনী কাটছে। একজনের পিছনে আরেকজন লেগেই আছে। এ-এক অদ্ভুত অভিযান।

আজ আবার বিজয়া দশমী। বিশ্বদেব এন্তার চিঠি লিখে চলেছে। মদনের ধারণা, বিশ্বাসের যা নেচার, তাতে ও যদি ঠিকমত হাত চালাবার ফুরসৎ পায়, তবে একদিনে এক জি-পি-ও পোস্ট কার্ড ও লিখে ফেলতে পারে।

সন্ধ্যার পর এক অভিনব অনুষ্ঠানে বিজয়া দশমী পালন করা হল। শেরপাদের নেমন্তন্ন করা হল। ওরা আসতেই ডাক-বাংলোর আঙিনায় গোল হয়ে সবাই ঘিরে বসলাম। একজন উঠে বললে, আজ বিজয়া দশমী, ভাই-ভাই পরব, এস আমরা কোলাকুলি করি। শুরু হল কোলাকুলি। তারপর ঘোষণা করা হল, এইবার মিষ্টিমুখ। সেন মহাশয় আর কে সি দাসের টিনের রসগোল্লার সদ্গতি হল। শেরপাদের রম্ দেওয়া হল।

তারপরের অনুষ্ঠান সংগীত। মূল গায়েন নিমাই আর বীরেনদা। নিমাই-এর "লে লো সুরমা" আর বীরেনদা'র শ্যামাসংগীত মিলে যা এক বিচিত্র ভাবের ঢেউ বইয়ে দিলে সকলের মনে, তা আর কহতব্য নয়। দা তেম্বাও খান দুয়েক গান গাইলে। শেরপা সংগীত।

নৃত্যানুষ্ঠানের শেষে বিজয়া দশমীর জলসা বন্ধ হল। রাত তখন দশটা সাড়ে দশটা।

(ক্রমশ)
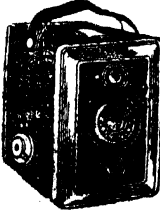
কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৬৮)

মনে আছে সে উনিশ শো একচল্লিশ সালের বাইশে জুনের কথা। হঠাৎ সকালবেলা পৃথিবীর সব মানুষ একসঙ্গে ঘুম থেকে উঠে জানতে পারলো জার্মানীর আর্মি বলা-নেই কওয়া-নেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে একেবারে সোভিয়েট রাশিয়ার বুকের ভেতরে। ব্যাল্টিক্ থেকে ব্ল্যাক-সী পর্যন্ত সমস্ত এরিয়া জুড়ে জার্মান-আর্মি তছ্-নছ্ করে দিয়েছে রাশিয়ার ডিফেন্স লাইন। ফিন্ল্যান্ড, হাঙ্গারী, বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া—সবাই আছে হিটলারের সঙ্গে।

ক্রফোর্ড সাহেব ডেকেছিল দীপংকরকে। দীপংকর গিয়ে বসল সামনে। বড় গম্ভীর মানুষ ক্রফোর্ড সাহেব। রেলের অফিসের কোনও কাজ নিয়ে কখনও তাড়াহুড়ো করবার মানুষ নয়। ধীর স্থির মানুষটা। কোয়ার্টার থেকে এসে চুপ করে সারাদিন কাজ করে যায়, আবার ঠিক অফিস থেকে চলেও যায় নিজের সময়মত।

ক্রফোর্ড সাহেব একটু হাসলো। সাধারণত গোঁফের আড়ালে হাসতে সাহেবকে কখনও দেখেনি কেউ।

জিজ্ঞেস করলেন—সেন, আর ইউ অ্যাফ্রেড্?

দীপংকর একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল প্রশ্নটা শুনে। বললে—কেন স্যার? এ-কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন?

হাতে ফাইলটা ছিল সাহেবের। হাতের ফাইলটা দেখিয়ে বললে—এই ফাইলটা দেখেছ? শুনেছি, হোল্ ক্যালকাটার লোক নাকি অ্যাফ্রেড হয়ে উঠেছে—

সত্যিই কলকাতায় তখন শহর ছেড়ে বাইরে চলে যাবার হিড়িক পড়ে গেছে, কেউ মধুপুর, কেউ গিরিডি, কেউ গ্রামের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার আগেই নন্-অ্যাগ্রেশন্ প্যাক্ট হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার হাতের কাছে তখন এগিয়ে এসেছে ওয়ার। পার্ল হারবারের লড়াই-এর পর জাপান আর একদিনও দেরি করেনি, এক দমে নিয়ে নিয়েছে ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর, ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ। কলকাতার পাশে বর্মা তখন টল্-মল্ করছে—

দীপংকর বললে—আমি তা জানি স্যার—

—তুমি তোমার ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিয়েছ নাকি বাইরে?

ক্রফোর্ড সাহেব জানতো না যে দীপংকরের ফ্যামিলি বলতে কেউই নেই। অথচ ফ্যামিলি না থাকলেও যে দীপংকরের কত আত্মীয় আছে তা কী করে বোঝাবে সাহেবকে। সাহেব হয়ত বুঝতেও পারবে না সে সব কথা!

তোমার কী মনে হয় সেন, উই উইল্ লুজ্ দি ওয়ার? আমরা যুদ্ধে হেরে যাবো?

দীপংকর ক্রফোর্ড সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। যে-মুখে কখনও কোনও কিছুর রেখাই পড়ে না, সেই মুখেই যেন ভয়ের রেখা ফুটে উঠেছে। উদ্বিগ্ন চার্চিল যেন চুরুট টানতেও ভুলে গেছে। হাওড়া স্টেশনে, শেয়ালদা স্টেশনে রোজ স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। শুধু ক্রফোর্ড সাহেব কেন, সমস্ত অফিসশুদ্ধ লোক ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সমস্ত কলকাতাই যেন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। যাদের ভাড়া-বাড়ির উপর আয়, তাদের আয় কমে যাচ্ছে। বিক্রি হয়ে যাচ্ছে অনেক বাড়ি। দর সস্তা হয়ে যাচ্ছে সম্পত্তির। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের মালিক নয়নরঞ্জিনী দাসী তাই একে একে সব বাড়ি বিক্রি করে লিকুইড্ ক্যাশ করে রাখছে ব্যাংকে। ফিক্সড্ ডিপোজিট্। দীপংকরের নিজের জীবনের মতই যেন সমস্ত পৃথিবীতে ভূমিকম্প সুরু হয়েছিল। হঠাৎ সেই সময়ে দেখা কিরণের সঙ্গে।

কিরণ একধারে টেনে নিয়ে এল দীপংকরকে।। বললে—কেউ জানে না আমি এখানে—আমার নামে ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া য়্যাক্টের ওয়ারেন্ট ঘুরছে—

—কিন্তু তুই এই সময়ে এলি কী করে?

কিরণ বললে—সাবমেরিণে—

দীপংকর জিজ্ঞেস করলে—কোথায় আছিস্?

—হোটেলে। সবাই জানে আমি ইউ-রোপীয়ান কিন্তু আর হোটেলে থাকা চলবে না, অল্রেডি সাস্পেক্ট করতে আরম্ভ করেছে সবাই, এই জিনিসটা তোর কাছে রাখতে এলুম—এটা রেখে দিবি? খুব সাবধানে রাখতে হবে কিন্তু—

একটা কাগজে মোড়া ছোট বাণ্ডিল। দীপংকর হাতে নিয়ে বললে—কী এটা

—তা জানতে চাসনি তুই, যা বলছি করবি কিনা বল্, আবার দু' তিন দিন পরে আমিই নিয়ে যাবো।

হঠাৎ দীপংকরের মা'র কথাটা মনে পড়লো। বললে—অব্জেক্শ্যানেব্ল্ কিছু আছে?

—তাহলে দে, রাখবার দরকার নেই—বলে বাণ্ডিলটা আবার টেনে নিয়ে কিরণ চলে

যাচ্ছিল। দীপংকর তাড়াতাড়ি বললে—দে না, আমি কি বলেছি রাখবো না?

—আমি তাহলে চলি?

কিন্তু......

কিরণ বললে—আর দেরি করবার সময় নেই, ট্যাক্সি-ড্রাইভারটা সন্দেহ করছে—

—তোর মা, তোর মার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

কিরণ ততক্ষণে ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছে। উঠতেই ট্যাক্সিটা স্টার্ট দিলে।

দীপংকর আবার জিজ্ঞেস করলে—তোর মা'র সঙ্গে দেখা করেছিস?

ততক্ষণে ট্যাক্সিটা হু হু করে চলে গেছে অনেক দূরে। দীপংকর হাঁ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তার মনে হলো যেন আবার বয়েস কমে গেল তার। আবার সেই তারা দু'জনে লাইব্রেরী করবে, আবার তারা সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের জীবন ফিরে পাবে, আবার যেন কিরণের বাবা বেঁচে উঠবে, দীপংকরের মা-ও ফিরে আসবে—আবার সেই অঘোরদাদু, বিন্তিদি, আবার সেই পুরোনো ছোটবেলায় যেন ফিরে যেতে ইচ্ছে করতে লাগলো দীপংকরের।

সেই অন্ধকার রোয়াকের ওপর অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দীপংকর।

কিরণের ট্যাক্সি চলে গেছে। স্টেশন রোডের রাস্তার গ্যাসের আলোগুলো অন্ধকারে মুখ ঢেকে ঠায় দাঁড়িয়ে। বড় নিরিবিলি রাত। বড় নিঃসংগ অন্ধকার। বহু যুগ পরে যেন দীপংকর এক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী পরিক্রমা করে এল। এ কী করলে কিরণ! এক মুহূর্তে এ কী রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়ে গেল তার? সেইখানে সেই রোয়াকের ওপর দাঁড়িয়েই তার মনে হলো বড় দেরি হয়ে গেল। কিরণকে ধরে রাখলেই ভালো হতো! কিরণকে তার মার কাছে পৌঁছিয়ে দিলেই ভালো করতো। কেন যেতে দিলে কিরণকে? আর যদি কিরণ না আসে? আর যদি না দেখা হয়! আর যদি ধরা পড়ে? ধরা পড়ে যদি জেল হয়? ফাঁসি হয়?

—দাদাবাবু!

টপ্ করে হাতের বান্ডিলটা দীপংকর নিজের অজ্ঞাতেই লুকিয়ে ফেলেছে। কাশী দীপংকরকে এই অবস্থায় দেখে কেমন অবাক হয়ে গেল। অনেকদিন থেকেই কাশী সব লক্ষ্য করছিল। কোথায় যেন কি বিপর্যয় ঘটেছে। মা'র মারা যাবার পর থেকেই দাদাবাবু যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। এক-একদিন সকালের আগে ঘুম থেকে উঠে ছাদে গিয়ে বেড়ায়। অনেক রাত্রে বাড়ি আসে। অনেক রাত্রে ঘুমোতে যায়। কখন যে ঘুমোয় টের পায় না কেউ। কাশী একা-একা লক্ষ্য করে। একা-একা দেখে।

এক-একদিন যখন সকাল-সকাল বাড়ি ফেরে দীপংকর ইজি-চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। সমস্ত শরীর ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। পাশ দিয়ে কাশী গেলেই ডাকে। বলে—কাশী—

কাশী কাছে আসে। বলে—কিছু বলছিলেন আমাকে?

দীপংকর জিজ্ঞেস করে—কাজ করছিলে?

কাশী বলে—না, আপনাকে খেতে দেব?

দীপংকর বলে—না—

তরপরে কী যেন বলতে গিয়েও বলতে পারে না দীপংকর। বলতে যেন দ্বিধা হয়, যেন বেধে যায় গলায়। কেমন করে বলতে হবে সেইটেই যেন ভেবে নেয় মনে মনে। অনেকদিন ধরেই কথাটা ভাবছে দীপংকর! অনেক দেখলে দীপংকর, অনেক দেখেছে। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন থেকে সুরু করে অনেক পথ পরিক্রমা করে এসেছে। অনেক মৃত্যু অতিক্রম করেছে, অনেক জীবন অতিবাহিত করেছে। কোথাও কোনও সান্ত্বনা পায়নি, কোথাও কোনও সমাধানও পায়নি। এখন মনে হয় একমাত্র কাশীর মধ্যেই যেন দীপংকর নিজেকে দেখতে পাবে।

দীপংকর জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে, তুই লেখাপড়া করবি?

লেখা-পড়া! লেখাপড়ার কথা কখনও কল্পনা করেনি কাশী।

—লেখাপড়া করলে মানুষ হতে পারবি। লেখাপড়া করলেই তবে মানুষ মানুষ হতে পারে। লেখাপড়া করলে অন্তত বুঝতে

পারবি পৃথিবীর কে কী-রকম মানুষ। কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ।

কাশী বললে—কখন লেখাপড়া করবো?

—কেন, আমি অফিস থেকে ফিরে এসে তোকে পড়াবো। একটু খালি মন দিস্‌, তাহলেই খুব শিগ্‌গির বুঝতে পারবি, তারপর যদি চাস্‌ তো তোকে আমাদের অফিসে চাকরি করে দেব। চিরকাল কি এমনি করে পরের বাড়িতে চাকরের কাজ করবি তুই—চিরকালই কি বাসন মাজবি, ঘর ঝাঁট দিবি?

—তাহলে কে বাসন মাজবে? কে আর ঘর ঝাঁট দেবে তখন?

দীপংকর বললে—দুটো কাজই করবি, লেখাপড়া করলে কি আর সংসারের কাজ করা যায় না?

তারপর অনেকক্ষণ ধরে অনেক-কথা বলে যায় দীপংকর। কাশী কিছু বুঝতে পারে না। দীপংকর যেন নিজের সংগেই কথা বলছে। নিজের কাছেই নিজের জবাবদিহি করছে। যেন আত্মবিশ্লেষণ করছে আপন মনে। একদিন সমস্ত পৃথিবী থেকে অন্যায়-অত্যাচার উঠে যাবে। একদিন মানুষ সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হবে। কাশী এ-সব কথা বুঝতে পারে না।

দীপংকর বললে—কাল তোর জন্যে একটা প্রথমভাগ কিনে আনবো, তুই পড়বি, বুঝলি?

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর শুতে গিয়ে কী মনে হলো। বিছানা থেকে আবার উঠলো দীপংকর। সমস্ত নিস্তব্ধ। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেক দূরে থেকে থেকে কোথায় যেন কামানের শব্দ হচ্ছে—তারই প্রতিধ্বনি এখানে এই কলকাতা শহরে এসে যেন পৌঁছুল এখন। কত লোক প্রাণ দিচ্ছে, কত লোক নিঃসন্তান হচ্ছে, কত লোক নিরাশ্রয় হচ্ছে, এখানে এই কলকাতা শহরে বসে তা যেন কল্পনা করা যায়। মস্কো আর লেনিনগ্র্যাডের দিকে এগিয়ে চলেছে জার্মানী। আর এদিকে জাপান এগিয়ে আসছে বার্মার পথ ধরে। বর্মার পরই কলকাতা। ক্রফোর্ড সাহেব ভয় পেয়েছে। রেলের অফিসের সমস্ত লোক ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়ার ইউনিটে নাম লিখিয়েছে। যে ক্লার্ক পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাচ্ছে—এই ইউনিটে নাম লেখালে পাবে আরো পঞ্চাশ টাকা। দিল্লী বোর্ড থেকে চিঠি এসেছে। যার খুশী সে-ই নাম লেখাতে পারবে। খাকী বুশ-কোট, খাকী প্যাণ্ট, খাকী ক্যাপ। সমস্ত অফিস সুদ্ধ লোক মিলিটারিতে নাম লিখিয়েছে।

ক্রফোর্ড সাহেব সেদিন ডেকেছিল। বললে—তুমি নাম লেখাওনি কেন?

দীপংকর বললে—না স্যার, সবাই আছে, আমি না-ই বা থাকলাম—

—কিন্তু, তুমি নাম লেখালে কিংস্ কমিশন পাবে—লেফ্‌টন্যান্ট্ হবে, মেজর হবে—

দীপংকর বললে—আমি জানি স্যার—

—তাহলে তুমি কি ভয় পেয়েছো? তুমি কি অ্যাফ্রেড্?

দীপংকর বললে—ভয় নয়, ঠিক উল্টো, আমি ভয় পাইনি বলেই সই করিনি—

—কিন্তু টাকা? ডি অব্ আইতে সই করলে আরো দেড় শো টাকা এক্সট্রা পাবে—টাকার বেনিফিট্ তুমি চাও না?

সত্যিই, জিনিস-পত্রের দাম বাড়বার জন্যে পুওর-ক্লার্করা সবাই মিলিটারিতে নাম লিখিয়েছে। শুধু দীপংকরই নাম লেখায়নি। বুড়ো বুড়ো ক্লার্ক, যারা জীবনে সংসার আর চাকরি ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, তারাও সবাই দুপুরবেলা প্যারেড করে। মাঠে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে লেফ্‌ট-রাইট্ করে। রোদে ঘেমে নেয়ে হাঁপায়। শুধু দুটো টাকার মুখ দেখতে পাবে বলে। কোথায় রইল কংগ্রেস, কোথায় রইল স্বরাজ, কোথায় রইল মহাত্মা গান্ধী—সবাই টাকার জন্যে দাসখৎ দিয়ে দিলে কাগজে। রেলের অফিসকে আর রেলের অফিস বলে চেনা যায় না। অন্য চেহারা হয়ে গেছে রাতারাতি। সবাই মিলিটারি—সবাই সেপাই। তালপাতার সেপাই সব। টাকার দাস। সুধীরবাবু, মধু, রঞ্জিতবাবু, পাশবাবু—কাউকেই আর চেনা যায় না। মাদ্রাজ আর কলকাতা—রেঙ্গুনে বোমা পড়বার পরই চেহারা বদলে গেল। দলে দলে দুটো শহরের লোক পালাচ্ছে। শহরের লোক সব হাওড়া আর শেয়ালদ' স্টেশনের দিকে ছুটছে। ছেলেরা চুপ-চাপ বসে থাকে। স্কুল কলেজ বন্ধ, ইউনিভার্সিটি

বন্ধ। কেউ নেই। কোথাও কেউ নেই। সমস্ত পৃথিবীতে যেন মানুষ নিরাশ্রয়ের মত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ছুটছে।

—তাহলে তুমি কি ভিক্টরি চাও না?

ভিক্টরি! কাদের ভিক্টরি, কীসের ভিক্টরি! কেন ভিক্টরি চাইবে দীপংকর। যদি মানুষের জয় হয় তো নিশ্চয়ই দীপংকর সে-দলে থাকবে। কিন্তু কই, পাঁচ বছর ধরে চায়নার উপর বোমা ফেলেছে জাপান, তবু চাইনিজরা তো পালায়নি! গ্রেট ব্রিটেনের ওপর জার্মানী তো কত বোমা ফেলেছে, কই, এমন করে তো ইংরেজরা পালায়নি সেখান থেকে! কেন তবে কলকাতার লোক পালায়! কেন তারা অসহায় বোধ করে! কেন তারা অভিভাবকহীন হয়ে গ্রামে মফঃস্বলে গিয়ে প্রাণের ভয়ে লুকোয়।

সন্তোষকাকা সেদিন এল। একেবারে দৌড়তে দৌড়তে ঘরে এসে ঢুকলো। দীপংকর তখন অফিসে যাচ্ছে।

সন্তোষকাকা বললে—তুমি তো আমাদের যেতে দিলে না রসুলপুরে, এখন এদিকে কী কাণ্ড হলো দেখছো তো?

দীপংকর বললে—কী কাণ্ড?

—কেন, তুমি জানো না কী কাণ্ড? তুমি জানো না? আমার সঙ্গে আবার চালাকি হচ্ছে?

দীপংকর একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে—কী বলতে চান, আপনি সোজা করে বলুন আমাকে?

—সোজা করে বলুন মানে? আমি কি

তোমার সঙ্গে ইয়ারকি করছি বলতে চাও? মানুষের প্রাণ নিয়ে ইয়ারকি করার সময় এইটে? আমরা গরীব লোক বলে আমাদের প্রাণের কি দাম নেই ভেবেছ?

—তার মানে?

সন্তোষকাকা বললে—তোমার না-হয় আপিস আছে, যদি বোমা পড়ে তো আমরা কোথায় থাকবো শুনি? আমরা কোথায় থাকবো? আমরা বাপ-বেটিতে বেঘোরে মারা যাবো, এই কি তোমার মনোবাঞ্ছা?

দীপংকর এতক্ষণে বুঝতে পারলে। বললে —কিন্তু বোমা পড়লে দেশে পালিয়ে গিয়েই কি বাঁচতে পারবেন কাকাবাবু?

—তোমায় আর অত দরদ দেখাতে হবে না বাবাজী, খুব দরদ দেখিয়েছ। তোমার নিজের রান্না-খাওয়া চলে যাচ্ছে কিনা, তাই আর উচ্চবাচ্য করছো না, এদিকে যে পাড়া ফাঁকা হয়ে গেল, পাড়ায় যে আর কেউ নেই —আমরা কি মরতে এসেছি এখানে?

দীপংকরের উত্তর দেবার আগেই সন্তোষ কাকা বাধা দিয়ে বললে—কিন্তু আর আমায় রাখতে পারবে না তুমি এই বলে রাখছি, আর আমায় ধরে রাখতে পারবে না—আমার মেয়ে আর তোমার আপিসের পিণ্ডি রাঁধতে পারবে না—এই বলে দিলুম—

দীপংকর বললে—তা ভাত রান্নাটা তো বড় কথা নয় কাকাবাবু, আমার কাশীই ভাত রাঁধতে পারবে—আপনারা আরাম করে থাকুন না এখানে—বিপদ হলে তো আর একলা আপনার হবে না, সকলেরই হবে! দেশে গিয়ে কী করবেন?

সন্তোষকাকা বললে—তার মানে? দেশে গিয়ে কী করবো? তুমি তো বেশ বললে, এদিকে আমার মেয়ের বয়েস হচ্ছে না? লড়াই যদি এখন দশ-বছর চলে তো আমার মেয়ে আইবুড়ো হয়ে থাকবে! তার বিয়ে দিতে হবে না?

দীপংকর বললে—বিয়ের জন্যে অত ভাবছেন কেন? আমি তো আছি—

সন্তোষকাকা এবার রেগে উঠলো। বললে —দেখ, খবরদার বলছি আমার সঙ্গে ইয়ারকি কোরো না, তোমার সঙ্গে আমার ইয়ার্কির সম্পর্ক নয়—জানো, আমি রসুলপুরের দত্ত?

বলে ঘর থেকে তেড়ে-মেরে বেরিয়ে গেল সন্তোষকাকা। যাবার সময় বলে গেল—আমি দেখাচ্ছি তোমার ইয়ারকি দেওয়া, আমার সঙ্গে ইয়ারকি দেওয়া আমি দেখাচ্ছি—

বলে চিৎকার করে শাসাতে শাসাতে সন্তোষকাকা একতলায় নেমে এল। তারপর সোজা উঠোন পেরিয়ে একেবারে রান্নাঘরে।

—এই ক্ষিরি, ক্ষিরি, আয় ইদিকে—হাতা-বেড়ি রাখ্ তোর—রাখ—

ক্ষীরোদা রান্না করছিল। হঠাৎ সন্তোষ-কাকা হাত ধরে টান দিল। বললে—রাঁধতে হবে না আর—

ক্ষীরোদা প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর সামলে নিয়ে বললে—বাবা তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

সন্তোষকাকা বললে—না, পাগল হইনি, তবে পাগল হতে আর দেরি নেই, তুইও পাগল হয়ে যাবি, আমিও পাগল হয়ে যাবো! ভেবেছে কী সব? আমি মেয়ের বিয়ে দিতে পারিনে? আমার ক্ষমতা নেই? আমি সবাইকে দেখিয়ে দেব রসুলপুরের সন্তোষ দত্ত কী করতে পারে? আমি লঙ্কা-কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারি—তা জানিস্, আমি কিছু বলিনে বলে তাই—

ক্ষিরি খানিকক্ষণ বাবার কথা শুনতে লাগলো। তারপর বললে—এমন করে চেঁচিও না তুমি—দুটো মুড়ি দিচ্ছি, খাও বসে বসে—

—কী? মুড়ি দিয়ে তুই আমার মুখ বন্ধ করতে চাস? খাবো না আমি মুড়ি—আমি চুপ করবো না, আমি আজ এর একটা হেস্ত নেস্ত করবোই—রাখ তুই হাতা-বেড়ি, চল্ আমার সঙ্গে—চল্—

ক্ষিরিকে সন্তোষকাকা যত টানে, ক্ষিরিও তত ভয়ে পেছু হাঁটে।

ক্ষিরি বলে—কোথায় নিয়ে যাচ্ছো আমাকে? কোথায় যাবো?

সন্তোষকাকা তখনও হাত ছাড়েনি। বলে —চল্, রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষে করবো, তবু এখানে থাকবো না, ও ভেবেছে আমার থাকবার জায়গা নেই, এ-বাড়ি ছাড়া আমার গতি নেই—

—কিন্তু তা বলে এই অবস্থায় যাবো?

—হ্যাঁ, যা বলছি শোন্—

—এখনও যে খাওয়া-দাওয়া হয়নি তোমার? তুমি ভাত খাবে না?

সন্তোষকাকা বললে—আমি পিণ্ডি খাবো না, উপোষ করবো, তবু এখানে থাকবো না —একদিন না-খেলে কী হয় শুনি? একদিন না-খেলে কী হয়? মরে যায় লোক? মরে যায় না। তুই চলে আয়—

ক্ষিরিকে টানতে টানতে সন্তোষকাকা প্রায় উঠোনের মধ্যেখানে এসে হাজির হয়েছে। তখনও ছাড়ে না।

হঠাৎ দীপংকর ওপর থেকে শব্দ পেয়েই একেবারে সিঁড়ি দিয়ে নিচেয় নেমে এসেছে। একেবারে সন্তোষকাকার হাতটা ধরে ফেলেছে। বললে—করছেন কী? করছেন কী কাকাবাবু? হাত-টানাটানি করছেন কেন? ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন—

সন্তোষকাকার হাতটা জোর করে ছাড়িয়ে দিতেই, সন্তোষকাকা দীপংকরের দিকে কেমন কটমট্ করে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তার-পর বললে—তুমি আমার গায়ে হাত দিলে শেষকালে? শেষকালে তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ে হেনেস্থা করলে? আচ্ছা দেখাচ্ছি —দাঁড়াও—

বলে আর কথাবার্তা নেই, একেবারে

চিৎকার করতে করতে লাফাতে লাফাতে সদর দরজা দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। রাস্তার বাইরেও সন্তোষ কাকার চিৎকার শোনা গেল—আচ্ছা দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা, মজা টের পাওয়াচ্ছি আমি—

তারপর আর সন্তোষকাকার গলা শোনা গেল না।

সেই উঠোনের ওপরেই দীপঙ্কর আর ক্ষীরোদা তখনও চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। যেন দু'জনেই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল সন্তোষকাকার এই কান্ড থেকে।

দীপঙ্কর ক্ষীরোদার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—তুমি কিছু ভেবো না, কাকাবাবু খিদে পেলেই বাড়ি ফিরে আসবেন—তুমি ভেবো না কিছু—

ক্ষিধে পেলে যে সন্তোষকাকা বাড়ি ফিরে আসবে, তা ক্ষীরোদা জানতো। কিন্তু এও জানতো যে তার খেয়ালী বাবা খেয়ালের ঝোঁকে সারাদিন উপোষ করেও কাটিয়ে দিতে পারে. ক্ষীরোদা তার বাবাকে ভাল করেই চিনে নিয়েছিল তার ছোট জীবন-পরিধির মধ্যে। বাবা যেমন খেতে পটু, তেমনি না-খেতেও যে পটু, সে-খবর বাইরের কেউ না-জানুক, ক্ষীরোদা জানতো। জানতো বাবা যখন রাগ করে, সে বড় কঠিন রাগ। তখন সে-রাগে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলতে পারে। আবার যখন ভালবাসে, তখন সে ভালবাসা বুঝি কখনও অমন করে পরকে আপন করেও নিতে জানে না। আরো জানতো বাবা গ্রামের লোক বটে, কিন্তু গ্রামেও বুঝি অমন লোক দু'টি পাওয়া যাবে না। তাই গ্রামেও বাবা টি'কতে পারেনি, শহরেও টি'কতে পারলো না।

তারপর এক সময় আরো বেলা হলো। বাবা এল না। দীপঙ্কর অফিসে চলে গেল খেয়ে-দেয়ে। রান্নাঘরের পাট চুকিয়ে কাশীও খেয়ে নিলে। কাশী জিজ্ঞেস করলে—তুমি খাবে না দিদিমণি?

ক্ষীরোদা বললে—না—

কাশী বললে—কাকাবাবুকে একবার খুঁজতে বেরোব?

ক্ষীরোদা বললে—একবার তুমি যেতে পাবো তো ভালো হয়—বুড়ো মানুষ তো—

কাশী বললে—কোথায় দেখবো? কোন্ দিকে যেতে পারেন?

ক্ষীরোদা বললে—আমি কি কোনওদিন বাইরে বেরিয়েছি এখানে যে বলবো। কোথায় আর যাবে বাবা, কাছেই হয়ত আছে কোথাও—দেখ না বাইরে গিয়ে—

কাশী বেরোল। ক্ষীরোদা জানালা ধরে দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার দিকে চেয়ে। রাস্তাটা নিঝুম হয়ে আছে। দুপুরের কলকাতা সহর। কয়েকমাস হলো রাস্তাটা আরো নিঝুম হয়ে গেছে। গলিটার ওধারে একটা নর্দমা। তার ওপাশে বেশি দূর আর নজর চলে না। একটা বাড়ির আড়ালে রাস্তাটা কোথায় গিয়ে ট্রাম-রাস্তায় ঠেকেছে—কিছুই জানে না ক্ষীরোদা। শুধু কর্কশ ঘড়-ঘড় আওয়াজ কানে আসে। দু'একটা বাড়ির ঝি-চাকর এধার থেকে ওধারে যায়। পাশের বাড়ির একটা বুড়ি-ঝি যাচ্ছিল। ক্ষীরোদা আস্তে আস্তে ডাকলে। বললে—ও মেয়ে শুনছো?

—কী মা? কাছে এল বুড়ী-ঝি'টা।

ক্ষীরোদা বললে—তুমি কোন্ দিকে গিয়েছিলে গা? আমার বাবাকে দেখেছ?

বুড়ী-ঝি'টা অবাক হয়ে তাকালো। বললে—তোমার বাবা? কই দেখিনি তো মা? কোথায় গেছে?

বুড়ী-ঝিটা আরো দু'একটা কথা বলে নিজের কাছে চলে গেল। ক্ষীরোদা গরাদে মাথা ঠেকিয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর দেখতে লাগলো। ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। কাঠ ফেটে যাচ্ছে রোদের ঝাঁঝে। আর একজন কে আসছিল। ক্ষীরোদার একবার দ্বিধা হলো। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। বললে—হ্যাঁ গো, একজন বুড়ো মানুষকে দেখেছ তুমি?

—বুড়ো মানুষ? কী-রকম বুড়ো মানুষ?

সত্যিই তো, বুড়ো মানুষ তো সংসারে কতই আছে, রাস্তাতেও কত ঘোরা-ফেরা করছে। কে আর তার সন্ধান করছে। কে তার বাবার নাম-ধাম-চেহারা মুখস্থ করে রেখে দিয়েছে! ক্ষীরোদা আরো অনেকক্ষণ ধরে জানালার বাইরে চেয়ে রইল। মাথার ওপারের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লো। চারটে বাজলো ঘড়িতে। পাঁচটা বাজলো, ছ'টা বাজলো। সন্তোষকাকা আর ফিরে এল না।

লক্ষ্মীদি সকালবেলাই ঘুম থেকে উঠেছে। সকাল থেকেই তার বড় তাড়া। দাতারবাবুও তৈরি হয়ে নিয়েছে। সকাল থেকেই লক্ষ্মীদির দরজার সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। সকালবেলাই চা চড়ায় কেশব। চা মুখে পড়লেই লক্ষ্মীদির আর জড়তা থাকে না। আগের রাত্রে দেরি করে ঘুমোলেও চায়ের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে।

বিছানায় শুয়ে-শুয়েই লক্ষ্মীদি এপাশ-ওপাশ করে।

দাতারবাবু সেজে-গুজে ঘরে এসে বলে—কী হলো, এখনও ওঠোনি?

লক্ষ্মীদি বললে—ক'টা বাজলো?

দাতারবাবু বললে—পাঁচটা—

—এখনও যে চা দিলে না কেশব?

দাতারবাবু চিৎকার করে ডাকে—কেশব, কেশব—শিগ্‌গির চা দাও—

খানিক পরে সুধাংশু এসে হাজির। সুধাংশুও সকাল-সকাল উঠেছে আজ। উঠেই চলে এসেছে।

বললে—মিসেস দাতার, এত দেরি যে আপনার?

লক্ষ্মীদি বললে—কালকে বড্ড বেশি খাইয়ে দিয়েছিলে সুধাংশু—

কেশব ততক্ষণে চা দিয়ে গেছে। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিতেই সমস্ত জড়তা কেটে গেল শরীরের। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো। বলে—তুমি বোস সুধাংশু একটু, আমি তৈরি হয়ে আসছি—

দাতারবাবু তৈরি হয়েই বসেছিল। সুধাংশু বললে—সাতটায় প্লেন আসবে, এখনও তো টাইম আছে—

দাতারবাবু বললে—আমার সেই ভোর চারটেতেই ঘুম ভেঙে গেছে সুধাংশুবাবু,—আমি অনেকক্ষণ আগে থেকে তৈরি—

—আজকাল কেমন আছেন আপনি মিস্টার দাতার?

দাতারবাবু বললে—এখন আর কোনও কষ্ট হয় না—আগে মাথাটা কেমন করতো, আজকাল তাও সেরে গেছে—

সুধাংশু বললে—তবু ওষুধটা এখনও খেয়ে যান—ওষুধ ছাড়বেন না—

কোথা থেকে যে সুধাংশু ওষুধ এনে দেয়! যে ওষুধ বাজারে কোথাও পাওয়া যায় না, সুধাংশু একটা টেলিফোন করলেই হাতের কাছে এসে যায় সেই ওষুধ। শুধু ওষুধ নয়, সব কিছুই সুধাংশুর হাতের নাগালের ভেতরে। যে হুইস্কি বাজারে ব্ল্যাকে আশি টাকা নব্বই টাকা, সেই হুইস্কি পঁয়তাল্লিশ টাকা ফেললেই চলে আসে সুধাংশুর কাছে। সুধাংশু বলে—আমাকে শুধু আপনি বলুন না আপনার কী চাই, আমি এনে দিচ্ছি? হরলিকস্ নেবেন? বাঘের দুধ নেবেন? খাঁটি ঘি নেবেন?

এই গড়িয়াহাটের এই বাড়িটা কি এমনি ছিল আগে? দীপঙ্কর একদিন দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। দীপঙ্কর লক্ষ্মীদির বাড়িতে এসে প্রথমে চিনতেই পারেনি। এ কী বাড়ি? এ কার বাড়ি? বিকেল বেলা তখন দীপঙ্কর বলেছিল—এ হঠাৎ কী হলো লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদি বলেছিল—বাড়িটা আমি কিনলুম যে!

—তুমি এই বাড়ি কিনলে?

দীপঙ্করের যেন বিশ্বাস হবার কথা নয়। যে-বাড়িতে একদিন ভাড়াটে হয়ে এসেছিল, সেই বাড়ির মালিক হয়ে বসেছে লক্ষ্মীদি। বাইরে থেকে একেবারে সমস্ত বাড়িটার ভোল বদলে গেছে। নতুন কনক্রীটের হাল ফ্যাসানের বাড়ি। সামনে গ্রীলের গেট। লম্বা টাওয়ার। গ্লাস-ফিটিং আঁটা উইনডো।

দীপঙ্কর বলেছিল—এত সিমেন্ট কোথায় পেলে এখন?

লক্ষ্মীদি বলেছিল—কেন, সুধাংশু আছে আমার, ভাবনা কী?

—তা কত দিয়ে বাড়িটা কিনলে?

সত্যিই, লক্ষ্মীদির অনেক সাধ ছিল জীবনে। স্বামী হবে, সংসার হবে, টাকা হবে, বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, ছেলে হবে। সব হয়েছে। সব হয়েছে লক্ষ্মীদির। লক্ষ্মীদি যা কিছু চেয়েছিল, সমস্ত পেয়েছে। আর কিছু হতে বাকি নেই।

—এখন তোমার ছেলের কোন্ ক্লাশ হলো?

হঠাৎ যেন মনে পড়লো। বললে—মানস? মানস তো আসছে রে কলকাতায়—তোকে বলতে ভুলে গেছি—

তারপর একটু থেমে বলেছিল—জানিস দীপু, সেই ছোটবেলা থেকে মানসকে দূরে সরিয়ে রেখেছি—একদিনের জন্যে কাছে আনতে পারিনি। বরাবর কষ্ট করে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি সেখানে—কিন্তু কাছে এনে রাখতে কখনও সাহস পাইনি—

—কেন?

লক্ষ্মীদি গলা নিচু করে বলেছিল—ছি, তুই বলিস কী—আমি মা হয়ে কি ছেলেকে এখানে আসতে বলতে পারি কখনও? এই জুয়া হুইস্কি আর এইসব পাপের মধ্যে?

দীপঙ্করের চোখের সামনে লক্ষ্মীদির যেন আর এক রূপ ফুটে উঠেছিল।

লক্ষ্মীদি আরো বলেছিল—আমি তো জানি আমি কী। আমি তো জানি আমি কী ভাবে টাকা রোজগার করেছি, কীভাবে শম্ভুকে সারিয়ে তুলিয়েছি, কীভাবে ছেলে-মানুষ করেছি—তুইও তা কিছু কিছু জানিস তো! তাই তো ছেলেকে বরাবর বাইরেই রেখেছিলাম—

—তোমার ছেলেকে আমি কখনও দেখিনি, লক্ষ্মীদি!

—দেখবি কী করে? আমিই কি দেখেছি? ক'বছর আগে একবার গিয়েছিলাম ছেলেকে দেখতে শুধু। তার ভেকেশনের সময় পর্যন্ত তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়েছি। তবু এখানে আসতে দিইনি। লিখেছি—তোমার বাবার অসুখ, এখানে এলে তোমার অসুবিধে হবে। কিন্তু এমন করে আর কতদিন আটকে রাখতে পারবো? একদিন তো মানস বড় হবে, একদিন তো মানস সব বুঝতে শিখবে, সব জানতে পারবে, তখন?

দীপঙ্কর এ-কথার কিছু উত্তর দিতে পারেনি।

তারপর লক্ষ্মীদি আবার বলেছিল—এবার মানস লিখেছে—এবার এখানে আসবেই—

দীপঙ্কর বলেছিল—এখন তো তোমার সব হয়েছে, এখন তোমার গাড়ি হয়েছে, বাড়ি হয়েছে, এখন দাতারবাবুকে দিয়ে আবার বিজনেস্ করাও না—আবার একটা ব্যবসা ফাঁদো না—সেই আগেকার মত অর্ডার সাপ্লাইএর ব্যবসা—

লক্ষ্মীদি বলেছিল—এখনও তো শম্ভুই ব্যবসা করছে। এখন তো শম্ভুর নামেই কন্‌ট্র্যাক্ট দিচ্ছে সুধাংশু—। আসলে এ-সবই তো সুধাংশুর দেওয়া, কিন্তু নামটা তো শম্ভুর—

তারপর হঠাৎ দেয়ালের একটা ছবির দিকে দেখিয়ে বলেছিল—ওই দ্যাখ্, ওই মানসের ছবি—

দেয়ালের গায়ে ফ্রেমে আঁটা ফোটোগ্রাফ ঝুলেছিল। দীপঙ্কর সেই দিকে চেয়ে দেখলে! কী আশ্চর্য! এমন চমৎকার ছেলে লক্ষ্মীদির। কী চমৎকার বড় বড় চোখ। চোখও যে কথা বলতে পারে, ছবিখানা না দেখলে যেন বোঝা যায় না।

—সুধাংশু বলছিল মানসকে ওখান থেকেই লণ্ডনে পাঠিয়ে দিতে। অক্সফোর্ড কিম্বা কেমব্রিজে কোথাও পড়ুক গিয়ে।

দীপঙ্কর বলেছিল—কিন্তু তুমি কি থাকতে পারবে ছেলেকে অতদূরে পাঠিয়ে?

—না পারলেও তো পারতে হবে। এতদিনই বা পারছি কী করে?

—তাহলে ?

—কিন্তু মানস শুনবে না। আমাকে চিঠি লিখেছে কলকাতায় এবার আসবেই। এখানে বাড়িতে আমার কাছে থাকবে—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিল—কবে আসবে?

—এই মার্চের শেষে!

এই সেই মার্চের শেষ। সকাল সাতটার প্লেনে আসছে মানস। লক্ষ্মী, দাতারবাবু, সুধাংশু সবাই তৈরি, সবাই আজ আনতে যাবে।

লক্ষ্মীদি তৈরি হয়ে এল। ডার্ক গ্রীন রং-এর ব্লাউজের ওপর লাইট ইয়োলো কলারের শিফন শাড়ি।

সুধাংশু বললে—রেডি?

—রেডি!

হঠাৎ লক্ষ্মীদি কী যেন একটা কথা মনে পড়লো। এতদিন পরে খোকা আসছে। মা'র কাছে আসছে।

লক্ষ্মীদি বললে—দাঁড়াও সুধাংশু, আমি আসছি—এক মিনিট—

বলে লক্ষ্মীদি আবার পাশের ঘরে চলে গেল। তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার ঘরে এসে ঢুকেছে। বললে—চলো চলো, আর টাইম নেই—

বলে নিজের রিস্ট-ওয়াচটা একবার দেখে নিলে।

সুধাংশু তখন যেন সামনে ভূত দেখছে। দাতারবাবুও অবাক হয়ে গেছে। সুধাংশু বললে—এ কি, শাড়িটা বদলে এলেন যে মিসেস দাতার?

মিসেস দাতারের সত্যিই তখন অন্য চেহারা। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শাড়ি ব্লাউজ সব বদলে এসেছে। সেই ডার্ক গ্রীন ব্লাউজ আর লাইট ইয়োলো শাড়ির বদলে পরে এসেছে একটা সাদা পপ্‌লিনের ব্লাউজ আর শান্তিপুরী তাঁতের শাড়ি।

সুধাংশু বললে—এ কী করলেন মিসেস দাতার? সে শাড়িটা বদলে এলেন কেন? রঙিন শাড়িতেই তো আপনাকে বেশি মানায়—

লক্ষ্মীদি বললে—ছি, আমার লজ্জা করছিল বড্ড—

সুধাংশু তবু বুঝতে পারলে না। বললে—কেন?

লক্ষ্মীদি বললে—না না সুধাংশু ছেলেকে আনতে অত সাজ-গোজ করতে যেন যেমন লজ্জা করছিল—

—কেন তাতে কী হয়েছে?

লক্ষ্মীদি বললে—না সুধাংশু, আমি যে তার মা—

তারপরে গাড়িতে উঠেই লক্ষ্মীদি বললে—চলো, আগে দীপুর বাড়িতে যাই, দীপুকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো, ও-ও মানসকে দেখবে বলেছিল—

সেদিনও এস্‌ট্যাব্‌লিশমেণ্ট সেকশ্যান থেকে সুধীরবাবু এসে মিস্টার ঘোষালের

সামনে ফাইলটা খুলে দাঁড়ালো।

বললে—স্যার, সেই মিস মাইকেলের ভেকেন্সিটা...

মিস্টার ঘোষাল কাজ করতে করতে বললে—নট নাউ—

.—স্যার অনেকদিন দেরি হয়ে গেল—

মিস্টার ঘোষাল আবার গর্জন করে উঠলো —নট নাউ—

সুধীরবাবুর আর সামনে দাঁড়াবার সাহস হলো না। একেবারে ঘরের বাইরে এসে বাঁচলো। ঘরের বাইরে আসতেই দ্বিজপদ বললে—কেমন মেজাজ দেখলেন বাবু সায়েবের?

সুধীরবাবু বললে—তোর সাহেবের মেজাজের বালাই নিয়ে এবার আমরা মরে যাবো দ্বিজপদ—এবার সমস্ত অফিসটাই মারা যাবে তোর সাহেবের জন্যে—! কবে তোর সাহেব নিজে মারা যাবে বলতে পারিস?

দ্বিজপদ বললে—শালা আমার সায়েব নয় তো শুয়োরের বাচ্ছা—

বাইরে মুখে যাই বলুক, মনে মনে কিন্তু কিন্তু দ্বিজপদ সাহেবের দীর্ঘ-জীবনই কামনা করে, বলে—জয় বাবা জগন্নাথ, জয় বাবা বলরাম, সাহেবকে আমার বাঁচিয়ে রেখ বাবা। আর ক'টা মাস বাঁচিয়ে রাখলে দ্বিজপদকে আর চাকরি করে খেতে হবে না। পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আয়েস করে দেশে গিয়ে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে! আর ক'টা মাস, বেশি দিন নয়। মাত্র আর ক'টা মাস।

রেলের বাবুরা মিলিটারি পোশাক পরে প্যারেড করে—আর হাঁপায়। কখনও তো অভ্যেস নেই। ক'টা টাকার জন্যে বেমালুম দাসখৎ লিখে দিয়েছে বাবুরা। জীবনে কখনও ধুতি-কামিজ ছাড়া পরেনি, তারাই আবার পরেছে প্যাণ্ট-কোট।

দ্বিজপদ হাসে বাবুদের দিকে চেয়ে। বলে—দেবে যখন গরু খাইয়ে তখন বুঝবেন ঠেলাটা—

—কেন গরু খাওয়াবে কেন?

বাবুরা রেগে যায় দ্বিজপদর কথা শুনে। বলে—গরু ওমনি খাওয়ালেই হলো?

দ্বিজপদ বলে—তা বাবু, লড়াইয়ে গেলে খাওয়াবে না? লড়াইতে নিয়ে গিয়ে কি কালিঘাটের পাঁঠার মাংস খাওয়াবে ভেবেছেন—

সত্যিই, বাবুদেরও ভয় লেগে গিয়েছে। দু'টো টাকার জন্যে শেষ কালে হয়ত জাতটা খোয়াতে হবে। দ্বিজপদর কী? দ্বিজপদর কিসের ভাবনা! ঘোষাল সাহেব যদ্দিন আছে, তদ্দিন মজা লুঠে নাও। তারপর বুঝবে ঠেলা। দ্বিজপদ ছাড়া আর সবাই মিলিটারিতে নাম সই করেছে। ট্র্যাফিক অফিসে এক দ্বিজপদ সই করেনি। আর সই করেনি সেন-সাহেব। সেন-সাহেব তখনও অফিসে আসেনি। একজন বাঙালী-বাবু এসে মধুকে জিজ্ঞেস করলে—সেন-সাহেব আছে?

মধু বললে—না—

—কখন আসবে সাহেব?

মধু বললে—আসবে দেরিতে—আসতে দেরি হবে সায়েবের—

লোকটা তখনও ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। কোণের দিকে একটা বেঞ্চি পাতা ছিল। তার ওপর বসলো গিয়ে।

মধু বললে—আপনি বরং কাল আসবেন বাবু, আজকে দেখা হবে না—

—কেন? আজকে কী হলো?

—এখন অনেক কাজ সায়েবের। আপিসে এসে কারো সঙ্গে দেখা করেন না আজকাল।

লোকটা বললে—আমার সঙ্গে দেখা করবে—আমার বন্ধু সেন-সাহেব, এক সঙ্গে এক ক্লাশে এক ইস্কুলে পড়েছি এককালে—

লোকটার কথা শুনে মধু যেন কেমন অবাক হয়ে গেল। সেন-সাহবের বন্ধু—এ কেমন বন্ধু আবার!

সেন-সাহেবের অফিসে আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল। বেলা তখন বারোটা তখন অফিসে এসে হাজির দীপঙ্কর। সমস্ত সকালটা কেটেছে রাইটার্স বিল্ডিং-এ। বর্মা ইভাকুয়ীজ অফিসের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হয়েছিল। সেদিনও খুব ভিড়।

দীপঙ্কর রসিদটা দিতেই ভেতরের ক্লার্কটা বললে—ভুবনেশ্বর মিত্র?

তারপর ঠিকানা দেখলে। অনেক কাগজ-পত্র খোঁজাখুঁজি করলে। অনেক ফাইল, অনেক পুঁথি অনেক নথি।

তারপর বললে—না স্যার, এখনও ট্রেস পাওয়া যায়নি—

দীপঙ্কর বললে—এর আগে অনেকবার এসে ফিরে গিয়েছি, একটু দেখুন ভাল করে—

ক্লার্কটা বললে—খুব ভাল করে দেখেছি স্যার, যাদের ট্রেস পাওয়া গেছে তাদের লিস্টও দেখেছি, আর যাদের ট্রেস পাওয়া যায়নি তাদের লিস্টও দেখেছি, কোনও লিস্টেই তাঁর নাম নেই—

তারপর লম্বা একখানা লিস্ট দেখিয়ে বললে—আর এই দেখুন ক্যাজুয়েল্টি লিস্ট—যারা বোমা পড়ে মারা গেছে, তাদের লিস্টেও ও নাম নেই—আপনি পরে আর একদিন আসবেন—

দীপঙ্কর সেখানে আর দাঁড়ায়নি। তারপর সেখান থেকে সোজা অফিসে আসতেই নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে কে যেন পাশ থেকে ডাকলে—দীপু—

দীপঙ্কর চেয়ে দেখলে।

—কে?

লোকটা এতক্ষণে সামনে এসে দাঁড়াল। বললে—আমায় চিনতে পারলে না?

—কে তুমি?

—আমি লক্ষ্মণ সরকার। সেই কালিঘাট স্কুলের ইনফ্যাণ্ট ক্লাশে এক সঙ্গে...

—এসো এসো, তুমি লক্ষ্মণ!

আশ্চর্যই বটে! আশ্চর্য ঘটনাই বটে! সেই ছোটবেলাকার লক্ষ্মণ সরকার! সেই ছোটবেলায় যখন-তখন মাথায় চাঁটি মারতো! রাস্তায়, পথে, বাজারে সব জায়গায় অপমান-অত্যাচারের একশেষ করতো যে লক্ষ্মণ, সেই আজ এসেছে দীপঙ্করের কাছে!

ততক্ষণে দীপঙ্কর নিজের ঘরে এসে চেয়ারে বসেছে। বললে—বোস বোস—কী মনে করে?

—তুমি আমায় চিনতে পেরেছ তো ভাই?

দীপঙ্কর বললে—খুব চিনেছি—হঠাৎ কী জন্যে?

লক্ষ্মণ বললে—ভাই, আমি ভীষণ বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি—ছোটবেলাকার কথা সব ভুলে যাও—আমিও এখন অনেক বড় হয়েছি, সে বয়েসও নেই, তুমিও এখন অনেক বড় হয়ে গেছ—

—আসল কথাটাই বলে ফেল না!

লক্ষ্মণ বললে—আমায় একটা চাকরি করে দিতে হবে ভাই—

চাকরি! চমকে উঠলো দীপঙ্কর। সেই লক্ষ্মণ সরকার আজ এত লোক থাকতে চাকরি চাইতে এল তার কাছে! এত সাহস হলো তার! একটু লজ্জাও করছে না দীপঙ্করের কাছে চাকরি চাইতে! একটু সঙ্কোচ একটু দ্বিধাও হচ্ছে না! সেই লক্ষ্মণ সরকার আজ নিজে এসে তার কাছে প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। দীপঙ্করের মনে হলো এক চড় কসিয়ে দেয় লক্ষ্মণ সরকারের গালে। বলে—মনে নেই? মনে নেই সেই সব দিনের কথা। যেদিন রাস্তায় অকারণে অপমান করেছে, বই কেড়ে নিয়েছে, খাতা কেড়ে নিয়েছে, মেডেল কেড়ে নিয়েছে, খাবার কমলালেবু, কদমা কেড়ে নিয়েছে। মনে নেই!

কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে দীপংকর। আত্মসম্বরণ করে নিলে হঠাৎ।

লক্ষ্মণ সরকার তখনও মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে প্রতীক্ষা করছিল।

দীপংকর অনেকক্ষণ পরে বললে—আচ্ছা যাও—দেখি আমি কী করতে পারি—

লক্ষ্মণ বললে—আমি ভীষণ বিপদে পড়েই তোমার কাছে এসেছি ভাই—আমি একেবারে খেতে পাচ্ছি না—

দীপংকর বললে—তুমি যাও এখন, পরে দেখা করো—

—কবে আসবো? আমি একটা দরখাস্ত এনেছিলাম, এই নাও—

দীপংকরের হঠাৎ রাগ হয়ে গেল। বললে—চাকরি কি আমার হাতের জিনিস যে তুমি চাইলেই আমি দিয়ে দেব?

লক্ষ্মণ সরকার কী বলবে বুঝতে পারলে না। দরখাস্তখানা রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

দীপংকর অনেকক্ষণ পরে দরখাস্তখানা হাতে তুলে নিলে। তারপর ছিঁড়েই ফেলতে যাচ্ছিল সেখানা। কিন্তু কী মনে হলো আবার রেখে দিলে টেবিলে। তারপর সুধীরবাবুকে ডাকলে।

সুধীরবাবু আসতেই দীপংকর বললে—কোথাও ভেকেন্সি আছে ট্র্যাফিকে?

সুধীরবাবু কিছুক্ষণ ভাবলে। তারপর বললে—আছে স্যার—

—কোথায়?

—জার্নাল সেকশ্যানে!

—জার্নাল সেকশ্যানে ভেকেন্সি কোথায়?

সুধীরবাবু বললে—আজ্ঞে, গাঙ্গুলীবাবুর জায়গায় একটা টেম্পোরারী ভেকেন্সি আছে—গাঙ্গুলীবাবু তো অনেকদিন আসছেন না—তিনি সেই যে সেই কাশ্মীর চলে গিয়েছেন—

দীপংকর বললে—ঠিক আছে, এই ভদ্রলোককে ওই ভেকেন্সিতে রাখুন, যতদিন না গাঙ্গুলীবাবু আসেন—

—আর একটা কথা।

সুধীরবাবু যেতে যেতে দাঁড়িয়ে গেল।

দীপংকর বললে—আর একটা কথা, মিস মাইকেলের ভেকেন্সিতে কোনও লোক নেওয়া হয়েছে?

সুধীরবাবু বললে—হ্যাঁ স্যার—

—কে? কাকে নেওয়া হয়েছে?

সুধীরবাবু বললে—মিস্টার ঘোষালের একজন ক্যান্ডিডেট—

—কে? নাম কী?

সুধীরবাবু বললে—মিসেস ঘোষ'

সেন-সাহেব একেবারে লাফিয়ে উঠেছে। কে মিসেস ঘোষ? কোন মিসেস ঘোষ? পুরো নাম কী?

এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্নের ঝড় বয়ে গেল যেন। সুধীরবাবু সেন-সাহেবের মুখ দেখে ভয়ে আতঙ্কে একেবারে শিউরে উঠেছে।

—বলুন, বলুন কোন্ মিসেস ঘোষ?

—আজ্ঞে মিসেস সতী ঘোষ!

লক্ষ্মীদি ভেবেছিল অত ভোরে বোধহয় দীপু ঘুম থেকে উঠবে না। সকাল সাতটায় প্লেন এসে পৌঁছোবে। এতদিন পরে, এত বছর পরে মানস আসছে। এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা অন্তত পৌঁছোতে লাগবে দমদমে। গাড়ির ভেতরে উঠেছিল দাতারবাবু আর লক্ষ্মীদি। আর গাড়ি চালাচ্ছিল সুধাংশু।

স্টেশন রোডের ঠিকানা সুধাংশু চেনে। অনেকবার মিসেস দাতারকে নিয়ে এসেছে।

ট্রাম রাস্তা থেকে মোড় ঘুরতেই দেখা গেল অনেক মানুষের ভিড় জমেছে দীপুদের বাড়ির সামনে।

সুধাংশু বললে—ওখানে অনেক ভিড় দেখছি মিসেস দাতার—

লক্ষ্মীদিও বুঝতে পারলে না। এত ভোরে ওখানে ভিড় কিসের! কিছু পুলিসও দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়িটা কাছে যেতেই মেয়েলি গলার কান্না শোনা গেল যেন। কে যেন ভেতরে কাঁদছে গলা ফাটিয়ে। ভিড়ের মধ্যে সেই ভোরবেলাই দীপংকরের লম্বা চেহারাটা দেখা যাচ্ছিল। স্পষ্ট দীর্ঘ চেহারা। আর তার পায়ের কাছেই যেন কার ক্ষত বিক্ষত শরীর মাটিতে শোয়ানো। দর দর করে, রক্ত পড়ছে। আর পাড়ার লোকজন চাকর-বাকর ঝি চারদিকে ঘিরে রয়েছে।

লক্ষ্মীদির গাড়িটার শব্দ পেয়েই দীপংকর মুখ ফিরিয়ে চাইলে।

সুধাংশু গাড়িটা থামাতেই লক্ষ্মীদি একেবারে ভিড় ঠেলে দীপংকরের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বললে—এ কে দীপু?

দীপংকর বললে—আমার এক কাকা—

—তোর তো কাকা ছিল না কখনও! কী হয়েছিল এর?

দীপংকর বললে—মিলিটারি লরীতে ধাক্কা খেয়ে মারা গেছেন—

—কখন হলো? কোথায়? কোন্ রাস্তায়?

ছিলেন, কেউ খোঁজ পায়নি—এখন ভোর

দীপংকর বললে—কাল সকাল বেলা বাড়ি থেকে রাগ করে না খেয়ে বেরিয়ে পড়ে-রাত্রে পুলিস নিয়ে এল—

লক্ষ্মীদি বলবার মত কোনও কথা খুঁজে পেলে না। সমস্ত জায়গাটা শোকাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। বাড়ির দরজার আড়াল থেকে মেয়েটার আর্তনাদে আবহাওয়াটা কেমন মর্মন্তুদ হয়ে উঠেছে। সুধাংশু, দাতার-বাবু, লক্ষ্মীদি সবাই বোবার মত একদৃষ্টে রক্ত মাথা নিষ্প্রাণ দেহটার দিকে অপলক-দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। দীপংকরের মুখেও যেন ভাষা ফুরিয়ে গিয়েছে।

লক্ষ্মীদি বললে—আমি আসি ভাই দীপু, আমার জরুরী কাজ আছে—আমার ছেলে আসছে আজ সাতটায়—

—কে? মানস?

—হ্যাঁ, দেরি হলে হয়ত অসুবিধে হবে তার, এত বছর পরে আসছে তো—তোকে নিয়ে যেতেই এসেছিলাম—তা..

দীপংকর বললে—তাহলে এসো—

সবাই আবার গাড়িতে উঠলো। দীপংকর বললে—তোমার সংগেও আমার অনেক কথা ছিল লক্ষ্মীদি—

—কী কথা?

দীপংকর বললে—পরে বলবো সব! সারা জীবনটার আমি কোনও মানে খুঁজে পাচ্ছি না লক্ষ্মীদি, এ কেন হয়? কেন হয় এমন কে জানে! কে বলে দেবে আমায়?

লক্ষ্মীদি হাসলো। বললে—কেন রে? কী হলো?

দীপংকর বললে—জানো, সতী আমাদের অফিসে চাকরি করতে ঢুকেছে—

—সে কীরে?

লক্ষ্মীদিও খানিকক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইল দীপংকরের মুখে দিকে। কিন্তু তখন আর বেশি কথা শোনবার সময় নেই। সুধাংশু গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে।

লক্ষ্মীদি যেতে যেতে বললে—পরে সব শুনবোখন, আসিস্ একদিন—

(ক্রমশ)
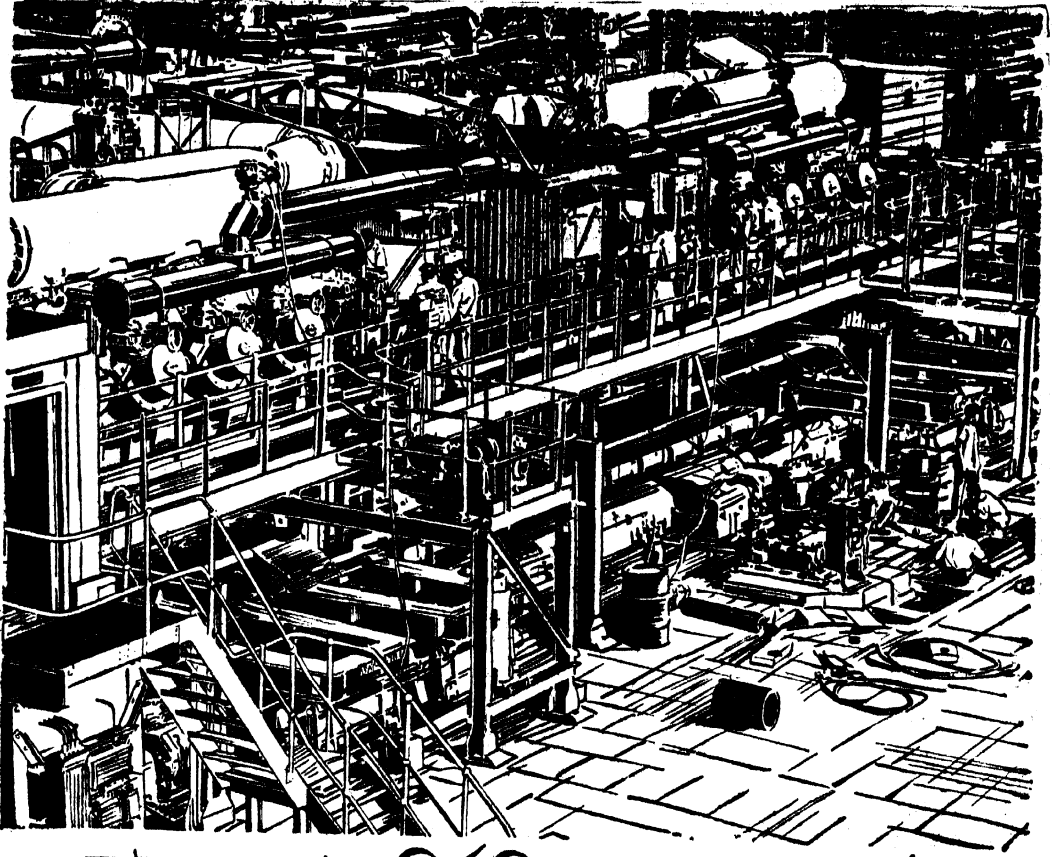
আর একবার নির্ধারিত সময়ের আগেই

দুর্গাপুরের ২৪" মিডিয়াম সেক্‌শন্ মিলটি নির্ধারিত সময়ের আগেই সম্পূর্ণ হয়েছে এবং রোলিং আরম্ভ করে দিয়েছে। এই মিলটি জয়েস্ট প্রভৃতি ইস্পাতের কাঠামো এবং রেলওয়ের জন্য নানা রকমের জিনিস উৎপাদন করবে।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার এটিই চতুর্থ রোলিং মিল। পঞ্চম ও শেষ রোলিং মিল অর্থাৎ মার্চেণ্ট মিলটিও সম্পূর্ণতার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

ইণ্ডিয়ান স্টীলওয়ার্কস্ কন্‌স্ট্রাক্‌শন্ কোং লিঃ

হেভি এবং ইউনাইটেড এন্‌জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড হেড রাইটসন্ অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ সাইমন-কার্ভস্ লিঃ দি ওয়েলম্যান স্মিথ ওয়েন এন্‌জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ দি সিমেন্টেশন কোম্পানি লিঃ অ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (রাগবি) লিঃ দি ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি লিমিটেড অ্যাসোসিয়েটেড ইলেকট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (ম্যানচেস্টার) লিঃ স্যার উইলিয়াম এরল অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ ক্লীভল্যাণ্ড ব্রিজ অ্যাণ্ড এন্‌জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ ডরম্যান লঙ (ব্রিজ অ্যাণ্ড এন্‌জিনীয়ারিং) লিঃ জোসেফ পার্কস্ অ্যাণ্ড সন্ লিঃ ইস্কন্ কেবল্ গ্রুপ।

এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত

নীরদ মজুমদারের চিত্রপ্রদর্শনী

এ সপ্তাহের বিশেষভাবে আকর্ষণীয় চিত্রপ্রদর্শনী 'উইং অব নো এণ্ড' অর্থাৎ 'যে পাখার শেষ নেই'। প্রদর্শনীটির ব্যবস্থা করেছেন ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর কালচারাল ফ্রীডম। রচনাগুলি প্রখ্যাত শিল্পী নীরদ মজুমদারের। প্যারিস থেকে ফেরার পর ১৯৫৮ সালে এঁর বিখ্যাত 'ইমাজেস এক্লোজেস' সিরিজ প্রদর্শন করা হয় আর্টিস্ট্রী হাউস-এ। তার তিন বছর পর

গোরক্তেট—উত্তর আমেরিকা।

আবার কলকাতার কলারসিকরা নীরদবাবুর একক প্রদর্শনী দেখার সুযোগ পাচ্ছেন। এই তিন বছর ধরে অক্লান্ত সাধনায় সৃষ্টি হয়েছে 'উইং অব নো এণ্ড'। কয়েক বছর আগে মেক্সিকোর পয়লা নম্বর শিল্পী আলফেরো সিকিরস কলকাতায় এসে বলেছিলেন, ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্য মহান, সেই ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণায় বর্তমান কালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ভারতীয় সমকালীন শিল্পীরা যদি চিত্রসৃষ্টি করতে পারেন, তবেই হবে সার্থক সৃষ্টি। একথা শুনে যাঁরা প্রাচীন ভারতীয় ধারা এবং লোকশিল্পের পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন, তাঁরা বললেন, তাঁরাই ঠিকপথে চলেছেন আবার 'আধুনিকপন্থীরা' বললেন, ওসব বাজে আমরাই ঠিকপথে চলেছি, বর্তমান কালের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গেলে এই রকমই

গরুড়ের নিষাদ ভক্ষণ —নীরদ মজুমদার
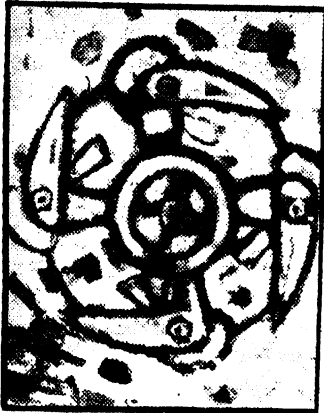
ছবি আঁকতে হবে।' সিকিরসের সঙ্গে আমরা একমত, তবে তথাকথিত ভারতীয় ধারা যাঁরা অনুসরণ করছেন কিংবা যাঁরা অন্ধভাবে পাশ্চাত্ত্য আধুনিকতার আমদানী করছেন, তাঁদের কাউকেই আমরা সমর্থন করতে পারি না। নীরদ মজুমদারের চিত্রকলায় মনে হয়, এ সমস্যার সমাধান হয়েছে। প্রথমে ধরা যাক এঁর টেকনিক—নীরদ মজুমদার ছবি আঁকেন তৈল মাধ্যমে। তেলরঙ যে একটি অত্যন্ত সমস্যাসংকুল মাধ্যম, তা যাঁরা তেলরঙে ছবি আঁকেন, তাঁরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করে থাকেন। তৈল মাধ্যমে যে ভাব ফুটে ওঠে, তা আদৌ ম্যুরাল রচনার উপযোগী নয়, কিন্তু নীরদ মজুমদারের রচনা কৌশল মূলত ম্যুরালধর্মী। এঁর ছবির পরিধি যেরকমই হোক না কেন, শিল্পী ম্যুরাল কল্পনা করেই তা আঁকা আরম্ভ করেন। পাশ্চাত্ত্য তৈল মাধ্যম ব্যবহার করার ফলে অনেক সময় বাধ্য হয়ে এঁকে কিছু কিছু পাশ্চাত্ত্য করণ কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। সনাতন আর্টের রীতি অনুযায়ী এঁর রচনা শুরু হয় একটি কেন্দ্রস্থল থেকে এবং ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। পাশ্চাত্ত্য চিত্র-রচনায় প্রথমেই ধরে নেওয়া হয় চতুষ্কোণ একটি ফ্রেম এবং সেই ফ্রেমের সীমার মধ্যে রেখেই শিল্পীকে করতে হয় কম্পোজিশন। কিন্তু নীরদবাবু যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, সে পদ্ধতির মাধ্যমে রচনা অনন্তে গিয়েও পৌঁছাতে পারে।

এদফু মন্দিরের কাজ—মিসর —নীরদ মজুমদার

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ- কবিকাহিনী

দীর্ঘকাল ইউরোপে থেকে এবং নানান রকম টেকনিকে কাজ করে শিল্পী তৈল-বর্ণের রহস্য কিছুটা উদ্‌ঘাটন করেছেন। তৈল মাধ্যমেও স্বচ্ছভাব প্রকাশ পেয়েছে এঁর রচনায়, যার ফলে রচনাগুলি অবশ্যই কিছুটা আধ্যাত্মিক স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে। এঁর বর্ণনকৌশল প্রত্যেক বর্ণসচেতন দর্শককেই পুলকিত করবে, সে বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ। নীরদবাবুর বিষয়বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায় শঙ্করাচার্যের দার্শনিক তত্ত্ব। অবিশ্যি এই তত্ত্ব ইনি সম্পূর্ণ স্বকীয় উপায়ে উপস্থাপিত করেছেন রচনার মধ্যে। সুতরাং এঁর ছবির রস কেবল বিদগ্ধ দর্শকগণই গ্রহণ করতে পারবেন। মূল সূত্রটি না ধরতে পারলে এ-দর্শনের মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

আলোচ্য প্রদর্শনীতে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, নানান দেশ এবং নানান সময়ের ৫০টি চিত্র, যা নীরদবাবু তাঁর নিজস্ব ঢঙে পুনরাবৃত্তি করেছেন। প্রায় সব ছবির মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়, প্রতীক আকারে পাখির রূপ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই সব দেশের এবং সব কালের শিল্পীদের আকারপ্রিয় বিষয়বস্তু এই পাখি। তাই বোধ করি, নীরদবাবু কাল এবং অনাদি অনন্তের একটা ধারণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বেছে নিয়েছেন প্রতীক হিসাবে পক্ষিরাজ গরুড়কে। নীরদ মজুমদারের স্বকীয় রচনা আছে সবসমেত ১৫টি। মহাভারত থেকে গরুড়ের উপাখ্যান বর্ণিত করেছেন একান্ত আপন দৃষ্টিভঙ্গীতে। রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য তিন ধারায়—প্রথম, এঁর অনুপ্রেরণার উৎস, দ্বিতীয়, অনুক্রমিক এই ১৫টি রচনা মিলে প্রকৃতপক্ষে একটি ছবির সৃষ্টি হয়েছে, রচনাগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা চলে না, তৃতীয়, এঁর প্রকাশভঙ্গী, যেখানে রঙের খেলা এবং বলিষ্ঠ রেখা সমানভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। রচনাগুলি অত্যন্ত গতিশীল।

প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে সুরেন ব্যানার্জি স্ট্রীট-এ ইউ এস আই এস-এর প্রদর্শনী হলে। আগামী ৩০শে এপ্রিল অবধি প্রদর্শনীটি চলবে। এই সঙ্গে 'উইং অব নো এন্ড' নামে একটি পুস্তিকাও বিক্রি হচ্ছে ঐখানে। পুস্তিকাটির লেখক শিল্পী স্বয়ং এবং প্রকাশক ইন্ডিয়ান কমিটি ফর কালচারাল ফ্রীডম। শিল্পী তাঁর ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করেছেন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়। পুস্তিকাটি ইংরাজীতে লিখিত।

কবিকাহিনী

চৌরঙ্গী এবং থিয়েটার রোডের সংযোগস্থলে কিছুদিন হল 'কবি-কাহিনী' চলছে। কিছু মাটির পুতুলের সাহায্যে কবগুরুর জীবনী রচনা করা হয়েছে। ব্যবস্থা করেছেন টেগোর সেণ্টিনারী কমিটি। প্রচারশিল্পী রণেন আয়ান দত্তের পরিচালনায় পুতুলগুলি গড়েছেন কলকাতার কয়েকজন শিল্পী। মাটির পুতুলের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন-কাহিনী রচনা করা বাস্তবিকই দুঃসাহসের কাজ। পরিপূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখিত ভাষায় কেউ রচনা করতে পেরেছেন বলেও বিশ্বাস হয় না। তবে বিভিন্ন রচয়িতার রচনায় কিছু কিছু নতুন তথ্য বা ঘটনা জানতে পারা যায়। 'কবি-কাহনী'তেও রবীন্দ্রনাথের জীবনীর কিছু ঘটনা যেমন বাদ পড়েছে, তেমনি নতুন তথ্যও অনেক কিছু জানতে পারা গেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনী যথাযথভাবে বলা হয়েছে কি নাহয়েছে, সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা দেখতে গিয়েছিলাম—পুতুলগুলি আর্ট পদবাচ্য কিনা। রণেন আয়ান দত্ত প্রচারশিল্পের ক্ষেত্রে বেশ স্বনামধন্য, তবে তাঁর পুতুল গড়ার কথা শুনিনি কখনও। তা হলেও, তিনি এই ভার নিয়েছেন শুনে বুঝেছিলাম, বাজারে যে ধরনের পুতুল চলে, ঠিক সে জাতের এগুলি হবে না। এর আগেও কলকাতায় দু-একটি পুতুল প্রদর্শনী হয়ে গেছে, সেগুলির তুলনায় কবি-কাহিনীর রচনাগুলি বাস্তবিকই অনেক উচ্চ মানের। সব পুতুল একজনের গড়া নয়, তাই দু-একটি কাঁচা কাজ অবশ্যই নজরে পড়ে। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করলে, প্রদর্শনীটি উপভোগ্য। সবশুদ্ধ ৭০টি সেট প্রদর্শন করা হয়েছে। পুতুলগুলি মাটির তৈরী হলেও সেটের অন্যান্য উপাদানগুলি বিভিন্ন জিনিসপত্রে বিভিন্ন উপায়ে সৃষ্ট। কয়েকটি সেটের রচনায় রণেনবাবু বাস্তবিকই শিল্পিমনের পরিচয় দিয়েছেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' একটি অভূতপূর্ব কল্পনা। প্রত্যেক রচনাতেই রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য চমৎকারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেটগুলির মধ্যে যে পরিপ্রেক্ষিত সৃষ্টি করা হয়েছে, তা সত্যিই চমৎকার। পরিশেষে উল্লেখ করি, উপস্থাপনায় অভিনবত্ব আছে সন্দেহ নেই। জনসাধারণের কাছে প্রদর্শনীটি উপভোগ্য হবে অবশ্যই। মে মাসের শেষ অবধি প্রদর্শনীটি চলবে। প্রবেশমূল্য ১৯ নয়া পয়সা।

নাটক

গোত্রান্তর—বিজন ভট্টাচার্য। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ; ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম : আড়াই টাকা।

গোত্রান্তর তিন অঙ্কের নাটক। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কে দৃশ্য ভাগ না করেও এবং নাট্যকার বাঁধাধরা ছকে নাটকটিকে না সাজিয়েও সুগভীর মননশীলতায় সময়ের যে ঐক্য (Unity of time) বিধান করেছেন, তদ্দ্বারা একটা অভিনবত্বের লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হল। নাটকটিতে খণ্ডিত বাংলার পটভূমিকায় উদ্বাস্তু মানুষের দুর্গতি এবং তারই সঙ্গে সর্বহারা মানুষের জয়সূচক একটা ইঙ্গিত সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান রয়েছে। পৃথিবীর ধনিক শ্রেণী কিভাবে শ্রমিক-শ্রেণীর ওপর নির্বিবাদে শোষণ ও অত্যাচার চালিয়ে যায় তা প্রমাণ করার জন্য কার্য-কারণের মাধ্যমে ছোটবাবু এবং বাড়িওয়ালার মতো নিষ্করুণ নিষ্ঠুর চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। তাছাড়া, বনেদী বাড়ির সরকার কিংবা দারোয়ানও কম যায় না। কিন্তু এদের চরিত্রের বৈষম্যের কারণটি নাট্যকার উদ্ঘাটিত করেন নি। এরাও পদ-দলিত এবং লাঞ্ছিত—একথা আমরা ভুলি কি করে? এদের চোখে মোহাঞ্জন থাকে—কিন্তু কদিন তা থাকে? এদেরও একদিন ভুল ভাঙ্গে। নাট্যকার সে দিকে একেবারেই দৃক্‌পাত করেন নি। হরেন্দ্র চরিত্রে পরিণতিটি বেশ সুন্দর, আবার শঙ্করী চরিত্রের উত্থান-পতন মধ্যবিত্ত জীবনের সমস্ত নারীর দৈন্যের একটি দিক। শ্রমিক যুবক কানাই এবং কানাই-এর মা শৈলী অপূর্বসৃষ্ট চরিত্র। আবার উকিল-বাবু মিঃ লাহিড়ী এবং ক্লাবের সদস্যদের অর্থহীন মৌখিক সহানুভূতির অভাব দরিদ্র সমাজে যত্র তত্র। নাট্যকার এই সব চরিত্রের মধ্যে ত্রুটি লক্ষ্য করে তাদের ব্যঙ্গই করেছেন। কিন্তু ভ্রষ্টা রমণীর চরিত্রে নতুনত্ব নেই। নীল দর্পণের সেই ভ্রষ্টা চরিত্রার কাছে "গোত্রান্তরে"র ভ্রষ্টা রমণী দাঁড়াতেই পারে না। সেখানে সেই রমণীর আত্মপ্রকাশ এবং খেদ আছে; কিন্তু গোত্রান্তরে আছে শুধু অর্থগৃধ্নুতা। কিন্তু কেন এমন অবস্থা, তার কারণ কি—একথা প্রগতিবাদী নাট্যকারকে জিজ্ঞেস করা বাহুল্যমাত্র। মাস্টারের মেয়ে গৌরীর সঙ্গে শ্রমিক যুবকের বিবাহ—বিশেষ সার্থকতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। ৭৩/৬০

উপন্যাস

মনামী—নারায়ণ সান্যাল, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ; ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—চার টাকা।

স্ত্রী রাধা, স্বামী অবনীমোহন, অবনীমোহনের দূর সম্পর্কিত ভাই সুবিমল এবং রাধার দূরসম্পর্কিত বোন মনামীর আত্ম-কথাকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। উপন্যাসটির কাঠামো "ঘরে বাইরে"র অনুসরণে সৃষ্ট, লেখক তা নিজেই ভূমিকায় জানিয়েছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান চেতনার সঙ্গে গ্রাম্য সংস্কারের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় তারই করুণ কাহিনী আছে "মনামী"-তে। অবনীমোহন বাইওলজির অধ্যাপক, রাধা দৈব বিশ্বাসী গ্রাম্য নারী। রাধার মৃত্যুর পর রাধারই অনুরোধে এবং কতকটা ঘটনাচক্রে অবনীমোহনের সঙ্গে বিয়ে হয় আধুনিকা মনামীর। কিন্তু মনামী বিরোধিতা করতে গিয়েও ভালবাসে মনে মনে সুবিমলকে। মনের এই গোপন ভালবাসাকে অবনীমোহন সহ্য করতে পারেনি। তাছাড়া নিজের শরীরে তিনি অস্ত্রোপচার করিয়েছেন, সুতরাং মনামীর জীবনে কিভাবে আর এক জীবনের সঞ্চার হতে পারে এই অন্তর্দাহে অসুস্থ অবনীমোহন অকস্মাৎ মারা যান। কিন্তু মনামী কোনোদিনই নিজেকে দোষী ভাবতে পারেনি। সে ভাবে, যে সন্তান তার মধ্যে এসেছে সে অবনীমোহনেরই। অবনীমোহনের

...ত্যুর পর সে উন্মাদপ্রায় হয়ে পড়ে। তবু এই তার আনন্দ যে,—অবনী-মোহনের সৃষ্টি আছে তারি মধ্যে। কিন্তু ন্যায়ারী পরীক্ষায় একদিন তাও ভুল প্রমাণিত হলে। সুবিমল তখন তার একমাত্র সহায়। এখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি।

এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র নির্দোষ তবু নানা দোষগুণের মধ্যেই তাদের নির্দোষিতার প্রমাণ হয়েছে। চরিত্রগুলি বাস্তবানুগ এবং স্বচ্ছ। ঔপন্যাসিক যুক্তিবাদী, যুক্তির সংগে আবেগের মিশ্রণে তিনি গল্পরসকে সুসংগত করে তুলেছেন। গঠন-শৈলীতে লেখক বারান্তরে স্বকীয়তা দেখাবেন, আশা করি। ৭০/৬০

অগ্নিকন্যা—চিত্তরঞ্জন মাইতি। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন মাইতি 'অগ্নিকন্যা' উপন্যাসে একটি সুন্দর সাবলীল কাহিনীর মধ্য দিয়ে এক সময়ের বাংলা দেশের সামাজিক ও আনুষংগিক সংকট ও অবক্ষয়ের চিত্র এ'কেছেন। সেই দুঃসময়ে, যখন একদিকে পর্তুগীজদের অকথ্য ও অবর্ণনীয় অত্যাচার, অন্যদিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের অনুশাসন, সতীদাহের নির্মম ব্রতপালন চলছে—নায়িকা, উদ্ভিন্নযৌবনা কর্পূরমঞ্জরীর সংকটাপন্ন জীবন ও অভিজ্ঞতাই বর্তমান উপন্যাসের উপজীব্য। উপন্যাসটি সুখপাঠ্য, চরিত্রগুলিও বেশ স্বচ্ছ; কিন্তু গভীরতার অভাবে স্থায়ী ছাপ রাখতে পারে না। এ বিষয়ে লেখক ভবিষ্যতে যত্নবান হলে খুশী হবো। ৫৬৪।৬০

একটি জীবন—ডাঃ অতুলচন্দ্র লাহিড়ী। পরিবেশক : ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ন-ওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য টা ৪·৭৫ ন প।

বাংলার স্বদেশী যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই উপন্যাসের কাহিনী রচিত হয়েছে। লেখকের বর্ণনা নৈপুণ্যে অতীতের গৌরবময় যুগটি যেন সজীব হয়ে উঠেছে। 'অর্জুন' নামে একটি বলিষ্ঠচেতা কিশোরের জীবনের বৈচিত্র্যময় ঘাত-প্রতিঘাতকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের সূত্রপাত হয়েছে। অন্যান্য চরিত্রগুলি এরই ছায়ায় এসে বিচরণ করছে।

কোনো যুগের আদর্শ প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে চরিত্র রূপে সৃষ্টি করা দুরূহ ব্যাপার। কেননা, লেখকের আদর্শের চাপে কোনো চরিত্রকেই রক্তমাংসের বলে মনে হয় না। এই উপন্যাস সেই ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়।

৫১২।৬০

স্বাধীনতার কাহিনী

সে যুগের আগ্নেয় পথ—শ্রীপূর্ণেন্দু চক্রবর্তী। প্রকাশক—শ্রীসুব্রত বাগচী, আনন্দ প্রেস, নিউ দিল্লি। দাম—২·২৫ নঃ পঃ।

একদিন যাঁরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার মহৎ উদ্দেশ্যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন, অম্লানবদনে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছেন কিংবা দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে গেছেন জীবনের শেষ বৎসরগুলি, তাঁদের অনেকের ইতিহাস আজও রয়েছে রহস্যাবৃত। কিন্তু সে-ইতিহাস জানার প্রয়োজন আছে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিকের। বর্তমান লেখক অনেকাংশে সে-দায়িত্ব পালন করেছেন। এ-গ্রন্থ পড়তে পড়তে আজও অনেক পাঠকের হৃদয় আবেগে আলোড়িত

হয়ে উঠবে। যাঁরা এ-গ্রন্থের বিশেষ চরিত্র, লেখক তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনকে জানতেন, তদুপরি পরম আন্তরিকতায় তাঁর অভিজ্ঞতাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। তার ফলে, এ-গ্রন্থটি কেবলই মাত্র ইতিহাস হয়ে ওঠেনি, সুসাহিত্য হয়ে ওঠারও পরিপূর্ণ সুযোগ পেয়েছে। ৫৭।৬১

সংগীত

সংগীত পরিচিতি (পূর্ব ভাগ)—শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়। হসন্তিকা প্রকাশিকা, ৩৯বি, মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬। তিন টাকা।

সংগীতের ইতিহাস এবং ব্যাকরণ একত্রে সহজবোধ্য করে লিখেছেন আলোচ্য গ্রন্থকার। সংগীত শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রী, বিশেষ ক'রে প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর পাঠ্য গ্রন্থ হিসাবেই 'সংগীত পরিচিতি'র পূর্বভাগ রচিত হয়েছে। 'থিওরী' শিক্ষা ব্যাপারে সংগীত এখনো প্রায় গুরুমুখী বিদ্যা হয়ে রয়েছে, কারণ প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির অভাব ছাত্রমহলে প্রকট। আলোচ্য লেখক নিজে একজন দীর্ঘকালের সংগীত-সম্পৃক্ত এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি। সংগীত পদ্ধতি, সাংগীতিক পরিভাষা ও বিবরণ, রাগরাগিণী, বাদ্য ও তার প্রকার ভারতীয় সংগীতের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষেপে স্বচ্ছ ভংগীতে আলোচনা করেছেন তিনি। মোটামুটিভাবে গ্রন্থটির দ্বারা ছাত্রছাত্রী তো বটেই সংগীত আগ্রহী মাত্রেই উপকৃত হবেন। ছাপা আরও পরিচ্ছন্ন হলে ভালো হত। ৩৬।৬১

বিবিধ

আজব টাকা—শ্রীশ্যামাপদ আচার্য। প্রকাশক—কল্লোল প্রকাশনী। এ ১০৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম—৫০ নঃ পঃ।

অর্থনীতির গোড়ার কথাটিকে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য গল্পচ্ছলে পরিবেশন করেছেন লেখক। রচনা প্রয়োজনমতো সহজ করা হয়েছে। এতো কঠিন ব্যাপারটিকে এর চেয়ে সহজে বলা হয়তো সম্ভবই নয়। ২৭৮।৬০

প্রাপ্তি স্বীকার

Problems in the third plan (a critical Miscellany).
শেষ বসন্ত—সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়।
ইতিহাসের দর্শন—মনোরঞ্জন রায়।
ডাক্তারের ডায়েরী—আর বিশ্বনাথন।
A Handbook of Sri Aurobindo's Yoga—T. D. Chatterjee.
মরুমায়া—শ্রীঅমলা দেবী।
সোনালী মেয়ে—অজিত ভট্টাচার্য।
তিনটি একাঙ্ক নাটক—অচল বন্দ্যোপাধ্যায়।
এই দশকের গল্প—বিমল কর সম্পাদিত।
ছোটদের মহাভারত—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী।
প্রণাম নাও—চিত্তজিৎ দে ও শ্যামাপ্রসাদ সরকার সম্পাদিত।
মহাদিগন্ত—জগন্নাথ চক্রবর্তী।
নির্বাসন—বিমল কর।
লেখালেখি—রমাপদ চৌধুরী।
সাজঘর—ইন্দ্র মিত্র।
হৃদয়ের জাগরণ—বুদ্ধদেব বসু।
রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য—শ্রীসজনীকান্ত দাস।
কাজল—রমেশচন্দ্র সেন।
রূপসী পেলেই হলো—স্বপন বাসর।
মাটি ও মানুষ—দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
বটের বীণা—স্বামী সত্যানন্দ।
চোখের জলে আলপনা—শ্রীঅর্চনা পুরী।
গীতগোবিন্দ—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
হাজার বছর পরে আমাদের কবি—সতীকুমার নাগ।

বা য়ুমণ্ডলের গভীর স্তর ভেদ করিয়া উপরে উঠিয়া যখন গাগারিন পৃথিবী দেখিতে পান, তখন নাকি তিনি 'কী সুন্দর পৃথিবী' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন। খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু

তিনি পৃথিবীর সব ক'টা অঞ্চলই দেখেছিলেন তো? যেখানে লালের ছোপ নেই, সেসব অঞ্চলও কি সুন্দর বলে মনে হয়েছে।"

ম হাকাশ বিচরণের কৃতিত্ব গাগারিনের একথা বলিতেছেন একদল। অন্যদল বলেন, তা নয়, এ-কৃতিত্ব রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের। আর-একদল বলেন, তা-ও নয়, কৃতিত্ব গাগারিনের পিতামাতার। তাঁদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে বলিয়াই ছেলের নাম রাখিয়াছিলেন "উঁড়ি" গাগারিন!

ই ডেন উদ্যানে রেলওয়ে সপ্তাহ উৎসবানুষ্ঠানে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বারো বৎসরে রেলওয়ের অনেক অগ্রগতি হইয়াছে। —"এবং কাজে কাজেই যাত্রীদেরও অনেক অগ্রগতি হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, টিকিট কাটার ঝামেলা আর নেই"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

সু-সংবাদ

ভা রতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিষবিশারদ মহাশয় মেদিনীপুর হইতে আমার গৃহে শুভানুগমন করিয়াছেন। ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে ইনি অসাধারণ পণ্ডিত। কোষ্ঠী, ঠিকুজি প্রস্তুতি বিচার, গণনা এবং জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষাদান বিষয়ে বিশেষ দক্ষ। পারিশ্রমিকের জন্য কাহাকেও পীড়ন করেন না। ২০ ও ২৫নং বালীগঞ্জ ট্রামে এবং ১০, ১৬, ৮ ও ৩৩নং বাসে এখানে আসা যায়।

শ্রীসুশীল চট্টোপাধ্যায়,
৫এ, মণ্ডল রোড (ত্রিতল), কলিঃ—১৯
(শ' ওয়ালেস বিল্ডিংস্-এর নিকট)
(স ৩৮১১)
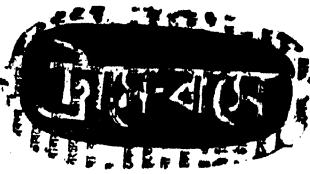
প্র সংগত লোকসভায় রেলওয়ে বিতর্কের কথা মনে পড়িল। শ্রীজগজীবন রাম বলিয়াছেন যে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের কোন কোন অঞ্চলে বিপদ-সংকেতের শিকল খুলিয়া লওয়া হইয়াছে। এক সহযাত্রী বলিলেন—"ঠিক করেছেন। একদিন রাম নাম সত্ হ্যায় বলে যখন চলে যেতেই হবে, তখন আর আগে থেকেই সংকেত-ইঙ্গিতের প্রয়োজন কী!"

ভা রতীয় ভাস্কর্যের প্রকৃতি বুঝাইতে গিয়া শ্রী হ্যাভেল নাকি বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় শিল্পী মানুষের মূর্তির মধ্যে দেবদেবীর রূপ ফুটাইয়াছে;

এবং গ্রীক শিল্পী দেবতার মূর্তিকে মানুষী রূপ প্রদান করিয়াছে। —"কিন্তু কালক্রমে ভারতীয় শিল্পী দেবতার মূর্তিকে শুধু মানুষ করেনি, একেবারে চিত্রতারকার রূপ দিয়েছে। বিশ্বাস না হয় সরস্বতী পুজোর সময় বারোয়ারি তলাটা একবার ঘুরে দেখে আসবেন"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

পা কিস্তানে চিনি রপ্তানি বিতর্কে লোকসভায় জনৈক সদস্য নাকি প্রশ্ন করেন—চিনি রপ্তানি দ্বারা উভয় দেশের মধ্যে কি সম্পর্ক মধুর করা যাইবে? শ্যামলাল বলিল—"বলা শক্ত। তেল-সিঁদুর দিলেই কি ভবী ভোলে। চিনির পরে হয়ত দেখা যাবে চিনির চেয়ে চুমো মিঠের দাবি॥"

কা শীরাম দাসের স্বগ্রামে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য সরকার আয়োজন করিতেছেন। —"খুবই আনন্দের কথা। তবে ভয়, শেষ পর্যন্ত না সরকার বলে বসেন, তা স্মৃতিরক্ষা না হলেও মহাভারত তো অশুদ্ধ হবে না"—মন্তব্য বিশু খুড়োর।

বা জেট পেশের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে কিম্বা পরে যাহাতে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে না পারে, তজ্জন্য কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। —"ডালে ডালে না ফিরে পাতায় পাতায় ফেরার কসরত আগে আয়ত্ত করুন, তারপর বিবেচনার কথা বিবেচনা করবেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

হা ঙ্গেরির সংবাদে শুনিলাম, সেখানে সমুদ্রগর্ভে ফল ও সব্জী সংরক্ষণ করা হয়। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"এই নিয়ম এখানে চালু হলে দেখা যেতো জলে দেওয়ার কাজে আমাদের জুড়ি নেই!!"

ক লিকাতায় পানের খিলির দর এক নয়া পয়সা করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। —"বোঝার ওপর শাকের আঁটি যদি চলে, তাহলে এক খিলি পানও চলবে"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

ল ণ্ডন হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে শুনিলাম, কোন কোন গ্রামাঞ্চলে গবেষণার উদ্দেশ্যে খামারের গবাদি পশুদের "রেডিও" খাওয়ান হইতেছে।

বিশু খুড়ো স্বীকার করিলেন—"রেডিও" খাওয়া কি, তা তিনি জানেন না। কিন্তু মন্তব্য করলেন—"তবে রেডিও যে অনেক সময় গিলছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এতে গবেষণার উদ্দেশ্য সফল হবে কি না, তা বেতারিরাই জানেন॥"

চন্দ্রশেখর

"যে প্রেম সম্মুখপানে,...চালাতে নাহি জানে"

দর্শকের দাবী ও শিল্পমূল্যের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য ছায়াছবিকে যে কতখানি চিত্তগ্রাহী করে তুলতে পারে তার অতি সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ হল এম এম প্রোডাকশন্সের "মধ্যরাতের তারা"।

প্রণতি ভট্টাচার্য প্রযোজিত এই ছবির আখ্যান অবলম্বন প্রতিভা বসুর একটি রসমধুর প্রণয়োপাখ্যান। তবে প্রণয় এ-ছবির কেন্দ্রবিন্দু হলেও এর মূল আবেদন ছড়িয়ে রয়েছে জীবনবোধের বেদনা ও আনন্দে।

কাহিনীর নায়িকা সুতপা। প্রথম যৌবনেই নিয়তির নিদারুণ বঞ্চনায় সে নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। সে আশ্রয় পেল এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে এবং আশ্রয়ের সংগে তার কপালে জুটলো লাঞ্ছনা। আনন্দ ও উৎসবে ভরা একটি সংসারের এক কোণে অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ভেতর দিয়ে তার দিনগুলি দিনে দিনে হয়ে উঠল দুঃখের বোঝা। তারই মাঝে সে একদিন খুঁজে পেল এক কণা আনন্দ। এক পুরুষের প্রেমের প্রতিশ্রুতিতে এই আনন্দ উঁকি দিয়ে গেল তার জীবনে।

সুতপার নীরব ও নিরানন্দ জীবনে প্রেমের সাড়া ও সুখ নিয়ে এল যে সে অমু—ছবির নায়ক। কিন্তু সুখ'ও বুঝি ছলনা করে গেল সুতপা'কে। প্রেমের প্রথম মধুর স্পর্শ তার জীবনপাত্রে ঢেলে দিয়ে গেল শুধু হলাহল। পুরুষের উদ্‌ভ্রান্ত বাসনাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না সুতপা। তার গর্ভে এল অনাকাঙ্ক্ষিত শিশু। দুঃসহ অপমান ও চিত্তদাহের ভেতর দিয়ে অপরিণীতা জননীর কলঙ্ক বরণ করে নিল সুতপা। তারপর একদিন দুঃখশেষের লগ্নে অনুতপ্ত প্রেমের স্বীকৃতিতে তার জীবনে সকল কাঁটা ধন্য করে মাধুর্য ও মর্যাদার শতদল কী করে ফুটে উঠল তা নিয়েই কাহিনীর সুখপরিণতি।

পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায় ছবির এই কাহিনীর বিন্যাস ও বিস্তারে যে অনিন্দ্য প্রসাদগুণের পরিচয় দিয়েছেন তা রসিকজনের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করবে। ছবিতে নায়িকার বঞ্চিত ও বিড়ম্বিত জীবনের উপাখ্যানের অন্তরালে সারি সারি অশ্রুবিন্দু সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছেন পরিচালক। ফলে ছবিটি দর্শকের মনকে এক অনির্দেশ্য বেদনায় উন্মনা করে তোলে। অশ্রুসিক্ত নয়নে ও পরম সমবেদনায় দর্শক ছবির দুঃখিনী নায়িকার সংগে একাত্ম হয়ে ওঠেন।

একটি পরিবারের পটভূমিতে পরিচালক যে নিপুণ প্রয়োগ-কর্মের কৌশলে আনন্দের রামধনু ও বেদনার আলপনা এঁকেছেন তাও দর্শকের মনকে অভিভূত করে রাখে।

ছবির কাহিনী ও তার বিন্যাস সর্বাংশেই যে অবাস্তবতা ও বৈসাদৃশ্যের স্পর্শ থেকে মুক্ত তা নয়। চিত্রনাট্যের অংগে কোথাও কোন অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত অংশ যে নেই তা নয়। কিন্তু এইসব ত্রুটি ছাপিয়ে উঠেছে এমন এক অন্তরংগতার সুর যা এক দুঃখ-সুখের পাঁচালী শুনিয়ে দর্শকের মনকে স্তব্ধ করে রাখে। ছবির শেষ দৃশ্যে সমাজের কাছে আজন্ম অবজ্ঞাত ও অবৈধ এক নিষ্পাপ শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে এক উদার মানবদরদী বৃদ্ধ যখন সামনে এসে দাঁড়ান দর্শকের সুখের আশা তখন কানায় কানায় ভরে ওঠে।

নায়িকা প্রণতি ভট্টাচার্যের অপূর্ব অভিনয় সম্পদে ছবিটি সমৃদ্ধ। একটি চরিত্র'কে অস্ফুট আনন্দ ও নিঃসীম বেদনায় জীবন্ত করে তোলার এমন অভিনয়-শৈলী বাংলা রজতপটে খুব বেশী দেখা যায় না। শ্রীমতী ভট্টাচার্যের এই কৃতিত্ব দর্শকদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নায়ক চরিত্রের রূপদানে অভি ভট্টাচার্য ছবিতে তাঁর অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিলেন নতুন করে। চরিত্রটিকে ব্যক্তিত্বে ও সৌকুমার্যে, বাসনা ও বিভ্রমে এবং প্রণয়ের অভিব্যক্তিতে সুন্দর ও মনোগ্রাহী করে তুলেছেন তিনি।

অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের "ভগিনী নিবেদিতা" চিত্রে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকায় অমরেশ দাস

এক উদারপ্রাণ মানবদরদীর ভূমিকায়

ছবি বিশ্বাসের অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে রাখে। তাঁর সহধর্মিণীর রূপসজ্জায় মলিনা দেবী একটি সরলপ্রাণা, স্নেহশীলা রমণীর চরিত্র আবেগের রেখায় রঞ্জিত ও বাস্তবানুগ করে তুলেছেন। ছবির কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে স্বচ্ছন্দ অভিনয়ের জন্যে প্রশংসা পাবেন রেণুকা রায়, লিলি চক্রবর্তী ও মধুচ্ছন্দা। নায়কের কুটিল ও উন্নাসিক প্রকৃতির প্রণয়িনীর রূপসজ্জায় মিতা চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রচিত্রণ অতি-অভিনয়ের দোষে কিছুটা দুষ্ট হলেও তিনি চিত্রনাট্যের দাবি পালন করেছেন। কিশোর-কুমার অতিথি শিল্পীরূপে তাঁর ভাঁড়ামি দিয়ে দর্শকদের প্রচুর হাসিয়েছেন। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন দীপক মুখোপাধ্যায়, শীলা পাল, পঞ্চানন ভট্টাচার্য ও জীবেন বসু।

সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এ ছবিতে আবহ-সুররচনায় অনবদ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ছবির আবহ-সংগীত বিভিন্ন দৃশ্যের আবেগ ও নাট্য-মর্মটিকে সুন্দরভাবে বাঙ্ময় করে তুলেছে। গানের সুরারোপে শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর দুর্লভ সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এবং নিজের মধুর কণ্ঠে দুটি গান গেয়ে দর্শকের মন ভরে তুলেছেন।

ছবিতে আর যিনি দর্শকদের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসার গৌরব অর্জন করেছেন তিনি আলোকচিত্রশিল্পী অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পরিচালনায় ছবির আলোকচিত্র রজত-পটে রূপমায়ার যে বৈভব এনে দিয়েছে তা দর্শকের দৃষ্টিকে বিমুগ্ধ করে রাখে। বিভিন্ন দৃশ্যের ও চরিত্রের "মুড"কে ফুটিয়ে তুলতে ক্যামেরা যে কত বড় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এ ছবিতে তার প্রমাণ দিয়েছেন।

ছবির কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজে প্রশংসনীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন শিশির চট্টোপাধ্যায় (শব্দগ্রহণ), অজিত দাস (সম্পাদনা) এবং বোম্বে'র বি এন শর্মা ও কৌশিক (সংগীতানুলেখন)। সর্বাঙ্গীণ অঙ্গসৌষ্ঠবে ছবিটি পরিচ্ছন্ন।

চিত্রালোচনা

আগামী সপ্তাহ বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে রবীন্দ্র জন্মের শতবর্ষপূর্তির আনন্দোৎসবের জন্যে। এই আনন্দায়োজনে চলচ্চিত্র শিল্পও যে একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করবে তা বলাই বাহুল্য। তারই পুরোধা হয়ে আসছে সত্যজিৎ রায়ের নবতম চিত্রসৃষ্টি "তিনকন্যা—রবীন্দ্রনাথের তিনটি বিখ্যাত ছোট গল্পের চিত্ররূপায়ন।

একই প্রমোদসূচীর অন্তর্গত করে তিনটি বিভিন্ন গল্পের চিত্ররূপ পরিবেশন এদেশে

যেমন এক অভিনব প্রচেষ্টা, তেমনি আরো একদিক দিয়ে "তিন কন্যা" একটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসে। আগামী সপ্তাহে "তিন কন্যা" শুধু কলকাতাতেই মুক্তি পাবে না, বিভিন্ন রাজ্যের সেরা শহরগুলিতেও একই সঙ্গে তার প্রদর্শন ব্যবস্থা হয়েছে—যেমন, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, আহমেদাবাদ, বাঙ্গালোর, গৌহাটী। তারও কয়েকদিন আগে আগামী ৩রা মে—লণ্ডনের ন্যাশনাল থিয়েটারে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট ও ইণ্ডিয়া হাউসের উদ্যোগে ছবিটির প্রথম প্রদর্শন অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করবেন ডিউক অফ এডিনবরা। দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নেহরু "তিন কন্যা"র উদ্বোধন করবেন এবং অন্যান্য শহরে সেই সেই রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীরা। ছবির জগতে এ এক অভূতপূর্ব ব্যাপার।

* * *

সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের জীবনী অবলম্বনে যে প্রামাণিক চিত্র তুলেছেন সেটিও আগামী সপ্তাহের একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ। মূল ছবিটির দৈর্ঘ্য পাঁচ হাজার ফুটের কাছাকাছি। তারই একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—যার দৈর্ঘ্য দু হাজার ফুটের বেশী নয়—সারা ভারতে আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাবে। আর মূল ছবিটি পুরোপুরি কলকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট চিত্রগৃহে দেখান হবে।

এই জীবনী চিত্রটির প্রথম উদ্বোধন হবে দিল্লীতে আগামী ৩রা মে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু প্রযোজক-পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে অনুরোধ জানিয়েছেন রাজধানীর এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে। শ্রীরায়কে একটি স্মারক উপহার দিয়ে সম্মানিত করবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। কারণ ছবিটি তিনি আগেই দেখেছেন এবং দেখে বিমুগ্ধ হয়েছেন। এই স্মারক উপহার হবে তারই নিদর্শন।

• • •

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে প্রযোজক-পরিচালক দেবকীকুমার বসু কবিগুরুর চারটি বিখ্যাত কবিতা ("পূজারিণী", "পুরাতন ভৃত্য", "অভিসার" ও "দুই বিঘা জমি") অবলম্বনে স্বল্প দৈর্ঘ্যের যে চারটি গাথা-চিত্র তুলেছেন আগামী সপ্তাহে তাদের মুক্তিরও তোড়জোড় চলছে। "রবীন্দ্রনাথ ও পল্লী সংগঠন" নাম দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় পরিচালক আশীষ মুখোপাধ্যায় দু' রীলের যে প্রামাণিক ছবিটি তুলেছেন সেটিও সম্ভবত এই সঙ্গে দেখান হবে।

যেসব সিনেমায় সদ্যমুক্ত ছবির প্রদর্শন চলছে তাদের বাদ দিয়ে একাধিক বাংলা সিনেমায় রবীন্দ্র কাহিনীর সফল চলচ্চিত্রায়নগুলি দেখাবার ব্যবস্থাও হয়েছে।

চলচ্চিত্র

রবীন্দ্র শতাব্দী সংখ্যায় লিখছেন

সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সন্তোষ ঘোষ, জ্যোতির্ময় রায়, দেবকী বসু, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ

॥ যোগাযোগ করুন ॥

৪৮বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-২৬

বিশেষ আকর্ষণ 'তিন কন্যা'র এক কন্যা

(সি-৩৯৩৯)

তাদের মধ্যে "ক্ষুধিত পাষাণ", "কাবুলিওয়ালা" "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

• • •

জোয়ালা প্রোডাকশন্সের প্রথম অর্ঘ্য "সন্ধ্যারাগ" রবীন্দ্রনাথের বহু পঠিত "কঙ্কাল" গল্পের চিত্ররূপ। ছবিটির চিত্রগ্রহণ জীবন গাঙ্গুলীর পরিচালনায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। রাঁচীর মনোরম পটভূমিকায় ছবির অবশিষ্ট বহির্দৃশ্যগুলি তুলে পরিচালক গাঙ্গুলী সম্প্রতি কলকাতায় ফিরে এসেছেন। স্টুডিওর কাজও আর অল্পই বাকী আছে, মে মাসের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যাবে আশা করা যায়। তারপর ছবিতে আবহসংগীত সংযোজন করবেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রক্তসন্ধ্যা" অবলম্বনে জোয়ালা প্রোডাকশন্সের পরবর্তী চিত্র তোলা হবে। সেটিরও পরিচালনা করবেন জীবন গাঙ্গুলী। ছবিটি ইস্টম্যান কলারে বাংলা ও হিন্দী দুই ভাষাতে গৃহীত হবে। বাণিজ্যলোভী পর্তুগীজ দস্যু দা গামা ও স্বাধীনতাকামী ভারত সন্তান মীর্জা দাউদের মধ্যে সংঘাতের পটভূমিকায় রচিত এর কাহিনী। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিমল মিত্রের সহযোগিতায় পরিচালক জীবন গাঙ্গুলী বর্তমানে এর চিত্রনাট্য লিখছেন। তিনি আশা করেন আগামী অগাস্ট মাসে এর চিত্রগ্রহণ শুরু করা যাবে।

• • •

এ সপ্তাহের মুক্তি তালিকায় মাত্র একটি হিন্দী ছবির নাম—"অমর শহীদ"।

মাদ্রাজের পদ্মিনী পিকচার্সের তোলা এই ছবিতে দক্ষিণাপথের সিংহ নামে খ্যাত বীর পাণ্ডিয়া কোট্টাবোম্মানের ঐতিহাসিক কাহিনী রূপায়িত হয়েছে। ভূমিকালিপির পুরোভাগে আছেন পদ্মিনী, রাগিণী, শিবাজী গণেশন ও জেমিনী গণেশন। বি আর পান্তলু এর প্রযোজক ও পরিচালক।

জামাল সেন সুরসৃষ্টির দায়িত্ব বহন করেছেন। ছবিটি আগাগোড়া টেকনিকলারে তোলা এবং বিশেষ জাঁকজমকপূর্ণ।

নাট্যাভিনয়

রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে স্টার থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের "কাবুলিওয়ালা" ও "মুক্তির উপায়" একসঙ্গে অভিনয় করবার ব্যবস্থা করেছেন। আগামী ১০ই ও ১৭ই মে এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে। "কাবুলিওয়ালা"-র প্রধান ভূমিকাগুলি এইভাবে বিতরিত হয়েছে: কাবুলিওয়ালা—ছবি বিশ্বাস; মিনি—মালা বাগ; মিনির বাবা—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়; ও মিনির মা—অপর্ণা দেবী। "মুক্তির উপায়"-এর ভূমিকালিপি এইরকম: গুরু—কমল মিত্র; ফকির—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়; মাখন—অনুপকুমার; পুষ্প—গীতা দে; ও হৈম—লিলি চক্রবর্তী।

"কাবুলিওয়ালা"-র নাট্যরূপ দিয়েছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত এবং দুটি নাটকই তিনি পরিচালনা করছেন। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন অনাদিকুমার দস্তিদার।

*

গত পূর্ব বুধবার মিনার্ভা থিয়েটারে সুন্দরমের রহস্য নাটক "ফিঙ্গারপ্রিন্ট"-এর অষ্টম অভিনয় সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদেশে ভালো জাতের রহস্য নাটকের একান্ত অভাব। তারই পরিপ্রেক্ষিতে "ফিঙ্গারপ্রিন্ট"-এর সামগ্রিক সাফল্য উল্লেখযোগ্য। প্রধান তিনটি চরিত্রে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, মিতা চট্টোপাধ্যায় ও পার্থপ্রতিম চৌধুরী সবিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। পরিচালনার কৃতিত্বও শেষোক্তের প্রাপ্য।

• • •

বহু অভিনীত ঐতিহাসিক নাটব
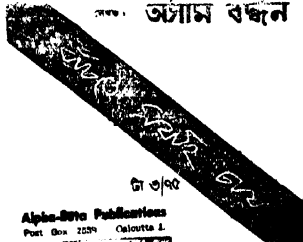
"কেদার রায়" আবার নতুন করে মঞ্চস্থ করলেন ক্যারিট মরাল রিক্রিয়েশন ক্লাব গত ১১ই এপ্রিল স্টার থিয়েটারে। অভিনয়ে যাঁদের কৃতিত্ব সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে ছিলেন কেকা (রত্না), সুকুমার (মুকুট) ও মুকুন্দ (শ্রীমন্ত)। ধনগোপালের কার্ভালো অতি-অভিনয়ের জন্যে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করতে পারেনি। কলাকুশলীদের একতা ও সহযোগিতার অভাবে নাটকের মূলরস কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

সুধীর মুস্তাফি পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছিলেন।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী

দক্ষিণ কলিকাতার নৃত্য ও গীত শিক্ষায়তন গীত বীথিকা গত ১৬ই এপ্রিল নিউ এম্পায়ার মঞ্চে কবিগুরুর "বিদায় অভিশাপ" কবিতা অবলম্বনে রচিত "কচ ও দেবযানী" নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করলেন। নাট্যরূপ ও নৃত্য-পরিকল্পনার দায়িত্ব বহন করেছিলেন জয়দেব চট্টোপাধ্যায়। নাম-ভূমিকাদ্বয়ে হিমাংশু গোস্বামী এবং ঊষা পাণ্ডের নৃত্য বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়েছিল। ভ্রমরীর ভূমিকায় ভারতী ঘোষের নাচও প্রশংসার যোগ্য। যাঁদের কণ্ঠদানে সমগ্র অভিনয়টি মনোজ্ঞ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, সুপ্রীতি ঘোষ, লীলা রায় এবং সুরবীথির ছাত্রীরা। সংগীত পরিচালনা করেছিলেন বকুল সেনগুপ্ত ও রবি বিশ্বাস।

এই অনুষ্ঠানেই রবীন্দ্রনাথের "পুরস্কার" কবিতাটি নৃত্যের আকারে রূপ দেয় শিশু-শিল্পীরা।

* * *

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ২২শে থেকে ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত চারদিনব্যাপী একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন করেছিলেন টালিগঞ্জ রবীন্দ্র শতাব্দী উৎসব কমিটি। রাখীর প্রযোজনায় "চণ্ডালিকা" (নৃত্যনাট্য), পার্থসারথীর প্রযোজনায় "নিশীথে" (নাটক), ইনস্টিটিউট গ্রুপের উদ্যোগে "কাবুলিওয়ালা" (নাটক), বিজয়ী সংঘের প্রযোজনায় "তোতাকাহিনী" (নাটক) ও "চিত্রাঙ্গদা" (নৃত্যনাট্য), রবীন্দ্র পরিষদের নিবেদন "আগমনী" (নৃত্যনাট্য), রবীন্দ্র নাট্যসংঘের প্রযোজনায় "মুক্তধারা" (নাটক) এবং ভ্রাতৃ সংঘ কর্তৃক "দুই বিঘা জমি" (নাটক) মঞ্চস্থ হয়। সুপ্রযোজনার গুণে এই নাটক ও নৃত্যনাট্যগুলির অভিনয় দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দেয়।

দক্ষিণীর আয়োজন

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী পালনে 'দক্ষিণী' দেশপ্রিয় পার্কের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটি উৎসবের আয়োজন করেছে। মেলা ও প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি এই উৎসবের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

মেলাতে থাকবে বিভিন্ন কুটীরজাত শিল্পসামগ্রী ও অন্যান্য আকর্ষণীয় দ্রব্যের শতাধিক স্টল ও প্রদর্শনী, প্রমোদ-প্রাঙ্গণ এবং শিশুদের ক্রীড়াঙ্গন সমেত ৮—২২শে 'মে' পর্যন্ত পনেরো দিনের উৎসবের আয়োজন। স্বতন্ত্র ও বিশেষভাবে নির্মিত মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যাতে ৮—১৫ই 'মে' পর্যন্ত রবীন্দ্র-নাট্য

পরিবেশন করবেন যথাক্রমে রাগ ও রূপ—চণ্ডালিকা, দক্ষিণী—পণরক্ষা, বিচিত্রা—তাসের দেশ, ওল্ড ক্লাব—গৃহপ্রবেশ, রূপকার—ত্যাগ, রঙ্গসভা—দালিয়া, দক্ষিণী—ফাল্গুনী এবং বৈশাখী—শেষ রক্ষা। এছাড়া, বর্ষামঙ্গল, বসন্তোৎসব ও ভানুসিংহের পদাবলী নৃত্যগীতানুষ্ঠান, একক

সুশীল মজুমদার প্রোডাকশন্সের "কঠিন মায়া"-তে একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় ছবির নায়িকা সন্ধ্যা রায়

সঙ্গীতের আসর ও সাহিত্যালোচনা অনুষ্ঠান-সূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই উপলক্ষে সমগ্র উৎসব-প্রাঙ্গণ আলোক-সজ্জায় সজ্জিত করা হবে। পঁচিশে বৈশাখ প্রভাতে দক্ষিণীর পাঁচশতাধিক শিক্ষার্থী সম্মিলিত কণ্ঠে 'জন্মদিনের গান' পরিবেশন করবে। এই উৎসবে দুইশত পৃষ্ঠার একটি সাহিত্য-পত্র প্রকাশিত হবে।

রবীন্দ্র মেলার উৎসবসূচী

আগামী ১লা মে থেকে ১৫ই মে পর্যন্ত পক্ষকালব্যাপী রবীন্দ্রকাননে (বিডন স্কোয়ার) রবীন্দ্র মেলার উদ্যোগে কবির জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হবে। এই সঙ্গে কবির একটি মূর্তি রবীন্দ্রকাননে প্রতিষ্ঠা করা হবে। রবীন্দ্র মেলার এই অনুষ্ঠানে উদয়শঙ্কর ও সম্প্রদায়, সাধনা বসু ও সম্প্রদায়, বহুরূপী, লিটল থিয়েটার গ্রুপ, দক্ষিণী, গীতবিতান, সুরমন্দির, ইণ্ডিয়ান প্রগ্রেসিভ ব্যালেগ্রুপ, পিনাকীর ব্যালেট, শৌভনিক, থিয়েটার ইউনিট, রূপকার, নন্দন, খেলাঘর, ইনস্টিটিউট গ্রুপ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান যোগদান করবেন। সামান্য-ক্ষতি, উদারচরিতানাম, শ্যামা, চণ্ডালিকা, বাল্মিকী প্রতিভা, অভিসার, ভ্রষ্টলগ্ন প্রভৃতি নৃত্যনাট্য এবং রক্তকরবী, মালঞ্চ, যোগাযোগ, বাঁশরী, মালিনী জীবিত ও মৃত, শোধ-বোধ, কাবুলিওয়ালা প্রভৃতি নাটক অভিনীত হবে। শ্রীমতী সাধনা বসু তাঁর সম্প্রদার সহ রবীন্দ্রানুরাগীদের নিকট দুইটি নৃত্যনাট্য পরিবেশন করবেন এবং বিশিষ্ট শিল্পিগণ সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন। ডাঃ বি ভি কেশকার, শ্রীঅনিল-কুমার চন্দ, শ্রীওয়াই বি চাবন, শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সত্যেন্দ্র-নাথ বসু, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডাঃ গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন। উদ্যোক্তা পরিষদ ৩০শে এপ্রিল সদস্য গ্রহণের শেষ তারিখ ধার্য করেছেন এবং উক্ত তারিখ পর্যন্ত মেলার কার্যালয় ৩এ, বিডন স্কোয়ার (কলি-৬) নতুন সদস্যও গ্রহণ করা হবে।

বিবিধ সংবাদ

ইউনাইটেড আর্টিস্টের "এপার্টমেণ্ট" পাঁচটি "অস্কার" লাভ করেছে এই ক'টি বিভাগে—শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র, শ্রেষ্ঠ পরিচালক (বিলি ওয়াইল্ডার), শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য (বিলি ওয়াইল্ডার ও আই এ এল ডায়ামণ্ড), শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্দেশ (সাদা-কালো), এবং শ্রেষ্ঠ সম্পাদনা।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী হিসাবে সম্মান লাভ করেছেন যথাক্রমে বার্ট ল্যাংকাস্টার ("এলমার গ্যান্টি") ও এলিজা-বেথ টেলর ("বাটারফিল্ড ৮")। পার্শ্ব-চরিত্রের শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে পিটার উস্টিনভ ("স্পার্টাকাস") ও শার্লি জোন্স ("এলমার গ্যান্টি") মনোনীত হয়েছেন।

*

১৯৬০ সালের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে পুরস্কৃত 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর প্রযোজক ইস্টার্ন সারকিউট প্রাইভেট লিমিটেড অল ইণ্ডিয়া সার্টিফিকেট অব মেরিট ছাড়াও রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে নগদ দশহাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছেন। উক্ত সংস্থার পক্ষে শ্রীহেমেন গাঙ্গুলী পুরস্কারের সমস্ত টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী ভাণ্ডারে সমান অংশে দান করেছেন।

*

হলিউডের একাডেমি অফ মোশান পিকচার আর্টস এণ্ড সায়েন্সের ৩৩শ বার্ষিক অধিবেশন গত ১৭ই এপ্রিল স্যাণ্টা মনিকাতে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে ১৯৬০ সালের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র শিল্পী কলাকুশলী প্রভৃতিকে "অস্কার" দানে সম্মানিত করা হয়।

একলব্য

স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলা আমরা উপহার পেয়েছি ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে। শুধু ফুটবল, ক্রিকেট হকিই বা কেন, টেনিস, টেবল টেনিস, ভলিবল, ব্যাডমিণ্টন প্রভৃতি খেলাধুলোও আমাদের নিজস্ব নয়। অতীত যুগে ব্যাডমিণ্টন নাকি ভারতেই প্রথম খেলা হয়েছিল, কিন্তু এই খেলার যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন এবং যাঁরা প্রথম খেলেছিলেন তাঁরা ভারতীয় নন। ওদেশেরই লোক। ভারতের সমস্ত রকমের খেলাধুলোর উপর ইংলণ্ডের প্রভাব সুস্পষ্ট। ভারতীয় খেলাধুলোর কাঠামোও ইংলণ্ডের ধাঁচে গড়া। শুধু মরসুমের মধ্যে যা পার্থক্য। ইংলণ্ডের খেলার মরসুমের সঙ্গে আমাদের খেলার মরসুমের সম্পর্ক—'তোমার হ'ল শুরু আমার হ'ল সারা' মত। ওদের ফুটবল মরসুম শেষ হয়েছে। আমাদের ফুটবল মরসুম শুরু হতে যাচ্ছে। আমাদের ক্রিকেট মরসুম শেষ হয়েছে, ওদের ক্রিকেট মরসুম সবে আরম্ভ হচ্ছে। যাক সে কথা।

ইংলণ্ড ক্রিকেটের মাতৃভূমি। ইংলণ্ড-বাসীর জাতীয় জীবনের সঙ্গে ক্রিকেট ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ক্রিকেটকে ইংরেজরা শুধু খেলা বলেই মনে করে না। মনে করে ধর্ম বলে। যে কোন অন্যায়কে ওরা ধিক্কার দেয় 'ইট ইজ নট ক্রিকেট বলে'। শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, শিল্প ভাস্কর্য প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানী-গুণীদের পাঁচজনের নাম করতে হলে তার মধ্যে একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়ও স্থান পান। ইংলণ্ডে ক্রিকেট এত জনপ্রিয়, ক্রিকেট খেলার এমন সম্মান ও সমাদর। কিন্তু সেই খাস ইংলণ্ডেই ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা আস্তে আস্তে কমে আসছে। গত মরসুমে কাউণ্টি খেলাগুলোতে আশানুরূপ দর্শক সমাগম হয়নি। অনেক কাউণ্টির ক্যাশবাক্সও ফাঁকা। ক্রিকেটের ঢিমে তেতালা ভাব, টেলিভিশনের জন-প্রিয়তা, মোটর ভ্রমণ এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদের প্রতি সাধারণের আগ্রহই নাকি ক্রিকেট খেলায় দর্শক হ্রাসের অন্যতম কারণ। অন্য কারণ বাদ দিলেও খেলার মন্থর গতি যে ক্রিকেটকে প্রাণহীন করে তুলছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বোলাররা ঝুঁকি না নিয়ে রান কম রাখার দিকে চেষ্টা করছেন, আগে ঘণ্টায় যেখানে ২২ থেকে ২৪ ওভার বোলিং করা হত এখন সেখানে বোলিংয়ে ওভার ১৮।১৯-এ নেমে এসেছে। ব্যাটস-ম্যানরাও স্ট্রোক করা ছেড়ে দিয়ে উইকেটে টিকে থাকার সাধনা আরম্ভ করেছেন। তাই এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ইংলণ্ডের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের চিন্তার অন্ত নেই। ক্রিকেটকে চিত্তাকর্ষক করার জন্য তাঁরা নানা পরিকল্পনা করছেন। দুই একটি নিয়ম কানুনেরও পরিবর্তন করা হয়েছে। এ বছর থেকেই পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই ইংলিশ ক্রিকেটের জনপ্রিয়তার পক্ষে এ বছর এক পরীক্ষার বছর।
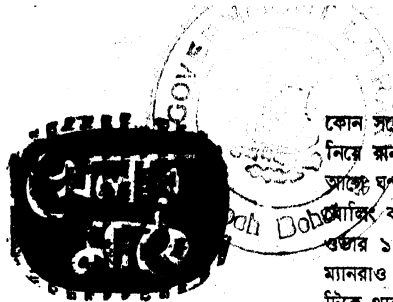
অবশ্য এই মরসুমেই ইংলণ্ডের অস্ট্রেলিয়া দলের সফর থাকায় ইংলণ্ডের ক্রিকেট মহল চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট খেলা দেখার আগ্রহ হয়েছে অপরিসীম। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ায় অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চিত্তাকর্ষক টেস্ট খেলায় ক্রিকেট ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে এসেছে নতুন জোয়ার। সবাই আশা করছেন ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলাও মরাগাঙ্গে জোয়ার আনবে। না হলে হবে ইংলিশ ক্রিকেটের মৃত্যু। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি

ইংলণ্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়রা এসেক্সের টিলবারী বন্দরে পৌঁছেই একখানি ইংরেজী সংবাদপত্রের খেলার পাতা দেখছেন। বাঁদিক থেকে—অধিনায়ক রিচি বেনো, জি ম্যাকেঞ্জি, নর্ম্যান ও'নীল, সহ অধিনায়ক নীল হার্ভে, ডারউ লরী ও রবার্ট সিমসনকে দেখা যাচ্ছে

বেনোও ইংলণ্ডে পৌঁছে চিত্তাকর্ষক ও মন-মাতানো ক্রিকেট খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দেখা যাক কার প্রতিশ্রুতি কতটুকু রক্ষা হয়।

* * *

হকি মরসুম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ময়দানে হকির পরমায়ু আর মাত্র ১৫ দিন। তারপরই আরম্ভ হচ্ছে খেলা-আমোদীদের মন-মাতানো প্রাণ-মাতানো ফুটবল। অবশ্য ময়দান পাড়ায় ফুটবলের প্রস্তুতি অনেকদিন থেকেই শুরু হয়েছে। ক্লাবে ক্লাবে আরম্ভ হয়েছে জোর কদমে তোড়জোড়। ঘাসের উপর কান পাতলেই শোনা যায় ফুটবলের পদধ্বনি। ফুটবল বলতে অবশ্য আমি কলকাতার লীগ খেলাকেই বোঝাতে চাইছি। ফুটবলের অনুশীলন তো অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছে। পাওয়ার লীগ এবং আন্তঃ অফিস লীগের খেলাও আরম্ভ হয়ে গেছে। শিবের আগে নন্দীভৃঙ্গীর মত এসব লীগ প্রথম ডিভিসন লীগের অগ্রদূত। কিন্তু এতে তো আর উৎসাহ উদ্দীপনা নেই। সবাই আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে আসল লীগের খেলার দিকে। লীগের খেলায় তিন বছর ধরে 'প্রোমোশন রেলিগেশনের' বিধান বন্ধ থাকবার পর এবার আবার প্রোমোশন রেলিগেশনের নিয়ম চালু হচ্ছে। সেও কম আকর্ষণ নয়। তারপর বাইরের থেকেও এবার কলকাতায় আসছেন কয়েক-জন বড় খেলোয়াড়। সেও আর এক আকর্ষণ।

ফুটবল খেলা নিয়ে এর মাঝে এক আলোচনা সভাও হয়ে গেছে। আই এফ এর সম্পাদক, রেফারী এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি এবং বড় বড় ক্লাবের কর্মকর্তাদের এই আলোচনা সভা বসেছিল ফুটবলের পরিচালনা নিয়ে। কলকাতায় ফুটবল খেলার পরিচালনা সন্তোষজনক নয় এ অভিযোগ বহুদিনের। রেফারীরা ভুলচুক করেন বেশী। অনেক সময় পক্ষপাতদুষ্ট বলেও তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। সুতরাং যাতে খেলাগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেই উদ্দেশ্যেই সব পক্ষের প্রতিনিধিদের আলোচনা সভা ডাকা হয়েছিল। এই সভায় রেফারীদের প্রতিনিধি আশ্বাস দিয়েছেন রেফারীরা তাঁদের সাধ্যানুযায়ী সুষ্ঠুভাবে খেলা পরিচালনা করতে চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। তবে এই সম্পর্কে ক্লাব কর্তৃপক্ষেরও যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। ক্লাবের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পেলে রেফারীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকে। সামান্য ভুলচুকে বা কাল্পনিক ভুলে রেফারীদের অনেক সময় ক্লাব সমর্থকদের হাতে নিগৃহীত হতে হয়। রেফারীরাও মনোবল হারিয়ে ফেলে।

কথাটা মিথ্যে নয়। আবার এ কথাও সত্যি যেখানে ক্লাবে ক্লাবে প্রবল রেষারেষি সেখানে রেফারীর পরিচালনার মারাত্মক ভুলে যদি এক পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্লাবের সমর্থকদের পক্ষে সে ভুলকে সহজভাবে গ্রহণ করাও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। রেফারীদের উপর হামলা হয় এটাও যেমন কাম্য নয়, তেমন রেফারীদের ভুলচুক হয় এটাও অভিপ্রেত নয়। এর উত্তরে হয়তো বলা হবে। ভুলচুক তো হবেই। মুনিঋষিদেরও ভুলচুক হয় আর রেফারীরা তো মানুষ। আমি বলবো ভুল করার স্বপক্ষে এটা যুক্তির কথা। ভুল না করাই রেফারীর যোগ্যতার প্রধান নিদর্শন। রেফারীর কর্তব্য অনেকটা বিধবার একাদশী করার মত। করলে পুণ্য নেই। না করলে পাপ। রেফারীদেরও পরিচালনা ত্রুটিহীন হলে বিশেষ কোন গৌরব নেই। পান থেকে চুন খসলেই সর্বনাশ। যাকে বলে থ্যাংকলেশ জব। এর কারণও আছে। ফুটবলের আইন রেফারীকে অসম্ভব ক্ষমতা দিয়েছে। মাঠের মধ্যে তিনি একচ্ছত্র অধিপতি, আইন রক্ষক, বিচারক। তার কোন কাজে প্রতিবাদ করার কারো কোন অধিকার নেই। তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না' বলে একটা কথা আছে। কথাটা রেফারীদের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য এমন বোধ করি আর কোথাও নয়। হাকিমের বিচারের পুনর্বিচার করবার জন্য আছে উচ্চ আদালত। কিন্তু রেফারীর সিদ্ধান্ত পাল্টাবার ক্ষমতা কারোরই নেই। ফুটবল এসোসিয়েশনেরও না। খেলার আইন রেফারীকে এতখানি ক্ষমতা দিয়েছে বলেই তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু নির্ভুল হওয়া দূরে থাক অনেক সময় রেফারীদের সততা সম্বন্ধেই মনে প্রশ্ন জাগে এবং তার থেকেই যত গোলমালের সূত্রপাত হয়। হয়তো বহু ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি অনিচ্ছাকৃত। কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই, রেফারীদের ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনাই কলকাতার ফুটবলের যত গোলমালের উৎসস্থল। তাই নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে রেফারীদের আরও সতর্ক হতে হবে। এমনভাবে খেলা পরি-চালনা করতে হবে যাতে কেউ কোন সন্দেহ আরোপ না করতে পারে। অবশ্য মনে যাদের সন্দেহ বাই আছে, যাঁরা খেলা দেখার বদলে প্রিয় দলের জয় দেখতে মাঠে যান তাঁরা অনেক সময় বিনা কারণেও সন্দেহ করবেন। কিন্তু আমি জোর করে বলতে পারি নিজের উপর আস্থা রেখে রেফারীরা যদি নির্ভীকভাবে কর্তব্য করে যান তবে সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা হবে তাঁদের অবশ্য প্রাপ্য।

* * *

হকি লীগের খেলা শেষ হলেও এখন পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ নিষ্পত্তি হয়নি। গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ও কাস্টমস লীগ কোঠার উপরে সমান পয়েন্ট পেয়ে লীগ শেষ করেছে। ফলে চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্নের মীমাংসার জন্য একটি অতিরিক্ত খেলার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। হকি লীগের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন অবস্থায় সৃষ্টি বেশীবার হয়নি। আগে দু'তিনবার এভাবে চ্যাম্পিয়ন-শিপের মীমাংসা করা হয়েছে।

এবারও চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণয়ের জন্য ইস্টবেঙ্গল ও কাস্টমসের মধ্যে খেলার দিন ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু যেভাবে খেলাটি বানচাল হয়ে গেছে তা বেঙ্গল হকি এসো-সিয়েশনের পরিচালকদের পক্ষে মোটেই গৌরবের কথা নয়—দূরদৃষ্টির অভাবেরই পরিচয়, লজ্জার কথাও বটে।

খেলায় পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ও কাস্টমস। দু'টিই শক্তিশালী দল—লীগের খেলায় অপরাজিত। সুতরাং এদের মধ্যে চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক বিশেষ খেলাটির আকর্ষণও যথেষ্ট। তাই দু'টি দলের সুযোগ সুবিধা মত খেলার দিন ধার্য করাই বুদ্ধিমানের কাজ ছিল। কিন্তু বি এইচ এর কর্তৃপক্ষ কাস্টমসের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও খেলার দিন ধার্য করে বসলেন। বি এইচ এর 'সর্বশক্তিমান' সম্পাদক শ্রীপঙ্কজ গুপ্তের হয়তো ধারণা ছিল কাস্টমসের ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তিনি কাস্টমস দলকে খেলতে বাধ্য করতে পারবেন। কিন্তু তিনি হালে পানি পাননি। তাই সংবাদপত্রে খেলার বিজ্ঞাপন দিয়েও শেষ পর্যন্ত খেলার নির্ধারিত দিনে দুপুর বেলায় তাকে খেলা স্থগিত রাখতে হয়েছে। কিন্তু যেভাবে খেলা স্থগিত রাখা হয়েছে তা আইনসিদ্ধ কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। এর

জন্য এই কাঠফাটা রোদে সাধারণ দর্শকেরও ভোগান্তি কম হয়নি। আর দুটি দলের একপক্ষ এবং খেলায় নির্বাচিত দু'জন আম্পায়ারকেও মাঠে হাজির হতে হয়েছে। এখন এ সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা বি এইচ এর লীগ কমিটির হাতে।

কাস্টমসের না খেলার পক্ষে যুক্তি ছিল তাদের নির্ভরযোগ্য ব্যাক গুরুবক্সের অনুপস্থিতি। হকি ফেডারেশনের সভাপতির দলে নির্বাচিত গুরুবক্স আগা খাঁ কাপের ফাইন্যালের জন্য আটকা ছিলেন বোম্বাইতে। অবশ্য একজন খেলোয়াড়ের অভাবে খেলায় অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত কোনভাবেই সমর্থন করা যায় না। কিন্তু যেভাবে এই খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং যেভাবে খেলাটি বানচাল হয়ে গেছে তাতে কাস্টমসের দোষের চেয়ে বি এইচ এর দোষ অনেক বেশী।

শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত নিজেকে কি মনে করেন জানি না। তিনি গুরুবক্সের জন্য আগা খাঁ কাপের ফাইন্যাল খেলা স্থগিত রাখারও আবেদন করেছিলেন বোম্বাইতে। গুরুবক্সকে না পেলে কাস্টমস খেলবে না একথা পরিষ্কারভাবে জানানো সত্ত্বেও শ্রীগুপ্তর ধারণা ছিল ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মহলে প্রভাব বিস্তার করে তিনি খেলার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু কোনটাই সম্ভব হয়নি। স্বীকার করি শ্রীগুপ্ত এক সময়ে ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে হর্তাকর্তা ছিলেন, তখন অনেক অঘটনই তিনি ঘটিয়েছেন, কিন্তু এখন যে তাঁর দিন ফুরিয়ে গেছে একথা কি তিনি বুঝতে পারেন না? শুধু কাস্টমস ও ইস্টবেঙ্গলের খেলার ব্যাপারেই নয়। এর আগে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের প্রদর্শনী খেলার ব্যাপারেও শ্রীগুপ্তের অনুরোধ বোম্বের হকি কর্তৃপক্ষের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে। তখন গোল্ড কাপের খেলা চলছিল। সাউথ ইস্টার্ন রেল ছিল গোল্ড কাপের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। রেল দলে ছিলেন মোহনবাগানের তিনজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। তাই মোহনবাগান তাঁদের অভাবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে প্রদর্শনী খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অস্বীকার করায় সর্বশক্তিমান পঙ্কজ গুপ্ত গোল্ড কাপ থেকে রেল দলের নাম খারিজ করে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। কি অযৌক্তিক আবদার। পঙ্কজ গুপ্তর স্মরণ রাখা উচিত ছিল বোম্বাই তাঁর মামা বাড়ি নয় যে এমন আব্দার করবেন। সেবার না হয় স্মরণ রাখেননি। কিন্তু এবার তিনি কি করে আগা খাঁ কাপের ফাইন্যাল স্থগিত রাখার আবেদন করলেন?

এসব ব্যাপারে তিনি নিজেও যেমন খাস্তা হচ্ছেন, খেলাকে নিয়েও তেমন ছেলে খেলা করছেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার হচ্ছে সুনাম নষ্ট।

* * *

আন্তঃ কলেজ হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ

যদিও লীগ কোঠার উপরে ইস্টবেঙ্গল ও কাস্টমস অপরাজিত থাকার কৃতিত্ব সমেত সমান পয়েন্ট পেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে এক আকর্ষণীয় অবস্থার সৃষ্টি করেছে তবু হকি লীগের খেলা এবার মোটেই ভাল জমেনি। কোন খেলা দেখেও দর্শকরা পায়নি সত্যিকারের আনন্দ। দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলাটি তো অনুষ্ঠিতই হয়নি। বড় বড় ক্লাবের বাকী খেলাগুলিতে হয় লাঠিবাজির আধিক্য না হয় ঢিমে তেতালা ভাব দেখা গেছে। উঠা-নামার বিধানে নীচের দিকের বহু খেলার ফলাফল গড়াপেটা করে নেওয়া হয়েছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের যোগসাজসে। একে কি খেলা বলে না, এ খেলা থেকে দর্শকরা কোন আনন্দের খোরাক পায়?

হকি লীগে এবার যা কিছু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে বাঙালী খেলোয়াড় নিয়ে গড়া গ্রীয়ার ক্লাব। গ্রীয়ার ক্লাব দুই প্রবল প্রতিপক্ষ মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করেছে, ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ড্র করেছে, কাস্টমসের কাছে হেরেছে মাত্র ১—২ গোলে। বাঙালী খেলোয়াড়দের নিয়ে এ কৃতিত্ব অর্জন বড় কম কথা নয়।

লীগের খেলা নিয়ে যদি সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করি তবে দেখতে পাব এবার খেলায় গোল হয়েছে ভুঁরি ভুঁরি। 'হ্যাট্রিকের' বোধ হয় নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। সবসুদ্ধ হ্যাট্রিক হয়েছে ১৪টি। হ্যাট্রিক করেছেন ১০ জন খেলোয়াড়। মোহনবাগান ক্লাবের সেণ্টার ফরোয়ার্ড মহাজন একাই করেছেন তিনবার হ্যাট্রিক। কাস্টমসের সেণ্টার ফরোয়ার্ড রাজবীর এবং জ্যাভেরিয়ান্সের সেণ্টার ফরোয়ার্ড আর ক্ষেত্রী দু'বার করে। বাকী ৭টি হ্যাট্রিকের অধিকারী ইস্টবেঙ্গলের এরিক, চন্দ্রপ্রকাশ ও বালু, উয়াড়ীর দীপ মিত্র, মেসারার্সের ফিলিপস, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের সান্তনরাম ও মোহনবাগানের পিয়ারা সিং।

গোলদাতার তালিকায় শীর্ষস্থান দখল করে আছেন মহাজন মোহনবাগানের ৫৭ গোলের মধ্যে একাই ২৩টি গোল করে।

প্রথম ডিভিসনের ১৯টি ক্লাবের মধ্যে এবার আর্মেনিয়ান্স ও মেসারার্স দ্বিতীয় ডিভিসনে নামার বিধানে পড়ল। আসছে বার এদের যায়গায় আসছে দ্বিতীয় ডিভিসন চ্যাম্পিয়ন পোর্ট কমিশনার্স ও রানার্স ভবানীপুর ক্লাব। পোর্ট কমিশনার্স অপরাজিত থাকার গৌরব সমেতই দ্বিতীয় ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। নীচে প্রথম ডিভিসনের লীগ টেবল থেকে বিভিন্ন দলের অবস্থা বোঝা যাবে।

প্রথম ডিভিসন হকি লীগ টেবল

	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি
ইস্টবেঙ্গল	১৮	১৫	৩	০	৪৫	৪
কাস্টমস	১৮	১৫	৩	০	৫৫	[illegible]
মোহনবাগান	১৮	১৫	০	৩	৫৭	[illegible]
মহঃ স্পোর্টিং	১৮	১১	৩	৪	২৯	১[illegible]
গ্রীয়ার	১৮	৯	৬	৩	১৯	[illegible]
ইস্টার্ণ রেল	১৮	৯	৪	৫	১৬	[illegible]
ওঃ বেঃ পুলিস	১৮	৮	৫	৫	৩১	৩০
খালসা ব্লুজ	১৮	৮	৪	৬	১২	১[illegible]
পুলিস পাঞ্জাব স্পোর্টস	১৮	৮	৪	৬	১৭	২০
স্পোর্টস	১৮	৬	৫	৭	১৬	২[illegible]
জ্যাভেরিয়ান্স	১৮	৬	৪	৮	২০	২[illegible]
উয়াড়ী	১৮	৪	৫	৯	৯	২[illegible]
রেঞ্জার্স	১৮	৩	৬	৯	১৪	২[illegible]
এরিয়ান	১৮	৩	৫	১০	৫	২[illegible]
আদিবাসী	১৮	৫	১	১২	৭	৩[illegible]
স্পোর্টিং ইউঃ	১৮	২	৬	১০	৮	৩[illegible]
রাজস্থান	১৮	৩	৩	১২	৮	২[illegible]
আর্মেনিয়ান্স	১৮	১	৬	১১	৬	২[illegible]
মেসারার্স	১৮	১	৬	১১	১০	৩[illegible]

(* ইস্টবেঙ্গল ও কাস্টমসের মধ্যে চ্যাম্পিয়নসিপ নির্ণায়ক খেলার পূর্বের টেবল)

দেশী সংবাদ

১৭ই এপ্রিল—কলিকাতা রেণ্ট কন্ট্রোলার অফিসের এক-শ্রেণীর পদস্থ কর্মচারীর যোগসাজসে এক দুষ্কৃতকারী দল গত ১২ বৎসরের ভিতরে ঐ অফিসের কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণা দ্বারা আত্মসাৎ করিয়াছে বলিয়া এক গুরুতর অভিযোগ পাওয়া যায়।

বঙ্গ সংস্কৃতি ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ অদ্য রাত্রি পৌনে দশটায় কলিকাতায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন।

দলত্যাগকারী বলিয়া পরিচয় দিয়া কয়েকজন চীনা সৈন্য তিব্বতী উদ্বাস্তুর ছদ্মবেশে ভুটানের দুর্গম গিরিবর্ত্ম দিয়া দার্জিলিং জেলায় প্রবেশ করে। কালিম্পং-এর কয়েকটি সীমান্ত ঘাটিতে তাহাদের পরিচয় ধরা পড়ে।

১৮ই এপ্রিল—অল্প কয়েকজনের হাতে যাহাতে অর্থনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হইতে না পারে, তাহার জন্য "ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সমস্যা" রোধের জন্য আজ লোকসভায় কয়েকজন সদস্য অর্থমন্ত্রীর ব্যয়মঞ্জুরীর দাবি সংক্রান্ত অসমাপ্ত বিতর্ককালে ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানান।

১৯শে এপ্রিল—অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই অদ্য লোকসভায় অর্থ বিল আলোচনার্থ উত্থাপন করিয়া নিম্নলিখিত পণ্যগুলির ক্ষেত্রে কর সম্পর্কে সুবিধা দানের কথা ঘোষণা করেনঃ—কৃষ্ট কফি, সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ, বিদ্যুৎচালিত তাঁত, স্বয়ংক্রিয় তাঁতজাত বস্ত্র, কাচের বাসন, চীনা মাটির বাসন ও পোরসিলিন শিল্প, তামা ও তামামিশ্রিত ধাতু এবং পশম।

আজ লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন ব্রহ্ম ও ভারতের 'ছিদ্রপথ' হইতে নাগা বিদ্রোহীরা তাহাদের অস্ত্র ও গুলীগোলার আংশিক সরবরাহ পায় বলিয়া মনে হয়।

২০শে এপ্রিল—গতকাল রাত্রি ১০-১০ মিনিটের সময় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জলপাইগুড়ি-আলিপুরদুয়ার সেকশনে শিলিগুড়ি হইতে নয় মাইল দূরে গুলমা ও সিবক স্টেশনের মধ্যে পোরমালা খোলা ব্রীজের উপর ৬নং ডাউন নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস ট্রেনখানি এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পতিত হয়। দুর্ঘটনার ফলে ইঞ্জিন ও রিফ্রেশমেণ্ট কামরা সহ সাতখানি বগী লাইনচ্যুত হইয়া যায় এবং তিনখানি বগী একখানি অপরখানির মধ্যে ঢুকিয়া যায়। এই দুর্ঘটনায় জন নিহত এবং ৮২ জন আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়।

২১শে এপ্রিল—অদ্য ওয়ারিয়ায় (দুর্গাপুর) অবস্থিত ডি ভি সি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের একটি বয়লারে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় আগামী-কাল (শনিবার) হইতে উক্ত কেন্দ্র হইতে শক্তি সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ লোকসভায় বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট পেশ করিবার দিনের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে কিম্বা পরে যাহাতে জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে না পারে তজ্জন্য তিনি ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

২২শে এপ্রিল—আজ লোকসভায় অর্থ বিল গৃহীত হয়। বর্তমান আর্থিক বৎসরে যেসব কর ধার্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে, এই বিলে তাহা কার্যকর করিবার কথা বলা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ বলেন যে, সমস্ত সমাজতান্ত্রিক আড়ম্বর সত্ত্বেও ভারতে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। তিনি বলেন যে, ভারতের জনসাধারণের মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও আপত্তিকর। বিশ্বের কয়েকটি ধনতান্ত্রিক দেশ অপেক্ষা ভারতে এই অসাম্য দুস্তর।

২৩শে এপ্রিল—প্রায় সাত লক্ষ টাকার টিউব-ওয়েলের সরঞ্জামাদি ক্রয়ার্থ প্রয়োজনীয় অনুমোদন লাভের জন্য কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রেরিত যাবতীয় কাগজপত্রাদি রাজ্য সরকারের বিভাগীয় দপ্তরে লালফিতার তলায় চাপা পড়ায় মহানগরীর অন্যূন পাঁচ লক্ষ নরনারীর পরিস্রুত জল ব্যবহারের সুযোগ লাভ হইতে বঞ্চিত হইতেছে বলিয়া এক গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৭ই এপ্রিল—কিউবার বিদ্রোহীদের সূত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, আজ প্রত্যূষে ক্যাস্ট্রো-বিরোধী সামরিক অভিযান আরম্ভ হইবার পর হাভানার রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। কিউবা প্রকৃতপক্ষে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

কিউবায় অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করিবার আদেশ দানের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ রাষ্ট্রপুঞ্জকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছে।

কঙ্গোর প্রেসিডেণ্ট যোসেফ কাসাভুবু আজ প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, কঙ্গোলীজ সরকার রাষ্ট্রপুঞ্জের সহিত সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক।

১৮ই এপ্রিল—"কিউবা প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ" অবিলম্বে বন্ধ করিতে বলিয়া শ্রীক্রুশ্চেফ আজ প্রেসিডেণ্ট কেনেডির নিকট এক বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন—"রাশিয়ার বলবত্তা সম্বন্ধে কাহারও কোন ভ্রান্তি থাকা উচিত নয়। সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাশিয়া কিউবাকে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার সাহায্যই দিবে। তথাকথিত ছোট যুদ্ধও ভয়াবহ পরিণাম ডাকিয়া আনিতে পারে।

কস্ট্রো বিরোধী সূত্রে আজ জানা যায় যে, হাভানা হইতে প্রায় ৯০ মাইল দূরে কিউবার প্রধানমন্ত্রী ডঃ কস্ট্রোর প্রতি অনুগত সৈন্যরা আক্রমণকারীদের প্রতিহত করার জন্য সোভিয়েট ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিতেছে।

১৯শে এপ্রিল—কস্ট্রো-বিরোধী সৈন্যরা রাত্রে কিউবার রাজধানী হাভানার উপর বিমান হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া আক্রমণ চালায়। কিন্তু দক্ষিণ কিউবায় আক্রমণকারী স্থল-সৈন্যদের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে, তাহা আজ জানা যায়নি।

গতকল্য মার্কিন প্রেসিডেণ্ট শ্রী কেনেডি রাশিয়ার উদ্দেশ্যে বলেন, কিউবায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। তবে ইহাও তিনি সুস্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন যে, সোভিয়েতের দিক হইতে সেখানে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করা হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার প্রতিরোধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিবে।

২০শে এপ্রিল—গত সোমবার যে বিদ্রোহী অভিযাত্রী বাহিনী কিউবা আক্রমণ করে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করা হইয়াছে বলিয়া আজ ডঃ ফিডেল কাস্ট্রোর গবর্নমেণ্ট দাবি জানাইয়াছে। ফ্লোরিডায় প্রাপ্ত কিউবা সরকারের এক বেতার-বার্তায় বলা হইয়াছে যে, গতকাল রাত্রে ভাড়াটিয়া সৈন্যদলের শেষ ঘাটি প্লেয়া গিরনের পতন ঘটিয়াছে।

বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপত্র আজ বলেন, লাওসে যুদ্ধবিরতি এবং লাওস সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বানের ব্যাপারে বৃটেন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে একটি বুঝাপড়া আসন্ন।

২১শে এপ্রিল—কিউবার বিদ্রোহী "সোয়ান" বেতার হইতে আজ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কিউবায় আবার নূতন করিয়া অল্প-স্বল্প লোক লইয়া বিদ্রোহীরা অবতরণ করিয়াছে। মিয়ামিতে কিউবার নির্বাসিত নেতৃবৃন্দের মহল হইতে আরও জানান হইয়াছে যে, কাস্ট্রো-বিরোধী নূতন কয়েকটি গেরিলা বাহিনী সমুদ্রপথে কিউবা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

২২শে এপ্রিল—প্রেসিডেণ্ট দ্য-গলের নীতির বিরোধী অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলদের নেতৃত্বে ফরাসী সেনাদল আজ বিনা রক্তপাতে এবং আকস্মিক অভ্যুত্থান দ্বারা আলজিয়ার্স অধিকার করিয়া ঘোষণা করিয়াছে যে, তাহারা "ফরাসী আলজিরিয়াকে রক্ষা করিয়াছে। আলজিরিয়াকে ফ্রান্সের ভিতরে রাখাই তাহাদের উদ্দেশ্য।"

আজ রাত্রে জেনারেল দ্য-গলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফরাসী মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে খাস ফ্রান্সে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

২৩শে এপ্রিল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত শুক্রবার একটি সাত-পর্যায় রকেট উৎক্ষেপ করিয়াছে। ইহাই পৃথিবীর প্রথম সাত-পর্যায় রকেট বলিয়া দাবি করা হয়। প্রথম তিনটি পর্যায় রকেটটিকে ১৭৫ মাইল উর্ধ্বে লইয়া যাইবে। প্রত্যাবর্তনের পথে কাজ করিবে বাকী চারটি পর্যায়।

পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা – ৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০ ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস ৬ সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

২৮শ বর্ষ

(১৪শ সংখ্যা হইতে ২৬শ সংখ্যা পর্যন্ত)

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

MAY 6, 1961. DESH
PRICE 80 nP.

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী

শেক্সপীয়র প্রসঙ্গে টি-এস-এলিয়ট বলেছেন, "মহৎ কবিমাত্রেই আপন রচনার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করতে গিয়ে নিজের যুগকেই প্রকাশ করেন। এইভাবে দান্তে প্রায় নিজের অজ্ঞাতেই ছিলেন ত্রয়োদশ শতকের কণ্ঠস্বর, শেক্সপীয়র, প্রায় নিজের অজ্ঞাতসারেই, হয়ে উঠেছিলেন ষোড়শ শতকের প্রতিভূ।" আমরা বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় আপন জীবনদেবতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে শুধু জীবনদেবতাকেই নয় ভারতবর্ষের বিচিত্র জনমানসকে প্রতিফলিত করেছেন; কেবল প্রতিফলিত নয়, আপন প্রতিভার সৃজনলৈপুণ্যে সঞ্জীবিত ও সমৃদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ একাধারে যুগপ্রকাশক ও যুগস্রষ্টা; আর সেই যুগসত্য প্রকাশ ও সৃষ্টিপ্রবাহের প্রায় গোটা একটি শতাব্দীর মনন ও কর্মের ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথ আমাদের কালচেতনায় দীপ্ত, উদ্ভাসিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিপ্রহরকালসূচনা পর্যন্ত বিস্তৃত এই রবীন্দ্রযুগ; আমাদের স্বাধিকার প্রত্যয়ী নব্যজীবনবেদের উন্মেষ থেকে বিজ্ঞানাশ্রয়ী আধুনিক তন্ত্রের ক্রান্তিকালের সুদীর্ঘ ইতিহাস এই রবীন্দ্র-সাধনার ধারাবাহী। বহু পর্বে বিভক্ত রবীন্দ্র-সাধনার অজস্র ঐশ্বর্যসম্ভার—কাব্য, কাহিনী, সঙ্গীত, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, ভাষণ—মণ্ডূকতার তমসালোকে আবদ্ধ আমাদের জাতীয় মানসে এনেছিল হংসবলাকার পক্ষধ্বনির মতো যেন এক নূতন উজ্জীবনের ঘোষণা। বহু অপূর্ণ স্বপ্ন, যুগযুগ ঈপ্সিত বহু অসাধ্য আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তি ও সমূহের, জাতি ও জনতার, স্বদেশ ও সমাজের অসংখ্য সংকল্প ও কল্পনা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের মধ্যে, সৃষ্টির মধ্যেই যেন পূর্ণপ্রতিভাত। শতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়ে, অতীত ও ভবিষ্যতের গ্রন্থিবন্ধনে আজিও তাই শতরূপে সঞ্চরমান। রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী পঞ্জিকায় চিহ্নিত স্মৃতি-সম্বলমাত্র কখনই হতে পারে না; শতরূপে সঞ্চরমান রবীন্দ্রনাথ কালজয়ী, তাঁর সান্নিধ্য নিত্য নানারূপে বিশ্ব-প্রকৃতির মহিমায়, আমাদের জীবনচর্যায় অনুক্ষণ অনুভূত।

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী নিঃসন্দেহে আমাদের জাতীয় জীবনে আধুনিককালের এক স্মরণীয়তম উৎসব। স্বাধিকার-রিক্ত ভারতবর্ষের বহু-ভগ্ন পূর্ব কোণে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব এক উজ্জ্বল ঐতিহাসিক ঘটনা। জাতীয় কল্যাণের সাধনায় যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাঁদের আমরা নমস্কার করেছি, বন্দনা করেছি, দেশনেতার পদে বৃত করেছি। তাঁরা তদানীন্তনকে সেবা করে মর্মরমূর্তির গৌরব লাভ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজেকে একাত্ম করে রেখেছেন চিরপ্রবাহী জীবনের সঙ্গে। তাঁকে আনুষ্ঠানিকক্ষেত্রে স্মরণ না করেও আমরা অনুভব করি, তাঁরই ভাষা, তাঁরই সুর আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত, আমাদের প্রাণ চাঞ্চল্যের মধ্যে তিনি স্পন্দমান, তাঁরই আদর্শ-প্রেরণায় আমরা সাধ্যমত উদ্বুদ্ধ। রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকীর স্মরণীয়তম জাতীয় উৎসবের বহিরঙ্গের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপূর্ণতা অথবা মাত্রাহীনতা যাই ঘটুক সেজন্য যেন আমরা এই পরম শুভ উৎসবটির অন্তর্নিহিত সঙ্গতির প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ না করি। উৎসবের অন্তরঙ্গটি যদি সর্বসুন্দর ও সর্বশুভ হয় তবে বহিরঙ্গের রূপসজ্জায় ত্রুটি বা আলোকসম্পাতের অনুজ্জ্বলতায় তার কোন ক্ষতি হবে না।

দেশনায়ক যাঁরা তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় খণ্ডসত্যের বাস্তব রূপদানে সতত নিযুক্ত। শুধু আশু প্রয়োজন পূরণের তাগিদে খণ্ডসত্যের সমাবেশ দ্বারা জাতির সমগ্র মানস-সৌধ সৃষ্টি করা যায় না। তার জন্য চাই সৃজনী আবেগ, জীবনে ও মননে সৌন্দর্যের সাধনা। অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক প্রকল্পকে জাতির ভাবরূপের সঙ্গে যুক্ত করাই জাতীয় ঐতিহ্য সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কথা। সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে জাতীয় জীবনসাধনাকে মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন ভারতবর্ষের ভাবরূপ। আমাদের কালের প্রয়োজন সেই ভাবরূপের উত্তরসাধনা। রবীন্দ্রনাথ রূপকথার 'সোনার তরী'তে বসে কেবল আকাশের সুধা পান করেন নি, স্বর্গ ও মর্ত্য, আকাশ ও মৃত্তিকার যুগ্ম-প্রত্যয় তাঁর ধ্যানধারণা ও জীবনসাধনার প্রতিটি পর্বে। "দেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে যাহা আমাদের বুদ্ধিকে, শক্তিকে, ধর্মকে চারিদিক আবদ্ধ করিয়াছে। সেই কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এদেশে মানুষের আত্মা অহরহ কাঁদিতেছে। সেই কান্নাই ক্ষুধার কান্না, মারীর কান্না, অকালমৃত্যুর কান্না, অপমানের কান্না।" "এদেশে মানুষের আত্মার" এই পীড়ন এবং অপমান-ভার মোচনের পবিত্র সংকল্প রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিক উৎসবে অবহেলিত না হলে তবেই রবীন্দ্রসাধনার উত্তরাধিকারত্বে আমাদের যোগ্যতা প্রমাণিত হতে পারবে।

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকীতে আমাদের সংকল্প হোক, সহস্র দুর্ভাগ্য, অপহ্নব, অবক্ষয়ের মধ্যেও, আমাদের ভ্রাতৃ-ঘাতী, আত্মসর্বস্ব কলহকোন্দল, শূন্য আড়ম্বর-মণ্ডিত চারিত্রদৈন্য এবং কর্তব্যকুণ্ঠ অপচয়কুশলতা সত্ত্বেও আমরা যেন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রত্যয়ী হতে সচেষ্ট হই। রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব প্রথানুযায়ী বা ততোধিক শূন্যগর্ভ উচ্ছ্বাস ও ভক্তিবিলাসের বন্যায় পরিণত হলে কার্যত সমগ্র রবীন্দ্রসাধনাকে ব্যঙ্গ করা হবে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দায় নন, দায়িত্ব, আমাদের সাধনা ও সিদ্ধির পথিকৃৎ, পুরোধা ও সর্বোত্তম সুহৃদ। তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকীতে সে সাধনার সমাপ্তি নয়, নবসংকল্প ও নবযোজনা।

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব শুধু ভারতবর্ষের নয়, সারা পৃথিবীর। বিশ্ব মানবতার কবি বিশ্বমানবের উদ্দেশে পাঠিয়েছেন তাঁর সৌভ্রাত্রের, মঙ্গলের অমর বাণী। রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন তাই আমাদের নিজেদের স্বদেশের প্রতি কর্তব্যই নয়, সমগ্র মানব সমাজের প্রতি আমাদের কর্তব্যপালন। প্রার্থনা করি, শতবার্ষিকীর সর্বজন উদ্যোগ সমগ্র মানব-সমাজের অকুণ্ঠ শুভচেতনাকে জাগ্রত করুক, উদ্বুদ্ধ করুক।
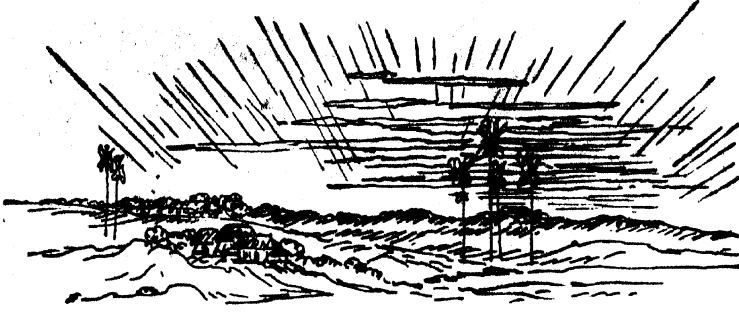
য থা স্থা ন

নিশিকান্ত

(১)

গানের গুরু, সুরের রাজা, তোমার শতবার্ষিকীতে
অর্ঘ্য দিতে
পত্র পেলাম, এলাম বিশাল রাজধানীতে।
এই নগরীর কোন ভবনে
যাবো তোমার অন্বেষণে?
সৌধমালার গহনবনে ভ্রান্তি ঘটে মোর আঁখিতে।
এইখানে কি পারবো তোমায় আমার গানের অর্ঘ্য দিতে
তোমার শতবার্ষিকীতে?

পূর্ব দিকের প্রান্তর নাই, নাই তো তোমার স্বরূপছবি!
আলোর কবি,
কোথায় তুমি আঁধারভূমির প্রভাতরবি?
এই নগরে যায় না দেখা
আকাশ-মাটির মিলন-রেখা;
দিগ্বালিকা পায় না কুসুম উদয়রাগের রক্তজবায়;
কেউ দেখে না দূর্বাদলের চিরশ্যামল স্নিগ্ধ শোভায়
নীল অমরার অরুণ-প্রভায়।

মালঞ্চ নেই! নাই বা থাকুক, ফুল আছে মোর স্মৃতির হাতে
শিশির পাতে
সিক্তগানে, তোমার দানের আশীর্বাদে।
রাজপথে আজ দিশা হারাই,
চেনামুখের দেখা না পাই!
বেচাকেনার এই শহরে যায় না সবাই তোমার পানে,
এই গতিভেদ আমার মাঝে দুঃসহতার আঘাত হানে
তোমায় পূজার অভিযানে।

সিংহতোরণ মুক্ত হ'ল প্রবেশ করি রাজসদনে।
এমন ক্ষণে
আমায় ডাকো কোন্ সুদূরের উদ্‌ভাসনে?
অট্টালিকার মহোৎসবে
কতক্ষণ বা দীপন রবে!
আমায় রাখো, তোমার ভাবের ভুবন ভরা তপনশিখায়,
শুক্লরাতের স্বপনঝরা পূর্ণচাঁদের অংশুলিখায়,
অযুত তারার দীপালিকায়।

পাষাণগড়া এই প্রাসাদে তোমার সোনার মূর্তিখানি
রাখেন জানি,
অনেক দেশের অনেক ধনী, অনেক মানী।
অর্ঘ্য সাজে রজত-থালায়
মণির মুকুট, মোতির মালায়,
আমার সুরের শিউলিমালা সাজবে না তো সেই থালিতে।
এইখানে আজ বিফল হ'লাম আমার গানের অর্ঘ্য দিতে
তোমার শতবার্ষিকীতে।

(২)

এবার চলি পল্লীপথে, হেথায় ধরা তোমার তরে
আসন ধরে
শিমের লতার বেড়ায় ঘেরা মাটির ঘরে।
এই নিরালায় তোমার মাঝে
বিশ্ববাণীর বীণা বাজে
শালবীথি আর আম্রবনের মৌমাছিদের গুঞ্জনিতে।
এইখানে আজ পন্থা পেলাম আমার গানের অর্ঘ দিতে
তোমার শতবার্ষিকীতে।

এই আঙিনার তরুলতার সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তায়
তোমার কথায়
নিখিল-প্রাণের কানন দোলে পুলক-ব্যথায়।
কয় মালতী, "আমায় ফোটাও,
সজল সুরের বর্ষণ দাও।"
কয় মাধবী, "মাধবকবি, হৃদয় রাখো আমার ফুলে।"
বকুল বলে, "তোমার মনের দখিন হাওয়ার ছন্দে দুলে
গন্ধ বিলাও আমায় তুলে।"

এইখানে কেউ নয় অচেনা, তোমার মালায় সবাই আছে
তোমার কাছে,
তোমার প্রেমের সুর-সুষমায় সবাই সাজে;
অমল ঊষার উদয়রাগে
কমল ফোটার লগ্নে জাগে;
সকাল-সাঁঝের বৈতালিকে তোমার সাথে কণ্ঠ মিলায়,
সবাই তোমার সৃজন-সুধার রাগরাগিণীর নিঝর বিলায়
তোমার গানের অঝোর লীলায়।

ওই শতবার্ষিকীর গতির উৎস আছে সংগোপনে
এই বিজনে,
হেথায় তুমি করলে বরণ চিরন্তনে।
চিরন্তনের কিরণ-কণায়
কল্প-কল্প আলোয় ঘনায়;
সেই কিরণে আমরা তোমার লক্ষশতবার্ষিকী পাই
ইন্দ্রধনুর মুকুট গড়ি, সূর্যমুখীর প্রদীপ সাজাই,
সরস্বতীর শংখ বাজাই।
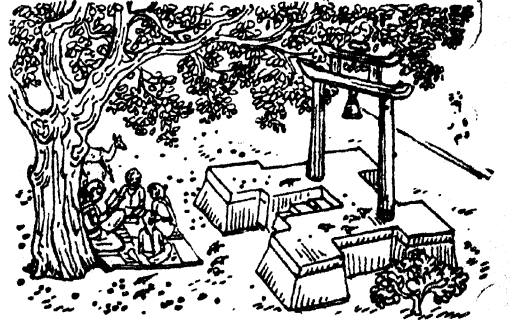
হেথায় স্বভাবসুন্দরী হয় তোমার তরে স্বয়ম্বরা:
শান্তি ভরা
এই নিকেতন পান্থজনের ক্লান্তিহরা।
সুন্দর হে, আমায় নিলে,
আশীর্বাদের শিউলি দিলে
মোর জীবনের প্রভাত-ক্ষণের শিশিরমাখা এই মাটিতে।
এইখানে আজ সফল হ'লাম আমার গানের অর্ঘ দিতে
তোমার শতবার্ষিকীতে।

পত্রাবলী

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১৩০ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার কাছে নালিশ করব। উচিত ছিল স্বয়ং কর্তৃপক্ষের কাছে করা কিন্তু আমার নাটকের প্রজারা রাজাকে লঙ্ঘন করে রানীর কাছে অভিযোগ আনচে যে-কারণে আমারও সেই একই কারণ। মহুয়ার প্রকাশ ব্যবস্থা একদা ছিল অপূর্বর হাতে, সে আজ দশমাস হয়ে গেল—তার পরে ভার নিলেন প্রশান্ত—এক থাক্ প্রুফ দেখাও শেষ করে দিয়ে এসেছি—মনে দুরাশা ছিল যে, পুজোর ছুটির পূর্বেই বই বেরবে এবং পুজোর বাজারে কিছু বিক্রিও হবে। আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়! আমাদের এখানকার ছাপাখানা দুয়োরানী—তাকে সবাই ঠেলে রেখে দেয়—কিন্তু তেরো ফর্মা তপতী সেই দুঃখিনী দর্শাদিনে সমাধা করেচে। রাখী সম্বন্ধে কী অভিপ্রায় তাও জানিনে—বস্তুত ২১০ নম্বর কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট মানব সংসারের ইতিহাসে কোনো প্রকার নড়াচড়ায় প্রবৃত্ত আছে কিনা সম্প্রতি তার খবরই পাইনে। রাখীর আবরণপত্র—যাকে হাল বাঙলায় প্রচ্ছদপট বলে—তাড়াতাড়ি একখানা বানিয়ে দিয়েছিলুম, সেটা কিন্তু আমার পছন্দমতো হয় নি—হুকুম পাবামাত্র চিঠি লিখতে বসে কোনোমতে কলমের আঁচড় কেটে ওটাকে হাতে হাতে এঁকে দিয়েছিলুম—ওটাই যে ব্যবহার করতে হবে এমন কোনো দায় নেই। কিন্তু বোধ হচ্চে বৃথা সময় নষ্ট করচি। —এখনো অনেক দেরি। বর্তমান যুগে মহুয়ার আবির্ভাবই কামনা করা যাক্।

আজ আসবেন আমাদের এখানকার কলেজের তিন ভাগ্যদেবতা। '——' এবং অপরিচিত আর দুজন। আমার জীবন-ধারার মাঝখানে এঁরা হবেন প্রক্ষিপ্ত। আজ মনটা ব্যাপারখানায় কিছুতে সায় দিতে পারচে না—তার কারণ আছে—আজ শরৎকালের প্রসন্ন আবির্ভাব চারদিকে। আকাশে মেঘপুঞ্জ শুভ্র এবং শুভ্রপ্রায়, পঞ্চাশ বছর বয়সের চুলের মতো—সাদায় কালোয় মিশোল—আলোকটি স্নিগ্ধ—প্রভাতের প্রান্তবেলাটি শান্ত স্তব্ধ—ঘরের সব জানালাগুলি খোলা—বাতাস এসে পড়চে গায়ের উপর, ছুটিপাওয়ার খুশীতে বুকের উপর ঝাঁপিয়ে-পড়া শিশুর কচিদেহের মতো কোমল। সামনের মাঠ দিগন্ত পর্যন্ত বর্ষার ঘাসে আবৃত, গোরু চরচে, সবুজ আকাশের উপরকার মেঘের মতো, সাদায় কালোয় পাটোলে মেশানো। মাঠের শেষ রেখার উপরে মোটা তুলিতে লেপে দেওয়া এক পোঁচ ঘন সবুজ রঙ, আর তার এদিকে এক-একটা সঙ্গছাড়া ঝাঁকড়া মাথা তাল গাছ ঊর্ধবাহু সন্ন্যাসীর মতো দাঁড়িয়ে, রাস্তার ওপারে খানিকটা লাল-রঙের খোয়াই ধরণীর ক্ষত অঙ্গের মতো, তারি ধারে একটিমাত্র বেঁটে খেজুরগাছ শাখাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে রোদ পোয়াচ্চে। বোলপুরের ঐ ছায়াশূন্য রাঙামাটির রাস্তা দিয়ে দৈবাৎ দুটি একটি পথিক চলচে। প্রভাতের আরম্ভে যেটুকু কর্মের বেগ এখানে দেখা দেয় এখন মধ্যাহ্নে তা ফুরিয়ে এলো—বর্ষাবন্যার অবসানে আশ্বিন মাসে অজয়ের ক্ষীণ স্রোতের মতো, সেই রকমই শব্দহীন এবং মন্দগতি। গোটা পাঁচেক রাখাল ছেলে বসে আছে আমাদের ঐ খড়ের চালওয়ালা চার পেয়ে নহবৎখানার ছায়াতে—বোধ হচ্চে ওরা মাটিতে ছক কেটে ঢেলা নিয়ে কোন্ একটা পাড়াগেঁয়ে সতরঞ্চ খেলা খেলচে। ইস্কুলে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজলো—এই মাঠের আকাশে স্তব্ধ দুপুর বেলায় ঘণ্টার শব্দ এমন করুণ কেন শোনায় বুঝতে পারিনে। যাক্‌গে, মোট কথা হচ্চে কুঁড়েমির বোঝাই নৌকা নিয়ে শরৎকাল আমার ঘাটে এসে পৌঁচেছে। কোনো দায়িত্বের কাজের মতো অবকাশ আজ নেই—আজকের প্রহরগুলো ছুটিতে একেবারে ঠাসা। বসে বসে গান তৈরি করতে রাজি আছি কিম্বা ছবি আঁকতে। বাঁশির শব্দ সম্বন্ধে রাধিকা বলচেন কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—আমার কাছে শরৎকালের ঐ শুভ্র মেঘ-পুঞ্জেরই মতো—নেশা ধরিয়ে দেয়—মর্ম-... থেকে বিচ্ছুরিত আলো সেই বাঁশির ... চিরন্তন বিরহের নেশা। বর্ষার মেঘদূতে রামগিরির দিক থেকে বিরহের বার্তা চলেছিল উড়ে। এ তার উল্টো—অলকার দিক থেকে লিপি এসে পৌঁছলো, শুভ্র মেঘের উপর আলো দিয়ে লেখা, সেই মানসতীরের অলকাপুরী যেখানে পৌঁছবার কোনো পথ নেই—স্বপ্ন ছাড়া, গান ছাড়া। শরতের মেঘদূতকে নিয়ে যখন পরিপূর্ণ আলস্যে ব্যস্ত আছি এমন সময় দূত আসচেন ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটির — একেবারে শার্দুল-বিক্রীড়িত ছন্দে। —কিন্তু আমার নালিশটা মনে রেখো—আমি নিরুপায়—যদি গতি থাকত আমি স্বয়ং এখানকার ছাপাখানাতেই ছাপিয়ে নিতুম—কিন্তু হাতছাড়া হয়ে গেছে, অতএব পথ চেয়ে থাকব। ইতি ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৩১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

ধীরে সুস্থে রিহার্সাল চলচে—মাঝে মাঝে লোকের ফাঁক, মুখস্তের ফাঁক, অবস্থাক্রমে কিছু কিছু হচ্চে কিছু কিছু বাকি থাকচে—এমন সময়ে হঠাৎ স্টেট্‌স-ম্যানে বিজ্ঞাপন দেখি ২১।২২ সেপ্টেম্বরে অভিনয়ের ঘোষণা— সবাই মিলে চমকে ধড়ফড় করে উঠেচি—পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে প্রমাদ গুনচি। চলছিল প্যাসেঞ্জার ট্রেন ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল হিসেবে—হঠাৎ পিছন থেকে এক্সপ্রেসের এক ধাক্কা লাগল—কে কার ঘাড়ে পড়ি তার ঠিক নেই। রথী গেছে এক-দৌড়ে কলকাতায় মেয়াদ বাড়িয়ে নেবার জন্যে, এবং অভিনয়ের লোক ধরবার উদ্দেশে আড়কাটির কাজ করতে। নাড়া খেয়ে আমি একরকম কাত হয়ে পড়েচি। এখানকার এই অবস্থা। এরই মধ্যে দেদার লোকের আমদানি, দর্শন দিতে হচ্চে, হুহু শব্দে আলাপ চলচে, মনের ভিতর একটা উদ্বেগ তোলপাড় করচে। মোটের উপর দেহ মন রীতিমতো ক্লান্ত। তার ফলে, একদিকে মুখস্ত করচি আর এক দিকে ভুলচি। বায়োকেমিক ওষুধ ধরেছি, মাঝে মাঝে স্যানাটোজেন জলে গুলে পান করা যাচ্চে। তোমরা যা শুনে ছিলে তার পরে বইখানা বিস্তর বদলে গেছে—ছাপা শেষ যদি না হয়ে যেত তাহলে আরো বদল চলত। এ চিঠিখানির বুনোনি খুব ফাঁকা হ'ল। এ থেকে বোঝা যাবে চিন্তার সুত্রের অভাব

এবং ঘুম পাওয়া মগজের আবল্য। কথা উঠতে পারে এমন চিঠি নাই বা লিখলে —তাহলে শুক্লপক্ষের সপ্তমীর চাঁদকে জিজ্ঞাসা করতে পারো আধখানা মূর্তি দেখিয়ে লাভ কী? সেদিনকার মতো হতভাগা চাঁদের ঐ আধখানাই সম্পূর্ণ সম্বল—তার বলবার কথা এই যে, তোর দারিদ্র্য থাকতে পারে কিন্তু কৃপণতা নেই।

অপরাহ্ণ নিকটবর্তী। একটু কেদারায় ঠেসান দিয়ে বসি, হয়তো চোখ বুজে আসবে। ইতি ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি সেবার 'রাজারাণী' নাটকটিকে গদ্যে রূপান্তরিত করে 'তপতী' নাম দিয়ে ছাপালেন। বইখানা বেরোবার আগেই যতদূর স্মরণ হচ্ছে ২৭শে সেপ্টেম্বর কবির জোড়াসাঁকো বাড়ির ঠাকুরদালানে এই নাটকটির প্রথম অভিনয় হলো। কবি স্বয়ং রাজার পার্ট নিয়েছিলেন এবং রাণী সেজেছিলেন কবির নাতবৌ শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর। আমার অসুস্থতা বশত এই অভিনয় দেখা হয় নি—২৬শে সেপ্টেম্বর আমাকে গিরিডি চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু অভিনয় আমার ভাগ্যে দেখা হবে না সেই করুণায় কবি একদিন আমাদের ২১০ নম্বর কর্ন-ওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়িতে এসে আমার রোগশয্যার পাশে বসে সমস্ত নাটকটি পড়ে শুনিয়েছিলেন। আরো অনেক বন্ধু-বান্ধবও সেখানে উপস্থিত থেকে সেই পড়া শোনবার সুযোগ পেয়েছিলেন। নাটক না দেখার অর্ধেক দুঃখ আমার এমনি করে কবির কল্যাণে লাঘব হয়েছিল। গিরিডিতে বিছানায় শুয়ে বেতার যোগে এই নাটক আমরা শোনবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আবহাওয়ার দুর্যোগে বিশেষ কিছুই শুনতে পাইনি।

॥ ১৩২ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আজ বুধবার বলেই কাজ বেশি। রিহার্সালের জোর ছুটির দিনে প্রবল হয়ে ওঠে। তার পরে আজ হচ্ছে বিদেশী চিঠি লেখবার দিন। সকাল থেকেই কর্মরত এবং তার ফাঁকে ফাঁকে কলম প্রবল বেগে চলচে। এখন বোধ হয় বেলা দুটো হবে। আর কিছু পরেই একদল শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থিনী এসে জুটবে। তার পরে একবার চারটের সময় এবং একবার ছটার পরে রিহার্সাল—কারণ মেয়াদ স্বল্প, আর যারা অভিনয়ে যোগ দিয়েছে তাদের শক্তি কম, তার উপরে জিনিসটা অত্যন্তই দুরূহ। এখনো পুরো লোক পাইনি—আশাকরি রথী কিছু সংগ্রহ করে আনতে পারবে।

অমিতা আর সুমিতা দুজনে এসেছিল আমার কাছে উপদেশ নিতে। এতক্ষণ তাদের নিয়ে বিস্তর বকুনি বকেচি। এই-মাত্র চলে গেল। দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হবার আর দেরি নেই। বারবার আওড়াতে আওড়াতে জিনিসটার রস মরে যায়, মনে সন্দেহ থাকে যে, সমস্তটা বুঝি ফাঁকা, ভয় হয় যারা দেখবে তাদের কাছেও এর অকিঞ্চিৎকরত্ব ধরা পড়বে। কতদিনের কত প্রয়াসে, কত লোকের কত সম্মিলিত উদ্যমে, কত অর্থব্যয়ে ও কারুনৈপুণ্যের সমবায়ে তবে জিনিসটা তৈরি হয়, তার পরে দুদিন তিনদিন কয়েকঘণ্টার মধ্যে একে একে নিবিবে দেউটি, পর্দা পড়ে যাবে, খবরের কাগজে কয়েক লাইন সমালোচনা বেরোবে—বাস্ চিরদিনের মতো চুকে যাবে। তার পরের বৎসরে যদি আর একবার এই অভিনয়ের অনুরোধ আসে তাহলে মন বিমুখ হবে। কলা বিকাশ জিনিসটার মধ্যে একটা ঔদাসীন্য আছে—যেটা হয়ে গেছে সেই অতীতের পরে সে মমতা রাখে না। হওয়ানোই তার কাজ, হবামাত্র সেটাকে সরিয়ে ফেলে আর একটা নতুন হওয়ার জন্যে তাকে জায়গা করতে হয়। যা ভুক্ত তাকে ও আর ভোগ করতেই চায় না। ইতি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৩৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রথী এসে বললেন তিন সপ্তাহের মেয়াদে তপতীর অভিনয় ধরতে হবে। একজনও একটু প্রস্তুত নেই—কেবল বিপাশা খানিকটা তৈরি হয়েচে। মনে হচ্চে উঠে পড়ে লাগতে হবে। এতদিন পরে বিক্রমের ভাগ্যে সুমিত্রার আগমন হোলো— কাশ্মীর থেকে নয় কলকাতা থেকে। আজ মধ্যাহ্নে তার প্রথম পাঠ হোলো—প্রথম পাঠ বলতে তার নিজের উচ্চবাচ্য কিছুই নেই—আমাকেই বারবার পড়তে হয়েচে—সংকোচ ভাঙাবার প্রথম উদ্যমটার সমস্ত ধাক্কা আমার উপরে পড়ে। এমন একজন নয়—প্রত্যেককেই যথোপযুক্ত উৎকর্ষে ঠেলে তুলতে মোটা মোটা লগি ভাঙো ভাঙো করে। এত করে যদি ভালো হয় তা হলে ভালোই হবে তাতে সন্দেহ নেই। ভালো যদি না হয় তা হলে ভালো হবে না এও নিশ্চিত সত্য। কোনো কোনো জিনিস আছে যা ভালো না হলেও মন্দ হয় না, মন্দ হলেও অত্যন্ত শোচনীয় হয় না—এ নাটকটি সে জাতীয় নয়—এই কারণে অত্যন্ত বেশি মন দিতে হচ্চে। —দুর্ভাগ্য এই যে সংসারে কাজ আমার একটা নয়। তার ফল হয়েচে এই যে মনের যে সব চিন্তা একটুখানি ফাঁক পেলে স্বভাবতই অঙ্কুরিত হতে চায় তারা কেবলি চাপা পড়চে। অথচ স্বগত চিন্তাটি মনের স্বধর্ম—যখন সেটাতে বাধা পায় তখন তাকে ছুটি বলে না—আসল ছুটি হচ্চে নিজের ঠিক কাজটি করা। মন মনের কাজ করতেই ভালোবাসে—তাকে যখন কলের কাজ করতে হয় তখনি তার মজুরী—তখনি সে শূদ্র বনে যায়। রিহার্সাল অভ্যাস করানো কলের কাজ। ক্লান্তির ভয়ে রথীরা আমাকে বিক্রমের ভূমিকা নিতে বারণ করচে—কিন্তু ভাষান্তরে তাকে বলা যেতে পারে বইটার অভিনয় বন্ধ করা। কিন্তু তাও তাদের অভিপ্রেত নয়। এ নাটকটি আমি যদি স্টেজে খাড়া না করি তাহলে অসূর্যম্পশ্য-রূপা বইয়ের পাতার মধ্যেই রয়ে গেলেন। —রথী এসে জানালেন প্রশান্ত বলেছেন আমাকে মহুয়ার প্রুফ তিনি পাঠিয়েছেন —তাঁর কথার কোনো প্রমাণ পাই নি— তিনি আমাকে বঞ্চিত করে স্বয়ং প্রুফ দেখবার ভার যদি নেন তাহলে সে অত্যা-চার সইব না। যে-প্রুফগুলো 'গেলি' আকারে কলকাতায় দেখেচি সেও মঞ্জুর নয়—আমার হাতে শেষ প্রুফ নিতান্তই আসা চাই—তাতে অন্যথা হওয়া আমার প্রতি জবরদস্তি। প্রশান্তকে বলে এসে-ছিলুম শেষ প্রুফ আমি দেখতে চাই কিন্তু তিনি কথাটা কী পরিমাণে স্বীকার করেচেন বুঝতে পারচিনে। ইতি ১৬ ভাদ্র ১৩৩৫

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি ভুল করে '১৩৩৫' লিখেচেন, ওটা '১৩৩৬' হবে।

॥ ১৩৪ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

সেদিন একটা কোন বাংলা কাগজে বঙ্কিমের গল্পের কথা পড়ছিলুম। দেখলুম লেখক প্রশংসা করেচেন বটে কিন্তু বেশ একটু জোর করে সুর চড়াতে হচ্চে পাছে অন্যমনস্ক পাঠকের কানে গিয়ে না পোঁছয়। মনে পড়ল যখন বঙ্গ-দর্শন প্রথম দেখা দিয়েছে, বিষবৃক্ষ মাসে মাসে খণ্ডশঃ বের হচ্চে। ঘরে ঘরে দেশের মেয়ে পুরুষ সকলের মধ্যে কী ঔৎসুক্য, রসভোগের কী নিবিড় আনন্দ! মনে করা সেদিন অসম্ভব ছিল যে এই আনন্দের

বেগ কোনোদিন এতটা ক্ষয় হতে পারে যাতে এর উৎকর্ষ প্রমাণ করতে জোর গলায় ওকালতির দরকার হবে। কিন্তু দেখতে দেখতে সেদিনও এল! এমন কি অপ্রকাশ্যে বঙ্কিমের যশ আজকাল অনেকেই হরণ করে থাকেন—আমি ছাড়া আমাদের দেশের আর কোনো খ্যাত লেখকের সম্বন্ধে প্রকাশ্যে এমন কাজ করতে কেউ সাহস করে না। মনে মনে ভাবলুম, ভালমন্দ লাগার আকর্ষণ বিকর্ষণ শক্তির দ্বারা মানুষের ইতিহাসে যে-মানবসৃষ্টির উদ্যম চলেছে, সে মায়ার সৃষ্টি। বঙ্কিমকে যেদিন খুব ভালো লাগছিল সেদিন পাঠক সমাজে কতকগুলি মানস উপাদান কিছু বা বেশি ছিল, সেগুলি বিশেষ আকারে, বিশেষ পরিমাণে সম্মিলিত ও সজ্জিত ছিল এই কারণ বশতই তার সম্ভোগসুখরূপে ফলটা এত অত্যন্ত প্রবল হতে পেরেছে। ইতিমধ্যেই, ২০।২৫ বছর না যেতে যেতেই প্রবহমান কালের ধাক্কায় তারা নড়ে চড়ে গেছে—সামনের জিনিস পিছনে পড়ল, উপরের জিনিস নীচে পড়ল অমনি সেদিনকার অত দীপ্যমান অত বেগবান উপলব্ধিও আজ অবাস্তব হয়ে দাঁড়াল, অন্তত অনেক লোকের পক্ষে বোঝা দুঃসাধ্য হয়েছে সেদিনকার ভালো লাগা কী করে সম্ভবপর হল। আজকের পাঠক সগর্বস্মিত হাস্যে ভাবছে সেদিনকার পাঠকদের মন ছিল নেহাৎ কাঁচা, এই জন্যেই সেই কাঁচা ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-বিচার স্থায়ী হতে পারে না। নিজের মনের একান্ত উপলব্ধির মতো বাস্তব আমাদের কাছে আর কিছুই নেই। চোখে যেটাকে যা দেখছি সেটা যে তাই না হতেও পারে এমন সন্দেহকে মনে স্থান দিলে বোধশক্তি সম্বন্ধে নাস্তিকতায় পৌঁছতে হয়—এতে কাজ চলে না। ভাগ্যক্রমে আমাদের দৈহিক চোখের বদল হয় না অথবা বহু লক্ষ বৎসরে হয়ে থাকে—তাই আমাদের আজকের দেখার সঙ্গে কালকের দেখার গুরুতর বিরোধ নেই—এই কারণে আমাদের দৃশ্যালোক ব'লে যে একটা সৃষ্টি আছে সেটাকে অন্তত সাধারণ লোকে মায়া বলতে পারে না। কিন্তু আমাদের দৈহিক চোখের স্নায়ু, পেশী এবং তার উপকরণ যদি কেবলই নড়াচড়া করত তাহলে এই দেখার জগৎ আকাশের মেঘের মতো রূপান্তর ধরতে ধরতেই চলত। কিন্তু কালে কালে আমাদের মনের দৃষ্টির বদল চলছেই. আজ সেই দৃষ্টির যে সব উপকরণের যোগে একটা বিশেষ অনুভূতি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েছে, এবং এত স্পষ্ট হয়েছে বলেই এত নিত্যরূপে সে প্রতীত,

কাল তাদের আগাগোড়া বদল হয় না বটে কিন্তু অনেকখানি এদিক-ওদিক হয়ে যায় —তখন বোঝা যায় না বিষবৃক্ষকে এত বেশি ভালো লেগেছিল কী করে! এ'কেই বলতে হয় মায়া। এই মায়ার উপরে দাঁড়িয়ে কত গালমন্দ তর্কবিতর্ক রক্তপাত! অথচ মানুষের মনের প্রকৃতিতে মোটামুটি অনেকখানি নিত্যতার বন্ধন যে নেই তা বলতে পারিনে—না থাকলে মানব সমাজ হ'ত প্রকাণ্ড একটা পাগলা গারদ। বস্তুজগতের মূলভূতের উপাদান সংস্থানে মোটের উপর একটা বন্ধন আছে সেই জন্যেই কারণটা কার্বন অক্সিজেনটা অক্সিজেন। কিন্তু বহুদীর্ঘকালের ভূমিকায় আদিসূর্য থেকে বর্তমান পৃথিবী পর্যন্ত সৃষ্টি সংঘটনের যে ব্যাপার চলচে তাতে সেই সব মূলভূতের মধ্যেও টানাছেঁড়া ঘটেচে—সেটা ভেবে দেখতে গেলে দেখি সৃষ্টিটা অনাদিকালের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মরীচিকার প্রবাহ। এতদিন বিজ্ঞান বলে আসছিল সেই পরিবর্তনের মধ্যে একটা বাঁধা নিয়মের সুদৃঢ় ধ্রুবসূত্র আছে। আজ বলচে সে কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়—থেকে থেকে অঘটন ঘটে, দুইদুইয়ে পাঁচও হয়। নিত্য এবং আকস্মিকের দ্বন্দ্বসমাস। বস্তুজগতের তত্ত্বালোচনা আমার কলমে শোভা পায় না—বলছিলুম ভাবজগতের কথা। বিশেষভাবে সাহিত্যকে নিয়ে। এই জগতে নিন্দা প্রশংসার নিত্যতার কথা কে বলতে পারে। সমালোচকেরা দৈবজ্ঞের সাজ পরে গণনা করে কুষ্টি তৈরি করচেন—তখনকার মতো সে কুষ্টি দাম দিয়ে কিনে লোকে মাথায় করে নিচ্চে—কিন্তু হায়রে শেষকালে আয়ুর কোঠায় মিল পায় না, গুণাগুণ ফলাফলও তথৈবচ। তবুও মানব প্রকৃতি একেবারে উন্মাদ নয়—মোটামুটি তার মধ্যে একটা হিসাবের ধারা পাওয়া যায়—যদিচ সে হিসাব সম্বন্ধে গণনার ভুল প্রতিদিন ঘটে। গতকল্যের গণনার ভুল আজকের দেখে যাঁরা খুব উচ্চকণ্ঠে হাসচেন আবার তাঁরাই দেখি খুব দম্ভ সহকারে ছক কেটে গণনায় বসে গেছেন! দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁদের গণনা অপ্রমাণ হয় ভাবীকালে—আশু তাঁরা নগদ বিদায় পান—লোকে যেটা শুনতে চায় সেইটেই খুব বিজ্ঞের মতো বিদ্যে ফলিয়ে বলবার শক্তি আছে তাঁদের—নিজের ও অন্যের ঈর্ষা বিদ্বেষকে তাঁরা উপস্থিতমতো খোরাক জুগিয়ে তাদের পালোয়ান করে তোলেন—অবশেষে দুদিনবাদে তাঁদের কথা কারও মনেও থাকে না, সুতরাং তখন তাদের মিথ্যে ধরা পড়লেও জবাবদিহি করবার জন্যে কোনো আসামীকে হাজির পাওয়া যায় না। —সন্দেহ হচ্চে মনের মধ্যে অনেক দিনের অনেক ঝগড়া জমা হয়ে রয়েছে, তোমার পত্রযোগে সেগুলোকে নিরাপদে ব্যক্ত করতে বসেচি। কিন্তু কিসেরই বা আক্ষেপ। খ্যাতি জিনিসটার পনেরো আনাই মৃত্যুর পরবর্তী ভাবীকালের সম্পদ। —সে সম্পদ খাঁটি কি মেকী তাতে কার কি আসে যায়, যিনি প্রশংসা পেতে চান তিনিও পান এমন কিছু যা কিছুই নয়, আর যিনি গাল দিয়ে খুশী হ'তে চান তাঁরও সে খুশী শূন্যের উপর। মায়া! "অতএব বলি শুন ত্যজ দম্ভতমোগুণ"। অতএব যা চারিদিকে রয়েচে তাকে সহজমনে গ্রহণ করে খুশী। —অতএব যদিচ আজ ভাদ্রমাসের মধ্যাহ্নের অসহ্য গরম তবু সর্বত্রই শরৎকালের মাধুর্য অজস্র, এইটাই যদি পরিপূর্ণ মনে ভোগ করে নিতে পারি তবে সেটাকে ফাঁকি বলতে পারব না—যদিও এর পরবর্তী ফাল্গুন মাসের সৌন্দর্য অন্যজাতের তবুও সেই বসন্তের দোহাই পেড়ে এই শরতের দানে খুঁত ধ'রে তার থেকেও বৃথা নিজেকে বঞ্চিত করা কেন। ইতি ১৮ ভাদ্র ১৩৩৬

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৩৫ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

ভাদ্রমাস এতদিন ভদ্রভাবে ছিল, দিন দুতিন থেকে নিজমূর্তি ধরেচে—ফিকে কালো রঙের কম্বল গরম জলে ভিজিয়ে পৃথিবীর সর্বাঙ্গে ফোমেণ্টেশন চলেচে। মনে হচ্চে জগৎজোড়া হাসপাতালে বাস করচি। এতে মনটা কেমন নিরুদ্দাম হয়ে পড়ে। ভালো নয়। যদি ছুটি থাকত তা হলে লম্বা কেদারায় পা তুলে দিয়ে চক্রপাখার ঘূর্ণি হাওয়ায় স্তব্ধ মনের ধূসর আলোয় একা একা গোধূলিবিহারী খাপছাড়া চিন্তাগুলোর ছায়ারূপের অনুসরণ করতুম। কিন্তু কাজের অন্ত নেই —দিবসারম্ভের পূর্ব হতে দিনান্তের পর পর্যন্ত। কাল সন্ধ্যা যখন আটটা ঘুমে সমস্ত দেহ ভারাক্রান্ত—দর্শনার্থীরা এসেচেন, উত্তর প্রত্যুত্তর করচি—ছ্যাকরাগাড়ির জীর্ণ ঘোড়া তার দীর্ঘপথযাত্রার শেষ মাইলটা গাড়োয়ানের নিরন্তর তাগিদে যেমন চলে আমার আলাপ সেইভাবে চলচে—যেমনি এঁরা বিদায় নিলেন বিছানার মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়লুম—মশারির পরিবেষ্টনের মধ্যে এমন অসাময়িক আকস্মিকে আত্মসমর্পণ বহু বৎসর হয়নি। রাত্রের প্রথম এবং শেষ অংশ শয়নমুক্ত অবস্থায় কাটাতেই আমার মনের প্রবৃত্তি—কিন্তু "আমার জন্মভূমি" সেই প্রদোষের অন্ধকারে ক্ষুদ্র অত্যাচারে আমাকে অস্থির করে তোলেন। এমন করে কী করে বাঁচি বলো। প্রতিদিনই ইচ্ছে করে এমন কোথায় পালিয়ে যাই যেখানে প্রতিমুহূর্তের ক্ষুদ্র পীড়নগুলো নেই—এই গুমোট, এই মশা, এই পোকা এইসব ইত্যাদি। এখন প্রাতঃকালের শেষভাগ মধ্যাহ্নের সন্ধিক্ষণ—অর্থাৎ ১১টা থেকে বারোটা পর্যন্ত এর সীমা—যে সময়ে লোকজন স্নানাহারের চেষ্টায় গেছে, আমারও খাবার আসে নি—এই সময়টুকুর মধ্যে চিঠি লিখতে বসেছি—মধ্যাহ্নে অভিনয়ের বৈঠকে একে একে জনসমাগম হতে থাকবে—ডাকের সময় চলে যাবে। বলতে বলতে হারাসান এসে উপস্থিত। বাংলা ভাষায় জানালে খাবার এসেচে—দেরি যদি করি সে অত্যন্ত

উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে—ওর বিশ্বাস আহারের সময়ের অনিয়মে এবং পরিমাণের অল্পতায় আমি নিজেকে পীড়িত করচি —এই চিন্তা নিয়ে ও সত্যই দুঃখ বোধ করে। তাই খবর দিয়ে করুণভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। চললুম—আর অবকাশ পাব না। খণ্ড অবকাশ পাব—তাতে কিছু কিছু বিশ্রাম হতে পারে কিন্তু কাজ হতে পারে না। ইতি তারিখ ঠিক মনে পড়চে না, মাস ভাদ্র, বৎসর ১৩৩৬

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৩৬ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আর একদফা নালিশ করতে হ'ল। কোনক্রমে মহুয়া ফুল, ফলে পরিণত হবে এমন আশা করা যাচ্চে। কিন্তু সহজ পাঠের প্রুফ না আসাতে দুঃখিত আছি। এতই যখন দেরি করালে ছবির ব্লক নিয়ে ওটা এখানকার ছাপাখানাতেই অতি দ্রুত আমরা শেষ করতে পারতুম তাতে আমাদের মুদ্রাযন্ত্রের তহবিলও পূর্ণ হোত। একদা আমার নিজের হাতে বই প্রকাশের ভার ছিল—গণেন ব্রহ্মচারী সেদিন তৎকালীন ছিন্নপত্র জীবনস্মৃতি হাতে নিয়ে বললেন এখানকার বহু-প্রশংসিত ছাপাখানার চেয়ে ভালো কাজ দিয়েচে। অথচ আদি ব্রাহ্মসমাজের ছাপাখানা এখানকার চেয়ে অনেক দরিদ্র ছিল। তখন এক-একটা বই ছাপাতে ১০।১৫ দিনের বেশি লাগ্‌ত না। সম্ভবত তার একটা কারণ, বানানের উৎপাত ছিল না। আর সমস্ত প্রুফ আদ্যোপান্ত আমিই দেখতুম। বোধ হচ্চে তোমরা মনে করবে আমি অহংকার করচি—ঠিক অহংকার নয়—এর থেকে আমার শক্তির প্রমাণ হয় না, আমার গরজ প্রমাণ হয়। নিজের বই নিজে ছাপাতে তর সয় না—তা ছাড়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম প্রসাধনের দিকে আমি দৃষ্টি দিতুম না—সেই অতি শৌখীনতার যে দরকার আছে তা আজো আমি মনে করি নে। মোটামুটি ভদ্ররকম নির্ভুল ছাপা ভালো কাগজে যদি হয় তাহলেই শ্বেতভুজা ভারতী সন্তোষ লাভ করেন—বীণার সুরের দিকে তাঁর কান, তার তুম্বিগুলোর সোনালী কারুকার্যের দিকে তাঁর দৃষ্টি নেই,—সেটা এসে পড়ে লক্ষ্মীর অধিকারে। লক্ষ্মীর মনস্তুষ্টি আমি যে চাইনে এমন কথা বলবার সাহস আমার নেই, তবে কিনা—দূর হোক্‌গে ছাই, এমন কথা নিয়ে বৃথা বাগ্‌বিস্তার করবার দরকার কী? আপাতত সংক্ষেপে এই কথা বললেই আমার সব কথা বলা হবে যে, সহজপাঠ প্রকাশের গতি এত বেশি মন্থর হয়েচে যে আমাদের দেশের প্রাচীন-কাব্যের যুবতীদের চালও সে ছাড়িয়ে গেছে—এর পরে গজেন্দ্রগমন; মরাল গমন প্রভৃতি শব্দ ত্যাগ করে সুন্দরী ললনাদের আর্টপ্রেস গামিনী বিশ্বভারতী গামিনী প্রভৃতি আখ্যা দিলে সেই বিশেষণকে কেউ আর ছাড়িয়ে উঠতে পারবে না। —তোমার পত্রেই প্রশান্তর পত্রের জবাব দিই—তাতে কিছু পরিমাণে কাজ সংক্ষেপে হবে—তার প্রয়োজন হয়েচে অত্যন্ত বেশি। ক্রিয়া পদের 'ছো' প্রত্যয়ে ওকার না দিলে হয়তো ধ্বনিতত্ত্ববিদদের মুখ দিয়ে বেরোবে 'ছোঃ' অতএব ওকার হরণের অপরাধ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। 'দিল' 'নিল'-র গণ্ডযুগলের থেকে ওকার কামিয়ে ফেলাই যদি শোভন হয় আমি তাতে আপত্তি করে সময় নষ্ট করব না। তিন বেলা রিহার্সাল চলচে, তার উপরে ভদ্র সমাজের অনিবার্য যত নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম আছে তার কোনোটাই বাদ পড়েনি—তাতে আমার সময়টা একেবারে ড্যালা পাকিয়ে নিরেট হয়ে উঠেচে—ষোলঘণ্টা জাগ্রদবস্থার ভলুম সমানই আছে কিন্তু তার পিণ্ডাবস্থাটা বেড়ে গেছে—তাতে করে ওজনে সে অত্যন্ত ভারী হয়ে উঠল, এর ভারাকর্ষণে আমার মেরুদণ্ড ধনুরাকৃতি হয়ে উঠচে। এই কারণে কাজের ভার কিছু লাঘব না করতে পারলে জাগ্রদবস্থার আয়তন বাড়াতে হবে, সেটাতে আয়ুর মূলধন ভেঙে খাওয়ার বিপদ ঘটবে। অতএব কলকাতায় যাওয়ার পূর্বে পর্যন্ত চিঠি বন্ধ থাকবে। পূর্ববর্তী পত্রের অতি

বহুলতার দ্বারা এই কয়েকসংখ্যক অনাগত পত্রের ছিদ্র ঢাকা পড়বে। ২২শে তারিখে কলকাতায় দল নিয়ে যাবার কথা —হয়তো এক আধদিন আগেও হতে পারে। ইতিমধ্যে জ্বরের উত্তেজনা যেমন করে হোক দাবিয়ে রেখো। যদি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার আবির্ভাব কখনো হয় তার অতি দ্রুত প্রতিকার Bromo-Quinine একটা মার্কিন ওষুধ, যতবার পরীক্ষা করেছি আশু ফল পেয়েছি—রাত্রে দুই বড়ি, প্রাতে দুই বড়ি। Bathgate ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। এজাতীয় ওষুধ আমি সহজে ব্যবহার করিনে—কিন্তু এবার জাহাজে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ কালে একজন মার্কিন যাত্রী এই ওষুধ খাইয়ে একদিনে সারিয়ে দিয়েছিলেন—তার পরে যতবার পরীক্ষা করেছি ততবারই তৎক্ষণাৎ ফল পেয়েছি। এতে কুইনিনের কুফল একটুও নেই, তা ছাড়া এটা ইতি ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৩৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, তোমার শরীর ভালো নেই শুনে উদ্বেগ বোধ করচি। কিছু করতে পারি এমন শক্তি নেই। বড়ো জোর দু চার লাইন চিঠি লেখা যেতে পারে। কিন্তু কাগজটাকে খর্ব করতে হোলো, কপাল দোষে। বড়ো কাগজ ভরাবার মতো বড়ো সময় নেই। তা হোক্, না এবং হাঁ-এর পার্থক্য অসীম। দুই চোখো মামা এবং কানা মামার প্রভেদ একটা চোখ নিয়ে, কিন্তু নেই মামা এবং কানা মামার মাঝখানে অনন্তের ব্যবধান। অথচ সেইটে এক আঁচড়েই ঘুচিয়ে দিতে পারি। শুনে হাসবে, আজ সকালে আমার দেশান্তর ঘটেচে। আমার বড় ঘরের পুব দিকে একটা বারান্দা ছিল মনে আছে? সেইটের ফাঁকগুলোতে জানলা বসেচে—সেইখানে এনেচি আমার লেখবার টেবিল। পুবে দক্ষিণে আকাশ পাওয়া গেছে—প্রভাতসূর্য আসবেন তত্ত্ব নিতে, বসন্তে মলয় সমীরণ আসবে আমের মুকুলের প্রথম সংবাদ নিয়ে। তা ছাড়া আষাঢ়ে মেঘদূতের বার্তাবহ পূর্বদিগন্ত থেকে উঠে এসে হাজির হবে একেবারে আমার সামনে। আমার বর্তমান বাসার বিস্তর রূপান্তর ঘটেচে তুমি ঠিক কল্পনা করতে পারবে না। যদি প্রশান্ত তার সেই নাকতোলা ক্যামেরা আনে তাহলে ছবি তুলে তোমাকে দেখাতে

পারে। সেই ছোটো যে দুটি কোণের ঘরে আমাকে দেখে গিয়েছিলে সেখানে অমিয় তার আফিস প্রতিষ্ঠা করেচে—তার পশ্চিমে একটা বড়ো ছাদ রচনা হয়েচে—আরো আরো অনেক সংস্করণ সংশোধন সংবর্ধন চলচে। মন্দ লাগে না। বাড়িগুলো অত্যন্ত বেশি স্থাবর, অথচ বাড়িতে যারা বাস করে তারা জঙ্গম। এই অসামঞ্জস্য ঘুচিয়ে দিতে হ'লে কোনোদিন বাড়ি তৈরি শেষ করা উচিত হয় না। ক্রমাগতই তাকে নতুন করে রাখা উচিৎ—নইলে মনে হয় সিন্দুকের মধ্যে আছি। মানুষ এক সময় যাযাবর ছিল, কেবলি স্থানান্তরিত হোত, তাঁবুর বাসায় সেটা সম্ভব ছিল। যেদিন ইঁট কাঠের বাসা বাঁধল, বাসার সঙ্গে নিজেকেও বেঁধে ফেললে। কিন্তু মনটা তো স্থির জিনিস নয়, স্থির অভ্যাসগুলো তাকে চেপে রেখে রেখে তার প্রকৃতি বদলিয়ে দেয়—স্থির বাসাও আমার মতে মনোবিকাশের অনুকূলে নয়। এইজন্যেই চড়িভাতি, পুজোর ছুটিতে দার্জিলিঙে দৌড়, পরের বাড়িতে আহারের নিমন্ত্রণ পেলে উৎসাহের সঙ্গে কোঁচা দোলানো। আমার বোধ হয় বাড়িতে কেবলি মিস্ত্রি লাগিয়ে রেখে যাযাবর বৃত্তির শখ বসে বসেই মেটানো চলে। রথী এই তত্ত্বই তার এই বাড়িতে খাটাচ্ছে। দেখো, কোনোদিন এখান থেকে ভারা নাববে না। ইতি ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৩৮ ॥
ওঁ
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

ভাদ্রমাস যেমনি তার ছেঁড়া মেঘের ঝুলি কাঁধে তুলে নিয়ে উত্তরের পথে যাবার আয়োজন করচে অমনি দেখতে দেখতে শিউলি ফুল একেবারে দল বেঁধে এসে উপস্থিত। আকাশে কালো মেঘ সাদা হবার অপেক্ষায় ছিল। শরতের আগমনের রাস্তায় শ্বেত চন্দন ছিটিয়ে দিয়েচে—ঘাসের আস্তরণ শিশির দিয়ে দিল ধুয়ে। ভোর বেলায় কাঁকর বিছানো রাস্তায় বেড়াই—দেখি দুই ধারে দুই সবুজ বর্ণের স্রোতের ধারা পূর্ণ প্রাণের জোয়ারে স্ফীত তরঙ্গিত হয়ে উঠেচে—তার উপরে অজস্র টগর শুভ্র ফেনার মতো। মনের ভিতরে রামকেলি রাগিণী গুনগুনিয়ে ওঠে—"প্যালা ভর-ভর লায়ি রে"—প্যালা ভরে ভরেই এনেচে—কাঁচা সোনা রঙের আলোয়, পান্না দিয়ে তৈরি প্যালা, আর নীলকান্তমণি দিয়ে তার ঢাকুনি বানিয়েচে। বছরের পর বছর অমৃতের পাত্র নতুন নতুন রঙের রসে কানায় কানায় ভ'রে দিয়ে যায়। কিন্তু নিমন্ত্রণের পত্র কি সকলেরই জোটে? আমার সবচেয়ে আনন্দ এই, আমার নিমন্ত্রণে ফাঁক যায় না। আমি চিঠি সঙ্গে করেই এনেছি পৃথিবীতে। দেখেচি, শুনেচি, পেয়েচি, ভালো লেগেচে। ভালো লাগায় মর্ত্যের বন্ধন নেই, সময়ের দ্বারা তা পরিমিত নয়—মুহূর্তে সে সীমাহীন। তাই অনেক সময় ভাবি, যতদিন বেঁচেছি আমি ভরা আয়ু নিয়েই বেঁচেছি। —কুষ্ঠির গণনায় আমার আয়ু নয়, সে গণনা আমি উত্তীর্ণ হয়ে গেছি—আমার পাওনার চেয়ে আমি পেয়েছি অনেক বেশি—তাই যখন যাব তখন খাতায় আমি উদ্বৃত্তের অঙ্ক দেখিয়ে যেতে পারব—আমি দেউলে হয়ে বিদায় নেব না। —বনমালী দুবার দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে আহারের সংবাদ দিয়ে গেল। মধ্যাহ্ন অতীত হয়ে গেছে। ইতি ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৩৯ ॥
ওঁ
শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

সকাল বেলায় উঠে আমার কঙ্কর রক্তিম বাগানে একবার গাছপালাগুলোর তত্ত্ব নিয়ে আসি। দিনের মধ্যে ঐ একটিমাত্র সময়ে আমার পদচালনা। কিছু কিছু নতুন খবর সংগ্রহ হয়। যথা, আজ প্রায় ভাদ্র শেষ হোলো, কিন্তু বেল ফুল এখনো ফুটেচে—কবিতায় শরৎকালে বেলফুল ফোটাতে সাহস করিনে। প্রকৃতি মাঝে মাঝে নিজেরই বাঁধা নিয়মকে নিজে বিদ্রূপ করে থাকে। হঠাৎ ছন্দ ভাঙ্গা কাব্য লিখে সমালোচকদের মুখের দিকে চেয়ে উচ্চ হাস্য করে ওঠে। নিয়মটাও যে তার খেলা এই কথা ঘোষণা করবার জন্যে অকস্মাৎ অনিয়মকে সে উস্কিয়ে দেয়। আজ দেখলুম আমার বাগানে সারি সারি কামিনী গাছ যেন তারস্বরে বলে উঠেচে, তোমরা ভাবো বসন্তেরই আমরা ছায়েবানুগতা—তাকে ছেড়ে আমাদের চলে না? সম্পূর্ণ ভুল। —ওদের দেখে মনে

আমার সব চেয়ে আনন্দ এই, আমার বিস্ময়ের অন্ত
হয় না। আমি শিশু মন নিয়ে এসেছি পৃথিবীতে।
দেখেছি, শুনেছি, পেয়েছি, ভালো লেগেছে। ভালো
লাগার মধ্যে শেষ নেই, সমস্ত দুয়ার তা খোলা
নয় — মুহূর্তে মুহূর্তে সে সীমাহীন। তাই অনেক সময়
ভাবি, যতদিন বেঁচেছি আমি ততো বয়স নিয়েই
বেঁচেছি — পৃথিবীর গণনায় আমার বয়স নয়, সে
গণনা থেকে আমি উত্তীর্ণ হয়ে গেছি — আমার অন্তরের
চেয়ে আমি দেখেছি অনেক বেশি — তাই বয়স
হবে অথচ যাওয়ার আমি উত্তরের সঙ্গে দেখিয়ে
যেতে পারব — আমি কেবল হয়ে বিস্ময় বের
না। — বনমালী দুবার দুটি পত্র এনে আহারের
সংবাদ দিয়ে গেল। মধ্যাহ্ন অতীত হয়ে গেছে। ইতি
১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হোলো এই কামিনীরা অত্যন্তই মডারন্ কামিনী। বসন্তের নামটা পুরুষের বলেই ওরা তার শাসন অতিক্রম করতে চায়। কিছুকাল পূর্বে যখন শেষ বর্ষণের পালা চলচে, তখন হঠাৎ একদিন সকালে দেখি একটিমাত্র বাবলা ফুল ডালের আগায় এসে বেরিয়ে পড়েচে—ঘড়ি মিলিয়ে দেখেনি—ওদের মীটিঙের সব বেঞ্চিই তখন খালি। শীতের কাছ থেকে ওরা বায়না নিয়েচে; ওদের পালা জমবে অঘ্রাণ মাসে। ইতিমধ্যে এ ডালে ও ডালে দুটি একটি করে আসচে খবর নিতে ঘণ্টা বেজেচে কিনা। কিন্তু শিউলি ফুলের সঙ্কোচ নেই, ওরা দলে দলে হো হো করে এসে পড়ে—শরৎঅভিসারের সংকীর্তন শুরু করে দেয়, দেখতে দেখতে আসর জমে ওঠে। সম্প্রতি খুব ভিড় করে এসেচে দোপাটি,—কাননসভায় ওরা জাতে ছোটো—বোধ করি সেই জন্যেই খুব উজ্জ্বল রঙের আঙ্গিয়া পরে আসে, নতুন ধনীর মতো। কিন্তু সবচেয়ে বাহাদুরী নিলে টগর ফুল—কোন্ কাল থেকে শুরু করেছে তাদের লীলা, আজো ক্লান্তি নেই—সঙ্গে আছে গন্ধরাজ, কিন্তু তারা দলে ভারি নয়। আমার চামেলি লতার প্রাঙ্গণেও চলেছে সৌরভের সদাব্রত—আর জবা, সাদার মধ্যে রাঙ্গার তান লাগিয়েচে একেবারে নিখাদে। অথচ এই সব ফুলেরই দলপতি ব'লে বসন্ত নাম জাহির করেচে। আমি যদি ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে ভাদ্রমাসের স্তুতি গানে এইসব ফুলের নাম গাঁথি সমালোচকেরা তাহলে আমাকে একঘরে করবে না কি? আজ এই পর্যন্ত। ইতি ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৪০ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, ফুল ফোটে গাছের ডালে, সেই তার আশ্রয়। কিন্তু মানুষ তাকে আপনার মনে স্থান দেয় নাম দেয়। আমাদের দেশে অনেক ফুল আছে যারা গাছে ফোটে, মানুষ তাদের মনের মধ্যে স্বীকার করেনি। ফুলের প্রতি এমন উপেক্ষা আর কোনো দেশেই দেখা যায় না। হয়তো বা নাম আছে, কিন্তু সে নাম অখ্যাত। গুটিকয়েক ফুল নামজাদা হয়েচে কেবল গন্ধের জোরে—অর্থাৎ উদাসীন তাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করলেও তারা এগিয়ে এসে গন্ধের দ্বারা স্বয়ং নিজেকে জানান দেয়। আমাদের সাহিত্যে তাদেরই বাঁধা নিমন্ত্রণ। তাদেরও অনেকগুলির নামই জানি, পরিচয় নেই, পরিচয়ের চেষ্টাও নেই। কাব্যের নাম-মালায় রোজই বারবার পড়ে আসচি যূথী জাতি সেঁউতি। কিন্তু ছন্দ মিললেই খুশী থাকি—কোন্ ফুল জাতি, কোন্ ফুল সেঁউতি সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবারও উৎসাহ নেই। জাতি বলে চামেলিকে অনেক চেষ্টায় এই খবর পেয়েছি, কিন্তু সেঁউতি কাকে বলে আজ পর্যন্ত অনেক প্রশ্ন করে উত্তর পাইনি। শান্তিনিকেতনে একটি গাছ আছে তাকে কেউ কেউ পিয়াল বলে—কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে বিখ্যাত পিয়ালের পরিচয় কয় জনেরই বা আছে? অপর পক্ষে দেখো, নদীর সম্বন্ধে আমাদের মনে ঔদাস্য নেই, নিতান্ত ছোট নদীও আমাদের মনে প্রিয় নামের আসন পেয়েছে, কপোতাক্ষী, ইছামতী—তাদের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের সম্বন্ধ। পুজোর ফুল ছাড়া আর কোনো ফুলের সঙ্গে আমাদের অবশ্য প্রয়োজনের সম্বন্ধ নেই। ফ্যাশানের সম্বন্ধ আজো অচিরায়ু সীজন-ফ্লাউয়ারের সঙ্গে—মালীর হাতে তাদের শুশ্রূষার ভার—ফুলদানীতে যথারীতি তাদের গতায়াত। একেই বলে তামসিকতা, অর্থাৎ মেটিরিয়ালিজ্ম—স্থূল প্রয়োজনের বাইরে চিত্তের অসাড়তা। এই নামহীন ফুলের দেশে কবির কী দুর্দশা ভেবে দেখো, ফুলের রাজ্যে নিতান্ত সংকীর্ণ তার লেখনীর সঞ্চরণ। পাখী সম্বন্ধেও ঐ কথা, কাক কোকিল পাপিয়া বৌ-কথা-কওকে অস্বীকার করবার উপায় নেই—কিন্তু কত সুন্দর পাখী আছে যার নাম অন্তত সাধারণে জানে না। ঐ প্রকৃতিগত ঔদাসীন্য আমাদের সকল পরাভবের মূলে—দেশের লোকের সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্যও এই স্বভাববশতই প্রবল। পরীক্ষা পাসের জন্যে ইতিহাস পাঠে তো উপেক্ষা করবার জো নেই—আমাদের স্বাদেশিকতা সেই পুঁথির বুলি দিয়ে তৈরি—দেশের লোকের পরে অনুরাগের ঔৎসুক্য দিয়ে নয়। আমাদের জগৎটা কত ছোটো ভেবে দেখো—তার থেকে কত জিনিসই বাদ পড়বে। ইতি ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

অনেকদিন পরে কাল (৮ই মার্চ, ১৯৪২) শান্তিনিকেতনে এলুম—কবি যাওয়ার পরে এই প্রথম। কাল সকালে ট্রেনে আসতে আসতে মনে পড়ছিল ১৯১০ সালে, বত্রিশ বছর আগে এই রকম একটা সকাল বেলার গাড়িতেই প্রথম শান্তিনিকেতনে আসি। মাঝে এই বত্রিশ বছর। আর মনে পড়ছে ঠিক এক বছর আগে মার্চ মাসের মাঝামাঝি দিল্লী থেকে ফিরতিপথে শান্তিনিকেতনে এসেছিলুম। সন্ধ্যেবেলায় এখানে পৌঁছেই কবির সংগে দেখা হল। বত্রিশ বছর আগেও শান্তিনিকেতনে পৌঁছেই প্রথমে দেখা করতে গিয়েছিলুম কবির সংগে। কাল থেকে বারেবারেই মনে পড়ছে যে, এবার আর দেখা করা হবে না। এক-একটা ঘরে যাই যেন মনে থাকে না কবি নেই। হয়তো এখনি দেখতে পাবো পাশে কোথাও রয়েছেন। তারপরে বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে। কাল রাত্রে শুতে গেলুম—সেই পুরানো ঘর, আসবাব, টেবিল, চেয়ার—সবকিছুই রয়েছে, অথচ কবির সংগে দেখা হয়নি। রাত্রে বারোটা বেজে গেল, একটা বাজলো। আজ সকালে উঠে কোনো তাড়া নেই। আগে কোন্ ভোরে রানী উঠে তৈরি হয়ে নেয়—কবি নইলে অপেক্ষা করে থাকবেন। সকালে গিয়ে চায়ের টেবিলে বসলুম—তারপরেই ওঁর সংগে দেখা করতে যাই। বড়ো ঘরটার পাশ দিয়ে চলে গেলুম। ঘর খালি। দক্ষিণের ঘরটায় এখন Museum করা হয়েছে—একবার উঁকি মেরে চলে এলুম। উপরে এসে বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখি, ফাল্গুন মাসে বৌঠানের বাগান ফুলে ফুলে উজ্জ্বল। পরশু কালবৈশাখী ঝড়ের পরে সকাল বেলার বাতাস স্নিগ্ধ। কবি এক সময়ে যে ঘরে থাকতেন, তার জানলা দিয়ে দূরে কোপাই নদীর পারে ঘন সবুজ রঙ লেগেছে। কবির পুরানো বাড়ি, উদীচি, শ্যামলী, পুনশ্চর সামনে কবির হাতে-লাগানো গাছের পাতা আলোয় বাতাসে ঝলমল করছে। চুপ করে বসে আছি। কতো পুরানো গানের সুর যেন ভেসে বেড়াচ্ছে।

বত্রিশ বছর আগের সেই দিনগুলি আবার নতুন করে দেখা দিয়েছে। ছেলেবেলায় ওঁকে দেখেছি দূরে থেকে। ঠাকুরদাদার সংগে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যেতুম মহর্ষিকে দেখতে—ঠাকুরদাদা ছিলেন মহর্ষির পুরানো শিষ্য—ঠাকুরদাদার দীক্ষা হয় মহর্ষির কাছে। তখন মহর্ষিই ছিলেন আমার কাছে বেশি উজ্জ্বল। এদিকে সংগে সংগে কবির লেখাও পড়তে আরম্ভ করেছি। বড়ো একখণ্ড গ্রন্থাবলী তখন বেরিয়েছে—যেটাকে আমরা "টালি" সংস্করণ বলি—একটা টালির মতো দেখতে বলে। মা ছিলেন কবির মহাভক্ত—সমস্ত বই তাঁর কাছে ছিল, আর সারাদিন ঘরকন্নার ফাঁকে ফাঁকে কবির বইগুলি নিয়ে নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। কখনো কখনো আমাকে কবিতা পড়ে শোনাতেন। অক্ষর-পরিচয় হওয়ার সংগে সংগেই কবির লেখার সংগেও আমার পরিচয় শুরু হয়। মনে পড়ছে যে, ঐ-কার জিনিসটাকে যখনো ভালো করে আয়ত্ত করতে পারিনি, সেই বয়সেই "রাজা ও রানী" পড়তে আরম্ভ করেছি। নাটকের মধ্যে "জনৈক" পথিক বা আর কারুর প্রবেশ; আমি চেঁচিয়ে পড়ছি "জনোক"। মা শুনতে পেয়ে ঐ-কার আর ও-কারের তফাৎ বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এই রকম করে কবির লেখার ভিতর দিয়েই বাংলা শিখেছি। ছেলেবেলায় ওঁর রঘুপতির অভিনয় আমাদের পাশের বাড়িতে তখন "সঙ্গীত-সমাজ" ছিল, সেখানে দেখেছি। আরো একটু পরে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। উনিও আমাকে দেখেছেন, প্রণাম করেছি, কিন্তু সে হল পারিবারিক পরিচয়। ঠাকুরদাদার আমল থেকে মহর্ষি আর জোড়াসাঁকোর বাড়ির সংগে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ যোগ। ওঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের অনেকের সংগে জ্যেঠামশায়, বাবা, মা এঁদের জানা-শোনা বন্ধুত্ব। আর আমার সবচেয়ে গভীর টান মহর্ষির সম্বন্ধে। আমি যে সময়ের কথা বলছি, মহর্ষির বয়স তখন তিরাশি-

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চুরাশি হবে—চোখে প্রায় দেখতে পান না, কানেও কম শোনেন। জোড়াসাঁকোর বাড়ির তিনতলায় দক্ষিণ দিকের ঘরে থাকেন—পরে কবিও এই ঘরেই থাকতেন। লোকজন তখন বেশি যাওয়া বারণ। ঠাকুরদাদার মতো পুরানো শিষ্যেরা আর আত্মীয়স্বজন কেউ কেউ তখন দেখা করতে পেতেন। লালবাড়ির ভিতর দিয়ে সিঁড়ি তখনো তৈরি হয়নি। বড়ো বাড়ির ভিতরের ঘোরানো গোল সিঁড়ি দিয়ে উঠে, দক্ষিণ দিকের ছাদ পেরিয়ে মহর্ষির ঘরে যেতে হত। উনি বসে থাকতেন একটা উঁচু হাতওয়ালা মাথা পর্যন্ত ঠেস-দেওয়া যায়, এমন একটা বড়ো চেয়ারে। গায়ে জোব্বা, পায়ে সাদা মোজা। আমি গিয়ে পায়ের কাছে বসতুম, আর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতুম। বুড়ো আঙুলটা খুব বড়ো আর বয়সের সঙ্গে একটু বেঁকে গিয়েছে। মহর্ষি অনেক সময় তাঁর হাতটা আমার মাথার উপরে রাখতেন—মহলানবিশের ছোট নাতিটির পরিচয় তাঁর জানা ছিল। মাঝে মাঝে আমার খবর নিতেন। ঠাকুরদাদাকে একবার বলেন যে ওকে ব্রাহ্মধর্মের শ্লোক মুখস্ত করাও। মহর্ষির নিজের সভাপণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব মহাশয়ের কাছে ব্রাহ্মধর্ম পড়বার ব্যবস্থা করে দেন। বিদ্যার্ণব মহাশয়কে মহর্ষি কাশীতে পাঠিয়ে সংস্কৃত শিখিয়েছিলেন—তাঁর উচ্চারণ বিশুদ্ধ—বাংলা দেশের মতো বিকৃত নয়। য, জ, বা ণ, ন, ষ, স—অন্তাস্থ য এ সমস্ত আলাদা আলাদা উচ্চারণ। বিদ্যার্ণব মহাশয়ের কাছে সেই ছেলেবেলায় সংস্কৃত পড়ায় আমারও উচ্চারণ অনেকটা বিশুদ্ধ—বাংলা উচ্চারণ কানে লাগে। বাবাকে মহর্ষি একদিন বললেন যে, তাঁকে শ্লোক আবৃত্তি করে শোনাতে হবে। ভয়ে ভয়ে আবৃত্তি করলুম। মহর্ষি খুশী হলেন দেখে যে কী আনন্দ, মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এই রকম করে ছেলেবেলায় মহর্ষির কাছে গিয়েছি। আরেক দিনের কথা মনে পড়ে। মহর্ষির পায়ের কাছে বসে আছি। সেদিন ঠাকুরদাদা একা নয়, শিবনাথ শাস্ত্রী আর উমেশচন্দ্র দত্তও ছিলেন। ওঁদের অনেক বড়ো বড়ো কথা, আমি কিছু বুঝি না—আমি শুধু মহর্ষির মুখের দিকে তাকিয়ে আছি আর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। উনি বোধহয় একবার পায়ে হাতের ছোঁয়া পেয়ে বুঝতে পারলেন, আমি পাশে রয়েছি—আমার মাথায় হাত রেখে বললেন তুমি খুব ভালো হবে তুমি খুব ভালো হবে। তাঁর এই কথা আর ব্রাহ্মধর্মের শ্লোকগুলি তিনি আমাকে আশীর্বাদ দিয়ে গিয়েছেন।

বত্রিশ বছর আগের দিনগুলি মনে পড়ছে। অতো বড়ো একটা মানুষকে দেখেছি কতো কাছ থেকে। আজ ছোটখাটো কতো টুকরো দিনের কথা মনে পড়ছে। বড়ো বড়ো কতো কাণ্ড ঘটেছে, কতো কবিতা, গান, অভিনয়। আজ মনে পড়ছে, এ সমস্ত ছাপিয়ে ওঁর কাছে কতো স্নেহ পেয়েছি।

১৯১১ সালের গ্রীষ্মের ছুটির আগে দু মাস শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছিলুম—তখন কলেজে পড়ি, সতেরো আঠারো বছর বয়স। তখন সারাদিন প্রায় ওঁর কাছে কাছেই থাকতুম। শান্তিনিকেতনের পুরানো Guest House-এর দোতলায় পূর্বদিকের সেই ছোটো ঘরখানায় উনি থাকেন। এই ঘরে বসেই গীতাঞ্জলি, রাজা, ডাকঘর লিখেছেন। মাঝে একটা বসবার ঘর। আমি থাকি পশ্চিমের ঘরে। গ্রীষ্মকাল—আমি একটা মাদুর নিয়ে উপরের বড়ো ছাদে শুতাম।

কবির চাকর ছিল উমাচরণ—সেই আমাকে খাওয়াতো। সন্ধ্যেবেলা আশ্রমের লোকজন দেখা করে যাওয়ার পরে দক্ষিণে গাড়ি-বারান্দার ছাদটায় কবি বসে থাকতেন একটা লম্বা চেয়ারে। সন্ধ্যার আগেই আমাদের খাওয়া হয়ে যেত। খুব সাদাসিধা, হয়তো একটা ফল বা মিষ্টি আর এক গেলাস ঘোলের সরবৎ। রাত্রে সে সময় রান্না হতো না। সকাল বেলা চায়ের সময় পাঁউরুটি আর ফল। দুপুরে একটু ভাত আর দু-একটা নিরামিষ তরকারি—তখন আর্থিক অনটন চলছে। আর কেউ নেই। রথীবাবু, বৌঠান, মীরা সকলে শিলাইদায়। উমাচরণই সব ব্যবস্থা করত। ঐ একজন চাকর, রাঁধিয়ে, সব কিছু।

সমস্ত কিছু ছিল সাদাসিধা। ছোটো ঘরখানায় খুব নীচু করে পাতা ওঁর বিছানা। এক কোণে একটা ছোটো নীচু লেখবার ডেস্ক। এছাড়া তাঁর আসবাবপত্র কিছু নেই। কয়েকখানা বই ডেস্কের একপাশে আর লেখবার সরঞ্জাম। ঘরে একসঙ্গে দু-তিন-জনের বেশি মাটিতে বসবার জায়গা নেই। পাশেই ছোটো স্নানের ঘর। কাপড়-চোপড়, পাজামা, পাঞ্জাবি আর একটা জোব্বা সেই ঘরেই আলনায় টাঙ্গানো। সিঁড়ির পাশে একটা বাক্সে বোধহয় আর কিছু কাপড় থাকতো। বারান্দায় একটা গোল টেবিলে বসে খাওয়া। এই ছিল তখনকার ব্যবস্থা।

রাত্রে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলতে বলতে দেখতুম, উনি চুপ করে আছেন। আমি ছাদে চলে যেতুম। কোনো কোনো দিন আমিও অনেকবার ছাদে বেড়াতে বেড়াতে দেখতুম, কবি তখনো স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। তারপরে গভীর রাতে কখন শুতে যেতাম। সূর্য ওঠবার আগে নীচে এসে দেখতুম যে কবি তার অনেক আগে উঠেছেন, কোনদিন বারান্দায় বসে আছেন। কোনোদিন বা মন্দিরের সামনে পূব দিকের চত্বরে গিয়ে বসেছেন। সকালবেলা চায়ের টেবিলে নানা রকম আলোচনা। কখনো কখনো বিদ্যালয় থেকে কেউ আসতেন কাজ-কর্মের কথা নিয়ে। কখনো অজিত চক্রবর্তী আসতেন কিছু আলোচনা করবার জন্য। সকালে অনেকক্ষণ কবি নিজের লেখাও লিখতেন, চিঠির জবাব দিতেন। বেশ একটু বেলায় যেতেন স্নানের ঘরে। এই ছিল ওঁর অবসর। কখনো একঘন্টা, কখনো দেড়-ঘন্টাও স্নানের ঘরে থেকেছেন। কখনো শুনেছি গান করছেন। দুপুরে খাওয়ার পরে আবার কাজ। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা। লেখা। অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা। এছাড়া মাঝে মাঝে সকালে বা দুপুরে ক্লাশ পড়াতেন। কোনো নতুন গান লেখা হলেই অজিত বা দিনুবাবুকে ডেকে পাঠাতেন। বিকালে এক একদিন গান শেখানোর পালা। সন্ধ্যে বেলা আবার দুচার জনের সঙ্গে কথাবার্তা। মাঝে মাঝে খানিকটা বেড়িয়ে আসতেন। কখনো বা বিদ্যালয়ে যেতেন। দু-একদিন নীচু বাংলা থেকে বড়োবাবু (কবির বড়োদাদা) এসে হাজির। খানিকটা দর্শন, বা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা। এই রকম করে দিনের পরে দিন ওঁকে দেখিছি—ওঁর সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় এই রকম করে ঘটেছে। শেষের দিকে নিজের কাজ, নানা লোক, নানা ব্যবস্থা নিয়ে ওঁর কাছ থেকে খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিলুম।• কিন্তু আগে শান্তিনিকেতনে এসে ওঁর

কাছেই থাকতুম। বেশির ভাগ সময় কাটতো ও'র কাছে।

বাঙালীর একটা স্বভাব আছে মাখামাখি করা। কবির ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ও'র নিজের সব ব্যবস্থায় চিরদিন একটা দূরত্ব ছিল। তাই এক একদিন যখন তার ব্যতিক্রম ঘটত, তখন ও'র ভালোবাসার নতুন পরিচয় পেতুম। স্নানের ঘর উনি বরাবর আলাদা ব্যবহার করতে ভালোবাসতেন। তাই ও'র স্নানের ঘর অন্য কেউ ব্যবহার করত না। কিন্তু একদিন মনে আছে গ্রীষ্মকালে দুপুরের গাড়িতে এসে পোঁছেছি, তখন বেলা সাড়ে বারোটা একটা হবে। জানতেন আমি আসবো। না খেয়ে অপেক্ষা করেছেন। আমি যেতেই বললেন, যাও তোমার জন্য জল রেখে দিয়েছি, স্নান করে এসো। তখন থাকতেন "দেহলি"র দোতলায়। সেখানে শুধু একটা ঘর। আমি থাকবো Guest Houseএ—আরো খানিকটা হেঁটে যেতে হবে। বুঝলুম যে তা ইচ্ছা নয়। অন্য সময় হলে হয়তো না বলতুম। তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে গিয়ে দেখি একটা পরিস্কার তোয়ালে, জল সব ঠিক করিয়ে রেখেছেন। এই রকম ছোটো ছোটো কতো কথা মনে পড়ছে।

সেও এক গ্রীষ্মের দিনের কথা। পঁচিশে বৈশাখের কাছাকাছি। সারা দিন অসম্ভব গুমটো গরমের পরে প্রকাণ্ড একটা কাল বৈশাখীর ঝড়ে বৃষ্টিতে ধুইয়ে দিল। তখন ঝড়ের সময় মাঠে ঘুরে বেড়ানো ছিল একটা মস্ত বড়ো আনন্দ। শিলাবৃষ্টির মধ্যে সন্ধ্যে বেলায় খুব দৌড়াদৌড়ি করে কাপড় ছেড়ে ও'র কাছে গিয়ে বসেছি। হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। একটু পরেই উনি উঠে পাশের ঘরে গেলেন। একটা গরম কাপড় কোথা থেকে বের করে এনে গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললেন, বেশ ঠাণ্ডা আছে। আর বাহাদুরি করতে হবে না। অনেকদিন পর্যন্ত—আমার বিয়ে হবার আগে—ও'র কিরকম একটা ধারণা ছিল যে আমার খাওয়া দাওয়া বা শোয়া সম্বন্ধে কিছু খেয়াল থাকে না। তাই সর্বদা ও'র সঙ্গেই আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। আর শুতামও প্রায়ই ও'র পাশে বা কাছাকাছি কোনো ঘরে। ও'র বরাবর ছোটো ছোটো ঘরে থাকা অভ্যাস, নতুন নতুন বাড়ি যখন করতেন তখন গোড়ায় একখানা বই দুখানা শোবার ঘর থাকত না। তাই ও'র বসবার ঘরে খাটিয়া ফেলে যে কতোদিন শুয়েছি তার ঠিক নেই। এক দিনের কথা মনে আছে। বোধহয় ১৯২২ সাল, ৭ই পৌষের উৎসবের আগের দিন বিকালের গাড়িতে এসে পৌঁছেছি। উনি তখন থাকেন "প্রান্তিক" বলে যে বাড়িটার নাম, তাতে। একখানা ছোটো শোবার ঘর আর প্রায় সেই রকমই ছোটো একটা বসবার ঘর, এক কোণে সেই
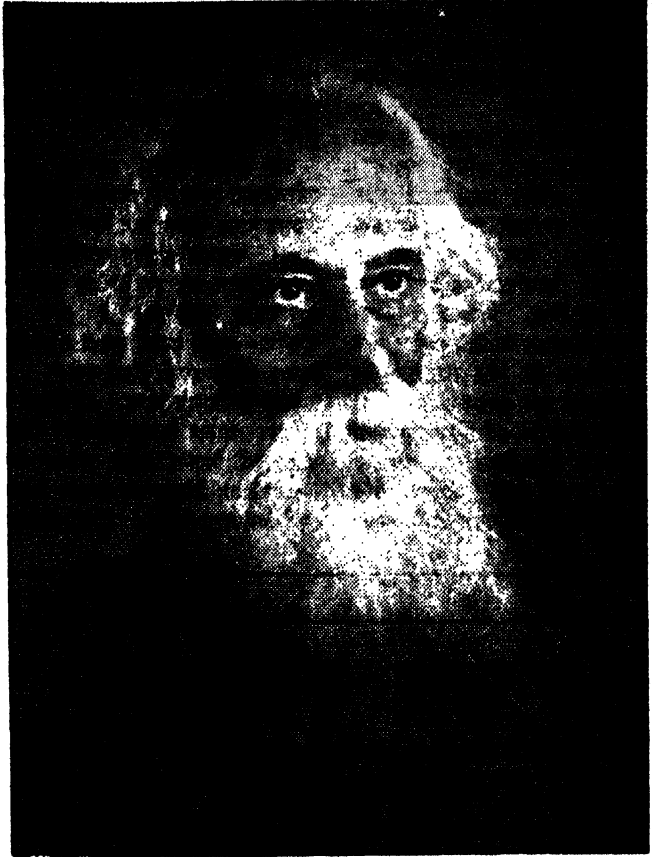
রবীন্দ্রনাথ ফটো: শম্ভু সাহা

মাপের একটি স্নানের ঘর, আর চার দিকে শুধু বারান্দা। শোবার ঘরে একটা ছোটো খাটিয়া ফেলা ছিল। ঘরটা এতো ছোটো যে সেখান থেকে ওঁর তক্তপোশ তিন চার হাত দূরে। মাঝের দরজায় পর্দা ফেলা। তার ঠিক আগে আলিপুরে হাওয়া আপিসে প্রথম গিয়েছি—উনি কয়েকদিন সেখানে আমার কাছে ছিলেন—তখনো আমার বিয়ে হয়নি। জানতুম মীরার জন্য ও'র মন খুব ব্যথিত আছে। রাত্রে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলবার পরে গিয়ে বারান্দায় বসলেন। আমি শুয়ে পড়লুম। তখন বেশ গভীর রাত। খানিকক্ষণ ঘুমবার পরে হঠাৎ শুনি উনি শোবার ঘরে, বোধহয় বিছানায় শুয়ে শুয়ে গান আরম্ভ করেছেন।

> "অন্ধজনে দেহ আলো
> মৃত-জনে দেহ প্রাণ।
> তুমি করুণামৃত-সিন্ধু
> করো করুণা-কণা দান॥
> শুষ্কহৃদয় মম
> কঠিন পাষাণ সম,
> প্রেম-সলিল নীরে সিঞ্চহ শুষ্ক বয়ান।"

তখন বোধহয় রাত তিনটা হবে। দুঘণ্টা ধরে বারবার করে গাইতে লাগলেন। আস্তে আস্তে, যাতে আমি জেগে না যাই। ভোর-বেলা পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে শুনলুম। বুঝলুম যে গানের ভিতর দিয়ে মনকে শান্ত করছেন। এক একটা কথা কতো-বার করে ফিরে ফিরে আওড়াতে লাগলেন। বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে, কতোখানি ভিতরের তাগিদে উনি গান লিখেছেন। শুধু কেন, ও'কে কাছে থেকে না দেখলে সাহিত্য, ও'র কবিতা, ও'র লেখা যে কতো খানি সত্য ছিল ও'র কাছে, তা কেউ বুঝতে পারবে না। ফাল্গুন চৈত্র মাসে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন গান গাইতেন, তখন ও'র সমস্ত শরীর মন যেন সাড়া দিয়ে উঠত। কাল বৈশাখীর ঝড়ে, বর্ষার দিনেও আবার দেখেছি ও'র মন কেমন মেতে উঠেছে। যারা শুধু ও'র লেখা পড়বে, তারা কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে কতোখানি বাদ পড়ল। এবার শান্তি-নিকেতনে এসে থেকে থেকে খালি মনে হচ্ছে যে সমস্ত যেন বদলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ধরে তো রাখা যায় না। আমরাও তো চলেছি। আমাদের দিনগুলিও একে একে নিয়ে আসছে। কালকের যে দিন

সেটা ফুরিয়েছে বলেই তো আজকের দিনটিকে পেয়েছি। আবার আজকের দিনকে না চুকিয়ে দিলে কাল আবার নতুন দিন আসবে কি করে?

এ সবই জানি, কিন্তু তবুও মনের মধ্যে ফাঁক থেকে যায়। শুধু কবি সম্বন্ধে নয়। সব জানাশুনা, পরিচয় ভেঙে ভেঙে নতুন করে গড়ছে। যেখানেই সৃষ্টি সেইখানেই তাই এত ব্যথা। কিন্তু মানুষ তবু ধরে রাখতে চায়। আঁকড়িয়ে রাখতে চায়! কিন্তু সে হল মোহ, নিতান্তই মিথ্যা। মহর্ষি শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরে বলে দিয়েছিলেন যে ওঁর কোনো ছবি কোনো প্রতিকৃতি যেন ওখানে না রাখা হয়। ওঁর মনে ভয় ছিল যে, এই মিথ্যাটাকে মালা চন্দন, ধূপধুনা দিয়ে পূজো ক'রে আশ্রমের আসল সত্য রূপটি চাপা পড়বে। কবি অনেক বার আমাকে এই কথা বলেছিলেন।

"সদর স্ট্রীটে থাকতে বাবামশায় আমাকে ডেকে বললেন, রবি, তোমাকে আমি এই কথাটা বলে যাচ্ছি—এ দায়িত্ব তোমার। শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার কোন প্রতিকৃতি যেন না থাকে।"

তাই এখানে আজ পর্যন্ত আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতার কোন ছবি কোথাও নেই। কবির নিজের মনের ধারাও ছিল ঠিক তাঁর পিতার মতো। আমাকে একদিন বলেছিলেন—

"রামমোহন রায় যে ব্রিস্টলে মারা যান, খুব ভালো হয়েছিল। এ দেশে এমন দুর্ভাগা—এখানে মরলে হয়তো ওঁকে পুজো করবার একটা জায়গা তৈরী হত।"

আজ রথীবাবুর সঙ্গে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। গোড়ার দিকে "শ্যামলী" বাড়িটায় কবির খাট, বিছানা, চেয়ার, টেবিল, কাপড়—চোপড় সব উনি যেমন ব্যবহার করতেন, সেই রকম করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। লোকে দেখতে আসত। ফুল দিয়ে যেত। তারপরে ধূপধুনাও দেওয়া হয়। রথীবাবু সম্প্রতি জিনিসপত্র সরিয়ে অন্য লোকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমি অবশ্য তাতে সায় দিলাম। রথীবাবু বললেন, "অথচ বাইরে থেকে যখন লোকজন আসে একটা কিছু ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়। ভাবছি যে, যে ঘরটা উনি সব শেষে করিয়েছিলেন সেটা খালি করে, খুব পরিষ্কার করে রেখে দেব। সেখানে ও'র ব্যবহার করা কোনো আসবাব থাকবে না। কিন্তু ও'র আঁকা এক একখানা ছবি, ও'র কোনো বই বদলিয়ে বদলিয়ে রাখা হবে।" আমি বললুম যে, তা হতে পারে, কিন্তু এর চেয়েও আরো ভালো হয় অন্য একটা ব্যবস্থা। শান্তিনিকেতন আশ্রমে বারবার করে কবি বলেছেন এখানকার এই উন্মুক্ত উদার প্রান্তরের কথা—দূরে যেখানে আকাশ আর মাটিতে মিশে গিয়েছে সেইখানে পূর্বদিকে সূর্য ওঠা আর পশ্চিমে আবার সেইরকম করেই ডুবে যাওয়া। এখানকার এই খোলা মাঠের মধ্যে একটা জায়গা একটু উঁচু করে আশেপাশে ফুলের গাছ দিয়ে সাজিয়ে দিন। তার উপরে হয়তো পাথরের একটি বেদী—কবি ব্যবহার করেছেন এমন কিছু নয়, কিন্তু শুধু দাঁড়াবার বা বসবার একটু জায়গা। কবি নিজের হাতে কাঁটা আর বুনো গাছের বাগান করেছিলেন—সেই রকম ছোটো ছোটো গাছ হয়তো এক এক পাশে। বিস্তীর্ণ প্রান্তর—চারদিক থেকে প্রশস্ত রাস্তা এসে মিশেছে। এই হল কবির যথার্থ স্মরণ-চিহ্ন। ওর মাটির দেহের কোন চিহ্ন তাতে নেই—আছে শুধু ও'র মনের একটা ইঙ্গিত। এইখানে লোকে এসে দাঁড়াবে। এইখানে খোলা আকাশের নীচে কবির কথা স্মরণ করবে। উৎসবের দিনে হবে আশ্রমের সকলের মেলবার জায়গা। কবির কথা যখন ভাবি, এছাড়া আর কিছুতো তাঁর যোগ্য বলে মনে হয় না।

মানুষের সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় তাকেও আমরা বারবার নানা রকম গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু তাতে শুধু নিজেকেই ছোটো করি। তাই যেখানে আমাদের সত্যি দরদ, সেইখানেই বারে বারে বন্ধন কাটাবার প্রয়োজন আছে। তাতে মন ব্যথিত হয় ফিরে ফিরে আঁকড়িয়ে ধরতে চায়। তবু মনে রাখতে হবে যে, সব চেয়ে বড়ো কথা মুক্তরূপে জানা। কিন্তু মুখে যতো সহজে বলি মন তো অতো সহজে বোঝে না। বারে বারে মনকে সামলাতেও হয়। আজ সকাল বেলা বসে বসে চেষ্টা করছি সেই অনুভূতিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য, যা সুখও নয়, দুঃখও নয়, শুধু শান্তি।

৮ই মার্চ, ১৯৪২ "উত্তরায়ণ"

কবি-সংবর্ধনা · ১৩[illegible]

শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সং[illegible]

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশ্য সংবর্ধনার (মজঃফরপুর, ১ শ্রাবণ ১৩০৮) বিবরণ ইতিপূর্বে দেশ-পত্রে (১৩৬৫ সাহিত্য সংখ্যা) প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র-জন্ম-শতবর্ষপূর্তি উৎসবের সময়, জন্মোৎসব ও অন্য উপলক্ষ্যে তাঁর সংবর্ধনা-অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ পাঠকের মনোজ্ঞ হতে পারে অনুমান করে তার কোনো-কোনোটির বিবরণ সংকলন করা গেল। এই সংকলনকার্যে শ্রীশুভেন্দু-শেখর মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে প্রভূত সহায়তা পেয়েছি* তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। প্রাসঙ্গিক যে-সকল রবীন্দ্র-রচনা বা অভিভাষণ গ্রন্থাকারে লভ্য নয়, পুরাতন সাময়িক পত্রাদির পৃষ্ঠা থেকে এই সংকলনে সেগুলি সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে; হর-প্রসাদ শাস্ত্রী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি সমকালীন মনীষীরা রবীন্দ্রনাথকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন সাময়িক পত্রাদি থেকে উদ্ধৃত রবীন্দ্র-সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে তাঁদের অভিভাষণ প্রভৃতিতে তারও নিদর্শন রক্ষিত।

পঞ্চাশবর্ষপূর্তি · উৎসব
[illegible]ান্তিনিকেতন ২৫ বৈশাখ ১৩১৮

১৩১৭ সালের ২৫ বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে শান্তি-নিকেতনের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ একটি উৎসব করেন, "নিতান্ত আত্মীয়দের উৎসব", "এই জন্মোৎসবের কথা তখনো আশ্রমের বাহিরে সাধারণের কাছে জানানো হয় নাই"। (১) এই অনুষ্ঠান বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের দ্বারা; সেটি গ্রন্থাকারে সহজপ্রাপ্য হলেও (২) প্রাসঙ্গিক বোধে তার একাংশ উদ্ধৃত করি—

"জন্মোৎসবের ভিতরকার সার্থকতা কিসে। জগতে আমরা অনেক জিনিসকে চোখের দেখা করে দেখি, কানের শোনা ক[illegible]
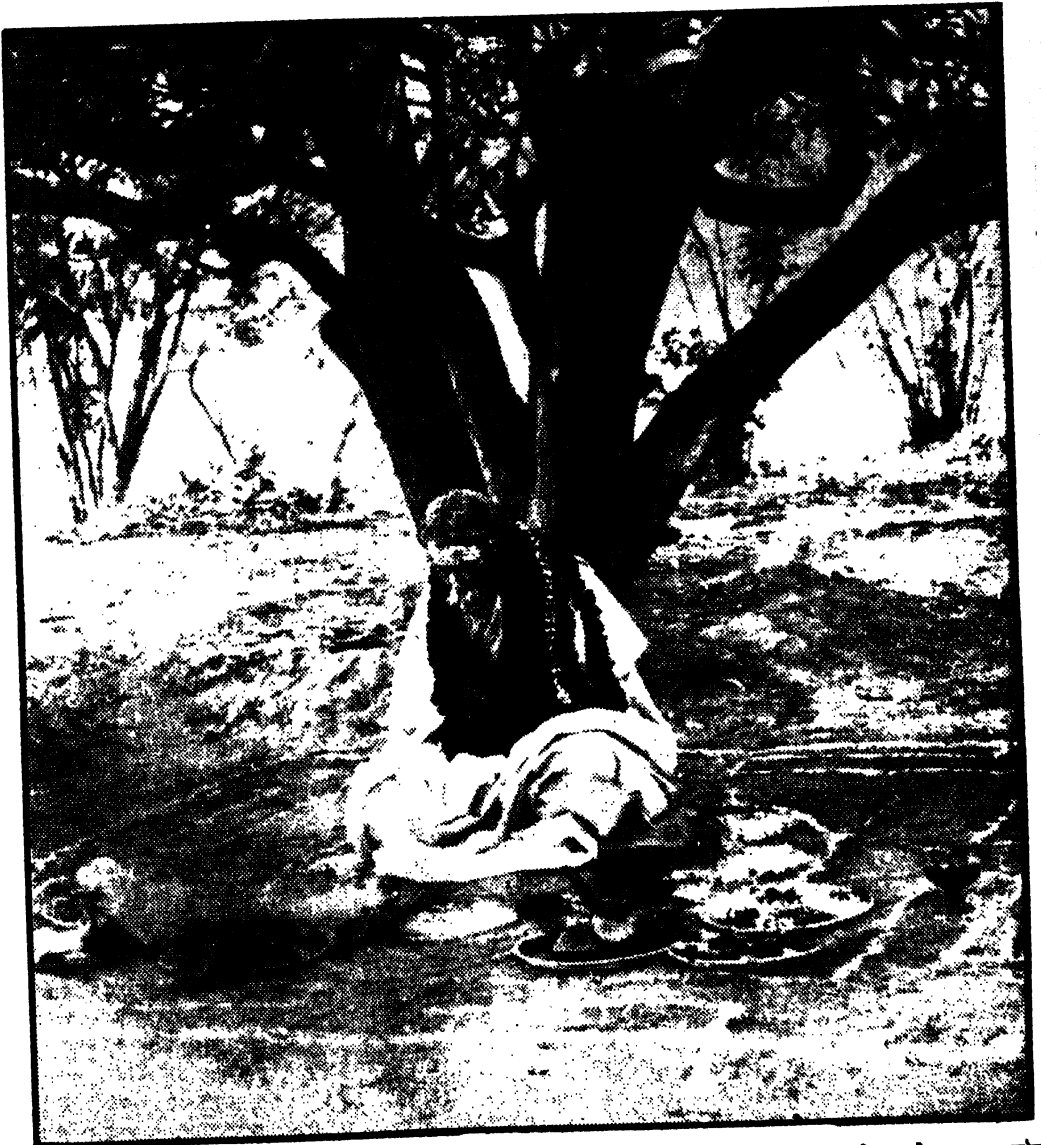
শান্তিনিকেতনে পঞ্চাশ বৎসরের জন্মদিনে — চিত্র রবীন্দ্র-সদনের সৌজন্যে।

শূনি, ব্যবহারের পাওয়া করে পাই; কিন্তু অতি অল্প জিনিসকেই আপন করে পাই। আপন করে পাওয়াতেই আমাদের আনন্দ—তাতেই আমরা আপনাকে বহুগুণ করে পাই। পৃথিবীতে অসংখ্য লোক; তারা আমাদের চারিদিকেই আছে কিন্তু তাদের আমরা পাইনি, তারা আমাদের আপন নয়, তাই তাদের মধ্যে আমাদের আনন্দ নেই।

"তাই বলছিলুম, আপন করে পাওয়াই হচ্ছে একমাত্র লাভ, তার জন্যেই মানুষের যত-কিছু সাধনা। শিশু ঘরে জন্মগ্রহণ করবামাত্রই তার মা বাপ এবং ঘরের লোক এক মুহূর্তেই আপনার লোককে পায়—পরিচয়ের আরম্ভকাল থেকেই সে যেন চিরন্তন। অল্পকাল পূর্বেই সে একেবারে কেউ ছিল না—না জানার অনাদি অন্ধকার থেকে বাহির হয়েই সে আপন-করে-জানার মধ্যে অতি অনায়াসেই প্রবেশ করলে; এজন্যে পরস্পরের মধ্যে কোনো সাধনার কোনো দেখা-সাক্ষাৎ আনাগোনার কোনো প্রয়োজন হয়নি।

"যেখানেই এই আপন করে পাওয়া আছে সেইখানেই উৎসব। ঘর সাজিয়ে বাঁশি বাজিয়ে সেই পাওয়াটিকে মানুষ সুন্দর করে তুলে প্রকাশ করতে চায়। বিবাহেও পরকে যখন চিরদিনের মতো আপন করে পাওয়া যায়, তখনো এই সাজসজ্জা, এই গীতবাদ্য। 'তুমি আমার আপন' এই কথাটি মানুষ প্রতিদিনের সুরে বলতে পারে না—এতে সৌন্দর্যের সুর ঢেলে দিতে হয়।...

"আজ আমার জন্মদিনে তোমরা যে উৎসব করছ, তার মধ্যে যদি সেই কথাটি থাকে, তোমরা যদি আমাকে আপন করে পেয়ে থাক, আজ প্রভাতে সেই পাওয়ার আনন্দকেই যদি তোমাদের প্রকাশ করবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তাহলেই এই উৎসব সার্থক। তোমাদের জীবনের সঙ্গে আমার জীবন যদি বিশেষ-ভাবে মিলে থাকে, আমাদের পরস্পরের মধ্যে যদি কোনো গভীরতর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে, তবেই যথার্থভাবে এই উৎসবের প্রয়োজন আছে, তার মূল্যে আছে।"

পর বৎসর (১৩১৮) পঞ্চাশ বৎসর পূর্তির উৎসব শান্তিনিকেতনে ২৫ বৈশাখে সাড়ম্বরেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল, শান্তি-নিকেতনে বাইরে থেকেও রবীন্দ্রনাথের সুহৃৎ-মণ্ডলীর অনেকে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় এই উৎসবের প্রসঙ্গে লিখেছেন (৩)—

"১৯১১ সাল। বৈশাখ মাস। গুরু-দেবের পঞ্চাশত্তম জন্মোৎসব উপস্থিত। আমরা তো সবাই নিঃস্ব। যথাসাধ্য দিয়েও খুব বেশী কিছু টাকা সংগ্রহ করা গেল না। কিন্তু উৎসাহের অন্ত নেই। এই উৎসাহ আর প্রাচীন যুগের উপকরণ (৪) নিয়েই আমরা অসাধ্যসাধন করলাম।

"শান্তিনিকেতনের ছাত্র ও অধ্যাপকের দল দিবারাত্রি যে কি পরিশ্রম করেছেন তা আর বলে বোঝানো যায় না। নেপালবাবু প্রভৃতি প্রবীণ অধ্যাপকের দল যুবা ছাত্রদের হার মানালেন। হীরালাল বসু ভালো ফলমূল আনবার জন্য সদলে কাটোয়া গেলেন, সেখান থেকে গোরুর গাড়ি করে ফল নিয়ে এলেন।

---

(১) শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র-জীবনী' দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৫৫), পৃ ২২২

(২) রবীন্দ্রনাথ, 'শান্তিনিকেতন' একাদশ খণ্ড, "জন্মোৎসব" প্রবন্ধ

(৩) ক্ষিতিমোহন সেন, '...শান্তি-নিকেতন আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক অর্ঘ্যদান উপলক্ষ্যে অভিভাষণ', ৭ পৌষ ১৩৫৯

(৪) "কাশীতে দেখেছি ব্যাস অথবা পুরাণ পাঠকদের জন্য থাকে সুসজ্জিত ব্যাস-বেদী বা ব্যাসাসন। মাল্যে চন্দনে তাঁদের অর্চনা করতে হয়। তীর্থস্থানের এইসব আয়োজন আমদানি করতেই এখানকার সভায় রূপ একেবারে বদলে গেল। বেদীর সম্মুখে আলপনা, পাশে ধূপদীপ গন্ধপুষ্প অর্ঘ্য প্রভৃতির সমারোহ, একেবারে প্রাচীন যুগের ঐশ্বর্য ফুটিয়ে তুলল। গুরু-দেব দেখে অতিশয় সন্তুষ্ট হলেন।...সঙ্গে চলল আলপনা। তারপর ধীরে ধীরে যোগ করা গেল বৈদিক মন্ত্রগুলিকে। গুরুদেবের গান তো আছেই।" উক্ত 'অভিভাষণ'
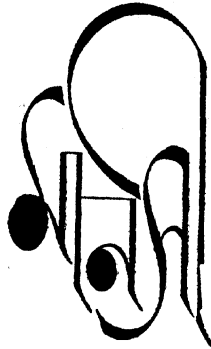
"এখানকার উৎসাহীদের সঙ্গে বাইরেরও কেউ কেউ এসে যোগ দিলেন।...সেই দলের মধ্যে প্রশান্ত [মহলানবিশ] ছিলেন অগ্রণী। কবি সত্যেন্দ্রনাথ, সুকুমার রায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন বাগচী, দিনুবাবু, অজিত চক্রবর্তী, সন্তোষ মজুমদার প্রভৃতি তরুণদের এবং রামানন্দবাবু, নেপালবাবু, দ্বিপুবাবু প্রভৃতি প্রবীণদের সমান উৎসাহ ও সহযোগ পাওয়া গেল। প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে এই উৎসব সম্পন্ন হওয়াতে নানা স্থান থেকে সমাগত সকলেই পরম পরিতৃপ্ত হলেন।"

এই উৎসবকালীন আশ্রম-জীবনের একটি স্নিগ্ধমধুর বিবরণ প্রকাশ করেছেন শ্রীমতী সীতাদেবী তাঁর "পুণ্যস্মৃতি" গ্রন্থে (পৃ ৮—৪৯), এখানে তার থেকে উৎসবানুষ্ঠানের বিবরণটুকুই উদ্ধৃত করবার অবকাশ আছে—

"২৫শে বৈশাখ ভোর পাঁচটার সময় আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। আমরা উৎসাহের আতিশয্যে প্রায় রাত থাকিতেই উঠিয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের আগেও অনেকে উঠিয়াছেন দেখিলাম। ভোর হইতে-না-হইতে দলে দলে লোক বাঁধ হইতে স্নান করিয়া ফিরিতেছেন। আমরাও স্নানাদি সারিয়া আম্রকুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হইলাম। উৎসবক্ষেত্র আলপনা ও পত্রপুষ্পে অতি সুন্দর করিয়া সাজানো হইয়াছিল।... দিনেন্দ্রনাথ তাঁহার ছাত্রদের লইয়া গান আরম্ভ করিলেন। আচার্যের কাজ করিলেন তিনজন, শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন, পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র রায়। নেপালবাবু শেষের দিকে ছাত্রদের কিছু উপদেশ দিলেন...তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমরা সকলেই গুরুদেবকে ভক্তি কর, কিন্তু তাঁকে কখনও যেন ঈশ্বরের স্থানে বসিয়ো না।'...

"রবীন্দ্রনাথকে আশ্রমের দিক হইতে অনেকগুলি সময়োচিত উপহার দেওয়া হইল।...বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় একটি অভিনন্দন পাঠ করিলেন।

"রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছিলেন তাহার কিছু মনে আছে। 'আমাকে আপনারা যে উপহার দিলেন সেগুলি পাবার আমি কতখানি যোগ্য তা যদি আমি মনে করতে যাই, তাহলে আমাকে লজ্জিত হতে হবে। কিন্তু একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে মানুষের কোনো লজ্জা নেই, সেটা প্রীতির ক্ষেত্র। এইসব উপহার আমাকে আপনারা প্রীতির সহিত দিচ্ছেন, সেইজন্য এসব গ্রহণ করতে আমার কোনো বাধা নেই।'

"কবিবরকে অসংখ্য পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হইয়াছিল। সভাস্থ অতিথিদেরও ফুলের মালা ও চন্দন দিয়া অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।...

"সভার কার্য শেষ হইতেই কবিকে প্রণাম করিবার ধুম পড়িয়া গেল। প্রায় তিনশত ব্যক্তির প্রণাম গ্রহণ করিতে তাঁহাকে আধঘণ্টারও বেশী দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল। তিনি সমস্তক্ষণই নতমস্তকে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। ছেলেদের প্রণামের পালা সাঙ্গ হইতেই তিনি চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আমরা এতখানি বঞ্চিত হইতে একেবারেই স্বীকার করিলাম না। সন্তোষবাবু গিয়া তাঁহাকে আবার ডাকিয়া আনিলেন। মহিলা ও বালিকাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়া তবে তিনি যাইতে পথ পাইলেন।"

এই উৎসবের দুষ্প্রাপ্য অনুষ্ঠানপত্রটি পরিশিষ্টে পুনর্মুদ্রিত হল।

'কবি - সংবর্ধনা'
কলিকাতা ১৪ই মাঘ ১৩১৮

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তিতে শান্তিনিকেতনবাসীদের পক্ষ থেকে যেমন জন্মোৎসবের আয়োজন চলছিল, তেমনি এই উপলক্ষ্যে দেশবাসীর পক্ষ থেকেও তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন চলছিল তাঁর সাহিত্য-শিষ্য ও অনুরাগীদের উদ্‌যোগে, যাঁদের পুরোভাগে ছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন (৫)—

"এই সময় পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ পূর্তি হব-হব হয়ে আসছে। সত্যেন্দ্র প্রস্তাব করলেন, কবীন্দ্র-সম্বর্ধনা করতে হবে। এই প্রস্তাব সমর্থন করলে মণিলাল [গঙ্গোপাধ্যায়] ও যতীন্দ্রমোহন [বাগচী] প্রভৃতি। আমরা চারজনে মেতে উঠলাম এর আয়োজনে।"

উদ্‌যোক্তাদের অন্যতম যতীন্দ্রমোহন বাগচী "সে যুগের কথা ও রবীন্দ্রনাথ

কবি-সংবর্ধনার প্রথম উদ্যোক্তৃবর্গ

বাম দিক হইতে ॥ উপবিষ্ট ॥ করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। বামদিক হইতে ॥ দণ্ডায়মান ॥ চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥ মধ্যস্থলে উপবিষ্ট কবি। উৎসবান্তে গৃহীত চিত্র ॥ শ্রীমণীন্দ্রমোহন বাগচীর সৌজন্যে

(৫) "সত্যেন্দ্র-পরিচয়", প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩২৯।

প্রবন্ধে (৬) এই উৎসবের নেপথ্যবিধানের বিবরণ দিয়েছেন—

"আমার এক দাদা [কবি] দ্বিজেন্দ্র-নারায়ণ বাগচীর পুরোবর্তিতায় আমাদেরই গৃহে একটি অনাড়ম্বর রবীন্দ্রচক্রের সূচনা ঘটিয়াছিল......আমাদের সেই অনামিকা গৃহসভায় একদিন কথা উঠিল, কবি পঞ্চাশ বৎসরে পদার্পণ করিবেন, এই উপলক্ষ্যে তাঁহার শুভ শতায়ু কামনা করিয়া আমাদের শ্রদ্ধানিবেদনকল্পে একটি প্রকাশ্য সম্বর্ধনা করিতে হইবে। ......যে কয়জন আমরা সভায় উপস্থিত ছিলাম—দ্বিজদা, আমি, সত্যেন, চারু ও মণিলাল প্রত্যেকেই একশত টাকার প্রতি-শ্রুতি দিয়া কার্যারম্ভ করিয়া দিলাম। ......চাঁদা সংগ্রহে বাহির হইয়া প্রথমেই প্রাণ ও দান বীর চিত্তরঞ্জন দাশের কথা মনে পড়িল। মণিলাল ও

(৬) পূর্ণিমা (বহরমপুর), আষাঢ় ১৩৫০।

আমি তাঁহার সুপরিচিত ছিলাম। সত্যেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারই কাছে আমাদের প্রথম যাত্রা। তিনি নিজে কবি ও সুরসিক সাহিত্যিক। আমাদের সংকল্পের সুখ্যাতি করিয়া একখানি চেক কাটিয়া দিলেন। ......নাটোর আমাদের অঞ্জলি ভরিয়া সম্মানোচিত দান দিলেন, কিন্তু অন্যত্র প্রায় নিরাশ হইতে হইল। পুনরায় সভা বসিল, পরামর্শ হইল। আমাদের সঙ্গে কোন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও মানী লোককে ধরিয়া সহযোগী করিতে হইবে, নতুবা হালে পানি পাইতেছে না। ......রামেন্দ্রসুন্দরের নাম মনে পড়িল। তিনি একাধারে পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও কবির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান। ...সদলবলে রামেন্দ্রবাবুর কাছে শরণ লইলাম :তিনি প্রসন্নমনে ও উৎসাহ সহকারে আমাদের প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন ও পরিষদেই একটা মন্ত্রণা-সভা ডাকিলেন। ফল চমৎকার হইল। সারদাবাবু (জজ সারদা-চরণ মিত্র), রায় যতীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় (টাকি) প্রভৃতিও আমাদের উৎসাহিত করিলেন। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার... বলিলেন, 'আপনারা যে পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন, আমি একাই, আশা করি, সেই পরিমাণ অর্থ আপনাদের সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিব। কিন্তু খরচ বাদে সঞ্চিত অর্থে কোন স্থায়ী কাজ করিতে হইবে, যাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করিতে পারে।"

এই আলোচনার ফলে একটি সম্বর্ধনা-সমিতি গঠিত হয় এবং এই সমিতির অনুরোধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সানন্দে এই অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করেন। 'সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা' (১৩১৯) থেকে তার বিবরণ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—

"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চাশত্তম বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে বঙ্গসাহিত্যের কতিপয় সেবক ও হিতৈষিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার সংকল্প করিয়া একটি স-বর্ধনা-সমিতি গঠন করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া উক্ত সমিতি গঠিত হয়।

"সমিতির সদস্য"

...শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
...শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু
...শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়
...শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল
...শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র
...শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
...শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
...শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
...শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত...(সমিতির সম্পাদক)
...শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (সমিতির ধনরক্ষক)।

"কলিকাতা সঙ্গীতসমাজ গৃহে এই সম্বর্ধনা-সমিতির প্রথম অধিবেশন হয় এবং স্থির হয় যে, সর্বসাধারণের নিকট প্রার্থনা দ্বারা কবিবরের সম্বর্ধনার্থ যে অর্থ সংগৃহীত হইবে ও সম্বর্ধনার পর যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা কবিবরের সম্মানার্থ সাহিত্যের হিতকল্পে নিয়োজিত হইবে, আরও থির হয় যে, বঙ্গসাহিত্যের মুখপাত্ররূপে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকে এই সমুদয় কার্যের ভার গ্রহণের জন্য সম্বর্ধনা-সমিতি অনুরোধ করিবেন এবং তদুপলক্ষে সংগৃহীত অর্থও সাহিত্য-পরিষদের হস্তে অর্পণ করিবেন। সম্বর্ধনা-সমিতির এই অনুরোধ উক্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় কর্তৃক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিদের সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইলে, পরিষদের কার্য-নির্বাহক সমিতি সাদরে এই অনুরোধ গ্রহণ করেন।"

সম্বর্ধনা-সমিতির পক্ষ থেকে এই নিবেদন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়—

"আগামী ২৫শে বৈশাখ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ৫০ বৎসর সম্পূর্ণ করিয়া ৫১ বৎসরে পদার্পণ করিবেন। রবীন্দ্রবাবু আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক: তিনি বহু বর্ষ ধরিয়া নানাভাবে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার এক-পঞ্চাশৎতম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন দেওয়া ও সম্বর্ধনা করা দেশবাসীর কর্তব্য বলিয়া মনে হওয়াতে নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটি সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। সমিতি ইচ্ছা করিলে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

"ইতিপূর্বে আমরা দেশের সাহিত্যিক-গণকে যথোচিত সম্মান দেখাই নাই; তাহাতে আমাদের জাতীয় ত্রুটি হইয়াছে। রবীন্দ্রবাবুর আগামী জন্মতিথি উপলক্ষে যেন আমরা ঐ ত্রুটির সংশোধন আরম্ভ করিতে পারি।

"রবীন্দ্রবাবুর প্রতি সম্মান দান যাহাতে দেশব্যাপী হয় তজ্জন্য সমিতি দেশের প্রতিভূস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে এই কার্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিবেন। এবং পরিষদের সহিত পরামর্শ করিয়া উৎসবের দিন ও প্রণালী ধার্য করিবেন।

"সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, উৎসব-দিবসে সাধারণ উৎসবের সঙ্গে কবিবরকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ উপহার দেওয়া হইবে এবং কবিবরের নাম স্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে কোনও লোক-হিতকর স্থায়ী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইবে।

"সমিতির উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার

জন্য সমিতি সাধারণের সহানুভূতি ও অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এ বিষয়ে সকলেরই যোগদান প্রার্থনীয়। যিনি যাহা দিবেন, সাদরে গৃহীত হইবে এবং সংবাদ-পত্রে স্বীকৃত হইবে।......"

কবি-সম্বর্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার টাউন হলে, ১৩১৮ সালের ১৪ই মাঘ তারিখে। এই সভার সমসাময়িক দু-একটি বিবরণে এই উৎসবের দিনের সুন্দর প্রতিচ্ছবি বিধৃত আছে, নিম্নে তার কোনো-কোনোটি উদ্ধৃত হল।

প্রথমযৌবনেই রবীন্দ্রনাথে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় বাল্মীকিকে সরস্বতীর বরদানের যে চিত্র অঙ্কিত করেছিলেন, তা উদ্ধৃত ক'রে সরলা দেবী চৌধুরানী ভারতী পত্রে লিখেছেন (৭)—

"আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি
শিখাতে গান!

তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ প্রাণ!...
যেথায় হিমাদ্রি আছে, সেথা তোর নাম রবে
যেথায় জাহ্নবী বহে, তোর কাব্য-স্রোত ব'বে।
...মোর পদ্মাসন তলে রহিবে আসন তোর
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর,
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর লিখিবে সঙ্গীত কত।
এই নে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার।"

"অনুভব করিলাম, এ ভারতবর্ষের আদি কবি বাল্মীকির অতীত ইতিহাস নহে, এ বঙ্গের নবীন কবি রবীন্দ্রের ভবিষ্যপুরাণ। এবং সেদিন টাউন হলের বিপুল জনতার মহোৎসবে সে পুরাণ ফলিত দেখিলাম।

"যাঁহারা পুরীতে সমুদ্র দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সাগরতরঙ্গ যখন বেলাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন কেমন করিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়া সমস্ত স্থলাংশটুকু আচ্ছন্ন করে, প্লাবিত করে, তিরোহিত করে। এক-একটা উত্তাল তরঙ্গ উত্থিত হয় আর তখন এপিঠের ওপিঠের কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। সেদিনকার সভার কার্যারম্ভকালে জনতরঙ্গ সেইরূপ উদ্বেল সমুদ্রের ন্যায়ই আচরণ করিয়াছিল। লোকপুঞ্জের পর লোকপুঞ্জ অগ্রসর হইতেছে ও বেদীর সম্মুখভাগ ও দুই পার্শ্ব স্ফীত করিতেছে। ক্রমে সেই প্রকাণ্ড হলের সমস্তটা লোকে লোকময় হইয়া গেল।......কিন্তু এখনও দূরাগত তরঙ্গ-গর্জনের ন্যায় সিঁড়ির উপর পদশব্দ শ্রুত হইতেছে। ......সেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ লোক-সমুদ্র আর প্রশান্ত হইবে কিনা সন্দেহ হইতে লাগিল।

"রবীন্দ্র আগমনের বহু পূর্ব হইতে নানা প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ও সেবিকার হলে পদার্পণ বা বেদীতে আরোহণের সমকালেই তাঁহাদের অভিজ্ঞান ও সম্মান-দানসূচক করতালি ধ্বনিত হইতেছিল। ......সাহিত্য-পরিষদের সভ্যপরিবৃত রবীন্দ্র-নাথের মূর্তি যখন লোকের নয়নপথে উদীয়মান হইল, তখন একটা মত্ত আবেগে সেই বৃহতী সভা বিলোল হইয়া উঠিল। এতক্ষণে সাহিত্য-সম্রাট আসিলেন। ......করতালি আর থামে না, হর্ষ-কাকলির আর অবসান নাই। ......রবীন্দ্রনাথ আসন গ্রহণ করিলে বেদীর নীচে তাঁহার সম্মুখেই একটা লোকময় প্রাচীর উঠিয়া গেল, লম্বা সারিতে বসা দর্শকবৃন্দ তার আড়ে পড়িয়া গেলেন, তাঁরা বেদীস্থ-গণের অদৃশ্য হইলেন—এবং বেদীস্থ সকলে তাঁদের অদৃশ্য হইলেন। কখন কখন প্রাচীরের মধ্যে ফাটল ঘটিলে আবার পরস্পরকে দেখা যায় ও পরস্পরের মুখচ্ছবিতে আনন্দপ্রাপ্তি হয়।

"কার্য আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সভার উদ্বোধন করিলেন। (৮) প্রসন্ন হাস্যময়, ব্যাধি ও জরার কবলে পতনোন্মুখ হইলেও দেশের মঙ্গলজনক সকল অনুষ্ঠানে অনলসভাবে উৎসাহশীল, মতভেদের মধ্যে ঐক্য অন্বেষী, বিসম্বাদের মধ্যেও প্রীতিবর্ষী, রক্তের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে দেশানুরাগ ভরা সজ্জন দ্বিজোত্তম গাঢ়ীকৃত প্রীতিপূর্ণ সুসংগত কথায় কার্যারম্ভ করিয়া দিলেন। তৎপশ্চাৎ আচার্যকৃত মঙ্গলাচরণ হইল।......

(৭) "কবি-সম্বর্ধনা" ভারতী, ফাল্গুন ১৩১৮। রচনাটি স্বাক্ষরহীন, বার্ষিক সূচীপত্রে লেখিকার নাম আছে।

(৮) "বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে আজ একটি গৌরবের দিন, আমাদের সাহিত্যজীবনে যে শুভ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, অদ্যকার এই কবিসম্বর্ধনা তাহারই ফলস্বরূপ। কবিবরের পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অদ্য যে অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা হইয়া থাকিবে। জীবদ্দশায় অতি অল্প কবিই তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান লাভ করিয়াছেন, আমাদের দেশেও মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং কবিবর হেমচন্দ্র তাঁহাদের জীবনের শেষ অবস্থায় যেরূপভাবে কাটাইয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃই বঙ্গবাসীর পক্ষে অগৌরবের কথা, কলঙ্কের কথা। রবীন্দ্র বাবুর সম্বর্ধনায় সেই কলঙ্ক-স্খলন করিবার জন্য যে আমরা যৎকিঞ্চিৎ আয়োজন করিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমরা আনন্দ অনুভব করিতেছি।"
—সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা, ১৩১৯

"অতঃপর মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে সুললিতছন্দে কবিকে আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার শব্দবিন্যাসনৈপুণ্য এমন সুন্দর যে, জানা না থাকিলে তাঁহার শ্লোকগুলিকে অনায়াসে বহুশতাব্দী পূর্বের কোন সংস্কৃত কবির রচনা বলিয়া চালান যাইতে পারিত। পণ্ডিত ঠাকুরপ্রসাদ আচার্যের উপনিষদ-গাথা পাঠ ও মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্নের আশীর্বচনে বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা সভা এক অনির্বচনীয় গাম্ভীর্যে ও সম্ভ্রমে ভরিত হইল।

"তদনন্তর কবিসখা নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথ অর্ঘ্যদান করিতে উঠিলেন।... কৃষ্ণসখা অর্জুনের ন্যায় নির্ভীক সত্যসন্ধী মহারাজ আজিকার কবিসূয় যজ্ঞে শিশুপালধর্মী যাহারা ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া বাধাদানের চেষ্টা করিয়াছিল বড় নিপুণতার সহিত প্রথমে তাহাদের খবর লইলেন। সভামধ্যে একটা বৈচিত্র্যের ঢেউ খেলিয়া

গেল। তিক্ত স্বাদের সম্ভাবনার আভাসটুকু দিয়া মধুরস্বাদকে আরও তিনি ঘনীভূত করিয়া দিলেন। বক্তব্যের পরিশেষে (৯) মহারাজ কবিসখাকে অর্ঘ্যদান করিলেন। একটি রৌপ্যপাত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে রক্ষিত ধান, দূর্বা, সিদ্ধার্থ, চন্দন, অগুরু, কুংকুম, দধি, মধু, ঘৃত, পুষ্প ও গোরোচনা। মাল্যদান করিলেন সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়—একটি স্বর্ণসূত্রমাল্য ও একটি পুষ্পমাল্য। তৎপরে একটি স্বর্ণপদ্ম উপায়ন প্রদত্ত হইল। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্যময় প্রস্ফুটিত শতদল। ইচ্ছামত তাহাকে মুদ্রিত করা যায়। তাহার আধারটিও অত্যন্ত মনোহারী! জিনিসটি সংগৃহীত হইয়াছে প্রাচ্যশিল্প প্রদর্শনী হইতে—অনুমান হয় এটি কাশ্মীর অঞ্চলের একটি বহু পুরাতন দুর্লভ কারুকার্য। (১০)

"সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যখন পাঁথির আকারে হস্তীদন্তের পাত্রে উৎকীর্ণ অভিনন্দন পাঠ করিতে উঠিলেন—তখন স্পষ্টই দেখা গেল বৃদ্ধ সাহিত্যরথী নিতান্তই অভিভূত হইয়াছেন। তাঁহার অভিনন্দনের ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে সত্যের হস্তচিহ্ন দেখাইতে দেখাইতে যেন তাঁর কণ্ঠস্বর বিগলিত হইতে লাগিল—দেহ কম্পায়মান হইল। তিনি গদগদকণ্ঠে কহিলেন—

সা॥হত্য-পরিষৎ কর্তৃক উপহৃত স্বর্ণ পদ্ম বর্তমানে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত

অভিনন্দন

কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়
করকমলেষু

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নবাভ্যুদয়ে নূতন প্রভাতের অরুণ-কিরণ-পাতে যখন নব শতদল বিকশিত হইল, ভারতের সনাতনী বাগ্দেবতা তদুপরি চরণ অর্পণ করিয়া দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি দিগ্বধূগণ প্রসন্ন হইলেন, মরুদগণ সুখে প্রবাহিত হইলেন, বিশ্বদেবগণ অন্তরিক্ষে প্রসাদপুষ্প বর্ষণ করিলেন, উর্ধ্বব্যোমে রুদ্রদেবের অভয়ধ্বনি ঘোষিত হইল, নবপ্রবুদ্ধ সপ্তকোটি নরনারীর হৃদয়মধ্যে ভাবধারা চঞ্চল হইল। বঙ্গের কবিগণ অপূর্ব স্বরলহরীর যোজনা করিয়া দেবীর বন্দনাগানে প্রবৃত্ত হইলেন; মনীষিগণ স্বহস্ত-রচিত কুসুমোপহার তাঁহার শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কবিবর, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অংকশোভা বর্ধন করিয়া বাঙ্গলার মাটি ও বাঙ্গলার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গে নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমা অর্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছি সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জী স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোম কিশোর হস্ত নব নব কুসুমসম্ভার চ করিয়া বাণীর অর্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোম পূর্বগামিগণের স্নিগ্ধনেত্র তোমাকে বা করিল; অনুগামিগণের মুগ্ধনেত্র তোমা পুরস্কৃত করিল; বাগ্দেবতার স্মেরান শুভ্র জ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রা ফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দি মণিমণ্ডিত নানা প্রকোষ্ঠে তুমি বি করিয়াছ; রত্নবেদির পুরোভাগ হই নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবা ভ্রাতাভগিনীকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করির তোমার ভ্রাতাভগিনী দেবপ্রসাদের আন সুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপা অঙ্গুলিপ্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূ অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতে পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগ পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণ করিয়াছ; সুপর্ণরূপিণী গায়ত্রী কর্তৃ গন্ধর্বরক্ষিত অমৃতরসের দেবলোকে ন কালে মর্ত্যোপরি যে ধারাবর্ষণ হইয়া পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষ্কা করিয়া নরলোকে সেই অমৃত-কণি বিতরণে তোমার সহকারিত্ব

---

(৯) জগদিন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণে, বঙ্গ-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামীদের স্মরণ ক'রে পরিশেষে বলেন—

"বঙ্কিমের জীবদ্দশাতেই যে কিশোর রবির কিরণসম্পাতে বঙ্গভারতীর কবিতা-কুঞ্জে কুসুমরাজি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কালক্রমে সেই রবির উজ্জ্বল তেজে আজ সমগ্র ভারতভূমি উজ্জ্বলিত, সেই সাহিত্য-রাজরাজেশ্বর তাঁহার মনোরত্নশালার নিভৃত মণিপ্রকোষ্ঠ হইতে নানাবিধ মহার্ঘ্য ও অমূল্য রত্নরাজি আহরণ করিয়া শিশু সাহিত্যের সর্বাঙ্গ ভূষিত করতঃ বিশ্ব-সাহিত্য-সমাজের নিকটে আজ তাহাকে দাঁড় করাইয়াছেন। অঙ্গদ, কুণ্ডল, বলয়, কেয়ূর প্রভৃতি দিব্যাভরণভূষিত তরুণ বঙ্গ-সাহিত্যের রূপচ্ছটায় দশদিক যে আজ উদ্ভাসিত, ইহা কবিবর, একক তোমারই কৃতিত্বে, তোমারই অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকুণ্ঠিত মুক্তদানের ফলে। আজ তোমার বীণার অমৃতনিস্যন্দী ঝংকারে বঙ্গ-সাহিত্যকুঞ্জের সর্বত্র প্রতিধ্বনিত।...সাহিত্য-নিকুঞ্জের প্রত্যেক পত্রপুষ্পে, বল্লরী ও কিশলয়ে, আজ তোমার সুধাময় সুর অনুরণিত রহিয়াছে।"

—"অর্ঘ্য", বঙ্গদর্শন, মাঘ, ১৩১৮

(১০) সভার লোকেরা উপহারগুলি দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় হস্তিদন্তের ফলকে উৎকীর্ণ অভিনন্দনটি একবার উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিয়া দেখাইলেন।"—শ্রীসীতা দেবী, 'পুণ্যস্মৃতি'

পরিষৎ কর্তৃক উপহৃত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ॥ বর্তমানে শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত

তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ-সংবৎসর তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামাজন্মদা তোমাকে স্নেহপীযূষে বর্ধন করিয়াছে; সেই ভুবনমনোমোহিনীর উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ু কামনা করিতেছেন।

কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
সম্পাদক (১১)

বঙ্গাব্দ ১৩১৮
১৪ মাঘ

"শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পূর্বে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও কিছু বলিয়াছিলেন।...তাঁহার ন্যায় আইন ও গণিত ব্যবসায়ীর শুষ্ক হৃদয়মরুকেও রবীন্দ্রের কাব্যজাহ্নবী কিরূপে সিক্ত ও উর্বরিত করিয়াছে তাহা বর্ণনা করিলেন—প্রমাণ স্বরূপ স্বরচিত এই গীতটি শুনাইলেন—

উঠ বঙ্গভূমি মাতঃ ঘুমায়ে থেকোনা আর
অজ্ঞান তিমিরে তব সুপ্রভাত হলো হের।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মীকি-প্রতিভা', দেখাইতে পুনর্বার।
হের তাহে প্রাণ ভরে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
'মণিময় ধূলিরাশি', খোঁজ যাহা দিবা নিশি,
ওভাবে মজিলে মন, খুঁজিতে চাবে না আর॥

"তাঁহার বক্তব্যে গুণগ্রাহী তীক্ষ্ণদর্শী মনীষী বৃদ্ধ এই কবি-সম্বর্ধনা সভাকে যে বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিলেন—'এই আবালবৃদ্ধবনিতা-শোভিতা সভা' বাস্তবিকই এই সভার অপূর্বতা তিনি একটি বিশেষণে পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। কল্পনা কর টাউন হলের মত স্থানে এমন বিরাট সভা, তার প্রায় অর্ধেক বঙ্গদুহিতৃগণে ভরা।...যে সকল মেয়েরা জন্মে কখনও টাউন হল দেখেন নাই তাঁহারাও আজ কর্তব্যবোধে কেবলমাত্র দেশপূজ্য কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাহাতে আজিকার সভার মান কত বাড়িয়া গিয়াছে—আর তাহার কি সুন্দর শোভাই হইয়াছে। অগণিত পুরুষরাজির মধ্যে বিদ্যুজ্জ্যোতিবৎ এক একটি বঙ্গললনার মুখ যখন নয়নে প্রতিভাত হইতেছে তখন মনে হইতেছে আজি এ সভা ধন্যা, কবি ধন্য, মাতা বঙ্গভূমি ধন্যা...।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, "কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, মেয়েদের হাত দিয়া কবিকে পুষ্প-অর্ঘ্য প্রদান করা হইবে।" (১৩) রবীন্দ্রনাথ অভিনন্দনের উত্তর দেবার পর "ডাক পড়িল মেয়েদের পুষ্প-অর্ঘ্য দিবার জন্য। অনেক ঠেলাঠেলির পর একটা রাস্তা পরিষ্কার হইল এবং বালিকারা সকলে অগ্রসর হইয়া গেলাম। দুই-চারিজন মহিলাও আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ হাসামুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুষ্প উপহার গ্রহণ করিলেন। তাহার পর সাহিত্যিক-বৃন্দ তাঁহাদের পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক [ঔপন্যাসিক] প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়...লোকের ভিড়ে কিছুতেই অগ্রসর হইতে না পারিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবশেষে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া সামনে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তিনিও কবির হাতে ফুলের তোড়া উপহার দিলেন। সংগীত ও ঐকতান-বাদ্যের পর সভাভঙ্গ হইল। প্রবল জয়ধ্বনির ভিতর রবীন্দ্রনাথ বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার গাড়ি আগাগোড়া ফুলে সজ্জিত করা হইল।" (১৩)

---

(১১) সরলাদেবীর প্রবন্ধে অভিনন্দন-পত্রটি আংশিক মুদ্রিত আছে, এখানে সম্পূর্ণ অভিনন্দনপত্রটি উদ্ধৃত করা গেল।

শ্রীসীতাদেবী পুণ্যস্মৃতি গ্রন্থে (১৩৪৯) এই অভিনন্দন পাঠ-প্রসঙ্গে লিখছেন—

"তাঁহার [রামেন্দ্রসুন্দরের] সেই আনন্দবিকশিত মুখ মনে পড়ে। কেমন জলদগম্ভীরস্বরে 'কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন' বলিয়া শেষ করিলেন, তাহা এখনও কানে বাজিতেছে।"

(১২) বাল্মীকি-প্রতিভার প্রথম অভিনয় (১২৮৮) দর্শনে মুগ্ধ হয়ে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কবিতাটি লিখেছিলেন। সর্বজনবিদিত হলেও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এই অভিনয়ে বাল্মীকির ভূমিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এবং কবিতায় উদ্ধৃত 'মণিময় ধূলিরাশি' ছত্রাংশ, দেবী সরস্বতীর ধ্যানরত বাল্মীকির লক্ষ্মীকে প্রত্যাখ্যান থেকে গৃহীত—

'কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা!
তুমি তো নহ সে দেবী, কমলাসনা—
কোরো না আমারে ছলনা!
কি এনেছ ধন-মান!
তাহা যে চাহে না প্রাণ।
দেবীগো, চাহি না চাহি না,
মণিময় ধূলিরাশি চাহি না....
যে বীণা শুনেছি কানে,
মন প্রাণ আছে ভোর,
আর কিছু চাহি না চাহি না।'

(১৩) শ্রীসীতা দেবী, 'পুণ্যস্মৃতি'

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তরের সারসংক্ষেপ সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিকা (১৩১৯) থেকে উদ্ধৃত হল—

"আজ আমার দেশজননীর আশীর্বাদ শিরোধার্য করিয়া লইয়া যদি আমি নীরবে প্রণাম করিয়া বসিতে পারিতাম, তবেই আমার পক্ষে ভাল হইত। আজ আমার কিছু বলিবার শক্তি নাই, আমার কণ্ঠ অবরুদ্ধ, আমার ভাষা প্রতিহত। এত বড় সম্মানের সম্মুখে নিজের ক্ষুদ্রতা অত্যন্ত পীড়াদায়ক-রূপে আমাকে সংকুচিত করিতেছে। এতদিন যে তপস্যা করিয়াছি, তাহার সিদ্ধি যখন আজ রূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহাকে অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করিতে পারি এমন শক্তি নিজের মধ্যে অনুভব করিতেছি না। এই সঙ্কোচ অনেকদিন হইতেই আমাকে বেদনা দিতেছে। কেবল একটি কথা চিন্তা করিয়া আমি মনের মধ্যে বল পাইয়াছি, আমি নিশ্চয় জানি, আজ আপনারা যে সম্মান দান করিলেন, সে সম্মান আপনারা বঙ্গসাহিত্যকেই দিলেন, আমি তাহার উপলক্ষ মাত্র। এমন একদিন ছিল, সাহিত্য যখন কোন ধনিবংশকে, কোন রাজসভাকে অবলম্বন করিয়া পালিত হইত, আজ সেই তাহার সংকীর্ণ ও কৃত্রিম আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সাহিত্য সমস্ত জাতির চিত্তে আপনার সত্যপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আজ তাই বাঙ্গালী বাঙ্গালা সাহিত্যকে আপনার চিরদিনের হৃদয়ের ধন জানিয়া তাহাকে আদর জানাইবার আয়োজন করিয়াছে। এই শুভ মুহূর্তে সেই সমাদরের বাহনরূপে আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, ইহার চেয়ে গৌরবের কথা আমার পক্ষে আর কিছুই নাই। আপনাদের এই মাল্যচন্দন এই অর্ঘ্যপাত্র আমি নতশিরে বহন করিয়া বঙ্গবাসীর মন্দিরে তাহা নিবেদন করিয়া দিব। আপনারা আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।"

"Rabindranath Honoured: Red Letter Day in Bengali Literature" এই আখ্যায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বেঙ্গলি' পত্র (১৪) এই সংবর্ধনা-সভার বিবরণ প্রকাশ উপলক্ষ্যে যে মন্তব্য করেছিলেন, তা উদ্ধৃত করে বর্তমান প্রসঙ্গ সমাপ্ত করি (১৫)—

On Sunday afternoon, at the instance of the Sahitya Parishad, a meeting was held at the Town Hall, which marked a unique event in the history of Bengali Literature. Bengalis, young and old, ladies and gentlemen, professors and teachers, doctors and merchants, traders and shop-keepers, lawyers and journalists, students of colleges and schools, besides writers, authors and poets, every one of whom must owe his or her allegiance to the personage, whose great personality had inspired the sentiment that found audible expression and visible demonstration on the occasion, assembled in their thousands to congratúlate our Poet

---

(১৪) সোমবার, ২৯শে জানুয়ারি, ১৯১২। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের শ্রীঅমল হোম-সম্পাদিত রবীন্দ্র-স্মৃতি-সংখ্যা (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪১) পত্রে পুনর্মুদ্রিত ও সেখান থেকে বর্তমান সংকলনে গৃহীত।

(১৫) "সাহিত্য-পরিষদের ছাত্রসভার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ছাত্র-সভ্যগণ একটি সান্ধ্যসম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন [১৯? মাঘ, ১৩১৮], এই সান্ধ্যসম্মিলনে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ মহোদয়গণ উপস্থিত হইয়া ছাত্র-সভ্যগণের উৎসাহ বর্ধন করেন। কবিবর আগমন করিলে তাঁহার কণ্ঠে মাল্য প্রদান করা হয় এবং ছাত্রসভ্যগণ কর্তৃক রচিত কবিতা কবিবরকে অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদত্ত হয়। রবীন্দ্রবাবু এই উপলক্ষে একটি অতি উপাদেয় সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত ছাত্র-সভ্যগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। অতঃপর ছাত্রসভ্যগণের অনুরোধে রবীন্দ্রবাবু একটি গান করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিলেন। জলযোগের পর সম্মেলনের কার্য শেষ হয়...

"কবিবরের অভ্যর্থনার জন্য সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে সম্বর্ধনা-সমিতি একটি সান্ধ্য-সম্মিলন আহ্বান করেন [২০? মাঘ, ১৩১৮]। এতদুপলক্ষে পরিষৎ-মন্দির সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং সম্বর্ধনা-সমিতি যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীতের এবং পরিশেষে জলযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের কতিপয় ছাত্রসভ্য কবিবরের রচিত 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয় করেন। ......এই সান্ধ্য-সম্মিলনে অনেক মহিলা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।" —সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩১৯।

সাহিত্য-পরিষদে একটি আনন্দসম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ ১৩১৮ ফাল্গুন-সংখ্যা ভারতী পত্রে 'অভিভাষণ' নামে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর সংকলিত তাঁর 'আত্মপরিচয়' (১ বৈশাখ, ১৩৫০) গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে, সেইজন্য এখানে আর উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক।

Rabindranath on his having completed his fiftieth birthday. A demonstration which had no semblance or connection with matters social or political, or religious, except that the congratulations had a religious aspect about it in the fact that the outpourings of love and joy and gratitude towards the poet were all heavily leavened with a religious devotion to him ; still the attendance was so large as would puzzle a frequent visitor to the Town Hall on demonstrative occasions, nay, the veriest meeting-hunter, as to how a meeting evidently of litterateurs could be so well-attended. A journalist of old, say the late Pandit Dwarkanath Vidyabhushan, if he had chosen to descend in his ethereal form and have a look at the audience, would have been confused why shopkeepers, who in his days were

either illiterate or would not read a Bengali book without much spelling, should be in a meeting like that, and, in spite of jostling and pushing and congesting to profuse perspiration, they should be waiting till the end. Really, the demonstration marked a new era. The litterateurs of the province are not to be counted now-a-days on fingers' end. Love of literature and of authors and poets, a strong love for the mother-tongue has penetrated the jute-mills, drapery shops, doctors' dispensaries, pundits' tols, even the green-grocers' stalls. So Rabindranath, the King among Bengali poets and authors, is surely the lord of his fellow writers in the same way, as of those who have no pretence to being literary men. That the bright rays of the Sun (Rabi) still at his meridian of poetic genius, though considerably past the meridian physically, have enlightened fair creatures behind the purda, and he holds quite undisputed a sway over the fair sex as over the stern. His suzerainty over the former was evidenced by the large number of ladies attending the meeting and paying homage to the poet.

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে সংবর্ধনা
শান্তিনিকেতন ৭ অগ্রহায়ণ ১৩২০

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পটভূমিকা সম্বন্ধে দেশ পত্রে ও অন্যত্র অনেক আলোচনা হয়েছে—সম্বর্ধনাসভার ও আনুষঙ্গিক বিবরণ প্রকাশই বর্তমান সংকলনের উদ্দেশ্য।

এই প্রসঙ্গে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির সংবাদ এ দেশে পৌঁছলে কিরকম উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল এখানে তার সামান্য বিবরণ দিলে বোধ করি অবান্তর হবে না। শান্তিনিকেতনের বিষয় শ্রীসীতা দেবী "পুণ্যস্মৃতি"তে লিখেছেন—

"[শুনিয়াছি] শান্তিনিকেতনে সেদিন মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, এমন কি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও নাকি নীচু বাংলা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ভ্রাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন, 'রবি, তুই নোবেল প্রাইজ পেয়েছিস!'......স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অবিচলিতই ছিলেন শুনিয়াছি। টেলিগ্রামখানি উপস্থিত এক অধ্যাপকের [নেপালচন্দ্র রায়?] দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, 'আপনাদের বাড়ি তৈরি

হল।' বিদ্যালয়ের জন্য কি একটি বড় বাড়ি তখন হওয়ার কথা চলিতেছিল, অর্থাভাবে আরম্ভ হয় নাই।" [বাড়ি কি অন্য কিছু, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন কাহিনী আছে, তবে মোট কথাটা একই]।

কবিচরিতকার এডওয়ার্ড টমসন এ সময় শান্তিনিকেতনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছেন—

"On the evening of a day in the first [?] week of November 1913], when I was staying at Santiniketan, suddenly a hubbub arose, and the masters rushed up with a sheaf of telegrams. "We have great news. Mr. Tagore has won the Nobel Prize." A minute later he entered. It was a time of great happiness for us all. The boys did not know what the Nobel Prize was, but they understood that their *Gurudeb* had done something wonderful, as he was always doing. They formed ranks and marched round the *asram*, singing *Amader Santiniketan*. They would not go into the guest house a second time, but gathered at the door till the poet went into it. He was greeted with a frenzy of worship, one after another throwing himself down and touching his feet. He stood with hands to his face, palms together, deprecating their homage; and, when Ajit Chakravarti flung himself down, he tried to stop him. Everyone shouted and sang. At last the boys dispersed and made a huge bonfire." — *Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist* (1926), pp. 232-33.

"......This rush of success embarrased as much as it cheered. I was his guest when the wire came announcing the Nobel award, and I can testify that its first effect was depression. 'I shall never have any peace again,' was his cry. It was a night of wild excitement without, the Santiniketan boys parading the grounds singing, the masters as excited as they. But within, the poet was troubled with misgivings for the future......"—*Rabindranath Tagore, His Life and Work* (1921), p. 44.

কলকাতায় এই সংবাদ পেৌছলে শিক্ষিত সমাজে স্বভাবতই কি রকম উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল শ্রীসীতা দেবী 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থে তার আভাস দিয়েছেন—

"১৪ই নবেম্বর কলেজ হইতে ফিরিবামাত্র শুনিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। কলিকাতা শহরে মহা হৈ চৈ বাধিয়া গেল। শুনিলাম কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সর্বপ্রথম কবিকে এই খবর টেলিগ্রামে জানাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে টেলিগ্রাম লিখিতে জানিতেন না, অন্য কাহাকে দিয়া লিখাইতে গিয়া দেরি হইয়া গেল, তাঁহার আগেই আর একজন টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিলেন।"

কবির একান্ত অনুরাগী ভক্ত সত্যেন্দ্রনাথ এই সংবাদে কিরকম আনন্দবিহ্বল হয়েছিলেন তাঁর প্রিয় সুহৃৎ চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের পরলোকগমনের পর ১৩২৯ শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে "সত্যেন্দ্র-পরিচয়" প্রবন্ধে তার যে বিবরণ দিয়েছেন এখানে তা উদ্ধারযোগ্য—

"সেবার রবীন্দ্রনাথ বিলেতে গিয়ে গীতাঞ্জলির অনুবাদ করে খুব নাম করেছেন। কবিসুলভ দূরদৃষ্টির অনুভবে সত্যেন্দ্র প্রায়ই বলতেন—'এবার রবিবাবু নোবেল প্রাইজ পান ত ঠিক হয়।' একদিন আমি প্রবাসী আপিসে প্রুফের মধ্যে নিমগ্ন হয়ে আছি; বেলা তখন তিনটে হবে; সত্যেন্দ্র হঠাৎ আমার ঘরে ঢুকেই বলে উঠলেন—'আমি তোমায় মারব।' প্রুফ থেকে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, উল্লাসে সত্যেন্দ্র যেন প্রাইজ পেয়েছেন?' এ আন্দাজ আমি করতে উপ্‌চে পড়েছেন—সেই আনন্দ যে কিসে প্রকাশ করবেন তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'কি এমন সুখবর যে আমায় মারতে ইচ্ছে করছে?' সত্যেন্দ্র বললেন—'আন্দাজ করো!' সত্যেন্দ্রের হাতে একখানা এম্পায়ার খবরের

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে কবি-সংবর্ধনা ॥ হিমাংশু মোহন গুপ্ত কর্তৃক গৃহীত চিত্র

কাগজ দেখে বললাম—'রবিবাবু নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন?' এ আন্দাজ আমি করতে পেরেছিলাম সত্যেন্দ্রের কাছে এর আগে বহুবার এই ঘটনার সম্ভাবনার উল্লেখ শুনেছিলাম বলে। সত্যেন্দ্র কাগজখানা টেবিলের উপর মেলে ধরে, শুধু খবরটা দেখালেন, কিছু বলতে পারলেন না। তার পর বললেন—'আজ আর কিছু কাজ নয়, আজ ছুটি! ছুটে বেরিয়ে পড়!' আমি বললাম—'রবিবাবুকে টেলিগ্রাম করেছ?' সত্যেন্দ্র বললেন, 'আমি......নগেন গাঙ্গুলীর কাছে এস্প্লানেডে শুনেই কাগজ কিনে নিয়ে তোমাকে খবর দিতে ছুটে এসেছি। টেলিগ্রাম ত আমি করতে জানি না—তুমি যা হয় করো।' তখন আমরা দুজনে কান্তিক প্রেসে গিয়ে মণিলালকে খবর দিলাম; আর তিনজনের নামে রবিবাবুকে টেলিগ্রাম করলাম আমাদের সানন্দ প্রণাম জানিয়ে—Nobel Prize, our pranams। আমাদের টেলিগ্রামটা নগেনবাবুর টেলিগ্রামের পরে রবিবাবুর কাছে পেঁছেছিল, তাতে সত্যেন্দ্র ক্ষুন্ন হয়ে বলেছিলেন—'আমি টেলিগ্রাম করতে জানলে আমিই আগে খবর দিতে পারতাম।'"

নোবেল প্রাইজের সংবাদে "কলিকাতা শহরে মহা হৈ চৈ বাধিয়া গেল।"(১৬) "কলিকাতা হইতে স্পেশ্যাল ট্রেনে শান্তিনিকেতনে গিয়া রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করার প্রস্তাব চলিতে লাগিল।"(১৬). এই অভিনন্দন-উৎসবের একজন যাত্রী মানসী পত্রে (পৌষ ১৩২০) এই অনুষ্ঠানের যে-আনুপূর্বিক বিবরণ প্রকাশ করেন তা এখানে উদ্ধৃত করি (১৭)—

"কলিকাতার বঙ্গীয়শিক্ষিতসমাজ, জৈন সম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রতিনিধি, মুসলমানগণের পক্ষ হইতে আবুল কাসেম ও ইংরাজের তরফ হইতে দুইজন সাহেব, মোট ৫০০ নরনারী রবীন্দ্রবাবুকে সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত ২৩শে নবেম্বর [১৯১৩] রবিবার বেলা ১০টা ৫৫ মিনিটের সময় স্পেশাল ট্রেনে বোলপুর গমন করিয়াছিলেন।...বেলা আন্দাজ তিনটার সময় গাড়ি বোলপুর পেঁছিল। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বালকগণ এবং রেভারেন্ড আন্[ড্রুজ] [সি এফ অ্যাণ্ড্রুজ] ধুতি-চাদর পরিধান করিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত প্লাটফরমে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বালকগণ ধান্যশীর্ষ ও কাশপুষ্প হস্তে শোভাযাত্রা শোভা সম্পাদন করিয়াছিল।... ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকগণ মধুরকণ্ঠে সঙ্গীত-সুধাধারা বর্ষণ করিতে করিতে জনতার অগ্রে আহ্বান করিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহারা গাইতেছিলেন—

মোদের তরুমূলের মেলা
মোদের খোলা মাঠের খেলা
মোদের নীল গগনের সোহাগমাখা
সকাল সন্ধ্যাবেলা॥

---

(১৬) শ্রীসীতা দেবী, পুণ্যস্মৃতি।

(১৭) ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "বোলপুরে রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা", মানসী পৌষ ১৩২০। প্রবন্ধটি এই সংকলনে অংশতঃ উদ্ধৃত হল; সম্বর্ধনার আনুষঙ্গিক বিবরণে যাঁরা কৌতূহলী তাঁরা সম্পূর্ণ লেখাটিই পড়বেন। শ্রীসীতাদেবীর 'পুণ্যস্মৃতি' গ্রন্থেও (পৃ ১১৯—১৩১) চিত্তাকর্ষক অনেক আনুষঙ্গিক তথ্য আছে, এখানে তার সামান্যই উদ্ধৃত করা সম্ভব।

কৌতূহলী কেউ সমসাময়িক সংবাদপত্রাদি দেখলে এ বিষয়ে আরো তথ্য ও মন্তব্যাদি সংগ্রহ করতে পারেন। সঞ্জীবনী পত্রে (২৮ নভেম্বর ১৯১৩) এই সভার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু পত্রিকাটি দেখবার সুযোগ ঘটেনি। এই পত্রিকা থেকেই রবীন্দ্রনাথের উত্তর ক্যালকাটা মিউনিসিপাল গেজেটের রবীন্দ্রস্মৃতিসংখ্যায় উদ্ধৃত হয়, ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও প্রবন্ধে সঞ্জীবনী থেকে উদ্ধৃত থাকবেন; বর্তমান সংকলনে প্রকাশিত উত্তর ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ গৃহীত।

"...পথের দুই ধারে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। এ অঞ্চলের অধিবাসিগণ বোধহয় বোলপুরের পল্লী-পথে জীবনে কোনদিন এত ভদ্রজন সংঘ পরিদর্শন করে নাই।...সত্য বলিতে কি, সেদিনকার মত এত লোক এক সংগে, এক সময়ে, এক উদ্দেশ্যে যাইতে বড় দেখা যায় না।...

"আশ্রম প্রবেশপথের অল্প দূরে হইতে ঘন ঘন শংখধ্বনি হইতে লাগিল।...লতাপত্র-শোভিত আশ্রমতোরণমুখে আম্রপল্লবপূর্ণ কুম্ভ, কদলীবৃক্ষ সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল। —আশ্রমে প্রবেশ করিতে বামপার্শ্বে এক একটি নবনির্মিত মৃত্তিকার স্তূপের উপর অর্ঘ্য, বস্ত্র, দীপ ও দর্পণ, কজ্জল, শংখ, ষোড়শোপচারে সকল দ্রব্যগুলি ও মাংগলিক নানাবিধ দ্রব্য স্তরে স্তরে সজ্জিত করা হইয়াছিল। ধূপ-ধুনা-পুষ্প ও চন্দন সুরভিতে চতুর্দিক ভরিয়া গিয়াছিল—গৈরিকবসনাবৃত শিশুগণের অকলংক হাস্য ও ব্যস্ততার মধ্যে সেই অতীত যুগের পবিত্র তপোবনের পবিত্রতা যেন স্বপ্নের মত আমাদের ক্ষণকালের নিমিত্ত আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিতেই সকলের ললাট চন্দনচর্চিত করিয়া দেওয়া হইল। তরু-মূলেই এই উৎসবের আয়োজন করা হইয়াছিল। সেখানেই সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। মধ্যে খানিকটা স্থান গোময়-পরিলিপ্ত করিয়া পুষ্প-চন্দন-ধূপ-ধুনা রক্ষা করা হইয়াছিল। তাহারই পার্শ্বে মহিলারা আসন গ্রহণ করিলেন। যথারীতি মঙ্গল-সংগীত গীত হইল। তারপর জষ্টিস আশুবাবুর [আশুতোষ চৌধুরীর] প্রস্তাবে ও ভূপেনবাবুর [ভূপেন্দ্রনাথ বসুর] অনুমোদনে ডাক্তার জগদীশ বসু মহাশয় সভাপতির আসন অলংকৃত করিলেন। অতঃপর হীরেন্দ্রবাবু [হীরেন্দ্রনাথ দত্ত]...অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিলেন।"

অভিনন্দনপত্রটির একটি প্রতি শ্রীসুহৃৎ-কুমার গুপ্তের কাছে রক্ষিত আছে, তাঁর সৌজন্যে সেটি মুদ্রিত হল—

যাঁহার কাব্যবীণায় বিকাশোন্মুখ শিশু-হৃদয়ের প্রভাতী কাকলী হইতে অধ্যাত্ম-রাগ-রঞ্জিত প্রৌঢ়-বৈরাগ্যের বৈকালী সুর পর্যন্ত নিখিল রাগিণী নিঃশেষে ধ্বনিত হইয়াছে, যাঁহার নব-নব-উন্মেষ-শালিনী প্রতিভার অজস্র কিরণসম্পাতে বংগীয় নরনারীর দৈনন্দিন জীবন আজ সমুজ্জ্বল, যিনি বিশেষভাবে বাঙালীর জাতীয় কবি হইয়াও সার্বভৌমিক গুণিগণের গণনায় জগতের কবি সভায় সম্মানের মহোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই ভাব ও জ্ঞান-রাজ্যের বর্তমান সম্রাট ধ্যানরসিক স্বদেশের

প্রিয়তম কবি
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে
বংগের আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রদ্ধার স্রক্‌চন্দনে
অভিনন্দিত করিতেছে।
৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২০ বংগাব্দ।(১৮)

"এইবার ডাক্তার জগদীশবাবু, চুনীবাবু [চুনীলাল বসু], ভূপেনবাবু প্রমুখ ব্যক্তিগণ রবিবাবুকে সভায় আহ্বান করিয়া আনিতে

(১৮) ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে এই অভিনন্দনপত্র সম্বন্ধে লিখেছেন, "শুনিলাম কবি সত্যেন্দ্রনাথ [দত্ত] তাহার মুসাবিদা করিয়াছেন।" বিপিনচন্দ্র পাল এই সংবর্ধনা প্রসংগে লিখিত প্রবন্ধে অভিনন্দনপত্রটির তীব্র সমালোচনা করে-ছিলেন।

যাঁহার কাব্যবীণায় বিকাশোন্মুখ শিশু-হৃদয়ের প্রভাতী কাকলী হইতে অধ্যাত্ম-রাগ-রঞ্জিত প্রৌঢ়-বৈরাগ্যের বৈকালী সুর পর্যন্ত নিখিল রাগিণী নিঃশেষে ধ্বনিত হইয়াছে, যাঁহার নব-নব-উন্মেষ-শালিনী প্রতিভার অজস্র কিরণসম্পাতে বঙ্গীয় নরনারীর দৈনন্দিন জীবন আজ সমুজ্জ্বল, যিনি বিশেষ ভাবে বাঙ্গালীর জাতীয় কবি হইয়াও সার্বভৌমিক গুণিগণের গণনায় জগতের কবি বলিয়া সম্মানের সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই জ্ঞান ও ভাব রাজ্যের বর্তমান সম্রাট ধ্যানরসিক স্বদেশের প্রিয়তম কবি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে

বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা শ্রদ্ধার অর্ঘচন্দনে

অভিনন্দিত করিতেছে।

৭ই অগ্রহায়ণ ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

Sanyal Photo.

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে সংবর্ধনার অভিনন্দনপত্র

শ্রীসুহৃৎকুমার গুপ্তের সৌজন্যে

গেলেন। তিনি পট্টবস্ত্রাবৃত ও চন্দনচর্চিত-ভাল ধীরপদে সভায় উপস্থিত হইলেন। হীরেন্দ্রবাবু পুনরায় অভিনন্দনটি পাঠ করিলে জগদীশবাবু রবিবাবুর কণ্ঠে মালা পরাইয়া দিলেন(১৯) তারপর সকল সম্প্রদায় হইতে যথারীতি অভিনন্দন করা হইল।"(২০)

এই সকল অভিনন্দনের বিবরণ যতটুকু পেয়েছি তা উদ্ধৃত করি—

"স্বর্গীয় পূরণচাঁদ নাহার মহাশয়ই বোধহয় কবিকে একটি জরির স্তবকের মালা পরাইলেন, আতর উপহার দিলেন এবং হিন্দী একটি কবিতার দুই লাইন আবৃত্তি করিলেন, তাহার অর্থ এই যে আকাশের রবিরও যেখানে প্রবেশাধিকার নাই, কবি সেখানেও প্রবেশ করিতে পারেন।...একজন মুসলমান ভদ্রলোক [আবুল কাশেম?] এবং জন-দুই ইংরেজও [মিঃ গর্ডন মিলবার্ন ও মিঃ হল্যান্ড] বক্তৃতা করিলেন।"(২১)

মিঃ মিলবার্ন বলেন—

"আপনার কবিতা পাঠ করিয়া আমরা এই

---

(১৯) "জগদীশচন্দ্র...ছোট মাটির টবে বসানো একটি লজ্জাবতী লতা তাঁহাকে উপহার দিলেন।"—শ্রীসীতা দেবী, পুণ্য-স্মৃতি, পৃ ১২৪

সকলেই জানেন, জগদীশচন্দ্রের যে বিজ্ঞান-সাধনায় রবীন্দ্রনাথ একদা বিশেষ আনুকূল্য করেছেন লজ্জাবতী লতা সেই সাধনার একটি প্রতীক; জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত রবীন্দ্র-নাথের খেয়া-কাব্যের (১৩১৩) উৎসর্গ-কবিতা 'বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা'ও এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে পড়বে।

(২০) ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ

১২৪

(২১) শ্রীসীতা দেবী, 'পুণ্যস্মৃতি', পৃ
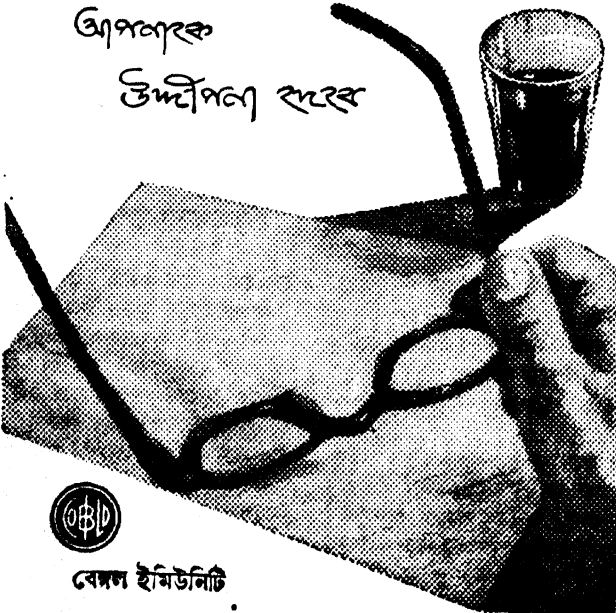
বিশাল বিশ্ব-ব্যাপার এক নূতনভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি, যাহা আমরা আর পূর্বে কখনও করিতে পারি নাই। আমি একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট আছি। আমি আনন্দের সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, আপনার 'গীতাঞ্জলি'র অনেকগুলি স্তোত্র আমাদের শাস্ত্রোক্ত উপাসনা-মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।"

মিঃ হল্যান্ড বলেন—

"মহাশয়, আমাদের দেশের একজন কবি বলিয়াছিলেন, 'যিনি দয়া প্রদর্শন করেন এবং যাহার প্রতি দয়া প্রদর্শিত হয়, তাঁহারা উভয়েই আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।' সম্মান সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ কথা বলা যায়। বাস্তবিক, জগতের কবি-সভায় আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে পুরস্কৃত করিয়া, ইউরোপ সমগ্র সভ্যসমাজে গৌরবান্বিত হইয়াছে। আজ আপনার সম্মানে যদি কাহারও অধিক আনন্দের কারণ থাকে, তবে সে ইউরোপের; আমি আজ আপনার সম্মুখে সেই আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিয়াছি। বহুকাল পর্যন্ত প্রতীচ্য দেশ ভারতবর্ষকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, আজ আপনার পুরস্কার সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। পন্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই বলিবেন যে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন অসম্ভব, কিন্তু আপনাকে এই বৎসর যে পুরস্কার প্রদত্ত হইল, তাহার ফলে পণ্ডিতগণের এই উক্তি খণ্ডিত হইয়া গেল, পূর্ব-পশ্চিমে মিলন হইল—আর এ মিলন কোন সম্প্রদায়বিশেষের দেব-মন্দিরে নহে—যেখানে নিত্যজ্যোতির্ময় পরমাত্মার প্রকাশ, এ মিলন সেই অধ্যাত্মরাজ্যে।"(২২)

"অভিনন্দনাদি প্রদান করিবার পর কবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবীন্দ্রের অসীম শক্তি ও গুণরাশি বর্ণনা করিয়া একটি কবিতা পাঠ করিলেন।"(২৩)

"সকলের বলা শেষ হইবার পর রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন। আগে শুনিয়াছিলাম তিনি বক্তৃতা করিবেন না, অভিনন্দনের উত্তর স্বরূপ কিছুকাল পূর্বে রচিত 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে' গানটি গাহিবেন। বোধহয় আর কিছু বলিবার সংকল্প প্রথমত তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহাকে প্রিয়তমের মত ভালবাসিয়াছে এমন বাঙালীরও যেমন অভাব নাই এবং ছিলও না, তেমনি চিরকাল তাঁহাকে বিদ্বেষ করিয়াছে এবং লোকচক্ষে

---

(২২) মিঃ মিলবার্ন ও মিঃ হল্যান্ডের বক্তৃতা সঞ্জীবনী পত্র থেকে বিনয়কুমার সরকারের 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী' গ্রন্থে মুদ্রিত, পৃ ৩৫—৩৭

(২৩) ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ। কবিতাটির নাম 'আভ্যুদয়িক'।

হীন করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এমন বাঙালীরও অভাব তখন ছিল না। এই রকম কয়েকটি ব্যক্তি সভাস্থলে খুব সামনে আসিয়া বসিয়াছিলেন। ইঁহাদের দেখিয়াই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের মত পরিবর্তিত হইয়া গেল। কপটতা ও অসত্যের প্রতি তাঁহার যে মর্মান্তিক ঘৃণা ছিল তাহা অনলবর্ষী ভাষায় রূপ ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল।"(২৪)

রবীন্দ্রনাথের বহু-আলোচিত এই ভাষণ নিম্নে উদ্ধৃত হল—

"আজ আমাকে সমস্ত দেশের নামে আপনারা যে সম্মান দিতে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তা অসংকোচে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করি, এমন সাধ্য আমার নেই।

"যাঁরা জনসাধারণের নেতা, যাঁরা কর্মবীর, সর্বসাধারণের সম্মান তাঁদেরই প্রাপ্য এবং জন-পরিচালনার কাজে সেই সম্মানে তাঁদের প্রয়োজনও আছে। যাঁরা লক্ষ্মীকে উদ্ধার করবার জন্যে বিধাতার মন্থনদণ্ডস্বরূপ হয়ে মন্থর পর্বতের মত জনসমুদ্র মন্থন করেন, জনতাতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে তাঁদের ললাটকে সম্মানধারায় অভিষিক্ত করবে, এইটেই সত্য, এইটেই স্বাভাবিক।

"কিন্তু কবির সে ভাগ্য নয়। মানুষের হৃদয়ক্ষেত্রেই কবির কাজ এবং সেই হৃদয়ের প্রীতিতেই তাঁর কবিত্বের সার্থকতা। কিন্তু এই হৃদয়ের নিয়ম বিচিত্র—সেখানে কোথাও মেঘ কোথাও রৌদ্র। অতএব প্রীতির ফসলেই যখন কবির দাবী তখন একথা তাঁর বলা চলবে না যে, নির্বিশেষে সর্ব-সাধারণেরই প্রীতি তিনি লাভ করবেন। যাঁরা যজ্ঞের হোমাগ্নি জ্বালাবেন তাঁরা সমস্ত গাছটাকেই ইন্ধনরূপে গ্রহণ করতে পারেন, আর মালা গাঁথার ভার যাঁদের উপরে তাঁদের অধিকার কেবলমাত্র শাখার প্রান্ত ও পল্লবের অন্তরাল থেকে দুটি চারিটি করে ফুল চয়ন করা।

"কবিবিশেষের কাব্যে কেউ বা আনন্দ পান, কেউ বা উদাসীন থাকেন, কারো বা তাতে আঘাত লাগে এবং তাঁরা আঘাত দেন। আমার কাব্য সম্বন্ধেও এই স্বভাবের নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম হয়নি, একথা আমার এবং আপনাদের জানা আছে। দেশের লোকের হাত থেকে যে অপযশ ও অপমান আমার ভাগ্যে পোঁচেছে, তার পরিমাণ নিতান্ত অল্প হয়নি এবং এতকাল আমি তা নিঃশব্দে বহন করে এসেছি। এমন সময় কি জন্য যে বিদেশ হতে আমি সম্মান লাভ করলুম তা এখনো পর্যন্ত আমি নিজেই ভালো করে উপলব্ধি করতে পারিনি। আমি সমুদ্রের পূর্বতীরে বসে যাঁকে পূজার অঞ্জলি দিয়েছিলাম তিনিই সমুদ্রের পশ্চিম তীরে সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করবার জন্যে যে তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করেছিলেন, সে কথা আমি জানতুম না। তাঁর সেই প্রসাদ আমি লাভ করেছি এই আমার সত্য লাভ।

"যাই হোক, যে কারণেই হোক, আজ য়ুরোপে আমাকে সম্মানের বরমাল্য দান করেছেন। তার যদি কোনো মূল্য থাকে তবে সে কেবল সেখানকার গুণিজনের রসবোধের মধ্যেই আছে, আমাদের দেশের সংগে তার কোনও আন্তরিক সম্বন্ধ নেই। নোবেল প্রাইজের দ্বারা কোনো রচনার গুণ বা রসবৃদ্ধি করতে পারে না।

(২৪) শ্রীসীতা দেবী, পুণ্যস্মৃতি।

জগদীশচন্দ্র বসুর কোনো নিকট আত্মীয়ের কাছে শুনেছি যে, জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাষণে বিস্ময় প্রকাশ করায় রবীন্দ্রনাথ কৈফিয়ত স্বরূপে বলেন যে, সেদিনই ডাকযোগে তিনি এই সম্বর্ধনা প্রসংগে কটূক্তিপূর্ণ একখানি চিঠি পেয়েছিলেন, যা পড়ে সেদিন তার মন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ছিল।

"অতএব আজ যখন সমস্ত দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে আপনারা আমাকে সম্মান উপহার দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন সে সম্মান কেমন করে আমি নির্লজ্জভাবে গ্রহণ করব? এ সম্মান আমি কতদিনই বা রক্ষা করব? আমার আজকের এ দিন ত চিরদিন থাকবে না, আবার ভাটার বেলা আসছে, তখন পঙ্কতলের সমস্ত দৈন্য আবার ত ধাপে ধাপে প্রকাশ হতে থাকবে।

"তাই আমি আপনাদের কাছে করজোড়ে জানাচ্ছি যা সত্য তা কঠিন হলেও আমি মাথায় করে নেব, কিন্তু যা সাময়িক উত্তেজনার মায়া তা আমি স্বীকার করে নিতে অক্ষম। কোনো কোনো দেশে বন্ধু ও অতিথিদের সুরা দিয়ে অভ্যর্থনা করা হয়। আজ আপনারা আদর করে সম্মানের যে সুরাপাত্র আমার সম্মুখে ধরেছেন তা আমি তা আমি ওষ্ঠের কাছে পর্যন্ত ঠেকাব, কিন্তু এ মদিরা আমি অন্তরে গ্রহণ করতে পারব না। এর মত্ততা থেকে আমার চিত্তকে আমি দূরে রাখতে চাই। আমার রচনার দ্বারা আপনাদের যাঁদের কাছ থেকে আমি প্রীতিলাভ করেছি তাঁরা আমাকে অনেকদিন পূর্বেই দুর্লভ ধনে পুরস্কৃত করেছেন, কিন্তু সাধারণের কাছ থেকে নূতন সম্মান লাভের কোনো যোগ্যতা আমি নূতন রূপে প্রকাশ করেছি এ কথা বলা অসংগত হবে।

"যিনি প্রসন্ন হলে অসম্মানের প্রত্যেক কাঁটাটি ফুল হয়ে ফোটে, প্রত্যেক পঙ্কপ্রলেপ চন্দনপঙ্কে পরিণত হয় এবং সমস্ত কালিমা জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠে তাঁরি কাছে আজ আমি এই প্রার্থনা জানাচ্ছি, তিনি এই আকস্মিক সম্মানের প্রবল অভিঘাত থেকে তাঁর সুমহান্ বাহুবেষ্টনের দ্বারা আমাকে নিভৃতে রক্ষা করুন।"

সীতা দেবী তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে লিখছেন—

"সভাস্থ সকলে যে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা এখনও মনে আছে। তাঁহার যথার্থ অনুরাগী যাঁহারা, তাঁহারা মনে অতিশয় আঘাত পাইয়াছিলেন। আমাদের নিজেদের বিস্ময়-বিমূঢ়তার স্মৃতি এখনও মনে জাগিয়া আছে।...

"কলিকাতায় কয়েকদিন এই ব্যাপার লইয়া বিষম হৈচৈ চলিল। কাগজে কাগজে কত বিষই যে উদ্‌গীরিত হইল (২৫) তাহার ঠিক নাই।...যাঁহারা যথার্থ তাঁহার অনুরাগী ভক্ত তাঁহারাও দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর বিদ্বেষটাই খালি দেখিলেন, ভালবাসাটা দেখিলেন না। আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক (২৬) এত মর্মাহত হইয়া ফিরিয়াছিলেন যে, ইহার পরে দুইদিন তিনি আহার গ্রহণ করেন নাই।"

অনুরাগীদের এই মর্মবেদনার কথা স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ অগোণেই অনুভব করেছিলেন—

"২৫শে নবেম্বর বিকালের দিকে কবি হঠাৎ আমাদের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।...তাঁহার যথার্থ অনুরাগী ও ভক্তদের মনে যে আঘাত দিয়াছিলেন, সেই বেদনা দূর করিবার জন্যই যে তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। চারুবাবুকে [চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] সেই মর্মে কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেনও, পরে শুনিয়াছিলাম।"(২৭)

"কবি তাহার পর রামেন্দ্রসুন্দরের বাড়ির দিকে যাত্রা করিলেন। বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি

---

(২৫) এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ করে সমর্থন জানিয়েছিলেন বোধ করি একমাত্র বিপিনচন্দ্র পাল। তিনি রবীন্দ্রভক্ত বলে পরিচিত নন, বরং বারে বারেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার গভীর মতবিরোধ ঘটেছে; কিন্তু এই অভিনন্দনসভা প্রসঙ্গে **Hindu Review** পত্রে সুদীর্ঘ একটি প্রবন্ধে তিনি জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথের স্থান সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছিলেন, কোনো কোনো বিষয়ে অনেকের মতপার্থক্য থাকলেও সেটি এখনো বিশেষভাবেই অনুধাবনযোগ্য। বিলাতে রবীন্দ্রনাথের সমাদরে বস্তুতঃ কোন্ দিক থেকে দেশবাসীর বিশেষভাবে আনন্দিত হবার কারণ ঘটেছিল, তাও তিনি এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রবন্ধটি বিপিনচন্দ্রের Character Sketches (1957) গ্রন্থে কিছুকাল পূর্বে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

(২৬) ইনি কবির চিরানুরক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্র শ্রীশান্তা দেবী, 'রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা', পৃ ১৬৫

(২৭) শ্রীসীতা দেবী, পুণ্যস্মৃতি

গিয়া বোধহয় তাঁহাকে অভিমান ভাঙ্গাইতে হইয়াছিল। পরে মাঘ [ফাল্গুন?] মাসে রামমোহন লাইব্রেরীর এক সভাতেও তিনি ঐ বিষয় কিছু বলিয়াছিলেন।"(২৮)

এই সভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার শ্রীসীতাদেবী 'পুণ্যস্মৃতি'তে (পৃ ১৩৫—৩৭) দিয়েছেন, তা এখানে উদ্ধারযোগ্য—

"কবি চিরদিনই দেশের লোকের প্রীতি-কামনা করেন। দেশের লোকের ভালবাসা তাহার প্রেয় নয় ইহা বলিলে ঠিক কথা বলা হয় না। অন্য দেশের লোকের নিকট হইতে এই প্রীতি অজস্রধারায় লাভ করিলেও যথেষ্ট বোধ হয় না, কবির হৃদয় উপবাসীই থাকিয়া যায়। কিন্তু মানুষ এ ধরনের উপবাস সহ্য করিতে পারে না বলিয়া একটি বিশিষ্ট দলের আদর বা বিদেশে প্রাপ্ত সম্মান দিয়া নিজেকে ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। তেমনি রবীন্দ্রনাথও বিদেশে বহু সম্মান পাইয়াছেন, কিন্তু তাহা তিনি নিজের বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, ভারতবর্ষের সম্মান বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দেশবাসীর কাছে সেই বিদেশে প্রাপ্ত সম্মানের প্রতিধ্বনিই তিনি চাহেন নাই। মায়ের ও ভাইয়ের সহিত ত মানুষের সম্মানের সম্পর্ক নয়, ভালবাসার সম্পর্ক। কিন্তু ইহা এমন জিনিস যে ভিক্ষা বা দাবী করিয়া পাওয়া যায় না, পাইবার সৌভাগ্য থাকিলেই একমাত্র পাওয়া যায়। বিদেশে তিনি যে সম্মান পাইয়াছেন তাহা তিনি সকলকে ভুলিয়া যাইতে বলিলেন, উহাকে মায়া বা স্বপ্ন মনে করিতে অনুরোধ করিলেন। এগুলি ভুলিয়া গিয়া, তাহার পর যদি দেশবাসী তাঁহাকে কিছু দিতে পারেন, তাহা হইলে সেইটুকুই তিনি চান। সম্মান তাঁহার কাম্য নয়। এই কারণে দেশের লোক যখন তাঁহাকে সম্মান দিতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি তাহা প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দেশবাসী তাঁহাকে ভুল না বোঝেন এই তাঁহার অনুরোধ। তিনি জানেন যে, দেশের লোকের সঙ্গে তাঁহার অনেক জায়গায় বিরোধ আছে, তাহা না হইলে এতদিন ধরিয়া এত অপমান এবং লাঞ্ছনা তাহার অদৃষ্টে জুটিত না। সে বিরোধের কারণ এই যে, দেশের লোকের প্রীতি সর্বান্তঃকরণে কামনা করিয়াও জনসাধারণ যাহা শুনিতে চায়, তিনি সেইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারেন না। তিনি নিজে যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছেন তাহা তাঁহাকে বলিতে হয়। দেশের লোকের প্রীতির চেয়েও যে বড় জিনিস, তাহার খাতিরে তিনি নীরব হইয়া থাকিতে পারেন না। ইহাতে অনেকে আঘাত পাইয়াছেন, কিন্তু কবিকে এই পথেই

(২৮) শ্রীশান্তাদেবী, 'রামানন্দ ও অর্ধ-শতাব্দীর বাংলা', পৃ ১৬৫

চিরদিন চালাতে হইবে। এই সব সত্ত্বেও, যদি তিনি কোনোদিন দেশবাসীকে আনন্দ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহারই পুরস্কার তিনি চান, সে যেটুকু হোক। এই পুরস্কার যদি দেশবাসী তাঁহাকে না দিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে টাউনহলে লইয়া গিয়া সম্বর্ধনা করিলে বা অন্যভাবে সম্মান দিলে কোনো লাভ নাই। ছেলে একটা খেলনা চাহিলে আর একটা দিয়া তাঁহাকে ভুলানো যায়, কিন্তু পূর্ণবয়স্ক মানুষ যাহা চায় তাহার পরিবর্তে অন্য জিনিস দিয়া তাহাকে, ভুলানো যায় না। যে ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রতিনিধিস্থানীয় যে মানুষ, কবিকে তিরস্কার এবং পুরস্কার দুই দিয়াই গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইয়া এবং সভাস্থ সকলকে নমস্কার করিয়া কবি আসন গ্রহণ করিলেন।" (২৮)

(২৮) "[সভাশেষে] সভাপতি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উঠিয়া রবীন্দ্রনাথের মাথায় হাত দিয়া উচ্ছ্বসিত আশীর্বাদ করিলেন, এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে কবিবরকে প্রত্যভিবাদন করিতে অনুরোধ করিলেন। সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহার অনুরোধ পালন করিল।"—শ্রীসীতা দেবী, পুণ্যস্মৃতি

"আমার সম্মানকে আমার স্বদেশ আপন সম্মান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আমার পক্ষে এমন পুরস্কার আর কিছুই হইতে পারে না" অকুণ্ঠিত ভাষায় এই কথা রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করলেন উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের পাবনা অধিবেশনে, নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তিতে অভিনন্দনের উত্তরে—

"এই অভিনন্দনের ভয়েই আমি এ সভায় আসিতে চাই নাই। এখানকার সভাপতিকে আমার বন্ধু বলিয়াই জানি, সেই জন্যেই আশা ছিল তাঁহার আড়ালে আশ্রয় পাইব; কিন্তু অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।

"সভাসমিতিতে সকলের সঙ্গে মিলিয়া সকলের মাঝখানে আসনটি লইয়া বসিব, এই আরামটি হইতে বিধাতা আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন:—আমাকে সর্বসাধারণের বেষ্টন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র বসাইয়া রাখিবার যে বিধান হইয়াছে ইহাতে আমি দুঃখ এবং লজ্জা পাইয়া থাকি। কোথাও যে নিঃশব্দে এবং নিরালায় একটু স্থান পাইব, এই অধিকারটি খোয়াইয়া বসিয়াছি।

"বিলাতে রাস্তার দুষ্ট বালকেরা কৌতুক করিবার জন্য কুকুরের ল্যাজে ঝুমঝুমি বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেয়। সে যেখানেই চলে, শব্দ হয় এবং তাহার পিছনে ভিড় জমিতে থাকে। আমার নামের পিছনে সেই রকমের একটা ঝুমঝুমি বাঁধা হইয়াছে, চলিতে গেলেই শব্দ হয় এবং লোকের দৃষ্টি পড়ে। প্রকাশ্যে চলা একরকম বন্ধ করিয়াছি।

"আমার ভাগ্যদেবতা আমার একগালে বিলাতী চূণ ও অন্যগালে ভূষার কালী মাখাইয়া স্তুতিনিন্দার সং সাজাইয়াছেন। তাঁহার এই কৌতুকে যোগ দিতে আমার কোনো উৎসাহ নাই। ইহাতে আমাকে ক্লিষ্ট করিয়াছে। আমি বরাবর যে কোণটাতে পড়িয়া আপনার কাজ করিয়া আসিয়াছি কোনো খ্যাতির মূল্যেই সেটা বিকাইতে আমার প্রলোভন হয় না। গান করাই আমার ব্যবসা। যে বাঁশিতে সুর বাজে সেটা সরু হইয়াই থাকে, তাহাকে পিপার মত প্রকাণ্ড করিয়া তুলিলে অন্য যে কাজেই লাগুক গানের সুবিধা হয় না। অত্যন্ত প্রশস্ত স্থান আমার নহে।

"যা হোক বিলাপ করিবার এ অবসর নয়, অতএব দুঃখের কথা আর বেশি বলিব না। আপনাদের সকলের কাছে আমার যে কৃতজ্ঞতা জানাইবার আছে তাহা নিবেদন করিবার এই যে সুযোগ পাইয়াছি তাহা নষ্ট করিব না। আমার ভাগ্যক্রমে সমুদ্রপার হইতে সম্মান লাভ করিয়াছি। সেই সম্মান প্রচুর এবং তাহার ভার সামান্য নয়। আমার সৌভাগ্য এই, আমার দেশের লোক এই এই সম্মানকে আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন—ইহা স্বদেশের সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া ভোগ করিতেছি তাহাতেই এই গুরু সম্মানভারের গৌরব যেমন বাড়িয়াছে ইহার ভার তেমনি কমিয়াছে। আমার সম্মানকে আমার স্বদেশ আপন সম্মান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আমার পক্ষে এমন পুরস্কার আর কিছুই হইতে পারে না। বিদেশের সম্মানকে আমার স্বদেশ নিজের হাতে লইয়া তাহাকে আপন প্রসাদে অভিষিক্ত করিয়া আমার হাতে অর্পণ করিলেন, ইহাই আমি তাঁহার আশীর্বাদ বলিয়া শিরোধার্য করিয়া লইলাম। (২৯)

(২৯) "শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তৃতা", মানসী, বৈশাখ ১৩২১
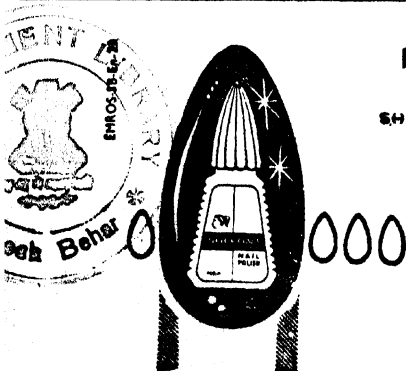
স্বদেশ-প্রত্যাগমনে অভিনন্দন
কলিকাতা ১৯ ভাদ্র ১৩২৮

বর্ষাধিককাল য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ ও আমেরিকা পরিক্রমান্তে ১৯২১ সালের জুলাই মাসে (১৩২৮ আষাঢ়) রবীন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এইবার ভ্রমণকালে তিনি প্রতীচ্যদেশের মনীষীসমাজে বিপুল সমাদর লাভ করেন, য়ুরোপের বহু দেশে সর্বসাধারণও তাঁকে রাজোচিত সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন; 'সেই একটি সময় গিয়েছে যখন য়ুরোপের উত্তরপ্রান্ত থেকে পূর্বতম প্রান্ত পর্যন্ত' রবীন্দ্রনাথকে 'উপলক্ষ্য করে যে একটি বিস্ময় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল তা অভাবনীয়, বোধহয় ঐ মহাদেশে সে যুগে কোনো কৃতীপুরুষ এমন প্রভূত সমাদরের ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করতে পারেননি।' বিদেশে এই কবি-পূজায় তাঁর স্বদেশীয় সুহৃৎসমাজের যে আনন্দ তাকেই প্রকাশ করবার জন্য সাহিত্য-পরিষৎ কবি-সংবর্ধনার আয়োজন করলেন (১৯ ভাদ্র ১৩২৮)।

নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। পরিষৎ-সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই সময় ঢাকায়, সেখান থেকে এই উপলক্ষ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতি আশীর্বচন পাঠিয়েছিলেন। বাংলাদেশের কবিসমাজ এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে যোগ দিয়েছিলেন—মানকুমারী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীকালিদাস রায় প্রভৃতির কবিতা এই সভায় পঠিত হয়েছিল। পরিষদের পক্ষ থেকে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথকে 'অভিনন্দন' জ্ঞাপন করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'আশীর্বচন', হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'অভিনন্দন', সভাপতিরূপে জগদিন্দ্রনাথ রায়ের বক্তৃতা ও রবীন্দ্রনাথের 'অভিভাষণ' সাময়িক পত্রাদির পৃষ্ঠা থেকে এখানে পুনর্মুদ্রিত হল।

আশীর্বচন

শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ,

তুমি যখন নিতান্ত বালক, তখন হইতেই তোমার কবিতায় বাঙ্গালী মুগ্ধ। তোমার যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তোমার প্রতিভা বিকাশ হইতে লাগিল। সে প্রতিভা যেমন একদিকে দেশ হইতে দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, তেমনি সাহিত্যেরও সকল মূর্তিই আয়ত্ত করিতে লাগিল। সে প্রতিভা প্রথম প্রথম কবিতায় আবদ্ধ ছিল, ক্রমে গদ্য, নাটক, নবেল-রচনা, ছোট গল্প, বড় গল্প, সমালোচনা, রাজনীতি, কর্মনীতি, এইরূপে সমস্ত সাহিত্য-সংসারে ছড়াইয়া পড়িল। তুমি সাহিত্যের যে মূর্তিতেই হাত দিয়াছ, তাহাকে উদ্ভাসিত ও সজীব করিয়া তুলিয়াছ। কারণ, তোমার প্রাণ আছে, সে প্রাণে যেমন মধুরতা আছে, তেমনি তেজ

ষাট বৎসরে — চিত্র রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে
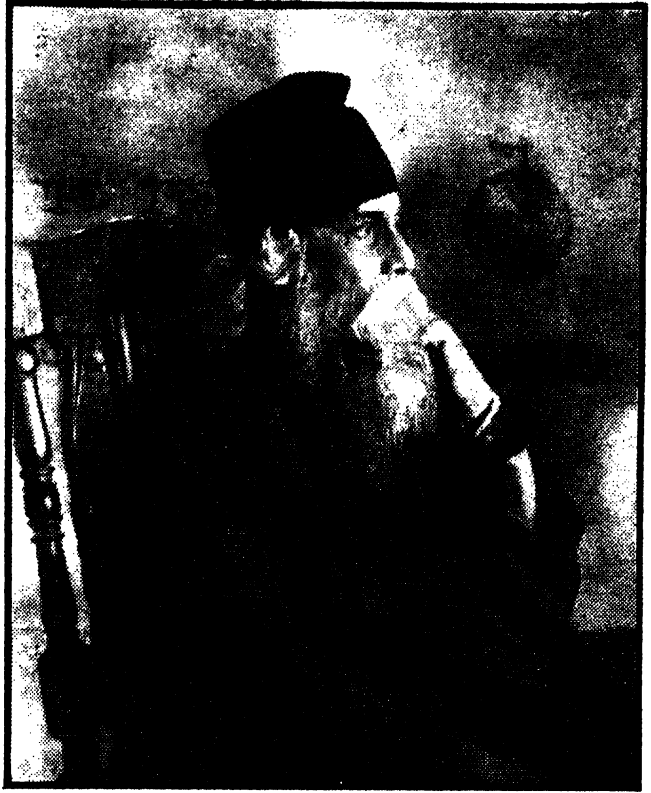
আছে—যেমন মোহিনী শক্তি আছে, তেমনি উন্মাদিনী শক্তি আছে—যেমন সূক্ষ্ম-দৃষ্টি আছে—তেমনি দূরদৃষ্টি আছে। তোমার প্রতিভা যেমন গড়িতে পারে, তেমনই ভাঙ্গিতে পারে—যেমন মাতাইতে পারে—তেমনই ঠাণ্ডা করিতে পারে—যেমন কাঁদাইতে পারে তেমনই হাসাইতে পারে। কিমধিকং, তোমার প্রতিভা সর্বতোমুখী, সর্বতঃপ্রসারী এবং সর্বতোমুগ্ধকারী। সঙ্গীতের সহিত সাহিত্যের মিলনে তোমার হাতে উভয়েরই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে; তোমাকেও যশোমন্দিরের উচ্চ চূড়ায় তুলিয়া দিয়াছে।

ইংরাজ-রাজত্ব হইয়া অবধি তোমার পূর্বপুরুষগণ ধনে মানে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, সদগুণে সাহসে বাঙ্গালায় অতি উচ্চ আসন অধিকার করিয়া আসিতেছেন। তোমার প্রতিভায় সেই বংশের গৌরব উজ্জ্বলতর—উজ্জ্বলতম হইয়া উঠিয়াছে। তোমার গুণে বাঙ্গালা ত চিরদিনই মুগ্ধ—ভারত গৌরবান্বিত, এখন পূর্ব ও পশ্চিম, নূতন ও পুরাতন সকল মহাদেশই তোমার প্রতিভায় উদ্ভাসিত। আশীর্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সমস্ত পৃথিবী আরও উদ্ভাসিত কর। তোমার বংশ দীর্ঘজীবীর বংশ, তুমি শতায়ু হও, সহস্রায়ু হও।

তোমার বয়স যতই পাকিতেছে, অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে, ততই মানুষের ব্যথায় তোমার মন গলিতেছে, তোমার বীণার ঝংকার গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে। মানবের মঙ্গলের জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ যতই বাড়িতেছে, ততই তুমি ব্যাকুল হইয়া মঙ্গলময়ের মঙ্গলাসনের সমীপবর্তী হইতেছ। তোমার মঙ্গলবাসনা চরিতার্থ হউক, তোমার নাম অক্ষয় হউক, তুমি অমর হইয়া ভারতের মঙ্গলকামনা করিতে থাক। তুমি দিগ্‌বিজয় করিয়া, বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়া, আবার সোনার বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছ, তুমি আমাদের ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও স্নেহের উপহারস্বরূপ এই পুষ্পমাল্য গ্রহণ কর। বিধাতার সৃষ্টিতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুরভি, সব এই পুষ্পেই আছে। আমাদেরও যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু সুরভি তাহা তোমাতেই আছে। আইস, উভয়ের মিলন করিয়া দিয়া আমরা কৃতার্থ হই।—ইতি

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি (৩০)

(৩০) অনুষ্ঠান-উপলক্ষ্যে পরিষৎ-কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্র-মঙ্গল' পুস্তিকা। অপিচ, সবুজ পত্র, ভাদ্র ১৩২৮
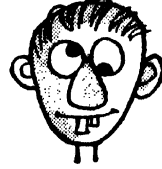
অভিনন্দন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রদ্ধাস্পদেষু

হে কবীন্দ্র! সুদীর্ঘ প্রবাস হইতে বিদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি বহন করিয়া, আপনি নির্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন—স্বদেশী সাহিত্যের সর্বায়তন এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আপনাকে আজ অভিনন্দন করিতেছে।

পরিষৎ নানাপ্রকারে আপনার নিকট ঋণী। পরিষদের শৈশবে আপনি অজস্র স্নেহদানে ইহাকে পোষণ করিয়াছিলেন—পরিষদের কৈশোরে আপনি সহায় হইয়া, ইহার শ্রী ও সম্পদ বর্ধন করিয়াছিলেন—আজ পরিষদের যৌবনে আপনি ইহার অকৃত্রিম 'সুহৃৎ-সখা'। যখন অমিত্র-নীরদের ঘনঘটায় পরিষদের পক্ষে 'পন্থ বিজন অতিঘোর' হইয়াছে, তখনই শুভ পথ প্রদর্শন করিয়া আপনি ইহাকে ঋতমার্গে পরিচালন করিয়াছেন। সেইজন্য পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইলে বঙ্গের সাহিত্যিকগণের মুখস্বরূপ এই সাহিত্য-পরিষৎ আপনাকে অভিনন্দন করিয়া বিশ্বপিতার নিকট আপনার শতায়ুঃ কামনা করিয়াছিল।

যাঁহার অর্চনার জন্য সাহিত্যের এই পুণ্য-পীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, হে বরেণ্য! আপনি সেই বাণীর বরপুত্র। যুগ-যুগান্তের সাধনার ফলে দেবী সারদা আপনার চিত্ত-সরোজে তাঁহার রক্তচরণ চিহ্নিত করিয়াছেন। সেই জন্য সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই আপনি বিজয়ী; সেইজন্য আপনি সাহিত্যের যে বিভাগ যখন স্পর্শ করিয়াছেন, স্পর্শমণির করস্পর্শে সেই বিভাগই স্বর্ণময় হইয়াছে। বীণাপাণির সপ্তস্বরার শততন্ত্রীতে যে বিশ্বসংগীত নিয়ত ঝঙ্কৃত হইতেছে, হে মহাকবি! আপনার হৃদয়-বীণায় তাহার প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

মানব অমৃতের পুত্র—অতএব কি প্রাচ্যে, কি প্রতীচ্যে, সে চিরদিন অমৃতত্বের প্রয়াসী। প্রাচীন ভারতের স্নিগ্ধ তপোবনে যে অমৃতের উৎস উৎসারিত হইয়াছিল, সেই পুণ্যপীযূষ পান ভিন্ন কোনমতে তাহার অদম্য ব্রহ্মতৃষার নিবৃত্তি হইতে পারে না। এই সত্যের উপলব্ধি করিয়া জীবনের ছায়াময় অপরাহ্নে মহর্ষি-সন্তান আপনি কুলোচিত ব্রত গ্রহণ করিয়া, জগৎকে সেই অমৃতবারি মুক্তহস্তে পরিবেষণ করিতেছেন।

বিদ্যাপক্ষিণীর দুই পক্ষ—দর্শন ও বিজ্ঞান। এই পক্ষদ্বয়ে নির্ভর করিয়া সে প্রজ্ঞানের পর-ব্যোমে নির্ভয়ে বিহরণ করে। পূর্ব পশ্চিম হইতে বিজ্ঞান আহরণ করুক, পূর্ব পশ্চিমকে দর্শন বিতরণ করুক। এই আদান-প্রদানের পূর্ণতায় যে বিদ্যার প্রপূর্তি হইবে, সেই বিদ্যার দ্বারাই "বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে" সেইজন্য আপনি "বিশ্বভারতী"র প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে রাখিবন্ধনে সংযুক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

হে কবীন্দ্র! আপনি সাহিত্যাকাশের দীপ্ত ভাস্কর—জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্। যিনি 'জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ' পরম জ্যোতিঃ, যাঁহার ঊর্জিত বিভূতি আপনাতে দেদীপ্যমান—সেই সত্য শিব সুন্দর আপনাকে জয়যুক্ত করুন। ওঁ।

গুণমুগ্ধ

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত (৩০ ক)

সভাপতির অভিভাষণ

গ্রহেশ্বর দিনকরের দীপ্ত প্রভায় বিশ্ব-ভুবন আলোকিত হয়—মধ্যাহ্ন-সবিতার সেই ভাস্বর স্বর্ণজ্যোতিঃ দেখাইবার জন্য উল্কা হস্তে কেহ যদি বাহির হয়, তাহা যেমন উন্মাদের হাস্যকর কার্য বলিয়া বিবেচিত হয়, আজ রবীন্দ্রের মহিমা কীর্তন করিয়া তাঁহাকে পরিচিত করিবার চেষ্টাও তদ্রূপ বাতুলেরই হাস্যোদ্দীপক প্রচেষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইবে। একদিন ছিল যখন রবিকে কেবল কবি বলিয়াই আমরা জানিতাম, এবং তাঁহার সেই অলোকসামান্য কবিত্বে কেমন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি তাহা আমরাই জানি; তাঁহার অপূর্ব প্রতিভাবলে তিনি বাংলা দেশের অরণ্যে কান্তারে সাগরে ভূধরে, ঘনচ্ছায়াসমন্বিত পল্লীচিত্রে এবং পল্লীজীবনের দৈনন্দিন সুখদুঃখের মধ্যে যেখানে সে সৌন্দর্য দেখিয়াছেন, তাহাই আহরণ করিয়া তাঁহার মোহন তুলিকার কুহকস্পর্শে সুন্দরতর করিয়া আনিয়া আমাদের মনোরঞ্জনার্থ উপস্থিত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের ঘনপল্লবিত চূতনিকুঞ্জের পত্রান্তরালে বসন্ত-বৈতালিকের কুহুস্বর চিরদিনই ধ্বনিত হইতেছে, কিন্তু রবির কবিত্বের সহিত পরিচিত হইবার পূর্বে সে স্বর তেমন করিয়া আমাদের কানে মধুবর্ষণ করে নাই; রৌদ্রদীপ্ত বৈশাখের তপঃক্লিষ্ট উগ্র তাপসমূর্তিটি, হেমন্তের রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চলাচ্ছাদিত উদাসিনী বসুন্ধরার সৌম্য মুখচ্ছবিখানি, পল্লীনিবাসের মূক বালিকা সুভাষিণীর হৃদয়-বেদনার চিত্র, পতিপ্রেমবঞ্চিতা নিরক্ষরা চন্দরার প্রাণপণে মৃত্যু আলিঙ্গনের আলেখ্য, এবং নষ্টনীড়ের ভ্রষ্টশ্রীর নিদারুণ করুণা রবি বিনা কে আর তেমন করিয়া আঁকিয়া তুলিতে পারিত? আজ রবি কেবল দেশপ্রেমিক নহেন, কেবল রাজনীতিক্ষেত্রের সরস বক্তা নহেন, এ সকলের উপরে আজ তিনি বিশ্বমৈত্রীর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। যখন পঞ্চবর্ষব্যাপী মহাকুরুক্ষেত্রের মহাসমরের অবসানে নূতন পুরাতন উভয় পৃথিবীর বিপুল জনসংঘ অপ্রসহ্য মর্ম-বেদনায় মৃতপ্রায় হইয়া সঞ্জীবন মহৌষধির প্রত্যাশায় কোন্ দিকে হস্ত প্রসারিত করিতে হইবে জানে না, সেই মাহেন্দ্র মুহূর্তে ভারতের প্রাচী-দিগন্তের বিশ্বকবির মুখে

(৩০ ক) সবুজ পত্র, ভাদ্র ১৩২৮

বিশ্বমৈত্রীর বাণী অস্খলিতভাবে উদাত্ত স্বরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। সার্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্বে নৈরঞ্জনার নীর-সন্নিধানের বোধিবৃক্ষমূলে বসিয়া এক রাজপুত্র সে বাণী উচ্চারণ করিয়া জগৎকে অভয় দান করিয়া গিয়াছেন, আজ আবার বোলপুরের বিশ্বভারতীর আশ্রম-তরুতলে বসিয়া আর এক রাজপুত্র নরমেধযজ্ঞ-ভার-প্রপীড়িত পৃথিবীর ভয়ার্ত জীববৃন্দকে সেই অভয় মন্ত্র শুনাইয়াছেন। যাঁহার মুখে আজকার ঐশ্বর্য ও ক্ষাত্রবীর্যের মদান্ধতায় লুপ্তদর্শন জীবের মুক্তিমন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে, তিনি একান্তভাবে বাংলার ও বাঙালীর—এই মহাগৌরব ভারতের হইলেও একান্তভাবে আমাদেরই। তাই আজ আমরা বঙ্গ-ভারতীর কুঞ্জকুটিরতলে সমবেত হইয়া রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার নামে স্বীয় হৃদয়ের নিবিড় আনন্দ প্রকাশের অবকাশ করিয়া লইয়াছি। সুরসভাতলে নৃত্যপরায়ণা পুলকোল্লসিতা উর্বশীর হাস্যলীলার বিলোল হিল্লোলের তালে তালে সাগরতরঙ্গ কেমন করিয়া নাচিয়া উঠে, এবং শস্যশীর্ষে ধরণীর হরিতঞ্চল কেমন করিয়া শিহরিত ও কম্পিত হয়, তাহা আমরা কুহকিনী কল্পনার প্রভাবে জানিয়াছি; কিন্তু তাঁহার গীতিচ্ছন্দে আজ সপ্তসিন্ধু যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং যুদ্ধোন্মাদের অবসানে পীড়িত মূর্ছিত মানবের হৃদয়ে কবির প্রেম-মৈত্রীর মন্ত্র যে অতুলনীয় আনন্দস্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছে ইহা কল্পনা নহে, অবিসম্বাদিত সত্য, আজ তাই সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসিবৃন্দ প্রসারিত বাহুর সভক্তি প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে কবিকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে; সে আদর, সে যত্ন, সে সম্বর্ধনা এবং সে গুণ-গ্রহণ যে কতখানি সত্য ও প্রাণস্পর্শী এবং নিবিড়, তাহা যাহারা দেখিয়াছে তাহারাই জানে। আমাদের এই দরিদ্র বাংলার দরিদ্র-তর সাহিত্যিক সম্প্রদায় তেমন আয়োজন-সম্ভার কোথায় পাইবে? কিন্তু নিরাবিল-স্নেহে উচ্ছ্বসিত জননীর স্বহস্তদত্ত শাকান্ন দেবদুর্লভ অমৃত অপেক্ষাও স্বাদু এবং আদরের,—সোদরের স্নেহালিঙ্গন পরম প্রার্থনীয় ও পবিত্র—ইহাই বাংলার এবং বাঙালীর একমাত্র ভরসা। সুদূর সমুদ্র-পারে, ধরণীর পশ্চিমদিগ্‌বিভাগে যে সমারোহে যে সম্বর্ধনা ও যে অভিনন্দন তিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাও কি তাঁহার যোগ্য? তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভার যথাযোগ্য প্রশস্তি রচনা করিতে বসিলে সর্বগন্ধর্বরাজ পুষ্পদন্তের সহিত রচয়িতাকে সমস্বরে বলিতে হয়—

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥"

হে বিশ্বকবি রবীন্দ্র, হে বঙ্গের দেশনিষ্ঠ একমেবাদ্বিতীয়, হে অভিনব যুগের মৈত্রী-মন্ত্রের ঋষি রবীন্দ্রনাথ, তোমার যৌবন-প্রারম্ভে প্রতিভার যে রশ্মিরেখা দেশের নব-প্রভাতে দেশবাসিজনের নিদ্রালস নয়নে জাগরণের সঞ্চার করিয়াছিল, তোমার সেই প্রতিভায় এবং আয়ুষ্কালের মধ্যগগনে অবস্থিত হইয়া যে রশ্মিজাল আজ তুমি দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত করিয়া দিয়াছ, সে হিরণ্ময় রশ্মিচ্ছটায় পূর্ব পশ্চিমের সর্ব অন্ধকার সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হইয়া যাউক। দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্বে অশোকের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অর্ধধরণী যেরূপ মৈত্রী বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছিল তোমার কণ্ঠোচ্চারিত সেই মহামন্ত্রে ঐশ্বর্যভার-প্রপীড়িত, ক্ষাত্রবীর্যনিষ্পেষিত, শোকতপ্ত পশ্চিম আজ পূর্বের সহিত প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হউক, সমস্ত ধরণীর মহামানব অ-শোকের মধ্যে, ক্ষমার মধ্যে, অক্রোধের মধ্যে, প্রীতি ও কল্যাণের মধ্যে জীবন অতিবাহন করিতে থাকুক। অম্লান, কল্পান্তস্থায়ী তোমার যশচন্দ্রমার নির্মল চন্দ্রিকালোকে বাংলার হৃৎকুমুদ আজ পরিপূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে; হে সর্বজনপ্রিয়

সুহৃত্তম, বন্ধুজনের হৃৎকুমুদের সেই ফুল্লাসনে চির-অবস্থিত হইবার জন্য তোমাকে আজ আমি সাদরে আহ্বান করিতেছি, মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ুতে তোমাকে আহ্বান করিতেছি, বিশ্বমানবের চিরন্তন কল্যাণসাধনে তোমাকে আহ্বান করিতেছি, এবং ভক্তজনের অগ্রণী হইয়া বারংবার কহিতেছি—"বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।"

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায় (৩২)

অভিভাষণ

য়ুরোপে আমি সমাদর পেয়েচি এবং য়ুরোপকে আমি সমাদর করেচি, কিন্তু শিশুকাল থেকে ভারতের আকাশ দুই চক্ষু ভরিয়ে আমার মনকে যে আলোক পান করিয়েচে, তার তৃষ্ণা আমার মনে নিয়ত জেগে ছিল; আর যারা আমার আপন দেশের লোক, তাদের কাছে থেকে প্রীতি পাবার যে আকাঙ্ক্ষা, সে কি আমার মিটেচে, কিম্বা কোনোকালে মিটবে?—তাই অনেকদিন পরে দেশে ফিরে এসে আপনাদের কাছ থেকে এই যে অভ্যর্থনা লাভ করলেম তা আমার কাছে উপাদেয়।

আমার বয়স যেদিন পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েছিল, সেদিন আমার যা-কিছু সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি, সে তো এই বাংলা দেশের সীমানা পার হয়নি। কিন্তু সেদিন এই বাংলা সাহিত্য-পরিষদই আমার সম্বর্ধনা করে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। সে কথা আমি ভুলব না। কেননা সেদিন আমার একমাত্র পরিচয় বাংলা ভাষার মধ্যে বাঙালীর কাছে, অর্থাৎ সে ছিল আত্মীয়ের পরিচয় আত্মীয়ের কাছে। এই অতিনিকটের পরিচয়ে সকল সময়ে সুবিচারের আশা থাকে না; যে বরমাল্য পাওয়া যায়, তাতে কারো কারো ভাগ্যে ফুলের চেয়ে কাঁটার অংশই বেশি থাকে; এবং যেহেতু তা আত্মীয়ের হাতের দান, এই জন্যে তার মধ্যে যে পীড়া থাকে তার বেদনা দুঃসহ। তাই সেদিন সাহিত্য-পরিষৎ আমাকে উপলক্ষ্য করে যে কবি-প্রশস্তিসভা ডেকেছিলেন, সে আমার পক্ষে যেমন বিস্ময়ের তেমনি আনন্দের বিষয় ছিল। সেদিন এই পরিষদের কাণ্ডারী ছিলেন আমার পরম বন্ধু স্বর্গগত রামেন্দ্রসুন্দর। তাঁর বুদ্ধির গভীরতা এবং হৃদয়ের ঔদার্য দুইই ছিল অসামান্য; সেদিন তিনি বাঙালীর প্রতিনিধিরূপে এই বরণ-সভা আহ্বান করেছিলেন; এই আনন্দ এবং গৌরব সকলের চেয়ে আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। জনসভার অনেক অংশই আনুষ্ঠানিক, প্রায় তা কাঠখড়েই তৈরি,—একদিন তার সমারোহ, পরদিন তা বিস্মৃতির জলে বিসর্জন দেবার যোগ্য। কিন্তু সেই আমার বন্ধুর নির্মল হাস্যে এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় সেদিনকার সভার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাঁর প্রীতিস্নিগ্ধ বাণীর মধ্যে আমার পক্ষে এই আশ্বাস ছিল যে, এই প্রীতি বর্তমানের সমস্ত বিরোধ-বিদ্বেষ, সমস্ত কলহ-কলুষের উপরকার জিনিস, এই প্রীতি সেই ভবিষ্যতের যা বাহির থেকে নিকটের মানুষকে দূরে নিয়ে গিয়ে অন্তরের দিকে তাকে নিকটতর সত্যতর করে। আজ তিনি স্বয়ং শাশ্বতলোকে গমন করেছেন, সেখান হতে তাঁর প্রসন্ন হাস্যের অভিনন্দন আমি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করি।

দশ বৎসর হয়ে গেল। এখন আমি ষাট উত্তীর্ণ হয়েচি। সাহিত্য-পরিষদে আজ আপনাদের এই অভিভাষণ কিসের উপলক্ষ্যে? আজ এখানে কেবল স্বাদেশিক আত্মীয়সভার মঙ্গলাচরণ নয়। ভৌগোলিক ভাগবিভাগের দ্বারা মানুষের যে আত্মীয়তা খণ্ডিত, আজ সেই আত্মীয়তার চতুঃসীমানার

(৩২) মানসী ও মর্মবাণী, আশ্বিন ১৩২৮
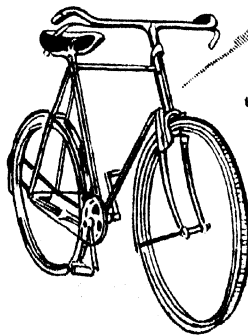
মধ্যে এই সভার অধিবেশন বসেনি। যে আত্মীয়তায় আত্মপরের বিচ্ছেদ, দূরে-নিকটের ভেদ-ব্যবধান দূর হয়ে যায়, আজ সেই আত্মীয়তার মাল্য আপনারা আহরণ করেচেন, এই কথাই আমি মনে অনুভব করতে চাই।

আপনারা হয়ত মনে ভাবেন যে, দেশের সাহিত্যকে আমি বিদেশে যশস্বী করে এসেচি, দেশের লোকের কাছে আজ সেই দাবিতেই আমার বিশেষ সম্মান। কিন্তু এই যশকে আপনারা খুব বেশি বড় করে দেখবেন না। আমি নিজে সকলের চেয়ে যেটিকে আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি, সে এই সাহিত্যের ফল নয়। য়ুরোপে আমার কাছে যারা হৃদয়ের অনুরাগ অকৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে ব্যক্ত করেচে, তাদের অনেকেই সাহিত্যরসব্যবসায়ী দলের কেউ নয়। তারা কেবলমাত্র সাহিত্যের বাজার যাচাই করে আমাকে যশের মূল্য চুকিয়ে দেয়নি, তারা আমাকে প্রীতি দিয়েচে, যা সকল মূল্যের বেশি। অর্থাৎ তারা ওস্তাদ বলে আমাকে

শিরোপা দিয়ে বিদায় করেনি, তারা আমাকে আত্মীয় বলে গ্রহণ করেচে। সেই আত্মীয়তা নিয়ে আত্মশ্লাঘা করা চলে না, তাকে নিয়ে নম্রমনে আনন্দ করাই যায়।

দ্বিজত্ব লাভ করবার একটি তত্ত্ব আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। তাতে এই কথা বলে যে, মানুষের প্রথম জন্ম নিজের অহংকারের ক্ষেত্রে। সেই "আমি"র ক্ষুদ্র সীমার আবরণ ও বন্ধন ভেদ করে মানুষ যখন অধ্যাত্মক্ষেত্রে অসীমের মধ্যে জন্মলাভ করে, তখনই হয় তার দ্বিতীয় জন্ম। যেমন অধ্যাত্মক্ষেত্রে, তেমনি সংসারের মধ্যেও মানুষের দুটি জন্ম। একটি হচ্চে নিজের দেশের মধ্যে, আরেকটি সকল দেশে। এই দুটি জন্মের সামঞ্জস্যেই মানুষের সার্থকতা। নিজের হৃদয়ে দেশের সংগে বিশ্বের মিলন সাধন করাতে পারলে তবেই হৃদয়ের মুক্তি।

পঞ্চাশোর্ধ্বে, সংহিতাকার যখন বনব্রজনের ব্যবস্থা করেচেন, সেই সময়ে আমি পশ্চিম মহাদেশে গিয়ে পেঁছিলেম। দেখলেম সেখানে আমার বাসস্থান আছে। দেখলেম সংসারে এই আমার দ্বিতীয় জন্মের মাতৃ-ক্রোড় পূর্ব হতেই প্রসারিত। আপন দেশ থেকে দূরে, যেখানে জন্মগত কোনো দাবি নেই, কর্মগত কোনো দায় নেই, সেইখানে যখন প্রেমের অভ্যর্থনা পাওয়া যায়, তখনি আমরা বিশ্বজননীর সুধাস্পর্শ পেয়ে থাকি। আমার ভাগ্যক্রমে সেই স্পর্শের আশীর্বাদ লাভ করেচি এবং মাতৃভূমিতে বহন করে এনেচি বলেই, আমার রচনার পরে বিশ্ব-বাণীর প্রসন্নতা লাভ করেচি বলেই, আজ আপনারা আমাকে নিয়ে বিশেষভাবে আনন্দ করচেন।

ভেবে দেখবেন, এই আনন্দের মধ্যে একটি মুক্তির উৎসাহ আছে। দেশ যখন আপন-টুকুকে নিয়েই আপনি নিবিষ্ট, তখন সে বিশ্বের অগোচরে থাকে। এই বিশ্বের অগোচরতা একটি মস্ত কারাপ্রাচীর। সংকীর্ণবাসের অভ্যাসে এ কথা আমরা অনেক সময়ে ভুলেই থাকি। হঠাৎ যখন একটা বন্ধ দরজা কোনো একটা হাওয়ায় খুলে যায়, তখন মন খুশি হয়ে ওঠে। আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর যে আবিষ্কার নিয়ে প্রথম বিশ্বসভার আহ্বান পেলেন, তাঁর সে আবিষ্কার যে কি, তা আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেই এখনো স্পষ্ট করে বোঝেনি—কিন্তু দেশের মন হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল তার কারণ এই যে, একদিকের দরজা খুলে গেল। সহসা অনুভব করলেম যে, আমরা বিশ্বের মানুষ, কেবলমাত্র দেশের মানুষ নই: আমাদের প্রাণের সংগে বিশ্বের হাওয়ার, মনের সংগে বিশ্বের আলোর সুগভীর যোগ আছে। স্বাদেশিক প্রাচীরের বন্ধ জানলা খোলবামাত্র হঠাৎ সামনে দেখতে পাই সর্বজনবিধাতার রূপটি। এই রূপটি দেখবার জন্যই আমাদের মানবজন্ম।

সাহিত্যের কলাকৌশল বিচার করে আমার লেখার কি মূল্য, সে কথা দূরে রেখে, আজ আমাকে এই গৌরবটুকু ভোগ করতে দিন যে, আমার গানে বা অন্য রচনায় সর্বজন-দেবতার রূপ হয়তো কিছু প্রকাশিত হয়েছে, সেইজন্যেই অন্য দেশের লোকে আমাকে আপন বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। এই নিখিলদেবের সাধন-মন্ত্র ভারতের কবির কানে পেঁচেছিল। কোথা থেকে? ভারত-বর্ষেরই তপস্বীদের কাছ থেকে। তাঁরাই একদিন বলেছিলেন, "এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ"; যিনি সর্বদাই সর্বজনের হৃদয়বাসী সেই দেবতাই মহাত্মা; এবং তিনি বিশ্বকর্মা, অর্থাৎ তাঁর সকল কর্মই বিশ্বের কর্ম, ক্ষুদ্র কর্ম নয়।

আজ আপনাদের যে আতিথ্য লাভ করচি, এ আমি একলা নিতে পারব না। কেননা একলা আমি কোনো আতিথ্য কোনো সমাদরের যোগ্য নই। আমার রচনায় আমি মহামানবের বাহন, এই বলে যদি আমাকে সমাদর করেন, তবে তাঁর আতিথ্যের জন্য প্রস্তুত থাকুন। তাঁকে ফেরাবেন না; বলবেন না, আজ আমাদের দুঃসময়, আজ আমাদের

দরজা বন্ধ। যখন পশ্চিমে ছিলেম, তখন গৌরব করে সকলকে বলেচি, আমি আমার মাতৃভূমির নিমন্ত্রণপত্রের ভার নিয়ে এসেচি। বলেচি যেখানে মাতার অমৃত অন্নের পরিবেশন হয়, সেইখানে এস। এসেছিলে একদিন আমাদের কয়লার খনিতে, আমাদের পণ্যের হাটে। যা সংগ্রহ করে নিয়ে গেছ, তাই নিয়ে তোমাদের পাড়ায় পাড়ায় ঈর্ষার আগুন জ্বলচে। পরস্পরের প্রতি সন্দেহে তোমাদের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্র কাঁটাবনের জঙ্গল হয়ে উঠেচে। আজ এস সেই ভাণ্ডারে, যেখানে অন্ন ভাগ করলে তার ক্ষয় হয় না।

য়ুরোপে শুনে এলেম কত জ্ঞানী গুণী সাধক বলচে, তাদের আত্মা ক্ষুধিত। তারা খুঁজচে শোকের সান্ত্বনা, ক্ষতবেদনার শুশ্রূষা; এই সন্ধানে যদি তারা পূর্ব মহাদেশে যাত্রা করে, তবে যেন দেখতে পায় আমাদের দ্বার খোলা আছে। আমরা যেন না বলি, "আমরা নিজের ভাবনায় মরচি, পর আমাদের কাছে অত্যন্ত পর, হৃদয় আমাদের বিমুখ।" এতদিন আমরা পরের দিকে তাকিয়ে ছিলেম ভিক্ষা করবার জন্য, তাতে লজ্জার পর লজ্জা পেয়েচি, অভাব পূরণ হয়নি। আজ যদি ধিক্কারের সঙ্গে বলতে পারি পরের কাছে ভিক্ষা করব না, সে তো ভালো কথা। কিন্তু সেই ক্ষোভে যদি বলি, পরের আতিথ্য করব না, তবে আরো বেশি লজ্জা। ভিক্ষায় যে দীনতা, অতিথির প্রত্যাখ্যানে যে বিশ্বাবমাননা, তারও অভিশাপ কঠিন। আমাদের পিতৃঋণ শোধ হবে কি করে? পিতৃগণের কাছ থেকে আমরা যে উত্তরাধিকার পেয়েছি, সে কি কেবল আমাদের নিজেরই জন্য? সে কি আমাদের নাস্ত ধন নয়? আমরা যদি বিশ্বের কাছে তার পূর্ণ ব্যবহার না করি তবে তাতে করে আমাদের পিতামহদের অগৌরব।

শকুন্তলা ছিলেন তপোবনের কন্যা। সেই তপোবনের কুটিরদ্বারে বসে তিনি আপনজনের কথাই ভাবছিলেন, বিশ্বজনের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। ভোলবার কারণ ছিল, কেননা কঠিন দুঃখে তাঁর মন ছিল অভিভূত। এমন সময় অতিথি এল তাঁর দ্বারে, বললে "অয়মহং ভোঃ।" সে ডাক কানে পৌঁছল না। তখন তাঁকে বাইরের শাপ লাগল, অসম্মানিত অতিথির পাশ। সে শাপ এই যে, যে-আপনজনের ভাবনায় তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিলে সেই আপনজনকেই হারাবে। বিশ্ব যদি আজ আমাদের দ্বারে এসে বলে "অয়মহং ভোঃ", তবে কি আমরা বলতে পারি যে, আজ নিজের ভাবনা কঠিন হয়ে উঠেচে, অন্যমনস্ক আছি? এ জবাব খাটবে না; নিজের দুঃখধন্দার তাড়ায় বিশ্বকে যে যে ফিরিয়েচে, বিশ্বের শাপ তাকে লাগবেই। তার আপনটুকু কেবলি ক্ষীণ হবে, আচ্ছন্ন হবে, নষ্ট হবে। যে সব জাত বিশ্বের অগোচরে নিজের মধ্যে বদ্ধ, তারা নিজেকে হারিয়ে বসে আছে, অথচ এত বড় ক্ষতি অনুভব করবার শক্তি পর্যন্ত তার লুপ্ত হয়েচে।

যখন সাহিত্যরচনায় আমি নিবিষ্ট ছিলেম, তখন বাহিরের কোনো সহায় আমার দরকার ছিল না। কবির আসন নির্জনে। সেখানে অনাদরে ক্ষতি করে না, বরঞ্চ জনাদর অনেক সময় মত্ত হস্তীর মতো সরস্বতীর পদ্মবনের পঙ্ক উন্মথিত করে তোলে। কিন্তু যজ্ঞ তো একলা হয় না। তাতে সর্বলোকের শ্রদ্ধা ও সহায়তা চাই। ঘরে যখন উৎসব, তখন বিশ্ব হন অতিথি। এই জন্যে পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই এই কাজকে আপনার কাজ বলেই গ্রহণ করেন। কর্মকর্তা দরিদ্র হলেও সেদিন দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে সকলকে ডেকে ডেকে বলেন "এস, এস!" কিসের জোরে বলেন? সকলের জোরে। দেশের হয়ে আমিও আজ একটি যজ্ঞের ভার নিয়েচি। সত্যের সাধনায় আমাদের সঙ্গে একাসনে বসবার জন্যে। সেইজন্যেই আজ আপনাদের কাছ থেকে আমি অভ্যর্থনা পাচ্চি, একে আমি কবির অভ্যর্থনা বলে একলা গ্রহণ করতে পারব না। এই অভ্যর্থনাকে ভারতের নবযুগে অতিথিসমাগমের প্রথম মঙ্গলাচরণরূপে আমি সকল আগন্তুকের হয়ে গ্রহণ করচি— আপনাদের সকলের সহযোগে মাতৃভূমির প্রাঙ্গণে বিশ্বচিত্তের একটি মিলনাসন প্রতিষ্ঠিত হোক।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৩৩)

[১৯ ভাদ্র, ১৩২৮]

(৩৩) সবুজ পত্র, ভাদ্র ১৩২৮

পরিশিষ্ট

১ ॥ কবি-সম্বর্ধনা—"বিবাদী" সুর

"অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষের মতই, উভয়েরই যোগে রাত্রির পূর্ণ প্রকাশ। আমার জীবন নিষ্ঠুর বিরোধের প্রভূত দান হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু তাহাতে আমার সমগ্র পরিচয়ের ক্ষতি হয় না। বরঞ্চ তাহার যা শ্রেষ্ঠ যা সত্য তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আমার জীবনেও যদি তাহা না ঘটিত, তবে অদ্যকার এই দিন সার্থক হইত না। আমার আঘাতপ্রাপ্ত শরবিদ্ধ খ্যাতির মধ্য দিয়া এই উৎসব আপনাকে প্রমাণ করিয়াছে। তাই আমার শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই তিথিকে প্রণাম করা আমার পক্ষে আজ সহজ হইল। যে ক্ষয়ের দ্বারা ক্ষতি হয় না, তাহাই বিধাতার মহৎ দান— দুঃখের দিনেও যেন তাহাকে চিনিতে পারি, শ্রদ্ধার সহিত যেন তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধা না ঘটে।"

—রবীন্দ্রনাথ, সপ্ততিবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের অভিনন্দনে 'কবির উত্তর'

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক কবি-সম্বর্ধনার যে বিবরণ সমসাময়িক ভারতী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের অর্ঘ্যাভিহরণ-ভাষণে 'কবিস্তুয় যজ্ঞে শিশুপালধর্মী যাহারা ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া বাধাদানের চেষ্টা করিয়াছিল তাহাদের' প্রসংগও তাতে উল্লিখিত আছে।

এই 'প্রতিকূলতা'র 'কৃষ্ণপক্ষে'র আভাস পাওয়া যাবে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকখানি পত্রে ও প্রবন্ধাংশে।

কবি-সম্বর্ধনার প্রস্তাব বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিনায়কবর্গ সাগ্রহে স্বীকার করলেও সে প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করবার লোকেরও সেদিন বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে যে অভাব ছিল এমন নয়। তার অভিনব একটি উপায় ছিল রবীন্দ্রনাথকেই পত্রাহত করা, যাতে তিনিই ক্ষুব্ধ হয়ে এই সংবর্ধনা গ্রহণ থেকে বিরত হন। সাহিত্য-পরিষদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা জ্ঞাপন করে প্রচারিত একটি পত্রের উল্লেখ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের নিম্নমুদ্রিত চিঠিতে (২১ বৈশাখ ১৩১৮) আছে—

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

প্রীতিনমস্কারপূর্বক নিবেদন—

আমাদের দেশে জন্মলাভকে একটা পরম দুঃখ বলিয়া থাকে, কথাটা যে অমূলক নহে

তাহা আমার জন্মদিনের পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে অনুভব করিবার কারণ ঘটিল।

আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আমার বন্ধু তাঁহাদের প্রীতি আমি লাভ করিয়াছি সেই আমার চিরজীবনের সমস্ত সাধনার পরম সফলতা। কিন্তু সম্মানলাভকে ভগবান মনু বিষের মত পরিহার করিতে বলিয়াছেন—আমাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

এক্ষণে আমি যে বিদ্যালয়ে কাজ করি সেখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকগণ আমার বৃদ্ধ বয়সের সূচনা লইয়া উৎসবের আয়োজন করিতেছেন—আপনি বুঝিতেই পারিতেছেন সে তাঁহাদের অকৃত্রিম আত্মীয়তারই আনন্দ উপদ্রব—তাহাকে ঠেকাইবার সাধ্য আমার নাই। এখানে ইঁহারা আমাকে যে মালা দিয়া সাজাইবেন তাহা ফুলের মালা, তাহা বহিতে পারিব। কিন্তু সাধারণ জনসভা যে মানের মুকুট আমার মাথায় পরাইতে চাহেন তাহার ভার বহন করিতে গিয়া আমার মাথা হেঁট হইবে। আমি জানি আপনি আমাকে ভাল-

---

বাসেন সেইজন্য আপনার কাছে আমার সানুনয় অনুরোধ, এই জনসভার স্নেহালিঙ্গন হইতে আমাকে রক্ষা করিবেন।

আপনারা পরিষৎ হইতে যে উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন একদল তাহার বিরুদ্ধে একখানি পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতেছেন। নিঃসন্দেহ তাঁহারা পরিষদের সভ্য। আপনাদের এই কবিসম্বর্ধনা প্রস্তাবের ইতিহাস আমি কিছুই জানি না সুতরাং তাঁহারা যে লিখিয়াছেন আপনারা চক্ষু-লজ্জার বিড়ম্বনায় আপনাদের বিধিলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা সত্য কি না বলিতে পারি না। কিন্তু তাহার মধ্যে আমার প্রতি যে কটাক্ষপাত আছে তাহা পড়িয়া বুঝিলাম আমার চিরন্তন ভাগ্য আমার পঞ্চাশিক জন্মোৎসবেও অবিচলিত আছেন। ভগবানের কৃপায় আমি সত্য মিথ্যা অনেক নিন্দা জীবনে বহন করিয়া আসিয়াছি আজ আমার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবার মুখে এই আর একটি নিন্দা আমার জন্মদিনের উপহাররূপে লাভ করিলাম এই যে, আমি আত্মসম্মানের জন্য লোলুপ হইয়াছি এবং অভিনন্দনের দায় হইতে পরিষৎকে নিষ্কৃতি দান করা আমারই উপরে নির্ভর করিতেছে। এই নিন্দাটিকেও নতশিরে গ্রহণ করিয়া আমার এক পঞ্চাশৎ বৎসরের জীবনকে আরম্ভ করিলাম আপনারা আশীর্বাদ করিবেন সকল অপমান সার্থক হয় যেন। ইতি, ২১শে বৈশাখ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৩৪)

সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হলেও নিজে তার থেকে দূরে থাকবেন, এ রকম কল্পনাও রবীন্দ্রনাথ এক সময় করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে যে রকম অপ্রিয় চিঠিপত্র পেতে লাগলেন তাতে ব্যথিত হয়ে এই সম্বর্ধনা প্রস্তাব প্রত্যাহরণ করবার জন্য রামেন্দ্রসুন্দরকে অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন পূর্বোদ্ধৃত পত্র লিখবার পরদিনই (২২শে বৈশাখ ১৩১৮) আর-একটি চিঠিতে—
(২২ বৈশাখ ১৩১৮)—

ওঁ

শান্তিনিকেতন
বোলপুর

সবিনয় নমস্কার পূর্বক নিবেদন—

একখানি পত্র এই সঙ্গে পাঠাইলাম। লেখক আমাকে জানাইয়াছেন যে, আপনাদিগকে আশুসঙ্কট হইতে মুক্ত করিয়া আমার ঔদার্য প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে—অথচ আমার পূজাটাও একেবারে মারা না যায় এমন সান্ত্বনাজনক ব্যবস্থারও অভাব নাই।

আপনি জানেন আমি সংসারের জনতা হইতে সরিয়া আসিয়াছি আজ আমাকে এই পাপানির মধ্যে কেন টানিয়া আনিলেন? অন্তর্যামী জানেন আমি মিথ্যা বলিতেছি না এই সম্মানের ব্যাপার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাই আমি আমার পক্ষে কল্যাণ বলিয়া জ্ঞান করি। আপনাদের সভায় আমি উপস্থিত থাকিব না বলিয়া প্রথম হইতেই স্থির করিয়াছিলাম—কিন্তু আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, একথা জানেন আত্মহত্যা করিলেই যে ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করা যায় তাহা নহে। আমার অনুপস্থিতিতেও আমার মুক্তি হইবে না। এইজন্য আপনাদের কাছে সানুনয়ে আমি মুক্তি ভিক্ষা করিতেছি। আমার সম্মানে এই যে বাধা পড়িয়াছে ইহাতে আমি বুঝিয়াছি ঈশ্বর আমাকে দয়া করিয়াছেন। আমার কর্ম অবসানে তিনি আমার মাথা নত করিয়া দিন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ছুটি লইব, আমি তাঁহার কাছ হইতে মজুরি চুকাইয়া লইয়া কর্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইব না। ইতি ২২শে বৈশাখ ১৩১৮

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৩৫)

প্রতিবাদকারীর দল যে বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজের এক খণ্ডাংশ মাত্র, সম্ভবতঃ এই কথা বলে পরিশেষে রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা গ্রহণে স্বীকৃত করিয়ে থাকবেন, তবে সেখানেই ব্যাপারের পরিসমাপ্তি হয়নি। যতীন্দ্রমোহন বাগচী তাঁর পূর্বোদ্ধৃত প্রবন্ধে লিখছেন—

"শুনিতে পাইলাম, সভার দিনে নাকি একটি দক্ষযজ্ঞ অভিনয় হইতে পারে। এ সংবাদ আমরা দলপতিগণকে জানাইলাম, কারণ সাহিত্য-পরিষদই এক্ষণে এ দলের কর্তৃত্বভার লইয়া অগ্রণী হইয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন, তথাস্তু। দেখা যাক, কতদূর কে কি করে। পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু নাটোর-মহারাজকেও একথা বলিলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তরে ভরসা দিয়া বলিলেন, মা ভৈঃ। এ রোগের ঔষধ আমার কাছে আছে, আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই সভায় উপস্থিত থাকিব...সে দায়িত্ব আমার রহিল।... ইতিমধ্যে সভার দিন সমাগত হইল। বুঝা গেল, অন্তরায় ঘটিবার কোন আশঙ্কা নাই।"

এই প্রসঙ্গে জগদিন্দ্রনাথের ভাষণের যে অংশ 'ভারতী'র বিবরণে উল্লিখিত হয়েছে তা এই—

"যুগ অতীত হইয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু বহুকাল পূর্বে একবার ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্মনন্দনের রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে অর্ঘ্যাধিকারীর নির্বাচনে বড়ই গোল বাধিয়াছিল, কুরুরাজ যুধিষ্ঠির বড় বিপদে পড়িয়া, সর্বনীতিজ্ঞ সর্বতত্ত্বদর্শী, ত্যাগধর্ম-পরায়ণ ভগবদ্ভক্ত মহাবীর পিতামহ ভীষ্মের শরণাপন্ন হইলে তিনি পুরু-

(৩৪) বঙ্গবাণী, আষাঢ় ১৩৩৪

(৩৫) বঙ্গবাণী, আষাঢ় ১৩৩৪

যোগ্যতমকেই অর্ঘ্যাধিকারী নির্বাচন করিয়া দেন; অবশিষ্ট গোলযোগ যাহা কিছু ছিল সে ভার চক্রপাণি যজ্ঞেশ্বর স্বয়ংই লইয়াছিলেন। বর্তমান ক্ষেত্রে পিতামহকল্প পরিষদকে অর্ঘ্যাধিকারীর অনুসন্ধানে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই, কারণ আজ বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীমান্তর পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করিলে সর্বথা যোগ্যপাত্র একই এবং তিনি সর্বতোভাবে অদ্বিতীয়। দুরাশার দুঃসাহসিক প্রেরণায় অধীর হইয়া স্পর্ধিত প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দাঁড়াইবেন এরূপ দামুকুলতিলক শিশুপালকল্প উন্মাদ কেহ বঙ্গদেশে আছেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, সুতরাং আরব্ধ যজ্ঞানুষ্ঠান বিঘ্নবিহীন হইয়া নিষ্পন্ন হইবে ইহাই আমাদের ঐকান্তিক ভরসা।" (৩৩)

অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়ে গেল, তবে রামেন্দ্রসুন্দরকে পরেও কৈফিয়ত দিতে হয়েছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সঙ্গে পদ্মনাথ দেবশর্মার পত্র ব্যবহার ছিল। "যখন মহাকবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অভিনন্দন লইয়া কলিকাতার পত্রিকাদিতে আলোচনা হয়, তখন প্রকৃত ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য, এবং যাহা অভিনব অথচ সর্ববাদিসম্মত তাহাতে প্রবৃত্ত না হওয়াই উচিত ছিল, এইরূপ লিখি।" তদুত্তরে রামেন্দ্রসুন্দরের এই চিঠি—

১২ পার্শিবাগান লেন, কলিকাতা
২০শে মাঘ ১৩১৮।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার বিবরণ সংবাদ-পত্রে বাহির হইয়াছে, তৎসহিত অভিনন্দন-পত্রখানিও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রপাঠে দেখিবেন, রবীন্দ্রবাবুর পঞ্চাশ বর্ষ বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁহার বহু বৎসরের সাহিত্যসেবার উপলক্ষ করিয়া [পরিষৎ] দীর্ঘায়ু কামনা করিয়াছেন মাত্র; কোনরূপ রাজ্যে বা সাম্রাজ্যে অভিষেক করেন নাই, কোনরূপ পদবী দেন নাই, বা সাহিত্যক্ষেত্রে অন্যের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার স্থান-নির্দেশের বা পদবীপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই। রবীন্দ্রবাবুর সাহিত্যক্ষেত্রে স্থান লইয়া মতভেদ আছে ও চিরকাল থাকিবে; সাহিত্য-পরিষৎ সে-বিষয়ে কোনরূপ মত প্রকাশ করিয়া ধৃষ্টতা দেখাইবেন না, বা দেখান নাই। তবে তিনি বহু বৎসর সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের পরিমাণও সামান্য নহে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই; কাজেই একটা উপলক্ষ পাইয়া তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ সম্মান প্রদর্শন করায় পরিষদের কোনরূপ অপরাধ হইয়াছে বলা উচিত নহে। অন্যান্য সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্য-অনুগ্রাহকগণকেও পরিষৎ এইরূপে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সম্মান প্রদর্শনে চিরকাল প্রস্তুত আছেন ও থাকিবেন। তাহার নজিরও আছে। বহুদিন পূর্বে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষতা-প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁহার সম্মানার্থ বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল। পরিষদের শৈশবে বিদেশী পণ্ডিত বেন্ডাল সাহেব পরিষদে উপস্থিত

(৩৩) "অর্ঘ্য", বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৮

হইলে তাঁহার সম্মানার্থ উৎসব অনুষ্ঠান হয়। সেবার পরিষদের স্থাপনকর্তা 'রমেশ-চন্দ্র দত্ত কলিকাতা আসিলে তাঁহার সম্বর্ধনার ব্যবস্থা হয়। সম্প্রতি বিশ্বকোষ-গ্রন্থ-সমাপ্তি উপলক্ষে বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রবাবুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রস্তাব উপস্থিত আছে। পূর্বতন 'সাহিত্যরথী'-দিগেরও সম্মানার্থ পরিষৎ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। 'কালীপ্রসন্ন ঘোষ কলিকাতা আসিলে পরিষৎ তাঁহার যথোচিত সম্বর্ধনা করেন। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির জীবদ্দশায় পরিষৎ তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইবার অবসর পান নাই; কেন না, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় পরিষদের অস্তিত্ব ছিল না—হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের জীবদ্দশায় পরিষদের তাদৃশ সামর্থ্য ছিল না। তথাপি হেমচন্দ্রের শেষ বয়সে অর্থকষ্ট নিবারণের জন্য পরিষৎ যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মর্মরমূর্তি স্থাপন করিয়াছেন ও বার্ষিক বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের মর্মরমূর্তির প্রতিষ্ঠা পরিষৎ-মন্দিরে শীঘ্র হইবে। বিদ্যাসাগরের বহু যত্নের লাইব্রেরিটি যখন নিলামে চড়িয়া বাঙ্গালীর দুই গালে চূণ-কালি মাখাইবার উপক্রম করিয়াছিল, পরিষৎ তখন মাঝে পড়িয়া ঐ লাইব্রেরিটি রক্ষা করিয়াছেন, উহা পরিষৎ-মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত হইয়া বিদ্যাসাগরের জীবন্ত মূর্তি স্বরূপে সাধারণের সম্মুখে রহিয়াছে।

অতএব, রবীন্দ্রনাথের প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ একটা অপূর্ব অন্যায় কাজ করিয়াছেন, তাহা বলা চলে না।

অপিচ এই অনুষ্ঠানে পরিষদের এক পয়সা ব্যয় করিতে হয় নাই। বঙ্গের মান্যগণ্য কতিপয় ব্যক্তি একটি সম্বর্ধনার কমিটি স্থাপন করিয়া কয়েক সহস্র টাকা চাঁদা তুলিয়াছিলেন। এই চাঁদা সর্বসাধা-রণের নিকট তোলা হয় নাই; তাঁহাদের নিজেরাই ও বন্ধুবান্ধবদের নিকট তোলা হয়। পরিষৎকে বাঙ্গালা শিক্ষিত সমাজের মুখপাত্র করিয়া তাঁহারা পরিষৎকে এই অনুষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। পরিষৎ সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা উচিত বোধ করেন নাই। সেই সংগৃহীত অর্থের কিয়দংশ মাত্র এই অনুষ্ঠানে ব্যয় করা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ সাহিত্যের কোনরূপ স্থায়ী উপকারের জন্য পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এখনও হিসাব শেষ হয় নাই; সম্ভবত অন্যূন সাত হাজার টাকা এইরূপে সাহিত্যের স্থায়ী উপকারার্থ পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইবে। পরিষদের হিতৈষী-

যাঁহারাই এই সংবাদ পাইলে আনন্দিত হইবেন সন্দেহমাত্র নাই।

আমাদের কতিপয় শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু কেন যে কলিকাতায় থাকিয়াও ও সমুদয় তথ্য জানিয়াও এই কবি-সম্বর্ধনা ব্যাপারে এতটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে।......

আপনার কুশলপ্রার্থী,

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ যে 'দেশের মুখরক্ষা' করেছিলেন তা প্রমাণিত হয়েছিল দুই বৎসর পরে—দীর্ঘ কৈফিয়তের কথা রামেন্দ্রসুন্দর বিস্মৃত হননি, তাই তিনি পদ্মনাথ দেবশর্মাকে তখন "রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা অবান্তর-ভাবে এই পত্রেও লিখিয়াছিলেন"—

১২ পার্শিবাগান লেন

৫ অগ্রহায়ণ ১৩২০

প্রীতি সহিত নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

......রবীন্দ্রবাবুকে যদি সে সময়ে সম্বর্ধনা করা না হইত এবং আজি বিলাতের সার্টিফিকেট দেখিয়া আমরাও সম্মান দেখাইতে উপস্থিত হইতাম তাহা হইলে লোকে বলিত না কি যে, আমরা স্বদেশী হইয়াও দেশের এতবড় লোকটাকে আদর করিলাম না বা চিনিলাম না; আজ সাহেবি সার্টিফিকেট দেখিবামাত্র অমনি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশের মুখখানা কতটুকু হইত? একেই ত কথা আছে বিলাতি প্রশংসাপত্র না দেখিলে আমাদের নিজের শাস্ত্রেও ভক্তি হয় না। ইহার পর বিদেশের সম্মান (৩৪) দেখিয়া স্বদেশীকে সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হইলে নিদারুণ লজ্জায় পড়িতে হইত না কি? আমি ত বোধ করি বিলাত যাইবার পূর্বে যে কোন একটা উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্র-বাবুর প্রতি যে আদর দেখানো হইয়াছিল, তাহাতে দেশের মুখরক্ষা হইয়াছে।........

ভবদীয়,

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (৩৬)

২ ॥ শান্তিনিকেতনে পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উৎসবের অনুষ্ঠানপত্র

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রমাধিপতি

পরমভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়ের

পঞ্চাশত্তম জন্মতিথি-উৎসবে

অর্ঘ্যাভিহরণ

মঙ্গলগীতি

শং নো বাতঃ পবতাং মাতরিশ্বা শং ন স্তপতু সূর্যাঃ।
অহানি শং ভবন্তু নঃ, শং রাত্রিঃ প্রতিধীয়তাং॥
শমুষা নো ব্যুচ্ছন্তু শমাদিত্য উদেতু নঃ।
শিবা নঃ শন্তমা ভব সুমৃড়ীকা সরস্বতি॥

(তৈ. আ. ৭. ৪২. ১—২।)

গগনসঞ্চারী পবন আমাদের কল্যাণকর হইয়া প্রবাহিত হউক! সূর্য্য আমাদের কল্যাণকর হইয়া তাপ প্রদান করুক! দিবস-সমূহ আমাদের কল্যাণকর হউক! রাত্রি-সমূহ আমাদের কল্যাণপ্রদ হইয়া প্রতি-ষ্ঠাপিত হউক! ঊষা আমাদের কল্যাণদায়িনী হইয়া প্রভাতা হউক! সূর্য্য আমাদের কল্যাণ-কর হইয়া উদিত হউক! এবং হে সরস্বতি, আপনি আমাদের শিবদায়িনী, কল্যাণদায়িনী ও সুখদায়িনী হউন!

আবাহন

নমস্তেহস্তু। (বা. স. ৩. ৬৩)।
কবিঃ সীদ নি বর্হিষি। (ঋ. স. ৯. ৫৯. ৩)
কবিং সম্রাজমতিথিং জনানাম্
(ঋ. স. ৬. ৭. ১)
গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে,
প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে,
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে।
(বা. স. ২৩. ১৯)
তব ব্রতে কবয়ো বিদ্মনাপসোহজায়ন্ত
(ঋ. স. ১. ৩১. ১);
পশ্চাৎ পুরস্তাদধরাদুদক্তাৎ কবিঃ কাব্যেন
পরিপাহি রাজন্। (ঋ. স. ১০. ৮৭. ২১)
মহান কবির্নিবচনানি শংসন্
(ঋ. স. ৯. ৯৭. ২)

---

(৩৬) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের দুখানি চিঠিই ১৩২৭ শ্রাবণ সংখ্যা সাহিত্যে মুদ্রিত ও আশুতোষ বাজপেয়ী-প্রণীত 'রামেন্দ্রসুন্দর' গ্রন্থে (১৩৩০) উদ্ধৃত।

স জীব শরদঃ শতম্। (শত ব্রাঃ ১৪ ৮ ৪ ২৬)

আপনাকে নমস্কার।

হে কবি, আপনি কুশাসনে উপবেশন করুন।

আপনি সম্রাট কবি, আপনি জনসমূহের আতিথি—সৎকারের যোগ্য পাত্র,

আপনি জনগণের নায়ক, আপনাকে আমরা আহ্বান করিতেছি!

আপনি প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয়, আপনাকে আমরা আহ্বান করিতেছি!

আপনি সমস্ত নিধির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি, আপনাকে আমরা আহ্বান করিতেছি।

আপনার ব্রত অনুসরণ করিয়া অনেক বিজ্ঞ কবি উৎপন্ন হইয়াছেন;

হে শোভমান কবি, আপনি সম্মুখ-পশ্চাৎ ও উচ্চ নীচ সর্বত্রই কাব্যদ্বারা (লোককে) রক্ষা করুন।

হে মহাকবি, আপনি আপনার সুভাষিত-সমূহ উচ্চারণ করিয়া শত বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকুন!

অর্ঘ্যাভিহরণ

এতচ্চন্দনমত্র শীলমিব তে চন্দ্রোজ্জ্বলং শীতলং,
দীপোহয়ং প্রতিভাপ্রভাব ইব তে কান্তস্থিরং দীপ্যতে।
ধূপোহয়ং তব কীর্তিসঞ্চয় ইবামোদৈর্দিশ ব্যশ্নুতে,
মালাং নির্মলকোমলং তব মনস্তুল্যাং তথেদং স্থিতম্ ॥
এতশ্চামরযুগ্মকং সুবিশদং কাব্যং ত্বদীয়ং যথা,
পুষ্পশ্রেণীরিয়ং গুণালিরিব তে পশ্যজ্জনাকর্ষিণী।
অর্ঘ্যং তাবদিদং কৃতং তব কৃতে দূর্বাঙ্কুরাদ্যান্বিতং
প্রীত্যা নঃ প্রতিগৃহ্যতাং সকৃপয়া, স্বস্ত্যস্তু তে শাশ্বতম্ ॥

এই চন্দ্রোজ্জ্বল চন্দন আপনার শীলের ন্যায় শীতল; আপনার প্রতিভাপ্রভাবের ন্যায় এই দীপ সুন্দর ও স্থিরভাবে দীপ্তি প্রাপ্ত হইতেছে; এই ধূপ আপনার যশোরাশির ন্যায় সৌরভে দিকসমূহকে ব্যাপ্ত করিতেছে; এবং আপনার মনের ন্যায় কোমল ও নির্মল এই মাল্যখানি এখানে অবস্থিত রহিয়াছে। আবার এই চামরযুগল আপনার কাব্যের ন্যায় সুবিশদ, এবং এই কুসুম-শ্রেণী আপনার গুণাবলীর ন্যায় দর্শকবৃন্দকে আকর্ষণ করিতেছে। দূর্বাঙ্কুরপ্রভৃতি দ্বারা আমরা আপনার জন্য এই অর্ঘ্য রচনা করিয়াছি আপনি আমাদের প্রতি প্রীতি ও করুণা করিয়া ইহা গ্রহণ করুন। আপনার শাশ্বত স্বস্তি হউক প্রার্থনা করি।

শান্তি

পৃথিবী শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তির্দৌঃ
শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ
শান্তির্বিশ্বে মে দেবাঃ শান্তিঃ শান্তিঃ
শান্তিভিঃ।
তাভিঃ শান্তিভিঃ সর্বশান্তিভিঃ শময়ামোহং
যদিহ ঘোরং
যদিহ ক্রূরং যদিহ পাপং তচ্ছান্তং তচ্ছিবং
সর্বমেব শমস্তু নঃ ॥
অথ. স. ১৯. ৯. ১৪।

পৃথিবী শান্তিময় হউক, অন্তরিক্ষ শান্তিময় হউক, দ্যুলোক শান্তিময় হউক; জল শান্তিময় হউক, ওষধিসমূহ শান্তিময় হউক, বিশ্বদেবগণ আমার সম্বন্ধে সমস্ত শান্তির দ্বারা শান্তিময় হউন!

এখানে যাহা কিছু ভয়ানক রহিয়াছে, যাহা কিছু পাপ রহিয়াছে, আমরা তাহা সেই শান্তিসমূহের দ্বারা সমস্ত শান্তির দ্বারা উপশমিত করিতেছি; তাহা শান্ত হউক, তাহা শিব হউক! সমস্তই আমাদের কল্যাণকর হউক!

ভক্তিপ্রণত
আশ্রমবাসিবৃন্দ।

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রম
বোলপুর,
২৫শে বৈশাখ, ১৩১৮ সাল [বঙ্গাব্দ]

৬ ॥ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ অনুষ্ঠিত
'কবি সম্বর্ধনার অনুষ্ঠানপত্র

কবি সম্বর্ধনা।/কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/মহাশয়ের পঞ্চাশত্তম বর্ষ পূর্ণ হওয়া/উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ/কর্তৃক/তাঁহার সম্বর্ধনা ও অভিনন্দন।/স্থান,—টাউনহল, কলিকাতা।/সময় ১৪ই/মাঘ ১৩১৮,—২৮ জানুয়ারী ১৯১২, রবিবার,/অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা।/সভাপতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম এ, বি এল।/(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি)/নিবেদন—কবিবর সভাত্যাগ করিবার পূর্বে অনুগ্রহ করিয়া/কেহ আসন পরিত্যাগ করিবেন না।

কার্যসূচী

১। দেশীয় তন্ত্রীযন্ত্রের একতান বাদন,—অধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। সভাপতি—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক—সভার উদ্বোধন।

৩। মঙ্গলাচরণ—উপনিষদ্-গাথা পাঠ,—পাঠক—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ঠাকুরপ্রসাদ আচার্য।

(শ্লোকাঃ)

কবিং পুরাণমনুশাসিতারম্
অণোরণীয়াংস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারম্ অচিন্ত্যরূপম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টম্
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবম্
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥

অগ্নি মূর্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্যৌ
দিশঃ শ্রোত্রে বাগবৃত্তাশ্চ বেদাঃ
বায়ু প্রাণো হৃদয়ং বিশ্ব যস্য
পদ্ভ্যাং পৃথিবীহ্যেষ সর্বভূতান্ত-
রাত্মা॥
ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে
ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ
মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥
হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধম্
বিচিন্ত্যমধ্যে বিশদং বিশোকম্।
অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপম্
শিবং প্রশান্তং অমৃতং ব্রহ্মযোনিম্॥
অনাদিমধ্যান্তবিহীনমেকম্
বিভুং চিদানন্দরূপমদ্ভুতম্।
ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিম্
সমস্ত সাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ॥
বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখ
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈঃ
দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং পশ্যতো জায়মানম্
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

যেনাবৃতং খঞ্চ দিবঞ্চ মহীঞ্চ
যেনাদিত্যস্তপতি তেজসা ভ্রাজসা চ।
যমন্তং সমুদ্রে কবয়ো বয়ন্তি
যদক্ষরে পরমে প্রজাঃ॥

যস্মিন্নিদং সঞ্চ বিচৈতি সর্বম্
যস্মিন দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
তদেব ভূতম্ তদুভব্যা মা ইদম্
তদক্ষরে পরমে ব্যোমন্॥

৪। অভ্যর্থনা-সংগীত—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ রচিত ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গায়কগণ কর্তৃক গেয়।

গীত।

বাণীবরতনয় আজি স্বাগত সভা মাঝে।
অমৃত-চিত-কমলে যেথা আসন তব রাজে॥
কাব্য-গীতি-চিত্র-গাথা-সপ্তস্বরা-তারে,
মুখর করি নিখিল লোক হরষ-রস-ধারে,
বিশ্ববীণাযন্ত্রে তব বিজয়বাণী বাজে।
আষাঢ় মেঘমন্দ্র কাঁপে গম্ভীর তব ছন্দে,
সরস শোভা পরশে রসি চরণ তব বন্দে,
মধুরস্বরে মাধবীসখা কোয়েলা মরে লাজে॥
ঘনায়ে আসে অতুল মেঘ অতুলতুলিস্পর্শে,
সুখের আলো উজল জ্বলে গম্ভীরতর হর্ষে,
শান্তি দিয়া সান্ত্বনায় শক্তি দিয়া কাজে।
বঙ্গভাবা ডাকিছে তোমায় শত সেবক-কণ্ঠে,
বঙ্গ আজি মিলিত তব মিলন-সুধা বণ্টে;
বাজায়ে শুভশঙ্খ আজি ডাকিছে
নিজে মা যে॥
এস হৃদয়বন্ধু এস এস হে কবিসূর্য্য,
মায়ের ঘরে বাজিছে তব অভিবাদনতূর্য্য,
স্বাগত কবিরাজ অধিরাজ রসসাজে॥

অর্ঘ্যদান—ধান্য, দূর্বা, অক্ষত, সিদ্ধার্থ, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুঙ্কুম, দধি, মধু, ঘৃত, পুষ্প, গোরোচনা-সজ্জিত অর্ঘ্যপাত্র নাটোরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর কর্তৃক প্রদান।
৬। মাল্যদান—(১) বর্ণসূত্রমালা। (২) পত্রপুষ্পমাল্য। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক প্রদান।
৭। উপায়ন—স্বর্ণপদ্ম।
৮। রচনা-পাঠ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচনা হইতে আবৃত্তি।
৯। অভিনন্দন—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম-এ মহাশয় কর্তৃক হস্তিদন্ত-ফলকে উৎকীর্ণ অভিনন্দনপত্র পাঠ ও অর্পণ।
১০। অভিভাষণ—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিভাষণ।
১১। সঙ্গীত।
১২। ঐকতান বাদন।

সে যুগে মানুষ তার
লাঙ্গল ও তাঁত,
তার তীর ও
ধনুক এবং
রথের ব্যবহার
করত তার
জীবনের বিকাশের
উদ্দেশ্যে; ঠিক তেমনি
আজকের দিনেও
আধুনিক যন্ত্রপাতিকে
মানুষের কল্যাণের জন্যই
নিয়োজিত করতে হবে।
কবিগুরুর 'নগর ও গ্রাম' ইংরেজী
প্রবন্ধের অংশবিশেষের বাংলা অনুবাদ।
বিশ্বভারতী বুলেটিনের ১৯৪৭ সালের
১০ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।
মার্টিন বার্ন লিমিটেড, দি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড, বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড,
দি হাওয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোং লিঃ এবং দি হুগলি ডকিং অ্যাণ্ড এন্‌জিনীয়ারিং কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

১৩৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশবাসীর পক্ষ থেকে যে উৎসবের আয়োজন হয়েছিল রবীন্দ্রানুরাগী যাঁরা এখনো ইহলোকে আছেন তাঁদের অনেকেরই পক্ষে তা জীবনের স্মরণীয়তম উৎসব—অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্য, পরিধি, সৌষ্ঠব ও সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতার বিচারে। বাংলা দেশের এ কালের যে-সকল শ্রেষ্ঠ মানুষকে স্মরণ করে আমরা গৌরব বোধ করে থাকি তাঁরা অনেকেই সেদিনও ইহলোকে, উৎসবের প্রাঙ্গণে তাঁরা প্রায় সকলেই সমবেত হয়েছিলেন, এই অনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ শ্রীঅমল হোমের বাহুতে শক্তিসঞ্চার করেছিলেন। এখানে উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ দেবার অবকাশ নেই; রবীন্দ্রজয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে যে অভিনন্দনপত্র অর্পিত হয়েছিল, এবং কবি তার উত্তরে যা বলেছিলেন, সাময়িক পত্রাদি থেকে সেই রচনা দুটি আমরা প্রকাশ করলাম। এই অভিনন্দন-পত্র শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা, জয়ন্তী-পরিষদের পক্ষ থেকে সভাপতি আচার্য জগদীশচন্দ্রের স্বাক্ষরে অর্পিত। ১৯৩১ সালের ২৭ ডিসেম্বর কলকাতা টাউন-হল প্রাঙ্গণে অভিনন্দনের প্রধান অনুষ্ঠান হয়, ঐদিন রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ ও উৎসাহে বর্ধিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের জন্মনগরী কলিকাতার পৌরসভার পক্ষে মেয়র শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মিলন ও প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পক্ষ থেকেও অভিনন্দন জ্ঞাপিত হয়—কবি প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র উত্তর দেন। এই অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিকরূপে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় "গোল্ডেন বুক অব টাগোর" গ্রন্থ কবিকে উপহার দেন।

প্রধান অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে প্রদর্শনী, সাহিত্য-সম্মিলন ও বিচিত্র উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। ছাত্রছাত্রী-উৎসব-পরিষদ সেনেট হলে কবিকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন, "প্রতিভাষণ" নামে সত্তর বৎসরের জয়ন্তীর যে অভিভাষণ পরিচিত তা এইখানেই কবি পাঠ করেছিলেন। ছাত্রছাত্রী-উৎসব-পরিষদ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ছাত্রদের রচনাসংগ্রহ "কবি-প্রশস্তি" পুস্তক এই উপলক্ষে প্রকাশ করে কবিকে প্রণাম-নিবেদন করেন। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টও একদিন রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করেন, তারই উত্তরে কবির গান

"তোমাদের দান যশের ডালায় সবশেষ সঞ্চয়"।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের অভিনন্দন

কবিগুরু,

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।

তোমার সপ্ততিতম-বর্ষশেষে একান্তমনে প্রার্থনা করি জীবনবিধাতা তোমাকে শতায়ুঃ দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক।

বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন; তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ব-বর্তী সকল সাহিত্যাচার্যগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।

আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে

৭০ বৎসর রবীন্দ্রজয়ন্তী-উৎসবানুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ চিত্রঃ শ্রীকাঞ্চন মুখোপাধ্যায়
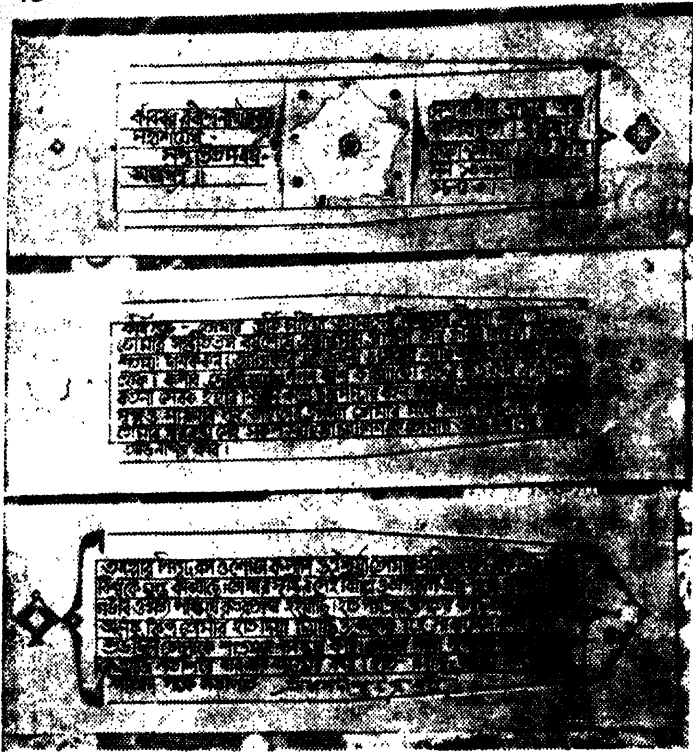
স্বর্ণপত্রে খোদিত অভিনন্দনপত্র শ্রীনন্দলাল বসুর হস্তাক্ষরে
শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত

স্বকীয় চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃতকৃতার্থ হইয়াছি।

হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি বারম্বার নতশিরে নমস্কার করি। ইতি—

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব-পরিষদ পক্ষে
জগদীশচন্দ্র বসু
সভাপতি

কলিকাতা
রবিবার, কৃষ্ণতৃতীয়া
১১ই পৌষ, ১৩৩৮ সাল, বঙ্গাব্দ

কবির উত্তর

বিপুল জনসঙ্ঘের বাণীসঙ্গমে আজ আমি স্তব্ধ। এখানে নানা কণ্ঠের সম্ভাষণ, এ যে আমারই অভিবাদনের উদ্দেশে সম্মিলিত, একথা আমার মন সহজে ও সম্যকরূপে গ্রহণ করিতে অক্ষম। সূর্যের আলোক বাষ্পাসিক্ত ধূলিবিকীর্ণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়, কোথাও বা সে অন্ধকারের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, কোথাও বা সে বাষ্পহীন আকাশে সমুজ্জ্বল, কোথাও বা পুষ্পকাননে বসন্তে তাহার অভ্যর্থনা, কোথাও বা শস্যক্ষেত্রে শরতে তাহার উৎসব। দৈবকৃপায় আমি কবিরূপে পরিচিত হইয়াছি, কিন্তু সেই পরিচয়ের স্বীকার দেশবাসীর হৃদয়ে অনবচ্ছিন্ন নহে, তাহা স্বভাবতই বাধাবিরোধ ও সংশয়ের দ্বারা কিছু-না-কিছু অবগুণ্ঠিত। তাহাকে বিক্ষিপ্ততা হইতে সংক্ষিপ্ত করিয়া আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া এই জয়ন্তী অনুষ্ঠান নিবিড় সংহতভাবে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া দিল—সেই সঙ্গে উপলব্ধি করিলাম দেশের প্রীতিপ্রসন্ন হৃদয়কে তাহার আপন অপ্রচ্ছন্ন বিরাটরূপে। সেই আশ্চর্য রূপ দেখিলাম পরম বিস্ময়ে, আনন্দে, সম্ভ্রমের সঙ্গে, মস্তক নত করিয়া।

অদ্যকার এই প্রকাশ কেবল যে আমারই কাছে অপরূপ অপূর্ব তাহা নহে, দেশের নিজের কাছেও। উৎসবের আয়োজন করিতে গিয়াই দেশশ্রী সহসা আবিষ্কার করিয়াছেন তাঁহার গভীর অন্তরের মধ্যে কতটা আনন্দ, কতটা প্রীতি নানা ব্যবধানের অন্তরালে অজস্র সঞ্চিত হইতেছিল। আবাল্যকাল দেশমাতার প্রাঙ্গণে গাহিয়াই আমার কণ্ঠসাধনা। মাঝে মাঝে যখন মনে হইত উদাসীন তিনি, তখনও বুঝি-বা তাঁহার অগোচরেও সুর পেঁৗছিয়াছিল তাঁহার অন্তরে; যখন মনে হইয়াছে তিনি মুখ ফিরাইয়াছেন তখনও হয়ত তাঁহার শ্রবণদ্বার রুদ্ধ হয় নাই। ভাল ও মন্দ, পরিণত ও অপরিণত, আমার নানা প্রয়াস তিনি দিনে দিনে মনে মনে আপন স্মৃতিসূত্রে গাঁথিয়া লইতেছিলেন। অবশেষে সত্তর বৎসর বয়সে যখন আমার আয়ু উত্তীর্ণ হইল, যখন তাঁহার সেই মালায় শেষ গ্রন্থি দিবার সময় আসন্ন, তখনই আমার দীর্ঘজীবনের চেষ্টা তাঁহার দৃষ্টি-সম্মুখে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণপ্রায়। সেইজন্যই তাঁহার এই সভায় আজ সকলের আমন্ত্রণ, স্নিগ্ধস্বরে তাঁহার এই বাণী আজ উচ্চারিত —"আমি গ্রহণ করিলাম।" সংসার হইতে বিদায় লইবার দ্বারের কাছে সেই বাণী স্পষ্ট ধ্বনিত হইল আমার হৃদয়ে। ত্রুটি বিস্তর আছে, সাধনার কোন অপরাধ ঘটে নাই ইহা একেবারে অসম্ভব। সেইগুলি চুনিয়া চুনিয়া বিচার করিবার দিন আজ নহে। সে সমস্তকে অতিক্রম করিয়াও আমার কর্মের যে সম্পূর্ণতা প্রকাশমান তাহাকেই আমার দেশ তাহার আপন সামগ্রী বলিয়া চিহ্নিত করিয়া লইলেন। তাঁহার সেই অঙ্গীকারই এই উৎসবের মধ্য দিয়া আমাকে বর দান করিল। আমার জীবনের এই শেষ বর, এই শ্রেষ্ঠ বর।

অনুকূলতা এবং প্রতিকূলতা শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষের মতই, উভয়েরই যোগে রাত্রির পূর্ণ আত্মপ্রকাশ। আমার জীবন নিষ্ঠুর বিরোধের প্রভূত দান হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু তাহাতে আমার সমগ্র পরিচয়ের ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ তাহার যা শ্রেষ্ঠ যা সত্য তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। আমার জীবনেও যদি তাহা না ঘটিত, তবে অদ্যকার এইদিন সার্থক হইত না। আমার আঘাতপ্রাপ্ত শরবিদ্ধ খ্যাতির মধ্য দিয়া এই উৎসব আপনাকে প্রমাণ করিয়াছে। তাই আমার শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই তিথিকে প্রণাম করা আমার পক্ষে আজ সহজ হইল। যে ক্ষয়ের দ্বারা ক্ষতি হয় না, তাহাই বিধাতার মহৎ দান—দুঃখের দিনেও যেন তাহাকে চিনিতে পারি, শ্রদ্ধার সহিত যেন তাহাকে গ্রহণ করিতে বাধা না ঘটে।

আপনাদের প্রদত্ত শ্রদ্ধা ও গৌরব আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করিতেছি। আপনাদের এই আয়োজন সময়োচিত হইয়াছে। জীবনের গতি যখন প্রবল থাকে তখন সম্মান গ্রহণ ও বহন করিবার দিন নয়। জীবন যখন মৃত্যুর প্রান্তে আসিয়া পেঁৗছায় তখনই তাহা অপেক্ষাকৃত সহজে লওয়া যায়। কর্মের গতি বেগময় জীবনের মধ্যে সম্মান, অনেক বিক্ষোভ ও বাদবিসম্বাদের সৃষ্টি করে। আজিকার দিনে আপনাদের হাত হইতে তাই জীবনের দেশের শেষ সম্মান আমি গ্রহণ করিতেছি ও দেশবাসীকে আমার সকৃতজ্ঞ হৃদয়ের শেষ নমস্কার জানাইয়া যাইতেছি।

"জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি"

শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হল, তার সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, এইটিই রবীন্দ্রনাথের শেষ অভিভাষণ। ১৩৪৮ সালের ১ বৈশাখ সায়ংকালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষপূর্তি উৎসবের ভাষণ 'সভ্যতার সংকট' শারীরিক ক্লান্তিবশত রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং পড়তে পারেননি, ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় তাঁর হয়ে সেটি পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করে যে কয়টি কথা বলেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন-কৃত তার অনুলিখন, শ্রীপ্রতিমা দেবী লিখিত রবীন্দ্র-জীবনের শেষ অধ্যায়ের বিবরণ 'নির্বাণ' গ্রন্থে মুদ্রিত আছে।

'আশ্রমবাসী কল্যাণীয়গণ, তোমরা আজ আমাকে অভিনন্দন করে উপহার বহন করে এনেছ, পরিবর্তে আমার কাছ থেকে আশীর্বাদের প্রার্থনা জানিয়েছ। প্রত্যহ নীরবে আমার আশীর্বাদ তোমাদের প্রতি ধাবিত প্রবাহিত হয়েছে, দীর্ঘকাল নিরন্তর তোমাদের অভিষিক্ত করেছে। আমার আশীর্বাদ আজ নূতন বেশে তোমাদের কাছে উপস্থিত হোক, সুন্দর বেশে তাকে তোমরা গ্রহণ করো।

'জন্মকালে আমরা যে আত্মীয় লাভ করি তার মধ্যে কোনো চেষ্টা নেই, জীবন-লক্ষ্মীর সে অযাচিত দান, তার মধ্যে আমাদের কোনো গৌরব নেই। তারপর জীবনযাত্রার পথে-পথে যদি আত্মীয় সংগ্রহ করতে পারি তবে সেই তো আশ্চর্য, সেই তো গৌরবের বিষয়, সেই আত্মীয়তা আরো গভীর, অকৃত্রিম, মূল্য তার অনেক বেশী—আশীর্বাদ সেই তো বহন করে আনে। আজ যে তোমাদের সকলের হৃদয়ের দান বিধাতার আশীর্বাদরূপে আমার কাছে উপস্থিত এ এক আশ্চর্য ঘটনা। কোন্ দূরে পরিবারের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আমার বাল্যলীলা আরম্ভ, আমি কাউকে জানতুম না, দু'চারজন আত্মীয়ের মধ্যে আমার পরিচয় সীমাবদ্ধ ছিল। আজ তোমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে ভাবি, বিধাতা আমার জীবনে কী খেলা খেললেন, সেদিন তো এ-কথা কল্পনাও করতে পারিনি। প্রচলিত ভাষায় যাকে আত্মীয় বলে তোমরা তা নও, তাই তোমাদের প্রীতি এত মূল্যবান। এই নব বৈশাখের উৎসবে তোমরা যে উপহার পুঞ্জীভূত করে এনেছ, কৃতজ্ঞ অন্তরে তা গ্রহণ করি। আমার মত সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই আছে, শুধু যে আমার স্বদেশীয়েরাই আমাকে ভালোবেসেছেন তা নয়, সুদূর দেশেরও অনেক মনস্বী তপস্বী রসিক আমাকে অজস্র আত্মীয়তা দ্বারা ধন্য করেছেন। জানি না আমার চরিত্রে কর্মে কী লক্ষ্য করেছেন। সকলের এই স্নেহমমতা সেবা আজ আমি অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করি, প্রণাম করে যাই তাঁকে, যিনি আমাকে এই আশ্চর্য গৌরবের অধিকারী করেছেন।'

শান্তিনিকেতনে অশীতিবর্ষপূর্তি-উৎসবে অভিভাষণরত রবীন্দ্রনাথ ॥ ১ বৈশাখ ১৩৪৮ চিত্র শ্রীশম্ভু সাহা

মর্ত্য-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রকাব্যের সংগে পাশ্চাত্ত্য জগতের প্রথম পরিচয় ঘটেছিল, কিন্তু এই অর্ধশতাব্দী কালের মধ্যে সেই পরিচয় খুব যে বিস্তার লাভ করেছে এমন বলা যায় না। বরং দেখা গিয়েছে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রকাব্যের চাইতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ইয়ুরোপে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কীর্তির চাইতে যেমন কর্তা মহৎ, কাব্যের চাইতে তেমনি কবি; সেদিক থেকে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়। ইয়ুরোপীয় পাঠক রবীন্দ্রকাব্যে যা পায়নি হয়তো তাঁর ব্যক্তিত্বে তাই পেয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে রবীন্দ্রনাথ যখন ইয়ুরোপ ভ্রমণে যান তখন যুদ্ধক্লান্ত পশ্চিম মহাদেশ তাঁর মুখে শান্তির বাণী শুনে তাঁকে প্রধানত শান্তির দূত এবং মানব-প্রেমিক হিসাবেই দেখেছে। তাঁর কবি ভূমিকা তখনকার মতো খানিকটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। তার পরেও ইয়ুরোপে তাঁর কবিখ্যাতি আর বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। এখানে এর মূল কারণটির সংক্ষিপ্ত একটু আলোচনা খুব অবান্তর হবে না। যুদ্ধটা একটা প্রচণ্ড বাত্যার মতো ইয়ুরোপীয় জীবন এবং সমাজকে একেবারে তচনচ্ করে দিয়েছিল, ফলে সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিতে ভয়ংকর রকমের একটা পরিবর্তন এসেছিল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইয়ুরোপে যে নতুন যুবক সম্প্রদায় দেখা দিল এরা কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছে, কাজেই জীবনের প্রতি এদের অদ্ভুত এক হ্যাংলাপনা। মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছি, রোসো, এবার একটু জীবনটাকে ভোগ করি—এই তাদের মনো-ভাব। আরেক শ্রেণী—এর চাইতেও এক ডিগ্রী চড়া। তারা বলতে লাগল, আমরা তো বলতে গেলে মরা মানুষ, তোমরাই মরতে পাঠিয়েছিলে, বরাত জোরে বেঁচে এসেছি। এখন আমাদের ধর্ম্মকথা শোনাতে এসো না, আমরা নীতিকথা শুনব না, তোমাদের আইন আদালত মানব না, আমাদের যা খুশি করব। আগের দল যদি করেছে হ্যাংলাপনা, এরা শুরু করলে বেলাল্লাপনা। সমাজে নানা রকম বিশৃংখলা দেখা দিল। আরো একদল—এ'রা উচ্চ-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, এরা যুদ্ধের সময় থেকেই যুদ্ধবিরোধী কবিতা লিখে আসছিলেন। যুদ্ধের অন্যায়কে তাঁরা অনন্যোপায় হয়ে সহ্য করেছেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষান্তির পরে রাষ্ট্রনায়কদের প্রতারণা আরোই অসহ্য মনে হয়েছে। যুদ্ধের হতাশ্বাসের চাইতে শান্তির নিরাশ্বাস এ'দের মনে গভীরতর আঘাত দিয়েছে। কোথায় গেল সব মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চকের দল যারা গালভরা কথা বলেছিল—যুদ্ধের পরে পৃথিবীতে স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে—কই, সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কিছুমাত্র পরিবর্তনের লক্ষণ নেই, পুরোনোটাকেই আঁকড়ে ধরে বসে আছে। বুঝতে বাকি নেই,—তলে তলে সবাই আবার যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, আরেকটি যুদ্ধ অনিবার্য। এ'রাই এ যুগের সাহিত্যিক। এঁদের মনে দারুণ তিক্ততা, জীবন সম্বন্ধে গভীর হতাশা, এই ঘুনে ধরা সভ্যতার প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা। এ'দের এই তিক্ততা, হতাশা এবং অবজ্ঞার ভাব তাঁর ঘৃণাত্মক এবং ব্যঙ্গাত্মক রচনায় প্রকাশ

শান্তিনিকেতন মন্দিরের উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ ফটো : শম্ভু সাহা

পেয়েছে। সেদিনকার কবি যুদ্ধ-প্রত্যাবৃত বিক্ষুব্ধ যুবকচিত্তের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার একটু নমুনা দেওয়া যাক্—

Walked eye-deep in hell
believing in old men's lies, then
unbelieving
came home, home to a lie,
home to many deceits,
home to old lies and new infancy;
usury age-old and age-thick
and liars in public places.

ইয়ুরোপের এই যখন মেজাজ তখন রবীন্দ্রনাথের শান্তস্বভাব মৃদুভাষী কাব্য তাদের ভালো লাগবে না, এ এক রকম জানা কথা। মিষ্টি মিষ্টি কাব্যে তখন তাদের অরুচি ধরেছে। কাব্যে তারা অন্য রকম তার চেয়েছে, কথায় আরো ধার চেয়েছে। এমন যে ইয়েটস্—রবীন্দ্রকাব্যের সংগে যাঁর সুরের এবং স্বাদের মিল ছিল তিনিও ক্রমে সমতল ভূমি ত্যাগ করে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ঊর্ধ্বগামী হলেন। ইংরেজি কাব্যের চলন বলন ঠাট ঠমক সব বদলে গেল।

অথচ এ কথা বুঝতে বিলম্ব হয় না যে এ'রা কাব্যে সাহিত্যে যে তিক্ততা প্রকাশ করেছেন তা জীবন সম্বন্ধে বীতস্পৃহা সঞ্জাত নয় বরং উল্টো—জীবনে এ'দের স্পৃহা আছে, জীবনকে এ'রা ভালবাসেন। কিছু বা অদৃষ্টের চক্রান্তে, বেশির ভাগ মানুষের চক্রান্তে এ'রা সেই জীবনের প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন—এই তাঁদের ক্রোধের কারণ। এ'দের আক্রোশ বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং সমাজ ব্যবস্থার ওপর।

ইয়ুরোপ জীবন-বিলাসী। ইয়ুরোপীয় পাঠক রবীন্দ্রকাব্যের মধ্যে জীবনের বার্তা খুব বেশি খুঁজে পায় নি। বলা বাহুল্য রবীন্দ্র-কাব্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইয়ুরোপে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত গীতাঞ্জলির কবি হিসাবেই পরিচিত। নোবেল প্রাইজের সংগে যুক্ত হয়ে গীতাঞ্জলি কাব্য অতি মাত্রায় প্রাধান্য লাভ করেছে। এর ফল ভালো হয়নি। নোবেল প্রাইজের দৌলতে অর্থলাভ যেটুকু হয়েছে তার চাইতে অনর্থ হয়েছে বেশি। বেশির ভাগ লোক গীতাঞ্জলিকেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলে জেনে রেখেছে। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ আর যে সব কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন তারও বেশির ভাগ গীতাঞ্জলি জাতীয়। ইংরেজিতে যাকে বলে hymn—সেই জাতীয় কবিতা অনুবাদে তাঁর কলম খেলত ভাল, এইজন্যে ঐ দিকেই তিনি ঝুঁকেছিলেন। ফলে ইংরেজ পাঠকের কাছে তিনি কেবলমাত্র অধ্যাত্মবাদী মরমীয়া কবি হিসাবেই পরিচিত হয়েছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের পাঠক যাঁরা অনুবাদের মারফৎ তাঁকে জেনেছেন তাঁরাও রবীন্দ্রনাথকে প্রধানত, অধ্যাত্মবাদী কবি বলেই জেনেছেন। আমরা ভারতবাসীরা অমনিতেই আধ্যাত্মিক জাতি বলে গর্ব করে থাকি। কাজেই রবীন্দ্রনাথকে অধ্যাত্মবাদী কবি বলে ভাবতেই আমাদের ভালো লাগে। বাংলা দেশেও এরূপ পাঠকের সংখ্যা বড় কম নয়। ফলে রবীন্দ্র সাহিত্যের একটা মস্ত বড় দিক কতকটা অনাদৃতই রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে একজন প্রকৃত জীবন রসিক, জীবনরসজ্ঞ কবি হিসাবেই যে তাঁর প্রকৃষ্টতম পরিচয় এ কথা ইয়ুরোপীয় পাঠক জানবার অবকাশ পায় নি, কারণ অনুবাদের অভাবে রবীন্দ্র সাহিত্যের বারো আনা অংশ তাদের অনধিগম্য। আমাদের কাছেও এ জিনিসটি খুব স্পষ্ট নয়, কারণ আমরা ভারতবাসীরা ঠিক জীবনরসজ্ঞ নই, ও রস আমাদের ধাতে সয় না। বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথই এই যুগে সর্বপ্রথম আমাদিগকে

জীবনধর্মে দীক্ষা দিলেন। সেই কথাটি বলবার জন্যেই এই প্রবন্ধ।

যন্ত্রক্লান্ত ইয়ুরোপ একদিন রবীন্দ্রনাথকে মানবপ্রেমিক বলে আবিষ্কার করেছিল—সেটা রাজনীতির ক্ষেত্রে। ওদেশের লোক জানত না যে সাহিত্য ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে মানবপ্রেমিক। কাব্যে সাহিত্যে চিরকাল তিনি মানুষেরই জয়গান করেছেন। শুধু মানবপ্রেমিক বললে সবটুকু বলা হয় না, তিনি জীবনপ্রেমিক এবং মর্ত্য প্রেমিক। কেবল অধ্যাত্মলোকে বাস করেন নি, মর্ত্ত-লোকেই বেশির ভাগ বিচরণ করেছেন। দেবতার চাইতে মানুষকে বেশি মূল্য দিয়েছেন, স্বর্গের চাইতে মর্ত্যকে, পরকালের চাইতে ইহকালকে।

এই যে দৃষ্টিভঙ্গি এটি বিশেষ করে ইয়ুরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি। ইয়ুরোপের কবির মুখেই আমরা শুনেছি—Oh! the wild joys of living! ও দেশের কবিই বলেছেন, I will drink life to the lees. আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের মুখেই অনুরূপ কথা আমরা প্রথম শুনলাম। 'জীবনের শতলক্ষ—ক্ষুধা' মিটাবার কথা, 'শত লক্ষ আনন্দের স্তন্যরসসুধা' নিঃশেষে পান করবার কথা তিনিই আমাদের শোনালেন। পৃথিবী সুন্দর, জীবন সুন্দর—এই সুন্দর পৃথিবীতে শুধু বেঁচে থাকার যে আনন্দ সে আনন্দের কথা এমন করে আর কেউ আমাদের শোনান নি। দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রকাব্যের এই দিকটি ইয়ুরোপের কাছে অজ্ঞাত। তারও চাইতে বড় দুর্ভাগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-বাসীরাও এ সম্বন্ধে উদাসীন। দেবদ্বিজে আমাদের স্বভাবজাত ভক্তি, আমরা রবীন্দ্র-কাব্যে মানুষ ছেড়ে দেবতাকে খুঁজেছি, মর্ত্যকে ভুলে স্বর্গকে। অথচ এটাই চিরকালের ভারতীয় মনোবৃত্তি এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। আমাদের প্রাচীন ঋষিরা এই পৃথিবীকে ভালবাসতেন, পৃথিবীর সৌন্দর্য তাঁদের মনোহরণ করে-ছিল। বেদগানে তাঁরা পৃথিবীর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন; বলেছেন, পশ্য দেবস্য কাব্যম্—দেখ, দেবতার কাব্য, কি অপূর্ব এই সৃষ্টি। মুগ্ধচিত্তে তাঁরা সূর্যস্তব করেছেন, সমুদ্র বন্দনা গেয়েছেন। এই পার্থিব জীবনকে মনে প্রাণে ভালবেসেছেন। বলেছেন, যিনি জীবনের সত্যরূপকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর কাছে সম্পূর্ণম্ জগদেব নন্দনবনং—সমস্ত জগৎ তাঁর কাছে নন্দন-কানন রূপে প্রতিভাত হবে; সর্বেঽপি কল্পদ্রুমঃ—সমস্ত মানুষকে কল্পতরুর ন্যায় উদারমনা মনে হবে; সর্বৈব স্থিতিরেব রম্যাবিষয়া—পৃথিবীর সমস্ত কিছু রমণীয় বলে মনে হবে।

জীবনকে ভালবাসা, জীবনের সত্যরূপকে

অত্যাশ্চর্য কথা একদিন ভারতীয় ঋষির মুখেই উচ্চারিত হয়েছিল। অথচ ভাবতে অবাক লাগে একদিন এই ভারতবর্ষই আবার জীবনের দিকে একেবারে পেছন ফিরে মুখ ঘুরিয়ে বসল, জীবনকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করল। ইহলোকে সুখের আশা ছেড়ে দিয়ে পরলোকের ভরসায় বসে রইল। সভ্যতার রূপান্তর এই ভাবেই ঘটে। সেই দূর অতীতে আমাদের সভ্যতার যখন শৈশব এবং কৈশোর অবস্থা তখন তার দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ, মন ছিল সরল। পৃথিবীর সব কিছু তার চোখে সুন্দর ঠেকেছে, জীবন পরম উপভোগ্য মনে হয়েছে। সেই সভ্যতার ক্রমে বয়স বেড়েছে; বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে মন যেমন পেকেছে মুখে তেমনি পাকা পাকা কথা বেরিয়েছে।—সব মিথ্যা, সব মায়া, সংসারকে কক্ষনো বিশ্বাস কোরো না। কে বা তোমার স্ত্রী, কে বা পুত্র, কেউ আপন নয়, কাউকে বিশ্বাস নেই। এই এক অদ্ভুত জীবন-দর্শন। জীব যদি জীবনকে মূল্য না দেয়,
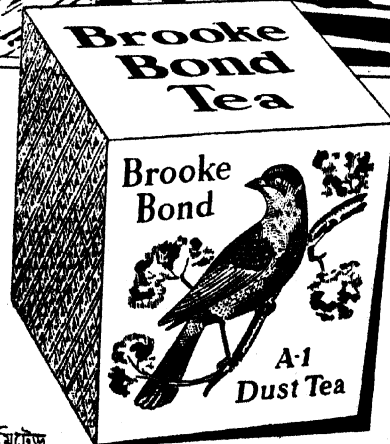
মানুষ যদি মানুষকে বিশ্বাস না করে তবে জীবন ধারণের অর্থ কি? ভাগ্যিস,—সংসার মিথ্যা, সংসার মায়া—আমরা মুখে যতখানি আওড়াই, মনে মনে ততখানি বিশ্বাস করি না। স্ত্রীপুত্রকন্যা কেউ তোমার আপন নয়—এ সব কথা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করলে জীবনে কি আর কোন স্বাদ গন্ধ থাকত? কিন্তু ক্ষতি যা হবার হয়েছে। এক যুগ গিয়েছে যখন বেশির ভাগ লোক এ সব বিশ্বাস করেছে। সারাক্ষণ এই জাতীয় কথা যদি কানের কাছে লোকে জপতে থাকে তবে জীবনের প্রতি আস্থা একটু নড়বড়ে হয়ে আসবেই। দেশের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত। এ ধরনের গুরুগম্ভীর উক্তি তারা বিনা প্রশ্নে মেনে নেয় এবং একে ধর্মচিন্তার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করে। বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে এই মনোভাব আমাদের দেশবাসীর মধ্যে ক্রিয়া করে এসেছে এবং তার ফলে জীবনের প্রতি আমাদের আগ্রহ বেশ খানিকটা কমে এসেছিল। মোহমুদ্গরের মুদ্গরটি বড় হাল্কা ওজনের নয়, একটি গোটা জাতির কোমর ভাঙবার পক্ষে ঐটিই যথেষ্ট ছিল।

যিনি একদিন এ জাতীয় দর্শন প্রচার করেছিলেন তিনি ফ্যালনা লোক ছিলেন কিম্বা নেহাৎ বাজে কথা বলেছিলেন এমন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। নিশ্চয় তাঁর যুগে এ দেশের লোক এমন অত্যধিক মাত্রায় সংসারে আসক্ত হয়ে পড়েছিল, সাংসারিক ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে এত বেশি ব্যাপৃত থাকত যে, এর বাইরে কোন জিনিসকে মূল্য দিতে তারা ভুলে গিয়েছিল, সে জন্যে একটু সাবধান বাণীর হয়তো-বা প্রয়োজন হয়ে থাকতে পারে। সব দেশে, সব সমাজেই কোন না কোন সময় এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজ কবির যেমন ক্ষোভ—
The world is too much with us
getting and spending
—এও তাই। তার বেশি গুরুত্ব আরোপ করবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সংসারের প্রতি মোহকে এতটা ভয়াবহ ব্যাপার মনে না করলেও চলত।

যে কথা বলছিলাম, এর ফলটা শুভ হয় নি। জাতিগতভাবে আমরা নির্জীব এবং নিস্পৃহ হয়ে পড়েছিলাম। জীবনটাকে একটা প্রচণ্ড বোঝা বলে আমাদের মনে হয়েছে। ভাবে ভঙ্গিতে, চিন্তায়, কথায় বার্তায়—তাই প্রকাশ পেয়েছে। জাতির চিন্তার মধ্যে যা বাসা বাঁধে ভাষার মধ্যে তাই শিকড় গেড়ে বসে। প্রবাদ বাক্যের জন্ম এইভাবেই হয়। আমাদের কাছে জীবন যে কত বড় বোঝা তার প্রমাণ আমাদের সুপরিচিত প্রবাদবাক্যে—প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত। দেশের অর্ধেক লোক বলে, মরলেই বাঁচি। এ তো সুস্থ জাতির লক্ষণ নয়। যে পৃথিবী আমাদের গৃহ তার প্রতি আমাদের মমতা নেই, টান নেই।
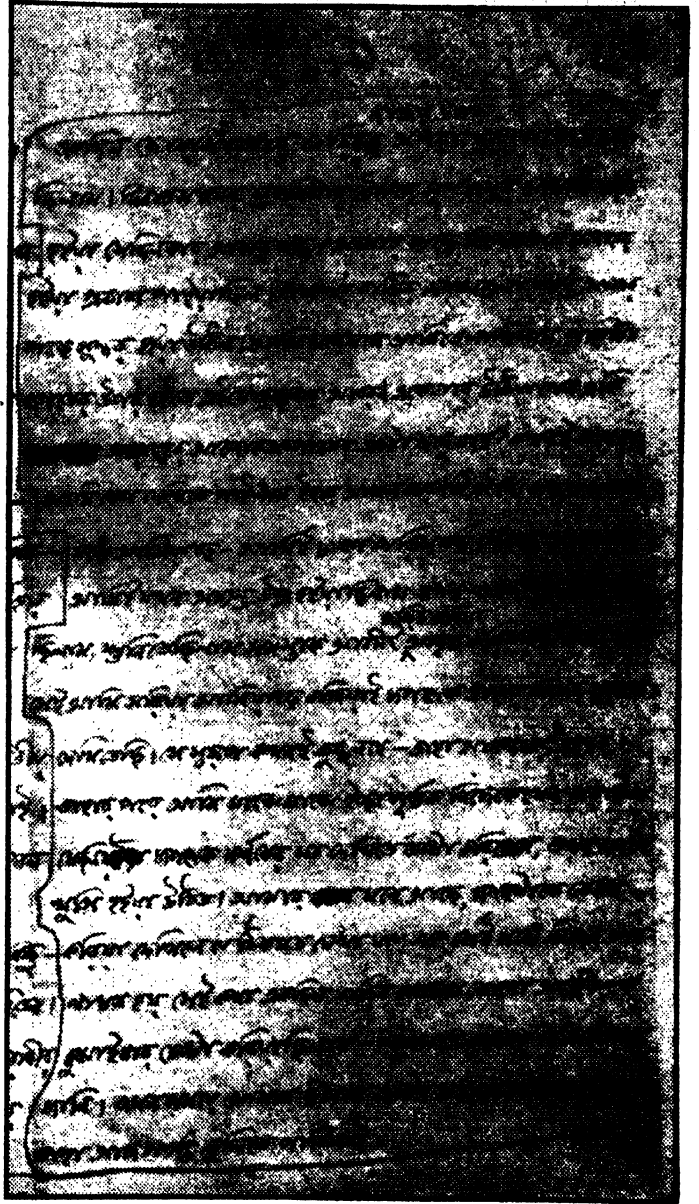
'জীবন স্মৃতির পাণ্ডুলিপি হইতে — রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত

দুদিনের ঘর, তার জন্যে আবার মায়া বাড়ানো কেন? এই মনোভাবকেই আমরা বিজ্ঞতার চরম লক্ষণ বলে মেনে নিয়েছিলাম। পার্থিব সুখের প্রতি বীতস্পৃহা ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। কয়েক শতাব্দীর প্রশ্রয়ে এই নিরাসক্তি আমাদের স্বভাবগত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সভ্যতা বরাবর এক রাস্তায় চলে না, মাঝে মাঝে ওর মোড় ঘুরে যায়। সভ্যতার চাকাটা যখন কর্দমাক্ত পথে আটকে পড়ে অচল হয়, তখন তাকে নতুন পথে চালু করবার জন্যে কোন বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হয়। যুগের প্রয়োজনেই সেই ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় মনকে নির্জীব নির্লিপ্ত নিরাসক্তি থেকে মুক্ত করবার জন্যে নতুন জীবন 'দর্শনের প্রয়োজন হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই নতুন জীবন-দর্শনের জন্মদাতা। শঙ্করাচার্য বলেছিলেন, এই সংসার বড় বিচিত্র স্থান, একে বিশ্বাস কোরো না। রবীন্দ্রনাথের মুখেও সেই বিচিত্র ভুবনের বার্তা আমরা শুনলাম, কিন্তু একেবারে অন্য

সুরে, অন্য অর্থে—একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখ কি বিচিত্র সুন্দর এই পৃথিবী। অন্তহীন এর সৌন্দর্য, অন্তহীন এর আনন্দ। পৃথিবী এক আনন্দ নিকেতন। 'তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ'—অঙ্গ নয়তো যে আনন্দে গড়া আমার জীবন। এ ধরনের কথা কত যুগ আমরা শুনিনি। যে দেশের লোক বলে মরলেই বাঁচি সে দেশের কবি বললেন, 'মরিতে চাহি না আমি এ সুন্দর ভুবনে'। পৃথিবীর মনোহর রূপ তাঁর নয়ন মন মুগ্ধ করেছে। কোথায় লাগে এর কাছে স্বর্গ। স্বর্গ মর্ত্যের তুলনা করে মর্ত্যকেই উচ্চতর স্থান দিয়েছেন। বলেছেন, "মর্ত্যভূমি স্বর্গ নহে, সে যে মাতৃভূমি" (স্বর্গ হতে বিদায়)—বলা বাহুল্য মাতৃভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী। এরও আগে ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে বলছেন—"ঐ যে মস্ত বড় পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি! ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল-নিস্তব্ধতা প্রভাত-সন্ধ্যা সমস্তটা সুদ্ধ দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি—এমন কি কোন স্বর্গ থেকে পেতুম।" 'বসুন্ধরা' কবিতায় সুন্দরী বসুন্ধরার প্রতি প্রেম প্রায় একই ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে—"ইচ্ছা করিয়াছে, সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে সমুদ্র মেখলা-পরা তব কটিদেশ।"

আমাদের বিমুখ মনকে তিনি আবার পৃথিবীর দিকে ফেরালেন। অসংখ্য গানে কবিতায় পৃথিবীর অফুরন্ত সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের চোখকে এবং মনকে আহ্বান করলেন। রবীন্দ্রকাব্য বলতে গেলে সৌন্দর্যের এক বিরাট ভোজ এবং এর বেশির ভাগই পার্থিব সৌন্দর্য। এর মধ্যে অপর্যাপ্ত পরিমাণে রং ছড়ানো, গন্ধ মাখানো, সমগ্র জিনিসটি রসে আর্দ্র। অর্থাৎ এর স্বাদ প্রধানত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। রবীন্দ্র-কাব্যের যে অংশে অপার্থিব মহিমা বা অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের আভাস অর্থাৎ মিষ্টি-সিজম্ এর কুয়াশা সেটাকেই বড় করে দেখা হয়েছে, আর যে অংশে (এবং এইটিই তাঁর কাব্যের বৃহত্তর অংশ) তিনি মুক্ত কণ্ঠে পৃথিবীর এবং জীবনের জয়গান করেছেন তাকে আমরা বেশি আমল দিতে চাই নি। একটু আধ্যাত্মিক গন্ধ বা ধোঁয়াটে ভাব না থাকলে আমরা তাকে যথেষ্ট উঁচুদরের কাব্য বলে মনে করি না। আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে কাব্যের স্বাদকে ব্রহ্ম-স্বাদ-সহোদর বলা হয়েছে। এই উক্তির তাৎপর্য আমাদের কাছে স্পষ্ট নয় বলেই এই জাতীয় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। নির্মল আনন্দের স্বাদকেই বলব ব্রহ্মস্বাদ। সে আনন্দ কেবল তত্ত্বজ্ঞান থেকে লাভ করতে হবে এমন কোন নিয়ম নেই। সামান্যতম জিনিস—কোন নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ, হঠাৎ শোনা কোন গানের সুর, প্রভাত আলোর ঝিকিমিকি—এমনি
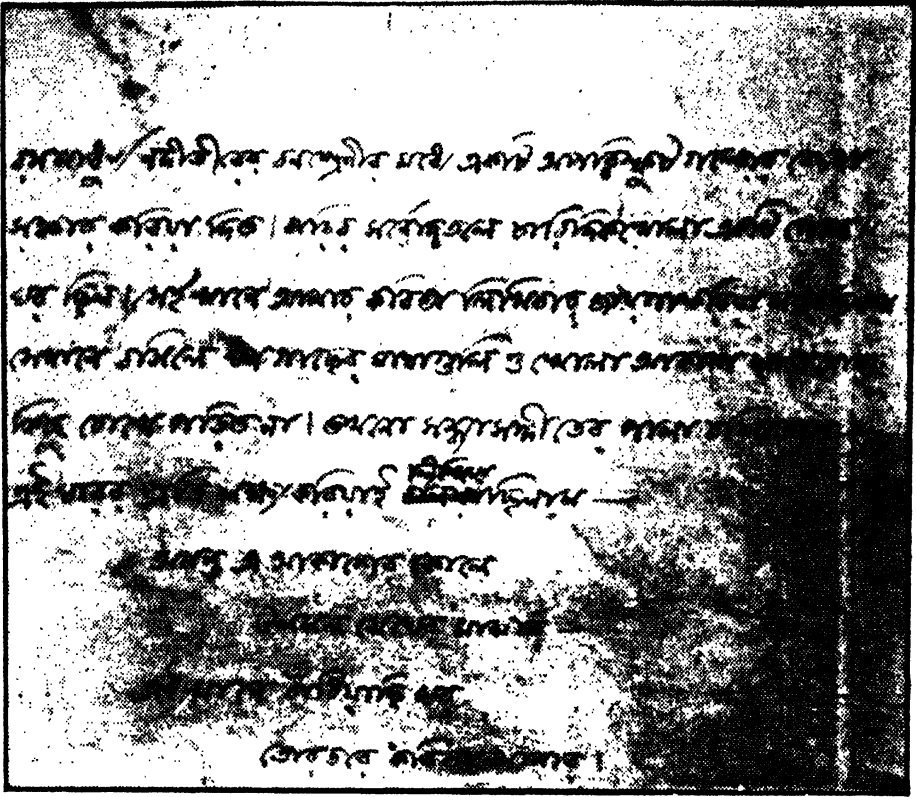
'জীবন স্মৃতি'র পাণ্ডুলিপির একাংশ — রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত

তুচ্ছতম জিনিস কবিকে প্রভূততম আনন্দ দিতে পারে। অন্তত রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছে এবং কবির যা মহত্তম গুণ—আপন মনের আনন্দ তিনি পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সব চাইতে বড় কৃতিত্ব, তিনি সাধারণকে অসাধারণ করেছেন, সামান্যতম জিনিসের মধ্যেও যে সৌন্দর্য লুক্কায়িত আছে তাকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। শুধু তাই নয়, সেই সৌন্দর্যকে তিনি অপরের দৃষ্টিগোচর এবং অনুভূতি-গোচর করেছেন। 'এই তো ভালো লেগেছিল, আলোর নাচন পাতায় পাতায়'—খুব সামান্য কথা কিন্তু কিছু বা ভাষার যাদুতে কিছু বা সুরের মাধুর্যে মুহূর্তে মনকে প্রসন্ন করে। চোখের সুমুখে এমন একটি আনন্দোজ্জ্বল ছবি এনে দেয় যে, আমাদের অতি পরিচিত অভ্যাস-মলিন পৃথিবীর মূর্তি সম্পূর্ণরূপে বদলে যায়।

যে দেশে, কেমন আছ জিজ্ঞেস করলে সুস্থ সবল দেহ যুবকের মুখেও শুনতে হয়—এই এক রকম কেটে যাচ্ছে—যেন কিছুই ভাল লাগছে না, কোন কিছুতেই স্বাদ পাচ্ছে না—সেই দেশের কবি প্রাণ খুলে বলছেন, ভালো লাগছে, চোখ মেলে যা দেখছি তাই ভালো লাগছে। "লাগল ভালো, মন ভোলানো, এই কথাটাই গেয়ে বেড়াই, লাগল ভালো"। জীবনভর ঐ একটি কথা বললেন—ভালো লাগল। এর মূল্য অপরিসীম। আমাদের রুগ্ন চিত্তে, বিস্বাদ মুখে তিনি জীবনের স্বাদ ফিরিয়ে আনলেন।

কোন আনন্দের অভিজ্ঞতাকে মনের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখাকে আমরা দুর্বলতা বলে মনে করি। সুখ দুঃখের কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়াকেই জ্ঞানীজনের লক্ষণ বলে জেনেছি। আর রবীন্দ্রনাথকে দেখলুম জীবনের অতি ক্ষুদ্র (আসলে ক্ষুদ্র নয়) আনন্দটিকেও কৃপণের ধনের মতো বুকে করে আগলে রেখেছেন। বালক বয়সে একবার কোথায় নৌকোয় যেতে গভীর রাত্রে জেগে উঠে এক ছোকরা মাঝির গান শুনেছিলেন। চাঁদের আলোয় নদীর জল উদ্ভাসিত, বালক মাঝির কণ্ঠে গভীর রাত্রের গান অপূর্ব লেগেছিল। সেটি অক্ষয় হয়ে রয়েছে তাঁর জীবনে। তিরিশ বছর বয়সে ছিন্নপত্রের এক চিঠিতে এই কাহিনীটি বলছেন মনের সমস্ত অনুরাগ মেখে—"একটি ছোট্ট ডিঙিতে একজন ছোকরা একলা দাঁড় বেয়ে চলেছে, এমনি মিষ্টি গলায় গান ধরেছে—গান তার পূর্বে তেমন মিষ্টি কখনো শুনিনি। **হঠাৎ মনে হল,** আবার যদি জীবনটা ঠিক সেই দিন থেকে ফিরে পাই!" কত কাল আগে শোনা কিশোর কণ্ঠের গানটি সারাজীবনে ভুলতে পারেন নি। মৃত্যুর ঠিক ছ' মাস আগে এই কাহিনীটি আবার স্মরণ করেছেন একটি কবিতায় (আরোগ্য—৪নং কবিতা)—

মনে এল, কিছুই সে নয়, সেই বহুদিন আগে,
দুপহর রাতি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।

* * *

সহসা উঠিনু জেগে।
শব্দশূন্য নিশীথ আকাশে
উঠিছে গানের ধ্বনি তরুণ কণ্ঠের
ছুটিছে ভাটির স্রোতে তন্বী নৌকা
তরতর বেগে।
মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল;
দুই পারে স্তব্ধ বনে জাগিয়া
রহিল শিহরণ।

জীবনের প্রান্ত সীমা যত নিকটবর্তী হয়েছে ততই সতৃষ্ণ নয়নে পেছন ফিরে তাকিয়েছেন। সারা জীবনের সঞ্চিত ধন, প্রতিটি আনন্দ-ঘন মুহূর্ত উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দিয়েছে। শেষ পর্বের বহু কবিতায় তাঁর শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন, বলা যেতে পারে, **দ্বিজত্ব লাভ করেছে। ফিরে ফিরে**

কৈশোরের কথা, যৌবনের কথা বারম্বার বলেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এই শেষ পর্বের কবিতায় মধ্যে আমাদের পণ্ডিতম্মন্যরা গলদঘর্ম হয়ে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ আর কাকে বলে। কোন কোন কবিতায় মৃত্যুর কথা অবশ্যই বলেছেন, তাঁর দেবতাকেও স্মরণ করেছেন। কিন্তু সমস্তকে ছাপিয়ে উঠেছে পৃথিবীর প্রতি তাঁর অসীম মমতা, জীবনের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা—'যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই'। মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে বলছেন—

প্রথম রৌদ্রের আলো
সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায়;
আমি বেঁচে আছি, তারি অভিনন্দের বাণী
মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও;

* * *

ভালোবাসা যা পেয়েছি আমার জীবনে,
তাহারি নিঃশব্দ ভাষা
শুনি এই আকাশে বাতাসে;
তারি পুণ্য অভিষেকে করি আজ স্নান।

(রোগশয্যায়—২৭নং কবিতা)

এই সময়কার আরেকটি কবিতায় বলেছেন—

আমি জানি, যাব যবে
সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি
সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে
এ বিশ্বেরে ভালো। বাসিয়াছি।

রবীন্দ্রকাব্যের তথা রবীন্দ্র সাহিত্যের সব চাইতে বড় কথা—ভালোবেসেছিনু এই ধরণীরে। গদ্যে পদ্যে গানে সুরে ছন্দে এই কথা যেমন অভ্রান্তভাবে সারাজীবন বলেছেন এমন আর কোন কথা নয়। সেই ছোকরা মাঝির গান স্মরণ করে বলেছেন, ইচ্ছা করে কবির গান গলায় নিয়ে "একটি ছিপছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় পৃথিবীতে ভেসে পড়ি, গান গাই এবং বশ করি এবং দেখে আসি পৃথিবীতে কোথায় কি আছে। জীবনে যৌবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে বাতাসের মতো একবার হুহু করে বেড়িয়ে আসি।...উপবাস করে আকাশের দিকে তাকিয়ে অনিদ্র থেকে, সর্বদা মনে মনে বিতর্ক করে, পৃথিবীকে এবং মনুষ্য হৃদয়কে কথায় কথায় বঞ্চিত করে, স্বেচ্ছারচিত দুর্ভিক্ষে এই দুর্লভ জীবন ত্যাগ করতে চাইনে। পৃথিবী যে সৃষ্টিকর্তার একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একটা ফাঁদ, তা না মনে করে একে বিশ্বাস করে ভালোবেসে, ভালোবাসা পেয়ে, মানুষের মতো বেঁচে এবং মানুষের মতো মরে গেলেই যথেষ্ট—দেবতার মতো হাওয়া হয়ে যাবার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়।" (ছিন্নপত্র—৩৬নং চিঠি)

অতি পরিচিত একটি গানে—তারায় তারায় দীপ্ত শিখায় অগ্নি জ্বলে—এই কথাটি বলতে চেয়েছেন যে বহুযুগ আগে ঐ নক্ষত্র-লোকে তাঁর জন্ম হয়েছিল। অনেক জন্ম কাটিয়েছেন জ্যোতিষ্কলোকে কিন্তু বলছেন—লাগল না মন লাগল না, ওখানে তাঁর ভালো লাগেনি। তারপরে বহু জন্ম জন্মান্তরের পরে তিনি এসেছেন শ্যামল মাটির ধরাতলে। এখানে—লাগল রে মন লাগল রে। এই পৃথিবীতে এসে ভালো লেগে গেল। এখানে কাটাতে পারেন অনন্তকাল। বলেই গিয়েছেন—আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে।

মায়াময় জগৎ আর মোহময় জীবন থেকে যাঁরা আমাদের মুক্তি দেন তাঁরা মহাপুরুষ আখ্যা লাভ করেন। আমরা ভুলে যাই যে এমন মহাপুরুষও আছেন যিনি নতুন করে আমাদের মনে মোহের সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় মহাপুরুষ। তিনি ছিলেন বলে পৃথিবীকে এত সুন্দর, জীবনকে এত মনোহর দেখলুম। তাঁর কাব্যের ছোঁয়াচ না লাগলে আমার চোখে আকাশ এমন নীল হত না, পৃথিবী এমন শ্যামলকান্তি হত না। রবীন্দ্রনাথের কাছে আমি এজন্য কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমার মন থেকে কোন মোহ কেড়ে নেননি বরং নতুন মোহের সৃষ্টি করে আমার আনন্দের সম্ভার বাড়িয়ে দিয়েছেন। 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি'—একথা যখন বলেছেন তখন আমাদের অনেককালের ভুলে-যাওয়া ঋষিবাক্যকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। আবার নতুন করে আমাদের শেখালেন—সম্পূর্ণম্ জগদেব নন্দন বনং। মৃত্যুর অনতিপূর্বে বিখ্যাত কবিতায় বলেছেন—

শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরনীর
বলে যাব তোমার ধূলির তিলক পরেছি
ভালে।

পৃথিবীর ধূলিকণাকেও যিনি ভালবেসেছেন তিনি মানুষকে কতখানি ভালবেসেছেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

এখানে একটি কথা বলে নেওয়া ভাল। পৃথিবীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বসাতে আমাদের পারলৌকিক লাভ কতখানি হয়েছে বলতে পারিনে কিন্তু লৌকিক লোকসান হয়েছে প্রচণ্ড। আমাদের পুরাণের গল্পে পৃথিবীকে কামধেনু আখ্যা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কিনা ওর কাছে যা চাইবে তাই পাবে। আশ্চর্যের বিষয় এই কামধেনুর কাছে আমরা কোনকালে কিছু কামনা করিনি। পৃথিবীর কাছে কিছু চাইনি সেও আমাদের কিছু দেয়নি। ইয়ুরোপ কিন্তু পৃথিবীকে কামধেনু হিসাবেই ব্যবহার করেছে, ওকে দোহন করে ধনরত্ন বের করেছে। আমরা যখন আমাদের ভারত মাতার গুণকীর্তন করে কবিতা লিখেছি, গান রচনা করেছি তখন ইংরেজ এসে তল্লাস করেছে ভূমিগর্ভে কোথায় আছে তেল, কোথায় কয়লা, কোথায় মাইকা, ম্যাঙ্গানিজ, সোনা। আমাদের খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ ওরাই আহরণ করেছে, আমাদের কামধেনুকে ওরাই দোহন করেছে। তার ফল ভোগ আমরা করেছি, এখনও করছি জীবন লক্ষ্মীর আরাধনা যে করে না, ভাগ্যলক্ষ্মী তার দিকে ফিরেও তাকায় না।

পৃথিবীতে এসে পৃথিবীকে ভালবাসতে পারলুম—এর চাইতে বড় কৃতার্থতা আর কিছু নেই। এমন কি সংসারে এসে কি পেলাম আর না পেলাম সে হিসাব করতেও বসব না। রবীন্দ্রনাথ যে একথা বলেছেন তার কারণ তিনি জানতেন হিসাবের কোন প্রয়োজনই হবে না। আমি যদি পৃথিবীকে ভালবাসি তবে পৃথিবী আপনি আমাকে উজাড় করে দেবে। আমাদের এই বোধ ছিল না বলেই রবীন্দ্রনাথকে এমন অশ্রান্তভাবে পৃথিবীর গুণকীর্তন করতে হয়েছে, নইলে আমাদের চেতনা ফিরে আসত না।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু লোকের একটি ধারণা আছে যে, তিনি অতিশয় সুখী মানুষ ছিলেন। সংসারে যা কিছু মানুষের আকাঙ্ক্ষিত—রূপ গুণ, ধনমান, যশ প্রতিপত্তি—সমস্তই তিনি অপর্যাপ্ত পরিমাণে পেয়েছিলেন। কাজেই সংসারের এবং পৃথিবীর গুণগান করা তাঁর পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা সত্য মনে হলেও বাস্তবিক পক্ষে এটি সত্য নয়। দুঃখের অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে যতখানি হয়েছে খুব কম লোকের জীবনেই তা হয়। দীর্ঘ জীবনে তিনি যত শোকের আঘাত পেয়েছেন, বিচ্ছেদের দুঃখ যতখানি তাঁকে সইতে হয়েছে একজন মানুষের জীবনে সচরাচর তা ঘটে না। মৃত্যুজনিত বিচ্ছেদ ছাড়া মতবিরোধের ফলেও বহু আপনজন, বহু স্নেহভাজন পর হয়ে গিয়েছেন। যে মানুষের জীবনে কতগুলি দৃঢ়বদ্ধ মূলনীতি থাকে বন্ধু বিচ্ছেদের দুঃখভোগ তাঁর জীবনে অনিবার্য। রবীন্দ্রনাথের মতো এমন নিঃসঙ্গ নির্জন মানুষ সংসারে বড় দেখা যায় না। তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তাঁর জীবনে সুখের চাইতে দুঃখের অংশ ঢের বড়। কিন্তু এমনি মনের রাসায়নিক শক্তি যে কঠিনতম দুঃখকেও তিনি গভীরতম আনন্দে পরিণত করেছেন। 'এই করেছ ভালো নিঠুর, এই করেছ ভালো'—মিথ্যা উক্তি নয়। দুঃখের দহনে তাঁর জীবন সমুজ্জ্বলতর হয়েছে, সোনার মতো উজ্জ্বলতর দীপ্তি লাভ করেছে' তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি—

খনে খনে যত মর্মভেদিনী
বেদনা পেয়েছে মন
নিয়ে সে দুঃখের ধীর আনন্দে
বিষাদ করুণ শিল্প ছন্দে
অগোচর কবি করেছে রচনা
মাধুরী চিরন্তন॥

বহুকাল থেকে আরো একটি অভিযোগ শুনে এসেছি যে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি একপেশে। কেবল জীবনের ভালোটাই দেখেছেন, মন্দটার প্রতি চোখ মেলে তাকাননি। জীবনের জটিলতাকে অস্বীকার করে তার লঘুকরণের চেষ্টা করেছেন। সত্যান্বেষী পাঠক মাত্রেই স্বীকার করবেন যে, জীবনের অপূর্ণতা সম্বন্ধে এমন কি জীবনের বিকার সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ ছিলেন এমন মনে করবার কোন হেতু নেই। মৃত্যুর অনতিপূর্বে মানব সভ্যতার সংকটের কথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে গিয়েছেন; অবশ্য তাই বলে মানুষের প্রতি তিনি বিশ্বাস হারাননি। এ যুগের কবিরা বর্তমান সভ্যতার উপরে খড়্গহস্ত; বর্তমান সাহিত্যের বারো আনা অংশ বিদ্রূপাত্মক। এই সব ক্ষুব্ধচিত্ত ক্রুদ্ধমতি সাহিত্যিকদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথ মানুষটা অনেক বেশী স্থিতধী, সহজে তিনি বিচলিত হননি। বলেছেন—

অপূর্ব শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।

জীবনকে খণ্ডিত করে টুকরো করে দেখি বলেই আমাদের অত ভয় ভাবনা। আমরা ভাবি মানব সভ্যতার বুঝি অন্তিমকাল উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন অখণ্ড দৃষ্টিতে এজন্য পৃথিবীর মহিমা, মানুষের মহিমা তাঁর চোখে কোনকালে ক্ষুণ্ণ হয়নি। বলেছেন, গুহাগহ্বরের ভাঙাচোরা রেখাগুলি যেমন হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতাকে আচ্ছন্ন করতে পারে না, তেমনি নিত্যদিনের বাধাবিঘ্ন দুঃখ শোক জীবন লক্ষ্মীর মহিমাকে কলঙ্কিত করতে পারবে না। জীবনের অখণ্ড মহিমা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তারই জয়গান তাঁর কাব্যে সাহিত্যে—

যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি
তেমনি
জীবনের শেষ বাক্যে আজি তারে দিব
জয়ধ্বনি।

"মৃত্যু দূত এসেছিল তব সভা হ'তে"

প্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রনাথের প্রান্তিক কাব্যখানির এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যাহা আগের আর কোন কাব্যে দেখিতে পাই না, অবশ্য পরবর্তী কাব্য আরোগ্য, রোগশয্যায় প্রভৃতি কাব্যেও এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যাইবে। ১৯৩৭ সালে কবি গুরুতর পীড়িত হইয়া পড়েন, সে পীড়া কোন এক মুহূর্তে প্রাণসংশয়কর মূর্তি গ্রহণ করিয়াছিল। সৌভাগ্যবশত অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নিরাময় হইয়া ওঠেন। প্রান্তিক কাব্য সেই অভিজ্ঞতার ফসল। প্রান্তিক কাব্যের প্রেরণার মূলে এই একটিমাত্র পরম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। পূর্ববর্তী আর কোন কাব্য সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নয়। একটি-মাত্র অভিজ্ঞতার শিলাখণ্ডে গঠিত বলিয়া কাব্যখানি আকারে ক্ষুদ্র, ভাষায় সংক্ষিপ্ত, ভাবে সংহত, অন্যান্য কাব্যে যেসব ভাবের অনুপরমাণু শিথিলবন্ধ বলিয়া নৃত্য করিবার সুযোগ পাইয়াছে, দারুণ অভিজ্ঞতার চাপে এখানে তাহা ঘনীভূত অবস্থায় দৃঢ়পিনদ্ধ প্রস্তরখণ্ডে পরিণত। কবিতা-গুলির ভার যেন হাতে অনুভূত হইতে থাকে। তুলনায় আরোগ্য ও রোগশয্যায়ভুক্ত কবিতাগুলি লঘুভার—যদিচ তাহাদের মূলেও আছে আসন্ন মৃত্যুর অভিজ্ঞতা। ইহার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে যেন অভিজ্ঞতার গভীর খনি হইতে উত্তোলিত মূর্তিটা দেখিতে পাই—এ যেন অভিজ্ঞতার কাঁচামাল, শিল্পকলা ইহার উপরে রাজকীয় মুদ্রা অঙ্কিত করিবার সুযোগ পায় নাই। পরবর্তী কাব্য সেঁজুতিতেও এই একই অভিজ্ঞতা, কাল-ব্যবধানের সুযোগ পাওয়াতে মূল অভিজ্ঞতাকে আর কাঁচা মূর্তিতে দেখা যায় না—শিল্পকলা তাহার মধ্যে একটা স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করিয়াছে।

প্রান্তিকের ঠাসবুনন কবিতাগুলি যেন বস্তাবন্দী অভিজ্ঞতার চাপ এমন কি অন্ত্যানুপ্রাসের স্বাভাবিক রন্ধ্র বর্জিত বলিয়া বাতাস খেলিবার সুযোগ হইতেও বঞ্চিত।১

এই কাব্যের আরো একটি বৈশিষ্ট্য এই যে অত্যল্প সময়ের মধ্যে ইহা আদ্যন্ত লিখিত। কবি যেন এক নিশ্বাসে নিদারুণ অভিজ্ঞতা বলিয়া ফেলিয়া মুক্তির স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে চান। আবার অল্প সময়ের মধ্যে রচিত বলিয়াই যেন কবিতাগুলি এক ছাঁচে ঢালাই হইবার সুযোগ পাইয়াছে।২

॥ ১ ॥

"পশ্চাতের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল মৃত্যুদূত চুপে চুপে।" জীবনের আকাশে যে-সব সূক্ষ্ম ধূলিকণা

আমি সুন্দরের পিয়াসী ফটো: শম্ভু সাহা

---

১ আঠারোটি কবিতার মধ্যে ১৪, ১৫, ১৬ সংখ্যক বছর তিন আগে লিখিত। এ কবিতাগুলিও ঠাসবুনন তবু অন্ত্যানুপ্রাস-যুক্ত বলিয়া অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ গতি। ১৯৩৭-এর রোগে' অভিজ্ঞতা ইহাদের প্রেরণা নয়। ১৮ সংখ্যক কবিতাটি অবশ্য অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত। এই শেষের কবিতাটি অন্ত্যানুপ্রাসের ঘণ্টা বাজাইয়া যেন কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করিয়াছে।

২ আঠারোটি কবিতার মধ্যে ১৪, ১৫ ১৬ সংখ্যক বাদ দিলে বাকি পনেরোটি কবিতার রচনাকাল নিম্নোক্তরূপ।

১ম—২৫।৯।৩৭
২য়, ৩য়—২৯।৯।৩৭
৪র্থ—১।১০।৩৭
৫ম, ৬ষ্ঠ—৪।১০।৩৭
৭ম—৭।১০।৩৭
৮ম—৯।১০।৩৭
৯ম, ১০ম—৮।১২।৩৭
১১শ, ১২শ—১৮।১২।৩৭
১৩শ—১৯।১২।৩৭
১৭শ, ১৮শ—২৫।১২।৩৭

কবির স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনায় রচনার প্রাচুর্য সত্যই বিস্ময়কর।

এখন আলোচনার সুবিধার জন্যে প্রান্তিকের পনেরোটি কবিতাকে একটী

ছিল তাহা ধীরে অপসারিত হইয়া গেল, "বিধাতার নবনাট্য ভূমে" যবনিকা উঠিল। "শূন্য হতে জ্যোতির তর্জনী" সঞ্চিত অন্ধকারকে চকিত করিয়া তুলিল; অভিনব জাগরণ অন্ধকারের নাড়িতে জ্যোতির্ধারা প্রবাহিত করিয়া দিল। তারপরে কিছুকাল আলো আঁধারের অস্পষ্ট বিভ্রম চলিবার পর "অবশেষে স্বপ্ন গেল ঘুচি।" পুরাতন সম্মোহ কুয়াশার মতো অন্তর্হিত হইল। তখন "নূতন প্রাণের সৃষ্টি হল অবারিত।" আর দেখা গেল এতদিন যে দেহখানা বিন্ধ্য গিরির ব্যবধান রচনা করিয়া ভবিষ্যৎকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল সেই দেহ প্রভাতের অবসন্ন মেঘের মতো নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। তখন

বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোক তীর্থে সূক্ষ্মতম
বিলয়ের তটে।

নাতিদীর্ঘ পূর্ণাঙ্গ কবিতার পনেরোটি শ্লোক বলিয়া ধরিয়া লইব আর সেইভাবে ধরিয়া লইয়া কবিকে অনুসরণ করিয়া তাঁহার প্রেরণার ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব। তবে সে কাজে প্রবৃত্ত হইবার আগে একটা দরকারী কথা সারিয়া লওয়া আবশ্যক। মৃত্যুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় নূতন নয়, তবে ইহার আগে অবধি সে পরিচয় সবক্ষেত্রেই ছিল পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ পরিচয় এই প্রথম। অবশ্য ডাকঘর নাটক লিখিবার আগে তাহার অনেকগুলি পত্রে মৃত্যুর আসন্নতার কথা আছে, দুরারোগ্য ব্যাধির কথা আছে, তবে যতদূর মনে হয় রোগটা সেখানে মানসিক। শারীরিক ব্যাধি যাহার পরিণাম মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়—চির-নীরোগ অটুটস্বাস্থ্য কবির জীবনে এই প্রথম। চিররুগ্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এরূপ অভি-মত নূতন অভিজ্ঞতা বহন করিয়া আনে না, নীরোগ ও স্বাস্থ্যবানের ক্ষেত্রেই তাহা নূতন বার্তাবহ, কেন না তাহা আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। এই জন্যে তাঁহার প্রান্তিকের মৃত্যুর কবিতা পূর্বতন মৃত্যুবিষয়ক কবিতা হইতে ভিন্ন জাতের। ইহাদের সর্বাঙ্গে জীবন ও মৃত্যু "ডেডলেটার আফিসের" শীলমোহর মুদ্রিত।

॥ ২ ॥

"আজন্মকালের ভিক্ষা ঝুলি" আজ মৃত্যুর প্রসাদবহ্নিতে চরিতার্থ হোক। এত-দিনের সঞ্চিত অহমিকারাশি দগ্ধ হইয়া গিয়া সেই আলোকে এ "মর্ত্যের প্রান্তপথ" দীপ্ত হইয়া উঠুক—সেই পথ-পূর্ব সমুদ্রের পারে অপূর্ব উদয়াচল চূড়ায় গিয়া পৌঁছিয়াছে যেন উপলব্ধি ঘটে।

॥ ৩ ॥

"এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্র" ছিন্ন হইয়া গেলে দেখা গেল যে সম্মুখে নিঃসঙ্গের দেশ। সেখানে "মহা একা" সম্মুখে একাকী কবি। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে একাকীর ভয় নাই, লজ্জা নাই। কেন না "বিশ্বসৃষ্টিকর্তা একা, সৃষ্টিকাজে আমার আহ্বান।" —আরও বুঝিলেন যে, পুরাতনকে পশ্চাতে ফেলিয়া

"রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে
নূতন জীবনছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।"

॥ ৪ ॥

"সত্য মোর অবলিপ্ত সংসারের বিচিত্র প্রলেপে"—যে সত্যের আদিম স্বাক্ষর নিয়ে
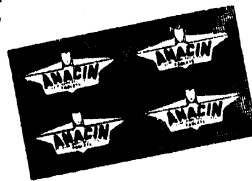
সংসারে আসিয়াছি পাঁচজনের মুখের কথায়, পাঁচজনের হাতের ছাপে তাহা বিলীন প্রায়। এমন সময়ে "আরতি শঙ্খের ধ্বনি" বাজিয়া উঠিল—সংসারের ছাপ অকিঞ্চিৎকর মনে হইল—তখন "একাকীর একতারা হাতে" "চলিলাম" "মৃত্যুস্নান তীর্থতটে সেই আদি নির্ঝরতলায়।" "বুঝি এই যাত্রা মোর . . পূর্বইতিহাসধৌত অকলঙ্ক প্রথমের পানে।"

॥ ৫ ॥

আমার জীবনের অকৃতার্থ অতীত তাহার ক্ষুধাতৃষ্ণা কামনা লইয়া আমাকে প্রলুব্ধ করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। হে "পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন,

রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা,
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও।"

মৃত্যুর ধন মৃত্যুকে ফিরাইয়া দিয়া ভারমুক্ত চিরপথিকের অনুগামী আমি হইব।

॥ ৬ ॥

"মুক্তি এই, সহজে ফিরিয়া আসা
সহজের মাঝে।"

চরাচরে মুক্তির যে সহজ রূপটি চিরকাল দীপ্যমান, "তারি বর পেয়েছি অন্তরে মোর" তাই আজ নিখিলের সঙ্গে একটি অন্তরঙ্গতা অনুভব করিতেছি।

॥ ৭ ॥

কিছু পাই নাই, শূন্য হাতে চলিলাম—"এ কী অকৃতজ্ঞতার বৈরাগ্য প্রলাপ ক্ষণে ক্ষণে।" "ধন্য এ জীবন মোর।" কিছু পাওয়ার অনেক না পাওয়া "কল্পনায় বাস্তবে মিশ্রিত, সত্যে ছলনায়" মিলিয়া আমার জীবনের পর্বে পর্বে যে সুগভীর রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহার উপরে ক্ষণে ক্ষণে অপরূপ অনির্বচনীয় স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে। আজ বিদায় বেলায় সেই বিপুল বিস্ময়কে স্বীকার করিব। আর গাহিব, "হে জীবন অস্তিত্বের সারথি আমার,

বহু রণক্ষেত্র তুমি করিয়াছ পার,
আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর
বিজয় যাত্রায়।"

॥ ৮ ॥

রঙ্গমঞ্চে যখন সবগুলি বাতি নিবিয়া গেল। এতদিনকার বিচিত্র সাজসজ্জার নিরর্থকতা বুঝিতে পারিলাম। সেই সব সাজ খসিয়া পড়িতেই "আপনাতে আপনার নিগূঢ় পূর্ণতা আমারে করিল স্তব্ধ।"

॥ ৯ ॥

দেখিলাম যে এতদিনকার দেহখানা তাহার সুখদুঃখ অনুভূতিপুঞ্জ লইয়া ভাসিয়া

মিলাইয়া গেল। "এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের পরে স্থলে জলে।" তখন উর্ধে তাকাইয়া জোড় হাতে বলিলাম—হে পূষণ তোমার রশ্মিজাল সংবরণ করিয়াছ, এবার তোমার কল্যাণতম রূপটি প্রকাশ করো —এবারে যেন "দেখি তারে সে-পুরুষে তোমার আমার মাঝে এক।"

॥ ১০ ॥

হে প্রলয়ংকর অকস্মাৎ "মৃত্যুদূত এসেছিল তব সভা হতে।" তোমার কবিকে সেই সভাতে লইয়া গেল আশা দিল নূতন রাগরাগিণী ধ্বনিত হইবে তাহার বীণায়—কিন্তু

"বাজিল না রুদ্রবীণা নিঃশব্দ
ভৈরব নবরাগে,
জাগিল না মর্মতলে ভীষণের
প্রসন্ন মূরতি,
তাই ফিরাইয়া দিলে।"

কিন্তু এই শেষ নয়—

"আসিবে আর একদিন যবে
তখন কবির বাণী পরিপক্ক ফলের মতন
নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের
পূর্ণতার ভারে
অনন্তের অর্ঘ্যডালি পরে। চরিতার্থ
হবে শেষে
জীবনের শেষ মূল্য, শেষ যাত্রা,
শেষ নিমন্ত্রণ।"

॥ ১১ ॥

এতকাল কবির আসন ছিল কলরবমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণে এবারে সেই আসন পরিত্যাগ করিবার আহ্বান আসিয়াছে। তাই বলিয়া কবিকে যে নীরব থাকিতে হইবে এমন নয়—গভীরতর শিল্পকলার আভাস তিনি পাইতেছেন।

"চরম ঐশ্বর্য নিয়ে
অস্তলগনের, শূন্য পূর্ণ করি এল
চিত্রভানু,
দিল মোরে করস্পর্শ। প্রসারিল
দীপ্ত শিল্পকলা
অন্তরের দেহলিতে। গভীর
অদৃশ্যালোক হতে
ইশারা ফুটিয়া পড়ে তুলির রেখায়।"

"আজন্মের বিচ্ছিন্ন ভাবনা" এবারে শিল্পলোকে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিবে।

॥ ১২ ॥

লোক বচনে এতকাল কবিত্বের পুরস্কার মিলিয়াছে এবারে তাহার অবসান হোক।

"পুরস্কারপ্রত্যাশায় পিছু ফিরে
বাড়ায়ো না হাত
যেতে যেতে; জীবনে যা-কিছু তব
সত্য ছিল দান
মূল্য চেয়ে অপমান করিয়ো না তারে"

সম্মান নয়, নব জীবনের আহ্বান এখন

শান্তিনিকেতন আম্রকুঞ্জে বসন্তোৎসবে রবীন্দ্রনাথ ফটোঃ শম্ভু সাহা

॥ ১৩॥

"একদা পরম মূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়,
আগন্তুক।"

রূপ সেই দুর্লভসত্তা যেখানে তুমি সূর্য-নক্ষত্রের সমকক্ষ। তোমার সম্মুখে অনন্ত পথ।

"সেথা তুমি একা যাত্রী, অফুরন্ত
এ মহাবিস্ময়।"৩

॥ ১৭ ॥

"যেদিন চৈতন্য মোর মুক্ত পেলো সুপ্তিগুহা হতে" জাগ্রত জগতের ইতিহাসের মধ্যে ফিরিয়া দেখিলাম যে মানুষের হাতে মানুষের নিদারুণ লাঞ্ছনা চলিতেছে। হে "মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন বিচারক," তুমি আমাকে সেই শক্তি দান করো যাহাতে আমি শিশুঘাতী নরঘাতী কুৎসিত বীভৎসকে ধিক্কৃত করিতে পারি।

খৃষ্ট জন্মদিনে রচিত ১৮ সংখ্যক শেষ কবিতাটি সুপরিচিতঃ

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে
বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে
ব্যর্থ পরিহাস-
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে॥

প্রান্তিকের কবিতাগুলির এই সংক্ষিপ্ত খসড়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কেন না এগুলি এমন ঠাসবুনন যে অনেক স্থলে পাঠকের বোধ সুপ্রবেশ্য নয়। সাধারণতঃ সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা ঠাসবুনন হইয়া থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চতুর্দশপদীর তুলনায় প্রান্তিকের শ্লোকগুলি অনেক বেশি দৃঢ়-পিনদ্ধ। এই খসড়াগুলির আরও একটা সার্থকতা আছে। অনবধানে একটি আধটি ধাপও উল্লঙ্ঘিত হইলে ভাবসূত্র অনুসরণে অসুবিধা হয়—কারণ কাব্যখানি আদ্যন্ত যুক্তিশৃঙ্খলাসমন্বিত। এ কাব্য আলোচনায় কেবল রসবোধটাই যথেষ্ট নয় সতর্ক পদ-ক্ষেপও আবশ্যক।

প্রান্তিক কাব্যে মৃত্যুর সম্বন্ধে কবির যে অভিজ্ঞতা ঘটিয়াছিল তাহা অভিনব। প্রান্তিকের কবিতাগুলি লিখিবার কয়েক মাস পরে নববর্ষের ভাষণ দান উপলক্ষে এই অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"কিছুকাল পূর্বে আমি মৃত্যু-গুহা থেকে জীবনলোকে ফিরে এসেছি। যে-মূলধন নিয়ে সংসারে এসেছিলাম, কর্ম-পরিচালনার জন্য শরীর-মনের যে শক্তির আবশ্যক তা যেন আজ পূর্ণ পরিমাণে নেই, অনেকটা তার লুপ্ত হয়েছে অতলস্পর্শে। আমার নিজের কাছে আমার প্রশ্ন এই, জীবনে এই যে রিক্ততার পর্ব নিয়ে এসেছি একি একটা নূতন পূর্ণতার ভূমিকা? যে জীবনকে নানাদিক থেকে নানা অভিজ্ঞতায় বিচিত্র করে সার্থক করেছি, যাত্রার শেষ প্রান্তে সে আমাকে সহসা একান্ত শূন্যতার মধ্যে পৌঁছিয়ে দিয়ে তার সমস্ত উপলব্ধিকে ব্যর্থ করে মিলিয়ে যাবে এ কথা ধারণা করা যায় না। আমার মনে হয় ক্রমে ক্রমে এই বোঝা ঘুচিয়ে দেবার রিক্ততাই সবচেয়ে আশ্বাসের বিষয়।......জীবনে অনেক কর্ম করেছি, সুখদুঃখ ভোগ অনেক হয়েছে, এখন যদি ইন্দ্রিয়শক্তি ক্লান্ত হয়ে থাকে তবে

৩ ১৪, ১৫, ১৬ সংখ্যক কবিতাগুলি কিছুকাল আগে লিখিত তাই এই ভাবপ্রবাহের সঙ্গে তাহাদের আলোচনা করা হইল না।

অধ্যাত্মলোক বাকি আছে; আমাদের যে শক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণার দিকে আসক্তির দিকে আমাদের গুহাবাসী জন্তুটাকে তাড়না করে তা যদি ম্লান হয় তবেই আশা করি অন্তরের দিক থেকেই মনুষ্যত্বের সিংহদ্বার খোলা সহজ হবে। রিক্ততার পথ দিয়েই পূর্ণতার মধ্যে পৌঁছানো যাবে। বোঁটার বাঁধন থেকে ফল খসে যায়, তাতে তাদের ভয় নেই, তাই শাখার আসক্তি তাদের পিছনের দিকে টানে না, নবজীবনের নব পর্যায়ে তাদের বন্ধন মোচন হয়। তেমনি দেহতন্ত্রে প্রাণের আসক্তি যদি শিথিল হয় তবে তাকে নবজীবনের ভূমিকা বলেই জানবো।" ৪

---

৪ রবীন্দ্র জীবনী, প্রান্তিক ৪র্থ খণ্ড, প্রভাত মুখোপাধ্যায়।

"রিক্ততার পথ দিয়েই পূর্ণতার মধ্যে পৌঁছানো যাবে।" —কথাটা কবির কাছে নূতন নয়। ফাল্গুনী নাটকের রাজা মাথায় একটা পাকা চুল দেখিয়া আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় যখন অবসাদগ্রস্ত কবি তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে পাকা চুলের উপরে কারিগর নূতন রঙ ফলাবে—শাদা তাহারই ভূমিকা। এবারে স্বয়ং কবির বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে "রিক্ততার পথ দিয়েই পূর্ণতার মধ্যে পৌঁছানো যাবে।" সত্য হিসাবে ইহা পুরাতন হইলেও অভিজ্ঞতা হিসাবে নূতন। ইহাই, এই অভিজ্ঞতাই, এই রিক্ততাই প্রান্তিক কাব্যের "সবচেয়ে আশ্বাসের বিষয়।" কিন্তু কবি শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছেন যে, রিক্ততা যে মাত্রায় পৌঁছিলে পাত্র পুনরায় নূতন সুধায় পূর্ণ হইয়া উঠিবার যোগ্য হয়—এখনো সে ভূমিকা রচিত হয় নাই কবির জীবনে। তাই মৃত্যু-গুহার বাহির দ্বারে উপস্থিত হইয়াও তাঁহাকে জীবনলোকে ফিরিয়া আসিতে হইল।

জীবন ও মৃত্যুর ছায়ালোক ঘুচিয়া গেলে এক "ছুটির মহাদেশে" কবি উপনীত হইলেন। সেখানকার সমস্ত সংস্কার পরিচিত সংস্কার হইতে ভিন্ন। তবু কিছু দূর পর্যন্ত পরিচিত সংস্কারের ভারে পীড়িত কবির অকৃতার্থ অতীত, অন্যত্র তিনি যাহাকে "পশ্চাতের আমি" বলিয়াছেন তাঁহাকে অনুসরণ করিল; "পিছু ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার।" মৃতকে অনুসরণকারী শ্মশানযাত্রী দলের মতো এই অকৃতার্থ অতীতটাই জীবনের শেষ চিহ্ন। তাহার মুগ্ধ অনুনয় অতিক্রম করিয়া যেখানে পৌঁছিলেন সেখানে জীবনের পুরাতন মূল্যগুলি লোপ পাইয়াছে—সেখানে "বিশ্বসৃষ্টিকর্তা একা, সৃষ্টি কাজে আমার আহ্বান।" কবি বুঝিলেন "রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে নূতন জীবনছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।" কিন্তু এখানেই গোল বাধিল। যে-সৃষ্টিকার্যের সহায়তায় কবির আহ্বান দেখা গেল এখনো তিনি সে যোগ্যতা লাভ করেন নাই—"তাই ফিরাইয়া দিলে।"

"সেই আলোকের সামগান
মন্দ্রিয়া উঠিবে মোর সত্তার গভীর
গুহা হতে
সৃষ্টির সীমান্ত জ্যোতির্লোকে,
তারি লাগি ছিল মোর
আমন্ত্রণ। লব আমি চরমের
কবিত্ব মর্যাদা
জীবনের রঙ্গভূমে, এরি লাগি
সেধেছিনু তান।
বাজিল না রুদ্র বীণা নিঃশব্দ
ভৈরব নব রাগে,
জাগিল না মর্মতলে ভীষণের
প্রসন্ন মুরতি,
তাই ফিরাইয়া দিলে।"

কবি জীবনে কবি, মৃত্যুতে কবি, মৃত্যুর পরপারবর্তী নূতন সত্তাতে কবি। বহু জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া তাহার কবিরূপটি তাহার চিরসঙ্গী। কিন্তু নূতন অস্তিত্বের নূতন তান সাধিবার যোগ্যতা যদি না হইয়া থাকে তবে আবার ফিরিয়া আসিতে হইবে, ফিরিয়া আসিতে হইল, সেই তান সাধিবার যোগ্যতা অর্জন করিবার উদ্দেশ্যে। কবিত্বের মর্যাদা ইহার অধিক টানিয়া লওয়া সম্ভব নয়—প্রান্তিক কাব্যের অভিজ্ঞতারও এখানেই সীমা। অতঃপর যে জগতে তিনি পুনরায় চৈতন্য লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিলেন তাহা জিঘাংসায় জঘন্য সর্বমানবের লাঞ্ছনায় বীভৎস। বিশ্বসৃষ্টিকর্তা যদি নূতন তানের অযোগ্য মনে করিয়া কবিকে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য করিয়া থাকেন তবে

তাঁহাকে এখানে পুরাতন তান সাধিতে হইবে, হয় তো ইহা নূতন তান সাধিবারই ভূমিকা মাত্র—

"বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।"

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের কবিতায়, বলাকা কাব্য রচনার সময় হইতে, এই সর্বমানবসত্তা সর্বদা উপস্থিত। কখনো আভাসে কখনো অতিভাসে, প্রান্তিক কাব্যে তাহার উদ্ভাসন অতিশয় প্রোজ্জ্বল।

এখানে প্রসঙ্গত সেঁজুতি কাব্যের আলোচনা সারিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রান্তিক কাব্য প্রকাশের কয়েক মাস পরে সেঁজুতি কাব্য প্রকাশিত হয়। প্রান্তিক কাব্য রচনার সময় কবির মন যেভাবে উদ্বেল তাহারই কতক উপচিয়া পড়িয়া সেঁজুতি কাব্যের কয়েকটি কবিতার সৃষ্টি করিয়াছে। বাকি অধিকাংশ কবিতা প্রান্তিকের অভিজ্ঞতার আগে লিখিত। সে-সব কবিতার অনেকগুলিরই উৎকর্ষ অসামান্য কাজেই রবীন্দ্র-কাব্যের আলোচনায় তাহাদের স্থান অবশ্যই আছে। কিন্তু আগেই বলিয়াছি যে, বর্তমান গ্রন্থে আমরা কবিকে জানিতে চেষ্টা করিতেছি, কাব্যকে নয়। সেই উদ্দেশ্যে অনেক উৎকৃষ্ট কবিতাকে লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে, আবার অনেক কবিতা উৎকর্ষের দাবী যাহাদের তেমন নয় তাহাদের বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইয়াছে। উৎকর্ষের মানে যে-সব কবিতা নীচু অনেক সময়ে তাহাদের মধ্যেই কবির প্রকাশ সমুজ্জ্বল, বাড়ির অবোধ ছেলেটির মধ্যে মাতৃস্নেহের প্রকাশের মতো।

প্রান্তিক কাব্যে মৃত্যুর সহিত কবির যে সম্পর্ক দেখিয়াছি তাহার মধ্যে কোথায় যেন একটুখানি অপরিণতি তথা অপ্রস্তুতির ভাব আছে, আর সেইজন্যই মৃত্যু যখন কবিকে বিশ্বস্রষ্টার সভাগৃহে লইয়া গেল সেখানে কবির স্থান হইল না তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। এই ভাবটি সেঁজুতি কাব্যে প্রবল হইয়া উঠিয়া একপ্রকার অনিশ্চয়তা ও সংশয়ে পরিণত হইয়াছে।

"আলো আঁধারের ফাঁকে দেখা যায়
অজানা তীরের বাসা,
ঝিমি ঝিমি করে শিরায় শিরায়,
দূর নীলিমার ও
সে ভাষার আমি চরম অর্থ
জানি কি বা নাহি জানি—৫

কিম্বা—

চির প্রশ্নের বেদী সম্মুখে
চির নির্বাক রহে
বিরাট নিরুত্তর ৬

অথবা—

কী আছে জানিনা দিন অবসানে
মৃত্যুর অবশেষে,
এ প্রাণের কোন ছায়া
শেষ আলো দিয়ে ফেলিবে কি রঙ
অস্তরবির দেশে,
রচিবে কি কোন মায়া! ৬

এ গীতাঞ্জলির কবির ভাষা নয়, ভাব তো নয়ই। গীতাঞ্জলি কাব্যের নিঃসংশয় আত্মসমর্পণ ও অতলস্পর্শ অধ্যাত্ম বিশ্বাস এই ভাব হতে বহু দূরে। গীতাঞ্জলি কাব্যের মধ্যাহ্ন আকাশে যে মহিমময় ভাস্করকে অপ্রচ্ছন্ন দেখা গিয়াছিল আজ সায়াহ্ন আকাশে তাহার উপরে অর্ধবিশ্বাসের স্বচ্ছ মেঘখণ্ড আসিয়া পড়িয়াছে; কিরণ কিছু ম্লান কিন্তু যেন সান্নিধ্যে সুন্দরতর। কবির শেষ জীবনের কাব্যের ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ। প্রান্তিকে অস্পষ্টভাবে থাকিয়া সেঁজুতিতে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

সেঁজুতির জন্মদিন কবিতাটিতে কবি যে-সব কথা বলিয়াছেন তাহার সমস্তই প্রান্তিক কাব্যে আছে, ভাব পূর্বতন, প্রকাশ নূতন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মতো তাঁহার ব্যষ্টি জীবনের মধ্যে মানুষের সমষ্টি জীবনের উপলব্ধি। ৭ এই ভাবটিও কবির শেষ জীবনের কাব্যের একটি লক্ষণীয় ব্যাপার। বলাকার পর হইতে সর্বমানবের জীবনের স্থূলতর সূত্রটি তাঁহার ব্যষ্টি জীবনের সূক্ষ্মতর সূত্রের সহিত ক্রমেই বেশি করিয়া জড়িত হইয়া গিয়াছে। ভাবটি তাঁদের মগ্নচৈতন্যে সর্বদা উপস্থিত বলিয়া অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত স্থানেও মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ৮ সর্বমানবচৈতন্য তাঁহার শেষ জীবনের কাব্যের একটি প্রধান উপাদান। সর্বত্রই যে এই বোধটি কাব্যে অপরূপত্ব লাভ করিয়াছে তাহা নয়, অনেকস্থলেই উপাদান আপন মৌলিক রূঢ়তাকে অতিক্রম করিতে পারে না, অনেক স্থলেই ভাবটি প্রোপাগাণ্ডার বর্ম পরিয়া দেখা

৫ উৎসর্গ—সেঁজুতি
৬ পত্রোত্তর—সেঁজুতি

৭ প্রান্তিক কাব্যের ১৭ সংখ্যক কবিতার সহিত জন্মদিন কবিতার
"শুনি তাই আজি
মানুষ জন্তুর হুহুঙ্কার দিকে দিকে
উঠে বাজি।"
হইতে আরম্ভ করিয়া
"গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।" পর্যন্ত তুলনা করিলেই মিলটা বুঝিতে পারা যাইবে।
৮ চলতি ছবি, সেঁজুতি

দিয়াছে, তৎসত্ত্বেও তাহার বহুব্যাপ্ত অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় আছে মনে হয় না।

রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন পর্বে এই শ্রেণীর সর্বশক্তিমান এক একটি ভাব দেখিতে পাওয়া যায়—সর্বশক্তিমান এই জন্যে, যতদিন তাহা বিসর্জিত হইয়া নূতন ভাবকে বেদীতে আসন না ছাড়িয়া দিতেছে ততদিন কবির মনের উপরে তাহাদের অপরিসীম প্রভাব। একসময় এইপ্রকার সর্বশক্তিমান আইডিয়া ছিল "প্রাচীন ভারত ও তপোবন"; তারপরে আসিয়াছে "ভারতবর্ষ"; শেষ জীবনে সমুপস্থিত "বিশ্বমানব" বা "সর্বমানব" বা "মহামানব"। তাই "গ্রামের মেয়ের কলসি মাথায় ধরা" চলতি ছবি দেখিতে দেখিতে হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় "যুদ্ধ লাগলো স্পেনে।" আবার প্রান্তিক কাব্যে কবি যখন বলিতেছেন "মৃত্যু দূত এসেছিল......তব সভা হতে," তখনো মগ্নচৈতন্যের মধ্যে, ভূগর্ভে অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের মতো, সর্বমানবের দুঃখ উদ্বেলিত হইতে থাকে।
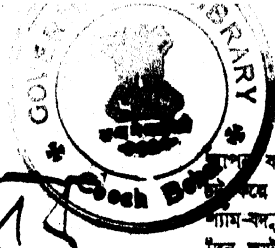
কবিগুরু গুরুদেব

সৈয়দ মুজতবা আলী

রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিষ্ঠান নানা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছেন। এ'দের অন্যতম প্রতিষ্ঠান এই সম্পর্কে একটি শর্ত করেন যে, কোনো লেখক যেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের উপলক্ষ করে কোনো রচনা না পাঠান। এই প্রতিষ্ঠানটির মনে হয়তো শঙ্কা ছিল, রবীন্দ্রনাথের নাম করে এ'রা হয়তো নিজেদের আত্মজীবনী লিখে বসবেন। শঙ্কাটা কিন্তু অমূলক নয়।

কিন্তু এ-শর্তের ভিতর একটা গলদ রয়ে গেল। এই প্রথম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা উল্লেখ করা যাবে— দ্বিতীয় জন্ম-শতবার্ষিকীর সময় এত দীর্ঘায়ু কেউ থাকবেন বলে ভরসা হয় না। কাজেই এই শতবার্ষিকীতে কেউই যদি মানুষ রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে চিনেছিলেন, সে কথা না লেখেন, তবে দ্বিতীয় শতবার্ষিকীতে যাঁরা আজকের দিনের প্রকাশিত প্রবন্ধাদি পড়ে মানুষ রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটি নির্মাণ করতে চাইবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বিক্ষুব্ধ হবেন। অবশ্য এই নিয়ে যে অন্যত্র ভূরি ভূরি লেখা হয়নি তা নয়, কিন্তু শতবার্ষিকীর নৈমিত্তিক ধ্যান এক রকমের অন্য নিত্য-রচনা অন্য ধরনের।

* * *

কিন্তু এই মানুষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়, তারও বর্ণনা দেওয়া হওয়া কি সহজ? প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ আর পাঁচজন কবি কিংবা গায়কের মত আপন কবিতা বা গান রচনা করার পর চাঁদরে ধুলোর সংসারে ফিরে এসে রাম-শ্যাম-যদু-মধুর মত তাস পিটে, হুঁকো টেনে দিন কাটাতেন না। দৈনন্দিন জীবনে ফিরে আসার পরও তাঁর বেশভূষা, বাক্যালাপ, আচার-আচরণে, দুষ্টের দমনে এবং শিষ্টের পালনে (আশ্রমের ছাত্রদের কথা হচ্ছে) তিনি কবিই থেকে যেতেন। এমনকি, আশ্রমের নর্দমা সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় কবিজনোচিত কোনো বাক্য বেমানানসই মনে হলে—এবং মনে রাখা উচিত সেই বেমানানসইটাও তাঁর কবি-সুলভ হৃদয়ই ধরে নিত—সেটাকে তিনি অন্তত কিছুটা হাস্যরস দিয়ে উচ্চ পর্যায়ে তুলে নিয়ে আসতেন। কিংবা সামান্য একটু অন্য ধরনের একটি উদাহরণ দিন।

তাঁর ভৃত্য বনমালী তাঁর জন্য এক গেলাস শরবৎ এনে দেখে বাইরের কে বসে আছেন। বনমালী থেমে যাওয়াতে কবি বললেন, 'ওগো বনমালী দ্বিধা কেন?' এই 'দ্বিধা কেন?' কবি বলেছিলেন সাধারণ ধুলো-মাটির দৈনন্দিন ভাষাকে একটু মধুরতর করার জন্যে। অথচ এ-দুটি তাঁর

শান্তিনিকেতনে নববর্ষের উৎসবে রবীন্দ্রনাথ, পাশে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন
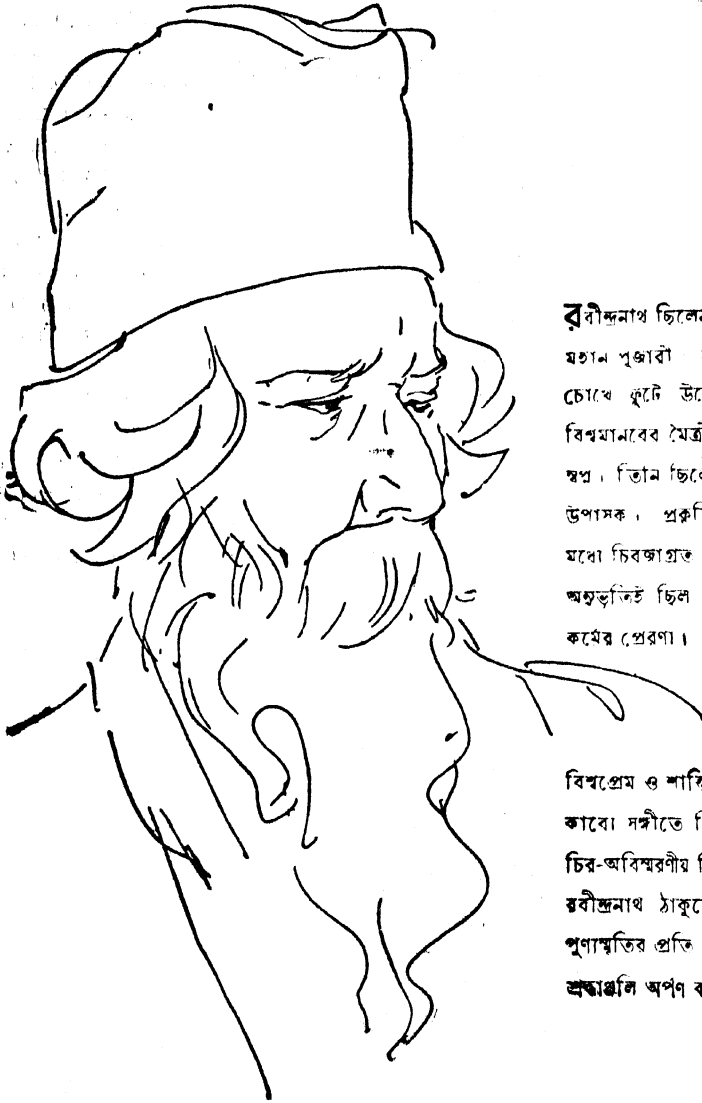
ফটো—শম্ভু সাহা

নিজের মনেও এমনই চাঞ্চল্য তুললো যে, তিনি সেদিনই গান রচনা করলেন,

হে মাধবী, দ্বিধা কেন,
আসিবে কি ফিরিবে কি—
আঙিনাতে বাহিরিতে
মন কেন গেল ঠেকি॥১

এমনকি, কমলালেবুর সওগাৎ পেয়ে, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে যে তাঁকে সেগুলো নিবেদন করেছিল, তার স্মরণে তিনি যে-সব কবিতা লিখেছেন, সেগুলো অনেক পাঠকই তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে না চিনেও স্মরণ করতে পারবেন।

এতেও কিন্তু তাঁর এদিকটার পরিচয় অতিশয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমরা তাঁকে প্রধানত চিনেছি গুরুরূপে। সে সম্বন্ধে সুধীরঞ্জন দাশ, প্রমথনাথ বিশী প্রাঞ্জল ভাষায় সবিস্তর লিখেছেন—আমারও সংক্ষেপে লেখার সুযোগ অন্যত্র হয়েছে। কিন্তু কেমন যেন মনে হয়, আমরা যেটুকু অসম্পূর্ণভাবে দেখেছি, সেটিও যেন সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারিনি।

এমন গুরু হয় না। পড়াবার সময় তিনি কখনো বাক্য অসম্পূর্ণ রাখতেন না—প্যারেনথেসিসে, অর্থাৎ এক বাক্যের ভিতর অন্য বাক্য এনে কখনো ছাত্রদের মনে দ্বিধার সৃষ্টিও করতেন না, এবং প্রত্যেকটি বক্তব্য তাঁর পরিপূর্ণ মধুরতম ভাষায় প্রকাশ করতেন। আমার মনে কণামাত্র দ্বিধা নেই যে, তাঁর ক্লাস-পড়ানো যদি কেউ শব্দে শব্দে লিখে রাখতে পারতো তবে সে রচনা তাঁর 'পঞ্চভূত' কিংবা অন্য যে-কোনো শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে একাসনে বসতে পারতো। এমনকি, একথাও অনায়াসে বলা যায়, সে হত এক অদ্ভুত তৃতীয় ধরনের রচনা। এবং আশ্চর্য, তারই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের প্রশ্নও জিজ্ঞেস করেছেন, উত্তরগুলো শুদ্ধ করে দিয়েছেন, তার একটি-আধটি শব্দ বদলে কিংবা সামান্য এদিক-ওদিক সরিয়ে তাকে প্রায় সুষ্ঠু ভদ্র-গদ্যে পরিণত করছেন।

ছাত্রের সব প্রশ্নের উত্তর কোনো গুরু দিতে পারেন কি না বলা কঠিন, কিন্তু এটুকু বলতে পারি, আমাদের সম্ভব-অসম্ভব সব প্রশ্নের কথা ভেবে নিয়ে প্রতিদিন তিনি অনেক মূল্যবান (মূল্যবান এই অর্থে বলছি যে, তিনি যদি ঐ সময়ে বিশ্বজনের জন্যে গান কিংবা কবিতা রচনা করতেন, তবে তারা হয়তো বেশী উপকৃত হত) সময় ব্যয় করে 'পড়া তৈরী' করে আসতেন। শেলী-কীটসের বেলা তা না হয় হল, কিন্তু একথা কি সহজে বিশ্বাস করা যায়, তিনি তাঁর আপন রচনা 'বলাকা' পড়াবার সময়ে পূর্বে দেখে নিয়ে রেখে তৈরী হয়ে আসতেন!

এই ক্লাশেরই বৃহত্তর রূপ আমাদের সাহিত্যসভা।

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিয়মানুরাগী ছিলেন। যদিও আমাদের সাহিত্য-সভা নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার, তবু তিনি যেভাবে সে-সভা চালাতেন, তার থেকে মনে হত —অন্তত আইনের দিক দিয়ে—যেন তিনি কোনো লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার-হোল্ডারের মিটিং পরিচালনা করছেন। কোথায়, কখন সভা হবে, তার কার্যসূচী বা এজেন্ডা নিয়মানুযায়ী হ'ল কি না, প্রত্যেকটি জিনিস তিনি অনেকক্ষণ ধরে

উৎসবপতি রবীন্দ্রনাথ ফটো—শম্ভু সাহা

(১) আমার স্মৃতি বলছে, পাঠটি একটু অন্য রকমের ছিলঃ

হে মাধবী, ভীরু মাধবী,
তোমার দ্বিধা কেন?

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। একটি সামান্য উদাহরণ দিই।

সভাতে পাকাপাকিভাবে এজেন্ডা অনুযায়ী গান, প্রতিবেদন-পাঠ (মিনিটস্ অব দি লাস্ট মিটিং), প্রতিবেদনে কোনো আপত্তি থাকলে সে সম্বন্ধে আলোচনা এবং সর্বসম্মতিক্রমে তার পরিবর্তন, প্রবন্ধ-পাঠ, আবৃত্তি, সংগীত ইত্যাদির পর সাধারণের বক্তব্য (জেনারেল ডিসকাশন) শেষ হ'য়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতির বক্তব্য বলতেন। এবং বিষয় গুরুতর হলে তাঁকে এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিতেও শুনেছি।

একদা প্রতিবেদন পাঠের সময় সভার সবকিছু উল্লেখ করার পর আমি পড়ে যাচ্ছি। 'সর্বশেষে গুরুদেব সভাপতির বক্তব্যে বলেন—'

এখানে এসে আমি থামলুম। কারণ গুরুদেব তাঁর পূর্ববর্তী সভাতে প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এবং আমার প্রতিবেদনে তার সারাংশ লিখতে গিয়ে সাধারণ খাতার প্রায় আট পৃষ্ঠা লেগেছিল। আমার মনে সন্দেহ জাগলো, এই দীর্ঘ আট পৃষ্ঠার প্রতিবেদন শোনার মত ধৈর্য গুরুদেবের থাকবে কি না। কারণ যে জিনিস তিনি অতি সুন্দর ভাষায় এক ঘণ্টা ধরে বলেছেন, তারই সারাংশ লিখেছে একটি আঠারো বছরের বালক তার কাঁচা, অসংলগ্ন ভাষায়। সেটা শোনা কবির পক্ষে স্বভাবতই পীড়াদায়ক হওয়ার কথা। আমি তাই পড়া বন্ধ করে গুরুদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা-ভরা স্বরে শুধালুম, 'এই সারাংশটি আট পৃষ্ঠার। পড়বো কি?' তিনি তাঁর চিবুকে হাত রেখে আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'পড়ো'। আমাকে পড়তে হলো। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল। কিছুদিন পরে দ্বিতীয় সভাতেও তারই পুনরাবৃত্তি। এবারেও সেই দ্বিধা প্রকাশ করলুম। একই উত্তর, 'পড়ো'।

তখন বুঝলুম, তিনি সম্পূর্ণ না শুনে প্রতিবেদন-পুস্তকে তাঁর নাম সই করবেন না। সেটা নিয়মানুযায়ী—লীগেল নয়!

কিন্তু পাঠককে চিন্তা করতে অনুরোধ করি, আঠারো বছরের ছোকরার কাঁচা বাঙলায় লেখা তাঁরই সর্বাঙ্গসুন্দর বক্তৃতার বিকলাঙ্গ প্রতিবেদন শোনার মত পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতাও তিনি এড়িয়ে যেতেন না। আমার শুধু মনে হত, এই অযথা, কালক্ষয় না করে ঐ সময়টুকু বাঁচিয়ে তিনি তো কোনো মহৎ কাজ করতে পারতেন!

• • •

রবীন্দ্রনাথ আমাদের গুরু, এবং তিনি কবি। তাই তিনি আমাদের কবিগুরু।
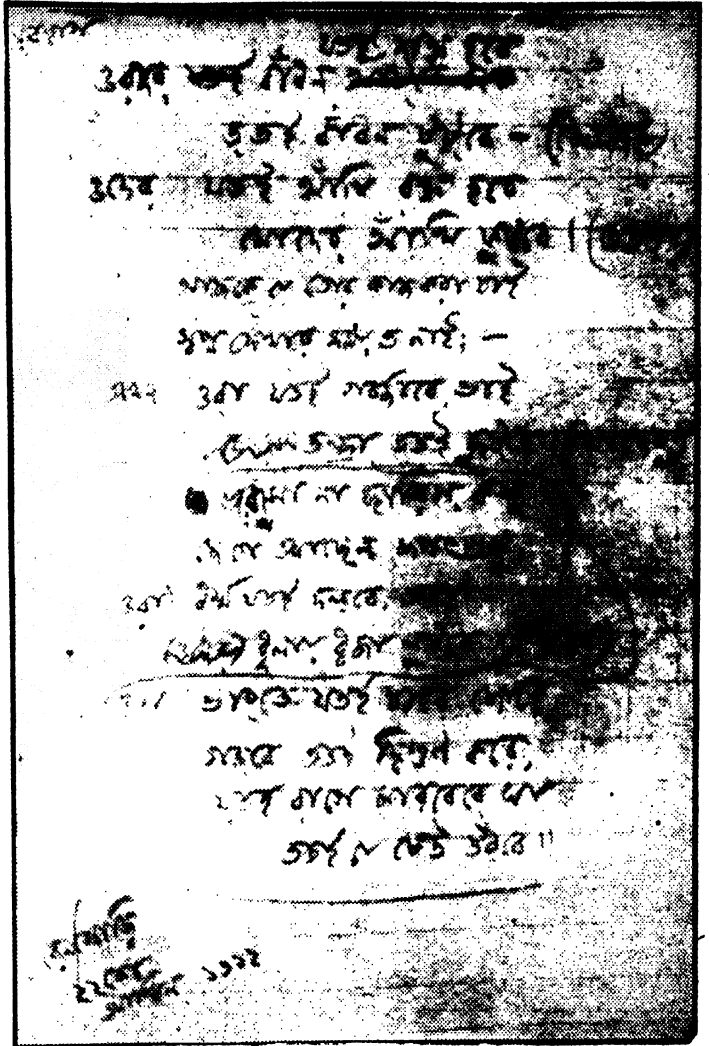
"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে" রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত

তিনি অবশ্য তাবৎ বাঙালীর কাছেই 'কবিগুরু', কিন্তু সেটা অন্যার্থে অন্য সমাস। আমরা তাঁর কবি রূপ দেখেছি অন্যভাবে।

তিনি দিনের পর দিন কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প এবং বিশেষ করে গান রচনা করে যেতেন, এবং প্রত্যেকটি শেষ হলেই আমাদের ডেকে শোনাতেন। এই ভিন্ন

রূপটি সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সচেতন ছিলেন।

কোনো কবিতা লেখা শেষ হলে তিনি সেটি শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশকে কপি করে পাঠাতেন। একবার একটি গান পাঠিয়ে সঙ্গের চিঠিতে লেখেন;—

'বলা বাহুল্য, বর্ষামঙ্গলের গানগুলি একটা-একটা করে রচনা করা হয়েছে। যারা বইয়ে পড়বে, যারা উৎসবের দিনে শুনবে, তারা সবগুলি একসঙ্গে পাবে। প্রত্যেক গান যে অবকাশের সময় আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে তারা দেখবে। আমার বিবেচনায় এতে একটা বড়ো জিনিসের অভাব ঘটল। আকাশের তারাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে হার গাঁথলে সেটা বিশ্ব-বেনের বাজারে দামী জিনিস হতেও পারে, কিন্তু রসিকেরা জানে যে, ফাঁকা আকাশটাকে তৌল করা যায় না বটে, কিন্তু ওটা তারাটির চেয়ে কম দামী নয়। আমার মতে যেদিন একটি গান দেখা দিলে, সেইদিনই তাকে স্বতন্ত্র অভ্যর্থনা করে অনেকখানি নীরব সময়ের বুকে একটিমাত্র কৌস্তভমণির মতো ঝুলিয়ে দেখাই ভালো। তাকে পাওয়া যায় বেশি। বিক্রমাদিত্যের সভায় কবিতা পড়া হত, দিনে দিনে, ক্রমে ক্রমে—তখন ছাপাখানার দৈত্য কবিতার চারদিকের সময়াকাশকে কালি দিয়ে লেপে দেয়নি। কবিও প্রতিদিন স্বতন্ত্র পুরস্কার পেতেন—উপভোগটা হাইড্রলিক জাঁতায় সংক্ষিপ্ত পিণ্ডাকারে এক গ্রাসের পরিমাণে গলায় তলিয়ে যেত না। লাইব্রেরিলোকে যেদিন কবিতার নির্বাসন হয়েছে, সেদিন কানে-শোনার কবিতাকে চোখে-দেখার শিকল পরানো হলো, কালের আদরের ধন পারিশ্রমের হাটের ভিড়ে হলো নাকাল। উপায় নেই—নানা কারণে এটা হয়ে পড়েছে জটলা পাকানোর যুগ—কবিতাকেও অভিসারে যেতে হয় পটলডাঙার কলেজ-পাড়ায় অম্নি-বাসে চড়ে। আজ বাদলার দিনে আমার মন নিঃশ্বাস ফেলে বলছে, "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে"—দুর্যোগে জন্মালুম ছাপার কালি-দাস হয়ে—মাধবিকা, মালবিকারা কবিতা কিনে পড়ে—জানলার পাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে না। ইতি—১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৬" (দেশ, ১৩৬৮, পৃ ৮৩৫)

আমরা তাঁকে পেয়েছি যেভাবে তিনি চেয়েছিলেন—তাঁরই ভাষায় বলি, 'আজকের দিনের মাধবিকা, মালবিকার' মত নয়।

কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়ে গঙ্গাজলে যে গঙ্গাপুজো করলুম, তার পর নিজের আর কোন্ অর্ঘ্য এনে বিড়ম্বিত হই?

শান্তিনিকেতনের নৃত্য আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের দান

শান্তিদেব ঘোষ

সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্য-কলার সম্মানজনক স্থান করে দেবার কার্যকরীভাবে চেষ্টা ভারতের বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথই করেন সর্বপ্রথম।

গুরুদেবের জীবনে লক্ষ্য করার মত একটি প্রধান দিক হল, তিনি যে বিষয়ে যা ভাবতেন সে বিষয়ে নিজের হাতে কাজ করে তা দশের সামনে বা দেশের সামনে উদাহরণ হিসেবে খাড়া করতেন। কেবল বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতদের মত বড় বড় আদর্শের বাণী প্রচার করেই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করতেন না। হাতে কলমে তা করে প্রমাণ করতেন যে, তিনি যা ভাবেন বা বলেন তা অবাস্তব নয়, তার মধ্যে সত্য আছে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ললিতকলা, সঙ্গীত ও নৃত্যের যে বিশেষ স্থান থাকা দরকার একথা তিনি কেবল একটা বড় আদর্শ হিসেবেই প্রচার করলেন না, শান্তি-নিকেতনের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে তার স্থান করে দিয়ে মানুষের সমাজে তার প্রয়োজনীয়তার প্রমাণ দিলেন। তাঁর এই চিন্তাকে কার্যকর করে তুলতে তিনি প্রথম থেকেই যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। নিজে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নেচেছেন, নাচে উৎসাহিত করেছেন, দিনের পর দিন ধৈর্য ধরে উপদেশ দিয়েছেন মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। এ-কাজে তাঁর একটুও অবসাদ বা অবহেলা ছিল না। তিনি নাচ অত্যন্ত ভালবাসতেন। নির্মল আনন্দ উপভোগের আর একটি বড় অবলম্বন রূপেই তিনি এটিকে দেখতেন বলে অন্যরাও যাতে সেই আনন্দ উপভোগ করে সেই দিকে ছিল তাঁর বিশেষ চেষ্টা।

শান্তিনিকেতনে নাচের মাস্টার রেখে ছাত্রদের নাচ শেখাবার চেষ্টা যদিও করা হয় ১৯১৯ সালে প্রথম, কিন্তু সেই চেষ্টা প্রকৃত দানা বাঁধে ১৯২৫ সাল থেকে। কিন্তু এ-পথে তাঁর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল তারও বহু বছর আগে এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এই কাজের পিছনে ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। 'শারদোৎসব' নাটকের অভিনয়-কালে বালকদলের গানের সঙ্গে আনন্দে নাচ, 'ফাল্গুনী'-র অভিনয়ের সময় যুবক-দলের নাচ ও অন্ধ বাউলের বেশে গানের সঙ্গে গুরুদেবের নিজের নাচ শান্তি-নিকেতনের প্রথম যুগের নাচের কয়েকটি তা[illegible]রণ। সে যুগের নাচ অবশ্য আজ-[illegible]কার মত নিয়মবন্ধ কোন বিশেষ ধারার না[চ] নয়। সে ছিল গানের ছন্দ মিলিয়ে [না]না প্রকার আনন্দের অঙ্গভঙ্গী। শিশু বয়স থেকেই ঐ যুগের ঐ ধরনের নাচের সঙ্গে আমরা সর্বদাই যুক্ত ছিলাম। সে যুগে নাটকের গানের সঙ্গে কিভাবে ছন্দে মিলিয়ে নাচতে হবে তার নির্দেশ গুরু-দেবের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি বারে বারে। ১৯২২ সালে 'বসন্ত' গীতনাট্যের অভিনয়কালে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে আমাদের সঙ্গে গুরুদেব কি উৎসাহে সমস্ত রঙ্গমঞ্চ জুড়ে নেচেছিলেন সে দৃশ্য আজও আমার চোখে ভাসে।

১৯১৯ সালে ও ১৯২৫ সালে মণি-পুরী নাচ শিক্ষার ব্যবস্থা বা ১৯৩১ সালে কথাকলি নাচের সূত্রপাত শান্তিনিকেতনের জীবনের একটি আকস্মিক ঘটনা নয়, গুরু-দেবের একান্ত ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার পরিণতি-রূপেই আমি তা দেখি।

শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের অভি-নয়ের গানের সঙ্গে নাচের নির্দেশ আমরা যেভাবে পেতাম পরবর্তী যুগেও তা থেকে আমরা বঞ্চিত হইনি। তাঁর কোন গানের সঙ্গে কোন্ নাচ কিভাবে খাপ খাবে সে-পথে তিনি সর্বদাই আমাদের পরিচালনা করেছেন। এমনকি বিশেষ নৃত্যভঙ্গীর নির্দেশও তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। 'নবীন' গীতনাট্যে বাউল সুরের একটি গানে নাচ রচনার সময় তাঁর কাছ থেকে নানাভাবে নির্দেশ পেয়েছিলাম। একতারাটি গানের

'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যাভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ

কোন পংক্তিতে কিভাবে ধরতে হবে, কোথায় নাচের মধ্যে উদ্দামভঙ্গী আনতে হবে, কোথায় নাচটি মোলায়েম হবে, কোথায় আমি নিচু হয়ে নাচব এ সবেরই নির্দেশ তাঁর কাছে পেয়েছিলাম। একবার একটি কবিতার সঙ্গে নৃত্য রচনার সময় দিনের পর দিন তাঁর সামনে নাচতে হয়েছিল। তিনি নিজে আবৃত্তি করে যেতেন এবং নানা নৃত্যভঙ্গীর বিষয় নির্দেশ দিতেন। গানের সঙ্গে নাচ বা গীতনাট্যের অভিনয়ের নাচ রচনা করে তাঁকে আগে দেখিয়ে তাঁর স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারতাম না। কোথায় কোন অঙ্গভঙ্গী অনাবশ্যক, কোথায় আরো কিছু নাচ বাড়ানো দরকার, গানের অর্থের সঙ্গে কোথায় অঙ্গভঙ্গী খাপ খাচ্ছে না ইত্যাদি নানারকমের আলোচনা সর্বদাই তিনি আমাদের সঙ্গে করেছেন।

কোনো একটা বিশেষ পদ্ধতির নাচ তাঁর গীতনাট্যের সঙ্গে মেশাবার চেষ্টা করতে গিয়ে যখন প্রবল আপত্তির সম্মুখীন

হয়েছি তখন গুরুদেব নিজে সে নাচ দেখে তার উপযোগিতা লক্ষ করে তা সমর্থন করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন যেন অন্য নাচের সংগে তাকে মিশিয়ে নাচের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটি নষ্ট না করি।

কোন গানের সংগে নাচ প্রথমবার যেভাবে রচিত হয়েছিল, কয়েক বছর পরে আবার যখন সে গানের সংগে নাচ রচনার প্রয়োজন হয় তখন তিনি বলেছেন কি করে নাচের আঙিনায় গানটিকে আরো মর্মস্পর্শী করা যায় সেকথা ভেবে নতুন করে নাচ রচনার চেষ্টা করতে।

গুরুদেবের মৃত্যু পর্যন্ত শান্তি-নিকেতনের নৃত্য আন্দোলনের যুগটিকে বলা যায় পরীক্ষা ও নিরীক্ষার যুগ। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেই তিনি এ-নাচের একটা বিশেষ দানাবাঁধা রূপ দেখে যেতে পেরে-ছিলেন। এই রূপটির প্রকৃতিটি কি সেটিও আলোচনা হওয়া উচিত বলে মনে করি।

উচ্চাংগের হিন্দুস্থানী গান, বাংলার নিজস্ব দেশী গান ও বিদেশী সংগীত থেকে গুরুদেব নানাভাবে আহরণ করে নিজের গানে তার প্রচুর ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তার ব্যবহারের সময় নিজের গানের কথাকে করতেন ভিত্তি। তাই ভিন্ন প্রকৃতির গানের ঢং অতি অনায়াসে একসংগে মিশে যেতে পারতো এবং সেই কারণেই সেই সার্থক মেশানো রূপটি তাঁর গানে সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত হতে পেরেছে। তাঁর গানের সংগে নৃত্যরচনায় আমরা তাঁর কাছ থেকে সেই দৃষ্টিভংগীটিই পেয়েছি বিশেষ করে। বিচিত্র নৃত্যভংগী ও নৃত্যাভিনয়ের ঢং গুরুদেবের গানকে নির্ভর করে মিলেমিশে সম্পূর্ণ নতুন একটি নৃত্যধারার সৃষ্টি করতে পেরেছে। নৃত্য-নাট্যগুলিতে সে মিশ্রণ হয়েছে আরো সার্থক। মণিপুরীর কোমলনাচের পাশে কথাকলির মত জোরালো পুরুষ নাচ, বাংলার বাউলদের নাচের ভংগীর পাশে সিংহলের কাণ্ডী নাচ, দক্ষিণ ভারতের ভরতনাট্যম নাচের পাশে উত্তর ভারতের কথক নাচ গানকে অবলম্বন করে এক হয়ে গেছে, কারুর সংগে কারুর বিরোধ ঘটেনি। এই সমন্বয়ের শিক্ষাই গুরুদেব আমাদের দিয়েছেন। এইরূপ সমন্বয়ের সাধনাই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমৃত্যু করে গিয়েছেন। শান্তিনিকেতনের নৃত্য-আন্দোলনের মাধ্যমে সেই আদর্শকেই আমাদের কাছে আর একভাবে তিনি রেখে গেছেন।

সিংহলে 'চিত্রাংগদা' অভিনয়ের দলসহ রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩০

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীতগুরু

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ শিক্ষানবীশী করে কখনো গান শেখেন নি। পদ্ধতি-গত সংগীত শিক্ষার প্রচলিত পথে তিনি সুর-লোকের সন্ধান পাননি, যদিও তাঁর একাধিক সংগীত-শিক্ষকের কথা জানা যায়। সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রের মতন সংগীতও তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার গুণে। রবীন্দ্রনাথের সত্যকার সংগীতগুরু কেউ ছিলেন না, যদু ভট্টের কথা মনে করেও একথা বলা চলে। যদু সংস্কার-বদ্ধ পদ্ধতিতে ও নিয়মিতভাবে সংগীতশিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ সে সময় তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন—কবি স্বয়ং সেকথা মৌখিক ও লিখিতভাবে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন, যদিও গায়ক ও সুরকার রূপে যদু ভট্টের প্রতি তিনি অসাধারণ শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন।

তাহলে এই লেখার এ শিরোনামা কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে একটি কথা বলা দরকার। রবীন্দ্রনাথের সংগীত-জীবনের পূর্ব-বৃত্তান্ত আলোচনা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। তাঁর সংগীত-'শিক্ষা'-র সূত্র ধরে বিগত শতকের এক বিশিষ্ঠ সংগীত-শিল্পীর প্রসংগ অবতারণাই আমাদের লক্ষ্য। সেই সংগীত সাধকের নাম শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী, তৎকালীন বাংলার অন্যতম গুণী গীতিকার ও সুরকার।

তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীতগুরু ছিলেন—একথা নিতান্ত লৌকিক বা সাধারণ অর্থে বলা যায়। কারণ, অতি অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে গান শিখতেন এবং তাও বেশিদিনের জন্যে নয়। রবীন্দ্রনাথ তখনো রবীন্দ্রনাথ হন নি! তাঁর বয়স সে সময় ন' বছর মাত্র। তাহলেও তথ্যের দিক থেকে বিষ্ণুচন্দ্রের নাম রবীন্দ্রনাথের সংগীত-জীবনের ইতিহাসে শুকতারার মতন ভাস্বর থাকবে।

তৃতীয় অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথের (১৮৪৪-৮৪) ওপর তখন রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষার ভার ছিল। বিষ্ণুচন্দ্রের কাছে তাঁর সংগীত-শিক্ষার ব্যবস্থাও হেমেন্দ্রনাথ করেন। যে বিচিত্র পদ্ধতিতে বিষ্ণুচন্দ্র সুরের পাঠ দিতেন, তারও প্রবর্তন হয় হেমেন্দ্রনাথের পরামর্শে। তার পরিচয় একটু পরেই দেওয়া হবে।

বিষ্ণুচন্দ্র সে সময় জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়িতে সংগীত-বিষয়ে গৃহশিক্ষক ছিলেন। সেখানে প্রতি রবিবার তিনি সংগীতশিক্ষা দিতেন। বাড়ির আর কয়েকজন ছেলে মেয়ের সংগে রবীন্দ্রনাথের গান শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিছু আগেই সে সময়ের গানের সংগে হারমোনিয়ম বাজাবার রীতি প্রচলিত হয়েছিল কলকাতায়। কিন্তু বিষ্ণুচন্দ্র তাঁর শিক্ষার্থীদের তানপুরা সহযোগে শিক্ষা দিতেন এবং তাঁরাও তানপুরা সহযোগে অভ্যাস করতেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পরে "ছেলেবেলা"-য় জানিয়েছেন, "কাঁধের উপর তম্বুরা তুলে গান অভ্যাস করেছি। কল-টেপা সুরের গোলামি করিনি।"

সংগীত শিক্ষার অভিনব পদ্ধতি

ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের বিষ্ণুচন্দ্র যে সংগীত শিক্ষা দিতেন, তার একটি বৈশিষ্ঠ্য ছিল। তাঁর সংগীত শিক্ষাদানের সেই বৈচিত্র্যের জন্যেই হয়ত বালক রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগীত-শিক্ষকের প্রতি বিরূপতা জাগেনি। রবীন্দ্রনাথ নিজের আনুষ্ঠানিক
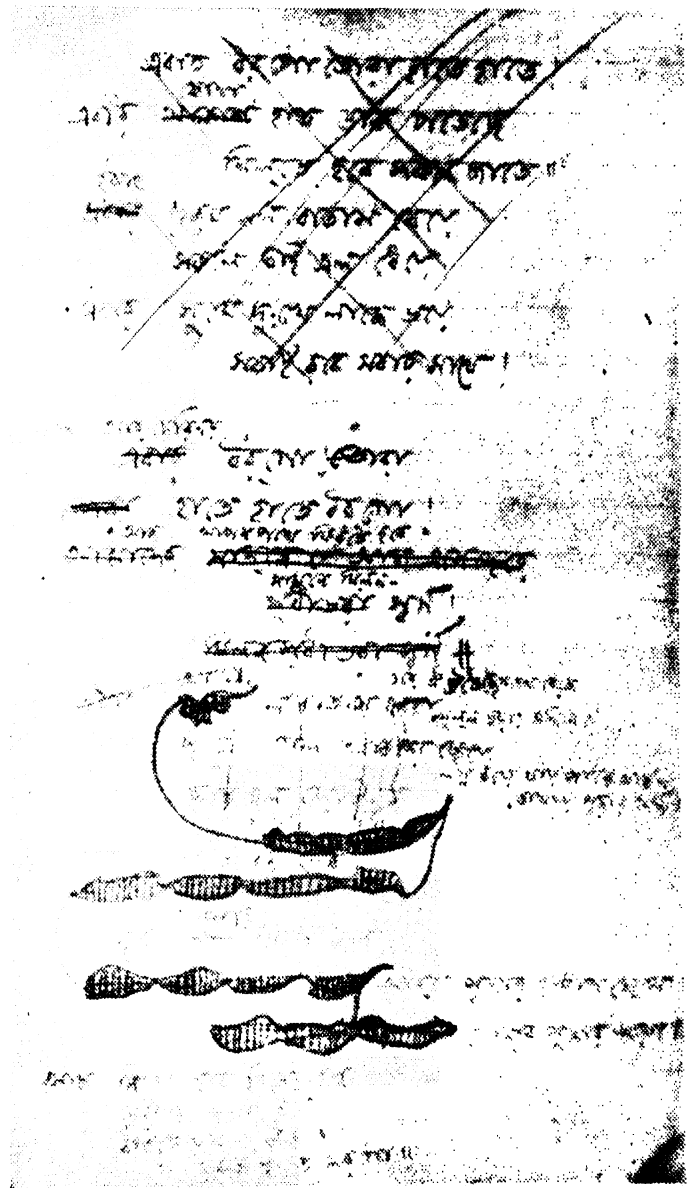
'খেয়া'র পাণ্ডুলিপি হইতে স্বদেশী সংগীত 'আর দেরি নয় ধর গো তোরা' রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত

শিক্ষা সম্বন্ধে যে পরে রহস্য করে বলতেন যে তিনি সকল বিদ্যালয়েরই "পলাতক ছাত্র" —বিষ্ণুচন্দ্রের সংগীত-শিক্ষার আসর সম্বন্ধে অন্তত সে কথা খাটে না। কারণ সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথের পলায়নের কথা শোনা যায় না।

বিষ্ণুচন্দ্রের এই শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে ছিল অভিনবত্ব। তিনি নিজে রাগসংগীতের একজন সত্যকার কলাকার ছিলেন। কিন্তু কলাবত-সুলভ অহমিকা কিম্বা গোঁড়ামি তাঁর ছিল না। সাধারণত ওস্তাদরা যে নিয়মে শিক্ষার্থীদের পাঠ দেন—প্রথমে সার্গম দিয়ে স্বরের অভ্যাস বা কণ্ঠসাধনা এবং পরে সরল সুরের হিন্দী গান—বিষ্ণুচন্দ্র তা করতেন না। তিনি গান শেখাতেন বাংলা ছড়া দিয়ে। ছোট ছোট বাংলা ছড়া সুরে গঠিত করে তিনি ছাত্রদের গান শেখাতেন। সংগীতের সাধনা যাতে ছোটদের কাছে নীরস বোধ না হয়, সুরের প্রতি যাতে তাদের আগ্রহ ও কৌতূহল জন্মায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে তিনি এই নতুন উপায় অবলম্বন করেন। নিতান্ত আট-পৌরে এবং গ্রাম্য ছড়ায় ভিন্ন ভিন্ন রাগের সুর আরোপ করে শিক্ষা দিতেন তিনি। শিক্ষার্থীরা সকৌতুকে এবং সহজে সংগীতের পাঠ নিত, সুরগুলি আনন্দের সংগে তাদের মনে বসত। এমনিভাবে বাংলা ছড়ার মধ্যে দিয়ে নানা সুরের সংগে প্রভাত-রবির প্রারিচয়ের সূত্রপাত।

এই অভিনব সংগীত-শিক্ষার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ পরে "ছেলেবেলা"য় লিখেছেন, "ছেলেমানুষি ছেলেদের মনের আপন জিনিস আর ঐ হালকা বাংলা ভাষা হিন্দী বুলির চেয়ে মনের মধ্যে সহজে জায়গা করে নেয়। ......শিশুদের মন-ভোলানো প্রথম সাহিত্য শেখানো মায়ের মুখের ছড়া দিয়ে, শিশুদের মন-ভোলানো গান-শেখানোর শুরু সেই ছড়ায়—এইটে আমাদের উপর দিয়ে পরখ করানো হয়েছিল।"

সেই সব সুরেলা ছড়ার অনেকগুলি বৃদ্ধ বয়সে কবির স্মৃতিতে জাগরূক ছিল। উক্ত পুস্তকেই তিনি তার কয়েকটি উল্লেখ করেছেন। যথা,

(১) এক যে ছিল বেদের মেয়ে
এল পাড়াতে
সাধের উল্কি পরাতে।
আবার উল্কি পরা যেমন তেমন
লাগিয়ে দিল ভেল্কি
ঠাকুরঝি,
উল্কির জ্বালাতে কত কেঁদেছি
ঠাকুরঝি।

(২) চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে
জোনাক জ্বলে বাতি,
মোগল পাঠান হদ্দ হল
ফার্সি পড়ে তাঁতি।*

---

* এই ছড়াটির প্রথম দু' লাইনের অন্য একটি পাঠ পাওয়া যায়। সম্প্রতি স্বর্গতা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ছড়াটির সেই পাঠ লেখককে জানিয়েছিলেন। মৃত্যুর চারদিন আগে এ বিষয়ে তিনি লেখককে প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ যে চিঠি লিখেছিলেন, তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল:—

ওঁ

শান্তিনিকেতন, ৮-৮-৬০

কল্যাণবরেষু,

আমার বৃদ্ধ বয়স ও দুর্বল শরীর সত্ত্বেও যিনি যা প্রশ্ন করেন তার সাধ্যমত উত্তর দেবার চেষ্টা করি, যদি জানা থাকে।......

আমি শুধু এইটুকু জানি, অর্থাৎ শুনেছি যে, ছেলেবেলায় তিনি (বিষ্ণুচন্দ্র) কবিগুরুকে গান শেখাতেন, এবং ছোট ছেলের উপযোগী গান—যথা:—

"বাঘ পালালো বেড়াল এল
শিকার করতে হাতী,

(৩) গণেশের মা,
কলাবউকে জ্বালা দিও না,
একটি মোচা ফল্‌লে পরে
কত হবে ছানা পোনা।
ইত্যাদি

সমসাময়িকদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিষ্ণুচন্দ্র যে সত্যকার গুণী গীতশিল্পী ছিলেন, সেকথা যাঁরা তাঁর গান শুনেছেন তাঁদের অনেকেই উল্লেখ করেছেন। তেমনি কয়েকজন বিশিষ্ট শ্রোতার লিখিত বিবরণ থেকে গায়ক বিষ্ণুচন্দ্রের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫) প্রশস্তিঃ "ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইলে পর, আমি মধ্যে মধ্যে লুকাইয়া তথায় যাইতাম। তখনও বিষ্ণু গান করিতেন। বিষ্ণুর এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার নাম কৃষ্ণ। রামমোহন রায়ের সমাজে বিষ্ণুর সহিত কৃষ্ণ একত্র গান করিতেন। গোলাম আব্বাস নামে একজন মুসলমান পাখোয়াজ বাজাইতেন। "বিগত বিশেষং গানটি রাজার অতি প্রিয় ছিল। বিষ্ণু ঐ সংগীতটি মধুরস্বরে গান করিতেন।"*

মহর্ষির দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩ খৃঃ) স্বরচিত "আমার বাল্যকথা"-য় বিষ্ণুচন্দ্রকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ঠকুর বাড়িতে যখন দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠান হত, তখনকার স্মৃতিকথার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বিজয়ার দিন প্রত্যুষে আমাদের গৃহগায়ক বিষ্ণু আগমনী ও বিদায়ের গান করতে আসতেন। যাত্রার গান যেমন প্রাকৃত, বিষ্ণুর তেমনি classical—সে কি চমৎকার ঠেক্‌তো, শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী মোহিত হয়ে যেত। বিষ্ণুর একটি আগমনী গান আমার এখনো মনে আছে—

আজু পরমানন্দ আনন্দ। মম গৃহে আলো।
যাও যাও সহচরী,
আন ডেকে পুরনারী
বরদারে বরণ করি বিলম্বে কি ফল।
এস উমা করি কোলে,
মাকে মা কি ভুলে ছিলে,
এতদিন পরে এলে বুঝি মনে ছিল।

মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল
ফার্সী পড়ে তাঁতি।"—

শুনে তাঁর উপর একটু ভক্তি হয়েছিল। তাছাড়া, অবশ্য এও শুনেছি যে, বিষ্ণু আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ছিলেন এবং তাঁর রচিত কতকগুলি গান কাঙালীচরণ সেনের ব্রহ্মসংগীতে স্বরলিপি গ্রন্থে ছাপা হয়েছে।...... শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী

* "বিগত বিশেষং" গানটি রামমোহনের রচিত। এই গান কেদারা রাগে, আড়া ঠেকা তালে গাওয়া হ'ত।

মা হয়ে মমতা মার
জান না গো উমা আমার
পাষাণ স্বভাব তোমার কিছু থাকা ভাল॥"

বিষ্ণুচন্দ্রের গানের রীতি বিষয়ে মহর্ষির পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫ খৃঃ) অনেকখানি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। নিজের জীবনস্মৃতিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন, "মহাত্মা রাম-মোহন রায় মহাশয়ের সময় হইতেই কৃষ্ণ ও বিষ্ণু দুই ভাই সমাজের একমাত্র গায়ক ছিলেন। কৃষ্ণকে আমরা কখনও দেখি নাই। আমাদের সময়ে বিষ্ণুই গান করিতেন। অন্যান্য ওস্তাদদের গানের চেয়ে বিষ্ণুর গানই সকলে বেশী পছন্দ করিত। বিষ্ণুর গানের একটা বিশেষত্ব ছিল। ওস্তাদেরা যেমন রাগিণীতে তান অলংকারেরই প্রাধান্য দেন, বিষ্ণু তেমন কিছু করতেন না। তিনি অল্প অল্প তান দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে রাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত না। ইহা ছাড়া, গানের

কথার যে একটা মূল্য আছে, সেটিও বিষ্ণুর গানে পূর্ণ মাত্রায় রক্ষিত হইত। সকলেই গানের সুর এবং গৎ দুইই সহজে বুঝিতে পারিত। বিষ্ণু ধ্রুপদ খেয়ালই বেশী গাহিতেন। বিষ্ণুর এই হিন্দী গান ভাঙ্গিয়াই সত্যেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম ব্রাহ্ম-সংগীত রচনা করেন।"

ঐ পুস্তকেরই অন্যত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, "হারমোনিয়াম প্রবর্তনের পূর্বে, সমাজে বিষ্ণুবাবুর গানের সঙ্গে মান্না নামে একজন সারেঙ্গী বাজাইত। এই মান্নার মত নিপুণ সারেঙ্গী কলিকাতায় তখন আর কেহই ছিল না। পরে হারমোনিয়াম চলিত হইলে, ক্রমে ক্রমে সারেঙ্গ উঠিয়া গেল।"...

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ও (১৮৬৮-১৯৪৬) তাঁর "আত্মকথা"য় বিষ্ণুচন্দ্রের সম্পর্কে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন. —"আমার যখন ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হয় তখন বিষ্ণু নামক একটি বৃদ্ধ ওস্তাদ প্রতিভা দেবীদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। আমার ধারণা, তিনি খুব ভাল গাইতেন। তাঁর গানে তানের বাহুল্য ছিল না। অথচ রাগ রাগিণী, সুর ও তালের উপর তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল।"...

"আত্মকথা"-র আর এক স্থানে চৌধুরী মহাশয় লিখেছেন, "হিন্দী গান বাংলায় প্রথম এঁরাই (অর্থাৎ বিষ্ণুচন্দ্র, গণেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি—লেখক) ভাঙেন।" হেমেন্দ্রনাথের কন্যা অভিজ্ঞার মুখে তাঁর শোনা একটি উৎকৃষ্ট গান— "ঠাঁরি রহো মেরে আঁখন আগে" (ছায়ানট) —তিনি "বিষ্ণুর গান" বলে উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ একাধিক স্থানে তাঁর সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। যথা, "তখন আমাদের বাড়িতে গানের চর্চার বিরাম ছিল না। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন সংগীতের আচার্য: হিন্দুস্থানী সংগীত-কলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন।......"

"বিষ্ণু ছিলেন ধ্রুপদী-গানের বিখ্যাত গায়ক। প্রত্যহ শুনেছি সকাল সন্ধ্যায় উৎসবে আমোদে উপাসনা-মন্দিরে তাঁর গান, ঘরে ঘরে আমার আত্মীয়েরা তম্বুরা কাঁধে নিয়ে তাঁর কাছে গানচর্চা করেছেন.........", ইত্যাদি।

এই উধৃত অংশগুলি থেকে, বিশেষত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী মহাশয়-দের অভিমত থেকে গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র সম্পর্কে ধারণা করা যায়। সাধারণত তাঁর গান ছিল ধ্রুপদাঙ্গের এবং তিনি উপাসনা জাতীয় সংগীতই বেশী গাইতেন। বাঁট, গমক প্রভৃতি অলঙ্করণ সহযোগে পূর্ণাঙ্গ আসরের ধ্রুপদ গান সম্ভবত তিনি করতেন না। মনে হয়, দুটি কারণে বিষ্ণুচন্দ্রের সংগীত জীবন প্রভাবিত হয়েছিল। বাংলা-দেশের সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য (সুরের সঙ্গে কাব্য ও ভাবেরও প্রাধান্য) এবং আদি ব্রাহ্ম সমাজের বাতাবরণ।
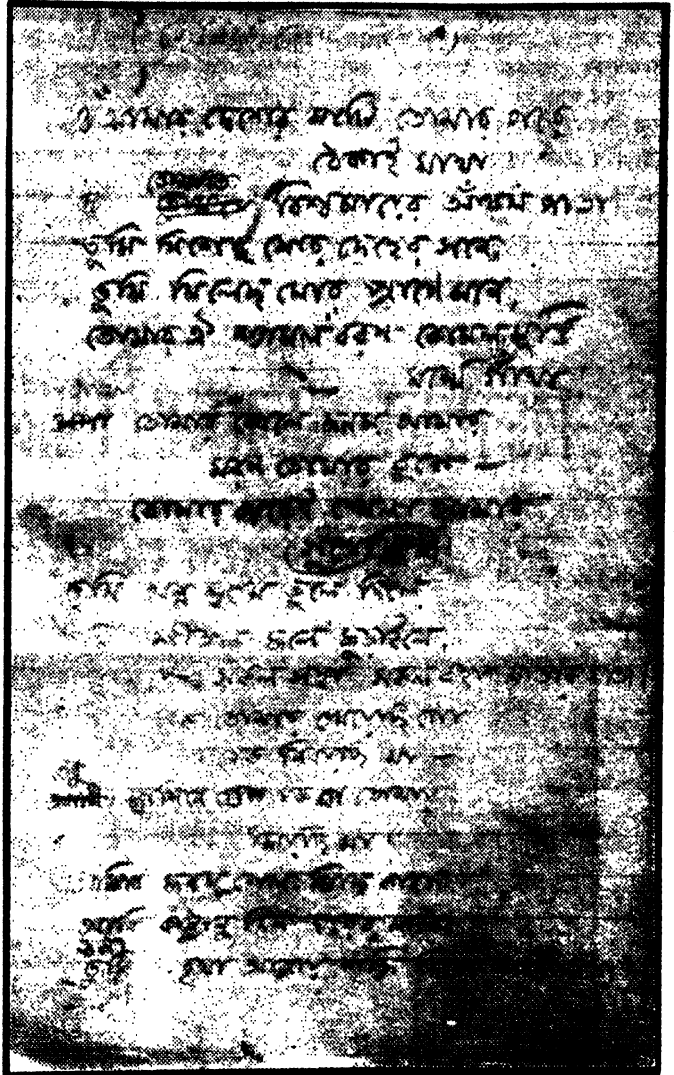
'খেয়া'র পাণ্ডুলিপি হইতে স্বদেশী সংগীত — রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত

আদি ব্রাহ্মসমাজ ও বিষ্ণুচন্দ্র

আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাগায়ক রূপেই বিষ্ণুচন্দ্রের প্রকৃষ্ট পরিচয় ছিল। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) সমাজ-মন্দিরে যে উপাসনা সংগীতের অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেছিলেন, বিষ্ণুচন্দ্র পরম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেই ধারাটি প্রবহমান রাখেন তাঁর জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত। একাধিক পশ্চিমা ওস্তাদের কাছে রীতিমত ধ্রুবপদ ও খেয়াল শিক্ষা করলেও, আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে আজীবন নিরবচ্ছিন্নভাবে যুক্ত বিষ্ণুচন্দ্র প্রধানত উপাসনাত্মক ধ্রুপদাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করতেন।

তাঁর সংগীত-প্রতিভা সেখানকার উপাসনা-মন্দিরকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত এবং বিকশিত হয়েছিল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তিনি যথার্থই একাত্ম ছিলেন। সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধু আত্মিক ছিল না, ছিল অতিশয় বাস্তবও। এ বিষয়ে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তা' এক বিস্ময়ের বস্তু। সেই অসাধারণ ব্যাপারটি হল : সুদীর্ঘ ৬৭ বছর ধরে বিষ্ণুচন্দ্র নিয়মিত ব্রাহ্ম সমাজের সাপ্তাহিক সভায় যোগদান করেন, একটি দিনের জন্যেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। একটি দিনও অনুপস্থিত হননি তিনি। একথা পরবর্তী-কালের আদি সমাজ সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্র-নাথ ঠাকুর স্বয়ং ঘোষণা করেছেন।

বিষ্ণুচন্দ্রকে ব্রাহ্মসমাজের গায়ক মাত্র

বল্‌লে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি ছিলেন সমাজের একজন বিশ্বস্ততম সেবক, রামমোহনের অন্যতম সহযোগী এবং (সংগীতের মধ্যে দিয়ে) তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ। এত দীর্ঘকাল ধরে এমন একনিষ্ঠতার সংগে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের সেবা আর কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ। সেজন্যে তাঁকে স্বার্থত্যাগও কম করতে হয়নি। এ বিষয়ে তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠার কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হয়েছিল একাধিকবার। কিন্তু প্রতিবারই তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত পরে উল্লেখ করা হবে।

ব্রাহ্ম সমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে অগস্ট্। রামমোহন রায় চিৎপুর রোডে কমললোচন বসুর বাড়ি (পরবর্তীকালে এটি হরনাথ মল্লিকের বাড়ি) ভাড়া নিয়ে সেখানে এই ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন। তারপর ১৮২৯-এর ৬ই জুন তারিখে সমাজের জমি কেনবার কবালা-পত্র হয় এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে

জানুয়ারী নবগৃহে প্রবেশ হয় (৫৫, আপার চিৎপুর রোডের বাড়ি)। বিষ্ণুচন্দ্র ১৮৩০-এ ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন এবং সে সময়ে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। তিনি এবং তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণপ্রসাদ গায়করূপে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়েছিলেন। রামমোহনের অন্যতম সুহৃদ কৃষ্ণমোহন মজুমদার সংগীতপ্রিয় ছিলেন এবং তাঁর সংগে উক্ত গায়ক ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিচয় ছিল। কৃষ্ণমোহন মজুমদারের সাহায্যে কৃষ্ণ ও বিষ্ণু রামমোহনের সংগে পরিচিত হন এবং তারই ফলে দুজনে ব্রাহ্ম সমাজের গায়করূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময় থেকে (১৮৩০) আরম্ভ করে ১৮৯৭ খৃঃ পর্যন্ত বিষ্ণু একাদিক্রমে ৬৭ বছর গায়করূপে ব্রাহ্ম সমাজের সংগে যুক্ত ছিলেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে তিনি সমাজের সাপ্তাহিক অধিবেশনে একটি দিনের জন্যেও অনুপস্থিত হননি। শারীরিক অসুস্থতা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন প্রকারের বাধাই তাঁকে সপ্তাহের সামাজিক উপাসনার দিনটিতে যোগদানে বিরত করতে পারেনি! যথারীতি উপস্থিত হয়ে উপাসনার অনুষ্ঠানগুলিকে তিনি মধুর কণ্ঠের ভাবোদ্দীপক সংগীতে সঞ্জীবিত করতেন। প্রসংগত উল্লেখ করা যায়, রামমোহন রায় যখন প্রথমে সমাজ স্থাপন করেছিলেন, তখন তাঁর নির্দেশে শনিবার সন্ধ্যায় সমাজ-মন্দিরে উপাসনা হত। পরে, তাঁর সহযোগীদের শনিবার সন্ধ্যায় যোগদান করতে অনিচ্ছার ফলে সাপ্তাহিক উপাসনার দিন স্থির হয় —বুধবার। দেবেন্দ্রনাথ যখন যোগদান করেন, তখন অধিবেশন বুধবারেই হত। ১৮২৮ খৃঃ যেদিন সমাজ প্রথম স্থাপিত হয়েছিল, সে দিনটিও ছিল বুধবার।

এই প্রসংগে ব্রাহ্মসমাজের আদি যুগের কথা আরো কিছু বলে নিতে হয়। রাজা রামমোহনের বিলাতযাত্রা (১৮৩০ খৃঃ) এবং ব্রিস্টলে তাঁর মৃত্যুর (১৮৩৩ খৃঃ) পর থেকে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের সময় (১৮৪২ খৃঃ) পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ কোনক্রমে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এই সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪—১৮৪৬ খৃঃ) সমাজকে প্রতি মাসে অর্থসাহায্য করতেন—প্রথমে ৬০ টাকা এবং পরে ৮০ টাকা করে। এই সাহায্যের সংগে (পরে আচার্য) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের (১৭৮৬—১৮৪৫ খৃঃ) বেদান্তজ্ঞান ও সমাজের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা যুক্ত হয়ে রামমোহনের মৃত্যুর পর থেকে দেবেন্দ্রনাথের সমাজে যোগদান পর্যন্ত ন' বছর ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করেছিল।*

বিষ্ণুর সংগীতও যে এই বিষয়ে অনেকাংশে সহায়ক হয়েছিল তা ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উদ্ধৃতি থেকে পরে জানা যাবে।

দ্বারকানাথের (১৮৪২ খৃঃ প্রথমভাগে) প্রথমবার বিলাতযাত্রার পরই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন (আনুষ্ঠানিকভাবে এবং শপথ গ্রহণ করে তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ সংগীদের সংগে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন ১৮৪৩ খৃঃ ২১শে ডিসেম্বর, ৭ই পৌষ অর্থাৎ সমাজে যোগদান করবার পরের বছরে)। যেদিন দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেবার সংকল্প করে সমাজের অধিবেশন দেখতে যান, সেই (১৮৪২ খৃঃ) সন্ধ্যার বর্ণনা প্রসংগে তিনি পরে লিখেছিলেন, "বেদীর সম্মুখে কৃষ্ণ ও বিষ্ণু এই দুই ভাই মিলিয়া একস্বরে ব্রহ্ম-সংগীত গান করিলেন। রাত্রি নটার সময় সভা ভংগ হইল।"(১)

তারপর ১৮৪৯-এ (সমাজ-গৃহের ত্রিতল তখন সবেমাত্র নির্মিত হয়েছে) যে সাম্বৎসরিক (১১ই মাঘ) অধিবেশন হয়, তার বিবরণের মধ্যেও দেবেন্দ্রনাথ বিষ্ণুচন্দ্রের

---

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট: সম্পাদকীয় মন্তব্য, ৩৫৫ পৃঃ। (সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত)।

(১) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের "আত্মজীবনী"। ৭১ পৃষ্ঠা।

সংগীতের উল্লেখ করেছেন। বিষ্ণুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণের তার আগে মৃত্যু হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সকলেরি মুখে নূতন উৎসাহ ও নূতন অনুরাগ। সকলেই আনন্দে পূর্ণ। বিষ্ণু সংগীতমণ্ড হইতে গান ধরিলেন, 'পরিপূর্ণমানন্দং'।"(২)

এমনিভাবে দেখা যায়, আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাসভার কথা যেখানেই আছে, সেখানেই বিষ্ণুচন্দ্রের নাম ও সংগীতের প্রসংগ উল্লিখিত। এ বিষয়ে অধিক দৃষ্টান্ত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

আগেই বলা হয়েছে, বিষ্ণুচন্দ্র যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রথম যোগদান করেন, তখন তিনি এগারো বছর বয়সের বালক মাত্র এবং তিনি তখন গায়করূপেই সেখানে নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুতরাং অনুমান করা অসংগত হবে না যে, সেই বয়সেই তিনি সংগীত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। নচেৎ রাম-মোহন রায়—যিনি স্বয়ং সংগীতবেত্তা ছিলেন—তাঁকে সমাজের গায়ক নিযুক্ত করতেন না। বয়সের সংগে সংগে বালক বিষ্ণুর সংগীতশিক্ষা ও সংগীতচর্চা যত অগ্রসর হতে থাকে, তাঁর সংগীত-প্রতিভাও উত্তরোত্তর বিকশিত হয়। তিনি যে অতিশয় সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন, সে বিষয়ে যথার্থ রসজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত যথাস্থানে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

বিষ্ণুচন্দ্রের সংগীত কতখানি হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক এবং ব্রাহ্মসমাজের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ আকর্ষণীয় ছিল, সে সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রশস্তি এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। পরবর্তীকালের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদক এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখে-ছেন, "বিষ্ণুচন্দ্রেরই সাহায্যে আদি সমাজের সংগীত ধর্মসাধনের অংগস্বরূপে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বলিতে গেলে বিষ্ণুর সংগীতেরই কারণে আদি সমাজের নাম আজ দিগন্ত বিঘোষিত। আমরা বাল্য-কালাবধি শুনিয়া আসিতেছি যে গানই হইল আদি সমাজের প্রধান আকর্ষণ। একা বিষ্ণুই বলিতে গেলে আদি সমাজ প্রকাশিত

(২) ঐ পুস্তক, ১৮৭ পৃষ্ঠা। এই সংস্কৃত ভাষার গানটি দেবেন্দ্রনাথেরই রচিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত "ব্রহ্মসংগীত" সংকলন গ্রন্থ থেকে গানটি উদ্ধৃত করা হ'ল:—

দেশ—তেওট।

পরিপূর্ণমানন্দং
অংগবিহীনং স্মর জগন্নিধানং।
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোবাচং,
বাগতীতং প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যং॥

সংগীত-পুস্তকের ষষ্ঠ ভাগ পর্যন্ত প্রায় সকল গানেরই সুর বসাইয়া দিয়াছেন। এক কথায়, বিষ্ণুচন্দ্রের জীবন এবং ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস চিরসম্বন্ধ থাকিবে। বিষ্ণুকে ছাড়িলে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।"(৩)

তাঁর গভীর ভাবের সংগে এবং বিশুদ্ধ তাললয়ে পরিবেশিত সংগীত ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠালাভে ও জনপ্রিয়তা অর্জনে প্রভূত সহায়তা করেছিল—একথার মধ্যে কোন অতিশয়োক্তি নেই। সংগীতের মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মসমাজের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। সেজন্য তিনি কতখানি আর্থিক ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করেন, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

রামমোহনের বিলাতযাত্রার পর যখন থেকে দ্বারকানাথ ব্রাহ্মসমাজকে প্রতি মাসে ৮০ টাকা করে দিতেন, তার থেকে বিষ্ণুচন্দ্রকে প্রথমে ৪০ টাকা মাসিক বেতনরূপে দেওয়া হত। পরে সেই বেতন কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১০ টাকায়। বিষ্ণু দরিদ্র ছিলেন এবং অন্যত্র গায়করূপে নিযুক্ত হয়ে বহুগুণ উপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু তবু তিনি বেতন হ্রাসের পরেও ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করবার কথা কোনদিন মনে স্থান দেননি। সমাজের প্রতি যেমন ছিল তাঁর নিষ্ঠা, তেমনি তিনি রামমোহন, দ্বারকানাথ ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রতিও শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। সেজন্যে এই আর্থিক ক্ষতিস্বীকার করতে তিনি পরাঙ্মুখ হননি। শেষ জীবনে তাঁর বেতন বৃদ্ধি পেয়ে ২০ টাকা হয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত বেতনই তাঁর প্রতিভার তুলনায় অতি তুচ্ছ ছিল, একথা বলাই বাহুল্য।

তখনকার কলকাতার বাঙালী ধনী সমাজে গায়করূপে তাঁর অসামান্য জনপ্রিয়তা ও প্রতিপত্তি ছিল। কয়েক বছর ধরে তিনি দুর্গাপূজার সময়েই ২।৩ হাজার টাকা উপার্জন করতেন। বিজয়া দশমী তিথিতে আগমনী ও বিজয়ার গান গেয়ে সেযুগেও একদিনে এতখানি উপার্জন করা সম্ভব হত তাঁর পক্ষে। কারণ, গানের ভাবে ও সুরে শ্রোতাদের তিনি মোহিত করতে পারতেন। শুধু বিজয়া উপলক্ষে নয়, হোলী উৎসবে এবং বিবাহ উৎসবেও তিনি অনেক উপার্জন করতেন প্রতি বছর। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে তিনি মাসিক ১০ টাকা বা ২০ টাকা বেতনেই সন্তুষ্ট ছিলেন। এত অল্প বেতনের জন্যে সমাজও ত্যাগ করেন নি কিম্বা বেতন-বৃদ্ধির জন্যেও দাবী করেন নি।

তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, অনেক ধনী-গৃহে সংগীত শিক্ষাদান করে বহু অর্থ উপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু একমাত্র দেবেন্দ্র-ভবন ভিন্ন কোথাও তিনি সংগীত-শিক্ষা দিতে যেতেন না। পাছে সমাজে পেঁছতে দেরি হয়ে যায়, পাছে সমাজের কোন অসুবিধা ঘটে, সেকথা ভেবে তিনি অন্যত্র সংগীত-শিক্ষকের কাজ কখনো করতেন না। নীরবে এতখানি স্বার্থত্যাগ করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের জন্যে! ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার যোগ্য।

তাঁর সুদীর্ঘকালের সংস্রবের মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে কত পরিবর্তন ঘটে! কত আদর্শের সংঘাত, কত মতামতের পার্থক্য, বিভেদ ও নতুন সমাজের পত্তন! সমাজের প্রথম যুগের সহযোগী ব্যক্তিরা মহাকালের কবলে একে একে পতিত হলেন। দ্বারকানাথ গত হলেন, আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ গত হলেন, আবাল্য সংগী গায়ক-ভ্রাতা কৃষ্ণপ্রসাদও অকালে পরলোকে গেলেন—কিন্তু সমাজে বিষ্ণুর সম্পর্ক কোন-দিন শিথিল হয়নি, তাঁর নিয়মিত যোগদানের কোন ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। তিনি একা

(৩) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত, ১৮৩৮ শকের ফাল্গুন সংখ্যা।

ব্রাহ্মসমাজের গায়কের কাজ করে যেতে লাগলেন। এমনি অবিচলিতভাবে তিনি তাঁর ৭৮ বছর বয়স পর্যন্ত সমাজকে সেবা করে গেছেন। তাঁর প্রসংগে মহর্ষি অন্য এক স্থানে বলেছেন, "তখনকার লোকের মধ্যে আর কাহারও যোগ দেখা যায় না। কেবল তখনো যে বিষ্ণু গান করিত, এখনও সেই বিষ্ণুই আছে। ইহার অভাব হইলে কে আর এমন ব্রহ্মসংগীত গান করিবে?..."(৪)

বিষ্ণুচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে গৌরবোজ্জ্বল গায়কজীবন ১৮৯৭ খৃঃ পর্যন্ত একাদিক্রমে চলেছিল। তারপর ঐ সনে তিনি সমাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ৭৮ বছর। বার্ধক্য এবং জরার পীড়নে আজীবন প্রিয় সমাজ থেকে এবং সংগীত-জগৎ থেকেও বিদায় নেন। এবং আবেদনের ফলে সমাজ থেকে তাঁর মাসিক দশ টাকা বৃত্তির (পেন্‌সন্‌) ব্যবস্থা হয়।

তিনি যখন সমাজের গায়ক পদ থেকে অবসর নেন, তখন আদি সমাজের জনৈক ব্যক্তি লিখেছিলেন, "অতঃপর ব্রাহ্মেরা এইরূপ মধুর কণ্ঠে ব্রাহ্মসংগীত আর শুনিতে পাইবেন কিনা সন্দেহ। যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উপাসনায় যোগ দিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় এমন কেহই নাই বিষ্ণুর সংগীতে যাঁহার অশ্রুপাত না হইয়াছে। বহুদিনের পর ব্রাহ্মসমাজে গায়কের একটি অভাব উপস্থিত হইল। পূরণ হইবে কি না কে জানে।"(৫)

এ প্রসংগে ধ্রুপদাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে আদি ব্রাহ্মসমাজের অবদানের কথা স্মরণীয়। আধুনিককালে সংঘ উপাসনার প্রবর্তক রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের কার্যধারার সংগে সংগীতকে অংগাংগীভাবে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টান্তে আদি সমাজে ধ্রুপদাংগ গানের প্রচলন হয় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় সেই ধারাটি অব্যাহত ছিল। বিষ্ণু চক্রবর্তী ভিন্ন যদু ভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি ভারত প্রসিদ্ধ গুণী এক এক সময় আদি সমাজের গায়ক ছিলেন। সুতরাং সংগীতের মান সেখানে কতখানি উন্নত ছিল, তা ধারণা করা যায়। সেই সংগে, হিন্দী ভাষার ধ্রুপদ ভেংগে বাংলা গান রচনার সার্থক প্রয়াসের কথাও ধর্তব্য। আদি সমাজের নিয়মিত সামাজিক প্রয়োজনে হিন্দী ধ্রুপদ গানের আদর্শে ও অনুকরণে বাংলার ধ্রুপদাংগের গান রচনার সার্থক প্রয়াস দেখা যায়। প্রথমে রামমোহন এবং পরে আরো কয়েকজন বাংলা গান রচয়িতার দৃষ্টান্তে ঠাকুর পরিবারের দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং শেষ ও সর্বোত্তম রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই শ্রেণীর বাংলা গানের শাখা নব নব সৃষ্টিতে পুষ্পিত হ'তে থাকে। নবীন বাংলার শিক্ষিত সমাজের একাংশে রাগাত্মক সংগীতের আদর বৃদ্ধি পায়। অবশ্য হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের আদর্শে বাংলায় গান রচনা যে প্রথমে একমাত্র আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে ঘটেছিল তা নয়। আদি সমাজ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকে এবং সমসাময়িককালে সমাজের ভাবমণ্ডলের বাইরে কয়েকজন উৎকৃষ্ট ধ্রুপদাংগের বাংলা গান রচয়িতা ছিলেন। যথা, চুপী গ্রামের (দেওয়ান) রঘুনাথ রায় (১৭৫০—১৮৩৬), বিষ্ণুপুরের রামশংকর ভট্টাচার্য (১৭৬১—১৮৫৩), চন্দ্রকোণার রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় (এঁর রচিত গানের বই "মূল সংগীতাদর্শ" ১৮৬২ খৃঃ প্রকাশিত হয়), কলকাতা কাঁসারিপাড়ার রাধামোহন সেন (জন্মঃ আঠারো শতকের তৃতীয় পাদে এবং মৃত্যুঃ ১৮৪০-৪৪এর মধ্যে) প্রভৃতি। তবে এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানগতভাবে আদি সমাজের উদ্যোগে যা' কাজ হয়েছিল, তাকে সংগীতক্ষেত্রে আদি সমাজের মহৎ অবদান বলা যায়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে উপাসনার জন্যে শত শত বাংলা ধ্রুপদাংগের গান রচিত ও গীত হয়েছে আদি সমাজে। সংগীতই ছিল তার প্রাণ—একথা অতিশয়োক্তি নয়।

সুরকার ও গীতিকার

বিষ্ণুচন্দ্র শুধু অসাধারণ গায়ক ছিলেন না একজন উৎকৃষ্ট সুরকারও ছিলেন। আদি সমাজে সুদীর্ঘকাল ধরে যত গান গীত হয়েছিল তিনি তার মধ্যে বহু গানে সুরসংযোজনা করেছিলেন। সে সমস্ত সুরই বিশুদ্ধ রাগ সংগীতের। ব্রাহ্মসমাজে গায়করূপে যোগ দেবার পর কয়েক বছর তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণের সংগে গান গাইতেন। কৃষ্ণ তাঁর অন্যতম সংগীত-শিক্ষকও ছিলেন। এই সমস্ত কথা এবং আদি সমাজের প্রথম কয়েক বছরে (দেবেন্দ্রনাথ যোগ দেবার আগে পর্যন্ত) বিষ্ণুর বয়সের কথা বিবেচনা করে, মনে হয়, যে প্রথম জীবনে তিনি সম্ভবত গানের সুর দিতেন না; কৃষ্ণের সহযোগী গায়করূপেই গান করতেন। কৃষ্ণের মৃত্যু হয় ১৮৪২ থেকে ১৮৪৭ খৃঃ মধ্যে কোন সময়ে। অর্থাৎ ভ্রাতার মৃত্যুর সময়ে বিষ্ণুর বয়স সাতাশ আঠাশের বেশি ছিল

---

(৪) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : "ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত", ১৫ পৃষ্ঠা।

(৫) শ্রীশান্তিদেব ঘোষ প্রণীত "রবীন্দ্র সংগীত" (২য় সংস্করণ, ৪১ পৃষ্ঠা) থেকে উদ্ধৃত।

না। সেই বয়স থেকে আরম্ভ করে পঞ্চাশ বছর ধরে বিষ্ণু আদি সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় একক গান গেয়েছেন। এই সমস্ত গানের বেশির ভাগই যে তাঁর দেওয়া সুরে গঠিত—একথা অনুমান করলে ভুল হবে না। কারণ, গানগুলি প্রায় সবই বাংলায় রচনা এবং প্রধানত উপাসনা বা সমাজের কোন বিশেষ উৎসব উপলক্ষ্যে ও হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের আদর্শে রচিত। বিষ্ণুচন্দ্র নিজে রাগসংগীতে বিশেষভাবে শিক্ষিত ও প্রাজ্ঞ ছিলেন এবং গানগুলিতে বিশুদ্ধ সুর ও তাল যোজনা করতেন।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একটি উদ্ধৃতি থেকে আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, আদি সমাজ প্রকাশিত ব্রাহ্মসংগীত সংকলনগুলির মধ্যে প্রথম ছ' ভাগে প্রকাশিত গানের প্রায় সবগুলিতেই বিষ্ণুচন্দ্র সুর দিয়েছিলেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ বারোটি ভাগে বা খণ্ডে ব্রহ্মসংগীতের সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করে। এই বারো ভাগে গানের সংখ্যা হল প্রায় পাঁচ শ'। তার মধ্যে প্রথম ছ' ভাগে গান আছে ২৫৮টি। সুতরাং প্রায় আড়াই শ' গানে বিষ্ণুচন্দ্র সুর সংযোজনা করেছিলেন। তা' ভিন্ন আরো অনেক আগেই তিনি সুর দিয়েছিলেন, কারণ সমাজের গাওয়া সমস্ত গান গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি।

আদি সমাজের অনুষ্ঠানগুলিতে বিষ্ণুচন্দ্র কত গান করেছিলেন? তার হিসাব আমাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে এবং তার তুলনা দুর্লভ মনে হয়। সাপ্তাহিক উপাসনার শেষে একটি করে গান গাওয়া হত। সুতরাং তিনি প্রায় আড়াই হাজার গান উপাসনা সভাতেই গেয়েছিলেন। তাঁর ভ্রাতার মৃত্যুর পরে তিনি এককভাবে পঞ্চাশ বছর ধরে এই সমস্ত গান সমাজে সংগীত পরিবেশন করেন। কৃষ্ণ যতদিন জীবিত ছিলেন, বিষ্ণু তাঁর সহযোগীরূপে গান করতেন এবং সেগুলি যোগ করলে আরো সাত-আটশ' গান হয়। তাহ'লে অন্তত তিন হাজার গান তিনি গেয়ে ছিলেন আদি সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে! অবশ্য এই গানগুলির মধ্যে কোন কোনটি একাধিকবার গাওয়া হতে পারে। অন্যত্র বলা হয়েছে, গানগুলির অধিকাংশই হিন্দুস্থানী ধ্রুপদের আদর্শে বাংলায় রচিত ধ্রুপদাঙ্গের গান।......

বিষ্ণুচন্দ্রের বাংলায় গান রচনা সম্পর্কে এখানে কিছু আলোচনা করার আছে। প্রমথ চৌধুরী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী প্রমুখ কেউ কেউ মনে করতেন যে, বিষ্ণুচন্দ্র বাংলা গান রচয়িতা ছিলেন। পূর্বে উদ্ধৃত পত্রটিতে চৌধুরাণী মহোদয়া লিখেছিলেন যে, বিষ্ণুর রচিত গান কাঙ্গালীচরণ সেনের "ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি" গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু এই তথ্যটি সঠিক নয়। কাঙ্গালীচরণ সেন রচিত উক্ত স্বরলিপি পুস্তকে যাঁর (দু'টি) গান আছে, তিনি হলেন বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়—বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী নন। বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় ভিন্ন ব্যক্তি। এঁর জন্ম হয় ১৮৩২ খৃঃ এবং মৃত্যু ১৯০১। ইনি 'গীতমালা', 'কুলকন্যার দ্বিরাগমন' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। চট্টোপাধ্যায় বিষ্ণুরাম বহু ধ্রুপদাঙ্গের বাংলা গান রচনা করেছিলেন এবং তাঁর রচিত অনেক গান আদি সমাজের উপাসনা সভায় ও অন্যত্র গাওয়া হত। বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় অতি উৎকৃষ্ট গান রচয়িতা ছিলেন এবং তাঁর রচিত কয়েকটি গান খুবই প্রসিদ্ধি লাভ

করে। যেমন, 'অচল ঘন গহন, গুণ গাও তাঁহারি' (বাহার, চৌতাল), 'আমার মন ভুলালে যে, কোথা আছে সে' (ভৈরবী, পোস্ত), 'যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা' (বিভাস, একতালা), 'তুমি একজন হৃদয়ের ধন' (বিভাস, কাওয়ালি), 'জয় জগজীবন জগতপাতা হে' (বেহাগ, ঝাঁপতাল), 'বিফল জনম বিফল জীবন' (সিন্ধু, একতালা—এই গানটি স্বনামধন্য গায়ক শ্রীঅঘোরনাথ চক্রবর্তীর রেকর্ড আছে) ইত্যাদি। এই সমস্ত গান বিষ্ণু চক্রবর্তীর নয়, চট্টোপাধ্যায়ের। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী মহাশয়ও তাঁর 'আত্মকথায়' 'অচল ঘন গহন' গানটি ভ্রমক্রমে বিষ্ণু চক্রবর্তীর বলে উল্লেখ করেছেন। মনে হয়, দুজনেরই নাম বিষ্ণু হওয়ায় মুখে মুখে এবং শ্রুতি-স্মৃতিতে চক্রবর্তী এবং চট্টোপাধ্যায় একাকারে মিশে গেছেন। উক্ত গানগুলি যে বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের সেকথা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (নববিধান) প্রকাশিত 'ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তন', সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত 'ব্রহ্মসংগীত' প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত 'ব্রহ্মসংগীত', দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত "বাঙ্গালীর গান" প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ধর্মসংগীত' পুস্তকে ঐ গানগুলির রচয়িতার নাম দেওয়া আছে শুধু 'বিষ্ণু।' বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় রচিত গানের বইতেও ঐ সমস্ত গান মুদ্রিত আছে। আমরা যতদূর জেনেছি, প্রকাশিত কোন সংগীত-গ্রন্থে বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর নামাঙ্কিত গান মুদ্রিত হয়নি। সেজন্যে, নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে তিনি গান রচনা করতেন কি না, কিংবা তাঁর গান মুদ্রিত হয়েছিল কি না। এ-বিষয়ে জানবার একটি ভাল উপায় ছিল—আদি সমাজ প্রকাশিত 'ব্রহ্মসংগীত' নামে গানের সংকলন পুস্তকটি। এটিই ব্রহ্মসংগীতের আদি সংকলন। আদি সমাজে গীত গানগুলি থেকে সংগ্রহ করে বারোটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল আর তার প্রায় অর্ধেক গানের সুর বিষ্ণুচন্দ্রই দিয়েছিলেন, একথা আমরা আগেই জেনেছি। বিষ্ণুচন্দ্র বাংলা গান রচনা করে থাকলে তা আদি সমাজের প্রকাশিত এই গ্রন্থেই থাকা সম্ভব। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কোন গানের সঙ্গে এই বইতে রচয়িতার নাম মুদ্রিত হয়নি! সুতরাং বিষ্ণুচন্দ্রের লেখা বাংলা ধ্রুপদাঙ্গ গান সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রায় অসম্ভব দাঁড়িয়েছে।

শিষ্যবৃন্দ

বিষ্ণুচন্দ্র অন্যান্য ওস্তাদদের মতন সংগীতকে পেশা করেননি এবং ঠাকুর পরিবারের বাইরে সংগীতশিক্ষা দিতেন না বলে তাঁর মতন গুণীর কোন বৃহৎ শিষ্য-সম্প্রদায় গঠিত হয়নি। তাঁর শিষ্যেরা প্রায় সকলেই ছিলেন ঠাকুরবাড়ীর। তিনি পারিবারিক সংগীতশিক্ষক ছিলেন বলে বাড়ীর যাঁরা সংগীতচর্চা করতেন, তাঁদের অনেকেই অল্পবিস্তর তাঁর কাছে শিক্ষা করেছিলেন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতাদের মধ্যে হেমেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের সংগীতশিক্ষার অধিক আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।(৬)

ঠাকুরবাড়ীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাঁর কালে সব চেয়ে ভালভাবে শিখেছিলেন এবং তাঁর সব চেয়ে প্রিয় ছিলেন প্রতিভা দেবী (১৮৬৫-১৯২২) ও হিতেন্দ্রনাথ। হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রতিভা দেবী পরে সে বিষয়ে লিখেছিলেন, "সে দিনে বিষ্ণু চক্রবর্তী বাড়ীর গায়ক। তাঁহার নিকট ছোট খেয়াল শিখিতাম।......বাড়ীতে তখন 'বিদ্বজ্জন সমাগম' হইত। সৌরীন্দ্রমোহন (রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—লেখক) ইত্যাদি আসিতেন। সে সময় আমি ও ভ্রাতা হিতেন্দ্র উভয়েই সকলের সামনে গাইতে বাধ্য হইতাম।"(৭)

(৬) "রবিবার সকালে আমাকে বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতে হইত।"—জীবনস্মৃতি।

(৭) শান্তিদেব ঘোষ প্রণীত "রবীন্দ্রসংগীত" থেকে উধৃত।

প্রসঙ্গতত উল্লেখ করা যায়, 'বিদ্বজ্জন সমাগম' ঠাকুর বাড়ীতে ১৮৭৪ খৃঃ প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। এই 'বিদ্বজ্জন সমাজ'-এর উৎসবের বিবরণীতে দেখা যায়, "হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্টম বর্ষীয়া কন্যা ও তদ্‌পেক্ষা অল্পবয়স্ক আর একটি বালক (হিতেন্দ্রনাথ —লেখক)......৩।৪টি হিন্দী গান গাইলেন। সে গান হারমোনিয়ম, বেহালা ও তবলার সংগে সঙ্গত হইয়াছিল। তাহার পর প্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুবাবুর একটি গানে ঐ বালকটি তবলা সঙ্গত করিল।"

রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি প্রতিভা"য় (প্রথম অভিনয় ১৮৮১ খৃঃ) সরস্বতীর অংশ গ্রহণ করেও প্রতিভা দেবী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি স্বামী স্যার আশুতোষ চৌধুরীর সহায়তায় (১৯১১ খৃঃ) 'সঙ্গীত সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করে এবং (১৯১৩ খৃঃ) ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর সহযোগে 'আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা' প্রতিষ্ঠা করে আজীবন আপনার রাগসঙ্গীত প্রীতির পরিচয় দিয়ে গেছেন। 'আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা'য় প্রতিভাদেবী বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে শেখা কয়েকটি উৎকৃষ্ট গানের স্বরলিপি রচনা করে প্রকাশ করেছিলেন। যেমন, 'লঙ্গর তোর কজন চুওয়া' (ভূপালী—কাওয়ালী), 'উমড ঘর ঘুমড বরষ বুদরিয়া চলতপুরে বাই' (মিয়া-কি-মল্লার, কাওয়ালী), 'দো না মেলে শোভা অন্তর দেখ—গৌড়-মল্লার, চৌতাল ইত্যাদি।

বিষ্ণুচন্দ্রের আর এক শিষ্য ছিলেন শ্যামসুন্দর মিশ্র। ইনি অবশ্য একমাত্র বিষ্ণুর কাছেই সঙ্গীতশিক্ষা করেননি। শ্যামসুন্দর প্রথমে ছিলেন বেতিয়া ঘরাণার প্রসিদ্ধ গায়ক শিবনারায়ণ মিশ্রের এক প্রধান শিষ্য। উনিশ শতকের শেষ ভাগে শ্যামসুন্দর মিশ্র ধ্রুপদ গায়করূপে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি হিন্দুস্থানী হলেও কলকাতাতেই তাঁর জন্ম (১৮৫৪) এবং আমৃত্যু (১৯২২) এখানকার সুখলাল জহুরী লেনে তাঁর নিজের বাড়ীতে বাস করতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথায় তিনি বাংলা ধ্রুপদাঙ্গের গান শিখতে আরম্ভ করেন বিষ্ণুচন্দ্রের কাছে। বিষ্ণুচন্দ্র, যদু ভট্ট এবং রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর পর শ্যামসুন্দর ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনেও (অর্থাৎ গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্রনাথের বাড়ী) শ্যামসুন্দর গায়ক ছিলেন। 'সঙ্গীত-সঙ্ঘে'ও তিনি বাংলা গান শেখাতেন। আর একটি কারণে শ্যামসুন্দর নাম স্মরণযোগ্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক বিশেষ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামসুন্দরের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় রূপান্তরকরণের জন্যে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছ থেকে যেমন হিন্দী রাগসঙ্গীত নিতেন, তেমনি শ্যামসুন্দর মিশ্রের কাছেও নিয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

বিষ্ণুচন্দ্রের শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র শ্যামসুন্দরই ঠাকুর পরিবারের ছিলেন না। তবে তিনি ঠাকুরবাড়ীর পরিমণ্ডলের অন্তর্গত, বলা চলে। অনেক ধনী পরিবারে শিষ্য করবার সুযোগ থাকলেও বিষ্ণুচন্দ্র অন্য কোথাও সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন না, ব্রাহ্মসমাজের কাজে অসুবিধা ঘটবার আশঙ্কায়।

জীবন-কথা

১৮১৯ খৃঃ রাণাঘাট অঞ্চলে বিষ্ণুচন্দ্রের জন্ম হয়। জন্মস্থান—'আন্দুলে কায়েত-

পাড়া' গ্রাম। পিতা কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী শাস্ত্রচর্চায় জীবিকানির্বাহ করতেন।

কালীপ্রসাদের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন কনৌজী ব্রাহ্মণ। আনুমানিক সতের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কান্যকুব্জ থেকে তাঁরা বাংলা দেশে আসেন। বাংলায় তাঁদের বসতি ছিল প্রথমে কাঁকুড়গাছা গ্রামে। পরে সেখানকার বাস উঠিয়ে, আরো কয়েক জায়গা ঘুরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শিবনিবাসে উপস্থিত হন। বিষ্ণুচন্দ্রের জন্মের অনেক আগে থেকেই তাঁদের বাস ছিল 'আন্দুলে কায়েৎ-পাড়া' গ্রামে।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বলে নদীয়ার রাজসভায় কালীপ্রসাদের সম্মান ছিল, যাতায়াত ত ছিলই। তাঁর পুত্রদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল নদীয়া দরবারের।

কালীপ্রসাদের পাঁচ পুত্র। জ্যেষ্ঠ নদীয়ারাজের সৈন্য বিভাগে কাজ করতেন। অন্য চার পুত্রের মধ্যে তিনজন সংগীতে আকৃষ্ট হয়ে সংগীতচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা হলেন—কৃষ্ণপ্রসাদ, দয়ানাথ এবং বিষ্ণুচন্দ্র। তিন ভ্রাতাই সংগীতের প্রেরণা লাভ করেছিলেন নদীয়া রাজদরবার থেকে।

নদীয়া দরবারে নানাপ্রকার কলাবিদ্যার সমাদরও সম্যক চর্চা ছিল। সংগীত তার মধ্যে একটি প্রধান বিদ্যা। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের সেই ঐতিহ্যের ধারা তখনো একেবারে লুপ্ত হয়নি দরবার থেকে। সেখানে পশ্চিমের সংগীতগুণীদের আগমন বা অবস্থান তখনো ঘটত। দরবারের সেই উচ্চমানের সাঙ্গীতিক আবহাওয়ায় বিষ্ণুচন্দ্র এবং তাঁর দুই ভ্রাতা প্রেরণা লাভ করেছিলেন। শুধু প্রেরণাই বা কেন? সংগীতশিক্ষার অসাধারণ সুযোগও। নদীয়া দরবারের সাহায্য না পেলে এত বড় কলাবতদের কাছে এবং রীতিমতভাবে সংগীতচর্চা করা হয়ত তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না।

তৎকালীন নদীয়ারাজ শ্রীশচন্দ্রের সভাতেও কৃতবিদ্য সংগীতজ্ঞগণ বিদ্যমান থাকতেন। শুধু বাংলার নয়, পশ্চিমের একাধিক সংগীতগুণী নিযুক্ত ছিলেন তাঁর সভায়। তার ফলে বিষ্ণুচন্দ্র এবং তাঁর ভ্রাতারা সংগীতশিক্ষার সুবর্ণসুযোগ লাভ করেন। এমনিভাবে তাঁরা পেয়েছিলেন—প্রসিদ্ধ কলাবত হসনু খাঁ, তাঁর ভ্রাতা দেলওয়ার খাঁ, বিখ্যাত কাওয়াল মিয়া মীরণ প্রভৃতিকে। হসনু খাঁ বাংলায় আসবার আগে দিল্লির বাদশার গায়ক ছিলেন।

বিষ্ণুচন্দ্র তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে হসনু খাঁর কাছে ধ্রুপদ এবং উক্ত কাওয়ালের কাছে খেয়াল শিখেছিলেন। উপরন্তু তিনি ভ্রাতা কৃষ্ণপ্রসাদ, দেলওয়ার খাঁ এবং প্রসিদ্ধ গায়ক রহিম খাঁর কাছেও সংগীতশিক্ষা করেছিলেন। দেলওয়ার খাঁ ছিলেন মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের সভাগায়ক। রহিম খাঁ তখন কলকাতায় অবস্থান করতেন এবং সেখানেই তাঁর কাছে সম্ভবত বিষ্ণু শিক্ষার সুযোগ পান। রামমোহন রায় রহিম খাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁকে পারসী গান শোনাবার জন্যে। তবে রহিম খাঁর সান্নিধ্য রামমোহন বেশিদিন লাভ করেননি। তাঁর কাছে নিযুক্ত হবার তিন/চার মাস পরে রহিম খাঁর মৃত্যু হয়।

বিষ্ণুচন্দ্ররা তিন ভ্রাতাই অতি অল্প বয়স থেকে সংগীতচর্চা আরম্ভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে দয়ানাথের অকালমৃত্যু হয় বালক বয়সেই। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হবার আগেই দয়ানাথের মৃত্যু হয়েছিল।

কৃষ্ণ এবং বিষ্ণুর ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেবার আগে রামমোহন রায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। রামমোহন তখন সমাজের উপাসনার শেষে সংগীত পরিবেশিত হবার ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, একেবারে প্রথম অবস্থায় ব্রাহ্মসমাজে গান গাওয়ার রীতি ছিল না। এবং গান যখন প্রথম আরম্ভ হয়েছিল, তখনও তা ধর্ম-সংগীত ছিল না। তবে রামমোহনের নির্দেশে উপাসনা সংগীতের রীতি প্রবর্তিত হয়। এ বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন—"একদিন রামমোহন রায় বলিলেন যে ভাল ভাল গায়ক সকল সংগ্রহ করিয়া মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে সংগীত দিলে ভাল হয়; অমনি গুণী গায়ক সকল সেখানে একত্রিত

হইল এবং নানাভাবের সংগীত চলিল। রামমোহন রায় বলিলেন, ও সব গান কেন? 'অলখ নিরঞ্জন' গাও। তখন সেই অবধি ব্রহ্মসংগীত হইতে লাগিল। তাঁহার সংগীতজ্ঞ এবং তিনি বাংলায় ধ্রুপদাঙ্গের বুঝা হয় নাই যে ব্রাহ্মসমাজে সংগীত গাইতে বলিলে ঈশ্বরের সংগীত গাইতে হইবে।"......(৮)

সংগীতপ্রেমী রামমোহনের একজন সহকর্মী ছিলেন—কৃষ্ণমোহন মজুমদার, রামমোহনের অন্যতম সুহৃৎ ব্রজমোহন মজুমদারের পুত্র। কৃষ্ণমোহন মজুমদার ছিলেন সংগীতজ্ঞ এবং তিনি বাংলায় ধ্রুপদাঙ্গের গানও রচনা করতেন। কৃষ্ণ এবং বিষ্ণু দুই ভাইকে এই কৃষ্ণমোহন রামমোহন রায়ের সঙ্গে পরিচিত করেন। তারপর কৃষ্ণ এবং বিষ্ণু গায়করূপে ব্রাহ্মসমাজে নিযুক্ত হন। তার আনুমানিক পনের বছর পরে কৃষ্ণের মৃত্যু হয়। তার পর থেকে বিষ্ণু গায়করূপে নিজেকে ব্রাহ্মসমাজের সেবায় কিভাবে উৎসর্গ করেন, সেসব কথা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। সংগীতজ্ঞরূপে বিষ্ণুচন্দ্রের কল্‌কাতায় প্রতিষ্ঠা লাভের কথাও আলোচনা করা হয়েছে ইতিপূর্বে। পুনরুল্লেখ বাহুল্য।

বিষ্ণুচন্দ্রের জীবনে প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ঠাকুরবাড়ীর হেমেন্দ্রনাথ। তাঁকে হেমেন্দ্রনাথ অনেক রকমে সহায়তা করতেন। আদি সমাজে বিষ্ণুচন্দ্রের মাসিক বেতন যখন মাসিক ২০ টাকায় দাঁড়ায়, তখনো হেমেন্দ্রনাথের সাহায্যে বিষ্ণুচন্দ্র আর্থিক সংকট থেকে মুক্ত হন। হেমেন্দ্রনাথ সেসময় তাঁর পত্নী ও পুত্র-কন্যাদের সংগীতশিক্ষার জন্যে বিষ্ণুকে নিযুক্ত করেন এবং সেজন্যে তাঁকে মাসিক ২০ টাকা করে দিতেন। তা ছাড়া, বিষ্ণুচন্দ্র যত গানের স্বরলিপি রচনা করতেন, তার প্রত্যেকটির জন্যে হেমেন্দ্রনাথ তাঁকে পুরস্কার ইত্যাদি দান করতেন সাহায্যস্বরূপ। এ সমস্তই হেমেন্দ্রনাথের পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন।

ব্রাহ্মসমাজ থেকে অবসর গ্রহণের পর বিষ্ণুচন্দ্র হালিশহরে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। এখানে একখণ্ড জমি কিনে বাড়ী তৈরী করিয়ে কিছুদিন সপরিবারে বাস করেন তিনি। কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপের জন্যে সেখানে বাস করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। শেষ বয়সে তিনি চলে আসেন কল্‌কাতায় এবং এক বাসাবাড়ীতে অন্তিমকাল পর্যন্ত ছিলেন। এখানেই ৮২ বৎসর বয়সে এই মহান সংগীতসাধকের জীবনাবসান হয়।

---

(৮) "ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত", ১৩—১৪ পৃষ্ঠা।

রবীন্দ্র চিত্রকলা প্রসঙ্গে
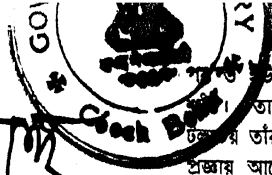
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

কী প্রলাপ কহে কবি?
তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি।
কে বলে, রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে।
মরি মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।
(ছবিঃ বলাকা)

ক্রৌঞ্চমিথুন বেদনা-বিধুর বাল্মীকির কণ্ঠে এলো প্রথম কবিতা আর দয়িতা শোকাহত কবিগুরুর মনে জাগলো ছবি। কাব্যের চিত্রকল্পরূপে কবির কলমে যদিও তার প্রথম প্রকাশ ঘটেছে, তবু চিত্রানুসন্ধানী মনের ঠিকানা ওতে ধরা দেয়। সম্ভবত এইসব ধ্বনিবাহী শ্রবণ-গ্রাহ্য-কাব্য মাধুর্যের সীমাবদ্ধ রূপায়ন ক্ষমতায় অতৃপ্ত হয়ে বিভিন্ন শিল্প কৌশলের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিণতিতে দর্শন-গ্রাহ্য চিত্রকর্মে নিযুক্ত হলেন কবি। অবশ্য চিত্রকর্মের উপযুক্ত পারিপার্শ্বিকতা অনেকদিন থেকেই তাঁর অনুকূল ছিল। অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ-এর চিত্রানুশীলন, ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের যুগ-স্রষ্ঠা চিত্র প্রেরণা প্রভৃতি কবিগুরুর কাব্য লেখাকে সার্থক চিত্র রেখায় রূপান্তরের মানসিক প্রস্তুতিতে সাহায্য করেছিল নিশ্চয়। তাছাড়া প্রথম জীবনের তাঁর প্রাথমিক চিত্রায়ন প্রচেষ্টার কথা তিনি নিজেই বলে গেছেন : "দুপুর বেলার জাজিম বিছানো কোনের ঘরে একটা ছবি আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে—সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন-মনে খেলা করা।"

রবীন্দ্র চিত্রকলা সম্বন্ধে সম্যকভাবে জানতে গেলে প্রথমত বুঝতে হবে, সমকালীন ইউরোপের চিত্রদর্শন ও প্রচেষ্টাকে, কারণ কবিগুরুর চিত্র প্রচেষ্টা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অপরূপ সংশ্লেষণ জাত বস্তু। যা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে, ভারতীয় কলার নব-জাগরণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগা-যোগের ফলে এবং তাঁর একাধিকবার ইউরোপ ভ্রমণে সমসাময়িক স্থানীয় শিল্পী ও শিল্পরসিকদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের পরিণতিতে।

ইউরোপীয় চিত্রকলার আলোচনায় জানা যায়, "art is that which produces beauty" এই ছিল ১৯ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় শিল্প চেতনার গ্রহণ [illegible]। তারপর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ঋষি টলস্টয় তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জিত প্রজ্ঞায় আর্টের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করলেন।

"art is a human activity consisting in this, that one man consciously by mean of certain external signs, hand on to others feeling he has lived through and that others are infected by these feelings and also experience them. . . ."

অর্থাৎ শিল্প একটা মানবীয় কর্ম, যার সাহায্যে শিল্পী তাঁর নিজস্ব রসোপলব্ধিকে সজ্ঞান কর্মের দ্বারা বাহ্যিক প্রকাশ করেন, সেই সার্থক শিল্প কর্ম দেখে দর্শক শিল্পীর রসোপলব্ধিকে নিজের মধ্যে অনুভব ও উপলব্ধি করেন।

টলস্টয় নিরূপিত এই শিল্প সংজ্ঞার প্রত্যক্ষ প্রভাব চিত্রজগতে আপাতদৃষ্টিতে খুব ক্ষণস্থায়ী মনে হলেও, পরোক্ষভাবে শিল্প চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল নতুনের সন্ধানে। ফলে ১৯ শতকের শেষ দিক থেকে নব নব ভাবধারায় ইউরোপের চিত্র-দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সমাজ বিবর্তনের পথ ধরে যন্ত্রযুগের সাথে সাথে চিত্র তার স্ব-সত্তা হারিয়ে হয়ে উঠলো বিজ্ঞানাশ্রয়ী। দ্রষ্টব্য বস্তুতে শিল্পী তার ব্যক্তিগত জ্ঞান ও বুদ্ধি-শোধিত রূপ দিয়ে সৃষ্টি করলো ইমপ্রেশনিজম (১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ)। সেই থেকে শুরু করে নবতর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তালে তালে এগিয়ে চললো, নানা মত ও পথ বিশ্বাসী বিভিন্ন চিত্রধারা, পরিণত হলো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের চিত্রায়িত ব্যাখ্যায়। পদার্থ বিদ্যানুযারী দর্শনেন্দ্রিয়জাত রঙ সংমিশ্রণ নির্ভরশীল পয়েণ্টালিজম সৃষ্টি হলো ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। পরকলা বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির বিশ্লেষিত রঙের সাহায্যে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কিউবিজম পরিণত রূপে পেল। তারপর ঐ পথ অবলম্বনে সৃষ্টি হলো ফ-বিজম অরফিজম এবং প্রত্যক্ষ যন্ত্র ভাবাশ্রয়ী ফিউচারিজম প্রভৃতি। সঙ্গে সঙ্গে বি-মূর্ত চিত্রধারাও অঙ্কুরিত হলো জার্মানীতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শিল্পী কেণ্ডেনেস্কির প্রচেষ্টায়।

গভীর মনোসমুদ্র মন্থন করে গবেষক আবিষ্কার করলেন মনস্তত্ত্বরূপী অমৃত। সঙ্গে সঙ্গে চিত্রধারাও পরিবর্তিত হলো মনো-বিদ্যাকে আশ্রয় করে। ইয়ং (JUNG) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের মতে সাধারণত মনের দুটি বিভাগ বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী মনকে অনুসরণ করে চিত্রকলাও দুটি অংশে বিভক্ত হলো, ন্যায়ধর্মী বহি-র্মুখী চিত্রধারাকে গ্রহণ করে রচিত হলো বহুচিত্ররূপ, তাদের বহু বিচিত্র নামকরণও

হলো, যার পরিচয় আগেই রয়েছে। আত্ম অন্তর্মুখী মনানুসারী চিত্রধারা, গভীর অবচেতন মনের অন্ধকারে ডুব দিয়ে অন্তরের অন্তস্তল থেকে সংগ্রহ করে পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে চললো রঙ, রূপ, রেখাশ্রয়ী বি-মূর্ত চিত্রকল্পকে।

বিজ্ঞান আশ্রয়ের সুযোগ পেয়ে চিত্রকর্ম তার প্রচলিত ব্যাকরণের প্রয়োগে বিরত হলো, সার্থক চিত্র নির্মাণ রীতি অনুযায়ী চিত্রের বিভিন্ন অঙ্গের সু-সমন্বিত প্রয়োগ অভ্যাস সীমায়িত করলো। ষড়ঙ্গ ব্যবহৃত পূর্ণাঙ্গ চিত্রের জায়গায়, শুধু বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ ব্যবহারী খণ্ডাঙ্গ চিত্র, অর্থাৎ খণ্ডচিত্র প্রচলিত হয়ে, শাস্ত্র-নির্দেশিত চিত্র বিন্যাসের অঙ্গগুলির কোনটিকে বাদ দিয়ে কোনটিতে নির্ভর করে চিরাচরিত চিত্রদর্শন অভ্যস্ত শিল্পরুচিকে বিপর্যস্ত করে দিল। এইসব বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ধীরে ধীরে নতুন শিল্পমান রচিত হয়ে চললো। বস্তু সংস্থাপন, ভাবপ্রকাশ, পরিপেক্ষিত, বর্ণ-বিন্যাস এইসব চিত্রাঙ্গগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কারু-কৌশল, গুরুমুখী বা বিদ্যায়তনধর্মী শিক্ষা ইত্যাদি গৌণ হয়ে পড়লো। বিজ্ঞান শিল্পীকে বুঝিয়ে দিল, দর্শনগ্রাহ্য বর্ণঝংকার, বস্তু সংস্থাপন প্রভৃতির দ্বারা দর্শকের স্নায়ুমণ্ডলে প্রয়োজনীয় অনুরণন সৃষ্টি করে, অর্থাৎ এই ধরনের খণ্ডচিত্রের সাহায্যে শিল্পী তাঁর ব্যক্তিগত রসোপলব্ধিকে দর্শক-মনে সঞ্চারিত করতে পারেন।

ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ, এই আধুনিক চিত্র-বিপ্লবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন চিত্র সৃষ্টিতে। প্রথম যৌবনের চিত্রবিলাস এবং আত্মীয় বন্ধু সৃজিত পরিবেশ ছাড়া তাঁর নিজস্ব কোন চিত্রবিদ্যা অনুধাবনের সংবাদ জানা যায় নি। অনায়ত্ত এই বিশেষ বিদ্যার নিজস্ব প্রয়োগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা নানা স্থানে নানা ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। স্বসৃজিত এই খণ্ডচিত্রকে, চিত্রসংজ্ঞা দিতেও তিনি কখনো কখনো কুণ্ঠিত হয়েছেন দেখা যায়, যেমন "My picture are my versification in lines."

খণ্ড অর্থাৎ আধুনিক চিত্রধারার সাহায্য ছাড়া কলাকৌশলজ্ঞানহীন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব হতো না, তাঁর মহৎ কবিপ্রতিভাজাত প্রজ্ঞাকে চিত্রভাষায় রূপান্তরিত করতে। অর্থাৎ যে কবিপ্রতিভার ভাবৈশ্বর্যে সমকালীন কাব্যজগতে তিনি সম্ভবত অদ্বিতীয় ছিলেন। নবরূপায়িত এই আধুনিক চিত্রকলা, তাঁকে তাঁর অনধীত চিত্রবিদ্যায় উত্তরণে এবং মহাকবির সেই ভাবৈশ্বর্যকে চিত্র মাধ্যমে রূপায়িত করতে পরম এবং প্রত্যক্ষ সাহায্য করলো।

ইউরোপীয় আধুনিক চিত্রধারার অনু-

প্রাণিত এই সব রবীন্দ্র-চিত্রাবলীর মূল্য বিচারের জন্য কবিগুরুকে বিনীতভাবে হাজির হতে হয়েছিল, ঐ আদর্শের আদি-কেন্দ্র ইউরোপের দরজায়। দ্বিধাগ্রস্তভাবে তিনি তাঁর চিত্রসম্ভার উপস্থিত করেছিলেন, ওদের চিত্ররসিকদের সামনে। সেই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেনঃ

"Until I arrived in Europe I had very great diffidence about the merit of these pictures, but I was encouraged by some artists whom

I chanced to meet when I was in the South France."

কাব্যলক্ষ্মীর সার্থক সাধক, কাব্যানুসরণে ভাবরাজ্যের যে মার্গে উপস্থিত হয়েছিলেন, শিল্পিজন-দুর্লভ সেই মার্গ-শীর্ষে আসীন হয়েই তিনি শুরু করেছিলেন চিত্রমাধ্যমে তাঁর নবপ্রকাশ। মহাকবির ভাবৈশ্বর্যস্নাত চিত্রের এই নবরূপায়ন শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো পরীক্ষায়। ও দেশের রসিক চিত্রবেত্তা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করলেন তাঁর মহত্ব। বুঝতে পারলেন রবীন্দ্রচিত্রকলার পাশে সমসাময়িক ইউরোপীয় চিত্রকলার অপূর্ণতা। এ বিষয়ে কবির লেখাতেই জানা যায় :

"One authority told me that I had achieved something in these pictures which their own artists had been trying to achieve without success."

আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানবাদী চিত্রাদর্শের সঙ্গে ঐতিহ্য ও ভাববাদী ভারতীয় শিল্পমানসের সংশ্লেষিত রূপগুলির একটি রবীন্দ্র চিত্রকলা। তাকে বুঝতে গেলে সহানুভূতির সঙ্গে সচেষ্ট হতে হবে চিত্রভাষা আয়ত্তে, অর্থাৎ ছবি দেখতে শেখায়।

শিল্পীর ব্যক্তিগত রসোপলব্ধিকে নিজের মধ্যে অনুভব ও অনুরণন করায়। ভাব ও কল্পনা আসঙ্গজাত সৃষ্টির বেদনাকাতর মুহূর্তে, আবেগচঞ্চল অথবা সমাহিত স্থির শিল্পীর সৃষ্টি প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান দীর্ঘ দিন, মাস, বৎসরের গতানুগতিক শৈথিল্য। অথবা তার বেদনা উন্মাদ কর্মশক্তিতে মুহূর্তে সৃজিত চিত্রকে যোগ্য বিচার করে দেখতে গেলে প্রথমত প্রয়োজন, সহানুভূতিশীল দর্শক-মনের। তারপর চিত্রসজ্ঞানী বিচক্ষণতার। চিত্রসূত্র এবং চিত্রকল্প অভিজ্ঞ দর্শকের স্ব-বিদ্যায় রবীন্দ্র-চিত্র বোঝা সম্ভব। কিন্তু রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উন্মুখ সাধারণ ভক্তদের পক্ষে রবীন্দ্র-চিত্ররস গ্রহণ উপযুক্ত, অথবা চিত্রবিদ্যার গুরুত্ব উপযুক্ত প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া এখন সম্ভব না, তাই এ প্রবন্ধ-প্রচেষ্টা।

সাধারণ সুকুমারকলা রসিক মন যদি রবীন্দ্র-চিত্রকলা বোঝবার দায়িত্ব গ্রহণ করে, প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুযায়ী সময় ও চিন্তা ব্যবহার করে, তবে জ্ঞান দ্বারা বোঝা সম্ভব না হলেও, দর্শনগ্রাহ্য স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার ফলে দৈহিক অবস্থায় জাত প্রত্যক্ষ কারণে তার কিছুটা নিশ্চয় সম্ভব হবে। যেমনভাবে বোঝা সম্ভব হয় আদিম চিত্র, লোক-চিত্র, শিশু-চিত্র ইত্যাদি। প্রাগৈতিহাসিক গুহা-চিত্র থেকে মোহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা ইত্যাদি অথবা আদিবাসী গারো, নাগা, কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতিদের শিল্পরীতি এবং সূত্রধর, ফৌজদার, পটুয়াদের পট কিম্বা শিশু-চিত্রের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু কটি আধুনিক চিত্রে এবং রবীন্দ্র-চিত্রেও অতি-ব্যবহৃত আকর্ষণ। তাই রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলি সরল শৈলীতে, সহজ রেখার ব্যবহারে, স্বাভাবিক ছন্দে, মূল বর্ণ সমন্বয়ের তীব্র ঝংকারে চোখের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে, যুগ যুগের জমে ওঠা সংস্কারকে পেরিয়ে গিয়ে দর্শকের সংস্কারজাত সভ্য মনকে ছাড়িয়ে গিয়ে পৌঁছবে উপলব্ধির জগতে।

বর্তমান ভারতের শিল্প-বিপ্লবের হোতা, আধুনিক চিত্রধারার প্রথম পূজারী এবং পূর্বসূরী রবীন্দ্রনাথের অনুসারী বাংলার শিল্পিবৃন্দ আজ উত্তরসাধক অ-বাঙালী ভারতীয় শিল্পীদের শিল্পকর্মের অতি-আধুনিকতায় দ্বিধাগ্রস্ত। পরাজয়ের গ্লানিতে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে নির্লজ্জভাবে অনুকরণ করছে সেই অর্বাচীন প্রচেষ্টাকে। প্রাদেশিকতাকে বাদ দিয়ে যুক্তি-নির্ভর চিন্তা অনুসরণে যে মীমাংসায় পৌঁছন সম্ভব তা হলো যদি একান্তই অনুকরণ করতে হয় তবে মহৎ শিল্পীর সার্থক শিল্প-কর্ম অনুকরণীয়। অবশ্য সার্থক শিল্পের বিচারক একমাত্র মহাকাল, তবুও সাধারণ যে সব কারণে সমসাময়িক চিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয় সেই নিরীখ অনুযায়ী রবীন্দ্র-চিত্রশৈলীই শ্রেয়তম; কারণ, আধুনিক শিল্প-ধারার স্রষ্টাদের স্ব-সৃজিত চিত্রশৈলীর অনুপাতে রবীন্দ্র-চিত্রকলার সার্থকতা তাঁরা স্বীকার করেছেন। বলেছেন: রবীন্দ্র-চিত্রৈশ্বর্য তাঁদেরও দুর্লভবস্তু। কবিগুরু ছাড়া, তাঁর সমসাময়িক অথবা আজ পর্যন্ত ভারতের কোন্ শিল্পী আধুনিক চিত্রকলার জন্ম ও কর্মভূমিতে নিজেকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করে শ্রেষ্ঠের সম্মান অর্জনে সক্ষম হয়েছেন?

রাষ্ট্রভাষা ও রবীন্দ্রনাথ

হারীতকৃষ্ণ দেব

আজ বাদে কাল আমরা রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী পালন করতে যাচ্ছি। অথচ তিনি যে বঙ্গজননীর সন্তান হয়ে জন্মলাভ করেছিলেন, শিশুকাল থেকে বাংলা ভাষাকে আশ্রয় করেই তাঁর শিক্ষালাভ হয়েছিল, এবং স্বীয় রচনায় তাঁর মাতৃভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিকে বিশ্বের দরবারে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন, একথা স্মরণ রাখবার চেষ্টা করছি না। তাই তাঁর রচিত একটি গানকে জাতীয় সঙ্গীত বলে গ্রহণ করেও সেই গানের ভাষাকে জাতীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করে নিতে পারি নি।

প্রত্যেক ভাষারই একটা বিশেষ শক্তি আছে। সেই বিশেষত্বকে ইংরিজীতে বলে জীনিয়াস্, এবং মানুষের মধ্যে যিনি সে ভাষার শক্তিকে রচনার মাধ্যমে চোখের সামনে ধরে দিতে পারেন, তাঁকেই জীনিয়াস্ বলি।

জগতে বহু সাহিত্য-স্রষ্টা হয়ে গেছেন। সাহিত্য-রসিকরা সে-সব সৃষ্টির বিচার করে গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ যে-চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি করেছেন, সে-সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধির বৈষম্য থাকলেও এ-বিষয়ে সকলেরই একমত যে শেক্‌সপিয়ার একটি জীনিয়াস্ ছিলেন। ইংরিজী ভাষার জীনিয়াস্‌কে তিনি প্রস্ফুটিত করে দিয়ে গেলেন এমনভাবে যে সে-ভাষার প্রচার ও প্রসার সারা পৃথিবীতে দেখা যাচ্ছে। শেক্‌সপিয়ারের প্রতিভাকে স্ফূর্তি দিয়েছিল তাঁর মাতৃভাষা, নতুবা সে-প্রতিভা তাঁর নিজের মনেই মিলিয়ে যেত, জন-মানসের অগোচরে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলা যায়। শুক-সারীর সংবাদ মনে পড়ে : শুক বলে, আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল; সারী বলে, আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল—নইলে পারবে কেন?

বাহান্ন বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলেন, ইংরিজীতে গীতাঞ্জলি লিখে। টমসন বলেছেন, সে-ইংরিজীতে অনেক ভুল ছিল, যে-রকম ভুল কোনো ইংরেজের কলমে বেরুতো না। রবিবাবু তো বাঙালী—নির্ভুল ইংরিজী লিখবেন কি করে? তিনি যে গোটা একখানা বই ইংরিজীতে লিখে ফেললেন, আর সেই বই আবার সেরা বই বলে প্রাইজ পেলে, এটা নিশ্চয় তাজ্জব ব্যাপার। স্টাইলের দিক থেকে বিচার করলে ইংরিজী গীতাঞ্জলি কখনো নোবেল পুরস্কার পেত না; ভাব-সম্পদের প্রতি দৃষ্টি রেখেই যে বিচারক-গোষ্ঠী রায় দিয়েছিলেন, এ-সিদ্ধান্ত সমীচীন হবে। পড়লে মনে হয়, গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত 'গীত'গুলি প্রথমে বাংলাতেই লেখা হয়েছিল; এবং যে উচ্চ ভাবসম্ভার সেই সব গীতে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে বিনা বাধায় আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল, সে-ভাবকে পূর্ণ-রূপে প্রকাশ করবার ক্ষমতা ছিল তাঁর মাতৃভাষায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও জানতেন সে-কথা।

প'চাত্তর বছর বয়সে কবি বলছেন : "শিশুকাল থেকে আমার মনের পরিণতি ঘটেছে কোনো ভেজাল-না-দেওয়া মাতৃভাষায়; সেই খাদ্যে খাদ্যবস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্যপ্রাণ ছিল, যে-খাদ্যপ্রাণে সৃষ্টিকর্তা তাঁর যাদু-মন্ত্র দিয়েছেন।"

['শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ'—প্রবন্ধ (১৯৩৬)]

ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আধুনিক

পুনশ্চ'র অলিন্দে রবীন্দ্রনাথ • ফটো শম্ভু সাহা
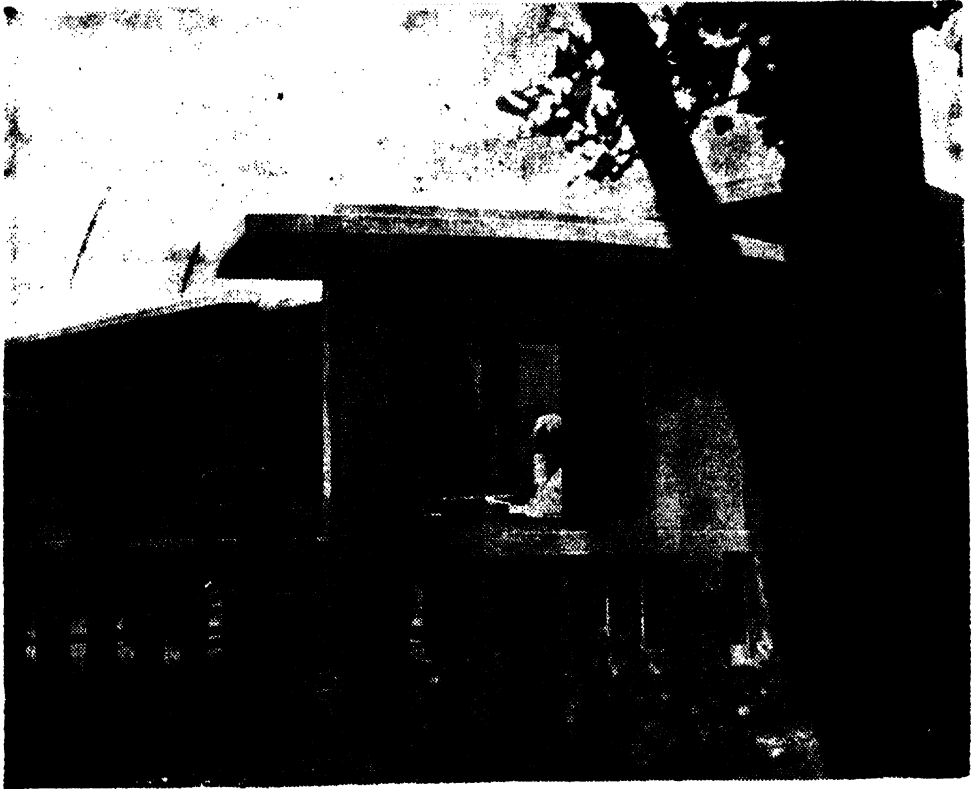
'হিন্দী' তৈরী করা হচ্ছে হিন্দুস্থানী থেকে যথাসম্ভব উর্দু-শব্দ বাদ দিয়ে। এতে হিন্দীর হিন্দুত্ব বজায় থাকছে ভেবে অনেকে খুশী, কারণ তাঁরা তাঁদের সংকীর্ণ ধর্মগত দৃষ্টি নিয়ে ভাষার মর্মগত কথা ভুলে গিয়ে কেবল এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেন যে, ইংরেজরা ভারত ভাগ করেছেন হিন্দুদ্রোহী মুসলমানদের প্ররোচনায়। কিন্তু ভাষার ধর্ম সব সময়ে সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্মকে অনুসরণ করে না, তার একটা নিজস্ব গতি ও ছন্দ আছে। তাছাড়া সকলেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন হিন্দু-মুসলমানবিরোধের একান্ত বিরোধী, এবং তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে ভারত ও ভারতীর এ-অবস্থা হতে পারে। তাঁর "বিশ্বভারতী"—নামকরণ থেকে যে-আদর্শের আভাস পাওয়া যেত, সে-আদর্শের বাস্তব রূপ অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যখন নোবেল-লরিয়েট হবার পরে তিনি শান্তিনিকেতনে আকর্ষণ করে আনতেন বিশ্বের মনীষী মানুষ, এবং সে-মানুষ প্রায়শই বাংলা শিখতে উৎসুক হতেন, কেননা বাংলাই ছিল এই বিশ্বকবির ভারতী। হিন্দী তিনি বলবার চেষ্টাও করতেন না।

ভারত-বিভাগ দেখার দুর্ভাগ্য অবশ্য তাঁর হয়নি তবে তাঁর জীবদ্দশায় লর্ড কার্জনের আমলে একবার বঙ্গ-বিভাগ হয়েছিল, যার ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি প্রদেশ গড়া হয়, আর বাকী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে বঙ্গ-প্রদেশের সীমা নির্দিষ্ট হয়। মোগল আমল থেকে যে 'সুবে-বাংলা' ভাষাগত ঐক্যের বন্ধনে সুসংবদ্ধ হওয়ার দরুণ শাসনগত ঐক্যের অভ্যন্তরে একটি অখণ্ড প্রদেশ হিসেবে শান্তিময় জীবন যাপন করছিল, সে-বাংলাকে ভেঙে দু-টুকরো করার প্রতিবাদে আমরা 'স্বদেশী আন্দোলন' করলুম, যার মূলে মন্ত্র ছিল বিলিতী-বর্জন। ঐ আন্দোলনকে প্রভূত প্রেরণা দেন রবীন্দ্রনাথ, এবং সংহত চেষ্টায় ফললাভ হয় কিছু। ভাঙা বাংলাদেশ আবার জোড়া লাগে নতুন আকারে—অর্থাৎ বাংলাভাষাভাষীরা একই প্রদেশের শাসনভুক্ত হয়। তাঁর মরণোত্তরকালে এদেশের ব্যবচ্ছেদ পুনরায় অনুষ্ঠিত হল, ভাষা-ধর্মকে অস্বীকার করে। অনুষ্ঠানকারীরা বিস্মৃত হলেন যে, সে-ধর্মের মন্তর আসে অন্তর থেকে, আর সে-মন্ত্র উচ্চারিত হয় প্রতি কার্যে, প্রতি ক্ষণে, শিশুর মুখে, প্রবীণের বাক্যে। এই অস্বীকারের কুফল আমরা সকলেই ভোগ করছি, দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে। ইংরেজের প্রত্যক্ষ-শাসন-মুক্ত ভারতে বাংলা-ভাষাভাষীদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প এবং বাসস্থান অতিশয় সংকীর্ণ। দুঃখের বিষয়, এ-বিপর্যয় এসেছে সেই বিলিতী বর্জনের মূলমন্ত্র বাংলাদেশ থেকে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ারই ফলে। আজকের দিনে বিলিতী-বর্জনের চাইতে ডলার-অর্জনের গর্জনই শুনি বেশী। সংখ্যালঘিষ্ঠ বাঙালীদের পক্ষে ভারতীয় গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে শাসনের উচ্চাসন অধিকার করার আশা দুরাশা। ডলার-তন্ত্র এখন আমাদের দলার-যন্ত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সময়-সময় বলতে ইচ্ছে হয়, এ-ডিমক্র্যাসি আসলে ঘোড়ার ডিম-ক্র্যাসি।

পাকিস্তানে নতুন করে গড়া হচ্ছে 'বেসিক ডিমক্র্যাসি' অর্থাৎ গোড়ার ডিমক্র্যাসি। মনের দুঃখকে ঢাকতে গেলে একটু মজার কথাই কইতে হয়। তাই বলছি, পাকিস্তানকে পাখিস্থানরূপে কল্পনা করতে দোষ কি? আঠারো-শো বছর আগে প্রতীচ্য ঐতিহাসিক প্লীনি লিখে গেছেন যে, সবচেয়ে সুন্দর পাখি পাওয়া যায় ভারতবর্ষে ও নাইল-ভ্যালিতে (মিশরে)। তাছাড়া. পাকিস্তান নামটিরও আদি-রূপ ছিল পাক্-স্তান। এ-নামের জন্ম হয় বিলেতে কেম্ব্রিজ শহরে। সেখানকার গুটিকয়েক ছাত্র একটি পুস্তিকা লেখেন যাতে চাওয়া আছে ভারতবর্ষের

সকল মুসলমানদের জন্যে একটি বাসস্থান। তখনকার পাঁচটি প্রদেশকে নিয়ে এই নিবাস-ভূমি কল্পিত হয়—পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্তান। ইংরিজী অক্ষরে পাঞ্জাবের 'পি', উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের অধিবাসী আফগান জাতির নামের 'এ', কাশ্মীরের 'কে', সিন্ধু প্রদেশের 'এস', আর বেলুচিস্তানের 'তান',—এই সব মিলে হয় PAKSTAN (পাকস্তান)। পরে কবি ইকবাল নাকি প্রথমে বলেন যে, পাকিস্তান-রূপটি ধর্মভাব-জ্ঞাপক, সুতরাং গ্রহণীয়। কিন্তু এখন যেহেতু বঙ্গদেশ (অর্থাৎ 'লুচি-স্থান') অনেকাংশে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত, বেলুচি-স্তানের 'তান' ছেড়ে 'থান' ধরাই বোধ করি ভাল।

সে যাই হোক, পাকিস্তানের নবতম ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে একটি ব্যবস্থার তারিফ না করে থাকা যায় না। সেখানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছে, বহু বাগ্-বিতণ্ডার পর। এমন কি, ঐ উদ্দেশ্যে প্রাণ পর্যন্ত পণ করে একাধিক বাঙালী সেখানে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। আর এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষাকে শিকেয় ঝুলিয়ে রেখে প্রাণ-পণে হিন্দী শিখতে লেগে গিয়েছি! দেখে শেখা যদি না হয়, ঠেকেই শিখতে বাধ্য হবো যে, বাংলাভাষাকে আমল না দিলে ভারত কিছুতেই পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মেলাতে পারবে না। যেরূপ দ্বন্দ্ব আজ ১৩।১৪ বছর চলেছে, তার অবসান ঘটাবার চেষ্টা করছেন এখন দু' তরফেরই কর্তারা। আসলে এটা অন্তর্দ্বন্দ্ব, বেশিদিন চললে দু-পক্ষেরই ক্ষতি। বস্তির বাসিন্দেরা যেমন কল-তলায় গিয়ে জলের জন্যে ঝগড়া করে, তেমনি ভারত ও পাকিস্তানের মাঝি-মোল্লারা পদ্মনদের তীরে দাঁড়িয়ে জল-কলহে যোগদান করার পর এতদিন বাদে কর্তৃপক্ষরা একটা রফা-চুক্তিতে রাজী হয়েছেন। সে-চুক্তিকে কার্যকরী করতে বহু অর্থব্যয় হবে। তা হোক। এক সময়ে বাংলাদেশে গৌরী সেন ছিলেন, যাঁর প্রসাদে আমরা বলতে পারতুম ঃ "লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন।" এখন গৌরীর প্রসাদ নিষ্প্রয়োজন। লক্ষ্মীর প্রসাদ এখন স্তব-স্তুতি না করেও পাওয়া যায়—নোট ছাপালেই টাকা। সুতরাং নদীর জল ভাগাভাগি করার ফলে যদি ভারতে ভাগ্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়, যদি পাকিস্তানের সঙ্গে মৈত্রী-স্থাপনার গোড়া-পত্তন এই জল-যোগেই সুসম্পন্ন হয়ে যায়, তার চেয়ে ভালো আর কি আছে? তবে সখ্যের বন্ধন শক্ত রাখতে গেলে সে-বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকা উচিত, এবং চেতনাকে জাগ্রত রাখাটা অনুভূতি-সাপেক্ষ। তার কারণ, দুজনের মধ্যে মনোভাবের আদান-প্রদান তখনই অবাধ গতি পায়, যখন পরস্পরের চিত্তে অনুভূতি আসে যে তাঁরা একই ভাষায় বক্তব্য ব্যক্ত করছেন। আজকের দিনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা যদি আত্মরক্ষার জন্যে বদ্ধ-পরিকর হই, তাহলে ভাষাগত প্রীতির অমরত্ব স্বীকার করে পাকিস্তানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। এই ভাষাগত প্রীতির ফলে আমাদের দেখতা দু-দুটো লড়াইয়ে ইংরেজরা মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের অমিত শক্তির সহায়তা লাভ করে রক্ষা পেয়েছে।

ভারতের কর্ণধারেরা যদি কোনোদিন কান ধরে ইংরিজী ভাষাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেন, তবে সেদিন হবে দেশের দুর্দিন। সভ্য প্রগতিশীল মানবসমাজের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র হচ্ছে ঐ ভাষা, যার সাহিত্য ভারতের মুমূর্ষু মনকে পুনর্জীবন দিয়েছে। এ-ভাষার স্থলে অপরিণত হিন্দী ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসকে দেশ-হিতৈষণার দিক থেকে প্রশংসা করা যায় না। বাংলা ভাষা হিন্দীর চেয়ে উন্নত, তবু ইংরিজীর সমকক্ষ হয় নি। সুতরাং, যদি বলি যে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা হোক, তার মানে এ নয় যে, ইংরিজীকে উঠিয়ে দেওয়া হোক। ইংরেজদের শাসনের উপর আমাদের স-হেতুক আক্রোশ থাকলেও তাদের ভাষার প্রতি অ-হৈতুকী প্রীতি আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। ইংরিজী সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ ঘটেছিল এই বাংলাদেশে। সেই জন্যে বাঙালীর মন হয়েছে এই সাংস্কৃতিক মিলনের শ্রী-ক্ষেত্র। আর বাঙালী রবীন্দ্রনাথ হলেন এ-মিলনের প্রকৃষ্ট যোগ-চিহ্ন।

যে বাংলা-ভাষার "খাদ্যপ্রাণ' রবীন্দ্র-নাথের রচনাকে জীবনী-শক্তি দিয়েছিল,

আমার মুক্তি গানের সুরে
এই আকাশে।
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায়
ঘাসে ঘাসে।।

সে-ভাষার বল এখন এত বেড়ে গেছে যে বোধ হয় এমন কোনো ভাবই নেই যা ঐ ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে তাঁর ও আমাদের মাতৃভাষা তথা-কথিত সাধু-ভাষার চাপে পড়ে সবল গতিচ্ছন্দ লাভ করতে পারেনি। ফলে সে-ভাষার চেহারা হয়েছিল অত্যধিক টয়লেট-করা রূপসীর মতন, তার স্বাভাবিক রূপের জলুষ ফুটে উঠতে সুযোগ পেলে না। বিশেষত গদ্যে, যেখানে ছন্দের বন্ধন অভিপ্রেত নয়, এই অলীক সাধুতা সে-ভাষাকে পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে বাধা দেয়। চলতি বাংলা-ভাষাকে সাহিত্যিক গোষ্ঠীতে এইভাবে অচল করার বিরুদ্ধে অভিযান যে হয়নি তা নয়। নক্সা-জাতীয় রচনায় (যেমন কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতুম প্যাঁচার নক্সা ও টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালের ঘরের দুলাল) চলতি ভাষার স্বরূপ ছাপার অক্ষরে দেখা গিয়েছিল বটে, কিন্তু "আলালী-ঢং"কে সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা ভাল চোখে দেখতেন না এবং তার মধ্যে ক্রিয়াপদে সাধু-চলিতের মিশ্রণ থাকায় সেটাকে ঠিক চলিত বাংলা বলাও চলতো না। তাছাড়া ঐ দুই গ্রন্থে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও মজা-ঠাট্টার ভাব এত বেশি যে পড়লে মনে হতে পারে, চলিত বাংলা কেবল হাস্যরসাত্মক রচনাতেই প্রযোজ্য এবং সে ভাষা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অন্য রসের স্রোত আনতে অক্ষম। এ-ধারণা যে অমূলক সেটা প্রমাণ হয়ে গেল, যখন "সব-জান্তা" এই ছদ্মনাম নিয়ে উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ছাপালেন একটি সমগ্র নভেল—"এই এক নূতন, আমার গুপ্তকথা', যার প্রবক্তা হরিদাস নামধারী হওয়ায় গ্রন্থটি সাধারণের কাছে "হরিদাসের গুপ্তকথা" নামে পরিচিত। এ নভেল পুরোপুরি চলিত বাংলাতেই লেখা, এবং এর মধ্যে সর্বপ্রকার রসের পরিবেশন আছে, কেবল হাস্য-রসেই রচনা সীমাবদ্ধ নয়। গ্রন্থকারের জীবদ্দশাতেই এর দ্বাদশটি সংস্করণ বেরিয়েছিল; সুতরাং বোঝা যায়, পাঠকের অভাব ছিল না। কিন্তু তাঁর দোসর মেলেনি তখন। চলিত বাংলাকে সাহিত্যে সচল করার জন্যে সব চাইতে বড় অভিযান শুরু করেন প্রমথ চৌধুরী, যাঁর ছদ্মনাম "বীরবল।" ইনি তরুণ বয়সে "গুপ্তকথা" পাঠ করে সেই রচনার আদর্শকে মনে ধরে রেখেছিলেন। সবুজপত্রের মারফতে সবুজ দলের মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর সুযোগ এল হাতে-কলমে দেখিয়ে দেবার যে, সাধুভাষার আড়ষ্ট শাসন থেকে খালাস পেয়ে বাংলা ভাষা সকল স্তরের ভাবকেই সরল ও সরস করে বুঝিয়ে দিতে পারে। তারপর গদ্য-রচনায় রবীন্দ্র-নাথ স্বয়ং এই পথের পথিক হলেন। গোড়ায় গোড়ায় তিনি সবুজপত্রে সাধুভাষা অবলম্বন করেই লিখছিলেন। যখন তাঁর শিষ্য প্রমথ চৌধুরীর অনুসরণে সাধুভাষার শিকলি কেটে জ্যান্ত বাংলায় রবীন্দ্রনাথ গল্প ও প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন, তখনই সে-ভাষার মুক্ত রূপ সগৌরবে প্রকাশ পেল। বাংলা ভাষার পক্ষে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষাদের সমপর্যায়ভুক্ত হবার পথে যে সামান্য অন্তরায় ছিল সেটুকুও ঘুচে গেল প্রমথনাথ ও রবীন্দ্রনাথের এই যুগ্ম প্রচেষ্টায়। বাংলা ভাষা আজ জীবন্মুক্তবৎ।

এ-পরিণতির পূর্বেও বাংলাভাষার গুণ-গান করে গেছেন বহু জ্ঞানী সমালোচক, যাঁদের মাতৃভাষা ছিল ইংরিজী। একজন শাসক-শ্রেণীভুক্ত ইংরেজ মত প্রকাশ করেছেন :

"Bengali, as I have said in print, is a true daughter of ancient Sanskrit and approaches its parents more nearly than any Indian language in the qualities which have rendered Sanskrit so unrivalled a medium for the expression of the highest ranges of human thought. It writes the mellifluousness of Italian with the power possessed by German of rendering complex ideals, and I cannot but regret that so little encouragement is afforded by the State to its cultivation." (F. H. SKRINE, Indian Civil Service, in a letter dated 22.1.1897 written to the late Dr. Dinesh Chandra Sen, as quoted in his book বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

এ মন্তব্যের মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই : প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার যথার্থ দুহিতা বাংলা। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার চেয়ে বাংলার মধ্যে সংস্কৃতের সদ্‌গুণ বেশি অর্শেছে, যেসব গুণ থাকার ফলে মানুষের উচ্চতম চিন্তাকে প্রকাশ করতে

সংস্কৃতের সমকক্ষ অপর কোন ভাষা ছিল না। এর ভিতরে পাওয়া যায় ইতালীয় ভাষার শ্রুতিমাধুর্য এবং জর্মন ভাষার জটিল-ধারণা-প্রকাশনী শক্তি। — স্ক্রাইন সায়েব দুঃখ করেছেন, তাঁর আমলের সরকার এ-ভাষার চর্চাকে উৎসাহ দিয়েছেন অতি যৎসামান্য।

ইতালীয় ভাষার শ্রুতিমাধুর্য ও জর্মন ভাষার জটিল-ভাব-প্রকাশনী শক্তি, এই দুই ধারার সঙ্গে তৃতীয় ধারার যোগ করলেন প্রমথ চৌধুরী। ফরাসী সাহিত্যে তাঁর ঐকান্তিক অনুরাগের বশে তাঁর গদ্য-রচনায় ফরাসী রীতির আবির্ভাব হয়। সকলেই স্বীকার করেন যে, ইউরোপীয় গদ্য-রচনায় ফরাসী ভাষা শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। সে-ভাষার প্রসাদ-গুণ অসামান্য। বোধ হয়, ফরাসী প্রভাবের ফলেই আমেরিকান ইংরিজীতে ঐ গুণের বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় তখন থেকে, যখন ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমেরিকা স্বাধীনতা পায়। ফরাসী ভাষায় আরও দুটি গুণ আছে যা বাংলাতেও দেখা যায়। এ-দুই ভাষাতেই প্রবাদ-বাক্য প্রচুর, এবং ফরাসীদের মতন বাঙালীরাও হাস্যরসে রসিক। সুতরাং হাস্য-রসাত্মক বাক্যসম্পদ উভয়ের সঞ্চয়ে বর্তমান। হয়তো এই কারণেই বাংলা সাহিত্যে মৌখিক ভাষার প্রাথমিক বিকাশ হবার সময় হাস্য-রসের আধিক্য দেখি, এবং বীরবলী রচনার মধ্যে ঐ রসের পরিমাণ বেশি। মৌখিক ভাষার সঙ্গে হাস্যরসের যে সবচেয়ে নিকট সম্বন্ধ, একথা নিশ্চয়ই হাসিমুখে মেনে নেবেন সকলে, কেননা হাসির কথা শুনলে আমরা হাসি, আর সেকথা কালি-কলমে কেউ যত্ন করে লিখলে তা পড়েও হাসি, যদিচ সেরূপ সুযোগ আমাদের কমই আসে। এ-বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত জল্পনা করলে হাস্যাস্পদ হবার সম্ভাবনা রয়েছে, সেই আশঙ্কায় শুধু এইটুকুই এখানে বলে রাখি যে, মৌখিক বাংলাকে সরস করে পংক্তি-ভোজনে যাঁরা পরিবেষণ করেছেন তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, কারণ সে ভাষা পাংক্তেয় হওয়াতে আমরা স্বাধিকার পেয়েছি। উপরন্তু, ইতালীয়-জর্মন-ফরাসী এই ভাষা-ত্রয়ের রস-ত্রিধারা একটা মিলন-কেন্দ্র পেয়েছে নদী-মাতৃক বঙ্গদেশে, যেখানে প্রাচীনকাল থেকে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সঙ্গম লাভ করেছে। প্রাজ্ঞ সমালোচক অতুল গুপ্ত মহাশয় ঠিকই বলেছেন : "প্রাক্ প্রমথ যুগের তুলনায় আজকের বাংলা গদ্য অনেক সংহত, তার গতি অনাড়ষ্ট, জটিলকে স্বচ্ছন্দ প্রকাশের প্রসাদগুণ তার অনেক বেশি।"

রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তির বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধে সকল সন্দেহ থেকে মুক্ত হলেন, তখনই তিনি প্রমথ চৌধুরীর সাহায্যে বিশ্বজ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিতে চাইলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে। ইংরিজিতে যেমন হোম ইউনি-ভার্সিটি লাইব্রেরি সীরিজ ছিল, বাংলাতেও তেমনই একটা সীরিজ ছাপানো উচিত, এই ধারণাকে আমাদের মনে গেঁথে দেবার উদ্দেশ্যে "বিচিত্রা"র দোতলায় (এখন যে-বাড়িতে "বিশ্বভারতী"র আপিস হয়েছে) একটি সভা বসে ১৯১৭ সালের জুন মাসে। চেষ্টা তখন-তখনই ফলপ্রসূ হয়নি, কারণ এ-ধরনের কাজে বহুজনের প্রয়াস প্রয়োজন। এ-বিষয় নিয়ে আমাকে লেখা প্রমথবাবুর পত্র উদ্ধার করছি:

১, ব্রাইট স্ট্রীট,
বালিগঞ্জ
২৬।৬।১৭

কল্যাণীয়েষু,

কাল সন্ধ্যে সাড়ে ছটার সময় আমরা রবিবাবু মহাশয়ের ওখানে বাংলায় Home University Series করবার পরামর্শ করবার জন্য সমবেত হব। রবিবাবু মহাশয়ের ইচ্ছে যে, যাঁরা এ বিষয়ে interest নেন, তাঁরা সকলে সেখানে উপস্থিত থাকেন। তুমি যদি কাল আমাদের সভায় যোগদান করো ত সুখী হই। বাড়ি অবশ্য জানো তবু ঠিকানাটা লিখে দিচ্ছি ৬ নম্বর দ্বারিকানাথ ঠাকুরের স্ট্রীট—জোড়াসাঁকো। মাণিককেও লিখছি—চাও ত তাঁর সঙ্গেই আসতে পারো। মাণিব ও-বাড়ি খুব ভাল রকমেই চেনে। ইতি—
শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী।*

---

* এ-পত্রের সঙ্গে সুধীন্দ্র সিংহকে লেখা প্রমথবাবুর আরও দুটি পত্র আমার "সবুজপাতার ডাক" শীর্ষক ধারাবাহিক রচনায় বেরিয়েছে। ["দেশ" পত্রিকা, ২রা আশ্বিন ও ৯ই আশ্বিন, ১৩৬৬ দ্রষ্টব্য]

রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শকে পরে ফুটিয়ে তুলতে উৎসাহী হয়েছেন অনেক লেখক "বিশ্ব-বিদ্যা-সংগ্রহে"। তিনি স্বয়ং বিজ্ঞানী না হয়েও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের ভারী ভারী কথা সহজভাবে বাংলা ভাষায় পরিবেশণ করেছিলেন তাঁর "বিশ্ব-পরিচয়"—নামক পুস্তকে। সে-পুস্তকের উৎসর্গ-পত্রে নাম পাই একজন বিখ্যাত বাঙালী বিজ্ঞানীর, যাঁর সুখ্যাতি কবিবর শুনেছিলেন জর্মানিতে আইনস্টাইনের মুখে। এই 'বোস' (অর্থাৎ সত্যেন বোস) ছিলেন সবুজ সভার সভ্য, কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্রে কোনো লেখাই তাঁর বেরোয়নি, যদিচ তিনি জাতীয় অধ্যাপক হবার পূর্বে বহু বৎসর ধরে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব সাদা বাংলাতেই সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" ঐ ধারার বাহক হয়ে আছে।

কোনো একটা ভাষা শিখতে গেলে দুটো জিনিষ আয়ত্ত করতে হয়—এক, তার ব্যাকরণ, দুই, তার উচ্চারণ। বাংলা ব্যাকরণ কিছুই আমাদের সময়ে ইস্কুল-কলেজে পড়ানো হয়নি। তবু তো কিছু বাংলা শিখতে পেরেছি? আজকাল বাংলা ব্যাকরণ ছেলে-মেয়েদের পাঠ্য পুস্তক হয়েছে। দু'চারখানা নেড়ে-চেড়ে দেখেছি, বোঝা দুরূহ। গ্রামার লেখেন পণ্ডিতরা, তাই শক্ত লাগে। কিন্তু ভাষা সৃষ্টি হয় মুখে-মুখে, তারপর সেই সৃষ্টির মূলে কি নিয়ম আছে তা আবিষ্কার করতে বসেন পণ্ডিতরা; ফলং ব্যাকরণম্। সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ শিষ্টদের মধ্যে যেমন ছিল, তাই লক্ষ্য করে পাণিনি তাঁর ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন আট অধ্যায়ে। ও-ভাষায় যে শিষ্টরা কথা বলতেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই—যেমন কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা এখনো বলতে উৎসাহী। ব্যাকরণের কচ্‌কচি বেশি হওয়ায় পরবর্তী যুগে একটা সহজ প্রণালীও প্রচলিত করা হয়েছিল, যার নিদর্শন হিতোপদেশে মেলে। সংস্কৃত বা হিন্দীর চাইতে বাংলা শেখা ঢের সোজা, কেননা বাংলায় দ্বিবচনও নেই, পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ-ক্লীবলিঙ্গের বালাইও নেই।

বাংলা উচ্চারণ অ-বাঙালীর কাছে কিছু-মাত্র কষ্টসাধ্য নয়। অন্তঃস্থ-ব আর দন্ত্য-স, এ-দুটিকে আমরা বাদ দিয়ে কথা বলি। কেবল দন্ত্য-বর্গের সঙ্গে যুক্ত হলেই দন্ত্য-স তাঁর আদিম শ্রুতিকে ফিরে পায়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই শ্রুতিকে 'ঐতরেয়' বলতেন। হিন্দীতে সংস্কৃতের মতন শ-ষ-স-এর তিনরকম উচ্চারণই বজায় রাখবার চেষ্টা আছে। ইংরেজরা 'ত' উচ্চারণে অপটু, তাই তাঁরা অধিকাংশ বাংলা শিখলেও 'তুমি' না বলতে পেরে 'টুমি' বলেন। তবে স্কচদের মুখে ত-বর্গ ভালই সরে। বৃটিশ বাংলার স্কচ গবর্নর স্বর্গত লর্ড কারমাইকেল একটা মীটিং-এ বাংলায় লেখা দীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করেছিলেন। তাঁর উচ্চারণে কোনো ত্রুটি ছিল না, একথা আমার বন্ধু 'প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মুখে শুনেছি। বন্ধুবর ডক্টর রাম ভট্টাচার্যের স্ত্রী রোজা এডিথ ভট্টাচার্য (যিনি 'সেরাপিয়া' নাম নিয়ে বহু কবিতা ইংরিজীতে লিখেছেন) বাংলায় কথা বললে কেউ সন্দেহ করবেন না যে তাঁর মাতৃভাষা জর্মন। কলকাতার সেণ্ট জেবিয়র কলেজের ইউরোপীয় অধ্যাপকরা অনেকেই বেশ বাংলা বলেন, এবং কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের গানও গেয়ে থাকেন। স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক (পরে অধ্যক্ষ ও কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য) ডক্টর আর্কহার্টকে বাংলা খবরের কাগজ পড়তে দেখেছি। ঐ কলেজের অধ্যাপক স্বর্গত স্কুমজর-ও বাংলা বলতে পারতেন শুনেছি। শ্রীমতী আর্কহার্ট রবি ঠাকুরের গান গাইতেন ভালই। চল্লিশ বছর আগে এফ জে মোনাহান সায়েব যখন কলকাতায় আই-সি-এস কমিশনার, তাঁর বাড়ীতে হঠাৎ একদিন গিয়ে দেখি যে তিনি প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ-প্রণেতা নগেন্দ্র-নাথ বসুর বাংলা একখানা বই (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস) নিয়ে মন দিয়ে পড়ছেন। তারপর তাঁর নিজের বই ইংরিজীতে ছাপা হয় (আর্লি হিস্টরি অফ বেঙ্গল)। বাবার মুখে শুনেছি, আই-সি-এস পার্জিটার সায়েব যখন বাংলায় কথা কইতেন, তাঁর উচ্চারণ শুনে তাঁকে বাঙালী বলেই মনে হোতো। আমিও দেখেছি এবং অনেকে দেখেছেন—কলকাতাতেই বহুসংখ্যক কাশ্মীরী, মাড়োয়ারী, পাঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাতী আছেন যাঁরা অক্লেশে আমাদের মতন বাংলা বলতে পারেন। প্রসঙ্গত মনে পড়ে ' কে এন দীক্ষিতের কথা। ইনি ছিলেন মহারাষ্ট্রী, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর জেনারল পর্যন্ত হয়েছিলেন। কলকাতা যাদুঘরের যখন ইনি অধ্যক্ষ, তখন আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। দু-এক বৎসরের মধ্যে উনি এত ভাল বাংলা শিখলেন যে, জেলেপাড়ার সং-এর ছড়াগুলো অবাধ স-বুঝে পাঠ করতেন। চল্লিশ বৎসর পূর্বে দেখেছি, জৈন ইতিহাসের গবেষক 'পুরণচাঁদ নাহার শুধু ভাল বাংলা বলতেন তা নয়; তাঁর দপ্তরখানায় খাতাপত্র লেখা হোতো বাংলায়।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ অবলীলাক্রমে বাংলায় কথা কন্। প্রেসিডেন্সী কলেজের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তিনি ঢাকা তিন কোয়ার্টার ধরে বক্তৃতা দিয়ে গেলেন নির্ভুল বাংলাতে। সে-বক্তৃতা তিনি লিখে এনে পাঠ করেননি, সুতরাং বলা যায় যে ঐ ভাষা তাঁর মৌখিক ভাষা। তিনি ভূমিষ্ঠ হন ছাপরায়, যখন ছাপ্‌রা ছিল বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত। অতএব আমরা দাবী করতে পারি যে, তিনি বাঙালী, এবং এ-দাবী এক-বার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়ও করে-ছিলেন। পদ-কর্তা বিদ্যাপতির দেশ ছিল

বিহারে। মহাপ্রভুর আশীর্বাদ-পূত উড়িষ্যায় ও মণিপুরে কীর্তন-গানের প্রসাদে বাংলা ভাষা সহজবোধ্য হয়ে আছে। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী হরেকৃষ্ণ মহতাব দিব্যি বাংলা বলেন। প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেহরু বাংলা শিখেছেন কি-না জানি না, তবে তাঁর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা ভালই বাংলা বলতে পারেন। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথেরই প্রেরণায় ইনি বাংলা শিখেছিলেন শান্তিনিকেতনে ছাত্রী থাকার কালে।

অ-বাঙালীরা অনেকে বাংলা সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করেছেন। এ-ভাষার প্রচার-কার্যে সহায়তা করেছিলেন শ্রীরামপুরের মিশনারিরা, বাঙালীর প্রিয় কীর্তিবাসের রামায়ণ ছাপিয়ে ১৮০২ সালে। ৫০।৬০ বছর আগে অ-বাঙালীদের মধ্যে দুজন অনুপম বাংলা গদ্য রচনা করে গেছেন—'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও 'সখারাম গণেশ দেউস্কর। এ-যুগেও যদি যথার্থ ভাষা-প্রেমিক অ-বাঙালীরা রামেন্দ্রসুন্দর ও সখারামের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, তাঁরা আমাদের ভাষায় রাম-রাজ্য আনতে পারবেন, যেখানে সুন্দরকে সখা-রূপে পাওয়া যাবে। আজকের দিনে রাষ্ট্রীয় শাসনে যে "স্বরাজ" পেয়েছি বলে গর্ব করি, সেই "স্বরাজ" শব্দটি বাংলা-ভাষার মাধ্যমে সখারামেরই দান।

আগেই বলেছি, এ-ভাষা এখন ত্রিগুণাত্মক। মিষ্টতা, ভাব-প্রকাশনী শক্তি ও আনন্দ দানের ক্ষমতা এই তিন গুণের অপূর্ব সমাবেশে বঙ্গ-সরস্বতী আজ সত্য-শিব-সুন্দরের মূর্ত প্রতীক। ভারতের স্বরাজ-লাভ তখনই সার্থক হবে, যখন বঙ্গ-সরস্বতীকে ভারতী-রূপে পূজা করবো। রবীন্দ্রনাথের জন্মশত-বার্ষিকীতে ভারতীয়রা তাঁর স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান যদি জানাতে চান, তাহলে রাষ্ট্রীয় বাণী-মন্দিরে তাঁর মাতৃভাষাকে ভারত-ভারতী-রূপে প্রতিষ্ঠা করুন। যে-ভাষার খাদ্য-প্রাণে সৃষ্টিকর্তা যাদুমন্ত্র দিয়েছিলেন, যে-ভাষায় রবীন্দ্রনাথের মন শিশু-কাল থেকে পুষ্ট হয়েছিল, যে-ভাষায় বিশ্বের উন্নততম ভাষার সদ্‌গুণ বিরাজমান, যে-ভাষায় সম্যক্ জ্ঞান লাভ করবার উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী তাঁর শেষ জীবনে ব্রতী হয়েছিলেন, সে-ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা-রূপে গণ্য করলে তার স্বকীয় মহিমা প্রোজ্জ্বল হয়ে সারা ভারতে আলোক বিকীরণ করতে পারবে। তবেই সমগ্র ভারতে ঐক্যের এক-তানে রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষা গ্রহণীয় ও বরণীয় হবে, শুধু সরকারের দরবারে নয়, মানব-মনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের প্রয়োজনে।

শম্ভু সাহা কর্তৃক গৃহীত সমস্ত আলোকচিত্র দি ইণ্ডিয়ান টিউব কোম্পানী (১৯৫৩) লিমিটেডের (টাটা স্টুয়ার্টস এবং লয়েডস-এর যুক্তপ্রচেষ্টা) সৌজন্যে প্রকাশিত।

ঐ এল রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি —
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।

চালায় যে নাম নাহি কয়।
কেউ বলে যন্ত্র সে, আর-কিছু নয়।
মনোহীন বলে তারে, তবু অন্ধের হাতে
প্রাণমন সঁপি দিয়া বিছানা সে পাতে।
বলে সে অনিশ্চিত, তবু জানে অতি
নিশ্চিত তার গতি।

নামহীন যে অচেনা বারবার পার হয়ে যায়,
অগোচরে যারা সবে রয়েছে সেথায়
তারি যেন বহে নিশ্বাস —
সন্দেহ-আড়ালেতে মুখ-ঢাকা জাগে বিশ্বাস।
গাড়ি চলে
নিমেষ বিরাম নাই আকাশের তলে।

— রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তার অ আ ক খ

শশধর সিংহ

মানুষে মানুষের সম্বন্ধ নিয়ে মানবসমাজ সৃষ্টি। মানুষ একক সমাজ গঠন করতে পারে না। রবিনসন্ ক্রুসোকেও ম্যান-ফ্রাইডেকে পেতে হয়েছিল তার স্বপ্ন সমাজ গড়বার জন্য। সমাজ-গঠন কল্পে মানুষ সঙ্গিনী খোঁজে, বন্ধু চায়, সহকর্মীর প্রয়োজন বোধ করে। সমাজের ভিতর দিয়েই তার ব্যক্তিত্বের চরম প্রকাশ ও বিকাশ। সমাজের পুষ্টির জন্য তাই মানুষের এত প্রয়াস। এই প্রয়াস সে নিজের তাগিদেই করে থাকে, কারণ সমাজের মধ্যেই তার গৌরব, সমাজই তার শক্তির উৎস। সমাজ পঙ্গু হয়ে পড়লে পর, সেও পঙ্গু হয়ে পড়ে। যুগে যুগে অনেক জ্ঞানী গুণী সংসার ত্যাগ করে, সমাজের বাইরে মুক্তি খুঁজেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয়ই এইভাবে মোক্ষ লাভ করেছেন, কিন্তু মোটা-মুটি এও সত্য যে, এই সমাজ-বর্জনের ফলে সমাজ লাভবান হয়নি, বরঞ্চ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গুরুদেব লিখেছেন, "বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়...।" সংসারের অসংখ্য সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্বের মধ্য দিয়েই তিনি মুক্তির স্বাদ লাভ করতে চেয়েছিলেন। এই ছিল কবির প্রকৃত মুক্তির আদর্শ।

নারী-পুরুষের রাজা-প্রজার, শাসক-শাসিতের, গুরু-শিষ্যের, আর কত শত লোকের সম্বন্ধ নিয়েই সমাজের যত সমস্যা এবং এইগুলিই হল সমাজ-চিন্তার কাঠখড় —মূল উপাদান।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানবপ্রেমিক, আর মানুষের প্রতি প্রগাঢ় আত্মীয়তা বোধই ছিল তাঁর দেশপ্রীতির সত্যকার উৎস। কবি তাঁর দেশকে ও দেশবাসীকে গভীরভাবে ভাল-বাসতেন। ভারতবর্ষের পরাধীনতা, দুঃখ-দৈন্য, শিক্ষার অভাব, অস্বাস্থ্য, সামাজিক অধোগতি, নৈতিক অবনতি ও অনগ্রসরতা তাঁর মনকে চিরকাল পীড়া দিত। তিনি এসব বিষয় নিয়ে যৌবনকাল থেকে ভেবেছেন, অনেক লিখেছেন এবং এইভাবে সমাজ-চিন্তার এক অতুলনীয় ঐতিহ্য রেখে গেছেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে এইসব চিন্তার সমীচীনতা সম্বন্ধে চিন্তা-শীল ব্যক্তিমাত্রই নিশ্চিত একমত হবেন, যদিচ এইসবের বহুল আলোচনা হওয়া দূরে থাকুক, সমাজ-চিন্তা কবিগুরুর প্রতিভার যে একটা বিশিষ্ট, অতি প্রয়োজনীয় দান, তা দেশ আজ ভুলতে বসেছে।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চিন্তা আলোচনা করলে আশ্চর্য হতে হয় এই ভেবে যে, তিনি সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তার এমন স্বচ্ছতা ও সাহস পেলেন কোথা থেকে? বলা নিষ্প্রয়োজন যে, কবির জীবনকে তাঁর অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পরিবারের প্রভাব থেকে বিচ্যুত করে দেখলে পর, এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যাবে না। একদিকে রামমোহনের মুক্ত-চিন্তার আদর্শ গুরুদেবের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করে কবির পরিবারকে ধর্মান্ধতা ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে মুক্ত করল। অন্যদিকে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে কবি নিজে আর তাঁর পরিবারবর্গ বাংলা দেশে কৃষ্টির—সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও ললিতকলায় এক যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটাতে সমর্থ হলেন।

পরিবারের এই মুক্ত কর্মবহুল পরিবেশে মানুষ হওয়ার ফলে, রবীন্দ্রনাথ দেশকে ও দেশের সমস্যাকে এক অভিনব স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে শিখলেন এবং তাঁর নবার্জিত দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর চিন্তায় স্বাধীনতা এনে-দিল।

যুক্তির শিক্ষা ও স্বাধীন-চিন্তার আদর্শ তিনি পেয়েছিলেন প্রধানত রামমোহনের কাছ থেকে। কবি বলেছেন, রামমোহন পাশ্চাত্যকে নিঃসংকোচে, সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, কারণ প্রাচ্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটল ছিল। একথাটা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। ইংরেজী সাহিত্যের স্বাধীন-চিন্তার প্রভাব এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সমাজ-চিন্তার ছাপ কবির রচনায় সহজেই চোখে পড়ে। কবির অগ্রজ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। ফরাসী মুক্ত-চিন্তার সহিত কবির পরিচয়ের এ একটা কারণ হতে

শ্রীনিকেতন উৎসবে এলমহার্স্ট ও রবীন্দ্রনাথ। এলমহার্স্টের পিছনে নির্মলকুমারী মহলানবিশ রবীন্দ্রসদনের সৌজন্যে

পারে। কিন্তু এই বিষয়ে শেলীর আদর্শ ও প্রভাব যে রবীন্দ্রনাথের মনের উপর গভীর ছায়াপাত করেছিল, তার নজিরের অভাব নেই।

রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চিন্তার প্রধানত দুটো দিক সহজেই চোখে পড়বে। একটা হল এর বিশ্লেষণের বা দার্শনিক দিক, আর অন্যটা সামাজিক সমস্যার সমাধানের বা ব্যবহারিক দিক। কবির গঠনমূলক সমাজ-দৃষ্টি এই দুই ভিত্তির উপর স্থাপিত। তিনি চিন্তা ও চিন্তার প্রয়োগকে কখনও পৃথক করে দেখেননি। চিন্তা ও কর্মের মিলন সাধনই ছিল তাঁর পূর্ণতার আদর্শ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সমাজকে বিচার করতে গিয়ে, তিনি দেখতে পেলেন যে, ভারতীয় সভ্যতার সত্যকার ভিত্তি হল দেশের গ্রাম্য সমাজ। এই সামাজিক কাঠামোই ছিল ভারতবর্ষের ধনোৎপাদন, নানামুখী প্রচেষ্টা, কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রকৃত লীলাক্ষেত্র। এই হেতু ভারতের সত্যকার স্বাধীনতা ছিল গ্রাম-কেন্দ্রী এবং দেশের সামাজিক প্রাণশক্তিকে অব্যাহত রাখাই ছিল ভারতের চিরন্তন সাধনা।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, অতীতে বারম্বার ভারতবর্ষ বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু বিদেশী আগন্তুকরা কালে সবাই হিন্দুস্থানকে আপন দেশ বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং ভারতীয় সামাজিক আদর্শকে শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেছিলেন। "শকহূন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন" ইতিহাসের দিক দিয়ে যেমন সত্য, সমাজ-দৃষ্টির দিক দিয়ে হয়ত তদপেক্ষা অধিকতর সত্য।

অতীতে বিজাতীয় পরাধীনতা ভারতীয় সমাজকে স্পর্শ করেনি এবং স্পর্শ করেনি বলেই দেশের ধনোৎপাদন, কৃষ্টি ও সভ্যতার অবারিতগতি মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ দিন পর্যন্ত হিন্দুস্থানকে সুজলা সুফলা করে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। তখন পর্যন্ত ধনৈশ্বর্যের জন্য ভারতবর্ষের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অটুট ছিল। আশ্চর্য হবার কি আছে যে, মুঘল শক্তির পতনের সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপ থেকে এসে নানা জাতি পঙ্গপালের মত দেশকে ছেয়ে ফেলেছিল। ধনলোভ ও ধনলাভের আশাই ছিল এ দেশের প্রতি এদের একমাত্র আকর্ষণ।

এদের মধ্যে সর্বশেষে এল ইংরেজ। অন্যান্য য়ুরোপীয়দের মত এরাও এখানে বাস করতে আসেনি। এদের সমাজ-দৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ অভারতীয়। দেশের মৌলিক সামাজিক আদর্শের প্রতি এদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। হিন্দুস্থানের ধন-দৌলতকে যথাসম্ভব শীঘ্র সমুদ্রের অপর প্রান্তে, স্বদেশে নিয়ে যাওয়াই ছিল এদের প্রধান স্বার্থ।

ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব ঘটল।

এর ফলে, ইংরেজদের শিল্পোৎপাদনের ক্ষমতা দ্রুত বেড়ে চলল। এখন থেকে এরা ভারত-জাত কাঁচামাল নিয়ে তার পরিবর্তে নিজেদের প্রস্তুত নানাবিধ সস্তা মাল ভারতবর্ষে চালাতে শুরু করল। এই প্রতিযোগিতায় দেশের তাঁতী ও অন্যান্য গ্রাম শিল্পীরা টিকে থাকতে পারল না।

এই সংঘাতের পরিণতি হল এই যে, ভারতীয় গ্রামের ধনোৎপাদনের উৎস শুকিয়ে গেল, আর ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা চুরমার হয়ে গেল। বর্তমান যুগের ভারতীয় দৈন্যাদুর্দশা, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা ও অনগ্রসরতার সূত্রপাত হল এই পরিপ্রেক্ষিতে। ভারতের পরাধীনতা এক্ষণে এক নূতন ভীষণ রূপ ধারণ করল। অতীতে ভারতবর্ষ পরাধীন হয়েছে সত্য, কিন্তু কখনও এমন নিঃসংশয় দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়নি। আর হয়নি বলেই ভারতবাসীরা চিরকাল তাদের আত্মসম্মান রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। এই হল গুরুদেবের প্রধান আবিষ্কার ও তাঁর সমাজ-চিন্তার মৌলিক, দার্শনিক দিক।

বলা বাহুল্য যে, সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ করেই কবি ক্ষান্ত হলেন না। তাঁর সক্রিয় মন চাইল এর একটা গঠনমূলক সমাধান। এই প্রয়াসের একটা দিক হল দেশে আত্মশক্তির উদ্বোধন, অন্যদিকে দারিদ্র্যের অপসারণ। কবির সমাজ-চিন্তার এই দিকটাকে আমি আগেই ব্যবহারিক দিক আখ্যা দিয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ কায়মনোবাক্যে দেশের স্বাধীনতা চাইতেন। কিন্তু বিশেষত স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনার অভিজ্ঞতার ফলে তিনি মর্মে মর্মে বুঝতে শিখলেন যে, দেশের স্বাধীনতা রাজনৈতিক আন্দোলনও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে আসবে না। উত্তেজনার ফল ক্ষণস্থায়ী। উত্তেজনা মনকে শ্রান্ত করে মাত্র। কিছু গঠন করে না। তাই এই মর্মে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কবি স্বদেশী সমাজ, রাজা ও প্রজা, সমাজ ও শিক্ষা প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁর সমাজ-চিন্তার মৌলিক আদর্শগুলি ব্যক্ত করলেন। পরবর্তী যুগে, অসহযোগ আন্দোলনের সময়, সত্যের আহ্বান প্রবন্ধে তিনি আবার তাঁর সমাজ-চিন্তার পুনরাবৃত্তি করলেন। ১৯৩০ সালে লেখা রাশিয়ার চিঠিতেও তিনি একই প্রকার মতামত প্রকাশ করলেন।

তিনি দেখালেন যে, ইংরেজ রাজত্বের অবসান হবে, দেশের সত্যকার স্বাধীনতা আসবে প্রধানত দেশের আত্মশক্তির উদ্বোধনের দ্বারা, গ্রামগুলিকে পুনর্জীবিত করে ও সেখান থেকে দারিদ্র্য, অজ্ঞান ও অস্বাস্থ্য নির্বাসিত করে। কারণ ভারতের চিরন্তন শক্তির এ ভিত্তি হল গ্রাম, যেখানে দেশের অধিকাংশ লোক বাস করে। হাল-

ফ্যাসানী রাজনীতি হল শহুরে। এর সংগে গ্রামবাসীর জীবনের যোগসূত্র অতি ক্ষীণ। দেশের আসল স্বরাজ হবে গ্রামের স্বরাজ এবং এই স্বরাজেই কবি আস্থা স্থাপন করতেন। কিন্তু গ্রামের স্বরাজ অর্থে তিনি গ্রাম্যতার জয়-জয়কারে বিশ্বাস করতেন না। তিনি গ্রাম্যতার বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন যে, গ্রাম্যতার সংগে বর্তমান যুগের কোন সম্পর্ক নেই। এ হল একপ্রকারের কুসংস্কার, বর্বরতার লক্ষণ।

তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা ও বিবিধ ঘটনা-মূলক সামবায়িক কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সংগীতে, আনন্দের প্রাচুর্যে গ্রামবাসীদের সুপ্ত মনকে জাগিয়ে তুলতে। তিনি মনে করতেন যে, যেদিন এইভাবে গ্রাম জাগ্রত হয়ে উঠবে, সেদিন দেশ সত্য সত্যই জাগ্রত হবে। এ কথাটা যে কত সত্য তা আজ দেশের চতুর্দিকে তাকালেই বুঝা যাবে।

দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে, দেশব্যাপী অনেক কর্মের সূচনা হয়েছে এবং এর জন্য অর্থেরও অভাব নেই। কিন্তু এইসব কর্মে জনগণের আনন্দ কই, উৎসাহই বা কই? আর একথাও কারো জানতে বাকী নেই যে, জাতীয় উন্নয়নে যতদিন উৎসাহের বন্যা প্রবাহিত না হবে ততদিন সব সরকারী প্রচেষ্টা কাগজকলমেই থেকে যাবে, সক্রিয় হবে না। দেশের সামনে আজ এই হল প্রধান সমস্যা।

কবি সবসময়ে বলতেন যে, শিক্ষার অভাবে ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ই অচল হয়ে থাকে। এই অচল অবস্থাকে দূর করতে হলে দেশব্যাপী শিক্ষার বিস্তার চাই। এই প্রসংগে মনে পড়ে ১৯৩০ সালে রাশিয়া থেকে তাঁর লেখা নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পঙক্তি কবি লিখেছেন, "রাশিয়ায় পা বাড়িয়েই প্রথমেই চোখে পড়ল, সেখানকার যে চাষী ও শ্রমিক সম্প্রদায়, আজ আট বৎসর পূর্বে, ভারতীয় জনসাধারণেরই মতো নিঃসহায় নিরন্ন নির্যাতিত নিরক্ষর ছিল, অনেক বিষয়ে যাদের দুঃখভার আমাদের চেয়ে বেশী বই কম ছিল না, অন্তত তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এ অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে উন্নতি লাভ করেছে দেড়শ বছরেও আমাদের দেশে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও তা হয়নি। আমাদের দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ স্বদেশের শিক্ষা সম্বন্ধে যে দুরাশার ছবি মরীচিকার পটে আঁকতেও সাহস পাইনি এখানে তার প্রত্যক্ষ রূপ দেখলুম দিগন্ত থেকে দিগন্তে বিস্তৃত।"

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চিন্তার একটা বিশেষ দিক হল শিক্ষা। শিক্ষা বিস্তার করে, জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাকে এক নূতন রূপ দান করে তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় সমাজকে পুনরায় সক্রিয়, সচল করতে এবং এইভাবে ভারতীয় ঐক্যেরও স্বাধীনতার ভিত্তি সুদৃঢ় করতে।

শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা করে কবি নিজের শিক্ষার আদর্শকে রূপায়িত করতে সযত্ন হয়েছিলেন। এই তিনটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানই তাঁর সমাজ-চিন্তার দার্শনিক দৃষ্টি-ভংগীর সহিত অংগাংগিভাবে জড়িত। শান্তিনিকেতনের উৎপত্তি হয় তাঁর বাল্যজীবনের বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতায়। তিনি ঐ সময়েই স্থির করেছিলেন যে, পরজীবনে তিনি তাঁর ও নিকটবন্ধুদের পুত্রকন্যাকে গতানুগতিক শিক্ষায়তনের সৌন্দর্যহীন, প্রাণহীন, আনন্দহীন শিক্ষা-ব্যবস্থার পেষণ থেকে নিষ্কৃতি দেবেন। তাই তিনি ১৯০১ সালে গুটিকয়েক ছেলে নিয়ে শান্তিনিকেতন স্থাপন করলেন, প্রকৃতির কোলে, স্বাধীনতা ও কৃষ্টির পরিবেশে শিক্ষার আসন পাতলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় কবি জাতীয়-বিদ্যালয় আন্দোলনের সংগে নানাভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি ঐ সময়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিক্ষা সমস্যাকে শিক্ষার বিশিষ্ট দৃষ্টিভংগী থেকে বিচার না করে জাতীয় আন্দোলনের বাহন হিসেবে দেখলে পর শিক্ষার সত্যকার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হবে। মানুষের মনকে মুক্ত করা ও তাকে আত্ম-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করাই শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ। এইদিকে মন না দিয়ে জাতীয়-বিদ্যালয় আন্দোলনের যুগে বাংলার নেতারা ভাবলেন যে, গতানুগতিক সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ শিক্ষায়তন স্থাপন করেই বাংলায় শিক্ষা-সমস্যার সমাধান হবে। ফলে হল এই যে, জাতীয় আন্দোলনের

উত্তেজনার মাত্রা কমে আসার সংগে সংগে এইসব জাতীয় বিদ্যালয় অর্থ, উৎসাহ ও জনসাধারণের অনুমোদনের অভাবে একে একে উঠে গেল। গুরুদেব পূর্বেই দেশকে এ সম্বন্ধে সতর্ক করেছিলেন।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কেবলমাত্র যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজই টিকে রইল। কারণ অন্যান্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ইহা দেশের এমন একটা প্রয়োজন সাধন করতে পারল যা অন্যগুলি করতে সমর্থ হয়নি।

এই উদাহরণ থেকে এই কথা প্রমাণ হয় না যে, গুরুদেব কেবল অর্থকরী বা প্রয়োজনীয় শিক্ষায় বিশ্বাস করতেন। কিন্তু সংগে সংগে একথাটাও স্বীকার করতে হবে যে, প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে কোন শিক্ষাব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত টিকতে পারে না। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা এই সত্যের সাক্ষ্য দেয়।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়, স্বদেশী যুগের মত, মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে, দেশের "শয়তানী" সরকারী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ শত শত ছাত্র-ছাত্রীরা ইস্কুল কলেজ ছাড়তে শুরু করল। গুরুদেব এই বিষয়ে মহাত্মাজীর সংগে একমত হতে পারেননি। তিনি বললেন, শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা না করে ইস্কুল কলেজ ছাড়তে বলা অনুচিত। এই প্রসংগে একটা ঘটনা চিরজীবন আমার স্মরণ থাকবে। এই সময়ে আমাদের অনেকে কলেজ ছেড়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাই। গুরুদেব আমাদের লক্ষ্য করে বললেন, "ওরে, শিক্ষাই তোদের একমাত্র অস্ত্র, সেটাকেই তোরা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে এলি?" শিক্ষা-ব্যাপারে যাঁরা অসহযোগ আন্দোলনের ভুক্ত-ভোগী, তাঁরা একথাটার তাৎপর্য সহজেই বুঝতে পারবেন। অল্প বয়সে সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তখন কথাটা ভাল করে বুঝিনি, ভালও লাগেনি।

স্বদেশী আন্দোলনের, বিশেষত অসহযোগ আন্দোলনের পর কবি ক্রমেই উপলব্ধি করলেন যে, শান্তিনিকেতনের শিক্ষা দেশের বিরাট সামাজিক জীবনের সংগে জুড়ে না দিতে পারলে তাঁর ছাত্রছাত্রী-দের শিক্ষা অসমাপ্ত থেকে যাবে। ১৯২১ সালে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার এই হল একটা পরোক্ষ কারণ। তিনি চাইলেন প্রথমত শ্রীনিকেতনে শিক্ষা ও বিবিধ সামবায়িক প্রচেষ্টার মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের এক ব্যাপক আদর্শ দেশের সামনে তুলে ধরতে। সংগে সংগে তিনি শান্তিনিকেতনের শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও সংকীর্ণতার গণ্ডি থেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হলেন। আর সমবায়কে কর্মের কেন্দ্রস্থলে রেখে দলাদলির বোঝা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের অন্ধতা থেকে মুক্ত করে দেশের শক্তির ভিত্তিকে পাকা করতে চাইলেন। গুরুদেব বলতেন যে, যাদের আত্মপ্রত্যয়ের অভাব, তারা অন্য কাউকে বিশ্বাস করতে সমর্থ হয় না। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনই হল আত্মশক্তি উদ্বোধনের প্রথম সোপান ও সামবায়িক নীতির গোড়ার কথা। তাই তাঁর সমাজ-চিন্তায় সমবায়ের নৈতিক দিকটার উপর কবি চিরকাল এত জোর দিয়ে গেছেন। তিনি বারবার বলেছেন যে, মিলে মিশে কাজ করবার অনিচ্ছা বা প্রবৃত্তির অভাবই হল
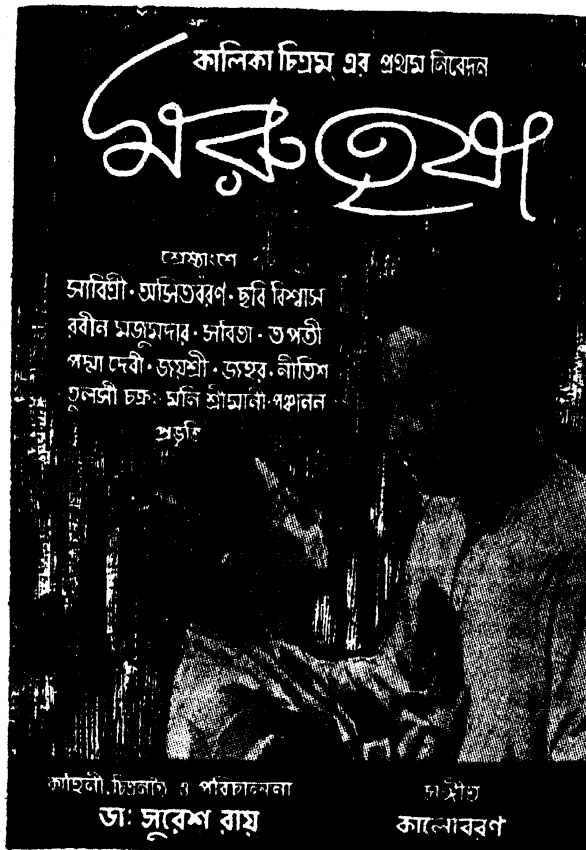
হে তরু, এ ধরাতলে রহিব না যবে
সেদিন বসন্তে নব পল্লবে পল্লবে
তোমার মর্মরধ্বনি পথিকেরে কবে:
ভালোবেসেছিল কবি বেঁচে ছিল যবে।।
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

When I am no longer on this earth, my tree;
let the ever-renewed leaves of thy spring
murmur to the wayfarers:
"The poet did love while he lived."
Rabindranath Tagore

8th November
1926

আমাদের প্রধান জাতীয় সমস্যা এবং এর সমাধানের উপরেই আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে।

বিশ্বভারতীর জন্ম হল একই সময়ে। কবির শিক্ষার আদর্শের তৃতীয় দিক তথা বিশ্বমৈত্রী রূপায়িত হল বিশ্বভারতীতে। "যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেক নীড়ম্", অর্থাৎ যেখানে বিশ্ব এক নীড়ে বাস করবে, এই হল বিশ্বভারতীর চরম আদর্শ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর গুরুদেব বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্ব-শান্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সজাগ হলেন এবং তিনি তাঁর সাধ্যানুযায়ী এই মৈত্রী-সাধনে বদ্ধপরিকর হলেন।

কবির মতে বিশ্বের অশান্তি, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে মনোমালিন্য প্রধানত পারস্পরিক অজ্ঞানের সৃষ্টি। এই হেতু, তিনি স্থির করলেন এমন একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে, যেখানে মানুষ জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে পরস্পরকে জানবার ও বুঝবার সুযোগ পাবে এবং পরস্পরের কৃষ্টিকে জানবার ও বুঝবার সুযোগের ভিতর দিয়েই ক্রমে অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হবে এবং মানব সমাজের সম্প্রীতি বর্ধিত হবে, আর বিশ্বে শান্তি আসবে। কবি এইভাবে শান্তি-নিকেতনকে বিশ্বসমাজে স্থান গ্রহণ করবার পথ প্রশস্ত করে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের গভীর মানবিকতা এক্ষণে বাস্তবরূপ ধারণ করল।

রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথের কোন আস্থা ছিল না। তিনি কোনকালে বিশ্বাস করেননি যে, আইনের কচকচি, মজলিশী রাজনীতি বা সম্মুখ সংগ্রামের দ্বারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আসবে, আর ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটবে। তিনি জনশক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেন এবং জনজাগরণ দ্বারা উদ্বুদ্ধ দেশের আত্মশক্তির বিকাশের মধ্যে দিয়েই অবশেষে দেশের পরাধীনতা ঘুচবে বলে কবি চিরকাল আশা পোষণ করে এসেছিলেন।

এই কারণে অসহযোগ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে নেতা বলে বরণ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী ছিলেন গণ-নেতা এবং তাঁর আদর্শ ও অনুপ্রেরণায় তিনি সমগ্র দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। তথাপি স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, গুরুদেব অসহযোগ আন্দোলনকে সর্বতো-ভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর কবি-প্রকৃতি সহযোগে বিশ্বাস করত, নঙর্থক বলে অসহযোগনীতিতে আদৌ আস্থা স্থাপন করতে পারেনি। কবি ছিলেন যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান-বিশ্বাসী। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে তিনি বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিতেন। দৈবযোগে বা আকস্মিকে তাঁর কোন বিশ্বাস ছিল না। তিনি বলতেন যে, বুদ্ধিকে খর্ব করে বা গৌণস্থান দিয়ে কোন সামাজিক আন্দোলন তার অভীষ্টে পোঁছাতে পারে না। অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করা ও উত্তেজনার স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়ার তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, সত্যভাবে পেতে হলে, দেশকে জয় করতে হবে, দৈহিক, আত্মিক ও সর্বপ্রকারের শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও প্রয়োগ করে। সুতরাং স্বদেশী যুগে জাতীয় আন্দোলনের নানাবিধ মৌলিক ত্রুটি সম্বন্ধে যে-সব কথা বলে-ছিলেন, ১৯২১ সালেও পূর্বেকার সমালো-চনার পুনরাবৃত্তি করলেন। সংগ্রামের মাতামাতিতে স্বদেশী যুগে কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করেনি। তাই তিনি লিখলেন, "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে।" পরবর্তী যুগেও কবিকে একলাই চলতে হয়েছিল এবং একই কারণে।

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতার দাম দিতে হল দেশকে বিভক্ত করে। আর আজও ভারতীয় সমাজ সংহত হয়নি। অনৈক্যের বীজ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। ক্ষুদ্র স্বার্থেরই আজ জয়-জয়কার।

অসহযোগ আন্দোলনের যুগে গুরুদেব মহাত্মাজীর সহিত বাদানুবাদে যে সমস্ত আশংকা প্রকাশ করেছিলেন এবং যে যে সমস্যার কথা ভেবে দেশের ভবিষ্যত সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন, তার সবগুলিই আজও বিদ্যমান এবং এদের আশু সমাধানের এখনও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

মহাত্মাজী ছিলেন কর্মযোগী, গুরুদেব ছিলেন ভাবুক। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রগাঢ় প্রভেদ সহজেই বোধগম্য হবে, বিশেষত তাঁদের কাছে, যাঁরা কবি—মহাত্মার বাদানুবাদ ও চিঠিপত্রের সহিতও সম্যকভাবে পরিচিত আছেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে গভীর মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও তাঁদের শ্রদ্ধার সম্বন্ধ কখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি। কবিকে মহাত্মাজী গুরুদেব বলে সম্বোধন করতেন এবং আজ সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁকে গুরুদেব বলেই জানে।

আরও অনুধাবন করার কথা এই যে, মহাত্মাজীর অনেক চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে গুরুদেবের কাছ থেকেই এসেছিল। উদাহরণ স্বরূপ "সর্বোদয়" প্রচেষ্টা উল্লেখ করা যেতে পারে। "বুনিয়াদি" শিক্ষার আদর্শের জন্যও দেশ গুরুদেবের কাছেই ঋণী।

ভারতবর্ষ জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, প্রাণে এবং বিবিধ কর্মের প্রচেষ্টায় উদ্দীপিত হয়ে উঠুক, এই ছিল কবির দেশের স্বাধীনতার আদর্শ। তিনি দেশবাসীর সামনে রেখে গেছেন আত্মনির্ভরশীলতার এক মহান, উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চিরজীবন তিনি দেশকে এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করবার বিপুল প্রয়াস করে গেছেন। পরমুখাপেক্ষী হয়ে ভারতবাসী কখনই সত্যকার স্বাধীনতা লাভ করবে না। তিনি এই মর্মে দেশকে বারবার সতর্ক করে গেছেন। বর্তমানকালে এই সতর্কবাণীর প্রয়োজনীয়তা ও সমীচীনতা সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।
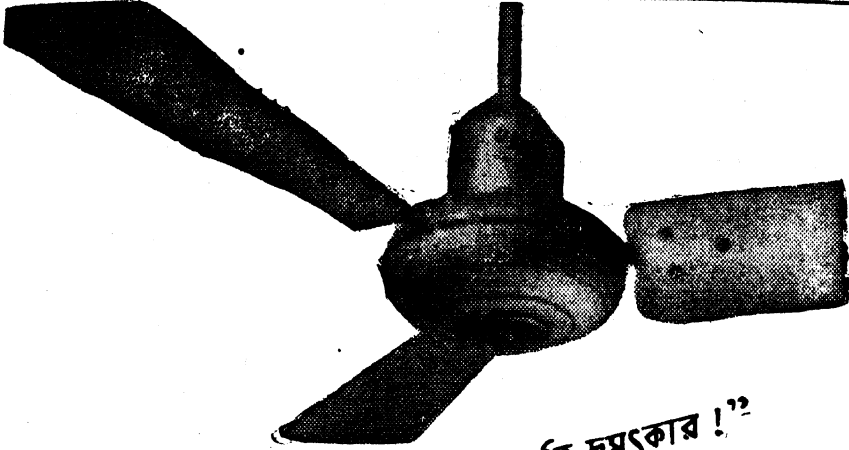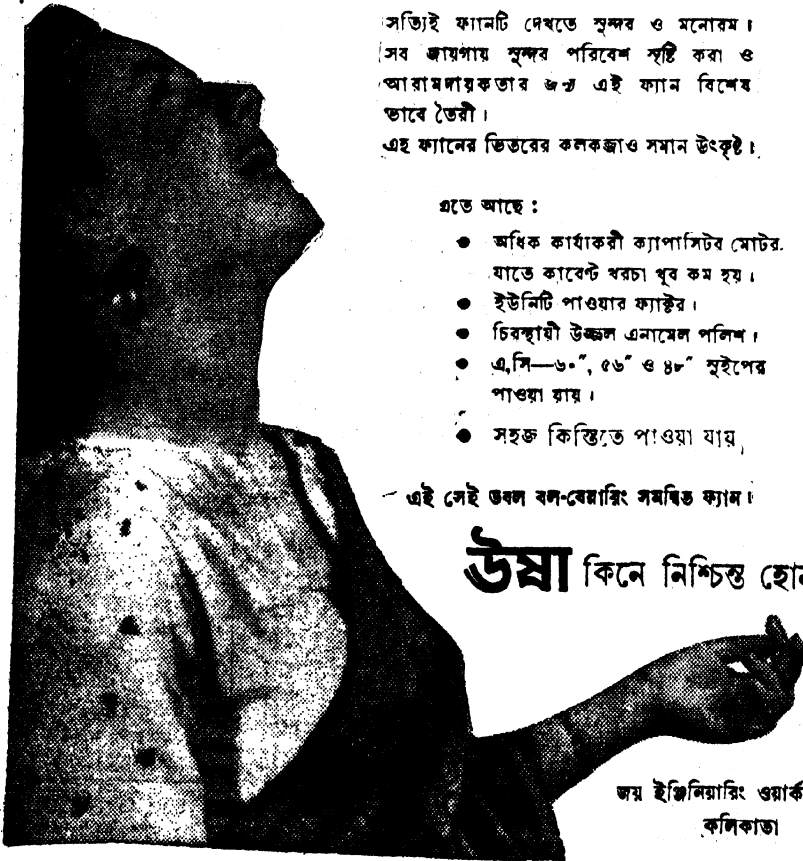
সমাহিত কবি

রিচার্ড চার্চ

১৮৭৭ সালে, ষোল বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে এসেছিলেন। তাঁর নিজ-দেশ বঙ্গদেশে প্রাচুর্যের কবি হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করে থাকলেও উত্তর সাগরের এই দূরতম দ্বীপে এই বিচিত্রতর দেশে তিনি সেদিন এক অচেনা বিদেশীই ছিলেন। সে দেশের অধিবাসীরা ছিল স্বভাবে রাশভারী, অনুচ্ছ্বাসী এবং তৎকালে ইংলণ্ডের পরিস্থিতিও ছিল খুব শীতল। জানি না সে দেশে উপস্থিত হয়ে এই তরুণ প্রতিভার মনে তৎকালে কোন্ প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল! অথচ সেখানে সেদিন তিনি অসুখী ছিলেন না। তাঁর জীবন স্মৃতিতেই এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। তিনি প্রথমে ব্রাইটনের স্কুলে পড়াশুনো করেছিলেন, পরে লণ্ডনের বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে, আর সে সময় তিনি কোন এক চিকিৎসকের বাড়িতে থাকতেন। এ তাঁর এক পরম সুখ-স্মৃতি যে তিনি হেনরী মরলের মত বিখ্যাত, প্রভাবশালী এক ব্যক্তির কাছে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। যিনি তাঁকে সপ্তদশ শতকী গদ্য, বিশেষ করে নরউইচের ডক্টর টমাস ব্রাউনের 'রিলিজিও মেডিসি' অধ্যয়ন করিয়েছিলেন। শব্দ সৌন্দর্যের বিস্ময়কর এই রচনা তাঁকে নিশ্চিত বিমুগ্ধ করে থাকবে, কেননা কবির পরবর্তী জীবনের সাহিত্যের সঙ্গে এই গদ্যরীতির ছন্দময়তার আশ্চর্য আনুকূল্য লক্ষ্য করা যায়। এলিজাবেথীয় রীতিতে এ যেন সুশৃঙ্খল এবং প্রেরণাময় ভাষার আশ্চর্য উন্মীলন। এ ভাষা যেন ভাবময় চিন্তারাশির কাঠামো, শব্দ-সমষ্টির জ্বালানিতে প্রোজ্জ্বল এক অগ্নিকাণ্ড। এই রীতিতেই সেদিন গড়ে উঠেছিল ষোড়শ আর সপ্তদশ শতকের ইংরিজি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এই রীতিকে আমার প্রাক-বৈজ্ঞানিক রীতি বলাই উচিত, কেননা এ ত শুধু বিষয়-ঘটনার সমন্বয়ের উপর স্থিত ছিল না, এক অতীন্দ্রিয় ভাববাদের উপর ছিল প্রতিষ্ঠিত; যে ভাববাদ যে কল্পনাবিলাস নিয়ে কবিদের নিয়ত কারবার। বিজ্ঞানের চেয়ে এই ভাববাদ কিছু কম সত্য ছিল না, যদিও পশ্চিম য়ুরোপে এই ভাবাদর্শ পরিত্যক্ত হয়েছিল বৈজ্ঞানিক রীতি-নীতি গবেষণা ও বাস্তব নিশ্চিতির তাগিদে।

এ সম্পর্কে আরও অনেক কিছু বলা যায়। কিন্তু আমি ভারতের মহান কবির ব্যক্তিত্ব ও কর্মের সঙ্গে এর যোগসূত্রটির উল্লেখ করব, পূর্ণ স্বাজাত্য প্রতিভা হিসাবে যে মহান কবি,—তাঁর দেশবাসীর জীবন ও লক্ষ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে একতাকে সার্থক করে তুলবার জন্যে বাস্তবানুগ এবং আধ্যাত্মিক পথ বেছে নিয়েছিলেন—যা প্রকৃতিতে এবং রাজনৈতিক মূল্যায়ণে পশ্চিমী। একজন মানুষের মধ্যে দ্বিবিধ শক্তির এই আবির্ভাব তাকে প্রভাবশালী করেছিল, তিনি শুধু ভারতের সমাজ-সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ ছিলেন না, আপনাদের এবং আমাদের ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য-জগতের ভাব-প্রচারক হিসাবে তিনি ছিলেন অগ্রণী-পুরুষ। অন্যান্য আরও যে-সব মহান কবি আপনাদের সাহিত্যকে গরীয়ান করেছেন—তাঁদের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথকে তুলনা করতে আমি দ্বিধান্বিত। আপনাদের ভাষায় সম্যক জ্ঞান ব্যতিরেকে সে কাজ আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এ কথা সত্য, প্রায় দেড়'শ বছর পূর্বে ইংলণ্ডে আপনাদের দেশের প্রথম চিন্তানায়ক রামমোহন রায়ের দ্বারা সে কাজের সূচনা হয়েছিল—রবীন্দ্রনাথ সেই মহৎ কর্মকাণ্ডেরই ধারাবাহক। আপনাদের ও আমাদের বিগত তিন'শ বছরের সম্মিলিত ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে, ইংরাজরা ভারতীয় জীবন সম্পর্কে যতখানি অজ্ঞ, ভারতীয়রা ইংরাজদের জীবন সম্পর্কেও ঠিক ততখানি অজ্ঞান। এমন কি আজকের দিনেও, ধরুন আমার নিজের কথাই বলি, এ-দেশ সম্পর্কে অত্যন্ত স্বল্প জ্ঞান, এখানকার জীবন, সামাজিক পরিস্থিতির জটিলতা, চিন্তাধারা ইত্যাদি সম্পর্কে অত্যন্ত নগন্য ধারণা নিয়ে আমরা ভারতে এসেছি। আর এই অজ্ঞতার জন্যে আমি কিছু বলতে অতিশয় কুণ্ঠা বোধ করছি। এইজন্যে আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি, আপনারা উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে আমাদের দেশে আসুন, আমাদের শিক্ষা দিন সেই অটল বিশ্বাসে, যে বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে আমাদের মহান কবি টমাস হার্ডি বলেছিলেন, 'আন্তর্জাতিক

তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ
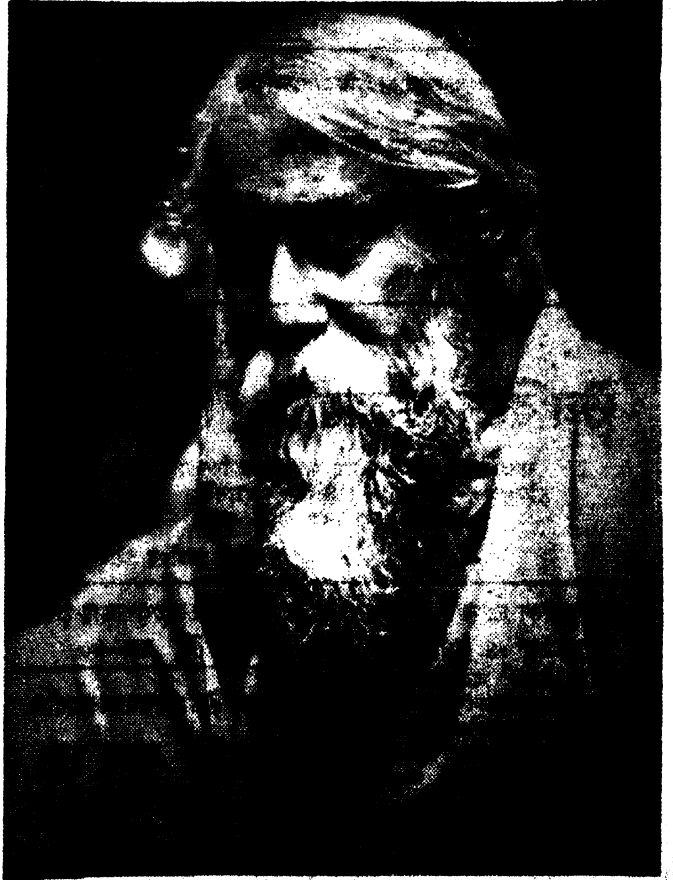
ভাব আর চিন্তা বিনিময়ের দ্বারাই একমাত্র জাগতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব।'

আমার স্থির বিশ্বাস, আমাদের বিনম্র কবি টমাস হার্ডির এই উক্তির মধ্যে দিয়ে যে উদ্দেশ্য পরিব্যক্ত হয়েছে,—রামমোহন রায় এবং রবীন্দ্রনাথের মত মানুষেরাই সেই উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

এই জন্যেই আমি, ভারতে আসা এবং শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারাকে এক বিশেষ সুযোগ বলে গণ্য করছি। আমরা ইতিহাসের সেই লগ্নে এখন পৌঁছিয়েছি, বিশ্বব্যাপী মানবজাতির ইতিহাসে যখন পুনর্গঠন শুরু হয়েছে। এ অত্যন্ত জরুরী কথা যে এখন আমাদের পরস্পরকে জানতে হবে, উৎসাহিত হতে হবে সেই কাজে, যার দ্বারা মানুষের আবির্ভাবের সূচনা-পর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন প্রাচীরকে ধূলিসাৎ করতে পারি। প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের মাঝখানে এই প্রাচীর সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে। যদি আমরা সকলে বেঁচে থাকতে চাই, তাহলে রাজনৈতিক দ্বিধা সংকোচ সন্দিগ্ধতা ত্রাস যে করেই হোক বিনাশ করতে হবে, যার ফলে জীবনের নতুন পথে আমরা পরস্পরকে দেওয়া-নেওয়ার সহজ বন্ধুত্বে গ্রহণ করতে পারি। জাতি বর্ণ দেশ মানসিক ও দৈহিক সমস্ত বৈষম্য সত্ত্বেও নব জীবনে সকলের জন্মাবে সমান অধিকার।

আমি বিশ্বাস করি এই অভিলষিত কর্মযজ্ঞে রবীন্দ্রনাথের মত মানুষেরা যুগ-প্রবর্তক। আজকের দিনে য়ুরোপীয়দের এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই তাঁকে বিচার করা উচিত। তাঁর সৃষ্টির বিস্ময়কর বৈচিত্র্য সৌন্দর্যকে সম্যক উপলব্ধি করি এত গুণান্বিত ক্ষমতা আমার নেই, তার কারণ নিজে যৎসামান্য যা তিনি ইংরিজিতে অনুবাদ করেছিলেন সমগ্র সম্ভারের কাছে তা অকিঞ্চিৎকর। তিনি ইংরিজি ভাষার ছন্দময়তাকে আয়ত্ত ও তার রুক্ষ শক্তি-মানতাকে রক্ষা করেছিলেন এবং তারই সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন ভারতীয় কল্পনা-ভাবনা-দ্যোতনার। ধর্মের কাঠামো ও ব্যক্তি-সম্পর্ককেও তিনি করেছিলেন নিয়ন্ত্রিত। এ খুব কম কৃতিত্বের ব্যাপার নয়। এর দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে ভাববাদী ও কর্ম-যোগীর ভূমিকা, প্রতিভার এই দুই ধারার প্রকাশ একই ব্যক্তির মধ্যে ঘটেছিল। তাঁর রবীন্দ্রনাথ নাম সুপ্রযুক্ত, যে নামের অর্থ দিনের আলোক-নির্যাস, স্বাস্থ্যবহ সূর্য—যা ব্যাধিগ্রস্ত তমসা আর সংস্কার অপসারণ করে।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে সম্মিলিত এই দ্বৈত ধারাকে এখন বিচার করে দেখতে চাই। ভূয়োদর্শী কবির পক্ষে একই সঙ্গে সমানে আর্থিক ও সামাজিক সংস্কারকের ভূমিকায় কাজ করা কি ভাবে সম্ভব হয়েছিল, চরিত্রের এই দুই দিকই তাঁকে কাজ করিয়ে নিয়েছিল, তাঁকে এনে দিয়েছিল খ্যাতি, এক অক্ষয় স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল শুধু তাঁর স্বদেশ নয় সমগ্র বিশ্বে। সে মন্ত্র কি যা তাঁকে কর্তৃত্ব দিয়েছিল, যার শক্তিতে ভারতের ধ্বংসাত্মক ঝঞ্ঝার প্রতিপক্ষ হয়ে তিনি দাঁড়াতে পেরে-ছিলেন একদা, শুধু ভারতেরই বা কেন, তাঁর জীবদ্দশায় সমগ্র বিশ্বের ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভের বিপক্ষে, যে ঝড় পৃথিবীর দুই মহাযুদ্ধের, যা পশ্চিমের প্রভুত্ব আর প্রাচ্যের সামন্ত-তান্ত্রিক নেতৃত্বকে বিচূর্ণ করেছিল—সেই ঝড় আজও ঘনীভূত হচ্ছে। অবশ্য সূক্ষ্ম-দর্শীরা তার মধ্যেই দেখতে পান মুক্ত আকাশের ইশারা। রবীন্দ্রনাথের জীবনে—

তাঁর জীবনের সায়াহ্নেও এ ধরনের কোন আলোর রেখা দেখা দেয়নি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪১ সালে কবির লোকান্তর কালে এই ঝড় তার নিকৃষ্টতর আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু এই ঝঞ্ঝা কি রুদ্ধ করতে পেরেছিল তাঁকে? না। তাঁর সত্তার স্থৈর্য একেও অতিক্রম করেছিল অনায়াসে আর তাঁর আবির্ভাবের মতই একদা তিনি অন্তর্ধান করেছিলেন। তিনি ছিলেন সেই মহামানব, যাঁর হৃদয় ও আবেগ—সকলই ছিল স্থির লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর, যে লক্ষ্য,—হতাশা প্রতিকূলতা ও সমালোচনায় কখনো ভ্রষ্ট বা বিঘ্নিত হয়নি।

এই ধরনের চারিত্র এবং এই ধরনের কর্মের সাফল্য অর্জন সেইসব নারী ও পুরুষের জীবনে সম্ভব যাঁরা সহজ হওয়ার মন্ত্রে সিদ্ধ। এক পরিপূর্ণ সুসমঞ্জস মানুষের নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম থেকেই প্রশ্নাতীত এক স্থির লক্ষ্যের প্রতি তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন যা তাঁকে সমগ্রতা ও একতার দর্শনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই কারণের জন্যই মানুষের চিন্তাধারার ইতিহাসে তাঁকে আমি একজন কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যতদ্রষ্টা বলে মনে করি। মানুষের এই চিন্তা ধারার ইতিহাস দ্বৈতদ্বন্দ্বের বিষ, বহুর বিক্ষোভ, মানুষ ও মতবাদের পরিপ্লাবী পরস্পরবিরোধী স্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম; আর ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে সেখানে এমন এক অন্বেষণ যা মানুষের প্রাকৃতিক অধিকার, জন্মসূত্রে ব্যতিরেকে তাদের অখণ্ড একতার দিকে চালিত করবে।

আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা তাঁকে দিয়েছিল এমন একটি আলোক-বর্তিকা যা তাঁকে মানুষের দ্বন্দ্বের এই বিভ্রান্তিতে পথের সন্ধান দিতে পারে। পুরাতন সত্যকে ভেঙে বিশ্বে বিজ্ঞানের পদক্ষেপের লগ্নে সমস্ত পরস্পর বিপক্ষতার সঙ্গে প্রতিযোগী হবার কর্তৃত্ব দিয়েছিল তাঁকে এই আলো। ফিরে গিয়েছিলেন তিনি অতীতে ভবিষ্যতের পথের সন্ধানে, এই কাজে অগ্রসর হয়ে বর্তমানকে দৃপ্ত-করেছিলেন তিনি আপন গানের আলোকে। সৌন্দর্যেরই অন্য রূপ কাব্য—সে কাব্য সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন তা হল,

'Beauty is no fantacy. It has the everlasting meaning of reality. The facts that cause despondence and gloom are mere mist, and when through the mist beauty breakes out in momentary gleams, we realise that peace is true and not conflict; love is true and not hatred; and truth is one, not the disjoined multitude. We realise that creation is the perpetual harmony between the infinite ideal of perfection, and the eternal continuity of its realisation; though as

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তীর
চিত্রোপযোগী উপন্যাস

প্রতিচ্ছায়া ৩·৫০

প্রাপ্তিস্থান—ডি এম লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলি—৬

শুকতারা
ফাল্গুনে চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ
এতে এবছর লিখছেন
•ডাঃ নীহার গুপ্ত
•বনফুল•নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ
•শৈলজানন্দ•ডাঃবিশ্বনাথরায়
•আশাপূর্ণা ও আরো অনেকে
দেব সাহিত্য কুটীর
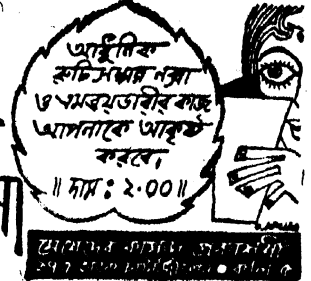
ধবল বা শ্বেত

শরীরের যে কোন স্থানের সাদা দাগ, একজিমা, সোরাইসিস ও অন্যান্য কঠিন চর্মরোগ, গাত্রে উচ্চবর্ণের অসাড়যুক্ত দাগ, ফুলা, আঙ্গুলের বক্রতা ও দূষিত ক্ষত সেবনীয় ও বাহ্য দ্বারা দ্রুত নিরাময় করা হয়। আর পুনঃ প্রকাশ হয় না। সাক্ষাতে অথবা পত্রে ব্যবস্থা লউন। হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা—পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা। ১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া। ফোনঃ ৬৭-২৩৫৯। শাখা : ৩৬ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৯। (পূরবী সিনেমার পাশে)।
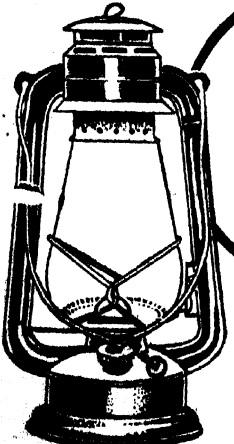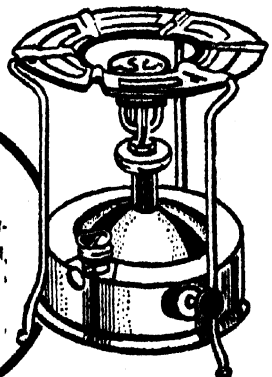
long as there is no absolute separation between the positive ideal and material obstacle of its attainment, we need not be afraid of suffering and loss. This is the poet's religion.'

আমাদের কবি শেলী এই প্লেটোনিক আস্থাই পোষণ করতেন, এই দৃঢ় বিশ্বাসই তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর সমকালীন ব্যক্তিরা সেদিন তাঁকে উন্মাদ আখ্যা দিয়েছিল কিন্তু যন্ত্রশিল্প যুগের নব অভ্যুত্থানে য়ুরোপে সেদিন সাবেক চিন্তাধারা চূর্ণ হতে শুরু হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত তাঁর মতাদর্শগুলি আরও তর্কসাপেক্ষ। আজকের দিনেও বহু লোক সেদিনের কবি শেলীর মতের বিরুদ্ধতার মত তাঁর মতগুলিরও বিপক্ষতা করবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"In the poet's religion we find no doctrine or injunction, but rather the attitude of our entire being towards a truth which is ever to be revealed in its own endless creation. In dogmatic religion all questions are definitely answered, all doubts are finally laid to rest. But the poet's religion is fluid, like atmosphere round the earth, whose lights and shadows play hide and seek, and the wind like a shepherd boy, plays upon its reeds among flocks of clouds. It never undertakes to lead anybody anywhere to any solid conclusion, yet it reveals endless spheres of light, because it has no walls round itself. It acknowledges the facts of evil; it openly admits the weariness, the fever and the fret in the world where men sit and hear each other groan; yet it remembers that in spite of all there is the song of the nightingale, and haply the Queen Moon is on her throne and there is

'White hawthorn, and the
pastoral eglantine,
Fast-fading violets covered up
in leaves;
And mid-day's eldest child,
The young musk rose, full of
dewy wine,
The murmurous hunt of flies on
summer eves'."

রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যকে যত গভীরভাবে চিন্তা করি ততই বুঝতে পারি সমাজে কবির এর থেকে প্রকৃষ্ট আর কোন সংজ্ঞা নেই। অথচ কি ধর্মের বা কি সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদীরা সর্বদা এই মতাদর্শের বিরোধীতা করেছে। এ হল পরম প্রয়োজনীয় চিন্তাধারার স্বাধীনতার জয় ঘোষণা, চিন্তার যে নির্বাধ স্বাধীনতা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে নিয়ত অভিব্যক্ত। আক্রমণাত্মক অস্ত্রের আঘাত অত্যাচারীরা সর্বপ্রথম এখানেই হানে। আজকের পৃথিবীতেও তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়, জানি মানুষের সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা বার বারই ঘটেছে এবং ঘটবে, —কিন্তু এও সত্য, পরিশেষে স্বাধীনতাই হয় জয়ী। কেননা, নব জীবনের পক্ষে এ এক অতীব অনুকূল প্রেরণা। তাছাড়া মানবজাতির প্রাণশিখা এখনও নির্বাপিত হয়নি।

কিন্তু কবির এই নীতি কি ভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল? কেমন করেই বা এই নীতির পরীক্ষা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একথা আমাদের জ্ঞাত যে স্বয়ং মহাত্মা তাঁকে যখন স্বরাজ আন্দোলনে যোগদানের জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তখন কবি বলেছিলেন,

"Gandhi, the whole world is suffering from a cult of selfish and short sighted nationalism. India has always offered hospitality to all nations and creeds. I have come to believe that we in India still have much to learn from the West and its science, and we still, through education, have to learn to collaborate among ourselves."

আরো একটি কথা তিনি গান্ধীজীকে বলেছিলেন:

"India should today be inviting teachers and professors from all over the world to come and teach in India, but also to learn from us of our own cultural heritage."

এই বক্তব্যের মধ্যে একথা সুস্পষ্ট যে রবীন্দ্রনাথ জীবনের মহান ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন এবং মানব-সমাজে জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে এই ঐক্যকে তিনি আরও উন্নত আকার দানের ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন। এবং এই বিশ্বাসকে তিনি অত্যন্ত কার্যকরীভাবে আরোপ করেছিলেন তাঁর পশ্চিম বাংলার লোক-জীবনে। জীবনের পুলকাপ্ত (নন্দিনী) আর কর্মের উদ্দীপনা (রঞ্জন) সত্যিই মিলিত হয়েছিল প্রেমের প্রেরণায়। এই ভাবাদর্শের উন্মীলন ঘটেছে তাঁর 'রক্তকরবী' নাটকে। তাঁর ইংরেজ সহকারী লিওনার্দ এলমহার্স্ট তাঁরই মতাদর্শে ইংলণ্ডে ডার্টিংটন সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন। কবি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য: তাঁর নানামুখী প্রতিভাকে বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে সব থেকে দুরূহ কাজ তাঁর শিল্পী-সত্তার স্বরূপ উন্মোচন করা। এই শক্তির উৎস সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন না, যে শক্তি তাঁর সমগ্র জীবনে, কাব্য সংগীত গান নাটক ও চিত্রাংকনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। কবি জেনেছিলেন এই অমিত শক্তিকে অস্বীকার করলে এর স্বপ্রকাশকে

স্বীকৃতি না দিলে তাঁর সমগ্র সত্তার অনিষ্ট সাধিত হবে।

রবীন্দ্রনাথের কর্ম প্রেরণার গোপন উৎসে লেগেছিল এই শক্তির স্পর্শ। তিনি দ্বিধার দ্বন্দ্বে আবিষ্ট হলেও তাঁর এই দ্বন্দ্ব প্রেমেরই আধার। এই প্রেম পরাকাষ্ঠার যে বস্তু সর্বাগ্রে দৃষ্টিগোচর হয় তা হল তাঁর জীবনের প্রাত্যহিক সমস্যা সম্পর্কে ধৈর্য ও স্বস্তি। এই দিক থেকে তাঁর একটি বক্তব্যে তাঁর মানসিক স্থৈর্যের উজ্জ্বল পরিচিতি বর্তমান। মনোভঙ্গির এই স্থিতাবস্থাই ছিল তাঁর সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র। তিনি বলেছেন,

'Always keep a vacant corner for some lazy do-nothing dreamer or poet, or singer like myself. Remember that poets must always have their place. Some of them may really turn out to be quite important people. So study and revive the past, not as if it were a museum piece, but with the help of artists like Nandalal, and of musicians like Dinu, and with some madcap poet like me, so that in a new dance and song and drama you vitalise those old streams with fresh currents."

তাঁর ভিতরের এই গুণ এতো বড় জিনিস যার সম্পর্কে কোন অতিশয়োক্তি করা যায় না; রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশবাসীকে মনের সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির জন্য কর্মের ধারাকে এবং সে ধারা থেকে নিঃসৃত শৃঙ্খলার মূল্যকে উপলব্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক সমস্ত প্রতিকূলতার বিপক্ষে সংগ্রামে ছিলেন আশাবাদী। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমার দেশ ইংলন্ডের মানুষের, এবং বলতে কি গোটা পশ্চিম য়ুরোপের অধিবাসীদের কষ্টকর সমস্যার তুলনা করি,—এখানে প্রয়োজন একেবারে বিপরীত। কর্মের প্রচণ্ডতা শক্তির ভয়ংকরতা থেকে যে হতবুদ্ধি উন্মাদনা জেগে ওঠে তা থেকে নিষ্কৃতিই আজ কাম্য, এখন আমাদের চিন্তা-সমাহিতির দিকে ফেরা প্রয়োজন, জানা উচিত কর্মযজ্ঞের নিহিত তাৎপর্য, আবিষ্কৃত হওয়া প্রয়োজন তার উৎস এবং পরিণাম-মূল্য। কবির এক পত্রে একটি সুন্দর ভাব ব্যক্ত হয়েছে, এবং সেখান থেকে বোঝা যায় জীবনের দ্বৈত উপস্থিতির মধ্যে ঐক্যে তাঁর কি বিশ্বাস কি আকর্ষণ। তিনি মূল্যকে বিচার করেছেন, কর্মশক্তির সঙ্গে যুক্ত দুর্নিবার প্রয়োজনকে ধৈর্যে বেঁধেছেন। একুশ বছর বয়সে লেখা তাঁর এক পত্রে বলেছেন,

"যতই একলা আপন-মনে নদীর উপরে কিম্বা পাড়াগাঁয়ে কোনো খোলা জায়গায় থাকা যায় ততই প্রতিদিন পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, সহজভাবে আপনার জীবনের

প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর-কিছু হতে পারে না। মাঠের তৃণ থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত তাই করছে; কেউ গায়ের জোরে আপনার সীমাকে অত্যন্ত বেশি অতিক্রম করবার জন্যে চেষ্টা করছে না ব'লেই প্রকৃতির মধ্যে এমন গভীর শান্তি এবং অপার সৌন্দর্য। অথচ প্রত্যেকে যেটুকু করছে সেটুকু বড়ো সামান্য নয়—ঘাস আপনার চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে তবে ঘাস রূপে টিঁকে থাকতে পারে, তার শিকড়ের শেষ প্রান্তটুকু পর্যন্ত দিয়ে তাকে রসাকর্ষণ করতে হয়। সে যে নিজের শক্তি লঙ্ঘন ক'রে বটগাছ হবার নিষ্ফল চেষ্টা করছে না, এইজন্যই পৃথিবী এমন সুন্দর শ্যামল হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক, বড়ো বড়ো উদ্যোগ এবং লম্বাচোড়া কথার দ্বারা নয়, কিন্তু প্রাত্যহিক ছোটো ছোটো কর্তব্য সমাধা-দ্বারাই মানুষের সমাজে যথাসম্ভব শোভা এবং শান্তি আছে।

অবশ্য আমার জীবনের প্রতিদিন এবং প্রত্যেক মুহূর্ত আমার সম্মুখে এখন প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নেই, তাই হয়তো দূরে থেকে হঠাৎ একটা কাল্পনিক আশার উচ্ছ্বাসে স্ফীত হয়ে উঠছি, সমস্ত খুঁটিনাটি খিটিমিটি সংকট এবং সংঘর্ষ বাদ দিয়ে ভাবী জীবনের একটা মোটামুটি চিত্র অঙ্কিত ক'রে এতটা ভরসা পাচ্ছি—কিন্তু তা ঠিক নয়।"

অনিবার্যভাবে জীবনের সামগ্রিক সম্পর্ক এবং পূর্ণতার অন্বেষণে শেষ বয়সে এলমহার্স্টের কাছে এক পত্রে কবিকে বলতে হয়েছিল,

'I carry an infinite space of loneliness around my soul through whice the voice of my personal life very often does not reach my friends; for whice I suffer more than they do. I have my yearnings for the personal world as much as any other mortal; perhaps more."

কবির জীবন সায়াহ্নের এই উক্তি খুবই বেদনার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অনুভূতি অনিবার্যভাবে দেখা দেয় সেই মানুষের চিত্তে যিনি ধর্ম দর্শন রাজনীতির কোন অন্ধ বিশ্বাসের দলভুক্ত হননি। খুব আশ্চর্যের যে এর জন্যে রবীন্দ্রনাথের কখনো হতাশা আসেনি যে হতাশা বহু মহৎ ব্যক্তির জীবনের শেষ-অধ্যায়কে আচ্ছন্ন করে। জীবনের শেষ অবধি তিনি প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে নতুনের অন্বেষণে বিশ্বাসী ছিলেন আর এই বিশ্বাসই তাঁকে আস্তিকতার শেষ পরিণতিতে পৌঁছিয়ে দেয়। আপাত অর্থে তাঁর কাজে বৈপরীত্য থাকলেও আমার বিশ্বাস তারা সবই সত্য, সেই চির সত্যের সঙ্গে তাদের যোগ, যে সত্য পরম ঈশ্বরের উপলব্ধিকে জাগ্রত করে। এই হল জীবন-সিদ্ধি—পরিণামে যার উন্মোচন ঘটে। সমগ্র জীবনব্যাপী তিনি এই সত্যকেই অন্বেষণ করেছিলেন, এবং আমার বিশ্বাস সেখানেই তিনি জয়ী যেখানে কবি এবং কর্মযোগীর মিলিত ভূমিকায় সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর স্বদেশে তিনি ছিলেন পূর্ণ সুসমঞ্জস সমগ্র এক মানবসত্তা, পশ্চিম জগতে তিনি ছিলেন

ভাবপ্রচারক: সেই পথের দিকেই তিনি সংকেত করেছেন, যেখানে সমস্ত বিরোধ বৈষম্যের ঊর্ধ্বে সাম্য বিরাজিত, মানব-জাতির সম্মিলিত শক্তির মধ্যে যেখানে পরম ঈশ্বর প্রতিফলিত, আর সেই উদ্দেশ্যের প্রতি—আমাদের চিন্তা দিয়ে যার নাগাল পাওয়া যায় না।

আমাদের সন্তাপে এই হল কবির বাণী। এই দুঃখ-কষ্ট হয়ত বা আমাদের নিজেদেরই সৃষ্টি,—অবশ্য এই যন্ত্রণা-বিষাদ থেকে মুক্ত হবার শক্তিও আমাদের ভিতরে নিহিত রয়েছে, অতএব পরিশেষে কবির বাণীতেই উচ্চারণ করি সেই ঐকতান, কবির গীতাঞ্জলির সেই গানটি তুলে ধরি যা তাঁকে একদা য়ুরোপে খ্যাতি এনে দিয়েছিল :

একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার
এ সংসারে॥
ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক তব ভবনদ্বারে॥
নানা সুরের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে
আত্মহারা
একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে॥
হংস যেমন মানসযাত্রী তেমনি সারা
দিবারাত্রি
একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ-পারে॥

অনুবাদ : সুনীল বসু

এক বছরের উল্লেখযোগ্য বই

গত এক বছরে বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য যে সব সাহিত্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ **প্রকাশিত হয়েছে, নীচে তার একটি তালিকা** দেওয়া হল। অনবধানবশত কোন কোন উল্লেখ্য পুস্তকের নাম বাদ পড়ে যাওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। **তার জন্য আগে থাকতেই আমরা ত্রুটি স্বীকার করে রাখছি।**

বিভিন্ন পুস্তক প্রকাশকের কাছ থেকে আমরা যে পুস্তক তালিকা পেয়েছি—তাতে দেখা যায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে সাত শতাধিক পুস্তক এই বৎসর প্রকাশিত হয়েছে। তার ভেতর থেকে আমরা প্রায় ৩ শত বইয়ের একটি তালিকা এখানে প্রকাশ করছি।

কবিতা

অন্ধকার বারান্দা	২·৫০	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	...	কৃত্তিবাস প্রকাশনী
অন্য এক সমুদ্র	২·০০	শান্তিকুমার ঘোষ	...	অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স
অন্যতর	১·৭৫	শক্তিব্রত ঘোষ	...	বুকস অ্যান্ড বুকস
একটি নির্জন তারা	২·০০	সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	সুপ্রকাশ
কালীঘাটের পট	২·০০	শান্তি লাহিড়ী	...	ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন
ঘরে ফেরার দিন	৩·৫০	অমিয় চক্রবর্তী	...	নাভানা
ছয় ঋতু সাত রঙ	২·০০	অজিত মুখোপাধ্যায়	...	কথাকলি
ঝড়	৩·০০	কাজী নজরুল ইসলাম	...	বুকস অ্যান্ড বুকস

ঝর্নার পাশে শুয়ে আছি	১·৫০	সমীর রায়চৌধুরী ...	কৃত্তিবাস প্রকাশনী
দর্পণে অনেক মুখ	২·০০	পবিত্র মুখোপাধ্যায় ...	কবিপত্র প্রকাশ ভবন
দ্বিতীয় সন্ধি	১·৫০	দুর্গাদাস সরকার ...	এম সি সরকার
পরশুরামের কবিতা	২·০০	পরশুরাম ...	"
পান্থজনপদ	৩·০০	সজনীকান্ত দাস ...	রঞ্জন পাবলিশিং
বাংলা সনেট	৫·০০	জীবেন্দ্র সিংহরায় ও শান্তিব্রত ঘোষ সম্পাদিত ...	কথাশিল্প
বিষুবরেখা	২·০০	অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় ...	কবিতা মেলা
বোদলেয়ার: তাঁর কবিতা	৮·০০	বুদ্ধদেব বসু ...	নাভানা
ভাইয়ের মুখ	১·০০	দক্ষিণারঞ্জন বসু ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ...	লোকায়ত সাহিত্য চক্র
মেঘদূত	১·৫০	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুশীল রায় সম্পাদিত ...	ধ্রুপদী প্রকাশন
যৌবন বাউল	৩·০০	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ...	সুরভি প্রকাশনী
শেষ অন্ধকার প্রথম আলো	২·০০	আশিস সান্যাল ...	গ্রন্থবিতান
হাইনের শ্রেষ্ঠ কবিতা	৪·০০	সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত ...	দীপায়ন প্রকাশনী
হাওয়ার সংবাগ	২·০০	শিপ্রা ঘোষ ...	সুরভি প্রকাশনী
হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য	২·৫০	শক্তি চট্টোপাধ্যায় ...	গ্রন্থজগৎ

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	৬·০০	অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ...	মডার্ন বুক এজেন্সি
উপন্যাসের কথা	৬·০০	দেবীপদ ভট্টাচার্য ...	সুপ্রকাশ
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য	৮·০০	দ্বিজেন্দ্রকুমার নাথ ...	জিজ্ঞাসা
কাব্য সাহিত্যের ধারা	৪·৫০	সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ...	মিত্র ও ঘোষ
চর্যাগীতি পরিচয়	৫·০০	সত্যব্রত দে ...	জিজ্ঞাসা
চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র	৬·০০	ভবতোষ দত্ত ...	"

তারাশঙ্কর	৮·০০	ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র	শতাব্দী গ্রন্থভবন
দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী	১২·০০	ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী	এ মুখার্জি
বঙ্গ সাহিত্য সম্ভার (১ম খণ্ড)	৬·০০	প্রতিভাকান্ত মৈত্র	বুক ক্লাব
বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা	১৪·০০	ডঃ অজিতকুমার ঘোষ	ভারতী
বাঙালী ঐতিহাসিক উপন্যাস	৮·০০	অর্পণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত	ক্যালকাটা বুক হাউস
বাংলা কাব্যে শিব	১০·০০	ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য	আই এ পি
বাংলা নাটকের আলোচনা	৩·৫০	ক্ষেত্র গুপ্ত ও জ্যোৎস্না গুপ্ত	গ্রন্থনিলয়
বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস	১২·০০	অজিত দত্ত	জিজ্ঞাসা
বীরবল ও বাংলা সাহিত্য	৪·০০	ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	ক্লাসিক
ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য	১৫·০০	ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত	শিশু সাহিত্য সংসদ
মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্য	৪·০০	অতীন্দ্র মজুমদার	নয়া প্রকাশ
রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য	৬·০০	সজনীকান্ত দাস	শতাব্দী গ্রন্থ ভবন
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস	৪·৫০	পুলকেশ দে সরকার	সাহিত্য
রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস	৮·০০	ডঃ মনোরঞ্জন জানা	ভারতী বুক স্টল
রবীন্দ্রনাথের বলাকা	৪·৫০	অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়	শান্তি লাইব্রেরী
রস ও কাব্য	২·৫০	ডঃ হরিহর মিত্র	ক্যালকাটা বুক হাউস

স্মৃতিকথা

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে	৪·৫০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	নিউ এজ
বাইশে শ্রাবণ	৫·০০	নির্মলকুমারী মহলানবিশ	মিত্র ও ঘোষ
বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ	৭·৫০	মৈত্রেয়ী দেবী	গ্রন্থম
লেখালেখি	২·৫০	রমাপদ চৌধুরী	ত্রিবেণী
সালাজারের জেলে উনিশ মাস	১০·০০	ত্রিদিব চৌধুরী	আই এ পি
স্মৃতিচারণ	১২·০০	দিলীপকুমার রায়	আই এ পি

সংকলন

এই দশকের গল্প	৪·০০	বিমল কর সম্পাদিত	নব গ্রন্থ কুটীর

গল্প পঞ্চাশৎ	৮·০০	প্রমথনাথ বিশী ...	মিত্র ও ঘোষ
গল্প পঞ্চাশৎ	৯·০০	গজেন্দ্রকুমার মিত্র ...	মিত্র ও ঘোষ
নবীনচন্দ্র সেনের রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস	১০·০০	ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ...	বুকল্যাণ্ড
প্রবাদ বচন	৬·০০	গোপালদাস চৌধুরী ও প্রিয়রঞ্জন সেন ...	বুকল্যাণ্ড
বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক	১২·০০	প্রমথনাথ বিশী ও বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত ...	মিত্র ও ঘোষ
শতবর্ষের শত গল্প (১ম ও ২য় খণ্ড) ১৫·০০,	১২·৫০	সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত ...	বেংগল পাব্লিশার্স
সেকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা	৩·০০	কুমারেশ ঘোষ ও ক্ষেত্র গুপ্ত সংকলিত	গ্রন্থগৃহ
সুদূরের পিয়াসী	৫·০০	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ...	অঞ্জলি

জীবনালেখ্য ও মনীষী প্রসঙ্গ

কবি স্মরণে	২·০০	চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ...	বসুধারা প্রকাশনী
গিরিশচন্দ্র	৩·০০	কিরণচন্দ্র দত্ত ...	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
নজরুল চরিতমানস	১০·০০	ডঃ সুশীলকুমার ঘোষ ...	ভারতী লাইব্রেরী
বিজ্ঞান সাধনায় বাঙালী	১·৪০	কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ...	ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ
বিদ্রোহী ডিরোজিও	৫·০০	বিনয় ঘোষ ...	বাকসাহিত্য
ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ	৫·০০	গিরিজাশংকর রায়চৌধুরী ...	জিজ্ঞাসা
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য	৭·০০	নারায়ণচন্দ্র চন্দ ...	অশোক পুস্তকালয়
শরৎচন্দ্র ও তাঁর পর	৪·০০	কাজী আবদুল ওদুদ ...	আই এ পি

শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক	৩·৫০	সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	...	বুক হাউস
শিশিরকুমার ও বাংলা থিয়েটার	১০·০০	মণি বাগচী	...	জিজ্ঞাসা

নানা নিবন্ধ

অপ্রমাদ	৩·০০	অন্নদাশংকর রায়	...	এম সি সরকার
অভিনয়, শিল্প ও নাট্য প্রযোজনা	৩·০০	অশোক সেন	...	এ মুখার্জি
অভিশপ্ত চম্বল	৫·৫০	তরুণকুমার ভাদুড়ী	...	নিউ এজ
অলিম্পিকের ইতিকথা	২৫·০০	শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত	...	বিদ্যোদয়
অলিম্পিকের প্রাঙ্গণে	৩·০০	অমরেন্দ্রকুমার সেন	...	প্রমোটাস
আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব	৬·৫০	বীরেন্দ্রমোহন আচার্য	...	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
উত্তরাধ্যয়ন সূত্র (১ম খণ্ড)	১২·০০	পূরণচাঁদ শ্যামসুখা ও অজিতরঞ্জন ভট্টাচার্য সম্পাদিত		কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কালিদাসের কাব্যে ফুল	৪·০০	সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	বুকল্যাণ্ড
চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি	১২·৫০	শংকরীপ্রসাদ বসু	...	বুকল্যাণ্ড
গ্রন্থবার্তা (২য় পর্ব)	৪·০০	শীলভদ্র	...	এভারেস্ট বুক হাউস
জাগৃতি ও জাতীয়তা	৪·৫০	যোগেশচন্দ্র বাগল	...	মিত্র ও ঘোষ
ফানুস ফাটাই	২·৫০	শিবরাম চক্রবর্তী	...	আই এ পি
বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১ম)	১২·৫০	আশুতোষ ভট্টাচার্য	...	এ মুখার্জি
বাঁচতে সবাই চায়	৩·৭৫	অসীম বর্ধন	...	আলফা বীটা
বিশ্বপথিক বাঙালী	৫·০০	বিমলচন্দ্র সিংহ	...	আই এ পি
ভারতে জাতীয় আন্দোলন	১০·৭৫	প্রভাতমোহন মুখোপাধ্যায়	...	গ্রন্থম্
ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞান	৬·০০	সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	বুকল্যাণ্ড

ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভূমিকা	৪·০০	প্রিয়তোষ মৈত্রেয়	...	গ্রন্থজগৎ
ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যা	৩·০০	শ্যামাপ্রসাদ আচার্য	...	প্রবর্তক
মহাচীনের ইতিকথা	৭·০০	শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	...	এম সি সরকার
মৌমাছিতন্ত্র	৩·৫০	শিবনারায়ণ রায়	...	রেনেশাঁ পাব্লিশার্স
শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলনীতি	৬·০০	কুলদাপ্রসাদ চৌধুরী	...	মডার্ন বুক এজেন্সী
সংখ্যা বিজ্ঞানের অ আ ক খ	৪·০০	রবীন্দ্রনাথ ঘোষ	...	গ্রন্থজগৎ

কোষগ্রন্থ

রবীন্দ্র রচনাকোষ	৬·৫০	চিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি	...	ক্যালকাটা পাব্লিশার্স

সঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথের গান	৪·০০	সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	করুণা প্রকাশনী
রবীন্দ্র সংগীত প্রবেশ (১ম)	৩·৫০	প্রফুল্লকুমার দাস	...	জিজ্ঞাসা

দর্শন

ভারতীয় দর্শন	৯·০০	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	...	ন্যাশনাল বুক এজেন্সী

ইতিহাস

বিশ্ব ইতিহাস	৩·৭৫	নারায়ণচন্দ্র চন্দ	...	ভারতী বুক স্টল

রম্যরচনা

অধ্যাপিকার ডায়েরী	৪·০০	শিপ্রা দত্ত	...	নয়াপ্রকাশ
ইডেনে শীতের দুপুর	৩·৭৫	শংকরীপ্রসাদ বসু	...	বুকল্যান্ড
ইদানীং	৩·৫০	পরিমল রায়	...	নিউ এজ
উত্তরস্যাং দিশি	২·০০	বিজন চক্রবর্তী	...	ক্লাসিক

ক্যাকটাস	৩·০০	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	...	আই এ পি
চতুরঙ্গ	৪·৫০	সৈয়দ মুজতবা আলী	...	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
পশ্চিমের জানালা	৫·০০	দেবেশ দাস	...	বেঙ্গল পাব্লিশার্স
ব্রজবুলি	৩·৫০	রূপদর্শী	...	বর্তিক
মানস-সুন্দরী	৪·০০	ইন্দ্রজিৎ	...	মিত্রালয়
রঙে রেখায়	৫·৫০	ইবনে ইমাম	...	নয়াপ্রকাশ
শ্রীপান্থের কলকাতা	৭·০০	শ্রীপান্থ	...	ত্রিবেণী
সাজঘর	১০·০০	ইন্দ্র মিত্র	...	ত্রিবেণী

ভ্রমণ ও অভিযান

আয়ুবের সঙ্গে	২·০০	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
এই ভারতের পুণ্যতীর্থে	৬·০০	দেবল	...	এ মুখার্জি
কেদার তুঙ্গ বদরীনারায়ণে	২·৫০	প্রীতিকণা আদিত্য	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
কোণারকের বিবরণ	৫·৭৫	নির্মলকুমার বসু	...	পুরোগামী
গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্তরী	১·৫০	জয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	অশোক পুস্তকালয়
তপোময় তুষার তীর্থ	৪·৫০	সুকৃতি রায়চৌধুরী	...	বুক হাউস
নব্য তুর্কী : সভ্য গ্রীস	২·৫০	কুমারেশ ঘোষ	...	গ্রন্থগৃহ
পথ আমাকে ডাকে	৪·০০	গদাধরচন্দ্র নিয়োগী	...	ডি এম
পায়ের দাগ	৪·০০	প্রবোধকুমার সান্যাল	...	বিশ্ববাণী
মন্দানন্দার দেশে	৪·০০	শুভংকর	...	প্রবর্তক
মানবতার সাগর সংগমে	৬·০০	শচীন সেনগুপ্ত	...	গুরুদাস
রম্যাণি বীক্ষ্য	৭·০০	সুবোধকুমার চক্রবর্তী	...	এ মুখার্জি
সীমান্তের সংকলোক	৩·০০	নিখিলরঞ্জন রায়	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স

সপ্তদ্বীপ পরিক্রমা	৪·৫০	সুভো ঠাকুর	...	সুপ্রকাশ
হিমালয়ের অন্তরালে	৪·০০	ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ	...	এস সি সরকার

পত্রাবলী

ছিন্নপত্রাবলী	১০·০০, ১২·০০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	বিশ্বভারতী

ধর্মগ্রন্থ

[illegible]রথসূত্র ধর্ম	১·০০	যোগীরাজ বসু	...	বিশ্বভারতী
নাশদীয় উপনিষদ ও পরিশিষ্ট	৪·০০	স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি	...	শ্রীগুরু

অনুবাদ

অদৃষ্ট (মিখাইল শলোখফ)	২·০০	স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য	...	প্রোমোটার্স
শ্রদ্ধাঞ্জলি (সি এফ এণ্ড্রুজ)	৪·৫০	নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	...	রাইটার্স সিণ্ডিকেট
একটি রাজার কাহিনী (মুলকরাজ আনন্দ)	৭·৫০	—	...	র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
কেরল সিংহম (কে এম পানিক্কর)	৬·০০	—	...	বিদ্যোদয়
ডাক্তার জিভাগো (পাস্টেরনাক)	১২·৫০	মীনাক্ষী দত্ত ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়		রূপা ও বেঙ্গল পাব্লিশার্স
দশ পুতুল (আগাথা ক্রিস্টি)	৩·৫০	অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	ত্রিবেণী
নয়া মানবতাবাদ (মানবেন্দ্রনাথ রায়)	৩·০০	—	...	রেনেশাঁ পাব্লিশার্স
নানার হাতি (মুহম্মদ বশীর)	২·০০	নিলীনা আব্রাহাম	...	ত্রিবেণী
পত্রগুচ্ছ (জওহরলাল নেহরু)	১০·০০	—	...	এম সি সরকার
বিমুগ্ধ আত্মা (৩ খণ্ড) (রোমাঁ রোলাঁ)	১৫·৫০	—	...	র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব
বৃত্তান্ত (সাঁ-জন পার্স)	১·৫০	পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	প্রকাশকঃ প্রফুল্লচন্দ্র দাস, কটক—২
সুখের সন্ধানে (বারট্রাণ্ড রাসেল)	৫·০০	পরিমল গোস্বামী	...	রূপা ও বেঙ্গল পাব্লিশার্স

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা ১৩৬৮

স্তেফান জেভায়াইগের গল্প সংগ্রহ	৫·০০	দীপক চৌধুরী	রূপা এন্ড কোং

নাটক

অভিশপ্ত ক্ষুধা	১·৭৫	সুনীল দত্ত	... জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
এক পেয়ালা কফি	২·৫০	ধনঞ্জয় বৈরাগী	... গ্রন্থম
একাঙ্ক সঞ্চয়ন	৮·০০	ডঃ সাধন ভট্টাচার্য ও ডঃ অজিত ঘোষ সম্পাদিত	...
গাওনা	২·৫০	লীলা মজুমদার	জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
গোত্রান্তর	২·৫০	বিজন ভট্টাচার্য	আই এ পি
জয়ঢাক	২·৫০	সুধীর সরকার	... জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
দশটা পাঁচটা	২·০০	মাধব রায়	... প্রান্তিক
দেশের ডাক	২·৫০	সুধাংশু বক্সী	... ”
ন'টা থেকে বারোটা	১·০০	শম্ভুনাথ ভদ্র	... আনন্দ পাব্লিশার্স
নাটক নয়	১·৫০	কিরণ মৈত্র	... চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
নাট্যাঞ্জলি	১০·০০	জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী	... সিটি বুক
মৌনমুখর	২·০০	অজিত গঙ্গোপাধ্যায়	... শান্তি লাইব্রেরী
শরৎ নাট্য সম্ভার	৮·০০	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	... অটোপ্রিণ্ট
শ্রেয়সী (সুবোধ ঘোষ)	২·৫০	দেবনারায়ণ গুপ্ত	... মিত্র ও ঘোষ
সাহিত্যিক	২·০০	বীরু মুখোপাধ্যায়	... ক্যালকাটা পাব্লিশার্স
			... জাতীয় সাহিত্য পরিষদ

গল্পগ্রন্থ

আগে কহ আর	৩·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	... টি এস বি প্রকাশন
উত্তর বসন্তে	৩·০০	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	... করুণা প্রকাশনী
এক দুই তিন	৩·৫০	শংকর	... বাক সাহিত্য
একটি জীবন ও কয়েকটি মৃত্যু	৩·০০	বুদ্ধদেব বসু	... এম সি সরকার

নাটক—মানুষ চাই—জলধর চট্টোপাধ্যায়—২, সূর্যমুখী—প্রশান্ত চৌধুরী—২,, প্রতিধ্বনি—উমেশ নাগ—২,

॥ এক নজরে অন্যান্য বই ॥

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	রবিবারের আসর	—	৩·০০
প্রশান্ত চৌধুরী	সমান্তরাল	—	৩·০০
	লাল পাথর	—	৩·০০
বনফুল	উজ্জ্বলা	—	৩·৫০
	কিছুক্ষণ	—	২·০০
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	মায়াকুরংগী	—	৩·৫০
	বুমেরাং	—	৩·৫০
গজেন্দ্রকুমার মিত্র	সোহাগপুরা	—	৪·০০
	কেতকী বন	—	৩·৫০
বিভূতি মুখোপাধ্যায়	আনন্দনট	—	৩·০০
রামপদ মুখোপাধ্যায়	মনকেতকী	—	৬·০০
	দুরন্ত মন	—	৩·০০
শ্রীবাসব	একাকার	—	৫·০০
	শ্যাওলা	—	২·৫০
অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ	কলেজ স্ট্রীটে অশ্রু	—	৪·৫০
সঞ্জয় ভট্টাচার্য	স্মৃতি	—	৩·০০
লুই ফিসারের	মহাজিজ্ঞাসা ১/২	—	৫·০০
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	দেশবন্ধু স্মৃতি	—	১০·০০
যোগেশ বাগল	কলিকাতায় সংস্কৃতি কেন্দ্র		৬·০০
প্রবোধকুমার সান্যাল	এক বাণ্ডিল কথা	—	৪·০০
	জনতা	—	৩·০০
	বন্দীবিহংগ	—	৩·৫০
	গল্প সঞ্চয়ন	—	৪·০০
প্রমথনাথ বিশী	নীলবর্ণ শৃগাল	—	৪·০০
	বাংলার কবি	—	৪·০০
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	অন্যদিগন্ত	—	৫·০০
	পঞ্চরাগ	—	২·০০
	মৃগশিরা	—	৩·৫০
মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত	বউডুবির খাল	—	৩·০০
	হে অতীত কথা কও	—	৪·০০
সুবোধকুমার চক্রবর্তী	একটি আশ্বাস	—	৬·৫০
শক্তিপদ রাজগুরু	বনমাধবী	—	৩·৫০
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	অরণ্য বাসর	—	৬·০০
	ছায়ানট	—	২·৫০
বেলা দেবী	জীবনতীর্থ	—	৩·০০
ইন্দুমতী ভট্টাচার্য	আতপ্ত কাঞ্চন	—	৩·০০
বিমল কর	দিবারাত্রি	—	৩·০০
হিরণ্ময়ী বসু	পরিচয়	—	৪·০০

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের বিখ্যাত আর্মেনিয়া কাটার সিরিজ ২৷৷০ হিঃ

রূপসী কারাবাসিনী	রূপসী বন্দিনী
রূপসী ছলনা	রূপসীর শেষ শত্রু
রূপসী নিষ্কৃতি	রূপসীর ফাঁদ
রূপসীর সংকট	টাকার কুমীর
রূপসী সর্বনাশী	জাহাজ ডুবী

—নূতন বই—

সানকীতে বজ্রাঘাত ৩৲

মহেন্দ্র গুপ্ত প্রণীত

রঙ্গ মঞ্চের রূপ তৃষ্ণা ৩৲

শ্রী গুরু লাইব্রেরী—২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন: ৩৪-২৯৮৪

জোনাকি ডেকেছিল	৩·২৫	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	...	আই এ পি
গল্প	৫·০০	অন্নদাশঙ্কর রায়	...	ডি এম
চন্দন কুঙ্কুম	২·৫০	রমাপদ চৌধুরী	...	বাক্ সাহিত্য
চর্যাপদের হরিণী	৩·০০	দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	মিত্রালয়
চিত্ত চকোর	৩·০০	সুবোধ ঘোষ	...	বাক্ সাহিত্য
ছদ্মহরিণ	৩·০০	সন্তোষকুমার ঘোষ	...	সুরভি
দিনের গল্প রাত্রির গান	২·০০	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	...	কারেন্ট বুক শপ
পদ্মরাগ	৩·২৫	নবেন্দু ঘোষ	...	আই এ পি
পাহাড়ী ঢল	৩·০০	সমরেশ বসু	...	সুরভি
বেনারসী	৪·৫০	বিমল মিত্র	...	ত্রিবেণী
মনের মত গল্প	৩·০০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	ভারত প্রকাশনী
মনোনয়ন	৩·০০	আশাপূর্ণা দেবী	...	কথামালা
যখন যেখানে	২·৭৫	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	...	বর্তিক
রঙ্গালয়ের নানা গল্প	২·০০	গোপালচন্দ্র রায়	...	সাহিত্য সদন
রমণীর মন	৩·৫০	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	...	ত্রিবেণী
শীতগ্রীষ্মের স্মৃতি	২·০০	দিব্যেন্দু পালিত	...	সরুভি
শুভক্ষণ	৩·০০	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	সুরভি
সপ্তপর্ণী	৩·০০	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	...	বিশ্ববাণী
সপ্তমী	৩·০০	বনফুল	...	নিও লিট
সায়াহ্ন যূথিকা	৩·০০	শচীন ভৌমিক	...	কথাকলি

উপন্যাস

অনেক সন্ধ্যা একটি সন্ধ্যাতারা	৪·০০	বারীন্দ্রনাথ দাশ	...	গ্রন্থশ্রী

অন্তলীনা	৫·০০	নারায়ণ সান্যাল	...	বাক্ সাহিত্য
অপরাজেয়	৩·৫০	রমেশচন্দ্র সেন	...	নিউস্ক্রীপ্ট
অফুরন্ত	৩·০০	সুনীল চক্রবর্তী	...	বঙ্গবাণী প্রকাশন
আনন্দনিকেতন	৪·৫০	শিশির সেন	...	আনন্দ পাবলিশার্স
আরও কথা বলো	২·৭৫	বাণী রায়	...	আই এ পি
উত্তর সাগরের তীরে	৮·০০	বোধিসত্ত্ব মৈত্র	...	সরস্বতী গ্রন্থালয়
উপকণ্ঠে	৯·০০	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	...	মিত্র ও ঘোষ
এই তীর্থ	৩·৫০	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	মিত্র ও ঘোষ
এক যে ছিল রাজা	৫·০০	দীপক চৌধুরী	...	রূপা এণ্ড কোং
একটি নীড়ের আশা	৩·০০	স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	...	ক্লাসিক
ছলনাময়ী ক্লাইভ স্ট্রীট	৪·৫০	বিদগ্ধ শর্মা	...	চিনকো
জব চার্নকের বিবি	৫·০০	প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র	...	অর্চনা পাবলিশার্স
জল পড়ে পাতা নড়ে	৮·০০	গৌরকিশোর ঘোষ	...	ত্রিবেণী
জলবিম্ব	৩·০০	চিত্ত সিংহ	...	সুজনী
জুনাপুর স্টীল	১০·০০	গুণময় মান্না	...	এ পি
জোয়ার এলো	২·৫০	সুনীলকুমার ধর	...	কথামালা
তটিনী তরঙ্গে	৫·০০	প্রফুল্ল রায়	...	মিত্র ও ঘোষ
তারার আঁধার	৩·০০	মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য	...	কথাকলি
তিনদিন তিনরাত্রি	৫·০০	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	...	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লি
তিলোত্তমা	৩·০০	শ্রীমন্ত সওদাগর	...	মণ্ডল বুক হাউস
তুঙ্গভদ্রা	৪·০০	সুবোধকুমার চক্রবর্তী	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
দুই পথিক	২·০০	বনফুল	...	আই এ পি
দূরের মালঞ্চ	৪·০০	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	...	সুরভি
নবজন্ম	৩·০০	আশাপূর্ণা দেবী	...	তুলিকলম
নাগলতা	৩·৫০	সুবোধ ঘোষ	...	ত্রিবেণী
নিশ্চিন্তপুরের মানুষ	৫·৫০	জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী	...	মিত্র ও ঘোষ
নিকষিত হেম	৩·০০	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
নির্বাসন	২·৭৫	বিমল কর	...	ত্রিবেণী
নিশিপালন	৪·৭৫	বিমল মিত্র	...	আই এ পি
পট ও পুতুল	২·৫০	রজত সেন	...	টি এস বি প্রকাশন
পাড়ি	৩·০০	জরাসন্ধ	...	বাক্ সাহিত্য
প্রথম কদম ফুল	১২·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	নাভানা
প্রিসিলার বিয়ে	২·৭৫	শিবরাম চক্রবর্তী	...	কথামালা
ফুলের নামে নাম	২·০০	সন্তোষকুমার ঘোষ	...	এভারেস্ট
বনে যদি ফুটলো কুসুম	৪·৫০	প্রতিভা বসু	...	গ্রন্থম
বহু মঞ্জরী	২·৫০	সুমথনাথ ঘোষ	...	আধুনিক সাহিত্য ভবন
বহু যুগের ওপার হতে	২·০০	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
বাঘিনী	৭·০০	সমরেশ বসু	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
বিদেহী	২·৫০	ধনঞ্জয় বৈরাগী	...	বাক্ সাহিত্য
বিনোদিনী বোর্ডিং হাউস	২·৫০	কুমারেশ ঘোষ	...	গ্রন্থগৃহ
বিপাশা	৪·০০	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	ডি এম
ব্যঞ্জনবর্ণ	৪·০০	অমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়	...	মিত্রালয়
মন দেয়া নেয়া	৩·৫০	অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ	...	সাহিত্য
মন বিহঙ্গ	৩·৫০	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	মুখার্জি বুক
মনে রেখ	৬·৫০	প্রবোধকুমার সান্যাল	...	এম সি সরকার
মরুমায়া	৩·২৫	অমলা দেবী	...	কল্লোল
মাটির গন্ধ	৪·০০	রামপদ মুখোপাধ্যায়	...	শ্রীগুরু
মাটির পথ	৬·৫০	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	...	ডি এম
রঞ্জনা	৩·০০	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	বিহার সাহিত্য ভবন
রাঘব বোয়াল	৩·০০	আনন্দকিশোর মুন্সী	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
রাজপথ জনপথ	৬·৫০	চাণক্য সেন	...	নবভারতী
রাজায় রাজায়	৯·০০	প্রাণতোষ ঘটক	...	এম সি সরকার
রানী পালঙ্ক	২·৫০	বিজন ভট্টাচার্য	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
রূপ অপরূপ	২·০০	শক্তিপদ রাজগুরু	...	নবগ্রন্থ কুটির
রূপবতী	৩·০০	মনোজ বসু	...	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

রূপ হল অভিশাপ	৭·০০	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	...	বেঙ্গল পাবলিশার্স
শকুন্তলা স্যানাটোরিয়াম	২·৭৫	অ কৃ ব	...	কল্লোল
শবনম	৫·০০	সৈয়দ মুজতবা আলী	...	ত্রিবেণী
শান্তিলতা	২·৫০	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	...	সাহিত্য জগৎ
শ্রীমতী	৪·০০	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	...	কথাকলি
সমুদ্র মানুষ	৫·০০	অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	...	মিত্রালয়
সারারাত	৪·০০	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	...	আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
সায়াহ্নের সানাই	৩·০০	প্রভাতদেব সরকার	...	রবীন্দ্র লাইব্রেরী
সুন্দরী কথা সাগর	৫·৫০	সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	শ্রীগুরু
সুর্যগঙ্গার মাঠ	৩·৫০	জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	...	নতুন প্রকাশক
সোম সবিতা	৪·০০	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	...	অটোপ্রিন্ট
স্মৃতির সমাধি	২·৫০	প্রবোধ সরকার	...	বুক নিউজ

ছোটদের সাহিত্য

একটা গাছে আটটা চড়ুই	১·৩৭	সুকমল দাশগুপ্ত	...	ইস্টার্ন ট্রেডিং
একলব্য (নাটক)	১·২৫	দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	বলাকা
কিশোর সঞ্চয়ন	৪·০০	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
কিশোর সঞ্চয়ন	৪·০০	বুদ্ধদেব বসু	...	"
ঢল গল্প নিকেতনে	২·৭৫	হেমেন্দ্রকুমার রায়	...	আই এ পি
চার মূর্তির অভিযান	২·০০	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	অভ্যুদয়
ছড়ার বই	১·৫০	অজিত দত্ত	...	গ্রন্থজগৎ
ছবিতে পৃথিবী (২)	১·২৫	মনোমোহন চক্রবর্তী	...	শিশু সাহিত্য সংসদ
ছোটদের গল্প	১·৬০	শিবনাথ শাস্ত্রী	...	নিউ স্ক্রীপ্ট
জাতকের গল্প	১·৭৫	শুভেন্দু ঘোষ	...	কথাশিল্প
তেপান্তর (নাটক)	১·৫০	প্রশান্ত চৌধুরী	...	বলাকা
নানান গল্প	২·০০	সুখলতা রাও	...	আই এ পি
পঞ্চরং	১·৫০	শিবরাম চক্রবর্তী	...	চক্রবর্তী এন্ড কোং
পথ হারিয়ে	১·৫০	অমলেন্দু ভট্টাচার্য	...	আধুনিক সাহিত্য ভবন
পরাশর	২·৭৫	প্রেমেন্দ্র মিত্র	...	আই এ পি
পৃথিবীর রূপান্তর	১·২৫	অচিনকুমার চক্রবর্তী	...	আই এ পি
প্রণাম নাও	৪·০০	চিত্তজিৎ দে ও শ্যামাপ্রসাদ সরকার সম্পাদিত	...	শ্রীপ্রকাশ ভবন
বক ধার্মিক	১·৭৫	লীলা মজুমদার	...	আই এ পি
বোমা	২·৫০	সুধীর সরকার	...	আই এ পি
মনের মত বই	২·২৫	ধীরেন্দ্রলাল ধর	...	ক্যালকাটা পাবলিশার্স
মরসুমী	৩·০০	জ্যোতিভূষণ চাকী	...	চিনকো
মহাভারতের ছাত্র সমাজ	১·২৫	অশোক মুখোপাধ্যায়	...	বাণী বিতান
রাশিয়ার রূপকথা	২·০০	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	...	নতুন প্রকাশক
রূপকুমারের রূপকথা	২·০০	মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	বিশ্বাস পাবলিশার্স
শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে	২·৫০	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	...	শিশু সাহিত্য সংসদ
সাপের কথা	২·০০	নরেন্দ্রনাথ রায়	...	চিনকো
সেকালের খোশ গল্প	৩·০০	তুলসীদাস সিংহ	...	মিত্র ও ঘোষ
হ্যামেলিনের বাঁশীওয়ালা	২·০০	বুদ্ধদেব বসু	...	শ্রীপ্রকাশ ভবন

রবীন্দ্রনাথ ও তেলেগু সাহিত্য-রবি আপ্পা রাও

কপিলা কাশীপাত

তেলেগু ভাষীদের কাছে সাংস্কৃতিক বৎসর—১৯৬১ সাল দুই দিক দিয়ে পরম শুভ। প্রথমত গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব; আবার, এই বৎসরেই তেলেগু সাহিত্য-রবি গুড়াজাড়া আপ্পা রাওয়ের জন্মশতবার্ষিকী। ভারতের এই দুই মহান কবি দুজনকে জানতেন, শ্রদ্ধা করতেন।

আপ্পা রাও বয়সে গুরুদেবের চাইতে কয়েক মাসের ছোট। তাঁর জন্ম হয়েছিল ১৮৬১ সালের ৩০শে নভেম্বর। ১৯১৬ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। এই স্বল্পকালের মধ্যে তিনি তেলেগু ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক সার্থক বিপ্লব এনেছিলেন। অথচ তাঁর সম্পূর্ণ লেখা গ্রন্থের সংখ্যা ৬।৭টির বেশী হবে না। তবু তাঁর লেখনী প্রতিটি ছত্রে নূতন পথ, নূতন ভাব-ধারার সৃষ্টি করেছে। কবিতা, নাটক, ছোট গল্প সাহিত্য সমালোচনা ও সাহিত্য-বিতর্কে তিনি নূতন নিশানা রেখে গিয়েছেন। প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য-শৈলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে তিনিই নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বাংলার নব-জাগরণ তাঁকে গভীর-ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল; তাই তিনি তখনকার তরুণ তেলেগু লেখকদের বাংলা ভাষা শিখে সম্পূর্ণ নিজস্বভাবে তেলেগু সাহিত্য সমৃদ্ধ করবার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আপ্পা রাও ছোটবেলা থেকেই ইংরাজী ও তেলেগু ভাষায় কবিতা লিখতেন। তিনি "শারংগধর" নামে ইংরাজীতে একটি নাটক লেখেন। এটি কলকাতার "রিস এ্যাণ্ড রায়ত" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তখন এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শম্ভুচন্দ্র মুখার্জি।

আপ্পা রাও ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা কলেজে প্রায় দশ বৎসরকাল অধ্যাপনা করেন। এই সময়ে তিনি ইতিহাস নিয়ে গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন। পরে তিনি মহারাজার একান্ত সচিব নিযুক্ত হন। মহারাজার একান্ত সচিব হিসাবে মাঝে মাঝে তাঁকে কলকাতায় আসতে হত। এই সূত্রে বাংলার অনেকের সংগে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। প্রধানত তাঁর সৌজন্যেই কলকাতার তৎকালীন অনেক সাহিত্যিক, বিশেষ করে বংগীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্যদের সংগে আপ্পা রাওয়ের পরিচয় হয়। এই পরিষদ সম্বন্ধে তিনি তাঁর অভিমত লিখে গিয়েছেন।

আপ্পা রাও ডায়েরী রাখতেন। পরিচিত

আপ্পারাও

ব্যক্তি ও বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে তিনি তাঁর মতামত লিখে রেখেছেন। এর কতকগুলি তেলেগুতে লেখা, কতকগুলি ইংরাজীতে। তাঁর ডায়েরীতে ঔপন্যাসিক হিসাবে বংকিমচন্দ্র এবং বংকিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের তেলেগু অনুবাদ সম্পর্কে আপ্পা রাওয়ের মতামত পাওয়া যায়। এক স্থানে তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী ও রচনাবলী সম্বন্ধে তাঁর অভিমত লিখে রেখেছেন।

ডায়েরীতে গুরুদেব সম্বন্ধে দুই স্থানে লিখেছেন, যদিও কোনটিই সম্পূর্ণ নয়। কবিগুরুকে প্রথম দর্শনের পরে এবং তাঁর সংগে সাক্ষাৎকারের পরে আপ্পা রাও আপন মনের কথা লিখে রাখেন।

১৯১২ সালে বংগীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কলকাতা টাউন হলে কবিগুরুকে যে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় আপ্পা রাও সেখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রথম দর্শন লাভ করেন। দ্বিতীয়বার দর্শন ঘটে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে মাঘোৎসবের সময়ে। তখনও গীতাঞ্জলির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি।

গুরুদেবের প্রথম দর্শন লাভের পর আপ্পা রাও তাঁর ডায়েরীতে লেখেন:

"আজ বাংলার জনসাধারণ কবিরাজ রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানালেন কোনওকালে কোনও দেশের কোনও রাজা তাঁর প্রজাকুলের কাছ থেকে সেরূপ শ্রদ্ধা লাভ করেননি। মহাকবি বাংলা

ভাষাকে সুউচ্চে তুলে ধরেছেন। কাব্যিক ভাবধারা প্রকাশের রুদ্ধদুয়ার তিনি উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। রবির রশ্মি আজ দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলা দেশ উপলব্ধি করেছে যে, কবির গৌরবেই তার গৌরব। সে অনুভব করেছে, কবিই হল তার 'ধী ও শ্রী'র প্রতীক। পরমেশ্বরের মত কবির কাছে তাই আজ সে প্রণতি জানিয়েছে।"

মাঘোৎসবের গুরুদেবকে দর্শন করে তিনি লেখেন :

"চীৎপুর রোড থেকে যদি একটা সরু গলির দিকে ঘুরে যান তাহলে তিনটি ভবন দেখতে পাবেন। মাঝের ভবনটি আমাদের দেশের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে, আমাদের বংশধরদের কাছে মহান স্মৃতি-সৌধ বলে বিবেচিত হবে। রবীন্দ্রনাথ এখানেই থাকেন।

সন্ধ্যার পর আমি সেখানে গিয়েছিলাম। তখন ব্রাহ্ম উৎসব চলছে। ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই একটা প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যে এসে পড়লাম। প্রাঙ্গণের চারদিক ঘিরে লাল-ইটের উঁচু দালান। আলো দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। ব্রাহ্ম সমাজের বহু লোক সেখানে সমবেত হয়েছেন। দক্ষিণ দিকের দোতলার বারান্দায় আমার মত দর্শকেরা এবং ঠাকুর পরিবারের কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে। আমাদের সম্মুখেই প্রার্থনা কক্ষ। কক্ষের ভেতরে কোন আলো নেই। সেখানে বহু সুন্দরী ব্রাহ্মমহিলা, আধো-আলো আধো-অন্ধকারে তাঁদের কিছুটা দেখা যায় কিছুটা দেখা যায় না—যেন পাতার আড়ালে ফল, জ্ঞান ও অজ্ঞানের আলো-অন্ধকারে ঢাকা মুক্তির দেবী। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে একটি মঞ্চ। সকলেই সেদিকে চেয়ে আছেন। মঞ্চের মাঝখানে সমাসীন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পরনে শুভ্র ধুতি, উর্ধাংগ চাদরে আবৃত। দু পাশে দুটি উজ্জ্বল আলো। রবীন্দ্রনাথের পিছনে বসে আছেন ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গায়কেরা। আমি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও হেরম্বচন্দ্র মৈত্রকে চিনতে পারলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ভাষণ দিলেন। তাঁর উদাত্ত বাণী সকলে নিঃশব্দে সমাহিত চিত্তে শুনলেন। তারপর কবি ও গায়কেরা উপাসনা সংগীত গাইলেন। গানটি বড় মধুর, স্বর্গীয়। আমি সত্যিই যেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করলাম।

রবীন্দ্রনাথ মহিমাময় জীবন যাপন করেন। তাঁর হৃদয় শান্তি, ভক্তি, করুণায় পূর্ণ। তিনি বিশ্বাস করেন যে, অপরের সেবাতেই জীবনের সার্থকতা। তিনি যথার্থ সৎ। এইসব মহাপুরুষদের জন্যই বাংলার খ্যাতি; তাই আজ সে জাতীয় আন্দোলনের পুরোধা।"

রবীন্দ্রনাথের সংগে প্রথম সাক্ষাৎকারের পর আপ্পা রাও লেখেন :

"১৯১২ সালের ২রা ডিসেম্বর তারিখে কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সংগে আমি দেখা করি। একটা বড় টেবিলের সামনে তিনি বসেছিলেন। ঘরটি ছিল পশ্চিমদিকের দালানের। সাধারণভাবে সাজান, আসবাব-পত্রও সাধারণ। রবীন্দ্রনাথের ডানদিকে একজন তরুণ বসে ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল করুণামন্ন। তাঁর চেহারা সুসংস্কৃত। চলাফেরা ও কথাবার্তা খুব সহজ, কোমল, তবে তাঁর উচ্চারণে পৌরুষ আছে। তাঁর সর্বাঙ্গ জুড়ে দৃঢ়-চিত্ততার একটা ছাপ সুস্পষ্ট।

আলোচনাকালে জানতে পারলাম যে, বাঙলা নাটকের পরম দুর্দিন চলছে বলে তিনি মনে করেন। নাট্যমঞ্চের অবস্থাও শোচনীয়।

বাংলা কবিতা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সাধারণ লোকের কথিত ভাষাই ব্যবহার করেন। প্রাচীন বাংলা ব্যাকরণের কঠিন বন্ধন তিনি ছিন্ন করেছেন। সেকেলে পণ্ডিতেরা এই ভাষা ব্যবহারের জন্য তাঁর কঠোর সমালোচনা করে থাকেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর ভাষা অনুমোদন করেননি। আজ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ও কথিত তেলেগু ভাষা ব্যবহারের বিরোধিতা করছে। কয়েকটি শব্দের উৎপত্তি নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হল। প্রাচীন কবিরা এই সব শব্দ কি অর্থে ব্যবহার করেছেন, তা তিনি বেশ ভালভালেই জানেন। কবির মতে আমাদের স্কুল-কলেজগুলিতে যে পদ্ধতিতে ইংরাজী সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হয়, তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। লণ্ডনে হেনরী মর্লির বক্তৃতা শুনে কিভাবে তিনি তাঁর ইংরাজী ভাষার জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন, কবি সে-কথা বললেন।

• • •

মাইকেল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী। তিনিই হলেন বাংলার প্রথম কবি যিনি ছন্দের মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি ভেঙে ফেলেন। মাইকেল বহুসংখ্যক সনেট লিখে গিয়েছেন। তিনি অনেক নূতন নূতন শব্দ রচনা করেন, যদিও সেগুলি ভিন্ন ধরনের। এই শব্দগুলি অবশ্য জনপ্রিয় হয়নি।

• • •

রবীন্দ্রনাথের একটি বিদ্যালয় আছে। সেখানে তিনি ছাত্রদের স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়েই শিক্ষা দিয়ে থাকেন।"

• • •

রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে আপ্পারাও তাঁর মতামত কোথাও লিখে রেখে যাননি। রবীন্দ্রনাথ সহজ ভাষায় লিখতেন, পাঠকও সহজে তা গ্রহণ করতে পারত। তেলেগু সাহিত্যে এই একই ঐতিহ্য সৃষ্টির উদ্যোগে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন, সে-কথা বলাই বাহুল্য। আপ্পারাও সারাজীবন এই উদ্দেশ্যে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। তিনি যে গদ্য রচনা করেন, তা তেলেগু লেখক-দের কাছে আজও আদর্শ হয়ে আছে। বস্তুত তেলেগু সাহিত্যের নব-জাগরণে গদ্য ও পদ্য রচনায় তিনিই ছিলেন পথ-প্রদর্শক।

দুই কবির মধ্যে যেসব পত্রালাপ হয়েছিল, আপ্পারাওয়ের কাগজপত্র ঘেঁটে তার একটিমাত্র চিঠি পাওয়া গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই চিঠি লিখেছিলেন রামগড় (কুমায়ুন পর্বত) থেকে ১৯১৪ সালের ২৪শে মে তারিখে। তার আগেই রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করে বিশ্বকবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। পত্রটি ইংরাজীতে লেখা। পত্রে কবিগুরু বলেছেন :

My friend,

I have been forced to go through a dissipation of mind for a long time. So I have taken shelter here in the solitude of the Himalayas to gather my scattered forces and regain my spiritual equilibrium. ***

রবীন্দ্রশব্দের অর্থবিচার

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথ একজন অসাধারণ শব্দশিল্পী—একথা এতই প্রত্যক্ষ সত্য যে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর রচিত শব্দের যেমন বৈচিত্র্য আছে তাঁর ব্যবহৃত শব্দের অর্থেরও অনেক বৈচিত্র্য দেখতে পাওয়া যায়।

অর্থের দিক থেকে তাঁর শব্দের এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। প্রাচীন শব্দ প্রাচীন অর্থেই ব্যবহৃত। যেমন—**আক্ষেপ**। প্রাচীন অর্থ আন্দোলন। রবীন্দ্র প্রয়োগ—'আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব বিলাতি জিনিস কেনা বন্ধ করিয়া...' **গৌরব**: প্রাচীন অর্থ ভারত্ব। রবীন্দ্রপ্রয়োগ—'তোমার 'বইপড়া' প্রবন্ধের মধ্যে অনেক মাল আছে। কিন্তু তারা এমনি ভান করচে যেন তাদের কোনো গৌরব নেই অর্থাৎ যেন তারা ভারাকর্ষণের কোনো ধার ধারে না।' প্রাচীন শব্দ বর্তমানে অপ্রচলিত অর্থেও রবীন্দ্র প্রয়োগে পাওয়া যায়। যেমন—**অসম্ভাব**। বর্তমানে অপ্রচলিত অর্থ অভাব। 'ইতিহাসে সে প্রমাণেরও কিছুমাত্র অসম্ভাব নাই।' প্রাচীন শব্দ নতুন অর্থেও রবীন্দ্রনাথের লেখায় দুচারটে পাই। যেমন—**কাকুধ্বনি**। নতুন অর্থ ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ। প্রয়োগ—'বুড়ো নিম গাছের তলায় ইঁদারা/ গোরু দিয়ে জল টেনে তোলে মালী, তার কাকুধ্বনিতে মধ্যাহ্ন সকরুণ।' **প্রদোষ**। নতুন অর্থ twilight. প্রয়োগ—'সেই প্রদোষের অস্পষ্টতায় ছায়াশরীরীর মতো...।' **ত্রিলোচন**। নতুন অর্থ শিব। 'যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন।' এক আধটা আঞ্চলিক শব্দ আঞ্চলিক অর্থেও রবীন্দ্রনাথে পাই। যেমন—**গ্রাম্ভারি**। অর্থ গুরুগম্ভীর serious। বীরভূম অঞ্চলে চলিত। প্রয়োগ—'পলিটিক্‌স্‌ এবং অন্যান্য গ্রাম্ভারি বিষয় নিয়ে পুরুষেরা নাড়াচাড়া করুন।'

শব্দের গঠনের আলোচনা অনেক স্থলেই শব্দার্থ-বোধের সহায়ক হয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সব শব্দের গঠন বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তাই সব স্থলে অর্থ স্পষ্টও নয়। প্রচলিত অভিধানগুলো এ বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। যেমন—'ওপারেতে ধানের খোলা / এই পারেতে হাট।' জ্ঞানেন্দ্রমোহনে এই **খোলার** অর্থ **'ক্ষেত্র'** করা হয়েছে। ব্যবহারিক শব্দকোষে অর্থ দেওয়া হয়েছে—'ধান আদি মাড়াই করিবার স্থান।' ওদুদ সাহেবের অর্থই ঠিক। নদীয়া অঞ্চলে এই অর্থেই শব্দটি প্রচলিত। অনেক সময় আবার অর্থনির্ণয়ে ভুল বা কষ্টকল্পনা দেখা যায়। যেমন—'শত শত গীতমুখরিত বনবীথিকা।' জ্ঞানেন্দ্রমোহন এই **'বীথিকা'র** অর্থ করেছেন—'দৃশ্যকাব্য বিশেষ'। এ অর্থ স্পষ্টতই ভুল। 'ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে / নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক, কহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।'—'চোখের মতো ভাবপ্রকাশক অশ্রু' ওদুদ সাহেবের **'অশ্রুচোখে'র** এই অর্থ স্পষ্টতই কষ্ট কল্পনা। সুতরাং রবীন্দ্র ব্যবহৃত শব্দের অর্থের আলোচনার প্রয়োজন আছে। বলা বাহুল্য সঠিক শব্দার্থবোধ ছাড়া ভালো সাহিত্যের রস পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত শব্দের অর্থ বিচারে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রয়োগ ও প্রাচীন অভিধান আলোচনা করলে অনেক সময় অর্থবোধের সুবিধা হয়। যেমন—**কুথা**। প্রাচীন সাহিত্যে কাদম্বরীর আলোচনা প্রসঙ্গে শব্দটি পাওয়া যায়। অর্থ হল 'কুশতৃণ।' সাধারণ অভিধানে শব্দটি নেই। অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রয়োগ থেকেও তাঁর ব্যবহৃত বিশেষ কোনো শব্দের অর্থ ঠিক করা সহজ হয়। যেমন—**অতিকৃতি** শব্দটি। 'কালান্তরে'র—'অনুকরণ প্রায় অতিকরণে পৌঁছয়।' 'বেশভূষার অতিকৃতি নিয়ে গর্ব...'। এই দুই প্রয়োগ থেকে বেশ বোঝা যায় শব্দ দুটি সমার্থক। আর এ দুয়ের অর্থও একই—'বাড়াবাড়ি।' নিচে অস্পষ্টার্থ বা দুরূহ কতকগুলো শব্দের অর্থ বিচার করা যাচ্ছে। **অঞ্জন**। আভিধানিক অর্থ

গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা

কাজল। 'নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর হে গম্ভীর'; 'নব নীল অঞ্জন'; 'নীলাঞ্জন ছায়া ঘন'; 'পশ্চিমের আকাশ প্রান্তে / আঁকা থাকবে একটি নীলাঞ্জন রেখা'—এই সব পংক্তির সঙ্গে 'নীল নব ঘনে আষাঢ় গগনে/তিলঠাঁই আর নাহি রে', কি 'নব নীল মেঘে' প্রভৃতি পংক্তির তুলনা করলেই 'অঞ্জন' অর্থে রবীন্দ্রনাথ কজ্জল ও কজ্জলসদৃশ মেঘ দুইই বুঝেছেন মনে হয়। নীলাঞ্জনের আভিধানিক অর্থ তুঁতে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেননি।

অন্নপায়ী। শব্দটির অর্থ অন্নজীবী। য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে আছে—'নিতান্ত অন্নজীবী বাঙালী মনে করে।' মানসীতে 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী / স্তন্যপায়ী জীব।' মানসীতে প্রয়োগকাল ১২৮৬ ও হাস্যকৌতুকে ১২৮৮। স্তন্যপায়ীর মতো হেয়জ্ঞানেই অন্নপায়ী তৈরি করা হয়েছে।

অভুগ্ন। 'বিশীর্ণ গোলকচাঁপা গাছে/ পাতাশূন্য ডাল / অভুগ্নের ক্লিষ্ট ইশারার মতো।' আকাশপ্রদীপ ২৩।৮১। ভুগ্নর আভিধানিক অর্থ রোগাদিজনিত বক্র, রুগ্ন, বক্র। তাহলে অভুগ্নের অর্থ দাঁড়ায় সরল ও অরুগ্ন। কিন্তু উদ্ধৃতিতে এ অর্থ খাটে না। **আকর্ষণজীবী**। 'কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে।' এর একটু পরেই আছে 'শোষণজীবী সভ্যতার'...। মনে হয় কবি শোষণজীবী অর্থেই কর্ষণ-এর সঙ্গে অনুপ্রাসের খাতিরে আকর্ষণজীবী ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বহু স্থলেই একটি শব্দ ব্যবহার করে একটু পরেই তার অর্থবোধক অন্য শব্দ ব্যবহার করেছেন। একই শব্দের বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি তাঁর বৈচিত্র্যকামী মনকে পীড়া দিত।

কুক্ষি। 'চাঁদার খাতা কক্ষিগত করিয়া উৎসাহী লোকদিগকে দ্বারে দ্বারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইয়াছে না...।' 'বাঁ হাতের কুক্ষিতে ঝুড়ি, ডান হাত দিয়ে মাচা থেকে লাউ শাক তুলছে।' শেষের এই পংক্তির সঙ্গে তুলনীয়—'ফাল্গুন দিনে শাক তুলে নাও ক্ষেতে / চপড়ি নিয়ে কাঁখে', তা হলে শেষের 'কুক্ষি'র অর্থ পাওয়া গেল কাঁখ। প্রথম কক্ষির অর্থ বগল। কুক্ষিগত=বগল-দাবা। বিহারীলালে কুক্ষি বগল অর্থে পাই।১ শব্দটির আভিধানিক অর্থ উদর বা কোঁক আর কক্ষ শব্দের অর্থ কাঁক বা বগল।

ক্রন্দসী। এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উদ্ভাবিত জ্ঞানেন্দ্রমোহনের এ মত গ্রাহ্য নয়। শব্দটি জ্ঞানেন্দ্রমোহন সংস্কৃত অভিধানে পাননি। তার কারণ এটি বৈদিক

১ কাব্য সংগ্রহ পৃঃ ৫৮১ (কে, বি, প্রকাশিত)

শব্দ। ২ লৌকিক সংস্কৃতে ব্যবহার না থাকায় সংস্কৃত অভিধানে স্থান পায়নি। শব্দটি যে রোদসীর অনুকরণে অনুপ্রাসানুরোধে গঠিত জ্ঞানেন্দ্রমোহনের এ যুক্তিও তাই মানা যায় না। রবীন্দ্রনাথ প্রথম শব্দটি ব্যবহার করেন উর্বশী কবিতায়—২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২। বেদের সায়নভাষ্যে এর অর্থ দ্যাবাপৃথিবী অথবা ক্রন্দনরতা মানুষী ও দৈবী সেনা (ঋক্‌বেদ ১০।১২১।৬)।৩ উর্বশীতে স্বর্গমর্ত্য মানে করা যায়। 'ওই শুন দিশে দিশে তব লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী'। উর্বশী'র পরে ৯ চৈত্র ১৩১৫ সালে 'শান্তিনিকেতনে' ব্যবহৃত হয়। 'যে প্রার্থনার যুগযুগান্তরব্যাপী ক্রন্দন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলেই বেদে এই অন্তরীক্ষকে ক্রন্দসী রোদসী বলেছে।' এখানে ক্রন্দসীর অর্থ আকাশ করা হয়েছে। এই অর্থ অন্যান্য অনেক অর্থের মতো কবির নিজস্ব বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের পরে নজরুল ইস্‌লাম রোরুদ্যমানা অর্থে ব্যবহার করেছেন—'কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে'। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবিরশ্মি (১ম খণ্ড)-তেও এই অর্থ—'বিশ্বপ্রকৃতি সেই অধরা উর্বশীকে ধরিতে না পারিয়া ক্রন্দসী হইয়া আছে।' বিষ্ণু-দে-র সাম্প্রতিক কবিতায় আকাশ অর্থেই পাই। ৪

ক্রীড়াশৈল। বিহারশৈল। এই অর্থেই শব্দটি মেঘদূতে আছে। ক্ষণিকায় এই অর্থেই ব্যবহৃত—'ক্রীড়াশৈলে আপন মনে/দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি। কিন্তু অন্যত্র খেলা পাহাড় (toy hill, imitation hill) অর্থে প্রযুক্ত। 'গুণদাদার বাগানের ক্রীড়াশৈল হইতে পাথরচুরি...।' তুলনীয়—'নেবু গাছ ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে/ খেলা পাহাড়ের গায়ে।'/শেষ সপ্তক।

গিরিব্রজ। গিরিসমূহ। 'দেখলেম দুর্গম গিরিব্রজে/ছবি আঁকছে গুণী/কোলাহলী কৌতুহলী দৃষ্টির অন্তরালে/অসূর্যম্পশ্য নিভৃতে/গুহা ভিত্তির পরে'/: শেষসপ্তক: 'চারদিকে সুন্দর গিরিব্রজ, শস্যশ্যামলা উপত্যকা জনপদবধূদের স্নানসেবায় চঞ্চল উৎসজল সঞ্চয়ের অবিরত কলপ্রবাহ'—যাত্রী। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিতে গিরিব্রজ, রাজগির। ৫—'তোমরা কি এবার গিরিব্রজে যাবার সংকল্প করছ?'

চরণচক্র। 'বাজু বন্ধ বা চরণ চক্র'—

---

২ ঋগ্‌বেদ ২।১২।৮, ৬।২৫।৪, ১০।১২১।৬।

৩ ভাষার ইতিবৃত্ত পৃঃ ২৭।

৪ 'এ কি ক্রন্দসী কাঁদে? মা কি কাঁদে মাটির হৃদয়ঃ (সাহিত্যপত্র বসন্ত সংখ্যা ১৩৬১): 'সেই হেমন্ত নিশির/ক্রন্দসীর তারাজ্বালা দুঃখের শিশির' (সাহিত্যপত্র ১০ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩৬৭)।

লোকসাহিত্য। 'সিঁথি থেকে চরণচক্র পর্যন্ত গয়নার অভাব নেই।' যাত্রী। 'সোনার চরণচক্র পায়ে'—আকাশপ্রদীপ। এই চরণচক্র কোন্ গয়না? চরণের চক্রাকার গয়না তো মলই। নূপুরকে নূপুররূপে ব্যবহার করতে কবির কুণ্ঠা নেই। বড়ো জোর বিকল্প মঞ্জীর ব্যবহার করেছেন। মল-এর তুচ্ছতা তাঁকে পীড়া দিত বলেই কি চরণচক্র? নাম-না-জানা বনফুল-এর যিনি নীলমণি-লতা নামকরণ করেছিলেন, তাঁর পক্ষে চরণচক্র রচনা খুবই স্বাভাবিক।

নিছনি। ৬ 'নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে/ আঁধার কেশভার দিয়েছে বিছায়ে।' গৃহপ্রবেশ। 'দুই সজল পল্লব নেত্রপাতের দ্বারা দুইখানি চরণ পদ্ম বারম্বার নিছিয়া মুছিয়া লইলাম।' অধ্যাপক গল্প। এই দুই দৃষ্টান্তে নিছনি 'মোছা' অর্থে ব্যবহৃত। আর 'আমি এ কথা, এ ব্যথা, সুখব্যাকুলতা কাহার চরণতলে/দিব নিছনি।' গীতবিতান (২য় খণ্ড)-এর এই কলিতে নিছনির অর্থ উপহার।

পরিণামবাদ। 'এমনি করে যিনি অসীম তিনি সীমার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছেন, যিনি অকালস্বরূপ খণ্ডকালের দ্বারা তাঁর প্রকাশ চলেছে। এই পরমাশ্চর্য রহস্যকেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে পরিণামবাদ।' শান্তিনিকেতন ১৩।৫৩১। জ্ঞানেন্দ্রমোহন পরিণামকে Cpsmic evolution-এর পরিভাষা বলে উল্লেখ করেছেন। পরিণামবাদ বলে একটি প্রাচীন দার্শনিক মত আছে। মনে হয় সেই পুরানো শব্দই কবি নতুন অর্থে প্রয়োগ করেছেন, নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ কথা বলার কারণ, evolution-এর প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় কবি অভিব্যক্তিবাদ, ক্রমাভিব্যক্তি, ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব, বিবর্তন ব্যবহার করেছেন।

বড়োদিন। 'আজ আমাদের বড়োদিন'... মুক্তধারা ১৪।১৮৮পৃ। তুলনীয়—'মিলনের মহাদিন'...ভারতবর্ষ ৪।৪৬৯; 'আজ এসেছে আমাদের একটি মহাদিন'.... শেষের কবিতা ১০।৩৫৯; 'এই উৎসবে সেই প্রভাতের প্রথম রশ্মিপাত হয়েছে যে-প্রভাত একটি মহাদিনের অভ্যুদয় সূচনা করেছে।' শান্তিনিকেতন ১৪।৩২০। এইসব দৃষ্টান্তে বড়োদিন আর মহাদিন একই। উৎসবের দিন সাধারণের দিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই 'উৎসবের দিন' অর্থেই রবীন্দ্রনাথ বড়োদিন ও মহাদিন ব্যবহৃত করেছেন, খৃষ্ট-মাস-ডে অর্থে নয়।

বলাকা। ১ 'রাজহংস দল/আকাশে বলাকা বাঁধি সত্বর চঞ্চল'—চিত্রা ৪।৯৭। ২ 'বলাকা উড়িয়া চলিবে'...সাহিত্য ৮।৩৬৭; ৩ 'বলাকার শ্রেণী'... সাহিত্য ৮।৪০২; ৪ 'বলাকাদল যাচ্ছে উড়ে/জানি নে কোন দূর-সমুদ্র পারে'। উৎসর্গ ১০।৪৯। ৫ 'বলাকা

নাম কাব্য' ১২।৬ 'হে হংসবলাকা', বলাকা ১২।৫৮; ৭ 'মেলিতেছে পাখা/লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা', বলাকা ৫৯।৮; ৮ সন্ধে-বেলায় বন্ধ আসা-যাওয়া,/হাঁস-বলাকার পাখার ঘায়ে চমকেছিল হাওয়া।' সেঁজুতি ২২।৪৬।২; ৯ 'বলাকাপাঁতির পিছিয়ে-পড়া ও পাখি'...সানাই ২৪।৭৮; ১০ 'সমুৎসুক বলাকার ডানার আনন্দচঞ্চলতা' সানাই ২৪।১০৪; ১১ 'আর বর্ষায় বলাকাই বল, হংস শ্রেণীই বল', শ্রাবণগাথা ২৫।১১৭; ১২ 'বলাকা উড়ে চলে'...গীতবিতান ১।১১; ১৩ 'স্বপন বলাকা'...গীতবিতান ২।৩৫৬; ১৪ 'মন চায় ওই বলাকার পথখানি নিতে চিনে'॥ গীতবিতান ২।৪৭৭।

প্রথম দৃষ্টান্তে বলাকার অর্থ শ্রেণী। বক বা হাঁস শ্রেণী বেঁধে ওড়ে বলেই শ্রেণী অর্থ কবি নিয়েছেন। উদ্ধৃতিগুলোতে দেখা যাবে বলাকা শব্দের সাধারণ অর্থ বক ৭ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ হাঁসের দল অর্থেও বলাকা শব্দ ব্যবহার করেছেন। শেষোক্ত অর্থপ্রসঙ্গে ১২শ। গ্রন্থ পরিচয়ে বলাকা কাব্য গ্রন্থের কবিতাগুলো সম্পর্কে কবির বক্তব্যের এই অংশটুকু প্রণিধানযোগ্য। "এই কবিতাগুলি ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা আসছিল। হয়তো এদের পরস্পরের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এইজন্যেই একে বলাকা বলা হয়েছে। হংসশ্রেণীর মতোই তারা......বলাকা নামের মধ্যে এই ভাবটা আছে যে, বুনো হাঁসের দল নীড় বেঁধেছে, ...সেদিন সন্ধ্যায় আকাশপথে যাত্রী হংস-বলাকা......।" 'বলাকাপাঁতি পিছিয়ে-পড়া ও পাখি'—সানাই-এর এই বলাকার অর্থ সারস ৮ হতে পারে। এই পোষাপাখি হাঁসও হতে পারে। নলদময়ন্তীর উপাখ্যানের হংস-দূতের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। 'বলাকা-দল যাচ্ছে উড়ে/জানি নে কোন দূর-সমুদ্র-পারে।' এখানে বক নয়, হাঁসের পক্ষেই সমুদ্রে পাড়ি জমানো সংগত। বলাকা হাঁস না বক না সারস এবিষয়ে অভিধানকারদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

ভেরে-ওঠা। 'বৃষ্টির ফোঁটায় ভেরে-ওঠা জুঁই ফুলটির মতো হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে খসে পড়ে।' লিপিকা ২৬।১৪৩। অর্থ অস্পষ্ট। তুলনীয়—'বৃষ্টিক্লান্ত জুঁই ফুলটির মতো'......গ্রন্থপরিচয় ১৪।৫৩১।

মঞ্জিরা। 'দস্যু তারা হেসে হেসে/হে ভিক্ষুক, নিল শেষে/তোমার ডম্বরু,শিঙা, হাতে দিল মঞ্জিরা বাঁশরি।' পূরবী ১৪।২১। চলন্তিকায় মন্দিরা (মঞ্জীর)—Cymbals দেওয়া আছে। রবীন্দ্রনাথ মন্দিরা অর্থেই মঞ্জিরা ব্যবহার করেছেন।

মাংসপেশল। 'মাংসপেশল চমৎকার শরীর।' য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র ১।৫৪০ পৃঃ। 'মাংসপেশল পুরুষ' গ্রন্থপরিচয় ১৬।৫১০ পৃঃ। 'গদ্যটি মাংসপেশল পুরুষ'...ছন্দ ২১।৪২০ পৃঃ। পেশল—সুন্দর। মাংস-পেশল—মাংসে ভরা সুন্দর।

সমীরিত। 'যে ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, অন্তঃপুরের অসূর্যম্পশ্য কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই;...।' 'যেথানে তোমার উদারবায়ু নিঃশ্বাস জোগায় মাত্র, অন্তঃকরণের মধ্যে বিশ্বপ্রাণকে সমীরিত করিতে পারে না... । 'সে মহা-আনন্দ যাহা.../বিচ্ছুরিত সমীরিত আকাশে আকাশে;...।' 'এখনও সেখানে উষ্ণ-নিশ্বাস সমীরিত।' 'আকাশমণ্ডল, যার মধ্য দিয়ে আমাদের প্রাণের নিশ্বাস বায়ু সমীরিত হয়।' 'বিকালের নিস্তব্ধ তন্দ্রালোকে সকালের চাঞ্চল্য সমীরিত করবার চেষ্টা করেছি।' এইসব দৃষ্টান্তে সমীরিত কথিত ও সঞ্চালিত অর্থে ব্যবহৃত।

৫ A city in Magadha—Apte
৬ নিছনি ১২।৫৩৬ পৃঃ।
৭ বিহারীলালেও এই অর্থ, কাব্য সংগ্রহ পৃঃ ৪৩ ৮ বলাকা— crane—Apte

অন্তরের নিহিত প্রবণতা পরাস্ত করে আমি এই ব্যথিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে বিশ্ব জুড়ে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হলেও বাঙালীর আজ অধিকার নেই সে-যজ্ঞে যোগ দেবার। রবীন্দ্রপ্রতিভার সার্থকতম বিকাশ বাঙলা ভাষায় : কবিরে পাবে না কভু কোনো অনুবাদে। বাঙালীর তাই দুর্লভ সুযোগ ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্যের সত্যকার মর্মবাণী আয়ত্ত করে আত্মস্থ হবার। রবীন্দ্রব্যাখ্যার বন্যা ইতিমধ্যেই ব্যাপক ও প্রবল। বক্তৃদুর্ভিক্ষ না হলে আমাকে কেন স্মরণ করেছিলেন একাধিক মফঃস্বলীয় সংস্থা? (বলা বাহুল্য, আমার সবিনয় প্রত্যাখ্যান প্রস্তুতই ছিল।) তবু এই নিরানন্দ চিন্তা কিছুতেই পরিহার করতে পারছি নে যে, হৃদয়মন্দিরে যাঁর অধিষ্ঠান ভাষাগত ঐক্যের কল্যাণে আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল তাঁরই জন্মদিন আজ তাঁর জন্মভূমিতে বন্ধ্য অনুষ্ঠানে পর্যবসিত। রবীন্দ্রনাথ কবি না হয়ে সাঁতারু হিসাবে সম্মানিত হলে তাঁর স্মৃতি-পালনের আয়োজন বিশেষ বিভিন্ন হোতো না বলে সন্দেহ করি।

রঞ্জন

ক্ষেত্রবিশেষে আক্ষেপ শুনেছি—বা পড়েছি—যে এই পরমলগ্নে রবীন্দ্রনাথের সংগীত ও নৃত্যনাট্য ব্যতীত আর কিছুর আশানুরূপ অনুশীলন হচ্ছে না। আমরা যারা গাইতে বা নাচতে জানিনে, শুধু কথার কারবারী, তাদের কাছ থেকে এমন অভিযোগ অপ্রত্যাশিত নয়। আমার অভিযোগ অন্যত্র।

*

কবি নিজেই "নানা রবীন্দ্রনাথের মালা"-র উল্লেখ করেছেন। তারও বহু আগে লিখে-ছিলেন, "বুঝা যায় আধ প্রেম আধখানা মন, সমস্ত কে বুঝেছে কখন?" তাই সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারব, এ-আশা চিরকালই ছিল সুদূরপরাহত। কোনো সসীম অংশের পরিমিত উপলব্ধি, তাই ছিল আমাদের উচ্চাশার শীর্ষ। পরবর্তী প্রশ্ন অংশনির্বাচনের।

রবীন্দ্রপ্রতিভার যে-ক্ষুদ্রাংশ সাম্প্রতিক বঙ্গচিত্ত হরণ করেছে তার মূল্যনিরূপণ বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। আশী বছরের দীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথের যে-বৈশিষ্ট্যটি আমাকে সব চাইতে বেশি আকৃষ্ট করে তা তাঁর ব্যালান্স, নিরবচ্ছিন্ন সামঞ্জস্য ও পরি-মিতিবোধ (জীবনে; রচনায় নয়, যেখানে তিনি প্রায়শ প্রগল্‌ভ)। তারুণ্যেও আতি-শয্যের ইঙ্গিত মাত্র পাইনে। সমগ্র জীবনে এমন সর্বাঙ্গীণ "পূর্ণতার পরশ"-এর দ্বিতীয় নিদর্শন আমার অজ্ঞাত।

*

আমার অস্পষ্ট বক্তব্য দৃষ্টান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অতিসহজ না হয়ে উপায় নেই। হওয়া যাক। রবীন্দ্রনাথ ইস্কুল যাননি; আমরাও যাইনে, গেলে তা বেঞ্চি ভাঙতে। মনে রাখিনে, গৃহে তাঁর অধ্যয়ন কত গভীর ও ব্যাপক ছিল। রবীন্দ্র-নাথ রোমান্টিক ছিলেন; শুনতে পাই আমরাও নাকি তাই। সংস্কৃত ও য়ুরোপীয় ক্লাসিকের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচিতির খবর রাখি ক'জন? রবীন্দ্রনাথ অচলায়তনের ডিসিপ্লিন পছন্দ করতেন না। আমাদের কোনো ডিসিপ্লিনেরই বালাই নেই কেননা ভুলেছি, রবীন্দ্রনাথের স্বারোপিত সংযম কী কঠোর ছিল। এবারে সবচেয়ে "হাস্যকর" দুটি দৃষ্টান্ত দেব। রবীন্দ্রনাথ ছেলে-বেলায় গান শিখতেন, পরে ছবি এঁকেছেন। আমরা মনে রাখিনি যে বাল্যে তিনি অ্যানাটমি এবং কুস্তিও শিখেছিলেন এবং পরে শুধু জমিদারি দেখেননি, ব্যবস্থায় করেননি, শান্তিনিকেতনের রাস্তা পরিষ্কার কিনা তার দিকেও লক্ষ্য রেখেছেন।

এই বহুধা বিচিত্র চরিত্রের একাংশ গ্রহণ করলে ভারসাম্য ভয়াবহরূপে ব্যাহত হতে বাধ্য। বর্তমান বাঙালী চরিত্রে ব্যালান্স প্রকট নয়।

•

কুস্তির কথায় মনে পড়ছে : মাইকেল আর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ ও রচনারীতির মৌল পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে আমার এক সুপণ্ডিত শিক্ষক দুটি লাইন উদ্ধৃত করে-ছিলেন। মাইকেল—"ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার।" রবীন্দ্রনাথ—"বিজলী

"দেখেছি সকলের চেয়ে গুরুতর অভাব আরোগ্যের, আধমরা মানুষ নিয়ে দেশে কোনো বড় কাজের পত্তন সম্ভব নয়, তারা কাজে ফাঁকি দেয় প্রাণের দায়ে, আর সেই কারণেই প্রাণের দায় দুরূহ হ'য়ে ওঠে। আমরা অনেক সময় দোষ দেই বাহ্য কারণকে — কিন্তু রোগজীর্ণতা পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জার মধ্যে বাস ক'রে গুরুতর কর্তব্যের ভারকে ভগ্ন উদ্যমের ফাটল দিয়ে পথে পথে সে ছড়িয়ে দিতে থাকে, লক্ষ্যস্থানে অল্পই পৌঁছায়—"

—রবীন্দ্রনাথ

শুধু চমক আভা হানে, নিবিড়তর তিমির চোখে আনে।" বক্তব্যের ঐক্য সত্ত্বেও সুরের ও মেজাজের বিজাতীয়তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয় না। আমার কালের প্রচলন অনুযায়ী মাইকেলকে আমি বর্বর মনে করতেম আর রবি ঠাকুরকে আলোক-প্রাপ্ত।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। রাবীন্দ্রিক কমনীয়তা সম্বন্ধে মমত্ব অল্পই লোপ পেয়েছে; কিন্তু মাইকেলের বজ্রগম্ভীর লাইনটি আজ শুধুই হাস্যোৎপাদন করে না। আরও আবিষ্কার করেছি, রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যে পেলবতার চাইতে ঋজু কঠোরতা আদৌ কম নেই। বর্তমান বাঙলা যদি শুধু মৃদু অংশ গ্রহণ করে থাকে তবে তার কারণ বাঙালীর স্বীয় চরিত্রক্ষীণতা।

*

"সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এদেশে", এ-গান এখন সহস্রবার গীত হবে। জানিয়ে রাখি, কবি একবার ক্ষণিক রোষবশে কয়েক-জনকে বলেছিলেন যে যাবার আগে কথা ক'টি নিজহাতে কেটে দিয়ে যাবেন। ১৯৩৮ সালে লেখা তাঁর একটি চিঠি উদ্ধার করা যাক।

Santiniketan, Bengal
November 28, 1938

My dear Jawaharlal,

I asked you to come and meet me not because I had any definite plan to discuss or any request to make. I merely wanted to know your opinion about Bengal whose present condition puzzles me and makes me despair. My province is clever but morally untrained and supercilious in her attitude to her neighbours, she breaks into violent hysteric fits when least crossed in her whims. I know her weakness but I cannot maintain my detachment of mind passively and acquiesce in her doom of perdition. But I am quite willing to settle down to my special work and leave to your Congress organization to deal with her as it thinks fit. But I myself believe in some personal force for tightening screws that are loose and sawing off parts that obstruct, a headworker, who may not be perfect as a man but expert as a mechanic. However, I want to talk to you and more than that I want to hear you talk though all this may not lead to anything practical. Truth is I want to see you but it may wait till you have some time to spare.

I am anxious about India's state of health. I hope her spending the winter months in India will help her.

Yours affectionately
Rabindranath Tagore

এর পরে রবীন্দ্রজয়ন্তী হিস্টীরিয়ায় যোগ দেবার অধিকার আমার নেই।

রুমানিয়ায় রবীন্দ্রনাথ

অমিতা রায়

২০শে নভেম্বর, ১৯২৬। বুখারেস্টের শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র Adevarul (সত্য)-এর প্রথম পৃষ্ঠায় একটি খবর প্রকাশিত হল:

বিশিষ্ট অতিথির আগমন

ভারতবর্ষের ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজ অপরাহ্ণ ৪টায় বুখারেস্ট পৌঁছাবেন।

রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে সংবাদপত্র লিখলেন: "নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আদর্শ মনুষ্যত্বের এক বিরল নিদর্শন—একমাত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না।"

Adevarul-এর প্রতিনিধি বুলগেরিয়া গেলেন রবীন্দ্রনাথের যাত্রাপথের বিবরণ সংগ্রহ করতে। কবি রুমানিয়া এসেছিলেন যুগোশ্লাভিয়া ও বুলগেরিয়া হয়ে। বুলগেরিয়াতে ছিলেন দু-দিন—'সমকালীন সভ্যতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন সোফিয়ায়। ঐ দু-দিন তাঁর সম্মানে বুলগেরিয়ার সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি দেওয়া হয়েছিল।

বুলগেরিয়া সরকার তাঁকে যেমন সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন। তেমনি সম্মেলনে বিদায় অভিবাদন জানিয়েছিলেন। রুমানিয়া যাবার জন্য কবির জন্য একটি বিশেষ জাহাজ ছাড়াও জনসাধারণের জন্য আর একটি জাহাজের বন্দোবস্ত ছিল; যাতে তাঁরা জলপথে এইটুকু সময় কবির সহযাত্রী হতে পারেন।

যথাসময়ে কবি জাহাজঘাটে পৌঁছালেন। হেমন্ত-অপরাহ্ণে রুশচুকের সেই জাহাজঘাটে কবির প্রথম দর্শন রুমানীয় সাংবাদিককে বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরদিনের কাগজে তিনি লিখলেন:

এ যেন বাইবেলে বর্ণিত এক saint—কোন প্রাচীন চিত্রকরের পবিত্র কল্পনার নিখুঁত রূপায়ণ।

অগণিত জনতার শুভেচ্ছা বহন করে কবির জাহাজ ছাড়ল। দানিয়ুবের এপারে রুশচুক, ওপারে রামাদান। রুমানিয়ার রামাদানে কবি জাহাজ থেকে নামলেন। ওপারের সমারোহের পরে এপারের শূন্য, প্রায়ান্ধকার জাহাজঘাটা—তবু কাস্টমসের কাজ যথাসম্ভব তৎপরতার সঙ্গে চুকিয়ে ফেলে কবি ও তাঁর সঙ্গীদের ছেড়ে দেওয়া হল।

রবীন্দ্রনাথ রুমানিয়ায় প্রবেশ করলেন। এ-বারের যাত্রায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী, কবির পৌত্রী, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশ, যাঁদেরকে সব সংবাদপত্রেই কবির কন্যা ও জামাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কবি ও তাঁর সহযাত্রীরা ট্রেনে উঠলেন। এখানেও অভ্যর্থনার ত্রুটি! কবির ঋষিসুলভ চেহারার কাছে ট্রেনের কামরার আভ্যন্তরীণ দৈন্য যেন আরো প্রকট হয়ে উঠল!

সংবাদপত্রের প্রতিনিধি তাঁর পাশেই আসন গ্রহণ করলেন। প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর তিনি কবিকে অনুরোধ করলেন তাঁর সংবাদপত্রের জন্য কিছু বলতে।

স্বভাবসিদ্ধ মৃদুকণ্ঠে কবি প্রশ্ন করলেন: কি বিষয়ে?

প্যান-এশিয়াটিক আন্দোলন সম্বন্ধে আপনার মতামত জানতে পারলে খুশী হব।

—আমার মতে প্রত্যেক জাতিরই একটা স্বকীয়তা, একটা উদ্দেশ্য আছে; অবিভাজ্য বিরাট মনুষ্যত্বের ধারণা ছাড়া আমার চিন্তার পরিধিতে আর কিছু আসে না। অন্যথায় এ প্রশ্ন রাজনৈতিক সমস্যার অন্তর্গত—সেটা ঠিক আমার ক্ষেত্র নয়।

—ইতালী সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

—ইতালী আমার ভাল লাগে। সুন্দর দেশ। ইতালীয়ানরাও খুব সুহৃদয় লোক। আর ইতালীর হিংসাত্মক পন্থার যে আমি সমর্থন করি না, সে তো জানেনই।

সাংবাদিক এবার কবির একটি অটোগ্রাফ চাইলেন তাঁর সংবাদপত্রের জন্য। এক মুহূর্ত ভেবে, তাঁর হাত থেকে খাতাটা টেনে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় লিখলেন :

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই॥

নীচে বাংলায় নাম স্বাক্ষর করলেন—'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

পরদিনের সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় কবির অটোগ্রাফ প্রকাশিত হল।

যাত্রাপথে প্রতি স্টেশনেই স্থানীয় লোকেরা ও ট্রেনের অন্যান্য কামরার লোকরা আসতে লাগলেন কবিকে দেখতে। 'কোমানা' স্টেশনে রুমানীয় সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের ও কলা বিভাগের কয়েকজন প্রতিনিধি, কাউন্সিলর অফ লিগেশন এবং সুপারিনটেনডেন্ট অব্ থিয়েটারস এলেন কবিকে সম্বর্ধনা জানাতে।

বুখারেস্টের নর্থ স্টেশনে কবির ট্রেন পেঁ'ছল; পররাষ্ট্র বিভাগের একজন প্রতিনিধি কবিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভাষণ দিলেন; কয়েকজন সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকও কিছু বললেন।

বুখারেস্টের সর্বোত্তম হোটেল 'আথেনি পালাসে' কবিকে নিয়ে যাওয়া হল।

২১শে নভেম্বরের 'Adevarul'-এ বেরোল রবীন্দ্রনাথের আগমন সংবাদ, আর তিনটি স্কেচ—রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। আর একটি বিখ্যাত কাগজ 'Universul'এ প্রকাশিত হল একটি ফোটো। রবীন্দ্রনাথ চেয়ারে বসে, পিছনে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী মহলানবিশ। 'Universul' রবীন্দ্রনাথের আগমন সংবাদ দিলেন এই বলে :

ভারতীয় কবি ও 'প্রোফেটে'র রাজধানীতে আগমন : ইংরাজ শাসনে নিপীড়িত ৩০ কোটি জনগণের দুঃখ বেদনার বাহক আমাদের দেশে পেঁ'ছেছেন।

২১শে নভেম্বর বিকালে রবীন্দ্রনাথের সংগীরা শহর দেখতে বেরিয়ে গেলেন। পথের ক্লান্তিতে অবসন্ন কবি হোটেলেই রইলেন, তার ওপর সেইদিনই রুমানীয় সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা আসছেন কবির সঙ্গে দেখা করতে।

বিকাল পাঁচটায় সম্মেলন শুরু হল। উপস্থিত সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন কবির দেশভ্রমণের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন।

কবি উত্তর দিলেন : সে-কথা বলা মুশকিল অল্প কথায় বলতে পারি যে, বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতি আমাকে আকৃষ্ট করে। তাই দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াই। তবে যেখানেই গেছি, সেখানেই পেয়েছি শুভেচ্ছা।

ইউরোপের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা উঠল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্বন্ধের আদর্শকে হিংসার

সংগে যুদ্ধ করে জিততে হবে। বিদ্রোহী শক্তি আজ ইউরোপ শাসন করছে। একথা ভাবা ভুল যে, মানুষকে দমন করে চিন্তাটাকেও লুপ্ত করে দেওয়া যায়। এই বিদ্রোহী চিন্তাটাকেই নাশ করা দরকার। ভালমন্দের দ্বন্দ্বে আজ মন্দই জিতছে। তবে, এই মন্দ ইউরোপের মূলে পৌঁছায় নি—এখনো শুধু বাইরের আবরণেই সীমাবদ্ধ।

একজন ইউরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে কবির অভিমত জানতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেনঃ ইউরোপীয় সাহিত্য বাস্তববাদী। ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের বর্ণনা অপূর্ব সুন্দর: কিন্তু মানবহৃদয়ের মিস্টিক অনুভূতির কোন স্থান তাঁদের সাহিত্যে নেই।

এর পর রবীন্দ্রনাথ নিজের নাম স্বাক্ষরিত একটি বই সাহিত্য-সোসাইটিকে উপহার দিলেন। সভা ভঙ্গ হল।

সন্ধ্যায় সম্মেলনের সভ্যবৃন্দ 'আথেনি পালাসে' এক ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কবির সম্মানে 'টোস্ট প্রোপোজ' করলেন। তার উত্তরে তিনি বললেনঃ

দূরদেশের মানুষেরা যখন পরস্পরকে জানার সুযোগ পায়, তখনই বোঝে তারা কত নিকট, কত আপন। ভৌগোলিক গণ্ডি মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে—সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাদের ভ্রাতৃত্ব-পাশে আবদ্ধ করে......।

আর্টের মধ্য দিয়ে এক নূতন মহাদেশ জাগছে। সেখানে সবার দ্বার উন্মুক্ত—সবাই আনছে তাদের উপহার। আমার নিজের কথা বলতে পারি—আমি আমার লেখার মধ্য দিয়ে এক বিশেষ নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছি।

সম্মান মৃতের জন্য—আর জীবিতের জন্য আছে ভালবাসা। মানুষের এই ভালবাসাই আমাকে অমর করে রাখবে।

মধ্যরাত্রে উৎসব শেষ হল।

২২শে নভেম্বর সকাল এগারটা থেকে বারটা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ন্যাশনাল থিয়েটারে কবিতা পাঠ করবেন ও বক্তৃতা দেবেন। কবি শুধু বাংলায় ও ইংরেজীতে বলবেন জানা সত্ত্বেও হলে তিলধারণের স্থান ছিল না।

বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ বেরোল ৩রা ডিসেম্বরের Viata Literara (সাহিত্য-জীবন) পত্রিকায়।

ধর্মযাজকের মত কাল পোশাক ও কাল ভেলভেটের টুপি পরে রবীন্দ্রনাথ সভায় ঢুকলেন। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। অগণিত জনসাধারণের মধ্যে চেনা যাচ্ছে যুগোস্লাভিয়ার রানী ও গ্রীসের ভূতপূর্ব রাজদম্পতিকে। একজন মন্ত্রী কবিকে অভ্যর্থনা ভাষণ জানালেন ও জনসাধারণের কাছে তাঁর পরিচয় দিলেন।

কবি মৃদুকণ্ঠে বলতে শুরু করলেন নিজের জীবনের কথা, ভারতীয় সভ্যতার

কথা, য়ুরোপীয় সভ্যতার কথা। বলতে বলতে কবি ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন—কণ্ঠস্বর হল কম্পিত, হাতের আঙ্গুল অস্থির, দৃষ্টি প্রখরতর।

কবি বললেন—

"ভারতের সত্তা একটি গানের মতন, এক-বিন্দু অশ্রুজলের মতন। অসীমের রাগিণী আমাদের ভাষার মধ্যে ওতঃপ্রোত ভাবে মিশে আছে। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে আমরা শিখেছি মানুষকে গ্রহণ করতে, মানুষকে ভালবাসতে। এই আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্য।

আর্যরা যখন প্রথম ভারতবর্ষে এসে-ছিলেন, ভারতের বনভূমি তাঁদের দিয়েছিল আশ্রয়, দিয়েছিল জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিস। মানব সভ্যতার সেই প্রথম যুগে প্রকৃতির স্নেহময় পরিবেশে হল তাঁদের ঋষি-সত্তার অভ্যুদয়।

তোমরা য়ুরোপীয়রা, প্রকৃতিকে মনে কর তোমাদের শত্রু—তোমরা চাও তাকে দমন করতে। আর আমাদের কাছে সে-ই সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। তোমাদের সভ্য নগরী তোমাদের প্রকৃতির স্বর্গ থেকে দূরে সরিয়ে এনেছে; তোমরা তার কাছ থেকে যতদূরে পারো পালিয়ে যাও। কিন্তু প্রকৃতির কাছ থেকে তোমরা যত দূরে সরে যাও—ততই এগিয়ে যাও মৃত্যুর কাছে। বাহ্যত সভ্য মানুষ প্রকৃতিকে জয় করছে—কিন্তু বস্তুত প্রকৃতি অপরাজেয়া, তার রীতি সরল—সে-রীতি অমান্য করার উপায় নেই। আমরা, ভারতীয়রা দুঃখের দিনে প্রকৃতির কাছে সান্ত্বনা খুঁজি। ভারতের মোক্ষ মানবাত্মার সঙ্গে বিশ্বজগতের মিলন-সাধনে। আমরা নীরবে সেই চরম দিনের জন্যে নিজেদের প্রস্তুত করি।"

এরপর আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কবি বললেন—

"আমি এ-দেশে দার্শনিক বা 'প্রোফেট'-রূপে আসিনি—এসেছি কবিরূপে। তাই যে পারিপার্শ্বিক আমাকে কবি করে তুলেছে, তার কথাই কিছু বলতে চাই।

কবির কাজ—ফুলের ভাষা, বাতাসের ধ্বনি, সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাসকে প্রতিধ্বনিত করা। ফুল জগৎকে তার সৌন্দর্য উপহার দেয়, কবিও সৌন্দর্যের উপাসক।

আমার জন্ম কলিকাতায়। পৃথিবীতে আমার প্রথম ক্রন্দনের মধ্যে দিয়ে বোধহয় মুক্তি আর প্রকৃতির সৌন্দর্যের বন্দনা বেজে উঠেছিল। বাল্যকালে আমার পৈত্রিক বাড়ির চারিদিকের নারকেল গাছের সারি যেন আমার কাছে কোন এক সুদূর গহন অরণ্যের বার্তা এনে দিত। আমি আমার পিতার পন্থানুযায়ী ব্রাহ্মণ।১ আমার পরিবারের

১ ভারতীয় 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি য়ুরোপে পরিচিত। তাই 'ব্রাহ্ম' অভিধাটিকে সকলেই ব্রাহ্মণ বলে ভুল করেছেন। একাধিক পত্র-পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে—এখনো পর্যন্ত এদেশের জনসাধারণ তাঁকে ব্রাহ্মণ বলেই জানেন।

প্রাচীনত্ব সহস্র বর্ষেরও অধিক। আমার পিতৃদেব বেদ-উপনিষদের ভিত্তিতে গঠিত এক ধর্মসম্প্রদায়ের যাজক ছিলেন—তাই আমাদের পরিবার চতুঃপার্শ্বস্থ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল।

বাল্যকালে কলকাতার মতন বিরাট ও সর্বজাতীয় নগরে আমি মানসিক নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছি। আমি বাস করতাম আমার স্বপ্নলোকে—এই নিঃসঙ্গতাই আমার বর হয়েছিল।

এই সময় থেকেই সংস্কৃত-সাহিত্যে আমার গভীর অনুরাগের সূত্রপাত। সংস্কৃত-কাব্যের অর্থ সম্পূর্ণ না বুঝলেও, তার ছন্দ আমার হৃদয়ে এক সংগীতসুধা ঢেলে দিত। প্রাচীন কবিদের অনুকরণে শুরু হল আমার প্রথম কাব্যসাধনা। প্রাচীন ভারতীয়দের মত উদ্যানে, মাটি মাখানো কাঠের ওপর আমার প্রথম পদ রচনা করলাম।

আমার কাব্য সাধনার প্রথম যুগে প্রাচীন কবিদের অনুকরণ করতাম—হঠাৎ একদিন সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম যে, আমার লেখা আর আমার পূর্বসূরীদের সঙ্গে মেলে না—তারা একান্তই আমার। এক স্বর্গীয় উপলব্ধির মত আমার নিজের পথ দেখতে পেলাম—বুঝতে পারলাম ভগবানের সৃষ্ট এ পৃথিবী আনন্দে, আলোকে পরিপূর্ণ। আমার কাজ শুধু এই আনন্দের গান গেয়ে যাওয়া।

বাংলা ভাষা ধর্মসংগীতের লীলাভূমি। বৈষ্ণবের গান—প্রেমের গান—সে প্রেম কখনো ঈশ্বরের প্রতি, কখনো মানুষের প্রতি, এমন কি কখনো ইতর প্রাণীর প্রতি। এই বৈষ্ণব সাহিত্য আমার কাছে জগতের এক নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করল। জগতের অসীম বৈচিত্র্যের অন্তরে বিরাজমান এক বিরাট একতা—সীমার অন্তরে জাগে অসীমের অনুভূতি।"

এর পরে কবি বর্ণনা করলেন তাঁর জীবনের সেই অভূতপূর্ব অনুভূতি যা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল প্রভাতসংগীত রচনা করতে।

ইউরোপ সম্বন্ধে কবি বললেন—"আমার ইউরোপে আসার উদ্দেশ্য মানুষকে জানা—তাদের হৃদয়ের কাছে আসা। এ আমার শিক্ষামূলক ভ্রমণ। পূর্বে য়ুরোপ আমাকে অধিকতর আকর্ষণ করে—কেননা আমাদের আত্মার সাথে তোমাদের গভীরতর আত্মীয়তা।

যুদ্ধের পূর্বে ও পরে দুবারই য়ুরোপ আমার একই রকম লেগেছে। ইউরোপে মানুষ সর্বদাই সশস্ত্র। তোমরা বল শান্তি চাও, কিন্তু চল ভুলপথে। যখনই তোমাদের অসন্তোষের কারণ ঘটে, অশান্তির মূলটাকে উৎপাটন না করে, তোমরা আগে শান্তির দূতকে বধ করো। মানুষের বিরুদ্ধে নয়—তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে চিন্তাধারার বিরুদ্ধে।"

এবার কবি ইউরোপীয় সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন—

"য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় শুধু ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে। তৎসত্ত্বেও য়ুরোপের সব বিখ্যাত সাহিত্যিক আমার পরিচিত। কিন্তু তাঁরা আমার মনে কোন গভীর ছাপ রাখেননি—কেন না, তোমাদের সাহিত্য মানবসত্যের থেকে অনেক দূরে।

আমি বুঝি না, কেন তোমরা অসুস্থ জীবনের চিত্র আঁকো। তোমাদের সাহিত্যও তাই আমার 'অসুস্থ সাহিত্য' বলে মনে হয়। সত্যকারের জীবন—স্বাস্থ্য, আনন্দ, জ্যোতি।

সমগ্র য়ুরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে টলস্টয়। কিন্তু তিনিও ভুল পথ বেছেছিলেন। সারাজীবন এক আদর্শ নিয়ে বেঁচে থেকে দুঃখময় মৃত্যু বরণ করা এক ট্রাজেডি। আর একজন রোম্যাঁ রোলাঁ—তিনি আমার বন্ধুও।"

রোম্যাঁ রোলাঁ আমাকে পি ইস্‌ত্রাতির[২] লেখা দেখিয়েছিলেন। খুব শক্তিশালী লেখা।"

রুমানিয়া ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কবি বললেন—

"এখানে আসার সময় আমার ইচ্ছা ছিল তোমাদের লোকনৃত্য, জাতীয় পোশাক ও আমার স্বদেশবাসী নরসিং মুলগন্দ'কে[৩] দেখা। তোমাদের নাচ খুব ছন্দোময়—বেশও বর্ণবহুল। আমি শুনেছি তোমাদের লোক-গীতি খুব সুন্দর।

আমাকে ডাক্তারের কন্যা এমিনেস্কুর[৪] একটি কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। তোমাদের ভাষায় কবিত্বের ও ছন্দের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই কবি জীবনে নিশ্চয় অনেক আঘাত পেয়েছিলেন। তাই কবিতাটি আনন্দের আরাধনার পরিবর্তে বিদ্রোহের সুরে শেষ হল! এত ছোট দেশে এত তিক্ততা কেন?"

এর পর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ও তার আদর্শ সম্বন্ধে কিছু বলেন।

বক্তৃতাশেষে কবি তাঁর দুটি কবিতা ও তার ইংরাজী অনুবাদ আবৃত্তি করলেন—কবির কণ্ঠের আবৃত্তি জনসাধারণকে অভিভূত করল—তাদের মনোযোগ হল গভীরতর। একটি মাত্র শুধু ক্ষোভ রইল তাদের মনে—যে-ভাষার ধ্বনি এত সুললিত, ছন্দ এত গীতিময়, তার মর্ম কেন তাদের বোধগম্য হল

---

২ একজন রুমানীয় ঔপন্যাসিক। এঁর একটি বইএর ভূমিকা রোম্যাঁ রোলাঁ লিখে দিয়েছিলেন।

৩ একজন হায়দ্রাবাদী ডাক্তার—প্রথম মহাযুদ্ধের আগে রুমানিয়া আসেন ও পরে বুখারেস্টেই বসবাস করেন।

৪ মিহাইল এমিনেস্কু (১৮৫০-১৮৯১)—রুমানিয়ার শ্রেষ্ঠ কবি।

না! কবি প্রথমে আবৃত্তি করলেন—'আমি সুদূরের পিয়াসী' ও তার পরে 'একী সত্য, হে আমার চিরভক্ত?' প্রথম কবিতাটি শ্রোতাদের মনে আলোড়ন জাগিয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয়টির ছন্দের অভিনবত্ব, ভাবের কোমলতা ও সর্বোপরি কবির সুরেলা কণ্ঠের আবৃত্তি তাদের মুগ্ধ করেছিল। সংবাদ-দাতার ভাষায়—ভারতীয় ফকির এক ইন্দ্র-জালের সৃষ্টি করেছিলেন। এরপর স্তইকু নামে এক ভদ্রলোক 'একী সত্য' কবিতাটির রুমানিয়ান অনুবাদ পাঠ করেন।

এরপর রুমানিয়ান পোশাকের একটি প্রদর্শনী হল—রুমানীয়া অভিনেত্রীরা বিভিন্ন প্রদেশের পোশাক পরে স্টেজে অবতীর্ণ হলেন।

সভাশেষে কবি রাজার মোটরে রাজ-ভবনের উদ্দেশে রওনা হলেন রাজা প্রথম ফার্দিনান্দের গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

সেইদিনই রুমানিয়াতে রবীন্দ্রনাথের শেষ দিন। কবি সন্ধ্যায় বুখারেস্ট স্টেশনে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট একটি বিশেষ কামরায় উঠলেন —ট্রেন কন্‌স্তান্‌ৎসা পৌঁছাল রাত্রি ৮-৫০ মিনিটে। বহু বিখ্যাত ও পদস্থ ব্যক্তিরা স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

সি মুরেশান নামে এক অধ্যাপক তাঁকে বিদায় অভিবাদনে জানালেন:

"আজকের এই পাশবিকতার জগতে তুমি গ্যয়টের মত আলোকের সাধক—আলো, আরো আলো আমাদের দাও। শিক্ষা, মনস্তত্ত্ব ও দর্শন সম্বন্ধে তোমার চিন্তাধারা ও তাদের প্রয়োগের সাফল্য আমাদের দেশে সুবিদিত। অল্পদিনের জন্য তুমি আমাদের এই ক্ষুদ্র দেশে এসেছিলে। ঈশ্বরের কাছে ভারতের সমৃদ্ধির জন্য তোমার ও তোমার পরিবারের দীর্ঘজীবন কামনা করা ছাড়া, তোমার বিদায়কালে আমরা আর কি বলতে পারি?"

অতি ধীর, মৃদু কণ্ঠে কবি উত্তর দিলেন:

"আজ, এখানে তোমাদের প্রীতির প্রকাশ এবং রুমানিয়ায় যে-স্বল্পক্ষণ ছিলাম, তার সর্বসময় তোমাদের কাছ থেকে পাওয়া আতিথ্য আমাকে গভীরভাবে বিচলিত করে তুলেছে। আমার খারাপ লাগছে একথা ভেবে যে, বড় অল্পক্ষণ তোমাদের সাথে ছিলাম—কিন্তু তোমাদের ভালবাসা ও সহৃদয়তা আমি চিরদিন মনে রাখব।"

কন্‌স্তান্‌ৎসা বন্দর থেকে রাত্রি ৯-৩০ মিনিটে কৃষ্ণসাগর বক্ষে কবির জাহাজ ভাসল।

মোরান সাহেবের বাগান ও রবীন্দ্রনাথ

মৃণাল ঘোষ

১২৮৮ সালে তরুণ রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম চন্দননগরে আসেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত গঙ্গাতীরে মোরান সাহেবের বকুল-বীথিকা-শোভিত সুন্দর বাগানবাড়িতে তখন তিনি কিছু দীর্ঘকাল যাপন করেন। সকল দিক থেকে কবি-প্রতিভা উন্মেষের অনুকূলে ভাগীরথী তীরের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে মোরান হাউস তাঁহার অন্তরকে অতি নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে। 'জীবন-স্মৃতি'র মধ্যে রয়েছে কবির সেই অবিস্মরণীয় অনুভূতির কথাঃ—

"আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হার্মোনিয়াম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাত-মুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন ক্ষ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম, কখনো বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম......যখন বাগানে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড় নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিকমিক করিতেছে।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জীবনে বহুবার বিশ্ব-ভ্রমণ করিয়াছেন। সুতরাং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন গৃহে তাঁহাকে অবস্থান করিতে হইয়াছে; কিন্তু মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির ন্যায় নিখুঁত এবং বিশদ বিবরণ বোধ হয় তিনি আর কোনো গৃহের সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করেন নাই। এই বাড়িটির বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেনঃ—

"আমরা যে বাগানে ছিলাম তাহা মোরান সাহেবের বাগান নামে খ্যাত ছিল। গঙ্গা হইতে উঠিয়া ঘাটের সোপানগুলি পাথরে বাঁধানো একটি প্রশস্ত সুদীর্ঘ বারান্দায় গিয়া পৌঁছিত।...ঘাটের উপরেই বৈঠকখানা ঘরের শার্সিগুলিতে রঙিন ছবিওয়ালা কাচ বসানো ছিল। একটি ছবি ছিল নিবিড় পল্লবে বেষ্টিত গাছের শাখায় একটি দোলা—সেই দোলায় রৌদ্রখচিত নিভৃত নিকুঞ্জে দুজনে দুলিতেছে; আর একটি ছবি ছিল, কোনো দুর্গপ্রাসাদের সিঁড়ি বাহিয়া উৎসব-বেশে সজ্জিত নরনারী—কেহবা উঠিতেছে কেহবা নামিতেছে। শার্সির উপরে আলো পড়িত এবং এই ছবিগুলি বড় উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত। এই দুইটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির সুরে ভরিয়া তুলিত। কোন্ দূর-দেশের, কোন্ দূরকালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝলমল করিয়া মেলিয়া দিত—এবং কোথাকার কোন্ একটি চিরনিভৃত ছায়ায় যুগল-দোলনের রসমাধুর্য নদীতীরের বনশ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্ফুট গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত।"*

পুরোনো দিনের কথা, প্রথম জীবনের স্মৃতি-কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি বার বার এই মোরান সাহেবের বাগানের কথা বলিতেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শোনালেন কবি-জীবনের 'ছেলেবেলা'-র কাহিনী। সেখানেও সেই মোরান বাগানের কথাঃ—

"তার কিছুদিন পরে বাসা বদল করা হোলো মোরান সাহেবের বাগানে। সেটা রাজবাড়ি বললেই হয়। রঙিন কাচের জানলা দেওয়া উঁচুনিচু ঘর, মার্বেল

---

* জীবনস্মৃতি—পৃঃ ২১১

পাথরে বাঁধা মেঝে, ধাপে ধাপে গঙ্গার উপর থেকেই সিঁড়ি উঠেছে লম্বা বারান্দায়। ঐখানে রাত জাগবার ঝোঁক লাগত আমার মনে, সেই সবরমতী 'নদীর ধারে'র পায়চারির তাল মেলানো চলত। সে বাগান আজ আর নেই, লোহার দাঁত কড়মড়িয়ে তাকে গিলে ফেলেছে ডাণ্ডির কারখানা।†

১৩৩৪ সালের কথা আজো আমাদের মনে পড়ে। সেদিন ফরাসী চন্দননগরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সারাদিনব্যাপী রবীন্দ্র সংবর্ধনা। নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে বিরাট এক নাগরিক সংবর্ধনার উত্তরদান প্রসঙ্গে আবার সেই মোরান হাউসের কথা আবেগভরা কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিলেন:—

"ছেলেমানুষের বাঁশি ছেলেমানুষী সুরে যেখানে বাজাত সে আমার মনে আছে। মোরান সাহেবের বাগানবাড়ি বড় যত্নে তৈরী, তাতে আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু সৌন্দর্যের ভঙ্গি ছিল বিচিত্র। তার সর্বোচ্চ চূড়ায় একটি ঘর ছিল, তার দ্বারগুলি মুক্ত, সেখান থেকে দেখা যেত ঘন বকুল গাছের আড়ালের চিকন পাতায় আলোর ঝিলিমিলি। চারদিক থেকে দুরন্ত বাতাসের লীলা সেখানে বাধা পেত না, আর ছাদের উপর থেকে মনে হত মেঘের খেলা যেন আমাদের পাশের আঙিনাতেই। এই-খানে ছিল আমার বাসা, আর এইখানেই আমার মানসীকে ডাক দিয়ে বলে-ছিলাম:—

'এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।'‡

তারপর ১৩৪৩ সালে (২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭) এই মোরান হাউস সম্বন্ধে আমরা শুনিলাম বিশ্বকবির অবিস্মরণীয় ঘোষণা। বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সেই ঐতি-হাসিক বিদ্বজ্জনসমাগমে চন্দননগরে ভাগীরথীতীরে 'জাহ্নবী-নিবাস'-এ রবীন্দ্র-নাথ তাঁর উদ্বোধনী অভিভাষণে বলিলেন:—

"আজকে আমার প্রতি ভার অর্পণ করেছেন এই সম্মেলনের উদ্বোধনের। উদ্বোধন এই কথাটি শুনে আমার মনে আর একদিনের কথা এল। সেই সময় এই শহরের এক প্রান্তে একটা জীর্ণ-প্রায় বাড়ি ছিল; সেইখানে আমি আমার দাদার সঙ্গে আশ্রয় নিয়ে-ছিলাম। তারপর মোরান সাহেবের বিখ্যাত হর্ম্যে আমাকে কিছু দীর্ঘকাল যাপন করতে হয়েছিল। বস্তুত এই গঙ্গাতীরে এই নগরের এক প্রান্তেই আমার কবিজীবনের উদ্বোধন।...... মোরান সাহেবের বাগানে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেম। গঙ্গার তীরের উপরে সেই হর্ম্যের অলিন্দেও সর্বোচ্চ চূড়ায় আমি অনেক রাত্রি কাটিয়ে-ছিলেম এবং আকাশের মেঘের সঙ্গে ছিল আমার মনের খেলা। মনে করে-ছিলেম, যেন বিশ্ব কত কাছে নেমে এসেছে। তখনি আমার কবিজীবনের প্রথম সূচনা হয়েছিল।" *

শুধু কবিজীবনের উদ্বোধনতীর্থ

† ছেলেবেলা—পৃ: ৭০-৭১

‡ ২১ বৈশাখ, ১৩৩৪ সালে চন্দননগরে এক পৌরসংবর্ধনার উত্তরদান প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের উক্তি। 'বঙ্গবাণী'-তে প্রকাশিত।

* বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন রিপোর্ট (অভিভাষণ—পৃ: ১, ২)

বলিলেই মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির পরিচয় নিঃশেষ হইয়া যায় না। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের ইতিহাস এবং ক্রম-বিকাশের দিক থেকে বিচার করিলে ইহার অধিকতর মূল্যায়ন সম্ভব। এই মোরান হাউসেই চন্দননগরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরানীর হাট' লেখা আরম্ভ করেন।

'সন্ধ্যাসংগীত'-এর কিছুটা এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরানীর হাট' রচনাও এই মোরান হাউসে শুরু হয়। রবীন্দ্র-মানসে এই মোরান সাহেবের বাগান গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। ১২৮৮ সালে তিনি মোরান সাহেবের কুঠিতে বাস করেন। তের বৎসর পরে লেখা 'গল্পগুচ্ছ'-এর একটি গল্পে মোরান সাহেবের বাগানের পারিবেশের কিছু কিছু উল্লেখ রয়েছে, যথা—'গঙ্গার ধারে ফরাসডাঙ্গার বাগান', 'সুদীর্ঘ বকুল-বীথি', 'প্রবীণ তরুশ্রেণীর অকম্পিত ঘন-পল্লববিতানের দীর্ঘনিপতিত ছায়া', 'বকুল-বনের পল্লবমর্মর', 'গঙ্গা হইতে ঘাটের সিঁড়ি বৃহৎ বাড়ির বারান্দার উপর উঠিয়াছে' এবং 'একখানি ছোটো নৌকা ভাড়া করিয়া তীরের দিকে চাহিয়া জোয়ার বাহিয়া চলিলাম' ‡ ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য ইহা মোরান সাহেবের বাগানের পরিবেশেরই কথা।

চন্দননগরে ভাগীরথীতীরে কবি-প্রতিভার উন্মেষতীর্থ এই মোরান বাগানের স্মৃতি রবীন্দ্রনাথের নিকট চিরদিন অবিস্মরণীয় ছিল। অনেকদিনের অনেক স্মৃতিবিজড়িত সেই বাগানের প্রসংগে জীবনের শেষ পর্বে চন্দননগরে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন:—

"সেই অতিথিবৎসলা বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর অবারিত আঙিনায় যেদিন যখন বালককে বসালেন, তাতে কানে কানে বললেন, 'তোমার বাঁশীটি বাজাও।' বালক সে-দাবি মেনেছিল।" *

সেই বকুল-বীথিকা-শোভিত মোরান হাউসের কাননভূমি আজ আর নাই, সেই প্রাসাদোপম হর্ম্যও আজ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন। পরে তাই ব্যথিতচিত্তে কবি বলিয়াছিলেন:—

"সে ঘর নেই, সে বাড়ি আজ লৌহ-দণ্ডদন্তুর কলের কবলে কবলিত। সে গংগা আজ অবমাননায় সংকুচিত, বন্দী হয়েছে কল-দানবের হাতে ত্রেতা যুগে জানকী যেমন বন্দী হয়েছিলেন দশমুণ্ডের দুর্গে। দেবী আজ শৃংখলিতা।" †

মোরান হাউস আজ আর নাই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের উদ্বোধনতীর্থ, রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্য-সাধনার এই ঐতিহাসিক পীঠস্থলকে স্বয়ং কবিগুরুই অমরত্ব দান করিয়া গিয়াছেন তাঁহার অবিস্মরণীয় অমৃত-ভাষণে এবং তাঁহার লেখনীর যাদুস্পর্শে।

‡ গল্পগুচ্ছ ২য় ভাগ, "অধ্যাপক", ভাদ্র ১৩০৫

* ২১ বৈশাখ ১৩০৪ সাল—চন্দননগরে নাগরিক সংবর্ধনার উত্তরদান প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের উক্তি।

† ঐ

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

রবীন্দ্রশতবার্ষিকী সংখ্যা মূল্য ৮০ নয়া পয়সা

[স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক: আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড]

শ্রী [illegible] চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা-১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
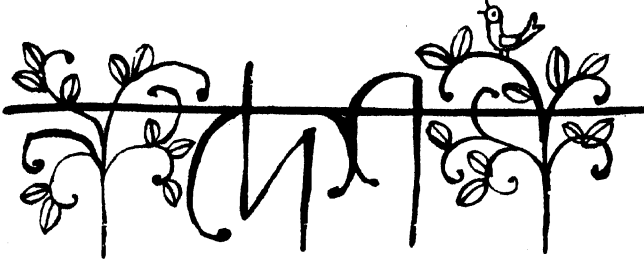
DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 13th May, 1961

২৮ বর্ষ ॥ ২৮ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৩০ বৈশাখ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

শতবার্ষিকীর ঐতিহাসিক দায়িত্ব

পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধন ভারতের জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয়তম কল্যাণকর পরিবর্তনের সূচনা বলা নিশ্চয়ই অত্যুক্তিদোষদুষ্ট গণ্য হবে না। উৎসবের উল্লাসমুখর দিবসটির দেশব্যাপী অনুষ্ঠানই এক্ষেত্রে একমাত্র উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য মনে করি না। উৎসবের অন্ত নেই এদেশে এবং উৎসবকালীন আনন্দের উচ্ছ্বাস অকৃত্রিম হলেও প্রায়শই তা ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিক উৎসব সেদিক দিয়ে অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র প্রকারের সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে জাতীয় মানসে। সেখানেই রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর সার্থকতা এবং বিপুল প্রতিশ্রুতিময় সম্ভাবনা।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরবর্তীকালে এই প্রথম ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে ঐক্যচেতনা একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে। এই ঐক্যচেতনার মূল্য অপরিসীম, অবশ্য যদি এর যথোচিত অনুশীলন হয়। বহু জাতি, বহু রাজ্য, বহু ভাষা এবং বহু স্বাতন্ত্র্যধর্মী প্রবণতার অস্তিত্ব এই বিরাট দেশে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেয়েছে বটে, কিন্তু এখনও স্থিতি লাভ করেছে বলা যায় না। ব্রিটিশ শাসনের আমলে এই বহুভাষী বহুজাতিক দেশে যে একতা উপর-উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার স্ব-বিরোধী প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত হইনি। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক ঐক্য ছিল মোটের উপর ব্রিটিশ শাসনের উপর নির্ভর, আর ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদকল্পে যে জাতীয় ঐক্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল তারও প্রেরণা ছিল প্রধানত রাজনৈতিক। এক কথায়, ভারতবর্ষের জাতীয় মানসে ঐক্য চেতনা ঠিক স্বাভাবিকভাবে বর্ধিত হওয়ার সুযোগ পায় নি। রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে গভীরভাবে আমাদের জাতীয় ঐক্য চেতনার এই মৌল অপূর্ণতা অনুভব করেছিলেন এবং তিনিই জাতীয় মানসকে উদারভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সবচেয়ে আগ্রহী এবং উদ্যোগী হয়েছিলেন। রবীন্দ্র ঐতিহ্যের এই ধারাটিকে সঞ্জীবিত, সমৃদ্ধ এবং সুবিস্তৃত করার সুযোগ বর্তমানে সমুপস্থিত।

রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর শ্রেষ্ঠতম, মহত্তম সার্থকতা বহু জাতি, বহু ভাষা এবং বহু স্বাতন্ত্র্যধর্মী প্রবণতার আপাত-বিরোধের সামঞ্জস্য বিধানে। ভেদ ও বিরোধ আমাদের দেশের অসংখ্য সংকল্প ও প্রয়াসকে নানাভাবে খণ্ডিত, বিপর্যস্ত করেছে। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভের পর গত চৌদ্দ বৎসরে জাতীয় জীবনের নানা স্তরে এই ভেদজ্ঞান ও স্বাতন্ত্র্যপ্রবণতা প্রবল হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের জবরদস্ত ঐক্য জাতীয় জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে যে বাধা সৃষ্টি করেছিল সে-বাধা অপসারিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের ঐক্যচেতনা সুস্থ স্বচ্ছন্দ ধারায় কেন প্রবাহিত হতে পারছে না তা গভীরভাবে চিন্তা করা কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় ভাবধারায় যে উদার মানবধর্মী প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন তার সম্যক অনুশীলন সেজন্য বর্তমানে দেশের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন।

রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী দেশের সর্বত্র যে গভীর অনুরাগ এবং উৎসাহ সৃষ্টি করেছে সেটি এদিক দিয়ে বিশেষ সুলক্ষণ। গান্ধীজি যেমন নবীন ভারতের রাষ্ট্রিক সংকল্পের প্রতিভূ, রবীন্দ্রনাথ তেমনি নব্যভারতের ভাবধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। বহু ভাষা ও বহু জাতির দেশ ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় স্বরূপ স্বীকৃত এবং সর্বত্র আত্মস্থ হলে তবেই দেশের আত্মিক ঐক্য দৃঢ় স্থিতি লাভ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কে এবং কী, নবীন ভারতবর্ষের অন্তর্জীবনে তাঁর স্থান কোথায় এবং কতখানি, তা নিয়ে বিতর্ক বিচার বর্তমানে যতদূর মনে হয় নিষ্প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় সত্তার অখণ্ড ও শুদ্ধরূপ রবীন্দ্রনাথের জীবনে, মননে ও কর্মে প্রতিভাত—সারা দেশ এ-বিষয়ে সচেতন হয়েছে, এর চেয়ে আশা ও আনন্দের আর কিছুই হতে পারে না। রবীন্দ্র-সাধনার সামগ্রিক ফলের সঙ্গে এখন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রতিষ্ঠা করাই প্রধান কাজ। রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে এই কাজ সুপরিকল্পিত ও সুবিস্তৃতভাবে পরিচালিত হলে জাতীয় ঐক্যচেতনা নিঃসংশয়ে শক্তিশালী হবে। ভারত সরকারের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের যে জীবনী-চিত্র রচিত ও প্রচারিত হয়েছে তার অপূর্ব আবেদন দেশবাসীর মনে যথেষ্ট কৌতূহল সৃষ্টি করবে সন্দেহ নাই। স্বাদেশিকতার আদর্শ আবেগ-স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ যে কেবল বাঙ্গালী ও বাংলার কবি নন, তিনি সারা ভারতের রূপকার, শিল্পীসাধক এবং নবযুগের বাণীবাহক, জাতীয় মানসে এই জীবন্ত সত্যটি দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হওয়া প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনীচিত্র, রবীন্দ্রসঙ্গীত, সাহিত্য ও চিত্রকলার অপরূপ ঐশ্বর্য এবং জাতীয় তাৎপর্য দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলের অধিবাসিগণকে উপলব্ধি করার, উপভোগ করার সুযোগ দিতে পারলে কেবল রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করা হবে না, স্বাধীন ভারতের ভাব-ভাণ্ডারে সর্বজনীন একত্বের এই অমূল্য সম্পদের উপর সকলেরই বাস্তব অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। রবীন্দ্র ঐতিহ্যের উপর এই বিরাট দেশের বহু ভাষা ও বহু জাতিগোষ্ঠীর সকলেরই স্বচ্ছন্দ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করাই জাতীয় ঐক্যসূত্র রচনার শ্রেষ্ঠ উপায়। রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী সে-উপায়ের সার্থকতা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করতে পেরেছে বলা যায়; এখন সে-উপায়ের সম্যক ও সর্বাঙ্গীন সদ্ব্যবহার করতে পারাই রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষের ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

আলোচনা

শুকতারার যাত্রী

সবিনয় নিবেদন,

দেশ পত্রিকার দ্বাবিংশতিতম সংখ্যায় শ্রীনিরঞ্জন দত্ত আমার 'শুকতারার যাত্রী' প্রবন্ধ প্রসংগে আলোচনা করেছেন। তিনি লুনিক—৩ কর্তৃক চাঁদের অপর পৃষ্ঠের আলোকচিত্র গ্রহণের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে আমিও তাঁর সংগে একমত। তবু আমার প্রবন্ধের অন্তর্গত ঘটনাপঞ্জিতে একে যুক্ত করিনি এজন্যে যে, প্রথম লুনিকের পৃথিবী ছাড়িয়ে চাঁদের দেশে পৌঁছনোর সংগে এর মূলত কোন তফাৎ ছিলনা। তৃতীয় লুনিক কিছু অতিরিক্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত ছিল বলেই সে চাঁদের অ-দেখা অংশের আলোকচিত্র পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল, যা সরঞ্জামহীন প্রথম লুনিকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে যান্ত্রিক এবং নিয়ন্ত্রণ কলাকৌশলের দিক থেকে তৃতীয় লুনিক প্রথমটির তুলনায় বহুগুণে সমৃদ্ধতর ছিল —একথা অবশ্য স্বীকার্য।

আমার রচনায় মার্কিন প্রচেষ্টাগুলির উল্লেখ না দেখতে পেয়ে নিরঞ্জনবাবু ব্যথিত হয়েছেন। কিন্তু আমি তো মহাশূন্য জয়ের ইতিহাস লিখিনি, আমার প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিল শুকতারার যাত্রী রকেট এবং শুক্র গ্রহের আনুমানিক স্বরূপ, কেবল পশ্চাদপটের সংক্ষিপ্ত পরিচয়দানের জন্য একটি ঘটনাপঞ্জি লিপিবদ্ধ করেছিলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমেরিকা নভোচারণ-গবেষণায় এখন পর্যন্ত এমন কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেননি যা প্রথম পদক্ষেপ রূপে বিবেচিত হতে পারে। আসলে কিছু পূর্বে সাফল্যমণ্ডিত নবনব রুশীয় প্রয়াস-গুলো মার্কিন সাফল্যদ্বারা অনুসৃত হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ রুশ-বিজ্ঞানীদের সংগে মার্কিন বিজ্ঞানীগণ সমতালে পা ফেলে এগিয়েছেন সত্য, কিন্তু সামান্য সময়ের ব্যবধানে। সুতরাং মহাশূন্য-পরিক্রমার ইতিহাসে তাঁদের কীর্তি গৌরব-জনক আসন লাভ করবে সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি বিশেষ কতগুলো ঘটনা 'মাইল স্টোন' হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়, তবে মার্কিন প্রয়াসগুলো তাতে স্থান পেতে পারে কি? তাহলে তো আমার ঘটনা-পঞ্জিতে অনুল্লেখিত অপরাপর রুশীয় সাফল্যগুলোকেও অবহেলা করা অসমীচীন হয়ে দাঁড়ায়।

নিরঞ্জনবাবু তাঁর চিঠিতে শুক্রে অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে রুশবিজ্ঞানী নিকোলাস কোজিরেভ' এর নিশ্চিত প্রমাণাভাবের কথা জানিয়েছেন, এজন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সম্বন্ধে আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করব এবং শুক্রে জীবনধারণোপযোগী পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অস্তিত্বের প্রমাণ সংগৃহীত হবে বলেই আশা করব।

এই অবকাশে আমি একটি ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ গ্রহণ করতে চাই। 'শুকতারার যাত্রী' প্রবন্ধে অনবধানতাবশত শুক্রের মেঘাবরণের একমাত্র উপাদান কঠিন-ডাই-অক্সসাইড বলে আমি উল্লেখ করে-ছিলাম। কিন্তু এটা অভ্রান্ত নয়। সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে শুক্রের আবহমণ্ডলে অতি সামান্যমাত্রায় অক্সিজেন এবং ঈষৎ জলীয় বাষ্পের সন্ধান পাওয়া গেছে—যদিও তার পরিমাণ নগণ্যের মাত্রাতেই পড়ে। বহু বৈজ্ঞানিক এ-বিশ্বাস পোষণ করেন যে, শুক্রের ঘন মেঘাবরণের নিচে হয়তো প্রচুর অক্সিজেন সম্পদ আছে, যার কথা আমরা এখনও জানতে পারিনি। যদি তা থেকে থাকে, তবে অপেক্ষাকৃত হাল্কা হয়েও কঠিন ডাই-অক্সাইড স্তরের নিচে তারা থাকতে পারবে এ কারণে যে, শুক্রের ভূচৌম্বকত্বের প্রভাব তুলনামূলকভাবে অক্সিজেনের উপর বেশি হতে বাধ্য।

আমার প্রবন্ধে বিবৃত অন্যান্য বিষয়-গুলোও বিতর্কের ঊর্ধে নয়, একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। আসলে শুক্রের স্বরূপ সম্বন্ধে তথ্যের অভাব এখনও বেদনাদায়ক বলে আমাদের অধিকাংশ জ্ঞানই অনুমান-ভিত্তিক। এই তথ্যহীনতার কারণ তো প্রবন্ধের গোড়াতেই আমি উল্লেখ করেছিলাম, —শুক্র তার অস্বচ্ছ ঘন মেঘাবরণে বৈজ্ঞানিকের সকল সন্ধানী দৃষ্টিকে প্রতিহত করে ফিরিয়ে দেয়, ভেতরের যথার্থ রূপ উন্মোচিত করে দেয়না।

নমস্কারান্তে
অশোক মুখোপাধ্যায়
গ্লাসগো, ইউ কে

বংগের বাহিরে বাংগালী

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, দেশ পত্রিকার গত ৯ই বৈশাখের সংখ্যায় শ্রীধ্রুবাচার্যের "বংগের বাহিরে বাঙালী" সম্বন্ধে লেখা চিঠি পড়লাম। উড়িষ্যার কটক শহরে কিছুকাল থাকবার সুযোগ আমারও হয়েছিল। সেখানে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের বড় রকমের কোন কেন্দ্র না থাকলেও একেবারে কিছু নেই বলা যায় না। অথচ শ্রীধ্রুবাচার্যের চিঠিখানা

স্থানীয় বাঙালী সমিতি কর্তৃক পরিচালিত একটি বিদ্যালয় বর্তমান, যেখানে বাঙলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। শীগগিরই সেটাকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হবে। নূতন গৃহ তৈরী হচ্ছে দেখে এসেছি। একাধিক বাঙলা বইয়ের লাইব্রেরী বা পাঠাগারও রয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করেও বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করছেন এমন পরিবারেরও অভাব নেই। ইতি—

সুভাষ সুর
বরোদা।

মরিয়ম-উজ-জমানী

সবিনয় নিবেদন,

১৮ই চৈত্রের দেশে শ্রীযুক্ত শৈলেন দত্ত "আকবর-মহিষী মরিয়ম-উজ-জমানী" শিরো-নামায় এক প্রবন্ধ লেখেন। তার প্রতিপাদ্য বিষয় মরিয়ম-উজ-জমানী আর কেউ নন, অম্বররাধিপতি বিহারীমলের কন্যা। বিষয়টি নিয়ে এর আগেও আলোচনা হয়েছে এবং এখন এ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন মরিয়ম-উজ-জমানী এবং সেলিমের মাতা অভিন্না। শৈলেনবাবু আরও বলেছেন 'যোধাবাই' প্রসাদে আকবরের কোন যোধ-পুরী বেগম থাকতেন না—তার কারণ, ও নামে আকবরের কোন বেগম ছিলেন না। কিন্তু তাঁর যুক্তিতে আবুল হাসান মোল্লা মশাই খুশী হতে পারেন নি—তার কারণ তাহলে শ্রীমতী সুনন্দা মল্লিকের মতো তাঁরও ইতিহাসে পড়া অনেক নাম তালগোল পাকিয়ে যায়। সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি এক অভিনব বুদ্ধি বাতলেছেন, তাঁর মতে মাতার যায়গায় বিমাতা ধরলে মরিয়ম-উজ-জমানীর একটা হিল্লে হয় এবং সেক্ষত্রে তিনি জাহাঙ্গীরের মাকে 'যোধাবাই' প্রাসাদে বসাতে পারেন, যেহেতু স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে তিনি পড়েছেন জাহাঙ্গীরের মায়ের নাম যোধাবাই। কিন্তু ব্যাপারটি অত সরল নয়।

সমকালীন ইতিহাসে যোধবাই বা যোধাবাই কারো উল্লেখ পওয়া যায় না। 'যোধবাই' বা 'যোধাবাই'-এর উৎপত্তি অনেক পরে টড, ব্লকম্যানের আমলে (ডঃ কালিকা-রঞ্জন কানুনগো জাহানারার আত্মকাহিনী সমালোচনা, প্রবাসী ১৩৫৮ ফাল্গুন, ১৩৫৯-চৈত্র)। কিন্তু তাঁরাও যোধবাই বা যোধাবাই সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী উক্তি করেছেন, কখনও বলেছেন জাহাঙ্গীরের মহিষী, কখনও আকবরের মহিষী, কখনও যোধপুর-রাজ উদয় সিংহের কন্যা কখনও বিকানীর-রাজ রায় সিংহের কন্যা। ডঃ

"বীরবিনোদ" থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেখিয়েছেন আকবর রাঠোর বংশের তিনজন রাজকুমারীকে বিবাহ করেন, একজন যোধপুর-রাজ মালদেবের (উদয় সিংহের পিতা) দাসী গর্ভজাতা কন্যা রুকমীবাই, একজন বিকানীর-রাজ রায়সিংহের খুল্লতাত (কন্যামল্লের ভ্রাতা) কানহার কন্যা আর একজন জয়শল্মীরের ভট্টীরাজা হরবদনের কন্যা যাঁকে উঠিয়ে আনবার জন্য আম্বের-রাজপুত্র ভগবানদাস গিয়েছিলেন। এখন এ তিনজনের মধ্যে একজনও সমকালীন ইতিহাসে (আবুলফজল, বদায়ুনী) যোধপুরী যোধবাই বা যোধাবাই বলে উল্লিখিত হননি। আকবরের পুত্র সেলিমও (পরে জাহাংগীর) যোধপুর বংশের এক কন্যাকে (যোধপুর-রাজ উদয় সিংহ যিনি 'মোটারাজ' নামে পরিচিত তাঁর কন্যা) বিবাহ করেন, এ'র নামছিল মানমতি বালমতি বা সংক্ষেপে মানবাই। এ'রই গর্ভে খুরম জন্মগ্রহণ করেন এবং এ'রই উপাধি ছিল জগৎ গোঁসাইন (গৌরীশংকর ওঝা—রাজপুতনেকা ইতিহাস, ডঃ কানুনগোর উদ্ধৃতি)। কেউ কেউ মনে করেন (ওঝা) ইনিই যোধাবাই কিন্তু কোন সঠিক প্রমাণ নেই।

আকবরের প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন আম্বের রাজ বিহারীমলের কন্যা, যাঁর নাম ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না। এ'রই গর্ভে যে সেলিম জন্মগ্রহণ করেন তা মনে করার পিছনে যথেষ্ট কারণ আছে। আমি দুটি সমসাময়িক ছবির উল্লেখ করতে পারি তাতে দেখা যাবে সেলিমের মা এবং অন্যান্য পরিচারিকাদের পোশাক রাজপুতানীদের অনুরূপ এবং খুব সম্ভব কচ্ছবাহ কুল থেকে গৃহীত, তার কারণ আকবরের দরবারে কচ্ছবাহ কুলের প্রভাবই ছিল সর্বাধিক। আকবর-সখা ও ঐতিহাসিক আবুল ফজল আকবর নামার কোথাও সেলিমের মাতার নাম উল্লেখ করেননি, শুধু তাই নয়, আকবর নামার কোথাও মরিয়ম উজ-জমানীর উল্লেখ নেই। কাজেই শৈলেনবাবুর উক্তি—"আবুল ফজল লিখিয়াছেন 'মরিয়ম-উজ-জমানী' পদবীতে ভূষিতা হন জাহাংগীরের মাতা" ভুল। আকবর নামার এক জায়গায় উল্লেখ আছে 'মিরিয়ম মকানীর' এবং তিনি হচ্ছেন আকবরের মাতা হামিদা-বানু। বেভারিজ সাহেব পাদটীকায় মন্তব্য করছেন (Vol-1 পৃঃ ৩৩) উপাধিটি আকবরের মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। এর আগে তাঁর প্র-পিতামহীরও (বাবরের মাতা) ওই একই উপাধি ছিল। দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ৫০৬ এর পাদটীকায় তিনি মন্তব্য করছেন।

"It will be seen that Abul Fazl does not give the name of Salim's mother. There is little doubt, however, that the statement of Khatasat-at-Tawarikh, that she was Biharimal's daughter is correct. Her title was, it seems, Miriam-Zamani, and there is a mosque in Lahore which was built by her and has an inscription put up by her."

জাহাংগীর তাঁর আত্মজীবনীতে যেভাবে মরিয়ম-উজ-জমানী সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উক্তি করেছেন তাতে সন্দেহ থাকে না ইনিই জাহাংগীরের জননী। মৃত্যুর পর তাঁকে যে কবরস্থ করা হয়েছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, তার কারণ নিজে সংস্কার বিসর্জন করতে না পারলে বস্তুত তিনি ছিলেন মুসলমানী এবং মুসলমান ধর্মানুসারে মৃত্যুর পর তিনি কবরস্থ হতে বাধ্য।

নমস্কারান্তে ইতি—
হীরেন মুখোপাধ্যায়
আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা

সাহিত্য আকাদেমি ও বাঙলা বই

সবিনয় নিবেদন,

বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকরা সবাই স্বীকার করেন যে, পুরস্কার দেবার ব্যাপারে সাহিত্য আকাদামির সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। এই সিদ্ধান্তের মূলে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রয়েছে। আমাদের ধারণা, একটি চক্রান্ত করা হয়েছে এবং তাতে বংগদেশীয় আমাদের কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষীই সহায়তা করেছেন। ধারণাটা ভিত্তিহীন নয় বলেই মনে হচ্ছে। কারণ সভা-সমিতিতে, সংবাদপত্রে বিক্ষোভ প্রকাশিত হলেও আকাদামির পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কোন বিবৃতি আজও প্রকাশিত হয়নি, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের ধিক্কার ধ্বনিত হোক।

কিন্তু এ প্রসংগে একটি কথা মনে রাখবার জন্য সাহিত্য দরদীদের অনুরোধ করব। সরকার সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হতে পারেন, ক্ষতি নেই। কিন্তু সরকারের জন্য সাহিত্য নয়। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়া এক দিক দিয়ে শুভলক্ষণ। খুব অপ্রিয় হলেও অসত্য নয় যে, এরই মধ্যে সরকারী সম্মান লাভের জন্য একটা সচেতনতা দেখা দিয়েছে। আমরা সবাই জানি, সরকারী দরবারের ভাঁড়ই আজ সাহিত্যিক নন—রাজ-রাজড়ার আশ্রয় না পেয়েই আজ সাহিত্য সৃষ্টি হয়। কাজেই বাংলা বই আকাদামির স্বীকৃতি পায়নি বলে আমরা কেউ মনে করছি না যে, বাংলা সাহিত্য বন্ধ্যা হয়ে গেছে। যাঁরা বাঙলা বই-এর খবর রাখেন, তাঁরা কেউ এমন কথা বলতে পারেন না। এদিক দিয়ে চিন্তা করলে প্রমাণিত হয় যে, আকাদামি বাঙলা বই-এর খবর রাখেন না।

প্রকাশনার ব্যাপারেও আকাদামি বাংলা সাহিত্যকে যথেষ্ট উপেক্ষা করেছেন। বাংলা বই অনুবাদ ও ভারতের বাইরে প্রচারে বিমাতৃসুলভ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

ভবদীয়,
সনৎকুমার বাগচী। ক'লকাতা—১২।

(২)

সবিনয় নিবেদন,

আকাদমীর সাম্প্রতিক বিচারে বাংলা সাহিত্যের পাঠকরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন—ক্ষোভের কারণ স্বাভাবিক। বুলিপোষ্য বুদ্ধিজীবী বাঙালীর সাহিত্যই ছিলো গর্বের প্রধান বিষয়বস্তু—সেই গর্ব ধূলিসাৎ হয়েছে। ফলে প্রতিক্রিয়া কি, তা সহজেই অনুমেয়।

বাংলা সাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক হিসাবে, আমার সহ-পাঠকদের আমাদের সাহিত্যের বর্তমান অবস্থার কথাটা চিন্তা করতে অনুরোধ করি। আমাদের গত পাঁচ-ছয় বৎসরের সাহিত্যের খতিয়ান নিলে দেখা যাবে, সৃষ্টিশীল সাহিত্য কর্মের উপস্থিতি প্রায় শূন্যে এসে ঠেকেছে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলাম, ত্রিশ দশকে বাংলা সাহিত্যে যে সব শক্তিশালী ঔপন্যাসিক দেখা দিয়েছিলেন, তাঁদের সমকক্ষ প্রতিভার পরিচয় কি গত পাঁচ ছয় বৎসরে দেখা গিয়েছে? গত পাঁচ ছয় বৎসরে কি 'সত্যাসত্য'র মতো মহৎ উপন্যাস, বা 'পদ্মানদীর মাঝি' বা 'দিবারাত্রির কাব্য'র মতো গভীর জীবনবোধযুক্ত সাহিত্য কর্মের সৃষ্টি হয়েছে?

সন্দেহ নেই বাংলা উপন্যাসে এখন Depression এর যুগ চলছে—এর দুটো কারণ। প্রথমত ত্রিশ দশকের প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের যাঁরা অবশিষ্ট, তাঁদের সৃজনী শক্তিতে ভাঁটা পড়েছে; দ্বিতীয়ত এই সব সাহিত্যিকদের যথার্থ উত্তর-সাধকের অভাব।

'দেশ'এর সহ-পাঠকদের কাছে, একজন সাহিত্যানুরাগী হিসেবে দুঃখ নিবেদন করলাম। সুখের বিষয়, আমাদের কবিতা এবং ছোট গল্পে এই অধোগতি এখনও দেখা দেয়নি। কিন্তু বর্তমান যুগধর্মের প্রভাবে, এদের পরিণতিও যে কি হবে, তা নিয়ে ভবিষ্যত বাণী করা কঠিন।

নমস্কারান্তে ইতি,
অশোক সেন
ক্লিফটন, ব্রিস্টল

বৈদেশিকী

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতবর্ষে এবং অন্য অনেক দেশেও নানা-প্রকারের স্মরণোৎসব চলছে। বিদেশে যে উৎসবাদি হচ্ছে সেগুলির সঙ্গে অল্পবিস্তর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জড়িত আছে, এই সন্দেহ আমাদের অনেকের মনে উদয় হয়েছে। সন্দেহটা অমূলক বলা যায় না, তবে সব ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য নয়। রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষকে "তোয়াজ" করার ইচ্ছা, প্রয়োজন বা তার জন্য আড়ম্বর করার শক্তি সব দেশের সমান নয়। সেইজন্য বাহ্যিক অনুষ্ঠানের বহর থেকে রবীন্দ্রপ্রীতির পরিমাণ কোথায় কতটা তার নিরূপণ দুঃসাধ্য। তাছাড়া আনুপাতিক বিচারের প্রশ্নটাও সহজ নয় এবং তাতে ভুল হওয়া খুবই সম্ভব। সে বিচার কেবল বিভিন্ন দেশের মধ্যে নয়, একই দেশের অনুভূতির বিভিন্ন অংশের মধ্যে। ধরুন, এক দেশে এক হাজার বই প্রচলিত, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের একখানা; আর এক দেশে দশখানা রবীন্দ্রনাথ চলছে, কিন্তু এক কোটির মধ্যে। এক্ষেত্রে দশখানার কথা শুনে প্রথম উৎফুল্ল হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে ততটা উৎসাহবোধ থাকে না।

যেসব দেশে সমাজ এবং সাংস্কৃতিক জীবনের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রশক্তির করায়ত্ত সেখানকার "শ্রদ্ধার্ঘ্যের" কতটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং কতটা অকৃত্রিম তার বিচার স্বভাবতই একটু বেশী কঠিন। তবে রাষ্ট্রের মারফৎ প্রকাশ হচ্ছে বলে তার পিছনে রাজনীতি ছাড়া আর কিছু নেই, এরূপ মনে করাও একেবারে ঠিক হবে না। একথা মনে রাখতে হবে যে, যে দেশে রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান সেখানে যাঁরা বাস্তবিকই শ্রদ্ধাশীল তাঁদেরও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং যন্ত্রের ভিতর দিয়ে ছাড়া আত্মপ্রকাশের কোনো উপায় নেই। টোটালিটারিয়ান অর্থাৎ যেসব দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তির কর্তৃত্ব সর্বাত্মক তাদের সম্পর্কে যেটা বিশেষ ভয় সেটা হচ্ছে বিকৃত প্রচারের, যা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে করা একদিক দিয়ে সহজ। জীবনের বিবিধ সমস্যার উপর রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুভূতি এবং উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকপাত হয়েছে। একই সমস্যাকে তিনি নানা দিক থেকে দেখেছেন এবং যখন যেদিক থেকে দেখেছেন তখন সেই দেখার মধ্যে একটা ঐকান্তিকতার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতার পরম্পরায় একই প্রশ্নের আলোচনায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবের দ্যোতনা প্রকাশ পেয়েছে, কখনো কখনো সেটাকে মত

পরিবর্তনের পর্যায়েও ফেলা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রায় এমন কোনো রচনাই নেই যার সম্পূর্ণটাই পরবর্তীকালে তিনি অগ্রাহ্য বলে মনে করেছেন। সবটার মধ্যেই কিছু না কিছু তাঁর অপরিবর্তনীয় প্রকাশ আছে কিন্তু তার সঙ্গে হয়ত আরো এমন কথা আছে যার সংশোধক বা পরিপূরক কথা পরবর্তী রচনায় পাওয়া যায়। সেইজন্য সমগ্রভাবে না দেখে কেবলমাত্র একটি আলোচনা থেকে "রবীন্দ্রনাথের মত" বলে কিছু ধরে নিলে অনেকক্ষেত্রেই ভুল হবার সম্ভাবনা। চেষ্টা করলে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ের রচনা থেকে বিভিন্ন "মতের" সমর্থন আবিষ্কার করে ইচ্ছামত উদ্দেশ্য প্রচারের কাজে লাগানো যায়। এই জন্য যেখানে রাষ্ট্রের হাতে সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণের নিরংকুশ কর্তৃত্ব সেখানে রবীন্দ্রপ্রীতির আছিলায় রবীন্দ্র সাহিত্যের অপপ্রয়োগের আশংকা বিশেষ করে মনে জাগে। কারণ সেখানে রাষ্ট্রশক্তি তার নিজের সুবিধামত রচনা নির্বাচন ও প্রচার করবে এইটাই সম্ভব। এটার জন্য বেশি ভয় এই জন্য যে "টোটালিটারিয়ান" দেশে রাষ্ট্রশক্তি যা প্রকাশে করবে তা ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশ করার অধিকার বা শক্তি আর কারো নেই। সুতরাং রবীন্দ্রনাথই হোন বা অন্য কেউই হোন, রাষ্ট্রশক্তি তাঁর যে-রূপ দেখাবেন, দেশের লোকের কাছে তাছাড়া অন্য কোনো রূপ প্রকাশ হবার উপায় নেই। এই অবিচারের একটা বিশেষত্ব আছে। বিদেশী-দের দ্বারা এবং বিদেশীদের দেশী চেলাদের দ্বারা গান্ধীজীরও কম অপব্যাখ্যা হয়নি। গান্ধীজীকে ধনী ও সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল বলেও চিত্রিত করা হয়েছে, আবার তিনি হিটলার এবং টোজোর পরোক্ষ সহায়ক বলেও নিন্দিত হয়েছেন। কিন্তু সেজন্য তাঁর বাক্য এবং কার্যনীতির অপব্যাখ্যা করতে হয়েছে, কেবল উদ্ধৃতির দ্বারা সেটা সম্পন্ন হত না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় কোনো কোনো বিষয়ে কেবল উদ্ধৃতির দ্বারাই তাঁর অপব্যাখ্যা সম্পন্ন করা যায় যদি তাঁকে সমগ্রভাবে না দেখিয়ে একটি বিশেষ নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁর রচনার আংশিক প্রকাশ করা হয়।

বর্তমানে "কোল্ড ওয়ারের" যুগে এই কর্মটি কোথায় কী পরিমাণে হচ্ছে সে বিষয়ে একটু সতর্ক হলে ভাল হয়। অবশ্য সতর্ক হলেই যে বিশেষ কিছু করা যাবে তা নয়। কোনো বিদেশী গভর্নমেণ্ট যদি রবীন্দ্রনাথকে কেটে-ছেঁটে প্রকাশ করেন তাহলে যে আমরা বিশেষ কিছু করতে পারব তা নয়, কিন্তু কোথাও রবীন্দ্রনাথের কিছু বেরুলেই যে আজকাল বিনা বিচারে জয়ধ্বনি দেবার একটা অভ্যাস দাঁড়িয়েছে সেই গদ্‌গদভাবে এবং ক্যাঙালপনার কিছুটা হ্রাস হতে পারে।

এসব কথা টোটালিটারিয়ান দেশগুলি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, যেসব দেশে সমাজ ও সংস্কৃতির উপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয় না, সে সব দেশ সম্পর্কে কোনো ভাবনা নেই, এরূপ মনে করার কিন্তু কোনো কারণ নেই। এই "কোল্ড ওয়ারের যুগে" "ফ্রী ওয়ার্ল্ড" সম্পর্কেও প্রায় সমান সতর্কতা আবশ্যক। সেখানেও যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র মূর্তি প্রকাশিত হওয়া সহজ তা নয়। আর তাছাড়া নিজেদের দেশের মধ্যে যাই হোক, বিদেশী কোনো লেখক বা চিন্তাবীরের প্রতিভার সঙ্গে দেশের লোকের পরিচয় ঘটনোর ব্যাপারে "ফ্রী ওয়ার্ল্ডের" গভর্ন-মেণ্টগুলির, বিশেষ করে শক্তিশালী গভর্ন-মেণ্টগুলির হাত-টেনে রাখা এবং ছেড়ে দেওয়া উভয়দিকেই—যথেষ্ট রয়েছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারাদিতে বৈদেশিক যোগাযোগ রক্ষার কাজে আমেরিকা বা বৃটেনের যে-সমস্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত আছে তাদের ভাব ও নীতির সঙ্গে তাদের স্ব স্ব গভর্নমেণ্টের ভাব ও নীতির একটা পরোক্ষ কিন্তু সুনিশ্চিত মিল এমনকি সাযুজ্য অনুভব করা যায়।

কিন্তু কেবল বাহিরের সম্পর্কে সতর্ক হয়ে কি হবে? রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালনের ব্যাপারে বিদেশী গভর্নমেণ্টগুলি যাতে উদ্যোগী হন তার জন্য আমাদের সরকারী মহল থেকে "তাগিদ" দেওয়া হয়েছে এবং তাতে কোনো কোনো বিদেশী গভর্নমেণ্ট কিছুটা বিরক্তও হয়েছেন, এমন কথাও শুনা যায়। এখানে রবীন্দ্র জয়ন্তী সম্পর্কে "ইউনেস্কোর" বা বিদেশের বিদ্বজ্জন সমাজের সঙ্গে "সাহিত্য আকাদেমির" যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টার নিন্দা আমরা করছি না। যেটা অসম্মানজনক বলে বোধ হবে সেটা হচ্ছে যদি আমাদের সরকার বিদেশী গভর্নমেণ্টগুলিকে তাগিদ দিয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনে প্রবৃত্ত করার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু তার চেয়েও ভাবনার কথা হচ্ছে দেশের মধ্যে আমরা যা করছি সেটা ঠিক হচ্ছে কিনা। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালনের ব্যবস্থা বেশিরভাগ যেভাবে হয়েছে তাতে এরূপ আশংকা হয় না কি যে, রবীন্দ্র-নাথের ঐতিহ্যবহনের ভার আমরা উত্তরোত্তর আমাদের সরকারের উপরই অর্পণ করতে মনস্থ করেছি?

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

ভবঘুরে (৭)

গেরো বাঁধলো 'শান্তির পাইপ খাওয়া' নিয়ে। এটা বোধহয় ড্রেস রিহার্সেল। তাই এই প্রথম সত্যকার পাইপে করে সত্যকার তামাক খাওয়া হবে। যে-ছেলেটি রেড-ইণ্ডিয়ানদের দলপতি সে বোধহয় একটু অতিরিক্ত মাত্রায় গোবেচারী—নিতান্ত দিক-ধেড়েঙ্গে ঢ্যাঙা বলে তাকে দলপতি বানানো হয়েছে এবং জীবনে কখনো রান্না-ঘরের পিছনে, ওদের ভাষায় চিলকোঠায় (এ্যাটিকে) কিংবা খড়-রাখার ঘরে গোপনে আধ-পোড়া সিগরেটও টেনে দেখেনি। না হলে আগে ভাগেই জানা থাকতো ভস্‌ভস্‌ করে পাইপ ফোঁকা চাট্টিখানি কথা নয়।

দিয়েছে আবার ব্রহ্ম-টান। মাটির ছিলিম হলে ফাটার কথা।

ভিরমি যায় যায়। হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড। একটা ছোট ছেলে তো ভ্যাঁক করে কেঁদেই ফেললে। ওদিকে আমিই ওদের মধ্যে মুরুব্বি। আমাকে কিছু একটা করতে হয়। একজনকে ছুটে গিয়ে মিনরেল-ওয়াটার আনতে বললুম—ও জিনিস এ-অঞ্চলে পাওয়া যায় সহজেই—টাই-কলার খুলে দিয়ে শির-দাঁড়া ঘষতে লাগলুম। এসব মুষ্টিযোগে কিছু হয় কিনা জানিনে—শুনেছি মৃত্যুর দু'একদিন পূর্বে রবীন্দ্র-নাথের হিক্কা থামাবার জন্য ময়ূরের পালক-পোড়া না কি যেন খাওয়ানো হয়েছিল—তবে সাইকলজিকাল কিছু-একটা হবে নিশ্চয়ই। আমি যখন রেড-ইণ্ডিয়ান তখন ওদের পাইপের পাপ কি করে ঠেকাতে হয় আমারই জানার কথা।

ফাঁড়া কেটে যাওয়ার পর দুর্ভাবনা জাগলো, শো'র দিনে পাইপ টানা হবে কি প্রকারে? হায়, হায়, এত সব বখেড়া পোওয়াবার পর, এমন কি জলজ্যান্ত রেড-ইণ্ডিয়ান পাওয়ার পর তীরে এসে ভরা-ডুবি?

আমি বললুম, 'কুছ পরোয়া নেই। সব ঠিক হো জায়েগা। কয়েক ফোঁটা ইউকেলিপ্‌টাস তেল নিয়ে এস'—অজ পাড়াগাঁ হলে কি হয়, এ যে জর্মানি।

তারই কয়েক ফোঁটা তামাকে ফেলে আগুন ধরাতেই প্রথমটায় দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো। সেটা ফু দিয়ে নিভিয়ে ফের ধরালুম। তারপর ভস্‌ ভস্‌ করে কয়েক টান দিয়ে বললুম, 'এইবারে তোমরা খাও। কাশি, নাকের জল, বমি কিছুই হবে না।' কেউ সাহস করে না। শেষটায় ঐ মাস্তিয়ানা,

অস্ট্রেলেস্ নাদিয়াই দিলে দম। সঙ্গে সঙ্গে খুশীতে মুখচোখ ভরে নিয়ে বললে, খাসা! মনে হচ্ছে ইউকেলিপটাসের ধুঁয়োয় নাক-গলা ভর্তি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেমন যেন শুকনো শুকনো।'

আমি বললুম, 'মাদাম ক্যুরিকে হার মানালি। ধরেছিস ঠিকই। শুকনো শুকনো ভাব বলেই খুব ভিজে সর্দি হলে ডাক্তাররা এই প্রক্রিয়াই ইউকেলিপটাস ব্যবহার করতে বলে?'

শুধালে, 'আর তামাকের কি হল? তার স্বাদ তো আদপেই পাচ্ছিনে।'

সাক্ষাৎ মা দুর্গা! দশ হাতে এক সঙ্গে পাঁচ ছিলিম গাঁজা সেজে—কুলোকে বলে নিতান্ত ঐ গাঁজার স্টেডি সাপ্লায়ের জন্যই শিব দশভূজাকে বিয়ে করেছিলেন—বাবার হাতে তুলে দেবার পূর্বে মা নিশ্চয়ই তাঁর বখরার পূর্ব-প্রসাদ নিয়ে নিতেন! এ মেয়ে শিব পাবার পূর্বেই নেশাটা মকসো করে রেখেছে—বেঁচে থাকলে শিবতুল্য বর হবে।

আমি বললুম, 'তামাক কর্পূর—মায় নিকোটিন।'

এমন সময় স্পষ্ট শোনা গেল গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজলো দুটো। সঙ্গে সঙ্গে এদের সক্কলের মুখ গেল শুকিয়ে। কি ব্যাপার? দুটোর সময় সব্বায়ের বাড়ি ফেরার হুকুম। মধ্যাহ্ন-ভোজন।

জর্মানি কড়া আইন, ডিসিপ্লিনের দেশ। বাচ্চাদের ডিসিপ্লিন আরম্ভ হয়, জন্মের প্রথম দিন থেকেই—সে-কথা আরেকদিন হবে। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, বিপদে পড়েছে আমাকে নিয়ে। ছেলেমানুষ হোক আর যাই হোক একটা লোককে হুট করে বিদায় দেয় কি করে? ওদিকে আমিও যে এগোতে পারলে বাঁচি সেটা বোঝাতে গেলে ওরা যদি কষ্ট পায়।

গোবেচারী মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন দেখলুম, যার দলপতি সাজবার কথা সে ছেলেটা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে। শুধালে, 'তুমি লাঞ্চ খেয়েছো?' আমার সত্য ধর্ম ছিল মিথ্যা বলার, অর্থাৎ হ্যাঁ, কিন্তু আমার ভিতরকার শয়তান আমাকে বিপদে ফেলার জন্য হামেহাল তৈরী। সে-ই সত্যভাষণ করে বললে, 'না, কিন্তু—'

কয়েকজন ছেলেমেয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললে, 'আমার বাড়ি চলো।'

মেলা হট্টগোল। আমি বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ, বাছারা, কিন্তু তোমাদের বাপ-মা একটা ট্র্যাম্পকে—?'

মারিয়ানা মেয়েটা একদিন জর্মানির রানী হবে যদি না কৈলাস থেকে হুলিয়া বেরোয়। বলা-নেই-কওয়া-নেই খপ করে তার ছোট্ট হাত দিয়ে আমার হাতখানা ধরে বললে, 'চলো আমার বাড়ি। আমাতে ঠাকুমাতে থাকি। কেউ কিচ্ছু বলবে না। ঠাকুমা আমায় বড্ড ভালোবাসে।'। তারপর ফিস্-ফিস করে কানে কানে বললে—যদিও আমার বিশ্বাস সবাই শুনতে পেলে—'ঠাকুরমা চোখে দেখতে পায় না।'

ইস্কুল থেকে বেরিয়ে বিস্তর হ্যান্ড-শেক, বিস্তর চকলেট বদলাবদলি হল। মারিয়ানা বললে 'চলো। আমাদের বাড়ি গ্রামের সর্ব-শেষে। তুমি যে দিকে চলছিলে সেই দিকেই। খামোখা উল্টো পথে যেতে হবে না।'

আজ স্বীকার করছি, তখনো আমি উজবুক ছিলুম। কাকে কি জিজ্ঞেস করতে হয়, না হয়, জানতুম না। কিংবা হয়তো, কিছুদিন পূর্বেই কাবুলে ছিলুম বলে সেখানকার রেওয়াজের জের টানছিলুম—সেখানে অনেকক্ষণ ধরে ইনিয়ে বিনিয়ে হরেক রকমের ব্যক্তিগত প্রশ্ন শোধানো হ'ল ভদ্রতার প্রথম চিহ্ন। জিজ্ঞেস করে বসেছি, 'তোমার বাবা মা?'

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'বাবা? তাকে আমি কখনো দেখিনি। আমার জন্মের পূর্বেই লড়াইয়ে মারা যায়। আর মা? তাকেও দেখিনি? দেখেছি নিশ্চয়, কিন্তু কোনো স্মরণ নেই। সে গেল, আমার যখন বয়েস একমাস।'

ইচ্ছে করে এরকম প্রশ্ন শুধিয়ে বিপদে পড়া আহাম্মুখিই। লড়াই, লড়াই, লড়াই! হে ভগবান! তুমি সব পারো, শুধু এইটে বন্ধ করতে পারো না?

ভাবলুম, কোন্ ব্যামোতে মা মারা গেল সেইটে শুধোলে হয়তো আলাপটা অন্য মোড় নেবে। শুধালুম, 'মা গেল কিসে?'

বারো, জোর তেরো বছরের মেয়ে কিন্তু যা উত্তর দিলে তাতে আমি বুঝলুম, আহাম্মুকের মত এক প্রশ্ন শুধিয়ে বিপদ এড়াবার জন্য অন্য প্রশ্ন শুধোতে নেই। বললে, 'আমাদের গাঁয়ে ডাক্তার নেই। বন শহরের ডাক্তার বলে, মা গেছে হার্টে। ঠাকুরমা বলে অন্য হার্টে। মা নাকি বাবাকে বড্ড ভালোবাসতো। সবে নাকি তাদের বিয়ে হয়েছিল।'

* * *

নির্জন পথ চিত্রিতবৎ সাড়া নেই সারা দেশে
রাজার দুয়ারে দুইটি প্রহরী ঢুলিছে
নিদ্রাবেশে

তার বদলে একটি সিঁড়ির উপর পাশাপাশি বসে দুটি বুড়ি ঢুলছে।

আর খোলা জানলা দিয়ে আসছে ক্যানারি পাখীর গিটকিরিওলা হুইসলের মিষ্টি মধুর সঙ্গীত। মারিয়ানা বললে, 'দুই দুই বুড়ির ঐ এক সঙ্গী—পাখিটি'॥

মোরগের ডাক থেকে

জগন্নাথ চক্রবর্তী

মোরগের ডাক থেকে মোরগের ডাক।
পথের ফিতেটা দেখ উঠেছে পে'চিয়ে
কুব্জপৃষ্ঠ ধোঁয়াটে পাহাড়ে।
হয়তো ঝরনার খোঁজে সেই পথচারী
(চা-রঙা ওভারকোট, পশমের টুপি)
ও ঐ পথে পথ হারাবে।
রোদ যেন রোদ নয়, কুয়াশারই ফিকে রং আকাশ-চোঁয়ানো,
সেই রোদে জ্বলে দেখ পশমের টুপি
মোরগের ঝুঁটির মতন।
হারানোর নেশা যাকে পায়
সে হারায়—পথ, রথ, সব।......

পাহাড় ও অন্ধকার বার্চহিলে যখন গায়ে গায়ে ঘে'ষা,
লেবং রোডের ধারে অপহৃত আত্মার মতন
ভ্রষ্ট আলো জ্বলে নিবে যায়।
হয়তো ইচ্ছুক হাতে হয়তো বা দমকা হাওয়ায়,
তখনও দিগন্ত জুড়ে পাহাড়ের সিলুয়েট জেগে থাকে
তৃষ্ণার্ত ঠোঁটের মতো দীর্ঘ, শুষ্ক, অনুজ্জ্বল;
ঝরনার হঠাৎ-শব্দে বুকের ধুকধুক শোনে ধূসর টিলাটা
জলের জ্যোৎস্নায় বাজে অসিঞ্চিত পিপাসার জ্বালা
ক্যামেলিয়া-ঝরে-যাওয়া পাহাড়ের খোঁজে
চা-রঙা ওভারকোট হয়তো তখনও খোঁজে
পাইনের অন্ধকারে নিজের ছায়াকে।......
তৃতীয় প্রহর রাতে 'স্নো-ফ্লেক' কটেজে কিংবা 'প্লেনারি'র ধা
আলসেশিয়ানটাকে মনে পড়ে তার—
বিশাল সে লোমশ পাহাড়
মাংসের স্বপ্নকে বে'ধে ঘুমন্ত নখরে,
সম্ভবত তৃতীয় প্রহরে।

কুব্জপৃষ্ঠ ধোঁয়াটে পাহাড়ে
অকস্মাৎ ভেসে আসে মোরগের ডাক।

স্বাদ

গোবিন্দ চক্রবর্তী

তুমি যে মদির বকুলগন্ধ
দূর কোন বনে ফোটা—
কোনো সে অতল নিশ্রুতি নদীর
অকারণে ঢেউ-ওঠা।
যাব না, তবু ত যাব না
জানি মায়ামৃগ পাব না
ক্ষণবসন্ত ছি'ড়ে দিয়ে যাবে
পয়ারের ছন্দটা।

মুসাফির প্রাণ হবে হয়রাণ,
যদিও নানান বাঁকে—
যত ক্ষতি-ক্ষয়, অপচয়—তবু
একটি মাণিকও রাখে।
চাব না বেশী ত চাব না—
ছুঁয়েছ আমারও ভাবনা
সেই স্বাদটুকু শুধুই হৃদয়
জড়াক না পাকে-পাকে।
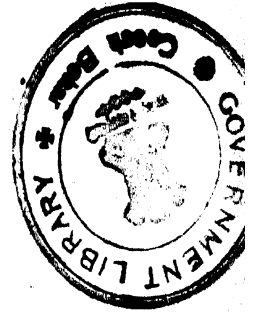
রূপময় ভারত

প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে রচিত ভরত মুনির "নাট্যশাস্ত্র" থেকে ভরত-নাট্যের উৎপত্তি। ভারতীয় মার্গ-নৃত্যের ক্ষেত্রে এই নৃত্যশৈলীটিই সম্ভবত সর্বপ্রাচীন। ভক্তি-রসাশ্রিত সহগামী সংগীতের অজস্র রমণীয় ব্যঞ্জনাই ভরত-নাট্যের প্রাণ। অধুনা ভারত-বর্ষের সর্বত্র প্রচলিত ও আদৃত হলেও, দাক্ষিণভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে, বিশেষত তাঞ্জোরে, একাদিক্রমে বহু শতাব্দী ধরে এই নৃত্যরীতিটির চর্চা হয়ে এসেছে। সঙ্গের আলোকচিত্রগুলি তাঞ্জোরের একটি প্রসিদ্ধ নৃত্য-বিদ্যালয়ে গৃহীত:

(১) নাচের আগে রূপসজ্জা (২) ভরত-নাট্যে ব্যবহৃত অনুগামী বিবিধ সঙ্গীতযন্ত্র, (৩) কবরী-রচনা: একটি বিশেষ নৃত্যভঙ্গি, (৪) নৈবেদ-নৃত্য, (৫) নৈবেদ-নৃত্য : পৃথক ভঙ্গি, (৬) ভরত-নাট্যের একটি "মুদ্রা" ব্যঞ্জনা।

আলোকচিত্রশিল্পী :

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২

৩
৪
৫
৬

কারো ধার ধারিনা, এমন কথা আর যেই বলুক আমি কখনই বলতে পারি না। আমার ধারণা, এক কাবুলিওলা ছাড়া এ জগতে একথা কেউই বলতে পারে না। অমৃতের পথ ক্ষুরস্য ধারা নিশ্চিতা; অকালে মৃত না হতে হলে ধার করতেই হবে।

ধার হলেও কথা ছিল বরং, কিন্তু তাও নয়। বাড়ি ভাড়া বাকী। তাও বেশী না, পাঁচশো টাকা মাত্তর! কিন্তু তার জন্যেই বাড়িওয়ালা করাল মূর্তি ধরে দেখা দিলেন একদিন—

'আপনাকে অনেক সময় দিয়েছি আর আমি দিতে পারব না। কোনো অজুহাত শুনছি না আর—'

'ভেবে দেখুন একবার,' আমি তাঁকে বলতে যাই : 'সামান্য পাঁচশো টাকার জন্যে আপনি এমন করছেন! অথচ এক যুগ পরে একদিন—আমি মারা যাবার পরেই অবশ্যি—আপনার এই বাড়ির দিকে লোকে আঙুল দেখিয়ে বলবে, একদা এখানে বিখ্যাত লেখক শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক বাস করতেন।'

'বাস করতেন! বাস করতেন!! বাস করে আমার মাথা কিনতেন!' জবাবে তাঁর দিক থেকে যেন এক ঝাপটা এল—'শুনুন মশাই, আপনাকে সাফ কথা বলি—যদি আজ রাত্তির বারোটার ভেতর আমার টাকা

একদা এখানে বিখ্যাত লেখক......

না পাই তাহলে এক যুগ পরে নয়—কালকেই লোকে এই কথা বলবে।'

বাড়িওয়ালা তো বলে গেলেন, চলে গেলেন। কিন্তু এক বেলার মধ্যে এত টাকা আমি পাই কোথায়? পাছে ধার দিতে হয় সেই ভয়ে সহজে কেউ আমার মত লেখকের ধার ঘেঁষে না। লেখক মাত্রই ধারালো, আমি আবার তার ওপর এক কাঠি—জানে সবাই।

হর্ষবর্ধনদের কাছে যাব? তাদের কাছে এই কটা টাকা কিছুই না। তাদের কীর্তি কাহিনী লিখে অনেক টাকা পিটেচি, এখন তাদের পিঠেই যদি চাপি গিয়ে? তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় যদি এই দায় থেকে উদ্ধার পাই?

গিয়ে কথাটা পাড়তেই হর্ষবর্ধন বলে উঠলেন—'নিশ্চয় নিশ্চয়! আপনাকে দেব না তো কাকে দেব!'

চমকে গেলাম আমি। কথাটা যেন কেমন তরো শোনালো।

'আপনি এমন কিছু আমাদের বন্ধু নন?' তিনি বলতে থাকেন।

'বন্ধুত্বের কথা যদি বলেন—' আমি বাধা দিয়ে বলতে যাই।

'হ্যাঁ, বন্ধুত্বের কথাই বলছি। আপনি তো আমাদের বন্ধু নন। বন্ধুকেই টাকা ধার দিতে নেই মানা আছে। কেননা, তাতে টাকাও যায় বন্ধুত্বও যায়।' তিনি জানান : 'তবে হ্যাঁ, এমন যদি সে বন্ধু হয় যে বিদেয় হলেই বাঁচি—তার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে ঐ ধার দেওয়া। তাহলেই চিরকালের মতন নিস্তার।'

আহা! আমি যদি ও'র সেই দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্ধু হতাম—মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম।

'কিন্তু আপনি তো বন্ধু নন, লেখক মানুষ। লেখকরা তো কখনো কারো বন্ধু হয় না।'

'লেখকদেরও কেউ বোধ হয় বন্ধু হয় না।' সখেদে বলি।

'বিলকুল নির্ঝঞ্ঝাট! এর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে বলুন?' তিনি বলেন : 'আপনি যখন আমাদের আত্মীয় বন্ধু কেউ নন, নিতান্তই একজন লেখক, তখন আপনাকে টাকা দিতে আর বাধা কি? কতো টাকা দিতে হবে বলুন?'

'বেশী নয়, শ পাঁচেক। আর একেবারে দিয়ে দিতেও আমি বলছি না।' আমি বলি : 'আজ তো বুধবার। শনিবারদিনই টাকাটা আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেব।'

কথা দিলাম। এ ছাড়া আজ বাড়িওয়ালার হাত থেকে প্রাণ পাবার আর কী উপায় ছিল? কিন্তু কথা তো দিলাম। না ভেবেই দিয়েছিলাম কথাটা—শনিবারের সকাল হতেই ওটা ভাবনার কথা হয়ে দাঁড়ালো।

ভাবতে ভাবতে চলেছি এমন সময় গোবর্ধনের সঙ্গে মোলাকাত—অকূল পাথারে। চৌরাস্তার মোড়ে।

'গোবর্ধন ভায়া, একটা কথা রাখবে? রাখো তো বলি।'

'কী কথা বলুন?'

'যদি কথা দাও যে তোমার দাদাকে বলবে না তাহলেই বলি তোমায়।'

"দাদাকে কেন বলতে যাব? দাদাকে কি আমি সব কথা বলি?'

'অন্য কিছু কথা নয়। কথাটা হচ্ছে এই, আমাকে শ পাঁচেক টাকা ধার দিতে পারো—

দিন কয়েকের জন্যে? আজ তো শনিবার? এই বুধবার সন্ধ্যের মধ্যেই টাকাটা আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেব।'

'এই কথা?' এই বলে আর দ্বিরুক্তি না করে শ্রীমান গোবরা তার পকেট থেকে পাঁচখানা একশ টাকার নোট বার করে দিল।

টাকাটা নিয়ে আমি সটান শ্রীহর্ষবর্ধনের কাছে।

'দেখুন আমার কথা রেখেছি কিনা। লেখক হতে পারি, দরিদ্র লেখক হতে পারি—কথা নিয়ে খেলা করতে পারি—কিন্তু কথার খেলাপ কখনো করি না।'

হর্ষবর্ধন নীরবে টাকাটা নিলেন।

'আপনি তো ভাবছিলেন যে টাকাটা বুঝি আপনার মারাই গেল! আমি আর এ জন্মেও এমুখো হব না। ভাবছিলেন যে—'

'না না। আমি সেসব কথা একেবারেই ভাবিনি। টাকার কথা আমি ভুলেই গেছলাম।' তিনি বললেন, 'বিশ্বাস করুন, টাকাটা আপনাকে দিয়ে আমি কিছুই ভাবিনি কিন্তু ফেরৎ পেয়ে এখন বেশ ভাবিত হচ্ছি।'

'ভাবছেন এই যে, এই পাঁচশো টাকা ফিরিয়ে দিয়ে নিজের ক্রেডিট খাটিয়ে এর পরে আমি ফের হাজার টাকা ধার নেব। তারপরে সেটা ফেরৎ দিয়ে আবার দু হাজার চাইব। আর এমনি করে ধারটা দশ হাজারে দাঁড় করিয়ে যে তারপরে আর এ ধারই মাড়াব না? এই তো? কেমন, এই তো ভাবছেন আপনি? এই ভেবেই তো ভাবিত হয়েছেন, তাই না?'

আমি তাঁর মনোবিকলন করি। তাঁর সঙ্গে বোধহয় আমার নিজেরও?

তিনি বিকল হয়ে বলেন, 'না না, সেসব কথা আমি আদৌ ভাবিনি। ভাবছি যে এত তাড়াতাড়ি আপনি টাকাটা ফিরিয়ে দিলেন! আর এত তাড়াতাড়ি আপনার প্রয়োজন কি করে মিটতে পারে? বেশ, ফের আবার দরকার পড়লে চাইতে যেন কোনো কুণ্ঠা করবেন না।'

বলাই বাহুল্য! মনে মনে আমি ঘাড় নাড়লাম। লেখকরা বৈকুণ্ঠের লোক, কোনো কিছুতেই তাদের কুণ্ঠা হয় না।

শনিবার দিনই দরকারটা পড়ল আবার। হর্ষবর্ধনের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে গোবর্ধনকে গিয়ে দিতে হোলো।

'কেমন গোবর্ধন ভায়া! দেখলে তো, কথা রেখেচি কিনা। এই নাও তোমার টাকা—প্রচুর ধন্যবাদের সহিত প্রত্যর্পিত।'

বুধবার আবার গোবরার কাছে যেতে হল। পাড়তে হোলো কথা—

'গোবর্ধন ভায়া, শনিবার টাকাটা ফেরৎ দেব বলেছিলাম শনিবারই দিইচি, দিইনি

শুনুন মশাই আপনাকে সাফ কথা বলি

কি? একদিনের জন্যেও কি আমার কথার কোনো নড়চড় হয়েছে?...'

'এমন কথা কেন বলছেন?' গোবর্ধন আমার ভণিতা ঠিক ধরতে পারে না।

'টাকাটার আমার দরকার পড়েছে আবার। ওই পাঁচশো টাকাই। সেইজন্যেই তোমার কাছে এলাম ভাই। এই শনিবারই তোমায় আবার ফিরিয়ে দেব টাকাটা। নির্ঘাৎ।'

এইভাবে হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন, গোবর্ধন আর হর্ষবর্ধন—শনিবার আর বুধবারের দুধারের টানা পোড়েনে আমার ধারিওয়াল কম্বল বুনে চলেছি এমন কালে পথে একদিন দুজনের সঙ্গেই দেখা।

দুই ভাই পাশাপাশি আসছিল। আমাকে দেখে দাঁড়ালো। দুজনের চোখেই কেমন যেন একটা সপ্রশ্ন দৃষ্টি।

হয়ত দৃষ্টিটা কুশল জিজ্ঞাসার হতে পারে, কোথায় যাচ্ছি কেমন আছি—এই ধরণের সাধারণ কোনো কৌতূহলই হয়ত বা, কিন্তু আমার তো পাপ মন, মনে হোলো দুজনের চোখেই যেন এক তাগাদা!

'হর্ষবর্ধনবাবু, ভাই গোবর্ধন, একটা কথা আমি বলব কিছু মনে কোরো না—' বলে আমি শুরু করি: 'ভাই গোবর্ধন, তুমি প্রত্যেক বুধবার হর্ষবর্ধনবাবুকে পাঁচশো টাকা দেবে। আর হর্ষবর্ধন বাবু, আপনি প্রত্যেক শনিবার পাঁচশো টাকা আপনার ভাই গোবর্ধনকে দেবেন। হর্ষবর্ধনবাবু, আপনি শনিবার আর গোবর্ধন, তুমি বুধবার, মনে থাকবে তো? গোবর্ধনকে শনিবার আর হর্ষবর্ধনবাবুকে বুধবার। হর্ষবর্ধনবাবু, বুধবার...গোবর্ধন শনিবার...আপনি বুধবার ...তুমি শনিবার...আপনি শনিবার...তুমি বুধবার...শনিবার বুধবার...বুধবার শনিবার ...বুধবার বুধবার শনিবার শনিবার...।

'ব্যাপার কি? হর্ষবর্ধন তো হতভম্ব। —'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ব্যাপার এই যে ব্যাপারটা আমি একেবারে মিটিয়ে ফেলতে চাই। আপনাদের দুজনের মধ্যে আমি আর থাকতে চাই না।'
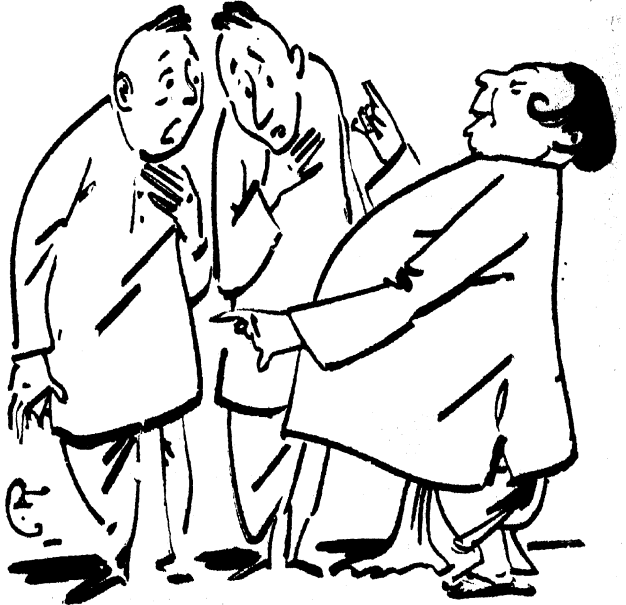
ব্যাপার এই যে ব্যাপারটা আমি একেবারে মিটিয়ে ফেলতে চাই

নি খিল ভারত উৎপাদক সমিতির অনুষ্ঠিত সভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারতে ধনী ও দরিদ্রের দুস্তর ব্যবধান অত্যন্ত দৃষ্টি-কটু।—"এর একমাত্র প্রতিবিধান হলো উৎপাদক সমিতিকে খুব বেশী করে কালো রঙের চশমা উৎপাদনের নির্দেশ দেওয়া। চক্ষুলজ্জা ঢাকার অন্য কোন উপায় আর নেই"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

অ বিলম্বে কলিকাতার বাজারে ঘৃতের অতিমাত্রায় মূল্য বৃদ্ধির আশংকা সম্বন্ধে একটি সংবাদ পাঠ করিলাম।—"আমরা দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই সংবাদটি পাঠ করেছি এবং পরম ঔদাসীন্যের সঙ্গে বলেছি, কপালে নেইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

ক লিকাতার বাজারে আম উঠিয়াছে। 'নগর দর্শন' করিয়া চাণক্য মন্তব্য করিয়াছেন—"ফলের সেরা আমের জন্য

ট্রামেবাসে

প্রতীক্ষার দিন তাহলে শেষ'।—"কিন্তু তিনি ভুল করলেন, বেল পাকে কিন্তু কাকের তাতে লাভ হয় না। আমেরও তাই, বাজারে ওঠে বটে কিন্তু ঘরে ওঠে ক'জনার"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

ক লিকাতায় ভূগর্ভস্থ পায়ে চলার পথ নির্মানের ব্যবস্থা হইতেছে।—"কাজটি সহজে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা

যায়। লাজে দুঃখে মা ধরণী তো অনেক ক্ষেত্রে আপনা থেকেই দ্বিধা হয়ে আছেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

শ্রী দেশমুখ মারাঠী সাহিত্যে রবীন্দ্র-নাথের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনায় মারাঠী কবি দেশপাণ্ডের লেখা উদ্ধৃত করিয়া বলেন, এ-যেন গংগা যমুনার সংগম। বিশু খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু দুঃখের কথা, কেউ কেউ (এবং তারা এই ভারতের মহা-মানবের সাগরতীরেরই মানুষ) মনে করেন এ গংগা হালের আদিগংগারই সামিল!!"

এ ই প্রসংগেই আমাদের শ্যামলাল বলিল—"সরস্বতীর মতো রবীন্দ্র-নাথের প্রতিমূর্তিতেও বাজার ছেয়ে গেছে। সরকার দেখেছেন কিনা জানিনে। কিন্তু আমরা দেখেছি এর অনেক মূর্তিই জোড়া-সাঁকোর রবীন্দ্রনাথের নয়, হয়ত কোন এক সাঁকোর রবীন্দ্রনাথের হবে!!"

ক লিকাতায় পাক-ভারত জলসম্পদ বিশেষজ্ঞদের সম্মেলন হইবার কথা শুক্রবার—'জন্মাবারে ক্রিকেট শুরু করে দেখেছি, সুফল হয় পাকিস্তানের অনু-কূলে। জলের ব্যাপারেও সেই জন্মাবার দেখে মনে ভয় হয় ফল না জলসই হয়"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

রা জ্যসভায় বায়বরাদ্দ মঞ্জুরী বিল সম্বন্ধে আলোচনার সময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই নাকি বলিয়াছেন যে, "কলিকাতা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার উদাসীন নহে"।—"ভুলি নাই, ভুলি

নাই, ভুলি নাই প্রিয়া" কবিতায় মন্তব্য করিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

ভা গীরথীর তলদেশের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সর্বপ্রথম তেজষ্ক্রিয় যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।—"এতে নদীর গতি পরীক্ষা হয়ত চলবে। কিন্তু যারা নদীতে ডুবে ডুবে জল খায় তাদের গতি প্রকৃতিও ধরা পড়বে কি"—বলেন খুড়ো।

মা ঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক প্রফেসার বলিয়াছেন যে, মাঝে মাঝে কটুকাটব্য করা বা মুখ খারাপ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।—"স্বাস্থ্যের এত

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যে আমরা এখনও বেঁচে আছি তার কারণ হয়ত এই মুখ খারাপ করা; দিনে কতবার যে কতজনের পিণ্ডি চটকাচ্ছি তার কি কোন লেখাজোখা আছে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

হা ওড়া জেলার কোন এক গ্রামে সম্প্রতি সন্ধ্যার পর হায়েনার চীৎকারে গ্রামবাসীরা অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। পরে আবিষ্কার করা হইয়াছে, হায়েনা নয়, দুইটি যুবক নাকি হায়েনার ডাক অনুকরণ করিয়া সবাইকে ভয় দেখাইত।—"আমাদের 'হাউণ্ড অব বাসকারভিল' মনে পড়ল। এক্ষেত্রে 'হায়েনা অব হাওড়া' বলে কোন চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটবে কিনা তা কে বলে দেবে, শারলক হোমস্ তো আজ আর নেই"—বলেন বিশু খুড়ো।
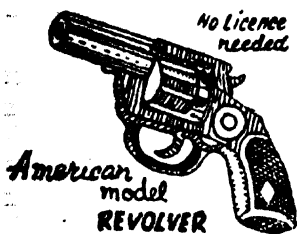
লেখক ও বেতার

সন্তোষকুমার ঘোষ

'রেডিও-তে গল্প পড়েন না কেন?'—অনেক লেখকবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছি। এক রকম উত্তর পাইনি। কেউ বলেছেন, বড্ডো কম টাকা। পঁচিশ-ত্রিশের বেশি পাওয়া যায় না।

'অন্যত্র কত পান?'

মোটামুটি খ্যাতি অর্জন করেছেন, এমন সব লেখকই বলেছেন, 'সাধারণত পঞ্চাশ। বেশিও মেলে।'

এ-ছাড়া কেউ কেউ গল্প পড়েন না ডাক আসেনি বলে। সকলকে ডাকা সম্ভব নয় জানি। বেতারের সময় সীমিত, অর্থাৎ নিরবধিকাল এক্ষেত্রে নিতান্তই সাবধি। কালের জায়গায় যদি স্থান বসিয়ে নিই তা হলে বলা চলে, অনুষ্ঠানের ফরাসের এক কোণে সাহিত্যের জন্যে ছোট্ট একটি পিঁড়ি যে পাতা হয়েছে এই ঢের। তবু সর্ব-সাধারণের মনে যাঁদের জন্যে প্রীতির আসন পাতা হয়ে গেছে সেই লেখকেরাও বেতার সূচীকারদের কাছে ছাড়পত্র পান না বলে খটকা লাগে বই কি!

আবার কোন-কোন লেখক বলেন, 'মশাই, উৎসাহ পাই না। একে তো ঘড়ি ধরে গল্প-পড়া—দশ মিনিট কি বারো মিনিট। আমি যে-জাতের গল্প লিখি, তা এই ফতুয়ার মত আঁটসাট ছাঁটা সময়ে ধরে না। ভাল গল্প দূরে থাক ফুড়ুত করে ভাল ক'রেই কি একটা গল্প বলা যায়?'

কিছু অসুবিধা অবশ্য মৌল। রচনার একটা বড় অংশ শৈলী-বস্তু আর ভঙ্গি, সৃষ্টির কারবারে দুইই সমান পার্টনার। বহুকালের অভ্যাসে শৈলী চোখ দিয়ে চাখার জিনিস, কান তার পুরো দাম দেবে কি, তাকে ভালমত যাচাই করতেই পারে না! তদুপরি এই জটিল চিন্তাধারার যুগে, শৈলীও বিলক্ষণ জটিল—স্বভাবতই। কানের ভিতর দিয়ে মরমে এ-রসের সামান্যই পাশে। লিপির, বিশেষত মুদ্রাযন্ত্রের, কল্যাণে শ্রুতি আর স্মৃতি দুইই বহুকাল বরবাদ হয়ে গেছে। নতুন করে শ্রুতিসাহিত্য তৈরি না হলে বেতারে সার্থক সাহিত্য-প্রচারের প্রয়াস ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এ-সব সূক্ষ্ম হেতু অবশ্যই একমাত্র বাধা নয়। এ-দেশে অধিকন্তু বাধা বেতারেরই নিজস্ব নিয়ম। কোন্ মান্ধাতার আমলে সরকারী কোন্ আমলা এ-নিয়ম চালু করে-ছিলেন কেউ জানে না, আজও তা বলবৎ আছে। বেতারের সাহিত্যিক গণ্ডিটি উঁচু পাঁচিলে ঘেরা, তাতে আবার সুনীতির কাঁচ বসানো, ঝোড়ো হাওয়ার সাধ্য নেই তা ছোঁয়। রাজনীতি-সমাজনীতি ইত্যাদির 'ডোন্টস' দাপটে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের প্রবণতা এবং ধারার সামান্য অংশই বেতার-সাহিত্যে বিম্বিত। পাঠক হিসাবে যা পড়তে বাধা নেই, শ্রোতা হিসাবে জনসাধারণের তা শুনতে মানা। লেখকেরা বেতারে বাধ্য হয়ে জলমিশ্রিত দুগ্ধ পরি-বেষণ করেন। আর আপোসে যাঁরা গররাজী তাঁরা শতহস্ত দূরে থেকে বলেন, বেতার-পরিচালকদের মনঃপূত নয়, এই কারণে আমার বিশ্বাস, জীবনবাদ বাদ দিয়ে গল্প লিখব? নৈব নৈব চ। এমন লেখায় হাতই দেব না।

নিতান্ত বৈষয়িক খুঁতখুঁতিও কারুর কারুর আছে। বেতারে-পড়া গল্পের বহু স্বত্ব আবার বেতার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত। কপিটি তাঁরা রেখে দেন। মর্জি হলে বেতার জগতে ছাপেন। কিন্তু ছাপা না হলে? কালের কপোলতলে নয়, চোয়ালের ভেতরে তার সদ্‌গতি।

একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক একবার পরি-হাস করে বলেন, সব কাগজের সম্পাদক লেখার জন্যে তাঁর কাছে হাত পাতেন, তিনি কিন্তু হাত পাতেন মাত্র একজন সম্পাদকের দরবারে, লেখার ছাপানোর উমেদারি করেন। বলে দিতে হবে না, এই ভাগ্যবান সম্পাদকটি কে। 'বেতার-জগৎ'-এর ভার যাঁর, তিনি।

খোলসা করে বলি। বেতারের একটি বিশেষ নিয়ম এই যে, বক্তার কপিটি পাঠমাত্র বেতার-অফিসে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। বাংলা লেখার নকল রাখা সুসাধ্য নয়, সুতরাং

বেতার-জগৎ লেখাটি কবে ছাপবে তার জন্যে তীর্থকাকের মত বসে থাকা বই উপায় নেই। না ছাপলে রচনাটি চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল। আর কত রাশি রাশি রচনার ইহলীলা এ-ভাবে শেষ হয় তার লেখাজোখা নেই। 'বেতারজগৎ'-এ ক'টি বা আর ধরে!

মনে রাখতে হবে, ছাপা হলেও নতুন করে আর দক্ষিণাপ্রাপ্তিযোগ ঘটে না। নামমাত্র দামে কেনা এক মুরগী দু' দফা জবাই হয়। অথচ অন্যত্র ছাপা হলে যে গরিব লেখকের দু' পয়সা হত, তিনি নিরুপায়। একটা যুক্তিহীন সাবেকী কড়া কানুনের জোরে অর্থহীন ব্যবস্থা বহাল রয়ে গেছে।

কোন লেখকের উক্তি : ডাইলেমার ব্যাপার মশাই! ছাপা হলে টাকা যায়, ছাপা না হলে যায় লেখাটাই। কী বিষম বিপদ বলুন তো!

লেখকদের আপত্তির তালিকা আরও বড় করা যায়। টাকা কম, সময় কম, আলুনি লেখা এ-সব তো আছেই, উপরন্তু বেতার-দপ্তরে যথাসময়ে হাজিরার দায়ও কম অসুবিধাজনক নয়। তাঁদের সুবিধামাফিক সময়ে আগেভাগে রেকর্ড করিয়ে রাখার সুযোগও খুব কম সাহিত্যিকের মেলে।

সবচেয়ে অসম্মানজনক কারণটির উল্লেখ এখনও করিনি। বেতারের অনুষ্ঠানসূচীতে লেখকদের নাম প্রায়শই ছাপা হয় না। বিশেষ করে গল্পকারদের নাম।

একটি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত দিই।

গত ১৯শে এপ্রিল "সাহিত্য বাসরে" যার গল্প পড়ার কথা ছিল সে এই প্রবন্ধের লেখক। "বেতার-জগৎ"-এর পাঠকদের সে-কথা অনুমান করা সম্ভব ছিল না। কেন না, তার নাম ছাপা হয়নি। এবং এই অসম্মানের প্রতিবাদেই সে "স্বরচিত গল্পটি" পাঠ করেনি।

পাঠক ঠাট্টা করে বলতে পারেন, "কেন? আপনি কি নামের এতই কাঙাল!"

বলব, "ঠিক তা নয়। কিন্তু আমি যে-গল্প পড়ছি সে-বিষয়ে বহুর আগ্রহ না থাকুক আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন এবং গুণগ্রাহী বন্ধুবান্ধবের আছে বলে আশা করি। আমার সতীর্থ লেখকদেরও সম্ভবত এইটেই মনের কথা। শুধু 'স্বরচিত গল্প' লেখা থাকলে সেটু খুলতে তাঁদের গরজ হবে কেন?" (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, লেখকের নাম যেখানে অনুক্ত সেখানে 'স্বরচিত গল্প' কথাটি অর্থহীন। বেতার-জগতের সম্পাদককে ভাষা-জ্ঞানে দীক্ষা দেবার ধৃষ্টতা রাখি না, তবু ভবিষ্যতে শব্দ-প্রয়োগের এই ন্যূনতম নিয়মটুকু মানলে তিনিই উপকৃত হবেন। শুনেছি উক্ত রাত্রিতে আমার বদলে রবীন্দ্রনাথের একটি 'স্বরচিত গল্প' দিয়ে প্রোগ্রামের ফাঁক পূরণ করা হয়েছিল।)

নাম এমন নানাক্ষেত্রেই থাকে না। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত', 'রাগপ্রধান' ইত্যাদি দেখেই বেতার-জগতের গ্রাহককে প্রায়শ তৃপ্ত থাকতে হয়। অথচ পত্রিকাটি নগদ মূল্যে ছ'আনায় কেনা। কে গান গাইবেন, কথিকা পড়বেন কে, সাহিত্যবাসরে কার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে তাই যদি জানা না গেল তবে বেতার জগৎ-এর প্রয়োজন কী? সকালে-দুপুরে-সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট কোন্ কোন্ প্রহরে যে অনুষ্ঠানের শুরু এবং শেষ তাতো শ্রোতামাত্রেরই জানা আছে। ফাউ খবর যদি কিছু নাই পাওয়া যাবে তাহলে শ্রোতারা খামখা ফাউ কড়ি গুনবেন কেন?

অন্যান্য শিল্পীদের মান-মর্যাদা রক্ষার ভার তাঁদের হাতে। আমি শুধু লেখকদের কথাই বলব। নাম বাদ যাবার মামুলি কৈফিয়ৎ কী কী তাও জানি। চুক্তিপত্রের একটি নকল লেখকের সই সমেত বেতার অফিসে জমা পড়ে এই নিয়ম। জমা পড়তে প্রায়ই নাকি দেরি হয়ে থাকে। ফলে বেতার-জগতে নাম ছাপান সম্ভব হয় না। (বর্তমান প্রবন্ধের লেখক কিন্তু যথাসময়েই চুক্তিপত্র সই করে পাঠিয়েছিলেন) ব্যতিক্রম একটি-দুটি হলে কথা ছিল না, কিন্তু শিল্পীর নাম ছাপা হওয়াটাই অধুনা ব্যতিক্রম বলে কর্তৃপক্ষের কাছে সরাসরি কয়েকটি প্রশ্ন করছি। চুক্তিপত্র তাঁরা বিলি করেন কবে? ফেরত এলো কি এলো না সেটা খেয়াল হয় কখন? ফেরত না এলে তাঁরা আদৌ তৎপর হন কি?—এবং একথা তাঁরা কি জানেন যে, শিল্পীদের নাম শ্রোতাদের আগেভাগে জানান তাঁদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত?

আর, তাঁদের বক্তব্য যদি এই হয় যে, শিল্পী যিনিই হোন না কেন, বেতারানুষ্ঠান শ্রোতারা শুনবেই তাহলে অবশ্য বলবার কিছুই নেই এবং এই তাচ্ছিল্যের বিরুদ্ধেই আমার প্রতিবাদ। বেতারের বিবেচনায় যথেষ্ট নামী নন এই কারণেই যদি কোন লেখকের নাম কাটা পড়ে তবে অবশ্যই সেই লেখকও পাল্টা প্রশ্ন তুলবেন যে, অনামী লেখককে প্রোগ্রামের চুক্তিপত্র বিলোনই বা

ইংলণ্ডের এক বিশিষ্ট বিবাহ উপদেষ্টা ডাঃ লেনা লেভিন দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিমত ব্যক্ত করেনঃ "অত্যন্ত সুপুরুষ লোক হলেই আদর্শ স্বামী হয় না এবং তার কতকগুলি বিশেষ কারণও আছে।" কারণগুলি হচ্ছে এই;

১। তার খুবই দাম্ভিক হওয়ার সম্ভাবনা।

সাধারণ লোকের কাছে যা, সুদর্শন ব্যক্তির কাছে চেহারা তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাই সে গড়পড়তা লোকের চেয়ে চেহারার পরিচর্যায় এবং পোশাকের ওপর বেশী অর্থ ও সময় ব্যয় করে, যে ব্যাপারটা সাংসারিক হিসেবে টান ধরায়।

২। তার স্ত্রীর মনে কোনদিনই সম্পূর্ণ নিরাপত্তাবোধ থাকে না।

স্ত্রীর পক্ষে কোনমতেই সম্পূর্ণভাবে এবং পুরাদস্তুর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ সম্ভব নয়, পরম নিশ্চিন্ততাবোধও সম্ভব নয়। স্বামী তার একান্ত অনুরক্ত হতে পারে, প্রবঞ্চনার সামান্যতম চিন্তাও তার মনে ঠাঁই না পেতে পারে, কিন্তু অপর স্ত্রীলোকে স্বামীর রূপকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখলে নিরাপত্তাহীনতা বোধ থেকেই যায়।

৩। তার উদ্যমী হওয়ার সম্ভাবনা কম।

জীবনভোর সে তার চেহারা ও সৌন্দর্যের জোরেই কার্যোদ্ধার করে আসে। অপর লোককে সেক্ষেত্রে অনুমোদন অর্জন করতে হয়, লোকপ্রিয় হতে এবং অন্যান্য দিকে উন্নতি করতে কঠিনতর পরিশ্রম করতে হয়। তারা অল্পকালের মধ্যেই যোগ্যতায় সুদর্শন লোকদের ছাপিয়ে যায় এবং উন্নতির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে।

৪। চেহারা সুন্দর হওয়াটা অসুবিধের কারণ হয়।

বহু লোক, তাদের শৈশবের অভিজ্ঞতার কথা মনে করে অতি-সুদর্শন ব্যক্তি অপছন্দ করে। এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সচিব স্পষ্টই বলে ঃ "সুন্দর চেহারার লোককে আমি ঘৃণা করি। আমার কাছে ওরা বিরক্তিকর ঠেকে। কেন জানি না—হয়তো নিজে সুদর্শন নয় বা কোনদিন ছিলাম না বলে।" এই থেকেই বোঝা যায় যে অতি সুদর্শন কোন ব্যক্তির প্রকৃত যোগ্যতা অনুসারে পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকলেও ওপরওয়ালার বিরূপ মনোভাবের জন্যে তাকে সে সুযোগ হারাতে হয়।

ইংলণ্ডের দক্ষিণ কেনসিংটনের বিজ্ঞান-মিউ জিয়ামে কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দেখার সংগে সংগে আবহবিবৃতি শোনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছবিতে ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে রডের সংগে রয়েছে ক্ষুদ্রাকার লাউড স্পীকার। স্পীকারটি কানে লাগিয়ে বিশ মিনিটব্যাপী বিবৃতি শোনা যায়

৫। স্বামীর পাশে স্ত্রীকে ছোট হয়ে থাকতে হয়।

এক মনোবিজ্ঞানীর মতে: "একত্রে থাকলে স্ত্রীকে স্বামীর গৌরবের প্রতিফলনে উজ্জ্বল হতে হয়। লোকের মুগ্ধ-দৃষ্টি ও প্রশংসা বর্ষিত হবে স্বামীর ওপর, স্ত্রীর ওপর নয়। প্রত্যেকে ভাববে যে স্ত্রীর অমন একজন সুদর্শন পুরুষকে বাগিয়ে নেওয়া ভাগ্যের কথা। তুলনায় স্ত্রীকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনবে না কেউ।

৬। সুদর্শন ব্যক্তি অত্যন্ত উ'চু মান আশা করে।

এক বিবাহ-উপদেষ্টা এর কারণ বলেন: "সুপুরুষ লোকে অতি মনোহারিণি সুন্দরীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। ইচ্ছামতো যে কোন মেয়ের সংগে আলাপ করা তার পক্ষে অতি সহজসাধ্য। সেই থেকে তার বিশ্বাস জন্মায় যে সব চেয়ে সেরা সুন্দরীকে সে স্ত্রীরূপে লাভ করতে পারে। এই থেকেই তার মনোভাব এমন হয়ে দাঁড়ায় যা শেষ পর্যন্ত যাকে সে বিয়ে করে তাকে অনেক সময়েই নিদারুণ মর্মপীড়া ভোগ করতে হয়।

৭। সুদর্শন ব্যক্তির দৃষ্টিটা একজনের ওপর নিবদ্ধ না থাকারই সম্ভাবনা বেশী।

রূপের জন্য বিবাহের পূর্বে জনপ্রিয় থাকায় এবং বহু মেয়ের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করায়, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, তার পক্ষে একজনের প্রতি অনুরক্ত থাকা কঠিন হতে পারে। অন্যান্য মহিলা যে তাকে আকর্ষণীয় দেখে এবং উৎসাহিত করে এই ব্যাপারেই তার পক্ষে ফ্লার্ট করা বা তদপেক্ষা জঘন্যতর কিছু করা থেকে নিবৃত্ত হওয়া দ্বিগুণ কষ্টসাধ্য হয়।

কিন্তু তাই বলে, সুদর্শন পুরুষমাত্রেই বদ স্বামী হয় না। তবে কোন মেয়ের পক্ষে আগে থেকেই কি করে সেটা জানা সম্ভব?

বিবাহ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের কাছে এর উত্তর পাওয়া যায়। পুরুষদের আচরণে কতকগুলি লক্ষণ দেখেই আগে থেকে সতর্ক হওয়া যায়। এই লক্ষণগুলি হচ্ছে:

কর্মজীবন ও ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন আলোচনা সে কি পরিহার করে চলতে চায়? আন্তরিক প্রকৃতির যুবকরা ভবিষ্যতে কি নিহিত আছে সে বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহান্বীত এবং অত্যন্ত বিচার বিবেচনা করে সেই মতো পরিকল্পনা করে। ফাঁকা মাথার লোকে হয় কৌতুকপ্রিয় ও খেলার দিকে ঝোঁক হয়।

সব সময়ে কি একাই বেড়াতে ভাল লাগে? যদি তাই হয়, তাহলে এর এই অর্থ হতে পারে যে তার এমন পুরুষ বন্ধু নেই যারা ওকে পছন্দ করে বা তাকে নিয়ে পার্টি করার উৎসাহ অনুভব করে। কোন যুবককে পুরুষদের পছন্দ না হলে সম্ভবত তার চরিত্র সম্পর্কে কতকগুলি অর্থসূচক কারণ থাকে যা বিবাহের পর প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ফিটফাট হয়ে থাকা ব্যাপারে কোন বিঘ্ন ঘটলে কি বিরক্ত হয় সে? ওর সংগে বেড়াতে বেরিয়ে রঙ্গচ্ছলে ওর চুলটা ঘে'টে দিলেও কি বিরক্তি প্রকাশ করে পকেট থেকে চিরুণী বের করে? ওর স্কার্ফ বা টাইটা টেনে দিলেও কি বিরক্তির ভাব প্রকাশ করে আবার ওগুলো ঠিক করে নেয়? যদি তাই হয়, তাহলে সে ব্যক্তি অত্যন্ত দাম্ভিক প্রকৃতির হয় এবং তাকে নিয়ে বিবাহিত জীবন সুখের হবার নয়।

খেলাধূলো বা এমন কোন কাজ যাতে মুখে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেসব কি সে পরিহার করে? মুখে আঁচড়ের দাগ পড়ার আশংকা যাদের তারা ফুটবল, হকি বা শারীরিক আঘাত পেতে পারে এমন সব খেলা থেকে দূরে সরে থাকে।

তার আলাপ-আলোচনা কি মেয়েদের সম্পর্কে গল্পে সিঞ্চিত থাকে? যদি তাই হয়, সেক্ষেত্রে জয় করার প্রলোভনটা তার মধ্যে অত্যন্ত তীব্র এবং সেটা সে অপরের উপস্থিতিতেও চাপা দিতে পারে না।

প্রশ্নগুলির দিকে দৃষ্টি দিন। এক বা দুটি প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হলে তা নিয়ে চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। কিন্তু যদি সব কটি প্রশ্নের উত্তর "হ্যাঁ" হয় তাহলে সতর্ক হওয়া দরকার।

অযাত্রায় জয়যাত্রা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(৬)

শরৎ-শেষের মুক্ত আকাশ থেকে রোদ্দুর ঠিকরে পড়ছে চারিদিকে। সরু পায়ে-হাঁটা পথটা মাঠের মধ্যে দিয়ে একে বেঁকে এসে সেখানে খানিকটা ফলাও হয়ে গিয়ে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকেছে, সেইখানে, একটা কদম গাছের শেকড়ের ওপর ছায়ায় বসে আছি আমি। এখন আমার আলাপে সঙ্গী পল্টু মুসহর। গ্রাম বললাম?...ঠিক গ্রাম নয়, তবে কথাটা ফিরিয়ে নিতে চাই না, বড় মিষ্টি এই শব্দটা। এই রাস্তাটা আরো দুপা এগিয়ে গিয়ে একটা যে কাঁচা সড়কে উঠে গেছে, সেই ত্রিভুজের মাঝখানটিতে গোটাচার বাড়ি, কোনটিতে একটি, কোন-টিতে দুটি ঘর, দুটির বেশি কোনটিতেই নেই। কঞ্চির ওপর কাদা লেপে দেয়াল, খড়ের চাল, সবগুলিতেই সজুমনু (লাউ) আর ঘিউরার (ধুঁধুল) লতা ছেয়ে ফেলেছে। ঘিউরার বড় বড় হলদে রঙের ফুলে সমস্ত জায়গাটা ঝলমল করছে।...... আমায় এখন লক্ষ্ণৌয়ে শাহী পার্কে নিয়ে যেতে চাইলে যাব না।

যতদূর দৃষ্টি যায় সবুজ, সবুজ আর সবুজ। ধানের ক্ষেতের মাঝে মাঝে অন্য গাছ, একটাই, বা গোটা তিন চার এক সঙ্গে, একে-বারে দূরে দিকচক্রে এখানে ওখানে বোধ হয় ওগুলো আম বাগান। সমস্তটুকুর ওপর ঘন-নীল আকাশ—যেন বুকের মধ্যে নিয়ে আগলে রয়েছে সবগুলোকে।

ধানের এমন রূপ দেখিনি আগে। সরু রাস্তাটুকু দিয়ে আসতে দুদিক থেকে গায়ে এসে পড়ছে। অন্নরূপা জননীর যেন হাত বুলিয়ে-দেওয়া গায়ে। সমুদ্রমন্থনে যে লক্ষ্মী উঠেছেন তাঁকে আমি প্রত্যক্ষ করছি এখানে। ঋতুতে ঋতুতে তাঁর নিত্য উদয় চলছে—আজ এখানে, কাল অন্যত্র, ঋতচক্রের জগদ্ব্যাপী নিত্য আবর্তনে। এই দিগন্ত-প্রসার হরিৎ-সমুদ্র ভেদ করে উঠছেন, মা। মাথায় ওটা স্বর্ণমুকুট, মায়ের মাথার স্বর্ণ-মুকুট সে তো সোনার ফসলেই হবে। নিরর্থক ধাতু-স্বর্ণের মুকুট—সে অন্য কোন দেবতা মাথায় দিন।

আমি নাকি পঞ্জিকা-বিরুদ্ধ অযাত্রায় বেরিয়েছি? তাহলে আকাশ জোড়া এই শোভাযাত্রার মাঝে এসে পড়লাম কি করে? এত ভুলের মধ্যে দিয়ে, এত ঘোরা পথে, এত লজ্জা-সঙ্কোচ-বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়ে?

থাক ওসব কথা, কিছু বোঝা যায় না। যাত্রা হয়ে উঠছে অযাত্রা, অযাত্রা হয়ে উঠছে যাত্রা—এই তো দেখে এলাম সারা জীবন ধরে।

একটু গোড়া থেকেই বলি। গল্পের মধ্যে তখন—বাবু বলে উঠলেন—"সে সব বড় ইন্টারেস্টিং কাহিনী ও'র। কিন্তু আমার আসল কথাটিরই জবাব পাই নি এখনও। এখানে আপনি হঠাৎ যে!"

যে মিথ্যেটা চালিয়ে এসেছি এ পর্যন্ত, ভুলের লজ্জা চাপা দেওয়ার জন্যে, সেটা এ'র কাছেও চালানো ঠিক হবে কিনা ভেবে সেকেন্ড কয়েক দ্বিধাগ্রস্থ থেকে একটু হেসে বললাম—"আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার সৌভাগ্যটা আজ কপালে লেখা ছিল নিতান্ত।"

"সেটা আমার সৌভাগ্য নিশ্চয়, কিন্তু আপনার কি করে হতে পারে, বুঝছি না তো মুকুর্জিবাবু......তবু বলুন, যদি কিছু সেবা হয় আমার দ্বারা।"

"সেবা নয়। তবে অনুগ্রহ একটা করতে পারেন আপাতত—টিকিট না চেয়ে। আপনার স্টেশনে অনাধিকার প্রবেশ করেছি আজ।"

পকেটে হাত দিয়ে টিকিট বের করে হাতে দিলাম। দেখে নিয়ে বললেন—"পাটনা!—মজঃফরপুরে গাড়ি গোলমাল করে ফেলেছেন নিশ্চয়—কিম্বা সমস্তি-পুরেই। এইরকম হচ্ছে, হঠাৎ গাড়ির কতগুলো রদবদল করে—প্রায়ই এসে নামছে দু একজন করে।"

আমি যে ঠিক তাদের দলের নয়, এখানে না এসে পড়বার যথেষ্ট সুযোগ নিজের দোষেই নষ্ট করেছি সেটা আর ভাঙলাম না। থাক না কথাটা ও'র কাছে ঐভাবেই। প্রতিবেশী মানুষ, একেবারে দ্বারভাঙ্গা পর্যন্ত চারিয়ে দেওয়ার দরকার কি?

বললাম—"দেখুন না, দুর্ভোগ। আমার পাটনা যাওয়ার গাড়িটা এই সন্ধ্যের সময়ই মজঃফরপুর থেকে ছেড়ে যাবে। ওটা

ধরবার আর উপায় নেই বোধ হয়।কিছু?"

চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, বললেন—"দেখছি না তো কিছু আপাতত। ক্যালক্যাটা প্যাসেঞ্জারটা ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়ে গেছে। আর তো......"

আমার মনে পড়ে গেল হঠাৎ। প্রশ্ন করলাম—"মালগাড়ী নেই কোন তার আগে—শুনেছি ফার্স্টক্লাসের ভাড়া দিয়ে যাওয়া যায় তাতে, গার্ডের সঙ্গে।"

এতক্ষণ ভুলে ছিলাম ওদিকটা, আবার মনটা বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ভাবছিলেনই অন্যমনস্ক হয়ে—বললেন, "সেই কথাই ভাবছি। গেলে অবশ্য ভাড়ার কথা ওঠে না, ব্যবস্থা হয়েই যায়। কিন্তু কোন ইন্টিমেশন তো নেই মালগাড়ীর। দাঁড়ান দেখি খোঁজ নিয়ে।"

টেলিফোনটা তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার রেখে দিয়ে বললেন—থাক, হয়েছে, কেন যে মনে পড়ছিল না।—আপনি বাই রোড চলে যান না। রেলের পাশেপাশে গেছেই রাস্তাটা।

শিউরে উঠেই বললাম—"কিন্তু সে তো অন্তত ন'মাইল হবে!"

"না না, হে'টে নয়।"—একটু হেসে বললেন—"হে'টে যাওয়ার কথা বলব?—এমন কি তেপান্তরে পড়েছেন? মোতিহারী-মজঃফরপুর বাস সার্ভিস রয়েছে, আপনি বেরিয়ে পড়ুন।"

"বাসটা কখন?"—প্রশ্ন করলাম আমি।

আন্দাজ করে নিয়ে বললেন—"এই সময় একটা ছিলো। হয়তো বেরিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তাড়াহুড়োর দরকার কি? রোদটা বড় কড়াও। আপনি ধীরে-সুস্থেই চলে যান। আধঘন্টা লাগে, পরেরটাতে গেলেও আপনি পাটনা গাড়ির জন্যে যথেষ্ট মার্জিন পাবেন।

একটা খালাসি দিলেন, সুটকেস, বেডিং, জলের কুঁজা আর ব্যাগটা নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আসবার সময় রুক্মিনী দেবীর কাছে বিদায় নিয়ে এলাম।

একটু আটকে নিলেন উনি, বুঝলাম মৈথিল ভাষা আরও খানিকটা চালাবার জন্যেই।......ও, তাই নাকি?—গাড়ি ভুল করে চলে এসেছেন! গেরো!......তা এখন যাচ্ছেন কোথায়?...বাসে করে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে? যায় নাকি পাওয়া বাস? কৈ আমায় বললেন না তো আপনি? পাহুন।"

—বাবু বললেন—"অনেকটা পথ বড়কী বহীন, তায় কড়া রোদ।—"

"শুনুন কথা ও'র বাঙালীবাবু! আমি মা-জানকীর দেশের মেয়ে, পথ চলতে কাতর হব!—যেতামই, তবে মুনীম যে এখনও এলেন না।—আহা, চমৎকার সাথী পাওয়া গিয়েছিল—দেশের মানুষ—"

মুখের দিকে একটু যেন ব্যথিত দৃষ্টিতেই চেয়ে রইলেন—দীর্ঘপথের আলাপ, মৈথিলীতে যেন কত বড়ই না একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল।

বললাম—"আচ্ছা নমস্তে, তাহলে আসি।"

একটু যেন চকিত হয়েই বলে উঠলেন—"হাঁ, আসুন, নমস্তে।"

সেই বেরিয়েছি স্টেশন ছেড়ে, তারপর ধানের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে প্রায় মাইলটাক এসে এখানেই আটকে পড়েছি। ঠিক যে ক্লান্তি তা বলব না। খাবার দেখলে ভরা-পেটেও একধরনের ক্ষিদে এসে পড়ে না? এও কতকটা তাই

তুমি বলবে সেরকম ক্ষিদে যে নেহাতই সেইরকম ঔদরিক, তারই আসে। খুব খাঁটি কথা। এবং আমার মনটাও এইরকম একটি ঔদরিকই, এইরকম খোরাকের সন্ধান পেলে পাগল করে ঘুরিয়ে মারে আমাকে। আর এটা তো জানো, দেহের উদরের চেয়ে মনের উদর অনেক বড়, চায়-ই না অল্পে ভরতে। স্টেশন ছেড়েই পেয়েছে যথেষ্ট খোরাক। শারদাকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে সে একরকম ভুরিভোজনই, ভরে যাওয়ার কথা উদরের; কিন্তু এই ছটাকখানেক ডোবার জলে হ্যালা ফুলের হুড়োহুড়ি, চারখানি ঘর নিয়ে এই গ্রাম (কে যেন খেলা-ঘরই পেতে বসেছে), আর, সব ঘরের চালে ধ'ধুলে ফুলের হলুদে উৎসব, সব মিলে এ যেন পেটুকের কাছে নতুন নিমন্ত্রণের ডাক। কদম্বের ছায়া পেয়ে ক্লান্তি এল, কি নতুন নিমন্ত্রণে নতুন করে ক্ষিদের উদ্রেক, তা ঠিক কি করে বলি? দুই যেন গেছে মিশে।

আর কি ক'রে বোঝাই বা তোমায়?

কোথায় বসে পড়ছ আমার এ চিঠি তুমি? তোমার আফিসের সিলিং পাখার নীচে: টেবিল, চেয়ার, ফাইলের ভিড়ের মধ্যে একটু সময় চুরি করে?...কিংবা তোমাদের বিডন রো'র সেই মেসের নীচের চাপ ঘরটিতে? পাশেই কলের জলের কলরবের সঙ্গে বাসন মাজার ঝনঝন...

হয়তো বা সন্ধ্যার মুখে তোমাদের হেদো পার্কেই গিয়ে পড়ছ এইখানটা। ওর নতুন নাম হয়েছে নাকি আজাদ হিন্দ বাগ। আহা, ঐটুকু নিয়েই কত আমোদ-আহ্লাদ, নামেরই কত রদবদল, তাই নিয়ে কর্পোরেশনে কত কাটাকাটি ভোটাভুটি! আহা, অপুত্রকের রোগা ছেলে, নামের চাপেই সারা হলো! পার্কে তো এদিকে ঘাসের চেয়ে বেঞ্চি বেশি, বেঞ্চির চেয়ে তার খদ্দের বেশি; সেখানে জলের চেয়ে সাঁতারু বেশি, সাঁতারের চেয়ে তার হুল্লোড় বেশি। তা হেদোই হোক বা নতুন নামেই হোক, সেখানে বসেই বা কি করে বুঝবে, এখানে অল্প আয়োজনে এ কি রাজভোগ!...আসল কথা কি জান? সৃষ্টির আদি থেকেই আমরা এত রাজা-রাজা করে মরলাম, এতদিন ঘর করলাম রাজার সঙ্গে, শেষে রাজার পাট উঠেই যেতে বসেছে, তবু কিন্তু আসল রাজা যে তখ্‌ৎ-তাউস ছেড়ে ঘাসের আসন বিছিয়েই কোথাও আছেন বসে এ খবরটা আজ পর্যন্ত পেলাম না। হয়তো ঐ জন্যেই, আসল ছেড়ে নকলের সঙ্গেই কাটিয়ে দিলাম তো সমস্ত দিন।

গাছতলায় দাঁড়িয়ে পড়ে খালাসীটাকে বললাম—"একটু জিরিয়ে নেব ভাবছি অনেকখানি এলাম রোদে। আর আছে কতদূর?"

একটু কি যেন ভেবে নিয়ে বলল—"তা এখনও ক্রোশটাক আছে হুজুর। কিছু বেশিই বরং।"

"তাহলে বসেই যাই একটু। তুইও ওগুলো নামিয়ে একটু জিরিয়ে নে।"

এগিয়ে ওকে সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম, জিভ কেটে দু পা পেছিয়ে গিয়ে বলল—"সে কি হয় বাবু? আপনি শরিফ লোক, বড়াবাবুর দোস্ত্‌......আমি লোক ডাকছি।"

"পলটু হো! বাড়-অ ঘড়মে?"
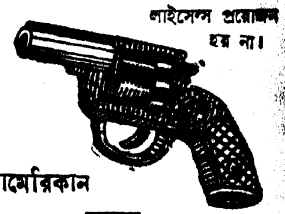
পলটু বেরিয়ে এল একেবারে শেষের ...র মধ্যে থেকে। বেশ বিস্মিতই। ...সী তাকে নামিয়ে দিতে বলল বোঝাটা। ...া ডাকলেও পারত: এমন কিছু ভারি ... নামিয়ে কিন্তু গামছাটা দিয়ে এত ঘটা ... গা হাত ঝাড়তে লাগল, এত ঘটা করে ...নো মুখের ঘাম মুছতে লাগল যে, ...য় বলতেই হলো—"তোরও দেখছি বেশ ...ন্ত হয়েছে, একটা লোক পেলে না হয় ...ই দিতাম তোকে। এ যেতে পারবে

"খুব পারবে বাবু, এটুকু বোঝা, এ তো ওর জলপান।"—একেবারে এতটা উৎসাহিত হয়ে কেন উঠল সেটা ওর পরের কথাতেই টের পেলাম, বলল—"আর একেও কিছু দিতে হবে না আপনাকে। পলটু হচ্ছে ইস্টিশনের ঠিকে খালাসী, বেশি মালটাল এলে নামাতে যায়।"

ওর দিকে চোখ বড় ক'রে চেয়ে বলল—"দেখিয় হো।......হুঁ!"

অর্থাৎ দেখো যেন লোভে পড়ে যেয়ো না।

গা-ঝাড়া দিয়ে ওকে গছিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যটা টের পাওয়া গেল। 'বড়াবাবু'র দোস্ত আমি, আমার কাছে ওরও লোভ করবার কিছু নেই, মোট পৌঁছে খালি হাতেই ফিরে যেতে হবে যখন, তখন আর এত মায়া কেন?

পলটুকে আর একবার হুঁশিয়ার করে দিয়ে স্টেশনের দিকে পা বাড়াতেই ডাকলাম—"শোন।"

ঘুরে দাঁড়াতেই পকেট থেকে একটা এক-টাকার নোট বের করে বাড়িয়ে ধরলাম, বললাম—"তোমার বকশিশ।"

আমার এইরকম দুষ্টবুদ্ধি মাঝে মাঝে উদয় হয় মাথায়। একটু অর্থদণ্ড লাগে, কিন্তু মনটা একটু হাসির খোরাক পায়।... টাকা পেয়ে এরকম মুখ শুকিয়ে যেতে এর আগে দেখিনি আমি।

মনে করছ স্টেশনমাস্টারের ভয়ে? মোটেই নয়। একবার যেন চেষ্টা সত্ত্বেও ওর দৃষ্টিটা সামনে বহু দূরে গিয়ে পড়ল—যেখানে নাকি বাসটা এসে দাঁড়ায়, হয়তো চেষ্টা সত্ত্বেও একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস পড়ল, তারপর নোটসুদ্ধ হাতটা কপালে ঠেকিয়ে, ঝুঁকে একটা সেলাম করে মন্থর পদে চলে গেল।

—কী ভুলটাই হয়ে গেছে ঐরকম বোকামি ক'রে মোট গছিয়ে দিয়ে পলটুকে। ঐ একটা টাকা অন্তত দুটো তো হতে পারতই মোট পৌঁছে বাসে তুলে দিলে!

পলটুকে প্রশ্ন করলাম—"কতটা হবে এখান থেকে—"বাস যেখানটায় দাঁড়ায়?"

পলটু জানাল—পোয়াটাক পথও হবে না, ঐ যে আমবাগানটা দেখা যাচ্ছে ওটা পেরিয়েই বড় সড়কের চৌমাথা, বাস এসে সেখানেই দাঁড়ায়।"

"ঠিক তো? ও তবে যে বললে ক্রোশ-খানেকেরও বেশি?"

"যাওয়ার ভয়ে হুজুর। আপনি যতটা এসেছেন ততখানিও আর হবে না। ও বেজায় ধড়িবাজ, জানে আমার কোমরে ব্যথা, তবুও দেখুন না......"

"যেতে পারবি না তুই?"—ভীতভাবেই প্রশ্ন করলাম।

"সে কি কথা! জান লাগিয়ে দেব হুজুরের কাজে; কোমরে ব্যথা, সে তো তুচ্ছ। আমি তাহলে তাড়াতাড়ি একটু তেল মালিশ করে নিই হুজুর রমিয়াকে দিয়ে। ......গে রমিয়া!"—বলে একটা হাঁক দিয়ে বাঁ হাতে কোমরটা টিপে একটু ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে ঘরের দিকে এগুল।

কিন্তু বেশ লক্ষ্য করেছি যখন বেরুল বাড়ি থেকে তখন মোটেই ন্যাংচাচ্ছিল না। ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হলে না, শাঁসাল খদ্দের দেখে দর বাড়াচ্ছে। বললাম—"তাহলে না হয় থাক পলটু। আমি বরং এই

লোকটাকে ডেকে নিচ্ছি, হাতের কাছেই যখন জুটে গেল।......এই, শুনো!"

একটা চাষাভুষো গোছেরই লোক যাচ্ছিল, হাঁক দিলাম।

পলটু কোমর থেকে হাতটা ঝট করে সরিয়ে নিয়ে একেবারে সোজা হয়ে ঘুরে চাইল, যদিচ একটু যেন চেষ্টা করেই। লোকটা আমার ডাকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, আগে তাকেই নিরস্ত করল, বলল—"কুছো নই, তু যা যাঁহা যা তাড়-অ।"—অর্থাৎ কিছু নয়, যেথায় যাচ্ছিলি যা।

তারপর মুখে অল্প একটু হাসি নিয়েই এগিয়ে আসতে আসতে (শেষ রক্ষার জন্য বার দুই মাত্র নেংচে নিয়ে) বলল—"হুজুর আপনি ডাগদর, না, উকিল, না দারোগা?" —ওরা বাঙালী মাত্রকেই এই ত্রিমূর্তিতে জানে কি না।

বললাম—"আমি ও তিনের একটাও নয়। কেন বলো তো?"

"ডাগদর হলে একটা ওষুধ দিতেন আমায়। অদ্ভুত রোগ তো। এই আছে, একেবারে পাশ ফিরতে দিচ্ছে না; পরের মুহূর্তেই একেবারে সাফ্, কিচ্ছু নেই, যেন কার কোমরে ব্যথা হয়েছিল! ......এই দেখুন না।"

আরও সোজা হয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে।

দেখছি ধূর্তের পীঠস্থানে এসে পড়েছি একেবারে! পয়েণ্টস্‌ম্যান, তারপর এই।

মনে মনে হেসে বললাম—"ডাক্তার না হলেও একটা মন্তর জানি যাতে এই রকম সব রোগ সঙ্গে সঙ্গে সেরে যায়। আর একটুও আছে বলে মনে হয়?"

"রত্তিভরও নয়। এই দেখুন না।"

—হাত দুটো চিতিয়ে বার দুই ডাইনে বাঁয়ে কোমরটা দুলিয়ে আর একটু বড় করে হেসেই দাঁড়িয়ে রইল। আমিও আশ্চর্য হয়েই হাসলাম। মনে মনে বললাম, এবার কেসটা দারোগা বা উকিলের হাতে তুলে দিলে হত।

"তাহলে নিয়ে নিই এগুলো হুজুর? উঠবেন?"—

এগিয়ে যাচ্ছিল, বললাম—"একটু বসা যায় না? তোর এই জায়গাটায় কী যে আছে, লাগছে বড় ভালো। বাসটা কি এক্ষুনি আসবে?"

নিশ্চয় ভালো লাগবার মতো কি আছে আবিষ্কার করবার জন্যে একবার চারিদিকটায় চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর হাত চারেক তফাতে উবু হয়ে বসতে বসতে বলল —"বাসেরও এখন দেরি আছে, এই খানিক আগে একটা বেরিয়ে গেল তো। হুজুর যাবেন কোথায়?"

"মজঃফরপুর।"

"দেরি আছে।"—ঘাস-জমিটুকু গামছা দিয়ে ঝেড়ে নিয়ে ভালো করে চেপেই বসল

পলটু, বলল—"এ জায়গা ভালো না লেগে তো উপায় নেই হুজুর। কী যে আছে এর মধ্যে আমরা তো বুঝব না, বুঝেছেন যিনি আমার পরদাদা। তাই তো এর মায়া এখনও ছাড়তে পারেন নি।"

"তোর পরদাদা বেঁচে সে এখনও!"—বলে বিস্মিতভাবে চাইলাম। পলটুর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। পরদাদা হচ্ছে বাপের ঠাকুরদাদা। টলস্টয়ের সেই গল্পটার কথা মনে করিয়ে দেয় যে—'এ গ্রেন অ্যাজ বিগ্ অ্যাজ এ হেন্স্ এগ্ পড়েছে?

—রাজার কাছে মুরগীর ডিমের মতো একটা বস্তু এনে হাজির করা হয়েছে, মাঝখানটাতে একটা খাঁজ, কেউ কিন্তু তার হদিস বাতলাতে পারছে না। যত বিজ্ঞ ও পণ্ডিতদের একত্র করা হলো, তারা পণ্ডিত এবং বিজ্ঞের মতো শুধু মাথা নাড়ল, অর্থাৎ জানে না, তবু এইটুকু জানাতে পারল যে এটা ক্ষেত্রজাত কোন শস্য ফল। শেষে বলল, কোনও অভিজ্ঞ প্রাচীন কৃষককে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তো বোধ হয় বলতে পারে।

খুঁজেপেতে আনা হলো একজন এই রকম লোককে। বয়সের ভারে একেবারে নুয়ে পড়েছে, একেবারে পলিত-দন্ত, দু'-বগলে দুটো লাঠির (Crutches) ওপর ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল। দৃষ্টি-শক্তিও একেবারেই গেছে, হাতে ফলটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আন্দাজ করে বলল—"না, মহারাজ, এরকম শস্য আমি ক্ষেতে আজ্জাইনি কখনও, হাটে-বাজারেও কিনিনি। আমি যা আজ্জেছি, কিনেছি তা এখনকার মতনই। আপনি আমার বাবাকে যদি ডেকে পাঠান তিনি হয়তো কিছু সন্ধান দিতে পারেন।"

তার বাবাকে ডেকে আনা হল।

একটা লাঠির ভারেই অনেকটা সোজা চালেই এল এ লোকটা। দৃষ্টি মোটামুটি ভালোই আছে, শুধু কানটার তত জুত নেই।

শস্যটা হাতে নিয়ে বেশ ভালোভাবেই পরীক্ষা করে বলল—"না মহারাজ, এ শস্য আমিও কখনও দেখিনি; ক্ষেতেও আজ্জাইনি। কেনার কথা বলতে গেলে—কেনার পাটই ছিল না আমাদের সময়, সবাই নিজের নিজের খাদ্য উৎপাদন করে নিত। সে সময়ে আজকালকার চেয়ে বড় শস্য হত, তা থেকে আটাও বেশি পাওয়া যেত, কিন্তু এ ধরনের কিছু দেখিনি আমি। আপনি এক কাজ করুন আমার বাবাকে ডাকিয়ে আনুন, তিনি বোধ হয় এ সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বলতে পারেন।"

ঠাকুরদাদা এল দিব্যি সিধা চালেই হাঁটতে হাঁটতে, লাঠির বালাই-ই নেই। পরিষ্কার সতেজ চাউনি, খাসা কান, পরিষ্কার উচ্চারণ। শক্ত সাজানো দাঁত দিয়ে শস্যটার একটুকরা কামড়ে নিয়ে বলল—"বাঃ, এ তো দেখছি আমাদের সময়েরই সেই গম।"

রাজার প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুরদাদা জানাল—তাদের সময় নিজের বলে কোন জমি ছিল না, সমস্ত পৃথিবীটাই ছিল পরমপিতা ভগবানের—তাঁর যে ছেলে যতখানি আবাদ করতে পারল ততখানি তার। বেচা-কেনা বলে কোন জিনিসই ছিল না। প্রচুর মেহনত, পুষ্ট এবং প্রচুর খাদ্য, মানুষ নিজের আইনের বেড়া না তুলে ভগবানের আইন অনুযায়ীই জীবনযাপন করত, কাজেই ঠাকুরদাদা এত মজবুত এখনও। ক্রমে ক্রমে ওদিকে যেমন সব উল্টে গেছে, তেমনি এদিকেও দাঁড়িয়েছে অবস্থা—ঠাকুরদাদার চেয়ে বাপ বুড়ো, বাপের চেয়ে ছেলে।

পলটুর আবার ঠাকুরদাদার নয়, পরদাদা, আরও এক পুরুষ ওপরে। টলস্টয়ের গল্পের নীতি-সূত্র ধরে লোকটাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে তো হওয়ার কথাও, আমি এই পরিবেশের মধ্যে যেটুকু পেয়ে মুগ্ধ হলাম, যাত্রাপথে খানিকটা আটকে যেতে হলো, তার কত বেশি না পেয়েছে সে যার জন্যে চার পুরুষ ধরে জায়গাটার মায়া ছাড়তে পারছে না; পাঁচ পুরুষই বলি, পলটুরও তো সন্তান আছে।

বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলাম—"তোর পরদাদা! বেঁচে সে এখনও!"

"আমার বয়স দু' কুড়ি সাত সাল বাবু। আমার পরদাদার বয়েস তাহলে কত হতে পারে?......বেঁচে থাকবেন?"

বললাম—"তা কোন না এক শ সোয়া শ' হবে?"

"এখন, বাঁচা দু রকম হয় বাবু। এই তো আমিও বেঁচে আছি। ঐ দুখানি ঘর, একটি মেয়ে, সাত সালের; একটি নেন্হা (ছেলে) পাঁচ সালও হয়নি। মেহরারু (বউ) আর আমি কুড়িয়ে বাড়িয়ে আনবার চেষ্টা করছি উদয়াস্ত, কোন রকমে একমুঠো যদি জোটে। এও তো একরকম বাঁচাই। তা আমার পরদাদা এমন কি পাপ করেছিলেন যে এ ধরনের বাঁচা বাঁচতে যাবেন এই সওয়া শ' বছর ধরে?"

আমি প্রশ্ন করলাম—"তাহলে?"

"ঐ বাড়িটা দেখুন বাবু, ঐ যে অনেক দূরে সাদা দো-মহল্লা বাড়ি।"

"সে ইয়ে, তিনি ঐ বাড়িতে থাকেন!"

—ভাষাটাকে তাড়াতাড়ি সম্ভ্রান্ত করে নিতে হল। উত্তরে, অনেক দূরে একটা টানা দোতলা বাড়ির ঊর্ধ্বাংশটা একটা আম-বাগানের মাথার ওপরে রোদ ঝকঝক করছে; ঢেউ খেলানো কার্নিস, একদিকে একটা উঁচু চিলে ঘর। সম্ভ্রান্ত বাড়ি; ওখানে রাজার হালে থাকে কেউ যদি এক শ সওয়া শ বছর পর্যন্ত মৃত্যুকে এড়িয়ে যায়, তো তেমন আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই! কিন্তু......

অপেক্ষাই করছিল পলটু; মুখের দিকে চাইতে বললে—"ও বাড়িটা আমার পরদাদা না-মঞ্জুর করেছিলেন বাবু, অর্থাৎ নিতেই চাইলেন না। আমার পরদাদার নাম ছিল জীবন মুশহর।"

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। প্রশ্ন করলাম—"নিতেই চাইলেন না? কার কাছ থেকে? কে দিতে চেয়েছিল তাঁকে?"

"তাহলে সবটাই শুনতে হয় আপনাকে।" (ক্রমশ

। পত্রাবলী ।

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১৪১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

শুক্রবারে বিকেলে গিয়ে পোঁছব—তার অনতিকাল পরেই বক্তৃতাসভায় হাজির হতে হবে। সেখান থেকে ফেরবার পথে আশা করি ক্ষণকালের জন্যে তোমাকে দেখে আসতে পারব। চিঠির চেয়ে চিঠি লেখকের সাক্ষাৎ আবির্ভাব যে সব সময়ে বেশি মূল্যবান তা নয়—চিঠিখানা যত্ন করে রাখলে দুদিন থাকে, কিন্তু সাক্ষাৎ দর্শনের মেয়াদ ক্ষণস্থায়ী। যাকে বলে পাওয়া-থোওয়া সেটা চিঠিতেই আছে—আর সাক্ষাতে আছে শুধু দেখা-শোনা—শেষের দুটোকে রাখবার জো নেই। কিন্তু কী করব বল—কাজ পড়েচে, কলকাতায় যেতেই হবে। অতএব শুক্রবারে চিঠির আশা কোরো না।

কাল তোমাকে ফুলের নাম সম্বন্ধে যে আক্ষেপ জানিয়েছিলুম তার মূলে একটুখানি ইতিহাস আছে। আমাদের উদয়নের কঙ্করবীথির দুই প্রান্তে দুই সার গাছ সম্বৎসর অজস্র সাদা ফুলের দাক্ষিণ্যে দৃষ্টির অঞ্জলি কোনোদিন রিক্ত হতে দেয় না। তার নাম জানতে চাই, একটা বিশেষ নাম, জিজ্ঞাসা করাতে একজন পূর্ববঙ্গীয় বললে গুড়িটগর, একজন অপূর্ববঙ্গীয় বললে কাঠটগর। অর্থাৎ অবজ্ঞা প্রকাশ করা হোলো ওটা টগর-শ্রেণীয়, ক্ষুদে টগর। ওর মর্যাদা স্বীকার করলে না। এমন করে টগরকেই সমস্ত সম্মান দিলে টগরের উপরে রাগ ধরে—তাকেই খাটো করবার ইচ্ছা হয়। এই দুটি ফুলের মধ্যে চেহারার বিশেষ প্রভেদ—একটা হচ্চে বহু পাপড়ির আবর্ত, আর একটি হচ্চে পাঁচটি পাপড়ির চক্র। এই শেষোক্তটি আয়তনে অপেক্ষাকৃত ছোট—কিন্তু সংঘ মাহাত্ম্যে বাগানের অধিকাংশ বড়ো বড়ো ফুলকে ছাড়িয়ে যায়। আমি আর থাকতে পারলুম না, এর একটা স্বতন্ত্র নাম দিয়েচি, মহাশ্বেতা। আশা করি যারা ফুলের অন্যায় অপমান সইতে পারে না তারা এ নামটা গ্রহণ করবে। কাঠটগর নামে উদাসীন চিত্তের কুঁড়েমি প্রকাশ পায়। যেমন কাঠবেড়ালী নাম। ঐ জন্তুটিকে বিড়াল শ্রেণীভুক্ত করবার কোনোই কারণ দেখা যায় না। বিড়ালের সঙ্গে ওর না আকৃতির না প্রকৃতির মিল আছে। অযত্নে কোনোমতে কাজ সেরে দেবার জন্য যা মুখে এল তাই বলে দিলে। ঐ "কাঠ" বিশেষণটা দিয়ে ত্রুটি মার্জনা দাবি করবার অধিকার রেখে দিলে। বুঝলে না ঐ বিশেষণটা দ্বারা এই প্রাণীটির পরিচয়ের প্রতি দ্বিগুণ অত্যাচার করা হয়েছে। বাংলা দেশের একটি নদীর নাম আছে হুড়োসাগর। বাঙালীর কাছে সে কী অপরাধ করেচে জানিনে। "সাগর" আখ্যাটাই "হুড়ো" বিশেষণের দ্বারায় অসম্ভব রকম অপমানিত হয়েচে। যদি "হুড়ো ডোবা" নাম দেওয়া হোতো তাহলে এতটা শোচনীয় হোতো না। ফুলটির পরে টগরের আভিজাত্য আরোপ করে পর মুহূর্তেই "কাঠ" বিশেষণের দ্বারা তার মাথা হেঁট করে দেবার কী দরকার ছিলো? আজ মধ্যাহ্নে একটা থেকে রিহার্সাল—আর পাঁচ মিনিট বাকি আছে।—এইবেলা চিঠি বন্ধ করি। ইতি ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি ভুল করে ১৭ই লিখেছেন। ওটা ১৮ই সেপ্টেম্বর হবে।

॥ ১৪২ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

কবি Mathew Arnold-এর কবিতার একটি অংশ আমার অত্যন্ত ভালো লাগে—সেইটি আজ তোমাকে কপি করে পাঠাই :—

Balm soul of all things, make it mine,
To feel amid the city's jar,
That there abides a peace of thine,
Man did not make and cannot mar.
The will to neither strive nor cry,
The power to feel with others give;
Balm, calm me more, nor let me die
Before I have begun to live.
Before I have begun to live.

নিজেকে সহজে সমস্তের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বিশ্বের গভীরতার মধ্যে আসন গ্রহণ করা এই সাধনাতেই অমৃতের স্পর্শ করা যায়। খণ্ডের মধ্যেই যত কিছু দ্বন্দ্ব, সেইখানেই পাওয়া-হারানোর বিরোধ,—অখণ্ডের মধ্যে চির পর্যাপ্ত, সেইখানে সমস্ত মনকে যখন স্তব্ধ করা যায়, তখন তার সমস্ত তুচ্ছ আবদারের কলরোল থেমে গিয়ে সে অনির্বচনীয় বিশ্বসত্যের সাড়া পায়। একথা অত্যন্ত পুরোনো, কিন্তু তবু এ কোনো কালেই পুরোনো হতে পারে না। সমুদ্রে মেলবার আবেগ নদীর যেমন কোনোদিনই শেষ হয় না—এই পরমলোকে পোঁছবার প্রার্থনাও মানুষের কোনোদিন থামবে না। মৃত্যু হতে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও এই চিরন্তন প্রার্থনাই ম্যাথিউ আর্নল্ড তাঁর ভাষায় বলেচেন। অমৃত মানেই হচ্চে নিখিল প্রাণের সঙ্গে প্রাণকে যোগের দ্বারা সম্মিলিত করা, বিশ্বসত্যের মধ্যে নিজেকে সত্যরূপে উপলব্ধিই হচ্চে অসত্য থেকে সত্যে উত্তীর্ণ হওয়া—তারই মধ্যে সুগভীর শান্তি। ইতি—১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুধাকান্ত তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখেচে—বলচে শুনানীর দিন নিকটবর্তী।

॥ ১৪৩ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আমার কেমন মনে হয় আমি আবার যেন পৃথিবীর খুব কাছে এসেচি। যেমন কাছে ছিলুম ছেলে বেলায়। মন তখন আপন চিন্তার জগৎ তৈরি করতে এত অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল না—সেইজন্যে বাইরের সঙ্গে আমার যোগ অত্যন্ত সহজ ছিল। সেই সঙ্গে আমার অনুভব করবার শক্তি ছিল সজীব। তাই আমি ছিলুম আমার চারিদিকে—ঘরের লোকের যেমন ঘরের কোনো জায়গায় যাবার বাধা থাকে না, এই বাইরের পৃথিবীতে আমার যেন সেই রকম অধিকার ছিল। এই অবস্থার সঙ্গে কাব্য রচনার

সামঞ্জস্য আছে—যে কথাটা শোনা যায় তারি জবাব দেওয়ার জন্যে। কিন্তু মন যখন নিজের কাজ নিয়ে উঠে পড়ে লাগে তখন সে আর ছুটি দিতে চায় না—তার দাবি প্রতিদিন বেড়ে উঠতে থাকে, তার সমস্যা কঠিন। সেই সমস্যা নিয়ে অনেক দিন নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলুম। আমার মুশকিল এই যে, আমার কাছে ভাবের দাবি এবং চিন্তার দাবি দুইই খুব প্রবল। আমি ভালো করে চেয়ে দেখার সুখ পাই, ভালো করে ভেবে না দেখেও থাকতে পারি নে। যেমন আমার চেয়ে দেখাকে কাজে লাগিয়েছি সাহিত্যে, তেমনি আমার ভেবে দেখাকেও কাজে লাগিয়েছি নানা প্রতিষ্ঠানে। এমনি করে অনেক দিন চলে আসছিল। কিন্তু চিন্তার শাসনটাই উঠছিল সব চেয়ে জবরদস্ত হয়ে—অন্তরে বাহিরে তার কর্মের তাগিদ নানা শাখা প্রশাখায় আমার সমস্ত অবকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। জগতে সবাই অবকাশের অধিকার নিয়ে আসে না—অনেকেরই পক্ষে অবকাশটা শূন্যতা—আমি কিন্তু শিশুকাল থেকেই বিধাতার কাছ থেকে আমার সব চেয়ে বড় দান পেয়েছি এই অবকাশের দান। আর একবার এখান থেকে বিদায় নেবার আগে অবকাশের পশ্চিম দিগন্তে রঙের খেলা খেলিয়ে তার পরে অস্ত সমুদ্রে ডুব দিতে ইচ্ছে করে। খ্যাতির বোঝা ঘাড়ে চেপেছে সেটাকে শেষ পর্যন্ত নামাতে পারব না—তবু যতটা পারি আমার আঙিনাটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে তাতে আল্পনা কেটে যাব এই ইচ্ছেটা প্রতিদিন দরজায় ধাক্কা মেরে যাচ্চে—আর শীতের মধ্যাহ্নে নীলাভ সুদূরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচি।

তুমি কেমন আছ তার খাপছাড়া খবর পাই। কোথায় কি ভাবে আছ তার ছবিটা আন্দাজ করা শক্ত। ইতি ২০ ভাদ্র

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বছরের উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। ২০ ভাদ্র ১৩৩৬ হবে।

॥ ১৪৪ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আজ বিজয়াদশমী। তাই চিঠির আকারে তোমাকে একটি আশীর্বাদ পাঠাতে বসলুম, যদিচ তুমি ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে, কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে দেহ তৈরি তো।

বেলা হোলো অনেক, দুটো বাজে। শরতের রৌদ্রে তন্দ্রাবিষ্ট মাঠের প্রান্তে নীলচে আভা দিয়েচে। কাকগুলোর হোলো কী—থেকে থেকে অকারণে ডাকচে, যেন আলস্য বিজড়িত স্বরে—বোধ হয় মানুষ হয়ে জন্মালে ঐ ডাকাটাকেই তর্জমা করে নিয়ে কবিতা লিখত, "আজি শরততপনে প্রভাত স্বপনে কী জানি পরাণ কী যে চায়।" আর দুটো একটা পাখীরও কাকলী যেন ঐ মধুমঞ্জরী লতার ঘন পল্লবের ভিতর থেকে শুনতে পাচ্চি—ভাষা শুনে ওদের পরিচয় পাবার মতো অভিজ্ঞতা আমার নেই—ওদের ভাষাও আজকালকার অত্যন্ত হাল আমলের ফুটকি-দেওয়া কবিতার মতো, খণ্ড খণ্ড ধ্বনি—মধ্যাহ্নের সোনার উত্তরীয়ের মধ্যে মধ্যে একটু একটু সুর বুনে দিচ্চে। বাকী আছে অনেক কাজ, বরোদার ফরমাশে একটা বক্তৃতা লিখতে আরম্ভ করেচি, খাতাটা সামনেই আছে, আর সামনেই ঘড়ির কাঁটা চলেচে টিক টিক করে, দুপুর থেকে একটা পেরিয়ে গেল, একটা থেকে এসে পড়ল দুটোয়। আমার মানসিক অবস্থাকে যদি ছবিতে আঁকতে হতো তাহলে আঁকতুম, মেয়েটি জল আনতে দিঘিতে এসেচে, ছায়াঘন নিভৃত দিঘির ঘাট, পুরাতন চাঁপা গাছে চাঁপা ফুলের আভা সবুজ নিবিড়তার গায়ে গায়ে, মাঝে মাঝে ডাকচে ঘুঘু, পাতিহাঁস চলেচে ভেসে, দিঘির পাড়ের কাছ থেকে আসচে নাল ফুল আর শেবালের ঠাণ্ডা গন্ধ, ওপারে জলের ধারে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে বক, সজনে গাছের ডালগুলো জলের দিকে নুয়ে পড়েচে আপন ছায়ার পানে, থেকে থেকে হুহু করে একটা হাওয়া এসে দিঘির ইস্পাতের মতো কালো জলটাকে ঝিকমিকিয়ে দিয়ে যাচ্চে, দিঘির শেষ পৈঠার উপরে মেয়েটা বসে আছে তো বসেই আছে, ঘড়া ভাসচে জলের উপর, জল ভরা আর হোলোই না, পাছে ভরা হলেই ঘরে যেতে হয়; আকাশে দল ছাড়া সাদা মেঘ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর শর্ষে খেত পেরিয়ে নদীর ঢালুর পাড়ির কাছে গোরু চরাতে এসেচে রাখাল, তারি বাঁশি থেকে মেঠো সুর কানে এসে পৌঁচচ্চে।

যখন আর কিছু ভালো লাগে না তখন ছবি আঁকি, কিন্তু আমার ছবি রেখার ছবি, রঙের ছবি; ভাবের ছবি নয়। ভাবের ছবির জন্যে কথা, সে ছবি অনেক এঁকেচি। সম্প্রতি কথার চেয়ে রেখার পরে মনের টান হয়েচে বেশি। রেখা চোখের ভিতর দিয়ে মরমে পশে, কানের ভিতর দিয়ে নয়। কথাকে অর্থ দিতে হয়, রেখাকে দিতে হয় রূপ—রূপ বিনা অর্থেই ভোলায়, দৃশ্যমান হয়ে ওঠা ছাড়া ওর আর কোনো দায়িত্ব নেই।

একখণ্ড মহুয়ার এক পাতায় আলস্য বিনোদনচ্ছলে একটা ছবি এঁকেছিলুম। সেই বইটা চেয়েছিল সমর, আমি হঠাৎ বলে ফেলেছিলুম দেওয়া সম্ভব হবে না—সমর অল্প যেন লজ্জিত হল। ভারি অনুতাপ মনে জেগেছিল। রথীকে বার বার বলে দিয়েছিলুম বইটা যেন হাতছাড়া না হয়, ওটা সমরকে দিতেই হবে। অথচ রথী ওটা কিশোরীর হাতে এবং কিশোরী ওটা প্রশান্তর হাতে দিয়েচে—রথীর নিষেধ ছিল। আজ বিজয়াদশমীর দিনে ওটা সমরকে পাঠাব বলে প্রতীক্ষা করছিলুম। কিন্তু এলো না। এখনো হাতে এলে বিজয়াদশমীর তারিখ লিখে সমরকে পাঠাতে চাই। এ সম্বন্ধে যদি প্রয়োজন হয় তো আনুকূল্য কোরো। যাই এবার—জল ভরে নিই ঘড়ায়। ইতি বিজয়াদশমী ১৩৩৬

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৪৫ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

রথী বউমারা রাঁচি চলে গেছেন। হারাসান কিছুকাল থেকে জ্বরে ভুগে এখনো দুর্বল শরীরে শয্যাগত অবস্থায় আছে। বাড়িতে একমাত্র পুপু আছে যার কাছ থেকে সজীবতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে থাকে দূরে—আমার মতো প্রাচীন ও বৃদ্ধিমান জীব তার পক্ষে দুর্ব্যবহার্য—তার আছে পায়রা হাঁস ছাগলছানা তিন চাকার গাড়ি এবং নানা আকার-প্রকারের পুতুল—আমি তাদের সমশ্রেণীভুক্ত হবার যোগ্য নই; এই কারণে আমি তার মনোযোগ থেকে বঞ্চিত। আমি থাকি একলা আমার জানলার ধারে—গগনচারী বায়ুশরীরীদের সঙ্গে আমার কারবার, আর আছে আমার লেখনী—সে আমার বিক্রমের সুমিত্রা বললেই হয়, কেবলি কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, বরোদার রাজদ্বারের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে। এমনি দুর্ভাগ্য যে অস্বাস্থ্যের দোহাই পাড়বার মুখ সম্প্রতি বন্ধ হয়ে গেল—শরীরটা আবার একবার ভালো হয়ে ওঠবার পালা শুরু করেচে। ছেলেবেলায় কাজ ফাঁকি দেবার উদ্বেগে অস্বাস্থ্য রচনা করতুম, আজকাল সত্যি অসুস্থ না হলে ছাড়া পাবার জো নেই। এটা নিছক ভীরুতা—বলবার সাহস নেই যে, আমার শরীর খুব ভালো, তবুও কিছুই করব না—তোমরা দশজনে তাই নিয়ে বকাবকি করো তো আমার বয়ে গেল। একটা কথা বলতে ভুলেছি—আমার নাট্যমঞ্চের মহিষী এই-

খানে ছুটি যাপন করতে এসেচে—তারা আছে কোনার্কে—সন্ধেবেলায় যখন ছুটির এঞ্জিনের ক্ষীণ বিদ্যুদ্দীপালোকে নির্জন ঘরে স্তম্ভিত হয়ে থাকি তখন সে এসে কাছে বসে, তার তরুণ কণ্ঠের বাণী আমার কর্মহীন সায়াহ্নকে ধীরে ধীরে পূর্ণ করতে থাকে। তারো মনকে আকর্ষণ করতে পারি এমন লঘু শক্তি আমার নেই—তাই চেষ্টা করি কোনো নতুন গানে নতুন সুর লাগাতে—সেইটে শেখাতে শেখাতে ঘণ্টা দেড়েক কেটে যায়—তার পরে আসে তার খাবার সময়, তার পরে ঘরে ঘনিয়ে আসে শূন্যতা, প্রথম প্রহর যায় চৌকির উপর চুপচাপ কেটে, দ্বিতীয় প্রহরে অন্তর্ধান করি মশারির মধ্যে। দিনের কর্মকাণ্ড এইখানে সমাপ্ত, তারপরে রাত্রির অজ্ঞানকাণ্ড। ইতি ২৯ আশ্বিন ১৩৩৬

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৪৬ ॥
ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

আজ লক্ষ্মী পূর্ণিমা। আশ্রমের একটা উৎসবের উপলক্ষ্য ফাঁক পড়ে গেল। মানুষ তার দিনগুলির উপরে নানা কারু-চিত্র বুনে দিতে চেয়েচে, অন্তত আমাদের দেশে। তার কারণ আমাদের দেশে অবকাশ ছিল বেশি—সেই অবকাশটাকে একেবারে ফাঁকা রাখতে মন যায় না। প্রতিদিনের তুচ্ছ ঘোরো কাজে যেটুকু স্রোত বয় তাতে শেওলা জমে পাঁকের সৃষ্টি করে তাতে আপন আপন খুচরো স্বার্থের জঞ্জাল ভেসে আসে। সেই জন্যে আমাদের মতো কঠোর সাধনাহীন গ্রাম্য দেশে বারো মাসে তেরো পার্বণের দরকার হয়েছিল। সেই পার্বণে সর্বসাধারণের যোগ, আতিথ্যের অজস্রতা, আর সেই সঙ্গে কোনো না কোনো দেবতার কল্পনায় মানুষ একরকম করে অনুভব করতে পারে জগতে এমন কোনো চিরন্তন সত্য আছে যা সংসারের সমস্ত সংকীর্ণতা ও অকিঞ্চনতার উপরে। অলস দেশের মানুষকে এইরকম ভাবের টানে খানিকটা উপরের দিকে টেনে রাখে। নইলে অবসাদের পাঁকের মধ্যে তার টিকি পর্যন্ত তলিয়ে যাওয়া ছাড়া আর গতি নেই। শীতের দেশে মানুষের উদ্যমের সচ্ছলতা প্রচুর—সেখানে তারা চারিদিকের প্রকৃতির সঙ্গে কেবলই লড়াই করে চলেচে। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যা কিছু সম্পদ লুকোনো তা তাদের করে নিতে তারা অহোরাত্র প্রবৃত্ত। নিজের দেশকে সমাজকে তারা কি রকম ঐশ্বর্যবান করে তুলেচে সে তোমরা চোখে দেখে এসেচ—এখনো জলে স্থলে আকাশে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলবার চেষ্টায় তাদের বিরাম নেই। সেই জন্যে ঘরের কোণে গ্রামের ছায়ায় সময়টাকে কোলে করে নিয়ে অনুষ্ঠানের কাঁথা বোনবার প্রবৃত্তিই তাদের হয় না। তারা ব্যক্তিগত স্বার্থের কাজকেও বড়ো কাজ করে তুলেচে, তাতে তুচ্ছতা নেই, তাতে বৃহৎশক্তি ও ব্যাপক বুদ্ধির দরকার। আজ আমরা দেশ উদ্ধারকল্পে যখন কাজের কথাও ভাবি তখনো চরখার ঊর্ধ্বে মনের সাহস পৌঁছয় না। চরখায় কিছু ভাববার দরকার হয় না, বহুকাল আগে যা উদ্ভাবিত হয়ে গেছে তাকে বিচারহীন অধ্যবসায়হীন মন নিয়ে নিরন্তর চালিয়ে গেলেই হোলো। কোনো নিরলস বীর্যবান দেশে এমন প্রস্তাব উত্থাপন করাই অসম্ভব হোতো—কিন্তু এদেশে এর চেয়ে কঠিন প্রস্তাব উত্থাপন করলেই সেটা একেবারেই বর্জিত হোতো। মনে করো মহাত্মা যদি বলতেন প্রত্যেক চাষীকেই এক বিঘা জমিতে অন্তত দুই সের ফসল বেশি ফলাতে হবে এই তার সাধনা হওয়াই চাই, এই তার পুণ্যকর্ম—যে পরিমাণে এটা সফল হবে সেই পরিমাণেই স্বদেশের যথার্থ পরিত্রাণ; তাহলেই তর্ক উঠত এতে যে বুদ্ধি চাই, জ্ঞান চাই, উদ্যম চাই, প্রকৃষ্ট পন্থার প্রতি শ্রদ্ধা চাই,—হাঁ, তা চাই, তা চাই বলেই তার দ্বারাই দেশে মুক্তি সম্ভবপর হতে পারে, মূঢ়চিত্তের ক্ষীণ উদ্যমের দ্বারা দেশ জাগতেই পারে না। দেশের বারো আনা লোক চাষী তারা আরো ভালো করে চাষ করবে এ কথা না বলে তারা জড়যন্ত্রের মতো চরখা চালাবে এ উপদেশ মানুষের অবমাননা। অবশ্য এই চাষের উন্নতির কথা বলার মানেই এই উদ্দেশে দেশব্যাপী ব্যবস্থা করা। চরখার জন্যে খদ্দরের জন্যে যে ব্যবস্থার চেষ্টা চলেচে এ তার চেয়ে বড়ো জাতের চেষ্টা। এর জন্যে চাষীদের মধ্যে, ফসল উৎপাদনের সমবায় প্রণালী প্রবর্তন করতে হবে, প্রদেশে প্রদেশে উৎকৃষ্ট বীজের ভাণ্ডার স্থাপন করতে হবে, জমির প্রকৃতি পরীক্ষার ও উপযুক্ত সার জোগাবার প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে। দেশে একদিন চরখা গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে চলত (বিদেশেও চলত), স্বাভাবিক কারণেই তা বন্ধ হয়ে গেছে—আজ বাহ্য উত্তেজনা দ্বারা সেই চরখা কিছু পরিমাণে চলতেও পারে, কিন্তু আবার তা বন্ধ হয়ে যাবে। তার কারণ, এ জিনিসটা এখনকার কালের সঙ্গে একেবারেই সঙ্গত নয়। অথচ সমবায় প্রণালীতে কৃষির উন্নতি চেষ্টা যদি সমস্ত ভারতবর্ষে প্রবর্তিত করা হয় তবে যতটুকু পরিমাণেই সেই চেষ্টা সফল হবে ততটুকু পরিমাণে সেই সফলতা স্থায়ী হবে এবং ক্রমশই ব্যাপ্ত হতে থাকবে, কেননা এইটেই বর্তমান কালের সঙ্গে সঙ্গত। খদ্দরের প্রচার দেশ উদ্ধারের মুখ্যতম উপায় এই উপদেশবাক্য যে এতটা ব্যাপ্ত হতে পেরেচে তার প্রধান কারণ ল্যাংকাশায়ারের উপর চাপ দিয়ে বণিকজাতিকে দুরন্ত করে আনবার ইচ্ছেটাই মনের মধ্যে প্রবল আছে। অর্থাৎ দেশ উদ্ধারের পথ এখনো আমরা বাইরের দিকেই খুঁজচি। এটা অন্তর্গূঢ় পরমুখাপেক্ষিতারই লক্ষণ। স্বদেশীর দিনে যখন বয়কট ব্যাপারে দেশ মেতে উঠেছিল তখনো লক্ষ্যটা ছিল সেই বাইরের দিকে। অসহযোগিতার প্ল্যান যখন করি তখন জবরদস্তির পন্থায় সহযোগিতা লাভ করবার আশাতেই তা করি। সে চেষ্টাও বহির্মুখী।

হঠাৎ তোমার চিঠিতে এ সব আলোচনার কী দরকার ছিল তার ভদ্ররকম কৈফিয়ত মনে জোগাচ্ছে না। এ চিঠি তোমার রোগশয্যার উপযুক্ত নয়। আরম্ভ করেছিলুম লক্ষ্মীপূর্ণিমার প্রসঙ্গ তুলে। সেটা অন্যায় হয় নি। আমাদের গ্রামসমাজে ব্রতপূজাপার্বণের কেন এত প্রাচুর্য সে কথাটাও এই সঙ্গে মনে এসেছিল। ভেবেছিলেম বালী দ্বীপের উদাহরণটা এই উপলক্ষ্যে তোমার কাছে পাড়ব—কেননা, সেখানে দেখে এসেচি নিত্য অনুষ্ঠানের ধারা। বালী আধুনিক জগতের থেকে অনেক দূরে। চাষ ক'রে দিন চলে, ফসল হয় অজস্র, কলকারখানার কোনো সম্পর্কই নেই,—জীবনযাত্রার জন্যে কিংবা পোলিটিকাল অথবা অন্য কোনো আইডিয়ার জন্যে ঠেলাঠেলি মারামারি নেই—সেই জন্যে এই শ্যামল দ্বীপের নিভৃত বনচ্ছায়ায় বসে দিনগুলিকে নিয়ে ওরা শিল্প কাজ করচে—তাতে শান্তি আছে, সৌন্দর্য আছে, কিন্তু বীর্য নেই, জীবনের সার্থকতা নেই। আমাদের সেকেলে বাংলা দেশের সঙ্গে বালীদ্বীপের অনেকটা মেলে। যে দেশে লক্ষ্মীর পুজো হাতে কলমে করতে হয় সে দেশে লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠানটা কারো দরকার হয় না, মনেও আসে না। ছোটো মেয়ে ঘরকন্না করে না বলেই ঘরকন্নার খেলা করে, তোমার মতো মেয়ে পৌত্তলিক বেহাইয়ের সঙ্গে বেয়ানগিরি করতে উৎসাহই বোধ করে না। এখনকার কালের আসল লক্ষ্মীর পুজার মতো প্রকাণ্ড অধ্যবসায়ের ব্যাপার আর কিছুই নেই, পারব কেন? উপযুক্ত উদ্যমের অভাববশতই যা যেমন চলচে তাকে তেমনই চলতে দিচ্ছি, আর লক্ষ্মীপূজা করচি, আর চরকায় সুতো কাটাকেই একটা মহদ্ব্যাপার বলে প্রচার করা হচ্চে। এদেশে এর বেশি কি আর কিছু কোনো-

হতেই সম্ভব হবে না, অথচ অন্যদেশের কঠোর সাধনার ফল আমরা এই পথেই লাভ করব বলে নিঃসংশয় হয়ে থাকব? এই সব আক্ষেপ মনের মধ্যে কানায় কানায় সঞ্চিত হয়ে আছে। সেই জন্যেই কোনো প্রসঙ্গ এর একটু কাছ ঘেঁষে চললেই অমনিই এটা বেরিয়ে পড়ে।

কাল এই পর্যন্ত লিখেই কলম বন্ধ করেছিলুম। ইতিমধ্যে বাদলাটা বেশ রীতিমতো উৎসাহের সঙ্গেই ঘনিয়ে এলো। এরকম মেঘচ্ছায়াশ্যামল বর্ষণমুখর দিন মোটের উপর আমার ভালোই লাগে। কিন্তু এই সময়টা, মাঠে যখন আউশ ধান কাটবার দিন আসন্ন হয়ে এল, তখন মনের থেকে উদ্বেগ কিছুতেই যেতে চায় না। যে দেশে অন্নের বরাত একমাত্র চাষের উপর সেদেশে আকাশের প্রত্যেক ইঙ্গিত নিয়ে মনটা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে। অন্য দেশে বাঁচবার পন্থা অনেকগুলো, আর সেগুলো বড়ো-বড়ো রাজপথ, পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে চলেচে। ভারতবর্ষে একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ গলি, তার এধারে মরণ ওধারে মরণ। তাই প্রতিদিন খবরের কাগজ খুলে সব প্রথমে আমি weather reportটা দেখে নিই। য়ুরোপ জীবিকার জন্যে তাকায় ভূগর্ভের খনির দিকে, আমরা তাকাই আকাশের পানে। ভূগর্ভের দিকে খন্তা চলে, আকাশের দিকে মন্ত্র।

যতই চেষ্টা করচি চিঠিটার স্বাদেশিক ঝোঁক কোনোমতেই কাটাতে পারচিনে। এর থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র উপায় চিঠি বন্ধ করা। কাগজের কিছু অংশ ফাঁক রয়ে গেল। সে জন্যে নালিশ করা চলবে না।

ঘড়িতে দুটো বাজল। দিনের বেলা। খুব ভালো সুগন্ধ চীনে চা পাওয়া গেছে। ইচ্ছে করছে এক পেয়ালা খাই। লীলমণিকে ডাকতে হোলো। হঠাৎ চায়ের কথাটা কেন মনে পড়ল যদি জিজ্ঞাসা করো তার কারণটা হচ্চে একটুখানি ঘুমের আবেশ এসেচে। ইতি ২ কার্তিক ১৩৩৬

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের বোষ্টমী-কে

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

আমার মাঝখানে তুই কী পেলি বোষ্টমী,
চম্পক-লাবণ্য-তনু গোরা?
চোখের পাপড়িতে মেলা স্বচ্ছ শান্ত দৃষ্টি, তোর কাছে
অধরা দিয়েছে যেন ধরা।

যাকে ভুলতে ছাড়লি ঘর তাকে চেয়ে গোপন অন্তরে
বাসনা কী রয়ে গেল বাকি?
আমার প্রসাদ পেয়ে ভেবে দেখ এখনো অন্তত
আমাতেই ঠেকে গেলি না-কি?

যে তোর পরম সাঁই সর্বব্যাপী, তার সত্তারূপ
খুঁজেছিলি মানুষে নিরালা?
মানুষের কণ্ঠ থেকে পাবি ভেবে, স্বর্গের অমৃত—
জোনাকিরে ভেবেছিলি আলা?

মনের মানুষ যাকে দেশ-বিদেশে খুঁজেছিস তুই
ভক্তির আগুন বুকে জেলে,
সেও যে তোকেই খোঁজে, এতদিন দেখিস্‌নি কেন যে
মনের ভিতরে চোখ মেলে।

সে যে তোকে ডাক দিয়ে গেছে রোজ ভোরের বাগানে
ছুঁয়ে স্নিগ্ধ হাওয়ার মতন,
চন্দন-শীতল-তনু, ফুলের সৌরভ আনে বয়ে
ও তার নিশ্বাস সর্বক্ষণ।

নিজেকে এমন আর ভুল করে ঠকাস্‌নে বোষ্টমী,
চোখ মেল মনের অতলে,
অচিন পাখিটি ঐ বসে আছে জারুলের ডালে
আন্‌মনা হলেই যাবে চলে।

॥ সাতাশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকে ঃ

১লা অক্টোবর। সাড়ে বারটার মধ্যেই যোশীমঠ পেঁাছে গেলাম। সকাল সকাল রওনা দিয়েছিলাম গোলাবমোটি থেকে। পথ চলতে মোটেই কষ্ট হচ্ছিল না। প্রথম দিকে চলতে বেশ ফুর্তিই লাগছিল। শেষের দিকে দুটো পায়েই ফোস্কা পড়ে গেল। বেশ খোঁড়াতে হয়েছে।

যোশীমঠে পেঁাছে দেখি বেজায় তৎপরতা। রাষ্ট্রপতি আসবেন। ঝাড়-পোঁছ হচ্ছে। তোরণ উঠছে। সরকারী অফিসার, মিলিটারি অফিসারেরা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। এখানে আরও কিছু রসদ কেনা হল। মালবাহকও আরও কয়েকজন নিতে হল। এক বিরাট বাহিনী।

সন্ধ্যার সময় মদন শের সিংকে নিয়ে ছাউনিতে গিয়েছিল ছোলদারি তাঁবু জোগাড়ের আশায়। মদন নন্দাঘুণ্টি পার্টির লোক, একথা জানতে পেরে কম্যাণ্ডাণ্ট সাহেব নাকি ওকে ডেটে দিয়েছেন। আমাদের অপরাধ, আমরা পিপলকোটির সব 'কুলি' নাকি নিয়ে নিয়েছি। ফলে রাষ্ট্র-পতির মটবহর বইবার লোকের অভাব পড়ে গিয়েছে। তাঁবু জোগাড় করতে পারল না মদন।

আমাদের ইচ্ছে ছিল যোশীমঠে একদিন থেকে রাষ্ট্রপতির আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা করা। কিন্তু মদনের কথা শুনে একটু ঘাবড়ে গেলাম। স্থির হল, আর দেরি করা নয়। যোশীমঠ থেকে কাল ভোরেই পিট্টান দিতে হবে। কি জানি, আমাদের মালবাহকদের যদি "রিকুইজিশন" করে নেয়।

আমরা যে রুটে যেতে চাই, সে পথ চেনে এমন কাউকে যোশীমঠেও পাওয়া গেল না। তবে একজন লোকের নাম তিন চার জায়গা থেকে শোনা গেল, সে নাকি ও অঞ্চল সম্পর্কে ভাল খোঁজখবর রাখে। তার বাড়ি রিনি গ্রামে।

ডাক্তার এখানে একচোট চিকিৎসা করে নিলেন। কারো গায়ে ব্যথা হয়েছে, ব্যথা সারার ট্যাবলেট দিলেন। ঠাণ্ডা লেগে গলা ব্যথা-ব্যথা হয়েছে কারোর, তারও দাওয়াই দেওয়া হল। দাস্ত ঠিক মত যাতে হয়, সবাইকে সেই ওষুধ খাওয়ান হল। আমাদের চিকিৎসা ডাক্তার ত করলেনই, শের সিং-এর ফোঁপর দালালিতে পড়ে চটিঅলার বেটার বউকেও চিকিৎসা করে আসতে হল তাকে। ভেবেছিলাম ভিজিট বাবদ ডিম কি মুর্গী, কিছু একটা পাঠাবে লোকটা, নিদেন পক্ষে চটির ভাড়াটা মকুব করে দেবে। ও মা, সব ভোঁ ভাঁ। অথচ বেটার টাকায় নাকি ছাতা ধরছে।

ছোট্ট একটা ঘরে গাদাগাদি করে শুয়ে আছি। একজনের এয়ার ম্যাট্রেস আরেক-জনের গায়ে গিয়ে লাগছে। মদন আর বিশ্ব-দেব পাশের একটা গুদোম ঘরে ঢুকে পড়ল। শেরপারা পাশের চটিতে আশ্রয় নিয়েছে। বেশ শীত লাগছে। পৌষ মাসের শীতের মত। স্লিপিং ব্যাগে ঢুকতে আর বের হতে অর্ধেক এনার্জি খরচ হয়ে যাচ্ছে।

২রা অক্টোবর। তের মাইল মার্চ করে রিনি পেঁাচেছি। সকাল ৭টায় তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তপোবনে পেঁাছে দুপুরে ঘণ্টা তিনেক বিশ্রান্তি। এখানে সুন্দর একটা আশ্রম আছে। আশ্রমে আশ্চর্য একটি কুণ্ড আছে। কুণ্ডটা উষ্ণ। এরা বলে তাতাপানি। কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, শীতল জলের একটা ধারাকেও কুণ্ডের বাঁধানো চৌবাচ্চার মধ্যে আনা হয়েছে। চৌবাচ্চায় তাই ঠাণ্ডা গরম, দুই রকম জলই পাওয়া যায়। আর ভারি পরিষ্কার সে জল। স্নান করলাম। ভারি আরাম হল। শরীরের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। আমার পায়ের ফোস্কা বেশ বড় হয়ে গিয়েছে। বেশ যন্ত্রণা দিয়েছে। তবে খানিকক্ষণ চলবার পর আমি আর আমল দিইনি তাকে। এসেছি শরীর মহাশয়ের সহ্য শক্তি কতটা তা যাচাই করার জন্য। এত সহজে হাল ছাড়লে চলবে কেন? চড়াইয়ে উঠবার চেয়েও ফোস্কা বেশী যন্ত্রণা দিচ্ছিল উতরাই-এর পথে। সকলের শেষে তপোবনে এসে পেঁাছেছিলাম। সকলের আগে তপোবন থেকে রওনা দিলাম। রাস্তা খুব ভাল। কোন কোন জায়গায় আমার মুসৌরীর কথা মনে পড়ছিল। এবার [illegible] নিমাই, সুকুমার, মদন, বিশ্বদেব আমার আগে পিছে চলেছে। আশু ফুতার ত [illegible]

গোলাবকুটি ডাক বাংলোয় বিজয়া সম্মেলনী

তে লেগে আছে সংগে। দিলীপ পাহাড়ের ধ্যে সুন্দর স্টাইলে হাঁটছে। বীরেনদা আর ক্তারও বেশ ভালভাবেই এগোচ্ছে।

ধৌলি আর ঋষিগংগার সংগমেই রিনি ম। গ্রামে ঢোকার মুখেই একটা চায়ের াকান। সেখানে অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। ন্ধ্যা হয়ে আসছে। আকাশ মেঘলা। নলাম আমাদের যাত্রা তখনও শেষ হয়নি। ারও মাইলখানেক এগিয়ে যেতে হবে। য় শ পাঁচেক ফুট উপরে একটা ইস্কুল াড়ি। শের সিং সেইখানেই আস্তানা ঠিক রেছে।

আবার উঠতে হবে! চড়াই ভাঙতে হবে! পায় কি? অতি কষ্টে পাঁচশ ফুট খাড়া ড়াই উঠে ইস্কুলে পৌঁছালাম। ক্লান্তিতে রীর ভেংগে পড়ছে। বারান্দায় রুকস্যাকে র দিয়ে শরীরটা এলিয়ে দিলাম।

রাত্রে এক বৈঠক বসল। দুজন গ্রাম-সীকে নিয়ে এল শের সিং। অনেকক্ষণ র আলোচনা হল। ওরা বললে, নন্দা-ঘুন্টির পথ ওরা দুজনেই চেনে। এত হজে গাইড পাওয়া যাবে ভাবিনি। জয় বা বদ্রিবিশলে। আমাদের মাথা থেকে াট দুর্ভাবনা নেমে গেল। নিমাই আর কুমার ম্যাপ নিয়ে লোক দুজনের সামনে ল। আমি নিমাই-এর পাশে এসে লাম।

নিমাই ওদের জেরা করছে। ওরা জবাব চ্ছে। সাব, আমাদের এখান থেকে প্রথমে তে হবে লতা। কতদূর? নিমাই জ্ঞাসা করল। থোড়া। দু মাইল। রপর লতা থেকে লতা খড়ক। কতদূর? োড়া। চার মাইল হবে। ওরা বলছে আর নিমাই মনোযোগ দিয়ে ম্যাপে কি যেন দেখছে। হ্যাঁ, তারপর? উসকে বাদ মানে হোগা ধরাসি। কতদূর? থোড়া। এই মাইল সাতেক হবে। নিমাই এবারে ম্যাপ বন্ধ করে ফেলল। ওরা দুজনে বলেই চলল: উসকে বাদ ধুবরেগাট্টা। থোড়া। ছয় মাইল। উসকে বাদ ডিউঁড়ি। থোড়া। ছয় মাইল। উসকে বাদ বিসকেপ। থোড়া। আট মাইল। উসকে বাদ রামনি। থোড়া—বাস বাস। চুপ কর। নিমাই অসহিষ্ণু হয়ে বলল, চুপ কর। এখন নন্দাঘুন্টির রাস্তা বল। রিনি থেকে মোরনা। তারপর কি? ওরা বলল, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। পহলে জানে হোগা লতা। উসকে বাদ লতা খড়ক। উসকে বাদ ধরাসি। উসকে বাদ—

চুপ কর। চুপ কর। যাও তোমরা। নিমাই ধমক দিল। ওরা চলে গেল। নিমাই বলল, ও সব রাস্তায় গেলে জীবনেও নন্দা-ঘুন্টি যাওয়া যাবে না সুকুমার। ওরা নন্দাঘুন্টির পথ জানে না। কেন, এই যে এতক্ষণ বলছিল। ঘোড়ার ডিম বলছিল। বলছিল নন্দাদেবীর কথা।

স্লিপিং ব্যাগে অনেকক্ষণ ঢুকেছি। ঘুম আসছে না। আরেকটা রাত্রি চরম অনিশ্চয়-তার মধ্যে কাটবে। কাল সকালে কি খবর পাওয়া যায় কে জানে?

৩রা অক্টোবর, সকাল। সকালে ঘুম ভেঙে উঠতেই দেখি সকলের মুখ অন্ধকার। আকাশে মেঘ। বৃষ্টি পড়ছে। বেশ শীত। ইস্কুল ঘরের ভিতরে আমরা গাদাগাদি করে শুয়েছিলাম শেরপারা বারান্দায়।

আজীবা গতকালই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। বারবার দাস্ত হচ্ছিল। কেমন যেন মুষড়ে পড়েছে আজীবা! বেচারি! ও যে পুরো তাকতে চলতে পারছে না, ওকে যে অন্যের সাহায্য নিতে হচ্ছে, এতেই মরমে মরে আছে। ট্রেন থেকে ওর সংগে অন্তরংগতা বেড়ে গেছে আমার। আঙ ফুতার ওরই পোষ্য। আজীবার কথামতই আঙ ফুতার আমার পাহাড়ি পথের গার্জেয়ান বনে গিয়েছে। ঘুম থেকে উঠেই আজীবার খবর নিলাম। কেমন আছ আজীবা? রাত্রে আর দাস্ত হয়েছে কি? আজীবা বললে, হ্যাঁ হয়েছে দুবার। পেট ব্যাথাও করছে। ডাক্তার রাত্রে উঠে উঠে আজীবার খবর নিয়েছে। ওষুধ দিয়েছে। ম্লান হেসে আজীবা বলল, সাব্ হামসে কুছ নেহি হোগা। নসিব খারাব্ হ্যায়। ওর জন্য আমার দুঃখ হচ্ছিল। মুখে হাসি টেনে এনে ওকে সাহস দিলাম। বললাম, কিছু ভেব না আজীবা, সংগে ডাক্তার যা আছেন একেবারে চাবুক। এমন দাওয়াই ও'র কাছে আছে, যার একগুলি তোমাকে এখানে খাইয়ে দিলে তোমার দার্জিলিঙের ফ্যামিলি অব্দি চাংগা হয়ে উঠবে। আজীবার মুখে হাসি ফুটল।

জোর বৃষ্টি পড়ছে। দূরের পাহাড়গুলোর গায়ে বরফ পড়ছে। সুকুমার গম্ভীরভাবে সেদিকে চেয়ে আছে। শেরপারা ইস্কুলের পিছনে ভুট্টা খেতের মধ্যে ত্রিপল টাঙিয়ে 'কিচেন' তৈরি করেছে। জিনিসপত্র জলের ছাঁটে যাতে না ভেজে—দিলীপ মদন, বিশ্বদেব আঙ শেরিং-এর সংগে তার ব্যবস্থা করছে। ডাক্তার আজীবাকে পরীক্ষা করছে; বীরেনদা যথারীতি গানের গলায় শান দিচ্ছে। নিমাই নির্বিকারভাবে শিস্ দিচ্ছে। ধ্রুব দা তেম্বাকে নিচে গিয়ে ভেড়ার সন্ধান নিতে বলছে। পেম্বা নরবুকে ডাক দিয়ে লতার পোস্ট অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

আমার এখন অন্য ভাবনা মাথায় চেপেছে। অন্তত জনাতিনেক স্থানীয় লোক আমার চাই। আমার 'রানার' হবে। টেলিগ্রামই বল, আর চিঠিপত্রই বল কি ফটো ফিল্মই বল, এ সবই পাঠাতে হবে পোস্ট অফিসের মারফত। আর এ তল্লাটে পোস্ট অফিস হচ্ছে সেই যোশীমঠে। রানারাই একমাত্র ভরসা। কিন্তু কোথায় রানার? ও কাজ করতে কেউ রাজী হয় না।

রানার সমস্যাও আবার চাপা পড়ে যায় গাইড সমস্যার কথা মনে পড়লে। এখনও পর্যন্ত গাইডের দেখা নেই। শের সিং কোন্ ভোরে বেরিয়ে গেছে তার সন্ধানে।

দুপুরে। আবহাওয়া আরও খারাপ হয়ে এল। কাছে বৃষ্টি আর দূরে বরফ সমানে পড়ছে, বিরাম নেই। পাহাড়ের গায়ে নতুন বরফ কত দ্রুত নিচের দিকে নেমে আসছে। ঠাণ্ডা এমনই কনকনে, এমনই স্যাঁতসেঁতে

যে গরম জামাকাপড় পরেও শানাল না, ভর-দুপুরে আত্মরক্ষার্থে স্লিপিং ব্যাগের ভিতরে গিয়ে ঢুকতে হল। এ এক অভূত-পূর্ব অনুভূতি। এমন একটা বাতাবরণ, এমন বোবা, এমন ভোঁতা যে, জীবনের স্বাদ বুঝি আলুনি আলুনি লাগে। কি একটা ভাবতে চেষ্টা করছি, পারছি নে। কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে চেষ্টা করছি পারছিনে। দূর ছাই, চুপচাপ শুয়েই থাক. যাক।

রাত্রি। এখনও বৃষ্টি থামল না। কালও যদি না থামে? বেশ শীত পড়েছে। কোন-ক্রমে খাওয়াটা শেষ করেই সবাই স্লিপিং ব্যাগে এসে ঢুকেছি। স্লিপিং ব্যাগটা পুরনো। কয়েকটা ফুটো হয়ে গেছে। সরু সরু নরম নরম পালকগুলো এক একটা করে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর আমি বিফল চেষ্টা করছি, ওগুলোকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা করতে।

রিশি হইতে মোরনার পথে অভিযাত্রী দল

দা তেম্বা একটা খবর এনেছে, সন্ধ্যের সময়। খবরটা সুবিধের নয়। দা তেম্বা বললে, মালবাহকরা এই বৃষ্টি দেখে গাঁই-গুঁই শুরু করেছে। ওদের জুতো নেই. শীতবস্ত্র নেই. ওয়াটার প্রুফ নেই। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, এসব শের সিং-এর খেলা। হ্যাঁ শের সিং তার পরিচিত এক অভিজ্ঞ শিকারীকে এনে হাজির করল। করম সিং নাম। করম সিং বললে, সে মোরনা, গোপা, রণ্টি, ত্রম্বাখড়ক থারগেট্টার, রাস্তা চেনে। যৌবনকালে শিকার করতে দু একবার গিয়েছে ওধারে। তবে থারগেট্টার ওদিকে আর যায়নি। রণ্টি হিমবাহ সে দেখেনি নন্দাঘুণ্টি চেনে না। করম সিং আরও বললে, তার এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে। ওসব পথে চলার ক্ষমতা তার নেই। সে যেতে পারবে না। তবে পথ আছে, সে জানে। থারগেট্টা পর্যন্ত যাওয়া যায়। শের সিংকে বলল, তুম যা সকোগে। যেতে পারবে তুমি। সুকুমার খুশি হয়ে বলল, শুনলে ত শের সিং। ও পথে যাওয়া যায়। অন্তত থারগেট্টা পর্যন্ত যাওয়া চলে। তবে আর কি, সেই পর্যন্তই চল। শের সিং খেঁকিয়ে উঠল, করম সিংকে বলল, মুখের কথায় চিঁড়ে ভিজিও না করম সিং। আমাকে গাইড্ দাও। তুমি পথ চিনতে, তুমি ত যাবে না। এ ত আর বাঁধা সড়ক নয় যে তুমি এখান থেকে বলে দিলে আর আমরা সুট সুট করে পেঁছে গেলাম। গাইড্ ছাড়া যেতে চেষ্টা করলে বিপদ আপদ ঘটবে না, এমন কথা জোর দিয়ে তুমি বলতে পার? করম সিং শের সিং-এর ধমকে থতমত খেয়ে বলল, বাঃ, তা আমি কেমন করে বলব। শের সিং বলল, তোমার কথামত এগিয়ে গিয়ে যদি কোন বিপদ আপদ ঘটে, তুমি তার জিম্মা নেবে? করম সিং ঘাবড়ে গেল। বলল, বাঃ, ত আমি কেমন করে নেব। শের সিং বলল তাহলে বকবক করো না, চুপ করে থাক। শের সিং সুকুমারকে বলল, লীডার সা করম সিং যদি গাইড্ দিতে পারে, ত শে সিং আগে বাড়বে, নচেৎ এখান থেকে ফিরবে। সুকুমার করম সিংকে বল আমাদের একজন বিশ্বাসী গাইড্ দে দিতে পারবে না করম সিং। করম সিং যেন ভাবতে লাগল। হঠাৎ মদন এগি এসে "শুনো করম সিং, শের সিং এবং বলে যেই না ভাষণ দেবার জন্য মু খুলেছে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বদেব ঝাঁপি পড়ে তার মুখে হাত চাপা দিয়ে দি বলল, মদন, প্লিজ। সব লোক ক্ষে পড়বে। এখন ওধারে যাও। মদন ম

ঘন্যাকুল ক্যাম্পে কুলীদের চাল আটা দেওয়া হচ্ছে

গোমড়া করে বলল, প্রাণ কা বাত বলতে দিলি না। ভুল করলি। করম সিং বলল, ঠিক হ্যায় লীডার সাব্, কাল আদমি লায়েগা।

আবার একটা অনিশ্চিত রাত্রি। কে জানে কেন, আজ ঘুমও আসছে না। একে একে সকলের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে এল। ভারি নিঃশ্বাস নিয়মিত পড়ছে, টের পাচ্ছিলাম। কারও কারও নাকও ডাকছে। একটা আবছা মূর্তি ও পাশ থেকে উঠে গেল। সুকুমার। একদৃষ্টে সে চেয়ে রইল দূর পাহাড়ের দিকে। অনেকক্ষণ পরে সে ফিরে এল আবার। জিজ্ঞাসা করলাম, বৃষ্টি থামল, ক্যাপ্টেন? সুকুমার সিগারেট ধরাল। বলল, না। বললাম, থামা ত উচিত। সুকুমার শুয়ে পড়ল। আর কি, এবারে আমিও শুয়ে পড়ি। বৃষ্টি পড়ছে। ঝপ ঝপ ঝপ। বৃষ্টি পড়ছে........

॥ আটাশ ॥

৪ঠা অক্টোবর। সকাল হল। বৃষ্টি তখনও পড়ছে। শেরপারা ভিজে কাঠ জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে অতি কষ্টে রান্নার ব্যবস্থা করে চলেছে। আকাশের অবস্থা দেখে মনে হয় না, বৃষ্টি আজ থামবে। শের সিং একবার দেখা দিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। কাল মালবাহকের দেখা নেই।

সুকুমার মনে মনে বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছে। আসবে ত করম সিং? আসবে নিশ্চয়ই। এত দেরি করছে কেন করম সিং? তাহলে আর এল না বোধ হয়।

"সর্দার!"

সুকুমার ডাকে, "সর্দার!"

আঙ শেরিং কয়েকজন শেরপাকে নিয়ে দিলীপের নির্দেশে মালপত্র আবার নতুন করে প্যাক করতে শুরু করেছে। মাল প্যাকিং ওদের যেন আর শেষই হবে না। তাড়াহুড়ো করে কলকাতায় মাল প্যাক করতে হয়েছিল। কোন্ প্যাকিং-এ কি আছে তার হিসাব ভাল করে রাখতে পারেনি। তাই এখন যে জিনিসটাই খোঁজে চট করে আর পাওয়া যায় না। কোয়ার্টার মাস্টার নিমাইকে জিজ্ঞাসা করলে সে উল্টোপাল্টা প্যাকিং দেখিয়ে দেয়। প্যাকিং খুলে খুলে দিলীপ হয়রান হয়ে যায়। বেজায় চটে যায় নিমাই-এর উপর। নিমাই সু-উ-ই করে সিটি বাজিয়ে সেখান থেকে কেটে পড়ে। আঙ শেরিং আর দিলীপ প্যাকিং বাক্স খুলে ফেলেছিল। এখন ভরছে।

সুকুমার ডাকল, "সর্দার!"

আঙ শেরিং সুকুমারের কাছে এগিয়ে এল।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করল, "করম সিং কেমন লোক সর্দার?"

আঙ শেরিং সুকুমারের উৎকণ্ঠা বুঝল।

"আচ্ছা হ্যায়। আচ্ছা হ্যায়।" আঙ শেরিং হাসল।

সুকুমার একটু যেন বুকে বল পেল। লালু মগ ভর্তি চা দিয়ে গেল। ওরা খেতে লাগল।

আজীবাকে খুব ভালভাবে পরীক্ষা করল ডাক্তার। অনেকটা ভাল এখন। আজ একটু খিদেও পাচ্ছে তার। কাল বার্লির জল খাইয়েছে আজীবাকে। আজ পথ্য কি দেবে? বার্লির জল শুধু খাওয়ালে দুর্বল হয়ে পড়বে আজীবা। সে চলতে পারবে না। তাই কপাল ঠুকে পেটের অসুখের রোগীকে, কালও যার ভালরকম দাস্ত হয়েছে, ডাক্তার পথ্য দিল ভাত আর ভেড়ার মাংস।

শেষ পর্যন্ত করম সিং এল একজন গাইড নিয়ে। শের সিংও এল। গাইডের নাম থেলু সিং। থেলু সিং খারগেট্টা পর্যন্ত গিয়েছে কখনও সখনও ভেড়া চরাতে। তার উপরে আর যায় নি। যাক, গাইডের সমস্যা মিটল। ওরা একটু নিশ্চিন্ত হল।

সুকুমার আর কালবিলম্ব না করে হুকুম দিল, মার্চ। বৃষ্টির জন্য মালবাহকেরা গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। শের সিং তাদের ডাকতে ছুটল। তাড়াতাড়ি ওরা কিছু খেয়ে নিল। তারপর শুরু হল মার্চ।

রিনি থেকে মোরনা দুই মাইল। বৃষ্টি মাথায় করে ওরা বের হল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়ে গেল। মোরনাই শেষ লোকালয়। ওরা সেদিন আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। তাঁবু ফেলল ঘন্যাকুলে। এই প্রথম ওদের তাঁবুতে বাস। আকাশ আবার মেঘে ছেয়ে গেল। বৃষ্টি শুরু হল। জীর্ণ তাঁবু ভেদ করে সেই শীতল জলধারা অভিযাত্রীদের বিছানা পোশাক ভিজিয়ে দিতে লাগল।

বিশ্বদেবের দিনলিপি থেকেঃ

ঘন্যাকুল, ৪ঠা অক্টোবর। রিনি থেকে দুর্যোগ মাথায় করেই বের হয়েছিলাম। যখন মার্চ করে এগিয়ে চলেছি, তখনও টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। এই বৃষ্টি, এই দুর্যোগ বড় ভাবনায় ফেলেছে আমাদের। কারণ উপরের দিকে বরফ পড়তে শুরু করেছে। এই নতুন বরফ বিপজ্জনক। এই বরফে চলা কষ্টকর। তার উপরে আবার অপরিচিত পথের নানা সমস্যা আছে।

আজ আমরা ঋষিগঙ্গার প্রবাহ ধরে চলেছি। চলেছি বেশ খানিকটা উপর দিয়ে। শুধু চড়াই আর চড়াই। বৃষ্টির জন্য পাহাড়ের গা কোথাও কোথাও খুব পিছল হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে আছাড় খেতে হচ্ছে। পথে ঘন জঙ্গল পড়ল। আগাছায় ভর্তি। খালি কাঁটা গাছ আর জল বিছুটি। এই সাত আট হাজার ফুট উপরেও যে এত জলবিছুটি হয়, তা এই প্রথম দেখলাম। পৌনে বারটায় মোরনা গ্রামে পৌঁছেছিলাম। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, আবার রওনা হলাম। প্রায় দুটোর সময় ঘন্যাকুল পৌঁছালাম। জায়গাটা ৮৫০০ ফুট উঁচু। আজ প্রায় দু হাজার ফুট ওঠা হল।

এখানেই তাঁবু ফেলা হল। পাহাড়ের গা কেটে জায়গা বানাতে হল তাঁবুর জন্য। ছোট ছোট সমতল আয়তক্ষেত্রে এক একটা তাঁবু গাড়া হল। এখানে চাষ বাস হয়। মোরনা গ্রামের অধিবাসীরাই এখানে এসে চাষ করে।

বিকেল হয়ে এল। সূর্য আজ প্রায় সারাদিনই মেঘে ঢাকা। আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আজ আমি ডিউটি অফিসার। ডিউটি অফিসারের অনেক কাজ। মালবাহকদের কাছ থেকে মালপত্র মিলিয়ে নেওয়া, প্রাতঃকৃত্য সারবার জায়গা খুঁজে

বের করা (এই কার্যটির একটি ভদ্রগোছের নাম সর্বসম্মতিক্রমে দেওয়া হয়েছিল—'বনমালীবাবুর বাড়িতে যাওয়া'), রাত্রে কি রান্না হবে তা ঠিক করা, মালবাহকদের র‍্যাশন দেওয়া, রাতের এবং সকালের প্রার্থনা পড়ান, ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ ডিউটি অফিসারকে করতে হয়। এমন ঘনঘোর বরষায় আমি ডিউটি অফিসার হলাম। ফলে আমাকে বিলক্ষণ ভিজতে হল।

রাত্রিতেও বৃষ্টির বিরাম নেই। তাঁবু ভেদ করে জল ঢুকছে। স্লিপিং-ব্যাগের উপর টুপ টুপ করে জল পড়ছে। স্লিপিং ব্যাগ ধীরে ধীরে ভিজে উঠছে। এয়ার ম্যাট্রেস্ ভিজে গেল। সব টের পাচ্ছি। কিন্তু কি করব? অ্যালকাথিনের চাদর তাঁবুর উপরে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু যদি জল বাধা না মানে ত কি করতে পারি, চুপচাপ শুয়ে থাকা ছাড়া? তবু আমাদের ভাগ্য ভাল, আমরা অ্যালকাথিনের চাদর আই-সি-আই কোম্পানীর কাছ থেকে পেয়েছিলাম। তা নইলে এতক্ষণে তাঁবুর ভিতর বন্যা বয়ে যেত। আমার টেন্ট পার্টনার মদন। আমরা দুজনে অন্যান্যদের কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

বিশ্বদেবও পরিশ্রান্ত হয়েছে। তবুও সেই ক্লান্ত শরীরেই দিনলিপি লিখতে বসল। মোমবাতির আলো স্থির থাকে না। তাঁবুর ফোকর দিয়ে সামান্য একটু বাতাস ঢুকলেই নিবে যাবার ভয়ে সেই ক্ষীণজীবী আলোটা যেন থরথর করে কাঁপতে থাকে। তাঁবুর উপর বৃষ্টি পড়ছে। শব্দ হচ্ছে পটর পটর।

লিখতে লিখতে নানাকথা মনে আসতে লাগল বিশ্বদেবের। বিশেষ করে ট্রেনিং পিরিয়ডের দিনগুলো এখন যেন মনে ভাসতে লাগল। পর্বতারোহণে ট্রেনিং নেওয়া আর নিজেরা অভিযান সংগঠন করা—এই দুটো কাজের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। ট্রেনিং-এর কলাকৌশল সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান সে পেয়েছে। সেটা ছিল ছক বাঁধা কাজ। কিন্তু তাতে কোনরকম দায়িত্ব ছিল না, কোন ঝুঁকি ছিল না। আর এখন, প্রতি পদে প্রতিবন্ধকতা। প্রতি রাত্রে দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য দুর্ভাবনা। এ অন্য জিনিস।

ভাবতে ভাবতে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল বিশ্বদেব। হঠাৎ মাঝরাত্রে তার ঘুম ভেঙে গেল। ভীষণ শীত করছে তার। ঠক ঠক করে সে কাঁপছে। দারুণ কাঁপুনি। স্থির থাকতে পারছে না বিশ্বদেব।

তবে কি তাকে ম্যালেরিয়ায় ধরল? দেশে থাকতে আগে তার ম্যালেরিয়া হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু সে ত অনেকদিন আগেই ভাল হয়ে গিয়েছে। তবে? বিশ্বদেব কিছুতেই কাঁপুনি থামাতে পারল না। কাঁপতে কাঁপতে বুকে পেটে পিঠে ব্যথা হয়ে গেল। হাত পা ঝিনঝিন করতে লাগল। মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। বেদম কাশি শুরু হল তার। তবে কি, এই ঠাণ্ডায় নিউমোনিয়া হল তার? বেজায় ভয় পেয়ে গেল বিশ্বদেব।

"মদন, মদন!"

মদন সাড়া দিল না।

"মদন, এই মদন।"

"উঁ।" ক্ষীণস্বরে সাড়া দিল মদন।

"মদন, ডাক্তার ডাক্ শিগ্‌গির। ডাক্তারকে খবর দে। আমার খুব খারাপ লাগছে।"

মদন মিনমিন করে বলল, "ফ্লাস্কে গরম জল আছে, খেয়ে নে। ভাল লাগবে। তাতেও যদি ভাল না হোস, তখন ডাক্তারকে ডেকে আনব।"

বিশ্বদেব চটে গেল মদনের উপর। কী স্বার্থপর! আমি মরতে বসেছি, বিশ্বদেব ভাবল, আর উনি ঘুমুচ্ছেন। পাছে উঠতে হয়, তাই গরম জল খাবার উপদেশ দিচ্ছেন।

মদন বলল, "তুই স্লিপিং ব্যাগের ভিতর নাক মুখ ঢুকিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা কর বিশ্ব। যদি না পারিস, বলিস, ডাক্তারকে ডেকে আনব। তুই ঘুমো বিশ্ব। ভয় নেই, আমি জেগে আছি।"

মদনের কপালে বিশ্বদেবের হাতটা পড়তেই বিশ্বদেব চমকে উঠল। আরে বাপ্‌, এ কী! মদনের কপাল যে পুড়ে যাচ্ছে! বিশ্বদেবের হাতে যেন ছ্যাঁকা লাগল।

বিশ্বদেব ভয়-ভয় গলায় বলল, "এ কী রে মদন?"

মদন একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমারও জ্বর এসেছে বোধ হয়। খুব কাঁপুনি হচ্ছে।"

"বোধ হয় কি রে, এ ত বেশ জ্বর। আমাকে ডাকিস নি কেন?"

"ভাবলাম সেরে যাবে। এত পরিশ্রমের পর ঘুমিয়েছিস, মিছে কেন কষ্ট দিই।"

"ডাক্তারকে ডাকি, কি বলিস?"
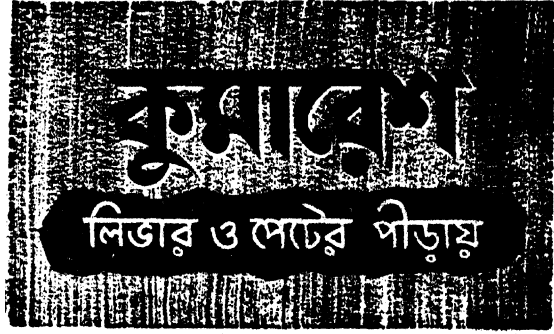
মদন শান্তভাবে বলল, "ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? এত পরিশ্রমের পর শুয়েছে বেচারা। এত রাত্রে আবার কণ্ট দিবি? তোর এখন কেমন লাগছে?"

একটু পরে বিশ্বদেব জবাব দিল, "ভাল। তোর?"

মদন বলল, "ভাল।"

দুজনের কেউই আর কথা বলল না। ভিজে স্লিপিং ব্যাগের ভিতর সমস্ত শরীর ঢুকিয়ে দিয়ে দাঁতে দাঁত চিপে কাঁপুনি রোধ করার চেণ্টা করতে লাগল। আর আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল, কখন ভোর হবে।

(ক্রমশ)

ভ্রম সংশোধন : পূর্বের একটি সংখ্যায় (১৫ই এপ্রিল) আই সি আই প্রতিষ্ঠানের নাম মুদ্রণ প্রমাদবশত আই সি এস ছাপা হইয়াছে। আই সি আই প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ নাম ইম্পিরিয়াল কেমিকাল ইন্ড্রাসট্রিজ।

পানাগড়েই যাব আমরা ঠিক করলাম। গোলোকমামার অতিথি হতে হবে। সংগে নিয়ে যেতে হবে হরিশকে।

হরিশ নামজাদা খাইয়ে। কখনো খাই-খাই করে না। তার স্বভাব তেমন না। কিন্তু একবার খেতে আরম্ভ করলে তাকে রোখা দায়। সুদর্শন চক্রবর্তীর মেয়ের বিয়েতে তার খাওয়ার গল্প এখনো অনেকে করে। ভরপেট খাওয়ার পর, আঁচাবার জন্যে উঠেছে, এমন সময় ত্রিদিব বটব্যাল বলে উঠল, "ওরে, হরিশে এমন বিষাদ কেন?"

হরিশ বলল, "যথা?"

ত্রিদিব বটব্যাল অট্টহাস্য করে উঠে বলল, "মুখটা যে ফ্যাকাশে দেখছি। গলা পর্যন্ত উঠেছে বুঝি?"

কথাটার মধ্যে একটু খোঁচা ছিল। হরিশ খেয়েছিল, যাকে বলে রাম-খাওয়া। ওরা নাকি গুনেছিল—তিপ্পান্নটা লুচি, বত্রিশটা পটল-ভাজা, পঁচিশ পিস্ মাছ, পঁয়ষট্টিটা চপ, তার উপর সের-দুই আন্দাজ মাংস; এবং এর পরেও মিষ্টান্ন-জাতীয় জিনিসপত্রও ঐ অনুপাতে। এই পরিমাণ খাওয়া দেখে অনেকের দম নাকি আটকে আসছিল। আর, সেইজন্যেই নাকি হরিশকে অমন খোঁচাটা দিল বটব্যাল।

বটব্যালের কথা শুনে হরিশ বলল, "গলা পর্যন্ত আর উঠতে দিলে কই? নিজেরাই তো গিললে!"

"পেট ভরেনি বুঝি?"

"ভরতে আর দিলে কই।"

কথায় কথা বাড়ে। কথায় কথা বাড়ল। হরিশ ফের চেপে বসল। তার রোখ চেপেছে। গেলাশের মধ্যে হাত কচলে হাত ধুয়ে নিয়েছিল এক-মেটে করে, পাতার উপর থেকে গেলাশ নামিয়ে হাত দিয়ে পাতাটা কেচে নিল। বলল, "কে আছ?"

কেউই ছিল না কাছে-ভিতে। এই ব্যাচে পরিবেশন যারা করছিল, তারা ভাঁড়ারে গিয়ে গা এলিয়ে বসে হাতের বুড়ো আঙুলে দিয়ে কপালের ঘাম কেচে কেচে ফেলছে। এমন সময় সেখানে খবর গেল।

বালতি-ভরতি লেডি-ক্যানিং এল। বললে বিশ্বাস করা দায়, ভরপেটে বিরাশিটা লেডিকিনি নির্বিবাদে গিলে ফেলল হরিশ।

বটব্যালের চক্ষু ছানাবড়া। হাঁ করে চেয়ে চেয়ে সে এই মর্মান্তিক ঘটনাটা দেখল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "বিষাদে এবার হরিশ এল। এবার ক্ষান্ত দাও।"

হরিশ ক্ষান্ত দিল।

ত্রিদিব বটব্যাল একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থেকে অবশেষে মন্তব্য করল, "অতগুলো গোল্লা গেল কোথায়? পেটে নিশ্চয় জায়গা ছিল না। তোর হাড় নিশ্চয় ফাঁপা, তা না হলে—"

হরিশ হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এবার আঁচানোর পারমিশন দিচ্ছিস তো?"

অনুমতি পেয়ে হরিশ আঁচিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তার আক্ষেপ নাকি যায়নি। বটব্যালকে টিট করতে সে নাকি পারেনি ঠিকমত। বিরাশিটাতেই ক্ষান্ত দেওয়ার ইচ্ছে নাকি তার ছিল না, কিন্তু তা[র] পাতের গোড়ায় একপাল মানুষ যদি হুমড়ি খেয়ে পড়ে কেবলই বলতে থাকে "আর না, আর না", তাহলে অগত্যা ক্ষান্ত দিতেই হয়।

অনুমতি পেয়ে হরিশ আঁচিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তার আক্ষেপ নাকি যায় নি। বটব্যালকে টিট করতে সে নাকি পারে নি ঠিক মত। বিরাশিটাতেই ক্ষান্ত দেওয়ার ইচ্ছে নাকি তার ছিল না, কিন্তু তার পাতের গোড়ায় এক পাল মানুষ যদি হুমড়ি খেয়ে পড়ে কেবলই বলতে থাকে "আর না, আর না" তাহলে অগত্যা ক্ষান্ত দিতেই হয়।

কিন্তু বটব্যালদের তরফ থেকেও কি[ছু] বলবার আছে। তাদের বলার কথা এই যে সুদর্শন চক্রবর্তী এমন কিছু পয়সাওয়ালা লোক না, মেয়ের বিয়ে দিতে বসেছেন ব[টে] কিন্তু দেউলে হতে বসেন নি। ব্যাপারে বাড়িতে একটি প্রাণীই যদি অমন টানে, ... হলে—কেবল টানাটানি পড়ে যাওয়াই না—তাহলে লোকটার লালবাতি জ্বালতে কতক্ষণ। পরিবেশন যারা করেছে তারা ... দিব্যি মজাই করেছে, ওদিকে চক্রবর্তী মশাই ছুটোছুটি আরম্ভ করেছেন তা ব... সকলে জানে না। চাপা গলায় তিনি কেবল বলছেন, "একটা মানুষ ক্ষেপেছে ব[লে] সকলেই কি পাগল হলে? শেষপর্যন্ত আমাকেও কি পাগল করবে? বরযাত্রী...

মধ্যে এখনো যে অনেক বাকি। হাত টেনে চলো, হাত টেনে চলো।"

বটব্যালরা তো মাথা নীচু করে গপাগপ গিলছিল না, তাদের নজর ছিল চারদিকেই, তাদের কানও ছিল চারদিকে। সেইজন্যেই বাধ্য হয়ে তারা বাধা দিয়েছিল।

পরে কারণটা অবশ্য হরিশও জানতে পারে।

এই ব্যাপার নিয়ে অনেকদিন আক্ষেপ করেছে হরিশ্চন্দ্র। সে বলে, "খেয়ে আর আনন্দ নেই। ভাবছি, খাওয়াই ছেড়ে দেব। প্রাণ ঢেলে খাওয়াতে পারে, এমন মানুষ আর নেই। সবাই কঞ্জুষ। দিলওলা লোকই যখন নেই, দিল খুলে আর খাওয়া যাবে কেমন করে?"

হরিশের এ বিষাদে আমরা সকলেই তাকে সমবেদনা জানিয়েছি। সমবেদনা জানাতে কোনো খর্চা পড়েনা বলেই এ-ব্যাপারে আমরা মুক্তহস্ত ছিলাম।

নিমন্ত্রণ এখনো সে পায়, এখনো সে খায়। একাই পাঁচটা লোকের খাওয়া খেয়ে এসে চুপ করে যখন বসে, তখন জিজ্ঞাসা করি, "কেমন হল?"

একটু হাসে হরিশ, বলে, "কোয়ার্টার ফাইনাল।"

"মানে?"

"মানে কোয়ার্টার ফাইনাল। সিকি। যা খেলে পেট ভরত, তার চারভাগের একভাগ খেলাম।"

একটু চুপ করে থাকে হরিশ, বলে, "তেমন লোক নেই রে আর; খাওয়াতে জানে, খাইয়ে আনন্দ পায় এমন লোক একালে মহার্ঘ।"

হরিশের কঠিন বাংলা শুনে বুঝতে পারি, ওর মনের কোথাও একটা কঠিন বেদনা আছে।

গোপেন চুপচাপ বসে নস্যি টানছিল, হঠাৎ সে বলে উঠল, "আছে।"

বটব্যাল জিজ্ঞাসা করল, "কি রে, কি আছে?"

গোপেন বলল, "তেমন লোক। আমার গোলোকমামা। খাইয়েই যার আনন্দ।"

সকলের কাছেই নিজের মামা একজন হিরো, সেইজন্যে গোপেনের কথায় প্রথমে আমরা বিশেষ কান দিই নি। কিন্তু ক্রমশ তার মামার রহস্য সে আমাদের কাছে খুলে-খুলে বলতে লাগল। শুনে-শুনে আমাদেরও কেমন বিশ্বাস হল— গোলোকমামা সত্যিই একটি রহস্য। অনেকটা গোলকধাঁধার মতই।

একদিন বললাম, "চ, যাই।"

নস্যির ডিবেটা পকেট থেকে বার করতে করতে গোপেন বলল, "তোরা হাসবি। সত্যিই, মামাটা একটা গোলকধাঁধা। বাইরেটা দেখে বুঝবার উপায় নেই। খুব সিম্‌পল্‌, খুব গেঁয়ো,, কিন্তু দিলটা—"

বটব্যাল বলল, "বুঝেছি। ব্লাফ। বলতে চাও যে, মামাটাকে দেখতে একটা পানা-পুকুর, কিন্তু তার দিলটা প্যাসিফিক ওশন?"

টিপটা টানতে গিয়েই গোপেন থেমে গেল, বলল, "এগ্‌জ্যাক্টলি। ঠিক ধরেছিস।"

হেরম্ব হাসছিল, বলে উঠল, "চেহারাটা একটা ডোবা-বিশেষ, কিন্তু হৃদয়ে নেমে পড়লেই ডুবে যেতে হবে, এই তো?"

"ঠিক। এই।" গোপেন স্বীকার করল।

আমরা সকলে গোপেনের মামার বাড়িতে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলাম, কিন্তু গোপেন গড়িমসি করতে লাগল। তার এ আচরণের কারণ জানার জন্যে যখন তাকে রীতিমত চেপে ধরা হল, তখন সে বলে উঠল, "লজ্জা করে।"

গুরুগম্ভীর গলায় বটব্যাল বলে উঠল, "লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ; কিন্তু মনে রেখো গোপেন, তুমি পুরুষ। কিসের লজ্জা, কেন লজ্জা?"

গোপেন বলল, "একেবারেই গেঁয়ো, নেহাতই গেঁয়ো। তোরা সব শহরের ফিটবাবু। তোরা ভাববি কি আমাকে?"

তার মামার বৃত্তান্ত জানার পর আমরা ঠিক করলাম হরিশকে নিয়ে যেতে হবে, গোলকমামার অতিথি হতে হবে। যাব আমরা পানাগড়ে। গোপেনের কথা যদি সত্যি হয়, তবে সত্যিই এমন মানুষ লাখে এক নেই, এবং এইখানেই আমাদের হরিশ তার আক্ষেপ মেটাতে পারবে। তাকে আর কোয়ার্টার ফাইনাল নয়, সেমিফাইনালও নয়, একেবারে চূড়ান্ত খাওয়া খাওয়ানো যাবে।
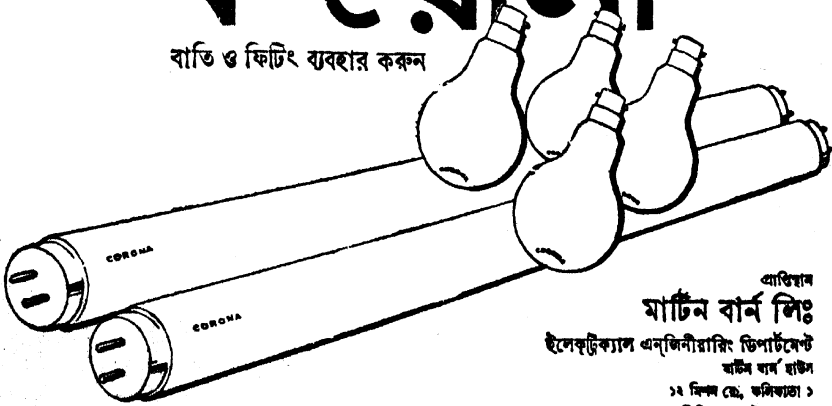
হেরম্ব বলল, "তা যাবে। কিন্তু যা শুনেছি, তার সিকি সত্যি হলেও হরিশ হয়তো আর ফিরে আসতে চাইবে না।"

গোপেন গর্ব করে বলল, "বেশ তো। মামা তাতে খুশিই হবে। এমন অতিথি পেলে মামা ধন্য হয়ে যাবে।"

এক অ্যামেরিকান সাহেবের গল্প বলল গোপেন। সাহেবের নাম মিস্টার ওয়াকার। গোলোকমামার গ্রেট ফ্রেন্ড। গে'য়ো লোক গোলোকমামা, একবর্ণ ইংরেজি জানেন না। তার উপর, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছে গোপেন, গোলোকমামা কানে কম শোনেন। এ অবস্থায়ও ঐ সাহেবের সংগে মামার কী ভাব। দুজনে পাশাপাশি বসে কত গল্প যে করে, কত হাসাহাসি যে করে তার ঠিক নেই। কি ভাষায় তাদের কথা হয়, কি কথা মামার কানে ঢোকে—কেউ জানে না। পানাগড়ের মিলিটারি ক্যাম্প থেকে দশ মাইল জিপ হাঁকিয়ে রোজ এই গাঁয়ে—পাঁচরুখীতে—আসা চাই মিস্টার ওয়াকারের। বসা চাই তে'তুল গাছের গু'ড়ির উপর। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা ধরে আলাপ করাও চাইই। তা না হলে সাহেবের বুঝি হজম হয় না। কথা সাংগ করে যখন ওয়াকার জিপে ওঠে, গোলকমামা কিছু-না-কিছু তুলে দেয় জিপে।

"কিছু-না-কিছু মানে?"

"কোনোদিন আমের ঝুড়ি, কোনোদিন পাকা জ্যাকফ্রুট, কোনোদিন মুরগি, কোনোদিন-বা একটা জ্যান্ত পাঁঠা।"

বটব্যাল বলল, "বুঝেছি। কিছু মনে করিসনে, তোর মামাটাই হচ্ছে আস্ত একটা জ্যান্ত পাঁঠা। আর, এইজন্যেই সেখানে আমাদের নিয়ে যেতে তোর এত লজ্জা।"

গোপেন স্বীকার করল, বলল, "ঠিক। আমাদেরও তাই ধারণা। পাঁঠাই যদি না হবে, লোককে এত পাঁঠা খাওয়াবার শখ হবে কেন। একালের আমাদের চোখে তিনি সত্যিই—"

হরিশ উৎসাহিত হয়ে উঠেছে, বলল, "যাব।"

এতদিন এত কথা শুনেও হরিশ কোনো মন্তব্য করেনি, কিন্তু এবার সে তেতেছে, বলল, "যাব।"

আমরাও ঠিক করলাম—যাব। হরিশকে নিয়েই যাব। আস্ত পাঁঠা খাওয়াব ওকে।

হরিশ বলল, "সব কথা সত্যি হলে গোলোকমামা একজন মহাপুরুষ। আমাদের মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের কাছে সব মহাপুরুষই পাঁঠা।"

হেরম্ব বলল, "যেমন সব মামাই মহাপুরুষ।"

হরিশ বলল, "যাব। পুরো একটি মাস থাকব। কাকে খাওয়া বলে দেখাব। কাকে খাওয়া বলে দেখবি।"

গোপেন বলল, "মামা তাহলে তোমাকে মাথার মুকুট করে রাখবে।"

কিন্তু গোলোকমামা এত করেন কি করে তাই-ই জানা হয় নি। জিজ্ঞাসা করাতে গোপেন বলল, "বিস্তর টাকা। মস্ত মস্ত শালবন। এক-একটা শালবন থেকে আয় কত জানিস?"

জানি নে। জানতে চাইও নে। আয় যত বেশি হয় ততই ভালো। ততই আমাদের পোয়াবারো। ততই তাঁর অতিথি হবার আগ্রহ জাগবে আমাদের, ততই উৎফুল্ল হবে হরিশচন্দ্র।

সব শুনে হরিশ বলল, "এ তোদের সুদর্শন চক্রবর্তী নয়, এ'র হাতে আছে সুদর্শন চক্র।"

"সেটা আবার কি?"

"সুদর্শন চক্র চেনো না। যে জিনিস চক্রের মত গোলাকার, এবং যা দেখতে নয়ন-মনোহর।"

হরিশের এই কঠিন বাংলা শুনে আমরা বুঝতে পারলাম তার মনে কঠিন আনন্দ এসে গিয়েছে।

বললাম, "সহজ বাংলায় বলো।"

শুন্যে ঝুন দিয়ে হরিশ বলল, "টাকা।"

আর বেশি কথা না। আমরা দল বে'ধে পানাগড়ে এসে নামলাম। শীতের দুপুর। রোদ ঝিলমিল করছে। কিন্তু হাওয়ার বড় ধার। শীতটা কনকনে।

পাঁচ বন্ধুতে স্টেশনে পা দিয়েই চারদিকে তাকালাম। ঐ। ঐ-যে দূর থেকে কে যেন হাত ইশারা করে আমাদের ডাকছে।

গোপেন বলল, "ঐ। নিশ্চয় মিস্টার ওয়াকার।"

আমরা এগিয়ে চললাম। তিনিও এগিয়ে আসছেন। মাঝপথে মিলন ঘটে গেল। মিলিটারি চেহারার একটা শক্ত সাহেব।

সাহেব নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, "আয়্যাম ব্রাউন ওয়াকার। মিস্টার গোলোক ইজ মাই ফ্রেন্ড। প্লিজ কাম টু মাই জিপ।"

প্রথম পরীক্ষায় পাস করলেন গোলোকমামা। তিনি জানিয়েছিলেন, 'দল বে'ধে এস, কিছু কষ্ট হবে না। আমার বন্ধু ওয়াকার তার গাড়ি নিয়ে তৈরি থাকবে।'

পানাগড়ের রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে, হাওয়ায় হাসি ছড়িয়ে, আনন্দে মনপ্রাণ ভরে নিতে নিতে, হু হু শব্দে আমরা ছুটে চললাম পাঁচরুখীর দিকে। শালের অরণ্য ভেদ করে, শুকনো পাতার উপর জিপের চাকা চালিয়ে সব-কিছু যেন চুরমার করতে করতে চললাম আমরা।

হরিশ বলল, "আই ফীল হাংরি।"

সহযাত্রী হচ্ছে সাহেব, হরিশ তাই হয়তো তার মনোভাবটা জানাল ইংরেজিতে।

আমরাও ইংরেজিতে উত্তর দিলাম, "সরি, সরি।"

কিন্তু দুঃখের অবসান যে অচিরেই হবে, সেবিষয়ে আশ্বাস দিল গোপেন। এসে গেলাম বলে। দশ মাইল তো রাস্তা। জিপ চলছেও তো চল্লিশ মাইল স্পীডে। তা হলে ক' মিনিটে পে'ছানো যাবে?

হরিশ বলল, "এখন অংক ভালো লাগছে না। পেটে ফায়ার জবলছে।"

আশ্চর্য। সত্যিই পে'ছে গেলাম চট করে। একটা পাক খেয়েই ঝাঁকি দিয়ে যখন জিপ থামল, দেখলাম—একটা পাকাবাড়ির গায়ে আমরা দাঁড়িয়ে। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে একটি লোক, গলায়-মাথায় কম্‌ফর্টার জড়ানো।

লোকটা হাত জোড় করে এগিয়ে এল। ছোট একটা কাপড় পরনে—হাঁটু দুটো খোলা, পুরোহাতার একটা নীল রঙের খসখসে উলের জামা গায়ে, কম্‌ফর্টার দিয়ে গলা আর মাথা জড়ানো। হিলহিলে লোকটা, বিশ্রীভাবে হেসে বলল, "আসুন।"

প্রত্যেকের হাত ধরে নামাল। পথে কোনো কষ্ট হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে লাগল প্রত্যেককে।

আমরা নেমে দাঁড়ালাম। চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম বাড়িটা। মস্ত বাড়ি।

গোপেনকে বললাম, "মামা কই?"

গোপেন আমার হাত ধরে লোকটার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, "মামা, এই আমার বন্ধু। অপূর্ব।"

আমার দিকে চেয়ে বলল, "ইনি গোলোক মামা।"

অপূর্ব। অপূর্ব দৃশ্য। কী চেহারা—মরি মরি। কী সাজ— হরি হরি। এ কোথায় আমাদের নিয়ে এল গোপেন্দ্রনাথ। সত্যিই যেন প্যাসিফিক ওশানে পড়েছি বলে মনে হল। চেয়ে দেখলাম, প্রত্যেকের মুখেই সমান বিস্ময়। সকলেই সমান হকচকিয়েছে।

ওদিকে ওয়াকার সাহেব ইঞ্জিনের ডালা তুলে যন্ত্রপাতি পরীক্ষায় লেগে গিয়েছেন।

গোলোকমামা ব্যস্তবিব্রত হয়ে গিয়েছেন। আমাদের হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলেন। ভিতরে যাওয়ার জন্যে যেন কাকুতি-মিনতি করছেন।

গোপেন ইশারা করল, আমরা এগিয়ে চললাম।

বারান্দায় পাঁচটা বালতি পর পর সাজানো। পাঁচটা ঘটি, পাঁচটা জলচৌকি, পাঁচটা গামছা।

"হাতমুখ ধুয়ে নাও সকলে। ঠান্ডা হয়ে নাও। কি ধকল গিয়েছে গাড়িতে—একবার রেল, একবার মোটর। এ কি সোজা কষ্ট!"

কথা বলছেন আর ঘটি ভরে ভরে জল তুলে দিচ্ছেন সকলের হাতে। উঃ, জলে হাত দেওয়া মাত্র শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। কী ঠান্ডা জল!

বুঝতে পারলাম, শুরুই যার এমন শেষ পর্যন্ত তা যে কী দাঁড়াবে! সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। এবং দেখতে লাগলাম গোলোকমামাকে মানুষটার যাবতীয় শীত বুঝি ঊর্ধাঙ্গে। খাটো এক ফালি কাপড় পরা, আর যত ভারি মাল সবই কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত চাপানো।

মস্ত একটা হল-ঘরে নিয়ে যাওয়া হল আমাদের। পাঁচটা খাট পাতা, খাটের পাশে পাঁচটা চৌপায়া। ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন গোলোকমামা। প্রত্যেকের কাছে গিয়ে প্রত্যেকের হাত চেপে ধরছেন আর জানাচ্ছেন যেন কোনো ত্রুটি আমরা না ধরি। এদিকে ইনি ব্যস্ত, আর ওদিকে অন্দরেও যে ব্যস্ততার হিড়িক পড়েছে তা স্পষ্টই আন্দাজ করা যাচ্ছে। চুড়ির টুংটাং, মলের ঝনঝনানি, চাবির তোড়া পিঠে পড়ার শব্দ —সবই আসছে জানলা ভেদ করে।

আমরা এ ওর মুখচাওয়াচাওয়ি করছি। গোলোকমামা ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন, আমরাও দল বেঁধে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, মিস্টার ওয়াকার উঠোনে সিঁড়ির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, গোলোকমামা বারান্দায় উবু হয়ে বসেছেন। দুজনে অনর্গল কি-যেন কথা বলে চলেছেন।

গোপেন বলল, "মামা কিন্তু কানে কম শোনে, মনে রেখ।"

বললাম "তবে এত হাসছেন কি শুনে?"

"ওদের আঁতাত এতই যে, আঁতের কথা বুঝতে ভাষার দরকার হয় না।"

হঠাৎ গোলোকমামা উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়লেন, "বিরিঞ্চি, বাদামী পাঁঠাটা গাড়িতে তুলে দে।"

"বাদামী পাঁঠা?" গোপেনের দিকে তাকালাম।

গোপেন সংক্ষেপে বলল, "রং।"

ওদিকে হাত কচলে পরিষ্কার বাংলায় গোলোকমামা বললেন, "দেখ ওয়াকার কিছু মনে কোরো না। আমি নিজে হাতে তুলে দিতে পারলাম না। ঘরে অতিথি, তাদের সৎকার করতে হবে। নইলে—"

ওয়াকার নিখুঁত ইংরাজিতে জানাল, অতিথি সৎকারই তো ফার্স্ট ডিউটি একজন গৃহস্থের। কিছু মাইনড্ সে করছে না। এখন গোলোক গিয়ে তার বিজনেসে মন দিক।

গোলোক মন দিতে এলেন বিজনেসে। আমাদের ঠেলে নিয়ে চললেন পাশের ঘরে।

হরিশ যে হাংরি তা ভুলেই গিয়েছিলাম, এবার তাকে নিয়ে পড়লাম সকলে। বললাম, "চল হরিশ, চল হরিশ।"

কম্ফর্টার ভেদ করে কিছু শব্দ গোলোকমামার কালা-কানে ঢুকে থাকবে। তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কি কি?"

গোপেন এগিয়ে গিয়ে মামার কানের কাছে মুখ নিয়ে হরিশকে দেখিয়ে বলল, "ওর বেজায় খিদে পেয়েছে।"
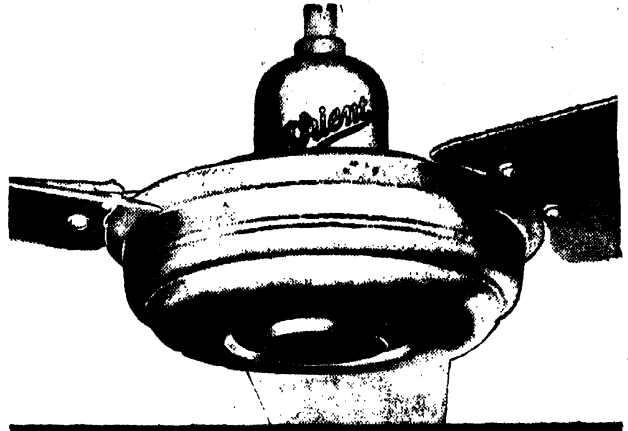
মামা জিভ কাটলেন, কপালে আলগোছে
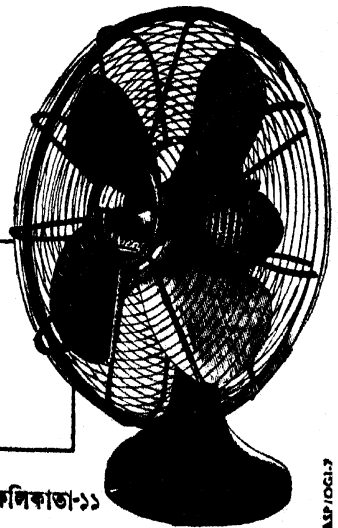
করাঘাত করে বললেন, "আমার নরক হোক। অতিথি হবে ক্ষুধার্ত? ছি ছি! অতিথিকে ক্ষিদে পেতে দেব কেন। গোলোক রায় তা কখনো দেয় নি। আজ তার অদৃষ্টে এ কি ঘটল।"

কথাটা নাকি মিথ্যে না। গোপেনই বলেছে। গোলোক রায় কাউকে ক্ষিদে পাওয়ার সুযোগ নাকি কখনো দেন নি। সব সময় অতিথির পেট ভরাট রাখেন।

হাহাকার করতে করতে তিনি আমাদের নিয়ে এলেন একটা চৌকো ঘরে। পাঁচটা আসন পাতা, পাঁচটা গেলাশ, পাঁচটা থালা—প্রত্যেকটার সাইজ পূর্ণিমার চাঁদের মত, প্রত্যেক থালাকে ঘেরাও করে বাটি সাজানো, বাটিগুলো গুনতিতে পাঁচের অনেক বেশি। তদারক করছেন গোলোকমামা।

বেলা একটা। আয়োজনের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম। বার বার হাত উল্টে ঘড়ি দেখতে লাগলাম। আর, একটা বাটির দিকে চেয়ে দেখি, একটা প্রকাণ্ড মাছ আমার দিকে যেন জ্বলজ্বল করে তাকাচ্ছে। মাছের মুড়োই ওই, তবে মাছটা কত বড়?

"পুকুরগুলো চষে ফেললাম। এর চেয়ে বড় মাছ পেলামই না। পোনা ছেড়েছি গত বর্ষায়। আট-সের ন-সের ওজন পর্যন্ত বেড়েছে এর মধ্যে। যদি মাস খানেক থাকো, আধমণী মাছ খাওয়াব।" গোলোক মামা বলে যেতে লাগলেন।

তিনি বসেছেন হরিশের পাশে। হরিশ ক্ষুধার্ত, এই খবর শোনার পর থেকে মামার আপসোসের অন্ত নেই। তাঁর পুরো নজরের অর্ধেকটাই হস্তগত করেছে হরিশ। এতে আমাদের কোনো আপসোস নেই, হরিশের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক—আমাদেরও সেই ইচ্ছে।

অনেকগুলো বাটি সাফ করতে হবে। মাংস এ বেলা হয়নি, তাই মাছের আইটেমই অনেক—চার রকম। তা ছাড়া, থালায় ভাতের পাশে নুনের গায়ে চারটে করে মাছভাজা ও তিনটে করে মাছের চপ।

হরিশ ভাজাগুলো শেষ করা মাত্র মামা দৌড়ে গিয়ে এক মুঠো ভাজা এনে হরিশের পাতে ফেলে দিয়ে বললেন, "কি পাপ! কি পাতক। অতিথি থাকবে ক্ষুধার্ত!"

আমাদের পাতে আছে বলে আমাদের বুঝি এখনি দিলেন না।

একটা-কিছু শেষ হওয়া মাত্র দৌড়ে গিয়ে ভিতর থেকে নিয়ে এসে আবার বাটি ভরে দিচ্ছেন মামা।

হরিশ খেয়ে চলেছে। আমরা তার খাওয়া দেখে তৃপ্তি পেয়ে চলেছি।

অবশেষে মুড়োটা ধরল হরিশ। বাগিয়েই ধরল। কিন্তু বাগ মানানো শক্ত। মনে হচ্ছে ওই মুড়োই বুঝি আমাদের খেয়ে ফেলতে পারে।

হরিশ মৃদু হেসে বলল, "আপনার পুকুরের মাছের স্বাস্থ্য কিন্তু খুব ভালো।"

মামা কান পেতে বললেন, "কি?"

গোপনে চেঁচিয়ে বলল, "মাছের স্বাস্থ্যের কথা বলছে।"

গর্বের সঙ্গে হাসলেন গোলোকমামা, বললেন, "চমৎকার স্বাস্থ্য। বিশেষ করে শীতকাল। এক মাস থাকো তোমরা, তোমাদের চেহারাও বদলে যাবে। পাঁচরুখী বেশ স্বাস্থ্যকর জায়গা।"

রক্ষণশীল বাড়ি। মেয়েরা তাই কেউ আসছেন না।

ভিতর থেকে তাঁরা এগিয়ে দিচ্ছেন। গোলোকমামা দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছেন, দৌড়ে দৌড়ে নিয়ে আসছেন।

হরিশ মন্দ খেলো না। সুদর্শন চক্রবর্তীর বাড়িতে যা খেয়েছিল, তার চেয়ে সম্ভবত একটু বেশিই।

দই-মিষ্টি এল। হরিশ তাও সমান তাল রেখে খেয়ে গেল।

গোলোকমামা উবু হয়ে হাঁটু বা'র করে তার পাশে বসেছেন, একবার আলগোছে তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "খুব আনন্দ পাচ্ছি। এমন খাইয়ে-লোক পেলেই-না অতিথির আনন্দ। গোপেনটা একটা গাধা। আগে নিয়ে আসতে হয় না?"

মামার সঙ্গে যোগ দিয়ে আমরাও গোপনকে গালাগালি দিতে লাগলাম।

হরিশ একটা ঢেকুর তুলল। ঢেকুর তুলেই আবার একটু জল খেল। হয়তো কিছু উঠে আসছিল—নামিয়ে দিল।

নীট খেয়েছে হরিশ। পাতে কিছু নেই। কেবল স্তূপ হয়ে পড়ে আছে এক গুচ্ছ কাঁটা।

গোলোকমামার বড় ভালো লেগে গিয়েছে হরিশকে। এমন রাজযোটক দেখা যায় না। এমন খাওয়াতে-জানা মানুষের সঙ্গে এমন খাইয়ে-মানুষের যোগ।

খেয়ে উঠতে বেলা দুটো বেজে গেল। খাদ্যের পরিমাণ হিসেব করলে সময় এমন-কিছু বেশি লাগেনি।

আমরা আঁচিয়ে নিয়ে ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করার জন্যে টান-টান হলাম।

হরিশ বলল, "গ্র্যান্ড।"

লেপ দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে নিরে সকলে শুয়ে আছি। ক দিন থাকা যায় এখানে সেই কথা নিয়ে গবেষণা করছি। মাঝে-মাঝেই গোলোকমামা এসে আমাদের খোঁজখবর নিয়ে যাচ্ছেন।

বেলা সাড়ে চারটের সময় গোলোকমামা বেশ যেন কলরব শুরু করলেন। কাঁসার বগি থালা এনে এক-একটা চৌপায়ার উপর রাখতে লাগলেন।

উঁকি দিয়ে দেখি—আঙুর নাশপাতি আখরোট, আর আম! শীতকালে আম?

"গরমকালে আম তো সকলেই খায় বাবা।" গোলোকমামা বললেন, "শীতকালে আম খেলে গরিব মামাকে মনে থাকবে।"

একটু হাসলাম। চেয়ে দেখলাম, হরিশ কোনো কথা না বলে খেতে আরম্ভ করেছে। হরিশের খাওয়া দেখে মামার চোখ-দুটো আনন্দে যেন জ্বলজ্বল করে উঠেছে। দৌড়ে চলে গেলেন তিনি, একটা মস্ত জামবাটি নিয়ে ফিরে এলেন। কাটা আমে ভরতি ছিল জামবাটিটা, হরিশের থালার উপর সবটা ঢেলে দিলেন।

এবার যেন দৌড়ে না, আনন্দে নাচতে নাচতে তিনি চলে গেলেন অন্দরে। ফিরে এলেন দু হাতে দুটো মস্ত বাটি নিয়ে। হরিশের কাছে একটা, আমার কাছে একটা দিয়েই চলে গেলেন, আরও তিনটে এনে ওদের তিনজনকে দিলেন।

হরিশ মামার মুখের দিকে চাইতেই মামা বললেন, "রাবড়ি।"

হরিশ একটু হাসল, আমাদের মুখের দিকে চাইল।

বলা বাহুল্য, আমরা সবটা খেতে পারিনি, কিন্তু হরিশ চেটেমুটে খেয়ে নিল। থালা সাফ, বাটি সাফ।

আর-একটু নেবার জন্যে মামা পিড়াপিড়ি করলেন। হরিশ হেসে বলল, "থাক্, রাত্রে তো আবার খেতে হবে।"

"তা বইকি, তা বইকি।" গোলোকমামা আনন্দে সায় দিয়ে উঠলেন।

ঘরে ভীষণ শীত। এত খাওয়ার পর নড়াচড়া করাও দরকার। বাইরে বিকেলের নিস্তেজ রোদ এখনো গাছের পাতায়-পাতায় নাচানাচি করছে।
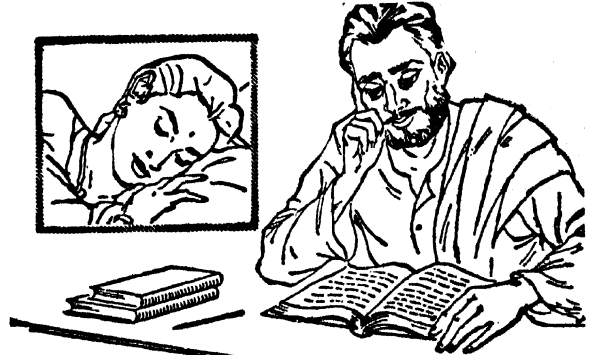
আমরা বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ত্রিভঙ্গ-মুরারি একটি খেজুর গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল হরিশ। গাছের গলায় হাঁড়ি ঝুলছে। হরিশ একবার তাকাল সেদিকে। দূর থেকে গোলোকমামা বুঝি তা লক্ষ্য করেছেন, কাছে চলে এলেন, বললেন, "কেমন লাগে খেজুরের রস?"

হরিশ বলল, "মন্দ কি। কিন্তু এখন না।"

হাত ইশারা করে গোপেন বুঝিয়ে দিল—এখন না।

গোলোকমামা হেসে বললেন, "এখন কেন? এ তো সকালে খাওয়ার জিনিস।"

আমরা একটু পায়চারি করতে করতেই হুট করে অন্ধকার নেমে এল চারধার থেকে। ঠান্ডাও যেন নেমে এল জমাট হয়ে। ঘরে পালালাম।

ঘরে ঝাড়লণ্ঠনে আলো জ্বলছে ঝিলমিল করে। চার দেয়ালে চারটে দেয়ালগিরি জ্বলছে।

বসে গল্প করছি, এমন সময় চা এল। শহুরে লোক আমরা, চা না হলে আমাদের যে চলে না, এ খেয়াল গোলোকমামার যে আছে তা তিনি বার-বার করে বলতে লাগলেন। চায়ের অনুপান হিসেবে দেশী ও বিদেশী খাবার এল—ক্র্যাকার বিস্কুট—মাখন দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় আঁটা, স্যান্ড-উইচ; তার সঙ্গে সিংগাড়া কচুরি নিমকি।

গোলোকমামা বললেন, "ওয়াকার না থাকলে কি আমি এসব পারতাম! সাচ্চা বন্ধু আমার। সেই সব জোগাড় করে এনে দিয়েছে।"

তা তো দিয়েছে, কিন্তু আমরা করি কি! সব খাবারের দিকে চেয়ে কেমন-যেন ভয় পেতে লাগলাম।

হেরম্ব বলল "আমি ভাই লিকুইড টী খাব। নো বিস্কিট নো স্যান্ডউইচ, নো—"

"কি বলে ও?" গোলোকমামা গোপেনের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

গোপেন কোনো উত্তর দিল না।

রাত নটা নাগাদ আমাদের আবার ডাক পড়ল। আবার সেই দুপুরের মত পাত পেড়ে খেতে বসার ডাক। গড়িমসি করে আমরা সকলে গেলাম। আবার সেই পঞ্চ-ব্যঞ্জন। মাছের কালিয়া, মাছের পাতুড়ি, মাছের ঝাল, মাছের ঝোল, এবং নিরামিষও নানাবিধ।

আমরা তো হাল ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু হরিশ এখনো লড়ছে। লড়ছে বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ছে। শেষ পাতে মিষ্টি। রাজভোগ ক্ষিরের চপ, বর্ধমানের সীতাভোগ ও মিহিদানা, আর পাঁচরখীর নামকরা মিষ্টি—ল্যাংচা।

মামার নজর এখন পুরোটাই হরিশের উপর। তিনি তার পাশে উবু হয়ে বসে তার পিঠে হাত বুলোচ্ছেন আর বলছেন—"খেয়ে নাও।"

হরিশের পাশেই আমি, একটা ল্যাংচা মুখে পুরতে পুরতে হরিশ আমাকে বলল, "একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে যেন!"

গোলোকমামার কানে কথাটা পৌঁছল না, কিন্তু তিনি যেন শুনেছেন! লাফ দিয়ে উঠে দৌড়ে চলে গেলেন। ফিরে এলেন এক থালা ল্যাংচা নিয়ে—ঢেলে দিলেন হরিশের পাতে। তিনি হয়তো ভেবেছেন হরিশ ল্যাংচার সুখ্যাতি করেছে।

সর্বনাশ! হরিশ চোখ-দুটো ছানাবড়ার মত করে তার পাতের ল্যাংচাগুলির দিকে তাকাল।

চেষ্টা সে করেছিল, কিন্তু কৃতকার্য হল না। সবগুলো শেষ করতে পারল না। পাতে আমাদের তো পড়ে রইলই, হরিশেরও। সেজন্য মামার আক্ষেপের যেন আর শেষ নেই। তাঁর কেবল আতঙ্ক—পেট বুঝি আমাদের ভরল না।

শীত বটে খুবই, তবু একটু হাঁটাচলা করার জন্যে আমরা বেরলাম। গায়ে আলোয়ান আচ্ছা করে জড়িয়ে নিয়ে পুকুরধারে গেলাম। চমৎকার পুকুর, চারদিকটাই বেশ সাফ করা, আর ধারে ধারে গাঁদার গাছে গোলগোল ফুল। চাঁদের আলোয় আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে।

হরিশ হন হন করে একটু হেঁটেই একটু থামল, তার কাছে যেতেই সে বলল, "এটা নিয়মই। স্বাস্থ্যের জন্যেই দরকার। আফটার সাপার ওয়াক এ মাইল।"

কিছুটা হাঁটার পর হরিশ বলল, "একটু যেন অম্বল মনে হচ্ছে। একটু সোডার দরকার হবে।"

বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা খুব হাল্কা

না। হরিশ যখন কাবু হয়েছে, এবং তা প্রায় কবুল করতেই বাধ্য হয়েছে, তখন ব্যাপার নিশ্চয় গুরুতর। বললাম, "বেশ করে হেঁটে নেওয়া যাক।"

ঘণ্টাখানেক নৈশভ্রমণের পর ঠাণ্ডায় হিম হয়ে আমরা ঘরে পেঁাছে দেখি গোলোকমামা আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। আরো দেখি, প্রত্যেকটা চৌপায়ার উপর কি-যেন ঢাকা দেওয়া।

মামা বললেন, "সবার মাথার কাছে ল্যাংচা রইল। মাঝরাতে যদি খিদে পায়। কিছুই তোমরা খাওনি, সব পাতে ফেলে উঠে পড়েছ।"

কোনো প্রতিবাদ করলাম না আমরা। কোনো কথাই বললাম না। চুপ করে মামার প্রস্তাব হজম করলাম।

দরজা টেনে দিয়ে মামা যেতে-যেতে বললেন, "খিল দিতে হবে না। এখানে লোক থাকবে। তোমাদের ঘুমোবার আগে বড় আলোটা নিবিয়ে দেবে।"

এর পর আমরা কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনে। বেশ টানা ঘুম দিচ্ছিলাম মনে হয়। হঠাৎ ঘুম ভাঙল গোলোকমামার ডাকাডাকিতে।

জেগে দেখি, ঝাড় আলোটা নেবানো। চার দেয়ালে জ্বলছে চারটে দেয়ালগিরি।

মামা বলছেন, "ও বাবা গোপেন, ও বাবা হরিশ। ওঠো বাবা। রস ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। খেয়ে নাও। ভোর হয়েছে।"

দেখলাম, অস্পষ্ট আলোতেও স্পষ্টই দেখলাম—গলায় দড়ি বাঁধা পাঁচটা মাটির কলসি পাঁচটা খাটের পায়ের কাছে রাখা।

মামা বললেন, "খেজুরের রসের কথা বলছিলে। টাটকা রস। দেরি কোরোনা, রস বাসী হয়ে যাবে।"

ঘর থেকে মামা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লেপের ভিতর থেকে হেরম্ব বলে উঠল, "পালাও। আর দেরি না, তল্পি গুটাও।"

হেরম্বের কথায় কেউ আপত্তি করল না। আপত্তি তো করলই না, বরঞ্চ যেন সায়ই দিল। সকলেই, এমনকি হরিশও।

হরিশ হেরেও হার স্বীকার করতে বুঝি চায় না। বলল, "পালানোই ভালো। বড্ড ট্যাক্স করা হচ্ছে ভদ্রলোককে।"

"তা হচ্ছে।" হেরম্ব বলল, "কিন্তু তোমার অম্বলটা কেমন?"

হরিশ তেতেছে, বলল, "হেরম্বটার বয়স বাড়ছে, কিন্তু চ্যাংড়ামি কমছে না।"

যাই হোক, ঠিক হয়ে গেল—আমরা পালাব। আর থাকা না। এ বিষয়ে হরিশের পরামর্শ চাওয়ায় সে বলল, "তাই। আর থেকে কি হবে। গোলোক-মামাকে দেখার ইচ্ছে ছিল, দেখা তো হয়েই গেল।"

কথাটা বলেই হরিশ লম্বা একটা ঢেকুর তুলল।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, "কি রকম বুঝছ হরিশ। ঢেকুরটা ওঠায় একটু রিলিফ বোধ হচ্ছে?"

হরিশ রেগেছে। উত্তর দিল না।

মামার অনুনয়-বিনয়-আক্ষেপ-হাহুতাশ উপেক্ষা করে আমরা রওনা হলাম। ওয়াকার সাহেবের জিপ হঠাৎ পাওয়া যাবে কী করে, তিনি তো পানাগড়ে। তাঁকে খবর পাঠানোর সময় পর্যন্ত আমরা দিলাম না—এজন্যে মামার কষ্ট যেন আরো বাড়ল, কেননা গোরুর গাড়িতে আমাদের যে কি কষ্ট হবে তা তিনি বুঝতে পারছেন।

মামা গোরুর গাড়ি ঠিক করে দিয়েছেন। আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম।

পাশেই একটা দুধের মত ধবধবে পুষ্ট পাঁঠা খুঁটিতে বাঁধা, কাঁঠালপাতা খাচ্ছে আর জুলজুলে করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে।

মামার চোখ ছলছল করে উঠল, বাষ্পরুদ্ধ গলায় তিনি বললেন, "আর একটা বেলাও থেকে গেলে হত না? ভেবেছিলাম, আজ দুপুরে ওটাকে কাটব।"

গাড়ি চলতে আরম্ভ করল, মামা সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা এগিয়ে এসে তেঁতুলতলায় বিদায় নিলেন।

হরিশ বলল, "পাঁঠাটার আয়ুর জোর আছে। বেঁচে গেল।"

হেরম্ব নস্যিটা টেনে নিয়ে বলল, "সেই সঙ্গে বুঝি আমরাও।"

হরিশ এর কোনো জবাব দিল না। কড়া চোখে একবার কেবল তাকাল হেরম্বর দিকে।

POND'S DREAMFLOWER TALC

হ্যাঁ—তাপদগ্ধ ঘর্মাক্ত দিনেও আপনি নিজেকে শীতল ও সতেজ রাখতে পারেন—যদি আপনি মিষ্টি গন্ধে ভরা পণ্ড্‌স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যালকম পাউডার ব্যবহার করেন। এই স্নিগ্ধ পাউডার আপনার গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে দেখুন কত তাড়াতাড়ি আপনার ঘাম শুকিয়ে গিয়ে আপনাকে সমস্ত দিন ধরে সতেজ ও সুমিষ্ট গন্ধে ভরপুর ক'রে রাখে। দীর্ঘস্থায়ী সৌরভ ও সজীবতার জন্য সর্বদা পণ্ড্‌স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌কম পাউডার ব্যবহার করুন।

চীজব্রো-পণ্ড্‌স ইনক (আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সীমিত দায়ে সমিতিবদ্ধ)

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৬৯)

সেদিন সন্তোষকাকার সেই অপঘাত-মৃত্যুটা দেখে মনে হয়েছিল যেন শুধু সেটা অপঘাত-মৃত্যুই নয়, সে-মৃত্যু যেন মানুষের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধের প্রথম বলি। প্রথম হত্যা। মানুষের সঙ্গে মানুষের যুদ্ধ আরোও বেধেছে। যুদ্ধের শেষ হয়নি পৃথিবীতে। মানুষ শিক্ষা পেয়েছে, সভ্যতা পেয়েছে, ধর্ম পেয়েছে, সমাজ পেয়েছে—সব পেয়েও মানুষ যে কিছুই পায়নি, সন্তোষকাকার মৃত্যু যেন তারই প্রথম প্রমাণ! সন্তোষকাকা কি পৃথিবীতে একজন! হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সন্তোষকাকারা আত্মবলিদান দিয়েছে মানুষের লড়াইতে। সন্তোষকাকারা জানেনি কী তাদের অপরাধ, আর কেনই বা তাদের এই শাস্তি! সন্তোষকাকারা বুঝতে পারেনি কে তাদের ভাগ্যবিধাতা, আর কী-ই বা তার বিচার। শুধু কলকাতার এই পূর্ব-প্রান্তেই নয়, শুধু বাঙলাদেশের প্রান্তরে প্রান্তরেই নয়, শুধু ভারতবর্ষের প্রদেশে-প্রদেশেই নয়, সমস্ত পৃথিবীর জলে স্থলে জনপদে-জনপদে সন্তোষকাকারা আত্মবলি দিয়েছে অকারণে। তারা জানতেও পারেনি কেন এই যুদ্ধ, কেন এই শত্রুতা। তারা জার্মানী দেখেনি, ইটালী দেখেনি, ইংল্যান্ড দেখেনি, আমেরিকা দেখেনি, জাপানও দেখেনি। তারা বোঝেনি কেন জার্মানী তাদের শত্রু, আবার কেন আমেরিকা তাদের বন্ধু। কিছু দেখতে পায়নি তারা, শুধু দেখেছে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ, শুধু দেখেছে প্রাণঘাতী মৃত্যু! মৃত্যুই সন্তোষকাকাদের সব প্রশ্নের নির্বাক উত্তর দিয়ে দিয়েছে। মৃত্যুই সন্তোষকাকাদের সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। যদি বেঁচে থাকতো সন্তোষকাকারা তাহলে হয়তো দীপঙ্করের মতই জানতে পারতো তাদের মৃত্যুর জন্যে মিলিটারী লরী দায়ী নয়, বোমা, বারুদ, রাইফেল, কিছুই দায়ী নয়। দায়ী আমেরিকার ডলার, দায়ী ইংলণ্ডের পাউন্ড, ইটালীর লিরা, জার্মানীর মার্ক, ফ্রান্সের ফ্রাঙ্ক, জাপানের ইয়েন, আর ইণ্ডিয়ার টাকা!

সমস্ত বাড়িটা ফাঁকা। ক্রমে আরো রাত হলো। আরো গভীর রাত। ফাঁকা হয়ে এল ভিড়। ফাঁকা হয়ে এল পৃথিবী। দীপঙ্করের পৃথিবীতে তখন সমস্ত নিস্তব্ধ। শুধু একতলার ঘরখানা থেকে একটানা একটা কান্নার আওয়াজ তখনও ক্ষীরোদার বুক চিরে বাইরে বাতাসের কানে এসে বিঁধছে।

অনেক সান্ত্বনা দিয়েছিল দীপঙ্কর। কিন্তু কাকে সান্ত্বনা দেবে? কে সান্ত্বনা চাইছে? শোকের প্রতিকার কেমন করে করবে দীপঙ্কর। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের শোকার্ত আত্মাকে সান্ত্বনার স্তোক দিয়ে দীপঙ্কর একলা কেমন করে ভোলাবে?

প্রত্যেক দিনের মত কাশী এসে দাঁড়িয়েছিল দরজার কাছে। প্রত্যেক দিনই আসে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম-ভাগখানা নিয়ে পড়তে আসে। প্রথম পাতা থেকে আরম্ভ করে ক'দিনের মধ্যেই অনেকখানি শিখে ফেলেছে, মুখস্থ করে ফেলেছে। একটা শেলটও কিনে দিয়েছে দীপঙ্কর। চমৎকার হাতের লেখা হয়েছে কাশীর। এই প্রথম-ভাগ শেষ করেই দ্বিতীয় ভাগ ধরবে, সঙ্গে সঙ্গে ধারাপাত।

কাশী বলে ইংরিজী পড়াবেন না দাদাবাবু?

দীপঙ্কর বলে—সব পড়াবো তোকে, ইংরিজী ফার্স্ট-বুকও কিনে দেব, তুই পারবি তো ইংরিজী শিখতে?

আজ কিন্তু দীপঙ্কর নিজেই বারণ করলে। বললে—আজ থাক কাশী, আজকে আর পড়াতে ভালো লাগছে না—

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যের পর বাড়ি এলেই দীপঙ্কর পড়াতে বসে কাশীকে। মনে হয় কাশীর মধ্যে দিয়েই দীপঙ্কর যেন নতুন করে নিজেকে গড়ে তুলবে। দীপঙ্কর যা পায়নি, তাই পাবে কাশীর মধ্যে দিয়ে। দীপঙ্কর যা জানেনি, কাশীর মধ্যে দিয়েই তা জানবে। এই সংসার, মা'র এই নিজের হাতে গড়া সংসারকে কাশীকে দিয়ে যেন নতুন করে গড়ে তুলবে। দীপঙ্কর যে যন্ত্রণা পেয়েছে, কাশী যেন তা না পায়, কাশী যেন দীপঙ্করের না-পাওয়া সম্পদে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে! কিন্তু আজ আর ভালো লাগলো না কিছুই। সন্তোষকাকার মৃত্যু যেন বিকল করে দিয়েছে সমস্ত চৈতন্যকে।

তারপর আরো রাত হলো। জীবনে কতবার শ্মশানে যেতে হয় মানুষকে। সেই
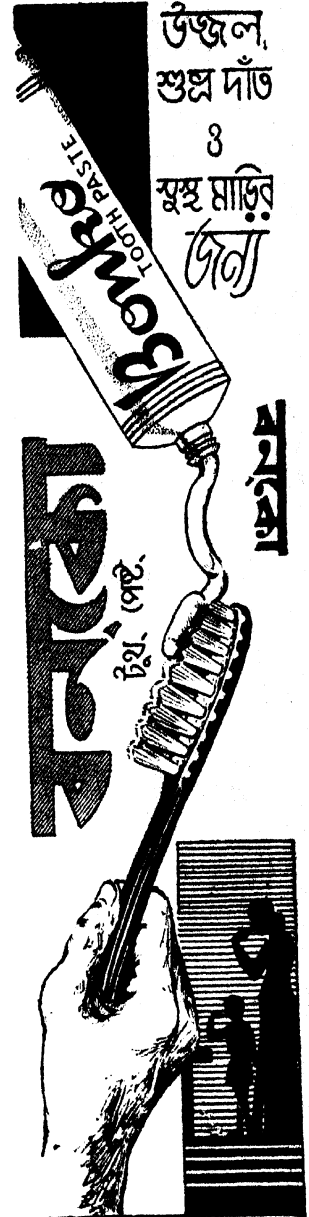
শ্মশানেই আর একবার যেতে হয়েছিল আজ। শ্মশানে গেলেই যেন সেই পুরোন ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের কাছাকাছি যেতে হয়। যেতে হয় একেবারে নিজের জীবনের ছোটবেলাকার কাছাকাছি। সমস্ত জীবনটাই পরিক্রমা করে আসতে হয়। ছোটবেলা থেকে এতখানি পথ যেন বড় ছোট, যেন বড় সংকীর্ণ। যেন মাত্র এই সেদিন সে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হলো, এই সেদিন সে বড় হলো। বড় হলো আর দু'চোখ ভরে দেখে নিলে পৃথিবীকে। কিন্তু কই, পৃথিবী কি দীপঙ্করের সংগে এতটুকু এগিয়েছে? দীপঙ্করের সংগে সংগে পৃথিবীর মানুষ কি এতটুকু বড় হয়েছে?

বাড়িতে কেউ ছিল না। পাশের বাড়ির দু'একজন মহিলা এসে ক্ষীরোদার পাশে বসেছিলেন। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ভোলাবারও চেষ্টা করেছিলেন। দীপঙ্করেরা শ্মশান থেকে এসেও শুনতে পেয়েছে ক্ষীরোদার অব্যক্ত কান্নার আওয়াজ। দীপঙ্করের মনে হলো—ও ক্ষীরোদা নয়, যেন ক্ষীরোদার গলার কান্নাই নয় ওটা। একটা অস্ফুট অপরিণত আর্তি, ধরিত্রীর অন্তস্থল ভেদ করে ওপরে উঠে আসছে অক্লান্ত ধারায়। বলছে—আমাকে মুক্তি দাও, আমাকে শান্তি দাও, আমার দুঃখের ভার লাঘব করো তুমি—

দীপঙ্কর অনেকক্ষণ ধরে শুনতে লাগলো কান পেতে। তারপর এক সময়ে নিচে নামলে। তারপর ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ক্ষীরোদা তখনও দেখতে পায়নি।

দীপঙ্কর বললে—

বলতে গিয়েও কিন্তু থেমে গেল। এতদিন সন্তোষকাকার মেয়ে এ-বাড়িতে আছে, কিন্তু কখনও মুখোমুখি একটা কথাও বলেনি কখনও। জিভটা কেমন আটকে গেল। কেমন করে কথা বলতে হবে তাই-ই যেন ভেবে পেলে না।

তারপর অনেক চেষ্টা করে বললে—কেঁদে তো কিছু লাভ নেই, যিনি গেলেন তাঁকে তো কেঁদে ফেরাতে পারা যাবে না—

যেন মন্ত্রের মত কাজ হলো। হঠাৎ কান্না থেমে গেল ক্ষীরোদার।

দীপঙ্কর বললে—আজ রাতটা তুমি বরং ওপরে শোও, আমি নিচেয় শুচ্ছি—আমি কাল থেকে ঝি রাখবার ব্যবস্থা করছি একটা—

তারপর কাশীকে ডাকলে—কাশী—

কিন্তু সংগে সংগে ক্ষীরোদা এক কাণ্ড করে বসলো। একেবারে হুড়মুড় করে দীপঙ্করের পায়ের ওপর মাথা রেখে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। বললে—আপনার দু'টি পায়ে পড়ি, আমায় আপনি আর যন্ত্রণা দেবেন না—

হঠাৎ ক্ষীরোদার এই ব্যবহারে দীপঙ্কর যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে আর একটা কথাও বেরোল না। আস্তে-আস্তে সেখান থেকে পা দু'টো সরিয়ে নিলে। না-জেনে ক্ষীরোদার মনের কোন্ তন্ত্রীতে আঘাত দিয়ে ফেলেছে সে কিছুই বুঝতে পারলে না। দীপঙ্করও হতবাক্, কাশীও হতবাক্। তারপর বিস্ময়ে লজ্জায় আতঙ্কে দীপঙ্কর আবার তার নিজের ঘরের ভেতরে গিয়ে ঢুকে পড়লো।

সকাল দশটা থেকেই কানা-ঘুষা চলছিল। প্রথমে চুপি চুপি, তারপর প্রকাশ্যে। দ্বিজপদই প্রথমে দেখেছিল। লাল শাড়ি,

কোঁকড়ানো চুল, সিঁথিতে সিঁদুর। ঘোষাল সাহেবের গাড়ি থেকেই নামলো, তারপর সোজা ঘোষাল সাহেবের সঙ্গেই ঘরে ঢুকে পড়লো। তারপর এক কান থেকে আর এক কানে উঠলো কথাটা।

কে-জি-দাশবাবু নিজের চোখে দেখে এল। এসে বললে—ওহে, দেখে এলাম তোমাদের মিসেস ঘোষকে—

মিসেস ঘোষ নামটা ক'দিন থেকেই মুখে মুখে রটছিল। এতদিন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরাই এই পোস্টে এক-চেটিয়া ছিল। এই প্রথমবার এল বাঙালী মেয়ে। একেবারে সিঁদুর-পরা বাঙালী হিন্দু মেয়ে। ট্রাফিক সেকশ্যানেও কথাটা গিয়ে পৌঁছুলো। যারা ডেলি-প্যাসেঞ্জার, তারা একটু দেরি করে এসেছিল অফিসে। এসেই খবরটা শুনলে। বললে—কী রকম দেখতে?

এস্ট্যাব্লিশমেণ্ট সেকশ্যানে সুধীরবাবুর কাছেই বেশি ভিড়। সুধীরবাবু নিজে গিয়ে সই-সাবুদ করিয়ে নিয়ে এসেছে। প্রথম চাকরির দিন। নাম-ধাম লেখা, অনেক রকমের ফর্ম্যালিটি আছে রেলের অফিসে। মিসেস ঘোষকে কিছুই করতে হয়নি। মিস্টার ঘোষাল নিজেই ডেকে পাঠিয়েছিল সুধীরবাবুকে। সুধীরবাবুই নিজে এসে পার্সোন্যাল ফাইলে যা কিছু লেখবার দরকার সব লিখে নিয়েছে।

সুধীরবাবু জিজ্ঞেস করেছিল—এ'র কী ডেজিগ্নেশন্ লিখবো স্যার? স্টেনো-গ্রাফার?

সতী বলেছিল—আমি তো শর্টহ্যাণ্ড জানি না—

মিস্টার ঘোষাল বলেছিল—লিখুন পি-এ। পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট্—

—তাহলে আপনার স্টেনোগ্রাফারের কাজ কে করবে?

মিস্টার ঘোষাল বলেছিল—টাইপিস্ট্ সেকশ্যান্ থেকে একজন টাইপিস্ট দাও আমাকে—

তা সেই ব্যবস্থাই হয়েছিল। আসলে গভর্নমেণ্ট অফিসে সবই হয়। আইন মানতেও যতক্ষণ আইন ভাঙতেও ততক্ষণ। আইনের অত কড়াকড়ি বলেই, গভর্নমেণ্ট অফিসে আইন অত ঢিলে। যেখানে আইন আছে, সেখানে আইনের ফাঁকিও আছে। সেই অসবর্ন সাহেবের আমল থেকেই এইরকম চলে আসছে। মিস্টার ঘোষালেরা সমস্ত জানে। সুধীরবাবুরাও সমস্ত জানে। গাঙ্গুলীবাবুর প্রমোশনের বেলাতে আইনের কড়াকড়ি দেখানো হয়, আবার মিসেস্ ঘোষের চাকরির সময়ে ফাঁকটাও কাজে লাগানো হয়। আইন আছে বলেই আইন ভাঙার এত দরকার হয়। আর আইন ভাঙবার দরকার হয় বলেই আইন তৈরি করতে হয়। আসলে আইনটা কিছু নয়, স্বার্থসিদ্ধিটাই বড় কথা। আইনই যদি মানতে হবে তাহলে সুধীরবাবুকে অত মাইনে দিয়ে রাখা কেন? সুধীরবাবুদের সৃষ্টিই হয়েছে আইন মানবার জন্যে ততটা নয়, যতটা আইন ভাঙার পথটা বাতলে দেবার জন্যে।

রঞ্জিতবাবু বললে—তাহলে এবার থেকে কি বাঙালী মেয়েও অফিসে ঢুকবে নাকি সুধীরবাবু?

সুধীরবাবু বললে—আমাকে বলছিস্ কেন তুই, আমি তো হুকুমের চাকর রে—

—তাহলে আড়াই শো টাকা গ্রেড্ কোন্ আইনে হয় সুধীরবাবু! শর্টহ্যাণ্ড জানে না কিছু না—

সুধীরবাবু বললে—হয় রে বাপু হয়, ঘোষাল সাহেব বললে সবই হয়—ঘোষাল সাহেবের ইচ্ছে হলে নতুন করে আইনও তৈরি হবে—

পাশবাবু সকালবেলাই দেখেছিল। ঘোষাল-সাহেব গাড়ি থেকে নামতেই পাশ-বাবু মাটি পর্যন্ত মাথা নিচু করে বলেছিল —গুড্ মর্নিং স্যার—

মাথা তুলতেই দেখে সঙ্গে আর একজন মেয়েমানুষ। হয়ত বউ, কিংবা হয়ত বউ নয়, বন্ধুর বউ। দরকার কী অত ঝঞ্ঝাটে। তাকেও মাথা নিচু করে নমস্কার করলে—

—গুড্ মর্নিং ম্যাডাম্—

রঞ্জিতবাবু জিজ্ঞেস করলে—কেমন চেহারা দেখলেন পাশবাবু?

পাশবাবু বললে—আহা যেন সাক্ষাৎ মা আমার—

—তা আপনি তাকেও গুড্ মর্নিং করতে গেলেন কেন?

পাশবাবু বললে—আরে বাবা, তোরা আজকালকার ছেলে কিছুই জানিস না, সব দেবতাকেই খুশী রাখা ভালো, কখন কে বিগড়ে যাবে আর চাকরিটি চলে যাবে কিছু বলা যায়?

সমস্ত অফিসের কথা-বার্তাগুলো অফিসের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। সব সেকশ্যানেই ওই এক আলোচনা। ওই একই বিষয়বস্তু। এতদিন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েরাই একচেটিয়া কাজ চালিয়ে এসেছে অফিসে। তারা গাউন পরে, লিপ্স্টিক্ মেখে, হিল্ তোলা জুতো পরে খটাখট্ করে অফিসে এসেছে গেছে, কেউ তাদের নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তারাও মেয়েমানুষ, কিন্তু মেয়েমানুষ হয়েও তারা বাঙালী পুরুষের আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারেনি। এবার এসেছে খাঁটি বাঙালী মেয়ে। খাঁটি বাঙালী বাড়ির বউ!

—ও কী পাশ সুধীরবাবু?

সুধীরবাবু বললে—বি এ পাশ—

—কত বয়েস?

পার্সোন্যাল ফাইলে সবই লিখতে হয়। এজ্, এডুকেশন্, হাসব্যাণ্ডের নাম—সব কিছু।

—কাদের বাড়ির বউ? হাসব্যাণ্ডের নাম কী?

প্রথমে মিস্টার ঘোষাল ওসব লিখতে চায়নি। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের যেমন বাবাদের নাম লেখবার নিয়ম নেই, তেমনি।

মিস্টার ঘোষাল বলেছিল—ও কলম্‌টা ব্ল্যাংক্‌ থাক্‌—

সুধীরবাবু তখনও ফাইলটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সতীও চুপ করে বসেছিল। বললে—কেন, ব্ল্যাংক্‌ থাকবে কেন? লিখে নিন্‌ আপনি, আমি বলছি—

মিস্টার ঘোষাল বললে—কেন, মিসেস ঘোষ, ও কলম্‌ এখনি ফিল্‌-আপ্‌ করবার দরকার নেই, পরে করলেও চলবে—

সতী বললে—না, লিখে নিন্‌ হাসব্যাণ্ড্‌ সনাতন ঘোষ,—ঠিকানা...

স্বামীর নাম, ঠিকানা, বংশ, কুলজী সমস্তই লিখে নেওয়া হলো। সতী যেন নিশ্চিন্ত হলো সমস্ত পরিচয় প্রকাশ করে দিয়ে। যেন দরকার হলে সে শাশুড়ির নামও প্রকাশ করে দিতে কুণ্ঠিত হতো না।

রেলের চাকরির খাতায় লেখা থাক্‌ কোন্‌ বংশের বউ, কার বউ, কার পুত্রবধূ, কোন্‌ প্রয়োজনে এখানে এই রেলের অফিসে চাকরি করতে আসতে বাধ্য হয়েছে। লোকে জানুক অগাধ টাকা থাকলেও কেন একজন মেয়ে কোন্‌ পরিচয়ে এসে রেলের চাকরিতে ঢোকে! কোন্‌ প্রয়োজনে!

সতী বললে—আমি কোন্‌ ঘরে বসবো মিস্টার ঘোষাল?

মিস্টার ঘোষালের তখন কাজ আরম্ভ করবার কথা। আজকাল কাজের শেষ নেই মিস্টার ঘোষালের। বাইরে সবাই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। মার্চেণ্টরা শ্লিপ দিয়েছে ভেতরে। সবাই চায় ওয়াগন্‌। সোনা নয়, রুপো নয়, হীরে নয়, মুক্তোও নয়। টাকা-কড়ি সম্মান প্রতিপত্তি কিছুই নয়। এমন কি ভগবানও নয়। শুধু ওয়াগন্‌। পৃথিবীসুদ্ধ মানুষ একখানা ওয়াগনের জন্যে স্বর্গ-মর্ত্য চষে বেড়াচ্ছে। আর কোনও কথা নেই কারো মুখে। শুধু ওয়াগন আর ওয়াগন। একখানা ওয়াগন পেলে ধর্ম-অর্থ-মোক্ষ-কাম্‌ সমস্ত পাওয়া হবে।

দীপঙ্কর যখন অফিসে এসে পৌঁছুলো তখন সবাই এসে ঢুকছে অফিসে। প্রতি-দিনের মত হাতে কলম তুলে নিয়েছে। ড্রয়ার থেকে কাগজ বার করে ক্লার্করা দুর্গা-নাম লিখতে শুরু করবে। তারপর ঢিমে চালে ফাইল আসবে, ফাইল যাবে, আর তারপর রেলের চাকা চলতে শুরু করবে। কোথায় কতদূরে রেল-লাইন, কোথায় লাইন-ক্লিয়ার, আর কোথায় ইঞ্জিন, কিন্তু এখানে এই হেড্‌-অফিসে বাবুদের কলমের কালি কতবার শুকোবে, বাবুদের চোখে কতবার ঘুম নেমে আসবে, কতবার অ্যালু-মিনিয়ামের গ্লাসে চা আসবে, কিন্তু ওয়াগন সাপ্লাই বন্ধ হবে না মিস্টার ঘোষালের। দশটা ওয়াগন যাবে মণিহারিঘাটে, বারোটা শিলিগুড়িতে, তিরিশটা ময়মনসিং-এ। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মিস্টার ঘোষালের কলমের একটা খোঁচায় বেঙ্গলের একশোটা মার্চেণ্ট্‌ রাতারাড়ি কোটিপতি হয়ে উঠবে!

কাজ তখন খুব চলছে সেন-সাহেবের ঘরেও। হঠাৎ মধু ঘরে ঢুকে একটা শ্লিপ্‌ দিয়ে গেল।

দীপঙ্কর কাজের মধ্যেও শ্লিপটা তুলে নিলে। বললে—কে দিয়েছে?

মধু বললে—নতুন মেমসাহেব—

নতুন মেমসাহেব! দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি ভাঁজ খুলে পড়লে—। ছোট শ্লিপ্‌। নিচেয় সই করেছে সতী। সতী লিখেছে—'দীপু, আজ থেকে তোমাদের অফিসে চাকরি নিয়েছি। কখন তোমার হাত খালি থাকবে? আমি একবার দেখা করতে চাই।

ইতি—সতী—'

শ্লিপটা পড়েই দীপঙ্কর দাঁড়িয়ে উঠলো। বাইরে এসেই সোজা গেল মিস্‌ মাইকেলের ঘরের দিকে। চাকরির প্রথম দিকে এই ঘরেই বসতো একদিন দীপঙ্কর। দরজাটা বন্ধ ছিল। সেন-সাহেবকে দেখেই দ্বিজপদ এগিয়ে এল। বললে—সেলাম হুজুর—

দীপঙ্কর বললে—এ-ঘরের দরজা বন্ধ কেন?

—ঘোষাল-সাহেব বন্ধ করে দিয়েছে হুজুর! সাহেবের ঘরের ভেতর দিয়ে রাস্তা, নতুন মেম-সাহেব এসেছে ভেতরে—

মিস্টার ঘোষালের ঘরের ভেতর দিয়েই দীপঙ্কর ঢুকছিল। তারপর ডান দিকে মিস্‌ মাইকেলের ঘরে যাবার রাস্তা। ঘরে তখন একজন মার্চেণ্ট্‌ বসে। অফিসের নানা কাজে পাবলিক এসে দরবার জমিয়েছে ঘরে।

—ওয়েল্‌!

মিস্টার ঘোষাল মুখ তুলে দীপঙ্করকে দেখেই রাগে আরো কালো হয়ে উঠলো। বললে—ওখানে কী চাও সেন? ওদিকে কী?

দীপঙ্কর বললে—মিসেস ঘোষ এখানে আছে?

—হ্যাঁ আছে, কিন্তু তাতে তোমার কী? তুমি ওখানে যাচ্ছো কেন? সি ইজ্‌ মাই পি-এ—

—আমার কাজ আছে।

বলে দীপঙ্কর ভেতরে ঢুকতেই যাচ্ছিল। মিস্টার ঘোষাল উঠে দাঁড়িয়ে বললে—স্টপ্‌ দেয়ার—

দীপঙ্কর হঠাৎ বাধা পেয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লো। এক মুহূর্তের মধ্যে তাকে কর্তব্য ঠিক করে নিতে হবে। গুজরাটি ভদ্রলোকও অবাক হয়ে মুখ তুলে চাইলে। মিস্টার ঘোষাল বললে—তোমার কী কাজ মিসেস ঘোষের সঙ্গে?

দীপঙ্কর সোজাসুজি মিস্টার ঘোষালের চোখে চোখ রাখলে!

—আমার পারমিশন্‌ ছাড়া কেউ দেখা করতে পারবে না মিসেস ঘোষের সঙ্গে! ডু ইউ হিয়ার মী?

দীপঙ্কর যেন তখনও কী তার কর্তব্য বুঝতে পারছে না।

—দিস্‌ ইজ্‌ অফিস, দিস্‌ ইজ্‌ নট্‌ ইওর পার্লার!

অপমানে দীপঙ্করের সমস্ত মুখটা রাঙা হয়ে উঠলো এক নিমেষে। হাতের মুঠোর মধ্যে সতীর শ্লিপটা টিপে পিষে জানলার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। সেটা অতদূর গেল না। ঘরের কোণে গিয়ে পড়ে দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা লেগে স্থির হয়ে গেল। দীপঙ্কর আবার ঘরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল।

—দীপু!

দীপঙ্কর মুখ ঘুরিয়ে দেখলে—সতী তার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। লাল একটা শাড়ি পরেছে। কপালে সিঁদুরের একটা মোটা টিপ্‌। মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলো খোপা করে বেঁধেছে আজ।

—আমার শ্লিপ্‌ পেয়েছিলে তুমি?

একটি মুহূর্ত শুধু! তারপর দীপঙ্কর ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

—দীপু!

ডাকটা আরো কাছে সরে এল যেন। দীপঙ্করের মনে হলো দুই হাত দিয়ে নিজের কান দুটো এঁটে বন্ধ করে দেয়। সতী হয়ত দীপঙ্করের পেছন-পেছনই আসছিল। কিন্তু মিস্টার ঘোষাল একেবারে সামনে এসে পথ আটকে দিয়েছে। বললে—কোথায় যাচ্ছো?

সতী মিস্টার ঘোষালের মুখের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল।

মিস্টার ঘোষাল আবার বললে—কোথায় যাচ্ছো তুমি? গো টু ইওর রুম মিসেস ঘোষ। তোমার ঘরে গিয়ে বোস! তোমার কাজ আছে—ইউ আর পি-এ টু ডি-টি-এস—

গুজরাটি ভদ্রলোক অবাক হয়ে দেখতে লাগলো ঘটনাটা। কিন্তু সেদিকে মিস্টার ঘোষালের খেয়াল নেই তখন। মিসেস ঘোষেরও খেয়াল নেই।

মিস্টার ঘোষাল আবার বললে—যাও, ডু হোয়াট আই সে! যাও—

—হোয়াট ডু ইউ মীন?

মিস্টার ঘোষাল সতীর চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। যে-মেয়ে কাঁদতে পারে, যে-মেয়ে তার আশ্রয় পেয়ে কৃতার্থ হতে পারে, সে-মেয়ের গলায় এত তেজ! যেন হঠাৎ কেউটে সাপের মত ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে মিসেস ঘোষ!

—হোয়াট ডু ইউ মীন?

—কিন্তু এটা অফিস, এটা ড্রয়িং-রুম নয়
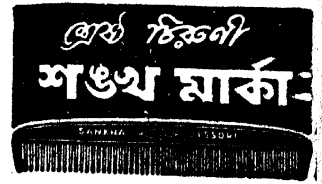
তোমার। এখানে আমি সিনীয়র অফিসার। আই অ্যাম ডি-টি-এস্ হিয়ার—

জাঁদরেল মিস্টার ঘোষালের গলার আওয়াজে যেন একটা ক্ষীণ কৈফিয়তের সুর বেজে উঠলো। বললে—তুমি আগে কখনও অফিসে কাজ করোনি মিসেস ঘোষ, অফিসেরও একটা ডিসিপ্লিন আছে, অফিসেরও একটা মর‍্যাল কোড্ আছে,—

গুজরাটি ভদ্রলোক এতক্ষণে একটু নড়ে চড়ে বসলো। ভাষা না বুঝে, ব্যাপারটার কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। বললে—আমি তাহলে পরে আসবো স্যার—

বলে নিজেই বাইরে চলে গেল। গিয়ে একেবারে গাড়িতে গিয়ে উঠলো। দ্বিজপদ সঙ্গে সঙ্গে পেছনে দৌড়িয়েছে: গাড়ি তখন চলতে শুরু করে-করে। কাছে গিয়ে মাথা নিচু করে বললে—সেলাম হুজুর—

গুজরাটি মার্চেন্ট্ পুরোন খদ্দের মিস্টার ঘোষালের। রামপুরহাটে তিনটে রাইস্-মিল্ দেশাইজীর। রাম-মনোহর দেশাই বহুদিন থেকে ওয়াগন চাইতে আসে। দশখানা চাইলে একখানা পায়। মিস্টার ঘোষালকে কিছুতেই খুশী করতে পারে না। দিনে কুড়িখানা হলে তবে কাজ চলে দেশাইজীর। সামনে আছে রাইস্‌মিল্। মিলের নাম করে ওয়াগন চেয়ে সেই ওয়াগনে টিম্বার, স্ট্র, ফায়ার-উড্ যা-কিছু পাঠাতে পারে। তাতে কারো কিছু বলবার থাকে না।

—সেলাম হুজুর।

দেশাইজী বললে—উও কৌন্ হ্যায় নপরাশি?

—হুজুর, ও তো ঘোষাল সাহেবকা নয়াবিবি হুজুর!

গুজরাটি দেশাইজী একটু ভেবে নিলে। তারপর বললে—আচ্ছা ঠায়রো, ম্যয় আতা হুঁ—

গাড়িটা স্টার্ট দিলে। অফিস-কোয়ার্টার পেরিয়ে একেবারে মেন্ রাস্তায় গিয়ে পড়লো। দেশাইজী বললে—জলদি ম্যান্, জলদি......

গাড়ি আরো জলদি চলতে লাগলো। লালবাজার পেরিয়ে বৌবাজার। একটা জুয়েলারির দোকানের সামনে আসতেই দেশাইজী লাফিয়ে উঠলো—রোখ্‌কে—

হীরালাল মোতিলাল কোম্পানীতে দেশাইজীর আসা-যাওয়া আছে। গাড়ি থেকে নামতেই আয়নায় দেশাইজীর ছায়া পড়লো। দেশাইজী একবার চেহারাখানা দেখে নিলে। কিন্তু দোকানের মালিক দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা করতে আরম্ভ করেছে তখন।

—আইয়ে শেঠজী, আইয়ে!

দেশাইজী বললে—জলদি কীজিয়ে জনাব। আচ্ছা সোনেকো হার দেখলাইয়ে—

দুপুরবেলার দিকে জুয়েলারী দোকানে ভিড় কম থাকে। দোকানের পাখা জোরে খুলে দেওয়া হলো, পান-জর্দা লেমনেড্ আইস্‌ক্রীম সব এল। সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছা সোনেকা হারও এল।

দেশাইজী বললে—এ কী চীজ্ দেখাচ্ছ জনাব, বঢ়ীয়া দেখ্‌লাও—

আরো বঢ়ীয়া চীজ রাখা হলো দেশাইজীর সামনে।

—কেত্‌না ভাউ?

—পান্‌শো রুপেয়া।

দেশাইজী হাত দিয়ে কেস্‌টা পাশে ঠেলে দিলে। বললে—ঔর বঢ়ীয়া দেখলাও—

হাজার টাকার জিনিস দেখানো হলো। তবু ঔর বঢ়ীয়া। দু'হাজার টাকার জিনিস এল। তাও ঔর বঢ়ীয়া। তিন হাজার, চার হাজার, পাঁচ হাজার টাকার চীজ্ এল। তাও দেশাইজী বলে—ইস্‌সে ঔর বঢ়ীয়া—

শেষে দশ হাজার টাকার চীজ এল সামনে। জড়োয়া হার। রুবি, ডায়মণ্ড্, স্যাফায়ার সেট্ করা নেকলেস্।

দেশাইজী জিজ্ঞেস করলে—কেয়া ভাউ ইসকো!

—দশ হাজার!

তখন চেক বই বার করলে দেশাইজী। আরে, দশ হাজার টাকার জন্যে রাম-মনোহর দেশাই পরোয়া করে না। ঘোষাল-সাহেব কৃপা করলে দশ হাজার টাকা মুনাফা করতে এক মিনিট! এক মিনিটের তোয়াক্কা। ওয়ান মিনিট ওন্‌লি।

দেশাইজী বললে—আচ্ছা করে চীজ্ বেন্ধে দাও জনাব, নয়া বিবি, নজ্‌রানা ভি নয়া—

—পান লিয়া নেই শেঠজী?

দেশাইজী ততক্ষণে গাড়িতে উঠে বসেছে। বললে—পান খাবার অনেক মওকা মিলবে জনাব—লেকিন ওয়াগন মিলনেকা মওকা জিন্দিগী মে কৌন্ দেনেওয়ালা!

(ক্রমশঃ)
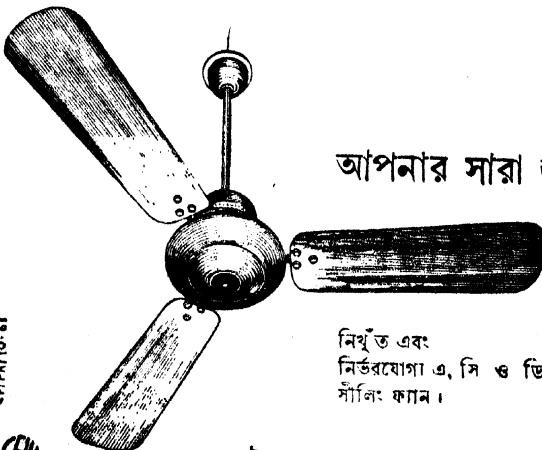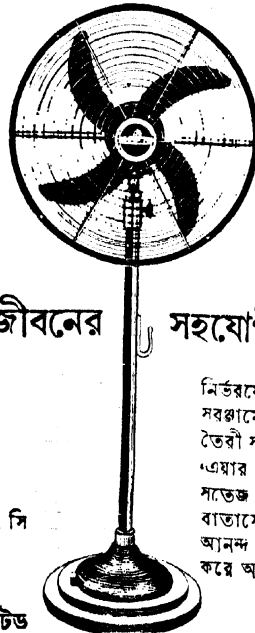
কোণারকের নক্‌শা

নির্মল সেনগুপ্ত

কোনারক জগমোহনের চূড়ার দিকে চেয়ে একটি জিনিস নজরে পড়েছিল। তাই থেকেই কোনারকের একটা নকশা তৈরী করবার কল্পনা মাথায় আসে।

জিনিসটা সামান্য। জগমোহনের চূড়া থেকে ধাপে ধাপে যে ছাতের সারি নেমে এসেছে তার প্রত্যেক 'তলায়' ছাতের প্রত্যেকটি টুকরোর কোণে কোণে এক একটি পাথরের খুঁটি মতন আছে। কোথাও কোথায়ও কোণে নয়, মাঝামাঝি জায়গায়ও অমনি খুঁটি। ওগুলির শিল্পশাস্ত্রসম্মত নাম কী জানি না—হয় তো শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীনির্মল বসু মহাশয় বলতে পারবেন। আপাতত ওর নাম দেওয়া যাক 'শৃঙ্গ'।

তলা থেকে জগমোহনের মাথার দিকে চাইলে মনে হয় ঐ শৃঙ্গগুলির সমাবেশের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আছে। সেটা এই যে, উঁচু থেকে নীচ পর্যন্ত শৃঙ্গগুলি এক একটি সরল রেখা ধরে নেমে এসেছে। রেখার ইঙ্গিত এত সহজ যে মনে হয় কোনারক যাঁরা প্ল্যান করেছিলেন তাঁদের স্পষ্ট নির্দেশ মতোই শৃঙ্গগুলি ঐ ভাবে সাজানো হয়।

আকাশ থেকে তোলা কোনো ফোটোগ্রাফে শৃঙ্গগুলির রেখসমাবেশের চিহ্ন পাওয়া যেতে পারে এই আশায় আমরা লাইব্রেরী খানাতল্লাস করেছি, কিন্তু সে রকম ফোটোগ্রাফ পাই নি। কোনো বিশেষজ্ঞ আকাশ থেকে দেখা নক্‌শা তৈরী করেছেন এরকম সংবাদও পাই নি। অতএব খানিকটা ফোটোগ্রাফের ভিত্তিতে একটা কাল্পনিক আকাশী নকশা তৈরী করা গেছে।

ফোটো থেকে আন্দাজ করা হয়েছে বলে হয়তো নক্শার মাপগুলোতে খুঁত থাকতে পারে, কিন্তু মোটামুটি নক্শার ছকটা বোধ হয় ঠিকই আছে।

নক্শাটি দেখে সন্দেহ হয় যে, ছাতের কোণাগুলির সারিতে যে রেখা-সমাবেশের ইঙ্গিত তার রেখাগুলির জের টানলে সেগুলি চূড়ার আমলকের রেখা এবং তার নীচের পদ্মগুলির পাঁপড়ির রেখায় গিয়ে মেশে। চূড়ার 'খুলি' থেকে সূর্য কিরণের মত যেন ৪৮টি 'কিরণ' বেরিয়েছে—আমলকের রেখা, পদ্ম রেখা এবং ছাতের কোণার শৃঙ্গগুলি যেন সেই কিরণের পথই অনুসরণ করেছে।

এই নক্শার ভিত্তি খুঁড়লে অনেক জ্যামিতিক তথ্য পাওয়া যায়। সমরেখ চতুর্ভুজ এবং বৃত্তের নানা বিভাগ ও তাদের সন্নিবেশে কোণারক জগমোহনের একটা জ্যামিতিক নক্শা গড়ে তোলা যায়। হয়তো পাঠকের তাতে রুচি নেই এই আশঙ্কায় সে আলোচনায় নিরস্ত হলাম।

এখন প্রশ্ন, কোণারকের স্থপতিরা কি বাস্তবিকই এমনি একটা নক্শা খাড়া করে কাজে নেমেছিলেন?

ভুবনেশ্বরের দামোদর মহারাণা বংশানুক্রমিক স্থপতি এবং ভাস্কর। তাঁকে আমরা এইরকম একটা প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, না।

দামোদর মহারাণা বললেন, মন্দির গড়বার মূল সূত্রগুলো এবং মন্দিরের অঙ্গগুলোর নানা অনুপাত সেকালের শিল্পীদের কণ্ঠস্থ ছিল। আর মন্ত্র ছিল, ধ্যান ছিল, অতএব কাগজে মন্দিরের নকশা আঁকবার কোনো দরকার হত না। বড় বড় মন্দির গড়া স্থির হলে সেকালের রাজারা তখনকার শ্রেষ্ঠ স্থপতি এবং ভাস্করদের ডেকে পাঠাতেন, স্থপতিরা এক সঙ্গে বসে আলাপ-আলোচনা করে মন্দিরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের মাপ ঠিক করে দিতেন। ছোট ছোট কাজ সাধারণ শিল্পীরা করত বড় বড় কাজগুলো শ্রেষ্ঠ স্থপতি ভাস্করেরা করতেন। মূল বিজ্ঞানটা সবাই জানতো বলে খুঁটিনাটি আগে থেকে ঠিক করার দরকার হত না। শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা মূল অনুপাত গুলো দেখিয়ে দিতেন।

এই বলে দামোদর মহারাণা কতকটা অনামনস্ক ভাবে তাঁর ঘরের মেঝেয় খড়ি দিয়ে মন্দিরের নকশা এঁকে দেখাতে শুরু করলেন।

দামোদর মহারাণার পূর্বপুরুষেরাও কি আলোচনার সময় তাঁদের ঘরের মেঝেয় এমনি নকশা আঁকতেন?

(২৩)

পরদিন চায়ের টেবিলে আইলীন চৌধুরী অভ্যাস মত যথারীতি দু'তিনটে হাসির গল্প বললেন। ও'র এ ধরনের গল্প শুনে মীনাক্ষীর কোনদিনই হাসি পায় না, কিন্তু আজ তার শুনতে খারাপ লাগল না। অতুল মামার সংগে মীনাক্ষীও হাসল।

চা পর্ব শেষ হবার পর মেম মামী কিন্তু এক মিনিটের জন্যেও আর বসলেন না, উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বললে, তোমরা দু'জনে কথা বল, শীলু বেচারী আমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে, ওকে নিয়ে বেড়িয়ে আসি।

মীনাক্ষী প্রশংসা করে বলল, আমার জানাশুনো লোকের মধ্যে আপনার মত কুকুরের শখ আর কারুর দেখিনি।

—শুধু শখের কথা নয় মীনা ডারলিং ওদের ভালবাসতে হয়। নিজেদের পরিবারের একজন হিসেবে দেখতে হয়। বেচারীরা তো কথা বলতে পারে না, কত সময় ওদের প্রতি আমরা অবিচার করি।

বলতে বলতে মনে হল আইলীন চৌধুরীর চোখের কোণ দুটো চিক চিক করে উঠল। আর কথা না বাড়িয়ে 'বাই' 'বাই' বলে বিদায় চেয়ে নিয়ে শীলুর সংগে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে মীনাক্ষী অতুল মামাকে একলা পেল। অতুল মামাও যেন এই সময়টুকুর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর মীনাক্ষী, বেশ হাসিখুশী মনে হচ্ছে?

মীনাক্ষী বিনা ভূমিকায় জানাল, দাদু একটা চিঠি লিখেছেন।

—কি ব্যাপার?

মীনাক্ষী চিঠিটা এগিয়ে দিল। অতুলমামা খুব মন দিয়ে চিঠি পড়লেন কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হলো না তিনি খুব খুশী হয়েছেন। পড়া শেষ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, থমথমে গম্ভীর মুখে চোখ দুটো ছোট করে দূরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি স্থির করেছ পীয়েরকে বিয়ে করবে?

অতুল মামাকে এতখানি গম্ভীর হতে মীনাক্ষী আগে কখনও দেখেনি, আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, একথা কেন জিজ্ঞেস করছ?

—তোমার দাদুর সংগে আমি একমত নই।

—কেন?

—আন্তর্জাতিক বিয়ে কখনও সুখের হয় না।

—কি বলছ তুমি?

অতুল মামা স্পষ্ট গলায় বলেন, তোমার দাদুর থিওরীকে আমি ভুল বলছি না, কিন্তু বাস্তব জীবনে ওর কোন দাম নেই। যদি আমার মত শুনতে চাও, আমি বলব এ বিয়ে করো না। যদিও জানি পীয়ের খুব ভাল ছেলে।

মীনাক্ষী কোন কথা বলতে পারে না, সে ভেবেছিল দাদুর চিঠি পড়ে অতুল মামা তাকে আরও উৎসাহ দেবে, কিন্তু সব যেন কি রকম গোলমাল হয়ে গেল। মনের অন্তঃপুরে একটা একটা করে আশার প্রদীপ সে অতি যত্নে জ্বালছিল, হঠাৎ দমকা হাওয়ায় যেন নিবে গেল।

অতুল মামা এবার মীনাক্ষীর দিকে তাকিয়েই বলেন, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তোমাকে আমি বলছি, মিথ্যে আলেয়ার পেছনে ছুটে কোন লাভ নেই। দেশে ফিরে গিয়ে বিয়ে করো, সুখী হয়ো। বিদেশে পড়ে থাকা যে কতখানি কষ্টের আমার অবস্থায় না পড়লে বুঝতে পারবে না।

অতুল মামার কথাবার্তার ধরনে মীনাক্ষীর মনে যে প্রশ্ন উঁকি মারছিল তা সে স্পষ্ট কথায় জিজ্ঞেস করল, তুমি কি সুখী হওনি অতুল মামা?

অতুল মামা হঠাৎ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না, চুপ করে গেলেন, তারপর নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললেন, যদি সত্যি কথা জানতে চাও, বলব, না হইনি। সারা জীবনটা আমার নষ্ট হয়েছে। একথা আর কেউ জানে না। প্রথম তোমাকেই বললাম, কারণ দেখছি তুমিও আমার মত ভুল করতে যাচ্ছ তাই। এদেশে আমার কি পরিচয়, নামহীন, গোত্রহীন একটা মানুষ, এদেশী

সমাজ আমাদের মেয় না। দেশের লোকেরাও আমাদের এড়িয়ে চলে। বলতে পার এ জীবনে আনন্দ কোথায়?

মীনাক্ষী মৃদু স্বরে বলে, কিন্তু আইলীন মামী, তিনি তো—

অতুল মামার কপালের শির দুটো কাঁপে, ওর কথা ছেড়ে দাও, যত বয়েস বাড়ছে, মানুষটা যাচ্ছে একেবারে বদলে। যে আইলীনকে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম সে নেই। কবে মরে ভূত হয়ে গেছে। যে আইলীনকে তোমরা দেখছ সে আমার জীবনে একটা গলগ্রহ। নিজের স্বার্থ ছাড়া আজ আর কিছু সে বুঝতে চায় না।

—এ তুমি কি বলছ অতুল মামা?

—আজকের আইলীনভাবে আমাকে বিয়ে করে তার জীবনটা নষ্ট হয়েছে। মনে করে নিজের জাতে বিয়ে করলে তিনবার ডিভোর্স করলেও সে সুখী হতো। অন্তত জীবন ধারণের একটা অর্থ খুঁজে পেত সে। আমাদের এ দাম্পত্য জীবনটা তার কাছে মনে হয় নিরামিষ, নিরর্থক।

—মেমমামীকে দেখে তো তা মনে হয় না।

—অনেক কিছুই বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না মীনাক্ষী। তবে এইটুকু জেনে রেখ, আইলীন যদি আজ কাউকে ভালবাসে সে শীলু, আমি নই। এক এক সময় মনে হয় আমার চেয়ে শীলু অনেক সুখী।

অতুল মামা শেষের কথাগুলো এমনভাবে বললেন মীনাক্ষী কিছুতেই চোখের জল সামলাতে পারল না। তাঁর জীবনের করুণ ট্র্যাজেডীর কথা ভেবে মীনাক্ষীর মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

যখন সে অতুল মামার বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল, তার মন থেকে সবটুকু আনন্দ যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। শুকনো মুখে অস্থির উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে কোনরকমে সে বাড়িতে এসে পৌঁছল। পীয়ের তার জন্যে বাইরে অপেক্ষা করছিল, স্বভাবসুলভ হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে বলল, তুমি তো আচ্ছা মেয়ে মীনা, আমাকে ন'টার সময় আসতে বলে নিজে ফেরবার নাম নেই।

মীনাক্ষী ছোট উত্তর দিল, চল, উপরে যাই।

—আগে তোমার দাদুর চিঠিটা দাও।

মীনাক্ষী চিঠি বার করে দেয়, পীয়ের পড়তে পড়তেই সিঁড়ি দিয়ে ওঠে।

ওরা ঘরে ঢোকে।

চিঠি পড়া শেষ করে পীয়ের সানন্দে মীনাক্ষীকে জড়িয়ে ধরে, এখন বুঝতে পারছি মীনা, তুমি কেন দিনরাত দাদুর কথা এত করে বলতে। সত্যিই উনি অসাধারণ মানুষ। কি চমৎকার করে সব কথা বুঝিয়ে লিখেছেন।

পীয়ের এতক্ষণে লক্ষ্য করল মীনাক্ষী সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক। মুখ তার বিবর্ণ চোখে বোধহয় জল।

—কি হয়েছে মীনা?

মীনাক্ষী নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে। কিছু না।

পীয়ের ব্যস্ত হয়, কেন আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করছ? বল তোমার কি হয়েছে।

মীনাক্ষী তবু চুপ করে থাকে।

পীয়ের মীনাক্ষীর মুখখানা ভাল করে লক্ষ্য করে বলে, আমি বুঝতে পেরেছি। মীনাক্ষী মুখ তুলে তাকায়।

—নিশ্চয় অতুল মামা তোমায় কিছু বলেছে, কিম্বা আইলীন মামী। একটু চুপ করে থেকে আবার বলে, কি বলেছে তাও জানি, বলেছে এ বিয়ে করো না।

পীয়েরের কথা শুনে মীনাক্ষী বিস্মিত হল, তুমি কি করে জানলে?

পীয়ের তীক্ষ্ম স্বরে বলে, ওরা তো বাধা দেবেই, যারা নিজেরা সুখী হয়নি, তারা কি করে বলবে তুমি বিয়ে কর।

মীনাক্ষী প্রশ্ন করে, তোমারও মনে হয় ওরা সুখী নয়?

—কি আশ্চর্য, এর আবার বোঝবার কি আছে। তোমার অতুল মামাকে দেখে
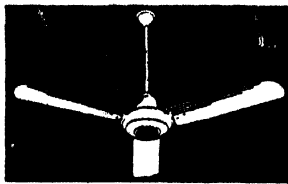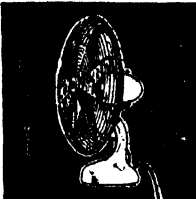
বুঝতে পার না? কতখানি হতাশা মানুষটার জীবনে। আমাদের দেশের কোন ছেলে হলে এ অবস্থায় মদ খেয়ে নিজের দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করত। উনি তাও পারেন না। তাই দুঃখের পরিমাণ বোধহয় আরও বেশী।

মীনাক্ষী যেন ক্ষীণ আলো দেখতে পায়, প্রশ্ন করে, তাহলে?

পীয়ের উঠে গিয়ে মীনাক্ষীর পাশে বসে, তার হাতটা নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, মীনা তোমার কাছে একটা অনুরোধ, জীবনে যারা পারেনি, হেরে গেছে, ভাল লোক হলেও তাদের কথায় বেশী কান দিও না। তারা নিজেরা পারেনি বলে চায় না আর একজন পারুক। যদি উপদেশই শুনতে হয়, এমন লোকের কাছে শুনো যে জয়ী হয়েছে, মনে যার কোন গ্লানি নেই। যেমন তোমার দাদু।

মীনাক্ষীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, বলে, সত্যি পীয়ের, অতুল মামার কথা শুনে কেমন যেন আমি স্বপ্নের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম, বুঝতে পারছিলাম না, কি আমার করা উচিত।

পীয়ের সহজ করে বুঝিয়ে দেয়, আর কোন উচিত অনুচিতের প্রশ্ন নেই মীনা, তোমার দাদুর মতামতের জন্য এতদিন অপেক্ষা করছিলাম। তা যখন পেয়ে গেছি আর আমি কোন চিন্তা করি না। আমার প্ল্যান তৈরী হয়ে গেছে। অফিস থেকে আমি ছুটি নেব, অনেক দিনের ছুটি আমার পাওনা হয়েছে। তোমাকে নিয়ে যাব কন্টিনেন্ট বেড়াতে, বিশেষ করে ব্রাসেলসএ। নিজের চোখে তুমি দেখো আমার আত্মীয় স্বজনদের, দেখো আমার সমাজ। যদি তুমে অপছন্দ কর মোটেও আমি বলব না ব্রাসেলসএ থাকতে। যে দেশ তোমার ভাল লাগে সে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ যেখানেই হোক না কেন সেইখানেই আমরা সংসার পাতব।

মীনাক্ষীর চোখ মুখ খুশিতে ঝলমল করে ওঠে, সত্যি বলছ পীয়ের? পীয়ের মীনাক্ষীকে আরও কাছে টেনে নেয়? মনে রেখো মীনা আমার জীবনের দাঁড়িপাল্লায় একদিকে তুমি, আর একদিকে যাবতীয় সব কিছু। তুমি যাতে সুখী হও সেইটাই হবে আমার একমাত্র লক্ষ্য। তোমার আত্মীয় স্বজন সবাইকে ছেড়ে, নিজের দেশের মায়া কাটিয়ে তুমি আমাকে গ্রহণ করতে রাজী হয়েছ একথা যখনই ভাবি, আমার চোখে জল আসে।

মীনাক্ষী পীয়েরের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বলে, ওভাবে কথা বলো না পীয়ের, আমার লজ্জা করে।

পীয়ের গাঢ় স্বরে বলে, কথা দাও, আর কোন রকম চিন্তা করবে না।

—না, করব না।

—যা কিছু ঠিক করব, আমরা দুজনে।

—বেশ তাই হবে।

রজত মিথ্যে বলেনি।

সে রাত্রে সোরেন রজতের সঙ্গে বেরিয়ে ল্যাম্বেথের এক প্রান্তে তাদের আড্ডায় না গেলে সত্যিই লণ্ডন জীবনের আর একটা দিক তার কাছে অজ্ঞাতই থেকে যেত, যে দিকটার কথা বেশীর ভাগ ইংরেজও জানে না। বিদেশী হয়েও সোরেন যে ওখানকার বিচিত্র মানুষগুলোকে খুব কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিল সে শুধু রজতের জন্যে।

প্রথম চোটে অবশ্য ল্যাম্বেথের সংকীর্ণ গলিপথ বেয়ে জীর্ণ এক বাড়ির বেসমেণ্টে ঢুকে সে অস্বস্তি বোধ করেছিল কিন্তু যখন দেখল এই আড্ডায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রজতের চোখ মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তখন সোরেন ইচ্ছে করে নিজের মনের বিরক্তি চেপে রেখে চেষ্টা করল এখানকার অচেনা মানুষগুলোকে চেনবার।

ওরা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একটি মেয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, ঐ যে রজত এসেছে।

রজত সহাস্যে তার অভ্যর্থনাকে গ্রহণ করল, সোরেনকে বলল, ওর নাম লরা। কেমন মিষ্টি দেখতে, না?

লরা কারুর সঙ্গে কথা বলছিল, তার কাছে বিদায় চেয়ে নিয়ে এগিয়ে এল রজতদের দিকে। বয়স কুড়ি, একুশ হবে, ছিমছাম শরীর। বড় বড় চোখ, রোদে পোড়া তামাটে রঙ, মাথায় তার সাদা চুল। রজতের কাছে এসে তার কাঁধের ওপর দুটো হাত ছড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, এতদিন আসনি কেন?

রজত লরার কপালের উপর চুমো খেয়ে উত্তর দিল, ব্যস্ত ছিলাম।

—শেষ কবে এসেছ বলত আমার কাছে?

—তা প্রায় মাস খানেক হবে।

লরা অভিমানের সুরে বলে, তার চেয়েও বেশী। হঠাৎ আজ এলে যে? মারিয়া কোথায়?

রজত অন্যমনস্ক স্বরে বলে, ও এখানে নেই।

লরার চোখ দুটো কৌতুকে হাসল, তাই তুমি এসেছ, আমি জানি মারিয়া পছন্দ করে না তোমার এখানে আসা।

রজত প্রতিবাদ করে কি যেন বলল, লরাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল অন্যদিকে।

সোরেন ওদের দেখছিল, খুব যে ভাল লাগছিল তা নয়, বিশেষ করে মনে পড়ছিল তার মারিয়ার কথা। ইস্ট এণ্ডের বাড়িতে মত্ত অবস্থায় একদিন সে ঠাট্টা করে বলেছিল, রজত সাদা চুলের মেয়েদের বেশী ভালবাসে। সেদিন সোরেন কথাটায় বিশেষ কান দেয়নি,

আজ লরাকে দেখার পর সৌরেনের মনে হল, মারিয়া হয়ত ঠিকই বলেছিল।

সৌরেনকে কিন্তু বেশীক্ষণ একলা দাঁড়িয়ে থাকতে হলো না, সোনালী চুলের কাঁচা পাকা দাড়িওয়ালা যে লোকটি তার কাছে এগিয়ে এল তাকে হঠাৎ দেখলে রোমান ক্যাথলিক ফাদার বলে ভুল হয়। প্রশস্ত কপাল, মুখে প্রশস্ত হাসি, সস্তা দামের রিপু করা ঢিলে কোট প্যান্টের মধ্যে থেকে, তার ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট।

নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, আমার নাম মাইকেল। এ আড্ডায় তোমায় বোধহয় নতুন দেখছি।

সৌরেন হেসে বলল, হ্যাঁ, আজ প্রথম।

—কি পান করবে বল।

—আমি বিশেষ কিছু খাই না, তবে বীয়ার হলে আপত্তি নেই।

মাইকেল সৌরেনের কাঁধে হাত দিয়ে ঘরের অন্যদিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, বীয়ার কেন, ভাল হুইস্কি আছে, চল।

—হুইস্কি আমি আগে খাইনি।

মাইকেল তার পিঠের উপর চাপড় মারে, খেলেই বুঝতে পারবে, ওটা অমৃত।

হুইস্কির স্বাদ সৌরেনের প্রথমটা ভাল না লাগলেও মনের জোর করে দু'এক ঢোক গিলে ফেলার পর খারাপ লাগল না। সে অনুভব করল আস্তে আস্তে হুইস্কির প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে তার শরীরের মধ্যে।

মাইকেল অনেক কথা বলে যাচ্ছে, সব কথা যে শুনল তা নয়, তবে এটুকু বুঝল, মাইকেল আর্টিস্ট, ফুটপাথের ওপর ছবি আঁকে। ন্যাশানাল গ্যালারীর কাছে গেলেই ফুটপাথের ওপর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

ঘরের মধ্যে এতক্ষণ সজোরে অর্গ্যান বাজছিল, একেবারে পাশাপাশি না দাঁড়ালে কথা শোনার উপায় ছিল না। বাজনার তালে তালে কয়েকজন ছেলেমেয়ে নাচছিল মেঝের উপর। ঢিমে আলো, তার সঙ্গে সিগারেটের ধোঁয়া। সব কিছু মিলিয়ে সৌরেনের মনে হচ্ছিল এ এক বিচিত্র পরিবেশ।

একটু বাদে রজত ফিরে এল তার কাছে, চোখে মুখে তার তৃপ্তির হাসি। যেন নিজের মনেই বললে, সত্যি, লরা একটা এঞ্জেল।

সৌরেন সে কথায় কান না দিয়ে হাতের গেলাসটা দেখিয়ে বলল, তোর পাল্লায় পড়ে আজ হুইস্কি খাচ্ছি।

—বেশ করেছিস, কিছু পয়সা দেতো!

—কত?

—পাউন্ড দু'এক।

সৌরেন দু'খানা নোট বার করে দেয়।

রজত স্মিত হেসে বলে, ধন্যবাদ। লরাকে এটা দিয়ে আসি। ড্রিংকস-এর চাঁদা। সেদিন কতক্ষণ সৌরেন ওদের আড্ডায় ছিল ঠিক তার মনে নেই। তৃতীয় পেগ হুইস্কি পানের সময় থেকেই নেশা তাকে পেয়ে বসেছে। স্বপ্নালু ঘোরের মধ্যে তার মনে পড়ে সুন্দরী লরা একবার এসেছিল তার কাছে, টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল নাচের মেঝেতে; একে সৌরেন নাচতে ভাল পারে না, তার উপর পানীয়ের প্রভাবে মোটেই তার পা তালে পড়েনি। কিন্তু আশ্চর্য তার জন্যে এতটুকু লজ্জা বোধ করেনি সৌরেন, বেশ ভাল লেগেছিল, কিছুক্ষণের জন্য অন্তত লরাকে কাছে পেতে।

হাসিতে চোখ উজ্জ্বল করে লরা বলেছিল, এর পর থেকে তুমি এখানে আসবে তো।

সৌরেন বলেছিল, আসব।

—তোমার বন্ধুটি বড় খামখেয়ালী। ওর জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই। সোজা চলে এস আমার কাছে।

যতদূর মনে পড়ে হঠাৎ এক সময় বাজনা থেমে গেল, লরা যেন বিরক্ত স্বরে বলল, দেখেছ, কানা জোন্সটা কি রকম হিংসুটে।

—কে কানা জোন্স?

—ঐ যে বাজনা বাজাচ্ছিল। তোমার সঙ্গে আমি নাচছি দেখে হিংসেয় বাজনা থামিয়ে দিল।

লরা খিল খিল করে হেসে সৌরেনকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল চেয়ারে।

তারপব কত রাত্রে সৌরেন বাড়ি ফিরেছে তার নিজেরই হুঁশ নেই। নিশ্চয় রজত তাকে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

পরের দিন ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। মাথা ধরে রয়েছে, কপালের কাছে শির দুটো এখনও দপ্ দপ্ করছে। কালকের সব ব্যাপারটাই দুঃস্বপ্নের মত মনে হল তার কাছে। রজত যেন তার চোখ বেঁধে ছেড়ে দিয়েছিল এক বিচিত্র রাজ্যে যেখানে সে কানামাছির মত চারদিকে ছুটে কারুর হদিশ না পেয়ে শরীরে মনে প্রচণ্ড অবসাদ নিয়ে ফিরে এসেছে।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়তে খেয়াল হল অফিসের ছুটি থাকলেও ডাইং ক্লিনিং থেকে এখুনি কাচানো স্যুটখানা নিয়ে আসা দরকার, দোকান বন্ধ হয়ে গেলে দেড়-দিন আর পাওয়া যাবে না।

মুখ ধুয়ে কালকের জামা কাপড়গুলোই পরে নিল সৌরেন। চা না হয় সে বাইরে কোথাও খেয়ে নেবে। কিন্তু চুল আঁচড়ে পকেটে হাত দিতে গিয়ে সে চমকে উঠল। পকেটে টাকা নেই। কাল রজতকে সে দু' পাউন্ড বার করে দিয়েছিল, তাছাড়া আরও দু'খানা নোট তার কাছে থাকবার কথা, কোথায় গেল সেগুলো? একবার মনে হল হয়ত কাল রাত্রে বাড়ি ফিরে নেশার বশে নোটগুলো অন্য কোথাও সযত্নে তুলে রেখে বেমালুম ভুলে গেছে। কিন্তু প্রায় আধঘণ্টা ধরে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে কোথাও সে পেল না।

যদি রজত নিয়ে থাকে। হয়ত রাত্রে দরকার পড়েছিল, সৌরেনের কাছ থেকে আরও দু' পাউন্ড চেয়ে নিয়েছে। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গিয়ে সৌরেন ফোন করল রজতকে। দু'চারটে মামুলী কথার পর সৌরেন টাকার প্রসঙ্গ তুলল। রজত জিজ্ঞেস করলে, আর কত টাকা তোর সঙ্গে ছিল?

—দু' পাউন্ড, পাঁচ শিলিং। শিলিংটা আছে, নোট দুটো নেই।

রজত গম্ভীর স্বরে বলল, হুম্।

—হুম্ কি আমার যে টাকার দরকার

রজত স্পষ্ট গলায় বলল, তাহলে বোধহয় লরা তুলে নিয়েছে।

সৌরেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না, কি বলছিস তুই?

—ওর ঐ এক বদ্ অভ্যেস। টাকা দেখলে লোভ সামলাতে পারে না।

—তার মানে লরা চোর?

রজত সহজভাবে বলে, চোর ঠিক নয়, পকেটমার। তবে তোর টাকা ও ফেরৎ দিয়ে দেবে।

সৌরেন বিরক্তি গোপন করতে পারে না, টাকাটা আজই আমার দরকার।

—বেশ। তাহলে ন্যাশানাল গ্যালারীর কাছে আয়; একটা নাগাদ। মাইকেলকে খুঁজে পাবি, ও ওখানে ছবি আঁকে, ফুটপাথের ওপর। মাইকেলের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তোকে ফেরত দিয়ে দেব।

(ক্রমশ)

ছোট গল্প

দেবযানী—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। অমৃত সাহিত্য মন্দির, ১৬/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—আড়াই টাকা।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে জীবনের শুধু রসরূপায়ণ বা "criticism of life" নেই, গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তির সংগে তিনি তাঁর গল্পের চরিত্রগুলির সংগে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সহযোগিতা স্থাপন করেন। কী কচি শিশু, কী পক্ককেশ বৃদ্ধ কিংবা খেটে খাওয়া যুবক-যুবতী সকলেই তাঁর মনের মানুষ। "দেবযানী" গল্পগ্রন্থের মধ্যে সাংসারিক জীবনের সুখ দুঃখের নির্যাস রসায়িত হয়ে উঠেছে। প্রতিটি গল্পেই নিগূঢ় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সামগ্রিক জীবনের একটি অংশের কি তুমুল তোলপাড়! কখনো আত্মবঞ্চনা, কখনো আত্মত্যাগ, সব হারানোর বেদনা, কিংবা সব হারিয়েও না-হারানোর মানসিকতা গল্পগুলির মূলে লক্ষ্য মনে হয়। তবু প্রতিটি গল্পই পৃথক, অনন্য, অভিনব। ডায়ালগেও অসাধারণ প্রাঞ্জলতা। গ্রন্থটির প্রথম গল্পের নাম "দেবযানী"। 'কচ ও দেবযানী' কথাকাহিনীর পটভূমিকায় আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে একটি নতুন আলেখ্য সৃষ্টি করেছেন গল্পকার এই গল্পটিতে। অর্থ আর রূপের কাছে গুণ যেন গৌণ। আরতির কাছে শিপ্রার পরাজয়ই তার প্রমাণ। তবু শিপ্রা চোখের জল লুকিয়েও আরতি ও সুজিতের বিবাহিত জীবন-পর্বে তাদের অভিনয়সুখ উপভোগ করে। সত্যি সবই যেন অভিনয়! তবু এরি ভেতর বড় হয়ে উঠেছে শিপ্রার সকরুণ আত্মত্যাগ। 'একটি বিনিদ্র রজনী' গল্পের প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প লেখকের গল্পের চেয়ে আপন বাস্তব জীবনের নাটকীয় কাহিনী কতো করুণ—তা লেখক আশ্চর্যভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন। 'নতুন স্বাদে'র বিপর্যস্ত জীবনেও বন্ধুপুত্রের জন্মদিনের আনন্দে নবজীবনের আস্বাদ রয়েছে। অবিবাহিত বর্ষীয়ান যোগেশ্বর তাঁর বয়সী বন্ধুর হঠাৎ-বিবাহোপলক্ষে উপহার দেবার জন্যে আনা হরগৌরী মূর্তিটা শেষ পর্যন্ত নিজেকেই দান করে। সে ছাড়া কেই বা দিত তাই সে "একক"। নিজের কাছে নিজেই সে ট্রাজেডি। টানাপোড়েনের সংসারে "বিবাহ বার্ষিকী"তে স্ত্রীকে দেওয়া দামী শাড়িটা দিতে হল ঠিকে ঝিয়ের মেয়ের বিয়েয়। না দিয়েও উপায় নেই। দিতেও বেদনা হয়। তবু এ-দানের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য বিরাগ-এর সমাপ্তি ঘটে দুজনের নিবিড় অনুরাগে। "আঠারো আনা গল্পে" মীনাক্ষীর সব দুঃখকে দূর করে দেয় আপনার মধ্যে অনাগত জীবনের অংকুরোদ্গমে। স্বামী চিন্ময় সেতার ছাড়লেও অফিসার হয়েছে। সুতরাং বেতার সেতারী সুনীলবাবু এবং মানসীর চেয়ে তারা অন্তত দু-আনা বেশি-ই লাভ করেছে। 'বনভোজন' গল্পে শঙ্কর এবং ছায়ার মাঝখানে গভীর দীর্ঘনিশ্বাসটার জোড়া লাগল না। দুজনের মনের দৈন্য দুজনকে সরিয়ে রাখল দু কোটিতে। হতভাগ্য মালীটাই পাঁচ টাকার জন্যে শঙ্করের ভাবী মিলনানন্দের নীরব খতিয়ান হয়ে পড়ে রইল। "সীমান্ত" গল্পে বেয়ারা গোবিন্দর ট্রাজেডিকে ছাপিয়ে লেখকের নিজের ট্রাজেডি বড় হয়ে উঠেছে। এই ভাবে নরেন্দ্র মিত্রের গল্পের স্বাদ অনন্য। এখানেই গল্প লেখক হিসেবে শ্রীযুক্ত মিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব।

৫৭-৬০

নীলাঞ্জনছায়া। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—৩, টাকা।

বাংলা কথাসাহিত্যে আজ শচীন্দ্রনাথ একটি উল্লেখযোগ্য নাম। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁর অনেকগুলো উপন্যাস এবং গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলেই যে তিনি খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছেন, তা নয় তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কথা হলো এই যে, পাঠকের প্রতি যেমন তাঁর শ্রদ্ধা আছে তেমনি তাঁর শ্রদ্ধা আছে সাহিত্যের প্রতি। পাঠকের প্রতি অবহেলায় তিনি তাঁর রচনায় কোনো আকস্মিকতাকে আনার পক্ষপাতি নন, অন্যপক্ষে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিয়েও তিনি তাঁর নবলব্ধ অভিজ্ঞতাকে নতুন করে সাহিত্যের ডালিতে সাজিয়ে দিতে পারেন। ফলে, একটা ব্যাপারে তাঁর সম্বন্ধে পাঠকেরা নিশ্চিত রায় দেবেন যে তিনি আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাঙ্গণকে অনেকখানি প্রসারিত হতে সাহায্য করেছেন।

এখনও পর্যন্ত তাঁর সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ নীলাঞ্জনছায়া এ উক্তির সমর্থন করবে। কোনো পাঠকেরই বুঝতে ভুল হবে না যে, কত বিচিত্র পথে লেখক পরিক্রমা করেছেন। এবং এ-ও সত্য যে প্রতিটি অভিজ্ঞতাকেই তিনি পরম যত্নে সঞ্চয় করে রেখেছেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এ-সংকলনের অধিকাংশ গল্পের পটভূমি বাংলা দেশের বাইরের, এমন কি কোনটা বা ভারতবর্ষেরও বাইরের। এবং পাত্র-পাত্রীরাও নানা স্তরের নানা দেশের। 'তৃতীয় ব্যক্তিতে' নায়িকের নিষ্ঠুর বিশ্বাস, 'খুঁজে-ফেরা আলোয়' সভ্যতার লেশমাত্র-হীন একটি নারীপ্রাণের হাহাকার, 'নীলাঞ্জন ছায়ায়' একটি আকুল হৃদয়ের ব্যথার প্রস্রবণ, 'প্রেমে' একটি দুর্বার জীবনের করুণ পরিণতি—এ সবের মধ্যে আপাত-সাদৃশ্য কিছু নেই। কিন্তু অনুভূতিশীল পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না সর্বত্রই লেখক মানুষের ভালবাসায় বিশ্বাসী। বলা বাহুল্য, এই সহানুভূতিই লেখককে সাহিত্যের

দরদালানে প্রবেশাধিকার দিয়েছে। এবং শচীন্দ্রনাথ প্রমাণ করেছেন সে অধিকারের মর্যাদা রক্ষা করার ক্ষমতাও তাঁর আছে।

৭৮।৬১

উপন্যাস

সুচরিতাসু। প্রভাত দেব সরকার। প্রকাশ—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—৩, টাকা।

বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে প্রভাত দেব সরকার বহুদিন থেকেই একজন পরিচিত লেখক। সুচরিতাসু তাঁর অধুনাতন প্রকাশিত উপন্যাস। এ-লেখকের লেখার সংগে ইতিমধ্যে যাঁরা পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন, এই উপন্যাসটিতেও লেখকের বৈশিষ্ট্যটি পরিপূর্ণভাবে বর্তমান। চোখ-ভোলানো আধুনিকতার প্রতি মোহ নেই প্রভাত দেব সরকারের। যে-জীবন তাঁর জানার বাইরে তাকে নিয়ে বড়াই করার লোভও তাঁর নেই। এ-দুএর স্বাস্থ্যকর পরিণতি এই যে, প্রভাতবাবু সরলরেখায় যে কাহিনী বর্ণনা করেন, তা সোজাসুজি পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে, এবং 'সুচরিতাসু'ও যে তাঁর অন্যান্য রচনার মতোই পাঠকমন জয় করতে সক্ষম হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ-উপন্যাসের বিষয়বস্তু সেই চিরন্তন প্রেম। কিন্তু প্রেমের বিচিত্র গতি নয়। কমলা বা বসন্ত পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট এবং মানসিকতার দিক থেকে শেষ পর্যন্ত আকর্ষণ অটুটই ছিলো। বিচিত্র গতি যদি এখানে কিছু থাকেই তবে তা সমাজ-মানসের। এই সমাজের চক্রান্তই ঘটিয়েছে তাদের সাময়িক বিচ্ছেদ। তবু বলবো লেখক একটি গতানুগতিক কাহিনী তৈরী করেননি। তা হলে সংগীতভবনের বৃদ্ধ গায়ক-শিক্ষক একটি অবান্তর চরিত্র হয়েই থাকতেন, পঞ্চাননের বোধ হয় কোনো দায়িত্বও থাকতো না। কিন্তু পাঠক লক্ষ্য করবেন এ দুটি চরিত্র কেমন জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। এমন কি অলক্ষ্য চরিত্র হয়েও ইঞ্জিনিয়ার চৌধুরী পর্যন্ত স্বাভাবিক এবং হৃদয়ের ঔদার্যে শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে। উপন্যাসটি রচনার পেছনে লেখকমনের যে সহৃদয়তা অলক্ষিতে কাজ করে চলেছে, বলতে বাধা নেই, এই সহজ সাবলীল কাহিনীটিতে তার স্পর্শ পড়েছে আগাগোড়া এবং এইজন্যেই গ্রন্থটি প্রতিটি পাঠকের ভাল লাগবে।

৮৭।৬১

প্রথম প্রণয়। বিক্রমাদিত্য। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—৩, টাকা।

ইয়োরোপের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস 'প্রথম প্রণয়'। আঙ্গিকের বিশেষত্বটি লক্ষণীয়। নায়ক আতিয়ার রহমান এবং তার দ্বিতীয়া স্ত্রী মিলি পরস্পরের কাছে খুলে ধরছে তাদের প্রথম প্রেমের কাহিনী পটভূমির বৈশিষ্ট্য এই যে আতিয়ার যখন তার কাহিনী বলছে তখন তার প্রথম প্রেমের নায়িকা প্রথমা স্ত্রী মৃত, এবং মিলি যখন বলছে তার কাহিনী তখন তার নায়ক আতিয়ারও বিগত। সুতরাং আঙ্গিক যে আকর্ষণীয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

উপন্যাসটিতে প্রেমই প্রধান উপজীব্য হলেও, জীবনের অনেক বিসর্পিল গলি-ঘুঁজির সন্ধান নিতে চেষ্টা করেছেন লেখক। তার ফলে মূল কাহিনীকে কেন্দ্র করে বহু চরিত্রের আনাগোনা ঘটেছে এ-উপন্যাসে। বিচিত্র মানুষের একটি মিছিল—কেউ বা উজ্জ্বল কেউ বা ম্লান। কিন্তু কোনো চরিত্রের প্রতিই অন্যায় করেন নি লেখক।

সে-সংগে প্রেমের বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী দুটি রূপকেই তাদের নিজস্ব চেহারায় ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন লেখক। এবং বুঝতে অসুবিধা হয় না যে লিলি এবং মিলি প্রেমের এই দুটি রূপেরই প্রতীক। পাঠক যদি সে দিক থেকে উপন্যাসটিকে রূপক কাহিনী বলে বিচার করতে চান, তা হলে তিনি হয়তো ভুল করবেন না।

আঙ্গিকে নতুনত্ব থাকলেও ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল। ফলে সমস্তটা কাহিনী একটি জলস্রোতের মতো বয়ে চলেছে। এই সহজ সরলতাকে কত কষ্টে যে লেখক আয়ত্ত করেছেন একজন লেখকের পক্ষে তা অনুমান করা বোধ হয় কঠিন নয়।

৮২।৬১

কবিতা

মুখের মেলা। মণীন্দ্র রায়। পুস্তক প্রকাশক। ৮।১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দেড় টাকা।

এই মুখগুলি মনে হয় আমাদেরও চেনা। নীরজা নামের সেই ঘূর্ণী হাওয়ার মত ভবিষ্যৎ-অন্ধ মেয়েটি, পাইলট অজিত নাগ, ধৈর্যশীলা শ্রীলতা সেন, দুঃখবিদ্ধ ইয়াসিন মিয়া, মফঃস্বল লাইব্রেরির সেই একনিষ্ঠ যুবক—এদের দেখেছি আমরাও রেস্তোরাঁয়, আফিসে, গঙ্গার ঘাটে, পথে, হাজার মানুষের মধ্যে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ চরিত্রে উদ্ভাসিত।

মণীন্দ্র রায়ের সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থে শুধু এই একজাতীয় চরিত্র-আখ্যান মূলক কবিতাগুলিই স্থান পেয়েছে। প্রত্যক্ষ অথবা প্রতিফলিত—মানুষের চরিত্রই

কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু। এমনকি নিসর্গ বর্ণনাও (বা বন্দনা) যদি কবির নিতান্ত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের অনুভূতিগুলি প্রকাশ না করে, তবে উদ্দেশ্যহীন বলে প্রতীয়মান হয়। বাস্তবসদৃশ মানুষের চরিত্র—যা এতকাল গল্প-উপন্যাসের বিষয়বস্তু বলে ধারণা ছিল—সেগুলি অবলম্বন করেই মনীন্দ্র রায় এই কাব্য-গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। ইংরেজী ভাষায় অডেনও এ-জাতীয় কিছু সার্থক কবিতা রচনা করেছেন।

বলা বাহুল্য, চরিত্রগুলির নিতান্ত বাস্তব সুখ-দুঃখ, অভাব-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা কবির কাজ নয়। সেগুলিকে নিতান্তই পদ্যবদ্ধ আখ্যায়িকা বলা উচিত। মনীন্দ্র রায় সে-চেষ্টা করেননি। কোন বিশেষ ভাবনা, একজন মানুষের অন্তবর্তী আসল মানুষটির পরিচয় তিনি উন্মোচিত করেছেন। যেন প্রত্যেকটি মানুষই প্রত্যেকটি মানুষের দর্পণ। সেই সঙ্গে সঙ্গে যে-কবি এই মানুষগুলিকে দেখছে—তারও স্পষ্ট চেহারা দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু এই কাব্যে মণীন্দ্র রায়ের মূর্তি যেন কেমন বিচলিত। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থে মণীন্দ্র রায়ের যে বলিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যেত—এখানে তা অনুপস্থিত। এখানে তিনি অতৃপ্ত, অস্থির, যন্ত্রণাকাতর, ব্যক্তিগত দুঃখে পরিপ্লুত মনে হয়। তাই অধিকাংশ মানুষেরই অন্যান্য দিক ভুলে তিনি দুঃখের দিক-সন্ধান করেছেন। এই দুঃখ-সন্ধান তাঁকে কবিতার নতুন পথে নিয়ে যাবে আশা করি।

কাব্যগ্রন্থটি পরীক্ষামূলক কবিতা হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধু একটি কথা নিবেদন করি যে, কয়েকটি রচনায় আবেদন বড় বেশী প্রত্যক্ষ হয়ে পড়েছে। গদ্যের সুর এসে পড়েছে সে-সব রচনায়। এ বিষয়ে একটু সচেতন হওয়া উচিত ছিল।

মিলিত সংসার। অরুণ ভট্টাচার্য। কবিতামেলা প্রকাশিত; বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। দু' টাকা।

বাত্যাবিক্ষুব্ধ অস্থির পরিবেশে দাঁড়িয়েও শ্রীযুক্ত অরুণ ভট্টাচার্য উত্তরণে বিশ্বাসী। তাঁর নবতম কাব্যগ্রন্থ 'মিলিত সংসার'-এর অন্তর্গত 'নেপথ্য নায়ক' কবিতাটি থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করব :

'বিধাতার সান্ত্বনা সকলেই গৌণ।
তথাপি দুর্বার হৃদয়ে উৎসব নিত্য,
আমরা দিনমান এ হেন সংসারে হব
নদী পারাপার।'

বলা বাহুল্য, প্রাগুক্তির সমর্থনে উদ্ধৃতির প্রয়োজন ছিল্যে। প্রথমতঃ কবি অরুণ ভট্টাচার্য 'বহুজনপঠিত' কবি নন; এবং

উচিতার্থে, তিনি জনপ্রিয় নন। কবিরা জনপ্রিয় প্রায়ই হন না, স্বীকার করি। কিন্তু অরুণ ভট্টাচার্য আধুনিক বাংলা কবিতার বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে যে ছায়ার মতো বিচরণ করেন, কখনো সম্মুখে আসেন নি, তাতে বাঙালী কবিতা-পাঠকের দুর্ভাগ্যই সূচিত হয়। আর একটি কারণ অবশ্য আছেঃ তিরিশের কবিদের সর্বপ্লাবী কবিতার স্রোতে যে কলরব উঠেছে, তার ধ্বনি-বিহ্বল ভবিষ্যৎ চল্লিশ ও পঞ্চাশের কবিদের সৎ-প্রতিভার দৃষ্টিগ্রাহ্যতায় যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করেছে। এখন কবিতা পাঠককে স্মরণ করতে বলি, স্থির হ'তে বলি; এবং অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতার দর্পণে একবার নিজেদের প্রতিবিম্বিত হ'তে অনুরোধ করি। আপাত-সারল্যে কখনো কখনো 'মহৎ' আত্মগোপন করে, যেমন করেছিলো উইলিয়ম ব্লেকের কবিতায়। অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতার নিষ্পাপ পবিত্রতা ও যন্ত্রণার অনুচ্চ অভিব্যক্তি ও ছন্দের কৌশল আমাদের যুগপৎ মুগ্ধ ও বিহ্বল করে। তাঁর আর একটি বিশেষ গুণ, শব্দকে তিনি শব্দাতীত গভীর ব্যঞ্জনায় উত্তীর্ণ করতে পারেন।

এবং সাম্প্রতিক কবিতায় যা দারুণ দুর্লক্ষণ, অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতায় সেই আরোপিত আর্তনাদ নেই, নেই অগ্রজ কবিদের ব্যর্থ অনুসৃতি।

এই কাব্যগ্রন্থে সংকলিত চৌত্রিশটি কবিতা এবং একটি কাব্যনাটক 'তিন চরিত্র' —একজন সৎ কবিকে চিনবার পক্ষে একবারের মতো যথেষ্ট।

রহস্য উপন্যাস

দশ পুতুল—আগাথা ক্রিস্টি। অনুবাদ—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম—৩·৫০ নঃ পঃ।

রহস্যের প্রতি মানুষমাত্রেরই আকর্ষণ দুর্বার এবং সে-রহস্য উন্মোচনেও তার আনন্দ অপার। বোধ হয় এই জন্যই রহস্য-রোমাঞ্চ-কাহিনীর পাঠকসংখ্যা সমস্ত পৃথিবীতেই অত্যধিক। এ-সাহিত্য পাঠের যোগ্যতা শিক্ষার ওপর নির্ভর করে না, কৌতূহলই পাঠককে এ-সাহিত্যপাঠে উৎসাহিত করে। দীর্ঘদিনে তাই আপন গতিতে রহস্য রোমাঞ্চ কাহিনী সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং যত্ন ও অনুশীলনের ফলে সাহিত্যের মর্যাদাও উন্নীত হতে পেরেছে। পৃথিবীতে যত ভাষায় সাহিত্য রচিত হচ্ছে, খুব সম্ভব তত ভাষাতেই রহস্য ও রোমাঞ্চ কাহিনীও লিখিত হচ্ছে। তবু যদি জিজ্ঞাসা করা যায় বর্তমান কালে এ-সাহিত্য সৃষ্টি করে সব চেয়ে জনপ্রিয় হয়েছেন কে, সন্দেহ নেই সকলেই বিনা দ্বিধায় একটিমাত্র নাম উচ্চারণ করবেন—সে নাম আগাথা ক্রিস্টি।

আগাথা ক্রিস্টির সৃষ্ট সাহিত্য আমাদের দেশেও কম প্রচারিত হয়নি, এবং তাঁর ভক্ত পাঠকের সংখ্যা এখন অগুণতি। কিন্তু তা এতকাল সীমাবদ্ধ ছিলো শুধুমাত্র ইংরেজী-জানা শিক্ষিত মহলে। ত্রিবেণী প্রকাশনের প্রচেষ্টায় এখন এই সাহিত্যের স্বাদ গ্রহণ করার অধিকার পেলো ইংরেজী না-জানা বাঙালী পাঠকেরাও। 'দশ পুতুল' লেখিকার একটি সার্থক রহস্য-উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ। রহস্য-উপন্যাস বটে কিন্তু, গতানুগতিক রীতিপদ্ধতি এখানে অনুসরণ করা হয়নি। সব চেয়ে অবাক হওয়ার বিষয় এই যে, উপন্যাস যেখানে শেষ হয়ে গেলো, সেখানেও কিন্তু মূল রহস্য অনুন্মোচিতই থেকে গেছে। এবং সে রহস্য ভেদ হলো যে পদ্ধতিতে তা প্রায় দৈবের মতো—অন্তত তা মানুষের আয়ত্তের বাইরে। বলা বাহুল্য, এ ধরনের রচনাপাঠে যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে অভ্যস্ত, 'দশ পুতুল' তাঁদের পক্ষেও একটি পরম বিস্ময়। তদুপরি এ-শুধু একটি কাহিনীই নয়, লেখিকার বর্ণনাভঙ্গিটিও এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। দুরূহ মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের পথে যে সতর্কতায় তিনি এগিয়েছেন, তা পাঠকমাত্রকেই বিস্মিত করে।

অনুবাদক প্রশংসা দাবি করতে পারেন। যে গ্রন্থের প্রতিটি শব্দের ওপর সমগ্র কাহিনী নির্ভরশীল, তার অনুবাদ সফল না হলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু অনুবাদক সেদিকে কিছু ভুলচুক করেননি, অথচ এমন ঝরঝরে অনুবাদ হয়েছে যে মূল রচনা বলে ভাবতেও অসুবিধা হয় না। ৮১/৬১

পত্র-পত্রিকা

দর্শক—সম্পাদক রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু। প্রকাশক নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২৫ নয়া পয়সা।

শিল্প বিষয়ক একমাত্র বাঙলা পাক্ষিক পত্রিকা 'দর্শক' অল্প কালের মধ্যেই শিল্প-রসিক মহলে একটা স্থান করে নিয়েছে। আলোচ্য (১ম বর্ষ, ১৯শ) বিশেষ সংখ্যা-খানি ভারতের জাতীয় স্থাপত্যকলা, পোড়ামাটির শিল্পধারা, বাঙলা ভিত্তিচিত্রের ঐতিহ্য, শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধের সূচী বিষয়ক বিবিধ সুচিন্তিত প্রবন্ধসম্ভারে সমৃদ্ধ। ভারতের নানা অঞ্চলের চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও লোকশিল্প বিষয়ক তথ্যাদির সংকলন সংখ্যাখানিকে শিল্পরসিক মহলের কাছে আদরণীয় করে তুলবে।

প্রাপ্তিস্বীকার

The Transposed Heads and The Black Swan—Thomas Maun.

Betwixt Dream and Reality—Bonophul.

The Meaning of Culture—John Cooper Powys.

অনুবীক্ষণ—রমেন লাহিড়ী।

বাঁচতে সবাই চায়—অসীম বর্ধণ।

উচ্চ মাধ্যমিক সংগীত প্রবেশিকা—বুদ্ধদেব রায়।

রুক্মিনি বিবি—সুধীর করণ।

মানবতাবাদ—বসুধা চক্রবর্তী।

প্রশ্ন ও রেখাবিচার—শ্রীচূড়ামণি বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রেমের ঠাকুর—নির্মল দত্ত।

মন পবন—নীহাররঞ্জন গুপ্ত।

সাগর আকাশ—অনিলকুমার ভট্টাচার্য।

অতলান্ত—ব্রজেন মজুমদার।

আর হবে না দেরী—ধনঞ্জয় বৈরাগী।

বনে যদি ফুটলো কুসুম—প্রতিভা বসু।

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

আকারে ছোট, আবেগে গভীর

সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের হরপার্বতী মিলনে জন্ম নেয় যে মহৎ শিল্প তা অলৌকিক আনন্দে ও অনির্বচনীয় অনুভবে রসিক-চিত্তকে অভিভূত করে তোলে। সত্যজিৎ রায়ের সর্বাধুনিক নিবেদন, সত্যজিৎ রায় প্রোডকশন্স--এর তৈরী "তিন কন্যা" এই মহৎ শিল্পের স্বরূপ ও সংজ্ঞা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের দুটি অসামান্য ছোট গল্প—"পোস্ট মাস্টার" ও "সমাপ্তি" এবং অতি-প্রাকৃত রসে চিত্তাকর্ষক তাঁর আরেকটি গল্প "মণিহারা" নিয়ে তৈরী "তিন কন্যা"। তিনটি গল্পের এই একত্রিত চিত্ররূপ বাংলা ছায়াছবিতে অভূতপূর্ব। এবং "তিন কন্যা" নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের তিনটি নারী-চরিত্রকে বিভ্রম, বেদনা ও ব্যাকুলতার ভেতর দিয়ে মর্মসঞ্চারী রসের অবয়বরূপে উপস্থিত করার এই শিল্প-প্রয়াস'ও অভিনব। এই অভিনবত্ব বাংলা ছবির দিগন্ত বিস্তার করেছে।

সত্যজিৎ রায় শিল্পী। সব শিল্পীই তাঁর সৃষ্টিকে নিজের মানসিকতার আলপনায় ও প্রত্যয়ের রঙে সাজিয়ে নেন, রাঙিয়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্পকেও শ্রীরায় কোন কোন অংশে নিজের বিশ্বাস ও রুচির অনুসরণে নতুন রূপে ও ভাবে রূপময় ও বাণীবাহ করে তুলেছেন। এই গল্পগুচ্ছের চিত্ররূপে শ্রীরায় রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্যকর্মের মূল সুর ও রস'কে উপেক্ষা করেননি। কিন্তু গল্পগুলির চলচ্চিত্রায়ণে গল্পকারের সাহিত্যিক-সত্তার পাশাপাশি এক শিল্পীমনের সক্রিয় অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। এই শিল্পীমন সত্যজিৎ রায়ের। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক- ভাব-দর্শনের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের শিল্পী-মানসের কোন বিরোধ বা অসহযোগিতা ছবিতে কোথাও প্রকাশ পায়নি। তবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল রস ছবিতে অব্যাহত ও অবিকৃত থাকলেও কোন কোন অংশে স্বাদের ব্যতিক্রম ঘটেছে। এই ব্যতিক্রম চিত্র-রূপে অনেক সময় অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়, এবং ওই ব্যতিক্রম-সাধনের স্বাধীনতা'ও চিত্র-নির্মাতার স্বাধিকার-বহির্ভূত নয়।

"সমাপ্তি" গল্পে নায়কের একটি আকাঙ্ক্ষিত চুম্বন ও অপ্রত্যাশিতরূপে তার বাসনাপূরণকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ যে মাধুর্যরস গল্পটিতে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন চিত্ররূপে তা একই স্বাদে পরি-বেশন করা সম্ভব নয়। কিন্তু সত্যজিৎ রায় তাঁর অভাবনীয় কল্পনাশক্তির বলে এই মাধুর্যরসকে ছবিতে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন ও উচ্ছল করে তুলেছেন।

"পোস্ট-মাস্টার" গল্পে পোস্ট মাস্টারের বিদায়ের কালে অভিমানিনী রতনের মুখের করুণ কথাগুলি ছবিতে নেই। কিন্তু "পোস্ট মাস্টার"-এর চিত্ররূপে "একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি"কে ঘিরে "এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্ম-ব্যথার প্রকাশ" কোথাও ব্যাহত হয়নি।

"মণিহারা" গল্পের যবনিকায় সত্যজিৎ রায় হাল্কা কৌতুকরসের আশ্রয় নিয়েছেন। এই কৌতুকরসের ভেতর দিয়ে শ্রীরায় রবীন্দ্র-কাহিনীর মূল প্রতিপাদ্যকে অতিপ্রাকৃতের অলীকতা নিপুণ শিল্পীর মত একটি সূক্ষ্ম আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। দর্শকের হাসিতে অতিপ্রাকৃত রোমাঞ্চকে তিনি অলীকতায় মিলিয়ে দিয়েছেন, এবং সেই সঙ্গে পরবর্তী চিত্রকাহিনীর জন্যে দর্শকের মনকে প্রসন্ন করে তুলেছেন।

এমনি নিবিড় রসবোধ ও কল্পনাশক্তি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্পকে সত্যজিৎ রায় একটি পরম রমণীয় সংযুক্ত চিত্ররূপে পরিণত করেছেন। "তিন কন্যা"-য় রস-সিদ্ধ নৈপুণ্যে এমনিভাবেই সত্যজিৎ রায় চিরায়ত সাহিত্য ও চলচ্চিত্রের যুক্তবেণী রচনা করেছেন।

চিত্রপরিচালক ও চিত্রনাট্যকাররূপে

"তিনকন্যা"-র অন্তর্গত "মণিহারা"-র নায়ক ও নায়িকা কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও কণিকা মজুমদার।

সত্যজিৎ রায় যে বিরাট প্রতিভা ও অননুকরণীয় প্রয়োগ-দক্ষতার অধিকারী এ-ছবিতে তার স্বাক্ষরটি যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে শুধু বহিরঙ্গ শিল্পশোভাই চোখ ধাঁধিয়ে দেয় এই অপরিণত অভিযোগ কোন দর্শকই হয়ত পোষণ করেন না। কিন্তু তাঁর ছবিতে সুন্দর পরিস্থিতি ও চরিত্রকে ঘিরে পূর্ণাঙ্গ গল্প গড়ে ওঠে না এই ধরনের এক অভিযোগ শোনা যায় কোন বিশেষ শ্রেণীর দর্শক-মহলে। এই ছবি অভিযোগকারীদের নিরুত্তর করে দিতে এসেছে।

"তিন কন্যা"-য় প্রতি গল্পের চরিত্র ও ঘটনার উপলখণ্ডের ওপর দিয়ে সুন্দর ছন্দে ও স্বচ্ছন্দে বয়ে চলেছে গল্পের প্রবাহ। এই প্রবাহের টানে দর্শকমন আবেগে, পুলকে ও

পটমঞ্জরীর নতুন ছবি "মেঘ"-এর নতুন নায়িকা মালবিকা গুপ্ত।

বিস্ময়ে বিচিত্র ঘটনার ঘাটে ও মনের প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। দর্শকের এই মানসিক পরিক্রমার পথে গল্প গড়ে ওঠে। এই গল্প তাঁরা মন দিয়ে পড়েন, চোখ দিয়ে দেখেন, সমস্ত অন্তর দিয়ে উপভোগ করেন।

রবীন্দ্র-গল্পের এই চিত্রায়ণে সত্যজিৎ রায় এমন এক সহজ, সরল ও সাবলীল প্রয়োগ-রীতি অনুসরণ করেছেন যার ফলে দর্শকরা নিমেষেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারা ও সমীক্ষার সঙ্গে এক স্বতঃস্ফূর্ত অন্তরঙ্গতা অনুভব করতে পারেন। এই প্রয়োগ-রীতির কোথাও কোন জটিলতা নেই, অস্পষ্টতা নেই, দুর্বোধ্য ব্যঞ্জনার অবতারণা নেই। তাঁর প্রয়োগ-কর্মে ব্যঞ্জনা মুহূর্তের মধ্যে বাক্যাতীতকে বাঙ্ময় করে তোলে, ইঙ্গিত অণুতে অসীমের আভাস দেয়।

"পোস্ট-মাস্টার" ও "সমাপ্তি"র চিত্ররূপে পল্লীজীবন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের পরিবেশ রচনায় সত্যজিৎ রায়ের শিল্পবোধ দর্শককে মুগ্ধ করে দেয়। প্রতিটি পরিবেশ, ও প্রতিটি দৃশ্য অপূর্ব বাস্তবনিষ্ঠায় মনোময় হয়ে উঠেছে।

তেমনি অপরদিকে "মণি-হারা"য় অতি-প্রাকৃত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চের শিহরণে দর্শককে স্পন্দিত করে তুলেছেন।

চিত্রনাট্য রচনায় ও কাহিনীর বিন্যাসেও শ্রীরায়ের কৃতিত্ব অতুলনীয়। "মণি-হারা"র বিন্যাসে তিনি এক গল্প-পাঠকের পাঠক্রমের ভেতর দিয়ে যেভাবে আখ্যানবস্তু ও নায়ক-নায়িকার মানসিক রূপটি উপস্থিত করেছেন তা বিস্ময়কর প্রয়োগ-সিদ্ধির পরিচয় দেয়। তিনটি গল্পের চিত্ররূপে সত্যজিৎ রায় বিভিন্ন মুহূর্তে যেভাবে হাসির উপকরণ ছড়িয়ে দিয়েছেন তারও জুড়ি তুলনা মেলে না। এইসব উপকরণ কৃত্রিম বা কষ্টকল্পিত নয়—জীবন ও বাস্তব থেকে আহরিত।

দর্শকের বিস্মিত হবার মত অসাধারণ প্রয়োগ-কুশলতার বিচ্ছুরণ রয়েছে তিন গল্পের এই একত্রিত চিত্ররূপের সর্বাঙ্গে। প্রতি মুহূর্তের সজাগ দৃষ্টি ও উৎকর্ণ শ্রুতি ছবির সকল সৌন্দর্য ও অন্তর্লীন রসের সন্ধান দেবে দর্শককে। গুনে গুনে এ-ছবির গুণ বলে শেষ করা যায় না।

বহিরঙ্গ শিল্প-সৌন্দর্যেও "তিন কন্যা" নয়নবিমোহন। সত্যজিৎ রায়ের সব ছবির মতই শিল্পকর্মের প্রতি অঙ্গে রূপ, প্রতি অঙ্কে শোভা। এই রূপ ও শোভা'কে অপরূপ করে তুলেছে এক বিরল শিল্পানুভূতি।

"তিন কন্যা"র বিভিন্ন চরিত্রে শিল্পী নির্বাচনেও সত্যজিৎ রায় দুর্লভ কল্পনা-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয় ছবির সব কয়টি চরিত্রই—বিশেষ করে রতন ও পোস্ট মাস্টার, মৃন্ময়ী ও অমূল্য (মূলে গল্পে "অপূর্ব")—রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে রূপ পরিগ্রহ করে রজতপটে এসে উপস্থিত হয়েছে।

চরিত্রগুলির এমনি করে জীবন্ত হয়ে ওঠার মূলে পরিচালকের কৃতিত্বের সঙ্গে রয়েছে শিল্পীদের অনবদ্য অভিনয়-সৌকর্য। তিনটি গল্পের শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা অভিনয়ে দর্শককে মুগ্ধ ও আবিষ্ট করে রাখেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ("পোস্টমাস্টার"-এর রতন) ও অপর্ণা দাশগুপ্ত ("সমাপ্তি"র মৃন্ময়ী)। রতনের মনের নিরুচ্চার বেদনা ও আবেগ চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শান্ত, নম্র অভিব্যক্তিতে অনুপম মাধুর্যে ফুটে উঠেছে। এই কিশোরী শিল্পীকে দর্শকরা কোনদিন ভুলতে পারবেন না। অপর্ণা দাশগুপ্ত'র মৃন্ময়ী রবীন্দ্রনাথের মৃন্ময়ীকে দর্শকের চোখের সামনে শরীরী করে তোলে। মৃন্ময়ীর প্রাণোচ্ছলতা, বন্ধনহীন জীবনাবেগ, ক্ষুব্ধ অভিমান ও প্রণয়ের ব্যাকুলতা এই নবাগত শিল্পীর অভিনয়ে প্রাণময় হয়ে উঠেছে। "মণিহারা"-র মণি-মালিকার রূপসজ্জায় কণিকা মজুমদার অভিনয় কিছুটা আড়ষ্ট। কিন্তু কাহিনীর প্রয়োজন তিনি স্বচ্ছন্দেই মিটিয়েছেন।

ছবির পুরুষ চরিত্র-চিত্রণে সর্বাগ্রে প্রশংসা পাবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ("সমাপ্তি"র অমূল্য) ও অনিল চট্টোপাধ্যায় (পোস্ট-মাস্টার)। এঁরা উভয়েই চরিত্র দুটির মর্ম-মূলে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করেছেন। বিগত দিনের শিক্ষিত নব্য বাঙালী যুবকের মার্জিত উন্নাসিকতা এবং দাম্পত্যজীবনের অপ্রত্যাশিত "ট্র্যাজেডি"তে মানসিক যন্ত্রণা ও আশাভঙ্গ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রাণবন্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত অভিনয়ে সুন্দরভাবে

"পোস্ট মাস্টার"-এর রতন চরিত্রে রূপে শিল্পী চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় অপূর্ব নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়।

পরিস্ফুট। তাঁর এই অনিন্দ্য অভিনয়-কুশলতা দর্শকের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করবে। পোস্টমাস্টারের চরিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায় মনোজ্ঞ ও মরমী অভিনয়ে দর্শকদের অভিভূত করেন। "মণিহারা"র ফণীভূষণের চরিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় চরিত্রানুগ।

"সমাপ্তি"র চিত্ররূপে অমূল্যের জননীর রূপসজ্জায় সীতা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় সংবেদনশীল ও সাবলীল। মৃন্ময়ীর মায়ের চরিত্রে অল্প অবকাশে গীতা দে দর্শকমনে রেখাপাত করেন। "পোস্টমাস্টার"-এ এক পাগলের চরিত্রে নৃপতি চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়-নৈপুণ্য প্রশংসার দাবি রাখে। "তিন কন্যা" বিভিন্ন গল্পের অন্যান্য পার্শ্ব-চরিত্রে যাঁদের অভিনয় চিত্তাকর্ষক তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কুমার রায়, গোবিন্দ চক্রবর্তী, সন্তোষ দত্ত, মিহির চক্রবর্তী (কিশোর শিল্পী), দেবী নিয়োগী ও খগেশ চক্রবর্তী।

সত্যজিৎ রায় এ-ছবির সংগীত-পরিচালনার দায়িত্ব নিজেই সম্পাদন করেছেন। ছবির সুরকার হিসাবে সর্বাংগীণভাবে শ্রীরায় দর্শকদের অবাক করে দেবার মত কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। ছবিতে আবহ-সংগীত খুব বেশী ব্যবহার করা হয়নি। ছবির "এফেক্ট মিউজিক" অভিনবত্ব বা অসাধারণত্বের দাবি রাখে না। তবে বাসরঘর থেকে পালিয়ে এসে মৃন্ময়ী যখন রথতলার দোলনায় দুলতে থাকে সেই সময়কার আবহ-সুররচনা চরিত্রটির অন্তরের মুক্তির স্বাদ ও আবেগকে বাঙ্ময় করে তোলে। নাট্যাবেগ সৃষ্টিতে সুরকার হিসাবে শ্রীরায় এই দৃশ্যে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে দর্শক যে উন্নত-মানের আলোকচিত্র এতকাল দেখে এসেছেন এবং যা দেখবেন বলে আশা করেন এ-ছবিতে তা অংশত অনুপস্থিত। ছবির সব দৃশ্যে আলো-আঁধারির কাজে আলোকচিত্রশিল্পী সৌমেন্দু রায় আশানুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। তবে সামগ্রিকভাবে তাঁর কাজ সন্তোষজনক।

দুর্গাদাস মিত্র'র শব্দগ্রহণে আরও উন্নতির অবকাশ ছিল। কারণ একাধিক সংলাপ চেষ্টা করে শুনতে হয়। শিল্প-নির্দেশে বংশী চন্দ্রগুপ্ত, সম্পাদনায় দুলাল দত্ত এবং রূপসজ্জায় শক্তি সেন দক্ষতা দেখিয়েছেন। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ আশানুরূপ পরিচ্ছন্ন।

চিত্রালোচনা

পটমঞ্জরী একটি নতুন চলচ্চিত্র সংস্থা। এঁদের প্রথম ছবি "মেঘ" বর্তমানে মুক্তির প্রতীক্ষা করছে। একটি হত্যা-রহস্যকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী।

সভ্যতা আজ যে সংকটের সম্মুখীন হয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনীটি রচিত। ব্যবসায়ের প্রয়োজন হিসাবে প্রাণ-হরণের পালা চলেছে আজ অব্যাহত গতিতে। অধিকাংশ খুনেরই কোন কিনারা হয় না। হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ প্রকৃত খুনীর নাগাল পাওয়া শক্ত অকুস্থল থেকে তাঁর অবস্থান সাধারণত শত শত যোজন দূরে।

উৎপল দত্ত এতদিন সুদক্ষ অভিনেতা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। এবার তাঁর খ্যাতির পরিধি বিস্তৃততর হয়ে উঠবে। কারণ তিনিই "মেঘ"-এর পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার। একটি প্রধান চরিত্রে তিনি অভিনয়ও করেছেন। আর একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় লাবণ্যময়ী এক নতুন অভিনেত্রীকে দেখা যাবে। তাঁর নাম—মালবিকা গুপ্ত। এ ছবিতে আরো আছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়,

"সমাপ্তি"-র দুটি প্রধান চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা দাশগুপ্ত।

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, রবি ঘোষ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা দাশ ও শোভা সেন।

• • •

মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবিগুলির মধ্যে ইউ-নাইটেড ফিল্মসের "স্বয়ম্বরা" চিত্রামোদী-দের ঔৎসুক্য বিশেষ ভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। তার প্রধান কারণ এর কাহিনীর বৈশিষ্ট্য এবং এর তারকাদ্যুতি।

সন্তোষকুমার ঘোষের মূলে কাহিনী এক অনূঢ়া শিক্ষয়িত্রী ও এক জীবন-সন্ধানী তরুণকে ঘিরে। জীবন-চক্রে মথিত হৃদয়ের চার পাশে কত আশা-নিরাশা, গ্লানি, ভুল-বোঝা ও ভীরু স্বপ্নের ভিড়। লেখকের মুন্সিয়ানায় জীবনের এই আলো-আঁধারি কাহিনী অপরূপ মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। ছবির পর্দায় তার আবেগ-স্পন্দিত রূপ দিয়েছেন কুশলী পরিচালক অসিত সেন।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী এ ছবির নায়ক-নায়িকা একটি বিশিষ্ট টাইপ-চরিত্রে আত্ম প্রকাশ করবেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, সীতা মুখোপাধ্যায়, গীতা দে প্রভৃতি। পণ্ডিত রবিশঙ্কর "স্বয়ম্বরা"-র সুরকার।

• • •

এস কে প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন "মন দিল না বঁধু"-ও অবিলম্বে মুক্তিলাভ করবে। এক অভিনেত্রীর জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ঘিরে এর কাহিনী রূপায়িত হয়েছে। ভূমিকালিপির পুরো-ভাগে আছেন সবিতা বসু, সুমনা ভট্টাচার্য, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি। পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন সন্তোষ মুখোপাধ্যায়।

• • •

স্টুডিও মহলে দক্ষ ব্যবস্থাপক হিসাবে খ্যাত বিমল ঘোষ সম্প্রতি নিজস্ব চিত্র প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেছেন। গত অক্ষয় তৃতীয়ার শুভদিনে বিমল ঘোষ প্রোডাক সন্সের যাত্রারম্ভ হয়েছে। শৈলেন দে রচিত "বধূ" উপন্যাসের চিত্ররূপ দেবেন বলে এঁরা মনস্থ করেছেন। চিত্রনাট্য রচনা ও সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে দেবনারায় গুপ্ত ও মানবেন্দ্র মুখো-পাধ্যায়। কয়েকজন অভিজ্ঞ কলাকুশলীর সম্মিলিত এক গোষ্ঠী ছবিটি পরিচালনা করবেন। উত্তমকুমার প্রধান পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করবেন। তাঁর সহ-শিল্পীদের মধ্যে থাকবেন ছবি বিশ্বাস, বসন্ত চৌধুরী, বিশ্বজিৎ, তরুণকুমার, কমল মিত্র, জীবেন বসু, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায় জয়শ্রী সেন প্রভৃতি।

সুধীর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ফিল্ম এণ্টার প্রাইজেস-এর "দুই ভাই"-এর চিত্র-গ্রহণ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এর কাহিনীকার। উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, সুলতা চৌধুরী, তরুণকুমার, জীবেন বসু, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকা-লিপি গঠিত হয়েছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরযোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

• • •

এ সপ্তাহে মাত্র একটি হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে। ছবিটি মাদ্রাজে তোলা, নাম "নজরানা"। ভূমিকালিপিতে আছেন রাজ-

পরশমল-দীপচাঁদ প্রোডাকসন্সের "উত্তরায়ণ" চিত্রের একটি দৃশ্যে সুপ্রিয়া চৌধুরী।

কাপুর, বৈজয়ন্তীমালা, উষা কিরণ এবং আগা। শ্রীধর ও রবি যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

একটি অনন্য জীবনী চিত্র

উপনিষৎ পরমপুরুষকে বলেছেন কবি—কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ। কবি হয়ে তিনি রসে ও ছন্দে সকলের মন আকর্ষণ করছেন। মর্ত্যকবির মধ্যে রয়েছে বিশ্ব-বিধাতার এই স্বরূপেরই আভাস ও আবেশ। কবি তাই দিব্যপুরুষ, ঋষি। "নাঋষিঃ কুরুতে কাব্যম্"—ঋষি বিনা কে কাব্য সৃষ্টি করতে সক্ষম?

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এ-যুগের এমনি একজন ঋষি-কবি। সীমার মধ্যে আত্ম-প্রকাশের জন্যে অসীমের অনন্ত বেদনা ও ব্যাকুলতা রূপ নিয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবি-কর্মে। যে ভাবলোকে কবির জন্ম ও তাঁর কবি-মনের বিকাশ তা মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির অগোচর। অসংখ্য কর্মপ্রবাহের মধ্যে আমরা কর্মবীরের জীবনচরিত খুঁজে পাই। কবির জীবন খুঁজতে হয় তাঁর কাব্যে। বিশ্বসংগীতের সব সুর কেমন করে তাঁর বাঁশীতে ধ্বনিত হয়ে ওঠে তা আমরা জানি না। কিন্তু এই সুর শুনে আমরা স্তব্ধ হই, অভিভূত হই। কবির কাব্যের উৎস আমাদের সন্ধানের অতীত। তাই তাঁর জীবনকাহিনী—জীবনের ঘটনা-রাজী—আমরা বর্ণনা করতে পারি। কিন্তু জীবন চরিত রচনা করতে পারি না। তাঁর কবি-মানসের ব্যাপ্তি ও অনুভূতি আমরা নিরুচ্চার বিস্ময় ও স্তব্ধতার ভেতর দিয়ে অনুভব করতে পারি, ব্যক্ত করতে পারি না। এই অনুভবকে যিনি বহুজনের মানসলোকে পৌঁছিয়ে দিতে পারেন তিনিই সত্যিকারের শিল্পী।

সত্যজিৎ রায় যে এমনি একজন সার্থক শিল্পী তার পরিচয় রসিকজন নতুন করে পেলেন তাঁর তৈরী "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" প্রামাণিক জীবন-চিত্রটিতে। রবীন্দ্র-শত-বার্ষিকীতে কবি-অর্ঘ্যরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্মস ডিভিশন কর্তৃক প্রযোজিত এই প্রামাণিক চিত্রের স্রষ্টা সত্যজিৎ রায় ছবিটিতে রবীন্দ্র-জীবনের বিশ্বরূপটি অপূর্ব ছন্দে ও শিল্পসুষমায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এই বিশ্বরূপে রবীন্দ্রনাথ কবি হয়েও কর্মবীর, বাঙালী হয়েও বিশ্বদরদী, শিল্পী হয়েও শিক্ষাব্রতী, সাধক হয়েও সমাজসেবী এবং নিঃসঙ্গ হয়েও নেতা। রবীন্দ্র-প্রতিভার অলৌকিক বিশালতা ও বহুরূপী বিকাশের একটি "বিশ্বকোষ" এই ছবিতে টুকরো টুকরো ঘটনা ও দৃশ্যের ভেতর দিয়ে উপস্থিত করার এক অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি। স্থিরচিত্র, দলিল, চিঠি, অঙ্কিত চিত্র, পুরনো পুঁথি ও পুরনো চলচ্চিত্রের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের জীবনের অনেক ঘটনা ও তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন এই ছবিতে। রবীন্দ্র-জীবনের বহু ঘটনার বিন্যাসে ছবিটিতে কবির দেশপ্রেম, সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাপ্রচারের কাজ, সমসাময়িক স্বদেশের ও বিদেশের অনেক মনীষীর সঙ্গে তাঁর ভাবের আদান-প্রদান প্রভৃতি রূপ নিয়েছে।

কিন্তু তাই বলে ছবির সব উপকরণ ও তথ্য, রবীন্দ্রনাথের বাইরের জীবনের ঘটনা-রাজি তাঁর ভেতরকার কবিপুরুষকে আড়াল করে রাখেনি। নিঃসীম বেদনা ও সহানু-ভূতিতে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস বাইরের জগতের আহ্বানে দিবসের কর্মে ও রাত্রির তপস্যায় কেমন করে সর্বচরাচরময় হয়ে উঠেছে তাই ফুটে উঠেছে ছবিটিতে। 'এক'

কবি কী করে সকল মানুষের মধ্যে 'বহু' হয়ে উঠলেন তাই বিকশিত হয়ে উঠেছে ছবিটিতে। সত্যজিৎ রায় এই বিশ্বকবির সংগেই দর্শকের আত্মিক পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তাঁর শিল্পকর্মের মাধ্যমে। তাই ছবিটিতে 'কবি রবীন্দ্রনাথ'কেই দর্শকরা অনেক ঘটনা ও তথ্যের ভেতর দিয়ে নতুন করে চিনে নিতে পারেন।

কবি পরিচয়ের সংগে সংগে রবীন্দ্রপ্রতিভা ও জীবনাদর্শের স্বরূপটিও সত্যজিৎ রায় তাঁর অতুলনীয় প্রয়োগ-কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন ছবিটিতে। এই ছবিতে শ্রীরায়ের শিল্পকর্মে বস্তুনিষ্ঠা ও আবেগরসের যে সমন্বয় সাধন করেছেন তা অভূতপূর্ব। একটি অনিন্দ্যসুন্দর চিত্রনাট্য ও তার ছন্দোময়, দৃষ্টিনন্দন ও প্রীতিমোহন বিন্যাস এই প্রামাণিক চিত্রের অন্যতম সম্পদ। এবং ছবিতে ব্যঞ্জনাত্মক ও রসমধুর এবং নয়নাভিরাম শিল্পশোভনতায় মণ্ডিত এমন কয়েকটি দৃশ্য রয়েছে যা দর্শকের মন ও চোখ'কে পুলক ও বিস্ময়ে স্তব্ধ করে রাখে। কবির নিজের কণ্ঠের গান ও আবৃত্তি দিয়ে শ্রীরায় দর্শকের চোখে জল ঝরিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি সামনে তুলে ধরে তিনি দর্শকের

শ্রদ্ধা ও বেদনাকে উদ্বেলিত করে তুলেছেন, কবির মানবতার বাণী ও জীবনাদর্শের মর্ম-রূপটি উদ্ঘাটিত করে তিনি দর্শককে অনুপ্রাণিত করে তুলেছেন। নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে, এমন অসাধারণ প্রামাণিক জীবন-চিত্র এদেশে এর আগে আর তৈরী হয়নি।

কিন্তু তবুও এই অসামান্য চিত্রের কোন কোন অংশে সত্যজিৎ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সব দর্শকরা একাত্মতা না'ও অনুভব করতে পারেন। ছবির প্রথমার্ধে কবির বংশ পরিচয় ও পূর্ব পুরুষদের কাহিনী অনাবশ্যকরূপে দীর্ঘায়িত করা হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে এটাই যেন ফুটে উঠেছে যে রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ পরিবারের সঞ্চিত প্রতিভারই পরিপূর্ণ বিকাশ। রবীন্দ্র-প্রতিভা যে একটি যুগের আস্পৃহা ও জিজ্ঞাসার, সাধনা ও সংগ্রামের এক অলৌকিক ফলশ্রুতি এ সত্যটি চিত্রনাট্যের প্রথমাংশে রবীন্দ্রনাথের পরিবার-পরিচয়ের বাহুল্যে যেন অনেকখানি উপেক্ষিত। রবীন্দ্র-জীবনীচিত্রে সতীদাহের একটি দৃশ্যও অপরিহার্য মনে হয় না।

কিন্তু ছবির নিরুচ্ছ্বাস গীতিময়তা ও আবেগরস যুক্তি বিচারের এই গুঞ্জন নিমেষেই স্তব্ধ করে দেয়। সুরের মাধুরীতে ছবিটিকে পরম রমণীয় করে তোলার ক্ষেত্রেও সত্যজিৎ রায় অনবদ্য রস-বোধের পরিচয় দিয়েছেন। আবহসঙ্গীত-রচনায় ছবিতে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র এবং দরদভরা কণ্ঠে ছবির গানগুলি গেয়েছেন "গীতবিতানে"র শিল্পীরা।

বালক ও যুবক রবীন্দ্রনাথের রূপসজ্জায় ও অন্যান্য চরিত্রের ভূমিকায় কয়েকজন শিল্পীর অংশ গ্রহণেও ছবিটি সমৃদ্ধ। তাঁদের মধ্যে দর্শকের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে বালক রবীন্দ্রনাথবেশী রায়া চট্টোপাধ্যায়।

এই প্রামাণিক চিত্রের নেপথ্য ভাষণ (ইংরেজী) রচনা ও পাঠ করেছেন সত্যজিৎ রায় নিজে। শ্রীরায়ের ভাষণ অন্তর স্পর্শ করে। তাঁর বাচনভঙ্গী ও উচ্চারণ নিখুঁত। দর্শকরা শ্রীরায়ের এই নতুন গুণের পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হবেন।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজে—বিশেষত আলোকচিত্র গ্রহণে ছবিটিতে সংশ্লিষ্ট কলাকুশলীরা প্রশংসনীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

চিঠিপত্র

"অগ্নিসংস্কার"-এর কাহিনী

মহাশয়,

একটি বিখ্যাত ইংরেজী ছবির সঙ্গে "অগ্নি সংস্কার"-এর কাহিনীর হুবহু মিল দেখে বিস্মিত হলাম। ইংরেজী ছবিটির নাম—রেজ ইন হেভেন। "'অগ্নি-সংস্কার"-এ যে দুটি চরিত্রের নাম দেওয়া হয়েছে অলোক (অনিল চট্টোপাধ্যায়) ও সুমিতা (সুপ্রিয়া চৌধুরী), ইংরেজী ছবিটিতে সেই দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রবার্ট মণ্টগোমারি ও ইনগ্রিড বার্গম্যান। রজতের অনুরূপ চরিত্রে যিনি অভিনয় করেছিলেন তাঁর নামটা মনে করতে পারছি না। দুটি ছবির কাহিনীগত মিলের খানিকটা নমুনা দিচ্ছি।

মানসিক হাসপাতাল থেকে অলোককে নিয়ে যেতে এলেন তার মামা; অলোক ওদিকে তার গাড়ি নিয়ে পালালো; রজত অলোককে খুঁজে বার করলো; রজত অলোকদের কারখানার কর্মচারী এবং খুব জনপ্রিয়; কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য হলো; অলোকের মা শয্যাগতা, সুমিতা অলোকদের বাড়িতে মেয়ের মতো থাকে; রজত সুমিতাকে একটা কুকুর উপহার দিয়েছিলো; অলোক আক্রোশ বশে সেটাকে হত্যা করলো; অলোক রোজ ডায়েরিতে পরবর্তী দিনের কর্মসূচী লিখে রাখে; রজত ও সুমিতার ওপর অলোক সন্দেহ করলো; বাইরে যাবার নাম করে তাদের ওপর সে নজর রাখে; পর্দার ফাঁক দিয়ে তার জুতো দেখে সুমিতা তা ধরে ফেললো; পাহাড়ী নদীর ধারে রজতকে ডেকে নিয়ে তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবার চেষ্টা করলো আলোক; সেদিন রাতে খাবার টেবিলে অলোকের সঙ্গে রজতের মনো-মালিন্য হলো; অলোক সুমিতাকে হত্যা করতে চেষ্টা করলো; সুমিতা পালালো রাত্রে পেছনের দরজা দিয়ে; সুমিতা রজতের বাড়িতে আশ্রয় নিলো; অলোক রজতকে ফোন করে প্রথমে ঝগড়া করলো, পরে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তার বাড়িতে আসতে অনুরোধ করলো বাড়ির লনের পথ দিয়ে; রজত এসে পৌঁছবার আগে অলোক ডায়েরি লিখলো ও চাকরকে চলে যেতে বললো; রজত এলে কৌশলে রিভলবারে তার হাতের ছাপ নিয়ে নিলো, পরে চাকরকে শুনিয়ে রজতের সঙ্গে উত্তেজিতভাবে কথা কাটাকাটি করলো; রজত চলে যাবার পর আত্মহত্যা করলো; হত্যা-পরাধে রজতের ফাঁসির হুকুম হলো; মানসিক হাসপাতালের চিকিৎসক ফাঁসির দুদিন আগে রজতের নির্দোষিতার কথা বললো; অলোকের ডায়েরী রজতের নির্দোষিতা প্রমাণ করলো; ফাঁসির আগের মুহূর্তে রজত মুক্তি পেলো। এ সমস্ত ঘটনাই "রেজ ইন হেভেন"-এ পাওয়া যাবে।

অবশ্য তাই বলে অমিল যে নেই তা নয়। একাধিক অমিলও আছে। যেমন—এই ছবিতে অলোক সুমিতার কুকুরকে হত্যা করেছে, "রেজ ইন হেভেন"-এ বিড়ালকে; এখানে অলোক রজতকে নদীতে ফেলে হত্যা করতে চেয়েছিলো, ইংরেজী ছবিটিতে আগুনে; এখানে অলোক রিভলভার দিয়ে আত্মহত্যা করেছে, ইংরেজী ছবিতে ছোরা দিয়ে। অন্তত এসব বিষয়ে "অগ্নি-সংস্কার" বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে।

সবশেষে একটা কথা। অন্যের থেকে কিছু গ্রহণ করলেই চুরি হয় না যদি তার সঙ্গে ঋণের স্বীকৃতিটুকু থাকে। এটুকু সৌজন্য অন্তত দেখাতে পারতেন এ ছবির কাহিনীকার, তাহলে কারুর কিছু বলার থাকত না। ইতি—

দীপঙ্কর চক্রবর্তী,
ইডেন হিন্দু হোস্টেল,
কলিকাতা-১২

একলব্য

হকি মরসুম শেষ হয়েছে। আরম্ভ হয়েছে ফুটবল মরসুম। অনেকদিন আগে থেকে পাওয়ার লীগ, অফিস লীগ ও এলেন লীগের খেলা আরম্ভ হলেও যতদিন না আই এফ এ পরিচালিত ক্যালকাটা ফুটবল লীগের খেলা আরম্ভ হয় ততদিন ফুটবল মরসুম আরম্ভ হয়েছে বলে ধরা হয় না। মে মাসের ১০ তারিখ থেকে সরকারীভাবে ফুটবল মরসুমের উদ্বোধন হয়েছে। তবে ফুটবলের উম্মাদনায় ময়দান এখনো সরগরম হয়ে ওঠেনি। বড় বড় ক্লাব আস্তে আস্তে ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছে। ময়দানও সরগরম হয়ে উঠছে ফুটবলের মাদকতায়।

এর আগে বলেছি 'প্রোমোশন রেলিগেশনে'র বিধান আবার চালু হওয়ায় লীগের আকর্ষণ অনেক বেড়ে গেছে। তবুও বলি চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্নই লীগের বড় প্রশ্ন এবং প্রধান তিনটি ক্লাব মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিংকে নিয়েই এই চ্যাম্পিয়নশিপের যুদ্ধ। কলকাতার ফুটবল খেলায় ইউরোপীয় প্রাধান্য খর্ব হবার পর থেকেই এই তিনটি ক্লাবের কোন না কোন একটি ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে আসছে। শুধু ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল ১৯৫৯ সালে। সেবার লীগ জয় করেছিল ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব। বলা বাহুল্য, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যে এবারও চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ এই তিনটি ক্লাবেই যত কৃতী ও কুশলী খেলোয়াড়ের সমাবেশ।

খেলোয়াড়দের দল অদলবদল এবং বাইরের খেলোয়াড়দের কলকাতায় আগমনের ফলে সমস্ত ক্লাবের দলশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হয়েছে। কেউ হয়েছে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, কেউ একটু দুর্বল। কোন ক্লাবের শক্তি কেমন হয়েছে এবং কার মধ্যে কতখানি খাদ আছে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কষ্টিপাথর ছাড়া তা যাচাই করা সম্ভব নয়। খেলোয়াড়দের নামডাকের জোরে এবার মহমেডান স্পোর্টিংকেই শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছে। গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের শক্তিও এতটুকু কমেনি। তবে সাম্প্রতিক পূর্ব আফ্রিকা সফরের ফলে মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা সারা বছরে একেবারেই বিশ্রাম পাননি। এতে খেলোয়াড়দের মধ্যে শ্রমকাতরতার চিহ্ন দেখা যেতে পারে। আবার পারস্পরিক যোগসাজস এবং সমন্বয়ে ফল ভালও হতে পারে। তবে ফুটবল বিশেষজ্ঞদের অভিমত বেশী খেলা উন্নতির পরিপন্থী। বেশী অনুশীলন ভাল কিন্তু বেশী খেলা ভাল নয়।

কাগজে কলমে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে এবার একটু দুর্বল বলেই মনে হচ্ছে। যে পরিমাণে গুণী খেলোয়াড় দল ছেড়ে চলে গেছেন সে পরিমাণে আসেননি। তবে খেলোয়াড়দের নামডাক এক কথা আর কার্যক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়া পৃথক কথা। গতবার ইস্টবেঙ্গল যথেষ্টই শক্তিশালী ছিল। কিন্তু লীগে তাঁরা পেয়েছিল তৃতীয় স্থান।

খেলোয়াড়দের দল অদলবদলের ফলে কোন ক্লাব কাকে পেয়েছে আর কাকে হারিয়েছে সে সম্বন্ধে এতদিন আলোচনা করা হয়নি। ফুটবল মরসুম আরম্ভের সংগে কিছু কিছু আলোচনা করছি।

মোহনবাগান ক্লাবের সংগে সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন ক্ষিপ্রপদ রাইট আউট এস সমাজপতি, রাইট ইন সুনীল নন্দী ও সেণ্টার ফরোয়ার্ড কে পাল। দলের সংগে নতুনভাবে সম্পর্ক পাতিয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক আর গুহ ও ব্যাক সুভাশিস গুহ। ইস্টার্ন রেলের রাইট আউট বেণু চ্যাটার্জিও মোহনবাগানে এসেছেন। আর এসেছেন কেরালার সেণ্টার ফরোয়ার্ড চিদানন্দন এবং মহীশুরের লেফট আউট অরুময়নয়াগম। তা হলে মোহনবাগানের টিম দাঁড়াচ্ছে:—

গোল—এস শেঠ, আর গুহ ও সি আর দাশ।
ব্যাক—শুভাশিস গুহ, এ রহমন, পি সরখেল ও সুশীল গুহ।
স্টপার—জার্নেল সিং ও অমিয় ব্যানার্জি।
রাইট হাফ—কেম্পিয়া, এ ধর।
লেফট হাফ—নারসিয়া।
রাইট আউট—দীপু দাস ও বেণু চ্যাটার্জি।
রাইট ইনসাইড—চুণী গোস্বামী (অধিনায়ক) ও অমল চক্রবর্তী।
সেণ্টার ফরোয়ার্ড—চিদানন্দন ও অরুণ চ্যাটার্জি।
লেফ্‌ট ইনসাইড—সাল্লাউদ্দিন।

মোহনবাগান ক্লাব প্রতীক

লেফ্‌ট আউট—অরুময়নয়াগম ও এস ঘোষ।

গতবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব লীগ রানার্স হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের চেয়ে মাত্র একটি পয়েণ্ট কম পেয়ে। পাঁচ ছয়জন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় এবার দল ছেড়ে চলে গেছেন। জাফর, গুলজার, নবী, ওয়ারিশ খাঁ, ইউসুফ কেউই বাঙলায় নেই। তা ছাড়া পাকিস্তানের তিনজন খেলোয়াড় গফুর, আবিদ হোসেন এবং মুসাও এবার কলকাতায় আসছেন না। এ'রা খেলবেন ঢাকায়। শুধু সেণ্টার ফরোয়ার্ড ওমরকে মহমেডান দলে খেলতে দেখা যাবে। কিন্তু এতে মহমেডান দলের শক্তি কিছুই হ্রাস হয়নি। তাঁরা পেয়েছেন এরিয়ানের উঠতি ব্যাক নুরুল ইসলামকে, ইস্টবেঙ্গলের রাইট আউট কানাইয়ান, লেফট ইন আমেদ ও

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতীক

স্টপার বীর বাহাদুরকে। কেরালার লেফট আউট মুসা এবং হায়দরাবাদের রাইট আউট শেখ আলি এবং অলিম্পিকখ্যাত রাইট ইন হামিদ এবার মহমেডান দলে খেলছেন। সুতরাং এবার মহমেডান স্পোর্টিং-এর দল হবে:—

গোল—রহমন, আমেদ আখতার ও ওসমান।
ব্যাক—মুস্তাক আমেদ, সালাম, মইন রাফাৎ ও নুরুল ইসলাম।
হাফ ব্যাক—মহম্মদ আলি, বীর বাহাদুর, ইব্রাহিম ও এ লতিফ।
স্টপার—আমেদ হোসেন।
রাইট আউট—শেখ আলি ও কানাইয়ান।
রাইট ইনসাইড—রহমতুল্লা ও হামিদ।
সেণ্টার ফরোয়ার্ড—ওমর ও পি রায়চৌধুরী।
লেফ্‌ট ইনসাইড—লতিফ খাঁ ও আমেদ খাঁ।
লেফ্‌ট আউট—এম গুহঠাকুরতা ও মুসা।

গতবারের লীগে তৃতীয় স্থান লাভ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের দলগত শক্তির পরিচায়ক নয়। ২৮টি খেলার মধ্যে ৭টি খেলা ড্র ও ৪টি খেলায় হার স্বীকার করবার মত টিম ছিল না ইস্টবেঙ্গল। আগেই বলেছি কাগজে কলমে ইস্টবেঙ্গলকে কিছুটা দুর্বল বলে মনে হচ্ছে। গোলকিপার আর গুহ,

ব্যাক সুভাশিস গুহ, পাকিস্তানী হাফব্যাক হাসান, রাইট আউট কানাইয়ান, রাইট ইন নারায়ণ ও এককালের কীর্তিমান খেলোয়াড় আমেদের সাহায্য থেকে এবার বঞ্চিত হবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ক্ষতি অপরিমেয়। মোহনবাগানের সমাজপতি, সুনীল নন্দী, এরিয়ানের সি পাল, শ্রীকান্ত ব্যানার্জি, খিদিরপুরের বি দেবনাথ, কেরালার পাপাচান ও উত্তরপ্রদেশের কমলাপ্রসাদকে নিয়ে এই ক্ষতির কতটুকু পূরণ হবে তা দেখবার জন্য দর্শক-সমর্থকদের আগ্রহ কম নয়। ইস্ট-বেঙ্গল টিমে এবার যাঁরা খেলবেন তাঁরা হচ্ছেন:—

গোল—অবনী বসু, এস কাঁড়ার ও এ বল্লভ।
রাইট ব্যাক—সি চন্দ ও বি দেবনাথ।
লেফট ব্যাক—অরুণ ঘোষ ও এম ঘোষ।
রাইট হাফ—শ্রীকান্ত ব্যানার্জি ও হোল্ডার।
স্টপার—কমলাপ্রসাদ ও এস চৌধুরী।
লেফট হাফ—রাম বাহাদুর ও সি পাল।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রতীক

রাইট আউট—এস সমাজপতি, বালু ও ভেঙ্কটেশ।
রাইট ইন—সুনীল নন্দী ও নীলেশ সরকার।
সেণ্টার ফরোয়ার্ড—কানন।
লেফট ইন—বলরাম ও পাপাচান।
লেফট আউট—কানাই দাশ।

গতবারের লীগে ইস্টার্ন রেলের স্থান ছিল চতুর্থ। খেলোয়াড়দের দল অদল-বদলে ইস্টার্ন রেলের এবার বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি। বেণু চ্যাটার্জি, এস ব্যানার্জি ও টি ঘোষ ছাড়া আর কেউ দল ছাড়েননি। নতুন খেলোয়াড়ও বেশী আসেননি এক রাজস্থানের লেফট আউট এন দত্ত ছাড়া। সুতরাং গত বছরের খেলোয়াড়-দের উপর নির্ভর করেই ইস্টার্ন রেলকে এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যাবে।

প্রথম ডিভিসনে রেলের অপর টিম বি এন আর কিন্তু এবার কিছু নতুন খেলোয়াড় যোগাড় করেছে। অন্ধ্রের ইন খুরসীদ ও ডি রাওকে এবার বি এন আর-এ খেলতে দেখা যাবে। খড়্গপুরের বি এন্টনীও এই দলে খেলবেন। মেওয়ালালও সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনিও বি এন আর-এ খেলবেন বলে শোনা যাচ্ছে।

এক সময় রাজস্থান ক্লাব বাহির থেকে খেলোয়াড় এনে দল ভারী করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। এখানকার কৃতী খেলোয়াড়দেরও তাঁরা সাদরে দলে টেনে নিয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হয়নি। তাঁরা এখন হাল ছেড়ে দিয়ে কলকাতার খেলোয়াড়দের উপরই আস্থাবান। ক্লাব কর্তৃপক্ষের ধারণা

খেলাধুলো এখন হেলাফেলার জিনিস নয়। বিলাস ব্যসন তো নয়ই। খেলা এখন জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ।

খেলাধুলোর কৃতিত্ব এখন জগতের চোখে দেশকে বড় করে তোলে। সে দেশের প্রতিনিধি বিশ্বক্রীড়াসভায় কৃতিত্বের পরিচয় দেয় তার পুরো-ভাগে চলে দেশের পরিচয় পতাকা।

খেলাধুলোর বিশ্বজগতে ভারতের স্থান মোটেই উঁচু নয়। ভারতের মেয়েরা আছেন আরো পিছিয়ে। ভারতের, বিশেষ করে বাঙালী মেয়েদের এতদিন আমরা শান্ত সৌম্যের প্রতিমূর্তি এবং কল্যাণী বধূরূপেই দেখে এসেছি। এই আবহাওয়ার মধ্যেও সমাজের বাধা কাটিয়ে এবং সংসারের কাজের ফাঁকে যেসব মেয়ে ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন বা দিচ্ছেন এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে 'দেশে'র পাতায় 'খেলাধুলোয় মহিলা' এই পর্যায়ে তাদের কথা আলোচনা করা হবে।

তাঁদের শক্তিশালী দল লীগে যে ফলাফল করেছিল তার চেয়ে এবার কিছু খারাপ হবে না।

এরিয়ান নিজেদের ঐতিহ্যের উপর বিশ্বাসী। যে খেলোয়াড় নিয়েই দল গড়া হোক নামের ও জামার জোরে তাঁরা ক্লাবের সুনাম রাখবে বলে কর্তৃপক্ষের আশা।

জর্জ টেলীগ্রাফের আস্থা নিজেদের সংগ্রাম-ক্ষমতার উপর। ১৫টি ক্লাবের বাকী প্রায় সমস্ত ক্লাবকেই প্রথম ডিভিসনে টিকে থাকবার জন্য লড়াই করতে হবে। ২৮টি খেলার পর কার অবস্থা কি দাঁড়াবে কেউ জানে না।

* * *

ইংলণ্ডে অস্ট্রেলিয়া দলের ক্রিকেট সফর শুরু হয়ে গেছে। সারা ক্রিকেট-বিশ্বের দৃষ্টি এখন সেদিকে। টেস্ট খেলার তো কথাই নেই। কাউণ্টি দলের সংগে অস্ট্রেলিয়া দলের খেলার ফলাফল জানবারও অপরিসীম আগ্রহ। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হতে এখনো প্রায় এক মাস বাকী। কিন্তু পাঁচটি টেস্ট খেলারই টিকিট অনেকদিন আগে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা মানে ক্রিকেট মাঠে বাঘসিংহের লড়াই। যদিও ক্রিকেট খেলার বর্তমান নেতিমূলক ধারা লেখকদের বিরুদ্ধ সমালোচনার কারণ হয়েছে তবু অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট খেলার আকর্ষণ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হবার কথা নয়। তারপর অস্ট্রেলিয়ায় অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চিত্তাকর্ষক টেস্ট খেলা থেকে সব দেশই অনুপ্রেরণা পেয়েছে। ইংলণ্ডও অস্ট্রেলিয়ার সংগে দর্শক-চোখের আনন্দদায়ক চিত্তাকর্ষক খেলা খেলতে বদ্ধপরিকর।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিক উৎসব শেষ হয়ে গেল। ইংলণ্ডে বোধ করি এবার ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট সফরের শত-বার্ষিক উৎসব পালিত হবে। কারণ ঠিক এক শত বছর আগে এই দুই দেশের মধ্যে ক্রিকেট সফর আরম্ভ হয়েছিল। যদিও সরকারীভাবে ১৮৭৬-৭৭ সাল থেকে অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট খেলার হিসাব ধরা হয়েছে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় ইংলণ্ড দলের প্রথম সফর শুরু হয়েছিল ১৮৬১ সালে। ১২ জন খেলোয়াড় বিশিষ্ট এই দলের প্রথম সফর শুরু হয়েছিল ১৮৬ ১৮৬৩ সালে জর্জ পারের অধিনায়কত্বে ইংলণ্ডের আর একটি ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফর করে। এ দলও সরকারী স্বীকৃতি পায় না। ১৮৭৬-৭৭ সাল থেকে সরকারীভাবে দুই দেশের মধ্যে টেস্ট খেলার প্রবর্তন হয়। তারপর দুই দেশের খেলা নিয়ে কত কাব্য কত সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। কত আলোড়ন হয়েছে, রচিত হয়েছে কত ঐতিহাসিক অধ্যায় তার ইয়ত্তা নেই। এইসব অধ্যায়ের মধ্যেই ১৮৮২ সালে 'অ্যাশেস' কথাটির উৎপত্তি। ১৯৩২-৩৩ সালে 'বডিলাইন' বোলিং কন্ট্রোভার্সি। এসব ঘটনা ইতিপূর্বে দেশের পাতায় আলোচনা করা হয়েছে।

অ্যাশেস অর্থাৎ 'ছাই' জয়ের যুদ্ধ এখন ঐতিহাসিক ক্রিকেট-যুদ্ধে পরিণত। সরকারী হিসাবে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া এ পর্যন্ত ১৭৮টি টেস্ট খেলেছে। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের সংখ্যা বেশী। অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ৭৪টি টেস্ট, ইংলণ্ড ৬২টি, ৪২টি খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। দুই দেশের সাম্প্রতিক টেস্ট যুদ্ধে ইংলণ্ড দল ১৯৫৩, ১৯৫৪-৫৫ ও ১৯৫৬ সালে রাবার পায়। ১৯৫৮-৫৯ সালে অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডকে হারিয়ে রাবার লাভ করে। 'অ্যাসেস' এখন অস্ট্রেলিয়ার দখলে। ইংলণ্ড নিজের মাটিতে এই 'অ্যাসেস' পুনরুদ্ধার করতে পারবে কিনা তার জন্য সারা ক্রিকেট বিশ্ব আগ্রহ ভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে।

—মুকুল—

ইলেকট্রিক সংকটের মধ্যেও বিজলী বাতির সমারোহ। কিন্তু প্রকৃতির কাছে সে আলোও যেন হার মেনেছে। 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' আলো উছলে পড়েছে সমস্ত আজাদ হিন্দ বাগে।

সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। রাত প্রায় ১টা। জলের উপর ভাসমান এক নারী মূর্তি। এক প্রৌঢ় পুরুষ উদভ্রান্তভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চঞ্চল পায়ে পায়চারি করছে ১২ বছরের এক ছোট্ট ছেলে। জলের চারদিকে রেলিং ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আগ্রহাকুল হাজার হাজার দর্শক।

এতক্ষণে বুঝতে বাকী নেই সাঁতার-পটিয়সী ইলা ঘোষ হাতে হাতকড়া লাগিয়ে ব্রতী হয়েছেন ২৫ ঘণ্টা অবিরাম সাঁতারের কষ্টসাধ্য সাধনায়। কলকাতার নবনির্বাচিত মেয়র শ্রীরাজেন মজুমদারের সংকেত পেয়ে জলে নেমেছেন সেই বিকেল ৫টা বাইশে—জল থেকে উঠবার কথা পরের দিন সন্ধ্যায়, ব্রত পূরণের পর। উদভ্রান্ত পুরুষ ইলা ঘোষের সন্তরণব্রতীর স্বামী প্রফুল্ল ঘোষ। আর ১২ বছরের ছেলেটি নিঃসন্তান জননীর নয়নের মণি।

বলা বাহুল্য, ইলা ঘোষ সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করেছেন এবং সিদ্ধিলাভ করে মেয়েদের সাঁতারে সৃষ্টি করেছেন এক নতুন রেকর্ড। কারণ বিশ্বে কোথাও হাত বেঁধে এভাবে সাঁতার কাটার রেওয়াজ নেই। তা ছাড়া পৃথিবীর কোন মেয়ের পক্ষে শুধু সাঁতারের জন্য এত বেশী সময় জলে থাকতে হয়েছে বলেও শুনিনি। তাই ইলা ঘোষের এ কৃতিত্ব সাঁতার-জগতের স্মরণীয় কীর্তি হিসাবেই স্বীকৃতি পাবার যোগ্য।

আজাদ হিন্দ বাগের বুকে বিয়াল্লিশ বছরের বর্ষীয়সী বধূ ইলা ঘোষের ভাসমান দেহকে দেখে মনে হয়েছিল কে যেন জলের উপর সাধনায় শায়িত। যেন ধ্যানমগ্না। সাঁতারের ভাষায় ওর নাম অবশ্য 'ফ্লোটিং'। ফ্লোটিং অর্থাৎ জলের উপর ভেসে থাকার বিদ্যা। এমন বিদ্যা ভারতের কোন মেয়ের কেন, কোন পুরুষেরও নাকি অধিগত নয়। বিছানার উপর শোবার মত যেন জলের উপর শুয়ে আছেন। সত্যি দর্শক-চোখের আনন্দ-দায়ক দৃশ্য।

যোগ্য স্বামীর যোগ্য সহধর্মিণী।

সহধর্মিণীই বটে। দুজনেই সাঁতারের সাধনা করে চলেছেন। সাঁতারই দুজনের নেশা ও পেশা, অবশ্য গৃহস্থালীর সঙ্গে। বিয়ের আগে ইলা ঘোষের সাঁতারে তেমন আগ্রহ ছিল না। ছোট বেলায় সেই কবে ঢাকার জোলসীন গ্রামে সাঁতার কেটেছেন ভাল করে মনে নেই। বুড়িগঙ্গা থেকে একটা নদী বেরিয়ে গিয়েছিল তাদের গ্রামের বাড়ি ছুঁয়ে। বাবা পঞ্চানন দাসের বকুনির ফাঁকে ফাঁকে সেই নদীতেই তার সাঁতারের হাতেখড়ি। তারপর জীবনের ঘূর্ণিপাকে মামার সঙ্গে এলেন কলকাতায়। মামা ছিলেন সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সেই সূত্রেই প্রফুল্লর সঙ্গে জানা-জানি। জানাজানি থেকে শেষে অর্ধাঙ্গিনী। প্রকৃত অর্থে সহধর্মিণী।

তারপর সাঁতারের আরাধনা। স্বামীর প্রেরণা আর স্ত্রীর সাধনা। যুগ্ম প্রচেষ্টায় অল্পদিনে অনেক শিক্ষার অধিকারিণী। স্বামী-স্ত্রী মিলে বাঙলার ও ভারতের নানা স্থানে সাঁতারের প্রদর্শনী। হাত-পা বেঁধে সাঁতার, স্বামী-স্ত্রীর যুগ্ম সাঁতারের মধ্যে 'নেতাজী বোর্ড', 'প্রপেলিং', 'পদ্মাসন', 'জগন্নাথ সুইমিং' প্রভৃতি নানা ধরনের সাঁতারে দর্শকদের মনোরঞ্জন, সঙ্গে সঙ্গে পয়সাও উপার্জন। শুনলে আশ্চর্য লাগে কুড়ি বছরে স্বামী-স্ত্রী মিলে ভারতের প্রায় নয় শো জায়গায় সাঁতারের নানা কসরত দেখিয়েছেন। বাহবা পেয়েছেন বহু দর্শকের কাছ থেকে। সাঁতারপটু এক দম্পতির পক্ষে এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়।

খেলাধুলোর ক্ষেত্রে অবশ্য দম্পতির অভাব নেই। তাঁদের কৃতিত্বের স্বাক্ষরও
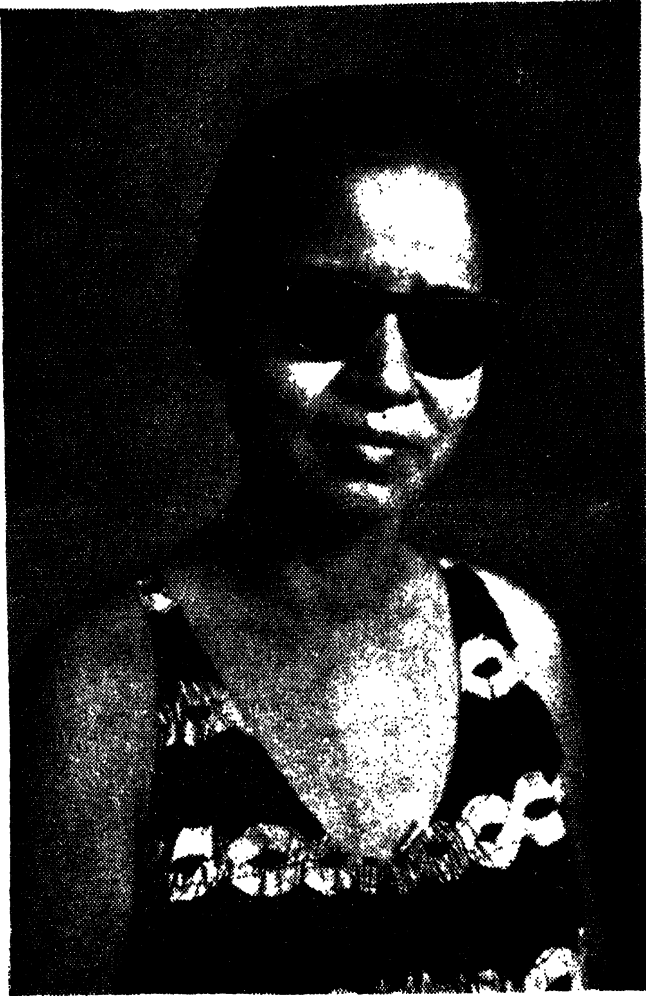
সাঁতার নিপুণা শ্রীমতী ইলা ঘোষ — ফটো—টি রতন

আছে সারা বিশ্বে। অ্যাথলেটিকসে জ্যাটোপেক দম্পতি এমিল ও ডানা—হ্যারোল্ড কনোলী ও ওগলা ফিকোটোভার বিশ্বজোড়া নামডাক। সাঁতারে কার্টালিন জোকে ও কালম্যান মার্কোভিচ—ডেসজো গ্যারমাটি ও ইভা জেকেলী, সারা জগতে সুপরিচিত।

প্রফুল্ল ও ইলা ঘোষ অবশ্য বিশ্বখ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। তবু স্বামী প্রফুল্ল ছিলেন সাঁতারক্ষেত্রে এক সময়ে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট। যার জন্য বড়লাট আরউইনের কাছ থেকে পেয়েছেন পুরস্কার। আর আশীর্বাণী পেয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, স্যার আশুতোষ, নেতাজী সুভাষের কাছ থেকে।

কথায় কথায় অনেক কথা এসে পড়ে। স্ত্রীর কথা বলতে গিয়ে স্বামীর কথা কিছু না বললে অনেক কিছুই অপূর্ণ থেকে যায়। কারণ 'তোমার মাঝে আমার প্রকাশের' মত স্ত্রীর মধ্যে স্বামীর নৈপুণ্যের প্রকাশ। তাই বোধ করি এদের দাম্পত্যজীবন আরও মধুর।

বাংলার মনীষীরা সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। কবি সত্যেন দত্ত ছিলেন প্রফুল্ল ঘোষের জ্যেষ্ঠ সহোদর-সম। সাঁতারের প্রতি ছিল সত্যেন দত্তর যথেষ্ট আগ্রহ। নিজে হেদোর জলে শুধু সাঁতারই কাটতেন না, তাঁর অমূল্য সময়ের বহুক্ষণই কাটতো এখানে। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' ছন্দে লেখা জলচর ক্লাবের জলসা-রংগ নামে কবিতায় তিনি লিখে গেছেন—

'রঙবেরঙের সঙের বাসা
আমাদের এই শহর খাসা
তাহার মাঝে আছে ক্লাব এক
সকল ক্লাবের সেরা,
পুকুর-জলে তৈরী সে যে
ঝাঁঝির জালে ঘেরা!
এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
কাৎলা-চিতল-কাঁকড়া-কাছিম
ব্যাঙের বিহারভূমি'

এই কবিতারই শেষ দিকে সাঁতারু প্রফুল্ল ঘোষের উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

'এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি
প্রফুল্ল, দুই জিতেন ছনুরে
হুল্লোড়েরি ভূমি।'

সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে কবি সত্যেন দত্ত নিজেও হৈ-হুল্লোড় কম করেননি। সত্যেন দত্তর হাত ধরেই প্রফুল্ল গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। সাঁতারের কৃতিত্বের জন্য রবীন্দ্রনাথের স্নেহও পড়েছিল প্রফুল্লর উপর। মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা 'মংপুতে

আজাদ হিন্দ বাগের পুকুরে হাতবাঁধা অবস্থায় ২৫ ঘণ্টা অবিরাম সাঁতার আরম্ভের আগে কলকাতার মেয়র শ্রীরাজেন মজুমদার ও ডেপুটি মেয়র শ্রীতুলসী পালের সঙ্গে সাঁতার নিপুণা ইলা ঘোষ। বাঁ দিকে ইলা ঘোষের সন্তরণবীর স্বামী প্রফুল্ল ঘোষ।

রবীন্দ্রনাথ' বইতে এর কিছু আভাসও আছে।

ইলা ঘোষের সাঁতারু স্বামী প্রফুল্ল ঘোষের কৃতিত্বের কথা কারোই অজানা নেই। উঠতি বয়সে প্রফুল্লর কোন সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। হেদুয়ায় তাঁর ৬৭ ঘণ্টা ১০ মিনিট এবং রেংগুনের রয়াল লেকে ৭৯ ঘণ্টা ২৪ মিনিট অবিরাম সাঁতার, আবার হাত-বাঁধা অবস্থায় হেদুয়ায় ৭১ ঘণ্টা ১৮ মিনিট একটানা সাঁতার আজও শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়।

স্ত্রী ইলা ঘোষও স্বামীর সাথে তাল রেখে চলেছেন। ১৯৪২ সালে দমদমের এক পুকুরে তিনি সেদিন সাঁতারের প্রথম 'ডিমনস্ট্রেশন' দেখিয়েছিলেন, সেদিন সভানেত্রী জ্যোতির্ময়ী গাংগুলী বলেছিলেন 'তুমি আমাদের মেয়েদের মুখ রাখবে'। ১৯৫৪ সালে জামসেদপুরে হাত বেঁধে ২৪ ঘণ্টা সাঁতার কাটার পর টাটা কোম্পানীর অন্যতম মুরুব্বি ফিরোজ কুঠার বলেছিলেন —'আপনি সাঁতারে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।' ইলা ঘোষের এবারকার কৃতিত্ব সে ঔজ্জ্বল্যকেও ম্লান করে দিয়েছে, নতুন কৃতিত্বে তাঁর মুখ হয়েছে আরও উজ্জ্বল। সংগে সংগে বাংলার বউ এবং মেয়েদেরও।

'বুক ভরা মধু বাংলার বধূ নয়নে নীরব ভাষা' সাঁতারনিপুণা ইলা ঘোষও নদীমাতৃক বাংলার বউ। হাতা খুন্তি বেড়ি ধরে দক্ষিণ হাতের ব্যবস্থা করছেন, হাতে হাতকড়া লাগিয়ে সাঁতার কেটে সৃষ্টি করেছেন নতুন রেকর্ড। আবার স্নেহমমতা উজাড় করে ঢেলে দিয়ে চিরদিনের জন্য কোলে তুলে নিয়েছেন এক কচি ছেলে। যার সংগে তাঁর রক্তের সম্বন্ধ নেই।

আর একটা কথা চুপি চুপি বলি : স্বামী পুত্র এবং এক সপত্নী নিয়ে ইলা ঘোষের শান্তির সংসার। অশান্তির কালো মেঘ কোনদিন তাঁদের ঘর অন্ধকার করেনি। সপত্নী তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদরাসম। আর ২০ বছরের বিবাহিত জীবনে ইলা ঘোষের জন্য প্রফুল্ল ঘোষকে কোনদিন ডাক্তার ডাকতে হয়নি, ওষুধও কিনতে হয়নি। সাঁতারে সুপটু দেহ—সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী সাঁতার-পটিয়সী ইলা ঘোষ।

দেশী সংবাদ

১লা মে—কলিকাতার পার্শ্ববর্তী যে সকল মিউনিসিপালিটি এবং অন্যান্য এলাকার কর্পোরেশনকে জল সরবরাহ করিতে হয়, কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ তাহা বন্ধ করার কথা বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। প্রকাশ, জলের বিকল্প ব্যবস্থা করিয়া লওয়ার জন্য দুই-একটি মিউনিসিপালিটিকে শীঘ্রই নোটিস দেওয়া হইতেছে।

সর্বশেষ সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মধ্যস্বত্বভোগীদের মোট ৬০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া স্থির হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। উহার মধ্যে ২০ কোটি টাকা নগদ এবং ৪০ কোটি টাকা হস্তান্তরযোগ্য বন্ডে পরিশোধ করিবার কথা স্থির হইয়াছে। ২০ বৎসরের মেয়াদে কিস্তিবন্দীভাবে উহা পরিশোধ করা হইবে।

২রা মে—অদ্য কলিকাতায় বঙ্গীয় জাতীয় বণিকসভা ভবনে পশ্চিমবঙ্গ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত এক সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, বিভিন্ন সওদাগরী অফিসে বাঙালী বিতারণ নিরোধ করিতে পরিষদ যে প্রস্তাব দিয়াছেন, তাহা কার্যকরী করার ব্যাপারে সরকার একরকম অসহায় বলা যায়।

প্রতি রবিবার ধাঙ্গড় ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের কর্মবিরতির ফলে কলিকাতা শহরে যেভাবে জঞ্জাল জমিয়া যাইতেছে তাহা দূরীকরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের অনমনীয় মনোভাব বর্তমানে সমগ্র পরিস্থিতিটি ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া জানা যায়। প্রকাশ এ সম্পর্কে অদ্য রাজ্য সরকারের লেবার কমিশনারের দপ্তরে যে ত্রিপক্ষীয় প্রাথমিক মীমাংসা আলোচনা বৈঠক আয়োজিত হইয়াছিল, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই।

৩রা মে—অদ্য লোকসভায় কয়লাখনি (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন সংশোধন বিলটি গৃহীত হয়। এই বিল অনুযায়ী কয়লার উপর ধার্য উৎপাদন শুল্ক টন প্রতি ১, টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৪, টাকা করা হইবে।

আসামে ভাষা লইয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পর্কে শ্রী এ পি জৈন যে তদন্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ণ বিবরণীতে তিনি বলিয়াছেন, 'আসামের সংখ্যাগুরু অসমীয়া কংগ্রেসীগণ সংখ্যালঘুদের অনুভূতির দিকে কোনও দৃষ্টি দেন নাই। এমন কি মন্ত্রিসভার মধ্যেও ভাষা সম্বন্ধে মতৈক্য ছিল না।'

আজ শিলং-এ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই সর্বদলীয় পার্বত্য নেতা সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গকে বলেন যে, আসামের পাঁচটি পার্বত্য জেলাকে লইয়া একটি পৃথক রাজ্য গঠনের অভিপ্রায় ভারত সরকারের নাই। তিনি বলেন যে, এই সর্ত সাপেক্ষে তিনি তাঁহাদের দাবি এবং অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করিতে সম্মত আছেন।

৪ঠা মে—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আজ লোকসভায় বলেন যে, সাম্প্রদায়িক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করিবার জন্য যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে গভর্নমেন্টের সিদ্ধান্ত যথাসম্ভব শীঘ্র ঘোষণা করা হইবে। যেমন করিয়াই হউক, সাধারণ নির্বাচনের অনেক পূর্বেই এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইবে।

আসামে গত জুলাই মাসে ভাষার ব্যাপার লইয়া যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়, তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত বাঙলা ভাষাভাষী জনগণের পুনর্বাসন বাবদ দুই কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রকাশ এই দুই কোটি টাকার মধ্যে আসাম সরকার এক কোটি টাকা সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।

অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশন ভবনে মেয়রের কক্ষে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ছয় ঘণ্টাব্যাপী কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এবং মজদুর পঞ্চায়েত নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক বৈঠকে ২০শে মে হইতে ধাঙড় ও অন্যান্য নিম্ন শ্রেণীর মজদুরদের ধর্মঘটের নোটিস প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করা হয়।

৫ই মে—অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত কাউন্সিলারদের সাপ্তাহিক সভা কংগ্রেস ও ইউ সি সি দলের বাদানুবাদ কথা কাটাকাটি ও হই হট্টগোলে চরম বিশৃংখলার রূপ নেয় এবং প্রায় 'অরাজক' অবস্থার পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত পৌরকল্যাণ ব্লকের দুইজন সদস্য ও ইউ সি সি দল দুই কিস্তিতে সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

গত বৎসর আসামে যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, তৎসম্পর্কে শ্রীভূপেশ গুপ্ত (কম্যুনিস্ট পশ্চিমবঙ্গ) আজ রাজ্যসভায় একটি ব্যাপক তদন্তের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া গতকল্য লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি করেন।

৬ই মে—পণপ্রথা নিবারণ বিল সম্পর্কে অদ্য সংসদের উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে যে বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে দুইটি বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—পণের সংজ্ঞা নির্ধারণে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন এবং পণ দাবি করিলে তজ্জন্য শাস্তিদান। উভয় ক্ষেত্রেই বহুসংখ্যক সদস্যের সমর্থন পাওয়া যায়। এই পণের ব্যাপারে কন্যাপক্ষ যাহাতে হয়রানি ভোগ না করে তজ্জন্য রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিতেও তাঁহারা অনুরোধ করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১লা মে—আজ 'ডেইলী মেল' পত্রিকায় প্রকাশ, আলজিরিয়ায় বিদ্রোহী ফরাসী সামরিক অফিসারদের সহিত "আমেরিকার কেন্দ্রীয় গুপ্তচর সংস্থার বিপজ্জনক যোগসাজশ" সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট কেনেডী ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত শুরু করিয়াছেন।

পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজাকির হোসেন এক সাক্ষাৎকারকালে জানান যে, আগামী বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং সম্ভবত ২৩শে মার্চ নূতন পার্লামেণ্টের অধিবেশন বসিবে।

২রা মে—আজ ভিয়েনতিয়েন হইতে ঘোষণা করা হয় যে, বামপন্থী প্রতিনিধিগণের মধ্যে প্রথম আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় ভার্গভিয়েং-এর দক্ষিণে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রণাঙ্গনটিতে গত রাত্রিতে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। লাওসের সর্বত্র সামগ্রিক যুদ্ধবিরতিকল্পে আজ আরও আলোচনা চলিতেছে।

৩রা মে—গত শনি ও রবিবার পূর্ব পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ থানা এলাকায় কয়েকটি গ্রামে দলবদ্ধ আক্রমণের ঘটনায় বহু গৃহস্থের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হয় বলিয়া কলিকাতায় সংবাদ আসিয়াছে। ঐ সময়ে বন্দুকের গুলীতে আহত হইবার ফলে দুইজন হিন্দুর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

"স্বাধীন আঙ্গোলা" আন্দোলনের নেতা শ্রীজোম গিলমোর আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, তাঁহার সৈন্যরা আঙ্গোলার এমন একটি অঞ্চল মুক্ত করিয়াছে যাহার দৈর্ঘ্য তিনশত মাইল এবং প্রস্থ দুইশত মাইল। বহু স্থানে পর্তুগীজ সেনারা দিনের পর দিন তাহাদের ঘাটিতে অবরুদ্ধ রহিয়াছে।

কম্যুনিস্ট পন্থী পাথেট লাো দলের বেতারে আজ লাওসের সর্বত্র পাথেট লাো বাহিনীকে যুদ্ধ বন্ধ করিতে বলা হয়। বলা হয় যে, অদ্য ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড টাইম সকাল ৭-৩০ মিনিটে যুদ্ধ বন্ধ করিতে হইবে। লাওসের প্রশাসনিক রাজধানী ভিয়েনতিয়েনে এই নির্দেশের কোন প্রতিক্রিয়া এখনও বুঝা যাইতেছে না।

৪ঠা মে লাওসের দক্ষিণপন্থী সরকারের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ফোমী নোসাভান গত রাত্রিতে ঘোষণা করেন যে, লাওসের সর্বত্র যুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে। দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আজ অপর পক্ষের প্রতিনিধিবর্গের সহিত এক বৈঠক হইবে বলিয়াও তিনি আশা করেন।

ওয়াশিংটনের কর্তৃপক্ষ মহলের সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট কেনেডী দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেণ্ট এনগো দিন দিয়েমকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, শেষ পর্যন্ত প্রয়োজন হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহার সেনাবাহিনীকে যুদ্ধার্থে দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রেরণ করিতে প্রস্তুত আছে।

৫ই মে—প্রথম মার্কিন মহাকাশচারী-মানব কম্যাণ্ডার আলান শেপার্ড আজ কৃতিত্বের সঙ্গে মহাকাশ পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে নির্বিঘ্নে অবতরণ করেন। মার্কারী বেডস্টোন রকেটটি মানব-যাত্রী সহ মহাকাশ অভিমুখে যাত্রা করে এবং ১৬ মিনিট পরে অতলান্তিক মহাসাগরে নামিয়া আসে।

৬ই মে—রাষ্ট্রপুঞ্জে যে সকল সংবাদ পৌঁছিতেছে তাহাতে মনে হয় যে, লিওপোল্ডভিল কর্তৃপক্ষ কাতাঙ্গা প্রেসিডেণ্ট টিশোম্বেকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার করিয়া লুমুম্বা হত্যার অভিযোগে তাহাকে বিচারার্থ হাজির করিবেন। কঙ্গোলী সেনারা এখনও টিশোম্বেকে কোকলাতভিলে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
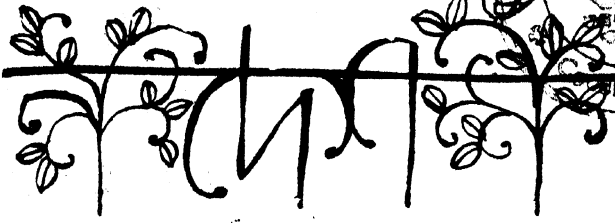
DESH 40 Naye Paise.
Saturday 20th May. 1961

২৮ বর্ষ ॥ ২৯ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

অতিজনতার বিপদ

"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে, সেদিন আসিবে।" কিন্তু সেদিন সুখের নয়, স্বস্তিরও না। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী সার জুলিয়ান হাক্সলো নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক বিশ্ব জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্মেলনের অধিবেশনে ঘোষণা করেছেন, আগামী পঞ্চাশ বৎসরে অতিজনতা বৃদ্ধির ভারে পৃথিবী ঘোর দুর্বিপাকের সম্মুখীন হবে। সংখ্যা-গাণিতিক হিসাবটি নিখুঁত। পৃথিবীর জনসংখ্যা বর্তমানে তিনশত কোটি। প্রতি ঘণ্টায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করছে প্রায় চার হাজার মানব শিশু; মৃত্যুর হার ঘণ্টায় দু হাজার থেকে আড়াই হাজার। অর্থাৎ পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতি ঘণ্টায় দেড় হাজার থেকে দু হাজার। এই হিসাব মত জনসংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত রইলে ২০০০ সাল নাগাদ পৃথিবীতে ছয়শত কোটি লোকের ঠাঁই দিতে হবে। সমস্যা অবশ্য কেবল কোটি কোটি লোকের স্থান সংকুলানের নয়। হাক্সলো আশংকা প্রকাশ করেছেন, বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ক্ষমতা যতই অঘটন-ঘটন কুশলী হোক না কেন, ছয়শত কোটি মানুষের আহার যোগানোর জন্য যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা বিজ্ঞানের পক্ষেও অসম্ভব হবে। বিজ্ঞানের বিশ্ববিজয়ী সর্বসিদ্ধি-দাতা ভূমিকার উপর যাঁরা আস্থাবান জীববিজ্ঞানী হাক্সলো তাঁদের সাবধান করতে জানিয়েছেন যে, এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। সসীম পৃথিবী আর সীমাহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য বিধান বিজ্ঞানেরও সাধ্যাতীত।

অতিজনতা বৃদ্ধির বিপদ এবং সে সম্পর্কে সার জুলিয়ান হাক্সলোর অভিমত মোটামুটিভাবে নির্ভুল। তবে কথা কী, জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপটা পৃথিবীর সর্বত্র সমান নয়। কাজেই হাক্সলো আগামী চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর পৃথিবীতে যে সমূহ বিপত্তির সম্ভাবনা দেখছেন সে বিপত্তির আবির্ভাব পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে এখনই অনুভূত। গত দশ বছরে ভারতবর্ষে ছয় কোটি মানুষ বৃদ্ধি পেয়েছে; চল্লিশ বছর পর ভারতের জনসংখ্যা আশী কোটির বেশী হবে। এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাটিন আমেরিকার অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির চড়া হার। এককালে য়ুরোপের ধুয়া ছিল "পীতাতংক" যার অর্থ চীনাদের অতি-দ্রুত বংশবৃদ্ধির ফলে য়ুরোপীয় ভূখণ্ডের বিভিন্ন জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বিপর্যস্ত হওয়ার আশংকা। "পীতাতংক" অন্তর্হিত হয়েছে বলা যায় না। তবে জীববিজ্ঞানী ও জনসংখ্যা-বিশারদরা এখন যে আতংক প্রকাশ করছেন সেটি সর্বজনীন—সাদা, কালো, বাদামী, হলুদ সব রকম জনতার জোয়ারে পৃথিবীর এক সার্বিক দুর্দশা সাগরে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ম্যালথসও অনুরূপ আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে খাদ্য উৎপাদন সমান তালে অগ্রসর হতে পারে না। কাজেই এমন সময় আসতে বাধ্য যখন খাদ্যাভাবের প্রতিকার করা মানুষের সাধ্যাতীত হবে। সংখ্যাগাণিতিক হিসাবটা বহু দূর ভবিষ্যৎ পর্যন্ত ঠেলে দিলে ওই রকমই মনে হয় বটে। তবে এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে যে ধরনের খাদ্যাভাব দেখা গেছে তা আদৌ সার্বিক বা সর্বজনীন নয়।

সংখ্যাগাণিতিক হিসাবটা বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে বিজ্ঞান ও উন্নততর বৈষয়িক সংগঠনের কল্যাণে খাদ্যের কল্পনাতীত প্রাচুর্য। সাধারণত অনগ্রসর দেশগুলিতেই খাদ্যের অভাব এবং এইসব দেশই আবার অতিজনতার ভারে পীড়িত। অতিজনতা বৃদ্ধির চাপ এবং খাদ্যাভাবজনিত দুর্দশা, দুই-ই এখন পর্যন্ত পৃথিবীর কতকগুলি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। অতএব চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর হাক্সলো পৃথিবীতে যে সমূহ বিপত্তি ঘটবার সম্ভাবনা দেখছেন সে বিপত্তি য়ুরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়াকে প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ নাও করতে পারে। বিপত্তি প্রধানত ভারতবর্ষের মত দেশের, যার লোকভার এবং দারিদ্র্যভার দুই-ই অসহনীয়। তবে "নগর পুড়িলে যেমন দেবালয়" নিষ্কৃতি পায় না তেমনি অতিজনতার ভারে পৃথিবীর কোন একটি বৃহৎ অঞ্চলে বিপর্যয় ঘটলে সচ্ছল ও পরিমিত জনসংখ্যাবিশিষ্ট অঞ্চলের উপরও তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে। সেদিক দিয়ে হাক্সলোর সাবধান-বাণীর সময়োচিত গুরুত্ব অনেকখানি।

অপরিমিতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কী দুর্গতি ঘটে এবং ঘটতে পারে আমাদের দেশে তার নিদর্শন অসংখ্য। অতিজনতার চাপে সমূহ খাদ্যসংকটই একমাত্র দুর্গতি নয়। কোটি কোটি মানুষের আহার, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং জীবিকার সুযোগ দান এখনই দুঃসাধ্য, এরপর বংশ বৃদ্ধির হার কোন না কোন উপায়ে নিয়ন্ত্রিত না হলে আমাদের দেশের অপরিসীম দুর্গতি অনিবার্য। দুর্গতি প্রতিরোধের উপায় একটাই মাত্র। পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন সার জুলিয়ান হাক্সলো। প্রস্তাব নূতন নয়।

অতিজনতা বৃদ্ধি রোধে কার্যকর কতকগুলি প্রাকৃতিক শাসন-পীড়নের উদাহরণ উল্লেখ করেছিলেন ম্যালথস গত শতাব্দীতে। মহামারী, মড়ক, অনাবৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদিতে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে, জীবনযাত্রা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়। এছাড়া যুদ্ধবিগ্রহেও লোক কম মারা যায় না। পৃথিবীর লোকভার হ্রাসের পক্ষে এগুলি মোক্ষম উপায় সন্দেহ নেই, যদিও সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে এইসব অমানুষিক লোকক্ষয়কারী দুর্দৈব প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্র এবং সমাজ একান্তভাবে সচেষ্ট হয়েছে। বিজ্ঞানের কৃপায় মারী ও মড়ক, অনাবৃষ্টি ও বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানেও একালের 'কল্যাণী' রাষ্ট্র সর্বথা উদ্যোগী। কাজেই ম্যালথসী রীতিতে প্রাকৃতিক শাসন-পীড়ন দ্বারা মানুষের অপরিমিত বংশ বৃদ্ধি রোধ করার সুযোগ আমাদের কালে ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে এসেছে।

অতএব অতিজনতার প্লাবন রোধ করার একটিমাত্র উপায়—জন্ম নিয়ন্ত্রণই সুপরিকল্পিতভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রয়োগ করা আবশ্যক। দুঃখের বিষয় জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হলেও কোন দেশেই রাষ্ট্র বা সমাজ বিধিবদ্ধভাবে রীতিমত জন্মনিরোধ প্রচেষ্টায় এখনও উদ্যোগী হয়নি। হাক্সলো এর জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যাপক ক্ষেত্রে উদ্যোগী হতে পরামর্শ দিয়েছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ কবে এবং কতখানি উদ্যোগী হতে পারবে সে বিষয়ে কোনই নিশ্চয়তা নেই। ভারতবর্ষের মত যেসব দেশ অতিজনতার ভারে অদূর ভবিষ্যতে বিপর্যয়ের সম্মুখীন সেসব দেশে অন্তত জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে জনকল্যাণ পরিকল্পনায় অবিলম্বে সামগ্রিক অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

আলোচনা

খোলো খোলো হে আকাশ

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৯শে এপ্রিল তারিখের 'দেশে' কিরণকুমার রায় মহাশয়ের "খোলো খোলো হে আকাশ" পড়ে বিস্মিত হয়েছি। রেডিও এবং য়ুরি গাগারিন কর্তৃক কথিত সংবাদে আমরা জানতে পারি যে, মহাকাশ বিজয়ের জন্য গাগারিনের প্রস্তুতি অত্যন্ত গোপনীয় ছিল, এমন কি, স্ত্রী ভালেন্তিনাও এ-সংবাদ জানত না। সে শুধু এতটুকুই জানত যে, গাগারিন কোন বিশেষ কাজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। যদিও এ-গোপনতার প্রধান কারণ—ভালেন্তিনা ছিল সন্তান-সম্ভবা। গাগারিন এ সময়ে স্ত্রীকে মানসিক অশান্তির মধ্যে ফেলতে চায়নি।

কিন্তু লেখকের লেখা পড়ে মনে হয়েছে, স্ত্রী ভালেন্তিনা এ-সংবাদ অনেক আগেই জানত এবং দ্বিতীয় গাগারিনের কন্যা গালার জন্ম অনেক আগেই হয়েছিল। লেখক এ-সংবাদ কোথায় পেয়েছেন, জানি না।

সত্যব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
কলকাতা।

(লেখকের উত্তর)

সবিনয় নিবেদন,

এই আলোচনার সুযোগ পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ। ১৩ই এপ্রিল ('৬১) ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে রয়টার প্রেরিত খবর পড়ে পাঠকদের ধারণা হয়েছিল, ভালেন্তিনা বোধহয় তাঁর স্বামীর আকাশ-বিচরণের সংকল্প জানতেন না। কিন্তু এ-সংবাদ যে ভিত্তিহীন, তা সেদিনই 'তাস' প্রচারিত এবং 'প্রাভদা' ও 'ইজভেস্তিয়া'য় প্রকাশিত সংবাদে জানা যাবে। (এ প্রসংগে বাহুল্য হলেও নিবেদন করি, গাগারিন কাহিনী সংগ্রহ করার জন্য আমি বিস্তর দিশী-বিদেশী সংবাদ ও তথ্যপত্র ঘাটাঘাটি করা ছাড়াও কলকাতার সোবিয়েৎ দূতাবাসের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সহায়তায় মূল 'প্রাভদা' ও 'ইজভেস্তিয়া' পড়ি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে তাঁর সংগে আলোচনা করি।) অবশ্য পরবর্তী প্রচারিত সংবাদে রয়টার ভুল সংশোধন করে নেয় এবং ভালেন্তিনা যে আগেই জানতেন, এ-খবর সরবরাহ করে। পত্রাঘাতকারী পরবর্তী তারিখের সংবাদপত্রগুলি আরেকটু মনোযোগের সংগে পাঠ করলেই আপন ধারণা প্রসারিত করতে পারবেন। গালার জন্ম সম্পর্কে পত্রাঘাতকারীর সন্দেহও নিতান্ত ভ্রান্ত ও অমূলক।

ভবদীয়
কিরণকুমার রায়।

শতবার্ষিকী সমীক্ষা

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

গত ২রা বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীহিমাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'শতবার্ষিকী সমীক্ষা' পড়িলাম। উক্ত রচনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অমর-প্রতিভার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লেখক-মনের গভীর আশংকা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কবির তিরোধানের অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাঙালীর মানস-প্রকৃতিতে কবি-গুরুর কাব্য-নাট্য-সংগীতের প্রতি অবজ্ঞা ও বীতস্পৃহা দেখা দিয়াছে বলিয়া তাঁহার ধারণা। যে কবি এক সময় বাঙালীর মাথার মণি ছিলেন, তাঁহাকে যেন বাঙালী অনেকটা স্বেচ্ছাকৃত-ভাবে অস্বীকার করিতে বসিয়াছে এবং সেই প্রতিভাধর মহাপুরুষের যথাযথ মূল্যায়ন ব্যাপারে বাঙালীর চিত্তদৌর্বল্য ক্রমশই প্রকট হইয়া উঠিতেছে। বাঙালীর সেই অত্যুচ্চ রবীন্দ্র-প্রীতি এরই মধ্যে ম্লান হইতে বসিয়াছে। আজ দেশব্যাপী রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর মহাসমারোহের মধ্যে কতখানি আন্তরিক মহৎ পূজার অনুপ্রেরণা আছে, তাহা সন্দেহের বিষয়। লেখক বাঙালীর রবীন্দ্র-প্রীতির ভিত্তি-ফাটল তিনভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন—(১) রবীন্দ্র-নাথের ভাবসমৃদ্ধ বাঙলা ভাষাকে এক দুর্বোধ কুহেলিকা জালে আচ্ছন্ন করা হইতেছে; (২) বাঙলার আধুনিক কবিগণ কবিগুরুর সাধনার ধনকে উপেক্ষা করিয়া নূতনের দিকে হাত মেলিয়াছে; (৩) রবীন্দ্র-সংগীত বাঙালীর মনকে তেমন করিয়া রসাবিষ্ট করিয়া তুলিতে পারে না। লেখকের আশংকার কারণ হিসাবে আলোচিত মূল বক্তব্যের ইহাই দাঁড়ায় সার-সংক্ষেপ।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বিপুল বিস্তৃত প্রস্তুতিতে নিমগ্ন উল্লসিত বাঙালী মনের উপর লেখকের রচনা কতখানি এবং কিরূপ প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইবে, আমার চিঠিতে তাহা আলোচ্য নহে। আমি লেখকের মন্তব্যের উপর কয়েকটি প্রশ্ন করিতে চাহি মাত্র।

(১) লেখক তাঁহার অভিযোগের প্রথমে বলিয়াছেন—"যে বাঙলা ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবনের সাধনা দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন, একদল সাহিত্যিক তাকে নানা বিষয়ে অক্ষম ও অসম্পূর্ণ বিবেচনা করে তার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়ে তার মধ্যে নানা বিজাতীয় দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করতে লেগেছেন।" এখানে স্বভাবতই যে প্রশ্ন মনে ওঠে, তাহা এই যে, রবীন্দ্র-প্রতিভায় পুষ্ট বাঙলা ভাষাকে কিরূপে বিজাতীয় দুর্বোধ্যতায় দুর্বোধ্য করিয়া তোলা হইতেছে? এবং কিরূপেই বা তাহাকে 'হাল-ফ্যাশানী' করিয়া তোলা হইতেছে? বাঙলার একদল সাহিত্যিককে এইরূপে অভিযুক্ত করিবার পূর্বে তাঁহাদের ব্যবহৃত ভাষার নিদর্শন দেওয়া উচিত ছিল না কি? বাঙলা ভাষার গতিপথ কি রবীন্দ্রনাথেই শেষ? রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ভাষার যে উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহাকে একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিবেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যাহা গৌরবের, যাহা নিত্যকালের সৌন্দর্য লইয়া আসিয়াছে, তাহা কোন কালেই ম্লান হইবার নহে। প্রতি সাহিত্যিকেরই নিজস্ব ভাবদ্যুতি আছে, যাহা তাহার প্রকাশে ভঙ্গি দেয়, ভাষাকে আলোকিত করে। সাহিত্যিকের স্টাইল সেখানে। এক্ষেত্রে বর্তমান সাহিত্যিকদের উপর লেখকের বিরূপ কটাক্ষের যুক্তি কতটুকু! বোধ হয় আদপেই নাই।

(২) "আজকের দিনের বাঙলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথকে সহজে খুঁজে পাই না। হয়তো সেখানে রবীন্দ্র-কাব্যের আত্মার অগোচর ছায়া-সম্পাত ঘটে থাকে, কিন্তু তার স্থূলে চেহারাটার কোন পরিচয় পাই না।" লেখক নিজে অনেকটা দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছেন। রবীন্দ্র-কাব্যের সূক্ষ্ম প্রভাব লইয়া তিনি সন্তুষ্ট নহেন; রবীন্দ্র-কাব্যের স্থূলে চেহারাটা পর্যন্ত আধুনিক বাঙলা কাব্যে দেখিতে চান। এ তাঁহার গভীর রবীন্দ্র-প্রীতি সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই দাবিতেই কি তিনি আধুনিক বাঙলা কাব্যে রবীন্দ্র-কাব্যের স্থূলে ও সূক্ষ্ম চেহারাটাকে দাবি করিয়া বসিয়াছেন? বাঙলার আধুনিক কবি-মানস যে রবীন্দ্র-প্রতিভায় প্রভাবান্বিত একথা তিনি অনেকটা সন্দেহমনা হইয়া স্বীকার করিতেছেন। প্রথমত, আধুনিক কাব্যে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় খুঁজিবার বাসনা কেন। আধুনিক কাব্যে আধুনিক কবিদেরই স্থান জানি। দ্বিতীয়ত, কাব্যের স্থূলে চেহারাটা যদি ভাষা, ছন্দ ও প্রকাশ-ভঙ্গি হইয়া থাকে, তবে তাহা একের ধন অপরের মধ্যে পাইতে চাই সাহিত্য বিচারের কোন যুক্তিতে? আধুনিক কাব্য সম্পর্কে লেখক অন্যত্র বলিয়াছেন—"আমার শুধু এই প্রশ্ন যে, বাঙালীদের জাতীয় মানস-

প্রকৃতি কি কয়েক বছরের মধ্যে এতই বদলে গেছে যে, রবীন্দ্র-কাব্যের বিশাল জগৎকে বর্জন করে তার বাইরে নূতন দুনিয়ার সন্ধান না করলেই নয়? আমাদের মধ্যেও কি স্পুটনিক-যুগ প্রবর্তন করার কোন অনিবার্য কারণ ঘটেছে?" লেখক নিজেই আবার স্বীকার করিতেছেন—"নবীন সৃষ্টি-চেতনা উৎসুক হয়ে উঠবে না—এমন কোন উৎকট রকমের অতীত পূজা আমার উদ্দেশ্য নয়।" তাই যদি হয়, তবে বাঙলা কাব্যের নূতন অভিসারের জন্য এত খেদ কিসে। তাঁহার মতে, এই অভিসারের পশ্চাতে কতখানি সত্য অনুপ্রেরণা, তাহাই ভাবিবার বিষয়। অনুপ্রেরণা যাহা, তাহা প্রাণেরই রঙ-ধরা রূপ। উহা সত্যিকারেরই হয়, মিথ্যা অনুপ্রেরণা বলিয়া কিছু নাই। রবীন্দ্রনাথের বিশাল জগতে যাহা আছে—তাহাই কি রবীন্দ্রোত্তর কবিদের কাব্যের ক্ষেত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়? সেখানে কাব্যে অনুকরণপ্রিয়তা আসিয়া আধুনিক কাব্যের অপমৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই কি?

(৩) রবীন্দ্রনাথের সংগীত প্রসংগে আসিয়া লেখক বলিয়াছেন—"রবীন্দ্র-সংগীতের পরিস্থিতিও খুব গৌরবজনক নহে। রবীন্দ্র-সংগীতের প্রসার নানা কারণে পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নাই। সে সত্ত্বেও বেশ বুঝতে পারা যায়, বাঙলার সংগীতানুরাগী জনসাধারণের সত্যকার আকর্ষণ কোন্ দিকে।" রবীন্দ্র-সংগীতের প্রসার যদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তবে তাহা নিশ্চয়ই সংগীতানুরাগী জনসাধারণের মধ্যে। যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে তাহাকে আমরা রবীন্দ্র-সংগীতের প্রসার-পাওয়া বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে রাজী নহি। রবীন্দ্র-সংগীতের আশাপ্রদ প্রসার যে এখনও হয় নাই, তাহার প্রধান কারণ দুইটি বলিয়া মনে করি—(১) রবীন্দ্র-সংগীতের অত্যুচ্চ ভাব-গাম্ভীর্য ও (২) রবীন্দ্র-সংগীতের স্বরলিপির কঠোরতা।

শ্রীহিমাদ্রিশেখর চক্রবর্তী,
টাকী, ২৪ পরগণা।

লেখক ও বেতার

মহাশয়,

দেশ পত্রিকার ৩০শে বৈশাখের সংখ্যায় শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষের "লেখক ও বেতার" পড়লাম।

পঁচিশ ত্রিশ তো নাগালের বাইরে। পনর টাকাই বা আসে কোত্থেকে? ঠিক সময়েই কন্‌ট্রাক্ট সই করে পাঠিয়ে দিলুম। বারো মিনিটের মেয়াদী গল্প। ঘড়ির সংগে মিলিয়ে দেখেই গল্প পেঁৗছে দিলুম। তারপর যথারীতি উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার মিনিট পনর আগে হাজির হলুম আকাশবাণী ভবনে। বেতার কর্তৃপক্ষ প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। কি ব্যাপার? সাত মিনিট সময় পাবেন। আপনার গল্প বিষম বড় হয়ে গেছে। ছাটুন। কলম এগিয়ে দিলেন। ঘড়ির দিকে চেয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। কালের যাত্রার ধ্বনি যেন হাতুড়ি ঠুকছে কানের মধ্যে। প্রায় ১৬।১৭ পৃষ্ঠার গল্প লিখেছিলুম। এখন করি কি? কোন্ দিকে কাটব? লেজের দিকটা না মুড়োর দিকে? মোটামুটি কাঠামো বজায় রেখে যাহোক্ তাহোক্ করে সাংগ করলুম। বললুম, দেখুন, ঠিক হল নাকি? ঠিক আছে, কলম ফিরিয়ে নিতে নিতে বললেন। তখনও শেষ অংকের অভিনয় বাকী। নির্দিষ্ট সময়ে পড়তে আরম্ভ করে দেখি অনুষ্ঠান শেষ হতে আর পাঁচ মিনিট বাকী। দুর্গা স্মরণেরও সময় নেই। গল্পের প্রথম দুটি কি তিনটি অনুচ্ছেদ দ্রুত তারস্বরে পড়েই শেষ পৃষ্ঠায় চলে এলুম।

আরম্ভ আর শেষ এই নিয়েই তো মানুষের জীবন। শ্রী ঘোষ যে জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, সেই নামের অনুল্লেখই শাপে বর বলে তখন মনে হল। আমার সে গল্প কারা শুনেছেন এবং শুনে কি বুঝেছেন তা আদৌ আমার বুদ্ধিগম্য নয়। মেজাজটা খিঁচড়ে গিয়েছিল (যা আমার মত নামহীন পরিচয়হীন ব্রতীদের পক্ষে গর্হিত অপরাধ) এবং দুম্ করে বলে ফেলেছিলুম, দয়া করে আমায় আর কন্‌ট্রাক্ট পাঠাবেন না। বেতার কর্তৃপক্ষ অনুরোধের আসর জমান প্রতি হপ্তায়। আমার অনুরোধ রেখেছেন তাঁরা।

তবু শ্রীযুত ঘোষের লেখাটা পড়তে পূর্বস্মৃতি এসে দরজায় ঠুক্‌ঠুক্ করল।

ভবদীয়,
জনৈক ভুক্তভোগী।
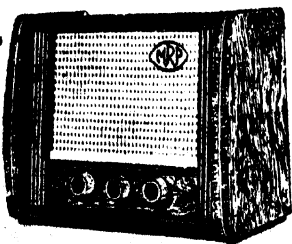
বৈদেশিকী

লাওসের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য যে চৌদ্দটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সম্মেলন ১২ মে তারিখে জেনেভায় আরম্ভ হবার কথা ছিল সেটা ঐ তারিখে আরম্ভ হতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধবিরতি যে হয়েছে সে বিষয়ে নিশ্চিত না হতে পারলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্মেলনে যোগ দেবে না বলেছিল। আন্তর্জাতিক কণ্ট্রোল কমিশন রিপোর্ট দিয়েছেন যে যুদ্ধবিরতি হয়েছে। যদিও তারপরেও দু একটা সংঘর্ষ হয়েছে বলে অভিযোগ শুনা গেছে, তাহলেও যুদ্ধবিরতির কথাটা আমেরিকা মেনে নিয়েছিল। গোল বাধল লাওসের প্রতিনিধি হিসাবে কারা সম্মেলনে যোগ দিতে পারে সেই প্রশ্ন নিয়ে। প্রিন্স বুন উম যে গভর্ণমেণ্টের প্রধানমন্ত্রী সেই "রাজকীয় লাওসিয়ান গভর্নমেণ্ট"কে পশ্চিমারা লাওসের একমাত্র বৈধ সরকার বলে মনে করে। অন্য দিকে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলির নিকট প্রিন্স সুভান্না ফুমাই লাওসের বৈধ প্রধানমন্ত্রী। এই দুই দলেরই প্রতিনিধি জেনেভা কনফারেন্সে যোগ দিতে পারবে এটা একরকম ধরা ছিল, যদিও তা নিয়েও আমেরিকা এবং সোভিয়েট সরকারের মতের দ্বন্দ্ব কিছু কম হয় নি। কিন্তু বিশেষ গোল বাধল "প্যাথেট লাও"কে নিয়ে।

প্রিন্স সুভান্না ফুমা "নিরপেক্ষতা"র পক্ষপাতী বলে অর্থাৎ লাওসকে কম্যুনিস্ট অথবা পশ্চিমা কোনো ব্লকেরই আওতার মধ্যে না রাখার পক্ষপাতী বলে বিদিত। এমন কি তাঁর নামের একটি বিশেষণ হয়ে গেছে—"নিউট্রালিস্ট"। কিন্তু গত কিছুদিন ধরে প্রিন্স সুভান্না ফুমার সঙ্গে কম্যুনিস্ট ব্লকের কর্তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ এবং যুক্ত বিবৃতি প্রদানের যে-সব সংবাদ বেরিয়েছে তাতে তাঁর "নিরপেক্ষতা" সম্পর্কে অনেকের বিশেষ করে পশ্চিমাদের মনে নিশ্চয়ই কিছুটা সন্দেহের উদয় হয়েছে। তা ছাড়া প্রিন্স সুভান্না ফুমার সমর্থক সৈন্যদল "প্যাথেট লাও"-এর সৈন্যদলের সঙ্গে একযোগে ভিয়েনতিয়েন সরকারের বিরুদ্ধে লড়েছে। "প্যাথেট লাও" পশ্চিমাদের চোখে পুরাপুরি কম্যুনিস্ট। তাহলেও প্রিন্স সুভান্না ফুমার "নিরপেক্ষতা" সম্পর্কে পশ্চিমারা বোধ হয় এখনো ষোল আনা নিরাশ হয় নি। মার্কিন সরকার বোধ হয় এ কথাও স্মরণ করছেন যে, লাওসকে "নিরপেক্ষ" রাষ্ট্ররূপে দেখবার ইচ্ছা তাঁদের সম্প্রতি হয়েছে। যদি সেই ইচ্ছা আরো কিছুকাল আগে হত,

তাহলে প্রিন্স সুভান্না ফুমার পরবর্তী-কালের মাথামাথিটা হয়ত এত বেশি হত না। যাই হোক জেনেভা কনফারেন্সে প্রিন্স সুভান্না ফুমার উপস্থিতি অপরিহার্য। কিন্তু কনফারেন্সে "প্যাথেট লাও"-এর প্রতিনিধিদের স্থান দিতে আমেরিকা নারাজ, বড়ো জোর প্রিন্স সুভান্না ফুমার দলের অংশ হয়ে "প্যাথেট লাও"-এর প্রতিনিধি কনফারেন্সে আসতে পারেন, কিন্তু স্বতন্ত্র ভাবে নয়। আবার ভিয়েনতিয়েন সরকার তাঁদের প্রতিনিধিদের প্রতি আদেশ দিয়েছেন যে, কেবল প্যাথেট লাও নয় প্রিন্স সুভান্না ফুমার প্রতিনিধিদেরও যদি কনফারেন্সে যোগ দিতে দেওয়া হয়, তাহলে যেন তাঁরা কনফারেন্সে না যান।

এই সব গোলমেলে ব্যাপার সত্ত্বেও আজ (১৬ মে) থেকে কনফারেন্স আরম্ভ হবে এরূপ আশাজনক সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। বৃটিশ এবং ভারতীয় নেতাদের চেষ্টায় নাকি একটা "কম্প্রোমাইজ ফরমুলা" উদ্ভাবিত হয়েছে। সেই ফরমুলা হচ্ছে এই: কনফারেন্সের "কো-চেয়ারমেন" অর্থাৎ রাশিয়া এবং বৃটেন স্থির করেছেন যে, কনফারেন্সে যে-সব রাষ্ট্র আমন্ত্রিত হয়েছে তারা আলাদা আলাদা ভাবে যাদেরই লাওসের প্রতিনিধি হিসাবে কনফারেন্সে ডাকতে চান তাদেরই কনফারেন্সে স্থান দেওয়া হবে। "কো-চেয়ারমেন" মনে করেন যে, এই কনফারেন্সের কাজ হবে লাওস সমস্যার কেবল আন্তর্জাতিক দিকগুলি বিবেচনা করা। যদি সম্মেলনে নিমন্ত্রিত রাষ্ট্রগুলির পৃথক পৃথক সুপারিশ অনুসারে সম্মেলনে লাওসের প্রতিনিধি নেওয়া হয় তাহলে সব দলেরই লোক আসবে। কারণ কেউ প্রিন্স বুন উমকে, কেউ প্রিন্স সুভান্না ফুমাকে, কেউ প্যাথেট লাওকে আসন দিতে বলবে। সম্মেলন লাওস সমস্যার কেবল আন্তর্জাতিক দিকগুলি আলোচনা করবে, এ কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে আভ্যন্তর প্রশ্নাদির (যথা, যদি লাওসে কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে সেটা কাদের নিয়ে করা হবে) মীমাংসা করা কনফারেন্সের এক্তিয়ারের মধ্যে নয়, সেগুলোর মীমাংসা লাওশিয়ানরা নিজেরা করবে। সুতরাং প্যাথেট লাও-এর প্রতিনিধিকে কনফারেন্সে যোগ দিতে দিলেই তার দ্বারা এটা স্বীকৃত হল না যে, অদূর ভবিষ্যতে লাওসে যদি কোনো কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট গঠিত হয় তবে তাতে প্যাথেট লাও-এর স্থান থাকতে বাধ্য। এই "কম্প্রোমাইজ ফরমুলা" মেনে না নিলে কনফারেন্স হবে না, কিন্তু এত তোড়জোড়ের পরে কনফারেন্স শুরু না হয়েই যদি ভেঙে যায়, তবে তার জন্য যে-অখ্যাতি রটবে সেটার বেশির ভাগ আমেরিকার ঘাড়ে পড়ার সম্ভাবনা। সঙ্গে সঙ্গে লাওসে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। যে সামরিক পরিস্থিতিতে লাওসের যুদ্ধবিরতি হয়েছে এবং সেখানে কম্যুনিস্ট-সমর্থিত পক্ষ যে-ভাবে প্রস্তুত হয়ে আছে, তাতে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হলে ভিয়েনতিয়েন সরকারকে বজায় রাখা কঠিন হবে যদি সাক্ষাৎভাবে মার্কিন অথবা সিয়াটোর সামরিক হস্তক্ষেপ দেখা না দেয়। সেটা প্রেসিডেণ্ট কেনেডি নিশ্চয়ই এড়াতে চান, কারণ তার ফল কী হবে কেউ বলতে পারে না। সুতরাং আমেরিকার পক্ষে উপরোক্ত "কম্প্রোমাইজ ফরমুলা" মেনে নেওয়া সম্ভব যদিও তাতে কম্প্রোমাইজটা আমেরিকার দিক থেকে বেশি হবে। সামরিক দিক থেকে লাওসে প্যাথেট লাও বর্তমানে যে-সুবিধা করে নিয়ে বসেছে তার সঙ্গে যদি জেনেভা কনফারেন্সে সে স্থান পায় তবে তার রাজনৈতিক অগ্রগতি কেবল ফরমুলার মারপ্যাঁচে ঠেকানো যাবে না।

জেনেভা কনফারেন্স লাওস সমস্যার কেবল আন্তর্জাতিক দিকগুলি আলোচনা করবে। লাওসের আভ্যন্তর সমস্যা সমাধানের ভার লাওশিয়ানদের নিজেদের। এটা কথার কথা মাত্র। লাওসের আভ্যন্তর পরিস্থিতি অনেকটাই বিদেশী হস্তক্ষেপের ফল। জেনেভা কনফারেন্স যদি বলে দেয় যে, লাওসে বিদেশী হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে, লাওসকে "নিরপেক্ষ" নীতি অনুসরণ করার সুযোগ দিতে হবে তাহলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই মন্ত্রবলে সব বিদেশী প্রভাব দূর হয়ে যাবে, লাওস 'নিরপেক্ষ' হয়ে উঠবে, এরূপ আশা করা ভুল। লাওসের অভ্যন্তরে পরস্পরবিরোধী দলগুলির বর্তমান শক্তি (অথবা দুর্বলতা) বাইরের সাহায্য দিয়ে গঠিত। এই শক্তিগুলির কোনোটার পক্ষেই এখন প্রকৃত "নিরপেক্ষ" ভাব গ্রহণ করা অসম্ভব এবং বাইরের দরদীরা যে তাদের ছেড়ে দেবে তারও কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ছেড়ে না দেবার পক্ষে হয়ত যুক্তিও দেখানো হবে, বিশেষ করে সেই পক্ষে যাদের অনুগৃহীতেরা সহসা অনাথ হলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্যাথেট লাও এবং প্রিন্স সুভান্না ফুমার সমর্থকগণের সঙ্গে প্রিন্স বুন উমের দলকে যদি এক কোয়ালিশন গভর্নমেণ্টের অন্তর্ভুক্ত করা যায় তবে শেষোক্ত দলের প্রভাব কতটুকু এবং কতদিন থাকবে বলা যায় না। এরূপ কোয়ালিশন গভর্নমেণ্টের "নিরপেক্ষতা" এত বেশি কম্যুনিস্ট ব্লকের দিকে ঝোঁকা হবে যে, তার দ্বারা লাওসকে বস্তুত কম্যুনিস্ট ব্লকের আওতায় ছেড়ে দেওয়া হবে—এই আশংকার বশবর্তী হয়ে আমেরিকা লাওসে আপাতত কোনো কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট গঠনের পক্ষপাতী হবে বলে মনে হয় না। কারণ এখন কোনো কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট গঠন হলে তাতে প্যাথেট লাও-এর প্রাধান্যলাভের সম্ভাবনা খুবই বেশি। সেটা আমেরিকার চক্ষে সমস্ত লাওসকেই কম্যুনিস্টদের হাতে ছেড়ে দেবার শামিল হবে।

বৃটেন হয়ত এখনো আশা করছে যে, একটা আন্তর্জাতিক চুক্তির রক্ষা কবচ পরিয়ে লাওসের "নিরপেক্ষতা" কম্যুনিস্ট গ্রাস থেকে রক্ষা করা যাবে। এমন কি, প্যাথেট লাওকে নির্বিষ করা সম্ভব বলে কোনো কোনো ইংরেজ হয়ত এখনো আশা করেন। কিন্তু আমেরিকার সেরকম কোনো আশাবোধ নেই। সেইজন্য লাওসে প্যাথেট লাও সহ কোয়ালিশন গভর্নমেণ্টের প্রস্তাব মার্কিন সরকারের সমর্থন পাবে না। আবার প্যাথেট লাওকে বাদ দিয়ে কোনো কোয়ালিশন গভর্নমেণ্টের প্রস্তাব কম্যুনিস্ট ব্লকও চাইবে না এবং প্যাথেট লাও যে-সামরিক প্রভাব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে তাতে বর্তমান অবস্থায় প্যাথেট লাওকে বাদ দিয়ে কোনো কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট গঠিত হলে তা টিঁকবেও না। অন্যদিকে মুশকিল হচ্ছে এই, যদি কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট গঠিত না হয় তবে লাওসের ভাগ্যেও কোরিয়া, ভিয়েৎনাম প্রভৃতির মতো বিভাগ ঘটার সম্ভাবনা। লাওসের আভ্যন্তর ব্যবস্থা, কোয়ালিশন গভর্নমেণ্ট হবে কি হবে না ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধানের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে লাওশিয়ানদের—এসব কথা যদি সত্য হত তবে খুব আনন্দের বিষয় হত কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কথাগুলো একেবারেই বাজে এবং সেগুলো যে বাজে তা "কো-চেয়ারমেন"ও খুব ভালো করে জানেন এবং মার্কিন সরকারও জানেন। কিন্তু "কম্প্রোমাইজ ফরমুলা"র ধারাই সাধারণত এইরূপ হয়ে থাকে।

১৬।৫।৬১

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

ভবঘুরে (৮)

গ্রামের ঐ একটিমাত্র সদর-রাস্তা পেরিয়ে যাওয়ার পর দু'দিকের বাড়িগুলো রাস্তা থেকে বেশ একটুখানি দূরে—অর্থাৎ গেট খুলে বাগান পেরিয়ে গিয়ে ঘরে উঠতে হয়।

'বাগান' বললুম বটে, কিন্তু সেটাকে ঠিক কি নাম দিলে পাঠকের চোখের সামনে ছবিটি ফুটে উঠবে, ভেবে পাচ্ছিনে।

ঢুকতেই কম্পাউন্ডের বাঁদিকে একটা ডোবাতে অনেকগুলো রাজহাঁস প্যাঁক-প্যাঁক করছে। টলটল স্বচ্ছ সরোবরে তরতর করে রাজহাঁস মরাল-সন্তরণে ভেসে যাওয়ার শৌখীন ছবি নয়—এ নিছক ডোবা, এদিকে-ওদিকে ভাঙা, ধসে-যাওয়া পাড়, জল ঘোলা এবং কিছু কিছু শুকনো পাতা এদিক-ওদিক ভাসছে। সোজা বাঙলায়, এখানে রাজহাঁসের চাষ হচ্ছে, বাগানের নয়নাভিরাম দৃশ্য হিসেবে এটাকে তৈরী করা হয়নি।

মারিয়ানার গন্ধ পেয়েই রাজহাঁসগুলো একজোটে ডোবা ছেড়ে তার চতুর্দিকে জড়ো হল। আমি লাফ দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালুম। রাজহাঁস, ময়ূর, এরা মোটেই নিরীহ প্রাণী নয়—যে যাই বলুন। মারিয়ানাও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শুধু বললে, 'বাপরে বাপ, জানোয়ারগুলোর কি খাঁই! এই সকাল বেলা উঠেই গাদা-গুচ্ছের খাইয়ে গিয়েছি, ডোবাতেও এতক্ষণ এটা-সেটা খেয়েছে, আবার দেখো, কি রকম লেগেছে! এদের পুষে যে কী লাভ, ভগবান জানেন।'

ইতিমধ্যে দেখি আরেক দল মোর্গা-মুর্গী এসে জুটেছে।

ঘরে ঢোকার আগে দেখি বাড়ির পিছনে এক কোণে জালের বেড়ার ভিতর গোটা-তিনেক শুয়োর।

আমি অবাক হয়ে মারিয়ানাকে শুধালুম, 'এই সব-কিছুর দেখ-ভাল তুমিই করো? তোমার ঠাকুরমা না—?'

ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'আমি করি কোথায়? করে তো কার্ল?'

আমি শুধালুম, 'সে আবার কে? তুমি না বললে, তোমরা মাত্র দুজনা?'

ইতিমধ্যে কার্ল এসে জুটেছে। মাঝারি সাইজের এলসেশিয়ান হলেও এলসেশিয়ান তো বটে—জর্মনরা বলে শেপার্ড ডগ, অর্থাৎ রাখাল-কুকুর—কাজেই একদিকে রাজহাঁস, অন্য দিকে

কুকুর, এ নিয়ে বিব্রত হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু দেখলুম, কার্ল স্যানা ছেলে, আমাকে একবার শুঁকেই মনস্থির করে ফেলেছে, আমি মিত্রপক্ষ।

মারিয়ানা বললে, 'আমি ওদের খাওয়াই টাওয়াই। কার্লই দেখা-শোনা করে। তোমার মত ট্র্যাম্প কিংবা জিপসি সুযোগ পেলেই কপ্ করে একটা মুরগী ইস্তেক হাঁসের গলা মটকে পকেটে পুরে হাওয়া হয়ে যাবে।'

আমি বললুম, 'মনে রইল। এবারে সুযোগ পেলে ছাড়ব না।'

ভয় পেয়ে বললে, 'এমন কর্ম্মটি করতে যেয়ো না, লক্ষ্মীটি। অনেকেরই কার্লের চেয়েও বিরাট দু-আঁসলা শেপার্ড ডগ রয়েছে। সেগুলো বড্ড বদ্‌মেজাজী হয়।'

আমি অবাক হয়ে ভাবছি, এই বারো বছরের মেয়ে দু-আঁসলা, এক-আঁসলা ক্রস-ব্রীডের কি বোঝে?'

মারিয়ানাই বুঝিয়ে বললে, 'খাঁটি আলসেশিয়ান কার্লের চেয়ে বড় সাইজের হয় না। আলসেশিয়ানকে আরো তাগড়াই করার জন্য কোনো কোনো আহম্মুক আরো বড় কুকুরের সঙ্গে ক্রস করায়। সেগুলো সত্যিকার দু-আঁসলা, বদ্‌মেজাজী আর খায়ও কয়লার ইঞ্জিনের মত।'

এর অনেক পরে এক ডাক্তার আমায় বুঝিয়ে বলেছিলেন, গরু-ভেড়া-ছাগল-মুরগী নিয়ে গ্রামের সকলেরই কারবার বলে কাচ্চাবাচ্চারা অল্প বয়সেই ব্রীডিং বুঝে, 'বীচি'র মোরগ কি বুঝে যায়। তাই শহুরেদের তুলনায় এ-বিষয়ে ওদের সুস্থ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি জন্মায়, এবং পরিণত বয়েসে যৌন-জীবনে শহুরেদের তুলনায় এদের আচরণ অনেক বেশী স্বাভাবিক ও বেহাঙ্গামা হয়।

থাক্ সে কথা। তবে এইবেলা এ কথাটি বলে রাখি, এই গ্রামাঞ্চলে ঘোরাঘুরির ফলে মানুষের জীবনধারা সম্বন্ধে যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছি, শহরের বহু ড্রয়িং-রুম, বার-রেস্তোরাঁর পাকা জউরি হয়েও তার সিকির সিকিও হয়নি।

*

'ঠাকুরমা, আমি অতিথি নিয়ে এসেছি।'

আমি বললুম, 'গ্রুস্ গট্ ঠাকুরমা। আমি বিদেশী।'

ঠাকুরমা সেই প্রাচীন যুগের লোক। গ্রুস্ গট্ বলাটাই হয়তো এখনো তাঁর অভ্যাস। তাই বলে বললেন, 'বসো।' মারিয়ানাকে বললেন, 'এত দেরি করলি যে। খেতে বস্। আর সানডে সেট বের কর। আর শোন্, চীজ, চেরি-ব্র্যাণ্ডি ভুলিসনি।'

'হ্যাঁ, ঠাকুরমা, নিশ্চয়ই ঠাকুরমা—' বলতে বলতে আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি চোখ টিপে হাসলে। বিশেষ করে দেরাজের উপরের থাকের চেরি-ব্র্যাণ্ডির বোতল দেখিয়ে। অর্থাৎ অতিথি-সৎকার হচ্ছে। সচরাচর এগুলো তোলাই থাকে।

এবং এটাও বোঝা গেল, নিতান্ত ঠাকুরমা নাতনী ছাড়া আর কেউ নেই বলে রবিবার দিনও সানডে সেটের কাপ-প্লেট বের করা হয় না।

মারিয়ানা টেবিল সাজাচ্ছে। আমি ঠাকুমাকে শুধালুম, 'আপনার স্বাস্থ্য কিরকম যাচ্ছে?'

ঠাকুরমা উত্তর না দিয়ে বললেন, 'তুমি তো আমার মত কথা বলো, আমার নাতনীর মত বলো না।'

আমি শুধালুম, 'একটু বুঝিয়ে বলুন।'

ঠাকুরমা বললেন, 'আমি হানোফারের মেয়ে। সেই ভাষাতেই কথা বলি। সে-ভাষা বড় মিষ্টি। আমি ছাড়বো কেন। আর নাতনীর বাপ-ঠাকুর্দা রাইনল্যাণ্ডের লোক। এরা সবাই রাইনিশ বলে। তুমি তো হানোফারের কথা বলছো।'

মারিয়ানা বলে উঠলো, 'ওঃ, কত না মিষ্টি। শ্‌পিৎসে, শ্‌টাইন বলতে পারে না; বলে স্পিৎসে, স্টাইন।'

(অর্থাৎ 'শ, স'-এ তফাত করতে পারে না; আমরা যে রকম 'সাম-বাজারের সসিবাবুর সসা খেয়ে খেয়ে সম্পারোন' নিয়ে ঠাট্টা করি।)

ঠাকুরমা কণামাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, 'আর তোরা ত কির্শে, কির্ষেতে তফাত করতে পারিসনে।'

(এ দুটো উচ্চারণের পার্থক্য বাঙলা হরফ দিয়ে বোঝানো অসম্ভব। তবে এক উচ্চারণ করলে ফলে দাঁড়ায় 'আমি গির্জেটা (কির্ষে) খেলুম (!), এবং তারপর চেরি ফলে (কির্শে) ঢুকলুম (!)' —যেখানে উচ্চারণে ঠিক ঠিক পার্থক্য করলে সত্যকার বক্তব্য প্রকাশ হবে, 'আমি চেরিফল খেয়ে গির্জেয় ঢুকলুম।')

আমি বাঙাল-ঘটি যে-রকম উচ্চারণ নিয়ে তর্ক করে, সে ধরনের কাজিয়ার বাড়াবাড়ি থামাবার জন্য বললুম, 'আমার গুরু ছিলেন হানোফারের লোক।'
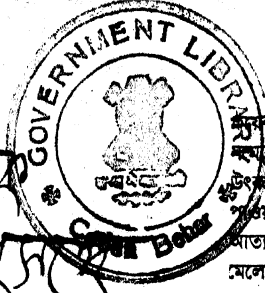
ডক্টর সরোজকুমার দাস

ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যানুসারে কোন গ্রন্থ বা নিবন্ধের অবতারণা করিতে হইলে রচয়িতাকে সর্বাগ্রে তৎসম্পর্কিত অধিকার ও প্রয়োজন নির্দিষ্ট করিতে হয়। এই নিবন্ধের "প্রয়োজন" স্থানকালমাহাত্ম্যে এতই সুস্পষ্ট যে তার পুনরুক্তি এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। কেবল এর অধিকার নির্দেশ-কল্পে বলিতে হয় যে "দর্শন" বা "দার্শনিক" শব্দের যে অর্থ সাধারণ্যে প্রচলিত, তাহার সীমিত অর্থে ইহাকে আবদ্ধ না রাখিয়া 'ধর্মবোধ' বা 'ধর্মতত্ত্বের আলোচনাও দর্শনের ব্যাপকতম অর্থে, দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর অধিকারভুক্ত করা সমীচীন ও সুসঙ্গত।

"দর্শন" শব্দের ইতিবৃত্ত হইতে এই প্রতীতি হয় যে, লোক-প্রচলিত প্রণালীতে যে লৌকিক জ্ঞান (এবং বিশিষ্ট অর্থে বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বও) লাভ করা যায় তা সমুদয় দর্শনের অধিকারভুক্ত। এইজন্য ব্যাপকতম অর্থে দর্শনের সহিত জীবনের অঙ্গাঙ্গ সম্পর্ক—একেবারে নাড়ীর যোগ বলা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি বলা যায় যে সমদ্বিবাহু একটি ত্রিভুজের শীর্ষস্থানে "জীবন"-কে সন্নিবেশিত করিলে তলদেশের দুই কোণে যথাক্রমে "সাহিত্য" ও "দর্শন" স্থান পাইতে পারে—তবে এই অঙ্গাঙ্গি-ভাব সুস্পষ্টভাবে ধারণা করা যায়। "সাহিত্য ও দর্শন" দুইটিই সমভাবে জীবনের গহনগুহাশ্রিত "জিজ্ঞাসা'য় সঞ্জাত ও সংবর্ধিত এবং এই জিজ্ঞাসার প্রকৃষ্ট নির্বচন (definition) জীবন-যোনি-প্রযত্ন (instinctive activity), এই নামকরণে। বিচার-মীমাংসাসম্ভূত জ্ঞানের উৎসস্বরূপ এই যে জিজ্ঞাসা, তার জীবন-পুরঃসর প্রবৃত্তির মধ্যেই সন্ধান পাই এর প্রাণস্পর্শ ও জৈব-প্রেরণার।

জীবনের সহিত দর্শনের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে তাহা, কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে সাম্প্রতিক দর্শনের ক্ষেত্রে একরকম সর্ব-বাদিসম্মত। এই মতবাদের দু'একটি নিদর্শন দেওয়া যায় যেমন "দর্শন জীবনেরই কেন্দ্রী-ভূত আত্মচেতনা-সংস্থান" অথবা কবিতার মাধ্যমে যেমন প্রকাশ করা হইয়াছে—"দর্শন জীবনকে স্থির চিত্তে ও সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিবারই একটি বিরাম-বিহীন প্রয়াস।" বাহুল্যবোধে আরও কয়েকটি প্রচলিত এই জাতীয় উক্তি উদ্ধৃত করা হইল না। প্রসঙ্গত ইহা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীতে—গানে, কবিতায়, গদ্যপ্রবন্ধে, নাটকে যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় তাকে নিঃসংশয়ে জীবন-দর্শন-সম্ভূত বলা চলে। সম্প্রতি কোন একজন রবীন্দ্ররচনাবিদগ্ধ সাহিত্যরসিক রবীন্দ্র-রচনা সম্পর্কে 'জীবন-দর্শন' শব্দটির ব্যব-হার অপপ্রয়োগ—এই জাতীয় একটা মত প্রকাশ করিয়াছেন। সম্ভবত জীবন-উপসৃষ্ট দর্শন তার স্বত্ব বা আভিজাত্য রক্ষা করিতে পারিবে না—এই আশঙ্কাতেই ঐ শব্দটি বর্জন করার নির্দেশ দিয়াছেন। আমার ত মনে হয় জীবন-দর্শনের বাস্তব-সত্তা বা নিরবচ্ছিন্ন সার্থকতা চরম উৎকর্ষ লাভ করে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী সম্পর্কে—তার বিচিত্র ভাবরসের অনুশীলন ও উপলব্ধিতে। চিন্তা ও মননশীলতার রাজ্যে শেষ পর্যন্ত [illegible]কটি চিরন্তন, অমীমাংসিত দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হইতেই হয় এবং সেই সকল উৎকট, উপচীয়মান দ্বন্দ্বের কোন সমাধান পাওয়া যায় না। সেই সকল দ্বন্দ্ব বা আত্যন্তিক বিরোধের আংশিক সমাধান মেলে জীবনে—তার সূক্ষ্মানুভূতি, তার ভাবব্যঞ্জনা, তার অলৌকিক রসবোধের মাধ্যমে। আমরা মৌখিক তর্ক বা আলো-চনায় অনেক সময় বলিয়া থাকি—'জীবন ন্যায়শাস্ত্রের নিয়ম-অনুশাসন মানিয়া চলে না' (Life is more than Logic) কিন্তু তত্ত্বের দিক হইতে এই স্বীকারোক্তিকে সে প্রাধান্য কখনও দিই না, যাহাতে এইসকল চিরন্তন সমস্যার সমাধানে সফলকাম হইতে পারি। তর্কের খাতিরে যতই বাদানুবাদে লিপ্ত হই, এই স্বচ্ছ সরল কথাটি যেন না ভুলি যে জীবন জিনিসটাই একটা 'আর্ট' বা শিল্পসাধনা—সব আর্টের সেরা আর্ট। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এরই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি সর্বাগ্রগণ্য।

সাম্প্রতিক ভারতীয় দর্শনের ("Con-temporary Indian Philosophy" edited by Radhakrishnan & Muirhead, 1936) প্রতীকস্বরূপ—মহাত্মা গান্ধী, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষিবৃন্দের আত্মপরিচয়সংবলিত রচনা-সমৃদ্ধ গ্রন্থে এই ভাবধারার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি পাই। রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রবন্ধে—

"রূপদক্ষের স্বধর্ম"।১ "আমার ধর্ম স্বরূপতঃ কবির ধর্ম। আমার গানের প্রেরণা যেমন অদৃশ্য গতিপথে এসে পোঁছেচে তেমনি অদৃশ্যপথেই এসেছে আমার ধর্মের প্রাণস্পর্শ আমার হৃদয়ে। আমার ধর্মসাধনা ও কাব্যসাধনা একই অজ্ঞাত রহস্যময় পদ্ধতিতে বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। কখন কিভাবে যে তাদের মধ্যে পরিণয়মঙ্গল সূত্র বাঁধা হয়েছে জানি না—এর আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির ব্যাপারটা অনেক আগেই হওয়া সত্ত্বেও, এই তথ্যটি আমার কাছে গোপন ছিল। আমি আশা করি সকলে বিশ্বাস করবেন যে আমি অহমিকার বশে এ কথা বলছি না যে, আমার কাব্যরচনার প্রেরণা এসেছে সেই হৃদয়াবেগের, সেই বেদনার গভীরতা থেকেই—যার

(১) The Religion of an Artist

সমীরিত স্পর্শে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে এই স্পর্শকাতর, সূক্ষ্মানুভূতিবাহক কবিমানস-তন্ত্রী। আমার শৈশবকাল থেকেই এমন একটি সূক্ষ্ম অনুভূতি বা বেদনাবোধ ছিল, যার প্রভাবে আমার মন পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক ও মানবীয় জগতের চেতনায় সর্বদাই অভিষিক্ত থেকেছে।"

জীবনের প্রান্ত সীমানায় পোঁছিবার পর এই যে পরাবৃত্ত গতিতে তাঁর কাব্য-জীবনের মূল্যায়ন, বিশেষত দার্শনিক পরিমণ্ডলের পরিবেশে এই যে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি,—ইহার পরিশেষ দায়িত্ব এবং মূল্য রহিয়াছে, কবির জীবন-দর্শনের মানদণ্ড হিসাবে। এই প্রান্তিক স্বীকৃতির গুরুত্ব এইখানেই নয় যে, এটি তাঁর সর্বশেষের গান। —এ গানের ধূয়া বারে বারেই তাঁর ভাবপ্রবণ চিত্ত স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। 'সবুজপত্র' পত্রিকার ১৩২৪ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায়) 'আমার ধর্ম" শীর্ষক প্রবন্ধে এই জীবন-দর্শনের প্রথম অভিব্যক্তি এবং পরে পূর্ণতর ও স্পষ্টতর প্রকাশ দেখি 'আত্ম-পরিচয়' গ্রন্থে(১লা বৈশাখ, ১৩৫০)। কালানুক্রমিক পদ্ধতিতে কবিগুরুর এই সাক্ষ্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই স্বীকৃতিসমুচ্চয়ের একটি স্বতঃপ্রামাণ্য সকল তর্কবিতর্কের ঊর্ধ্বে সমুজ্জ্বল হইয়া ওঠে।

"শুধু কি কবিতা-লেখার একজন কর্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ, তাহার সমস্ত যোগবিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজন একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন।" যিনি সকলকে পরিবেষ্টন করিয়া অতিক্রম করিয়া আছেন, যিনি, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ—ঈশোপনিষদ-বর্ণিত 'কবিমনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ'—যিনি আদিকবি বা স্রষ্টা, মনের ঈশিতা বা নিয়ন্তা, সর্বব্যাপী ও স্বয়ংপ্রকাশ—তাঁরই প্রতিভূ ও প্রতিসৃষ্টি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাই সাধর্ম্য-চেতনায় অভিষিক্ত চিত্তে নিবেদন করিলেন তাঁর গভীরতম ভাবোচ্ছ্বাস—"এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালো-মন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবন-দেবতা' নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া বিশ্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না। আমি জানি, অনাদি-কাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া

আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি, সেইজন্য এত বড়ো রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।" এইখানেই নানাবিধ তর্ক, মতবাদ উঠিবে আশংকা করিয়াই যেন মুখ-বন্ধ করিলেন, "তত্ত্ববিদ্যায় আমার কোনো অধিকার নাই। দ্বৈত-অদ্বৈতবাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব। আমি কেবল অনুভবের দিক দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধি মন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্ব-জগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এ লীলা তো আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই স্বীকৃতি স্পষ্টাক্ষরে দিয়াছেন যে, এই বোধ "বিশেষ কোনো একটা নির্দিষ্ট মত নয়—একটা নিগূঢ় চেতনা, একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব—আমার সুখদুঃখ অন্তর-বাহির, বিশ্বাস-আচরণ, সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব... আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিসটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে তুলতে পারব সেই আমার চরম সত্য।"

"মনুষ্যের প্রত্যেকের মধ্যে সত্যের একটি বিশ্বরূপ আছে, আবার সেই সঙ্গে তার একটি বিশেষ রূপ আছে। সেইটেই হচ্ছে তার বিশেষ ধর্ম। সেইখানেই সে ব্যক্তি সংসারের বিচিত্রতা রক্ষা করছে। সৃষ্টির পক্ষে এই বিচিত্রতা বহুমূল্য সামগ্রী...... আমার অন্তর্যামী জানেন মনুষ্যত্বের মূলে আমার ধর্মের একটি বিশিষ্টতা বিরাজ করছে। সেই বিশিষ্টতাতেই আমার অন্তর্যামীর বিশেষ আনন্দ।" পশ্চিমের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বহু-সুখ-দুঃখ-মন্থন-করা ধন অর্থাৎ ব্যক্তিমাত্রেরই যে একটি সীমাহীন, অতুলনীয় ও অনির্বচনীয় মূল্য রয়েছে—তার স্বীকৃতি "আমার ধর্ম" ব্যাখ্যানের সাধর্ম্য লাভ করার স্পর্ধা রাখে বলিয়া মনে হয়।

এই "ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা"। কিন্তু "যেখানে আমি স্পষ্টতঃ ধর্মব্যাখ্যা করেছি সেখানে আমি নিজের অন্তরতম কথা না বলতেও পারি, সেখানে বাইরের শোনা কথা নিয়ে ব্যবহার করা অসম্ভব নয়। সাহিত্য রচনায় লেখকের প্রকৃতি নিজের অগোচরে নিজের পরিচয় দেয়, সেটা তাই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। তাই কবিতা ও নাটকেরই সাক্ষ্য নিচ্ছি।" সত্যই তাই দেখি "আমার ধর্ম আমার উপচেতন-লোকের অন্ধকারের ভিতর থেকে ক্রমে ক্রমে চেতন-লোকের আলোতে" উঠে আসছে—সেই "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" ও "প্রভাতসংগীতে" স্তরের মধ্য থেকে—"স্পষ্ট ও অস্পষ্ট পায়ের

চিহ্ন" রেখে। "সে চিহ্ন দেখলে বোঝা যায় যে, পথ সে চেনে না এবং সে জানে না ঠিক কোন্ দিকে সে যাচ্ছে। পথটা সংসারের কি অতিসংসারের তাও সে বোঝে নি। যাকে দেখতে পাচ্ছে তাকে নাম দিতে পারছে না, তাকে নানা নামে ডাকছে।" শেষ কথা "আমার ধর্ম" সম্বন্ধে তাই বললেন, "ধর্ম-বোধের এই যে যাত্রা এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত। মানুষ সে। অমৃতের অধিকার লাভ করেছে। কেননা জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেয়ের ক্ষুরধার-নিশিত দুর্গম পথে দুঃখকে, মৃত্যুকে স্বীকার করেছে......সেইজন্যেই তো মানুষ প্রার্থনা করে, অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়। 'গময়' এই কথার মানে এই যে, পথ পেরিয়ে যেতে হবে, পথ এড়িয়ে যাবার জো নেই।

"আমার রচনার মধ্যে যদি কোনো ধর্ম-তত্ত্ব থাকে তবে সে হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার সংগে জীবাত্মার সেই পরিপূর্ণ প্রেমের সম্বন্ধ উপলব্ধিই ধর্মবোধ—যে প্রেমের একদিকে দ্বৈত আর একদিকে অদ্বৈত, একদিকে বিচ্ছেদ আর একদিকে মিলন, এক-দিকে বন্ধন আর একদিকে মুক্তি। যার মধ্যে শক্তি এবং সৌন্দর্য, রূপ এবং রস, সীমা এবং অসীম এক হয়ে গেছে; যা বিশ্বকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে অতিক্রম করে; এবং বিশ্বের অতীতকে স্বীকার করেই বিশ্বকে সত্যভাবে গ্রহণ করে; যা যুদ্ধের মধ্যেও শান্তিকে মানে, মন্দের মধ্যেও কল্যাণকে জানে এবং বিচিত্রের মধ্যেও একককে পূজা করে।"

"আমার ধর্ম", 'মনুষ্যত্ব', 'মানবসত্য' তথা 'ধর্ম', 'ধর্মবোধ' বা 'ধর্মতত্ত্বে'র এরূপ স্বচ্ছ, সরল, সামগ্রিক ব্যাখ্যান আর কোথাও পাওয়া গিয়াছে, বা ভবিষ্যতে যাইবে কিনা জানি না। পশ্চিমের মরমী সাধনার ব্যাখ্যাতা ও সমালোচকেরা ধর্ম বা মরমী (mystic) সাধনার স্তরভেদ নির্দেশ করেন—The Purgative বা বিসর্জনমূলক স্তর, the Illuminative চেতনা বা বোধনমূলক স্তর এবং the Unitive বা একীকরণ বা সামীপ্যস্থাপক স্তর,—অধিকন্তু খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বপ্রভাবিত যে "Die to live"-এর অনুশাসন-বাক্য ও তদনুষংগী যে অধ্যাত্ম-বাদ—এই সকলের সহিতই কবিগুরুর এই ব্যাখ্যান তুলনা করা যায় এবং এই তুলনার পটভূমিকায় তদীয় ব্যাখ্যানের যে বৈশিষ্ট্য ও মহাত্মা আছে, তা নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক দৃষ্টিভংগী ও জীবন-দর্শন সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ংগম করিতে পারিব।

প্রসংগতঃ, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, রবীন্দ্র জীবন-দর্শনের মুখ্যতম আংগিক হইতেছে, রবীন্দ্রনাথের গান। সংগীতস্রষ্টার অধিকারে তাই বলেছিলেন—"আমাদের সংগীত জিনিসটা ভূমার সুর। তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করে।" ২ অধিকন্তু রবীন্দ্র জীবন-দর্শনের মর্মবাণীই হইতেছে এই—"মানুষের সঙ্গীত কোন্ ধ্রুব সত্যকে প্রকাশ করছে? না—সমস্ত ছাড়া-ছাড়ির মূলে একটি গভীর মিল আছে, একটি অনির্বচনীয় আনন্দময় মিল। এই মিলের কথাটি ভাষায় বলা যায় না, কেবলমাত্র সুরেই বলা যায়। কারণ, কথা জিনিসটা মানুষেরই। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ; আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেজন্যে সুরশিল্পীর কণ্ঠসংগীত আমাদের মুখের কথাকে নিরস্ত করে অনির্বচনীয়ের আভাসে ভরা গানকেই জাগিয়ে তোলে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত দর্শনতত্ত্ববিৎ আর্ডম্যান (Erdman) তাঁর বিশ্ববিশ্রুত 'দর্শনের ইতিহাস' গ্রন্থে 'গান' সম্পর্কে এই ধরনের ব্যঞ্জনাপূর্ণ একটি উক্তি করেছিলেন—যখন তোমার অন্তর্জগৎ ব্যাপ্তি ও গভীরতায়, বহি-র্জগৎকে অতিক্রম করিয়া যায়, তখনই জল-বুদ্‌বুদেরই মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে একটি গান।"

জীবনসন্ধ্যায় যে স্পষ্ট ও পূর্ণতর সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন কবিগুরু তাঁর "পত্র-পুটে," তাহাই স্মরণ করি এ ক্ষেত্রে—

"আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে
দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য—
ভালোবাসার অমৃত।"

২ শান্তিনিকেতন (পরিবর্তিত সংস্করণ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৬২

তবেই তো সম্ভব হইয়াছিল সকল সুরবৈভব ও ভাবগাম্ভীর্যে সৃষ্টির প্রথমতম রহস্যেকে "প্রতিসৃষ্টির" দীপালোকে উজ্জ্বল করে এই গান—

"হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহপ্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান"

এই দৃষ্টিপথ খুলিয়া দেয় "প্রাচীন ভারতের একঃ।" এই "একের সত্য, একের অভয়, একের আনন্দ বিচ্ছিন্ন জগৎকে এক করিয়া অপ্রমেয় সৌন্দর্যে গাঁথিয়া তুলিল, কিন্তু আমাদের মন আপনার স্বাভাবিক ধর্মবশতঃ কখনও জানিয়া, কখনো না জানিয়া সেই পরম ঐক্যের আনন্দকে সন্ধান করিয়া ফিরে"। এই আনন্দলোকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে চেষ্টা তাহাকেই আমরা 'ধর্ম' বলি। বস্তুতঃ ইহাই মানুষের ধর্ম, মানুষের ইহাই 'স্ব'-ভাব, ইহাই তাহার সত্যতম চেষ্টা। বীরের ধর্ম যেমন বীরত্ব, রাজার ধর্ম যেমন রাজত্ব তেমন মানুষের ধর্ম ধর্মই—তাহাকে আর কোন নাম দিবার দরকার করে না। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে সকল উচ্চাঙ্গের ধর্মসাধনা, "স্বাধিকারপ্রমত্ত" মানুষকে এই স্ব-ভাবে বা স্ব-অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করারই সাধনা।

এই যে বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের সাধনা, এই সমন্বিত দৃষ্টি, রবীন্দ্র জীবন-দর্শনের প্রথম ও শেষ কথা। এই 'দৃষ্টি-দান' আমার তো মনে হয়, রবীন্দ্র জীবন-দর্শনের ও সাহিত্যের চরম ও পরম উৎকর্ষ—সাম্প্রতিক তথা ভাবীকালের দর্শনের পক্ষে একটি অক্ষয় আধ্যাত্মিক সম্পদ ও উত্তরাধিকার। এই সত্যধর্মী দৃষ্টির কেন্দ্রগত তত্ত্ব হচ্ছে—"মানবসত্য"। যদিও এই সত্য-দৃষ্টি পূর্ণবিকাশ লাভ করেছে "মানুষের ধর্ম" অভিহিত "কমলা বক্তৃতা"মালায় (১৯৩৩), এর ক্রমশঃ উপচীয়মান প্রকাশ দেখা যায় নিখিল ভারতীয় দার্শনিক সম্মেলনের প্রাথমিক অধিবেশনে প্রদত্ত "আমাদের জাতীয় জীবন-দর্শন" (The Philosophy of our People) সভাপতির অভিভাষণে এবং পরে অক্সফোর্ডে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতায় (The Religion of man) মানবসত্যের ব্যাখ্যানে। যে কথা বলতে চেয়েছেন তা এই সর্ব-মানুষের জীবন-দেবতার কথা"—যে মানুষ একাধারে বিশ্বভূমিন ও সনাতন। তার জন্মভূমি ত্রিতয়াত্মক—পৃথিবীলোক, স্মৃতিলোক আত্মিকলোক। মানুষের তাই দুই রূপ বা দ্বৈপায়নবৃত্তি—একদিকে তার জীবভাব, ব্যক্তিগত বিশেষত্ব অন্যদিকে তার বিশ্বভাব, সর্বগতভাব। একদিকে তার সম্বল তথ্য; অপরদিকে তার অধিকার বা ঐশ্বর্য, সত্য। তাঁরই কথায় বলি—"বাউল একেই বলেছে 'মনের মানুষ'" গেয়েছে—

ওরে আমি কোথায় পাব তারে
মনের মানুষ যে রে

সঙ্গে সঙ্গেই বলেছে—

"মনের মানুষ মনের মাঝে কর অন্বেষণ"

কারণ—

"তোরই ভিতর (যে) অতলসাগর"

এই যে সত্যদৃষ্টি, কোন দার্শনিক মতবাদের উপসংহার হিসাবে তিনি পান নাই—পাইয়াছিলেন তাঁর উপলব্ধিতে। এই উপলব্ধির প্রসাদেই বুঝিতে পারি যে, "বিশ্ব সৃষ্টি-কর্তার আনন্দরূপ, কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি আনন্দকে দেখছিনে—সেইজন্য রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করছে—আনন্দকে যেমনি দেখব অমনি কেউ আর আমাদের কোন বাধা দিতে পারবে না। সেই তো মুক্তি। সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয়, যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয়, প্রকাশের মুক্তি।' তবে সংসারের মধ্যে আমাদের মুক্তি কোন্‌খানে?—প্রেমে। মানুষ এই একটি আশ্চর্য কথা বলে যে, আমি মুক্তি চাই। কি হইতে সে মুক্তি চায়? না, যা কিছু

সে অখণ্ডভাবে চাহিতেছে, তাহা হইতেই সে মুক্তি চায়।

যদি বলি মানুষ 'মুক্তি' চায়, তবে মিথ্যা বলা হয়। মানুষ মুক্তির চেয়ে ঢের বেশী চায়—মানুষ অধীন হইতেই চায়। যা অধীন হইলে অধীনতার অন্ত থাকে না, তারই অধীন হইবার জন্য সে কাঁদিতেছে। সে বলিতেছে, "হে পরম প্রেম তুমি যে আমার অধীন আমি কবে তোমার অধীন হব? অধীনতার সংগে অধীনতার পূর্ণ মিলন হবে কবে? যেখানে আমি উদ্ধত, গর্বিত, স্বতন্ত্র সেইখানেই আমি পীড়িত, আমি ব্যর্থ। হে নাথ, আমাকে অধীন করে, নত করে, আমাকে বাঁচাও।" "আমাদের জীবনে জাতীয় দর্শন" অভিভাষণের এবং হিবার্ট বক্তৃতায় "আধ্যাত্মিক মুক্তি" শীর্ষক অধ্যায়ে ভাষণের উপসংহার করিয়াছেন তথাকথিত অশিক্ষিত বাউলের অপূর্ব একটি ভাবগম্ভীর গানে—

"হৃদয় কমল উঠিতেছে ফুটি
কতো যুগ ধরি,
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা
উপায় কি করি?
ফুটে ফুটে কমল ফুটার না হয় শেষ,
এই কমলের যে এক মধু
রস যে তার বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর
পারে না যে তাই
তাইতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা,
মুক্তি কোথাও নাই।"

যেমন মুক্তিতত্ত্বে, তেমনি সৃষ্টিতত্ত্বে কবি-গুরুর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের প্রভাব দেখা যায়। "সৃষ্টি হয় এই বোধে যে জগৎটা আমার—আমার জ্ঞানের, আমার হৃদয়াবেগের, আমার আনন্দ বা সৌন্দর্যানুভূতির যোগেই সৃষ্টি হয়—ওটা রেডিওচাঞ্চল্যমাত্র নয়।" আমি যে মুহূর্তে দেখিতেছি, সেই মুহূর্তে সেই দেখার যোগে সৃষ্টি হইতেছে—

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।"

এই 'আমি'র কাব্যভাষ্যে বলেছেন—

"এ আমার অহংকার
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকারপটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।"

এখানে অবশ্য নানাবিধ তর্কবিতর্ক, মতবাদ উঠিবে। কেহ দেখিবেন এর মধ্যে ভারতীয় "দর্শনের দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ" অথবা "একজীব-বাদে"র ছায়াপাত, কেহ বা আবিষ্কার করিবেন দেবতাতে অবিমিশ্র মানবিকতার আরোপ কিংবা অপরিমার্জিত অহংকারকে দেবতার আসনে উত্তীর্ণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াসমাত্র।

কিন্তু কবি তাঁর অতুলনীয় ব্যাখ্যানে, "আমার জগৎ" প্রবন্ধে, সৃষ্টিতত্ত্বের উপসংহার এইভাবে "অসীম যেখানে সীমাকে গ্রহণ করেছেন সেইটে হল মনের দিক। সেইদিকেই তাঁর প্রকাশ। অসীমের বাণী অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্চে অহমস্মি। "আমি আছি"—এইটিই হচ্চে সৃষ্টির ভাষা...আমি ধন্য যে আমি পান্থশালায় বাস করচিনে, রাজপ্রাসাদের এক কামরাতেও আমার বাস নির্দিষ্ট হয় নি, এমন জগতে আমার স্থান আমার আপনাকে দিয়ে যার সৃষ্টি; সেইজন্যই এ কেবল পঞ্চভূত বা চৌষট্টিভূতের আড্ডা নয়; এ আমার হৃদয়ের কুলায়, এ আমার প্রাণের লীলাভবন, আমার প্রেমের মিলনতীর্থ!"

এ সৃষ্টিতত্ত্বও চরমতত্ত্ব নয়। মানব-সত্যের ভূমিকায় "এহ বাহ্য আগে কহ আর"! সকল বোঝাপড়া, জানা-শোনার পরপারে যে অজানার অনিশ্চয়তা, তাতেই বোধহয় সকল জিজ্ঞাসার সমাপ্তি ও পরিতৃপ্তি। "জানা-শোনার বাসা বেঁধে কাটলো তো দিন হেসে কেঁদে" যে সুরে গাহিয়াছিলেন একদিন, শেষ বিদায়ের আগে বিষাদ-গম্ভীর সুরে আবার গাহিলেন, "জয় অজানার যয়!" মহাপ্রয়াণের ঠিক দেড় মাস আগে বিশু মুখোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে৩ তদানীন্তন মনের ভাব যথাযথ ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"আমার মনে পড়ে বেদের সেই বাণী, 'কো বেদঃ' অর্থাৎ কে জানে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানেন। কিংবা জানেন না, এমন সন্দেহের বাণী বোধহয় আর কোনো শাস্ত্রে প্রকাশ হয়নি যে, যার সৃষ্টি তিনি আপন সৃষ্টিকে জানেন না। সৃষ্টি তাঁকে বহন করে নিয়ে চলে। আসল কথা চরম প্রশ্নের কোন উত্তর নেই।"

এই চিঠির মধ্যে যে একটি সকরুণ আবেদন আছে, তা নিয়ে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে। শুধু এই কথাটাই স্মরণ করিব যে, এই সুরের অনুরণন চলিয়াছিল কবি-জীবনের শেষ সীমা পর্যন্ত গানে, কবিতায়

৩ ২৩শে জুন (১৯৪১)এ লিখিত ও প্রবাসীতে ১৩৪৮ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

গদ্যরচনায়—

"প্রথমদিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল,
সত্তার নূতন আবির্ভাবে
কে তুমি?
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিমসাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি
পেল না উত্তর।"

হয়ত এই "শেষ প্রশ্নে"র শেষ উত্তর মিলিবে 'আজি হতে শতবর্ষ পরে' অথবা ১৪৪৮ সালের ২২শে শ্রাবণ। কিন্তু আমরা এ কালের মানুষেরা স্মরণ করিব তাঁর উল্লিখিত "পত্রপুটে"র সাক্ষ্য, আর তাঁর জীবন-স্পন্দন-উদ্ভাসিত সেই গানের কথাতেই সায় দিয়া যাইব—

"বুঝেছি কি বুঝি নাই বা
এ তর্কে কাজ নাই
ভালো মোর লেগেছে যে
রইল এই কথাই।"

রূপময় ভারত

রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনার বীরত্ব-ব্যঞ্জক রূপদানই কথাকলি নৃত্যের উপজীব্য। দক্ষিণ ভারতে, বিশেষত কেরল অঞ্চলে, অতি প্রাচীন এই নৃত্যশৈলীটির চর্চা বহু শতাব্দী ধরে হয়ে আসছে। ভারতীয় মার্গ-নৃত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রীতি হিসাবে, শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে যাতে এটির অনুশীলন হয় সেজন্য কেরলের প্রখ্যাত কবি ভল্লটোল "কেরল কলামণ্ডলমের" প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্গের আলোকচিত্রগুলি সেই প্রতিষ্ঠানে গৃহীতঃ

(১) সজ্জা-বিচারে নিরত কথাকলি নায়িকা, (২) নৃত্যভঙ্গিমায় নায়িকা, (৩) কথাকলি নায়কঃ বীরত্বের প্রতিমূর্তি, (৪) প্রণয়-দৃশ্যে নায়ক নায়িকা, (৫) দৃপ্ত ভঙ্গিমায় কথাকলির রাক্ষস, (৬) অভিনয়রত রাবণ, (৭) বিশিষ্ট অঙ্গসজ্জায় হনুমান।

আলোকচিত্রশিল্পী :
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২

৩

প্রৌঢ় এবং সূর্যাস্ত

তারাপদ রায়

আর কতকাল বাঁচবো জানি না; জানি না; কতকাল
ম্লান সূর্যাস্তকে সাথী রেখে এই জানালায় বসে;
ম্লানতর ছিন্নপত্র ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত বয়সে
সতত সঞ্চরমান; কতকাল, আরো কতকাল?

চতুর্দিকে সব কাঁটাজমি রুক্ষ, আগামী আবাদে
কিম্বা কোনো দূর কালে ধান্যভারে ছেয়ে যেতে পারে,
এ আশা করি না: শুধু বুঝি, বহু পরিশ্রমে যারে
ঘরে তোলে, যে লক্ষ্মীকে, তার বাসা সুদূর প্রবাদে।

বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সূত্রে ইচ্ছা জুড়ে দিয়ে কেহ-কেহ
দীর্ঘজীবী, কেহ সুখী প্রসাদী কুসুমে মালা গাঁথে;
'সে রকম বাঁচবো কিনা?' প্রত্যহের সূর্যাস্তের সাথে
দেখা হলে তাই ভাবি, সূর্যোদয় দেখে কেহ-কেহ।

একদা কৈশোর কালে হিরণ্ময় অতনু সাগরে
দেখেছি আহত সূর্য রক্তাক্ত, গভীর-কালো জলে;
চিরদিন সেই রক্ত সঞ্চারিত স্মৃতির অতলে
দিনান্তের অস্তাভাসে স্থির শূন্য অন্ধকার ঘরে।

অন্ধকার; চতুর্দিকে সঞ্চারিত দীর্ঘ অন্ধকার,
স্মৃতিচ্ছায়া অন্ধকার; বনচ্ছায়া অন্ধকার আর
কবেকার ম্লান ছায়া—ছায়া-ছায়া লুপ্ত চারিধার;
গৃহচ্ছায়া অন্ধকার, এই গৃহ দীর্ঘ অন্ধকার॥

ঘাটশিলার স্মৃতি থেকে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

এক-একটা টিলায় উঠে আকাশে তাকালে মনে হ'তো
আমার পায়ের নীচে পৃথিবীর মাটি নেই আর।
যেন আমি দৃশ্যের উল্লাসে সব প্রাচীন দুঃখের অধিকার
ভুলে যেতে, অর্থাৎ আনন্দে আমি শব্দ করে গান
গেয়ে উঠতে পারি। একা
এক-একটা টিলায় উঠে আকাশে তাকালে মনে হ'তো।

সন্ধ্যায় যখন দূর সপ্তর্ষির আলোর ইশারা
জানালার প্রতিবেশী দীর্ঘ শাল মহুয়ার শিরে
নীরবে দাঁড়াতো এসে, আমি এক প্রশ্নচিহ্ন অপলক চেয়ে দেখতাম
আর মনে পড়ে যেতো এই ব্যর্থ স্পর্শভীরু সীমার শরীরে
তোমার মুখের দাবী চিনে নিতে মানুষ ছিলাম না কোনদিন।
দূরে সুবর্ণরেখার জলে বেজে যেত অন্তহীন
ধ্বনির প্রণাম, আমি ঘাটশিলার অন্ধকারে মুগ্ধ শুনতাম॥

অন্য কোনোখানে

অধীর সরকার

কতবার বলে গেছি হে হৃদয়, আর তুমি কেঁদো না, কেঁদো না
এখনো মুকুল আছে ফোটবার, ফোটাবার ফাল্গুনের আয়ু:
অতএব আর তুমি যন্ত্রণার অন্ধকার ডেকো না, ডেকো না—
বকুলে-পলাশে মিশে সপ্রেম সোচ্চার হোক তোর পরমায়ু।

ওই দ্যাখো, লাল-চেলি-ঘোমটা-টানা কৃষ্ণচূড়া হয়ে আছে বধূ,
বকুল একান্তে বসে দিনান্ত পাগল করে যৌবনের ঘ্রাণে:
বনের বেষ্টনী ঘিরে মহুয়া বিলিয়ে দেয় ফাল্গুনের মধু—
সাঁওতালী মেয়ের বুকে নেচে-ওঠা শোণিতের আকাঙ্ক্ষার গানে।
তাই দ্যাখো, তৃপ্ত হও; হে হৃদয়, আর তুমি কেঁদো না,
কেঁদো না,
বকুলে-পলাশে মিশে সপ্রেম সোচ্চার হোক ফাল্গুনের দিন;
কী জানি কি বুঝলে সে, চেয়ে দেখি দিনান্তের অস্তগামী সোনা
হঠাৎ দুচোখে তার সুগভীর ছায়া ফেলে করুণ মলিন।
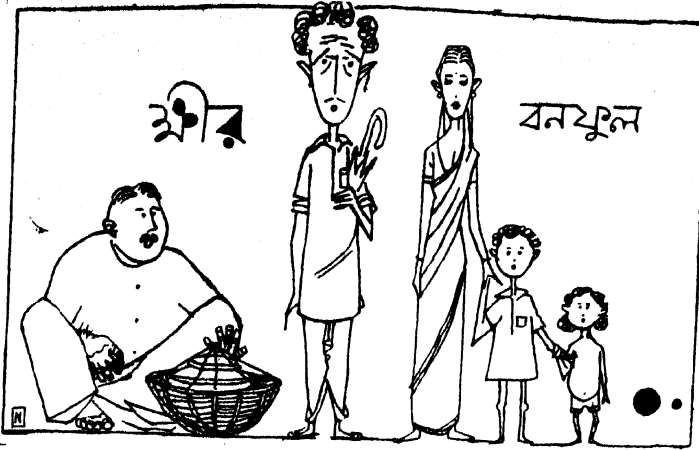
পীতাম্বর দাস চাষা লোক। ঘোর পাড়াগাঁয়ে থাকে। জমিতেই উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। ঘরে চার-পাঁচটি গাই আছে। তাহাদের সেবাও স্বহস্তে করে পীতাম্বর। অসুখ-বিসুখ যে মাঝে মাঝে হয় না তাহা নয়, কিন্তু মোটের উপর তাহার শরীর বেশ সুস্থ। আধ সের চালের ভাত, তদুপযুক্ত ব্যঞ্জন এবং খাঁটি এক সের দুধ সে অনায়াসে হজম করিয়া থাকে। পীতাম্বরের ভাই নীলাম্বর স্কুলে পড়িয়াছিল, স্কুল হইতে কলেজে যায়। কলেজ হইতে বাহির হইয়া সে কেরানী হইয়াছে। কলিকাতার একটি এঁদো গলিতে বাসা ভাড়া লইয়া বাস করিতেছে। দশ বৎসর একটানা কেরানীগিরিই করিয়া চলিয়াছে। ছুটি লয় নাই, বাড়ি যায় নাই। কলেজ হইতে বাহির হইবামাত্র পীতাম্বর তাহার বিবাহ দিয়াছিল। কেরানীগিরি পাইবামাত্র নীলাম্বর বধূকে আনিয়া উক্ত এঁদো গলির মধ্যে তাহার গৃহস্থালি পাতিয়াছে। গুটি তিনেক সন্তানও হইয়াছে। পীতাম্বর ভাইকে দশ বৎসর দেখে নাই। নীলুর ছেলেমেয়ে কলিকাতাতেই হইয়াছে, পীতাম্বর পোস্টকার্ডযোগে সে খবর পাইয়াছে মাত্র।

......সহসা তাহার চিত্ত একদিন আকুল হইয়া উঠিল। ধানকাটা শেষ করিয়া সে ঠিক করিল নীলুকে এইবার একবার দেখিয়া আসিতে হইবে। সুযোগও জুটিয়া গেল. গ্রামের একটি ছেলে কমল কলেজে পড়িবার জন্য কলিকাতা যাইতেছিল, পীতাম্বর ঠিক করিল তাহার সহিতই যাইবে। সঙ্গে কেহ না থাকিলে তাহার পক্ষে কলিকাতা শহরে নীলুকে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব. কমলকে সঙ্গে পাইয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

নীলুর জন্য পীতাম্বর ক্ষীর লইয়া যাইতেছিল। বাড়ির গরুর দুধ প্রায় পাঁচ সের হয়, বিধু গয়লানীর নিকট সে আরও পাঁচ সের লইয়াছিল। এই দশ সের দুধ মারিয়া ক্ষীর প্রস্তুত করিয়াছিল সে। লোকমুখে সে শুনিয়াছিল কলিকাতা শহরে নাকি ভাল দুধের খুব অভাব। কমল ছোকরা খুব বুদ্ধিমান। বলিল, ক্ষীর মাটির হাঁড়িতে লইবেন না। অ্যালুমিনিয়ম্ বা পিতলের হাঁড়িতে লওয়াই ভাল। মাটির হাঁড়িতে লইলে ট্রেনের ভিড়ে ঠোকা লাগিয়া হাঁড়ি ভাঙিয়া যাইতে পারে।

তাহার দ্বিতীয় পরামর্শটিও সুপরামর্শ। সে বলিল, একটি বড় ঝুড়ির ভিতর হাঁড়িটি বসাইয়া লউন। হাঁড়ি গড়াইবে না, তা ছাড়া হাঁড়ির চারিপাশে বরফ দেওয়ারও সুবিধা হইবে। কলিকাতা পৌঁছিতে বারো ঘণ্টার উপর লাগিবে। গ্রীষ্মকালে ক্ষীর পচিয়া যাইতে পারে। হাঁড়ির চারিদিকে বরফ দিলে সে ভয় আর থাকিবে না। পীতাম্বর কমলের দুইটি উপদেশই পালন করিল।

"ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করিতে হইল"

হাওড়া স্টেশনে যখন তাহারা নামিল তখন রাত্রি প্রায় নটা। ঝুড়ি-সুদ্ধ ক্ষীরের হাঁড়ি লইয়া ট্রামে বা বাসে চড়া গেল না। কমল বলিল ট্যাক্সি করিতে হইবে। ট্যাক্সির জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল।

ক্ষীরের জন্য এত ঝঞ্ঝাট, তবু কিন্তু পীতাম্বর উৎফুল্ল। খাঁটি ক্ষীর পাইয়া নীলু, নীলুর বউ এবং ছেলেমেয়েরা যে কত খুশী হইবে এই মনে করিয়া সমস্ত ঝামেলা সে হাসিমুখে সহ্য করিতে লাগিল।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় তাহারা নীলুর বাসায় পৌঁছিল। নীলুর চেহারা দেখিয়া পীতাম্বর তো অবাক। চেনা যায় না। চক্ষু কোটরাগত, গালের হাড় দুইটা উঁচু, জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা। তাহার বউ, ছেলে-মেয়েরাও খুব রোগা।

ঝুড়িসুদ্ধ ক্ষীরের হাঁড়িটা দেখাইয়া নীলু প্রশ্ন করিল—"ওটা কি—"
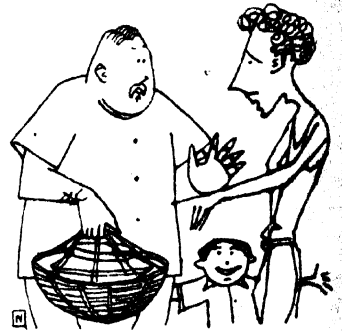
"ক্ষীর! ক্ষীর না এনে কিছু কাঁচকলা আনলেই পারতে—"

"ক্ষীর। খাঁটি ক্ষীর এনেছি তোদের জন্য—"

"ক্ষীর! ক্ষীর না এনে কিছু কাঁচকলা আনলেই পারতে—"

"কাঁচকলা! কাঁচকলা কি এখানে পাওয়া যায় না?"

"যায়, কিন্তু বড্ড দাম—"

"সে খেয়াল তো করিনি। যাই হোক, ক্ষীরটা এনেছি, খেয়ে ফেল। এখুনেই খা। তা না হলে টকে যাবে। বরফ দিয়ে দিয়ে এনেছি—"

"এখন তো খাওয়া যাবে না"

"কেন!"

"চৌবাচ্চায় এক ফোঁটা জল নেই।"

বলা হয়ে থাকে যে প্রতিভা হ'ল শতকরা এক ভাগ অনুপ্রেরণা এবং ৯৯ ভাগ চর্চা। কাজেই এই প্রবাদ অনুযায়ী প্রতিভাশালী ব্যক্তিরও যথারীতি শিক্ষণের প্রয়োজন। এই রীতি অনুসারে নেদারল্যাণ্ডের একটি প্রতিষ্ঠান ভি এ ই ভি ও গত ৫০ বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে। ওলন্দাজ ভাষায় এই সংক্ষিপ্ত নামটি অত্যন্ত বড় তবে অনুবাদ করলে এর অর্থ দাঁড়ায়ঃ 'মাধ্যমিক শিক্ষায় রুচি বিষয়ক জ্ঞান প্রসার সমিতি'। এর অর্থ সুস্পষ্ট। হল্যাণ্ডের মাধ্যমিক স্কুলগুলির ছাত্রদের মধ্যে সৌন্দর্য ও রুচিজ্ঞান বাড়ানো সম্পর্কে এই সমিতির কতকগুলি কর্মপন্থা আছে।

এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতাগণ মনে করতেন যে ছাত্রদের পাঠ্য বিষয় শিক্ষা দিয়ে মানসিক উৎকর্ষ সাধন করা ছাড়াও তারা যাতে একটা রুচি সম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারে সেইজন্য মাধ্যমিক স্কুলগুলির কলাবিষয়ক প্রাথমিক শিক্ষাও দেওয়া উচিত। মূলত শিক্ষকগণের সহযোগিতাতেই শুধু এই রকম শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। তবে এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার উপযুক্ত উপায়েরও ব্যবস্থা করতে হয়। এখানেই এই সমিতি স্কুলগুলিকে সাহায্য করে। ছাত্রগণ যদি একবার এই সম্পর্কে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে তখন তাদের উপযুক্ত জিনিসপত্র সরবরাহ করতে হয় এবং তখন থেকে এটা একটা ধারাবাহিক পদ্ধতি হয়ে পড়ে। তাছাড়া শিক্ষার কোন কর্মসূচী যত ভাল করেই তৈরি করা হোক না কেন, বিষয়বস্তু ও প্রশিক্ষণ ধারা কোন সময়েই পূর্ব নির্দিষ্ট হওয়া উচিত নয়। এই সমিতির কর্মসূচী এই নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং পরিবর্তিত সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী এই কর্মসূচী পরিবর্তন করা হয়; অর্ধশতাব্দীরও বেশী সময় ধরে সমিতি, বিশেষ ধৈর্য সহকারে তাদের কর্মসূচী অনুসরণ করে চমৎকার সাফল্য লাভ করেছে এবং তার ফলে ১৯৪৭ সাল থেকে নেদারল্যাণ্ডস সরকারের স্বীকৃতি লাভ ক'রে আর্থিক সাহায্য লাভ করছে।

যে কোন স্কুল বা প্রতিষ্ঠান বাৎসরিক ৪০, টাকা চাঁদা দিয়ে এর সদস্য হতে পারে। প্রত্যেক সদস্য প্রতিষ্ঠান এই জিনিসগুলি

ইথিওপিয়ার প্রাচীন শহর ইয়াহাতে প্রাপ্ত দু হাজার বছরের পুরণো ব্রোঞ্জের তৈরী আইবেক্স ও সিংহ মূর্তি—দুটিই দক্ষিণ আরবীয় বিগ্রহের প্রতীক।

পায়ঃ—(১) কলা বিষয়ক সাময়িক পত্র, (২) ভি এই ভি ও'র বার্ষিক সংখ্যা (মূলে লিথো, ওলন্দাজ শিল্পীকৃত কাঠ খোদাই অথবা এচিং) এবং (৩) সর্বোত্তম রঙ্গীন চিত্র ও অন্যান্য চিত্রের নকল সহ একটি চিত্র পঞ্জী। এগুলি ছাড়া মূল সদস্য প্রতিষ্ঠান এই সমিতির অন্যান্য নানা রকম কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। প্রথমত ওলন্দাজ শিল্পীদের কৃত মূল চিত্র ও ভাস্কর্য, প্রসিদ্ধ বিদেশী শিল্পীদের লিথোগ্রাফ অথবা প্রাচীন ও আধুনিককালের বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা রঙ্গীন চিত্রসমূহের একটি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী আছে। রেখাচিত্র, রঙ্গীনচিত্র, ভাস্কর্য, বিখ্যাত ভবনগুলির ফটোচিত্র, বিখ্যাত গীর্জা, গীর্জার গবাক্ষ এবং বিশ্বের বিখ্যাত চিত্রগুলির ফটো বা নকলসহ শিল্প শিক্ষার পক্ষে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, এই সমিতি সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বণ্টন করে। এই সংগ্রহালয়ে অজন্তা গুহার ৩১টি দেওয়াল চিত্রের প্রতিলিপিও আছে। সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে চিত্রসংগ্রহ দেওয়া হয় তার মধ্যে শিশু শিল্পীদের আঁকা ছবির সংগ্রহও রয়েছে। এই চিত্রগুলি শিশু ও ভাবীকালের শিল্পীদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। কারণ এতে তাদের সৃজন প্রতিভা উৎসাহিত হয় এবং তাদের মধ্যে একটা সুস্থ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে। এই চিত্র সংগ্রহ যাতে কোন দুর্ঘটনায় নষ্ট না হয় এবং ভাল থাকে সেজন্য সমিতি বিশেষ যত্নে কাঠের বাক্সে ভরে এই সংগ্রহ সদস্য প্রতিষ্ঠান গুলির কাছে পাঠায়।

ভি এ ই ভি-ও যেসব জিনিসপত্র পাঠায় সেগুলি স্কুলে বিভিন্ন উপায়ে কাজে লাগানো হয়। শিক্ষকগণ স্কুলে এগুলির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন এবং কলাবিষয়ক ইতিহাস পড়ানোর সময় প্রামাণ্য চিত্র হিসেবে এগুলি ব্যবহার করেন। ক্লাশের মধ্যেও এগুলি প্রদর্শন করা হয় এবং তাতে ছাত্ররা এইসব ছবি সব সময় দেখতে পারে এবং বিশ্ববিখ্যাত চিত্রগুলির সংগে পরিচিত হতে পারে।

গত ৫০ বছরে এই সমিতি, প্রাচীন ও আধুনিক চিত্রশিল্পের বিপুল একটি সংগ্রহালয় গড়ে তুলেছে এবং বিখ্যাত ওলন্দাজ শিল্পী রেমব্রাণ্টের প্রায় সম্পূর্ণ চিত্রগুলি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে। সমিতি মধ্যে মধ্যে প্রতিষ্ঠান সদস্যদের নেদারল্যাণ্ডের বড় বড় যাদুঘর দেখাতে নিয়ে যায়, তা ছাড়া বিখ্যাত চিত্রের প্রতিলিপি ছাপিয়ে সেগুলি সম্পর্কে ছোট ছোট ব্যাখ্যা দিয়ে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে।

বহু স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এই সমিতির সদস্য হয়েছে এবং প্রকৃত পক্ষে এদেরই চেষ্টায় হল্যাণ্ডের মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্ররা প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পীদের আঁকা চিত্রগুলি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং বিভিন্ন শিল্পের সৌন্দর্য সম্বন্ধে একটা গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে। এই সাফল্যের একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হ'ল, হল্যাণ্ডে প্রতি বছর যেসব প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় সেগুলিতে শিল্প রসিকদের উপস্থিতি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই সমিতি যে অনেক শিল্পীর প্রতিভা উন্মেষে সাহায্য করছে তাই নয়, জনসাধারণের রুচিজ্ঞানেরও উৎকর্ষ সাধন করছে।

বস্তারোপাখ্যান

সুনীত ঘোষ

ভারতের সংবাদ-মানচিত্রে বস্তার এক উল্লেখযোগ্য বিন্দু। আধুনিক যুগে এক সুপ্রতিষ্ঠিত গভর্নমেণ্টের সঙ্গে প্রায় মধ্যযুগীয় এক দেশীয় নৃপতির পাঞ্জা লড়ার চমকপ্রদ কাহিনী গত কয়েক মাস ধরে সংবাদপত্র-পাঠককে বিস্মিত করেছে। মধ্যপ্রদেশের এই দেশীয় রাজ্যের ভূতপূর্ব মহারাজা প্রবীরচন্দ্রের সরকার-বিরোধিতা, উত্তরকালে তাঁর গদিচ্যুতি এবং কারাবাস, আদিবাসীদের অসহযোগ আন্দোলন, লোহাণ্ডিগুড়ায় পুলিসের গুলিবর্ষণে বারজনের মৃত্যু, প্রবীরচন্দ্রের কারামুক্তি এবং আগামী সাধারণ নির্বাচনে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ কাটজুকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা বস্তার নাটকের দ্রুত পটপরিবর্তনের ইঙ্গিত। এই নাটকের যবনিকাপাত কবে এবং কোথায়, কোনও রাজনৈতিক জ্যোতিষীর পক্ষে সে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়।

এই প্রবন্ধ যখন লিখিত হয়, বস্তারের ভূতপূর্ব মহারাজা তখন নরসিংগড় জেলে অন্তরীণ।

'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।' কয়েকটি আম্রপত্র, ওপরে 'হালবি' ভাষায় একটি কথা লেখা 'লোহাণ্ডিগুড়া'। হাত থেকে হাতে ঘুরে যায় নারায়ণপুর, কোণ্ডাগাঁও, জগদলপুর, দান্তেওয়ারা তহশিলের প্রতিটি 'মারিয়া মুরিয়া' পল্লীতে 'ঢাকর হালবাদের' পাড়ায় পাড়ায়, 'ভাতরা, পরজা ধুরুয়াদের' বস্তিতে বস্তিতে। আম্রপত্র যে বাণী বহন করে এনেছে বস্তারের আদিবাসীদের কাছে তার অর্থ পরিষ্কার। ডাক এসেছে, এবারে আর প্রস্তুতি নয়—ঝাঁপিয়ে পড়ার। প্রায় নিস্তব্ধ পল্লীজীবনের দু কূল ছাপিয়ে বুঝি কর্মের প্লাবন এসেছে। বর্ষাগমে নববারিধারাপুষ্ট বেগবতী নদীর জলোচ্ছ্বাসেরই মত তার তীব্রতা।

গভীর রাত্রে মাদল বেজে ওঠে গুরু-গুরু। নওজোয়ানেরা ধনুকে ছিলে পরায়, প্রাচীনেরা টাঙ্গির ধার পরীক্ষা করে। ৩১শে মার্চ শুক্রবার। লোহাণ্ডিগুড়ার সাপ্তাহিক হাট। কিন্তু সেদিন মহুয়া ফুল মাথায় গুঁজে মেয়েরা হাটে আসেনি পসরা নিয়ে। ওদের বদলে হাজার হাজার জোয়ানকে দেখা যায়—প্রত্যেকেরই হাতে কোন না কোন অস্ত্র। কেনাবেচায় কারও মন নেই। বিশ মাইল দূরের শহর থেকে যে কয়জন মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী এসেছিলেন সওদা করতে তারাও গতিক সুবিধার নয় বুঝে চুপি চুপি সরে পড়লেন। তারপর এক সময়ে বিদ্যুতের মত একটি ইশারা ঝিলিক দিয়ে গেল। বিরাট জনতা সামনে এগোতে থাকল যেন একটি বিরাট মানুষ। জনতার মুখে একটি ধ্বনি: "আমাদের রাজাকে ছেড়ে দাও।" সরকারী মহলে খবর পৌঁছেছিল আগেই। তাই লোহাণ্ডিগুড়ার পুলিস ফাঁড়িতে প্রস্তুতির অভাব ছিল না। পুলিসের বড়কর্তারা উপস্থিত, উপস্থিত বস্তারের নূতন মহারাজা বিজয়চন্দ্র। তারপর মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে কী যেন ঘটে গেল। কিছু বোঝবার আগেই বারজন আদিবাসী লুটিয়ে পড়লো পথে। লাল রাস্তার রং হল আরও লাল। গাঢ় থেকে গাঢ়তর। ওখানে যাদের 'মাঝি' বলা হয় গ্রামের সেই মোড়লরা অবাক হয়ে মৃতদেহ গুলি উল্টেপাল্টে দেখল। রক্তই তো! অথচ

বস্তারের ভূতপূর্ব মহারাজা প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জদেও

এ রকম কথা ত' ছিল না। তারা যে শুনেছিল পুলিসের বন্দুক থেকে জল বেরোবে, শুধু জল, গুলি নয়। শুনেছিল, কারও কোনও অনিষ্ট হবে না। তবে কি সবই ফাঁকি? মিথ্যা? আবার একটি ইশারা: পালাও। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোজবাজির মত সব উধাও। কেবল কয়েকটি দেহ রাজপথে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল। তাদের সনাক্ত করতেও কেউ এগিয়ে এল না।

বস্তার। মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ প্রান্তের সর্ববৃহৎ জেলা। আয়তন: ১৫০১০ বর্গ মাইল—পশ্চিম বাংলার প্রায় অর্ধেক। লোকসংখ্যা মাত্র বার লক্ষ। বস্তারের মাটির নীচে স্তরীভূত আকরিক লোহ—আধুনিক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মধ্য প্রদেশের শ্রেষ্ঠ বনসম্পদ সেগুন এই বস্তারের অরণ্যে। তবু আদিবাসী অধ্যুষিত এই জেলার সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য অপরিসীম। 'বস্তারিয়া'র (বস্তারবাসীদের নাম) দু বেলা অন্ন জোটে না। না জুটুক; তার জন্যে কারও বড় একটা অভিযোগও নেই। চাহিদাই বা কী? জমির অভাব নেই। চাষ করলেই ফসল পাওয়া যায়। জঙ্গলে প্রচুর কাঠ। লজ্জা নিবারণের জন্য একটি নেংটিই যথেষ্ট। কখনও অন্নাভাব হলে জঙ্গল থেকে বুনো মুরগি অথবা একটা হরিণ ধরলেই হল। অতিরিক্ত আনন্দের জন্য মহুয়া আছে। তা ছাড়া আছে কয়েক ডজন ভাটিখানা। ভিক্ষা যখন বৃত্তি হিসাবে স্বীকৃত তখনও 'বস্তারিয়া' ভিক্ষা করতে শেখেনি। আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পরও চুরির প্রয়োজন ওদের অজ্ঞাত।........

সব মিলিয়ে বস্তারের আদিবাসী গোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় বত্রিশ। এর মধ্যে প্রধান গোষ্ঠী প্রায় আটটি—মারিয়া, মুরিয়া, ভাতরা, পরজা, ধুরুয়া, গড়বা, ধাকর ও হালবা। (হালবাদের ভাষা 'হালবি' আদিবাসীদের সাধারণ কথ্য ভাষা।) এদের মধ্যে মারিয়ারা আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ। পাহাড়ে এদের বাস। মিতভাষী—সহজে মনের কথা কাউকে খুলে বলে না। সাধারণত শান্ত-প্রকৃতি, এরা কিন্তু একবার উত্তেজিত হলেই বিপদ। পারিবারিক বা গোষ্ঠিগত বিবাদে টাঙ্গির একটি আঘাতে একটি আস্ত মানুষকে দু টুকরো করে ফেলতে এদের হাত কাঁপে না। আবার দশ মাইল হেঁটে মৃতের কাটা অঙ্গ থানায় জমা দিয়ে নিজের 'কীর্তি' কবুল করতেও এরা পারে স্বচ্ছন্দে।

মারিয়ারা বড্ড বেশী গোঁয়ার—তাই অন্যান্য আদিবাসীরা এদের গাঁ মাড়ায় না। মারিয়ারা ওদের কাছে 'বেওকুফ'। মারিয়াদের পরেই মিশ্র শ্রেণী ধাকর ও হালবা। আদিবাসী সমাজে এদের সুনাম সামান্যই। কথায় বলে,

'ধাকর মন্ত্রী হালবা জুঝার
দোনোঁ মিলকে বস্তার কো কিয়ে উজার।'

(ধাকর মন্ত্রী এবং হালবা সেনাপতি মিলে বস্তারের সর্বনাশ করল।) কিন্তু পছন্দ হোক বা না হোক মারিয়া মুরিয়া ধাকর হালবা এদের কথা না শুনে উপায় নেই। এরাই দলে ভারী।

সাধারণভাবে আদিবাসীদের কাছে সরকারী আইন-কানুনের বড় একটা অস্তিত্ব নেই। অস্তিত্ব আছে কেবল দেবী দন্তে-

লোহাণ্ডিগুড়া বাজারের দৃশ্য ফটো—হীরেন সিংহ

শ্বরীর(১) আর মহারাজের। আদিবাসীরা এখনও মনে প্রাণে বিশ্বাস করে মহারাজা নরদেহী দেবতা। দন্তেশ্বরীর সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। ভূমি পূজার প্রধান পুরোহিত। সেই মহারাজা কারাগারে বাস করবেন—এ অসহ্য। তাই দাবি উঠেছিল 'আমাদের মহারাজাকে ফিরিয়ে দাও।'

বস্তারের শাসক হিসাবে অনুজ বিজয়চন্দ্র ভঞ্জদেও সরকারী স্বীকৃতি পেলেও বস্তারিয়াদের কাছে জ্যেষ্ঠ প্রবীরচন্দ্র এখনও মহারাজা। অদ্ভুত এই মানুষটি। মাত্র ৩০ বছর বয়স। মাথায় বড় বড় চুল। পরনে গাঢ় লাল রেশমি ধুতি। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রবীরচন্দ্র মাতা মহারানী প্রফুল্লকুমারী দেবীর সঙ্গে কিছুদিন বিলাতে কাটান। সুন্দর ইংরাজী বলেন—বাচনভঙ্গি চমৎকার। রাজনৈতিক আলোচনার কালে কথায় কথায় তিনি লাস্কি উদ্ধৃত করে থাকেন। আবার হ্যাভেলক এলিসেও তাঁর বেশ দখল। সর্বাপেক্ষা প্রবল উৎসাহ দুটি সাধনায়—তন্ত্র ও নারী। অধিকাংশ সময় পুজো নিয়ে থাকলেও এরই মাঝে সময় করে তন্ত্র ও যৌন শাস্ত্র বিষয়ে কয়েকখানি পুস্তিকাও রচনা করেছেন। অসম্ভব খামখেয়ালী। ১৯৫৯ সালে পিতা(২) দিল্লিতে পরলোকগমন করেন। পুত্রের কাছে 'তার আসে 'মৃতদেহ নিয়ে যাও।' 'না'—অসংকোচে প্রবীরচন্দ্র জানিয়ে দিয়েছিলেন। পিতার সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। অগত্যা দিল্লিতে যমুনার তীরে সংকার সম্পন্ন করা হল। এরই কয়েকদিন পরে জগদলপুরে রাজবাড়িতে প্রবীরচন্দ্রের একটি প্রিয় কুকুর মারা যায়। বিরাট শোভাযাত্রা করে মৃত কুকুরকে নিয়ে

১। দুর্গার আর এক নাম। দন্তেওয়ারা তহশিলে শংখিনী ও ডাকিনী নদীর সংগমস্থলে দন্তেশ্বরীর মন্দির।

২। প্রফুল্লকুমার ভঞ্জদেও, পি এইচ-ডি (কেম্ব্রিজ) সংসদের ভূতপূর্ব সদস্য। ময়ূরভঞ্জ মহারাজার সহোদর।

যাওয়া হল শ্মশানে দাহ করার জন্য। কয়েক হাজার লোক ভরপেট খেয়ে নিল কুকুরের শ্রাদ্ধ উৎসবে। তারপর অস্থি পাঠান হলো প্রয়াগে বিসর্জনের জন্য। বস্তারের লোক ছি ছি করেছে। এ কী অদ্ভুত আচরণ! তবু প্রতিবাদ করতে ভরসা পায়নি। মা দন্তেশ্বরী অপ্রসন্ন হবেন। দেশে বৃষ্টি হবে না। অকাল দেখা দেবে।

বিবাহ না খেলা?

প্রজাদের বড় দুঃখ মহারাজা এখনও অকৃতদার। কতবার কতভাবে অনুরোধ এসেছে প্রবীরচন্দ্রের কাছে "মহারাজ, তুমি বিয়ে কর।" অনেক 'প্রধান' অভিমানে পাগড়ি (আনুগত্যের প্রতীক) দরবারে ফেরৎ পাঠিয়েছে। মহারাজা বলেছেন একটু রোসো। কোর্ট অব ওয়ার্ডস থেকে জমিদারি ছাড়া পেলেই বিয়ে করব। ... ...

মহারাজা অবিবাহিত? তাহলে ১৯৫৯ সন থেকে যে নারী (বয়স প্রায় ৪৫) মহারাজের অন্তঃপুরবাসিনী তিনি কে? মহারাজের কারাবাস কালে যে নারী নিজেকে প্রবীরচন্দ্রের পত্নীরূপে পরিচয় দিয়ে দন্তেশ্বরীর মন্দিরে পুজো দিতেন—মারিয়াদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে যিনি বলে বেড়াতেন, 'মহারাজাকে গদিতে ফিরিয়ে আনতে হবে, মহারাজ চলে গেলে মা দন্তেশ্বরী চলে যাবেন, দেশে অজন্মা হবে', তিনি তবে কে?

সেটুকু জানবার জন্য অতীতের দিকে ক্ষণকালের জন্য দৃষ্টি ফেরাতে হবে। ১৯৫৭ সন। নির্বাচনী সফরে বেরিয়ে মহারাজা একদিনের জন্য বিশ্রাম নিলেন রাজোওন গ্রামে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শিবলোচনের প্রৌঢ়া স্ত্রী সুভদ্রার রূপের খ্যাতি ছিল। মহারাজের আলাপ হলো শিবলোচনের সঙ্গে, সুভদ্রার সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময়। তারপর নির্দিষ্ট দিনে শিবলোচনের অনুপস্থিতির এক মাহেন্দ্রক্ষণে সুভদ্রা গমনোদ্যত প্রবীরচন্দ্রের সঙ্গ নিলেন। গ্রামে ফিরে শিবলোচন দেখলেন সকল শূন্য, ঘর শূন্য, অন্তর শূন্য। তবু তিনি শুধুই কপাল চাপড়ালেন না। দুঃসাহস দেখিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রাসাদে ডেকে মহারাজ বোঝালেন, তাঁর কোন অসৎ অভিপ্রায় নেই। তিনি একটি সুন্দরী স্ত্রী চান। তবে শিবলোচন যদি বিবাহযোগ্যা কোন সুন্দরী মেয়ের সন্ধান দিতে পারেন তবে মহারাজা তাঁকে পুরস্কৃত করবেন। প্রবীরচন্দ্রের কাছ থেকে দু হাজার টাকা নিয়ে শিবলোচন নেপাল রওনা হলেন কন্যা সংগ্রহের জন্য। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই বস্তারের কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক চিঠি পেলেন।

'আপসে নিবেদন হ্যায় কি পরমাত্মাকে অনুগ্রহ সে আয়োজিত হমারে বিবাহোৎ-

সবকে মঙ্গলকার্যমেঁ রাজমহলমেঁ সম্মিলিত হোকর হমেঁ অনুগৃহীত করেঁ'।
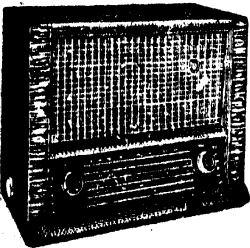
দিনাঙ্ক ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০ সাল, রবিবার'।

নিমন্ত্রণকারী বর—শ্রীপ্রবীরচন্দ্র ভঞ্জদেও কাকতীয়। বধূ—সুভদ্রা দেবী।

নির্দিষ্ট দিনে রাজবাড়িতে নিমন্ত্রিতের দল সমবেত হয়েছেন। শুভলগ্নে সপ্তপদী শুরু হলো। মহারাজা প্রদক্ষিণ করছেন ভাবী স্ত্রীকে। সাতবার প্রদক্ষিণ করার কথা। কিন্তু পঞ্চমবারের পরেই তিনি বসে পড়লেন। পুরোহিত শশব্যস্ত। সাতবার না ঘুরলে বিবাহ যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মহারাজা কিন্তু অবিচলিত। পুরোহিতকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, বিবাহ সম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি আর ঘুরবেন না। তিনি যা করেছেন তাই মা দন্তেশ্বরীর ইচ্ছা। এর উপর কি আর কথা চলে? তবু, নিমন্ত্রিতেরা অলক্ষ্যে বুঝি হেসেছিলেন। আর বধূবেশিনী সুভদ্রা? অবগুণ্ঠনের অন্তরালে তার নত নয়নে যদি অশ্রুবিন্দু জমা হয়ে থাকে তাও সবার অলক্ষ্যে নয়নেই মিলিয়ে গিয়েছে।

আরও কয়েকদিন পরের কথা। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ কৈলাসনাথ কাটজুর সঙ্গে প্রবীরচন্দ্রের দেখা। কথায় কথায় ডঃ নির্ভর করে এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। কাটজু জানালেন, মহারাজের বিয়ের কথা শুনে তিনি আনন্দিত। প্রবীরচন্দ্র যেন আকাশ থেকে পড়লেন। 'বিয়ে! আপনি কি বলছেন? সুভদ্রাকে বিয়ে করিনি তো। ও যে মায়ের মত।

'শী জাস্ট লুকস আফটার মি।'

চতুর মহারাজা, দুর্বল সরকার

খামখেয়ালী, অস্থিরচিত্ত, প্রবীরচন্দ্রের আচরণ কিছু বা অসংলগ্ন। কিন্তু না, তিনি বিকৃতমস্তিষ্ক নন। কোর্ট অব ওয়ার্ডস থেকে জমিদারি ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য তিনি যে রাস্তা নিয়েছেন তাতে রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় বিলক্ষণ। মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস বস্তারে দলীয় প্রভাব বিস্তারের জন্য মহারাজাকে রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করেননি। আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রবীরচন্দ্রও কংগ্রেসের আহ্বান উপেক্ষা করেননি। ১৯৫৭ সনে কংগ্রেস মনোনয়নপত্রের জোরে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে সরকারের কাছ থেকে কিছু সুবিধা আদায় করা সম্ভব নয় তখনই তিনি দলত্যাগ করলেন। আদিবাসীদের বোঝালেন, কংগ্রেস সরকার তাদের কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ হয়েছে বলেই তিনি কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। সরল আদিবাসীরা মহারাজের জয়ধ্বনি করেছে। কেউ একবারও জানতে চায়নি (অবশ্য জানতে চাওয়া সম্ভবও ছিল না) জমিদারি যখন কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর আওতায় যায়নি তখন মহারাজা কয়েকটি ভাটিখানা খোলার অনুমতি দেওয়া ছাড়া প্রজাকল্যাণকর আর কি কাজ করেছেন।

কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে প্রবীরচন্দ্র আদিবাসী সেবাদল প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৯১০ সন থেকে (৩) আদিবাসীরা গবর্ন-

---

★ कार्यक्रम ★

—०—

विवाह २८ फरवरी १९६० रविवार राजमहल— ......बजे।

निवेदक
— महाराजा बस्तर.

श्री माई दन्तेश्वरी की जय

बस्तर की जनता की जय हो.

[illegible]

श्रीमान /श्रीमती ____________

आपसे निवेदन है कि परमात्मा के अनुग्रह से आयोजित हमारे विवाहोत्सव के मंगल-कार्य में राजमहल में सम्मिलित होकर हमें अनुग्रहीत करें।

वर
श्री श्री १०८
श्री प्रवीरचन्द्र भंज देव काकतीय
[illegible]

वधू
श्रीमती
सुभद्रा देवी

সুভদ্রা দেবীর সহিত প্রবীরচন্দ্রের বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রের প্রতিলিপি

৩। ১৯১০ সালে বস্তারে আদিবাসী বিদ্রোহ হয়। রাজ্যের তৎকালীন দেওয়ান বৈজুনাথ পাণ্ডে কিছু প্রগতিমূলক কাজের গোড়াপত্তন করেন। কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বৈজুনাথকে জব্দ করার জন্য তার বিরোধীপক্ষ (শোনা যায়, তাদের মধ্যে পারালকোটের রাজাও ছিলেন) আদিবাসীদের উত্তেজিত করে এবং বেছে বেছে শিক্ষক ও পাটোয়ারীদের উপর হামলা করে। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য তৎকালীন সরকারকে কড়া দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ফলে বহু আদিবাসী গ্রাম ছেড়ে পালায়।

মেণ্টকে সন্দেহের চোখে দেখে। এখনও সরকার মানেই অত্যাচারী। কংগ্রেস জমানাতেও সে ধারণার নিরসন হয়নি। তাই প্রবীরচন্দ্রের পক্ষে আদিবাসীদের পুনরায় ক্ষেপিয়ে তোলা কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল না। কিন্তু উত্তেজনার ঝোঁকে তিনি এমন কোন কাজ করেননি যা তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা রচনা করতে পারে। তিনি বারবার শাসিয়েছেন, "ইচ্ছে করলে জগদলপুর শহরে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতে পারি।" কিন্তু সে রকম মারাত্মক পথ তিনি বেছে নেননি। এদিকে মহারাজাকে খুশী রাখতে ব্যস্ত কংগ্রেস সরকার আদিবাসীদের উন্নয়নমূলক এমন কোন কাজ করেননি যাতে তাঁরা বস্তারিয়াদের কৃতজ্ঞতাভাজন হতে পারেন। বরং গত ২০শে মার্চ জগদলপুরে আদিবাসীদের সরকার-বিরোধী বিক্ষোভে যে ঝড়ের ইঙ্গিত ছিল (যার পরিণতি লোহাণ্ডিগুড়ার বেদনাদায়ক ঘটনা) তাকে অঙ্কুরে বিনাশ না করে পরোক্ষে তাঁরা আন্দোলনকে প্রশ্রয় এবং নিজেদের দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ২২শে মার্চ থেকে ২৯শে মার্চ পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসীরা অসংকোচে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শুরু হলো কতকটা এক অসহযোগ আন্দোলনের। এদিকে কিছু স্বার্থপর দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক আদিবাসীদের মনে এক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করল। আদিবাসীরা জানল, দণ্ডেশ্বরীর মায়ায় পুলিসের বন্দুক থেকে গুলির বদলে জল বেরোবে।

গত ৩০শে মার্চ করঞ্জিবাজারে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হবার জন্য আদিবাসীদের উপর নির্দেশ আসে। কিন্তু তখনও পুলিস কোনরকম প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার দিকে নজর দেয়নি। পরদিন ৩১শে মার্চ অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

তা ছাড়া, প্রবীরচন্দ্রকে নরসিংগড় জেলে অন্তরীণ রেখে তার স্থলে অনুজ বিজয়চন্দ্রকে বস্তারের মহারাজারূপে স্বীকার করার আকস্মিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকার সুবিবেচনার পরিচয় দেননি। অন্তত বস্তারের রাজনীতি বিশেষজ্ঞ মহল এই ধারণা পোষণ করেন। বস্তার রাজবংশ কাকতীয়। মহারাজা রুদ্রপ্রতাপের (প্রবীরচন্দ্রের মাতামহ) কন্যা মহারানী প্রফুল্লকুমারীর মৃত্যুর পর প্রবীরচন্দ্র কুলপ্রথা অনুযায়ী বিশেষ অনুষ্ঠান করে কাকতীয় বংশের উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকৃত হয়ে তবেই গদি আরোহণের অধিকারী হয়েছেন। তা ছাড়া মহারাজের পক্ষে আদিবাসী সমাজেরও স্বীকৃতি একান্তভাবেই আবশ্যিক। বিজয়চন্দ্র অদ্যাপি কাকতীয় বলে পরিগণিত নন। আদিবাসীরাও স্বীকৃতি দেয়নি। ওদের মতে বিজয়চন্দ্র কেবলমাত্র 'সরকারী রাজা'।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি একদা জেলা কর্তৃপক্ষ দণ্ডেশ্বরী মন্দিরে নূতন রাজাকে সাড়ম্বরে নিয়ে গিয়েছিলেন। মন্দিরের এই বিশেষ পূজা অনুষ্ঠানে আদিবাসী সমাজের কয়েকজন প্রধান আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁরা সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। বিজয়চন্দ্রকে তাঁরা খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছেন, —"তোমাকে মানবো যদি মহারাজা স্বয়ং এসে আমাদের সে-কথা বলে যান। শুধু এই শর্তে।"

বস্তারের রাজনৈতিক ভাগ্য আজও গদিচ্যুত মহারাজার কথার উপর অনেকখানি নির্ভর করে, একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

পত্রাবলী ।

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১৪৭ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

প্রশান্ত আমাকে যে কাজের ভার দিয়েছিল সে একটুও সোজা নয়। পঞ্চভূতের ভূমিকার একখানা অনুবাদ আমাকে পাঠিয়েছিল আমি তার উপরে পড়েছিলুম তার অনুবাদত্ব ঘুচিয়ে দিতে। এখন সে তার অনুবাদলীলা সম্পূর্ণ সম্বরণ করেচে, তার পূর্বদেহের কিছু নেই বললেই হয়। অমিয়কে চোখ বুলিয়ে দেখতে বলেছিলুম সে এইমাত্র ছুটে এসে বললে জিনিসটা অসাধারণ রকম ভালো হয়েচে। তার সানুনয় নিবেদন এই যে, ওটাকে যেন বিশ্বভারতীর ত্রৈমাসিকের পত্রস্তরের মধ্যে গোর দেওয়া না হয়। সুন্দরী মেয়েকে রুমের সুলতানের জেনেনার মধ্যে অন্তর্ধান করতে দেখার মর্মপীড়া সে ভোগ করচে। অমিয় যদি রূপকথার রাজপুত্র হত তাহলে কর্মসচিব-রক্ষিত লুপ্তিদুর্গ হতে ওকে উদ্ধার করে আনত। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করো আমার মন কী বলে তাহলে লজ্জার মাথা খেয়ে মানতেই হবে যে আমি কীর্তিনাশের জন্যে ততটা সন্তপ্ত হচ্চিনে মুনাফালোপের জন্যে যতটা। আমি নিশ্চিত জানি, ধারাবাহিক আকারে এই লেখাগুলো যদি আমি এটলাণ্টিক মান্থলীতে পাঠাই তাহলে প্রত্যেক মাসেই আমি বেশ একটা মোটা অঙ্কের টাকা পাই। মনের অন্তরতম প্রদেশ পর্যন্ত তলিয়ে দেখলুম, আমি কবি মানুষ বলেই এই টাকা-প্রাপ্তির সম্ভাবনার প্রতি কিছুমাত্র ঔদাসীন্য বা অবজ্ঞা যে আমার আছে তা আমার বোধ হোলো না। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো এ সব কথা যথাস্থানে না জানিয়ে তোমাকে জানাচ্চি কেন? আশা করি তুমি সেটা আন্দাজ করতে পারবে। সোজাপথ সব চেয়ে সহজ পথ সব সময়ে নয়—অনেক সময় পথ ঘুরে চললে পথ বাঁচে। অপর পক্ষ থেকে একটা কথা বলবার আছে। খসড়া অনুবাদটা আমার সামনে ফেলে আমাকে যদি নাড়া না দেওয়া হত তাহলে একাজে আমি হাত দিতুম না। কথাটা একটুও মিথ্যে নয়। ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তুমি খাস পৌত্তলিক পাড়াগাঁয়ের অনেক খবর জানো—তুমি নিশ্চয়ই জানো লুকিয়ে কারো বাড়িতে ঠাকুরের প্রতিমা দিয়ে এলে তাকে পূজো সমাধা করতেই হয়। আমার অবস্থাও তাই—কিন্তু এর মধ্যে যেটা বিচার্য বিষয় সেটা হচ্চে এই যে, যে ভদ্রলোক পূজা করে পুণ্য ফল তারি না যে অন্য লোকটি তার ঘাড়ে ঠাকুর চাপিয়ে আসে তার? দোহাই তোমার, অপক্ষপাত বিচার কোরো। অবশ্য এর মধ্যে মুশকিলের কথা একটা আছে—ত্রৈমাসিকের পাত পাড়া হয়ে গেছে, অন্নের অপেক্ষায় আমার দিকে তাকিয়ে। সময় বয়ে যায়, ক্ষিদে মরে যাচ্চে—কী করা কর্তব্য। যদি অভয় পাই তাহলে কাল সকালেই আর একটা ইংরেজি ডেকচি চড়াব—যাতে পেট ভরে তার জোগাড় নিশ্চয়ই করব—নইলে বেইমানি করা হবে। কিন্তু হে সচিবনী, কর্মসচিবকে বোলো সে যেমনভাবে তর্জমা করে যা[...] সেটা বন্ধ যেন না করে। ঐ রকমের একটা প্রথম ঝাঁকানি [...] পেলে আমার মনের কল চলতে চায় না।

মনটা বেশ একটু খারাপ চলচে—হারাসান আমাকে যথে[...] পরিমাণে উৎকণ্ঠিত করলে। এইবার তৃতীয়বার সে জ্বরে পড়ল। অমন সুস্থ শরীর একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েচে তার দুর্বলতা দেখেই ডাক্তার ভয় পায়। কাল ওষুধের স[...] অল্প মাত্রায় ব্রাণ্ডি দিয়েছিল আমার বিশ্বাস তাতেই জ্বরে তাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। রাত্রে উঠেছিল ১০২°, আজ দুপু[র] পর্যন্ত চলছিল ১০১°-এর এদিক-ওদিক—সুতরাং সন্ধ্যা[র] দিকে আরো বাড়বার আশংকা ছিল। সৌভাগ্যক্রমে কিরণ তা[র] সেবা করতে এসে আমার কাছে ওষুধ চাইলেন। আমি তা[র] জিম্মায় ওষুধ দিলুম—আধঘণ্টা অন্তর ফেরাম ফস ও কেলি সালফ। জানি কেলি সালফ ঘাম এনে জ্বর কমায়—দেখতে দেখতে প্রচুর ঘেমে জ্বর ৯৯এ এসে ঠেকেচে। দেখা যাক রাত্রে কেমন থাকে। হৈমন্তী অমিতা কিরণ পালা করে দেখচে আজ রাত্রে এখানকার মিশন থেকে একজন খৃস্টান মেয়ে আসবে ওর পরিচর্যায়। রথীরা নেই—ডাক্তারের মুখ দেখে মনে হ[য়] সেও শঙ্কিত—যদি রোগের বৃদ্ধি হয় তাহলে কী করা কর্তব্য তাই পরামর্শ করবার জন্যে অপূর্বকে তার করে দিয়েচি। সন্ধ্যে সময় এসে আজ রাত্রেই চলে যাবে। নিতান্ত যদি প্রয়োজন ঘটে তাহলে কলকাতার কোনো হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে —সেই সম্বন্ধে ওর সঙ্গে বাত-চিত করতে হবে। মুশকিল এ[ই] যে এখান থেকে ওকে নিয়ে যাওয়া হবে বললেই ও অস্থির হয়ে উঠবে। অনেক বুঝিয়ে ওর তেতালার সেই চূড়া থেকে বৌমার ঘরে নামিয়ে এনেচি। একটা সুখবর এই যে, আজ অবিশ্রান্ত কয়দিন-ধরে ঘোর বাদলের পর আজ সূর্য উঠেচে তাতে আর কিছু না হোক আমার মনটা আকাশের আশ্বাস বাণী পেয়ে অনেকখানি দুশ্চিন্তা মন থেকে নামাতে পেরেচে। এই বাদলটা নিঃসন্দেহই তোমাদের ওখান থেকে বিদায় নিয়েচে —বৃষ্টির পরে তোমাদের শালবনের উপরে প্রসন্ন আকাশের দৃষ্টি নেমেচে—নিশ্চয়ই খোলা দরজা দিয়ে সমস্তক্ষণ শরতের আগমনী শুনতে পাচ্চ। আজ পঞ্চভূতকে আমার কলম থেকে নামাতে বেলা একটা বেজে গিয়েছিল। তার পরে নানা ব্যাপারে বেলা গেল, এখন পাঁচটা বাজবার অভিমুখে ঘড়ির ইশারা দেখতে পাচ্চি। আর কিছুক্ষণ পরেই নীচের তলায় ভোজনশালায় গরম আটার লুচির সহযোগে কিঞ্চিৎ আলুভাজা খাব —শেষ দুখানা খাব মধু দিয়ে (বৌবি আমাকে এই মধু পাঠিয়েচে)। অবশেষে রাত্রে স্যানাটোজেন খেয়ে আমার জঠর সেবার পালা সমাপ্ত হবে। ময়ান-কোমল কবোষ্ণ যে আটার লুচি হয়, সেটা উপাদেয় ঘি পাই বাড়ির গোরুর দুধ থেকে আটা বাড়ির জাঁতায় ভাঙা—লুচি পাত্রে সাজিয়ে নিয়ে আসে আমার বাড়ির বৌমা[...]। ইতি ৩রা কার্তিক ১৩৩৬

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৪৮ ॥

ওঁ

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু,

হারাসানকে নিয়ে এখনো শহরে বন্ধ হয়ে আছি। ওকে আর কোথাও রাখব এমন স্থান নেই, আর কারো হাতে দেব এমন লোক নেই। সমস্ত দায়িত্ব আমার। অথচ আমার নানা চিন্তা, নানা কাজ। এবার যেন সেরে উঠল কিন্তু আবার যখন অসুখে পড়বে তখন কি সমস্ত কাজের মাঝখানে ওকে নিয়ে

আরি দুহাত জোড়া পড়বে। ক্ষণে ক্ষণে এই সমস্ত চিন্তা মনে আসচে। স্থির করেচি একটু সেরে উঠলেই ওকে স্বদেশে রওনা করে দেব। হয়তো তা নিয়ে কান্নাকাটি করবে কিন্তু এই ব্যবস্থা নিঃসন্দেহ ওর পক্ষে ভালো, আমার পক্ষে ততোধিক। আজ অপরাহ্ণে একটি রুশীয় মহিলা আসচেন তিনি মনের কথা বলতে পারেন। আমার মনের কথা আমি জানি সুতরাং পরের কাছ থেকে তার পুনরাবৃত্তির জন্যে আমার কোনো আগ্রহ নেই। তবু এ ব্যাপারটা ভালরূপে পরীক্ষার যোগ্য। মন জিনিসটা কী সে কথা জানতে ইচ্ছে করে কিন্তু মনকে দিয়েই জানতে হয় বলে কাজটা সহজ হয় না। যদি দেখা যায় বাইরে তার একটা যাতায়াতের পথ আছে, তার চিন্তাগুলোর এমন একটা বিশেষ আকার আছে যা অন্য লোকের চিন্তার মধ্যে বিনা বাক্যবাহনে উপস্থিত হতে পারে তবে সে একটা বড়ো কম খবর নয়। বিজ্ঞান বলচে যেটা বৈদ্যুতশক্তির বিশেষ লীলা সেইটেই বস্তুরূপে বিশেষ আকার ধারণ করে আমাদের গোচর হয়; যদি দেখা যায় আমার অন্তরে যেটা ভাব মাত্র সেটাও একটা অদৃশ্য আকার ধারণ ক'রে অন্যের মনে ভাবরূপকে প্রতিফলিত করে তাহলে হয়তো কোন্ দিন প্রমাণ হবে, চিন্তাও একটা বৈদ্যুত পদার্থ, তা অবস্থাবিশেষে বস্তুরূপে অথবা ভাবরূপে প্রকাশ পায়। আমার চিন্তা যে ভাষাতেই আমার মনে বর্তমান থাক রুশীয় মেয়ে অন্য ভাষায় সেই চিন্তাটাকেই ধরতে পারে। এই জনশ্রুতি যদি সত্য হয় তাহলে বলতে হবে চিন্তার ভাষা-নিরপেক্ষ একটা রূপ আছে অন্যের মনে সেটা অভাষায় পরিণত হয়। কতকটা গ্রামোফোনের রেকর্ডের মতো—অর্থাৎ আঁচড়ের ভাষা আওয়াজের ভাষা হয়। আমাদের চিন্তা তাহলে কোনো একটা অদৃশ্য ফলকে আঁচড় কাটে, সেইটে বাক্যরূপে কোনো কোনো চিত্তে উচ্চারিত হতে পারে। যাক্, আগে দেখা যাক্ ব্যাপারখানা কী, তার পরে চিন্তা করা যাবে। এইমাত্র তোমার মেসোমশায়১ এসেছিলেন, তিনি বললেন, মাদ্রাজে এক ভদ্রলোককে তিনি প্রত্যক্ষ দেখেছিলেন, তাঁকেও লাটিনে ফরাসীতে প্রভৃতি যে-কোনো ভাষাতেই প্রশ্ন করলে তিনি সংস্কৃত ভাষায় তার উত্তর করতেন। এইসব ভদ্রলোকরা ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় তার পরে যায় কোথায়? এদের কাছ থেকে যথানিয়মে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয় না কেন? হয় না যে তার কারণ বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামি এরকম ব্যাপারের প্রমাণ সংগ্রহ চেষ্টাকেই মনে করে বৈজ্ঞানিক হেরেসি।

আজ নীলরতনবাবু একটু সন্দেহ করচেন হারাসানের enteric জ্বরও হতে পারে, তার মানে আরো সপ্তাহ তিনেক পর্যন্ত এর মেয়াদ চলা অসম্ভব নয়—অতএব জোড়াসাঁকোয় তাঁবু গেড়ে বসা গেল। ইতি বোধহয় ৪ঠা কার্তিক ১৩৩৬

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১। ডাক্তার স্যার নীলরতন সরকার আমার মেজ মামাশ্বশুর। তাঁকেই কবি ভুল করে আমার মেসোমশায় বলে উল্লেখ করেছেন।

॥ ১৪৯ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

আমার জীবনে নিরন্তর ভিতরে ভিতরে একটি সাধনা ধরে রাখতে হয়েচে। সে সাধনা হচ্চে আবরণ মোচনের সাধনা, নিজেকে দূরে রাখবার সাধনা, আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা। স্থির হয়ে বসে এ কথা প্রায়ই আমাকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করতে হয় যে, যে-আমি প্রতিদিনের সুখ দুঃখে কর্মে চিন্তায় বিজড়িত, সে ঐ সংখ্যাহীন অনাত্মের নিরুদ্দেশ স্রোতে ভেসে যাওয়ার সামিল। তাকে দ্রষ্টারূপে স্বতন্ত্রভাবে দেখতে পারলেই ঠিক দেখা হয়—তার সঙ্গে নিজেকে অবিচ্ছিন্ন এক করে জানাই মিথ্যা জানা। আমার পক্ষে এই উপলব্ধির অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন আছে বলেই আমি একে এত করে ইচ্ছা করি। আমার মনের বাসা চৌমাথায়, আমার সব দরজাই খোলা, সব রকমের হাওয়া এসেই পৌঁছায়, সব জাতেরই আগন্তুক একেবারে অন্দরে ঢুকে পড়ে। মানুষের জীবনের অন্দর বলে একটা জায়গা আছে, সেইটে তার বেদনার জায়গা, সেইখানে তার অনুভূতি। এই জন্যেই এর মধ্যে কেবল অন্তরঙ্গের প্রবেশ। তাদেরই নিয়ে সুখ দুঃখের লীলাই সংসারের লীলা। ঐ সীমার মধ্যে সবই সহ্য করতে হয়। কিন্তু আমার জীবন দেবতা আমাকে কবি করবেন স্থির করেচেন বলেই আমার অন্দর মহলকে অরক্ষিত রেখেচেন, আমার খিড়কির দরজা নেই, চারদিকেই সদর দরজা। সেই জন্যেই আমার অন্দর মহলে কেবল আহূত নয়, রবাহূত অনাহূতেরও আসা যাওয়া। আমার বেদনাযন্ত্রে সকল সপ্তকের সকল সুর বাজবার মতোই তার চড়িয়ে রাখা হয়েচে। সুর থামালে আমার নিজের কাজ চলে না—সংসারকে বেদনার অভিজ্ঞতাতেই আমাকে জানতে হবে—নইলে প্রকাশ করব কী! আমার তো বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের মতো জ্ঞানের ব্যাখ্যা নয়, আমার যে প্রাণের প্রকাশ। কিন্তু একদিকে এই অনুভূতিই যেমন প্রকাশের প্রবর্তনা তেমনি আর একদিকে তাকে ছাড়িয়ে দূরে আসাও রচনার পক্ষে দরকার। কেননা দূরে না এলে সমগ্রকে দেখা যায় না, সুতরাং দেখানো যায় না। সংসারের সঙ্গে অত্যন্ত এক হয়ে গেলেই অন্ধতা জন্মায়—যাকে দেখতে হবে সেই জিনিসটাই দেখাকে অবরুদ্ধ করে। তা ছাড়া ছোটো হয়ে ওঠে বড়ো, এবং বড়ো হয়ে যায় লুপ্ত। সংসারে বড়োর সুবিধে এই যে, সে আপনার ভার আপনি বহন করে, কিন্তু ছোটোগুলো হয়ে ওঠে বোঝা। তারাই সবচেয়ে অনর্থক অথচ সবচেয়ে বেশি চাপ দেয়। তার প্রধান কারণ তাদের ভার অসত্যের ভার। দুঃস্বপ্ন যখন বুকের উপর চেপে বসে, প্রাণ হাঁপিয়ে আসে; তবুও সেটা মায়া। যখন আমির গণ্ডী দিয়ে জীবনের পরিমণ্ডলটাকে ছোটো করি তখনই সেই ছোটোর রাজ্যে ছোটোই বড়োর মুখোশ পরে মনকে উত্তেজিত করে। যা সত্যই বড়ো, অর্থাৎ যা আমির পরিধি ছাড়িয়ে যায়, তার সামনে যদি এদের ধরা যায় তাহলে তখনি এদের মিথ্যে আতিশয্য ঘুচে গিয়ে এরা এতটুকু হয়ে যায়। তখন, যা কাঁদায়, তাকে দেখে হাসি পায়। এই কারণেই আমির বেড়াটাকে আমার থেকে সরানোই জীবনের সবচেয়ে বড়ো সাধনা—তাহলেই আমাদের অস্তিত্বের সবচেয়ে বড়ো অপমানটাই লুপ্ত হয়। অস্তিত্বের অপমানটা হচ্চে ছোটো খাঁচায় থাকা—সেটা পশুপাখিকেই শোভা পায়। এই আমির খাঁচার মধ্যে সব মারই হয় বেঁধে-মার, সব বোঝাই হয়ে ওঠে অচল বোঝা। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অন্তত একপংক্তি দূরে সরিয়ে বসিয়ে রাখাই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অত্যন্ত দরকার—নইলে নিজের দ্বারা নিজে পদে পদে লজ্জিত হতে হয়। মৃত্যুশোকের দ্বারা বৈরাগ্য আনে, সেই রকম বৈরাগ্যের মুক্তি একাধিকবার অনুভব করেছি—কিন্তু যথার্থ বৈরাগ্য আনে যা কিছু সত্য বড়ো তাকেই সত্য করে উপলব্ধি করা দ্বারা। আমার নিজের মধ্যেই বড়ো আছে যে দ্রষ্টা, আমার নিজের মধ্যেই ছোটো হচ্চে, যে ভোক্তা। ঐ দুটোকে এক করে ফেললে দৃষ্টির আনন্দ নষ্ট হয়, ভোগের আনন্দ দুষ্ট হয়। কাজ জিনিসটাকে বাইরে থেকে ঠেলা গাড়ির মতো ঠেলতে থাকলেই

সেটা চলে ভালো, কিন্তু ঠেলা গাড়িটাকে যদি কাঁধে নিয়ে চলি তবে গলদঘর্ম ব্যাপার হয়ে ওঠে। বিশ্বভারতী বলে একটা কাজ নিয়েছি—একাজটা সহজ হয় যদি একে আমি-র ঘাড়ে না চাপাই—যদি আমি-র থেকে বিযুক্ত করে রাখি। অবস্থাগতিকে কাজ সফলও হয় বিফলও হয় কিন্তু সেটা যদি আমি-কে স্পর্শ না করে তাহলেই সেই আমি-নিযুক্ত কাজ নিজেরও মুক্তি আনে আমারও মুক্তি আনে। সবচেয়ে যিনি বড়ো তাঁরই কাছে আমাদের সবচেয়ে বড়ো প্রার্থনা এই—অসতো মা সদগময়। কেমন করে এ প্রার্থনা সার্থক হবে? না, আমার মধ্যে তাঁর আবির্ভাব যদি সম্পূর্ণ হয়। তাঁকে যদি আমার মধ্যে সত্য করে দেখি তবেই আমি-র উপদ্রব শান্ত হতে পারে।

জানিনে আমার এ চিঠি কবে পাবে? যদি জন্মদিনে পাও তো খুশী হব। যদি না-পাও তবে জন্মদিনকে আরো একটা দিন পর্যন্ত বাড়িয়ে নিলে বিশেষ ক্ষতি হবে না। যে সব কথা নিজের অন্তরতম তা সব সময়ে বলতে পারা যায় না—অথচ বলা চাই নিজেরই জন্যে। তাই তোমার জন্মদিনকে উপলক্ষ্য করে এই চিঠি লিখলুম—কেননা প্রত্যেক জন্মের মূল মন্ত্র হচ্চে মুক্তির মন্ত্র—অন্ধকার থেকে জ্যোতির মধ্যে মুক্তি। হারাসান অনেকটা ভালো আছে। আশা করি যথেষ্ট পরিমাণ কুইনীনের তাড়নায় তার জ্বর এইবার ভাগবে। ইতি ৬ কার্তিক ১৩৩৬

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৫০ ॥

ওঁ

কলিকাতা

কল্যাণীয়াসু

আমার সময় খারাপ যাচ্চে। হারাসানের জ্বর এমন আকার ধারণ করল যে তাকে আর শান্তিনিকেতনে রাখতে পারলুম না। এতদিন খুব একটা নিরন্তর উদ্বেগের মধ্যে ছিলুম অথচ তার মধ্যে আমাকে কলম চালনা করতে হচ্ছিল। তোমাকে তো পূর্বেই বলেচি বরোদায় প্রবন্ধ পাঠ করতে আমি বাধ্য। সেটা গোটা কয়েক পাতা লেখা হতেই এল পঞ্চভূত—সেটাকে সেরে ফেলে মাজতে ঘষতে কিছুকাল গেল—আবার সেই লেকচারটার ছিন্ন সূত্রটা জোড়া লাগাবার সময় এল কিন্তু মন লাগানো শক্ত হোলো। কেবলই ভয় হতে লাগল একটা বিপদ ঘটে। একবার জ্বর নাবে, আশা হয় আজ বুঝি পালা সাঙ্গ হোলো, আবার খানিক বাদেই দেখি তাপ চড়তে আরম্ভ করেচে। তার উপরে ওর কান্না থামে না, বোধ হয় ওর মনে হয়েচে দেশে আর ফিরতে পারবে না। দেশ থেকে ওর ভাই ওকে কাপড় পাঠিয়েছে, কোলে নিয়ে ওর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়েচে। মনে আছে ও যখন জাহাজে উঠল ওর দুই ভাই এসেছিল ওকে বিদায় দিতে। বড়ো ভাই শান্ত হয়ে ছিল, কারণ জাপানীরা পারতপক্ষে হৃদয়াবেগ বাইরে প্রকাশ করতে চায় না। হারাসানও আমাদের সামনে অবিচলিতভাবেই ছিল। কিন্তু ওর ছোটো ভাই কান্না রাখতে পারলে না—অপূর্বকে এসে বারবার বললে, Be kind to my sister.

একজন মানুষের সঙ্গে কতদিকে কত দরদের সম্বন্ধ আছে। আমার এমন হোলো রাত্রে ঘুমোনো কঠিন হয়ে উঠল। কেদারায় হেলান দিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে অপেক্ষা করে বসে আছি—শোবার আগে খবর নিয়ে যাব জ্বরের তাপ কতদূর উঠল। ঘড়িতে দশটা বাজল, সাড়ে দশটা বাজল, এগারোটা বাজে। বৈদ্যুত পাখা বন্ধ, বিজলী বাতি নির্বাপিত, কল বিকল হয়েচে। এতদিন যে সব পোকা তড়িৎ শিখায় সভ্যতম শ্রেণীর নির্বাণ মুক্তিলাভ করছিল, আজ তারা মুক্ত বাতায়ন পথে দলে দলে আসচে ম্লানজ্যোতি কেরোসিন আলোর কাছে চরম আত্মোৎসর্গ করবার জন্যে। মশাগুলো দেহের প্রত্যন্ত দেশে পায়ের কাছে আক্রমণ করচে। চন্দন তেলের গন্ধ যে মশাদের পক্ষে দুঃসহ ক্রমে ক্রমে তাদের অপনয়ন হতে হতে এখন যারা টিকে গেছে চন্দনের গন্ধ সহযোগে রক্ত সেবনে তাদের অরুচি নেই। একে বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে যোগ্যতমের উদ্বর্তন, কিম্বা প্রাকৃতিক নির্বাচন। এই বিশেষ নির্বাচিত মশাদের আমি নাম দিয়েচি আমার "চরণ-চারণ-চক্রবর্তী"। অবশেষে কোনো দিন খবর আসে জ্বর কমচে কোনোদিন শুনি জ্বর বাড়চে—বারম্বার অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা গেল পরিণামে দুই বার্তারই ফল সমান। পথ্য কী দিতে হবে আমারই কাছে প্রশ্ন আসে—অনেক বিচার করে উপদেশ দিই—চিরন্তর বার্লিরস, অথবা ডালের সুপ, পুটপাকপক্ক মুর্গির সুপ, সোডা জলযুক্ত দুগ্ধ, বহু তরলীকৃত স্যানাটোজেন, সম্ভব হলে বেদানার রস। অবশেষে যখন দেখা গেল ব্যাধির জাল ক্রমশই জটিল হয়ে আসচে তখন আমার প্রধানমন্ত্রী প্রতাপকে ডেকে বললুম, কাল সকালেই হারাসানকে কলকাতায় রওনা করা চাই। ইতিমধ্যে বিকেল থেকে আমাকে ধরল জ্বরে। কাউকে কিছু না বলে খেলুম দু বড়ি ব্রোমোকুইনীন—পরদিন প্রাতেও তথৈবচ। উত্তেজনাকে নাবিয়ে দেওয়া গেল নিরেনব্বইয়ের পর্যায়ে। কিন্তু হারাসানের সাহচর্যে কলকাতায় যাবার মতো উৎসাহ রইল না। বলে রাখলুম আজ তোমরা যাও, আগামীকাল আমি অনুসরণ করব। সেই আগামীকালটা অদ্যকাল হয়েছিল গতকালে। এখানে এসে দেখা গেল রোগের লক্ষণ ভালোতর। নীলরতনবাবু দেখচেন। হৈমন্তী এসেচেন সেবা করতে, একটি স্থূলায়তন নার্সও নিযুক্ত—প্রতাপ এসেচে দলপতি হয়ে, এরিয়ম বললেন, "আমিও লাগব সেবায়"। এদিকে কলকাতায় আমাদের মহম্মদীয় সূপকার ছুটি উপলক্ষ্যে অনুপস্থিত, সেবকবৃন্দ রথীর অনুবর্তী—গাড়ি একখানা আছে এখানকার রথশালায়, পত্তলাল আছে রাঁচিতে। এদিকে আমাদের সবেধন নীলমণি বাড়ি থেকে পত্র পেয়েচে তার স্ত্রী অসুস্থ এবং স্বামীকে দেখবার জন্যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করচে, স্বামীর মুখ মলিন, কণ্ঠ বাষ্পবিজড়িত। এরিয়মকে অনুনয় করে বললুম জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে অন্নাভাব বাড়ে, ম্যালথসের এই মত, আমার বর্তমান অবস্থায় সেই মতের সমর্থন দেখতে পাচ্চি, অতএব দোহাই, সেবা করবার প্রয়োজন নেই, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন এখান থেকে তোমার শান্তিনিকেতনে ফিরে যাওয়া। আমার অবস্থা এই রকম।

আজ মধ্যাহ্নে অতি সামান্য পরিমাণে অন্নপান করেচি। মাথাটা ভারগ্রস্ত, দেহটা ক্লান্ত, মেরুদণ্ডের মধ্যবিভাগে যেন কিসের একটা আপত্তি, চক্ষুপল্লবে জড়িমা। দুটো বেজে পাঁচ মিনিট। সর্বাঙ্গের অবসাদ মোচনের জন্যে এক পেয়ালা চা এইমাত্র সেবন করেচি। ঘণ্টাখানেক পূর্বে তোমার মেসোমশায় এসে রোগিণীকে নেড়ে চেড়ে ঠুকে ঠেকে দেখে গেলেন। তাঁর ব্যবস্থা মতো কাল থেকে তিনঘণ্টা অন্তর তিন গ্রেন করে কুইনীন চলচে। রক্ত ও অন্য নানাবিধ পরীক্ষা হয়ে গেছে, প্রমাণ হল টাইফয়েড বা তজ্জাতীয় কিছু নয়। একটা প্রধান উপসর্গ ধরা দিয়েচে সেটা চক্র ক্রিমি, ক্রিমির প্রভাবে সকল শ্রেণীর রোগ প্রশ্রয় পায়। অতএব আজ রাত্রে তাকে ধ্বংস করবার ব্যবস্থা করা হোলো। রোগীর হতাশ মনে এখন আশার সঞ্চার হয়েচে, আমাদেরও তথৈবচ। এখন আকাশও পরিষ্কার, যেন দ্যুলোকেও নীরোগতা—বাতাস আশ্বাস দিচ্চে ভয় নেই।

কিন্তু সবশুদ্ধ জড়িয়ে অত্যন্ত নাড়া খেয়েছি, মনটাকে বহু তাড়না করে কিছু কাজ করিয়েছি, পঞ্চভূতে বিচিত্রী শ্রাদ্ধ সহজে হয় নি—বরোদার বক্তৃতা মনের মধ্যে অসম্পূর্ণ

কর্তব্যের দায় চাপিয়ে—খাতা বন্ধ করে বসে আছে। সেদিন স্পর্ধা করে বলেছিলুম জর্নালের শূন্য স্থান ভরাবার জন্যে একটা কিছু লিখে পাঠাব। ক্লান্ত এবং উদ্বিগ্ন মনকে নাড়া দিতে গেলেই সে খিট্‌খিট্ করে উঠল—বললে, দাও না যেটা লিখেচ সেটা পাঠিয়ে—না হয় সেটা কেউ পড়বে না—তা নিয়ে এত আক্ষেপ কিসের? অনেককে অনেক পড়া তো পড়িয়েচ, আর কাজ কি। আর টাকার প্রত্যাশা? সেটাও ত্যাগ করো। এতকাল ধরে প্রত্যাশা করেছ বহুৎ, টাকা পেয়েছ সামান্য, সেটুকু না হয় নাই পেলে।—অতএব আজকের ডাকে লেখাটা পাঠাব। মনে দুঃখ এই রইল—শেষকালটায় সেই পাঠালুম অথচ না পাঠাবার অপরাধ রয়ে গেল—দাক্ষিণ্য করলুম কিন্তু কৃপণতার কলঙ্ক তার ঘুচল না। লেখাটা পাবে সোমবারে কারণ কাল রবিবার। দ্বিধা করতে করতে অনাবশ্যক যে দেরি করলুম সেটা ক্ষমা করবার জন্যে তুমি স্বয়ং যদি আমার হয়ে ওকালতি করো তাহলে জানি অকৃতকার্য হবে না। কিন্তু সম্পাদককে বোলো যথালিখিতং তথা ছাপিতং যেন করেন—কারণ সূক্ষ্ম তুলির লেখা অল্প একটু নড়ালেই ধেবড়ে যায়।

এ চিঠিখানা কিছু বড়ো করেই লিখলুম, কেননা হয়তো কিছুদিন কলমের কামাই যাবে। নানা দিক থেকে আজকাল আমার ভাগ্য প্রসন্ন নয়, সে আমার বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিয়েচে, বিনা কারণে থেকে থেকে আমাকে ঠেলা মেরে যাচ্চে। এরকম অবস্থায় মনকে সম্পূর্ণ ছুটি দিলে সে আপনার ভিতর থেকে আপনার মুক্তি উদ্ভাবন করে নেয়। ইচ্ছে করচে আর একবার পদ্মার শুশ্রূষা প্রার্থনা করতে যাই। ইতি ৯ই কার্তিক ১৩৩৬

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হারাসান বলে একটি জাপানী মেয়ে কবির সঙ্গে জাপান থেকে ১৯২৯ সালে এসেছিল কবিকে সেবা করবে বলে। সেই মেয়েটির কবির প্রতি অসীম শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য ছিল। খুব যত্ন করে বাংলা শিখতে, মীরা দেবীর কাছ থেকে কবির উপযোগী রান্না শিখতে এবং সব বিষয়েই তাঁর সেবা করতে আগ্রহের অন্ত ছিলো না। এই মেয়েটিই কিছুদিন পরে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পরে মারা যায়।

অ স মা প্ত

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

'মাঘ নয়, ফাল্গুনে বরং.........'
বলেছিলে, দেরি করো।
কম্পিত ওষ্ঠের প্রান্ত আশঙ্কায়
থরো থরো।
বলেছিলে 'দেরি করো'।

'বরং বৈশাখ ভালো। চৈতালী বাতাস
হবে তীক্ষ্ণ খরতর!'
কম্পিত ওষ্ঠ কী নীল আশঙ্কায়
থরো থরো।
বলেছিলে 'দেরি করো'।

সময় করে না ক্ষমা। যৌবনের
বেদনাও বহুতর,
তুমি জান নিরুপমা। নয়ন তাই কি
ক্ষণতরে থরো থরো?
বলেছিলে 'দেরি করো'।

যেতে যেতে পথ চিনিঃ থামিনি কোথাও।
যেতে হবে যতই ভাবনা
উচাটন করুক আমাকে, তবু
দুজনেই ফিরে তাকাব না।

হোক অচিরায়ু, তবু অপূর্ব লেগেছে
ঐ হাত যবে ছিল হাতে।
সেই সামান্যই ভালো। সকলে কি পারে
বিশ্বাসের বকুল ফোটাতে?

বয়সের চাপা কলি যখন কপালে
এ'কে দেবে বিদায়ের টিকা,
বাতাসে বিকেল বলবে, 'এইবার জ্বালো
প্রদীপের শিখা'।

'মাঘ নয় ফাল্গুন বরং'
বলেছিলে 'দেরি করো'
কম্পিত ওষ্ঠের প্রান্ত শাশ্বত সকালে
চিরায়ত থরো থরো
বলে যাবে, 'দেরি করো।... দেরি করো॥... দেরি করো।॥'

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৭০)

রেলের অফিসের বড় সাহেবের তখনও সেই একই দৃশ্য চলছে। সেই তখনও ফণা তুলে রয়েছে সতী।

—তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার চাকরির জন্যে কেয়ার করি?

মিস্টার ঘোষাল বললে ভুলে যেও না, এটা অফিস সতী! এ প্যালেস-কোর্ট নয়। এখানে চেঁচিয়ে কথা বললে আমার চাপরাশি শুনতে পাবে, আমার ক্লার্করা শুনতে পাবে—

—তোমার চাপরাশি আর ক্লার্কদের তুমি ভয় করবে! আমি ভয় করবো কেন? হোয়াই. ডীড্ ইউ ইনসাল্ট্ দীপু? কেন তুমি ওকে অপমান করলে? জানো আমি তাকে শ্লিপ পাঠিয়েছি দেখা করবার জন্যে?

—কিন্তু আমার পারমিশন্ নিয়েছিলে তুমি? তুমি আমার পি-এ তা জানো না!

সতী দরজার দিকে ততক্ষণ এগিয়ে গেছে। বললে—এই তো আমি যাচ্ছি দীপুর কাছে, দেখি তুমি কী করতে পারো—

—আই ক্যান্ স্যাক্ ইউ মিসেস ঘোষ!

সতী সংগে সংগে জবাব দিলে—হ্যাঙ্ ইওর স্যাকিং! আমি নিজের হাসব্যান্ডকে ছেড়ে চলে এসেছি, আমি নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি, আমাকে তুমি আড়াই শো টাকা মাইনের চাকরির ভয় দেখাও! আমাকে তুমি স্যাকিংএর ভয় দেখাও—

বলতে বলতে সতীর বুকটা ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো। মাথার ওপর পাখার হাওয়া লেগে কোঁকড়ানো চুলগুলো উড়তে লাগলো ঘন-ঘন। হাত নাড়ার সংগে সংগে সোনার চুড়িগুলো ঠিন্ ঠিন্ করে বেজে উঠলো।

সতী আবার বললে—আমাকে তুমি মিস্ মাইকেল পাওনি মিস্টার ঘোষাল—আই য়্যাম মেড্ অব্ ডিফারেন্ট মেট্যাল—

—মিস্ মাইকেলের কথা তুলছো কেন তুমি?

সতী সত্যিই রাগী মেয়ে। রাগলে আর জ্ঞান থাকে না। বললে—তুলবো না? তুমি ভেবেছ আমি জানি না, কে মিস মাইকেলকে খুন করেছে?

—সতী!!

মিস্টার ঘোষাল দৌড়ে কাছে এসে সতীর মুখটা চেপে ধরতে গেল। কিন্তু তার আগেই সতী পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে। ঘরের বাইরে এক গাদা লোক দাঁড়িয়ে ছিল। গুজরাটি ভাটিয়া সিন্ধী। সকলেরই ওয়াগন চাই।

—সেলাম হুজুর।

সতী বেরোতেই দ্বিজপদ মাথা নিচু করে সেলাম করলে। সতীও মাথা হেলিয়ে বললে—সেলাম—

তারপর সোজা চলে এল দ্বীপঙ্করের ঘরের সামনে। পাশবাবু সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। সারাদিন কোনও কাজ থাকে না পাশবাবুর। এই অফিসের মধ্যে এখানে-সেখানে ঘোরাটাই কাজ। আর সাহেব-মেমসাহেবদের দেখে সেলাম করাই কাজ। আসলে ওইটেই আসল কাজ। বলতে গেলে আখেরের কাজ। নতুন মেমসাহেব। ঘোষাল সাহেবের সংগে এক-গাড়িতে অফিসে আসতে দেখেছে। সামনে গিয়ে মাথা নিচু করে এক হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে-সেলাম মেমসাহেব—

পুলিনবাবু পাশবাবুর কান্ড দেখে অবাক। বললে—এ কি পাশবাবু, ওকে সেলাম করতে গেলেন কেন?

পাশবাবু বললে—তুমি ও বুঝবে না ভায়া, তোমরা আজকালকার নতুন ছোকরা সব—

—তা ওকে সেলাম করলে কি আপনার প্রমোশন হবে?

পাশবাবু বিজ্ঞের মত হেসে বলে—আরো কিছুদিন রেলে থাকো, বুঝবে কিসে কী হয় কিছু বলা যায় না—

তা পাশবাবু ওই রকমই। ক্রফোর্ড সাহেবের আয়া বিকেল-বেলা কোয়ার্টারের সামনে ঘোরা-ফেরা করে, পাশবাবু তাকে দেখলেও সেলাম বাজায়। কেউ জিজ্ঞেস

করলেই বলে—ও তোমরা বুঝবে না ভায়া, এই আমার পেটেই হয়ত একদিন ফিউচার ডি-টি-এস জন্মাবে—তখন?

কিন্তু ওদিকে ততক্ষণ সতী একেবারে সোজা দীপংকরের ঘরে ঢুকে পড়েছে। দীপংকর মুখ তুলতেই সতীকে দেখে আবার মুখ নামিয়ে নিলে।

সতী দৌড়তে দৌড়তেই এসেছে। তখনও হাঁফাচ্ছিল। বললে—দীপু, এ কী করলে তুমি?

দীপংকর মাথা না তুলেই ফাইল্ নিয়ে কাজ করতে লাগলো।

সতী বসলো একটা চেয়ার টেনে নিয়ে। বললে—তুমি আমার শিলপ পাওনি?

দীপংকর এবার মাথা তুলে বললে—আমি এখন একটু ব্যস্ত, তুমি যাও এখন—আমি পরে দেখা করবো।

—কিন্তু তুমি আমাকে ডেকে না-পাঠিয়ে নিজে গিয়েছিলে কেন? আমার জন্যে কেন তুমি এমন অপমানিত হতে গেলে? তুমি জানতে না মিস্টার ঘোষাল কী-রকম লোক? তুমি ডেকে পাঠালে না কেন আমাকে?

দীপংকর উঠে দাঁড়াল। সতী দীপংকরের মুখের চেহারা দেখে চমকে উঠলো। বললে—কী হলো তোমার?

দীপংকর বললে—আমি এখানে চাকরি করি—

—কিন্ত আমিও তো চাকরি করতে এসেছি দীপু!

দীপংকর বললে—তোমার কথা আলাদা!

—কিন্তু আলাদা বলে কি কথা বলাও বারণ? আলাদা বলে তোমার কাছেও আমি আলাদা! আমি এখানে এলে কি তোমার কাজের ক্ষতি হয়? যদি ক্ষতি হয় তো বলো, আমি আর আসবো না।

দীপংকর বললে—হ্যাঁ ক্ষতি হয়!

সতী চুপ করে রইল দীপংকরের দিকে মুখ করে। কী বলবে যেন ভেবে পেলে না। দীপংকরের গলার আওয়াজে কেমন যেন একটা গাম্ভীর্য ছিল। দীপংকরের এ-গাম্ভীর্যের সংগে তার যেন কোনও পরিচয় ছিল না এতদিন। এ যেন নতুন দীপংকর।

—তাহলে আমি চলে যাবো তোমার ঘর থেকে?

দীপংকর বললে—আমার অনেক কাজ রয়েছে হাতে—

—কিন্তু তুমি নিজের মুখে চলে যেতে বলো, তবে আমি যাবো।

দীপংকর বললে—তোমার প্যালেস কোর্টে তুমি যা খুশি করো, এটা প্যালেস-কোর্ট নয়।

—তাবলে আমাকে তুমি এই রকম করে অপমান করবে দীপু?

—তোমার আরো অপমান হওয়া উচিত! কিছুই হয়নি এখনও।

সতী খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে—বুঝেছি—

—কী বুঝেছ তুমি?

—বুঝেছি, আজকে সুযোগ পেয়ে তুমি আমার সেদিনকার অপমানের প্রতিশোধ নিলে। আজ আমার অবস্থার সুযোগ নিয়ে তুমি আমাকে এত অপমান করবার সাহস পেলে।

দীপংকর বললে—বাইরে হলে তোমার এ-কথার জবাব দিতুম, কিন্তু এটা অফিস।

—কিন্তু অফিস বলে কি মান-সম্মান-মর্যাদা-ভদ্রতা সব জলাঞ্জলি দিতে হবে? অফিস বলে কি এখানে মানুষ নয় কেউ?

—মানুষ আছে কি না, আর কিছুদিন চাকরি করলেই তা বুঝতে পারবে।

সতী বললে—কিন্তু তোমার সংগে যে আমার অনেক কথা ছিল দীপু। অনেক কথা ছিল। সব বলবার জন্যেই যে আমি এসেছিলুম তোমার কাছে! তুমি দাঁড়িয়ে কেন, বোস না, বোস!

দীপংকর তবু দাঁড়িয়ে রইল। বললে—তুমি ঘর থেকে চলে গেলে বসবো—

এবার সতীও দাঁড়িয়ে উঠলো। বললে—তাহলে তুমি কিছুই শুনবে না?

দীপংকর বললে—সেদিন প্যালেস-কোর্টে মিস্টার ঘোষালের রিভলবারের মুখে তুমি আমাকে দাঁড়াতে দাওনি, বোধহয় আজকে নতুন করে অপমান করাবার জন্যেই দাঁড়াতে দাওনি তুমি!

—তোমার হলো কী দীপু? তোমার কী হলো? তুমি তো এমন ছিলে না?

দীপংকর সে-কথার উত্তর না-দিয়ে বললে—তুমি যাও এখান থেকে, আর কথা বাড়িও না—

—আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ তুমি?

দীপংকর বললে—বাঙলা ভাষায় তো সেই মানেই দাঁড়ায়!

সতী নিঃশব্দেই চলে যাচ্ছিল, দীপংকর ডাকলে—শোন—

সতী ফিরে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে বললে—কী?

দীপংকর বললে—তুমি কি সত্যিই তোমার ভাল চাও?

সতী হাসলো এতক্ষণে। ব্যঙ্গের হাসি। তারপর বললে—আমার ভাল-মন্দ নিয়ে তুমি এখনও ভাবো তাহলে?

—বাজে কথা থাক, তুমি নিজের ভাল চাও তো তুমি এ-চাকরি ছেড়ে দাও—

—তারপর?

—প্যালেস-কোর্ট'ও ছেড়ে দাও। অন্য-বাড়িতে গিয়ে থাকো তুমি। যেখানে তোমার খুশি। কলকাতায় না থাকতে চাও, কলকাতার বাইরে গিয়ে থাকতে পারো। এখন কলকাতা থেকে সবাই বাইরে চলে যাচ্ছে, তুমিও বাইরে গিয়ে থাকো। আমি তোমার সমস্ত খরচ দেবো, তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত কিছুর দায়িত্ব নেবো, আমি কথা দিচ্ছি, তুমি এ-পথ ছাড়ো—

—থাক আর বলতে হবে না, বুঝেছি...

বলে সতী আবার পেছন ফিরে চলে যাচ্ছিল। সুইং-ডোরটার কাছে গিয়ে আবার মুখ ফেরালে। বললে—ভেবেছিলাম তুমি অন্তত অন্য পুরুষের মত নও, কিন্তু তুমিও একটা জানোয়ার, তুমিও একটা পশু—

বলতে বলতে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সতী! আর দীপংকর সতীর মুখের চেহারা দেখে পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রামমনোহর দেশাইরা সময় বোঝে, মেজাজ বোঝে, সুযোগও বোঝে। এই সব বুঝেই তিনটে রাইস মিল করেছে। পাঁচটা খাঁটি ভেজিটেবল ঘি আর তিনটে ভেজাল ভেজিটেবল ঘি-এর কারবার চালাচ্ছে।

মিস্টার ঘোষাল সত্তরটা ওয়াগনের ইনডেণ্ট অর্ডার সই করে কাগজটা দেশাইজীর দিকে এগিয়ে দিলে।

বললে—এটা আবার কেন দিলে দেশাইজী—? এ হার আমার কী হবে?

দেশাইজী হেসে বললে—এ কিছু না জী, গরীব আদমী কিছু নজরানা দিলে আপনার মিসেসের জন্যে!—আপনার মিসেসের নজরানা—

—কত দাম পড়লো?

ভাল করে কেসটা খুলে পরীক্ষা করতে লাগলো মিস্টার ঘোষাল।

—দাম কী লাগবে হুজুর? দাম কেন লাগবে? আমার তো নিজের জুয়েলারীর দুকান আছে হুজুর! দুকান থেকে নিয়ে এলুম!

—তোমার কি আবার জুয়েলারীর কারবারও আছে নাকি দেশাইজী?

—হুজুর আপনার কৃপায় সবই আছে, সব কারবার থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়েই কিছু হয়, আপনি যদি ওয়াগন দেন তো আমি একটা সরষু-তেলের কারবার করতে পারি, সরষু-তেলের কারবারে বহুত নাফা হুজুর—

মিস্টার ঘোষাল হারটা তখনও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। বললে—আর কতদিন নাফা করবে দেশাইজী!

—কেন হুজুর? যতদিন হুজুরের কিরপা থাকবে, ততদিন নাফা করবো!

মিস্টার ঘোষাল হাসলো। বললে—আর বেশিদিন নাফা করতে পারবে না দেশাইজী—

—কেন হুজুর? হুজুর কি বদলি হয়ে যাচ্ছেন?

মিস্টার ঘোষাল বললে—না, তা নয়, ক্রিপস্ সাহেব তো বিলেত থেকে এসেছিল, মহাত্মা গান্ধীর সংগে দেখা করেছে, জওহরলাল নেহরুর সংগে দেখা করেছে, সকলের সংগেই দেখা করেছে—হয়ত আজাদী হয়ে যাবে ইণ্ডিয়া, তখন কী করবে? তখন তো স্বদেশী-জমানা—

দেশাইজী হো হো করে হেসে উঠলো। বললে—আজাদী হয়ে গেলে তো আরো সুবিস্থা হবে হুজুর।

—কেন? তখন কি দিশী সাহেবদের ভেট দিতে পারবে? তারা কি ভেট নেবে তোমার? তারা তো সব জেল-খাটা লোক?

দেশাইজী আরো জোরে হাসলো। বললে—আমরা বেওসাদার আদমী আছি হুজুর—এখন যেমন বেওসা করছি, তখনও তেম[illegible] বেওসা করবো—দেখে লেবেন।

—কী করে করবে?

দেশাইজী বললে—তা করবো হুজু[illegible] আমি তো কংগ্রেস-পার্টির মেম্বর [illegible] আছি—

—তুমিও কংগ্রেসের মেম্বর?

দেশাইজী বললে—জী হুজুর! জম[illegible] বদলালে আমরা বদলাবো না হুজুর, স্বদে[illegible] জমানায় আমরা বেওসা ভি করবো, আ[illegible] বেশী নাফা ভি করবো। এ ইংরেজ-শাল[illegible] হারামী আছে হুজুর—ও-শালারা যাও[illegible] ভালো। ওরা দেশ থেকে চলে গেলে ও[illegible] বেওসা ভি আমরা লিয়ে লেব—

ততক্ষণে দেশাইজীর কাজ হয়ে গে[illegible] ইনডেণ্ট-ফর্মগুলো ব্যাগের ভেতর পু[illegible]

...উঠলো। বললে—রাম রাম হুজুর—
...রাম—

...বাইরে বেরোতেই শিবজপদ পেছন নিয়ে ...লে—সেলাম হুজুর—

...রাম মনোহর দেশাই তখনও সন্তরণ-... ...গানের আনন্দে ডগমগ করছে। সে কথায় কানই দিলে না। গট্ গট্ করে সদরের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

শিবজপদ পেছন-পেছন যেতে-যেতে বললে সেলাম হুজুর-

একেবারে গাড়ির ভেতর উঠে বসেছে দেশাইজী। গাড়ি ছাড়লো বলে।

শিবজপদ মাথা নিচু করে আবার বললে—সেলাম হুজুর-

এতক্ষণে বুঝি নজরে পড়লো। দেশাইজী বুক পকেট থেকে একটা দশটাকার আস্ত নোট বার করে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিলে। ফেলে দিতেই গাড়িখানা হুশ হুশ করে চলে

গেল। আর ওদিকে হাওয়ায় তখন নোটখানা উড়তে উড়তে চলেছে—

নোটও দৌড়োয়, দ্বিজপদও দৌড়োয়—

শেষকালে নর্দমার ধারে গিয়ে ধরে ফেলেছে। তারপর নোটটাকে পকেটে পুরে নিজের মনেই বলে—শালা যেন ভিক্ষে দিচ্ছে, শালা যেন ভিখিরি পেয়েছে আমাকে—যেমন হয়েছে শুয়োরের বাচ্চা, তেমনি হয়েছে শালার খদ্দের, সত্তরখানা ওয়াগন পেলি, আর আমার বেলাতেই যত বুড়ো আঙুল—

মিস্টার ঘোষালের ঘরের সামনে তখনও লাল আলো জ্বলছে। লাল আলো জ্বললে কারোর ভেতরে যাবার অধিকার নেই। কিন্তু ঝড়ের বেগে সতী ঘরে ঢুকলো। অফিসের আর যার জন্যে যে-নিয়মই থাক, পি-এ'র জন্যে সে নিয়ম নয়!

মিসেস ঘোষের চেহারা দেখে মিস্টার ঘোষাল চমকে উঠলো।

ততক্ষণে জুয়েলারীর কেসটা সরিয়ে ফেলেছে মিস্টার ঘোষাল। হোয়াটস্ আপ? কী হলো?

সতী সোজা নিজের কামরার দিকেই চলে যাচ্ছিল। মিস্টার ঘোষালও চেয়ার ছেড়ে উঠলো। বললে—কী হলো? কোথায় গিয়েছিলে? সেন-এর সঙ্গে দেখা করে এলে?

সতী মুখ ঘুরিয়ে একেবারে সোজা মিস্টার ঘোষালের দিকে চাইলে। বললে—তুমি আমার একটা কথা রাখবে?

মিস্টার ঘোষাল অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে—কী কথা?

—তুমি রাখবে কিনা আগে বলো?

মিস্টার ঘোষাল হঠাৎ ড্রয়ার থেকে কেসটা বার করে বললে—এটা দেখেছ? তোমার জন্যে কিনে এনেছি—

সতীও দেখলে চেয়ে। রুবি, ডায়মন্ড, স্যাফায়ার বসানো নেকলেস।

সতী বললে—কখন কিনলে?

মিস্টার ঘোষাল বললে—তোমাকে বলিনি, কাল কিনেছি, ভেবেছিলাম আজকে রিসেস-এর সময় চা খেতে খেতে তোমায় চমকে দেব! কিন্তু তুমি যে-রকম রেগে গেলে তখন—

সতী বললে—আমি রাগিনি, তুমিই আমাকে রাগিয়ে দিলে—

—তোমার পছন্দ হয়েছে? কত প্রাইস হবে বলো তো?

—জীবনে কখনও তো নিজে কিছু কিনিনি, দাম কত কী করে বলবো?

মিস্টার ঘোষাল বললে—থার্টিন থাউজ্যান্ড ক্যাশ ডাউন—

—কিন্তু এত টাকা দিয়ে কেন মিছিমিছি কিনতে গেলে আমার জন্যে? আমার তো সব গয়নাই আছে।

মিস্টার ঘোষাল বললে—সে থাক, সে তো তোমার শ্বশুর-বাড়িতে আছে—

সতী হাতে তুলে নিলে কেসটা। মিস্টার ঘোষাল বললে—আর ইউ হ্যাপি মিসেস ঘোষ?

—আই য়্যাম, কিন্তু এত দাম দিয়ে কেন কিনতে গেলে?

মিস্টার ঘোষাল হাসলো। বললে—তোমার জন্যে আমি আর কী করতে পারি মিসেস ঘোষ?

সতী বললে—সত্যি তুমি আমার জন্যে কিছু করতে চাও?

—আই য়্যাম য়্যাট ইওর সার্ভিস মিসেস ঘোষ! অলওয়েজ—

—তাহলে মিস্টার সেনকে ট্র্যান্সফার করে দাও—

মিস্টার ঘোষালও এতটা আশা করেনি। অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে সতীর দিকে। বললে—আর ইউ শিওর?

সতী বললে—হ্যাঁ যা বলছি তুমি করো, আমি এখানে চাকরি করবো ওর চোখের সামনে, তা হয় না। হয় তুমি আমাকে ট্র্যান্সফার করো, আর নয়তো ওকে—। যেখানে হোক, যে কোনও ডিভিশনে—

—কিন্তু কেন? কী হলো হঠাৎ?

সতী তখনও হাঁফাচ্ছে। যেন দীপঙ্করের সমস্ত কথাগুলো আবার মনে পড়ে গেল। বললে—ও একটা জানোয়ার, ও একটা পশু—

মিস্টার ঘোষাল কঠিন হয়ে উঠলো। বললে—তোমাকে ইনসাল্ট করেছে সেন?

—সব কথা আমি তোমাকে বলতে পারবো না। কিন্তু ওর চোখের সামনে একই অফিসে আমি চাকরি করতে পারবো না—ওকে আমি আর টলারেট করতে পারছি না—হি ইজ এ ড্যাম নুইসেন্স হিয়ার—

মিস্টার ঘোষাল বললে—অলরাইট, আমি মিস্টার ক্রফোর্ডকে আজই নোট দিচ্ছি—

বললেই চেয়ারে মিস্টার ঘোষাল কলিং-বেলের ওপর জোরে ঘা মারলে।

বাইরে থেকে আওয়াজ এল—হুজুর—

দ্বিজপদ ঘরে এসে দাঁড়াল। মিস্টার ঘোষাল বললে—টী—

রেলের অফিসের বাবুদের টেবিলে তখন অনেক কাজ। ওয়ার-ট্র্যাফিক মাথা খারাপ করে দিয়েছে সকলের। এজেন্টের অফিস থেকে সকালবেলা একটা অর্ডার আসে, দিল্লীর বোর্ড থেকে আসে উল্টো অর্ডার বিকেল বেলা। তারপর আছে লোক্যাল ট্র্যাফিক। কলকাতার সমস্ত লোক সার বেঁধে চলেছে রেল-স্টেশনের দিকে। ডালহৌসী, স্ট্র্যান্ড রোড, হাওড়া ব্রীজ ধরে একেবারে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে চলেছে মানুষের মিছিল। মানুষের কোলে ছেলে, মাথায় মোট! ঘোড়ার গাড়ির মাথায় মানুষের দল বসে বসে চলেছে। সমস্ত

খাটাল উজাড় করে হিন্দুস্থানীরা চলেছে—সঙ্গে সঙ্গে চলেছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গরু-মোষ-ছাগল-ভেড়া। গরু-মোষের পাশাপাশি মানুষও চলেছে। কলকাতার মানুষ মরতে চায় না, তাই কলকাতা থেকে পালিয়ে বাঁচবে।

সমস্ত অফিস যখন ছুটি হয়ে গেল, মধু এল ঘরে।

দীপংকর বললে—কিছু বলবি মধু?

মধু বললে—সবাই চলে গেছে হুজুর?

দীপংকর বললে—তুইও যা, আমার যেতে দেরি আছে—

তারপর ক্রমে সমস্ত অফিসই ঠান্ডা হয়ে এল। কোথাও কোনও শব্দ নেই। ওয়ার-ট্র্যাফিকের কাজ করতে হঠাৎ মনে হলো কোথায় যেন একটা কী শব্দ হচ্ছে। হয়ত পাশের বাথরুমে কলের জল পড়ছে টপ্ টপ্ করে। কিম্বা হয়ত ফাইলের গাদায় ইঁদুর ঢুকেছে। কিম্বা হয়ত সে-সব কিছুই নয়। অন্য শব্দ! বহুদিন আগে কলেজে পড়বার সময় হাইনের লেখা লাইনগুলো মনে পড়লো—

In the silence one can hear a soft monotonous dripping. It is the dividend of the capitalist continuously trickling in, continuously mounting up. One can literally hear them multiply, the profits of the rich. And one can hear too, in between, the low sobs of the destitute, and now and then a harsher sound, like the knife being sharpened.

আজ এতদিন পরে দীপংকর সেই পুরোন কথাগুলোর মানে যেন বুঝতে পারলে। কোথায় কিয়েভ, কোথায় ওডেসা, কোথায় খারকভ, কোথায় লেনিনগ্রাড, কোথায় সেভাস্টোপল্—সেখানে যুদ্ধ করছে কারা, আর এখানে রেলের অফিসে চলেছে আর এক যুদ্ধ, আর এক লড়াই। টাকার লড়াই ডিভিডেন্ডের লড়াই, রাইব আর ডিবচারির লড়াই।

দীপংকর উঠলো। তখনও সেই শব্দটা কানে আসছে। একটানা একঘেয়ে শব্দ। ডিভিডেন্ড, শেয়ার, ইন্টারেস্ট, প্রপার্টি। একটানা, একঘেয়ে। প্রমোশন, ট্রান্সফার, ইনক্রিমেন্ট।

নির্মল পালিত সেই কথা বোঝাচ্ছিল প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে।

—তোমরা যাবে না বাবা কলকাতা ছেড়ে?

নির্মল পালিত বললে—আমি তো যেতে পারলে বাঁচতাম মা-মণি—কিন্তু যাই কী-করে বলুন?

—কেন?

নির্মল পালিত বললে—এই আপনার প্রপার্টির একটা ব্যবস্থা না করে যাই কী করে? আমি আপনার সব প্রপার্টি বেচে লিকুইড ক্যাশ করে দিয়ে তবে ছুটি পাবো, তার আগে নয়।

মা-মণি বললে—তোমার বাবাই তো এর জন্যে দায়ী বাবা! আমি কি এ-সব চেয়েছিলুম? আমি বিধবা মানুষ, একটু ধর্ম-টর্ম করে শেষের ক'টা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই যথেষ্ট মনে করতুম, কিন্তু তোমার বাবাই সব কাল করে গেলেন—

—কিন্তু রাতারাতি তো আর সংসার ছেড়ে যেতেও পারেন না আপনি!

—হ্যাঁ আমার আবার সংসার। সংসারের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে বাবা! টাকাগুলো ব্যাঙ্কে রেখে মাসে মাসে সুদ পেলেই আমি খুশী। সেই সুদ নিয়ে একটা জীবন আমার কাশীতেই কেটে যাবে—

—কিন্তু সনাতনবাবু? তাঁকে দেখবার কে থাকবে এখানে?

—যে-যার কপাল নিয়ে সংসারে এসেছে বাবা। আমি কী করবো। আমি তো তার ভাল করতেই চেয়েছিলুম আর তার ভালোর জন্যেই ছেলের বিয়ে দিয়েছিলুম। আজ যদি বউ ভাল হতো আমার তো ভাবনা ছিল না। এতদিনে ছেলে-পিলেতে ঘর ভরে যেত! কত বাড়িতে তো যাই, কত আনন্দ করে আছে সবাই দেখি। কিন্তু দেখ না, এ যেন ভূতের বাড়ি হয়েছে। যেন শ্মশানের মধ্যে বাস করছি বাবা! যেন শ্মশান, বাড়ি নয় তো! এবার একপাল শকুন এসে বাগানে বসে না কেন তাই ভাবি! এই দেখ না বাবা, আগে তবু মালী ছিল, গাড়িটা ছিল, ড্রাইভারও ছিল, রাগ করে সব বেচে দিলাম। সকলকে ছাড়িয়ে দিলাম—

—কিন্তু কেন বেচলেন? টাকার জন্যে?

মা-মণি আর কথা বাড়ালে না। বললে—থাকগে ও-সব কথা। ও-কথা ভাবতেও খারাপ লাগে বাবা। তুমি আসো তাই একটু যা কথা বলে সুখ পাই। তুমি তো সবই জানো, তোমাকে বলতে দোষ নেই—ছেলের সঙ্গেও আমার বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ!—আমি শ্মশানে বাস করছি বাবা, ক্যাওড়াতলার শ্মশানও এর চেয়ে ভাল আমার কাছে—

হঠাৎ বাইরে কার জুতোর আওয়াজ পেতেই নির্মল পালিত মুখ ফেরালে। মা-মণিও ফিরে দেখলে।

নির্মল পালিতই মুখ খুললে প্রথম। বললে—আরে তুই?

দীপংকর বললে—আমি সনাতনবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই—

নির্মল পালিত মা-মণির মুখের দিকে একবার চাইলে। মা-মণি বললে—কী দরকার?

দীপংকর বললে—আমার বিশেষ জরুরী একটা দরকার আছে—

অন্যদিনের চেয়ে দীপংকরের মুখটা যেন আরো গম্ভীর, আরো করুণ দেখালো!

(ক্রমশ)

॥ উনত্রিশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকেঃ

ঘন্যাকুল, ৪ঠা অক্টোবর। এখনও বিকাল চারটে বাজেনি, অথচ আমরা কেউ মার্চ করছিনে। তাঁবুর মধ্যে ঢুকে বসে আছি। বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য আর কী ই বা করতে পারতাম! তাঁবুতে বসে দিনলিপি লিখছি! এই চিন্তাটাও যথেষ্ট রোমাঞ্চকর! আমাদের তাঁবুটা বেশ হাল্কা। হাই অলটিটিউড তাঁবু। সবুজ রঙ। একটু উঁচু। মাথা সোজা করে বসা যায়। সুকুমারকে ধন্যবাদ, এমন তাঁবুটাই আমাদের জন্য ছেড়ে দিলে। আমার তাঁবুর আরেকজন শরিক বীরেনদা। ওদিকে সুকুমার আর ধ্রুব, বিশ্বদেব আর মদন, দিলীপ আর নিমাই এক একটা তাঁবুতে জায়গা পেয়েছে। ডাক্তার কর বললেন, অসুস্থ আজীবাকে তাঁর তাঁবুতে রাখতে। একটা ছোট তাঁবু ছিল, সর্দার আঙ শেরিং তার মধ্যে গিয়ে ঢুকল। দুটো ত্রিপল সঙ্গে ছিল। একটা দিয়ে মালপত্র ঢাকা হল। আর একটা দিয়ে কিচেন বানান হল।

শেরপারা খুঁজে খুঁজে একটা পাথুরে খোঁড়ল বের করেছে। পাথরটা এমনভাবে হেলে আছে একদিকে, যেন একটা ছাত, যেখানে বেশ প্রশস্ত একটা গুহার মত হয়ে গেছে। শেরপারা গুহার মুখটার উপরে ত্রিপল দিয়ে ছাউনি করে দিলে। এখন বৃষ্টি ঢোকে সাধ্য কি? এটা হল আমাদের কিচেন, ডাইনিং রুম আর বৈঠকখানা। বাকি শেরপারা এখানেই শোবার ব্যবস্থা করল। দিলীপ রেডিওটাও এখানেই বসিয়ে দিলে।

আমাদের তাঁবু যে জায়গায়, কিচেন সেখান থেকে একটু দূরে হল বটে, তবু বলতেই হবে, ধারে কাছে এর চেয়ে আর ভাল জায়গা ছিল না। সকাল সকাল খেয়ে নিলাম। বেজায় ঠান্ডা পড়েছে। রেডিও সিলোন ধরে হিন্দি গান শোনা হল। সেই গানের সঙ্গে আমার আর নিমাই-এর নৃত্যও হল খানিক। তারপর কফি খেয়ে গরম জলের বোতল নিয়ে যে যার তাঁবুতে ফিরে এলাম।

বিকালে বসে বসে খাতায় একটু আঁচড় কেটেছিলাম। আবার খাতাটা নিয়ে বসলাম।

তাঁবুতে ঢোকা আর সেখান থেকে বের হওয়া এক দারুণ কসরতের ব্যাপার। প্রথমত আমাকে তাঁবুর মধ্যে গুঁড়ি মেরে ঢুকতে হবে। ঢুকতে হবে উপুড় হয়ে কিন্তু ভিতরে যাওয়া মাত্র শরীরটিকে উল্টে চিৎ করে এয়ার ম্যাট্রেসের উপর ফেলে দিতে হবে। এই প্রথম কসরতের পর দ্বিতীয় কসরতের পালা শুরু হবে জুতো খোলার সময়। আমার ভুঁড়িটি এতদিন স্বাধীন-ভাবে বেড়ে উঠেছে। পাহাড়ি পথে চলার সময় তার স্বাধীনতায় প্রায়শই হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে বলে তার বোধহয় ধারণা হয়েছিল। তাই, মাঝে মাঝে আমার বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ভুঁড়িটি বিদ্রোহ করে আপন অস্তিত্বটি জানিয়ে দিত। বিশেষ করে জুতো খোলা বা পরার সময় আমার হাত এবং জুতোর মধ্যে বেশ ব্যবধান সৃষ্টি করে রাখত। কি আর করব, হাঁসফাঁস করতে করতে জুতোর ফিতে খুলতে হল। তৃতীয় কসরতটি হল শরীরটাকে সেই সামান্য একটুখানি জায়গার মধ্যে বাঁকিয়ে ঢুকিয়ে স্লিপিং ব্যাগের ভিতর ঢোকান এবং সেখান থেকে বের করে আনা। প্রায় জামাই ঠকানো প্রক্রিয়া আর কি?

বীরেনদার শরীরটা আমার থেকে অনেক বেশি চটপটে। আমি যতক্ষণে জুতো খুলে পা দুটো ভিতরে এনেছি ততক্ষণে বীরেনদার স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢোকা সারা।

যা হোক, তবু এই বিড়ম্বনাও আমার ভাল লাগছে। আমার আনাড়িপনায় বীরেনদা হাসে। আমিও হাসি। বে[...] মজাই লাগছে। ঘন্যাকুল জায়গাটা ছবির মত। একটু দূরে বৃষ্টির জলে স্ফীত হয়ে একটি স্রোতোধারা প্রচন্ড গর্জন [...] প্রপাতের মত আছড়ে পড়ছে নিচে। এ[...] শব্দটা সেই অপরিসীম নির্জনতার ম[...] অনেকগুণ ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

হঠাৎ মনে পড়ল ধোটিয়াল মালবাহকদের কথা। এই বৃষ্টিতে তারা কোথায় গেল, কোথায় আশ্রয় নিল? রিণিতে [...] লোকালয় ছিল। এরা সে সব জায়গাতে আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু এখানে?

শেষ লোকালয় ছেড়ে এসেছি মো[...] গ্রামে। আর লোকালয় নেই কোথাও। [...] ওরা এই বৃষ্টিতে আশ্রয় নেবে কোথায়? বেচারি সব! ভাবনা হল ওদের [...] বীরেনদা ভাবছে তার ক্যামেরার [...]

চলতে চলতে পথের মধ্যে অবসর

আক্কেল সিং-এর পিঠে এই সব ক্যামেরা বোঝাই করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই রকম বৃষ্টি পড়লেই ত হয়েছে। একটু জল ঢুকলেই বারটা বেজে যাবে ম্যামেবার। তাঁবুর ভিতরে জল চুঁইয়ে পড়ছে। স্লিপিং ব্যাগ, কিট ব্যাগ, এয়ার ম্যাট্রেস ভিজে উঠেছে। বীরেনদা ক্যামেরার জন্য উসখুস করছে। বেশ ঘুম পাচ্ছে আমার। আজ এই পর্যন্ত।

ডাক্তারের দিনলিপিতে লেখা ছিল: ৪ঠা সকালে এলাম ঘন্যাকুল। বৃষ্টি। কারোরই জামাকাপড় পর্যাপ্ত ছিল না। তাই অনেকেই সর্দি কাশি ইনফ্লুয়েঞ্জার হাত থেকে রক্ষা পায়নি। পথে, মোরাণা গ্রামে চিকিৎসা করতে হয়েছে। গ্রামশুদ্ধ প্রায় সবাই রোগী। অধিকাংশেরই ব্যাধিই হচ্ছে, পেটের, গলার আর চোখের। এক যুবক চাষী এল। বেশ সুন্দর দেখতে। কিন্তু চলতে পারে না। দেখলাম হিপ জয়েণ্টে ব্যথা। ইনজেকশন দিতে হল। গুণদিনের হিল ডায়ারিয়া হয়েছে। আজীবা একটু সুস্থ।

লেখকের দিনলিপি : ৫ই অক্টোবর। আবহাওয়া খুব খারাপ। সারাদিনেও আকাশ পরিষ্কার হল না। সত্যিই এবার ভাবিয়ে তুললে। উঁচু উঁচু পাহাড়গুলোতে শ বরফ পড়েছে। মেঘ আর কুয়াশা দলা াকাতে পাকাতে অনবরত নিচু থেকে পরে উঠে আসছে। জলভরা মেঘগুলো মাদের তাঁবুতে এসেও যেন গুঁতো চ্ছে। ভেসে চলে যাচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে মাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। আমরা থন সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচুতে।

বিপদের উপর বিপদ। আমাদের ইড্ থেলু সিং জানিয়ে দিলে, সে মাদের সঙ্গে আর যাবে না। যেতে পারবে না। কী সর্বনাশ! আমরা চমকে উঠলাম। কেন থেলু সিং, কেন যাবে না তুমি? থেলু সিং বলল, দেখ সাব্, হাম বহোৎ বুড্ঢা হ্যায়। এই আবহাওয়ায় আমার মত লোকের সাধ্য হবে না, এই দুর্গম পথ অতিক্রম করা। হাম বুড্ঢা হ্যায়, বহোৎ বুড্ঢা। সকেগা নেহি। তা সে কথা আগে বলনি কেন? এখন এই জংগলে আমরা দুসরা আদমি কোথায় পাব? আমরা একটু গরম হয়ে উঠলাম। তোমাদের কি কৃতজ্ঞতা বোধ নেই থেলু সিং? এই যে আমরা মোরনায় এত লোকের চিকিৎসা করলাম) ওষুধ দিলাম তোমাদের। আর সেই তোমরা কিছুই করবে না আমাদের জন্য।

হাম বুড্ঢা হ্যায় সাব্। লেড়কা জওয়ান হ্যায়। লেড়কা জায়েগা। থেলু সিং এমন ভাবে কথা বলল, কেউ বুঝতে পারল না। লেড়কা জওয়ান হ্যায়। সব আচ্ছা জানতা। লেড়কা জায়েগা।

থেলু সিং-এর কথা আঙ শেরিং বুঝল। বলে, কই তোমার লেড়কা? থেলু সিং বলে, আয়েগা। আলু লেকে আয়েগা।

আঙ শেরিং আমাদের বললে, ওর ছেলে আলু নিয়ে আসছে আমাদের জন্য। সেই যাবে আমাদের সঙ্গে।

সত্যিই থেলুর ছেলে এল। মোরনাতে ওকে আমরা দেখেছি। লাজুক খুবই। বেশ সুন্দর চেহারাটি। নাম গোরা সিং। এইবার গাইডের সমস্যা মিটল। আর আশ্চর্য, এই জনমানবহীন প্রান্তরে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল আমার রাণার। বেশ চটপটে একটা লোক জুটে গেল আমার। নাম কেদার সিং। বিখ্যাত ভারতীয় পর্বতারোহী গুরুদয়াল সিং-এর সংগে খুব ঘুরেছে কেদার সিং।

বিশ্বদেবের দিনলিপি : সকালে উঠেই আকাশের দিকে চাইলাম। আকাশ অপ্রসন্ন। মেঘ মেঘ, কালো কালো মেঘ সারা আকাশ ছড়িয়ে রয়েছে। বৃষ্টির বিরাম নেই। সকালের খাবার কেউ যেন আর ভাল মনে মুখে তুলতে পারছিনে। মেজাজ নেই কারও। গতকালও যে সব পাহাড় পরিষ্কার ছিল, আজ দেখি সে সব বরফে ঢেকে গিয়েছে। ঐ বরফ যেন বিরাটাকার কোন জন্তুর ধারাল দাঁত। ভেংচি কাটছে, বিদ্রূপ করছে আমাদের অসহায় অবস্থাকে।

ঘন্যাকুলের পরের হল্ট ঠিক হয়েছে গোপাতে। কিন্তু গোরা সিং (আমাদের নূতন গাইড্) জানাল, গোপা পর্যন্ত বরফ পেঁাছে গেছে বলেই তার মনে হয়। এই অবস্থায় আজ যদি আমরা এগোই তবে মালবাহকদের বিপদ হতে পারে। তাদের গায়ে তেমন গরম পোশাক নেই, পায়ে জুতো নেই; চোখের রঙীন চশমাও নেই। শীতের কষ্টের কথা ছেড়েই দিলাম, খালি পায়ে, খালি চোখে বরফের উপর দিয়ে হাঁটলে মালবাহকদের পা এবং চোখের ক্ষতি হবার আশংকা আছে। আঙ শেরিং পরামর্শ দিলে, আজ যাত্রা স্থগিত রাখ। আমরা সর্দারের পরামর্শ গ্রহণ করলাম।

আজ বৃষ্টি শুধু নেই, হাওয়ার ঝাপটাও আছে। এখানেই এই, উপরে ব্লিজার্ড হচ্ছে কি না, কে বলবে?

ত্রিপল দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ে কিচেন ভিজে যাচ্ছে। দুটো ত্রিপলে কুলোয়নি। আটা চাল চিনি আলু যদি ভেজে তবে ত চিত্তির। মনে হচ্ছে রান্নার সরঞ্জাম কমই আনা হয়েছে। আরও দুটো প্রেসার কুকার কয়েকটা স্টোভ, কিছু বেশি করে কারি পাউডার আনলে ভাল হত।

লেখকের দিনলিপি থেকে : আজও সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া চুকে গেল। ভাত আর ভেড়ার মাংস। গতকালের "ডিনারের"ও এই একই মেনু ছিল। ভেড়াটা মারা হয়েছিল রিণিতে দুদিন আগে। সেই মাংস কাঁচা অবস্থায় আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি। একটু একটু করে আমরা সেটা গলাধঃকরণ করছি। আশ্চর্য, একটুও নষ্ট হচ্ছে না। মদনের জ্বর হয়েছে। ওকে একটু কাহিল লাগছে। তবে সে কাহিল হয়েছে দেহে। মনে সে এখনও তাজা।

দুদিন বৃষ্টির মধ্যে উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁবুর আশ্রয়ে কাটিয়ে দিলাম। আজও সকাল সকাল তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। ভিতরকার বাতাস ভিজে ভিজে, ভারি-ভারি লাগল। আজ কেন যেন চট করে আর ঘুম আসতে চাইছে না। কতক্ষণ জেগে ছিলাম, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনে।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড হৈ চৈ চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। বীরেনদাও দেখি তড়াক করে উঠে পড়েছে। বাইরে থেকে নিমাই-এর গলা শোনা গেল। দিলীপও চেঁচাচ্ছে। "বাইরে এস, বাইরে এস জলদি।" কী হল রে বাবা, এত রাত্রে। জুতো ফুতো এ'টে বেরিয়ে পড়লাম তাঁবুর বাইরে। বেরিয়ে দেখি বিবাট জটলা। সবাই এসে গেছে। আকাশের দিকে আঙুল তুলে ওরা বললে, "দেখ, দেখ।"

দেখলাম, বৃষ্টি থেমে গেছে। মেঘ ছিঁড়ে পূর্ণিমার চাঁদ মুখ বার করে হাসছে। কালো কালো মেঘ দ্রুত ভেসে যাচ্ছে। এক অপার্থিব আলোছায়ার খেলা শুরু হয়েছে। এই পরিবেশে আমাদের ঘোর লেগে গেল। সবাই চেঁচাচ্ছে, লাফাচ্ছে, গান করছে, নাচছে, কোলাকুলি করছে। সবাই যেন পাগলা হয়ে গেছি।

তাঁবুতে ঢুকে পর্দাটা বাঁধবার আগে আবার একবার আকাশের দিকে চাইলাম। আকাশে তখনও পূর্ণচাঁদের মায়া বিরাজ করছে। হঠাৎ আমার মনে পড়ল, আরে তাই ত, আজ যে কোজাগরী পূর্ণিমা। আমাদের বাড়িতে ত আজ লক্ষ্মীপুজো। ওরা নিশ্চয়ই আলপনা দিয়েছে। স্পষ্ট সব ভেসে উঠল চোখে। চাঁদের আলোটাকে কেন জানিনে, আমার দস্যি মেয়ে ঝুমুরের দুষ্টু দুষ্টু হাসির মতই মনে হল। মনে পড়ল, আসবার সময় সে কেঁদে গড়িয়ে পড়েছিল। সেই কান্না যেন যোজন যোজন ব্যবধান অতিক্রম করে পাহাড়ি নদীর আর্তনাদের সঙ্গে মিশে যেতে লাগল। মনটা বিষন্ন হয়ে গেল। আশ্চর্য, এতদিন বাড়ির কথা একবারও মনে হয়নি। পাহাড় কত স্বার্থপর! আর কারও কথা মনে পড়তে দেয় না।

ফারা খড়কে কুলিরা গাছ পালা দিয়ে তাদের থাকবার আস্তানা তৈরী করে নিচ্ছে।

॥ ত্রিশ ॥

নেচে কুঁদে গান গেয়ে, তারপর আবহাওয়া ভাল করে দেবার জন্য আকুল প্রার্থনা জানিয়ে ওরা ফের যখন তাঁবুর ভিতরে গিয়ে ঢুকল, তখন বেশ রাত।

তারপর রাত পোহাল। অন্ধকার তখনও কাটেনি। তাঁবুর দরজা ঠেলে একখানা আবছা হাত সুকুমারের মাথার কাছে এগিয়ে গেল। "সাব্ চা, গুড্ মর্ণিং লীডার সাব্, গুড্ মর্ণিং ম্যানেজার সাব্, চা।" কুক হরি সিং-এর আওয়াজ পাওয়া গেল। সুকুমার অতি কষ্টে চোখ মেলল। অন্ধকার। তাঁবুর ভিতর বেশ অন্ধকার। চোখদুটো রগড়ে নিল সুকুমার।

বলল, "গুড্ মর্ণিং হরি সিং।"

হাত বাড়াল। দু হাতে দু মগ চা নিল। একটা হাত ধ্রুবর দিকে বাড়িয়ে দিল।

"ধ্রুব, এই ধ্রুব, চা।"

ধ্রুব একটু বিরক্ত হল। তার ঘুম পোরে নি। খুব চটে গেল হরি সিং-এর উপর। সুকুমারের হাত থেকে মগটা প্রায় এ হেঁচকায় ছিনিয়ে নিল। এক চুমুক গর চা পেটে পড়তেই মেজাজটা বশে এল। ম হরি সিং লোকটা কাজের আছে। ধ্রু প্রফুল্ল মনে চায়ের মগটি খালি করে দিল তারপর কালবিলম্ব না করে শুয়ে পড়ল এবারে ঘণ্টাখানেক নিদ্রা। সদ্য ত শরীরটি এলিয়ে এসেছে, অমনি "গু মর্ণিং, গুড্ মর্ণিং সাব্" শুনে সে চম উঠল। এই রে, সেরেছে! আগু ফুতা

ধ্রুবর আন্দাজ মিথ্যে হবার নয়। সত্যি আগু ফুতার। হাতে মাল্টি-ভিটামি ট্যাবলেট।

ধন্যাকুল থেকে ফারা খড়ক যাওয়ার পথে একটি জংগল।

"গুড্ মর্ণিং সাব্।"

"গুড মর্ণিং ফতুার সাব্।"

"ট্যাবলেট্ সাব্।"

"দেও সাব্।"

ধ্রুব সুবোধ বালকের মত ট্যাবলেট দুটো ভিটামিন ট্যাবলেট খাইয়ে যেতে। দুটো নিয়ে নিল। না নিলে কি হয়, যাচাই করতে ভরসা পায়নি। ডাক্তার আঙ ফতুারকে ভার দিয়েছিল, যতজন ক্লাইম্বার আছে, প্রত্যেককে সকালে দুটো বিকালে নিমাই-এর অভিজ্ঞতার পর ধ্রুব আর তা আঙ ফতুার অতি বিশ্বস্তভাবে তার দায়িত্ব পালন করে যেতে লাগল। নিমাই-এর আবার ট্যাবলেট ফ্যাবলেট মুখে রোচে না। ও তাই আঙ ফতুারের হাত থেকে এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আঙ ফতুারকে কর্তব্যচ্যুত করা নিমাই-এর কর্ম নয়। নিমাই "বনমালীবাবুর বাড়িতে" গিয়ে সবে বসেছে, হঠাৎ "গুডমর্নিং সাব্" শুনে চমকে উঠে দাঁড়াল। তার তখন পুরোপুরি আনরেডি অবস্থা।

আঙ ফতুারের কোন দিকে দ্রূক্ষেপ নেই। সে দুটো ট্যাবলেট নিমাই-এর দিকে বাড়িয়ে দিল। একগাল হেসে বলল, "সাব ট্যাবলেট।" এবং নিমাইকে সেই অবস্থায় ট্যাবলেট গলাধঃকরণ করতে হল।

এ-কাহিনী প্রচারিত হবার পর ফতুারের ত পোয়া বারো। কার সাধ্য রোধে তার গতি।

"গুডমর্নিং সাব্।"

"গুডমর্নিং ফতুার।" বিশ্বদেব তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে দিল। "দে দো বাবা ট্যাবলেট।"

"গুডমর্নিং মণ্ডল সাব্।"

"বুঝা হ্যায় বাবা, বুঝা হ্যায়।" মদনের আত্মসমর্পণ কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল। "বিশ্বাস সাবকো হাতমে দিয়ে দাও। হাম খা লেগা। উঃ, ডাক্তার, মাইরি আর লোক পেল না!"

বিশ্বদেব সাড়া দিল না। সে তখন তাঁবুর বাইরে মাথা বের করে আকাশ দেখছে। বিশ্বদেবের মুখটা কালো হয়ে গেল।

মদন জিজ্ঞাসা করল, "কিরে, আবহাওয়ার অবস্থা কেমন?"

বিশ্বদেব গম্ভীরভাবে বলল, "একই রকম। কোন পরিবর্তন নেই।"

মদন বলল, "তাহলে উপায়। আজও হল্ট্ নাকি?

বিশ্বদেবের মনেও এ-আশঙ্কা উঁকি মেরেছিল। আবার সে আকাশের দিকে চাইল। আকাশে তখন দুর্যোগের সাংঘাতিক চক্রান্ত চলেছে। আজও কি আমরা এখানে আটকে থাকব? আর এইভাবে আটকে থাকা মানে কি? প্রতিদিন প্রায় ৮০০ টাকা লোকসান। তার চাইতেও বড় কথা, ঠিক সময়ে বেস্ ক্যাম্প স্থাপন করবার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে।

শের সিং এসে সুকুমারকে বলল "সাব্, নন্দাদেবীর পুজো দাও তোমরা। একটা ভেড়া আর টাকা মানত কর। নাহলে দুর্যোগ যাবে না।"

সুকুমার দশটি টাকা মানত করল। শের সিং কপালে লাল টকটকে ফোঁটা পরে উঁচু একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কি সব মন্ত্র পড়তে লাগল। সুকুমার হুকুম দিলে, তাঁবু ভাঙো। আজ মার্চ হবে।

মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে। পাহাড়ের পর পাহাড় বরফের আস্তরণে ঢাকা। বৃষ্টির প্রশ্রয় পেয়ে পাহাড়ী নদীর স্রোত প্রপাতের গর্জন তুলছে। শের সিং-এর লম্বা লিকলিকে চেহারাটা, লাল ফোঁটা সমেত, যেন একটি কাপালিক। মালবাহকেরা, শেরপারা, অভিযাত্রীরা মালপত্র গোছগাছ করে নিতে বড়ই ব্যস্ত। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য ফুটে উঠল সেখানে।

বিশ্বদেবের দিনলিপি থেকেঃ বেরতে বেরতে সাড়ে নয়টা হল। তখনও ঘন মেঘে চারিদিক ছেয়ে আছে। আজ মার্চ শুরু করার সংগে সংগেই চড়াই শুরু হয়েছে। আর, সে-চড়াই ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগল। গৌরদা, ধীরেনদা ডাক্তার, পর্বতে এই প্রথম। ওঁদের জন্য ভাবনা হচ্ছিল। তবে ওঁরা বেশ চলেছেন। শম্বুক গতি বটে তবে অগ্রগতিতে ভাটা পড়ছে না। আজও আমরা পুরো দল একসংগে হাঁটছি। গৌরদার গতি সব থেকে ধীর। তাই দলটার গতিও ধীর।

এতে অসুবিধে হচ্ছিল আমার, মদন আর দিলীপের। আমাদের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হতে থাকায় আমাদের পরিশ্রম বেড়ে যাচ্ছিল। অস্বস্তিও লাগছিল।

চড়াই ভাঙতে ভাঙতে প্রায় নয় হাজার ফুট উপরে উঠলাম। এখন জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে। খুব যে উঁচু গাছের জঙ্গল তা নয়। গাছগুলি নীচু নীচু, তবে খুব ঘন। আমার উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানে কোন জ্ঞান নেই। যাহোক আমার কাছে যা ভাল লাগল, আশ্চর্য লাগল তার কিছু কিছু নমুনা আমার পিঠঝুলিতে ভরতে লাগলাম। মালবাহকদের জিজ্ঞাসা করে করে সেসব জিনিসের গাড়োয়ালি নাম সংগ্রহ করতেও শুরু করলাম।

রোডোডেনড্রনকে এরা বলল চিমালা। ভূর্জপত্রের গাছ, বনসুর, এদিকে প্রচুর। বনসুরের ফল অনেকটা আঙুরের মত দেখতে, রঙটা কালো হয়। মালবাহকেরা ত বলল যে, এ-ফল ওরা খায়। এক রকম গাছের পাতা খানিকটা ডুমুরের পাতার মত—তার নাম বললে, আঁইশালু। গাছটি মাথায় বাড়ে ৬।৭ ফুট। থোকায় থোকায় ফল হয়। একসঙ্গে ৮।১০ থোকা। দেখতে এলাচের দানার মত। পাকলে লাল হয়। এ-ফলও ওরা খায়। আরেক রকম গাছ দেখলাম, পাতা আমাদের দেশের তিত-ফলতা পাতার মত। নাম বললে, ফাঁপর। এ-গাছ ৫।৬ ফুট উঁচু। এর পাতা ভেড়াতে খায়, ফল খায় মানুষে। চুথ্যো বলে যে-গাছ দেখাল, তা একেবারে আমাদের বৈঁচি ফলের গাছের মত। এর ফলও ওরা খায়। এছাড়া আলিয়া দোলিয়া, চুলিয়া, ধূপ-পাতি, বন-রসুনের গাছও ওরা আমাকে দেখাল। শেরপারা বন-রসুনের গাছ সংগ্রহ করে নিল। বললে, চাটনি বানাবে। ৮ থেকে ১১ হাজার ফুটের মধ্যে এসব গাছ পেলাম।

বন-জংগলের অবস্থা, বিশেষ করে ঘন আগাছার জংগলই আমাদের জানিয়ে দিল, এদিকে বেশ বৃষ্টি হয়। বর্ষার প্রারম্ভ থেকে আর শীতের আগ পর্যন্ত বৃষ্টি পড়ে এদিকে। সত্যি এদিকে এত বৃষ্টি যে, বড় বড় গাছগুলো দাঁড়িয়ে থেকে থেকে পচে গেছে। ধ্রুবকে কয়েকটা নমুনা দেখালাম। ধ্রুব বললে, শুধু গাছ কেন, ঐ দ্যাখ, পাথর পর্যন্ত পচে গেছে।

প্রায় দশ হাজার ফুট উঠে দেখি রোডোডেনড্রনের জংগল শুরু হয়েছে। সে জংগল এত ঘন যে, গাছ কেটে মাঝে মাঝে আমাদের পথ বার করতে হয়েছে।

লেখকের দিনলিপি:

ফারাখড়ক, ৬ই অক্টোবর। আজ এখানে (১১০২৫ ফুট) বেলা দেড়টায় এসে পৌঁচেছি। ঘন্যাকুল থেকে দুর্যোগ মাথায় করেই বেরিয়েছিলাম। আশে পাশে মেঘের চক্রান্ত দেখে মনে হয়েছিল, আজ বিলক্ষণ ভিজোবে। কিন্তু কী আশ্চর্য, একটুও বৃষ্টি পড়ল না মোটে। রোদও একটু উঠে পড়ল।

আজ বেশ চড়াই ভাঙতে হয়েছে। মাত্র মাইল তিনেক এসেছি। কিন্তু ছেদহীন চড়াই ভাঙতে গিয়ে দম বেরিয়ে গেছে। একে বৃষ্টি হয়ে পাহাড়ের গা পিছল, তার উপর খাড়া চড়াই, তবু এই বিপজ্জনক পথ চলতে আমার একটুও ভয় করেনি, খারাপ লাগেনি। একবার মারাত্মক আছাড় খেলাম। পা হড়কে মুখ থুবড়ে ছিটকে পড়লাম। বাঁ পাশে ছিল অতলস্পর্শী খাদ—সাক্ষাৎ মৃত্যু, ডান দিকে পাহাড়ের প্রাচীর—আশ্রয়। আর একচুল বাঁয়ে হেললেই খাদে পড়ে যেতাম। কিন্তু বিদ্যুৎবেগে শরীরটা ডান দিকে মোচড় খেয়ে পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম। আমার দুর্গতি দেখে সবাই হাসল। আমার একটুও রাগ হল না। হাসতে লাগলাম। পিঠঝুলিটার টানে কাঁধে ব্যথা লেগেছিল। উপেক্ষা করলাম।

সত্যি বলতে কি, আজ আমার সামনে মদত, পিছনে মদত ছিল। আমি যেন দার্জিলিঙের ছোট রেল। সামনে ইঞ্জিন, পিছনে ইঞ্জিন। সামনে সুকুমার, পিছনে আঙ ফুতার। ঠিক রাজার হালে পাহাড়ে চড়ছি।

প্রথমে ঠিক ছিল গোপাতে বিশ্রাম নেওয়া হবে। কিন্তু আমরা আরও আধ মাইল এগিয়ে গেলাম। চারিদিকে পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে। ওরই মধ্যে একটু সমতল জায়গা বের করে তাঁবু খাটান হচ্ছে। বীরেনদার এনার্জির আর শেষ নেই। ঘুরে ঘুরে ফটো তুলে বেড়াচ্ছে। আমার আর ডাক্তারের মাথা ধরেছে। কয়েকজন মাল-বাহকেরও মাথা টিপ টিপ করছে বলে জানা গেল। ডাক্তার জোলাপ খেল।

তারপর মালবাহকদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে ডাক্তার ওদের পরীক্ষা শুরু করল। একজন মালবাহককে খারিজ করে দিলে। সে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমায় ভুগছে। আবার আজীবা অসুখে পড়ল। তার নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। ডাক্তার বেশ করে পরীক্ষা করে দেখে বললে, ভয় নেই, সেরে যাবে। আমরা আর সবাই বেশ ফিট ছিলাম। খুব ফুর্তি আছে সকলের মনে। এখন "বাবা" ওয়েদার প্রসন্ন থাকেন তবে হয়।

এই যে, বলতে না বলতেই কেলেংকারী। এতক্ষণ বেশ আলো ছিল। এখন মোটে চারটে। দেখতে না দেখতে আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। কুণ্ডলীর পর কুণ্ডলী মেঘ উপর থেকে ছোঁ মেরে নিচে নেমে আসছে। চারিপাশের নিচু নিচু উপত্যকা থেকে সোঁ সোঁ করে মেঘ উপরের দিকে উঠে আসছে। আলোর তেজ কমে এল। কুয়াশা এসে সব ঢেকে দিল। আর-একটা অক্ষরও দেখতে পাচ্ছিনে। নাঃ, তাঁবুতে ঢোকাই ভাল। (ক্রমশ)

(২৪)

মাইকেলকে খুঁজে পেতে সত্যিই কোন অসুবিধা হয়নি সৌরেনের। ফুটপাথের উপর হাঁটু গেড়ে বসে চক দিয়ে ছবি আঁকছিলো মাইকেল। সেইদিনকার ডেলী এক্সপ্রেসে প্রকাশিত একটা কার্টুনের নকল মার্কিন ইলেকশনের ব্যঙ্গচিত্র।

সৌরেনকে দেখে মাইকেল খুশী হল। বলল এত শীগগিরই তোমার দেখা পাবো আশা করিনি।

সৌরেন জানাল, রজত আমায় আসতে বলেছে।

—তাই নাকি? তবে ওর যা সময় জ্ঞান, ঘণ্টাখানেকের এধার ওধার হামেশাই হয়।

সৌরেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল আর দেখছিল মাইকেলের কাজ, খুব দ্রুত ও ছবি আঁকে, কাজ করতে করতে গল্প করে অনায়াসে। ওর পাশেই ওলটানো রয়েছে একটা টুপি, পথচারীদের মধ্যে কেউ কেউ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে মাইকেলের ছবি আঁকা দেখে, কেউ বা দয়াপরবশ হয়ে দু' পেনি বা ছ'পেনি ছুঁড়ে দেয় টুপির মধ্যে। মাইকেল এ সময় ইচ্ছে করে অন্যমনস্ক হয়ে যায় পাছে ধন্যবাদ জানাতে হয়, কিন্তু বুদ্ধি ওর টনটনে, দাতা সরে গেলেই টুপির থেকে পয়সাগুলো তুলে নিয়ে নিজের পকেটে রেখে দেয়। হাসতে হাসতে সৌরেনকে বলে, কেন পয়সাগুলো সরিয়ে রাখলাম জানো?

—কেন?

—লন্ডনবাসীদের চেন না, যদি দেখে টুপিতে বেশ দু' পয়সা জমেছে তাহলে আর একটি পেনিও দেবে না।

সৌরেন না বলে পারল না, তুমি বেশ বিচক্ষণ।

মাইকেল হাসল, না হয়ে কি আর উপায় আছে? এইভাবে রুটি রোজগার করতে হবে তো?

খুব মন দিয়ে না শুনলে মাইকেলের কথা বোঝা মুশকিল, বিশেষ করে সৌরেনের পক্ষে। কারণ ও কথা বলে লন্ডনের কর্কনি ভাষায়, সাধু ইংরিজীর সঙ্গে তার আকাশ পাতাল তফাত।

মাইকেল এক সময় বলল, আমাদের সর্বনাশ করেছে কয়েকজন ডিটেকটিভ গল্প লেখক, তারা ফুটপাথের শিল্পীদের মধ্যে থেকে খুঁজে বার করেছে ক্রিমিন্যালদের, গল্পকে রহস্যজনক করে সাজিয়ে তোলার জন্যে দেখিয়েছে আমরা অনেক টাকা রোজগার করি। সাধারণ লোক ঐসব গল্প পড়ে আমাদের ভুল বোঝে, সহজে কেউ টুপিতে পয়সা দিতে চায় না।

ভাষা পুরোপুরি না বোঝা গেলেও মাইকেলের কথার ধরনটি বড় চমৎকার। অতি সহজে সে সৌরেনকে আপনজনের মত করে নিল।

—তাহলে তোমাদের চলে কি করে?

মাইকেল সগর্বে বলে, একরকম জো করে ভিক্ষে আদায় করতে হয়। আমা পদ্ধতি কি জান?

বলেই মাইকেল যে ছবিটা আঁকা করেছিল তা মুছে ফেলে মন থেকে একটা ছবি আঁকা শুরু করল, বলল, আমার বুদ্ধি। ছবি এঁকে আমি বসে না। তাহলে কোন শিকার ধরতে পারব এই হচ্ছে মানুষের সাইকোলজি, আমা ছবি আঁকতে দেখলে তারা থমকে দাঁড় তবেই তারা পয়সা দেয়।

মাইকেলের এই স্পষ্টবাদিতার প্রশং সৌরেন মনে মনে না করে পারল জিজ্ঞেস করল, কি রকম রোজগার তোমার?

মাইকেল ছবি আঁকতে আঁকতে জ দিল, কোন ঠিক নেই। বর্ষার সময় বা ছবি আঁকতেই পারি না। তখন রোজগার কোথায়? তবে বক্সিং ডে'র বিশেষ দিনে পাঁচ ছ' পাউন্ডও রোজ হয়ে থাকে। সারা বছর হিসেব ক গড়পড়তা পাউন্ড দুয়েক সপ্তাহে রোজ করি।

সেদিন রজত আসতে দেরি করায় মাইকেলের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করেছিল সোরেন, শুধু গল্প নয়, মাইকেল তাকে চাও খাইয়েছিল। সস্তার 'টি' স্টলে ঠিক এ ধরনের কোন চরিত্রের সঙ্গে আগে আলাপ হ'বার সুযোগ হয়নি বলেই বোধহয় মাইকেলকে সোরেনের এতটা ভাল লেগেছিল। এরপর সে সুবিধে মত অনেকবার গেছে মাইকেলের সঙ্গে দেখা করতে, তার জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনাও করেছে।

মাইকেল গরীবের ছেলে, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিল শিল্পী হবার। বাপমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে প্যারিসে পালিয়ে গিয়ে সে ছবি আঁকা শিখেছে। মাইকেল ভাল শিল্পী। অন্তত নিজে সে তাই মনে করে, কিন্তু ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা ছবির ক্যানভাস বগলে করে প্যারিস আর লণ্ডনের বিভিন্ন আর্ট গ্যালারীতে ঘুরেও কোথাও সে সুবিধে করতে পারেনি, ক্ষুধার তাড়না যখন তীব্র, এই ন্যাশান্যাল গ্যালারীর সামনে দাঁড়িয়ে সে একদিন লক্ষ্য করল ফুটপাথে যেসব শিল্পীরা ছবি আঁকছে তাদের টুপিতে লোকে পয়সা দিয়ে চলে যাচ্ছে। অথচ নিজে সে প্রকৃত শিল্পী হয়েও খাবার পয়সা জোটাতে পারছে না। এত টাকা বাজারে দেনা হয়ে গেছে যে নতুন করে কারুর কাছে ধার পাওয়া একেবারে অসম্ভব। লজ্জা শরম ত্যাগ করে, মাইকেল সেদিন ফুটপাথের উপর হাটুগেড়ে বসে ছবি আঁকতে শুরু করেছিল।

আজও মাইকেল সেই ফুটপাথের শিল্পী। সেই শিল্পী হবার স্বপ্ন সে ত্যাগ করেছে, কিন্তু বেঁচে থাকার বাসনা এতটুকুও কমেনি।

মাইকেল বলে, প্রথম দিকে যে মনে কষ্ট পাইনি তা নয় কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম এই যে, ভিক্ষে করে আমায় বেঁচে থাকতে হচ্ছে তার জন্যে আমার তো কোন দোষ নেই, দোষ আমাদের সমাজ ব্যবস্থার।

সোরেন ধীর স্বরে জিজ্ঞেস করেছে, কিন্তু তোমার ভবিষ্যৎ?

মাইকেল হাসতে হাসতে বলে, ভবিষ্যতের কথা ভাববে বড়লোকরা, আমার তো সব চিন্তা দু' টুকরো রুটির। যেদিন জুটলো, পেট ভরে খাই, না জুটলে আর উপায় কি? যেদিন বেশী পয়সা রোজগার করি টেনে মদ খাই, কখনও বা লরার কাছে যাই। এই করেই দিব্যি কেটে যাবে।

—তারপর?

মাইকেল মুখ তুলে তাকাল, তারপর আবার কি? একদিন মৃত্যু এসে আমার দরজায় টোকা মারবে, ব্যস্। সব ঝামেলা চুকে যাবে।

মাইকেলের সঙ্গে আলাপ না হলে সোরেন সত্যি ভেবে পেত না খাও দাও, আনন্দ কর এই ধরনের ফিলসফি নিয়ে কেউ থাকতে পারে। এখন সোরেন বুঝতে পারে কোথা থেকে রজত এই জীবনের স্বাদ পেয়েছে। শুধু মাইকেল নয় ওদের দলের আরও দু'একজনের সঙ্গে আলাপ হ'বার পর সোরেন দেখেছে ওদের সকলের গোত্র এক।

সেদিন রজত দেরি হলেও পরে এসেছিল, সোরেনের হাতে দু' পাউণ্ডের নোট এগিয়ে দিয়ে বলে, লরা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে, ও বিশেষ লজ্জিত।

মাইকেল বাধা দিয়ে বলে, মিথ্যে বলো না রজত, লরা লজ্জা পাবার মেয়ে নয়। তুমি নিশ্চয় অনেক চেঁচামেচি করে টাকাটা
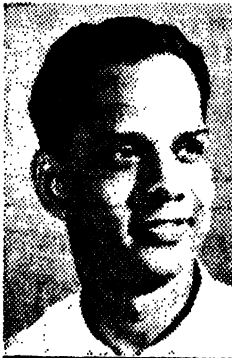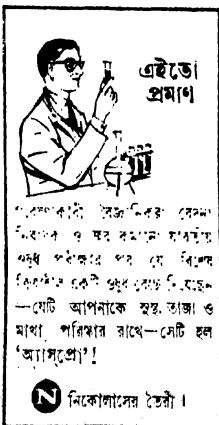
ফেরত নিয়ে এসেছ। এখনও লরা আমার পকেট থেকে টাকা তুলে নেয়, জান?

—সত্যি!

—আমি কি ভেবেছি জান, একখানা ভাল পোর্ট্রেট এঁকে যাব, লরার পোর্ট্রেট। ওর সুন্দর চেহারাটার ভেতর থেকে যদি ওর মনটাকে ফুটিয়ে তুলতে পারি, ছবি আমার অমর হয়ে যাবে।

রজত ঠাট্টা করে বলল, বলা যায় না সে ছবি ন্যাশানাল গ্যালারীর বাইরের ফুটপাথে শোভা না পেয়ে হয়ত হলের মধ্যেই বিরাজ করবে।

লরাকে সৌরেন বুঝতে পারেনি, তার সম্বন্ধে রজত এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা যে ধরনের কথা বলে তা থেকে লরা সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করা সহজ নয়। লরার সঙ্গে মেশবার সাহসও সৌরেনের ছিল না।

শুধু লরা কেন ঝাঁটার কাঠির মত লম্বা প্রস্থহীন দীর্ঘ স্টিভসকেও কেমন যেন আশ্চর্য মনে হয়েছে সৌরেনের। স্টিভস ট্রাফালগার স্কোয়ারে ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যেই দেখে কোন লোক পায়রাদের হাতে করে দানা খাওয়াবার চেষ্টা করছে, স্টিভস অমনি ছবি তোলার ভঙ্গী করে, হেসে বলে, খুব সুন্দর ছবি উঠেছে আপনার।

হয়ত ভদ্রলোক অসন্তুষ্ট হ'ন, ঝাঁঝের সঙ্গে বলেন, আমি তো ছবি তুলতে বলিনি।

স্টিভস পালটা চাপ দেয়, সেকি আপনি যে ইশারা করলেন আমায়।

—মোটেও না, আমি হাত নেড়ে পাখিদের ডাকছিলাম।

স্টিভস নিজের মনেই দুঃখ প্রকাশ করে, তাহলে আমারই ভুল হয়েছে। মিছিমিছি আপনার ছবি তুলে এক শিলিং নষ্ট হল।

ভদ্রলোকের রুক্ষতা এবার কমে, স্টিভসের কাঁচুমাচু মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমার চার্জ কত?

—মাত্র তিন শিলিং।

—আচ্ছা দাও। কপিটা নিয়েই যাই।

স্টিভস্-এর মুখ কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়, বলে এখনি আমি রেডী করে দিচ্ছি। ক্যামেরার পেছনে গিয়ে এইবার সে সত্যি-কারের প্লেট ভরে। মুখে বলে, আগের ছবিটা তত ভাল আসেনি, আমি আর এক-বার ছবিটা নিচ্ছি। এর জন্যে অবশ্য আপনাকে বেশী পয়সা দিতে হবে না।

আশ্চর্য স্টিভস-এর শিকার ধরার ক্ষমতা, দূরে থেকে চেহারা দেখে বলে দিতে পারে কোন মক্কেল তার জালে পা দেবে।

সৌরেন জিজ্ঞেস করেছিল, কারা তোমায় বেশী পয়সা দেয়?

স্টিভস হেসে জবাব দিয়েছে, বিদেশীরা, জোর করে চেপে ধরলে কিছুতেই না বলতে পারে না। একটু থেমে বলে, আমার বেশী লাভ টুরিস্ট পাকড়াতে পারলে। ধর কালই সে চলে যাচ্ছে প্যারিসে, সেখান থেকে অন্যান্য শহরে যাবে। আমি তাকে কথা দিই প্যারিসের ঠিকানায় ছবি পাঠিয়ে দেব, আসলে কিন্তু আদৌ আমি কোন ছবি তুলি না।

কথাগুলো শুনতে সৌরেনের ভাল লাগছিল না। বললে, এত জোচ্চুরি।

খনখনে গলায় স্টিভস হাসল, ওটা মনের ভুল। বাঁচতে আমায় হবে, সেইটেই বড় কথা, হাত পেতে ভিক্ষে চাইলে আইন বিরুদ্ধ বলে পুলিস আমায় ধরে নিয়ে যাবে। এত আমি বুদ্ধি খাটিয়ে রোজগার করছি, এতে কার কি বলবার আছে।

নির্লজ্জের মত কথা বলে স্টিভস, বিদেশী-দের ছবি তুলতে গিয়ে সে যে তাদের কানে কানে রূপোপজীবিনীদের ঠিকানা বলে দিয়ে দু'এক শিলিং বকশিশও আদায় করে, সে কথা জানাতেও এতটুকু দ্বিধা করে না।

সৌরেন ভেবে পায় না, রজত কি করে এদের সঙ্গে দিন কাটায়, কি আনন্দ সে পায় এদের সংসর্গে। একদিন 'সোহো'র বারে বসে সে রজতকে সরাসরি এই প্রশ্ন করে। রজত চোখ দিয়ে মিটিমিটি হেসে বলল, জানতাম তোর ভাল লাগবে না, তুই যে অ্যারিস্টোক্র্যাট। ঐ আড়ষ্ট কবিদের সমাজে নাম লিখিয়েছিস্।

সৌরেন বিরক্ত হয়ে বলে, কতগুলো চোর জোচ্চোরের সঙ্গে মেশার যে কি বাহাদুরি আমি বুঝতে পারলাম না।

রজত বীয়ারের "জাগে" লম্বা চুমুক দিয়ে বলে, আমি ওদের ভালবাসি। ভালবাসি, ওরা সহজ বলে, কোন রকম ভড়ং ওদের নেই।

—কিন্তু ওরা কি?

রজত সৌরেনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, কেন তোমার কি মনে হয়?

সৌরেন তেতো গলায় বলে, মানুষ নয়, পশু।

রজত এক চুমুকে বাকী বীয়ারটুকু শেষ করে, ঐ জন্যেই তো ওদের ভালবাসি।

—তার মানে।

—কারণ ওরা পশুর মতই থাকে, একবারও চেষ্টা করে না নিজেকে অন্যভাবে চালাতে, যে রকম তোমরা নিজেদের চালাও।

সৌরেন স্তব্ধ হয়ে যায়।

রজত উত্তেজিত হয়ে পড়ে, টেবিলের উপর একটা চাপড় মেরে বলে, মানুষের definition কি জান ত? Man is a rational animal। মানুষ সেই জাতের পশু যার বিচারবুদ্ধি আছে, বিবেকবোধ আছে। কিন্তু আমাদের ভেতরকার ঐ পশুত্বটাই কি বারবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে না? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নৃশংসতা দেখেও কি এই প্রত্যয় দৃঢ় হয়নি যে আমরা জানোয়ার ছাড়া আর কিছুই নই? দেখনি

...আমাদের দেশে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গার নামে ...সেই জন্তুটার আস্ফালন? তবে আর মিথ্যে ...tionalityর মুখোশ পরার চেষ্টা করা কেন?

সৌরেন ভাবতে পারেনি রজত এতখানি বিচলিত হবে। এখন তাকে বাধা দিতে সৌরেনের ভয় করে।

রজত দূরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বলে যায়, বিজ্ঞানের এত উন্নতির কথা আমরা শুনি, সভ্যতা আর সংস্কৃতির ঢাকের শব্দে কান আমাদের কালা হবার যোগাড়। কিন্তু মানুষের কি উন্নতি হয়েছে বলতে পার? সেই আদিম যুগের মানুষের সঙ্গে আজকের মানুষের কতটুকু তফাত? শিশু জন্মায়, খায়-দায়, বড় হয়। একদিন দেহের কান্না উপলব্ধি করে, সংসার পাতে। ছেলে-মেয়ে হয়, তারপর মৃত্যু। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ঈর্ষা, দ্বেষ, মোহ, আনন্দ, ভয়, এই-সব অনুভূতির মধ্যে দিয়ে সেদিনের মানুষকেও যেতে হয়েছে, আজকের মানুষও যাচ্ছে। আনন্দে আমরা হাসি, দুঃখে কাঁদি। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে হয়ত আমাদের বসবাসের সুখ-সুবিধা হয়েছে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তার বেশী আর কিছু না। এতটুকু স্বার্থে আঘাত লাগলেই আমাদের ভেতরকার পশুটা গর্জন করে বেরিয়ে আসে।

সৌরেন আস্তে আস্তে বলে, কিন্তু এ থেকে তুমি বলতে চাইছ কি?

রজত দৃঢ়স্বরে বলে, আমি বলতে চাই ঐ মাইকেল, ঐ লরা, ঐ স্টিভস্, ঐ কানা জোনস্, ওরা পশুর মত থাকে বটে, তার জন্যে দুঃখ করে না, মিথ্যে ভদ্রলোক সাজার ভান করে না। ওদের মধ্যে একটা সত্য আছে। সে সত্যটা হয়ত অমার্জিত, হয়ত স্থূল, কিন্তু তবু সেটা সত্য। আমি সেই সত্যটাকে ভালবাসি।

পয়সাটা চুকিয়ে দিয়ে রজত উঠে দাঁড়াল।

সৌরেনকে নিয়ে বেরিয়ে ... বন্ধুতে পাশাপাশি হাঁটে, সৌরেন বুঝতে পারে রজত একেবারে অন্যমনস্ক। সে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে।

এক সময় রজত হঠাৎ বলতে শুরু করে, আমাকে বোঝা তোর পক্ষে সম্ভব নয়, শুধু তুই কেন কেউই তো আমায় বোঝে না। ওরা সবাই মনে করে আমি ছন্নছাড়া, আমি মাতাল, আমি দুশ্চরিত্র। তাদের কোন অভিযোগই আমি অস্বীকার করছি না। স্বীকার করছি সব কটা দোষই আমার আছে, এবং থাকবেও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, কিন্তু কেন? কই, সে কথা তো একবার কেউ ভেবে দেখল না।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়েছিল তিন কোনা দ্বীপের মত ছোট্ট একটুকরো পার্কের মধ্যে। তিন দিক দিয়ে রাস্তা চলে গেছে, সামনের খালি বেঞ্চিতে দুজনে গিয়ে বসল। সৌরেনের কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে রজত ধরায়। বলে, তুই ত দেখেছিস মারিয়া আর আমি এক সঙ্গে থাকতাম, মারিয়া চলে গেছে, এখন ঘুরছি লরা'র সঙ্গে। দেহ ছাড়া আর কোন রকম সম্পর্ক ওদের সঙ্গে আমার নেই। ওরাও সেটা জানে। সেই-জন্যেই ওদের আমার ভাল লাগে।

সৌরেন বিশ্বাস করতে পারে না, তুই বলতে চাস মারিয়ার সঙ্গে তোর কোনরকম হৃদয়ের সম্পর্ক নেই?

রজত বিজ্ঞের মত হাসে, ওসব কল্পনা বিলাস আমার নেই, শুধু আমার নয়, আমাদের দলের কারুর নেই। সেইজন্যেই আমাদের নিয়ে তোদের কোন ভয়ের কারণও নেই, কারণ তোরা জানিস আমরা পশু। পছন্দ না হলে আমাদের এড়িয়ে যাবি। শক্তি থাকলে শাসন করবি, কিন্তু ভয় তাদের নিয়ে, যারা সারাটা জীবন কাটাচ্ছে অভিনয় করে।

কথাটা নতুন শোনাল সৌরেনের কানে, কিসের অভিনয়?

—নিজের মনের ইচ্ছেকে চেপে রেখে ওরা সমাজের নির্দেশ মেনে চলে, যে যা নয় সেইটেকেই বড় করে তুলে ধরছে অন্যাদের সামনে। তার জন্যে বাহবা পাচ্ছে, মনে মনে ভাবছে কত না মহৎ তারা।

সৌরেন বাধা দিয়ে প্রশ্ন করে, এ ছাড়া উপায়ই বা কি?

রজতের মুখে বিদ্রূপ ফুটে ওঠে, শুধু এই কথাটি মনে রেখ সৌরেন, তুমি পাঁচজন দশজন কি তারও বেশী লোককে ধাপ্পা দিতে পার। কিন্তু পারবে না নিজেকে ধাপ্পা দিতে। তখন আসে অনুশোচনা, এ অনুশোচনা আত্মগ্লানির।

রজত সেদিন অনেক কথা বলে গেল, অবশ্য বক্তব্য তার একটাই, মিথ্যের অভিনয় করে মানুষ কখনও সত্যের স্বাদ পেতে পারে না। সেই সূত্র টেনে এক সময় সে উত্তেজিত স্বরে বলে, বিশ্বাস কর সৌরেন, আমি বইয়ে পড়া কোন থিওরী আওড়াচ্ছি
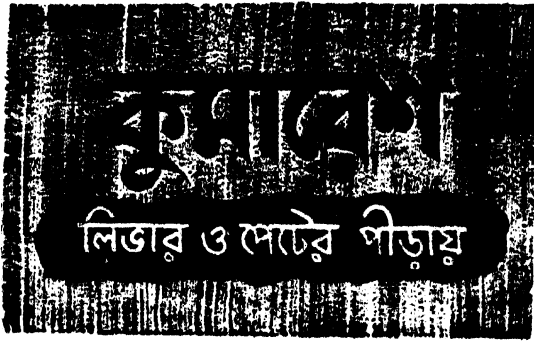
না, নিজের জীবন দিয়ে এ কথাগুলো আমি উপলব্ধি করছি। কেন এ দেশে এসেছিলাম জানিস? খুব ভাল করে জীবনটাকে দেখতে, অনেক দেখেছি, কিন্তু এখনও আমার সাধ মেটেনি, আরও দেখতে চাই। একটু থেমে বলে, ভাবতেও আশ্চর্য লাগে, দেশে থাকতে কূপমণ্ডূকের মত কি রকম চুপটি করে বসেছিলাম।

সৌরেন বাধা দিয়ে বলল, অথচ দেশে থাকতে আমরা তো ভাবতাম তুই আমাদের চাইতে কত বেশী Practical, কত কি জানিস।

রজত হাসল, জেনেছিলাম ঠিকই, তবে ভাল কিছু নয়। জীবনের মন্দ দিকটা। তুই তো জানিস, আমাদের joint family, খুব বড় না হলেও বাবারা চার ভাই এক সঙ্গে থাকতেন। বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল, তাই দুঃস্থ পরিবারবর্গের সংখ্যাও কম ছিল না। পরিচয়টা গোপন করেই বলি, আমার এক আত্মীয়া, গুরুজন ত বটেই, শ্রদ্ধেয়াও। হঠাৎ বিধবা হলেন বাইশ বছর বয়েসে, কোলে তার দুটি অপোগণ্ড শিশু। আমি তখন চোদ্দ বছরের ছেলে। বিধবাকে সান্ত্বনা দিত সবাই, আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতাম। তার মন ভোলাবার জন্যে গল্প করতাম, খেলতাম। ক্রমে বুঝতে পারলাম তিনি আমায় স্নেহ করেন। কিন্তু কবে যে সেই স্নেহ অন্যরূপ ধারণ করল আমি নিজেও তা বুঝতে পারিনি। সে এক বিচিত্র অনুভূতি। রাতের পর রাত তার আহ্বানের প্রতীক্ষায় আমি বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি। বন্ধুবান্ধব সকলের সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে বেশীর ভাগ সময়ে বাড়িতেই থাকতাম, শুধু তার সঙ্গ পাবার লোভে। বয়স বাড়তে লাগল, বুঝতে পারলাম আমি তাকে ভালবেসেছি। আমার মন প্রাণ দেহ সব তাকে সমর্পণ করেছি। কিন্তু আশ্চর্য, বাচ্চারা বড় হয়ে উঠছে দেখে তিনি ক্রমশ আমার কাছ থেকে সরে গেলেন। বুঝলাম আমাকে নিয়ে এতদিন তিনি খেলা করেছেন, শখ মিটিয়ে আমাকে ত্যাগ করে আশ্রয় নিলেন পাথরের দেবতার কাছে। শুরু হল বাড়িতে পুজো-আর্চা, দান, ধ্যান, উপোস, পালন করা শুরু হ'ল ব্রত, আমি দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম এই প্রহসন। শরীরের ভেতরটা জ্বালা করত। এক একবার মনে হত বিধবার ভড়ং করা ঘুচিয়ে দিই, কিন্তু পরে অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে চলে এলাম বিদেশে। উঃ সৌরেন, এ ভণ্ডামির কি লাভ বলতে পারিস? তাইত বলি, মারিয়া কি লরা ওদের আমি বুঝতে পারি। ওরা অনেক সৎ। ওরা যা ওরা তাই।

কথা বলতে বলতে মনে হল রজতের গলা ভারী হয়ে এসেছে, চোখের কোল দুটোও যেন চিকচিক করে উঠল।

সৌরেন সহানুভূতি-মাখা স্বরে বলে, কই, এ কথা তো তুই আগে কখনও বলিসনি।

—বলবার মত কথা ত নয়।

—তুই যে ভগবানে বিশ্বাস করিস না, তাহলে অন্তত মনে শান্তি পেতিস।

রজত রুক্ষস্বরে বলে, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয় সৌরেন, হয়ত তোদের ভগবান আছে। কিন্তু আমি তাকে পছন্দ করি না। এই পৃথিবী, এই মানুষ, এই জীবজন্তু যদি তারই সৃষ্টি হয়, সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করতে আমি অক্ষম। কী করে যে তাকে তোরা ভালবাসিস!

রজতের প্রত্যেকটি কথা এত স্পষ্ট, এত ধারালো, এত সত্যপ্রতিজ্ঞ যে সৌরেন আর কোন উত্তর দিতে পারলো না, নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলো রজতের থমথমে মুখের দিকে, বোঝবার চেষ্টা করলো তার অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত।

তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে লণ্ডনের বুকে।

(ক্রমশ)
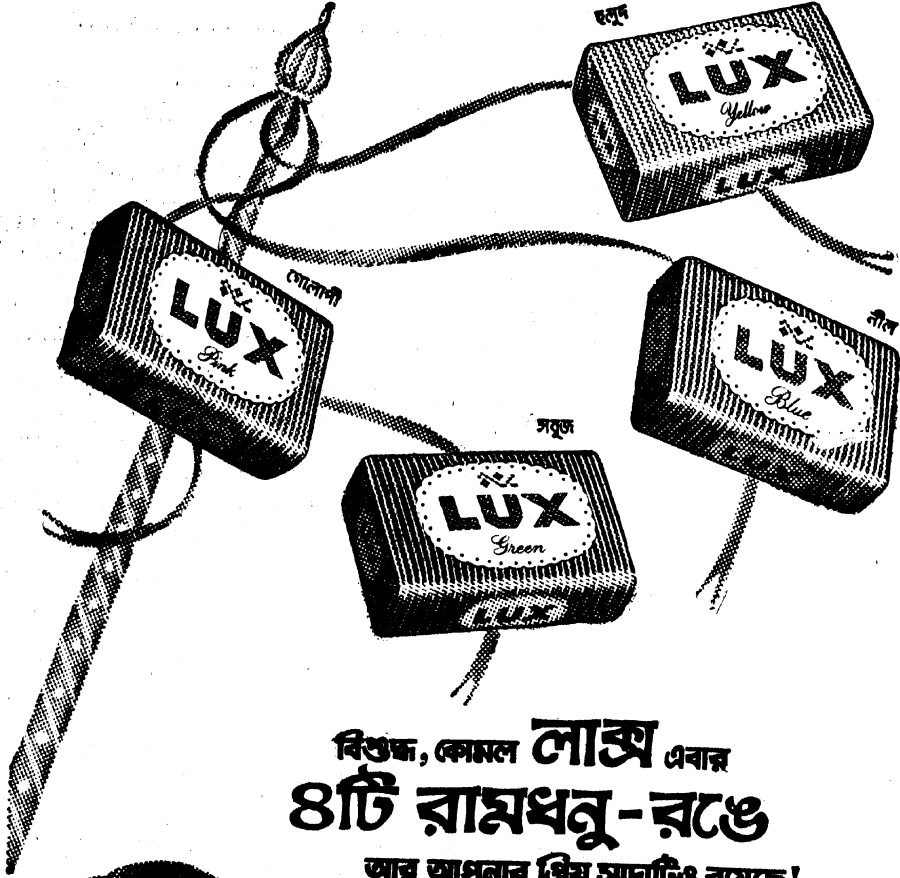
নাটিকা

সুধীর করণ

সামনেই পুকুর। ভরা-যৌবনের লাবণ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিছুদিন আগেও এ যৌবন ছিল না। তখন মনে হত, না-খেতে-পাওয়া হাড়জিরজিরে মেয়ে। ঋতুর খাতায় এখন ভাদ্র মাসের হিসেব; তাই মরা নদীও ভরা। পুকুরের জলেও টলটলে ঢেউ। গ্রীষ্মের পাতায় যখন মৃত্যুর হিসেব লেখা ছিল, তখন কেউ ভাবত না যে আবার আকাশের মেঘ ভালবাসলেই এই পুকুরটাও রূপবতী হয়ে উঠবে। পুকুরটাকেও রোম্যান্টিক মনে হবে! পুকুরটা এখন ছবি, ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। এক কোণে কয়েকটা রাজহাঁস স্থির হয়ে ভেসে আছে, আর এক কোণে কয়েকটি মেয়ে। মেয়েরা শাড়ির আঁচল খুলে জলে নেমেছে। নিমেঘ আকাশ থেকে সোনার মত উজ্জ্বল আর নরম নরম আলো তাদের তামাটে, কালো, ফর্সা দেহের ওপর রঙের পর রঙ বুলোচ্ছে। কয়েকটা পাতিহাঁস সারি দিয়ে এপার থেকে ওপারে যাবার জন্য পাল তুলেছে।

পুকুরের পাড়ের ওপর কয়েকটা ছাগল; সাদা কালো মেটে। ওরাও নির্বাক, স্থির হাতে-গড়া পুতুলের মত সজীব আর নিষ্প্রাণ। একটা ছাগল ঘাসে মুখ ঠেকিয়েছে, কিন্তু খাচ্ছে না। মুখও তুলছে না। পুকুর-জল-হাঁস-মেয়ে-ছাগল সব কিছুই পটে আঁকা ছবি।

উঁচু পাড়ের মধ্যে, ছাড়িয়ে কয়েকটা খড়ের চাল; পাশেই দু-একটা ছোট-খাটো আর নিরীহ পাকা বাড়ির সমতল ছাদ। তার ও-দিকে আর নজর চলে না। পাড়ের ঠিক নীচে কি আছে, কে জানে! তবে বোঝা যায়, পাড়ের নীচেই আরো—আরো—নীচু মাঠ। ওখানে যে ধেনো জমি আছে তা বুঝতে একটু সময় লাগে। নীচু জায়গাটা বেশ কিছু দূরে উঁচু হয়ে ওপরের দিকে উঠেছে। চড়াই-মাঠটাতে কিছু কিছু ধেনো জমি আছে; তবে দূরের থেকে ঘাসের ক্ষেত বলেই মনে হবে। চারদিকে এক পোঁচ সবুজের রঙ মাখানো। তার ওধারে স্পষ্ট করে কিছু দেখা যায় না। শুধু অবারিত নির্বাক মাঠ; তার ওপর নীল-নীল গাছ। অনে—ক দূরে নীল-ধূসর পাহাড়ের দেওয়াল পশ্চিম থেকে পূব দিকে গাঁথা। এলোমেলো উঁচু-নীচু হলেও দূরের থেকে মনে হয়, ঢেউ-খেলানো বক্ররেখা; একই সরলরেখার ওপর ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে।

বর্ষা-মুক্ত ভাদ্রের একটি সকালে এ ছবি দেখা যায়; অনেক সময় মনে হয় থিয়েটারের সস্তা দৃশ্যপট। বেশ মোটা তুলিতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আঁকা।

পুকুরের পাড়ে সেই ছাগলগুলো এখন আর নেই; হাঁসগুলো একটু সরে গেছে। আর এক কোণের সেই নাইতে-আসা-মেয়েগুলি গলা ডুবিয়ে বসে আছে। শুধু মাথাগুলি দেখা যাচ্ছে।

বড় রাস্তার বেশ কিছুটা ব্যবধানে এ-পাশের জানলা থেকে সব কিছুই দেখা যায়। দেখতে হলে একটু রঙ চড়াতে হয় কল্পনাতে। তৃতীয় শ্রেণীর আসনে বসে থিয়েটার দেখা। কেমন যেন মায়াময়; স্পষ্ট অথচ ঝাপসা।

আসলে, ঐ দৃশ্যপটের সামনেই অভিনয়ের ক্ষেত্র।

সংগীতহীন একটি নাটকের অভিনয় চলছে প্রত্যেকটি জীবনকে কেন্দ্র করে। কেউ নায়ক নয়, কেউ নায়িকা নয়,—সবাই সব-কিছুই।

রাস্তার ওপর দিয়ে সাইকেল হাঁকিয়ে কে একজন যাচ্ছিল। খুব জোরে চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেই ছিল, কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। একদল নেংটি-পরা মজুর কাজে আসছিল ওই পথ দিয়ে। কেন কে জানে, সহজে তারা পথ ছাড়ল না। সাইকেলের ঘণ্টি শুনেও তারা নির্বিকার। সাইকেলটা থামতে বাধ্য হল আর সেই মুহূর্তে লোকগুলো হো হো করে হেসে এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ল। সাইকেলের লোকটা বিড়বিড় করতে করতে পাশ কাটাল। একটু পরে একটা অতিকায় ট্রাক হর্ন দিতেই লোকগুলো তেমনি হাসতে হাসতেই প্রায় লাফ দিয়ে পথ ছেড়ে দিল।

একটা ঘ্‌ুঁটেওয়ালী ব্‌ুড়ী, ধন্‌ুকের মতো পিঠ বেঁকিয়ে, হাতের লাঠিতে ভর করে মাথায় এক ঝ্‌ুড়ি ঘ্‌ুঁটে নিয়ে পথ হাঁটছিল। তারই পাশ দিয়ে একটি তর্‌ুণ ছেলে মসমস আওয়াজ তুলে হেঁটে গেল। হাঁটতে হাঁটতেই, ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের এবং বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের পাঞ্জাবির হাতা গ্‌ুটিয়ে নিল।

এর পর কিছ্‌ুক্ষণের জন্য রাস্তাটা ফাঁকা।

এই পটের সামনে একটির পর একটি একক দ্‌ৃশ্য ফ্‌ুটে উঠতে থাকে প্রায়ই। আকাশের মর্জিমত আলোকপাতও মাঝে মাঝে ঘটে।

এই বড় রাস্তার যতট্‌ুকু অংশ জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যায়, ততট্‌ুকু অংশই অনেক কিছ্‌ু দেখার পক্ষে যথেষ্ট।

আট-সাট গ্রামীণ মেয়েরা মাথায় ওপর শাকসব্‌জির ঝ্‌ুড়ি নিয়ে শহরের হাটে যায় এই রাস্তার ব্‌ুকে পা ফেলে। ছোকরা রিক্‌শআলারাও ঝমেুরের স্‌ুর ভাঁজতে ভাঁজতে সাইকেল-রিক্‌শ নিয়ে স্টেশনে ছোটে। সাঁওতাল মেয়েরা ধীর মন্থর পায়ের তালে নাচের ছন্দ তুলে পাখির মত ওড়ে।

কোন দিন, কোন একদিন যদি প্‌ুরো একটি একাঙ্কিকার তিনটি বা চারটি বা পাঁচটি দ্‌ৃশ্য দেখার স্‌ুযোগ মেলে, তা হলে প্‌ুরো একটি থিয়েটার দেখার আনন্দ নিয়ে সারাদিন সারারাত বিভোর হয়ে থাকলেও নিজের ওপর কর্‌ুণা হবে না।

এমন একটি দ্‌ৃশ্য।

কয়েকটি বাচ্চা ছেলে, পাঁচ থেকে বারো বছর পর্যন্ত বয়স। যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। চটের মতো মোটা কাপড়ের পায়জামা আর খাকি রঙের মোটা কাপড়ের হাফ-শার্ট-পরা সবাই। প্রত্যেকের কাঁধে এক একটা ময়লা থলে ঝোলানো। প্রত্যেকের মাথার সাদা রঙের ময়লা গান্ধীট্‌ুপি। বাচ্চারা একবার পেছন দিকে ফিরে তাকাল। সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটা ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। সবাই একসংগে হাঁটছে, কিন্তু সবাই যেন আলাদা-আলাদা, পরস্পরের অচেনা।

সবচেয়ে বড় বাচ্চাটা এগিয়ে এল সামনে। মাঝারিগ্‌ুলো তাকে অন্‌ুসরণ করল। পাঁচ বছরের ছোট ছেলেটা এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে যন্ত্রের মত পেছনে পেছনে এল। পায়জামার আড়ালে ওদের পা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ম্‌ুখের ওপর স্পষ্টভাবে আঁকা অর্ধাহারের ছাপ। মরা-মরা চোখে বেঁচে থাকার কচি কচি আগ্রহ। সবচেয়ে বড় ছেলেটার ম্‌ুখটা দড়ির মত শ্‌ুকনো। গালে হাড় দ্‌ুটো বড় বেশী নির্লজ্জ। ওরা সবাই প্রায় একই সংগে কাঁধে ঝোলানো যে-যার থলের ভেতর হাত চালিয়ে, এক একটা বাঁশের বাঁশি বার করে সার দিয়ে দাঁড়াল একটি মাঝারি মধ্যবিত্ত ঘরের দরজার সামনে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধই ছিল।

পাঁচ বছরের বাচ্চাটা বড় ছেলেটার দিকে একবার তাকাল। তার নাক দিয়ে সর্দি ঝরছিল; হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ছেলেটা সর্দি ম্‌ুছে নিল, তারপর হাতটাকে পায়জামার ওপর ম্‌ুছল। বাচ্চা ছেলেটার হাতেও বাঁশি। মরা মাছের মত নির্লিপ্ত চোখ দিয়ে সবাই একবার যে-যার বাঁশির দিকে তাকাল।

ভাদ্র মাসের এমনি একটি বর্ষণ-রিক্ত রোদ-রোদ সকালে ওদের ম্‌ুখ কালো মেঘের মত ম্লান। ভয়-সংকোচ-প্রার্থনা আর বিরক্তির একটি মিশ্রিত রঙ্‌ তাদের ম্‌ুখে মাখানো।

ওরা এসে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে গলা খ্‌ুলল। কে যেন ভাঙা, প্‌ুরোনো গ্রামোফোনে দম দিয়ে একটা বাজে রেকর্ড চাপিয়ে দিল। কেউ বাঁশি বাজাল না। বাচ্চা ছেলেটা ম্‌ুখ নাড়বার চেষ্টা করল, তারপর কুকুরছানার মত কুংকুং করে এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগল।

এর মধ্যেই একজন আধবয়সী লোক কখন এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছে। এতক্ষণ কোথায় ছিল লোকটা! পোশাকে-আশাকে হ্‌ুবহ্‌ু ছেলেদের মত। তেমনি পায়জামা, হাফশার্ট, থলে, ট্‌ুপি আর বাঁশি। কিন্তু পোশাকগ্‌ুলি তত বেশী ময়লা নয়। লোকটা এসেই বাঁশের বাঁশিটা ম্‌ুখে তুলে কায়দা করে ফ্‌ুঁ দিতে লাগল। হিন্দী-সিনেমার একটা চাল্‌ু গানের স্‌ুর তুলল সে। চোখ বন্ধ করে বাজাল। স্‌ুর্যের আলো তার চোখে এসে লাগছিল।

ছেলেরা আগেই গান বন্ধ করেছিল। এখন সবাই লোকটার বাঁশির স্‌ুরে স্‌ুর মিশিয়ে বাঁশি বাজাবার চেষ্টা করল। ছোট বাচ্চাটা মরা-মরা ভাসা-ভাসা চোখ তুলে তাকায় এক একবার। তারপর সেও তার ছোট বাঁশিটার

গোল গোল চোখগুলোর একটাতে মুখ দিয়ে ফু দেয়; বাকী কয়েকটা চোখের গর্তের ওপর তার কচি কচি নোংরা আঙুলগুলো শুঁয়োপোকার মত নড়তে থাকে। তার বাঁশি থেকে কোন শব্দ বেরুচ্ছে কি না বোঝার উপায় নেই কোন। ছোট-বড়-মাঝারি বাঁশি-গুলো ছোট-বড়-মাঝারি আঙুলের চাপে পড়ে কাতরাতে লাগল।

লোকটা হঠাৎ পেছন থেকে মাঝারি একটা বাচ্চার পাছায় হাঁটুর গুঁতো দিল। ছেলেটা হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল। ছেলেটা বাঁশিতে মুখ দিয়েই দাঁড়িয়ে ছিল, ফু দেয়নি। ফু দিতে গেলেও যতটুকু জোর লাগে ততটুকু জোর খরচ করতে বোধ হয় রাজী ছিল না।

গৃহস্বামী এলেন। মুখে গুমোট আকাশের ছাপ।

"কি চাই?"

বয়স্ক লোকটি সেলাম ঠুকে জবাব দিলঃ "হুজুর মা-বাপ, আমি এই অনাথ বালক-গুলিকে আশ্রমে রেখে মানুষ করি; আমি হুজুর বহু কষ্টে এই বাপ-মা-হারা—"

"চুপ!" গৃহস্বামী ধমকে উঠলেন। "আর বেশী কথা নয়। বাপ-মা-হারা অনাথ বালক-দের মানুষ করছেন উনি।" প্রায় দাঁত-মুখ খিঁচিয়েই বললেন, "বলি, ওদের মানুষ করতে কে বলেছে তোমাকে? সরকার থেকে হুকুমনামা আনিয়েছ বুঝি! —যত্ত সব— জাতকুঁড়ের দল। ভিক্ষে করার সহজ উপায়। লোকের বাড়ির ছেলে চুরি করে ব্যবসা শুরু করেছে। এগুলোকে কোত্থেকে যোগাড় করেছ, শুনি?"

লোকটা হাঁ করে শুনছিল। ভয়-পাওয়া মুখ। আসলে কিন্তু হাঁ করে শোনাই তার অভ্যাস। বাচ্চাগুলোর বাঁশি কখন থেমে গেছে। ছোট বাচ্চাটা নাক মুছতে হাত তুলল; তারপর কি ভেবে নাক পর্যন্ত হাত তুলতে সাহস করল না। খুব আস্তে গড়িয়ে-আসা পাতলা সর্দি সুড়ুৎ করে টেনে নিল নাক দিয়ে।

সব চেয়ে বড় ছেলেটা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। মাঝে মাঝে আড়চোখে বয়স্ক লোকটার দিকে তাকাচ্ছিল।

গৃহস্বামীর মেজাজ ভালো ছিল না বোধ হয়। তিনি একনাগাড়ে বকে যেতে লাগলেন। "—কাদের ছেলে চুরি করেছ, অ্যাঁ?" ভদ্রলোক বারবার একই প্রশ্ন করছেন। লোকটা আর জবাব দেওয়ারও সুযোগ পাচ্ছে না। বড় ছেলেটা ছেলে চুরির কথা শুনেই আড়চোখে তাকাচ্ছে বয়স্ক লোকটার দিকে।

লোকটা শুরু করল এবার। কৈফিয়ত দেওয়ার সুরে নয়, বক্তৃতা করার ভঙ্গিতে।

"হুজুর, কত মা-বাপ-হারা ছেলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়; ছেলেধরার দল অনেক সময় ভুলিয়ে-ভালিয়ে, চুরি করেও বাচ্চাদের ধরে নিয়ে যায়; নিয়ে ভিখিরি বানায়। অন্ধ করে দেয়, খোঁড়া করে দেয়—। তারপর, হুজুর—"

গৃহস্বামী জ্বলন্ত চোখে লোকটার দিকে তাকিয়ে শুনছিলেন। কি যেন বলতে গেলেন একবার, তারপর একটা ঢোঁক গিলেই শান্ত হলেন।

লোকটা প্রায় বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতেই বলে চলেছে। হুজুর হুজুর করে বলাই তার অভ্যাস।

"হুজুর—, এমনটাও হয় হুজুর—।" লোকটা এবারে গৃহস্বামীর আগাগোড়া দেখে নিল একবার। তার দৃষ্টিতে গৃহস্বামী কিছুটা যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন।

"হুজুর—।" লোকটা এক পা এগিয়ে এল, তারপর গলার স্বর একটু নামিয়ে খুব অন্তরঙ্গতার সুরে বলল, "কত ছেলেকে, —একেবারে কচি কচি জ্যান্ত ছেলেকে অনেক সময় কুড়িয়ে পাওয়া যায়। হুজুর, আমিই কত পেয়েছি। লাল টুকটুকে ছেলে! কে কোথায় জন্ম দিয়ে ফেলে যায়। হায় ভগবান, মায়ের মন যে ডাইনী কেন হয়!"

কথা বলতে বলতেই লোকটা গৃহস্বামীর দিকে আবার সরাসরি তাকাল। বাছুরের মত ড্যাবডেবে চোখ। গৃহস্বামীর ভয় ভয় করতে লাগল। লোকটার দৃষ্টি যেন যাদু-করের দৃষ্টি। একটা ঢোঁক গিললেন তিনি।

লোকটা বলেই চলেছে। "পাপ কি কখনো চাপা থাকে হুজুর? তবু লোকে চেপে রাখতে চায়। অনেক বড় বড় বাড়িতেও এ কাণ্ড—"

"অ্যাঁ!" গৃহস্বামীর গলা থেকে হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে এল শব্দটা। শব্দটা, বিস্ময়ের না ভয়ের না কিসের তাও তিনি বুঝতে পারলেন না। আত্মস্থ হবার পূর্বেই লোকটা আরো কাছে সরে এল। গৃহস্বামীকে আর ভয় করার কারণ তার নেই।

"হ্যাঁ, হুজুর, এমন কত হয়। ঐ যে বাচ্চা ছেলেটাকে দেখছেন—" একটু সঙ্গোপনে ছোট ছেলেটার দিকে গৃহস্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে,—"হ্যাঁ, ওকে তো আমি ঐ আমবাগানের একটা ঝোপের ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম; সে আজ প্রায় পাঁচ-ছ বছর হলো। ঐ যে বাগানটা হুজুর—"

গৃহস্বামী প্রায় চমকে উঠলেন। অত্যন্ত ধীর গলায় বললেন, "ক' বছর হলো? পাঁচ বছর?" তারপরে একবার বাচ্চাটার দিকে তাকিয়েই রাগে ফেটে পড়লেন হঠাৎ, "যাও, বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এক্ষুনি।"

লোকটা মোটেই ভয় পেল না। করুণ সুরে বলল, "এদের ভার তো আপনাদেরই নিতে হবে হুজুর। আমি তো নিমিত্ত মাত্র। আপনাদেরই ঘরের ছেলে এরা হুজুর, আমি শুধু বড় করে দেবার চেষ্টা করছি। না হয় ওরা তো সব কোকিলের বাচ্চা হুজুর। কাকের ঘরে আর কদ্দিন—"

গৃহস্বামীর নাক কুঁচকে উঠল। আড়-চোখে একবার ছোট ছেলেটার দিকে তাকালেন।

আর কিছু না বলে গৃহস্বামী ভেতরে চলে গেলেন। গৃহস্বামী আপন মনেই কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন। "শালা মিথ্যুক, শালা ভণ্ড, যা-তা কথা বলে পয়সা আদায়ের ফন্দি—"

বাঁশি হাতে বয়স্ক লোকটা তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করতে লাগল। এ ধরনের কথাবার্তায় অনেক জায়গাতেই কাজ হয়। অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় সে ভালো করেই বুঝেছে। কোথায় কখন যে কথা-গুলো কিভাবে লেগে যায়!

এদের পেছনে এখন বড় রাস্তা। রাস্তা দিয়ে একটা বুড়ো ভিখিরি চলে গেল। বুড়োর ইচ্ছে ছিল, সেও এদের সঙ্গে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু কি ভেবে—এল না। গৃহস্বামী তখনও ভেতরেই। এরই মধ্যে একদল কুঠে ভিখিরি এসে দূর থেকেই হাঁক দিল : "রোববারের ভিক্ষে পাই মা—।"

ছেলেরা ওদের দিকে ফিকে তাকাল একবার, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল। লোকটা মুখ বেঁকিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করল। তারপর বাঁশিটা মুখে ঠেকিয়ে বাজাতে আরম্ভ করল। যন্ত্রের মত ছেলেরাও তার অনুসরণ করল। কুঠে ভিখিরিগুলো ওদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

গৃহস্বামী ফিরে এসে কয়েকটা পয়সা লোকটার হাতে তুলে দিলেন। লোকটা আবার বলতে শুরু করল। "কত বড় বড় ঘরের ছেলে হুজুর, ভাগ্যদোষে অনাথ হয়েছে—"

গৃহস্বামী উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠলেন।

"—যাও—, এক্ষুনি যাও, বেরোও, নইলে পুলিস ডাকব—।"

ছোট ছেলেটা ভয়ে কুঁকড়ে গেল।

কুঠে ভিখিরিগুলো ভয়ে ভয়ে এ-দোর থেকে অন্য দোরের দিকে পা বাড়াল।

গৃহস্বামী এবারে সত্যিই ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন, বেশ শব্দ করেই।

অন্য দৃশ্য।

পুকুরের পাড় ধরে ওরা হাঁটছে। একটা সরলরেখার ওপরে কয়েকটা ছোট বড় দাঁড়ি। ওরা হাঁটছে। পুকুরের জলে লম্বা লম্বা পায়ের এলোমেলো প্রতিবিম্ব। একটু পরে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে হতে এক সময় এ দৃশ্যটি মুছে গেল, ঠিক যেন স্লেটের ওপর থেকে কেউ হিজিবিজি লেখাগুলোকে হাত দিয়ে ঘষে মুছে পরিষ্কার করে দিল।

অন্য একটি দৃশ্যে অন্যত্র থেকে দেখা গেল, লোকটা হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে। বাচ্চা ছেলেটা শামুকের মত হাঁটছিল। লোকটা তার কান ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে পেছন থেকে সামনে নিয়ে এল। "—শালা নবাবপুত্তুর।"—লোকটা অকারণেই তাকে গাল দিল।

বাচ্চা ছেলেটা এগিয়ে গিয়ে নাক মুছল। তারপর হঠাৎ বাচ্চা সাপের মত ফোঁস্ করে বলে উঠল, "ক্ষিদে পেয়েছে।"

"শালা গোঁয়ার; বাপের সম্পদ রাখা আছে তোর, না? মারব এক চড়—" লোকটা মুখ বিকৃত করে হাত ওঠাল, কিন্তু মারল না। অন্যান্য ছেলেরা নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে থাকল, শুধু বড় ছেলেটা একবার বাচ্চাটির দিকে এমনি তাকিয়েছিল। তারপর লোকটার দিকেও তাকাল। চোখোচোখি হতেই চোখ নামিয়ে নিল ছেলেটা। লোকটা একটু অবাক হলো; বড় ছেলেটার দৃষ্টিটা কেমন যেন ঢোঁড়া সাপের দৃষ্টির মতন। বিষ ঢালতে পারবে না, কিন্তু কামড় দিয়ে মাংস তুলে নেবে।

লোকটা তার দিকে তাকিয়ে বলল, "নিধি, তোর ক্ষিদে পেয়েছে নাকি?"

এমনিতে অবশ্য বড় ছেলেটাকে সে 'নিধে' বলেই ডাকে।

খুব জোরে মাথা নাড়ল ছেলেটা। বলল, "আমার ক্ষিদে পায় না। ওই ছোট্কার পেয়েছে; কাল থেকে খায়নি।"

বাচ্চাটা, যেন বড় ছেলেটার কথার সমর্থন করতে গিয়ে আবার নাক ঝাড়ল।

লোকটা একটু নরম হলো যেন। বলল, "কাল থেকে তোরাও তো খাসনি। আমিই কি খেয়েছি নাকি?"

মাঝারি একটা ছেলে ওর দিকে তাকাল। বড় ছেলেটা আর কিছু বলল না। বাচ্চাটা হঠাৎ শুয়োরের মত গোঁ ধরল, "আমার তেষ্টা পেয়েছে; জল খাব।"

লোকটা আবার ক্ষেপে উঠল। প্রায় লাফিয়ে উঠেই বলল, "শালা—, তেষ্টা পেয়েছে! যত্তো সব ইয়ে—। যা-না পুকুরে গিয়ে জল খা।"

ছেলেটাকে প্রায় ঠেলে দিল সে। বাচ্চাটা টাল সামলাতে না পেরে উঁচু পাড় থেকে গড়াতে গড়াতে নীচের দিকে নামতে লাগল; মাঝারি ছেলেগুলো ভয়ে আঁক্ করে উঠল। লোকটা সেই শব্দ শুনে কুঁকড়ে গেল। তারপর এসে বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে এল ওপরে। বিশেষ কিছু লাগেনি, তবু বাচ্চাটা নাক টেনে টেনে কাঁদছিল।

বড় ছেলেটার দিকে কেউ লক্ষ্য করেনি এতক্ষণ। হঠাৎ একটা চীৎকার শুনে লোকটা ওর দিকে তাকাল। বড় ছেলেটা চেঁচিয়ে উঠে বলল, "কেন ঠেলে দিলে ওকে?"

লোকটা রাগে জ্বলে যাচ্ছিল। কিন্তু বড় ছেলেটার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি পড়তেই ছেলেটাকে সে নতুন করে দেখল। ছেলেটার গলার স্বর কর্কশ; ছেলেটার হাত-পাগুলো শক্ত শক্ত। তার ওপর, মুখে ঈষৎ গোঁফের রেখা; চোখ দুটো রাগে-ঘৃণায়-অপমানে অস্থির। লোকটা থমকে গেল। তারপর যেন কৈফিয়ত দেবার মতই বলল, "আমার কথা শোনে না যে। তোদের মত ভালো ছেলে হলে কিচ্ছু বলতাম না ওকে—।"

বাচ্চা ছেলেটা কিছুতেই সেখান থেকে আর নড়তে চাইল না।

লোকটা ভয় দেখাল; কিন্তু বড় ছেলেটাকে তারই ভয় ভয় করতে লাগল। ফলে খুব ভালো মানুষের মত বলল : "চল্, আর একটু পরেই মুড়ি কিনে দেব।"

বাচ্চাটা তবু নড়ল না।

বড় ছেলেটা বলল, "চল্—"

আর অমনি সুড়সুড় করে বাচ্চাটা হাঁটতে শুরু করল।

লোকটা চোখ বন্ধ করে দেখল, তার অনাথ আশ্রমের দরজাটা ওই বড় ছেলেটাই তার নাকের ডগায় বন্ধ করে দিচ্ছে। লোকটা জামার পকেট থেকে একটা সিকি বের করে বড় ছেলেটার দিকে ছুঁড়ে দিল। এর আগে কোনদিন এমনভাবে কাউকে একটি পয়সাও তুলে দেয়নি কিংবা শহরের ভিড়ে কাউকে একাও ছেড়ে দেয়নি। বলল, "যা, একটু দূরেই একটা দোকান আছে, মুড়ি নিয়ে আয়।"

বড় ছেলেটা নিঃশব্দে চলে যাচ্ছিল। লোকটা আবার বলল, "এক পয়সার বিড়ি আনিস কিন্তু।"

ওরা সবাই মিলে পুকুরের পাড়ে বসে পড়ল। লোকটার মাথায় ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছিল। ঘাম মুছে, পয়সার হিসেব করতে বসল সে। এ পর্যন্ত দশ আনা উপার্জন। মুড়ির জন্য চার আনা বেরিয়ে গেল; বাকী থাকে ছ আনা। লোকটা বিড়বিড় করতে লাগল। এক সের চালও হবে না। আজও এক বেলা উপোস দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

লোকটা একবার আড়চোখে তাকাল বাচ্চা-

টার দিকে। ওর দিকে তাকিয়েই লোকটার মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল।

বাচ্চাটাকে কাছে ডাকল সে। "অ্যায়, শোন্।"

বাচ্চাটা এল। তাকে প্রায় কোলের ওপর টেনে নিয়ে লোকটা বলল, "কাল থেকে খাসনি তুই; কেউ খায়নি; আমি শালাও খাইনি। তোদের এবারে ছেড়ে দেব আমি। এ—শালা ভালো লাগে না আর।"

আর কিছু বলতে পারল না সে। এ ধরনের কথা বহুবারই বলেছে। ছেলেরা বড় হলেই পালায়, এও তার জানা আছে। বড় ছেলেটাও একদিন পালাবে। তার চোখের দৃষ্টিতে আজ পাখির ডানা দেখেছে সে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। বড় ছেলেটা সত্যি এল না। লোকটা পাগলের মত লাফাতে লাগল। "শালা চার আনা পয়সা নিয়ে ভেগেছে। খুঁজে পেলে পিঠের চামড়া রাখব না।"

তারপর যত আক্রোশ গিয়ে পড়ল বাকী ছেলেদের ওপর।

"চল্—চল্ শুয়োরের বাচ্চারা—।" প্রায় ছাগলের মতই তাড়িয়ে নিয়ে গেল বাকী-গুলোকে।

চিত্রগ্রীব

বালিগঞ্জে সাউথ পয়েন্ট স্কুলে রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে একটি চিত্রকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সবসমেত ছবি চল্লিশটির বেশী হবে না। ছবিগুলি ১১, ১৩ এবং ১৪ বছরের ছাত্রছাত্রীদের আঁকা রচনা। এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের চিত্রপ্রদর্শনী গত কয়েক বছর ধরেই আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দেখছি। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর কাজের মধ্যে অকৃত্রিম আন্তরিকতা। এতটা আন্তরিকতা খুব কম স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময়েই আমরা লক্ষ্য করি, ছোটদের বাহবা পাওয়ানোর জন্যে হয় বড়রা এঁকে দেন, না-হয় অপরিণত আঁকা কিছুটা অদলবদল করে 'পরিণত' করে তোলা হয়। এটা শিশুদের প্রায় প্রত্যেক চিত্রপ্রদর্শনীতেই লক্ষ্য করা যায়। এমন কি, একটি আন্তর্জাতিক শিশু চিত্রকলা প্রদর্শনীতেও আমরা এ ধরনের কাজ দেখেছি। বড়দের ছোঁয়া লাগলেই ছোটদের রচনায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাব লোপ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার রসও অন্তর্হিত হয়। বড়দের মত আঁকা হয়েছে এই বিচারে অনেক সময় সেসব ছবি অনভিজ্ঞ দর্শকদের প্রশংসাও পেয়ে থাকে, সেকথা অবশ্যই স্বীকার করি, কিন্তু ঐসব শিশুরা বড় হয়ে কখনই শক্তিশালী শিল্পী হতে পারে না। আরেকটা কথা, অনুশীলন করার জন্যে অবশ্যই বড় বড় শিল্পীদের কাজ নকল করা প্রয়োজন; এডগার দাগাও বলেছেন, তিনি আঁগ্রার একেকটি রচনা প্রায় একশবার করে নকল করেছেন, তবেই তাঁর আঁকা অত পরিণত হয়েছে; কিন্তু পরের রচনা নকল করে কেউ যদি নিজের বলে চালিয়ে প্রশংসা পাবার আশা করে, তা হলে বলব তার মত নির্বোধ আর কেউ নেই। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের এই চিত্রপ্রদর্শনীতে নকল বা বড়দের ছোঁয়া-লাগা রচনা নেই দেখে আমরা বাস্তবিকই আনন্দিত হয়েছি। প্রদর্শনীটি সাজানো গোছানোও বেশ চমৎকার। আমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছে ১১ বছরের প্রবীর সান্যালের 'বীরপুরুষ' সিরিজ। এর পর উল্লেখযোগ্য সিপ্রা কর, ছন্দা দাশগুপ্তা, অনিল চোপরা এবং রথীন দত্তের রচনা।

ভাল ছবি আঁকা শিখতে হলে ভাল ছবি দেখারও প্রয়োজন। ছবি দেখা এবং ছবি দেখে তা উপলব্ধি করা শিক্ষা এবং সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ। সেই কারণে পাশ্চাত্যের প্রত্যেকটি দেশের বড় বড় শহরে আর্ট গ্যালারী আছে। সেখানকার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ঐসব গ্যালারীতে নিয়ে যাওয়ার এবং কোন্ ছবির উৎকর্ষ কোনখানে, সেটা বোঝানোর নিয়মিত ব্যবস্থা আছে। এই সব কারণেই ঐসব দেশে সমজদারের সংখ্যা এবং শিল্পীর সংখ্যাও আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কলকাতায় আজও কোনও উপযুক্ত গ্যালারী প্রতিষ্ঠিত হল না, যেখানে গেলে দেশ-বিদেশের পথিকৃৎ শিল্পীদের চিত্রকলা দেখার সুযোগ পাওয়া যায়। আর্ট গ্যালারী নাম দিয়ে কয়েকটি দোকান অবশ্যই খোলা হয়েছে এখানে কিছুদিন হল, কিন্তু সে সব দোকানে শিক্ষার্থীদের না যাওয়াই মঙ্গল। আর্টের নামে সেখানে এমন অনেক ছবিই প্রদর্শন করা হয়ে থাকে যা সত্যিই ভয়াবহ। অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর ওপর আমাদের যথেষ্ট আস্থা ছিল এক সময়। আশা করেছিলাম আর্ট গ্যালারীর অভাব বুঝি মিটবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাঁরা করলেন? অথচ ভারত শিল্পের রেনেসাঁস সম্বন্ধে সচেতনতা আসে সর্বপ্রথম এই বাংলাদেশে। এটা বাস্তবিকই একটা দুঃখের বিষয় যে, সেই বাংলাদেশে কোনও আর্ট গ্যালারী নেই। আমাদের প্রশ্ন হল, নিঃস্বার্থভাবে কোনও প্রকৃত শিল্পানুরাগী অথবা কোনও সংস্থা কি এগিয়ে আসতে পারেন না এই কলঙ্ক দূর করার জন্য? এ বিষয় জনসাধারণের সমর্থন নিশ্চয় পাওয়া যাবে এবং জনসাধারণের সমর্থন থাকলে সরকারও সাহায্য করতে বাধ্য হবেন। প্রত্যেক প্রকৃত শিল্পানুরাগী এবং শিল্পীকে আমরা এ বিষয় আন্তরিকভাবে চিন্তা করতে অনুরোধ করি। কলকাতায় চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রচার এবং উন্নতির জন্য অল্পবিস্তর কাজ করছেন এমন ব্যক্তি অনেক আছেন এবং সেরকম সংস্থাও অনেক আছে। আমার মনে হয় এঁরা যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজে নাবেন তা হলে কলকাতায় একটি গ্যালারী প্রতিষ্ঠিত করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। গ্যালারীর সঙ্গে একটি প্রশস্ত প্রদর্শনী কক্ষেরও প্রয়োজন। এ ব্যাপারেও আজ কলকাতা বম্বাই এবং দিল্লি থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। উপযুক্ত প্রদর্শনী কক্ষ কলকাতায় নেই একথা স্বীকার করতে কোনই দ্বিধা নেই।

অযাত্রায় জয়যাত্রা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
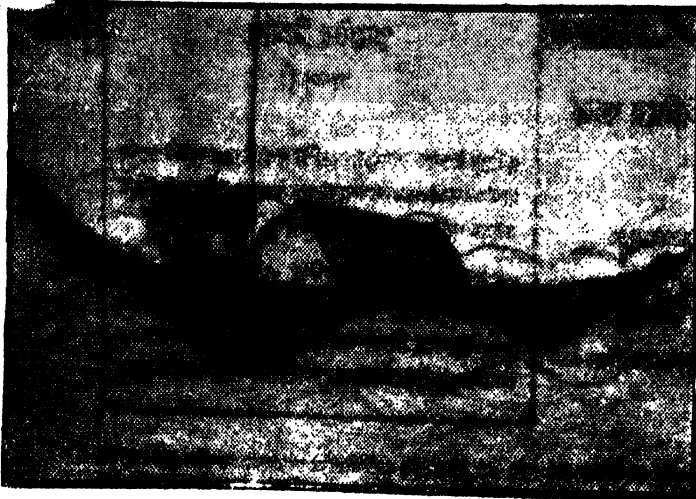
(৭)

পলটু হাঁটু দুটো মুড়ে গামছার একটা পাকে বেঁধে নিয়ে গুছিয়ে বসল, এখানকার ঘরোয়া বা গাছতলার মজলিসে গল্প করবার বিশেষ পোজে (Pose)। এতে সুবিধে, হাত দুটো থাকে মুক্ত, গল্পের প্রয়োজন মত সঞ্চালিত করা যায়। বলল —"আজ থেকে প্রায় শ' খানেক বছরের কথা, আমার পরদাদার তখন জোয়ান বয়স। ভয়ানক ডানপিটে ছেলে—যেখানেই শক্ত কাজ, দুঃসাহসের কাজ, সেখানেই জীয়ন মুশহর। ফাঁদ পেতে বুনো শুয়োর ধরা হয়েছে, বড়হম বাবার সামনে বলি দেওয়া হবে—বুকে বাঁশের বর্শা বিঁধে, কেউ এগুতে সাহস করছে না, দেখ, জীয়ন মুশহর কোথায় আছে। এসে একাই তাক করে গিয়ে ধরলে দুটো দাঁত। অবশ্য সে-ও বুনো শুয়োরই, পড়ল বলি, ওরই একার হাতে, তবে বাঁ-হাতের কনুই থে'ক নিয়ে একেবারে ওপর পর্যন্ত ফেড়ে দিয়ে গেল। বুড়ো বয়স পর্যন্ত—লাঙলের ফালের মতন সে-দাগ বয়ে বেড়িয়েছিলেন পরদাদা। জলায় কোথা থেকে কুমীর এসে পড়েছে একটা। নাককাটা (মেছো) কুমীর: জেলে নামতে দিচ্ছে না, মাছের বংশ সাবাড় করে দিচ্ছে, জমিদারবাড়ি থেকে জীয়ন মুশহরের ডাক পড়ল। একটা পাশীদের (শিউলিদের) খেজুরগাছ-কাটা হাঁসুয়া আর একগাছা শক্ত দড়ি নিয়ে উঠল নৌকায়, তারপর মাঝ-জলায় কুমীরটাকে ভাসতে দেখে তবে কুমীরও লড়েছিল বৈকি, বাঁ উরুতে দিয়ে গলা চেপে বসল। সামনের একটা পা হাঁসুয়া দিয়ে সাবড়ে দিয়েছে, ডাইনেরটা। তবে কুমীরও লড়েছিল বৈকি, বাঁ উরুতে তিনটে লম্বা নখের আঁচড় টেনে দিল। পরদাদার নাম পড়ে গিয়েছিল—"ফাড়ল জীয়ন" অর্থাৎ চেরা-জীয়ন। তা ফাড়ুক, পরদাদা কিন্তু তার লম্বা চোয়াল দুটো দড়িতে বেঁধে নৌকোয় এসে উঠল। এসব হলো বড় বড় নমুনা, যা নাকি এখানে এখনও অনেকের মুখে শুনতে পাবেন। এ ছাড়া ছোট-বড় যে কত ছিল, তার কি হিসেব আছে?

এই গেল তাঁর ডানপিটেপনার ইতিহাস। গাঁয়ে দিন-দিনই বোলবোলাও বেড়ে যাচ্ছে, তারপর ঐ কুমীর ধরার ব্যাপার থেকে জমিদারের নজরে পড়ে গেলেন। তখন গদিতে রয়েছেন বর্তমান বাবুর পরদাদা, বাবু হুকুম সিং। কুমীর ধরার বকশিশ হিসেবে পরদাদাকে চার বিঘে জমি লাখেরাজ লিখে দিলেন এইখান। আগে আমাদের বাড়ি ছিল আজ যেখানে স্টেশন, তার পো'খানেক ওদিকে। বাপ মারা যেতে পরদাদা উঠে এসে এইখানে বাড়ি করলেন।"

পলটু ঘুরে একবার পেছনে দেখে নিয়ে একটু হেসে বলল—"অবশ্য এ-বাড়ি নয়। এ-চালাঘরের মটকাতে তো তাঁর মাথাই ঠেকে যেত। সে জমিও তো নেই থাকলে তাঁর নাতি-নাতকুড়দের আজ এ-দশা? চার বিঘে থেকে এখন চার কাঠায় এসে ঠেকেছে। সে ফলনও নেই, তিনটে মাসেরও ফসল দেয় না বছরে।

যাক সে কথা, সবাই তো নিজের নিজের বরাতে খায়। কবীরজী বলেছেন—সমুদ্র: সে তো অতল-অপারা আছেই, কিন্তু তুই তো ততটুকুই জল নিতে পারবি, যতটুকু তোর নিজের ঘটিতে আটে। থাক, পরদাদার গল্পটাই শুনুন আগে আপনি।"

গামছার বেড়ের মধ্যে আবার একটু নড়ে চড়ে বসল পলটু, তারপর আরম্ভ করল—"পরদাদার নসিবের ঘটিটা নিশ্চয় আমার চেয়ে অনেক বড় ছিল বাবু; অনেকগুণেই বড়, কিন্তু মনে হলো তাও বুঝি হঠাৎ ফেঁসে যায়......"

প্রশ্নের জন্যে মুখের দিকে চাইল পলটু। জিজ্ঞেস করলাম—"কি রকম?"

"জমিদারবাড়িতে খাতির বেড়েই চলল।

জমানা তখন তো অন্য রকম—আইন-আদালতের পরোয়া নেই, যিস্‌কা লাঠি উসকা ভৈঁসা। জমিদারদের মধ্যে যার যত শক্ত লাঠিয়াল, তার তত দখলদারি, তার তত প্রতাপ। রাজপুত রয়েছে, বাগদী রয়েছে, গয়লা রয়েছে, সব একসে এক লাঠিয়াল, কিন্তু পরদাদার লাঠির সামনে সব লাঠিকেই মাথা হেঁট করতে হয়, খাতির দিন-দিন বেড়েই চলল তাঁর। এদের সবার বুক জ্বলে, কিন্তু মনিবই যখন সহায়, তখন তার কার তোয়াক্কা? কিন্তু এমন ব্যাপার হয়ে গেল হঠাৎ একটা, সেই মানবের একেবারে চক্ষুশূল হয়ে পড়লেন পরদাদা।"

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম—"কি করে?"

পলটু একবার দূরে বাসের রাস্তাটার দিকে চেয়ে নিল। বলল—"কাহিনীটা দীর্ঘ বাবু, খুঁটিয়ে বলতে গেলে সময় নেবে। ব্যাপারটা স্ত্রীলোকঘটিত। বাবু হুকুম সিং এদিকে ভালো লোক হলেও সব জমিদারের যা রোগ ছিল, তা থেকে তো আর বাদ যেতে পারেন না। অন্য জমিদারি থেকে একটি বিধবা মেয়ে নিয়ে এসেছিলেন—লুটে আনাই, পরদাদা রাতারাতি তাকে উদ্ধার করে—অবিশ্যি চুরি করেই—বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এলেন। একেবারে রাজরোষ তো গিয়ে পড়ল ঘাড়ে, শির নিয়ে আসবারই হুকুম হলো বাবু হুকুম সিংয়ের। পরদাদা গা-ঢাকা দিতে শিরটা বেঁচে গেল, তবে আক্রোশটা অন্য দিক দিয়ে পড়লই এসে। ফসল কাটার সময়, সমস্ত ফসল কাটিয়ে লুটিয়ে দেওয়া হলো, তারপর একদিন......"

আমি প্রশ্ন করলাম—"জমিটা কেড়ে নিলেন না?"

পলটু একটু জিভ কাটল, বলল—"তা কি করে নেবেন, দান-করা জিনিস, অধর্ম তো করতে পারেন না। তবে হুকুম হয়ে গেল, ও-ক্ষেতের ফসল আর জীয়ন মুশহরের ঘরে উঠবে না, পুস্ত-ব-পুস্ত (পুরুষানুক্রমে)। ...হুজুর হাসলেন যে?"

হাসলাম—আমার সেই পরম বৈষ্ণব গৃহস্থের কথা মনে পড়ে গেল। বাড়িতে চোর ঢুকে ধরা পড়ে গেছে, টেনে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক প্রহার দিচ্ছে সবাই, কর্তা জপে ছিলেন, উঠে এসে দয়াপরবশ হয়ে প্রশ্ন করলেন—"ব্যাপারখানা কি রে?"

"আজ্ঞে, চুরি করছিল ব্যাটা।"

"তা বলে এত প্রহার, কৃষ্ণের জীব মরে যাবে যে!"

"কি করা যায় তাহলে আজ্ঞা করুন।"

"থলেয় পুরে কুয়োয় ফেলে দাও। আহা, কৃষ্ণের জীব!"

পুরুষানুক্রমে হা-হুতাশের সঙ্গে দেখবে ক্ষেতের পাকা ফসল কেটে নিয়ে যাচ্ছে: তার চেয়ে একেবারে কেড়ে নেওয়াটা কম সাজা হলো বৈকি! পলটুকে বললাম—"না, এমনি হাসছি। তাহলে তোরও তো এই চার কাঠার ফসল পাওয়ার কথা নয়—"

"ও-হুকুমটা তো আর রইল না হুজুর। বাবু হুকুম সিং মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুয়াসীন সাহেবা (জমিদারপত্নী) ওঁর ওটা রদ করে দিলেন......"

"তার কারণ? বনিবনাও ছিল না স্বামী-স্ত্রীতে?"—বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলাম।

পলটু বলল—"এমনি তো খুব ভক্তিমতী সাধ্বী স্ত্রীলোক ছিলেন। কিন্তু স্বামীর স্বভাব তো ঐ, বনে কি করে বলুন না। পরদাদার কাজটায় খুশীই তো হয়েছিলেন, সুযোগ খুঁজছিলেন কি করে বকশিশ করেন। শ্রাদ্ধ হয়ে যেতে বাবু হুকুম সিং নাবালক ছেলের হাতে পিণ্ডিটা খেয়ে বৈকুণ্ঠে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবুয়াসীন সাহেবাও নায়েবকে ডেকে বলে দিলেন—ধান কেটে জীয়ন মুশহরের ঘরে দিয়ে আসা হোক। ফসলেরই সময়, বোঝায় বোঝায় সব ধান এসে পৌঁছুতে লাগল।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। সদ্য-সদ্য যে অত্যাচারের ঝড়টা বয়ে গেল সেটা তো এখনও গল্প হয়ে রয়েছে এখানে। অবস্থাটা ফেরার পর পরদাদা বাড়িটাও একটু গুছিয়ে নিয়েছিলেন। অবিশ্যি, তেমন কিছু নয়

পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গত ২১শে এপ্রিল বারুইপুর শিল্প এস্টেটে সুপ্রা কালির কারখানা পরিদর্শন করেন। ছবিতে ডাঃ রায়ের সাথে সুপার টয়লেট এবং কেমিক্যাল কোং (প্রাঃ) লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী এ বসু, এম এস্‌সি (ফলিত রসায়ন)কে দেখা যাইতেছে।

তখনকার দিনে আমাদের মতন লোক—গরীবগুর্বো, দুসাধ-মুশহরেরা তো ইচ্ছে মতন বাড়ি করতেও পারত না—বামুন রাজপুতদের অপমানই তো সেটা—খানচারেক চালা ঘরই তুলে নিয়েছিলেন পরদাদা—মাটির দেয়াল, বাঁশের টাটি দিয়ে উঠানটা ঘেরা—একদিন বাবু হুকুম সিংয়ের মাহুত হাতি নিয়ে এসে সমস্তটা ভেঙে উপড়ে তছনছ করে দিয়ে বাঁশ, খড়, চৌকি, সিন্দুক—যা ছিল তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল।

বছর খানেক পরের কথা।

একটা কঠিন পীড়া হয়ে গুজব রটে গিয়েছিল যে বাবু হুকুম সিং মারা গেছেন। পরদাদা ঐ ব্যাপারটার পর তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন গা ঢাকা দিয়ে, বোধ হয় ঐ খবরটা শুনে একদিন গভীর রাত্রে ফিরে এলেন গ্রামে।

এই যে আপনি কদম গাছটার নীচে বসে আছেন, এটা তখন সবে মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে একটু। পরদাদার হাতের পোঁতা গাছ, আর শোনা যায় বাবু হুকুম সিংয়ের মাহুত এসে যখন হাতি দিয়ে বাড়িটা ভেঙেচুরে দেয়, গাছপালা সব নষ্ট করে দেয়, হাজার চেষ্টা করেও সেটাকে এই গাছটার দিকে নিয়ে আসতে পারেনি। পরে অমন যে অগ্নিকাণ্ড হল, তাতেও নাকি এর একটি পাতা ঝলসায়নি। সত্যি মিথ্যে হনুমানজী জানেন, তবে এটা তো দেখতেই পাচ্ছেন, আর সব কদম গাছে শ্রাবণ গেল তো ফুল শেষ, এতে আশ্বিনেও রয়েছে ফুটে। দোফলা গাছ, কোজাগরী লছমী মাঈয়ের পুজো তো, এইবার যাবে। আসল কথা কি জানেন? কবীরজী বলেছেন—

মনুমা (মন) তুই বড় বড় মন্ত্র পড়ে পণ্ডিতাই করিস—কিন্তু দু' অক্ষরের রাম নামের সামনে তাদের এনে একবার পরখ করে দেখতে তারা কত ছোট। ঐ সব এমারত সেই বড় বড় মন্ত্র হুজুর—পরদাদার পোঁতা এই কদমগাছের সামনে দাঁড়াতে পারে? ফুঁয়ে উড়ে যাবে।

ঘরদোর বলতে আর কিছুই নেই, পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক—নিজের হাতে পোঁতা এই একটি গাছ, পরদাদা এইটির নীচে বসে দুনিয়ার অসারতা সম্বন্ধেই নিশ্চয় চিন্তা করছিলেন,—এইরকম কোজাগরী লছমী পুজোর রাত্রির, চারিদিক নিস্তব্ধ, হঠাৎ কানে গেল—"কেঁও রে বেটা, অকেলা ইঁহা ক্যা করতা?"

আওয়াজ শুনে মাথা ঘুরিয়ে দেখেন একজন সন্ন্যাসী পেছনে দাঁড়িয়ে। মাথায় প্রায় কদমগাছটার মতন, তবে বেশবাসে নানকপন্থী, কি রামানুজী, কি অঘোরী, কি গোরপন্থী কিছু বোঝবার জো নেই। যাই হোক পরদাদা একটু তফাত থেকেই গড় করে উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বললেন—"একলাই করে দিয়েছেন ভগবান আমায় বাবা। এইখানে আমার বাড়ি ছিল—চারখানা ঘর, দুয়ার......"

আর বলতে পারলেন না। বেশ উদাসীনের মতন চুপ করে বসেই ছিলেন, ঝরঝর করে চোখের জল ঝরে পড়ল। জাতে অস্পৃশ্য মুশহর বলেই পরদাদা পা ছুঁয়ে প্রণাম করেননি। সন্ন্যাসী কিন্তু বেশ চেপে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে জিজ্ঞেস করলেন—"ঘরদুয়োরের জন্যে তোর দুঃখ আছে মনে?"

পরদাদা বললেন—পরিবার আত্মীয়স্বজন জমিদারের ভয়ে কে কোথায় জানি না; আছে কি নেই তাও জানি না, সুতরাং ঘরদোরে আর আমার কি কাজ? আমার দুঃখ শুধু এইজন্যে যে আপনি দয়া করে পায়ের ধুলো দিলেন আমার ভিটেয়, আমি আজ এমনই ফকির যে গাছতলা ভিন্ন আর বসাবার জায়গা নেই।"

আরও আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন পরদাদা। তখন ভরা জোয়ান, তিন কুড়িও বয়েস হয়নি, সন্ন্যাসী তাঁকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—"চুপ কর, তুই এই গাছতলার মাহাত্ম্য জানিস না বলেই অমন কথা বলছিস। তোর এখানে এমারত থাকলেও কি আমি এ-গাছতলা ছেড়ে সেখানে গিয়ে উঠতাম ভেবেছিস? যাই হোক, তোর এমন হল কেন, আমায় খুলে বল। দেখি যদি কিছু করতে পারি তোর জন্যে।"

পরদাদা সে-রাত্রের গল্পটা বলতে খুব ভালবাসতেন, জীবনের ধারাই বদলে গেলো তো। বলতেন—ভাবলাম সন্ন্যাসী মানুষ, তিনি তো সবই জানেন, তবু আমায় রহস্য করে জিজ্ঞেস করা কেন? তীর্থে তীর্থে ঘুরে কিছু হুঁশ হয়েছিল, বুঝতে পারলাম—যা করলাম তাতে নিজের দম্ভ প্রকাশ পায় কিনা সেইটে নিশ্চয় জেনে নিতে চান।—দম্ভ কোনকালে ছিল না পরদাদার—শক্ত কাজ, করিয়ে নিতে চাও?—হাজির আছি। অন্যায় হচ্ছে কোথাও? প্রাণ দিয়ে প্রতিকার করতে হবে?—হাজির আছি।—এই ছিল তাঁর মনের ভাব। তবুও যাতে একটুও ঘমণ্ড প্রকাশ না পায় সেই দিকে আরও হুঁশিয়ার হয়ে সমস্ত কাহিনীটা বলে গেলেন। শুনে সন্ন্যাসী একটু হেসে ঠাট্টা করে বললেন—"সেই কবে তুই মেহনত করলি, আজ ক্ষিদে পেয়ে গেল আমার, কিছু আছে?"

পরদাদার চোখে আবার জল ভরে এল। হাতজোড় করে বললেন—"প্রভু, গোলামের সঙ্গে এ কী রহস্য করেছেন? থাকবার যা তা তো দেখতেই পাচ্ছেন সামনে। আজ এক সন ধরে একরকম বলতে গেলে ভিক্ষেই সম্বল; আমি আপনাকে কি দিতে পারি?"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করলেন—"তোর গামছায় কি বাঁধা রয়েছে দেখছি। দিতে চাস না?"

পরদাদা বললেন—"পথে আসতে এক গাড়োয়ান কিছু নতুন ধানের চিঁড়ে দিয়ে-

...তার গাড়ির চাকা পাঁকে প'ড়তে গিয়ে-...তুলে দিই। কিছু খেয়েছি, কিছু ...আছে।"

"তা বেশ তো, বাকিটুকু দে আমায়"—বলে ...বাড়াতে পরদাদা অপ্রস্তুত হয়ে ...টুলিটা পাশে সরিয়ে নিয়ে বললেন—"আমি একে জাতে মুশহর, অস্পৃশ্য, তার ...পর এটা এঁটো-করা, আপনার সেবায় কি ...রে দিতে পারি দেবতা? একে তো পূর্ব-জন্মে কত যে পাপ করেছি..."

সন্ন্যাসী শেষ করতেও দিলেন না, কতকটা ...ন রাগ করেই 'কিরপিন, বদমাস' এই ...াছের কয়েকটা গালাগাল দিয়ে কেড়ে ...লেন গামছাটা। তারপর কয়েক গ্রাসে ...চিড়ে কটা শেষ করে নিলেন। পরদাদা ...্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলেন, শেষ হতে ...াড়ার কাউকে ডেকে জলের ব্যবস্থা করতে ...াচ্ছিলেন, উনি বাধা দিলেন, বললেন—"অমৃতকুণ্ড ছেড়ে আর কোথাকার জল খাব ...খানে আমি?"

পরদাদা একটা পুকুর কাটাতে কাটাতে ...মিদারের অত্যাচারে ছেড়ে দিয়ে গিয়ে-...ছলেন—শুকুতে শুকুতে এখন ঐ হাত ...য়েকের ডোবাটুকুতে দাঁড়িয়েছে। ভরা ...র্ষাতেও কোমর-জল হয় না, অনেকদিনের ...থা তো। সন্ন্যাসী এগিয়ে গিয়ে আঁজলা ...আঁজলা জল খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে উঠে ...লেন, যেন কী ভূরিভোজই না সারা হলো, ...লেন—"তুই কি চাস এবার মেগে নে ...মার কাছে, এবার যাব।"

আগে হলে বোধ হয় চাইতেন কিছু, কিন্তু এক সন ধরে শুধু তীর্থে তীর্থে ঘুরে পরদাদার মেজাজ অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল, বললেন—"কি চাইব প্রভু? দুনিয়ারজিনিসের অসারতা এই তো দেখতেই পাচ্ছি. আজ আছে কাল নেই।"

"দুশমনের মৃত্যু?—যে তোর এই দুর্দশা করলে।"

পরদাদা বললেন—"সে তো ভালোও করে-ছিল একদিন, আসল কথা শত্রুমিত্র তো বোঝাও শক্ত, কার মরণের হেতু হয়ে পাপের ভাগী হই?"

সন্ন্যাসী বললেন—"থাক মৃত্যু তাহলে। তুই এমারত নেই বলে দুঃখ করছিল। তোকে আমি ঐ এমারতের মালিক করে দিচ্ছি; সে ক্ষমতা আমার কাছে আছে।, বল্ চাস্ তো।"

কথা কইতে কইতে পরদাদারও তখন সেই ভ্যাবাচাকা ভাবটা কেটে গেছে, বললেন—"কি হবে একজনকে বঞ্চিত করে প্রভু? ক'দিনেরই বা জিন্দগি?"

"তাহলে একটা আলাদাই কিছু দি তোকে ওর চেয়েও বড়। জায়গা ঠিক কর তুই। ভোজবাজি ভাবিস নি, এক বছরের মধ্যেই এমন সব ব্যাপার হবে, বাড়বৃদ্ধির সংগে তোর বাড়িও তোয়ের হয়ে যাবে।"

পুরুষানুক্রমে আমাদের দুর্দশার জন্যে পরদাদার দুর্মতি বলব, কি বিষয়সম্পত্তির অসারতার জন্য সুমতিই বলব জানি না,

এবারেও তিনি যা উত্তর দিলেন তা ঠিক আগের মতনই, বললেন—"গোস্তাকি যদি মার্জনা করেন তো বলি প্রভু, এই তো একটু আগে আপনিই বললেন এমারতের চেয়ে গাছতলা ভালো, তাহলে আমায় সেই এমা-রতের জন্য লালচি করে তুলেছেন কেন?"

কথাটা যোগী মহারাজের নিশ্চয় খুব ভালো লেগে থাকবে, তিনি ও'র ডান কাঁধটা চেপে ধরে মুখের দিকে একটু চেয়ে রইলেন, তারপর একটু হেসে বললেন—"তোর মুখে যে অন্য উত্তর থাকতে পারে না এটা জানতাম আমি। তুই নিজেকে চিনিস না, আমি একবার পরখ করে নিচ্ছিলাম। মা জানকীর সময় থেকে যুগে যুগে পৃথিবীর কত জায়গায় নারীর অপমান হয়ে আসছে তাই মহাবীর হনুমানজীও তার শক্তি স্থানে স্থানে ছড়িয়ে রেখেছেন। তুইও সেই শক্তিতেই শক্তিমান, নয়তো সাধ্যি কি ঐ রকম প্রবল জমিদার—পিশাচের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসিস সেই সাধ্বী ব্রাহ্মণকন্যাকে? সেই শক্তিরই অংশ, তুই তো চাইবি না, কোন-রকম বিষয়সম্পত্তি, কোনরকম যশ-প্রতিষ্ঠা। তোর প্রাপ্য অন্য জিনিস আমি তোকে তাই দিয়ে যাচ্ছি।"

পরদাদার মাথায় হাত চেপে বললেন—"তুই তাঁরই মতন অমর হয়ে থাকে।"

শোনার সংগে সংগে নিশ্চয় খুশী হয়ে উঠে থাকবেন পরদাদা, কিন্তু একটু ভেবে দেখতেই সে ভাবটা চলে গেল, বললেন—"কিন্তু এই পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকা, প্রভু, নিজের চিরবার্ধক্য, শক্তি নেই—না হয় চির-যৌবনই রইল—নিজের চোখের সামনে যারা আপন তাদের মৌৎ হয়ে যাচ্ছে, নিরুপায় ভাবে দেখছি—এ চিরকাল বেঁচে থাকায় লাভ?"

যোগীরাজ বললেন, "মহাবীর হনুমানজী যে বেঁচে আছেন, অমর হয়ে। কেউ তাঁকে দেখেছে?"

পরদাদা বললেন—"কই এমন তো শুনিনি।"

যোগীরাজ বললেন—"তুমিও সেইরকম ভাবেই থাকবে বেঁচে। তুমি সবই দেখবে, সবই করবে, কিন্তু তোমায় কেউ দেখতে পাবে না।...আমার পরদাদাও সেইরকম ভাবে বেঁচে আছেন বাবু, আজ পর্যন্ত।"

পলটুর গল্প সেই চিরন্তন মানবিক পরিণতিতে এসে থেমে গেল। মানুষের সেই পুরাতন বিশ্বাস মরজগতের একমাত্র সান্ত্বনা, যারা গেল মৃত্যুর পরও তারা সবাই আছে বেঁচে; যারা রইল পড়ে, স্নেহ-প্রীতি ভালোবাসার দৃষ্টি দিয়ে তাদের দিকে আছে চেয়ে। পলটুর পরদাদা জীয়ন মুশহর ছিল বংশের কৃতী পুরুষ, তাকে তাই বিশিষ্ট করে বাঁচিয়ে রেখেছে পলটু। তাই তো করে সবাই।

(ক্রমশ)
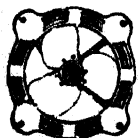
উপন্যাস

হাটে বাজারে। বনফুল ঃ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ঃ তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সদাশিব অবসরপ্রাপ্ত সরকারী ডাক্তার। এখন হাটে বাজারে ঘুরে ঘুরে যাদের চিকিৎসা করে বেড়ান তারা সমাজের নীচের তলার লোক। ডাক্তারকে কিছু দেবার সামর্থ্য তাদের নেই। অধিকাংশ সময়ে ওষুধ এবং পথ্য দুই-এর ব্যবস্থাই সদাশিবকে করতে হয়। 'হাটে বাজারে' উপন্যাসে সদাশিবের চারদিকে এই সব টুকরো চরিত্রের ভিড়।

হয়তো আলোচ্য বইকে উপন্যাস বললে ভুল হবে। কারণ এ বই-এর গল্পাংশ কোন অবিচ্ছিন্ন ঘটনাবলির সুষম পরিণতি নয়। একটি মূল চরিত্রের চারদিকে বহু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত টুকরো চরিত্র এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনার মিছিল। আঙ্গিকের দিক থেকে অনেকাংশে লেখকের প্রথম দিকের রচনা নির্মোকের স্বধর্মী। কিন্তু সার্থকতায় তুলনীয় নয়।

বক্তব্য কখনও লেখকের জবানীতে কখনও সদাশিবের ডাইরি মারফত উপস্থাপিত।

বিপত্নীক সদাশিব অনাত্মীয় নন, তবু নিঃসঙ্গ। মেয়েরা বিবাহিতা। স্বামী-পুত্র নিয়ে সুখী। অন্য আত্মীয়স্বজনও আছে। তবু নিঃসঙ্গতা সদাশিবের চরিত্রের স্বধর্ম। আত্মীয়দের হীন স্বার্থ তাঁকে পীড়া দেয়। সমাজের নীচের তলার দুঃস্থ লোকগুলির সঙ্গেই তিনি বরং একটা সহজ আত্মীয়তার সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন।

এ বই-এর বহু ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চরিত্র যেমন মেছুনী ছিপলি, ভোজন-বিলাসী বাঁড়ুয্যে মশাই, ড্রাইভার আলী, গোয়ালার মেয়ে নিতিয়া (নীতা)—স্বল্প পরিসরেও মনে রেখাপাত করে। পরনির্ভর স্বামীর নিঃসন্তান স্ত্রী মালতীর (সদাশিবের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ) চরিত্রের জটিলতা প্রায় আভাসে প্রস্ফুটিত। এখানে পুরনো দিনের বনফুলকে মনে পড়ে। (১০১।৬১)

ছোট গল্প

কোকিল ডেকেছিল ঃ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ঃ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ঃ তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের ছোট গল্প প্রধানত দুটি রসের অনাবিল ধারায় সিঞ্চিত। কৌতুক এবং বাৎসল্য। বরযাত্রী ইত্যাদির মত অপূর্ব কৌতুক রসের গল্প যে-কোন সাহিত্যেরই সম্পদ। অন্যদিকে বাৎসল্যের আশ্চর্য সুধাক্ষরণ হয়েছে রাণুর প্রথমভাগ ইত্যাদি গল্পে। কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক কালের গল্পে এই দুটি ধারাই স্তিমিত হয়ে এক নতুন রূপ পরিগ্রহ

করেছে। কিন্তু পাঠকের ক্ষোভের কোন কারণ নেই। কারণ একটি কৌতুকপ্রিয় মন পরিণত বয়সে এসে সহজ আলাপাচারি ভাষায় একটি প্রশান্ত পরিমণ্ডল রচনা করেছে। বরযাত্রীর লেখক আর রাগের স্রষ্টা এক হয়ে গিয়ে অবসর সময়ে বৈঠকখানায় যে-গল্পের আসর জমিয়েছেন এ-বইএর গল্পগুলি যেন তারই ফল। পড়তে পড়তে হো হো করে কেউ হেসে উঠবেনা, কিন্তু একটি প্রসন্ন হাসি পাঠকের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়বে।

কোকিল ডেকেছিল, নালিশ, এল এল, রিয়্যালিষ্ট, অথ নাসিকা কথা প্রভৃতি গল্প একটি শান্ত কৌতুক-রস-সিঞ্চিত। পড়ার পরে মনে একটি স্নিগ্ধ হাসির ছোঁয়া লাগে। আবার কোন গল্পের কৌতুকময় পরিবেশের সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে কেমন এক মৃদু বিষাদ মনকে ছুঁয়ে যায়। যেমন তিন কেন্ট। ক্লাইম্যাক্স এবং নিশীথের অতিথি গল্প দুটিতে অশরীরী পরিবেশ রচনার অংশটুকু বিস্ময়কর।

সব মিলিয়ে এ গ্রন্থের গল্প ক'টি কৌতুকপ্রিয় একটি পরিণত মনের আলাপাচারি ঢঙে গল্প বলার একটি আশ্চর্য ক্ষমতার স্বাক্ষর বহন করছে। (৯৪।৬১)

বারোয়ারি উপন্যাস

নাগরিকা — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সমরেশ বসু, মনোজকুমার রায়চৌধুরী, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—অভিজিৎ প্রকাশনী, ৭২-১ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—৪্ টাকা।

বাংলাদেশের নয়জন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক নয়টি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ করেছেন নাগরিকা। এদেশে এ প্রচেষ্টা নতুন নয়। ইতিপূর্বে একাধিক উপন্যাস এভাবে রচিত হয়েছে, এবং শরৎচন্দ্র পর্যন্ত তাতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সুলেখক মাত্রেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং একটি উপন্যাসের ব্যাপকতায় সে স্বাভাবিক পরিণতি সম্ভব, ভিন্ন-ভিন্ন রচনাকারের মারফত সে পরিণতি আশা করা অন্যায়। সুতরাং বারোয়ারী উপন্যাসের লেখকরা যদি সামান্য অংশ রচনায় অস্বস্তি বোধ করেন, তা হলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু নাগরিকার কৃতিত্ব শেষ পর্যন্ত সে একটি প্রবহমান গতিকে রক্ষা করতে পেরেছে। কাহিনী গড়ে উঠেছে একটি অসহায় নারীকে কেন্দ্র করে। স্বামীকে সে আইনের সাহায্যে ত্যাগ করেছে, নিজের ভাই-এর সংসারেও স্থান পায়নি। নিজের ভাগ্যকে জয় করতে সে বেরিয়ে পড়েছিলো পথে। হৃদয়ের নিষ্কলুষ প্রেম তাকে নানা দুঃখ দুর্দশার অন্ধকারের শেষে জীবনের প্রভাত দেখিয়েছে। রচনাকারেরা তাঁদের সুনাম রক্ষা করেছেন, তবু বলবো, শেষ পরিচ্ছেদের লেখক সবচেয়ে বেশী কৃতিত্বের অধিকারী। পরিচ্ছেদ পরম্পরায় যদি লেখকের নাম ঘোষিত হয়ে থাকে তবে শেষ পরিচ্ছেদের লেখক শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বলতে গেলে উপন্যাসটিকে সার্থকতার দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছেন তিনিই —শেষরক্ষা করার দায়িত্ব ছাড়াও তিনি লেখক হিসেবে নিজের দায়িত্বও পরম নিষ্ঠায় পালন করেছেন। এবং তাই পাঠকদের কাছে এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ আশ্বাস পৌঁছে দেওয়া যায়। ১০২।৬১

রম্যরচনা

ইন্টকুটুম—লীলা মজুমদার। ত্রিবেণী প্রকাশন, ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। সাড়ে তিন টাকা।

ইন্টকুটুম কিছু কিছু চিত্তাকর্ষক ঘটনার বর্ণনা, কিছু বা ইতিহাস, কিছু বা কিংবদন্তী। বলবার ভঙ্গিটাই এসব ক্ষেত্রে প্রধান আকর্ষণের বিষয়। বাইশটি নিবন্ধে সম্পূর্ণ এই 'ইন্টকুটুম' উৎসর্গ করা হয়েছে প্রমথনাথ চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং চারুচন্দ্র দত্তের নামে। এ'দের মজলিসে গল্প শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন লেখিকা শ্রীমতী লীলা মজুমদার। 'নেশা', 'পিসেমশাই', 'বটুমামা', 'পাশের বাড়ি', 'সেয়ানে-সেয়ানে' ইত্যাদি শিরোনামগুলি লক্ষ্য করলেই বিষয়বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকটা আঁচ করা যেতে পারে।

'রম্যরচনা' নামে সাহিত্যের যে বিশেষ শ্রেণী আজকাল লেখক-মহলে খুবই অনুশীলিত হচ্ছে, এ-বইয়ের লেখাগুলি সেই শ্রেণীতেই জায়গা পাবে। এসব লেখায় ভার নেই—বক্তব্য-বিষয়ের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই—যেটা সর্বাধিক স্মরণীয়, সে শুধু এর গতির মসৃণতা! রীতির দিকে এই অতিরিক্ত ঝোঁক পড়ার ফলে 'তিন অংক' লেখাটির প্রথম বাক্যেই দেখা যায়—'তারপর ধরুন আমার নকুড় মামার কথা।' আকস্মিকতা, সরলতা—এবং লঘু মসৃণ গতিধর্মই এসব লেখার প্রধান বিশেষত্ব। এবং এই সরল সাংবাদিকতার মধ্যেই দু'একটি রেখাপাতে কোথাও বা স্থায়ী দু'একটি প্রতিকৃতি দেখা দিয়েছে। মন্দাকিনী অথবা নকুড়মামাকে তারই উদাহরণ বলতে পারা যায়।

৭৫।৬১

রজনুলি। রূপদর্শী। বর্ণিক: ১।৩২ এফ্ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রো, কলকাতা—২৬: তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বিগত দশকে বাঙলা সাহিত্যের যে-

শাখাটি রম্যরচনা নামে বহুবিচিত্র এবং অজস্র রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে সেখানে একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন রূপদর্শী। তাঁর বিচিত্র দৃষ্টিকোণ, বেপরোয়া শব্দচয়ন এবং সুনিপুণ গল্পবয়ন প্রথম থেকেই পাঠককে চমৎকৃত করেছিল। রূপদর্শী লেখার বৈশিষ্ট্য রম্যরচনার আড়ালে আপাত অগোচর একটি সুনিবিড় বেদনাবোধের উপস্থিতি, যা এই শ্রেণীর রচনায় দুর্লভ। সহস্র হাসির ঝিনুকের মধ্যে লুকনো এক বিন্দু কান্নার মুক্তো। হাসতে হাসতে হঠাৎ কখন, নিজের অগোচরে, পাঠকের চোখের পাতা এক মুহূর্তের জন্য ভারী হয়ে উঠেছে। হালকা হাসির আলতো আঙুল হঠাৎ কখন জীবনের গভীরে ছুঁয়ে গেছে।

রূপদর্শীর সাম্প্রতিক রচনা ব্রজবুলি কিন্তু এর ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম, কারণ এ-কাহিনীর পটভূমি স্বতন্ত্র। রূপদর্শীর ভূমিকাও। এ-কাহিনী রূপদর্শীর জীবন-দর্শন নয়। তিনি এখানে অন্যের বলা কাহিনীর লিপিকার মাত্র। এ বইএর সব গল্পই বাবু ব্রজরাজ কারফর্মার (যিনি রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির নিমিত্ত, যিনি অন্নদাশঙ্কর রায়কে বাঙলা শিখিয়েছেন, দেশবন্ধুকে করেছেন কলকাতার মেয়র, শ্রী নেহরুকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী—ইত্যাদি) শ্রীমুখের বুলি। তাঁর নিজের মুখে বলা নিজের গল্প। রূপদর্শী কেবল নির্ভর যোগ্য বসওয়েল অথবা শ্রীম—হবার চেষ্টা করেছেন।

বইটি পড়ে মনে হলো তাঁর সে-প্রচেষ্টা সার্থক।

ব্রজবুলির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ব্রজ-রাজ কারফর্মার রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কাহিনী। আর বিচিত্র সেই সব কাহিনী, যার কাছে আলেকজান্ডারের দিগ্বিজয়ের কাহিনীও ম্লান।

পাঠক জেনে চমৎকৃত হবেন যে, কাশ্মীরের হ্রদের বুকে রবীন্দ্রনাথের বোটে বসে এক ঝাঁক উড়ন্ত হাঁস দেখে ব্রজরাজ কারফর্মা রবীন্দ্রনাথকে হাঁসের ওপর একটা 'পোয়েট্রি' লিখতে অনুরোধ করেন। তার ফলশ্রুতি বলাকার পাঠক অবগত আছেন। আর ঝিলমের সঙ্গে খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ারের সেই উপমাটিও স্বয়ং ব্রজরাজ কারফর্মার মুখ থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম শোনেন। কারণ ব্রজদার কোমরবন্ধে কাশ্মীরের রাজকুমারী চম্পকলির নিজে হাতে বেঁধে দেওয়া সেই বাঁকা তলোয়ারের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়েই ব্রজদার মুখ থেকে উপমাটি বেরিয়েছিল।

আরও আছে। বাঙালীর মুখ রাখতে জার্ডিনের দলের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে ব্রজরাজ কারফর্মা যে-বলটিকে সুপার-বাউন্ডারি হিট করে অনন্ত নীলিমায় পাঠিয়েছিলেন সেটি হয়তো স্পুটনিকের অগ্রবর্তী হয়ে আজও মহাশূন্যে প্রদক্ষিণ করছে। কারণ তার নেমে আসার খবর পাওয়া যায়নি। বিখ্যাত স্ত্রী-গোয়েন্দা মাতাহারি যে ফরাসী জেনারেলের কুকুরী হয়ে শত্রুপক্ষের হাতে খবর পাঠাচ্ছিল, ব্রজরাজ কারফর্মা না থাকলে মিত্রপক্ষ তা কোনদিনই জানতে পারত না।

এমনি সব চিত্তচমৎকারী রোমহর্ষক কাহিনী রূপদর্শী বিধৃত করেছেন ব্রজবুলির পাতায় পাতায়। রূপদর্শীর গল্প বলার বিশেষ ভঙ্গি এবং ভাষায় তাঁর কারুকার্যের স্বাক্ষর মিলবে প্রতিটি গল্পে। গল্পের রোমাঞ্চ এবং লিপিকারের লিপিকৌশল পাঠককে উর্ধ্বশ্বাসে বইটি শেষ পাতায় টেনে নিয়ে যায়। বর্ণনা থেকে চরিত্র-কল্পনার কাজ সহজ করেছে অহিভূষণের ছবি। এ-ছবি না হলে গল্প যেন অসম্পূর্ণ থেকে যেত। (৪৭৩।৬০)

প্রাপ্তিস্বীকার

রাষ্ট্রীয় পঞ্চাঙ্গ (বাংলা) শকাব্দ ১৮৮৩ (খৃষ্টাব্দ ১৯৬১-৬২)।

নরহরি পণ্ডিতের কাহিনী—স্বপন বুড়ো।

আদিবাসী রূপকথা (১ম খণ্ড)—শচীশ মুখোপাধ্যায়।

কবি ও কান্তা—শ্রীবিমলজ্যোতি দাস।

Historical Relics etc. in the Bangiya Sahitya Parisad Museum —Monoranjan Gupta.

রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প—সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত।

মহাশূন্যের রহস্য—মনোজ দত্ত।

ভগবান রমণ মহর্ষি—হরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

ট্রামেবাসে

ট্রামে যাইতে যাইতে শুনিলাম জনৈক যাত্রী তাঁর বন্ধুকে বলিতেছেন—"কলকাতায় অভাবের অন্ত নেই।" সম্প্রতি

আর একটি অভাব জুটেছে; সে অভাব হলো প্রধান অতিথির, প্রধান বক্তার এবং সভাপতির। যোগ্যতমদের বুকিং নাকি ছয় মাস আগে থেকেই হয়ে গেছে।" শ্রোতা বোধ হয় তাঁহার সহযাত্রী অপেক্ষাও ভালো পর্যবেক্ষক। তিনি বলিলেন—"অচিরেই আর একটি অপূরণীয় অভাবের লক্ষণ ইতিমধ্যেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, সেটি হলো প্রধান শ্রোতার অভাব। প্রধান অতিথি এবং প্রধান বক্তার সংগে প্রধান শ্রোতার দাবি প্রায় ঘনিয়ে এসেছে।"

রসায়ন শাস্ত্রে নোবল পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হ্যারল্ড সি উরি নাকি বলিয়াছেন যে, চন্দ্রের বয়স পৃথিবী অপেক্ষা দশ কোটি বৎসর অধিক। "তাহলে বুঝুন বুড়ীর মেক্ আপ-এর কায়দা কত,

এখনো মুখের ছাঁদটি ঠিক্ রেখেছে, বয়স বোঝবার জো নেই"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

দিল্লিতে রবীন্দ্র-ভবনের উদ্বোধনী ভাষণে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলিয়াছেন—নিঃসন্দেহে এ কথা সত্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর যে সকল বিষয় ও ঘটনার ফল আজ আমরা ভোগ করিতেছি তাহার অনেক কিছুই বাংলার দান। রাজনৈতিক জাগরণে যে চিন্তাধারা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং যে চিন্তাধারায়

ভারতের ঐক্যের উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল তাহা বাংলারই দান। সমাজ সংস্কার ও পাশ্চাত্য শিল্প ও সভ্যতার প্রয়োজনীয়তার কথা বাংলা হইতেই আসিয়াছে। —বিশুখুড়ো উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সাধু, সাধু"। এবং পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "এই ভাষণের টেপ রেকর্ড রাখা হয়েছে তো!!"

ফিনিশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারী ও ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্টের পুত্র শ্রীটার্নেল কেক্কোনেনকে মোটরে যাইতে যাইতে কী কথা কাটাকাটিতে রাগ করিয়া তাঁর স্ত্রী জুতা ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন। কেক্কোনেন এখন হাসপাতালে আছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী কবিতা আবৃত্তি করিলেন—"জুতা দিয়ে মারো যারে চিনল না সে মরণকে!!"

কলিকাতা শহর হইতে ধোঁয়া দূর করিবার পরিকল্পনা চলিতেছে। "অতঃপর সমস্ত কর্মতৎপরতা ধোঁয়ায় পরিসমাপ্তি লাভ করবে বলে আশা করা যায়"—মন্তব্য করিলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

এক সংবাদে শুনিলাম, আগামী পয়লা জুলাই হইতে দেশব্যাপী মক্ষিকা-বিরোধী সপ্তাহ পালন করা হইবে। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু মুশকিল আছে ভাই, মনে কর হুঁকো মুখো হ্যাংলার কথা, মাছিমারা সম্বন্ধে সে বলেছিল, যদি দেখি কোন পাজি, বসে ঠিক মাঝামাঝি কি যে করি ভেবে নাহি পাইরে, ভেবে দেখ একি দায়, কোন্ ল্যাজে মারি তায়, দুটি বই ল্যাজ মোর নাইরে।"

অনুরূপ এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে ডিব্রুগড় হইতে। সেখানে ১৫ই মে শুদ্ধ খাদ্য দিবস পালন করা হয়েছে। "বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে একটা দিন বই তো নয়। বাকী দিনগুলি যে-খাদ্যই পরিবেশিত হোক না কেন, যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষ করে শুদ্ধ করে নিলেই চলবে" —বলেন বিশুখুড়ো।

বিজ্ঞানীরা নাকি বলিতেছেন যে, মহাকাশযাত্রী মানুষ (বৃদ্ধ হইলে) বয়সে নবীন হইয়া ফিরিতে পারিবে।—"তাহলে আর আমাদের চান্স কি। মন্ত্রীরা কি এই মওকা ছাড়বেন! চন্দ্রলোকগামী যানের সব টিকিট তো তাঁরাই বুক করে নেবেন আগেভাগে"—বলেন জনৈক বৃদ্ধ সহযাত্রী।

'**আ**বার মন্ত্রী পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি।' —একটি সংবাদ শিরোনামা। বিশুখুড়ো বলিলেন—"মেয়েদের বেলা আন্নাকালী, ক্ষান্তমণি প্রভৃতি নাম রাখা হতো। মন্ত্রীদের বেলা চাইনাচরণ, শেষনাথ গোছের নাম রেখে দেখুন না পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি যদি বন্ধ করা যায়!!"

আচার্য বিনোবা ভাবে আসামে নাকি বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালীরা তাহাদের আচরণ পরিবর্তন না করিলে তাহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। শ্যামলাল বলিল—"মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, থাকবে শুধু ভূদানের ভূটুকু!!"

শান্তিনিকেতনে বিচিত্রা ভবন উদ্বোধনে শ্রীনেহরু মন্তব্য করিয়াছেন, এই ভবনটি নির্মিত হওয়ায় বহুদিনের একটি স্বপ্ন রূপ নিল। শ্যামলাল গানে তার মন্তব্য প্রকাশ করিল—"বিশ্ব হতে হারিয়ে গেছে স্বপ্নলোকের চাবি।"

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

কবি স্মরণে

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে সারা দেশ জুড়ে নৃত্য-গীত-অভিনয়ের যে প্রবাহ বইতে শুরু করেছে তাতে বহু মনের তটভূমি নিশ্চয়ই কবি-পরিবেশিত প্রাণরসে উর্বর হয়ে উঠবে। অন্তত আমরা তাই মনে করি।

অনুষ্ঠানের সংখ্যাধিক্যে কেউ কেউ বিচলিত হয়েছেন। কারোর বা ধারণা, এতে বাঙালীর হুজুগপ্রিয়তাই প্রকট হয়ে উঠেছে, কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নয়। অনেকে মনে করেন, নাচ-গান নিয়ে এই বাড়াবাড়িটা ভাল নয়, কারণ রবীন্দ্র-প্রতিভার আরো নানাদিক তাতে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে জন-সাধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে। এমনিধারা আরো অনেক অভিযোগ অনেকের মনে জমা হয়ে উঠেছে।

এর অনেক কথাই হয়তো উপেক্ষণীয় নয়। রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তা যে তাঁর বিরাট প্রতিভার একমাত্র পরিচয় এমন অসার কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবেন না। কিন্তু তাঁর যে প্রসন্ন দানে দেশের সমস্ত মন ভরে রয়েছে তা নিয়ে মতামাতিটা যদি একটু বেশী হয় তাতে বিচলিত হবার কী আছে? জনপ্রিয়তার ধারাই এই।

একদা এই বলে আক্ষেপ করা হ'ত যে, রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে চলে না। তাঁর গান মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে আনন্দ দেয় মাত্র, সাধারণ শ্রোতাকে তা আকর্ষণ করে না। নৃত্যনাট্য বস্তুটাই তো এদেশে নতুন, জনসাধারণের সঙ্গে তার কোন যোগই নেই!

এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি আজকের শত-বার্ষিকী উৎসবের বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে কত অল্পদিনের মধ্যে জন-মানসে কী যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এবং রবীন্দ্রনাথের যাঁরা অনুরাগী ভক্ত তাঁরা এতে নিশ্চয়ই উল্লসিত হবেন।

শুধু কলকাতা শহরের কথাই ধরা যাক। কবি-পক্ষে অন্তত দুশোটি উৎসবের আসর বসেছে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে। এইসব আসরে পরিবেশিত হয়েছে রবীন্দ্র সঙ্গীত, কবিগুরুর নাটক ও নৃত্যনাট্য। এবং যেটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—দর্শকের অভাব হয়নি কোথাও। এছাড়া, শহরের তিনটি প্রধান পাবলিক থিয়েটার—স্টার, রঙমহল ও লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ পরিচালিত মিনার্ভা—পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে একাধিক রজনী রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। এ সবের মধ্যেই যে শুভ ইঙ্গিত রয়েছে তা নিশ্চয়ই চক্ষুষ্মান দর্শকের দৃষ্টি এড়াবে না।

কবি-পক্ষকে কেন্দ্র করে আরো একটি শুভ সূচনার সূত্রপাত হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে। সরকারী অর্থে ভারতের অন্তর্ভুক্ত চোদ্দটি রাজ্যে একটি করে আধুনিক নাট্য-শালা স্থাপনা করা হচ্ছে। তার মধ্যে চার পাঁচ জায়গায় ইতিমধ্যেই রবীন্দ্র নামাঙ্কিত নতুন নাট্যশালার দ্বারোদ্ঘাটিত হয়েছে। আগামী শীতকালের মধ্যেই বাকিগুলি তৈরি হয়ে যাবে। জাতীয় জীবনে এই ধরনের নাট্যশালার সাংস্কৃতিক মূল্য সামান্য নয়। এছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মোট কুড়িটি নাট্য সম্প্রদায়কে অর্থ-সাহায্য করেছেন রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করবার জন্যে। বাংলাদেশের পাঁচটি নাট্য-সম্প্রদায় এই সাহায্য লাভ করেছেন। তদনুযায়ী ওড়িয়া ও কানাড়া ভাষায় "চিরকুমার সভা", বাংলায় "শেষ রক্ষা", "মালিনী" ও "তপতী", মণিপুরীতে "বিসর্জন", পাঞ্জাবীতে "ডাকঘর", অসমীয়াতে "খেলাঘর" ও মালয়ালমে "চিত্রা"-র অভিনয় ব্যবস্থা হয়েছে।

কোন দেশের কবির সম্মানে এমনিধারা ব্যাপক উৎসব পৃথিবীর আর কোথাও হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

ইউনাইটেড ফিল্মসের "স্বয়ম্বরা"-র নায়ক -নায়িকার ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

চিত্রালোচনা

"তিন কন্যা"র মুক্তির পর আবার যে প্রশ্নটা সকলের মনে বড় হয়ে উঠেছে, সেটা হচ্ছে—সত্যজিৎ রায় এবারে কী ছবি তুলবেন? প্রত্যেক যশস্বী পরিচালকের পরবর্তী চিত্র সম্বন্ধে চিত্রামোদীরা আগ্রহ অনুভব করে থাকেন। সত্যজিৎ রায়ের বেলায় যে সে আগ্রহ তাঁরা একটু বেশী মাত্রায় অনুভব করবেন, তা একান্তই স্বাভাবিক, কারণ সারা দেশের লোক—এবং বিদেশেরও—সত্যজিতের নব নব চিত্রসৃষ্টির আস্বাদ পেতে উন্মুখ হয়ে রয়েছেন।

কথা ছিল, "তিন কন্যা" শেষ করে সত্যজিৎ রায় তাঁর পিতামহ স্বর্গত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রচিত একটি ছোটদের কাহিনীকে চিত্রাকার দেবেন। গল্পটির নাম "গোপী গায়েন বাঘা বায়েন"। কাহিনী যখন ছোটদের তখন তাকে রঙীন করে ছবি পর্দায় উপস্থিত করাই বাঞ্ছনীয়।

পটমঞ্জরীর প্রথম চিত্রার্ঘ্য "মেঘ"-এ জহর রায়কে একটি জ্যোতিষীর ভূমিকায় দেখা যাবে। ছবিটি আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাবে

সত্যজিৎ রায় তাই করবেন স্থির করেছিলেন। কিন্তু এ দেশে রঙীন ছবি তৈরি করবার পথে বহু বাধা। আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত ল্যাবরেটরির অভাব তার মধ্যে প্রধান। তাই ও-ছবি আপাতত মুলতুবি রাখা হয়েছে।

তার বদলে কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করে তার বহু ভাষাভাষী অধিবাসীদের নিয়ে একটি ছবি তোলবার কথা সত্যজিৎ রায় ভাবছেন। স্রষ্টার ভাবনা যদি রজতপটে রূপ পরিগ্রহ করে তাহলে এ-ছবির সংলাপ কোন একটি ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা হবে শহর কলকাতার মতই নানা জাতীয়, বিচিত্ররূপী। তবে পাকাপাকিভাবে এখনই কিছু বলা শক্ত, কারণ নতুন ছবির কাজে হাত দেবার আগে পরিচালকের মন নানা বিষয়বস্তুর মধ্যে ওঠা-নামা করতে থাকে। সত্যজিৎবাবুর এখন সেই অবস্থা।

*

কিছুদিন আগে খবর বেরিয়েছিল যে, সত্যজিৎ রায় মহাভারত অবলম্বনে একটি ছবি তুলবেন। এ সংকল্প এখনও শ্রী রায় পোষণ করেন।

মহাভারত সম্বন্ধে সত্যজিৎ রায়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে মহাভারতের চরিত্রগুলি রক্ত-মাংসের মানুষের মতই জীবন্ত, নিছক কাল্পনিক সৃষ্টি নয়—তাই আজকের মানুষের কাছে তাদের আবেদন এত স্পষ্ট, এত বাস্তব। মনস্তত্ত্বমূলক মানবীয় নাটক হিসাবে তিনি মহাভারতকে ছবির পর্দায় উপস্থিত করতে চান, কেবলমাত্র জাঁকজমকপূর্ণ পৌরাণিক ঘটনার মিছিল হিসাবে নয়।

সত্যজিৎবাবু মনে করেন যে, মহাভারতের মত ছবির ভূমিকালিপি পৃথিবীর সেরা শিল্পীদের নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত। এই চিরায়ত মহাকাব্যের চরিত্রগুলির সম্মান তাহলে পুরোপুরি বজায় রাখা সম্ভব হবে। তাঁর এই ইচ্ছা যদি কোনদিন পূরণ হয়, তাহলে তিনি বিখ্যাত রুশ অভিনেতা চেরকাশভকে যুধিষ্ঠিরের ভূমিকায় নির্বাচন করবেন। অবশ্য এ ধরনের ছবি করতে গেলে অন্যান্য দেশের সহযোগিতা লাভ করা চাই, এবং তা সম্ভব যৌথ-প্রযোজনা বা কো-প্রোডাকশনের মাধ্যমে। সত্যজিৎবাবু তাঁর এই মনোভাব জনৈক সাংবাদিকের কাছে সম্প্রতি ব্যক্ত করেছেন।

*

তারাচাঁদ বারজাতিয়া হিন্দী ছবির একজন নাম-করা পরিবেশক বা ডিস্ট্রিবিউটর। সারা ভারত জুড়ে তাঁর কারবার। চিত্র-ব্যবসায়ের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা খুব প্রখর। তিনি মনে করেন, বাংলা দেশে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ছবি তোলা উচিত, যেমন একদিন নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে তুলে এসেছে। স্থানীয় চিত্র-সাংবাদিক বা চিত্র-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যখনই তিনি মিলিত হয়েছেন, এ সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ তিনি সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেছেন।

প্রণতি ভট্টাচার্য প্রযোজিত "মধ্যরাতের তারা" শ্রীবারজাতিয়ার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান রাজশ্রী পিকচার্সের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করে। সেই উপলক্ষে তিনি সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। এবং এসেই সাংবাদিকদের তিনি একটি সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি আর পরের প্রত্যাশায় বসে থাকবেন না, নিজেই বাংলা ও হিন্দী

দুই ভাষাতেই ছবি তুলতে মনস্থ করছেন। এবং তা তোলা হবে কলকাতার স্টুডিওতে। প্রাথমিক তোড়জোড় ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। কাহিনী নির্বাচন চলছে। শিল্পী ও কলাকুশলীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো হচ্ছে। এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ যথাসময়ে চিত্রামোদীরা জানতে পারবেন।

* * *

এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে পড়ে, মাদ্রাজে তোলা হিন্দী ছবির বিপুল জনপ্রিয়তার কথা। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতীয় স্টুডিওগুলিতে শুধু আঞ্চলিক ভাষায় ছবি তোলা হত—এখানে এখন যেমন হচ্ছে। অথচ দেখতে দেখতে হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতীয় প্রযোজকরা

এল বি ফিল্মসের "মেমদিদি"-র প্রধান দুই চরিত্রে কেশী মেহরা ও তনুজা। ছবিটি আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাবে
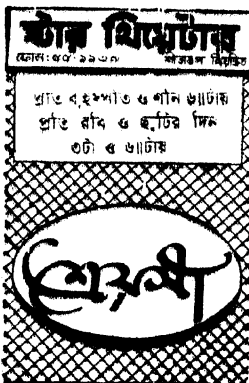
আজ নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছেন। মাদ্রাজে তোলা হলেও এসব ছবির তারকা আমদানি করা হয় বোম্বাই থেকে। এ যেন "তোর শিল, তোর নোড়া, তোরই ভাঙি দাঁতের গোড়া" গোছের ব্যাপার।

এই প্রসঙ্গে একটি খাঁটি কথা বলেছেন হিন্দী চিত্রজগতের যশস্বী লেখক ও গীতিকার রাজেন্দ্রকৃষ্ণ। মাদ্রাজের ভেনাস পিকচার্স প্রযোজিত "নজরানা"র মুক্তি উপলক্ষে তিনি গত সপ্তাহে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর এবং ছবির যুগ্ম-প্রযোজক এস কৃষ্ণমূর্তি ও টি গোবিন্দ-রাজনের সম্মানার্থে একটি ভোজসভার আয়োজন করেন ছবিটির স্থানীয় পরিবেশক ভি এ পি আয়ার। সেই সভায় এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে রাজেন্দ্র-কৃষ্ণ বলেন যে, দক্ষিণী প্রযোজকদের সাফল্যের কোন গোপন ফরমুলা নেই, তাঁদের আন্তরিকতাই তাঁদের সাফল্যের পথ প্রশস্ত করেছে। অন্যত্র কোন রকমে ছবি শেষ করাই প্রযোজকদের লক্ষ্য থাকে, আর দক্ষিণী প্রযোজকদের লক্ষ্য থাকে বিষয়বস্তুর সার্থক রূপায়ণের প্রতি। তাঁদের সাফল্যের এইটাই গোপন তথ্য।

বাংলা দেশের প্রযোজকরা কথাগুলি ভেবে দেখতে পারেন।

* * *

ইউনাইটেড ফিল্মসের বহু-আকাঙ্ক্ষিত "স্বয়ম্বরা"র মুক্তি এই সপ্তাহে। ছবিটি সম্বন্ধে অনেক কথাই আমরা পূর্বে জানিয়েছি। সন্তোষকুমার ঘোষের গল্প অবলম্বনে পরিচালক অসিত সেন ছবিটি তুলেছেন। সুপ্রিয়া চৌধুরী ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এর প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। পণ্ডিত রবিশঙ্করের সুর এ-ছবির অন্যতম আকর্ষণ।

রঙমহলের শিল্পিবৃন্দ রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে "চিরকুমার সভা" অভিনয় করে কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। বিভিন্ন চরিত্রের রূপসজ্জায় তাঁদের দেখা যাচ্ছে

রাজ্য সরকারের কবি-অর্ঘ্য

রবীন্দ্রনাথের শততম জয়ন্তীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবি-অর্ঘ্যরূপে যে ছয়টি অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরী করেছেন, সেগুলি গত সপ্তাহে শহরের কয়েকটি বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করে।

এই ছয়টি চিত্রের মধ্যে চারটিকে একসঙ্গে "অর্ঘ্য" নামে সংযুক্ত করা হয়েছে। দেবকীকুমার বসু পরিচালিত "অর্ঘ্য" রবীন্দ্রনাথের "পূজারিনী, দুই বিঘা জমি, অভিসার ও পুরাতন ভৃত্য"—এই চারটি কবিতার চিত্ররূপ।

কবিতা চতুষ্টয়ের চিত্রায়ণে পরিচালক শ্রীবসু কবিতা-কাহিনীকে অবিকৃত রেখেছেন, এবং আবৃত্তি, অভিনয়, সঙ্গীত, নৃত্য এবং ভাবানুগ দৃশ্যপটের মাধ্যমে চলচ্চিত্রপটে বিষয়বস্তুর রূপ দিয়েছেন।

কিন্তু কবিতা-আখ্যানের প্রতি পরিচালক আনুগত্য দেখালেও বিভিন্ন কবিতার মর্ম-রসের সিঞ্চনে তিনি তাঁর চিত্রসৃষ্টিকে রসোত্তীর্ণ করে তুলতে পারেননি। কবিতা-গুচ্ছের চিত্রবিন্যাসে তিনি কাহিনীকে অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘায়িত করে তুলেছেন। নাচ-গানের মাত্রাধিক্যও কবিতাগুলির রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। এবং কবিতার চরণ ও সংলাপ নেপথ্য ও বিভিন্ন চরিত্রের মুখে তিনি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করলেও বিশেষ নাট্যমুহূর্তে কবিতা-বহির্ভূত সংলাপ ছবিতে রসহানির কারণ হয়ে উঠেছে। অভিসার-এর চিত্ররূপে সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কথার মাঝখানে বাসবদত্তার মুখে "বল, বল থামলে কেন?" কথাগুলি হাস্যকর। "অভিসার" ও "পুরাতন ভৃত্যে"র নাট্য-পরিণতিতে "রোদনভরা এই বসন্ত" ও "মরণ রে তুহু মম শ্যাম সমান" গান দুটির অপপ্রয়োগ রসিক-জনকে পীড়া দেবে।

চারটি কবিতার চিত্ররূপের মধ্যে "দুই বিঘা জমি" ও "পূজারিনী" দর্শকের কাছে বেশী চিত্তাকর্ষক বলে মনে হতে পারে। এই দুটি ছবির প্রধান চরিত্রে যথাক্রমে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও মঞ্জুশ্রী চাকিকে দর্শকের ভাল লাগে। তাঁদের অভিনয় সংবেদনশীল।

"অভিসার"-এর চিত্রায়ণ মোটেই মনোগ্রাহী হয়নি। রবীন্দ্রনাথের এই অনবদ্য রসমধুর কবিতাটির রস ও মাধুর্যে
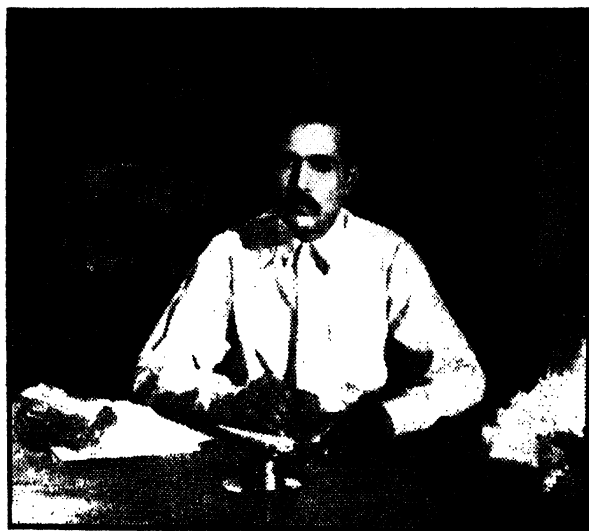
অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের অভিনব জীবনী-চিত্র "ভগিনী নিবেদিতা"-র শ্রীঅরবিন্দের রূপসজ্জায় রবীন মজুমদার

দর্শকের মনকে নতুন করে সিক্ত করে তুলতে পারেননি পরিচালক। এবং "অভিসার"-এর বাসবদত্তাকে সন্ধ্যা রায়ের ব্যক্তিত্ব, অভিনয় ও অভিব্যক্তিতে কল্পনা করে নেওয়া শক্ত। সন্ন্যাসী উপগুপ্তের বেশে দ্বিজু ভাওয়াল চিত্ররূপের প্রয়োজন মিটিয়েছেন মাত্র।

"পুরাতন ভৃত্য"র চিত্ররূপ অনেকটা 'কমেডি' কথাচিত্রের আঙ্গিকে তৈরী। তাই কৌতুকরসের উপকরণ ছবিটিতে অপর্যাপ্তরূপে পরিবেশিত। এবং কবিতার মূল চরিত্র 'কেষ্টা' ছবিটিতে তিন প্রধানের (গৃহকর্তা ও কর্ত্রী সহ) একজন হয়ে উঠেছে। ফলে "পুরাতন ভৃত্য"র রস ছবিটিতে অনেকখানি বিক্ষিপ্ত। মূল চরিত্রে অনুপকুমার (কেষ্টা), অমর গঙ্গোপাধ্যায় ও অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

"অর্ঘ্য"র কয়েকটি রবীন্দ্র-সংগীত দরদভরা কণ্ঠে গেয়েছেন সুচিত্রা মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও শ্যামল মিত্র।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্য দুটি চিত্র হল: শান্তি চৌধুরী পরিচালিত "রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন" এবং আশিস মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "রবীন্দ্রনাথ ও গান পুনর্গঠন"। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন নিয়ে তথ্যবহুল এই দুটি প্রামাণিক চিত্র সুপরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত। শান্তি চৌধুরীর ছবিটি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও কর্মধারার সঙ্গে দর্শকের পরিচয় ঘটিয়ে দেবে।

আশিস মুখোপাধ্যায়ের ছবির তথ্যনিষ্ঠা ও শিল্পশোভনতা ভূয়সী প্রশংসার দাবি রাখে।

প্রেমের মূল্য

দক্ষিণ ভারতের নবতম হিন্দী চিত্রোপহার, ভেনাস পিকচার্স-এর "নজরানা" চিত্রামোদীদের মনোরঞ্জনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে।

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত জনপ্রিয় তামিল চিত্র "কল্যাণ পারিসু"র হিন্দী চিত্ররূপ এই ছবি। ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে দুই সহোদরাকে কেন্দ্র করে।

একই পুরুষের প্রতি দুই সহোদরার প্রণয় এবং একের সুখের জন্য অপরের আত্মত্যাগ এই ছবির আখ্যান-কেন্দ্র। ত্রিকোণ প্রেমের এই সমাধানে নায়ক ও তার প্রণয়িনী পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এবং এই অবাঞ্ছিত সমাধানের ফাটল ধরে তিনজনের জীবনেই যে

আশ্রমিক সংঘ নিবেদিত "বাল্মিকী প্রতিভা"-র শেষ দৃশ্যে দেবী বীণাপাণি দস্যু রত্নাকরকে বরদান করছেন। ভূমিকা দুটি রূপায়িত করেন পিয়ালি রায় ● অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়

অনিবার্য বেদনাময় পরিণতি দেখা দেয়, তা নিয়েই চিত্রনাট্যের বিস্তার।

কাহিনীকার-পরিচালক শ্রীধর ছবির এই উপাখ্যানটির বিন্যাসে এর আবেগধর্মিতার প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়েছেন। এই কারণে ছবিটি আবেগরসের দিক দিয়ে চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠেছে। ছবির ভাব-গম্ভীর নাট্যরসের ফাঁকে ফাঁকে পরিচালক-

কাহিনীকার সুকৌশলে কৌতুক উপকরণ পরিবেশন করেছেন। এর ফলেও ছবিটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ছবিটিতে ঘটনার বাহুল্য এবং কষ্টকল্পিত ও অযৌক্তিক নাট্যোপকরণেরও অভাব নেই।

ছবির তিনটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাজ কাপুর, বৈজয়ন্তীমালা ও ঊষাকিরণ। এ'দের সকলেরই অভিনয় স্বচ্ছন্দ ও মনোগ্রাহী। অন্যান্য কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রে অচলা সচদেব, আগা, সবিতা চট্টোপাধ্যায় ও জেমিনী গণেশন উল্লেখযোগ্য।

গানের দিক দিয়ে ছবিটি সমৃদ্ধ। রাজেন্দ্রকৃষ্ণ রচিত ছবির কয়েকটি গানে মনমাতানো সুর দিয়েছেন সংগীত-পরিচালক রবি। ছবিটির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ ও অঙ্গসৌষ্ঠব প্রশংসনীয়।

নাট্যাভিনয়

আশ্রমিক সংঘের "বাল্মীকি প্রতিভা"

রবীন্দ্র-শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ গত ১২ই মে নিউ এম্পায়ারে রবীন্দ্রনাথের "বাল্মীকি প্রতিভা" গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করেন।

আশ্রমিক সংঘ নিবেদিত এই গীতিনাট্য কবির অনবদ্য রচনার মর্মরসটি সেদিন আশ্চর্য সুন্দরভাবে রসিকজনের মনে সঞ্চার করে দিতে সমর্থ হয়। এই বিরল সাফল্যের মূলে ছিল এই গীতিনাট্যের প্রয়োগ-কর্তা এবং শিল্পীদের গভীর আন্তরিকতা ও নিবিড় রসবোধ। কোন আঙ্গিক, অলংকার ও বৈভবের আশ্রয় না নিয়ে গীতিনাট্যের রূপকাররা পরম শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরকে অনুসরণ করেছেন। ফলে "বাল্মীকি প্রতিভা"র অন্তর্লীন মাধুর্য ও রস এই গীতিনাট্যাভিনয়ের প্রতি দৃশ্যে ও অঙ্কে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শকেরা শান্ত আবেগরসে আপ্লুত হয়ে গীতিনাট্যটি উপভোগ করেছেন।

গীতিনাট্যে বাল্মীকির চরিত্রে অবতরণ করেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মধুর কণ্ঠের গান ও মুখের অভিব্যক্তি দর্শককে প্রচুর আনন্দ দেয়। এক প্রধান দস্যু-অনুচরের রূপসজ্জায় শ্যামল মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় ও গান খুবই চিত্তগ্রাহী হয়ে ওঠে। বালিকার ভূমিকায় চিত্রলেখা চৌধুরীর মর্মস্পর্শী গান ও অভিনয় দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় যাঁরা গীতাভিনয়ে দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন, তাঁদের মধ্যে সুনন্দা রায়, পিয়াল্লি রায়, প্রিয়ব্রত রায় ও শোভন গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

বনদেবীর রূপসজ্জায় কস্তুরী গুপ্ত, মমতা চৌধুরী, জয়শ্রী লাহিড়ী, দোলনচাঁপা দাশগুপ্তা, সুনন্দা চৌধুরী ও শ্যামলী চন্দের নৃত্যাংশ খুবই চিত্তাকর্ষক হয়।

শিশু-রঙমহল-এর "ছেলেটা"

রবীন্দ্র-জন্ম শতবর্ষ পূর্তি এবং শিশু-রঙমহল-এর দশম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষে এই সুখ্যাত শিশু-সংস্থা গত ৭ই মে নিউ এম্পায়ারে তাঁদের নতুন নাট্য-প্রযোজনা "ছেলেটা" মঞ্চস্থ করেন।

জোয়ালা প্রোডাকশন্সের "সন্ধ্যারাগ"-এর একটি মনোমুগ্ধকর বহির্দৃশ্য

রবীন্দ্রনাথের একটি অনন্যসুন্দর গদ্য-কবিতা "ছেলেটা" এই মঞ্চ-প্রয়াসে রূপায়িত। রবীন্দ্রনাথের "ছেলেটা" এক নিরাশ্রয় অনাথ। শিক্ষকের শাসন, আত্মীয়ের অবজ্ঞা ও বন্ধুদের বিরূপতার ভেতর দিয়েই চলে তার প্রত্যহের উপেক্ষিত জীবন-পরিক্রমা। প্রহারে প্রহারে তার দিবস-সন্ধ্যার প্রহরগুলি হয়ে ওঠে দুঃসহ, তার স্বপ্ন ও সাধ, বাসনা ও ব্যাকুলতা, জিজ্ঞাসা ও জীবনাবেগ গঞ্জনা ও লাঞ্ছনায় দিনে দিনে হতে থাকে নিষ্পেষিত। যে প্রাণোচ্ছলতার পথে তার পদস্খলন, যে বেদনা থেকে তার জীবনের বিচ্যুতি, তার পরিচয় কেউ নিতে চায় না। প্রতিদিনকার প্লানির ঊর্ধ্বে সে গড়ে তোলে তার স্বপ্নের জগৎ। একদিন একটি স্বপ্নকে ধরতে গিয়েই সে তার প্রাণ বিসর্জন দেয় অতল জলের আহ্বানে। অশ্রু-বিসর্জনে পৃথিবী থেকে সেদিন কেউ তাকে বিদায় জানায়নি।

শিশু-রঙমহল-এর "ছেলেটা"তে এমনি এক হতভাগ্য ছেলের মর্মস্পর্শী কাহিনী রূপ নিয়েছে। "ছেলেটা"র রূপকার এই মঞ্চ-নাট্যে রবীন্দ্রনাথের "ছেলেটা"র মূল রস ও ভাব থেকে অনেকখানি সরে এসেছেন। জীবন-জিজ্ঞাসার ব্যাপ্তি ও গভীরতায় যে গদ্যকবিতা মহৎ, বিষাদান্ত "মেলোড্রামা"র স্থূল আবেগে তাই খর্বিত রূপ নিয়ে শিশু-রঙমহল-এর "ছেলেটা"য় উপস্থিত হয়েছে। রবীন্দ্র-কবিতার শিল্পরস এই নাট্যরূপে তাই অনেকখানি অপরিস্ফুট। মঞ্চে এই কবিতা-কাহিনীর গঠন ও বিন্যাস শিথিল এবং নাট্যরূপে নানা ঘটনা ও উপকরণের বাহুল্যও পীড়াদায়ক। এর ফলে নাটকটির রস পরিপূর্ণভাবে দানা বেঁধে উঠতে পারে না।

তবুও যদি "ছেলেটা" মনোগ্রাহী হয়ে থাকে, তবে তার মূলে রয়েছে এর শিশু-শিল্পীদের সাবলীল ও প্রাণবান অভিনয়। এদের মধ্যে সকলের আগে দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবে মূল চরিত্রের অভিনেতা ময়ূখ ঘোষ। তার মূকাভিনয় বাঙ্ময়। নিরুচ্চার অভিব্যক্তিতে এই কিশোর অভিনেতা চরিত্রটির চিত্তদাহ ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। চরিত্রটিতে দুর্বার প্রাণোচ্ছলতা আরোপেও শ্রীমান প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছে। আরও যারা প্রাণবন্ত ও স্বচ্ছন্দ অভিনয়ে নাটকটিকে চিত্তগ্রাহী করে তুলেছে, তাদের মধ্যে রয়েছে দীপেশ চক্রবর্তী, সাথী, নন্দিতা ও প্রবুদ্ধ।

রবিশঙ্করের অনবদ্য সুরসৃষ্টি এই নাটকে প্রাণসঞ্চার করেছে। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নৃত্য-পরিকল্পনা রসিকজনের সাধুবাদ অর্জন করবে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন সমর চট্টোপাধ্যায়।

খেলার মাঠে

একলব্য

খেলাধুলোর এক বিচিত্র কাহিনী। অনেকটা স্বপ্নের মত।

স্থান : যোধপুর থেকে ৪৫ মাইল দূরের এক টেনিস কোর্ট। কাল : অপরাহ্ন। পাত্র : দুই প্রতিদ্বন্দ্বী টেনিস খেলোয়াড়।

টেনিসে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় সাধারণত পাঁচটি। জেণ্টস সিংগলস, জেণ্টস ডাবলস, লেডিস সিংগলস, লেডিস ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস। কিন্তু এখানে ছিল এক নতুন বিষয়, যাকে মিক্সড সিংগলস বলে অভিহিত করা যায়। অর্থাৎ সিংগলসের খেলায় এক তরুণের সংগে এক তরুণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিষয়টি যেমন অভিনব খেলার ফলাফলও তেমন অতি বিচিত্র।

চ্যালেঞ্জ আসে তরুণীর কাছ থেকে টেনিস খেলায় তাকে কে হারাতে পারে। হাসি-ভরা মুখ নিয়ে সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এক তরুণ। এবার পাল্টা চ্যালেঞ্জ। 'কিছু বাজি ধরবেন?' 'নিশ্চয়ই।' বলে এগিয়ে আসে হর্ষোৎফুল্ল তরুণী। 'আপনার যা ইচ্ছে বাজি ধরতে পারেন।'

'বেশ! খেলায় যদি আপনার হার হয় আমার গলায় বরমাল্য দিতে হবে।'

'তাতে রাজী।' বলে তরুণী খেলা আরম্ভ করে তরুণের সংগে। কোর্টের আশেপাশে প্রবল উত্তেজনা। ফলাফল জানবার এবং পরিণতি দেখবার জন্য দর্শকদের আকুল আগ্রহ। একবার এগিয়ে যাচ্ছে তরুণ, একবার তরুণী। জয়-পরাজয় মীমাংসার মুখে তরুণের এক দুর্বল 'ড্রাইভ' তরুণী ফেরাতে পারে না। সোল্লাসে কোর্টের মধ্যে ঢুকে পড়ে যত দর্শক। তরুণী তার কথা রেখে বিজয়ীর গলে পরিয়ে দেয় বরমাল্য। মিলনের ইতরে জনার অধ্যায়ও বাকী থাকে না।

টেনিস কোর্টে রাজপুতনার সিরাস বংশের এক তরুণীর এই বিচিত্র বিয়ের খবরটি পরিবেশন করেছেন ইণ্ডিয়ান নিউজ সার্ভিস-এর সংবাদদাতা। যে বংশের প্রেমকাহিনীর কিংবদন্তীর শেষ নেই। তরুণের দুর্বল 'ড্রাইভ' তরুণী ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করেই অক্ষম হয়েছে কি না খবরে সংবাদদাতা তার উল্লেখ করেননি; কিন্তু আভাস আছে বাঞ্ছিতকে বিমুখ না করার জন্যই তার ব্যর্থতা। খেলার আগে ফলাফল 'গড়াপেটা' করে রাখাও বিচিত্র নয়। কলকাতায় ফুটবল খেলায় বেটিং-এর (বাজি) জন্য কত খেলার ফলাফলই তো আগে থেকে গড়াপেটা করা হয়। কিন্তু সে বেটিং-এর উদ্দেশ্য থাকে ধনলাভ। খেলার ব্যাপারের বেটিং-এ লক্ষ্মীলাভের এটা প্রথম ঘটনা। কলকাতায় যোধপুরের এই কাহিনীর ছোঁয়াচ লাগবে না তো!

* * *

হকি মরসুমের উপর যবনিকা পড়েছে। ফুটবল মরসুম আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু হকি লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের এখনো মীমাংসা হয়নি। হকি খেলার পরিচালকদের পক্ষে এটা মোটেই যোগ্যতার কথা নয়। যেভাবে চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণয়ের প্রশ্ন 'কোল্ড স্টোরেজে' জীইয়ে রাখা হয়েছে তা পরিচালকদের অব্যবস্থা এবং অযোগ্যতারই নিদর্শন।

কেন চ্যাম্পিয়নশিপের মীমাংসা হয়নি? না, ইস্টবেংগল ও কাস্টমস দুই ক্লাব সমান পয়েণ্ট পেয়ে লীগ কোঠার উপরে থাকে। ফলে চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণয়ের জন্য এই দুটি ক্লাবের মধ্যে আর একটি বিশেষ খেলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বি এইচ এ অর্থাৎ বেংগল হকি এসোসিয়েশনের পক্ষে সে খেলার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

খেলার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি বললে অবশ্য ঠিক বলা হয় না। বলা উচিত খেলার অব্যবস্থাই করা হয়েছিল। কারণ কাস্টমসের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও খেলার দিন তারিখ ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু

বেংগল হকি এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি এবং এডিশনাল পুলিস কমিশনার শ্রী পি কে সেনের সহধর্মিণী শ্রীমতী আরতি সেনের কাছ থেকে 'বেটন কাপ' গ্রহণ করছেন সেণ্ট্রাল রেলের অধিনায়ক পেয়ারেলাল। —ফটো 'দেশ'।

বেটন কাপে মোহনবাগান ও দিল্লি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ক্লাবের খেলায় একটি তীর বাঁচাচ্ছেন দিল্লির গোলরক্ষক।
—ফটো 'দেশ'।

খেলাটি হবে কিনা সে বিষয়ে বি এইচ এ-র ছিল পুরোপুরি সন্দেহ ও অবিশ্বাস। শেষ পর্যন্ত না খেলার পক্ষে কাস্টমস ক্লাব সংকল্পে অটুট থাকায় খেলার দিন খাম-খেয়ালীপনার চূড়ান্ত পরিচয় দিয়ে খেলা স্থগিত করা হল, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী দুই পক্ষের এক পক্ষকে সে কথা জানানো হল না। ইস্টবেংগল ক্লাব যথারীতি মাঠে হাজির হল। তাদের দাবিঃ প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুপস্থিতিতে তারাই চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারী।

বি এইচ-এর পক্ষ থেকে নতুন করে খেলার আয়োজন করা হল। ইস্টবেংগলের কাছে চিঠি গেল—তোমরা কবে খেলতে রাজী। এবার ইস্টবেংগল সংকল্পে অটুট। চিঠির জবাব এল: 'খেলার প্রশ্ন ওঠে না, আমরা চ্যাম্পিয়নশিপের অধিকারী।' ফাঁপরে পড়ল বি এইচ এ। এখন কি করা যায়? অনেক গবেষণার পর ঠিক হল এবার চ্যাম্পিয়নশিপই বাতিল করে দেওয়া হবে অর্থাৎ হকি লীগে এবার কেউই 'চ্যাম্পিয়ন' নয়। অদ্ভুত ঘোষণার এই চিঠি ইস্টবেংগলের কাছে পৌঁছুতেই তারা পাল্টা চিঠি দিয়ে নতুন করে চ্যাম্পিয়নশিপের দাবি জানিয়েছে। এই দাবি সম্পর্কে এখনো বি এইচ এ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি।

না খেলে খেলা জেতার সম্মানলাভের আমি সমর্থন করি না। বিশেষ করে বড় বড় ক্লাবের পক্ষে এ আচরণ খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির পরিচায়ক নয়। এবার মোহনবাগান ক্লাবও ক্রিকেটের লীগ ও নক আউট জিতেছে এক রকম না খেলে। এখন ইস্টবেংগল ক্লাবও চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচ না খেলে হকি লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ দাবি করছে। কিন্তু কি ক্রিকেট, কি হকি দুই ক্ষেত্রেই ক্লাবের দাবির পেছনে রয়েছে পরিচালক সমিতির অব্যবস্থা ও খামখেয়ালীপনা। ক্লাবের দোষের চেয়ে পরিচালক সমিতির দোষ বেশী। শান্তি যেখানে বিঘ্নিত সেখানে সন্ধি বিধেয়। গোলমালের ক্ষেত্রে একটু সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সন্ধি করলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

হকি লীগ নিয়ে বি এইচ এ সত্যিই এক মুশকিলে পড়েছে। এগোলেও বিপদ পেছলেও বিপদ। শাঁখের করাতের মত। ইস্টবেংগলকে চ্যাম্পিয়নশিপ দিলে কাস্টমসই বা শুনবে কেন? খেলা যখন কর্তৃপক্ষ থেকে স্থগিত হয়েছে তখন তারাও খেলার দাবি করতে পারে। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে চ্যাম্পিয়নশিপ মীমাংসার জন্য আদালত পর্যন্ত যাওয়াও বিচিত্র নয়! হকি লীগের তৃতীয় ডিভিসনের চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে ইতিমধ্যেই একটি ক্লাব আদালতের শরণ নিয়েছে। ফলে কোন ডিভিসনের লীগ খেলারই পুরস্কার বিতরণ করা হয়নি। হকি খেলার দীর্ঘ ইতিহাসে এ এক নতুন ঘটনা।

* * *

ফুটবল খেলার মত হকিতেও প্রধান প্রতিযোগিতা তিনটি। ফুটবলে যেমন রোভার্স, ডুরাণ্ড ও আই এফ এ শীল্ড, হকিতে তেমন গোল্ড কপ, আগা খাঁ কাপ ও বেটন কাপ। এবার গোল্ড কাপ জিতেছে মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপ, আগা খাঁ কাপ পেয়েছে বিভিন্ন রাজ্যের উঠতি খেলোয়াড় নিয়ে গড়া প্রেসিডেন্টের একাদশ, বেটন কাপ ঘরে তুলেছে বোম্বের সেণ্ট্রাল রেল।

এবার ৩২টি দল নিয়ে বেটন কাপের খেলার তালিকা রচনা করা হয়েছিল। এর মধ্যে বাইরের ৯টি দল ছিল খুবেই শক্তিশালী। অবশ্য আগা খাঁ কাপ বিজয়ী প্রেসিডেন্টের একাদশ প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য নাম পাঠিয়েও শেষ পর্যন্ত যোগ দেয়নি। কিন্তু রায়গড়ের সিটি ক্লাব, দিল্লী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ক্লাব, মারহাটা লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি, মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপ, পাঞ্জাব পুলিস, লুসিটেনিয়ান্স, সেণ্ট্রাল রেল ও ইণ্ডিয়ান নেভী যথারীতি খেলায় অংশ গ্রহণ করে। এ ছাড়া কলকাতার নামডাকের ক্লাবের মধ্যে মোহনবাগান, ইস্টবেংগল, কাস্টমস ও মহমেডান স্পোর্টিং তো ছিলই।

বেটন কাপের সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে কোনবার ভারতের এতগুলি শক্তিশালী টিম যোগ দেয়নি। সমস্ত দলই কিছু কিছু অলিম্পিক খেলোয়াড়ে সমৃদ্ধ ছিল, যাঁরা রোম অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পাঞ্জাব পুলিস দলে ছিলেন ৪ জন অলিম্পিক খেলোয়াড়—রাইট ব্যাক পৃথ্বীপাল সিং, সেণ্টার হাফ চরণজিত, রাইট ইন গুরুদেব সিং ও লেফট ইন উধম সিং। গোলরক্ষক লক্ষ্মণ, লেফট ব্যাক শান্তারাম ও লেফট ইন বি পাতিল, এই তিনজন অলিম্পিক খেলোয়াড়ে সমৃদ্ধ ছিল মারহাটা লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি দল। মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপের রাইট ইন পিটার এবং সেণ্ট্রাল রেলের সেণ্টার ফরোয়ার্ড আরম্যান অপর দুই অলিম্পিক খেলোয়াড়। কলকাতার তিনটি ক্লাবেও তিনজন অলিম্পিক খেলোয়াড় আছেন। কাস্টমসের সেণ্টার হাফ রোন অলিম্পিক টিমের ছিলেন অধিনায়ক, ইস্টবেংগলের যোগীন্দর সিং ছিলেন রাইট আউট, মোহনবাগানের ভোলা লেফট আউট। এই ১২ জন অলিম্পিক খেলোয়াড় ছাড়াও বহু কৃতী ও কুশলী খেলোয়াড় এবার বেটন কাপে খেলে গেছেন।

দিল্লিতে ভারত ও জাপানের মধ্যে ডেভিস কাপের পূর্বাঞ্চলের ফাইন্যাল খেলার প্রথম সিংগলসের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আকুসী মিয়াগী (জাপান) ও জয়দীপ মুখার্জি করমর্দন করছেন। প্রথম সিংগলসে জয়দীপ হেরে গেলেও ভারত ৪—১ খেলায় জাপানকে হারিয়ে দিয়েছে

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি কারো খেলা দেখেই যেন মন ভরেনি। সেণ্ট্রাল রেল ও পাঞ্জাব পুলিসের ফাইন্যাল খেলা ছাড়া অন্য কোন খেলাতেও তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস পাওয়া যায়নি। খ্যাতনামা খেলোয়াড়রা কোন কোন খেলায় খ্যাতি অর্জন করেননি বললে অবশ্য সত্যের অপলাপ করা হবে। কিন্তু যদি বলি কোন খেলোয়াড়ই সে ক্রীড়াশৈলী দেখাতে পারেননি যা এককালে দর্শকদের মোহাবিষ্ট করে রাখত তা হলে হয়তো কেউই আপত্তি করবেন না। সত্যি আমাদের হকি খেলার স্ট্যান্ডার্ড বা মান অনেক নেমে গেছে। রোম অলিম্পিকে দল গঠনে হয়তো কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। কিন্তু খেলার নিম্নমানই যে পাকিস্তানের কাছে আমাদের পরাজয়ের কারণ সে কথা অস্বীকার করে লাভ নেই।

এই লেখার সংগে 'বেটনের সমস্ত খেলার ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে। তবু খেলার কথা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করছি। সেমি-ফাইন্যালে শক্তিশালী পাঞ্জাব পুলিসের কাছে গতবারের বেটন কাপ বিজয়ী মোহনবাগানের ১—০ গোলে পরাজয় ক্রীড়াধারার সংগতিসূচক ফলাফল, কিন্তু তৃতীয় রাউণ্ডে ইণ্ডিয়ান নেভীর কাছে ইস্টবেংগল ক্লাবের ৩—১ গোলে পরাজয় স্বীকার বেশ কিছুটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন এবং এ বছরের লীগ কোঠার শীর্ষস্থান অধিকারী ইস্টবেংগলের পরাজয় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। বেটনে কাস্টমস ক্লাব এবার মন্দ খেলেনি। বোম্বের লুসির্টোনিয়ান্স ক্লাবের সংগে দুইদিন অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করবার পর তৃতীয় দিন তারা ১—০ গোলে বিজয়ী হয়ে কোয়ার্টার ফাইন্যালে ওঠে। কোয়ার্টার ফাইন্যালে হার স্বীকার করে বেটন বিজয়ী সেণ্ট্রাল রেলের কাছে ২—১ গোলে। দুই নাম-করা টিম গোল্ড কাপ বিজয়ী মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপ ও পাঞ্জাব পুলিসের খেলায় মোটেই নৈপুণ্যের আভাস পাওয়া যায়নি। উঠতি খেলোয়াড় নিয়ে গড়া রায়গড়ের সিটি ক্লাব কিন্তু বেশী গোলে এম ই জি-র কাছে হারলেও দর্শক মনে ছাপ রেখে গেছে। আর সংগ্রাম-ক্ষমতায় প্রশংসা কুড়িয়েছে আমাদের গ্রীয়ার ক্লাব। দ্বিতীয় দিন পরম শক্তিশালী পাঞ্জাব পুলিসের কাছে ৩—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করলেও প্রথম দিন পাঞ্জাব দলের সংগে সমানে লড়ে তারা খেলা ড্র করেছিল। সমস্ত বাংগালী খেলোয়াড় নিয়ে গড়া গ্রীয়ার এবার লীগে মোহন-বাগান ও মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়েছে, ইস্টবেংগলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে একটি পয়েণ্ট। একটি খেলায় জয় ভাগ্য-প্রসূত হতে পারে, কিন্তু এতগুলি খেলায় কৃতিত্ব অর্জন গ্রীয়ারের সংগ্রামী ক্ষমতার পরিচায়ক।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বেটন কাপের মাঝারি ধরনের ক্রীড়াধারার মধ্যেও সেণ্ট্রাল রেল ও পাঞ্জাব পুলিসের শেষ দিনের শেষ খেলাটি দর্শকদের কিছুটা আনন্দ দিয়েছে এবং সেণ্ট্রাল রেল যোগ্য দল হিসাবেই ২—১ গোলে পাঞ্জাব পুলিসকে হারিয়ে দিয়ে সর্বপ্রথম লাভ করেছে বেটন কাপ। ভারতীয় রেল দল এবার জাতীয় হকির চ্যাম্পিয়ন। সেণ্ট্রাল রেল দলে সাত আটজন খেলোয়াড় ছিলেন, যাঁরা ভারতীয় রেল দলের হয়ে খেলেছেন।

এবারকার বেটন প্রতিযোগিতায় মাত্র দুজন খেলোয়াড় হ্যাটট্রিক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। একজন মোহনবাগানের মহাজন আর একজন ইস্টবেংগলের এরিক। একাই ৫টি গোল করার কৃতিত্ব সমেত মহাজন দ্বিতীয় রাউণ্ডে হ্যাটট্রিক করেন তালতলার বিপক্ষে। একই রাউণ্ডে এরিক মেসারার্সের বিরুদ্ধে।

নীচে বেটন কাপের সমস্ত খেলার ফলাফল দেওয়া হলঃ—

প্রথম রাউণ্ড

তালতলা (০) (১) স্পোর্টিং ইউঃ (০) (০)
পুলিস (১) পাঞ্জাব স্পোর্টস (০)
জ্যার্ডেরিয়ান্স (২) বি ই কলেজ (০)
ভবানীপুর (২) এরিয়ান (১)
আর্মেনিয়ান্স (০) (২) রেঞ্জার্স (০) (০)
উয়াড়ী (০) (৩) রাজস্থান (০) (০)
খালসা ব্লুজ (০) (০) (১) (১)
পোর্ট কমিশনার্স (০) (০) (১) (০)
মেসারার্স (ও...ক ওভার)
আদিবাসী (স্ক্র্যাচ)

দ্বিতীয় রাউণ্ড

মোহনবাগান (৭) তালতলা (১)
পুলিস (১) ইস্টার্ন রেল (০)
সিটি ক্লাব—রায়গড় (২) জ্যাভেরিয়ান্স (১)
গ্রীয়ার (২) ভবানীপুর (০)
কাস্টমস (১) আর্মেনিয়ান্স (০)
ওঃ বেঃ পুলিস (ওয়াক ওভার)
উয়াড়ী (স্ক্র্যাচ)
খালসা ব্লুজ (১) মহঃ স্পোর্টিং (০)
ইস্টবেংগল (৪) মেসারার্স (১)

তৃতীয় রাউণ্ড

মোহনবাগান (১) ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ক্লাব—দিল্লি (০)
মারহাটা এল আই (০) (২)
পুলিস (০) (০)
মাদ্রাজ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ (৪)
সিটি ক্লাব—রায়গড় (০)
পাঞ্জাব পুলিস (০) (৩) গ্রীয়ার (০) (০)
লুসির্টোনিয়ান্স (০) (০) (১)
কাস্টমস (০) (০) (০)
সেণ্ট্রাল রেল (১) ওঃ বেঃ পুলিস (০)
খালসা ব্লুজ (ওয়াক ওভার)
প্রেসিডেন্টের একাদশ (স্ক্র্যাচ)
ইণ্ডিয়ান নেভী (৩) ইস্টবেংগল (১)

কোয়ার্টার ফাইন্যাল

মোহনবাগান (৪) মারহাটা এল আই (০)
পাঞ্জাব পুলিস (২)
মাদ্রাজ ইঞ্জিনীয়ারিং গ্রুপ (১)
সেণ্ট্রাল রেল (২) কাস্টমস (১)
ইণ্ডিয়ান নেভী (৫) খালসা ব্লুজ (১)

সেমি-ফাইন্যাল

পাঞ্জাব পুলিস (১) মোহনবাগান (০)
সেণ্ট্রাল রেল (১) ইণ্ডিয়ান নেভী (০)

ফাইন্যাল

সেণ্ট্রাল রেল (২) পাঞ্জাব পুলিস (১)

—মুকুল—

'শুধু স্মৃতিটুকু পড়ে আছে সে এখানে নেই।'

সব ফেলে রেখে সে চলে গেছে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে। খ্যাতি যশ মান, মায়ের স্নেহ, দেশবাসীর ভালবাসা, কিছুই তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। আলমারি-ভরা কাপ মেডেল, বাক্স-ভর্তি সার্টিফিকেট, ঘর-বোঝাই সাজ-সরঞ্জাম—রানিং শু, ট্র্যাক সুট, দৌড়-লাফঝাঁপের আরো কত কি সরঞ্জাম। সব পড়ে রয়েছে পার্শীবাগান অঞ্চলের কালিদাস সিংহ লেনের বাড়িতে। কিন্তু যার জিনিস সে নেই। বাংলা তথা ভারতের খ্যাতনাম্নী মেয়ে এখন পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গের ঘরনী। নীলিমা ঘোষ এখন নীলিমা ভিক। কুর্ট ভিকের সহধর্মিণী।

অথচ এখানেই গড়ে উঠেছিল নীলিমার নামযশের তাজমহল।

অ্যাথলেটিকসে এমন মেয়ে কটা মেলে? বাংলায় তো আর একটাও নেই। গুনলে সারা ভারতেও বেশী পাওয়া যাবে না।

ছোটবেলায় অ্যাথলেটিকসে হাতেখড়ি হৃষীকেশ পার্কের বালিকা ব্যায়াম সঙ্ঘে। তারপর পার্ক পেরিয়ে বড় মাঠে। ১৯৪৮ থেকে সুনাম আহরণ। ১৯৪৯-এ ইস্থার লীলার পশ্চাৎধাবন। দৌড়পটু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে লীলা সে বছর সব স্পোর্টসে প্রথম। নীলিমা দ্বিতীয়। তারপর সুনামের সোপান বেয়ে ধীরে ধীরে উচ্চে আরোহণ। এ বছর থেকেই জাতীয় অ্যাথলেটিকসে নীলিমা নিয়মিতভাবে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করতে আরম্ভ করে। ১৯৫২ সাল থেকে মেয়ে টিমের অধিনায়িকা। ১৯৫১ সালে এশিয়ান গেমে ভারতের প্রতিনিধি। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে অ্যাথলেটিক টিমের অন্যতমা। অলিম্পিক অংগনে প্রথম বাঙালী মেয়ে। অবশ্য আরতি সাহাও।

অলিম্পিকের অ-ঠাঁই জলে নীলিমা অবশ্য ঠাঁই পায়নি। ভারতের কেই বা পেয়েছে? এমন যে কীর্তিমান মিলখা সিং সেও তো ডুবে গেল। আর নীলিমা তো সে দেশেরই নারীজাতির প্রতিনিধি।

তবু ভাবতে আনন্দে বুক ভরে ওঠে ভারতীয় অ্যাথলেটিকসে নীলিমা কতখানি বাড়িয়েছে বাংলার সুনাম। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত মেয়েদের স্পোর্টসে এই নামটিই ঘুরেছে সবার মুখে মুখে। নানা স্পোর্টসে রাশি রাশি পুরস্কার। একার কৃতিত্বে সিটি এ্যাথলেটিক ক্লাবের জন্য বছর বছর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ। রাজ্য রেকর্ডের ভাঙ্গাগড়া। হার্ডল রেসে বাঙালী মেয়ের প্রথম ভারতীয় রেকর্ড।

বাঙালী মেয়ে কেন? বাংলার ক'জন পুরুষই বা অ্যাথলেটিকসে ভারতীয় রেকর্ড করেছেন। বোধ হয় মাত্র দুজন। হাই জাম্পে আবু ইউসুফ আর পোল ভল্টে আনন্দ মুখার্জি।

শুধু কি অ্যাথলেটিকস? ব্যাডমিণ্টনেও নীলিমার কৃতিত্বের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। জাতীয় ব্যাডমিণ্টনে অনেকবারের প্রতিনিধি। রাজ্য ব্যাডমিণ্টনে একাধিকবার বিজয়িনীর জয়মাল্য। অ্যাথলেটিকসের নানা বিষয়েই নিপুণ ছিল নীলিমা। প্রথম নাম দৌড়ে, পরে হার্ডলসে, তারপর জ্যাভেলিন ও ডিসকাসে। স্পোর্টসকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিল এই মেয়েটি। অনলস অনুশীলন, অফুরন্ত অধ্যবসায়, আর বিরামহীন সাধনাই তার সাফল্যের সোপান।

নীলিমা সত্যিই নীলিমা। নীলিমায় নীলও বলা যায়। কোঁকড়া চুলের এই কালো মেয়েটিকে দেখলে মনে হত যেন কোনো গ্রীক ভাস্করের হাতে গড়া কালো পাথরের প্রতিমূর্তি। অ্যাথলেটিকস ক্ষেত্রে এক সৌন্দর্যের ছবি। অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারিণী।

কুর্ট ভিকের সংগে নীলিমার বিয়ের ব্যাপারটা অনেকের কাছে অজানা রয়ে গেছে। প্রথম পরিচয় বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের এক মিলন-কেন্দ্রে। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের আগে কোপেনহেগেনের অ্যাথলেটিক ক্যাম্প। ভারতীয় দলে নীলিমা। কুর্ট ভিক পশ্চিম জার্মানীর ফুটবল দলে। সৌজন্যসূচক মৌখিক আলাপ। ক্ষণিকের পরিচয়। কিন্তু ওই অল্প সময়ের আলাপে 'কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ' যে কাঞ্চনবরণ কুর্টের চোখে মায়াকাজল পরিয়ে দেবে তা নীলিমারও জানা ছিল না। দুজনার দুটি পথ দুই দিকে বেঁকে গেল। ৪ বছর পরে আবার পথ এসে মিশল সেই দেশে যে দেশ কত অজানারে জানিয়েছে প্রীতি, কতজনকে ঠাঁই দিয়েছে—কত দূরকে করেছে নিকট বন্ধু।

কলকাতার কূলে এসে ভিড়ল কুর্টের সোনার তরী। পরিচয়হীন অজানা শহর। জাহাজের কাজের ফাঁকে এখানে ওখানে আনাগোনা। তারপর দেখা স্বপ্নলোকের সংগীনির সংগে। নীলিমা তখন এখানকার এক ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়ের বাগদত্তা। বিয়ে এক রকম ঠিকঠাক। কিন্তু মান-অভিমানের পালা বিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে। দুজনের অন্তরে তখন বিরহজ্বালা। এই অবস্থায় আর এক বিরহীকে বিমুখ করা নীলিমার পক্ষে সম্ভব হল না। বাঙালীর সংগে বিদেশীর বিয়েতে শাঁখ বাজল না, হুলুধ্বনি পড়ল না, সানাই পোঁ ধরল না। ১৯৫৬ সালের এক শুভলগ্নে কলকাতার জার্মান কনসুলেটে নীলিমার সংগে কুর্ট ভিকের রেজিস্ট্রি-ম্যারেজ সম্পন্ন হয়ে গেল।

নীলিমা ঘোষের হার্ডলস রেসের মনোরম ভঙ্গি

দেশী সংবাদ

৯ই মে—সত্য-শিব-সুন্দরের একনিষ্ঠ পূজারী, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শাশ্বত বাণী-সাধক, নিখিল মানবাত্মার বাণী-মূর্তি বিশ্বমানব মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কবিতীর্থ কলিকাতা মহানগরী বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সোমবার ২৫শে বৈশাখ যথাযোগ্য গাম্ভীর্য ও আড়ম্বর সহকারে বিশ্ববাসীর সহিত একযোগে কবির শতবর্ষজয়ন্তী উদ্‌যাপন করে।

গত শনিবার অপরাহ্নের ম্লান আলোকে ভারতীয় অভিযাত্রী দলের নেতা ভারতীয় নৌ-বাহিনীর লেঃ এম এস কোহলী, শ্রীসোনাম গিয়াৎসো এবং একজন নেপালী শেরপা অন্নপূর্ণার (তৃতীয়) শীর্ষে আরোহণ করেন।

পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের যৌথ অধিবেশনে অদ্য বিতর্কমূলক পণপ্রথা নিবারণ বিল গৃহীত হয়। এই আইনানুযায়ী পণ গ্রহণ বেআইনী এবং দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

১০ই মে—বর্তমানে আসাম পরিভ্রমণকালে আচার্য বিনোভা ভাবে তথায় যে সব উক্তি করেন, তাহা সংখ্যালঘু বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মৌলিক স্বার্থের পরিপন্থী। আশঙ্কা হয় যে, তাঁহার এই সব উক্তির ফলে অসমিয়া সংকীর্ণতাকেই সম্ভবত উস্কানী দেওয়া হইয়াছে।

নয়াদিল্লির কূটনৈতিক মহল হইতে জানা গিয়াছে, পাকিস্তান তথাকথিত আজাদ কাশ্মীর এলাকায় এক নূতন 'ফরমোজা' সৃষ্টির চেষ্টায় আছে। পাকিস্তান আজাদ কাশ্মীরকে যে নূতন মর্যাদা দিতেছে রাজধানীর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ তাহার তাৎপর্য উপলব্ধি করিতেছেন।

১১ই মে—অদ্য পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সর্বত্র চতুর্থ শ্রেণীর হাসপাতাল কর্মচারীদের ধর্মঘট শুরু হইয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে, এই ধর্মঘট সর্বাত্মক হয় নাই। ধর্মঘটের সাফল্য সম্পর্কে সরকার পক্ষ ও কর্মী ফেডারেশনের পক্ষ হইতে পরস্পর বিরোধী মতামত ব্যক্ত হইয়াছে।

বিদ্যুৎশক্তির অভাবে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল বন্ধ হওয়ার দরুন অদ্য রাত্রি দশটার কিছু আগে হইতে হাওড়া স্টেশনের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম গৃহগমনেচ্ছু কয়েক হাজার নরনারী ও শিশু যাত্রীদের দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়। রাত্রি দুইটা পর্যন্ত তাহাদের গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

১২ই মে—বৃহস্পতিবার রাত্রে যে প্রচণ্ড ঝটিকা প্রবাহিত হয়, তাহার ফলে কলিকাতা হইতে ২০ মাইল দূরে ভদ্রেশ্বর এলাকায় ৪ জনের মৃত্যু হয় এবং অন্যূন ৫০ জন আহত হয়। নিহতদের ভিতরে দুইজন মহিলা এবং একজন বালিকা আছেন।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য-কেন্দ্রসমূহের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী-ধর্মঘট অদ্য পূর্বাহ্নে প্রত্যাহৃত হয়। পূর্বদিন সকাল হইতে ঐ ধর্মঘট শুরু হইয়াছিল।

১৩ই মে—বহরমপুরস্থ কেন্দ্রীয় রেশম গবেষণাগারটিকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে মহীশূরে স্থানান্তরিত করার জন্য গত ষোল বৎসর ধরিয়া যে সুপরিকল্পিত গোপন চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে, সম্প্রতি তাহা এক নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা বোর্ডের প্রাথমিক রিপোর্টে প্রকাশ, এ পর্যন্ত আই এ-তে শতকরা সাতাশ-এর কিছু বেশী এবং আই এস-সিতে শতকরা বত্রিশ-এর কিছু বেশী ছাত্রছাত্রী পাশ করিয়াছে।

১৪ই মে—একদিকে রাজ্য পুনর্বাসন দপ্তরের টালবাহানা ও অদূরদর্শিতা এবং অন্যদিকে রাজ্য সরকারের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের দরুন পূর্ববঙ্গাগত প্রায় দশ হাজার উদ্বাস্তু পরিবার আজ পথে বসিতে চলিয়াছে।

আজ এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ভারত সরকার অনুমোদিত ট্রেড ইউনিয়ন-সমূহকে উহাদের কার্যকলাপ পরিচালনের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা দানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

৯ই মে—আজ পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সমস্ত জেলার উপর দিয়া প্রচণ্ড গতিবেগ সম্পন্ন প্রলয়ংকর ঘূর্ণিবাত্যা বহিয়া যায় এবং তাহার ফলে বাইশজন নিহত, দুইজন নিখোঁজ এবং অন্যান্য পাঁচ ব্যক্তি আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১০ই মে—এয়ার ফ্রান্সের একটি সুপার কনস্টেলেশন বিমান আজ সাহারায় বিধ্বস্ত হয়। ফলে বিমানে যে ৬৯ জন আরোহী ছিলেন তাঁহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন।

উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার (ন্যাটো) মন্ত্রণা পরিষদ আজ পশ্চিম বার্লিনের এবং উহার জনসাধারণের স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প করে।

উত্তর আঙ্গোলার সেনাগের নিকট বিপ্লবীদের এক বিরাট সমাবেশ দেখা যাইতেছে—তাহারা নিকটবর্তী বিমানঘাটির উপর এক ব্যাপক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে বলিয়া মনে হয়। এই বিমানঘাটি হইতেই সরকারী বাহিনী বিপ্লবীদের উপর আক্রমণ চালাইয়া আসিয়াছে।

১১ই মে—আজ রাত্রিতে সরকারী সূত্রে জানা গিয়াছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের দশটি জেলা হইতে দুইদিন পূর্বেকার ঝড়ের দরুন এ পর্যন্ত ১৩৮ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া বহুসংখ্যক গো-মহিষ মারা গিয়াছে এবং প্রচুর ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে।

তাই সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল চারুসাথিয়ারা জানান যে, উত্তর-পূর্ব থাইল্যাণ্ডে ক্ষমতা দখলের জন্য কম্যুনিস্টরা যে ষড়যন্ত্র করিতেছিল—তাই সরকার তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন।

১২ই মে—সিংহলের সুপ্রীম কোর্ট আজ তিনজনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ইহারা পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়ককে হত্যার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু সোমরামা থেরো ১৯৫৯ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীকে তাঁহার বাসভবনে গুলী করেন। পরদিন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হয়।

নেপালের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৩ সাল হইতে পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে হিন্দীভাষা বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ইহার ফলে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে কেবল ইংরাজী ও নেপালী ভাষা ব্যবহৃত হইবে।

সোভিয়েট বিজ্ঞানীগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কথা ঘোষণাকালে বলেন যে, প্রতিহত বেতার তরঙ্গের সাহায্যে তাহারা শুক্রগ্রহের আবর্তনের বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। এই আবর্তনকাল পৃথিবীর দশ দিনের সমান।

১৩ই মে—পূর্ব পাকিস্তানের ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার সম্পর্কে আশঙ্কাজনক সংবাদ পৌঁছিয়াছে। হিন্দুপ্রধান এই অঞ্চলের প্রায় সমস্ত হিন্দু বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করিয়া ভস্মীভূত করা হইয়াছে। সংখ্যালঘু শ্রেণীর প্রাণহানির সংখ্যাও কম নহে। যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহারাই বা কে কোথায় রহিয়াছেন বলা কঠিন।

১৪ই মে—তিনদিন স্থগিত থাকার পর লাওস সম্পর্কে জেনেভা-সম্মেলন আগামীকাল শুরু হইতেছে বলিয়া মার্কিন সূত্রে আজ জানা গেল। প্রকাশ, সম্মেলনের পক্ষে যে অসুবিধা দেখা দিয়াছিল, বৃটেনের একটি আপস প্রস্তাবে তাহা দূর হইয়াছে। প্রস্তাবটি বৃহৎ শক্তিবর্গ মানিয়া লইয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
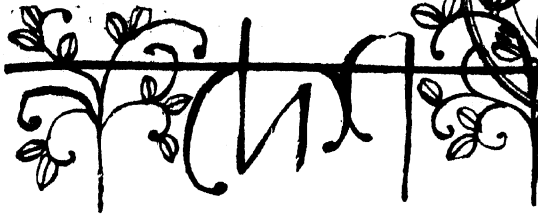
DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 27th May, 1961.

২৮ বর্ষ ॥ ৩০ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

রক্তস্নান

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক উৎসবের আনন্দ-দীপ্তি শোকের ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। বাংলা ও বাঙ্গালী এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় শিলচরে বাঙ্গালী সত্যাগ্রহীদের প্রাণ বলি দিতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নেহরু যখন গৌহাটিতে রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষার গুণকীর্তনে ব্যস্ত ঠিক সেই সময়েই শিলচরে ঘটেছে সরকারী শস্ত্র-পাণিদের বীভৎস তান্ডব। এর চেয়ে নির্মম পরিহাস আর কী হতে পারে। ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের প্রাণের মূল্য খুব বেশী নয়। আমাদের আইন-শৃংখলা-রক্ষাকর্তাদের বিচারে মূল্য আরও কম। তারপর সেই আইনশৃংখলারক্ষাকর্তারা যদি পক্ষপাতদুষ্ট হন, কোন একটি জনসমষ্টির প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হন তখন রাষ্ট্রিক নিরাপত্তার অজুহাতে লাঠি-গুলী-বন্দুকের যথেচ্ছ ব্যবহারে লজ্জা বা ভয়ের কিছুমাত্র বালাই থাকে না। শিলচরে আসাম রাজ্য সরকারের শান্ত্রীদের রণতান্ডব তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

কাছাড়ের বাংলাভাষী অধিবাসীদের চরম 'শিক্ষা' দানের জন্য আসাম রাজ্য সরকার সুপরিকল্পিতভাবে ব্যূহ রচনা করেছেন, এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। নতুবা শিলচরে সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব ও শান্তিপূর্ণ নরনারীর উপর লাঠি-গুলী-বন্দুকবাজীর কোনই সংগত কারণ দেখা যায় না। এ-সমস্ত ব্যাপারে গভর্নমেণ্ট অবশ্য চিরকালই সাফাই দিতে সিদ্ধ-হস্ত। ব্রিটিশ আমলের এবং এখনকার আমলের কর্তাদের মধ্যে এ-বিষয়ে কোনই তফাৎ দেখা যায় না। তবু আশ্চর্য মানি যে, ঘটনাস্থল থেকে বহুদূরে থাকা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নেহরু কী করে সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চিত হতে পারলেন শিলচরে পুলিসী গুলী চালনার যৌক্তিকতা সম্পর্কে। যে-রাজ্যের মন্ত্রী আমলা ও পুলিসবাহিনীর বাঙ্গালী-বিদ্বেষী মনোভাব সুবিদিত সে রাজ্যে পুলিশের গুলীচালনা এবং বাঙ্গালী হত্যা সম্পর্কে সরকারী সাফাইএ বিশ্বাস স্থাপন করা কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। শ্রী নেহরু আসাম সরকারের সাফাই নির্বিচারে সারসত্য বলে মেনে নিয়েছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি এইরকম অর্বাচীন অথবা ঘোর পক্ষপাতদুষ্ট হন তাহলে কোন গুরুতর বিষয়েই আর ন্যায় বিচারের আশা করা যায় না।

শ্রী নেহরুর সম্বল কতকগুলি ছাপ-মারা বাঁধাবুলি। দেশের ঐক্য এবং সংহতি রক্ষার জন্য তাঁর কিনা ভাবনার অন্ত নাই। তাঁর মতে ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করা নিরর্থক এবং আপত্তিকর। অথচ আসাম রাজ্য-সরকার লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষী এবং পার্বত্য অধিবাসিগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার বঞ্চিত করে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করলে শ্রী নেহরুর নিকট এই জবরদস্তি আপত্তিকর বলে মনে হয় না। শ্রী নেহরু দেশের ঐক্য এবং সংহতি রক্ষা করতে চান, ভাল কথা। কিন্তু যেখানে আঞ্চলিক অথবা ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট এবং একপক্ষ ভাষাগত আধিপত্য কায়েম করার জন্য নিষ্ঠুরতম উপায় অবলম্বনে দ্বিধা করে না সেখানে কতকগুলি ছাপমারা বাঁধা-বুলির সাহায্যে শ্রী নেহরু কী করে মিলনের সেতুবন্ধ রচনা করতে পারেন? এই প্রশ্নও এখন অবান্তর এবং অবাস্তব, আজ যখন বাঙ্গালীর রক্তস্রোতে আসাম রাজ্যের বহুভাষী ঐক্যের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ এবং চিরতরে বিলুপ্ত।

শিলচরে সরকারী গুলীচালনার মর্মান্তিক পরিণাম সুদ্ধমাত্র শোকাবহ মনে করলে গুরুতর ভুল হবে। শোকের তীব্রতা, প্রিয়জন বিয়োগবেদনা কালক্রমে ক্ষীণ হয়, এক্ষেত্রেও হবে। শোক নয়, অত্যাচার এবং অপমানের জ্বালা লক্ষ লক্ষ বঙ্গভাষী অধিবাসীর মনে জাগ্র[illegible] রবে যতদিন না বাংলাভাষা এ[illegible] বাঙ্গালী তার আপন অধিকার অর্জ[illegible] সক্ষম হয়। আসামের জনজীবনে [illegible] গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে গত বৎস[illegible] জুলাই মাস থেকে তাকে গভীরত[illegible] করেছেন দ্বিধাগ্রস্ত অদূরদর্শী প্রধা[illegible] মন্ত্রী নেহরু এবং বাঙ্গালী-বিদ্বে[illegible] বিকারগ্রস্ত চালিহা মন্ত্রিমণ্ডল[illegible] শ্রী নেহরু এবং শ্রীবিমলাপ্র[illegible] চালিহা কী করে আশা কর[illegible] পারেন যে, আসামের বাংলাভাষী অ[illegible] বাসীরা তাঁদের আশ্বাসবাক্যে অথ[illegible] সামান্য কৃপাকণা বিতরণে নিশ্চিন্ত বো[illegible] করবে? কাছাড়ের চৌদ্দ লক্ষ অধিবা[illegible] কী করে ভুলবে যে, তাদের মাতৃভাষ[illegible] সংগত অধিকার দাবির উত্তরে তা[illegible] আসাম সরকারের কাছ থেকে উপহ[illegible] পেয়েছে লাথি, ঘুষি আর প্রাণঘা[illegible] বুলেট! নারীঘাতী, শিশুঘাতী ক্ষম[illegible] মোহান্ধতার সঙ্গে কাছাড়ের চৌদ্দ [illegible] মানুষের সুস্থ মানবিক সম্পর্ক [illegible] উপায়ে স্থাপিত হবে?

শাসক এবং শাসিতের মধ্যে প[illegible] বিশ্বাস ও সদ্ভাব না থাকলে স্বা[illegible] গণতন্ত্রী দেশের নাগরিক জীবন বা[illegible] বিপর্যস্ত হয়। বারবার এরকম বিপ[illegible] ঘটতে দেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষে সর্বনা[illegible] সূচক। আসামে গত এক বৎস[illegible] ঘটনাবলী থেকে প্রধানমন্ত্রী নেহরু [illegible] সর্বনাশা বিপর্যয়ের ইঙ্গিত পান [illegible] সতর্ক নীতিনির্ধারণ করা প্রয়োজন [illegible] করেন নি, রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে এটা [illegible] বুদ্ধিবৈকল্যের পরিচায়ক। বিদ্[illegible] একটা মুষ্টিযোগের বিধান [illegible] ব্যক্তি গভীর দুশ্চিন্তাপীড়িত হলে [illegible] ওষুধ হল "Think of a numb[illegible] অর্থাৎ একাগ্রমনে কোন একটা স[illegible] জপ করা। শ্রী নেহরু সম্ভবত অনু[illegible] মুষ্টিযোগে বিশ্বাসী, যে কারণে [illegible] চোখ-কান বন্ধ করে ঐক্যমন্ত্র জপ [illegible] রক্তস্নাত আসাম সম্পর্কে দুশ্[illegible] লাঘবের চেষ্টায় নিযুক্ত। দুশ্[illegible] শ্রী নেহরুর একলার নয়; আর যে [illegible] লক্ষ লোক মাতৃভাষার মর্যাদা র[illegible] স্বাধীন নাগরিকত্বের ন্যায্য অধি[illegible] প্রতিষ্ঠায় সর্বস্ব পণ করেছে, [illegible] জনকে হারিয়েছে কিন্তু হার মানে[illegible] তারা নিশ্চয়ই জাতীয় ঐক্যের চ[illegible] প্রতিবাদী ক্ষমতালোহান্ধ অসম[illegible] শাসকগোষ্ঠীর নিকটে আত্মসমর্পণ ক[illegible] না। বাংলাভাষা ও বাঙ্গালীর পক্ষে [illegible] যেমন কঠিন পরীক্ষা তেমনি গৌর[illegible] শহীদের রক্তস্নাত কাছাড়ের অ[illegible] প্রতিরোধে।

বার্ধক্য এবং এর সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র ক'রে নতুন একটা বিজ্ঞানের সৃষ্টি হচ্ছে। যাকে সাধারণতঃ "জীবনের অপরাহ্ন" বলা হয়। সে সম্পর্কে অর্থনীতিক, সামাজিক, জৈবিক ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে নতুনভাবে চিন্তা করা হচ্ছে। হল্যান্ডের, 'নেদারল্যান্ড সোসাইটি ফর জেরোন্টোলজী' এই প্রশ্নগুলি পরীক্ষা করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে, বর্তমানে সেগুলি কার্যত প্রয়োগ করে দেখা হচ্ছে। এই পরীক্ষার বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে 'জেরোন্টোলজী'।

সমিতির সমাজ বিজ্ঞান শাখা, বৃদ্ধদের বাসস্থান, পেন্সন, তাদের প্রতি সমাজের মনোভাব ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে গবেষণা করে। এর চিকিৎসা বিভাগ, বার্ধক্য ও বার্ধক্যের রোগ সম্পর্কে গবেষণা করে। এর জৈবিক বিভাগ পশুর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে বার্ধক্যের গতি-প্রকৃতি নিরূপনের চেষ্টা করে।

জেরোন্টোলজী যদিও একটি আধুনিক বিজ্ঞান এবং হল্যান্ড এর চর্চা করছে বলে তার অর্থ এই নয় যে, নেদারল্যান্ডে অতীতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবাযত্নে আগ্রহের অভাব ছিলো। শহর ও নগরে যে সব 'হোম' বা অনাথালয় রয়েছে তাতেই প্রমাণিত হয় যে, অতীতেও এ সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। কিন্তু সকলেই হয়তো এইসব অনাথালয়ে আশ্রয় পেত না এবং অনেকে সরকারী ধর্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করতো। অতি প্রাচীনকাল থেকেই সরকারী ধর্মশালাগুলি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রধান আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং তখন থেকে অবশ্য অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

সাম্প্রতিককালে এ'দের জন্য গৃহ নির্মাণের ওপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হ'তো এবং বিশেষ ক'রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই সম্পর্কে অনেক কিছু করা হয়েছে। শহর পরিকল্পনা ও সম্প্রসারণের সময় চতুর্দিকের বড় বড় ফ্ল্যাট বাড়ির মধ্যে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের থাকার জন্য বাংলো বাড়ি তৈরি করার জায়গা রাখা ছাড়া
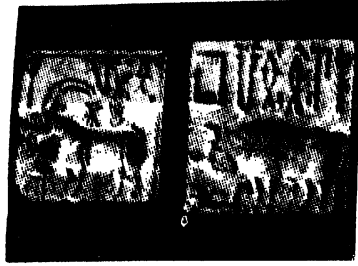
ভারতে আবিষ্কৃত হরাপ্পা সংস্কৃতির নিদর্শন খৃষ্টপূর্ব আড়াই হাজার থেকে দেড় হাজার বৎসর পূর্বেকার শীলমোহর— প্রথমটি দীর্ঘশৃঙ্গযুক্ত বন্য ছাগ এবং দ্বিতীয়টি বৃষের মূর্তি

ফ্ল্যাট বাড়িও রাখা হয়, সেখানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা স্বাধীনভাবে থাকতে পারে তবে আহার ও অন্যান্য সেবার ব্যবস্থা বাইরে থেকে করতে হয়। অবশ্য এখনও বেশীর ভাগ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাই আধুনিক অনাথালয়গুলিতে এক সঙ্গে বাস করে। বড় বড় ঘরে এক সঙ্গে শয়ন করে, এক সঙ্গে আহার করে। বর্তমানে এই অবস্থার পরিবর্তন করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। নতুন যেসব প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হচ্ছে তাতে প্রত্যেকের জন্য পৃথক শয়নকক্ষ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উপবেশন কক্ষও থাকবে। অনেক জায়গায় এদের জন্য পৃথক পল্লীও তৈরি হচ্ছে। একটা বড় বাড়ির চতুর্দিকে ছোট ছোট বাড়ি তৈরি করে' এদের সেখানে বাস করতে দেওয়া হয়। এই রকম ক্ষেত্রে অসুখে বা সাময়িক কোন অসুবিধায় খুব তাড়াতাড়ি সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা যায়।

সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বার্ধক্যের সব চাইতে বড় সমস্যা হ'লো স্বাধীনতার অবসান। কাজেই এদের সেবা শুশ্রূষা করার আধুনিক পদ্ধতি হ'লো এদের সেই স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে হবে, অথবা তা রক্ষা করতে হবে। এরা যাতে নিজেদের বাড়িতেই থাকে সে সম্পর্কে যথাসাধ্য উৎসাহ দেওয়া হয় এবং চার-পঞ্চমাংশ বৃদ্ধ নিজেদের বাড়িতেই থাকে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের স্বাধীনতার পক্ষে প্রধান আশঙ্কার কারণ সম্পূর্ণভাবে সামাজিক। আর্থিক সমস্যাটাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানকালে সরকারী পেন্সনের ব্যবস্থা থাকলেও 'তা' এতো কম যে জীবন ধারনের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, কর্মহীন হওয়া, স্ত্রী বিয়োগ আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়গুলিও এদের পক্ষে কম আশঙ্কার কারণ নয়। পরিবার পরিজনের সান্নিধ্যটাই বড় কথা নয়, দুই পক্ষের আদান প্রদানটাই বড় কথা। বৃদ্ধদের যে শুধু স্নেহ ভালোবাসার প্রয়োজন তাই নয়, তারাও স্নেহ ভালবাসা দিতে চায়। কাজেই শারীরিক ও মানসিক এই কারণগুলি খুব সহজেই তাদের পঙ্গু করে দিতে পারে।

বার্ধক্যের রোগগুলির একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য তারা প্রায়ই একাধিক রোগে আক্রান্ত হয়। কাজেই এদের পঙ্গুত্ব প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার প্রয়োজন খুব বেশী। খাদ্যও একটা প্রধান প্রশ্ন। বেশীর ভাগ বৃদ্ধই বেশী খেতে চায়, অন্যরা হয়তো যথেষ্ট আহার্য পায় না। তা ছাড়া রাস্তাঘাটে আছাড় খাওয়ার আশংকা থাকে। যার ফলে হয়তো বাকি জীবনটা পঙ্গু হয়ে কাটাতে হয়।

বর্তমানে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবা পরিচর্যার ক্ষেত্রে নতুন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। বৃদ্ধদের জন্য সমিতি গঠন করে এবং নিয়মিতভাবে এদের সঙ্গে দেখাশুনা ক'রে এদের উৎফুল্ল রাখার চেষ্টা করা হয়। আত্মীয় পরিজনবিহীন যেসব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অত্যন্ত একাকী বোধ করে তাদের জন্য বন্ধু সৃষ্টি করা। বন্ধুত্বের আদান-প্রদানের জন্য নিয়মিতভাবে এদের কাছে পরিদর্শকগণ এসে থাকে। একবার বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে, বৃদ্ধটি যাতে হঠাৎ পড়ে গিয়ে আহত না হয় সে জন্য কৌশলে কোন কোন জিনিস এদিকে ওদিকে সরিয়ে তার পড়ে যাওয়ার বিপদ হ্রাস করতে পারে অথবা খাদ্যাভাস সঠিক পথে চালিত করতে পারে। মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা সমিতি এবং চার্চের কর্মিগণের সাহায্যে এই কাজ সুরু করা হয়েছে।

বৃদ্ধ জনগণের সমিতি আরও অনেক বেশী উন্নতি করেছে। নীতি হিসেবে তাদের লক্ষ্য হ'ল বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা, তবে কয়েকটি সমিতির সাংস্কৃতিক লক্ষ্যও রয়েছে। রাস্তায় চলাফেরা সম্পর্কে বৃদ্ধাদের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাঁদের জন্য কিছু কিছু ব্যায়ামেরও ব্যবস্থা করা হয়।

বৈদেশিকী

এক বছর আগে দক্ষিণ কোরিয়ায় ডক্টর সিংম্যান রীর কর্তৃত্বের অবসান হয়। আইনানুগ উপায়ে সেটা সম্ভবপর হয়নি। কনস্টিট্যুশন ছিল, কিন্তু থাকলে কী হবে? নিজের স্বেচ্ছাচারী একনায়কত্ব বজায় রাখার জন্য কোনো রকম জোর-জবরদস্তি, জাল-জোচ্চুরি থেকে পিছপাও হবার পাত্র ডক্টর রী ছিলেন না। সুতরাং বিদ্রোহ ছাড়া তাঁকে সরাবার আর কোনো উপায় ছিল না। গত বছর সেই বিদ্রোহে ছাত্র এবং অল্প-বয়স্ক লোকেরা একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করে। ডক্টর রী-র অপসারণের পরে দক্ষিণ কোরিয়ায় ডেমোক্র্যাটিক পার্টির গভর্নমেণ্ট অধিষ্ঠিত হয়। শ্রী ইউন প্রেসিডেণ্ট এবং ডক্টর জন চ্যাং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। এক বছর হতে না হতে আবার পট-পরিবর্তন। ১৬ই মে তারিখে একটি "ক্যু" নিষ্পন্ন করে একটি সামরিক দল ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে। এই দলের যিনি নেতা তাঁর নামও চ্যাং—জেনারেল চ্যাং। ডক্টর চ্যাং এবং তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্য সদস্যগণ "পদত্যাগ করেছেন" এবং আপাতত বন্দী হয়েছেন। প্রেসিডেণ্ট ইউনও পদত্যাগ করেছিলেন, তবে তিনি জেনারেল চ্যাংএর অনুরোধে প্রেসিডেণ্ট থাকতে রাজী হয়েছেন। এটা বোধ হয় জেনারেল চ্যাংএর বে-আইনী কাজের উপর একটু আইনের পালিশ লাগাবার চেষ্টা যদিও পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

জেনারেল চ্যাংএর দল বলছেন যে, সরকারী ব্যুরোক্রাসির দুর্নীতি তাঁরা দূর করবেন। তাঁদের আর একটি মুখ্য ধ্বনি হচ্ছে যে তাঁরা কম্যুনিস্ট-বিরোধী নীতি পুরোদমে চালাবেন, "ইণ্টারনাল অ্যাগ্রেশন" অর্থাৎ দেশের ভিতর থেকে দেশকে নষ্ট করার যেসব চেষ্টা চলছিল সেসব তাঁরা দমন এবং নিবারণ করবেন। অর্থাৎ জেনারেল চ্যাংএর দলের বক্তব্য এই যে, ডক্টর চ্যাংএর শাসন যথেষ্ট রকম কম্যুনিস্ট-বিরোধী ছিল না। ইতিমধ্যেই কম্যুনিস্ট-দের অনুকূল ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত বলে বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং "ইউ-এন" সামরিক বাহিনীর অধিকর্তা প্রথমে জেনারেল চ্যাংএর দলের কাজকে অবৈধ বলে মনে করেন এবং তাঁরা ডক্টর চ্যাংএর নির্বাচিত গভর্নমেণ্টকেই দক্ষিণ কোরিয়ার বৈধ গভর্নমেণ্ট বলে স্বীকার করেন, এরূপ ঘোষণা করেন। কিন্তু মার্কিন কর্তৃপক্ষ এই মতে স্থির থাকেননি। দু'তিনদিনের মধ্যেই তাঁদের ভাবের পরি-

বর্তন হয় এবং তাঁরা জেনারেল চ্যাংএর দলের ক্ষমতা গ্রহণ একরকম মেনে নেবার পথে চলেছেন।

"ক্যু"এর প্রথম অবস্থায় সৈন্যবাহিনীর কত অংশ জেনারেল চ্যাংএর পক্ষে আছে সেটা স্পষ্ট ছিল না। আমেরিকানদের হয়ত ধারণা ছিল যে, সৈন্যবাহিনীর বেশীর ভাগ ডক্টর চ্যাংএর বৈধ গভর্নমেন্টের পক্ষে থাকবে এবং জেনারেল চ্যাংএর "ক্যু" সফল হবে না। অন্ততপক্ষে নির্বাচিত চ্যাং সরকারের পক্ষে মার্কিন ঘোষণার পরে জেনারেল চ্যাংএর দল দমে যাবে অনেকেরই এই রকম আশা হয়েছিল। কারণ অনেকেরই ধারণা যে মার্কিন কর্তৃপক্ষ যদি আপত্তি করেন তবে দক্ষিণ কোরিয়ায় কোনো সামরিক দলের পক্ষে তা অগ্রাহ্য করে চলা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। কি কোরিয়ায়, কি অন্যত্র আমেরিকার সাহায্যেই যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা যে আমেরিকার আদেশ এবং উপদেশ শুনেই সর্বদা চলে তা নয়। বিদেশে সামরিক সাহায্য বিতরণের মার্কিন নীতির এই একটা মৌল দুর্বলতা যদিও সাধারণত কেউ তা সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। মার্শাল চিয়াং কাইশেকই হন, ডক্টর সিংম্যান রীই হন, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের শ্রীইয়েমই হন অথবা ইরানের শাহই হন কাউকে দিয়েই আমেরিকার খুশিমতো যা কিছু করাবার সাধ্য নেই।

অবশ্য মার্কিন গভর্নমেন্ট নিজে কী চান তাও যে সব সময় তাঁরা নিশ্চিতরূপে জানেন তাও নয় এবং মার্কিন সরকারের অভ্যন্তরেই অনেক সময়ে নীতির রূপ এবং তার পরিচালনার পদ্ধতি এবং উপায় সম্বন্ধে দ্বন্দ্ব লক্ষিত হয়। মার্কিন গভর্নমেন্টের এক অংগ যা চান অনেক সময়ে অন্য অংগ অন্য রকম চান। বর্তমান ক্ষেত্রেও এরূপ কোনো দ্বন্দ্ব ছিল কিনা বলা যায় না। হয়ত ছিল এবং হয়ত সেইজন্যই দক্ষিণ কোরিয়ায় অবস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত এবং "ইউ এন" কমান্ড জেনারেল চ্যাংএর "ক্যু" সম্বন্ধে প্রথমে বিরুদ্ধভাব ঘোষণা করলেও অনতিবিলম্বে মার্কিন কর্তৃপক্ষ জেনারেল চ্যাংএর ক্ষমতা গ্রহণ একরকম স্বীকার করে নিচ্ছেন। এ থেকে মনে হয় যে, আমেরিকানদের মধ্যেও এরকম প্রভাবশালী লোক আছেন, জেনারেল চ্যাংএর কার্যের প্রতি যাঁদের অনুমোদন ছিল।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শাসনে দোষত্রুটি নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তার জায়গায় জেনারেল চ্যাংএর সামরিক গভর্নমেণ্ট এলে যে দক্ষিণ কোরিয়ার কিছু ভালো হবে এমন আশা করা যায় না। আর জেনারেল চ্যাংএর দল যে বলছেন যে, তাঁদের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে যত শীঘ্র সম্ভব শাসনব্যবস্থা থেকে দুর্নীতি দূর করে অসামরিক হস্তে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করা, এসব কথার যে কী মূল্য তা সকলেই জানে। তবে এক বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই—জেনারেল চ্যাং আমেরিকার কথা শুনুন বা না শুনুন তাঁর দুষ্কর্মের জন্য নিন্দার বোঝা আমেরিকাকে বইতেই হবে, যেমন ডক্টর রীর জন্য নিন্দার বোঝা আমেরিকাকে বইতে হয়েছে।

* * *

প্রেসিডেন্ট কেনেডি ফ্রান্সে আসবেন এবং প্রেসিডেন্ট দ্য গলের সংগে আলাপ-আলোচনা করবেন এটা অনেকদিন আগেই স্থির হয়েছিল। যে সংবাদে লোক কিঞ্চিৎ চমৎকৃত হয়েছে সেটা হচ্ছে এই যে, প্যারিস থেকে প্রেসিডেন্ট কেনেডি ভিয়েনাতে যাবেন এবং সেখানে শ্রীক্রুশ্চফের সংগে তাঁর সাক্ষাৎকার হবে। ৩১শে মে থেকে ২রা জুন পর্যন্ত শ্রীকেনেডি ফ্রান্সে থাকবেন, তারপর ৩রা জুন সকালে ভিয়েনায় পৌঁছবেন, সেখানে শ্রীক্রুশ্চফের সংগে সাক্ষাৎকারের পরে ৪ঠা কোনো সময়ে ভিয়েনা থেকে লণ্ডনে আসবেন এবং ৫ই রাত্রে লণ্ডন থেকে ওয়াশিংটন রওনা হয়ে যাবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমা শক্তি-বর্গের নায়ক, তাহলেও পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বের অন্তর্গত কোনো ব্যাপারে অন্যদের সম্মতি না নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের সংগে কোনো চুক্তির আলোচনায় অগ্রসর হতে পারেন না—এই কথাটা কিছুদিন থেকে আমেরিকাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট দ্য গলের মনে এই সম্পর্কে একটু বেশী অসন্তোষ সঞ্চিত আছে। ফ্রান্সকে যথোচিত "কেয়ার" করা হয় না, এই তাঁর অভিযোগ। এইসব কারণে আগে থাকতেই একটু বেশী জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে, শ্রীকেনেডি ও শ্রীক্রুশ্চফের মধ্যে সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তা একান্ত "ইনফরম্যাল" ধরনের হবে, তাঁরা পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে কোনো বিষয়ে চুক্তির আলোচনায় বা লেনদেনের কথায় যাবেন না। যাই হোক, শ্রীক্রুশ্চফের সংগে দেখা হবার আগে শ্রীকেনেডি জেনারেল দ্য গলের মন বুঝবার সুযোগ পাবেন। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট দ্য গল পশ্চিম জার্মানীর কর্তা ডক্টর অ্যাডেনায়রের সংগে কিছু কথাবার্তা বলে নিয়েছেন। শ্রীম্যাকমিলান তো প্রেসিডেন্ট কেনেডির সংগে অনেক আগেই দেখা করে এসেছেন। সুতরাং শ্রীক্রুশ্চফের সংগে দেখা হবার আগেই শ্রীকেনেডি বুঝে নিতে পারবেন যে স্বীয় মিত্রদের দ্বারা তাঁর হাত কতখানি বাঁধা, যেমন শ্রীক্রুশ্চফকে অনুভব করতে হয় তাঁর কোমরে বাঁধা দড়ি ধরে পিকিং কখন কতটা টানছে।

* * *

সুইজারল্যাণ্ডে জেনেভার সন্নিকটে ইভান নামক শহরে ফরাসী গভর্নমেণ্ট এবং আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদী "প্রভিশনাল" সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। পূর্বে এরূপ আলোচনা যখন আরম্ভ হতে যাচ্ছিল তখন ইভানে বোমা ফেলা হয় যার ফলে সেখানকার মেয়র মারা যান। প্রায় সংগে সংগেই আলজেরিয়ায় ফরাসী জেনারেলদের বিদ্রোহ ঘটল। বিদ্রোহীরা পরাস্ত হয়েছে কিন্তু আলজেরিয়াতে ফুটফাটে বোমাবাজী এখনো কিছু কিছু চলছে, উদ্দেশ্য এখনো যদি আলজেরিয়ার স্বাধীনতা আটকানো যায়, এখনো যদি মিটমাটের আলোচনা ভণ্ডুল করে দেওয়া যায়। কিন্তু আশা করা যায় যে, এবার আলোচনা বন্ধ হবে না। ফরাসী সরকার আপাতত একমাসের জন্য আলজেরিয়াতে "ট্রুস" যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছেন এবং কয়েক সহস্র আটক করা লোকের মুক্তিদানের আশা দিয়েছেন। এর দ্বারা আবহাওয়া কিছুটা মিটমাটের আলোচনার অনুকূল হবে যদিও মিটমাটের পথে অনেক কঠিন প্রশ্নের বাধা রয়েছে যেগুলিকে সরাবার জন্য যথেষ্ট ধস্তাধস্তি করতে হবে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে জোর দর কষাকষি চলল। তা চলুক, শেষ পর্যন্ত মিটমাট হলেই হয়।

• • •

ক্যাম্বোডিয়ার রাজা বলেছেন যে, লাওস-এর সমস্যার সমাধান করতে হলে কোনো-রকমে তিন "প্রিন্স"কে এক সংগে করা দরকার। লাওসে "দক্ষিণপন্থী", "নিরপেক্ষ" এবং "কম্যুনিস্ট" তিন দলের প্রত্যেকটির নেতাই একজন প্রিন্স।

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

ভবঘুরে (৯)

"ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণা-ময়ী। তুমি প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেছ। রমণীজাতির মধ্যে তুমিই ধন্য, আর ধন্য তোমার দেহজাত সন্তান যীশু। মহিমাময়ী মা মেরি, এই পাপীতাপীদের তুমি দয়া করো, আর দয়া করো যেদিন মরণের ছায়া আমাদের চতুর্দিকে ঘনিয়ে আসবে।"

এই 'আভে মারিয়া' বা 'মেরি-আবাহন-মন্ত্র' উচ্চারণ না করে সাধারণত ক্যাথলিকরা খেতে বসে না—আর গ্রামাঞ্চলে তো কথাই নেই। অনেকটা হিন্দুদের গণ্ডূষের মত। আর প্রটেস্টান্টরা সাধারণত 'হে আমাদের দ্যুলোকের পিতা' (পাতের নস্তের) মন্ত্র পাঠ করে। কোনো কোনো পরিবারে উপাসনাটা অতি ক্ষুদ্রঃ

'এস হে যীশু!
আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করো।
আমাদের যা দিয়েছো তার উপর
তোমার আশীর্বাদ রাখো।
'কমে য়েজু, জাই উনজের গাস্ট্।
উনট্ জেগনে ভাস ডু
উনস্ বেশেরট্ হাস্ট॥'[1]

মুসলমানদের উপাসনাটিও ক্ষুদ্র: 'আমি সেই খুদার নামে আরম্ভ করি যিনি দয়াময়, করুণাময়।'

এদের এই মন্ত্রপাঠে একটি আচার আমার বড় ভালো লাগে: পরিবারের সর্ব-কনিষ্ঠ—যে সবে আধো আধো মন্ত্রোচ্চারণ করতে শিখেছে—তাকেই সর্বজ্যেষ্ঠ আদেশ দেন, উপাসনা আরম্ভ করতে।

---

১ বিলাতের কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোজনগৃহে এই মন্ত্রপাঠ করার সময় জনৈক ভারতীয় ভোজনালয় ত্যাগ করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি সেটি ফলাও করে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বর্ণনা দেন। নাস্তিকের এই 'সৎ-সাহসের' কর্মটি তিনি যদি ইনকুইজিশন যুগে করতেন তবু না হয় তার অর্থ বোঝা যেত। কিন্তু তাঁর এই আচরণ থেকে ধরে নিতে হবে, হয় ভারতীয়রা পরধর্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণু, অথবা ঐ লেখক ভারতীয় নন। জানি, একজন ভারতীয়ের আচরণ থেকে তাবৎ ভারতীয় সম্বন্ধে কোনো অভিমত নির্মাণ করা অযৌক্তিক কিন্তু দেশ-বিদেশে সর্বত্রই তাই করা হয়।

পক্ষান্তরে খাঁটি নাস্তিক আনাতোল ফ্রাঁস যখন একবার শুনতে পান, ফরাসী সরকার যে-পুস্তকে ভগবানের নাম উল্লেখ থাকে সে-পুস্তক স্কুল-লাইব্রেরীর জন্য কিনতে দেয় না, তখন তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, 'তাহলে ফরাসী বিদ্রোহে এত রক্তপাত করে পেলুম আমরা কী সে স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতা আস্তিককে তার ধর্মবিশ্বাস প্রচার করতে দেয় না?'

ঠাকুরমা আদেশ করলেন, 'মারিয়ানা, ফাণ্ডেমাল্‌ আন—আরম্ভ কর।'

প্রাগোক্ত শুদ্ধ - বুদ্ধ - বিবেকমণ্ডিত 'নাস্তিক' ভ্রমণকাহিনী লেখক আমি নই। (ভ্রমণকাহিনী যদিও লিখেছি তবু তাঁর মত খ্যাতি লাভ করতে পারিনি)। তাই আমি হস্তী দ্বারা তাড়ামানের ন্যায় খৃষ্টানের গৃহ ত্যাগ করলুম না।

মারিয়ানার কিন্তু তখনো খাবার সাজানো হয়নি—রোববারের বাসন-কোসন বের করতে একটু সময় লেগেছে বই কি, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সুপ, স্যালাড আনতে আনতেই, সেই সদাপ্রসন্ন তরুণ মুখটিতে কণামাত্র গাম্ভীর্য না এনে সহজ সরল কণ্ঠে বলে উঠলো,

'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা
করুণাময়ী!—'

বাচ্চাদের উপাসনা আমার সব সময়ই বড় ভালো লাগে। বড়দের কথায় বিশ্বাস করে তারা সরল চিত্তে ধরে নিয়েছে ভগবান সামনেই রয়েছেন। ফলে তাদের মন্ত্রোচ্চারণের সময় মনে হয় তারা যেন তাঁর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা কইছে—যেন ঠাকুরমার সঙ্গে কথা না বলে ভগবানের সঙ্গে কথা বলছে। আর আমরা, বয়স্করা, কখনো উপরের দিকে, কখনো মাথা নিচু করে 'উপাসনা করি'—তাঁর সঙ্গে কথা বলিনে।

গ্রামের লোক হাতী ঘোড়া খায় না। শহুরেদের মত আটপদী নিরতিশয় ব্যালানস্ড ফুড—ফলে স্বভাবতই আনব্যালান্‌স্‌ড!—খায় না বলেই শুনেছি তাদের নাকি থ্রম্বোসিস কম হয়।

সুপ।

আপনারা সায়েবী রেস্তোরাঁয় যে আড়াই ফোঁটা পোশাকী সুপ খেয়ে ন্যাপকিন দিয়ে তার দেড় ফোঁটা ঠোঁট থেকে ব্লট করেন এ সে বস্তু নয়। তার থাকে তনু, এর আছে বপু।

হেন বস্তু নেই যা এ সুপে পাবেন না।

মাংস, মজ্জা সুদ্ধ হাড়, চর্বি সেদ্ধ করা আরম্ভ হয়েছে কাল সন্ধ্যা থেকে, না আজ সকাল থেকে বলতে পারবো না। তারপর তাতে এসেছে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রাসেল স্প্রাউটস্‌, দু এক টুকরো আলু, এবং প্রচুর পরিমাণে মটরশুঁটি। মাংসের টুকরো তো আছেই—তার কিছুটা গলে গিয়ে ক্বাথ হয়ে গিয়েছে, বাকিটা অর্ধবিগলিতালিঙ্গনে তরকারির টুকরোগুলোকে জড়িয়ে ধরেছে। এবং সর্বোপরি হেথা হোথা হাবুডুবু খাচ্ছে অতিশয় মোলায়েম চাক্তি চাক্তি ফ্রাঙ্কফুর্টার সসিজ। চর্বিঘন-মাংসবহুল-তরকারি সম্বলিত—মজ্জামণ্ডিত এই সুপের পৌরুষ দার্ঢ্যের সঙ্গে ফেনসি রেস্তোরাঁর নমনীয় কমনীয় কাচিসংসদ ভোজ্য সুপ নামে পরিচিত তরল পদার্থের কোনো তুলনাই হয় না।

এর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে এদেশের ভাষায় বলতে গেলে বলবো, মা মাসীদের ভুলিয়েভালিয়ে কোনো গতিকে পিকনিকে নিয়ে যেতে পারলে তাঁরা সাড়ে বত্রিশ উপকরণ দিয়ে যে খিচুড়ি রাঁধেন ধর্মে-গোত্রে এ যেন তাই। খেয়েই যাচ্ছি, খেয়েই যাচ্ছি, শুধুমাত্র খিচুড়িই খেয়ে যাচ্ছি—শেষটায় দেখি, ওমা, বেগুন ভাজা মমলটে হাত পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

জর্মনির জনপদবাসী ঠিক সেই রকম সচরাচর ঐ একটিমাত্র সুপই খায়। তার সঙ্গে কেউ কেউ রুটি পর্যন্ত খায় না।

আজ রোববার, তাই ভিন্ন ব্যবস্থা। অতএব আছে, দ্বিতীয়ত, স্যালাড।

আবার বলছি, আপনাদের সেই 'ফিনসি' রেস্তোরাঁর উন্নাসিক 'সালাদ রুস্‌', 'সালাদ আলা মায়োনেজ', 'সালাদ ভারিয়েও-পোয়াসোঁ' ওসব মাল বেবাক ভুলে যান।

সুপে যেমন ছিল দুনিয়ার সাকুল্যে সর্বকিছু, স্যালাডে ঠিক তার উল্টোটি। আছে মাত্র তিনটি বস্তু: লেটিসের পাতা, টমাটোর টুকরো, পাঁজের চাক্তি—ব্যস!

এগুলো মেশানো হয়েছে আরো তিনটি বস্তু দিয়ে। ভিনিগার, অলিভ ওয়েল এবং জলে-মিশিয়ে-নেওয়া সরষেবাটা। অবশ্য নুন আছে এবং গোলমরিচের গুঁড়ো থাকলে থাকতেও পারে। কিন্তু ঐ যে সিরকা, তেল, সর্ষে সেই তিন বস্তুর কতটা কতখানি দিতে হবে, কতক্ষণ মাখতে হবে—বেশী মাখলে স্যালাড জবুথবু হয়ে নেতিয়ে যাবে, কম মাখলে সর্বাঙ্গে সর্ব জিনিসের পরশন শিহরন জাগবে না—সেই হল গিয়ে তমসাবৃত, সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য।

দম্ভভরে বলছি, আমি শঙ্কর কপিল পড়েছি, কাণ্ট হেগেল আমার কাছে অজানা নন। অলংকার নব্যন্যায় খুঁচিয়ে দেখেছি, ভয় পাইনি। উপনিষদ সুফীতত্ত্বও আমার কাছে বিভীষিকা নয়। আমার পরীক্ষা নিয়ে সত্যেন বোসের এক সহকর্মী আমাকে বলেছিলেন, তিন বছরে তিনি আমায় রিলেটিভিটি কলকাতার দুগ্ধবত্তরলম্‌ করে দিতে পারবেন। পুনরপি দম্ভ ভরে বলছি, জ্ঞানবিজ্ঞানের হেন বস্তু নেই যার সামনে দাঁড়িয়ে হকচকিয়ে বলেছি, 'এ জিনিস? না, এ জিনিস আমাদ্বারা কক্‌খনো হবে না। আপ্রাণ চেষ্টা করলেও হবে না।'

কিন্তু ভগ্নদূতের মত নতমস্তকে বারবার স্বীকার করছি ঐ স্যালাড মেশানোর বিদ্যেটা আমি আজো রপ্ত করে উঠতে পারিনি। অথচ বন্ধুমহলে—বোম্বায়ের শচীন চৌধুরীর থেকে আরম্ভ করে কলকাতার ডাক্তার ঘোষ পর্যন্ত—স্যালাড মেশানো ব্যাপারে আমার রীতিমত খ্যাতি আছে। তাঁরা যখন আমার তৈরী স্যালাড খেয়ে 'আ মরি, আ মরি' করেন, আমি তখন ঠাকুরমার সেই স্যালাডের স্মরণে জানলা দিয়ে হঠাৎ কখনো বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে থাকি, কখনো বা মাথা নিচু করে বসে থাকি।

বাঙলা কথায় তুলনা দিয়ে বলতে হলে, শুধোই, তেলমুড়ি আপনি মাখাতে পারেন, আম্মো পারি, কিন্তু পারেন ঠাকুমার মত? ধনে পাতার চাটনিতে কাঁই বা এমন কেরদানি! কিন্তু পারেন পদি পিসি পারা পিষতে?

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

এমন অনেক শব্দ আমাদের সংগীতে প্রচলিত যেগুলির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই এবং প্রশ্ন করলে সেগুলি ব্যাখ্যা করা মুশকিল হয়ে পড়ে। অথচ, এসব শব্দ বহুকাল থেকে চলে আসছে। ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে অভারতীয়দের কৌতূহল আজকাল কম নয়। তাঁদের কাছ থেকেও নানা প্রশ্ন আসে কিন্তু উত্তর দেবে কে? যেসব শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নই সেগুলির নতুন নামকরণ বা সেগুলির ব্যাখ্যা যাতে পাওয়া সম্ভব হয় সেদিকে চেষ্টা না করলে এইরকম অপ্রবন্ধ শব্দ প্রয়োগের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকবে। অতএব একটা কিছু করা দরকার।

প্রথমেই "সুর" শব্দটা আমাদের মনে আসে। সাধারণত আমাদের বোঝানো হয়েছে "স্বর" থেকেই এই প্রচলিত "সুর" শব্দের উৎপত্তি। কিন্তু অর্থের দিক থেকে "স্বর" এবং "সুর"-এর মধ্যে পার্থক্য অনেক। স্বর বলতে আমরা আওয়াজ বুঝি আর বুঝি একটা নির্দিষ্ট শ্রুতির পর্দা। সুর বলতে আমরা আরও অনেক বেশি বুঝি—এমনকি রাগ-রাগিনী পর্যন্ত সুর শব্দের অন্তর্ভুক্ত। সুর-শব্দটা তাহলে প্রচলিত হল কেমন করে? স্বর-শব্দের প্রচলন তো রহিত হয়নি। দুটো শব্দই ক্রমাগত প্রয়োগ করা হচ্ছে। সুতরাং সুর-শব্দের পশ্চাতে কী রহস্য থাকতে পারে সেটা উদ্ঘাটিত করা প্রয়োজন।

মূর্ছনা নামক একটি শব্দ প্রচলিত যাকে খুব শিথিলভাবে ব্যবহার করা হয়। প্রশ্ন করে দেখেছি মূর্ছনা শব্দের স্পষ্ট ব্যাখ্যা অনেকে দিতে পারেন না। অনেকের ধারণা মূর্ছনা বলতে গানের একটা সুন্দর অংশকে বোঝায়। "সুরের অপূর্ব মূর্ছনায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি"—এরকম উক্তি অনেকে করেন এবং এক্ষেত্রে তাঁরা যা বোঝাতে চান তা হচ্ছে সুরের সৌন্দর্য বা অলংকার। মূর্ছনার আসল অর্থ এটা নয়। এই শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধেও সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

তান—অপর একটি অতি প্রচলিত শব্দ। আগেকার দিনে তান ছিল মূর্ছনারই রকম-ফের কিন্তু বর্তমানে মূর্ছনা যেমন অনিশ্চিতভাবে প্রযুক্ত তান শব্দটিও তেমনি। তান বলতে বর্তমানে আমরা দ্রুত স্বর সঞ্চালন বুঝি। পূর্বে এটা তানের একটা প্রকারভেদ মাত্র ছিল। আসলে দ্রুত তান আমাদের সংগীতে বিশেষ স্বীকৃত হয়নি।

তার কারণ দ্রুত তান করতে স্বর-গুলি এমন একাকার হয়ে যায় যে, রাগের পরিপ্রেক্ষিতে একটি তানের বৈচিত্র্য বা বিশেষত্বকে স্বতন্ত্রভাবে বোঝানো সম্ভব হয় না। আমাদের পূর্বতন সঙ্গীতে এইসব তান, মূর্ছনার স্বাতন্ত্র্যকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হত। এমনকি ধ্রুপদেও দ্রুত তানের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়নি।

মার্গ সংগীত শব্দটি সবাইকার মুখে মুখে ফেরে কিন্তু এর ব্যবহারও প্রকৃত অর্থ-সম্মত—এটা বললে সত্যভাষণ হয় না। মার্গসংগীত কী বস্তু ছিল সে নিয়ে গোলমাল হবার কারণ বোঝা যায় না। সংগীত শাস্ত্র একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের প্রদর্শিত পন্থায় ভরতাদি ঋষি কর্তৃক মহাদেব এবং অপরাপর দেবগণের সম্মুখে যে সংগীত প্রযুক্ত হয়েছিল তাই মার্গসংগীত নামে খ্যাত। অর্থাৎ বস্তুটি আর কিছুই নয় প্রাচীন নাট্যসংগীত যার মূলে ছিলেন ব্রহ্মা। আমাদের রাগ-সংগীতও নাট্যসংগীত থেকেই শ্রীবৃদ্ধিলাভ করেছে। পরে মার্গসংগীত বলতে রাগ-সংগীতও বোঝাতো। বর্তমানে যদি ধ্রুপদ, খেয়ালকে আমরা মার্গসংগীতের অন্তর্ভুক্ত করি তাহলে খুব যে একটা দোষ হয় এমন নয় কেননা মার্গসংগীতের এরকম ব্যাপ্তি ইতিপূর্বেও ঘটেছে; কিন্তু প্রয়োগটা সংখ্যা-গরিষ্ঠ সংগীতসমাজের সম্মতির অপেক্ষা রাখে।

অতঃপর প্রচলিত গীতগুলির মধ্যে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি—কোনটারই ইতিহাস আমরা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করতে পারি না—বহুল পরিমাণে অনুমানের ওপর নির্ভর করে আমাদের মতামত প্রদান করতে হয়।

তালের দিক থেকেও কয়েকটি শব্দের ব্যাখ্যা নেই বললেই চলে। একতাল শব্দটা চলে আসছে; কিন্তু কেন একতাল বলা হয় তার অর্থ বোঝা দুঃসাধ্য। একতালের বেলাতেও যেমন আমরা তিন তাল এক ফাঁক স্বীকার করি তেতালা বা ত্রিতালের বেলাতেও তাই। তফাৎ কেবল মাত্রাসংখ্যায়—এক-তালের বেলায় বারো ত্রিতালের বেলায় ষোলো। ত্রিতালই বা কেন বলা যাবে তারও কোন স্পষ্ট নির্দেশ নেই। চৌতাল সম্পর্কেও একই সন্দেহ বর্তমান। একতালে এবং ত্রিতাল—এদুটি ব্যবহৃত হয় কিন্তু এর মাঝামাঝি দ্বিতীয় তাল বলে কিছু প্রচলিত নেই। শাস্ত্রে দেখা যায় আদিতাল, দ্বিতীয়-তাল, তৃতীয়তাল, চতুর্থতাল এবং পঞ্চমতাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও কী হিসাবে যে একাদিক্রমে এই পাঁচটি তাল নির্ণীত হয়েছে তা বোঝবার উপায় নেই। অন্তত সাত আটশো বছর আগে থেকেই এইরকম বহু প্রয়োগ চলে আসছে যার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। ফাঁক বস্তুটাও আমরা কেন স্বীকার করি তা নিজেরাই জানি না। হাতের নির্দেশে ফাঁক দেখিয়ে দিলেও তবলা বা পাখোয়াজের বিরাম দেখা যায় না। অতএব এই বিরাম ওরফে ফাঁক বা খালি-র উদ্দেশ্য যে কী তা বলা বড়ই কঠিন ব্যাপার।

বাজনার ক্ষেত্রে দু-চারটে যন্ত্র আছে যাদের নাম ঠিক কী হওয়া উচিত তা আমরা নির্ণয় করে উঠতে পারিনি। সরোদ আজকাল বিশেষ প্রচলিত কিন্তু প্রকৃত শব্দটি যে কী সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ বর্তমান। সরোদ, শরদ, শারদবীণা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এটি পরিচিত। লেখকের ধারনা শব্দটি আসলে ছিল "সুরুদ্"। ফার্সী ভাষায় "সুরুদ্ দাদন" বলতে বাদ্য-যন্ত্রের আওয়াজ করা বোঝায় এবং "সুরুদ্ জুদন" বলতে গান করা বোঝায়—গান বাজনার আসরকে বলে "সুরুদ্ ও মজলিস।" খুব সম্ভব মোগল যুগের শেষ দিকে এই যন্ত্রের প্রচলন হয়ে থাকবে। তবে, এবিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না—এ অনুমান ভ্রান্তও হতে পারে। এসরাজ—শব্দটিও অনিশ্চিতভাবে ব্যবহৃত হয়। অনেকে বলেন আসল শব্দ এসরার্। এটি অসম্ভব নয়—তবে শব্দটা সাংগীতিক নয়। এসরার্ শব্দের অর্থ গোপনতা, রহস্য বা গুপ্ত ব্যাপার। এই শব্দের ভাব নিয়ে যন্ত্রের নামকরণ হতেও পারে। দিলরুবা—শব্দটিও তো এমনভাবেই নেওয়া হয়েছে এবং এটিও এসরাজেরই প্রকার ভেদ। আমীর খস্রুর নামের সঙ্গে এমন অনেক রাগবোধক শব্দ জড়িত আছে যা সংগীত-পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত নয়। সেতার শব্দটিও খুব সম্ভব বীণ-সেহ্‌তার ছিল। ক্রমে বীণ শব্দটি উঠে যায়।

এইরকম আরো অনেক শব্দ আছে যেগুলির সম্বন্ধে আমাদের ধারনা স্পষ্ট নয়। কথা হচ্ছে এইসব ব্যাপার নিয়ে খোলা-খুলি আলোচনা করা দরকার এবং গান-বাজনার বর্তমান পরিভাষার বিশেষ পরীক্ষণ প্রয়োজন। সংগীত এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃত বিষয়—অতএব এই বিদ্যার তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে অস্পষ্টতা, অনিশ্চয়তা এবং ভ্রান্তি যত শীঘ্র দূর করা যায় ততই ভাল।

প্রাসঙ্গিকী
শ্রীদিলীপকুমার রায়

এপ্রিল মাসের শেষভাগে রক্সী প্রেক্ষা... শ্রীদিলীপকুমার রায় মহাশয়ের সংগীত-অনুষ্ঠানে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করেছি। দিলীপকুমার প্রধানত ভক্তিগীতি পরিবেশন করেছিলেন এবং বর্তমানে ভগবদ্ প্রসঙ্গেই তিনি সংগীতানুষ্ঠান করে থাকেন। অতএব তাঁর সংগীত আমাদের সমালোচনার বিষয়ীভূত নয়। এই উপলক্ষ্যে আমরা কেবল আমাদের গভীর পরিতৃপ্তির সংবাদই তাঁকে জ্ঞাপন করছি। এই অনুষ্ঠানে দ্বিজেন্দ্রলালের "বঙ্গ আমার জননী আমার" —গানটি সম্পর্কে তিনি আমাদের একটি তথ্য জানিয়েছেন যেটি প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। এই সর্বজনবিদিত গানটির শেষ কলির শেষ পদ—

আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা মানুষ আমরা নহিত মেষ
দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার আমার দেশ।

দিলীপকুমারের উক্তি থেকে জানা গেল দ্বিজেন্দ্রলাল গানটি রচনার সময় লিখে-ছিলেন—"আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা হৃদয় রক্ত করিয়া শেষ।" তৎকালীন রাজ-পুরুষদের উগ্রমনোভাবে শঙ্কিত হয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধবগণ মনে করেন যে "রক্ত" শব্দটি কবিকে বিপদগ্রস্ত করতে পারে। স্নেহ-মুগ্ধ বন্ধুদের অনুরোধই তিনি এই অংশটির পরিবর্তে "মানুষ আমরা নহিত মেষ"—এইটি যোজনা করেন। দিলীপ-কুমার মনে করেন যে, বর্তমানে এই পরিত্যক্ত অংশটি পুনরায় যোগ করলে ভাল হয়। তিনি প্রচলিত এবং পরিত্যক্ত দুটি অংশই দুবার গেয়ে থাকেন।

এই শীত-শেষের মরা রোদের তাপ নিতে ঐ পুরোনো তেতলা বাড়ির পশ্চিমের বারান্দায় এসে যে মেয়েটি দাঁড়াল, মরচে ধরা লোহার রেলিংগুলোর ওপর ততোধিক জীর্ণ কাঠখানার উপর সন্তর্পণে হাত রেখে বুক ছুঁয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে বড় রাস্তার দিকে চাইল, তাকে তোমরা বোধহয় চেন না? দেখনি বোধহয় আর কোনদিন?

না, দেখনি কোনদিন। আর দেখবে কেন? রাস্তা-ঘাটে, ট্রামে-বাসে কত দেখবার মত মেয়ে তো আজকাল দেখতে পাচ্ছো! প্রজাপতির কত রঙ, কত সাজ, নয়ন-মন অভিরাম!

চোখ তুলে সত্যিই মেয়েটি দেখবার মত নয়! ওই তো রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে কতক্ষণ! তোমরা কেউ কি একবারও চোখ তুলে দেখছ, না কি মনে তোমাদের কোন ঔৎসুক্য জেগেছে মেয়েটির সম্বন্ধে? না। চোখ গেলেও তোমরা চোখ ফিরিয়ে নিয়েছ। (আমার ধারণা অবিশ্যি, কিছু মনে করো না।)

পশ্চিমের মরা রোদের স্পর্শটুকু যদি গোপনে অবৈধ চুম্বনের মত হঠাৎ এসে ওর মুখে-চোখে না পড়তো, আমিও হয়তো চেয়ে দেখতুম না। কথাও ছিল না, রাস্তার এপারে দাঁড়িয়ে পানের দোকানে সিগারেট কিনতে কিনতে ঐ বারান্দার দিকে চাইবো—বিগত যৌবনা একটি মেয়েকে চেয়ে চেয়ে দেখলো! (হঠাৎ ভাল লেগেছিল যে দেখতে!)

রোদটা মেয়েটির মুখ থেকে বুকের উপর খানিক যেন থমকে থেমে রইল, আড়চোখে কি যেন খুঁজলে, তারপর বুক বেয়ে বারান্দার কার্নিশে উঠে গেল। পালানো রোদটাকে ধরতে যেন মেয়েটি সচকিত হ'য়ে এদিক-ওদিক চাইলে। বারান্দার রেলিং ছেড়ে দাঁড়াল। বারান্দার ভেতরটা বেশ অস্পষ্ট। ছায়া ছায়া।

আদৌ সুন্দরী নয় মেয়েটি। অষ্টাদশী বা ষোড়শীও নয়। এ পাড়ায় আমিও নতুন নয়। ওর বয়স কত বসন্ত ছুঁয়েছে আমি বলতে পারি। কিন্তু এখন বলবো না। বয়স দিয়ে কেউ কুমারী মেয়েদের দেখে না, আর যারা দেখে আমি তাদের একজন নই। আজ আমি মেয়েটিকে যে দেখেছি (চুরি করে নয় কেন), দেখে মনে হয়েছে ওর বয়সের কথাটা যা শুনেছি বড় বেশি বাড়ানই। ওর যৌবন বিগত নয়। মধ্যাহ্নের খর রোদ না হ'লেও পড়ন্ত এই শীত-শেষের রোদের মত উত্তাপহীন, ছাদ-কার্নিশ, গাছ-পালার মাথা-ছোঁয়া, হেলে-পড়া, থর-থর কম্পমান!

নাম ওর অনিমা। ঐ তেতলা বাড়ির

কোন এক সূত্রে যেন আত্মীয়া! পাড়ার অনেক সমবয়সী, অসমবয়সী মেয়ের মধ্যে ওকে আমি আবিষ্কার করেছি। কোনদিন পশ্চিমের ঐ জীর্ণ বারান্দায়, কি উত্তরের অব্যবহার্য ঐ ঘরের হঠাৎ-পাল্লা-খুলে দেওয়া জানালার ধারে। বড় নিঃশব্দ-চারিনী, ভীরু মেয়েটি!

ওর বাবা মারা যাবার পর ওরা এসে ঐ তেতলা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। সিংগীরা ওদের দূর সম্পর্কে আত্মীয়। ও, ওর মা, আর ওর এক ভাই সুভাষ! ওর মাকে আমি দেখিনি, কিন্তু সিংগী বাড়ির সব বৌঝিকে দেখেছি গাড়িতে কি হেঁটে পাড়ার মধ্যে আসা-যাওয়া করতে। সুভাষ ও বাড়ির ছেলের মত মিশে গেছে, এ পাড়ার একজন হ'য়ে গেছে। মনেই হয় না, বাপ-মরা, অভিভাবকহীন, অনাথ ছেলেটা!

অনিমাই বড়। কত বড় তা জানি না। শুনেছি অনিমার পর অনেকগুলো ভাই-বোন মরে-ঝরে সুভাষ হ'য়েছিল, তারপর ওদের পিতৃবিয়োগ হয়। ওরা অনাথ হ'য়েছে, পরের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। সিংগীদের তিনটি পোষ্য বেড়েছে। তিন-তলা বাড়ির বিরাট সংসারে গায়ে-পড়া ঐ তিনটি প্রাণী এমন কিছু সংখ্যাধিক্যের সৃষ্টি না করলেও অনিমা আর অনিমার মা যোগমায়াদেবী নিজেদের খুব বেশী ভার বলে মনে করেন, অপরাধীর মত অন্তঃ-পুরের এক ধারে সরে গিয়ে জড়-সড় হ'য়ে থাকেন, শশক শাবকের মত।

শীতকালের মেঘ-করা একটা সকালে, গোটা তিন চার ঠেলা গাড়ি করে অসংখ্য ভাঙা-চোরা জিনিসপত্র সমেত সিংগী বাড়ির দোর গোড়ায় এসে ওরা থেমেছিল, অনেকক্ষণ ওরা মালপত্রের সংগে অপেক্ষা করেছিল, ঠিকানা-খুঁজে-না-পাওয়া বাড়ির সন্ধানে ইতস্তত করার মত ওদের দেখতে লেগেছিল। বেশ বড়-সড় তখন অনিমা, ঘর্মাক্ত (শীতকাল হ'লেও) কপোলে লজ্জা মিশে বড় বিহবল আর বিভ্রান্ত মনে হ'য়ে-ছিল। সে তুলনায় যোগমায়া দেবী সপ্রতিভ ছিলেন, মেয়েকে ছেলেকে নিয়ে সিংগী বাড়ির দরজা পেরিয়ে অন্দরে প্রবেশ করেছিলেন। অনেকক্ষণ বাড়ি বদলের মালগুলো সিংগীদের সদর দরজায় এলো-মেলো আর কাৎ হ'য়ে নরলোকের চোখের সামনে পড়েছিল, যেন বেওয়ারিশ কোন উদ্বাস্তুর গৃহস্থালী! অদূরে একটা কাক 'সিংহ-ভিলার' থামের ওপর বসে চেঁচিয়ে গলা চিরে ফেলেছিল—কে জানে ঐ জিনিসগুলোর মধ্যে সে কোন ভজ্য দ্রব্যের সন্ধান পেয়ে অমন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল কিনা!

তারপর সূর্যাস্তের পর কোন এক সময় সিংগীদের সদর দরজা পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছিল। কে বলবে ওখানে কেউ কয়েক ঘণ্টা আগে পোটলাপুঁটলি, বাক্স-পেঁটরা, ভাঙা চেয়ার, তক্তপোশ, লেপ-তোশক আর কাঠের আলমারী নিয়ে অপেক্ষা করেছিল। (সাধারণ আমার গৃহস্থালীর রূপটা সেদিন আমার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল। কাঠ-কাটরা, পোশাক-আশাক, বাসন-কোসন সব মিলিয়ে আমার যে সম্পত্তি, যার জন্যে অষ্টপ্রহর আমার ভাবনার শেষ নেই, যার বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির জন্যে দিন-রাত সংগ্রাম করছি তা কত তুচ্ছ যেন! আমার সংসারটাকে একদিন আমার অবর্তমানে গুটিয়ে ফেললে বোধ হয় ওর বেশী কিছু একটা দেখতে লাগবে না—কটা ঠেলা-গাড়িতেই শেষ!')

অত বড় 'সিংহ-ভিলার' কোন্ এক
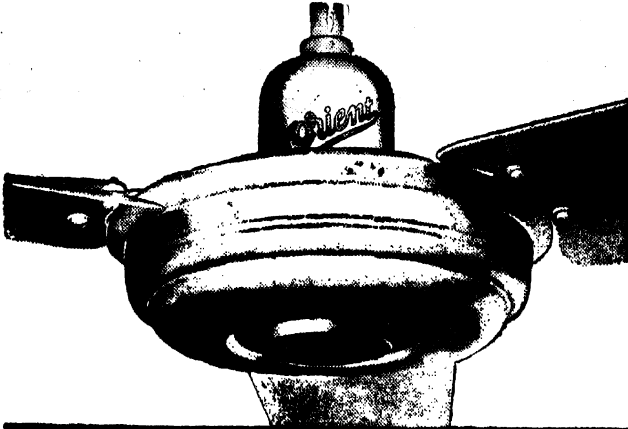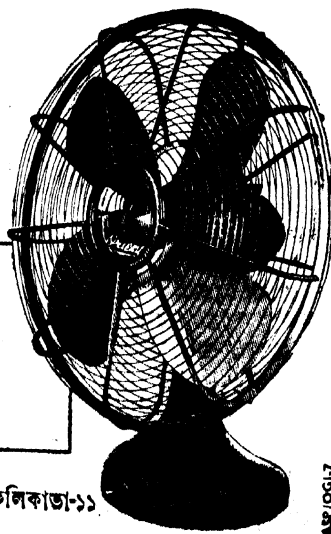
কুটীরিতে ওরা আশ্রয় নিয়েছিল আর কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। কেবল ঐ সুভাষ ছেলেটিকে কাজে-অকাজে রাস্তাঘাটে ঘোরা-ঘুরি করতে দেখা যায়। সুভাষ স্কুলে পড়ে না, কাজেই সিংগী বাড়ির ফাই-ফরমাজ খাটতে ওস্তাদ! দেখ-না-দেখ রাস্তায় এসে দাঁড়াচ্ছে, ছুটে 'সিংহ-ভিলায়' ঢুকছে, ব্যস্ত সমস্ত বেচারা রাত-দিন! পরের ছেলেটা!

পাড়ার মধ্যে সিংগীরা বনেদী। ডাল-পালায় অনেকখানি বিস্তৃত। এককালে এ জায়গাটাতে লোকে বলতো সিংগীপাড়া। এখন রাস্তা-ঘাটের নানা নামকরণ হ'য়েছে, অলিগলির গাল-ভরা নাম, সেসব নাম কেবলি নাম! তবু বড় রাস্তার ওপর প্রকাণ্ড বাড়িটা সিংগীদের পরিচয়, জজ-ব্যারিস্টার, দেশবরেণ্য কেউ না থাক, এককালে ও'রা দান-ধ্যান, আর পুজোপার্বণের জন্যে বিশেষ খ্যাত ছিলেন। শোনা যায় একদিন ও'দেরই খেয়ে আশ্রিত অনেকে জজ-ব্যারিস্টার, ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক আর দেশ-নেতা হয়েছেন। সিংগীদের সে অবস্থা আর নেই। জমিদারী ছেড়ে এখন ও'রা ঠিকেদারি করে তাল সামলাচ্ছেন। এখনো অনিমাদের মত অমন কত আসছে যাচ্ছে কে তার খোঁজ রাখে!

আমি খোঁজ রেখেছিলুম। সেই প্রথম থেকে না হোক তারপর অনেকদিন থেকে। সুভাষকে দেখলে ওদের কথা মনে হত—কেমন আছে ওরা নতুন আশ্রয়ে? সিংগীদের মেয়ে-পুরুষ। সকলেরই প্রায় কখনো-না-কখনো চকিত দর্শন মেলে, পর্দানসীন (হ'লেও সে-পর্দা জীর্ণ) ও'রা কেউ নন, কিন্তু অনিমাদের দেখা মেলেই না আর! (পরাশ্রয়ে অসূর্যম্পশ্যা!)

কতদিন দেখেছি সিংগীদের পুরোন ফোর্ড গাড়িটা জঠরে ছোট-বড়-মাঝারি কত মেয়ে-বৌ ভর্তি ক'রে সরীসৃপের মত প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছে, হাসিখুশী আর কল-কাকলিতে পাড়া মুখর হ'য়ে উঠেছে! চেয়ে চেয়ে কত দেখেছি, অনিমাদের কখনো দেখিনি সেই দলে। বোধ হয় বাড়ি আগলাতে ও'রা মায়ে-ঝি-এ রয়ে গেছেন।

সুভাষকে আমি কখনো কাছে ডাকিনি, কিছু বলিনি। দূর থেকে ওকে দেখি আর ওদের কথা ভাবি। নিশ্চয়ই ওর মা, বোন ওরই মত সিংগীদের সংসারে কুটি ভে'ঙে দুখানা করছেন। সিংগী বাড়ির হে'সেল-আঁতুড় তো কামাই নেই!

সিংগী বাড়ির অনিমার সমবয়সী অনেক-গুলো মেয়ে বেণী দুলিয়ে বই-এর গোছা বুকে চেপে স্কুল-কলেজে যায়। অনিমা কেন যায় না? শুনেছিলুম অনিমা নিজেদের বাড়িতে যখন ছিল লেখাপড়া করতো। নিজেকেই আবার বলেছি যাবে কি করে, কে পাঠাবে আর ওকে স্কুলে, খরচ দেবে কে, সময় পাবে কখন পড়াশোনা করবার? ছেলে হ'য়ে সুভাষ কি পড়ছে যে মেয়ে হ'য়ে অনিমা পড়বে? তায় পরাশ্রয়ে অনাথ হ'য়ে ওরা এসেছে।

কিন্তু তবু মনটা খারাপ হ'য়ে যায় সিংগী বাড়ির পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের দেখলে। রাস্তাঘাটে খুশী ছড়ালে। খুব বেশী করে মনে হয় ওদের কথা, সেই শীতকালের মেঘ-করা একটা সকাল!

হিসেব করে দেখলে পনের বছর পরে আর একটা শীতকাল গত হ'তে চলেছে। এ পাড়ার এবং ঐ সিংগী বাড়ির অনেক পরি-বর্তন হ'য়েছে, জোয়ারের জল অনেক উঠেছে, পাড়া গম্ গম্ করছে। চেনা-পরিচয়ের, আত্মীয়তার দিন চলে গেছে। সামাজিকতার চেয়ে এখন রাজনীতিকতা সমধিক আদরের এবং শ্রদ্ধার! দান-ধ্যান এবং উৎসবপরায়ণ সিংগীরা চাপা পড়েছেন। তাছাড়া ও'দের নিজেদের মধ্যেও ভাঙন ধরেছে—সেই যুদ্ধের দুর্মূল্যতার সংগে সংগে মন ভেঙেছে, হাঁড়ি ভাগ হ'য়েছে। অনেকদিন বাড়িঘরে চুনকাম করা হয়নি, বালি খসে খসে রঙচটে লোল-চর্ম হ'য়ে আছে 'সিংহ ভিলা'। শুনছি এবার বাড়িটা বিক্রী হ'বে।

কি বলতে গিয়ে কি বলছি, ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি! তা হোক ধান-ভানা তো আছেই! আজকাল পাড়া বেড়ান উঠে গেছে, নইলে এতক্ষণে ওদের সম্বন্ধে কত খবরই যে তোমাদের শোনাতে পারতুম, শুনে শুনে তোমরা বিরক্ত হ'য়ে উঠতে!

পনেরটা শীত যেমন এসেছে পনেরটা বসন্তও তেমনি গেছে। দেহে মনে অনিমা অনেক বেড়েছে। দেখতে দেখতে সুভাষেরই তো গোঁফ গজিয়ে গেল!

একদিনের কথা মনে পড়ে। বেশ স্পষ্ট। মনের মধ্যে ছাপটা মোছেনি। বর্ষায় কাকের ইরেতে আমাদের পাড়াটা ভেসে যায়, রিক্সা-নৌকোগুলোর তখন মহরম শুরু হয়—পারাপার করতে গা-মত মাশুল নেয়।

সেই ট্রাম লাইন থেকে পার্কের কোল পর্যন্ত সমস্তটা জলাশয় হ'য়ে গেছে। বৃষ্টি ধরেছে, ছে'ড়া দুধের মত মেঘ কাটছে, রাত খুব বেশি হয়নি। ট্রাম থেকে নেমে মাল-কোঁচা এ'টে জল-ঝাঁপাতে প্রস্তুত

রিক্সাগুলো ঘন ঘন ঘুঙুর বাজিয়ে আকর্ষণ করছে, বদ্ধজলে অদ্ভুত শব্দ কল কল করছে, চোখে জলের পটার মত পথের আলোগুলো চেয়ে আছে। শিকারী বকের মত পা তুলে তুলে জলের ছাট বাঁচাতে হাঁটছি, পায়ের জুতো মাথায় উঠেছে! গা ঘিন্ ঘিন্ করছে, ভাবছি বাড়ি পেঁছে চান করে ফেলবো—আর পারলে পাড়াটা বদলাব। প্রতি বর্ষায় কম করে বিশ-পঁচিশ দিন এ দুর্ভোগ অসহ্য! যেমন বন্ধ হয় ঘরের নর্দমা তেমনি রাস্তার হাইড্রাণ্ট—ঘরে বাইরে সমান অবস্থা!

মনে হ'চ্ছে যেন কেষ্টকে কোলে নিয়ে যমুনা পার হচ্ছি, তেমনি দুর্যোগের রাত্রি! বাজারের পথটা পেরতে এক যুগ কেটে গেল! আবার টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি শুরু হল। রিক্সাটা নিলেই হত তখন! মাথার ওপর বৃষ্টির টিপ্পুনী অসহ্য! মনে মনে আরো অনেকবারের মত প্রতিজ্ঞা করলুম, কলকাতায় আমি থাকবো না, কখনোই থাকবো না!

পা-ফেলার একটু অসাবধানে পায়ের জল
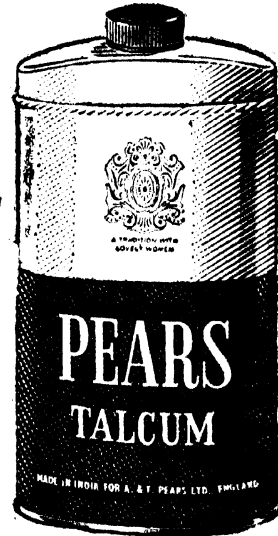
গায়ে-মাথায় হল। মনে হল, ডুবে মরি, হরি-হরি!

হঠাৎ চোখ তুলে চাইতে দেখলুম, সামনে জল-ভেঙে ও'রাও চলেছেন, পায়ে মাথায় জল নিয়ে ছপ্‌-ছপ্‌ ক'রে।

সেই কবে কোন যুগে ও'দের রাস্তায় দেখেছিলুম, ঠেলা-গাড়ি করে মাল এনে সিংগী বাড়ির দোর গোড়ায় অপেক্ষা ক'রতে। আর এই দেখলুম। তারপর কত বর্ষার জল পাড়াময় থৈ-থৈ করেছে, সরেও গেছে!

মাকে ধরে ধরে অনিমা চলেছে। পায়ে মল-বাজার মত জলের শব্দ হ'চ্ছে। অনিমার মাথার চুল, পিঠের কাপড় ভিজে সপ্‌ সপ্‌ করছে। নির্লজ্জ আলোগুলো কট্‌ কট্‌ করে চেয়ে চেয়ে দেখছে, অনিমার বুক-পিঠ।

আমিও দেখলুম। ভিজে ধুয়ে কেমন দেখতে হ'য়েছে অনিমাকে, সংকুচিতা, শঙ্কিতা, বিজড়িতা যেন। অনিমা যৌবন উত্তীর্ণা! জলাশয়ে বৃষ্টি ভেজা শালুক অনেককাল আগে ফুটে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে বুঝি তৃষ্ণার বারি চেয়েছিল।

জলের মধ্যে এমন আড়ষ্ট হ'য়ে চলছিল, মনে হচ্ছিল বুঝি এই পড়ল দুজনেই হুমড়ি খেয়ে। কি দরকার ছিল এখনি এই জলের মধ্যে সাঁতার কাটবার? কুটি আঁকড়ান ডুবন্ত মানুষ যেন। এত তাড়া কিসের?

সেদিন সিংগী বাড়ির গেটের আলোটা নিভে যেতে বাইরে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে চেয়ে অনেকবার আন্দাজ করতে চেষ্টা করছি, তেতলা বাড়ির কোন ঘরে অনিমারা থাকে, আজ কোথায় গিয়েছিল মায়ে-ঝি-এ যে বৃষ্টি মাথায় করেই জল ঝাঁপিয়ে এসে হাজির হল? সিংগীরা ছাড়া ওদের আর কোন আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু আছে নাকি?

আমি তো দেখিনি, শুনিনি!

তারপর অনেকক্ষণ বাইরের রকে বসে অনিমাদের নিয়ে আবোল-তাবোল কত কথা ভেবেছি। মনে মনে একটা ঔৎসুক্য জ্বালিয়ে রেখে চোখ চেয়ে অন্ধকারাবৃতা 'সিংহ-ভিলা' আতি-পাতি ক'রে খ'জেছি—এই বুঝি কোন প্রকোষ্ঠে হঠাৎ আলো জ্বলে অনিমাকে দেখা যাবে—ভিজে কাপড় ছেড়ে, চুলের জল নিঙড়ে, মুখ মার্জনা করে কেমন দেখতে হ'য়েছে?

যে তারাটা সিংগী বাড়ির একেবারে পিছনদিকে আড়াল ছিল সন্ধ্যে রাতে সে তারাটা চুপি চুপি উঠে এসে মাথার ওপর জ্বলছে, সপ্রতিভ।

আরো মনে হল, সিংগীদের আত্মীয় যখন মেয়েটার একটা গতি করে না কেন, চেনা-জানা আত্মীয়-স্বজনের তো ও'দের অভাব নেই? বেশ বয়স হ'য়েছে অনিমার। এই বয়সে কিছু না ক'রে ঘরে বসে থাকা মেয়েছেলের উচিত নয়! বিয়ে দিয়ে দিলে পরে, যোগমায়াদেবীর একটা ভাবনা দূর হয়। আর তা এমন কি অসম্ভব? বছরে সিংগী বাড়িতে একবার, দুবার, পাঁচবার, অমন ম্যারাপ বেঁধে বেসুর সানাই বাজেই! গায়ে-হলুদের তত্ত্ব আসে মাছের মাথায় সিঁন্দুর দিয়ে কত? আমরা পাড়ার লোকেরা হিসেব রাখি!...

সেদিনের বর্ষার রাতের সঙ্গে তুলনায় আজ যেন অনিমাকে কেমন দেখতে লাগছে! অদ্ভুত একটা নির্লিপ্ত সুন্দরতা যেন রাস্তার এখান থেকে সিংগী বাড়ির পশ্চিমের ঐ বারান্দাটা পর্যন্ত প্রসারিত।

নিজের কাছে নিজে লজ্জা পাই! মাথা নিচু করে রাস্তার মোড়ের দিকে এগিয়ে যাই। এত কথার আমার দরকার কি, সিংগী-দের আত্মীয় সিংগীরা বুঝবে, ভাববে, ব্যবস্থা করবে! বিয়ে দিক, আইবুড়ো রাখুক আমার ভাবনার দরকার কি!

হঠাৎ মাথা ঝেড়ে ভাবনাটাকে দূর করে দিতে যেন মোড়ের মাথায় এসে চোখ তুলে চাইলুম। হঠাৎ এই জনস্রোত দেখে যেন যুগপৎ বিস্মিত, পুলকিত এবং ভীত হলুম। বড় আশ্চর্য বোধ হল।

দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেছে সুভাষও! ধুতিটা আজকালকার কায়দায় কেমন এক রকম করে পরেছে, পায়ের চপ্পলটা আধখানা পদাশ্রিত, অল্প অল্প গোঁফ-দাঁড়িতে মুখটা লাজুক-লাজুক, শার্টের কলার তোলা। হঠাৎ মনে হল, এই বুঝি যৌবন, এই চিহ্ন চোখে-মুখে, আর ভাবে ছেলে-ছোকরাদের!

শালপাতা মোড়া দুটো ফুলের তোড়া সুভাষের হাতে। কলাপাতায় মোড়া কিছু ফুলের মালাও সেই সঙ্গে। (ঝরা আর বাসি রজনীগন্ধা বলে আমি আন্দাজ করছি!)

আজই প্রথম ডেকে কথা কইলুম সুভাষের সঙ্গে। আত্মীয়তার সুরে বললুম, 'কি ব্যাপার সুভাষবাবু? এত ফুল!'

শালপাতা মোড়া ফুলের তোড়া দুটো হাত ফিরতি ক'রে সুভাষ হাসল, হয়তো ব্যাপারটা জানাতে লজ্জা পেল।

আমিও হাসলুম। বোধহয় বোকার মত। পুনঃ জিজ্ঞেস করলুম, 'ফুল কিনতে এসেছিলে?'

সুভাষ মাথা নাড়লে। মানে সেটা তো দেখাই যাচ্ছে, ফুল কিনতে না এলে যেচে কেউ দেয়নি এমন বেঁধে-ছে'দে ফুলগুলো!

ভাই-এর মুখের সঙ্গে বোনের মুখের আদল আছে। দেখলেই বলা যায় ভাই বোন। মনে হল, এইমাত্র পড়ন্ত রোদ মেখে পশ্চিমের বারান্দায় অনিমা দাঁড়িয়েছিল বুঝি এরই আশায়, ফুলের আশা, গন্ধের আশা, আনন্দের আশা!

তারপর সুভাষই বললে, 'দিদিকে আজ দেখতে আসবে তাই ফুল কিনতে এসেছি!'

অনূঢ়া কন্যাকে ফুল দিয়ে দেখা আর

রিনা ফুলে দেখা দুটোর মধ্যে যেন অনেকটা তফাৎ আছে। সুভাষের মুখ-চোখ দেখে মনে হল, এত খুশী-খুশী ওকে আর কোনদিন মনে হয়নি।

আমিও বুঝি খুশী হয়েছি, অনিমার সম্বন্ধ আসায়। জিজ্ঞেস করলুম, 'কোথা থেকে আসবে? কারা আসবেন?'

এত আত্মীয়তা নেই আমার সঙ্গে যে এমন প্রশ্ন করতে পারি বা করা উচিত হয়েছে। লজ্জা পেলুম।

সুভাষ কিন্তু কিছু মনে করলে না, আত্মীয়তার সুরে বললে, 'উত্তরপাড়া থেকে আসবে! জানেন, ও'রা খুব বড়লোক!'

'বেশ! বেশ!' খুশী হলেও হঠাৎ কেমন যেন একটা খোঁচা লাগল মনে। বড়লোকের নজর হঠাৎ এমন একটা পরাশ্রিতার প্রতি পড়লো কেন—যে কন্যা সুন্দরী নয়, উচ্ছল যৌবনবতীও নয়? মেয়ে-দেখাটা প্রহসন না হয়! কেমন আমার মনে হ'ল, অনিমা অমনোনীতা হবেই। বৃথা ফুল, ফল আর খাদ্যের আয়োজন। এর আগে নিশ্চয়ই আরো অনেকবার অনিমাকে দেখান হয়েছে, ফুল-ফলের অর্ঘটা আমার নজরে পড়েনি। অনিমার বাপ নেই, অনিমা সুন্দরী নয়, অনিমা শিক্ষিতা নয়, অনিমার বয়সও হয়েছে। কে এমন সহৃদয় আছে যে অনিমাকে পছন্দ করবে? নেই, আমি জানি।

বোধ হয় বড়লোক আত্মীয় বলে এমন একটা অসম্ভব কল্পনা সম্ভব হ'য়েছে। উত্তরপাড়া থেকে বড়লোক সম্বন্ধে এসেছে। যদি পছন্দ হয়—

আর ভাবা উচিত হবে না। কল্পনা-বিলাসই! মুখের হাসি উজ্জ্বল করে সুভাষদের আশাকে উৎসাহিত করলুম।...

কয়েকদিন আর দেখিনি অনিমাকে। পশ্চিমের বারান্দাটা যেন আরো জীর্ণ হয়ে গেছে। শীত কবে ফুরিয়ে গেছে, বসন্ত যায় যায়। উত্তরপাড়ার ওরা কবে দেখে গেছে মেয়ে।

চিরাচরিত রীতিতে যা হয়, মেয়ে দেখানই সার, পছন্দ বড় একটা কেউ করেন না প্রথম দর্শনে! বাংলা দেশের কোন মেয়েই বুঝি বলতে পারে না সাহস করে, গর্বভরে—মেয়ে-দেখার দল তাকে এক নজরেই পছন্দ করেছে, মনোনীতা হয়েছে সে, বধূ-জায়ার মর্যাদা পেয়েছে! হায় রে কপাল! তারপরের কথা ভাবলে নারী জন্ম বৃথাই মনে হয়! আর, এ তো অনিমা! ও কি দিয়ে ভোলাবে, কি মায়া লাগাবে উত্তরপাড়ার বরপক্ষের চোখে? ঐ তো বেকার ভাই সুভাষ, বিধবা মা যোগমায়া, কত ছোটাছুটি করতে পারেন! আর সিংগীরা নেহাৎ দূর সম্পর্কের আত্মীয়, তার গলিত নখ-দন্ত।

সব জানি। তবু মনে মনে রাগ করি, কি দরকার ছিল বাপু গরীব অনাথের ঘরে মেয়ে দেখতে আসার তোমাদের? হয়তো যোগমায়া দেবী স্বামীর মৃত্যুর পর কিছু টাকা হাতে পেয়েছিলেন, পুত পুত করে রেখেছেন মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রে, খেতে-পরতে পায়—এমন, সমর্পণ করবেন বলে, তাই থেকে খরচ করেছেন সেদিন ফুলের তোড়া আর জল-খাবারের থালা সাজাতে। ক'দিন পরে আমি দেখেছি, সিংগীবাড়ির বাইরে ফুলদানি থেকে সেই ফুলের তোড়া দুটোকে রাস্তার ওপর ফেলে দিতে। কেননা, ফুলগুলো আর কাজে লাগেনি, শুকিয়ে নেতা হয়ে গিয়েছিল, দেবদারু পাতার ঝালরগুলো ভাজা পাঁপরের মত খড়খড়ে হয়ে গিয়েছিল।

ঠিক অমনি একদিন এসে ওরা জিনিসপত্তর নিয়ে 'সিংহ ভিলা'র দরজায় দাঁড়িয়েছিল—ঠিক ঐ বাসি ফুলের (রঙ হারান, গন্ধ হারান) অবস্থা যেন! কচি দেবদারু পাতায় বাতাস ছুঁলে কত কাঁপন

দাগ, ফুলদানিতে এসে শান্ত হয়ে যায়।

আমি অনিমার মত ক'রে কতদিন ভেবেছি : কোথায় উত্তরপাড়া আমি জানি না, দক্ষিণপাড়াও না, কিন্তু তোমরা কি আমাকে তোমাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে এক ধারে স্থান দিতে পার না? আমি জানি আমার রূপ নেই, আর আমার বাবা নেই যে তার ফাঁক-টুকু পূরোন করে দেবেন! না হয় একটু এগিয়ে এলে গরীবের দায় উদ্ধার করতে! আমি তোমাদের অনেক কাজে লাগব! তোমাদের সকলকে মাথায় করে রাখবো, আর—

মাঝে একদিন চকিতে যেন বারান্দার রেলিং ধরে অনিমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে-ছিলুম। কেমন ঝড় খাওয়া চেহারা যেন, চোখের কোণে কালি পড়েছে, হঠাৎ বুড়ি হ'য়ে গেছে! পরীক্ষায় ফেল-করা ছাত্র, আত্মহননের চেষ্টায় অকৃতকার্য আপাতত!

এই তো প্রথম ও শেষবার নয়! (অনিমা তোমার এত দুঃখ কেন? তুমি কি স্বপ্ন তৈরী করেছিলে উত্তরপাড়ার ওদের নিয়ে? আর কখনো কি তোমাকে কেউ বধূ-নির্বাচনে অমনোনীত করেনি?)

শুনেছিলুম, অনিমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে নাকি সিংগীরা হেরে গেছেন, এ পাড়ায় ও পাড়ায় রটে গেছে—ডানাকাটা পরী আছে সিংগী বাড়িতে। যোগমায়া দেবী কপালে আঘাত করে নাকি কত দুঃখ করেছেন, তাঁর মেয়ের বেলাই লোকের চোখ থাকে না, দেখতে পায় না! পাড়ার জানা-শোনা আত্মীয়-স্বজনের কারো আর বিয়ে হ'তে বাকি নেই অনিমার বয়সী মেয়েদের! তাদের নাতি-পুতি হ'য়ে গেছে! (অনিমা ত্রিংশতি বর্ষীয়া, এবার চুপি চুপি বলি!)

কোন বিয়ে-বাড়ির সামনে দিয়ে গেলে, কি কোন নবোঢ়াকে দেখলে আমার অনিমার কথাই মনে পড়ে। ওর মুখটা বড় করুণ হয়ে চোখের ওপর ফোটে। কতদিন নেমন্তন্ন-বাড়িতে কত মেয়ের মধ্যে যেন অনিমাকেই খুঁজেছি—জন-সমাগমের শেষ সীমায় স্তিমিত দীপ শিখার কম্পমান ছায়ায় অনিমারই মুখ দেখেছি—যেমন দেখি সিংগীবাড়ির পশ্চিমের বারান্দার রেলিং ধরে কখনো কখনো অনিমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে, কি গ্রীষ্মে, কি বসন্তে, কি শীতের বেলা শেষে!

অনিমা অনেকখানি আমার ভাবনা জুড়ে আছে। অনিমা আমার কেউ না, সিংগী-বাড়ির সম্পর্কে ও কেউ হ'লেও আমার সংগে সত্যি ওর কোন সম্পর্কই নেই! ভিন্ন ভাতে পাড়া-পড়শী!

তবু ও'রা কেন যে বেছে বেছে আমাকেই আবার অনিমার পাকা দেখায় নেমন্তন্ন করলেন বুঝতে পারলুম না। সিংগীবাড়ির একজন কর্তা এসে সবিশেষ অনুরোধ করলেন উভয় পক্ষের পাকা দেখায় উপস্থিত থাকবার জন্যে। বোধ হয় এই প্রথম সিংগীরা আমার সংগে স্বজন সম্পর্ক পাতালেন। সানন্দেই গ্রহণ করলুম।

আনন্দ আরো, উত্তরপাড়ার ও'রাই অনিমাকে পছন্দ করেছেন, অনিমা মনোনীতা হয়েছে। ও'রা পাকা কথা দিয়ে বিবাহের দিন স্থির করতে উদ্যোগী হয়েছেন।

লজ্জানতা, চন্দনচর্চিতা, পট্টবস্ত্রাবৃতা, অলক্তকরাগরঞ্জিতা অনিমাকে নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়। উত্তরপাড়ার লোকের পছন্দ আছে—অনিমা দর্শনীয়া, গ্রহণীয়া, অনুত্তীর্ণ যৌবনা! বেশ মানিয়েছে বধূটির মত। গরবিনী! অন্তরালবর্তিনী যোগ-মায়া দেবীর স্তিমিত চোখে আশার সঞ্চার উদ্বেলিত অশ্রুভারে টল টল করছে বুঝি! শাঁখের স্বর এমন সুমধুর আর কখনো বাজেনি! আমার হাতে ফুলের মালাটি যেন সুড়সুড়ি দিয়ে বলছে, কেমন! হল তো? তবে যে বল তোমরা অনিমাকে দেখতে ভাল নয়! ঐ তো দেখ না যৌবন ওর বুকের মধ্যে কেমন উচ্ছ্বসিত হ'য়েছে, লম্বিত পুষ্পহারে ধক ধক করছে!

সিংগী বাড়ির অব্যবহার্য পশ্চিমের বারান্দাটা সম্প্রতি অনিমার উপস্থিতিতে মুখর হয়ে উঠেছে। যা কখনো দেখিনি, দেখ না দেখ, অনিমা এসে বারান্দার রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়ে বড় রাস্তা দেখছে, নয়তো উর্ধ্বাকাশে দৃষ্টি মেলে কি যেন বারতা পাঠাচ্ছে। আমি অনেকদিন লক্ষ্য করেছি, অনিমা আর সেই অনিমা নেই, আগামী দিনের সুখে, আনন্দে, সম্ভাবনায় কেমন যেন অষ্টাদশীটির মত হ'য়ে উঠেছে—এখন কে বলবে অনিমারা সিংগীদের আশ্রিতা,

...রাত্রের গ্লানি কিছুমাত্র আছে। অপরের মনোনয়নে আপন মর্যাদাটি পেয়েছে—বুঝি তাই বলতে চাইছে, আমি মনোনীতা, আমি পরিণীতা! স্বার্থক আমার রূপ, স্বার্থক আমার যৌবন!

মেয়ের বাড়ি পাকা-দেখা সেরে ছেলের বাড়ি পাকা দেখতে যাবারও নিমন্ত্রণ পেয়েছি। সিংগীরা হঠাৎ আমাকে বিশেষ গণ্যমান্য মনে করেছেন। ছেলের পাকা দেখায় আমাকে জোর করে সংগে নিলেন। যথা-সময়ে ও'দের সেই পুরোন গাড়িটা ভর্তি হয়ে আমরা ছেলের বাড়ি উপস্থিত হলুম। যা শুনেছিলুম তাতে অনেক কিছু বুঝি আশা করেছিলুম—ভেবেছিলুম না জানি কোন রাজারাড়ির দেউড়িতে গিয়ে উপস্থিত হব! অনিমার ভাগ্য এমনিই কল্পনা করে-ছিলুম। আহা, অনেক মনস্তাপের পর, মানুষের মনে অনিমা যে স্থান পেয়েছে!

গাড়ি থেকে নেমে মনটা কেমন যেন ভার ভার মনে হ'ল। ত্রুটি কিছু ছিল না, তবু কোথায় যেন একটা মস্ত ফাঁক ছিল, ঠিক ধরতে পারছি না। ঘর-দোর বেশ সাজান-গোছান, আশীর্বাদের উপকরণ থরে থরে সাজান। আমরা কেবল অপেক্ষা করছি। সামনের দেওয়ালে একটা বড় ঘড়িতে সময়ের কাঁটাটা ওঠা-নামা করছে, পেণ্ডুলামটা না-না করে মাথা চালছে। আমদের কথা ফুরিয়ে গেছে। বরপক্ষের ও'রা কেবল ঘর-বার করছে। হঠাৎ কাটলেট ভাজার গন্ধে সভাস্থল ভরপুর হ'য়ে উঠল। গন্ধটা কেমন উগ্র যেন। পাত্রপক্ষের কে যেন ভোজ্যদ্রব্যের ঘ্রাণ নিয়ে বললেন, 'আয়োজন কমপ্লিট্!'

এদিকে প্রায় হাত গুটিয়ে বসে থাকার অবস্থা! বোধ হয় আলাপ-পরিচয়েরও শেষ আছে। 'আমরাও প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। শুভলগ্ন অনেকক্ষণ বয়ে গেছে, পাঁজি-পুঁথি নিথর হয়ে আছে।

মানে বরের দেখা নেই। সেই যে আসছি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে, এখনো নাকি ফিরছে না। সর্বত্র লোক পাঠান হয়েছে, কোন খবরই পাওয়া যাচ্ছে না। বরের বাবা অপরাধীর মত ঘর-বার করছেন। আমরা চুপ, নির্বাক।

কাটলেট-ভাজা গন্ধে বুকের নিঃশ্বাস ভারি হয়ে আছে। বলবার কিছু নেই। আয়োজন তো সম্পূর্ণ! রাত দশটায় তৃতীয় লগ্নও যখন যায়-যায়, তখন ভট্টাচার্য মশাই বললেন, 'আর অপেক্ষা অনুচিত, পাত্র যদি উপস্থিত না হয় তা হ'লে যথাবিহিত—'

সিংগীবাড়ির ছোট কর্তা গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'কি আর হবে! এখানে বিহিত আর কি? হতভাগীর কপালই মন্দ! ভেবেছিলুম একটা দায় উদ্ধার হ'ল! এতটা আশা করা অন্যায় হয়েছে! ছি, ছি!'

ছি-ছি করাটা যেন পাঁচ মুখে ছিটিয়ে পড়ল।

হঠাৎ যেন অধিকতর উত্তেজনার সৃষ্টি হ'ল। কিছু বুঝে ওঠবার আগেই চোখ দুটো আমার যেন সদ্য ঘুম ও স্বপ্নের মধ্যে জেগে উঠল! শাঁখ বাজল, ধান-দুর্বা-চন্দন এবং দধি সহযোগে একটি মস্তককে কেবলি বিব্রত করা হল।

শুনলুম, বাপের সম্মান বজায় রাখতে পাত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহে রাজী হয়ে সভা-স্থলে বসেছে। সে চিরকুমার থাকার সংকল্প ত্যাগ করেছে। সুতরাং সবার মুখ রক্ষায় এই বিকল্প ব্যবস্থা।

(কেমন সন্দেহ হ'ল, লোক মুখে কন্যার রূপের খ্যাতি অবগত হয়ে পাত্র অস্বীকৃত হয়নি তো? পাত্র বরয়তি রূপম্!)

শুভকর্মশেষে মিষ্টিমুখের জন্য অতঃপর পাত্রপক্ষ সবিশেষ পেড়াপিড়ি করলেন। কন্যাপক্ষের সকলেই অন্ন গ্রহণ করলেন, কিন্তু আমার আহারে রুচি ছিল না। কাটলেট ঠাণ্ডা হ'লে বুঝি চামড়ার মত হয়ে যায়! ভাল লাগে না খেতে!

বেচারা অনিমার কথা আর ভাবতে পারি না। পাত্র বদল সে কিভাবে গ্রহণ করবে জানি না। কিন্তু আমার আদো ভাল লাগেনি। ভাগ্যের এ পরিহাস হয়তো সকলের কাছে সমান মর্মান্তিক নয়। শেষ-বেশ বিয়ে তো হ'চ্ছে। বিয়ে নিয়েই কথা! দুঃখের কিছু নেই।

হয়তো নেই। ছেলে-ভুলনো ছড়ার মত সংসারটা নিজেকে বুঝিয়ে চলছে। নতুন ক'রে আর কি মানে করবে! অনিমার মনো-ভাবে আমাদের দরকার কি।...

বিয়েটা বোধ হয় আর দু'দিন পরে, আগামী ২২শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার! আকাশে জল-ভরা অনেক মেঘের আনাগোনা, মেঘ-রোদ্রের খেলা। ইতিমধ্যে কয়েক পশলায় পিচ ধুয়েছে।

আকাশে চোখ তুলে দেখলুম। বিয়ের দিনে বৃষ্টি হ'লে বড় অসুবিধা! অনিমার বিয়ের জন্যে যেন আমারই দুর্ভাবনা এখন। ভালয় ভালয় বিয়েটা হ'লে হয়!

সিংগী বাড়ির সামনে এক গাড়ি বাঁশ এসে জড় হ'য়েছে। আয়োজন দেখে মনে হয়, সারা বাড়িটাই ঘেরা হবে, আষ্টেপৃষ্ঠে ঢাকা হবে। সিংগীরা ভালই খরচ করবেন অনিমার বিয়েতে। আজ পনের বছরের উপর যোগমায়া দেবী অনিমাকে নিয়ে ও বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। আপনার জন হয়ে গেছেন।

শ্রাবণ শেষে আকাশ ভেঙেই পড়বে বলে মনে হয়। পূর্ব-মেঘ ঘন-ঘটা। বেলাশেষে সূর্যের মুখ দেখা যায় না। মেঘের নীচে শহর যেন নিরানন্দ। জবু-থবু, কুকুর-কুণ্ডলী!

হঠাৎ ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামল। 'সিংহ-ভিলা' ভিজতে লাগল। দড়ি-দড়া নিয়ে ঘরামীরা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। আশ্চর্য, পরিত্যক্ত মনে হয় বিয়ে বাড়িটা এখন।

সিংগী বাড়ির পশ্চিমের বারান্দাটাও কি ওরা ঘিরবে—ঐ একপাশে অব্যবহার্য, রেলিং-ভাঙা খোলা বারান্দাটা?

মনে হওয়ার সংগে সংগে চোখ দুটো ঘুরে গেল উৎসুকভাবে। একি? এই অবেলায় খোলা-ভাঙা বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনিমা ভিজছে? আজ বাদে কাল ওর বিয়ে নয়?

মনে হল চেঁচিয়ে বলি, 'অনিমা অমন ক'রে ভিজো না, তোমার অসুখ করবে—ঘরের মধ্যে যাও, বৃষ্টি বড় জোরে এসেছে!' ভিজে কাক হ'য়ে গেছে অনিমা, চুল-মাথা-কাপড় ওর ভিজে সপ্-সপ্ করছে। ওর সারা অংগ বেয়ে বৃষ্টির জল ঝরছে।

রাস্তায় জল জমে গেছে। নোংরা জল ছিটিয়ে গাড়ি ছুটছে। মেঘ-সাগরে ঢেউ উঠেছে। সিংগী বাড়ির পশ্চিমের বারান্দাটা বুঝি ধুয়ে যাবে, গলে যাবে, পড়ে যাবে!

সূর্য ডুবে গেল। সন্ধ্যাবাতি জ্বলে উঠল, বৃষ্টি ধরে এল। হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হয়ে বুঝি আলো ফুটলো।

আবার চেয়ে দেখলুম, বারান্দাটা ফাঁকা! সিংগী বাড়ির পিছন ফেরা যত ছায়া ওখানে এখন ঘনীভূত। চকিতে ছায়ারা নড়ল, অন্ধকার দীর্ঘ ক'রে কয়েক টুকরো সাদা কাগজ এদিক-ওদিক উড়ে গেল। আশ্রয়চ্যুত শ্বেতপারাবত যেন!

এক টুকরো কাগজ আমার হাতে এসে পড়ল। আদিঅন্তহীন সে-লেখার কিছু অংশ বুঝি পড়তে পারি।

'...ভুল...ভুল...পছন্দ আমাকে কেউই করেনি......প্রথমেও না, শেষেও না......এই চের!'......

এই কদিনে অনিমা কেমন যেন ঢিলে-ঢালা হয়ে গিয়েছে।

সর্বাংগে ওর বিগত যৌবনের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। এমন নব জল-ধারায় স্নান করেও ওকে সুন্দর দেখতে হয়নি কেন?

বি ষ

সুনীল বসু

এমন কোন যাদু জানিস বিষ নামানো ওঝা
রক্ত থেকে মুছে দে তুই মিষ্টি চুমোর বিষ,
লণ্ঠনের নীচে আমার শরীর ঢেলে ছিল
পরশমণি ছুঁইয়ে মারা এতই নাকি সোজা।

হায় রে আমায় গভীর রাতে তুক করেছে তুক
জ্বালা আমার মধু খাওয়ার জ্বালা কোথায় রাখি?
কোথা জুড়োই ঝলসে যাওয়া দুরন্ত এই বুক
দুটো চোখই মুঠোয় ঢেকে দিল আমায় ফাঁকি।

ফাটা কপাল, যা হল তাও যায় না বলা মুখে
দেহখানা ঝাঁজরা হল কাঁটায় ফুঁড়ে ফুঁড়ে।
শুকনো চুলে তেল মাখি না, সাজ ত গেছে চুকে
জলের আয়না ভেঙে ফেলি, পাথরে ফেলি ছুঁড়ে।

নীল হয়ে আসছে আমার নষ্ট দেহ সখি,
আমার শাড়ি তোকে দিলাম, চিরুনিখান নিস
চিতাখানাও চন্দনের কাঠে সাজাস সখি,
মধ্যরাতে দেহে আমার ছড়িয়ে গেছে বিষ।

আ দি ম

দিলীপ রায়

জঙ্গল থেকে দ্রুত এলো ট্রেন
ডাইনোসোরাস যেন,
হুইশিল দিল তীক্ষ্ণ।
অতিকায় কোন বিকট আদিম জন্তুর ঘন চীৎকার
গর্জন গুরুগম্ভীর, কাঁপে প্রান্তর আর পাহাড়।

বনের মধ্যে মৃত্যুর মতো স্তব্ধতা ছিল যেন,
এক ভয়ানক শ্বাপদ রক্তপিপাসায় যেন ছুটল
ট্রেন যেন তার অতি আধুনিক প্রতীক।

আকাশের পটে পাহাড়, সে নিঃশব্দ;
তার নীচে দিয়ে খেলনার মতো দ্রুত
দূরে চ'লে যায় ট্রেন, এ'কেবেঁকে এক অস্থির অজগর।

যন্ত্রের এই বিজয়ঘোষিত আগমন
স্পর্ধায় করে স্তম্ভিত, যেন পরাজিত সব কিছু।
তবু মনে হয়, শক্তির এই সংহত অতিরঞ্জন
যেন আজও সেই আদিম, বন্য জন্তুর মতো বর্বর।
হুংকার করে যন্তর॥

স্মৃ তি থে কে

মানস রায়চৌধুরী

ট্রেন ছেড়ে দেবে ভাই ছেলেবেলা ফিরে আসে তোমার দু চোখে
বৃষ্টিভেজা এই বেলা ওপারে পাহাড়ে-বেঁধা বিষণ্ণ আলোর
স্মরণীয় স্পর্শ খোঁজে, সেদিকে কি তাকাতে পারো না?
অবিন্যস্ত প্লাটফর্ম. হকারের ক্লান্তিহীন মলিন ঘোষণা
পাশে রেখে যে দাঁড়ালো তার স্মৃতি কতকাল রক্তে অনাদৃত!

ঘুমের ভিতর শব্দ, অথচ স্তব্ধতা চিরকাল প্রবাহিত
সুবর্ণরেখার কূলে নামহীন লোকালয়ে অদ্ভুত বাজার
ঝিঙে-ক্ষেত রৌদ্রময়, কার অন্বেষণে গ্রামান্তরে
এখনো কিশোরী তুমি হেঁটে যাও, সারা দিবসের পরিশ্রমে—
ভালবাসা তীরবিদ্ধ হরিণ-শিশুর কান্না,
শব্দ তার উপত্যকা জানে!

রূপময় ভারত

মণিপুরের বিবিধ নৃত্যশৈলীর মধ্যে রাস-নৃত্যই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। সাধারণভাবে, এটিকেই সর্বত্র মণিপুরী-নৃত্য বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মুঘল-যুগের শেষ দিকে হিন্দু-উৎপীড়নের ফলে বহু উদ্বাস্তু পরিবার মণিপুরের নিরাপদ উপত্যকায় আশ্রয় নেন ও বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার চিরন্তন উপাখ্যানকে অবলম্বন করে, মধ্যযুগীয় ভারতীয় জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন এই সম্প্রদায়টি যে-বিশিষ্ট নৃত্যশৈলীটির সৃষ্টি করেন, রাস-নৃত্য তারই পরিণত রূপ। বর্ণাঢ্য পোশাক, মনোজ্ঞ অভিনয় ও মৃদু সঞ্চরণশীলতার জন্য, ভারতীয় ক্লাসিকাল নৃত্যের ক্ষেত্রে, রাস-নৃত্য অনন্য। সঙ্গের আলোকচিত্রগুলি ইম্ফলের সরকারী নৃত্য-বিদ্যালয়ে গৃহীত :

(১) মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ, (২) অবগুণ্ঠিতা শ্রীরাধিকা, (৩) রাধা-কৃষ্ণ : দ্বৈত-নৃত্য, (৪) ও (৫) বিভিন্ন নৃত্য-ভঙ্গিমায় গোপিনীগণ, (৬) প্রতীক্ষামানা শ্রীরাধা।

আলোকচিত্রশিল্পী :

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
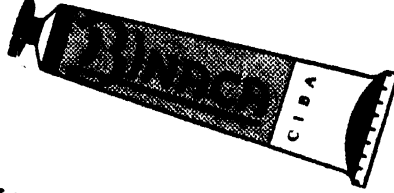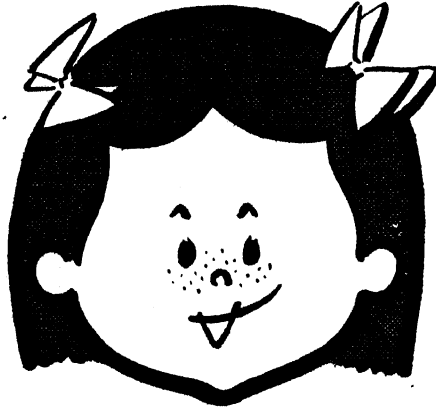
৩

৪
৫
৬

দিন বলেন। বলা তাঁর কর্তব্য। কিন্তু তাঁর প্রয়োজনে ম্যানেজারকে খ‍ুঁজে বের করবার এই ব্যগ্রতার অন্যরকম অর্থ করতে অশোকের ভালো লাগে। ভাবতে ভালো লাগে এই অতিরিক্ত সেবাটুকুর শরিক আর কেউ নেই। মনের কথাটাকে অশোক চেখে চেখে উপভোগ করেন।

কিন্তু অপারেটারের সংগে দেখা আর হয় না। ব্যবসার খাতিরে অশোককে মাঝে মাঝে নিওন সাইন অফিসে যেতে হতো। সম্প্রতি যাতায়াত একটু ঘনঘন হচ্ছে। কারণে এবং অকারণে। নিয়ন অফিসের হল ঘরটা তন্ন তন্ন করে খ‍ুঁজে বেড়ায় অশোকের দুটি চোখ। কিন্তু সেখানে অপারেটার কোথায়। সে বসে তার নিজের কামরায়। ম্যানেজারের কামরায় বসে অশোক নিতান্ত বিনা কারণে কতবার তাঁর নিজের অফিসের নম্বর চেয়েছেন। কত ছুতো করে আরো কত দপ্তরের নম্বর চেয়েছেন। পেয়েছেনও। কিন্তু নম্বর পাওয়াটাই তো বড় কথা নয়। সত্যিকারের প্রয়োজন যাকে তিনি যে চোখের আড়ালেই থেকে গেলেন।

নিওন সাইন হিয়ার।

এ কার কণ্ঠস্বর বলে অশোক বুঝি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন। এ তো সেই বীণার ঝংকার নয়! বাঁশির মূর্ছনা কি স্তব্ধ হয়ে গেল? বোধন হতে-না-হতেই বিসর্জন?
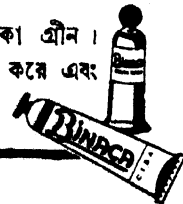
নিওন সাইন হিয়ার।

শুধু এই কটি কথা। অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সীর ম্যানেজার শ্রীঅশোক রায় সিলভারি ভয়েস কথাটা বইতে পড়েছিলেন। আজ প্রথম নিজের কানে শুনলেন। নিওন সাইন কোম্পানীর টেলিফোন অপারেটারের এই কণ্ঠস্বর। শুধু স্বর নয়, সুর। নিওনের আলোর বাণী বুঝি ফুটে উঠল এই সুরে।

নিওন সাইন কোম্পানীটির সংগে যোগাযোগ রাখতে হয় টেলিফোনের মাধ্যমে। এইখানেই গল্পের সূত্রপাত। রক্তে বসে জাল বোনার শুরুও এখানেই। কণ্ঠস্বরটি শুনে অশোক রায় প্রথম দিনেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্রেমে পড়েছিলেন বললে ভুল হয় না। চোখে না দেখে শুধু বাণী শুনে প্রেমে পড়া নূতন নয়।

কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। কাজের কথা ছাড়া টেলিফোনে ক'টা কথা বলার সুযোগই বা মেলে। "ম্যানেজার বাবুর সংগে কথা বলতে পারি কি" বলার সংগে সংগে ম্যানেজারের সংগে টেলিফোনের যোগাযোগ হয়ে যায়। তারপর শুরু হয় শুষ্ক ব্যবসার কচকচি। ম্যানেজার অফিসে উপস্থিত না থাকলে বরং দু একটা কথা হয়—কোথায় গেছেন, কখন ফিরবেন, কলকাতার বাইরে বুঝি, তা কবে নাগাদ ফিরবেন। কিন্তু তাই বা কতটুকু। শুরু হতে না হতে কথা ফুরিয়ে যায়। মন উপোসী থেকে যায়। গ্রামোফোন রেকর্ডে "মুনলাইট সোনাটা"র আয়ু আর কতক্ষণ!

টেলিফোন অপারেটার এই ক'দিনে অশোক রায়ের গলাটিও চিনে নিয়েছেন। "এড্‌ম্যান হিয়ার" বললে বুঝতে ভুল হয় না। ভুল হয় না সৌজন্য প্রকাশে। বলেন—গুড্ মর্নিং স্যার। অশোক প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়ে বলেন, মর্নিং। দুবার দুবার বলেন—মর্নিং মর্নিং। সংক্ষিপ্ত ইংরেজী "মর্নিং" কবে থেকে যে বাংলায় "কেমন আছেন" কথায় সম্প্রসারিত হয়েছে তা বুঝি অশোক টের পাননি। "ম্যানেজার বাবু এখন তাঁর ঘরে নেই। আপনি দয়া করে একটু ধরুন। আমি দেখছি তিনি কোথায় আছেন"—এ কথা অপারেটার কত-

তবে কি সে কাজ ছেড়ে চলে গেছে? তাকে কি ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে? কিন্তু অশোক তো তাঁর অফিসেই মেয়েটিকে বাহাল করতে পারতেন। কাজ তো তাঁর নিজের হাতেই ছিল। একবার বললেও তো পারত। মেয়েটা কী বোকা!

অশোক জানেন এ প্রশ্ন এখন বৃথা। তবু তিনি একদিন নিওনের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলেন—"আপনাদের পুরনো টেলিফোন অপারেটার বুঝি এখন আর নেই?"

নতুন অপারেটারের সার্ভিসের বিরুদ্ধে হয়ত অশোকের কোন অভিযোগ আছে এ কথাই মনে হলো ম্যানেজারের। উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি এ প্রশ্নই অশোককে করলেন। অশোক হাসলেন। বললেন—"না, না, অভিযোগ আমার কিছু নেই। ক'দিন নতুন গলা শুনছি কিনা তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।" পুরনো অপারেটার এক মাসের ছুটিতে গেছেন শুনে অশোক রায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

"গুড মর্নিং স্যার। কেমন আছেন? আমি এক মাস ছুটিতে ছিলাম।" সেই রুপোলী কণ্ঠ। এক মাস পর। এক যুগ পর বুঝি। অশোক ছুটির খবর জানতেন। তবু শুনে বললেন—"ও, তাই নাকি। আমি তো জানতুম না। তা, ছুটি কেমন কাটালেন? এখানেই ছিলেন, না বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন?" অশোক একটু বেশি কথাই বলে ফেললেন।

"না, এখানে নয়। গিয়েছিলাম বেনারস। সেখানে আমার এক পিসিমা থাকেন। অনেক দিন তাঁর সংগে দেখা হয় না। তাই ভাবলাম একবার দেখা করে আসি। সংসারে আত্মীয়-কুটুম বলতে তো ঐ পিসিমাই আছেন।" অপারেটারও একটু বেশি করেই বললেন।

তারপর ছ'টার শোতে সিনেমা

এই ঘরোয়া আলাপ অশোকের বড় ভালো লাগল। অন্তরংগতার এই নিবিড়তা অশোককে চঞ্চল করে তুলল। তিনি প্রসংগটার জের টানতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু ওদিক থেকে অকস্মাৎ অপারেটার বললেন—"আপনি লাইনটা একটু ধরুন স্যার। ম্যানেজার বাবুর সংগে কথা বলুন।"

বেনারসী শানাই-এর একটি মনমাতানো সুর বুঝি অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। কথা বলার এই মাহেন্দ্র-ক্ষণে নিওনের ম্যানেজার না এসে পিসিমাই যদি থাকতেন আর খানিক তাতে এমন কী ক্ষতি হতো। পিসিমা ছাড়াও তো বেনারসে আরো অনেক কিছুই আছে। দশাশ্বমেধ মণিকর্ণিকার ঘাট বেণী-মাধবের ধ্বজা, বিশ্বেশ্বরের মন্দির, শাড়ি, সুর্তিজর্দা, মালাই, বেগুন, মাগুর মাছ—কত কিছুই তো ছিল। কত কিছুই তো সে বলতে পারত।

দিন যায়। ময়নার মুখে একবার বুলি ফুটলে তাকে আর নতুন করে কিছু শেখাতে হয় না। সে নিজে নিজেই তখন কত কথা নকল করে। কত কথা বলে। বলতে যখন শেখে তখন "কাল রাতে কী অসহ্য গরম পড়েছিল। আজ কী বৃষ্টিই না হচ্ছে" অনায়াসেই বলতে পারে। তখন মোহনবাগান ইস্টবেংগল খেলার কথা বলতেও বাধা থাকে না। টিকিট সংগ্রহের ঝামেলাটা বিস্তৃত করে বলা যায়। বিস্তৃত-তর করে আলোচনা করা যায় সিনেমার কোন নতুন বই-এর।

সিনেমায় তো একদিন যাওয়া যায়—প্রস্তাব করতে অশোকেরও বাধে না। অশোক দুঃসাহসী হয়ে ওঠেন। অকৃতদার অশোক। যৌবনের স্বপ্নে দুরন্ত অশোক। "একটু সকাল সকাল বেরিয়ে কোথাও একটু চা খাওয়া যাবে। তারপর ছ'টার শোতে সিনেমা। যে-কোন বই। যে-কোন হাউসে" —প্রস্তাব করেন অশোক রায়।

অপারেটারের বিস্ময়ের সীমা নেই। এড্‌ম্যানের ম্যানেজার তাঁকে সিনেমায় নিয়ে যাবেন, বুঝি ভাবা যায় না। আমতা আমতা করে বলেন—আপনি যখন ডেকেছেন তখন নিশ্চয়ই যাবো। কিন্তু আপনার সংগে সিনেমায় যাবো এ সৌভাগ্যের কথা যে কল্পনা করা যায় না। কোথায় আপনি, আর কোথায়........

তার কথাটা শেষ হলো না। শেষ করতে দিলেন না অশোক। বললেন—"দেখুন, ওসব কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। বড় চাকরি-ই নয় করি। কিন্তু মানুষের জীবনে চাকরিটাই তো সব নয়। চাকরির বাইরেও তার নিজস্ব একটা পৃথিবী আছে। স্নেহ প্রেম ভালবাসা আছে। ভালবাসা দিয়েই সেখানে মানুষের সংগে মানুষের পরিচয়।"

অশোক অকস্মাৎ আবিষ্কার করলেন একটু যেন বেশি বলা হয়ে গেল। অতটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় তো তার নেই অপারেটারের সংগে। সে কী অর্থ করে, কে জানে। শনৈঃ পন্থায় বিশ্বাসী অশোক কথাটার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। বললেন—"শুধু সিনেমার জন্যই নয়। একটা টেলিফোনের অ্যাকাউন্ট হাতে এসেছে। টেলিফোন নিয়ে একটা বিজ্ঞাপনের কপি লিখতে হবে। আপনি এ লাইনে আছেন। আপনার অভিজ্ঞতা আছে। আপনার সংগে এই নিয়ে একটু আলোচনা করতে পারলে কপি লেখার সুবিধে হয়।" অপারেটার জ্যান্ত মানুষ। ভোলাতে আর কতক্ষণ!

গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে দাঁড়াবার কথা। পাঁচটার বেশ কিছু আগেই অশোক যথা-স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রথম দর্শনের মাহেন্দ্র ক্ষণটির অপচয় হতে তিনি দেবেন না। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল পরিচয় নিয়ে। মেয়েটিকে তিনি নিজের চোখে দেখেন নি। তাই এই জনস্রোত থেকে তাকে চিনে উদ্ধার করা যে সত্যিই শক্ত। রাস্তা দিয়ে কত

মেয়ে এল গেল। কেউ এসে গ্র্যান্ডের সামনে দাঁড়াল না। অশোক সকলের দিকেই তাকাতে লাগলেন। চেষ্টা করলেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। তাঁর তাকাবার ভংগী দেখে অনেকে বিরক্ত হলেন। একটি মেয়ে তার সংগিনীকে বলছিল—"লোকটা কী অসভ্য।" কথাটা অশোকের কানে এসেছে। কিন্তু উপায় কী। অশোককে যে আজ সেই বীণাকণ্ঠীকে খ'ুজে বের করতেই হবে। সময় কেটে যাচ্ছে। এই অদর্শন অশোককে ভাবিয়ে তুলল।

কিন্তু তার চাইতেও ভাবিয়ে তুললেন প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি। সাড়ে পাঁচটার কাছাকাছি ভদ্রলোকটি অশোকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন—"আপনারই নাম কি অশোক রায়?"

অশোক তাঁর দিকে তাকালেন। কিন্তু তাঁকে কোনদিন কোথাও দেখেছেন বলে মনে করতে পারলেন না। অকস্মাৎ একটা প্রশ্ন অশোককে ভীত, বিভ্রান্ত করে দিল—ভদ্রলোক অপারেটারের স্বামী নয় ত! অপারেটার বিবাহিতা কিনা এখবর অশোক জানে না। প্রায় অপরিচিতা একটি মেয়েকে চা খাওয়ানো এবং সিনেমা দেখানোর নিমন্ত্রণ নিশ্চয়ই সামাজিক সংস্কার বিরোধী। ভদ্রলোক যদি মেয়েটির স্বামী হয়ে থাকেন এবং তিনি যদি অশোককে তার এই অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেন তা হলে কোন সদুত্তরই তো সে দিতে পারবে না। স্নেহ প্রেম ভালবাসার উচ্চ আদর্শ নিয়ে সে অপারেটারকে যা-ই বলুক না, তার স্বামীর কাছে তো আর এসব বলা চলবে না। ভদ্রলোক মেয়েটির স্বামী হয়ে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই একা আসেন নি। পাড়ায় শিভেলরাস যুবকের অভাব নেই। তারা হামলা শুরু করবে রাস্তার ওপর। পরের দিন সংবাদপত্রে ফলাও করে ঘটনার বিবরণ ছাপা হবে। কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। অশোকের গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল।

কিন্তু যা হয়ে গেছে তার আর চারা নেই। কৃতকর্মের ফলভোগ অশোককে করতেই হবে। আত্মগোপন করারও কোন অর্থ হয় না। তার পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েই হয়ত ভদ্রলোক এসেছেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে দুঃসাহসী হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। ভদ্রলোকের জিজ্ঞাসার উত্তরে অশোক বললেন যে তিনিই অশোক রায়। —"কিন্তু আমাকে আপনার কী প্রয়োজন"—এই পাল্টা প্রশ্নও অশোক একটু মরিয়া হয়েই করলেন।

ভদ্রলোক অশোককে সবিনয়ে নমস্কার করে বললেন—"আপনি আমাকে চিনবেন না, স্যার। আমার নাম নিতাই গোস্বামী। আমিই নিওন অফিসের অপারেটার।"

মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী বিবর্ণ বিস্বাদ হয়ে গেল। রাস্তার কোলাহল বুঝি একটা

আমার নাম নিতাই গোস্বামী

বিরাট বিদ্রূপের মতো অশোকের কান দুটোকে ঝালাপালা করে দিয়ে গেল। নিতাই গোস্বামী টেলিফোন অপারেটার। সেই বীণাকণ্ঠী! মনুমেন্টের চূড়োটাকে কে বুঝি দুমড়ে মুচড়ে ধূলিসাৎ করে দিয়ে গেল।

চা আর সিনেমার কৌতূহল আর এতটুকুও অবশিষ্ট নেই। কিন্তু সৌজন্য তো আর জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না। সুতরাং চা খাওয়া হলো। সিনেমা দেখাও হলো। হলো না শুধু বিজ্ঞাপনের কপি লেখার আলোচনা। সময় আজ আর নেই এই অজুহাতে অশোক বিজ্ঞাপনের প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন।

চা খেতে খেতে অশোক এক সময় বললেন—"টেলিফোনে আপনার গলা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যরকম শোনায়।"

নিতাই গোস্বামী হাসলেন। বললেন—"কী করব স্যার। টেলিফোনে মেয়েলী গলায় কথা বলা আয়ত্ত করতে হয়েছে। গলা ভালো না হলে চাকরি হয় না, হলে থাকে না। টেলিফোনের কাজ ভালো জানা সত্ত্বেও দুবার দুবার চাকরি গেল। তখন গলা সাধার কাজে লেগে গেলাম। ফলও পেলাম। অবশ্য এই মেয়েলী গলাটা আমি শুধু টেলিফোনেই ব্যবহার করি। ইচ্ছা করলে যখন তখন গলা পাল্টাতে পারি।

কথাটা বলেই ভদ্রলোক তাঁর স্বরসাধনার পরিচয় দিলেন—"নিওন সাইন হিয়ার।" সেই রুপোলী কণ্ঠ। কিন্তু এখন তা অশোকের কানেই গেল। মরম স্পর্শ করল না।

এত নৈরাশ্যেও অশোকের একমাত্র সান্ত্বনা, নিতাই গোস্বামী টেলিফোন অপারেটারের স্বামী নন!

গত সপ্তাহে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস রবীন্দ্র শতবর্ষ উৎসব পালন করেন রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত কিছু পেইণ্টিং-এর

একটি প্রদর্শনী উদ্বোধন করে। প্রদর্শনীটি আরম্ভ হয় ১৮ই মে থেকে। সংখ্যায় বেশী না হলেও রচনাগুলি বেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত। অনেক ছবিই দর্শকগণ এই প্রথম দেখবার সুযোগ পেলেন। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস একটি ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন, তাতে রচনাগুলির নাম প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্ররচনার কোনও নামকরণ করতেন কিনা জানি না। সে কথা কখনও

চিত্রগ্রীব

শুনিনি। ছবিগুলির কোনও নাম থাকার প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। রচনাগুলি বিভিন্ন ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে যোগাড় করে প্রদর্শন করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। পাশ্চাত্যে যদি তিনি শিল্পী হিসাবে স্বীকৃতি না পেতেন তা হলে এদেশে আজ তাঁর ছবির এত সমাদর হত কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা শেখা নয়, পাওয়া। আপনা থেকেই তিনি লাভ করেছিলেন এই শক্তি, তাই কোনও ছবিতেই কিছুমাত্র দুর্বলতা অনুভব করা যায় না। কোনও বাঁধা নিয়মের অধীনে না থেকে প্রকাশ করেছেন ব্যক্তিমানসের প্রতিফলন। অজানা, অচেনা, কিম্ভূতকিমাকার, অবাস্তব, অসম্ভবরা সব আসর জমিয়ে বসেছে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায়। কি অসাধারণ স্পষ্ট উচ্চারিত শিল্পীর অনুভূতি।

বাস্তবের ফ্রেমে বাঁধা যাঁদের মন তাঁদের জন্য রবীন্দ্রনাথের ছবি নয়। সম্পূর্ণরূপেই এ রচনা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুতরাং সবরকম দর্শকের কাছে আবেদন সমান নয়। রবীন্দ্রনাথ যদি আঁকা শিখে রচনা করতেন তাহলে এতটা স্বাধীনতা গ্রহণ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। আঁকা না শিখলেও রচনাগুলির মধ্যে যে ছন্দের ঝংকার অনুভূত হয় তা বাস্তবিকই অসাধারণ। কোনও কোনও ছবিতে বর্ণের প্রয়োগও যেমন ভাবিয়ে তোলে আবার ভারসাম্যপূর্ণ রচনাকৌশলও স্তম্ভিত করে দেয়। কোত্থেকে এ বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন শিল্পী! অনেকে রবীন্দ্রনাথকে সুররিয়ালিস্ট গোষ্ঠীভুক্ত করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রবীন্দ্রচিত্রকলা আদৌ সুররিয়ালিস্টিক নয়। রচনাগুলি স্বপ্নের চিত্ররূপ বা অবচেতন মনের প্রতিফলন নয়— ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ এবং টেকনিক সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথের পেশা ছবি আঁকা ছিল না সুতরাং ক্রেতার মনোরঞ্জন করে তাঁকে রচনা করতে হয়নি। তিনি যা এঁকেছেন তা সবই নিজেকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে। তাই রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আসর জমিয়ে বসে আছে বাস্তবের স্পর্শশূন্য নিছক সব কল্পনা। অবসর সময় কাটানোর জন্যে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতেন সে কথা ঠিক; কিন্তু অজান্তেই তিনি সৃষ্টি করে গেছেন এমন কিছু ছবি যা সারা বিশ্বের শিল্পের দরবারে সেরা আর্ট হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবে চিরকাল।

অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে রবীন্দ্রচিত্রকলা প্রদর্শনীর উদ্বোধনে শ্রীমতী মীরা দেবীর সঙ্গে লেডী রাণু মুখার্জী

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১৫১ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আজ সুশোভন১ বাবুলি২ ও শেভা৩ সকালে দেখা করতে এসেছিল তাদের কাছে তোমার সব খবর পাওয়া গেল। একতালা থেকে তোমাকে দোতালায় তোলবার আয়োজন হচ্চে, আমার এক একবার মনে হয়, পরীক্ষা উপলক্ষ্যে জাহাজে করে কলম্বো পর্যন্ত যদি যাও, তার পরে শরীর ভালো বোধ করলে আর একটু লম্বা পাড়ি দেওয়া। মুশকিল এই, কলম্বোর সমুদ্রে এই সময়টায়-বৃষ্টি বাদলার প্রাদুর্ভাব। সেদিন রুষীর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে মৈত্রেয়ী এবং তার বাবা এসেছিলেন। দর্শনের বেশি আর কোনো ফল পাওয়া গেল না। কিছুই বলতে পারলে না। আমার শরীরটা বেশ একটুখানি ক্লিষ্ট, মাথার খুলিটার ভিতরদিকে একটা বেদনা আছে। তোমার মেজোমামা আজ ছটার সময় আমাকে নিয়ে যাবেন এক ডায়োথার্মিকওয়ালীর কাছে। নাক কান গলার ভিতরটা বৈদ্যুতিক ঝাঁটা দিয়ে ঝাড়াই করিয়ে নেবেন। বোধ করি, কিছুদিন ধরে এই কাণ্ড চলবে।

সেই পঞ্চভূতের তর্জমাটা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রশান্তর কাছে চালান করে দিয়েচি, হস্তগত হয়েছে কিনা তার কোনো খবর পাই নি।

আজকাল কিছু লেখা আমার পক্ষে সহজসাধ্য নয়, তার কারণ পূর্বেই বলেচি—মাথায় চিন্তার দরজা জুড়ে একটা ব্যথা আড্ডা গেড়ে বসেচে। মাথাধরা বলে একটা বালাই কোনো কালে আমার ছিল না—মনে হচ্চে যেন একেই বলে মাথাধরা। এটা মানসিক কাজকর্ম করার পক্ষে অনেকখানিই প্রতিকূল। এবং কাজ ফেলে রেখে বিশ্রাম করার পক্ষেও অনুকূল নয়। তবুও হেলান কেদারা আশ্রয় করে বিশ্রাম করবার চেষ্টা করতে দোষ নেই। অনেক সময় বিশ্রামের ভান করেও ললাটে বেদনার লিখন কিছু পরিমাণে খণ্ডন করা যায়। অতএব সেই চেষ্টায় চললুম। ইতি ১৫ কার্তিক ১৩৩৬

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১। সুশোভন সরকার।
২। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ছোট বোন। সুশোভন সরকারের স্ত্রী।
৩। সুশোভন সরকারের ছোট বোন। সুমন্ত মহলানবিশের স্ত্রী।

॥ ১৫২ ॥

ওঁ

[illegible] কলকাতায় আবদ্ধ আছি। শুধু দেহটা নয় মনটা ছাড়া পাচ্ছে না। এখানে ভাবতে পারিনে। চিন্তার পরিধিটা ছোটো এবং খাপছাড়া। ঠিক যেন পাত পেড়ে ভোজের আয়োজন নয়, হাত পেতে। মুঠোয় যেটুকু ধরে মুখে সেইটুকু পুরি, থালায় কিছু সাজানো হয় নি। মন ঠিক যেটুকুকে ব্যবহার করে তার চারদিকে আরো অনেকখানি থাকা চাই তবে সে খুশী হয়, ঘড়ায় তোলা জলে স্নান সারলে ক্ষতি নেই, কিন্তু দিঘিতে গিয়ে নাইলে ঠিক যে জলটুকুতে স্নান হোলো তার চেয়ে অনেক বেশি জল থাকে যা কোনো ব্যবহারেই লাগে না—অথচ দিঘির সেই স্নানেই মনের আনন্দ। কলকাতায় আমার গেলাস ভর্তি করা কলের জল—দেয়ালবন্ধ সীমানায় সেইটেই সুবিধে, দিঘিটা অত্যন্ত অসঙ্গত। অথচ আমার মনের অভ্যাসটা হয়েছে গা-ঢেলে-দেওয়া অভ্যাস, অবগাহন নইলে মন খুঁত-খুঁত করে। কিন্তু ডাক্তারের পাল্লায় পড়ে গেছি, নড়বার জো নেই—একদিকে বেঁধেচে রোগী, আর একদিকে বেঁধেচে রোগ। একটু-একটু জ্বর আসচে, ইতর শ্রেণীর জ্বর—ছিঁচকে চোরের মতো—৯৯এর বাইরে পা বাড়াতে সাহস নেই। একখো দুই তিন ডিগ্রির রাজকীয় জ্বর আসে দেহ কম্পমান করে দিয়ে—পুরো খাজনা আদায় করে নিয়ে গলদঘর্ম করে দিয়ে চলে যায়, আর নিরেনব্বুয়ে জ্বর ছিঁচ-কাঁদুনে দুঃখের মতো ঘ্যান ঘ্যান করতেই থাকে, কুইনীনের তাড়া লাগালেও তার ধন্না দেওয়া বন্ধ হয় না। আজ নীলরতনবাবু এসেছিলেন এর আড্ডা কোথায় খোঁজ করতে, রক্ত নিয়ে গেলেন পরীক্ষার জন্যে। ওদিকে সায়াহ্নে যাই কানের মধ্যে বিদ্যুতের ঝাড়ু বোলাবার জন্যে। হারাসাম এখনো শয্যাবলম্বিনী—৯৭ থেকে ১০০র মধ্যে দোলায়মানা। হৈমন্তী আছে তার সেবায়—নইলে মুশকিলের অন্ত থাকতো না। —কাল বিকেলে ফণীকে নিয়ে রাণু এসেছিল। বেশ লাগ্‌ল। তার এখনকার স্নিগ্ধ গম্ভীর বুদ্ধিতে তার মনের প্রকাশ বেশ সহজ সংযত অথচ রমণীয়। যতক্ষণ না আমাকে ডাক্তারের বাড়ি যেতে হয়েছিল বসে বসে গল্প করতে লাগল। মনের মধ্যে এইটুকু অনুভব করতে পারলুম আমাকে খুশী করতে ওর খুশী লাগে—সে তো কম কথা নয়। পৃথিবীতে আমাদের সুখের উপাদান এইরকম ছোটো ছোটো জিনিসেই। অথচ এইগুলোই ভাগ্যে জোটে না—দিন বোঝাই হয় মোটা মোটা ভারী ভারী কাজের জিনিসে—দিনের পর দিন জীবনের দায়িত্ব শোধ করতেই যায়। বিশ্রাম করতে ডাক্তারের জোর হুকুম। না মেনে এইটুকুখানি লেখা গেল। এ পর্যন্ত প্রশান্ত জানালেই না আমার লেখা পেয়েছে কিনা—হয়তো তার পছন্দ হয় নি, বলে প্রাপ্তি স্বীকার করতে দ্বিধা বোধ করচে কিন্তু আমার এ জাতীয় লেখার সম্বন্ধে আমার অভিমান নেই। ইতি ১৬ কার্তিক ১৩৩৬

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৫৩ ॥

ওঁ

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু,

আমার তেতালার ঘরের পশ্চিমদিকের বারান্ডা পেরিয়ে ঐ দেখা যায় কদম গাছ, নিম গাছ আর গোলক চাঁপার গাছ

পুষ্পগুচ্ছ। চিতন পরিপুষ্ট পল্লবপুঞ্জের উপরে অপরাহ্ণের রৌদ্র ঝিলমিল করচে। এখন বেলা আড়াইটা। শীতের হাওয়া আতপ্ত হয়ে উঠেচে। ঐ বাইরের পাণ্ডুর নীল আকাশে শরৎকাল স্নিগ্ধ প্রশান্ত প্রসন্ন হয়ে বিরাজমান। কলকাতার প্রান্তরের কলরব এই প্রসন্নতার ভিতর দিয়ে একটি নতুন সুর নিয়ে আসচে, তার ছিন্ন বিচ্ছিন্নতা একটি উজ্জ্বল শুভ্রতার মধ্যে ঢাকা পড়েচে। কী সহজ প্রশস্ত সম্পূর্ণ এই সংশ্লেষ—অবরুদ্ধ নীলে আলোয় হাওয়ায়। আর ঠিক এরই নীচে এরই পাশে মানুষের সংসার—কত জাল জঞ্জাল, কত বিরোধ, কত আবর্জনার পুঞ্জীভূত বাধা—কত কী করবার তাগিদ অথচ কত হাজার রকমের বিঘ্ন, পরস্পরের প্রতি কত পীড়ন অপমান বঞ্চনা। এর উল্টো কিছু নেই এমন বলা অত্যুক্তি, আনন্দ আছে, শান্তি আছে, সৌন্দর্য আছে, সফলতা আছে, কিন্তু আহত প্রতিহত হতে হতে তাদের দোলায়িত প্রকাশ—কত চিন্তা নিয়ে রাত্রে শুতে যেতে হয়, কত বেদনা নিয়ে প্রভাতে জেগে উঠি। প্রকৃতির রাজ্যে ঐ সমস্ত গাছপালার ভিতরে ভিতরে প্রাণক্রিয়ার নানা দ্বন্দ্ব যে চলচে না তা নয়, ওর মধ্যেও নানা বিপরীতের সংঘাত আছে কিন্তু সমস্তকে আবৃত করে যে একটি রূপ দেখা দেয় তার মধ্যে পূর্ণতার স্বাদ পাই। ঐ গাছগুলোর দিকে তাকাই আর মনে হয় ওরা যত কাছেই থাক তবু যেন ওরা সুদূর দেশে সুদূরকালে আছে তাই এমন একটি ক্লান্তিহীন শান্তি। কিন্তু মানুষের অতি ছোটো জিনিসও অত্যন্ত বেশি গায়ে-পড়া, কিছু অবকাশ দেয় না, ভারের উপর ভার চাপায়—সস্তার তুচ্ছতম উপকরণও মাসুল আদায় করে। তার সম্বন্ধে হাঁ না করতে করতে বেলা বৃথা বয়ে যায়। এই সমস্ত অসংখ্য খুচরো জিনিসের অনাবশ্যক জবাবদিহি থেকে বাঁচবার জন্যে নিজের চারদিকে একটি নিত্য বিদ্যমান দূরত্ব সৃষ্টি করার অত্যন্ত দরকার হয়। অস্তিত্বের দাবিগুলোকে একেবারেই মানব না তা হতেই পারে না—কিন্তু গায়ের উপর তাদের ছেঁকে বেঁকে ধরতে দেবো না। এই কথা সর্বদাই নিজেকে শোনাই, জমে ওঠা আবর্জনাকে ঝেঁটিয়ে ফেলতে চেষ্টা করি—নিজেকে বিবিক্ত করে নিজের মর্যাদা রাখব এই ইচ্ছাটা মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে। আবার ভুলতে কতক্ষণ? অশান্ত অসহিষ্ণু স্বভাবটা ব্যস্ত হয়ে সংসারের সব চেঁচামেচিতে যোগ দেবার জন্যে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়। তবু হার মানব না, আত্মাবমাননা থেকে নিয়ত নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে জেগে থাকব। ইতি ১৭ কার্তিক ১৩৩৬

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনঃ প্রশান্তকে একবার মনে করিয়ে দিয়ো তাকে যে লেখাটা পাঠিয়েছি সেটা পেঁছ-সংবাদ দিতে অবজ্ঞা না করে যেন। তোমার খবর পেলেও খুশী হব।

॥ ১৫৪ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

একটা বড়ো চিঠি ফেঁদেছিলুম। শেষ করতে পারা গেল না। এ চিঠিটার বিশেষ গুরুত্ব আছে। তোমাকে আজ কেবল তারি আশ্বাস দেবার সময় আছে। হারাসানের অবস্থা পূর্ব-বৎ। রথীরা কোন্ দেশে কোন্ দিকে ভ্রাম্যমাণ কিছুই জানিনে। আমার জ্বর ছেড়েছে—কিন্তু শ্রবণশক্তির বাধা এখনো কান পাকড়াও করে বসে আছে। মনটা শান্তিনিকেতনের পথে। লেখার কাজ অনেক ছিল কিন্তু লেখনী রচনার অভিসারে পদে পদে বাধাগ্রস্তা। লোকজনের প্রাচুর্যই আছে, কিন্তু নিঃসঙ্গ নির্জনতার দ্বারা মন পীড়িত।

সকালে উঠে যখন ক্রমে ক্রমে অন্ধকার দূর হতে থাকে এবং সামনের ঐ বিচিত্র ঋজুরেখারচিত বাড়িগুলোর উপর শরতের সোনারবরণ রৌদ্র ফুটে উঠতে থাকে তখন চেয়ে দেখি আর ভাবি, এই ছবিই বা মন্দ কি? এই কঠিন ভূমিকায় যে রচনা দেখা দেয় তার একটা মহিমা আছে, যা গাছপালায় নেই। ঐ বাড়িগুলির সুনির্দিষ্ট রেখা সঙ্ঘের উপর শরৎকালের আকাশটিকে বড়ো চমৎকার দেখতে লাগে। প্রতিদিনই সকালে এই দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করে। এখন অপরাহ্ণ। আজ আকাশ একটা সংশয়াম্বিত মেঘের ম্লান ছায়ায় আবিষ্ট। বঙ্গসাগরের কোনো এক কোণ থেকে আসন্ন বাদলের বার্তা এসেচে, কিন্তু সে বার্তা রথীদের খবরের মতো—কিছুই নিশ্চিত নয়, হয়ত এখনি প্রতিবাদ আসতে পারে। কিন্তু কাকগুলো কিছু যেন উৎকণ্ঠার স্বরেই ডাক দিচ্চে। আজ কিন্তু কলম আর চলতে চাচ্চে না—দিনে বিশ্রাম করতে পারি নি। সমস্ত সকাল গেছে দর্শনার্থীদের অভ্যর্থনায়। মধ্যাহ্নে আহারের পর লিখতে বসেছি—সূর্য এখন পশ্চিম দিগন্তের স্ফীত মেঘের তাকিয়ার উপর হেলান দিয়েচেন—সেই-দৃষ্টান্ত আমারও অনুসরণ করা উচিত। ইতি ৫ নবেম্বর ১৯২৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই বড়ো চিঠিটা শেষ করতে চললুম। মুক্তি নেই, মুক্তি নেই।

॥ ১৫৫ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

সেদিন বুলা১ এসেছিল—হঠাৎ কথায় কথায় প্রকাশ পেল তার হাতে প্রেতাত্মা ভর করে পেন্সিল চালিয়ে কথা কইতে পারে। বলা বাহুল্য, শুনে মনে মনে হাসলুম। বললাম, আচ্ছা, দেখা যাক্। কাগজের উপর পেন্সিল ঘুরোতে লাগল ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে। প্রথম নাম বেরোলো, মণিলাল গাঙ্গুলি। তার কথাগুলোর ভাষা এবং ভঙ্গীর বিশেষত্ব আছে। উত্তরগুলো শুনে মনে হয় যেন সেই কথা কইচে। কিন্তু এ সব বিষয়ে খুব পাকা প্রমাণ পাওয়া যায় না—তার প্রধান কারণ, মন তো সম্পূর্ণ নির্বিকার নয়—তার যা ধারণা হয় সে ধারণার হেতু সব সময়ে বাইরে থাকে না, তার নিজের প্রকৃতির মধ্যেই থাকে। আমি যখন বললুম, মনে হচ্চে যেন মণিলাল কথা কচ্চে, তখন সেই মনে হওয়াটা সম্পূর্ণই আমার আত্মগত হতে পারে। তবু ধারণা হয়েছিল একথা মানতে হয়। মোট কথা আমাকে কতকটা ভাবিয়ে দিয়েছিল। বুলাকে আর একদিন আসতে বললুম। কাল এল। প্রথমে নাম বেরোলো মণিলালের—সে বল্লে, সত্যেন আসতে চায়। আমার দুঃখ এই কথাগুলো কেউ লিখে রাখেনি। ওর সব উত্তরগুলোই বেশ সুসংবন্ধ। পশ্চিম মহাদেশে আমার কর্তব্যের কথা জিজ্ঞাসা করতেই উত্তর এল, পশ্চিমে আপনার আরো অনেক কাজ আছে, সেখানে আপনার সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে থাকবে। —মণিলাল তার আগের দিন বলেছিল আমেরিকায় একবার আপনাকে যেতেই হবে, সেখানে আপনার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। মণিলাল বলেছিল, পৃথিবীতে থাকতে পর-লোক সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছি কিন্তু তার সঙ্গে এখানে কোনো মিল নেই। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম তোমার ধর্মমতের কি কিছু বদল হয়েছে? সে বললে, পৃথিবীতে আমি নাস্তিক ছিলুম কিন্তু এখানে আমি ঈশ্বরকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করি। সত্যেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করতে সে বল্লে, এখানে কোনো দেবতাকে খুঁজতে হয় না, এই যা পরিবর্তন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম তুমি কি অন্তরের মধ্যেই তাঁকে অনু-

তব করো? উত্তর এল খুব ভালো করেই করি, তাইই তো এত শান্তি। তখন, হিবার্ট লেকচারে ধর্ম সম্বন্ধে আমি যে মত ব্যক্ত করতে চাই সেটা সত্য কিনা জিজ্ঞাসা করতেই উত্তর পেলুম—"একেবারে ঠিক, কিন্তু কী আশ্চর্য! এখনো তো আপনি পৃথিবীতে"! মণিলালকেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তার পরে অজিতকে, তারা বলেছিল খুব সত্য। অজিত বললে "Imagination সম্বন্ধে আপনি যে প্রবন্ধ লিখচেন সেটা যে কত সত্য তা আমাদের এখানকার অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারি"। অমিতা আমার সংগে অভিনয় করেছিল অজিত তা জানে কিনা জিজ্ঞাসা করতে বললে, "জানি, জানি, সে তো আপনারই সৃষ্টি"। সত্যেন্দ্র বললে, "জানি, সেদিন খুব কাছেই ছিলুম, সেদিন আমার মধুর অবসর ছিল"। আমার আধুনিক লেখা পড়েছে কিনা প্রশ্ন করলুম, সত্যেন্দ্র বললে, "পড়েচি কেমন করে বলি, কিন্তু প্রত্যেক লাইনটা জানি। আশ্চর্য"! "শরৎ চাটুজ্জের লেখার উপর তোমার শ্রদ্ধা আছে"? উত্তর "পূর্বে ছিল কিন্তু এখন ঠিক ধরতে পারিনে। হয়তো সে আমার দেহহীন আত্মারই দুর্ভাগ্য"। সত্যেন্দ্রর সব কথাই কারো লিখে রাখা উচিত ছিল, থাকলে দেখতে তাতে ভাববার কথা খুবই আছে। আমার লক্ষ্মীছাড়া স্মৃতিশক্তি—মনে আনতে পারচি নে। সত্যেন্দ্রর পালা শেষ হবার মুখে সে বললে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেচেন। তাঁর সমস্ত কথা শুনে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেছি। উপস্থিত থাকলে বুঝতে পারতে তার একটা ব্যক্তিগত বাস্তবতা। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম যে সব রচনা প্রভৃতি নিয়ে পৃথিবীতে নিযুক্ত ছিলেন এখনও কি তার কোনো অনুবৃত্তি আছে? তিনি বললেন, "ঠিক তেমন নয়, এখানে কেবল আত্মসৃষ্টিতেই আনন্দ"। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "সৃষ্টির কোনো উপকরণ নেই"? তিনি বললেন, "আত্মাইতো আমাদের সব—তাকে গঠন করে পরিপূর্ণ করাই আনন্দ"। অবন জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা ছবি আঁকা প্রভৃতি নিয়ে যে সব কাজ করছি, তা কি খেলা মাত্র"? তিনি বললেন, "তুমি আর্টিস্ট হয়ে একথা কেমন করে জিজ্ঞাসা করলে"? জ্যোতিদাদা একটা ভারি নতুন রকমের কথা বলেছিলেন—পৃথিবীতে থাকতে বার বার কেবল শান্তি চেয়েছিলুম, এখানে এসে ভাবচি সুখই বা মন্দ কি?" এর একটা অর্থ আমি এই ঠাউরেচি যে, সুখ জিনিসটা সীমাবদ্ধ দেহ এবং ইচ্ছা থেকেই উৎপন্ন—বস্তুর সংগে ভাবের সংগে সে জড়িত, তাকে ধরবার জন্যে ভোগ করবার জন্যে বাস্তব উপকরণের দরকার। মণিলাল অজিত সত্যেন সবাইকে আমি জিজ্ঞাসা করেচি, তোমরা কি আনন্দ ভোগ কর? সত্যেন্দ্র একটা প্রশ্নের চিহ্ন দিয়ে লিখলে, আনন্দ? —তার পর বললে আনন্দ আমরা নিজের অন্তরেই সৃষ্টি করি। মণিলালও লিখেছিল সুখ নয়, কিন্তু শান্তি। জ্যোতিদাদাকে প্রশ্ন করেছিলুম, দেহ নিতে ইচ্ছা হয়? তিনি বললেন, "আমি ইচ্ছা করিনে, যারা সুখ চায় তারাই ইচ্ছা করে।" আনন্দর কথায় তিনি বলেছিলেন, "অসীম শান্তি। কিন্তু আনন্দ?" এসব কথা খুব স্পষ্ট বোঝা গেল না। জিজ্ঞাসা করলুম, "কোনো বিশেষ স্থানে বাস করেন?" তিনি বললেন, "শূন্যে আকাশে।" প্রশ্ন, সে কি সীমাবদ্ধ আকাশ? তিনি বললেন, "এখনো তো সীমারেখা দেখতে পাইনে।" ওখানকার সত্তাটা যে ঠিক কি সেটা যেন বুঝিয়ে বলা যায় না এমনি একটা ভাব দেখা গেল। সত্যেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, পৃথিবীতে স্বদেশ সাহিত্য প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে তোমার যে উৎসাহ ছিল ওখানেও কি তেমন কিছু আছে? সত্যেন উত্তর করলে, "এখানে ঠিক সেই জিনিসটাই নেই—পৃথিবীর সে উত্তেজনা নেই—অথচ অনেক সময় তারো অভাব অনুভব করি। প্রথমটা যখন আসি, পৃথিবীর প্রত্যেকটি বেদনা যেন বুকের ভিতর অনুভব করেছি ক্রমেই বেগ কমে আসচে।" মণিলাল বলেছিল "সম্বন্ধ থাকলেও তার আকর্ষণ ক্ষয় হয়ে আসে নইলে মুক্তি হবে কেমন করে?" আমি জিজ্ঞাসা করেছিলুম, পৃথিবীতে আমরা যে সব অধ্যবসায়ে প্রবল ইচ্ছায় ও চেষ্টায় প্রবৃত্ত তাতে কি পরলোকগত আত্মার যোগ থাকে? জ্যোতিদাদা বললেন, "ঠিক আমাদের মনে সে বাসনা থাকে না। কিন্তু পৃথিবীতে যদি কেউ কিছু সৃষ্টি করে অথবা কিছু একটা ভালো কাজ হয় সে আমরা অনুভব করি।" জন্মান্তরের কথা জিজ্ঞাসা করতে বললেন, "জন্মান্তর আছে কিন্তু পৃথিবীতে থাকতে আমরা যে রকম বুঝতেম সে রকম নয়।" আমার মুক্তির কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বললেন, "পাবে। কিন্তু আরো সাধনা চাই। কত যে ভুল ঘটে।" আমার রচনা সম্বন্ধে বললেন,—"তোমার রচনা সমস্ত বাধা অতিক্রম করে চরম সার্থকতার পথে চলচে। তুমি সকল অবস্থায় শান্ত হয়ে থেকো।" জ্যোতিদাদা বারবার আমাকে বলেচেন, "শান্ত হও, শান্ত হও।" আমি বললুম, শান্ত হতেই চাই। আপনার এই উপদেশে আমি বিশেষ বল পেয়েচি। তিনি বললেন, "জানি, সেই জন্যেই তোমার কাছে এসেচি।" আমার ছবির কথা সেদিন মণিলালকে প্রশ্ন করেছিলুম, সে বলেছিল, আপনার ছবি য়ুরোপে আদর পাবে। জ্যোতিদাদা বললেন, "আশঙ্কা করো না। তোমার ছবি জগতে একটা নতুন আলো দেখাবে!" আশ্চর্য লাগল এই জন্যে যে, আমার মনে সত্যই এ সম্বন্ধে আশঙ্কা আছে। পৃথিবীতে যাদের ভালোবাসি পরলোকে তাদের সংগে আমাদের কী সম্বন্ধ—তার উত্তরে বললেন, "যাদের ভালোবাসি তারা অন্তরের দেবতার সংগে এক হয়ে যায়। আর তো হারাবার ভয় নেই।" হিবার্ট লেকচারে আমি যে মত ব্যক্ত করতে চেয়েছি তার সম্বন্ধে তাঁর মত জিজ্ঞাসা করতে তিনি চারবার চৌকো গণ্ডী দিয়ে লিখলেন সত্য সত্য—খুব জোরের সংগে। এক সময়ে আপনিই লিখলেন "ঐ গোলাপ ফুলটি আমার কাছে আনো।" তখন হঠাৎ দেখি ঘরের অন্য অংশে একটা ছোটো টেবিলে ফুলদানিতে তোড়ার মধ্যে গোলাপ ফুল। আমাদের টেবিলে আনতেই বললেন, "কি সুন্দর!" তার পরে বললেন, "আমাকে একটা গান শোনাও।" আমি চারদিকে চেয়ে দেখচি, কে গান গাইতে পারে। তিনি লিখলেন, তুমি গান গাও। আমি তো ভেবেই পাইনে কী গান গাব। লিখে দিলেন, "রূপসাগরে ডুব দিয়েচি" — গান শুরু করে একটু পরেই কথা বেধে গেল তখন তিনি গানের মাঝখানের থেকে দুটো লাইন লিখে দিলেন—

যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথা নিত্য বাজে—
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভা মাঝে।

এইটুকু গাইতেই বললেন, খুব ঠিক। বড়ো ভালো লাগল। যে কথা তিনি বলতে চেয়েছিলেন বোধ হয় এর মধ্যেই বলা হয়ে গেল। আমার আর মনে ছিল না—আমি আর গাইও নি। সুরেনের কথা জিজ্ঞাসা করলুম, সে নিষ্কৃতি পাবে কি? উত্তর, পাবে বৈ কি? সে কি উত্তেজিত হয়? আমি বললুম—"উত্তেজনার কারণ আছে, সে যে ঋণে জড়িত।" তিনি বললেন "কর্মফল। মাঝে মাঝে ও যে হঠকারিতা প্রকাশ করে।" নতুন বৌঠানের সংগে দেখা হয় কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বললেন, তোমার নতুন বৌঠান সমভাবেই আছেন। আমি শুধালাম, পৃথিবীর প্রতি তাঁর কি আকর্ষণ আছে? তিনি বললেন, "আছে, সেই জন্যেই তো দেখা হয় না।" আমি বললুম "আমি এখনো তাঁকে ভুলতে পারিনে—বেদনার সংগে মনে পড়ে।" তিনি বললেন, "জানি, তোমার নতুন বৌঠানকে

আমি বলব।” জ্যোতিদাদা চলে গেলে, নাম উঠল, সাহানা। হঠাৎ কিছুতে মনে পড়ল না, কে সাহানা। বুলা জিজ্ঞাসা করলে, সাহানা কার নাম? সে জানত না। অবন বললেন, বলুর স্ত্রী। সাহানার মৃত্যুর খবরটা আমার মনে স্পষ্ট ছিল না বলেই তাঁর কথাটা ভাবতে পারিনি। জিজ্ঞাসা করলুম, বলুর সঙ্গে দেখা হয় কি? বললে, মৃত্যুর পর একবার দেখা হয়েছিল অনেকের মাঝখানে। প্রশ্ন—তাকে ডেকে দিতে পারবে কি? —দিচ্চি। বলু এল।

কেমন আছ? সুখে আছ? —“বেশ।” দেহহীন আত্মা নিয়ে আনন্দ পাও? —“আনন্দ? যদি পাই তো সে আমারই সৃষ্টি?”

আমার নতুন রচনার সঙ্গে পরিচয় আছে? —“আছে। ভালো লাগে খুব। যুগের পর যুগ যেন নব-নব ধারায় চলেচে।”

তপতী দেখেচ! —“ছিলাম।” —“কী রকম লাগল?” —“কী আশ্চর্য।”

তোমার এখানকার রচনার কোনো অনুবৃত্তি কি সেখানে আছে? “চলবে না, চলবে না। সে যে কী ছেলেখেলা আমার!”

রচনার কাজে তোমার মন আছে কি?

“ভাবি খুব। মনের ভিতর যেন রচনা গড়ে ওঠে।”

তোমার কোনো একটা মনের সৃষ্টি এখনি আমাদের ভাষায় বলতে পারো?

“আজ মনে হচ্চে আজ সকালে পৃথিবীতে যে রোদ উঠেচে সে যেন আমারই প্রাণের আনন্দের রূপ।”

শরৎকালের এই রোদের সঙ্গে তোমার শরৎকালের স্মৃতি কি দেখা দেয়?

“দেয়। তাই তো ছুটে এসেচি।”

পৃথিবীর সুখ দুঃখের রেশ তোমার অন্তরে আছে কি?

“কতক ভুলে গেছি। কতক এখনো ছায়ার মতো আমার সঙ্গে আছে। আমার যা বন্ধন তা থেকে আমাকে তো এখনো মুক্তি দিল না।”

বন্ধন থেকে মুক্তি কামনা করো?

“করি। কিন্তু আমি যে অনেক পিছনে পড়ে আছি। সে যেন আমার—”

আমি মুক্তি চাই। সিদ্ধিলাভ করব কি?

“মুক্তি তো আপনার অন্তরের আর একটি রূপ। সে যে মুক্ত কর হে সবার সঙ্গে, মুক্ত কর হে বন্ধ।

দেহান্তর ধারণ করবার ইচ্ছে আছে কী?

“যদি আপনার জীবদ্দশায় যেতে পারতেন তাহলে ইচ্ছা করিৎ কত যে পরিবর্তন?”

পুনর্বার দেহ ধারণ কি ইচ্ছার উপর নির্ভর করে?

“এখানে কে এসেচেন জানেন?”

“কে তুমি বল।”

“না বলব না, আমার নাম তুমি বল।”

“ছোটো বৌ নাকি?”

“হ্যাঁ।”

“কেমন আছ?”

“যাদের ভালোবাসি তারা তো একে একে আমার কাছে আসে।”

পৃথিবীর সঙ্গে তোমার বন্ধন কি প্রবল আছে?

“আছে বই কি, একথা জিজ্ঞাসা করো কেন? জান না কি?”

আমার কাজকর্ম সাধনার প্রতি তোমার Interest আছে?

“আছে। আজো আমার মন সমস্ত অন্তর থেকে তোমার কল্যাণ কামনা করে।”

রথীর কাজে তোমার সম্মতি আছে?

“সে কি আমায় জিজ্ঞাসা করবার? তার কাছে যিনি আছেন তিনি দেবতার মতো আলো দেখাবেন।”

শেষের দিককার প্রশ্নোত্তরগুলো মোহনলাল লিখেছিল। ঠিক তাদের পরম্পরা রক্ষা করে লিখতে পারলুম। অন্যগুলো হিজিবিজি-কাটা কাগজের ভিতর থেকে উদ্ধার করেচি। কিন্তু তাদের পরম্পরা রাখতে পারি নি। আরো অনেক কথা লেখা হয়েছিল—খুঁজে পাওয়া গেল না। সত্যেনের একটা কথা লিখতে ভুলেচি। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বাংলার আধুনিক কবিদের সম্বন্ধে তোমার মত কি? সত্যেন্দ্র উত্তর করেছিল, “অনেকেরই ভিতর পদার্থ আছে কিন্তু জানি ঠিক সেই সুর নেই।”

ব্যাপারখানা ঠিক কি তা জোর করে বলতে পারি নে। মনে হল যেন ভিন্ন ভিন্ন লোকের সঙ্গেই কথা কওয়া হোলো। সন্দেহমাত্র নেই যে বুলার ভাষা নয় ভাবও নয়। আমারও নয় যেহেতু আমি যা ভাবি ও ভাবতে পারতুম তার সঙ্গে অনেকটাই মেলে না। আমার অজ্ঞাতসারে আমার মন যদি জবাব দিত তবে সে অন্য রকম হত। অবশ্য একথা যদি বলো আমার অবচেতনচিত্ত কি বিশ্বাস করে কি বলে তা আমি জানিইনে। তাহলে তর্কই চলে না। দেহহীন আত্মা কি রকম এবং তার চিত্তবৃত্তি কি ভাবের, কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু আজকালকার বিজ্ঞান মানলে দেহটাই যে কেন বস্তুর মত প্রতীত হয় সে রহস্য ভেদ করা যায় না। —বস্তুর মূলে অবস্তু, অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনির্বচনীয় পদার্থ; এই মায়াকে যদি মানতে পারি তবে দেহহীন সত্তাকেও মানতে দোষ নেই অবশ্য যদি তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আজকাল প্রমাণ সংগ্রহ চলচে এখনো সর্বজনসম্মত বিশ্বাসে পৌঁচয়নি।

যাই হোক জ্যোতিদাদা যাকে বলচি বা কল্পনা করচি তাঁর কথাগুলি আমার মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেচে। আমি না মনে করে থাকতে পারচিনে তিনি আমাকে বলবার সুযোগ খুঁজছিলেন যে, “তুমি শান্ত হও”। এই কথাটাই আমার জীবনে সকলের চেয়ে দরকারী কথা। সেই থেকেই ঐ কথাটার প্রতিধ্বনি ক্ষণে ক্ষণে মনে বাজচে। তোমার চিঠিতে অনেকবার তোমাকে এই কথা লিখেচি। আমার মন অতিরিক্ত বেদনাকাতর বলেই মানুষের সংস্রবে আমি অনেক সময় শান্তি রক্ষা করতে পারিনে। কিন্তু তার অনতিকাল পরেই এর আত্মাবমাননা আমার মনকে পীড়িত করে।

যাক্‌গে, কাল রাত্রে রথী ও বৌমা এসে পৌঁচেছেন। হারাসান সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য আজ সেই কথাটা নীলরতনবাবুর সঙ্গে স্থির করতে হবে। ওদিকে শান্তিনিকেতনে কাজ আরম্ভ হোলো। আর অনুপস্থিত থাকা চলবে না। সেখানকার ডাক্তার এতদিন রোগীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তাকে যথাস্থানে ফিরতেই হবে। অমিয়র সঙ্গে হৈমন্তীর বিচ্ছেদ অতি দীর্ঘকাল বিলম্বিত করে রেখে দিতে পারিনে। যদি হাসপাতালে রাখবার কোনো সুব্যবস্থা করা সম্ভব হয় তাহলেই এ যাত্রা নিষ্কৃতি পাই। রোগটা যে কোনখানে এবং কী আকারে এখনো তা ধরা পড়েনি—জ্বর ঠিক সময় মত এবং ঠিক পরিমাণেই ওঠানামা করচে—দিনের পর দিন। এটা স্থির যে Enteric নয়, Typhoid নয়, তার চেয়ে গুরুতর কিছু নয়।

প্রশান্তর চিঠি পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েচি। পঞ্চভূতটা জার্নালেই আটকালে ক্ষতি কি? কিন্তু জার্নাল কি কোনো এক সময়ে আবির্ভূত হবে। ভবভূতি বলেন—কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ—সময় সসীম—অতএব তাকে এড়িয়ে যাবার জো নেই। ইতি ৬ নভেম্বর ১৯২৯।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১ বুলার ডাক নাম উমা। উমা মোহিত সেনের ছোট মেয়ে।

ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী গগনেন্দ্রনাথ

কমল সরকার

ভারতীয় সাময়িক পত্র-পত্রিকায় কার্টুন প্রচলনের রীতি দীর্ঘকালের না হলেও ভারতীয় কার্টুন আজ যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যদিও ভারতীয় কার্টুনের ইতিহাস শতবর্ষ অতিক্রম করেনি, তথাপি রসগ্রাহিতার দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় কার্টুন যে কোন বিদেশী কার্টুনের সমকক্ষ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে সাময়িক পত্রিকাগুলির উৎসাহে বাঙলা দেশে কার্টুনের প্রচলন হয়, তাদের মধ্যে বাঙলা সাময়িক বসন্তক, পঞ্চানন্দ এবং হরবোলা ভাঁড়ের অবদান সবচেয়ে বেশী।

ভারতের প্রথম ব্যঙ্গপত্রিকা দিল্লী থেকে প্রকাশিত ইণ্ডিয়ান পাঞ্চ (১৮৫৯) হলেও এটিকে ভারতীয় ব্যঙ্গচিত্রের ইতিহাসে প্রথম ব্রতী হিসেবে স্বীকার করার বাধা আছে। কারণ ইণ্ডিয়ান পাঞ্চের প্রকাশের অন্তরালে অ-ভারতীয় উদ্যোগ, আদর্শ এবং মালিকানার নির্দেশ কাজ করেছে। তাছাড়া ভারতের পরাধীনতার মহাবিপ্লব সিপাহী বিদ্রোহকে ব্যঙ্গ করার জন্য ইণ্ডিয়ান পাঞ্চের ভূমিকা ভারতীয় সমাজে বিদ্বেষের সৃষ্টি করে। নানাসাহেব, ঝাঁসীর রানীর দেশাত্মবোধকে হীনভাবে আক্রমণের জন্য সেকালের ইংরেজ সমাজ ছাড়া ভারতীয় সমাজে তা বাহবা পায়নি। তবে এশীয় ভৌগোলিক সীমার মধ্যে কার্টুনের প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে ইণ্ডিয়ান পাঞ্চের ভূমিকা স্মরণীয় এবং ভারতীয় শিল্পীদের অনুপ্রেরণার মূলে এর অবদান অপরিসীম। ইণ্ডিয়ান পাঞ্চের পরে বসন্তক, পঞ্চানন্দ এবং হরবোলা ভাঁড়ের সমসাময়িক অন্যান্য ব্যঙ্গচিত্রপ্রধান সাময়িক পত্রের মধ্যে কলকাতার 'ইণ্ডিয়ান চেরিভরী' এবং লক্ষ্ণৌর উর্দু 'অযোধ্যা পাঞ্চ' বিখ্যাত।

উনবিংশ শতাব্দীতে কার্টুনের যে গোড়াপত্তন এদেশে হয়, স্বাভাবিকভাবে বিংশ শতাব্দীতে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ শতাব্দীর প্রথমভাগে যে কয়জন শিল্পী কার্টুনের সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের পুরোধা হলেন গগনেন্দ্রনাথ। বাঙলা তথা ভারতীয় কার্টুনের অন্যতম ক্ষণজন্মা প্রতিভা গগনেন্দ্রনাথ আধুনিক ব্যঙ্গচিত্রের পথপ্রদর্শক।

এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ব্যঙ্গচিত্র-শিল্পী হিসেবে তিনি খ্যাত হয়েছিলেন তাঁর বিচিত্র ব্যঙ্গ কর্মের জন্য। এক রং অথবা একাধিক রঙে তাঁর ব্যঙ্গচিত্রগুলি তৎকালীন বঙ্গসমাজের দর্পণবিশেষ। কার্টুন বলতে এখন যা বোঝায় — অর্থাৎ রাজনৈতিক কার্টুন তখনো বাঙলা দেশের সংবাদপত্রে আসর জমাতে পারেনি। সে সময়ে কার্টুন বলতে সাধারণত সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রকেই বোঝাত। এই কারণে গগনেন্দ্রনাথ সামাজিক বিষয়-

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বস্তুকেই সাবজেক্ট হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। সমাজের যেখানে অসঙ্গতি, যেখানে অভিযোগ, সেইখানেই দৃষ্টিপাত ঘটেছে গগনেন্দ্রনাথের। এর ফলে প্রগতিশীল সমাজে গগনেন্দ্রনাথ বিপুল অভিনন্দন লাভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন মহলে নৈরাশ্য এবং ভীতির সৃষ্টি হয় তাঁর কার্টুনকে কেন্দ্র করে। ধর্মের নামে স্বেচ্ছাচারিতা, উগ্র সাহেবীআনা, কুশিক্ষা, জাতি-বৈষম্য প্রভৃতি জাতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতিকে তিনি কটাক্ষ করেছেন একাধিক কার্টুনে। তাঁর বহু বিখ্যাত কার্টুন আজও ব্যঙ্গচিত্রের অবিস্মরণীয় কীর্তি হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর কটাক্ষ থেকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনও রেহাই পাননি। প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের নৈতিক চরিত্রের অনমনীয় মনোভাবের যে ব্যঙ্গচিত্র গগনেন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন, হাস্যরসের একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর হিসেবে তা আজ জন-শ্রুতিতে পরিণত হয়েছে। বাঙালী সমাজের সাহেবীভাবাপন্ন ব্যক্তিদের বিজাতীয় ভাব-ধারায় অনুপ্রাণিত হতে দেখে তিনি এদেরও কটাক্ষ করেছেন অনেক কার্টুনে। ব্যঙ্গের লক্ষ্য থেকে পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরাও অব্যাহতি পাননি। প্রসঙ্গত গগনেন্দ্রনাথের The Mocking Bird Club কার্টুনটি উল্লেখযোগ্য। বাঙালী শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি গগনেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং একবার তিনি এক ভোজসভায় গগনেন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রিত গগনেন্দ্রনাথ ভোজসভায় উপস্থিত হয়ে দেখেন ভারতীয় বলতে তিনি এবং রাজেন্দ্রনাথ ছাড়া আর সকলেই অভারতীয়। গগনেন্দ্রনাথ রাজেন্দ্র-নাথকে ব্যঙ্গ করলেন কার্টুনটির মধ্যে Find the Indian লিখে। ব্যঙ্গচিত্রে একমাত্র বেয়ারা-বাবুর্চি ছাড়া আর সকলেই কোট-প্যাণ্টলুন পরা বিলেতী সাহেব।

পরাধীনতার গ্লানি গগনেন্দ্রনাথের অসহ্য ছিল। অগ্নিযুগের বহু বিপ্লবী এবং বিপ্লবী সংস্থা গোপনে গগনেন্দ্রনাথের সাহায্য পেয়েছেন এ দৃষ্টান্ত একাধিক। দেশপ্রেম এবং জাতীয়তাবোধ তাঁর চরিত্রের অন্যতম মহৎ গুণ। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় তাঁর জাতীয়তাবোধ তীব্র আকার ধারণ করে। প্রাদেশিকতার অন্ধ মোহ থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় চিরকালই সর্ব-ভারতীয় চিন্তার চেয়ে কেবল বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথাই ভাবতেন বেশী। আদর্শের দিক থেকে গগনেন্দ্রনাথ প্রফুল্ল-চন্দ্রের এ নীতির বিরোধী ছিলেন। প্রফুল্ল-চন্দ্রের উগ্র বাঙালী প্রীতির জন্য তিনি এক কার্টুনে বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রফুল্লচন্দ্রকে ইণ্ডিয়ান ইঙ্ক তৈরী করা অবস্থায় আঁকলেন আর কার্টুনের কথা দিলেন—

> যি দিয়ে ভাজো নিমের পাতা,
> তবু না যায়—তার জাতের ধা' ত।

অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে ব্যবহার-জীবীরা আদালত, ছাত্ররা বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করেছেন। সরকারী চাকুরেরা চাকুরীতে ইস্তফা দিচ্ছেন। বাংলাদেশে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছাত্রদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়ে বলছেন, "পাঠ্য-পুস্তক পুড়িয়ে ফেলো। নতুন করে

পরিত্যাগ করো।" বাংলার বাঘ আশুতোষ এর প্রতিবাদ জানালেন। এই পটভূমিকায় গগনেন্দ্রনাথ তুলি ধরলেন। অঙ্কিত হলো "বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্নিযোগ" এবং "বিশ্ববিদ্যালয়ে জলযোগ" কার্টুন। প্রথমটিতে চিত্তরঞ্জন স্তূপীকৃত পুস্তকে অগ্নিসংযোগে প্ররোচিত করছেন বিদ্যার্থীদের, দ্বিতীয়টিতে আশুতোষ মিষ্টান্ন দেখিয়ে ছাত্রদের প্রলুব্ধ করছেন। এ কার্টুনগুলি গগনেন্দ্রনাথের কার্টুন সংকলন "নবহুল্লোড়ে" প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া, সে যুগে প্রবাসী, মডার্ন রিভিয়ু এবং মাসিক বসুমতী প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় গগনেন্দ্রনাথের কিছু কিছু কার্টুন প্রকাশিত হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এবং বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের গুণমুগ্ধ দর্শক ছিলেন। বাংলাদেশ থেকে কার্টুনের সংকলন প্রথম গগনেন্দ্রনাথই প্রকাশ করেন। যান্ত্রিক পদ্ধতির বিশেষ উন্নতি না হওয়া সত্ত্বেও একাধিক রঙে তাঁর বহু ব্যঙ্গচিত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ব্যঙ্গচিত্র সংকলন 'অদ্ভুতলোক', 'বিরূপবজ্র' এবং 'নবহুল্লোড়ে' সে-যুগের সমাজে প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। বিরূপ বজ্রের ভূমিকা লিখে দেন স্বয়ং জগদীশচন্দ্র। এই তিনটি সংকলনের মধ্যে 'অদ্ভুতলোক' ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত হয়। প্রেসের নাম ছিল বিচিত্রা। কার্টুনগুলি লিথো পদ্ধতিতে ছাপা। ছাপার সময় শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। কার্টুনগুলিতে ইংরেজী এবং বাংলা উভয়প্রকার ক্যাপসান বা টীকা ব্যবহৃত হয়েছে।

অদ্ভুত লোকের কার্টুন 'শান্তিজল'

গগনেন্দ্রনাথের পরিচয় ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী হিসেবে খ্যাত হলেও মডার্ন আর্টসের সার্থক শিল্পী হিসেবেও তাঁর এক বিশেষ পরিচয় আছে। ভারতীয় শিল্পে নব্য-ভাবধারার প্রচলনের জন্য তিনি খ্যাত। আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলায় কিউবিজমের সূত্রপাতের তিনিই পথিকৃৎ। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য কিউবিজমের অন্ধ অনুসরণ তিনি করেন নি। স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিবেশে এ বিষয়ে এক বিশেষ রীতির প্রচলন করেন গগনেন্দ্রনাথ।

শিল্পসৃষ্টি ছাড়াও শিল্পসম্পর্কীয় বিভিন্ন বিষয়ে তার উৎসাহ উল্লেখযোগ্য। জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় 'বিচিত্রা' নামে শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা এবং অনুশীলনের জন্য যে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় গগনেন্দ্রনাথ তার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অনুজ অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব অরিয়েণ্টাল আর্টের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক হিসেবেও তিনি স্মরণীয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তৎকালীন অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শিত হয়।

একাধারে ফাইন আর্টস এবং ক্যারিকেচারের দ্বৈতভূমিকা সম্ভবত গগনেন্দ্রনাথের পূর্বে অন্য কোন শিল্পীর মধ্যে একীভূত হতে দেখা যায়নি। বিশ্ববিখ্যাত একাধিক চারুশিল্পীকে ফাইন আর্টস থেকে কার্টুনে আগ্রহী হতে দেখা গিয়েছে কিন্তু একাধারে কার্টুন এবং ফাইন আর্টসকে কেন্দ্র করে শিল্পীজীবনে সাফল্যলাভ করেছেন এ দৃষ্টান্ত বিরল। সেদিক থেকে তিনি ব্যতিক্রম।

আজ থেকে তিরানব্বই বছর আগে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে গগনেন্দ্রনাথের জন্ম। পিতা গুণেন্দ্রনাথ, মাতা সৌদামিনী দেবী। পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় ভ্রাতা। সম্পর্কে তিনি বিশ্বকবির ভ্রাতুষ্পুত্র। গগনেন্দ্রনাথ পিতামাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ এবং বাংলার প্রথম মহিলা শিল্পী সুনয়নী দেবী যথাক্রমে তাঁর তৃতীয় ভ্রাতা এবং কনিষ্ঠা ভগিনী।

বাল্যে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে গগনেন্দ্রনাথের লেখাপড়া শুরু হয় এবং সিনিয়র কেম্ব্রিজ পর্যন্ত তিনি স্কুলে যাতায়াত করেন। চিত্রাঙ্কনের হাতে খড়ি এই সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলেই হয় কিন্তু স্কুল পরিত্যাগের পর তাঁর শিল্পানুরাগ খুব বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। চিত্রাংকনের চেয়ে ফটোগ্রাফীর দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকায় যৌবনে তিনি বিজ্ঞানের ভক্ত হ'য়ে ওঠেন এবং বেশীর ভাগ সময় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি নিয়েই সময় কাটাতেন। চিত্রশিল্পী হবার কোন লক্ষণ তাঁর মধ্যে ছিল না।

অভিনয়ের উপরে প্রবল ঝোঁক ছিল গগনেন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের নাটকে অংশগ্রহণের অনেক আগে থেকেই তিনি ঠাকুর-

নবদ্বীপ্রোড়ের কার্টুন 'বিশ্ববিদ্যালয়ে জলযোগ'

বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে অভিনয় করতেন। রবীন্দ্রনাথের একাধিক নাটকে গগনেন্দ্রনাথ অভিনয় করেছেন। তাঁর জন্য রাজার চরিত্রটি সব সময়ই স্থির হয়ে থাকত। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলতেন—"রাজা সাজা গগন ছাড়া হবে না।" ঠাকুরবাড়িতে 'বিচিত্রা'য় রবীন্দ্রনাথের ফাল্গুনী নাটকে গগনেন্দ্রনাথের রাজার ভূমিকায় অভিনয় দেখে অ্যানি বেশান্ত তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। পরিণত বয়সে যখন ফাইন আর্টস চর্চা শুরু করেন তখন বিভিন্ন পেণ্টিংএ নাটকীয় পরিবেশ অর্থাৎ স্টেজ, উইংস প্রভৃতির আধিক্য প্রাধান্য পেয়েছে।

গগনেন্দ্রনাথের ছবি আঁকা শুরু হয় একটু বেশী বয়সে—সম্ভবত ১৯০৭ কিংবা ১৯০৮ সালে। এই সময়ে জনৈক জাপানী শিল্পী ঠাকুরবাড়িতে ছবি আঁকার জন্য আসেন এবং এ'র ছবি আঁকা দেখে গগনেন্দ্রনাথ ছবি আঁকায় আকৃষ্ট হন। বেশ কিছুকাল তিনি কালো রং দিয়েই ছবি আঁকতে থাকেন কিন্তু দীর্ঘকাল এ ধরনের আঁকা তাঁর মনঃপূত হয়নি। এর কিছুকাল পরেই তিনি কার্টুন আঁকা আরম্ভ করেন। কার্টুন আঁকার পেছনে এক চিত্তাকর্ষক গল্প আছে। এ ঘটনার কথা অনেকেরই অজ্ঞাত। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের পুত্র শ্রীঅলকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে এ বৃত্তান্ত পাওয়া গিয়েছে। কার্টুন আঁকার প্রথম পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে হাইকোর্ট থেকে। কারণ গগনেন্দ্রনাথ প্রায়ই বিশেষ জুরী হয়ে হাইকোর্টের বিভিন্ন মোকদ্দমায় উপস্থিত থাকতেন। হাইকোর্টের বিচারপতি, ব্যারিস্টার প্রভৃতির গম্ভীর চালচলন তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। জুরী অবস্থায় বসে বসে আদালতের ব্যারিস্টার এবং বিচারপতিদের স্কেচ করতেন। তৎকালীন বিচারপতিদের মধ্যে পেজ, ব্যারিস্টার এরাটুন, জ্যাকসন প্রভৃতির ব্যঙ্গচিত্র তিনি হাইকোর্টে বসেই এ'কেছিলেন। এইভাবেই তিনি কার্টুনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিয়মিত কার্টুন আঁকা শুরু করেন।

গগনেন্দ্রনাথের অন্যান্য কার্টুনের মধ্যে 'বিদ্যার কারখানা' বিশ্ববিদ্যালয়ের গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির বিচিত্র চিত্রায়ন। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকছে এবং যন্ত্র হয়ে বেরিয়ে আসছে—কার্টুনে দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া, কেশবিন্যাসে পটু বাঙ্গালীর জাতীয় স্বভাব 'কেশ বৈচিত্র্য' কার্টুনে ইহলোকের কেশবিন্যাস নশ্বর মানুষের কাছে অর্থহীন তা তিনি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, গগনেন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করতে পারেন নি। শেষ জীবনে প্রায় দশ বছর তিনি দুরারোগ্য পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় মৃত্যুর অপেক্ষা করেছেন এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ব্যঙ্গচিত্রের এই যুগ-পুরুষের ইহজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সময়ের বিচারে গগনেন্দ্রনাথের অধ্যায় দীর্ঘকাল আগের অধ্যায় হলেও আধুনিক পরিবেশে তাঁকে বেমানান মনে হয় না। তাঁর বিচিত্র ব্যঙ্গচিত্র একথাই প্রতিপন্ন করে যে, গগনেন্দ্রনাথ সর্বকালের—সেকালের এবং একালেরও। কয়েক দশক আগেও তিনি যা ভেবেছেন, যা এ'কেছেন আধুনিক পরিবেশেও তা আজও নূতন বলে মনে হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কার্টুন

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৭১)

মা-মণি বললে—কী দরকার তোমার বলো?

দীপংকর যেন এতক্ষণে মা-মণিকে দেখতে পেয়েছে। সামনে গিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালে। বললে—সনাতনবাবুর সঙ্গেই আমার দরকার ছিল—

—তা তো ছিল, কিন্তু দরকারটা কীসের?

—আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবো!

মা-মণি বললে—সে তো বুঝলুম, কিন্তু কীসের দরকার, সেইটে জিজ্ঞেস করছি—

দীপংকর বললে—আমি তো বলেছি, দরকার আমার তাঁর সঙ্গে!

—আরে, এ তো দেখছি বড় আলটপকা মানুষ! আমি বলছি কীসের দরকার আর তুমি বলছো বিশেষ দরকার!

তারপরে নির্মল পালিতের দিকে ফিরে বললে—শুনলে তো বাবা, শুনলে তো?

নির্মল পালিত সবই শুনিয়াছিল। এতক্ষণে কাছে এল। বললে—কীরে, কী দরকার বল না? এই প্রপার্টি সম্বন্ধে কিছু বলবি? প্রপার্টি সম্বন্ধে কিছু যদি বলতে চাস তো আমাকে বলতে পারিস। ঘোষ-ফ্যামিলির প্রপার্টি আমিই দেখাশোনা করি। বাড়ি কিনবি?

দীপংকর আরো গম্ভীর হয়ে উঠলো। বললে—সনাতনবাবু কি নেই বাড়িতে? আর থাকলে তাঁর সঙ্গে কি দেখা করতে দেওয়ার নিয়ম নেই?

মা-মণি নির্মল পালিতের দিকে চেয়ে বললে—তুমি বাবা একটু বুঝিয়ে বলো তো একে যে, এ-বাড়ির মালিক আমি, আমাকে না-জিজ্ঞেস করে এ-বাড়ির ভেতরে কারো সঙ্গে কথা বলা যায় না—

হঠাৎ শম্ভু কাছে এসে দাঁড়াল। বললে—দাদাবাবু আপনাকে ভেতরে ডাকছেন একবার—

—কে ডাকছে রে শম্ভু?

শম্ভু বললে—আজ্ঞে, দাদাবাবু! দাদাবাবু নিজের ঘর থেকে নতুন-দাদাবাবুর গলা শুনতে পেয়েছে—

—শুনলে তো বাবা, শুনলে তো! শুনলে তো ছেলের কাণ্ড? আমি আর কী বলবো বলো, এরকম করলে মানুষের কি মাথার ঠিক থাকে! আর আমি একলা মানুষ, কত দিকে মাথা দেব! আমার এই সম্পত্তিই হয়েছে কাল! তোমার বাবা এই সর্বনাশটা আমার করে গিয়েছেন বাবা—যা ইচ্ছে করুক ওরা, আমার কী!

নির্মল পালিত বললে—আপনি কোনও দিকে কান দেবেন না মা-মণি, আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এই দলিলটাতে সই করে দিন—এই তিনটে জায়গায়—

ততক্ষণে দীপংকর একেবারে সোজা সনাতনবাবুর শোবার ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বললে—কেমন আছেন সনাতনবাবু?

—ভালো আছি দীপুবাবু। আপনি কেমন আছেন? দেখলেন তো আপনাকে আমি বলেছিলাম ওয়ার বাধবে। এ আর কেউ রোধ করতে পারবে না! রোধ করতে পারবে কী করে, বলুন?

দীপংকর চুপ করে রইল খানিকক্ষণ।

সনাতনবাবু বলতে লাগলেন—কেবল হিটলারের দোষ দিচ্ছে চার্চিল সাহেব! কিন্তু হিটলারের কী দোষ বলুন। হিটলার না-থাকলেও লড়াই বাধতো। ছোট ছোট হিটলারে দেশ যে একেবারে ভরে গেছে মশাই, কেউ কাউকে বিশ্বাস করছি না, কেউ কারোর উন্নতি সহ্য করতে পারছি না, কেউ কারোর দুঃখ বুঝছি না। আমাদের হাড়েই ঘুণ ধরছে যে—

দীপংকর বললে—আমি একটা কাজের কথা বলতে এসেছি আপনার সঙ্গে—

—তা এটাও তো কাজের কথাই দীপুবাবু, এটা ভাবছেন কাজের কথা নয়! এত বড় কাজের কথা আর আছে কী, বলুন তো! সমস্ত পৃথিবীসুদ্ধ লোকের মন-প্রাণ নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে, আর আপনি বলছেন কাজের কথা নয় এটা!

দীপংকর বললে—কাজের কথা তো

বটেই। কিন্তু আরো জরুরী কাজের কথা বলতে এসেছি আমি!

—দেখুন দীপুবাবু, এ-যুদ্ধ আমাদের ঘর-সংসার সব বদলে দেবে, সব ভেঙে দেবে, এই আমি বলে রাখলুম। আমাদের ভালোটাও ভাঙবে, আমাদের খারাপটাও ভাঙবে! এ-যুদ্ধটাও আমাদের তাই দরকার ছিল—আমার তো তাই মনে হয়। আপনি কী বলেন!

তারপর দীপঙ্করের গম্ভীর মুখটার দিকে নজর পড়তেই সনাতনবাবু বললেন—আপনি কি অফিস থেকে আসছেন? খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে আপনাকে!

দীপঙ্কর বললে—আমি সতীর কথা বলতে এসেছিলাম, মিসেস ঘোষের কথা—

—সতীর কথা! —সনাতনবাবু যেন অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—কিন্তু তিনি তো নেই দীপঙ্করবাবু, তিনি তো বাড়িতে নেই। জানেন দীপঙ্করবাবু, আপনি শুনে অবাক হয়ে যাবেন, তিনি একদিন এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন! এখানে আর তিনি থাকেন না!

দীপঙ্কর বললে—সে আমি জানি। জানি বলেই তো এসেছি—

সনাতনবাবু বললেন—আপনি জানেন? কিন্তু তিনি কেন চলে গেলেন বলুন তো! আমি তো অনেক করে থাকতে বললাম, কিন্তু তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে চলে যেতে বললেন! কিন্তু আমি কী করে যাই? আপনিই বলুন!

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—তিনি বড় ভালমানুষ ছিলেন, জানেন দীপঙ্করবাবু, এমন ভালো সচরাচর দেখা যায় না। আমি তো বিয়ের দিন থেকেই দেখে আসছি, বড় ভালো মানুষ ছিলেন। আমি তাঁকে বরাবর বলতাম, লেখাপড়ার মধ্যে মনকে ডুবিয়ে রাখতে, লেখাপড়ার মত বন্ধু তো আর নেই জগতে! কিন্তু তাঁকে আমি দোষ দিই না দীপঙ্করবাবু! তাঁর কোনও দোষ নেই, তিনি বড় ভালো মানুষ ছিলেন—

তারপর আরো যেন কী বলতে যাচ্ছিলেন—দীপঙ্কর তার আগেই বললে—সব আমি জানি—

—আপনি সব জানেন?

সনাতনবাবু যেন দীপঙ্করের কথার মধ্যে সতীর কাজের সমর্থন পেয়ে অকূলে কূল পেলেন। বললেন—আপনিও জানেন তিনি কী রকম ভালো মানুষ ছিলেন? আপনিও জানেন?

দীপঙ্কর বললে—জানি বৈকি সনাতনবাবু, সতীর মত স্ত্রী পাওয়া যে-কোনও পুরুষের পক্ষে সৌভাগ্য!

সনাতনবাবুর মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল এতক্ষণে। বললেন—তাহলে তো আপনিও জানেন দেখছি! আর জানবেন নাই-বা কেন? আপনি তো ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছেন! কিন্তু আরো অনেক জিনিস জানি, যা আপনিও জানেন না দীপঙ্করবাবু!

—কী জিনিস?

সনাতনবাবু বললেন—স্ত্রীলোকের সমস্ত ভূষণ তাঁর মধ্যে আছে দীপঙ্করবাবু। শাস্ত্রে যে-সব গুণ থাকলে স্ত্রীলোককে স্ত্রী-রত্ন বলা হয়, তার সমস্তগুলি তাঁর মধ্যে বর্তমান। আপনি ঠিকই বলেছেন, যে-কোনও পুরুষের পক্ষেই অমন স্ত্রী পাওয়া সৌভাগ্য!

—কিন্তু তিনি এখন কোথায় আছেন, জানেন আপনি?

সনাতনবাবু বললেন—না তো!

দীপঙ্কর বললে—আপনি হয়তো শুনে অবাক হয়ে যাবেন, তিনি এখন আমাদের অফিসে চাকরি করছেন।

—তাই নাকি? সে তো বড় বিচিত্র অভিজ্ঞতা!

দীপঙ্কর বললে—সেই কথাই আমি আপনাকে জানাতে এসেছি, এমন এক জায়গায় চাকরি করছেন যেখানে চাকরি করলে মানুষের মনুষ্যত্বে কলঙ্ক লাগে, এখন আপনি আপনার যা বিবেচনা হয় করুন!

সনাতনবাবু যেন মহা-সমস্যায় পড়লেন। বললেন—কিন্তু দীপঙ্করবাবু, আমার তো বিবেচনা হচ্ছে ভালোই করেছেন তিনি। সংসারের মধ্যেই কি কম আবিলতা মনে করেন! যত ছোট বা যত বড়ই সংসার হোক, তার মধ্যে থেকেও তো মনুষ্যত্বকে নিষ্কলঙ্ক রাখবার উপায় নেই আজ, আর চাকরি করলেই যত দোষ!
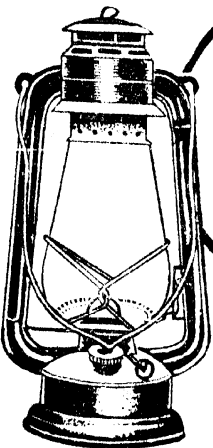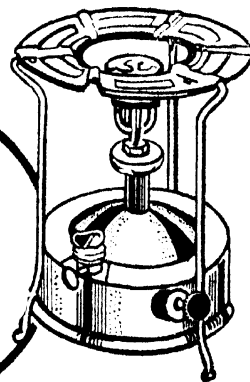
—তাহলে আপনিও তার চাকরি করা সমর্থন করেন?

সনাতনবাবু বললেন—না, তা করি না! আমি তো তাঁর বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াই সমর্থন করি না। আপনাদের অফিসেই তো তিনি চাকরি করেন, তা আপনি একবার দেখা হলে তাঁকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবেন?

—বলুন, কী জিজ্ঞেস করবো?

সনাতনবাবু বললেন — এই কেন তিনি চলে গেলেন? আমি নিজে তো কোনও দোষ করিনি!

দীপংকর বললে — আপনি তো নিজেই সেই কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারেন!

সনাতনবাবু বললেন—তা পারি বৈ কি! আমি নিজেও জিজ্ঞেস করতে পারি—

—আপনার অসুখটা সেরে গেলে একদিন অফিসে যাবেন। আমি একদিন তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা করিয়ে দেব! আপনার শরীরটা তার আগে একটু ভালো হোক!

সনাতনবাবু বললেন—আপনি তো ভালো প্রস্তাবই করেছেন। তা শরীর আমার এমন কিছু খারাপ নয়, আমি কালকেই যেতে পারি। ট্যাক্সি করে যেতে হবে। আমাদের গাড়িগুলো মা-মণি বিক্রি করে দিয়েছেন, আপনি জানেন তো! তিনি চলে যাবার পর এ-বাড়ির সব কিছু বদলে গিয়েছে, আপনি তাঁকে বলবেন—

—সে তো আপনি নিজেও বলতে পারেন!

—তা আমিও গিয়ে বলতে পারি! আমার বলতে কীসের আপত্তি! আমার সঙ্গে তো তাঁর কোনও মনোমালিন্য হয়নি দীপংকরবাবু যে আমি বলতে পারবো না। আপনি অফিসে যাবার সময় আমাকে নিয়ে যাবেন! আমি সব বলবো। আপনার সঙ্গে যা-যা কথা হলো সব বলবো! আমার বলতে আপত্তি কীসের!

দীপংকর বললে—আপনি তাকে চাকরি করতে বারণ করুন সনাতনবাবু! আমি বারণ করেছি কিন্তু আপনি বারণ করলে সে কিছুতেই এড়াতে পারবে না। আপনার কথা অমান্য করতে পারবে না সতী! আপনি তাকে চাকরি করতে বারণ করবেন, বাড়িতে ফিরে আসতে বলবেন—। আমার কথা সে না শুনুক, আপনার কথা শুনবেই, আপনার কথা ফেলতে পারবে না কিছুতেই—

সনাতনবাবু বললেন—তা বলবো, কিন্তু আপনি উঠলেন কেন, বসুন না—

দীপংকর চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার বসলো। দীপংকরের মনে হলো একদিন অনেক দিন আগে এই বাড়িতে আসতেই তার কেমন রোমাঞ্চ হয়েছিল, আর আজ সমস্ত বাড়িটা যেন শূন্য হয়ে গেছে। যেন খাঁ খাঁ করছে সমস্ত বাড়িটা। ঘরের জানালা দিয়ে বাগানটার দিকে চেয়ে দেখলে। বাগানে সেই ফুলের

কেয়ারি নেই। অনেক ঘাস গজিয়ে জায়গাটাকে জঙ্গলে পরিণত করেছে।

সনাতনবাবু বললেন — আপনার জল-যোগের ব্যবস্থা করতে বলি শম্ভুকে, আপনি অফিস থেকে আসছেন—

দীপংকর আপত্তি করলে। বললে—ব্যস্ত হবেন না, আমি এখান থেকে বাড়ি চলে যাবো—

সত্যি, বাড়িতেই বা কে আছে দীপংকরের। সেই মা তো আর নেই। কে-ই বা তার জন্যে পথের দিকে চেয়ে বসে থাকবে মা'র মতো! দীপংকর সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। একদিন এই ঘরেই সতী থাকতো। এই ঘরেই সতী শুতো, এই ঘরেই বাস করতো। এই ঘরেই খিল বন্ধ করেই সনাতনবাবুকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি সতী। সতীর জীবনের কতদিনের ইতিহাস এই ঘরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই ঘরেই দিনের পর দিন, রাতের পর রাত একলা কেটেছে সতীর। এই ঘরের ভেতরেই যেন সতীর সান্নিধ্যের উত্তাপ লেগে আছে।

অনেক দিন পরেও দীপংকরর এই ঘটনাটার কথা মনে পড়তো! এতদিন পরে এই দিনকার কথা ভাবতে গিয়ে আবার

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল হৃদপিণ্ড ভেদ করে। এমনি করেই বোধহয় একদিন মানুষের সব স্বপ্ন-সৌধ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এমনি করেই বোধহয় অলক্ষ্য কাল এসে সব কামনা-বাসনাকে গ্রাস করে। এমনি করেই একদিকে ভাঙে, আর একদিকে গড়ে তোলবার জন্যে! কিন্তু প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের এত বড় স্বপ্নটাকে ভেঙে মহাকালের কী লাভ হলো! কার উপকার হলো? সনাতনবাবুর, না দীপঙ্করের, না সতীর— কার?

কিন্তু দীপঙ্কর কি জানতো ঠিক তখনই, সেই মুহূর্তেই আর একটা স্বপ্ন প্যালেস-কোর্টের করিডোর অতিক্রম করে একেবারে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের মোড়ে এসে বাসা বাঁধছে! দীপঙ্কর কি জানতো সেই সতীর সর্বাঙ্গ জুড়ে ঘৃণার আর প্রতিশোধের বহ্নি লেলিহান হয়ে উঠেছে! তা জানলে দীপঙ্কর এমন শান্ত হয়ে বসে থাকতে পারতো না সনাতনবাবুর রোগশয্যার সামনে।

সতী গাড়িতে হেলান দিয়ে হা-হা করে হেসে উঠলো।

মিস্টার ঘোষাল পাশে বসে চুরুট টানছিল। বললে—হাসছো যে!

সতী হঠাৎ মিস্টার ঘোষালের দিকে ঝুঁকে পড়লো একটা ঝাঁকুনি খেয়ে। বললে —তোমাদের সেন-সাহেবের কথা ভাবছি—

মিস্টার ঘোষাল বললে — একটা আস্ত কাউয়ার্ড—আই শ্যাল্ ট্রান্সফার হিম্—

সতী বললে—তুমি পারবে তো ট্রান্সফার করাতে?

মিস্টার ঘোষাল বললে—নিশ্চয় পারবো, এমন জায়গায় ট্রান্সফার করে দেব, যেখান থেকে আর কলকাতায় না আসতে পারে—

সতী বললে—যেন কখনও ওর মুখ না-দেখতে হয় আমাকে—

গাড়িটা সোজা আসছিল। হঠাৎ মিস্টার ঘোষাল জিজ্ঞেস করলে—এইটেই তো প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, এই বাঁদিকে!

সতী ততক্ষণে আবার গম্ভীর হয়ে গেছে। বলতে গিয়ে তার মুখে যেন কথা আটকে গেল।

—তোমার শ্বশুর-বাড়ি কোনটা?

সতী তখনও সেই দিকে চেয়ে ছিল এক-দৃষ্টে। এইখান থেকেই একদিন বিতাড়িত হয়ে চলে যেতে হয়েছে তাকে। এইখানেই একদিন চূড়ান্ত অপমানের ধৈর্য-পরীক্ষা হয়ে গেছে তার ওপর দিয়ে। এই বাড়িতেই একদিন তার ভাগ্য-দেবতার স্থান সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিল তার বাবা। সতীই কি একদিন জানতো আবার একদিন এইখানেই তাকে ফিরে আসতে হবে চরম প্রতিশোধের দণ্ড হাতে নিয়ে।

—কোনটা তোমার শ্বশুর-বাড়ি? ডান দিকের এইটে?

সতী তখনও সেইদিকে চেয়ে আছে। গেটে আর সেই দারোয়ান নেই। অন্ধকারে ভেতরটা স্পষ্ট দেখা গেল না। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সতী চিনতে পারলে— ব্যারিস্টার পালিতের গাড়ি হয়তো!

—চারদিকে তো অন্ধকার দেখছি, লোক-জন কেউ নেই বুঝি ভেতরে! সব চলে গেছে কলকাতা ছেড়ে?

সতী শুধু বললে—না—

—তাহলে? মেম্বর ক'জন বাড়িতে?

সতী তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলে। বললে—ওদের কথা ছেড়ে দাও—এখন থেকে ওরা কেউ নয় আর আমার— এখানে থামাতে বলো—

গাড়িটা থামলো। মিস্টার ঘোষাল নামলো। ঠিক উল্টোদিকের বাড়িটা। রাস্তার সামনের দিকে বারান্দা। ওপরে দু'খানা ঘর, নিচেও দু'খানা। বাড়িওয়ালা পেছনের অংশে থাকে। কড়া নাড়তেই ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বললেন—আসুন, আসুন, আপনা-দের জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম—

মিস্টার ঘোষাল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে— আমাদের আসতে একটু দেরি হয়ে গেল—

—তাতে কী হয়েছে, আপনি তো অ্যাড্-ভান্স দিয়ে গেছেন, আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। আর এ-সময়ে তো টেনেণ্ট পাওয়াই যায় না। সবাই কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে এখন, আপনারা হলে, তবু বাড়িটা দেখা-শোনা করবার একজন লোক পাওয়া যাবে!

সতীও ভেতরে ঢুকলো। ভদ্রলোক আগে আগে চললেন। এ-পাড়ার বহুদিনের বাসিন্দা। যেতে যেতে বললেন—সবাই চলে গেছে তো পাড়া থেকে, আমিও ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিয়েছি বাইরে—। এ-পাড়ায় তো লোক নেই কেউ আর। আছি শুধু আমরা আর সামনের ঘোষেরা—

—ঘোষেরা? কোন্ ঘোষেরা?

ভদ্রলোক বললেন—সনাতন ঘোষ বলে এক ভদ্রলোক। তিনি আছেন আর তাঁর বিধবা মা আছেন বাড়িতে, আর কেউ নেই, ছেলের বউ ছিল, তা সে-বউও শুনেছি নাকি আর নেই। কলতে গেলে পাড়া একেবারে খাঁ খাঁ করছে এখানে থাকতেও ভয় করে স্যার—

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার রাস্তা। ভদ্রলোক হাতে চাবির গোছা নিয়ে উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। বললেন—নিচের কীচেন, আর বাথরুম, আর ওপরে অ্যাটাচড্ বাথ, আর দু'খানা বেড-রুম্—

মিস্টার ঘোষাল পেছনে উঠতে উঠতে বললে—ওতেই আমাদের পার্পাস্ সার্ভড্ হয়ে যাবে—

ভদ্রলোক বললেন — কেন যে আপনারা

প্যালেস-কোর্টের মত ফ্ল্যাট ছেড়ে এখানে আসছেন কে জানে, তার তুলনায় এ অবশ্য কিছুই না—

মিস্টার ঘোষাল বললে—তা হোক, এখানে আমরা একটু লুজ্‌লি থাকতে পারবো, মানে ঢিলে-ঢালাভাবে! দরকার হলে মাঝে-মাঝে গানের আসর বসাবো—। মিসেসের আবার গান-বাজনার শখ আছে কি না—

—ও, তাই বলুন!

ততক্ষণে দুটো ঘরের দরজা খুলে দিয়েছেন ভদ্রলোক। সতী সোজা প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের দিকের ছোট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সামনের বাড়িটার সমস্তটা স্পষ্ট দেখা যায় এখানে থাকে। ওই গেট, গেট পেরিয়ে ভেতরে গিয়ে বাঁদিকে সরকারবাবুর ঘর। তারপর বসবার বৈঠকখানা। বৈঠকখানা ঘরে আলো জ্বলছে। ব্যারিস্টার পালিত বোধহয় শাশুড়ির সঙ্গে পরামর্শ করছে ওখানে বসে বসে। কেমন করে জব্দ করা যায় সতীকে, সেই মতলবই আঁটছে বোধহয়। তারপরেই কিছুদূরে গিয়ে লাইব্রেরী-ঘর। ঘরটা অন্ধকার। দোতলার সমস্ত জানালাগুলো বন্ধ। তেতলার ঘরটায় আলো জ্বলছে। নিজের ঘরটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শুধু বোঝা যায় হয়ত কেউ আছে। হয়ত তিনিই আছেন।

—ওর সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই, পুব-মুখো ঘর, আলো-বাতাস পাবেন।

মিস্টার ঘোষাল কাছে এল। বললে—কী হলো? তুমি কিছু বলছো না যে?

সতী বললে—আমি আর কী বলবো?

মিস্টার ঘোষাল বললে—এই ঘরেই আসর পাতা যাবে, এই ঘর থেকেই তো ও-বাড়ির সব কিছু ডাইরেক্ট দেখা যাবে!

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বললেন — ওখানে পর্দা ঝুলিয়ে রাখবেন, তাহলেই আর কিছু দেখা যাবে না—

সতী অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাসলো। এখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে ডাকতে পারলেও যেন খানিকটা হাল্কা হতো মনটা! যেন গালাগালি দিলেও মনটা পরিতৃপ্ত হতো। অনেক কাঁটা, অনেক কলঙ্ক জমা হয়ে আছে ভেতরে। সব পরিষ্কার হয়ে যেত এখানে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে পারলে।

বললে—এখান থেকে গান গাইলে ওদের বাড়িতেও শোনা যাবে তো?

ভদ্রলোক বললেন—আপনারা তো আর দিনরাত গান-বাজনা করছেন না?

মিস্টার ঘোষাল বললে—যদি তাইই করি, তাতেই বা কী! আমরা নিজেদের বাড়িতে নাচবো গান গাইবো—যা খুশি আমাদের করবো—ওদের কী!

ভদ্রলোক বললেন—তা করতে পারবেন

ইচ্ছে হলে করতে পারেন বৈ কি! আর ওদের যদি অসুবিধে হয় তো আপনারা দরজা বন্ধ করে দিয়ে গাইবেন—ওরা শুনতে পাবে না!

সতী হঠাৎ মুখ ফেরালো। বললে—কেন? ওদের কি ভয় করে চলতে হবে?

ভদ্রলোক বললেন — না না ভয়ের কথা হচ্ছে না, ওদের ভয় করতে যাবেন কেন আপনারা?

—তাহলে কেন বলছেন ও-কথা আপনি? আমরা ভাড়া দিয়ে থাকবো না? আমরা এখানে যা-খুশি করবো। ওদের যদি অসুবিধে হয় তো ওরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাক্!

ভদ্রলোক বললেন—না না, সে-কথা নয়, ওবাড়িতে তো কেউ থাকে না। থাকবার মধ্যে থাকে কেবল বুড়ী মা আর তার ছেলে। বহুকালের লোক ওরা—এককালে ওদের স্টিভেডোরের ব্যবসা ছিল—লোক ওরা খুব ভালো!

—কে আপনাকে বললে, লোক ভালো? কে বললে?

ভদ্রলোক কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়লেন। কী বলবেন ভেবে পেলেন না।

সতী আবার বলতে লাগলো — আপনি আমার চেয়ে ওদের বেশি চেনেন? আমার চেয়ে ওদের বেশি জানেন? আপনি আমাকে চেনাতে এসেছেন ওদের? ওরা লোক ভালো?

মিস্টার ঘোষাল ততক্ষণে ভাড়া দিয়ে রসিদ নিয়ে পকেটে পুরে নিয়েছে। বললে—আপনাকে কে বলেছে ওরা লোক ভালো? আপনি জানেন ওদের?

দু'দিক থেকে তাড়া খেয়ে ভদ্রলোক আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় বার করতে পারলেন না। বললেন—উঁরা তো পাড়ার কোনও ব্যাপারে থাকেন না কিনা তাই বলছি—

সতী তখনও থামেনি। বললে—ওরা যদি ভালো লোক হবে তো ওদের বাড়ির বউ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়?

ভদ্রলোক বললেন—আমরা তো অত খবর জানতে পারি না।

—তাহলে কেন বলছেন ওরা লোক ভালো! ওদের বাড়ির ভেতরে গিয়ে আপনি দেখেছেন, না শুধু বাইরে থেকে গাড়ি দেখছেন, চাকর বাকর দেখছেন আর বিচার করেছেন! জানেন ওদের অন্দর-মহলে কত রকম অত্যাচার হয়? জানেন ওদের বাড়িতে বউ হয়ে এলে তার জীবন নষ্ট হয়ে যায় চিরকালের মত? তার ইহকাল-পরকাল-চিরকাল কেঁদে কাটাতে হয়?

বলতে বলতে সতী হঠাৎ যেন সম্বিত হারিয়ে ফেললো। উত্তেজনায় কাঁধের শাড়িটা খসে গেল অজান্তে। যেন এক মুহূর্তে উন্মাদ হয়ে উঠলো সতী! যেন অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সমস্ত তার একাকার হয়ে গেল এক নিমেষে।

মিস্টার ঘোষাল সামলে নিলেন। বললেন—চুপ করো, ও'র সঙ্গে অত কথা বলবার দরকার কী?

সতী বললে—কেন চুপ করবো? চুপ করে থাকবার জন্যে কি ও'র বাড়ি ভাড়া নিয়েছি? আমি এ-বাড়ির ছাদে উঠে চেঁচাবো, সকলকে জানিয়ে দেব আমি কে? সকলকে প্রচার করে দেব আমি ঘোষ-বাড়ির বউ—

তারপর—

মিস্টার ঘোষাল আবার সামনে এসে দাঁড়িয়ে মিসেস ঘোষের মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার আগেই সতী চুপ করে গেছে। হঠাৎ দেখা গেল তেতলার সতীর ঘরের জানালায় যেন কার মুখ দেখা গেল। সনাতনবাবু! হয়ত তিনিই টের পেয়েছেন। হয়ত তিনি সতীর গলা চিনতে পেরে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়েছেন।

সতীর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে মিস্টার ঘোষালও চেয়ে দেখলে সেই দিকে। বললে—কে ও? মিস্টার সেন না!

সতীও যেন এতক্ষণে চিনতে পারলে। দীপু না? দীপু ওখানে কেন এই সময়ে?

কিন্তু একটি মুহূর্ত। তারপরেই মুখটা ভেতরে সরে গেল।

(ক্রমশ)

অযাত্রায় জয়যাত্রা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(৮)

গোড়ায় যে ইণ্টারেস্ট বা কৌতূহল জাগিয়েছিল, সেটা গেছে মরে। তবু চুপ করে বসে না থেকে প্রশ্ন করলাম—"তা বেঁচে যে আছেন, কোথায় আছেন তিনি?"

নিতান্তই একটা উদ্দেশ্যহীন প্রশ্ন, যদিই বা থাকে কিছু উদ্দেশ্য তো সে শুধু গল্পটার জের টেনে রাখা। কিন্তু এইতেই আর একটা নূতন ইণ্টারেস্ট নিয়ে নূতন দিকে এগুল গল্পটা। পলটু উত্তর করল —"এইখানেই আছেন তিনি বাবু। ভিটে ছেড়ে আর কোথায় থাকবেন? তিনি আছেন বলে তো আমরাও পুরুষানুক্রমে এই চালা দুটো আশ্রয় ক'রে পড়ে আছি। তপস্যা করছেন তিনি, কবে তাঁর তপস্যা শেষ হবে, দয়া ক'রে আসবেন কিষুণ মহারাজ, তা তো কেউ জানে না। তাঁকে মানুষ করে তুলতে হবে, নইলে দেখছেনই তো—'অব্বল' শরীর নয় তো বাবু, জাঁহান মুশহরেরই সন্তান তো আমরা—সব্বাই পুরুষ মুলুকে (বাংলা-দেশে) গিয়ে কামিয়ে নিয়ে এসে ঘরবাড়ি তুলছে, জমি কিনছে, আমরাই কি পারি না? কিন্তু ঐ কথা, এ ভিটে ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই আমার। ঐ যে বড়াবাবু, 'টীশন মাস্টার', উনি কি ও'র টীশন ছেড়ে কোথাও যেতে পারেন? ঐ যে জিলার মালিক মাজিস্টর সাহেব, উনি কি মঝঃফরপুর ছেড়ে কোথাও যেতে পারেন।"

বেশ একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছে পলটু। দারিদ্র্যের মধ্যে বংশের ধারা বেয়ে একটা মর্যাদা, অন্য সবার চেয়ে আলাদা ধরনের একটা কৌলীন্যবোধ যে রয়েছে ধমনীর মধ্যে সেটা হঠাৎ উঠেছে জেগে। আর কিছু না হোক, গল্পটা এগিয়েও তো থাক খানিকটা। আমি প্রশ্ন করলাম—"তিনি তপস্যা করছেন বললে না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এইখানে বসেই—কিষুণ মহারাজের জন্যে।"

"কিন্তু কেউ যদি কখনও নাই দেখে থাকে..."

"দেখবে যে, তার জন্যে পুণ্যিবল থাকা চাই তো। হনুমানজীও তো মা-জানকীর দোয়ায় চিরজীবী হয়ে বেঁচে আছেন, কিন্তু আপনি-আমি কি দেখতে পাচ্ছি? তবু পরদাদাকে আমরা মাঝে মাঝে দেখি বৈকি।"

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতে বলল—"না, সে যা দেখি, সেটা এমন কিছু পুণ্যির জোরে নয়। তেমন পুণ্যিই যদি থাকবে আমাদের তো স্বামীস্ত্রীতে উদয়াস্ত খেটে মরছি তবু এ-দশা ঘোচে না কেন? কথাটা হচ্ছে, যত পাপীই হই তবু তাঁরই তো সন্তান আমরা, মাঝে মাঝে দেখা দিতেই হয়। বরং পাপী বলেই দেখা দিতে হয় তাঁকে, নইলে তাঁর দর্শনে যদি পাপক্ষয় না হয়ে যায় তো, যখন এই পাপের দেহটাকে লাথি মেরে চলে যাব তখন তাঁর কাছে পৌঁছুব কি করে? কথাটা হচ্ছে, সন্তানের পাপ কেউ ধরে না, ধরলে চলে না। কিষুণজী দই-ক্ষীর-ননী চুরি ক'রে নাজেহাল করে দিতেন যশোদা-মাইকে, একটা কথা বলতেন কখনও? বাইরের কেউ ওর সিকি ভাগও উপদ্রব করলে করতেন বরদাস্ত?—আপনিই বলুন না?"

"প্রায়ই দেখতে পাও তা হলে?"—কৌতূহলটা আবার কমে গিয়ে নিতান্তই অলস একটা প্রশ্ন—না হয় চলুক না পাড়া-গেঁয়ে ভূতের গল্পই একটা। পলটু একটু বিস্মিত হয়েই উত্তর করল—"প্রায়ই কি বলছেন বাবু? পরদাদার এই প্রায় এক শ' বছরের তপস্যা—যোগী মহারাজ বলছিলেন এক শ' বছর পূর্ণ হলেই তাঁর 'মনসা' পূর্ণ হবে—আসবেন কিষুণ মহারাজ, তিনিও বিষ্ণুলোকে চলে যাবেন। তা এক 'শ বছর তো হয়েও এল। হয়তো পূর্ণও হয়ে গেছে, পাঁজি দেখে তো রাখেনি কেউ—তা এলেন কই তিনি? যাক, সে তো আমাদের নসিবের কথা, আপনি যে প্রায়ই দেখবার কথা বলছিলেন—এ জিনিস কি এবেলা-ওবেলা দেখা যায়? আমার ঠাকুরদাদা নাকি দেখেছিলেন তিনবার। বাবা দেখেন বার দুই। আমি আজ পর্যন্ত মাত্র একবারই দেখেছি, পুণ্যের ধারা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে তো।"

"কি দেখলে?"—এবারও সেই রকম কৌতূহলহীন প্রশ্নই, মনটা বারবারই রাস্তায় গিয়ে পড়ছে, কখন বাসটা এসে পড়বে। হাতঘড়িটাও উল্টে দেখে নিলাম।

"সেদিনও এই রকম পরিষ্কার আকাশ হুজুর, তবে এ যেমন দিনদুপুর, আগেই বলেছি সেটা ছিল রাত্তির—পূর্ণিমা রাত্তির—কোজাগরী লছমী পুজোর..."

"চুপ করো!—থামো তো পলটু!—ও কে!"—এরকম একটা থ্রিল (thrill)—

বিদ্যুৎপ্রবাহর মতো সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে একটা বিস্ময়-শিহরণ জীবনে আর কখনও অনুভব করেছি বলে মনে পড়ে না আমার। চোখের তারা দুটো একেবারে নিশ্চল হয়ে গিয়ে মুখের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে পলটুও যেন একেবার বিমূঢ় হয়ে গেছে। একটু নির্বাক হয়ে গিয়ে বিহ্বলভাবে প্রশ্ন করল—"কি বড়া-বাবু?...আপনিও দেখতে পেলেন নাকি?"

"হ্যাঁ..."

এর পরই সংবিৎটা কিছু কিছু ফিরে এল, যদিও অনুভব করছি তখনও মাথার চুলগুলো যেন খাড়া হয়ে রয়েছে। কণ্ঠস্বর অনেকটা সহজ করে এনে প্রশ্ন করলাম—"ও ছেলেটি কে?"

মসীকৃষ্ণ একটি প্রায় বছর ছয়েকের শিশু, সুডৌল, একেবারে নগ্ন দেহ, যেন কষ্টিপাথরে খোদাই করা; মাথায় এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, ডগাগুলো তেলের অভাবে পিঙ্গল। কোমরে একটা হলদে নতুন ঘুনসি, গলায় টকটকে রাঙা কৃত্রিম মুগার

মালা—এ দেশের প্রায় সব ছেলের গলায়ই যা থাকে। দুটো কদম ফুল সুদ্ধ একটা কদম গাছের ডাল, বাঁ হাতে বুকের ওপর চেপে ধরা। ডোবাটার ধারে নেমে হ্যালা ফুল তুলছে; একটা তুলে একটার ডাঁটায় হাত দিয়েছে।

ওপরে জল থেকে হাত খানেক তফাতেই একটি বছর চারেকের মেয়ে। অত কালো নয়। যে রকম উদ্গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মনে হলো ফরমাশটা যেন তারই।

পলটু বিস্মিতভাবেই চেয়ে আছে। ঐদিকেই, কিন্তু ও ছেলের দিকে নয়। যেন খুঁজছে কোন্ ছেলেকে দেখে আমার এই উৎসুক প্রশ্ন, এই নিশ্চল ভাব। প্রশ্ন করল—"কোন্ ছেলে বড়াবাবু?"

আরও কতকটা সামলে নিয়েছি, বললাম —"ঐ যে হ্যালা ফুল তুলছে।"

"ওটা আমার বেটা রামকিষনা। ভয়ানক দামাল বাবু। বুড়ো বয়সে ঐ একটা ছেলে বড়হমজীকে অনেক বলি চড়িয়ে, কিন্তু ওর আশা নেই বাবু, এক নম্বর শয়তান, কোনদিন জলে ডুববে, কি সাপে কামড়াবে তার ঠিক নেই। আর মিটঠু মুশরের মেয়ে ঐ দুলারিয়াটা—ঐ বয়সে অমন বেয়াড়া মেয়ে ... আরে রামকিষনা, উঠ, না তো উঠতানি হাম।"

উঠল পলটু। যেতে যেতে মুখটা ঘুরিয়ে বলল—"মাদুলি আর ফকিরের তাবিজ দিয়ে এ ছেলে বাঁচানো যাবে বাবু? আপনি ছিলেন তাই তো, নইলে আজ..."

ছেলেটা উঠে এসে মেয়েটার দিকে একবার চেয়ে নিয়ে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁটু পর্যন্ত পাঁক। নড়া ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে পলটু বলল—"নে, বড়াবাবুকে পরনাম কর।"

অপ্রতিভভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকায় গায়ের ঝাল মিটিয়ে চড় মারতে যাচ্ছিল পলটু হাত তুলে—আমি এদিকে চোখ দুটো কোথায় রাখব ঠিক করতে পারছি না, ও চড় উঁচুতেই যেই মুখ তুলে চেয়েছি একেবারে থ হয়ে গিয়ে বিস্মিত প্রশ্ন করল —"ও কি বড়াবাবু, আপনার চোখে জল!"

"তুই মারিসনি তা বলে ঐ ননীর ছেলেকে। জল কই চোখে—ওরকম হয় আমার সূর্যের দিকে চোখ থাকলে বেশিক্ষণ।"

কোঁচার খুঁট দিয়ে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলতে গিয়ে আরও যেন ডেকে আসে বান। কী যেন হয়ে গেছে, একদিকে বুকে জড়িয়ে ধরবার ইচ্ছা, একদিকে অতি ভাবালুতার লজ্জা। মান বাঁচাল বাসের হর্নটা, অনেক দূরে লম্বা এবং তীক্ষ্ণ আওয়াজ, মনটা চকিতে ঐদিকে ঘুরে গেল, বললাম—"নে, তোল মোটটা, এসে গেল ঐ।"

"ও নহি বড়াবাবু, বাসের দেরি আছে।"

"তা হোক, তুই তোল। স্ট্যাণ্ডে গিয়েই বসা যাক।"

"পরনাম না করলে তু? মার লাগেকে?" —ছেলেটার দিকে ঘুরে বলতে সে একটু ঝুঁকে হাত বাড়িয়েছে, আমি তাড়াতাড়ি ধরে ফেললাম হাতটা, মনে হলো এখনি কত বড় যেন একটা অপরাধ হয়ে যেত। পকেট থেকে একটা টাকা বের করে মুঠার মধ্যে দিয়ে মুঠোটা মুড়ে দিয়ে বললাম—"হোলো পরনাম, লে দাহি-মক্‌খন খেইহে।"

চাপবার চেষ্টা তো করছি ভাবালুতা, কিন্তু কথাগুলো যেন বেরিয়ে যাচ্ছে ঐ সুরে।

"বড়াবাবু রুপেয়া দেলে বাড়ন, তু ফুল না দেব—বউয়া হমর?"

উপার্জন করেছে ছেলে, চকচকে গোটা টাকা একটা, কণ্ঠস্বর দ্রব হয়ে গেছে পলটুর। রামকিষনা তিনটে ফুলই বাড়িয়ে ধরল।

এত লুব্ধ কখনও হইনি জীবনে, তার কারণ মনের সেই তরলভাবটা এখনও তো সামলাতে পারিনি। মনে হচ্ছে এ যেন কত তপস্যার ধন, কার হাত থেকে কী বস্তুই না নিচ্ছি। দ্বিধাও রয়েছে বৈকি, শিশুর সঞ্চিত ধন। সেই দ্বিধার মধ্যে হঠাৎ কেন জানি না দৃষ্টিটা ডোবার ধারে গিয়ে পড়ল। মেয়েটা আমার চেয়েও লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়েছিল—লুব্ধ আর শঙ্কিত; চোখোচোখি হতেই মুখটা ওদিকে ঘুরিয়ে নিল।

দ্বিধা কেটে গেল আমার। আজ একটার পর একটা অপরাধ থেকে আমায় কে বাঁচিয়ে যাচ্ছে এমন করে?...ডাক দিলাম, "দুলারিয়া আ তো।" কেন যে প্রথম ডাকেই গুটিগুটি এসে দাঁড়াল, বলতে

পারি না, কোন জন্মের অনেক সংকোচ কাটানো অভ্যাস আছে বলেই কি?...রাম-কিষনাকে বললাম—"দুলারিয়াকে দে।"

কদম দেয় কি হ্যালা দেয়, দেখাই যাক না। ...দুটোই দিয়ে দিল। এও হয় তো কোন জন্মের সব-উজাড় করে দেওয়ারই অভ্যাস।

অপরাধের ওপর অপরাধ হয়ে যায় যে! রামকিষনা পাবে টাকা আর দুলারিয়াই নয়! পকেটে হাত দিতে গিয়ে ব্যাগের মধ্যে দুটো টাকার ওপরই হাত ঠেকল। দ্বিধা না করে দুটোই বের করে দিয়ে দিলাম ওর হাতে।

অস্বীকার করব না, কেমন যেন একটু সাধ হলো—বেশ তো, না হয় সেই আর এক কোন্ জন্মের মতো ঝগড়া-মান-অভিমানই হবেখন একটু।...শুধু আমিই পাব না দেখতে।

উঠে পড়লাম পথে।

নিঃশব্দে চলেছি দুজনে। মনটা কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পড়েছে—এক যুগ থেকে আর এক যুগের মাঝখানে একটা স্বর্ণ সেতু—কথা কইতে সাহস হচ্ছে না—কিছু বলতে গেলেই আবার যদি চোখে জল এসে পড়ে। এবার তো সূর্যের উল্টো দিকে মুখটা ঘোরানো।

অনেকটা এসে কি মনে হতে একবার ঘুরে চাইলাম। দুলারিয়ার মন ভরেনি, ছেলেটা আবার কখন জলে নেমেছিল, দেখি আর একটা ফুলে হাত করে কদমতলাটায় দুজনে সামনা-সামনি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাঁত্যই কি জীবন মুশহরের তপস্যা হলো পূর্ণ?

পথ চলতে চলতে অবশ্য ও ভাবটা কেটে এল। আমার ভেতরের লেখক মানুষটি গল্পটা নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হল। কোন শক্তিমান পুরুষপুরুষের শক্তির সঙ্গে, সমৃদ্ধি-সম্ভাবনার সঙ্গে, পরবর্তীদের দুঃখ দারিদ্র্য ব্যর্থতা মিলিয়ে একটা গল্প দাঁড় করিয়েছে। পলটুর হয়তো পারি-বারিক কাহিনীই একটা, পুরুষানুক্রমেই আসছে চলে। রক্তের তেজের সঙ্গে অসামর্থ্যের ক্ষোভ রয়েছে মিশে; সে হর্ম্য স্বপ্নেরও বাইরে, জীর্ণ কুটির তার দিকে চেয়ে চেয়ে নিতান্ত ঈর্ষা বশেই তাকে তুচ্ছ অকিঞ্চন বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। নিত্য এই তো হচ্ছে পৃথিবীতে। এই সান্ত্বনা বুকে করেই তো দারিদ্র্য আছে বেঁচে।

লরি, তাও চুনের লরি। একটা চায়ের দোকানের সামনে বোঝা নামিয়ে পলটু আমায় একটা নড়লো চেয়ার এনে দিয়েছে, বসে আছি, এমন সময় আর এক দুঃসংবাদ।

দোকানী প্রশ্ন করল—"কোথায় যাবেন বাবু?"

আমার আগে পলটুই জবাব দিল—"মজঃফরপুর। ফার্স্ট কিলাসকে জগহ্ মিল যায়েগা?"

বাজে প্রশ্ন। কোথায় বাস, তার ফার্স্ট ক্লাসে জায়গা আছে কিনা এখান থেকে কি করে জানবে লোকে? কিন্তু তা তো নয়, লরি, ঘোড়েদৌড়ের গাড়ি, একটা গাল-ভরা কথা না বলে বাঁচে কি করে?

"বাস তো রাস্তামে বিগড় গেল বা।"—উনুনে ডেকচির ধারটা অন্যমনস্ক করে রেখেছে কিছু কিছু, দোকানীর কথায় আমি চকিত হয়ে ঘুরে চাইলাম তার দিকে। আবার আমাকেই বলল—জী হাঁ হুজুর, এ লরি ড্রাইভারকে জিগ্যেস করুন না।

ড্রাইভার আর লরির জন তিনেক লোক বেঞ্চে বসে চা পান করছিল, জানালো প্রায় মাইল চারেক দূরে তারা দেখে এসেছে বাসটাকে, ড্রাইভার কনডাকটার মিলে বনেট তুলে কি সব কলকব্জা মেরামত করতে ব্যস্ত।

"দেরি হবে?"—প্রশ্ন করলাম।

ওরা কিছু বলতে পারল না। শুধু এইটুকু জানাল যে প্রায় মাইলখানেক যখন এগিয়ে এসেছে, দ্যাখে যাত্রীরা নেমে ঠেলছে কিন্তু নড়াতে পারছে বলে মনে হলো না। যেটুকু পেয়ালায় ছিল এক চুমুকে শেষ করে দোকানীকে বলল—"অওর এক কাপ ভইয়া।"

বাসে লরিতে চিরকাল আড়াআড়ি, এমন দরাজ গলায় পেয়ালাটা বাড়িয়ে ফরমাশ করল, মনে হলো এই বাড়তি মৌজটুকু লরির আজকের এই বিজয়োৎসবেই।

"তা হলে উপায়?"—পলটুকেই জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম তাও ইশারাতেই, দোকানীর

ট্রামেবাসে

হিন্দুস্তান চেম্বার অব্ কমার্সের শ্রী কুঠারী কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইকে জানাইয়াছেন কোন্ কোন্ দেশে কি কি হারে কর আদায় করা হয়। এই তথ্যের জন্য মোরারজী কুঠারী

মহোদয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে প্রয়োজন বোধে নূতন করহার সম্বন্ধে তিনি বিবেচনা করিবেন।—"মনসাকে আর ধুনোর গন্ধ না দিলেও পারতেন কুঠারীজী"—বলেন বিশুখুড়ো।

ঢাকাতে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জন্মশত-বার্ষিকী সভায় সভাপতি মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন যে, রবীন্দ্র-প্রতিভা সমুদ্র-সদৃশ, বড় বড় নদনদীর জলে তা পুষ্ট হইয়াছে।—"রবীন্দ্রবিরোধীরা হয়ত বলেছেন, বুড়ীগংগা কখনো সে সমুদ্রে পড়েনি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

ঢাকাতে নাকি সত্যি সত্যি একটি রবীন্দ্রবিরোধী সভার অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। তাহাতে জনৈক বক্তা নাকি বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান আর ভারতের সাহিত্য সংস্কৃতি এক, এ কথা যাঁরা বলেন তাঁরা মনে রাখিবেন, পাকিস্তান ভারতের রামরাজ্য নহে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা তা জানি। তবে মরা মরা বলতে বলতে যে কী হয় সেটাই বোধ হয় বক্তা জানেন না!!"

যোধপুরের এক সংবাদে শুনিলাম, একটি পাত্রীকে বিবাহ করিবার জন্য তিনটি বর বরযাত্রীসহ উপস্থিত হইয়াছিলেন—"নাল্পে সুখমস্তি হলো এই ভারতের পুণ্যবাণী"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

নাগাড়ে দুই বৎসর কোন কাজ না করিয়া মাসের পেন্সনে বসিয়া বসিয়া খাওয়ার অভিযোগে সোবিয়েৎ সরকার একটি মহিলাকে নির্বাসন দণ্ড দিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"বসে বসে খাওয়ার নীতির বিরুদ্ধে সোবিয়েৎ সরকারের মনোভাব যদি এই হয় তা হলে রুশপ্রীতি ব্যাহত হতে বাধ্য!!

জেনেভার সংবাদে জানা গেল যে, চীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্শাল চেন্-ইকে কী চা দিয়া আপ্যায়ন করা যায় তা নিয়া বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হিউম খুব বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন—সবুজ চা, কালো চা কোন্‌টা তাঁর পছন্দ এই ছিল চিন্তার বিষয়। শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেওয়া হইল দার্জিলিং-এর লাল চা। লাল চায়ের কথাটা লর্ড হিউমেরই মনে হইল।—"বুদ্ধির খেলায় বৃটিশকে এক শতে এক শত নম্বর দেওয়া যায়, লর্ড হিউম ঠিক ধরেছেন, লাল-এর লালিমা থাকলে চেন-ই মোটেই চেঁচামেচি করবেন না, সম্বন্ধটা একেবারে চেনে-বন্ধ"—বলে শ্যামলাল।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ লক্ষাধিক ফাইল ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।—"কিন্তু তাতে ফাইলেরিয়ার জড় মরবে বলে
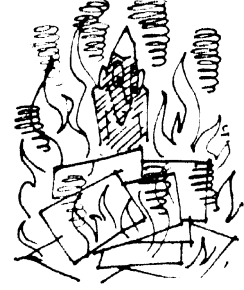
মনে করার কোন কারণ নেই"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

"কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের মধ্যে আদর্শের অভাব"—একটি সংবাদ শিরোনামা। বিশুখুড়ো সংক্ষেপে মন্তব্য

করিলেন—"বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার!!"

রাশিয়া নাকি এইবার মহিলাদের মহাব্যোমে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"একেবারে মোক্ষম ব্যবস্থা। ওড়াওড়ির দিক থেকে উঁড়ি গাগারিনরা তো মহিলাদের কাছে নাবালক!!"

উত্তরপ্রদেশ সরকার আর গ্রীষ্মে শৈলাবাস করিবেন না বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।—"কিন্তু টুরিস্ট-দের কৌতূহলী করতে যে ওটার বিশেষ প্রয়োজন। তাই তো বাংলা সরকার আপনি আচরি প্রথা জীবেরে শিখায়"—বলেন বিশুখুড়ো।

(২৫)

যে ক'দিন এলিজাবেথ লণ্ডনে ছিল না সৌরেন প্রায় রোজই গেছে রজতের সঙ্গে দেখা করতে। হয় তারা মিলিত হয়েছে 'সোহো'র অতি পরিচিত কফি বারে কিংবা লরাদের আস্তানায় আবার কখনও বা ট্রাফালগার স্কোয়ারের পাথরে বসে দুজনে লক্ষ্য করেছে 'স্টিভস' এর ব্যবসায়ী কায়দা। আর নয়ত মাইকেলের কাজে সাহায্য করার জন্যে রজত যখন পথচারীদের সামনে টুপি বাড়িয়ে দিয়ে পয়সা সংগ্রহ করত অদূরে দাঁড়িয়ে থাকত সৌরেন। দেখত তার এতদিনের বন্ধুকে নতুন পরিবেশে, নতুন উদ্দীপনায়।

এই প্রথম সৌরেন বুঝতে পারল কেন এতদিন রজতকে তার ছন্নছাড়া বলে মনে হয়েছে। রজতের ভেতরের সঙ্গে বাইরের কোন পার্থক্য নেই। সে মনে যা ভাবে মুখে তাই বলে, কাজে তাই করে। যুক্তি দিয়ে বিচার না করে কোন কথাকেই সে সত্য বলে মেনে নিতে রাজী নয়। সংস্কারের দোহাই পেড়ে যারা যুক্তিহীনতাকে প্রশ্রয় দেয় রজত তাদের উপহাস করে। ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ বিচারের মাপকাঠি তার নিজের মনে, অন্যের ধার-করা দাঁড়িপাল্লায় সে সত্য মিথ্যে ওজন করতে নারাজ। সেইজন্যেই বোধ হয় বাইরে থেকে দেখলে সবাই রজতকে ভুল বোঝে, যেরকম সৌরেনও এতদিন বুঝেছিল।

মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের আর পাঁচটা ছেলের মতই মামুলি চিন্তাধারা সৌরেনের, সে চিন্তাধারায় কোন মৌলিকতা ছিল না। সৌরেনের পৃথিবী ছোট, কতগুলো ধারণার বশে নিজের মনেই সে ঘুরে বেড়িয়েছে। এই ধারণাগুলো বিশ্বাসযোগ্য কিনা এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন ওঠেনি তার মনে এতদিন। কিন্তু রজতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার পর তার সেই ছোট্ট পৃথিবীতে জিজ্ঞাসার ঝড় উঠল। শান্ত প্রকৃতির রাজ্যে হঠাৎ ঝড় ওঠে নিমেষের মধ্যে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যায়, কিন্তু এ বিশৃঙ্খলতা বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। ঝড় বয়ে যাবার পর মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সৌরেনের চিন্তারাজ্যের ঝড়ও তার মনের বহু আবর্জনাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু তার মনের আকাশে কতগুলো প্রশ্ন তারার মত জ্বলতে লাগল দিবারাত্র।

যে প্রশ্ন তাকে সবচেয়ে বেশী উদ্ভ্রান্ত করে তুলল সে বোধ হয় মানুষের এই চিরন্তন প্রশ্ন, নিজেকে জানবার একান্ত বাসনা। রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সৌরেন ভাববার চেষ্টা করেছে কে সে? কী তার পরিচয়? ডাক্তারের ছেলে, অমুকের ভাই, এই যদি তার পরিচয় হয় তবে কি তার নিজের সত্তার কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিচয় নেই? আত্মীয়তার সমস্ত বন্ধন থেকে রজত নিজেকে মুক্ত করেছে, নিজেকে উপলব্ধি করার জন্যে। রজতের সঙ্গে তুলনা করে নিজেকে বড় ছোট মনে হল সৌরেনের। এতদিন পর্যন্ত সে যে সমাজের বেড়া আর সংস্কারের ধমক শুনে দিন কাটিয়েছে, সে কথা ভাবতেই মনে মনে সে সংকুচিত হয়ে উঠল। গুরুজনদের সে বরাবর ভক্তি করেছে, কখনও যাচিয়ে দেখেনি সে গুরুজন ভক্তি পাবার যোগ্য কিনা। ছোটদের সে স্নেহ করেছে, ভেবেও দেখেনি সেখানে মনের সাড়া আছে কিনা। নিজেকে বিচার করতে গিয়ে সৌরেন দেখল রজত যা বলে তা মিথ্যে নয়। মা, দাদা, ভাই, আত্মীয় স্বজন কারুর সঙ্গেই তো সে মন খুলে মিশতে পারেনি। কোথায় যেন একটা মিথ্যের আবরণ রয়ে গেছে। এই যে স্নেহ প্রীতি ভালবাসা যা মানুষের জীবনের পরম সম্পদ তাও তো তা হলে নির্ভেজাল নয়। পরিজনের খাতিরে সেখানেও যে আমরা খাদ মিশিয়ে থাকি। রজতের জোরালো যুক্তিগুলো সৌরেনের চিন্তাধারায় যে তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিল, তারই বিপরীত দিকে সাঁতার কাটতে গিয়ে অবসন্ন হয়ে পড়ল সৌরেন। মনের মধ্যে দেখা দিল সন্দেহ।

তবে কি এলিজাবেথের সঙ্গে তার যে আলাপ গড়ে উঠেছে তাও শুধু বাইরের? এ আলাপের কি কোন গভীরতা নেই? শুধু লোক-দেখানো প্রেমের অভিনয়! এলিজাবেথকে না পেলে সত্যিই কি তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে! কই, মনের দিক থেকে কোন সাড়াই তো সে পেল না। বিপুল বিস্ময়ে আত্মসমীক্ষায় প্রবৃত্ত হল সৌরেন।

কিন্তু কোন প্রশ্নেরই সে সঠিক উত্তর খুঁজে পেল না, মনে মনে ভাবল, রজতের সঙ্গে এভাবে না মিশলেই বোধ হয় ভাল হত।

ইতিমধ্যে একদিন দেখা হয়েছিল পল্টুর সঙ্গে। এখনও তার চাকরি হয়নি, কিন্তু

আশাও ছাড়েনি সে, আগের মতই জোরের সংগে বলে, তুমি কিছু ঘাবড়ো না সৌরীদা, একটা না একটা ঢিল ঠিক লেগে যাবে, কম ইন্টারভিউ তো দিইনি।

পল্টুর কথা শুনলে সত্যিই আশ্চর্য হয় সৌরেন। বাংলা দেশের দমে-পড়া আব-হাওয়ায় মানুষ হয়েও কোথা থেকে এই উজ্জ্বল আশাবাদকে সে বাঁচিয়ে রাখল মনের মধ্যে।

—তোর চলছে কি করে?

পল্টু প্রাণখোলা হাসল, চলে যাচ্ছে কোন-রকমে। আজকাল এক নতুন ফন্দি বার করেছি, আমাদের হোস্টেলের মালিক দারা সিং-এর শাগরেদি করছি।

—তার মানে?

—ওর হয়ে বাজার করে দি, ফাইফরমাশ খাটি। তাই থাকা-খাওয়াটা এখন বিনা পয়সায়। আর এদিক ওদিক ছোটখাট কাজ করে হাতখরচাটা চালিয়ে নি, আর কি।

সৌরেন কথার খাতিরে জিজ্ঞেস করে, এতদিন চেষ্টা করেও কোথাও সুবিধা করতে পারলি না?

পল্টু সহজ গলায় উত্তর দিল, দু-এক জায়গায় যে পাইনি তা নয়, তবে বিশেষ কোন prospect নেই।

সৌরেন ইচ্ছে করেই ঠুকে কথা বলে, হ্যাঁ, তুই তো আবার আমাদের মত কেরানী হবি না।

—মরে গেলেও না। মজা কি জানো, মলিদি ছাড়া কেউ আমাকে বুঝতে পারে না। কি আমার স্বপ্ন, কি আমি হতে চাই।

সৌরেন অনেকদিন থেকেই মলিনা দাসের কোন খবর পাচ্ছে না বলেই জিজ্ঞেস করল, তোমার দিদিটি কোথায়?

—ফ্রান্সে।

—একলা?

—তুমিও যেমন, দিদি কখনও একলা থাকতে পারে! সোম সাহেবের সংগে বেড়াতে গেছে। এই তো কালই আমি চিঠি পেয়েছি। দিন কয়েক বাদেই লণ্ডনে ফিরছে।

অন্যমনস্ক সৌরেন হঠাৎ বলে, কি জানি, তোমার দিদিটিকে আমি আজও বুঝতে পারলাম না।

পল্টু হাসল, সবাইকে বোঝবার চেষ্টা না করাই তো ভাল। তারপর নিজের মনেই বলে, দিদি ফিরে এলে ক'দিন বেশ খাওয়া-দাওয়া হবে।

সৌরেনের আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না, বলে, চলি পল্টু, আবার পরে দেখা হবে।

পল্টু হাত নাড়ল, হয়ত দিদির ফ্ল্যাটেই, বাই, বাই।

পথ চলতে চলতে সৌরেন চিন্তা করছিল মলিনা দাসের কথা। সোম সাহেবকে সে দু চোখে দেখতে পারে না, এ কথা সে সৌরেনকে একবার নয়, বারবার জানিয়েছে। অথচ তারই সংগে বেড়াতে চলে গেল ফ্রান্সে। আর কিছুই নয়, সোম সাহেবের আছে টাকা, আছে পদমর্যাদা। মলিনা দাস বিনা খরচায় এতখানি আনন্দ পাবার সুযোগ ছাড়বে কেন? সোম সাহেব বোকা নয়, মলিনা দাস যে তাকে পছন্দ করে না এ কথা সে নিজেও জানে, তবু একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে আর পাঁচজনের চোখে ঈর্ষা জাগিয়ে ঘুরে

বেড়াবার লোভ সে সামলাতে পারে না।

সোরেন মিলিয়ে দেখল রজতের কথা নির্ভুল। প্রয়োজনের খাতিরে নিজেদের সুবিধেমত আমরা অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে নি। তার সঙ্গে হৃদয়ের কোন সম্পর্ক নেই। ঐ একই কারণে পল্টু মলিনা দাসকে দিদির আসনে বসিয়েছে, যদি তাকে দিয়ে কিছু সুবিধে হয়। কে বলতে পারে, পল্টুকে ভাই হিসেবে কাছে টেনে নেওয়ার পেছনে মলিনা দাসের আর কোন মতলব আছে কিনা।

ঠিক এভাবে সমালোচনা করে আগে কখনও ভাবতে শেখেনি সোরেন, কিন্তু এখন, রজতের অনুকরণে চিন্তা করতে গিয়ে ক্রমশ যেন জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে। ইচ্ছে করে সে একদিন দেখা করতে গিয়েছিল ব্রেনহিম ক্রেসেন্টের পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে। সেই বেঁটে কেষ্ট, সেই বাজপেয়ী, সেই বাঁড়ুজ্যো, আগের মত ঘরে বসে আড্ডা মারছে, হো-হো করে হাসি। এক-এক কথায় যে-কোন রাজনৈতিক মতবাদকে নস্যাৎ করে দিচ্ছে। কি প্রচণ্ড কলরব, কি যুক্তিহীন তর্ক!

আধ ঘণ্টার বেশী বসতে পারল না সোরেন।

বেঁটে কেষ্ট ঠাট্টা করে বললে, কি সাহেব, এখুনি উঠছ? আমাদের সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে করছে না?

বাজপায়ী কথার চিমটি কাটল, নিশ্চয় তোর সুন্দরী বান্ধবী এ-পাড়ায় কারুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। তাই তুই সময় কাটাতে আমাদের আড্ডায় ঘুরে গেলি।

একজন কেউ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, বিয়েটা কবে দাদা?

আরও কি সব যেন তারা বলল, হাসল নিজেদের মধ্যে, সোরেন কিন্তু কোন কথায় কান না দিয়ে আস্তে আস্তে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

ভাবতে আশ্চর্য লাগল, একদিন সে নিজেও ঐ বেঁটে কেষ্টদের মতই ছিল। ঐভাবেই আড্ডা মেরেছে, সকলকে নিয়ে ঠাট্টা করেছে, পাঁচজনের নামে কুৎসা রটিয়েছে। ভাগ্যিস সে এদের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিল, তা না হলে আজও নিজেকে বোঝবার চেষ্টা করত না সে। রজতের মতই তার মনে প্রশ্ন জাগল, কেন এই বেঁটে কেষ্টর দল বিদেশে আসে? কেন তারা কলকাতায় বসে রকবাজি করল না? এত কষ্ট করে এত দূরে দেশে এসেও এদেশের কোন ভাল জিনিসটাকেই এরা নিল না। একখানা ছোট্ট ঘরের মধ্যে কলকাতার আবহাওয়া সৃষ্টি করে পায়রার মত নিজেরা বকম বকম করে। চোখ খুলে পৃথিবীটার দিকে তাকিয়ে দেখার শক্তি নেই। ভালকে ভাল বলে স্বীকার করার সাহস নেই মনে। যেসব কুসংস্কার, ভুল ধারণা, মিথ্যে অহংকার সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল সেগুলোকেই সযত্নে মনের মধ্যে পুষে রেখে ফিরে যাবে কলকাতায়। তখন হয়ত বিলেত-ফেরত বলে আগের মত রকে বসে আড্ডা মারতে অহমিকায় বাধবে, কিন্তু মিথ্যে ইণ্টেলেকচুয়ালের ভান করে কফি-হাউসে বসে এই রকমই পরনিন্দা আর পরচর্চা করতে এতটুকু তাদের লজ্জা করবে না।

ঠিক এই রকম যখন সোরেনের মনের অবস্থা, হঠাৎ এক সন্ধ্যায় টেলিফোন এল মীনাক্ষীর কাছ থেকে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে।

মীনাক্ষীর শান্ত মধুর কণ্ঠস্বর, আজ সন্ধ্যায় খালি আছ সোরেন?

—আছি, কেন বল।

—আমার বাড়িতে এস, একটা সুখবর দেবার আছে।

—তুমি যখন নিজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছ নিশ্চয় আসব।

—একথা এখনও কাউকে জানাইনি, ভাবলাম তোমার সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়, তুমি আমায় ঠিক বুঝতে পারবে।

সোরেন ছোট্ট উত্তর দিল, সে আমার সৌভাগ্য।

অনেকদিন বাদে মীনাক্ষীর কণ্ঠস্বর আগের মতই মিষ্টি শোনাল সোরেনের কাছে। বড় সহজ, সরল। আজ সন্ধ্যেবেলায় বিশেষ কিছু তার করবারও নেই, মনে মনে সে খুশী হল মীনাক্ষীর কাছ থেকে এ আমন্ত্রণ পেয়ে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে প্রশ্ন জাগল, মীনাক্ষী তাকে কি সুখবর দিতে চায়।

মীনাক্ষীর সুখবরটি যে কি হতে পারে, তা মনে মনে আঁচ করেই রেখেছিল সোরেন, তাই সন্ধ্যেবেলা মীনাক্ষী যখন জানাল পীয়েরকে সে বিয়ে করবে বলে মনঃস্থির করেছে, সোরেন এতটুকু বিস্মিত হল না। শুধু বিস্মিতই নয়, মনের দিক থেকে বিচলিতও সে হয়নি। কিছুদিন আগে হলেও এ-সংবাদে নিশ্চয় সে মর্মাহত হত। যে মীনাক্ষীর সঙ্গে তার যৌবনের উন্মেষে আলাপ হয়েছিল, যার সঙ্গলাভের আশায় কলকাতায় তাদের বাড়ি প্রতি সন্ধ্যায় সে হাজিরা দিয়েছে, যাকে পাবার লোভে সুদূর লণ্ডন পর্যন্ত

সে ছুটে এসেছিল, আজ সেই মীনাক্ষী একটি বিদেশী ছেলেকে স্বামিত্বে বরণ করতে যাচ্ছে শুনেও এতটুকু ব্যথিত হল না, বরং প্রসন্নমুখে বলল, কনগ্র্যাচুলেশন।

—আমি জানতাম তুমি শুনে খুশী হবে; আগের সেই অতিপরিচিত মেয়েটির মত মীনাক্ষী খুশীতে উজ্জ্বল চোখ তুলে কথা বলল।

মীনাক্ষীকে দেখতে বড় ভাল লাগল সৌরেনের, সারা দেহে তার চঞ্চলতার জোয়ার। এক সময় বলল, মনে পড়ে মীনাক্ষী, কি ছেলেমানুষ আমরা ছিলাম, তোমাদের মামার বাড়ির অন্ধকার ছাদে বসে যখন তারা-ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতাম। তখন কে ভেবেছিল এত দূরে দেশে এসে আবার আমাদের দেখা হবে।

অন্যমনস্ক মীনাক্ষী নিজের মনে বিভোর হয়েছিল, সৌরেনের কথা কানে যেতেই উত্তর দিল, সে দিনগুলোও বড় চমৎকার কেটেছিল সৌরেন।

কথাটা আশ্চর্য শোনাল সৌরেনের কানে, তোমার তাই মনে হয় নাকি!

মীনাক্ষী বড় বড় চোখ মেলে তাকাল, কেন, তোমার মনে হয় না?

সৌরেনের চোখ-মুখের চেহারা হঠাৎ যেন বদলে গেল, মুখে ফুটে উঠল অতি বিজ্ঞের হাসি বলল, আমার মনে হয় ওগুলো ছেলেমানুষি।

মীনাক্ষী জোর দিয়ে বলে, হোক না ছেলেমানুষি, তাতে ক্ষতি কি! হয়তো ঐ ছেলেমানুষিরও দরকার ছিল নিজেকে বোঝাবার জন্যে বোঝবার জন্যে যে আজকে যা করছি সেটা ছেলেমানুষি নয়।

আড়ষ্ট হাসল সৌরেন, ঐখানেই আমরা ভুল করি মীনাক্ষী, বর্তমানটা সব সময় আমাদের বিদ্রূপ করে। কে বলতে পারে আজকেও আমরা ছেলেমানুষি নিয়ে মেতে নেই?

সৌরেনের কথাগুলো বড় তির্যক শোনাল। মীনাক্ষী অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে শান্ত স্বরে বলে, আমি বুঝতে পারছি সৌরেন, তুমি ভাবছ আজ আমি যে ঘর বাঁধাব সংকল্প করেছি সেটাও ছেলেমানুষি। এ সংশয় আমার মনেও ছিল, তাই দাদুকে চিঠি লিখেছিলাম। দাদুর কাছ থেকে উত্তর পেয়ে বুঝেছি আমার সিদ্ধান্ত নির্ভুল।

মীনাক্ষীর দাদুকে সৌরেন কোনদিনই বুঝতে পারেনি মনে হত কিরকম যেন বেয়াড়া ধরনের কথাবার্তা। কোন কথাই সোজা ভাবে বলেন না, মীনাক্ষীর সঙ্গে প্রতিদিন দেখা করতে যাওয়া উনি যে পছন্দ করেন না তা সৌরেন মনে মনে ভালো করেই জানত। মীনাক্ষীর সেই দাদু যে পাত্রের সঙ্গে বিয়েতে সানন্দে অনুমতি দিয়েছেন তা মেনে কিছুটা অবাক হল সৌরেন। তবু সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলল, মীনাক্ষী তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, জীবনে অভিজ্ঞতাও পেয়েছ অনেক রকম, তাই মনে হয় না আমাদের দেশের মামুলি মেয়েদের মত ভাবপ্রবণতার বশে কোন বেঠিক কাজ করে বসবে। তবে এইটুকুই অনুরোধ—মোহকে প্রশ্রয় দিও না। যদি কোনদিন মনে হয় ভুল করেছ তা স্বীকার করবার সৎ সাহস যেন থাকে।

মীনাক্ষী কোন কথা না বলে একদৃষ্টে সৌরেনের দিকে তাকিয়ে রইল। সৌরেন অস্বস্তি বোধ করে, কি দেখছ?

—তোমাকে।

—তার মানে?

মীনাক্ষী মৃদু হাসল, তুমি যে কখনও এ রকম গুছিয়ে কথা বলতে পারবে, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

—তোমার সামনে আর কথা বলার সুযোগ পেলাম কোথায়? বরাবর তুমিই ছিলে বক্তা, আমি শ্রোতা।

—আমি তা বলিনি সৌরেন, ঠিক এ ধরনের কথা তুমি আগে কখনও বলতে না। কেন জানি না আজ তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এতদিন লণ্ডনে থেকে তুমি সিনিক হয়ে গেছ।

সৌরেন সগর্বে বললে, সিনিক কি না জানি না, তবে আগের মত আর ভাবাবেগের বশে কাজ করি না। সব কিছুই যাচিয়ে নেবার চেষ্টা করি।

মীনাক্ষী স্থির গলায় বলল, কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয় আমাদের পক্ষে তা বিচার করে বোঝা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। যুক্তিবাদীরা যতই বড়াই করুন কার্যকারণ সম্বন্ধ বার করতে গিয়ে অনেক সময় তাদেরও যে হার মানতে হয়। তুমি আমি তো কোন ছার।

সৌরেন মীনাক্ষীর কথাগুলো ভালো করে না শুনেই উত্তর দিল, সে তুমি যাই বল মীনাক্ষী, বুদ্ধির আলোতে পথ চলতে শিখে বুঝতে পারছি যে হৃদয়ের রাজত্ব বড় গোলমেলে। যুক্তিহীনতার দোহাই দিয়ে অনেক আবর্জনা সেখানে এসে ঢুকে পড়ে। আমি তা থেকে মুক্তি পেতে চাই। মানুষ হতে চাই।

সৌরেনের শেষের কথাগুলোয় বিষাদের সুর বেজে উঠল।

ইচ্ছে করে উঠে পড়ল মীনাক্ষী, প্রসঙ্গ বদলে বলে, তোমার জন্যে মুরগীর কারি রেঁধেছি, নিয়ে আসি। তুমি তো মুরগী খেতে খুব ভালবাসতে।

সৌরেন হাসে, এখনও মনে আছে!

—আমি সহজে কিছু ভুলি না।

মীনাক্ষী খাবার আনতে গেল পাশের

ঘর থেকে। সোরেন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস বলল, পীয়ের আসবে না?

—বোধ হয় না, এলেও রাত করে। লণ্ডনের বাইরে গেছে।

—অফিসের কাজে?

—হ্যাঁ। পরশু থেকে ওর ছুটি।

—তাই নাকি, বিয়েটা কবে?

মীনাক্ষী ততক্ষণে ডিশ নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছে, আস্তে আস্তে বলল, কাউকে বলতে পাবে না কিন্তু, কথা দাও।

সোরেন হেসে বলল, না, বলব না।

—এই সোমবার আমি আর পীয়ের কণ্টিনেণ্ট যাচ্ছি, বেড়াতে। বিশেষ করে বেলজিয়ামে, ওর বাবা মার সঙ্গে আলাপ হবে। তারপর লণ্ডনে ফিরে এসে বিয়ে করব।

—সোমবার ক'টায় ট্রেন? স্টেশনে যাব তোমাদের "সী অফ্" করতে।

—কেন মিথ্যে কষ্ট করবে। আমাদের ইচ্ছে কাকপক্ষীকে জানতে না দিয়ে চলে যাওয়া।

সোরেন ডিশের উপর মাংস তুলে নিতে নিতে বলে কিন্তু আমি যে জেনে গেলাম।

মীনাক্ষী শান্ত চোখ মেলে উত্তর দিল, ইচ্ছে করেই যে বললাম তোমায়। মীনাক্ষীর সঙ্গে চোখোচোখি হতে সোরেন বিস্মিত হল, সে চোখের দৃষ্টিতে আন্তরিক সহানুভূতি, কত কথাই সে যেন আজ বলতে চায়। অতি ধীর স্বরে বলল, আমি জানি সোরেন, তুমি আমাকে বরাবর ভুল বুঝেছ। আমার কথা ভেবে মিথ্যে অভিমানে কষ্ট পেয়েছ, সবই আমি বুঝি। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও বুঝি আমাদের ভেতরকার অন্তর্লীন মহত্ত্বকে মহাপ্রাণতার পর্যায়ে ফুটিয়ে তোলার জন্যে যে করুণা-ধারার প্রয়োজন তার সন্ধান তুমি বা আমি কখনও পাইনি পাইনি বলে আমাদের জীবনস্রোত এক হতে পারেনি।

মীনাক্ষী চুপ করে যায়, চোখে তার জল ভরে আসে, সামলে নিয়ে বলে, আমার দিক থেকে তোমার বিরুদ্ধে কোন অভি-যোগই নেই। তোমার অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে যদি আমাকে স্বীকার কর আমি খুশী হব।

মীনাক্ষীর আন্তরিকতায় অভিভূত হল সোরেন, বলল তোমার কথা আমার মনে থাকবে মীনাক্ষী।

খাওয়াদাওয়ার পর সোরেনকে বিদায় দেবার সময় মীনাক্ষী সংযত কণ্ঠে বলল, আর একটি অনুরোধ তোমার কাছে, জীবনের ওপর বিশ্বাস হারিও না। আমাদের জীবনে দৈনন্দিন হীনতা, দীনতা, নীচতা, অসারতা, সব আছে, কিন্তু ঐগুলোকেই চরম সত্য বলে ভেব না। তাহলেই ভুল করবে। এ কথা এই জন্যে তুললাম তুমি একটু আগেই বলছিলে 'হৃদয়ে'র চেয়ে 'বুদ্ধি'র ওপর তোমার বেশী আস্থা। কিন্তু আমি ঠিক তার উল্টো দিকটাই ভাবি। কেন আমি পীয়েরকে এত ভালবাসি জানো, ওর মধ্যে পেয়েছি আমি সেই শক্তির পরিচয় যা তাকে পারিপার্শ্বিক অসারতা কাটিয়ে সত্যিকার মনুষ্যত্বলোকে উত্তীর্ণ করতে পারবে। পীয়ের সব সময় হৃদয়ের ডাকে সাড়া দেয়, বিচক্ষণতার নিষেধ সে মানে না।

মীনাক্ষীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সারাক্ষণ সোরেন ঐ কথাগুলো ভেবেছে। কি আশ্চর্য, রজত যা বলে, মীনাক্ষী ঠিক তার উল্টো কথাগুলো বলে গেল। অথচ একথা সত্য এগুলো মীনাক্ষীর মুখের কথা নয়, মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে বলেই সে সোরেনকে অনুরোধ করেছে মানুষের অন্তর্লীন মহত্ত্বকে ভুলে না যেতে। কিন্তু কোন্ পথটা ঠিক? যুক্তিবাদী রজতের মত প্রতি পদক্ষেপ বিচার করে সে এগিয়ে চলার চেষ্টা করবে, না মীনাক্ষীর মত হৃদয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে বিচক্ষণতার হুমকি না মেনে জীবনস্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে!

কিন্তু এ নিয়ে আর বেশী চিন্তা করার সুযোগ পেল না সোরেন। নিজের বাড়িতে পৌঁছে দেখল দরজা খোলা ভেতরের বারান্দায় মিসেস হোরিং দাঁড়িয়ে এক অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। সোরেনকে ঢুকতে দেখে মিসেস হোরিং উত্তেজিত স্বরে বললেন, ইনিই মিঃ লাহিড়ী, তিনতলায় থাকেন।

ভদ্রলোক বললেন, গুড্ ইভনিং মিঃ লাহিড়ী। আপনার সঙ্গে দু'একটা দরকারী কথা আছে।

সোরেন ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে, আমার সঙ্গে দরকার? কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

মিসেস হোরিং বলে দিলেন, উনি পুলিসের লোক।

সোরেন চমকে উঠল, পুলিস, কি ব্যাপার?

—আপনারা ড্রইং রুমে গিয়ে বসুন, ওখানে কেউ নেই।

অজানা আশঙ্কায় সোরেনের বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে যায়, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে পারে না পুলিস আসার কি কারণ হতে পারে। ড্রইং রুমে ঢুকে তারা পাশা-পাশি সোফার উপর বসল।

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, মিস্ এলিজাবেথ হোপকে আপনি চেনেন?

পুলিসের লোকের মুখে এলিজাবেথের নাম শুনে মনে মনে আরও ভয় পেল সোরেন, কেন তার কি হয়েছে?

—তাঁর কিছু হয়নি, মিসেস্ হোরিং-এর কাছে শুনলাম তিনি এখন লণ্ডনে নেই।

—না। এলিজাবেথ তার গ্রামের বাড়িতে গেছে।

—কবে?

—গত শনিবার।

—ফেরবার কথা?

—আগামী রবিবার সন্ধ্যেবেলা।

ভদ্রলোক নোট বই-এ উত্তরগুলো লিখে নিচ্ছিলেন সোরেন কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস

করল, যদি আপত্তি না থাকে বলবেন কি মিস্ হোপের বিষয়ে এসব খবর করছেন কেন?

ভদ্রলোক নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর দিলেন, কেন, আপনি কাগজে পড়েননি?

—কি!

—মিস্ হোপের কাকা খুন হয়েছেন।

সৌরেনের শরীর অবশ হয়ে যায়, কাকা মানে, মিঃ লিণ্ডসে হোপ, মে ফেয়ারে যাঁর দোকান?

—হ্যাঁ, উনিই।

এলিজাবেথ সম্বন্ধে আরও দু'চারটে প্রশ্ন করে উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। যাবার সময় একটা কার্ড দিয়ে বলে গেলেন, মিস্ হোপ লণ্ডনে এলেই যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। গুড্ নাইট্।

—গুড্ নাইট্।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর সৌরেন কিন্তু আর উপরে উঠল না। ছুটল ওয়েস্ট হ্যাম্পস্টেড টিউব স্টেশনের দিকে, খবরের কাগজের সন্ধানে। সত্যিই তো আজ সারাদিনে তার কাগজ পড়ার সময় হয়নি

(ক্রমশ)

॥ একত্রিশ ॥

গত রাত্রে খাবার সময় ঠিক হল, এবার দলটা দু ভাগে ভেঙে দেওয়া যাক। নইলে অসুবিধে দেখা দিচ্ছে। কেউ দ্রুত চলতে পারে, কেউ চলছে ধীরে। এতে দেখা গেল, দলের উপর অহেতুক একটা চাপ পড়ছে। তাই ঠিক হল, যারা দ্রুতগামী তারা এবার থেকে এগিয়ে যাবে। এ ছাড়া, অ্যাড্ভান্স পার্টি তৈরি করার আর একটা কারণও ছিল। আমরা যতই উঠছি, ততই পাহাড়ী নদী আর ঘন জংগলের প্রতিরোধ ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করছে। ছোট একটা নদী, কিন্তু তারই বা কী তেজ! পাথর কুড়িয়ে এনে নদীতে সেতু বাঁধতে হয়, তবে আমরা পার হতে পারি। আর জংগলের কথা কি বলব। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়, কথাটা এতদিন শুনেই এসেছি। ওর মর্মার্থ কি, এবার হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। এদিকে কঞ্চির ঝাড় এত বেশি আর এত ঘন যে প্রতি পদে শেরপারা কুকরি চালিয়ে পথ পরিষ্কার করেছে। তবু নাকি আমাদের ভাগ্য ভাল। দক্ষিণের পথে (রানীক্ষেত-সুতোল হয়ে যে পথ, যে পথে আগেকার অভিযানগুলো গিয়েছিল) কঞ্চির দৌরাত্ম্য নাকি আরও বেশি।

জংগল কেটে পথ বানাতে, এক এক জায়গায় সেতু বাঁধতে তিন চার ঘণ্টাও দেরি হয়। তাই ঠিক হল, যারা দ্রুত চলতে অভ্যস্ত, এবার থেকে তারা এগিয়ে যাবে। পথ বানাবে, সেতু বাঁধবে, তাঁবু ফেলবার জায়গা খুঁজে বের করবে।

প্রথম দিন যে অ্যাড্ভান্স পার্টি তৈরি হল, তার নেতৃত্বের ভার দেওয়া হল বিশ্বদেবকে। বিশ্বদেব "ড্যাশ্ গ্ল্যাভ্"! মালবাহক আর কজন শেরপা অ্যাড্ভান্স পার্টিতে যাবে। বিশ্বদেবকে বেশ তাজা লাগছে। সকাল সাতটার মধ্যে তাঁবু টাবু গুটিয়ে ফেলে "ব্রেকফাস্ট" সারা হল। প্রার্থনা অন্তে "জয় বদ্রীবিশাল" বলে হুংকার ছেড়ে বিশ্বদেব যেই যাত্রা করেছে, অমনি দেখা গেল মদন তার পিঠঝোলা তুলে নিয়ে বিশ্বদেবের সঙ্গে ভিড়ে পড়েছে। আমরা ত অবাক! দিলীপ জিজ্ঞেস করল, "ও কি রে মদন, তুই ওখানে গিয়ে ভিড়লি কেন?" মদন দাঁড়ালও না। উঠতে উঠতে মুখ ফিরিয়ে বলল, "আনা ছোড়না লেকিন সাথী নেহি ছোড়না। তা ছাড়া, বিশ্ব আমাদের কবি। বিশ্বকবি। এই বন-জঙ্গলের ভিতর কোথায় কখন ময়ূর কি টিয়া দেখে ফেলুক, আর তারপর ওর ঠোকর খাওয়া হিয়াটা ভুল রাস্তায় পিয়া পিয়া করে ছুটে চলুক, তখন আমি ছাড়া ওকে সামাল দেবে কে?"

বিশ্বদেবের দিনলিপি থেকে:

আজকের অ্যাডভান্স পার্টিতে আমি, মদন, সর্দার আঙ শেরিং, নরবু, গুর্ণেদিন আর টাসি ছিলাম। আর ছিল শের সিং তার বাহিনী নিয়ে। পথপ্রদর্শক গোরা সিং ত আছেই।

সোয়া সাতটায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তার আগে সকালের খাবারটা বেশ পেট ভরে খেয়ে নিলাম। খাবারের মধ্যে দুখানা করে চাপাটি আর মগ ভর্তি চা। এই হল ব্রেকফাস্ট। "লাঞ্চ"টাও সঙ্গে নিলাম। লাঞ্চ মানে আলুর চাপাটি।

ফারাখড়ক থেকে যাত্রা করা মাত্র চড়াই শুরু হল। খুব যে খাড়া চড়াই, তা বলা চলে না। পাহাড়ের ঢাল থেকে আন্দাজ হল ১৪৫ অথবা ১৫০ ডিগ্রি কোণ হবে। তবে সোজাসুজি উঠতে হচ্ছিল বলে আজকে হাঁফ ধরে আসছিল। অবশ্য আজ আমরা অন্যদিনের তুলনায় দ্রুতই হাঁটছিলাম। শেরপাদের সঙ্গে সমান তালে। গত কয়েক-দিন ধীরগতিতে এসেছি। হাঁটছি কিনা, বুঝতেই পারিনি।

যাক, প্রথম চড়াইটা উঠবার পর পাহাড়টা আরও একটু ঢালু হয়ে এল। চলতে একটু আরাম পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আরেক মুশকিল দেখা দিল। জংগল ক্রমশ ঘন নিবিড় হয়ে উঠল। শেরপারা আগে আগে চলেছে। কুকরি দিয়ে তারা সমানে জংগল কাটতে লাগল। রাস্তা বের হল। আমরা সেই রাস্তায় মালবাহকদের চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলাম। এদিকে রোডোড্রেনডনের বন প্রচুর। কোথাও কোথাও মাইলের পর মাইল শুধু রোডোড্রেনডনের গাছ। ফুলের মরসুম নয়। এ বড় আফশোস। আরও একটু লক্ষ্য করে দেখছি, আরও হরেক রকম গাছ-গাছড়া রয়েছে। বিশেষ করে, এখানকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব করছে কঞ্চি আর জল-বিছুটি। এত উঁচু অলটিচিউডে জলবিছুটি এই আমি প্রথম দেখলাম। ভাগ্যি শেরপারা কুকরি এনেছিল!

এখন দেখছি সাত থেকে বার হাজার ফুট উপরে হিমালয়ে চলতে গেলে কুকরি বা কুড়ুল অপরিহার্য। আমরা গাছ কেটে, আগাছা মেরে পথ করতে করতে ক্রমশ উঠছি। কাটা গাছগুলোই পথের নিশানা হয়ে থাকছে। পরের দলটা এই নিশানা দেখেই এগিয়ে যেতে পারবে। যেখানে গাছ কাটার প্রয়োজন নেই অথচ নিশানা রাখতে হবে, সেখানে শেরপারা গাছের গায়ে কোপ মেরে চাকলা তুলে দিচ্ছে। যেখানে গাছ নেই, শুধুই পাথর, সেখানে আমরা জায়গায় জায়গায় পাথর সাজিয়ে রাখছি। এই সাজান পাথর, এই সব কাটা কাটা গাছপালা আমরা ত রেখে যাচ্ছি পিছনে। মাঝে মাঝে ভাবনা হচ্ছে ওদের নজরে এগুলো যদি না পড়ে! পাহাড়ের পথ বড় গোলমেলে। একবার খেই হারিয়ে ফেললে উদ্ধার পাওয়াই দায়!

ক্রমশ চড়াই কঠিন হতে লাগল। কখনও পাহাড় ডিঙিয়ে চলেছি, কখনও বা পাশ কাটিয়ে। সঙ্গের মালবাহকের দল কখনও পিছিয়ে পড়ছে। বড় দলটা ভেঙে ক্রমশ ছোট ছোট দল তৈরি হয়েছে। তাদের কখনও দেখা যাচ্ছে, কখনও তারা অদৃশ্য হয়ে পড়ছে।

আজ কি জানি কেন, বড় নিঃসংগ বোধ হচ্ছিল। আমরা সারাক্ষণ মুখ বুজেই

যাত্রা করতে না করতেই শুরু হল খাড়া চড়াই, শুরু হল জঙ্গল

চলছিলাম। ক্বচিৎ আমি আর মদন মুখ খুলছিলাম। এতদিনের চলার সঙ্গে আজকের তফাতটা বেশ বড় হয়েই ফুটে উঠছিল। এতদিন সমস্ত দলটা এক সঙ্গে এগিয়েছে। গদাই লস্করি চালে এগিয়েছে। দেখে মনে হত, এদের বুঝি তাড়া নেই। যতক্ষণ খুশি হাঁটছে, যতক্ষণ খুশি বসছে। হাসছে। কলরব করছে। সমস্ত দৃষ্টি-ভঙ্গীটাই যেন পিকনিক করার। ফলে ক্ষতি কি হয়েছে জানিনে, তবে এটা বলতে পারি, পথের কষ্ট এ ক'দিন একেবারে টের পাইনি।

পাহাড়ে "হাই অলটিটিউড্ এফেক্ট" বলে একটা কথা আছে। খুব উঁচুতে ওঠার পর মন খারাপ হয়, মেজাজ গরম হয়, স্নায়ু-গুলো তিরিক্ষে হয়ে পড়ে, একটুতেই রাগ হয়, এমন কি নিজেদের মধ্যে মারামারি পর্যন্ত হয়। এ আমরা পড়েছি, শুনেছি, দেখেওছি।

আর আমাদের "হাই অলটিটিউড এফেক্ট" হল ঠিক এর উল্টো। আমরা অতিরিক্ত হেসেছি। অত্যধিক ঠাট্টা তামাশা করেছি। মাঝে মাঝে আমরা এমন হাসি হেসেছি যে, সর্দার আঙ শেরিং ছুটে ছুটে এসেছে, বারবার সাবধান করেছেঃ সাবলোগ হিঁয়াপর হাঁসো মৎ। পাথর বাহাৎ লুজ হ্যায়। পাথর গিরেগা। হেসো না, এখানে তোমরা জোরে হেসো না। এখানকার পাথর বড় আলগা। সামান্য শব্দেই গড়িয়ে পড়তে পারে।

কিন্তু সর্দার যাই বলুক (যদিও তার কোন কথাই আমরা কখনও অমান্য করিনি) আমার ত মনে হয়েছে পাহাড়ে এসে যে প্রাণখোলা হাসি হাসতে পারে, পাহাড় তার কাছে কাবু। পাহাড়ের সকল অসুবিধা, সব কষ্ট, তার কাছে তুচ্ছ হয়ে ওঠে।

যারা হেসে গল্প করে মাতিয়ে পথ চলত, তারা সব পিছনের দলে আসছে। এখন তাদের অভাব খুব বোধ করছি। দুজন খবরের কাগজের লোক সঙ্গে আছেন। এই প্রথম এসেছেন পর্বত অভিযানে। রস তাঁদেরই বেশি। চলতে চলতে দেখেছি পরিশ্রমে ওঁদের কেউ কেউ কাতর হয়ে পড়েছেন। মুখ চোখের ভাব দেখে মনে হয় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছেন। তাঁদের সহন-শীলতা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। চলতে পারছেন না, বসে পড়েছেন। কিন্তু সে কয়েক মুহূর্ত মাত্র। যেই বুকে দম ফিরে এল, সঙ্গে সঙ্গে এমন এক কড়া মন্তব্য করে বসলেন যে, হাসির দমকে যাবতীয় ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। আজ আমাদের সঙ্গে তাঁরা যে নেই, প্রতি পদে সেটা টের পাচ্ছি। সত্যি বলতে কি, আজই প্রথম মনে হচ্ছিল, সত্যিই পাহাড়ে চড়ছি।

চলতে চলতে মধ্যে মধ্যে আনমনা হয়ে পড়ছিলাম। সে বরং ভালই হচ্ছিল একদিক দিয়ে। সর্বদা পথ সম্পর্কে সচেতন হয়ে থাকলে পথের কষ্ট বেড়েই চলে। আনমনা হওয়া ভাল।

একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম। সামনে একটা পাহাড়। দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে আছে। পথটা ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছে। পথের বাঁকে মোড় নিতেই আমার চোখের সামনে আর একটা পাহাড় ভেসে উঠল। দু হাজার আড়াই হাজার ফুট খাড়া উঠে গিয়েছে। পাহাড়টা আগাগোড়া বরফে ঢাকা। দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি ভয়াবহ। বিস্মিত নেত্রে সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। মদনের ধাক্কায় ঘোর কাটল।

মদন বলল, "বিশু, ওদিকটায় দেখেছিস?" মদনের কথামত চেয়ে দেখি মালবাহকেরা সব দাঁড়িয়ে পড়েছে। সর্দার আঙ শেরিং উত্তেজিতভাবে হাত পা নেড়ে কি সব বোঝাচ্ছে। মালবাহকদের মেট শের সিং যে ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে, তা এতদূর থেকেই আমাদের বুঝিয়ে দিলে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। কি জানি কেন, আশঙ্কায় আমার বুকটা কেঁপে উঠল। নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ব্যাপার কিছু ঘটেছে।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলাম। কাছে পৌঁছে সর্দার আঙ শেরিংকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি ব্যাপার?"

সে জবাব দেবার আগেই শের সিং চীৎকার করে বলে উঠল, "কৈ কুলিলোগ হিঁয়াসে এক কদম নেহি উঠেগা।"

আমি আর মদন তখনও ধাতস্থ হইনি। হাঁফাচ্ছি।

শের সিং আবার চীৎকার করে উঠল, "আপলোগ রুপেয়া দিজিয়ে ইয়া নেহি, কৈ বাৎ নেহি, লেকিন হামলোগ নেহি যারেঙ্গে।"

এই আশঙ্কাই করছিলাম। এই ধোটিয়াল মালবাহকদের সম্পর্কে অনেক কথা পড়েছি সাহেবদের বিবরণে। লোককে অসুবিধায় ফেলতে এদের চাইতে দক্ষ আর কেউ নেই, এমন মন্তব্য সাহেব অভিযাত্রীরা হামেশাই করেছেন। এমন কি, এ কথাও বলেছেন, এই ধোটিয়ালদের জ্বালায় অনেক অভিযান পণ্ড হয়ে গিয়েছে। এবার বুঝি আরেকটা হয়।

শের সিংকে থামতে বলে আঙ শেরিংকে পাশে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাপার কি সর্দার?"

আঙ শেরিং-এর মুখ থমথম করছে। সে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, "গোরা সিং বলছে আমাদের এই পথে এগুতে হবে। কিন্তু কুলিরা যেতে রাজি নয়। পাহাড়ে বরফ আছে। ওরা ভয় পেয়েছে। কিছুতেই ওদের রাজি করাতে পারছিনে।"

আঙ শেরিং-এর স্বরও কাঁপছে। সেও কি ঘাবড়ে গেল নাকি?

॥ বত্রিশ ॥

সামনেই রয়েছে পাহাড়টা। বিরাট আর উঁচু আর বরফ-ঢাকা। আর একেবারে নিস্তব্ধ। মদন একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে ছিল। সূর্যের আলো সেই জমাট সাদার উপর আছড়ে পড়ছে। কী প্রখর দীপ্তি ঠিকরে পড়ছে সেই পাহাড়ের গা থেকে! চোখে ধাঁধা লাগে। মাথা ধরে আসে। মদন রুকস্যাক থেকে একজোড়া স্নো গগলস্ বের করে চোখে আঁটল। হ্যাঁ, এতক্ষণে সে আরাম বোধ করল একটু।

আবার সে পাহাড়টার দিকে চাইল। সুদৃঢ় প্রতিরোধ রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়টা। তার ভাবখানা যেন এইঃ আমাকে পরাস্ত না করে তোমরা নন্দাঘুন্টির দিকে পা বাড়াতে পারবে না।

মদন ধীরে ধীরে চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে নিতে লাগল। ঐ যে ধোটিয়াল মালবাহকেরা, বোঝা নামিয়ে সব বসে রয়েছে। বিড়ি

ফ্‌ুঁকছে, গল্প করছে। মাঝে মধ্যে ভীত সন্ত্রস্ত চোখ মেলে সামনের পাহাড়টাকে দেখে নিচ্ছে। আর ঐ যে শের সিং, ওদের মেট্‌, একটা ছোট পাথরের উপর একটা পা তুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিদ্রোহী নেতার ভঙ্গীতে। ঐ যে নরবু, ঐ যে টাসি, গ্যুর্নদিন, ওরা বসেনি, দাঁড়িয়ে আছে নির্বাক। কেউ কেউ তুষার-গাঁইতিটা দিয়ে আলতো-ভাবে জমি সমান করছে। বিশ্বদেব কোথায় গেল?

ঐ যে ওরা—বিশ্ব আর সর্দার, একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে পরামর্শ করছে। এখনও ওদের বিশ্রামের সময় হয়নি। লাঞ্চের বিরতিরও দেরি আছে। তবু ওরা কেউ নড়ছে না। সমস্ত দলটারই গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। মদনের কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে।

বিশ্বদেব ডাকতেই মদন তার কাছে এগিয়ে গেল।

আঙ শেরিং বলল, মণ্ডল সাব্‌, কুলি-লোগ যায়েগা নেহি। বরফ না পড়লে এ ঝামেলা হত না। ওরা বরফকে বড় ভয় করে।

আঙ শেরিং শান্তভাবে কথাটা বলল। মদনের মনে হল জজ সাহেবের মুখ থেকে যেন ফাঁসির হুকুম শুনল। কার ফাঁসি? কেন, মদনের। মদন না ট্রান্সপোর্ট অফিসার? বেস ক্যাম্প পর্যন্ত মাল পেশঁছে দেওয়া তারই না দায়িত্ব? এখন, মালবাহকেরা যদি এখান থেকে ফিরে যায়, ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে এরা ফিরে যাবারই মতলব করছে, তা হলে ত অভিযান খতম হয়ে গেল। আর কার জন্যে এমন কাণ্ড হল। মদনের জন্য। মদন নিজের কাঁধেই দোষ চাপাল।

বিশ্বদেব বলল, "তা হলে এখন কি করা যায় মদন?"

মদনের কানে বিশ্বদেবের সশঙ্কিত প্রশ্ন ঢুকল না।

মদন ভাবছিল, ফিরে যাওয়ার অর্থ কি? আজ যদি ওরা ফিরে যায়, অভিযান এই-খানেই পণ্ড করে দিয়ে তা হলে অবস্থা কি দাঁড়াবে? পরে কোন অভিযান ওদের পক্ষে সংগঠন করা সাধ্য হবে কি? অসম্ভব। তার মানে বাংলাদেশের পর্বতারোহণ সম্পর্কে আগ্রহ ও উৎসাহের অকালমৃত্যু ঘটবে। আর তার জন্য কাকে দায়ী করবে ইতিহাস? অবশ্যই ট্রান্সপোর্ট অফিসার মদন মণ্ডলকে।

"কি রে মদন, ভাম মেরে গেলি যে!" বিশ্বদেব বলল, "কি করা যায় বল?"

মদন ভাবছে। হ্যাঁ, আমাকেই দুষবে সবাই। বলবে, কে ছিল ট্রান্সপোর্ট অফি-সার? মদন? তাই বল। সঙ্গীরা বলবে, মদন, মালবাহকদের উপর এই তোমার প্রভাব! এই তোমার মুরোদ! ছি মদন, আগে জানলে, এ ভার তোমাকে দিতাম না।

"মদন, এই মদন। কী রে! কী ইয়ার্কি হচ্ছে, অ্যাঁ। কথা কানে ঢুকছে না, নাকি?" বিশ্বদেব অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

না না অসম্ভব, এ হতে পারে না। এ আমি কিছুতেই হতে দিতে পারিনে। দেব না।

মদন আবার পাহাড়টার দিকে চাইল। পাহাড়টা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি বিরাট আর উঁচু আর হিংস্র। সাদা বরফ যেন উপহাসের এক প্রচণ্ড অট্টহাসি। সে অট্টহাসি এই জমাট শীতল স্তব্ধতা ভেদ করে মদনের মর্মে গিয়ে আঘাত করল। ওর পৌরুষে ঘা দিল। মুহূর্তের মধ্যে মদন অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়ে গেল। অন্তর থেকে সে প্রেরণা লাভ করল। প্রতিজ্ঞায় ভীষণ হয়ে উঠল। প্রকৃতি যত বাধাই সৃষ্টি করুক আগে, সেসব তারা চুরমার করে দেবে। হয় সফল হবে নয় মরবে। মদন ভাবল, একটি মৃত্যু কিছু না। কারণ এই মৃত্যু বাংলাদেশের শত হৃদয়ে প্রেরণার আগুন জ্বালিয়ে দেবে। আমরা কাপুরুষ নই, আমাদের চরম সান্ত্বনা হবে তাই।

"কি রে মদন," বিশ্বদেব চেঁচিয়ে উঠল। "ধ্যানে বসলি নাকি? বলিহারি যাই বাবা তোকে। শিরে যে সংক্রান্তি এসে পড়েছে, বলি সে খেয়াল আছে?"

মদন শান্তভাবে হাসল। বলল, "এত উতলা হচ্ছিস কেন বিশ্ব। ব্যস্ত হসনে। সব ঠিক হয়ে যাবে দেখিস।"

মদনের স্বরে বয়স্ক বলিষ্ঠ এক প্রত্যয় ফুটে উঠল। মদনের কথায় প্রশান্ত এক অভয়। বিশ্বদেবের অস্থিরতা মুহূর্তে কেটে গেল। বিশ্বদেব বিস্মিত হয়ে মদনের দিকে চাইল। সেই মদন তবু যেন সে মদন নয়।

বিশ্বদেব বলল, "এখন আমাদের কর্তব্য কি, বল ত।"

মদন তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলল, পাহাড়ের চূড়ার দিকে আঙুল তুলে, "ঐ ঐখানে গিয়ে পেশঁছান। কর্তব্য এই একটাই।"

"কিন্তু মালবাহকরা যদি না যায়?"

"সেই চেষ্টাই ত করতে হবে। শোন বিশ্ব, ওরা যে ভয় পেয়েছে, সেই ভয়টা ওদের ভাঙাতে হবে। আমি ঠিক করেছি, ওদের বুঝিয়ে বলব। আয় আমার সঙ্গে।"

আঙ শেরিং-এর সঙ্গে ওরা পরামর্শ

বিপদসংকুল পথে উঠছে মালবাহকের দল

করল। সর্দার সব ব্যাপারেই রাজী। মদন তখন মালবাহকদের জটলার কাছে এগিয়ে গেল।

মদন উঁচু একটা পাথরের উপর উঠে গলাটা চড়িয়ে বলল, "ভাই সব, যারা এর মধ্যে মরদ আছ, যারা পাহাড়ী মায়ের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছ, আমি তাদের কাছেই আমার আবেদন রাখছি। যেসব জেনানা এই দলে মর্দানার পোশাক পরে এসেছ তারা আমার কথা না শুনলেও আমার আফসোস নেই। এখন শোন। যারা তাদের বন্ধুদের মাঝপথে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে চায়, তারা চলে যাক। তাদের এক পয়সা মজুরি আমরা কাটব না। কিন্তু যারা নিজের ইচ্ছেয় যেতে চাইবে, তাদের যেন কেউ বাধা না দেয়। মনে রেখ, টিপ-ছাপ দিয়ে কণ্ট্রাক্টে সই করেছ।"

বেঁটে খাটো কর্ণবাহাদুর হাত জোড় করে উঠে দাঁড়াল। বলল, "হুজুর, সাব্..."

মদন বলল, "ভাই সব, আমরা কেউ সাহেব নই। আমাদের মধ্যে হুজুরও কেউ নেই। তোমরা যে ভারতের লোক, আমরাও সেই ভারতের লোক। তোমরা পাহাড়ী, আমরা সমতলের বাসিন্দা। এই মাত্র তফাত।"

মদন থামতেই কর্ণবাহাদুর হাতজোড় করে আবার উঠে দাঁড়াল। "হুজুর, সাব্! তোমাদের সংগে যেতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ বরফে আমাদের যেতে বল না। দোহাই তোমাদের। খতম হয়ে যাব।"

বিশ্বদেবের বুক দুরদুর করে উঠল। আঙ শেরিং-এর মুখ শুকিয়ে গেল। নরবু, টাসি, গুর্নদিন নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল। মালবাহকেরা উৎকর্ণ। সকলের দৃষ্টি মদনের দিকে। মদন একটুও চঞ্চল হল না। তার মুখে সুদৃঢ় প্রত্যয়, তার কণ্ঠস্বরে সুগভীর প্রশান্তি।

"আমি কাউকেই মরতে বলছি না।" নিরুত্তেজ অথচ স্পষ্ট উচ্চারণে মদন বলতে লাগল। "ঐ পাহাড়ে মৃত্যু যদি ওত পেতে থাকে তবে সেখানে কাউকেই যেতে বলব না। কিন্তু শোন ভাই সব, আমরা সেখানে যাচ্ছি। আমি, বিশ্বাস আর শেরপারা—এই ক'জন শুধু যাব। তোমরা এখানে বসে বসে শুধু দেখ। আমাদের দেশে পাহাড় নেই, বরফ নেই। তবু আমরা ঐ বরফের উপর দিয়ে পাহাড়ে উঠতে যাচ্ছি। যদি আমরা মরে যাই, তোমরা ফিরে চলে যেয়ো। তোমাদের মজুরি ম্যানেজার দিয়ে দেবে। আর যদি দেখ আমরা মরিনি, উঠে গিয়েছি তা হলে তোমাদের মধ্যে যে কয়জন মরদ আছ তারা আমাদের সংগে এসো। আর জেনানারা ফিরে চলে যেয়ো।"

মদন শের সিংকে ডাকল, "শের সিং।"

"সাব্।" শের সিং হাত কচলাতে কচলাতে এগিয়ে এল।

মদন তার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে বলল, "তু ত শের হ্যায়। সাচ্চা শের শিয়ালকা মাফিক কাম নেহি করতা হ্যায়।"

"জী সাব্।"

মদন বলল, "তোমারই জিম্মায় এদের সবাইকে রেখে যাচ্ছি।"

"জী সাব্।"

মদন পাথর থেকে নামল। তারপর কোনদিকে না চেয়েই নিজের রুকস্যাক ঘাড়ে তুলল। স্ট্র্যাপ দুটো ঠিক করে এঁটে নিয়ে আইস অ্যাক্স্ তুলে নিল।

তারপর বলল, "আয় বিশ্ব।"

জয় বদ্রীবিশালজী কি আওয়াজ তুলে ওরা তিনজন পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল সেই প্রবল প্রতিরোধের দিকে।

অসম্ভব খাড়া উৎরাই। তার উপর বরফ। নতুন বরফ। কোথাও কোথাও দু তিন ফুট পর্যন্ত বরফের আস্তরণ পড়ে গেছে। বরফ খুবই নরম, খুবই আলগা। ওরা ছ'জন লাইনবন্দী হয়ে চলেছে। পাছে চলার গতি শ্লথ হয়ে আসে, তাই ওরা দড়ি বাঁধেনি। আঙ শেরিং পিছন থেকে নির্দেশ দিচ্ছে। টাসি সেই নির্দেশ অনুযায়ী সামনে সামনে পথ কাটতে কাটতে চলেছে। টাসি অধিকাংশ সময়েই লাথি মেরে মেরে ধাপ কাটছে। কচিৎ সে তুষার-গাঁইতি কাজে লাগিয়েছে।

বিশ্বদেবের বেশ কষ্ট হচ্ছে। মদনেরও। হাঁফ ধরছে। বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাবে বোধ হয়। একটু বিশ্রাম চাই। একটু থামলে হ'ত না। নিচে মালবাহকরা চেয়ে আছে ওদের দিকে। থামলে চলবে না। বুক যদি ফেটে যায়, যাক।

বিশ্বদেব নিচের দিকে একবার চাইল। অনেকখানি উঠে এসেছে ওরা। মালবাহকদের খুদে খুদে কতকগুলো পোকার মত দেখাচ্ছে। না, ওদের কারোর মধ্যে কোনরকম চঞ্চলতা ত দেখা যাচ্ছে না। তবে কি উঠবে না ওরা? ফিরে যাবে?

বিশ্বদেবের পা হড়কে গেল। তুষার-গাঁইতিতে ভর দিয়ে কোনরকমে সামলে গেল। নাঃ, অনামনস্ক হলে চলবে না। বড় বিপদ ঘটে যেতে পারে। কিন্তু আর কতটা উঠতে হবে। আর পারছে না বিশ্বদেব। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বুকের ভিতর ভয়ানক আওয়াজ হচ্ছে। কানের ভিতর ঝিঁঝি পোকার গান শুরু হয়েছে। একটু বিশ্রাম চাই, এবার একটু বিশ্রাম চাই। ঘাম কলকল করে বেরিয়ে চোখে মুখে ঢুকে পড়ছে। পা আর তুলতে পারবে না বুঝি। শরীর থরথর করে কাঁপতে লেগেছে। তবু ওরা এগিয়ে চলেছে। থামবে না, কিছুতেই থামবে না।

হঠাৎ বিশ্বদেবের মনে হল, এ বুঝি তার চোখের ভুল। আবার ভাল করে চেয়ে দেখল। না, ভুল নয় ত। সত্যিই এই সাদা বরফের উপর দিয়ে একটা পিঁপড়ের সারি এগিয়ে আসছে। এখানে এত ঠাণ্ডায় পিঁপড়ে উঠবে কোত্থেকে। না না পিঁপড়ে নয়, ওরা মালবাহক।

বিশ্বদেব তুষার-গাঁইতির উপর শরীরের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "মদন, মদন, উ লোগ আতা হ্যায়, উ লোগ আতা হ্যায়।"

বিশ্বদেবের চীৎকারে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, সত্যিই পিঠের উপর ঝোলা তুলে ওরা অতি কষ্টে উপরে উঠছে। সবাই আসছে। মদনের বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। "জয় বদ্রীবিশালজী কি।"

(ক্রমশ)

রেম্‌ব্রান্টের তুলিকায় মুঘল চিত্রের প্রতিলিপি

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

হল্যাণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর ভ্যান্-রিন্ রেমব্রান্ট্ (১৬০৬—১৬৬৯ খৃঃ অঃ) মূর্তি-চিত্রকাররূপে দেশ-বিদেশে সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। মূর্তিচিত্রে তিনি এমন সব নূতন ধারা ও রীতির প্রবর্তন করেন, যাহার দ্বারা ১৭ শতকের য়ুরোপীয় চিত্রকলা নূতন মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। তিন শতাব্দীর পরেও এই প্রতিভাবান কলা-শিল্পীর বিশ্বজয়ী খ্যাতি এখনও অম্লান রহিয়াছে। এখনও তাঁহার তুলিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর চিত্র লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হয়। বিলাতের ন্যাশনাল গ্যালারীতে রেমব্রাণ্টের কলমে লেখা ১৭খানি চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে—তাহার মধ্যে তাঁহার 'বৃদ্ধার' চিত্র 'শ্রেষ্ঠচিত্র' বলিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছে। তাঁহার মূর্তিচিত্রের বিশেষত্ব এই যে—নানা রীতির অন্ধকার পটভূমিকার উপর চিত্রিত মানুষের মুখখানি প্রস্ফুটিত পদ্মের মত ফুটিয়া থাকে। তাঁহার রচিত একাধিক নিজের প্রতিমূর্তিতেও এই বিশিষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। তিনি যাহাই দেখিতেন—তাহাই তাঁহার পটের উপর 'আলো' ও 'ছায়ার' যাদুবিদ্যায় রূপান্তরিত হইত। তাঁহার চিত্র-পটের মুখ-চিত্রগুলি চারি দিকের গভীর ছায়া গ্রাস করিবার বৃথা চেষ্টা করে, কিন্তু মধ্যদেশে লিখিত আলোকিত 'মুখ'খানি মণিমাণিক্যের মতন দীপামান থাকে। একাধিক ওস্তাদ শিল্পী ও বিখ্যাত সমালোচকরা রেমব্রাণ্টের কলা-কুশলতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। স্যার ফ্রেডরিক লেটন্ বলিয়াছেন "এই ওস্তাদ মূর্তি-চিত্রকার সন্ধ্যালোকের কাব্য এবং অন্ধকারের যাদুর জগৎ নূতন রীতিতে পরিদৃশ্যমান করে রেখে দিয়েছেন—যাহার তুলনা দেখা যায় না।" জন রস্কিনের মতে রেমব্রাণ্টের চিত্রিত পটমালা — ছায়ার সজীবতায় এবং আলোকের নিষ্প্রভতায়—বিচিত্র রীতিতে উজ্জ্বল ও মহিমাময়।

মূর্তিচিত্রকলায় ভারতের মুঘল কলা-রীতির প্রশংসা সারা বিশ্বে প্রচারিত হইয়া-ছিল এবং এই প্রশংসা রেমব্রাণ্টের কানেও পৌঁছাইলে, তিনি কতিপয় মুঘল-মূর্তি-চিত্রের নিদর্শন সংগ্রহ করিয়া তাহার 'নকল' করিয়াছিলেন। তাঁহার মত বিশ্ববিখ্যাত মূর্তিকার মুঘল মূর্তিকলার 'নকল' করিয়া ভারতের কলা-শিল্পকে উচ্চ সম্মান দিয়া-ছেন। এই নকল কলার [illegible] যে ভারতীয় মূর্তিচিত্রকলার রীতিতে কোনও নূতন ধারার অনুসন্ধান করা—এবং তাহার বিশিষ্ট গুণ ও লক্ষণ আত্মসাৎ করা। তিনি যে বহুসংখ্যক মুঘল চিত্র নকল করিয়াছিলেন—তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে—জোনাথন্ রিচার্ড-সনের নিলামের বিক্রয়-সূচীপুস্তকে **"(A Book of Indian Drawings by Rembrandt 25 in numbers")** ১৯০৪ সালে ফ্রেদ্রিসে সারে, প্রাসিয়ান্ কলাবিষয়ক বার্ষিক পত্রিকায় রেমব্রান্টের ভারতীয় চিত্রকলার নকল রেখাচিত্রের বিবরণ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি বিলাতে সদ্‌বে কোম্পানির (Sotheby) নিলামে, সাহাজাহানের মূর্তির রেম্‌ব্রাণ্টের নকল, একখানি রেখাচিত্র তের হাজার পাঁচ শত পাউণ্ডে (এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচ শত টাকা) বিক্রয় হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, নিলামে এই উচ্চ মূল্যে মুঘল কলমের চিত্ররীতির প্রাপ্য—না ওস্তাদ শিল্পী বিশ্ববিখ্যাত রেম্‌ব্রাণ্টের তুলিকার রেখাচিত্র বলিয়া এত উচ্চদাম অর্জন করিয়াছে। সম্প্রতি দুই একখানা মুঘল চিত্র দুই এক হাজারে বিক্রয় হইয়াছে বটে, কিন্তু এক লক্ষ দামের সীমায় এখনও মুঘল চিত্রাবলী উন্নত হইতে পারে নাই। মুঘল চিত্রাবলী বিশেষ সম্মান লাভ করে—যখন অস্ট্রিয়ার মহারানী মারিয়া থেরেসা (১৭৪০—৮০) তাঁহার ভিয়েনা শহরের নিকট নূতন প্রাসাদ সোনরুন্ নির্মাণ করিয়া (১৭৬২

শিল্পী রেমব্রাণ্টের তুলিকায় একটি মুঘল চিত্রের নকল

খৃঃ অব্দে) তাহার একটি বিলাস-কক্ষের দেওয়াল—অনেক মুঘল চিত্র ৬০খানা ফ্রেমে বাঁধাইয়া গৃহটি সুসজ্জিত করেন।

ইহার পূর্বেই রেমব্রাণ্ট অন্তত ২৫খানা মুঘল-চিত্রের 'নকল' করিয়া ভারতের এই পদ্ধতির কলাচিত্রের প্রতি প্রভূত সম্মান দেখাইয়াছিলেন। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে রেমব্রাণ্ট মুঘল চিত্রকলার একজন গুণগ্রাহী ভক্ত ছিলেন এবং নানাচিত্রের নকল করিয়া তিনি ঐ রীতির চিত্রকলার বিশিষ্ট লক্ষণ ও গুণ আত্মসাৎ করিতে অনেক সাধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা কতটা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল তাহা নিশ্চিত-রূপে বিচার করা দুরূহ। কারণ তাহার উপরে উক্ত ২৫খানা নকলের মধ্যে ২।১ খানা পাওয়া গিয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধের সহিত একখানা প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম। এই নকল চিত্রে মুঘল চিত্ররীতির সূক্ষ্ম রেখা-বিন্যাস ও সাবলীল ছন্দ ও বলিষ্ঠ কলাভঙ্গীর কোনও গুণই প্রস্ফুটিত হয় নাই। সম্ভবত অন্যান্য 'নকলে' মুঘল-রীতির সুকুমারত্বের, এবং 'এক্‌বাল্‌-কলমের' (one-hairbrush) সবল ছন্দের প্রমাণ বর্তমান ছিল। সমস্ত 'নকল'গুলি বিচার করিয়া না দেখিলে, এই পথে রেম্‌-ব্রাণ্টের সাধনার সিদ্ধির বিষয়ে চূড়ান্ত অভিমত দেওয়া যায় না।

কবিতা

হাইনের শ্রেষ্ঠ কবিতা। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত। দীপায়ন প্রকাশনা ভবন। ২৮-সি, মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা—২৬। চার টাকা।

উনিশ শতকের মধ্যদেশ দীপ্ত করে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জার্মান গীতিকবি হেইনরিখ হাইনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রায় দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে তিনি পৃথিবীর কাব্য-সাহিত্যে জ্যোতিষ্কের মত বিরাজিত। বাঙালী পাঠক এবং কবির কাছে তিনি অতিপরিচিত এবং প্রিয় কবি। প্রায় সত্তর বছর আগেই তাঁর কবিতা বাঙলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং আজ পর্যন্ত হচ্ছে। হাইনের কবিতাবলী থেকে উনচাল্লিশটি কবিতার অনুবাদ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তরুণ এবং প্রবীণ বাঙালী কবিরা এই অনুবাদ কার্য সমাধা করেছেন। অনুবাদের পাশে মূল জার্মান কবিতাও ছাপা হয়েছে। অবশ্য প্রত্যেকটি অনুবাদই মূল জার্মান থেকে করা হয়েছে, এমন নয়। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, সৌম্যেন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থের প্রত্যেকটি অনুবাদই মুগ্ধ করবার মত নয় হয়ত, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই প্রচেষ্টা স্মরণযোগ্য। মূল জার্মান কবিতার প্রতিলিপি সাধারণ পাঠকের কোন উপকারে লেগেছে, এমন মনে হয় না, বরং ইংরেজী তর্জমা গ্রথিত হলে ভালো হত। ভূমিকায় এবং সম্পাদনায় জার্মান কাব্য-সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা এবং ভালোবাসা বিকীর্ণ হয়েছে।

গ্রন্থটির সর্বাঙ্গ সুন্দর। ৬৬।৬১

মেঘদূত। অনুবাদক : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদক : সুশীল রায়। ধ্রুপদী প্রকাশন, ১৩-বি, কাঁকুলিয়া রোড, কলিকাতা—১৯। দেড় টাকা।

'মেঘদূত' কাব্যের প্রভাব এবং অনুবাদ সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়ানো। ধর্মগ্রন্থ বাদে, কেবলমাত্র কাব্যমূল্যে, যুগ-যুগ ধরে এমন বহুল প্রচারিত ও পঠিত কাব্য ভারতীয় সাহিত্যে দ্বিতীয় রচিত হয়নি বলে আমাদের ধারণা। মূল সংস্কৃত থেকে বাঙলায় মেঘদূতের সম্পূর্ণ অনুবাদের সংখ্যা খুব সামান্য নয়। তাদের কিছু গদ্যে, কিছু পদ্যে এবং সামান্যই কবিতায় অনূদিত হয়েছে। মেঘদূতের কাব্যানুবাদগুলির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। এমন সহজ সাবলীল অথচ নিষ্ঠাপূর্ণ অনুবাদ খুব বেশী চোখে পড়ে না। অতি তরুণ বয়সে দ্বিজেন্দ্রনাথ এই অনুবাদ সম্পন্ন করেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে, অর্থাৎ আজ থেকে একশ' বছর আগে। শতবর্ষ পূর্বের উন্নাসিক কবি মধুসূদন পর্যন্ত এই অনুবাদের প্রশংসা করে-ছিলেন। দীর্ঘকাল এই গ্রন্থটি অমুদ্রিত ছিল। সম্পাদক এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের পুনরুদ্ধার এবং বর্তমান কালের উপযোগী করে যথাসময়েই আমাদের হাতে তুলে দিলেন, এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। অনুবাদের ক্ষেত্রে অধিকারী ভেদ আছে, একথা আজকাল আমরা বিস্মৃত হতে বসেছি। তাই শ্রদ্ধাহীন হাতের অনুবাদের অনুবাদ অনেক সময় পাঠককে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। আলোচ্য অনুবাদক যে যোগ্য ব্যক্তি সন্দেহ নেই, সম্পাদক হিসাবে শ্রীযুত সুশীল রায়ও অনধিকারী নন। কিছুকাল পূর্বে গদ্যে যে মেঘদূতের মর্মবাণী প্রকাশ করেছিলেন,

'আলেখ্য দর্শন' নামে সেটি এ-প্রসঙ্গে অনুল্লেখ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ সহ দ্বিজেন্দ্রনাথের একখানি মূল্যবান আলোকচিত্র ও মণিভূষণ গুপ্ত অঙ্কিত 'যক্ষপত্নী'র রঙিন চিত্র গ্রন্থের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

১১১।৬১

উপন্যাস

মল্লিকা। বিমল কর। কথাকলি, ১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা। তিন টাকা।

একটি প্রেমের উপন্যাস—মল্লিকা; কিন্তু এইটুকু বললেই সন্দেহ থাকে, সব বলা হলো কিনা। প্রেম-বিষয়ের ব্যবহার বিমল করের প্রায় প্রতিটি রচনার মধ্যেই কিছু না কিছু থাকে; কিন্তু সন্দেহ করি, শুধু মাত্র প্রেমকে উপজীব্য ক'রেই সম্প্রতিকালে তিনি কিছু লিখেছেন কিনা। এখন অতি সহজে ও সংক্ষেপে বলা চলে, 'মল্লিকা' একটি অ-সচরাচর উপন্যাস। এবং বিমল করের সাম্প্রতিক সাহিত্যচিন্তায় তরঙ্গ-সংকুল বিহ্বলতার মধ্যে 'মল্লিকা'র উপস্থিতি একটি দ্বীপের মতো, বিশ্রামের মতো।

এবং 'মল্লিকা', অনুভূতিপ্রবণ যে কোনো যুবক, যে কোনো স্মৃতিজীবী প্রৌঢ়ের কৈশোর ও যৌবনের প্রেমের অভিজ্ঞতা ব'লে মনে হ'তে পারে। তিন পর্বে বিভক্ত সমগ্র কাহিনীটি, কৈশোরের স্ফুটনোন্মুখ অথচ অপরিচিত যন্ত্রণার অভিব্যক্তি; যৌবনের প্রাপ্তি ও সেই প্রাপ্তিজনিত সংশয় ও বিবিক্ত হৃদয়াবেগ; তৃতীয় পর্বে স্বীকৃতি ও বিচ্ছেদের দৈবত-চিত্র। সমগ্র উপন্যাসটি উত্তম পুরুষে লেখা, ফলত আত্ম-জৈবনিক, স্মৃতি-রোমন্থনের চিহ্ন সর্বত্র প্রতীয়মান হয়। এই স্মৃতিকাহিনীর কথক শ্যামল; যৌবনেই দিক-ভ্রষ্ট, অস্থিতির যন্ত্রণার সঙ্গে যার মিশেছে মনোবাসিত মল্লিকার জন্য করুণ আকাঙ্ক্ষা। দ্বিধায়, সংশয়ে আন্দোলিত সে যখন বন্ধপরিকর দাবি নিয়ে মল্লিকার কাছে উপস্থিত হলো, স্বাভাবিক কারণে, তখন অত্যন্ত দেরি হ'য়ে গেছে; মল্লিকার স্বীকারোক্তি তাকে বিচ্ছেদের অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই উপহার দিতে পারে না।

প্রেম-বিষয়ক অসংখ্য নির্মল অনুভূতি ও জীবনের বহু খণ্ড সত্য অখণ্ড রূপে নিয়ে এই উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে, যা যে কোনো অনুভূতিপ্রবণ পাঠকের হৃদয়ের সমর্থন পাবে। উপরন্তু কাশী ও কয়লা-খনি-শহরের যেসব দৃশ্য এই উপন্যাসে পরিবেশিত, গ্রন্থের পরিণতির সঙ্গে কোথায় যেন তার যোগ রয়েছে; শীতের অপরাহ্নের ধূসর আকাশের মতো, একটি আচ্ছন্ন বিষাদ পাঠককে মোহগ্রস্ত না ক'রে পারে না। 'মল্লিকা' আধুনিক জীবনের একটি বিয়োগান্তক চিত্র; এবং বিমল করের অন্যতম সার্থক সৃষ্টি; যা পড়তে গেলে, দুঃখ ও যন্ত্রণা পেতে হবে, কিন্তু সরিয়ে রাখা অসম্ভব।

১২০।৬১

অনুবাদ গ্রন্থ

স্বর্ণাঞ্জলি : চার্লস ফ্রিয়ার অ্যান্ড্রুজ। সম্পাদনা ও অনুবাদ : নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক : রাইটার্স সিন্ডিকেট। ৮৭ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। দাম চার টাকা।

সি এফ অ্যান্ড্রুজ এই বিদেশী নামটির

সঙ্গে সমস্ত ভারতবাসী পরিচিত। বিদেশী ইংরেজ হয়ে তিনি এই ভারতভূমিকে আপনার নবজন্মভূমি বলে গ্রহণ করেছিলেন। পরাধীন ভারতবাসী ও সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদ পীড়িত বঞ্চিত মানুষের সেবায় তিনি তাঁর জীবনদান করেছিলেন। অতুলনীয় তাঁর দান। কিছুই তিনি রাখেননি। আর্তত্রাণে তিনি শ্রেষ্ঠ দান করেছিলেন—তাঁর সমগ্র জীবন। এই অ্যান্ড্রুজ দীনবন্ধু নামে খ্যাত। তিনি প্রথমে মিশনারী শিক্ষক হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। কিন্তু ভারতবাসী ও ভারতবর্ষকে আহ্বান করে নেবার প্রেরণায় তিনি খৃষ্টান ধর্মযাজকের বস্ত্র পরিত্যাগ করে বৈরাগী গণসাধকের ব্রত গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথকে তিনি গুরুদেব রূপে গ্রহণ করেন। গান্ধীজীর তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গ সুহৃদ। ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে তিনি একাত্ম ছিলেন।

লোকধর্মের গণ্ডির মধ্যে অ্যান্ড্রুজ থাকতে পারেন নি। কারণ তিনি ছিলেন পরম মানবধর্মী। বিশ্বমানবের আনন্দ-বেদনার আসনে তিনি তাঁর প্রভু যীশুখৃষ্টকে প্রতিভাত দেখেছিলেন। 'হোয়াট আই ও টু ক্রাইস্ট' অ্যান্ড্রুজের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যে যীশুর জীবনাদর্শের অনুপ্রেরণায় সেবা ও মানবতার ধর্মে তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গীকৃত—সেই যীশুর প্রতি তাঁর অবিচল বিশ্বাস ও প্রেরণার আত্মকাহিনী এই গ্রন্থ। ধর্ম যে কোন ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না, যীশুখৃষ্টের মহিমা যে দেশকাল পাত্রের গণ্ডির মধ্যে সীমিত নয়,—এই চরম উপলব্ধিকে অ্যান্ড্রুজ নিঃশংসয়ে উজ্জ্বলতায় প্রকাশ করেছেন এই গ্রন্থে। জীবনদেবতার চরণে জীবনপথিকের ঋণাঞ্জলি এই গ্রন্থ।

শ্রীনির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় আরো কয়েকটি বিখ্যাত বিদেশী বই এর সার্থক বঙ্গানুবাদ করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। 'ঋণাঞ্জলি' অনুবাদে তিনি যে নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। এক আশ্চর্য বিষয়কে আশ্চর্য শ্রদ্ধার সঙ্গে আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় ভাষান্তরিত করেছেন তিনি। তাছাড়া একটি দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি অ্যান্ড্রুজ জীবনের একটি সারাৎসার দিয়েছেন, যা অতিশয় মূল্যবান। ভারতীয় ভাষায় দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা ও তাঁর ভারত-সম্পর্ক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা দেশবাসীর অবশ্য কর্তব্য। শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় সেই কর্তব্যের সূচনা করে সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ৩৮১।৬০

পত্রিকা

সন্দেশ। সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ৩, লেক টেম্পল রোড, কলকাতা ১৯। দাম ৭৫ নয়া পয়সা।

অত্যন্ত সুখের কথা একদার সেই ছোটদের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পত্রিকা 'সন্দেশ' দীর্ঘকাল পরে আবার প্রকাশিত হয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সত্যজিৎ রায়ের সম্পাদনায় এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি দেখে আমরা প্রীত হয়েছি। পত্রিকাটিতে সুখ্যাত শিশুসাহিত্যিকদের রচনা ছাড়াও কয়েকজন প্রায় নতুনের লেখা আছে। ছবির আকর্ষণও যথেষ্ট। আশা করি 'সন্দেশ' এ-কালের শিশুদের মুখে হাসি ভরে তুলবে।

প্রাপ্তি-স্বীকার

সমাজতন্ত্র কোন পথে? —মাখন পাল।

বিজ্ঞান বিচিত্রা—শ্রীচন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন। অনুবাদক—শ্রীসুধাংশু প্রকাশ চৌধুরী।

মানুষ দেবতা হবে না—রবি গুহ মজুমদার।

রবীন্দ্রনাথ—শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ।

অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রণ্ট—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা।

একশো রবির ছড়া ছবি—গোবিন্দমোহন গুপ্ত।

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

পটমঞ্জরীর প্রথম চিত্রার্ঘ্য "মেঘ"-এর প্রধান নারী চরিত্রে নবাগতা অভিনেত্রী মালবিকা গুপ্ত

জীবন-সংগ্রামী নারীর পতি-নির্বাচন

স্বয়ম্বরার হাতের মালা বুঝি কী এক দ্বন্দ্বের বাতাসে দোলায়িত হয়ে ওঠে। বরণীয় কে? কার গলায় দুলবে এই মালা? দুই পুরুষের মাঝে এক আধুনিকার জীবনে কেমনভাবে এই দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তা নিয়ে রসসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষের একটি ছোট গল্পের চিত্ররূপ ইউনাইটেড ফিল্মস-এর "স্বয়ম্বরা"।

কিন্তু অসিত সেন পরিচালিত এই ছবিতে সন্তোষ ঘোষের কাহিনীর নায়িকা রয়েছে, তার পাণি ও প্রণয়প্রার্থী দুই যুবক রয়েছে এবং সেই সংগে রয়েছে মূল আখ্যানের পরিবেশ ও পরিমণ্ডল। নেই শুধু কাহিনীর মূল রস—যা এক নারী-হৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্বকে ঘিরে জীবনবোধের বেদনা ও আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

ছবির নায়িকা লীলার জীবনে যে দুই পুরুষের পদক্ষেপ ঘটেছে তাদের একজন স্মরজিৎ, অপরজন অনুপম।

চিত্রনাট্যে স্মরজিৎ ও অনুপমের চরিত্র এমনভাবে উপস্থাপিত ও বিন্যস্ত যে তাদের মধ্যে কে বরণীয় আর কে বর্জনীয় তা বুঝে নিতে দর্শকের যেমনি কোন কষ্ট হয় না, তেমনি নায়িকার মনেও কোন দ্বন্দ্বের রেখাপাত দেখা যায় না। কারণ ছবিতে স্মরজিৎ উদার প্রাণের প্রতীক, আদর্শবান, প্রেমিক। আর অনুপম প্রথমে উন্নাসিক, আত্মমর্যাদা-জ্ঞানহীন এবং নারীসংসর্গে চঞ্চলচিত্ত। নায়িকার ভৎসনায় তার মধ্যে পরিবর্তন যখন এল, তখনও সে আত্মকেন্দ্রিক প্রণয়াভিলাষী, অভীষ্টসিদ্ধিতে চতুর এবং নায়িকার অনুরোধ, আকাঙ্ক্ষা ও মিনতির প্রতি সমবেদনাহীন।

নায়িকা যে অনুপমকে বিয়ে করবার জন্য সাময়িকভাবে সম্মত হয়, তার মূলে দেখা যায় প্রেমাস্পদের প্রতি তার অভিমান এবং তার মায়ের আকুতি ও আদেশ। অনুপম কখনও যে লীলার মন অনুরাগের রঙে রাঙিয়ে তুলেছে ছবিতে তার কোন আভাস নেই। সুতরাং স্মরজিৎ ও অনুপমকে নিয়ে লীলার জীবনে কোন দ্বন্দ্ব ও সংঘাত রূপ নেয়নি ছবিতে। ফলে সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্পের মূল রসকেন্দ্রবিন্দুটি ছবিতে বর্জিত।

ছবির পর্দায় যে প্রণয়োপাখ্যান রূপ নিয়েছে তার গতি, প্রকৃতি ও পরিণতি

অত্যন্ত মামুলি। ত্রিকোণ প্রণয়-কাহিনী বাদে ছবিতে নায়িকার বাড়ির যে উপ-কাহিনী গড়ে উঠেছে তার উপকরণরাজিও গতানুগতিক। অভাবের তাড়নায় খিটখিটে-হয়ে-ওঠা গৃহকর্ত্রীর গঞ্জনায় সদাপীড়িত অক্ষম গৃহস্বামী, চাকুরে মেয়ের প্রতি ভবিষ্যৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিশ্রুতিতে সদা-লালায়িত জননীর হৃদয়হীনতা ও বিনা কুণ্ঠায় মেয়েকে প্রণয়ীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠাবান পাত্রের হাতে তুলে দেওয়ার অপচেষ্টা, মেয়ের জন্য স্নেহশীল পিতার গোপন সমবেদনা, এবং সংসারের অভাব-অশান্তি নিয়ে কতকগুলি করুণ ঘটনার সমাবেশ—এইরকম সব বহুব্যবহৃত উপাদান স্তরে স্তরে সাজানো হয়েছে এই উপকাহিনীতে।

এই বিবর্ণ চিত্রকাহিনীর বিন্যাস ও উপ-স্থাপনে পরিচালক অসিত সেন ছবির প্রথমাংশে তাঁর প্রয়োগ-নৈপুণ্যের সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। নায়ক-নায়িকার মধ্যে (স্মরজিৎ ও লীলা) প্রেম-সম্বন্ধটি গড়ে ওঠার পর্বটি পরিচালক প্রশংসনীয় রসবোধ ও পরিমিতিবোধের ভেতর দিয়ে রূপায়িত করে তুলেছেন। ছবির এই প্রথম অধ্যায়টি দর্শককে নিঃসংশয়ে আনন্দ দেয় ও অভিভূত করে রাখে। স্মরজিতের চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলতেও তিনি কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

কিন্তু ছবির দ্বিতীয়ার্ধের বিন্যাসে পরি-চালকের প্রয়োগ-কর্ম বৈশিষ্ট্যহীন। নায়িকার মনের ভয় ও আশঙ্কা ফুটিয়ে তুলতে পরিচালক তার মা ও ভাই-বোনকে ভিক্ষুক সাজিয়ে দর্শককে যে রূপক-চিত্রটি দেখিয়েছেন তা অপরিণত রসজ্ঞানের পরি-চায়ক। অসিত সেনের পরিচালনায় এমনি ধারা অপরিপক্কতার আরও একটি নিদর্শন নায়িকার বাড়ির রেডিওটি। নিদারুণ অভাবের সংসারে এই রেডিওটি এক হাস্যকর বৈসাদৃশ্যের প্রতীক। হয়তো একটি গানের জন্যই এই রেডিওটির প্রয়োজন ছিল —যে গান ছবিতে কোন নাট্যমুহূর্ত গড়ে তুলতে পারেনি।

ছবির এইসব দুর্বলতা সত্ত্বেও এর মধ্যে দর্শকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট করে রাখবার মত অনেক শিল্পশোভন ও মনোময় দৃশ্য রয়েছে। এইসব দৃশ্যে কৃতী চিত্র-পরিচালক অসিত সেনের সক্রিয় উপস্থিতিকে স্বচ্ছন্দে অনুভব করা যায়। কিন্তু সুন্দর সুন্দর এইসব দৃশ্যরাজি ও নাট্যঘটনাপুঞ্জ সামগ্রিকভাবে ছবিতে কোন অবিচ্ছিন্ন আবেগরসের ধারা বইয়ে দিতে পারেনি।

এই ছবির সর্বপ্রধান আকর্ষণ স্মরজিতের রূপসজ্জায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয়। অভিনেতা তাঁর অনুভূতি ও বুদ্ধি দিয়ে চরিত্রটিকে অপূর্বভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই চরিত্রের প্রাণোচ্ছলতা ও প্রণয়াবেগ তিনি তাঁর অভিব্যক্তিতে এমন সাবলীল ও মধুময় করে তুলেছেন যা দর্শককে এক মর্মসঞ্চারী সুখানুভূতিতে অভিভূত করে রাখে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের এই অভিনয় দর্শকের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নায়িকা লীলার চরিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরীর অভিনয়ও বেশ স্বচ্ছন্দ। কিন্তু চরিত্রটিকে হৃদয়াবেগের সিঞ্চনে তিনি আরও মরমী করে তুলতে পারতেন। এই চরিত্রের রূপ-সজ্জায় ভ্রূযুগলে কাজল-প্রলেপ ও লিপ-স্টিকে ওষ্ঠরঞ্জন খুবই পীড়াদায়ক। খেটে-খাওয়া চাকুরে মেয়ের এই প্রসাধন পরিচালক বর্জন করতে পারতেন।

ছবির উপনায়ক অর্থাৎ অনুপমের ভূমিকায় দিলীপ মুখোপাধ্যায় নিজের অভিনয়-দক্ষতায় চরিত্রটির দুর্বলতা অনেক-খানি অতিক্রম করেছেন। এই নবাগত অভিনেতার শিল্পী-ব্যক্তিত্ব লক্ষণীয়।

নায়িকার পিতার চরিত্রে বিকাশ রায়ের অভিনয় চিত্তগ্রাহী। মুহূর্তের অভিব্যক্তিতে চরিত্রটির অস্ফুট বেদনা ও বঞ্চনা, এবং এক টুকরো হাসিতে অন্তরের প্রসন্নতা তিনি অননুকরণীয় অভিনয়-নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়িকার মায়ের ভূমিকায় সীতা মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় চিত্রনাট্যের প্রয়োজনেই শুধু মিটিয়েছে।

স্বল্প অবকাশে যাঁরা ছবিতে মরমী অভিনয়ে দর্শকের মনে রেখাপাত করেন তাঁদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস ও ছায়া দেবীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বিশেষ পার্শ্বচরিত্রে সুষ্ঠু অভিনয়ের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন গীতা দে, অঞ্জলি রায় ও মধু-ছন্দা। কয়েকটি ছোট চরিত্রে উজ্জ্বলকুমার, সাধনা রায়চৌধুরী, তুলসী চক্রবর্তী ও ভানু

বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ছবির সংগীত পরিচালনায় পণ্ডিত রবিশংকর দর্শককে বিমুগ্ধ করে রাখার মত তাঁর অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেননি অথবা দেবার সুযোগ পাননি। ছবিতে দুটি মাত্র গান, তার সুরেও আশানুরূপ হৃদয়গ্রাহী হয়নি।

ছবির আলোকচিত্র পরিচালনায় ও চিত্রগ্রহণে যথাক্রমে অনিল গুপ্ত ও জ্যোতি লাহা তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এবং ছবিটিকে শিল্পশোভায় মণ্ডিত করে তুলতে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। শব্দগ্রহণ ও সম্পাদনায় যথাক্রমে বাণী দত্ত ও তরুণ দত্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বহির্দৃশ্যের শব্দগ্রহণে মৃণাল গুহঠাকুরতা, ভূপেন ঘোষ ও সুজিত সরকারের কাজ প্রশংসনীয়। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ ও সর্বাঙ্গীণ আঙ্গিক গঠন সন্তোষজনক।

প্রমোদের নামে পাগলামি

"নিউ দিল্লী"-খ্যাত মোহন সায়গলের নতুন চিত্রনিবেদন "ক্রোড়পতি" এক কাণ্ডিমান প্রযোজক-পরিচালকের শোচনীয় পদস্খলনের নজির হিসাবে উপস্থিত হয়েছে।

শুধু যে একটি অবাস্তব ও উদ্ভট কাহিনীই এ-ছবির একমাত্র পীড়াদায়ক উপকরণ তা নয়। রসজ্ঞ ও রুচিবান দর্শকের মন তিক্ততায় ভরে তোলার মত আরও অনেক নীরস ও নিকৃষ্ট উপাদান প্রযোজক-পরিচালক শ্রীসায়গল এই চিত্রে পরিবেশন করেছেন। ফলে ছবিটি রসিকজনের কাছে শুধু যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতারই উৎস হয়ে উঠেছে।

এক ক্রোড়পতির একমাত্র বিকৃতমস্তিষ্ক সন্তানকে কেন্দ্র করে এই ছবির গাঁজাখুরি গল্পের বিস্তার। ক্রোড়পতির মৃত্যুর পর তার অপ্রকৃতিস্থ সন্তানের মত দেখতে এক ছদ্মবেশী পেশাদারী অভিনেতার পাগলামির অভিনয় দর্শককে কিছুকালের জন্য বিরক্তি সহকারে সহ্য করতে হয়। তারপর এই নকল পাগলামি মস্তিষ্কের আঘাতের অজুহাতে পরিচালক সারিয়ে তোলেন। তারপর ক্রোড়পতির পালিতা এক যুবতীর সঙ্গে এই অভিনেতার প্রেম-পর্ব অজস্র নাচ-গানের ভেতর দিয়ে পুরোদমে শুরু হয়ে যায়।

এবং সেই সঙ্গে ক্রোড়পতির সম্পত্তি আত্মসাৎ করার মতলবে নিদপরিবর তার খলস্বভাব ভাই নানাভাবে ও নানা ফন্দিতে এই ছদ্মবেশী অভিনেতার আসল পরিচয় উদ্ঘাটনে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ছদ্মবেশী অভিনেতা যাতে ক্রোড়পতির পালিতা কন্যার সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হতে না পারে সে-ব্যাপারেও ছবির খলনায়ক বিশেষ সচেষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ ক্রোড়পতির সন্তানের অপ্রকৃতিস্থতা হেতু এই পালিতা কন্যাই উইল অনুযায়ী তার সম্পত্তির মালিক। সুতরাং তার পতি হওয়া মানে ক্রোড়পতি হওয়া। সম্পত্তি আত্মসাতের জন্য কুচক্রী এই ভাগ্যবতীকে বিয়ে করার চেষ্টায় তার সন্তানকে নিয়োজিত করে। কিন্তু কুচক্রীর সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ পর্যন্ত ছদ্মবেশী অভিনেতাই যে ক্রোড়পতির নিজের সন্তান এই তত্ত্বটি কেমনভাবে প্রকাশ পায় তা নিয়েই কাহিনীর যবনিকা।

এই কিম্ভূতকিমাকার কাহিনীর বিন্যাসে প্রযোজক-পরিচালক বহুল পরিমাণে বৈসাদৃশ্য, অসংগতি ও কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন এবং "বক্স-অফিসে"র দিকে তাকিয়ে প্রবল উৎসাহে রুচি ও শোভনতাকে স্থানে স্থানে বিসর্জন দিয়েছেন।

কিশোরকুমার ছবির প্রথম অংশে তাঁর ভাঁড়ামিতে কাহিনীর প্রয়োজন আশানুরূপ মিটিয়েছেন। পরবর্তী অংশেও তাঁর অভিনয় চরিত্রানুগ। নায়িকার ভূমিকায় শশীকলা নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রনাট্যের দাবি মেনে চলেছেন, যদিও নায়িকা হিসাবে তাঁকে

মোটেই মানায় নি। অভিনয়ে অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রাধাকিষণ, কুমকুম, অনুপকুমার ও কে এন সিং।

শংকর-জয়কিষেণের সুররচনার ফলে ছবি দেখাকালে কয়েকটি সুখশ্রাব্য গান শোনা যায়। ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ ও আংগিক পারিপাট্য সন্তোষজনক।

চিত্রালোচনা

ঈদ পর্ব উপলক্ষে এ সপ্তাহে এক সংগে চারখানি নতুন ছবি মুক্তি পাচ্ছে। তার মধ্যে পটমঞ্জরী-র "মেঘ" একমাত্র বাংলা ছবি।

একদা চ্যাপলিন যে বলেছিলেন, "Business is terrible business"—তারই প্রতিধ্বনি শোনা যাবে "মেঘ" ছবির বক্তব্যে। ব্যবসায়ীর কুটিল ষড়যন্ত্রকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এর কাহিনী। উৎপল দত্ত রচিত একটি নাটক থেকে কাহিনীটি গৃহীত হয়েছে। ছবির পরিচালক তিনি। আবহ সংগীত যে কোন রহস্য-চিত্রের একটি প্রধান
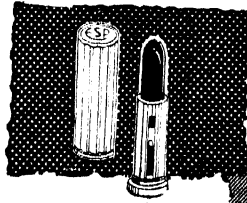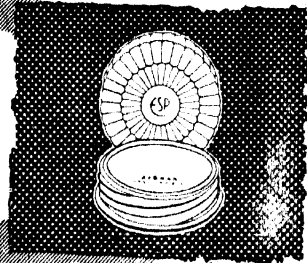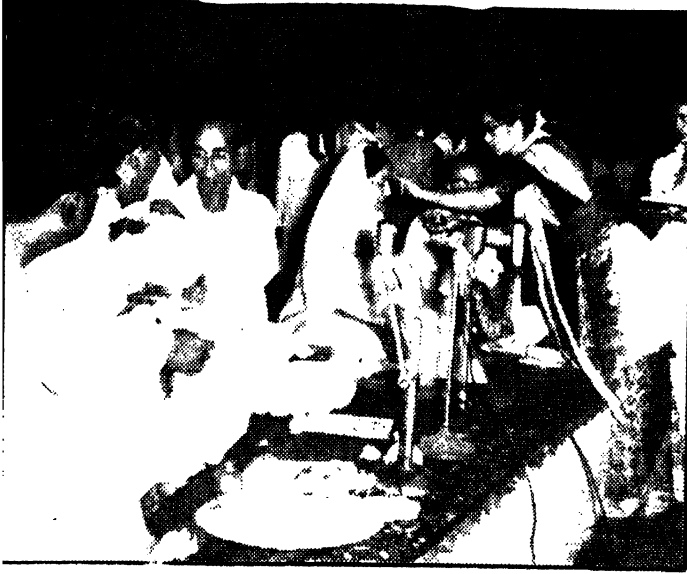
রবীন্দ্র মেলার উদ্যোগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবে কয়েকজন গুণীকে সম্বর্ধনা জানান হয়। সংগীতশিল্পী মালতী ঘোষালকে এখানে সম্বর্ধিত হতে দেখা যাচ্ছে

...ংশ। এ ছবিতে তা সৃষ্টি করেছেন পণ্ডিত বিশঙ্কর। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অবতরণ করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও বাগতা মালবিকা গুপ্ত। এক উৎকেন্দ্রিক গ্র্যাজুয়েট চরিত্রে জহর রায়কে দেখা যাবে। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন রবি ঘোষ, শোভা ...সন, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা দাস ও ...ৎপলা দত্ত।

* * *

হিন্দী ছবিগুলির মধ্যে হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "মেমদিদি"-র নাম ...বাগে উল্লেখযোগ্য। এল বি ফিল্মসের এই ...বতম চিত্রে প্রধান তিনটি চরিত্রে অভিনয় ...রেছেন ললিতা পাওয়ার ডেভিড ও ...য়ন্ত। কাহিনীর তরুণ প্রেমিক-যুগলের ...মিকায় রূপ দিয়েছেন তনুজা ও কেসি ...হরা। শচীন ভৌমিক এ ছবির কাহিনী-...র। সলিল চৌধুরী সংগীত পরিচালনা ...রেছেন।

মুকুল পিকচার্সের "মদন মঞ্জরী" পুরো-...র প্রমোদচিত্র। সাজসজ্জার আড়ম্বর, ...চগানের বাহুল্য এবং সবার উপরে ...কটি প্রণয়োপাখ্যান প্রমোদের উপকরণ ...গিয়েছে। নলিনী চোংকর, মনোহর ...শাই, কাম্মো, সুন্দর, বি এম ব্যাস, টুনটুন ...ভৃতকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত ...য়েছে। জশুভাই ত্রিবেদী ছবিটি পরি-...লনা করেছেন, এবং এতে সুর-যোজনা ...রেছেন সরদার মালিক।

হেমলতা পিকচার্সের "জমানা বদল গায়া" সপ্তাহের অন্যতম আকর্ষণ। জয়ন্ত ...শাই পরিচালিত এই ছবির প্রধান ভূমিকা-...গুলিতে অভিনয় করেছেন চার্লি, চাঁদ উসমানী, ভগবান ও হেলেন। সুরসৃষ্টি করেছেন ইকবাল কুরেশী।

* * *

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসিত মণ্ডল প্রযোজিত রূপভারতী ফিল্মসের "কাঞ্চন মূল্য" আশু মুক্তির প্রতীক্ষা করছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় রচিত এই গল্পটি শরৎ স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছে। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা বিবাহ একদা বাংলার পল্লীসমাজে কী বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তারই পটভূমিতে এক বৈচিত্র্যময় কৌতুক-কাব্য এর মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, বাসবী নন্দী, রাজলক্ষ্মী, গীতা দে, অপর্ণা দেবী প্রমুখ কুশলী শিল্পীদের অভিনয়ে ছবিটি সমৃদ্ধ। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন নির্মল মিত্র। নির্মল চৌধুরী এর সুরকার।

* * *

শক্তিপদ রাজগুরুর একটি অভিনব প্রণয়-কাহিনী "কুমারী মন"। তাকে চিত্রাকার দিচ্ছেন ফিল্ম এজ নামক একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। ঋত্বিক ঘটক এই কাহিনীর চিত্রনাট্য লিখেছেন, এবং 'চিত্ররথ' নামের আড়ালে একদল তরুণ কলাকুশলী এর পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেছেন। এর বিভিন্ন ভূমিকায় কণিকা মজুমদার, সন্ধ্যা রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, দেবী নিয়োগী ও জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়কে দেখা যাবে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র 'কুমারী মন'-এর সুরকার।

রূপভারতীর "কাঞ্চন মূল্য"-এর নায়িকা বাসবী নন্দী

মেলডি ইণ্টারন্যাশনাল আর একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের নাম। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এর প্রথম ছবি "বনানী কন্যা"-র মহরত সম্প্রতি সুসম্পন্ন হয়েছে। রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী ছবিটি পরিচালনা করবেন। বিভিন্ন ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন ছবি বিশ্বাস, অনিল চট্টোপাধ্যায়, অসীমকুমার, দ্বিজু ভাওয়াল, মঞ্জুলা সরকার, ভারতী রায় প্রভৃতি। চিন্ময় লাহিড়ী সুরসৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

জ্যোতিরূপা চিত্র পরিষদের প্রথম ছবি "পলাতক" এর নিয়মিত চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটির স্টুডিওতে শুরু হয়েছে। রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, অসিতবরণ, মঞ্জু দে, জহর রায় ও দ্বিজু ভাওয়াল এর প্রধান শিল্পী। দেবব্রত দাশগুপ্ত ছবিটি পরিচালনা করছেন এবং রবীন চট্টোপাধ্যায় সুরসৃষ্টির ভার নিয়েছেন।

নাট্যাভিনয়

লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ বর্তমানে তাঁদের পরবর্তী নাটক "ফেরারী ফৌজ"-এর প্রস্তুতি-পর্ব প্রায় শেষ করে এনেছেন। আগামী কাল রবিবার মিনার্ভা থিয়েটারে এর উদ্বোধন হবে। বিংশ শতকের গোড়ায় দেশপ্রেমের যে বহ্নি তরুণদের মনে রঙ ধরিয়েছিল তারই স্ফুলিঙ্গ দিয়ে ভরা উৎপল দত্তের এই নতুন নাটক "ফেরারী ফৌজ"। লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপের কুশলী শিল্পীর দলকে এই নাটকে আবার নতুন মহিমায় দেখা যাবে। ভূমিকালিপির পুরোভাগে আছেন রবি ঘোষ, সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল সেন, নীলিমা দাশ, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, কমল মুখোপাধ্যায় ও সুনীল রায়। পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন উৎপল দত্ত।

• • •

সাধারণ রঙ্গমঞ্চ হিসাবে থিয়েটার সেণ্টার মাত্র ছয় মাস আগে যাত্রারম্ভ করে। এই অল্পকালের মধ্যেই দক্ষিণ কলকাতার নাট্যামোদীদের মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে এই কনিষ্ঠতম নাট্যশালাটি। ধনঞ্জয় বৈরাগীর "আর হবে না দেরী" এর প্রথম নাটক, এবং এখনও তা পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত হচ্ছে। আধুনিক বাংলার রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা এই নাটকে এর প্রযোজক মুখোশ-দল দলগত অভিনয়-নৈপুণ্যে নিজেদের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রেখেছেন। খালেদ চৌধুরীর অনুপম মঞ্চ-সজ্জা ও অমর ঘোষের আলোক-সম্পাত অভিনয়ের আকর্ষণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

এই সপ্তাহে "আর হবে না দেরী"-র শততম অভিনয় রজনী পূর্ণ হবে। সেই উপলক্ষে গত বৃহস্পতিবার থেকে আগামী রবিবার পর্যন্ত থিয়েটার সেণ্টারে একটি স্মারক অভিনয় উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। রবিবারেই "আর হবে না দেরী"-র শেষ অভিনয়। থিয়েটার সেণ্টারের পরবর্তী আকর্ষণ ধনঞ্জয় বৈরাগীর "রজনীগন্ধা"।

• • •

আগামী ৩রা জুন থেকে বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ আয়োজিত গিরিশ নাট্যোৎসব-এর তৃতীয় বর্ষ শুরু হবে। এই উৎসব প্রতি শনিবার বেলা আড়াইটায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে। এবারের উৎসব প্রায় এক বৎসর ধরে চলবে এবং এতে ৫০টি অগ্রগণ্য নাট্যসংস্থা অংশ গ্রহণ করবে। এদের মধ্যে বিশ্বরূপা, লিট্‌ল্ থিয়েটার, বহুরূপী, প্রান্তিক, শৌভনিক, মুখোশ, অভিনেতৃ সংঘ, ওল্ড ক্লাব, হাওড়া সমাজ, বঙ্গীয় নাট্যসংসদ, অনুশীলন, গন্ধর্ব প্রভৃতি আছেন। বিভিন্ন রীতির, রসের ও আঙ্গিকের এমনিধারা সমাবেশ ইতিপূর্বে আর কোন নাট্যোৎসবে দেখা যায়নি।

অচলায়তন প্রযোজিত "কুলীনকুল-সর্বস্ব" দিয়ে তৃতীয় বৎসরের গিরিশ নাট্যোৎসবের উদ্বোধন হবে।

• • •

এ বছরেও আনন্দম্-এর উদ্যোগে সারা বাংলা আন্তঃ-অফিস একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা আগামী সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ৩১শে মে। আনন্দম্ কার্যালয়ে (২২।২, বিডন স্ট্রীট) বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে।

• • •

হাওড়া যুব-সভা সংগঠিত রবীন্দ্র সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোগে হাওড়া টাউন হলে বিগত ২৫শে বৈশাখ থেকে নয় দিন-ব্যাপী রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে যুব-সভা কর্তৃক 'তপতী', শৌভনিক কর্তৃক 'গোরা', রূপকার কর্তৃক 'শাস্তি', থিয়েটার

দাক্ষিণী অভিনীত "ফাল্গুনী"-র একটি মনোরম দৃশ্য

ইউনিট কর্তৃক 'যোগাযোগ', প্রান্তিক কর্তৃক 'মুক্তির উপায়', হাওড়া এমেচার্স কর্তৃক 'শেষরক্ষা' এবং যুব-সভার মহিলা ও কিশোর বিভাগ কর্তৃক যথাক্রমে 'ডাকঘর' ও 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' অভিনীত হয় এবং শিল্পিবৃন্দ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। বিশেষভাবে 'তপতী' নাটকের বিপাশার ভূমিকায় কুহু চট্টোপাধ্যায়, 'গোরা' নাটকের আনন্দময়ীর ভূমিকায় নিবেদিতা দাস, 'শাস্তি' নাটকের ছিদামের ভূমিকায় সবিতাব্রত দত্ত এবং 'ডাকঘর' নাটকের অমলের ভূমিকায় মন্দাকিনী দেব অভিনয় সকলকার প্রশংসা অর্জন করে।

*

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সুখ্যাত নাট্যসংস্থা রঙসভার কবি-অর্ঘ্য, রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' আগামী ২৮শে মে নিউ এম্পায়ারে মঞ্চস্থ হবে। নাটকের বিভিন্ন প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবেন দিলীপ রায়, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিতোষ রায়, সুলেতা চৌধুরী, রথীন ঘোষ, চন্দন রায় প্রভৃতি। নাট্যপরিচালনার দায়িত্ব সম্পাদন করবেন পীযূষ বসু।

দাক্ষিণীর রবীন্দ্র উৎসব

দেশপ্রিয় পার্কে দাক্ষিণীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উৎসবের বিভিন্ন অধিবেশনে একক সংগীত পরিবেশন করেন হেনা সেন, অর্ঘ্য সেন, কৃষ্ণা সেন, সুখেন্দু গোস্বামী, শ্যামশ্রী রায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জুলা গুহ-ঠাকুরতা, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, ইন্দ্রাণী আচার্য, সুশীল চট্টোপাধ্যায়, ঋতু গুহঠাকুরতা, শ্রীপর্ণা ঘোষ রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী ঘোষাল, উৎপলা সেন, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, সুচিত্রা সেন, পূরবী মুখোপাধ্যায়, সুনীলকুমার রায়, অমল নাগ, সাগর সেন ও কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়।

সাহিত্যালোচনায় মনোজ্ঞ ভাষণ দেন ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য (রবীন্দ্র নাট্য-সাহিত্য), শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায় (কবি ও কাব্য-প্রকৃতি) এবং ডাঃ এডওয়ার্ড সি ডিমক। কবিগুরুর একটি কবিতা আবৃত্তি করেন শ্রীআশিসকুমার মুখোপাধ্যায়।

নাট্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন রূপ ও রূপ (চণ্ডালিকা), দাক্ষিণী (শেষরক্ষা), বিচিত্রা (তাসের দেশ), ঘরোয়া (বসন্তমঙ্গল), গুণ্ড ক্লাব (গৃহপ্রবেশ), সুরেন্দ্রম (বসন্তোৎসব), রূপকার (ত্যাগ), দাক্ষিণী (ভানুসিংহের পদাবলী), রঙসভা (দালিয়া), দাক্ষিণী (ফাল্গুনী) ও বৈশাখী (শেষরক্ষা)। অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চণ্ডালিকা, ত্যাগ, দালিয়া, ভানুসিংহের পদাবলী ও ফাল্গুনী দর্শকমণ্ডলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। তাসের দেশ এবং শেষরক্ষার অভিনয় অত্যন্তই অসংলগ্ন ও দুর্বল।

"পংক্তিতিলক" চিত্রে এক অন্ধ বালকের ভূমিকায় শ্রীমান পংকজকুমার অপূর্ব অভিনয় করেছেন

একলব্য

দীর্ঘ দিনের টালবাহানার পর শেষ পর্যন্ত বি এইচ এর দরবারে হকি লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের মীমাংসা হয়েছে। লীগ কোঠার শীর্ষস্থানে সমান পয়েণ্ট সংগ্রহকারী দুই ক্লাব ইস্টবেঙ্গল ও কাস্টমস হয়েছে যুগ্মভাবে লীগ চ্যাম্পিয়ন। সময়াভাবে কাপের খেলায় ইতিপূর্বে এভাবে যুগ্ম বিজয়ী হবার নজির থাকলেও লীগ খেলার চ্যাম্পিয়নশিপ মীমাংসায় এটা নতুন ঘটনা। বি এইচ এর দুর্বল নীতি এবং ত্রুটিপূর্ণ পরিচালন ব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী। খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা খেলার মাঠেই কাম্য। দরবারে জয় খেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তির অভাব দোষে দুষ্ট।

তবু এ ব্যবস্থা মন্দের ভাল। সমান পয়েণ্ট সংগ্রহকারী দুই অপরাজিত টিম ইস্টবেঙ্গল ও কাস্টমসের মধ্যে গোল অ্যাভারেজে ইস্টবেঙ্গল উপরে থাকলেও যখন গোল অ্যাভারেজে চ্যাম্পিয়নশিপের নিষ্পত্তির বিধান উঠে গেছে; আর চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক বিশেষ খেলাটির ব্যবস্থা করাও যখন সম্ভব হয়নি, তখন পূর্ব সিদ্ধান্ত মত চ্যাম্পিয়নশিপ একেবারে নাকচ না করে দুই দলকে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন বলে স্বীকার করা ভালই হয়েছে।

কিন্তু আমার আপত্তি এই নাটকের নাটের গুরুর দুর্বোধ্য আচরণে। কারোই অজানা নেই বি এইচ এর সম্পাদকের জন্যই আজ এই অবস্থা। বি এইচ এর সম্পাদক পদাধিকারবলে লীগ কমিটির সদস্য। চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পর্কে লীগ কমিটির প্রস্তাব উল্টিয়ে দেওয়ার অর্থ লীগ কমিটির উপর এক রকম অনাস্থা প্রকাশ করা। সে অনাস্থা প্রকাশ করা হয়েছে আবার সম্পাদকেরই ভোটের জোরে। ৫—৪ ভোটে লীগ কমিটি হেরে গেছেন এবং সম্পাদক বি এইচ এর সভায় দিয়েছেন প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট। সত্যই দুর্বোধ্য আচরণ।

সেই অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র বলেছিলেন—'বারেক যখন, নেমেছে পাপের পথে কুরুপুত্রগণ তখন ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে।' ক্ষমতান্ধ বি এইচ এ সম্পাদকেরও সেই ভাব। অধর্মের বিষমাখা মধুময় ফল তিনি হাত থেকে ফেলতে নারাজ।

যাই হক, হকি চ্যাম্পিয়নশিপের মীমাংসা হয়েছে, তবে লেজের আগুন এখনো নিবেছে কিনা জানি না। যদি না নিবে থাকে তবে সে আগুনে কারো কারো মুখ পোড়াও অসম্ভব নয়।

* * *

প্রায় দুমাস নিউজিল্যাণ্ড সফর করবার জন্য ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেশনের অনুমোদনক্রমে ইণ্ডিয়ান ওয়াণ্ডারার্স হকি টিম নিউজিল্যাণ্ড যাত্রা করেছে। নিউজিল্যাণ্ডে ওয়াণ্ডারার্স দল খেলবে ৩১টি ম্যাচ। এর মধ্যে তিনটি টেস্ট।

ভারতীয় হকি দলের নিউজিল্যাণ্ড সফর এই প্রথম নয়। নিউজিল্যাণ্ডই ভারতীয় হকিকে প্রথম আতিথ্য দিয়েছিল ১৯২৬ সালে, অলিম্পিক হকিতে ভারতের প্রথম জয়লাভেরও আগে। অবশ্য ভারতের সে দল ছিল ফৌজী খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত। তারপর ১৯৩৫ সালে সরকারীভাবে নিখিল ভারত হকি টিম নিউজিল্যাণ্ড সফর করে। তারপর ১৯৩৮ সালে মানভাদারের নবাবের দল এবং ১৯৫৫ সালে ইণ্ডিয়ান ওয়াণ্ডারার্স হকি দল নিউজিল্যাণ্ড সফর করে এসেছে। কিন্তু ভারতে নিউজিল্যাণ্ড দলের সামগ্রিক সফর এখনো সম্ভব হয়নি। গত বছর অবশ্য নিউজিল্যাণ্ডের অলিম্পিক টিম দিল্লী,

দমদম বিমানঘাটিতে তোলা নিউজিল্যাণ্ড গামী ইণ্ডিয়ান ওয়াণ্ডারার্স হকি টীমের ছবি। ফটো—দেশ

ব্রাডফোর্ডে ইয়র্কশায়ার ও অস্ট্রেলিয়ান দলের খেলায় ইয়র্কশায়ারের ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান বোলাস ডেভিডসনের বলে ক্যাচ তুলে হার্ভের হাতে আউট হচ্ছেন

আমেদাবাদ, মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোরে কয়েকটি খেলায় অংশ গ্রহণ করে গেছে। কিন্তু বিরাট ভারতে এটা ব্যাপক সফর নয়। ১৯৫৬ সালে নিউজিল্যাণ্ড দলের ভারত সফরের কথা ছিল কিন্তু সে সফর ব্যবস্থা কার্যতঃ রূপায়িত হয়নি। তবে ১৯৬২ সালের জানুয়ারীতে ভারতে বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতার যে আয়োজন করা হয়েছে তাতে আমন্ত্রিত হয়েছে নিউজিল্যাণ্ড। আশা করা যায় এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিউজিল্যাণ্ডের হকি কর্তৃপক্ষ ভারতীয় হকির সংগে তাঁদের সম্পর্ক নিবিড় করে তুলবেন।

বিশ্বমানের তুলনায় নিউজিল্যাণ্ডের মান উন্নত নয়। এর আগে ভারতীয় দল যে ৪ বার নিউজিল্যাণ্ড সফর করেছে তার ফলাফলেই ভারতীয় হকির পর্যাপ্ত প্রাধান্যের সম্যক পরিচয়। ৪ বারের সফরে মোট খেলা হয়েছে ১০৯টি, ভারতীয় দল জিতেছে ১০৪টি খেলায়, পরাজিত হয়েছে তিনটিতে, ২টি খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেছে। আর গোল? ভারতের খেলোয়াড়রা গোল করেছেন ৮৭৭টি, খেয়েছেন মাত্র ৮৭টি।

ইণ্ডিয়ান ওয়াণ্ডারার্সের হয়ে এবার যাঁরা নিউজিল্যাণ্ড সফরে গেছেন তাঁরা সবাই ভারতীয় হকি ক্ষেত্রে সুপরিচিত। কয়েকজন অলিম্পিকখ্যাত এবং উঠতি খেলোয়াড় নিয়ে দলটি গঠিত। সুতরাং এবারও যে এরা খেলায় বিপুল সাফল্য অর্জন করে ফিরে আসবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যে ১৬ জন খেলোয়াড় ইণ্ডিয়ান ওয়াণ্ডারার্স টিমের হয়ে নিউজিল্যাণ্ড গেছেন তাঁদের নামঃ—

গোল—গুরুদেব সিং (পাঞ্জাব) ও জগৎ ইন্দ্র প্রকাশ (দিল্লী)।

ব্যাক—পৃথিপাল সিং (পাঞ্জাব) মদনলাল শর্মা (উত্তর প্রদেশ) ও গুরুবক্স সিং (বাঙলা)।

হাফ ব্যাক—দেশমুখ (সার্ভিসেস), কিদারাম্যান (মাদ্রাজ), মোহনলাল (দিল্লী) ও চরণজিৎ সিং (পাঞ্জাব)।

ফরোয়ার্ড—মনমোহন সিং (পাঞ্জাব), গুরুদেব সিং (পাঞ্জাব), হরবিন্দর সিং (পাঞ্জাব), প্রেম সিং—অধিনায়ক (পাঞ্জাব), টেম্পো (সার্ভিসেস), বলবীর সিং (পাঞ্জাব), বান্দু পাটেল (সার্ভিসেস)।

• • •

ইংলণ্ডে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট টিম তাঁদের স্বভাব সুলভ ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখিয়ে একটির পর একটি খেলা জিতে যাচ্ছে। জল বৃষ্টির জন্য প্রথম তিনটি খেলার ফলাফল অবশ্য মীমাংসিত হয়নি। উস্টার, ল্যাঙ্কাশায়ার এবং কাউণ্টি চ্যাম্পিয়ান ইয়র্কশায়ারের সংগে প্রথম তিনটি খেলাই মাঝপথে বা শেষ মুখে বন্ধ হয়ে গেছে। এক ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে নর্মান ওনীলের ১০০ রান ছাড়া এ তিনটি খেলায় কোন পক্ষের আর কেউ সেঞ্চুরীও করতে পারেননি। কিন্তু তার পরের তিনটি খেলায় অস্ট্রেলিয়ান বোলিং ও ব্যাটিং দিয়েছেন তাঁদের পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়। তাঁরা ল্যাঙ্কাশায়ার দলকে ৪ উইকেটে হারিয়ে প্রথম জয়লাভের পর পরম শক্তিশালী কাউণ্টি সারেকে হারিয়েছে ১০ উইকেটে, পরের খেলায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়কে ৯ উইকেটে। গ্লামারগানও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারবার মুখে। লেখার সময় পর্যন্ত ফলাফল পাইনি।

ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধে প্রথম দিনে অস্ট্রেলিয়ার ৮ উইকেটে ৪০২ রান করা এবং নীল হার্ভের ১২০ ও পিটার বার্জের ২০১ রান খুবই উল্লেখযোগ্য।

এডারিচ, ব্যারিংটন, পিটার মে, সোয়েটম্যান, টনি লক, বেডসার ও লোডার সমন্বিত শক্তিশালী সারেকে ১০ উইকেটে হারানোও কৃতিত্বের পরিচায়ক। এ খেলায় উঠতি খেলোয়াড় বিল লরি ১৬৫ রান করে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করেছেন।

কেম্ব্রিজের বিরুদ্ধেও অস্ট্রেলিয়া একদিনে সংগ্রহ করেছে ৪৪৯ রান। সবচেয়ে বলবার কথা এ খেলায় অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ৪ জন ব্যাটসম্যান ম্যাকডোনাল্ড, লরি, বুথ ও ম্যাকে সেঞ্চুরী করে ব্যাটিংয়ের ফুলঝুরি দেখিয়েছেন। গ্লামারগানের বিরুদ্ধেও হার্ভে ও ওনীল সেঞ্চুরী করেছেন।

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হতে বেশী দেরি নেই। জুনের ৮ তারিখে এজবাসটনে আরম্ভ হচ্ছে প্রথম টেস্ট খেলা। কাউণ্টির কষ্টিপাথরে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের যোগ্যতার যাচাই হয়ে গেছে। কিন্তু ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা এখন পর্যন্ত তাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে কেউ সেঞ্চুরীও করতে পারেননি, তবে কাউণ্টি খেলার সংগে টেস্ট খেলার আকাশ পাতাল পার্থক্য। টেস্টের রূপই আলাদা। রূপ রস বর্ণে তা অনন্য। খেলার গতিও বিচিত্র। টেস্ট খেলার জন্য সারা বিশ্বই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। খবরের জন্য আমরাও কান পেতে আছি।

—মুকুল—

ভারতে বীর নারীর বীরত্ব কাহিনীর অভাব নেই। কিন্তু বাঙালী গেরস্থ ঘরের মেয়ে বৌ বন্দুক কাঁধে করে শুটিং রেঞ্জে যাবে, গুলী ছোড়ার প্রতিযোগিতা করবে পুরুষ-মেয়ের সংগে, কয়েক বছর আগে একথা কি কেউ ভাবতে পেরেছিল? আজ কিন্তু সব শহর খুঁজলে কিছু কিছু মেয়ে মেলে রাইফেল, রিভলবার যাদের খেলার সাথী; যদিও একটু উঁচু ও সংগতি-সম্পন্ন ঘরের মেয়েদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। কারণ রাইফেল চালনার রেওয়াজ বেশ ব্যয়-সাধ্য। অবসর সময়ের চিত্তবিনোদন এবং স্পোর্টস হিসেবেই তাঁরা এটা গ্রহণ করেছেন।

তবু মেয়েদের রাইফেল চালনায় আগ্রহের পেছনে একটু ইতিহাসও আছে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার পর রাষ্ট্রনায়ক-দের উদাত্ত আহ্বান: "দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশ রক্ষার দায়িত্ব এখন ভারত-বাসীর। শুধু পুরুষ নয়। দেশ রক্ষায় পুরুষ-নারীর সমান অধিকার, সমান দায়িত্ব। নারীকেও এসে দাঁড়াতে হবে পুরুষের পাশে। যোগাতে হবে সাহস ও প্রেরণা। প্রয়োজন মত হাতে তুলে নিতে হবে হাতিয়ার, কাঁধে বন্দুক।"

রাষ্ট্রনায়কদের এ আহ্বান বিফল হয়নি। সামরিক বিভাগের কাজ যুবকদের কাছে এখন আর অপাংক্তেয় নয়। মেয়েদের পক্ষে রাইফেল চালনাও নয় অপরাধ। ভারত স্বাধীন হবার আগে দেশে যেখানে একটিও রাইফেল ক্লাব ছিল না, দেশ স্বাধীন হবার পর সেখানে শ'খানেক রাইফেল ক্লাব গজিয়ে উঠল। স্পোর্টসের মাধ্যমে রাইফেল চালনায় পটু হবার আহ্বানে সাড়া দিল শত শত যুবক-যুবতী।

সাড়া দিলেন সবিতা চ্যাটার্জিও। রাইফেলে রপ্ত হবার বয়স তাঁর তখন প্রায় পেরিয়ে গেছে। চল্লিশের কোঠায় পা বাড়িয়েছেন। কিন্তু সাহস যোগালেন স্বামী সূর্য চ্যাটার্জি। সূর্য চ্যাটার্জি দু' বছর আগেই সাউথ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের সভ্য হয়েছেন। রাইফেল চালনায় কিছুটা সুনামও কিনেছেন। পরে হয়েছেন যশস্বী রাইফেল চালক। স্ত্রীকে তিনি বললেন—'শিক্ষার ক্ষেত্রে বয়সের বাধা বড় প্রতিবন্ধক নয়ই' স্ত্রী রাজী হয়ে গেলেন। ১৯৫২ সাল থেকে সূর্য ও সবিতা—স্বামী-স্ত্রী এক সংগে রাইফেলের অনুশীলন আরম্ভ করলেন। পরে ১২ বছরের ছেলে অলোক চ্যাটার্জি ও ছোট মেয়ে ললিতা চ্যাটার্জিও হলেন রাইফেলের অনুরাগী। গড়ে উঠল এক রাইফেল পরিবার। প্রথমে সাউথ ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবে। পরে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটায় তাদের অনুশীলন।

১৯৫২ সালে সবিতা চ্যাটার্জি রাইফেল ক্লাবে ভর্তি হবার প্রথম বছরেই টালিগঞ্জ পুলিস রেঞ্জে অল ইণ্ডিয়া রাইফেল শুটিং-এর প্রতিযোগিতা। মাত্র ৬ দিনের প্র্যাকটিসে সবিতা চ্যাটার্জি 'প্রোনে' হলেন দ্বিতীয়া। সেই বছর দিল্লীতে জাতীয় রাইফেল চালনায়ও 'প্রোনে' একই স্থান। কিন্তু তারপর কোন প্রতিযোগিতাতেই তাঁর কাছ থেকে 'প্রোনের' প্রথম স্থান কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। পঁচিশ, পঞ্চাশ, একশ, দুশো মিটার—'প্রোনের' সব বিষয়েই তিনি বিশেষজ্ঞা। 'স্ট্যাণ্ডিং' এবং 'নীলিং'য়েও প্রায় সমদক্ষতা। ৯০ সেকেণ্ডে ১০ রাউণ্ড গুলী ছোড়ার 'টাইম লিমিট' প্রতিযোগিতায় বরাবর প্রথম স্থান। পিস্তল রিভলবার ছোড়াতেও অসামান্য সাফল্য। দিল্লী, বাঙ্গালোর ও আমেদাবাদের জতীয় প্রতিযোগিতায় মেয়েদের চ্যাম্পিয়নশিপ। কোন কোনবার এক সংগে পনেরো কুড়িটা পুরস্কার লাভ। রাইফেল চালনায় ভারতের আর কোন মহিলার পক্ষেই এ কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হয়নি। জাপানী রাইফেল শুটারদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য ডাকও পড়েনি আর কোন মহিলার। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ভারতে রাইফেল চালনার প্রতিযোগিতায় সবিতা চ্যাটার্জি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠা।

'পতি পরম গুরু'। গার্হস্থ্য ও ধর্ম জীবনে তো বটেই, রাইফেল চালিকা সবিতা চ্যাটার্জির রাইফেলে পারদর্শিতা অর্জনের ক্ষেত্রেও কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

গুরু দ্রোণাচার্য শিষ্যদের ধনুর্বিদ্যা
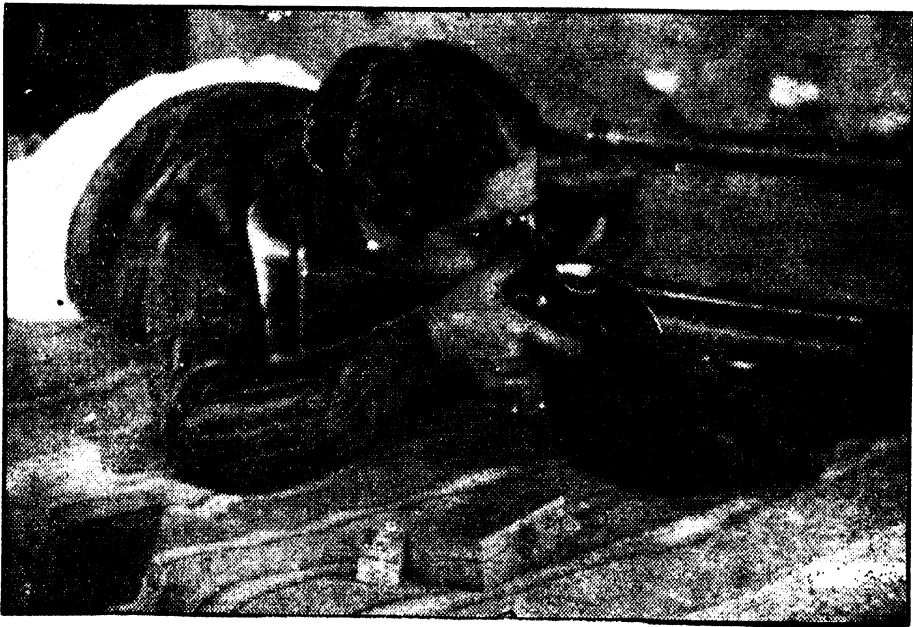
'প্রোনে' সবিতা চ্যাটার্জীর রাইফেল ছোড়ার দৃশ্য

শেখাবার সময় গাছে একটা পাখীকে দেখিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—

'গাছে কি দেখছ?'
'একটা পাখী।'
'তুমি কি দেখছ?'
'একটা পাখীর মাথা।'
'অর্জুন, তুমি কি দেখছ?'
'শুধু চোখ।'

এবার মনের মত উত্তর। পাখীও না, পাখীর মাথাও না। শুধু চোখ। এমন দৃষ্টি, এমন একাগ্রতা না হলে কি ধনুর্বিদ্যায় পারঙ্গম হওয়া যায়? একাগ্রতাই তো লক্ষ্যভেদের মূল কথা।

এখানে পতি গুরু, পত্নী শিষ্যা। যে আন্তরিকতা নিয়ে পতি বিদ্যা দান করেছেন ততোধিক আন্তরিকতার সঙ্গে পত্নী তা গ্রহণ করেছেন। তাই বাঙলার রাইফেল চালনার ইতিহাসে এস এন চ্যাটার্জি ও সবিতা চ্যাটার্জির নাম সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে।

শুধু কি শিক্ষা ও সম্মান? বাঙলার রাইফেল চালকদের জন্য পরলোকগত এস এন চ্যাটার্জি যা করে গেছেন তার তুলনা কম। এস এন চ্যাটার্জি ছিলেন বাটা কোম্পানীর চীফ সেক্রেটারী। পয়সার অভাব তাঁর ছিল না। কিন্তু পয়সা থাকলে কজনের সে পয়সা খরচ করার 'দিল' থাকে? নিজের জন্য যদিও বা কেউ করে, পরের জন্য খরচ করার দৃষ্টান্ত বিরল। এস এন চ্যাটার্জি নিজের এবং স্ত্রী-পুত্রের জন্য রাইফেল চালনার অনুশীলনে মাসে খরচ করতেন হাজারখানেক টাকা। কিন্তু ক্লাবের ছেলেমেয়েদের গুলীর খরচের জন্য তাঁর পকেট থেকে মাসে মাসে আরও হাজার দুই করে টাকা বেরিয়ে যেত। রাইফেল চালনায় যার হাত ভাল দেখতেন তাঁরই জন্য দরাজ হাতে তিনি খরচ করতে দ্বিধা করতেন না। বলা বাহুল্য, রাইফেল স্পোর্টসে স্বামীর এই আগ্রহই স্ত্রীকে আগ্রহশীল করে তোলে, সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়েকেও। পুত্র অলোক চ্যাটার্জি এবং মেয়ে ললিতা চ্যাটার্জিও রাইফেল চালনার জুনিয়র বিভাগে একাধিক পুরস্কার ঘরে তোলেন। বিশ্বক্রীড়াক্ষেত্রে ক্রীড়ানুরাগী দম্পতি ও পরিবারের অভাব নেই। কিন্তু চ্যাটার্জি পরিবারের মত এমন পরিবারও খুব বেশী নেই।

আর একটি বিষয়ে এ পরিবারে একটা চমৎকার মিল দেখছি। সূর্য চ্যাটার্জি ও সবিতা চ্যাটার্জি—স্বামী-স্ত্রীর নামের একই অর্থ। রাইফেল ক্ষেত্রেও দু'জনের সমান প্রতিষ্ঠা। বড় মেয়ে নমিতা চ্যাটার্জির স্বামী জগদীশ গোপাল কলকাতা হাই-কোর্টের ব্যারিস্টার। নমিতা গোপালও বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী আরম্ভ করেছেন। এখন স্বামী-স্ত্রী ব্যারিস্টার। ছোট মেয়ে ললিতা চ্যাটার্জি নাম করা সঙ্গীত শিল্পী। বিয়ে করেছেন সঙ্গীতজ্ঞ শ্যামল বসুকে। স্বামী-স্ত্রী সঙ্গীতজ্ঞ। যাক সে কথা।

শ্রীযুক্তা সবিতা চ্যাটার্জির শিশুকাল কেটেছে রাঁচিতে। বাবা বসন্ত বন্দোপাধ্যায় ছিলেন রাঁচীর উকীল। ছোটবেলায়
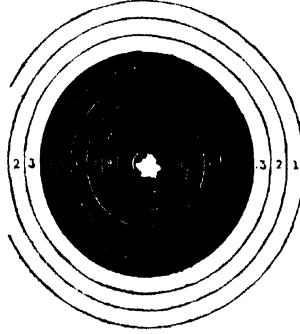
সবিতা চ্যাটার্জীর গুলী ছোড়ার একখানা স্কোর কার্ড। কেন্দ্রবিন্দুতে গুলী মারবার জন্য ১০ নম্বর। ১০টি গুলীতে ১০০ নম্বর। সবিতা চ্যাটার্জী ১০টি গুলী কেন্দ্রবিন্দুতে আঘাত করে ১০০ নম্বরের মধ্যে ১০০ নম্বর পেয়েছেন

আগ্নেয় অস্ত্রে আগ্রহ ছিল না। তবে আদিবাসীদের তীরধনুক ছুড়তে দেখে তীরও তীরধনুক ছুড়তে শখ হয়েছিল। একটু উৎসাহিত করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে তা কাজেও লেগেছে। ১৯৫৬ সালে আমেদাবাদে জাতীয় রাইফেল শুটিং-এর আসর। তার পাশেই ধনুর্বিদ্যা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়েছিল। সবিতা চ্যাটার্জি তাতে যোগ দিয়ে প্রথম স্থান দখল করেছিলেন।

'রাইফেল চালনার শখ এলো কোথা থেকে?' প্রশ্ন করেছিলাম মিসেস চ্যাটার্জিকে। তার উত্তরে তিনি যা বললেন তাতে বুঝলাম এদের রক্তের সাথেই মিশে আছে রাইফেলের নেশা।

এস এন চ্যাটার্জির বাবা ফণীন্দ্রমোহন চ্যাটার্জি ছিলেন পাবনার জেলা জজ। সেই সূত্রেই বাঙলা তথা ভারতের বিখ্যাত শিকারী কুমুদ চৌধুরীর সঙ্গে বন্ধুত্ব। ক্রমে শিকারে অনুরাগ। পুত্র এস এন চ্যাটার্জির মধ্যেও সেই নেশা সংক্রামিত হল। বিয়ের পর সবিতা চ্যাটার্জিকে নিয়ে শিকারের জন্য নানা যায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন এস এন চ্যাটার্জি। বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের নানা জঙ্গলে খুঁজলে হয়তো এখনো তাঁদের পায়ের চিহ্ন দেখা যাবে। এমন কি, পূর্ব আফ্রিকার উগান্ডা পর্যন্ত তাঁরা শিকারে গিয়েছেন।

যদি কোনদিন আপনার নিউ আলীপুরের 'জি' ব্লকের 'সূর্য দেউল'-এ যাবার সুযোগ ঘটে, তবে দেখতে পাবেন চ্যাটার্জি দম্পতির শিকারের চিহ্ন। হরিণ বাইসনের মাউণ্ট করা মাথা দেওয়ালের গায়ে মাথা উঁচু করে আছে। 'সূর্য দেউল-এর একতলার সাজানো ঘরে দেখতে পাবেন রাইফেল চালনা প্রতিযোগিতা থেকে চ্যাটার্জি দম্পতির আহরিত কাপ মেডেল চারটি আলমারীতে থরে থরে সাজানো। সিঁড়ি বেয়ে উপরের ঘরে গেলে দেখা যাবে এক আলমারী ঠাসা দামী দামী রাইফেল রিভলবার। কোনোটা 'অ্যান্সুলজ', কোনোটা 'মার্টিনী', কোনোটা 'হ্যামারলী', কোনোটা বা 'ওয়ালথার'। সবসুদ্ধ ১১টা রাইফেল আর ৯টা রিভলবার। সযত্নে রাখিত। তবে আগ্নেয়াস্ত্রগুলোর চেহারা বড় করুণ। যেন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। ৩ বছর হ'ল এস এন চ্যাটার্জি পরলোকগমন করেছেন। মিসেস সবিতা চ্যাটার্জি রাইফেল চালনা এক রকম ছেড়ে দিয়েছেন। পুত্র অলোক চ্যাটার্জি বিলেত থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এই জানুয়ারীতেই ফিরে এসেছেন। এখনো রাইফেলের রেওয়াজ আরম্ভ করেননি। তাই বড় করুণ চেহারা এই ভীষণ অস্ত্রগুলোর।

এক সঙ্গে এতগুলো আগ্নেয়াস্ত্র দেখে মিসেস চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'এগুলোর লাইসেন্স ছিল তো মিঃ চ্যাটার্জির নামে। কোন উৎপাত হয়নি তো?' মিসেস চ্যাটার্জি বললেন—'না, সবগুলোর লাইসেন্সই আমাদের স্বামী-স্ত্রীর যুগ্ম নামে। তাই কোন উৎপাত পোহাতে হয়নি।'

দেশী সংবাদ

১৫ই মে—গত ২রা মে দার্জিলিংয়ের বাজারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যবহৃত পরীক্ষার খাতা আবির্ভাবের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়েরই বহু অব্যবহৃত পরীক্ষার খাতা নদীয়ার কোন একটি কলেজে ভিন্ন কাজে ব্যবহারের আরও এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ডাক ও তার বিভাগে দুর্নীতির শাখা-প্রশাখা কিভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং এই দুর্নীতির জালে যে দিন দিন অধিক সংখ্যায় বিভাগীয় কর্মচারীরাও জড়াইয়া পড়িতেছেন ১৯৫৯-৬০ সনের অডিট রিপোর্টে তাহার এক শোচনীয় চিত্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ১৯৬০ সনের আগস্ট মাস অবধি বিভাগীয় কর্তারা ১৮৭০৭টি অডিট আপত্তি ধামাচাপা দিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল আপত্তির সঙ্গে জড়িত অর্থের পরিমাণ ৩২ কোটি ২২ লক্ষ টাকা।

১৬ই মে—আজ নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি বলেন যে, ভারতের সর্বত্র মুসলিম লীগের পুনরুজ্জীবনে দেশের কল্যাণ সাধন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে এক গুরুতর বিপদ দেখা দিয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশন এলাকায় কলেরা মহামারী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। মঙ্গলবার কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য দপ্তরের এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে ইহা জানানো হয়।

১৭ই মে—আসামের পার্বত্য জেলাসমূহের সাতজন সদস্যবিশিষ্ট এক প্রতিনিধি দল আজ প্রাতে পররাষ্ট্র বিষয়ক দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জানান যে, আসাম পার্বত্য অঞ্চলের জন্য স্কটল্যান্ডের ধাঁচে সীমাবদ্ধ স্বায়ত্তশাসনের যে প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন প্রতিনিধি দল তাহা গ্রহণে অসমর্থ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট নির্বাচনে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট কেন্দ্রে বহুসংখ্যক ব্যালট-পত্র 'জাল' হইয়াছে বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশেষে সরকারীভাবে স্বীকার করিয়াছেন। মঙ্গলবার 'সন্দেহক্রমে' এই কেন্দ্রের ভোট-গণনা অকস্মাৎ বন্ধ রাখা হইয়াছিল এবং ইহার কারণ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ ঐদিন কিছু বলিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

১৮ই মে—যাঁহারা ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্ম-নিরপেক্ষ আদর্শে আস্থাবান, যদি শুধু তাঁহাদিগকেই প্রস্তাবিত মুসলিম সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হয় তাহা হইলে কংগ্রেস এই সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব সমর্থন করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সম্প্রতি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর প্রথম কম্যান্ডার-ইন-চীফ স্যার ফ্রাঙ্ক মেসারভি স্বল্প সময়ের জন্য ভারত ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আগমনকে কেন্দ্র করিয়া এমন গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয় যাহার ফলে বেরিলির কর্তৃপক্ষ মহল গভীরভাবে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

১৯শে মে—বাংলা ভাষাকে আসামের অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দানের দাবিতে কাছাড় সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে যে আন্দোলন

শুরু হইয়াছে, আজ প্রথম দিনেই সশস্ত্র পুলিস শিলচর শহরে শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র সত্যাগ্রহী-দের উপর বে-পরোয়া গুলি চালাইয়া বালক-বালিকা ও শিশুসহ আটজনকে ঘটনাস্থলেই নিহত করিয়াছে। শিলচর রেলওয়ে স্টেশন কম্পাউণ্ডে এই বর্বর ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। চারজন বালিকাসহ প্রায় ৩০জন শরীরের ঊর্ধ্বাংশে গুরুতররূপে আহত হইয়া হাস-পাতালে প্রেরিত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট কেন্দ্রে সেনেট সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে জাল ভোটের কেলেঙ্কারি কলিকাতার কোন কোন মহল হইতে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়।

২০শে মে—গতকল্য অপরাহ্ণে আঙ্কলেশ্বর তৈলক্ষেত্রে ৭নং তৈলকূপে এক বিস্ফোরণ ঘটে। প্রচণ্ড চাপে গ্যাস বাহিরে আসিতে থাকে। অদ্য সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। গ্যাস ও কর্দম বহির্গমনের চাপ অদ্য সকাল পর্যন্ত হ্রাস পায় নাই।

কাছাড়বাসীদের ভাষা আন্দোলন দমনে শিলচরে শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর আসাম পুলিসের নৃশংস গুলিচালনা ও মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস এবং বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক মহলে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণার ঝড় উঠিয়াছে।

২১শে মে—বাঙ্গালোরের সংবাদে জানা যায় যে, মহীশূর রাজ্যের রায়চুর জেলার গঙ্গাবতী তালুকের অন্তর্গত বসুর গ্রামে এক দাঙ্গায় নয়জন খুন হইয়াছে। প্রকাশ, একজন নারীর উপর নির্যাতনের পর ১৪ই মে সন্ধ্যায় ঐ গ্রামে দাঙ্গা বাধে।

কাছাড় জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও আসাম বিধানসভার সদস্য শ্রীরণেন্দ্রমোহন দাস শিলচরের শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপরে গুলি চালাইয়া নয়জনকে হত্যা ও বহু লোককে আহত করিবার প্রতিবাদে বিধানসভার সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি শিলঙে প্রধানমন্ত্রীর নিকটও এক তার করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই মে—কঙ্গোলী নেতৃবৃন্দের ককুইলহাত-ভিল্ল সম্মেলন আজ স্থির করেন যে, প্রাক্তন বেলজিয়ান কঙ্গো ভবিষ্যতে ফেডারেল রিপাব্লিক বলিয়া পরিচিত হইবে।

প্রেসিডেণ্ট কেনেডী এক পত্রযোগে কোমিণ্টাং চীনের প্রেসিডেণ্ট চিয়াং কাইশেককে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, আমেরিকা কম্যুনিস্ট চীনকে ভবিষ্যতেও স্বীকার করিয়া লইবে না এবং রাষ্ট্রপুঞ্জে পিকিং গবর্নমেণ্টকে আসন দিবার সকল চেষ্টার বিরোধিতা করিবে।

১৬ই মে—বিশ্বস্ত সূত্রে আজ জানা গেল, আগামী ৩রা জুন ভিয়েনায় প্রেসিডেন্ট কেনেডী ও প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেফ এক বৈঠকে মিলিত হইবেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার উচ্চপদস্থ সামরিক নেতৃবৃন্দ আজ আকস্মিকভাবে দক্ষিণ কোরিয়ার সর্বময় কর্তৃত্ব হস্তগত করেন। অভ্যুত্থানের নেতৃবৃন্দ সরকারী বেতারকেন্দ্র দখল করেন এবং ঘোষণা করেন যে, "দুর্নীতিপরায়ণ ও অযোগ্য রাজনীতিকগণের উপর" আস্থা রাখা সম্ভবপর নহে বলিয়া তাঁহারা গবর্নমেণ্টের সকল ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছেন।

১৭ই মে—গতকল্যকার সামরিক অভ্যুত্থানের পর আজ দক্ষিণ কোরিয়ান সেনারা সিওল হইতে উত্তর দিকে প্রসারিত প্রধান সড়কের উপর প্রতিরক্ষাঘাটি নির্মাণ করিয়া সেখানে অবস্থান করিতেছে—সড়কের উপর ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী পরিখা খনন করা হইতেছে এবং মেশিনগান-ঘাটি গড়িয়া তোলা হইতেছে।

লাওসে একটি কোয়ালিশন গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধবিরতির তদারকী কার্যে সহায়তা করার জন্য একটি সম্মিলিত সাব-কমিশন গঠনের প্রশ্নে সরকারী ও বিদ্রোহী প্রতিনিধি দল আজ আকস্মিকভাবে নীতিগতভাবে একমত হইয়াছেন।

১৮ই মে—ওসাকা শহর বিশ্ববিদ্যালয়ের জাপানী পর্বতারোহী দলের দুইজন অভিযাত্রী এবং একজন শেরপা তুষারঝটিকার ফলে বরফের নীচে সমাহিত হইয়াছে বলিয়া অদ্য কাঠমাণ্ডুতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। শেরপার দেহ দুর্ঘটনার পরে ১১ই মে পাওয়া গিয়াছে কিন্তু জাপানীদের দেহ এখনও পাওয়া যায় নাই।

১৯শে মে—কিউবার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ কাস্ত্রো এক বৃহৎ কৃষক সমাবেশে বক্তৃতাকালে বলেন, ১৭ই এপ্রিল কিউবায় অভিযান চালাইতে আসিয়া যাহারা বন্দী হইয়াছে, তাহাদের মুক্তির বিনিময়ে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে ৫ শত বুলডোজার পাইতে চাহি। অন্যথায় এ সকল লোককে কঠোর শ্রমে নিয়োগ করা হইবে।

২০শে মে—দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট পো সান ইউন পদত্যাগপত্র পেশ করিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সমর পরিষদের চাপে তাহা প্রত্যাহার করিয়া লন—ইহার ফলে, দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক মন্ত্রিসভার পুরোভাগে নামেমাত্র রাষ্ট্র-প্রধানরূপে একজন অসামরিক নাগরিকই প্রতিষ্ঠিত রহিলেন।

একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্নমেণ্ট সহ কঙ্গোকে একটি প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে যে গঠনতান্ত্রিক প্রস্তাব করা হইয়াছে, আজ ককুইলহাতভিল্লে কঙ্গোর নেতৃবর্গের সম্মেলনে সেই প্রস্তাবটি যথারীতি অনুমোদিত হয়।

২১শে মে—বাংলা দৈনিক "আজাদ" পত্রিকায় প্রকাশ, গত ৯ই মে তারিখের ঝঞ্ঝাবাত্যায় একমাত্র বরিশাল জেলাতেই অন্ততঃ সাত হাজার লোক নিহত হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
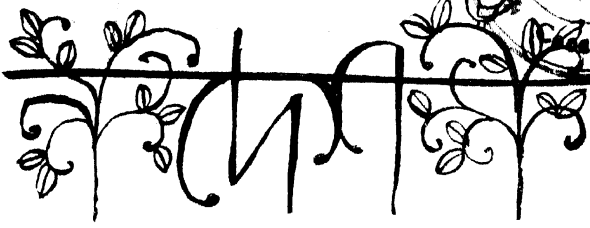
DESH 40 Naye Paise.
SATURDAY, 3RD JUNE, 1961

২৮ বর্ষ ॥ ৩১ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২০ জৈষ্ঠ, ১৩৬৮ বংগাব্দ

জাতীয় ঐক্য যে একটা অখণ্ড সম্পদ যার পরে সমস্ত ভারতের সমানাধিকার, এই মৌল সত্যটি গত চৌদ্দ বৎসরে দেশের নানা অঞ্চলে নানা ভাবে বিধ্বস্ত হচ্ছে। আর এখন এমনই অবস্থা যে, দেশের কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসীরা ভেবেই পাচ্ছেন না ভারতীয় নাগরিক হিসাবে তাঁদের অধিকার কোথায় ও কতটুকু। তবু আমাদের রাষ্ট্রপ্রতিমার কাঠামোয় অংগরাজ্যগুলির যে আলাদা আলাদা হিস্যা নির্ধারিত রয়েছে তার কোনও অদলবদল সম্ভবত কেউই চাইছেন না।

জতুগৃহ

এক সময়ে আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছি, বিদেশী শাসনই ভারতবর্ষে যাবতীয় ভেদ বিবাদ এবং অনৈক্যের মূলে। ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের জন্য দেশবাসী প্রায় সকলেই যখন একত্র সংকল্প গ্রহণ করেছে তখন ধরে নিয়েছি ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব বেশী ভাবনার কারণ নেই। ব্রিটিশ রাজকে বিদায় করতে পারলেই 'এক জাতি, এক প্রাণ, একতা' বাস্তব ক্ষেত্রে অনায়াসে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। কিন্তু আমাদের সে-আশা আজ প্রায় বিলুপ্ত, বিদেশী শাসনের রাহুমুক্ত ভারতের অনায়াসলভ্য জাতীয় ঐক্যে বিশ্বাসের ভিত্তিমূল পর্যন্ত বিপর্যস্ত, যে কারণে স্বাধীনতা লাভের চৌদ্দ বৎসর পর জাতীয় ঐক্য-বিধ্বংসী শক্তিগুলির মারাত্মক অনিষ্টকর ক্রিয়াকলাপ প্রতিরোধের প্রস্তাব দেশের নেতৃস্থানীয়গণ বিচার বিবেচনা করার জরুরী তাগিদ অনুভব করছেন। জাতীয় ঐক্য-বিধ্বংসী শক্তি অবশ্য এক-রকম মাত্র নয়। উগ্র সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্য-বোধ জাতীয় ঐক্যের পক্ষে কী পরিমাণ ক্ষতিকর হতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্বাধীন ভারতের জন্মবৃত্তান্তেই লেখা হয়ে আছে। কিন্তু তার পরও আছে। জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নে বর্তমানে যে কঠিন সংকট দেখা দিয়েছে তার মূলে আছে কোন কোন অঞ্চলের ভাষাগত সংখ্যাগরিষ্ঠদের উগ্র আধিপত্য প্রয়াস। এককথায় সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু, মেজরিটি ও মাইনরিটির সমস্যা যেমন ব্রিটিশ আমলে তেমনি এখনও ভারত-বর্ষের কাঁধে চেপে রয়েছে।

অথচ ব্রিটিশরাজের সংগে যেকালে আমাদের লড়াই চলছিল তখন লন্ডনে হোয়াইট হলের বড়কর্তাদের, এদেশে ইংরেজ রাজপুরুষদের আমরা জোরগলায় শুনিয়েছি ভারতবর্ষের ইতিহাসের চির-ন্তন সত্য হল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বহুর মধ্যে একের বা একাত্মতার প্রকাশ। আমরা বলেছি, ব্রিটিশ রাজই সাম্রাজ্যিক স্বার্থ-রক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়, জাতি, বর্ণ এবং ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্বেষ ও বিবাদ বিসম্বাদ সৃষ্টি করেছে। অভিযোগ নিতান্ত মিথ্যা ছিল না; কিন্তু এও ঠিক যে, শুধু মাত্র ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিচিত্র বিভিন্ন লোকসমষ্টিকে একত্রিত করার প্রয়াস অনেক পরিমাণে সফল হলেও জাতীয় জীবনের অন্য সব ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য খুব দৃঢ় এবং বিস্তৃতভাবে প্রসারিত হতে পারে নি। ইংরেজের রাজত্বে আমরা পেয়েছিলাম এক শাসন, কিন্তু একদায়িত্ব নয়। তবে ব্রিটিশ শাসন অবসানের জন্য এক লক্ষ্যানুগামী একদায়িত্বের প্রেরণা ভারতের জাতীয় ঐক্যবোধ অনেকখানি উদ্বুদ্ধ করেছিল সন্দেহ নাই। আর সে সময় আমরা প্রবল ভাবাবেগের প্রভাবে অনায়াসে বিশ্বাস করেছিলাম সুইজারল্যান্ডের লোকেরা যখন তিন জাত তিন ভাষাভাষী হয়েও নেশন তখন আমাদেরই বা নেশন হতে বাধা কী? বাধা যে কোথায় এবং কী বিষম সেটা রাষ্ট্র-নৈতিক স্বাধীনতা এবং শাসনক্ষমতা লাভের পর গত চৌদ্দ বৎসরে নানাভাবে ঠেকে ঠেকে শেখা যাচ্ছে।

স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী ভারত যদিও রাষ্ট্র হিসেবে এক এবং অবিভাজ্য তবু এর রাষ্ট্রপ্রতিমার কাঠামো এমনভাবে গড়া যে নানা অংগপ্রত্যংগের মধ্যে জোড়ের চিহ্নগুলি সুস্পষ্ট। জোড় মানে অবশ্য সবক্ষেত্রে জোড়াতালি না হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রিক ক্ষমতার হিস্যা যেখানে অংগরাজ্যগুলির আলাদা অলাদা কোঠায় আলাদা আলাদা হিসাবে ভাগ করে দেওয়া সেখানে জোড়ের কোথায়ও সামান্য ফাটল ধরলেই বিপদ। ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্য যে একটা অখণ্ড সম্পদ...

তবে কথা কী, অংগরাজ্যগুলি যেমন একদিকে ভারতীয় জনসমষ্টির বৈচিত্র্যের স্বীকৃতি তেমনি এগুলির পরস্পরনির্ভর ঐক্যও ভারতীয় সংবিধানে সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজেই কোন অংগরাজ্যই একেবারে নিজের খুশীমত চলতে পারে না; কোন অংগরাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষা-গোষ্ঠী দাবি করতে পারে না যে, সে রাজ্যের ভাষাগত সংখ্যা-লঘুদের স্বতন্ত্র মর্যাদা এবং অধিকার বিলোপ করা হোক। কোন অংগরাজ্যে কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাগোষ্ঠীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হলে অসন্তোষ এবং অশান্তি অনিবার্য। অথচ এই ধরণের অশান্তির ন্যায়সংগত প্রতিকার সম্ভব। ভারতীয় সংবিধানেই তার উপায় নির্দেশিত আছে।

কোন অংগরাজ্যে যদি লক্ষ লক্ষ অধি-বাসীর মাতৃভাষা সেই রাজ্যের সংখ্যা-গরিষ্ঠের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র হয় তাহলে ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী সেই রাজ্যে দুই বা ততোধিক ভাষা রাজ্যভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। সমস্যা এবং তার সমাধান এমন কিছু জটিল বা দুঃসাধ্য নয়। তবে কথা ওই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাগোষ্ঠী যদি জিদ করে রাজ্যটার ষোল আনা হিস্যা তাদের, তাহলে সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য যাকে আমরা ভারতেতিহাসের প্রাণস্বরূপ বলে গণ্য করি তার বিপর্যয় রোধ করা অসম্ভব। ভারতের কোন রাজ্যই কোন ভাষাগোষ্ঠীর একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, এই বাস্তব সত্যকে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন-ভাবে ভারতের নাগরিকবৃন্দ মেনে না নিলে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিন্দুমাত্র আশা নেই। বর্তমানে আমরা যে ভারতবর্ষে বাস করছি তাকে জতুগৃহ বলা অন্যায় হবে না। দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র চৌদ্দ বৎসর পর জাতীয় ঐক্যের এমনই পরিণতি।

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

ভবঘুরে (১০)

'গুটেন্ আপেটিট'—গুড্ এপিটাইট!

এর ঠিক বাংলা নেই। উপাসনার পর একে অন্যের দিকে তাকিয়ে সবাই বলে, 'আশা করি তোমার যেন বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হয়, আর তুমি তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পারো।' ইংরিজির মত জর্মানেও 'হাঙার' (হুঙার) ও 'এপিটাইট' ('আপেটীট') দুটো শব্দ আছে। 'এপিটাইটের' ঠিক বাঙলা প্রতিশব্দ নেই। 'খাওয়ার রুচি, বাসনা' অনেক কিছু দিয়ে মোটামুটি বোঝানো চলে কিন্তু ঠিক অর্থটি বেরয় না। যেমন ইংরিজিতে বলা চলে 'আই এম্ হাঙরি বাট হ্যাভ্ নো এপিটাইট'—'আমার ক্ষুধা আছে কিন্তু খাবার প্রবৃত্তি নেই,' কিংবা 'মুখে রুচছে না।' আবার পেটুক ছেলে যখন খাই খাই করে তখন অনেকেই বলে, 'দি বয় হ্যাজ এপিটাইট বাট্ হি ইজ নট হাঙরি এট অল।' এস্থলে 'এপিটাইট' তাহলে দাঁড়ায় 'চোখের ক্ষিধে'। আমার অবশ্য, দুইই ছিল।

আইনানুযায়ী আমার মাঝখানে বসার কথা, কিন্তু আমি একরকম জোর করে মারিয়ানাকে মাঝখানে বসিয়ে দিলুম। ঠাকুরমার কখন কি দরকার হয় আমি তো জানিনে। মারিয়ানা কাছে থাকলে ওঁকে সাহায্য করতে পারবে।

বিরাট গোল এক চামচ দিয়ে সুপের বড় বোল্ থেকে আমার গভীর সুপ-প্লেটে মারিয়ানা চালান করতে লাগল লিটার লিটার সুপ। আমি যতই বাধা দিই, কোনো কথা শোনে না। শুধু মাঝে মাঝে পাকা গিন্নীর মত বলে, 'মান্‌জল্ অর্ডন্‌ট্‌লিষ এসেন' —'ভালো করে খেতে হয়, ভালো করে খেতে হয়!'

ঠাকুরমা দেখি, তখনো কি যেন বিড়বিড় করছেন। হয়তো নিত্য মন্ত্রের উপর তাঁর কোনো ইষ্টমন্ত্র আছে,—সেইটেই জপ করছেন।

আমার মা বলতো, আমাকে দেখলে যতটা বোকা বলে মনে হয়, আমি ততটা বোকা নই; আর বড়দা বলতো, আমাকে দেখলে যতটা বুদ্ধিমান বলে মনে হয়, আমি ততটা বুদ্ধিমান নই। কোনটা ঠিক জানিনে, তবে আমার স্মৃতিশক্তিটি ভালো সে-কথাটা উভয়েই স্বীকার করতেন। আমার মনে পড়ে গেল, আমার শহুরে বন্ধু পাউল একবার আমাকে 'উপাসনার অত্যাচারের' কথা শুনিয়েছিল। সমস্ত দিন খেটে খিদেয় হন্যে হয়ে চাষারা তাকিয়ে আছে সুপ-প্লেটের দিকে—ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর—আর পাদ্রীসায়েব, তিনি সমস্তদিন 'প্রভুকে' স্মরণ করেছেন বলে তাঁর হাঙার এপিটাইট কিছুই নেই—পাদ্রী সায়েবের উপাসনার আর অন্ত নেই।

আমি অনুমান করলুম, আমি বিদেশী বলে হয়তো মারিয়ানা মন্ত্রোচ্চারণে কিছু কিছু কাট-ছাঁট করেছে। ফিস্‌ফিস্ করে সে-কথা শোধাতে তার সর্বমুখ শুধু নয়, যেন ব্লণ্ড চুলের গোড়াগুলো পর্যন্ত লাল হয়ে গেল। অপরাধ স্বীকার করে মাথা নিচু করে বললে, খাওয়ার পরের উপাসনা পুরোপুরি করে দেবে।

ঠাকুরমার প্লেটে মারিয়ানা সুপ ঢেলেছিল অল্পই। তিনি প্রথম চামচ মুখে দেওয়ার পর আমরাও খেতে আরম্ভ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে মারিয়ানা আমার দিকে তাকিয়ে শুধোলে, 'শেনক্‌ট্ এস্?' অর্থাৎ 'খেতে ভালো লাগছে তো?' এটা হল এদেশের দু নম্বরের টেবিল এটিকেট। আমি বললুম, 'ধন্যবাদ! অপূর্ব! রাজসিক!' জর্মানে কথাটা 'হ্যারলিষ'—তার বাঙলা 'রাজকীয়' 'রাজসিক'।

আমি বললুম, 'ঠাকুরমা, আপনাদের এই রবিবারের সেটটি ভারী চমৎকার।'

ঠাকুরমা বললেন, 'এ বাড়িতে কিন্তু মোটেই খাপ খায় না। তা কি করবো বলো। আমার মামা কাজ করতেন এক পর্সেলিন কারখানায়। তিনি আমাকে এটা দেন। সে কতকালের কথা—এস্ ইস্‌ট্ সো লাঙে হের।'

মারিয়ানা বললে, চেপে যেও না, ঠাকুরমা! তোমার বিয়ের সময় উপহার পেয়েছিলে সেটা বললে কোনো অপরাধ হবে না। ফের "এস্ ইস্‌ট সো লাঙে হের" বলে আরম্ভ করো না।'

আমি শুধালুম, 'এস্ ইস্‌ট সো লাঙে হের—সে আবার কি?'

উৎসাহের সঙ্গে মারিয়ানা বললে, 'বুঝিয়ে বলছি, শোনো। ঠাকুমা যখনই আমাকে ধমক দিতে চায়, তখন হঠাৎ তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠে। "তোর বাপ এ-পরবের সময় এরকম ধারা করতো না, তুই কেন করছিস? তোর মা তার সাম্বৎসরিক পরবের দিনে (নামেন্‌স্‌টাখ্) ভোরবেলা চার্চে গিয়েছিল, আর তুই ন'টা অবধি ভস্‌ভস্ করে নাক ডাকালি।" কে কবে হেসেছিল, কে কবে কেশেছিল টায়-টায় মনে গাঁথা আছে। আবার দেখো, শীতকালে যখন দিনভর রাতভর দিনের পর দিন বরফ পড়ে, বাড়ি থেকে বেরনো যায় না, তখন যদি সময় কাটাবার জন্য ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস করি, 'হ্যাঁ, ঠাকুমা, বলো তো ভাই, লক্ষ্মীটি, ঠাকুরদা কিভাবে
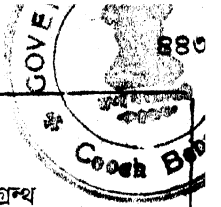
তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পেড়েছিল। এক হাঁটু গেড়ে আরেক হাঁটু মুড়ে, ফুলের তোড়া বাঁ-হাতে নিয়ে এগিয়ে দিয়ে, ডান হাত বুকের উপর চেপে নিয়ে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'অবাক করলি! তুই এসব শিখলি কোথায়? তোর কাছে কেউ বিয়ের প্রস্তাব পেড়েছিল নাকি?'

এইবারে ঠাকুরমার ঠোঁট খুললো। বললেন, 'বেশ হয়েছে।'

মারিয়ানা মুখ আবার লাল করে বললে, 'দ্যাৎ! সিনেমাতে দেখেছি। উইলহেলম বুশের আঁকা ছবিতে দেখেছি। (১) তা সে যাকগে, আমার কথা শোনো। ঐসব বিয়ের প্রস্তাব, বিয়ের পর পয়লা ঝগড়া, ঠাকুরদা যখন লড়াইয়ে চলে গেল তখনকার কথা, এসব কথা জিজ্ঞেস করলে হঠাৎ ঠাকুরমার স্মৃতিশক্তি একদম লোপ পায়। আমাদের ঐ কার্ল কুকুরটা যেরকম পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ডুকরে ডুকরে আর্তরব ছাড়ে ঠিক সেই গলায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে বলে,—সে-এই কথা—"এস্ ইসট্ সো লাঙে হের", "সে কত প্রাচীন দিনের কথা, সে সব কি আর আমার মনে আছে।" ধমকের বেলা সব মনে থাকে—তখন আর "লাঙে হের, লাঙে হের" নয়।'

আমি বললুম 'আলবাৎ, আলবাৎ।'

তার থেকে অবশ্য বোঝা গেল না আমি কোন্ পক্ষ নিলুম। পরে বিপদে পড়লে যেদিকে খুশী ঘুরিয়ে নেব। অবশ্য আমি কালো, কৃষ্ণ-পক্ষ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই থাকার চেষ্টা করি।

ইতিমধ্যে আমি মারিয়ানার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছি।

ঘরের উত্তর-পূব কোণে দুই দেয়ালের সঙ্গে মিলে সিন্ক্—জর্মানে বলে *প্যুলে-ষ্টাইন।

দেয়ালে গাঁথা ওয়াশস্টেন্ডের মত, ছোট্ট চৌবাচ্চা-পানা, দেয়ালে গাঁথা বলে যেন হাওয়ায় দুলছে—মাটি পর্যন্ত নেবে আসেনি। সেখানে ট্যাপে বাসন-কোষন মাজা হয়, মাছ-মাংস ধোওয়া হয়—তাই রান্নাঘরে, কিংবা দাওয়ায় (অবশ্য এই শীতের দেশে দাওয়া জিনিসটাই নেই) ঘড়া ঘড়া জল রাখতে হয় না। খাওয়া-দাওয়ার পর তাবৎ বাসন-বর্তন, হাঁড়ি-কুড়ি ঐটেতে রেখে সেটাকে জলভর্তি করা হয়। তারই উপরে বাঁদিকের দেয়ালে কয়েকটা হুকে ঝুলছে ধুঁদুলের জালের

---

(১) জর্মানদের সুকুমার রায়। ও'রই মত নিজের কবিতার ছবি নিজেই আঁকতেন। তবে সুকুমারের মত 'প্যোর ননসেন্স' লেখেননি। ও'র বেশীর ভাগই ইলাসট্রেটেড্ গল্প।

পরিবর্তে ওয়েস্ট কটন, অতি সূক্ষ্ম তারের জালের স্পঞ্জ, খান দুই ঝাড়ন। আর তার নিচে দেয়ালে গাঁথা শেলফের উপর ভিমজাতীয় (ওদের বোধ হয় 'পের্সিল') গুঁড়োর চোঙা, সাবান, আর দু-একটা টুকিটাকি যেগুলো আমি চিনিনে। আমি তো আর জর্মান রান্নাঘরে ছেলেবেলা কাটাইনি। ডানদিকের দেয়ালে গাঁথা, কিংবা ঝোলানো একটা বেশ বড় খোলা শেলফ্‌। সিনকে হয়তো দু-চার কাৎলি গরম জলও ঢেলে দেওয়া হয়েছে—রান্না শেষ হওয়ার পর যে-টুকু আগুনে বেঁচে থাকে, সেটা যাতে করে খামকা নষ্ট না হয়, তাই তখন তার উপর কাৎলি চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই গরম জলে বাসন-কোষনের চর্বি গলাবার জন্যে সিনকে ঢেলে দেওয়া হয়, আর ইতিমধ্যে কেউ কফি বা চা খেতে চাইলে তো কথাই নেই। সিনকের সামনে দেয়াল-মুখো হয়ে দাঁড়িয়ে উপর থেকে ভিম্‌, স্পঞ্জ পেড়ে নিয়ে এক একটা করে হাঁড়ি মাজবে, ঝাড়ন দিয়ে সেটা শুকোবে, তার পর ডান দিকের শেলফে রাখবে। ভালো হয় যদি একজন মাজে আর অন্যজন ঝাড়ন দিয়ে পোছে।

সিনকের ডান দিকে পুবের দেয়ালের সঙ্গেগা ঘেঁষে একটি প্রমাণ সাইজের মোক্ষম টেবিল। উপরের তক্তাখানা অন্তত দু ইঞ্চি পুরু হবে। এর উপরেই মাছমাংস-তরকারি কাটাকুটি হয়। তাই তার সর্বপৃষ্ঠে ক্রিস্‌-ক্রস্‌ ছোট-বড় সব রকম কাটার দাগ। পোয়া ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা বেরবে না যেখানে কোনো দাগ নেই। টেবিলের এক পাশে মাংস কোফ্‌তা কাটার জন্য একটা কল লাগানো আছে। টেবিলের সামনে একটি টুল—কিন্তু জর্মান মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রান্নার কাজ করতে ভালোবাসে।

সিনকের বাঁদিকে উত্তরের দেয়ালের সংগে গা ঘেঁষে হার্থ, উনুন, যা খুশী বলতে পারেন। প্রায় টেবিল সাইজের একটা লোহার বাক্স। উপরে চারটে উনুনের মুখ। নিচের দরজা খুলে কয়লা পোরা হয়। ভাঙা টুকরো টুকরো পাথুরে কয়লা ছাড়া এরা ব্যবহার করে ব্রিকেট্‌। কয়লা গুঁড়ো করে ইঁটের (ব্রিক্‌) সাইজে বানানো হয় বলে এগুলোর নাম ব্রিকেট। হাত ময়লা না করে সাঁড়াশি দিয়ে তোলা যায়, আগুনও ধরে খুব তাড়াতাড়ি আর ধুঁয়োও দেয় অত্যল্প। উনুনের পাশে এক বাল্‌তিতে কয়লা, অন্য বাল্‌তিতে চিমটেসুদ্ধ একগাদা ব্রিকেট। উনুন থেকে ধুঁয়ো নিকাশের চোঙা বেরিয়ে দেয়ালে গিয়ে ঢুকেছে যেখানে তারই ডান পাশে দেয়ালে গাঁথা আরেকটা শেলফ্‌। তাতে বড় বড় জার্‌ কোনোটাতে লেখা 'মেল'—ময়দা, কোনোটাতে 'ৎসুকার'—চীনি, কোনোটাতে 'সাল্‌ৎস্‌'—নুন। তাম-চীনির ষ্টো (ষ্টোন-ওয়েয়ার) জারগুলো পোড়াবার আগেই কথাগুলো লেখা হয়েছিল বলে ওগুলো কখনো মুছে যাবে না (২)। তারপর বোতল বোতল তেল, সিরকা ইত্যাদি তরল পদার্থ। সর্বশেষে মার্গারীন, মাখন আরো কি সব।

ঘরের মাঝখানে খাবার টেবিল।

ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে—অর্থাৎ সিনকের তির্যক কোণে—একখানা পুরনো নিচু আর্ম-চেয়ার। দক্ষিণ থেকে ঘরে ঢুকতেই বাঁদিকে পড়ে। এ-চেয়ারে ঠাকুরমা বসে বসে ঢোলেন। সামনের ছোট ফুটস্টুল বা পাদপীঠের উপর পা রেখে।

এদের ড্রইং-রুম-কম্‌-ডাইনিং রুম আছে। কিন্তু তার ব্যবহার বড় একটা হয় না। সেটা যেন বড্ড পোশাকী। বসে সুখ পাওয়া যায় না, কথাবার্তা কেমন যেন জমে না। বন্ধ ঘরের কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

আর এ-ঘরে কেমন যেন একটা হৃদ্যতা, খোলাখুলি ভাব। কেউ যেন কারো পর নয়॥

---

(২) 'ষ্টোন-ওয়েয়ার' শব্দ বাংলা অভিধানে 'পাথরের বাসন' বলা হয়। আসলে ওটা সবচেয়ে নিরেস পর্সেলিন বা গ্লেজড্‌ পটারি বলা যেতে পারে। তাম্রবর্ণের চীনেমাটি বলে এসব জারকে পূববাঙলায় তাম্‌-চীনি বলে। উভয় বাঙলায়ই এগুলো ব্যবহার হয় প্রধানত আচার রাখার জন্য।

বৈদেশিকী

কিছুদিন যাবৎ অ্যাঙ্গোলায় পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আফ্রিকানদের বিদ্রোহ চলেছে। এই বিদ্রোহ দমনের প্রচেষ্টায় সালাজার সরকার যে-মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেটা পরিপূর্ণ ঘাতকের মূর্তি। হত্যা, হত্যা, হত্যা—নির্বিচারে হত্যা চালিয়ে যাও, যতক্ষণ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র বিদ্রোহী মনোভাবের চিহ্ন থাকে—এই হলো লিসবন গভর্নমেণ্টের নীতি। উত্তর অ্যাঙ্গোলা থেকে প্রায় সমস্ত য়ুরোপীয়ানদের সরিয়ে আনা হয়েছে, যাতে চোখ বুজে মেশিনগান চালানো যায় এবং 'নাপাম' বোমা নিক্ষেপ করা যায়। অ্যাঙ্গোলার কথা ইউনাইটেড নেশনস্‌-এ উঠেছে এবং একটা প্রস্তাবও পাশ হয়েছে, কিন্তু পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের নৃশংস নীতি ব্যাহত করার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা এখনো কিছু হয়নি। ইউনাইটেড নেশনস-এ মার্কিন সরকার পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের ঔপনিবেশিক নীতির কিছুটা নিন্দা করেছেন বটে, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে সালাজার গভর্নমেণ্টের উপর কোনো চাপ দেওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বস্তুত সালাজার "ন্যাটো"র পরোক্ষ সমর্থনই পেয়ে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে মার্কিন সরকারের চেয়ে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ভাব আরো সন্দেহজনক। অ্যাঙ্গোলায় পর্তুগীজরা যে কাণ্ড করে চলেছে, তাতে সারা আফ্রিকায় তীব্র অসন্তোষ এবং ক্রোধ সঞ্চারিত হচ্ছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের সমর্থক, আফ্রিকানদের মনে এরকম ধারণার সৃষ্টি হলে সেই অসন্তোষ এবং ক্রোধ কিছুটা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের উপর যাবে। সেটা অবশ্য বৃটিশ গভর্নমেণ্ট চান না, কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এবং বৃটিশ রাজপুরুষদের কোনো কোনো সাম্প্রতিক ব্যবহার এমনধারা হয়েছে, যাতে পর্তুগীজ সরকারের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন সহানুভূতির আভাস পাওয়া যায়—অন্ততপক্ষে বাইরে থেকে তাই মনে হবে। তা না হলে এই সময়ে বৃটিশ রণতরী "লিওপার্ডে"র লুয়াণ্ডায় 'গুড্ উইল ভিজিটে' যাবার কী মানে হয়? অথবা এই সময়ে বৃটিশ মন্ত্রীদের পর্তুগালে বেড়াতে যাবার ঘটাই বা কেন? সালাজারের সৈন্যবাহিনীর জন্য অস্ত্রশস্ত্র যে-সব দেশ থেকে সংগৃহীত হয়, তারা প্রায় সকলেই "ন্যাটো"র অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকা, বৃটেন এবং অন্য কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ, যারা "ন্যাটো"র

প্রধান সদস্য তাদের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সাহায্য না পেলে পর্তুগাল গভর্নমেন্টের পক্ষে তার বর্তমান নীতি চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হতো।

এই বিষয় উল্লেখ করে পণ্ডিত নেহর, দুর্গাপুরে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় একটি বক্তৃতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। শ্রী নেহর, বলেন যে, অ্যাংগোলায় আফ্রিকান বিদ্রোহীদের হাতে অনেক পর্তুগীজ নিহত হয়েছে সত্য, কিন্তু পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট যা করতে আরম্ভ করেছে, সেটাকে জাতি হত্যা বা "জেনো-সাইড" ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। আফ্রিকায় সর্বত্র স্বাধীনতা লাভের জন্য আফ্রিকানদের উত্থানের প্রতি পণ্ডিত নেহর, ভারতবর্ষের সহানুভূতি ও সমর্থন জানান এবং বলেন যে, পর্তুগাল যে এখনো এই ধরনের ঔপনিবেশিক নীতি চালিয়ে যেতে পারছে, তার কারণ এখনো পর্তুগাল কতকগুলি শক্তিশালী এবং 'সম্মানিত' মিত্রের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ সাহায্য পাচ্ছে।

বলা বাহুল্য, এগুলির কোনোটাই নূতন কথা নয়। পর্তুগীজরা যে গোয়া দখল করে বসে থাকতে পারছে, সে-ও ঐ কারণে, এ কথা আমরা এক যুগ বারো বছরের উপর শুনে আসছি। একদা গোয়ার সহিত মুক্তি-আন্দোলনের প্রতি ভারতের কংগ্রেসী সরকারের সক্রিয় সমর্থনের প্রত্যাশা অমূলক ছিল না বলে লোকের ধারণা হয়েছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল যে, এ বিষয়ে ভারত সরকারের নীতি একটা "নয়া মোড়" নিয়েছে। তখন থেকে গোয়ার মুক্তির জন্য ভারত সরকার প্রোপাগান্ডা ছাড়া আর কিছু করতেন না—এই পথ নিয়েছেন এবং দেশের লোককে বলে আসছেন, ধৈর্য ধরে থাকো, গোয়া ছেড়ে দিতে পর্তুগীজরা একদিন না একদিন বাধ্য হবেই। আমাদের কিছু (বাকব্যয় ছাড়া) না করলেও হবে। সালাজারের গভর্নমেণ্টের মতো অত্যাচারী প্রতিক্রিয়াশীল গভর্নমেণ্ট স্বদেশেও হয়ত বেশিদিন টিকবে না। তা ছাড়া পর্তুগাল এবার "ন্যাটো" মিত্রদের কাছ থেকে যে সাহায্য ও সমর্থন এখন পাচ্ছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে, তাও একদিন উবে যেতে বাধ্য। তখন গোয়া আপনিই মুক্তি এবং স্বাধীন ভারতে স্বস্থান লাভ করবে।

একদিন না একদিন গোয়া মুক্তি পাবে। অবস্থার চাপে পর্তুগালের ঔপনিবেশিক মুষ্টি কোনো না কোনো দিন শিথিল নিশ্চয়ই হবে—কিন্তু এই কথা ঘোষণা মাত্র করাকে তো একটা কার্যনীতি বলা যায় না। এর জন্য এই রকম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনের জন্য পর্তুগালের শক্তিশালী মিত্রগণ ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পারে, কারণ ভারত সরকার অসহিষ্ণু হয়ে গোয়া সম্পর্কে কিছু একটা করে বসলে পর্তুগালের সেই সব শক্তিশালী মিত্রগণ নিশ্চয়ই একটু মুশকিলে পড়বেন। কারণ ভারত সরকার যদি নামমাত্র সামরিক ব্যবস্থাও অবলম্বন করেন, তা হলেও পর্তুগীজদের দু দিনও গোয়ায় টিকে থাকা সম্ভব নয়, "ন্যাটো"র প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া। কিন্তু "ন্যাটো"র কর্তাদের পক্ষে পর্তুগালের হয়ে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সাহায্য দিতে অগ্রসর হওয়া কি সহজ হতো? তাতে জগৎব্যাপী "কোল্ড ওয়ার" পরিস্থিতিতে যে বিপুল পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হতো, তার সম্মুখীন হতে কি আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি "ন্যাটো"র মুখ্য সদস্যগণ সাহসী হতো?

ভারত সরকার চান যে, আন্তর্জাতিক অবস্থার চাপ আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতির উপর পড়ুক এবং সেই চাপে তারা পর্তুগালের সালাজার গভর্নমেণ্ট এবং উহার ঔপনিবেশিক নীতির প্রতি সুস্পষ্ট বিরাগ প্রকাশ করতে বাধ্য হোক। আমেরিকা, বৃটেন প্রভৃতি প্রতিকূল হলে পর্তুগালের অত্যাচারী ঔপনিবেশিক নীতি অচল হবে। কিন্তু "ন্যাটো" শক্তিসমূহের উপর যে-আন্তর্জাতিক অবস্থার চাপ ভারত সরকারের আকাঙ্ক্ষিত সেটার সৃষ্টিতে নিজে কোনরূপ সক্রিয় অংশ নিতে ভারত সরকারের আপত্তি কেন? এই অনাগ্রহ কি ধর্মসম্মত? পণ্ডিত নেহর, যে কংগ্রেস কমিটির মিটিংএ অ্যাংগোলা সম্পর্কে দুটো শক্ত কথা বলেছেন বা ইউনাইটেড নেশনসএ ভারতের প্রতিনিধি অ্যাংগোলায় পর্তুগীজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে বক্তৃতা এবং নোট দিয়েছেন বা দেবেন সেটাকে হয়ত পূর্বোক্ত আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করার দিক দিয়ে ভারত সরকারের একটা বড়ো কাজ বলে কেউ কেউ মনে করবেন।

একথার কিছু মূল্য থাকত যদি গোয়ার মুক্তির প্রশ্নের সংগে ভারতের স্বার্থ সাক্ষাৎভাবে জড়িত না থাকত। আজ অ্যাংগোলায় হাজার হাজার মানুষকে পর্তুগীজরা মেরে শেষ করছে। এই ঘটনা নিয়ে পৃথিবীময় যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে তার চাপ অবশ্যই "ন্যাটো" শক্তিবর্গের উপর পড়বে। কিন্তু সেই চাপ কি এই জন্য পড়বে যে দুর্গাপুরে এ-আই-সি-সি মিটিংএ পণ্ডিত নেহর, এই নিয়ে দুটো শক্ত কথা বলেছেন? গোড়ায় যে-ব্যাপারটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাংগোলায় আফ্রিকানদের বিদ্রোহ। তারা যদি বিদ্রোহ না করত, তারা যদি এই ভেবে বসে থাকত যে আন্তর্জাতিক অবস্থার চাপে একদিন না একদিন পর্তু-গীজদের অ্যাংগোলা ছেড়ে যেতেই হবে, তাহলে কি এই চাপ সৃষ্টি হতো? অ্যাংগোলা, মোজাম্বিক প্রভৃতি পর্তুগীজ উপনিবেশিক রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়েছে বলেই তো আন্তর্জাতিক অবস্থার চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। ঐসব দেশে যদি বিদ্রোহ না ঘটত তবে ভারত সরকারের আকাঙ্ক্ষিত আন্তর্জাতিক অবস্থার চাপ কোথেকে আসত? অর্থাৎ আমাদের ধৈর্যের নীতির সাফল্য নির্ভর করছে অ্যাংগোলা, মোজাম্বিক প্রভৃতি পর্তুগীজ উপনিবেশিক রাজ্যের নির্যাতিত আফ্রিকান অধিবাসীদের ধৈর্য-চ্যুতির উপর। অর্থাৎ গোয়ার মুক্তির লড়াই অংশত অ্যাংগোলা এবং মোজাম্বিকের বিদ্রোহীরা করছে এবং তার জন্য তারা হাজারে হাজারে প্রাণ দিচ্ছেন। এর জন্য কেবলমাত্র বক্তৃতা করে পর্তুগাল এবং তার মিত্রদের গাল দেওয়া ভারত সরকারের পক্ষে উচিৎ কার্য হয় না।

গোয়ার সংগে ভারতের কোনো সম্পর্ক না থাকলে ভিন্ন কথা হোত। কিন্তু এক্ষেত্রে গোয়া সম্পর্কে ভারতের সরকারী নীতি যা তাতে অ্যাংগোলায় যারা মরছে তাদের প্রাণ বিসর্জনের ফলে আমরা সাক্ষাৎভাবে না হোক পরোক্ষভাবে কিঞ্চিৎ লাভ আশা করি। সুতরাং এখানে কিছু না করে কেবল মুখের কথা আর ভোট দিয়ে কর্তব্য সারা যায় না, তাতে অধর্ম হবে। এক্ষেত্রে ভারত সরকারের কর্তব্য হবে অবিলম্বে গোয়া মুক্তি সম্পর্কে একটা সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা। অন্ততপক্ষে অবিলম্বে ভারত সরকারের এই ঘোষণা করা উচিত যে একটা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে—ধরুন সাত দিনের মধ্যে—যদি অ্যাংগোলায় পর্তুগীজ অত্যাচার বন্ধ না হয় তবে ভারত সরকার গোয়া থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করতে অগ্রসর হবেন। সেইটাই হবে মানুষের মতো কাজ, মানুষের ধর্মপালন। কিন্তু ইলেকশনী প্রতীক খুঁজতে গিয়ে যাঁরা হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র কিংবা বৃষ পছন্দ না করে একজোড়া নিরীহমুখ প্রাণী—বলদ বেছে নিলেন, তাঁদের দ্বারা পরিচালিত গবর্ণমেন্ট কি তা করতে পারবে?

• • •

আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদী "প্রভিশনাল" গভর্নমেণ্টের এবং ফরাসী গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিদের মধ্যে এভিয়ান শহরে যে-আলোচনা চলছে সেই সম্পর্কে গত সপ্তাহের "বৈদেশিকী"তে একটি প্যারাগ্রাফ লিখিত হয়। তাতে এভিয়ান শহরের উল্লেখ যে-ভাবে করা হয় তা থেকে উক্ত শহরের অবস্থান সম্বন্ধে পাঠকের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এভিয়ান শহরটি ফ্রান্স ও সুইটজারল্যাণ্ডের সীমান্তে অবস্থিত কিন্তু ফ্রান্সের সীমানার মধ্যে সুইজারল্যাণ্ডে নয়। এভিয়ান শহরটি ফ্রান্সের স্যাভয় নামক প্রদেশের অন্তর্গত। স্যাভয় পূর্বে ফ্রান্সের অংশ ছিল না। ১০০ বছর আগে, নিখুঁত হিসাবে করলে ১০১ বছর পূর্বে ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩০।৫।৬১

আলোচনা

রামেন্দ্রসুন্দর

সবিনয় নিবেদন,

দেশ সাহিত্য সংখ্যায় শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব মহাশয়ের "রাষ্ট্রভাষা ও রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধের এক জায়গায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে অবাঙালী বলা হয়েছে। এরূপ মন্তব্য আমাদের কাছে নতুন লাগল। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় রামেন্দ্রসুন্দরের যে পরিচয় আছে তাতে কোথাও এই মন্তব্যের সমর্থনে কিছু খুঁজে পেলাম না। এ-বিষয়ে লেখক আলোকপাত করলে ভাল হয়। —ইতি

কমলকুমার হালদার, কলকাতা

বস্তারোপাখ্যান

সবিনয় নিবেদন,

দেশ পত্রিকার ২৯ সংখ্যায় (২০শে মে '৬১) বস্তার স্টেটের ভূতপূর্ব মহারাজা প্রবীরচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীসুনীত ঘোষ যা লিখেছেন তার সবটাই কি সত্য তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? না, রাজনৈতিক প্রচারকার্য— ঠিক বোঝা গেল না। লেখক বলছেন, মহারাজার মাত্র ৩০ বছর বয়স। যত দূর জানা যায় ১৩৩৬ সালে প্রবীরচন্দ্র দার্জিলিঙে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁর বয়স বত্রিশ পার হতে চলল। এটা অবশ্য মারাত্মক ভুল নয়। কিন্তু সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রবীরচন্দ্র মাতা মহারানী প্রফুল্লকুমারী দেবীর সঙ্গে কিছুদিন বিলাতে কাটান— এ যে একেবারে অসম্ভব কথা। ইংরাজী ১৯৩৬-এর প্রথম বা শেষ ভাগে মহারানী প্রফুল্লকুমারী বিলাতে মারা যান। প্রবীরচন্দ্রের তখন ছয় কি সাত বৎসর মাত্র বয়স (বাংলা ১৩৪২-৪৩)। আর্যদর্পণ মাসিক পত্রিকার ১৩৬৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রফুল্লচন্দ্র ভঞ্জ দেও লিখছেন, মহারানী মারা যাওয়ার পর ছোট্ট ছেলেমেয়েদের নিয়ে কিরকম বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন তিনি।

একটি তথ্যের এতখানি অসঙ্গতিতে সমস্ত রচনাটির সঙ্গতি সম্বন্ধেই কি সন্দেহ জাগে না? মহারাজ প্রবীরচন্দ্রের বিরুদ্ধে সরকার অবশ্য রুষ্ট কিন্তু দেশবাসীর তাতে রুষ্ট হওয়ার কি থাকতে পারে বা প্রবীরচন্দ্রকে নিন্দা করার কি এমন কারণ ঘটতে পারে প্রবন্ধটি পড়ে তাও তো বোঝা গেল না। প্রবীরচন্দ্রের যেসব দোষের ইঙ্গিত করা হয়েছে আমাদের অনেক বড়লোকেরই কি তা নাই?

জনৈক জিজ্ঞাসু
পুরী, উড়িষ্যা।

আকবর-মহিষী মরিয়ম-উজ-জমানী

(লেখকের উত্তর)

সম্পাদক মহাশয় সবিনয় নিবেদন,

৯ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল) তারিখের "দেশ" সংখ্যায় উপরোক্ত প্রবন্ধের আলোচনায় শ্রীআবুল হাসান মোল্লা সাহেব লিখিয়াছেন, "মরিয়ম উজ-জমানীকে জাহাঙ্গীরের বিমাতা ধরিয়া নেওয়া যেতে পারে।" এই মতের পক্ষে তিনি অভিনব দুইটি যুক্তি দিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক শ্রীহীরেন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৩০শে বৈশাখ (১৩ই মে) তারিখের "দেশ" সংখ্যায় প্রশ্নবহুল উত্তরদানে আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

আমার প্রবন্ধে আছে—"আবুল ফজল লিখিয়াছেন 'মরিয়ম-উজ-জমানী' পদবীতে ভূষিতা হন জাহাঙ্গীরের মাতা"—আমার এই উক্তিটি যে ভুল, তাহা নির্দেশ করার জন্য

অধ্যাপক মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। অসাবধানতাবশতই এই কথা কয়টি লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম, ঐতিহাসিক আলোচনায় এরকম ত্রুটির জন্য অন্যায় স্বীকার করিতেছি।

জাহাঙ্গীরের মাতার কথায় আবুল ফজল যে কথা ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অনুবাদ Beveridge সাহেব করিয়াছেন matrix of the sun of fortune। সুজন রায়ই একমাত্র ঐতিহাসিক যিনি জাহাঙ্গীরের মাতা অম্বর-দুহিতার পদবীটির কথা প্রথমে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার যথার্থতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা আজ একমত।

মোল্লা সাহেবের প্রথম যুক্তি যে আমার উদ্ধৃত উক্তিগুলিতে জাহাঙ্গীর মরিয়ম-উজ-জমানী পদবীটির উল্লেখকালে কোথাও মা শব্দটি ব্যবহার করেন নাই। অধ্যাপক মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"জাহাঙ্গীর তাঁর আত্ম-জীবনীতে যে ভাবে মরিয়ম-উজ-জমানী সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উক্তি করিয়াছেন তাতে সন্দেহ থাকে না ইনিই জাহাঙ্গীরের জননী" —মোল্লা সাহেব সম্ভবত এই মন্তব্যে সন্তুষ্ট হইবেন না, তাই তাঁহার প্রীত্যর্থে এমন একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি যাহাতে পদবীটিও আছে আর মা শব্দটিও রহিয়াছে, যথা ঃ

"As when I started in pursuit of Khusrau I had left my son Khurrum in charge of the palaces and treasury, I now when that affair had been settled, ordered the said son to attend "Hazrat Marayam Zamani," and other ladies and to escort them to me. When they reached the neighbourhood of Lahore on Friday, the 12th of the month mentioned I embarked in a boat and went to a village named Dahr to meet my **mother** and I had the good fortune to be received by her.

অধ্যাপক মহাশয়ের যথার্থ উক্তি, যে "যোধবাই বা যোধাবাই"-এর উৎপত্তি অনেক পরে, টড ও ব্লকম্যানের আমলে—কথা কয়টি একটু বিস্তারিত করিয়া মোল্লা সাহেবকে জানাইতেছি যে জাহাঙ্গীরের মায়ের নাম যোধবাই এই উক্তিটির উদ্ভাবক হইলেন Blochman সাহেব। তাঁহার অনূদিত আইন-ই-আকবরীর প্রথমার্ধে (৩১০ পৃষ্ঠা) এই কথাটি আছে। তিনিই আবার শেষার্ধে (৬১৯ পৃঃ) এই অনুমান ভুল স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, অম্বররাজ বিহারীমলের কন্যাই নিঃসন্দেহে জাহাঙ্গীরের মাতা আর যোধবাঈ হইলেন জাহাঙ্গীরের স্ত্রী।

Beveridge সাহেব এ কথা না মানিয়া একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"...... Jahangir's mother was Muhammedan and no other than Salima Sultana Begam, the widow of Bairam Khan.

Elphinstone সাহেব এ দুই মতের *সমন্বয় রাখিয়া বলিয়াছেন, জাহাঙ্গীরের জন্মের পরেই তাঁহার মায়ের মৃত্যু হওয়ায় সলিমা বেগম তাঁহাকে মানুষ করেন।*

Vincent Smith যোধবাঈ নাম ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু কোন ঐতিহাসিক নজির দেখান নাই।

এমনই সব পরস্পর-বিরোধী উক্তি ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা করিয়াছেন।

অধ্যাপক মহাশয়ের চিঠির পরে, আর আমার এই স্বল্প কথায় এই আলোকপাতের পর মোল্লা সাহেবকেই বিচার করিয়া লইতে অনুরোধ করি।

আকবরের সহিত বিবাহের পরেও অম্বর-দুহিতা "আজীবন হিন্দু ছিলেন বলিয়া আমরা জানি" অর্থাৎ তিনি মুসলমান হন নাই। মোল্লা সাহেবের এই দ্বিতীয় ও প্রধান যুক্তিটি শুধু উদ্ভটই নয়, নিজ ধর্ম বিষয়ে তাঁহার অজ্ঞতারই পরিচায়ক। এ বিষয়ে অধ্যাপক মহাশয়ের অল্প কথা কয়টিই যথেষ্ট।

অধ্যাপক মহাশয়ের চিঠির দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রথম, রাঠোর বংশের তিনজন রাজকুমারীর সহিত আকবরের বিবাহের উল্লেখ। এ বিষয়ে দুইটির সম্বন্ধে অত্যন্ত ঐতিহাসিক প্রমাণাভাব। তবে বিকানীর রাজকন্যার কথা বদায়ুনী উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয়, জাহাঙ্গীর-পত্নী যোধপুরাধিপতি রাজা উদয় সিংহের কন্যার নাম ছিল—"মানমতি বালমতি বা সংক্ষেপে মানবাঈ......কেউ কেউ মনে করেন (ওঝা) ইনিই যোধবাঈ কিন্তু ইহার সঠিক প্রমাণ নেই।"

জাহাঙ্গীরের প্রথম বিবাহ হয় রাজা ভগবানদাসের কন্যা, মান সিংহের বোনের সহিত, তাঁহারই নাম ছিল মানবাঈ, পুত্র খসরুর জন্মের পর শাহবেগম পদবীতে তিনি ভূষিতা হন। যা হোক, এ বিষয় দুইটির আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়।

পরিশেষে মোল্লা সাহেবকে জানাই বর্তমানে প্রচলিত যোধবাঈ মহল নামকরণটি হইয়াছে ইংরাজ আমলেই। আগ্রা-দিল্লির কয়েকটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানেই এরকম ইতিহাস-বিরুদ্ধ নামের বিভ্রাট দেখা যায়। ভবিষ্যতে আরও কয়েকটির পরিচয় দেওয়ার ইচ্ছা আছে।

যে ভুল ইতিহাস মোল্লা সাহেবকে রাত্রি জাগিয়া মুখস্থ করিতে হইয়াছে, সে ভুল ইতিহাস আজও প্রচলিত রহিয়াছে। আর এই ভুল শিক্ষার জন্য দায়ী সেই শিক্ষকেরাই যাঁহারা ইংরাজদের ইতিহাস মাত্রই অভ্রান্ত মানিয়া অনেক মিথ্যা চর্বিত চর্বণ করিয়া ইতিহাস শিক্ষা দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন না।

মোল্লাসাহেবকেও, বিশেষ করিয়া অধ্যাপক মহাশয়কে, আমার অশেষ ধন্যবাদ জানাই। নিবেদন, —ইতি

শ্রীশৈলেন দত্ত

সভাপতি খুঁজতে নেই

প্রেমেন্দ্র মিত্র

পাড়ার ছেলেরা হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

তাদের কোন হদিস্ দিতে পারলাম না, তাদের সমস্যার কোন সুরাহা করতে।

সংকট মোচন না করতে পারার লজ্জাতেই জনে জনে দু কাপ করে চা আর পাড়ারই আদি অকৃত্রিম দোকানের তেলেভাজার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও যেরকম শুকনো মুখে সবাই গেল তাতে মনে হল মোড়ের ময়রার কিছু মিষ্টান্নও আনান উচিত ছিল।

সমস্যা অবশ্য তাদের গুরুতর। অবস্থা সঙীন।

শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের সভাপতি পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আজ বাদে কালকেই সভা। ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। মাইক ভাড়া হয়ে গেছে চার চারটে লাউডস্পীকার সমেত। স্টেজ খাটান প্রায় শেষ। চেয়ার টেবিল, নিয়ন লাইট, স্পটলাইট মায় ফুলের মালার অর্ডার চলে গেছে।

কেন তোমাদের ত......বলতে গিয়েছিলাম তাদের আগে থাকতে ঠিক করা সভাপতির কথা।

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে একজন বলেছে—না স্যার, তাঁকে পাওয়া যাবে না। তিনি এখন মৌনী।

মৌনী! সে আবার কি? সন্ন্যাস টন্ন্যাসে, তার ত ঝোঁক ছিল না!

শিবু ও আমি দুজনেই অবাক হয়ে বক্তার দিকে তাকিয়েছি। যাঁর কথা বলেছি তাঁর আর যাই হোক এরকম আধ্যাত্মিক ব্যাধির লক্ষণ ত কোনদিন দেখা যায় নি।

না স্যার সন্ন্যাস নয়, ব্যাপারটা ল্যারিঞ্জিসমস্।

শব্দটা উচ্চারণ করতে গিয়ে বিষম খেয়ে শিবু বলেছে,—তার মানে?

মানে সকাল বিকেল রোজ বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে ওই গলার রোগ হয়েছে। কথা বলতে গেলে খাবি খান। চিকিৎসা চলছে।

তাই ত'—বলে দ্বিতীয় একজন বক্তা-শিরোমণির নাম করেছি।

ছেলেরা মাথা নেড়েছে বিষণ্ণভাবে।—তাঁর কাছেও গিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর মান রাখতে পারলাম না যে!

মান রাখতে পারলে না!—একটু অসন্তুষ্ট হয়েই বলেছি, মানী লোককে ডেকে তাঁকে অপমান করেছ তাহলে?

না না, অপমান করব কেন?—সবাই সমস্বরে প্রতিবাদ করেছে, তিনি আসেন-ই-নি, তা অপমান করব কাকে?

আসেন নি?

আজ্ঞে না। তিনি বলেছিলেন, প্রেস ফটোগ্রাফারের ব্যবস্থা করে তবে তাঁকে আনতে যেতে। প্রেস ফটোগ্রাফার পাব কোথায়? লাগামের চেয়ে ঘোড়া পাওয়া শক্ত।

আরো দু চারজন বাক্যবীরের নাম করে তারপর দেখেছি ছেলেরা কারুর জন্যেই চেষ্টা করতে বাকি রাখে নি। কিন্তু সভাপতিদের কারুরই এখন ফুরসত নেই।

শিবু এতক্ষণে বলেছে,—হ্যাঁ হরিশ বাবুকে পেলে আর ভাবনা ছিল না। সব সমস্যা মিটে যেতে পারত বটে!

হরিশ বাবু কে, প্রশ্ন তোলবার আগে শিবু নিজেই নিজের কথায় একরকম পূর্ণচ্ছেদ দিয়েছে, হরিশবাবুর অস্তিত্বেও জিজ্ঞাসার চিহ্ন,—তবে বেঁচে থাকলেও তিনি আর এরকম সভায় আসবেন কি না সন্দেহ!

অস্তি নাস্তির সংশয়াবৃত হরিশ বাবু সম্বন্ধে ছেলেরা উৎসাহিত হয়নি।

তারা হতাশ হয়ে চলে যাবার পর কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—হরিশ বাবু আবার কে হে?

চেনো না ত'!—শিবু আমার দিকে একটু যেন অনুকম্পাভরে চেয়ে বললে, একবার কি কষ্টে যে তাঁকে সভাপতি করেছিলাম। হ্যাঁ তবে জমেছিল বটে সভা।

কিসের সভা?

সাহিত্যের হে সাহিত্যের!—বলতে শুরু

কিন্তু তাঁর মান রাখতে পারলাম না যে

করল শিব্‌,—এখানকার মত সকাল বিকেল অলিতে গলিতে না হলেও তখনও সাহিত্য-সভা হ'ত। আর এমনি একটি সাহিত্য-সভার সভাপতি খ'্‌জতে বেরিয়েছিলাম আমি আর গৌর। আমার মাসতুত ভাই গৌরকে ত চেনো। গৌর আমার চেয়ে বয়সে ছোট হলে কি হবে ব্‌দ্ধিতে বিচক্ষণতায় অনেক এগিয়ে গেছে তখনই। সে-ই য্‌ক্তি দিয়েছিল গ্‌র্‌গম্ভীর সাহিত্য-সভা ত সবাই করে, আমাদের হবে সাহিত্যের হাসির সভা। হাসির সভা জমাতে পারে এমন সভাপতির খোঁজখবরও সে কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিল। সভাপতি হবেন স্বয়ং হরিশ বাব্‌।

হরিশ বাব্‌ আবার কে?—তোমাদের মত আমিও হতভম্ব হয়েছিলাম।

হরিশ বাব্‌কে জানেন না! প্রেমচাঁদ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের হরিশ বাব্‌?—গৌর এমন অবজ্ঞাভরে জবাব দিয়েছিল যে আর কিছ্‌ প্রশ্ন করতে সাহস করিনি।

গৌরই উদার হয়ে আর একট্‌ বিস্তারিত পরিচয় দিয়ে তারপর জানিয়েছিল যে, হরিশ বাব্‌ একজন উঠ্‌তি নতুন লেখক, তাঁর লেখা পড়লে নাকি হাসতে হাসতে নাড়ি ছি'ড়ে যায়।

সেই হরিশ বাব্‌কে খ'্‌জতে শহর প্রায় চষে ফেললাম। কিছ্‌ক্ষণ বাদে সন্দেহ হ'ল প্রেমচাঁদ চ্যাটার্জি স্ট্রীট কোথায় গৌরেরও ঠিক জানা নেই। এ রাস্তা ও

কি হেতু আগমন?

রাস্তা ঘ্‌রে রাস্তার নামের কিছ্‌ আদল মেলে ত হরিশ বাব্‌কে পাওয়া যায় না। হরিশ বাব্‌র নাম পাওয়া যায় ত পরিচয় বা রাস্তার নাম মেলে না।

কিন্তু তেমন সাধনায় ভগবান মেলে ত' হরিশ বাব্‌ কোন্‌ ছার?

শেষ পর্যন্ত হরিশবাব্‌র খোঁজ পেলাম। পেলাম এক পাড়ায় নামাবলি গায়ে সদ্য গঙ্গা স্নান ফেরত বলেই মনে হল এক বাম্‌ন পণ্ডিত গোছের লোকের কাছে।

হরিশবাব্‌ কি? হরিশ শাস্ত্রীকে খ'্‌জছ বলো!—দয়াপরবশ হয়ে তিনি কোন্‌ দিক দিয়ে কোথায় গেলে হরিশ বব্‌কে পাওয়া যাবে ব্‌ঝিয়ে দিলেন।

হরিশবাব্‌র বদলে হরিশ শাস্ত্রী শ্‌নে আমি একট্‌ হতভম্ব হলেও গৌর নির্বিকার। যেতে যেতে সগর্বে বললে,—কিরকম লেখক দেখেছেন? ব্‌ড়ো বাম্‌ন পণ্ডিতরাও এক ডাকে চেনে!

কিন্তু শাস্ত্রী বললেন যে!

কেন শাস্ত্রী হতে আপত্তি কিসের? শাস্ত্রী হলে আর হাসতে জানে না! প্‌লিস হলে বিয়ে করে না? ওইটেই ত মজার ভড়ং!

য্‌ক্তিটা ঠিক না ব্‌ঝলেও কিছ্‌ এর পর আর বলতে পারলাম না। কিন্তু মজার ভড়ং হরিশবাব্‌ থ্‌ড়ি শাস্ত্রী মশায়ের আরো অনেক দেখলাম তারপর। গৌরের কাছে উঠ্‌তি লেখক শ্‌নে যা ধারণা হয়েছিলো তার সঙ্গে কোন মিলই নেই। বেশ বয়স্ক গম্ভীর সম্ভীর মান্‌ষ, পরনে গেরুয়া ধ্‌তি আর চাদর। গলায় র্‌দ্রাক্ষ, কপালে লাল চন্দনের ত্রিপ্‌ণ্ড্রক। আমি ঘরে ঢ্‌কেই একট্‌ থতমত খেলেও গৌর তখ্‌নি আমাদের দিকে চেয়ে চোখের ইঙ্গিত করে হাসি চাপতে খ্‌ক খ্‌ক করে কাশতে শ্‌র্‌ করেছে।

আমাদের দিকে ভ্রূকুটি-কুটীল চোখে চেয়ে হরিশবাব্‌ (বাব্‌ই বলি) 'কি হেতু আগমন?' বলতেই গৌর প্রায় বেসামাল হয় আর কি হাসির বেগ চাপতে!

গৌরের বদলে স্‌তরাং আমাকেই আগমনের হেতুটা সবিনয়ে জানাতে হ'ল।

সভাপতিত্ব?—সব শ্‌নে কিছ্‌ক্ষণ চোখ ব্‌জে যেন ধ্যানস্থ হয়ে হরিশ শাস্ত্রী (না, শাস্ত্রীই ঠিক) বললেন,—বেশ সম্মত হলাম। কিন্তু পাথেয় ও প্রণামী?

গৌরের কাশির ছলনা আর ব্‌ঝি টেঁকে না।

পাথেয় ও প্রণামী দিতে দ্‌জনের পকেট প্রায় খালি করে বেরিয়ে আসবার পরও রাস্তাতেই হেসে সে প্রায় ল্‌টিয়ে পড়ে।

এই না হলে হাসির লেখক। যা বলে-ছিলাম অক্ষরে অক্ষরে মিলল কিনা?

সামান্য একট্‌ সংশয় প্রকাশ করে বলতে গেলাম,—কিন্তু তুমি যে বলেছিলে উঠ্‌তি লেখক। এ'র যা বয়স...

গৌর কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলে,—আরে উঠতি বয়স ত বলিনি। পড়তি বয়সে ব্‌ঝি উঠতি লেখক হতে পারে না!

মনের মধ্যে সন্দেহ সংশয় যাই থাক, সভার দিন গৌরের সব কথা অক্ষরে

অক্ষরেই মিলল বটে। হরিশবাবু (বাবুই বা নয় কেন?) যথাসময়ের বেশ কিছু আগে একটি বেশ ভারী ক্যাম্বিশের ব্যাগ নিয়ে তাঁর সেই গৈরিক ধুতি চাদরের বদলে প্রায় আলখাল্লা জাতীয় বেশে এসে সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করা থেকে ব্যাগ খালি করে, বিদায় নেওয়া পর্যন্ত সমস্ত সভা হেসে কুটিপাটি।

হরিশ শাস্ত্রী (শাস্ত্রীতে দোষ কি?) সভায় আসীন হলে প্রাথমিক মাল্যদান ইত্যাদি অনুষ্ঠানের পর গৌরই তাঁর পরিচয় দিতে উঠল। কিন্তু পরিচয় দেবে কি? হরিশবাবু (দূর—! বাবুই থাক্) সম্বন্ধে আমার ও গৌরের কাছে যা আভাস ইঙ্গিত সবাই ইতিমধ্যে পেয়েছে তাতে সভা আরম্ভ না হতেই থেকে থেকে হাসির হিল্লোল উঠতে শুরু করেছে। গৌর ত পরিচয় দিতে গিয়ে হাসতে হাসতেই বসে পড়ল। তারপর হরিশ শাস্ত্রী (ওই শাস্ত্রীই রইল) যখন উঠে দাঁড়িয়ে জলদগম্ভীর স্বরে শুরু করলেন,—'পুণ্যভূমি আর্যাবর্তের হে আত্মবিস্মৃত অর্বাচীন মূঢ়মতি কুলাঙ্গারমণ্ডলী...' তখন হাসির রোলে তাঁর বক্তৃতাই আর শোনা গেল না। বিশেষ করে তিনি যখন ক্যাম্বিশের সেই পেট মোটা ব্যাগ খুলে বলতে লাগলেন, —'পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের এই তামসিক যুগে ত্রিকালজ্ঞ বৈদিক ঋষিগণের পরম তপস্যালব্ধ যে অলৌকিক সম্পদ আজ আপনাদের মোহান্ধতা দূর করবার জন্যে আমি বহন করে এনেছি...' তখন সভার চেয়ার বেঞ্চি ত প্রায় খালি। হাসতে হাসতে মাটিতেই সবাই গড়াগড়ি যাচ্ছে।

প্রথম পরিচয় থেকে শুরু করে সভার শেষ পর্যন্ত হাসিয়ে যিনি মাৎ করেছেন তাঁর মুখে এতটুকু হাসি কিন্তু দেখি নি।

সে হাসি দেখলাম ট্যাক্সিতে উঠিয়ে তাঁকে সসম্মানে বিদায় দেবার সময়। তখন তাঁর ক্যাম্বিশের ব্যাগ খালি আর আলখাল্লার পকেট ঝুলে পড়েছে।

শিবু থামল। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—কি ছিল ব্যাগে?

মৃত্যুন্তক কবচ। নগদ মূল্য পাঁচ সিকা। পাঁচ সিকে দিয়ে সেই কবচ কিনতেই কি হুড়োহুড়ি আর হাসির ধুম!

সেই স্মৃতি জেগে ওঠাতেই বোধহয় শিবু আমার দিকে চেয়ে অদ্ভুতভাবে আবার হাসতে লাগল।

হঠাৎ একটু সন্দিগ্ধ হয়ে বললাম,—আচ্ছা নাম ঠিকানা কি বললে যেন! হরিশ বাবু, না, না হরিশ শাস্ত্রী প্রেমচাঁদ চ্যাটার্জি লেনের? গৌর নাম ঠিকানার কিছু ভুল করেনি ত! কোথায় যেন কি একটা গোলমাল আছে ঠেকছে?

ঠেকছে নাকি?—বলে শিবু হঠাৎ উঠে গেল কেন কে জানে!

ট্রামেবাসে

পাম্পিং মেশিনের ভাল্‌ব বিকল হইয়া যাওয়ায় কলিকাতা কর্পোরেশনের খাস দপ্তরে পৌর-পিতাদের মধ্যে নাকি জল লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল, সকলের

মুখেই জল জল রব।—"শুনেছিলাম আশী-বিষে দংশন না করলে নাকি বোঝা যায় না বিষের কী যাতনা। ভাবছি সামান্য কয়েকটা ঘণ্টার জন্যও জলাভাবের কষ্ট যে কি নিদারুণ তা পৌর-পিতারা উপলব্ধি করেছেন কি?" —প্রশ্ন করে শ্যামলাল।

পুরীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় শ্রীনেহরু বলিয়াছেন যে আসাম ও বাংলার মধ্যে বিরোধের জন্য কে দোষী বা কে নির্দোষ তিনি বিচার করিতে চাহেন না। বিশুখুড়ো বলিলেন—"বিচার নেই বলেই তো সখেদে বলছি অপরাধী জানিল না কিবা অপরাধ, বিচার হইয়া গেল!!"

এক সংবাদে প্রকাশ জাপানের একজন বিজ্ঞানী পনর বছর গবেষণার পর আবিষ্কার করিয়াছেন যে মানুষের পায়ের তলা দেখিয়া লোকটি সুস্থ ও তৃপ্ত কিনা তা

বলা যায়, সুস্থ ও তৃপ্ত ব্যক্তির দেহের ভার পায়ের তলায় সমানভাবে পড়ে।—"আর যাদের দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না তাদের সম্বন্ধে বিজ্ঞানী কোন গবেষণা করেছেন কি"—প্রশ্ন করে শ্যামলাল!

কর্পোরেশনেরই অন্য খবরে শুনিলাম ছাত হইতে বৃষ্টির জল পড়িয়া একটি অফিস কক্ষ নাকি জলে জলময় হইয়া গিয়াছিল।—"একেই বলে, শিরে কৈল সর্পাঘাত তাগা বাঁধিব কোথা"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

মার্দার্স কেডেট কোর কর্তৃক অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তীতে রাশিয়ান কনসুলেটের সম্পাদক কবিগুরুর প্রশস্তি গাহিয়াছেন। এবং পরে গাগারিন সম্পর্কে বলিয়াছেন, "আজ যদি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তিনিই মহাকাশ বিজয় সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা অধিক সুখী হইতেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"কবির মহাকাশ বিজয় সম্বন্ধে গাগারিন কি বলেন? তিনি শুনেছেন কি, মন মোর মেঘের সঙ্গী, উড়ে চলে দিক-দিগন্তের পানে নিঃসীম শূন্যে"।

জলধরের সংবাদে শুনিলাম সেখানে একটি ত্রিপদ বিশিষ্ট শিশু জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে।—"ছুচা ফোটা দান নিয়ে যাদের দর্পের অন্ত নেই তারা বামনরূপী বিষ্ণু ও দৈত্যরাজ বলির কথা স্মরণ করুন" —মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

জাপানেরই অন্য খবর একটি দংশন বিশারদ সম্বন্ধে। মানব দেহে দংশনের চিহ্ন সম্পর্কে ইনি গবেষণা করিতেছেন। কয়েকটি মহিলার বাহু ও স্কন্ধে দংশন করিয়া তিনি ক্ষত সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছেন।—"কিন্তু দাঁতে কাটা যাদের স্বভাব, তাঁদের দংশনের ছাপ চর্মে পড়ে না, পড়ে মর্মে। মনে হয় দাঁতেকাটাদের গবেষণাটাই আগে হওয়া উচিত"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

জাপানের আর একটি খবর (জাপানের হইল কী!) হইল দাম্পত্য কলহের দাওয়াই আবিষ্কার। চীন সাগরের উপকূলে গাংকা নামে জেলেদের একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে প্রবাল দ্বীপের উপর একটি ন্যাড়া পাহাড় আছে। এই পাহাড়ের নামকরণ করিয়াছে গাংকার জেলেরা—"বিচ্ছেদমিলন পাহাড়"। স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া হইলেই গাঁয়ের লোকেরা নৌকা করিয়া তাদের ঐ পাহাড়ে রাখিয়া আসে। দুই একদিনের মধ্যেই স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন হয়। তখন আবার তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা হয়।—"বিবাহবিচ্ছেদের জন্য কোর্টে না গিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে একবার গাংকার পাহাড়টা ঘুরিয়ে আনলে হয় না। তবে কথা হচ্ছে, সবাই তো আর তেমন বাপের বেটা বেটী নয়, পাহাড় তো তাদের কাছে নুড়ি মাত্র"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

ফুটবল লীগের খেলায় মোহনবাগান বি এন আর-এর কাছে এক গোলে হারিয়াছেন।—"মোহনবাগান আর যা করুন,
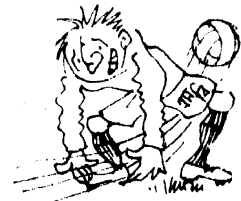
রেলওয়ের সঙ্গে খেলতে হুঁশিয়ার, ওদের এখন বৃহস্পতি তুঙ্গী। মনে নেই বেটন কাপের কথা"—মন্তব্য করেন জনৈক ক্রীড়া-রসিক সহযাত্রী।

বাবা বুড়োরাজ

নির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

(১)

কণ্টকনগর কাটোয়া। ভাগীরথীবিধৌত কাটোয়া। ভারতের ধর্মসংস্কৃতির ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় নাম। নবদ্বীপচন্দ্র নিমাই সংসার পরিত্যাগ করে গঙ্গা পার হয়ে প্রথম পদার্পণ করেন এই কাটোয়ায়। এখানে তিনি কেশবভারতীর কাছে দীক্ষা নেন। মস্তক মুণ্ডন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পিতৃদত্ত বিশ্বম্ভর নাম পরিত্যাগ করেন :

এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্বলোকে তোমা হইতে যাতে হৈল ধন্য॥

বৈষ্ণবতীর্থ কাটোয়ায় কালহরণের উপায় নেই এবার। এই প্রত্যুষেই বড়ো লাইনের দক্ষিণগামী ট্রেন ধরতে হবে। কয়েকটিমাত্র স্টেশন মাঝে। নামব পাটুলিতে। গত কাল শুক্লা চতুর্দশী গেছে। আজ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। চলেছি বুড়োরাজের মেলায়। পাটুলি স্টেশনে নেমে গঙ্গাকে পিছনে রেখে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল হাঁটা পথ। এই পথের প্রান্তে বুড়োরাজের স্থান। গ্রাম জামালপুর, ডাকঘর বেলেরহাট, থানা পূর্বস্থলী।

বুড়োরাজ বড়ো জাগ্রত দেবতা। তাঁর কথা অনেকদিন শুনেছি। কিন্তু আগে কোনো দিনই তাঁর কাছে আসার সুযোগ হয়নি। এ বছর বৈশাখী পূর্ণিমায় বাবা দয়া করেছেন।

পাটুলি স্টেশন থেকে পাটুলি গ্রাম ও ভাগীরথী নদী প্রায় আড়াই মাইল। আমরা হাঁটতে শুরু করলাম গঙ্গার বিপরীত মুখে। সহযাত্রী হলেন পাটুলির একজন শিক্ষক ও অগ্রদ্বীপের এক সরকারী কর্মচারী। শিক্ষকটি তরুণ সমাজকর্মী,—সেবাদলে যোগ দিতে চলেছেন। অপর ভদ্রলোকটি প্রৌঢ়। বাবার চরণে মানসিক দেবেন,—সঙ্গে নিয়ে চলেছেন অর্ঘ্য ও গঙ্গাজল।

চওড়া পথ। গরুর গাড়ির পক্ষে প্রশস্ত। কোথাও কোথাও বড়ো বড়ো তেঁতুল ও নিমগাছ, বাঁকে বাঁকে প্রাচীন বট-অশ্বত্থের ছায়া। তবে অধিকাংশ পথই ছায়াবিরল। দু ধারে শস্যরিক্ত শূন্য ক্ষেত। বৈশাখের দ্বিপ্রহরে এই পথ মহা কণ্টকর সন্দেহ নেই, তবে ভোরবেলা সেই কষ্ট কল্পনাতেও আসে না। পাটুলির পর আর ইলেকট্রিক নেই। বর্ধিষ্ণু কৃষিপ্রধান গ্রামের পর গ্রাম,—কাঁকনাইল, ছাতনি, মধুপুর, বেলেরহাট, নিমদহ। তারপর জামালপুর। প্রধান জীবিকা কৃষিকর্ম ও পশুপালন। বেলেরহাটের হাট ধান ও পাটের জন্য বিখ্যাত। জামালপুরের গোহাটায় প্রতি রবিবার অসংখ্য গরু মহিষ ভেড়া ছাগল হাঁস-মুরগির আমদানি। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের পর বহু কৃষিজীবী পূর্ববঙ্গবাসী এই অঞ্চলে বসতি করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে প্রত্যক্ষ কৃষিকর্মী হয়েও যথেষ্ট সমৃদ্ধির মুখ দেখেছেন ও পাকাবাড়ি তুলেছেন। স্বাধীনতার পরের উল্লেখযোগ্য অবদান কৃষি-সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা, গ্রামে গ্রামে টিউবওয়েল স্থাপন ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার।

শিক্ষক বন্ধুটি বললেন,—মাত্র দশ বারো বছর আগেকার কথা। পাটুলি থেকে জামালপুরের এই পাঁচ মাইল পথ ছিল ঘন বনের মধ্যে দিয়ে। দু ধারে শুধু সেঁয়াকুল আর বাবলার জঙ্গল,—কোথাও কোথাও ঘন বাঁশবন। বন্যজন্তুর আড্ডা। আর অজস্র ছিল পিটুলি আর শিমুল গাছ। গ্রামগুলি টিম্ টিম্ করত। দিনের বেলাতেই ভয় করত এই পথে যেতে।

বাঁ দিকে হাত বাড়িয়ে বন্ধু বললেন—ঐ দেখুন উঁচু বাঁধ, ওর ওপারে গঙ্গা। আগে বন্যায় এ ধারের গ্রামাঞ্চল ডুবে যেত। স্থানীয় কৃষিজীবীদের সহযোগিতায় কেমন সুন্দর বাঁধ উঠেছে। গঙ্গা দামপালের কাছে বাঁধা পড়েছেন—এদিকের কৃষিক্ষেত্রগুলো বিপন্মুক্ত হয়েছে।

পাটুলি ছাড়া পাশাপাশি আরো দুটি স্টেশন আছে যেখানে তীর্থগামী যাত্রীরা নামে। বেলেরহাট হল্ট আর লক্ষ্মীপুর। সব যাত্রী মধুপুর গ্রামের কাছাকাছি এসে একত্রে মেলে। মধুপুর থেকে জামালপুর পর্যন্ত সমস্ত পথে যাত্রীর ভিড় ফুলে ফেঁপে উঠল। এক বস্ত্র, নগ্নপদ, কাঁধে গামছার পুঁটুলি, হাতে লাঠি। অনেক অনেক দল পাঁঠা চরিয়ে ও মুখে দড়ি বেঁধে শুয়োর টেনে নিয়ে চলেছে, দলের মধ্যমণির কাঁধে লাল গামছায় জড়ানো বলির খড়্গ। নারী ও শিশুর সংখ্যা অগণিত। মেয়েদের অনেকেরই হাতে ঘটিভর্তি বাবার মাথায় দেবার জল। সবাই চলেছে পায়ে হেঁটে। গরমকালে এ পথে গরুর গাড়ির সংখ্যা খুবই কম। একটু বৃষ্টি পড়লে এঁটেল মাটিতে গাড়ির চাকা একবার বসলে আর নড়বে না। সযাত্রী প্রৌঢ় ভক্তটির কাছ থেকে

লাঠিয়াল ভক্তদের সমাবেশ।

বুড়োরাজ বাবার আবির্ভাবের কাহিনী শুনতে শুনতে চলেছি। ইতিমধ্যেই চড়া রোদ গায়ে এসে বিঁধছে।

বহু বৎসর আগেকার কথা। জামালপুর তখন ঘন অরণ্যে ঘেরা। পার্শ্ববর্তী গ্রাম নিমদহে তখন বিশেষ সমৃদ্ধিশালী গোপদের বাস। এই গোপদের মধ্যে যদু ঘোষ ছিল প্রধান। তার বহু দুগ্ধবতী গো-মহিষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী দুধ দিত শ্যামলী নাম্নী একটি গাভী। এই গাভীটির আদর যত্নও ছিল সবচেয়ে বেশী। হঠাৎ কিছুদিন ধরে যদু লক্ষ্য করত লাগল শ্যামলীর স্তন দুগ্ধশূন্য। অন্য সব গাভীর সঙ্গে শ্যামলী রোজ মাঠে চরতে যায়, দিন-শেষে দলের সঙ্গে ফিরেও আসে, অন্য সব গাভীরা দুধ দেয়, কিন্তু এমনি আদরিনী দুগ্ধবতী শ্যামলীর স্তনে দুধ থাকে না। কে চুরি করে শ্যামলীর দুধ? রাখালকে ধমক দিয়ে কোনো সুরাহা হলো না, অবশেষে একদিন যদু নিজে গরুর দলের পিছনে চুপিসারে চলল। নিজের চোখে আবিষ্কার করতে হবে শ্যামলীর দুগ্ধ-অন্তর্ধানের রহস্য। দলের সঙ্গে কিছু দূর যাবার পর শ্যামলী জামালপুরের জঙ্গলের দিকে একলা ছুটে চলল। যদু চুপি চুপি অনুসরণ করল তাকে।

গভীর অরণ্য,—বাবলা আর বেতবনের জড়াজড়ি। পায়ে হাঁটারও পথ নেই। জঙ্গল ঠেলে ঠেলে শ্যামলী এক লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে, যদুও চলেছে তার পিছনে। হঠাৎ গভীর বনের মধ্যে এক জায়গায় শ্যামলী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। ফুলে উঠল গাভীর স্তন, তার চারটি বাঁট থেকে একসঙ্গে অঝোরে ঝরতে লগল শ্বেতামৃতধারা। এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল যদু। ছুটে গিয়ে ধরে নিয়ে এল গ্রামের প্রধান ব্রাহ্মণ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়কে। তিনিও নির্বাক বিস্ময়ে দেখলেন শ্যামলীর এই দুগ্ধ-অর্ঘ্যদান। পরে কাছে গিয়ে দেখলেন তার দুধ জমা হয়েছে এক প্রস্তরশিলার মাথায়।

এই প্রস্তরশিলাই বাবা বুড়োরাজ। প্রাক্-ব্রাহ্মণ্য গ্রামীণ নিম্নশ্রেণীর বিশ্বাস অনুসারে তিনি শ্রেষ্ঠ লোকদেবতা ধর্মরাজ। ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের ধারণায় তিনি স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ অনাদিলিঙ্গ শিব। বুড়োশিবের শিব আর ধর্মরাজের রাজ,—দুই-এ মিলিয়ে উচ্চনীচ আর্য-অনার্যের এই দেবতা বুড়োরাজ। বুড়োরাজের প্রথম পুজারী জামালপুরের ব্রাহ্মণ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, প্রথম ভক্ত নিমদহের গোপ যদু ঘোষ। বর্তমান কালেও বুড়োরাজের মালিক-সেবাইত ব্রাহ্মণ। কিন্তু এই বৈশাখী পূর্ণিমার উৎসবে পূজার প্রথম অধিকারী নিমদহের গ্রামবাসিগণ। নিমদহের পূজার আগে বাবার স্থানে এদিন অন্য কোনো পূজা গ্রহণ করা হয় না।

বড়ো জাগ্রত দেবতা বাবা বুড়োরাজ। শিবের গাজন সর্বত্র হয় চৈত্র-সংক্রান্তিতে। বুড়োরাজের গাজন হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এই প্রাচীন গ্রামদেবতা ধর্মরাজের সম্পর্ক আছে। তাই মনে হয় তাঁর প্রধান পূজা বুদ্ধপূর্ণিমায়। অবশ্য কিংবদন্তী এই যে, এই দিনেই বুড়োরাজ প্রকাশ হয়েছিলেন। বাংলার সমস্ত অঞ্চল থেকে এই বৈশাখী পূর্ণিমার গাজন-উৎসবে যাত্রী ভক্ত ও সন্ন্যাসীরা আসেন। বিরাট মেলা বসে। এই উৎসব ছাড়া প্রতি শুক্লপক্ষের সোমবার ও পূর্ণিমাতেও যথেষ্ট ভক্ত সমাগম হয়। অগণিত মেয়ে-পুরুষ দণ্ডী খেটে এসে বাবার চরণে পূজা দেয়। বাবার স্থানের আশেপাশে কয়েকটি পুষ্করিণী আছে। বাবার পুষ্করিণীতে স্নান করে ভিজে এক বস্ত্রে দণ্ডী খাটতে হয়। সাত মাইল দূরে দামপালের ঘাটে গঙ্গাস্নান করে খানাখন্দ পথ মাঠ বন-প্রান্তর ধরে দণ্ডী খেটে আসে এমন ভক্তও বিরল নয়।

(২)

পথ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। চড়চড় করছে রোদ। একমনে জোর কদমে পা চালিয়েছিলাম। বাধা পেলাম ঠিক মেলার মুখে এসই। ভিড়ের কী প্রচণ্ড চাপ! কালো কালো নগ্ন বলিষ্ঠ পিঠগুলো ঘামে চকচক করছে, প্রত্যেকটি কাঁধের উপর ইয়া মোটা লাঠি। কোনো কোনো কাঁধে ধারালো খড়্গ—চকচক করছে সূর্যের আলোয়। যতো ভক্ত ততো লাঠি আর ততো মানসিকের পাঁঠা। এগোবার সাধ্য নেই,—লাঠিধারী ভক্তের জমায়েতে দু-পাশের মাঠও ঠাসা ভর্তি। মাথার উপর লাঠি তুলে নৃত্য করছে, তারস্বরে হাঁক মারছে ঘন ঘন—জয় বাবা জামালপুরের বুড়োরাজ—মহাদেব!

জনতার ফাঁকে ফাঁকে কন্টেস্টে এগোলাম। বিরাট এক বটগাছ, তার গা ঘেঁষে রাস্তাটা ডান দিকে বেঁকে গেছে। ঠিক বাঁকের মুখেই পুলিসের পাহারা। প্রায় কুড়ি তিরিশজন সেপাই হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছে। সাদা খদ্দরের টুপি মাথায় ভলান্টিয়ারও আছে কিছু। তারা প্রাণপণে ভিড় ঠেলে রেখেছে। ভিড়ের মধ্যে আরো জনা কুড়ি অফিসার ও সেপাই ঢুকেছেন। হাঁকের উপর হাঁক ছাড়ছেন আর ভক্তদের হাত থেকে খপাখপ্ লাঠি কাড়ছেন। এক কোণে জমছে লাঠির পাহাড়। মেলার মধ্য লাঠির সংখ্যা যতোটা কমানো যায়, তাই উদ্দেশ্য। আমার গেরুয়া বসন দেখে এক পুলিস-অফিসারের কী মনে হলো। চেঁচিয়ে ডাকলেন,—ও সাধু-বাবা, এগিয়ে আসুন আমাদের কাছে, মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ান! হ্যাঁ, এবার সৎকাজ করুন আমাদের সংগে, লাঠি কাড়ুন!

সরকারী শান্তিবাহিনীর দলে ভিড়ে যেতে এক মুহূর্ত দেরি করলাম না। উর্দিধারী না হই গেরুয়াধারী তো বটে! মূর্তি দেখে থমকে গেল অনেকেই—হাতের লাঠি পরিত্যাগ করল। সৎকার্যের নেশা মুহূর্তে মাথায় চড়েছে। চরকির মতো ভিড়ের মধ্যে ঘুরছি। আথালি-পাথালি ধাক্কা খাচ্ছি আর হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে লাঠির পর লাঠি খপ্ খপ্ করে ধরছি। তারপর হঠাৎ এক ভিড়ের ধাক্কায় একেবারে দশ পা এগিয়ে গেলাম। পড়ি কি মরি অবস্থা! কানে শুনলাম পুলিস-অফিসারটি বলছেন,—এগোন দাদা এখন, আবার দেখা হবে!

এবার হাত ধরলে ছোকরা স্বেচ্ছাসেবকেরা। বললে,—খুব সাহস দেখিয়েছেন স্যার—মাথায় যদি একটা পড়ত! ইঃ, একেবারে গলদ্ঘর্ম অবস্থা! চলুন আমাদের ক্যাম্পে,—একটু জিরিয়ে নেবেন।

সহৃদয় আশ্রয় পেলাম সেবাব্রতীদলে। কানে মধুবর্ষণ হলো—ঝুলিটা রাখুন দাদা, হাত পা ধোন,—বসুন বেঞ্চিটায়।

মাটির এক পাত্রে কিছুটা গুড় আর ভিজে চিঁড়ে এল। স্বেচ্ছাসেবকদের ব্রেকফাস্ট। খাবার পর উপদেশ, এবার খুব ঘুরে বেড়ান যত্রতত্র, তবে জুতোটা ছেড়ে যান, কাপড়টাও গুটিয়ে নিন হাঁটুর কাছে। নজর রাখবেন—কখন দৌড় মারতে হয় বলা তো যায় না!

দৌড় মারতে হবে কেন?

একটু চোখ কান খুলে ঘুরুন,—আপনিই টের পাবেন।

মেলার মাঝে মাঝে সরু সরু গলি। গলির ধারে ধারে ঠেসাঠেসি করা দোকানের পর দোকান। গিস্গিস্ করছে যাত্রিদল। বুড়োরাজের মন্দিরের দিকে যতো এগোও, মানুষের চাপ বাড়ছে। মন্দিরের সামনে একটি পাকা তোরণ ও পাশাপাশি ক'টি ঘ্যাঁশোল। কোনো ভক্ত একদা এই পাকা ইমারত তৈরি করেছিলেন,—এখন জীর্ণ চেহারা, কালিঝুলি মাখা শ্যাওলা-ধরা ইঁটের গায়ে কোথাও চুনবালির অন্তরের চিহ্ন নেই। এই তোরণের পরই একটি মেটে প্রাঙ্গণ, তার পরই বাবার মন্দির। মন্দিরের সামনে বিরাট একটি অশ্বত্থ গাছ, পিছনে বিরাটতর একটি নিমগাছ। দু পাশে কয়েকটি বৃহৎ তেঁতুল গাছ আছে। এই-সব গাছ সারা প্রাঙ্গণটিকে ছায়া-ছায়া করে রেখেছে।

বাবা বুড়োরাজের মন্দির ইঁটের নয়, পাথরের নয়। খিলান নেই, চূড়া নেই। একটি জরাজীর্ণ কুটির মাত্র। মাটির দাওয়া, মাটির ফাটা ফাটা দেয়াল। নড়বড়ে খুঁটির মাথায় এবড়ো-খেবড়ো খড়ের চাল। পিছনে বাঁশের খুঁটি পোঁতা কয়েকটি ভাঙা গবাক্ষ, সামনে সংকীর্ণ প্রবেশদ্বার। এই কুটিরের মাঝখান বিরাট যোনিগহ্বর—জলে কাদায় ভর্তি। তার মধ্যে বাবা মাথাটি জাগিয়ে রেখেছেন। সেই মাথায় ঘটি ঘটি দুধ জল পড়ছে ও গহ্বর ছাপিয়ে পিছনের কাঁচা নালী দিয়ে বার হয়ে যাচ্ছে।

প্রাঙ্গণ জুড়ে ঠাসাঠাসি ভিড়। বাহুবল ছাড়া এক পা এগোবার উপায় নেই। সকলেরই খালি পা, খালি গা—ঘর্মাক্ত অঙ্গের সংগে অঙ্গ ধাক্কা লেগে পিছলে পিছলে যাচ্ছে। মন্দিরের সামনে দাওয়ার উপর প্রণামীর ঝুড়ি পেতে বসে আছেন সেবাইতরা। মেয়েপুরুষ উন্মাদ আগ্রহে সিঁড়ি বেয়ে বাবার ঘরে ঢুকছে, বাবার মাথায় জল দিয়ে আবার বার হচ্ছে। মেয়েরা ধাক্কাধাক্কি করে জানলায় জানলায় মানসিকের নুড়ি বাঁধছে, পিছনের নালী দিয়ে গড়িয়ে আসা বাবার মাথার জল অঞ্জলি আর ঘট ভরে সংগ্রহ করছে।

এগোতে কুণ্ঠিত, পেছোতে কুণ্ঠিত। মন্দিরের চত্বরে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের দাপটই বেশী। এ বছর বাবার সন্ন্যাস নিয়েছে পাঁচ হাজারের বেশী। তাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় দু হাজার। শুক্লা দশমী তিথিতে চুল কামিয়ে সংযম পালন করে শিব সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হয়। একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা,—প্রতিদিনই সারা দিনমান উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধন। সন্ধ্যায় বাবার পুজোর পর সামান্য জলপান। এই কদিনের জন্যে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা গৃহ সংসার পরিত্যাগ করেছে, দিনরাত কাটাচ্ছে বাবার স্থানে। শুধু সংসারীর জীবনযাত্রা নয়, সংসার-জীবনের গোত্র পর্যন্ত পরিত্যাগ করে প্রতিটি সন্ন্যাসী একই শিবগোত্রভুক্ত হয়েছে। নগ্ন পদ, পরনে কোরা কাপড় ও একটি গামছা, গলায় শিবের উত্তরী, হাতে বেতের শিবদণ্ড। এই কদিন সে সংসারাবদ্ধ জীব নয়, পরমাত্মীয় বিয়োগে অশৌচ তার লাগে না, গুরুদশা হয় না। সে শুধু শিবময়। এই পাঁচ হাজার সন্ন্যাসীর

একজন মূল সন্ন্যাসী আছেন। প্রতিপদের দিন বাবার মাটি মেখে উত্তরী উন্মোচন করে কামিয়ে স্নান করে প্রতিটি সন্ন্যাসী মূল সন্ন্যাসী মারফত বাবার পায়ে ফুল দেবে। সকল সন্ন্যাসী সমবেত হলে এবং সন্ন্যাসে কোনো অনাচার না হলে তবেই বাবার মাথার ফুল পড়ে। এই ফুল পড়ার পর সন্ন্যাসী আবার সংসারে ফিরে যায়। সন্ন্যাসীরা মাথার উপর তাদের দণ্ড ঘুরোচ্ছে, অন্য যাত্রীদের দলিত মথিত করে দলে দলে সামনে ছুটছে আর পিছু হটছে। চীৎকার করছে—জয় বাবা জামালপুরের বুড়োরাজ—মহাদেব! কোলাহল প্রার্থনা আর হুংকার এক সঙ্গে মিশে এক ভয়াবহ গর্জনের রব তুলছে।

সহস্র লোকের পায়ের ফাঁকে অর্ধ-চেতন অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় মেয়েপুরুষ কাদামাখা বীভৎস ভৌতিক চেহারা নিয়ে দণ্ডী খাটতে
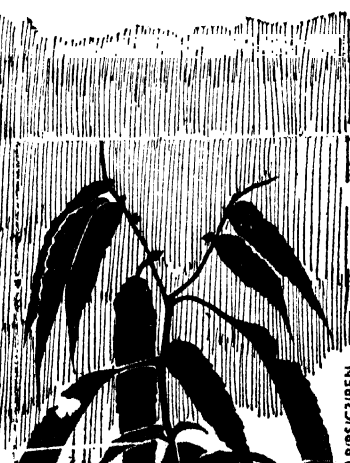
খাটতে এসে বাবার মন্দিরের দাওয়ার সামনে লুটিয়ে পড়ছে। এধারে ওধারে মলিন কাপড় ঢাকা মনুষ্যমূর্তি মৃতদেহের মতো স্থাণু হয়ে পড়ে রয়েছে। ওরা সব জ্যান্তে মরা—কতো দিন হলো হত্যা দিয়ে পড়ে আছে, কে জানে!

এক কোণে দাঁড়িয়ে এই জনসমুদ্রের উচ্ছ্বাস দেখছিলাম, হঠাৎ ঠিক প্রাঙ্গণের মাঝখানে তীক্ষ্ম একটা আর্তনাদ উঠল। আর্তনাদের পর আর্তনাদ!

কে মরছে? কে কাকে মারছে, পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাটছে! অদূরে ঐ ভিড়ের মাঝখানে নিশ্চয়ই অতি ভয়াবহ অতি হিংস্র একটা অপরাধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে,—আমাকে দেখতে হবে, ভীরু ঔদাসীন হয়ে পিছন ফিরে গা ঢাকা দিলে চলবে না। ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

মাথাটা মাটির সঙ্গে আঁটা,—ঘাড়টা শক্ত করে অদৃশ্য হাড়িকাঠে বাঁধা যেন। রুক্ষ জটার ভারে মুখটা দেখা যাচ্ছে না। শুধু বোঝা যাচ্ছে, থুবড়ে পড়া একটা নারী দেহ বলির পাঁঠার মতো ছটফট করছে। বুকটা তার মাটি থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আর ধড়াস ধড়াস করে পড়ছে। আর ঐ উপুড় হওয়া দেহ থেকে উঠছে এক ভাষা-হারা জান্তব আর্তনাদ। কয়েক মুহূর্ত পরে স্বর বন্ধ হলো। কাঠ হয়ে এল দেহটা। উবু হয়ে এবার উঠে বসল নারী। মাটিতে দু হাত রেখে ঘাড়টা উঁচু করে তুলল ক্রুদ্ধা ফণিনীর মতো—পিঙ্গল জটার ভার এলিয়ে পড়ল পিঠে। রক্তবর্ণ ললাট, মুখ দিয়ে উদ্গত সাদা ফেনা, বন্ধ দুই চোখ। বিস্রস্ত আঁচলের নিচে স্ফীত বক্ষ নিশ্বাসে নিশ্বাসে অজগরের মতো ফুঁসে উঠছে। চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সন্ন্যাসীর দল। হঠাৎ সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল,—জয় বাবা জামাল-পুরের বুড়োরাজ—মহাদেব! সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত হয়ে উঠল নাগিনীর স্তব্ধ ফণা। চোখ দুটো কপালে উঠল, বন বন করে মাথা ঘোরাতে লাগল নারী। কপালটা একবার মাটি ছোঁয় আর ওঠে, মাথার জটাজাল দিশাহারা ঝড়ের তাণ্ডবের মতো মাথার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে আর মাটিতে এসে ঝাপটায়।

একইভাবে মাথাটা ঘুরতে লাগল প্রায় দশ পনেরো মিনিট। কখন শেষ হবে এই উন্মত্ততা কেউ জানে না। দর্শকরা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। মাটিতে ঠুকে ঠুকে ধূলিধূসরিত কপালে রক্তধারা দেখা দিল, রক্ত ঝরতে লাগল নাক দিয়ে। শেষ পর্যন্ত এ দৃশ্য আর যখন সহ্য করা যায় না তখন মুখ থুবড়ে মাটির উপর অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল,—নগ্ন পাঁজরগুলো শুধু বার কয়েক কাঁপল থর থর করে। নিশ্চল দেহটার উপর অঞ্জলি ভরে বাবার মাথার জল ছড়িয়ে ভক্তগণ আবার চিৎকার করে উঠল,—জয় বাবা বুড়োরাজ—মহাদেব!

এ নারী মহাপুণ্যবতী। বাবার দয়ায় এর ভর হয়েছে।

(৩)

সেপাইএর সংখ্যা শ-দেড়েক। অফিসারও জন পনেরো। সঙ্গে লাঠি তো আছেই, তা ছাড়া বন্দুক টিয়ারগ্যাস। মেলায় পুলিস, সামনের মাঠে ও রাস্তায় পুলিস, মন্দিরের প্রাঙ্গণে পুলিস। মেলার মুখে রাস্তার এধারে ওধারে শত শত লাঠিধারীর ঠাসা-ঠাসি জমায়েত।

১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িকতার সূচনা হয়েছিল জামালপুরের এই মেলায়। দাঙ্গার কারণটা সামান্য, কিন্তু ফল হয়েছিল ভয়ানক ও সুদূরপ্রসারী। এই মেলা আক্রান্ত হয় ও শত শত দোকানপাট লুণ্ঠিত হয়। বহু মাথা ভাঙে, রক্তারক্তি হয়, —বাবার মন্দিরকেও মাটিতে লুটিয়ে দেবার চেষ্টা হয়। নিমদহের গোপদের তৎপরতায় ও প্রতি-আক্রমণে বাবার মন্দির রক্ষা পায়। ১৪ই আগস্ট ১৯৪৬ মুসলিম লীগের সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস—যার ফলে শেষ পর্যন্ত ভারত বিভাগ ও পাকিস্তানের জন্ম—সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পহেলা রিহার্সাল হয়েছিল এই জামালপুরের বুড়োরাজতলায় বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে।

এবারও কিছুদিন থেকে এদিকে ওদিকে আতঙ্কিত গুজব ছড়িয়েছিল গ্রামে গ্রামে যে, এ বছর বুড়োরাজে বেশ বৃহৎ রকম এক আগুন জ্বলবে। স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এ অবস্থায় চোখ বুজে থাকতে পারে না। তাই শান্তি রক্ষার জন্যে এই কঠোর পুলিসী প্রস্তুতি।

বুড়োরাজের মেলায় শান্তিভঙ্গের আশংকা প্রতি বছরই পদে পদে। এ গ্রাম ও গ্রামের এ দলে ও দলে বলির পশু নিয়ে কাড়াকাড়ির প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ মেলার একটা স্বাভাবিক প্রথাগত ব্যাপার। বহু ব্যক্তিগত বিদ্বেষ সারা বছর চাপা থেকে এই মেলায় এসে লাঠির আগায় মীমাংসা হয়। লাঠালাঠি তো আছেই,—বলির খড়্গও সুবিধা পেলেই ছোটে। লাঠিয়াল ভক্তের ভিড়ে কোথাও চাঞ্চল্য দেখলেই লোকজন দৌড় মারে পিছনে, পুলিস দৌড়য় সামনে। ঐ বুঝি লেগে গেল! প্রকৃতিও সহৃদয়,—বৈশাখের প্রচণ্ড দাবদাহ মাথার মধ্যে আগুন জ্বালায়, টগবগ করে রক্ত, রক্তবর্ণ হয়ে ওঠে চোখ।

তবে এই গা ছমছম করা আতঙ্কের মধ্যেও মেলার মধ্যে যাত্রী ও ক্রেতার ভিড়ের ঘাটতি নেই। সবসুদ্ধ পাঁচ ছয় শো দোকান, লাইনে সাজানো। বাঁশের খুঁটির উপর কাপড়ের চাল। চালগুলি খুব নিচু,—নিশ্চয়ই কাল-বৈশাখীর ঝড়ের ভয়ে। বড়ো বড়ো মনিহারী দোকান, লোহা, কাঁসাপিতল ও অ্যালুমিনিয়ম বাসনের দোকান, কাপড়ের তৈরি পোশাকের ও দর্জির দোকান, মাটির পাত্রের দোকান, খাবারের দোকান।

বেলা সাড়ে দশটা বেজে গেছে। মাথার উপর চাঁদি-জ্বালানো প্রচণ্ড রোদ, আকণ্ঠ তৃষ্ণা। ভিড়ের ধাক্কায় জামার একটা কোণ ছিঁড়ে গেছে—হাঁ-হওয়া পকেটের পয়সা-গুলো ট্যাঁকে এঁটেছি। স্বেদমলিন চেহারা, কাদা ভর্তি পা।

ছায়া খুঁজতে খুঁজতে আবার মেলার মুখে বড়ো রাস্তার কাছে এলাম। মোড়ের কাছে দোতলা পাকাবাড়ি, সামনে উঁচু রোয়াক। সারা জামালপুর গ্রামে এই একটিমাত্র পাকা বাড়ি। বাবার সেবাইতরা এই বাড়ির মালিক। এঁরা বাবার আদি পুরোহিত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্র বংশীয়। বন্দ্যোপাধ্যায়,—আদি নিবাস নদীয়া জিলার ধর্মদহ। সেবাইতরা বিভিন্ন শরিকে ভাগ হয়ে গেছেন। স্থানীয় দুই প্রধান শরিকের কর্তা হচ্ছেন রামবাবু ও ধর্মদাসবাবু।

সামনের বাঁকে অসংখ্য লোকের ভিড়। হঠাৎ সেই ভিড়ের চাপ যেন ভূমিকম্পে ফেটে ফেটে যেতে লাগল। দৌড়তে লাগল লোকজন, শিশু কোলে মেয়েরা রাস্তার দু পাশ ছিটকে ছিটকে পড়তে লাগল আলু-থালু অবস্থায়। আর্তনাদ করতে লাগল বলির ভয়ার্ত পাঁঠাগুলো। আর কানে এল ডিমডিম ঢক্কানিনাদ।

হাঁ করে রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছিলাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। কী শুরু হলো এবার? দাঙ্গা? পাঁঠা-ডাকাতির লড়াই? হঠাৎ শুনলাম নারীকণ্ঠে কে যেন চীৎকার করে ডাকছে,—ঠাকুর ও ঠাকুর, শুনছেন?

কোমরে আঁট করে কাপড় জড়ানো কষ্টি-পাথরের মতো চেহারার একটি কৃষক-বধু। মাথায় কাপড় নেই, এলোমেলো রুক্ষ চুলের নিচে টকটকে লাল সিঁদুর-লেপা কপাল, পুরু দুই ঠোঁটের ফাঁকে ঝকঝকে দাঁত। একটা উলঙ্গ শিশু কোলে করে সেবাইত বাড়ির রোয়াকের উপর দাঁড়িয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই ডান হাতটা তুলে ইশারা করে আবার ডাকল,—আসুন ঠাকুর, এদিকে আসুন! কাছে যেতে বললে,—উঠে আসুন, রাস্তায় দাঁড়াবেন না, রোয়াকে উঠে পড়ুন!

নিচু হয়ে বলিষ্ঠ ডান হাতটা বাড়াল অপরিচিতা। সেই হাত ধরে আমি এক লাফে রোয়াকে উঠে পড়লাম। তারপর নিশ্বাস চেপে শুধোলাম,—ব্যাপার কি? মারামারি লাগল নাকি সামনে?

ঝকঝকে দাঁত ঝিলকিয়ে হি-হি করে হাসল মেয়েটি। বললে,—ঠিক বুঝেছিলাম, আর কখনো আসেননি বুঝি বুড়োরাজে,—এই প্রথম?

হ্যাঁ, এই প্রথম।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখুন, নিমদের পুজো আসছে।

আসছে নিমদহের পুজো,—বৈশাখী পূর্ণিমায় বাবা বুড়োরাজের প্রথম পুজো। এক সঙ্গে কুড়িটি ঢাক বাজছে। বাজাতে বাজাতে নেচে নেচে এগিয়ে আসছে ঢাকীর দল। আর তাদের পিছনে এক প্রকাণ্ড বিরাট শোভাযাত্রায় আসছে নিমদহের হাজার হাজার গোপভক্ত। শোভাযাত্রার সামনে দৌড়াচ্ছে পুলিস, তারা ভিড় সরাচ্ছে রূঢ় হস্তক্ষেপে, রাস্তার ধারে ধারে ব্যাপারীদের পণ্যের ডালা লাঠির ধাক্কায় দূরে ফেলে দিয়ে পথ করে দিচ্ছে।

কাছে এগিয়ে এল শোভাযাত্রা। হাজার লোকের প্রত্যেকের খালি গা খালি পা। ঝাঁকড়া রুক্ষ চুলে গামছার পাগড়ি, হাতে লাঠি। ঘূর্ণমান রক্তচক্ষু, বন বন করে ঘুরছে হাতে লাঠি, ঘর্মাক্ত কৃষ্ণবর্ণ দেহের পেশীতে পেশীতে সূর্যকিরণ পড়ে ঠিকরে ঠিকরে যাচ্ছে। লাঠিতে লাঠিতে ঠোকাঠুকি লাগছে, কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে তার আওয়াজ। হাজার লাঠিধারীর পিছনে অন্তত শ-দুই খড়্গধারী। খড়্গগুলো গামছা ঢাকা নয়,—মাথার উপরে বলিষ্ঠ হাত তুলে শোভাযাত্রীরা খড়্গগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উদ্দাম নাচছে—ঝকঝকে ফলা-গুলি ঘূর্ণিপাকের সঙ্গে সূর্যরশ্মিতে বিদ্যুতের মতো জ্বলছে। খড়্গধারীদের পর সন্ন্যাসীরা। পরনে নূতন ধুতি ও গামছা, গলায় বাবার উত্তরী। হাতে বেতের দণ্ড। তার পিছনে পুজোর্ঘ্যের বাহক দল। লম্বা লম্বা বাঁশের মই পাশাপাশি চওড়া করে বাঁধা। মইগুলি বাহকদের বাঁধে। মই-এর উপর থরে থরে সাজানো ফলমূল, দুই চিঁড়া মিষ্টান্ন বাতাশা। পিছনে দড়ি-বাঁধা বলির পশু। ঢাকের নিনাদ, লাঠির ঠোকাঠুকি, খড়্গের ঝনৎকার,—সব কিছু
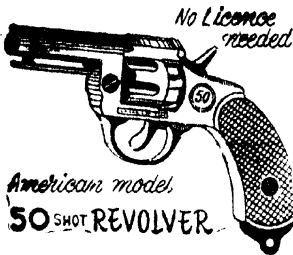
ছাপিয়ে ঘন ঘন উঠছে শোভাযাত্রীদের উন্মত্ত হুংকার,—জয় বাবা জামালপুরের বুড়োরাজ—মহাদেব! সেই হুংকারের রেশের সংগে যোগ দিচ্ছে দু ধারের সমস্ত যাত্রীর উন্মত্ততর প্রতিহুংকার—মহাদেব!

(৫)

অপরাহ্ন গড়িয়ে এসেছে। সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে কাটল। এখন দীঘির ধারে গাছের ছায়ায় দেহটাকে ছড়িয়ে দিয়েছি। পাশে বসে তরুবালা।

নিমদহের পুজো বাবা বুড়োরাজ গ্রহণ করলেন। মুহূর্তে সেই সংবাদ মেলায় ছড়িয়ে যাবার সংগে সংগে সারা মেলা জুড়ে শুরু হলো বলির উৎসব। বলি উৎসর্গ করার জন্যে বাবার সামনে যেতে হয় না। যাওয়াও অসম্ভব। মাঠে ঘাটে রাস্তার ধারে যেখানে সেখানে বলি হয়। আধঘণ্টার মধ্যে পাঁচ শোর বেশী পাঁঠা শুয়োরের ধড় থেকে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হোলো। বলির জীবকে লাঠির মাঝখানে বেঁধে অনেক যাত্রী ফিরতি পথে হাঁটা দিয়েছে। অনেকে আবার মাংস চড়িয়েছে কাঁচা উনুনে। পাঁঠার আস্বাদনে মানুষের পুণ্য বাড়ে—সেই পাঁঠার মাংস পেটে গেলে পুণ্যের মহারস ভক্তের অস্থিমজ্জা রক্তে সরাসরি গিয়ে মেশে,—পবিত্র হয় নরদেহ।

নিমদহের শোভাযাত্রার ভিড়ে যে মেয়েটি আমাকে ডেকে আলাপ করেছিল তারই নাম তরুবালা। ভারি সপ্রতিভ মিষ্টভাষিনী মেয়ে। ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল, এই পড়ন্ত বিকেলে এই দীঘির ধারে আবার দেখা হয়েছে। ছেলে কোলে নিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছে আমার পাশে।

পাঁচালীকার দাশরথি রায়ের জন্মভূমি পিলা গ্রামে তরুবালার শ্বশুরবাড়ি। সম্পন্ন চাষী গৃহস্থের পরিবার। স্বামী আসেনি সংগে। দেড় বছরের শিশুটিকে কোলে নিয়ে গ্রাম্য প্রতিবেশিনীদের সংগে বাবার পুজো দিতে এসেছে তরুবালা।

আমি বললাম,—সংগে কোনো পুরুষ আত্মীয় নেই, তোমার শ্বশুরবাড়ির লোক তোমাকে ছেড়ে দিল?

তরুবালা বললে,—না দিয়ে উপায় কি ঠাকুর! এ যে আমার সারা জীবনের মানসিক!

তার মানে?

গত দু বছর থেকে আসছি,—এই ছেলের নামে মানসিক করেছি যতোদিন বাঁচব প্রতি বছর এই দিনে বাবার মাথায় জল দেবই দেব। আমাকে আটকাবে কে?

বাবার কাছে কী তোমার মনস্কামনা, তরুবালা?

মনস্কামনা করেছিলাম প্রথমবার। সেই মনস্কামনা বাবা পূর্ণ করেছেন। আর কোনো কামনা নেই, শুধু বাবাকে ডেকে বলি এই ছেলেটা যেন বেঁচে বর্তে থাকে।

কী মনস্কামনা করেছিলে?

জবাবে ছেলেকে কোলে তুলে বুকের কাছে টেনে নিল তরুবালা। কালো কুচকুচে বলিষ্ঠ শিশুটার মাথা আঁচলের নিচে মুখ চেপে আদর কুড়োতে লাগল। এক অনির্বচনীয় সার্থক মাতৃরূপ আমি দেখলাম।

বাবার দয়ার স্মৃতিতে দু চোখ জলে ভরে এসেছে তরুবালার। পশ্চিম আকাশে কালো মেঘ জমেছে। সেই মেঘের কৃষ্ণাঞ্জন যেন এই কৃষাণ রমণীর করুণ দৃষ্টিতে। নির্লজ্জ স্পষ্টতায় আমার কোলের কাছে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল, বললে,—দেখুন ঠাকুর, বাবার দয়ার কথা বলতে বলতে গাটা কেমন কাঁটা দিয়ে উঠেছে!

একটু পরে চোখ মুছে মুখে হাসি ফুটিয়ে তরুবালা বললে,—একটা নিবেদন করব আপনাকে? কথা রাখবেন?

আগে বলো তো শুনি!

সকালে ঐ যে যন্তরটা বুকে নিয়ে আপনি ঘুরছিলেন, ওটা দিয়ে ছবি তোলে, তাই না?

ঠিক বলেছ।

আমার এই রাজার একটা ছবি তুলে দেবেন?

রাজা নাকি তোমার ছেলের নাম?

হ্যাঁ, ডাকনাম রাজা, ভালো নাম শিবদাস। তুলে দেবেন বলুন?

নিশ্চয় তুলব। রাজার তুলব, রাজার মারও তুলব। ঠিকানাটা দিয়ো, ছবি উঠলে পাঠিয়ে দেব।

আগ্রহে আনন্দে চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল তরুবালার। শুধোলো,—কখন তুলবেন?

আজ নয়, তরুবালা। দেখছ না আকাশ জুড়ে কেমন অন্ধকার মেঘ করে এল। কাল সকালে রোদের আলোয় তুলব, কেমন?

তরুবালার অনুরোধ আমি রাখতে পারিনি। আধঘণ্টার মধ্যে সারা আকাশ জুড়ে ঐরাবতের মতো কালো মেঘের পাল দাপাদাপি শুরু করল। আর এল কালবৈশাখী। ঝড়ের উন্মত্ত তাণ্ডবে দুলতে লাগল উঁচু গাছের মাথা, ভেঙে পড়তে লাগল শাখা। তচনচ হতে লাগল মেলার দোকানপাট, মড়মড় করতে লাগল বাবার মন্দিরের চাল। কতো চালাঘর যে ধসে পড়ল ইয়ত্তা নেই। মেলার জনতা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল আশ্রয়ের সন্ধানে।

ঝড় থামতে না থামতেই মুষলধারে বৃষ্টি। সূর্য কখন অস্ত গেছে জানিনে,—ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যে ঘন অন্ধকার। কোন্ যাত্রী কোথায় আশ্রয় পেল, কে ভিজল কোন্ গাছের তলায়, কে জানে? সিক্ত বস্ত্রে এক হাঁটু কাদা ভেঙে সেবাকেন্দ্রে যখন আশ্রয় নিতে এলাম তখন দেখি ক্যাম্পের ত্রিপল কোথায় উড়ে গেছে! একটি গ্যাস বাতিও জ্বলছে না,—শুধু নিকষ অন্ধকারে স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছাউনির বাঁশগুলি ভূতের মতো ভিজছে।

গভীর রাত্রে মেঘ-বৃষ্টির অবসানে আকাশে বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র দেখা দিল। কিন্তু সন্ধ্যারাত্রির সেই দুর্যোগের মধ্যে তরুবালাকে আমি হারালাম। পরদিন সকালে সারা মেলা ঘুরে কোথাও তার দেখা পেলাম না।

ব্যঙ্গ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

অনুক্ষ আবেগে বোনা অজিন আসনে
বসিয়েছিলাম.
তুমি তার উপযুক্ত দাম
দিয়েছো আমাকে. আমি বৈরাগ্য মেনেছি, প্রাণপণে।

উপরন্তু, কোপীনের নেপথ্যগহনে
স্মরণের অবচ্ছিন্ন কাঁচুলি রাখিনি,
ভুবনডাঙায় আজ নও তুমি নও একাকিনী।

ইন্দ্রিয় আমার আছে, মানি। বস্তুজগতের দেনা
সুতরাং বাড়ে, এখনো মেলেনি অতীন্দ্রিয় চাবি:
তবু মনে প্রশ্ন জাগে, যখন তোমার কথা ভাবি:
মাতালের আলিঙ্গনে লজ্জা করে না?

শেষ অপরাহ্নে যবে আততায়ী অতিথিরে ডেকে
ঘরে নিয়ে দিলাম সুস্বাদু ফল মদ মধু জল,
পাখার বাতাস, আর, আশু দস্যুতার প্রতিফল
অমৃতনিষ্যন্দী দাস্যরস, বুকে কিছুই না রেখে:
জামা খুলে দেখালাম কোন্‌খানে অগাধ কুন্তল
রেখেছিলো একজন, কোন্‌খানে অবুঝ আবেগে
পুরোনো যা মুছে দিতে পিঙ্গশ্যামা অমূল্য অঞ্চল
পাঁজরকে ভরেছিলো—বললাম কিছুই না ঢেকে।

বললাম: 'প্রভু, তবে তোমার কবল থেকে তারে
প্রত্যর্পণ করো, তুমি যা বলবে, আমি বাক্যহীন
পরিশ্রমে হবো আজ্ঞাবাহী সম্পাদক। আলাদীন
হয়ে রাত্রি জেগে থাকবো তোমার গৃহের বহির্দ্বারে,
এমন-কি, তাকে দেবো?'
শুনে বলে: 'তাকেই জামিন
রেখেছি তোর বদলে, তুই যা স্বাধীন, দেশোদ্ধারে॥'

রথ পার হয়ে গেলো গর্হিত নদীটি। হংসারূঢ়
শিশুর মতন সেই সারথি নির্বূঢ়,
নিশ্চিত, এবং সেই সারথিটি হয়ে গেছে বুড়ো।

তবু ভাবে রথ নিয়ে আরবার জলে
নামবে পদাধিকারবলে.
দেখবে কুম্ভীর হিংস্র, খল জলপরীর নূপুরও;
রবে না সৈকতে বন্দী বেদনাবিহীন উদূখলে।

অথচ অবাধ্য রথ, ঘোড়াগুলি ঘোটকীর কাছে
গিয়েছে বিশ্রাম নিতে, তরল বিশ্বাসে, আস্তাবলে॥
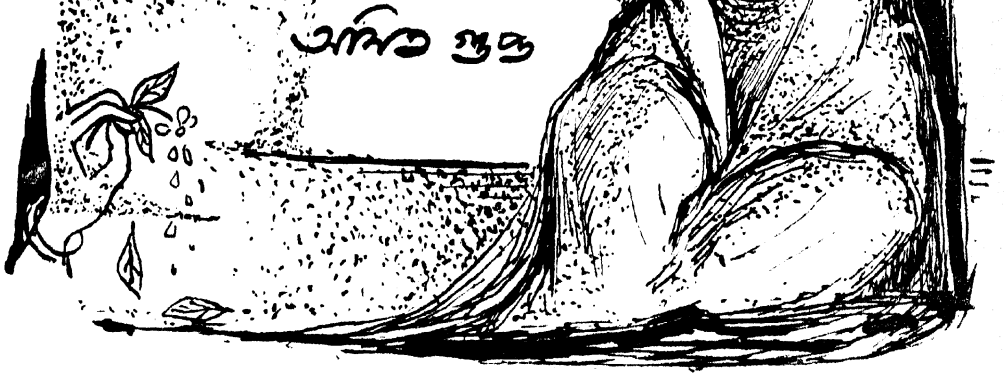
মালবিকা অনেকক্ষণ ধরে এই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্ধকার হয়ে গেছে। অন্ধকারের সঙ্গে তাকে আর আলাদা করা যাচ্ছে না। মালবিকার মনে হলো এইভাবে আর কিছুটা সময় থাকলেই সে তার চেতনা হারাবে। যে চেতনা এতক্ষণ ধরে তার মনে অনেক-রকম ভাবনা-বিশ্ব তৈরি করেছে; ছোট বড়, আলো আঁধারি। যে চেতনা আশা-আগ্রহ তৈরি করেছে। উদ্বেগ, উত্তেজনা তৈরি করেছে। সেই চেতনা এখন বেদনার কারণ হয়েছে যেন। নিরেট এবং অনন্ত এক বেদনা। মালবিকা চাইছে, এবার তাকে গাঢ় অচৈতন্যের পুরু পর্দা ঢেকে ফেলুক; তারই পরতে পরতে নিঃশেষে মিলিয়ে গিয়ে মালবিকা স্বস্তি পাক। আরাম পাক।

তবে কি নিরুপম আসবে না! মালবিকা ভাবল। আর এই একটিমাত্র ভাবনা তৎক্ষণাৎ তার বুকের ভেতরটা নিদারুণ যন্ত্রণায় কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। মাথাটা ঘুরে যেতেই সে একটা হাত বাড়িয়ে দিল অন্ধকারে, কিছু ধরার আশায়। নিক্ষিপ্ত হাতের চুলিতে চুলিতে ঠোকা লেগে ঠং করে একটা শব্দ হলো। আর সেই শব্দটা,—মালবিকার মনে হলো যেন ঘুরতে ঘুরতে, ছন্দে ছন্দে বেজে উঠে একটা মহাশব্দে মিলে গিয়ে বিরাট সংগীতের সৃষ্টি করল।

এই ভাবনা খানিকটা তৃপ্তি দিল মালবিকাকে। বুকের দম বন্ধ-হওয়া ভাবটা একটু কমল। সে বসল সামনের চাতালটায়। বসে আকাশের দিকে তার ক্লান্ত দৃষ্টি মেলে দিল।

আকাশের এক একটা তারা যেন এক একটা করুণ চোখ। মালবিকা তার নিজের চোখ দেখতে পাচ্ছে না, তবু সে স্পষ্ট বুঝতে পারল, তার চোখেও তেমনি অসহায় কারুণ্যের ছায়া পড়েছে। ওই তারাভরা নীল আকাশের কোথায় যেন একটা মায়াময় বিরাগ লুকনো আছে। সেই মায়ার অবসাদ তার মনকে ধীরে ধীরে অবশ করে তুলছে।

সামনের নির্জন রাস্তায় অস্বস্তিকর নীরবতা গলে গলে পড়ছে। একটা কুকুরও ডাকছে না। শুধু অ্যাসফল্টের অরণ্যে পথের আলোগুলো যেন কোন বিদেশী পথিক। পথ ভুলে হকচকিয়ে তাকিয়ে আছে।

নিরুপম বোধ হয় আর আসবে না। এই রাতটির জন্যে সাতদিন ধরে যত জল্পনা-কল্পনা চলেছে, উত্তেজিত আলোচনা—আজ এখানেই তার পরিসমাপ্তি। মালবিকা নিরুপমের সঙ্গে পালাবে, তাই তার এই প্রতীক্ষা। তাই, সে এখানে অধীর আগ্রহে বসে আছে নিরুপমের পথ চেয়ে। নিরুপম আসবে, তাকে এখান থেকে বার করে নিয়ে গিয়ে এক পরম নিশ্চিন্ততায় মুক্তি দেবে। বিচিত্র আলোর আলপনায় তার নতুন জীবন ঝলমলিয়ে উঠবে।

কিন্তু নিরুপম কোথায়! এখনো আসছে না কেন! তার চেতনার চিহ্নটুকু থাকতে থাকতে তাকে এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে না কেন? মালবিকা কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল একটা দশ। সময় যেন আর চলছে না। এক একটা মুহূর্ত আজ অলৌকিক শক্তিতে অস্বাভাবিক দীর্ঘ ও স্ফীত হয়ে তার সমস্ত অস্তিত্বে বসে যাচ্ছে।

মালবিকা ডান দিকে ঘাড় কাত করল। দেওয়ালে-টাঙানো একটা ছবির ফ্রেমের মতো তার মাথাটা একটু হেলে রইল। এখান থেকে বাড়িটাকে যেন বাড়ি মনে হয় না। মনে হয়, বাড়ির ছায়া। জলের গায়ে ছায়া পড়লে যেমন দেখায় অনেকটা যেন তেমনি।

ওই বাড়িতে রণেন আছে। তার এই নৈশ পরিকল্পনার কথা না-জেনেই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। মালবিকা এখান থেকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ওকে। পাশবালিশটা বুকের কাছে জড়ো করে কুঁকড়ে শুয়ে আছে। গায়ে ডোরাকাটা ঘুমোবার পোশাকটা পেটের কাছে বোতাম দুটো খোলা। কালো মোটা পেটের উদ্‌ঘাটিত অংশটুকু বিশ্রীভাবে ওঠা-নামা করছে। তারই সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট দুটো ফুলে উঠে মুখ দিয়ে একটা অস্বস্তিকর শব্দ বেরোচ্ছে। হয়ত বা দাঁতে দাঁত ঘষারও আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

মালবিকার কাছে সব অবস্থাটাই খুব চেনা। গত পাঁচ বছর ধরে একটানা দেখে এসেছে সে। দেখে বহুবার তার গা-ঘিনঘিন করে উঠেছে। রণেন যেন একটা জন্তু

কথাটা অত্যন্ত অপ্রিয় হলেও মালবিকা এ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে নি। অনেকদিন খুব কাছে থেকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেছে। তবু ঘুমন্ত রণেনকে দেখে তার মনে এতটুকু মায়া জাগে নি। ভালবাসতে ইচ্ছে করে নি। বরং ওর নিদ্রা-বহির্ভূত চেহারায় এমন একটা রূপসজ্জা আছে যা দেখে ওকে কোন কোন সময় সহ্য করা সম্ভব হয়। কিন্তু ঘুমোলে যেন ওর অগোচরে আসল মানুষটাই বেরিয়ে আসে।

মালবিকার পায়ের ওপর দিয়ে কি যেন একটা চলে গেল। ব্যাঙ বোধ হয়। তাড়াতাড়ি পা'টা সরিয়ে নিয়ে ঘাড় নীচু করে দেখল মাটিটা। তারপর বাঁ হাত দিয়ে পায়ের চেটোটা একবার স্পর্শ করল। সেই হাতটা অজান্তে চলে এল নাকের কাছে। কি যেন শুঁকেই কোমর থেকে রুমালটা বার করে হাতটা রগড়ে রগড়ে মুছে ফেলল।

দূরে একটা গাড়ির শব্দে উৎকর্ণ হয় মালবিকা। একটু নড়ে চড়ে বসে। গলার কাছটা কিরকম ভেজা ভেজা আর তেল-তেলে। শাড়ির আঁচল দিয়ে সে চেপে ধরে গলাটা। গাড়ির আওয়াজটা প্রকাণ্ড বড় হয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। আশা হচ্ছে মনে। কিন্তু না, আশাটা শেষ পর্যন্ত তার সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

আপনা থেকেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল মালবিকার বুক বেয়ে। নিস্তব্ধ রাত্রিতে একাকিত্বের শূন্যতায় সেই দীর্ঘশ্বাস ঝড়ের মতো বাজল তার নিজেরই কানে। মালবিকা তার অবসন্ন দেহটা একটা গাছের গায়ে হেলিয়ে দিল। চোখ বুজল।

রণেন যেদিন মদ খায়, সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরত দেরি করে। আর মালবিকা ভয়ে কাঁটা হয়ে বসে থাকে এই চাতালটায়। এখন যেখানে সে বসে আছে। অথচ কি আশ্চর্য, এখন জায়গাটাকে তার অচেনা মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে কোন নিষিদ্ধ জায়গায় বসে আছে সে। আর তার জন্যে একটা অজানা অস্বস্তির কাঁটা খচখচ করে বাজছে। আসলে পরিস্থিতি-বদলের সঙ্গে সঙ্গেই সব অবস্থার ওলটপালট হয়। চেনা জায়গা হয় অচেনা। প্রিয়জন হয় অপ্রিয়। আজ মালবিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে এ জায়গায় এসে বসেছে। রণেনের জন্যে নয়, নিরুপমের জন্যে।

যেদিন রণেন মদ খেয়ে আসত, সেদিন গেটের কাছে গাড়ির দরজা বন্ধ করার আওয়াজ আর জড়ান গলা শুনেই মালবিকা বুঝত উপদ্রবটা কতদূর গড়াবে। চাকর ছুটে এসে ধরত মনিবকে। জামা-কাপড় ছাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দিত। কিন্তু রণেন শুতো না। কাঁচের জিনিসপত্তর ভেঙে, অশ্লীল গালাগালি করে একটা নারকীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি করত। প্রথম-প্রথম মালবিকা ভীষণ ভয় পেত। কাছে যেত না। নিজের ঘরের খাটে কিছুক্ষণ সন্ত্রস্ত হয়ে বসে থাকত, তারপর বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদত।

একবার মত্ত রণেন মালবিকাকে ধাক্কা মেরেছিল। খটের বাজুতে লেগে কপালটা গিয়েছিল কেটে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটেছিল। ঝি-চাকর দৌড়ে এসেছিল ভয় পেয়ে। কিন্তু রণেন বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত হয়নি। পরের দিন হুঁশ ফিরে এলেও 'কাল রাত্তিরের জন্যে দুঃখিত' ছাড়া আর একটি কথা বলে নি। যথারীতি চা খেয়েছে, দাড়ি কামিয়েছে, তারপর অফিসের গাড়ি এলে বেরিয়ে গেছে।

এক-আধদিন নয়, দীর্ঘ পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনের প্রতিটি সময় মালবিকা এই সহানুভূতির অভাব, বিবেচনার অভাব, ভালবাসার অভাব টের পেয়েছে। একই ছাদের তলায় তারা এতদিন বাস করেছে শুধু আর একটা নিষ্ঠুর পৌরুষের খুশির শিকার হয়েছে মলবিকা। মন তার গ্লানিতে ভরে গেছে। নিজেকে বারবার ধিক্কার দিয়েছে।

রণেন তাকে সব প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। সংসারের যাবতীয় দায়িত্বে বরাবর ওকেই এগিয়ে দিয়ে নিজে সরে দাঁড়িয়েছে। বিয়ের আগেই রণেনের চাকরি গিয়েছিল। সে কথা কাউকে সে প্রকাশ করে নি। বিয়ের পর সবে সাতদিন কেটেছে, রণেন জোর করে মালবিকাকে পাঠিয়েছিল চাকরি করতে। মালবিকার প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। আর তার ফলে মালবিকা কোনদিন মা হতে পেল না।

মালবিকা আর কিছু জানে না, শুধু মনে আছে দশটার সময় খেয়ে একদিন অফিস যাবার জন্যে ট্রামে চড়েছিল। গরম-কালের রোদে সারা রাস্তা যেন জ্বরে পুড়েছিল। আর, তারই ছ্যাঁকা লাগছিল মালবিকার গায়ে। বাইরের পৃথিবীটা সেঁকা চামড়ার মতো। একটু আগে স্নান করে আসা সত্ত্বেও মালবিকার বুক পিঠ খসখস করছে। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে খটখট করে। আর সারা ট্রামটা চুপচাপ। শুধু মাঝে মাঝে কণ্ডাক্টরের টিকিট পাঞ্চ করার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মালবিকার মনে হচ্ছিল, কেবল দুটো শব্দই পার্থিব। আর চারদিকের জড়ত্বটা অন্য জগতের, কোন নির্লিপ্ত পুরীর। বোধ হয় একটু তন্দ্রার ভাব এসেছিল তার।

গন্তব্যস্থান আসতেই ধড়মড় করে উঠে পাদানিতে এসে দাঁড়িয়েছিল মালবিকা। পেছনে একটা লরি আসছিল। তাতে লোহার পাত বোঝাই। গাড়ির ঝাঁকানির সংগে সংগে লোহাগুলোর ঝনঝন শব্দ হচ্ছিল। তারপর আর কিছু মনে নেই। একটা সুতীব্র যন্ত্রণা তার চেতনাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে বেরিয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান হবার পরও তার মস্তিষ্কের কোনও প্রত্যন্ত কক্ষ থেকে ওই লোহার ঝনঝন শব্দটা ঘুঙুরের মতো আওয়াজ দিচ্ছিল।

রণেনের মুখদর্শন করতে চায়নি আর। মালবিকার মা যখন মেয়েকে দেখতে এসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রণেনের দিকে তাকিয়েছিলেন, সে তখন অম্লান বদনে বলেছিল, 'কেন যে ও চাকরি করতে যেত, আমি জানি না। বহুবার আমি বারণ করেছি তবু শোনে নি।'

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘৃণায় কুঁচকে গেছে মালবিকা। এত মিথ্যেবাদী, এত শঠ লোকটা? এরই সংগে তার সারাটা জীবন কাটাতে হবে? তারা সুখী এই ভাব দেখাতে হবে বাইরের জগতের কাছে? এত ছলনা? তারপর অবশ্য রণেন ভাল চাকরি পেল। দৈনন্দিন ব্যবহার অনেকটা মসৃণ হলো। কিন্তু মনে মনে ওরা সহস্র যোজন দূরে দূরেই রইল। যেন দুটো আলাদা আলাদা দ্বীপ। নিঃসঙ্গ এবং অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা দুটো দ্বীপ। আরো পরে মালবিকার মনে হয়েছিল, সেই অস্বাভাবিক ঠাণ্ডাটা তাকে কেমন যেন অসাড় করে তুলেছে। যেন একটা বরফের ছুরি দিয়ে ক্রমাগত কে তার অনুভূতিকে কেটে চলেছে। জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই। শুধু অস্বাভাবিক জমাট এক ঠাণ্ডা!

মালবিকা নিজের বাড়ির কাউকে কোনদিন আসতে বলেনি এ সংসারে। রণেনও বিশেষ পছন্দ করত না। একবার রুণু এসেছিল। রুণু মালবিকার ছোট ভাই। তার একটা পা ছিল না। ছোটবেলায় পড়ে ঘোরানো সিঁড়ির ফাঁকে আটকে গিয়ে পাটা হাঁটুর তলা থেকে বাদ দিতে হয়েছিল। তার একটা ক্রাচ ছিল।

এ বাড়িতে এসে দু দিনেই রুণুর সব উৎসাহ চুপসে গিয়েছিল। আবহাওয়া দেখে বুঝেছিল, বাড়িটা এক বিরাট বন্দীশালা। আর তার দিদিকে এখানেই চিরকাল বন্দী হয়ে থাকতে হবে। সে বলেছিল, 'দিদি এখানে থাকলে তুই সত্যি সত্যি মরবার অনেক আগেই মরে যাবি।'

—'চুপ চুপ, অমন করে বলিস নে ভাই।' ওর মুখ চাপা দিয়ে তারপর ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছিল মালবিকা।

সেদিন রাত্তিরেই মালবিকাকে মেরেছিল রণেন। মালবিকা একটিও কথা বলে নি রুণুর জন্যে। কিন্তু রুণু কাঠের পাটা নিয়ে খটখট শব্দ করে ওদের ঘরে এসে দাঁড়াল। অবস্থাটা ভাল করে দেখে রণেনের দিকে সোজা চোখে তাকিয়ে বলল, 'স্বামী বলে কি আপনি অধিকারের সুযোগ নিচ্ছেন?'

সেই প্রথম মনে হলো মালবিকার যে রুণু আর ছোটটি নেই, অনেক বড় হয়ে গিয়েছে।

'মনে রাখবেন সমস্ত যাতনা সহ্য করারও একটা সীমা থাকবে। আর আপনার এই স্বামিত্বের খামখেয়ালীপনা বরদাস্ত আমরা না-ও করতে পারি। কারণ সব সম্পর্কের চেয়েও ওর জীবনটা আমাদের কাছে বড়। ভবিষ্যতে এরকম করলে, আপনি যার জোরে এসব করতে পারছেন, সেই সম্পর্কটা আমাদের ঘুচিয়ে দিতেও বাধবে না।'

উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল রুণু। মালবিকা ওকে নিরস্ত করতে চেয়েছিল, কিন্তু সে তখন বেপরোয়া। রণেন একটি কথাও বলল না। রুণুর সব বলা শেষ হয়ে গেলে শিকারী বিড়ালের মতো ও এগিয়ে এল। জোর করে ছিনিয়ে নিল ক্রাচটা। তারপর চাকরকে ডেকে সেটাকে কয়লা রাখার ঘরে পাঠিয়ে দিল।

মালবিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে শুধু। দেখে অবাক হয়েছে। একটা মানুষের নিষ্ঠুর হবার প্রক্রিয়া দেখে অবাক হয়েছে। অসহায় রুণুর চোখ ফেটে জল এসেছিল। রণেন তাকে এমন দুর্বল জায়গায় আঘাত করবে সে ভাবে নি। ভাবে নি, শাস্তি দেবার এমন কুৎসিত, অশ্লীল উপায় বার করবে।

পরের দিনই মালবিকা বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল রুণুকে। বলেছিল, 'আর কখনো আসিস নে ভাই।' রুণু আর থাকতে পারে নি। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'আমি কি ব্যবহার পেয়ে গেলাম, দুঃখ সেজন্যে নয় দিদি। দুঃখ এইজন্যে যে বাবা-মা তোর জীবনটাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছেন।'

'আমার ভাগ্য নিয়ে আমাকে থাকতে দে ভাই। বাবাকে যেন এ সম্বন্ধে কিছু বলিস নে, তাহলে বড় দুঃখ পাবেন।'

রণেনই এ বাড়িতে এনেছিল নিরুপমকে। ও কোনও কলেজের বাংলার প্রফেসর। রণেনের সংগে অনেকদিনের আলাপ।

প্রথম পরিচয়েই মালবিকা চমকে উঠেছে। এ কি কথা, না গান, এত সুন্দর মার্জিত কথা মালবিকা অনেকদিন শোনে নি। তারপরের ইতিহাস খুবই সংক্ষেপ, দ্রুতগতিতে একটা পরিণতির দিকে এগিয়েছে। সব হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে মালবিকার। এতদিনকার জরা-জীর্ণ ধারণাগুলো হঠাৎ রূপ-বদল করেছে। মালবিকা নিজেকে বাধা দিয়েও পারে নি। রাতের পর রাত নিদ্রাহীন চোখে যুক্তির জাল বিস্তার করেও কোন সুবিধে হয়নি। মন তো যুক্তির হাতধরা নয়। যদিও সে জানত তাদের সম্বন্ধটা একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছবার আগেই মাপ-জোক করা জায়গায় থেমে যাওয়া উচিত।

কিন্তু তা হয়নি। নিরুপমের কথা তার মনে শুধু মন্ত্রের মতো বেজেছে আর বেজেছে। 'আপনি এত ক্লান্ত কেন, আপনার চোখমুখে এক কিসের নিঃসংগতার ছায়া?' জিজ্ঞেস করেছিল নিরুপম। মালবিকা উত্তর দিতে পারেনি। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল ওর সামনে থেকে। কিন্তু মনের কাছ থেকে পালাতে পারে নি। দিনে-রাত্তিরে সেই প্রশ্নটা এক নিরুপমেরই হাজারটা কণ্ঠ হয়ে ওর কানে বেজেছে। 'কেন, কেন' কেন?'

'না, না, না, আমি কোন অন্যায় করছি না। নিরুপমের কাছে আমার মুক্তি আছে। সে আমার পরিত্রাতা।'

নিস্তব্ধ রাত্তিরে নিঃসঙ্গ হয়ে বাড়ির কম্পাউণ্ডের চাতালে বসে, নিরুপমের

জন্যে অপেক্ষা করতে করতে মালবিকার বুক থেকে কথাটা ঠিক্‌রে বেরিয়ে এল। কিন্তু মুখে কোন শব্দ হলো না। শুধু তারই সকল অস্তিত্বে কথাটা কেটে বসে গেল।

ভীষণ ক্লান্ত দেখাল মালবিকাকে। চোখ দুটোকে বুজে সে গভীর প্রশান্তির স্বাদ পেতে চাইল। তার মনে হলো, সে একটা মেঘলোকে চলে গেছে। তার চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে গুঁড়ো গুঁড়ো মেঘ। বিচার হচ্ছে তার। সে দাঁড়িয়ে আছে একটা কাঠগড়ায়। কিন্তু সব কিছুই যেন অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট। বিচারকের আসনে যে বসে রয়েছে, মালবিকা শুধু বুঝেছে সে পুরুষ-মানুষ। কিন্তু তার চোখ-মুখ কিছুই ঠাহর করতে পারা যাচ্ছে না। হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ অথচ গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল কোন কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে।

'তুমি অন্যায় করছ, মালবিকা, তুমি পাপ করছ।'

'পাপ? কিসের পাপ? আমি যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচতে চাই। আমি জীবন চাই।'

'জীবন মানে কি?'

'জীবন মানে যন্ত্রণা নয়।'

নিরুপম আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও। প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করতে চাইল মালবিকা। কিন্তু শব্দগুলোর যেন কোন শক্তি নেই, একটুও আওয়াজ বেরোল না। মালবিকা চমকে চোখ মেলল। কোথাও কিছু নেই। শুধু তার হৃদ্‌পিণ্ডটা দ্বিগুণ তেজে দুলছে। আর, সেই শব্দটা একটা ফেঁসে যাওয়া ঢোলের ওপর কাঠি পড়ার মতো ঢবঢবে আওয়াজ দিচ্ছে। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। যেন সেই পাথরটা, সিসিফাসকে শাস্তি দেবার জন্যে যে পাথরটা তুলতে বলা হয়েছিল, সেই পাথরটাই তার বুকে চেপে বসেছে। মালবিকা দু হাতে ভর দিয়ে প্রাণপণে সংজ্ঞাহীনতার অবস্থা এড়াতে চেষ্টা করল। দাঁত দিয়ে সজোরে কামড়ে ধরল নীচের ঠোঁটটা।

দুটো বাজে। নিরুপম আর আসবে না। তবে কি নিরুপম কাপুরুষ? তার ভালবাসাটা শুধুই কতকগুলো ভাল ভাল কথার ফানুস?

মালবিকার শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে গিয়ে মুখ থেকে খানিকটা হাওয়া বেরিয়ে এল। হাহাকারের মতো শোনাল সেটা।

সমস্ত প্রকৃতি ভয়ংকররকম শান্ত হয়ে রয়েছে। একটা গাছের পাতাও নড়ছে না। চারদিকের সব কিছুই গতি হারিয়ে অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু, হ্যাঁ, শুধু রাত্তিরের সেই ভয়ংকর নিস্তব্ধতার, সেই সীমাহীন বিপুল অন্ধকারের একটা দুর্বার গতি আছে। সেটাই যেন বিরাট এক দৈত্যের আকার নিয়ে শতসহস্র হাত বাড়িয়ে মালবিকাকে ধরতে আসছে।

মালবিকা আবার গাছে হেলান দিয়ে 'আঃ' বলে দীর্ঘছন্দের হতাশা-বেদনা-ক্লান্তি মিশ্রিত এক শব্দ করল। নিজেকে সে সব চিন্তা থেকে একটু অব্যাহতি দিতে চাইল, কিন্তু পারল না। তার মনে হলো, নিরুপম মিথ্যে, তার প্রেম মিথ্যে, তার আশ্বাস মিথ্যে। সবই এক নাটকের পূর্ব-নির্ধারিত দৃশ্য।

মালবিকার মনে হলো, তার চারিদিক ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সে একা পারাপারহীন এক দুস্তর মরুভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সেই কুয়াশা ভেদ করে কয়েকটা মূর্তি ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তারপর আরও কয়েকটা। তারপর আরও।

মালবিকা চমকে উঠল। ওরা কারা! সমস্ত শক্তি দিয়ে চেনবার চেষ্টা করল সে। হ্যাঁ, চিনেছে। নিরুপম। মালবিকা প্রাণপণে ছুটে গেল সেই দিকে। কিন্তু কাছে যেতেই সব কটা মূর্তি হঠাৎ মিলিয়ে গিয়ে রণেন হয়ে গেল। তবে কি পৃথিবীর সব পুরুষই রণেন? তবে মালবিকা কাকে বিশ্বাস করবে? কাকে বিশ্বাস করে ভালবাসবে? এমনি ক'রে বারবার কতজনের কাছে আশ্রয় চাইবে আর হারাবে? গভীর বেদনায় চোখ খুলল মালবিকা। চোখ তুলল আকাশের দিকে। গাল বেয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। আকাশটা এত নীল কেন! বিষে নীল হয়েছে? হঠাৎ একটা তারা খসে পড়ল।

মালবিকা বহু কষ্টে নিজের শরীরটাকে তুলে ধরে ঘরের দিকে এগোবার চেষ্টা করল। বুক থেকে কাপড়টা খসে গেছে। লুটোচ্ছে মাটিতে। সেটাকে তোলবার শক্তি পর্যন্ত নেই তার। ভিজে ঘাসের ওপর দিয়ে নরম ফিসফিসে একটা শব্দ তুলে মালবিকা টলতে টলতে ঘরের দিকে এগোল। খুট্‌ করে দরজাটা খুলে এবং আবার বন্ধ করে মালবিকা রণেনের ঘরে, তার খাটের কাছে এসে দাঁড়াল। অঘোরে ঘুমোচ্ছে রণেন। তার কালো পেটটা তেমনি বিশ্রী-ভাবে উঠছে আর নামছে। মুখ থেকে সেই অস্বস্তিকর শব্দটা ক্রমাগত ঠেলে বেরোচ্ছে। কিন্তু তবু আজ মালবিকার তত বিশ্রী লাগল না। সে রণেনের বিছানায় মুখ রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল। শুধু ওর দেহটা ঘন ঘন কেঁপে উঠতে লাগল।

পাশ ফিরে শুলো রণেন।

এর পর কি হবে মালবিকা জানে। কাল থেকে হয়ত নিরুপম আর আসবে না। হয়ত আসবে। এসে নানা অজুহাত দেবে, রাত্তিরে আসতে না-পারার বহু কারণ দর্শাবে। হয়ত কোন দুর্ঘটনার কথাও বলবে। কিন্তু মালবিকা জানে তাতে সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না। আর ফেরাতে পারবে না নিরুপম। কেননা সেই মনট তখন আর ফিরবে না। সে ভেবেছিল একটা পরিণতির কাছাকাছি আসতে পেরেছে তারা, কিন্তু এক রাত্তিরের ব্যর্থ প্রতীক্ষা তাকে আবার পাঁচ বছর পেছনে নিয়ে গেছে।

শুধু এই নতুন কান্নাটা তার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়ে রইল, যে-কান্না মালবিকা এখন কাঁদছে। খুব নীরবে এবং খুব গোপনে।

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১৫৬ ॥

ওঁ

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু,

হারাসান আরোগ্যের কিনারায় এসেছে। তাই স্থির করেছি আগামী কাল সকালের গাড়িতে শান্তিনিকেতনে যাত্রা করব। বৌমা এখানে কিছুকাল থাকবেন হাঁপানির জন্যে ডায়োথার্মিক চিকিৎসা করাবার সঙ্কল্প করেচেন। কলকাতায় থাকতে আমার কাজকর্ম অর্থাৎ বক্তৃতা প্রভৃতি লেখার কাজ বন্ধ ছিল,—অথচ লিখতেই হবে। এইবার শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়ে নিভৃতে কাজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ডুব দেব মনে করচি কিছুকাল আমার কাছ থেকে চিঠিপত্র প্রত্যাশা কোরো না। সেখানে বিদ্যালয় ছুটির পরে খোলা উপলক্ষ্যে, ইংরেজিতে যাকে বলে বিজিনেস্ অর্থাৎ ব্যবসায়িক কাজ তাও প্রথম প্রথম আমাকে ছেঁকে ধরবে। মেয়েদের জন্যে নতুন বাড়ি তৈরি হয়েচে—সেইখানে তাদের এনে তাদের ভূতপূর্ব বাসায় কালেজি ছেলেদের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সম্বন্ধে কিছু বাদানুবাদের আশঙ্কা আছে। "—" পণ করে বসেচেন যে মেয়েদের বাড়িতে গরাদ না লাগালে তিনি সেখানে মেয়েদের ঢুকতে দেবেন না। তাঁর আরো একটা আপত্তি—ছোটো ছেলেদের সঙ্গেও এক ভোজনশালায় মেয়েদের খাওয়ানো তাঁর মতে গর্হিত। তিনি পুরোপুরির একটা খাঁচা বানাতে চান। একথা ভুলেচেন যে, এমনতরো উচ্চৈঃস্বরে আশঙ্কা প্রকাশ করলেই আশঙ্কার কারণ বেশি ঘটে। বিশ্বাস করতে পারলেই বিশ্বাসযোগ্যতার সৃষ্টি হয়। এদিকে এই শীতের কয়মাস বিদেশী অতিথি দলে দলে আসতে থাকবে। তাদের কাছ থেকে পালিয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। অতুল সেন আমাকে লক্ষ্ণৌয়ে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেচেন। মনে ভাবচি গেলে হয়তো শরীরও ভালো হবে, মনস্থির করে কিছু কাজ করতেও পারব। যদি যাই তাহলে ৭ই পৌষ ফাঁকি দেব—একেবারে ববদায় চলে যাব বক্তৃতা সারতে। আমার মুশকিল এই যে আমার সঙ্গে যেতে পারে এমন সেক্রেটারি জাতীয় কেউ নেই। হারাসান এখন দীর্ঘকাল কোথাও নড়তে পারবে না। আমার সেবা না হলেও চলে, কিন্তু রাশীকৃত বাজে কাজ জমে উঠে আমার প্রতি ভ্রূকুটি করতে থাকবে সেই বিভীষিকা থেকে কে আমাকে বাঁচাবে? আমার খাতির আবর্জনাতেই আমার বোঝা প্রতিদিন বাড়তে থাকে—আমার যশের শৃঙ্খলে আমি বদ্ধ!—বুলা তার পরে আর একদিন এসে পেন্সিল ধরেছিল। এদিনও ভাববার মতো অনেক লেখা বেরিয়েছে। একটা বড়ো আশ্চর্য কথা পাওয়া গেছে। শমী এসেছিল। অন্য অনেক কথার মধ্যে সে বল্লে, "শান্তিনিকেতনের ধ্রুবকে আমার মনে পড়ে।" সে অনেকদিনের কথা। ধ্রুব এবং আর দুটি ছেলে শান্তিনিকেতনে আমারই বাড়িতে শমীর সঙ্গে একত্রে ছিল। বেলা তাদের দেখাশোনার ভার নিয়েছিল,—তাদের পড়ানোতেও সাহায্য করত। ওর নাম যখন উঠল আমি কিছুতেই মনে আনতে পারলুম না। অপূর্ব বল্লে হাঁ, ধ্রুব বলে এক ছাত্র ছিল। রাত্রে বিছানায় শুয়ে হঠাৎ ঐ তিন জনের কথা মনে পড়ল। ধ্রুবকে বেলা খুব স্নেহ করত। তার কথা শমীর মনে পড়ে এটাই সঙ্গত। কিন্তু বুলার হাত থেকে এ কথা বের হোলো কি করে? শমীর কথাগুলি ভারি মজার রকমের। সুকুমারের কথাও খুব যেন তারি মতো। মোহনলাল এগুলো লিখে নিয়েচে। কোনো একসময়ে দেখতে পাবে।—কাগজে খবর পেয়ে থাকবে হঠাৎ কাল সুবীর মৃত্যু হয়েচে। অমিতা ছিল বোলপুরে, সে চলে এসেচে। কমলও এখানে।

শীতের হাওয়া দিয়েচে—শরৎকালের অবসান হয়ে এল। এই সময়ে শান্তিনিকেতনের রোদের বেলাটার জন্যে মনটা টানে। ইতি ৯ নবেম্বর ১৯২৯

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৫৭ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

শান্তিনিকেতনে এসেচি। আজ সকালে হঠাৎ '—' এসেছিল। সে বল্লে —র কাছে সে শুনেচে যে '—' তাকে বলেচে '—কে আমি ঘৃণা করি, অনেক চেষ্টা করেও তাকে ছাড়াতে পারিনে। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে লাগল। আমার মনে ভারী কষ্ট হয়েচে। ছেলেমানুষ, ওকে অত্যন্ত কঠিন আঘাত করা হোলো। আমাদের মনে কোনো একটা সংস্কার একবার আকার ধারণ করতে আরম্ভ করলে তার ঝোঁক ক্রমে বেড়ে উঠতে থাকে—তাকে নিয়ে যে সৃষ্টির কাজ চলে সেটা যথাযথের সীমা ছাড়িয়ে যায়। মন আপন রচনাকে সুসম্বন্ধ করতে গিয়ে অন্যায় করে। বুদ্ধির প্রেরণায় যে জিনিসটা আমরা গড়ি সেটাতে অত্যুক্তির সম্ভাবনা কম—কিন্তু ভালোমন্দ লাগার উপর যদি সৃষ্টির ভার পড়ে তাহলে আমাদের অগোচরে প্রতিকৃতি অতিকৃতির দিকে এগোতে থাকে। মানুষকে দিয়ে ছবির শখ মেটাবার চেষ্টা করলে প্রায় তার পরে কঠোর অন্যায় করা হয়—রঙের পরে রঙ চড়াতে থাকি সত্যির খাতিরে নয়, চিত্রের খাতিরে। ক্রমে আপনার রচনা আমাদের আপনাকে ভোলাতে থাকে, ছবি হিসাবে যতই সেটা সম্পূর্ণ হয় ততই তার প্রতি আমাদের হৃদয়ের ভাবটা ঘনীভূত হয়ে একটা বিশেষ ধারা অবলম্বন করে—মানুষকে নিয়ে এইরকম রচনাব্যাপারকে প্রশ্রয় দেওয়া একেবারেই ভাল নয়—বস্তুত এই প্রণালীতে যার উপরে আমরা নিষ্ঠুর হয়ে উঠি, সে সত্যপদার্থ নয় অথচ যে আঘাত পায় সে সত্যকার মানুষ। আমার নিজের কথা যদি বলো আমি একান্ত যত্নে চেষ্টা করব সত্যদৃষ্টিকে কলুষমুক্ত করতে। কোনো কারণে যাকে আমাদের ভালো না লাগে মনে মনে তার একটা অপ্রিয় চিত্র এঁকে তাকে আমরা দণ্ড দিই। আমি কল্পনাপ্রবণ মানুষ, ভালো করে সেই চিত্র আঁকতে পারি বলেই আমার বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। মানুষের মমতা মানুষ এত করেই চায় অথচ এত সহজেই তাকে আমরা বঞ্চিত করি।

প্রশান্ত তার চিঠিতে লিখেচে বুলার হাত দিয়ে যে লেখা-

গুলো বেরোর বিশেষ করে তার পরীক্ষা আবশ্যক। আমার নিজের মনে হয় এসব ব্যাপারে অতি নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। আমার আপন সম্বন্ধে যাকে ফ্যাক্টস্ বলা যায় তাই নিয়ে যদি তুমি পরীক্ষা করো তবে প্রমাণ হবে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নই। যে গান নিজে রচনা করেচি পরীক্ষা দিতে গেলে তার কথাও মনে পড়বে না, তার সুরও নয়। একজন জিজ্ঞাসা করেছিল চন্দননগরের বাগানে যখন ছিলুম তখন আমার বয়স কত, আমাকে বলতে হয়েছিল, আমি জানিনে, বলা উচিত ছিল, প্রশান্ত জানে। আমি যখন দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছিলুম, সে দু বছর হোলো না, তিন বছর না চার বছর, নিঃসংশয়ে বলতে পারিনে। শমীর মৃত্যু হয়েছিল কবে, মনে নেই—বেলার বিয়ে হয়েছিল কোন বছরে কে জানে। অথচ টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা কবার সময়ে তুমি যা নিয়ে আমার সম্বন্ধে নিঃসংশয় সেটা তোমার ধারণা মাত্র। তুমি জোর করে বলচ ঠিক আমার স্বর, আমার ভাষা, আমার ভঙ্গী, আর কেউ যদি বলে, না, তার পরে আর কথা নেই। কেননা তোমার মনে আমার ব্যক্তিত্বের যে একটা মোট ছবি আছে, অন্যের মনে তা না থাকতে পারে কিম্বা অন্য রকম থাকতে পারে। অথচ এই ব্যক্তিত্বের সাক্ষ্যই সব চেয়ে সত্য সাক্ষ্য, কেননা, এটাকে কেউ বানাতে পারে না। আমার জীবনের বিশেষ বিশেষ তথ্য আমার চেয়ে প্রশান্ত বেশি জানে, কিন্তু হাজার চেষ্টা করলেও আমার মোট ছবিটা সে নিজের মধ্যে ফোটাতে পারবে না। আত্মার চরম সত্য তথ্যে নয়, আত্মার আত্মকীয়তায়।

ইতিমধ্যে পশু বুলার হাতে একটা লেখা বেরিয়েছে তাতে নাম বেরোলো না। বল্লে, নাম জিজ্ঞাসা কোরো না, তুমি মনে যা ভাবচ আমি তাই। তার পরে যেসব কথা বেরোলো সে ভারি আশ্চর্য। তার সত্যতা আমি যেমন জানি আর দ্বিতীয় কেউ না। কোনো এক অবসরের সময় কপি করে তোমাকে পাঠাবো। কিন্তু অবসর আর পাব কিনা জানিনে। অনেক কাজ। প্রশান্ত এখনো ওখানে আছে কিনা জানিনে। তাকে এই চিঠি দেখিয়ো।

এখানে কলেজে স্কুলে যে আন্তরিক অসামঞ্জস্য ঘটেচে তাতে গুরুতর অনিষ্ট ঘটচে। আমি প্রথম থেকেই এই আশঙ্কা করেছিলুম, আর তাই বাধা দিয়েছি। আমাদের বাঙালীর প্রকৃতির মধ্যে একটা গভীর মর্মগত দুর্বলতা আছে, তারি অস্বাস্থ্য আমাদের সকল কাজকেই দূষিত করে। আমার দুর্ভাগ্য আমি বাংলা দেশে আমার কাজ ফেঁদেচি। এখানকার পলিমাটিতে সমস্ত বড়ো বড়ো কীর্তি দেখতে দেখতে তলিয়ে গেছে। আমরা আমাদের চিত্তদৈন্য দ্বারা সব কিছুকেই নষ্ট করি। আমাদের আত্মশক্তি নেই অথচ অহমিকার অন্ত নেই। একবার প্রশান্তর এখানে আসা অত্যন্ত আবশ্যক। আজকাল আমি চেষ্টা করি যা ঘটচে তাকে অবিচলিত চিত্তে গ্রহণ করতে কিন্তু তাই বলে তার প্রতিকারে ঔদাসীন্য করলে অপরাধ হয়।

তোমার ক্রিমির কথা শুনলুম। ওটার উপদ্রব সম্পূর্ণ ধ্বংস হলে বোধ হয় অনেকটা আরাম পাবে। কাঁচা পেঁপের আটা অল্প একটু দুধের সঙ্গে মিলিয়ে বারবার খেলে উপকার হবে বলে মনে করি। ইতি ১০ নবেম্বর ১৯২৯

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৫৮ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

তোমাকে চিঠি লিখব লিখব করচি এমন সময়ে তোমার চিঠি পেলুম। বিশেষ করে লেখবার বিষয় কিছু তা নয়— কিন্তু যা লিখলেও হয়, না লিখলেও হয়, কিছুতেই কিছু আসে যায় না সেটা হচ্ছে উড়ো ভাবনা, তাকে ধরা শক্ত। যাবে বলে খবর, সে—এই পর্যন্ত লিখেছি তার পরে অনেকদিন হোলো, সময় চাপা পড়ে গেলো নানা আকার আয়তনের নানা প্রকার কাজের তলায়। সেদিনকার উড়ো ভাবনা সেই দিনেই লীলা সাঙ্গ করে বৈতরণী পেরিয়ে স্থলে গেছে। সেদিন ছিলো শীতের দুপুর, বেলাটা আমার জগতে সব চেয়ে বড়ো স্থান নিয়ে—পেয়ালা উপচিয়ে পড়ছিল—আমার মনটা যেন সমস্ত আকাশ জুড়ে ছিল, আর তার মধ্যে জমে উঠেছিল সোনার আলোর নেশা এই মন আকাশে আলো আর খোলা মাঠ নিয়ে সব সুদ্ধ ব্যাপারখানা যে কী তা তো স্পষ্ট করে বলবার যো ছিল না। অস্পষ্ট করেই বলতে বসেছিলুম এমন সময় কোনো একটা সুস্পষ্ট কর্তব্য কিম্বা অকর্তব্য মনটাকে নিয়ে গেল সেই কলমের মুখ থেকে ছিনিয়ে। ঠিক সেই জায়গাটাতে ফিরে আসা আর ঘটল না। যেটাকে "সেই জায়গা" বলচি "সেই জায়গাটা" সুদ্ধ দৌড় মেরেচে। মনে হচ্ছে সেদিন এসেছিল " ", "—" চিঠিতে কুৎসিতভাবে আমার কুৎসা করেচে তার সঙ্গে "—"র যোগ নেই এই কথাটা জানিয়ে যেতে। অথচ আমার তরফেও কিছু কিছু ত্রুটি আছে এই আভাসও পেয়েছি। "—" প্রভৃতি আমার সহচরের বাক্যে বা ব্যবহারে যত কিছু দুষ্টতা প্রকাশ পায়, আমার জীবনচরিতের অধ্যায়ে লোকে সেগুলো যোজনা করে আমার নামের উপর কালিমা লেপন করে। এই গেল এক, আর একটা হচ্ছে আমি তপতী প্রভৃতি নাট্যে অভিনয় করে এতদূর আত্মশ্লাঘবতা প্রকাশ করেছি যে ইদানীং "—" আমার এই সব অভিনয়ে আসা বন্ধ করেচে। হায় রে, এরা আমাকে ভক্তি করতেও পারত যদি নিজেকে যথেষ্ট ছোটো করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত। জীবনে আমার কাজ হচ্ছে প্রকাশ করার কাজ— এই আমার স্বভাব। যা কিছু আমি প্রকাশ করতে পারি তাকেই প্রকাশ করা আমার স্বধর্ম। সুতরাং তাই আমার কর্তব্য। লেখার দ্বারা তপতী নাটক প্রকাশ করায় যদি আমার অপরাধ না হয়ে থাকে তবে অভিনয়ের দ্বারা সেটাকে প্রকাশ করায় নিন্দার কী কারণ হয়েছে বোঝা গেল না। দুটো কাজেরই মূলে একই শক্তি। বেদে ঈশ্বরকে বলেচেন আবিঃ প্রকাশস্বরূপ, ঐটেই তাঁর প্রকৃতি—অর্থাৎ তিনি আর্টিস্ট। আমার যদি প্রকাশ করবার কোনো শক্তি থাকে তাহলে বলতে হবে সেটা দিব্য শক্তি। সংসারে যা আমরা ভোগ করি তার সঙ্গে আমরা লিপ্ত, যা আমরা প্রকাশ করি তার সঙ্গে আমরা নির্লিপ্ত। বোধ হয় "—" মনে হয়েচে যে অভিনয়ের উপলক্ষ্য করে আমি ভোগ করে থাকি। এখানে আর তর্ক চলে না— এখানে এই বলে চুপ করতে হবে যে, ভিন্নপ্রকৃতির্হি লোকঃ। কিছুকাল পূর্বেও এমন একদিন ছিল যখন এই সমস্ত কুৎসায় আমার উত্তেজনা ঘটত। এখন বারম্বার আঘাতে আমার বাহিরের আমিটা আমার গভীরতর আমির থেকে শিথিল হয়ে পড়েচে। আমার নিজের থেকে নিজে দূরে যাবার যে সাধনা সেইটেতে এই সমস্ত অবমাননা আমার সহায়তা করেচে। আমার সম্বন্ধে এই যে সমস্ত কিছু ঘটেচে সেটাকে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে একটা সাধারণ ঘটনা মাত্র বলে আমি দেখচি। আমার দেশে যে-ইচ্ছা সেই আমাকে অন্যায় অপমান করতে পারে যাতে করে অপমানকারীর কোনো ক্ষতি ঘটে না এবং দেশের চক্ষে বেদনা লাগে না এটা একটা fact। চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে এ fact ছিল না, মহাত্মাজি সম্বন্ধেও নেই বললেই হয়। এ নিয়ে ক্ষোভ করা চলে না। এইটেই এই, তা স্পষ্ট করেই জেনে রাখলেই চুকে গেল। যতদিন ঠিক মতো জানানো যায় ততদিন এটা সম্বন্ধে মনকে শান্ত করা

কঠিন হয়। কারণ বেদনা অনুভব করবার শক্তি, আমাদের প্রকাশ করবার শক্তির সহচর। বিশেষত যাদের বন্ধু বলেই জেনেছিলুম, কোনোদিনই যাদের ভালো বই মন্দ করি নি, আজো যাদের স্নেহ করি, তারা আমার অবমাননায় উদাসীন থাকবে, এমন কি উৎসাহ প্রকাশ করবে, এর বেদনা নিছক ব্যক্তিগত নয়, এর দুঃখ সর্বমানবকেই বাজে,—আমি ওপতীর অভিনয় করলেও এর ক্ষালন হয় না। তবু আমার নিজের দিক থেকে বলতে পারি এতে আমার যথার্থ উপকার হয়েচে —গভীরভাবে আমাকে মুক্তির দিকে অগ্রসর করেচে। যেমন ঝড়ের উপর মারীর উপর মানুষে রাগ করে না, তেমনি এই সমস্ত আঘাতকে স্বীকার করে নিয়ে আমি যেন রাগ না করি যেন শান্ত থাকি প্রতিদিনই নিজেকে এই কথাই বলচি এবং মনের ভিতর থেকে এর সায় পাচ্চি। আজ সাতই পৌষ। সকালবেলাকার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। ভিতরকার গভীর কথাকে প্রকাশ করার দ্বারা যে একটা শান্তি আসে আজ সেই শান্তি আমার মনের উপর বিরাজ করচে। ইতি ৭ই পৌষ ১৩৩৬

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৫৯ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আজ যাঁরা তোমার ওখানে যাচ্চে এই উপলক্ষ্যে দু কলম লিখে দিই। ঘড়িতে সাতটা পেরিয়ে গেছে কিন্তু বাড়ির যাঁরা প্রধান ব্যক্তি এখনো তাঁদের চোখে ঘুমের ঘোর। আমি ভোর রাত্রে কিছু বাদাম কিসমিস, ঘরের তৈরি মাখন এবং সদ্য দোহন করা দুধ মিশিয়ে চা খেয়ে আমার কঙ্কর কণ্ডপথে কিঞ্চিৎ পদচারণা করে ঘরে এসে বসেচি। সূর্য এখন দিগন্তের বেশ খানিকটা উপরে উঠেছেন, জানলার ভিতর দিয়ে আমার টেবিলের উপর অদাকার ডাকের চিঠির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উদয়-বার্তা পাঠিয়েছেন। গত কাল পর্যন্ত অকাল-বাদলের আক্রমণ চলেছিল, আজ আকাশ নির্মল, শীতের বাতাস উত্তরের মাঠ পেরিয়ে হু হু করে এসে আমার রুদ্ধ দরজা নাড়া দিচ্চে। অনেকগুলো কাপড় চড়িয়েছি গায়ে, তোমার সেই জলহস্তীর খোলসটাকে স্মরণ করে আজ মনে ঈর্ষা জন্মাচ্চে।

তোমাকে সেদিন সেই চিঠিটা লিখে অবধি মনের ভিতরে ভিতরে একটা বেদনা বোধ করচি। "—" সম্বন্ধে কিছু অবিচার করেচি বলে মনে হচ্চে। "—" "—" চিঠি অবলম্বন করে আমার বিরুদ্ধে উৎসাহ করেচেন বলে দুই ভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছ থেকে খবর পেয়েছিলেম। সেটা সত্যও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে। আমাদের দেশের হাওয়ায় অপ্রিয় সংবাদ অত্যন্ত বিকৃত হয়ে ওঠে তার পরিচয় অনেক পেয়েছি —অতএব এ ক্ষেত্রে তাই হয়েছে বলে ধরে নিলে অবিচারের আশঙ্কা থাকে না। তা ছাড়া আমার প্রতি "--" র যথেষ্ট শ্রদ্ধা যদি না থাকে তবে সেটাকে অপরাধ বলে গণ্য করা উচিত নয়। আমিও অনেক লোকের 'পরে অশ্রদ্ধা করে থাকি।— বিশ্বের আগন্তুকের আগমন হচ্চে। এই সময়ে আমি যদি গন্তুক হতে পারতুম তাহলে রক্ষা পেতুম কিন্তু আলিপুরের আদালত পথ রোধ করে আছে—৫ই তারিখে সেখানে আমার তামাশা হবে, দেশের লোক উৎসুক হয়ে আছে—টিকিট করলে বিক্রি হত। আমাকে নিয়ে যেমন খুশি ব্যবহার করতে কারো মনে কোনো সংকোচ নেই। পয়লা জানুয়ারী থেকে দেশের সঙ্গে নির্লিপ্ত হবার সাধনা করব স্থির করেচি। ইতি ১২ পৌষ ১৩৩৬।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাঁরা হয়তো যাবে না এমন গুজব শুনলুম—কিন্তু পোস্ট আপিসের মত বদলায় নি। অতএব তাকেই আশ্রয় করি।

ঘ র

শঙ্খ ঘোষ

তোমরা যদি কথা বলতে চাও—
এসো আমার ঘরে, আমি ঘর পেয়েছি—
এসো,
আমার ঘরে উদাত্ত বন্ধুতা।

তোমরা যদি ছায়া গুনতে চাও—
এসো আমার ঘরে, আমার মুখের ওপর আলো,
পিছুদুয়ারে ছায়া খরস্রোতা।

কিংবা যদি বাহিরই চাও, এসো এসো এসো—
নীল পাথরে হাঁটিঃ

সেই মুহূর্তে নিভে গেল ঘরে সকল বাতি॥

রূপময় ভারত

নাচের দেশ মণিপুর। গানেরও। বস্তুত, সাধারণ মানুষের জীবনে নৃত্য-গীতের এমন গভীর প্রভাব ভারতবর্ষের অন্যত্র দুর্লভ। বহুকাল যাবৎ নানাবিধ নৃত্যশিল্পীর উদ্ভব ও চর্চা হয়ে এসেছে মণিপুরে। রাস-নৃত্য তাদের মধ্যে প্রধান হলেও "মাইবি", "কাবী", "লাই-হারোবা", "খাম্বা থইবি" প্রভৃতি ভিন্ন প্রকৃতির মণিপুরী নৃত্য অথবা নাগা কুকি প্রভৃতি স্থানীয় আদিবাসীদের নৃত্য-পদ্ধতিগুলি মণিপুরের বিপুল নৃত্য ভাণ্ডারের বিশিষ্ট সম্পদ। এই বহুমুখী নৃত্যকলার পরিচয়জ্ঞাপক সঙ্গের ছবিগুলি মণিপুর উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে গৃহীত:

(১) আদিবাসী "কাবুই" নৃত্য (২) "কাবুই" নৃত্যের নটী (৩) "খাম্বা-থইবি" নৃত্যের দৃশ্য (৪) "খাম্বা- থইবি" নৃত্যের নর্তকী (৫) "মাইবি" নৃত্যের ভঙ্গি (৬) ও (৭) নাগা-নৃত্যের নর্তক-নর্তকী।

আলোকচিত্রশিল্পী:

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

৪
৫
৬
৭

"তরুণ-তরুণীদের জন্যে এমন কতক-গুলো বাড়ি তৈরি করা হোক, যেসব বাড়িতে তরুণ-তরুণীরা এক সাথে এসে মিলিত হবে, এবং তাদের অবসর-মুহূর্তগুলো আনন্দে কাটাতে পারবে। তরুণ তরুণীদের সামনে সব সময়ই খোলা থাকবে এইসব বাড়ির দুয়ার",—১৯২০ সালের পরে এই মর্মে এক দাবী জানানো হয়েছিলো জার্মানীতে। তদানীন্তন জার্মাণীর তরুণ-তরুণীদের তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যার ভার যাদের উপর ন্যস্ত ছিলো, তারাই শুধু এই "দুয়ার খোলা বাড়ির" প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি; দেশের বেসরকারী লোকজন, বিশেষ করে তরুণ-তরণীদের পিতামাতারাও এই দাবীর প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলো। তরুণ-তরুণীরা তাদের অবসর সময়ে যখন পরস্পরের সাথে মিলিত হতে চায়, তখন জায়গার অভাবে তারা যাতে কোনো পানশালা, ভোজনালয়ে অথবা রাস্তায় যেতে বাধ্য না হয়, তাই তরুণ-তরুণীদের জন্যে "দুয়ার খোলা বাড়ি" তৈরির প্রস্তাবে সায় দিয়েছিলো সবাই।

এই আন্দোলনের ফলে জার্মানীতে তরুণ-তরুণীদের জন্যে সে সময় প্রথম কয়েকটা "দুয়ার খোলা বাড়ি" তৈরি করা হয়েছিলো। তরুণ-তরুণীরা প্রয়োজন মতো এইসব বাড়িতে মিলিত হতে পারতো; এজন্য কোনো সমিতির সভা হওয়ার দরকার পড়তো না। তাছাড়া এইসব বাড়িতে অবসর সময় কাটানোর ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট নিয়মকানুনও মেনে চলতে হতো না। বর্তমানে জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের প্রত্যেকটা শহরে এই ধরনের এক বা একাধিক বাড়ি গড়ে উঠেছে। শুধুমাত্র হামবুর্গেই আঠারোটা "দুয়ার খোলা বাড়ি" দেখতে পাওয়া যায়।

এগুলোর মধ্যে তেরোটা তৈরি করেছে নগর কর্তৃপক্ষ, এবং পাঁচটা নির্মিত হয়েছে ব্যক্তিবিশেষের প্রচেষ্টায়। অবশ্য পৌর ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কিছু কিছু সাহায্য করেছে। জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের ছোটো ছোটো পল্লী এলাকায়

চাঁদে অভিযাত্রীর পোশাক—লস এঞ্জেলেসে অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বাওটেকনলজি লেবরেটরীতে প্রস্তুত পরীক্ষামূলক স্যুট

এবং বিভিন্ন গাঁয়েও "দুয়ার খোলা বাড়ি" চোখে পড়ে। তবে সত্যিকার "বাড়ি" বলতে যা বোঝায়, তা অবশ্য এইসব অঞ্চলে বড়ো একটা নেই। সাধারণত ছোটো ছোটো ঘরে অথবা বাসগৃহে তরুণ-তরুণীরা জমায়েত হয়।

"দুয়ার খোলা বাড়ি" ছাড়াও জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রে এমন অনেক বাড়ি আছে, বিভিন্ন তরুণ-সংস্থা সেগুলো অনায়াসে ব্যবহার করতে পারে। প্রতি সপ্তাহে একটা নির্দিষ্ট দিনে এইসব বাড়ি তরুণ-তরুণীদের জন্যে খোলা থাকে। কোনো এক "দুয়ার খোলা বাড়ির" জনৈক পরিচালক বলেছেন, "তরুণ-তরুণীরা অবসর সময়ে "দুয়ার খোলা বাড়ি"তে এসে সমবেত হয়। আপন আপন পরিবারে, বিদ্যালয়ে এবং কর্মস্থলে এইসব তরুণ-তরুণীরা যে শিক্ষা পায়, "দুয়ার খোলা বাড়ি"তে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা আর জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে সে শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে।" অবশ্য এসব "বাড়ি"তে যেসব সুযোগ-সুবিধা বর্তমানে থাকে, তরুণ-তরুণীরা স্বেচ্ছায় সেগুলোর পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে কিনা, তা "বাড়ি"র পরিচালকের ব্যক্তিত্ব আর প্রচেষ্টার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। কারণ, প্রায় শ'খানেক তরুণ-তরুণীর মধ্যে তিনিই হলেন একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি। পরিচালক পারতপক্ষে তরুণ-তরুণীকে কোনো আদেশ মেনে চলতে বাধ্য করেন না। "বাড়ি"র নির্দিষ্ট নিয়মকানুন অনুসারে তরুণ-তরুণীরা নিজেরাই সব কিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করবার চেষ্টা করে, এবং নিজেদের ইচ্ছামতো বিভিন্ন দলে যোগ দেয়।

এই ধরনের কোনো একটা "দুয়ার খোলা বাড়ি"তে পা দিলেই একথা অনায়াসে বোঝা যায় যে, "বাড়ি"তে যেসব সুযোগ-সুবিধা বর্তমান আছে, তরুণ-তরুণীরা সেগুলোর পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করে। "বাড়ি"র এক কোণে হয়তো ডাকটিকেট সংগ্রহকারিদের একটা আসর চোখে পড়ে, অন্য কোণে হয়তো কয়েকজন তরুণ-তরুণীকে একটা কোনো নতুন গানের সুর ভাজতে দেখা যায়। তাছাড়া "বাড়ি"র মাটির নীচের তলায় টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের জন্যে পাতিয়ে রাখা দুটো বড়ো বড়ো টেবিলও হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে।

সপ্তাহের মধ্যে কোনো একটা নির্দিষ্ট দিনে তরুণতরুণীদের অনুরোধে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিরা এইসব বাড়িতে আসেন। বিভিন্ন তরুণ-তরুণীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করেন তাঁরা। এইসব "দুয়ার খোলা বাড়ি"তে মাঝে মাঝে নাচেরও আয়োজন করা হয়। শুধুমাত্র সুরাসার বর্জিত পানীয়ের ব্যবস্থা থাকে এইসব অনুষ্ঠানে, এবং তরুণ-তরুণীরা একথা ভালো করেই প্রমাণ করে যে, মানুষ সুরাসারযুক্ত পানীয় ছাড়াই নাচের জলসায় বেশ আনন্দ পেতে পারে।

"দুয়ার খোলা বাড়ি" জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের সব অঞ্চলেই অসামান্য খ্যাতি অর্জন করেছে। তরুণ-তরুণী, এমন কি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষও এই ব্যবস্থার অকুণ্ঠ প্রশংসা করে থাকে আজকাল। জার্মানীর যেসব তরুণ-তরুণী কোনো তরুণ-সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে না, অথবা সাধারণত কোনো প্রকার "দল পাকানো" পছন্দ করে না, "দুয়ার খোলা বাড়ি" হল তাদের দ্বিতীয় "গৃহ"।

(২৬)

দু'তিনখানা খবরের কাগজের প্রথম পাতায় লিন্ডসে হোপের ছবি বেরিয়েছে, সেই সঙ্গে তার হত্যার বিবরণী। রিপোর্ট-গুলো গুছিয়ে নিলে এই দাঁড়ায়—লিন্ডসে হোপ (৫০) পরশুদিন সন্ধ্যেবেলা দোকান থেকে ফিরে নিজের 'মে' ফেয়ারের ফ্ল্যাটে স্নান করে নেন, রাত্রে কোথাও ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। এই সময় কোন এক অপরিচিত আগন্তুক তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। পরিচারিকা আগন্তুকের কাছ থেকে কার্ড নিয়ে উপরে যায়, লিন্ডসে হোপ তখন সবে স্নান সেরে বেরিয়ে এসে বিশ্রাম নিচ্ছেন পরিচারিকার হাত থেকে কার্ডটি নিয়ে বিরক্ত স্বরে লিন্ডসে হোপ বললেন, বলে দাও আমি এখন ওর সঙ্গে দেখা করব না, আমি ব্যস্ত।

পরিচারিকা জানায়, ভদ্রলোক বড় কড়া মেজাজের, উনি বলছেন দেখা না করে যাবেন না।

লিন্ডসে হোপ রেগেই বললেন, না, না। এখন দেখা হবে না।

পরিচারিক আস্তে আস্তে নীচে নেমে আসে, আর আগন্তুককে মৃদু স্বরে তার প্রভুর বক্তব্য জানায়।

ভদ্রলোক কিন্তু সে কথায় কান দিলেন বলে মনে হলো না, দাঁত কড়মড় করে বলেন, আজই আমি লিন্ডসে হোপের সঙ্গে দেখা করব। এখুনি।

আগন্তুক অভদ্রভাবে পরিচারিকাকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যায়। পরিচারিকা এ ধরনের ব্যবহার মোটেই আশা করেনি। প্রথম সে বিমূঢ় হয়ে পড়ে, কিন্তু পরক্ষণেই আগন্তুকের পিছু পিছু সিঁড়ি দিয়ে ওঠে এবং চেঁচিয়ে বলে, দোহাই আপনার, ওপরে যাবেন না।

বলা বাহুল্য, তাতে কোন ফল হলো না, পরিচারিকা উপরে উঠবার আগেই আগন্তুক লিন্ডসে হোপের ঘরে ঢুকে গেছে।

লিন্ডসে হোপ তখনও ড্রেসিং গাউন পরে দাঁড়িয়ে, আগন্তুককে দেখে তার চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

পরিচারিকা ত্রস্তপদে ঘরে ঢুকে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, আমার বাধা না মেনে এ ভদ্রলোক জোর করে ওপরে উঠে এসেছেন।

লিন্ডসে হোপ নিজেকে সংযত করে গম্ভীর গলায় বলেন, ঠিক আছে, তুমি যাও, আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি।

পরিচারিকা দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাইরে চলে আসে। তারপর সে রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল। এ ঘরে লিন্ডসে হোপও আগন্তুকের মধ্যে কি কথা হয় সে জানে না। প্রায় আধঘণ্টা বাদে হঠাৎ তার মনে হয় যেন বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেল। পর পর তিনটে গুলী ছোঁড়ার শব্দ। পরিচারিকা ভীত হয়ে পড়ে। হাতের কাজ রেখে দিয়ে ভয়ে ভয়ে সে বাইরের ড্রইং রুমের দিকে এগিয়ে যায়। সে জানত লিন্ডসে হোপ প্রচণ্ড বদরাগী লোক, হয়ত আগন্তুকের এ অনধিকার প্রবেশ তিনি সহ্য করতে পারেননি। ওঁর আলমারিতে যে সব সময় রিভলবার থাকত তাও পরিচারিকার জানা ছিল। অজানা আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে ওঠে।

কিন্তু ঘরের কাছে এসে সে দেখে দরজা খোলা, অতি সন্তর্পণে ভেতরে ঢোকে। একটু এগিয়েই বুঝতে পারে, কোচের ওপর লিন্ডসে হোপ অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন, ঘরে আর কেউ নেই। আগন্তুক পালিয়েছে। সোফার কাছে গিয়ে প্রভুর রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে সভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। ছুটে গিয়ে টেলিফোনে পুলিসকে খবর দেয়।

খবরের শেষে জানান হয়েছে পুলিসের তদন্ত চলছে, এবং তারা মনে করে খুব শিগগির হত্যাকারীকে খুঁজে বার করতে পারবে।

সৌরেন লন্ডনে এসে থেকে, প্রায়ই কাগজে পড়েছে কোন না কোন হত্যাকাণ্ডর কথা। খুন, রাহাজানি, ডাকাতির লোমহর্ষক বিবরণী যে খবরের কাগজ যত বেশী দিতে পারে তার বিক্রি ও দেশে তত বেশী। লন্ডনে পকেটমার ছিঁচকে চোর এসব নেই সত্যি কথা, কিন্তু নৃশংস হত্যাকাণ্ড প্রায়ই ঘটে থাকে। অবশ্য পুলিসও খুব তৎপর, অপরাধী ধরা পড়ে, তার সাজা হয়।

আগে সৌরেনের মনে হতো এইসব উত্তেজনাপূর্ণ খবরগুলো আদৌ সত্যি-কারের ঘটনা কি না। কাগজ বিক্রির ফন্দি করে কাগজওয়ালারা হয়ত এইসব গল্প বানিয়ে লেখে। কিন্তু লিন্ডসে হোপের

হত্যাকাণ্ডের কথা পড়ে সে ভুল তার ভেঙে গেল। রক্তমাংসের এ মানুষটাকে সে চিনত, তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, শুধু তাই নয়, এলিজাবেথের সে কাকা। মানুষটা আজ খুন হয়েছে, কারণ এখনও জানা যায়নি। তার জীবনের সঙ্গে কি রহস্য জড়িয়ে আছে কে বলতে পারে।

এ হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছে এলিজাবেথের কথা। বড় সহজ সরল মেয়ে, কাকার সঙ্গে তাদের বাড়ির মিলন ঘটতে যাচ্ছে ভেবে কত আনন্দই না সে পেয়েছিল। অথচ এরই মধ্যে এ কি দুর্ঘটনা ঘটে গেল। শুধু তাই নয়, এলিজাবেথদের বাড়ির সকলকেই বোধ হয় পুলিস জেরা করবে। জানতে চাইবে তাদের পারিবারিক মনোমালিন্যের কথা, হয়ত কাগজে সেসব বিবরণী প্রকাশ পাবে। মনে মনে সৌরেন এলিজাবেথের জন্যে বড় বিচলিত হয়ে পড়ল।

পরের দিন ভোর বেলা তার দরজায় টোকা পড়তে ধড়মড় করে উঠে পড়ল সৌরেন। ড্রেসিং গাউনটা গায় দিয়ে ঘুম-ভরা চোখে দরজা খুলে দিল। সামনে দাঁড়িয়ে এলিজাবেথ।

এলিজাবেথের মুখ শুকনো, বড় ক্লান্ত হাসি। সৌরেন জিজ্ঞেস করল, তুমি কখন এলে লিজি?

—এখুনি। একটু থেমে প্রশ্ন করে, কাকার খবর তো শুনেছ?

সৌরেন ছোট্ট উত্তর দেয়, হ্যাঁ, কাগজে পড়লাম।

—শুনেলাম পুলিসও এসেছিল।

—কে বললে তোমায়?

—মিসেস হেরিং। একটু বাদেই আমি যাব পুলিসে রিপোর্ট করতে। একটু ইতস্তত করে এলিজাবেথ বলে, যদি তোমার সময় থাকে আমার সঙ্গে যাবে?

সৌরেন জোর দিয়ে বলে, নিশ্চয় যাব।

এলিজাবেথ অনামনস্ক সুরে বলে, কেন জানি না আমার বড় ভয় করছে।

সৌরেন এলিজাবেথকে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে আসে, চেয়ারে বসায়, ভরসা দিয়ে বলে, এতে তোমার কি করবার আছে? পুলিস যা প্রশ্ন করবে তুমি তার সত্যি উত্তর দেবে। এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক?

—ঠিক তা নয় সৌরেন, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল এলিজাবেথ, হাজার হোক লিণ্ডসে হোপ আমার কাকা, যদি তদন্তের ফলে তার জীবনের—

এলিজাবেথ থেমে যায়।

সৌরেন বলে, আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারছি লিজি। আমার মনে হয় না এ নিয়ে এত কিছু ভাববার আছে।

এলিজাবেথ অন্য কথা ভাবছিল, বলল, কাকার সঙ্গে কথা হয়েছিল অন্তত তিনদিন উনি গ্রামের বাড়িতে আমাদের সঙ্গে কাটাবেন। কিন্তু চার পাঁচ ঘণ্টার বেশী থাকতে পারেননি। বললেন, তাঁর খুব বেশী কাজ। লণ্ডনে ফিরে যেতে হবে। তখনই ওঁর চেহারা দেখে মনে হয়েছিল উনি খুব বেশী চিন্তিত কোন বিষয় নিয়ে। আমি জিজ্ঞেসও করেছিলাম, কোন উত্তর দিলেন না।

সৌরেন প্রশ্ন করে, তোমার বাবা, কাকার প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলেন?

—রাজী ঠিক হননি, তবে আগের থেকে নরম হয়েছিলেন অনেকটা। কথা ছিল দিন পনের বাদে বাবা লণ্ডনে আসবেন, তারপর ঠিক হবে আমরা কাকার ব্যবসায় যোগ দেব কিনা।

একটু থেমে এলিজাবেথ নিজের মনেই বলে, এক সময় নিজেকে বড় 'আনলাকী' মনে হয়।

—কেন?

—কিছুই করতে পারলাম না, যাও বা কাকার সঙ্গে একটা যোগাযোগ হল, তাও কি রকম নষ্ট হয়ে গেল। এসবের মধ্যে আমার না যাওয়াই উচিত ছিল।

সৌরেন গম্ভীর স্বরে বলে, এ ধরনের সেণ্টিমেণ্টাল কথা তোমার মুখে শুনব আশা করিনি লিজি। জীবনে যা ঘটবার, তা ঘটবেই, তুমি আমি তার কি করতে পারি। আমি তোমায় বলছি মাথা ঠাণ্ডা করে থাক, সব ঠিক হয়ে যাবে। ত ছাড়া আমি তো তোমার পাশে রয়েছি।

এলিজাবেথ সৌরেনের হাতটা আঁকড়ে ধরে, সত্যি সৌরেন, লণ্ডনে আসার পথে সারা ট্রেন আমি শুধু তোমার কথাই ভেবেছি। তুমি না থাকলে আমি বোধ হয় ভরসা করে এই বিপদের কথা জেনেও একলা এখানে আসতে পারতাম না।

সৌরেন গাঢ় চুম্বন এঁকে দিল এলিজাবেথের কপালে। বলল, সুইট লিজি,

আমিও তো এ ক'দিন শুধু তোমার কথাই ভেবেছি।

এলিজাবেথের চোখে জল এসে পড়েছিল, সামলে নিয়ে বলল, চল এবার তৈরি হয়ে নেওয়া যাক।

—আমি মিসেস হেরিংকে বলছি, দুজনের ব্রেকফাস্ট আমার ঘরেই দিয়ে দেবার জন্যে।

এর পর থেকে ক'দিন ধরে সৌরেন এলিজাবেথকে নিয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গায়। হয়তো পুলিস স্টেশনে, কখনও বা তাদের নির্দেশ মত লিন্ডসে ফ্যাশান হাউসে, দু-একটি কর্মচারিণীকে সনাক্ত করার জন্যে, এমন কি একবার লিন্ডসে হোপের মে ফেয়ারের ফ্ল্যাটেও তাদের যেতে হয়েছিল। পুলিসকে সব রকম সাহায্য করার চেষ্টা করেছে এলিজাবেথ, কিন্তু সব সময় তার মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভাব ছিল, কিসের যেন আশংকা। সাহসে ভর দিয়ে ইনস্পেক্টারদের সঙ্গে কথা বলে বাইরে বেরিয়ে এসে নিজেকে সে বড় অসহায় বোধ করত। পরামর্শ চাইত সৌরেনের কাছে।

সৌরেন এলিজাবেথকে দেখছে অনেকদিন ধরে, তাদের মধ্যে বন্ধুত্বও যথেষ্ট। কিন্তু এই আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন না হলে সৌরেন বোধ হয় এলিজাবেথকে এত গভীরভাবে চিনতে পারত না। এতদিন এলিজাবেথকে সে জানত সহজ আর সরল মেয়ে বলে, কিন্তু সংসারের তিক্ততার সামনে সে যে এতখানি দুর্বল তা সে বুঝতে পারেনি। অসহায়া কিশোরীর মত একমাত্র অবলম্বন হিসেবে সৌরেনকে সে যে সারাক্ষণ আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় তা বুঝতে পেরে সৌরেন শুধু তাকে কাছেই টেনে নিল না, তার সব দায়িত্বকে স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধের উপর টেনে নিল। কিন্তু সৌরেনের কোন সময় মনে হয়নি এ কর্তব্যের ভার সিন্ধুবাদ নাবিকের ঘাড়ে চড়া বৃদ্ধের মত বোঝা হয়ে তার কাঁধের উপর চেপে বসেছে। বরং এলিজাবেথকে সব সময় উৎসাহ দিয়ে তার মনে নতুন করে ভরসা জাগিয়ে সে অনাবিল আনন্দ পেয়েছে।

শুধু এলিজাবেথকে বুঝতে পারাই নয় আর একটা সত্য সৌরেন উপলব্ধি করেছে এই ক'দিনে। রজত আর তার সঙ্গীদের সঙ্গে মিশে যে নতুন ধরনের চিন্তাধারার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল তা যেন ক্রমে দূরে সরে গেল। সৌরেনের মনে হল রজতদের ফিলসফি তর্ক করার জন্যে ভাল, কিন্তু তাকে কাজে লাগানো যায় না। হয়ত ওমর খৈয়ামী ধরনে বলা সহজ 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক', কিন্তু জীবনের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে এ কথা বলতে পারে তারাই যারা কাপুরুষ। আজ তার ওপর যে এলিজাবেথের প্রগাঢ় বিশ্বাস, যে নিশ্চিন্ত নির্ভরতা, তাকে সে

অস্বীকার করবে কোন মুখে? রজতদের মত নিজের ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা ভেবে সে যদি এলিজাবেথের দায়িত্ব গ্রহণ করতে না চাইত তবে কি জীবনের বেচাকেনায় তার ক্ষতির অঙ্কটাই বেশী হত না?

প্রথম দিকের উত্তেজনা কেটে যাবার পর লিন্ডসে হত্যাকাণ্ডের চাঞ্চল্য যখন অনেকখানি সহজ হয়ে গেল সকলের কাছে, তখন সৌরেন আর এলিজাবেথ দুজনে উপলব্ধি করল বিপদের সমুদ্র তাদের দুজনকে সংসারের নিশ্চিন্ত তীরে একত্রিত করে দিয়ে অনেকখানি দূরে সরে গেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তারা বাঁচল। স্বপ্ন দেখল ঘর বাঁধার।

সৌরেন বলল, আশ্চর্য লাগছে লিজি ভাবতে যে এতদিন আমরা ছেলেমানুষি নিয়ে মেতে ছিলাম, মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে নিজেদের আমরা বুঝতে পেরেছি, তাই না?

এলিজাবেথ স্মিতহাস্যে উত্তর দিয়েছে, আমি কিন্তু গোড়া থেকেই জানতাম, সব সময় তোমাকে কাছে পাব। তোমার চোখ

দেখেই মনে হয়েছিল আমি তোমার উপর নির্ভর করতে পারি; যা আমি পারি না আমাদের দেশের ছেলেদের উপর।

—এ কথা কেন বলছ?

—কেন জানি না আমার মনে হয় এদেশের ছেলেরা সংসার পাততে চায় না। তাদেরও দোষ দিতে পারি না। এর জন্যে দায়ী বোধ হয় মহাযুদ্ধ। যার ফলে যা কিছু ভাল ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু নতুন কিছু আর গড়া যায় না।

সৌরেন চুপ করে কথাগুলো শুনছিল, বলল, আমরা, ভারতবাসীরা কিন্তু মনেপ্রাণে যুদ্ধকে ঘৃণা করি।

এলিজাবেথ তাড়াতাড়ি বলে, সেইজন্যেই তো আমি ভারতীয়দের শ্রদ্ধা করি।

সৌরেন এলিজাবেথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, এক সময় প্রশ্ন করে, ঠিক বুঝতে পারি না কলকাতায় গিয়ে তুমি থাকতে পারবে কিনা।

—কেন পারব না?

—এক এখানকার মত ব্যবস্থা তো আমাদের দেশে নেই, তা ছাড়া জীবনটাও অন্য ধরনের।

এলিজাবেথ হাসে, এ কথা সত্যি, তোমাদের সঙ্গে কথা বলে তোমাদের দেশের একটা পুরো ছবি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ কেউই পরিষ্কার করে বল না। তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে বহু ভারতীয়কে কলকাতার কথা জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রত্যেকেই এক এক রকম বলে, দুজনের কথার মধ্যে মিল খুঁজে পাই না।

—এ তুমি বাড়িয়ে বলছ।

—সত্যি বলছি সৌরেন, আজ তুমি বললে কলকাতায় থাকতে আমার অসুবিধে হবে, অথচ সরোজদাকে আমি একদিন ঐ কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, উনি বলেছিলেন, কলকাতায় আমি অনেক স্বচ্ছন্দে থাকতে পারব। এখন কার কথাটা আমি অবিশ্বাস করব বল?

সৌরেন ইচ্ছে করে ঘুরিয়ে উত্তর দিল, ও তর্কে এখন লাভ নেই, আমার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে নিজের চোখে দেখে বিচার করো কার কথাটা ঠিক। অবশ্য আমায় তখন দোষ দিলে শুনব না।

এলিজাবেথ উঠে এসে সৌরেনের পাশে বসল, আমি জানি, তোমাকে দোষ দেবার কোন সুযোগ পাব না আমি।

—কি করে জানলে?

—ডোরিয়ার কাছ থেকে যে আমি চিঠি পাই।

—তাই নাকি, কই তুমি তো আমায় আগে বলনি।

এলিজাবেথ ব্যাগের মধ্যে থেকে চিঠি বার করতে করতে বলে, ডোরিয়া যখন লণ্ডন থেকে যায় আমি ওকে বিশেষ করে অনুরোধ করেছিলাম, ভারত কি রকম লাগছে, সে কথা আমাকে জানাতে। প্রথম চিঠি ও লেখে জাহাজ থেকে, সবে তখন 'রেড সী'তে ঢুকেছে, লিখেছিল বেজায় গরম। ভারতও যদি এই রকম গরম হয়, তা হলে ওখানে থাকা কষ্টকর হবে। দ্বিতীয় চিঠি ও লেখে কলকাতায় পৌঁছে, পথে বম্বে শহরে হোটেলে থেকে খুব খুশী হয়েছিল ডোরিয়া, মুগ্ধ হয়েছিল সে জিৎএর ভারতীয় বন্ধুদের আতিথেয়তায়। কলকাতায় পৌঁছে জিৎএর পরিবারে পরিচিত হয়ে সে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছে। বিশেষ করে লিখেছিল জিৎএর বাবা মার কথা। তাদের মনের মধ্যে কোনরকম সংকীর্ণতা সে দেখতে পায়নি। অবশ্য শহরের কয়েকটা জিনিস তার অস্বাস্থ্যকর বলে মনে হয়েছে, কিন্তু সেগুলোর উপর বিশেষ গুরুত্ব সে দেয়নি।

সৌরেন খুশী হয়ে বলল, যাক, ডোরিয়া যে কলকাতায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে জেনে বড় ভাল লাগল। জিৎএর কোন চাকরি হয়েছে কিনা লিখেছে?

—না, এখনও হয়নি। তবে জিৎ কয়েক জায়গায় ইণ্টারভিউ দিয়েছে।

এলিজাবেথ এবার নিজের মনে হাসে, হাতের চিঠিটা দেখিয়ে বলে, এই হলো ডোরিয়ার তৃতীয় চিঠি। একটা জায়গা তোমায় পড়ে শোনাই, বড় মজা করে লিখেছে। এলিজাবেথ পড়তে শুরু করে,

...সত্যি লিজি, এখন তুমি আমাকে দেখলে চিনতে পারবে না। পুরোপুরি আমি হিন্দু ঘরের বউ। খুব গুছিয়ে শাড়ি পরতে শিখেছি। আগের মত আর পিন দিয়ে আটকে রাখতে হয় না। যেদিন এ বাড়ির মেয়ে নাপিত এসে আমার পায়ে লাল রঙের একটা বর্ডার দিয়ে দেয়, দেখতে বড় মজার লাগে। এ বাড়ির মেয়েরা বলে আমার পায়ে রঙ লাগালে খুব সুন্দর মানায়। জান লিজি, আমি আর চুল খুলে থাকি না, সারাক্ষণ খোঁপা বেঁধে রাখি, সকাল থেকে সন্ধ্যে নিজের আত্মীয়স্বজনেরা আমায় দেখতে আসে, আবার পাড়ার বন্ধুবান্ধবরাও। এরা সকলেই সাজপোশাকের প্রশংসা করে, এক এক সময় নিজেকে রানীর মত ভাগ্যবতী বলে মনে হয়। গুরুজনের প্রশংসাধন্য হব তা কি আগে কখনও আমি ভাবতে পেরেছিলাম?

এলিজাবেথ এই পর্যন্ত পড়ে বলল, আমি বুঝতে পারছি, ডোরিয়া সত্যিই সুখী হয়েছে।

সৌরেন মৃদু হেসে বলে, ডোরিয়ার ঐ চেহারা দেখে যদি সবাই রানী ভেবে থাকে তা হলে তো তোমাকে দেখলে নিশ্চয় অপ্সরী ভাববে।

এলিজাবেথ সকৌতুকে বলল, ঠাট্টা কর[ছ] বুঝি।

সৌরেন তার হাতের উপর চাপ দি[য়ে] মৃদুস্বরে বলে, তোমার মত সুন্দরী মে[য়ে] এ দেশেও যে বিরল। সে কথা তুমিও জে[...]

বেশ ভাল করেই জান। তোমার পাশে আমাকে দেখলে বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলে, বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার।

—আঃ সৌরেন, তুমি ভারী দুষ্টু।

সৌরেন হেসে বলল, অনেকদিন বাদে আজ তোমাকে আগের মত স্বাভাবিক মনে হচ্ছে লিজি, চল বেড়িয়ে আসি।

—কোথায়?

সৌরেন ভেবে নিয়ে বলে, চল না, সরোজদার ফ্ল্যাটে গিয়ে নক করি। অনেকদিন দেখা হয়নি। যদি বাড়িতে থাকে গল্প করা যাবে।

এলিজাবেথ উৎসাহ প্রকাশ করে, বেশ, তাই চল। আমি এখনি তৈরি হয়ে আসছি।

সৌরেনরা 'সুইস কটেজের' ফ্ল্যাটে গিয়ে পৌঁছল সন্ধ্যার একটু আগেই। তখনও রাস্তায় আলো জ্বলে ওঠেনি, দিনের আলো তখনও যাই যাই করেও যেন যায়নি।

দরজা খুলল অমিতাভ, চোখে মুখে তার খুশিতে উপচে পড়া হাসি। দেখে মনে হল এতক্ষণ কোন হাসির গল্পে মেতে ছিল, ঘণ্টির শব্দ শুনে দরজা খোলার জন্য ছুটে এসেছে।

সৌরেনদের দেখে আনন্দে সে চেঁচিয়ে উঠল। সৌরীদা, কতদিন বাদে তুমি এলে —মিস হোপ, তুমিও আমাদের ভুলে গেছ। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভেতরে এসো।

ভেতরে ঢুকে সৌরেন জিগ্যেস করে, সরোজদা কোথায়?

সে কথার উত্তর না দিয়ে অমিতাভ চেঁচিয়ে ডাকে সরোজদা, দেখে যান কারা এসেছে।

সরোজও চেঁচিয়ে উত্তর দিল, এ ঘরে নিয়ে আয়।

বাইরের ঘরে সরোজ আর লীলা কার্পেটের উপর বসে ছুরি দিয়ে ফলের খোসা ছাড়াচ্ছিল। সৌরেনদের দেখে সহাস্যে অভ্যর্থনা করলো।

এলিজাবেথ থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার, বিকেলের চা পর্বের আয়োজন চলছে নাকি?

উত্তর দিল লীলা। রাতের জন্য ফ্রুট সালাড করা হচ্ছে।

—আজ কোন বিশেষ অনুষ্ঠান নেই তো?

—সে রকম কিছু নয়, তবে প্রমীলা আসছে সন্ধ্যার ট্রেনে এখানে উইকেন্ড কাটাতে।

সৌরেন সোৎসাহে বলে, তাই নাকি? কখন আসছে প্রমীলা? খুব ভালো হয়েছে আজকে এসে পড়ে। ওর সংগেও দেখা হয়ে যাবে।

এতক্ষণে কথা বলল সরোজ, শুধু দেখাই হবে না সৌরেন এক সংগে বসে ডিনারও খাবে।

সৌরেন বাধা দিয়ে বলে, না না, তা হয় না, আমরা রবাহূতের মত খেতে বসে গেলে—

—থাক তোমাকে আর পাকামি করতে হবে না। যা বলছি কর, কাজে লেগে পড়।

এ ঠিক সেই আগের সরোজদা, কর্তৃত্ব করা যেন তাকেই মানায় সবচেয়ে বেশী। গম্ভীর গলায় বলে, অমিত, তুই বাজারে যা, কয়েকটা জিনিস কিনে আনা দরকার। এলিজাবেথ তুমি লীলাকে সাহায্য কর, একেবারে এ ক্লাশ ফ্রুট সালাড হওয়া চাই। সৌরেন, বাসনপত্রগুলো মেজে ফেল।

সৌরেন হাসতে হাসতে বলে, ও তো আমার বাঁধা কাজ।

—আমি মাংস চড়িয়ে দিচ্ছি।

লীলা ব্যস্ততা দেখিয়ে বলে, দোহাই আপনার, সরোজদা। মাংসের স্বাদ তৈরি করতে গিয়ে একশো গুঁড়ো লংকা ছেড়ে দেবেন না। তা হলে আর বেচারী এলিজাবেথ মুখে দিতে পারবে না।

সরোজ তাকেও থামিয়ে দেয়। থাক, তোমাকে আর ফোড়ন কাটতে হবে না। যে যার হাত চালিয়ে কাজ কর। সব কিছু যাতে আটটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। ৯টার সময় স্টেশনে যেতে হবে প্রমীলাকে আনবার জন্যে।
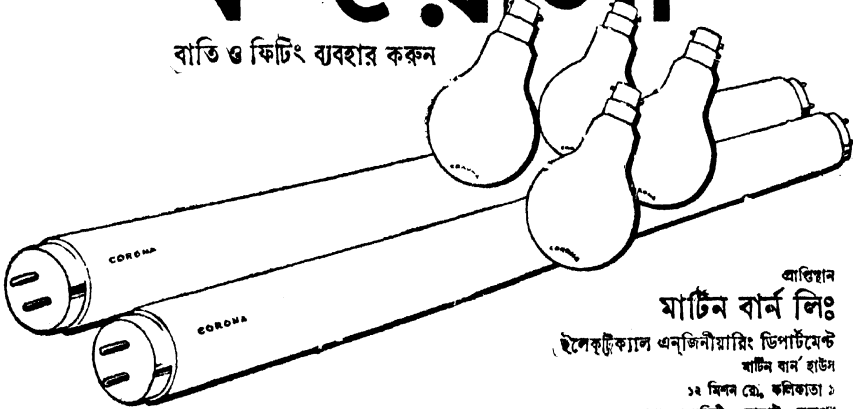
কিছুক্ষণের মধ্যে সুইস কটেজের ফ্ল্যাটে আবার সেই আগের মত হই হই শুরু হয়ে গেল। কে বলবে অনেকদিন বাদে আজ তারা মিলিত হয়েছে সরোজের বাসায়। আগের মত সেই হাসি ঠাট্টা গল্প গুজব।

সরোজ রান্না করতে করতে গান করছে

গন্ গন্ করে। সোরেন ডিশ ধুতে ধুতে তাল দেবার চেষ্টা করছিল।

লীলা পাশের ঘর থেকে হুঁশিয়ার করে দিল দেখো সোরেন সংগীত-প্রীতি দেখাতে গিয়ে ডিশ ভেঙ্গে ফেলো না, গেরস্তর ক্ষতি হব।

সোরেন হেসে উত্তর দিল, আমার সে খেয়াল আছে, ভয় তোমাদের নিয়ে, দেখো মেয়েলী গল্প করতে করতে একবারের জায়গায় তিনবার নুন দিয়ে ফেলো না ফ্রুট স্যালাডে, তা হলে আর মুখে দেওয়া যাবে না,

অমিতাভ বাজার করে ফিরলো আধঘণ্টার মধ্যে, হাঁপাতে হাঁপাতে সে এসেছে, অথচ একটা জিনিসও ভোলেনি। ফর্দ মিলিয়ে বাজার করেছে।

সরোজ চেঁচিয়ে বলল, ফুল মার্কস ফর অমিতাভ।

সঙ্গে সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলল সোরেন, হিপ হিপ হুররে।

ওদের চেঁচামেচির ধরনে হেসে উঠল সকলে।

এলিজাবেথ এক সময় মৃদুস্বরে বলল, তুমি হয়তো জানো না লীলা, এতদিন বড় দুশ্চিন্তার মধ্যে আমার দিন কেটেছে, আজ এখানে এসে খুব ভালো লাগছে,

লীলা বলল, তোমরা এসেছো বলেই এত জমেছে আজ। নইলে আমাদের চুপচাপই কাটে।

—ঠিক মনে হচ্ছে সেই 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের রিহার্সালের সময় যে রকম আমরা আনন্দ করতাম, আজও যেন সেই রকম আনন্দ করছি।

লীলা অন্যমনস্ক সুরে বলে, সত্যি, সেই সুখের দিনগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

—আবার একটা উৎসবের আয়োজন করলে হয়।

এলিজাবেথের কথায় ছেলেমানুষী সুর, সে যে কিছু ভেবে কথাটা বলেছে তা বলে মনে হয় না। শুনে লীলা না হেসে পারলো না। সরোজকে উদ্দেশ্য করে বলল, শুনেছেন এলিজাবেথ কী বলছে?

—কি? সরোজ মুখ তুলে তাকালো।

—আবার কোন নাটকের রিহার্সাল শুরু করতে।

সরোজও হাসলো, নাটক? কী উপলক্ষ্যে?

উত্তর দিল অমিতাভ, সে একটা উপলক্ষ্য খুঁজে বার করলেই হবে। আমি কিন্তু এলিজাবেথকে পূর্ণ সমর্থন করছি। একটা কিছু করা দরকার, বড্ড যেন কি রকম মিইয়ে গেছি আমরা।

বেশ কিছুক্ষণ এই নিয়ে পরামর্শ চলল, দেখা গেল সত্যিই বলা বলতে কি কারুরই বিশেষ অমত নেই। কোন একটা অনুষ্ঠান হলে মনে মনে সকলেই খুশী হয়।

শুধু সরোজ আপত্তি তুলে বলে, ভাঙ্গা হাটে আর কী আসর জমবে?

সমবেতভাবে সকলে উত্তর দেয়, নিশ্চয় জমবে। আজ প্রমীলা এলে ওকে বলা যাক, মনে হয় প্রত্যেক উইকেন্ডে প্রমীলাও রিহার্সাল দিতে পারবে।

তা হলে অবশ্য আমার আপত্তি নেই।

সঙ্গে সঙ্গে সোরেন সোচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল, থ্রি চিয়ার্স ফর সরোজদা। অন্যরাও সাড়া দিয়ে বলে, হিপ হিপ হুররে।

শুধু উচ্ছ্বাসই নয়, সবাই মিলে আলোচনা শুরু করে দিল, কী ধরনের অনুষ্ঠান করা উচিত, যাতে পরিশ্রম বেশী হবে না অথচ বেশ হইচই করা যাবে। বাইরে কোন হল ভাড়া নিয়ে খরচা বাড়িয়ে লাভ নেই, তার চেয়ে কারুর বাড়িতেই ঘরোয়াভাবে আয়োজন করা ভাল। বেশী বাইরের লোক না ডেকে, চেনাশোনার মধ্যে থেকে শিল্পী নির্বাচন করতে হবে।

এ আলোচনা হয়তো চলতো অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু হঠাৎ একটা টেলিফোন আসায় তা বন্ধ হয়ে গেল।

টেলিফোন এসেছিল কার্ডিফ থেকে।

সরোজ ইঙ্গিতে অন্যদের চুপ করিয়ে স্পষ্ট গলায় বলল, হ্যাঁ, আমি সরোজ রায় কথা বলছি। হ্যাঁ, বলুন। কার মেসেজ? ও মিস চৌধুরী আজ আসতে পারবেন না? কি হয়েছে ওঁর? ভাবনার কিছু নেই তো ঠিক আছে, মিস চৌধুরীকে বলবেন আমরা চিঠি দেব। খবর দেওয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।

সরোজ আস্তে আস্তে রিসিভার নামিয়ে রাখলো।

তার চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে লীলা উদ্বিগ্ন স্বরে জিগ্যেস করলো, কী হয়েছে প্রমীলার?

সরোজ গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, প্রমীলার জ্বর হয়েছে। ও ভেবেছিলো লন্ডনে আসতে পারবে, তাই আগে কোন খবর দেয়নি, কিন্তু ডাক্তার শেষ পর্যন্ত বারণ করেছে। ওর হোস্টেল থেকে মেসেজ দিল।

—ভয়ের কিছু নেই?

—বললো তো না। সামান্য জ্বর, সামনের সপ্তাহে লন্ডনে ঠিকই আসতে পারবে।

নিমেষের মধ্যে কলরব থেমে গেল। যে আনন্দস্রোত জোয়ারের তেজে ক্রমশ স্ফীত হয়ে উঠছিল, হঠাৎ যেন তাতে ভাঁটা পড়লো। যে গৃহে সারি সারি প্রদীপের আলোর ঝলমল করে জ্বলছিল, হঠাৎ যেন দমকা ঝড়ের ফলে তা অন্ধকারের গহ্বরে তলিয়ে গেল।

অনেক দূর থেকে যেন ক্লান্ত স্বর ভেসে এলো সরোজের। আর রাত বাড়িয়ে কি হবে? রান্না তো হয়েই গেছে, যে যার খেয়ে নাও।

একবারও কেউ উত্তর দিল না। সবাই চুপ করে বসে থাকে।

(ক্রমশ)

কার হৃদয়ে কি আছে

সুধাংশু ঘোষাল

কার হৃদয়ে কি আছে তা বলা শক্ত বৈকি! কারণ অমুকের হৃদয় আর তমুকের হৃদয় তো আর এক নয়। 'হৃদয় আসন শূন্যে' থাকলেও সেখানে ঢোকবার ছাড়পত্র পেতে কত সাধ্য-সাধনা। দুনিয়ার বড়ো দিলদরিয়া লোক পর্যন্ত বলতে পারবে না, কার দিলের সঙ্গে কার মিল, কার গরমিল। কার হৃদয়ে কে বাসা বেঁধেছে, কার দিল নিয়ে কে দিল্লিকা লাড্ডু খেয়েছে, কার হৃদয়ের কাকের ডিম ফেলে দিয়ে কোকিলের ডিম রেখে গেছে কে, এ ধরনের পাঁচমিশেলী আলোচনার আদি অন্ত নেই। এসব মন-জানানো হৃদয়-ঝাঁপানো খবর কফি হাউস, ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিন ছাড়িয়ে সেই আটচালার মাঠে পর্যন্ত পৌঁছেছে। নীরবে গোপনে মাধবীকুঞ্জে, নদীর তীরে বা সাগরসৈকতে অহরহ কত হৃদয় সংযোজন আর হৃদয় যাচাই। চিরকালের সাহিত্যের দরবারে হৃদয় নিয়ে কত উপন্যাস আর কাব্য। নায়ক-নায়িকার মিলন, আর 'তারপর দুটি বক্ষে বক্ষে স্পন্দন বিনিময়', ব্রাউনিং-এর নৈশ অভিযানের ভাষায় 'the two hearts beating each to each,' কবি লিখেছেন, হৃদয়ে হৃদয় যোগ করা পৃথিবীর চিরন্তন চিরনূতন সুর। বলা বাহুল্য, হৃদয়দ্বারে ঘা দিতে হলে কোন সাজসজ্জা, প্রসাধন এমন কি আটপৌরে গৌরচন্দ্রিকাও অনাবশ্যক। কবির ভাষায়, 'অলকে কুসুম না দিয়ো, শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো। কাজলবিহীন সজল নয়নে হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ো।' বিনা ভূমিকায় আসতেও কোনও দোষ নেই। 'শুধু হাসিখানি আঁখিকোণে হানি উতলা হৃদয় ধাঁধিয়ো।' তাই কোন সাজসরঞ্জাম না নিয়ে, চোখের সামনে যাকে পাই তার হৃদয়টা একটু বাজিয়ে নিয়ে হৃদয়ের প্রতিস্পন্দন প্রতিরহস্যের ছোঁয়াচটুকু অনুভব করা যাক।

সকলেই জানেন, এককোষী প্রাণী অ্যামিবার দেহে নাক, কান, চোখ মায় হৃদয় পর্যন্তও নেই। তাই বেচারা হৃদয়হীন প্রাণীগুলোর শাপে বর। হৃদয় নেই, বেশ নির্ঝঞ্ঝাট। কোন দরদী, মরমী, শরমী এদের হৃদয় নিয়ে পুকুর চুরি করার ফন্দি আঁটতে পারবে না। দরজার পাশ হতে বাঁকা চোখের চাহনি হতে এদের নিষ্কৃতি। হৃদয়ের সওগাত, লোক জানাজানি, মন কষাকষির বালাই নেই এদের।

অ্যামিবা ও নিম্নস্তরের প্রাণী ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর হৃদয় আছে। অনেকের কারণ যাদের হৃদয় আছে, তাদের হৃদয় সাধারণতঃ একটি। কেউ যদি তানসেন পিল খাইয়ে অথবা দিলে ঢিল মেরে একটা হৃদয় হতে হাজারটা হৃদয় করে দিতো, তবে অবস্থাটা কি হতো ভাবুন দেখি। হৃদয়-রাজত্বে নিশ্চয়ই রামরাজত্ব হয়ে যেতো। একহৃদয়ীদের কাছ থেকে যাঁরা no vacancy শুনে ভাঙা মনে ফিরে এসেছেন, তাঁরা সম্ভবত পিঁপড়ে বা

হৃদয় দুয়ারে ঘা দিয়ো

মৌমাছিদের মতো দলে দলে এই বহু-হৃদয়ীদের কাছে ধরনা দিতেন। বহুহৃদয়ী জীবের অস্তিত্ব যে পৃথিবীতে নেই, তা নয়। কেঁচোর হৃদয় হাজারটা নয় বটে, মাত্র দশটা। একদিকে পাঁচটি, অপর দিকে পাঁচটি। শুধু কি তাই! বাম দিকের পাঁচটি হৃদয়, ডান দিকের অনুরূপ পাঁচটি হৃদয়ের সঙ্গে মিলে পাঁচটি বৃত্তাকার মালার সৃষ্টি করেছে। আমাদের অলক্ষ্যে গলার চারপাশে হৃদয়ের মালা জড়িয়ে মালাবদলের কাজটা এরা আগেই সেরে নিয়েছে।
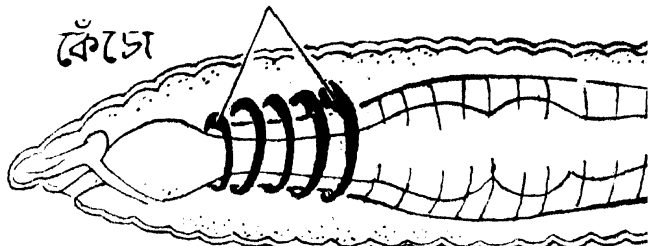
চিংড়ির হৃৎপিণ্ড তিন কোণা বর্শার ফলার মতো। এর সূঁচালো দিকটা সামনের দিকে ফেরানো। হৃদয়ে প্রবেশ করার জন্যে আছে পাঁচ জোড়া দরজা। দরজা মোটেই দরাজ নয়। চোরকুঠুরির দরজার মতো ছোটো। এ দরজা দিয়ে ভেতরে যাওয়া যায়, কিন্তু বাইরে আসা যায় না। রক্ত হৃৎপিণ্ডে ঢোকামাত্র এই দরজা সঙ্কুচনের সময় বন্ধ হয়ে যায়। অন্য 'রক্তনালী' দিয়ে রক্ত দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কেঁচো বা মানুষ বা অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে 'রক্তের মতো লাল' কথাটা সত্যি হলেও, চিংড়ির ক্ষেত্রে তা ডাহা মিথ্যে। অক্সিজেন বয়ে নিয়ে যাবার সময় চিংড়ির রক্ত নীল। পাঠকপাঠিকারা জানেন আমাদের রক্তের লোহিত কণিকার মাঝে আছে এক রঙীন মসলা, হিমোগ্লোবিন। চিংড়ির রক্তে দ্রবীভূত রঙীন মসলা হচ্ছে —হিমোসায়ানিন্। হৃদয়ের মাঝে রঙের হোলি, লাল নীল আরো কত কি, কে জানে? নীল সাগর বা নীল আকাশের মতো এদের হৃদয় কতটা উদার তা আমাদের জানা নেই। চিংড়ির হৃদয়ের সন্ধান পাওয়া নেহাত সোজা কাজ নয়। আমরা জানি বুকের চামড়া কাটলে হৃদয় দেখা যায়। চিংড়ির বেলায় এসব জারিজুরি চলবে না। ভাবছেন বুঝি, কাঁচি দিয়ে বুক কেটে চিংড়ির হৃদয় দেখার কাজটা এক নিমেষে সেরে ফেলবেন। কিন্তু সে গুড়ে বালি। বুক চিরে ফর্দাফাঁই করলেও এদের হৃদয়ের টিকিটা পর্যন্ত দেখতে পাবেন না। পিঠের খোলা আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে পর্দাটি সাবধানে সরিয়ে ফেললেই এদের হৃদয়ের পাত্তা পাবেন।

আসুন, এবারে কোন প্রশস্তহৃদয় প্রাণীর কাছে ঢুঁ মারা যাক। আরশোলাকে সদাশয় বা মহাশয় না বলে 'হৃদয়াশয়' বলাই ভালো। প্রাণীটির হৃদয় দেহের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীজ হবার যোগাড় আর কি! তবুও ভাগ্যিস এমনতরো হয়নি। যদি হতো, তবে হৃদয়ের কিছুটা দেহের বাইরে বেরিয়ে থাকতো; আর এই দুর্দিনের বাজারে খোলা হাটে হৃদয় নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো। দেহের অনুপাতে এদের হৃদয়ের আয়তন (আপনার-আমার তুলনায়) যে অনেক বেশী, তা আরশোলার শত্রু পর্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করবে। হৃদয়ের যায়গার প্রাচুর্য।

হৃদয়ের মালাবদলের কাজ কেঁচোরা গোপনে সেরে নিয়েছে

মাকড়সা। পশ্চাৎ-হৃদয়া
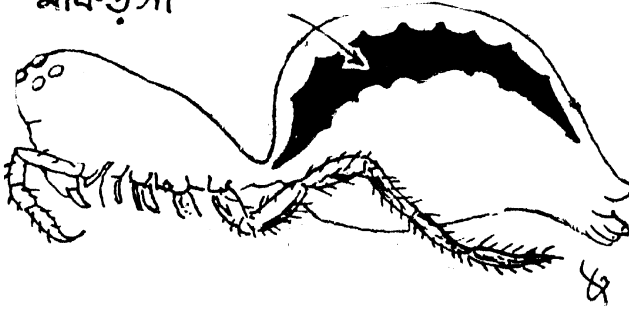
একটা-দুটো নয়, ট্রেনের মতো এদের হৃদয়ে আছে পর পর ১৩টি কামরা। পাশাপাশি কামরার মাঝে দরজা। এক কামরার মজা লুটে নিয়ে অপর কামরায় যেতে হয় এই দরজা দিয়ে। এদের তেরো-কক্ষবিশিষ্ট হৃদয় আছে পিঠে। বলা বাহুল্য অধিকাংশঅমেরুদণ্ডীর হৃদয়ের অবস্থান পিঠে। মাকড়শার হৃদয়ের অবস্থানও শরীরের পিছন দিকে, মুখ হতে দূরে। তাই ভয়ে এদের 'heart in mouth' হবার কোন আশঙ্কা নেই। প্রণয়কার্যের পর স্ত্রীর হাতে পুরুষ মাকড়শার অকালমৃত্যু হয়। মনে হয় প্রণয় উত্তেজনা স্ত্রী চোখমুখ ছাড়িয়ে দেহের পিছনে হৃদয় গিয়ে পৌঁছাতে পারে না।

'মাছের মা' কথাটা শ্লেষজড়িত হলেও মাছেদের হৃদয় মেরুদণ্ডীদের মতো বুকে আছে এবং সব মেরুদণ্ডীর রক্তের রঙও লাল। রুই, কাতলার হৃদয় লুডোর ছক্কার মতো, কি আর একটু বড়ো। আরশোলার মতো হৃদয়সর্বস্ব না হলেও হৃদয়ে উচ্ছ্বাসের কার্পণ্য নেই। পুকুর, খানা, ডোবা হতে সাগরের উন্মত্ত হৃদয়ে জায়গা করে দূর-দূরান্তের সফর করার সাহস রাখে এরা। মাছেদের হৃদয়ে মোটামুটিভাবে দুটি প্রকোষ্ঠ আছে। হৃদয়সংলগ্ন স্ফীত অংশকে প্রকোষ্ঠ হিসাবে ধরা হলেও, এই প্রবন্ধে অলিন্দ ও নিলয়কে প্রকোষ্ঠ হিসাবে ধরা হয়েছে।

অভিব্যক্তিবাদীরা বলেন, জল হতে ডাঙায় অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় সম্পূর্ণ দু ভাগে ভাগ হয়ে যাবার সূত্রপাত হয় (প্রাকৃতিক নির্বাচনের কার্যকারিতায়) যখন সম্পূর্ণভাবে হৃদয় দু ভাগে ভাগ হয়, দূষিত ও বিশুদ্ধ রক্ত মিশে না যাওয়ায় হৃদয়ের উৎকর্ষ অনেক বেড়ে যায়। ব্যাঙের অলিন্দ দুটি, নিলয় একটি। নিলয়ে দূষিত ও বিশুদ্ধ রক্তের মিলন হয়ে যায়। একটি বড়ো ঘর যেমন একটি পার্টিশন দিয়ে ভাগ করা যায়, নিলয়ের মাঝে তাই দেয়াল গাঁথা আরম্ভ হয়। সরীসৃপের হৃদয়ের দেয়াল গাঁথতে গিয়ে অর্ধেক দেয়াল গেঁথে কোন মিস্ত্রী চম্পট দিয়েছে কে জানে। কুমীরের সাথে বিবাদ সাজে না। তাই কুমীর সরীসৃপ হলেও তার নিলয় দু ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ কুমীরের হৃদয়ে চারটি কুঠরী (দুটি অলিন্দ, দুটি নিলয়)। পাখি ও স্তন্যপায়ীর উৎপত্তি সরীসৃপ হতে। কাজেই এদের হৃদয়েও চার কামরা। রক্ত সঞ্চালনের দুটি বর্তনী। শরীরের বিভিন্ন স্থান হতে দূষিত রক্ত হৃদয়ের ডান দিকে জমা হয়। হৃদয়রক্তকে ঠেলে ফুসফুসে পাঠিয়ে দেয় ও তা পরিস্কৃত হয়ে (অক্সিজেন নিয়ে) হৃদয়ের বাম দিকে ফিরে আসে। এখান হতে নানান রক্তবাহী ধমনীর মারফত তা দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, মায় হৃদয় হতে হৃদয়ের পেশী-গুলোতেও রক্ত সঞ্চালিত হয়। পাখি ও স্তন্যপায়ীর ভ্রূণ হতেও বিবর্তনের এই পর্যায়গুলি দেখা যায়।

প্রজননকালে কয়েকটি প্রাণীর হৃদয়ও রঙীন হয়ে ওঠে। ব্যাঙের প্রতি মিলিমিটার রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা প্রায় চার লক্ষ (মানুষের ক্ষেত্রে ৪০—৫০ লক্ষ)। প্রজনন-কালে অনেক রকমের ব্যাঙের লোহিত কণিকার সংখ্যা বেড়ে যেতে দেখা গেছে। বিভিন্ন প্রাণীর হৃদয়ের ওজন (শরীরের ওজনের শতকরা কত ভাগ) ও প্রতি মিনিটে হৃদয়ের স্পন্দন-সংখ্যা নীচে দেওয়া হলো:

	ওজন	হৃৎস্পন্দন
ব্যাঙ	·৫৭	২২
মানুষ	·৪২	৭২
পায়রা	১·৭১	১৩৫
ক্যানারী পাখি	১·৬৮	৫১৪
হামিং বার্ড	২·৩৭	৬১৫

উপরের তালিকা হতে স্পষ্ট দেখা যায় পাখি ও স্তন্যপায়ীদের আকার যত ছোট হয়, প্রায়শ হৃদয়ের ওজন ও স্পন্দন-সংখ্যা ততই বেড়ে যায়। অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর তুলনায় পাখির হৃদয়ের আয়তন যথেষ্ট বেশী। আকাশে উড়ে বেড়াবার জন্য পাখিদের হৃদয় ছাড়া অন্যান্য অঙ্গের ক্ষেত্রে এমন অভিযোজনগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। বলা বাহুল্য পাখির রক্তে হিমোগ্লোবিন আমাদের থেকে মোটেই বেশী নয়। মুলার্ড ও পায়রার প্রতি ১০০ সি সি রক্তে হিমোগ্লোবিন আছে মাত্র ১৫ গ্রাম (আমাদের প্রায় সমান পরিমাণ); কিন্তু পাখির রক্তে শর্করার পরিমাণ আমাদের দ্বিগুণ। মানুষ ও ইঁদুরের রক্তের চাপ কমবেশী যথাক্রমে ১২০ ও ১০৬ (মিলিমিটার পারদ); কিন্তু পায়রা ও মুরগীর ক্ষেত্রে এই সংখ্যা যথাক্রমে ১৪৫ ও ১৮০। শূন্যে বিচরণের পরিপ্রেক্ষিতে পাখির হৃদয়সংশ্লিষ্ট এই অভিযোজনগুলি লক্ষ্য করা উচিত।

গবেষকেরা হাঁস, মুরগী, উভচর ইত্যাদি প্রাণীর ডিম ও ভ্রূণের উপর অনেক ভৌত রাসায়নিক পরীক্ষা করে চলেছেন। হৃদয় দুমড়ে, মুচড়ে, বেঁকিয়ে-চুরিয়ে অনেক অদ্ভুত ফলাফল দেখা যায়। প্রকৃতির ল্যাবরেটরীতেও আকস্মিকভাবে ভ্রূণের অনেক গঠনমূলক বিপর্যয় দেখা যায়। কয়েকটি ক্ষেত্রে হৃদয়ের মাঝের দেয়ালের ছিদ্রপথ বন্ধ হয় না। সংবাদপত্রে একটি নারীর দেহে দুটি হৃদয়ের খবর আমরা পেয়েছিলাম। দুই হৃদয়ের দুই সম্ভাব্য আসন সম্পর্কে কোন রসিকপ্রবর বেশ রসদার মন্তব্য করেছিলেন, শুনেছি। ভয় হয়, দু দিন পরে হয়ত পরীক্ষাগারে একাধিক (?) হৃদয়প্রস্তুতির খবর পাওয়া যাবে। এক হৃদয়ের উক্তিতেই কান ঝালাপালা, 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ।' সেদিন সহস্র-হৃদয়াদের কথা না শুনে করুণ অবস্থার সৃষ্টি হবে, অথবা সহস্রহৃদয়ে সহস্রের ঠাঁই মিলে সুবিধে হবে কিনা তা কল্পনা করা শক্ত বৈকি! বলা যায় না, সেদিন হৃদয়বীক্ষণ যন্ত্র (আবিষ্কার হলেও হতে পারে!) দিয়ে হৃদয়ের ঘটন-অঘটন লক্ষ্য করে, হৃদয়ের অঙ্গন-প্রাঙ্গণে বিচরণ করা যাবে।
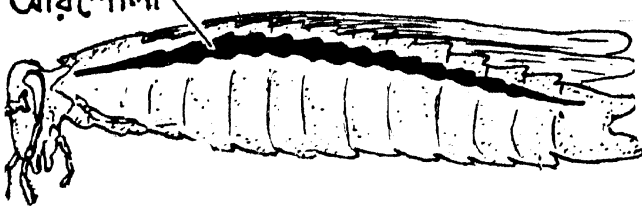
আরশোলার "হৃদয়াশয়"—হৃদয় দেহের বাইরে বেরিয়ে পড়ে আর কি

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৭২)

একতলার বৈঠকখানা ঘরে নির্মল পালিত তখন কাগজপত্র ছড়িয়ে মা-মণিকে বলছিল—নিজের চোখে আপনি সমস্ত দেখে নিন্—নিজের প্রপার্টি নিজের চোখে দেখাই ভালো মা-মণি—

মা-মণি বললেন—আমার কি পোড়া চোখ আছে যে আমি দেখবো বাবা, ও-সব আমায় দেখাচ্ছো কেন? আমি ও-সব কী-ই বা বুঝি?

নির্মল বললে—কিছু বুঝতে যে আপনাকে হবেই মা-মণি! আপনার প্রপার্টি আপনি না বুঝে নিলে বুঝবে কে?

—না বাবা আমার ও-সব বুঝে দরকার নেই। আর আমিই যদি অত বুঝতে পারবো তো তুমি আছো কী করতে? আর আমার কি মনের ঠিক আছে বাবা। আমার মন যে পড়ে রয়েছে অন্য জায়গায়—

—অন্য জায়গায়? কোথায়?

মা-মণি বললেন—সেই যে ছোক্‌রা ওপরে ছেলের কাছে গেল, সে তো এখনও ফিরলো না! কানে কী ফুস্-মন্তর দিচ্ছে কে জানে—

তারপর উঠলেন। বললেন—দাঁড়াও বাবা, তুমি বোস, আমি ওপরে গিয়ে দেখে আসি এতক্ষণ ধরে কী শলা-পরামর্শ দিচ্ছে কানে। একে আমার বাতের জ্বালা, তার ওপর হয়েছে এই এক ঝঞ্ঝাট—

বলে মা-মণি উঠে ঘরের বাইরে গেলেন।

ঘরের মধ্যে বসে কথা বলতে বলতে হঠাৎ দীপংকরের মনে হলো যেন কোথা থেকে সতীর গলার শব্দ আসছে। তবে কি সতীও এসেছে এ-বাড়িতে! ঠিক সতীর গলার শব্দের মতই বটে! এখন এখানে এসেছে! দীপংকর জড়সড় হয়ে বসলো। এক্ষুণি হয়ত এ-ঘরে ঢুকে পড়বে! কিন্তু আবার মনে হলো, ভেতরে নয়, বাইরে। বাইরে কোথা থেকে আওয়াজটা আসছে। ঠিক অবিকল সতীর মত গলা। দু'জনের গলার শব্দ কি একরকম হতে পারে! হঠাৎ পাশের জানালাটায় গিয়ে দাঁড়াল দীপংকর। একটা দোতলা বাড়ির বারান্দায় যেন দু' তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। অল্প অন্ধকারে স্পষ্ট চেনা যায় না। তবু তীক্ষ্ন নজর দিয়ে দীপংকরের মনে হলো সতীই যেন। আর সতীর পাশে? সতীর পাশে যেন মিস্টার......

—কানে কী এত ফুস্-মন্তর দিচ্ছ শুনি?

হঠাৎ দীপংকর পেছন ফিরলো। ফিরেই দেখলে সামনেই সতীর শাশুড়ী। সতীর শাশুড়ী আবার বললেন—তখন থেকে বসে বসে কী এত ফুস্-মন্তর দেওয়া হচ্ছে আমার ছেলেকে?

দীপংকর তাড়াতাড়ি কাছে সরে এসে বললে—এ আপনি কী বলছেন? শুনেছিলাম সনাতনবাবুর অসুখ, তাই দেখতে এসেছিলাম—

—তা দেখতে কি এই দশ ঘণ্টা লাগে বাবা! চোখে তো এখনও চশমা ওঠেনি, তবু এত কীসের দেখা।

দীপংকর বললে — এইবার আমি যাচ্ছিলাম—

—তা যাচ্ছিলাম তো যাও। যাই-যাই করেও তো দশ ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে! এতক্ষণ কী এত শলা-পরামর্শ হচ্ছিল শুনি?

দীপংকর সহজভাবেই উত্তর দিলে—শলা-পরামর্শ আবার কী হবে মা-মণি!

—হয় হয় বাবা হয়। আমি বুড়ো মানুষ হলে কী হবে, কোথায় কার সংগে কী শলা-পরামর্শ হয় সব আমার কানে আসে, আমি সব টের পাই! বুড়ো হয়েছি বলে এখনও চোখ-কানের মাথা খেয়ে বসিনি—

দীপংকর বললে — ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি—

বলে উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল দীপংকর, হঠাৎ সনাতনবাবু বললেন—আপনি তাহলে আমাকে আপনাদের ওখানে একদিন নিয়ে যাচ্ছেন দীপংকর-বাবু—

দীপংকর বললে—হ্যাঁ—আপনি তৈরি হয়ে থাকবেন—

মা-মণি হঠাৎ আকাশ থেকে পড়লেন যেন। বললেন—কোথায়? কোথায় নিয়ে যাবে?

কথাগুলো যে কাকে উদ্দেশ করে বলা

হলো বোঝা গেল না। দীপংকর দরজার দিকে যেতেই সতীর শাশুড়ী আবার জিজ্ঞেস করলে—কোথায় নিয়ে যাবে শুনি? কোথায়?

কিন্তু ততক্ষণে দীপংকর সোজা বেরিয়ে এসেছে। সতীর শাশুড়ীর প্রশ্নের উত্তর সনাতনবাবু দিলেন কিনা তা আর জানা হলো না। সোজা তেতলার সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে চারদিকে চেয়ে দীপংকর অবাক হয়ে গেল আবার। একদিন এই বাড়ির ভেতরেই বহুকাল আগে একবার এসেছিল, সেদিন এখানে সযত্ন পারিপাট্যের ছোঁয়াচ ছিল, আজ যেন সব হতশ্রী। বারান্দার কোণে, সিঁড়ির দু'পাশে ধুলো জমেছে! নিচের সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছেও একটা পাখি ছিল। খাঁচাটা খালি পড়ে আছে আজ। তারপর বারান্দা আর বাগান পেরিয়ে সোজা প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে এসে থামলো!

বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বললেন—তাহলে কবে থেকে আসছেন আপনারা?

মিস্টার ঘোষাল বললে—ধরে নিন আজ থেকেই—আজ থেকেই নিয়ে নিলুম—আপনি তো ভাড়া পেয়ে গেলেন—

গাড়িতে উঠে মিস্টার ঘোষাল বললে—কী ভাবছো?

সতী বললে—কই, ভবছি না তো কিছু—

মিস্টার ঘোষাল বললে—তুমি বলেছিলে বলেই ভাড়া নিলুম—তোমার জেদটা রইল—

তবু সতী কিছু কথা বললে না। এতদিন এত জল্পনা-কল্পনা, এতদিন ধরে এত প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা সব যেন আজ হঠাৎ শিথিল হয়ে গেছে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িটার সামনে এসে।

মিস্টার ঘোষাল আর একটা চুরোট ধরালে। বললে—তুমি যা চেয়েছিলে সব তো দিলাম, তবু মুখ ভার করে রইলে কেন?

সতী উত্তর দেবার আগেই গাড়িটা ব্রেক কষে একবার হর্ন বাজালে। রাস্তার মধ্যেই কে যেন ছিল। সে সরে যেতেই গাড়িটা আবার সোজা হাজরা রোডে গিয়ে পড়লো। মিস্টার ঘোষাল বললে—ঘর চলো—

একটু মুহূর্ত শুধু। ব্রেক কষে থেমে আবার সোজা ধুলো উড়িয়ে চলে যাওয়া। ব্ল্যাক্-আউটের অন্ধকার। তবু স্পষ্ট আন্দাজ করতে পারলে দীপংকর। স্পষ্ট আন্দাজ করতে পারলে সতী। আর তার-পরেই দীপংকর খানিকক্ষণ সেই রাস্তার ধারেই নির্বোধের মত দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে আবার চলতে লাগলো আস্তে আস্তে।

হাজরা পার্কের ভেতরে তখন কিছু ভিড় জমেছে। আলো নেই। ব্ল্যাক-আউটের রাতে বাইরে আলো জ্বালানো নিষেধ। তবু কয়েকজন জড়ো হয়েছে সেখানে। জোর বক্তৃতা চলছে। বক্তাকে ঘিরে অনেক লোক চুপ করে লেকচার শুনছে।

ভদ্রলোক বলছে—বন্ধুগণ, আমরা আজ ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে বসবাস করছি। আমাদের মাথার ওপর যুদ্ধ, আর আমাদের নিজেদের ঘরের মধ্যে বিভেদ। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্-এর প্রস্তাব আমরা নাকচ করে দিয়েছি আপনারা জানেন। আজ যদি আমরা চল্লিশ কোটি ভারতবাসী একমত হতে পারতুম, আজ যদি মহম্মদ আলি জিন্না আমাদের কংগ্রেসকে সমর্থন করতেন, তাহলে কি আজ ক্রিপস্ সাহেব এমন করে আমাদের ধাপ্পা দিয়ে খালি হাতে চলে যেতে পারতেন! তবু আমি বলছি, আমাদের ভয় করবার কিছু নেই; আমরা কংগ্রেস-সেবীরা মহাত্মা গান্ধীকেই আমাদের নেতা বলে মেনে নিয়েছি—মহাত্মাজী ওয়ার্ধার মিটিং-এ আমাদের বলেছেন, তাঁর অবর্তমানে তাঁর শূন্য স্থান শ্রীরাজগোপালাচারীকেও দিতে চান না, সর্দার প্যাটেলকেও দিতে চান না। দিতে চান পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে। পণ্ডিতজী বাঙলার বড় আদরের নেতা—আজ যখন বাঙলা দেশ নেতাহীন, সুভাষবাবু নিরুদ্দেশ, শরৎ বসুও জেলে, তখন পণ্ডিতজীর মত নেতা থাকতে বাঙালীর ভয় কী......

অনেক দূর থেকেও কথাগুলো কানে আসছিল দীপংকরের। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে গিয়েও হঠাৎ কী যেন সন্দেহ হলো। আবার পার্কের কাছে ফিরে এল। তারপর পার্কের ভেতরে ঢুকে কাছে গিয়ে দেখলে।

—এই যে যুদ্ধ বেধেছে, এ হিংসা, এ
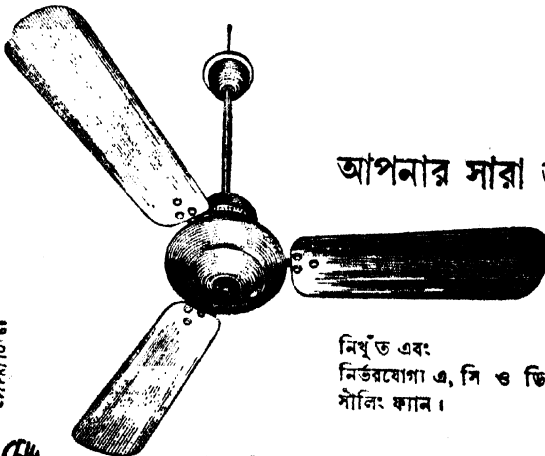
ষড়যন্ত্র, এ অন্যায় আর অত্যাচারের ফল। মানুষ আজ সৎ হতে ভুলে গেছে, মানুষ আজ অহিংসার পথ ভুলে গেছে, মানুষ আজ সত্য কথা বলতেও ভুলে গেছে!

দীপংকর অবাক হয়ে দেখলে—বক্তৃতা দিচ্ছে ফোঁটা। ফটিক ভট্টাচার্যি! একটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ফোঁটা বক্তৃতা দিচ্ছে, আর প্রাণমথবাবু তারই পাশে চুপ করে বসে আছেন। ম্রিয়মাণ, বিষণ্ণ, অসহায়ের মত চেহারা। আর তাঁর পাশেই ছিটে। ফোঁটা যেন আরো ফরসা হয়েছে, আরো স্বাস্থ্যবান। ফরসা ধপ্‌ধপে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি-চাদর গায়ে। কী চমৎকার সৌম্য শান্ত চেহারা, কী উদাত্ত কণ্ঠ। কথা শুনলেই ভক্তিতে গদগদ হয়ে মাথা নিচু করতে ইচ্ছে করে! ছিটেকেও আর চেনা যায় না।

আর দাঁড়াতে ইচ্ছে হলো না দীপংকরের। সোজা বেরিয়ে হাজরা রোড পার হয়ে একেবারে নেপাল ভট্টাচার্যি লেনের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। একে বস্তি, তার ওপর ব্ল্যাক্-আউট্। কিরণের মা কি জানে যে, কিরণ ফিরে এসেছে? বাড়িতে ক্ষীরোদা একলা রয়েছে, এ-সময়ে যদি কিরণের মা দীপংকরের কাছে গিয়ে থাকে তো অনেক সুবিধে হয়। তা ছাড়া, এই বস্তির মধ্যে একলা পড়ে থেকে লাভ কী! কে দেখবার আছে? যদি একটা অসুখ বিসুখ হয়, তখন?

কিন্তু কিরণদের বাড়িটার সামনে গিয়েই দীপংকর অবাক হয়ে গেল। চার পাঁচটা পুলিস বাড়ির সদর দরজার সামনে বেঞ্চির ওপর বসে পাহারা দিচ্ছে।

দীপংকর ভেতরে ঢুকতে যেতেই তারা বাধা দিলে।

বললে—কাঁহা যানা হ্যায় বাবু?

দীপংকর বললে—ভেতরে মাঈজীর সংগে দেখা করবো—

পুলিসদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বললে—কোন্ মাঈজী?

দীপংকর বললে—কিরণবাবুর মা—

তারা ভেতরে যেতে দিলে না। শেষ পর্যন্ত কিরণের মা-ই বাইরে এল। বললে—দীপু! তুমি?

দীপংকর বললে—মাসীমা, আপনার সঙ্গেই একটা কথা বলতে এসেছিলুম, কিন্তু চারদিকে পুলিস-পাহারা দেখছি—

মাসীমা বললে—হ্যাঁ বাবা, দেখ না, বাড়ির বাইরেও যেতে পারিনে, বাড়ির ভেতরে থেকেও শান্তি নেই, ক'দিন থেকে যে কী হয়েছে বুঝতে পারছিনে, কেন এমন করছে তা-ও কেউ বলতে পারছে না।—আমি ক'দিন ধরে বড় ভাবনায় পড়েছি বাবা—

দীপংকর পুলিসদের দিকে ফিরে জানতে চাইলে কেন তারা এখানে পাহারা দিচ্ছে। এর কারণ কী? তারা জানালে—তাদের ওপর যেমন হুকুম হয়েছে, তেমনি করছে।

মাসীমা বললে—তুমি বাবা দীপু এদের একটু বলে দাও না, কেন এরা এ-রকম করছে! কিরণ তো নেই এখানে, তাকে কতদিন দেখিনি—সে বেঁচে আছে কিনা তাও জানি না, তবু কেন এত দুর্ভোগ বল দিকিনি বাবা? আমি কী করেছি? কার কী ক্ষতি করেছি?

দীপংকর একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে—আপনি মাসীমা আমার বাড়িতে চলুন—যাবেন?

মাসীমা বললে—না বাবা, আমি কোথাও যাবো না, এখানেই মরবো আমি- আমি এখানেই মরবো—এখানেই মরে পড়ে থাকবো—

দীপংকর আর কথা বাড়ালো না। বললে—আপনি ভেতরে যান মাসীমা, আমি এখন আসি, আবার আসবো—

মনে আছে, সেদিন আর বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি সেখানে দীপংকর। মাসীমার মুখের চেহারা দেখে কেমন ভয় হয়েছিল মনে। বোধ হয় মাসীমা আর বেশিদিন বাঁচবে না। মনে হয়েছিল কিরণের মা'র মনে এতটুকু শান্তি দেবার ক্ষমতাও তার নেই। নিজেকে তাই বড় অপদার্থ মনে হয়েছিল তার। কিরণের মা'র উপকার করা যেন কিরণেরই উপকার করা। কিরণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে দীপংকর, কিরণের মা'র উপকার করে তার যেন কিছুটা ক্ষালন হতো। যেন কিরণেরই উপকার সে করতে এসেছিল এখানে।

কিন্তু কিছুই করা হলো না। অসহায় দুর্বলের মত, অপরাধীর মত দীপংকর আস্তে আস্তে আবার নেপাল ভট্টাচার্য লেন পার হয়ে চলে এল বড়-রাস্তায়।

সকাল থেকেই সনাতনবাবু তৈরী হয়েছিলেন। নিজেই বিছানা ছেড়ে উঠেছেন। নিজেই নিজের সব জামা-কাপড় বার করেছেন। কখনও নিজের কাজ নিজেকে করতে হয়নি তাঁকে। কোথায় কোন্ জামা কোন্ কাপড় থাকে তাও জানেন না। আলমারির চাবিও কোনও দিন নিজের হাতে স্পর্শ করেন নি। কোন্ ফুটোতে কোন্ চাবি লাগে তাও জানেন না।

শম্ভু হঠাৎ দেখতে পেয়ে বললে—এ কী জামা পরেছেন, দাদাবাবু, এ যে উল্টো পরেছেন?

—হোক্ উল্টো, উল্টো পরলে কে দেখতে পাচ্ছে?

শম্ভু বললে—আসুন, আমি ঠিক করে দিচ্ছি—

দীপংকর নিচের বৈঠকখানা ঘরে বসে ছিল অপেক্ষা করে। অফিসে যাবার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছিল। অনেকক্ষণ বসে থাকার পরেও সনাতনবাবু আসছেন না।

হঠাৎ মা-মণি ঘরে ঢুকলেন। বললেন—কোথায় যাচ্ছো তুমি সোনাকে নিয়ে?

দীপংকর মা-মণির এই হঠাৎ উপস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিল না। এই প্রশ্নের জন্যেও প্রস্তুত ছিল না। কী বলবে বুঝতে পারলে না। মা-মণি আবার বললেন—তোমায় সেদিন বলেছিলুম না যে তুমি আমার ছেলের কানে ফুস্-মন্তর দিতে এসো না—

দীপংকর বললে—সনাতনবাবু যদি না-যেতে চান তো আমি জোর করে তাঁকে নিয়ে যাবো না—

—তুমি তো বড় বেয়াদব্ দেখছি!
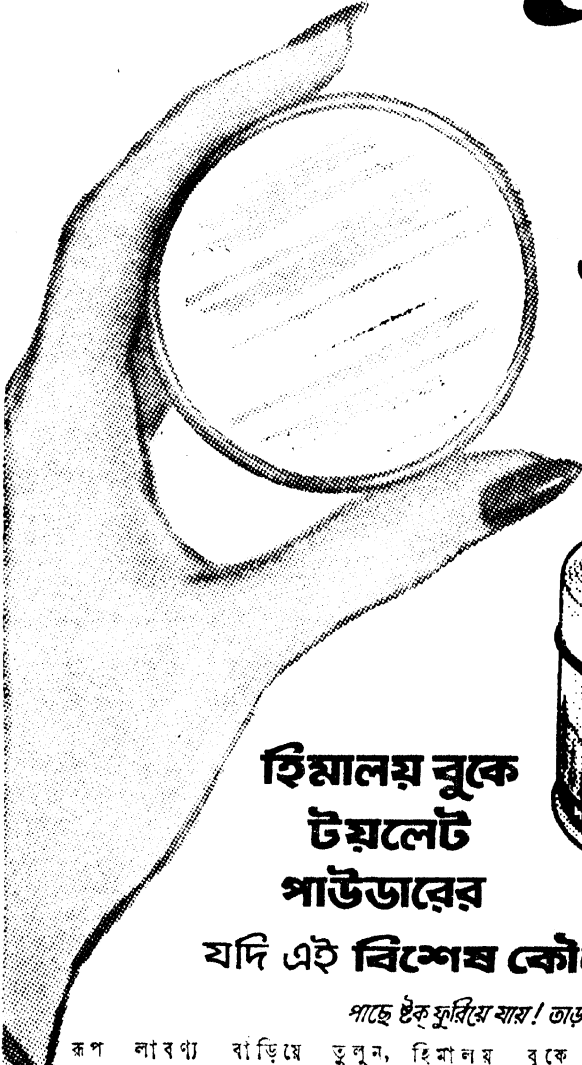
দীপঙ্কর বললে—আপনি মিছিমিছি রাগ করছেন আমার ওপর!

মা-মণি বললেন—আবার তুমি আমার মুখের ওপর কথা বলছো? তুমি যাও এখান থেকে, বেরিয়ে চলে যাও—

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়াল। বললে—আপনি আমাকে আজ যেতে বললেও যাবো না, সনাতনবাবু এলে তিনি যা বলবেন, তাই করবো!

—তা আমি কেউ না? তোমার কাছে আমার ছেলেই আমার চেয়ে বড় হলো?

দীপঙ্কর বললে—আপনি ভুল বুঝেছেন মা-মণি, আমি আপনাকে সে-কথা বলিনি। আপনাকে আমি সম্মান করেই কথা বলেছি, আপনার যথাযোগ্য মর্যাদা আমি দিয়েছি, তবু আপনি আমাকে অপমান করছেন। আমি আপনারও শুভাকাঙ্ক্ষী, সনাতনবাবুরও শুভাকাঙ্ক্ষী—

ছেঁদো কথা রাখো, আমি যা বলছি করো, তুমি এখান থেকে চলে যাও, আর কখনও এসো না। যেদিন থেকে তুমি এসে ঢুকেছ, সেইদিন থেকেই শনি ঢুকেছে আমার সংসারে। আমার কত সাধের সংসার, আমার কত যত্নের বাড়ি, সব ছারখার হয়ে গেল তোমাদের জন্যে! কেন তুমি আসো? আমার বউকে নিয়ে গেছ, তাতেও তোমাদের সাধ মেটেনি? এখন আবার আমার ছেলেকে ভাঙিয়ে নিতে চাও—

বলতে বলতে মা-মণি যেন বেদনায় নরম হয়ে এলেন। অনুশোচনায় সজল হয়ে এলেন। এমন চেহারা কখনও দেখেনি দীপঙ্কর মা-মণির।

মা-মণি আবার বলতে লাগলেন—আমি তোমাদের কী করেছি বলো তো? কী করেছি আমি তোমাদের? আর কারই বা আমি কী সর্বনাশ করেছি? আমার সোনার সংসার তোমরা দশজনে মিলে কেন এমন করে নষ্ট করলে? কী পাপ করেছিলুম আমি?

হঠাৎ শম্ভু ঘরে এল। বললে—মা-মণি, দাদাবাবুর বোতাম কোথায়? খুঁজে পাচ্ছি না তো! কোথায় আছে?

একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন মা-মণি।

—দাদাবাবুর বোতাম কোথায় তা আমি কী জানি? আমি দাদাবাবুর বোতাম লুকিয়ে রেখেছি যে আমাকে জিজ্ঞেস করছিস?

শম্ভু তাড়াতাড়ি পালিয়ে বাঁচলো। মা-মণি যেন নিজের মনের আগুনেই নিজে পুড়তে লাগলেন। বললেন—খবরদার বলছি, আমাকে কারো কোনও কথা জিজ্ঞেস করবি না কেউ, আমি কেউ নই এ-বাড়ির, আমি কারোর ব্যাপারে থাকি না, থাকবোও না—

কিন্তু যাকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলা সে ততক্ষণে ঘর থেকে বাইরে চলে গেছে। দীপঙ্করের দিকে ফিরে মা-মণি বললেন—বলি, তুমি ভদ্দরলোকের ছেলে, না কী? কথা যে তোমার কানে যায় না মোটে—

সঙ্গে সঙ্গে সনাতনবাবু এসে পড়েছেন। বললেন—চলুন, চলুন, বোতাম না হলে আর কী এমন অসুবিধে—চলুন, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, চলুন—

—সোনা!!

বোধ হয় বহুদিন বাদে এই প্রথম মা-মণি নিজের ছেলেকে নাম ধরে ডাকলেন।

—কী মা মণি?

—কোথায় যাচ্ছো শুনি? আমাকে না জিজ্ঞেস করে কোথায় যাচ্ছো শুনি? বৌকে আনতে?

সনাতনবাবু ধুতির কোঁচা গোছাতে গোছাতে বললেন—হ্যাঁ—

—তাকে যে আনতে যাচ্ছো, তা আমাকে জিজ্ঞেস করেছ? আমার মত নিয়েছ? আমিও তো একটা মানুষ, না কি মনে করেছ মা-মাগী একটা মানুষই নয়!

সনাতনবাবু কথাটা শুনে যেন আরো বিব্রত হয়ে পড়লেন। বললেন—সে কি মা, আমি তো খারাপ কাজ কিছু করছি না, বড় কষ্টে পড়েছে তোমার বৌমা, টাকার অভাবে দীপঙ্করবাবুদের অফিসে চাকরি করতে হচ্ছে তাকে—তাই আনতে যাচ্ছি, বাড়ির বউ হয়ে চাকরি করবে, কথাটা কি ভালো? তুমিই বলো?

—তা সে কি তোমার পায়ে ধরে সেধেছে এখানে আসবার জন্যে?

—সাধবে কেন? আমরাই তো তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, সে কোন্ সাহসে সাধবে আবার? তার কি লজ্জা-সম্ভ্রম-মান-অপমানের কিছু বাকি রেখেছি আমরা?

মা-মণি বললে—খুব তো লজ্জা-সম্ভ্রমের কথা আওড়াচ্ছো দেখছি, কিন্তু এতদিন কার বাড়িতে কার সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে সে খবরটা রেখেছ? নির্মল পালিত আমাকে সব বলেছে!

সনাতনবাবু বললেন—আর তুমিও তাই বিশ্বাস করলে? তোমার বৌমাকে তুমিই চেনো আর আমি চিনি না? আর তা ছাড়া রাত যদি কাটিয়েই থাকে তো তার জন্যে কে দায়ী মা!

—তার মানে?

দীপঙ্কর দেখলে মা-মণির সমস্ত শরীরটা থর থর করে কাঁপছে। যেন এখনি প্রলয়-কাণ্ড শুরু হবে। আবার চেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন—তার মানে আমি দায়ী?

সনাতনবাবু বললেন—আমি কি তাই বলেছি তোমাকে মা-মণি? বলেছি তুমিও দায়ী, আমিও দায়ী!

বলে দীপঙ্করের দিকে ফিরে বললেন—

আদেন দীপঙ্করবাবু, আপনার অফিসের দেরি করিয়ে দিলাম—

দীপঙ্কর বললে—না, আপনি সেজন্যে ভাববেন না, আমি আজ দেরি হবে জেনেই বেরিয়েছি—

সনাতনবাবু বললেন—বোতামটা পাওয়া গেল না, বোতামের জন্যেই এতক্ষণ দেরি হয়ে গেল—

দীপঙ্কর বললে—তাতে কী হয়েছে, আমি সেদিন আপনাকে বলে গেলাম পরের দিন আসবো, কিন্তু সময় করে আসতে পারিনি—চলুন—

বাইরের সদরের দিকেই পা বাড়াচ্ছিল দীপঙ্কর। হঠাৎ মা-মণির বজ্র-গম্ভীর গলার আওয়াজে থেমে যেতে হলো।

—যেও না, শোন!

সনাতনবাবু ফিরলেন। বললেন—আমাকে বললে?

মা-মণি বললেন—হ্যাঁ, যদি বৌকে আনতেই হয় তো একটা কথা মনে রেখে তবে এনো, তোমার বউ আমাদের এই রাস্তায় মিত্তিরদের বাড়িটা ভাড়া করেছে! বিশ্বাস না হয় নির্মল পালিতকে জিজ্ঞেস করো!

—ভাড়া করেছে? তোমার বৌমা? কীসের জন্যে?

সনাতনবাবু দীপঙ্করের মুখের দিকেও চাইলেন। জিজ্ঞেস করলেন—ভাড়া করেছে নাকি দীপুবাবু? আপনি তো বলেননি কিছু আমাকে? কীসের জন্যে ভাড়া করেছে?

উত্তর দিলেন মা-মণি! তাঁর গলায় বিষ ঢেলে দিয়ে বললেন—কীসের জন্যে আবার, ব্যবসা করবার জন্যে!

—মা!!

মা-মণিও কম উত্তেজিত হননি! বললেন—চোখ রাঙাচ্ছো কাকে? চোখ রাঙাচ্ছো কাকে তুমি খোকা! আমিই এ-বাড়ির মালিক, এ-বাড়িতে বৌকে আনতে হলে আমার অনুমতি নিতে হবে, এই আমার হুকুম। আমার হুকুমটা মনে রেখে তবে বৌকে আনতে যেও—

বলে তিনি মুখ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছিলেন দোতলার সিঁড়ির দিকে। সনাতনবাবুও সদর দরজার দিকে এগোচ্ছিলেন। হঠাৎ পেছনে একটা শব্দ হতেই দীপঙ্কর ফিরে দেখলে মা-মণি সিঁড়ির প্রথম ধাপটার ওপর উঠতে গিয়ে ধপাস করে পা পিছলে পড়ে গেছেন। দীপঙ্করও দেখেছে, সনাতনবাবুও দেখেছে।

দীপঙ্কর দৌড়ে ধরে তুলতে গেল। কিন্তু কী ভেবে একটু সংকোচও হলো আবার। কিন্তু সনাতনবাবু ততক্ষণে অবস্থাটা বুঝে নিয়েছেন। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে মা-মণির হাতটা ধরে তুলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মা-মণির তেজ বোধ হয় তখনও কমেনি। একেবারে আর্তনাদের মত করে চেঁচিয়ে উঠলেন—ছুঁও না আমাকে, ছুঁও না—তোমার মত ছেলের ছোঁয়াচও পাপ—

সনাতনবাবু কিন্তু দমলেন না তবু। নিচু হয়ে বললেন—মা-মণি, লেগেছে খুব?

শব্দ পেয়ে শম্ভু দৌড়ে এসেছে। ভেতর-বাড়ি থেকে কৈলাশও দৌড়ে এসেছে। বাতাসীর-মা, ভূতির-মা, তারাও দৌড়ে এসেছে। ঠাকুর রাঁধতে রাঁধতে খবর পেয়ে দৌড়ে এসেছে। ভিড় জমে গেল বারান্দায়। মাথাটাতেই বেশি লেগেছিল। সিঁড়ির সিমেন্টের ওপর টপ্ টপ্ করে রক্ত পড়তে লাগলো।

সনাতনবাবু বললেন—শম্ভু, ডাক্তার-বাবুকে খবর দে একবার—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—ব্লাড-প্রেশার ছিল নাকি মা-মণির?

সনাতনবাবু বললেন—তা তো জানি না—

ডাক্তারবাবু বোধ হয় পাড়ারই। সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির হলেন। পরীক্ষা করতে লাগলেন। সনাতনবাবু তখন নিজেই কাঁপছেন থর থর করে। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু ব্লাড-প্রেশারটা দেখছিলেন তখন। দেখা শেষ করে বললেন—না, প্রেশার নর্ম্যাল—এমনি পা শিলপ করে পড়ে গেছেন—কিছু ভয় নেই—এবার ধরাধরি করে ভেতরে শুইয়ে দিন—

মা-মণি তখন অচৈতন্য। আর মুখে সেই ঝাঁঝ নেই। সনাতনবাবু দীপঙ্করের দিকে চেয়ে বললেন—আজ আর আমার যাওয়া হবে না দীপঙ্করবাবু, দেখছেন তো ব্যাপারটা—

দীপঙ্করও বললে—না না আজকে আপনার আর যাওয়ার দরকার নেই—আমি আমি—

সনাতনবাবু বললেন—আপনি সতীকে সব জানাবেন দীপঙ্করবাবু—বলবেন আমি যেতুম ঠিক, কিন্তু বাধা পড়লো—সে যেন একবার মা-মণিকে দেখতে আসে—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমার সঙ্গে যে সতী আর কথা বলে না—

—কেন? কথা বলে না কেন?

দীপঙ্কর বললে—আর আমিও তো এখানে কলকাতায় বেশি দিন থাকছি না, আমিও যে ট্রান্সফার হয়ে চলে যাচ্ছি, তাই ভেবেছিলাম যাবার আগে একটা যা-হোক ব্যবস্থা করে যাবো...

—কোথায় ট্রান্সফার হচ্ছেন?

দীপঙ্কর বললে—ময়মনসিংএ।

রাস্তায় বেরিয়েই নজরে পড়লো। সনাতনবাবুদের বাড়ি ঢোকবার সময় অতটা লক্ষ্য হয়নি। ঠিক সামনের বাড়িটা। এতদিন প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে এসেছে,

এ-বাড়িটার দিকে কখনও নজর পড়েনি আগে। কোন্ মিস্ত্রিদের বাড়ি। ওপরে দু'খানা ঘর, নিচেও দু'খানা। রাজমিস্ত্রী খাটছে বাইরে। বাঁশের ভারা বেঁধেছে। চুন-কাম হচ্ছে সমস্ত বাড়িটা। এইখানেই এসে সতী উঠবে। এইখানেই মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকবে। একেবারে এক ছাদের তলায়। একেবারে ঘোষ বাড়ির মুখোমুখি। একেবারে সনাতনবাবুর চোখের সামনে। একেবারে নয়নরঞ্জিনী দাসীর বুকের ওপর!

আস্তে আস্তে দীপংকর হাজরা রোডে গিয়ে পড়লো। তারপর হাজরা রোড থেকে একেবারে সোজা ডালহৌসী স্কোয়ার।

ট্যাক্সীটা অফিসের দিকেই যাচ্ছিল, কিন্তু দীপংকরের কী মনে হলো, বললে—সামনে চলো—

সোজা গিয়ে ট্যাক্সিটা থামলো রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে। তখন অনেক ভিড় জমেছে সেখানে। বার্মা ইভাকুয়ীজ অফিসের সামনে অসংখ্য মানুষ উদ্‌গ্রীব হয়ে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ নিতে এসেছে। দীপংকর তাদের ভিড় ঠেলে অনেক কষ্টে ভেতরে ঢুকলো। সমস্ত কলকাতা যেন এসে জুটেছে এই অফিসের সামনে। জেনারেল ওয়াভেল বার্মা নিয়ে নেবার তোড়জোড় করছে তখন। কিন্তু সবাই বলছে এবার ইণ্ডিয়ার ওপর বোমা পড়বে। এবার কলকাতার পালা। দীপংকরের কানে নানারকম কথা এল। পাশের দেয়ালে পোস্টার পড়েছে—একজন জাপানী রাইফেল উঁচিয়ে সামনে এগিয়ে আসছে। ছবির নিচেয় বড়-বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—'গুজবে কান দিবেন না'। আরো কত রকমের সব পোস্টার। খরচ কমান। যুদ্ধে জয়লাভে সাহায্য করতে ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন। ঘুড়ি উড়িয়ে সুতো নষ্ট করবেন না। ছেঁড়া জামা-কাপড় সেলাই করে পরুন।

অনেকক্ষণ পরে দীপংকরও জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর রসিদটা এগিয়ে দিলে। বললে—ভুবনেশ্বর মিত্র—টিম্বার মার্চেণ্ট—প্রোম্—

ভেতরে ক্লার্করা খেটে-খেটে হিম্-সিম্ খেয়ে যাচ্ছে। গাদা-গাদা ফর্ম, গাদা গাদা ফাইল। দীপংকরের হাত থেকে রসিদটা নিয়ে কাগজ-পত্র-ফাইল সব ঘাঁটতে লাগলো। তারপর খানিক পরে বললে—এখনও নো ট্রেস্—কোনও খবর নেই—এই নিন—

দীপংকর বললে—সে কি? আজ তিনমাস ধরে ঘুরে যাচ্ছি, এখনও খবর আসেনি, আই মাস্ট সী ইওর চীফ। আমি আপনাদের চীফের সঙ্গে দেখা করবো—আর একটু ভালো করে দেখুন—

ক্লার্কদেরও দোষ নেই। তারা দিন-রাত পরিশ্রম করে বিপর্যস্ত। আবার কাগজ-পত্র-ফাইল পাড়লে। আবার নতুন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। শেষে পাওয়া গেল। বললে—এই যে স্যার, পেয়েছি—

—পেয়েছেন? বেঁচে আছেন?

ক্লার্কটা বললে—না, এই ক্যাজুয়েল্টি-লিস্টে নাম রয়েছে, ভুবনেশ্বর মিত্র—টিম্বার মার্চেণ্ট—প্রোম্—

—মারা গেছেন?

ক্লার্ক বললে—হ্যাঁ, ইভাকুয়েশনের সময় যে জাহাজে উঠেছিলেন, সেই জাহাজটাই বোমা পড়ে ডুবে গেছে, কোনও লোক বাঁচেনি—যারা ছিল তারাও ডেড্—এই দেখুন, লিস্ট দেখুন—

বলে ভদ্রলোক ছাপানো ক্যাজুয়াল্টি লিস্টটা বাড়িয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু দীপংকরের তখন সমস্ত হাত-পা হিম্ হয়ে গেছে। মুখ দিয়েও কথা বেরুচ্ছে না যেন।

বললে—আর একবার ভালো করে দেখুন, ভুলও তো হতে পারে—

ভদ্রলোক বললে—ভুল হবে কী করে স্যার, আপনি নিজের চোখেই দেখুন না, এই তো ছাপার অক্ষরে লেখা রয়েছে—ভুবনেশ্বর মিত্র—টিম্বার মার্চেণ্ট—প্রোম্—বার্মা। এ খবর কখনও ভুল হতে পারে, আপনি নিজের চোখেই দেখুন না—

—কিন্তু এক নামের দুজনও তো থাকতে পারে।

ভদ্রলোক এবার বিরক্ত হলো। তার অনেক কাজ। পেছনে অনেক লোক তখনও দাঁড়িয়ে আছে। কাগজ-পত্র গুটিয়ে রেখে বললে—তা ভুল থাকলে থাকবে—আমরা ছাপার অক্ষরে যা দেখছি তাই আপনাকে বললুম—এর পরেও যদি আপনার সন্দেহ হয় তো হোক—তাতে আমরা কী করতে পারি—

(ক্রমশ)

॥ তেত্রিশ ॥

এখনও খানিকটা পথ বাকি আছে। মদন একবার উপরের দিকে চেয়ে ভাবল। তবে পাহাড়টার প্রতিরোধ অনেক শিথিল হয়ে এসেছে। মদন তুষার-গাঁইতি বরফে পুঁতে তার উপর দেহের ভারটা ছেড়ে দিয়েছে। বেদম হাঁফাচ্ছে। তেষ্টা পেয়েছে বেজায়। একটু জল খেতে পারলে ভালই হত। কিন্তু তবু জল খেল না মদন। যদি সর্দি গর্মি হয়। আবার সে উপরের দিকে চাইল।

একটু উপরে বিশ্বদেব এই একই কায়দায় বিশ্রাম নিচ্ছে। হাঁফাচ্ছে। শেরপারা আরও উপরে উঠে গিয়েছে। ওরাও বিশ্রাম নিচ্ছে। ওদের মত তারাও হাঁফাচ্ছে। শেরপাদের সংগে প্রায় তাল রেখেই ওরা উঠছে। খুব পিছিয়ে পড়ে নেই। মদন খুশী হল।

এবারে সে নিচের দিকে চাইল। মালবাহকের দল ক্রমশ এগিয়ে আসছে। মদনের বুকের ভিতর একটা আবেগ আলোড়ন তুলল। তার চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। তার কর্তব্য সে করেছে, করতে পেরেছে। ঈশ্বরকে প্রাণভরে সে ধন্যবাদ জানাল।

মালবাহকরা মদন আর বিশ্বদেবের কাণ্ড দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। মদনের অদ্ভুত ভাষার ভাষণের অর্থ অনেকেরই বোধগম্য হয়নি। কিন্তু মদনের কাজটা তারা পরিষ্কার বুঝল। ওরা বসে বসে দেখতে লাগল বিশ্বাস সাব্ আর মণ্ডল সাব্ শেরপা সাবদের পিছু পিছু সেই ভয়াবহ বরফের উপর দিয়ে কেমন তর তর করে উঠে যাচ্ছিল। প্রথমটা ওরা ভয় পেয়েছিল। নির্বাক তারা ওদের দিকে চেয়ে ছিল। ওরা অনেকটা উঠে গেছে। বসে থেকে ওদের আর দেখা যাচ্ছে না। মালবাহকেরা একে একে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক পাও কেউ নড়ল না। শুধু দেখতে লাগল তারা। সাদা বরফের ঢালু বেয়ে যে ছয়টা লোক উঠছে তারা ধীরে ধীরে কেমন ছোট হয়ে আসছে! আর আশ্চর্যের কথা, আজ সকালে ঐ ছয়জন লোক তাদের সংগেই যাত্রা করেছিল। রোজ যেমন হয়। সকলে এক সংগে একটা আস্তানা থেকে বের হয়। একই সংগে নতুন আস্তানায় গিয়ে পেঁছিয়। আজ তার ব্যতিক্রম হল। ওরা ছয়জন ঐ উঠে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ওদের চেহারা অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর তারা নিজেরা পাথরের মত পর্বতের সানুদেশে বসে আছে। আর আশ্চর্যের কথা, মণ্ডল সাবু বিশ্বাস সাবু, ওদের দেশে পাহাড় নেই, বরফ নেই, তবু তারা বরফের উপর দিয়ে কেমন দিব্যি উঠে যাচ্ছে। আর পড়ে থাকল কারা? পাহাড়ের দেশে যাদের জন্ম, বরফের দেশে যারা মানুষ, তারাই! কি তাজ্জব! ওদের কেউ কেউ মাথা চুলকোতে লাগল।

শের সিং একটা ঘাসের শিষ ছিঁড়ে নিয়ে চিবোতে লাগল। এতক্ষণে সে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে। তার আত্ম-সম্মানে ঘা দিয়েছে দুধপোষা দুই বাঙালীবাবু। শের সিং উপরের দিকে চাইল। ঐ যে ওরা এখনও উঠছে। উঠেই চলেছে। শের সিং আড় চোখে একবার তার দলের সবাইকে দেখে নিল। কেমন সম্ভ্রমভরা বিস্মিত দৃষ্টিতে সবাই উপরের দিকে চেয়ে রয়েছে! শের সিং-এর কানে মদন সাবের কথাটা ঘুরে ঘুরে বাজতে লাগল, "যে সব জেনানা এই দলে মর্দানার পোশাক পরে আছে......"

কাকে লক্ষ্য করে মদন সাবু এ কথা বলেছে? শের সিং-কে লক্ষ্য করে নয় ত? "শের সিং," মদন সাবু যাবার সময় বলে গেছে, "তুম তো শের হো?" তাকে একটু যেন ঠেসই দিয়েছে মদন সাবু। তবে কি তাকেই জেনানার দলে ফেলে দিল? তার দলের লোকেরা আবার এই কথা ভাবছে না ত? শের সিং অস্থির হয়ে উঠল। আজ পঁয়ত্রিশ বছর ধরে এখানে সর্দারি করে আসছে শের সিং। কেউ তার কর্তৃত্বের উপর কথা বলতে পারেনি। এতগুলো লোকের ভালমন্দের দায়িত্ব তার ঘাড়ে। কারো কিছু মন্দ হলে লোকে তাকেই দায়ী করবে। তাই শের সিং কোন ঝুঁকি নিতে রাজি হয়নি। সে জানে সাহেবরা তার উপর বিশেষ খুশী নয়। তা না হোক। সাহেবদের নেকনজর পাবার আশায় সে তার সাথীদের গর্দান হাড়িকাঠে বাড়িয়ে দিতে পারে না। এই ভয়াবহ পথ অতিক্রম করার অভিজ্ঞতা তার দলের অধিকাংশ লোকেরই নেই। সে একথা ভাল রকমই জানে। যে সব লোক তার সংগে এখানে এসেছে তাদের বেশির ভাগই কেদার বদ্রীর বাঁধা সড়কে যাত্রীদের বোঝা বয়। পর্বত অভিযানের মর্ম কি তা জানে না। ওরা না জানুক, শের সিং জানে। টিলম্যান সাহেবের সংগে বহু বছর আগে নন্দাদেবী অভিযানে গিয়ে সে যা নাকানিচুবানি খেয়েছিল সে কথা মনে পড়লে এখনও তার গা শিউরে ওঠে। "শের সিং, তুম তো শের হো?"

বিরক্ত হয়ে শের সিং মুখ থেকে ঘাসের শিষটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। থুঃ করে খানিকটে থুথুও ফেলল। উপরে চেয়ে দেখল, ওরা সমানে উঠে যাচ্ছে'

এমন বিড়ম্বনায় আর কখনও পড়েনি শের সিং। শের সিং জানে, আজ তার প্রতিষ্ঠা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সাব্‌রা যদি জোর করত, ধমকাত, তাহলে শের সিং-এর সুবিধে হত। সে সবাইকে নিয়ে ফিরে যেতে পারত। কিন্তু এখন যে অবস্থার মধ্যে সাব্‌রা তাকে ফেলে গেল, তাতে তা আর ফেরার কথা বলার মুখ রইল না। শের সিং জানে, যে মুহূর্তে দলের লোকেরা ভাববে সে কাপুরুষ, সে জেনানা, সে শের নয়, সেই মুহূর্তেই তার নেতাগিরির অবসান হবে।

হঠাৎ মনঃস্থির করে ফেলল শের সিং। দুটো দুধের ছেলে তাকে চোট দিয়ে যাবে, এ সে সহ্য করবে না কিছুতেই। সে যাবে।

শের সিং হাততালি দিয়ে সবাইকে ডাকল।

বলল, "শুনো, বরফকা উপর হাম কিসিকো যানে নেই বোলেগা। যো যায়েগা আপনা মর্জিসে যায়েগা। লেকিন হাম হিঁয়া ঠহ্‌রেগা নেহি। হাম সাব্‌লোগোকো পাস্ যা রহা হ্যায়।"

শের সিং আর দেরি করল না। নিজের বোঝাটি তুলে নিয়ে উঠতে শুরু করল। শের সিং-এর জুতোজোড়া ছেঁড়া। বরফের উপর পা ঠেকানোমাত্র পা অসাড় হয়ে যেতে লাগল। সে গ্রাহ্য করল না। তার সেনা-গগল্‌স্ নেই। বরফের উপর ঠিকরে পড়া সূর্যের প্রখর রশ্মিতে তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সে ভ্রূক্ষেপ করল না। শের সিং-এর প্রতি পদে মনে হতে লাগল, সে বুঝি বিরাট এক ঠাণ্ডা আয়নার উপর দিয়ে চলেছে। প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি তার মুখের অনাবৃত অংশ যেন পুড়িয়ে দিতে লাগল। তার গালে, তার নাকে অসহ্য জ্বলুনি শুরু হল। সে উপেক্ষা করল। মনে মনে বলতে লাগল, "সাব্, ম্যয় জেনানা নেহি হুঁ। ম্যয় শের হুঁ, শের।"

শের সিং এগিয়ে যেতেই কর্ণবাহাদুর লাফিয়ে উঠল। সেই বেঁটে মানুষটা পুরো এক মন বোঝা পিঠে নিয়ে বলে উঠল, "হাম ভি যাতা হ্যায়।"

আক্কেল বলে উঠল, "হুজুর কে লিয়ে সব কুছ কর্ সক্‌তা। জান ভি যায় তো পরোয়া নেহি।" উৎসাহের মাথায় আক্কেল একটা কথা ভুলে গেল, তার বোঝায় "নক্‌শা সাবের" (বীরেনদার) ক্যামেরা ফিলিম্ রয়ে গিয়েছে। নক্‌শা সাহেব তখনও এসে পৌঁছন নি।

আক্কেলের পিছু পিছু এক এক করে সবাই সেই বরফে আবৃত খাড়া চড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করল। প্রত্যেকের পিঠে এক এক মন বোঝা। তার উপর এইরকম বিপজ্জনক পথ। অতি কষ্টে এক পা এক পা করে ওরা এগুতে থাকল।

মাঝামাঝি যেতে না যেতেই একজন মুখ থুবড়ে বরফের মধ্যে পড়ে গেল। কয়েক-

খরস্রোতা নদীর উপরে পাথর ফেলে পুল বাধা হয়েছে। মোটা সাবকে পার করা হচ্ছে

জনে মিলে ধরাধরি করে তাকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। বোঝা বয়ে উঠবার ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। বোঝা ফেলে রেখেই সে উঠতে লাগল। একটু পরে আরেকজন পড়ল, তারপরে আরেকজন, তারপরে আরেকজন......

শের সিং যখন গিরিশিরার শীর্ষে উঠে এল, তখন তার সহ্যশক্তি শেষ সীমা অতিক্রম করেছে। তার মুখখানা পুড়ে কালো হয়ে গেছে। পায়ের তলা সম্পূর্ণ অবশ। তার দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। বাক্‌শক্তি রহিত হয়েছে। তবু সে টলতে টলতে মদনের কাছে এগিয়ে গেল। ইশারা করে বলল, সাব্, হাম আ গিয়া। মদন তার অতিক্রান্ত দেহটা নিয়ে কোনরকমে উঠে দাঁড়াল। তারপর শের সিংকে বুকে জড়িয়ে ধরল। শের সিং-এর যন্ত্রণাকাতর মুখে এক ফালি হাসি ফুটে উঠল। সে ধপ্ করে বসে পড়ল। আঙ শেরিং তাকে লেমন বার্লি খেতে দিল। চোঁ চোঁ করে মগটা খালি করে শের সিং খানিকটা ধাতস্থ হল।

একটু পরে কর্ণবাহাদুর, আক্কেল, তারপর একে একে সবাই উঠে এল। দুজনের চোট লেগেছে। কুড়িজন বোঝা ফেলে এসেছে। আধ ঘণ্টা ধরে সবাই বিশ্রাম নিল। তারপর বকশিশ কবুল করে কুড়িজন মালবাহককে নিচে পাঠিয়ে মাল তুলে আনা হল। ব্যবস্থা শের সিং-ই করে দিলে।

এবার নামার পালা। মদন, বিশ্বদেব, আঙ শেরিং গিরিশিরার চূড়াটা থেকে পাহাড়টার গোড়ার দিকে চাইল। মদনের মনে হল, আগেকার সেই ঔদ্ধত্য আর একটুও নেই। তাদের অধ্যবসায়ের কাছে সম্পূর্ণ নত হয়ে গিয়েছে।

পরের দলটাকে দেখা গেল। তারা পাহাড়ের সানুদেশে এসে জড় হয়েছে।

আঙ শেরিংকে ভাবিত দেখা গেল।

বললে, "আমি ভাবছি নতুন যেসব সাব্ এসেছে তাদের কথা। নক্‌শা সাব্, ডগদর সাব্, বিশেষ করে মোটা সাবের কথা। এই ধকল সহ্য করতে পারলে হয়।"

॥ চৌত্রিশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকেঃ

৭ই অক্টোবর। রাত্রি। বিশ্বাস করতে পারছি নে, আদৌ বিশ্বাস হচ্ছে না, আজ আমি ১৩২২৫ ফুট উঁচু এক পাহাড় ডিঙিয়ে এসেছি। পাহাড়ের গা বরফে ঢাকা ছিল। জীবনে এই প্রথম বরফে পা দিলাম।

এখন রাত্রি সাড়ে আটটা। ঠিক দু ঘণ্টা আগে এখানে এসে পৌঁছেছি। সকাল সাড়ে সাতটার সময় ফারাখড়ক থেকে রওনা দিয়েছিলাম। তার মানে আজ পাক্কা এগার ঘণ্টা হেঁটেছি। বিরামবিহীন। এগার ঘণ্টা!!

আজ আমরা দু দলে ভাগ হয়ে হেঁটেছি। প্রথম দলটা আমাদের আগে বেরিয়ে গেছে। আমরা যখন বরফ-ঢাকা পাহাড়টার গোড়ায় এসে পৌঁছলাম, তখন প্রথম দল সেটা পার হয়ে গিয়েছে। এই বিরাট আর হিংস্র পাহাড়টা ডিঙোতে হবে শুনে আমার

আনন্দধারার উপর অভিযাত্রীদল।

অন্তরাত্মা অন্তরেই শুকিয়ে গেল। বাইরে কিছু প্রকাশ করলাম না।

পাহাড়ের গোড়ায় একটু বিশ্রাম নিয়ে আমরা জয় গুরু বলে উঠতে শুরু করলাম। আঙ ফুতার আমার ছায়ায় ছায়ায় ছিল। সুকুমারের নির্দেশে দিলীপও আমার কাছে কাছে চলল। দা তেম্বা, আজীবা, সুকুমার আর নিমাই ডাক্তার আর বীরেনদার উপর নজর রাখল। বীরেনদার মেজাজ আজ শরিফ নেই। ওঁর পার্সোন্যাল পোর্টার শ্রীমান আক্কেল বেয়াক্কেলের মত ক্যামেরা ট্যামেরা নিয়ে আগের দলের সঙ্গে কেটে পড়েছেন। তাই বীরেনদার ছবি তোলা হল না। বিশেষ করে মুভি ক্যামেরাটা নিয়ে যাওয়াতেই তাঁর মনটা বেশী খারাপ হয়ে গিয়েছে।

ধীরে ধীরে উঠেছি। বরফে চলার জুতো আমাদের কারোর পায়েই ছিল না। বরফের জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। ইংরেজিতে যাকে "স্নো-লাইন" বলে, আমরা হিমালয়ের সেই হিমানী রেখা পার হইনি। তবু যে আমরা এখানে, এই তের হাজার ফুটে এসেই বরফ পেলাম, তা এই ক'দিনের দুর্যোগময় আবহাওয়ার জন্য। অনবরত ক'দিন ধরে তুষারপাত হয়েছে। তাই এই পর্বতেই বরফের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে গেল।

উঠে চলেছি একেবারে খাড়া। তাইতে কষ্ট বেশী হচ্ছে। এর আগে খাড়া চড়াই আমরা যথাসম্ভব এঁকেবেঁকে উঠেছি। ওতে বেশী পথ চলতে হয় বটে, কিন্তু দম লাগে কম। আজ যেন আর মায়া দয়া করছে না কেউ, আমি যে আনাড়ি, আমি যে নতুন এসেছি, তা যেন ওরা ভুলেই গিয়েছে। ওরা সোজাসুজি একেবারে খাড়া পথ বেয়ে উঠে চলেছে। আমি কি ওদের সঙ্গে পারি?

এক ঘণ্টার উপর সমানে উঠছি। তবু পথ আর ফুরোয় না। উপরের দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। নির্মেঘ আকাশে প্রদীপ্ত সূর্য গনগন করছে। মনে হল, চূড়াটা বহু—বহু দূরে। প্রচণ্ড গরম লাগছে। বরফের উপর দিয়ে হাঁটছি, তবু গরমে অস্থির হয়ে উঠেছি! পায়ে জঙ্গল বুট, রবার সোলের জুতো। মোটা উলের মোজাও পরা নেই। পায়ের তলাটা ক্রমশ হিম হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে অস্বস্তিকর এক যন্ত্রণার জন্ম হচ্ছে সেখানে। ফোস্কা পড়ল না কি?

যেমন বিপদ কখনও একা আসে না, তেমনি অসুবিধেও। পাহাড়ে চলার সময় বারবার আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। অসুবিধেগুলো যেন ওত পেতে থাকে। একবার যদি দেখে কোন কারণে আমি কাবু হয়ে পড়েছি, অমনি ওরা চতুর্দিক থেকে আক্রমণ শুরু করে। একেবারে নাস্তানাবুদ করে দেয়। এখানেও আমার সেই দশা হল।

যে মুহূর্ত থেকে পায়ের যন্ত্রণা আমাকে কষ্ট দিতে শুরু করল, অমনি যেন সেই মুহূর্ত থেকেই টের পেতে লাগলাম আমার দৃষ্টিশক্তিও আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। সব ঝাপসা দেখছি। সেই বিপদসংকুল খাড়া চড়াই-এর পথে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ফেলা যে কী ভয়ংকর ব্যাপার, সে কথা মনে করে আমার বুক শুকিয়ে এল। প্রায় অন্ধের মত আমি এগিয়ে চললাম। আমার চোখে ঠুলি-বাঁধা রঙগীন চশমা ছিল। সেই রঙগীন চশমার কাঁচে কুয়াসা জমে যাচ্ছে। একেবারে কিচ্ছু দেখতে পারছিনে।

আমি চশমা ছাড়া চোখে ভাল দেখতে পাইনে। দুই চোখে টি বি'র আক্রমণ হওয়ায় দৃষ্টি বজায় রাখবার জন্য সর্বদা পাওয়ার গ্লাস পরে থাকতে হয়। বীরেনদা আর সুকুমারও চশমার দাস। আমরা তাই বিশেষভাবে অর্ডার দিয়ে স্নো গগল্‌সের সঙ্গে পাওয়ার ফিট্ করে নিয়েছিলাম। বীরেনদা আর সুকুমার তাই পরেই দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমার বেলায় পৃথক ফল হচ্ছে। কারণ আমার ঘাম। গলগল করে ঘাম আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে বের হচ্ছে। চোখ মুখ প্লাবিত করে নামছে লোনা জলের স্রোত। শাঁখ-ফোঁকা একটা ভগীরথকে জোগাড় করতে পারলে "ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন" সম্পূর্ণ হয়ে উঠত। এই ঘামের দরুনই ঠুলি-বাঁধা চশমার মধ্যে অনবরত কুয়াসার সৃষ্টি হচ্ছে। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। পথ দেখতে পাচ্ছি না।

অথচ অভিজ্ঞ সঙ্গীসাথীরা বারবার সাবধান করে দিচ্ছে, আগের দলের লোকেদের পায়ের চাপে চাপে যে পথ সৃষ্টি হয়েছে, সেই পথই নিরাপদ, খবরদার, আমি যেন সে পথের বাইরে পা না ফেলি। বিপথে পা বাড়ান এখানে বিপদকে ডেকে আনা। কিন্তু প্রায়ান্ধ আমার কাছে পথ কোন্‌টা তা ঠাহর হচ্ছে না।

চশমা মুছে নিলেই ত ঝামেলা চুকে যায়? কিন্তু চলতে চলতে মানে উঠতে উঠতে চশমা মুছি কি করে। চশমা মুছতে গেলে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু সেই পলকা পথে দেহের ভার এক সেকেণ্ডের বেশী রাখতে মানা। নরম বরফ তাহলে আমাকে সুদ্ধু টেনে নিয়ে ধসে পড়বে। আর এই ধস শুধু

আমারই বিপদের কারণ হয়ে উঠবে না, আমার নিচে যারা রয়েছে তাদের সর্বনাশও ডেকে আনবে। আমার সে এক কল্পনাতীত স সে মি রা অবস্থা। ভাষায় বর্ণনা করা অসাধ্য। না পারছি চলতে, না পারছি দেখতে, না পারছি চশমা মুছতে, না পারছি দাঁড়াতে।

অবশেষে, প্রতি পদক্ষেপে যা ঘটবার আশঙ্কা করছিলাম, তাই ঘটল। বোধ হয় পথের বাইরে কোথাও আলগা বরফস্তূপে পা দিয়েছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে পতন। মুখ গ‍ুঁজে পড়ে গেলাম। পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড বোঝা ভর্তি রুকস্যাক্ আমার পিঠেরই উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তুষার-গাঁইতির হাতলটা ডান পায়ের হাঁটুতে প্রবলভাবে ঠুকে গেল। ঝিন ঝিন করে উঠল ব্রহ্মরন্ধ্র। সমস্ত শরীরে সুতীব্র যন্ত্রণা প্রবল উল্লাসে যেন নৃত্য শুরু করল। পায়ের তলায়, হাঁটুতে, পেটে, দেহের কোষে কোষে, সমগ্র চেতনায় যন্ত্রণার ঢল নামল। গালে নাকে কপালে শুধু বরফের শীতল স্পর্শ শির শির করে উঠল।

যাক এতক্ষণে নিশ্চিন্ত। আর উঠব না। এবারে বিশ্রাম নেব। কারো কথা শুনেছি না আর। ওদের কথা ঢের শুনেছি। ঢের উঠেছি। আর না। এখন শরীরটাকে বিশ্রাম দেব। যতক্ষণ খুশি, সারা জীবন, যতক্ষণ না শেষ নিঃশ্বাস পড়ছে, শুয়ে থাকব এইখানেই। যারা আমার আগে আছ, তারা আগে উঠে যাও। পিছনে ফিরে চেয়ো না! যারা আমার পিছনে আছ, তারা আমাকে ডিঙিয়ে যাও। আমাকে বিরক্ত করো না। আমাকে নিয়ে টানাটানি করো না। আর দোহাই তোমাদের, হে অভিযাত্রিগণ, হে বাংলার সাহসী বীরগণ, তোমাদের এই অশক্ত সংগীটির অক্ষমতার প্রতি কটাক্ষ করো না। মনে রেখ, এক মুহূর্তের জন্যও সে তোমাদের গলগ্রহ হয়নি, কখনও তোমাদের ভার বাড়ায়নি, কোন অভিযোগ করেনি। তার দেহে যতক্ষণ শক্তি ছিল হাসিমুখে তোমাদের অনুসরণ করেছে' এবার তাকে ছুটি দাও। সে এখন শ্রান্ত বড় ক্লান্ত। সে এখন ঘুমুবে—এই শীতল, এই নরম বরফের হিমস্নেহ শয্যায় সে তার গতিহীন দেহভার লুটিয়ে। আঃ, এখানে কি অপরিসীম শান্তি।

আমার ঘুম পাচ্ছিল। শরীর ঝিমঝিম করছিল। হৃদ্‌পিণ্ডের অতি দ্রুত স্পন্দন যন্ত্রণার সূচ হয়ে বারবার বিঁধছিল।

"সাব্, সাব্..."

কানের ভিতর অজস্র ঝিঁঝিঁপোকা ডাকছে। ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ।

"সাব্, সাব্, মোটা সাব্..."

দারুণ ঝড়ের রাতে ভরা নদীর পুলের উপর দিয়ে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে মেল ট্রেন ছুটে চলেছে। ঝম্ ঝম্ ঝম্।
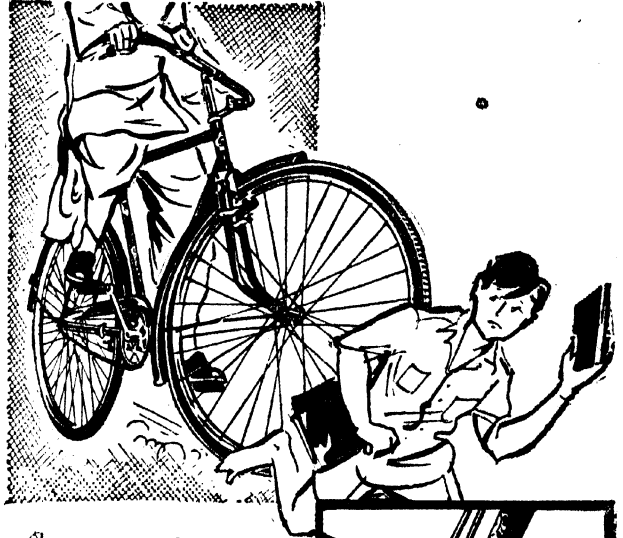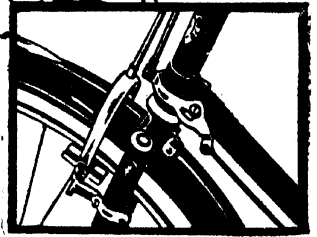
আনন্দধারা থেকে নেমে অভিযাত্রীদল রণ্টির দিকে চলেছেন। বামে বরফে ঢাকা বেথারথোলি হিমাল ও সামনে রণ্টি দেখা যাচ্ছে।

"মোটা সাব্, মোটা সাব্..."

অকস্মাৎ কান পরিষ্কার হয়ে এল। বুকের ধুকপুকুনি শান্ত হয়ে এল। শ্বাস প্রশ্বাস সহজ হয়ে এল। এককুচি বরফ মুখের ভিতর ঢুকে গিয়েছিল। তার তীব্রতা জিভকে সচেতন করে দিল। এতক্ষণে অনেকটা ক্লান্তি ঝরে পড়ল।

"মোটা সাব্, মোটা সাব্, উঠো, উঠো, জলদি।"

আঙ ফুতার ডাকছে।

"জলদি উঠো, জলদি উঠো, আউর থোড়া হ্যায়।"

খুব ভাল লাগল আঙ ফুতারকে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম। আঙ ফুতারকে ঝাপসা লাগল। জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললাম।

বললাম, "ফুতার, কুছ নেহি দেখাই দেতা। চশমা খোল দো।"

"ঠিক হ্যায় সাব্," ফুতার চটপট জবাব দিল। "দেখো মৎ। বহোৎ ধুপ হ্যায়। অন্ধা হো জায়গা। দেখো মৎ সাব্।"

"ঠিক হ্যায় ফুতার। তুম্ খোল দো চশমা।"

আমি চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ফুতার চশমার ফিতে খুলে ফেলল।

বললাম, "ফুতার, উসমে পানি হ্যায়। সাফা করো।"

"ঠিক হ্যায় সাব্। আভি সাফা হোগা। আঁখ্ বন্ধ্ রাখো।"

বললাম, "ফুতার, চশমা লাগা দো।"

"ঠিক হ্যায় সাব্।"

ফুতার চশমা পরিয়ে দিল। সমস্ত পাহাড়টা পরিষ্কার ফুটে উঠল চোখে। ঘামও কমে গেছে। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে শীত করতে লাগল। এও এক তাজ্জব ব্যাপার। দুপুরে রোদে বরফের উপর দিয়ে হাঁটলে গরম লাগে, ঘাম ঝরে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে না নিতেই আবার শীত করে। ফুতার ঠিকই বলেছিল। চূড়ার কাছাকাছি এসে গিয়েছি। তবে এখনও বেশ খানিকটা উঠতে হবে। আর খাড়া চড়াই। আমাকে উপরের দিকে বিপন্নভাবে চাইতে দেখে আঙ ফুতার হাসল। এটা ওর অভয়। আমিও হাসলাম।

বললাম, "ফুতার, লেমন পানি?"

"ঠিক হ্যায় সাব্। লো, থোড়া থোড়া পিও। থোড়া।"

লেমন জল খেয়ে ধাতস্থ হলাম। পুরনো বল এরই মধ্যে ফিরে এসেছে। ইশারা করলাম, আঙ ফুতার, চল।

আঙ ফুতার বলল, "সাব্, রুকস্যাক্ দে দো।"

আমার আত্মসম্মানে ঘা লাগল।

হেসে বললাম, "না, ফুতার। ওটা আমার কাছেই থাক। তুমি চল।"

কখনও ধাপ কেটে কেটে, কখনও বা হাত ধরে টেনে আঙ ফুতার আমাকে বাকি পথটুকু পার করে দিল। চূড়ায় উঠে দেখি পাহাড়টা ওপিঠে একটু ঢালু হয়ে সোজা দক্ষিণে নেমে গিয়েছে। ওদিকে বরফ খুব বেশী নেই।

ধ্রুব, সুকুমার, নিমাই, দিলীপ, আর ধীরেনদা একদৃষ্টে দক্ষিণ দিকে চেয়ে আছে। নিমাই খুশীমনে শিষ দিয়ে "লে লো সুরমা, লে লো" ভাঁজছে। ম্যাপ দেখছে। আর দূরে আঙ্গুল দেখিয়ে বলছে, "ঐ যে বেথারথোলির পুচ্ছ, ঐ যে রণ্টি পর্বতের মাথা। ঐ যে দেখছ এ দুয়ের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে একটা নদী নেমে এসেছে, ঐটে হচ্ছে রণ্টি গড্, রণ্টি নদী, যা খুশি বল না কেন। ঐ নালা ধরেই আমাদের পৌঁছতে হবে রণ্টি হিমবাহে। ঐ পথই নন্দাঘুণ্টির পথ। ক্লিয়ার? সিওর।"

ধীরেনদা ছবি তুলছিল।

বললে, "হ্যাঁ রে, নিমাই, ও নদীটা যে বিশ্বনাথের গলি।"

নিমাই সিটি মেরে বললে, "রাইট্।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এই যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এ পাহাড়টার নাম কি?"

নিমাই ম্যাপ দেখে বলল, "এটা একটা গিরিপথ। কিন্তু এর নাম ত ম্যাপে নেই।"

আমার মনে তখন রোমাণ্টিসিজমের পুলক জেগে উঠেছে। যেন কলম্বাসের মত নতুন কোন দেশ আবিষ্কার করেছি।

বললাম, "তাহলে এর একটা নামকরণ করলে হয় না?"

সবাই হৈ হৈ করে সমর্থন করল। শুধু তাই নয়, নামকরণের সম্মান দলপতি সুকুমারকেই দেওয়া হল।

সুকুমার একটু ভেবে নিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, "যে আনন্দবাজার পত্রিকা বাঙালীদের প্রথম পর্বতারোহণের উদ্যোগ করেছে তার নামের সঙ্গেই আমি এই গিরিপথটির নাম যুক্ত করতে চাই। আজ থেকে এর নাম হোক 'আনন্দধুরা'।"

(ক্রমশ)
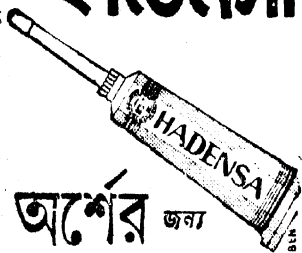
অযাত্রায় জয়যাত্রা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১)

একটা জোট-বাঁধা চক্রান্তের মধ্যেই পড়ে গিয়েছিলাম নাকি? যাতে ড্রাইভার আছে, দোকানীটা আছে, হয়তো পলটুও আছে। কেন বলছি?

মাইল চারেকও যাইনি, পেছনে খানিকটা দূরে একটা টানা হর্নের শব্দ। মনটা ওদিকে পড়েছিল বলে গলা বাড়িয়ে দেখতে যাব, ড্রাইভার হাঁ হাঁ করে চেঁচিয়ে উঠল, বলল—"মুখ ঘোরাবেন না, বাবু; চুন এসে পড়বে চোখে।"

জিজ্ঞেস করলাম—"হর্ন দেয় কিসের?"

"বলা যায় না তো, হয়তো কোন লরি—ক্রমাগতই তো চলছে......"

পাশ কাটিয়ে দিয়ে চলার মাঝেই একটা বাস হর্ন দিতে দিতেই ধুলি উড়িয়ে বেরিয়ে গেল ডান দিক দিয়ে। বৃথা জেনেও প্রশ্ন করলাম—"মজঃফরপুরের বাসটাই তো, না?"

"মনে তো হচ্ছে।" নির্বিকার ভাবে উত্তর দিল।

বৃথা জেনেও প্রশ্ন করলাম—"একেবারে বিগড়ে গেছে বললে না?"

"তাই তো দেখলাম তখন।"

রাস্তার ড্রাইভার বাসের হর্ন ভুল না করাই সম্ভব। অন্তত এটা একেবারে ধ্রুব সত্য যে, পাছে দাঁড় করাই সেই জন্যে ঘুরে চাইতেও দিল না। দুটো প্রশ্নেই মনের বিরক্তির ভাবটা ফুটে উঠেছে, এবার বেশ সোজা রূঢ় করেই ঐ কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ সামলে নিলাম। বুঝলাম দুর্বুদ্ধি সরস্বতী ভর করেছেন। এই অযথা অধৈর্যের কোন ফল নেই, বরং উল্টো উৎপত্তি হওয়ারই সম্ভাবনা। এ ক্ষেত্রে দুটো কটু কথা বলবার জন্যে জিভ চুলকাল—এ দুষ্টু সরস্বতীরই জো পেয়ে এসে ভর করা বইকি।

তাকে ঠেলে সরাতে প্রায় মাইলখানেক গেল লেগে, মনের যত শক্তি আছে সবটুকু নিয়োগ করেও। তারপর বেশ ঠাণ্ডা হয়ে বললাম—"না ভেইয়া, ভেবে দেখছি তুমি ঠিকই করেছ। বোকামি করে দাঁড় করাতে গেলে আবার কোথায় বিগড়ে বসে থাকত।"

"বিগড়োনই ওদের কাজ।"

"খুব ঠিক। তুমি আর একটু জোর করে দিতে পার না।"

দেখেছি অনেক সময় এক একটা কথা বেশ ভালের মাথায় মনে পড়ে গিয়ে অনেক মুশকিল আসান করে দেয়, অনেক বিপদকে রুখে ঠেকিয়ে। আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল পঞ্চাননবাবুর কথা। আমাদের স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার ছিলেন, এদিকে একটু আত্মীয়তাও ছিল আমাদের সঙ্গে। যখনকার কথা তখন সবেমাত্র কিছু দিন হল নতুন আরম্ভ করেছেন কাজ।

কোন কারণে আমরা সেদিন একটু উৎসবের মাতে মেতেছি, শখ হয়েছে লছমী-সাগরে নাইতে যেতে হবে। লছমীসাগর রাজার একটা বিখ্যাত পুকুর আমাদের ওখানে। চারিদিকে উঁচু পাড়, ফুল আর নানারকম দুষ্প্রাপ্য ফলের বাগান। চারি-দিকে ছোট ছোট বড় বড় নাইবার ঘাট। স্নানের হুকুম ছিল, তবে অনেকটা নিয়মকানুনের মধ্যে। ... এই নিয়ম-কানুনের ... যে লোকটা রাখবারি করত তার নামের সঙ্গে একার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে চাইলে নাইতে পারো, নতুবা নয়। এবং যেমন স্বাভাবিক, সে ছেলেদের নাইতে দিতে একেবারে ছিল নারাজ বিশেষ করে বাঙালীর ছেলেদের তো নয়ই। লোকটাকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যেত না এর জন্যে। পুকুর তোলপাড় করতে বাঙালীর ছেলের জুড়ি নেই। পুকুর-নালা-নদীর দেশের ছেলে, অন্য সবার যদি জলে নামলে রক্ত ঠাণ্ডা হয় তো বাঙালীর ছেলের রক্ত যেন আরও টগবগিয়ে ওঠে। তার ওপর কি জল, কি ডাঙা—সবতেই অন্য জাতের ছেলের চেয়ে দুষ্টু বুদ্ধিটা একটু বেশি সক্রিয়। পুকুর থেকে উঠেই চার পাড়ে ফলের বাগান—পীচ, সপাটু, দালিম, পেয়ারা, তুঁত; আম-লিচুর সময় আম লিচু। পুকুর পালিয়ে এক সাঁতার দিয়ে উঠে কে কোন পাড়ে গিয়ে গাছ হালকা করছে খেই পেত না লোকটা। আমাল দিয়ে উঠতে পারত না। সুতরাং, ধুলো পায়েই বিদায় করে দিত; হবে না। আমরা আবার সেদিন গেছি দল-বেঁধে, বেশ একটি পুরু দল। রাজ স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার রয়েছেন, অনেকদিন পরে দিব্যি সাধ মিটিয়ে......

না, সাধ মিটিয়ে পুকুর তোলপাড় নয়,—রাজস্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার সঙ্গে রয়েছেন, কড়া Disciplinarian (এ কথাটার বেশ নিখুঁত ধরে অনুবাদ করা যায় না কেন বলতে পার? ওদের অর্থে নিয়মানুবর্তিতা আমাদের মধ্যে কি কোনকালে ছিল না?)। আমরা একটু সাধ মিটিয়ে নাইবই বলে গেছি, কিন্তু হল না।

একটু এগিয়ে পড়েছিলুম আমরা। তার কারণ অবশ্য আর কিছু নয়, শুধু ছাত্রের চাল আর শিক্ষকের চাল এক হতে পারে না বলেই। পঞ্চানন-বাবুর Discipline আবার একেবারে পায়ের বুড়ো আঙুল পর্যন্ত নেমে এসেছিল। মেপে মেপে পা ফেলে বাংলা দেশের প্রথায় বুকে তেল মালিশ করতে করতে আসছেন বিমর্ষ মুখে আমাদের ফিরে আসতে দেখে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—"কি হল?"

"দিলে না স্যার নাইতে।"

একটু যেন চিন্তা করে নিলেন কি একটা, তারপর বললেন—"দিলে না, তার কারণ নিশ্চয় ওর পুকুরে নাইতে এসে ওরই ওপর চোখ রাঙিয়েছ।"
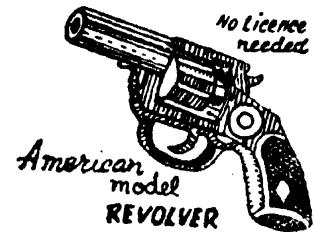
"না স্যার।"

"কিচ্ছু করনি—ঝগড়া বচসা, কিচ্ছু নয়।"

"কিন্তু ওর পুকুর নয় তো স্যার।" একজন বেশ একটু উষ্মার সঙ্গেই বলে উঠল।

ও'র মুখে সূক্ষ্ম একটু যে হাসি ফুটল তার কারণ পরে টের পেলাম অবশ্য, একটু চটিয়ে আসল কথাটা বের করে নিলেন আর কি। প্রশ্ন করলেন—"তা হয়ে হয়েছিল একটু?"

সবাই মাথা হে'ট করে রইল। ভয়ানক কড়া Discipline-এর মানুষ তো, একটা মিথ্যা আরম্ভ করলেও শেষ রক্ষা করা যেত না।

ঝগড়াটুকু যে দরকার ছিল, কাজে লাগাবার জন্যেই প্রশ্ন করছিলেন—সেটাও অবশ্য পরে টের পেলাম।

বললেন—"চলো, এসো আমার সঙ্গে।"

"ও মিছিমিছি বলবে ঝগড়া করেছি স্যার।"

"এমন আর কি তোমাদের চেয়ে বেশি দোষ করবে?...চলো।"

—অর্থাৎ আমরাও তো মিছিমিছিই বললাম, করিনি ঝগড়া।

রাখওয়ার অর্থাৎ রক্ষীর ছোট্ট চালাটা বেশ
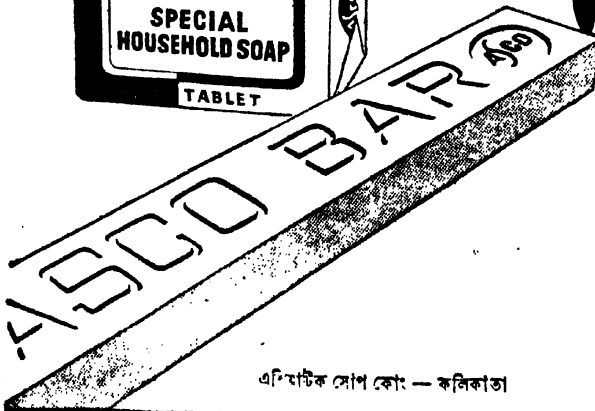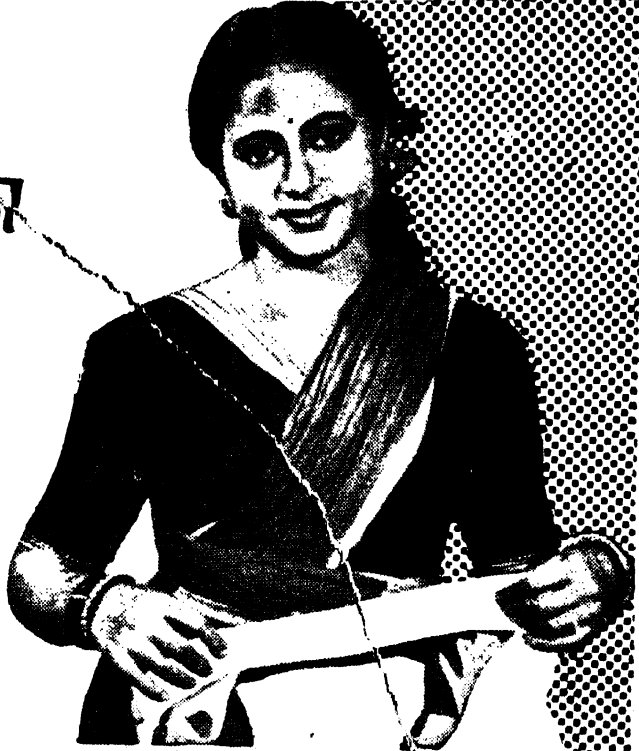
খানিকটা দূরে। তবে আমাদের খেদিয়ে নিশ্চিন্ত না হতে পেরে ও তখনও ঘাটেই তুঁত গাছটার নীচে বসে ছিল. নীচু চোখ একটু তুলে দেখলাম, আমাদের ফিরতে দেখে কটমটিয়ে চেয়ে আছে।

পঞ্চাননবাবু বুকে তেল রগড়াতে রগড়াতে এগিয়ে গেলেন, তুঁততলায় পৌঁছেই প্রশ্ন করলেন—"ইয়ে তালাব আপহিকা জিম্মামে হ্যায় ?"

পঞ্চাননবাবুর অবশ্য বয়স হয়েছে, তবু লক্ষ্য করেছিলাম লোকটা দূর থেকে 'যুদ্ধং-দেহি'র দৃষ্টিতেই চেয়ে রয়েছে ও'র দিকে, প্রতিপক্ষের দলপতিই তো।

প্রশ্নটা শুনেই কিন্তু প্রায় মিলিটারি কায়দাতেই দাঁড়িয়ে উঠে একটা সেলাম ঠুকে দিল, উত্তর করল—"জী হুজুর।"

ব্যাপারটা তুমি নিশ্চয় বুঝলে না। হিন্দীতে "আপ" কথাটার মানে হচ্ছে 'আপনি'। এখন, স্বাধীনতার পর থেকে শুনেছি নাকি বিচারক পর্যন্ত চোরকে 'আপ' বলেই অভিহিত করবেন এরকম নিয়ম হয়েছে; কিন্তু যখনকার ক. বলছি, তখন অত খাতিরের সর্বনাম রাখওয়ার চৌকিদার তো দূরে থাক, আরও অনেক উঁচু স্তরের মানুষেরও স্বপ্নের অতীত ছিল।

যেমন বলেছি, অভীপ্সিত ফলটা সদ্য সদ্যই পাওয়া গেল। শানের বেঞ্চটা ছেড়ে নেমে দাঁড়াতে পঞ্চাননবাবু বসলেন তার ওপর; একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—"এ তো দেখছি মস্ত বড় দায়িত্ব আপনার, এত বড় পুকুর, ফলফুলের বাগান। তা হলে তো ঠিকই করেছেন দেখছি। আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে কেন ?"

"কি ঠিক করার কথা বলছেন হুজুর ?" নীচেই উবু হয়ে বসে প্রশ্ন করল লোকটা।

"এই ছেলেদের ভাগিয়ে দিয়ে। ছেলেদেরই পাল তো পুকুর তোলপাড় করবে, তারপর ফুল তুলবে, ফল পাড়বে......"

জিভ কাটল লোকটা। বলল—"ভাগিয়ে কখনও দিতে পারি হুজুর, আপনাদের ছেলেপুলে। তবে বাবুরা এসেই গালমন্দ আরম্ভ......"

"না স্যার, ওই বরং......"

"হয়েছে !"—দাবড়ানিই দিয়ে উঠলেন পঞ্চাননবাবু, তারপর হিন্দীতেই বললেন—"এত বড় দায়িত্ব যার ঘাড়ে সে কখনও মিথ্যে কথা বলতে পারে না। তোমরাই করেছ ঝগড়া। ও বেচারির স্বার্থ কি ?"

তারপর ওকেই বললেন—"আপনি বলবার আগেই আমি বুঝে নিয়েছিলুম ওরা একটা কিছু হাঙ্গামা বাধিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই ফিরিয়ে নিয়ে এলুম। আমি হচ্ছি রাজ স্কুলের মাস্টার। গোলমালে বোধ হয় ভালো করে মুখ চিনে রাখতে পারেননি, দেখে রাখুন। স্কুলে এসে নালিশ করে চিনিয়ে দেবেন।"

আমাদের বললেন—"এবারে তোমরা যাও।"

"হুজুর, এবারটা মাফ করে দিন।" লোকটা হাত দুটো কচলাতে কচলাতে দাঁড়িয়ে উঠল।

"কাকে ? ওদের ? কী বলছেন আপনি !"

"জী হাঁ, ও'দের কথাই বলছি। এবারটি মাফ করুন। স্কুলের ছেলেই তো।"

একটু যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ভাবলেন, তারপর আমাদের বললেন—"আচ্ছা যাও, আর এমুখো হয়ো না।"

"হুজুর স্নানটুকুও করে নিতে দিন—যখন এসে পড়েছেন, ছেলেমানুষ সব।"

"দ্যাখো, অথচ বলছিলে এই লোক ঝগড়া করেছে তোমাদের সঙ্গে। বেশ, দুটো করে শান্তভাবে ডুব দিয়ে উঠে এসো, যাও !"

"না বউয়া সব, তোমাদের যেমন খুশি স্নান করে নাও।"

—এত মোলায়েম মেজাজের লোক। সম্ভব ওর পক্ষে ঝগড়া ফ্যাসাদ করা ! অনুমতি-টুকু পেয়ে ঘাটের দিকে এগুতে এগুতে শুনলাম—একটু প্রশ্রয়ের চাপা গলায় বলছে—"ছেলেমানুষ সব হুজুর, একসময় আমরাও তো ছিলুম, তাতে আবার স্কুলের ছেলে, একটু বেশী দুরন্ত হয়ই.....

পঞ্চাননবাবু হেঁকে বললেন—"কাটতে পার সাতার, একটু কাটবে তো, কিন্তু খবরদার ফলফুলের দিকে যদি যাও......"

অতটা সাহস হওয়ার কথাও নয়, উনি নিজে রয়েছেন ঘাটে বসে, তবে ফিরে যখন এলাম, উনিও স্নান করে কাপড় কেচে উঠে এসেছেন, দেখি একটি ছোট্ট ঝুড়ি করে এক ঝুড়ি ফল নিয়ে শানের নীচে বসে আছে লোকটা। পীচ, পেয়ারা, পাটু, তুঁত। বলল—"হুজুর, বউয়া লোকদের বাঁটিয়ে দিন আপনি।"

বেশ একটু দমেই গেছি তো, আমরাই তো দোষী সাব্যস্ত হলাম; সেই জন্যেই রাস্তায় এসে নালিশ আর পরিচয়ের হুড়োহুড়ি পড়ে গেল খানিকটা—

"ভয়ানক বদমাইশ স্যার. লাঠি না উঁচিয়ে কথা বলে না, ঐ যে খেঁটে লাঠিটা পেছনে লুকিয়ে ধরে ছিল আপনার সঙ্গে কথা বলবার সময়......"

"বাংলা দেশ ঘুরে-আসা স্যার...এগুলো আরও বদমাইশ হয়......বলে কি স্যার ?—

বাঙালীরা জলের জানোয়ার—জল ঘোলানই কাজ ওদের......"

হ্যাঁ, পরিচয় দেওয়ার সময় একটা কথা বলতে ভুলে গেছি; নিয়মানুবর্তী হওয়ার সঙ্গে আবার খুব প্রাকটিক্যাল ছিলেন পঞ্চাননবাবু।

চুপ করে শুনে যাচ্ছিলেন, সংক্ষিপ্ত উত্তর করলেন—"কার্য উদ্ধারটা তো করে আসতে হবে, যার জন্যে যাওয়া।"

মজঃফরপুরের লরি ড্রাইভারটার কথা বলছিলাম। বুঝছি ওরাই যোগসাজস করে

আমায় বাসটার জন্যে অপেক্ষা করতে দিল না; দেখলাম ওই আমায় একটা ভাঁওতা দিয়ে বাসটা পাশ কাটিয়ে দিল, থামাবার সুযোগটাও নষ্ট করলে ওই, তবু ওরই সাধুতো আর বুদ্ধির বলিহারি দিতে হল। সান্ত্বনা এইটুকু রইল যে বুদ্ধির বলিহারি দেওয়াটায় তেমন কিছু মিথ্যা বলা হয়নি অন্তত।

কথাটা কি জানো? গৃহের নীতি আর পথের নীতি এক করলে দুটোই অচল হয়ে পড়ে। তা যদি বললে তো সব কিছুরই নিজের নিজের আলাদা নীতি আছে। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে "ইতি গজ"—বলিয়েছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রেই, ঘরে পুজোর আসনে বসিয়ে নিশ্চয় বলাতেন না।

বলিহারি দিয়ে বললাম—"ভাইয়া, একটু জোরে চালাও, ট্রেনটা আমার ধরিয়েই দিতে হবে কোনরকম করে?"

ব্যস, যেটুকু পারলাম করা গেল। এর পর বরাত; গাড়ি পেয়ে যাই, বহুৎ আচ্ছা, না পাই, করছি কি?"

বরাত আর চেষ্টা, দৈব আর পুরুষকার, এ দুটোর হদিস পাওয়া গেল না এ পর্যন্ত জীবনে। তবে এটুকু দেখেছি, দুটোকেই ধরে রাখা ভালো। বরাতটা হচ্ছে আমাদের জীবনের ছুটির দিক। "কি আর করা যাবে?" বলে মাঝে মাঝে পাল নামিয়ে হাল তুলে নিয়ে চুপ করে বসে থাকবার একটা বিপুল সার্থকতা আছে। নইলে হাল টেনে আর পালের মোড় ঘুরিয়েই মরতে হয়, তাতে চলমান জীবনের অনেক কিছু থেকেই বঞ্চিত হতে হয় আমাদের।

হঠাৎ কে যেন সেই কথা মনে করিয়ে দিল আমায়। কে যেন আলোর চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিল—ওহে একবার চোখ মেলে দেখো কী বঞ্চিতই না হচ্ছ!

সত্যিই আলোর চিঠি।

আমাদের ট্রাকটা চলছিল রাস্তার দু ধারে দু সারি ঘন সন্নিবিষ্ট গাছের মধ্যে দিয়ে, হঠাৎ সেগুলো শেষ হয়ে গিয়ে দু' দিককার আলো এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল চোখে-মুখে। শরতের দিন-শেষের আলো, খুব সূক্ষ্ম একটু হলুদের ফাগ ছড়ানো তার গায়ে, যেটা আর দু দিন বাদেই হেমন্তে গিয়ে আরও গাঢ় হয়ে উঠবে। আলোর ঠিক এই রূপটি আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। শরতের অন্তরাগ—সে করবে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি; এই তো জানি। আকাশে মেঘের স্তূপে স্তূপে চলবে রঙের খেলা, নীচেও চলবে সেই খেলাই—ধানের ক্ষেতে, দীঘির জলে, কাশের বনে; ধরণী তো আলোর সাতটা রঙকে শত বৈচিত্র্যে ফুটিয়ে তুলতে শরৎকালের মতো আর অন্য কোন ঋতুতেই তয়ের হয় না। দেখেও ত আসছি এতক্ষণ দুধারের গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে। এখানে কিন্তু একেবারে অন্যরকম। আকাশটা একেবারে পরিষ্কার। পেছনের অংশটা দেখতে পাচ্ছি না বলেই আরও মনে হচ্ছে তাই, নীচেও ধানের ক্ষেত ছাড়া আর কিছু নেই—একটানা মাইলের পর মাইল, আর এর মাঝখানে সেই নিরাভরণ আলোক। মনটা হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়; আলো যেন এখানে এক ধ্যানমৌন সন্ন্যাসী, নগ্ন, অচপল, অবিকৃত, চরণ দুটি পদ্মাসনবদ্ধ, জটাজুট অম্বরে লুপ্ত।

ড্রাইভারের হাতটায় একটু চাপ দিয়ে বললাম—"একটু আস্তে করে দিতে পার না এখানটায়?"

"আপনার ট্রেন ধরতে হবে না বাবু? আপনিই তো বললেন"—একটু বিস্মিতই হয়েছে। আমিও একটু অপ্রতিভই হয়ে গেছি, মনে আসা মাত্র কথাটা বলে দিয়ে। মনের কোথা থেকে যে কথাটা উঠে এল, এখন ওকে কী করে বলি? কী করে বোঝাই, গাড়ির কনেকশন আবার অনেক পাব, সারা জীবন ধরে; কিন্তু আজ এই বিশেষ জায়গাটিতেই এই যে বিশেষ লগ্নটি আমার জন্যে এসে পড়েছে, একে আর কবে ফিরে পাব এ জীবনে? জীবনের পর জীবন নিয়ে যে অনন্ত জীবন তাকেই বা আর কবে পাব ফিরে?

লোকালয় এসে পড়েছে। আবার গাছ-পালা, বাড়িঘর, পুকুর বাগান, শহরটা আস্তে আস্তে আরম্ভ হচ্ছে। লরির গতিবেগ আপনিই এল কমে, হর্নের আওয়াজ গেছে বেড়ে, আর শুধু আমাদেরই নয়। এরই মধ্যে কখন সূর্যাস্ত হয়ে গেল টের পাইনি। ...অন্ধকার নেমে এল ধীরে ধীরে, শহরের বিজলীবাতির আওতায় এসে পড়েছি আমরা। আমার আকস্মিক পরিক্রমা শেষ করে আবার ফিরে এসেছি মজঃফরপুরে। আমার এই কটা ঘণ্টার টাটকা অভিজ্ঞতা, অমন বর্ণাঢ্য ভুলের ফসল স্বপ্নের মতো ফিকে হয়ে এসেছে; তার জায়গায় রূঢ় বর্তমান তার যত সমস্যা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—বুকটা ধড়ফড় করছে—গাড়ি পাব তো?—না পেলে!

আরও একটা ছিল আপাতত। তবে সেটা এত সুদূর, এখন প্রায় অসম্ভবের কোঠায় যে মাঝে মাঝে মনের মধ্যে উঁকি মেরে একটু অস্বস্তি জাগালেও তেমন কিছু চিন্তার বিষয় হয়ে উঠতে পারে নি। অথচ আশ্চর্য, এইটেই শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল সত্য, প্রবল-ভাবেই সত্য।

আর গাড়ি? আমি প্রায় মিনিট আটেকের মাথায় পৌঁছেছি; লরিটা স্টেশন প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াতে একটা কুলি ডেকে তাকে মোটঘাটগুলো নামিয়ে নিতে বললাম—পাটনার গাড়ি ধরতে হবে...এপারে, না, পুল পেরিয়ে?

ধীরে সুস্থে মাথায় পাগাড়ি বাঁধতে দেখে বিরক্তভাবেই তাগাদা দিতে জানাল—"গাড়ি এক ঘণ্টা লেট বা।"

রবীন্দ্রচর্চা

রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প। সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত। কথাশিল্প, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পাঁচ টাকা।

শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত গ্রন্থ-প্রকাশে প্রকাশক ও এই প্রসঙ্গে উদ্যোগী সম্পাদকদের উৎসাহ সম্প্রতি অতি প্রকট। সমগ্র বিষয়টির মধ্যে একটা ব্যবসায়িক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ-উপলব্ধ কোনো মহৎ ও সর্বগুণে-গুণান্বিত পুরুষ নন; ইতিপূর্বেও তাঁকে নিয়ে ব্যাপক আলোচনার সুযোগ ছিল; কিন্তু, যুগপৎ দুঃখ ও বিস্ময়ের বিষয়, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন আলোচনা ব্যতীত অনতিগতকাল পর্যন্ত শতবার্ষিকী বছরের তুলনায় বহুলাংশে তিনি উপেক্ষিতই ছিলেন। আজকের যে-কোনো উদ্যোগ, সুতরাং, উদ্যোগের সংনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ জাগায়। শ্রীযুক্ত সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প' সংকলন গ্রন্থ হাতে পেয়ে বর্তমান সমালোচকের মনে সংগত কারণে, প্রাগুক্ত ধারণা জন্ম নিয়েছিলো। কিন্তু, সূচনার অসংগতি বাদ দিলে আলোচ্য সংকলন গ্রন্থটি বস্তুত একটি সমাদরযোগ্য প্রয়াস বলতেই হবে। বিশেষত, যে-কারণে এই সংকলনটির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, এ-গ্রন্থের রচনাকারেরা কেউই রবীন্দ্রনাথের পোশাকী সমালোচক নন, অন্তত ইতিপূর্বে তাঁদের কেউই সেই খ্যাতি অর্জন করেন নি। রবীন্দ্র কর্মপরিধির বিভিন্ন দিক ও অংশ নিয়ে কয়েকজন 'তরুণ ও অনতিতরুণ' অধ্যাপক এবং তাঁদের বাইরে দু'এক সং অনুসন্ধিৎসু, বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকসম্পাতের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের প্রয়াস সর্বক্ষেত্রে সমান সার্থক নয় কিন্তু সম্মিলিতভাবে এইসব রচনা একটি নিজস্ব ভাবমণ্ডল সৃষ্টিতে সক্ষম; এবং অন্তত, চারটি প্রবন্ধ চিন্তাকে সমৃদ্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রবন্ধগুলির বিশদ আলোচনার সুযোগ ও পরিসর এখানে নেই। চারটি বিশিষ্ট প্রবন্ধের উল্লেখ করা কর্তব্য। যথাক্রমে : (১) 'রবীন্দ্রনাথের কবিতায় চিত্রকল্প'—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত; (২) 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনীতিক'—হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী; (৩) 'সুফীতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথ'—হরেন্দ্রচন্দ্র পাল; এবং (৪) 'নাটকের গান, রবীন্দ্রনাথের নাটক'—শঙ্খ ঘোষ। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের চিত্রকল্প বিষয়ক নিবন্ধটি সংক্ষিপ্ত হ'লেও প্রাঞ্জলতা ও আলোচ্য বিষয়ের নিপুণ বিশ্লেষণে মৌল স্বাদযুক্ত। 'সুফীতত্ত্ব ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি, যতদূর স্মরণ হয়, এই বিষয়ে প্রথম আলোকসম্পাতের চেষ্টা, সেজন্য প্রশংসনীয়। হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শঙ্খ ঘোষ তন্নিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন বিষয়ের সরলীকরণে। এ-ছাড়া অশ্রুকুমার সিকদারের 'রবীন্দ্রনাথের সনেট' এবং সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের 'হিন্দীকাব্যে রবীন্দ্রপ্রভাব' উপভোগ্য রচনা।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিভিন্ন দিক অন্বেষণে এই গ্রন্থটি বিশেষ সাহায্য করবে ব'লেই আমাদের বিশ্বাস।

১৮৮।৬১

ছোট গল্প

এক দুই তিন—শংকর। বাক্‌সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। তিন টাকা আট আনা।

এই দশকে বাঙলা উপন্যাস এবং গল্প মোড় বদলেছে। বিষয়বস্তুতে, উপকরণে এবং উদ্ভাসনে। সাংবাদিক তথ্য, নিষ্ঠা, অনুসন্ধিৎসা এবং সমবেদনা নিয়ে যে লেখকবৃন্দ বর্তমান কালে এগিয়ে এসেছেন এবং অল্প লিখেই নাম করেছেন, তরুণ ছদ্মনামী লেখক শংকর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বর্তমান গ্রন্থটি অবশ্য উপন্যাস নয়, দীর্ঘাকৃতি তিনটি ছোট গল্প-সংগ্রহ। নিছক প্রেমের গল্প বলেননি লেখক, তাঁর ভঙ্গিটিও গতানুগতিক নয়। প্রেমের অবিস্মরণীয় বিদ্যুচ্ছমকে তিনি মানুষের সত্তা, নিষ্ঠা ও সামাজিক মূল্য বিচার করেছেন। নারীত্ব সম্বন্ধে, নরনারীর নানাবিধ প্রাবৃত্তিক চেতনা সম্বন্ধে আমাদের দীর্ঘকালীন একটা অন্ধসংস্কার আছে। শংকর সেই সংস্কারের মূলে আঘাত করেছেন। এক-এ চন্দ্র, দুই-এ পক্ষ তিন-এ নেত্র,—এই তিনটি গল্পই এক দুই তিন নাম নিয়েছে গ্রন্থ-কলেবরে। লেখকের ভাষাটি অনাড়ম্বর এবং সুন্দর।

৬৩।৬১

উপন্যাস

অমৃতের স্বাদ—শক্তিপদ রাজগুরু। সত্যব্রত লাইব্রেরী, ১৯৭, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য আট টাকা।

শক্তিপদ রাজগুরুর নবতম উপন্যাসটির গতি প্রথম দিকে শ্লথ এবং ফলে একটু এক ঘেয়ে লাগলেও পরবর্তী পর্বে কিন্তু পাঠক নিজেকে আর একাকী মনে করতে পারেন না। মানুষের জীবন জয়যাত্রার সঙ্গী হিসাবে রামকুমার-শেলী-গৌরী-ফৈয়জের সঙ্গে পাঠকের একাত্ম হয়ে যেতে দেরি হবে না। কাহিনীর গতি প্রথম দিকে অত্যন্ত ধীর, এবং পরে মৃত্যুর ঘনঘটা এর গাম্ভীর্যকে অনেক হ্রাস করেছে। গ্রন্থের গ্রামবাংলার বিচিত্র জটিল সামাজিক অনুশাসন শরৎচন্দ্রের আমলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিচ্ছেদ আর মিলনের প্রাচুর্যে হয়তো কাহিনীর সূত্র হারিয়ে যেতে পারে—তবু একটা সুর আবিষ্কার করা যায়—যার টানে পাঠকের মনও অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করে কাহিনীর গৌর আর গৌরীর মতো। কাহিনীটি আমাদের আনন্দ দিয়েছে। কয়েকটি উর্দু রুবাইয়ৎ-এর ব্যবহার কাহিনী ও পরিবেশকে মর্যাদাদান করেছে। গ্রন্থসজ্জা মনোরম।

২৫৮।৬০

রাণী পালংক—বিজন ভট্টাচার্য। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সমাজের পরিভাষায় যারা অন্ত্যজ, অনাদৃত, গ্রামবাংলার শ্রমজীবি, তথাকথিত নিম্নমধ্যবিত্ত তাদের আশা-আকাঙ্খা আনন্দ-বেদনার মর্মবাণীটিকে তুলে ধরতে শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্য ইতিপূর্বে তাঁর অন্যান্য রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থটির পরিবেশ রচনায়ও তার ব্যতিক্রম নেই। আলোচ্য উপন্যাসে পদ্মাপারের সম্ভাবনাময় এক হৃদয়বান কাষ্ঠশিল্পীর বেদনাঘন কাহিনী পল্লবিত হয়েছে। নিষ্ঠা ও একান্ত সাধনায় সৃষ্ট মনোরম একটি পালংক একদা শিল্পীর খ্যাতিকে প্রসারিত করেছিল। কিন্তু সময়ের করুণ চক্রান্তে বাস্তুত্যাগের পরোয়ানায় তার জীবনস্রোত গতি হারাতে বাধ্য হলো। লেখকের সহানুভূতিবোধ প্রবল—শিল্পীর অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশে, এবং নাটকীয় পরিমণ্ডল রচনায় উপন্যাসকারের বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪।৬১

বিদেশী সাহিত্য

দি হ্যাপী ওয়ারিয়রস। হ্যালডর ল্যাক্‌সনেস। রূপা অ্যান্ড কোং, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। তিন টাকা।

যথাযোগ্য অনুবাদের অভাবে, অন্তত ইংরেজি অনুবাদের অভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে সকলের পরিচয় ঘটে না। নোবেল পুরস্কার ভিন্ন তাঁদের অনেকের উপন্যাসই আমাদের সামনে কখনো উপস্থিত হয় না। হ্যালডর ল্যাক্‌সনেস একেবারে সেই পর্যায়ের লেখক না হলেও ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পরেই আমাদের কাছে সম্যক পরিচিত হন।

দি হ্যাপী ওয়ারিয়রস্ তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস। ইংরেজী সমকালীন উপন্যাসের সঙ্গে বর্তমান লেখকের বিষয়-নির্বাচন এবং রচনাশৈলীতে বেশ ব্যবধান আছে। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ভাইকিংদের ঘনঘটাময় জীবন তাঁর কাহিনীর উপজীব্য হয়ে উঠেছে। নির্লিপ্ত লোকগাথার ভঙ্গিতে তিনি উপন্যাসের কাহিনী সাজিয়েছেন এবং নীরবেই তিনি তাঁর বক্তব্য ফুটিয়ে তুলেছেন।

বর্তমান উপন্যাসের নায়কযুগল, টরজিয়ের ও টরমড, এই দুই ভ্রাতা, প্রাচীন-কালের অতিশয় বীরপুরুষ, তাদের অলৌকিকপ্রায় দ্বন্দ্ব, প্রেম, প্রতিহিংসা এবং স্মরণীয় কীর্তিকলাপের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে কখন এযুগের অপভ্রংশ মানব-গোষ্ঠীর নিহত ভাগ্যের অংশীদার হয়ে পড়েছে। ইতিহাস কিংবা লোকশ্রুতি তাঁর কাছে গতানুগতিক বা মৃত অতীত নয়, তার মধ্যেও আধুনিক পরিভাষা ফুটে বেরিয়েছে।

ভারতীয় সংস্করণে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি কৌতূহলী পাঠকদের আনন্দ দেবে আশা করি। ২৯২।৬০

অনুবাদ গ্রন্থ

দি মুন অ্যান্ড সিক্স পেন্স। সমারসেট মম। অনুবাদকঃ অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়। রীডার্স কর্নার, ৫, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। ৫৲ টাকা।

সমারসেট মমের সাহিত্যিক পরিচিতি বাঙালী পাঠকের কাছে আজ বাহুল্যমাত্র। 'দি মুন অ্যান্ড সিক্স পেন্স' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসটির একটু ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। বায়োগ্রাফিক্যাল নভেলের পর্যায়ে পড়ে এটি। অনুমান করা হয়, বিখ্যাত ফরাসী চিত্রশিল্পী পল গগাঁ-র জীবনের অনুকৃতি আছে আলোচ্য উপন্যাসে। কাহিনী, চরিত্র এবং ভাষার গুণে উপন্যাসটি পাঠকের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। উপন্যাসের নামকরণও চমকপ্রদ।

এই জনপ্রিয় উপন্যাসটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হল। অনুবাদক তাঁর সাধ্যমত মূল লেখকের ভাষা এবং ভঙ্গি অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর রচনা ঈষৎ স্পর্শকাতর, উচ্ছ্বসিত মনে হল। ভাষা আরও জোরালো হলে ইংরেজী মেজাজটা বজায় থাকতো। কোন কোন শব্দের উচ্চারণে আমাদের আপত্তি আছে। কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন অনুবাদকের প্রাপ্য। ১৩৮।৬১

মহাশূন্যের রহস্য—উইলি লে। অনুবাদকঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। ১·৫০ নঃ পঃ।

মানুষ চিরকাল রহস্যজীবী। কোন-না-কোন রহস্য নিয়ে প্রতিটি যুগের মানুষই নিরতিশয় ব্যস্ত ছিল। ঈশ্বর-রহস্য ছিল দীর্ঘকাল মানুষের জ্ঞাতব্য বিষয়। বিজ্ঞান-সভ্যতার চূড়ান্ত অধ্যায়ে এসে ঈশ্বর মানুষের অনুসন্ধিৎসা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এখন মহাশূন্যের রহস্য মানুষের মাথায় ঘুরছে। শূন্য শুধু শূন্য নয়, একথা জেনে ফেলবার পর থেকে হাতে-কলমে, কাগজে-কলমে মহাশূন্যের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছে। পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, মানুষ নিজের মর্ত্যসীমা লঙ্ঘন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে। তার ফলে মহাশূন্য ও মহাশূন্য-যান সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। লেখক উইলি লে স্বচ্ছ ভঙ্গিতে গ্রহ-গ্রহান্তর, রকেট-ক্ষেপণাস্ত্র, কৃত্রিম উপগ্রহ, মহাশূন্যের বিবিধ উপসর্গ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। অনেকগুলি প্রাসঙ্গিক আলোকচিত্র সংযুক্ত করা হয়েছে। অনুবাদ ভালোই হয়েছে। ৫৩১।৬০

নানার হাতি—ভৈকম মুহম্মদ বশীর। অনুবাদ—নিলীনা আব্রাহাম। প্রকাশক—সাহিত্য আকাদেমীর পক্ষে ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—২৲ টাকা।

আধুনিক মালয়লম ভাষার লেখকদের মধ্যে ভৈকম মহম্মদ বশীরের নাম উল্লেখ-যোগ্য। আন্তর্ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে সাহিত্য আকাদেমী বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যকে প্রচার করার চেষ্টা করছেন। সাহিত্য আকাদেমীর পক্ষে ত্রিবেণী প্রকাশন এ-ব্যাপারে উৎসাহ প্রকাশ করে বাংলা দেশের পাঠকদের কাছে ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

নানার হাতি একটি করুণ কাহিনীর সুখদ পরিণতি। একটি মুসলমান পরিবার কেমন করে অত্যন্ত বড় অবস্থা থেকে দারিদ্র্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিলো, এ উপন্যাস তারই একটি বাস্তব চিত্র। লেখকের দেখার গুণে পারিবারিক খুঁটিনাটিগুলো আশ্চর্য রকম সত্যরূপে ফুটে উঠতে পেরেছে। অথচ লেখার মধ্যে কোথাও একটু গুরুগম্ভীর চাল নেই। তার কারণ সমস্ত কাহিনীর ঘটনাগুলোকে একটি তরুণীর চোখের সামনে তুলে ধরেছেন লেখক, আর সে মেয়েটি তার অনভিজ্ঞ মন দিয়ে বুঝে নিতে চেষ্টা করছে সমস্ত কিছুকে। সে সঙ্গে দুঃখ বেদনার ফাঁকে ফাঁকে বিকশিত হয়ে উঠছে তার প্রেম। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতগুলো চরম হয়েও যেমন অনাড়ম্বর, চরিত্রগুলোও তেমনি পরস্পর-বিরোধী হয়েও সহজ সরল। তার ফলে নানার হাতি সমস্যামূলক উপন্যাস হওয়া সত্ত্বেও দুর্বোধ্য মননধর্মী নয়, সরল একটি কাহিনী-নির্ভর উপন্যাসই।

অনুবাদিকার কৃতিত্বও এ-সাফল্যের জন্য অনেকাংশে দায়ী। ভাষার সরলতা এবং যোগ্য শব্দচয়ন ও সুন্দর কাব্যবিন্যাস উপন্যাসটিকে অত্যন্ত সুখপাঠ্য করে তুলতে পেরেছে। ৭৭।৬১

আমারি আঙিনা দিয়া। অনুবাদকঃ সরিৎশেখর মজুমদার। অটোপ্রিন্ট এন্ড পাবলিসিটি হাউস, ৪৯ বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬। দাম তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'মেন নেভার নো' উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ-কাল ১৯৩৫। এই উপন্যাসটির সম্বন্ধে কম্পটন ম্যাকেঞ্জী বলেছিলেন, এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির একটি। আর এই উপন্যাসের লেখিকা ভিকি বম সম্বন্ধে জে. বি. প্রিস্টলি বলেছেন: উপন্যাসের গঠন, লেখিকার নৈর্ব্যক্তিকতা এবং ক্ষমতা নিঃসন্দেহে অসাধারণ।

উপন্যাসটির পটভূমি বার্লিন এবং প্যারী শহর। ঘটনাকাল মাত্র পাঁচটি দিন। চরিত্র সংখ্যা গুটিকয়েক। পরিণতি বিয়োগান্ত। এক তরুণী জননীর তীব্র প্রেমলিপ্সা যা কিনা তাকে অমোঘ দুর্ঘটনার দিকে ঠেলে দিল। ইভলীন যেন সেই প্রমত্ত পতঙ্গ, তাই বুঝি প্রেম তাকে দিল মৃত্যুর উপহার।

উপন্যাসটির প্রধানতম আকর্ষণ এর আঙ্গিক। সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণটি শিল্পসম্মত। তথাপি গল্পস্রোত অব্যাহত।

অনুবাদক ভাষার ব্যবহারে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছেন। বিদেশী শব্দের, ভঙ্গির অনুসঙ্গ, ব্যঞ্জনা এবং অর্থময়তা তার অনু-বাদ কর্মে বাধা পড়েনি, ফলস্বরূপ উপন্যাসটির গতি আড়ষ্ট, কিংবা বলি শিথিল।

পরিশেষে অনুবাদকের কাছে একটি বিনীত নিবেদন যে, মূল উপন্যাসটির নাম ছিল মেন নেভার নো, বাংলা ভাষায় অনূদিত

হলে কী করে মূলে নামটির এমন আমূল পরিবর্তন ঘটে তা বর্তমান সমালোচকের বুদ্ধির অগম্য। ১৩৫।৬১

মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড : জুলে ভার্ন। অনুবাদক : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ৩·৫০।

প্রায় সকল দেশে, এবং সকল বয়সের পাঠকের কাছে প্রিয় হবার সৌভাগ্য কম লেখকের ভাগ্যেই ঘটে। জুলে ভার্ন এমন একজন লেখক যিনি সকল দেশ এবং সকল বয়সের পাঠকের কাছে এই দুর্লভ ভালোবাসা লাভ করেছেন। তাঁর রচনার বিষয় বিজ্ঞানসম্মত, রহস্য রসসমৃদ্ধ।

এই রচনাটি পাঠে স্বভাবতই পাঠকের ডানিয়েল ডিফোর রবিনসন ক্রুসোর কথা সহজেই মনে পড়তে পারে, কিন্তু একথা স্মর্তব্য যে পূর্বসূরীদের সমস্ত প্রভাব মেনে নিয়েও এটি জুলে ভার্ন-এর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসরূপে পরিচিত। এই উপন্যাসে তরুণ হার্বার্ট, নাবিক পেনক্রাফট, সাংবাদিক স্পিলেট, ক্যাপ্টেন হার্ডিং, ভৃত্য নেব ও একটি পোষমানা প্রভুভক্ত কুকুর ঘটনাচক্রে এই কয়েকজন একটি নির্জন দ্বীপে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তিনটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তারপর তাঁদেরই তীব্র ক্লান্তি ও অনমনীয় উদ্যমের কথা বিবৃত হয়েছে। মূল কাহিনীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে এমন রসগ্রাহ্য অনুবাদ পাঠক বিস্মিত করে। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে বহু মূল্যবান রচনার অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বুঝি তাঁর অনায়াসসাধ্য স্বচ্ছ এবং কাব্যধর্মী ভাষা ব্যবহার, আকর্ষণীয় রচনাশক্তি তার অনুবাদ কর্মকে মনোগ্রাহী করে তুলেছে।

(১৪০।৬১)

কবিতা

ছয় ঋতু সাত রঙ। অজিত মুখোপাধ্যায়। কথাকলি। এ ১২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। দাম দু টাকা।

ছয় ঋতু সাত রঙের কবি অজিত মুখোপাধ্যায় কবিতা পাঠকের কাছে পূর্ব পরিচিত। পত্র পত্রিকায় ইতস্তত তাঁর কবিতার প্রকাশ ঘটেছে। ছন্দের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকাসত্ত্বেও কোন কোন কবিতার অংশে কবির ক্ষমতার প্রকাশ ঘটেছে। পরিশেষে কবির কাছে নিবেদন, এই কাব্যগ্রন্থের জন্য এমন একটি বালকসুলভ ভূমিকার কি বিশেষ প্রয়োজন ছিল? এই কাব্য গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা করেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী। ১২৯।৬১

অন্ধকারের বেদনা থেকে। রবীন্দ্র অধিকারী। বুক নিউজ। ৩১।৪ রামকান্ত বোস লেন, কলিকাতা—৬। দাম দু টাকা।

ভাবের সুসম্বন্ধ প্রকাশের উপর নির্ভর করে কবিতার সার্থকতা। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে এই প্রকাশের অভাব ঘটে, তাকে আর তখন কবিতা বলা চলে না। তখন অন্য কোন নামে তাকে অভিহিত করতে হয়। এই কাব্যগ্রন্থ পাঠের পর সৎ-কাব্য পাঠকের এই কথাটি মনে হওয়া স্বাভাবিক।

অন্ধকারের বেদনা থেকে কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় অত্যন্ত দীন কণ্ঠে কবি জানিয়েছেন যে : আমি কবি নই। কবিতা লেখক। আসলে হয়ত প্রচ্ছন্ন পদ্য লেখক। ...এ গ্রন্থে কোন মহৎ আবেগ-অভিঘাত নেই। এই কাব্যগ্রন্থে কবিতা সংখ্যা একত্রিশ, পৃষ্ঠা সংখ্যা আটচল্লিশ। আশ্চর্যের বিষয় ভূমিকার বিনীত সরল নিবেদনটির পরবর্তী কাব্যাংশে এমন সার্থক অনুসরণ ইতিপূর্বে কোন কাব্যগ্রন্থে দৃষ্ট হয়নি।

১৩৩।৬১

জ্যোতিষ শাস্ত্র

প্রশ্ন ও রেখা বিচার—শ্রীচূড়ামণি বন্দ্যোপাধ্যায় (তারাচাঁদ দাস এন্ড সন্স), ৮২ আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৫, তিন টাকা।

ফলিত জ্যোতিষ, রেখা বিচার ও প্রশ্ন গণনা এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়বস্তু। ফলিত জ্যোতিষের মূল কথাগুলি বলে ও বিভিন্ন চক্র সন্নিবেশ করে সেইগুলি বুঝিয়ে লেখক রেখা বিচার সম্বন্ধে বিশদভাবে বলেছেন। যাঁদের হাত দেখা ব্যাপারে আগ্রহ ও কৌতূহল আছে, তাঁদের বইখানি ভালো লাগবে আশা করি। নষ্টদ্রব্য গণনা ও প্রশ্ন গণনার পরিচ্ছেদগুলিও লেখক সরলভাবে বলেছেন। ১৭৪।৬১

চিত্র-পরিচয়

Twelve Paintings by Rabindra Nath Tagore

রবীন্দ্র শতবর্ষ উপলক্ষে টাটা আয়রন এ্যান্ড স্টীল কোম্পানী লিঃ রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত বারোটি ছবির একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেছেন। ছাপা বাস্তবিকই চমৎকার। দাম আট টাকা। প্রত্যেকটি ছবিই ঘরে বাঁধিয়ে রাখার উপযোগী। প্রকাশক ছবিগুলির কোনও নামকরণ করার চেষ্টা করেন নি। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রদর্শনী আমরা এই শতবর্ষে উপলক্ষে এবং আগেও দু চারটি দেখার সুযোগ পেয়েছি। সব স্থানেই লক্ষ্য করেছি রবীন্দ্রনাথের ছবির নামকরণ করার অদম্য কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনও নিজের ছবির নাম দিতেন না। কারণ, কোনও বিশেষ ভাবকে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি চিত্ররচনা করতে বসতেন না। তুলি বা কলম নিয়ে বসতেন আঁকিবুকি কাটতে—যা বেরোতো তাই হয়ে উঠতো চিত্রবিচিত্র। সুতরাং রবীন্দ্র চিত্রকলার নামকরণ করতে যাওয়া অসমীচীন। সে অসমীচীনতা এই অ্যালবামে লক্ষ্য করা যায় নি। এই অ্যালবামে ছবিগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ রচিত কয়েকটি পত্রাবলী থেকে এবং দু একটি গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু অংশ তুলে তাঁর চিত্রকলা সম্বন্ধে একটি চমৎকার প্রবন্ধও যোগ করা হয়েছে। রবীন্দ্র চিত্রকলা সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা অনেকে পোষণ করেন। সেসব ধারণা সংশোধিত হতে পারে এই প্রবন্ধ পাঠ করলে। অ্যালবামটি বাস্তবিকই লোভনীয়।

২০৫।৬১

বিবিধ

নিজের ডাক্তার নিজে : ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য : ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ : দু' টাকা প'চাত্তর নয়া পয়সা।

শুনেছি ডাক্তারও নিজে অসুস্থ হলে নাকি অন্য ডাক্তার ডাকেন চিকিৎসার জন্য। অথচ আলোচ্য গ্রন্থে ডাক্তার-লেখক সবাইকে নিজের ডাক্তারি নিজে করতে বলছেন। তবে ডাক্তারি অর্থে লেখক এখানে রোগের চিকিৎসার কথা বলেন নি। বলেছেন শরীর এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাধারণ কতকগুলি সাবধানতার কথা যা সকলেরই জানা এবং মেনে চলা প্রয়োজন। যে সম্পর্কে সুষ্ঠু কোন জ্ঞান না থাকলে আমরা হয় অকারণে রোগ-বাতিকগ্রস্ত হই নয়তো অযৌক্তিকভাবে বেপরোয়া হয়ে রোগকে অবহেলা করি। বলা-ই বাহুল্য রোগ এবং সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে এই দ্বিবিধ মনোভাবই সমভাবে পরিহার্য।

আমাদের জানা উচিত কিভাবে সাধারণ শরীরচর্চা এবং খাদ্য নিয়ন্ত্রণ দ্বারা রোগকে এড়ান যায় অথবা এড়াতে না পারলে কখন ডাক্তার ডাকাই উচিত। রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা বিশেষজ্ঞের কাজ। সেই বিশেষজ্ঞকে ডাকতে অবহেলা করলেও বিপদ।

খুব সহজভাবে লেখা সাধারণের উপযোগী এই জাতীয় বই ইংরেজীতে অনেক

থাকলেও বাঙলায় এই ধরণের বই-এর খুবই অভাব। বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ ভট্টাচার্য আলোচ্য বইটিতে এই অভাব অনেকটা মিটিয়েছেন। রচনাভঙ্গী সহজ। কোন কথা বুঝতেই দুবার পড়তে হয় না। কাজেই নাম শুনে সাধারণ পাঠকের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। ১৬।৬১

শ্রীশ্রীব্রজধাম ও গোস্বামিগণ—(দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড) শ্রীগোবর্ধন দাস কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৮৲ টাকা।

মহাপ্রভুর অনুগত ছয় গোস্বামীর জীবনী এবং তাহাদের প্রণীত গ্রন্থমালার সম্বন্ধে গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দার্শনিকতার বিচার এবং তাহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রজ মণ্ডলের তীর্থ-সমূহের প্রকটনকল্পে শ্রীমৎ রূপ এবং গোস্বামী লোকনাথ মহাপ্রভু কর্তৃক প্রথমে প্রেরিত হন। আলোচ্য গ্রন্থে ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সাধ্য এবং সাধন সম্পদ সম্বন্ধে মোটামুটি বেশ স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। গোস্বামীবর্গের গ্রন্থের আলোচনাংশ বিশেষ মূল্যবান, যুক্তি সারগর্ভ এবং সুচিন্তিত। জিজ্ঞাসু সমাজ পুস্তকখানি পাঠে উপকৃত হইবেন। ২২।৬১

গোস্বামী তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানস—(তৃতীয় খণ্ড) শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য প্রণীত। চিরঞ্জীব ঔষধালয়। ১৭০ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট (বহুবাজার), কলিকাতা-১২। মূল্য প্রতি খণ্ড ৩৲ টাকা।

সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের প্রণীত রামচরিত মানসের তৃতীয় খণ্ড পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিলাম। তুলসীদাস কৃত রামচরিত মানস হিন্দী সাহিত্য ভাণ্ডারে সমুজ্জ্বল রত্ন। আলোচ্য গ্রন্থে মূল, মূলের প্রতি-শব্দের বাংলা অর্থ, পদ্যানুবাদ এবং প্রতি শ্লোকের সারমর্ম প্রদত্ত হইয়াছে। ভাষা সুমধুর এবং প্রাঞ্জল। বাঙালীর ঘরে ঘরে আমরা সংগ্রন্থের প্রচার কামনা করি। সমাজের সাংস্কৃতিক সংস্থিতি এবং নৈতিক আদর্শের সমুন্নতির পক্ষে এমন প্রয়োজন ঘটিয়াছে। গ্রন্থকার এজন্য জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন। ২১।৬১

Religion and Realisation—Diamond. Published by Sri Sunil Chandra Banerjee, Sura-Dham, 1, Kali Banerjee Lane, Howrah. মূল্য ...

ধর্ম ও ধর্মসাধনা সম্বন্ধে কয়েকটি চিন্তার সমন্বয়। তবে আগাগোড়া রচনা হিন্দুধর্মকে ভিত্তি করেই। প্রয়োজনে শ্রীরামকৃষ্ণের বহু মূল্যবান বাণী উদ্ধৃত করা হয়েছে। কৌতূহলী পাঠকদের গ্রন্থটি ভালো লাগবে আশা করা যায়। ৪৫৫।৬০

ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা— শিক্ষাবিদ্। প্রকাশক—দি বুক ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৪, রিপন স্ট্রীট, কলিকাতা-১৬। দাম—১৲

অত্যন্ত সহজে ভারতে শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করে লেখক শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষাসমস্যার স্বরূপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। বইটি যত ক্ষুদ্রই হোক, বিষয়বস্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং লেখক তাঁর মর্যাদারক্ষার দিকে সজাগ দৃষ্টিও রেখেছেন। সুতরাং শিক্ষিত বাঙালীর কাছে বইটি আদর পাবে বলে আশা করা যায়। ৩৫।৬১

তলিয়ে যাবার আগের কাঁদন—সুধাংশু-মোহন ভট্টাচার্য। প্রকাশক—দেশ প্রকাশনী, ১৪৬, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—৩৲ টাকা।

জমিদারি-উচ্ছেদ বিল প্রবর্তিত হয়ে গেছে। শতাধিক বৎসর ধরে যাঁরা পুরুষানুক্রমে জমিদারি চালিয়ে এসেছেন, আর যাঁরা তাঁদের আশ্রিত কর্মচারী ছিলেন, তাঁদের মানসিকতায় এ-আইন কিরকম ক্রিয়া করেছিলো সেদিন তা সাধারণ মানুষের জানার কথা নয়, কিন্তু তাই বলে তাদের মনের পরিবর্তনটাও উপেক্ষার বস্তু নয়। লেখক সেই মুহূর্তের কয়েকজন কর্মচারীকে, কিছু প্রজাকে চোখে দেখেছিলেন। যেভাবে দেখেছেন ঠিক সেভাবেই তাদের আঁকতে চেষ্টা করেছেন এ-বইতে। দেখা এবং লেখার মধ্যে কোনো ফাঁকি নেই, তাই চরিত্র কয়টি চমৎকার বাস্তবরূপে ধরা দিতে পেরেছে। ইচ্ছা করলেই লেখক তাঁর অভিজ্ঞতাকে একটি উপন্যাসের আকার দিতে পারতেন, কিন্তু সে-চেষ্টা না করে ভালোই করেছেন, কেননা, সেক্ষেত্রে প্রয়োজনের খাতিরে অনেক বাস্তব চরিত্রকে হয়তো তিনি বাধ্য হয়েই বাদ দিতেন। ইতিহাসের দিক থেকেও তাই গ্রন্থটি মূল্যবান। ৬৩৪।৬০

পূর্ব বাংলার সাহিত্য

অরমা—হাসান ফেরদৌসী। প্রকাশক—ইস্টবেঙ্গল পাবলিশার্স, ৪৫ ইসলামপুর, ঢাকা-১। দাম—২৷৷০।

রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বাঙলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হলেও, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রটি বিভক্ত হতে পারেনি। এবং সম্ভব নয় এই কারণে যে, ভাষার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ওপর পূর্ববঙ্গকে নির্ভর করতেই হবে। নিশ্চিতভাবেই তাই বলা যায়, যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে ততদিন পূর্ববঙ্গের এই নির্ভরতা রক্ষা করে চলতে হবেই। তাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষয়ক্ষতি কিছু হতে পারে কিনা জানি না, কিন্তু এ কথাটি সত্য যে, তার ফলে বাংলা ভাষা দিনে-দিনে সমৃদ্ধতরই হবে। হাসান ফেরদৌসীর 'অরমা' এ উক্তির সমর্থনে একটি বিশেষ প্রমাণ। ভাষার পরিচর্যায় লেখক সে কতখানি সিদ্ধ হয়েছেন এ বইটি থেকে পাঠকমাত্রেই তার সম্যক পরিচয় পাবেন। একথা অন্তত বলা যায় লেখকের রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ ব্যর্থ হয়নি।

বিষয়বস্তুর দিক থেকেও অরমা গতানুগতিক নয়। কাহিনীর পরিণতি দেবদাসের কথা পাঠককে মনে করিয়ে দিতে পারতো, কিন্তু বিচক্ষণ লেখক অত্যন্ত সাবধানে অথচ কৌতুকপ্রদ উপায়ে নিজেকে এবং তাঁর রচনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। কাহিনীর উপজীব্য প্রেম—যা বস্তুত নিকষিত হেম হয়েই রইলো শেষ পর্যন্ত সেই চিরন্তন বিষয়টিকে লেখক অভিনব উপায়ে পরিবেশন করেছেন। বাস্তব এবং স্বপ্নের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে নায়ক খসরু, নায়িকা হেনা নিরুদ্দেশ, কাহিনীর কালও বিগত। এ অবস্থায় আত্মকথা বলে যাচ্ছে খসরু, পটভূমিতে একটি সদাব্যস্ত হোটেল। লেখার গুণে হোটেল বা রেস্তোরাঁটিও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

অথচ কাহিনীটিকেও যেন প্রসঙ্গত বলেই মনে হয়। সমস্ত পরিবেশের মধ্যে লেখক এমনভাবে মিশে গেছেন যে, মূল কাহিনীর সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কহীন ঘটনা এবং চরিত্রগুলোকেও একবারের জন্য অবান্তর মনে হয় না। ৫১।৬১

প্রাপ্তি-স্বীকার

বিনি সুতোর মালা—সমীরকুমার গুপ্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগ্রন্থ সাহিবজী (সটীক বঙ্গানুবাদ) ২য় খণ্ড শ্রীরাগ প্রথমার্ধ—শ্রীহারাণচন্দ্র দেবশর্মা চাকলাদার।

বড়ো পিসীমা—বাদল সরকার।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে পদাবলীর স্থান—শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার।

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র—মোহিতলাল মজুমদার

রবীন্দ্র-অভিধান ১ম খণ্ড—সোমেন্দ্রনাথ বসু।

শতাঞ্জলি—শ্রীশ্রীমহারাজ।

যে কালে যে দেশে—অমিয় দত্ত।

তরুণ রবি—নয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অন্য দিন অনেক সময়—মনোরঞ্জন রায়।

জীবন জিজ্ঞাসা—মীরাটলাল।

সন্ধ্যারাগ—সরোজকুমার রায়চৌধুরী।

রবীন্দ্রায়ন ১ম খণ্ড—শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

নতুন রসের স্বাদ

লিটল থিয়েটার গ্রুপ অতি অল্পকালের মধ্যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং নাট্যামোদীদের অন্তর জয় করে নিয়েছেন। এবার তাঁরা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে বাংলা ছবির জগতে পদক্ষেপ করেছেন এবং চিত্ররসিকদের জন্য একটি ভিন্নধর্মী উপহার নিয়ে এসেছেন। পট-মঞ্জরীর "মেঘ" তাঁদের এই প্রথম চিত্রোপহার।

এই সুখ্যাত নাট্যগোষ্ঠীর অন্যতম কর্ণধার, অভিনেতা ও পরিচালক-প্রযোজক উৎপল দত্ত "মেঘ" ছবিটির চিত্রনাট্যকার-পরিচালক এবং নায়ক।

ছবির নায়ক সমরেশ একজন ব্যর্থকাম ঔপন্যাসিক। অতীতের ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বালা সইতে না পেরে মানসিক ভরসাম্যও সে হারিয়ে ফেলেছে। তার তরুণী স্ত্রী মাধুরী স্বামীর বিকল মনটিকে কিছুতেই সুস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলতে পারে না।

একটি নিখুঁত খুনের কাহিনী লেখার ঝোঁক চেপে বসে সমরেশের মনে। শুধু লেখাই নয়, বিনিদ্র রজনীতে এক প্রচণ্ড অস্থিরতায় হাতে ধারালো ক্ষুর নিয়ে সে একটি নিখুঁত খুনের প্রয়োগ-রূপটিও বুঝি যাচাই করে দেখতে চায়। মধ্যরাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে স্বামীর এই ভীষণ মূর্তি দেখে মাধুরী ভয়ে আঁতকে ওঠে।

নিখুঁত খুনের কল্পনার সঙ্গে সমরেশের মনে যার মুখটি ভেসে ওঠে সে হল সুজাতা। সুজাতার ছলনাই সমরেশের জীবনকে বিষিয়ে দিয়ে গেছে। সমরেশ জানত না সুজাতা বিয়ে করেছে। সুজাতার স্বামী সাগর সেন বে-আইনী ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। সুজাতা তার স্বামীর পাপের পথের কাঁটা। তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়ে সাগর সেন নিজের পথ নিষ্কণ্টক করতে চায়। খল-চরিত্র সাগর সেন তার পাপ উদ্দেশ্য সফল করতে চায় অপ্রকৃতিস্থ সমরেশকে দিয়ে। সে সমরেশের মনে সুজাতাকে খুন করার উন্মত্ত নেশা জাগিয়ে তোলে। এবং জন-কোলাহলের বাইরে সমরেশ তার নির্জন বাড়িতে এক রাত্রির বিভীষিকায় তার নিখুঁত খুনের কাহিনীর খুনী-নায়ক হয়ে ওঠে।

চিত্রপরিচালনার ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের আগমন যে আশাপ্রদ তার প্রমাণ ছবির প্রয়োগ-কর্মের কয়েকটি সুন্দর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে এ

অগ্রগামীর আগামী চিত্র "কান্না"-র নায়িকা নবাগতা নন্দিতা বসু।

ছবির চিত্রনাট্য শিথিল ও বাহুল্যের ভারে ভারাক্রান্ত, এবং এর গতিও কিছুটা মন্থর। কিন্তু দর্শকের মনোযোগ আকৃষ্ট করে রাখার মত কয়েকটি নাট্যমুহূর্ত গড়ে তোলার কাজে চিত্রনাট্যকার-পরিচালক নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এই মুহূর্তগুলি রূপ নিয়েছে নায়কের মনে একটি "নিখুঁত খুনের" প্রতিক্রিয়ারাশিকে কেন্দ্র করে। নায়কের তীব্র মানসিক প্রতিক্রিয়ার এই দৃশ্যরাজি যদিও মঞ্চের আঙ্গিকে গঠিত এবং এই সব দৃশ্যের স্বগতোক্তি-সংলাপ যদিও মঞ্চানুগ, তবুও চিত্রনাট্যের এই অধ্যায়ে দর্শকেরা এক দুর্বার কৌতূহলের আস্বাদ গ্রহণ করেন।

সূক্ষ্ম অনুবীক্ষণে ছবির দু-একটি চরিত্র-বিন্যাসে এবং একাধিক ঘটনার বৈসাদৃশ্য ও অসঙ্গতি অতি সহজেই ধরা পড়বে। তবে ছবিতে 'সাসপেন্স' সৃষ্টিতে ও রোমাঞ্চরস বিস্তারে এবং কৌতুকরস পরিবেশনে পরিচালক-চিত্রনাট্যকার দক্ষতা দেখিয়েছেন। ফলে ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ছবিটি সামগ্রিকভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

ছবির একটি প্রধান সম্পদ নায়ক সমরেশের ভূমিকায় শক্তিমান অভিনেতা উৎপল দত্তের মনোজ্ঞ অভিনয়। তাঁর অভিনয় সব সময়ে চলচ্চিত্রানুগ না হলেও চরিত্রটির মানসিক বৈকল্য এবং হত্যাকাণ্ডের পর তার মানসিক প্রতিক্রিয়া তিনি অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ব্যবসায়ী সাগর সেনের ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায় চরিত্রটির খলপ্রকৃতি সুন্দর

ফুটিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী ও নায়কের পূর্ব প্রণয়িনী সুজাতার চরিত্রটি নীলিমা দাস বাস্তবানুগ করে তুলেছেন।

নায়কের স্ত্রীর চরিত্রে নবাগতা মালবিকা গুপ্তর অভিনয় স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। একটি ছোট্ট ভূমিকায় রবি ঘোষের অনবদ্য কৌতুকাভিনয় দর্শককে মুগ্ধ করে রাখে।

তরুণ মিত্র ও শোভা সেন ছবিটির দুটি বিশেষ পার্শ্বচরিত্রে তাঁদের অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। ছবিতে অল্প অবকাশে যাঁরা দর্শকের মনে রেখাপাত করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জহর রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংগীত-পরিচালক রবিশঙ্কর তাঁর অপূর্ব সুররচনা ও "এফেক্ট মিউজিক"-এর ভেতর দিয়ে ছবিতে প্রাণসঞ্চার করেছেন। ছবির একাধিক দৃশ্যের রহস্য ও রোমাঞ্চের উপাদান তাঁর রচিত আবহসুরের গুণে নাট্যসংবেদনে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

আলোকচিত্র গ্রহণ রামানন্দ সেনগুপ্তর কাজ উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে। কলা-

একতা প্রোডাকসন্সের "আহ্বান" চিত্রের একটি মনোরম বহির্দৃশ্যে ছবির প্রধান দুই শিল্পী সন্ধ্যা রায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়।
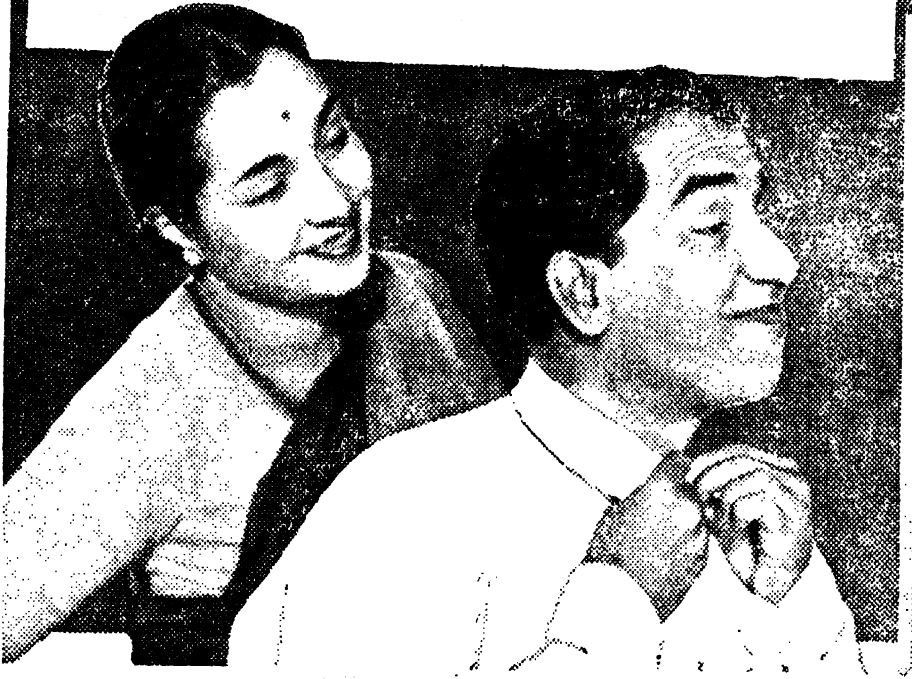
কৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। ছবির আঙ্গিক গঠন সন্তোষজনক।

মামুলি কাহিনীর উপভোগ্য চিত্ররূপ

রাষ্ট্রপতি সুবর্ণপদক বিজয়ী পরিচালক হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় আজ খ্যাতির উচ্চ লোকে প্রতিষ্ঠিত। তাই তাঁর ছবি নিয়ে চিত্ররসিকমহলে উদ্দীপনার সঞ্চার হওয়াটা বিচিত্র নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এল বি ফিল্মসের পতাকাতলে গৃহীত হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের সর্বাধুনিক ছবি "মেমদিদি" এই উদ্দীপনা অনেকটা স্তিমিত করে দেবে।

হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে রসজ্ঞ দর্শকরা প্রত্যেক ছবিতেই নতুন কিছু আশা করে থাকেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁদের হতাশ হতে হয়েছে, কারণ "মেমদিদি" গতানুগতিক আমুদে হিন্দী ছবির গোত্র-পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। শচীন ভৌমিক লিখিত এ ছবির কাহিনী বাস্তবতাবর্জিত এবং এতে যেসব মহৎ ভাব ও চিন্তা রয়েছে সেগুলিও জীবনবোধের স্পর্শরহিত।

"আনাড়ী"তে পরিচালক মুখোপাধ্যায় দর্শকদের সঙ্গে এক খৃষ্টান মহিলার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এ ছবির মেমদিদির মধ্যে "আনাড়ী"র সেই খৃষ্টান মহিলাই যেন দ্বিজত্ব লাভ করেছেন। চেহারা ও চরিত্রে উভয়েই এক। "আনাড়ী"তে তিনি ছিলেন এক "আওয়ারা"-প্রতিম যুবকের জননীস্থানীয়া, এ ছবিতে তিনি দুই প্রায়-প্রৌঢ় (একজন সম্বন্ধে 'প্রায়' মোটেই বলা চলে না) ডানপিটে বাস্তির অগ্রজা-স্বরূপা।

মেমদিদি খৃষ্টান এবং তার পাতানো দুই ভাই-এর মধ্যে একজন রাজপুত, অপরজন পাঠান। বিভিন্ন জাতির এই তিন চরিত্রের মধ্যে ভাই-বোনের নির্মল স্নেহের সম্পর্ক চিত্রকাহিনীর অন্যতম রসকেন্দ্র-বিন্দু। এই রসের কল্পনাটির মধ্যে বড় আদর্শের ছোঁয়াচ আছে। কিন্তু এই কল্পনা এমন কষ্টকল্পিত ও এত সাজানো যে তা দর্শকমনে মহৎ মানবিকতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে না। তবে স্বীকার করতে বাধা নেই তা স্থূল আবেগের সঞ্চার করে।

ভাই-বোনের মধুর সম্পর্ক রচনায় শরৎচন্দ্রের "রামের সুমতি"র সুস্পষ্ট প্রভাব দর্শকের নজর এড়াবে না। মেমদিদির অসুখের সময় তার দুই ভাই-এর ডাক্তার ডেকে আনা ও দিদির রোগ সারে না বলে ডাক্তারকে শাসানোর মধ্যে "রামের সুমতি"র রামের ডাক্তার ডাকার ঘটনাটিই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মেমদিদির কলেজে পড়া মেয়ে ও তার প্রণয়ীর প্রেমোপাখ্যানটি একান্ত মামুলি। মেমদিদির দুই পাতানো ভাইয়ের চেষ্টা ও কৌশলে তাদের মিলিত হওয়ার উপাখ্যানটি

সাধারণ হিন্দী ছবির যন্ত্র ও সংগীত বর্জিত আখ্যানের মতই বৈশিষ্ট্যহীন।

"মেমদিদি"র এই নিষ্প্রাণ কাহিনীর চিত্রনাট্যে আমোদ-উপকরণের অভাব নেই। এবং ছবিটি সামগ্রিকভাবে যদি দর্শকের চিত্তবিনোদনের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে তবে তবে তার মূলে রয়েছে একটি সুন্দর চিত্রনাট্য যা একটি বিবর্ণ কাহিনীকে অনেকাংশে উপভোগ্য করে তুলেছে। সেই সংগে রয়েছে পরিচালক-চিত্রনাট্যকার হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের নিপুণ প্রয়োগ-কর্ম। ছবিতে আবেগ-মুহূর্ত গড়ে তোলার কাজে এবং মনোরম পরিবেশ রচনায় ও ছোট ছোট সুন্দর ঘটনা সৃষ্টিতে পরিচালক মুখোপাধ্যায় প্রশংসনীয় রসবোধ ও শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। আখ্যানের অভিনবত্বে বা বাস্তবধর্মিতায় এই ছবি একটি উঁচুদরের শিল্পকর্ম হিসাবে পরিগণিত না হলেও এটি একটি উপভোগ্য চিত্র হিসাবে দর্শকদের আনন্দ দেবে।

ছবির নাম-ভূমিকায় চিত্রনাট্যের দাবি মিটিয়ে সংবেদনশীল অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন ললিতা পাওয়ার। মেম-দিদির দুই পাতানো ভাইয়ের চরিত্রে ডেভিড ও জয়ন্তের চিত্তগ্রাহী অভিনয় এ ছবির এক বিশেষ সম্পদ। ছবির প্রণয়ীযুগলের ভূমিকায় তনুজা ও কেসি মেহরা প্রাণোচ্ছল অভিনয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। অন্যান্য বিশেষ পার্শ্বচরিত্রে ধুমল, রশিদ খাঁ ও হরি শিবদসানির অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

সংগীত পরিচালক সলিল চৌধুরী ছবির একাধিক মনমাতানো হাল্কা সুরের গানের জন্য বাহবা পাবেন। তাঁর রচিত আবহসংগীত পরিবেশানুগ।

ছবির আলোকচিত্র গ্রহণে জয়ন্ত পাথারে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কলা-কৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ ও আঙ্গিক সৌষ্ঠব উঁচুদরের।

চিত্রালোচনা

পশ্চিমবংগ ও পূর্ব পাকিস্তানের যৌথ প্রযোজনার ভিত্তিতে বাংলা ছবি তোলবার কথা কেউ কেউ ভাবছেন। এর দ্বারা বাংলা ছবির সীমাবদ্ধ প্রদর্শনীক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করবে এবং দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পথ সুগম হবে—এমন আশা করলে সম্ভবত অন্যায় হবে না।

এই সম্পর্কে দুটি প্রতিষ্ঠানের নাম শোনা যাচ্ছে—সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন্স ও আলোছায়া প্রোডাকসন্স। যৌথ প্রযোজনার প্রস্তাব যদি সরকারী সমর্থন লাভ করে তা হলে সত্যজিৎবাবু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মা নদীর মাঝি" উপন্যাসটিকে চিত্রান্তরিত করবেন বলে প্রকাশ। আলো-ছায়া প্রোডাকসন্স কী ছবি তুলবেন তা স্থির না হলেও, সে ছবির নায়ক হবেন উত্তমকুমার তা একরকম ঠিক। তাঁর বিপরীতে সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তানের কোন উদীয়মানা অভিনেত্রী চিত্রাবতরণ করবেন।

যৌথ প্রযোজনা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করতে পক্ষকাল আগে ঢাকা থেকে জনৈক চিত্রসাংবাদিক ও লাহোর থেকে একজন প্রযোজক কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁদের দৌত্যের ফলে সম্মিলিত চিত্র-নির্মাণের ব্যাপারটি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে দুই দেশের সরকারী মহলের বিবেচনাধীন রয়েছে।

• • •

দ্বিতীয় দফায় একতা প্রোডাকসন্সের "আহ্বান"-এর বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে পরি-চালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় দলবল নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। এবারে বহির্দৃশ্য তোলা হয়েছে রাণাঘাটে গংগা ও চূর্ণী তীরবর্তী হিজুলীর মনোরম অঞ্চলে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল কাহিনীর এইটিই পটভূমি।

শিল্পীদের মধ্যে বহির্দৃশ্যগুলিতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ছবির নায়ক-নায়িকা অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়, এক আধুনিকার ভূমিকায় লিলি চক্রবর্তী, শাশ্বতী জননী চরিত্রে হেমাঙ্গিনী দেবী, এবং অন্যান্য ভূমিকায় প্রশান্তকুমার, প্রেমাংশু বসু, গংগাপদ বসু, শিপ্রা মিত্র, নিভাননী প্রভৃতি।

অনেক দিন বাদে এই ছবিতে পংকজকুমার মল্লিক আবার সুরসৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর নিজ কণ্ঠের গানে ও রবীন্দ্র সংগীতে ছবিটি সমৃদ্ধ হবে।

• • •

কালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে এম কে জি প্রোডাকসন্সের নবতম চিত্রার্ঘ্য "মা"-র নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। অনুরূপা দেবীর এই বিখ্যাত উইন্যাসটি সবাক চিত্রের প্রথম যুগে একবার চিত্রায়িত হয়—বাংলা ও হিন্দী দুই ভাষাতেই। কানন দেবী সে ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, নবতম সংস্করণে ঐ চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন সন্ধ্যারাণী। অসিত-বরন এ ছবির নায়ক। চিত্ত বসুর পরি-চালনায় ছবিটি গৃহীত হচ্ছে।

অগ্রগামী প্রোডাকসন্সের নতুন ছবি "নিশীথে"-র শুটিংও এই সপ্তাহের গোড়া থেকে আরম্ভ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যে গল্পটি অবলম্বনে ছবিটি তোলা হচ্ছে তার রোমাঞ্চরস পাঠকদের অভিভূত করে রাখে। এবার ছবির পর্দায় তারই পুনরাভাস পাওয়া

বি এন রায় প্রোডাকসন্সের মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবি "ঝিন্দের বন্দী"-র একটি দৃশ্যে রাধামোহন ভট্টাচার্য ও নায়কবেশী উত্তমকুমার।

যাবে। উত্তমকুমার ও অগ্রগামীর নবাবিষ্কৃত তারকা নন্দিতা বসু নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করছেন। সন্তোষ গাঙ্গুলী ও জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এর যুগ্ম-পরিচালক।

* * *

অগ্রদূতের পরিচালনায় সুচিত্রা-উত্তম তারকাজুটির নবতম ছবি "বিপাশা"-র চিত্রগ্রহণ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তারাশঙ্করের একটি জনপ্রিয় কাহিনীর চিত্ররূপ এটি। চিত্রনাট্য লিখেছেন গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার। এই ছবির অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, লিলি চক্রবর্তী প্রভৃতি। রবীন চট্টোপাধ্যায় সুর যোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "শ্রীশ্রীমধুসূদন" নামে একটি ছোটদের ছবির কাজ শুরু হয়েছে রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে। পরমহংসদেব কথিত একটি ভক্তিমূলক কাহিনীর ভিত্তিতে পরিচালক স্বয়ং এর চিত্রনাট্য লিখেছেন। শ্রীমান দেবাশিসকে নিয়ে ছবি তোলা আরম্ভ হয়। এর প্রধান দুটি চরিত্রে দুটি নতুন কিশোর শিল্পীকে দেখা যাবে। তাদের নাম—নীলাঞ্জন রায় ও সুচেতা মল্লিক। মধুমিতা প্রোডাকসন্সের পতাকাতলে ছবিটি তোলা হচ্ছে।

• • •

ফিল্ম যুগ-এর হিন্দী ছবি "আশ কা পনছী" এ সপ্তাহের একমাত্র নতুন আকর্ষণ। একটি তরুণ চিত্রগোষ্ঠীর নিবেদন এটি। ভূমিকালিপির পুরোভাগে আছেন বৈজয়ন্তীমালা, রাজেন্দ্রকুমার, শাম্মিন্দর, রাজ মেহরা, নাজির হুসেন, লীলা চিটনীস ও সুন্দর। ছবিটি পরিচালনা করেছেন মোহনকুমার। শংকর-জয়কিষণ রচিত সুর এর অন্যতম আকর্ষণ।

আগামী ৮ই জুন বি এন রায় প্রোডাকসন্সের "ঝিন্দের বন্দী"র বহু প্রতীক্ষিত মুক্তি। তপন সিংহের পরিচালনা, আলি আকবর খাঁর সুরারোপ, এবং বিভিন্ন ভূমিকায় উত্তমকুমার, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির অনবদ্য অভিনয় এর আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

নাট্যাভিনয়

রঙ্গসভার "দালিয়া"

রবীন্দ্র আবির্ভাবের শতবর্ষপূর্তির উৎসব-লগ্নে রঙ্গসভার কবি-অর্ঘ্য "দালিয়া" গত ২৮শে মে নিউ এম্পায়ারে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়।

রবীন্দ্রনাথের একটি অনন্যমধুর ছোট গল্প "দালিয়া"। এক নির্মম প্রতিহিংসার প্রতিজ্ঞা নিবিড় প্রণয়ের বাহুপাশে কেমন করে নিমেষে হারিয়ে যায় তা নিয়েই "দালিয়া"র রসকলি পাপড়ি মেলেছে। মহম্মদ শাহ সুজার দুই কন্যা জুলিখা ও আমিনাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের এই অপরূপ উপাখ্যানের বিস্তার।

রবীন্দ্রনাথের মূল কাহিনীর অনুপম মাধুর্যরস নাটকটিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। নাটকের এই প্রসাদগুণের জন্য রসিকজনের সাধুবাদ অর্জন করবেন নাট্যকার-পরিচালক পীযূষ বসু। নাটকের প্রধান তিনটি চরিত্র-বিন্যাসেও তিনি তাঁর স্বচ্ছ কল্পনাশক্তি ও গভীর রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। কয়েকটি নাট্যমুহূর্ত গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও প্রশংসনীয় প্রয়োগ-কর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে নাটকটিকে আরও সুসংবদ্ধ করার অবকাশ ছিল এবং নাট্যপ্রস্তুতির ভেতর দিয়ে নাট্যপরিণতিকে আরও আবেগমণ্ডিত করে তোলা যেত।

এই নাটকের প্রধান আকর্ষণ সম্মিলিত অভিনয়-সৌকর্য। নামভূমিকায় দিলীপ

ভায় সদানন্দ প্রেমিকের রূপটি অতুলনীয় অভিনয়-দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। নাট্য-পরিবর্তিতে তাঁর অভিনয় সে তুলনায় কিছুটা নিষ্প্রভ হলেও দাদিয়ার চরিত্রে তিনি সামগ্রিকভাবে প্রাণসঞ্চার করেছেন। নায়িকা আমিনার রূপসজ্জায় রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রাণচঞ্চল ও প্রণয়কুল উদ্ভিন্ন-যৌবনার চরিত্রকে মধুর অভিব্যক্তি ও সপ্রতিভ অভিনয়ে মরমী করে তুলেছেন।

বেদনার মুহূর্তেও তাঁর অভিনয় মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

জুলিখার চরিত্রচিত্রণে সুলতা চৌধুরী প্রতিহিংসাপরায়ণা নারীর অন্তর-জ্বালা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর অভিনয়ে সহোদরার প্রতি স্নেহের ভাবটিও যথাযথ প্রকাশ পেয়েছে।

আমিনার আশ্রয়দাতা জেলের চরিত্রে পরিতোষ রায়ের অভিনয় যেমন মনোগ্রাহী তেমনি সংবেদনশীল। রহমৎ-এর ভূমিকায় চন্দন রায়ের সুন্দর অভিনয় দর্শকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অন্যান্য ভূমিকায় চরিত্রানুগ অভিনয়ের জন্য প্রশংসা পেয়েছেন রথীন ঘোষ, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, ভোলা বসু ও শংকর সরকার।

সুনীতি মিত্রর মঞ্চসজ্জা শিল্পশোভন ও পরিবেশানুগ হয়ে উঠেছে। সংগীত পরিচালক অচিন্ত্য মজুমদারের মনোময় আবহ-সুররচনা বিভিন্ন নাট্যমুহূর্তের রসটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। আলোক-সম্পাতে আশুতোষ বড়ুয়া কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

অভিনব নাট্য-প্রচেষ্টা

রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বাণী মন্দির নাট্য পরিষদ আগামী ৫ই জুন বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে সন্ধ্যা ৬টায় "কুশারী পরিবার" নামে একটি ভিন্নধর্মী তথ্য-সংবলিত নাটক মঞ্চস্থ করবেন।

"কুশারী পরিবার" নাটকটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষগণের জীবন-কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত। নাটকটি রচনা করেছেন নন্দলাল দাস (সাহিত্য বিনোদ)।

বাণীমন্দির নাট্য পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত এক সাম্প্রতিক সাংবাদিক বৈঠকে সংঘের সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক এই অভিনব মঞ্চপ্রয়াসের কথা ঘোষণা করার পর নাট্যকার নন্দলাল দাস নাটকটি প্রসঙ্গে সাংবাদিকগণকে বলেন, "পূর্বপুরুষগণের ইতিহাস বিজড়িত নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই পরিষদের সভ্যদের একমাত্র কাম্য। এঁরা বাস্তবকে সম্মুখে রেখে অতীতকে জানাতে চায় বেদনা-ভরা আহ্বান, ঐতিহ্যকে দিতে চায় প্রাধান্য।"

"কুশারী পরিবার" নাটকটি পরিচালনা করবেন শক্তি মুখোপাধ্যায় এবং আলোক-সম্পাতের দায়িত্ব সম্পাদন করবেন তাপস সেন। নাটকের প্রযোজক সুনীল মুখোপাধ্যায় সুরারোপের দায়িত্ব নিয়েছেন। নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করবেন পরিষদের শিল্পীরা।

পশ্চিম বার্লিনে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব

(কুশল মিত্র)

যখন বাংলা দেশের আকাশ-বাতাস কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে মুখরিত, তখন বাংলা তথা ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে বিশ্বকবিকে নতুন করে স্মরণ করা হল।

বার্লিনের রবীন্দ্র উৎসবে এসে অনুভব করা গেল—শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র পৃথিবীর সুস্থ মানুষের জীবনপ্রবাহে রয়েছে এক মহামিলনের ফল্গুধারা।

সর্বপ্রকার সুব্যবস্থায় যার তুলনা নেই, বার্লিনের সেই প্রখ্যাত "কুউনস্ট আকাডেমী"র পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে রবীন্দ্র উৎসব এখানকার এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। এই উৎসব আয়োজনের পিছনে ছিল বার্লিন গবর্নমেন্টের উৎসাহ, সহযোগিতা ও প্রচুর অর্থব্যয়। সিনেটের ফ্রউর ফলস্‌বিল-ডুংগ (সংস্কৃতি মন্ত্রী) এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। একথাও স্বীকার্য, এত বড় অনুষ্ঠানের পেছনে ভারতীয় কন্সাল জেনারেলের অফিস ও ভারত মজলিসের সাথে বার্লিন সরকারের কুণ্ঠাহীন সহ-যোগিতা না থাকলে এর এত সুন্দর পরি-সমাপ্তি হত কিনা সন্দেহ। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে আনন্দবাজার পত্রিকার বার্তা সম্পাদক সন্তোষকুমার ঘোষ, দেশ পত্রিকার সহঃ সম্পাদক সাগরময় ঘোষ, যুগান্তর পত্রিকার বার্তা সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন বসু ও স্টেটস-ম্যানের সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় বার্লিনে পাঁচ দিনের জন্য এসেছিলেন। তাঁদের নির্দেশ ও উপদেশ রবীন্দ্র উৎসবকে অনেকখানি উৎসাহ ও এগিয়ে দিয়ে গেছে।

৫ই মে থেকে ৮ই মে পর্যন্ত ছয়টি অনুষ্ঠান "কুউনস্ট আকাডেমী"তে হয়। ৯ই ও ১০ই মে বার্লিনের Hermann-Ehlers-Schule ও Gustav-Stresemann-Saal-এ আরো দুটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়।

ভারতীয় সঙ্গীতগোষ্ঠী কর্তৃক "হে নূতন দেখা দিক আর বার" গান দিয়ে প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। আকাডেমীর একটি আসনও খালি ছিল না এ কয়দিন। বহুলোক টিকিট না পেয়ে ফিরে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যাঁরা বক্তৃতা দেন, তাঁরা হলেন—সিনেটের অধ্যাপক ডাঃ টিটিবউরাটিউস, ভারতীয় কন্সাল-জেনারেল মেহবুব আহমেদ
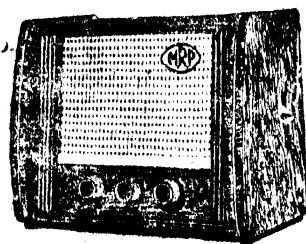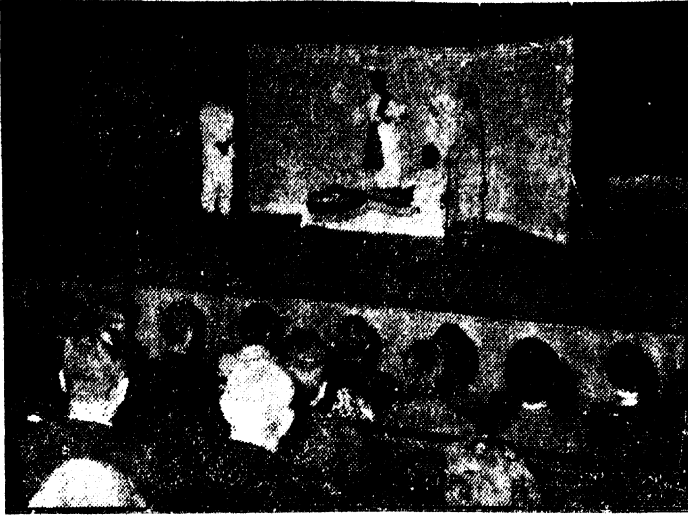
বার্লিনে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসবে অভিনীত "ডাকঘর" নাটকের একটি দৃশ্য।

পশ্চিম জার্মানীর প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ডাঃ হয়েস, জার্মানীর অন্যতম ইন্ডিওলজিস্ট টিউবিনগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ হেলমুখ গ্লাজেনাপ। সংস্কৃত সাহিত্য, বাংলা ভাষা, কলকাতা, বোলপুর, শান্তিনিকেতন ও ভারতবর্ষকে ভূমিকা করে রবীন্দ্রজীবন, দর্শন, কবিতা ও সাহিত্যের ওপর এক বিশদ আলোচনা করে ডাঃ গ্লাজেনাপ সবাইকে আশ্চর্য করে দেন। "হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী" গান দিয়ে প্রথম দিনের অধিবেশন শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিন থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। বলাই সেন গানের আসর পরিচালনা করেন। তাঁর কণ্ঠে "মহারাজ একি", "বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী" ও "বাঁধ ভেঙে দাও", সন্তোষকুমার রায়ের গাওয়া "শুধু তোমার বাণী", "মধু গন্ধে ভরা", "তুমি কেমন করে গান করো", "আজি বিজন ঘরে" ও "যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন" এবং বলাই সেন, সন্তোষ ব্রহ্ম ও ফ্রয়লাইন ইংগেবোর্গের ত্রয়ী কণ্ঠে গাওয়া "খরবায়ু বয় বেগে", ও "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে" গানগুলি পরিপূর্ণ বিশাল প্রেক্ষাগৃহকে বারবার করতালিতে মুখরিত করে রাখে। সমবেত সংগীতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন রঞ্জন পিটার্স, ফ্রয়লাইন ডরোথি, অশোক ঘোষ ও রজত দাশগুপ্ত। বুলবুল চ্যাটার্জির গীটার, ভাটনগরের সেতার ও কোয়েলের তবলা অনুষ্ঠানের আকর্ষণ বাড়িয়েছিল।

আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেন—কার্ল র‍্যাডাটৎস, মানামে হপে ও দীপক বোস। প্রথমোক্ত দুজন বার্লিনের শিলার ও শ্লস-পার্ক থিয়েটারের প্রখ্যাত অভিনেতা ও অভিনেত্রী। এঁরা রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে" (Heim and Welt) থেকে জার্মান ভাষায় পাঠ করেন। তাছাড়া জার্মান ভাষায় "আজি হতে শতবর্ষ পরে", "অত চুপি চুপি কেন কথা কও" ইত্যাদি কয়েকটি কবিতাও আবৃত্তি করেন। এঁদের পাঠ ও আবৃত্তি জার্মান শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ উদ্দীপ্ত করে তোলে।

রবীন্দ্রনাথের নাটক "ডাকঘর" (Das Postamt) বার্লিনের বহু নরনারীর কাছে এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল। প্রবাসী কয়েকটি ভারতীয় ছাত্র জার্মান ভাষায় তার যে অভিনয় করল, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। অমলের ভূমিকায় রঞ্জন পিটার্সকে মানায়নি। মাধবের ভূমিকায় কান্ত হোরে এবং সুধার ভূমিকায় ডরোথি স্মিথট নিঃসন্দেহে ভাল অভিনয় করেন। পরিচালনা ও মঞ্চসজ্জার জন্যে যথাক্রমে ফ্রয়লাইন টারনিউ ও মনোতোষ চৌধুরীর কৃতিত্ব অসামান্য।

এখানকার প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলি রবীন্দ্র উৎসবকে নানাভাবে সচিত্র অভিনন্দন জানিয়েছে। টেলিভিসনেও প্রথম দিনের অনুষ্ঠান জার্মানীতে প্রচারিত হয়।

এই উৎসবে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি ছবি সংগ্রহ করে একটি ছোট চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। জার্মান ভাষায় রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি গ্রন্থের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে এই উপলক্ষে।

সবকিছুকে ছাপিয়ে যায় এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ সত্যজিৎ রায় কৃত রবীন্দ্র-জীবনের ছায়াচিত্র। নিঃসন্দেহে এ ছবির তুলনা নেই। কিন্তু জার্মান শ্রোতাদের কাছে এর ইংরেজি নেপথ্য-ভাষণ আবেদনহীন হয়ে পড়েছিল।

সবশেষে একথা বলতেই হল—বার্লিনে যে রবীন্দ্র-উৎসব হয়ে গেল, তা বাংলা দেশের বহু সার্থক রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষ করে যে গাম্ভীর্যময় পরিবেশ ও সহৃদয় নরনারীর মুগ্ধভাব এই উৎসব লাভ করেছে, তা সত্যিই দুর্লভ।

বিবিধ সংবাদ

হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকবিজয়ী ছবি "অনুরাধা" বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে বলে জানা গেল। ভারত সরকার প্রথমে এই ছবিটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠাতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র পাঠাতে না পারায় কান উৎসবে ছবিটি দেখানো সম্ভব হয়নি।

সত্যজিৎ রায়-কৃত "রবীন্দ্রনাথ" বার্লিন উৎসবের ডকুমেণ্টারি বিভাগে প্রদর্শনের জন্যে মনোনীত হয়েছে। উৎসবের কর্তৃপক্ষ সত্যজিৎ রায়কে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির বিচারকমণ্ডলীতে যোগ দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সত্যজিৎ রায় আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন কিনা জানা যায়নি। বর্তমানে তিনি পুরীতে অবকাশ যাপন করছেন।

• • •

ফরাসী প্রযোজক রাওউল জে লেভি তাঁর আগামী ছবি "মার্কো পোলো"-র বহির্দৃশ্য খুঁজতে ভারতবর্ষে এসেছেন। ছবিটির মধ্যে থাকবে নানা দেশের দৃশ্য। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন ফরাসী অভিনেতা আল্যাঁ দেলঁ ও ইটালিয়ান অভিনেত্রী জিনা লোলোব্রিগিডা।

বুদ্ধদেবের জীবন সম্পর্কীয় ছবি "শাক্য"-র বহির্দৃশ্য তুলতে একটি জাপানী দলও শীগগিরই এ দেশে আসছেন। জাপানের দুজন শীর্ষস্থানীয় শিল্পী এর প্রধান দুটি চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন।

* * *

আগামী ২৭শে অক্টোবর থেকে ১৭ই নবেম্বর পর্যন্ত ভারতের প্রধান চারটি শহরে একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হবে।

নিউদিল্লিতে ২৭শে অক্টোবর উৎসবটির উদ্বোধন হবে এবং সেখানে ২রা নবেম্বর পর্যন্ত তা চলবে। কলকাতায় ১লা থেকে ৭ই নবেম্বর পর্যন্ত, মাদ্রাজে ৬ই থেকে ১২ই নবেম্বর পর্যন্ত এবং বোম্বাইতে ১১ই থেকে ১৭ই নবেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

উৎসবটি প্রতিযোগিতামূলক হবে না। তবে প্রদর্শিত ছবির প্রত্যেকটিকে একটি স্মারক পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রত্যেক দেশ দুটি করে ছবি এই উৎসবে পাঠাতে পারবেন। উৎসবে যোগদানের প্রধান শর্ত: ছবিগুলি ১লা জানুয়ারী, ১৯৬০ বা তার পরে নির্মিত বা প্রদর্শিত হয়েছে, কিন্তু এ দেশে এখনও প্রদর্শিত হয়নি।

একলব্য

কীর্তিমান ক্রীড়া সংগঠক এ এস ডি'মেলোর মৃত্যু ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতা এনে দিয়েছে। ভারতের খেলাধূলার সংগে কিছুকাল ধরে অবশ্য তার কোন সম্পর্ক ছিল না এবং ক্রীড়া-সংগঠন ক্ষেত্রের সহকর্মীদের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে একটু অভিমান নিয়েই তিনি দূরে সরে ছিলেন। তা ছাড়া সহসা ক্যান্সার রোগের আক্রমণও খেলাধূলা সম্পর্কে তাঁর সাম্প্রতিক অনীহার অন্যতম কারণ ছিল।

গত বছর রোম অলিম্পিক যাবার পথে ডি'মেলো সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে জেনেভার এক হাসপাতালে ভর্তি করে অস্ত্রোপচার করা হয়। শীতকালে বোম্বাইতে ফিরে আসবার পর আর একবার এবং দিল্লীতে তৃতীয়বার তাঁর ক্ষতস্থানে অপারেশন করা হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হয় না। গত ২৪শে মে সকালে ৬১ বছর বয়সে দিল্লীর 'অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স' হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছামত মৃত্যুর পর তাঁর দেহ এম সি সি-র পোশাক, স্কার্ফ ও টাইতে সজ্জিত করে তাঁরই রচিত ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে নিয়ে যাওয়া হয়। যোগ্য মর্যাদার সংগে পরের দিন তাঁর মরদেহকে সমাহিত করা হয় হার্ট ক্যাথিড্রালে।

সত্যিই কর্মবহুল জীবন ছিল অ্যান্টনী ডি'মেলোর। নিজেও খেলোয়াড় ছিলেন, খেলাকেও গ্রহণ করেছিলেন অন্তর দিয়ে। ক্রিকেটই ছিল তাঁর প্রথম নেশা। তবে কোনদিকে নয়? ফুটবল, হকি, অ্যাথলেটিকস, টেবল টেনিস, সব ক্রীড়াংগনেই তাঁর স্মৃতিচিহ্ন পড়ে আছে। তবে ক্রিকেটে ছিল অসম্ভব অনুরাগ। প্রধানতঃ তাঁর প্রচেষ্টাতেই ১৯২৮ সালে ভারতে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড প্রতিষ্ঠা হয় এবং ভারত টেস্ট খেলার মর্যাদা পায়। ডি'মেলো প্রথমে কন্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক, পরে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সভাপতি ছিলেন।

ডি'মেলোর প্রচেষ্টাতেই ১৯৩৭ সালে বোম্বাইতে ব্রাবোর্ন স্টেডিয়াম ও ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা। ১৯৫১ সালে দিল্লীতে প্রথম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হবার মূলেও এই মানুষটি। পরের বছর বোম্বাইতে বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসাবার ক্ষেত্রেও ডি'মেলো।

আজ যে বোম্বাই ও দিল্লীতে ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার দুটি মনোরম স্টেডিয়াম দাঁড়িয়ে আছে, এ দুটি জায়গা হয়তো খালিই পড়ে থাকতো, যদি ডি'মেলো এর পেছনে না থাকতেন। স্বাধীনতা লাভের পর খেলাধূলার জন্য দেশের বড় বড় শহরে তিনি স্টেডিয়াম রচনার এক পরিকল্পনা করেন। তার ফলেই এ দুটি স্টেডিয়ামের অস্তিত্ব।

পরলোকগত এ এস ডিমেলো

শেষ জীবনে অসুস্থতা তাঁর কর্মক্ষমতা হরণ করলেও ডি'মেলো একেবারে চুপ করে বসে ছিলেন না। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও ভারত সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীদের সংগে তাঁর বেশ হৃদ্যতা ছিল। সরকারের উপর চাপ দিয়ে কোন কিছু আদায় করার ছিল অসীম ক্ষমতা। ডি'মেলোর শেষ ইচ্ছা ছিল ভারতের মাটিতে বিশ্ব অলিম্পিকের আয়োজন করা। এর জন্য তিনি এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর হাতে দিয়েছিলেন। জানা গেছে পরিকল্পনাটি এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন। ডি'মেলো নেই, অলিম্পিক পরিকল্পনাও লাল ফিতের বাঁধনে। ভারতে কি এমন কেউ নেই যিনি ডি'মেলোর অন্তিম ইচ্ছাকে রূপ দিয়ে ভারতের মাটিতে বিশ্ব অলিম্পিকের ব্যবস্থা করতে পারেন?

• • •

কলকাতার ফুটবল খেলা আস্তে আস্তে জমে উঠছে। ময়দান এখন ফুটবলের আমেজে সরগরম। তবু ফুটবলের আবেগ-অধীর দিনগুলো এখনো কিছু দূরে। অনেক অপ্রত্যাশিত ফলাফলও ফুটবলের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

আগে বহুবার বলেছি তিনটি প্রধান ক্লাবকে কেন্দ্র করেই কলকাতা ফুটবলের হৈ-হুল্লোড় ও শোরগোল। তবে তিন বছর পরে প্রমোশন রেলিগেশনের বিধান বহাল হওয়ার সব খেলারই গুরুত্ব রয়েছে। এমন কয়েকটি ক্লাবও আছে, যাদের তেমন নাম-ডাক নেই, দলে নামডাকের খেলোয়াড়ও নেই অথচ ক্রীড়ানৈপুণ্যে দামী খেলোয়াড়-দেরও নাম ভুলিয়ে দিতে চাইছে।

গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ক্লাব এবার মোটেই তাদের সুনাম মত খেলতে পারছে না। নতুন খেলোয়াড়দের মধ্যে কেরালার সেন্টার ফরোয়ার্ড চিদানন্দন তাঁর সম্বন্ধে প্রত্যাশার প্রতিদান দিতে পারেননি এবং প্রায় অচল প্রতিপন্ন হবার পর্যায়ে পড়েছেন। চিদানন্দন মন্থর গতির খেলোয়াড়। মন্থর গতির খেলোয়াড় যদি নিজের গোলের দিকে মুখ করে বল 'রিসিভ' করে তবে তার ঘোরাফেরার সময়ের মধ্যেই প্রতিপক্ষ তাঁর কাছে এসে যাবার সুযোগ পায়। বিনা বাধায় গোলে শট করবার সুযোগ থাকে না—পায়ে যত ভাল শটই থাক না কেন। মহীশূরের লেফট আউট অরুময়ই মোহনবাগানের একমাত্র নতুন খেলোয়াড় যাঁর খেলায় নৈপুণ্যের ছাপ আছে। তবু অরুময় শুকনো মাঠে প্রতি-পক্ষের সন্ত্রাসের কারণ। ভিজে মাঠে ভাল কিনা তার প্রমাণের অপেক্ষা আছে। সারা বছর একটানা ফুটবল খেলার ফলে আর সব খেলোয়াড়রাও যেন একটু পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই এখন পর্যন্ত কোন খেলাতেই মোহনবাগান দর্শকদের মন ভরাতে পারেনি। তা ছাড়া মোহনবাগানের নির্ভরশীল রাইট হাফ কেম্পিয়া এখনো কলকাতায় এসে পৌঁছননি। দল গড়তেও কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ফলও ভাল হয়নি।

প্রথম ছয়টি খেলার মধ্যে মোহনবাগানকে একটি 'ড্র' ও একটি পরাজয়ের মাধ্যমে হারাতে হয়েছে ৩ পয়েণ্ট। ড্র করেছে জর্জ টেলিগ্রাফের সংগে। হার স্বীকার করেছে বি এন রেলের কাছে। হাওড়া ইউনিয়ন, পুলিস, খিদিরপুর ও ইস্টার্ন রেলের বিরুদ্ধে ৪টি খেলায় জয়লাভের মধ্যে এক হাওড়া ইউনিয়ন ছাড়া আর তিনটি খেলার জয় শেষ মুহূর্তের গোলে। এটা খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাসের পরিচায়ক নয়। তবে ৪টি জয়ের মধ্যে ৩টি জয় হয়েছে যখন শেষ সময়ের গোলে তখন

মোহনবাগান ও হাওড়া ইউনিয়নের লীগের খেলায় মোহনবাগান অধিনায়ক চুনী গোস্বামী গোল করছেন।

এইভাবেই গতবারের লীগ বিজয়ী মোহনবাগান এবারও শেষ রক্ষা করবে কিনা তা দেখবার বিষয়।

ইস্টবেঙ্গলের এবারকার সূচনা খুবেই আশাপ্রদ। বেশীর ভাগ বাঙালী খেলোয়াড় নিয়ে গড়া ইস্টবেঙ্গল টিম এবার যেভাবে খেলা আরম্ভ করেছে, গৌরবদীপ্ত অধ্যায়ে ভারতের খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া ইস্টবেঙ্গল টিম তেমন খেলতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। অথচ খেলার আগে এমন খেলা প্রত্যাশা করা যায়নি।

ইস্টবেঙ্গল টিমে আছেন এবার ৯ জন খেলোয়াড়, যাঁরা কলকাতা ইউনিভার্সিটির 'ব্লু'। গোলকিপার অবনী বসু, ব্যাক চিত্ত চন্দ ও বি দেবনাথ ও অরুণ ঘোষ, হাফব্যাক শ্রীকান্ত ব্যানার্জি ও সি পাল, ফরোয়ার্ড এস সমাজপতি, সুনীল নন্দী ও নীলেশ সরকার সবাই ফুটবলে কলকাতা ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এতগুলি খ্যাতনামা বাঙালী খেলোয়াড়ের সমাবেশ ইস্টবেঙ্গল টিমে বহুদিন দেখা যায়নি।

প্রায় প্রতি খেলাতেই উন্নতির পরিচয় দিয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁদের বিজয় অভিযান অব্যাহত রেখেছে। প্রথম ছয়টি খেলার মধ্যে তাঁরা একটি পয়েন্টও নষ্ট করেননি। প্রথম ছয়টি বলছি এইজন্য যে, এই পর্যন্ত খেলা নিয়েই আমাকে আলোচনা করতে হচ্ছে। চমৎকার যোগাযোগ এবং ক্ষিপ্র গতিবেগ ইস্টবেঙ্গলের খেলার প্রধান গুণ। সমাজপতি, সুনীল নন্দী, শ্রীকান্ত ব্যানার্জির গতিবেগ মারাত্মক। চোট না খেলে খেলায় যে এঁরা চটক দেখাবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ইস্টবেঙ্গলের বড় সমস্যা ছিল 'স্টপার' নিয়ে। দেরাদুন থেকে আগত 'স্টপার' কমলা প্রসাদ মোটেই ভাল খেলতে পারেননি। ফলে লেফট ব্যাক অরুণ ঘোষ খেলছেন স্টপার হিসাবে। 'স্টপার' হিসাবে অরুণ ঘোষ অবশ্য নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু এতে তাঁর নিজের ক্ষতিরও কারণ আছে। অরুণকে এখন ভারতের শ্রেষ্ঠ লেফট ব্যাক বলা যায়। আগামী এশিয়ান গেমে ও টোকিও অলিম্পিকে তিনি ভারতের পক্ষে দলভুক্ত হবার আশা রাখেন। কিন্তু 'স্টপার' হিসাবে খেললে তাঁর দাবি কতটুকু যোগ্যতার সঙ্গে বিবেচিত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। দলের প্রয়োজনে অরুণ ঘোষের 'স্টপার' হিসাবে খেলা সত্যি একরকমের স্বার্থত্যাগ।

ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের ৬—০ গোলের জয় এখন পর্যন্ত বড় জয় হিসাবে নথিভুক্ত হয়ে আছে। এই মরসুমে আর কোন খেলায় এত বেশী গোল হয়নি। গোলদাতার তালিকায় যুগ্মভাবে শীর্ষস্থানে রয়েছেন ইস্টবেঙ্গলের বলরাম ও ইস্টার্ণ রেলের পি কে ব্যানার্জি। মে মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত দুজনেই করেছেন ৭টি করে গোল। এ পর্যন্ত একটি মাত্র হ্যাটট্রিকের অধিকারী পি কে ব্যানার্জি। ফুটবল লীগের উদ্বোধন দিনে খিদিরপুর ক্লাবের বিরুদ্ধে তিনি এই হ্যাটট্রিক করেন।

কলকাতার ফুটবল মরসুমের উদ্বোধন দিনে খিদিরপুর ক্লাবের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকের অধিকারী ইস্টার্ণ রেলের খেলোয়াড় পি কে ব্যানার্জি

মোহনবাগানের মত ইস্টার্ণ রেলও প্রথম ৬টি খেলায় ৩ পয়েন্ট নষ্ট করেছে। গতবারের লীগ কোঠায় চতুর্থ স্থানাধিকারী রেলের এবারকার খেলা দেখে মনে হয় গতবারের চেয়ে এবার তাদের ফলাফল খারাপ তো হবেই না, ভালও হতে পারে।

এবার সবচেয়ে বে-হিসাবী খেলা খেলছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কাগজে-কলমে মহমেডান স্পোর্টিং খুবেই শক্তিশালী টীম। কিন্তু খেলার বেলায় তার পরিচয় নেই। এখন পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার না করলেও পর পর তিনটি খেলা ড্র করে তিন পয়েন্ট নষ্ট করেছে মহমেডান দল। দলের মধ্যে নেই সংহতি, নেই জয় লাভের অনুপ্রেরণা। পাকিস্তানী সেণ্টার ফরোয়ার্ড ওমর এখনও কলকাতায় এসে পৌঁছননি। আমার কিন্তু ধারণা মহমেডান দলের খেলায় নিশ্চয়ই উন্নতি দেখা যাবে যদি না নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

'নামগোত্রহীন' খেলোয়াড় নিয়ে এরিয়ান মোটামুটি ভালই খেলছে। বি এন আর, জর্জ টেলিগ্রাফ, হাওড়া ইউনিয়নের খেলাতেও আছে দৃঢ়তার পরিচয়। জর্জ টেলিগ্রাফ অবশ্য এখনো কোন খেলায় জিততে পারেনি। আর জিততে পারেনি রাজস্থান, উয়াড়ী ও পুলিস দল।

আমাদের দেশে স্যাঁতারপটু মেয়ের অভাব নেই। সন্ধ্যা চন্দ্র, কল্যাণী বসু, আরতি সাহা, ভারতী সাহা, বন্দনা মার্চেন্ট, ফেনী মিস্ত্রী, মীরা কারিয়াপ্পা, অনুরাধা গুহঠাকুরতা—এমনি আরও কত নাম, আরও কত সাধারণ অসাধারণ সাঁতারু মেয়ে। একটু পিছন দিকে যদি ফিরে চাই তা হলে দেখতে পাই ডলী নাজির, সুখলতা পাল, সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়াল, বাণী ঘোষ লীলা চ্যাটার্জি প্রভৃতিকে, সাঁতারের অসামান্য সাফল্যে যারা ভারতে যারা সুপরিচিত। কিন্তু এদের মধ্যে যদি কেউ অসাধারণত্বের দাবি করতে পারে তা হলে দু'টি মেয়ে—আরতি সাহা ও সন্ধ্যা চন্দ্র।

সন্ধ্যা অবশ্য সাগরপারে গিয়ে আরতির মত সাড়া জাগাতে পারেনি, কিন্তু নিজের দেশের সাঁতার প্রতিযোগিতায় সন্ধ্যার কাছে আরতির কৃতিত্বও অতিক্রান্ত।

এই একটি মেয়ে যার একার কৃতিত্বে বাঙলা আজ ভারতীয় সাঁতারের শীর্ষ-দেশে। বাঙলার সাঁতার-আকাশে সন্ধ্যার উদয় সন্ধ্যাতারার মত ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত মেয়েদের সাঁতারে বোম্বের মেয়েরাই ছিল পুরোভাগে। আর প্রায় সমস্ত ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারিণী ছিলেন ডলী নাজির। প্রধানত তাঁকে কেন্দ্র করেই বোম্বের এই বিজয় বৈজয়ন্তী। কিন্তু ১৯৫৫ সাল থেকে পালা বদল, এবার সন্ধ্যা চন্দ্রকে কেন্দ্র করে বারবার বাঙলার টীম চ্যাম্পিয়নশিপ। শুধু ১৯৫৯ সাল ছাড়া, যে বছর জাতীয় সাঁতারে সন্ধ্যা যোগ দেয়নি। আর রেকর্ড? শুধু ব্রেস্টস্ট্রোক ছাড়া বাঙলার ও ভারতের প্রায় সব রেকর্ডই এখন সন্ধ্যার করতলগত। একে একে ডলী নাজিরের সব রেকর্ডই এই মেয়েটি ভেঙে তচনচ করে দিয়েছে।

এক শ' মিটার ফ্রি স্টাইলের রেকর্ডে সন্ধ্যার নাম লেখা হয়নি এক অদ্ভুত কারণে। কারণটা বে-আইনী এবং তার জন্য দায়ী সুইমিং ফেডারেশনের বিধিব্যবস্থা। ১৯৪৮ সালে পাম ব্যালেন্টাইন নামে একটি ইংরেজ মেয়ে সাময়িকভাবে বোম্বেতে বসবাস করবার সময় জাতীয় সাঁতারে যোগ দিয়ে এক শ' মিটারে রেকর্ড করেছিল। আজও সেই রেকর্ড নথিভুক্ত করে রাখা হয়েছে। অথচ অ-ভারতীয়র অপবাদে ব্যালেন্টাইনকে অলিম্পিকে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। অ-ভারতীয়র এই ভারতীয় রেকর্ড ভাঙবার জন্য সন্ধ্যা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যেভাবে সন্ধ্যা সাঁতারের সাধনা করে চলেছে তাতে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা তার পক্ষে সাধ্যাতীতও নয়।

অষ্টাদশী এই মেয়েটির সাঁতার-জীবনের সূচনা কলকাতার সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে।

—মুকুল—

গুরু সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের চীফ 'কোচ' শ্যামাপদ গোস্বামী। সাঁতারক্ষেত্রে যিনি গোঁসাইদা নামে সুপরিচিত। সন্ধ্যাদের বাড়ি হেদো থেকে হাত কয়েক দূরে। ২০।১।১ মদন মিত্র লেনে। হেদো থেকে হাঁক দিলে হয়তো ডাক শোনা যায়। জ্যাঠাবাবু নন্দলাল চন্দ্রর হাত ধরে সন্ধ্যা রোজ সন্ধ্যায় বেড়াতে যেত হেদোয়, আর দেখতো চেনা অচেনা কত ছেলে মেয়ে জলের বুকে বুক রেখে নানা ছন্দে সাঁতার কাটছে। মোটামত এক ভদ্রলোক কত যত্ন নিয়ে তাদের সাঁতারের ছলাকলা শেখাচ্ছেন।

সন্ধ্যার নিজের কথা : "রেলিং-এ ভর দিয়ে হেদোর কোলে দাঁড়িয়ে থাকতাম আর তন্ময় হয়ে যেতাম সাঁতার দেখতে দেখতে। শিশু-মনের কৌতূহল কত কল্পনার রঙে রঙীন হয়ে উঠতো। ভাবতাম কি মজা ওদের। কেমন জলের বুকে খেলা করে। আমারও মন নেচে উঠল সাঁতার কাটতে। বাড়ি গিয়ে সে কথা জানাতেই জ্যাঠাইমার মেজাজ খাপ্পা হয়ে গেল। বললেন—'ঘরের মেয়ে সবার সামনে সাঁতার কাটবে? ওমা সে কি কথা! ওসব হবে না।' এক নিমিষেই আমার সাঁতার শেখার স্বপ্ন ভেঙে গেল, কল্পনার জাল গেল ছিঁড়ে।"

কিন্তু ঐকান্তিক আগ্রহ থাকলে অভীষ্ট একদিন সিদ্ধি হয়। আর এক সন্ধ্যায় সন্ধ্যাকে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেই মোটা ভদ্রলোক স্নেহমাখা স্বরে বললেন—"খুকু, তুমি সাঁতার শিখবে?"

—'শিখব। কিন্তু বাড়ির যে আপত্তি।'

—'বাড়ি গিয়ে বুঝিয়ে বল। আপত্তি হবে না।'

সত্যি আর আপত্তি হ'ল না। সন্ধ্যা আবার সাঁতার শেখবার প্রস্তাব করতেই জ্যাঠামশাই নন্দলাল চন্দ্র রাজী হয়ে গেলেন। ৮ বছর ১১ মাস বয়সে হল সন্ধ্যার সাঁতারের হাতেখড়ি।

মোটা লোকটি আর কেউ নন—চীফ কোচ গোঁসাইদা। তিনি নীলুদার হেপাজতে মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে বললেন শুধু বাঁশ ধরিয়ে 'পা' করাবে। পা করাবে মানে দুটি পা পর্যায়ক্রমে জলের মধ্যে উঠবে আর নামবে। হাতের কোন কাজ নেই। সাঁতার শিক্ষকদের মতে পায়ের কাজ ভাল হলে হাতের কাজ শেখাতে বেশী দেরি হয় না।

সন্ধ্যা রোজ ক্লাবে আসে আর নীলুদার তত্ত্বাবধানে পায়ের প্র্যাক্টিস করে। আস্তে আস্তে তার হাতও চলতে আরম্ভ করে। তবু 'নভিস'। অর্থাৎ আনাড়ি সাঁতারু। এটা ১৯৫২ সালের কথা।

এ বছর ক্লাবের সাঁতার প্রতিযোগিতায় 'নভিস'দের ৫০ মিটারে সন্ধ্যা হল দ্বিতীয়। প্রথম পদক্ষেপে প্রথম সাফল্য বড় হবার সাহস এনে দিল। নতুন উদ্যমে সাঁতার শিখতে লাগল সন্ধ্যা চন্দ্র। 'মেয়েটির স্টাইল তো বেশ' বলে এবার সাঁতার শেখাবার ভার নিজের হাতে নিলেন গোঁসাইদা।

১৯৫৩ সালে গঙ্গার বুকে এক মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা। আরতি, ভারতী সাহার সঙ্গে সন্ধ্যাও সেখানে অন্যতমা মেয়ে প্রতিযোগী। হেদো থেকে হুগলী নদীতে সাঁতার। এর আগে সন্ধ্যা কোনদিন নদীতে সাঁতার কাটেনি। তবু চতুর্থ স্থান। হয়তো আর একটু উপরেও স্থান পেতে পারতো কিন্তু কি একটা জন্তু তার সামনে স্রোতের টানে টানে ভাসছিল আর ডুবছিল। ভয়ে প্রায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যা। নিজে বলেছে—"এক-রকম চোখ বুজে সাঁতার কাটছিলাম, মাঝে মাঝে চোখ চেয়ে দেখছিলাম জন্তুটি আমার কত কাছে। তখন কি জানতাম ওটা শুশুক?"

১৯৫৪ সালে লেকে এক মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যা এবার সবার আগে শেষ সীমায়। এখন সে বেশ পাকা-পোক্ত সাঁতারু মেয়ে।

১৯৫৫ সাল থেকে সন্ধ্যার সাঁতার-জীবনে সম্মান লাভের সূত্রপাত। রাজ্য সাঁতারের এক শ' ও চার শ' মিটার ফ্রি স্টাইল এবং এক শ' মিটার ব্যাক স্ট্রোক—তিনটি বিষয়েই প্রথম—উপরন্তু চার শ' মিটারে নতুন রেকর্ড।

পরের বছর এই রেকর্ডের আরও উন্নতি। এক শ' মিটার ফ্রি স্টাইল এবং ব্যাক স্ট্রোকেও নতুন রেকর্ড। দু শ' মিটার ফ্রি স্টাইল সন্ধ্যার কাছে আরতির পরাজয়। ১৯৫৭ থেকে ১৯৫৯ সাল সন্ধ্যার জীবনের স্মরণীয় তিন বছর। এই সময়ের মধ্যে সে ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাঁতারু ডলী নাজিরকে হারিয়েছে, দিন দিন সময়ের উন্নতি করে আগেকার প্রায় সব রাজ্য ও জাতীয় রেকর্ড ভেঙেছে আর গড়েছে। যেখানে সময়ের ক্ষুদ্রাতিতম ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের উন্নতি করতে বহু চেষ্টা, বহু অনুশীলন ও বহু সাধনার প্রয়োজন সেখানে চার শ' মিটার ফ্রি স্টাইল ডলী নাজিরের ভারতীয় রেকর্ড প্রায় ৮ সেকেণ্ডে কমিয়ে আনা সন্ধ্যার সবচেয়ে বড় কৃতিত্বের পরিচায়ক।

সাঁতারের আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে তুলনা করলে সন্ধ্যা অবশ্য এখনো অনেক পিছনে। তবু আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি যোগ্যতার মাপ-কাঠিতে এই কৃতিত্বের জন্যই রোম অলিম্পিকগামী ভারতীয় দলে সন্ধ্যার ঠাঁই হল। অলিম্পিক অঙ্গনে দেশের প্রতিনিধিত্ব? এত বড় সম্মান! আনন্দে নেচে উঠল ছোট মেয়েটির ছোট্ট হৃদয়। কিন্তু অলিম্পিকের কর্মকর্তারা সন্ধ্যাকে গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নিলেন। ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী।' বিদেশী অর্থের অভাবের অজুহাতে ভারতীয় দল থেকে কেটে-ছেঁটে বাদ দেওয়া হল অনেকের নাম। সেই সঙ্গে সন্ধ্যার নামও কাটা পড়ল। প্রতিভা স্ফুরণের মুখে কেটে খান খান করা হল একটি ছোট মেয়ের বড় আশা।

"ছাত্রী তো আরও আছে, সাঁতারে সন্ধ্যার এতখানি সাফল্যের কারণ কি?" প্রশ্ন করেছিলাম সন্ধ্যার "কোচ" গোঁসাইদাকে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন—"অনুশীলন, অধ্যবসায় এবং সাধনাই সন্ধ্যার সাফল্যের মূল সূত্র। তার চেয়ে বড় কথা জলকে সে ভালবাসে, জলও তাকে ভালবাসে। সাঁতারকে সে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছে। তা ছাড়া সাঁতার কাটার নিখুঁত পদ্ধতি আমি তাকে বরাবর শেখাতে চেষ্টা করেছি।

সন্ধ্যা সাঁতার কাটে ১×৪ বিট ক্রলে। অর্থাৎ একবার হাতের টানের মধ্যে ৪ বার পা ওঠা-নামা করে। সোজাভাবে হাত চালাতে তাকে বরাবর বারণ করে এসেছি। এতে জোর কম হয়। রাইট অ্যাঙ্গেলে কনুই বেঁকিয়ে হাত চালালে 'ল্যাটিসিমাস', 'আর্ম', 'ফোরআর্ম' ও 'শোল্ডার মাস্‌ল্‌' একসঙ্গে কাজ করে, টানে জোর হয়, সাঁতারের গতিবেগও অনেক বেড়ে যায়। সন্ধ্যা এই পদ্ধতিতে সাঁতার কাটে। তা ছাড়া ওর 'বোয়েন্সি' ও 'গ্লাইড খুবই ভাল। কাঠের মত জলের উপর ভেসে থাকে, গতি স্বচ্ছ বর্শা-ফলকের মত।"

সন্ধ্যার বাবার নাম তারকচন্দ্র চন্দ্র। কাজের জন্য তিনি থাকেন প্রায়ই কলকাতার বাইরে। কিন্তু বাবার সব দায়িত্ব পালন করেন নিঃসন্তান জ্যাঠাবাবু নন্দলাল চন্দ্র। আর একজনও সন্ধ্যার কাছে পিতৃতুল্য। বলা বাহুল্য, তিনি সাঁতারের শিক্ষাগুরু শ্যামাপদ গোস্বামী।

সাঁতার-নিপুণা সন্ধ্যা চন্দ্র

অনেকের ধারণা ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী ডাঃ বিমল চন্দ্র সন্ধ্যার সহোদর ভাই। ভাই বটে, তবে সহোদর নয়, রক্তের সম্বন্ধও নেই। একই ক্লাবের দুই কৃতী সাঁতারুর মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বছর বছর ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠান ও পারস্পরিক উপহার বিনিময়ের মধ্য দিয়ে এই ভ্রাতৃ-বন্ধন আরও দৃঢ় হচ্ছে।

সন্ধ্যা চন্দ্র এখন সেন্ট মার্গারেট স্কুলের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। এই বছরই হাইয়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দেবে। মেয়েটি শুধু সাঁতারেই সুপটু নয়। হাতের কাজ এবং ড্রইং সুন্দর। ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের উদ্যোগে সাঁতারের কোচ জন মার্শাল কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি সন্ধ্যাকে সাঁতারের যেসব পাঠ শিখিয়ে গেছেন তার 'ডায়গ্রাম' সন্ধ্যার নিজের হাতেই আঁকা। গানও একটু জানে।

সন্ধ্যার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের জন্য কতবার যে তার স্কুলের মেয়েরা ছুটি পেয়েছে তার হিসাব-নিকাশ নেই। আর একটি বলবার মত ঘটনা যে জ্যাঠাইমা বলেছিলেন "ঘরের মেয়ে সবার সামনে সাঁতার কাটবে? সে কি কথা?" সেই জ্যাঠাইমাই এখন সন্ধ্যার রাশি রাশি পুরস্কারের সতর্ক প্রহরী।

দেশী সংবাদ

২২শে মে—১৯শে মের নরমেধ যজ্ঞ বঙ্গ-ভাষার পূজারী সংগ্রাম পরিষদের স্বেচ্ছাসেবক-দের মনোবল এতটুকুও ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। শহর করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, বদরপুর প্রভৃতি অঞ্চলের শহর ও গ্রামে গ্রামে মৃত্যুভয়হীন সত্যা-গ্রহিগণ মাতৃভাষাকে স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া দলে দলে আজ হইতে নবোদ্যমে পিকেটিং আরম্ভ করেন।

পশ্চিমবঙ্গের—বিশেষ করিয়া কলিকাতার এক শ্রেণীর চীনা অধিবাসীর মধ্যে কিছুকাল যাবৎ ভারত-বিরোধী কার্যের তৎপরতা বৃদ্ধি সম্পর্কে রাজ্য সরকার গোপন সূত্রে সংবাদ পান এবং ঐ ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রকাশ যে, তদন্তের ফলে ষড়যন্ত্রের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাটি আবিষ্কৃত হয় এবং এই সম্পর্কে গত তিন মাসে অন্ততপক্ষে ৫০ জন চীনাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২৩শে মে—আজ শিলচর হইতে প্রায় ৫৩ মাইল দূরে পাথারকান্দিতে সাব-ডেপুটি কলেক্টরের অফিসের সম্মুখে বঙ্গভাষা আন্দো-লনের সত্যাগ্রহীদের উপর সশস্ত্র পুলিস অমানুষিকভাবে লাঠি চার্জ করে। ফলে মোট ৩২ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মেয়ে সত্যাগ্রহীও আছে।

২৪শে মে—অদ্য পশ্চিমবঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। কাছাড়ে বঙ্গভাষা আন্দোলন দমনে আসাম সরকারের নিষ্ঠুর হত্যা-লীলার ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মনে যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, এইদিন শান্ত সংহত স্বতঃস্ফূর্ত হরতালের রূপে তাহা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির কংগ্রেস কর্মী ও নেতৃবৃন্দ বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন সম্পর্কে নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী এবং আসাম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসিদ্ধিনাথ শর্মার ফতোয়ার নিকট মাথা নত করিতে স্বীকৃত হন নাই।

২৫শে মে—'আমরা সরকারী নিষেধাজ্ঞা মানি না' এবং বন্দেমাতরম ধ্বনি করিয়া অদ্য শিলচরে এক মাইল দীর্ঘ এক শোভাযাত্রা ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া শহর পরিভ্রমণ করে। দুইজন অশীতিপর বৃদ্ধার নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই শোভাযাত্রায় কাল পতাকা এবং কংগ্রেস পতাকা রহিয়াছে। জেলা কর্তৃপক্ষ ও টহলদারি সৈন্যরা হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

কাছাড় আত্মোৎসর্গ জনচিত্তে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে, সহস্র বাঙ্গালী আজ কাছাড়ের নিগৃহীত ভ্রাতাভগিনীগণকে উদার হস্তে সাহায্য করিতে চাহিতেছেন। এই সময়োচিত সুমহৎ সংকল্পকে বাস্তবে রূপ দিবার জন্য "আনন্দ-বাজার", "হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড" এবং "দেশ" পত্রিকার পক্ষ হইতে "কাছাড় নিগৃহীত সাহায্য ভাণ্ডার" নামে একটি তহবিল খোলা হইল। আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষ হইতে এই ভাণ্ডারে ১০০১, (এক হাজার এক টাকা) দান করা হইয়াছে।

২৬শে মে—কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী
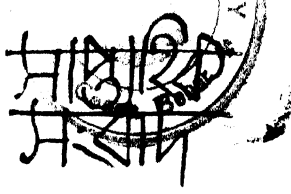
আজ সকালে ৭-৫০ মিনিটে দিল্লি মেলযোগে দুর্গাপুরে আসিয়া ট্রেন হইতে অবতরণ করার সংগে সংগেই একটি যুবক উদ্যত ছুরিকা হস্তে কংগ্রেস সভাপতির উপর ঝাঁপাইয়া পড়ার চেষ্টা করে। একজন স্বেচ্ছাসেবক এবং অপর কয়েক ব্যক্তি যুবকটিকে ধরিয়া ফেলে। তাহাকে পুলিসের নিকট অর্পণ করা হইয়াছে।

২৭শে মে—ক্ষমতাধিষ্ঠিত কংগ্রেস দলের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম "ভারতীয় সংহতি" সংক্রান্ত এক খসড়া প্রস্তাবে চীন এবং পাকি-স্তানকে ভারতীয় অঞ্চলে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া একই সংগে উল্লেখ করা হয়। আজ সন্ধ্যায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আজ দুর্গাপুরে শিলচরে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহী-দের উপর গুলী চালনার প্রতিবাদে এবং চালিহা মন্ত্রিসভার বরখাস্তের দাবিতে বামপন্থী রাজ-নৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক পরিচালিত চারি হাজার লোকের একটি জনতা কৃষ্ণ পতাকা লইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

আজ দুর্গাপুরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন-স্থল হইতে অনতিদূরে অপ্রত্যাশিতভাবে এক হাঙ্গামা বাধিয়া যায়। ইস্পাত কারখানার কর্মী ও পুলিসের মধ্যে এক বচসা হইতে এই হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। হাঙ্গামার ফলে একটি তোরণ ভস্মীভূত হয় এবং অবশেষে পুলিস লাঠি চালায় ও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে।

২৮শে মে—আজ সকালে দুর্গাপুরে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে কাছাড়ের বাঙ্গলা-ভাষীদের উপর অত্যাচার এবং আসাম ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্নটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া ওঠে। আসাম সরকারের নারকীয় নির্যাতনের কাহিনী বিবৃত করিয়া পশ্চিমবঙ্গের ৫।৬ জন সদস্য তীব্র ভাষায় ভারত সরকার, আসাম সরকার ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে আক্রমণ করে।

পুলিস মহল হইতে বলা হয়, গত কালের হরতাল সম্পর্কে ধৃত আট ব্যক্তির মুক্তির জন্য আজ শিলং-এ দেড় হাজার হইতে দুই হাজার লোকের এক জনতা একটি থানা ঘেরাও করে এবং উহার উপর আধ ঘণ্টার অধিককাল ধরিয়া ইষ্টক বর্ষণ করে। ধৃত কয়েকজনকে জামিনে মুক্তি দিলে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়।

বিদেশী সংবাদ

২২শে মে—মার্কিন কংগ্রেসের এক সাব-কমিটির নিকট সাক্ষ্যদান প্রসংগে ফেডারেল গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টর শ্রী জে এডগার হুভার জানান যে, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রসমূহের ৩ লক্ষ গুপ্তচর বিশ্বের সর্বত্র অ-কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র-সমূহের গোপন তথ্য সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে।

২৩শে মে—ফেডারেল সৈন্যদের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও রবিবারের ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামার দরুন আলবামায় সামরিক আইন জারি করা হইয়াছে।

পাক প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁ আজ ঢাকায় জানান যে, পাক-আফগান সীমান্তে সাম্প্রতিক সংঘর্ষকালে নিয়মিত আফগান সৈন্য ও সীমান্তের খণ্ডজাতীয় লোকেরা রুশ অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করায় পাকিস্তান সরকার উহার বিরুদ্ধে রুশ সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানাইবার কথা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তিনি বলেন যে, বিক্ষুব্ধ খণ্ডজাতীয় লোকেরা রুশ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতেছে।

২৪শে মে—ভারত-বিরোধী সার্কুলারে ওয়াশিংটন ছাইয়া গিয়াছে। সার্কুলারের শিরোনামঃ—"প্রচুর মার্কিন সাহায্যের জন্য আপনাদের প্রতি নেহরুর ধন্যবাদ"—তারপর আছে কিউবা সম্পর্কে নেহরুর বিবৃতির উদ্ধৃতি। কে বা কাহারা এই সার্কুলার ছড়াইতেছে জানা যায় নাই, তবে সেনেটর, সংবাদপত্র সম্পাদক, কূটনীতিবিদ—সকলেরই হাতে উহা পৌঁছিয়াছে।

২৫শে মে—কংগোর রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ প্রতি-নিধি শ্রীরাজেশ্বর দয়াল নিউইয়র্ক হইতে লিও-পোল্ডভিলে আর প্রত্যাবর্তন করিবেন না বলিয়া অদ্য সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীদাগ হ্যামারশেল্ড জানাইয়াছেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সুপ্রীম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান লেঃ জেঃ দো ইয়াং চাং ওয়াশিংটনে যাইবার জন্য যে ভিসার আবেদন করেন—মার্কিন দূতাবাস তাহা নাকচ করিয়া দিয়াছে বলিয়া আজ দূতাবাস হইতে জানানো হইয়াছে।

২৬শে মে—গতকল্য সিংগাপুর শহরের কেন্দ্র-স্থলে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। শহরের পাঁচ বর্গমাইল এলাকা জুড়িয়া আগুন জ্বলিতে থাকে। সিংগাপুরের ইতিহাসে এরূপ অগ্নিকাণ্ড আর ঘটে নাই।

২৭শে মে—এই মর্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তিব্বতের কম্যুনিস্ট-সৃষ্ট নেতা পাঞ্চেন লামাকে লাসা হইতে অপসারিত করিয়া পিকিংয়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। কোন কোন সূত্রে বলা হইয়াছে যে, পাঞ্চেন লামাকে তাঁহার সাম্প্রতিক কম্যুনিস্ট-বিরোধী একটি ভাষণের জন্য বিচারার্থ পিকিংয়ে লইয়া যাওয়া হয়।

২৮শে মে—আফ্রিকানদের 'যে যার ঘরে থাক' আন্দোলন শুরু হওয়ার দুই দিন পূর্বে আজ হইতেই ডারবানের পথে পথে সাঁজোয়া গাড়ির শহরকে টহল দিতে দেখা যায়। সারা দক্ষিণ আফ্রিকায় জরুরী অবস্থা আগেই ঘোষণা করা হইয়াছে।

কাঠমাণ্ডুতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, ২৭ হাজার ৭ শত ৯০ ফুট উচ্চ মাকালু শীর্ষে স্যার এডমণ্ড হিলারীর অভিযান পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বলে : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
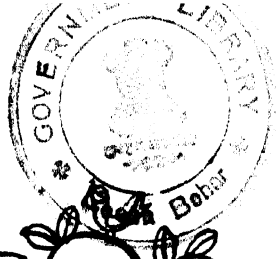
DESH 40 Nye Paise.
SATURDA, 10TH JUNE, 1961

শনিবার, ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ
২৮ বর্ষ ॥ ৩২ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা

ভারতবর্ষের ভাষাগত মানচিত্রে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা পৃথক পৃথক চৌহদ্দি মোটা দাগে টেনে আঁকা হয়েছে এবং হচ্ছে সাম্প্রতিককালে ভাষাবিরোধ বর্তমানে প্রবল ও প্রকট হয়েছে প্রধানত রাজনৈতিক কারণে; রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সুবিধা কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যেই কোন কোন অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাগোষ্ঠী ষোল আনা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত। নতুবা নিছক ভাষাগত চরিত্র বিচারে কোন কোন অঞ্চলে প্রধান প্রধান ভাষাগুলির মধ্যে স্বাভাবিক সাদৃশ্য এত সুস্পষ্ট যে এগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিঘ্নিত হওয়ার সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। কিন্তু তবু বিরোধ ঘটেছে; এই বিরোধের মূলে যে স্বাতন্ত্র্যস্পৃহা সমশ্রেণীর প্রতিবেশী ভাষাগুলির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, কৃত্রিম রাজনৈতিক ব্যবধান রচনা করেছে তার শুরু হয় ইংরেজ আমল থেকে।

১৩০৩ সালে অর্থাৎ পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্বে 'ভাষাবিচ্ছেদ' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কীভাবে বৈদেশিক শাসকবর্গের উত্তেজনা এবং প্রাদেশিক অভিমান বাংলা, অসমীয়া এবং উড়িয়া ভাষার মধ্যে সামান্য প্রভেদকে স্ফীত ও স্পষ্ট করে সমশ্রেণীর ভাষাগুলির একীভবনের স্বাভাবিক গতিপথ রোধ করেছে।

"যে-সকল প্রতিবেশী জাতির মধ্যে প্রভেদ সামান্য তাহারা ক্রমশ এক হইয়া যাইতে পারিত অন্তত ভাষা সম্বন্ধে তাহার উপক্রম দেখা গিয়াছিল।

"উড়িষ্যা এবং আসামে বাংলা শিক্ষা যেরূপ সবেগে ব্যাপ্ত হইতেছিল, বাধা না পাইলে বাংলা এই দুই উপরি ভাগ ভাষার সামান্য অন্তরালটুকু ভাঙিয়া দিয়া একদিন একগৃহবর্তী হইতে পারিত।

"সামান্য অন্তরাল এই জন্য বলিতেছি

ভাষাবিচ্ছেদ

যে, বাংলা ভাষার সহিত অসমীয়া ও ওড়িয়ার যে প্রভেদ সে-প্রভেদসূত্রে পরস্পর ভিন্ন হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। উক্ত দুই ভাষা চট্টগ্রামের ভাষা অপেক্ষা বাংলা হইতে স্বতন্ত্র নহে। বীরভূমের কথিত ভাষার সহিত ঢাকার কথিত ভাষার যে প্রভেদ, বাংলার সহিত অসমীয়ার প্রভেদ তাহা অপেক্ষা খুব বেশী নহে।......

"ভারতবর্ষেও যে যে সমশ্রেণীর ভাষার একীভবন স্বাভাবিক অথবা স্বল্প-চেষ্টাসাধ্য, সেগুলিকে এক হইতে দিলে আমাদের ব্যাপক ও স্থায়ী উন্নতির পথ প্রসর হইত।

"কিন্তু যদিচ একীকরণ ইংরেজ রাজত্বের স্বাভাবিক গতি, তথাপি দুর্ভাগ্যক্রমে ভেদনীতি ইংরেজের রাজকৌশল। সেই নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আমাদের ভাষার ব্যবধানকে স্থায়ী ও দৃঢ় করিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা বাংলাকে আসাম ও উড়িষ্যা হইতে যথাসম্ভব নির্বাসিত করিয়া স্থানীয় ভাষাগুলিকে উত্তেজনায় পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত।......

"ইংরেজদের কৃত্রিম উৎসাহে বাংলার এই দুই উপকণ্ঠ বিভাগের একদল শিক্ষিত যুবক বাংলা প্রচলনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ধ্বজা তুলিয়া স্থানীয় ভাষার জয়কীর্তন করিতেছেন।

"অসমীয়া এবং ওড়িয়া যদি বাংলার সগোত্র ভাষা না হইত তবে আমাদের এত কথা বলিবার অধিকার থাকিত না। বিশেষত শব্দভাণ্ডারের দৈন্যবশত সাধু-সাহিত্যে লেখকগণ প্রচুর পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য, অতএব সাহিত্যগ্রাহ্য ভাষায় অনৈক্য আরও সামান্য।"

পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, সুতরাং ভাষাগত চরিত্র বিচারে বাংলার সঙ্গে অসমীয়া এবং উড়িয়ার পার্থক্য বা অনৈক্য যৎসামান্যই ছিল, এবং "ভাষা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যদি প্রাকৃতিক নির্বাচনের স্বাধীন" বিকাশ সম্ভব হত তাহলে অন্ততপক্ষে পূর্ব ভারতের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাংলা ভাষাই স্বচ্ছন্দে ব্যাপ্ত হতে পারত। সমগোত্রীয় ভাষাভাষী অঞ্চলে বাংলা ভাষার স্বচ্ছন্দ বিস্তৃতির পথ কেন এবং কীভাবে রোধ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ থেকে উধৃত অংশগুলিতে তার সূত্র পাওয়া যায়। ভাষা-বিচ্ছেদের সূত্রটি পুরাতন, অর্থাৎ ইংরেজ আমলের। দুর্ভাগ্য এই যে বিচ্ছেদটাই বর্তমানে রাষ্ট্রিক অনুমোদনের শীলমোহরাঙ্কিত প্রচণ্ড সত্য।

সমগোত্রীয় আঞ্চলিক ভাষাগুলির একীভবনের যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ অনুসরণযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন তার অনুকূল পরিবেশ বর্তমান ভাষাবিচ্ছেদ-বিরোধ কণ্টকিত ভারতবর্ষে কোথায়ও আর নেই। একীভবনের প্রস্তাবে এখন আর কোন অঞ্চলের জনসমষ্টির কাছ থেকে সাড়া পাওয়ার আশা নেই। ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যচেতনা দীর্ঘকাল ধরে পৃথক পৃথক ধারায় প্রবাহিত হয়ে যে বৃহৎ এক একটি খাত রচনা করেছে সেগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত ও মিলিত করতে পারা অসম্ভব। অসম্ভব আরও এই কারণে যে ভাষাগত স্বাতন্ত্র্যচেতনা কেবল ভাষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশেই সমাপ্ত নয়। অসমীয়া ভাষীরা তাঁদের মাতৃভাষা অসমীয়ার প্রতি অনুরক্ত, বাংলাভাষীরা বাংলার প্রতি—ভাষাগত প্রীতির প্রকাশ যদি স্বাভাবিকভাবে এই ধারা অনুসরণ করত তাহলে আর যাই হোক ভাষাগত পার্থক্য থেকে বিচ্ছেদ এবং বিচ্ছেদ থেকে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারত মনে হয় না। ভাষার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগের সঙ্গে ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্রিক একাধিপত্য কামনা যুক্ত হওয়ার ফলে কোন কোন ভাষাগোষ্ঠীর চিত্ত-বিকার ঘটেছে।

ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠন আর ভাষাগত একাধিপত্য দাবি যে এক জিনিস নয় একথা অসমীয়াগণ আপাতত উপলব্ধি করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। আসামে অসমীয়া ভাষাই এক এবং অদ্বিতীয় গণ্য হবে, এ-দাবি কোন যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা যায় না। অথচ অসমীয়াদের দাবিটা তাই। যেহেতু রাজ্যশাসন ক্ষমতার ষোল আনা না হোক পনের আনা তাঁদের হাতে সেই হেতু তাঁদের ভাষাই একমাত্র

সরকারী ভাষা ঘোষিত হবে, এরকম জিদ যে গণতান্ত্রিক বিধানের পরিপন্থী অসমীয়াগণ তা কিছুতেই স্বীকার করতে রাজি নন দেখা যাচ্ছে। বাংলাকে, পার্বত্য উপজাতীয় ভাষাকে যথোচিত স্বীকৃতি দিলে অসমীয়া ভাষার বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে এমন কথা নয়। অসমীয়াগণ যদি প্রচ্ছন্নভাবে এই মনোভাব পোষণ করেন যে অঙ্গরাজ্য আসামের শাসক-শ্রেণী তাঁরা, বাঙ্গালী এবং পার্বত্য অধিবাসীরা তাঁদের আশ্রিত প্রজামাত্র, তাহলে অবশ্যই বলতে হবে তাঁরা কেবল অসমীয়া ভাষার নয় অসমীয়া হিসাবে একটা স্বতন্ত্র জাতিসত্তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়সংকল্প। মনে রাখা দরকার যে এমন কোন পৃথক জাতিসত্তার প্রাধান্য ভারতবর্ষের ভাষাভিত্তিক মানচিত্রেও এখন পর্যন্ত স্থান পায়নি। অসমীয়ারা কার্যত আসামের অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠীর বিলুপ্তি চাইছেন। আসামের ভাষাগত দ্বন্দ্ববিরোধের বিপর্যয়কর তাৎপর্য এখানেই। ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যেই কোন ভাষাগোষ্ঠী এমন নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়নি।

ভাষাগত পার্থক্য অবশ্য এখন আর মেনে না নিয়ে উপায় নেই; সমগোত্রীয় ভাষাগুলির একীভবনের যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথ প্রচার করেছিলেন তার পুনরুজ্জীবনের আশাও নিঃশেষিত। ভাষাবিচ্ছেদ বর্তমানে অপ্রতিরোধ্য হতে পারে, কিন্তু ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান অনুযায়ী অঙ্গরাজ্যের প্রধান প্রধান ভাষাগুলির শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি কার্যকর করা নিশ্চয়ই সম্ভব এবং নিঃসন্দেহে জরুরী প্রয়োজন।

পরলোকে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের পুত্র, এই পরিচয়—যদিও এই-ই সব নয়—রথীন্দ্রনাথকে সাধারণের চোখে প্রীতি ও মাধুর্যমণ্ডিত করেছিল। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী বর্ষে রথীন্দ্রনাথের মৃত্যু যেন অকাল প্রযোজিত জীবন-মরণ লীলার একটি বিয়োগান্ত নাটকীয় পদক্ষেপ। অলোকসামান্য প্রতিভাধর পিতার সস্নেহ-সান্নিধ্যে রথীন্দ্রনাথের জীবনের বেশীর ভাগ অতিবাহিত হয়েছি[ল]। সৃজনী-প্রতিভায় বংশগত উত্তরাধিকারের দৃষ্টান্ত বিরল; তবে রথীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-প্রতিভার অবিকল প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হতে প্রয়াসী না হয়ে স্বকীয় রুচি ও প্রকৃতি অনুযায়ী কতকগুলি বিশেষ গুণে অনুশীলনে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছিলেন। বিনয়ী, মিতভাষী, আত্মপ্রচারে অনাগ্রহী, সূক্ষ্মমার্জিত রুচিসম্পন্ন মানুষটির রচনায়, কারুশিল্প সৃষ্টিতে, চিত্রাঙ্কণে রবীন্দ্র-সাধনা ধারার সার্থক নিদর্শনের অভাব নেই। রথীন্দ্রনাথের লোকান্তরিত আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

আলোচনা

রাষ্ট্রভাষা ও রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

গত ২৩শে বৈশাখ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা দেশে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব মহাশয় লিখিত রাষ্ট্রভাষা ও রবীন্দ্রনাথ নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম। প্রবন্ধটি সুলিখিত। কিন্তু দেব মহাশয়ের প্রবন্ধে এমন একটি উক্তি আছে যাহার সংশোধন হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে হওয়ায় এই পত্র দিতেছি।

দেব মহাশয় অবাঙালীদের বাংলাভাষার চর্চার বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে অবাঙালী আখ্যা দিয়া তাঁহাকে সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের সহিত এক পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমি যতদূর জানি, ইহা সঠিক বিবরণ নহে। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর প্রবন্ধ লেখক বা বাংলায় বসবাসকারী সকলের মত বাঙালীই ছিলেন। আচার্য দেবের পূর্বপুরুষ কয়েকশত বৎসর পূর্বে পশ্চিম ভারত হইতে বাংলাদেশে চলিয়া আসেন ইহা সত্য বটে। তাঁহার বংশপরিচয় জানা যায়, বংশের পূর্ববর্তিগণ প্রথমে মুর্শিদাবাদ জেলার টেঁয়া গ্রামে বসবাস করিতেন এবং পরে রামেন্দ্রবাবুর প্রপিতামহ ঐ জেলার জেমো গ্রামে আসিয়া বসবাস শুরু করেন। টেঁয়া গ্রামে বসবাসের সময় হইতেই তাঁহারা বাংলাভাষাকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করেন এবং তদবধি বংশানুক্রমে বাংলাভাষাকে মাতৃভাষা হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন। আচার্যদেব বাঙালীরূপেই বাংলা মায়ের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা মায়ের অতবড় একজন কৃতী সন্তানকে অবাঙালীরূপে পরিচিত করা দেব মহাশয়ের পক্ষে অনুচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। কয়েকশত বৎসর পূর্বে তাঁহার পূর্বপুরুষ বাংলার বাহিরে বসবাস করিতেন এই কারণে যদি রামেন্দ্রবাবু অবাঙালী পর্যায়ভুক্ত হন তবে বাংলাদেশের বহু পরিবারকেই অবাঙালী আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

ভবদীয়। শ্রীপূর্ণচন্দ্র রায়। দক্ষিণ চাতরা, ২৪ পরগণা।

বস্তারোপাখ্যান

সবিনয় নিবেদন,

দেশ পত্রিকায় ২৯ সংখ্যায় (২০শে মে '৬১) বস্তারের ভূতপূর্ব মহারাজা প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জ দেও সম্বন্ধে শ্রীসুনীত ঘোষ যা লিখেছেন তার উত্তরে উড়িষ্যার জনৈক জিজ্ঞাসু কতকগুলো প্রশ্ন করেছেন। প্রথমে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন—সুনীত ঘোষ যা লিখেছেন তার সবটাই কি সত্য তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? না, রাজনৈতিক প্রচারকার্য! প্রবন্ধটির মধ্যে লেখক যে কোথায় রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালিয়েছেন বুঝতে পারলাম না। এরপর লেখকের লেখার মধ্যে যে দুটো ভুল তিনি দেখিয়েছেন তা লেখকের জবাবে অবশ্য আমরা জানতে পারব। কিন্তু প্রথম প্রশ্নের অবতারণা করবার কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রবন্ধের মধ্যে লেখকের নিন্দার মনোভাব বিন্দুমাত্র নেই। তিনি প্রবীরচন্দ্রের চরিত্রের কয়েকটা দিক উদ্ঘাটন করেছেন মাত্র। যা প্রবীরচন্দ্রের চরিত্রে বিদ্যমান। এর মধ্যে প্রবীরচন্দ্রের বিরুদ্ধে দেশবাসীর রুদ্ধ মনোভাব বা লেখকের নিন্দা করবার অভিপ্রায় কি করে থাকে?

প্রবীরচন্দ্র ছিলেন একজন বিচিত্র প্রকৃতির ব্যক্তি। যাঁর চরিত্র অন্যান্য পাঁচজনের চরিত্রের সঙ্গে মেলে না। সেইজন্য তাঁর সম্বন্ধে জানবার এবং জানাবার জন্য লোকের মনে স্বভাবতই কৌতূহল জাগে। এই কৌতূহল মেটাবার জন্যই লেখক প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। কিছুদিন আগে অন্য একটি দৈনিক পত্রিকায় এক প্রবন্ধে বস্তারের মহারাজা প্রবীরচন্দ্রের বিচিত্র চরিত্রের আরও কিছু নিদর্শন পেয়েছিলাম। শেষে জনৈক জিজ্ঞাসু প্রশ্ন করেছেন—প্রবীরচন্দ্রের যেসব দোষের ইঙ্গিত করা হয়েছে আমাদের অনেক বড়লোকেরই কি তা নেই? এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রবীরচন্দ্র একটা স্টেটের মহারাজা। সুতরাং তাঁকে সাধারণ বড়লোকের গোষ্ঠীভুক্ত করে লাভ নেই।

ইতি—অজয়েন্দ্রনাথ মজুমদার, সারঙ্গাবাদ, বজবজ, ২৪-পরগণা।

ভিয়েনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তার পরে যে সরকারী ইস্তাহার প্রচারিত হয়েছে তাতে মাত্র এক শো পঁচিশটি শব্দ আছে। (আমরা গুনে দেখিনি, সংবাদ-পরিবেশক এজেন্সীই শব্দসংখ্যা গুনে বলেছে। মূল ইস্তাহারটি নিশ্চয়ই কেবল একটিমাত্র ভাষায় রচিত হয়নি। ইংরেজী, রুশ, ফরাসী এবং যখন ভিয়েনাতে এই দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে তখন ভদ্রতার খাতিরে সম্ভবত জার্মান ভাষাতেও ইস্তাহারটির একটি সরকারী পাঠ আছে। এই বিভিন্ন ভাষায় ইস্তাহারটির শব্দসংখ্যা সমান হতে পারে না। ইংরেজী পাঠই এখানে আমরা পেয়েছি এবং নিউজ এজেন্সী কর্তৃক উল্লিখিত শব্দসংখ্যা নিশ্চয়ই ইংরেজী পাঠ সম্পর্কেই প্রযোজ্য।) এই অল্প কথার ইস্তাহারটির জন্য শ্রীকেনেডি ও শ্রীক্রুশ্চফের নিশ্চয়ই ধন্যবাদ প্রাপ্য। রাষ্ট্রপ্রধানদের মিলনের পরে প্রচারিত ইস্তাহারে সাধারণত যে ধরনের বাজে ধোঁয়াটে এবং বেশীর ভাগ অর্থহীন কথার জাল বোনা হয়, এ ক্ষেত্রে তা হয়নি। প্রেসিডেন্ট কেনেডি এবং প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চফ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় আলোচনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে এই আলোচনার যোগাযোগ তাঁরা রক্ষা করবেন বলে স্বীকৃত হয়েছেন। নিউক্লিয়ার অস্ত্রের পরীক্ষা, নিরস্ত্রীকরণ এবং জার্মানীর সমস্যা তাঁরা আলোচনা করেছেন বলে ইস্তাহারে উল্লেখ মাত্র করা হয়েছে। কেবল লাওস সম্বন্ধে নূতন না হলেও "পজিটিভ" কিছু কথা আছে। লাওশিয়ানদের নিজেদের মনোনীত গভর্নমেণ্টের অধীনে লাওস একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হবে এবং লাওসের নিরপেক্ষতা এবং স্বাধীনতা আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা সুরক্ষিত হবে—শ্রীক্রুশ্চফ এবং শ্রীকেনেডি এই মতের পুনরুক্তি করেছেন। এই সম্পর্কে তাঁরা লাওসে খাঁটি যুদ্ধবিরতির আবশ্যকতা স্বীকার করেছেন। লাওসে খাঁটি যুদ্ধবিরতি এখনো হয়নি, যে পক্ষ যেখানে সুবিধা পাচ্ছে, আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, দুই পক্ষ পরস্পরের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে আসছে। মার্কিন-সমর্থিত পক্ষই এই অভিযোগ বেশী করেছে, তার একটা কারণ অবশ্য এই যে, সামরিক দিক থেকে তারা একটু বেশী বেকায়দায় পড়েছে। যুদ্ধবিরতির প্রশ্নে মতদ্বৈধের উপশম হলে জেনেভায় লাওস কনফারেন্স অধিকতর সচল হতে পারে। কেনেডি-ক্রুশ্চফ সাক্ষাৎকারের ফলে সেদিক দিয়ে কিছু উন্নতির সম্ভাবনা হয়েছে, কিন্তু তাই বলে লাওস কনফারেন্সের অগ্রগতির পথে সব বাধা দূর হলো বা লাওস সমস্যার সমাধান হতে আর বিলম্ব নেই, এরূপ মনে করা খুবই ভুল হবে। বাদাবিসংবাদ ঠেলাঠেলি চলতেই থাকবে, তবে আপাতত কোনো তীব্র সংকট উপস্থিত হয়ত হবে না। নিউক্লিয়ার অস্ত্রের পরীক্ষা সম্বন্ধীয় কনফারেন্সে যে অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তারও কিঞ্চিৎ উপশম হতে পারে অর্থাৎ আলোচনার স্রোত বন্ধ না হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাই বলে দুই পক্ষের মতের সামঞ্জস্য লাভ এবং তদনুযায়ী চুক্তি আসন্ন, এরূপ আশা করার কোনো হেতু নেই।

এই দেখা-সাক্ষাতের ফল সম্বন্ধে শ্রীকেনেডির মনের ভাব যাঁদের কথা থেকে কিছুটা আন্দাজ করা যায় তাঁদের কথাবার্তার সুর নাকি তেমন আশাব্যঞ্জক নয়, অর্থাৎ এই দেখা-সাক্ষাতের ফলে পূর্ব-পশ্চিম বিরোধ সংশ্লিষ্ট কোনো বৃহৎ প্রশ্নের আশু সমাধানের সম্ভাবনা যে বিশেষ কিছু বেড়েছে তা নয়। মিঃ ক্রুশ্চফের ভাবটা কিছুটা অন্যরকম মনে হয়। তাঁর ভাবটা যেন শ্রীকেনেডির চেয়ে একটু প্রফুল্লতর। বোধ হয় শ্রীকেনেডির সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁর ধারণা হয়েছে যে, অনেক বিষয়ে তাঁর চেয়ে শ্রীকেনেডির

মুশকিল ঢের বেশী। শক্তির ক্ষেত্রে সোভিয়েটের সামনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পিছু-হাঁটা বন্ধ করাটাই শ্রীকেনেডির সব চেয়ে বড়ো সমস্যা। সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রীর পক্ষে সেটা অনুভব করা কঠিন নয় এবং তাতে তিনি কিঞ্চিৎ হর্ষ অনুভব করবেন, এটাও বিচিত্র নয়।

• • •

ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী অপপ্রচারের মাত্রা আবার বেড়েছে। এজন্য ভারত সরকার ও ভারতীয় জনমত কিছুটা চঞ্চল হয়েছে এবং পাকিস্তান সরকার যদি ভারতের উপর কোনো আক্রমণ চালাবার অভিসন্ধি পোষণ করে থাকেন, তবে সে সম্পর্কে পাকিস্তানকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে সেরূপ কোনো আক্রমণ হলে তাকে প্রতিহত করার জন্য ভারত প্রস্তুত আছে। এই হুঁসিয়ারি সময়োচিত হতে পারে, কিন্তু পাকিস্তান ও চীনের আক্রমণাত্মক ভাব এবং কার্যকে এক পর্যায়ে ফেলার ভঙ্গী যেটা কিছুকাল থেকে চালু হয়েছে সেটা ঠিক কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই ভঙ্গীটি বিশেষভাবে প্রবর্তন করেছেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন। যখনই চীন কর্তৃক ভারতীয় ভূমির জবরদস্তি দখলের প্রসঙ্গ ওঠে তখনই শ্রীমেনন তাঁর সঙ্গে কাশ্মীরের এক অংশে পাকিস্তানীদের বেআইনী অবস্থানের কথাটা জুড়ে দেন। ভারতভূমি থেকে চীনকে তাড়ানো এবং কাশ্মীর থেকে পাকিস্তানকে তাড়ানো একই ধরনের কর্তব্য এই ভাবের কথা শ্রীমেনন যখনই সুযোগ পান বলে আসছেন। তাঁর উক্তিগুলি শুনলে সাধারণের ধারণা হবে যে, কাশ্মীরে পাকিস্তানী সৈন্যের অবস্থিতি যদি আমরা সহ্য করতে পারি তা হলে ভারতভূমিতে চীনা সৈন্যের অবস্থিতিও আমাদের অসহনীয় হওয়া উচিত নয়, কারণ উভয়ই একই ধরনের বেআইনী দখল।

বারবার এরূপ কথা বলে বলে চীনাদের ভারতভূমি থেকে সরাবার দাবিকে কেবল নরম করে দেওয়া হচ্ছে তা নয়, বস্তুত তার মূলোচ্ছেদ করা হচ্ছে। এক সময়ে চীনাদের কার্যকে অন্যায় আক্রমণ, "অ্যাগ্রেশন" বলতেও শ্রীমেননের আটকাতো। এখন তিনি চীনাদের কার্যকে "এ্যাগ্রেশন" বলতে আপত্তি করেন না, কিন্তু সে কথা উঠলেই সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের অ্যাগ্রেশনের কথা তোলেন এবং চীনা ও পাকিস্তানী অ্যাগ্রেশন থেকে ভারতকে মুক্ত করার অভিপ্রায় এক সঙ্গে ব্যক্ত করেন। কাশ্মীরের একাংশে পাকিস্তানী অবস্থিতি যে বেআইনী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ কথা কি পৃথিবীর জানা নেই যে, বর্তমানে কাশ্মীরের যতটা পাকিস্তানের দখলে আছে, সেখান থেকে পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ হটিয়ে দিয়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের কথা ভারত সরকারও ভাবেন না, দেশের লোকেও ভাবে না? প্রতিরক্ষা মন্ত্রী যখন বলেন যে, ভারতভূমির যে অংশ চীনারা বেআইনী দখল করেছে তার পুনরুদ্ধার করতে ভারত সরকার যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ঠিক তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাঁরা পাকিস্তানীদের কবল থেকে কাশ্মীর মুক্ত করতে তখন তার নির্গলিতার্থ এই দাঁড়ায় যে, ভারত সরকার চীনাদের ভারতভূমি থেকে হটানোর কথা আসলে চিন্তাই করছেন না। শ্রীমেননের কথা যদি ভারত সরকারের নীতি অনুযায়ী হয় তবে পিকিং সরকার আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে, ভারতভূমি থেকে চীনাদের হটাবার কোনো চেষ্টা ভারত সরকার করবেন না, মাঝে মাঝে গলাবাজি করা ছাড়া। কাশ্মীরে পাকিস্তানী "অ্যাগ্রেশনে"র বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ ভারত সরকার করে যাচ্ছেন এবং যাবেন যতদিন পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার কাশ্মীর উপত্যকা দাবি করতে এবং থেকে থেকে সামরিক আক্রমণের হুমকি দিতে থাকবেন, কিন্তু কাশ্মীর থেকে সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানী দখল উচ্ছেদ করার চেষ্টা, এমন কি ইচ্ছাও ভারত সরকারের নেই। এ হেন কাশ্মীর সমস্যার সঙ্গে হিমালয়ে চীনা সমস্যাকে এক পর্যায়ে ফেললে তার কী অর্থ হয় সে কথা আমাদের বুদ্ধিমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নিশ্চয়ই বোঝেন। প্রধানমন্ত্রী মহাশয় এবং ভারত সরকারের অন্য মন্ত্রীরা কি বোঝেন না যে শ্রীকৃষ্ণ মেননের কথার অর্থ—বর্তমানে চীনারা হিমালয়ে যে বারো হাজার বর্গমাইল ভারতভূমি দখল করে বসেছে তার সম্পর্কে তাদের চিরস্থায়ী ভোগের আশ্বাস দান?

৬।৬।৬১

ভবঘুরে (১১)

কুকু-কুকু, কুকু-কুকু, কুকু-কুকু!

এ কি?

এত যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রান্নাঘরের বর্ণনা দিলুম, ঘড়িটা গিয়েছি বিলকুল ভুলে। লক্ষ্যই করিনি। পর্যবেক্ষণ শক্তি আমার বিলক্ষণ অক্ষম বলে ছেলেবেলায়ই আমার গুরুমশাই আমাকে 'রাত্র্যন্ধ, দিবান্ধ' ইত্যাদি উত্তম খেতাবে বিভূষিত করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আমাদ্দারা আর যা হোক হোক সাহিত্যিক হওয়া হবে না। আমার দোষের মধ্যে, লাটসায়েবের কুকুরের যে একটা ঠ্যাঙ নেই, সেটা আমি লক্ষ্য করিনি। এবার সেটা পুনরায় সপ্রমাণ হল। অবশ্য আমার একমাত্র সান্ত্বনা, মারিয়ানা আমার চেয়ে এক মাথা খাটো বলে দেয়াল-ঘড়িটা ঠিক আই-লেভেলে ঝোলানো হয়নি।

এসব ঘড়ি সস্তা হলেও এ দেশে বড় একটা আসে না। ছোট্ট একটি বাক্সের উপর ডায়েল লাগানো কিন্তু কাচের আবরণ নেই। বাক্সের উপর ছোট্ট একটি কুটিরের মডেল—ব্ল্যাক ফরেস্ট (শ্বেয়ার্ৎস্ ভাল্ট—কালো বন) অঞ্চলে যে-রকম সচরাচর হয়ে থাকে, এবং কুটিরটি দেখা যাচ্ছে যেন তার পাশ থেকে, কারণ কোনো দরজা সেখানে নেই, আছে একটি হলদে রঙের জানলা—কুটিরটি সবুজ রঙের। প্রতি ঘণ্টায় ফটাস্ করে জানলার দুটি পাট খুলে যায় আর ভিতর থেকে লাফ দিয়ে তার চৌকাঠে বসে একটি ছোট্ট পাখী মাথা দোলাতে দোলাতে কুকু করে জানিয়ে দেয় ক'টা বেজেছে। তারপর সে ভিতরে ডুব মারে আর সঙ্গে সঙ্গে জানলার দুটি পাট কটাস্ করে বন্ধ হয়ে যায়।

ব্ল্যাক ফরেস্টের কুটিরশিল্প। এ দেশে রপ্তানী হতে শুনিনি। হলেও বেকার হবে। এতটুকু কাচের আবরণ যে ঘড়ির কোথাও নেই সে ঘড়ি এই ধুলো-বালির দেশে দু দিনেই ধূলিশয্যা গ্রহণ করবে।

আমি চমকে উঠে বললুম, 'সর্বনাশ। তিনটে বেজে গেছে। আমাকে যে এগুতে হবে।'

আমাদের তখন সবেমাত্র সুপ পর্ব সমাধান হয়েছে। ঠাকুরমা সুপ শেষ করে চুপচাপ বসে আছেন।

মারিয়ানা বললে, 'এগুতে হবে মানে? খাবার শেষ করে তো যাবে। আজ যে রোববারের লাঞ্চ—তার উপর রয়েছে রে রাগু।'

'রাগু' কথাটা ফরাসী। অর্থাৎ কোফ্তা-কাটা মাংস। আর 'রে' মানে হরিণ।

তার সঙ্গে টুকরো টুকরো করে কাটা থাকে ব্যাঙের ছাতা (এ দেশে মেদিনীপুর বাঁকুড়ার লোক এর তত্ত্ব কিছু কিছু জানে, কাশ্মীরীরা ভালো করেই জানে এবং টিনে করে রপ্তানী আরম্ভ হয়ে গিয়েছে), প্যাঁজ আর ট্রাফ্‌ল্‌—অবশ্য যদি এই শেষোক্ত বস্তুটি পাওয়া যায়।১ রীতিমত রাজভোগ!

আমি শুধালুম, 'হরিণের মাংস পেলে কোথায়?'

বললে, 'দাঁড়াও, রাগুটা নিয়ে আসি।'

আমার আর মারিয়ানার সুপ প্লেটের নিচে আগের থেকেই মারিয়ানা প্রধান খাদ্যের প্লেট সাজিয়ে রেখেছিল। এখন শুধু সুপ প্লেটই উপর থেকে সরাতে হল। শুনেছি রাশাতে চার পদের লাঞ্চ-ডিনার হলে

(১) এই ট্রাফ্‌ল্‌ নামক সব্জিটি জন্মায় মাটির কয়েক ইঞ্চি নিচে, প্রধানত ফ্রান্সেই। একমাত্র কুকুর আর শুয়োরই মাটির উপর থেকে গন্ধ পেয়ে এটা খুঁড়ে বের করতে পারে—যদিও ট্রাফ্‌ল্‌ কুকুরের খাদ্য নয়। এ জিনিস বের করার জন্যে মাংসের টুকরোর লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে কুকুরকে ট্রেন্‌ করতে হয়। বেচারী কুকুরগুলোকে স্বার্থপর মানুষ অত্যন্ত কম খাইয়ে খাইয়ে রাখে—না হলে তারা ট্রাফ্‌লের সন্ধান করে না। আর কুকুর-গুলোকে ট্রাফ্‌ল্‌-শিকারী খোঁজবার সময় যে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে সে শোনবার মত—'ও যাদু, ও বাছা, ও আমার সোনার খনি! এগো না বাবা, খোঁজ না ধন!'—আরো কত কী! শেষের দিকে বেচারী কুকুরকে মাংসের পরিবর্তে বাসী রুটির ছোট ছোট টুকরো দিয়ে ভোলানো হয়। ট্রাফ্‌লের নাকি এফ্রো-ডিজিয়াক গুণ আছে। ফ্রান্স ঐ দিয়ে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা কামায়।

এরকম ধারা চার চারখানা প্লেট একটার উপর আরেকটা সাজানো হয়। যেমন যেমন এক এক পদ খাওয়া শেষ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে সেই প্লেট সরানো হয়—প্রতিবারে নূতন করে পরের পদের জন্যে প্লেট সাজাতে হয় না। এ কথাটা আমি শুনেছি, কারণ একাধিক রাশানের বাড়িতে আমি খেয়েছি—বলশী এবং জারিস্ট দুই সম্প্রদায়েরই, কিন্তু এ-ব্যবস্থা দেখিনি। একখানা প্লেটের উপর সুপ প্লেট রাখলে উচ্চতায় বিশেষ কিছু হের-ফের হয় না, কিন্তু চারখানা প্লেটের উপর সুপ প্লেট রাখলে সে তো নাকের ডগার কাছে পৌঁছে যাবে!

আভ্‌ন্‌ খুলে মারিয়ানা রে রাগু নিয়ে এল।

আমি ঠাকুরমার দিকে তাকিয়ে মারিয়ানাকে চোখের ইশারা করলুম।

মারিয়ানা বললে, 'ঠাকুরমা এক সুপ ভিন্ন অন্য কিছু খায় না। আমিও না। কিন্তু ঐ না জিজ্ঞেস করলে হরিণের মাংস কোথায় পেলুম? আমাদের গ্রাম থেকে বেরলে দূরে দক্ষিণে দেখতে পাবে আরেকটা গ্রাম—তার নাম মুফেন্‌-ডর্ফ। তারপর পুরো একটা ক্ষেত পেরিয়ে রুঙ্‌স্‌-ডর্ফ। তার শেষে নাম করা হোটেল ড্রেজেন—রাইনের পাড়ে। সেখানে কিন্তু ওপারে যাবার খেয়া নেই। তাই কিছুটা দক্ষিণে গিয়ে মেলেম্‌ খেয়াঘাট। ওপারে কোনিগস্‌-ভিণ্টার। সেটা সীবেন্‌-গেবির্গের (সপ্তকুলাচলের) অংশ। তার আরো অনেক দক্ষিণে গিয়ে লরেলাই। ঐ যে তোমার পকেটে রয়েছে হাইনের কবিতার বই তাতে আছে লরেলাই সম্বন্ধে কবিতা।'২

মারিয়ানা ইস্কুল মাস্টারের মত আমাকে বেশ কিছুটা ভূগোল-জ্ঞান দান করে বললে, 'হ্যাঁ হরিণের মাংসের কথা হচ্ছিল। ঐ যে মুফেন্ ডর্ফ (ডর্ফ=গ্রাম) সেটা এমনি অজ যে আমরা ওটাকে ডাকি মুফ্রিকা—আফ্রিকার মত সভ্যতা থেকে অনেক দূরে আছে বলে আফ্রিকার 'ফ্রিকাটি' জুড়ে নিয়ে। আর আফ্রিকাবাসীকে যেমন জর্মনে বলা হয় 'আফ্রিকানার' ঠিক তেমনি ওদের আমরা ডাকি মুফ্রিকানার।'

আমি হেসে বললুম, 'তোমাদের রসবোধ আছে।'

মারিয়ানা বললে, 'ঐ মুফ্রিকার কাকা হান্‌স্ বাবার বন্ধু। আসলে অবশ্য বাবার বন্ধু বলেই ওঁকে ডাকি অঙ্‌কল্‌ হান্স। দুজনাতে প্রতি শনিবারে হরিণ শিকারে যেত। যতদিন বাবা বেঁচেছিল। এখন একা যায়। যেদিন ভালো শিকার

(২) অধুনা প্রকাশিত 'হাইনের শ্রেষ্ঠ কবিতা' ('দীপায়ন প্রকাশনা')। 'দেশ' ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ সংখ্যা, পৃ ৪১৮ দ্রঃ) পুস্তিকার ৮৬ ও ৮৭ পৃ পশ্য।

জোটে সেদিন মাংসের খানিকটে আমায় দিয়ে যায়। ব্যাঙের ছাতা আমি নিজে বন থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসি আর প্যাঁজ তো ঘরে আছেই।'

আমি বললুম, 'মারিয়ানা, লক্ষ্মী মেয়ে, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ঠাকুরমার সুপ প্লেট সরানোর পর তিনি হাত দুটি একজোড় করে অতি শান্তভাবে আমাদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে অল্প মৃদু হাসা করলে গাল দুটি টুকটুকে লাল হয়ে যাচ্ছিল। যেন সর্ব শরীরের রক্ত ছুটে গিয়ে গাল দুটিতে আশ্রয় নিচ্ছিল—হায়, বুড়িদের গায়ে ক' ফোঁটা রক্তই বা থাকে!

এবারে তিনি মুখ খুলে বললেন, 'মারিয়ানা না বললো তুমি পায়ে হেঁটে হাইকিঙে বেরিয়েছো, তবে তোমার তাড়া কিসের। এ গ্রাম যা, সামনের গ্রামও তা। গ্রামে গ্রামে তফাত কোথায়? শহরে শহরে থাকে। কারণ ভগবান বানিয়েছেন গ্রাম, আর মানুষ বানিয়েছে শহর।'

এক লম্ফে চেয়ার ছেড়ে মারিয়ানা ঠাকুরমার কাছে গিয়ে দু হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর গালে ঝপাঝপ গণ্ডা তিনেক চুমো খেলে। আর সঙ্গে সঙ্গে 'ওঃ! তুমি কি লক্ষ্মীটি ঠাকুমা! তোমার মত মেয়ে হয় না ঠাকুমা! আমার কথা শুনতে যাবে কেন ঐ ভবঘুরেটা। দেখা হয়েছে অবধি শুধু পালাই পালাই করছে।'

ঠাকুরমা ব্যতিব্যস্ত না হয়ে বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে। তুই খাওয়া শেষ কর।'

রে রাগুর সঙ্গে নোনা জলে সেদ্ধ করা আলু আর জাওয়ার ক্রাউট।

ঠাকুরমা ব্যতিব্যস্ত না হয়ে বললেন, ক্রাউট খেতে ভালোবাসো? আমি তো শুনেছি, বিদেশীরা ও জিনিসটা বড় একটা পছন্দ করে না।'

আমি বললুম, 'জিনিসটা যে বাঁধাকপির টক আচার। সত্যি বলতে কি, প্রথম দিন আমার ভালো লাগেনি। এখন সপ্তাহে নিদেন তিন দিন আমার চাই-ই চাই। জানেন, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পিয়ের লাভাল যখন একবার বার্লিনে আসেন তখন তাঁর দেশ-বাসী কে যেন তাঁকে বলেছিল জর্মানদের মত জাওয়ার ক্রাউট কেউ বানাতে পারে না। সে কথা তাঁর মনে পড়ল যেদিন ভোরে তিনি চলে যাবেন তার আগের রাত্রে আড়াইটার সময়। রেস্তোরাঁ তখন বন্ধ; হলে কি হয়, ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী, তিনি খাবেন জাওয়ার ক্রাউট—যোগাড় করতেই হল।

সেই রাত সাড়ে চোদ্দটার সময় ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী সোল্লাসে খেলেন জাওয়ার ক্রাউট!

আমি যে এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা পছন্দ করি না তার প্রধান কারণ ঐ খাদ্যটি সম্বন্ধে তিনি অচেতন॥

শার্ঙ্গদেব

গজল রচয়িতা নজরুল

কৈশোরে আমরা নজরুলের গজল শুনে মুগ্ধ হতাম। নজরুলের ফার্সী ধরনে রচিত গানগুলির একটা মাদকতা ছিল যা সে যুগের বাঙালীকে পেয়ে বসেছিল। একটা নতুন রঙে আমাদের মন রঙীন হয়ে গিয়েছিল। বাংলা গানে পরীক্ষা নিরীক্ষা কম হয়নি। অনেকে অনেক নূতনত্ব আনতে চেষ্টা করেছেন; পাশ্চাত্য সংগীতের রীতিনীতি আমাদের সংগীতে প্রয়োগ করবার চেষ্টা যথেষ্ট হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে, কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির সংগীত সম্বন্ধে আমরা উৎসাহিত হইনি। নজরুলের মত এদিকে আর কারুর আগ্রহ দেখা যায়নি। তারুণ্যে হাফেজের কাব্য তাঁকে আকর্ষণ করেছিল—পরবর্তীকালেও পারসিক সাহিত্য এবং সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ অব্যাহত ছিল।

ফার্সী চৌপদী, মসনবী, গজল প্রভৃতি প্রগাঢ়ভাবে চিত্তাকর্ষক। আর তাদের সংগে আমাদের ভাবধারার মিলও যথেষ্ট। সুফীদের ভাবধারার সংগে আমাদের কাব্যগত ভাবধারা সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে। বহু ফার্সী কবিতা শুনলে মনে হবে আমাদের কবিরাও এমনি করেই তাঁদের কথা বলে এসেছেন। এ ছাড়া সুর এবং ধরণ ধারণেও আমাদের সংগে ওদের ঐক্য কম নয়। রবীন্দ্রনাথ পারস্যে ভ্রমণকালে সেখানকার সংগীতে আমাদের ভৈরোঁ, রামকেলির প্রায় যথাযথ পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন। বহুশত বৎসরের সাংস্কৃতিক সংস্পর্শে ইরাণ-ভারতীয় বিভিন্ন আর্টে উভয় দেশের নানা বৈশিষ্ট্য স্থায়ীভাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। ভাব এবং প্রকৃতির মিল যেখানে এত অধিক সেখানে কোনও প্রতিভার দৃষ্টি পড়বে এটা স্বাভাবিক এবং নজরুলের দৃষ্টি এইদিকে প্রসারিত হওয়াতে আমাদের দেশ উপকৃত হয়েছে। সুর সহযোগে ফার্সী কাব্যের ধ্বনি তাঁর মর্ম স্পর্শ করেছিল তার কারণ প্রথমত মধুর ভাষা দ্বিতীয়ত সুললিত গতি এবং তৃতীয়ত চিত্তাকর্ষক ছন্দ। ফার্সী কাব্যের উত্তম পঠনে জীবন্ত মানব হৃদয়ের প্রতিটি ইমোশন যেন স্পন্দিত হতে থাকে। এই ভাষায় অল্প কথায় প্রচুর জ্ঞাপকতা বর্তমান। ফার্সী কবিতা আধ্যাত্মিকতা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে অবহেলা করেনি—পৃথিবী তার রমণীয়তা নিয়ে এবং মানুষ তার সহৃদয়তার সমস্ত উপকরণ নিয়ে সেখানে উপস্থিত। অথচ তারই মধ্যে আছে সমীক্ষা, তত্ত্ব এবং দর্শন। ফার্সী কাব্যের মানবিকতা ফার্সী সাহিত্যের সবচেয়ে বড় সম্পদ। নজরুল এই মানবিকতাকেই বিশেষভাবে আশ্রয় করেছিলেন এর সংগে তাঁর গানে আছে ফার্সী কাব্যের অপর বৈশিষ্ট্য,—কবির নিরাসক্তি এবং সহৃদয়তার সহিত দূরে থেকে মানবহৃদয়ের কামনা, যাতনা এবং ব্যর্থতার পর্যবেক্ষণ। "মুসাফির মোছরে আঁখিজল ফিরে চল আপনারে নিয়া", "জাগ জাগরে মুসাফির হয়ে আসে শিশিভোর", "রঙমহলের রঙমশাল মোরা আমরা রূপের দীপালী" প্রভৃতি গান সুরে, ছন্দে ভাবে সমৃদ্ধ এবং এদের সংগঠনে ফার্সী কবিতার শোভন ছায়াপাত ঘটেছে।

নজরুলের বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ, —তিনি বহু ফার্সী, আরবী শব্দ প্রয়োগ করেছেন যা বাংলা ভাষায় অস্বাভাবিক। শব্দগুলি এককভাবে বেমানান বটে, কিন্তু নজরুল তাদের যেভাবে আমাদের ভাষার মালায় গ্রথিত করেছেন তাতে সেগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে এবং মানিয়েও নিয়েছে। নজরুল ছন্দ এবং গতির দিক থেকে ফার্সী কাব্যকে অনুসরণ করেছেন, কিন্তু সুরের দিক থেকে বিজাতীয় হতে চেষ্টা করেননি। তাছাড়া প্রাচ্যভাষা এবং প্রাচ্যভাবের মধ্যে যে একটা সাধারণ মিল রয়েছে তার জন্যও তাঁর প্রচেষ্টা স্বাভাবিকতাকে অতিক্রম করেনি। এই অসুবিধা বরং পাশ্চাত্য সুরপ্রয়োগের বেলায় ঘটে থাকে কেননা সেক্ষেত্রে উভয় ভংগীতে কোন মিল নেই।

নজরুল সম্পর্কে আর একটি অভিযোগ—তাঁর গানগুলি অনেক ক্ষেত্রে লঘু হওয়ার বিদগ্ধজনের সমাদৃতি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই অভিযোগ মিথ্যা নয়। আর্থিক প্রয়োজনে লঘুতর জনপ্রিয় গান তাঁকে বহুলাংশে রচনা করতে হয়েছে। বারম্বার অভাব এবং বিপত্তির সম্মুখীন হতে না হলে এই বিড়ম্বনা তাঁকে ভোগ করতে হত না এবং তাঁর গভীরতর ইনটেলেকটের পরিচয় পাওয়া যেত। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় যখন তিনি অভিজ্ঞতার পূর্ণতায় এসেছেন এবং প্রয়োগশিল্পে পরিণত অধিকার অর্জন করেছেন ঠিক সেই সময়েই কালব্যাধিতে আক্রান্ত হলেন। শেষের দিকে তিনি ক্রমেই বুদ্ধিদীপ্ত রচনায় উদ্যোগী হচ্ছিলেন—বহু পরিকল্পনাও তাঁর ছিল; কিন্তু সেগুলি তাঁকে অসমাপ্ত রেখে অবসর গ্রহণ করতে হল।

সামগ্রিকভাবে দেখলে নজরুলের সংগীত-চিন্তা থেকে তাঁর আদর্শের মহত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়। বাংলা গানে তাঁর বহু দান রয়েছে যার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ কিন্তু ফার্সী চালের গানগুলিতে তিনি একটা উত্তম আর্টকে আমাদের সংগীতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেলেন যার মূল্য অপরিসীম।

ব্যাধিক্লিষ্ট নির্বাক কবির জন্মদিনে এই কথাগুলিই লেখকের বার বার মনে পড়েছে। তাঁর দান আমাদের ভাণ্ডারে সযত্নে সঞ্চিত থাকুক। তাঁর জীবনে শান্তি আসুক।

মহুয়া মাদল

আশাপূর্ণা দেবী

গোঁফ নেই, গোঁফের রেওয়াজও নেই, মিথ্যে জঞ্জাল। কিন্তু জঞ্জালটা বাদ দিতে গিয়ে পুরুষের প্রধান পৌরুষ ভঙ্গীটাই গেছে বাদ! জুত করে একটু গোঁফে তা দিলে যেমন বিশ্বনস্যাৎ ভাবটি ফোটে, তেমন আর কোন ভঙ্গীতে?

কিন্তু ঊর্নাবংশের ফ্যাশান তো আর বিংশে চলে না! অথচ ভঙ্গীটা চাই। ওই বিশ্বনস্যাৎ ভঙ্গী। তাই বিকল্পে টাই সুট পরা টিপ্ টপ্ শরীরটার কোনাচে খোঁচ দুটোকে মাঝে মাঝে একটু ঝাঁকিয়ে নিতে হয়, হয় হাত দুটো একটু কায়দার সঙ্গে উল্টোতে। যার নির্গলিতার্থ অর্থ "কি জানি মশাই, আপনারাই বোঝেন।'

কিন্তু আজ আর সেন সাহেবের এ কায়দা তাকিয়েও দেখল না শোভেন ঘোষাল, সেন সাহেব অনুমতি করার আগেই ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে চাপা উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, "ব্যাপার তো বেশ গড়িয়ে এল স্যার।"

"কেন, আর নতুন কি হ'ল?"

প্রবল ঔৎসুক্যকে অবহেলার ছদ্মবেশ পরিয়ে আসরে নামালেন সেন সাহেব।

ইতিমধ্যে ঘোষাল পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে ফেলে, এবং যদিও কেউ নেই, অথবা বিনা তলবে কি বিনা এত্তালায় হুট করে কারো ঢুকে পড়বারও সম্ভাবনা নেই, তথাপি গলাকে খাদে নামিয়ে বলে, "ইস্তাহার তো ছাপতে চলে গেছে। অনেক চালাকি খেলিয়ে প্রেস থেকে একটা গ্যালি প্রুফ বার করে এনেছি। ভাষার বহরটা একবার দেখুন স্যার!"

কাগজটা বাড়িয়ে ধরে ঘোষাল ওপরওলার নাকের সামনে।

নাঃ, আর ছদ্মবেশ বজায় থাকে না। "কই, দেখি"—সেন সাহেব খস করে টেনে নেন কাগজটা।

তা ভাষাটা ওজস্বিনী সন্দেহ নেই।

মুনাফাবাজ মালিকের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্ট শ্রমিকের অভিযোগের ভাষা যতটা ঝাঁজালো হওয়া উচিত তা হয়েছে, এবং পরিশেষে সংকল্প মন্ত্র পাঠ, একটি সর্বদলীয় পাকা-পোক্ত ইউনিয়ন গড়ার জন্য। যে ইউনিয়ন, কর্মীদের সর্ববিধ স্বার্থ সংরক্ষণের ভার নেবে ও মালিককে বুঝিয়ে দেবে শোষণের যুগ আর নেই। এই উদ্দেশ্যে মিটিংয়ের জন্য বিশেষ একটি তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে, সেই তারিখে যেন সমস্ত ওয়ার্কাররা ওয়ার্কশপের বাইরের মাঠে জমায়েত হয়।

"তারিখটা দেখেছেন স্যার—" শোভেন ঘোষাল অবহিত করিয়ে দেয়, "কোম্পানীর কি বলে গিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস! পাঁচজনের সামনে অপদস্থ করার তালে—"

ডাঁটুস সেন সাহেবের সঙ্গে এত মুক্ত-বাক্যে ভাব প্রকাশ করতে তাঁর কর্মচারীরা কেউ পারে না, কিন্তু শোভেন ঘোষালের কথা আলাদা। শোভেন তাঁর গুপ্তচর। আর এ রকম একটি চর না থাকলে কারখানার অফিস চলে না।

বাপের আমলের একটি স্বদেশী চিরুনির কারখানা ছিল, আর ছিল ব্যাঙ্কে বেশ কিছু মজুত টাকা। দুটো ভেঙে বেশ একটা জমজমাট প্ল্যাস্টিক কারখানা খুলেছেন সেন সাহেব, এবং লাভের অঙ্ক দিন দিন প্রত্যাশার মাত্রা ছাড়াচ্ছে। আর সেইটাই কর্মিবৃন্দের দীর্ঘ-ঈ সৃষ্টির কারক।

সেন সাহেবের বাপের টাকায় আর তাঁর নিজের প্রখর মেধায় যে বৃক্ষটি গড়ে উঠেছে, তার পাকা ফলটি সেন সাহেব একা না খেয়ে তারা সবাই মিলে কেন খাবে, এ কথা ভাবছে না কেউ। বেশ তো তোরাও যা না, খোল গে না আরও বড় বড় প্রতিষ্ঠান, বারণ তো করেনি কেউ। একজন মাটি খুঁড়ে বীজ পুঁতে সার দিয়ে আর জল ছিটিয়ে সে গাছটিকে বাড়ালো, তার ফল খাবার সুযোগ

সবাই কেন হাত বাড়াবে, এ সেন সাহেবের বুদ্ধির অগম্য।

ঠিক যেন দেশের জ্ঞাতির মত।

জীবনে কেউ তারা সেন সাহেবের অপকার বই উপকার করেনি, সেন সাহেব বিলেত গেলে তাঁর বাপকে ব্যঙ্গ প্রশ্ন করেছে "দেশে বুঝি আর তোমার ছেলের বিদ্যে ধরলো না, তাই বিদেশে গিয়ে—" অথচ তারাই অনায়াস অক্লেশে মেয়ের বিয়ে, ছেলের পড়া, শক্ত রোগের চিকিৎসার খরচের জন্যে সেন সাহেবের কাছে হাত পাতে। আশানুরূপ না পেলে 'চামার' বলে গাল দেয়, সেন সাহেবের বাড়ির সাজসজ্জা দেখলে তাদের চোখ টাটায়, যেমন টাটাচ্ছে তাঁর কোম্পানীর লাভের অংক দেখে কোম্পানীর কর্মিদের।

মজুরি বাড়ানো, ছুটি বাড়ানো, এবং বোনাস বাড়ানো নিয়ে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে হতে এবার আগুন জ্বলে উঠছে। সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে তারা। চালাকি দেখ, কোম্পানীর বার্ষিক উৎসবের দিন, যেদিনে নাকি সেন সাহেব তাঁর বড় বড় খদ্দেরদের নেমন্তন্ন করে খানাপিনার স্রোত বহান, সেইদিন তারা ফাক্টরির মাঠে জমায়েত হয়ে বক্তৃতার স্রোত বহাবে!

"দেখছেন স্যার দুর্বুদ্ধিটা।"

"দেখছি." সেন সাহেব কাঁধটা ঝাঁকিয়ে নেন, "মাত্রাটা ছাড়াচ্ছে মনে হচ্ছে, টেম্পারেচার নামানো দরকার!"

"নামাবেন! কি করে পারবেন স্যার?

ওই যে আসছেন টিকটিকি!

ওদের ঝাণ্ডা ডাণ্ডা সব যে তেতে উঠেছে।"

"ঠাণ্ডা করতে হবে।"

ঘোষাল স্থান কাল পাত্র ভোলে। টেবিলের কোণ চেপে ধরে বলে ওঠে, "হবে না স্যার, হবে না। ওদের চেনেন না আপনি, আগুন, আগুন একেবারে। যতদূর দেখছি ওদের দাবিই মানতে হবে—"

কথা শেষ করতে পায় না বেচারা তীক্ষ্ম হাসির ঘায়ে, "ঘোষাল কি আজকাল ও পক্ষ থেকে ঘুসটুস নিচ্ছ নাকি?"

"স্যার! বরং আমার মাথায় দু' ঘা জুতো মারুন! এ কথা বলার চাইতে তাও বরং—"

"তুমিই বলাচ্ছ! বলি দাবি মেনে নেওয়ার মানে জানো? এখনকার দাবি মেনে নিলেই আবার দাবির ধুয়ো ধরবে, 'পরিবারের ব্যবস্থা'। বলবে বিনি ভাড়ার বাড়ি চাই, বিনি মাইনের ইস্কুল চাই, নিখরচার মেটার্নিটি হোম চাই, রোগে ওষুধ চাই, রোগীর পথ্যি চাই, মরলে পোড়াবার কাঠ চাই, 'চাই'য়ের শেষ থাকবে না, বুঝলে ঘোষাল!"

"তা হলে স্যার?"

"যাতে আর কোন কিছু না চায় তার উপায় দেখতে হবে। এখন যাও তুমি।"

অতএব গেল ঘোষাল।

গেল আর কোথায়!

সেই ও পক্ষের কাছে। গেল সরল শুভ্র অকলংক মুখে।

কিন্তু ওরা দূরে থেকেই মুখ বাঁকায়, "ওই যে আসছেন টিকটিকি!"

"ইচ্ছে করে ওর ওই টিয়ে নাকটা ঘুঁষিয়ে চ্যাপটা করে দিই।"

"বেটা বিভীষণ! মীরজাফর! উমিচাঁদ!"

"ঘুঘু নম্বার ওয়ান!"

"এবার ঘুঘু ওর ভিটেয় চরবে।"

শোভেন ঘোষাল শিশুর অকপটতা মুখে মাখিয়ে এর ওর কাছে ঘোরাঘুরি করে, পাত্তা পায় না।

খানিক পরে সহসা এক ঝড়!

সেন সাহেব শিলপ পাঠিয়েছেন, কাজের শেষে কেউ যেন চলে না যায়, তাঁর কিছু বক্তব্য আছে।

হুকুম!

বটে!

ফুঁসে ওঠে অগ্নিকণার ঝাঁক, 'কক্‌খনো না, কেউ থাকবো না। দেখি কি করে আটকায়। গেট বন্ধ করে দেবে? দিয়ে দেখুক না!"

দলের চাঁই অনিল বিশ্বাস বলে, "বুঝছ পালিস? বেটা টিকটিকি লাগিয়ে ভাঙিয়ে এসেছে, তাই আবার কিছু বক্তব্য! বলি কি আর বলবি তুই; সেই তো নতুন বোতলে পুরোনো মদ ঢালবি! সেই কোম্পানীর হিসেব খুলে বোঝাবি যা কিছু লাভ তার সবটাই লোকসান! তারপর লম্বা লম্বা কথা ফেঁদে 'ও দেশ' দেখাবি, সোভিয়েট দেখাবি, চীন দেখাবি, কর্ম আর ঘর্মের মূল্য বোঝাবি, শেষ অবধি বিল্বিপত্তর শুঁকিয়ে ছেড়ে দিবি! ওসব ছেঁদো কথা ঢের শোনা গেছে দাদা, ওতে আর নয়।"

"তা হলে আমরা অটল?"

"নিশ্চয়! আমরা হেলব না, দুলব না, টলব না!"

"ছেঁদো কথায় ভুলব না!"

কাজ আর হয় না তারপর, খালি জটলা। চলে যাওয়া হবে, না থাকা হবে।

শেষ অবধি কৌতূহলের জয়!

দেখাই যাক কোন রগড়ের কথা বলেন সাহেব!

কিন্তু এ কী!

এ কোন অলৌকিক বাণী!

ধারণার সাত ক্রোশ, সম্ভাব্যের যোজন তফাত!

ওয়ার্কশপের মধ্যে রবীন্দ্র জয়ন্তী হোক এই প্রার্থনা সাহেবের! বিনীত ভঙ্গী, মধুর সুরেলা গলা, আবেগপূর্ণ আবেদন!

রবীন্দ্র জয়ন্তী!

হ্যাঁ, শতবার্ষিকী উৎসব!

কেন নয়? সারা পৃথিবী যে উৎসবের জোয়ারে ভাসছে, সে জোয়ার কি শুধু তাঁর ওয়ার্কশপের প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যাবে? ভাসিয়ে ডুবিয়ে মাতিয়ে তুলবে না তাঁদের? সেন সাহেবের প্ল্যাস্টিক ফ্যাক্টরি কি পৃথিবীর মানচিত্রের বাইরে?

হঠাৎ দলের চাঁই মাজা চাঁচা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, "আমাদের আবার রবীন্দ্রনাথ! আমরা কি মানুষ স্যার?"

"ছি ছি, ও কথা বলবেন না অনিলবাবু!"

রেগে নয়, তেড়ে নয়, বিগলিতকরুণা বুদ্ধের মত বাণী বিতরণ করেন সেন সাহেব, "হতে পারি আমরা দীন দুঃখী, অভাবী, হতে পারে আমাদের জীবনে সমস্যার শেষ নেই, আমরা পীড়িত বঞ্চিত ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট, কিন্তু বিশ্বের দরবারে সংস্কৃতিতে হারবো কেন আমরা? বাঙালীর আজ কোন সম্বল নেই, সম্বলের মধ্যে ওই সংস্কৃতিটুকু। আর সম্পদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ। সেটুকু আমরা উপলব্ধি করবো না? স্বীকার করবো না? না না, তা হয় না। করুন আপনারা রবীন্দ্র জয়ন্তী, করুন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অভিনয় আবৃত্তি নাচগান সব কিছু দিয়ে ভরিয়ে তুলুন তাপদগ্ধ মনকে। আমি জানি আপনাদের সকলের মধ্যেই লুকিয়ে আছে একটি শিল্পী, ক্ষেত্র পেলেই সে তার প্রতিভা দেখাতে পারবে। আর সেইজন্যেই—"

আরও নানা কথার ঝঙ্কারে সমস্ত আবহাওয়া মধুর করে তুলে ঘোষণা করেন সেন সাহেব, বাইরে থেকে মহিলা আর্টিস্ট আনুক অনিল বিশ্বাসরা, আনুক গাইয়ে বাজিয়ে, সব খরচ সেন কোম্পানীর।

শেষোক্ত ঘোষণায়, অস্ফুট একটা গুঞ্জন উঠল।

কিন্তু কিসের? কৃতার্থম্মন্যের?

না ব্যাঙের?

হ্যাঁ, ব্যাঙেরই। যেন 'ওঃ ভারী বদান্যতা! স্টাফ খেতে পায় না আর উনি...'

কিন্তু গুঞ্জন ভাষায় ধ্বনিত হয়ে ওঠবার আগেই আর একবার সেন সাহেবের প্রেম ও মৈত্রীর বাণী ছড়িয়ে পড়ল,—না না, এ তাঁর বাহুল্য বদান্যতা নয়, সামান্যতম কর্তব্যপালন মাত্র। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান থেকেই স্টাফকে হাজার হাজার টাকা দেওয়া হচ্ছে এই জাতীয় উৎসবের জন্যে। সরকার বাহাদুর দিকে দিগন্তরে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করছেন, সেন সাহেবের ক্ষমতা সামান্য, কিন্তু সেই সামান্যটুকুও যদি তিনি করতে না পান, তিনি যে জাতীয় কর্তব্যচ্যুত হবেন। সেন সাহেব আর তাঁর কোম্পানী কি বিশ্বপ্রবাহের একটি অংশ নয়?

অভিজাত ঘরের সন্তান, গলা সুরেলা, কথা শেষ হবার পরও যেন একটা মূর্ছনার মাদকতা!

চাঁই নীরব, কাজেই সকলেই নীরব।

সেন সাহেব উচ্চাসন থেকে নেমে এসেছেন, তবু আর একবার অবহিত করিয়ে দেন, "কিন্তু সময় আর নেই অনিলবাবু, যত চটপট পারেন ব্যবস্থা করে ফেলুন। অন্তত নাটকটা যেন বলবার মত হয়। আমার ডীলারদের নেমন্তন্ন করা যাবে সেদিন।"

ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসেই কাঁধের সেই বিশেষ ভঙ্গীটি করেন সেন সাহেব। পিছন পিছন সুড়সুড়িয়ে আসে ঘোষালও।

"আপনি যে তাজ্জব করলেন স্যার!"

"তাজ্জবের কি আছে!" জাতীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত মুখে সেন সাহেব বলেন, "এটা আমাদের কর্তব্য। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীতে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে না পারলে নিজেদেরকে অসংস্কৃত বলে পরিচয় দেওয়া হয়।"

শোভেন ঘোষালের হাঁ আর বুজতে চায় না।

ওদিকে প্রবল উত্তেজনা!

সাহেবের এ সমস্তই পলিসি, এ ফাঁদে পা দেবে না তারা। তারা হেলবে না দুলবে না, ভুলবে না টলবে না।

অনিল বিশ্বাস বলে, "নিবারণদা, তুমি তো লিখিয়ে পড়িয়ে আছে, রিফিউজ্যাল লেটারটার খসড়া করে ফেল, সবাই সাইন দিয়ে পাঠিয়ে দিই।"

বিশু আঢ্য বলে, "আর সেই চিঠির মধ্যে বেশ দু' চারটে ঝাঁজালো কথা ঠেসে দিও

নিবারণদা, বলো যাদের পেটে দানা নেই, তাদের আবার সংস্কৃতি, তাদের আবার ঐতিহ্য!"

চটপট চেষ্টা করেও চটপট হয়ে ওঠে না।

নানা আজেবাজে কথায় সময় কেটে যায়। আনমনা সুরেন দত্ত বলে, "যাই বলিস, সাহেবের ভাষাটা কিন্তু খুব চোস্ত। রাতদিন তো ইংরিজী কথা কয়! অত ফাস্ট কেলাস বাংলা শিখলো কি করে বল দিকি!'

বিকাশ মন্ডল ঝেঁকে ওঠে, "উঁচু প্লাট-ফর্মে দাঁড়িয়ে কথা বললে, অমন শুনতে মধুরই লাগে হে সুরেনদা, বুঝলে? চিরদিন মাটিতে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে মরলাম, মধু আর ঝরবে কোথা থেকে?"

"তা যা বলেছ।"

সায় দেয় সকলেই।

কিন্তু প্রত্যাখ্যানপত্র আর লেখা হয়ে ওঠে না।

হট্টগোলের মাঝখানে বেরিয়ে পড়ে সবাই।

পরদিন।

বিকেল নয়, সকাল।

অর্থাৎ পুরো চব্বিশ ঘণ্টারও ব্যবধান নয়, কিন্তু দেখা গেল বাতাসের মোড় অদ্ভুতভাবে ঘুরে গেছে। সারা রাত্রির চিন্তায় চিত্তের গতি বদলে গেছে সকলের। সত্যিই তো, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? কেন করবে না সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান? উঁচু মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাণী বিতরণ করতে কেমন লাগে একবার চেখেই দেখা যাক না। ইউনিয়নের কাজটা না হয় কিছু পিছোল, তারা তো আর হেলছেও না, দুলছেও না, টলছেও না, ভুলছেও না। বেটা ধড়িবাজের পয়সায় একটু আমোদ আহ্লাদ করেই নেওয়া যাক।

কাজ সেদিন শিকেয় ওঠে। বাইরে থেকে কোন কোন মহিলা শিল্পীকে আনা হবে তারই মুখরোচক আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে পরামর্শ সভা। তা ছাড়া নাটক নির্বাচন, নিজেদের মধ্যে ভূমিকা ভাগ, সেও তো কম আকর্ষণীয় আলোচনা নয়।

নাঃ, কাজ আর হয় না সেদিন।

কিন্তু শুধুই কি সেদিন?

পর পর কতদিন পর্যন্ত কাজ কি আর কেউ করতে পারে? দশটা কন্যাদায়ের বাড়া যে এই সাংস্কৃতিক দায়!

মান অভিমান, রাগ বীতরাগ, দলত্যাগ আবার দলে প্রবেশ ইত্যাদি অনেক লীলার শেষে "শেষরক্ষা"র রিহার্সাল শেষ হয়। আর দেখা যায় সেন সাহেবের কথাই ঠিক, সকলের মধ্যেই সুপ্ত ছিল এক একটি শিল্পী, ক্ষেত্র পেয়ে জেগে উঠেছে সেই সত্তা।

গানে, বাজনায়, তবলায়, অভিনয়ে, আবৃত্তিতে, কিসে নয়?

দলের চাঁই মাঝে মাঝে বিনীত পদক্ষেপে সেন সাহেবের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায় নির্দেশ চাইতে। তিনি সহাস্যে বলেন, "ওসব হচ্ছে আপনাদের ব্যাপার। আপনারা যা ভাল বুঝবেন! আমাকে খানকতক কার্ড দেবেন দয়া করে, বন্ধুবান্ধব নিয়ে অনুষ্ঠান দেখবো, এই আর কি।" ভুরু নাচিয়ে বলেন, "বেশ সোনালীবর্ডার দিয়ে কার্ডটা ছাপবেন, আগের টাকায় না কুলোয় কোম্পানী আবার দেবে।"

কথার সংগে সংগে নিজেকে এমনভাবে ঝাঁকিয়ে নেন সেন সাহেব, যেন কোম্পানীকে ফাঁদে ফেলে বেশ আমোদ পাচ্ছেন।

"কার্ডটা ওঁর মনের মত হওয়া চাই, বুঝলে অনিলদা।"

"তা তো উচিতই, কিন্তু কথা হচ্ছে কার্ড তো ছাপতে দেওয়া হবে, কিন্তু প্রিসাইড করছে কে? চীফ গেস্ট কে?"

আঁ, তাই তো!

এতদিন তো এটা খেয়াল হয়নি।

সভাপতি আর প্রধান অতিথি না হলে আবার রবীন্দ্র জয়ন্তী কিসের।

এখন কাকে ধরা যায়?

কবি?

সাহিত্যিক?

অধ্যাপক?

এম এল এ?

মন্ত্রী?

কিন্তু সময় আর কোথা!

এত কম সময়ে কি শিকার ধরা যাবে?

মণ্ডল বলে, "আসবে না! কেউ আসতে চাইবে না। আমার ভাগ্নেটা ওদের পাড়ার না ক্লাবের জয়ন্তীর পাণ্ডা হয়েছিল, ছোকরা আ-দক্ষিণ-উত্তর কলকাতা চষে বেড়িয়েছে সভাপতি সভাপতি করে, বলে যার কাছেই যায় তিনিই বলেন ছ মাস আগে থাকতে সারা এপ্রিল মে-র জন্যে বুক্ড্ হয়ে আছেন। তা ছাড়া শরীর! সে তো প্রত্যেকেরই খারাপ। মহিলা সাহিত্যিকদের আবার সংগে একজন—"

"নিকুচি করেছে হাবিজাবি কথার"—নিবারণ ছিটকে ওঠে। "অনেকগুলো টাকা দিয়েছে কোম্পানী, সেন সাহেব বলবে কৃতজ্ঞতা নেই আমাদের, ওকেই বরং সভাপতি—"

"সেন সাহেব!"

অনেকগুলো কণ্ঠে এক সংগে উচ্চারিত হ'ল ওই একটি শব্দ।

অতঃপর?

ঝপাঝপ ভোট পড়ে যায় সেই নামে। দেখে মনে হ'ল ওই নামটাই বুঝি সকলের মুখের আগায় মুখিয়ে ছিল, শুধু চক্ষুলজ্জায় মুখের বাইরে বেরোতে পারছিল না।

একটা ঘুলঘুলি খোলা পেয়ে পাঁচিল ভেঙে বাঁচল। তা তো হ'ল!

কিন্তু চীফ গেস্ট?

"ওর আর ভাবনার কি আছে? মিসেসের নামটাই ছাপো!"

"আসতে রাজী হবেন?"

"না হবেন কেন? আনুয়েলে তো আসেন কি বারই, চলু না সকলে মিলে ইয়ে করে

এত সুন্দর আলপনা দিল কে?

আশ্চর্য ধৈর্যের সঙ্গে কর্তা গিন্নী বসে বসে সব দেখেন যে!

কিন্তু এটাই কি শেষ?

প্রধান অতিথি বলেন, জীবনে কখনো 'শেষরক্ষা'র এত সুন্দর অভিনয় তিনি পেশাদার রঙ্গমঞ্চেও দেখেননি। সভাপতি বলেন, অভিনেতাদের রৌপ্যপদক দিতে না পারা পর্যন্ত তিনি যেন স্বস্তি পাচ্ছেন না। পাঁচখানি পদকের ঘোষণা হয়।

সভাপতি আরও বলেন, তাঁর কর্মক্লিষ্ট স্টাফেদের মধ্যে যে এতখানি শিল্পচেতনা ছিল লুকিয়ে, এ কথা কে জানতো! বলেন কোম্পানী ব্যয় মঞ্জুর করবে, এ'রা যেন বছরে অন্তত কয়েকবার কোন কিছুর উপলক্ষ্য ব্যতীতই এরূপ রূপময় আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করেন। কে বলতে পারে, এই সামান্য অনুষ্ঠানের মধ্য থেকেই কোন অসামান্য প্রতিভার আবির্ভাব ঘটবে কি না!

কিন্তু বিনয় আর প্রশস্তির পাল্লায় এরাই কি কম যাবে?

এরাও মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে হাত কচলে কচলে প্রভু ও প্রভুপত্নীর স্নেহ সহানুভূতি ও বদান্যতার ব্যাখ্যা করে।

তারপর শুরু হয় খানাপিনা!

সমস্ত স্টাফকে অভিভূত করে বিগলিত-করুণা বৃদ্ধ-যুগল তাদের আয়োজন থেকে দু'টি কোকাকোলা তুলে নেন। আর একবার বলেন, "সত্যিই অনিলবাবু, তাজ্জব করেছেন আপনারা! কিন্তু লোভ লাগিয়ে দিলেন মনে রাখবেন।"

আসা যাক।" বললেই হবে তোয়াজ করে, "আমরা রবীন্দ্রনাথের কি বুঝি বলুন, আপনারা না এলে—"

সেন সাহেব কার্ডের গোছা হাতে করে বিব্রত বদনে বলেন, "এটা যে আপনারা কী করলেন! মিসেস সেন তো বেজায় লজ্জিত।"

অনেকগুলো হাঁ হাঁ হাঁ করে ওঠে, "এ কী বলছেন স্যার!"

"আমি তো আপনাদের ভাষণ টাষণ দিতে পারব না; যা পারেন উনিই করবেন মশাই। যা দেখছি ডোবাবেন আপনাদের!"

অমায়িকের অবতার!

আর এরাও যেন বিনয়ে পাল্লা দেবেই।

অবশেষে এসে পড়ে সেই মহাদিন।

বাঁধিয়ে নিয়ে আসা হয় ক্যালেন্ডারের একখানি দাড়ি সম্বলিত নিরীহ বৃদ্ধের মুখচ্ছবি। তাঁর সামনে সাজিয়ে রাখা হয় একশতটি মাটির প্রদীপ।

কে বলবে জীবনে কখনো কোনও ফাংশান করেনি এরা?

আলো, প্যান্ডেল, মাইক, ডেকরেশান, ফুলমালা, ধূপ, আলপনা, আয়োজনে খুঁত নেই।

উঃ, জীবনে এত আনন্দ এত সার্থকতা থাকে, থাকতে পারে! কী রোমাঞ্চ, কী রোমাঞ্চ!

মাইক টেস্টের সময় যে পারে একবার করে 'হ্যাল্লো হ্যাল্লো' করে নেয়, কারণ সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চ তো নিজের কণ্ঠস্বরখানি সপ্তস্বরা হয়ে ছড়িয়ে পড়ায়!

আর সত্যি বলতে কি, কম রোমাঞ্চ লাগে না যখন মিসেস সেন এসে অবাক অবাক মিষ্টি গলায় শুধান, "এত সুন্দর আলপনা দিল কে?"

আরও কত রোমাঞ্চ, তিনি যখন প্রশ্নের উত্তর পেয়ে হতাশ ভঙ্গীতে বলেন, "নাঃ, মেয়েদের অহঙ্কার করবার আর কিছু রাখলেন না আপনারা!"

রোমাঞ্চের প্লাবন বইতে থাকে যখন মিস্টার এবং মিসেস মঞ্চে আরোহণ করেন, আর তাঁদের গলায় পরিয়ে দেওয়া হয় সেই বৃহদাকার গার্ল্যান্ড দুটি, যে দুটি সেদিনকার নিউ মার্কেটের মালার দোকানের সব সেরা।

তারপর বিচিত্রানুষ্ঠান, তারপর অভিনয়! এ কি স্বপ্ন? এ কি মায়া? এ কি স্বর্গ? এ কি স্বর্গের ছায়া?

রোমাঞ্চে আর কুলোয় না, দেখা দেয় অশ্রু কম্প স্বেদ!

হবে না?

শোভেন ঘোষাল টাকের চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে এসে বলে, "তাজ্জব যে আপনিই করলেন স্যার! ওই কিম্ভূতকিমাকার অভিনয়কে আপনি 'সাকসেসফুল' বলে এলেন? ওকে কি অভিনয় বলে?"

কাঁধের সেই বিশেষ ভঙ্গীটি করে স্বর্গীয় একটু হাসি হাসেন সেন সাহেব, "অভিনয় 'সাকসেসফুল' বলেছি কার অভিনয় তা তো বলিনি স্পষ্ট করে।"

"ওদিকে তো ইতিমধ্যেই আগামী নাটকের জল্পনা চলছে—"

"আহা সে তো চলবেই, জানতাম! দেখো এর পর তোমার ওই পাণ্ডারা ঠাণ্ডা মেরে গিয়ে ইউনিয়ন না পড়ে থিয়েটার ইউনিট গড়বে!"

"গড়বে!"

"গড়বে বই কি! ইয়ে তোমার হাঁ-টা বোজো ঘোষাল, তাকাতে পারছি না।"

"কিন্তু স্যার—"

"ওর আর কিন্তু নেই ঘোষাল। দেখো সারা বচ্ছর বন্দ হয়ে থাকবে, নেশা কাটিয়ে এদিক ওদিক তাকাবার অবকাশই পাবে না।"

কাঁধটা ঝাঁকিয়ে নেন সেন সাহেব! সেই বিশেষ ভঙ্গীতে!

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রভঞ্জন সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সাতাশ, সেই সময় তাঁর এই পুত্রটি জন্মগ্রহণ করেন। এ তাঁর প্রথম পুত্র, দ্বিতীয় সন্তান। প্রথমটি কন্যা—মাধুরীলতা। রথীন্দ্রনাথের পরে আরও দুইটি কন্যা ও এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন; পুত্রটি শমীন্দ্রনাথ—তিনি অল্প বয়সে মারা যান, এর কয়েক বছর আগে মারা যান দ্বিতীয়া কন্যা রেণুকা এবং কয়েক বছর পরে প্রথমা কন্যা মাধুরীলতা। এবার রথীন্দ্রনাথ গত হলেন। এখন জীবিত রইলেন মীরা দেবী—নন্দিতা কৃপালনীর মাতা।

একে একে নিবে যাচ্ছে দেউটি। রথীন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বংশের ধারা রক্ষার, অন্যভাবে যাকে বলে বংশে বাতি দেবার, আর কেউ রইল না।

শেষ বাতি নিবল। ২০শে, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ (৩রা জুন, ১৯৬১) তারিখে দেরাদুনে লোকান্তরিত হলেন রথীন্দ্রনাথ। পিতার মৃত্যুর কুড়ি বছর পরে।

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব যখন পালিত হচ্ছে দেশে-বিদেশে, তখন ঘটল এই দুর্ঘটনা।

১৮৮৮ সালে জোড়াসাঁকোতে রথীন্দ্রনাথের জন্ম। তাঁর জন্মের আগে পরিবারের মধ্যে একটু জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল—পুত্র হবে না, কন্যা হবে। একটি খাতা ছিল তাঁদের পার্ক স্ট্রীটের বাসায়, তার নামই ছিল 'পারিবারিক খাতা।' এতে পরিবারের সকলে খুশিমত মন্তব্য লিখে রাখতেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁর On the Edges of Time (১৯৫৮) গ্রন্থে দুটি মন্তব্য তুলে দিয়েছেন—

Uncle Rabi's Baby—A Forecast

Uncle's baby will be fortunate boy,
not girl.
He will not be as laughter-loving
as uncle, but
Comparatively serious. He will not
go about doing
Social work but will prefer to live
apart in solitude
And devote himself to religious
prayer.

Park Street House
November 1888

Hitendranath
Tagore

হিতেন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল করে পুত্রই জন্মগ্রহণ করল; কিন্তু এই জাতক সম্বন্ধে অন্যান্য ভবিষ্যদ্বাণী খাটে মিলল না, শিশুর রকমসকম দেখে বছর দেড়েক বাদে বলেন্দ্রনাথ ঐ পারিবারিক খাতায় লিখলেন—

Hit-da, the subject of your prophecy has now become visible. One must admit that he is serious by nature. But I don't think the

রথীন্দ্রনাথ

baby will become a forest sage instead of a social creature. And because he is serious it does not follow that he won't laugh. Uncle Rabi's nature is also fundamentally serious if you come to think of it. There is a difference between seriousness and moroseness.

March 1890 Balendranath Tagore

হিতেন্দ্রনাথের মতে বলেন্দ্রনাথ একমত হতে পারলেন না। তপোবনের তপস্বী যে এ শিশু হবে না, এ যে হবে সামাজিক জীব—এ ধারণা তখনই হয়েছিল বলেন্দ্রনাথের।

কিন্তু আমরা দেখেছি উভয়ের কথাই ফলেছে। তপোবনের আশ্রমিক হয়েছেন রথীন্দ্রনাথ—শান্তিনিকেতন-আশ্রমের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল নিবিড়; প্রথম যে পাঁচজন ছাত্র শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম থেকে পাশ করেন, তিনি ছিলেন সেই পাঁচজনের মধ্যে একজন। এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রদের যে সংঘ আশ্রমিক সংঘ নামে পরিচিত, রথীন্দ্রনাথ এই প্রাক্তন ছাত্র-সংঘের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ। এবং তাঁর সামাজিক জীবন ছিল আর পাঁচজনের মতই। দশজনের সঙ্গে মিলে-মিশে সমাজের অন্যতম একজন হয়ে জীবনযাপন করেছেন তিনি।

১৮৮৮ সনের ২৯শে নভেম্বর তাঁর জন্ম অর্থাৎ ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর কয়েকদিন পরে।

সেই ঘটনার ৭৩ বছর পরে এখন আর একটি ঘটনা ঘটল। একটি বংশের ধারা বিলুপ্ত করে লোকান্তরিত হলেন রথীন্দ্রনাথ—নিঃসন্তান রথীন্দ্রনাথ।

এই পুত্রকে নিজের মনের মত মানুষ করার জন্যে এবং শিক্ষাদানের জন্যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করেছেন। রথীন্দ্রনাথ যখন শিশু, রবীন্দ্রনাথ তখন সপরিবারে বাস করছেন শিলাইদহে। সেখানে পুত্রের লেখাপড়ার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না দেখে এবং মেয়েরাও বড় হচ্ছে দেখে, তিনি স্থির করলেন শিলাইদহ ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে গিয়ে একটি আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবেন। সেখানে নিজের তত্ত্বাবধানে পুত্রের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হবে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। রথীন্দ্রনাথ হলেন সেই বিদ্যালয়ের প্রথম দলের একজন ছাত্র। এখান থেকে রথীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করলেন ১৯০৪ সালে।

রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই গতানুগতিক শিক্ষার পক্ষপাতী নন। উচ্চশিক্ষার জন্য

পুত্রকে কোনো কলেজে ভর্তি না। পুত্রকে বিদেশে পাঠাবার উদ্যোগী হলেন। কিন্তু বিদেশ পক্ষে উপযুক্ত জ্ঞান থাকা দরকার। পাশ একটি ছাত্রের সে জ্ঞান থাকা নয়। এইজন্যে নিজের দেশ সম্বন্ধে ভাবে রথীন্দ্রনাথের যাতে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে, সেই উদ্দেশ্যে কিছুকাল তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা হল। কবি সতীশচন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, মোহিতচন্দ্র সেন ও বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে নিয়মিত পাঠ নিতে আরম্ভ করলেন রথীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের পল্লীর সঙ্গে পরিচিত। পল্লীর উন্নয়ন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে ভেবেছেন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ—এ দেশের উন্নতির চেষ্টা করতে হলে কৃষির উন্নতি সাধনই দরকার। এই সব বিবিধ বিষয় বিবেচনা করে তিনি পুত্রকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষালাভের ও গোপালন বিদ্যা অর্জনের জন্যে পাঠালেন বিদেশে।

সতেরো বৎসর বয়সে রথীন্দ্রনাথ

আমেরিকায় গেলেন। আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলেন তিনি। তিন বৎসর অধ্যয়নের পর ব্যাচিলর অব সায়েন্স (B. S.) ডিগ্রি লাভ করে ফিরে এলেন দেশে, ১৯০৯ সনে।

রবীন্দ্রনাথ পুত্রকে নিয়ে গেলেন শিলাইদহে। ইচ্ছা, এখানে, এই গ্রামে, রথীন্দ্রনাথ তাঁর অধীত জ্ঞান প্রয়োগ করবেন। কিন্তু কি কারণে যেন তা সম্ভব হল না। কিন্তু একটি গ্রামে যদি তা প্রয়োগ করা হয়ে না ওঠে, তবে অন্য গ্রাম আছে। আছে সুরুল—শান্তিনিকেতনের উপকণ্ঠের গ্রাম। যেখানে এখন গড়ে উঠেছে শ্রীনিকেতন।

বিদেশ-প্রত্যাগত পুত্রের বিবাহের জন্যে উদ্যোগী হলেন রবীন্দ্রনাথ। খুব সমারোহের সঙ্গে বিবাহ হল রথীন্দ্রনাথের। ১৯১০ সনে। বিবাহ হল প্রতিমা দেবীর সঙ্গে। প্রতিমা দেবীর বয়স তখন সতেরো, তিনি বাল্যবিধবা। গগনেন্দ্রনাথ - সমরেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের ভগিনী বিনয়িনী দেবীর কন্যা তিনি। প্রতিমা দেবীর পিতার নাম শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

এরূপ বিধবা-বিবাহ ঠাকুর পরিবারে এবং আদিব্রাহ্মসমাজে এই প্রথম। অনেকে এই ঘটনাকে সামাজিক বিপ্লব বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ঠাকুর পরিবারে ইতিপূর্বে এর চেয়েও বড় বিপ্লব ঘটেছে সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে। অন্তঃপুরিকা গৃহবধূ ঘোড়ায় চড়ে গড়ের মাঠের হাওয়া খেতে গিয়েছেন স্বামীর সঙ্গে। এইজন্যে একে খুব বড়-রকমের বিপ্লব বলা যায় না। যাই হোক, সেকালীন সমাজে এটা একটা সামান্য ব্যাপার অবশ্য নয়।

এই ব্যাপারের বছর দুই বাদে, ১৯১২ সনে, রবীন্দ্রনাথ যখন বিলাতে যান তখন তাঁর সহযাত্রী হলেন রথীন্দ্রনাথ এবং তাঁর নবপরিণীতা বধূ। ইংলণ্ড থেকে রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে আমেরিকায় গেলেন। সমুদ্রের তীরে ক্ষুদ্র আর্বানা শহর দেখে জায়গাটি বিশেষ পছন্দ হল রবীন্দ্রনাথের, তিনি এখানে কিছুকাল থেকে যাবেন বলে স্থির করলেন।

এই অবসরে রথীন্দ্রনাথ গেলেন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে—ইলিনয়ে। এখানে তিনি নিযুক্ত হলেন জীবতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণায়।

দেশে ফিরে এসে রথীন্দ্রনাথ পিতার সহযোগীরূপে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই রইলেন। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়-পরিচালনায়, শ্রীনিকেতনে গ্রামসেবার কাজে তিনি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নিযুক্ত করলেন। বিদ্যালয় ক্রমশ বড় হতে লাগল, শ্রীনিকেতনের কুটীরশিল্প ক্রমশ বিস্তারলাভ করতে লাগল, সেই সঙ্গে ক্রমশ বড় হতে লাগলেন রথীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর এই প্রতিষ্ঠান-দ্বয়ের পরিচালনা-ব্যাপারের দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁর উপরে। তারপর ১৯৫১ সনে প্রতিষ্ঠিত হল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। এই নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য—ভাইস চ্যান্সেলার—হলেন রথীন্দ্রনাথ। ১৯৫১ সনের ১৪ মে থেকে ১৯৫৩ সনের অগস্ট মাস পর্যন্ত এই পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন।

অতঃপর তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করে দেরাদুনে চলে যান। শেষ জীবন কর্ম-কোলাহল থেকে দূরে অতিবাহিত করার জন্যে। এইখানে তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হল।

রথীন্দ্রনাথ সুগায়ক ছিলেন। প্রকাশ্যে তিনি গান বিশেষ করেন নি। কিন্তু একবার 'ফাল্গুনী' অভিনয়ে গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। বাগানের শখ ছিল তাঁর প্রবল, উদ্যানরচনায় তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করেছেন। কাঠের কাজ ও চিত্রশিল্পে তাঁর দক্ষতার কথা অ... জানেন। ১৯৫২ সালে তাঁর আঁকা ছ... ও কাঠের কাজের প্রদর্শনী হয়। চা... উপর কারুকার্যের প্রবর্তক রথীন্দ্রনা... ভারতবর্ষে এ কাজ আগে প্রচলিত ছিল ...

'রবীন্দ্রভারতী' প্রতিষ্ঠার ব্যাপ... স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র মজুমদারের স... রথীন্দ্রনাথ একযোগে কার্যপরিচালনা ... রবীন্দ্রস্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

রথীন্দ্রনাথ নিঃসন্তান। এখন ... তাঁর পালিতা কন্যা নন্দিনী।

রথীন্দ্রনাথ এই কয়েকটি গ্রন্থ ... করেছেন,—

অভিব্যক্তি

প্রাণতত্ত্ব

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত। ২ খণ্ড

(পালি থেকে অনুবাদ)

On the Edges of Time

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকে :

বেস ক্যাম্প (থারগাট্টা), ৯ই অক্টোবর। কাল এখানে এসে পৌঁছেছি। পৌঁছতে সন্ধ্যে ঘোর হয়ে গিয়েছিল। এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে ডায়েরি পর্যন্ত লিখতে পারিনি। আজ সকলের বিশ্রাম।

এখন, এই দুপুরে, রোদে পিঠ দিয়ে বসে লিখতে গিয়ে দেখি, গত দু দিনের কোন ঘটনাই ভাল করে মনে করতে পারছি নে। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। একটু একটু করে ছবিগুলো ভেসে উঠছে। কাল সকালেও একটা অ্যাডভান্স পার্টি বের হয়েছিল। এর নেতা ছিল সুকুমার। সঙ্গে সর্দার আঙ শেরিং আর নিমাই। ওদের কাজ ছিল বেস ক্যাম্পের জন্য নিরাপদ একটা জায়গা খুঁজে বের করা।

নিমাই, সুকুমার আর সর্দার হিসেব করে বলল, রণ্টি থেকে থারগাট্টা দূরে বেশী নয়। এক ঘণ্টা মার্চ করলেই পৌঁছে যাওয়া যাবে। তাই ঠিক করা হল সকালের খাওয়াটা তাড়াতাড়ি সেরেই রওনা দেওয়া হবে। দুপুরের খাওয়া আমরা বেস ক্যাম্পে পৌঁছেই সারব। তাই অ্যাড্‌ভান্স পার্টি বের হবার একটু পরেই আমরা সমস্ত মালবাহকদেরও রওনা করে দিলাম। আজীবা ছাড়া সমস্ত শেরপা তাদের সঙ্গে গেল। সবার পিছনে চলল আমাদের পার্টি—দিলীপ, বিশ্ব, মদন, এই তিন তেজী ঘোড়া, বীরেনদা, ডাক্তার কর, আমি, এই তিন বেতো ঘোড়া আর আজীবা।

আগের দিন আনন্দধুরা পার হয়ে রণ্টি পৌঁছতেই আমাদের দম বেরিয়ে গিয়েছিল। একটা দিন বিশ্রাম নিলে ভাল হত। কিন্তু রিনি আর ঘন্যাকুন্ডে বৃষ্টির জন্য আটকে পড়ায় দুটো দিন নষ্ট হয়েছে তাই বিশ্রাম নেবার কথা আর মুখে আনলাম না।

আমরা যাত্রা শুরু করেই রোডোডেন্ড্রনের বন পেলাম। জানি না কেন, আমার চলতে ভাল লাগছিল না। শরীরটা খারাপ-খারাপ লাগছিল। তার উপর আঙ ফুতারও সঙ্গে নেই। সে এগিয়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে আমি কোন রকম উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। বরং কষ্টটাই বেশী করে বাজছিল। চলতে চলতে বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে যাচ্ছিল। রোদের তেজ বড় ভয়ানক। ঘাম হচ্ছিল খুব। জল তেষ্টা ঘন ঘন পাচ্ছিল। রণ্টি থেকে আধঘণ্টার রাস্তা যেতে না যেতেই হাঁফাতে শুরু করলাম। বীরেনদারও, মনে হল যেন, আগের সেই ফূর্তি আর নেই। মুখ শুকিয়ে এসেছে। দেখলেই মনে হয় তাঁর স্নায়ুর উপর কি অসম্ভব চাপই না পড়েছে। ডাক্তারবাবুও খানিকটা কাবু হয়ে পড়েছেন। দিলীপ, মদন আর বিশ্ব প্রতি পদে আমাদের সাহায্য করেছে।

রোডোডেন্ড্রনের বনটা পার হতে খুব বেশী সময় আমাদের লাগেনি। বড় জোর পনের মিনিট। আগে যারা গিয়েছে তারা বন জংগল কাটতে কাটতে গিয়েছে। সেই নিশানা ধরেই আমরা এগোচ্ছিলাম। তারপর খোলা জায়গায় এসে পড়তেই সে নিশানা হারিয়ে গেল। এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করতেই হারানো সূত্র খুঁজে পেলাম। একটা উৎরাইয়ের মুখে এসে পড়লাম। পাহাড়ের গাটা ঢালু হয়ে চার পাঁচ শ ফুট নেমে গিয়েছে। একটা ছোট্ট স্রোতোধারা পূবে পশ্চিমে বয়ে সম্ভবত রণ্টি নদীকেই সমৃদ্ধ করেছে। আবার একটা ঝরনা এসে ঐ স্রোতোধারায় পড়েছে। আমাদের পথ এই ঝরনা ডিঙিয়ে সেই ছোট্ট নদীতে গিয়ে মিশেছে। এখানে পাহাড়ের গায়ে খালি আলগা মাটি আর আলগা পাথর। অতি সাবধানে এগুতে হচ্ছে।

আমরা একে একে সাবধান হয়ে ঝরনার স্রোত ডিঙিয়ে নদীর খাতে নেমে পড়লাম। নদীর বুকে বড় বড় পাথর ফেলে সেতু বানানো হয়েছে। তার উপর দিয়ে ডিঙি মেরে পার হয়ে গেলাম।
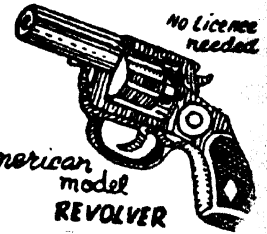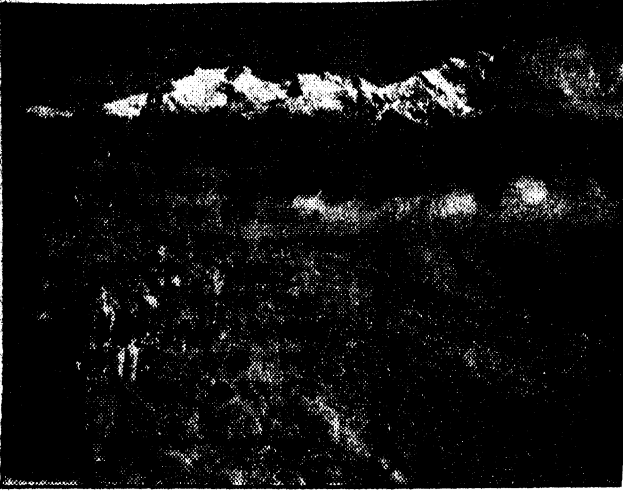
থারগাট্টার পথে

কি জানি কেন, এখন লিখতে বসে শেরপাদের "সেতু-বন্ধনের" দৃশ্যটা বার বার মনে পড়ছিল। অন্যান্য সকলে পাথর কুড়িয়ে এনে নদীতে ফেলছে। কে সামাত্র স্রোতের বেগ সেগুলোকে মুহূর্তের মধ্যে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে শেরপাদের সে কি হাসির ধুম। যেন নদীটা ওদের সঙ্গে মস্ত রসিকতা করছে। টাসি আর নরবু—এই দুজন শেরপার হিসেব কিছু সোজা। অন্যেরা যখন ছোটখাট পাথর সংগ্রহে ব্যস্ত তখন ওরা দুজন গন্ধমাদন নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে। ওদের ভাবখানা এই, কি বারবার খুচরো পাথরের জন্য ছুটাছুটি করছ তার চেয়ে এস এই পাহাড়ের আধখানা বসিয়ে দিই। একবারেই কাজ চুকে যাবে। আর তা ওরা করেও ছেড়েছে। পেল্লায় পেল্লায় পাথরের চাঙগড় ওরা পিঠ দিয়ে ঠেলে ঠেলে নদীতে এনে ফেলেছে। আঙ ফুতার, টাসি আর নরবুর গায়ে দৈত্যের মত বল।

যতটা নেমেছিলাম প্রায় ততটাই আবার উঠতে হল নদীর ওপারে গিয়ে। জায়গায় জায়গায় দেওয়ালের মত খাড়া গা বেয়েও উঠতে হয়েছে। আমার সব থেকে কষ্ট হয়েছে এই রকম চড়াই উঠবার সময়। দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেব, সে অবকাশ মিলত না। কারণ গতি বন্ধ হয়ে গেলেই শরীরের ভারে আলগা মাটি ধসে পড়তে পারে। আর একবার যদি পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায় তবে আমার নিচে যারা রয়েছে তাদের নিয়ে নিচে খসে পড়ব। তাই দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। যাক্ প্রাণ থাক মান, এই পণ নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে উঠছিলাম। শেষ ধাপটা দিলীপ এক হ্যাঁচকা টানে আমাকে তুলে দিল। আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। থপ করে বসে পড়লুম। তারপর রুকস্যাকে ভর দিয়ে শরীরটাকে মাটির উপর এলিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ এমনিভাবে পড়ে থাকার পর বুক-ধড়ফড় একটু কমে এল। লেমন জল খেয়ে চাঙ্গা হয়ে আবার দু পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম আমার পায়ে আগের মত আর জোর পাচ্ছিনে। পা দুটোকে ক্রমেই ভারি লাগছে। এর একটা কারণ হয়ত এই যে, এইদিন আমি হাল্কা জঙ্গল বুটের বদলে ভারি মাউণ্টেনীয়ারিং বুট পরেছিলাম। এই বুটজোড়া পরা ইস্তক আমার চলার স্বাচ্ছন্দ্য একেবারে চলে গিয়েছিল অথচ বুটজোড়া যে পালটে নেব, সে উপায় ছিল না। কারণ আমার হাল্কা বুটজোড়া রয়েছে কিটব্যাগে। কিটব্যাগ আছে মালবাহকের পিঠে। এবং মালবাহক আমার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে।

কারণটা যাই হোক, পদযুগল আমার নির্দেশ আর পালন করছে না, এটা বেশ বুঝতে পারছি। তাই খানিকটা ভয়ে ভয়ে চলেছি। ওরা বলেছিল এক ঘণ্টার রাস্তা। দু ঘণ্টা পার হয়ে গেল, তবু চলার বিরাম নেই। আবার একটা খাড়া উৎরাইয়ে নামতে হল। আবার হাঁচড়পাচড় করে উঠতে হল পাঁচ ছ শ ফুট উঁচু একটা খাড়া চড়াইয়ে। আবার প্রাণ বেরিয়ে যাবার যো হল। গোরা সিং বলেছিল, আজকের রাস্তা 'ময়দান-ই-ময়দান', চলতে কিছু তকলিফ হবে না। কিন্তু এই যদি তার ময়দান হয়ে থাকে, তবে পাহাড় না জানি কি? দেখলাম কারো কারো মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে উঠতে শুরু করেছে। মেজাজ কি আমারই ভাল আছে? বার কয়েক এই রকম খাড়া চড়াই আর উৎরাই ভাঙার পরও যখন রাস্তা ফুরলো

না, বেস ক্যাম্পের একটা খুঁটিও নজরে পড়ল না, তখন আর কারোর মেজাজই শরিফ রইল না। ক্ষিধেয় পেট জ্বলছে, মাথার উপরে মধ্যাহ্নের সূর্য যেন আগুন ঢেলে দিচ্ছে। এমন কি সঙ্গের জলের বোতলগুলোও খালি হয়ে গিয়েছে। তেষ্টা মেটাব, সে উপায়ও নেই। একমাত্র নির্ভর করে আছি কোলে কোম্পানীর লজেন্সগুলোর উপর। কিন্তু ওগুলোও দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সত্যি বলতে কি, আমরা একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। পথ হারায় নি তো? একঘণ্টার মধ্যে আমাদের বেস ক্যাম্পে পৌঁছবার কথা। সাড়ে তিনঘণ্টার পরও আমরা সেখানে পৌঁছাতে পারলাম না। ব্যাপার কি?

কিন্তু আমরা তো সতর্ক হয়েই চিহ্ন দেখে দেখে এগিয়ে এসেছি। পথ হারাবার তো কথা নয়। তবে?

মনে পড়ল আগের দিনের কথা। আনন্দধুরা পার হবার ... কাতর হয়ে পড়ায় আমরা খুব ধীরে ধীরে পথ হাঁটছিলাম। বিশ্বদেব আর মদন আমাদের অবস্থা অনুমান করে, রণ্টি শিবির থেকে চা আর বিস্কুট লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল। পথের মধ্যে গরম চা আর বিস্কুট আমাদের কাছে দেবতার আশীর্বাদ বলে মনে হয়েছিল। এইদিন স্বয়ং লীডার অ্যাড্‌ভান্স পার্টির নেতৃত্ব করছে। সে কি আমাদের কথা ভুলে গেল? তাজ্জব!

আবার হাঁটতে শুরু করলাম। ক্ষিধে, তৃষ্ণা আর পরিশ্রমে আমার অবস্থা কাহিল হয়ে উঠেছে। খালি পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে। পা দুটো থরথর করে কাঁপছে। কিছুক্ষণ যাবার পর সামনে একটা বিরাট বন পড়ল। রোডোড্রেনডনের ঘন জঙ্গল। হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলেছি। কিছুক্ষণ চলবার পর, রোডোড্রেনডনের একটা দো-ডালের মধ্যে বসে পড়লাম। আর এক পাও চলতে পারব, এমন মনে হল না। দিলীপ সেই অবস্থায় আমার একটা ছবি তুলল।

পাহাড়ে এসেছি, চলব না বললে ছাড়ে কে? আবার উঠতে হল। টলতে টলতে একসময় বনটা পারও হলাম। তারপরই একটা সমতল জায়গা চোখে পড়ল। প্রাণে জল এল। এরই কোথাও বেস ক্যাম্প আছে। নিশ্চয়ই।

কিন্তু আতিপাতি করে খুঁজেও আমরা সেখানে বেস ক্যাম্প বের করতে পারলাম না। ক্রমশ আমরা সেই টেবিলের মত সমতলের এক কোনায় এসে পড়লাম। আর এগিয়ে যাবার পথ নেই। পাহাড়ের গাটা ওখান থেকে একেবারে দেওয়ালের মত খাড়া নেমে গিয়েছে প্রায় হাজার দেড়হাজার ফুট। নিচেই রণ্টি নদী। উপর থেকে একটা সরু রুপোলী ফিতের মত দেখাচ্ছে। আর নদীর ওপারে আমাদের ঠিক সামনেই আরেকটা পাহাড়, ঠিক অমনিই খাড়া, প্রায়

বেস ক্যাম্পে বসে অভিযাত্রী দল ম্যাপ দেখে তাঁদের পথের সন্ধান করছেন।

হাজার দুয়েক ফুট উঠে গিয়েছে। কিন্তু বেসক্যাম্প কোথায়?

আমরা দস্তুরমত ভ্যাবাচাকা খেয়ে সেখানেই বসে পড়লাম। দিলীপ অকস্মাৎ চেঁচিয়ে উঠল। সামনের পাহাড়টায় আঙ্গুল দেখিয়ে বলল,

"ঐ দেখ, আমাদের মালবাহকরা। ঐ যে ওরা উঠছে।"

সত্যিই তাই। ঠাহর করে চেয়ে দেখি পিঁপড়ের সারির মত ওরা উঠছে। তারপর পাহাড়টা ডিঙিয়ে আবার ডানদিকে এগিয়ে একে একে নেমে যাচ্ছে অনেক নিচুতে। ওদের এই বিভ্রান্তিকর কাজের আমরা কোন মাথামুণ্ডু খুঁজে পেলাম না।

ডাক্তারের চোখে শিকারী বাজের ধার। সে বলল, "ঐ নিচু জায়গাটাতেই আমাদের বেস ক্যাম্প। তাঁবু খাটানো হচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ওখানে ওরা ঐ উঁচু পাহাড়টা ডিঙিয়ে যাচ্ছে কেন? নদীর ধার ধরে ধরে এগিয়ে গেলেই তো পারে। তা হলে অনেক কম উঠতে হয়।"

এই এতটা পথ নেমে আবার ঐ উঁচুতে উঠতে হবে, এই কথা ভাবতেই আমার চোখ অন্ধকার হয়ে এল। আমার মেরু-দণ্ডের ভিতর দিয়ে শীতল রক্তের একটা ঘন স্রোত নামতে লাগল। অসম্ভব। আমার শরীরের এখন যা অবস্থা, তাতে আমার দ্বারা আর এক পাও এগোনো সম্ভব হবে না।

সবাইকে সে কথা বললাম। ওরা গম্ভীর-ভাবে মাথা নাড়ল। বসে পড়লাম সবাই। বেলা তখন আড়াইটে হবে। বসে বসে দেখছি মালবাহকেরা উঠছে। যাদের বোঝায় কেরাসিনের টিন ছিল, সেই টিনের গায়ে রোদ ঠিকরে পড়ায় তাদের বোঝাগুলো মাঝে মাঝে চিকচিক করে উঠছে।

হঠাৎ দেখি গোরা সিং এল। গোরা সিং জানাল যে ক্যাম্পের ভাল জায়গা পাওয়া গিয়েছে। সাহেবদের এখন সেখানে যেতে হবে। এ কথা শুনে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আমি সেরেফ বলে দিলাম, আমার দ্বারা আর এক পাও চলা সম্ভব হবে না। আমাকে এখানে রেখে তোমরা চলে যাও। গিয়ে চা খাবার আর একটা তাঁবু পাঠিয়ে দিও। বীরেনদা আর ডাক্তারেরও এই একই মত।

ধ্রুব, দিলীপ, বিশ্ব আর মদন, ওদের সম্ভবত যাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমাদের অবস্থা ভেবেই বোধ হয়, ওরাও থেকে গেল। গোরা সিংয়ের হাতে সুকুমারের কাছে এস-ও-এস পাঠান হল। আমরা পরি-শ্রান্ত। চলবার ক্ষমতা নেই। খাবার পাঠাও। জল পাঠাও। তাঁবু পাঠাও।

গোরা সিং হরিণের গতিতে সেই বিপদ-বার্তা বয়ে নিয়ে বেস ক্যাম্পে রওনা দিল। আমরা চুপ করে বসে রইলাম। আমি বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম। বেশির ভাগ বিরক্তিই নিজের জন্য। আমি বুঝতে পারছিলাম, সুকঠিন পরীক্ষা আমার সামনে। এই ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে সেই পরীক্ষায় পাশ করতে পারব কি না, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। আমি জানি, এখন দাঁড়াতে গেলেই আমার পা কাঁপবে। আগের দিন এগার ঘণ্টা আর এবারে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা একটানা হাঁটার ধকল আমার পদযুগল যদি সহ্য করতে না পারে ত তাদের আমি দোষ দিই কি করে? আবার এ-ও আমি চাইছিলাম না যে, আমার জন্য ওরা আটকে থাক। কিন্তু আমাকে এখানে একলা ফেলে ওরা যদি চলে যেত, তা হলেই কি আমি খুশী হতাম? নিশ্চয়ই না। সমস্তটা মিলে সমাধানহীন এক সমস্যার মুখোমুখি হয়ে পড়েছিলাম।

আমার মনে হতে লাগল, সুকুমার আজ শুরু থেকেই ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। "মাত্র এক ঘণ্টার পথ বাকী, এ কথা যেই তাকে বলে থাকুক, পথ যেখানে একেবারে অপরি-চিত, সেখানে তার পক্ষে ও কথার ওপর এতটা নির্ভর করা ঠিক হয়নি। অন্তত লাঞ্চটা তৈরি করে বের হওয়া উচিত ছিল। একে পথের ক্লান্তি, তার উপর পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে। কাহিল হয়ে পড়া আমাদের মত অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। তারপর যখন দেখল, পথের হিসেবে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, তখন কি সুকুমারের উচিত ছিল না, আমাদের খাবার একটা ব্যবস্থা করে রাখা? অনায়াসে সে এখানে কয়েক প্যাকেট বিস্কুট আর ফ্লাস্ক ভর্তি চা রেখে যেতে পারত?

"গুড্ মর্নিং সাব্।"

পিছন থেকে আচমকা সম্বোধন শুনে চমকে উঠলাম। আরে এ যে কেদার সিং! আমার রানার। ঘন্যাকুল থেকে ওর হাত দিয়ে ডেস্প্যাচ্ পাঠিয়েছিলাম। যোশী

মঠে গিয়ে তার লাগিয়ে এরই মধ্যে এসে সে আমাদের ধরে ফেলল। বাহাদুর বটে!

কেদার সিংকে দেখে আমি মনের জোর ফিরে পেলাম। আমার কেমন যেন মনে হতে লাগল, এ পথ আমি পাড়ি দিতে পারব। দূরে দেখা গেল, কয়েকজন লোক দ্রুতবেগে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ধ্রুব আর দিলীপ নিচে নামতে লাগল। মদন আর বিশ্ব আমাদের কাছে থাকল।

টাসী সকলের আগে এসে পৌঁছাল। তারপর আঙ ফুতার। তারপর গোরা সিং। তারপর কয়েকজন মালবাহক। তাঁবু আনেনি, চা আর বিস্কুট এনেছে। ওরা আমাদের নিতে এসেছে।

চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে আমরা যখন উঠলাম তখন আলোর জোর কমে এসেছে। আঙ ফুতারের হাত ধরে আমি আর টাসীর হাত ধরে বীরেনদা সেই বিপজ্জনক পথে অকুতোভয়ে অবতরণ [illegible]াতে শুরু করলাম। ডাক্তার কারো সাহায্য নিতে রাজী হল না।

অন্ধকার ঘন হয়ে এল। তখনও আমরা নামছি। আঙ ফুতার কখনও আমার সামনে এগিয়ে গিয়ে ধাপ কেটে দিচ্ছে, কখনও পিছন থেকে আমার পতনোন্মুখ দেহটা ধরে ফেলছে। অন্ধকারে ওর দেহটা একেবারে মিলিয়ে গিয়েছে। ওকে প্রায় দেখতেই পাচ্ছি নে। শুধু ওর স্বরটা শুনতে পাচ্ছি। আমার কানে সেটা অনবরত বাজছেঃ "উতারো সাব্, উতারো। হাম কভ্ভি নেহি ছোড়েঙ্গে।"

এদিনের অ্যাডভেঞ্চার কমিক দিয়ে শেষ হল। হাজার ফুটের বেশী খাড়া উৎরাই খতম করে, রণ্টি নদীর উপল আস্তরণ আধ মাইল মাড়িয়ে, পাথরের উপর ডিঙ্গি মেরে মেরে খর স্রোত পেরিয়ে আবার দু তিন শ ফুট খাড়া চড়াই ভেঙ্গে যখন বেস ক্যাম্পে পোঁছালাম তখন ছটা বেজে গিয়েছে। নিমাই আর সুকুমার একগাল হাসি নিয়ে এগিয়ে এল।

সুকুমার বীরেনদার কাছে গিয়ে বললে, "বহোৎ আচ্ছা।"

সঙ্গে সঙ্গে বীরেনদা বিভীষণ মূর্তি ধরে তেড়ে গেল সুকুমারের দিকে।

হাঁফাতে হাঁফাতে বীরেনদা বললে, "আবার রসিকতা হচ্ছে। মারব ব্যাটাকে আইস্ অ্যাক্সের এক বাড়ি......"

বলেই মাথার উপর বীর বিক্রমে আইস্-অ্যাক্সটা বন বন করে ঘোরাতে গিয়ে বীরেনদা আর টাল সামলাতে পারলে না। একেবারে পপাত ধরণীতলে। সুকুমার এই আচমকা আক্রমণে থতমত খেয়ে গেল। তারপর সংবিৎ ফিরে পেয়ে যেই না সে বীরেনদাকে তুলতে গেছে অমনি নিমাই হাঁ হাঁ করে তাকে টেনে ধরল।

বললে, "তফাত যাও, তফাত যাও। আহত সিংহ। কাছে যেতে নেই। ডেঞ্জারাস।"

বেস ক্যাম্পে ডাঃ কর একজন অভিযাত্রীর পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছেন।

নিমাই-এর কাণ্ড দেখে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। বীরেনদাও।

বীরেনদাকে হেসে উঠতে দেখে নিমাই চেঁচিয়ে উঠল, "লাইন ক্লিয়ার। হরি সিং, নকশা সাব্ কো কফি পিলাও।"

॥ ছত্রিশ ॥

বেস ক্যাম্প, ১০ই অক্টোবর। বলতেই হবে সর্দার আঙ শেরিং-এর পছন্দ আছে। বেছে বেছে খাসা জায়গাটা বের করেছে বেস ক্যাম্পের জন্য। জায়গাটা নিরাপদই শুধু নয়, ছবির মত সুন্দর। চারদিকেই পাহাড়ের আড়াল। কাজেই ঝড়ো হাওয়া খুব বেশী উৎপাত করতে পারবে না। এক পাশ দিয়ে রণ্টি নদী বয়ে চলেছে। আরেক পাশ দিয়ে আরেকটা স্রোতোধারা লাফাতে লাফাতে নেমে গিয়ে রণ্টির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

সোজা উত্তর থেকে দুটো পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে নেমে আসছে রণ্টি। তার এক পাশে বেতারথলি, অন্য পাশে রণ্টি পর্বত। বেস ক্যাম্প থেকে দেখলে বেতারথলি রণ্টি নদীর বাঁ পাশে পড়ে আর ডান পাশে পড়ে রণ্টি পাহাড়। হিমানী রেখার নিচে বেস ক্যাম্প করা হয়েছে। এ বিষয়ে সর্দারের পরামর্শই আমরা মেনে চলেছি। সর্দার বলেছে, বেস ক্যাম্প গরম জায়গাতেই করা ভাল। বরফে কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তা হলে এখানে এসে সে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে।

কাল পঞ্চাশ জন মালবাহককে আমরা ছুটি দিয়ে দিয়েছি। শের সিং তাদের সঙ্গে চলে গেছে। যাবার সময় প্রত্যেকের চোখে জল দেখা দিয়েছিল। কী আশ্চর্য মানুষের মন! ওরা সকলেই আমাদের সাফল্য কামনা করেছে। নিরাপদে যাতে ফিরতে পারি তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে। ওদের সঙ্গে কেদার সিং-ও চলে গেল ডা[illegible] নিয়ে। আর আটজন মালবাহককেও পাঠান[illegible] হল রসদ আনবার জন্য।

কাল সারা দিন জিনিসপত্র প্যাক করা [illegible] হয়েছে। দেখা গেল কয়েকটি আবশ্যকী[illegible] সামগ্রী আনতে ভুল হয়ে গিয়েছে। জুতোর মাখান গ্রিজ্ আনা হয়নি। বরফে জুতো শক্ত লোহা হয়ে উঠবে যখন, তখন তা নরম করা হবে কি দিয়ে কে জানে? কোয়ার্টার মাস্টার মাথা চুলকোতে লাগল। স্টোভও মারাত্মক কম আনা হয়েছে। যেখানে কম করেও পাঁচটা আনার কথা, সেখানে স্টোভ আনা হয়েছে তিনটে। তাও একটা বিকল হয়ে পড়েছে। বাড়তি পার্টস্ আনা হয়নি সারানো গেল না। বাধ্য হয়েই দুটো স্টোভ দিয়ে কাজ চালাতে হবে। কোয়ার্টার মাস্টার দাড়ি চুলকোতে লাগল। এইভাবেই [illegible] অধিকাংশ সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছে।
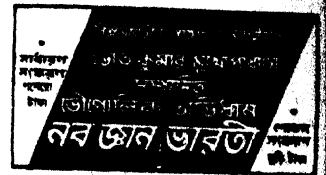
রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হল। মদনের প্রশ্নটা তোলা হল। দেখা গেল, দলে ক্লাইম্বারের সংখ্যা বড় কম। ধ্রুবকে ক্লাইম্বার হিসেবে ধরা হল না। ঠিক হল ধ্রুব প্রধানত বেস ক্যাম্পে থাকবে। সাপ্লাই পাঠাবার দায়িত্ব ওর ঘাড়ে চাপান হল। মদনকে বাদ দিলে থাকে আর চারজন—সুকুমার, বিশ্ব, নিমাই আর দিলীপ। এর মধ্যে একজন কি দুজন যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তা হলে? চিন্তার কথা। অনেকক্ষণ পরামর্শের পর সকলে একটা বিষয়ে একমত হল, মদনকে বাদ দেওয়া যায় না। সে যেভাবে নিজের দক্ষতা বারবার প্রমাণ করেছে, তাতে মদনকে বাদ দিয়ে রাখলে দলেরই ক্ষতি হবে। সর্বসম্মতিক্রমে মদনকে দলভুক্ত করা হল। কিন্তু তাতেও সমস্যা দেখা দিল। পোশাক কই? সরঞ্জাম কই? জুতো?

জুতোর সমস্যা মিটল সহজেই। বীরেনদার জুতো তার পায়ে ফিট করছিল না। মদনকে দিতেই তার পায়ে লেগে গেল। আমার জুতো জোড়া বীরেনদা পায়ে খাপ খেয়ে গেল। মদনের অন্যান্য সাজসরঞ্জাম শেরপাদের কাছ থেকে কিছু নিয়ে আর আমাদের কাছ থেকে বাকিটা দিয়ে কোনরকমে সংগ্রহ হয়ে গেল।

আজ সকালে প্রথম দল যাত্রা করল অ্যাড্‌ভান্স বেস স্থাপন করতে। দলে ছিল তের জন। অশুভ তের। যাত্রা কেমন হবে কে জানে? আমি ছিলাম ডিউটি অফিসার। আমার ঈশ্বর নেই। তবু যাত্রার আগে প্রার্থনা পড়ালাম আমিই। শুরুটাই হল গোঁজামিল দিয়ে শেষ কি হয় কে জানে?

বীরেনদা পরশু রাত থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অনবরত কাশছে। রাত্রে ভাল করে ঘুমতে পারছে না, খাবারে রুচি নেই। চোখ গর্তে বসে গেছে, গাল তুবড়ে গেছে। ডাক্তার প্রাণপণ চেষ্টা করছে বীরেনদাকে চাঙ্গা করে তুলতে। আজীবা এখনও দুর্বল। পঁচিশ জন মালবাহক আর আমরা চারজন বেস ক্যাম্প পড়ে থাকলাম। আর রইল হরি সিং আর লালু।

"জয় বদ্রী বিশাল" বলে রওনা দিল ওরা তেরজন—সুকুমার, ধ্রুব, নিমাই, দিলীপ, বিশ্ব, মদন, আঙ শেরিং, পেম্বা নরবু, দা তেম্বা, গুণদিন, টাসী, আঙ ফুতার আর গোরা সিং। প্রত্যেকে মালের বোঝা বেশ চাপিয়েছে।

আজ দিনটা বেশ পরিষ্কার। ওরা সার বেঁধে রওনা দিল। আজ বের হতে একটু দেরিই হয়ে গেল ওদের। আমি আর ডাক্তার ওদের সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর গেলাম। ওরা ধীরে ধীরে স্রোতোধারার খাতে নেমে গেল। তারপর নালাটা পার হয়ে একটা ছোট্ট চড়াই বেয়ে উঠে গেল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে রণ্টি নদীর বুকে নেমে গেল।

ক্রমশ বড় বড় মানুষগুলো ছোট ছোট হয়ে আসতে লাগল। ডাক্তার হঠাৎ এক সময় জানাল, ওরা নদী পার হতে পারছে না। ওরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ওরা বসে পড়ল। এই ওরা ঘোরাঘুরি করছে। ওরা ওখানে কি যেন করছে? পুল বানাচ্ছে না কি?

দেড় ঘণ্টা পর ডাক্তার বলল, ওরা এগোচ্ছে। ঐ যে একে একে একটা বড় চড়াইয়ে উঠছে।

এবার আমিও দেখতে পেলাম, কালো কালো কতকগুলো বিন্দু উঠছে, নামছে, নড়ছে। তারপরে একে একে ওরা পাহাড়ের বাঁকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। (ক্রমশ)

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১৬০ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

ছবিতে তোমাকে যে রকম বেশ মোটাসোটা দেখা গেল তোমার চিঠিখানিও তেমনিতরো—তাতে খুশী হলুম। ছবিতে তোমার পূর্বের আকৃতির একটুখানি পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল—পরিচিত সাদৃশ্য আছে কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য কিছু আছে যা সম্পূর্ণ পরিচিত নয়। সেইটে কি ঠিক সুনির্দিষ্ট করে বুঝতে এবং বলতে পারলুম না—একটু যেন প্রাচীনতর সংস্করণ। হয়তো সেটা ফোটোগ্রাফারের কারচুপি। মানুষকে আমরা নানা দিক থেকেই দেখি, তার মধ্যে কতকগুলো দেখা পুনঃ পুনঃ ঘটে, সেইগুলোই মনে স্থায়ী রেখা জমিয়ে দেয়—তার আশপাশ থেকে কখনো কখনো যে অংশটা দেখা যায়, সেটা ক্ষণকালের জন্যে, সেইটে মনে থাকে না। কিন্তু ফোটোগ্রাফের চোখে যদি সেইটে একটা আকস্মিক ধরা পড়ে যায়, তাকে একটুমাত্র নড়াতে দেয় না। এই জন্যেই অনেক সময়ে ফোটোগ্রাফ দিয়ে [illegible] চেনা লোককে চিনি [illegible] কিন্তু তোমার বেলায় তা হয়নি। [illegible] কিন্তু আর্টিস্ট, [illegible] ফোটোগ্রাফ কিছুই বানায় না। [illegible] আলোতে মুখের যে বিশেষত্বকে সে দেখিয়েছে সেটা নিত্য নয়—মুখের সহস্র রকমের প্রকাশের মধ্যে কেবল একটি—কিন্তু ফোটোগ্রাফ সেইটেকেই একমাত্র করে ওকে বলে মনে হয় যে ওই সে।

শীতের দিকে সুদূর সরোবরের হাঁসগুলো পদ্মার চরে এসে তাকে মুখরিত করে তোলে, দেশ-দেশান্তরের আগন্তুকের দল তেমনি করে এসে সমস্ত শীতকালটা শান্তিনিকেতনকে চঞ্চল করে তোলে। এই কয়দিনে কত লোক এল গেল তার ঠিকানা নেই—দর্শন দিতেই হবে। মনের মধ্যে কিছুতেই ঠিক বুঝতে পারিনে এমনিই কি অদ্ভুত দরকার ছিল। নিজেকে সকলের দর্শনীয় বলে মনে করবার মতো স্পর্ধা আমার একটুও নেই। একথা মনে না ভেবে থাকতে পারিনে যে আমার প্রাপ্যের চেয়ে অনেক বেশি পাচ্ছি। যারা আমাদের কাছে আসে অনেকটা পরিমাণে আমার [illegible] রচিত। তারা বাদসাদ দিয়ে বাড়িয়ে কমিয়ে একটা রবীন্দ্রনাথ তৈরি করে নেয়, সেই রবীন্দ্রনাথ তাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা যা পায় এ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার মাপের মিল হয় বলে আমার তো মনে হয় না। কিন্তু তাও বলি, এ রবীন্দ্রনাথ যে কী পদার্থ তা আমিও ভালো বুঝতে পারিনে। তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বুঝতে পারি যে, আমি কবিও না গুরুও না—এটাও নিশ্চিত সত্য যে, আমি কবি। কখন বুঝতে পারি? যখন জানলার বাইরে চেয়ে দেখি;—বার বার করে দেখলুম এই মানুষটাকে, শীতে বসন্তে বর্ষায়, দিনে রাতে—এ জীবনে ওর চেয়ে দেখাটা ব্যর্থ হয়নি, দেখার অঞ্জলি ভরে' ভরে' ও কী যে নিল কি জানি। ছেলেবেলা থেকে ও জানলার ধারের মানুষ, ওর সামনেই সুদূর, বিপুল সুদূর—সেইখানে বাজছে বাঁশি, দিগন্তের ঐ বেগুনি রঙের সুরে, শীতের মধ্যাহ্ন রৌদ্রের এই সোনালী রঙের সুরে, আতপ্ত হাওয়ায় তালগাছের এই পাতা-কাঁপানির সুরে। এই জানলার ধারের মানুষটার কথা চিঠিতে তোমাকে বোধ হয় বার বার করেই বলেচি এই তাকিয়ে থাকার মানুষটার প্রলাপ-বাক্য। কিন্তু হঠাৎ কোন্ এক সময়ে জানলার ধার থেকে বেরিয়ে পড়ি, এসে পড়ি যেখানে সে হল নিকটের রাজ্য; এক মুহূর্তে মনের চেহারা বদল হয়ে যায়। এই কিছুদিন হোলো আমেরিকা থেকে ডাক্তার বাটারফীল্ড এসেছিলেন, তিনি কৃষিবিজ্ঞানে বিখ্যাত ওস্তাদ, গ্রামের সমস্যা নিয়ে ভাবচেন। তাঁর সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ ধরে আলাপ হল, তিনি শুনলুম কাকে বলেচেন আমার মতো কেজো বুদ্ধির লোক তিনি প্রায় দেখেননি। সেটাও আমার স্বভাবের ভিতরকারই রূপ। আমি গ্রামের কথা না ভেবে থাকতে পারিনি—শুধু ভাবা নয় তার জন্যে নিজেকে ঢেলেই দিয়েচি। তেমনি করে ছেলেদের জন্যে বিদ্যালয়েরও প্রতিষ্ঠা করেচি, না করে উপায় ছিল না। ঐ সুদূরের দিকে স্তব্ধ তাকিয়ে থাকা মানুষ, আর এই নিকটের সংসারে ব্যস্ত হয়ে খেটে মরা মানুষ, এই দুটোর মধ্যে কোথায় যে মিল, তা তো ভেবে পাইনি। যখন খাপার মতো গানে সুর বসাই, ছবি আঁকি তখন অন্য মানুষটা কোথায় যে গাঢাকা দিয়ে থাকে, তার টিকি দেখবার জো থাকে না—মনে হয় সে মায়া। কিন্তু সেই বুদ্ধিমানের পালা যখন আসে তখন এই খাপটা নিজেকে সম্পূর্ণ বেকবুল করে' বসে। দুটো ভিন্ন জাতের জীব, অথচ এক জায়গায় বাসা বেঁধেছে, তাই এ যখন ভিতরে আসে ও যায় বাইরে, আবার ও এলে এর সেই দশা। একজনের যখন রাত্রি আর একজনের তখন দিন, তার ফলে হয়েছে আমার দিনরাত্রি সমান হয়ে এল, একবার করি খেলার কাজ, আর একবার করি কাজের খেলা। বিশ্রাম নেই। সেকালে যখন পদ্মার চরে বসে সোনার তরী আর ছোটো গল্প লিখেচি তখন আমার এ দশা ছিল না, তখন আমার স্বভাব দ্বৈতবাদী ছিল না, একের মধ্যে কৈবল্য-লাভ করে বসেছিলুম, ছিলুম ভালো। কিন্তু এখন সেই পদ্মার চর আর এই শান্তিনিকেতনের মাঠের মধ্যে মন কেবলই ঠাঁই বদল করে বেড়ায়। পদ্মার চরটা প্রত্যক্ষ না থাকলেও চলে, কেননা সেখানে আমার কল্পরাজ্য — এই মাঠের মধ্যে হাতগড়া কাজ, তাই এখানে থাকতে হয় সশরীরে। এক একবার মন বলে শান্তিনিকেতনের এই লীলাটা মধ্যলীলা, আর একবার সেই আদ্যলীলায় ফিরে গিয়ে তবে সেই মূল ধুয়োর মধ্যে জীবনের লীলা সমে এসে ঠেকবে। দিন তো বেশি নেই, অথচ কাজ তো ফুরোলো না—ছুটি না পেলে তো নড়তে পারব না। ছুটি তো বাইরে থেকে নেওয়া যায় না। যদি যেত তবে তো সেই পদ্মার চর পড়েই আছে, বোটও আছে, অপেক্ষা করে।

বরোদায় বক্তৃতা করতে যেতে হবে। আর দেরি নেই। ইচ্ছে ছিল পথে তোমাকে দেখে যাব কিন্তু রাস্তাঘাটের যে রকম জটিলতা তাতে সাহস হল না। দেহখানা রাস্তায় রাস্তায় দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াবার উপযুক্ত নয়—অথচ আমার ভাগ্যবিধাতা আজও আমাকে পথে পথেই ঘুরিয়ে বেড়াচ্চেন —লোকে ভাবচে সইবে না, অথচ দেখচি এক রকম করে সয়েও

যাচ্চে যদিও মন কেবাল বলচে, আত্মারাম একটু স্থির হয়ে বোসো। ২ জানুয়ারী ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৬১ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

পথে শরীরটা বিগড়ে গিয়েছিল। ভিক্ষের কাজটা আমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর বা সুখকর বা লাভজনক নয়। যা পাই তাতে পেট ভরে না। জাত যায়। বারবার বুঝতে পারি দেশের লোক কোনোমতে আমাকে প্রশংসা করেই দৌড় মারে, আমাকে জায়গা দিল না। তাদের দোষ নেই, আমার কাজটাকে তাদের নিজের কাজ বলে স্বীকার করতে তারা পারেনি।

এখানে ফিরে এসেই শুনি সাহিত্য সম্মেলনে আমার অনুপস্থিতি নিয়ে যেসব কথার সৃষ্টি হয়েচে সেগুলো আমার পক্ষে শ্রুতিসুখকর নয়। শুনে প্রথমেই রাগ হয়, তারপরে রেগেচি বলে লজ্জাবোধ করি। জীবনের পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষ এইসব ব্যাপার নিয়ে রাগারাগি করে, তারপরে পঁয়ত্রিশ বছর লাগে এই কথাটা বুঝতে যে, এসব ব্যাপার নিয়ে রাগারাগি করা হাস্যকর। আমার সেই দ্বিতীয় পর্বের পঁয়ত্রিশটা বছর এখনো সমাপ্ত হয়নি, সেই জন্যে বেশ পেট ভরে রাগ করবার সুখও পাইনে, দ্বিতীয় পঁয়ত্রিশটা প্রথম পঁয়ত্রিশের মুখ লাল হতে দেখলেই তার মাথায় পাখার বাতাস করে বলে ঠাণ্ডা হও দাদা। যাক্‌ গে।

কিন্তু ক্লান্তিটা পিঠের উপর সওয়ার হয়ে বসে আছে। সামান্য মাত্র কাজ করতেই ইচ্ছা করছে না। অথচ বিশ্রামের ফাঁক পাইনে। শীতকালে লোকের ভিড়—পালাবার রাস্তা নেই। কাজও যথেষ্ট।

হয়তো বিলেত যাওয়া ঘনিয়ে আসচে। রথীর পক্ষে সেটা নিতান্ত আবশ্যক। হয়তো এলমহার্স্ট আমাদের নিয়ে যাবে। তার মনে সেই সংকল্প। জাহাজে জায়গা মিলবে কিনা খবর জিজ্ঞাসা করে তার করেচে। জবাব এলে বুঝতে পারব।

শ্রীনিকেতনের উৎসব হয়ে গেল। ভালোই হল। সমস্ত বিবরণ প্রশান্তর কাছে শুনতে পাবে। বর্ণনা করে লেখবার মতো জোর পাচ্চিনে। মনটা ইস্কুল পালানো ছেলের মতো—কিছুতে তাকে কোনো কাজে হাজির করতে পারচিনে।

মাঘ শেষ হয়ে এল—শীত যায় না। হু হু করে উত্তরে হাওয়া দিচ্চে—আকাশে ফ্যাকাশে রঙের মেঘগুলো ঘোরা-ফেরা করচে, মাঠের উপর দিয়ে ছায়া যাচ্চে ভেসে। আর কোনো নালিশ নেই কেবল দেহ জুড়ে এই মোটা মোটা কাপড়-গুলো একঘেয়ে হয়ে উঠেচে, খোলস ছাড়তে পারলে খুশী হই। কিন্তু যদি মার্চে বিলেতে যাওয়া ঘটে তবে খোলসের মেয়াদ বাড়বে।

এইবার কলম ছেড়ে একবার ঠেসান দিয়ে বসা যাক্‌—থেকে থেকে চোখটা ঘুমে জড়িয়ে আসচে। ইতি ১১ ফেব্রু ১৯৩০

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৬২ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

শরীর অলস, মনটা মন্থর। শান্তির গোধূলি। কেদারায় বসে আছি তো বসেই আছি, একটুখানি উঠে টেবিলে বসে সামান্য কিছু একটা কাজ করব তাও কেবাল পিছিয়ে যাচ্চে। রাত হয়ে যায়, বিছানায় শুতে যাব, তাতে গড়িমসি, সকাল হল রোদ উঠেছে, বিছানা ছেড়ে উঠব সেও তথৈবচ। কোনো বিশেষ অসুখ আছে তা নয়, জীবনের স্রোতটা থমথমে। বাইরের দিকে চেয়ে আছি তো চেয়েই আছি, ঠিক যেন ঐ রোদ-পোহানো জামগাছটার মতো। দুপুরবেলাকার আলোটা আমার মনের উপর ছড়িয়ে পড়েচে—সেখানকার দিগন্তে সুদূর স্মৃতির নীলাভ রেখা, আর সেখানকার ঝোপের মধ্যে কোথায় একটা ঘুঘু ডাকচে, প্রহর যাচ্চে চলে। ঐ শূন্যে মাঠের পর দিয়ে থেকে থেকে একটা ছিন্ন মেঘ যেমন তার ছায়া বুলিয়ে চলেচে, তেমনি কোন্‌ একটা দিশাহারা উড়ো বিষাদের ছায়া মনের উপর দিয়ে চলে যায়—মেঘেরই মতো খাপছাড়া—বাস্তব কিছুর সঙ্গেই জড়িত নয়।

এই পর্যন্ত কাল লিখেচি এমন সময় ডাক পড়ল। মেয়েরা ঋতুরঙ্গ অভিনয় করবে আজ সন্ধেবেলায়, তাদের অভ্যাস করাতে হবে। ওরা অঙ্গভঙ্গীর লতানে রেখা দিয়ে গানের সুরের উপর নক্সা কাটতে থাকে। মনে মনে ভাবি এর অর্থটা কি। আমাদের প্রতিদিনটা দাগধরা, ছেঁড়াখোঁড়া, কাটাকুটিতে ভরা, তার মধ্যে এর সঙ্গীত কোথায়? যারা লোকহিত-ব্রত-পরায়ণ সন্ন্যাসী, তারা বলে বাস্তব সংসারে দুঃখ দৈন্য শ্রীহীনতার অন্ত নেই তার মধ্যে এই বিলাসের অবতারণা কেন? তারা জানে 'দরিদ্রনারায়ণ' তো নাচ শেখেননি, তিনি নানা দায় দিয়ে কেবলি ছটফট করে বেড়ান, তাতে ছন্দ নেই। এই সব সাধু লোকেরা এই কথাটা ভুলে যায় যে প্রতিদিনের দৈন্যটাই যদি একান্ত সত্য হোত তাহলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভালো লাগতো না, এটাকে পাগলামি বলতুম। কিন্তু ছন্দের এই সুসম্পূর্ণ রূপলীলাটা যখন দেখি তখন মন বলতে থাকে এই জিনিসটি অত্যন্ত সত্য—ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছন্নভাবে চারদিকে যা চোখে পড়তে থাকে তার চেয়ে অনেক গভীরভাবে নিবিড়ভাবে। পর্দাটার উপরেই প্রতিদিনের চলতি হাতের ছাপ পড়চে, দাগ ধরচে, ধুলো লাগচে, ছিঁড়ে যাচ্চে, পরিপূর্ণ-তার চেহারাটা কেবলি অপ্রমাণ হচ্চে—একেই বলি বাস্তব। কিন্তু পর্দার আড়ালে আছে সত্য, তার ছন্দ ভাঙে না, সে অম্লান, সে অপরূপ। তাই যদি না হবে তবে গোলাপ ফুল ফুটে ওঠে কিসের থেকে—কোন্‌ গভীরে কোথায় বাজে সেই বাঁশি যার ধ্বনি শুনে মানুষের কণ্ঠে কণ্ঠে যুগে যুগে গান চলে এসেচে আর মনে হয়েচে মানুষের কলহ কোলাহলের চেয়ে মানুষের এই গানেই চিরন্তনের লীলা দেখা যায়? অঙ্গে অঙ্গে যখন নাচ দেখা দিল তখন ঐ ময়লা ছেঁড়া পর্দাটার এক কোণা উঠে গেল—দরিদ্রনারায়ণকে হঠাৎ দেখা গেল বৈকুণ্ঠে, লক্ষ্মীর ডান পাশে। তাকেই অসত্য বলে উঠে চলে যাবে মন তো তাতে সায় দেয় না। দরিদ্রনারায়ণকে বৈকুণ্ঠের সিংহাসনেই বসাতে হবে, তাঁকে লক্ষ্মীছাড়া করে রাখব না, সাধু লোকদের এই তো হওয়া উচিত লক্ষ্য। কিন্তু বৈকুণ্ঠের আভাস যদি কোথাও না দেখি, আর দেখলেই চক্ষু বোজাকে মনে করি সাধুতা তাহলে তো মানুষের গতি নেই। আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিদ্রবেশ আর অন্নপূর্ণায় তাঁর ঐশ্বর্য—বিশ্বে এই দুইয়ের মিলনেই সত্য। সাধুরা এই মিলনকে যখন স্বীকার করতে চান না তখন কবিদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে। তখন শিবের ভক্তকবি কালিদাসের দোহাই পেড়ে সেই যুগলকেই আমাদের সকল অনুষ্ঠানের নান্দীতে আবাহন করব যাঁরা 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ', যাঁদের মধ্যে অভাব ও অভাবের পূর্ণতার নিত্যলীলা।

আর দুইএকদিনের মধ্যেই আমাদের জাহাজের সঠিক খবর পেলে আমাদের গতিবিধির নিশ্চিত খবর তোমাকে জানাব।

আজ আর সময় নেই। ইতি তারিখ ভুলেচি—ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খামের উপরে ডাকের ছাপ দেখে তারিখ বসিয়েছি ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০।

॥ ১৬৩ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

কয়দিন ধরে নানা রকম ব্যাপার চলেচে। একটুও সময় পাচ্ছিলুম না। কাল রাত্রে ঋতুরঙ্গ শেষ হয়ে যাওয়াতে আপাতত আমার কর্তব্যের অবসান হোলো। এখন অত্যন্ত ক্লান্তি এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেচে। কিন্তু আমার দেহের সঙ্গে ক্লান্তির সম্বন্ধটা খুব পুরোনো হয়ে এসেচে—বোধ হচ্চে শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটবে না। যদিচ জাহাজের চূড়ান্ত খবর এখনো পাই নি তবু একরকম স্থির যাওয়া হবেই—জাহাজের রাজকক্ষ যদিবা নাও পাই তবু ভেসে পড়াই ভালো। কলকাতা থেকে সম্ভবত ২৪।২৫শে গোছ কোনো একটা তারিখে ছাড়বে—খুব দেরি হয় ত ছাব্বিশে—কারণ ফেব্রুয়ারি মাসে তারিখের কৃপণতা আছে। অতএব কলকাতায় ২০।২১ নাগাদ গিয়ে অধিষ্ঠান করব। যদি তোমার দেখা পাই তো খুশী হব—কিন্তু দেহকে পীড়ন কোরো না। ইতি ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৬৪ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

২৩শে কলকাতায় পৌঁছব ২৮শে কলকাতা ছাড়ব, এর মধ্যে যদি কর্নোয়ালিস স্ট্রীট ধাঁ করে ঘুরে যেতে পার তা হলে সমুদ্র পার হবার পূর্বে দেখা হতে পারবে। কিন্তু মনে ভয় হয় ৯৯টাকে পাছে ঝাঁকানি দিয়ে একশোর কোটায় প্রোমোশন দেওয়া হয়। গরম তো পড়েইচে—এইবার তোমার কর্তব্য সেই দেশে রওনা হওয়া যে দেশে জলহস্তীর মোড়ক পরে দেহকে উদারতর করেছিলে। এবার আমার সঙ্গী এরিয়ম—এর বেশি আর কিছু বলতে চাই নে। ইতি ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আলো-আঁধারি

সুনীল দাশগুপ্ত

অকালে যদি সন্ধ্যা হল
স্মৃতি কি ক'রে বুঝবে বলো
স্বপ্ন কতদূর।
ভাবতে গিয়ে থমকে পড়ি
আপনা থেকে হাওয়ায় ঝরি
সময় বন্ধুর।

হঠাৎ কোনো কথায় কাঁপে
আমার সারারাতের পাপে
একলা-চলা মন।
যন্ত্রণায় কে গান গায়
চলতি পথে রাত বাড়ায়
কাদের ক্রন্দন।

মায়ায় পড়ে হৃদয় পোড়ে
শূন্যে পাখী উদাস ওড়ে
গ্রহান্তরে গ্রহে।
শহর গ্রাম বন্দরেও
ঘুরেছি তবু পাইনি পেয়
নিঃস্ব সমারোহে।

আমার সারারাতের তারা
যন্ত্রণায় আত্মহারা
খেয়াপারের আলো।
স্বপ্ন সেও মৃত্যু হয়ে
রহস্যের ইশারা বয়ে
রক্তে চমকাল।

রূপময় ভারত

রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের আদিবাসী ভীল। প্রশস্ত নাশা, সুঠাম দেহ ভীলরা অত্যন্ত কর্মঠ এবং কয়েক পুরুষ আগের তুলনায় এখন ওরা চাষ আবাদও করে বেশী। সঙ্গের ছবিগুলিতে দেখা যাচ্ছে: (১) ভীল পিতা ও পুত্র; (২) বাজারের পথে বিশ্রামরত; (৩) কুটিরের সম্মুখভাগ; (৪) শস্য কাটায় নিরত; (৫) গৃহপালিত মহিষের তত্ত্বাবধানরত ভীল যুবক; (৬) সন্তান-কোলে ভীল জননী; (৭) গ্রীষ্মকালে মাঠে গর্ত খুঁড়ে পানীয় জল আহরণ; (৮) গ্রামে মন্দিরের সামনে বৃক্ষছায়ায় বিশ্রামরত ভীল নারী; (৯) প্রধান গোষ্ঠিপতি।

আলোকচিত্রশিল্পী :

সুনীল জানা

১

২

৩

৪

৫

৬
৭
৮
৯
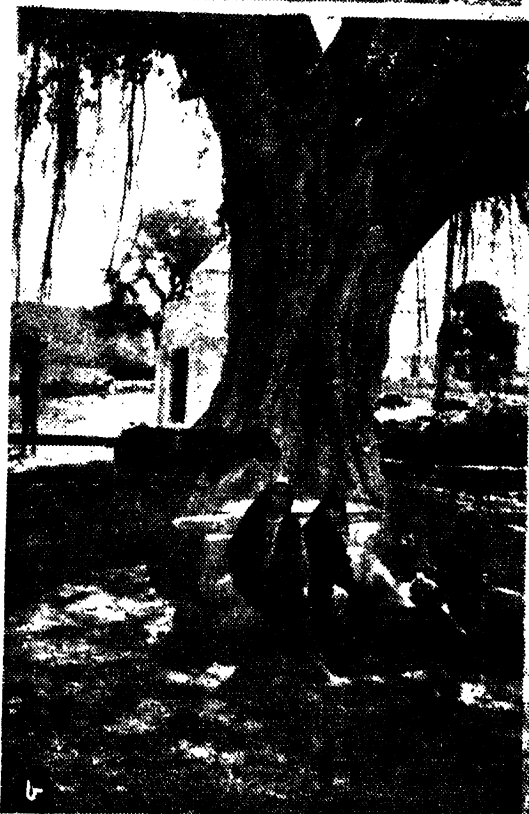
বিজ্ঞান সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে যে স্তনপায়ী শিশুর পুষ্টিবিধানে মাতৃদুগ্ধই সবচাইতে ভালো। তবে বর্তমানে কৃত্রিম উপায়ে মাতৃদুগ্ধের পরিবর্তে অন্য আহার্য দিয়ে (গোদুগ্ধ) শিশুদের লালন পালন করা হয়। কিন্তু অসময়ে যে সব শিশু জন্মগ্রহণ করে তাদের ক্ষেত্রে অবশ্য দ্বিতীয় উপায় প্রযোজ্য হয় না। তাদের সব সময়েই এ্যালবুমেন প্রয়োজন এবং একমাত্র মাতৃদুগ্ধেই এই এ্যালবুমেন রয়েছে। অসময়ে জাত সন্তানের পুষ্টির জন্য অন্ততঃ পক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ মাতৃদুগ্ধ প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে আবার অসময়ে জাত সন্তানের মায়ের বুকেই দুধ হয় না অথবা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। সুতরাং অসময়ে জাত সন্তানদের পক্ষে যখন মাতৃদুগ্ধ পাওয়া সম্ভব নয় তখন যদি সংরক্ষিত মাতৃদুগ্ধ পেলে তাকে ভগবানের দান বলা যায়।

গত মহাযুদ্ধে হল্যাণ্ড শত্রুদের অধিকারে থাকা কালে নেদারল্যাণ্ডস রেড ক্রসের রক্তদান সেবার বায়োকেমিস্ট ডাঃ জি জি এ মাস্টেনব্রুক, রাজধানীতে শিশু মৃত্যু বেড়ে যাওয়াতে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন।

ডাঃ মাস্টেনব্রুক দেখেন যে, দেশে খাদ্যাভাস নিম্নতর হয়ে যাওয়ায় মায়ের বুকে দুধও যেমন বেশী হয় না তেমনি স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় গুণও হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং মাতৃদুগ্ধ যাতে অনেক দিনের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা যায় সে সম্পর্কে মাস্টেনব্রুক এই গবেষণা করতে থাকেন যে, রক্ত কণিকা যেমন শুষ্ক করে রাখা যায়, মাতৃদুগ্ধ সেই রকম শুষ্ক করে রাখা যায় কিনা। সে সময়ে আমস্টারডামে আধুনিক যন্ত্রপাতি সহজলভ্য না থাকায় তিনি প্রাচীন পদ্ধতির শরণাপন্ন হন। ১৯৪৫ সালে তিনি প্রথম মাতৃদুগ্ধকে সমস্ত গুণ সহ শুষ্ক করতে সমর্থ হন।

শুষ্ক রক্তকণিকা সম্পর্কে মাস্টেনব্রুকের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি জানতেন যে এই পদ্ধতিতে জিনিষের গুণগুলি ঠিকই থাকে কিন্তু দুধের চর্বির অংশ ঠিক থাকবে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কারণ শুষ্ক করার পর হয়তো চর্বিমূলক এসিডগুলি পৃথক হয়ে যাবে এবং শিশুদের খাদ্য হিসেবে তা অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু তার উদ্ভাবিত শুষ্ককরণ পদ্ধতিতে তিনি সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন।

এই নতুন জিনিসটি নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য অধ্যাপক ভান ক্রেভেল্ড তাঁকে সাহায্য করেন। এ ছাড়া লিডেনের পরলোকগত অধ্যাপক ডাঃ ই গোরটারও তার গবেষণাগারটি এই পরীক্ষার জন্য ছেড়ে দেন।

১৯৪৭ সালে নেদারল্যাণ্ডস রেড ক্রসের পরিচালনাকারী কমিটি একটি মাতৃদুগ্ধ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ডাঃ মাস্টেনব্রুক এই কেন্দ্রের পরিচালক নিযুক্ত হন। যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনে অবশ্য ইতিপূর্বেই একটি মাতৃদুগ্ধ কেন্দ্র স্থাপিত হলেও সেখানে প্রথমে দুধকে বীজাণুমুক্ত করে তরল দুধই বিতরণ করা হত।

কিন্তু হল্যাণ্ডের নতুন শুষ্ককরণ পদ্ধতিতে গুঁড়ো দুধ তৈরী হয় এবং তা জলের সংগে বেশ মিশে যায়। জলের সংগে মেশালে তা আবার মাতৃদুগ্ধে পরিণত হয় এবং তার সবগুলি গুণই বিদ্যমান থাকে। এই গুঁড়ো মাতৃদুগ্ধ কয়েক বছর পর্যন্ত ভালো থাকে। কাজেই সংরক্ষণের অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এতে সুবিধে অনেক বেশী।
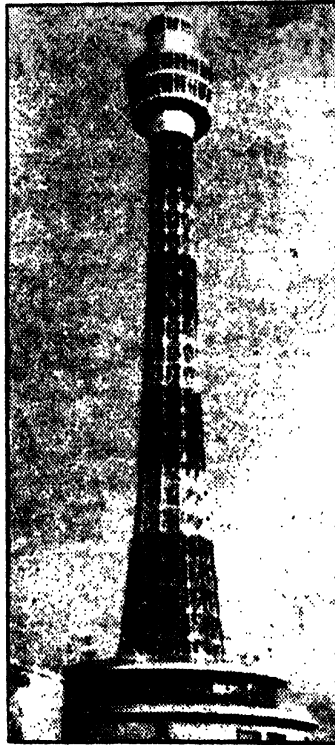
জাপানের ইয়াকোহামাতে নির্মিত পৃথিবীর উচ্চতম (৩৪৮ ফুট) আলোকস্তম্ভ। ৬ লক্ষ বাতির রশ্মির সমান শক্তিবিশিষ্ট আর দীপ্তি কুড়ি মাইল দূরে থেকে দেখা যায়। ইস্পাতের তৈরী এই আলোকস্তম্ভটিতে একটি রেস্তরাঁ ও মিউজিয়াম আছে

আমস্টারডামের মিউনিসিপ্যাল জন স্বাস্থ্য বিভাগ এবং চিকিৎসকগণের সাহায্যে মাতৃদুগ্ধ সংগ্রহ করা হয়। ডাঃ ডালমেয়ার চিকিৎসকগণের কাছে এই সম্পর্কে আবেদন জানান। চিকিৎসকগণ তাঁদের এলাকার মাতা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অবহিত বলে তাঁদেরই এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। যে মায়েরা তাঁদের অতিরিক্ত দুধ এই দুগ্ধকেন্দ্রে দান করতে পারেন, চিকিৎসকগণ তাঁদের উপযোগীতা পরীক্ষা করে দেখেন। তারপর আমস্টারডাম রেডক্রসের কর্মীগণ দুগ্ধ সংগ্রহ করেন। আসতে আসতে নেদারল্যাণ্ডের অন্যান্য শহরেও এই কর্মপন্থা অনুসৃত হচ্ছে।

শুষ্ক করণে দুটি পর্যায় আছে। প্রথমে ৪০০ সি সির বোতলে দুধ নিয়ে ৩০° উত্তাপে তা জমিয়ে ফেলা হয়। এই দুধ যতখানি সম্ভব জমিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়। এর পর ভ্যাকুয়াম পাম্প দিয়ে একটি কণ্ডেনসারের বায়ুর চাপ, পারদের ৫০ মাইক্রন পর্যন্ত কমিয়ে তাতে এই জমাট দুধের বোতলগুলি রাখা হয়। একটি রেফ্রিজারেটারের সাহায্যে বোতলের অভ্যন্তর ভাগের উত্তাপ ৫০° পর্যন্ত কমিয়ে নেওয়া হয়। এবারে বোতলের চারদিকে গরম জল চালিয়ে উত্তাপ আস্তে আস্তে ৫০° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত বাড়ানো হয়।

অত্যন্ত কম উত্তাপ এবং অত্যন্ত কম বায়ুচাপে জমাট দুধ আর তরল না হয়ে সোজাসুজি বাষ্পে পরিণত হয়। কাজেই একে একদিকে থেকে বরফের বাষ্পে রূপান্তর বলা যায়। বোতলগুলিতে শুধু শুষ্ক একটা চূর্ণ পড়ে থাকে। এই চূর্ণ থেকে শেষ জলবিন্দুটিও দূর করার জন্য ফসফোপেণ্টোক্সাইডের ওপর এগুলি আরও বারো ঘণ্টা শুকনো হয়। এই শুষ্ক দুগ্ধকে রোগ-ব্যাধি বীজাণু মুক্ত করার জন্য শুষ্ক করার আগে ৬৭° উত্তাপে আধ ঘণ্টা উত্তপ্ত করে বীজাণুমুক্ত করা হয়। ৮০° উত্তাপে আধ মিনিট রাখলে সেটা সম্ভব হয়।

সেলোফেনের ছোট ছোট প্যাকেটে এই শুষ্ক মাতৃদুগ্ধ বিলি করা হয়, এতে ১২·৫ গ্রাম শুষ্ক দুগ্ধ চূর্ণ থাকে। এতে আবার ১০০ সি সি জল মিশিয়ে ১০০ সি সি মাতৃদুগ্ধ পাওয়া যায়। বীজাণুমুক্ত করা হয় বলে এই দুধের ছানা জাতীয় উপাদান সামান্য নষ্ট হলেও তাতে খাদ্যদ্রব্য হিসেবে এর গুণ ব্যাহত হয় না।

একটা অসুবিধা হ'ল শুষ্ককরণে সমস্ত ভিটামিন সি চলে যায়। তবে খাওয়ার আগে দুধে কিছু পরিমাণ ভিটামিন সি মিশিয়ে নিলেই চলে।

প্রকৃতি নির্দিষ্ট অন্যান্য ভিটামিনগুলি এই শুষ্ক দুগ্ধে সবই থাকে।

আরণ্যক

ইতিপূর্বে 'শান্তিনিকেতনের বাঘ শিকারের' কাহিনীর পাঠকরা শ্রীবিজয় বাসুর নাম অবগত আছেন। বালক বাসু প্রৌঢ়ত্বে পেঁাছে বড় বাঘ, অর্থাৎ টাইগার, শিকারে কি করে তাঁর একটি হাত হারিয়েছেন তার রোমাঞ্চকর বিবরণ এবারে আপনাদের বলা যাক :

বাসু মহাশয়ের শিকারের নেশা শান্তি-নিকেতনের ব্যাঘ্রপর্বের পর থেকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং এরই তাগিদে তিনি পশ্চিম ভারত ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জঙ্গলে নিয়মিত শিকার করেছেন। ১৯৫০ সালের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনি এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু একত্রে বম্বে থেকে মধ্য-প্রদেশের চান্দা শহরে কোন বিয়ের নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে যান। নিমন্ত্রণ রাখা তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না, ওটা ছিল উপলক্ষ্য-মাত্র। আসলে চান্দা অঞ্চলের বিখ্যাত জঙ্গলে শিকারের সুযোগই ছিল বিশেষ আকর্ষণ। বিজয়বাবু এবং তাঁর চারজন বম্বের বন্ধু—ডাঃ আফজলপুরকার, ডাঃ আথলে, ডাঃ দ্রাবিড়, এবং মিঃ পণ্ডিত—চান্দা থেকে ৮৫ মাইল দূরে আলাপল্লীর জঙ্গলে রওনা হন। কিন্তু সেখানে তিনদিন কাটিয়েও কোন শিকার না পেয়ে তাঁরা চান্দায় ফিরে আসেন। তারপর আবার ১লা ডিসেম্বর বিকেল ৪টের সময় স্থানীয় কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে বাসুরা ৩৫ মাইল দূরে কানহারগাঁও জঙ্গলের দিকে বেরোন। কানহারগাঁওয়ে কয় বছর ধরে শিকার করা নিষিদ্ধ ছিল। মোটে অল্পদিন আগে এই জঙ্গল এলাকায় শিকারের অনুমতি দেওয়া শুরু হয়েছিল। কানহারগাঁওতে প্রচুর শিকার পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে বলে স্থানীয় বন্ধুবান্ধব মত প্রকাশ করেছিলেন। এবং যাওয়ার পথে বাসুরাও লক্ষ্য করে-ছিলেন বিভিন্ন জানোয়ার স্বচ্ছন্দ ভংগীতে এদিকে ওদিকে বিচরণ করছে। তাঁরা বিশেষ করে বিকালের দিকে এটা লক্ষ্য করেছিলেন।

শিকারী দল তিনখানা গাড়িতে বিকাল-বেলা কানহারগাঁও ফরেস্ট বাংলোয় গিয়ে পেঁাছলেন। ওই বাংলোটা জংগলের দুটো রাস্তার ঠিক মাথাতেই অবস্থিত। দলের কয়জন—আফজলপুরকার, আথলে ও পণ্ডিত মিঃ বুইটের গাড়িতে বামনপল্লী রোড নামে বাংলোর ডান দিকের রাস্তায় তখনই শিকার দেখবার আগ্রহে বেরিয়ে পড়লেন। এবং বাসু ও দ্রাবিড় আর একটি বন্ধুর গাড়িতে বাঁ দিকের রাস্তায় শিকারের খোঁজে বেরোলেন। বাকী সংগীরা বাংলোতে বিশ্রাম করতে লাগলেন। বাসুদের গাড়ি সন্ধ্যা ৭টার আগেই বাংলোয় ফিরে এল। তাঁরা ময়ূর আর হরিণের পাল ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাননি। তখনও মিঃ বুইটের গাড়ি ফেরেনি। আন্দাজ ৭-৩০টার সময় বাংলোর লোকরা কয়েকটা গুলী ছোঁড়ার আওয়াজ পান। আওয়াজগুলো বাংলোর পিছন দিকে ডান পাশ থেকে এল, এবং বোধ হল যেন কাছেই। বাসুরা জানতেন তাঁদের সংগীরা ছাড়া অন্য কেউ অন্ধকারে ওই সময়ে শিকারের খোঁজে জংগলে ঘোরবে না। আধঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে তাঁরা বাংলো থেকে অন্য দলটির উদ্দেশে বামন-পল্লী রোড ধরে গাড়িতে রওনা হলেন এঁরা যখন অপর দলের নাগাল পেলেন তখন বুইট তাঁর গাড়ি ঘোরাচ্ছেন। তাঁর বাসুদের বললেন যে ১৫ মাইলের চিহ্ন দেওয়া পাথরের কাছে বাঁশের ঝাড়ের ভিতর একটা বড় বাঘ মারা হয়েছে, এবং তাঁরা যাচ্ছেন সেটা গাড়িতে তুলতে। বাসুদের গাড়ি ঘুরে সেই ১৫ মাইলের চিহ্ন দেওয়া পাথরের কাছে এসে পেঁাছল, কিন্তু মরা বাঘের দেহ আশেপাশে কোথাও তাঁরা দেখতে পেলেন না। আরও শ'খানেক গজ এগিয়ে তাঁরা গাড়ি থামালেন, ইতিমধ্যে অন গাড়িখানা এসে উল্লিখিত পাথরের কাছে বাঁশবনের সামনে দাঁড়াল, তারপরে একটু বাঁ দিকে বেঁকলো বোধ হয় জঙ্গলে ঢোকবার জন্য। ঠিক সেই মুহূর্তে বাসুরা একটা প্রচণ্ড গর্জন শুনলেন ও সংগে সংগে দুটো গুলীর শব্দ। তারপরে বুইটের গাড়ি এসে একসংগে সকলে বাংলোয় ফিরলেন।

ফেরার পর ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বাসুরা শুনলেন। আফজলপুরকারের ৩০·০৬ ম্যাগাজিন রাইফেলের সংগে একটা টর্চবাতি লাগান ছিল। তার আলোতে আফজলপুরকার বাঘের একজোড়া জ্বল-জ্বলে চোখ নজর করেন। বাঘটা শিকারীর দিকে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে ছিল। আফজল-পুরকার দুই চোখের ঠিক মাঝখানে লক্ষ্য করে গুলী করেন। গুলী খেয়েই বাঘ চিৎ হয়ে পড়ে যায়, এবং পাগুলো শূ ছুঁড়তে থাকে। তখন আথলে ও আফজ

শিকারী শ্রীবিজয় বসু বাঘ শিকারে তিনি একটি হাত হারিয়েছেন।

পুরকার বাঘটাকে আরও কয়েকটি গুলী করে। বাঘটার দেহ একেবারে নিথর স্থির হয়ে যায়। শিকারীরা গাড়ির কাছে ফিরে এসে গাড়িটা ঘুরিয়ে হেড লাইটের আলো বাঘের উপর ফেলে ভাল করে লক্ষ্য করেন জীবনের কোন লক্ষণ দেখা যায় কিনা।

কিন্তু মিনিট পনের ধরে বাঘটা একেবারে নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে দেখে ও'রা নিশ্চিত হন যে বাঘ মরেছে। গাড়িটা ঘোরাবার মত যথেষ্ট জায়গা না থাকায় ও'রা খানিকটা এগিয়ে সুবিধা মত জায়গায় গাড়ি ঘুরিয়ে যখন বাঁশঝাড়টার কাছে ফিরে এলেন তখন দেখেন যে বাঘটার কোন চিহ্নই নাই। মরা বাঘের দেহটা যেন যাদুতে উবে গেছে। আশেপাশের জংগল গাড়ির আলোতে ভাল করে দেখবার জন্য ও'রা যেই গাড়ির মুখটা সেই দিকে একটু ঘুরিয়েছেন অমনি অন্ধকারের ভিতর থেকে বাঘটা গাড়ির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পিছনের পায়ের উপর ভর করে উঠে গাড়ির হুডের দিকে থাবা চালায়। ঠিক ওই সময়েই বাসুরা তাঁদের গাড়ি থেকে বাঘের গর্জন শুনতে পান। আফজল খুব তৎপরতার সংগে বাঘটার দিকে দুবার গুলী করেন ও সে নিমেষের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।
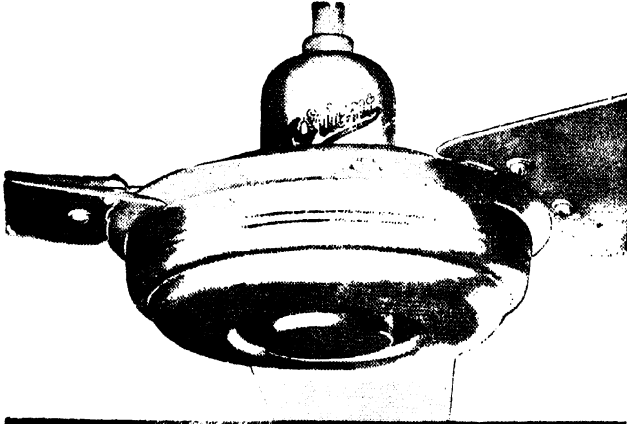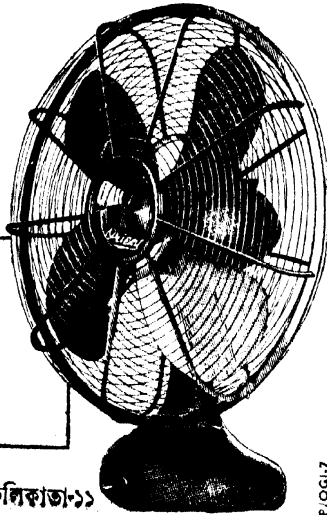
এর পর শিকারীরা খুব গুরুতর সমস্যার মধ্যে পড়লেন। বাঘের কি রকম চোট লেগেছে, আঘাতটা মারাত্মক কিনা এবং তার ফলে রাত্রে বাঘটা মরে থাকবে কিনা এই সব প্রশ্ন নিয়ে তাঁরা চিন্তাকুল হলেন। এই বিষয়ে ঠিক কিছু জানবার উপায় ছিল না। অথচ এই সমস্যার উপযুক্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আহত বাঘের কারণে স্থানীয় লোকেরা একটা বিষম বিপদের মধ্যে বাস করবে, এ কথা ভুলবেনা। তা ছাড়া শিকারের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে আহত জানোয়ারকে যথাসম্ভব শীঘ্র তার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার দায়িত্ব তাঁদের অবশ্য ছিল।

সে রাত্রে আর করবার কিছু ছিল না। সকলে স্থির করলেন চান্দায় ফিরে যাবেন, পরদিন খুব ভোরে এসে বাঘের সম্বন্ধে খোঁজখবর করা হবে।

বাংলোর চৌকিদার ও কাছের লোকজনদের বিশেষ করে মানা করে দেওয়া হল যেন শিকারীরা আসার আগে কেউ জংগলের দিকে না যায়। আরও বলা হল ওই অঞ্চলের সব লোকে এই খবর যেন জানান এবং ও সকালে যতগুলি সম্ভব মোষ জড়ো করে তারা বাংলোতে নিয়ে আসে। মোষের ঘ্রাণশক্তি ও শ্রবণশক্তি বেশ তীক্ষ্ণ। বাঘ বা চিতার লেশমাত্র সন্ধান পেলে এরা ঠিক জায়গাটার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে যায়, অর্থাৎ সম্মুখসমরের জন্য প্রস্তুত। এবং একটু উস্কোলেই আক্রমণ করে লুকোন বাঘকে তাড়িয়ে বার করে। উত্তেজিত হলে মোষ কাউকে ভয় করে না, কিছুই মানে না। অনেক দুর্দান্ত বড় বাঘ ক্ষিপ্ত মোষের পালের সামনে পড়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ছিন্নভিন্ন মাংসের তালে পরিণত হয়েছে। এই জন্য ক্ষেত্রবিশেষে মোষ দিয়ে বাঘ তাড়ানো আমাদের দেশে শিকারের একটা কৌশল বটে।

পরদিন সূর্য উঠবার অনেক আগেই আফজলপুরকার, আথলে, বুইট, দ্রাবিড় এবং বাসু চান্দা থেকে রওনা হয়ে ৭টার সময় কানহারগাঁও বাংলোয় গিয়ে হাজির

হলেন। সেখানে কিছু লোক আগেই এসে পেণছেছিল; তাদের মধ্যে কেউ কেউ অভিজ্ঞ 'ট্র্যাকার' বা খ‍্‌‌ুজি বলে শিকারীরা শুনলেন। লোকরা বলল অল্পক্ষণের মধ্যে মোষের পাল এসে পড়বে। ইতিমধ্যে শিকারীরা গাড়ি করে সেই বাঁশঝাড়ের কাছে গেলেন, এবং গাড়িতে বসেই চারিদিক ভাল করে দেখলেন, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু তাঁরা বুঝতে পারলেন না। তাঁরা ঝোপ লক্ষ্য করে কয়েকটা এল জি টোটা ছ‍ুড়ে বাংলোয় ফিরে গেলেন। ততক্ষণে প্রায় চল্লিশজন লোক সেখানে এসে জুটেছে। আধঘণ্টারও বেশী অপেক্ষা করার পর যখন মোষ আর আসে না, শিকারীরা ঘটনার জায়গায় আবার রওনা হলেন। বলে গেলেন মোষগুলো এলে ওই জায়গায় পাঠিয়ে দিতে।

মোটবে ওই ১৫ মাইলের চিহ্ন দেওয়া জায়গাটা বাংলো থেকে যেতে যদিও দুই মাইল পড়ে, জংগলের ভিতরকার পায়ে চলা পথে ওর দূরত্ব আধ মাইলেরও কম। জন ত্রিশ লোক এই সোজা পথে শিকারীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বলে রওনা হল। ও'রা মনে করেছিলেন এক সংগে অনেক লোক দেখলে বাঘটা সহসা আক্রমণ করবে না সম্ভবত। সময় বাঁচাবার জন্য মোষ আসার আগে বাঘটা কোথায় আছে মোটামুটি তার একটা খবর নেওয়া হবে স্থির করা হল। শিকারীরা পাঁচজন বন্দুক, রাইফেল ইত্যাদি নিলেন, এবং গ্রামের একটি লোকের হাতে একটা বন্দুক দিলেন। ঠিক করা হল যে বন্দুকধারীরা এক সংগে দু'জন দু'জন করে থাকবেন। তাতে একজন অপরের নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারবেন; আরও 'খ‍ুঁজি'দের নিরাপদ করা যাবে।

এর পরের ঘটনা বাসুর ভাষায় শুনুন। "বাঁশঝাড়ের চারিদিকে আমরা প্রথমে তন্ন তন্ন করে খ‍ুঁজে দেখতে লাগলাম। ওই বিশেষ ঝাড়টির গোড়া দিয়ে একটা সরু সুঁড়িপথ ভিতর দিকে চলে গেছে। মাটিতে উপুড় হয়ে ওর ভিতর যতটা নজর চলে দেখলাম, কিন্তু কোন চিহ্ন পেলাম না। প্রথম দিকে আমরা পায়ের দাগ বা রক্তের দাগ দেখিনি। কিন্তু পরে যখন অনেকটা জায়গা ছাড়িয়ে খোঁজা হচ্ছে, একজন 'খ‍ুঁজি' একটা পাতার উপর একফোঁটা তাজা রক্ত দেখল। একটু এগিয়েই আরও তাজা রক্ত এবং রক্তাক্ত পায়ের ছাপ পাওয়া গেল। এই চিহ্নগুলো ক্রমে একটা বড় বাঁশঝাড়ের নীচে একটু ফাঁকা জায়গার মুখে গিয়ে পড়েছে দেখলাম। প্রথমটার থেকে এই ঝাড়টার দূরত্ব প্রায় ২০ গজ হবে। এই সুড়ংগটাও আমি পরীক্ষা করলাম, কিন্তু এত ঘন অন্ধকার ওখানে যে কিছুই বুঝতে পারলাম না। এর বাইরের চারিদিক ভাল করে পরীক্ষা করা হল, বাঘটার ওখান থেকে বেরিয়ে যাবার কোন নিদর্শন আমরা পেলাম না। তখন রাস্তার ধারে ফিরে গিয়ে সকলে মিলে মোষের জন্য অপেক্ষা করা সাব্যস্ত হল।

জংগল খ‍ুঁজবার সময় আমি অন্যদের চেয়ে একটু আগে ছিলাম, কাজেই ফিরবার সময় সকলের খানিকটা পিছনে একলা পড়লাম। দু'এক পা যেতে না যেতেই পিছন থেকে দুইবার অতি তীক্ষ্ম খাঁকানো গর্জন শুনলাম। এই বিশেষ হুংকারটি হচ্ছে আক্রমণ করবার মুহূর্তে বাঘের স্বাভাবিক ভাষা। সংগে সংগে ঘুরেই দেখলাম একটা বিশাল, অস্পষ্ট, হলদে মত জিনিস সেই বাঁশতলার অন্ধকার থেকে উল্কার মত আমার দিকে বিদ্যুৎবেগে যেন শূন্যে ভর করে চলে আসছে। এক মুহূর্তেরও কম সময়ের মধ্যে আমি চট করে বাঁ দিকে এক ধাপ সরে আমার বন্দুকের (শট্‌ গান) একটা নল একেবারে বাঘের গায়ে ঠেকিয়ে গুলী করবার সুযোগমাত্র পেলাম। তার পরের মুহূর্তে (তখন তাই বোধ হয়েছিল) বাঘের সংগে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম; আমার বাঁ হাতের কনুইয়ের নীচ থেকে বাঘের মুখের মধ্যে হাতটা কামড় দিয়ে ধরা। গুলী করা এবং হাত কামড়ে বাঘটা আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মাঝের ঘটনার কোন কিছুই আমার মনে পড়ে না। অথচ অন্য অতি সামান্য খ‍ুঁটিনাটি যেন স্পষ্ট দেখতে পাই।

আমি লক্ষ্য করলাম আমার বন্দুকটা মাটিতে পড়ে আছে, জংগলের গাছপালার ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো আসছে, চারিদিকে রোদ আর ছায়া মিলে বিচিত্র নকশা তৈরি হয়েছে, আর খুব বেশী করে অনুভব করলাম যেন একটা কঠিন, জমাট নিস্তব্ধতা আমাকে ঘিরে আছে। আমার পায়ে ছিল

হাঁটু সমান উঁচু বুট জুতো, তার ফিতে পুরোপুরি বাঁধা ছিল না। ডান পায়ের ফিতেটা খুলে গিয়েছিল, এতে বাঘের পাল্লায় পড়ে হাঁটবার সময় ফিতেয় বেধে হোঁচট খাচ্ছিলাম। এই গাফিলতির জন্য সে সময় মনে মনে নিজেকে দোষী করেছিলাম।

বাঘটা আমাকে নিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে বসল, আমাকেও বসতে হল। তারপরে সে যখন মাটিতে উবু হয়ে শুলো, আমাকেও মাটিতে লম্বা হয়ে লুটিয়ে পড়তে হল। বাঘের দুই থাবা সামনের দিকে ছড়ানো, আমার বাঁ হাত তার মুখে শক্ত করে ধরা। মাঝে মাঝে সে আমার দিকে গর্ গর্ করে তাকায়। হঠাৎ খুব জোরে দাতের চাপ দিয়ে হাতটা সে চিবোতে লাগল। হাড়গুলো যখন মট মট করে ভাঙ্গছিল মনে হচ্ছিল বুঝি রাইফেলের আওয়াজ হচ্ছে। সেই সময় শুনতে পেলাম "সাহেব কো পাকড়া" বলে কেউ চিৎকার করছে। বাঘের গর্জন শোনামাত্র নিরস্ত্র লোকজন গাছে উঠেছিল। তাদেরই কেউ

আমার চরম অবস্থা দেখতে পেয়ে চিৎকার করছিল।

ওই চিৎকার হওয়ার পরই দেখলাম আথলে ছুটে এসে ৫ গজ দূর থেকে বাঘের বাঁ পাশটায় গুলী চালাতে শুরু করল। তারপরে আফজলপুরেকার, বুইট ও দ্রাবিড় এসে পড়ল। দ্রাবিড়ের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না, অন্য দু'জনের হাতে রাইফেল ছিল। ওরা তখন উভয় সংকটে পড়েছে, কারণ বাঘকে গুলী করলে সেই গুলীতে আমারও মরবার যথেষ্ট আশংকা ছিল। আমি চেঁচিয়ে বললাম, "আমাকে মেরে ফেল না যেন।' আমার দেহের উপর দিক অনড় অবস্থায় ছিল, কিন্তু পা ছুঁড়ছিলাম তখন। বেশ টের পেলাম একটা ছিটে গুলী আমার ডান পা ফুটো করে গেল। তখন কোন বাথা বুঝতে পারিনি, যদিও আঘাতটা বুঝেছিলাম।

বাঘের নজর তখন আমাকে ছেড়ে অন্যদিকে পড়েছে, সে কটমট করে আমার বন্ধুদের দিকে তাকাতে লাগল। আমার হাতখানা অবশ্য তার মুখের মধ্যেই আছে। বাঘটা মাথা ঘোরানোর সংগে সংগে আমার বাঁ গালে তার ডান চোয়ালের ঘষা লাগছে। আমি দেখছি আথলের গুলী তার শরীরের যেখানে যেখানে লাগছে সে জায়গাগুলো ফেটে যাচ্ছে। এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে (আমার কাছে বোধ হচ্ছিল কয়েক ঘণ্টা) দেখলাম দ্রাবিড় বুইটের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিল, এবং বাঘের ঘাড়ের বাঁ দিকে খুব ভাল করে তাক করে গুলী করল। গুলীর আঘাতের ধাক্কাটা আমি বেশ অনুভব করলাম। তখনই আমার হাতটা ছেড়ে বাঘটা পাশে লুটিয়ে পড়ল। ·৩৭৫ ম্যান্‌লিকার রাইফেলের ২৭০ গ্রেন গুলী কাছ থেকে বাঘের ঘাড় ভেঙ্গে দেওয়ামাত্র সে প্রাণ হারাল। বাঘটা সত্যিই এবারে মরেছে কি না তা দেখার অপেক্ষা না করেই আমার বন্ধুরা এক লাফে আমার কাছে এল। আমাকে সাবধানে উঠিয়ে হাতের ভর রাখার মত একটা বাঁধন আমার গলায় ঝুলিয়ে ওরা ২০ গজ দূরে গাড়ির কাছে নিয়ে গেল।

আমার বোধশক্তি তখন দিব্যি স্বাভাবিক আছে। মনে আছে আফজলপুরেকার বলেছিল "বাস্, আরও রক্ত বার হয়ে তোমার জখমটার বিষ ধুয়ে গেলে" ভাল ছিল।' তখনও আমি কোন বেদনা বা যন্ত্রণা বোধ করছিলাম না। শুধু মনে হচ্ছিল বাঁ হাতে যেন এক টন ওজনের কোন বোঝা ঝুলছে। আমাদের গাড়ি যখন চান্দার দিকে ফেরানো হচ্ছে তখন মোষের পাল এসে হাজির হল।

রাস্তা মোটেই ভাল নয়, খারাপ রাস্তায় যত জোরে যাওয়া সম্ভব বুইট গাড়ি ছোটালো। গাড়িটায় যখন ঝাঁকি লাগছিল সেই সময় প্রথম তীব্র ব্যথার চিড়িক বুঝতে পারলাম।

চান্দায় হাসপাতালে পৌঁছে অ্যান্টি-বায়োটিক ও মর্ফিয়াজাতীয় ওষুধপত্র আমাকে দেওয়া হয়। আথলে কতগুলি এক্স-রে প্লেট নিল; এতে জখমের পরিমাণ ও প্রকৃত অবস্থা বোঝা গেল। বাঁ হাতের দুটো হাড়ই ভেঙ্গে কুচি কুচি হয়ে গেছে, এবং আধহাত মত জায়গার মাংস পিষে একটা তালগোল পাকানো পিণ্ড হয়েছে। ডান কাঁধে দাঁতের পাঁচটা দাগ পাওয়া গেল, দুটো কাঁধের সামনে আর তিনটে পিছনে। ডান দিকের ফুসফুসটা অল্পের জন্য বেঁচে গেছে, ফুটো হয়নি। ডান হাতের উপর-দিকের হাড়ের মাথায় ফাটার চিড় ছিল, একটা ছোট হাড়ের টুকরো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল, কিন্তু স্থানচ্যুত হয়নি। বন্ধুরা বললেন, সে ওটা পরে ক্রমে ক্রমে বড় হাড়ের সংগে জোড়া লেগে যাবে। আর আগেই বলেছি যে একটা ছিটে গুলী পায়ের পেশী ফুটো করে হাঁটুর পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

যাই হোক, বুঝলাম কমের উপর দিয়ে বিপদটা কেটে গেছে। ডাক্তার বন্ধুরা বললেন চান্দায় শুধু জখম সাফ করা ও বাঁধাছাঁদা হবে, বাকী চিকিৎসা বম্বেতে করা হবে। চান্দা বম্বের মেন রেললাইনে পড়ে না; ৩রা ডিসেম্বর আমাকে অ্যাম্বুলেন্স করে ১২০ মাইল দূরে নাগপুরে নেওয়া হল, সেখান থেকে আমরা বম্বের ট্রেনে উঠলাম। চান্দা থেকে বম্বে পর্যন্ত বন্ধুরা আমাকে নিয়মিতভাবে ইনজেকশন দেয়, আর দরকার মত ঘুমের ওষুধও। পরদিন দুপুরে বম্বেতে নেমে বন্ধুরা আমাকে একটা নার্সিং হোমে নিয়ে যায়। সেখানে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে ডাক্তারদের তৎপরতা সত্ত্বেও জখমটায় গ্যাস গ্যাংগ্রিন ছড়িয়ে গেছে। চিকিৎসকদের মত অনুসারে এই কারণে বাঁ হাতটা কনুইয়ের উপর কেটে ফেলতে হল। ডান হাতের উপর দিকে হাড়ের যে টুকরোটা আলগা হয়ে গিয়েছিল সেটা পরে আর বড় হাড়ের

সংগে জোড়া লাগেনি; কাজেই ওটাকে বার করে ফেলতে হয়েছিল। এর ফলে ডান হাতটা স্বাভাবিকভাবে নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা বোধ করি। তবে ডাক্তারদের নির্দেশ মত পেশীর ব্যায়াম, মালিশ ইত্যাদি করার পর অসুবিধা অনেকটা কমেছে। ডান পায়ের গুলীর জখমটা খুব তাড়াতাড়ি সেরে গিয়েছিল।

আমি যখন বাঘের কবলে লম্বা হয়ে মাটিতে পড়ে ছিলাম তখন আমার জ্ঞানবুদ্ধি পুরো টনটনে ছিল। বাঘটার মুখ থেকে কোন দুর্গন্ধ পাচ্ছি না তা লক্ষ্য করে-ছিলাম। নিজেকে একান্ত অসহায় বোধ হচ্ছিল। ভাবছিলাম যদি নড়াচড়া করি তা হলে বাঘটা হাত ছেড়ে ঘাড়ে কামড় দেবে, আর তার মানে নিশ্চিত মৃত্যু। মরতে মোটেই রাজী ছিলাম না। যথাসাধ্য নিশ্চল হয়ে পড়ে ছিলাম। যখন বন্ধুরা এল তখন যেন বাঁচার আশা হল। কেবল ভয় হয়েছিল গুলী লেগে না মারা পড়ি।

বন্ধুরা পরে বলেছিল বাঘের খ্যাঁকানি শুনে তারা প্রাণপণে গাড়ির কাছে দৌড়ে পালাতে বাধ্য হয়। গাড়ির গায়ে যখন রাইফেলগুলো ঠেকিয়ে রাখছে তখন তারা লক্ষ্য করে যে আমি ফিরে আসিনি। তার-পরই গাছের উপর থেকে চিৎকার শোনে "সাহেব কো পাকড়া"। অমনি হাতের কাছে যে যা পায় তাই নিয়ে ওরা আমার কাছে ছুটে আসে।

আফজল পরে বলে যে যখন সে আমাকে বাঘের কবলে অসহায় অবস্থায় দেখল তখন জানোয়ারটার উপর একটা বিজাতীয় আক্রোশ আর ঘৃণায় সে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। এবং শটগান দিয়ে উন্মত্তের মত গুলী চালাতে আরম্ভ করে তখন। বাঘটা আমাকে ছেড়ে লুটিয়ে পড়বার পরেও সে গুলী চালাচ্ছিল।

ওই নিদারুণ শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আফজল কিন্তু অসামান্য বীরত্ব ও সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল। সে বুইটের হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে একমাত্র যেখানে গুলী করা আমার পক্ষে নিরাপদ অথচ বাঘের পক্ষে মারাত্মক হবে, ঠিক সেই জায়গা হিসাব করে গুলী করে। কিন্তু বারো বছর আগে কলেজ ছাড়ার পর সে আর কখন রাইফেল ছোঁড়েনি। আফজলপুরকার এবং বুইট সংকটের সামনাসামনি হয়ে হতভম্ব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়।

কলকাতায় আসার পর বাঘের চামড়াটা আমাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাঘটা পূর্ণবয়স্ক মদ্দা ছিল, গায়ের লোমগুলো বেশ সুন্দর অবস্থায় ছিল। চামড়াটা মাপে সাড়ে নয় ফিট ছিল।

চামড়ার গুলীর ছিদ্রগুলি থেকে আমি বুঝবার চেষ্টা করেছি বাঘটা কিভাবে জখম হয়, এবং তারপরে তার চালচলনই বা ওই-রকম হল কি করে?

সন্ধ্যাবেলায় আফজলপুরকারের প্রথম গুলী—২০০ গ্রেন বুলেট—ডান দিকের কানের নীচে মাথায় লেগে ঠিকরে চলে গিয়েছিল, কোন জায়গা ভেদ করেনি। এই ধাক্কায় বাঘটা চিত হয়ে পড়ে গিয়েছিল। বাঘের মাথার খুলির আকার গোল ধাঁচের, সে কারণে সামনাসামনি মাথায় গুলী করা সমীচীন নয়; বিশেষত যে রাইফেলের গুলীর বেগ খুব বেশী। এতে গুলী ঠিকরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বাঘটা মাটিতে পড়ে যখন ছটফট করছিল তখন আথলে ও আফজলপুরকার যেসব গুলী করে তার কোন একটায় বাঘের সামনের বাঁ পা ভেঙে যায়, ফলে থাবা মারবার ক্ষমতা নষ্ট হয়। পরদিন খুব কাছ থেকে তার ডান কাঁধে আমি যে এল. জি. গুলীটা করি তাতে তার শরীরের ভিতরে খুবই জখম হয়ে রক্তপাত হতে থাকে; উপরন্তু ডান থাবা ব্যবহার করবার ক্ষমতাও লোপ পায়।

আথলে সকালে শট গান দিয়ে যে গুলী-গুলো করে তাতে বাঁ পাশে দুটো বড় ফুটো ও কতগুলো ছোট ফুটো হয়। এর ফলে ভিতরের জখম ও প্রচুর রক্তপাত অবশ্যই হয়ে থাকবে। দ্রাবিড়ের গুলী তার ঘাড়ের অল্প বাঁ দিকে লাগে।

জখম হওয়ার পর বাঘটা আত্মরক্ষার জন্য খুব সতর্ক হয়েছিল; আর তার স্বাভাবিক ধূর্ততাও মনে হয় খুব প্রখর হয়ে উঠেছিল। রাত্রে গাড়ির উপর হামলা করার পর সে ভোর অবধি প্রথম বাঁশঝাড়ের নীচে আশ্রয় নিয়েছিল। এবং আমরা যখন সকালে ওইখানটায় আন্দাজে গুলী করি, তখন সে আমাদের উপর তীক্ষ্ণ নজর দেওয়া সত্ত্বেও তিলমাত্র সাড়া শব্দ করেনি। আর ওই আশ্রয়স্থল যে তার পক্ষে নিরাপদ নয় সেটা বেশ বুঝে আমরা চলে আসার পর সে দ্বিতীয় বাঁশঝাড়ের নীচে সরে আসে। ভেবেছিল ওর ভিতরে হয়ত তার সন্ধান করা হবে না। সে যে অল্প আগে সরে এসেছে তা বোঝা যায় টাটকা রক্তের চিহ্ন দেখে। চলার সময় তার রাত্রের ক্ষত থেকে আবার তাজা রক্ত বেরোতে শুরু হয়।

আমরা যখন দ্বিতীয় বাঁশঝাড়ের কাছে তার সন্ধান করছিলাম তখন সে যে আমাদের নজরবন্দী করে রেখেছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চয়ই সে প্রতিহিংসার জন্য অস্থির হচ্ছিল, কিন্তু উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় চুপ করে ওত পেতে ছিল। তার সামনে যে অনেকগুলি শত্রু, সেটা সে সময় তার যথেষ্ট খেয়াল ছিল। কিন্তু তার সুযোগ এল যে মুহূর্তে সে দেখল আমি একা পড়েছি। পলকের মধ্যে হাঁক দিয়ে এক লাফে এসে আমার ডান কাঁধ কামড়ে ধরল। ওর ধাক্কায় আমার হাত থেকে বন্দুক ছিটকে পড়ে। নিজেকে বাঁচাবার জন্য আমি নিশ্চয়ই বাঁ হাত দিয়ে তাকে ঠেলা দিয়েছিলাম, তখন আমার বাঁ হাতটা কামড়ে ধরে বাঘটা আমাকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। আমি তার পাশাপাশি সোজা হয়ে স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে থাকায় সে অবশ্যই বিমূঢ় হয়েছিল। কারণ তার অভিজ্ঞতায় কোন জীবই তার কবলে পড়ে ওরকম অদ্ভুত আচরণ করেনি।

কিন্তু আমাকে ধরার পর তার আক্রোশ অনেকটা কমে গিয়েছিল। যদি সে সামান্য জোর করত অনায়াসে সে আমাকে মাটিতে পেড়ে ফেলতে পারত, এবং কামড়ে শুধু জখম নয় নিমেষের মধ্যে আমাকে মেরে ফেলতে পারত। খুব সম্ভব তার শরীরের ভিতরকার আঘাতে প্রচুর রক্তক্ষরণে তার প্রাণশক্তি নির্জীব হয়ে আসছিল। এই জন্য সে আমার বন্ধুদের দেখেও তাদের আক্রমণ করবার কোন চেষ্টা করেনি। আমার হাত চিবোতে চিবোতে যখন আমার দিকে বাঘটা কটমট করে তাকাচ্ছিল, তখন হয়ত তার মনে প্রশ্ন ছিল যে, "কেন তোমরা আমাকে অযথা নির্যাতন করছ?"

এই ঘটনার বিবরণ শুনে কোন বন্ধু মন্তব্য করেছিলেন, "আহা, বেচারা বাঘ।" তিনি বোধ হয় ঠিকই বলেছেন।

আফজলপুরকার বছর কয়েক হল অনেক-দিন রোগে ভুগে মারা গেছে। আথলে এখন বম্বের একজন সেরা রেডিওলজিস্ট, দ্রাবিড়ও সেখানকার খ্যাতনামা ডাক্তার। বুইট উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার।

আমি কৃত্রিম বাঁ হাত তৈরী করিয়েছি, বন্দুক ছুঁড়তে পারি, এবং এখনও শিকার করি। অনেক বছর আগের সেই ডিসেম্বর মাসের ঘটনাটা খুব বেদনাদায়কভাবে মাঝে মাঝে মনে পড়ে—যে হাতটার অস্তিত্বই নেই সেইখানের ব্যথায় যখন অস্থির হই। কিন্তু যন্ত্রণাটা মোটেই ভুতুড়ে নয়। রীতিমত কষ্ট পাই, ওষুধও নিতে হয়। এটা নাকি কারও কারও হয়, এবং একে বলা হয় ফ্যান্টম পেন' বা কাল্পনিক যন্ত্রণা।

Brown & Polson
BLANCMANGE

(২৭)

পরের সপ্তাহেও প্রমীলা লণ্ডনে আসতে পারল না। শুধু তাই নয়, খবর এল শরীর আরও খারাপ হওয়ায় তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এ সংবাদে সরোজরা চিন্তিত হয়ে পড়ল, স্থির হল লীলা আর অমিতাভ কার্ডিফে গিয়ে প্রমীলার সঙ্গে দেখা করে আসবে, খোঁজ খবর নেবে ডাক্তারদের কাছে। অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকায় সরোজ ওদের সঙ্গে যেতে পারল না।

কিন্তু সরোজ কার্ডিফে গেলেই বোধ হয় ভাল করত। লীলাদের পাঠিয়ে মনে সে এতটুকু শান্তি পায়নি, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে কখন তারা ফিরে আসবে, কি খবর দেবে তাই জানবার জন্যে। প্রমীলার জন্যে তার মন যে এতখানি চঞ্চল হয়ে উঠবে তা সরোজ রায়ের নিজেরই জানা ছিল না। এই প্রথম সে বুঝতে পারল প্রমীলার সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ এতদিন ধরে গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে আর কারুর তুলনা করা ভুল। সরোজের জীবনে প্রমীলার স্থান স্বতন্ত্র, সে একক, বোধ হয় অদ্বিতীয়া।

লীলারা কিন্তু ফিরে এল নিশ্চিন্ত মনে চিন্তিত সরোজের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, না, সত্যিই ভাবনার কিছু নেই সরোজদা। পেটে সামান্য যন্ত্রণা আছে।

—তবে আর হাসপাতালে গেল কেন?

—ডাক্তাররা বলছেন গ্যাস্ট্রিক পেন আগেও এখানে থাকতে কত সময় পেট ব্যথা করছে বলে শুয়ে থাকত মনে নেই? সেই ব্যথাটা কার্ডিফে গিয়ে বেড়েছে আর কি। প্রমীকে তো আমি জানি, শরীর সম্বন্ধে কোনদিন যত্ন নেয় না, জোর করে আমি খাওয়াতাম তাই খেত। হোস্টেলে একলা ছিল, সময় মত খাওয়া-দাওয়া করেনি।

সরোজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, যাক, শীগগিরই সেরে উঠবে তা হলে।

—হ্যাঁ, খুব বেশী হলে আর এক সপ্তাহ।

—তা হলে আর কলকাতায় এ নিয়ে চিঠি লেখার দরকার নেই, কি বল?

লীলা শঙ্কিত কণ্ঠে বলে, পাগল হয়েছেন, অসুখের কথা শুনলেই মা টেলিগ্রাম ছেড়ে ঘন ঘন টেলিফোন করতে শুরু করবেন।

অমিতাভ মনে করিয়ে দিল, সরোজদা, আপনাকে একবার দেখা করতে যাবার জন্যে বলেছে প্রমীলাদি।

লীলাও জোর দিয়ে বলে, হ্যাঁ, আপনাকে যেতেই হবে। সামনের সপ্তাহে।

সরোজ ইচ্ছে করে আগ্রহ প্রকাশ করে না, ভাল যখন আছে আমি আর গিয়ে কি করব।

—না, না, ও বিশেষ করে যেতে বলেছে।

—দেখি, আবার অফিসের কাজ আছে তো।

—বুধ আর শনি, দু'দিন দেখা করতে দেয়। আপনি সামনের বুধবারেই ঘুরে আসুন।

যদিও সরোজ মুখে কিছু বলল না, মনে মনে স্থির করে নিল খুব একটা ঝামেলায় না পড়লে সামনের বুধবার সে যাবে প্রমীলার কাছে। অফিস থেকে একদিনের ছুটি নিলেই হবে, সকালের গাড়িতে গিয়ে বিকেলে হাসপাতালে দেখা করে সন্ধ্যের ট্রেনে লণ্ডনে ফিরে আসবে।

সরোজ ভেবেছিল প্রমীলার জন্যে কিছু ফুল কিনে নিয়ে যাবে। কিন্তু হাসপাতালের কাছাকাছি চেষ্টা করে খুঁজেও কোন ফুলের দোকান না পাওয়ায় শুধু হাতেই তাকে দেখা করতে যেতে হল। রুগীদের সঙ্গে দেখা করার সময় বাঁধা আছে তাই ভিজিটারস্ কার্ড দেখাতেই ভেতরে নিয়ে গেল। দোতলা বিরাট হাসপাতাল, গেট্ দিয়ে ঢুকে ডান দিকের বড় হলে প্রমীলার বেড্। বিরাট লম্বা ঘর, পালিশ করা কাঠের মেঝে, সাদা রঙের জানালা, পর পর লোহার খাট সাজান রয়েছে।

নার্স সরোজকে নিয়ে গিয়ে প্রমীলার

খাটের কাছে চেয়ার দিয়ে বসিয়ে দিল। দুখানা পর্দার পার্টিশান টেনে এনে ওদের আড়াল করে দিল যাতে কথা বলার সুবিধে হয়।

সরোজ হাসি মুখে প্রমীলাকে দেখছিল। মুখখানা তার শুকনো, কিন্তু টানা টানা বড় চোখ দুটো খুশীতে উজ্জ্বল। তেল না পড়ায় মাথার চুলগুলো শুকনো। আলগা করে দুটো বিনুনি বেঁধেছে। কালো চুল, লালচে দেখাচ্ছে। পরনে তার সাদা রঙের হাসপাতালের জামা, ইওরোপীয়ান ড্রেসে বেশ দেখতে লাগছে প্রমীলাকে।

প্রমীলা সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল, আপনি এসেছেন—আমি খুব খুশী হয়েছি, সরোজদা। ক'দিন থেকে আপনারই কথা মনে পড়ছিল।

সরোজ স্মিত হেসে বলে, তা না হয় পড়ল, কিন্তু শরীরটা খারাপ করলে কি করে? শুনলাম সময় মত খাওয়া-দাওয়া করছিলে না।

—বাঃ, শরীর খারাপ বুঝি কারুর করতে নেই।

সরোজ প্রমীলাকে উৎসাহ দেবার জন্যে বলল, তোমাকে কিন্তু অনেক ফ্রেশ

দেখাচ্ছে। হাসপাতালে-এসে শরীরটা বিশ্রাম পেয়েছে, খুব খাটছিলে বোধ হয়, না?

প্রমীলা উত্তর দিতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কি জানি। কেন যে শরীরটা বিগড়ে বসল। একটু থেমে বলে, যাক গে ওসব কথা, নিজের কথা ভাবতে আর ভালো লাগে না। বলুন লণ্ডনে কিরকম আপনার দিন কাটছে?

—খুব মন দিয়ে কাজ করছি।

—সে জানি। কিন্তু সোশ্যাল লাইফ?

—নেই বললেই হয়।

প্রমীলা ক্ষুণ্ণ স্বরে বলে, কেন আপনি এমন করে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন বলুন তো? লীলারাও সেদিন দুঃখ করছিল। কি হয়েছে আপনার?

সরোজ বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়ে অন্য কথা ভাবছিল, ইচ্ছে করে প্রমীলার নকল করে বললে, নিজের কথা ভাবতে আর ভালো লাগে না।

প্রমীলা হাসল। সেই সঙ্গে সরোজও।

এক সময় প্রমীলা জিজ্ঞেস করে, মীনাক্ষী আর পীয়ের নাকি কণ্টিনেণ্ট চলে গেছে?

—হ্যাঁ, দিন কয়েক আগে।

—তারপর কোনও খবর পেয়েছেন?

—না।

—ওরা কি বিয়ে করবে?

—হয়তো।

প্রমীলা তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সরোজকে দেখে, কি হয়েছে আপনার আজ? কাটা কাটা ছোট উত্তর দিচ্ছেন।

সরোজ কথা না বলে শুধু মিষ্টি করে হাসল।

প্রমীলা নিজের মনে বলে যায়, জানেন ডোরিয়ার একটা খুব সুন্দর চিঠি পেয়েছি, ওরা সুখী হয়েছে। ভারতের জীবনটাকে ভালো বেসেছে।

মাঝখান থেকে সরোজ প্রশ্ন করল, তাই নাকি?

—কেন, আপনি ওদের কোন চিঠি পাননি?

—পেয়েছি, একটা জিতের চিঠি, সরোজ থেমে যায়।

—কি লিখেছে?

—ঠিক বুঝতে পারলাম না। এখনও জিৎ চাকরির সুবিধে করতে পারেনি। তা ছাড়া ও বোধ হয় কলকাতায় থাকতে চাইছে না। অবাক হলাম এই জন্যে যে সারা চিঠিতে কোথাও ডোরিয়ার কথাও লেখেনি।

—আশ্চর্য। প্রমীলা নিজের মনেই কি যেন ভাবে।

সরোজ গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করে, জান প্রমীলা, এতদিনে একটা সত্য উপলব্ধি করেছি যে নিজেকে বোঝা বড় শক্ত।

প্রমীলার মনে হল এ এক সম্পূর্ণ অচেনা কণ্ঠস্বর, চমকে ফিরে তাকাল সে। চোখে-চোখি হতে দেখে সরোজ তারই দিকে চেয়ে আছে। কি গভীর দৃষ্টি।

—প্রমীলা, তুমি যখন এবার সুস্থ হয়ে উঠে লণ্ডনে আসবে, অনেকগুলো কথা তোমাকে বলতে হবে।

—কি কথা, সরোজদা?

—নিজের কথা। এতদিন ভাবতাম জীবনটাকে খুব খুঁটিয়ে দেখেছি, বুঝেছি, আমার মন কি চায়, আর কি চায় না। কিন্তু এখন সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

প্রমীলা সহানুভূতিভরা গলায় প্রশ্ন করে, কেন এসব আবোলতাবোল ভাবছেন?

সরোজ ম্লান হাসল, আবোলতাবোলই বটে। সময় হলে একদিন হয়তো তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারব।

সরোজের বাঁ হাতটা খাটের উপরেই ছিল, প্রমীলা সযত্নে তুলে নিল বুকের কাছে, স্থির নিষ্কম্প গলায় বলল, আমি বুঝতে পারি, সরোজদা। প্রমীলার কথার মধ্যে কোন উচ্ছ্বাস নেই, অথচ স্পষ্ট করে সে সরোজকে জানিয়ে দিল তার মনের অবস্থা প্রমীলার মোটেই অজানা নয়। বিস্মিত সরোজ তাকিয়ে রইল এই মেয়েটির দিকে, কে বলবে একদিন সে এই প্রমীলাকে কিশোরীর মত চঞ্চলা ভেবেছিল, ভেবেছিল অপরিণত বুদ্ধির প্রকাশ তার কথায়, ব্যবহারে, কাজে। কিন্তু সেই প্রমীলা যে এত সহজে মনের অলি-গলি পেরিয়ে অন্তঃপুরের ঠিকানা খুঁজে বার করবে তা সে ধারণাও করতে পারেনি।

কথা বলতে গিয়ে সরোজ থেমে গেল, প্রমীলার চোখে নীরব জলধারা তাকে মুহূর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল এক অচেনা রাজত্বে যেখানে শুধু দুজনের দেশ। যেখানে সমাজ সংসার মিছে হয়ে যায়, অসার মনে হয় জীবনের কলরব, শুধু চোখের ভাষায় যেখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে অন্তরের কথা, অনুভব করা যায় হৃদয়ের গভীরতা।

নার্স এসে খোঁজ নিয়ে গেল প্রমীলার কিছু দরকার আছে কিনা।

ছন্দ কেটে গেল। নিজেদের সামলে নিল ওরা।

প্রমীলা বলল, নার্সটা বড় ভালো।

সরোজ ছোট্ট উত্তর দিল, কিন্তু বেরসিক।

—এখন তাই মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু ওদের মহত্ত্বের কোন তুলনা হয় না। জানেন সরোজদা, রাত্রির অন্ধকার যখন নেমে আসে, ঐ নার্সরা শব্দ না করে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। বিশেষ করে যেদিন ঘুম আসে না, তার ওপর পেটে যন্ত্রণা হয়, ওদের হাসি-খুশী মুখগুলো দেখলে মনে অনেকখানি সাহস পাই। তখন মনে হয় ওরাই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু, ওরা আমাদের বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে চলে যাবে না, অন্ধকারের অনিশ্চয়তায় ত্যাগ করবে না।

সরোজ সহজ গলায় বলে, অবশ্য ঐ তো

ধৈর্যের কাজ। নার্স যখন হয়েছে অসুস্থের সেবা তার ধর্ম।

প্রমীলা নিজের বিনুনি দুটো নিয়ে খেলা করছিল, বললে, আমি ঠিক তা বলিনি, সরোজদা। হাসপাতালে না থাকলে বুঝতে পারবেন না, রাত্রি যত গভীর হয়, বিনিদ্র রজনী কাটাবার ভয়ে নিজেকে শিশুর মত অসহায় মনে হয়, কত রকমের চিন্তা তখন মাথায় এসে ভিড় করে। হয়ত দেখি পাশের ঘরে নাটক চলছে মৃত্যুর হাত থেকে একটি রুগীকে বাঁচাবার জন্যে ডাক্তার আর নার্সদের লড়াই, কে জিতবে আগে থেকে তো বলা যায় না। তখন মনে হয় আপনারা সবাই কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছেন, আর আমি শুধু জেগে, একা, একেবারে একা। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি কখন ভোরের আলো ফুটে উঠবে। এক একদিন থাকতে না পেরে নার্সকে ডেকে আনি। বলি, সিস্টার, যা হোক কিছু তুমি বল, এ নিস্তব্ধতা আমার কাছে অসহ্য। সিস্টার কি বলে জানেন?

—কি?

—এই হচ্ছে মানুষের অসহায়তার সব চেয়ে করুণ কান্না।

দেখা করবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় সরোজকে উঠে পড়তে হয়, বলে, আশা করি সামনের সপ্তাহে তোমার সঙ্গে লন্ডনে দেখা হবে।

প্রমীলা ছলছল চোখে উত্তর দেয়, আমিও সেই আশা করে থাকব, সরোজদা।

কথাটা সামান্য, তবু সরোজের চোখে জল এল। কোন রকমে সামলে নেবার জন্যে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে প্রমীলার কথাগুলো, সে একা। আজও হয়ত ঘুমের প্রতীক্ষায় সে রাত জেগে বসে থাকবে, চিন্তা করবে সরোজদের কথা, কখন ভোর হবে তারই জন্যে প্রহর গুনবে। হয়তো গল্প করার অছিলায় নার্সকে ডেকে এনে পাশে বসাবে।

প্রমীলার কথা চিন্তা করে সরোজের মন আর্দ্র হয়ে উঠল। ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা গেল ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে। ভদ্রলোক বৃদ্ধ অমায়িক ব্যবহার, সরোজকে বুঝিয়ে বললেন, আমার মনে হয় না মিস চৌধুরী সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ আছে। আমি ওঁর কাছ থেকে যতদূর জেনেছি, পেটে যন্ত্রণা অনেকদিন থেকেই হয়। রোগ যখন ধরা পড়েছে, খুব তাড়াতাড়ি আমরা সারিয়ে তুলতে পারবো। তবে—

সরোজ জিজ্ঞেস করে, থামলেন কেন? বলুন।

ডাক্তার হাসলেন, রুগীকে একটু বাধ্য হতে হবে। মানে সময়মত খাওয়া-দাওয়া করা। নিয়মমত কিছু দিন চলা এবং ভাবনা চিন্তা একটু কমানো।

—শেষের কথাটা ঠিক বুঝলাম না।

—আমি দেখেছি, রুগীর যদি মানসিক অশান্তি থাকে, অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠে, এ ধরনের গ্যাসট্রিক যন্ত্রণা বড় তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। আশা করি মিস চৌধুরীর এই ছোট জীবনে সে ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি।

সরোজ স্মিত হেসে বলে, আমি যতদূর জানি, না।

সরোজ ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে আসছিল, ডাক্তারও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। জিজ্ঞেস করেন, আপনিই তো লন্ডনে ভারতীয় নাটকের প্রযোজনা করেন? মিস চৌধুরীর মুখে আপনার নাম আমি শুনেছি।

সরোজ হাসল, সেসব অ্যামেচার শো।

—মনে হয় মিস চৌধুরী আপনার কথা শোনেন।

—হয়তো হবে।

ডাক্তার সরোজের কাঁধের উপর একটু হাত রাখেন মিস চৌধুরীকে সময়মত বোঝাবেন, উল্টো-পাল্টা চিন্তা করে, নিজের মনকে উনি যেন ক্ষত-বিক্ষত না করেন।

সরোজ বিস্মিত হয়, এ কথা কেন বলছেন?

—উনি মনে করেন এ পৃথিবীতে উনি একেবারে একা, সম্পূর্ণ অসহায়।

ডাক্তারের কথার মধ্যে একটা উদ্বেগের সুর। (ক্রমশ)

অযাত্রায় জয়যাত্রা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১০)

যেটাকে কিন্তু সুদূর আর প্রায় অসম্ভব মনে করেছিলাম, সেটা শুধু সামনেই নয়, একেবারে ঘাড়ে এসে পড়ল।

আমি এই মুজঃফরপুরে এক সময় অনেকদিন গেছি কাটিয়ে, দুইবারে প্রায় বছর চারেক। ছিলামও দুটো বড় বড় স্কুলের শিক্ষক হয়ে। এদিকে খেলাধুলো ছিল, বাঙালীদের সব প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যোগ ছিল; সব মিলিয়ে পরিচিতের সংখ্যা খুব বেশী শহরের মধ্যে। মাস্টারি কাজটাও আর কিছু না হোক, বেয়াড়ারকম খাতির আর প্রণাম কুড়বার কাজ।

শহরের প্রান্তভাগে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে একটা চিন্তা আস্তে আস্তে মনটাকে অধিকার করে ফেলছিল, চুনের ট্রাক গিয়ে দাঁড়াবে আর সঙ্গে সঙ্গে হয়তো পাশ থেকে—'পরনাম স্যার।' কিংবা নমস্কার মাস্টারমশাই। কিংবা—'এই যে বিভূতিবাবু! উঃ কদিন পরে দেখা! তা আপনি হঠাৎ...'

খোলা চুনের গাদার ওপর দৃষ্টি পড়ে উনিও অপ্রস্তুত, আমার মুখেও কথা যোগাচ্ছে না।

যা ভয় করছিলাম তা-ই কি ঘটতেও হয়? তাও যদি যখন লরিওলাটাকে ভাড়াটা দিচ্ছি সেই সময় দেখতে পায়, তা হলেও খানিকটা বাঁচোয়া থাকে. ও হতভাগা এসে দাঁড়াল যখন ভাড়া চুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কুলি মোট মাথায় তুলে দেওয়ার জন্যে লোক খুঁজছে।

"পরনাম মাস্টার সাহেব।"

বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল, এই আশঙ্কাই তো করছিলাম। পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে। বেশ তাগড়া চেহারা, খদ্দরের পাঞ্জাবি পরা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ, বয়স পঁচিশ কি পঁয়ত্রিশ বোঝা শক্ত। আশীর্বাদটা সেরে একটু মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললাম—"তোমায় কিন্তু চিনতে পারছি না বাপু। ভুল কর নি তো?"

"আরে ব্বাপ! আমি ভুল করব!" বাঁ হাতের ওপর ডান হাতে উল্টা পিঠটা ঠুকে একটু হেসেই উঠল কেন জানি না, বলল—"বলে এক অচ্ছর কারুর কাছে পড়লে চিরকাল সে কথা মনে রাখতে হয়, আমি তো হুজুরের প্রাইভেট স্টুডেন্টই ছিলুম। মনে পড়ছে না?"

লরিটার দিকে একবার একটু ঘাড় উঁচিয়ে চাইল। বললাম—"না, ঠিক......"

"আমার নাম রামবুঝাওন মিশির। এবার মনে পড়ছে?"

'মনে পড়ছে' বললে অব্যাহতি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী কি 'পড়ছে না' বললে, মনে মনে ঠাহর করবার চেষ্টা করছি,, কুলি বলল—"কেউ তো নেই, মোটগুলো একটু তুলে দিতে হবে।"

পা বাড়িয়েছি রামবুঝাওন তাড়াতাড়ি ঘুরে ধরল বাক্সটা, "সে কি স্যার। আমি রয়েছি কি করতে?"

সবগুলো তুলে দিয়ে সেইভাবে উল্টো হাতে তালি বাজিয়ে একটু হেসে বলল—"আজ কত বছর পরে একটু সেবা করবার সৌভাগ্য হল স্যার?"

চুনের লরির দিকে কয়েকবারই চোখ দুটো গিয়ে পড়েছে এর মধ্যে, একটু তেরছাভাবে।

বললাম—"তা হবে বৈকি......"

কুলিটা এগিয়েছে। কথাটা কেটে দিয়ে বললাম—"আচ্ছা, আসি তা হলে, সত্যি খুব আনন্দ পেলাম।"

"তা তো পাবেনই স্যার; কী স্নেহটাই

যে পেয়েছি আপনার কাছে! চলুন, গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি: কত বছর পরে যখন পাওয়া গেছে দর্শন।"

চলতে চলতে গা থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যেই বলেছিলাম আনন্দ পাওয়ার কথা। চিনতে পারছি না, একটা অস্বস্তিই বোধ করছি। ও চেনে, আর দেখলও এই রকম অবস্থায়—মাস্টারমশাই চুনের লরি থেকে নামছেন, অস্বস্তিটা আরও যেন বেড়েই যাচ্ছে। বললাম—"আমার গাড়ির এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি। লেট আসছে। তারপর জল নিয়ে ছাড়তে আরও খানিকটা বাড়িয়েই নেবে, তুমি আর কেন......"

"তাই নাকি!" —পুলের ওপর উঠেছি, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, কুলিটাকে বলল —"এই দাঁড়া।"

আমিও দাঁড়িয়ে পড়েছি আপনা হতেই, সেই রকম চোখ বড় বড় করে হেসে আর উল্টো হাতের তালি দিয়ে বলল—"ও লেট হয়েছে আমার ভাগ্যে স্যার, ঘণ্টাখানেকের বেশী সময় পাওয়া যাচ্ছে তো চলুন আমার বাসায় নাস্তা-পানি ক'রে আসবেন একটু। না, কোনমতেই ছাড়ছি না। মুখ-হাত ধুয়ে একটু নাস্তা-পানি......ইস্, চুন উড়ে উড়ে কি চেহারা হয়ে গেছে স্যার! আমি মনে করেছিলুম, মাস্টারমশাইয়ের বুঝি সব চুল পেকে গেছে। ...দাঁড়ান, ঠিক মনে পড়ে গেছে। আপনার চুনের গাড়িটা বোধ হয় যায়নি। দাঁড়াতে বলে দি গে।"

ভিড় আছে পুলে একটু, তারই মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে খানিকটা গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বলল—"আপনারাও আসুন স্যার। এই কুলি, চলো!"

কী এক নাছোড়বান্দার পাল্লায় পড়া গেল! একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েই গেছি, সামলে নিয়ে কুলিটাকে বললাম—"চল, এগো। প্ল্যাটফর্মেই গিয়ে বসব। একটু তাড়াতাড়ি চল।"

দূরত্বটা যতখানি বাড়িয়ে ফেলতে পারি এই সুযোগে। হঠাৎ কোথা থেকে এক বিপদ এসে জুটল দমকা!

সিঁড়ি ছেড়ে প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েছি, সেই রকম ভিড় ঠেলে হন্তদন্ত হয়ে নেমে এল।

"এই কুলি, দাঁড়াও। ...আপনার চুনের লরিটা চলে গিয়েছিল স্যার, আমি একটা ট্যাক্সি ঠিক করে এলুম, চলুন।"

বিরক্তিটা চাপবার চেষ্টা করলাম না: একটু বেশী স্পষ্টই হয়ে ফুটে থাকবে মুখে, একটু থতমত খেয়ে চেয়ে থেকে বলল—"তা হ'লে তাই করুন স্যার। আর ও ব্যাটাও জব্দ হোক।"

এগিয়েছি আবার। প্রশ্নের দৃষ্টিতে ঘুরে চাইতে বলল—"ওই ট্যাক্সিওয়ালার কথা বলছি। এইটুকু তো পথ, এর জন্যে

গরজ দেখে আড়াই টাকা চার্জ করে বসল, যেতে-আসতে পাঁচটা টাকা, হল্টেজ আলাদা। থাক শালা—ব'সে ব'সে যত পারিস হল্টেজ তোল এখন। কি বলেন স্যার? ...ঐ যে আপনার চুনের লরিটা..."

"কিন্তু আমার চুনের লরি, তোমায় কে বললে?"

"নয় স্যার?" —একটা যেন ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তবে আমি আর না-দাঁড়ানোয় তখুনি আবার চলতে আরম্ভ করে দিল। প্রেসিডেন্ট নিয়ে যাওয়ার মতো ক'রে ভিড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; আলাপ করতে করতেই নিয়ে যাচ্ছিল, এবার খানিকটা চুপচাপই গেল। তার মধ্যে ঘুরে শুধু বার দুই আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখে নিল। একটা বেঞ্চের সামনে এসে কুলিটা দাঁড়াল, বলল—সেকেন্ড ক্লাসের গাড়িটা এইখানেই দাঁড়াবে। রামবুঝাওন মোটগুলো নামিয়ে দিল। বেঞ্চটা ভরাই ছিল। "মাস্টার সাহেব হ্যাঁয় মাস্টার সাহেব হ্যাঁয়"—বলে তারই মধ্যে অনুরোধ উপরোধ করে আমার জন্যে একটু জায়গা করে দিল, তারপর একটু জবরদস্তি করে কানুন দেখিয়েই দুজনের দুটো পুঁটলি নামিয়ে নিজেও একটু জায়গা করে নিল আমার পাশে। বেশ একটু চিন্তিত। যেন হিসাবের ভুলটা কোথায় কি ক'রে হলো বুঝে উঠতে পারছে না। দুয়ে-দুয়ে মিলে চারই হয়, চিরকালই এই দেখে এল, হঠাৎ পাঁচ হয়ে বসল কি করে!

আমিও রয়েছি নিজের চিন্তা নিয়ে। এমনি এক ঘণ্টা লেট হয়ে রাত আটটার জায়গায় প্রায় সাড়ে দশ-এগারোটা হয়ে যাচ্ছে—গাড়ি পৌঁছতে প্রায় বারোটা—এন-ই আরের গাড়ি—একবার লেট হলে আরও লেট করবারই ঝোঁক থাকে—কি হবে, কখন পৌঁছাব, কিছুরই যেন হদিস পেয়ে উঠছি না। এর ওপর এই এক উপদ্রব এসে জুটল কোথা থেকে! সমস্ত দিন যে ধকলটা গেল, ঘোরাঘুরি, মনস্তাপ, বেশ ক্ষিদে পেয়ে গেছে। হাতে সময় রয়েছে, ইচ্ছে ছিল সোজা ওয়েটিং রুমে গিয়ে স্টেশনের হোটেল থেকে কিছু আনিয়ে রাত্তের খাওয়াটাও এইখানেই সেরে নেব; সে তো ওর খাতিরের অত্যাচারের ভয়েই হলো না, এইখানেই স্টল থেকে একটু যে আনিয়ে নেব, সে সাহসও হচ্ছে না......

"স্যার মাফ করবেন।" —কথাটা বলার সংগে সংগেই দাঁড়িয়ে উঠেছে। প্রশ্ন করলাম—"কি?"

"বাস্, ঠিক পাঁচ মিনিট, যাব আর চলে আসব।"

পাঁচ বছর, এমন কি অগস্ত্য-যাত্রা হলেও যে আমার কোন দুঃখ নেই, এ কথা কি ক'রে বোঝাই? কিন্তু যা যাত্রা করে বেরিয়েছি, এত সহজ হওয়ার কি উপায় আছে? ও উঠতেই একেবারে পাশের লোকটি তার পুঁটুলিটা তুলে নিয়ে রাখতে যাচ্ছিল বক্রদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলল—"বাঃ! বাঃ! অমনি পুঁটুলি উঠে আসছে, দিব্যি তামাশা তো!"

"আপনি উঠে যাচ্ছিলেন......"

"পাঁচ মিনিটের জন্যেও নিজের জায়গা ছেড়ে একটু কাজে যেতে পারবে না লোকে? আর পুঁটুলির জন্যে বেঞ্চ পেতে রেখেছে কোম্পানী! বাঃ!"
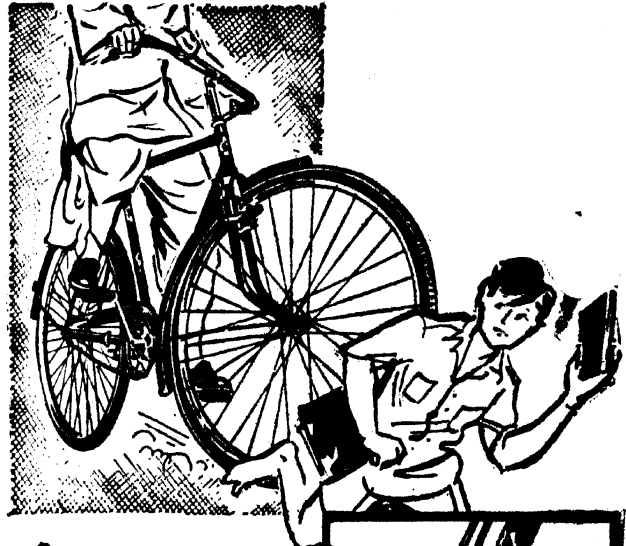
একটু রূঢ়ভাবেই ওর পুঁটুলি সুদ্ধ হাতটা ঠেলে আবার বসে পড়ল।

"আচ্ছা জবরদস্তি তো!" —লোকটা একটু ক্ষীণজীবী, নিরুপায়ভাবে মন্তব্যটা করে আরও কি একটা বলতে যাচ্ছিল, রামবুঝাওন আমার দিকে ঘুরে বলল—"ও কি বলছে, কানে তোলবার দরকার নেই স্যার—মানুষ দাঁড়িয়ে থাক, পুঁটলি থাক ব'সে, দেখুন না আব্দার! ...আমি একটা কথা জিগ্যেস করছিলুম স্যার, অবিশ্যি যদি অনুমতি দেন, নইলে থাক। গুরুর অনুমতি না পেলে—বাবুজী বলেন—তুলসীদাসজী তাঁর রামচরিত-মানসে নাকি বলে গেছেন......"

"কি কথা—বলোই না।" —বাধা দিয়ে বললাম।

"চুনের লরিটা আপনার ছিল না?"

"বিশ্বাস হলো না তোমার? গুরু-বাক্যই তো।"

"আরে ব্বাপ! অবিশ্বাস করতে পারি কখনও! কী যে বলেন স্যার!" —দু'হাতে নিজের দুটো কান স্পর্শ করল।

"তা হলে?"
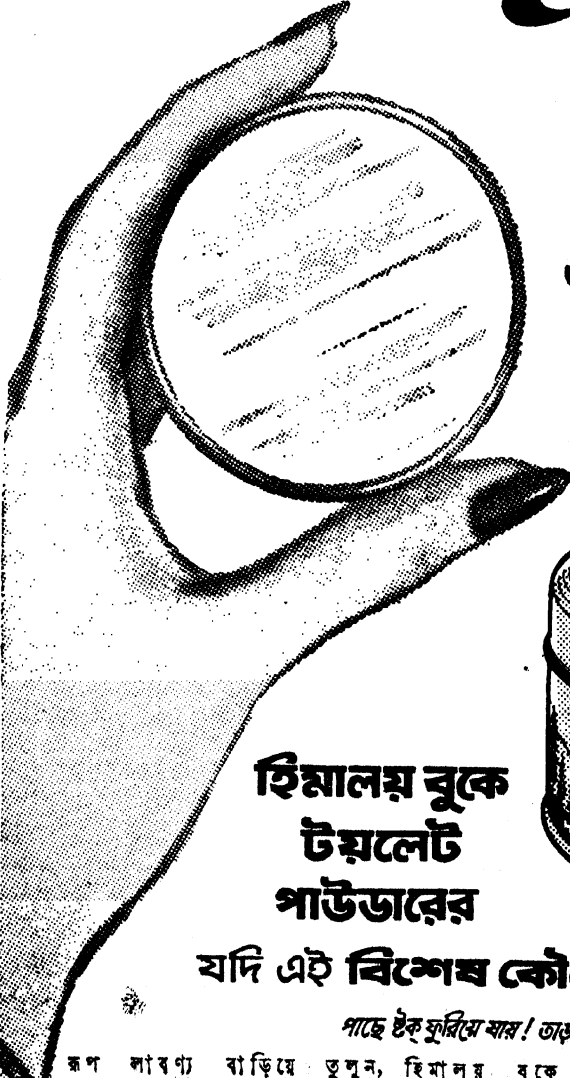
"মানে......কথা হচ্ছে স্যার, আপনি প্রায়ই বলতেন—সেই যখন পড়াতেন আমায়—প্রায়ই বলতেন—কে একজন পি সি রায় নাকি বলতেন—দেখুন স্যার, নামটা এখনও মনে আছে আমার! —তিনি নাকি বলতেন, ব্যবসায়ের মতন জিনিস নেই......"

"তারপরেই এই দেখছ চুনের টাক থেকে নামছি!" —এত দুঃখেও মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল, বললাম—"না, আমি একটা মুশকিলে পড়ে......"

"থাক, হয়েছে স্যার, আর বলতে হবে না; লাজ কি পাঁচ কান ক'রে?"—আমার ডান হাতটা দু হাতে চেপে ধরে একটু আবেশভরে মুখের দিকে চেয়ে উঠে পড়ল, বলল—"পাঁচ মিনিট স্যার, এক্ষুনি ফিরে আসছি।"

ত্রস্তভাবেই দু পা এগিয়ে আবার ফিরে এল। আমার সুটকেশটা নীচে থেকে তুলে খালি জায়গাটায় বসিয়ে দিয়ে বলল—"কেউ যদি নামিয়ে দিতে চায় জবরদস্তি ক'রে, আপনি কক্ষনও দেবেন না স্যার—দরকার হলে পুলিস ডাকবেন। তারপরে আমি তো আছিই।"

"বাঃ! পুলিস ডাকবেন! আপনার জন্যে এক আইন আর আমার জন্যে অন্য আইন!"

বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, সেইখান থেকেই ঘুরে চড় দেখিয়ে বলল—"জবরদস্তি ক'রে, আগে ক'ষে দু ঘা বসিয়ে দেবেন!"

"আপনি নিজে এসে বসান না দেখি কত বড় পহ্লোয়ান!" —বেশ চটে দাঁড়িয়ে উঠেছে। রোগা মানুষ, কাঁপতেও আরম্ভ করেছে রাগে।

আমি ডান হাতটা ধরে বললাম—"আপনি বসুন। সত্যিই কি মারামারি করবে পুঁটলি নিয়ে?"

"করলে আমিও পেছপা নই মশাই! ......আপনি কে হন ওর?"

"কেউ নয়। বোধ হয় বুঝতেই পারছেন আমি হচ্ছি বাঙালী। ওর নাম রামবুঝাওন মিশির। বলছে নাকি এক সময় আমার কাছে পড়েছিল।"

"কিরকম শিক্ষা দিয়েছেন মশাই আপনি? কিরকম শিক্ষা দেন?" —বসেনি, কথাটা পেয়ে খুব একচোট গরম হয়ে উঠেছে; বলে চলেছে—"আপনাদের শিক্ষার দোষেই ছাত্রদের এই রকম অবস্থা চারিদিকে—বাপকে মানছে না, ভাইকে মানছে না—আইন মানছে না, কানুন মানছে না! তা বেশ তো, আসুক, চেহারা দেখে ভেবেছে, আমি কম যাই ওর থেকে। হয়ে যাক তা হলে, এই প্ল্যাটফর্মের ওপরেই সবার সামনে, ওর রোয়াব আমি ভেঙে দিই......"

হাতটায় একটু টান দিয়ে বসালাম। একটু হেসেই বললাম—"আপনি ওর গুরুর চেহারা দেখে সেই আন্দাজেই বোধ হয় ওকে ঠাণ্ডা করার কথা বলছেন। কিন্তু সম্ভব কি তা? আর কাজ কি সে পরীক্ষা করে? আর আমরা পাঁচজনে দেবই বা কেন করতে? থাক ও কথা। দেখছেন লোকটা একটু খামখেয়ালী, ওর কথায় কান দিলে চলে? আর দরকারই বা কি তার?"

"দরকার নেই?" —আমার নরম হয়ে বলার জন্যে একটু জুড়িয়ে এসেছিল, আবার একটু গরম হয়ে উঠল; বলল—"দরকার নেই? কি বলছেন আপনি? অমন করে পুঁটলিটা নামিয়ে দিলে—আপনার চোখের সামনেই তো। আমি যদি এখন সুটকেশটা নামিয়ে দিই।"

"দরকার কি হাঙ্গাম বাড়িয়ে? গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ একটা। আপনিও রেল-যাত্রা করে যাচ্ছেন কোথায়—পথে অযথা একটা অশান্তি। তার চেয়ে এক কাজ করুন না। পোঁটলায় কি আছে আপনার?"

"কিচ্ছু না। অত প্রশ্নে কি দরকার আপনার?"

নরম গলাই, তবে শিষ্যের ওপর ঝালটা যতটা সম্ভব গুরুর ওপরে মিটিয়ে নিচ্ছে।

বললাম—"যাই থাক, আপনি সুটকেশটার ওপর তুলে রাখুন না। ...দিন, আমিই না-হয় তুলে রাখছি—"

অর্থাৎ দায়িত্বটা আমিই নিলাম। হাতটা বাড়িয়েছি, ঠেলে দিয়ে মুখটা কুঁচকে বলল—"থাক, আর দয়ায় কাজ নেই।"

ওর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে সামনের দিকে চেয়ে দেখি, রামবুঝাওন পুল থেকে নেমে এগিয়ে আসছে। এবার একলা নয়, ওর পাশে ওর চেয়েও লম্বা-চওড়া, মোটাসোটা একজন প্রৌঢ়, বয়স প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে, পায়ে বিপুলকায় এক জোড়া নাগরা জুতা, গায়ে খদ্দরের কুর্তা, গলায় তসরের চাদর জড়ানো, মাথায় বিপুল তসরের পাগড়ি, হাতে একটা মোটা বাঁশের লাঠি, পেতল দিয়ে বাঁধানো।

হন হন করে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল দুজনে। রামবুঝাওন আমায় দেখিয়ে বলল—"এই ইনি, ভর্তৃভূতিবাবু, আমার মাস্টারমশাই, যাঁর কথা তোমায় বলছিলুম। ......আমার বাবুজী স্যার। বাড়ি পর্যন্ত যেতে হলো না, রাস্তাতেই দেখা হয়ে গেল। বাবুজীর নাম বাবু রামসিংহাসন মিশির।"

লোকটি একরকম ভক্তিগদগদ দৃষ্টিতে মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, যুক্ত কর কপালে ঠেকিয়ে বলল—"নমস্তে।"

বললাম—"নমস্তে।"

রামবুঝাওন সুটকেশটা নামিয়ে দিয়েছে। বললাম, বসুন, জায়গাটা বাড়াবার জন্যে ওরই মধ্যে নিজেও একটু গুছিয়ে বসলাম।

পাশের লোকটির মুখের ভাবটা একটু অন্যরকম এবার। খুব বেশীরকমই আস্ফালনটা নাকি করেছিল, সেজন্যে একটু

চ্যালেঞ্জের ভাবটাকে ধরে রাখতে হয়েছে, তার সঙ্গে বেশ একটু ভয়ও; এবার তো দুজন। যেন প্রতীক্ষাই করছিল রামবৃঝাওন এবার ওকে উঠতে বলবে, তারপর ওর প্রতিক্রিয়াটা কি হবে মনে মনে ঠাহর করছিল, আমিই সমস্যাটা মিটিয়ে দিলাম। রামবৃঝাওন কিছু বলবার বা করবার আগেই বললাম—"তুমি সামনাসামনি হয়ে আমার বেডিংটার ওপর বসো রামবৃঝাওন, গল্প করবার সুবিধে হবে।"

কি গল্প করব, কি উদ্দেশ্যে হঠাৎ আবার বাপকে এনে হাজির করল, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। সাধারণ সৌজন্যের প্রথা ধরে বললাম—"আপনার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল, সৌভাগ্যের বিষয়।"

"সৌভাগ্য—সে আমার হজুর, আপনাদের মতন লোকের দর্শন পাওয়া......"

"আর দেখুন স্যার, কি রকম অদ্ভুত যোগাযোগ। বাড়ি যাচ্ছি, ডেকে আনব প্রায় বলেন তো আপনার কথা—পুল থেকে নেমে দেখি থার্ড ক্লাস টিকিট ঘরের সামনে কিউ-এর মুখ থেকে বেরিয়ে আসছেন... জিজ্ঞেস করলুম আপনি কোথায় যাচ্ছেন? না, সোনপুরে একটা কাজে। বললুম—তা হলে চলুন, আমার মাস্টারমশাই এই গাড়িতে যাচ্ছেন, পরিচয় করিয়ে দিই, আপনি এত করে বলতেন......"

উল্টো হাতের তালি দিয়ে চোখ বড় বড় করে বলল—"ভাগ্য বলতে হয় তো একেই স্যার। বাবুজী হচ্ছেন ঠিকাদার। আপনার পি সি রায়ের ব্যবসাই তো ওটাও।"

"থার্ট গিলাসের টিকিট নিয়েছিলুম—বদলে সিকিন গিলাস ক'রে নিতে একটু দেরি হয়ে গেল। বললুম—তা হলে এক গিলাসে গল্প করতে করতেই যাবে।"

"বড় সুখী হলাম।"

অবশ্য মোটেই হইনি। একেবারে আনাড়ি গোছের যেন লোকটা; চলতি ইংরাজী কথাগুলো বলবে, তারও ঐ নমুনা। এর সঙ্গে কি গল্প করব? একে তো নিজের চিন্তা নিয়ে মরছি। তারপর কেমন যেন মনে হচ্ছে, সমস্তটাই সাজানো—সোনপুরে কাজ থাকা থেকে থার্ড ক্লাসের টিকিট; সেটাকে সেকেন্ড ক্লাসের করে নেওয়া: সবটুকুই। মনে হচ্ছে ও ওকে বাড়ি থেকেই টেনে এনেছে, কোন কারণে সোনপুর পর্যন্ত ভিড়িয়ে দিচ্ছে আমার সঙ্গে। টিকিট কেটে উঁচু শ্রেণীতে বদলানো—ওটা যেন নিছক ভাঁওতা একটা। বাড়ি গিয়ে ডেকে আনতে যে সময়টা লেগেছে সেটাকে পূরণ ক'রে দেওয়ার জন্যে।

কিন্তু প্রশ্ন হ'চ্ছে—কেন?

এদিকে কবে পড়েছিল তাও তো মনে পড়ছে না। অল্পদিনের কথাও তো নয়, কম ক'রে ধরলেও বিশ-বাইশ বছর হয়ে গেল। পি সি রায়ের কথা—আমি কথাটা আওড়াতাম বটে বেশী। কিন্তু ও কথাটা সব বাঙালীর মুখেই চলছে তখন।

বেশ অস্বস্তিতে পড়েছি। রাত্রির ট্রেনে যাত্রা, লেট হয়ে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব। কোন জোচ্চোরে পিছু নিল না তো!

কুলি মাথার পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে এসে বলল—"উঠুন হুজুর, গাড়ি এসে গেছে।"

হাত উল্টে ঘড়িটা দেখে নিলাম। এক ঘণ্টার বিলম্বটা কমিয়ে তিন কোয়ার্টারে দাঁড় করিয়েছে গাড়িটা। যা দিন যাচ্ছে যেটুকু পাচ্ছি, মনে হচ্ছে যেন পরম লাভ।

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৭৩)

সত্যিই তো, তাদের কী দোষ। তারা কী করবে। জীবনের এই উদার বিস্তারের মধ্যে আমরা যতই বিস্তীর্ণ হবো, ততই তো আমাদের আনন্দ, আবার ততই তো আমাদের আঘাত সহ্য করতে হবে। আনন্দকে যদি স্বীকার করে নিয়ে থাকি, তাহলে আঘাতকেও এড়ালে চলবে না তো-! যে-সৃষ্টি কার্যটি নিঃশব্দে সারা ভুবনময় চিরদিন ধরে চলে আসছে, ধ্বংসের অঙ্কুরটি তো তার মধ্যেই চির-নিহিত আছে। এসব জেনেও দীপঙ্করের সেদিন প্রথমে হতবাক হয়ে গিয়েছিল খবরটা শুনে। তাই প্রথমে বিশ্বাস হয়নি ক্লার্কের কথাগুলো। তাই বার-বার প্রশ্ন করে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে চেয়েছিল। তাহলে? সমস্ত আশ্রয়গুলো নির্মূল. হয়ে গেলে কোথায় আশ্রয় পাবে সতী? কোথায় সান্ত্বনা পাবে সে?

—হুজুর!

অফিসের নির্জন কামরার মধ্যে এতক্ষণ দীপঙ্কর যেন আত্ম-সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিল। কোথায় কত দূরে কোন্ এক অত্যন্ত পরিচিত আত্মীয়ের যেন অন্তর্ধান হয়েছে, তারই বিয়োগ দীপঙ্করকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে মুহ্যমান করে দিয়েছিল একেবারে। অথচ পাশেই রয়েছে সতী। একেবারে পাশের ঘরেই। সেই সতীও জানে না কোন্ অপঘাত তার অজ্ঞাতে চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছে তার জীবনে। শুধু সতী নয়, কেউই জানে না। লক্ষ্মীদিও জানে না হয়ত।

—হুজুর!

এতক্ষণ মুখ তুলে চাইলে দীপঙ্কর। মধু দাঁড়িয়ে আছে সামনে। দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কী রে?

—ক্রফোর্ড সাহেব ডেকেছেন হুজুর।

সেদিন ক্রফোর্ড সাহেব হয়ত আশা করেছিল দীপঙ্কর তার কাছে অনুনয়-বিনয় করবে। হয়ত তার ট্রান্স্ফার ক্যানসেল্ড করবার জন্যে দরবার করবে। সদাশিব ক্রফোর্ড সাহেব শুধু বললে—তোমার কবে যেতে সুবিধে হবে সেন?

দীপঙ্কর বললে—যেদিন আপনি বলবেন!

সাহেব বোধহয় সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিল। বললে—তোমার বোধহয় সুবিধেই হলো সেন, এ-সময়ে ক্যালকাটা ইজ এ ডেঞ্জার জোন, ডেঞ্জার জোন্ ছেড়ে যাওয়াই হয়ত ভালো তোমার পক্ষে!

সাহেব চেয়েছিল দীপঙ্কর প্রতিবাদ করে দরখাস্ত করবে। কিন্তু কিছুই করেনি দীপঙ্কর। এ ট্রান্সফার সে মাথা পেতেই নিয়েছে। অফিসের হুকুম বলে নয়। এ সতীর দেওয়া শাস্তি বলে সে মাথা পেতে নিয়েছে। সতী তাকে মমতা দেয়নি। সতী তাকে সান্নিধ্য দেয়নি, তাতে দীপঙ্করের মনে মনে যে ক্ষোভ জমে উঠেছিল, সতীর ঘৃণা পেয়ে, সতীর শাস্তি পেয়ে যেন তার সমস্তটুকু ধুয়ে মুছে গেল।

—তোমার যদি ময়মনসিংএ যেতে কোনও অসুবিধে থাকে তো তুমি অ্যাপীল করতে পারো—ইউ ক্যান অ্যাপীল—আমি কন্সীডার করবো তোমার অ্যাপ্লিকেশন্ সেন!

আশ্চর্য! ক্রফোর্ড সাহেব জানতো বাঙালীরা কলকাতা শহর ছেড়ে বাইরে যেতে চায় না, তাই বার বার অনুরোধ করেছিল সেদিন। কিন্তু তবু দীপঙ্কর কিছুতেই রাজি হয়নি। অভয়ঙ্কর সোজা এসে ঢুকেছিল ঘরের মধ্যে। সেও বুঝতে পেরেছিল এ ট্রান্সফার অন্যায়, এ ট্রান্সফার অবৈধ, অকারণ। দীপঙ্কর ক্লার্ক থেকে বড় হয়েছে, সেইটেই হয়ত তার একমাত্র অপরাধ। কিন্তু আর কোনও অপরাধের রেকর্ড তার পার্সোন্যাল ফাইলে নেই। দিল্লীর বোর্ড থেকে শুরু করে জেনারেল ম্যানেজার পর্যন্ত সবাই জানে সেন এফিসিয়্যান্ট অফিসার। ডি-টি-আই হিসেবেও এফিসিয়্যান্ট ছিল, এখন অফিসার হিসেবেও এফিসিয়্যান্ট। স্টাফের কাছে পপুলার। স্টাফরা ভালবাসে। ক্রফোর্ড সাহেব বেশী কাজ দেখে না, ঘোষাল ওয়াগন আর এস্ট্যাবলিশমেণ্ট নিয়েই ব্যস্ত। ট্রাফিকের কাজে সেনকেই সব করতে হয়। আর কেউ নেই।

অভয়ঙ্কর বলেছিল—কিন্তু দিস্ ইজ রং, দিস ইজ আন্ওয়ারেণ্টেড—ইউ মাস্ট প্রোটেস্ট—
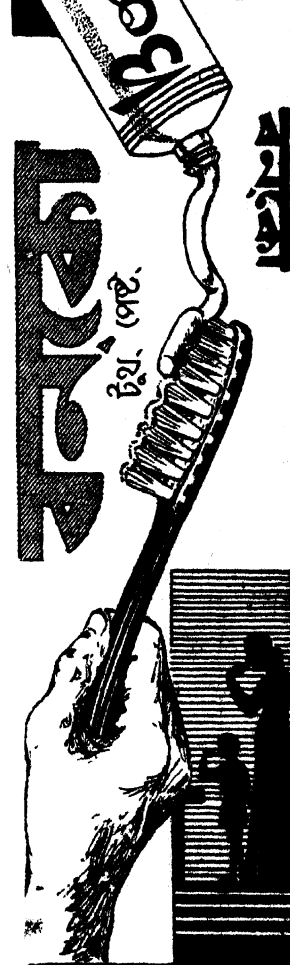
দীপঙ্কর হেসেছিল। বলেছিল—আমি প্রোটেস্ট করবো না—

—কিন্তু কেন? হোয়াই? তোমার কি ভয় করছে প্রোটেস্ট করতে?

দীপঙ্কর বলেছিল—না, ভয় করছে না, ভাল লাগছে, এই ইনসাল্ট আমার ভাল লাগছে—

—তার মানে?

অভয়ংকর কিছুই বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারবেই বা কী করে! এ দীপংকরের এক অদ্ভুত আস্বাদ। সতীর সমস্ত ইনসাল্ট যেন দীপংকরের কাছে আশীর্বাদ। আর তাই-ই তার আনন্দ। সতী তাকে আরো আঘাত করুক। আরো অপমান করুক। তার আঘাতের মধ্যে দিয়েও যেন দীপঙ্কর সতীর সান্নিধ্য অনুভব করতে পারে। মমতা না দিক, আঘাতের মধ্যে দিয়েই তাকে মর্যাদা দিক, তাকে আপন আত্মীয় করুক।

সেই আনন্দের কথাটা বলতেই বোধহয় দীপংকর সেদিন আবার লক্ষ্মীদির বাড়িতে গিয়েছিল। সেই লক্ষ্মীদির বাড়ি।
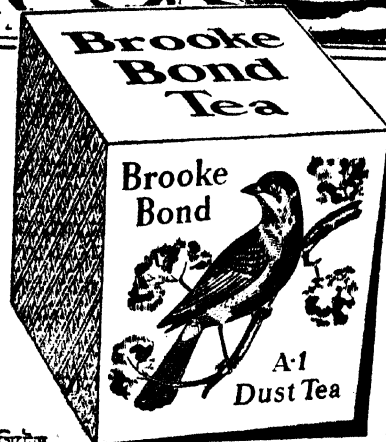
সেখানে তখন আরো পরিবর্তন হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য সেখানে তখন আকাশের মত নিচু হয়ে নেমে এসেছে লক্ষ্মীদির মাথায়। লক্ষ্মীদি শুধু হুকুম করে। একদিন যে ঐশ্বর্য সতীর করায়ত্ত হয়েছিল ভুবনেশ্বর মিত্রের অর্থের যৌতুকে, সেই ঐশ্বর্যের সবটুকু আশীর্বাদের মত লক্ষ্মীদির মাথার এসে নেমেছে। লক্ষ্মীদি ঘুম থেকে ওঠে দেরি করে। তারপর চা খায়। তারপর ব্রেকফাস্ট। পাড়ার লোকেরা অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছে, বাড়িটা কেমন ভাঙা-বাড়ি ছিল, আর কেমন রাতারাতি হঠাৎ একটা প্রাসাদ হয়ে উঠেছে। ভেতরের অনেক বিলাসের প্রাচুর্য বাইরের জগতে উঁকি-ঝুঁকি মারে। সবটা দেখা যায় না, বেশির ভাগটাই আন্দাজ করে নিতে হয়। বড় বড় গাড়ি এসে দাঁড়ায় বাড়ির গেটের সামনে। বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোক নামে। তারপর ভেতরে ঢুকে যায় তারা। কোট-ট্রাউজার পরা সব সম্ভ্রান্ত লোক। সম্ভ্রান্ত লোকদের চেহারা দেখলেই চেনা যায়। লক্ষ্মীদি তাদের অভ্যর্থনা করে আমন্ত্রণ করে। লক্ষ্মীদির সঙ্গ পেয়ে তারা ধন্য হয়ে যায়।

কেউ বলে—আজকাল হুইস্কিতে বড় ভেজাল চলছে—

তখনি টনক নড়ে উঠে লক্ষ্মীদির। বলে—ভেজাল! ভেজাল তো হতে পারে না। আমি তো ওল্ড কাস্টমার, আমাকে ভেজাল প্রভিসন দেবে কেন? আচ্ছা দেখছি—

বলে তখনই ফোন করে দেয় স্টোরে। মিসেস দাতারের বাড়িতে হুইস্কি সাপ্লাই করা হয়েছে অমুক তারিখে। সে হুইস্কি কবেকার ইনডেণ্ট, কোন্ কোম্পানীর সাপ্লাই, সব খোঁজ-খবর নেওয়া হয়। হুলুস্থুল পড়ে যায় দোকানে। মিসেস দাতার আমাদের পুরোন কাস্টমার। ওয়ারের শুরু থেকেই তার বাড়িতে মাল যাচ্ছে, এরকম কম্‌প্লেন হওয়া অন্যায়। এমনি করে শুধু হুইস্কি নয়। সব কিছুই মিসেস দাতারের বাড়িতে স্বচ্ছল। সব কিছুই উদার। টাকার জন্যে চিন্তা নেই, শুধু পিওর মাল দরকার। পিওর মাল দাও, পেমেণ্ট দেব ক্যাশ। মিসেস দাতারের কাছে পেমেণ্টের জন্যে কেউ ভাবনা করে না। বিরাট মিলিটারি কণ্ট্রাক্টর। যুদ্ধ যদি চলে আরো কিছুদিন, মিসেস দাতার আরো উদার হবে, আরো সচ্ছল হবে। টি একটু বেশী বয়েল হয়ে গেলে মিসেস দাতারের মেজাজ বিগড়ে যায়। বলে—কী যে করে এরা সব, এখনও চা তৈরি করতে শিখলে না—

তারপর ডাকে—কেশব—

কেশব তখনও আছে। কেশবের পদমর্যাদা বেড়েছে মাইনে বেড়েছে এ-বাড়িতে। সে দৌড়ে এস বলে—কী মা?

লক্ষ্মীদি বিছানায় শুয়ে শুয়েই বলে—এ চা কে করেছে রে? এখনও চা করতে শেখেনি? আকবর বুঝি?

সামান্য একটু চা, সেই চা খারাপ হলেই লক্ষ্মীদির মাথায় এখন বজ্রাঘাত হয়। বজ্রাঘাত হয় বাড়ির বাবুর্চি, বয়, খানসামা চাকর—সকলের মাথায়। তারপর হুইস্কি, চা, সোডা, লেমনেড, ডিনার, ব্রেকফাস্ট—সব কিছুর দিকেই মিসেস দাতারের তীক্ষ্ণ নজর। মিস্টার দাতার চুপ করে থাকেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদেও এখন আরো জৌলুষ এসেছে। কোথা থেকে টাকা আসছে, কে টাকা জোগাচ্ছে, সব দেখতে পান। তাঁর নামেই কারবার। যে ফ্যাক্টরি তাঁর নেই, সেই ফ্যাক্টরি থেকেই লক্ষ-লক্ষ টাকার অর্ডার সাপ্লাই হচ্ছে। তিনিই চেক সই করছেন, তিনিই চেক রিসিভ করছেন। তিনিই সব। তাঁর নামেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট। লক্ষ্মীদি কেউ না, কিছু না। কিন্তু তবু যখন সুধাংশু আসে, বাড়ির সবাই তটস্থ হয়ে থাকে। সুধাংশুর হুইস্কিতে একটু সোডার প্রপোরশন কম হলে চলবে না, সুধাংশুর চায়ে একটু কম চিনি হলে চলবে না। সুধাংশুর জন্যেই এই বাড়ি, এই গাড়ি, এই ঐশ্বর্য, এই সুখ, এই টাকা, এই সব কিছু। সবাই টেবিলে বসে আছে, হঠাৎ খবর এল। সুধাংশুর গাড়ির হর্ন-এর শব্দ শুনেই সবাই বুঝতে পারে।

—কী হলো সুধাংশু, এত দেরি যে?

সকলেরই মুখ এই একটি মানুষের মুখের দিকে। এই একটি মানুষকে ঘিরেই সকলের সব উৎসব, সব আয়োজন।

—আর বলেন কেন মিসেস দাতার, এবার গভর্নমেণ্ট আমাকে খেয়ে ফেলবে। হোল্ সাউথ ইস্ট এশিয়ার সাপ্লাই সেণ্টার হয়ে গেছে আমাদের অফিসটা, কাজ করে করে আর পারছি না।

মিসেস দাতার বলে—সত্যিই তো, তুমি আর কতদিক সামলাবে, কিন্তু এ রকম করলে যে তোমার হেলথ ব্রেক করবে—আরো গোটা কয়েক অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অফিসার নাও—

সুধাংশু বলে—সে তো নিয়েছি, কিন্তু যেমন হয়েছে আমাদের রটন গভর্নমেণ্ট, তেমনি হয়েছে আমাদের রটন অ্যাসিস্ট্যাণ্টস্—কারোর যদি একটু বুদ্ধি থাকে—ওয়ান আউন্স অব ব্রেন থাকে—রটন্—রটন্—

মিসেস দাতার বলে—কেন, আজকেও বুঝি কনফারেন্স ছিল?

—কনফারেন্সের কথা ছেড়ে দিন মিসেস দাতার, এই মুসলিম লীগ মিনিস্ট্রি হয়েছে যেমন, তার মিনিস্টাররাও হয়েছে তেমনি—খাজা হাবিবুল্লার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আজ আমার মাথা ধরে গেছে। কিছু বোঝে না—ইংরিজী ভাবাটাও এরা ভালো করে শেখেনি, অথচ মিনিস্টার হয়েছে—।

তারপর হঠাৎ বললে—ভাবছি দিল্লীতে চলে যাবো—

দিল্লীতে! সবাই চমকে উঠলো। মিসেস দাতার বললে—দিল্লীতে?

সুধাংশু ততক্ষণে চায়ে চুমুক দিয়ে সিগ্রেট ধরিয়েছে। বললে—দিল্লীতে না গেলে কাজের বড় অসুবিধে হচ্ছে, বার বার দিল্লীতে যেতে-আসতে অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে, কেউ তো কিছু কাজ জানে না—সমস্ত রটন্ হয়ে গেছে, এ ওয়ার যে এরা কেমন করে জিতবে বুঝতে পারছি না—

চৌধুরীও এতক্ষণ সব শুনছিল। সে যেন আঁতকে উঠলো। বললে—ওয়ার কি শেষ হয়ে যাবে নাকি?

মিসেস দাতারও চমকে উঠলো। বললে—বলছো কী, সুধাংশু, ওয়ার শেষ হয়ে যাবে?

সুধাংশু চায়ে আর একবার চুমুক দিয়ে বললে—আমি যদি ঠিকমত সাপ্লাই না দিতে পারি তো ওয়ার তো শেষ হয়ে যাবেই—ওয়ার করবে সোলজাররা কী খেয়ে?

মিসেস দাতার বললে—না, না, সে কি? ওয়ার যেন শেষ করতে দিও না, আরো কয়েকটা বছর অন্ততঃ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া চাই—তুমি যে আমাকে ভয় পাইয়ে দিলে দেখছি সুধাংশু—

চৌধুরী বললে—আমিও ভয় পেয়ে গেছি তিনশো টাকা অ্যালাওয়েন্স হঠাৎ স্টপ হয়ে গেলে খাবো কী?

সুধাংশু বললে—সেই অবস্থাই হয়ে উঠেছে—কেউ কিছু কাজ করবে না, সবাই ডিস্-অনেস্ট হয়ে উঠেছে, কীসে আরো একস্ট্রা উপায় করবে তাই ভাবছে—সে গভর্নর থেকে আরম্ভ করে ডাউন টু মিনিস্টারস্—

মিস্টার দাতার এতক্ষণ শুনছিলেন সব কথা। বললেন—ওয়ার কি সত্যিই থেমে যাবে সুধাংশুবাবু?

সাধারণত এ-সব আলোচনার সময় মিস্টার দাতার কথা বলেন না। তিনি সেজেগুজে চুপ করে বসে থাকার দলে। কিন্তু তাঁকে কথা বলতে শুনে সুধাংশু একটু অবাক হলো। বললে—আপনার কিছু ভয় নেই মিস্টার দাতার—অন্তত আমি যতদিন সাপ্লাইতে আছি—

মিস্টার দাতার বললেন—না, আপনারা তো সেসব দিন দেখেননি সুধাংশুবাবু, ট্রেড-ডিপ্রেসনের ভিক্‌টিম যে আমি—অনেক ভুগেছি—তখন এখনকার মত ক্যাশে পেমেণ্ট হতো না তো—দু বছর তিন বছর পর্যন্ত ক্রেডিট পড়ে থাকতো পার্টির কাছে—

এমনি করেই প্রতিদিন এ-বাড়িতে আড্ডা হয়। বাইরে যখন ব্ল্যাক আউট, যখন মিলিটারী লরী রাস্তা কাঁপিয়ে লোক চাপা দিয়ে ছুটে বেড়ায়, বাইরে যখন যুদ্ধ কবে শেষ হবে তাই নিয়ে আলোচনা করে গৃহস্থেরা, তখন এখানে হুইস্কিতে ভেজাল হলে হুলস্থুলে পড়ে যায়, চায়ে চিনি কম হলে খানসামার চাকরি চলে যায়, তখন যুদ্ধ হঠাৎ শেষ হয়ে যাবে শুনলে সবাই চমকে ওঠে।

তারপর যখন রাত আরো গভীর হয়, এ-পাড়ার রাস্তায় মিলিটারি লরীর আওয়াজ আরো বাড়ে, তখন চলে তাস। দল বেঁধে তাস খেলা শুরু হয়। হুইস্কির বোতল খোলা হয় নতুন করে। সিগারেটের টিন খোলা হয় নতুন করে।

মিসেস দাতার সুধাংশুর হাতটা চেপে ধরে। বলে—আর খেও না সুধাংশু, এর পরে আর ড্রাইভ করতে পারবে না—

সুধাংশু হাসে। বলে—কী বলছেন মিসেস দাতার, আপনি আমাকে এখনও চিনলেন না—

মিসেস দাতার বলে—আর চিনে দরকার নেই তোমাকে—

সুধাংশু তবু হাসে। বলে—আপনি ভয় পাবেন না মিসেস দাতার, বর্ন ইন এইটিন এইট্টি অ্যান্ড স্টিল গোয়িং স্ট্রং—আমি খাঁটি স্কচ—ডাইরেক্ট ফ্রম ব্রুয়ারী, হোয়াইট হর্স—রেড লেবেল—ব্ল্যাক-মার্কেটে আমার দাম পঁচাত্তর টাকা পার বটল্—

মিসেস দাতার বলে—আস্তে, একটু আস্তে সুধাংশু—

সুধাংশু বলে—কেন, আস্তে কেন মিসেস দাতার, আমি কাউকে ভয় করি নাকি?

মিসেস দাতার বলে—পাশের ঘরে যে মানস আছে—

—মানস!

এতক্ষণ কারোরই খেয়াল ছিল না। সুধাংশু বললে—তা মানস কবে যাবে?

—কোথায় যাবে? ও তো আর কোথাও যেতে চাইছে না!

—পাঠিয়ে দিন! জোর করে পাঠিয়ে দিন আপনি। অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ যেখানে হোক পাঠিয়ে দিন। আমি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারি—

মিসেস দাতার বললে—কিন্তু এখন পাঠাই কী করে আমি? ওকে সেই যুদ্ধের মধ্যে পাঠিয়ে কি আমিই থাকতে পারবো?

সুধাংশু বললে—কিন্তু এখানে আপনার চোখের সামনে অত বড় ছেলে থাকলে ফুর্তি জমবে কী করে মিসেস দাতার? ছেলের সামনে কি ফুর্তি জমে? আপনিই বলুন?

ওদিকে ভেতরে মিস্টার দাতার নিজের বিছানার ওপর চিত হয়ে চুপ করে শুয়ে ছিলেন। অন্ধকার চারদিকে। মাঝে মাঝে অনেক দূরে থেকে অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফ্‌ট বন্দুকের আওয়াজ আসছে। হঠাৎ ঘরের ভেতরে কার পায়ের শব্দ পেয়েই চমকে উঠলেন।

—কে?

—এ কি, তুমি ঘুমোও নি এখনও? রাত তো অনেক হয়েছে, ঘুমিয়ে পড়। আবার তোমার শরীর খারাপ হবে দেখছি—

মিস্টার দাতার বললেন—তুমি ঘুমোবে না?

মিসেস দাতার বললে—আমি কী করে ঘুমোই, ওরা যে এখনও রয়েছে—

—ওরা কখন যাবে?

মিসেস দাতার বললে—তা ওরা না গেলে কি ওদের জোর করে তাড়িয়ে দেব বলতে চাও? তুমি যে কী বল তার ঠিক নেই। আমি কি ওদের চলে যেতে বলতে পারি?

—না, আমি কি তাই বলেছি? বলছিলুম যে ওদের কি ঘুমও পায় না?

—যাক, তোমার সংগে আমি আর তর্ক করতে পারি না।

দাতারবাবু কিছু বললেন না। খানিক চুপ করে রইলেন। তারপরে আবার বললেন—তুমি কি কোথাও বেরোচ্ছ নাকি এখন?

মিসেস দাতার শাড়ি বদলাচ্ছিল। বললে—হ্যাঁ, একটু মাঠের দিকে বেড়াতে যেতে বলছে সুধাংশু—

—তা বলে এত বাত্তিরে? এখন তো অনেক রাত!

মিসেস দাতার বললে—ওরা বায়না ধরেছে এখন, না গেলে চলে?

দাতারবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন—একটা কথা তোমাকে বলছিলুম—

—কী কথা বলো, আমার আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে, শিগগির বলো।

দাতারবাবু বললেন—আমাদের তো অনেক টাকা হয়ে গেল, সেদিন ব্যাঙ্কের পাশ-বইটা দেখছিলুম, আর এখন টাকার দরকারই বা কী!

—তুমি যে কী বলো! তোমার দেখছি মাথাটা এখনও ভাল করে সারেনি। টাকার
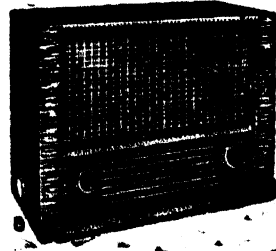
ষড়যন্ত্রকারের আবার শেষ আছে নাকি? যে-কষ্ট আমরা করেছি, তোমার মনে না-থাক, আমার তো মনে আছে। তুমি ঘুমোবার চেষ্টা কর দিকিনি। আমি চললুম—

দাতারবাবু আর কথা বললেন না। লক্ষ্মীদি নতুন শাড়িটা গায়ে জড়ালে। মুখে গালে, গলায় পাউডার, স্নো ঘষলে। তারপর বললে—মানস যদি ওঠে, তাহলে যেন বোল না আবার কোথায় গেছি আমি,—

—কখন আসবে?

—মানস টের পাবে না। মানস ঘুম থেকে ওঠবার আগেই আমি ফিরে আসবো—যাই, কেমন?

খানিক পরেই বাইরের রাস্তায় সুধাংশু-বাবুর গাড়ির ইঞ্জিনটা গর্জন করে উঠলো। হৈ হৈ শব্দ করতে করতে দল-বল বেরিয়ে গেল। দাতারবাবু শুনতে পেলেন লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে গিয়ে গাড়িটা জোরে জোরে হর্ন বাজাচ্ছে। বোধহয় গেটটা বন্ধ। সেই মাল-গাড়িটা এই সময়ে রোজ আসে। রোজ রাত্রে দাতারবাবু জেগে-জেগে মাল-গাড়ির শব্দটা শোনেন। প্রথমে ঝিক্-ঝিক্ ক্ষীণ শব্দ। তারপর শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়, আরও তীক্ষ্ম হয়। ক্রমে আরও স্পষ্ট, আরও তীক্ষ্ম। তারপর একেবারে হুড়মুড় করে এসে পড়ে বাড়িটার কাছাকাছি। তখন মাটি কাঁপে, বাড়িটাও কাঁপে। দাতারবাবুও থর থর কাঁপেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে। তাঁর মনে হয় আবার বুঝি তাঁর মাথার মধ্যে সমস্ত গোলমাল হয়ে যাবে আগেকার মত। একদিন টাকার অভাবে মাথাটা গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার টাকার প্রাচুর্যে সব গোলমাল হয়ে যাবে।

এমনি রোজ। রোজ রোজ এমনি করে বেরিয়ে যায় মিসেস দাতার শেষ রাত্রের দিকে। গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে গিয়ে সুধাংশুর গাড়িটার হর্ন বেজে ওঠে। অধৈর্য হয়ে ওঠে সুধাংশুর রক্ত। অধৈর্য হয়ে ওঠে রেড-লেভেল হুইস্কি। অধৈর্য হয়ে ওঠে উনিশ শো বিয়াল্লিশ সাল।

—কে?

সকাল বেলাই দীপংকর লক্ষ্মীদির বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে। দাতারবাবু সকাল বেলাই উঠে পড়েন। বললেন—তুমি অনেকদিন পরে যে এবার?

দীপংকর জিজ্ঞেস করলে—অফিস যাবার পথে একটা কথা বলতে এসেছিলাম, লক্ষ্মীদি কোথায়?

—তিনি তো এখনও ঘুমোচ্ছেন!

—সে কি? এখন তো সাড়ে ন'টা বাজছে—

দাতারবাবু বললেন—কাল ফিরতে অনেক রাত হয়েছে কি না, একটু বোস না, এই দশটার সময়ই উঠে পড়বেন—

পাশেই ছোট ছেলে একটি দাঁড়িয়ে ছিল। কী চমৎকার চেহারা। বছর চোদ্দ-পনেরো বয়েস হবে। এই চেহারাটাকেই যেন বহু দিন আগে ফ্রেমে আঁটা দেয়ালের ছবিতে ঝুলতে দেখেছিল। বললে—এই বুঝি আপনার ছেলে দাতারবাবু?

—হ্যাঁ, মানস!

এর চোখই সেদিন কথা বলেছিল মনে আছে। এই ছেলের জন্যেই লক্ষ্মীদি অপারগ হয়ে একদিন চৌরঙ্গীর রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষ ডেকে এনেছে নিজের বাড়িতে। এই ছেলের জন্যেই একদিন অনন্ত রাও ভাবের মাতলামি সহ্য করেছে। এই ছেলের জন্যেই আজ লক্ষ্মীদির বাড়িতে সুধাংশুর এত প্রতিপত্তি। এই ছেলের জন্যেই সুধাংশু আজ এ-বাড়িতে তার আনাগোনার অবাধ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। এই ছেলের জন্যেই আজ লক্ষ্মীদির এমন অবস্থা হয়েছে যে এখন সুধাংশুকে তাড়িয়ে দিলেও যাবে না। সে ছেলে এই! দীপংকর একদৃষ্টে দেখতে লাগলো মানসের দিকে চেয়ে। মনে হলো সেই লক্ষ্মীদির প্রথম যৌবনের সমস্ত সৌরভটুকু নিংড়ে নিয়ে যেন মানস-কমল হয়ে ফুটে উঠেছে মানস।

দীপংকর জিজ্ঞেস করলে—তোমার পরীক্ষা হয়ে গেছে? কী পরীক্ষা দিলে তুমি?

মানস মাথা নাড়লে। বললে—সিনীয়র কেম্ব্রিজ—

লজ্জা নেই, জড়তা নেই, সহজ সরলভাবে মুখের দিকে মুখ রেখে উত্তর দিলে মানস। লক্ষ্মীদির কলংকের ওপর সমস্ত পংকিলতা থেকে মুক্ত একটা স্বপ্ন। লক্ষ্মীদির স্বপ্ন, দাতারবাবুর স্বপ্ন। দীপংকর বললে—চমৎকার ছেলে আপনার দাতারবাবু, লক্ষ্মীদির মুখে নাম শুনে-ছিলাম, এখন দেখলাম—

তারপর একটু থেমে বললে—আপনি কেমন আছেন আজকাল?

দাতারবাবু বললেন—তুমি কেমন দেখছ আমাকে?

—খুব ভালো।

দাতারবাবু বললেন—তা হবে, হয়ত এত ভালো থাকাও ভাল নয় দীপুবাবু!

—কেন, একথা বলছেন কেন দাতারবাবু?

দাতারবাবু বললেন—তুমি তো জান একদিন অনেক অভাব ছিল আমার, টাকার অভাবের জন্য জেলে যেতে যেতে বেঁচে গিয়েছি। আজ আবার অনেক টাকার মুখ দেখেছি দীপুবাবু, এখন অনেক টাকা আমাদের। এই বাড়ি ঘর গাড়ি, সবই তো দেখতে পাচ্ছ! কিন্তু মনে হচ্ছে এত ভালো থাকাও হয়ত ভাল নয়—

কী কথা বলতে গিয়ে কী কথা বেরিয়ে গেল দাতারবাবুর মুখ দিয়ে, তা নিজেও তিনি বুঝতে পারেননি। কিন্তু দীপঙ্করই সামলে নিয়েছিল সেদিন। সেদিন আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবার প্রবৃত্তি হয়নি সেখানে। সেই ঐশ্বর্য যেন দীপঙ্করকে পীড়া দিচ্ছিল। সেই সাজানো-গোছানো বাড়ি, সেই শৌখিন ফার্নিচার, সেই বাবুর্চি, খানসামা, প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা জিনিস যেন দীপঙ্করের চোখে আঙুল দিয়ে বলছিল—কড়ি দিয়ে সব কেনা যায়, সব কেনা যায় কড়ি দিয়ে—

দাতারবাবু বলেছিলেন—সে কি, উঠছ কেন তুমি? তোমার লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা করবে না?

দীপঙ্কর বলেছিল—না দাতারবাবু, আমি আর থাকতে পারব না, আমাকে এখনি অফিসে যেতে হবে—। আমি আবার শীঘ্রি বদলি হয়ে যাচ্ছি কলকাতা থেকে—

—কোথায়?

দীপঙ্কর বললে—ময়মনসিংএ।

—কেন? হঠাৎ বদলি হবার কথা উঠলো কেন?

দীপঙ্কর বললে—ওই যে আপনি যা বললেন, আমারও তাই—এত বেশি ভালো হয়ত ভাল লাগছে না—

—তাহলে, তুমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে?

দীপঙ্কর বললে—কলকাতা শহরকে ভালবাসি বলেই কলকাতা ছেড়ে চলে যাব। কলকাতার সবটাই যেন বেশি-বেশি। এখানকার ভালোটাও বেশি, এখানকার খারাপটাও বেশি। এখানে পুণ্যও বেশি পাপও বেশি, এখানে টাকাটাও বেশি, টাকার অভাবটাও বেশি—এত বেশি-বেশিটা হয়ত ভালো লাগছে না—চেষ্টা করলে হয়ত ট্রান্সফারটা ঠেকিয়ে রাখা যেত। কিন্তু ভেবেছি সে-চেষ্টাও করবো না আমি!

দাতারবাবু বললেন—বোধহয় আমরাও কলকাতা ছেড়ে চলে যাবো দীপুবাবু।

তোমার লক্ষ্মীদি বলছিল—

—আপনারাও যাবেন? কেন? হঠাৎ?

দাতারবাবু বললেন—সুধাংশুবাবু ট্রান্সফার নিয়ে চলে যাচ্ছেন দিল্লিতে, তাই আমরাও যাচ্ছি, দিল্লিতে আরও বেশি কনট্র্যাক্ট, আরও বেশি পারমিট পাওয়া যায়—আর সুধাংশুবাবুই যে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের সিনীয়র সেক্রেটারী, ও'র হাতেই তো সব। ও'কে বাদ দিয়ে ওয়ার-মিনিস্ট্রিই অচল হয়ে পড়বে যে। ও'র কাছাকাছি থাকাই তো ব্যবসার পক্ষে ভাল!

দীপঙ্কর বললে—আচ্ছা তাহলে এখন চলি, আর দেরি করলে অফিসের দেরি হয়ে যাবে আবার—একটা কথা শুধু বলে দেবেন লক্ষ্মীদিকে লক্ষ্মীদির বাবা মারা গেছেন—

—সে কি? ভুবনেশ্বরবাবু? কবে? কে বললে তোমাকে?

দীপঙ্কর বললে—কেউ বলেনি, আমি বার্মা ইভাকুয়ীজ অফিস থেকে খবর পেয়েছি। হয়ত লক্ষ্মীদির এ-খবর শুনে কিছু মনে হবে না, কিন্তু তবু খবরটা দেওয়া কর্তব্য মনে করে দিয়ে গেলাম। খবরটা শুনে যার সবচেয়ে কষ্ট হবে সেই সতীই খবরটা এখনও জানে না—তাকেও খবরটা দিতে হবে! আমি চললুম, আপনি বলবেন, আমি এসেছিলুম—

আর কিছুক্ষণ থাকলেই হয়ত সেদিন লক্ষ্মীদিকে খবরটা মুখোমুখি দেওয়া যেত, কিন্তু দীপঙ্করের যেন মনে হয়েছিল সত্যিই এ-সব ভাল নয়। লক্ষ্মীদি সুখী হয়েছে হোক, কিন্তু কোন্ মূল্যে? সততার মূল্য, আন্তরিকতার মূল্য, সত্যের মূল্য দিয়ে যা পাওয়া নয়, তাকে দীপঙ্করের বড় ভয়। সে-পাওয়া তো ক্ষণিক পাওয়া। সে-পাওয়া তো পাওয়ার প্রবঞ্চনা। তার চেয়ে সতীই ভালো। সতী পায়নি, কিন্তু না-পাওয়ার পরিতৃপ্তি দিয়ে নিজেকে তো প্রবঞ্চনা করেনি লক্ষ্মীদির মত!

সেদিন অফিসে যাবার আগেই মনে মনে অনেক পরিকল্পনা করে গিয়েছিল দীপঙ্কর। অনেকগুলো কাজ ছিল মাথায়।

প্রত্যেক দিন ফাইলের স্তূপের মধ্যে সে-কাজগুলো হারিয়ে যেত। লক্ষ্মীদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে মনে মনে সংকল্প স্থির করে নিলে। প্রথমেই লক্ষ্মণ সরকারের খবর নিতে হবে। গাঙ্গুলীবাবুর লিভ্-ভেকেন্সিতে লক্ষ্মণ সরকার ঢুকেছে অফিসে সেই গাঙ্গুলীবাবুরই বা কী খবর। এতদিন কাশ্মীরে গেছে। একটা খবরও দেয়নি। টাকার দরকার হলেও লিখে জানাবার কথা ছিল। হাওড়া স্টেশনের প্লাটফরমের উপর দাঁড়িয়ে দীপংকর ভাল করে বলে দিয়েছিল—টাকার দরকার হলেই আমাকে জানাবেন চিঠি দিয়ে, লজ্জা করবেন না যেন—

দীপংকর আরো বলেছিল—আপনার স্ত্রী যা খুশি কিনতে চাইলে টাকার জন্যে যেন বারণ করবেন না—

গাঙ্গুলীবাবুর সেই মুখখানার কথাও বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠতো। কার কথাই বা ভেসে উঠতো না দীপংকরের মনে! শুধু কি লক্ষণ সরকার? শুধু কি গাঙুলীবাবু? আরো কত লোক আছে দীপংকরের চারপাশে! ক্ষীরোদা। ক্ষীরোদার শান্ত নির্বাক মূর্তিটা বাড়িতে থাকলেই চোখে পড়তো। আগে যাও বা একটু কথা বলতো, সন্তোষকাকার মৃত্যুর পর তাও বলতো না। মৃন্ময়ী যেন একেবারে পাথরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

কাশী এসে সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল—দাদাবাবু?

—কী রে কাশী? কিছু বলবি?

—আমরা কলকাতা ছেড়ে বদলি হয়ে যাচ্ছি নাকি? কবে যাবো?

—তোকে কে বললে?

—আপনিই তো বলছিলেন সেদিন। আমি দিদিমণিকে তাই বলছিলাম। শুনে দিদিমণি খুব ভয় পেয়ে গেল!

দীপংকর জিজ্ঞেস করলেন—কেন, ভয় পেয়ে গেল কেন দিদিমণি?

কাশী বললে—তা জানি না—

তারপর একটু থেমে কাশী আবার বললে—দিদিমণির বিয়ে হবে না দাদাবাবু?

বিয়ে! দীপংকর চমকে উঠলো। বললে—দিদিমণির বিয়ের কথা তোকে কে জিজ্ঞেস করলে? দিদিমণি নিজে?

কাশী তখন ভয় পেয়ে গেছে। বললে—না, দিদিমণি কিছু বলেনি, আমি নিজের থেকেই বলছি—

কাশী আর এ সম্বন্ধে কথা বাড়ালে না। আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে চলে গেল। দীপংকর আর কিছু বলেনি সেদিন। এ সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি কোনওদিন। কিন্তু কাশীর কথাতেই যেন খোঁচাটা আবার নতুন করে বুকে গিয়ে ঠেকলো। একটা হাহাকার বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস হয়ে। যেন একটা মহা অপরাধ দীপংকরের কাঁধের ওপর চাপিয়ে গেছে সন্তোষকাকা। সন্তোষকাকা তার কেউই নয়—কিন্তু কেউ না হয়েও সন্তোষকাকা যেন অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসে আছে দিনরাত। দয়া যেন দায়িত্বে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে আজ!

আরো মনে আছে সেদিন রাত্রেই সদর দরজার কড়া নাড়ানাড়িতে দীপংকর সচকিত হয়ে উঠেছিল। কে? এত রাত্রে কে কড়া নাড়ে?

কাশী দৌড়তে দৌড়তে ওপরে উঠে এসেছিল। হাঁফাচ্ছিল তখনও। বললে—দাদাবাবু, গোরা পুলিস এসেছে—

—গোরা পুলিস?

দীপংকর তাড়াতাড়ি নিচেয় গিয়ে দেখে-ছিল দু'জন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট সাদা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। এ রকম পুলিসের মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতা আছে দীপংকরের। রায় বাহাদুর মজুমদারের বীভৎস মূর্তিটাও মনে আছে। কিন্তু তখন যুদ্ধের সময় নয়। তখন ডিফেন্স-অব-ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট হয়নি। আজ নতুন করে দীপংকরের সমস্ত মুখে ভয়ের ছায়া ফুটে উঠলো। ভয় নিজের জন্যে নয়, যতটা আর একজনের জন্যে!

দীপংকর বললে—আমিই দীপংকর সেন—

—কিরণ চ্যাটার্জিকে আপনি চেনেন?

দীপংকর বললে—হ্যাঁ—আমি চিনি, তার মা'কেও আমি চিনি। আমরা ক্লাশফ্রেণ্ড—। ছোটবেলার বন্ধু আমার কিরণ।

—তার বাড়ি আপনি চেনেন?

—চিনি। প্রত্যেক মাসে আমি তার মার সঙ্গে দু'একবার করে দেখা করে আসি—

—হোয়াই?

দীপংকর বললে—তার মাদার খুব গরীব। তার মা'কে আমি মাসে মাসে কুড়ি টাকা করে চ্যারিটি করি।

—কিরণ লাস্ট ওয়ান-ইয়ারের মধ্যে আপনার এ-বাড়িতে কখনও এসেছিল?

দীপংকর তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে পুলিস দু'জনের দিকে চেয়ে রইল। যেন তারা তার মুখের দিকে চেয়ে তার সততার পরীক্ষা করছে। যেন দীপংকরের সততার ওপর কিরণের নিরাপত্তা নির্ভর করছে। দীপংকরের একটা উত্তরের ওপর কিরণের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। হঠাৎ দীপংকরের চোখের সামনে কিরণের নির্ভীক চেহারাটা ভেসে উঠলো। কিরণ যেন বললে—সত্যি কথা বল্, সত্যি কথা বল্ তুই—দীপু, প্রাণমথবাবুকে মনে করে দেখ, কখনও মিথ্যে কথা বলবি না প্রতিজ্ঞা করেছিস। তাতে আমার যা হয় হোক—

পুলিস আবার প্রশ্ন করলে—বলুন, বলুন, কখনও এসেছিল কিনা কিরণ চ্যাটার্জি?

(ক্রমশ)

উপন্যাস

জল পড়ে পাতা নড়ে। গৌরকিশোর ঘোষ। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। মূল্য আট টাকা।

ভূমিকাতেই লেখক জানিয়েছেন এই উপন্যাসটি তাঁর "দেশ মাটি মানুষ" নামক এপিক উপন্যাসের প্রথম খন্ড। এপিক উপন্যাস নামে উপন্যাসের কোনো স্বতন্ত্র বিভাগ স্বীকার করা যায় না। অনেক সময় উপন্যাস রচিত হবার পর সাফল্যে তা প্রায় এপিকের মর্যাদা পায়। অতএব, লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত এই শব্দটি থেকে তাঁর বাসনার আভাসই পাওয়া যেতে পারে মাত্র, আলোচ্য উপন্যাসের দোষগুণ বিচারে ঐ শব্দটির কোনো প্রভাব না থাকাই শ্রেয়।

তাহলে বাকি থাকে উপন্যাস। ১৯২২ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত উপন্যাসের ঘটনাকাল। অকুস্থল—যশোহর জেলার দুটি প্রায় প্রতিবেশী গ্রাম। এই দুটো গাঁয়ের মধ্যে যোগসূত্র—দেওয়ানবাড়ির মেজ-কর্তার মেয়ে গিরিবালার বিয়ে হয়েছে ঝিনেদার ভূষণের সঙ্গে। সন্তানসম্ভাবনা হয়ে গিরিবালা পিত্রালয়ে এসেছে। তারপর স্বামীগৃহে ফিরে এসেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের ঘটনাস্থলেরও পরিবর্তন হয়েছে। উপন্যাসের ঘটনাকালের প্রথম বছরটি কেটেছে গিরিবালার পিতৃভবনে, বাকি তিনটি বছর কেটেছে তার শ্বশুরালয়ে।

এই স্থান-পরিবর্তন কেন তার কোনো ব্যাখ্যা উপন্যাসটি থেকে মিললো না। দেওয়ানবাড়ির কাহিনী (দুরন্ত ধারা) তিন ভাই-এর একটি সামন্ততান্ত্রিক যৌথ পরিবারের কাহিনী। গিরিবালার শ্বশুর-বাড়ির কাহিনীও (হাওয়া এলোমেলো) চারভাইয়ের একটি যৌথ পরিবারের কাহিনী। চাকরি সূত্রে উভয় পরিবারের দু' এক ভাই বাস্তুচ্যুত। মেজকর্তা বৈজ্ঞানিক শিক্ষার ভিত্তিতে দেশের মন তৈরি করাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম শর্ত মনে করেন। ভূষণের অনুপস্থিত সেজ ভাই নিজে হাতে-কলমে জাতীয় শিল্পের প্রসারসাধনে নেমেছেন। সুতরাং এই দুটি পরিবারের স্বতন্ত্র কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি নেই বলে মনে হয়। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষনীয়, কাহিনীর স্থান-পরিবর্তন হয়েছে গিরিবালার স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে। গিরি-বালার স্থানান্তরের কারণ তার পুত্র শঙ্খ। উপন্যাস শেষও হয়েছে শঙ্খসহ ভূষণ-গিরিবালায় শ্রীহট্ট যাত্রায়। তা-ছাড়াও গ্রন্থমধ্যে পুনঃ পুনঃ লেখক শঙ্খকে স্বতন্ত্র ও প্রত্যক্ষভাবে এনেছেন। বস্তুত উপন্যাসের কাহিনী-অংশের কেন্দ্র শঙ্খ—যদিও কেন্দ্রস্থ শঙ্খর চরিত্র নেই। তাই অনুমান করি, পরবর্তী খণ্ডগুলি সহ তাঁর সমগ্র উপ-ন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হবে হয়তো এই শঙ্খ। সে-কারণেই এই উপন্যাসেও তার এতো মূল্য। এ-অনুমান সত্য হলে অবশ্য লেখকের নির্দেশমতো এই প্রথম খণ্ডকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ বলে ধরা যায় না।

এ-তো গেল কাহিনীর কথা। বিষয়গত ভাবে উপন্যাসের ঘটনাকালকে বিচার করলে দেখা যাবে ১৯২২-এর হিন্দু-মুসলেম প্যাক্টের (পৃঃ ৬৮) সময় থেকে উপন্যাসের শুরু, ১৯২৬-এ দেশবন্ধুর মৃত্যুতে উপন্যাসের শেষ। গান্ধীজীর নেতৃত্বে প্রথম আন্দোলনের পর প্রধানত সমগ্র উত্তরভারত জুড়ে স্বরাজ্য পার্টির নেতৃত্বে যে নতুন ধরনের পার্লামেন্ট-মুখী স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলো— আলোচ্য উপন্যাসে—তারই সঙ্গে গার্হস্থ্য ঘটনার সেতুবন্ধ রচনা করেছেন লেখক। এই চেষ্টাই অভিনন্দনযোগ্য। আমাদের অনেক লেখক-ই যখন চিন্তামূলক উপন্যাসের

ন্যায়িত্ববহনে অক্ষম হয়ে 'র রচনা' নামক ন্যায়িত্বহীন রচনায় হাত দিয়েছেন, তখন এককালের অতিখ্যাত রম্য-রচনাকারের এইপ্রকার একটি উপন্যাস লেখবার চেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। উপন্যাসটিতে প্রচুর সাধারণ মানুষ এসেছেন। লেখকের বর্ণনাশক্তির গুণে তাঁরা জীবন্ত-ও হয়েছেন। কিন্তু এঁরা বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত পরিচিত। অথচ এই পরিচিত গ্রামবাংলায় মানুষগুলিকে ইতিহাসের বিশেষ অংশের অন্তর্ভুক্ত করে কেউ দেখান নি। লেখক সমসাময়িক ইতি-হাসকে নানাসূত্রে ব্যাখ্যা করেছেন। মেজবাবুর মুখ দিয়ে ও চিন্তা দিয়ে আমরা ধারবার একটি উদারনৈতিক ব্যাখ্যা পেয়েছি। কিন্তু তবু ইতিহাসের যে বিশেষ কালটি উপন্যাসের ভিত্তি তা মেজবাবু ও সুধাময়কেও ছাড়িয়ে বুদো ভুঁয়ে, সরকার মশায়, স্যান কবিরাজ, গোপাল বিশ্বাস সফীকুল—এঁদের-কে যদি অন্তর্গত করে না নেয়, তবে এ উপন্যাসও গ্রাম বাংলাকে নিয়ে লেখা আরো অনেক "বাস্তববাদী উপন্যাসের" নামান্তর মাত্র হবে. বস্তুতার মূল রহস্য যেখানে সেই ইতিহাস-গত বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

লেখক নিজেও এ-বিষয়ে সচেতন। তাই এতো মানুষের চরিত্র আঁকতে গিয়ে বা সুখ দুঃখ হাসি কান্নার এত ঘটনা লিখতে গিয়েও তিনি কোথাও আটকে যান নি, বা কোনো চরিত্রের মোহে পড়েন নি, বা কোনো ঘটনায় জড়িয়ে যান নি। তাঁর এই নিরাসক্তি আছে বলেই আশা করি তাঁর সবকটি খণ্ড প্রকাশ হবার পর একটি সর্বাঙ্গ সার্থক উপন্যাস আমরা পাবো।

সেই আশাতেই নিবেদন করছি—ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখক-কে আরো একটু সবাধানী হতে। অতি-চর্চিত ভাষায় যেন উপন্যাসের গতি ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি অতি-সাধারণ ভাষাতেও হয়। পরন্তু যশোহরের বিশিষ্ট বাক্‌রীতি যখন এ-উপন্যাসের সংলাপের মাধ্যম, তখন, লেখকের মাধ্যম বিশিষ্ট হওয়া প্রয়োজন, নইলে সমস্ত উপন্যাসটির মধ্যেই আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ গন্ধ লেগে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—'ছ্যাপ' কথাটি বহুবার ব্যবহার করা হয়েছে। একবার স্মৃতিকে কচুরিপানার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ-রকম আরো অনেক আপাত চমকপ্রদ শব্দ বা বাক্য-প্রয়োগ আছে—যা ফলত উপন্যাসের রস-গ্রহণের বাধা সৃষ্টি করে।

কয়েকটি বিশেষ বর্ণনার প্রশংসা করতে হয়। শংখর জন্ম একটি অত্যন্ত উল্লেখ-যোগ্য অংশ। অতি সামান্য অংশ হলেও রচনাগুণে ভক্ত-ঘোষের সরকারী রিপোর্ট ও ছোটকর্তার আগমনের পর নরার পলায়ন অতি উপভোগ্য। এমন ছোট-বড়ো আরো নানা অংশ উপন্যাসটিতে ছড়িয়ে আছে।

এই রকম একটি প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। ৮০।৬১

আমি সিরাজের বেগম—শ্রীপারাবত—কিশোর লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড। ২৭, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম তিন টাকা মাত্র।

আলোচ্য পুস্তকখানি উপন্যাস এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তরালে যে পারি-বারিক কাহিনী আছে, তাহাকেই এখানে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। নবাব আলিবর্দির দৌহিত্র সিরাজ এবং সিরাজের অন্যতমা বেগম লুৎফার ভূমিকা এই গ্রন্থে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। পার্শ্বচরিত্রে আলিবর্দি দুহিতা আমিনা বেগম (সিরাজের মাতা) এবং ঘষেটি বেগমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলিবর্দির মৃত্যুর পরে সিরাজের সিংহাসন প্রাপ্তি এবং অচিরেই তাঁহার পতন ও হত্যা ঐতিহাসিক সত্য এবং ইহার প্রত্যক্ষ কারণ সিরাজের উচ্ছৃংখলতা, নৃশংসতা, চরিত্র-হীনতা ও অযোগ্যতা। পরোক্ষ কারণের মধ্যে চরিত্রহীনা সিরাজের মাতা আমিনা বেগম এবং আমিনা বেগমের ভগ্নি

দুশ্চরিত্রা ঘষেটি বেগমের যোগসাজসে সিরাজের পারিষদবর্গের কূট-চক্রান্ত। একান্ত সত্যনিষ্ঠ, আদর্শ-চরিত্র লুৎফার বুদ্ধিমত্তা বহুক্ষেত্রে সিরাজকে রক্ষা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, কিন্তু শেষরক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছে। পারিবারিক চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে লেখক মোটা-মুটি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ভাষা সহজ সরল এবং সাবলীল।

৫৬।৬১

পত্রিকা (রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষ সংখ্যা)

উত্তরসূরী। সম্পাদক: অরুণ ভট্টাচার্য। ৯-বি-৮, কালীচরণ ঘোষ রোড; কলকাতা—৫০। দাম—দু' টাকা।

সাহিত্যপত্রিকা-জগতে 'উত্তরসূরী' একটি বিশিষ্ট নাম। এর অন্যান্য সংখ্যার মত আলোচ্য সংখ্যাটিও স্বকীয়তায় ভাস্বর। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত দুটি চিত্রের প্রতিলিপি, সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কয়েকটি চিঠি, একটি রবীন্দ্র-সংগীতের অপ্রকাশিত স্বরলিপি এবং ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর শেষ রচনা 'রবিকাকা ও সবুজপত্র' এই সংখ্যাটিকে মূল্যবান করে তুলেছে। এ ছাড়াও, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখের কবিতা এবং কানাই সামন্ত, অরবিন্দ পোদ্দার, অমলেন্দু বসু, অন্নদাশংকর রায় ও বিনয় ঘোষ প্রমুখের প্রবন্ধ এ সংখ্যার উল্লেখযোগ্য রচনা।

গণবার্তা। সম্পাদক: বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৩৭ রিপন স্ট্রীট; কলকাতা—১৬। দাম—তিন টাকা।

"গণবার্তা"র এই রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষ সংখ্যাটিতে রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, ছবি প্রভৃতির ওপর লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ, কয়েকটি কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত দুটি চিত্রের প্রতিলিপি স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই সুলিখিত।

মানস। সম্পাদক: রবি রায়। ৬৪, বহুবাজার স্ট্রীট; কলকাতা—১২। দাম—এক টাকা।

অভিনব প্রচ্ছদে মোড়া আলোচ্য সংখ্যাটি গুটি কয় প্রবন্ধ এবং কবিতার একটি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন সংকলন। সংগতভাবেই আশা করা যায়, সাহিত্যপত্রিকানুরাগীদের এটি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হবে।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় "সন্দেশ" পত্রিকার বিজ্ঞাপনে বার্ষিক চাঁদা ৯, পড়িতে হইবে।

ট্রামেবাসে

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, শিক্ষার কার্যক্রমে কোন পরিবর্তন বা ছাটাই চলিবে না; কারণ উহাই সমুদয় প্রগতির মূলে রহিয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"উত্তম কথা। তবে প্রকাশ থাকে যে, টালবাহানা করিয়া সময় মত হিসাব প্রস্তুত না করিলেও চলিবে এবং তাহাতে শিক্ষকদের আর্থিক বিপর্যয় দেখা দিলেও চলিবে, যেমন চলিতেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের টালবাহানায় প্রায় তিন হাজার শিক্ষকের দুর্গতি!!"

কর্পোরেশনের বহু সংখ্যক পদ দীর্ঘকাল যাবত শূন্য রহিয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। শ্যামলাল বলিল—"শুধু কর্পোরেশনের আত্মীয় কুটুম্বের এমন নিদারুণ অভাবের কথা কোথাও পাঠ করিনি!!"

বিদ্যুৎ সরবরাহ অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে দুর্গাপুরে এ আই সি সির অধিবেশনস্থল কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়।—"এ রকম অন্ধকারের একটা সুবিধের দিক আছে: টের পাওয়া যায় না অন্ধকারে মহাঘোরে কে
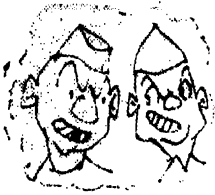
কাহারে ভেংচি মারে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী!

ভারত সরকার নাকি "জনতা মোটর" চালু করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।—"আহারের সুব্যবস্থা যখন করা গেল না, তখন ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের জন্য যৎসামান্য হাওয়ার ব্যবস্থা করিতেই হয়"—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

সমস্যা ও সমাধান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—সমস্যার সম্মুখীন হইলে ফরাসীরা সরকার পরিবর্তন করে, ইংরেজেরা উচ্চহারে কর দেয়, মার্কিনীরা

পুরনো মোটর নতুনের সঙ্গে বদল করে আর রুশরা প্রচারের ধারা বদল করে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আর ভারত চুটিয়ে বক্তৃতা দেয়, খালি বক্তৃতা, আবার বক্তৃতা।"

উত্তর প্রদেশের জনৈক কয়েদী কাজ না করিয়া শুধু গান গাহিয়াছিল বলিয়া শাস্তি পাইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"নিশ্চয়ই গানটা ছিল আধুনিক। তা নইলে লঘুপাপে সাজা দেবার মতো নিরেট তো সরকার নন।"

সংবাদে শুনিলাম তিনশত বৎসরের একটি পুরাতন তালপত্রের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে এবং রাজা মহেন্দ্র ইহার মধ্যে আয়ু বৃদ্ধির রহস্য আবিষ্কারে ব্যস্ত আছেন। খুড়ো বলিলেন—"ব্যক্তিগত মানুষের আয়ুর সঙ্গে রাজতন্ত্রের আয়ুর রহস্য উদ্ধারও এই পাণ্ডুলিপি থেকে করা যাবে কি না তাই ভাবছি!!"

সদুপুর গভর্নমেণ্ট কলোনীর সংবাদে শুনিলাম সেখানে ছাগলে একটি লংকা গাছ খাওয়াতে দুই দলে সংঘর্ষ হয় এবং ফলে একজন খুন ও দুইজন আহত হয়। "একেই বুঝি বলে লংকাকাণ্ড" বলেন জনৈক সহযাত্রী।

সত্যজিৎ রায়ের "তিন কন্যার" মধ্যে লণ্ডনে নাকি মাত্র দুই কন্যা দেখান হইয়াছে। সেখানকার প্রবাসী ভারতীয়রা আর এক কন্যার কী হইল তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। আমাদের সহযাত্রীই জবাব দিলেন—"আর এক কন্যা গোসা করে বাপের বাড়ি যান!!"

দক্ষিণ আফ্রিকায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উৎসব উপলক্ষে আফ্রিকানরা ৬০ টন মাংস আহার করিয়াছে এবং বিয়ার পান করিয়াছে ৬ হাজার টন।—

"সাধারণতন্ত্র এমনি করেই অসাধারণতন্ত্র হয়ে ওঠে" বলে আমাদের শ্যামলাল।

সংবাদে প্রকাশ, পাতিয়ালার ন্যাশনাল স্পোর্টস ইনস্টিটিউটে প্রখ্যাত বৃটিশ ফুটবল শিক্ষক হিসাবে বিলি রাইটকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।—"এখন কোন লেফট-এর দিক থেকে কোন দাবী না উঠিলেই হয়"—বলেন বিশু খুড়ো।

কলিকাতায় স্টেডিয়াম নির্মানের জন্য ইতালিয়ান স্থপতিকে যতশীঘ্র সম্ভব কলিকাতায় চলিয়া আসিবার জন্য সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।—"তা আসুন তাড়াতাড়ি ক্ষতি নেই। কিন্তু মনে রাখবেন রোম গিয়ে আমরা রোমবাসীর মত ব্যবহার করি। সুতরাং আশা করব স্থপতি স্টেডিয়াম নির্মানে কলকাতা এসে কলকাতাবাসীর মতো ব্যবহার করবেন অর্থাৎ চলবেন গদাই লস্করী চালে"—এ মন্তব্যও খুড়োর।

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

বি এন রায় প্রোডাকশন্সের সদ্যোমুক্ত "ঝিন্দের বন্দী"-র একটি মনোরম দৃশ্যে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নায়কবেশী উত্তমকুমার

বাংলা ছবির গান

বাংলা ছবির স্বর্ণযুগ শুরু হয়ে গেছে কিনা, তা নিয়ে হয়ত মতান্তরের অবকাশ আছে। কিন্তু বাংলা ছবি যে ক্রমবিবর্তনের একটি সার্থক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তা নিয়ে আর কারোরই দ্বিমত নেই। অথচ এই শিল্প-সার্থকতা প্রত্যক্ষ করেও আমরা জোর করে বলতে পারছি না যে, বাংলা ছায়া-ছবি সর্বঅংগে ও সর্বরূপে নিষ্কলুষ আত্মশুদ্ধি অর্জন করেছে। বিগত দিনের অচল, অনড় রূপ-রীতির নাগপাশ থেকে আধুনিক বাংলা চলচ্চিত্র নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণ মুক্ত করে নিয়েছে। কিন্তু সেই সংগে আধুনিকতার উগ্র মাদকরসে মত্ত হয়ে অতীতের অনেক সম্পদকেও অবহেলায় বিসর্জন দিয়েছে। অতীতে যা ছিল রসসমৃদ্ধ, বর্তমানে তা-ই নীরস হয়ে উঠেছে এবং রসিকজনকে নিয়ত পীড়া দিচ্ছে। এই ব্যর্থতা অপরিণত ও অক্ষম হাতে দায়িত্বভার অর্পণেরই বিষফল—যা দিনে দিনেই আধুনিক বাংলা ছবিতেও উৎকট হয়ে দেখা দিচ্ছে।

এই প্রসংগে আধুনিক বাংলা ছায়াছবির গানের কথাই প্রথমে মনে জাগে। বাংলা ছবিতে গান আগেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু এখনকার কোন বাংলা ছবির গান রসিকচিত্তকে তেমন করে অভিভূত করে তুলতে পারে না কেন? এর উত্তরে প্রথমেই বলতে হয়, তখনকার ছায়াছবির জন্য যাঁরা গান রচনা করতেন, তাঁরা ছিলেন স্বভাব-কবি। অন্তরের কোন বিশেষ অনুভূতি, মানব-হৃদয়ের বেদনা, আনন্দ ও আকূতিকে কথা ও ছন্দে বাঙ্ময় করে তোলার এক বিশুদ্ধ প্রেরণায় তাঁরা গান রচনা করতেন। সেই সব গান ছায়াছবিতে আবেগ সঞ্চার করত, দর্শকের মনকে ভাবে ও রসে আপ্লুত করে তুলত। তারপর সে-সব গানই জনপ্রিয় হয়ে লোকের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ত।

আর আজকাল? অতি আধুনিক কালে ছায়াছবির জন্য যাঁরা গান লেখেন, তাঁদের গীতিকবি অবশ্য বাধ্য হয়েই বলতে হয়। কিন্তু তাঁরা যেন ছায়াছবির যে-কোন একজন কলাকুশলীর মত। একটি বিশেষ কলাকৌশলেই যেন তাঁরা নিজেদের তৈরী করে তুলেছেন। ফরমাশী গান লেখাই যেন তাঁদের কাজ। আজকের ছায়াছবির এই সব গীতিকাররা প্রত্যেকেই বিশেষ কোন জনপ্রিয় সংগীত-পরিচালকদের অনুগ্রহ-ভাজন। সংগীত-পরিচালক একটি গানের সুর ভাঁজলেন, আর গীতিকার সংগে সংগে সেই সুরের তালে তালে একটি গান রচনা করে দিলেন। সেই গানের কথায় সাহিত্য-রস বা প্রসাদগুণ না-ই বা থাকল। ভাবরস তো দূরের কথা। একটি "হিট" গান পরিবেশনের "মহৎ" প্রয়াসে সংগীত-

পরিচালক গানটিতে এমন সুর আরোপ করলেন, যা শ্রোতাদের কাছে খুব চেনা-চেনা ঠেকবে। যেন এই সুর তাঁরা কবে শুনেছেন। তার কারণ আর কিছুই নয়। সঙ্গীত-পরিচালক তাঁর পুরনো কোন "হিট" গানের সুরকেই অদলবদল করে নতুন গানে আবার নতুন করে ঢেলেছেন। আর তা না হলে অন্য সুরকারের "হিট" গান তো আছেই।

মূল কথা, "প্রোফেশন্যাল" গীতিকবি ও "হিট"-গাননিষ্ঠ সঙ্গীত-পরিচালকরা তাঁদের যুগ্ম-প্রয়াসে যেসব গান নিবেদন করছেন, কথা ও সুরে তা আর রসজ্ঞ ব্যক্তিদের আনন্দ দিতে পারছে না। আধুনিক বাংলা ছবির এই দৈন্য দূর করার উপায়গুলি চিত্রপ্রযোজক ও পরিচালকদের ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদের মত গীতিকার যে-দেশে জন্মেছেন, সে-দেশে চলচ্চিত্রের উপযোগী সুন্দর গীতি-কবিতার অভাব ঘটতে পারে, এ-কথা ভাবাটাও অন্যায়।

ফিল্ম এণ্টারপ্রাইজার্সের নতুন ছবি "দুই ভাই"-য়ের একটি নাটকীয় মুহূর্তে সুলতা চৌধুরী ও উত্তমকুমার

আর রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদের গান বাদেও যে বাংলা ছবিতে রসমধুর গীতি-কবিতার সন্ধান কোনদিন মেলেনি, তা নয়। অতীতেও মিলেছে, বর্তমানেও মিলছে। "মুক্তি" ছবির "ওগো সুন্দর মনের গহনে তোমারি মুরতিখানি" গানটি বাংলার রসিক জনসাধারণ আজও ভুলতে পারেননি। অতি-আধুনিক কালের একাধিক ছবির জন্যও সুসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র যে-সব গান লিখেছেন, সেগুলিও বিদগ্ধ-জনকে মুগ্ধ করেছে।

যে-সব সাহিত্যিক বাংলা ছবির জন্য গান রচনা করেছেন, তাঁরাও রবীন্দ্রোত্তর যুগেরই লেখক। রবীন্দ্র-কাব্যের প্রভাব থেকে তাঁদের গীতি-কবিতাও হয়ত সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। কিন্তু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ও ভাবের আবেদনে তাঁদের কবিতা রসপিপাসুদের কম আনন্দ দেয়নি। আজকের বাংলা ছবির জন্য যে-সব গীতি-কবিতা লেখা হচ্ছে, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্র-কবিতার নির্লজ্জ অনুকরণ-রূপেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে। নতুবা অর্থহীন ভাষা ও অস্পষ্ট ভাবে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। এবং এই সব গানে যখন হিন্দী গান অথবা "রক-এন-রোল"-এর অনুকরণে হাল্কা সুর—অনেক ক্ষেত্রে যা সুরারোপিত আবৃত্তি-প্রতিম—সংযোজিত হয়, তখন রসজ্ঞ শ্রোতার বিরক্তিও চরমে ওঠে।

যে-সব গীতিকবি ও সুরকারদের কথা বলা হল, তাঁরা বাংলা ছবি ছেড়ে চলে যান, এটা কারোরই কাম্য নয়। বরঞ্চ তাঁরা তাঁদের শিল্প-দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হোন, এটাই সকলের কাম্য। এবং বাংলা ছবির এই অন্যতম দুর্লক্ষণ অবসানকল্পে গান

রচনার জন্য রসসিদ্ধ সাহিত্যিকদের অবদানকে সশ্রদ্ধ ও সাদরে গ্রহণ করা হোক, এই কামনা সকল রুচিবান চিত্রামোদীরাই পোষণ করবেন।

চিত্রালোচনা

তপন সিংহ পরিচালিত "ঝিন্দের বন্দী"র বহুপ্রতীক্ষিত মুক্তি এই সপ্তাহে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় কাহিনীর এই চিত্ররূপটি নানা কারণে চিত্রপ্রিয়দের ঔৎসুক্য দুর্বার করে তুলেছে। পরিচালকের খ্যাতি ও কাহিনীর আবেদন এক দিকে যেমন এর আকর্ষণ বাড়িয়েছে, অপর দিকে তারকা-সমাবেশ ও আঙ্গিক সমারোহের দিক দিয়ে এই ছবিটির মধ্যে রয়েছে অনন্য শিল্প-বৈশিষ্ট্যের অঙ্গীকার। উত্তমকুমার এ-ছবির নায়ক এবং তিনি দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায় আছেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাবে খল নায়কের ভূমিকায়। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে চিত্রাবতরণ করেছেন রাধামোহন ভট্টাচার্য, মিহির ভট্টাচার্য, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, সন্ধ্যা রায় ও নবাগতা সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর সংযোজন করেছেন ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ। সুতরাং এদিক দিয়েও "ঝিন্দের বন্দী" কম আকর্ষণীয় নয়।

এ সপ্তাহের মুক্তি-তালিকায় একটি হিন্দী ছবিও আছে—শান্তিনিকেতন ফিল্মসের "ওয়ারেণ্ট"। এটি একটি ক্রাইম-ড্রামা। হিন্দী ফিল্মের চলতি পদ্ধতি অনুযায়ী রহস্য-রোমাঞ্চের সঙ্গে যথেষ্ট হাল্কা রসও পরিবেশন করা হয়েছে এর মধ্যে। অশোককুমার ও শাকিলা প্রধান দুটি চরিত্রে চিত্রাবতরণ করেছেন। ভূমিকালিপিতে আরো যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজ মেহরা, মির্জা মুশারফ, কাক্কু, হেলেন, ধুমল ও শিশু-শিল্পী আকাশদীপের নাম। কেদার কাপুর ও রোসন যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

* * *

বিশ্বভারতী চিত্রমন্দিরের নবতম নিবেদন "পংক্তিলক" আসছে সপ্তাহে মুক্তিলাভ করবে। একটি মর্মস্পর্শী কাহিনীকে ঘিরে এই বাস্তবধর্মী ছবিটি রূপ নিয়েছে। মঙ্গল চক্রবর্তীর পরিচালনায় এর বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ মিত্র, বিকাশ রায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ রায়, জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, সবিতা বসু, সন্ধ্যা রায়, শ্রীমান দীপক ও শ্রীমান পল্লব।

গান ও আবহসঙ্গীত এ-ছবির বিশেষ আকর্ষণ। সুধীন দাশগুপ্ত সুরসৃষ্টি করেছেন, এবং গানগুলি গেয়েছেন লতা মুঙ্গেশকর, গীতা দত্ত, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মান্না দে ও হেমন্তকুমার।

* * *

"স্মৃতিটুকু থাক"-এর পর যাত্রিক পরিচালকগোষ্ঠী যে ছবিটি তুলছেন, তার নাম "কাঁচের স্বর্গ"। বর্তমানে দার্জিলিঙে এর বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হচ্ছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার চিরন্তন সৌন্দর্য এবং এই জগৎপ্রসিদ্ধ শৈলনিবাসের নৈসর্গিক শোভা ছবিটিকে একটি বিশেষ শ্রী দান করবে বলে আশা করা যায়। যাত্রিক গোষ্ঠীরই অন্যতম কলাকুশলী দিলীপ মুখোপাধ্যায় এই ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাঁর সহায়তা করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুলা সরকার, মঞ্জু দে, পাহাড়ী সান্যাল,

উমাল লাহিড়ী, সবিতাব্রত দত্ত প্রভৃতি। চিত্রযুগ ছবিটির নির্মাতা, এবং এতে সুর-সংযোজন করছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র।

সুলতা পিকচার্স "মিস্টার অ্যান্ড মিসেস চৌধুরী"কে দর্শকদের সামনে হাজির করে তাঁদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন। এইবার তাঁরা তুলবেন "চৌধুরী বাড়ি"। একটি মিষ্টি-মধুর পারিবারিক কাহিনী এটি, লিখেছেন ডাঃ বিশ্বনাথ রায়। কিন্তু তার চেয়ে যেটা বড় খবর, সেটা এই যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির চিত্রবিন্যাস ও সংলাপ-রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অসীম পালের পরিচালনায় ছবিটি তোলা হবে।

ত্রিভুজ প্রেমের রূপকথা

বোম্বাই-এর চিত্রনির্মাতারা লঘু প্রমোদকে উপজীব্য করে যেসব হিন্দী ছবি সাধারণত উপহার দিয়ে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে তুলনায় ফিল্মবুগ-এর "আশ কা পনছি" কুলীন পদবাচ্য।

এক বিশেষ শ্রেণীর দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য এ ছবিতে অভব্য নাচ-গান ও পাপ-উপাদান পরিবেশনের অপপ্রয়াস নেই। ফলে রুচিবান চিত্রামোদীদের কাছে ছবিটি বর্জনীয় হয়ে ওঠেনি।

এই ছবির আখ্যানবস্তু একটি ত্রিভুজ প্রেমোপাখ্যান। প্রণয়োপাখ্যানের ত্রিকোণের মধ্যে রয়েছে এক নারী, দুই পুরুষ। দুজন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। কিন্তু একই নারীকে ঘিরে যে তাদের প্রণয়-সুখস্বপ্ন রূপ নিয়ে চলেছে তারা তা জানতে পারেনি। মদনদেবতার এই নির্মম ছলনাটি যেদিন নায়িকার প্রেমাস্পদের কাছে ধরা পড়ল, সেদিন বন্ধুর সুখের জন্য আত্মসুখ বিসর্জনের ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা সে গ্রহণ করল। এদিকে নায়িকা তার বাঞ্ছিত পুরুষকে পাওয়ার জন্য পার্বতী-তপস্যায় নিবেদিত-প্রাণ। শেষ পর্যন্ত অপর বন্ধুর স্বার্থ-ত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রণয়ী-যুগল কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হল তা নিয়েই এই প্রেমকাহিনীর যবনিকা।

পরিচালক মোহনকুমার চিত্রকাহিনীর বিন্যাসে কয়েকটি প্রণয়মধুর ও আবেগ-মণ্ডিত মুহূর্ত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এই সব মুহূর্তের ক্ষণিক সম্মোহনী প্রভাব দর্শকের বিচারবোধ ও যুক্তিকে সব দিক দিয়ে তুষ্ট করতে পারে না। ছবির উপাখ্যানের স্তরে স্তরে এমন অনেক অসার কল্পনা ও অসঙ্গতি স্থান পেয়েছে, যা ছবির রসপ্রবাহকে পদে পদে ব্যাহত করে এবং দর্শকের রসবোধকে পীড়িত করে। ছবির নায়ক স্বাধীন ভারতের সৈন্যবাহিনীর সৈনিক। যুদ্ধক্ষেত্রে তার অসীম বীরত্বের ঘটনাও ছবিতে চিত্রায়িত। কিন্তু এই রণ-কাণ্ড ও রণক্ষেত্রের কোন প্রামাণিক পরিচয়

ছবিটিতে অনুপস্থিত। এমনি ধরনের বহুবিধ বৈসাদৃশ্য ও কষ্টকল্পনা ছবির কাহিনীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট। তবুও প্রেমের রূপসজ্জায় যাদের মন ভোলে তারা এই ছবি দেখে কিছুক্ষণের জন্য বাস্তব জগৎকে ভুলে থাকতে পারবেন।

ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্র দুটির রূপ দিয়েছেন রাজেন্দ্রকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা। তাঁদের অভিনয় আবেগপূর্ণ ও চরিত্রানুগ। ছবির নায়কের বন্ধুর ভূমিকায় শমিন্দর চরিত্রানুগ কুশলতা দেখিয়েছেন। অন্যান্য বিশেষ পার্শ্বচরিত্রে নাজির হোসেন, লীলা চিটনীশ, রাজ মেহরা ও সুন্দরের নাম উল্লেখযোগ্য।

সংগীত পরিচালক শংকর-জয়কিষণ ছবির কয়েকটি গানে মন ভুলানো হাল্কা সুর দিয়েছেন। তাঁদের আবহ-সুর কিন্তু বৈশিষ্ট্যবর্জিত। কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ ও সর্বাংগীণ আংগিক-গঠন সন্তোষজনক।

চিঠিপত্র

"তিন কন্যা" সম্বন্ধে

মহাশয়,

সত্যজিৎ রায়-কৃত ছবি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যা বলতে চাই তা প্রশংসাবাচক হলে আমাদের কলম মনের ইচ্ছাকেও ছাপিয়ে চলে। তাই কলকাতার নানা পত্রপত্রিকায় ('দেশ' বাদ নয়) প্রকাশিত তাঁর সদ্যোনির্মিত 'তিন কন্যা'র আলোচনায় উচ্ছ্বাসের যে দুর্বার প্রবাহ লক্ষ্য করলাম তাতে বিস্মিত হইনি। এটা হয়ত অন্যায় নয়, বিশেষ করে প্রশংসার বহুল কারণ যেখানে আছে, তবুও 'তিন কন্যা'র একটি বড়রকমের ত্রুটি সম্পর্কে আপনারা কি কারণে উদাসীন রইলেন ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, 'তিন কন্যা'র দুটি গল্প 'মণিহারা' ও 'সমাপ্তি' অনবদ্য হয়েছে; দুটি ছবিই নিবিড় শিল্পবোধ, আশ্চর্য রসজ্ঞান ও অপরূপ পরিমিতি-কুশলতায় উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথ-রচিত গল্প থেকে ঈষৎ ব্যতিক্রম হয়ত আছে, কিন্তু চলচ্চিত্রায়ণের শিল্পসূত্র আলাদা, এ কথা আমরা জানি ও মানি। গল্পদ্বয়ের ভাববস্তু প্রায় পুরোপুরিই ছড়িয়ে আছে দৃশ্যে দৃশ্যান্তরে। 'সমাপ্তি'তে মৃন্ময়ীর adolescence থেকে নারীত্বে উত্তরণ আকস্মিক মনে হলেও হতে পারে, কিন্তু এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথও যথেষ্ট প্রস্তুতি দেখান নি। বিয়ের রাতে পালিয়ে-যাওয়া কনের দোলনায় দোল খাওয়া একটি আশ্চর্য সুন্দর কল্পনা। দর্শকদের অভিভূত করে দিয়েছে। 'নেত্যকালী'-twistটা যদিও অনুপস্থিত, তথাপি মনে হয়, 'মণিহারা'র চিত্রনাট্য সবচেয়ে ভাল হয়েছে। ফণিভূষণ ও মণি-মালিকা যেন বইয়ের পাতা থেকে পর্দায় নেমে এসেছে। পরিবেশনের ঢঙটা বইয়ের গল্পের মতোই; মাঝে মাঝে দুর্বল নায়কের চরিত্রের ওপর ভাষ্যকার ইস্কুলমাস্টারের সানুকম্প কটাক্ষপাত মূলে গল্পটিকে যেমন ছবিটিকে তেমনই উপভোগ্য করে তুলেছে।

কিন্তু স্তম্ভিত হলাম 'পোস্টমাস্টার' দেখে। একটি অপরূপ ছোটগল্প কোথায় হারিয়ে গেল, বদলে পেলাম এক শহুরে মানুষের গ্রামে আসার আর ভাল-না-লাগার জন্যে গ্রাম ছেড়ে যাবার কাহিনী। সাপের খোলস দেখে সে ভয় পায়, গ্রাম্য সংগীতের আসরে সে হাঁফিয়ে ওঠে, ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ে সে অসহায় বোধ করে, আর সর্বোপরি এক পাগলের কীর্তিকলাপে সে আতংকিত হয়ে ওঠে। তাই সে গ্রাম ছেড়ে দেবে ঠিক করল, যদিও রতন নামে একটি গ্রামের মেয়েকে সে মোটামুটি স্নেহই করত। এই হল সত্যজিৎবাবুর 'পোস্টমাস্টার'।

রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টারে'র দিকে যদি একবার চোখ ফেরাই, দেখব এ দুয়ের মধ্যে কি অদ্ভুত অমিল। গ্রাম্যজীবনের অসংখ্য

কনক প্রোডাকশন্সের "আশায় বাঁধিনু ঘর"-এর দুটি রোম্যান্টিক চরিত্রে বিশ্বজিৎ ও রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘটনা ছবিটিতে ভিড় করে আছে, আর রতন গেছে ম্লান হয়ে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে পোস্টমাস্টার-রতন সম্পর্কটা স্বচ্ছ ছিল, আর সেইটাই ছিল গল্প। সেখানে রতনের পূর্ণ ছবি পাই। আর ছবিতে পাই রতনকে পাঁচটা জিনিসের একটা হিসেবে, নিতান্তই গৌণ ভূমিকা তার।

'পোস্টমাস্টার' গল্পটির করুণ মাধুর্য তাই ছবিতে আমরা পেলাম না এবং না পাওয়াটাই স্বাভাবিক। আরো হতভম্ব হয়ে গেছি পাগল-চরিত্রের আমদানিতে। গল্পের কোন্ ফাঁক এতে পূর্ণ হয়েছে বুঝি নি। Visually চরিত্রটা পীড়াদায়ক, প্রায় অসহনীয়। গল্পতে শহুরে বাবুর গ্রামভীতি সহজাতই ছিল, বিতৃষ্ণা প্রবলতর হল যখন সে ম্যালেরিয়ায় পড়ল। চলে যাবার আগে রবীন্দ্রনাথের পোস্টমাস্টার করুণ বিচ্ছেদ-বেদনা অনুভব করেছে। বিশেষ ক্ষণে সে একবার ভেবেছে ফিরে যাবার কথা। চলে যাবার আগে প্রায় পুরো মাইনে সে দিতে চেয়েছে রতনকে; বিদায়মুহূর্তে তার মনো-বেদনা আন্তরিক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ জাগে না। কিন্তু ছবিতে দেখলাম সে সহজেই ফিরে যাচ্ছে, রতনের বন্ধন এখানে খুবই শিথিল। মূল গল্পে রতনের কথা আছে কয়েকটা। ছবিতে তা নেই। 'দাদা-বাবু, তোমার বাড়ি আমায় নিয়ে যাবে', রতনের এই প্রশ্নের উত্তরে দাদাবাবু যখন বলেছিল 'সে কি করে হবে?' তখন সে আশ্চর্য অভিমানে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ছবিতে এই অপরূপ মুহূর্তটি অনুপস্থিত। 'দাদাবাবু তোমায় কিছু দিতে হবে না' বলে রতনের বিদায়বেলাকার কান্না ছবিটিকে মহিমান্বিত করতে পারত। বাংলা দেশের মাটি ও মন যখন নরম, আর তা নিয়ে লেখা গল্পও যখন নরম ছিল, তখন সে-গল্প নিয়ে তৈরী ছবি নরম হলে খুব দোষের হয়ত হত না। গল্পের সংগে মিল রেখেই ছবি যেখানে ভাল হতে পারত, সেখানে চলচ্চিত্রায়ণের দোহাই দিয়ে পরিবর্তন করা অসংগত, বিশেষ করে তাতে যদি প্রধান চরিত্র আবছা হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের গল্প হলে তো কথাই নেই। ইতি—

অরুণাভ দাশগুপ্ত
কলিকাতা—৩১

একলব্য

বার্মিংহামের এজবাসটন মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলার পরি-প্রেক্ষিতে ক্রিকেট নিয়েই কিছু আলোচনা করা যাক।

দুই দেশের এবারকার টেস্ট যুদ্ধে দুই দলই চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলতে বদ্ধপরিকর। অস্ট্রেলিয়া দল ইংলণ্ড সফরে কাউন্টি টীমের সংগে এ পর্যন্ত যেসব ম্যাচ খেলেছে, তাতে রয়েছে চিত্তাকর্ষক ক্রিকেটের পর্যাপ্ত পরিচয়। এদিক দিয়ে এম সি সি-র সংগে তাদের সাম্প্রতিক খেলাটি বিশেষভাবেই উল্লেখ করার মত।

পাতৌদির নবাব 'টাইগার'

আগে কয়েকটি খেলায় অস্ট্রেলিয়া দল এক দিনে চার শো, এমন কি, সাড়ে চার শো পর্যন্ত রান তুলেছে; পর পর প্রথম চারজন ব্যাটসম্যান ব্যাটিং করেও ব্যাটিংয়ের ফুলঝুরি দেখিয়েছেন। কিন্তু এম সি সি-র সংগে খেলায় পরাজয়ের ঝুঁকি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক রিচি বেনো যেভাবে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন, তা তাঁর চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলার প্রতিশ্রুতিরই পরিচয়। শুধু পরাজয়ের ঝুঁকি নয়, রেকর্ডের দিকে এবং তথাকথিত সেঞ্চুরী করার গৌরবের দিকে তিনি ফিরেও তাকাননি।

দ্বিতীয় ইনিংসে দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান বিল লরির ৮৪ এবং ববি সিম্পসনের ৯২ রান। দুজনই নট আউট। একটু সময় পেলে দুজনই পিটিয়ে সেঞ্চুরী করতে পারেন। কিন্তু কি হবে সেঞ্চুরীর খাতায় নাম তুলে? তার চেয়ে জয়-পরাজয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এম সি সি-কে ব্যাট করতে দেওয়া ভাল। বেনো করলেনও তাই। ঘোষণা করলেন দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি।

৪ ঘণ্টা, অর্থাৎ ২৪০ মিনিটে ২৯৪ রান করলে বিজয়ী হতে পারে, এই অবস্থায় এম সি সি ব্যাট করতে আরম্ভ করল। এক সময় তাদের সম্মুখে জয়লাভের হাতছানি। ম্যাচ জিততে তারাও বদ্ধ-পরিকর। কিন্তু বেনো তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন। অগ্নিবর্ষী বলে বিদায় দিলেন এক-একজন ইংলিশ ব্যাটসম্যানকে। খেলায় জিতল অস্ট্রেলিয়া। লরি ও সিম্পসন সেঞ্চুরী হারালেন, কিন্তু দলের সম্মান বেড়ে গেল, আর বাড়ল একজনের সম্মান, যিনি অস্ট্রেলিয়ার দলপতি। ব্যক্তিগত খেলোয়াড় হিসাবে তিনি সম্মান চান না। চান দলের সম্মান। তাই তিনি বড় অধিনায়ক।

চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলার এই যে অনুপ্রেরণা, এটা এসেছে অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিগত টেস্ট খেলার পর থেকে। ক্রিকেট জেগে উঠেছে পরশ-পাথরের ছোঁয়া পেয়ে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, যিনি এই ছোঁয়া লাগিয়েছেন, তাঁর পাথরে খোদাই-করা দেহ, কিন্তু ক্রিকেটের সজীব প্রতিমূর্তি—তিনি আর কেউ নন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল। ক্রিকেট প্রায় মরতে বসেছিল। ক্রিকেটের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন ফ্রাঙ্ক ওরেল।

অস্ট্রেলিয়াবাসীও তাঁর দানের স্বীকৃতি দিয়েছে পূর্ণ মর্যাদায়। দুই দলের রানের সমতায় অমীমাংসিত ব্রিসবেন টেস্টকে স্মরণীয় করে রাখবার উদ্দেশ্যে তাঁরা ফ্রাঙ্ক ওরেল ট্রফির ব্যবস্থা করেছে। এই ট্রফির

আব্বাস আলী বেগ

ব্যবস্থা করার সময় কোন রাষ্ট্রনায়কের নাম অস্ট্রেলিয়াবাসীর মনে আসেনি। ক্রিকেটের দিকপাল ভিক্টর ট্রাম্বার, ম্যাকার্টনি বা জ্যাক ফিঙ্গালটনের নামও না। এমন কি, ডন ব্র্যাডম্যানও বাদ পড়েছেন। প্রতিপক্ষের পরাজিত অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল তাঁদের চোখে বড় হয়ে উঠেছেন। বড় হয়েছেন সারা বিশ্বের চোখেও। ক্রিকেট আজ অনেক জীবন্ত!

ক্রিকেটের নেতিমূলক ভাব অনেকটা কেটে গেছে। এই ভারতের মাটিতে ভারত ও পাকিস্তানের টেস্ট খেলা আমাদের চোখকে পীড়া দিয়েছে, মনে এনেছে বিরক্তি। নেহরু ও আয়ুব খাঁর চেয়েও যেন নরী কণ্ট্রাক্টর ও ফজল মামুদ দেশের কথা বেশী ভেবেছেন। ক্রিকেট মাঠের পরাজয় যেন দেশের মুখে কালি লেপন না করে। কিন্তু ক্রিকেটের মুখে যে কালি পড়ছে, তা কেউ ভেবে দেখেননি।

খেলার জয় দেশের সম্মানকে বড় করে তোলে, সন্দেহ নেই। আবার পরাজয়ের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত খেলা দেশের সম্মান নষ্টও করে। ক্রিকেট খেলার রাজা। রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধে তা রমণীয়। দেশের কথা ভাববার জন্য ক্রিকেট খেলোয়াড়ের জন্ম হয়নি। তা ভাববার জন্য রাজনৈতিক নেতা ও রাষ্ট্রনায়করা আছেন। আছেন আরও অনেকে। ক্রিকেটের সৌন্দর্য, ক্রিকেটের রমণীয়তা, ক্রিকেটের সম্মান ও আভিজাত্য ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক, সারা বিশ্ব একান্ত মনে আজ এই কামনাই করে। আর আশা করে, এই পর্যায়ের টেস্টে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রাও ক্রিকেট খেলবেন ক্রিকেট-ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখে।

ইংলণ্ডে অস্ট্রেলিয়া দলের এই পর্যন্ত সমস্ত খেলার পর্যালোচনা করার এখানে স্থানাভাব। তাই সংক্ষেপে খেলাগুলোর ফলাফল এবং দুই দেশের যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন, তাঁদের তালিকা এখানে প্রকাশ করছি।

ইংলণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার এ পর্যন্ত খেলার ফলাফল

অস্ট্রেলিয়া : উরস্টার (ড্র)

অস্ট্রেলিয়া : ডার্বিশায়ার (ড্র)

অস্ট্রেলিয়া : ইয়র্কশায়ার (ড্র)

(জলবৃষ্টির জন্য এ তিনটি খেলার কোন খেলাই পুরো সময় অনুষ্ঠিত হয়নি)।

অস্ট্রেলিয়া : ল্যাঙ্কাশায়ার (অস্ট্রেলিয়া ৪ উইকেটে বিজয়ী)।

অস্ট্রেলিয়া : সারে (অস্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে বিজয়ী)।

অস্ট্রেলিয়া : কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় (অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে বিজয়ী)

অস্ট্রেলিয়া : গ্লস্টারশায়ার (ড্র)।

অস্ট্রেলিয়া : গ্লামোরগান (ড্র)।

অস্ট্রেলিয়া : এম সি সি (অস্ট্রেলিয়া ৬৩ রানে বিজয়ী)।

অস্ট্রেলিয়া : অক্সফোর্ড (ড্র)।

সেঞ্চুরী করে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। শুধু তাই নয়, তিন চার সপ্তাহ ধরে ইংলণ্ডের ব্যাটিং অ্যাভারেজে পাতৌদির নামই রয়েছে শীর্ষস্থানে। ইংলণ্ডের ভিজে ও অনিশ্চিত উইকেটে উপর্যুপরি তিনটি ইনিংসে সেঞ্চুরী করা আর অস্ট্রেলিয়া দল যখন ইংলণ্ড সফর করছে সেই সময়ে ব্যাটিং

অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের সেঞ্চুরী

নর্ম্যান ও'নীল	—১০০	নট আউট	বনাম	ইয়র্কশায়ার
" "	—১২৪		"	গ্লামোরগান
" "	—১২২		"	এম সি সি
নীল হার্ভে	—১২০		"	ল্যাংকাশায়ার
" "	—১১৭		"	গ্লামোরগান
পিটার বার্জ	—১৫৮		"	সাসেক্স
" "	—১০১	নট আউট	"	ল্যাংকাশায়ার
বিল লরি	—১৬৫		"	সারে
" "	—১০৪		"	এম সি সি
" "	—১০০		"	কেম্ব্রিজ
বি বুথ	—১১৩		"	কেম্ব্রিজ
কেন ম্যাকে	—১০৬	নট আউট	"	কেম্ব্রিজ
কলিন ম্যাকডোনাল্ড	—১০০		"	কেম্ব্রিজ
ববি সিম্পসন	—১৪৮		"	অক্সফোর্ড

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী

জে প্রেসডী (গ্লামোরগান)	১১৮	নট আউট
কলিন কাউড্রে (এম সি সি)	১১৫	

• • •

ইংলণ্ডে এখন দুই ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়ের খুবই নাম ডাক। তাঁদের নামে বড় বড় কাগজে বড় বড় হেড লাইন। দুজনই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একজন পাতৌদির নবাব 'টাইগার', অপরজন আব্বাস আলী বেগ।

অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধিনায়ক পাতৌদির নবাব উপর্যুপরি তিনটি ইনিংসে

অ্যাভারেজে শীর্ষস্থানে ওঠা কম কৃতিত্বের কথা নয়। 'টাইগার' তাঁর বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্রিকেটে নিজের জায়গা করে নিচ্ছেন। পাতৌদির পরলোকগত নবাবও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধিনায়ক ছিলেন এবং পর পর চারটি ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছিলেন।

অক্সফোর্ড ও অস্ট্রেলিয়া দলের তিনদিন-ব্যাপী খেলায় আব্বাস আলী বেগ প্রথম ইনিংসে ৯৫ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৭৩ রান করে তাঁর ব্যাটিং প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। একরকম বেগের জন্যই অক্সফোর্ড এ খেলায় পরাজয়ের হস্ত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। গত বছর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আব্বাস আলীর ব্যর্থতা দেখে তাঁর প্রতি যাঁরা বিরূপ হয়েছিলেন, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্যে তাঁরা উৎফুল্ল হবেন কিনা জানি না। তবে খবরে প্রকাশ, আগামী শীতকালে ভারতে ভারত ও ইংলণ্ড দলের টেস্ট খেলায় 'টাইগার' ও আব্বাস আলী বেগকে পাওয়া যাবে কিনা সে সম্পর্কে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি এম এ চিদাম্বরম নিজে বিলেতে গিয়ে তদ্বির তদারক করছেন। 'টাইগার'কে আমরা নেটে ডেকেও টেস্ট খেলায় স্থান দিইনি, আর আব্বাস আলী বেগকে কোলে তুলে আবার ফেলে দিয়েছি। এখন আমরা দুজনের জন্যই লালায়িত। সেই যে কথা আছে না? 'জীবনে যারে কভু দাওনি মালা মরণে তারে কেন দিতে এলে ফুল?' টাইগার ও আব্বাস আলীর ক্ষেত্রেও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সেই অবস্থা

• • •

ফুটবল লীগের খেলা আরও একটু জমে উঠেছে। উপর্যুপরি ৮টি খেলায় জয়লাভের পরে বিজয় অভিযানে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম বাধা পেয়েছে স্পোর্টিং ইউনিয়নের কাছে। মরসুমের প্রথম চ্যারিটি খেলায় প্রতিপক্ষ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৫—০ গোলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করবার পর হীন-বল স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে লীগ কোঠায় শীর্ষস্থান অধিকারী ইস্টবেঙ্গলের ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করার ঘটনা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। অত্যধিক আত্ম-প্রত্যয় ইস্টবেঙ্গলের জয়লাভের অন্তরায় হওয়া অসম্ভব নয়। তাছাড়া, দল গড়াতেও কিছু ভুলচুক ছিল। দলের ১১ জন খেলোয়াড় নিয়ে অবশ্য ২৪টি ম্যাচ খেলা যায় না। খেলোয়াড়দের অসুখ বিসুখ আছে, পায়ে চোট লাগা আছে। তাছাড়া, অপর খেলোয়াড়দের খেলার সুযোগ না দিলে তাদের মনোবল নষ্ট হতে বাধ্য। সব মেনেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, লেফট আউটের খেলোয়াড় বালুকে সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলানো কোনভাবেই উচিত হয়নি। যাই হক, বেশীর ভাগ বাঙালী খেলোয়াড় নিয়ে ইস্টবেঙ্গল এতদিন যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে তা খুবই প্রশংসাযোগ্য। বিশেষ করে, চ্যারিটি খেলায় মহমেডান স্পোর্টিংকে ৫—০ গোলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করা কম কথা নয়। কলকাতার বড় ক্লাবের সংগে বড় ক্লাবের খেলায় এমন ফলাফল বেশী হয়নি। ১৯৪৯ সালে আর একবার ইস্টবেঙ্গল ৬—১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করে।

বর্তমানে লীগে চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংকীর্ণ হতে আরম্ভ হয়েছে এবং কলকাতার দুই প্রধান মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল মাথা উঁচু করে আছে। মোহন-বাগান হারিয়েছে ৩ পয়েণ্ট। ইস্টবেঙ্গল ১ পয়েণ্ট। এক আধটি খেলার হেরফেরে দুই দলের অবস্থা এক হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

খেলাধুলায় মহিলা

—মুকুল—

তপতী মিত্র

কলকাতা শহরে অনেক বড় বড় বাড়ি। কিন্তু বিরাটত্বে 'কারনানী এস্টেট' বোধ হয় জুড়ি নেই। খুঁজলে পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট - মারাঠা - দ্রাবিড় - উৎকল-বঙ্গের এখানে হদিস মেলে। তা ছাড়া শ্বেত-দ্বীপের শতেক অধিবাসী। সব সময় শ্বেত-পীত-কৃষ্ণের কলকাকলি। কলকাতার মধ্যে 'কারনানী এস্টেট' যেন এক খুদে কলকাতা। কে কার খোঁজ রাখে?

কিন্তু এখানকার কেউ কেউ হয়তো খোঁজ রাখত একটি ছোট মেয়ের যে হাফ রেসিং রুড বাটলার সাইকেল কাঁধে নিয়ে রোজ ছ তলায় উঠা-নামা করত। ওর ভার বইবার ভাব দেখে অবাকও হত অনেকে।

অবাক হয়েছিলেন মেডিক্যাল কলেজের সিলেকশন বোর্ডও। ষোলো বছরের এই ছোট্ট ফ্রক পরা মেয়েটি ডাক্তারি পড়বে? ও আই এস সি পাশ করল কি করে?

আজও অনেকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে যখন দেখে একটি মেয়ে সাইকেলে চড়ে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর কানে 'স্টেথিস্কোপ' লাগিয়ে শিশু ও প্রসূতিদের বুক পরীক্ষা করছে, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, ইনজেকশন দিচ্ছে, উপদেশ দিচ্ছে কি করে শরীর সুস্থ রাখতে হয়। অনেকেই জানে না, সিঙ্গুর হেলথ সেণ্টারের লেডি মেডিক্যাল অফিসার এই মেয়েটিই এক সময়ে অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, সাইকেল চালনা ও টেবল টেনিসে ছিল বাঙলার নম্বর ওয়ান।
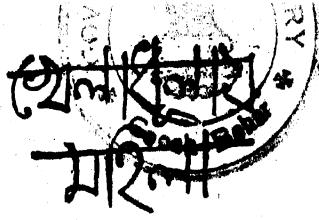
জানতেন না এম বি ক্লাসে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার কর্মকর্তারাও। কাগজে হয়তো মাঝে-সাজে ওর ছবি চোখে পড়েছে। কিন্তু কে চেহারার সাথে মিলিয়ে দেখেছে? আই এস সি সেকেণ্ড ডিভিসন এম বি কোর্সে ভর্তি হবার যোগ্যতার যথাযথ মানও নয়। কিন্তু আর কথা উঠল না যখন অ্যাডমিশন ফর্মে ক্যাপিটাল লেটারে লেখা নামটি চোখের সামনে ভেসে উঠল—'তপতী মিত্র'। স্পোর্টসম্যানের আদর সর্বত্র। স্পোর্টস উওম্যানের তো কথাই নেই। ভর্তি হবার ডাক এল ক্যাম্বেল থেকেও। একই কারণে। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে পড়বার চান্স পেলে কে আর ক্যাম্বেলে যেতে চায়? মেডিক্যাল কলেজ থেকেই এম বি ডিগ্রীর সঙ্গে খেলাধুলায় চ্যাম্পিয়নশিপের অনেক ডিগ্রী পেয়েছে তপতী মিত্র। লেখাপড়া ও খেলাধুলার যুগ্ম সাধনায় তপতী সত্যিই দিয়েছে প্রগতির পরিচয়। এদিক দিয়ে ওকে বাঙলার শীর্ষস্থানীয়াও বলা যেতে পারে।

খেলাধুলায় নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলতে তপতী সদা সঙ্কোচ ও স্বল্প-বাক। যদি কিছু ভুল হয়, যদি কিছু বেশী বলে ফেলে এই ভয়। সপ্রতিভ হয়ে বলে: "কি বা এমন করেছি যে, আমার কথা লিখতে হবে? জীবনে কিছুই তো হল না। বিশ্ব অলিম্পিকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করব এটাই ছিল আমার বড় আশা। সে সাধ আমার অপূর্ণই রয়ে গেল।"

উত্তরে তপতীকে বলেছিলাম: "যা করেছ বাঙলার ক'টা মেয়েই বা তা করতে পেরেছে, এখন যা করছ তাই বা কজন করতে পারছে?"

নানা বাধাবিঘ্ন ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে খেলাধুলায় তপতীকে নিজের জায়গা করে নিতে হয়েছে। তপতীর প্রথম অনুরাগ সাইকেল চালনায়, পরে অ্যাথ-লেটিকসে, শেষে টেবল টেনিসে। খুব ছোট বেলায় দেশপ্রিয় পার্কের কি একটা স্পোর্টসে ৫০ মিটার দৌড়ে তপতী প্রথম হয়েছিল, তা ভাল করে মনে নেই। তপতীর দুই আলমারি-ঠাসা পুরস্কারের মধ্যে সেইটিই প্রথম। কিন্তু তারপরে কিছুদিনের জন্য ছেদ। সাইক্লিং ও স্পোর্টসের অনু-শীলন আরম্ভ হয় বেশ একটু দেরিতে। তপতী তখন বেলতলা গার্লস হাই স্কুলে ক্লাস নাইনের ছাত্রী। খেলাধুলায় অনুরাগ থাকায় এর মধ্যে সে সেণ্ট জেমস স্কোয়ারে শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী সভ্যা হয়ে বসেছে। বেনেপুকুর অঞ্চলের বাড়ি থেকে ওখানেই ও রোজ যত স্পোর্টসের প্র্যাক্টিস করতে। নবীন সেন ছিলেন শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পরিচালক। মেয়েটি সম্বন্ধে তিনি আগ্রহ দেখালেন। ক্রীক রোতে তাঁর বাড়ির রাস্তায় ওকে সাইকেল চড়াতে শুরু করলেন। স্কুলের ক্লাস নাইনে থাকা সময়েই সাইকেল ও অ্যাথলেটিকসের কিছু কিছু পুরস্কার এল তপতীর হাতে। ১৯৪৫-এ ক্লাস টেনে প্রোমোশনের সঙ্গে খেলাধুলায়ও প্রোমোশন। এবার স্কুলের ওপেন ইভেণ্টে পনেরো শো মিটার সাইকেলে প্রথম। এর পর ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বাঙলার সাইকেলে কখনই সে দ্বিতীয়

তপতী মিত্র

হয়নি, শুধু একবার ছাড়া। কি একটা স্পোর্টসে তাকে ইচ্ছে করে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তবু সে প্রতিযোগিতা শেষ করেছিল। কিন্তু উ'চুতে স্থান ছিল না।

একটু আগে বলছিলাম না, নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়ে তপতীকে স্পোর্টসে জায়গা করে নিতে হয়েছে। স্পোর্টসে তখন চটপটে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের আধিপত্য। ইস্থার লীলা, স্মিথ, বেলগার্ড, ডার্লাস বিকদের মধ্যে চিন্না, পম্মা, নীলিমা, তপতীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। পিছু হটে যাচ্ছে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েরা। সুতরাং সাইকেল স্পোর্টসে ওরা আর নাম দেয় না। প্রতিযোগিতা বাতিল হবার যোগাড়। কারণ কোন বিষয়ে প্রতিযোগিতা চালাতে হলে অন্তত তিনটি মেয়ে চাই। তাই তপতীর সাইকেল রেসের জন্য অনেক স্পোর্টসে নীলিমা ঘোষ এবং পম্মা দত্তকেও নাম দিতে হয়েছে। বহু স্পোর্টসে তপতীকে পাল্লা টানতে হয়েছে প্রায় এককভাবে। ফলে সময় ভাল হয়নি। সময় ভাল না হবার দ্বিতীয় কারণ তার হাফ রেসিং রুড বাটলার সাইকেল ওজনে একটু ভারী। ১৫ সের। রেসিং সাইকেল আরও একটু হাল্কা হয়, হাওয়ার সংগে উড়ে চলে।

যাই হোক ১৯৪৫ থেকে ১৯৫১ পর্যন্ত সাইকেলে তপতীর জুড়ি মেলেনি। অ্যাথ-লেটিকসেও প্রায় সমপটুতা। প্রথম দিকে দৌড়ে নীলিমা ঘোষকেও নতি স্বীকার করতে হয়েছে এই মেয়েটির কাছে। পরে নীলিমা এগিয়ে গেল। ও পড়ল সাইকেল নিয়ে। তবু স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়বার সময় দু' বছরই ওর কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপ। ১৯৫৯-এ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী অবস্থায় আন্তঃ কলেজ স্পোর্টসে সর্বশ্রেষ্ঠ স্পোর্টস উওম্যানের সম্মান। এ বছর বঙ্গ-দেশপাল শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী নামাঙ্কিত পদকের সংগে যে সার্টিফিকেট তপতীর হাতে এল তাতে লেখা ছিল:—

১৫০০ মিটার সাইকেল রেস—প্রথম
রানিং ব্রড জাম্প—দ্বিতীয়
১০০ মিটার দৌড়—প্রথম
৮০ মিটার লো হার্ডলস—প্রথম

পরের বছর বঙ্গদেশপাল ডাঃ কৈলাস-নাথ কাটজুর পদকও হাতে ছল তপতীর। কিন্তু তপতী বলে এ বছর সে চ্যাম্পিয়ন-শিপ পায়নি। কেন যে গভর্নরস মেডেল তাকে দেওয়া হল সে জানে না। যাই হোক, 'কারনানী এস্টেটে' তপতীর রাশি রাশি কাপ মেডেলের মধ্যে দুই বঙ্গদেশপালের দু'টি মেডেল মাথা উ'চু করে আছে।

মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সময়ই স্পোর্টস নিয়ে তপতী পড়ল এক মুশকিলে। বিশারদরা বললেন—দু'টো হবে না। হয় তোমাকে সাইকেল ছাড়তে হবে, না হয় অ্যাথলেটিকস। কারণ যাঁরা সাইকেল চালায় তাঁদের 'থাই মাস্‌ল' ভারী হয়ে

হাফ রেসিং রুড বাটলার সাইকেল নিয়ে তপতী মিত্র

পড়ে। ওটা এ্যাথলেটিকসে উন্নতির পরিপন্থী। তপতীর বড় সাধ অলিম্পিকে যাওয়া। সুতরাং সাইকেলকেই সে আঁকড়ে ধরে রইল। কিন্তু তার জানা ছিল না অলিম্পিকের সাইকেল রেসে মেয়েদের ইভেন্ট নেই। যখন জানল, ভীষণ আঘাত পেল মনে। আঘাত পেল দেহেও। মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্স অব ওয়েলস গ্রাউণ্ডে কলেজের বার্ষিক স্পোর্টস। ৭৫ মিটার দৌড়ে সকলকে অনেক পেছনে ফেলে সে এগিয়ে গেল। শেষ সীমা পার হবার পর দৌড়ের টাল সামলানোর জায়গা পেল না। হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে সজোরে গতিবেগ সামলাতেই তার পা ঘুরে গেল। প্রিন্সিপ্যাল দীনেশ চক্রবর্তী তাকে আর দৌড়তে বারণ করলেন। কিন্তু বারণ শুনল না তপতী। কারণ স্পোর্টসের নেশায় সে পাগল। খোঁড়া পায়ে খোঁড়াদের দৌড়ে, মানে ক্যাঙ্গারু রেসেও সে স্থান পেল। তপতী এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, হাঁটুতে মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। কিছুদিন পরে রোগ ধরা পড়ল। 'মেডিয়াল সেমিলুনার কার্টিলেজ অব দি রাইট নী'। ১৯৫০ সালে হাঁটু অপারেশন করলেন মেডিক্যাল কলেজের সার্জন প্রভাত সান্যাল। সাইকেল জীবনে তপতীকে এখানেই ইতি টানতে হ'ল।

এবার টেবল টেনিস। পড়ার সংগে ওখানকার কমন রুমেই পাঠ আরম্ভ। ১৯৫৪ সালে ফাইন্যালে ইস্থার মোজেসকে হারিয়ে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ। জাতীয় অ্যাথলেটিকস ও সাইকেলে বাঙ্গলার প্রতিনিধিত্বের সুযোগের মত গুন্টুর, শাহরনপুর, হায়দরাবাদ, এমন কি কলম্বোতেও জাতীয় টেবিল টেনিসে বাঙ্গলার প্রতিনিধিত্বের সুযোগ। ১৯৫৪ সালে তপতী ছিল বাঙ্গলার টেবল টেনিসে এক নম্বর মেয়ে, পরে দুই নম্বর, এখনো সে তৃতীয় স্থানে রয়েছে গতবারের খেলার ফলাফলে। কিন্তু আর থাকবে না। খেলা সে ছেড়ে দিয়েছে।

তপতীর টেবল টেনিসের গ্রিপ একটু ডিফেক্টিভ। না পেনহোল্ড, না শেকহ্যাণ্ড। টেবল টেনিসের গুরুজী ভিক্টর বার্না তাঁর হাতের মা'র দেখে বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রিপ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা তার হয়ে ওঠেনি।

তপতীদের পৈতৃক বাড়ি ছিল খুলনা জেলার মিকশিমিল গ্রামে। বাবা সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক নলিনবিহারী মিত্র শান্তিনিকেতনে কিছুদিন ইংরেজীর অধ্যাপনা করেছেন। মা নীহার মিত্র ছিলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। ওখান থেকেই তিনি আই এ বি এ পাশ করেছেন। 'তপতী'র নামের একটু ইতিহাস আছে এবং সে ইতিহাস খুবই গর্বের। তপতী পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করবার আগে তপতীর অভিনয়ে মা নীহার মিত্রের 'বিপাশা' ও 'গৌরী'র ভূমিকা গুরু-দেব রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল লাগে। তপতী হবার পর গুরুদেবই তাঁর নাম রাখেন 'তপতী'।

মায়ের উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণাই খেলা-ধুলায় তপতীর সাফল্যের সোপান।

দেশী সংবাদ

২৯শে মে—জানা যায়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আগামীকাল বিমানে শিলং যাত্রা করিতেছেন। তিনি তাঁহার সহিত বিরোধ নিষ্পত্তির একটি ফরমুলাও লইয়া যাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ। এবার এ আই সি সি'র অধিবেশনে যদি সুস্পষ্ট ফল কিছু ফলিয়া থাকে তবে তাহা ইহাই।

আজ শোকদিবস। মাতৃভাষার দাবিতে ১১ জন শহীদের স্মৃতিদিবস। সমগ্র কাছাড় জেলা এইদিন সর্বাত্মক হরতাল পালন করে। জেলার হিন্দু ও মুসলমান, বাঙ্গালী অবাঙ্গালী ইহাতে যোগ দেয়।

৩০শে মে—কাছাড়ের ঐক্যবদ্ধ ভাষা আন্দোলন বানচাল করার জন্য ইদানীং কয়েকজন সরকারী কর্মচারী অত্যন্ত তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হইতে লক্ষাধিক টাকা এই অঞ্চলে আসিয়াছে এবং অসমীয়া ভাষা সংক্রান্ত কোন একটি 'সাহিত্য সভা' ও অন্যান্য ব্যক্তি মারফত উহা অকাতরে বিতরণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়ায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছে, তাহা অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ৩৪১ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য যে দাবি জানাইয়াছিল, তাহা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

৩১শে মে—পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের চূড়ান্ত হিসাবপত্র প্রণয়নে টালবাহানার দরুন এই রাজ্যের সাহায্যপ্রাপ্ত তিন সহস্রাধিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশই দারুন আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক যখন চাকুরির আশায় দ্বারে দ্বারে ধরনা দিয়া ফিরিতেছে, তখন শুধুমাত্র কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের গাফিলতির দরুন বহু সংখ্যক চাকুরি দীর্ঘদিন ধরিয়া খালি পড়িয়া থাকে; কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের ১৯৫৯-৬০ সালের বার্ষিক রিপোর্টে ঐ তথ্য উদ্ঘাটিত হয়।

১লা জুন—ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের প্রস্তাবের তুলনায় আরও বৃহত্তর পরিকল্পনা অনুমোদনের যে দাবি ক্রমাগত জানাইয়া আসিতেছিলেন, কমিশন তাহা মানিয়া লইতে ইচ্ছুক আছেন বলিয়া আজ সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দপ্তরের জনৈক মুখপাত্রের নিকট জানা গিয়াছে যে, কাছাড় জেলা কংগ্রেস কমিটি উহাকে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য যে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, উর্ধ্বতন কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন না।

২রা জুন—ইউ সি সি সদস্যগণ শর্ত সাপেক্ষে কলিকাতা কর্পোরেশনের বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটিতে যোগদান না করিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।

এক অভিযোগে প্রকাশ যে, অসমীয়া ভাষার জন্য কেহ হল্লাবাজি করিলেও কিছু না করার জন্য কয়েকটি থানায় সম্প্রতি এক গোপন সার্কুলার আসিয়াছে। তবে ইহাও কাছাড় জেলার ঐক্যে ফাটল ধরাইতে পারে নাই।

৩রা জুন—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অদ্য সকালে তাঁহার জাজপুরে দেরাদুনস্থ বাসভবনে আন্ত্রিক গোলযোগে মারা গিয়াছেন বলিয়া কলিকাতায় সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মৃত্যুকালে রথীন্দ্রনাথের বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে রাখিয়া গিয়াছেন।

অদ্য রাত্রির প্রথম ভাগে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলে উল্টাডাঙ্গা সুরিবাগান অঞ্চলের একটি বিরাট কাঠের কারখানা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। কিভাবে এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হইল তাহা জানা যায় নাই। তবে এত বড় অগ্নিকাণ্ড সম্প্রতি কলিকাতায় হয় নাই বলিয়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা মন্তব্য করেন।

৪ঠা জুন—কাছাড়ে ভাষা সমস্যার মীমাংসার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর দৌত্য অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বাংলা ভাষাকে আসামের অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দানের দাবি পুনরায় উত্থাপন করেন। প্রকাশ, শ্রী শাস্ত্রী নাকি নেতৃবৃন্দকে জানান যে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এই দাবি কখনই মানিয়া লইবে না।

বিদেশী সংবাদ

২৯শে মে—গত মাসে আলজিয়ার্সে সামরিক অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণের জন্য এখানে প্রাক্তন জেনারেল মরিস চালে ও আঁদ্রে জিলারের যে বিচার আরম্ভ হয়, আদালতে জিলার দুইবার সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ায় আজ উহা মুলতুবি রাখিতে হয়।

"যোগ-তরঙ্গিণী"তে মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির যে উপায় নির্ধারিত রহিয়াছে, রাজা মহেন্দ্র শীঘ্রই তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অল্প কিছুদিন পূর্বে তালপত্রে লিখিত সাড়ে তিন শত বৎসরের পুরাতন এই পাণ্ডুলিপিখানি তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন।

৩০শে মে—আফগানিস্তান ও পাকিস্তান সীমান্তের বিজাউর অঞ্চলে পাকিস্তানী বিমানবহর গত সপ্তাহে তিন দফা আক্রমণ চালায় বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহার ফলে এই অঞ্চলে ৯২ জন ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটিয়াছে।

আজ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চলে এবং সমুদ্রোপকূলের নিকটবর্তী দ্বীপগুলির উপর দিয়া একটি প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হয়। ঘূর্ণিবাত্যার গতিবেগ ঘণ্টায় ১০০ মাইল পর্যন্ত উঠিয়াছিল।

৩১শে মে—জনৈক মার্কিন মুখপাত্র আজ প্যারিসে বলেন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি ও প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের মধ্যে বার্লিন সম্পর্কে যে আলাপ-আলোচনা হয়, তাহাতে উভয়ে মোটামুটি একমত হইয়াছেন।

সোমবার পেশোয়ার জেলার লালকোর্তা দলের বারজন প্রাক্তন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। লালকোর্তা দলের ভূতপূর্ব নেতা খান আবদুল গফ্ফর খান বর্তমানে জেলেই আছেন।

১লা জুন—অদ্য সকালে প্যারিসে এলিজে প্রাসাদে প্রেসিডেণ্ট দ্য গল এবং প্রেসিডেণ্ট কেনেডির মধ্যে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হয়। দোভাষিগণ ব্যতীত বৈঠকে আর কেহ উপস্থিত ছিলেন না।

দক্ষিণ কোরিয়ার শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বৈপ্লবিক পরিষদ আজ ৭ জন কূটনীতিবিদ্‌কে পদচ্যুত করিয়াছেন এবং ৪৬৬ জন সিনিয়ার মিলিটারী পুলিস অফিসারকে সক্রিয় চাকুরি হইতে রিজার্ভ বাহিনীতে বদলি করিয়াছেন।

২রা জুন—গতকল্য প্যারিসের দক্ষিণ শহরতলি ক্লামারে বহুসংখ্যক বাসগৃহ পতনের ফলে ১৮ জন নিহত হয়। উদ্ধারকারী দল ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে ৫৫ জন আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন।

তৈল উত্তোলনের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের সহিত চুক্তি বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে ছয়জন সদস্য-বিশিষ্ট একটি সোভিয়েট প্রতিনিধি দল করাচীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

৩রা জুন—মার্কিন প্রেসিডেণ্ট শ্রী কেনেডি ও সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেফ বিশ্ব সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য আজ ভিয়েনাতে এক ঘরোয়া পরিবেশে গোল টেবিল বৈঠকে মিলিত হন। এই আলোচনার ফলে সোভিয়েট-মার্কিন সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হইবে।

একটি মৃতজাত শিশুর বক্ষদেশ চিরিয়া লণ্ডনের জনৈক সার্জন কর্তৃক অঙ্গুলি দ্বারা হৃৎপ্রদেশ সংবাহনের ফলে শিশুর জীবন সঞ্চার হইয়াছে। বৃটিশ সার্জিকাল ইতিহাসে এবং সম্ভবত সমগ্র বিশ্বে ইহা রেকর্ড।

৪ঠা জুন—মার্কিন প্রেসিডেণ্ট শ্রী কেনেডি এবং সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রী ক্রুশ্চেফের মধ্যে ভিয়েনাতে সপ্তাহ শেষে "প্রয়োজনীয়" আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আজ রাত্রে এক যুক্ত রুশ-মার্কিন ইস্তাহারে বলা হয়। ইস্তাহারে প্রকাশ, উভয় নেতাই নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন লাওসের জন্য পুনরায় তাহাদের সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা। মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা। মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১। টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
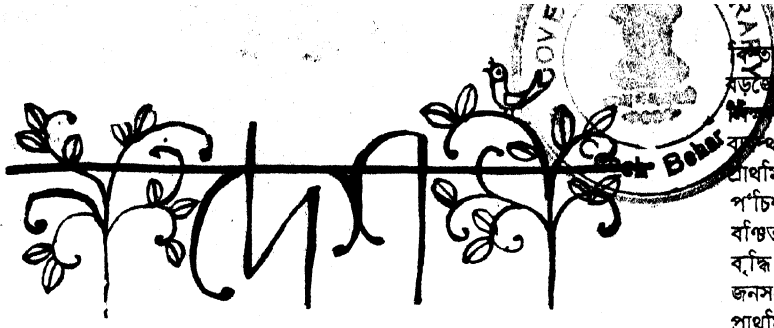
DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 17th June, 1961.

২৮ বর্ষ ॥ ৩৩ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২ আষাঢ়, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

ভাষা ও শিক্ষা

শ্রীনেহরু তাঁর একটি সাম্প্রতিক ভাষণে বলেছেন, ভাষাশিক্ষা ব্যাপারে 'অধিকন্তু ন দোষায়', যত বেশী সংখ্যক ভাষা শেখা যায় ততই ভাল। তাঁর মতে য়ুরোপে নাকি অনেকেই একটার বেশী ভাষা শেখে। 'অনেকে' কথাটা সংখ্যাগাণিতিক বিচারে ধরাছোঁয়ার বাইরে-প্রায়। তাছাড়া য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা বর্তমানে খুব অর্থবহ নয়।

য়ুরোপে অক্ষরজ্ঞানহীন লোকের সংখ্যা নামমাত্র; আমাদের শতকরা আশী-জন এখনও নিরক্ষর। যে কোন বড় শহরের বা শিল্পকেন্দ্রের পোস্ট অফিসে মাসের প্রথমদিকে গেলে দেখা যাবে বহু প্রাপ্তবয়স্ক লোক কিছু দর্শনীর বিনিময়ে ইংরেজীনবীশ কাউকে দিয়ে মনি-অর্ডার ফরম লিখিয়ে নিচ্ছে। আমাদের কাছে এ-দৃশ্য গা-সওয়া হয়ে গেছে। শতকরা আশীজন অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষের দেশে বহু ভাষা শিক্ষার উপদেশ দেওয়া নিরর্থক। আপিসে, আদালতে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোককে নির্ভর করতে হয় ইংরেজীনবীশের উপর; দলিলপত্র যথারীতি সম্পাদনায় টিপসই ছাড়া অনেকেরই গতি নেই; ভোটযুদ্ধে রকমারি প্রতীক-চিহ্নের প্রয়োজনও অনুরূপ কারণে। অতএব ভারতবর্ষের বহুলোক যে বহুভাষায় লিখন পঠন বা কথোপকথনে পারদর্শী হতে চেষ্টিত হবে তার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

বহু ভাষা ব্যবহারে চলনসই অধিকার সম্পর্কে শ্রী নেহরু য়ুরোপের যে নজীর দিয়েছেন সেটিও বাস্তবিকপক্ষে নির্ভর-যোগ্য নয়। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা শখ করে শেখে এমন লোকের সংখ্যা য়ুরোপে এবং আমেরিকায় খুব সামান্যই। ব্যবসায়িক, সাংস্কৃতিক এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতি সংক্রান্ত প্রয়োজনে বিদেশী ভাষা কিছু কিছু লোকের শেখা আবশ্যক বটে, কিন্তু সাধারণ লোক যারা স্কুলের পর্ব শেষ করে জীবিকা অর্জনে নিযুক্ত হয় তারা মাতৃভাষার গণ্ডি বড় একটা পার হয় না। সাধারণ ইংরেজ শুধু ইংরেজীই জানে; ফরাসীরা ত তাদের মাতৃভাষার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন বলে ইংরেজী বা জার্মান ভাষা নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে শেখে না। তবু একথা মানতে হবে যে, য়ুরোপে প্রতিবেশী দেশগুলির শিক্ষিত মহলে মাতৃভাষা ছাড়া দুএকটা বিদেশী ভাষা চর্চার রেওয়াজ আছে। মোট জনসংখ্যার অনুপাতে এ'দের সংখ্যা অবশ্য কখনই খুব বেশী নয়। কথা হল, যেখানে মাতৃভাষায় প্রায় সকলেই লিখন-পঠনক্ষম সেখানেই আরও দু'চারটি ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ সঞ্চার সম্ভব।

আমাদের উচ্চশিক্ষিত মহলেও বহু-ভাষা শিক্ষায় বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। মাতৃভাষা ছাড়া একমাত্র ইংরেজী ভাষাই ভারতবর্ষের শিক্ষিত শ্রেণী সযত্নে যথাসাধ্য আয়ত্ত করে থাকেন। রাষ্ট্রিক কারণে হিন্দীচর্চা ক্রমশ বিস্তৃত হলেও এখনও এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশী নয় যারা ত্রি-ভাষী অর্থাৎ মাতৃভাষা, ইংরেজী এবং হিন্দী, তিনটিতেই লেখাপড়া অথবা কথাবার্তা চালাতে সক্ষম। চৌদ্দটি আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে বাকী কয়টির সংগে মোটামুটি পরিচয় আছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা আরও কম।

মাইকেল মধুসূদন কিম্বা হরিনাথ দের মত বহু ভাষা শিক্ষায় উৎসাহীর সংখ্যা কোন দেশেই প্রচুর নয়। আমাদের সমস্যাও অন্যরকম। প্রথমত, লিখন-পঠনক্ষমের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার দ্রুত বিস্তার প্রয়োজন। বহুভাষা শিক্ষা পরের কথা, ভারতবর্ষে সর্বজনীন ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের আয়োজনই এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের যে সংকল্প নেয়া হয়েছে তাতে বড়জোর দেশের তিন-চতুর্থাংশ প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য স্কুলে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এর মানে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা প'চিশজন লিখন-পঠন শিক্ষার সুযোগে বঞ্চিত থাকবে। ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতি বৎসর পঞ্চাশ লক্ষ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে তাল রেখে প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন কিন্তু বিস্তৃত হচ্ছে না। কাজেই কারো কারো আশঙ্কা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে লিখন-পঠনক্ষমের বর্তমান শতকরা কুড়িজন হারও কমে যাওয়া অসম্ভব নয়।

ভাষার অধিকার নিতান্ত তত্ত্বগত সামগ্রী নয়, শ্রীনেহরু যে বহুভাষায় অধিকার বিস্তৃত করার পরামর্শ দিয়েছেন তার উপযোগী বাস্তব পরিবেশ রচনা ও সঙ্গতিবিধান আরও দুরূহ আয়াস-সাধ্য। য়ুরোপের শিল্পোন্নত সভ্যতায় একদেশের মানুষের সংগে অন্যদেশের মানুষের বৈষয়িক যোগাযোগ এবং ভাব-বিনিময়ের ব্যবস্থা দীর্ঘকাল ধরে বিস্তৃত ও সুবিন্যস্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক এখনও নিজ নিজ গ্রামীণ পরিমণ্ডলের মধ্যে আবদ্ধ। এক রাজ্যের লোকের কাছে প্রতিবেশী রাজ্যই বিদেশতুল্য; কেবল ভাষাগত ব্যবধান নয়, বেশভূষায়, সামাজিক আচার আচরণে, কুটুম্বিতায় ভারতবর্ষের এক অঞ্চলের অধিবাসীর সঙ্গে অন্য অঞ্চলে অধিবাসীর দুস্তর ব্যবধান। ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও ইংরেজের সংগে ফরাসীর, ফরাসীর সংগে জার্মানের, জার্মানের সংগে ইংরেজের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনে বাধা নেই। তেমনি জীবনযাত্রার মান উঁচু বলে য়ুরোপের, বিশেষ করে পশ্চিম য়ুরোপের, মানুষ সুযোগ পেলেই তার অভ্যস্ত সামাজিক গণ্ডীর বাইরে প্রতিবেশী রাজ্য অথবা দেশের সংগে পরিচিত হতে চেষ্টা করে। এক ব্রিটেন থেকেই প্রতি বৎসর দশ লক্ষ লোক খাস য়ুরোপ ভ্রমণে বার হয়। এইভাবে বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আত্মীয়তা-বন্ধন রচিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত সচ্ছল অবস্থাপন্ন লোকেরাই এখনও পরস্পর অন্তরঙ্গ পরিচয়ে উৎসাহী নন, সাধারণ লোকদের পক্ষে ত সে-সুযোগই নেই। শিক্ষার বিস্তার ও জীবনযাত্রার মান বহুল পরিমাণে উন্নত না হওয়া পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত জনসমষ্টির মধ্যে স্বচ্ছন্দ সম্প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা সুদূরপরাহত।

বিস্মৃত আঁধার

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

কোনোদিন চলে যাবো জলমালা ছায়ানীল জলে।
কোথা হে শৈশব তব মুখচ্ছবি, সুদূর ঝরোকা
কেন এ কাঁটার শ্লোক বয়সের জটিল ফসলে;
শরীরে আষাঢ় হানে জলময় কমল অলকা।

খাখালিয়া রৌদ্র ছিলো অপরাহ্ণে ফেরিঘাটে একা,
জাহাজের শব্দ শুনে......অলৌকিক জলজ্যোৎস্নায়
আমার কৈশোর গেছে—দুঃখময় মৃদু পথরেখা।
দূরের কুহক আজ গাঢ় জলে টানে অবেলায়।

অন্তরীপে ঘোরে হাওয়া, শান্তির অপার নারিকেল......
দৃশ্যাবলী ভেসে যায় অনীশ্বর লবণ সাগরে.
রৌদ্রে পোড়ে নোনা বালি......ঝাঁকড়া, মাছ—বিপুল বিকেল;
বিরলে বুকের দোলা গৃহপুঞ্জে......স্মৃতির জাগরে।

ক্লিষ্টগুলি চলে যাবে একরাশ হেমন্তে উদ্বেল,
কোনোদিন যাবো না কী অইসব পুরানো আদরে!

সুন্দরী তমাল

নিখিলকুমার নন্দী

সুন্দরী এই পৃথিবীটাকে দু হাতে ধ'রে
মাতাল হাওয়া কী কথা বলে শুনতে চাও
মদের ফোঁটা শরীরময় কী জাদু করে
ঘড়ির কাঁটায় পায়ের ধ্বনি গুনতে চাও
দেখতে চাও, দ্যাখো সুখের মাতাল হাওয়া!

আকাশময় অন্ধকার ছড়িয়ে দিয়ে
পৃথিবীদেহে আলোকরেখা ফুটতে দেয়
ইন্দ্রিয়ের সব উনান জ্বালিয়ে নিয়ে
শরীরে তার ঝাঁপিয়ে পড়ে লুঠতে নেয়
বহু সময় বন্ধুদের সঙ্গে বওয়া!

তবেই বোঝো ভব্যতার অন্তরালে
সখা তোমার জখম করে বিশ্বরূপ
খোশমেজাজী যদিবা হয় তারই গালে
রতির দাগ বাসীরাতের অন্ধকূপ
তাকে চেয়েও কেন তোমার দুঃখ সওয়া!

ইছামতী

মঞ্জুলিকা দাশ

বিকেল হলে-ই চুপচাপ বসে থাকতাম
তোমার বুকের কাছে।
কী এক গভীর ইচ্ছাপূরণের শান্তি তোমাতে নিহিত আছে
জানতাম ঠিক। ফুলে উঠতে, ফেঁপে উঠতে
দুরন্ত সমীরে তুমি, আমি কাঁপতাম।

তোমার জলকে ছুঁয়ে, তোমার ঢেউকে ছুঁয়ে আমি তাই পাই—
পাই না যা, পাব না যা জীবনে কখনও।
আমি যাকে ভালবাসি সবচেয়ে তার চোখে চোখ রেখে
নিজেকে হারাতে চাই,—
কিন্তু আজ বহুদূরে নিরুপায় মন
মিশে যেতে চায় নদী তোমাতে আমাতে।
দুঃখ নেই, শোক নেই, পৃথিবীর কোন লোক আমাকে না চা'ক,
তোমার অশান্ত জলে আমার অসুস্থ মন নীড় ফিরে পাক।

বৈদেশিকী

অ্যাঙ্গোলা সম্পর্কে সিকিউরিটি কাউন্সিলে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবটির খসড়া অ্যাফ্রো-এশিয়ান গ্রুপের তরফ থেকে দেওয়া হয়। প্রস্তাবটিতে পর্তুগীজ গবর্নমেণ্টকে অবিলম্বে অ্যাঙ্গোলায় দমননীতিমূলক কার্যাবলী থেকে নিবৃত্ত হতে বলা হয়েছে। এই প্রস্তাবের দ্বারা অ্যাঙ্গোলার বাস্তব অবস্থায় কোনো আশু পরিবর্তন ঘটবে এরূপ আশা করার কোনো কারণ নেই। প্রস্তাব গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পর্তুগালের প্রতিনিধি ঘোষণা করেন যে, এই প্রস্তাবটি "বে-আইনী", এর দ্বারা পর্তুগালের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন করার চেষ্টা হয়েছে, পর্তুগীজ গবর্নমেণ্ট এই প্রস্তাবকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনবেন না।

ইউ-এন'এর এই ধরনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে যে চলা যায় তার অনেক নজির আছে। সংশ্লিষ্ট গবর্নমেণ্ট যদি বাস্তবে কোনো-দিক থেকে বড়ো রকমের চাপ কিছু না পান তবে ইউ-এন'র ভৎসনা অগ্রাহ্য করতে বাধে না। ইউ-এন সংসদে বা সিকিউরিটি কাউন্সিলে সময়োচিত গবর্নমেণ্টের মিত্রদের ভাব বা ভোটের অর্থও সবসময়ে স্পষ্ট নয়। সমালোচনা করা ভোটে নিরপেক্ষ থাকা, এমন কি বিরুদ্ধে ভোটদানেও তেমন কিছু আসে যায় না যদি কার্যত এমন কিছু না করা হয় যাতে সমালোচিত গভর্নমেণ্টের কর্মধারা বাস্তবে ব্যাহত হতে পারে। অন্যদের কাছে মুখ রক্ষার জন্য, এমন কি খানিকটা আন্তরিক সদিচ্ছা থেকেও ইউ-এন সংসদে বা সিকিউরিটি কাউন্সিলে কোনো পুরাতন মিত্রের কোনো কর্ম নীতির কিছুটা সমালোচনা করা, কিন্তু সেই কর্মনীতি পরিচালনার পথে কোনো কার্যকর বাধা সৃষ্টি না করা এইরকম পরস্পর বিরোধী ব্যবহারের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আলজেরিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে ফ্রান্সের মিত্রগণ অনেকদিন থেকেই কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে আসছেন। ফ্রান্সের নীতি সারা পশ্চিমা ব্লককে পৃথিবীর জনমতের নিকট বিশেষ করে আরব দুনিয়ার জনমতের নিকট অপ্রিয়তর করে তুলছে এটা আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের অন্য মিত্রেরা অনুভব করেন। ইউ-এন'এর দরবারে আলজিরিয়া সম্পর্কিত আলোচনাদিতে ফ্রান্সের মিত্রদের এই অস্বস্তির ভাবের প্রকাশ দেখা গেছে এবং ক্রমশ ভোটাভুটিতেও তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু যাতে ফ্রান্সের যুদ্ধ চালিয়ে যাবার শক্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কিছু কাজ ফ্রান্সের মিত্রেরা করেননি। এমন কি আলজেরিয়ায় যুদ্ধ চালিয়ে যাবার দরুণ ফ্রান্স ন্যাটো চুক্তির নির্দিষ্ট কর্তব্য করতে পারেনি, সেটাও ফ্রান্সের মিত্রগণ মেনে নিয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পক্ষে কোনো বাধাই ফ্রান্স তার মিত্রদের কাছ থেকে পায়নি। অস্ত্রবলে আলজিরিয়াকে পদানত করে রাখা যে সম্ভব হচ্ছে না তার জন্য ফ্রান্সের মিত্র-গণকে এতটুকু দোষ দেওয়া যায় না, তারা ফ্রান্সের জয়ের পথে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। অন্তরায় যা তা সৃষ্টি করেছে আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতার যোদ্ধারা।

সিকিউরিটি কাউন্সিল অ্যাঙ্গোলা সম্পর্কিত প্রস্তাবের আলোচনাতেও

পর্তুগালের মিত্রগণের অস্বস্তির ভাব অনেকটা প্রকাশ পেয়েছে. শুধু তাই নয়, এই ব্যাপারে আমেরিকার সঙ্গে বৃটেন ও ফ্রান্সের কিছুটা মতভেদও হয়েছে যেটা ভোটেও প্রকাশ পেয়েছে। প্রস্তাবটি ৯—০ ভোটে গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে কেহ ভোট দেয়নি। কিন্তু দুটি দেশ ভোটদানে বিরত ছিল, তারা হচ্ছে বৃটেন ও ফ্রান্স। বক্তৃতায় এই সব দেশের প্রতিনিধিরা অবশ্য এ্যাঙ্গোলায় যা ঘটছে তার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, এমনও নয় যে, পর্তুগীজ সরকারের নীতির অভ্রান্ততা সম্বন্ধে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেননি। ফ্রান্সের প্রতিনিধি তাঁর বক্তৃতায় নূতন যুগের উপযোগী নীতি ও কর্ম-পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদনও জানিয়েছেন। কিন্তু পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টকে সোজাসুজি দোষী সাব্যস্ত করে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতে তাঁরা রাজী হননি। বৃটিশ প্রতিনিধি প্রস্তাবটিকে আরো নরম করতে চেয়েছিলেন। এ্যাঙ্গোলায় যে হিংসাত্মক কার্যাবলী চলেছে সেগুলি বন্ধ হোক—এই ধরনের প্রস্তাব বৃটিশ প্রতিনিধি চেয়েছিলেন। অর্থাৎ কেবল পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টকেই দোষী না করে এ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতাকামী আফ্রিকান বিদ্রোহী এবং পর্তুগীজ গভর্নমেণ্ট উভয় পক্ষের হিংসাত্মক কার্য বন্ধ হোক—এই মর্মে (এবং কোনো পক্ষের নাম উল্লেখ না করে) আবেদন জানাবার পক্ষে বৃটিশ প্রতিনিধি ওকালতি করেন।

এই ব্যাপারে আমেরিকা বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে এক তালে চলেনি। আমেরিকা এ ব্যাপারে পর্তুগীজ নীতির নিন্দাবাদে যোগ দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করেছে। এজন্য লিসবনে এবং লুয়াণ্ডাতে মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শনও হয়ে গেছে। কিন্তু পর্তুগালের মিত্রদের এই ভোট দেওয়া বা না দেওয়ার দরুণ এ্যাঙ্গোলায় পর্তুগীজ নীতিতে অবিলম্বে কোনো মৌল বাস্তব পরিবর্তন হবে, এমন আশা করা যায় না। আমেরিকার সঙ্গে বৃটেন ও ফ্রান্সের মতানৈক্য প্রকাশ হওয়াতে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টের বর্তমান বেপরোয়া ভাবের আপাতত প্রশমিত হবার সম্ভাবনা বরঞ্চ কমতে পারে। পর্তুগাল যা করছে তাতে সে তার শক্তিশালী মিত্রদের কাছ থেকে হাতে কলমে কোনো বাধা পাবে এমন আশংকা তার আছে বলে মনে হয় না।

সুতরাং বাস্তবে যদি পর্তুগীজ নীতিকে প্রতিহত করতে হয় এবং এ্যাঙ্গোলায় অমানুষিক হত্যালীলা বন্ধ করতে হয় তবে তার দায়িত্ব এ্যাঙ্গোলায় এবং অন্যান্য পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক রাজ্যে যাঁরা স্বাধীনতার লড়াই করছে তাদেরই বহন করতে হবে। সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রস্তাবের প্রভাব কার্যকর হবে বা পর্তুগালের শক্তিশালী মিত্রগণ পর্তুগালের উপর চাপ দিয়ে পর্তুগীজ নীতির পরিবর্তন ঘটাবেন, এই আশায় বসে থাকলে পর্তুগীজ অত্যাচারের আশু নিরসনের কোনো সম্ভাবনা নেই।

এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের যে একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে সে কথা গত সপ্তাহের বৈদেশিকীতে আলোচিত হয়েছে। ভারতের দায়িত্ব এই জন্য যে ভারত এখনও নিজের দেহে পর্তুগীজ অত্যাচার সহ্য করছে। গোয়া ভারতভূমির অংশ এবং গোয়ার মুক্তি ভারতের স্বার্থেই আবশ্যক—একথা ভারত সরকার কর্তৃক বহুবার ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু গোয়ার মুক্তি ভার ভারত সরকার ইতিহাসের উপর ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক ঘটনার চাপে একদিন পর্তুগাল তার শক্তিশালী মিত্রদের সমর্থন হারাবে, সেদিন গোয়া অনায়াসে ভারতের কোলে এসে যাবে. এই ভরসাই ভারত সরকারের "গোয়া নীতি"র নামান্তর। সেই নীতিতে যাতে মাঝে মাঝে গলাবাজি করা ছাড়া ভারত সরকারের আর কোনো কর্তব্য নেই বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এই নিষ্ক্রিয় নীতির কাপুরুষতা যে কতখানি সেটা এ্যাঙ্গোলার অবস্থা এবং সেই সম্পর্কে জগতের এবং ভারতের কী তার বিচার করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি। আজ আমাদের এটা স্পষ্ট বুঝা উচিত যে, অন্যে যে যাই করুক ভারতবর্ষের পক্ষে কেবল গলাবাজি এবং ইউ-এন'এর দ্বারা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেবার চেষ্টাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট হতে পারে না, ভারতবর্ষের পক্ষে সেটা ভারত সরকারের গোয়া নীতির কাপুরুষতাকে ঢাকা দেওয়ার অন্যতম প্রয়াস মাত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

সিকিউরিটি কাউন্সিলের এ্যাঙ্গোলা সম্পর্কিত আলোচনাকালে পর্তুগালের প্রতিনিধি ভারতের পক্ষে মানহানিকর কতকগুলি কথা বলেছেন বলে ভারতীয় প্রতিনিধি তাঁর বক্তৃতায় পর্তুগীজ প্রতিনিধির "বেয়াদবি"র প্রতিবাদ করেছেন। পর্তুগীজ প্রতিনিধি কী বলেছিলেন তা এখন পর্যন্ত এখানকার কাগজে বেরোয়নি। বোধহয় সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি ভারত সরকারকেও অত্যাচারী বলে চিত্রিত করার প্রয়াস করেছিলেন। পর্তুগীজ প্রতিনিধি ভারত সরকারের বিরুদ্ধে কী কী মিথ্যা উক্তি করেছিলেন জানি না। কিন্তু তিনি যদি ভারতের নিন্দা করতে গিয়ে ভারত সরকারের প্রতি কাপুরুষতা আরোপ করতেন তাহলে সেটা সত্যের অপলাপ হত বলে আমরা মনে করি না।

পঞ্চতন্ত্র
সৈয়দ মুজতবা আলী

ভবঘুরে (১২)

জাওয়ার ক্রাউট নিয়ে বড্ড বেশী বাগাড়ম্বর করার বাসনা নেই। আমাদের কাসুন্দোর মত ওতে বড্ড বয়নাক্কার খাটুনিটি। তার কারণ সমস্যা দু'জনারই এক। তেল, নুন, সিরকা, চিনি এসব কোনো সংরক্ষণকারী বস্তু অর্থাৎ প্রিজারভেটিভ ব্যবহার না করে কিংবা যতদূর সম্ভব অল্প ব্যবহার করে কি প্রকারে খাদ্যবস্তু বহুকাল ধরে আহারোপযোগী করে রাখা যায়, কাসুন্দো ও জাওয়ার ক্রাউটের এই নিয়ে একই শিরঃপীড়া। সেই কারণেই বোধ হয় কাসুন্দো বানাবার 'আস্য' পুব বাঙলার বেশী পরিবারে নেই। মুসলমানরা আদপেই কাসুন্দো বানাতে পারে না বলে কাসুন্দো বানাবার সময় অক্ষয় তৃতীয়ায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বড্ড বেড়ে যায়। বানাবার 'আস্য' না থাকলেও সহাস্য বদনে খাবার 'আস্য' সকলেরই আছে।

পশ্চিমের উপর খুদাতালার মেহেরবানিও অত্যধিক। ওদের তরি-তরকারি ফলমূল বেবাক তৈরী হয়ে ওঠে গ্রীষ্মের শেষে। তার পরেই শীত এসে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণে সাহায্য করে। আমাদের উত্তম উত্তম তরি-তরকারি তৈরী হয় শীতের শেষে—তার পরই আসে গ্রীষ্মকাল—সংরক্ষণকর্মে প্রকৃতির কোনোই সহায়তা পাইনে। ফল পাকে গ্রীষ্মকালে—তার পরই এসে যায় ভ্যাপসা বর্ষা—মসনে-ছাতি পড়ে সব-কিছু বরবাদ। পচা বর্ষার শেষের দিকে দুই নয়া পয়সার রোদ্দুর ওঠা মাত্রই গিন্নী মা'রা আচারের বোয়াম নিয়ে টাটু ঘোড়ার বেগে বেরন ঘর থেকে। ফের পইন্ট জিরো ইলশে গুঁড়ি নাবামাত্র তাঁরা 'ঐয্যা, গেল গেল, ধর ধর' বলে বেরন রকেট-পারা। আর বাইবেলী ভাষায় 'ধন্য যাহারা সরল হৃদয়'—অর্থাৎ ভোলা-মন, তাদের তো সর্বনাশ।

জানি, তেলে টইটম্বুর করে রাখলে মসনে পড়ে না, কিন্তু বড্ড বেশী তেল চিট্‌চিটে আচার খেয়ে সুখ নেই। তদুপরি ভেজাল তেলের ঠেলায় এ গ্রীষ্মে মোক্ষম মার খেয়ে আমি আচারের মাথায় ঘোল ঢেলে দিয়ে বিদায় দিয়েছি। এখন রইলেন শুধু জারক নেবু, আর বাজারের ও'ছা আচার!

আমি বললুম, 'মারিয়ানা, ঠাকুরমার সেই "লাঙে হের, লাঙে হের"—পুরনো দিনের গল্প বলো না?'

অপরাহ্নের ট্যারচা সোনালী রোদ এসে পড়েছে ঠাকুরমার নীল সাদা সেটের উপর

আর মারিয়ানার ব্লণ্ড চুলের উপর। চেরি ব্র্যাণ্ডির বেগনী রঙের সঙ্গে সে আলো মিশে গিয়ে ধরেছে এক অদ্ভুত নূতন রঙ। ডাবরের সূপের ফোঁটা ফোঁটা চর্বির উপর আলো যেন স্থান না পেয়ে ঠিকরে পড়ছে। সে রোদে ঠাকুরমার বরফের মত সাদা চুল যেন সোনালী হয়ে উঠলো। তার পিঠের কালো জামার উপর সে আলো যেন আদর করে হাত বুলোচ্ছে। জানলার পরদা যেমন যেমন হাওয়ায় দুলছে সঙ্গে সঙ্গে আলোর নাচ আরম্ভ হয় ঝকঝকে বাসন-কোশনের উপর, গেলাসের তরল দ্রব্যের উপর আর ঠাকুরমা নাতনীর চুলের উপর।

অনেককাল পর গ্রামাঞ্চলে এসেছি বলে খেতে খেতে শুনছি, রকম-বেরকম পাখির মধুর কূজন। এদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এরা আর বেশীদিন এখানে থাকবে না। শীত এলে দক্ষিণের দিকে পাড়ি দেবে। তখন গ্রাম শহরের তফাত ঘুচে যাবে।

আসবার সময় এক সারি পপলার গাছের নিচু দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় বাড়ি পৌঁছেছিলুম। রবিবারের অপরাহ্ন বলে এখনো সমস্ত গ্রাম সুষুপ্ত—শুধু ঐ চিনারের মগডালের ভিতর দিয়ে বাতাস চলার সামান্য গুঞ্জরন ধ্বনি কানে আসছে, কিংবা কি এদেরই ডোবার পাড়ে যে নুয়ে পড়া উইপিং উইলো দেখেছি তারই ভিতর দিয়ে বাতাস ঘুরে ফিরে বেরবার পথ পাচ্ছে না? ঐ গাছের জলের উপর লুটিয়ে-পড়া, মাথার সমস্ত চুল এলোমেলো করে দিয়ে সদ্য-বিধবার মত গুমরে গুমরে যেন কান্নার ক্ষীণ রব ছাড়া—এগুলো আমার মনকে বড় বেদনায় ভরে দেয়। দেশের শিউলি ফুলের কথা মনে পড়ে। তার নামও কেউ কেউ ইংরিজীতে দিয়েছে 'সরো ফ্লাওয়ার' বিষাদ-কুসুম।

ঠাকুরমা ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ জেগে উঠলেন। জানিনে, বোধ হয় 'লাঙে হেরের' ফাঁড়া কাটাবার জন্য মারিয়ানাকে শুধোলেন, 'কাল হের হান্সের সঙ্গে কি কথা-বার্তা হল?'

মারিয়ানা আমার দিকে তাকিয়ে দুষ্টু হাসি হেসে বললে, 'দেখলে? তা সে যাক্। কিন্তু জানো, হান্স্ কাকা বড় মজার লোক। যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলে —কোন্‌টা যে সত্যি, কোন্‌টা যে তার বানানো কিচ্ছুটি বোঝার উপায় নেই। কাল বলছিল একবার হান্স্ কাকা আর বাবা নাকি লড়াইয়ের ছুটি পেয়ে দুজনা শিকারে গেছে—তখন লড়াইয়ের সময় বলে বন্দুকের লাইসেন্স নিয়ে বড্ড কড়াক্কড়ি। হঠাৎ একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়েছে পুলিস, দেখতে চেয়েছে লাইসেন্স। পুলিসকে যেই না দেখা অমনি হান্স্ কাকা বাবাকে ফেলে দিয়েছে চোঁ চাঁ ছুট। পুলিসও ধরবে বলে ছুটেছে পিছনে। ওদিকে হান্স কাকা মোটা-সোটা গাব্দা-গোব্দা মানুষ। আধ মাইল যেতে না যেতেই পুলিস তাকে ধরে ফেলেছে। কাকা বললে, পুলিস নাকি হুংকার দিয়ে লাইসেন্স চাইলে। কাকাও নাকি ভালো মানুষের মত গোবেচারী মুখ করে পকেট থেকে লাইসেন্স বের করে দেখালে।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'লাইসেন্স যদি ছিল তবে ওরকম পাগলের মত ছুটলো কেন?'

মারিয়ানা বললে, 'আহ্, শোনোই না। তোমার কিছুতেই সবুর সয় না। পুলিসও তোমারই মত বেকুব বনে ঐ প্রশ্নই শুধালে। তখন হান্স্ কাকা নাকি হাসতে হাসতে গড়াগড়ি দিয়ে বললে, "আমার লাইসেন্স আছে, কিন্তু আমার বন্ধুর নেই। সে এতক্ষণে হাওয়া হয়ে গিয়েছে।" পুলিস নাকি প্রায় তাকে মারতে তাড়া করেছিল।'

আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'খাসা গল্প। পুলিসের তখনকার মুখের ভাবটা দেখবার আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে। জানো, আমাকেও একবার পুলিস তাড়া করেছিল। ওরে বাপ রে বাপ! সে কী ছুট, কী ছুট, কিন্তু ধরতে পারেনি।'

মারিয়ানার কচি মুখ ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছে। হোঁচট খেতে খেতে শুধোলে, 'কেন, কি হয়েছিল?'

আমি বললুম, 'কি আর হবে, যা আকছারই হয়ে থাকে। পুলিসে স্টুডেণ্টে পাল্লা।'

মারিয়ানা নির্বাক ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি শুধলুম, 'কি হল? আমার মাথার পিছনে ভূত এসে দাঁড়িয়েছে নাকি?'

তোৎলাতে তোৎলাতে শুধোলে, 'তুমি য়ুনিভার্সিটির স্টুডেণ্ট!'

আমার তখনো জানা ছিল না, এ দেশের গ্রামাঞ্চলের লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় একটা যায় না। কাজেই এখানে তাদের বড় সম্মান, রীতিমত সমীহ করে চলা হয়। তাই আমি আমার সফরের শেষের দিকে কথাটা বেবাক চেপে যেতুম। আমি ট্র্যাম্প, ট্র্যাম্পই সই। কী হবে ভদ্রলোক সেজে।

মারিয়ানা বললে, 'তাই বলো। আমিও ভাবছি, ট্র্যাম্পই যদি হবে তবে নখের ভিতর দু' ইঞ্চি ময়লা নেই কেন? ট্র্যাম্পই যদি হবে তবে সোপ্সে গিলছে না কেন? খেতে খেতে অন্তত বার তিনেক ছুরিটা মুখে পুরলো না কেন?'

আমি অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে বললুম "ভুলগুলো মেরামত করে নেব।"

'ধ্যাৎ! ওগুলো নোংরামি। শিখতে হয় নাকি?'

আমি বললুম, 'কোথায় স্টুডেণ্ট বলে পরিচয় দিলে লাভ, আর কোথায় ট্র্যাম্প সাজলে লাভ এখনো ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারিনি। যখন যেটা কাজে লাগে সেইটে করতে হবে তো। এই তো যেমন তুমি। মনে হচ্ছে ট্র্যাম্পের কদরই তোমার কাছে বেশী।'

এইটুকু মেয়ে। কি বা জানে, কীই বা বোঝে। তবু তার মুখে বেদনার ছায়া পড়লো। বড় বড় দুই চোখ মেলে নিঃসংকোচে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমাকে আমার ভালো লাগে, তা তুমি ট্র্যাম্পই হও, আর স্টুডেণ্টই হও।'

পঞ্চদশীর স্মরণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'অকারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে, ছল ছল জল এনে দেয় তব নয়নপাতে।' এ মেয়ে একদিন বড় হবে। ভালোবাসতে শিখবে। সেইদিনের আগমনী আজকের দিনের এই 'ক্বচিৎ জাগরিত বিহঙ্গ-কাকলীতে।'

মনস্তত্ত্ব ও রঙের প্রভাব

শৈলেনকুমার দত্ত

মানুষের জীবনে রঙ্ একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীকে রঙ্ ইচ্ছেমত বদলাতে পারে। ঠিক এই দুর্বলতার জন্যই ব্যবসায়ীরা তাঁদের জিনিস কাটাবার জন্যে রঙের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। বস্তুত আকাশ নীল থাকলে মন প্রফুল্ল থাকে কিন্তু বর্ষার কালো মেঘ দেখলেই তার পরিবর্তন হয়। ঘরের দেওয়াল লাল হলে রক্তচাপাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের কষ্ট দেয়—ধৈর্যহীন ব্যক্তিরাও বেশ উত্তেজনা অনুভব করেন। অথচ নীল রঙ স্বভাবতই শান্ত। হলুদহীন সবুজ রঙও অসুস্থ রোগীকে আনন্দ দেয়। কিন্তু ক্যাটকেটে হলদে রঙ মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিকে পীড়া দেয়।

এই প্রভাবের জন্যেই রেস্তোরাঁতে রঙের প্রয়োজন হয়। মধু মিষ্টির চেয়ে মুখ মিষ্টি হলে যেমন বিক্রি বেশী হয় ঠিক তেমনি সাদা ডিশের বদলে সবুজাভ ডিশে খাবার পরিবেশন করলে বিক্রি যে একটু বেশী হয় না—একথা বলা যায় না।

শল্যচিকিৎসকদের অস্ত্রোপচারের সময় রঙের আশ্রয় নিতে হয় বিশেষভাবে। হাসপাতালে সাদার পরিবর্তে নীলাভ-সবুজ ব্যবহার করা ভাল। ডাক্তার এবং নার্সদের হাতেমুখে যে নীলাভ সবুজ রঙের মুখোশ বা দস্তানা ব্যবহার করা হয় এতে তীব্র আলো থেকে এঁদের চোখ খুব বেশী কষ্ট অনুভব করে না। দেওয়ালের সবুজাভ রঙও এতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

সম্প্রতি কাগজশিল্পের এক ভদ্রলোক খাতায় নীল লাল লাইনের পরিবর্তে হাল্কা পাঁশুটে রঙের লাইন টেনে দেখেন তাতে বিক্রি একটু বেশী হয়। জুতোশিল্পের একজন পরিচালকও অনুরূপ একটি ঘটনা লক্ষ্য করেন। দোকানের মেঝেতে লাল রঙের একটি কার্পেট পাতার ফলে বিক্রি বেশ কমে যায়। তখন এক রঙ-বিশেষজ্ঞ ঐ কার্পেটটির বদলে ধূসর এবং নীল রঙের একটি কার্পেট পাতবার নির্দেশ দেন। এতে সত্যি-সত্যিই বিক্রির স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

আরও একটি ঘটনা ঘটে একজন রসায়নবিদের জীবনে। বহুদিন পরে তিনি এক পুরোনো বন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়ে তার মলিনতার কথা জিজ্ঞেস করেন। বন্ধুটি

তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন অবশ্য রসায়নবিদ কোন কারণ খুঁজে না পেলেও রাত্রে ডিনার টেবিলে এসে উত্তেজনার কিছুটা সূত্র খুঁজে পান। তিনি বন্ধুটিকে দেওয়ালে লাল রঙের পরিবর্তে নীলাভ আচ্ছাদন দেওয়ার নির্দেশ দেন। বন্ধুর কথামত দেওয়ালে রঙ পরিবর্তন করা হলে দেখা যায় যে সত্যিই তাঁর স্ত্রীর উত্তেজনা অনেক কমে এসেছে। এবং এই রঙের জন্যেই তাঁদের দাম্পত্যজীবনেও স্বাভাবিক শান্তি ফিরে আসে।

কিন্তু এই প্রভাবের কারণ কি? কেন একটা রঙ দেখলে আনন্দ পাই, আর একটা দেখলে উত্তেজিত হই? এর মূলে অবশ্য দুটি কারণ আছে। প্রথম কারণটি হল চোখের রঙ্ লক্ষ্য করার ক্ষমতাটুকু অথবা যেভাবে চোখ রঙ্ লক্ষ্য করে। আর দ্বিতীয়টি হল আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিচিত রঙগুলির চিরন্তন প্রভাব।

আলো এক প্রকার শক্তি। বিভিন্ন আলোর বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Wave length) থাকায় তরঙ্গে এরা বিভিন্ন প্রকারে যাতায়াত করে। যখন কোন বর্ণালীতে (Visual spectrum) অনেকগুলি তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে আমরা একই সময়ে দেখি তখন সেগুলি একত্রিত হয়ে সাদা দেখায়। কিন্তু এ আলোর এক অংশকেই যখন কোন প্রতিফলিত আলোর সাহায্যে বাধা দেওয়া হয় তখন আমরা ঐ প্রতিফলিত অংশকেও অন্যান্য রঙের মধ্যে দেখতে পাই। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ভ্রমণসীমা (Range) হল লালে সর্বাপেক্ষা বেশী অর্থাৎ এক ইঞ্চির ১/৩৩০০০ অংশ আর ধূমল (Violet) বর্ণে সবচেয়ে কম অর্থাৎ এক ইঞ্চির ১/৬৭০০০ অংশ।

লাল এবং হলদে রঙ সহজেই অক্ষিপটের (Retina) ওপর ছায়াপাত করে বলে আমরা এ রঙগুলি সহজেই দেখতে পাই। কিন্তু কয়েক শত বছর আগেও এগুলির ব্যবহার ছিল না। এদের এই স্বাভাবিক আকর্ষণ আর মানব-ইতিহাসে অল্পায়ুর জন্যেই এরা এই উত্তেজনার সৃষ্টি করে। মনস্তত্ত্ববিদের মতে একজন কয়েদীকে লাল রঙের ঘরে বন্দী রাখা হলে সে সহজেই পাগল হয়ে যাবে।

ঠিক এদের বিপরীত রঙ হল নীল আর সবুজ। এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত ছোট বলে আমরা এদের পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই। প্রাকৃতিক জগতে এদের ব্যবহার খুব বেশী। আকাশ, গাছপালা, সমুদ্র প্রভৃতি এদের এই হাল্কা রঙের জন্যে বহুদিন ধরে মানুষের মনোরঞ্জন করে আসছে।

কানাডার একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি তাঁদের হোটেলে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, রঙের সাহায্যে ঘরের তাপকে বাইরের আবহাওয়া থেকে ইচ্ছেমত নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাঁরা প্রথমে ঘরটিক নীল রঙে রঞ্জিত করেন। তারপর ঘরটিকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ৭২° উত্তাপে নির্দিষ্ট রাখেন। কিন্তু ক্রেতারা যখন ঘরটি ঠাণ্ডা বলে অভিযোগ করেন ভদ্রলোক তখন তাপমাত্রা আরও দু' ডিগ্রী বাড়িয়ে দেন। কিন্তু তখনও তাঁদের অভিযোগ মেটে না। শেষকালে ঘরের রঙের দিকে নজর দেওয়া হয়। দেওয়ালে নীল রঙের ওপর কমলা রঙ ব্যবহার করা হয় আর আসবাবপত্রগুলিতে রক্তাভ এবং খয়েরী রঙ দেওয়া হয়। তখন তাপমাত্রা ৭২°-তে আনলেও ক্রেতারা গরমের জন্যে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

আলো তাপকে গ্রহণ অথবা বিকীরণ করতে পারে। সাদা রঙে আলোর ন্যায় তাপও প্রতিফলিত হয়। কিন্তু কালো রঙ তাপকে ধারণ করে রাখে। এই দুটি কারণের জন্যেই চায়ের কাপে সাদা এবং শীতের পোশাকে কালো রঙ ব্যবহার করা হয়। কালো এবং সাদা রঙের জাহাজে আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রায় ১০ ডিগ্রীর তারতম্য দেখা যায়।

বেগুনে রঙের ন্যায় কালো রঙেরও কতকগুলি দোষ আছে। টাইপ ইত্যাদির ন্যায় একঘেয়ে শারীরিক পরিশ্রমে লাল হলদে ইত্যাদি রঙ মস্তিষ্কে পীড়ার সৃষ্টি করে। কারখানার দেওয়াল যদি ধূসর এবং নীল রঙের পরিবর্তে জমাট সাদা ও লাল রঙে রঞ্জিত করা হয় তা হলে কাজের গতি রীতিমত কমে আসে। টাইপের গতি যেখানে শতকরা ১২ ভাগ বর্ধিত করার কথা সেখানে শতকরা ২০ ভাগ কমে আসে।

এইজন্যে একই রঙ নিয়ে বহুক্ষণ কাজ করবার পর প্রত্যেক শ্রমিকেরই কিছুটা হাল্কা রঙ দেখার প্রয়োজন হয়। যে সমস্ত ইঞ্জিনীয়াররা সারাদিন কালো অক্ষর নিয়ে ব্যস্ত থাকেন অথবা যে সমস্ত মিস্ত্রীরা অন্য যে কোন একটি রঙ নিয়ে কাজ করেন তাঁদের ফুরসতের সময় মাঝে মাঝে হাল্কা রঙ দেখলে কষ্ট কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সবুজ অথবা নীলাভ রঙের দেওয়াল এদের এ কাজে যথেষ্ট সহায়তা করে।

আগেই বলেছি, এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেক ব্যবসায়ী তাঁদের জিনিসপত্র কাটতির জন্যে জনপ্রিয় রঙ ব্যবহার করে থাকেন। লাল, হলদে, কালো ইত্যাদি রঙ মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করে বলে খাবারের প্যাকেটে অনেক সময় এই রঙ ব্যবহার করা হয়। এসব রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বড় বলে অন্যান্য রঙের প্যাকেট আয়তনে সমান হলেও ছোট মনে হয়। এতে বিক্রি যে একটু বেশী হয় না—তা নয়। বেগুনে রঙের প্যাকেটে খাবার রেখে জনৈক বৈজ্ঞানিক দেখেছেন যে, সেগুলি সহজেই ইঁদুরকে আকৃষ্ট করে।

শিকাগো শহরের এক ভদ্রলোকও একটি পরীক্ষা করে রঙের এক আশ্চর্য প্রভাব লক্ষ্য করেন। তিনি কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে সোনালী এবং পাঁশুটে রঙের খাবার সাজিয়ে ডিশ পরিবেশন করেন। তাঁরা বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই খাচ্ছিলেন কিন্তু যে মুহূর্তে ঘরের রঙটা পরিবর্তন করা হয় তখনই সকলে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। কারণটা আর কিছুই নয়। ভদ্রলোক এক নতুন আলো ঘরে প্রবেশ করান যাতে সব জিনিসের রঙই পরিবর্তিত হয়। খাবারের রঙ হয় সাদা, দুধ রক্তের মত লাল, আর স্যালাড ঘোর নীল। পরে ভদ্রলোক ঘরের আলো পরিবর্তন করে দেখান যে—রঙ যে শুধু দৃষ্টিরই পরিবর্তন করে তা নয়, স্বাদ এবং গন্ধের ওপরেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

দিলীপ আগে আগে যাচ্ছিল। আজ বীরেনদা নেই। কাজেই ছবিগুলো তাকেই তুলতে হবে। রুকস্যাকে গন্ধের মাল ভর্তি করেছে। ওজন পঁয়তাল্লিশ পাউন্ড ত হবেই। কাঁধে বেশ চাপ পড়ছে। দিলীপ দাঁড়াল। রুকস্যাকের ফিতে দুটো একবার ঠিক করে নিল। পিছন ফিরে চাইল। না, বেস ক্যাম্পের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। ঐ যে ওরা পিছনে আসছে সবাই। একে একে রশি্ট নদীর বুকে নেমে পড়ছে। ধ্রুবর চলা দেখে দিলীপের মনে হল, আজ তার কষ্ট হচ্ছে। ওর ছোট্ট রোগা শরীরের উপর মালের চাপ কম পড়েনি! কিন্তু নিমাইদার কি হল আজ? এরই মধ্যে সে কাতর হয়ে পড়ছে কেন?

দিলীপ চলতে শুরু করল ফের। ওরা চলেছে রশি্ট নদীর বাঁ দিক ঘেঁষে। স্রোতটা পার হতে হবে। নিমাই মানচিত্রের কনট্যুর রেখা দেখে নির্দেশ দিয়েছে ডান ধারের পাহাড়ের উপর দিয়ে এগোতে। বাঁ ধারের পাহাড় সাক্ষাৎ শমন। শেরপারা, বিশেষ করে আঙ শেরিং পাহাড়ের চেহারা দেখে নিমাই-এর কথাই সমর্থন করেছে।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

বেস ক্যাম্প থেকে বেরিয়েই পাহাড়ী নদীর খাতে নামতে হল। তারপর স্রোতটা পায়ে পায়ে পার হয়ে আবার ওঠা। বেশ খানিকটা উঠলে একটা পাহাড়ের ঢাল্ গা মিলবে। সেইটে ধরে সোজা দক্ষিণে এগিয়ে যাও। খানিকটা। তখনও কিন্তু বেস ক্যাম্পটা দেখা যায়। তারপর যে মুহূর্তে রশি্ট নদীর নুড়ি আর পাথর ভরা বুকে নেমে গেলে সেই মুহূর্তে দেখলে, পিছনে আর কিছু নেই। না মানুষ, না তাঁবু, না কিছু। আছে শুধু পাহাড়ের সারি।

এই ত দিলীপ মুখ ফিরিয়ে চাইল। দেখল বেস ক্যাম্প থেকে হাত নাড়ছে ওরা। দিলীপও হাত নাড়ল। ওরা দেখতে পেয়েছে তাকে। ঐ যে ঘন ঘন হাত নাড়ছে। তারপর দিলীপ মাত্র কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছে, কয়েক ধাপ মাত্র নেমেছে, আর অমনি বেস ক্যাম্প উধাও! এ ত এক আশ্চর্য ভোজ-বাজি! দিলীপের অবাক লাগে। আর এই যে পাহাড়ী পথের প্রতি মুহূর্তের বিস্ময়, ক্ষণে ক্ষণের চমক, পাহাড়ে চলার এইটাই সব চাইতে বড় পাওয়া। অন্তত দিলীপের ত তাই ধারণা।

দিলীপের পিঠে প্রকাণ্ড বোঝা। গলায় ঝোলানো ক্যামেরা। একটা আগফা আই-সোলেট আর একটা ছোট্ট 'রোলি'—রোলিফ্লেক্স। আর আছে ছোট্ট এক আট মিলিমিটারের মুভি ক্যামেরা। সবগুলোই রেডি। দিলীপ দলের মধ্যে সব থেকে লম্বা। এর দেহের গঠন সব থেকে ভাল। ভাল ছবি তুলতে পারে। সংগঠন ক্ষমতা অসাধারণ। বয়েসে সকলের ছোট। ইচ্ছে করলে দিলীপ জনা চারপাঁচের খাবার একাই সাবড়ে দিতে পারে। এবং অমন ইচ্ছে তার প্রায়ই হচ্ছে।

বাঁ দিকে বেতারথলি। মাথায় বরফের স্তূপ। ডান দিকে রশি্ট পর্বত। মূল রশি্ট নয়, ওরই জ্ঞাতিগুষ্ঠি। এ দুই কঠিন প্রাচীরের ভিতর দিয়ে বেঁকেচুরে রশি্ট নদী কোনমতে বেরিয়ে এসেছে। রশি্ট পাহাড়ের পিছন দিকটায়, যে দিক দিয়ে ওরা এগিয়ে

বেস্ ক্যাম্প। মোটা সাব্ প্রার্থনা পড়াচ্ছেন

চলেছে, বিশেষ বরফ নেই। তবে পনের ষোল হাজার ফুট ওপর থেকে ওর গা ভেঙে গিয়েছে। সমস্ত পাহাড়টা শিথিল মাটি আর পাথরের প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনবরত পাথর গড়িয়ে পড়ছে। বেতারথলিও শান্ত নয়। সারাদিন তার গায়ে রোদ লাগে। তার সারা গায়ে, মাথায় আলগা তুষারের নৈবেদ্য সাজানো। রাতদিন ভীষণ আওয়াজ তুলে তা খসে খসে পড়ছে। ধস নামছে তুষারের।

সমস্ত পরিবেশে কেমন এক ক্রূর হিংস্রতা। সমস্ত পাহাড় যেন নীরব ষড়যন্ত্রে মগ্ন। গোপনে মারাত্মক সব ধারাল অস্ত্রে ওরা যেন অনবরত শান দিচ্ছে। ওর যেন তৈরী। বাগে পেলেই ভীমবেগে ঝাঁপিয়ে পড়বে অভিযাত্রীদের উপর।

অভিযাত্রীরাও আবহাওয়ায় এই চক্রান্তের আভাস যেন পেয়ে গেল। অভিজ্ঞ শেরপা সর্দার আঙ শেরিং সবাইকে বারবার সতর্ক করে দিল।

"শুনো সাব্‌লোগ, ইয়ে পাহাড় বহোৎ খতরনাক হ্যায়। হুঁশিয়ারি সে যানা হোগা। পাথর বহোৎ লুজ হ্যায়। হাসো মৎ, কাশো মৎ, জোরসে বাৎ ভি মৎ বোলো। বহোৎ হুঁশিয়ারি সে যানা হোগা। মালুম।"

প্রায় ঘণ্টাখানেক ওরা রান্টি নদীর বাঁ ধার ঘেঁষেই চলল। নদী পার হবার সুবিধে-মত জায়গা আর খুঁজে পায় না। অবশেষে এক জায়গায় এসে আঙ শেরিং বলল, এখানে পুল বাঁধতে হবে। বেলা তখন প্রায় এগারটা।

পুল সেই খরতর গতিস্রোতের উপর বাঁধা কি সোজা! শেরপাদের অমানুষিক পরিশ্রমে অবশেষে নদী পার হবার ব্যবস্থা হল। অভিযাত্রীরা যখন নদী পার হয়ে ডান ধারে গিয়ে পৌঁছুল তখন ঘড়ির কাঁটা বারটা প্রায় ছোঁয় ছোঁয়। তারপর শুরু হল কষ্টসাধ্য চড়াই। একটানা ওঠা। আধঘণ্টা অবিরাম উঠে ওরা পাহাড়ের উপর কাছিমের পিঠের মত একটা ঢালু পেল। ধ্রুব আর নিমাই ধপ করে সেখানে বসে পড়ল। ওদের দম ফুরিয়ে গিয়েছে। ধ্রুব আজ মাউন্টেনীয়ারিং বুট পরেছে। পায়ে তার অসহ্য যন্ত্রণা। নিশ্চয়ই ফোস্কা পড়েছে। ধ্রুব পা আর পাততে পারছে না। নিমাই-এর যন্ত্রণা হচ্ছে পেটে। নাভিকুণ্ডের কাছটায় এমন মোচড় দিয়ে উঠছে যে সে অস্থির হয়ে উঠছে। "বনমালীবাবুর বাড়িতে" এক ছুটে যেতে পারলে সে বোধ হয় স্বস্তি পেত। অসহায়ভাবে নিমাই চারিদিকে একবার চাইল। এ অতি ভয়াবহ স্থান। কোন আব্দার এখানে চলবে না। নিমাই ভিতরের তাগিদকে প্রশ্রয় দিল না। শুধু মনে মনে নিজের মুণ্ডপাত করতে লাগল। কাল থেকে তার ভয়ানক আমাশা হয়েছে। কেন সে কথা ডাক্তারকে জানাল না সে? কেন সে অসুস্থ শরীরে এল আজ? কিন্তু এ ভুল এখন আর শোধরাবার সময় নেই। সঙ্গীরা তাদের জন্য থেমে পড়েছে। একটু দম ফিরে পেতেই তুষার গাঁইতিতে ভর দিয়ে নিমাই উঠে দাঁড়াল। ধ্রুবও।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করল, "রেডি?"

নিমাই-এর পেটটা সেই মুহূর্তেই আবার খামচে উঠল। নিমাই কথা বলল না। বুড়ো আঙুলটা তুলে শুধু একটা সিটি দিল, সু-উ-উ-ই।

অতি সাবধানে ওরা চলেছে। পাহাড় সমানে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। উপর থেকে অনবরত পাথর গড়িয়ে পড়ছে। একটি পাথর গায়ে বা মাথায় পড়লে তৎক্ষণাৎ ভবলীলা সাঙ্গ। একবার একটা বিরাট পাথর হুড়মুড় করে গড়িয়ে এল। ওদের মাথার কাছাকাছি এসে এক লাফ মেরে নিচে নেমে গেল। ঝুরো মাটি ঝুরঝুর করে বৃষ্টিধারার মত ওদের মাথার এসে পড়তে লাগল।

দিলীপ বিরক্ত হয়ে উঠল। এমন ছবিটা সে তুলতে পারল না। দাঁড়াবার জায়গা নেই।

তার মনে হল, বিপজ্জনক কোন ছবিই সে এ পর্যন্ত তুলতে পারেনি। কেউ পারে কি? এমন সব জায়গায় নিজেকে বাঁচাতেই সময় চলে যায়। নিজে বাঁচলে তবে বাবার নাম। ছবি ত তার অনেক পরের জিনিস। দূরে ছাই, তবে আর এই যন্তরগুলো বয়ে মরা কেন? হঠাৎ ওর তুষার গাঁইতির সূচলো মুখটা বোঁ করে ঘুরে গেল। দিলীপ সাবধান হবার আগেই সেটা ঢুকে গেল তার বাঁ হাতের তর্জনীতে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। সে আঙ্গুলটা মুখে পুরেই উঠতে লাগল।

বিশ্বদেব বলল, "কি রে দিলীপ, কি হল রে?"

দিলীপ জবাব দিল, "কিছু না। একটু ভিটামিন খাচ্ছি।"

প্রথমে বোঝা ফেলে দিল ধ্রুব। পা আর পাততে পারে না, ফোস্কার এমন যন্ত্রণা। ধ্রুবর বোঝার মাল কম ছিল। সবাই ভাগ করে তুলে নিল। তারপর মদন। সেও বসে পড়ল। ওর পায়ে খিল ধরে গিয়েছে। তারপর বেশ খানিকটা পথ পার হয়ে বসে পড়ল নিমাই। তার দুর্বল শরীর না পারল বোঝার ভর সইতে, না পারল নিজের ভর সইতে। বোঝা নামিয়ে ফেলায় ধ্রুব তবু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। মদনও। কিন্তু নিমাই-এর একেবারে অচল অবস্থা।

ওরা এখন আবার নেমে এসেছে রুপিট নদীর বুকে। পাথরে, নুড়িতে ভর্তি চারিদিকে। মাঝে মাঝে বালি। নিমাই বড়সড় এক পাথরে হেলান দিয়ে চোখ বুজে পড়ে রইল। দু সপ্তাহ দাড়ি কামানো হয়নি। এরই মধ্যে চাপদাড়ি গজাবার উপক্রম হয়েছে। ক্লান্তিতে শরীর এলিয়ে আসছে। একটু লেমন-বার্লি খেয়ে নিল সে। চা খেতে ইচ্ছে করছিল তার। ওদের সঙ্গে ফ্লাস্ক আছে। চা আছে। কিন্তু গরম কিছু খেতে সে ভরসা পাচ্ছে না। এই শরীর নিয়ে তার আসাই অন্যায় হয়েছে। পাহাড়ের পথে সঙ্গীর দাম অনেক। কিন্তু অসুস্থ সঙ্গী অভিশাপ বিশেষ।

নিমাই ঠিক করল, এখানে এই নদীর বুকে সে শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম করবে। ওরা তাকে এখানে রেখে বরং এগিয়ে যাক। ফেরার পথে ওরা যেন তাকে নিয়ে যায়। নিমাই প্রস্তাবটা করল। আঙ শেরিং বললে, তা হয় না। প্রথমত এই নির্জনে একা বসে থাকলে নিমাই-এর খারাপ লাগবে। দ্বিতীয়ত, এ জায়গা একেবারে অপরিচিত, এর ঘাৎঘোৎ কিছুই জানা নেই। যে কোন সময় যে কোন বিপদ ঘটে যেতে পারে। কোয়ার্টার মাস্টারকে ফেলে রেখে যাওয়ার সে পক্ষপাতী নয়।

অগত্যা নিমাইকে উঠতে হল। তার

বেস্ ক্যাম্প থেকে অ্যাড্ভান্স বেসে যাওয়ার পথে বরফের গ্হা। নিচ দিয়ে জলস্রোত বেরিয়ে আসছে। পাশে দিলীপ আর স্কুমারকে বিশ্রাম নিতে দেখা যাচ্ছে

মালের বোঝা সেখানেই ফেলে রাখা হল। তারপর তারা এক সংগে চলতে শ্রু করল। এবার চড়াইটা তত বেয়াড়া নয়। ধীরে ধীরে উঠে গেছে। মাঝে মাঝে দ্ একটা জায়গা বেশ খাড়া। তবে উচ্চতা বেশী নয়।

বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর সেই রহস্যময় দৃশ্যটির উপর সকলের নজর পড়ল। প্রথমে অবশ্য আঙ শেরিং দেখল সেটা। আঙ শেরিং-এর দৃষ্টি সেদিকে পড়তেই সে থমকে দাঁড়াল। ম্হূর্তে চেহারা বদলে গেল তার। তাকে দেখে মনে হল সে প্রবলভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। দিলীপকে ডাকল আঙ শেরিং। দা তেম্বাকে ডাকল। গ্নদিনকে ডাকল। টাসী এল। আঙ ফ্তার এল। ওরা সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সবাই এগিয়ে গেল একটা বড় পাথরের দিকে। সন্তর্পণে বালির উপর সতর্ক দৃষ্টি ব্লাতে লাগল। এদিক ওদিক চাইল। নিজের মধ্যে স্বভাষায় আলোচনা করতে লাগল। দিলীপ ওরা সে ভাষার এক বর্ণও ব্ঝতে পারল না। শ্ধ্ যে শব্দটা শেরপারা সকলেই বারবার উচ্চারণ করছে, সেইটাই বারবার ওর কানে বাজতে লাগল।

"ইটি ইটি ইটি ইটি—"

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা দিলীপের লেগেছিল শেরপাদের ম্খে "ইটি ইটি" চীৎকার শ্নে। ইটি ইটি ইয়েতি! সেই ইয়েতি, যার সন্ধানে হিলারি দলবল নিয়ে খ্ম্ব্ উপত্যকা চষে বেড়াচ্ছেন! সেই ইয়েতির সাক্ষাৎ ওরা পেয়ে যাবে নাকি!

আঙ শেরিং উব্ হয়ে বালির উপরকার কতকগ্লো ছাপ মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। দিলীপ তার পাশে বসে পড়ল। এতক্ষণে তার দেহে উত্তেজনার সঞ্চার হচ্ছে। ভিজে বালির উপর যে চিহ্ন আঁকা হয়ে আছে, তাকে অনায়াসে পদচিহ্ন মনে হতে পারে। এমন কি, যদিও ছাপগ্লো খ্ব স্পষ্ট নয়, তব্ চট করে মান্ষের পায়ের ছাপ বলেই মনে হবে।

এমনও ত হতে পারে, কোন লোক, কাঠ্রে কি শিকারী, এদিকে এসেছে আমাদের আগে? প্রশ্নটা দিলীপের মনে উঁকি দিল। গোরা সিংকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বলল, নেহি সাব্, হিয়াপর কোই আদমি নেহি আতা। শেরপারা সমস্বরে বললে, এ আর কেউ না, ইটি ইটি ইটি—

দিলীপ ছবি নিল।

নদীর ব্ক থেকে ওরা আবার উঠতে শ্রু করল। নদী পেরিয়েই খাড়া চড়াই। প্রায় এক শ ফ্ট উঠে পাহাড়ের গাটা খানিক ঘ্রে যেতে হল। আঙ শেরিং আগে আগে যাচ্ছে। বিপজ্জনক জায়গাগ্লো সতর্ক-ভাবে পার হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ইশারা করে ওদের এক একজনকে ডাকছে, ওরা একে একে পার হচ্ছে।

প্রায় চল্লিশ মিনিট এইভাবে চলার পর ওরা আবার পাহাড়ের গা থেকে নদীর ব্কে নেমে এল। কিছ্ক্ষণ বিশ্রাম নিল। তারপর কিছ্টা এগিয়ে যেতেই একটা স্ন্দর দৃশ্য ওদের সামনে ভেসে উঠল। প্রনো বরফের গ্হার মধ্য থেকে জলের স্রোত বেরিয়ে এসে রৌদ্রে পড়ছে। কিছ্ক্ষণ বিশ্রাম নিল সেখানে। তারপর গ্হাটাকে ডান পাশে রেখে ওরা এগিয়ে চলল।

এবারে ওরা পেঁজা বরফের বিরাট একটা স্তূপ পার হল। রণ্টির শাখা থেকে কবে এক প্রচণ্ড তুষার-ধস নেমেছিল সেইটাই এখন ওদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। এ বরফের রং কিন্তু সাদা নয়। দেখলে মনে হয়, হাজার হাজার মন চুন কেউ বুঝি পাহাড়ের মাথা থেকে ঢেলে দিয়েছে।

রণ্টি নদী ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। এতক্ষণ দিলীপরা রণ্টি নদীর ডান ধার দিয়ে যাচ্ছিল। এবার নদীটা পেরিয়ে বাঁ ধার দিয়ে চলতে লাগল। আবার একটা খাড়া চড়াই সামনে পড়েছে। প্রায় দেড় শ ফুট হবে। ওরা ক্রমশ আমাদের তেরতলা সেক্রেটারিয়েটের মত উঁচু চড়াইয়ের উপরে উঠে গেল। দিলীপ, দা তেম্বা আর টাসী প্রথমে পৌঁছল। বেলা তখন সওয়া দুটো। আঙ শেরিং এসে বলল, ব্যস্, এইখানেই মাল ডাম্প্ কর।

॥ আটত্রিশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকে:

ডাক্তার বলল, চারটে বাজে। এবার ওদের ফেরার সময় হল। আমরা সবাই যেদিক দিয়ে আজ সকালে ওরা অ্যাড্ভান্স বেস্ ক্যাম্পের জায়গা দেখতে বেরিয়ে গিয়েছে, সেইদিকে চাইলাম।

আকাশ এতক্ষণ একেবারে পরিষ্কার ছিল। প্রচুর রোদ। সূর্যের আলো এখনও উজ্জ্বল। এতক্ষণে বহু দূরে বেতারথলির ছোট্ট গম্বুজ থেকে একটা শ্বেত বাষ্পীয় ফোয়ারা—ঠিক যেন ধোঁয়া—আকাশে উঠতে শুরু করল। আমার মনে হল অনাদি অনন্ত সাগরে একটা অতিকায় তিমি বুঝি জল ছুঁড়ে দিচ্ছে আকাশে। সেই সাদা ফোয়ারা আকাশে উঠতে লাগল। একটু একটু করে জমতে লাগল। এক এক টুকরো মেঘ হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সেখানে হাল্কা মেঘের মেলা বসে গেল।

আজীবা আজ বড় বিষণ্ণ। প্রথম দলে সে যেতে পারেনি। বিষণ্ণ চোখে সে চেয়ে রইল রণ্টি নদীর উজান পথের দিকে। ঐ পথেই সবাই ফিরে আসবে।

বীরেনদা হামাগুড়ি দিয়ে তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। ভূতের মত চেহারা হয়ে গেছে তার। আজ কাশি একটু কম।

"ওদের আসবার সময় হয়ে এল, কী বলিস?" বীরেনদা একটু একটু কাশল।

হরি সিংকে চা বানাতে বললাম। বিস্কুট, লেমন পানি তৈরি রাখতে বললাম। তারপর বেস্ ক্যাম্পের উপর নজর বুলিয়ে নিলাম। ঐ যে আমাদের সবুজ তাঁবুটা। সেই সারিতেই আরও দুটো তাঁবু—সাদা আর্কটিক টেণ্ট। আমাদের পাশেরটাই সুকুমারের আর ধ্রুবর, তার পাশেরটা মদনের আর বিশ্বদেবের। এই সারির এক ধাপ নিচে আরও দুটো তাঁবু। একটা নিমাই-এর আর দিলীপের, অন্যটা ডাক্তারের আর আজীবার। এই সারের বাইরে ছোট্ট ঐ তাঁবুটা আঙ শেরিং-এর। আরও খানিকটা নিচে ত্রিপল খাটিয়ে বানানো হয়েছে রসুইখানা। হরি সিং, লালু আর দা তেম্বা ওর মধ্যেই শোয়। রেডিওটা ওখানেই রাখা হয়েছে। তার এক ধাপ নিচে আরেকটা ত্রিপল খাটানো—সেখানে শোয় পেম্বা নরবু, গুনদিন, টাসী আর আঙ ফুতার। মাল-বাহকরা বেস্ ক্যাম্পের তিন শ ফুট উপরে আরেকটা জায়গায় পাথরের খোঁড়ল খুঁজে বের করেছে। সেখানে ওরা গুহাবাসী হয়েছে:

এখন বেস্ ক্যাম্প ফাঁকা। আমরা পাঁচজন

অ্যাড্‌ভান্স বেস্‌-এ তাঁবু খাটানো হচ্ছে

মাত্র আছি। ঐ যে উপর থেকে মাল-বাহকেরা নেমে আসছে। আজীবা তার তাঁবুর বাইরে বসে বসে সেলাই করছে। আজ সারাদিন সে সেলাই করেছে। কিচেনের খুঁটিতেও দুটো ভেড়ার রাং ঝুলছে। এখানে কিছুই পচে না।

"ঐ যে, ঐ যে ওরা আসছে।" দূরবীন-চোখ ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠল। "ঐ যে, ঐ বরফের উপর চেয়ে দেখুন। একজন, দুজন, পাঁচজন, সাত আট...সবাই আসছে।"

বুকটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। চেয়ে দেখলাম, প্রথমটা কিছুই নজরে পড়ল না। শুধু পাহাড়ের পর পাহাড়। উঁচু নিচু ঢেউ খেলানো। হ্যাঁ, ঐ যে দূরে, একটা বরফের পাহাড় আছে বটে। ডাক্তার বলেছিল, ওরা নাকি যাবার সময় সেটা পেরিয়ে গিয়েছে। বরফের উপর তীক্ষ্ন নজর দিলাম। হ্যাঁ, এতক্ষণে সচল কালো বিন্দু-গুলো নজরে পড়ল।

আজীবা গম্ভীরভাবে বলল, "মালুম হোতা, রাস্তা খারাপ হ্যায়। আচ্ছা নেই লাগতা।"

আমি চটপট তৈরী হয়ে নিলাম। আমার সঙ্গে লালু, আক্কেল, কর্ণ বাহাদুর চা বিস্কুট লেমন পানি নিয়ে যেতে রাজী হল। আমরা যথাসম্ভব দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগলাম।

পথটা যেখানে রশিট নদীর বুকে নেমে গিয়েছে সেইখানে দেখা হল দা তেম্বা আর আঙ ফুতারের সঙ্গে। ওরা দারুণ বেগে এগিয়ে এসেছে। ওদের ছবি তুললাম। চা খেতে দিলাম। ওরা চলে গেল। আমরা আরও খানিক এগিয়ে পুরো দলটার সাক্ষাৎ পেলাম। ফটো তোলার আলো ততক্ষণে মিলিয়ে গিয়েছে।

আমাকে ওরা আশা করেনি। দেখে খুব খুশী হল। ওখানেই সব বসে পড়ল। তারপর ধীরে ধীরে চা খেয়ে চাঙ্গা হল। দিলীপের হাতে লেগেছে। ধ্রুব আর নিমাই অত্যন্ত ক্লান্ত। তবু নিমাই আমাকে দেখেই সু-উ-ই করে একটা সিটি দিল।

সুকুমার জানাল, অ্যাড্‌ভান্স বেসের জন্য সুন্দর একটা জায়গা পাওয়া গিয়েছে। হিমবাহের একেবারে নাকের ডগায়। রশিট নদী ওখান থেকেই বেরিয়ে আসছে। আমরা পাথরের উপরই তাঁবু ফেলতে পারব। কোন দিক থেকেই পাথর কি তুষার-ধস নামার উপায় নেই। সেদিক থেকে জায়গাটা নিরাপদও।

সুকুমার থামলে নিমাই বলল, "আসলে জায়গাটা আছে একটা মিডিয়াল মোরেনের উপর। ওর নিচে কিন্তু বরফ, হিমবাহ। হিমবাহের উপর পাহাড় ধসে ধসে এত পাথর পড়েছে যে, বরফ আর দেখাই যায় না। এদিককার পাহাড়গুলো যে আন্দাজে ভাঙছে, তাতে কিছুকাল পরে ওগুলোর চেহারাই বদলে যাবে।"

দিলীপ বলল, "এদিকে তুষার-মানব আছে। আমরা তার পায়ের ছাপ দেখেছি রশিট নদীর ভিজে বালির উপরে। বেশ কয়েকটা পায়ের ছাপ দেখেছি।"

কি জানি কেন খবরটা আমাকে চমক দিতে পারল না। এমন কি, আঙ শেরিং বার বার ওগুলোকে "ইটি"র (ইয়েতি কথাটা ওদের মুখে এই রকমই শোনায়) পায়েরই ছাপ বলে জোর করা সত্ত্বেও আমি বিশেষ

আমল দিলাম না। আমার কেমন ধারণা হয়েছিল, তুষারমানবের পায়ের ছাপ বালির উপরে পড়তে পারে না। দিলীপ বলল, সে ছবি তুলেছে। তাতেও আমি বিশেষ বিচলিত হলাম না।

চা পান শেষ করে, যথেষ্ট বিশ্রাম নিয়ে, ধীরে ধীরে দলটা বেস্ ক্যাম্পে ফিরে এল। এবার শুরু হল ডাক্তারের কাজ। ধ্রুবর জুতো খুলে দেখা গেল মারাত্মক ফোস্কা পড়েছে তার পায়ে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হল। দিলীপের আঙ্গুলে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। সেটা ড্রেস করা হল। নিমাই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে বিশ্রাম দেওয়া হল।

রাত্রে খাবার সময় আবার পরামর্শ-সভা বসল। যেখানে আজ মাল ডাম্প্ করে আসা হয়েছে, আঙ শেরিং-এর মতে সেই জায়গাটাই অ্যাডভান্স বেসের পক্ষে সব থেকে নিরাপদ। অ্যাভালান্স ঘাড়ে পড়বে না, পাথরও মাথায় পড়বে না। তবে ওখানে জল নেই, লকড়ি নেই। জল না থাকুক, বরফ আছে। বরফ গলিয়ে এন্তার জল পাওয়া যাবে। সমস্যা শুধু লকড়ির। আর সে সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় বেস্ ক্যাম্প থেকে লকড়ি ভেংগে অ্যাড্ভান্স বেসে পাঠিয়ে দেওয়া। ঠিক হল, তাই দিতে হবে। আর, এ কাজের ভার পড়ল আমার আর ধ্রুবর উপর।

১১ই অক্টোবর। সুন্দর আবহাওয়া। এইমাত্র ওরা চলে গেল অ্যাড্ভান্স বেসের দিকে। আজ নিমাই আর ধ্রুব বেস্ ক্যাম্পে থেকে গেল। ওরা বিশ্রাম নেবে। বিশ্বদেব, মদন, আঙ শেরিং আর টাসী আজ থেকে যাবে অ্যাড্ভান্স বেসে। কাল ওরা ওখান থেকে প্রথম শিবিরের স্থান নির্বাচনে বের হবে। সেই রকমই প্ল্যান হয়েছে গতকাল। হরি সিং ওদের সংগে চলে গিয়েছে। সে অ্যাড্-ভান্স বেসেই থাকবে।

নিস্তব্ধ এই পরিবেশে বসে দিনলিপি লিখছি। নিমাই আর ধ্রুব কিচেনে বসে রেডিও চালাচ্ছে। বীরেনদা ক্যামেরা ঝাড়-পোঁছ করছে। আজীবা কার যেন একটা ঘড়ি মেরামতে ব্যস্ত। এই লোকটা এক মুহূর্ত চুপ করে বসে থাকে না।

একটা হিমালয়ের ঈগল ডানা মেলে আমাদের মাথার উপর অনবরত উড়ে বেড়াচ্ছে। আমার শরীরও বেশ খারাপ। আমাশা হয়েছে। ডাক্তারের দাওয়াই-এর ক্রিয়া সহজে নিমাই-এর উপর হচ্ছে, তেমন ক্রিয়া আমার উপরেও হচ্ছে না কেন, ভেবে অবাক হচ্ছি।

এদিক ওদিক চাইছি। মদন আর বিশ্বর তাঁবুটা যেখানে ছিল, আজ সেখানটা শূন্য। সর্দারের ছোট্ট তাঁবুটা নেই। একটা ত্রিপলও আজ উপরে উঠে গিয়েছে। বেস্ ক্যাম্প ফাঁকা হতে শুরু করেছে।

বেলা প্রায় দেড়টা। হঠাৎ হাওয়া শুরু হল। আকাশ মেঘে ছেয়ে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে আবহাওয়া ভীষণ মূর্তি ধারণ করল। একটু আগেই কেমন রোদ ছিল। এখন চেয়ে দেখি, তা পালিয়েছে। আলো ছিল কত, তাও দেখি পালিয়েছে। এই ত ঈগলটা উড়ছিল ডানা মেলে। আবহাওয়ার ভ্রূকুটিতে ভয় পেয়ে সেও পালিয়েছে।

ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ল। বাইরে বসে থাকতে পারলাম না। তাঁবুর ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। হঠাৎ চড়চড় চড়চড়, তাঁবুর উপর তুষার পড়তে লাগল। স্লিপিং ব্যাগের উষ্ণতায় আশ্রয় নেবার আশায়, বৃথা বিলম্ব না করে, তার ভিতরে ঢুকে গেলাম।

বিশ্বদেবের দিনলিপিঃ

অ্যাড্ভান্স বেস, ১১ই অক্টোবর। আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়ে ওরা চলে গেল। একটা উঁচু পাথরের উপর গিয়ে দাঁড়ালাম আমি আর মদন। ওরা বেশ দ্রুত নেমে যাচ্ছে। অদৃশ্য হবার পূর্বমুহূর্তে দিলীপ ফিরে চাইল। আমরা হাত নাড়তে থাকলাম। সে দেখতে পেল। হাসল। হাতটা তুলে একবার নাড়াল। তারপর চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। তখনও বেশ রোদ। বেশ আলো।

ফিরে দেখি পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ছেঁড়া ছেঁড়া হাল্কা মেঘ জমতে শুরু করেছে। বিশেষ গ্রাহ্য করলাম না। মালগুলো উন্মুক্ত জায়গাতেই পড়ে আছে। এগুলো তুলব তুলব ভাবছি। তার আগে অ্যাড্ভান্স বেসের চারদিকে চোখটা বুলিয়ে নিতে লাগলাম। পাথরের চাঙ্গড় সরিয়ে সরিয়ে বা সাজিয়ে তাঁবু খাটানোর জায়গা করে নেওয়া হয়েছে। আমাদের পশ্চিমে রয়েছে রণ্টির প্রসারিত দেহের পশ্চাদ্ভাগ। বিরাট উঁচু, উলংগ পাথুরে গিরিশিরাটা দেখা মাত্র মনে সম্ভ্রম জাগে। ঐ পাথুরে গিরিশিরা থেকে চোখ ধীরে ধীরে দক্ষিণে ঘুরিয়ে আনলে দেখা যায়, এই গিরিশিরাটাই কিছুটা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার পশ্চিমে মোড় নিয়েছে। এটারই শেষ প্রান্তে রণ্টির শিখরকে নাকি পাওয়া যাবে।

আমাদের পূবে রয়েছে বিরাট এক খাদ। একটু এগিয়ে উঁকি মারলে দেখা যায়, হিমবাহের শেষ প্রান্ত থেকে রণ্টি নদী বেরিয়ে যাচ্ছে। বিরাট খাদটার পূব পাড় থেকে খাড়া পাহাড় উঠে গিয়েছে। ওটা বেতারথলি হিমালেরই লেজুড়। এই পাহাড়টা পাথুরে নয়, ছাই-ছাই মাটি আর পাথরে গড়া। তার উপর শ্যাওলার শ্যামল পলেস্তারা। সেই মাটি আর পাথর এত আলগা যে, মিনিটে মিনিটে ধস্ নামছে। সব সময় পাহাড় ধসার ভীষণ গর্জনে চারি-দিক মুখরিত। পূবদিকের গিরিশিরাটি দক্ষিণে এগিয়ে মূল বেতারথলি হিমালের সংগে যুক্ত হয়ে গিয়েছে।

শিবির থেকে ৩০।৪০ গজ দক্ষিণে এক ভয়াবহ বরফের ফাটল হাঁ করে চেয়ে আছে। নজর পড়লেই অন্তরাত্মা শুকিয়ে আসে। চারটে প্রায় বাজে। সূর্যের তেজ কমে আসছে। মেঘ জমছে দ্রুত। এখন বরফের ফাটলটার মুখে কিছু আলো, সেখানটা সাদা দেখাচ্ছে। ভিতরটায় ছায়া পড়েছে, ভীষণ কালো হয়ে উঠেছে। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে কয়েকটা ছবি তুললাম।

হঠাৎ বরফ পড়া শুরু হল। দৌড়ে কিচেনে এসে আশ্রয় নিলাম। ত্রিপল খাটিয়ে পাথর সাজিয়ে পাঁচিল গড়ে কিচেনে সুরক্ষিত এক আশ্রয় গড়ে তোলা হয়েছিল, তাই রক্ষে।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। তুমুল তুষারপাত হতে লাগল। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এল। শীত, কী প্রচণ্ড শীত! হরি সিং ভয় পেয়ে গেল। ওর মুখ শুকিয়ে এসেছে।

[illegible] করে চাইছে। আর তারস্বরে [illegible]কে ডাকছে। শেরপা দুজন, মদন একটু আগেই খোলা মালগুলো কিছু তাঁবুতে পুরে, কিছু কিচেনে এনে বাঁচালে।

আমাদের তাঁবুর উপর পুরু হয়ে বরফ পড়েছে। বড় ভাবনা হল। তাঁবুগুলো ওয়াটার-প্রুফ নয়। আর এমনই দুর্দৈব, অ্যালকাথিনের শীটগুলো বেস্ ক্যাম্পে ফেলে এসেছি। ফলে, অবস্থা যা দাঁড়াবে, সে কথা ভেবে শরীর আরও হিম হয়ে গেল। আমরা আগুনের দিকে সরে বসলাম।

আর ভাবতে লাগলাম ওদের কথা, যারা কিছুক্ষণ আগে এখান থেকে বেস্ ক্যাম্পে রওনা দিয়েছে। জানি, ও পথে বিন্দুমাত্র আশ্রয় নেবার জায়গা নেই। জানি, ওদের কারো কাছে উইণ্ড-প্রুফ নেই। এই দুর্যোগে যে কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। ওদের কথা ভেবে ভেবে দুশ্চিন্তা বেড়ে যেতে লাগল। কিন্তু কি করব? কি করতে পারি? কাল দুপুরের আগে কোন খবর পাবার সম্ভাবনাই নেই। একটা ওয়ারলেস ট্রান্সমিটারের অভাব বড় হয়ে দেখা দিল। আহা, ওরা নিরাপদে পেঁছিাক, এই প্রার্থনাই মনে মনে জানাতে লাগলাম। (ক্রমশ)
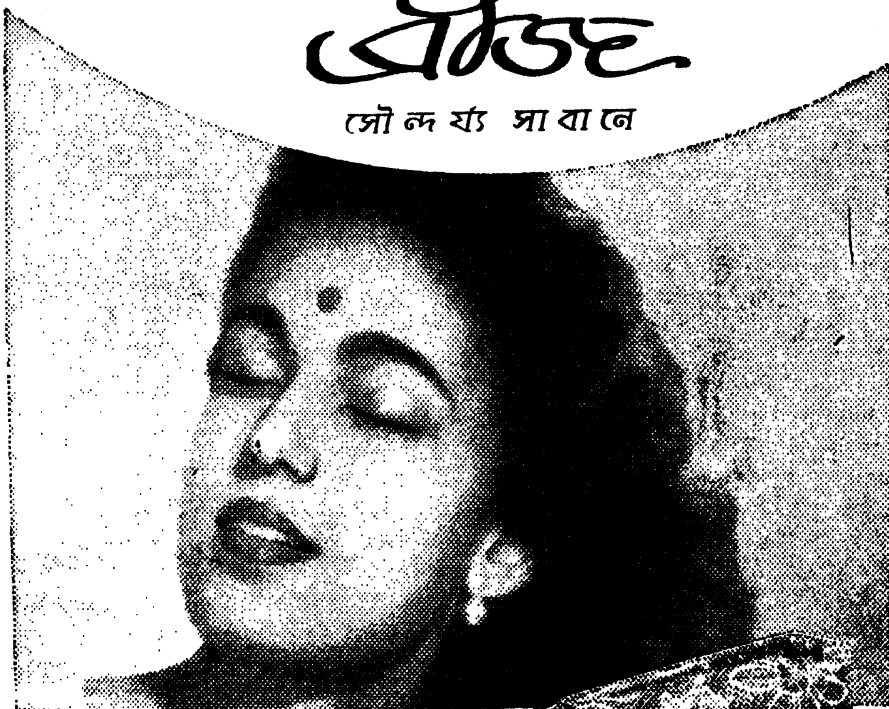
লবণ বধের পরের ঘটনা।

শত্রুঘ্ন নানা সরাইতে বিশ্রাম করতে করতে অবশেষে বাল্মীকির আশ্রমে এসে পৌঁছলেন। বাল্মীকি রামায়ণ গান শুনিয়ে শত্রুঘ্নকে পরম আনন্দ দান করলেন। পরদিন বিদায় নিয়ে তিনি অযোধ্যায় রামের কাছে এসে পৌঁছলেন।

রাম খুবই খুশী হলেন ভাইকে অনেক দিন পরে দেখে।

শত্রুঘ্ন বললেন, "আপনারই আদেশে লবণকে বধ করেছি, মধুপুরে বাড়িও করেছি একখানা। দীর্ঘ বারো বছর আপনার সঙ্গে আমার দেখা নেই, আপনাকে ছেড়ে আমি—"

আবেগে শত্রুঘ্নের কণ্ঠ রুদ্ধ হল, অশ্রুর ধারা বইতে লাগল দু চোখ বেয়ে। তারপর কিছু সামলে নিয়ে বললেন, "আপনাকে ছেড়ে দূরে থাকতে আমি চাই না।"

রাম বললেন, "ভাই, দুঃখ করো না। রাজাদের বিদেশ বাস অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, বরং দেশে থাকাই অস্বাভাবিক। তবে মাঝে মাঝে ছুটি নিয়ে আমার কাছে এসো। তবে আপাতত দিন সাতেক এখানে থাক, মনটা ভাল হয়ে গেলে মধুপুরে ফিরে যেয়ো।"

দেখতে দেখতে সাত দিন কেটে গেল। রামের মনটা অকারণ বিষন্ন হয়ে উঠল শত্রুঘ্নের বিদায়ে। একটা কিছু কাজ চাই, কাজে না ডুবলে মন ভাল হবে না। শত্রুঘ্ন কাজের লোক, তাই সে বেশীক্ষণ চিন্তা করার সময় পায় না। লবণ বধ করে সে ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কাজ করেছে, রামেরও ঐরকম একটা কিছু কাজ অবিলম্বে পাওয়া দরকার।

রাম বিমর্ষভাবে পায়চারি করতে লাগলেন।

এমন সময় হনুমানের প্রবেশ।

"কি সংবাদ বৎস?"

হনুমান কিছু ইতস্তত করে বলতে আরম্ভ করল, "কিষ্কিন্ধ্যায় রাজাচ্যুত সুগ্রীবের দূতরূপে আমি যেদিন প্রথম আপনার সঙ্গে দেখা করি, সেদিন আমার মুখে বিশুদ্ধ উচ্চারণের এবং সম্পূর্ণ ব্যাকরণসংগত সংস্কৃত ভাষা শুনে এবং বেদ বিষয়ে আমার জ্ঞান দেখে আপনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, মনে পড়ে প্রভু?"

"মনে আছে, বৎস। আমি সে কথা লক্ষ্মণকে বলেছিলাম। আমি বিস্মিত হয়েছিলাম তোমার পাণ্ডিত্য দেখে।"

"কিন্তু প্রভু, সেই আমি আমার যথাশক্তি নিয়োগ করে আপনার কার্যোদ্ধার করেছি, তা-ও আপনি আশা করি মনে রেখেছেন।"

"রেখেছি বইকি, বৎস। পরবর্তী উপাধি তালিকায় তোমার নাম সবার উপরে থাকবে।"

"তাতে লোভ নেই প্রভু। আমার বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, আমার সন্তানেরা ব্যাকরণ কিনতে পারছে না, এমনি দুরবস্থা চলছে এখন আমার।"

"বল কি বৎস? আমি এর ব্যবস্থা নিশ্চয় করব। আমি তো এতটা কল্পনা করতে পারিনি আগে। তোমার সন্তানাদি আছে, এবং তোমার সম্পত্তি না থাকলে তারা খেতে পায় না, এমন ধারণা আমার মাথায় আসেনি।"

"কিন্তু প্রভু, আরও একটি নিবেদন আছে। আমার আত্মীয়েরা এসেছে দেখা করতে সংখ্যায় প্রায় বিশ হাজার হবে। তারা সব রাজধানীর বাইরের অরণ্য-শাখায় অপেক্ষা করছে।"

"কেন, তাদের আবার কি হল?"

"তারা সবাই সেতুবন্ধে সাহায্য করেছিল, যুদ্ধে সাহায্য করেছিল, এবং কি না করেছিল। তারা বলছে, তারা পলিটিক্যাল সাফারার। কারণ সীতা উদ্ধারের পর তাদের সেনাদলকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তারা এখন বেকার।"

রাম কিছুক্ষণ চিন্তার পর বললেন, "আচ্ছা এখন এসো, আমি ওদের কথা বিবেচনা করছি। কিন্তু ওরা পলিটিক্যাল সাফারার বলে দাবি করছে কেন? ওরা তো জেল খাটেনি।"

"না, তা খাটেনি। কিন্তু ওরা পলিটিক্যালি নেগলেকটেড, অর্থাৎ অবহেলিত, সেই অর্থে সাফারার শব্দটি ব্যবহার করছে।"

"তুমি পণ্ডিত মানুষ, কাজেই প্রতিবাদ করব না, আমাকে তোমাদের অবস্থাটা একটু ভেবে দেখতে দাও।"

হনুমান বিদায় নিলে রাম মৃত পুত্রের পিতাকেও ঐ একই কথা বললেন, "আপনিও আসুন, আমি আপনার পুত্রের অকালমৃত্যুর কথা বিবেচনা করে দেখছি।"

মৃত পুত্র নিয়ে পিতা স্বদেশে ফিরে গেলেন এবং সেখানে মৃতদেহ নিয়ে কয়েক মাইল দীর্ঘ এক শোভাযাত্রা বার করা হল।

এদিকে রাম খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। ভেবে দেখলেন, যার পুত্র অকালে মারা গেছে, সে সাধারণ শ্রেণীর লোক নয়। তারা সবাই বিধাতার খণ্ড সত্তা, তারা নিজেদের পরিচয়ে শুধু 'আমি' বলে। বহু আমি মিলে তবে বৃহৎ আমি। আমি অর্থাৎ অহম্। যে অহম্ ছেলেটি অকালমৃত্যু বরণ করেছে, তার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করা রামের অবশ্য কর্তব্য। তাই তিনি এ বিষয়ে পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে বশিষ্ঠাদি ঋষি ও ভাইদের আহ্বান করলেন, মার্কণ্ডেয়, কাশ্যপ, নারদ, গৌতমও এলেন।

কি সংবাদ বৎস!
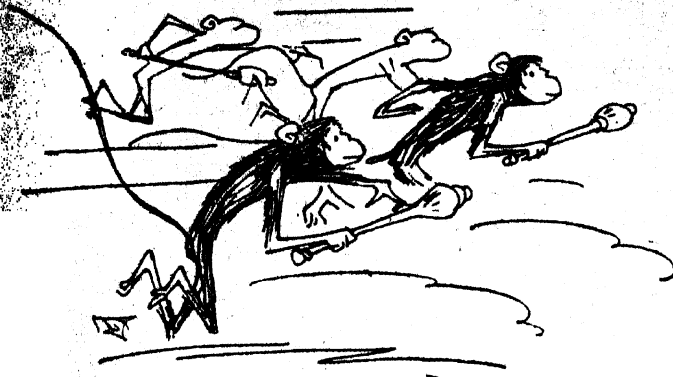
হুপ হুপ করে আনন্দ প্রকাশ করল।

পরামর্শ সভা বসল। বহু আলোচনার পর নারদ বললেন, "আমার যা ধারণা, তা এ সভায় অকপটে ব্যক্ত করছি, আপনারা তা বিশ্বাস করলে ভাল, না করলে আমার কিছু বলবার নেই।"

সবাই বললেন, "আপনার কথা আমরা বিশ্বাস করব বলে প্রস্তুত হয়েই এখানে এসেছি, আপনি অকপটে আপনার মনের কথা ব্যক্ত করুন।"

এ কথায় নারদ খুশী হয়ে বললেন, "সত্যযুগে শুধু সত্যেরই জয় হত। এবং সত্যযুগে একমাত্র অহম্‌ ভাষাই ছিল সবার ভাষা। সেজন্য সে যুগে কোনো অকালমৃত্যু ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি এ যুগে আবাম্‌ নামক এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে, তারা বয়ম্‌ নামক এক কৃত্রিম ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করেছে। ঐ নামেরই অপভ্রংশ হচ্ছে বাংলা। এই কৃত্রিম ভাষার ওরা সবাই শাস্ত্রাদি আলোচনা করায় দেশে পাপ ঢুকেছে এবং সেই পাপেই ওই বালকের মৃত্যু ঘটেছে।

রাম এ কথায় কঠিনভাবে শুধু বললেন, "বটে।"

তিনি অতঃপর কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। তিনি লক্ষ্মণের উপর রাজ্যভার ছেড়ে দিয়ে পুষ্পক রথে পাপিষ্ঠ সন্ধানে যাত্রা করলেন, সংগে নিলেন পুনর্নিযুক্ত হাজার খানেক পলিটিক্যাল সাফারার—তারা 'হুপ হুপ হুররে' করতে করতে যাত্রা করল।

রাম বহু অনুসন্ধানের পর অবশেষে দক্ষিণ দিকে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন নারদবর্ণিত সেই পাপিষ্ঠদের এক বিরাট উপনিবেশ রয়েছে। এইখানে বয়ম্‌রা অহম্‌দের বিরাগভাজন হয়েও বাংলা ভাষায় কথা বলছে এবং শাস্ত্রাদি আলোচনা করছে।

তাঁর সংগের সৈন্যরা আসন্ন যুদ্ধের আনন্দে পুনরায় হুপ-হুপ করে আনন্দ প্রকাশ করল।

রাম তাদের একজন প্রতিনিধিকে ডেকে পাঠালেন। যিনি এলেন, তাঁর নাম শম্বুক।

রাম বললেন, "আমি দাশরথি রাম, কৌতূহলবশে প্রশ্ন করছি, কেন এই দুষ্কার্য করছ?"

শম্বুক বলল, "দুষ্কার্য করছি না, সৎকার্য করছি এবং এটি আমাদের জন্মগত অধিকার বলেই করছি।"

রাম বাল্মীকি রামায়ণের সংগে মিল রেখে তৎক্ষণাৎ শম্বুক হত্যার জন্য খড়্গ কোষমুক্ত করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তখনই পুনর্নিযুক্ত বেকার সৈন্যদের কথা মনে পড়ায় উক্ত কার্যটি তাদের দিয়েই সমাধা করালেন। তারা উৎসাহবশে একজনের বদলে মোট এগারোজনকে হত্যা করল এবং তাদের মধ্যে যে একজন বালিকা ছিল, তাকেও বাদ দিল না।

আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল। দেবগণ বললেন, "রাম, তুমি আমাদের প্রিয় কাজ করেছ, তুমি ইচ্ছামতো বর চাও।"

রাম ইন্দ্রের দিকে চেয়ে বললেন, "আর কিছুই চাই না, আপনি শুধু মৃত অহম্‌ ছোকরাকে বাঁচিয়ে দিন।"

ইন্দ্র বললেন, "সব ঠিক আছে, এদের নিধনের সংগে সংগেই সে বেঁচে উঠেছে, তোমার রাজ্যের পাপ ধুয়ে গেছে।"

রাম এ কথায় খুশী হয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। সৈন্যরা বলল, 'হুপ!"

কানাইলাল বসু

দেশের কর্ণধারদের চোখে ঘুম নেই। ভাবনায় নাওয়া খাওয়া প্রায় বন্ধ। কি ব্যাপার? —না দেশের লোকগুলোকে ভাল করে খেতে পরতে দিতে হবে! তাদের রুজিরোজগার বাড়াবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে! কাজেই তার জন্য কত টাকা চাই, কি কি হবে, ইত্যাদি ব্যাপারগুলো ঠিক করবার জন্য অংক কষতে মন মন কাগজ আর হাজার হাজার পেন্সিল কলম দরকার হলো। আলাপ-আলোচনার নামে হলো বিস্তর গলাবাজী। তৈরি হলো তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার খসড়া। হলে হবে কি?—শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ালো—সাদা কথায় সেটা হচ্ছে স্রেফ ফাঁকা বুলি। কিন্তু ফাকা বুলিতে না মেটে খাওয়া-পরার সমস্যা, না বাড়ে রুজিরোজগারের পন্থা।

ভারতের তিন নম্বর যোজনার প্রাথমিক যে খসড়া তৈরি হয়েছিল পরিকল্পনা কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকার সেটা বিবেচনা করেছেন। তবে বিশেষ কিছু রদবদল করা হয়নি। যেটুকু পরিবর্তন করা হয়েছে সেটা দেখতে যৎসামান্য বটে, তবে তার যে একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে এটা অস্বীকার করা যায় না।

এই সেদিন দেশে যে আদমসুমারি হয়ে গেল তার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনায় দেশের জনসংখ্যার মোট হিসেবের কিছুটা রদবদল করা হয়েছে—বিশেষত খেটে-খাওয়া শ্রমিক গোষ্ঠীর সংখ্যার ব্যাপারে। খসড়া পরিকল্পনা তৈরির সময় খেটে খাওয়া লোকের বাড়তি সংখ্যা ধরা হয়েছিল দেড় কোটির মত। সেটা এখন বদল করে আরও বেশী—মানে এক কোটি সত্তর লাখ ধরা হয়েছে। অথচ তৃতীয় যোজনায় মাত্র এক কোটি চল্লিশ লাখ লোকের জন্য নতুন কর্ম-সংস্থান বা রুজিরোজগারের রাস্তা করে দেওয়া সম্ভব হবে বলে বলা হয়েছে। কাজেই বাকী আরও তিরিশ লাখ লোক বেকারই থেকে যাচ্ছে। এদের কি গতি হবে? এদের মধ্যে কিছু লোকের জন্য ছোট ছোট শিল্পের সংখ্যা বাড়িয়ে ও গ্রামীণ কাজকর্মের ব্যাপক ব্যবস্থা মারফতে বাড়তি কাজ জোগাড় করে দেওয়া হবে বলা হয়েছে। তবে বাতলানো ব্যবস্থাটা কার্যত অবাস্তব। কারণ শেষ আদমসুমারীতে লোকসংখ্যার ব্যাপারে বাড়তির যে একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে সেটা বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, তৃতীয় যোজনার পাঁচ বছরের মেয়াদের মধ্যে লোকসংখ্যা এখনকার চেয়ে আরও বাড়বে বই কমবে না। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, দেশের পাকামাথারা দেশের বেকার সমস্যার ক্রমবর্ধমান "চ্যালেঞ্জের" সামনা-সামনি দাঁড়াতে অপারগ। তাঁরা এটা এড়িয়ে যাবার রাস্তাই ধরেছেন। মাত্র এক কোটি চল্লিশ লাখ লোকের জন্য নতুন কর্মসংস্থান করা হবে, তাও কাগজে কলমে বলা মানেই সমস্যা সমাধানে সরকারের ও পরিকল্পনাকারীদের অক্ষমতার কথা স্বীকার করা। অথচ এই রুজিরোজগারের সুযোগ সৃষ্টির ওপরই নির্ভর করছে জাতীয় আয়ের পরিমাণ—সাশ্রয়ের পরিমাণ—বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্যে টাকা পয়সা বিনিয়োগের পরিমাণ।

আরও একটা জিনিস তলিয়ে দেখবার আছে। আদমসুমারিতে দেখছি দেশের লোকসংখ্যা বাড়ছে। তাই যদি হয় তবে এটাও ঠিক যে, যারা চাষবাস করে তাদের সংখ্যাও বাড়ছে। এখন কথা হচ্ছে যে এদেশে যখন মোট লোকসংখ্যার মধ্যে কৃষিজীবীদের সংখ্যাই বেশী, তখন চাষবাসের উন্নতির জন্য আরও বেশী টাকা বরাদ্দ করা উচিত। এটা যে শুধু দেশে খাবার জিনিসের ফলন বাড়াবার জন্য দরকার তা নয় বরং যারা চাষের কাজে আছে তাদের জীবনযাত্রার মান, সাদা কথায় ভালভাবে থাকা-খাওয়া-

পল্লীর অবস্থার উন্নতির জন্যও বটে। কিন্তু আসলে ব্যবস্থা হয়েছে ঠিক উল্টো। যেটা উচিত—পরিকল্পনা কমিশন সেটা করেন নি, অনুচিতটাই করেছেন। আবাদী জিনিসের উৎপাদনের লক্ষ্য না বাড়িয়ে বরং কমানো হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে খরচের বরাদ্দও। কমিশন বলেছেন, ছোট ছোট শিল্প ও গ্রামীণ কাজকর্ম বাড়ানো হবে। হবে তো জানলাম—কিন্তু তার জন্য বাড়তি বরাদ্দ টাকা কোথায়?

কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে তিন নম্বর যোজনায় সরকারী আওতায় খরচ হওয়ার কথা ছিল এক হাজার চুরানব্বই কোটি টাকা। সরকার ও পরিকল্পনা কমিশন সেটাকে কমিয়ে করলেন এক হাজার বাহাত্তর কোটি। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ যোজনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার সময় সেটা আরও কমিয়ে করলেন এক হাজার আটষট্টি কোটি। যা দরকার, বরাদ্দ হলো তার চেয়ে কম। কিন্তু টাকার অঙ্কের কম-বেশীটা বিশেষ

বড় কথা নয়—বড় কথা টাকার অংকটা শেষ পর্যন্ত কত দাঁড়াচ্ছে? এখানেও সেই একই কথা—স্রেফ ফাঁকা বুলি। আধ কোটি এক কোটি নয়—একেবারে হাজার কোটিরও বেশী বরাদ্দ। চাট্টিখানি কথা! কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে গালভরা টাকার মধ্যেও রয়েছে ফাঁকি। দেশে আজ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে—টাকার দাম ক্রমশ কমছে। আজকের দশ টাকায় যা পাওয়া যাবে কাল হয়তো তা পাওয়া যাবে না। কাজেই এই হাজার আটষট্টি কোটির আসল দাম শেষ পর্যন্ত কতটা দাঁড়াবে বলা শক্ত। মুদ্রাস্ফীতি যত বাড়বে বাস্তব কাজের পরিমাণও তত কমবে।

এখন প্রশ্ন উঠবে যে, অবস্থা যদি এই হয় তো যারা চাষবাসের ওপর নির্ভরশীল সেই গ্রামীণ লোকেদের ভালভাবে খেয়ে পরে বাঁচবার ব্যবস্থা কি করে করা যাবে? তাদের ভালমন্দের ভার কি আমরা তাদের বরাতের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবো? এখন তাদের সত্যিকারের অবস্থা কি? কিছুদিন হলো একটা সরকারী অনুসন্ধান হয়েছে—তাতে দেখা যাচ্ছে যে, পশ্চিম বাংলায় কৃষিজীবীদের আয় ক্রমশ কমে যাচ্ছে। শুধু পশ্চিম বাংলায় কেন—সারা ভারতের কৃষিজীবীদের অল্পবিস্তর এই একই অবস্থা। এতে আশ্চর্য হওয়ার বিশেষ কিছু নেই—কারণ পরিকল্পনাকারীদের দেশের চাষবাস সম্বন্ধে নাক সিঁটকানো মনোভাবেরই ফল ওটা। আসলে যা হচ্ছে সেটা এই যে, দিনের পর দিন করের বোঝা বাড়িয়ে এইসব কৃষিজীবীদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নিংড়ে আদায় করা হচ্ছে আর সেই আদায় করা টাকা আবার অন্য রাস্তায় দেশের অন্য এক বিশেষ শ্রেণীর পকেটে পুরে দেওয়া হচ্ছে। একের গাঁট কেটে অন্যের পকেট ভর্তি করার কাজটা ভালভাবে হাসিল করবার জন্য দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির ভাঁওতা দেওয়া হচ্ছে। না দিয়ে উপায় নেই যে! সরকার যত টাকা উৎপাদন শুল্ক হিসেবে আদায় করেন তার অধিকাংশ দেয় দেশের সাধারণ লোকেরা। আর আমাদের দেশে যেখানে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে চারজন গ্রামীণ অধিবাসী তখন এটা নিঃসন্দেহ যে, এই টাকার মোটা অংশটা তাদের কাছ থেকেই আদায় করা হয়। আয়কর দেয় শুধু ধনীরাই। কারণ আয় না থাকলে আর কর দেবে কি করে? কিন্তু উৎপাদন শুল্ক দেয় সকলেই। গত দশ বছর যাবৎ পরিকল্পনার আওতায় থেকে আর দেশের উন্নতি করে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? দেখছি যে, আয়কর আদায়ের পরিমাণ বাড়েনি বরং গত দশ বছরে শতকরা চার ভাগ কমেছে। তার মানে, বড়লোকদের কাছ থেকে জনদরদী সরকার কম আদায় করে তাদের আরও বড়লোক করে দিয়েছেন। সে যায়গায় কেন্দ্রীয় সরকারের উৎপাদন কর আদায়ের পরিমাণ শতকরা এক আধ ভাগ নয়—চারশ আটাশী ভাগ বেড়েছে। এই থেকে কোন শ্রেণীর লোকেদের কাছ থেকে বেশী আদায় করা হচ্ছে সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না কি? এ ছাড়া, আছে আরও নানান রকম রাজ্যসরকারের কর। সেগুলোর বোঝাও গরীব জনসাধারণকেই বইতে হচ্ছে। দেশ গড়ার কাজে জনসাধারণকে যখন ত্যাগস্বীকার করবার জন্য শুকনো উপদেশ দেওয়া হয় তখন কাদের উদ্দেশ্য করে সেগুলো বলা হয় তা আর খুলে বলবার দরকার নেই বোধ হয়।

তিন নম্বর যোজনায় কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় টাকা বরাদ্দ করা যাবে না কারণ সামর্থ্যের অভাব। কিন্তু যে যায়গায় অন্যান্য বিষয় বাবদ যে খরচ বরাদ্দ করা হয়েছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। অনেকে মনে করেন যে, ইচ্ছে থাকলে তৃতীয় যোজ-

...নায় মোট খরচের [illegible] কৃষির জন্য আরও বেশী বরাদ্দ করা যেতে পারতো। যাই হোক, পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে, সরকারী আওতায় যে সাড়ে সাত হাজার—আট হাজার কোটি টাকা খরচ ধরা হয়েছে সেটা বাস্তবে পরিণত করা সম্ভব। এই মনে করার পেছনে আছে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে বিদেশী ভরসা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজে কতটা হয়ে উঠবে বলা [illegible]—কারণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া না পাওয়ার পেছনে থাকবে আন্তর্জাতিক [illegible]র রূপ। কাজেই তাহলে তৃতীয় পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করছে দেশের লোকের মোট সঞ্চয়ের কতখানি অংশ নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের উৎপাদনে না লাগিয়ে সেটা অন্যান্য উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ করা যেতে পারে—তার ওপর। এটা কার্যকরী করতে গেলে সাধারণ জিনিসের ব্যবহার কমাতে হবেই। কিন্তু তা করলে কি আমাদের খাওয়া পরা থাকার অবস্থার উন্নতি হবে? —যাকে আমরা বলি জীবন-যাত্রার মান! অথচ আমাদের জনদরদী সরকার ও পরিকল্পনা কমিশনের মতে এই জীবন-যাত্রার-মানের উন্নতি করাই নাকি পরিকল্পনাগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বিচারে দেখা যাচ্ছে যে উদ্দেশ্য পূরণ হবার আশা খুবই কম। যা বলা হচ্ছে সেটা স্রেফ ফাঁকা বুলির পর্যায়ে পড়ছে না কি?

শেষ পর্যন্ত ঢ্যাড়া পড়েছে। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় অনুমোদনের চূড়ান্ত ছাপ মেরে দিয়েছেন। তবে চূড়ান্ত বলে যাকে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে—আসলে কিন্তু সেটা একেবারে চূড়ান্ত নয়। সরকারী আওতায় যত টাকার কাজ হবে আর যত টাকা খরচ বরাদ্দ করা হয়েছে দুটোর মধ্যে
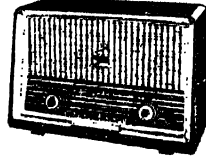
ফারাক আছে—ফারাকের পরিমাণ নেহাত কম নয়। প্রায় পাঁচশ কোটি টাকা। কাজ হবে আট হাজার কোটি টাকার মত —আর বরাদ্দ হয়েছে সাড়ে সাত হাজার কোটি। তফাতটা অবশ্য হয়েছে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকারের দাবীর চাপের ফলে। চাপে পড়ে দাবী স্বীকার করলেও এটা বোঝা যাচ্ছে যে টাকা যোগাড়ের বাস্তব সম্ভাবনার ব্যাপারে পাকামাথারা সন্দিহান। সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকার যদি কুলিয়ে না ওঠে, তখন দেখা যাবে—সরকারী মনোভাব কতকটা এই রকম। কিন্তু ব্যাপারটা কি হলো তাহলে? সোজা কথায় গোঁজামিল। গোঁজামিলই হচ্ছে নতুন ভারতের সর্বৌষধি। যেখানেই হালে পানি পাওয়া যাচ্ছে না—সেখানেই দাও গোঁজামিল। ছোট বড়, দরকারী অদরকারী সব যায়গায়। তবে কথা হচ্ছে গোঁজামিলে আর যাই হোক দেশ গড়ার বনিয়াদ শক্ত হয় না।

তৃতীয় যোজনার সব থেকে গুরুতর ব্যাপার হলো যে, শুধু পরিকল্পনা তৈরী করণেওয়ালারা কেন কেউ-ই জানে না যে এই সাড়ে সাত বা আট হাজার কোটি টাকা খরচের বরাদ্দটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? কারণ খরচটা একান্তই টাকাপয়সা যোগাড়ের সম্ভাবনার ওপর নির্ভরশীল। কেন্দ্রীয় অর্থ উপমন্ত্রী শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ বলেছেন যে, যোজনার খরচের জন্য নির্দিষ্ট কোন টাকার তহবিল নেই। ওটা নির্ভর করবে পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে বিভিন্ন শিল্প বাণিজ্যে কি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ থেকে কি ধরনের প্রতিদান পাওয়া যাবে তার ওপর। খরচের বরাদ্দটা আলাদা ভাবে দেখলে চলবে না—কাজের লক্ষ্যটাও বিবেচনা করতে হবে। খরচ আর কাজ—দুটোর সম্বন্ধই পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আট হাজার কোটি টাকা যোগাড়ের যদি ক্ষমতা হয় তো পরিকল্পনার সরকারী আওতার অন্তর্ভুক্ত কাজ পুরোপুরি হবে—না হয় যতটা পারা যায় সামঞ্জস্য বজায় রেখে কাজে কাটছাঁট করতে হবে। কিন্তু এই কাটছাঁটে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে কি না কে জানে? ধুরন্ধরেরা তো বলেন, না। তবে বাস্তবে তো তা মনে হয় না। দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য মূলধন বিনিয়োগের গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে তবে সেইটাই একমাত্র পথ নয়। যাদের জন্য উন্নতি সেই মানুষদেরও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে দেশের আর্থিক উন্নতির ব্যাপারে। বড় রকমের একটা যুদ্ধ বিগ্রহ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের গ,. যখন সব ধ্বংস হয়ে যায় তখন দেশের আর্থিক উন্নতি বা পুনর্গঠনের গতি থাকে বেশ দ্রুত—তাই সেটা চোখে পড়ে। কিন্তু শান্তির সময় এর গতি কমে যায়। অনুভব করা শক্ত হয়—মানুষের ভূমিকার গুরুত্ব যায় বেড়ে। আমাদের দেশে কিন্তু তা হচ্ছে না। মানুষের ভূমিকাকে যেন আমরা উপেক্ষা করছি। তার কোন গুরুত্বই দিচ্ছি না। দেশের শতকরা আশী/নব্বুই ভাগ লোক পেট ভরে দুবেলা খেতে পায় না—লেখাপড়া জানে না—মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই। মানুষের মত বেঁচে থাকবার তাদের সেই প্রাথমিক উপকরণগুলো মেটাবার দিকে আমাদের নজর নেই—তার জন্য জনদরদী সরকারের কোন মাথা ব্যথা নেই—ভাবনা আছে শুধু কি করে দুচারটে ইস্পাত কারখানা তৈরি করা যাবে। যে ইস্পাত কারখানা তৈরীর কাজ আজ সুরু করলে তার মারফৎ লোকের অভাব ঘুচবে দুদশ বছর পরে। কিন্তু ততদিন বেঁচে থাকতে হবে তো! সেটা কি হাওয়া খেয়ে হবে? অথচ

দিনের পর দিন শোনা যাচ্ছে উপদেশ—তোমরা ধৈর্য ধর—ত্যাগস্বীকার করো—আমরা তোমাদের ভাল থাকা খাওয়া পরার ব্যবস্থা করবো। কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে সবই ফাঁকা বুলি। বিনিয়োগের পরিমাণ বছরে ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছি সেটা থেকে কি প্রতিদান পাচ্ছি তা আমরা দেখছি না মোটেই। এখন প্রতিদানের দিকটা দেখবার সময় এসেছে। কি পেলাম, কি পাচ্ছি সেটা বিচার করে তবে এগুতে হবে। বেসরকারী ব্যাপারে আমরা কি দেখি? যে বিনিয়োগ থেকে প্রতিদানে ভাল ফল পাওয়া যায় না বা আশানুরূপ পাওয়া যায় না, সে বিনিযোগকে আমরা খারাপ বলি। সরকারী ব্যাপারে কতকগুলো সুবিধে থাকলেও সাধারণ নীতিটা বদলে যাবে না। বিনিয়োগ থেকে প্রতিদান ঠিক মত না পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই সেটা ভাল বিনিয়োগ নয়। কাজেই জেনেশুনে চোখ বন্ধ করে শুধু বুলি আওড়ালে দেশের লোককে ভাল খেতে পরতে দেওয়া যায় না।
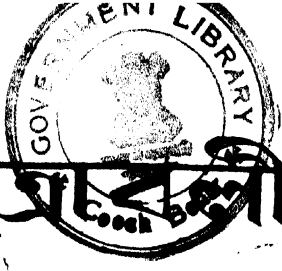
[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১৬৫ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

প্রথম বয়সে অনেকদিন পৃথিবীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখেচি। নারিকেলতরু শ্রেণীর উপর সূর্যের উদয়, পুকুরের জলে সমস্ত দিন হাঁসের ডোবাডুবি, বাড়ির ছাদের পিছনে হঠাৎ জলভরা ঘন নীল মেঘের সমারোহ, গলির ধারের বাড়ির নানা আয়তনের দেয়াল, তার উপরে জ্যোৎস্নারাত্রে নানা আকারের ছায়ার ষড়যন্ত্র, অন্দরের প্রাচীর পেরিয়ে গয়লাপাড়ার কুঁড়ে-ঘর, তারি একপ্রান্তে ডোবার জলের উপর রোদ্রের ঝিকিমিকি, পূর্বদিকে অনেক দূরে উঁচুনিচু অনেক রকমের ছাদের শেষে গাছে গাছে নীলাভ নিবিড় সবুজের স্তূপ, কখনো ঘরের জানলার ধারে চুপ করে বসে, কখনো ছাদের পাঁচিলের গায়ে একটা প্যাকবাক্সের উপর দাঁড়িয়ে কেবল দেখে দেখে কাটিয়েছি—তাতে ছিল অতি নিবিড় আনন্দ। ভোর বেলায় উঠেই সব প্রথমে মনে হোত দেখবার জিনিস কত কি আছে। আর কিছুই না, সমবয়সী বন্ধু কেউ ছিল না, নিতান্তই একলা ছিলুম—আমার একমাত্র সঙ্গী ছিল এই চোখের দেখার বিচিত্র বিশ্ব—সেও বুঝি তার আকাশের বাতায়নে বসে কোনো একটা সুদূর অভাবনীয়ের দিকে চেয়ে থাকত। তার পরে রূপের জগতের সীমানায় যেখানে মানুষে মানুষে রূপকথা জমে উঠচে, সেইখানে এসে পড়লুম। এক যে ছিল রাজপুত্র, আর এক যে ছিল কত কী। স্পষ্ট করে কিছুই বুঝিনে, অস্পষ্ট করে অনুভব করি, এই হল ভাবের যুগ। চাওয়া পাওয়া হারানোর বেদনা-বাষ্পাকুল আলোছায়ার আবর্তন। মনের মধ্যে গানের সুর ঘনিয়ে এল। তখন চোখে দেখার জগতের উপর রঙীন কুয়াশার একটা পাতলা পর্দা কখন নেমে এল জানিনে। তার পরে জাগল চিত্ত—নানা বলবার কথা এবং করবার ব্রত ভিড় করে আসে। তাদের দাবি গুরুতর—কিছু অবসর বাকি রাখে না। সেও তো কম দিন হল না। তার দুঃসাধ্যতা অতি কঠোর। এদিকে শরীরের শক্তি কমে আসচে, ক্লান্তির গোধূলি নেমে আসচে মনের উপরে,—ছুটি নিতে চাই, কিন্তু ছুটির বেলাকার খেলা একটা কিছু না থাকলে যে ছুটি ফাঁকা হয়ে পড়ে, সেই ফাঁকার ভার বইবে কে? হেনকালে কাজের কোন্ একটা ছিদ্র দিয়ে আমাকে পেয়ে বসলো ছবি আঁকার নেশা। এ যেন আবার সেই বিশুদ্ধ দেখার জগতে ফিরে আসা। তফাতের মধ্যে এই যে, সেই দেখার খেলাটা ছিল বাইরের দিক থেকে, এখন এটা ভিতরের দিক থেকে। ছবি দিয়ে রূপের খেলনা নিজেই বানাই, ঠিক বালকেরই মতো। অর্থাৎ সেগুলো ভালো কি মন্দ সে তর্ক অপ্রাসঙ্গিক। রেখাতে রঙেতে একটা কিছু গড়ে উঠেচে এই যথেষ্ট, তার কোনো উদ্দেশ্য নেই। এর দ্বারা খ্যাতি পাবো সে ভরসাও রাখিনে। বরঞ্চ দেশের লোকের কাছে অখ্যাত পাবার আশঙ্কাই প্রবল। বাইরের কৌতূহল থেকে এদের প্রচ্ছন্ন রাখাই আমার পক্ষে নিরাপদ। তা হোক, এই রূপ উদ্ভাবনের নেশা মরে না—কর্তব্য ভুলি, মনে হয় আর কিছুরই প্রয়োজন নেই। এই তো এমনি করে মনটা ঘুরে এল সেই কর্তব্যহীন চোখে দেখার রূপলোকে, সেই বালককালের খেলাঘরে। এই জন্যেই তো সেদিন শান্তিনিকেতনে আমার জানলায় বসে সবুজ মাঠ ও নীল আকাশের উপর শীতমধ্যাহ্নের ছায়ালোকের তুলি-বোলানো দেখে দেখে সব কাজ ছেড়ে বেলা কাটিয়েছি। সে কোন সঙ্গীহীন সুরবালকের খেলা, কোন অন্যমনস্ক দিগঙ্গনার স্বপ্নরচনা।

তার পরে আজ চলেচি রেলগাড়িতে চড়ে মাদ্রাজের দিকে। একটা ভারী গোছের নীল-মলাটওয়ালা বই এনেছিলুম—সে আর খোলা হল না। জানলার বাইরে আমার দুই চক্ষের অভিসার আর থামে না। কোথাও বা এবড়ো-খেবড়ো রুক্ষ জমি, কালো পাথরগুলো রোদ্দুরে নিঃঝুম হয়ে রয়েচে, যেখানে-সেখানে বাবলা গাছ আলুথালু অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়িয়ে,—কোথাও বা গ্রামের কাছাকাছি চষাক্ষেত আঁকাবাঁকা আল দিয়ে বিভক্ত, বিরলতৃণ মাঠে গোরু মোষ শান্ত গমনে চরে বেড়াচ্চে, আম-বাগানে বোল ধরেচে, ইঁদারায় জল তোলবার বংশদণ্ডের আগায় ল্যাজ-ঝোলানো ফিঙে, গ্রামের রাস্তায় চলেচে গোরুর গাড়ি, কিসের বোঝাই জানিনে,—দিক্প্রান্তে বেগুনি-রঙের শৈলশ্রেণী, তার পিছনে পাণ্ডুর নীল আকাশ। মন বলচে, দেখে নিলুম। রথ চলেচে ছুটে—কোনো কিছু ফিরে দেখবার সময় নেই। যারা চঞ্চলতার অপবাদ দিয়ে এই দেখাশোনার সংসারকে ত্যাগ করবার উপদেশ দেয় এই রেলে-চড়া মানুষ তাদের পক্ষে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত। প্রতি মুহূর্তেই ত্যাগ করেই চলতে হচ্চে তবু কেন ধরে রাখার কথা বলা? সেই তো আশ্চর্য। এ যদি এত বেশি অদ্ভুত হবে তবে এ কথা মানুষ বলেই বা কেন? ত্যাগ করচি এ কথার চেয়ে অনেক বেশী সত্য পাচ্চি—ত্যাগ করার ভিতর দিয়েই সেই পাওয়া এত নিবিড় হয়। জানলা দিয়ে এই ফাগুনের রোদ্রে যখন একটি অভাবনীয় মাধুরীর মূর্তি দেখি তখন নিশ্চিত জানি সেটা দেখতে দেখতে মিলিয়ে যাবে। মনকে জিজ্ঞাসা করি এই উপলব্ধিটা কি একেবারেই মায়া। মন তো তা স্বীকার করে না। যা দেখচি সে তো একলা আমারই আনন্দের দেখা নয়—এ ত একজন মানুষের খেয়াল নয়, পাগলামি নয়, আমি যে সমস্ত মানুষের হয়ে দেখচি—আমি যাব কিন্তু মানুষ তো যাবে না। কালিদাস মেঘদূতে আষাঢ়ের মেঘচ্ছায়াশ্যামলা পৃথিবীর যে রূপ দেখে মন্দাক্রান্তা ছন্দে তার আনন্দ ঢেলে দিয়েচেন—সে যে সমস্ত মানুষের আনন্দ—সে আনন্দ তখনো ছিল আজও আছে। তার মাঝখান দিয়ে রেলগাড়ির মতো আমাদের প্রত্যেকের জীবন ছুটে চলেচে, কিন্তু তার মধ্যে থেকে যেটুকু পাচ্চি সে ক্ষণকালীন নয়, সে চিরকালীন,—তার উপরে যুগযুগান্তরের মানুষ আপন ভালো লাগা জড়িয়ে গেল—আমি সেই সহস্রের আনন্দকেই পাই একলা বসে। যারা এতকাল দেখেচে এবং চিরকাল দেখবে তাদেরই দেখাকে সংগ্রহ করে নিয়ে গেলুম—সেই সঙ্গে এই একটা কবিতাও লেখা গেলঃ

সুনীল সাগরের শ্যামল-কিনারে
দেখেছি পথে যেতে তুলনা-হীনারে।
এ কথা কোনোদিন পারে না ঘুচিতে,
আছে সে নিখিলের মাধুরী-রুচিতে,
একথা শিখানু যে আমার বীণারে,
গানেতে চিনালেম সে চির-চিনারে॥

সে কথা সুরে সুরে ছড়াব পিছনে
স্বপন-ফসলের বিছনে বিছনে।
মধুপ গুঞ্জে সে লহরী তুলিবে,
কুসুম কুঞ্জে সে পবনে দুলিবে,
ঝরিবে শ্রাবণের বাদল-সিচনে,
শরতে ক্ষীণমেঘে ভাসিবে আকাশে,
স্মরণ-বেদনার বরণে আঁকা সে,
চকিতে খনে খনে পাব যে তাহারে
ইমনে কেদারায় বেহাগে বাহারে॥

কিন্তু এই পর্যন্ত। ঘাটে বসে তরীর অপেক্ষায় সময় হাতে ছিল তাই বড়ো করে চিঠি লিখলুম। আর বোধ হয় এমন অবকাশ জুটবে না। কিন্তু "লেখা তো লিখেচি ঢের"। ইতি ২ মার্চ ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৬৬ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

এবারে বহু কষ্টে জাহাজডুবি বাঁচিয়ে ফুটো জাহাজ নিয়ে ছাব্বিশ দিনে মধ্যধরণী সাগরের ঘাটে এসে পৌঁচেচি। দুটো হালের একটা হাল জখম হয়েচে, স্টীম পাইপ একটা ফেটেচে, তলায় ফাঁক হয়ে জাহাজের খোল জলে ভরেচে—ভয়ে ভয়ে বরাবর ডাঙার গা ঘেঁষে ঘেঁষে জাহাজ চালিয়ে তবে পারে এলুম। তলায় যাওয়া অসম্ভব ছিল না—কাপ্তেন সেই আশঙ্কাই করেছিল।

লেকচারটা লিখচি। সমস্ত মনটা সেইদিকেই লাগাতে হচ্চে। এবারে চিঠি পত্তর লেখা সম্ভব হবে না। সময়ের অভাব বশত যে তা নয়, কিন্তু মনটাকে একভাবে ভরতি রাখতে চাই, যেন পৃথিবীতে আমার পক্ষে আর কোনো কর্তব্য নেই—উৎসবের আলো ভরপুর করে জ্বালাতে হলে ঘরের অন্য সমস্ত আলো যেমন নেবানো দরকার হয় এ তেমনি। আশা করি বলবার কথা ভালো করেই বলতে পারব। দেশের সমস্ত খুচরো অত্যাচার থেকে পেরিয়ে এসে মনটা যেন উপরের দিকে উঠতে পেরেছে। ওখানে পাঁকে কেবলি পা ডুবে যায়, মানুষ অপমানিত হয়ে ছোট হয়ে বৃহৎ জীবনযাত্রার অযোগ্য হতে থাকে, মানুষের গৌরব থেকে ভ্রষ্ট হয়ে বাঙালীর দীনতায় জড়িত হয়ে পড়ে। যেখানে আছি চমৎকার জায়গা। দেশের খবর দীর্ঘকাল কিছুই জানিনে। ইতি ২৭ মার্চ ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৬৭ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠি এইমাত্র পাওয়া গেল। সমুদ্র পার হতে আমাদের ২৬ দিন লাগল, তবু ভালো যে পার হতে পেরেচি—ইংরেজীতে একটা কথা আছে বেটার লেট্ দ্যান্ নেভার। নাপারগ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল কারণ মধ্যধরণী সাগরে জাহাজের মর্মদেশ লবণাশ্রুতে ভারান্বিত হয়েছিল। তা ছাড়া সুয়েজখালে তার দুই কর্ণের মধ্যে একটা বিক্ষত হওয়াতে তার গতি হয়েছিল মন্থর। তার পরে একদা তার একটা বাষ্পবহ নাড়ী গেল বিদীর্ণ হয়ে। এই সমস্ত গ্রহানিগ্রহের কথা বোধ হয় আমার পূর্বতন পত্রে বলে থাকব—কিন্তু ইতিমধ্যে আর কোনো অবধানযোগ্য সংবাদ না ঘটাতে ঘূর্ণিপাকগ্রস্ত শৈবালদলের মতো এইগুলোই কলমের চারদিকে বার বার আবর্তিত হচ্চে। এই শ্রেণীর আরো একটা খবর আছে। রেলের স্টেশনে আমাদের পাসপোর্টের বাক্সটা অন্তর্ধান করেচে। ওর চেয়ে দামী জিনিসের বাক্স ছিল সেগুলোর ক্ষতি হয় নি, চোর এত সাধু। তুমি বোধ হয় জানো, বোলপুর থেকে আমাদের একজন দূত আমার গোটাকতক চিঠি নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছিল। রাত্রে তার চাদর থেকে সেই চিঠিগুলিই চুরি গিয়েছিল, যার বাজার দর বেশী এমন জিনিসও ছিল কিন্তু ধর্মভীরু তাতে হস্তক্ষেপ করেনি। এর থেকে অনুমান করচি, আমার জাহাজ যদি বা ডাঙায় পৌঁছল কিন্তু আমার চিঠিগুলো তীরে না পৌঁছতে পারে। যিনি মাঝপথে আমার চিঠিগুলো খুলবেন তাঁর প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, যদিবা আমার দুরভিসন্ধি থাকে চিঠিতে তার আভাস দেবার মতো বোকামি আমার নেই। এখনো আমার মন বক্তৃতার পথে—ব্রডগেজের গাড়ি—একে চিঠিপত্রের ন্যারো গেজ রেলের উপর চড়ানো হঠাৎ সম্ভবপর হবে না। "আমার জন্মভূমিকে" গড় করে চলে এসেচি, যতদিন ভুলে থাকতে পারব ততদিন আরামে থাকব। ইতি ১লা এপ্রিল ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৬৮ ॥

ওঁ

Cape Martin
Villa Dunure

কল্যাণীয়াসু,

এখানে মানবলোকের একটা প্রশস্ত ভূমিকার উপর নিজের জীবনটাকে দেখতে পাই, মন সম্পূর্ণ করে জেগে ওঠে। স্বদেশে হাজার রকম খুচরো জিনিসের মধ্যে নিজেও খুচরো হয়ে যাই—এখানে এসে সে জন্যে লজ্জা বোধ হয়। দেশে চারদিকে এমন একটা অকিঞ্চিৎকরতা যে, সেখানে ছোট জিনিস বড় আকার ধরে—মানুষের পক্ষে তার মতো শত্রু আর নেই। পরিমাণবোধ ছোটো হয়ে গেলেই নিজের সত্য থেকে পদে পদে ভ্রষ্ট হতে হয়। নিজের সার্থকতার অনেক নীচে এসে মন হাত গুটিয়ে বসে। মাঝে মাঝে ডাকযোগে যখন দেশ থেকে মাসিক পত্রাদি আসে—চোখ বুলোতে গিয়ে হঠাৎ দেশের হাওয়া এসে মনকে সঙ্কুচিত করে। তাই বার বার আমার মনে হয়, বৎসরে অন্তত ছয় মাস আমার পক্ষে য়ুরোপে থাকা একান্ত দরকার—নইলে আত্মবিস্মৃতির দুর্গতি থেকে নিজেকে বাঁচানো বড়ো কঠিন হয়।

দক্ষিণ ফ্রান্সে এখনো আছি। শীত আজও প্রবল আছে। আর একটু গরম পড়লে প্যারিসে যাবার ইচ্ছে।

বক্তৃতা লেখা হয়ে গেছে কিন্তু নাড়াচাড়া করচি। মে মাসের ১৯শে থেকে অক্সফোর্ডে আমার পালা। তিনটে মাত্র লিখতে পেরেচি। শরীর যে খারাপ আছে তা নয় কিন্তু চলতে ফিরতে সেই রকমই দুর্বলতা বোধ করি। রথী মোটের উপর ভালোই আছে—তবু কিছুদিন স্বাস্থ্যনিবাসে থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্যচর্চা করা দরকার হবে। ওরা যাবে সুইজারল্যাণ্ডে। আমার ভার নেবে এণ্ড্রুজ এবং এরিয়ম।

তুমি নিশ্চয় গেছ দার্জিলিঙে। সেখানে তোমার শরীর সহজে ভালো থাকে বলেই ভালো না থাকা সহজ। অর্থাৎ সতর্কতা চলে যায় তার পরে লাভের চেয়ে লোকসানের অঙ্ক হঠাৎ বেড়ে ওঠে। ইতি ১৭ এপ্রিল ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৬৯ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

রানী, আজ আমার জন্মদিন। কিন্তু জ[illegible] জন্মস্থানের মিল করতে না পারলে সমস্ত জিনিসটাকে মনের মধ্যে পাওয়া যায় না। দেশে থাকলে পঁচিশে বৈশাখের আকাশের মধ্যে জীবনের প্রথম দিনের রৌদ্র মাতৃভূমির স্পর্শে চিত্তকে জাগরূক করে তুলত। কিন্তু এখানকার রৌদ্র আমার জন্মদিনকে চেনে না। আমার মনের একটা স্বভাব আছে, সমগ্রতার মধ্যে সে নিজেকে স্থাপন না করতে পারলে সে বাসা পায় না। এখানে যে রবীন্দ্রনাথ আছে সে এখানকার উপকরণ নিয়ে নিজেকে একটা বিশেষ সম্পূর্ণতা দিয়েছে, তার সঙ্গে পঁচিশে বৈশাখের রবি ঠাকুরের ঠিক মিল হবে না। দেশে ফিরে গেলে তবে আমি তাকে ফিরে পাব, সেখানকার সব কিছুর সঙ্গে। তার মূল্য কিন্তু ঢের কম, ভেজাল-দেওয়া জিনিসের মতো। সেখানকার নানা হালকা এবং বাজে পদার্থে তাকে খাটো করেচে—বহু অকিঞ্চিৎকরতার সঙ্গে জড়িত হয়ে সে আত্মমর্যাদা ভুলে যায়। তাই সেখানে মন পালাই পালাই করে। অথচ সেখানে আকাশে বাতাসে রূপে রসে এমন কিছু আছে যা আমার মানস-খাদ্যের প্রাণপদার্থ। আসল কথা আমার বিশ্ব-প্রকৃতি আছে সমুদ্রের ওপারে, মানব-প্রকৃতি আছে এপারে। এখানকার মানুষ আমাকে গভীর করে সম্পূর্ণ করে উদ্বোধিত করে, তাই নিজেকে শ্রদ্ধা করতে পারি। তাই আমার জন্মভূমি পূর্বে ও পশ্চিমে দ্বিখণ্ডিত।

আমার ছবির প্রদর্শনী চলচে। ইংরেজী গীতাঞ্জলি প্রকাশের সময় যেমন বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল, ছবি নিয়েও প্রায় তেমনি হল। বর্ণনা করে কোনো লাভ নেই—এদের দেখার মধ্যে দিয়ে দেখলে তবে ঠিক বুঝতে পারতে। —তুমি এখন দার্জিলিঙে আছ—আর কিছু না হোক এখানকার হাওয়াটা কি রকম তা কল্পনা করা দুঃসাধ্য হবে না। যথেষ্ট গরম কাপড় জড়িয়ে আছি তবু পিঠের দিকে একটু শীতে শীত করচে। ইতি জন্মদিন ১৯৩০

পঁচিশে বৈশাখের রবিঠাকুর

॥ ১৭০ ॥

ওঁ

C/o. American Express
Company
6, Hay Market, London

কল্যাণীয়াসু

রানী, খুব বেশী দিন নয়, তিন মাস হোলো দেশ ছেড়ে এসেচি। কিন্তু সময়ের দূরত্ব না হোক দেশের দূরত্ব যেন প্রতিদিন বেড়ে এসেচে। তার প্রধান কারণ, এখানকার নানা [illegible]জে মন ভরে উঠেচে, ভারতবর্ষের ছবি আমার চেতনার পট-ভূমিকায় যথেষ্ট জায়গা পাচ্চে না। মাঝে মাঝে ওপার থেকে ছাপাখানার দৌত্য আমার সামনে এসে পৌঁছয়, কিন্তু তার বাণী তেমন জোরালো তেমন বড়ো নয় যাতে সমুদ্র পার হয়ে এখানকার প্রবল আবেষ্টন থেকে মনকে নেপথ্যে ডেকে নিতে পারে—তারা দেশের স্বরূপকে অত্যন্ত ছোটো করে সামনে আনে। এমন সময়ে হঠাৎ তোমাদের কাছ থেকে দুই একখানা চিঠি কাজে লাগে। কেননা মানুষ হিসাবে যাদের ভালো করে চিনি তারা কোনো দিনই ছোট নয়, তাদের বাস্তবতা নিবিড় ও নিঃসন্দিগ্ধ।

কিন্তু সম্প্রতি দেশের খবরগুলো দেশকে প্রকাণ্ড করে তুলেচে। একটা অগ্নিকাণ্ডের আভা পড়েচে তার মুখে, তার মূর্তি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেচে। মাঝখানের দূরত্ব এখন ছোটো হয়ে গেল, আমার চিত্ত আমার দেশের সত্তার সঙ্গে প্রবল বেদনায় সম্মিলিত হয়েচে, এই সময়ে এইখানে দেশ থেকে দূরে আছি তাতে ক্ষতি হয় নি—হয়তো কাছে থাকার চেয়ে বেশী কাজ করতে পারব।

ছবির কথা অল্পস্বল্প শুনেছ—তার চেয়ে বেশী করে বলা আমার পক্ষে শোভন নয়, অহংকারের অত্যুক্তির মত শুনতে হবে। তার চেয়ে অন্যায় হবে যখন তোমরা অহংকৃত স্বরে বলতে শুরু করবে আমরা তো আগেই বলেছিলুম। বুঝতে পারবে না তোমরা যে রকম করে বলেছিলে এ বলা সে রকম নয়, এর মধ্যে আন্দাজের ক্ষীণতা নেই। সে জন্যে নালিশ করিনে—কেননা আমি নিজেই বুঝিনি। তোমরাই আমার চেয়ে বুদ্ধিমান হয়ে ঠিক কথাটা স্পষ্ট বুঝেছিলে এ কথা বলতে আমার দুর্বল মন বাধা পায়। স্পর্ধা করে বলতে ইচ্ছে করে, "কেমন, এখন কী বলো।"

অক্সফোর্ডে বক্তৃতার পালা চলচে। তার সমস্ত বিবরণ সত্য করে বলা নীতিশাস্ত্রে বারণ আছে। অতএব যথেষ্ট পরিমাণে খাটো করেই বলতে হোলো, মন্দ হয় নি, লোকে তো ভালই বলচে। এতে করে দেশের সুরের সঙ্গে আমার সুর কতকটা পরিমাণে মিলবে। আর যাই হোক এখনো কেউ বলচে না, এমনিই কি ভালো,—এমন কি আমার স্বদেশী প্রবাসীরাও। এ দেশে বাসকালে আমার গৌরবের অংশ দাবি করায় তাদের লাভ আছে, স্বদেশে তাতে তাদের নিজের গৌরব খাটো হয়।

সত্যের খাতিরে একটা কথা তোমাকে বলা দরকার—যে ছবি-গুলো প্যারিসে প্রদর্শিত হয়েছিল সেগুলো অবনীন্দ্র ঠাকুরের নয়, তার কনিষ্ঠ পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের। মনে কোরো না, কথাটা অতিরঞ্জিত।

রথীরা আছে ডেভন-শিয়ারে টার্কিতে—ভালোই আছে। স্বদেশ সম্বন্ধে কাল লণ্ডনে আমাকে কিছু বলতে হবে। যা মুখে আসে তাই—তার পরে যা কপালে থাকে তাই হবে। ইতি ২৪ মে ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রূপময় ভারত

মধ্য প্রদেশে বস্তারের আদিবাসী মুরিয়াদের বিচিত্র বিবাহরীতি। বিবাহযোগ্য ছেলে ও মেয়েরা বিশেষভাবে নির্মিত একটা আস্তানায় (ঘোটুল) সমবেত হয়ে পতি পত্নী নির্বাচন করে নেয়। সঙ্গের ছবিগুলি ওদের বিবাহের আচার সম্পর্কিত।

(১) কুয়ার ধারে মুরিয়া দম্পতি; (২) বিবাহ উৎসবে ঘোটুলের সামনে নৃত্যরতা মুরিয়া মেয়ের দল; (৩) ঘোটুলের মধ্যে আগুনের সামনে মুরিয়া ছেলেমেয়ে; (৪) ঘোটুলের সামনে সমবেত নৃত্য; (৫) জীবনসঙ্গী ও সঙ্গিনী নির্বাচনের পর; (৬) মুরিয়া মেয়েদের হস্ত প্রক্ষালন; (৭) বিবাহ উৎসবের অঙ্গ হিসেবে সমবেত ব্যক্তিদের মহুয়া থেকে প্রস্তুত সুরা ফুলিয়া পান; (৮) মুরিয়া তরুণের কেশ প্রসাধন।

আলোকচিত্রশিল্পী

সুনীল জানা

৫
৬
৭
৮

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পানীয়ের খবর নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, তাঁদের একটা ধারণা যে জার্মানীর লোকে জল বা অন্যান্য পানীয়ের চেয়ে বেশী ব্যবহার করে বীয়ার। এটা কিন্তু ভুল ধারণা। ওদেশের লোক বেশী পান করে দুধ—জনপ্রতি বছরে ৩১ গ্যালন। বীয়ার ব্যবহৃত হয় বছরে জনপ্রতি ২২ গ্যালন। বর্তমানে কফি ও চায়ের ব্যবহার যুদ্ধপূর্ব কালের চেয়ে অনেকগুণ বেশী বৃদ্ধিলাভ করেছে।

ফলের রস, লিমনেড প্রভৃতি সুরাসার-বিহীন জাতীয় পানীয়ের ব্যবহার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রুচি পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গত যুদ্ধের আগে যে যায়গায় এই সব তৃষ্ণানিবারক পানীয় ব্যবহৃত হতো জনপ্রতি দু গ্যালন, বর্তমানে সেটা দাঁড়িয়েছে ছয় গ্যালন।

*

আর্থিক সাশ্রয়ের উপায় উদ্ভাবনে জার্মানীর ফেডারেল রেলওয়ের একটি ব্যবস্থা হাস্যকর হলেও বেশ সাফল্যলাভ করেছে। সুক্লেসুইগ-হোল্সটিন রেলপথে বাড ওল্ডেস্লো এবং রাৎসেবুর্গস স্টেশনের মাঝে কাম্ভডর্ফ গ্রামের ধারে লেবেল-ক্রসিংয়ে নিযুক্ত কর্মচারীকে একরকম "বেকারই" থাকতে হচ্ছিল। সারাদিনে মাত্র দুবার ট্রেন আসার সময় গেট বন্ধ করা এবং ট্রেন চলে গেলে খুলে দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজই ছিল না তার। জার্মানীতে একে লোকের অনটন, তার ওপর একজনকে এই কাজের জন্য সারাদিন নিযুক্ত রেখে দেওয়াটা রেল-কর্তৃপক্ষের কাছে শ্রমের অপচয় মনে হওয়ায় সেই কর্মচারীকে অন্য কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে।

লেবেল-ক্রসিংয়ের গেট খোলা ও বন্ধ করার কাজটা এখন ট্রেনের গার্ডের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। লেবেল-ক্রসিংয়ের কাছে এসে পৌঁছলেই ট্রেন থামিয়ে গার্ড গাড়ি থেকে নেমে গেট বন্ধ করে দেয় এবং ক্রসিং পার হয়ে গাড়িখানি অপর ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। গার্ড তখন গেট খুলে আবার গাড়িতে গিয়ে চড়ে। অন্য কিভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়, তা নিয়ে ভেবে দেখা হচ্ছে। তবে বর্তমান ব্যবস্থাটি গার্ডদের পছন্দ হয়েছে, কারণ গাড়িতে বসে থাকার একঘেয়েমি কাটাতে একবার নেমে একটা কাজ করতে তাদের ভালই লাগে।

*

শামুকের গতি হচ্ছে মিনিটে তিন ইঞ্চি, তবে অন্তত একটি শামুক দু মিনিটে আট ইঞ্চি অতিক্রম করার কৃতিত্ব দেখিয়েছে বলে জানা যায়। খুব কম শামুকই বেশীক্ষণ এই গতি রক্ষা করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের মেরীল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শামুককে ঘণ্টায় গড়পড়তা হিসেবে ২৫ ইঞ্চি চলতে দেখা যায়।

চলার সময় পথ যেভাবে প্রশস্ত করে নেয়, সেকথা ধরলে শামুকদের এই গতি নিন্দনীয় নয়। যে জমি অতিক্রম করতে চায় শামুকেরা, তার ওপরে লালা ছড়িয়ে যায়। এই আঠাল পথ শামুককে এমন-ভাবে রক্ষা করে যে, তার পক্ষে ক্ষুরের ধারালো ফলার ওপর দিয়ে চলাও সম্ভব হয়।

শামুকেরা তাদের এই মন্থরগতিকে পুষিয়ে নেয় অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়ে। ওর চেয়ে ২০০ গুণ বেশী ভারী খেলনার ওয়াগন অনায়াসেই ওর টেনে নিয়ে যেতে পারে, যেটা দশ পাউণ্ড ওজনের শিশুর একখানি মোটর গাড়ি টেনে তোলার সমান।

ডাঙার শামুকেরা সাধারণত ক্ষতিকারক হয় না, কিন্তু কতকগুলি সামুদ্রিক শামুক বিষাক্ত হয়। অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডের উপকূলে এক ধরনের শামুক পাওয়া যায় যাদের কামড় যন্ত্রণাদায়ক হয়, এমনকি মৃত্যুও ঘটায়।

*

স্পেনের এক কৃষক, ভ্যালেণ্টিন মেডিনা পোন্ডেস, দাবি করে যে জীবনে সে কোনদিন ঘুমোয়নি এবং সে যে সত্যি কথা বলছে না কেউ সারাক্ষণ জেগে থেকে তা প্রমাণ করতে পারেনি।

সারা স্পেনের চিকিৎসকরা মেডিনাকে পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং তারা সকলেই এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সে সম্পূর্ণ অনিদ্রারোগগ্রস্ত হতে পারে, কিন্তু তারা নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারেন না।

সম্প্রতি দুজন রিপোর্টার এই ক্ষুদ্রকায় কিন্তু সহনশক্তিশীল কৃষকটির ওপর একটানা ৪৮ ঘণ্টা প্রহরা দেয়। মেডিনা সারাক্ষণ পত্রিকা পড়ে এবং গ্যালন কতক সুরা পান করে সময় কাটিয়ে দেয় কিন্তু একবারও চোখ বোজেনি বা তার কোন লক্ষণও প্রকাশ করেনি।

রিপোর্টার দুজন পালা করে জেগে থাকে এবং দুদিন শেষ হতে একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে যায়।

মেডিনা বলে যে, তার এই অবস্থার জন্য কোন রকম অসুবিধা সে বোধ করে না। বলেঃ "ঘুমলে তো আর পাঁচজনের মতোই হতে হয়। এই দিক থেকে আমি ভিন্ন ধরনের।"

বস্টনের মিউজিয়াম অফ ফাইন আর্টসে রক্ষিত খৃস্টপূর্ব ৫৫০ সালের 'ইট্রাসকান চিতা'—ইতিপূর্বে 'ইট্রাসকান' সিংহের মূর্তি পাওয়া গেলেও লোনা পাথরের তৈরী চিতার মূর্তি এই প্রথম পাওয়া গিয়েছে

অপেক্ষায়

দেবেশ রায়

বাড়িতে ঢুকবার দরজার একেবারে মুখোমুখি একটা রাস্তার আলো। বারান্দার বাঁ পাশের খোলা জায়গায় একটা শেফালি গাছ—সেটাকে দেখলে শেফালি গাছ বলে মনেই হয় না।

"জানো, যেদিন প্রথম জানলাম মন্দার মানে মাদার ফুল কী দুঃখ যে পেয়েছিলাম না—"

"কেন? মাদার ফুল দেখতে খারাপ?"

"খারাপ তো নয়ই, কিন্তু সেটা মাদারই থাকুক, মন্দার হতে গেল কেন?"

"ও তো প্রথম থেকেই মন্দার, তুমি ওর ভালো নাম না জানলে কি ও দায়ী হবে?"

"আচ্ছা বল তো, নথ্‌নীর নাম এখন যদি হয় নবনীমোহন, তুমি রাগ করবে না?"

"কী হেতু?"

"বাঃ, নথ্‌নী বেশ আমাদের চেনাজানা মানুষটি, এক কাপ চা চাইলে আড়াই ঘণ্টা পরে দেবে, আজকের খবরের কাগজটা এনে দিতে বললে সাতদিনের-টা এনে জড়ো করবে—ইনি নথ্‌নী। বেশ। কিন্তু নবনী-মোহন হতে গেলেই তো তখন, মানে নবনী-বাবুকে তো আমাদের চেনবার কথা নয় অথচ নথ্‌নীকে তো আমরা চিনি—"

"জাতি পুষ্পের নাম শুনেছ?"

"শুনিনি, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দু' চারবার দেখে থাকবো।"

"চেনো?"

"ওগুলো চেনবার নয়, ওগুলো নাম।"

"চামেলি ফুলকেই নাকি জাতি-পুষ্প বলে।"

"বাঃ!"

"সত্যি?"

"মাইরি?"

সে আমার ডান দিকে। শেফালি গাছটা আমার বাঁদিকে। বাঁ দিকে মুখ ফেরাই। সে এখন উৎসাহে আরাম কেদারাটায় সোজা হয়ে বসেছে। আমার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আমি তার দিকে তাকাতে চাই না। শেফালি গাছের এমন একটা ডাল আছে যেটার দিকে চাইলে, রাস্তার আলোটাকে আর দেখা যায় না।

"এই সত্যি বলছো, চামেলিকেই জাতি-পুষ্প বলে?"

"পড়েছিলাম যেন কোথায়"—আমি সম্পূর্ণ অনামনস্কের মতো জবাব দিলাম।

আমার অন্যমনস্কতা ও গোচরে আনলো না। "কোথায় পড়েছ?"

"মনে নেই ছাই। মন্দার আর মাদার এক হলেই তোমার দুঃখ কিসের, জাতি আর চামেলি এক হলেই বা সুখ কিসের?" আমি স্পষ্টত বিরক্তি প্রকাশ করলাম।

"আমি চামেলি ফুল দেখি-ই নি—হা-হা-হা"—পারলে ও যাত্রার দুর্যোধনের মতোই হাসতো, কিন্তু এতো দীর্ঘদিনের অসুখে অত প্রবল হাসবার মতো ওর শক্তি নেই। "আচ্ছা" ও হাসি থামালো, আমি ঘাড় ঘোরালাম, "চামেলি ফুল দেখতে কী রকম?"

চামেলি ফুল দেখেনি বলেই কি ও আমার মুখে চামেলির চেহারা শুনে তাকে নিকট করতে চায়? ও কি চায়? সব চিনতে, জানতে? না, না, তাহলে ও দেখতে চাইত,—শুনতে চাইত না।

"আমিও চামেলি ফুল দেখিনি—"

বাহারে হৃদয়, তোবা, তোবা, কেন মিথ্যে করে বললাম না, দেখেছি; কেন মিথ্যে করে রং, গন্ধ, আকার গুনলাম না? আমি কি চাই ওকে সব চিনিয়ে দিতে, জানিয়ে দিতে? হ্যাঁ। কেন? ও যে স্বপ্ন দেখবে এ আমার সহ্য হয় না। অথচ হায়, গত তিন বছর ধরে রোজ সন্ধ্যায় আমি ওকে ওকে সংগ দি। আমি সহৃদয়, বাহারে হৃদয়?

"তুমিও দেখোনি—হি হি হি"—শরীর সুস্থ থাকলে যাত্রার শকুনির মতোই ও হাসতো—এখন হাসিটা শোনাল যেন সীতাকে বিড়ি খেতে দেখে কোনো কিশোর। মানে, তবে কি ও আমার প্রতিহিংসা দেখতে পেয়েছে? মানে, তবে কি ও বুঝতে পেরেছে আমি সহ্য করতে পারি না ও স্বপ্ন দেখবে। আহা রে হৃদয়, কোথা রে হৃদয়, না, না, আমি তোমার বন্ধু—

"না, আমিও দেখিনি" অতঃপর কেদারার ওপর সোজা হয়ে বসতে বসতে হেসে, "চামেলি কিন্তু বর্ষার ফুল!"

"হুঁ, তোমার মামা বলেছেন"—ও ওর কেদারায় হেলান দিল। আমি ওর দিকে আরো ঝুঁকে বললাম, "মানে? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"

"তোমার কানে-কানে?"—আরাম কেদারার ভেতর থেকে ও বললো—যেন ঈষৎ

দূরবর্তী। ওর গলার স্বরের সেই দূর-বর্তিতা পেরিয়ে যাবার জন্য আমি আরো একটু উঁচু গলায় বললাম—"মানে? পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য বিলাসে, ভাষার অতীত তীরে, কাঙাল নয়ন—মনে নেই?"

"সাজাহান?" ও কী একটু হাসলো। গত তিন বৎসরে ওর গালের মাংস একটু-একটু করে খসেছে, অথচ গত তিন বৎসর ধরে যৌবনও তো এসেছে! আমার ছায়া কিংবা আরাম-কেদারার গর্তটা ওকে ঢেকে রেখেছে। অথচ 'সাজাহান' শব্দটা উচ্চারণ করার সময় ও এমন একটু অন্যমনস্ক হাসি মেশালো যে ওর মুখমণ্ডল দেখবার জন্য আমি কিঞ্চিৎ ব্যগ্র হলাম—"যে লাইনটি বললে, তাতে কোথায় বর্ষার কথা আছে?"—যেন আগে থেকেই জানে আমি কি বলবো, আর সে কারণেই নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বরে জবাব দিয়ে যাচ্ছে। সেই শীতলতা আমি গোচরে আনলাম না। বরঞ্চ সেই শীতল কণ্ঠস্বর যেন খানিকটা আহ্বান মেশানো।

"তা হোক, কিন্তু তোমার ইচ্ছে করছে না চামেলি বর্ষায় ফুল হোক"—ইচ্ছা, ইচ্ছা,—ইচ্ছা—বাক্যটি বলবার পর শব্দটি আমি বারকয়েক আবৃত্তি করলাম।

"ইচ্ছা, ইচ্ছা।—ইচ্ছা।" বাক্য বলবার আগে শব্দটি ও বারকয়েক আবৃত্তি করলো—"ইচ্ছে তো করছে।—" ও থেমে গেল, অথচ থেমে যাবার কোনো ইঙ্গিত ওর কণ্ঠস্বরে ছিল না বলে সকরুণ ইচ্ছার মতো শোনালো। গত তিন বৎসর ধরে একটু-একটু করে ওর দেহ থেকে যৌবন, এমন কি জীবনও সরে যাচ্ছে—অথচ যৌবন তো তিন বৎসর ধরেই ওর কাছে এসেছে। এসেছে।

"তা বর্ষার ফুল হলে কিন্তু মন্দ হতো না"—যেন এতোক্ষণ ধরে ও চমেলি ফুলটাকে বিভিন্ন ঋতুতে দেখে এলো। আমি চোখ বুজে আমার কেদারার গর্তে ঢুকে গেলাম—"সত্যি, মন্দ হতো না!"—বৃষ্টি, চামেলি, গন্ধ—অন্ধকার—বৃষ্টি—'বাদলের চামেলি যে কালো আঁখি জলে ভিজে—' মনে পড়ল—কিন্তু আমার বলতে ইচ্ছে করলো না, তার আগেই তো ও ডুবে গিয়েছে বাদলের ঘন অন্ধকারে, চামেলির সৌরভে। ও ডুবে গিয়েছে, আর আমি? আমি? হ্যাঁ আমিও, আমিও, অথচ আমার তো স্বপ্ন দেখার কথা ছিল না। কে আমাকে স্বপ্ন দেখায়? স্বপ্নে টানে? ও। ও। অথচ আমিই তো প্রতি সন্ধ্যায় ওর কাছে আসি—ওকে সঙ্গ দেবার জন্য। অথচ আমার সেই সচেতন সহৃদয়তা কোথায়? ওরে আমার হৃদয় আমার, তোরে আজি স্বপ্ন স্রোতে কে ভাসালে? চোখের চামড়া এতো পাতলা কেন, শেফালির সেই ডালটা কোথায়। বর্ষা নেমেছে, বর্ষা, অন্ধকার, আর এক বিদেহী সত্তার মতো গন্ধ সেই বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকারে; চামেলির, অথচ চামেলি ফুল আমি চিনি না, ও চেনে না।

আমাদের একটা ক্লাব আছে। অফিসের পর সবাই বাড়ি ফেরে। বাড়ি থেকে আবার সেই ক্লাবে যায়। সেখানে রাত দশটা সাড়ে দশটা পর্যন্ত তাস-ক্যারম-দাবা ইত্যাদি খেলে আবার বাড়ি ফেরে। আমি বাড়ি থেকে ওর কাছে আসি। সেখানে রাত দশটা সাড়ে দশটা অবধি থেকে বাড়ি ফিরি।

ও অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। তিন বছর ধরে ওর শরীর ধ্বংস হচ্ছে অথচ যৌবন এবং জীবন নিয়ত ওকে ভাসিয়ে নিতে চাইছে।

"জানো, আমি তোমাদের বাড়িতে তো গত প্রায় পাঁচ বৎসর যাই না, অথচ স্পষ্ট বলে দিতে পারবো কোথায় কি আছে। সেই রান্নাঘরের পেছনে একটা জলপাই গাছ তখন ছিল দেয়াল উঁচু, এখন নিশ্চয়ই অনেক বড় হয়েছে"—রান্নাঘরের পাশে অনেকগুলো গাছই তো আছে, কিন্তু কাঁঠাল গাছ বাদে আর কোনো গাছই আমি মনে আনতে পারি না।

"আর তোমাদের শোবার ঘরের বারান্দায় বসলে ও পাশের বাড়ির সজনে গাছটা দেখা যেত। সজনে গাছে যখন ফুল ফোটে, তখনই সুন্দর, ডাঁটা হলেই বিশ্রী লাগে দেখতে"—একটু হাসির আভাস মিশলো। স্মৃতি, স্মৃতি। হয় স্বপ্ন, নতুবা স্মৃতি। হয় স্বপ্ন, নতুবা স্মৃতি। "তোমাদের টিনের দরজার পাশে আমগাছটায় আম হয়েছিল—"

"আমগাছটা কেটে ফেলা হয়েছে।"

"কেটে ফেলা হয়েছে? কেন? কেন?"

—ও চেঁচিয়ে উঠলো। অসুখ হলে কারো গলার স্বর এতো কর্কশ হয়? আর আমি, আমি কেন ওকে স্মৃতি থেকে জাগাতে গেলাম। অথচ আমি প্রতি সন্ধ্যায় ওর কাছে আসি ওকে সঙ্গ দেবার জন্য। হায়রে, আমি নাকি একজন সহৃদয় যুবা।

"আমগাছটার একটা ডাল চালের ওপর উঠে গিয়েছিল, টিনটা বেঁকে যাচ্ছিল"—আমি প্রায় জোর করে নিজেকে থামালাম। আমার গলার নিষ্করুণ ধার দেখে আমি নিজেই স্তব্ধ হয়ে গেলাম। কেন, কেন আমি বললাম না—হ্যাঁ, এবারও আমগাছটা মঞ্জুরিত হয়ে উঠেছিল, আর তারপর ধীরে ধীরে সবুজ ফলে ছেয়ে গিয়েছিল।—ও চুপ করে গেছে। ও কি এখন ধীরে-ধীরে আমগাছহীন আমাদের বাড়িটার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে। ও কি এখন ধীরে-ধীরে ওর স্মৃতিকে বদলাচ্ছে। তা হলে ও স্মৃতিকে বদলায়। তা হলে স্মৃতি বদলায়। গত তিন বৎসর পূর্বের পুঞ্জিত যাবতীয় স্মৃতি ধীরে-ধীরে বদলে যাচ্ছে। গত তিন বৎসর ধরে জীবন পরিবর্তিত হচ্ছে।

"আচ্ছা, তুমি না বলেছিলে আমাকে তারা চিনিয়ে দেবে?"—খুব একটা শোক যেন ও সামলে উঠতে চাইল, অথচ ওর গলায় মোটেই সেই আন্তরিকতা এলো না। আর আন্তরিকতা এলো না বলেই যেন আমি উৎসাহবোধ করলাম—আবার ওকে স্বপ্নে ফিরিয়ে নিতে। আমি কি চাই। আমাকে রোজ চব্বিশ ঘণ্টা বাস্তবের সম্মুখীন হতে হচ্ছে অথচ ও স্মৃতি অথবা স্বপ্নের মধ্যে ডুবে থাকবে—এ আমার সহ্য হয় না? কিন্তু নিজেকে আমি সহৃদয় বলে জানি। তাই আবার ওকে স্বপ্ন দেখাতে চাই?

"আমার সঙ্গে তারাদের খুব চেনাজানা আছে ভাবো নাকি?"

"জানো, তুমি সপ্তর্ষি চিনিয়ে দেবার পর প্রতিদিন সেটাকে আমি দেখি, দেখো, ওর চতুর্থ তারাটা কেমন নিবু নিবু।"

"একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে এলেই পারো"

"নামগুলো মনে আছে তোমার? অগস্ত্য, বশিষ্ঠ, অত্রি, পুলস্ত—আর?

"তুমি আমি হবো আর কি। আচ্ছা বলতো, সাত ঋষি মিলে একটা প্রশ্ন-চিহ্ন তৈরি করার কোনো অর্থ হয়?"

কতো যান্ত্রিকভাবে রসিকতা করার চেষ্টা করছি। কেটে ফেলা আমগাছটা ওকে আজ আর স্বস্তি দেবে না। স্মৃতিও বদলায়, স্মৃতিও।

স্মৃতিও বদলায়। স্বপ্নও বদলায়। অথচ পরিবর্তনশীল জীবনের পরিবর্তনের গতি বুঝতে না পেরে আত্মরক্ষার নির্মম তাগিদে স্থিতিশীল বলে খ্যাতনামা—স্মৃতি, ও, অপরিবর্তনীয় বলে প্রতিষ্ঠিত স্বপ্ন—এই দুইয়ের হাতে নিজেকে সঁপে দেয়া ছাড়া তিন বছরের রুগীর আর কোনো উপায় ছিল না। ভাড়াটে বাসা, অস্থায়ী চাকরি, এবং নিত্য নৈমিত্তিক আরো শত ঝামেলায় মাতালের মতো বেতাল হয়ে জনৈক স্বপ্নদ্রষ্টা ও স্মৃতিচারীর সহগামী হয়ে লব্ধ কিছু স্বপ্ন আর কিছু স্মৃতি আমার পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল।

কিন্তু প্রতিদিন আমার সর্বশেষ অনুভূতি হিসেবে অবশিষ্ট থাকে অতি নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রকারীর অভিজ্ঞতা, স্বপ্নকে হত্যা করার উত্তেজনা, আর এর সঙ্গে মিশ্রিত এক অপরাধবোধের ফলে স্ফীত আত্ম-

সন্তুষ্টি। হারে পুরুষ! হারে নারী! হারে প্রেম!
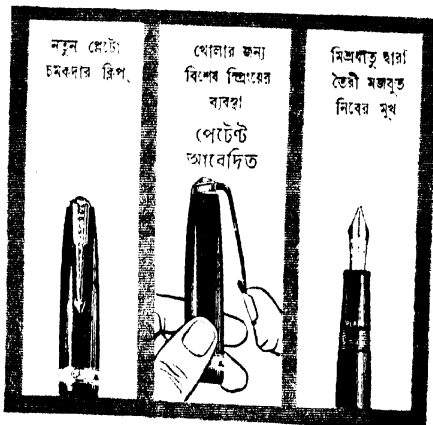
সেই সন্ধ্যাবেলাগুলোতে, দুজন মাত্র ব্যক্তির উপস্থিতিতে ও অংশ গ্রহণে একটা অত্যন্ত গোপন, বিষাক্ত সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হতো। জীবনে কোনো শক্ত মাটি না পেয়ে, অন্য কোনো জগতে—যা স্বপ্নলোক বা স্মৃতিলোক বলে প্রচারিত—গিয়ে আমরা পরস্পরকে বোধহয় পরস্পরেরও অজ্ঞাতসারে মেরে ফেলতে চাইতাম। সেই পৌরাণিক আবহাওয়ায় নিঃশব্দে যুদ্ধরত দুইজনের মাঝখানে কুব্জ-ন্যুব্জ জনৈক মর্তবাসীর প্রবেশ—যার সারা শরীরে ভারবহনের খর্বতা,—আর সেই মর্তবাসীকে দেখেই স্বপ্ন বা স্মৃতি লোকবাসিনী নায়িকার মনে এক অতি তীব্র জিঘাংসা উপজিল।

"বাবা আমার ওষুধ এনেছ?"—তার এ প্রশ্নের উত্তরে পলায়নের এক তীব্র ভঙ্গিকে চরম আঘাত দেবার জন্য সে হিসহিসিয়ে ওঠে, "আজো আনোনি। তা হলে আফিম কিনে এনে দাও, দড়ি কিনে এনে দাও—আমি মরি, তুমিও বাঁচো। গত দু বছর ধরে কোনো চিকিৎসাই হচ্ছে না, ওষুধের প্রেসকৃপসন টেবিলে পড়ে থাকে।" গলার স্বর যেন অজ্ঞান হওয়ার পূর্বে মানুষের দিক-জ্ঞানশূন্য চেতনার আবর্ত।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই মর, তুইও বাঁচিস, আমিও বাঁচি। তিন বছর ধরে তোকে পুষতে-পুষতে আমার সর্বস্ব গেছে। কোত্থেকে তুই এ রোগ নিয়ে এলি, এখন আমাকে তার জন্য সুদ্দু কম্পাউন্ডারের হাতে মার খেতে হয়।"

রূপকথার তেমনি এক বাতাস,—যা সময়কে পিছিয়ে দেয়, এগিয়ে নেয়,—রইলো—মৃত্যুর অভিশাপ মাথায় নিয়ে গা ঝাড়া দিল এক বেয়াড়া জীবন? হারে জীবন! হারে প্রেম!

"আজ উঠি, তোমার খাওয়া-দাওয়ার সময় হলো।"

"হ্যাঁ, তোমারও হলো—" পা মাটিতে নামাতে-নামাতে বললো।

"ও কি তুমি উঠছো কেন?"

"চলো একটু এগিয়ে দিয়ে আসি—"

"না না"

"আরে ঐ নিম গাছটা পর্যন্তই"—নিমগাছটা রাস্তার ওপরে।

তারপর আমরা একটা শ্মশানে এসে পৌঁছলাম। ওদের বাড়ির সন্নিহিত সেই নিচু জলো জমিটার ওদিকে কৃষ্ণপক্ষের মুমূর্ষু একটা চাঁদ অস্ত যাচ্ছিল। এতো প্রকাণ্ড সে চাঁদ—অথচ অসম্পূর্ণ এবং ক্ষতযুক্ত, ও পুরনো হতে থাকা রক্তের মতো পাঁশুটে—যে আমার মনে হলো ওটা এমন কোনো বস্তু নয় যা সকলের দৃষ্টিগোচর, যার সঙ্গে আমার কোনো ব্যক্তিগত যোগাযোগ নেই। কিংবা ঐ জলো মাঠটা থেকে আলেয়ার মতো কোনো আলো জ্বলে স্থির হয়ে আছে। অথবা এখনি ঐ চাঁদটা প্রজ্জ্বলন্ত অথচ মৃত্যু ভয়ে স্থির দুই চোখ নিয়ে কোনো ক্ষুধার্ত বুড়োর মতো আমার দিকে দুই কঙ্কালসার হাত প্রসারিত করবে। আমি সভয়ে পাশে তাকালাম—আর চাঁদের দিকে এক চোখ আর আমার দিকে এক চোখ নিয়ে কঙ্কালের মতো মুখে ও হাসছে—"চাঁদটা মারা যাচ্ছে, না?"—আমি ওর হাসি আর জ্বলন্ত চোখ সহ্য করতে না পেরে চাঁদের দিকে তাকালাম—তেল ফুরিয়ে যাওয়া লণ্ঠনের মতো পোড়ামাটি রং-এর চাঁদটা আরো ক্ষতযুক্ত হয়ে টুপ করে ঐ মাঠটার ওপর খসে পড়বে—অথচ কেউ জানে না, কেউ দেখছে না, ফলে সন্ধ্যাবেলা যখন আর চাঁদ উঠবে না তখন খোঁজ পড়বে। তখন চাঁদকে পাওয়া যাবে না। সেই শ্মশানে যেন আমরা অপেক্ষা করে থাকলাম—কখন ক্ষয়ে-ক্ষয়ে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে চাঁদের নাভিকুণ্ডলী একটা ছোট বিন্দুর আকার নেয় ও তারপর ঝরে পড়ে। "চাঁদটা মারা যাচ্ছে—।" চাঁদ আমাদের আমগাছটা, বর্ষারাতের চামেলিফুল, সপ্তর্ষি তারা—সব, সব, সব মারা যাচ্ছে। প্রকৃতি গো, জননী গো—তোমার শ্মশানে আমরা এবার গুরুদেশা নেবো। স্বপ্নও বদলায়, স্মৃতিও বদলায়। আমি একটি সহৃদয় যুবা, ওর তিন বছরের ক্ষয়ে-যাওয়া শরীরের পাশে এসে বসি। ও স্বপ্ন আর স্মৃতি দেখে! অথচ স্বপ্নও বদলায়, স্মৃতিও বদলায়। আর জীবন। তাই অবশেষে আমরা এসে মহাশ্মশানে পৌঁছই যেখানে সকল মানুষ কর্তৃক বিস্মৃত চাঁদ, আমাদের দুজনের চোখের সম্মুখে, একই মড়কে বৌ-মেয়ে-ছেলে-নাতি-মরা গাঁয়ের পাগলা বুড়োর মতো—এক অতি নির্জন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

অথচ জীবন আর যৌবন আমাদের শরীর ছুঁয়ে গেছে—!

"আমার পায়ের তলায় একটু শক্ত মাটি পেলাম না, অথচ চাঁদ মারা যাচ্ছে। একটু শক্ত মাটি। একটু। অথচ শক্ত।"

"তুমিও পাও নি?" সে এসে আমার হাত ধরলো, আমার ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো, আর মৃত্যুমুখী চাঁদের শেষ জ্যোতিতে ঐ জলো মাঠটার দু' একটা জায়গা চকচক করে উঠলো—সেগুলো ঘাস না জল বোঝা গেল না।

"না না আমিও পাইনি, আমিও পাইনি, কী করে পাবো, আমিও তো তোমার মতো স্বপ্ন দেখি অথচ স্মৃতিতে ডুবি। বাঁচার মতো একটু মাটি পেলাম না।"

"পাওনি?",

"না—"

"না?"

"না"—

"তবে আমিও পেতাম না, সুস্থ থাকলেও আমি পেতাম না? সুস্থ থাকলেও তুমিআমি একটু শক্ত মাটি পেতাম না?"

"না"
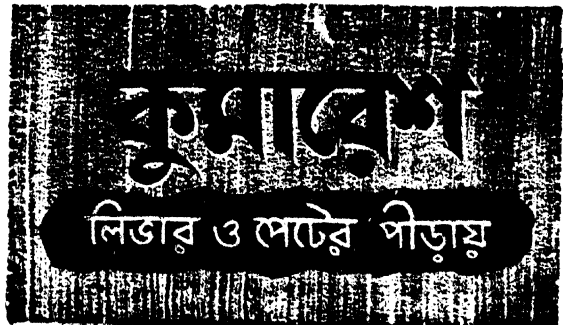
"তবে বাঁচবো কেন? বাঁচা কেন?"
আ-হা-হা-হা-হা-রে
"তবে বাঁচবো কেন? বাঁচা কেন?"

ও আমার দু-কাঁধের ওপর দু' হাতের দশটা আঙুল সাঁড়াশির মতো চেপে ধরে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। আর রাত্রির পাখির পাখার শব্দে সারা আকাশের হাহাকারের মতো এক হাহাকারের ওপর আমরা আকাশ ফাটানো হাহাকার করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলাম। সেই পোড়ো অনুর্বর জলো জমির অপর পারে চাঁদে আরো ক্ষয় ধরেছে, যেন এক বিশেষ জাতীয় জন্তুর শেষ নিদর্শন মুখব্যাদান করে মারা যাচ্ছে। আর মৃত্যুমুখী চাঁদের গা-চোঁয়ানো ক্ষীন আলোতে আমরা পরস্পর জড়াজড়ি করে ভবিষ্যৎ নামক কোনো এক চিত্রকরের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—আহত চাঁদের মৃত্যু, নতুন চাঁদের জন্ম ও 'বাঁচবো কেন বাঁচা কেন' স্বপ্ন ও স্মৃতি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত জনৈক মানুষের উত্থাপিত এই প্রশ্নের জবাবের অপেক্ষায়।

বিমল মিত্র

(৭৪)
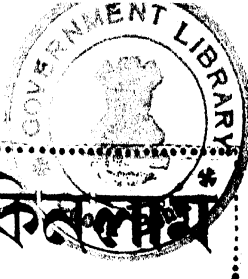
দীপঙ্কর জীবনে বহুবার নিজের আত্মার মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত এমন করে এমন অকরুণভাবে কখনও মুখোমুখি হতে হয়নি। তখন যুদ্ধের এক কঠোর পরিচ্ছেদ চলেছে পৃথিবীতে। এক দিকে মানুষের দম্ভ আর এক দিকে নিরীহ অস্তিত্বের প্রশ্ন। দম্ভে দম্ভে সমস্ত পৃথিবীর স্থল জল অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত। সাধারণ নিরীহ অস্তিত্ব-সন্ধানী মানুষ সে-দম্ভের তলায় একেবারে নিষ্পেষিত হয়ে আর্তনাদ করছে। আকাশে শূন্যচারী হিংসা, বাতাসে বারুদের গন্ধ। মানুষ কেবল মানুষকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে পেরু থেকে ফিলিপাইনস পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডে। পৃথিবী দুভাগ হয়ে গেছে দুদলের ক্ষোভের আর অত্যাচারের ভয়ে। দীপঙ্কর একলা তার কতটুকু হিসেব করতে পারে? এত ক্ষমতা সে কোথায় পাবে? দুটি মানুষকে আজ পর্যন্ত মিলিয়ে দিতে পারলো না সে একটি সূক্ষ্ম গ্রন্থি দিয়ে, একটি মানুষকেও সান্ত্বনার শান্তি দিয়ে সজীব করে তুলতে পারলো না। তাহলে সে কতটুকু ক্ষমতার অধিকারী! অন্যের যন্ত্রণায় কাতর হওয়াটাই কি বড় কথা! আর অন্যের ক্ষতি? ক্ষতিই বা সে কেমন করে করবে? কিরণ তো দূরের কথা, কারোর ক্ষতিও তো জ্ঞানত করতে পারবে না সে। ক্ষতি করতেও তো ক্ষমতার দরকার হয়!

কিন্তু সত্য যে আরো বড়। জীবনের চেয়েও বড়, মৃত্যুর চেয়েও বড়। পাপ, পুণ্য, ধর্ম, ইহলোক, পরলোক সব কিছুর চেয়েও যে সত্য বড়। সেই সত্যকেই সে পরিত্যাগ করবে!

দীপঙ্কর সোজাসুজি চাইলে দুজনের মুখের দিকে। সত্যিই যেন দুটো বুলডগ্। রক্তপান করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। যেকোনও প্রকারে রক্ত চাই। হয় কিরণের, না-হয় দীপঙ্করের, না-হয় আর কারো। কোনও ইণ্ডিয়ানকে আর বিশ্বাস নেই। সব ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের লোক। আর কংগ্রেসের লোক মানেই প্রো-হিটলার। ইণ্ডিয়ানরা সবাই চায় ব্রিটিশ এ-যুদ্ধে হেরে যাক, ইণ্ডিয়ানরা সবাই চায় হিটলার এ-যুদ্ধে জিতুক। বুলডগরা চিনে নিয়েছে এখন ইণ্ডিয়ানদের। এরা সবাই এক-একটা আস্ত সুভাষ বোস।

হঠাৎ কিরণের মুখটা আবার ভেসে উঠলো চোখের সামনে। কিরণ আবার বলতে লাগলো—বল্ দীপু, তুই সত্যি কথাই বল—তুই সত্যবাদী, তুই ভালো ছেলে, তুই সংসারী মানুষ, আমি মরবো তাতে কারু কোনও ক্ষতি হবে না, তুই সত্যি কথা বল্। তোকে বাঁচতে হবে, তোকে আরো টাকা উপায় করতে হবে, তোকে বিয়ে করে ছেলে-মেয়ের বাবা হতে হবে, তুই এত সহ্য করতে পারবি না—বল্—

সেদিন মনে আছে সেই সার্জেণ্ট দুটোর সামনে এক মুহূর্ত দ্বিধা করতে গিয়ে দীপঙ্কর সত্যি-সত্যিই কিরণকে বিপদে ফেলেছিল।

তারা আবার জিজ্ঞেস করলে—ইয়েস অর নো?

দীপঙ্কর সামনের দিকে মুখ তুললে। বললে—ইয়েস!

—কবে এসেছিল?

দীপঙ্কর তারিখটাও বললে। যেমন অবস্থায়, যে-সময়ে এসেছিল, তাও বললে।

বুলডগ্ দুজন নিমেষের মধ্যে কী যেন পরামর্শ করলে। কী যেন দুর্বোধ্য ইঙ্গিতে আলোচনাও করলে। তারপর বললে—অলরাইট্,—

তাদের ভঙ্গিতে মনে হলো, তারা যেন রক্তের গন্ধে আরো উন্মত্ত হয়ে উঠলো। হিটলারকে সামনে না পাক, কিরণকে পেলেও তাদের কাজ চলবে। মটর-বাইক হাঁকিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে তারা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

লক্ষ্মীদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাতের ঘড়িটা দেখে নিয়েছিল দীপঙ্কর। লেভেল-

ক্রসিংয়ের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। গুড্স্-ট্রেন আসবে। ভূষণকেও দেখা গিয়েছিল। সেই কালো বেঁটে চেহারা। আরো বুড়ো হয়েছে এখন। অনেক দিনকার লোক। চিনতে পারলে আবার সামনে আসতো। সামনে এসে সেলাম করতো। অনেক কথা বলতো। রবিনসন সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করতো।

সেই সব পুরোন দিন। যখন দীপঙ্কর ডি-টি-আই ছিল। যখন পৃথিবী আরো সহজ ছিল, যখন মানুষ আরো সরল ছিল। গাড়িটা গড়গড় করে গড়িয়ে চলেছে। আর দুদিন। দুদিন পরেই দীপঙ্কর কলকাতা ছেড়ে চলে যাবে। আর দুদিন পরে এই পৃথিবী এই রকমই থাকবে, শুধু দীপঙ্করই আর থাকবে না এখানে। নতুন করে আবার জীবন শুরু করতে হবে নতুন এক মফঃস্বলে। ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের সঙ্গেও আর কোনও সম্বন্ধ থাকবে না তার। বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের সঙ্গেও আর কোনও সম্পর্ক থাকবে না। লক্ষ্মীদির সঙ্গেও দেখা করা হলো না। না হোক। দেখা করার আর কোনও প্রয়োজনও নেই। দাতারবাবু ভাল হয়ে উঠেছে মানস লেখাপড়া শিখেছে লক্ষ্মীদি যা চেয়েছিল, তা পেয়েছে। এখন আর দীপঙ্করকে কিসের প্রয়োজন? এক সতী? সনাতন-বাবুর সঙ্গে সতীর একটা বোঝাপড়া করে দিতে পারলেই দীপঙ্করের বাকি কাজটা শেষ হয়ে যাবে। আর ক্ষীরোদা!

তারপর থেকে আর কোনও কথা বলবারই সুযোগ হয়নি দীপঙ্করের। নিঃসহায় নিঃসম্বল মেয়েটিকে মা হয়ত পুত্রবধূই করতে চেয়েছিল। তাতে হয়ত মা'র প্রয়োজন মিটতো। কিন্তু তাই বা দীপঙ্কর কেমন করে সার্থক করে।

সংসারে তখনও ক্ষীরোদা সেই একভাবে নিঃশব্দে সব কাজ করে যায়। সেই আগেকার মত রান্না করে। সেই আগেকার মত ভাতের থালা এগিয়ে দিয়ে যায় সামনে। তারপর নিঃশব্দে সরে যায় সামনে থেকে। কোথায় কেমন করে দিন কাটে ক্ষীরোদার, তার খবর কেউ রাখা প্রয়োজন মনে করে না। ক্ষীরোদা যেন নিজেকে আড়াল করে রাখতেই ভালবাসে। সকলের দৃষ্টির আড়ালে থেকে নিজের কাছ থেকেও যেন নিজের অস্তিত্ব-টুকু মুছে ফেলতে চায়। দীপঙ্কর হাজার চেষ্টা করেও ক্ষীরোদার এতটুকু দুঃখ ঘোচাবার পথ খুঁজে পায় না। তবু আগে সন্তোষকাকা ছিল। বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেও দিনটা কাটতো তার। সন্তোষকাকা নিজে বাক্যবাগীশ লোক। নিজে বাক্য-বাগীশ, বাক্যবাগীশ লোককেই তাই ভালো লাগতো তার। কিন্তু ক্ষীরোদা হয়েছে ঠিক তার উল্টো। ক্ষীরোদা জানে না যে এ-সংসারে জোর করে আদায় না-করে নিলে

কিছুই পাওয়া যায় না। তারপর যখন দীপংকর অফিসে চলে যায়, তখন খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিজের অন্ধকার ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে আত্মগোপন করে। কতদিন দীপংকর খুঁজেছে ক্ষীরোদাকে। দুটো কথা বলতে চেয়েছে। অন্তত দুটো সান্ত্বনার বাঁধা বুলি। কিংবা ভবিষ্যতের কিছু পরামর্শ। কিন্তু সারা বাড়ির চারিদিক চেয়েও কোথাও কোনও চিহ্ন পায়নি ক্ষীরোদার।

এখন বদলির খবরটার পরই বেশি করে মনে পড়েছে ক্ষীরোদার কথাটা। ক্ষীরোদা কোথায় যাবে?

বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিয়ে একলা অপিস করতেন। তিনি খবর শুনে একদিন এলেন। বললেন—কী হলো, আপনার বদলির?

দীপংকর বললে—আমি তো চলে যাচ্ছি, এ-বাড়ি আপনার আমি ছেড়ে দেব—

বাড়িওয়ালা দুঃখ করতে লাগলেন। বললেন—কী আর বলবো আপনাকে, আমারই কপাল—

তারপর একটু থেমে বললেন—আপনি কি সপরিবারে চলে যাচ্ছেন?

দীপংকর বললে—তা এখানে আর কীজন্যেই বা থাকবো বলুন, সেখানে তো বড় কোয়ার্টার পাবো—

সপরিবারে কথাটার অর্থ যে কী, তা দীপংকর বুঝতে পেরেছিল। ক্ষীরোদাও যাবে। যদি সেখানে যেতে আপত্তি না থাকে তো যাবে নিশ্চয়ই। কোথাও তো আর যাবার জায়গা নেই তার। কেউ যে নেই তার পৃথিবীতে। একবার জানতে ইচ্ছে হয়েছিল দীপংকরের, সত্যিই কি কেউ নেই ক্ষীরোদার? নিকট না হোক, দূর-সম্পর্কের কেউ! হয়ত কোনও ভাই বা দিদি বা মাসী বা পিসী। কেউ-না-কেউ তো থাকে মানুষের? এতদিন এখানে আছে, কই, কেউ তো খোঁজ নিতেও আসেনি কখনও। এত বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল, তা-ও তো কোনও চিঠি এল না সমবেদনা জানিয়ে।

কাশীকেও একদিন খবর নিতে বলেছিল দীপংকর। কাশী এসে বলেছিল—না দাদাবাবু, দিদিমণির কেউ নেই—

—কোনও দূরসম্পর্কের আত্মীয়?

কাশী বলেছিল—তা-ও জিজ্ঞেস করেছি। দিদিমণি বললে—কেউ নেই—

—কিন্তু বিয়ে হলে তো নিজের লোকজন-দের খবরাখবর দিতে হবে, নেমন্তন্ন তো করতে হবে—

কাশী বলেছিল—এ-কথা তো জিজ্ঞেস করিনি, জিগ্যেস করে আসবো?

—না, থাক্!

তারপর যখন বদলি হবার কথা উঠেছিল, তখনও কাশীকে বলতে বলেছিল ময়মনসিং-এ যেতে ক্ষীরোদার কোনও আপত্তি আছে কি না!

কাশী এসে বলেছিল—না, দাদাবাবু, কিছু বললে না দিদিমনি—

—কলকাতা ছেড়ে চিরকালের জন্য বিদেশে চলে যেতে রাজি আছে কিনা জিগ্যেস করেছিলি?

কাশী বলেছিল—জিগ্যেস করেছিলুম, কিছু বললে না—

—তা তোর আপত্তি নেই তো?

কাশীর কিছুতেই আপত্তি নেই। সারা-জীবন সে দীপংকরের কাজ করবে বলে দিয়েছে। যে প্রতিবাদ করে, যে প্রতিরোধ করে, তাকে তবু সরানো যায়, কিন্তু যে নির্বাক হয়ে শুধু নির্ভর করে তাকে নিয়েই তো মুশকিল! তবু দীপংকর সকলকে নিয়েই চলে যাবে ঠিক করে ফেলেছিল। কলকাতায় তার কিছু দায়-দায়িত্ব ফেলে রেখে যাবে না। সবাই তার আপন। যে দীপংকরকে ত্যাগ করবে, তার কথা আর ওঠে না। সতী থাক এখানে। মিস্টার ঘোষাল থাকুক। লক্ষ্মীদি থাকুক, তারা কেউ-ই তাকে চায়নি। কিরণও হয়ত তাকে চায়নি। একে একে সবাই দূরে চলে গেল। কিম্বা হয়ত দীপংকরকেই দূরে ঠেলে দিলে।

তবু শেষবারের মত একবার ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনটা দেখে যেতে ইচ্ছে হলো। ট্যাক্সিটাকে ঘুরিয়ে নিতে বললে। রাস-বিহারী এভিনিউ দিয়ে সোজা এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে সদানন্দ রোড। তারপর বাঁদিকে। আস্তে আস্তে চলতে লাগল ট্যাক্সি। কী ছিল জায়গাটা, আর কী হয়েছে। কত বদলে গিয়েছে। এই মোড়েই ছিল আশু কলুর তেলের ঘানিকলটা। এখানেই ছিল চিকেপাড়া। এর মাটির সংগে একদিন দীপংকরের এই মাটির শরীরটার যোগ বড় নিবিড় হয়ে কেটেছিল। সে বড় নিবিড় যোগ! তখন ভাবতেও পারেনি, একদিন ঐ পাড়াতেই আবার ট্যাক্সি করে দেখতে আসতে হবে। বাড়ির ভেতর গাড়ি ঢোকে না। এই মোড়ে। এই মোড়ে এসে দাঁড়াতো সতীদের কলেজের বাসটা। উঁচু হিল-তোলা জুতো পরে এইখানে এসেই বাসে উঠতো সতী! এই-খানেই একদিন পাড়ার ছেলেরা ভিড় করে সতীদের বাড়ি চড়াও হয়েছিল। বলে মাতরম বলে চিৎকার করেছিল। সেদিন এই দীপংকর সতীর মর্যাদা নিজের শরীরের আচ্ছাদনের মধ্যে ঢেকে রক্ষা করেছিল। এই পাড়ায় রাস্তাতেই পুলিস এসে দীপংকরকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বয়েসই শুধু বাড়ে, মানুষ সেই শিশুই থাকে ভেতরে ভেতরে। বাইরে থেকে কেউ তা বুঝতে পারে না। কেউ তা দেখতে পায় না।

ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে রইল। দীপঙ্কর দেখতে লাগলো চেয়ে চেয়ে। সেই পুরোন বাড়িটার ভগ্নাবশেষ আর কোথাও নেই। চারদিকের এলোপাতাড়ি বাড়ির মধ্যে তখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে অঘোরদাদুর বাড়িটা। 'অঘোর-স্মৃতি-সৌধ'। হয়ত সেই ঘরগুলোও আর নেই সেখানে। সেই উঠোনটাও নেই। সেই আমড়া গাছটাও নেই—আর সেই কাকটাও হয়ত নেই। সে-ও হয়ত অঘোরদাদুর মত একদিন পৃথিবীর বুকের ওপর আছাড় খেয়ে মরেছে।

—এই যে দীপুদা, আপনি?

দীপঙ্করের যেন জ্ঞান ফিরে এল। একটা অচেনা ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে কাছে। দীপঙ্কর চিনতে পারলে না চেহারাটা।

—এদিকে কী করতে? কোথায় এসেছিলেন?

ছেলেটির হাতে বাজারের থলি। দীপঙ্কর বললে—তোমায় তো ঠিক চিনতে পারলুম না ভাই—

—আমি গোবিন্দ, ব্যায়াম সমিতিতে সেই প্যারালেল-বার প্র্যাকটিস করতুম—চিনতে পারলেন না আমাকে।

তবু মনে পড়লো না। শুধু মুখে বললে—ও—

—ফোঁটাদা বলছিল আপনার কথা—আমি আপনার বাড়িতে একদিন যেতুম—

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—কেন?

—একটা যদি চাকরি করে দিতেন আমায় আপনার আপিসে, আমি বড় অভাবে পড়ে গেছি। বাবা মারা যাবার পর থেকে সংসার ঘাড়ে এসে পড়েছে। আপনি তো ক্ষ্মণদাকেও চাকরি করে দিয়েছেন!

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এখন কী করছো?

—এখন তো অনেক কষ্টে এ-আর-পিতে ঢুকেছি। তাতে ঠিক চলে না। আর তাছাড়া, এ তো পাকা চাকরি নয়, ওয়ার থেমে গেলে তো ছাড়িয়ে দেবে ওরা!

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আমি যে পরশু চলে যাচ্ছি এখান থেকে বদলি হয়ে—

—ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছেন?

দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ, তা তোমার ফোঁটাদার কী খবর?

ছিঁটে-ফোঁটার খবরও বললে ছেলেটা। বললে—ও'রাই তো পাড়ার ইজ্জত রেখেছে দীপুদা, এই দেখুন না, এ-পাড়ায় তো কত ছেলেই ছিল, ও'দের মতন ক'জন দেশের ডাকে সাড়া দিচ্ছে। আমরা যখন সবাই এ-আর-পি, সিভিক গার্ডে ঢুকে গেলুম, ও'রা এখনও সেই খদ্দর পরে দেশ নিয়ে পড়ে আছেন। এবার প্রাণমথবাবুর সঙ্গে ইলেকশনে দাঁড়াচ্ছে ফোঁটাদা, কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হবে শুনেছি—

ট্যাক্সিটা তখনও দাঁড়িয়েছিল। ছেলেটাকে এড়িয়ে তাড়াতাড়ি দীপঙ্কর ট্যাক্সি চালাতে বললে। যাবার সময় বললে—আচ্ছা চলি—

সেই পাড়ার কী দশা হয়েছে নিজের চোখে তা আর দেখতে ভাল লাগলো না। হয়ত পাড়ার উন্নতিই হয়েছে সত্যি-সত্যি। কিন্তু তবু দীপঙ্করের মনে হলো সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেন যেন আর ঠিক তেমন নেই। যেন কিছুটা শ্রীহীন। তখন আপিস যাবার টাইম। দলে দলে ট্রাম-রাস্তার দিকে ছুটেছে সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে। শেষবারের মত প্রাণ ভরে দেখে নিতে ইচ্ছে হলো দীপঙ্করের। একবার শেষ বারের মত। এখানেই একদিন মা তাকে বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছে। এখানে এলেই যেন মা'র কথা মনে পড়ে।

মাসীমাও সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল। সেই অসময়ে দীপঙ্করকে দেখে ভয়ও পেয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। বললে—কী বাবা দীপু, এমন সময়ে যে?

—মাসীমা, আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি। ময়মনসিং-এ বদলি হয়েছি—তাই যাবার আগে একবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করে গেলাম—

পুলিসের দল তখনও বাড়ির সামনে বসে পাহারা দিচ্ছে। দীপঙ্কর তাদের দিকে চেয়ে বললে—এরা এখনও আছে—

—হ্যাঁ বাবা, দিনরাত পাহারা দেয়, আমার ভাল লাগে না মোটে।

দীপঙ্কর বললে—আমি আপনাকে সেখান থেকে মনি-অর্ডার করে টাকা পাঠিয়ে দেবখন, আপনি কিছু ভাববেন না। এই বলতেই এসেছিলুম—

—না বাবা, টাকা তুমি আর পাঠিও না।

—কেন? কী হলো?

—আমি মরে গেলেই তো ভালো। না-খেতে পেয়ে যদি মরে যাই, সেই ভালো। তুমি এদের বলো না বাবা আমাকে মেরে ফেলতে, এদের হাতে বন্দুক আছে, লাঠি আছে, একটু চেষ্টা করলেই আমাকে মেরে ফেলতে পারে। তা-ও মারব না, আবার পাহারাও দেবে দিনরাত—

একবার দীপঙ্কর ভাবলে কিরণের কথা বলবে মাসীমাকে। কিরণ এসেছিল কিনা, জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু পুলিসরা তখনও তাদের কথাবার্তা শুনছে মন দিয়ে। তাড়াতাড়ি বললে—যাই মাসীমা, আপিসের দেরি হয়ে গেল—

মাসীমা বললে—এসো বাবা, তোমাকে দেখলও শান্তি পাই, তোমার মা অনেক পুণ্য করেছিল, তাই তোমার মত ছেলে গর্ভে ধরেছে—

কিন্তু দীপঙ্কর কি জানতো তারই অজ্ঞাতে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে তখন আর-এক নাটক অভিনয় হচ্ছে। আর-এক নাটকের প্রথম অঙ্ক। আর প্রথম অঙ্কও ঠিক নয়। প্রথম অঙ্ক আরম্ভ হয়েছিল অনেক আগেই। অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। সে কবেকার কথা। কোন্ এক বিচক্ষণ লোক কবে টাকা আবিষ্কার করেছিল কে জানে। ইতিহাসের সে মধ্যযুগের কাহিনী। ধান, চাল, বাসন, তৈজস, ঘরবাড়ি, গরু-মোষ সমস্তই ছিল, টাকা ছিল না। কিন্ত একদিন সেই অদ্ভুত জিনিসটারই আবির্ভাব হলো সংসারে আর সব ওলোটপালোট হয়ে গেল রাতা-রাতি। দরকারের বেশি টাকা এসে জমলো যাদের হাতে, তারাই হলো শেষে মহাজন। মহাজনদের তখন ভারি খাতির। যুদ্ধ বাধবে, টাকা চাই। দাও ধার। রাজা প্রাসাদ বানাবে, টাকা চাই। দাও ধার। রাজা-রাজড়াদের স্বার্থেই মহাজনরা ফুলে-ফেঁপে উঠতে লাগোল দেশে দেশে। টাকা এল—আর সঙ্গে সঙ্গে এল টাকার সুদ। শেষে একদিন সেই মহাজনরাই রাজার ঘাড়ে চেপে বসলো। বললে—আমার

কারবারের সুবিধে হচ্ছে না, আইন বানাও। এমন আইন করো, যাতে আমার টাকা-খাটানোর সুবিধে হয়। তা সেই আইনই হলো। সেই টাকা এদেশ থেকে ওদেশে গেল। স্বদেশ থেকে বিদেশে। কোথায় কাদের দেশে দুর্ভিক্ষ হয়ে খেতে পায় না, মোটা সুদে সেখানে ধার দাও। অবস্থা ভাল হলে শোধ দিও। শেষে রাজা-মহারাজারা আর কেউ কিছু নয়—আসলে মহাজনরাই সর্বেসর্বা। এডওয়ার্ড থার্ড কি একশো বছর ধরে যুদ্ধ চালাতে পারতো—মহাজনেরা সাহায্য না করলে? সেই মহাজনেরাই শেষে ব্যাঙ্ক খুললে। টাকা খাটাবার নানান ফন্দি বার করলে। ব্যবসাদারদের টাকা দাদন দিতে লাগলো। মোটা সুদ, মোটা লাভ। নতুন নতুন ব্যবসা গড়ে উঠলো টাকা পেয়ে পেয়ে। সেই টাকায় জাহাজ বানিয়ে ভাস্কো-ডি-গামা আরো টাকা উপায় করতে বেরোল—আরো নতুন মার্কেট। আরো নতুন মহাদেশ। নতুন টাকার বাজার খুললো আমেরিকায়, ইণ্ডিয়ায়। তারপর এল মেশিন। মেশিনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গোটা চেহারাটাই বদলে গেল। গোটা সমাজটার ভোল পাল্টে গেল। এক নতুন দেশ, নতুন মানুষ, নতুন সমাজ, পুঁজিপতি, মজুর, কেরানী, উকিল, ব্যারিস্টার—যাদের নাম কখনও কেউ শোনেনি আগে। আর সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠলো লণ্ডন প্যারিস, বার্লিন, নিউ ইয়র্ক, বোম্বাই, কলকাতা। নেপোলিয়ান যুদ্ধ করবে—টাকা জোগায় মহাজনেরা। আকবর যুদ্ধ করবে, টাকা জোগায় মহাজনেরা, আলীবর্দীও যুদ্ধ করবে, টাকা জোগায় জগৎশেঠরা। হিটলার যুদ্ধ করবে, টাকা জোগায় থাইসেনরা। এমনি করে গড়ে উঠলো একাদশী বাড়ুজ্জে আর শশধর চাটুজ্জেরা। এমনি করে গড়ে উঠলো অঘোরদাদুরা।। এমনি করে গড়ে উঠলো শিরীষ ঘোষ, নয়নরঞ্জিনী দাসী, প্রাণমথবাবু। এমনি করেই তৈরি হলো ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল স্কুল। এমনি করেই গজিয়ে উঠলো রেল কোম্পানি, রবিনসন সাহেব, রোটারী ক্লাব। এমনি করেই সৃষ্টি হলো মিস্টার ঘোষাল, ছিটে-ফোঁটা, কিরণ, দীপঙ্কর। এমনি করেই সম্ভব হলো লক্ষ্মীদি, দাতারবাবু আর সুধাংশু। এমনি করেই একদিন এসে হাজির হলো নির্মল পালিতরা।

নির্মল পালিতরাই একদিন শিরীষ ঘোষকে হটিয়ে দিয়ে গ্রাস করলো প্রপার্টি। কাইজার গেল, জার গেল, পোপ গেল, পুরোহিত গেল, সিরাজউদ্দৌলা গেল, নির্মল পালিতরাই একদিন দখল করে বসলো গদি। তারপর যখন যুদ্ধ বাধলো, তখন তাদেরই জয়-জয়কার। এবার কেবল টাকা, টাকা, টাকা! টাকা তখন উড়তে শুরু করেছে।

সেই নির্মল পালিতেরই সেদিন খোঁজ পড়লো প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের নয়নরঞ্জিনী দাসীর বাড়িতে।

সরকারবাবু ছুটতে ছুটতে এসেছে। ডাকলে—মা-মণি—

মা-মণি তখনও বিছানায় পড়ে। পা'টা মচকে গেছে। জখম-পায়ের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। বললেন—আবার কী? তুমি কি আমাকে একটু স্বস্তিতে থাকতে দেবে না, সরকারবাবু!

—আজ্ঞে, চেক ফিরে এসেছে।

—সে কি? বলছো কী তুমি?

মা-মণিও চমকে উঠলেন। মাসকাবারি সংসার খরচের চেক কেটেছিলেন তিনি। যেমন কাটেন বরাবর। এমন প্রত্যেক মাসে কাটা হয়ে থাকে। নেই-নেই করেও তো এখনও অনেক খরচ আছে। ঝি-চাকরের
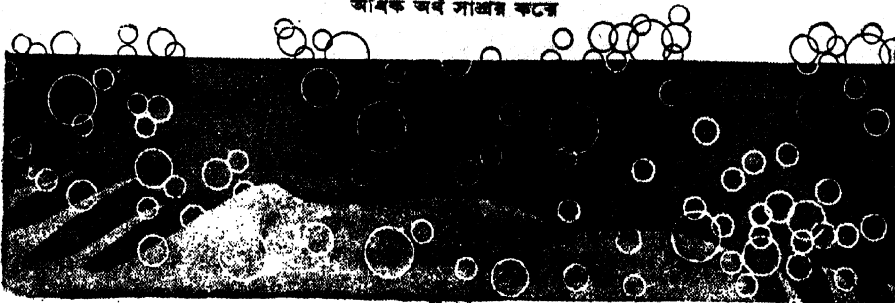
মাইনে, খাই-খরচ জামা-কাপড়। সরকারবাবু আছে, তার মাইনে আছে। তারও সংসার চালাতে হয় এই মাইনের ওপর নির্ভর করে। নিজের হাতে দায়িত্ব নেবার পর থেকেই খরচের বহরটা টের পাচ্ছেন তিনি। সনাতনবাবু যখন চেক কাটতেন, তখনকার কথা আলাদা। নির্মল পালিতই সেসব আলাদা করে দিয়েছে। নির্মল পালিতকেই আম-মোক্তার-নামা দিয়ে দিয়েছেন নয়নরঞ্জিনী দাসী। নির্মল পালিতই তাঁর একমাত্র বিশ্বাসী লোক। তার সঙ্গে এক-পুরুষের নয়, দু-পুরুষের সম্পর্ক।

মা-মণি বললেন—চেক ফেরত দিলে কেন? কী বললে তারা?

—আজ্ঞে, বললে, টাকা নেই—

—সে কি? হাজার টাকা নেই? এই যে গেল মাসে বউবাজারের বাড়ি বিক্রি করে কুড়ি হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এলে তুমি? সে টাকা কি রাতারাতি উড়ে গেল? যাও, তুমি আবার যাও, আবার গিয়ে বলো তাদের' তোমাদের নিয়ে যত ঝামেলা হয়েছে আমার, একটা কাজ যদি তোমাদের দিয়ে হয়। যাও, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? যাও—

সরকারবাবু বললে—আজ্ঞে, মা-মণি, আমি তা বলেছি,—দিলে না কিছুতেই—

—তার মানে?

খোঁড়া পায়েই উঠে বসতে চাইলেন মা-মণি। টাকা গেল কোথায়? টাকার কি পাখা আছে নাকি যে উড়ে পালাবে! চিৎকার করে ধমক দিয়ে উঠলেন। সেই চিৎকারে রান্নাঘরের মধ্যে কৈলাস, বাতাসীর-মা, ভুতির-মা সবাই চমকে উঠলো। আবার মাগী ধমকায় কাকে! মাগীর পা খোঁড়া হয়ে গেছে, তবু গলার তেজ কমলো না এতটুকু গা। বউটাকে তো বাড়িতে তিষ্ঠোতে দিলে না, এখন কাকে আবার ধমকাচ্ছে?

শম্ভু বললে—ও সরকারবাবুকে—সরকারবাবুরও যেমন কপাল।

বাতাসীর-মা বললে—তা সরকারবাবু, ছেড়ে দিলেই পারে চাকরি। কে খোশামোদ করতে বলেছে তোর সরকারবাবুকে শুনি? মাইনে নেবে কাজ করবে, তুমি আমার পর! এ-মাসে এখনও তো মাইনে দিলে না এখনও —এখনও কাজ করছে কেন?

কৈলাস বললে—গেল মাসেও তো মাইনে পাইনি আমরা বাতাসীর-মা—

বাতাসীর-মা বললে—আর পেয়েছিস তুই ছোঁড়া, এখন ভালোয়-ভালোয় বিদেয় হ' দিকিনি—সেই যে কথায় আছে না—বিশ্বকর্মাও ঋষি, পদীর মা-ও পিসী—। ওই আবার চেঁচাচ্ছে মাগী—

সত্যিই তখন ওপরে আবার চেঁচামেচি শুরু হয়েছে জোর। চেক ভাঙানো যায়নি। নিশ্চয় কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে। সনাতনবাবুরও ডাক পড়লো। নিজের লাইব্রেরীঘরে তিনি পড়ছিলেন। সরকারবাবু গিয়ে বললেন—দাদাবাবু, ব্যাঙ্ক থেকে চেক ভাঙায়নি, আপনি একটু দেখবেন?

সনাতনবাবু বললেন—কীসের চেক? কার চেক সরকারবাবু?

কোনওদিন চেক-বই নিয়ে মাথা ঘামাননি তিনি। আগে শুধু সই করতেন। ইদানীং তাও করতে হয় না। তিনি বেঁচেই গিয়েছিলেন। সরকারবাবু বললেন—আজ্ঞে, মহা মুশকিলে পড়েছি, মা-মণি আমায় বকাবকি করছেন—আপনি একবার চলুন—

সনাতনবাবু বললেন—তা আমি কী করবো গিয়ে, নির্মল পালিতবাবুকে খবর দাও না—

সরকারবাবু বললে—আজ্ঞে তাঁকে তো মা-মণি টেলিফোন করেছিলেন, তিনি তো বাড়িতে নেই—

—তা তাড়াতাড়ি কীসের সরকারবাবু, তিনি বাড়ি ফিরে এলে আসবেন—

—আজ্ঞে না, তিনি কলকাতাতেই নেই।

—কলকাতায় নেই তো কোথায় গেলেন? তিনি তো পালিয়ে যেতে পারেন না।

মা-মণি কিন্তু অতটা অপেক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর যেন কেমন সন্দেহ হয়েছিল। তিনি প্রথমে পাঠালেন শম্ভুকে। তারপরে পাঠালেন কৈলাসকে। শেষে সরকারবাবু নিজেই গেল। আগে একবার টেলিফোন করলেই হতো। টেলিফোন পেলেই নির্মল পালিত কাজ-কর্ম ফেলে দৌড়ে আসতো। কিন্তু সেই নির্মল পালিত আজ বাড়িতেই নেই। দরোয়ান কিছু বলতে পারলে না। মুহুরি, ম্যানেজার কেউই কিছু বলতে পারলে না। শুধু বললে—সাহেব কাল সন্ধ্যেবেলা মেমসাহেবকে নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে গেছে।

সরকারবাবু জিজ্ঞেস করলে—কবে আসবে সাহেব?

মুহুরি বললে—সাহেব তা বলে যায়নি—

আর তারপরই মা-মণির উদ্বেগটা আরো বেড়ে গেল। একবার টেলিফোন করেন ব্যাঙ্কে। তাতে সুবিধে না পেলে, সরকারবাবুকে যেতে হয়। সরকারবাবু ফিরে আসেন শুকনো মুখে। মা-মণির কাছে আরো বকুনি খেতে হয়। তখন আবার ছুটতে হয় নির্মল পালিতের বাড়িতে। সেখানে গিয়েও কোনও সুরাহা হয় না। সমস্ত সকালটা এ-বাড়িতে একটা তুমুল কাণ্ড বেধে গেল। সরকারবাবু আবার সনাতনবাবুর কাছে গিয়ে হাজির হন ভয়ে-ভয়ে। বলে—দাদাবাবু, সর্বনাশ হয়েছে—

—কীসের সর্বনাশ সরকারবাবু?

—আজ্ঞে আপনি একবার মা-মণির কাছে চলুন—সর্বনাশ হয়ে গেছে—

মা-মণি সনাতনবাবুকে দেখেও ধমক দেন। পায়ের যন্ত্রণায় ক'দিন থেকেই তিনি ছটফট করছিলেন। সামনে সনাতনবাবুকে দেখে আরো জ্বলে উঠলেন। বললেন—তোমাকে কে আবার আসতে বললে আমার কাছে? তুমি আমার কাছে এসেছ কিসের জন্যে শুনি? যাও, বেরিয়ে যাও সামনে থেকে, যেমন আহাম্মক হয়েছে বাড়ির সরকার, তেমনি হয়েছে পেটের ছেলে—সবাই সমান।

সনাতনবাবু নির্বাক হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

মা-মণি আবার তেড়ে উঠলেন—বলি, সামনে দাঁড়িয়ে দেখছো কী, হাবার মত? যা দু' চক্ষে দেখতে পারিনে, তাই হয়েছে আমার—

সনাতনবাবু বললেন—কী হয়েছে মা-মণি?

মা-মণি তখন পারলে যেন নিজের মাথাটাই নিজে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতেন। বললেন—তোমাকে আর সোহাগ করতে হবে না, তোমাকেই যদি বলে বোঝাতে পারবো, তো আমার এই দশা হয়! আমি মরছি পায়ের ব্যথায়, আর তুমি এলে এখন সোহাগ জানাতে। এখনও গেলে না সামনে থেকে? এখনও দাঁড়িয়ে আছো হাঁ করে?

—তা কী হয়েছে বলবে তো?

মা-মণি বললেন—না, আমার কিছুছু হয়নি, আমি মহা আরামে আছি, তোমাদের সোহাগে আমি একেবারে স্বর্গে বাস করছি, আমার সুখের আর সীমে-পরিসীমে নেই, টাকার গাদায় শুইয়ে তোমরা আমায় কিতাথ করে দিয়েছ একেবারে—

—শুনছিলুম; চেক্ নাকি ফিরে এসেছে ব্যাঙ্ক থেকে। সরকারবাবু বলছিল ব্যাঙ্কের টাকা নাকি সব তোলা হয়ে গেছে।

মা-মণি আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন—সরকারবাবু বলছিল? কোথায়

গেল সরকারবাবু? ডাক তাকে আমার কাছে। ডেকে দাও—

সরকারবাবু পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সামনে আসতেই মা-মণি গর্জন করে উঠলেন—বলি, তুমি ডেকেছ দাদাবাবুকে? কেন তুমি ডাকলে শুনি আমার হুকুম ছাড়া? আমার হুকুম ছাড়া তুমি ডাকবার কে? তোমায় এত নবাবী করতে কে বললে বলো তো? কেন তুমি ডাকলে জবাব দাও। দাও, জবাব দাও। চুপ করে রইলে কেন, কৈফিয়ৎ দাও—

—আজ্ঞে, আমার ভুল হয়ে গেছে।

—ভুল হয়ে গেছে? এমন ভুল কেন হলো তাই বলো আগে। কেন তুমি ডাকলে? তুমি জানো আমার কেউ নেই। আমার ছেলে বউ কেউ নেই। তুমি জানো আমার পেটের ছেলে আমার শত্রু! অমন ছেলের মুখ দর্শন পর্যন্ত আমি করি না। তবু কেন তুমি ডাকলে শুনি? কী করতে ডাকলে?

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু চেকটা কেন ক্যাশ হলো না, সেইটে তো আগে ভাবতে হবে—

—রাখো তোমার ভাবনা, তুমি বৌকে আনতে যাচ্ছিলে আগে তাই যাও, পরে চেকের কথা ভেবো। এ-বাড়ি ভেঙে যাক্, চুরে যাক্, চুলোয় যাক্, আমার টাকা সাত ভূতে লুটে-পুটে নিক্, তা তো তোমার দেখবার দরকার নেই—।

—কিন্তু নির্মলবাবুর তো খোঁজ-খবর নিতে হবে। তিনি এই সময়ে হঠাৎ না-বলে-কয়ে কোথায় গেলেন, তাও তো দেখতে হবে!

মা-মণি বললেন—খুব হয়েছে, যা দেখবার যা করবার, তা আমি করবো। আমি এই খোঁড়া পা নিয়েই করবো। আমার পা ভেঙে গেছে বলে আমি তো মরে যাইনি। আর আমি নির্মলকে আম্-মোক্তার-নামা দিয়েছি, সে আমার খুশি! আমার টাকা যদি খোয়া যায় তো তোমার কী? তুমি কেন বলতে আসো আমাকে? তোমার টাকা খুইয়েছি আমি? তোমার টাকায় আমি হাত দিয়েছি? তুমি বলবার কে?

সনাতনবাবু কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু মা-মণি থামিয়ে দিলেন। বললেন—যাও, আর কথা বাড়িও না—যাও আমার সামনে থেকে

নিচে একতলায় দীপঙ্কর এসে ঢুকতেই কেমন যেন একটা সন্দেহ হলো। সরকারবাবুর ঘরটা খোলা। ওপর থেকে মা-মণির গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। কাকে ডাকবে, কেমন করে সনাতনবাবুকে খবর দেবে ভাবছিল। হঠাৎ দেখলে শম্ভু সিঁড়ি দিয়ে নামছে।

দীপঙ্কর ডাকলে। বললে—তোমার দাদাবাবু কোথায় শম্ভু?

শম্ভু কাছে এসে বললে—আপনি এসেছেন? কিন্তু ওপরে মা-মণির সঙ্গে দাদাবাবুর খুব ঝগড়া হচ্ছে—

—কেন? হঠাৎ ঝগড়া হচ্ছে কেন?

—আজ্ঞে, ঝগড়া তো রোজই হয়, আজকেও হচ্ছে। ব্যারিস্টারবাবুকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। মা-মণির ব্যাঙ্কের টাকা চুরি হয়ে গেছে।

দীপঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে গেল। বললে—সে কি? কোন্ ব্যারিস্টারবাবু? নির্মল পালিতবাবু?

শম্ভু বললে—হ্যাঁ, তাঁকে খুঁজতেই তো আমরা সবাই তাঁর বাড়ি গিয়েছিলুম—আপনি বসুন, আমি দাদাবাবুকে ডেকে দিচ্ছি—

সনাতনবাবু খানিক পরেই এলেন। বললেন—এই যে দীপঙ্করবাবু, কী হয়েছে জানেন, আমাদের একজন ব্যারিস্টার ছিলেন, নির্মল পালিতবাবু, তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না—

দীপঙ্কর বললে—হয়ত বাইরে কোথাও গেছেন।

সনাতনবাবু বললেন—তা তো বটেই, পাওয়া যাচ্ছে না মানে, তিনি বাইরে গেছেন—আবার ফিরে এলেই পাওয়া যাবে। তিনি লোক খুব ভালো, ভেরি অনেস্ট ম্যান্, তাঁকেই তো পাওয়ার-অব্-য়্যাটর্নী দেওয়া ছিল। এখন একটা হাজার টাকার চেক্ ডিস্অনার্ড হয়ে ফিরে এসেছে—

—এখন কী হবে?

সনাতনবাবু বললেন—সেই কথাই তো আমি মা-মণিকে বলছিলাম। টাকা বড় তুচ্ছ জিনিস দীপঙ্করবাবু, কিন্তু সেই তুচ্ছ জিনিসটাও তো এক-এক সময় অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাই হয়েছে আর কি—আর কিছু নয়! ওর জন্যে আপনি ভাববেন না, নির্মল পালিতবাবু এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—

দীপঙ্কর বললে—তা হলে আমি উঠি, আমি ভেবেছিলাম, আজকে আপনাকে নিয়ে আমাদের আপিসে যাবো—

এতক্ষণে যেন সনাতনবাবুর মনে পড়লো। বললেন—ও, তাই তো! আমার একেবারে মনে ছিল না। আপনি সতীকে সব বলে-ছিলেন তো সেদিন? বলেছিলেন তো যে সেদিন বাধা পড়ে গিয়েছিল? বলেছিলেন তো?

—আজ্ঞে না বলিনি। বলবার সুযোগ পাইনি। আর আপনাকে তো বলেইছিলাম, সতী আমার সঙ্গে কথা বলে না।

—কেন? কথা বলে না কেন?

দীপঙ্কর বললে—সে-সব অনেক কথা, পরে সব আপনাকে বলবো। তা এখন বোধহয় আপনি যেতে পারবেন না আমার সঙ্গে—

সনাতনবাবু বললেন—না? যেতে পারবো না কেন?

দীপঙ্কর বললে—এই অবস্থায় আপনার বোধহয় যেতে অসুবিধে হবে। তার চেয়ে আপনি যদি একটা চিঠি দেন—তাহলেও হতে পারে। আমি পরশু দিন তো ময়মনসিং-এ বদলি হয়ে যাচ্ছি—আজকেই আমি তার হাতে চিঠিটা দিয়ে দিতে পারতাম। যাবার আগে আমি দেখে গেলে মনে তৃপ্তি পেতাম যে, সতী আপনার কাছে এসেছে।

—তা দিতে পারি। চিঠিও দিতে পারি। চিঠি দিলে যদি কাজ হয়, আমি তা-ও দিতে পারি। আমি এখনি দিয়ে দিচ্ছি। আর বলে দেবেন, আমি ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা মিটে গেলেই যাবো তার কাছে। আর তিনি তো আমার ওপর রাগ করেননি। আপনি কী বলেন; তিনি রাগ করেছেন আমার ওপর? তাকে তো আমি চিনি দীপঙ্করবাবু, রাগ তিনি আমার ওপর করতেই পারেন না—

তারপর একটা কাগজ টেনে নিয়ে একটা চিঠি লিখতে বসলেন। অনেকক্ষণ ধরে চিঠি লিখে সেটা দিলেন দীপঙ্করের হাতে। বললে—এবার আপনি পড়ে দেখুন তো, ঠিক হয়েছে কি না!

দীপঙ্কর বললে—এ-চিঠি আমি আর পড়বো না, আমার পড়া উচিত নয়।

—না-না, তাতে কী! আপনি পড়ুন। আমাদের সম্পর্কের মধ্যে গোপনীয় কিছু নেই, আপনি স্বচ্ছন্দে পড়তে পারেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে আবার গোপনীয় কী থাকতে পারে বলুন—

শম্ভু হঠাৎ এসে বললে—দাদাবাবু, মা-মণি আপনাকে ডাকছেন আবার?

—আমাকে? আচ্ছা যাচ্ছি, তাহলে ওই কথাই রইল দীপঙ্করবাবু!

সনাতনবাবু বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। দীপঙ্কর আবার রাস্তায় বেরিয়ে এল। এতদিন যে-ভয় করছিল, সেই ভয়ই যেন ঘটে গেল শেষ পর্যন্ত। চিঠিটা পকেটে পুরে ট্যাক্সিতে উঠে বসলো আবার। তারপর আপিসে পৌঁছে ট্যাক্সি থেকে নামতেই যথারীতি গুর্খা দরোয়ান সেলাম করলে। কিন্তু কোরিডোরের ভেতরে ঢুকতেই অবাক হয়ে গেল। মিস্টার ঘোষালের ঘরের সামনে অনেক লোকের ভিড়। ম্যাকফারসেন সাহেব নিজের ঘর থেকে বেরোলেন। অভয়ংকর, সোম সবাই এদিক থেকে ওদিকে যাতায়াত করছে। আপিসের চাপরাশীরা, বাবুরা, সবাই ভিড় করেছে। অন্যদিন মার্চেন্টদের ভিড় থাকে, তারা কেউ নেই। এ যেন অন্য রকম। যেন কোনও ব্যতিক্রম ঘটেছে আপিসে। কী হলো? কীসের এত ভিড়? দীপঙ্কর সোজা নিজের কামরার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পাশবাবু সামনে এসেই মাথা নিচু করে সেলাম করলে—গুড মর্নিং স্যার।

দীপঙ্কর চলতে চলতে বললে—এত ভিড় কীসের এখানে?

পাশবাবু বললে—স্যার, মিস্টার ঘোষালকে পুলিসে ধরেছে স্যার—অ্যান্টি করাপশনের পুলিস ধরেছে—

—কেন? দীপঙ্কর যেন আকাশ থেকে পড়লো। ওদিক থেকে ক্রফোর্ড সাহেব নিজের ঘরে যাবার পথে দীপঙ্করকে দেখেই ডাকলে। বললে— মিস্টার সেন, কাম টু মাই রুম, আমার ঘরে এসো—

ঘরে গিয়ে বসতেই ক্রফোর্ড সাহেব বললে—তুমি শুনেছ বোধহয় মিস্টার ঘোষাল হ্যাজ বীন অ্যারেস্টেড বাই স্পেশাল পুলিস। বেইল-এ রিলিজ করবার ব্যবস্থা করেছি আমি—আমি চাই, তুমি চার্জ টেক-ওভার করে নেবে—

—কিন্তু আমি যে ময়মনসিং-এ ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছি স্যার, ডে আফটার টু-মরো।

ক্রফোর্ড সাহেব বললে—দ্যাট অর্ডার ইজ ক্যানসেলড্—

সমস্ত পরিস্থিতিটা যেন এক মুহূর্তে ওলোট-পালোট হয়ে গেল। দীপঙ্কর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে—স্যার, আমি মিসেস ঘোষের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি, সী মাস্ট বি ফীলিং আনইজি—

মিস্টার ক্রফোর্ড বললে—মিসেস ঘোষ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল—সী ইজ সীক, আমি তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি বুঝতে পারছি না কী করবো—আই ডোণ্ট নো হোয়াট টু ডু—

(ক্রমশ)

অযাত্রায় জয়যাত্রা

শ্রীবিভূতিভূষণ-মুখোপাধ্যায়

(১১)

পনেরো মিনিট বাঁচিয়ে এবার দেড় ঘণ্টা। লেট করে গাড়িটা ছাড়ল।

গাড়ি পৌঁছতেই বাপ-বেটায় ভিড় ঠেলে উঠে পাশাপাশি দুটো জায়গা দখল করে বসেছিল, আমি যেতে রামবুঝাওন তারটা ছেড়ে দিয়ে আমায় বসাল। এটাও যেন উপকারের চেয়ে বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়েই করল বলে মনে হলো আমার। আমার ইচ্ছা ছিল এই সুযোগে আলাদা হব, গারি তো ভিড়ের অজুহাতে অন্য এক গাড়িতেই গিয়ে বসব, সেটা আর হলো না। একে তো মতলবখানা কি, সেই নিয়ে একটা ধুকপুকুনি লেগে রয়েছে, তার ওপর মাথায় ঐ পাগড়ি, গলায় আস্ত একখানা তসরের থান জড়ানো, গায়ে মোটা খদ্দরের কুর্তা, ঘামের বোটকা গন্ধে অতিষ্ঠ করে তুলেছে; ধনে-প্রাণে মারা যাওয়ার উপক্রম।

গাড়ি যতক্ষণ রইল, দাঁড়িয়েই রইল রামবুঝাওন। চুপ করে নয়, পুরনো কথা তুলে আমার গুণকীর্তন করে গেল বাপের কাছে, সে এক আলাদা যন্ত্রণা। গাড়ি ছাড়লে, আমার যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় তার জন্যে পুনঃ পুনঃ বাপকে বলে দিয়ে নেমে গেল।

আমি জায়গাটা পেয়েছিলাম একেবারে জানলার ধারটিতে, গাড়ি ছেড়ে দিলে বাইরের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে বসলাম। ইয়ার্ডের আলোর মালা ছাড়িয়ে বেরিয়ে এল আমাদের গাড়ি। স্টেশনটা শহরের শেষ প্রান্তে, অল্প একটু এসেই অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করলাম।

"Give us more light," কিন্তু এক এক সময় মনে হয় অন্ধকারেরই যেন বেশী প্রয়োজন। বাইরের সব মুছে এলে, ভেতরে স্মৃতিতেও অনেক সময় যেন ছায়া এসে পড়ে। অন্ধকার, নিদ্রা, মৃত্যু—সবগুলো একই জাতের জিনিস—অবস্থা-ভেদে আমরা এটাকে চাই বা ওটাকে। মুছে দেবে, লুপ্ত করে দেবে। অবস্থার তারতম্যে, দুঃখ-বেদনার গভীরতার অনুপাতে আমরা নির্ণয় করার চেষ্টা করি কোনটের প্রয়োজন, —অন্ধকার, নিদ্রা, না মৃত্যু? বেশ লাগছে। গাড়িটা হু-হু করে ছুটছে। শহরের একেবারে শেষ দিকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যে কখানা বাড়ি, তাদের আলোও গেছে সরে, শুধু নক্ষত্রখচিত আকাশের নীচে অন্ধকার আর অন্ধকার। খানিকটা পর্যন্ত গাছ, আগাছা, মাঠ, ক্বচিৎ এক-আধটা কুটির, তারপরে চিহ্নহীন বিলুপ্তি। জামার বোতাম খুলে দিয়ে বুকটা হাওয়ায় ধরলাম মেলে। হাওয়াটা হচ্ছে সান্ত্বনা-জাতের জিনিস, তাই আলোর হাওয়ার চেয়ে অন্ধকারের হাওয়াটা যেন আরও মিষ্টি। মৃত্যুর চরম অন্ধকারের দেশে সে আবার কী নিবিড় সান্ত্বনার হাওয়া বয় কে জানে?

কিন্তু মৃত্যু আমার একেবারে শিয়রে। ও মৃত্যু নয়, তা হলে তো বাঁচতাম। সম্পূর্ণ
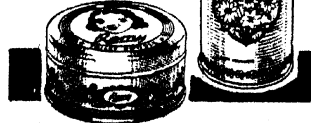
অন্যরূপে, মাথায় পাগড়ি, গায়ে খদ্দর, গলায় দোপাট্টা।

"মাস্টার সাহেব, আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?"

বললাম—"না, বেশ আছি।"

তখনই ভুলটা সংশোধন করে নিয়ে বললাম—"মাথাটা একটু একটু ধরেছে।"

বলে মাথাটা জানলার শিকে চেপে ধরলাম। যদি বকানো থেকে অব্যাহতি দেয় অন্তত।

"কোন রকম সেবায় আসতে পারি?—বলেন তো—"

মাথায় হাত বুলুনো নিশ্চয়। ওটা আলংকারিক অর্থে বোধ হয় আছেই অদৃষ্টে আজ, শঙ্কিতই রয়েছি, ব্যবহারিক অর্থেও আস্বাদ গ্রহণ করবার উৎসাহ নেই আর। বললাম—"না, সেসব কিছু প্রয়োজন নেই। এই যে দিব্যি হাওয়া দিচ্ছে, মাথাটা খানিকটা জানলায় এইরকম চেপে পড়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।...চুপচাপ করে।"

মিনিট পাঁচও গেল না—

"ঠিক হয়ে গেছে হুজুর?"

"না, এত শিগগির কখনও যায়? এত শীগগির কোন কিছুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়?"

শেষেরটুকু অবশ্য ওকেই লক্ষ্য করে গায়ের জ্বালা মিটিয়ে একটু বক্রোক্তি। কিন্তু লিখে লিখে আমাদের কেমন একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে, অত্যন্ত সাহিত্যিক হয়ে গেল, বেশ স্পষ্ট হলো না ওর কাছে।

"কতক্ষণ নেবে?"

"আপনিই জানেন।"—এই কথাটাই স্পষ্ট করে বললে ভালো হত বোধ হয়, যদিও কাজ কতটা হত জানি না, তবে অভ্যাস তো নেই, মুখে আটকে গেল। তবু চেষ্টার ত্রুটি করলাম না, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ তো, বললাম—"তা এরকম হলে আমার প্রায় ঘণ্টা দুই লেগে যায়। গাড়িতে বোধ হয় বেশীই লাগবে।"

একটু যেন ভেবে নিয়ে বলল—"কিন্তু গাড়িতে তো তেমনি হাওয়াটাও বেশী লাগছে।"

"তা লাগছে বটে। একটু যদি চুপ করে পড়ে থাকতে পারা যায়-তা হলে বোধ হয় সেরেও যেতে পারে তাড়াতাড়ি।"

চুপচাপ গেল একটু। অনুভব করেছি—খুব যেন একটা সমস্যায় পড়েছে, আমার অশান্তির চেয়ে ওরটা কোন অংশে কম নয়।

"তা কি পারবেন চুপ করে থাকতে? কোনমতেই পারবেন না।"—একটু পরে বেশ একটু হেসে উঠেই বলল—"আপনাদের যে আবার মাস্টারি ধাত, বকছেন তো বকেই যাচ্ছেন।"

আবার উল্টে ঠাট্টা! কিন্তু একটা সুযোগও তো, ঠাট্টার উত্তরে এবার বেশ স্পষ্ট করেই প্রকাশ করা যেত মনের ভাবটা, কিন্তু এই সময় গাড়িটা ব্রেক কষতে কষতে

স্টেশনে এসে প্রবেশ করল এবং ব্রাম-সিংহাসন সীট ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল।

প্রশ্ন করলাম—"নামছেন আপনি?"

"এই দেখ্নে! আপনার এই অবস্থা আর একলা ফেলে নেমে যাব আমি! এক্ষ্নি আসছি।"

মান্ষ আশা নিয়েই বে'চে থাকে। ভাবছি গাড়িটা লেট আছে, ভগবান করেন ও এসে পড়বার আগেই যদি ছেড়ে দেয় তাড়াতাড়ি। ধরা যাক, জল খেতে নেমেছে, জলের কুলিটা খ্‌ুজতে খ্‌ুজতে খানিকটা দ্‌রে গিয়ে পড়েছে—জল খাচ্ছে, গাড়ি দিল ছেড়ে—সঙ্গে সঙ্গে গতিবেগ, আজ যেমন দিচ্ছে... কিংবা যদি...

জানলার বাইরের দিকে ম্‌খ করে আশায় আশায় নানা সম্ভাবনার ফিকির বের করে যাচ্ছি, গাড়িটা ছেড়েও দিয়েছে, হঠাৎ-দরজার কাছে এক বিকট চীৎকার—"এই যে আস্‌ন! অম্‌তসরে জগদ্বিখ্যাত ধন্বন্তরী অ্যাণ্ড কোম্পানীর..."

ঘ্‌রে দেখি একজন হকার—চলতি
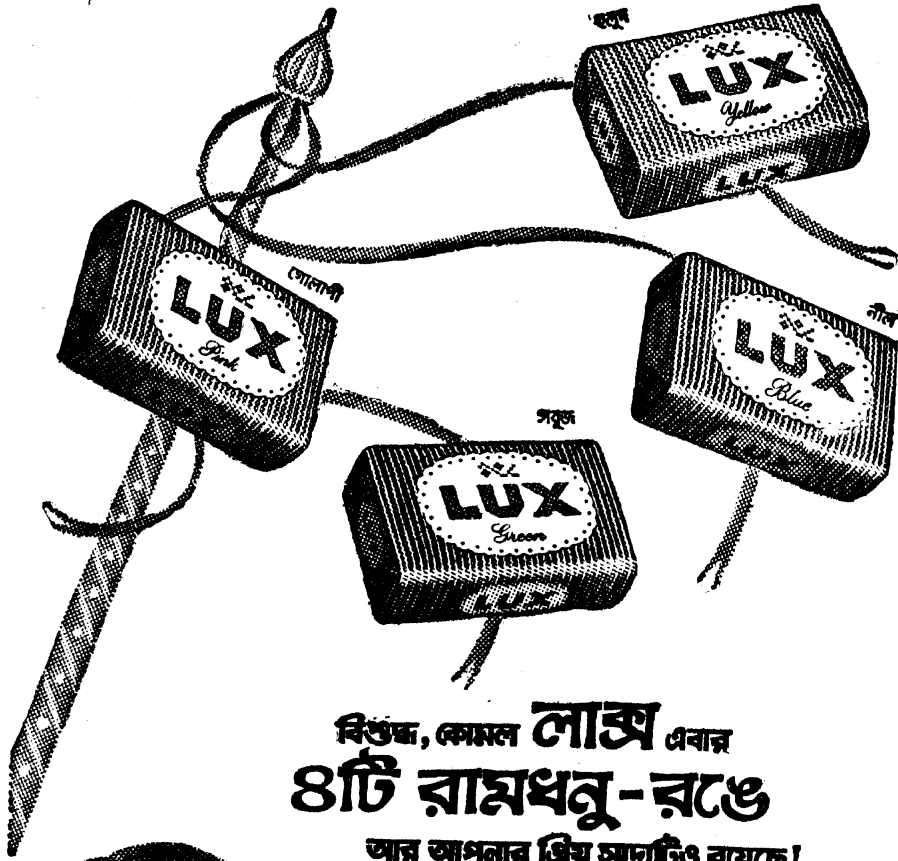
গাড়িতে যারা ওষুধ ফিরি করে বেড়ায়। সামনে— রামসিংহাসন। ওকে পিছু পিছু আসতে বলে এগিয়ে এল, একগাল হেসে বলল—"ভেবেছিলুম খুঁজে বের করতে দেরি হবে, কিন্তু হনুমানজীর এমন দয়া, একটু এগিয়েছি, দেখি সামনের গাড়ি থেকে নেমে আসছে—ধরে নিয়ে এলাম।"

বসে, লাঠিটার মাথায় হাত দুটো রেখে ওর দিকে চেয়ে রইল। লোকটা একটা ছোট শিশি তুলে ধরে গাড়ির আওয়াজের ওপর গলা তুলে চীৎকার করে যাচ্ছে—"বিখ্যাত দর্দ-দমন মাথাঘোরা, আধকপালে, চোখে ধোঁয়া দেখা, অনিদ্রা—আঙুলের টিপে একটুখানি নিয়ে কপালে ঘষে দিন—দু মিনিট, ব্যাস আর দেখতে নেই—সংগে সংগে বিলকুল সাফ!—তারপর ঘুমুন না কত ঘুমুবেন—শুধু এক টিপ, আঙুলের ডগায়—যাঁর দরকার আছে সদ্য সদ্য পরীক্ষা করতে পারেন—দর্দ-দমন্! দর্দ-দমন্!—আসুন, হাত তুলে জানান কার দরকার—দর্দ-দমন্—ছোট শিশি তিন আনা, বড় শিশি পাঁচ আনা!..."

"হুজুরের জন্যে একটা শিশি নেব? জিনিসটা খুব ভাল, আমি নিজে পরখ করে দেখেছি।"

উল্টো দিকে মুখ করে সেই একইভাবে পড়ে আছি, রাগে সর্বাংগ জ্বলে যাচ্ছে, না ঘুরেই বললাম—"না, দরকার নেই। একটু চুপ করে..."

হঠাৎ একটা খেয়াল হলো—থেমে গিয়ে সোজা হয়ে বসে হকারটাকেই প্রশ্ন করলাম—"ঘুম আসবে শীগগির?"

"সংগে সংগে বাবু সাহেব।"

মুখটা একটু শুকিয়েই গেছে লোকটার, সদ্য সদ্য পরীক্ষা করবার জন্যে উদ্যত, তায় ভদ্রলোকই, যারা টপ করে আমল দিতে চায় না। কথাটা বলে একটু যেন সামলে নেওয়ার জন্যেই জুড়ে দিল—"তবে আপনার যদি খুব বেশী ধরে থাকে মাথাটা তো একটু বেশী মালিশ..."

"আধ ঘণ্টা?"

"নাঃ, অত বেশী..."

"পনের মিনিট?"

"তা...তার আগেই...ঘষতে ঘষতে..."

"দাও এক শিশি।"

রামসিংহাসন দামটা দিতে যাচ্ছিল, আমি হাতটা ধরে ফেললাম, বললাম—"না না, আপনি দেবেন কেন? আপনি যে এত কষ্ট করে ডেকে এনেছেন এই যথেষ্ট।"

দাম দিয়ে শিশিটা নিয়ে মোম দিয়ে আঁটা ছিপিটা খুলে ফেললাম, দু আঙুলে একটু ঢেলে নিয়ে কপালে ঘষতে লাগলাম। আমায় কিনতে দেখে আরও কয়েকজন কিনল।

এবার স্টেশনটা কাছে, তাড়াতাড়ি এসে পড়ল। অনেকগুলি শিশি বিক্রি করে হকারটা নেমে পড়ে অন্য কামরায় চলে গেল। নেমে গেল ওরা এক কামরায় বেশীক্ষণ থাকতে সাহস করে না বলেই, তবে থেকে গেলে আর কিছু বিক্রি করতে পারত।

পনের মিনিটও তো নিলাম না আমি। মিনিট ছয়-সাত পরে যখন রামসিংহাসন আমায় ডাকল—বকিয়েই তো যাচ্ছে বরাবর—তখন মলম ঘষতে ঘষতে আমার হাত এলিয়ে এসেছে, মাথাটা ঢুলে পড়েছে জানলার গায়ে। দুবার ডাকার পর গাঢ় তন্দ্রার মধ্যে থেকে যেন কোন রকমে "উঃ" করে একটা অস্পষ্ট শব্দ করলাম মাত্র।

পাশের কয়েকজনের মুখে বিস্মিত প্রশ্ন হলো—"ঘুমিয়ে পড়েছেন! সে কি, এরই মধ্যে! অত যিনি কাতর হয়ে পড়েছিলেন মাথার যন্ত্রণায়!"

"মনে তো হচ্ছে সেই রকম।"—নিতান্ত নিস্তেজ কণ্ঠস্বর রামসিংহাসনের, এমন একটা মহৌষধির সন্ধান দেওয়ার যশটা যার নাকি এত বেশী করে প্রাপ্য। একেবারে যেন চুপসে গেছে, একটু ঠেলা দিয়েই আমায় ডাকল—"মাস্টার সাহেব!"

বেশ একটু জোর দিয়েই।

এক সংগে অনেকগুলি কণ্ঠে আপত্তি উঠল—"আহা-হা, ডাকে কখনও!... ঘুমুচ্ছেন তো ঘুমুতে দিন।...ওষুধ কিনে ফল কি তা হলে?...আপনিই তো ডেকে নিয়ে এলেন মশাই!..."

চুপচাপ গেল একটু, তারপর একটি যে দীর্ঘশ্বাস পড়ল সেটার শব্দ দ্রুত ধাবমান গাড়িটারও শব্দের ওপর গেল উঠে। অবশ্য রামসিংহাসনেরই।

যাক, একটু ভাববার সময় পাওয়া গেল। লোকটা কে, লোক দুটোই বলা ঠিক। কেন এভাবে আমার পিছু নিয়েছে? জোচ্চোর বলে মনে হয়েছিল, একেবারে শেষ পরিস্থিতিতে তাতেও বেশ একটু খটকা এসে পড়েছে যেন,—অবশ্য বাঁ দিকের পকেটগুলো চেপেই আছি, তবু মনে হচ্ছে জোচ্চোর হলে, মোটঘাট পাচার করবার তালে থাকলে এই যে গাঢ় নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লাম এতে তো খুশীই হওয়ার কথা ওর। কণ্ঠস্বরে তো তা মনে হয় না মোটেই। তারপর দেখলামও।

প্রগাঢ় ঘুমের নিঃশ্বাসের মধ্যে একবার খুব সন্তর্পণে বাঁ চোখের কোণটা একটু ফাঁক করে দেখলাম লাঠির পেতল-বাঁধানো মাথাটার ওপর দুটো হাত চেপে, তার ওপর চিবুকটা চেপে চুপ করে মুখ নীচু করে বসে আছে বেচারী। যেন কী মারাত্মক ভুলই একটা করে বসেছে, যার জন্যে জীবনের একটা কত বড় সুযোগ চিরদিনের জন্যে হাতছাড়া হ'য়ে গেল।

সুযোগটা হতে পারে কী? কিছু বলত আমায় যার জন্যে জমি তোয়ের করছিল? উভয়ের পক্ষেই কোনরকম ভালো প্রস্তাব? তাও তো হতে পারে...

থাক, আর বাজে ভাবনা ভাবতে পারি না। তা ভিন্ন বা ক'রে ফেলেছি, ক'রেই

ফেলেছি, আর জেগে ওঠাও তো চলবে না এত তাড়াতাড়ি অত গভীর নিদ্রা থেকে। ঘুমের নিদ্রা, এত তাড়াতাড়ি ভেঙে যাওয়াও তো স্বাভাবিকও নয়।

"শুনছেন মশাই?"

আমাকে রামসিংহাসন নয়, রামসিংহাসনকেই অন্য কে একজন ডাকছে।

"কি, বলুন না।"—উত্তর করল। স্বরটা খুব গম্ভীর।

"একবার লোকটাকে ডেকে দেবেন? আমিও এক শিশি নিতুম তা হলে।"

কোন উত্তর নেই।

"বড় একটা শিশিই নিতুম।"

"আমিও তা হলে নিতুম এক শিশি।"—আর একজন।

একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল রামসিংহাসন। লাঠিসুদ্ধ হাত নেড়ে বেশ গলা ছেড়েই বলে উঠল—"তা নেবেন তো নিন গে না মশাই—বড় নিন, ছোট নিন, মাঝারি নিন, আমার তার সঙ্গে কি সম্পর্ক? ভালো বিপদ তো। আপনারা ওষুধ নেবেন, আমায় ডেকে ডেকে নিয়ে আসতে হবে? আমি যেন সমস্ত গাড়িটার ঘুম পাড়াবার ঠিকে নিয়েছি!"

"হঠাৎ এত চটে উঠলেন কেন? দেখলুম আপনার সঙ্গে যেন জানাশোনা—তাই..."

"জানাশোনা আমার মজঃফরপুরের অমুক অমুক বাবুর সঙ্গে আছে (বড় বড় দুজনের নাম করল), পাটনার অমুক অমুক বাবুর সঙ্গে আছে, কলকাতার অমুক অমুক শেঠের সঙ্গে আছে, বলতে চান সবাইকে ডেকে একাট্ঠা করা আপনাদের জন্যে?"

ভয়ানক চটেছে, ঝাঁউ ঝাঁউ করে শব্দ উঠছে গাড়ির আওয়াজের ওপর।

"ওর মানে এই হলো?"

"আর কি হতে পারে আপনিই বলুন। আপনার দরকার থাকে আপনি নেমে গিয়ে ডেকে আনুন। আমার সম্বন্ধী না ভায়রা-ভাই ও শালা যে, আমি তোয়াজ করে ডেকে না নিয়ে এলে আসবে না। আর যদি বলেন তো আমি নামলে তো ওকে পুলিসের হাতেই দেব আগে।"

"ওর অপরাধটা কি, হ্যাঁ মশাই?"—বেশ ব্যঙ্গের টোনে প্রশ্ন বোধ হয় দ্বিতীয় লোকটার, যে বলেছিল সেও এক শিশি নিতে চায়।

"অপরাধ!—জোচ্চোর—খুনে। কি বিষ দিল ওষুধ বলে, ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে ঢুলে নেতিয়ে পড়লেন। কোথায় যাচ্ছেন, কোথায় গিয়ে উঠবেন কিছু ঠিক নেই। গোখরো সাপের বিষও এত তাড়াতাড়ি কাজ করে না। মোটে আর উঠবেন কিনা তারই বা ঠিক কি? আপনি বলছেন—অপরাধটা কি! তাজ্জব ব্যাপার আপনাদের!"

ভীষণ খাপ্পা হয়ে উঠেছে একেবারে।

হাসি পাচ্ছে ভয়ানক, এত দুঃখের মধ্যেও; হাসি জিনিসটা বাধা পেলেই আরও অবাধ্য হয়ে ওঠে তো। ভয় হচ্ছে চালটা ফাঁস না হয়ে যায় আমার; লজ্জাও তো একটা।

না হয় এই চেঁচামেচির অজুহাতেই পড়ি উঠে?

একটি ভদ্রলোক থামিয়ে দিলেন ওদের। বললেন—"আপনারা একটু চুপ করলে ভালো হয়। আমার মনে হয় ওষুধটা যেমন বিষও নয় তেমনি যতটা গুণের মনে করছেন ততটাও নয় আবার। ভদ্রলোক এমনি খুব ক্লান্ত ছিলেন বলে মনে হচ্ছিল আমার যেন। এসব ওষুধ তো আর কিছুই নয়—পিপারমেণ্ট, মেন্থল এই সব দিয়ে তৈরী—একটা ঠাণ্ডার ভাব সদ্য সদ্য এনে দেয়—তারপর গাড়ির হাওয়াটা রয়েছে—ঘুমিয়ে পড়েছেন—"

"আর কোথায় নামবার, যদি ঠেলে গিয়ে আর এক স্টেশনে ওঠেন,—তখন?"—রামসিংহাসনেরই প্রশ্ন, তবে অনেকটা খাদে নেমে এসেছে, যদিও ব্যঙ্গের রেশ একটু লেগেই রয়েছে।

"মনে হয় সে রকম ভয় নেই কিছু।"—অন্য একজন বলছেন বলে মনে হচ্ছে—"বাঙালী মানুষ, এসব স্টেশনে না নামাই সম্ভব। নামতে হাজীপুর, সোনপুরে কিংবা হয়তো পাটনাতেই যাবেন। আমিও পাটনায় যাচ্ছি, হাজীপুরেই না হয় একবার তুলে জিগ্যেস করে নিলেই হবে।"

"যদি উত্তর পান।"—সেই একটু ব্যঙ্গের রেশ।

"না, না, তেমন কিছু নয়। আপনি আবার বাড়াবাড়ি ভয় পেয়ে গেছেন।"—একটু লঘুভাবেই উঠলেন ভদ্রলোক, বললেন—"কি সম্বন্ধ আপনার সঙ্গে ও'র?"

"সম্বন্ধ আর কি থাকবে! উনি দেখছেন বাঙালী, আপনাদের সঙ্গেও যেমন আমার সঙ্গেও তেমনি। তবে এক সঙ্গে যাচ্ছি গল্প করতে করতে..."

"যাবেন কোথায় আপনারা?"

"আমি যাব সোনপুর পর্যন্ত।"

"আর উনি?"

"পাটনা।"

মুখ ফসকেই বেরিয়ে পড়েছে কথাটা; সামলে নিয়ে বলল—"বোধ হয়। ঐ রকম যেন একবার বললেন।"

"তা হলে ঐ। একটু ঘুমুতে দিন। সত্যিই যেন বিশেষ ক্লান্ত রয়েছেন।"

(ক্রমশ)
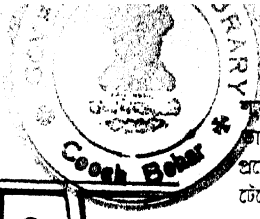
(২৮)

লিণ্ডসে হোপের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে যে রহস্য নাটকের শুরু হয়েছিল তার উপর যবনিকা পড়ল প্রায় দু সপ্তাহ বাদে যেদিন তামাটে রঙের ছ' ফুট লম্বা জর্জ শেরউড্ স্বেচ্ছায় গিয়ে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করল লিণ্ডসে হোপের হত্যাকারী হিসেবে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল এলিজাবেথ আর সৌরেন, খুশী হল দোকানের কর্মচারীরা যাদের মধ্যে অনেককেই পুলিস জেরা করে করে অস্থির করে তুলেছিল।

জর্জ শেরউডের জবানবন্দী থেকে হত্যা-রহস্যের মীমাংসা হলেও যেসব পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হল, তার সমাধান করা একরকম দুঃসাধ্য বলেই মনে হল সকলের কাছে। জর্জ লিণ্ডসে হোপের যে ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছে তা পড়লে মনে হয় লিণ্ডসে হোপ শুধু ধূর্ত ব্যবসাদার নয়, সে একজন শয়তানের অনুচর। তার ফ্যাশান হাউসের যেসব সুন্দরী মেয়েদের রাখা হয়েছিল মডেল হিসেবে তারা দোকানের জন্যে শুধু খদ্দেরই যোগাড় করত না, রাত্রি কাটাবার মত পয়সাওয়ালা মক্কেলও খুঁজে নিত তাদের মধ্যে থেকে। সেটাও ছিল লিণ্ডসে হোপের ব্যবসার একটা অঙ্গ। এর জন্যে সে লণ্ডনের বুকের উপর দু'খানা ফ্ল্যাট রেখেছিল, মেয়েদের সঙ্গে সময় ঠিক করে নিয়ে বহু বিখ্যাত ধনীই রাত্রি কাটাতে যেতেন এইসব ফ্ল্যাটে। এর থেকে লিণ্ডসে হোপের রোজগারও ছিল প্রচুর এবং তার জন্যে নিত্যনতুন সুন্দরীদের আমদানি করত দেশবিদেশ থেকে।

জর্জ শেরউডের ছবি কাগজে দেখে সৌরেন চমকে উঠল, লিজি, এ ভদ্রলোককে আমি আগে দেখেছি।

এলিজাবেথও কম বিস্মিত হল না, কোথায়?

—তোমার কাকার দোকানে।

—কবে?

যেদিন প্রথম আমরা গিয়েছিলাম ওঁর সঙ্গে দেখা করতে, মনে আছে এই ভদ্রলোক কাউণ্টারের কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করছিল লিণ্ডসে হোপের সঙ্গে দেখা করবে বলে।

—তারপর?

সৌরেন একাগ্রমনে ভাববার চেষ্টা করে, দোকানের কর্মচারীরা ওকে দেখা করতে দিল না। ভদ্রলোক রেগেমেগে চলে গেল, যতদূর মনে পড়ছে যাবার সময় বেশ শাসিয়ে বলেও গেল, লিণ্ডসে হোপের ফ্ল্যাটে গিয়েই সে দেখা করবে।

সৌরেনের অনুমান মিথ্যে নয়। জর্জ শেরউড্ সত্যিই সেদিন লিণ্ডসে ফ্যাশান হাউসে গিয়েছিল একটা কিছু হেস্তনেস্ত করতে। শেরউড সাধারণ গৃহস্থ মানুষ, কাজ হল বিলিতী ওষুধ ক্যানভাস করে বেড়ানো। ইংলণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ওকে ঘুরে বেড়াতেই হয়, তা ছাড়া দরকার পড়লে ফ্রান্স, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ডেও পাড়ি দিতে হয় হামেশা। বাড়িতে তার সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, এডিথ, বয়েস ত্রিশ। দশ বছর তারা সুখে দাম্পত্যজীবন কাটিয়েছে, আট বছরের একটি ছেলে। মাস কয়েক আগে, জর্জ তখন ফ্রান্সে, এডিথ চিঠি লিখল লিণ্ডসে ফ্যাশান হাউসে সে একটি কাজ পেয়েছে, নেবে কি না। প্রথমে জর্জ অনুমতি দেয়নি, কিন্তু পরে এডিথের পীড়াপীড়িতে সম্মতি দিতে সে বাধ্য হয়।

প্যারিস থেকে ফিরে এসে জর্জের মনে হল এডিথ এই ক' মাস কাজ করে অনেকখানি বদলে গেছে, আগের মত সংসারে তার মন নেই ছেলেকে যত্ন করে না, তা ছাড়া টাকা খরচা করছে একটু বেশী মাত্রায়।

জর্জ এ নিয়ে ঠাট্টা করে বলেছিল, সবই যদি খরচা কর তবে আর রোজগার করে কি লাভ?

এডিথ সহাস্যে উত্তর দিয়েছে, আর কটা মাস যেতে দাও, দেখবে আমি কত বেশী রোজগার করি। আমাদের মালিক বড় চমৎকার লোক, যে ভালো কাজ করে, তার যাতে উন্নতি হয় সেদিকে সব সময় লক্ষ্য রাখেন।

—কি যেন নাম?

—লিণ্ডসে হোপ।

এই প্রথম শেরউড লিণ্ডসের নাম শুনলো তার স্ত্রীর মুখে, কিন্তু তখন ভাবতেও পারেনি এই মানুষটাই প্রতিদিন প্রলোভন দেখিয়ে এডিথকে ক্রমশ পাপের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

অবশ্য অসৎ পথে চলার লক্ষণগুলো চাপা রইলো না, প্রকট হয়ে উঠল। শুধু এডিথের জীবনে নয়, তাদের এতদিনের সুখের সংসারে। শুধু হল স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কথা কাটকাটি। ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি। আর এতটুকু শান্তি রইলো না ওদের জীবনে। চোখের সামনে ছেলেটা ক্ষয়ে যেতে
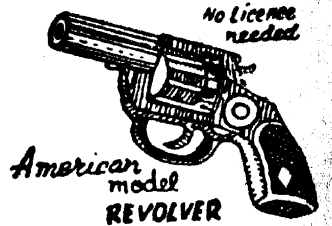
লাগলো, কোন বাবার পক্ষেই এসব সহ্য করা সম্ভব নয়। তাই রাগের মাথায় জর্জ একদিন এডিথকে জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কি চাও? কেন এভাবে আমাদের সংসারটা ভেঙে দিচ্ছ?

স্বামীর এ কঠিন উক্তিকেও এডিথ গায়ে মাখল না, ব্যবহারিক গলায় বলল, আমার তো মনে হয় না, আমি অন্যায় কিছু করছি।

—তুমি কি বুঝতে পারছ না ছেলেটা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে?

এডিথ তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে, তোমারও তো ছেলে, তুমি দেখলেই তো পার। এ উত্তর শুনে জর্জ বিমূঢ় হয়ে যায়, আস্তে আস্তে আস্তে বলে, বিয়ের পর থেকেই দশ বছর আমরা এই বাড়িতে বাস করছি। পাড়ার সবাই ঈর্ষা করত, আমাদের এই সুখী, সুস্থ জীবনের দিকে তাকিয়ে। অথচ আজ—

এডিথ কঠিন স্বরে পদপূরণ করে, বাড়িতে থাকতে এক মিনিটও আমার ভাল

লাগে না। ভগবান জানে কবে আমি এখান থেকে মুক্তি পাব।

জর্জ স্ত্রীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে স্থির গলায় প্রশ্ন করে, সত্যি তুমি মুক্তি চাও?

—হ্যাঁ, চাই।

স্বামীকে এতখানি রূঢ়ভাবে আঘাত করতে এডিথ এতটুকু দ্বিধাবোধ করল না। দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে জর্জ শেরউড সেদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল, এ সবই কি লিণ্ডসে হোপের জন্যে? ঐ শয়তানটার কি শরীরে এতটুকু দয়া মায়া নেই, জন্তুর বেহদ্দ ঐ বুড়োটা।

এডিথ উত্তেজিত স্বরে বলে, দোহাই তোমার, ওরকম ছোটলোকী ভাষায় কথা বলো না। লিণ্ডসে হোপকে আমি ভালবাসি।

এ ঘটনার পরদিন জর্জ শেরউডের সুইজারল্যাণ্ড যাবার কথা। লিণ্ডসে হোপকে টেলিফোন করে দেখা করল কোন এক রেস্তরাঁয়। লিণ্ডসে হোপ উদ্ধত প্রকৃতির মানুষ, জর্জকে সে আমলই দিতে চাইল না। শেরউড ধরা গলায় বলেছিল, আমার স্ত্রীকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসি। আমাদের জীবনটা আপনি নষ্ট করে দেবেন না।

লিণ্ডসে হোপ যেন আকাশ থেকে পড়লো, তোমাদের জীবনকে আমি নষ্ট করত যাবো কেন?

—আমার স্ত্রী এডিথ আপনাকে ভালবাসে।

—আমি তার কি করবো, আমি নিজে তো আর তাকে ভালবাসিনি।

জর্জ শেরউড যতদূর সম্ভব নিজেকে সংযত করে বলেছে, আপনি বুঝতে পারছেন না। শুধু এই কারণে আজ আমার ঘর ভেঙে যাচ্ছে।

লিণ্ডসে হোপ কপট সহানুভূতি দেখায়, সেজন্যে আমি দুঃখিত।

—আমার ছেলেটা অযত্নে অবহেলায় কি রকম যেন, জর্জ কথা শেষ করতে পারে না।

—আমি বুঝতে পারছি না, কেন এসব কথা আমায় বলতে এসেছ। যদি ভেবে থাক এর জন্যে আমি তোমাকে টাকা দেব তা হলে ভুল করেছ। তবে হ্যাঁ, এডিথ যদি তোমার ছেলের ভরণপোষণের জন্য কোন টাকা দিতে চায় আমি তার ব্যবস্থা করে দেব।

জর্জ দাঁত কড়মড় করে বলে, ঐ পাপের পয়সায় আমি থুথু দিই।

সদম্ভে সে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে আসে, এডিথকে এ বিষয়ে কোন কথা না জানিয়ে সোজা চলে যায় সুইজারল্যাণ্ড। সেখানে সে পিস্তল কেনে, ফিরে এসে শোনে এডিথ আজকাল বেশীর ভাগ রাত কাটাচ্ছে লিণ্ডসে হোপের সঙ্গে। ছেলেকে নিয়ে গেছে জর্জের বোন। এর পর আর মাথার ঠিক রাখতে পারেনি জর্জ শেরউড। কয়েকবার সে চেষ্টা করেছিল লিণ্ডসে হোপের সঙ্গে দেখা করতে, কিন্তু সুযোগ পায়নি।

অবশেষে একদিন ঝিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে লিণ্ডসে হোপের ফ্ল্যাটে সে তার মুখোমুখি দাঁড়াল। যার জন্যে সে তার বউকে হারিয়েছে, তার মুখ থেকে কোন যুক্তিই সে শুনতে চাইল না, পর পর তিনবার গুলী ছুঁড়ে সে নিজের হাতে শাস্তি দিল শয়তানকে।

প্রথমে সে সংকল্প করেছিল লিণ্ডসে হোপকে খুন করে সে পুলিসের কাছে ধরা দেবে, কিন্তু পারল না। তার মনের কোণে একটা ক্ষীণ আশা দেখা দিয়েছিল প্রৌঢ় লিণ্ডসে হোপকে সে যখন সরিয়ে ফেলতে পেরেছে হয়ত এডিথ আবার আগের মত তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে রাজী হবে। তাই এ দু সপ্তাহ সে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেও এডিথের সঙ্গে দেখা করেছে, তাকে বোঝাবারও চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। যেদিন জর্জ বুঝতে পারল এডিথকে আর ফেরানো সম্ভব নয়, সে এখন দেহপসারিণীর পর্যায়ে নেমে গেছে, আর কালবিলম্ব না করে পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

এখন তার কেস চলছে, রায় কি বেরবে কে বলতে পারে। সাধারণ নিয়মে খুনের দায়ে তার অভিযুক্ত হবার কথা, কিন্তু একটা কথা যা নাড়া দিয়েছে বিচারক আর জুরীদের মন তা হলো জর্জের অবিচলিত প্রেম এডিথের প্রতি। বার বার করে সে কোর্টের সকলের কাছে আবেদন করেছে, তোমরা আমার মৃত্যুদণ্ড দাও, এত চেষ্টা করেও যখন এডিথকে ফিরে পেলাম না, আর এই বয়েসে একলা বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই।

জর্জ শেরউডের চরিত্র শুধু বিচারকদেরই বিস্মিত করেনি তা অভিভূত করেছে জনসাধারণকে। তার জন্যে সমবেদনা জানিয়েছে দেশের যুবক মহল, তার হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছে বিবাহিতা মেয়েরা।

এলিজাবেথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেছে, জর্জ শেরউড আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে, তা না হলে কে বলতে পারে কাকার কথায় রাজী হয়ে আমরাও হয়ত অজান্তে ওর এই পাপ ব্যবসার মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়তাম।

সৌরেন মাথা চুলকে বলে, আমি একটা কথা বুঝতে পারি না, তোমার কাকা হঠাৎ বুড়ো বয়েসে তোমার বাবাকে অংশীদার হিসেবে নিতে চেয়েছিলেন কেন?

—আমার মনে হয় কাকা অতি ধূর্ত লোক ছিলেন, তিনি বুঝতে পারেন তাঁর এই পাপ ব্যবসার কথা আর গোপন নেই, অনেকেই জেনে গেছে। হয়ত একদিন পুলিসের নজর পড়বে তাই চেয়েছিলেন বাবাকে এবং সেই সঙ্গে আমাদের ওঁর ফার্মে ঢুকিয়ে ফেলতে। আমাদের গাঁয়ে বাবার সম্মান খুব, সকলেই জানে তিনি সত্যনিষ্ঠ ধর্ম-

জীব মানুষ। তাই কাকা ভেবেছিলেন আমার নামটাও এ সংগে যুক্ত থাকলে কেউ আর তাঁকে সন্দেহ করার সাহস পাবে না।

সোরেন সায় দিয়ে বলে, তুমি ঠিক ধরেছ লিজি, আমারও এখন তাই মনে হচ্ছে।

এলিজাবেথ সোরেনের গলাটা জড়িয়ে ধরে গাঢ়স্বরে বলে, তুমি না থাকলে আমি কি করতাম সোরেন?

—কি আবার করতে, কাজ করতে, খেতে, ঘুমোতে।

এলিজাবেথ আবদেরে সুরে বলে, তাও বোধ হয় আমি পারতাম না সোরেন। সত্যি, শুধু তোমার জন্যে এত বড় বিপদের মধ্যে পড়েও আমি এতটুকু বিচলিত হইনি। তোমার মাথাটা আশ্চর্য রকম ঠান্ডা।

—শেষ পর্যন্ত রাখতে পারি, তবে তো।

এলিজাবেথ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায়, আমি জানি, তুমি পারবে। একটু থেমে বলে, আমার জীবনে এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা, সত্যিই যদি কাকার ব্যবসায় যোগ দিতাম, হয় ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোথায় ভেসে যেতাম কে বলতে পারে। শুনেছি টাকা মানুষের লোভ ক্রমশ বাড়িয়ে দেয়, আমিও হয়ত লোভী হয়ে পড়তাম। ভগবানকে ধন্যবাদ তিনি আমাকে এই সব কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন নি। শুধু তাই নয়, তোমাকে চিনিয়ে দিলেন কত সহজে।

সোরেন সায় দিয়ে বলে, সে কথা আমিও ভাবি। সাধারণ বন্ধুত্ব মামুলি আলাপ তারই মধ্যে থেকে কি ভাবে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কেমন করে প্রেম এসে বাসা বাঁধে, আগে থেকে কেউ বুঝতে পারে না।

—আমি আরও খুশী হয়েছি এ জন্যে, তোমাকে বাবার খুব ভালো লেগেছে, সত্যি কথা বলতে কি ভারতীয়দের সম্বন্ধে আগে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না।

এলিজাবেথের বাবা চার্লস্ হোপ্ ভাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে দুদিনের জন্যে এসেছিলেন লণ্ডনে, সেই সময় এলিজাবেথ সোরেনের সংগে তাঁর আলাপ করিয়ে দেয়। ভদ্রলোক শান্ত প্রকৃতির মানুষ, গ্রাম্য জীবনের সরলতাকে তিনি ভালবাসেন। শহরের চাকচিক্যে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। সোরেনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিলেন, এদিকের ঝামেলা চুকলে লিজিকে নিয়ে আমাদের গ্রামের বাড়িতে এস, ইংলণ্ডকে যদি দেখতে চাও তার গ্রামকে না দেখলে কোন দেখাই হবে না।

সোরেন সানন্দে জানিয়েছে, প্রথম সুযোগেই আমি আপনার আমন্ত্রণ গ্রহণ করব।

বৃদ্ধ মুখে পাইপ ধরিয়ে বলেন, আরও এইজন্যে বলছি, তোমরা বিদেশী, দোহাই তোমাদের, লণ্ডন দেখে ইংরাজকে বিচার করো না। প্যারির নাগরিক জীবন দেখে ফ্রান্সের কথা ভেবো না। রোমকে ইতালী ভাবলেও সেই ভুল করবে।

সোরেন তাকে বুঝিয়ে বলেছে, এ কথা আমাদের দেশ সম্বন্ধেও ত খাটে মিঃ হোপ্। কলকাতা, দিল্লি, বম্বে, মাদ্রাজ দেখে যাঁরা মনে করেন ভারতবর্ষকে বুঝতে পেরেছেন তারাও সেই একই ভুল করেন।

সোরেনের সংগে আলাপ করে যে চার্লস হোপ্ খুশী হয়েছিলেন তা বোঝা গেল শেষের দিন ট্রেনে ওঠার সময়, যখন তিনি সোরেনের কাঁধে হাত রেখে গাঢ় স্বরে বলে গেলেন, ইয়ংম্যান, তোমার সংগে আমি আরও পরিচিত হতে চাই। এলিজাবেথ তোমার সম্বন্ধে যা যা বলে আমি এ দু দিনে মিলিয়ে দেখলাম ওর সব কথাগুলোই খাঁটি।

চার্লস হোপ চলে যাবার পর থেকে সোরেন লক্ষ্য করেছে এলিজাবেথ যেন আরও প্রাণখোলা আরও সহজ হয়ে নিজেকে ধরা দিয়েছে সোরেনের কাছে। পিতার সমর্থন পাবার পর আর তার মনে কোনরকম সংশয় নেই।

তাই আজ যখন সোরেন এক সময় আবেগ-ভরা গলায় বলল, আমার ভয় হয় যদি আমি তোমায় সুখী করতে না পারি।

এলিজাবেথ তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে একেবারে কাছটিতে বসে সোরেনকে নিবিড় আলিঙ্গনে নিজের কাছে টেনে নিল। চোখের উপর চোখ রেখে মধুর স্বরে বলল, সুখী আমরা হবই সোরেন, আমি যা চেয়েছিলাম তোমার মধ্যে আমি তা পেয়েছি।

অনেক দিন পরে সোরেন আজ নিশ্চিন্ত মনে অফিসে বসে কাজ করছে। এলিজাবেথের ঝামেলা চুকেছে। আর ওকে পুলিস স্টেশনে দৌড়তে হয় না। এ কদিন প্রায় রোজই অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হয়েছে এলিজাবেথের জন্যে। সে কারণ টেবিলে কিছু কাজও জমা হয়েছিল। আজ অফিসে বসে সোরেন পুরনো কাজের কাগজ-পত্রগুলো ঘাঁটছিল।

এমন সময় উপরওয়ালা পাঞ্জাবী অফিসার এসে হাজির, জানালেন দু'খানা দরকারী
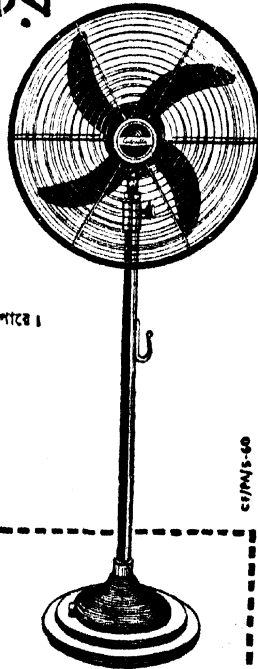
ফাইল নিয়ে এখুনি তাঁর ঘরে যাবার জন্যে।

কাজটা সোরেনের নয়, জ্যাক ব্রেন্টের। কিন্তু তখনও জ্যাক ব্রেন্ট অফিসে আসেনি তাই তার টেবিলের দেরাজ খুলে সোরেন ফাইল দুটো বার করল। কিন্তু তাতেও কাজের বিশেষ সুবিধে হল না। সোরেন ফোন করল জ্যাককে।

জ্যাক ব্রেন্ট বাড়িতেই ছিল। ফোন পেয়ে সে ঘাবড়ে গেল, বললে, কি সর্বনাশ বল ত, আজই বস্ আমার খবর করলেন!

সোরেন পালটা প্রশ্ন করে, কি ব্যাপার জ্যাক, শরীর খারাপ নাকি?

—না, শরীর ঠিক আছে। আমি এখুনি অফিসে আসছি। নিজেই ফাইল নিয়ে 'বসে'র টেবিলে যাব।

—দেরি হয়ে যাবে না তো?

—আমি ট্যাক্সি নিচ্ছি।

সোরেন বরাবর দেখেছে জ্যাক্ ব্রেন্টের কর্তব্যজ্ঞান খুব। সহজে সে কাজে ফাঁকি দেয় না, নিশ্চয় কোন অসুবিধায় পড়ে সকালের দিকে আসতে পারেনি।

মিনিট দশের মধ্যে হন্তদন্ত হয়ে জ্যাক ব্রেণ্ট সোরেনদের অফিস ঘরে ঢুকল। বেচারী একেবারে হাঁফাতে হাঁফাতে এসেছে। টাই-এর গিটটা ঢিলে চুল উস্কখুস্ক, ছোঁ মেরে সোরেনের টেবিল থেকে ফাইল দুটো নিয়ে চলে গেল পাঞ্জাবী অফিসারের ঘরে।

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে জ্যাক ব্রেণ্ট টেবিলে ফিরে এল। মুখে তার প্রসন্ন হাসি। চেয়ারে বসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, ভাগ্যিস তুমি ফোন করেছিলে লাহিড়ী, তা না হলে আমি খুব বিপদে পড়তাম।

সোরেন কাজ করতে করতেই বলে, হাঙ্গামা মিটেছে তা হলে।

অফিসেরটা মিটিয়েছি, কিন্তু বাড়ির হাঙ্গামা আর মিটল কই?

সোরেন ঘাড় ফেরায়, আবার কি হলো?

—আমার গুণধর ভাই রবার্ট কোথায় বুঝি মারামারি করেছে, পুলিসে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়েছিল। রেফারেন্সে দয়া করে তিনি আমার নামটি দিয়ে দিয়েছেন। কি বিপদ বলো ত?

সোরেন নিজের মনেই মাথা নাড়ে, সত্যি, তোমার ভাইটি একটি চীজ্।

জ্যাক দাঁতে দাঁত ঘষে, তা আর আমি জানি না।

—মারামারি কি নিয়ে?

—সে কথা বলতেও আমার লজ্জা করছে।

সোরেন হাসল, কেন, নারীঘটিত বুঝি?

—তা হলে তো বলতে লজ্জা করত না।

—তবে?

জ্যাক ব্রেণ্ট একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, আমাদের পাড়ায় বেশ কিছু জ্যামেইকান লোক বাস করে। এরা এসেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে। ওদেরই সঙ্গে রবার্টদের দলের ঝগড়া হয়েছে।

সোরেন বিস্মিত হয়ে বলে, আশ্চর্য। এতদিন লণ্ডনে আছি, এ রকম মারামারির কথা তো কখনও শুনিনি।

—হ্যাঁ, লণ্ডনে আজকাল এ এক নতুন বিপত্তি শুরু হয়েছে। কালো আর সাদা চামড়ার ঝগড়া।

—কিন্তু কারণ কি

জ্যাক্ ব্রেণ্ট দৃঢ়স্বরে বলে, কারণ যদিও বা থাকে, এ অন্যায়। যেরকম করে হোক, এ উত্তেজনাকে থামাতে হবে। শহরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে দিলে আমরা ভুল করব।

জ্যাকের কথার গাম্ভীর্য সোরেনকে নাড়া দিল, কেন, তোমার কি মনে হয় এ হাঙ্গামা আরও বাড়বে?

—কি জানি, বুঝতে পারছি না।

জ্যাক্ ব্রেণ্টের ডাক এল বস্-এর কাছ থেকে। সে উঠে চলে গেল। এ প্রসঙ্গও চাপা পড়ে গেল সেদিনের মত। সোরেনের হাতেও অনেক কাজ, সেগুলো শেষ না করে কথা বলার তার সময় কোথায়?

কতক্ষণ এক মনে সোরেন কাজ করেছে, খেয়াল ছিল না। এক সুদর্শন ভদ্রলোক এলেন, তার পাসপোর্টে এনডোর্সমেন্টের জন্যে।

সোরেন তাকে চেয়ারে বসিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার নাম?

ভদ্রলোক চালচলনে বেশ কেতাদুরস্ত, নিখুঁত সাজপোশাক। পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে দিলেন, তাতে লেখা হারীন সোম। সেই সঙ্গে তাঁর ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নাম।

—কোন্ দেশের এনডোর্সমেণ্ট দরকার?

হারীন সোম পকেট থেকে পাসপোর্ট বার করলেন, জার্মানী। ওখানে যাবার কোন কথা ছিল না, কিন্তু এখানে এসে দেখছি না গেলেই নয়। ওদের সঙ্গে ব্যবসা করার সুযোগ এসেছে।

—কবে যাবেন?

—দিন পনেরর মধ্যে।

সোরেন ছাপা ফরম্ এগিয়ে দেয়, আপনি এগুলো ভর্তি করে দিন, আমি চেষ্টা করব যাতে আপনি তাড়াতাড়ি এনডোর্সমেণ্ট পেয়ে যান।

হারীন সোম ফরমের উপর নাম ঠিকানা লিখতে শুরু করে, সোরেন সেইদিকে তাকিয়ে থাকে। ভদ্রলোকের মুখখানা যেন চেনা চেনা মনে হয়। জিজ্ঞেস করে, আপনাকে কি আগে কোথাও দেখেছি? কতদিন এসেছেন লণ্ডনে?

—মাত্র এক সপ্তাহ।

—কোথায় উঠেছেন?

—স্ট্র্যাণ্ডে।

স্ট্র্যাণ্ডের নাম শুনে সোরেনের মনে পড়ে যায় সোম সাহেবের কথা। বলে, কিছুদিন আগে একজন মিঃ সোমের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনিও ঐ হোটেলে উঠেছিলেন, জানি না আপনার কোন আত্মীয় কিনা।

হারীন মুখ তুলে হাসল, আমার দাদা।

—উনি এখন কোথায়?

—বোধ হয় কলকাতায় ফিরে গেছেন। কণ্টিনেণ্ট হয়ে দাদার দেশে ফেরার কথা। আমি করাচী ঘুরে এলাম কি না, তাই দেখা হয় নি।

সোরেনও হাসল, আপনারা ভাগ্যবান, কেমন দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

—শুধু ঘুরে বেড়াতে পারলে অবশ্য খুশী হতাম, এত কাজের বোঝা থাকে নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাই না।

কিছুক্ষণ পরে ধন্যবাদ জানিয়ে হারীন সোম চলে গেল। কেন জানা নেই তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে সৌরেনের হাসি পেল। বোধ হয় মনে পড়ল সোম সাহেবের কথা। সেদিন রাত্রে মলিনা দাসের ফ্ল্যাটে যে অবস্থায় তাকে দেখেছিল, তা ভেবে সৌরেন কৌতুক বোধ করল। হারীন বলে গেল, সোমসাহেব কলকাতায় ফিরে গেছে, মলিনা দাসও তার সঙ্গে চলে গেল নাকি? হয়ত বা ফিরে এসেছে লণ্ডনে। একবার টেলিফোন করে দেখলে হয়। সে রাত্রে মলিনা দাসের কাছ থেকে পালিয়ে আসার পর মনের মধ্যে যে সঙ্কোচ জমা হয়েছিল, এক সপ্তাহের ব্যবধানে তার তীব্রতা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। তাই সাহস করে সে টেলিফোনের নম্বর চাইল।

তখনও লাঞ্চে বেরবার সময় হয়নি, অন্য দিক থেকে মলিনা দাসের মিষ্টি কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

সৌরেন আস্তে আস্তে বলে, তুমি কবে ফিরলে মলিদি? আমি সৌরেন কথা বলছি।

—কি'ছেলে রে তুই? কোথায় ডুব মেরেছিলি? একটা খোঁজ খবর নেই।

এত সহজভাবে মলিনা দাস কথা বলল, শুনে কে বলবে এদের মধ্যে কোনরকম মনোমালিন্য হয়েছিল।

সৌরেন সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, বাঃ, তুমিই তো হঠাৎ না বলে কয়ে প্যারিসে চলে গেলে।

মলিনা দাস খিলখিল করে হাসে, কার সঙ্গে গিয়েছিলাম জানিস তো?

—জানি, সোমসাহেব।

—কি, হিংসে হচ্ছে বুঝি?

সৌরেন ইচ্ছে করে রসিকতা করে, তা একটু হচ্ছে বইকি।

—দুঃখ করতে হবে না, কাল বিকেলে আয় না, মাছ রেঁধে খাওয়াব।

—সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু একলা যাব?

মলিনা দাসের গলায় ঈষৎ শ্লেষ ফুটে ওঠে, দোকলাটি কে? সেই এলিজাবেথ?

—হ্যাঁ, যদি অবশ্য তোমার আপত্তি না থাকে।

—না, আপত্তি নেই, তবে—

মলিনা দাসকে থামতে দেখে সৌরেন জিজ্ঞেস করে, কি তবে?

—কাল বরং তুই একলাই আয়। অনেক কথা আছে। মেম সাহেবের সামনে সারাক্ষণ ইংরিজীতে বকর বকর করতে ভাল লাগবে না। একটু থেমে বলে, ভয় নেই, তোর চরিত্র নষ্ট হবে না।

সৌরেনও হাসল, ঠিক আছে, আমি অফিস থেকে সোজা যাব। ওহো, তোমায় বলতে ভুলে গেছি, সোম সাহেবের ছোট ভাই এসেছে লণ্ডন।

মলিনা দাস কৌতূহল প্রকাশ করে, কে, হারীন?

—হ্যাঁ।

—ওর আসবার কথা আছে শুনেছিলাম। উঠেছে কোথায়?

—স্ট্র্যাণ্ডে।

—ঠিক আছে। কাল তা হলে তোর সঙ্গে দেখা হবে, বাই বাই।

—বাই বাই।

সৌরেন টেলিফোনটা নামিয়ে রাখে, চোখের সামনে তার মলিনা দাসের দুষ্টুমি-ভরা মুখখানা ভেসে ওঠে।

(ক্রমশ)

রচনাবলী

হরপ্রসাদ-রচনাবলী। ২য় সম্ভার। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ঈস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী। ৬৪এ, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। দাম প্রতি খণ্ড পনরো টাকা।

আধুনিক ভারতবর্ষে পুরাতত্ত্বের আলোচনায় ভারতীয়দের মধ্যে পথিকৃৎ ছিলেন মনীষী রাজেন্দ্রলাল মিত্র। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি নামক যে বিষয়টি একালে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে রাজেন্দ্রলাল ও হরপ্রসাদ তার ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছেন। এবং এ যুগের দুজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের হাতে-গড়া ছাত্র। সুনীতিকুমার বহু পরিশ্রমে গ্রন্থ সম্পাদনা করে এবং সুশীলকুমার স্বতঃপ্রণোদিত আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে তাদের গুরুঋণ কিঞ্চিৎ পরিশোধ করেছেন। একালের তরুণ শিক্ষার্থী ও গবেষকদের নিকট তা আদর্শ হয়ে বিরাজ করুক। সুনীতিকুমার বহুবিধ কাজের মধ্যে ব্যস্ত থেকেও এই রচনাবলীর প্রতি বক্তব্যের যে ভাবে টীকা ভাষ্য ও মূল্য নির্ণয় করেছেন, এ একটা আশ্চর্য সম্পাদনানিষ্ঠা রূপে স্মরণীয় হয়ে থাকল। হরপ্রসাদ যে সময়ে কাজ করছিলেন সে সময় আজকের মত এত তথ্য আবিষ্কৃত হয় নি। সেই জন্য সে সিদ্ধান্ত কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। তা' ছাড়া অনুসন্ধিৎসুরা জানেন শাস্ত্রী মহাশয় সব সময় তাঁর বক্তব্যের উৎস নির্দেশ করতেন না। এগুলি বের করে পরবর্তীকালে প্রাপ্ত তথ্য ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে তুলনা করে দেখানো

একমাত্র সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত পণ্ডিতের পক্ষেই সম্ভব।

শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনার বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, সংস্কৃত সাহিত্য, সমসাময়িক কালের নানা প্রসঙ্গ থেকে লঘু প্রবন্ধ ও উপন্যাস রচনা—সব বিষয়ে তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকিপ্রতিভার সমকালে তিনি 'বাল্মীকির জয়' রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র দুয়ের তুলনা করেছিলেন। তাঁর মেঘদূতের ব্যাখ্যা ক্লাসিক হয়ে আছে। বর্তমান খণ্ডে তাঁর সুপরিচিত রচনাগুলির মধ্যে 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে'র ভূমিকা, কীর্তিলতা (বিদ্যাপতির মূল গ্রন্থসহ) কাঞ্চনমালা, মেঘদূত স্থান পেয়েছে। সব মিলিয়ে একচল্লিশটি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ এতে সংগৃহীত হয়েছে। সাহিত্যিক হিসাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্থান বাংলা সাহিত্যে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাঁর ভাষার সরলতা ও কথ্যভঙ্গির অনুগামিতা বিস্ময়জনক। সত্যি কথা বলতে কি, এ ভাষা আর লেখা হয় না। আজকাল চলতি ভাষা নামে যে অতি প্রসাধিত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভাষা লেখা হয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষার সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায় সত্যিকার মৌখিক স্বাভাবিক ভাষা কোনটা। এ ভাষার নিজস্ব রস আছে, যা সাহিত্যের সম্পদ।

হরপ্রসাদের রচনা এইজন্যে পড়তে সহজ। ভাষার পাণ্ডিত্যে তার রচনা ভয়াবহ একেবারেই নয়। রচনাগুণের জন্য এই গুরু বিষয়ও গবেষক-ব্যতিরিক্ত অন্যান্য পাঠকদের কাছেও আকর্ষণীয় হবে। যথার্থ উচ্চতম শ্রেণীর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের এমন পরিবেশন দুর্লভ। গল্প-উপন্যাস-রম্যরচনার যুগে হরপ্রসাদ-রচনাবলী পাঠকসমাজে যদি সমাদৃত না হয়, তবে সে আমাদেরই দুর্বল শিক্ষার লক্ষণ হবে মাত্র। ২৪।৬১

রম্যরচনা

ইদানীং—পরিমল রায়। নিউ এজ পাবলিশার্স লিঃ। ২২, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা—১। সাড়ে তিন টাকা।

পরিমল রায়ের সাহিত্য-কীর্তির পরিধি নেহাতই অল্প। ইদানীং-এ সংকলিত রচনা কয়টি ছাড়া তাঁর কিছু পদ্য রচনাও আছে। এককালে 'সুবাস' নাম দিয়ে

কৌতুককর চুটকি কবিতা তিনি লিখতেন। তাঁর গদ্য রচনাগুলি যে গ্রন্থবন্ধ হয়ে আজকালকার পাঠকের গোচরে এসেছে, এতে পাঠকদেরই লাভ। লেখকের লাভ-ক্ষতি কিছুই নেই; কারণ আজ তিনি সব কিছুর বাইরে।

কোনো দার্শনিক চিন্তা নয়, কোনো অর্থনৈতিক পর্যালোচনা নয়, কোনো নৈতিক বিধান নয়—এই রচনাগুলির বিষয় আমাদের পারিপার্শ্বিক মধ্যবিত্ত সংসারের আচার-ব্যবহার, হাস্যকর অসংগতি, কৌতুক-জনক সংলাপ, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অত্যন্ত অভ্যস্ত চালচলন। এগুলি গল্প নয়, প্রবন্ধ নয়, বর্ণনা নয়, নকশার লক্ষণ থাকলেও নকশা নয়। অন্য নামের অভাবে এদের রম্য-রচনার শ্রেণীতে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। রম্য-রচনার যেসব লঘুতা এখন ধরা পড়েছে ইদানীং-এ, তার চিহ্নমাত্র নেই। অথচ এর প্রতিটি রচনাই হাসির তুবড়িবাজি। আমাদের চারপাশের মানুষ-গুলির কথাবার্তা এবং এমন সব বৈশিষ্ট্য লেখকের চোখে পড়েছে, যেগুলি মনুষ্য-প্রকৃতিরই অঙ্গ এবং সেই জন্যই লেখকের বক্তব্য জীবনের চিরন্তন গভীরতাকে স্পর্শ করে গিয়েছে। সত্যকার বিপ্লবী যে মুক্ত-দৃষ্টিতে মানুষের দিকে তাকাতে পারেন, তারই অধিকারী ছিলেন লেখক। লেখকের আবাল্যবন্ধু বুদ্ধদেব বসু ভূমিকায় লেখকের যে অসাধারণ ধীশক্তির উল্লেখ করেছেন, অর্থনীতির সুপণ্ডিত অধ্যাপক-রূপে তিনি তাঁর সেই ধীশক্তিকে শুধু সেই ক্ষেত্রেই আবদ্ধ রাখেননি—প্রাত্যহিক জীবন ও মানবচরিত্রের পর্যবেক্ষণে লেখক সেই ধীশক্তির শিল্পীজনোচিত প্রয়োগ করেছিলেন। এই শক্তি থাকলে তবেই এমন নিরাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক হওয়া সম্ভব, চলতি রম্য-রচনায় এর একান্ত অভাবের ফলে আজ রম্য-রচনার তেমন মর্যাদা নেই। ইদানীং-এর রচনায় নিঃসংশয় বাস্তব ভিত্তির দৃঢ়তা আছে। বিভিন্ন রচনায় ছোটখাট নানারকম চরিত্র এসেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই অধ্যাপকরূপে এখনও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপরিচিত। যাঁরা তাঁদের চিনতে পারবেন, এই রচনা পাঠে তাঁদের কৌতূহল এবং কৌতুক অকুণ্ঠ হাসির বেগে মুক্ত হবে। যদি কেউ চিনতে না পারেন, তাতেও কোনো ক্ষতি নেই, কারণ এই সব চরিত্র এবং পরিস্থিতি সাময়িকতাকে সম্পূর্ণ-রূপে অতিক্রম করে গিয়েছে। লেখক যে নিজেকে নিয়েও নির্মম পরিহাস করতে পারেন, এতেই বুঝতে পারা যায়, সাহিত্যে সেই পরম বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য তিনি কতখানি আয়ত্ত করেছিলেন, যার নাম অবজেক্টিভিটি। সাধু ভাষায় রম্য-রচনা আজকাল কেউ লেখেন না। ইদানীং-এর সাধু ভাষা পড়লে পাঠক বুঝবেন, কী আশ্চর্য শক্তি এ-ভাষা এখনও বহন করে। পরিমল রায়ের ইদানীং আপন গুণেই সাহিত্যে আসন স্থায়ী করে নেবে। সমালোচকের কাজ শুধু ভিড়ের মধ্যে পাঠকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটানো মাত্র। ১০১।৬১

উপন্যাস

অন্তরাল। সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সরস্বতী গ্রন্থালয়, ১৪৪, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। তিন টাকা।

শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় পাঠক-মহলে সুপরিচিত। কম-বেশি তাঁর সকল রচনাতেই একটি সহজ আন্তরিকতার স্পর্শ থাকে। কিন্তু, বর্তমান উপন্যাস (যাকে একটি কষ্টকল্পিত বড় গল্প বলাই শ্রেয়) 'অন্তরাল' পাঠকের প্রত্যাশা-পূরণে অসমর্থ। সাধারণ শ্রেণীর ছায়াচিত্রে 'নাটকীয়-গুণসমৃদ্ধ' এক ধরনের সস্তা, প্যাঁচালো

কাহিনী সচরাচর চোখে পড়ে, 'অন্তরাল' নিঃসন্দেহে সেই গোত্রীয়। যেমন লঘু এর কাহিনী, তেমনি বিন্যাসভঙ্গীও অত্যন্ত গতানুগতিক। গ্রন্থটি মূলত অমিতার—যে আপাত-দৃষ্টিতে নিঃসঙ্গ—মানসিক দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং সমাপ্তিও অমিতার দুর্ঘটনায়—মৃত্যুতে। এই দৃশ্যটিতে পৌঁছানোর জন্য মনে হয়, ক্লাইম্যাক্সের রীতি অনুযায়ী লেখক সমস্ত কাহিনীটি সাজিয়েছেন। সংলাপও 'সিনেমা' ধরনের; সাহিত্যে যা ঠিক খাপ খায় না। তবু, ওরই মধ্যে অমিতাকে মাঝে-মাঝে ভালো লাগে অনুভূতির কয়েকটি নির্মল প্রকাশের জন্য। ধীরেন্দ্রনাথ, অমিতার কন্যা শর্মিলা, রঞ্জন—এরা সকলেই লেখকের ইচ্ছানুসারে কাহিনীতে ছড়িয়ে রয়েছেন কলের পুতুলের মতো। অবশ্য লেখকের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা পাঠ করলে উল্লিখিত ত্রুটিগুলি সহজগ্রাহ্য মনে হবে। ৪৯৭।৬০

কিশোর-সাহিত্য

নরহরি পণ্ডিতের কাহিনী—স্বপনবুড়ো সাহিত্য চর্চানিকা, ৫৯ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দুই টাকা।

গ্রাম্য পাঠশালার এক আদর্শবাদী পণ্ডিতের জীবনকে কেন্দ্র করে ছোটদের এই উপন্যাসখানি রচনা করা হয়েছে। শুধু বই পড়ে পরীক্ষার গাঁট উত্তীর্ণ হলেই মানুষ হওয়া যায় না—যারা ভবিষ্যতে একদিন দেশের নাগরিক হয়ে উঠবে, তারা যদি নীতি ও আদর্শের পথে অগ্রসর হতে না পারে, নিজেদের আকাঙ্ক্ষার পেছনে দেশ ও দশের সেবা করবার আগ্রহ না থাকে, তা হলে তথাকথিত বিদ্যার অর্থাৎ পরীক্ষা পাশের কোনো মূল্য নেই।

পণ্ডিত মহাশয়ের এই ছিল দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁর এই আদর্শের পথে চলতে চলতে তিনি কত আঘাত পেয়েছিলেন সেই কাহিনী এই পুস্তকে বলা হয়েছে।

কাহিনীর পরিণতি বিয়োগান্ত। পণ্ডিত মহাশয়ের চরিত্রটি মনে বেশ রেখাপাত করে। ১৮৫।৬১

পত্রিকা

উজ্জীবন (বিশেষ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬৮) সম্পাদক : আচার্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস। শ্রীবলরাম ধর্মসোপান, খড়দহ হইতে প্রকাশিত। মূল্য : বিশেষ সংখ্যা— ১.।

ধর্ম সম্পর্কিত মাসিক পত্রিকা। আলোচ্য সংখ্যায়ও ধর্ম ও তৎসম্পর্কিত নানা নিবন্ধ ও কবিতা স্থান পাইয়াছে। শুধু ধার্মিক নহে সকল মহলেই প্রবন্ধগুলি আদৃত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

প্রাপ্তি-স্বীকার

Tagore's Asian Outlook—Shakti Das Gupta.

পান্থীর পত্তন—ইলিয়া এরেনবুর্গ, অনুবাদক অমল দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র মজুমদার ও অনিলকুমার সিংহ।

পৃথিবী বিশাল—বিশ্বনাথ ঘোষ।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা—প্রবোধচন্দ্র সেন।

সুর ও বীণা—পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

কাশ্মীর দেখে এলাম—দেবেশ সান্যাল।

রবীন্দ্র শতবর্ষ রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত কবিতা—ভারতীয় সুধাকেন্দ্র ঢাকা।

Muslim Traditions In Bengali Literature—Syed Ali Ashraf

Islam In The Soviet Union 1917-1960—Walter Kolarz

Bengali Literary Review—Vol. V. No. II—Syed Ali Ahsan

সেরা-সেরা লেখকের শ্রেষ্ঠ গল্প—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন ও শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

কবিগুরু স্মরণে—শ্রীশক্তিচরণ চট্টরাজ।

শততম রজনীর অভিনয়—রমেন লাহিড়ী।

রবীন্দ্র স্মৃতি—বিশ্বনাথ দে।

রবীন্দ্রচরিত—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য।

সেকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা—ক্ষেত্র গুপ্ত ও কুমারেশ ঘোষ।

কাঞ্চনরঙ্গ—শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র।

স্বাবলম্বিনী—প্রভাত দেব সরকার।

অন্ধকার বারান্দা—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

যে জীবন দীন—শ্রীপারাবত।

র বী ন্দ্র না থ—কালিম্পঙের দিনগুলি—শক্তিব্রত ঘোষ।

বাতাবরণ—অসিতকুমার ভট্টাচার্য।

প্রবাসী ষষ্টিবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ—প্রবাসী প্রেস।

বৈকালী—যুগোলকিশোর দাশ ও বিশ্বনাথ মৈত্র।

দিওয়ান-ই-হাফিজ—কা ব্যা নু বা দ ক—স্পর্শমণি।

উত্তর-নায়িকা—মনোরমা সিংহরায়।

ট্রামেবাসে

নদীয়া জেলা হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে কোন এক স্থানে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সভায় হাতাহাতি হইয়াছে ও হাতবোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছে। —"সভাপতি, প্রধান অতিথিরা
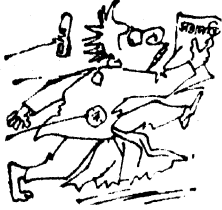
অবহিত হউন। মনে রাখবেন না মৌক্তিকং গজে গজে।" —বলে আমাদের শ্যামলাল।

শাস্ত্রী ফরমুলা নৈরাশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে—একটি সংবাদ। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আমরা প্রায় সবাই জানতাম এ ফরমুলা ফলপ্রদ হতে পারে না; এ (অসমীয়া) প্লাস বি (বাংলা) পার্ট স্কোয়ার—ফরমুলার পরিণতি এ-ই হয়!!"

শাস্ত্রীজী বিভিন্ন হাসপাতালে ভ্রমণ করিয়া পুলিসের গুলিতে আহত ব্যক্তিগণকে দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—"গুলি চালনার ঘটনাটি বেদনাদায়ক ও মর্মান্তিক।' শ্যামলাল বলিল—"তাই নাকি, জানতাম না তো!"

এক সংবাদে শুনিলাম বেহালার নিকট উপনগরী নির্মাণের প্রস্তাব আপাততঃ ধামাচাপা। —"ট্রামে-বাসের আলোচনায় আমরা আগেই বলেছিলাম উপনগরী নির্মিত হবে আজি হতে শতবর্ষ পরে। আমাদের ভবিষ্যৎবাণীই ফলতে চলেছে। হতেই হবে। "উপ" উপসর্গধার প্রতি মন্ত্রিত্বের দাবি মিটিয়ে তবে না উপনগরীর দাবি। —মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

আনন্দবাজার পত্রিকার জামালপুরের সংবাদদাতা তাঁর গৃহে একটি দুই মাথাওলা টিকটিকি ধরিয়াছেন। আমরা কাগজে টিকটিকির ছবিও দেখিয়াছি।—ভাগ্যিস দুই মাথাওলা টিকটিকি বৃটিশ আমলে জন্মায় নি। তখনকার দিনে এক-মাথাওলা টিকটিকির ঠেলাতেই সব অস্থির। —বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

সিমেন্টের সঙ্গে গঙ্গার মাটি মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করার অপরাধে পুলিস কয়েকজন অসাধু ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। —"কিন্তু অসাধুদের উদ্দেশ্য যে সাধু ছিল তা স্বীকার করতেই হবে; গঙ্গামৃত্তিকা-মিশ্রিত সিমেন্টে তৈরি বাড়িতে বাস হাতে-হাতে স্বর্গলাভেরই শামিল।"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

শিক্ষকদের জন্য মাদ্রাজ সরকারের ত্রি-ফলা পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গে চালু করার প্রশ্ন বিবেচনা করিতে নাকি কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত। ডাঃ রায়ের নিকট এ সম্বন্ধে দাবির স্মারকলিপি পেশের সংবাদও পাঠ করিলাম। বিশুখুড়ো বলিলেন—"মুখ্যমন্ত্রী মশাই স্বয়ং ডাক্তার বলেই তাঁর পক্ষে বলা সহজ, ত্রিফলা-ই লাগবে না, সোনামুখীর পাতাই যথেষ্ট!"

সংবাদে প্রকাশ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি ও সোবিয়েৎ প্রধান-মন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চফ যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানী পরিদর্শন করিবেন।—

"ফল কী হবে তা কিপলিং সাহেব বেঁচে থাকলে বলতে পারতেন।" —মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

পাকিস্তানের সংবাদে শুনিলাম সেখানে প্রতি কুড়ি সেকেণ্ডে নাকি একটি করিয়া শিশু জন্মগ্রহণ করিতেছে।

শ্যামলাল বলিল—"এতদিনে চ্যাংড়ামির বাড়াবাড়ির একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া গেল!!"

ইতালিতে শাশুড়ী প্রতিযোগিতার সংবাদ পাঠ করিলাম। অর্থাৎ যে যত ভাল শাশুড়ী হইবেন তাঁহাকে নাকি পুরস্কৃত করা হইবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"জামাইষষ্ঠীর মুখে সংবাদটা বাংলা সরকারের মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা বলা শক্ত। তবে ইতালীর কথাটা বুঝি। সেখানে একদিন শ্বশুরের হাতে জামাতাজীবনের জীবনান্ত হয়েছিল। নিজের জামাতার প্রশ্নের উত্তরে উইনস্টন চার্চিল জানিয়েছিলেন যে মুসোলিনী হলেন এ যুগের সবচেয়ে প্রখ্যাত রাজনীতিক, কেননা জামাতৃ নিধনের যৌক্তিকতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন! শ্বশুর মুসোলিনীর মত কোন শাশুড়ী যদি মারমুখী হয়ে ওঠেন, সেই আশঙ্কাতেই হয়ত এই শাশুড়ী প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা!!"

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

বাহির্দৃশ্য গ্রহণকালে একটি পরিচিত ভঙ্গীতে সত্যজিৎ রায়। তিনি মেঘমেদুর আকাশের শোভা নিরীক্ষণ করছেন না, লাইট মিটারের সাহায্যে আলোকের উপযোগিতা পরীক্ষা করে দেখেছেন। ফটো : অলক মিত্র।

জনপ্রিয় কাহিনীর চিত্ররূপ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস "ঝিন্দের বন্দী"র চিত্ররূপ দিতে গিয়ে পরিচালক তপন সিংহকে দোটানার মধ্যে পড়তে হয়েছে। বি এন রায় প্রোডাকশন্স নিবেদিত ছবিটি দেখে অন্তত তাই মনে হল।

তপন সিংহের আগের ছবিগুলিতে দর্শকরা পরিচালকের যে সৌন্দর্যনিষ্ঠ ও রসনিবিষ্ট শিল্পীমনের পরিচয় পেয়ে এসেছেন, সেই মন-ই যেন এই ছবিতে সকল ক্রূরতার মাঝে কোমলতা ও প্রচণ্ডতার মধ্যে পেলবতাকে খুঁজে বেড়িয়েছে। লাবণ্য-রসের যে তৃষ্ণা রুক্ষতা ও কুটিলতা, নির্মমতা ও নৃশংসতার সংস্পর্শে পীড়া বোধ করে তারই প্রতিভাস রয়েছে এ ছবিতে। অথচ "ঝিন্দের বন্দী"র মত কাহিনীর চিত্ররূপে লাবণ্য-বীক্ষণের অবকাশ খুবই সীমিত। তাই পরিচালক-চিত্রনাট্যকার তপন সিংহ রসতত্ত্বের ওপর অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেওয়ার ফলে কাহিনীর রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চ ও উত্তেজনার প্রতিশ্রুতি এ ছবিতে পুরোপুরি পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি।

ছবিতে পাহাড়-ঘেরা ঝিন্দ ও ঝরোয়ার নয়নাভিমোহন পটভূমি, নয়নাভিরাম বহির্দৃশ্যরাজি, গড়, প্রাসাদ ও রাজঅন্তঃপুরের দৃষ্টিনন্দন দৃশ্যপট—এই সব কিছুর মধ্যে এক অপরূপ শিল্পশোভনতা ফুটে উঠেছে। বাংলা চলচ্চিত্রপটে কাহিনী-পরিবেশানুগ এমন দৃশ্যসৌন্দর্য-সম্ভার ইতিপূর্বে দেখা যায়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু মিথ্যা পরিচয়ের মাধ্যমে দুটি তরুণ হৃদয়ে যে আবেগের সঞ্চারকে কেন্দ্র করে কাহিনীর নাট্যরস দানা বেঁধে উঠতে পারত তা ঠিকমত পরিস্ফুট না হওয়ায় ছবিটির দৃশ্যশোভা কেবলমাত্র চোখকেই তৃপ্তি দেয়, নাটকের বিষয়ীভূত হয়ে তা অন্তরে সাড়া জাগায় না। ছবির শেষ দৃশ্যে ব্যর্থ প্রণয়ীযুগলের মর্ম-

বেদনাকে পরিচালক দক্ষ শিল্পীর মত অল্প কয়েকটি তুলির টানে ফুটিয়ে তুলেছেন। অথচ যে নাট্য-প্রস্তুতি থাকলে এই দৃশ্যটি দর্শকদের চোখ অশ্রু-সজল করে তুলতে পারত তার অভাবে এটি একটি মামুলি বিয়োগান্ত দৃশ্যে পরিণত হয়েছে।

বহুপঠিত "ঝিন্দের বন্দী"র কাহিনীর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। চিত্রনাট্যে ঝিন্দের ছোট রাজকুমার সিংহাসনলোভী উদিৎ সিং ও তার কুচক্রী সাথী ময়ূরবাহনের হাতে বড় রাজকুমার শংকর সিং-এর অশেষ লাঞ্ছনা ও কারাবাস, শংকর সিং-এর ছদ্মপরিচয়ে গৌরীশংকরের ঝিন্দে আগমন ও সাময়িকভাবে রাজসিংহাসন প্রাপ্তি, গৌরীশংকরের সংগে ঝরোয়ার রাজকুমারী কস্তুরীর প্রণয় এবং শেষ পর্যন্ত গৌরীশংকরের হাতে সকল হীন ষড়যন্ত্রের অবসান ও দুই খল নায়কের মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনাগুলিই প্রধান হয়ে উঠেছে।

এইসব ঘটনারাজির বিন্যাসে চিত্রপরিচালক প্রশংসনীয় সংযম, কারুমিতি ও রুচিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। গানে ও সুরের মায়ায় রসজ্ঞ দর্শকের মনকে অব্যক্ত আনন্দ ও বেদনায় ভরে তোলার যে অনায়াস ক্ষমতায় তপন সিংহ সিদ্ধহস্ত, এ ছবিরও কয়েকটি দৃশ্যে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এখানেও তাঁকে ব্যর্থতা বরণ করতে হয়েছে কাহিনীর অন্তর্নিহিত রসের সংগে সংগীত পুরোপুরি integrated না হওয়ায়—"ক্ষুধিত পাষাণ"-এ যেমনটি হয়েছিল।

গৌরীশংকরের হাতে ময়ূরবাহন ও উদিৎ সিং-এর মৃত্যুর ঘটনা দুটি বীরত্বে ও সংঘর্ষে আরও বেশী রোমাঞ্চকর হয়ে উঠতে পারত। এবং কাহিনীর হীন ষড়যন্ত্র ও দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপকরণরাজি অবলম্বনে ছবির ঘটনা-সংঘাতজাত রোমাঞ্চপূর্ণ আবেদন আরও অনেক বাড়িয়ে তোলা যেত।

উত্তমকুমারের অনবদ্য অভিনয়ে ছবিটি সমৃদ্ধ। শংকর সিং ও গৌরীশংকরের দ্বৈত ভূমিকায় এই জনপ্রিয় শিল্পী দুই চরিত্রের দুই বিপরীতধর্মী রূপ আশ্চর্য নৈপুণ্যের সংগে ফুটিয়ে তুলেছেন। উদারহৃদয়, সরল, ভ্রাতৃবৎসল সংগীতরসিক ভাবুক, মদাপ ও অসহায় শংকর সিং-কে তিনি যেমনি অনুপম অভিনয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন, তেমনি গৌরীশংকরের প্রাণোচ্ছল ও প্রণয়ী চরিত্রেও তিনি অপূর্বভাবে প্রাণসঞ্চার করেছেন।

কুচক্রী ময়ূরবাহনের চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় দর্শককে সহজেই মুগ্ধ করে রাখে। চরিত্রটির খলতা ও ক্রূরতা তিনি দক্ষতার সংগে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ঝরোয়ার রাজকুমারীর রূপসজ্জায় অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়কে কিছুটা নিষ্প্রভ মনে হল। বয়সের দিক দিয়ে তাঁকে যেমন মানায়নি, অভিনয় করবার অবকাশও তিনি কম পেয়েছেন।

ঝিন্দের প্রবীণ সর্দার ধনঞ্জয়ের ভূমিকায় রাধামোহন ভট্টাচার্যের অভিনয় ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও মনোগ্রাহী। উদিৎ সিং চরিত্রের কুঅভিসন্ধি ও উচ্চাশা তরুণকুমারের অভিনয়ে যথাযথ রূপায়িত। রুদ্ররূপের ভূমিকায় দিলীপ রায়ের অভিনয় স্বচ্ছন্দ ও চরিত্রানুগ। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন ধীরেন মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য ও বীরেশ্বর সেন।

সংগীত পরিচালক ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ তাঁর খ্যাতি অনুযায়ী সুরসৃষ্টি করলেও কাহিনীর সংগে সঙ্গীতের মেলবন্ধন না ঘটায় তা দর্শকদের মাতিয়ে তুলতে পারে না।

ক্যামেরার সুষ্ঠু কাজে বিমল মুখোপাধ্যায় ছবিটিকে বহিরংগ রূপবৈভবে ভরে পূর্বসুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। চিত্রসম্পাদনায়

সঙ্গিতেও তাঁর দক্ষতা উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে।

ছবির শিল্প-নির্দেশে সুনীতি মিত্র তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। চিত্রসম্পাদনায় সুবোধ রায় আশানুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অতুল চট্টোপাধ্যায় ও সুজিত সরকারের শব্দগ্রহণের কাজও প্রশংসনীয়।

চিত্রালোচনা

"তিনকন্যা"-র পর সত্যজিৎবাবু কী ছবি তুলবেন? এ প্রশ্ন পুরনো হবার আগেই সত্যজিৎ রায় তাঁর পরবর্তী ছবির কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের "অবতরণিকা" তাঁর নতুন ছবির আখ্যান অবলম্বন। ছবির নাম রাখা হয়েছে "মহানগর"। নগরজীবনকে কেন্দ্র করে ছবি তোলবার আগ্রহ শ্রীরায় বহুদিন ধরে পোষণ করে আসছেন। "মহানগর" তাঁর আকাঙ্ক্ষা-পূরণের প্রতিশ্রুতি বহন করছে।

শ্রী এন সি এ প্রোডাকসন্স "মহানগর"-এর নির্মাতা। ছবিটির তিনটি প্রধান চরিত্রে সম্ভবত তিনজন নতুন শিল্পীর দেখা মিলবে। এ বিষয়ে "মহানগর" সত্যজিৎ রায়ের পূর্ব-ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রাখবে মনে হয়।

বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসবে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে সত্যজিৎ রায় আগামী ২১শে জুন বার্লিন যাত্রা করছেন। তার আগেই "মহানগর"-এর কয়েকটি বহির্দৃশ্য গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি বিদেশ থেকে ফিরে এলে ছবির শুটিং পুরোদমে শুরু হবে।

• • •

কথা ছিল, বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসবের ডকুমেন্টারি বিভাগে সত্যজিৎ রায়-কৃত রবীন্দ্রনাথের জীবনী-চিত্রটি প্রদর্শিত হবে। কিন্তু রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ছবিটি ইউরোপের একাধিক শহরে ইতিপূর্বে দেখানো হয়েছে। তার ফলে ফেস্টিভ্যাল কমিটির নিয়মানুযায়ী ছবিটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার যোগ্যতা হারিয়েছে। সেই কারণে স্থির হয়েছে, ডকুমেন্টারি ছবির বিভাগে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের নিয়ে তোলা ফিল্মস ডিভিসনের প্রামাণিক চিত্র "দি হ্যাপি আইল্যান্ডস্"।

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদকবিজয়ী হিন্দী ছবি "অনুরাধা" বার্লিন চলচ্চিত্রোৎসবের পূর্ণাঙ্গ চিত্র বিভাগে ভারতের পক্ষে প্রতিযোগিতা করবে—এ খবর আগেই বেরিয়েছে। এই উপলক্ষে সরকারীভাবে একটি প্রতিনিধি দল বার্লিনে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রতিনিধি দলে থাকবেন পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, প্রযোজক এল বি লছমন, নায়িকা অভিনেত্রী লীলা নাইডু এবং কানু দেশাই।

• • •

ফিল্ম ক্র্যাফ্টের "বেনারসী"র সম্পাদনা তত্ত্বাবধান করতে পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় গত সপ্তাহে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর হাতে এখন অনেকগুলি ছবি। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এ ভি এম-এর নতুন হিন্দী ছবি "ছায়া"র কাজ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। আগস্ট মাসের গোড়ায় ছবিটির সর্বভারতীয় মুক্তি নির্ধারিত হয়েছে। এটি মাদ্রাজে তোলা। বোম্বাইতে "আশিক" নামে আর একটি হিন্দী ছবি হৃষীকেশের পরিচালনায় সমাপ্তপ্রায়। এই সপ্তাহেই এল বি ফিল্মসের পরবর্তী হিন্দী ছবির শুভারম্ভ হচ্ছে বোম্বাইতে। ছবিটির এখনও নামকরণ হয়নি।

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় এইবার কলকাতায় একটি বাংলা ছবি তোলবার সংকল্প করেছেন। ছবির মূল বক্তব্য হবে প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে মানুষে মানুষে ঐক্য-বন্ধন। কলিকাতাবাসী এক পাঞ্জাবী যুবক এ ছবির নায়ক। এই ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করবেন রাজ কাপুর। নায়িকার চরিত্রে এখানকার কোন নামকরা অভিনেত্রীকে দেখা যাবে।

এ ভি এম-এর "ছায়া"-র স্থানীয় পরিবেশক ভি এ পি আয়ারের নিমন্ত্রণে এখানকার চিত্র-সাংবাদিকরা হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একটি ভোজসভায় মিলিত হন। বাংলা ছবি সম্বন্ধে তাঁর সংকল্পের কথা এই সভাতেই শ্রীমুখোপাধ্যায় সাংবাদিকদের জানান।

• • •

অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের উদ্দীপনাময় জীবনী-চিত্র "ভগিনী নিবেদিতা"র বহির্দৃশ্য গ্রহণ করতে যে দলটি কিছুদিন আগে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, সেখানকার কাজ শেষ করে তাঁরা সম্প্রতি কলকাতায় ফিরেছেন। এই দলে ছিলেন পরিচালক বিজয় বসু, তাঁর সহকারী অরুণ বসু ও কর্মাধ্যক্ষ ডি পি দাঁ। সুবিখ্যাত ইংরেজ ক্যামেরাম্যান রবার্ট টেলর ওখানকার দৃশ্যগুলি তুলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসার আগে ভগিনী নিবেদিতার নাম ছিল মার্গারেট নোবল্। লণ্ডনের যে-সব জায়গার সঙ্গে মার্গারেটের জীবনের যোগ ছিল, সে-সব অঞ্চলের ছবি বিশেষ যত্নের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে। তা ছাড়া সে যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ, যে গাউন পরে মার্গারেটের বিয়ে হবার কথা ছিল তার অনুরূপ অঙ্গবাস এবং বহু দুষ্প্রাপ্য দলিল ও চিঠিপত্রের সমাবেশে বিলাতের দৃশ্যগুলি ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণীয় অংশ হবে বলে আশা করা যায়।

• • •

বিশ্বভারতী চিত্রমন্দিরের বাংলা ছবি "পংক্তিলক" এ সপ্তাহের একমাত্র নতুন আকর্ষণ। রাসবিহারী লালের একটি গল্পকে ছবিতে রূপ দিয়েছেন পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী। ভূমিকালিপির পুরোভাগে আছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা বসু, বিকাশ রায়, তরুণ মিত্র, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, সন্ধ্যা রায়, জহর রায়, তরুণ রায়, শ্রীমান দীপক, শ্রীমান পল্লব প্রভৃতি। সুধীন দাশগুপ্ত ছবিটির সুরকার।

মুক্তি প্রতীক্ষিত বাংলা ছবিগুলির মধ্যে ভি এম এন প্রোডাকশন্সের "নেকলেস" ও রূপভারতী ফিল্মসের "কাঞ্চনমূল্য"-র দর্শন মিলবে অচিরেই। প্রথম ছবিটিতে উত্তমকুমারের বিপরীতে সুনীতা নামধারী একজন নতুন অভিনেত্রী চিত্রাবতরণ করেছেন। দিলীপ নাগ ছবিটি পরিচালনা করেছেন। "রাজধানী থেকে"-খ্যাত নির্মল মিত্র "কাঞ্চনমূল্য"-র পরিচালক। এর ভূমিকালিপিতে বহু জনপ্রিয় শিল্পীর সমাবেশ করা হয়েছে।

• • •

গত ৯ই জুন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ইন্দ্রধনু চিত্রণের প্রযোজনায় ভারতী চিত্রণের "জোয়ার ভাটা"-র শুভ মহরৎ সুসম্পন্ন হয়েছে। হিরন্ময় সেন এর কাহিনীকার ও পরিচালক। ছবি বিশ্বাস, ছায়া দেবী, রেণুকা রায়, তপতী ঘোষ, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা ও কয়েকজন নবাগত শিল্পীকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে।

মুখোশ-দল অভিনীত "আর হবে না দেরী"র শততম রজনীতে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের মধ্যে দুটি বিশিষ্ট ভূমিকার রূপসজ্জায় তরুণ রায় ও কানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে।

গত ২৭শে মে রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে স্যার গুরুদাস ইনস্টিটিউটের সাংস্কৃতিক বিভাগ "ইনস্টিটিউট ইউনিট" অমিয় বসুর প্রযোজনা এবং সমীর বিশ্বাসের পরিচালনায়, কবিগুরুর "বৈকুণ্ঠের খাতা" মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন অমিয় বসু, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, দেবী দত্ত, প্রসূন বসু, ব্রতীন দেব প্রভৃতি ইউনিটের সভাবৃন্দ। এই উপলক্ষে ২৮শে মে রবিবার এবং ২৯শে মে সোমবার যথাক্রমে ইনস্টিটিউট গ্রুপ কর্তৃক "কাবুলীওয়ালা" এবং ধ্বনি বিতান কর্তৃক নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' অভিনীত হয়। তা ছাড়া এই তিন দিনই রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং রবীন্দ্র জীবন-দর্শন-সাহিত্যের মনোজ্ঞ আলোচনা হয়।

মুখোশ দলের সাফল্য

'মুখোশ' নাট্যগোষ্ঠী ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'আর হবে না দেরী' নাটকটির শততম অভিনয়ের স্মারক হিসাবে গত ২৫শে মে থেকে উপর্যুপরি চার দিন থিয়েটার সেণ্টারের পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে উক্ত নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। ২৫শে মে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে থিয়েটার সেণ্টারের সভাপতি শ্রীসুকোমল ঘোষ বলেন যে, ইউনেস্কোর আদর্শে নাট্য আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন স্থাপনের উদ্দেশ্যেই কেন্দ্রীয় সংস্থারূপে থিয়েটার সেণ্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। মৌলিক 'একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা' ও বিভিন্ন ভাষায় নাট্যোৎসবের আয়োজন করে তাঁরা নাট্য আন্দোলনের নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। থিয়েটার সেণ্টারের ক্ষুদ্র প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া নিয়ে 'মুখোশ' দল তরুণ রায়ের পরিচালনায় 'আর হবে না দেরী' নাটকটিকে ক্ষুদ্র পর্যায়ে পেশাদার নাট্যাভিনয়রূপে উপস্থাপিত করার পরীক্ষায় জয়যুক্ত হওয়ায় শ্রীঘোষ তাঁদের অভিনন্দিত করেন।

মুখোশের সভাপতি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র 'মুখোশ' দলের কর্মধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেন।

২৮শে মে স্মারক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি দিবসে বিশিষ্ট অতিথি অহীন্দ্র চৌধুরী বলেন যে, পাশ্চাত্যদেশে বহু পূর্বেই 'লিটল থিয়েটার' আন্দোলন শুরু হয়েছে। এমন কি কফি হাউস থিয়েটারেরও ওদেশে প্রবর্তন হয়েছে। শততম রজনীর শেষে অন্য নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্তে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন যে, সকল জিনিসেরই একটা সীমা থাকা উচিত। একের পুনরাবৃত্তির পরিবর্তে বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও রসের পরিবেশনা অধিকতর প্রীতিপ্রদ।

অভিনয় শেষে এই নাটকের প্রকাশক সংস্থা 'গ্রন্থম'-এর পক্ষ থেকে নাট্যকার, শিল্পী ও নেপথ্য কর্মীদের পুরস্কৃত করা হয়। শিল্পী ও কর্মীদের প্রত্যেককে 'গ্রন্থম' প্রকাশিত দুইটি গ্রন্থ, একটি পাইলট পেন ও পুষ্পস্তবক এবং ধনঞ্জয় বৈরাগীকে গ্রন্থ দুইটি ব্যতীত একটি 'পার্কার ৫১' পেন উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হয়। 'মুখোশ' দলকে একটি বিরাট পুষ্পসম্ভার প্রদান করা হয়।

একলব্য

অল ইণ্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিল একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে দেশের খেলাধুলার উন্নতির জন্য এর সৃষ্টি। প্রয়োজনমত বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য, কোচিং-এর ব্যবস্থা, বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধা দান, সরকারকে পরামর্শ দান প্রভৃতি কাজ কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থার অন্তর্ভুক্ত। এই ক্রীড়া সংস্থার কাজের সুবিধার জন্য আবার রাজ্যে রাজ্যে রাজ্য ক্রীড়া সংস্থা বা স্টেট স্পোর্টস কাউন্সিল গড়ে উঠেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ এ বিষয়ে পশ্চাদ্গামী। শুধু পশ্চাদ্গামীই নয়, স্টেট স্পোর্টস কাউন্সিল গড়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গের খেলাধুলোর পরিচালকদের কোন আগ্রহই নেই। অথচ খেলাধুলোয় পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সর্বাগ্রগামী রাজ্য। কিন্তু এখানে আজও একটি ফুটবল স্টেডিয়াম গড়ে ওঠেনি। ক্রিকেট স্টেডিয়ামের নির্মাণের কাজ একটুখানি আরম্ভ হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। সে স্টেডিয়ামেও রাজ্যের ক্রিকেট সংস্থার অধিকার নেই। সেটি যে ক্লাবের সম্পত্তি সে ক্লাবের অস্তিত্বও প্রায় বিলীন। বছর বছর এখানে জাতীয় টেনিসের আসর বসে অথচ বেংগল লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব লন নেই। হকি এবং অ্যাথলেটিকসের একই অবস্থা। অ্যাথলেটিকসের জন্য সিণ্ডার ট্র্যাকের আজও ব্যবস্থা হয়নি। সুইমিং পুল, ব্যাডমিণ্টনের কভার্ড কোর্ট সবই শূন্যে বিরাজ করছে। ক্রিকেট স্টেডিয়াম আরম্ভের সময় ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব ইডেন উদ্যানে অবশ্য ব্যাডমিণ্টন খেলার জন্য একটি কভার্ড কোর্টের ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু তাকে কভার্ড কোর্ট না বলে টিনের আটচালা বলাই শ্রেয়।

খেলাধুলো পরিচালনার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের এই অবস্থা। অথচ একটু ইচ্ছে থাকলে এর অনেক অসুবিধাই দূর করা সম্ভব। অন্তত কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থার আর্থিক সাহায্যে কিছুটা অভাব দূর হতে পারে। কিন্তু রাজ্যে স্পোর্টস কাউন্সিল গঠিত না হওয়ায় কেন্দ্র থেকে টাকা পাবার কোন সুযোগ নেই। পশ্চিমবঙ্গের ভাগের অনেক টাকা এজন্য বরবাদও হয়ে গেছে। যেখানে টাকার অভাব সেখানে এভাবে টাকা বরবাদ হওয়া অপরাধ নয় কি? কার অপরাধ সে কথা না বললেও চলে। সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের খেলাধুলার পরিচালককুলই এজন্য দায়ী।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থায় বাঙলার নবনিযুক্ত একমাত্র প্রতিনিধি শ্রীদিলীপ বসু সেদিন ক্রীড়াপরিচালকদের এক বৈঠক ডেকে স্টেট স্পোর্টস কাউন্সিল গঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। অনেক হোমরা-চোমরাই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এর প্রয়োজনীয়তা না বোঝেন, এমন নয়। তবুও স্পোর্টস কাউন্সিল গঠনের বাধা কোথায় বুঝে উঠতে পারি না। প্রাক্তন টেনিস খেলোয়াড় শ্রীদিলীপ বসুর কাছে অনুরোধ, তিনি যখন উদ্যোগী হয়েছেন তখন আর একটু লেগে থেকে স্পোর্টস কাউন্সিল গঠনে সক্রিয় সাহায্য করুন। দিলীপ বসু মামুলী ক্রীড়াপরিচালক নন। সুতরাং তাঁর দ্বারা কিছু কাজ হলেও হতে পারে।

* * *

কবির ভাষায় বলিঃ—'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'। জীবে প্রেম করবার জন্য আই এফ এ-র বিগলিত অশ্রু। তাই বছর বছর চ্যারিটি খেলার মাধ্যমে তাঁরা অর্থ সংগ্রহ করে আর্তের সেবায় দান করেন। এ তো একরকম জীবে প্রেম। কিন্তু আই এফ এ-র জীবনও যে এই দানের উপর নির্ভরশীল এ কথা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। আই এফ এ প্রাচ্যের সর্ববৃহৎ ফুটবল সংস্থা। আই এফ এ-র অধীনে যত ক্লাব ও যত খেলোয়াড় আছে প্রাচ্যের কোন ফুটবল সংস্থার অধীনে তত ক্লাব ও তত খেলোয়াড় নেই। অথচ আই এফ এ সম্পূর্ণভাবে পরনির্ভরশীল। অ্যাফিলিয়েশন ফি, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নজরানা প্রভৃতি থেকে যে টাকা সংগৃহীত হয় তা দিয়ে আই এফ এ-র খরচ চলে না। আগে কিন্তু চলত। এখন চলে না তার কারণ, ওটা একটা জমিদারিতে পরিণত হয়েছে। মোটা মোটা মাইনের কর্মচারী, জুড়ি, গাড়ি, লোকলস্করের বারবরদারি, কিছুরই অভাব নেই। খরচ দিন দিন বেড়েই চলেছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এক বছরের উপর আই এফ এ-র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরলোকগমনের পর সে পদ খালি পড়ে আছে অথচ খরচের বরাদ্দ বেড়ে গেছে। ১৯৬০ সালে আই এফ এ-র কর্মচারীদের জন্য যেখানে খরচ হয়েছে ৩৭৬৮৯ টাকা ১৯ নয়া পয়সা সেখানে এ বছরের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৪০৭০০ টাকা ৩২ নয়া পয়সা। কর্মচারীরা যাতায়াতের জন্য গত বছর খরচ করেছেন ১২০২ টাকা ২৯ নয়া পয়সা। এবার তাঁদের যাতায়াতের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১৮২৫ টাকা। যাতায়াতের চৌহদ্দি কিন্তু ধর্মতলা থেকে ময়দান পর্যন্ত। তাও ফুটবল মরসুমের ক মাস মাত্র।

কোন কর্মচারী রাখতে হলে নিশ্চয়ই তাকে পেট ভরে খেতে দিতে হবে। কিন্তু একটি অ্যামেচার ক্রীড়া সংস্থার পক্ষে কজন কর্মী প্রয়োজন এবং এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক একজন আই সি এস-এর বেতন পেতে পারেন কিনা সেটা ভেবে দেখা দরকার। অ্যামেচার প্রতিষ্ঠানে বেতনভুক সম্পাদক নিয়োগের নজির কম। যদি বেতনভুক সম্পাদক নিয়োগ করতেই হয় তবে যাতে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আয়ের দ্বারা তার খরচ সংকুলান হয় সেইদিকেই লক্ষ্য রেখে নিয়োগ করা দরকার। 'দানে'র পয়সায় জমিদারি করার অধিকার কারো নেই। কিন্তু এখানে আই এফ এ-র দলভারী শাসক-গোষ্ঠী 'দানে'র পয়সায় জমিদারি চালাচ্ছেন। আর ক্রীড়ামোদীদের কাছ থেকে পয়সা সংগ্রহ করে মসনদে বসে ছিটেফোঁটা দান করছেন আর্তের সেবায়। আবার কবির কথায় বলি। আই এফ এ-র ভাবখানাঃ 'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।'

* * *

থাইল্যাণ্ডকে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ৬—৩ খেলায় হারিয়ে ইন্দোনেশিয়া আবার টমাস কাপ পেয়েছে। টমাস কাপ আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন খেলায় বিজয়ী দেশের

মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের চ্যারিটি খেলায় মহমেডান দলের গোলের মুখে মোহনবাগানের রাইট আউট দীপু দাশ একটি বল হেড করছেন

পুরস্কার। খেলার প্রথা ডেভিস কাপের মত। অর্থাৎ যারা বিজয়ী হবে টমাস কাপ থাকবে তাদের দখলে। সারা বিশ্বের আঞ্চলিক প্রথার খেলায় অন্য যে দেশ বিজয়ী হবে তাদেরকে আগের বারের বিজয়ীর দেশে গিয়ে কাপ উদ্ধার করতে হবে। তবে টেনিসে ডেভিস কাপের খেলা বাৎসরিক অনুষ্ঠান। আর টমাস কাপের খেলা বসে দুই বছরের ব্যবধানে। আর টেনিসে খেলতে হয় পাঁচটি ম্যাচ। চারটি সিংগলস, একটি ডাবলস। ব্যাডমিণ্টনে খেলতে হয় নয়টি ম্যাচ। ছয়টি সিংগলস, তিনটি ডাবলস।

এবার ইন্দোনেশিয়া সব ক'টি সিংগলসেই বিজয়ী হয়েছে কিন্তু তিনটি ডাবলসের খেলার মধ্যে তারা একটিতেও তাইল্যাণ্ডকে হারাতে পারেনি। ইন্দোনেশিয়ার দুই কীর্তিমান খেলোয়াড় তান জো হক ও কোর সোনোভিলের উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যই ইন্দোনেশিয়াকে দ্বিতীয়বার টমাস কাপ বিজয়ীর সম্মান এনে দিয়েছে। অনেকেই আশা করেছিলেন, তাইল্যাণ্ডের দুই উঠতি খেলোয়াড় চ্যাম্পিয়ন সমকক্ষ বুনিয়াসুহানন এবং রানার্স চান্নারং রত্নসায়ংগসাংগ ইন্দোনেশিয়াকে এবার হারিয়ে দেবেন। বিশেষ করে, আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যালে চান্নারং-এর কাছে ডেনমার্কের দুই খ্যাতনামা খেলোয়াড় ফিন কোবেরো ও আরল্যাণ্ড কপসের পরাজয়ের পর অনেকের এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তান জো হকের সংগে চান্নারং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও বিজয়ী হতে পারেন নি। অপূর্ব ক্রীড়াদক্ষতায় তান জো তাঁকে হারিয়ে দিয়েছেন।

ব্যাডমিণ্টনে এখনো প্রাচ্যের আধিপত্যই বজায় রয়েছে। ১৯৪৮-৪৯ সাল থেকে টমাস কাপের খেলা আরম্ভের পর মালয় পর পর তিনবার বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে। এবার নিয়ে দু'বার টমাস কাপ পেল ইন্দোনেশিয়া। টমাস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে এ পর্যন্ত খেলার ফলাফল নীচে দেওয়া হল:—

১৯৪৮-৪৯—মালয় ৮—১ খেলায় ডেনমার্ককে পরাজিত করে।

১৯৫১-৫২—মালয় ৭—২ খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত করে।

১৯৫৪-৫৫—মালয় ৮—১ খেলায় ডেনমার্ককে পরাজিত করে।

১৯৫৭-৫৮—ইন্দোনেশিয়া ৬—৩ খেলায় ডেনমার্ককে পরাজিত করে।

১৯৬০-৬১—ইন্দোনেশিয়া ৬—৩ খেলায় তাইল্যাণ্ডকে পরাজিত করে।

* * *

কলকাতার ফুটবল লীগের আর একটি চ্যারিটি খেলা হয়ে গেছে। এ খেলাতেও মহমেডান স্পোর্টিং পরাজিত হয়েছে। আগেরবার ইস্টবেঙ্গলের কাছে ৫—০ গোলে। এবার মোহনবাগানের কাছে ১—০ গোলে। ওস্তাদের মার শেষ রাত্রের মত খেলার একেবারে শেষ মুহূর্তে গোল করে মোহনবাগান শেষ রক্ষা করেছে। তবে মহমেডান দলের এদিনের খেলা তাঁদের এ মরসুমের ছন্নছাড়া খেলার সংগে সংগতিহীন। ভালই খেলেছিল মহমেডান দল। অন্তত এবার অন্য কোন ম্যাচে তারা এত ভাল খেলতে পারেনি। তবু তাঁদের হার স্বীকার করতে হয়েছে। খেলার হালচাল ও শেষ সময়ের 'নাটকীয়' গোল দেখে সকলেই বুঝেছেন ভাগ্য এবার মোটেই মহমেডান দলের সহায়ক নয়। সত্যিই দ্বিতীয় চ্যারিটি ম্যাচে মরসুমের তৃতীয় পরাজয় এবং আর চারটি ম্যাচ ড্র করায় গতবারের লীগ রানার্স মহমেডান দলের চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার আর কোন আশা নেই।

এখন চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কলকাতার দুই প্রধানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গত সপ্তাহের পর কেউ আর কোনো পয়েণ্ট হারায়নি। মোহনবাগানের খেলায় উন্নতির লক্ষণ সুস্পষ্ট। ইস্টবেঙ্গল ঠিক আগের মনোবল নিয়ে খেলতে না পারলেও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়ের অভাব দেখা যায়নি। দুই প্রধান তাদের পারস্পরিক মর্যাদার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বলা বাহুল্য এই খেলার উপর চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন বিশেষভাবে নির্ভরশীল, যদিও ছোট বড় খেলায় দুই দলের আরও পয়েণ্ট খোয়ানোর সম্ভাবনা। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের দুবারের খেলায় যদি একটি দল দুবারই জেতে তবে সে দলের চ্যাম্পিয়নশিপ একরকম নিশ্চিত। যদি পয়েণ্ট ভাগাভাগি হয় তবে অন্য খেলার ফলাফলের উপর একটি দলের চ্যাম্পিয়নশিপ।

— মুকুল —

অনীতা মুখার্জি

ষোলো বছর আগের কথা। ক্যালকাটা নার্সিং হোমে অর্ধ-অচেতন অবস্থায় শুয়ে আছেন মিসেস কমলা মুখার্জি। আধো নিদ্রিত আধো জাগ্রত। যাকে বলে 'টুইলাইট স্লিপ'। এমন সময় ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাক্তার কর্নেল এস সি মিত্র এসে বললেনঃ 'মিসেস মুখার্জি শুনছেন—আপনার একটি 'আমাজোনিয়ান' মেয়ে হয়েছে।'

প্রথম দুটি পুত্রসন্তানের পর একটি মেয়েকেই কোলে নিতে চেয়েছিলেন মুখার্জি দম্পতি। তাকে সাজাবেন গোছাবেন, রঙবেরঙের ফ্রক পরাবেন, বব্-ছাঁট চুলে ফিতে পরিয়ে দেবেন, মনের মত করে মানুষ করবেন মেয়েটিকে। পরীর মত ফুরফুর করে ঘরে ঘোরাফেরা করে বেড়াবে। এমনি আরও কত রঙীন কল্পনা। কিন্তু তন্দ্রার ঘোরে 'আমাজোনিয়ান' মেয়ের কথা শুনে মিসেস কমলা মুখার্জি প্রথমে যেন খুব খুশী হতে পারলেন না। তাঁর মনের ভাবঃ একটি মেয়েই তো চেয়েছিলাম, তার আবার পুরুষালী চেহারা হ'ল কেন? ভাবটা হয়তো বুঝলেন কর্নেল মিত্র। কারণ ডাক্তাররা তা শুধু দেহ-বিজ্ঞানীই নন, মনের খবরও তাঁদের রাখতে হয়।

বললেনঃ "আপনি কী ভাবছেন মিসেস মুখার্জি? মেয়ে আপনার খুব সুন্দরীই হবে। বেশ বড়সড় হয়েছে। ছেলের মত গড়ন। ওজন ন' পাউণ্ডেরও বেশী। ক্যালকাটা নার্সিং হোমে এত বড় মেয়ে বেশী হয়নি।. তাই আমি ওকে 'আমাজোনিয়ান' গার্ল বলছিলাম।"

খুশির নেশায় এবার ঘুমিয়ে পড়লেন মিসেস মুখার্জি। স্বপ্নের ঘোরে রঙীন স্বপ্নকেই লালন করতে লাগলেন।

ক্যালকাটা নার্সিং হোমের ষোলো বছর আগের এই মেয়েটি আজকের ষোড়শী অনীতা মুখার্জি। বাঙলায় শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নৃত্যগীতপটিয়সী নামকরা বাঙালী মেয়ে অ্যাথলীট। সাউথ ইস্টার্ণ রেলের সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত কণ্ট্রোলার অব স্টোরস মিঃ ডি আর মুখার্জি ও মিসেস কমলা মুখার্জির একমাত্র কন্যা।

খেলাধুলাই আমার প্রধান আলোচ্য বিষয়। তাই অনীতার খেলা-ধুলো নিয়েই প্রথমে আলোচনা করা যাক। জীবনী নিয়ে কিছু লিখতে হলে যেসব খুঁটিনাটি বিষয় আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় সে আলোচনাও তো বাদ দেওয়া চলে না।

অনীতাকে মনের মত করে মানুষ করতে চেয়েছিলেন মুখার্জি দম্পতি। তার মধ্যে খেলাধুলো এল কেন? বিশেষ করে অ্যাথলেটিকস? এ ত ইংলণ্ড, ইউরোপের অন্য কোন দেশ বা আমেরিকা নয় যে, ধনীর দুলালীরা মাঠের খেলাধুলো নিয়ে মাতামাতি করবে! ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বামী ডিউক অব এডিনবরা একজন চৌকস খেলোয়াড়। পুত্রের অ্যাথলেটিকসে উঠতি নাম। রাজ-পরিবারের মেয়েরাও দৌড়াদৌড়ি করে। কিন্তু বাঙালী ঘরের ধনীর দুলালীদের অ্যাথলেটিকসে অনীহাই বেশী। তবু অনীতাকে তার বাবা মা অ্যাথলেটিকসে অনুপ্রেরণা দিলেন কেন? তার কারণ, মুখার্জি দম্পতি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন খেলাধুলো জাতীয় জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যৌবনে নিজেরাও খেলাধুলো কম করেন নি। মিঃ ডি আর মুখার্জি ছাত্র-জীবনে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের 'ক্রস-কাণ্টি' চ্যাম্পিয়ান। চাকুরিজীবনে ১৯৪৭ সালে কলকাতা-রাঁচি মটর রেসে তাঁর বিজয়ীর সম্মান। অফিস স্পোর্টসে অফিসার্সদের ভেটারান্স রেসে বরাবর ফার্স্ট।

মিসেস মুখার্জি পাঞ্জাবের বাঙালী মেয়ে। ছোটবেলায় লাহোরে লালিত পালিত। অমৃতসরের স্ট্যাফোর্ড কলেজে পড়বার সময় অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে যোগ দিয়েছেন। স্পোর্টসের প্রতি চিরদিনই এঁর আসক্তি। পুরীর সমুদ্রের জলে ঢেউ খেতে গিয়ে একবার প্রায় ডুবতে বসেছিলেন। তখন সাঁতার জানতেন না। ফিরে এসে কাঁচড়াপাড়ার রেল সুইমিং পুলে সাঁতার শিখে নিলেন। মেয়ের অ্যাথলেটিকসে আগ্রহ দেখে কিছুদিন আগে বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অফিসিয়াল হবার পরীক্ষা দিয়ে সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণা হয়েছেন মিসেস মুখার্জি। ১৯৬১ সালে জলন্ধরে ভারতের জাতীয় খেলাধুলোয় তাঁর উপরই ন্যস্ত করা হয়েছিল বাঙলার মেয়ে টীমের ম্যানেজারের দায়িত্ব। মিসেস কমলা মুখার্জি সাউথ ইস্টার্ন রেলে ভারত স্কাউট ও গাইডের স্টেট কমিশনারও।

খেলাধুলোয় মা-বাবার এই আগ্রহই অনীতার অনুপ্রেরণা। তার রক্তের মধ্যেই রয়েছে খেলার নেশা। চাকুরিজীবনে খড়্গপুর, বেলভেডিয়ার পার্ক, পোর্টল্যাণ্ড পার্ক, গার্ডেনরিচ—যখন যেখানেই মিঃ ডি আর মুখার্জির আস্তানা হয়েছে তখন সেখানেই গড়ে উঠেছে অনীতার খেলা-ধুলো চর্চার ছোট মাঠ। সাউথ ইস্টার্ন রেলের গার্ডেনরিচের অফিসার্স কোয়ার্টারের ১২।এ, নম্বরে গেলে এখনো দেখা যাবে বাংলোর লনে লং জাম্পের 'পীট', হাই জাম্পের ফ্রেম।

স্পোর্টসে অনীতার প্রথম পাঠ পোর্টল্যাণ্ড পার্কে ভাইয়েদের সাথে। প্রথম সাফল্য ১৯৫৭ সালে সাউথ ইস্টার্ন রেলের ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টসে। 'ব্রড জাম্পে অনীতা ফার্স্ট। এক শো ও দু শো মিটার দৌড়ে অনীতা সেকেণ্ড, নীলিমা ফার্স্ট। নীলিমা ঘোষ তখন সাউথ ইস্টার্ন রেলে চাকরি পেয়েছে। বাঙলার প্রাক্তন অ্যাথলেটিক অধিনায়ক অমিয় মুখার্জিও গার্ডেন-রিচে সাউথ ইস্টার্ন রেলের সদর দপ্তরের কর্মী। মেয়েটির পার্টস দেখে অমিয় ও নীলিমা তাকে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করলো। ছুটির দিন সকালে, কাজের দিন

বিকেলে। অফিসের পর রোজ যায় অফিসার্স কোয়ার্টারে। দেখিয়ে দেয় দৌড় ও লাফের নিখুঁত পদ্ধতি। কোনো কোনোদিন এলেনবরো কোর্সেও চলে অনীতার অনুশীলন।

১৯৫৭ সালেই কলকাতার ছোট বড় মাঝারি স্পোর্টসের কয়েকটি ছোট-মাঝারি পুরস্কার এলো অনীতার হাতে। দিল্লিতে আন্তঃ রেল স্পোর্টসেও তার ডাক পড়লো। ১৯৫৮ ও ৫৯ সালে আরও কিছু পুরস্কার, আরও একটু উন্নতি। বেহালা অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের ব্রড জাম্পে অনীতার লাফ অনেককেই বিস্মিত করল। বেঙ্গল রেকর্ড হয়েছে ধারণা করে বিচারকরা ফিতে নিয়ে দূরত্ব মাপতে গিয়ে দেখলেন ১৫ ফুট ৮½ ইঞ্চি। গ্লোরিয়া প্রাউলিং-এর ১৫ ফুট ১১½ ইঞ্চি রেকর্ডের একটু কম।

১৯৬০ সাল। দিল্লিতে ভারতের জাতীয় খেলাধুলো। বাঙলার প্রতিনিধিত্বের জন্য ডাক পড়ল অনীতার। তবে জুনিয়র গার্ল হিসাবে। জুনিয়র গার্লদের ব্রড জাম্প ও ও রিলে দৌড়ে ও পেল দু'টি ব্রোঞ্জ পদক। অর্থাৎ তৃতীয় স্থান। আর একটি ব্রোঞ্জ পদকও ওর হাতে এল। কিন্তু তার মূল্যে অনীতার কাছে গোল্ড মেডেলের তুল্য। কারণ এটা পেয়েছিল ও সিনিয়র মেয়েদের রিলে দৌড়ে। মিলখা সিং সাবাস জানালেন মেয়েটিকে।

অলিম্পিকের আগে দিল্লির এই ন্যাশনাল স্পোর্টসের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। ভারতের নামকরা সব অ্যাথলীটই রাজধানীতে সমাগত। সবার কৃতিত্ব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মিলখা সিং তখন উড়ন্ত শিখ—সবার আলোচনার পাত্র। মিলখা তাঁর নামের মর্যাদা রাখলেন তিনটি বিষয়ে নতুন জাতীয় রেকর্ড করে। এই কৃতিত্বকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য ভারতের উঠতি অ্যাথলীটদের নিয়ে মিলখা এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। সেখানে নিমন্ত্রণ পেলেন বাঙলার একমাত্র কুমারী অনীতা। বলা বাহুল্য, অনীতার মা-বাবাও বাদ পড়লেন না। ভোজ শেষে মিলখা অনীতার মা বাবাকে বললেন, আপনাদের মেয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ওকে ভালভাবে 'কোচ' করুন। ওখান থেকে ফিরে আসবার পর অনীতার কোচিং-এর ভার নিলেন অ্যাথলেটিক কোচ বলাই চ্যাটার্জি।

১৯৬১ সাল অর্থাৎ এই বছর অনীতা আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। জলন্ধরে জাতীয় অ্যাথলেটিকসে সে পেয়েছে চারটি সিলভার মেডেল। ব্রড জাম্প, ছোট মেয়েদের ৫০ মিটার দৌড় এবং ছোট ও বড় মেয়েদের ৪×১০০ মিটারের দু'টি রিলে। সব বিষয়েই দ্বিতীয় স্থান। জলন্ধরে ৬টি সোনার মেডেলের অধিকারিনী মহীশূরের

ব্রড জাম্পের জন্য স্টার্ট নিচ্ছে কুমারী অনীতা মুখার্জি

ক্রিস্টিন ফোরেজ ব্রড জাম্পে অল্পের জন্য অনীতাকে পরাস্ত করেছেন। রাজস্থান ক্লাব স্পোর্টসে অনীতা ৪টি বিষয়ে প্রথম হয়েছে। যদিও রাজস্থান ক্লাব স্পোর্টস 'ওপেন' বা প্রথম শ্রেণীর স্পোর্টস নয় তবু এখানে যেসব মেয়ে যোগ দিয়েছিল তারা প্রায় সবাই বাঙলার প্রথম স্থানীয়া বাঙালী ও অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়ে। লা মার্টিনার, সেণ্ট জনস, মডার্ন হাই, সেণ্ট টমাস, গোখেল, লরেটো, প্রাট মেমোরিয়াল ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ, ডেভিডিয়ান গার্লস প্রভৃতি স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে আয়োজিত ইস্টার ইয়োরোপীয়ান , গার্লস স্কুল স্পোর্টসে অনীতা পেয়েছে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপ। এ ধরনের স্পোর্টসে বাঙালী মেয়ের চ্যাম্পিয়নশিপ বোধ হয় এই প্রথম।

রণজি স্টেডিয়ামে আয়োজিত বার্ষিক 'রেল সপ্তাহ' উপলক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন কুমারী অনীতা তাঁদের অন্যতমা। বেস্ট স্টেশন মাস্টার, বেস্ট কেপ্ট স্টেশন, বেস্ট পুরুষ অ্যাথলীট, বেস্ট মেয়ে অ্যাথলীট প্রভৃতি রেলের বেস্টদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি জানানো হয় এখানে।

অনীতা এখন লরেটোর ছাত্রী। এ বছরই সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দেবে। ব্যাডমিণ্টন, বাস্কেটবল এবং টেবল টেনিসেও অনীতার ভাল হাত। তবে এসব খেলাধুলো স্কুলের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ষোলো বছর আগে কর্নেল এস সি মিত্র যে মেয়েটিকে 'অ্যামাজোনিয়ান' বলেছিলেন সে এখন অ্যামেজিং গার্ল। কিছুদিন আগে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে আয়োজিত 'মিস বেঙ্গল' সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অনীতা পেয়েছে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর সম্মান। মিস বেঙ্গল সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় দেহের সৌন্দর্যই শুধু বিচারের বিষয় ছিল না। ব্যক্তিত্ব, ভঙ্গিমা, বুদ্ধিমত্তা, মুখসৌন্দর্য, চলার ধরন, অঙ্গসৌষ্ঠব, কণ্ঠস্বর এবং মনোহারিত্বের উপর বিচারের মান নির্ধারিত হয়েছিল। মিস বেঙ্গল উপাধি লাভের পর অনীতা যোগ দিয়েছিল বোম্বের 'মিস বিউটি ডেলিগেট কনটেস্টে'। এখানকার প্রথম স্থানাধিকারিণী ক্যালিফোর্নিয়ার লং বিচে আন্তর্জাতিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকারিণী। বিউটি ডেলিগেট কনটেস্টে অনীতা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় ক্যালিফোর্নিয়া যাবার সুযোগ পায়নি।

আগেই বলেছি, অনীতা নৃত্যগীতেও পটিয়সী। অভিনয়েও দক্ষতা আছে। কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'কিং অব দি ডার্ক চেম্বারে' ও এক প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করে অনেকের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে।

তবে খেলাধুলোয় ষোড়শী অনীতা-এখনো ষোলোকলায় পূর্ণ হয়নি। বাঙলা এবং ভারত তার কাছে আরো কিছু আশা করে।
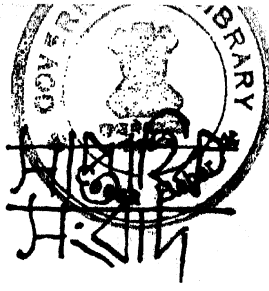
দেশী সংবাদ

৫ই জুন—আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা অদ্য সাংবাদিকদের নিকট বলেন, আসাম সেক্রেটারিয়েট এবং বাংলা ভাষাভাষী কাছাড়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থার মধ্যে পত্রালাপে ইংরেজী এবং পরে উহার পরিবর্তে হিন্দী গ্রহণে আসাম গবর্নমেণ্টের কোন অসুবিধা নাই।

অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের নয়টি স্ট্যাণ্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। দুইজন অদলীয় সদস্য ব্যতীত কংগ্রেস সদস্যগণই চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন। তবে অদলীয় ঐ দুইজন সদস্যও কংগ্রেস দল কর্তৃক প্রস্তাবিত ও সমর্থিত।

৬ই জুন—অদ্য রাত্রে টেলিফোনযোগে শিলচরে কাছাড়ের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহিত আলোচনাক্রমে জানিতে পারা গিয়াছে যে, এইদিন শিলং হইতে প্রচারিত শাস্ত্রী ফর্মুলা জেলার বিভিন্ন মহলে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছে। আসামে শাস্ত্রী-দৌত্য ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়াও তাঁহারা উল্লেখ করেন।

আজ শিলং হইতে যাত্রার প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, আলোচনার ফলে এমন কতকগুলি প্রস্তাব উদ্ভাবিত হইয়াছে, যাহা, আমার মনে হয়, কেবল কাছাড়ের পক্ষেই নয়, সমগ্র রাজ্যের পক্ষেই সন্তোষজনক।

৭ই জুন—আংশিকভাবে পুনর্বাসন প্রাপ্ত কৃষিজীবী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য দণ্ডকারণ্যে যাইতে দেওয়া হইবে বলিয়া সরকারী সিদ্ধান্ত হইয়াছে। অদ্য কলিকাতায় এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে ঐ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রজাসমাজতন্ত্রী নেতা ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মতে "দূরভিসন্ধিপূর্ণ" শাস্ত্রী ফরমুলা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয় এবং তিনি এই ফরমুলা মানিয়া লইতে কাছাড়বাসীকে কখনই উপদেশ দিবেন না।

৮ই জুন—স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি সত্ত্বেও সংগ্রাম পরিষদের স্বেচ্ছাসেবকগণ শিলচরের সরকারী অফিসগুলিতে পুনরায় সত্যাগ্রহ চালায়। করিমগঞ্জ হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, আজ দুই হাজার লোকের একটি মিছিল "বাঙলা আমাদের ভাষা" এই ধ্বনি দিতে দিতে শহরের রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য আসামের ভাষা বিতর্ক সম্পর্কিত শাস্ত্রী ফরমুলার প্রশংসা করিয়া বলেন যে, উহা সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। তিনি আসামের জনগণকে বিশেষ করিয়া কাছাড়ের জনগণকে শাস্ত্রী ফরমুলা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন।

৯ই জুন—কাছাড় জেলা সংগ্রাম পরিষদের কর্ম সমিতি আজ করিমগঞ্জে এক সভায় মিলিত হন। আসামে ভাষা সমস্যার সমাধানকল্পে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী যে ফরমুলা দিয়াছেন, কার্যত তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। পরিষদের নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলিতে থাকিবে।

১০ই জুন—আসামে ভাষা-সমস্যার ব্যাপারে সম্প্রতি যে নারকীয় ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার পটভূমিকায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাস্ত্রী-জীর প্রস্তাবসমূহ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অদ্য এক বিবৃতি প্রসঙ্গে কেন্দ্র হইতে প্রত্যেক রাজ্যকে বহু ভাষা-ভাষী রাজ্য হিসাবে যত শীঘ্র সম্ভব ঘোষণা করিবার দাবি উত্থাপন করিয়াছেন।

অদ্য কম্যুনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের জনৈক উগ্রপন্থী পশ্চিমবঙ্গীয় সদস্য কর্তৃক প্রাপ্ত এক পত্রে কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা এস এ ডাঙ্গের বিরুদ্ধে পার্টির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের তীব্র আক্রমণের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

১১ই জুন আসামের বঙ্গভাষাকে অন্যতম সরকারী ভাষারূপে গণ্য করার দাবিতে শিলচরে সমবেত সত্যাগ্রহীদের উপর গত ১৯শে মে যে গুলি চালনা হয়, তাহা "বিনা প্ররোচনায় এবং অন্যায়ভাবে" করা হয়। এই সম্পর্কে কলিকাতার বিশিষ্ট আইনজীবীদের লইয়া যে বেসরকারী তদন্ত কমিশন গঠিত হয়, ঐ কমিশন উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন আমেদাবাদ হইতে ১৭ মাইল দূরে কালোল নামক স্থানে একটি নূতন তৈলখনি আবিষ্কার করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় খনি ও তৈল দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী কে ডি মালব্য অদ্য দেরাদুনে এক ঘরোয়া সাংবাদিক সম্মেলনে ইহা ঘোষণা করেন।

বিদেশী সংবাদ

৫ই জুন—অবজারভার পত্রিকার খবরে প্রকাশ, অ্যাঙ্গোলায় পর্তুগীজরা যাহা করিয়াছে, দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনার তুলনায় তাহা অধিকতর শোচনীয়। গত এক মাসের মধ্যে পর্তুগীজরা অ্যাঙ্গোলায় যত আফ্রিকানকে হত্যা করিয়াছে, গত এক শত বৎসরে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নে সেই সংখ্যক আফ্রিকানকে হত্যা করা হয় নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার জন্য একটি চুক্তির খসড়া প্রকাশ করে। বলা হয় যে, বৃটেন ও আমেরিকা এখনই জেনেভায় সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত এরূপ একটি দলিলে সহি করিতে রাজী।

৬ই জুন—পাকিস্তানের পরিবার পরিকল্পনা বোর্ডের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, পাকিস্তানে প্রতি ২০ সেকেণ্ডে একটি করিয়া শিশু জন্ম-গ্রহণ করিতেছে। উক্ত বোর্ডের মুখপাত্র বলেন যে, রোগ নিরোধক বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে জন্মহার মৃত্যুহারকে ছাড়াইয়া যাইবে।

ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ, বিশ্ব ব্যাঙ্ক কর্তৃক ভারতকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ বর্তমানে ৬৮ কোটি ডলারে গিয়া পৌঁছিয়াছে। ফলে ভারত এখন বিশ্ব ব্যাঙ্কের বৃহত্তম অধমর্ণ।

৭ই জুন—সোভিয়েট প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রী জোরিন গত রাত্রে নিরাপত্তা পরিষদে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, 'ন্যাটো' শক্তিবর্গ অ্যাঙ্গোলায় পর্তুগীজদের অত্যাচার সমর্থন করিতেছেন।

কম্যুনিস্টপন্থী সৈন্যরা ২৪ ঘণ্টাব্যাপী আক্রমণের পর আজ সকালে জার্স প্রান্তরে দক্ষিণপন্থীদের প্রধান ঘাটি বান পাডং দখল করিয়াছে। দক্ষিণপন্থী সেনাপতি কর্নেল ভান পাও এক বেতারবার্তায় জানান যে, তিনি তাঁহার সৈন্যদের 'অন্য' স্থানে সরাইয়া লইতেছেন।

৮ই জুন—আজ জেনেভায় বলা হইয়াছে যে, লাওসে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের সর্বশেষ গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে নিজ নিজ সরকারের সহিত আলোচনা শেষ না করিয়া এখানকার লাওস সংক্রান্ত ১৪টি জাতির সম্মেলনে পাশ্চাত্ত্যের বৃহৎ ৩টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা যোগ-দান করিবেন না।

৯ই জুন—পূর্ব পাকিস্তানের গোপালগঞ্জ মহকুমায় কিছুকাল পূর্বে সংখ্যালঘু হিন্দু অধিবাসীদের উপর যে অত্যাচার ও লাঞ্ছনা হয় সে সম্পর্কে ভারত সরকারের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার সম্প্রতি সরেজমিনে তদন্ত করিয়া ভারত সরকারের নিকট এক গোপন রিপোর্ট প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত রিপোর্টে নাকি বলা হইয়াছে যে, গোপালগঞ্জে যাহা ঘটিয়াছে তাহা "ভয়াবহ"।

আজ পর্তুগীজ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'লুসিটানিয়ার' এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, বিদ্রোহীরা অ্যাঙ্গোলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু ধ্বংস করিবার ফলে অ্যাঙ্গোলার রাজধানী লুয়াণ্ডা এবং সমুদ্রতীরবর্তী শহর আমব্রীজের মধ্যে যানবাহনের ব্যবস্থা ব্যাহত হইয়াছে। আমব্রীজ লুয়াণ্ডা হইতে ৭৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

১০ই জুন — গত রাত্রে নিরাপত্তা পরিষদ পর্তুগালকে অবিলম্বে অ্যাঙ্গোলায় অত্যাচার বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানান। নিরাপত্তা পরিষদ পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত তদন্ত কমিশনকে অবিলম্বে নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতে বলেন। বৃটেন এবং ফ্রান্স ভোট দানে বিরত থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেন। প্রস্তাবটি ৯—০ ভোটে গৃহীত হয়।

১১ই জুন—ফ্রাঙ্কো আলজিরিয়ান শান্তি আলোচনায় আলজিরিয়ান প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীবেলকাসেম করিম গতকল্যকার বৈঠকে স্বাধীন আলজিরিয়ার অভ্যন্তরে "ফরাসী সামরিক ছিট-মহল" রাখার প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১, টাকা, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রক ও প্রকাশক : শ্রী[illegible] চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

দেশ
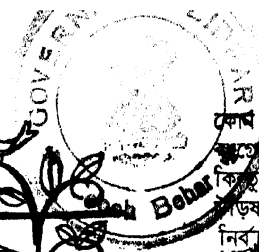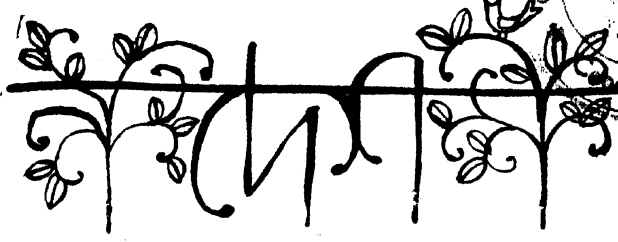
DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 24th June, 1961

২৮ বর্ষ ॥ ৩৪ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৯ আষাঢ়, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

উড়িষ্যায় বিজয়

উড়িষ্যায় অন্তর্বর্তীকালীন সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের অসামান্য সাফল্য সর্বভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। সাফল্য কেবল অসামান্য নয়, অনেক পরিমাণে অপ্রত্যাশিত। কারণ উড়িষ্যায় গত পাঁচ ছয় বৎসর ধরে কংগ্রেসের শক্তি হ্রাস পাচ্ছিল। কংগ্রেসের শক্তি মানে কংগ্রেসের জনসমর্থন, যার উপর গণতান্ত্রিক বিধানে শাসনক্ষমতার অধিকার ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

কেরল ছাড়া অন্য সব রাজ্যে এবং কেন্দ্রে কংগ্রেসদল একক ক্ষমতাধর। একসময়ে কংগ্রেসের বহুবিঘোষিত দৃঢ় সংকল্প ছিল অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কংগ্রেস একত্র শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে না। কেরলে কংগ্রেসের পক্ষে এই সংকল্প রক্ষা করা সম্ভব হয়নি; প্রজা সোস্যালিস্ট দল ও মুসলিম লীগের সঙ্গে নির্বাচনী ঐক্যে রাজী হতে হয়েছে এবং তারপর প্রজাসমাজতন্ত্রী নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভায় অংশীদার হয়েছে কংগ্রেস। কিন্তু কেরলের 'কোয়ালিশন' বন্ধনসূত্রে রচিত হওয়ার অনেক আগেই উড়িষ্যায় কংগ্রেস অন্যদলের সমর্থন সংগ্রহে চেষ্টিত হয়। অর্থাৎ উড়িষ্যায় কংগ্রেস দল এবং সংগঠনের দুর্বলতা প্রকাশ পায় ১৯৫১ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময় থেকেই। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর অবস্থা আরও সঙীন। কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রথমে নির্ভর করতে হয় ঝাড়খন্ড দলের অনিশ্চিত সমর্থনের উপর; শেষপর্যন্ত গণতন্ত্র পরিষদের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা।

কেরলের চেয়ে উড়িষ্যার এই কংগ্রেস-গণতন্ত্র কোয়ালিশন কংগ্রেসের পক্ষে অনেক বেশী মর্যাদাহানিকর এবং ভবিষ্যৎ বিপর্যয়সূচক হয়েছিল। সেই কারণে উড়িষ্যায় অন্তর্বর্তীকালীন সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল জয় এখন অনেকের কাছে খুবই আশাব্যঞ্জক মনে হচ্ছে। অবশ্য উড়িষ্যায় এই কংগ্রেস সাফল্যকে ভারতীয় রাজনীতিতে কোন বিশেষ পরিবর্তনসূচক বলা যায় না। উড়িষ্যায় গণতন্ত্র পরিষদের শক্তিবৃদ্ধির ফলে কংগ্রেসকে শাসন ক্ষমতা ভাগ-বাঁটোয়ারায় রাজী হতে হয়েছিল। নীতি-গত বিচারে গণতন্ত্র পরিষদের সঙ্গে এই কোয়ালিশন গঠন কংগ্রেসের পক্ষে পরাজয় ও পশ্চাদপসরণের সামিল হয়েছিল বলা অন্যায় নয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে উড়িষ্যার নবীন কংগ্রেস দল-পতি শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়ক, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে অন্তর্বর্তীকালে সাধারণ নির্বাচনে গণতন্ত্র পরিষদের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তার ফলও আশাতীতরূপে ভাল হয়েছে। কেবল উড়িষ্যার পক্ষে নয়, সারা ভারতের পক্ষেই।

এদেশে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্প্রতি অনেকে নানা-রকম সংশয় ও শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। কংগ্রেস দল দীর্ঘকাল একটানা ক্ষমতাসীন থাকায় দেশের নানা অঞ্চলে অসন্তোষ কম সঞ্চিত হয়নি। কংগ্রেস তার জনপ্রিয়তার পুঁজি খোয়াচ্ছে এবং সে কারণে অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেস দল ক্ষমতাচ্যুত হওয়া খুবই সম্ভব, কোন কোন মহলে ইদানীং এই ধারণা খুবই প্রবল। ধারণা অনেকক্ষেত্রেই মনোগত ইচ্ছার প্রতিফলন, কাজেই বাস্তব অবস্থানুগ নয়। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী ক্ষমতা হাতবদল হওয়া স্বাভাবিক ও সংগত, কিন্তু ভারত-বর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে সেরকম স্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটানোর উপযুক্ত বিকল্প নেতৃত্ব অর্থাৎ প্রভাবশালী রাজ-নৈতিক দল এখনও গড়ে উঠতে দেরী আছে মনে হয়। জনসমর্থন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সত্যিই ঝুঁকছে কি না তারও নির্ভরযোগ্য নিদর্শনের অভাব। দেশের কোন কোন স্থানে উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় সম্প্রতি ঘটেছে ঘটে, কিন্তু তার বিপরীত সাক্ষ্য আবার উড়িষ্যার অন্তর্বর্তীকালীন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল।

উড়িষ্যায় কংগ্রেসের সাফল্য বিশেষ অর্থ বহন করে, কারণ এই একটিমাত্র রাজ্যে গত পাঁচ ছয় বৎসরে কংগ্রেসের জন-সমর্থন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেতে দেখা গিয়েছিল, আশঙ্কা হয়েছিল, উড়িষ্যার মত অন্যত্রও কংগ্রেসকে পশ্চাদপসরণ করতে কিম্বা জোড়াতালি দিয়ে ক্ষমতা-সীন থাকতে হবে। উড়িষ্যায় কংগ্রেসের অসামান্য সাফল্য কেবল সে আশঙ্কা মিথ্যা প্রমাণিত করে নি, উপরন্তু দেখিয়েছে যে, কংগ্রেস সংগঠনে তারুণ্য-শক্তি নিয়োজিত হলে জনসাধারণের আস্থা অর্জন অনায়াসসাধ্য।

উড়িষ্যায় যেমন ক্ষমতার ভারকেন্দ্র কংগ্রেস থেকে দূরে সরে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তেমনি অন্য কয়েকটি অঙ্গরাজ্যেও রাজনৈতিক ক্ষমতাসংস্থান সম্পর্কে অল্পবিস্তর অনিশ্চয়তা বর্তমান। উড়িষ্যায় কংগ্রেস সাফল্যে সে অনিশ্চয়তা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হবে আশা করা যায়। উড়িষ্যার রাজ-নীতিতে দলগত বিন্যাস সর্বভারতীয় রাজনীতির ছাঁচে ঢালা নয়। অনেকটা সেই কারণেও উড়িষ্যায় গণতন্ত্রপরিষদের শক্তিবৃদ্ধি সর্বভারতীয় রাজনীতির পক্ষে শঙ্কাজনক হয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যেই প্রাদেশিক, প্রাদেশিক, সাম্প্রদায়িক এবং আরও নানা-রকম শক্তি ও স্বার্থ জনসাধারণের সমর্থন সংগ্রহে সচেষ্ট। গণতন্ত্র পরিষদের দেখাদেখি রাজস্থানে, গুজরাটে, মধ্য-প্রদেশে এইসব শক্তি ও স্বার্থ কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য তোড়জোড়ে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। রাজ্যকেন্দ্রিক দল হওয়া সত্ত্বেও গণতন্ত্র পরিষদ সেই কারণেই সর্ব-ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এইরকম কতক-গুলি গোঁড়া রক্ষণশীল স্বার্থের প্রতিভূ গণ্য হয়েছে। প্রাক্তন সামন্তরাজগোষ্ঠী পরিপুষ্ট এই রাজনৈতিক দলের শক্তি ও জনপ্রিয়তাবৃদ্ধি কেবল কংগ্রেসের নয়, পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব ও প্রসারের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হত। উড়িষ্যায় কংগ্রেসের অসামান্য সাফল্য তাই কেবল সংকীর্ণ অর্থে কংগ্রেস দলের শ্রীবৃদ্ধিসূচক নয়, ভারতের গণতান্ত্রিক অগ্রগতি এবং জনসাধারণের সুস্থ রাজ-নৈতিক চেতনা বিকাশের প্রতিশ্রুতিও বহন করে এনেছে উড়িষ্যায় অন্তর্বর্তী-কালীন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল।

বিখ্যাত মনোবিদ্ কার্ল গুস্টাভ ইয়ুং

সুনীলচন্দ্র বিশী

গত ৬ই জুন কার্ল গুস্টাভ ইয়ুং ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। মনোবিদ্যায় তাঁর দান অতুলনীয় ও যুগান্তকারী। বিভিন্ন মতবাদের স্রষ্টাদের মধ্যে তিনি হলেন অন্যতম।

১৮৭৫ সালে তাঁর জন্ম। ভেষজবিজ্ঞানে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতক হবার পরেই তিনি মানসিক চিকিৎসা বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং বিশ্ববিখ্যাত মনোবিদ সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের মতবাদগুলির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। এই সময় তিনি জুরিখে ব্লুলার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গে মিলে মনঃসমীক্ষণের তথ্যগুলির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা আরম্ভ করেন। গোড়ার দিকে সবাই যখন ফ্রয়েডের শত্রুই ছিলেন এবং কোথাও থেকে তাঁর তথ্যগুলির স্বীকৃতি পায়নি তখন জুরিখের দলটিই শুধু ফ্রয়েডের মতবাদগুলির অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে। ফ্রয়েড নিজেও স্বীকার করেছেন যে জুরিখের দলের সমর্থন থাকার জনাই এবং তাঁদের চেষ্টার ফলে মতবাদগুলির স্বীকৃতি পাওয়া সহজসাধ্য হয়েছে। যখন সবাই ফ্রয়েডের বিপক্ষে তখন এই অবস্থার মধ্যেও ইয়ুং-এর অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টাতেই ফ্রয়েডের মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণকে নিয়ে মনের কার্যপ্রণালীর গবেষণা করবার জন্য জুরিখেই প্রথম ক্লিনিকস্ খোলা সম্ভব হয়েছিল।

কার্ল গুস্টাভ ইয়ুং

ইয়ুং-এর গবেষণালব্ধ তথ্যগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য দুই একটি মতবাদ নিয়ে আলোচনা করব।

ফ্রয়েডকে বাদ দিয়ে ইয়ুংকে জানা সম্ভব নয়। ফ্রয়েড বললেন যে মানসিক রোগীর চিন্তাধারা জানতে হলে তার সঙ্গে অবাধ-ভাবানুষঙ্গ করতে হয়। রোগীকে বলা হয় যে তার মনে যে কথাই আসবে তাই যেন সমীক্ষককে বলে। দিনের পর দিন অবাধ ভাবানুষঙ্গ করবার ফলে রোগীর সমস্ত চিন্তাধারাই সমীক্ষকের কাছে প্রকাশিত হয়। ইয়ুং আর এক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সমস্যাটি দেখলেন। মনের গহনে প্রবেশ করতে আর একটি পন্থার উদ্ভাবন করলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর গবেষণালব্ধ ফল ১৯০৪ সালে প্রকাশ করেন এবং এ নিয়ে খুবই আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল। আবিষ্কার হ'ল শব্দ অনুষঙ্গ অভীক্ষা। তাঁর মতে বিভিন্ন চিন্তাধারা অনুষঙ্গের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাছাই বাছাই শব্দের একটি তালিকা প্রস্তুত করলেন। শব্দগুলি রোগীকে বলা হয়। শব্দগুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মনে যা উদয় হয় তাই প্রকাশ করতে বলা হয়। এই উপায়ে বিভিন্ন শব্দে রোগীর মানসিক প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে রোগীর বিভিন্ন ভাবাবেগ, ধারণা, গূঢ়ৈষা প্রভৃতি উদ্ঘাটন করা সম্ভব।

ফ্রয়েডের মতবাদের কতকগুলি মনে-প্রাণে মেনে নিতে না পারায় ইয়ুং তাঁর দল থেকে বেরিয়ে এসে 'অ্যানালিটিক স্কুলে'র প্রতিষ্ঠা করলেন। অনেক বিষয়েই তাঁর মতবাদ ফ্রয়েডের থেকে বিভিন্ন। যেমন ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে, মানুষের সমস্ত কর্মপ্রেরণার মূল উৎস হ'ল কামশক্তি। এই কামশক্তির ধর্ম হ'ল যে এটা অবাধে প্রকাশ পেতে চায়। অবাধে প্রকাশের পথে যদি বাধা আসে তখন অন্য পথ অবলম্বন ক'রে মানুষ তার পরিতৃপ্তি সাধন করে। এর জন্যই আসে বিভিন্ন দিকে মানুষের আগ্রহ যেমন ললিতকলা, ধর্ম, সমাজসেবা প্রভৃতি। এই প্রক্রিয়াকে বলে উর্দ্ধগতি। ইয়ুং-এর মতে শক্তিই সব কাজের উৎস কিন্তু এটা যৌন নয় এবং কামনা-মিশ্রিত থাকে না। একে ইচ্ছামত বিভিন্ন পথে চালিত করা যায়। ধর্ম, ললিতকলা, সমাজসেবার পথে চালালে আসে এইসবের উপর আগ্রহ আবার যৌন পথে চালালে কাম-প্রবৃত্তির উদয় হয়।

ইয়ুং নির্জ্ঞান মনের বিভিন্ন কার্যাবলী, অস্মিতা, বায়ুরোগ প্রভৃতি বহু বিষয় নিয়ে গবেষণা ক'রে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি মনোবিদ্যাকে সম্পদশালী করতে খুবই সাহায্য করেছে। তাঁর লেখা অনেক মূল্যবান বই বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে যা পৃথিবীর সর্বত্রই খুব সমাদরে গৃহীত হয়েছে।

এটা আমাদের খুবই আনন্দের কথা যে তিনি আমাদের দেশেও এসেছিলেন এবং কলকাতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডাক্তার উপাধিতে ভূষিত করেছিল। তিনি আজ আমাদের মধ্যে আর নেই তবুও তাঁর কীর্তি তাঁকে বিশ্বের সকলের কাছে বিশেষ ক'রে মনোবিদদের কাছে চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবে।
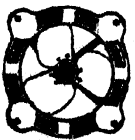
বৈদেশিকী

সম্প্রতি রুশ প্রধানমন্ত্রী শ্রী ক্রুশ্চফ ও মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডি পরস্পরকে যে দীর্ঘ পত্র বা মেমোরান্ডাম্ পাঠিয়েছেন সেগুলির বিষয়বস্তুসমূহ এই দুই রাষ্ট্র-প্রধানের ভিয়েনার বৈঠকে নিশ্চয়ই অনুল্লেখিত ছিল না। ভিয়েনার বৈঠকের পরে যে সরকারী ইস্তাহার প্রচারিত হয় তাতে বিশেষ উল্লেখ একমাত্র লাওস সমস্যা সম্পর্কেই ছিল। লাওসএ খাঁটি যুদ্ধ-বিরতির প্রয়োজনীয়তা এবং লাওস্‌কে নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে গড়ে উঠবার সুযোগ ও তৎসম্পর্কে আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিদানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে দুই নেতা একমত হন। এখন তাঁদের পরস্পরকে প্রেরিত মেমো-রান্ডাম্ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, অন্য যে-সব বিষয় ভিয়েনাতে আলোচনা হয় তাতে কোনোটাতেই দুজনে একমত হতে পারেননি। সেটা অবশ্য কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। প্রথম সাক্ষাতেই শ্রী কেনেডি এবং শ্রী ক্রুশ্চফ বহু সমস্যার সমাধান করে ফেলবেন এ আশা কেউ করে নি। আমেরিকার মুখ্য মিত্রগণের মত না নিয়ে অনেক বিষয়েই শ্রী কেনেডির পক্ষে রাশিয়ার সঙ্গে কোনো মিটমাটের দিকে এগোনো সম্ভব নয়। সে যাই হোক, এখন দেখা যাচ্ছে যে, লাওস সম্পর্কে ছাড়া অন্য সব বিষয়েই দুপক্ষ একটা অনমনীয় ভাব নিয়েছিলেন। তাহলেই যে লেনদেনের কথা আর হবে না, এমন নয়। লেনদেনের কথা অনেক সময়ে এইরকম অনমনীয় মনোভাবের প্রকাশ দিয়ে শুরু করা হয়। এক্ষেত্রেও সেটা হতে পারে। তবে আপাতত দেখা যাচ্ছে যে দুপক্ষই বেশ কড়া মেজাজে আছেন অথবা কড়া মেজাজের প্রকাশ আবশ্যক বলে মনে করছেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে একটা মজা লক্ষ্য করার আছে। ভিয়েনা বৈঠকের পরে মার্কিন দিক থেকে যে-সমস্ত মন্তব্যাদি প্রকাশিত হয় তার মোটামুটি সুরটা ছিল নৈরাশ্যব্যঞ্জক অর্থাৎ অনেক গুরুতর বিষয়েই দুই প্রধানের মতের মধ্যে দূরত্বের উপর জোর দেওয়া হয় এবং সেই দূরত্ব হ্রাস যে সহজ হবে না মার্কিন মহল থেকে এই ভাবটাই জাহির করা হয়। শ্রী কেনেডি নিজেও আমেরিকায় ফিরে গিয়ে শ্রী ক্রুশ্চফের সঙ্গে তাঁর আলোচনার উল্লেখ করে যে-বক্তৃতা দেন তাতে তিনি রাশিয়ার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও প্রকাশ করেন যে, কম্যুনিস্ট পক্ষের সঙ্গে মিটমাট সহজে হবে না এবং "ডেমোক্রাটিক ফ্রীডম্"এর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনো মিটমাটে আমেরিকা রাজীও হবে না। শ্রী ক্রুশ্চফ কিন্তু ভিয়েনা বৈঠকের পরে যে মন্তব্যাদি করেন তাতে নৈরাশ্যের তেমন কোনো আভাস ছিল না। তাতে মনে হয়, শ্রী কেনেডি যত শক্ত কথাই বলে থাকুন না কেন সোভিয়েটএর দিক থেকে তার মধ্যে বিশেষ কোনো আশংকার কারণ শ্রী ক্রুশ্চফ দেখেন নি। হয়ত পশ্চিমা তরফ থেকে শ্রী কেনেডি যা বললেন তা শুনবার জন্য সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। শ্রী কেনেডির কথার সুরে তিনি আশ্চর্যবোধ করেন নি। তাছাড়া শ্রী ক্রুশ্চফ হয়ত ভাবেন যে আমেরিকা এখনও যাই বলুক সোভিয়েট ব্লকের সঙ্গে শক্তির চাপ শেষ পর্যন্ত কার্যকর হতে বাধ্য এবং সে শক্তি ক্রমশই বাড়ছে। সোভিয়েটের এই বিশ্বাস থাকাতো ভিয়েনা বৈঠকের ফল শ্রী ক্রুশ্চফের পক্ষে নৈরাশ্যজনক না হতে পারে। কিউবাতে এবং অনেকটা লাওসএ মার্কিন নীতি অপদস্থ হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে এটাও স্মরণীয় যে, গত বছর শ্রী ক্রুশ্চফ স্বয়ং ইউ-এন জেনারেল এ্যাসেমব্লীতে উপস্থিত হয়ে শ্রী হ্যামারশোয়েল্‌ড্‌কে বিতাড়িত করে সেক্রেটারী জেনারেলের পদটিকে ত্রিধাবিভক্ত করার যে চেষ্টা করেছিলেন তাতে তিনি সফল হন নি। কংগোর ব্যাপারেও সোভিয়েট উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু এসব ধাক্কার অন্তিম জয় সম্বন্ধে সোভিয়েট ব্লকের আত্ম-বিশ্বাস টলে না।

গত বছরের মে মাসে রুশ-মার্কিন-ইংগ-ফরাসী "শীর্ষ" সম্মেলন ভেংগে দেবার সময়ে শ্রী ক্রুশ্চফ ঘোষণা করেন যে, শ্রী আইজেন-হাওয়ার প্রেসিডেন্ট থাকা পর্যন্ত আমেরিকার সংগে সোভিয়েটের রাজনৈতিক কারবার করা সম্ভব নয়। কয়েক মাস পরে আমেরিকায় নূতন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে বলেই তিনি এরূপ কথা বলতে পেরেছিলেন। যদি তখনো শ্রীআইজেনহাওয়ারের কার্যকাল আরো তিন বা দু বছর বাকী থাকত তাহলে শ্রী ক্রুশ্চফ এরূপ কথা কখনই বলতে পারতেন না। একজন ডেমোক্রাটিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তাঁর সংগে কথা বলতে সোভিয়েট গবর্নমেন্টর সুবিধা বোধ করবেন, এই ধারণা প্রকাশ করলেও সোভিয়েট নেতাগণ সেটা অন্তরে কতখানি পোষণ করতেন বলা যায় না। শ্রীআইজেন-হাওয়ারের চেয়ে শ্রী কেনেডির সংগে কাজ-কারবার করা সোভিয়েট ব্লকের পক্ষে সহজ হবে এবং শ্রী কেনেডি সোভিয়েট ব্লক সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত উদার এবং নরম হবেন, এরূপ ধারণা সত্যসত্যই সোভিয়েট নেতা-দের মনে কখনো ছিল কিনা বলা যায় না। সকলেই জানেন যে সোভিয়েট নেতাদের সংগে বৃটেনের লেবার গবর্নমেন্টের সংগে কখনো ভাব জমে নি, সোভিয়েট নেতারা স্পষ্টই বলেছেন যে লেবারের চেয়ে কনজারভেটিভ গবর্নমেন্টের নেতাদের সংগে কাজ কারবার করতে তাঁরা বেশি আরাম বোধ করেন। আইজেন-হাওয়ারের চেয়ে কেনেডি সরকারের সংগে কাজকারবার করা সোভিয়েট ব্লকের নেতারা যে অধিকতর সুবিধাজনক বলে মনে করছেন তা বোধ হয় নয়।

অস্ত্রপরীক্ষামূলক নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ বন্ধ করা সম্পর্কিত আলোচনা একত্রিশ মাস ধরে জেনেভায় চলছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত চুক্তির সর্তাবলী সম্বন্ধে কনফারেন্স মতের ঐক্যে পেঁছতে পারল না। ভিয়েনা বৈঠকের পূর্বে অনেকে আশা করেছিলেন যে বৈঠকের পরে জেনেভা কনফারেন্সে অচল অবস্থার অবসান হবে, নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ বন্ধ করা সম্বন্ধে চুক্তির পথ পরিষ্কার হবে, অর্থাৎ ভিয়েনা বৈঠক ফলপ্রদ হল কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যাবে জেনেভায়। দেখা যাচ্ছে সে দিক দিয়ে ভিয়েনা বৈঠকে কিছুই কাজ হয় নি। প্রধান বিবাদটা এখন ঠেকেছে চুক্তি হলে সেই চুক্তির শর্ত প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা, অর্থাৎ নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ কোথাও হচ্ছে কিনা তার পর্যবেক্ষণের ভার থাকবে কার উপর। অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রধান প্রশ্ন উঠেছে এই পর্যবেক্ষকদের পদ নিয়ে। পশ্চিমাপক্ষের প্রস্তাব হচ্ছে পর্যবেক্ষকসংস্থা উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে নিযুক্ত হবে। সোভিয়েট প্রস্তাব হচ্ছে পর্যবেক্ষক সংস্থা তিনপক্ষওয়ালা হবে—তার একটি পশ্চিমাদের দ্বারা, একটি কম্যুনিস্ট-দের দ্বারা এবং একটি নিরপেক্ষ শক্তিবর্গের দ্বারা মনোনীত হবে। শ্রী ক্রুশ্চফ আরো প্রস্তাব করেছেন যে, নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ সম্পর্কিত আলোচনা আর পৃথক ভাবে না চালিয়ে, নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে যে আলোচনা হচ্ছে তার সংগে মিলিয়ে বা জুড়ে দেওয়া হোক। শ্রী কেনেডি তাঁর পত্রে এই দুই প্রস্তাবই গ্রহণযোগ্য নয় বলে শ্রী ক্রুশ্চফকে জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, প্রেসিডেন্ট কেনেডি এই অভিযোগ করেছেন যে, সোভিয়েট গবর্নমেন্টই চুক্তি হতে দিচ্ছেন না। সোভিয়েট ইউনিয়নে গবর্নমেন্ট যা খুশি করতে পারেন, সেখানে গবর্নমেন্ট কোনো ব্যাপার গোপন করতে চাইলে কেউ তা প্রকাশ করতে পারে না। সোভিয়েট ইউনিয়ন কী করছে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া সম্ভব নয়, তা সত্ত্বেও আমেরিকা প্রায় তিন বছর হলো নিউক্লিয়ার অস্ত্র পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ রেখেছে। মার্কিন এবং "ফ্রী ওয়ার্লডের" নিরাপত্তার দিক থেকে আমেরিকা এই ঝুঁকি অনির্দিষ্ট কালের জন্য নিতে পারে না। সুতরাং যদি নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ সম্বন্ধে অবিলম্বে কোনো চুক্তি সম্পাদিত না হয় তবে নিউক্লিয়ার অস্ত্র পরীক্ষার ব্যাপারে আমেরিকা যে নিষেধ পালন করছে সেটা এবার করবে না। শ্রী কেনেডির এই কথা থেকে অনেকের ধারণা হয়েছে যে, আমেরিকা শীঘ্রই নিউক্লিয়ার অস্ত্রপরীক্ষা আবার আরম্ভ করবে। আমেরিকায় এক দলের মতে মার্কিন সামরিক এবং নিরাপত্তার স্বার্থের দিক থেকে এটা আবশ্যক। অনেকের বিশ্বাস যে সোভিয়েট ইউনিয়নে নিউক্লিয়ার অস্ত্রের উন্নতির চেষ্টা অবিরাম চলছে এবং বর্তমানে যখন মাটির নিচে ...২০ কিলোটন পরিমাণ পর্যন্ত বিস্ফোরণের প্রমাণ ধরার যন্ত্র নেই তখন সোভিয়েট ইউনিয়নে মাটির নিচে ঐরূপ কাজ যে চলছে না তা কে বলতে পারে। সুতরাং নিউক্লিয়ার অস্ত্র পরীক্ষা আবার আরম্ভ করার জন্য মার্কিন গবর্নমেন্টের উপর একটা চাপ রয়েছে। সেই চাপ পড়েই হোক অথবা সোভিয়েট গবর্নমেন্টের উপর চাপ দেবার জন্যই হোক প্রেসিডেন্ট কেনেডি অনতি-বিলম্বে নিউক্লিয়ার অস্ত্র পরীক্ষা আবার আরম্ভ করবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন।

অন্যদিকে শ্রী ক্রুশ্চফ ভয় দেখিয়েছেন বার্লিন নিয়ে। শ্রী ক্রুশ্চফ মেয়াদের শেষ তারিখ দিয়েছেন এই বছরের ৩১শে ডিসেম্বর। এর মধ্যে বার্লিনকে "ফ্রী সিটি" করার জন্য সোভিয়েট যে প্রস্তাব দিয়েছে তার আলোচনা এবং তদনুযায়ী একটা ব্যবস্থাসহ যদি জার্মানী সম্পর্কে একটা সন্ধিপত্র সম্পাদিত না হয় তবে সোভিয়েট গবর্নমেন্ট পূর্ব জার্মানীর সংগে আলাদা সন্ধিপত্র সম্পাদন করবেন যার ফলে গোটা বার্লিনেই পূর্ব জার্মানীর অধিকার জন্মাবে। বলাবাহুল্য শ্রী কেনেডি ও শ্রী ক্রুশ্চফের হুমকির জোর সমান নয়। কারণ আমেরিকা যদি নিউক্লিয়ার অস্ত্রপরীক্ষা আবার প্রকাশ্যে আরম্ভ করে তবে তাতে আপাতত সোভিয়েটের বিশেষ কোনো ক্ষতি নেই, বিশেষত যদি এ সন্দেহ অমূলক না হয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে গোপনে মাটির নিচে নিউক্লিয়ার পরীক্ষামূলক কাজ চলছে যার উদ্দেশ্য "নিউট্রন" বোমা তৈরী করা। এই ব্যাপারে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রচার চালাবার পক্ষে একটা উপকরণও হবে। কিন্তু বার্লিন সম্পর্কে শ্রী ক্রুশ্চফ যে হুমকি দিয়েছেন সেটার প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা পশ্চিমা-শক্তিদের পক্ষে অসম্ভব। আরো মুশকিল এই জন্য যে, এ ব্যাপারে সোভিয়েটের সংগে আপোস করার লক্ষণ দেখালেই পশ্চিম জার্মান গবর্নমেন্ট হৈ হৈ করে উঠবেন। আপোস না করে গোঁ ধরে বসে থাকলে শ্রী ক্রুশ্চফ চুপচাপ হয়ে যাবেন, এরূপ আশা করাও নিরাপদ নয়। সুতরাং শ্রী কেনেডির নিউক্লিয়ার অস্ত্রপরীক্ষা আরম্ভ করব বলে হুমকির এবং শ্রী ক্রুশ্চফের বার্লিন সম্পর্কিত হুমকির ওজন এক নয়, দুটোর মিলে কাটাকাটি হয়ে যাবে বলে ভরসা করা যায় না।

১৪-৬-৬১

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

ভাষাদ্বরে (১৩)

এবারে কিন্তু মারিয়ানা সেয়ানা। আহারান্তে উপাসনা আরম্ভ করলে, 'তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই, হে প্রভু সর্ব-শক্তিমান' দিয়ে এবং শেষ করলো পরলোক-গত খৃষ্টাত্মাদের স্মরণে।

এসব প্রার্থনার সুন্দর অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভব। সর্ব ভাষার সর্ব প্রার্থনার বেলাই তাই। প্রণব কিংবা 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণম্ মুখম তেন মাহস্পাহি নিত্যম্'-এর বাঙলা অনুবাদ হয় না। আমি বহু বৎসর ধরে মুসলমানের প্রধান উপাসনা 'ফাতিহা' অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। আজ পর্যন্ত কোনো অনুবাদই মনকে প্রসন্ন করতে পারেনি। 'আভে মারিয়া' মন্ত্রটি অতি ক্ষুদ্র। ট্রামে-বাসে ঘরে-বাইরে বারবার মনে মনে এটির অনুবাদ করেছি—আঠেরো বছর ধরে, এবং এখনো করছি—কোনোটাই মনঃপূত হয় না। দেশের ট্রেনে আমার পরিচিত এক ক্যাথলিক পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ ধরে ঐ 'আভে মারিয়া'র দুটি শব্দ নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা হয়। ঐ মন্ত্রে মা-মেরির বিশেষণে লাতিনে আছে, 'প্রাৎসিয়া প্লেনা', ইংরিজীতে 'ফুল অব গ্রেস', জর্মনে 'ফল্ ডেরগ্নাডে'। আমি বাংলা করেছিলুম 'করুণাময়ী'। পাদ্রী সাহেবের সেটা জানা ছিল। শব্দটা আমার মনঃপূত হয়নি, কিন্তু দুজনাতে বহু চেষ্টা করেও পছন্দসই শব্দ বের করতে পারলুম না।

কাজেই মারিয়ানার প্রার্থনাগুলোর বাঙলা অনুবাদ উপস্থিত মুলতুবি থাক।

মারিয়ানা বাসনকোসন হাঁড়িবর্তন সিনকে ফেলেছে।

আমি উঠে গিয়ে সিনকের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমি মাজি ঃ তুমি পোঁছো।'

জুতো দিয়ে কাঠের মেঝেতে ঠোক্কর মেরে মারিয়ানা বললে, 'একদম অসম্ভব! তার চেয়ে তুমি ঐ টুলটার উপরে বসে আমাকে ইন্ডিয়ার গল্প বলো।'

এ স্থলে আমার পাঠকদের বলে রাখা ভালো, যে এ-কাহিনীতে অনেক কিছু কাট-ছাঁট বাদ-সাদ দিয়েই আমি লিখছি। কারণ ভারতবর্ষ কত বড় দেশ, পাহাড় নদী আছে কি না, লোকে কি খায়, মেয়েদের বিয়ে ক'বছর বয়সে হয়, এসব জানবার কৌতূহল বাঙালী পাঠকের হওয়ার কথা নয়, আর হলেও জর্মানির গ্রামাঞ্চলে হাই-কিঙের বর্ণনায় সেগুলো নিশ্চয়ই অবান্তর

ঠেকবে। অথচ জর্মানরা ঐসব প্রশ্নই বারবার জিজ্ঞেস করে বলে কথাবার্তার বারো আনা পরিমাণই ভারতবর্ষ নিয়ে। তাই পাঠক ভাববেন না, জর্মান জনপদবাসী আমার সামনে আপন দেশ নিয়েই বড়-ফাট্টাই করেছে, আর-কিছু শুনতে চায়নি।

আমি বললুম, 'দেখো মারিয়ানা, তুমি যে বললে, আমাকে তোমার ভালো লাগে, সেটা নিছক মুখের কথা। আমাকে খাইয়েছো ব'সে আমাকে দিয়ে বাসন মাজিয়ে নিতে চাও না— কারণ তা হলে খাওয়ানোটা মজুরি হয়ে দাঁড়ায়। এসব হিসেব লোকে করে, যে-জন আপন নয়, তার সঙ্গে। আপনজনকে মানুষে সব কর্ম অকর্মের অংশীদার করে। এইটুকু বলে, রাস্তার নাসপাতিওলা যে আমাকে শেষ পর্যন্ত তার গাড়ি ঠেলতে দিয়েছিল সে-কথাও বললুম।

এ-কথাটা বলা হয়তো আমার উচিত হয়নি। টম্-বয় হোক, আর হন্টর-ওয়ালীই হোক মেয়েছেলে তো মেয়েছেলে। দেখি, মারিয়ানার চোখ টলটল করেছে। আমাদের দেশে মানুষের নীল চোখ হয় না, আকাশের হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন, 'জল ভরেছে ঐ গগনের নীল-নয়নের কোণে—।' দেশে যে জিনিস আকাশে দেখেছি, এখানে সেটা মানুষের চোখে দেখলুম। অবশ্য এদেশের আকাশ কিন্তু আমাদের আকাশের মত ঘন নীল, ফিরোজা নীল হয় না।

আমি তাড়াতাড়ি এই সজল সংকট কাটাবার জন্যে ঝাড়ন নিয়ে মারিয়ানার পাশে দাঁড়ালুম। সে কিছু না বলে একখানা প্লেট আমার দিকে এগিয়ে দিলে।

আমি সঙ্কটের সম্পূর্ণ অবসান করার জন্য মাজার গুঁড়ো একটা হাঁড়ির উপর ছড়াতে ছড়াতে শুধালুম, 'ঠাকুরমা দুপুর-বেলা ঘুমোয় না?'

'ঐ চেয়ারেই। দিন রাতের আঠেরো ঘণ্টা ওরই উপরে কাটায়, রাত্রেও অনেক বলে কয়ে তাকে শোবার ঘরে নিয়ে যাই। মাঝে মাঝে কার্ল অবশ্য ওকে বেড়াতে নিয়ে যায়।'

আমি শুধালুম, 'কার্ল? কুকুরটা? তুমি নিয়ে যাও না?'

'ঠাকুরমা কার্লের সঙ্গে যেতেই পছন্দ করে। লীশে ঢিল পড়লেই ঠাকুরমা থেমে যায়, টান পড়লেই আস্তে আস্তে এগোয়। ঠাকুরমা বলে, ওতেই নাকি তার সুবিধে বেশী। জানো, লোকে আমার কথা বিশ্বাস করে না, যখন বলি, কার্ল ঠিক বুঝতে পারে কখন বৃষ্টি নামবে। তার সম্ভাবনা সে দেখতে পেলেই ঠাকুরমাকে বাড়ি ফেরত নিয়ে আসে।'

হঠাৎ কার্লের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'ঠাকুমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবিনে?

সঙ্গে সঙ্গে কার্ল পাশের ঘরে গিয়ে তার কলার লীশ মুখে করে নিয়ে এসে ঠাকুরমার কোলে রাখল। তিনি চমকে উঠে বললেন—হয়তো বা ইতিমধ্যে তাঁর তন্দ্রা এসে গিয়েছিল— 'আমি এখন বেড়াতে যাবো কি করে?'

মারিয়ানা হেসে বললে, 'না, ঠাকুরমা, আমি শুধু ওকে দেখাচ্ছিলুম কার্ল কি রকম চালাক।' তারপর কার্লকে বললে, 'যাও কার্ল! আজ ঠাকুরমা বেরুবে না।' স্পষ্ট বোঝা গেল, কার্ল সাতিশয় ক্ষুণ্ণ মনে লীশ কলার মুখে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। এবং খুব সম্ভব, অভিমান করে ফিরে এল না।

আমি শুধালুম, 'ঠাকুরমা কারো বাড়িতে যায়?'

মারিয়ানা বললে, 'রববার দিন গির্জেয়। অন্যদিন হলে পাদ্রীসায়েবের বাড়ি। আর মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে গোরস্তান যায়। আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে না। বাবা তো সেখানে নেই, শুধু মা আছে। তাকেও চিনিনে।'

ওর বলার ধরনটা এমনই সরল আর স্বাভাবিক যে আমার চোখে জল এসে গেছে। পাছে সে সেটা দেখে ফেলে তাই শেলফটার কাছে গিয়ে শুকনো বাসনগুলো এক পাশে সরাতে লাগলুম। তাতেও দেখলুম, কোনো কাজ হয় না। তখন বুঝলুম, এ বোঝা নামিয়ে ফেলাই ভালো।

ফের মারিয়ানার কাছে এসে বললুম, 'আমাদের দেশের কবির একটি কবিতা শুনবে?'

উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'নিশ্চয়ই!'

আমি বললুম, 'অনুবাদে কিন্তু অনেক-খানি রস মারা যায়। তবু শোনোঃ

"মনে পড়া মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন খেলতে গিয়ে
হঠাৎ অকারণে
একটা কী সুর গুনগুনিয়ে
কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন
আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত, আমার
দোলনা ঠেলে ঠেলে;
মা গিয়েছে যেতে যেতে
গানটি গেছে ফেলে।
মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে
শোবার ঘরের কোণে,
জানলা থেকে তাকাই দূরে
নীল আকাশের দিকে
মনে হয়, মা আমার পানে
চাইছে অনিমিখে।
কোলের 'পরে ধরে কবে
দেখতো আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে
সারা আকাশ ছেয়ে।"
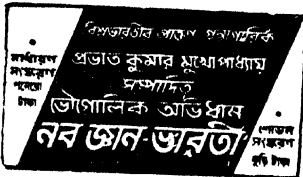
শার্ঙ্গদেব

প্রত্যেক যুগের একটা প্রচেষ্টা আছে যা সেই যুগকে চিহ্নিত করে রেখে যায়। প্রচেষ্টা কতখানি সার্থক হল সে প্রসঙ্গ ভিন্ন কিন্তু প্রচেষ্টার যে একটা গৌরব আছে তাকে অস্বীকার করা যায় না। বর্তমান কাব্যসংগীতেরও কতকগুলি উদ্দেশ্য আছে এবং সেই অনুযায়ী প্রচেষ্টাও আছে। যত নিন্দাই আধুনিক বাংলা গানের ওপর বর্ষিত হোক না কেন এ যুগের সামগ্রিক প্রয়াসকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। যেহেতু সংগীত আজকাল ব্যবসায়ীদের দখলে সেহেতু কোনও গান ভাল হতে পারে না—এমন ধরণা সংগত নয়। যাঁরা গান বাজনা করেন ও'দের খেয়ে পরে বাঁচতে হবে—অতএব ব্যবসায়ীদের সংগে সহযোগিতা না করে তাঁদের উপায় নেই। সাহিত্য বলুন, শিল্প বলুন, কোনটাই বা ব্যবসায়ীদের দখলে নয়? প্রকৃতপক্ষে অভাব যেটা সেটা প্রতিভার অভাব, আর কিছু নয়। আধুনিক গানের কাব্যসাহিত্য অধিক ক্ষেত্রেই উৎকৃষ্ট নয় এমনকি বিস্তর গানের ভাষা সমালোচনার পর্যায়ে পৌঁছোয়নি। এইটাই দুঃখের বিষয়। কিন্তু গীতসাহিত্য যেখানেই সুযোগ্য হয়েছে সেখানেই সংগীত প্রচেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়েছে এবং তার সমাদরও হয়েছে। আর একটা ত্রুটি এ যুগের প্রচেষ্টাকে ম্লান করেছে সেটি হচ্ছে কণ্ঠস্বরের ঐচ্ছিক অবদমন। মনোহারিত্বের অভিপ্রায়ে স্বরের স্বাভাবিক বিস্তারকে কোন কোন ক্ষেত্রে সংকুচিত করা আবশ্যক হয় কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করলে সেটা একটা ব্যাধিতে দাঁড়িয়ে যায়। বর্তমানে প্রেমসংগীতের আধিক্য সংগীত-সাহিত্যের দুর্বলতার লক্ষণ। প্রেমের গান খুব বেশি প্রচলিত বলে একই ধরনের গায়নপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায় যেটা মনকে অবসন্ন করে তোলে। এইরকম আরো কয়েকটি ত্রুটি আছে; কিন্তু নূতনত্বের অনেক চেষ্টাও দেখা যায় যার পরিকল্পনায় সাহসের পরিচয় আছে।

বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে আগেকার গানের সঙ্গে এযুগের গানের অনেক তফাৎ। আগেকার গান ছিল রাগাশ্রয়ী—গানের আবেদনকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য প্রধানত রাগসংগীতকেই অবলম্বন করা হত। এ যুগের গান এতটা রাগসংগীতের অধীন নয়—প্রকাশের বিভিন্ন বৈচিত্র্যে এরা নিজেদের

স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই বৈচিত্র্যের অনুসন্ধানই বর্তমান কাব্য-সঙ্গীতের প্রচেষ্টা। অধিক পরিমাণে একঘেয়ে প্রেমসঙ্গীত রচিত হলেও অন্য আরও নানা ধরনের যেসব গান শোনা যাচ্ছে তাতে গতানুগতিকতাকে পরিহার করবার চেষ্টা বেশ বোঝা যায়।

বর্তমান যুগ রাগসঙ্গীতকে উপেক্ষা করেছে এমন কথা বলব না—"রাগপ্রধান" শব্দটাই এযুগের তৈরি। যদিও এই নাম সম্পর্কে লেখকের আপত্তি আছে তথাপি কোন বিশেষ নামকরণ ব্যতিরেকেও এ কথা বলা যায় যে বর্তমান বাংলাগানে রাগসঙ্গীত থেকে আহরণ করবার মত বস্তুর অনুসন্ধান যথেষ্ট হয়েছে। হিমাংশুকুমার দত্ত রাগ-সঙ্গীতের কিছু কিছু চিত্তাকর্ষক Phrase সংগ্রহ করে তাঁর গানে আরোপ করেছিলেন সাফল্যের সঙ্গে। স্বরের বিচিত্র সংযোগে কাব্যাংশের আবেদনকে ফুটিয়ে তোলবার এমন প্রচেষ্টা এর আগে হয়নি। অনেকে হিমাংশুকুমারের সুরকে রাগপ্রধান বলে প্রচার করতে উৎসুক; কিন্তু রাগপ্রধান নামটাই কৃত্রিম। এই শ্রেণীর সঙ্গীত স্বাভাবিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বর্তমানে রাগপ্রধান নামে যে সঙ্গীত সম্পাদিত হয় তা একটা মিশ্র-রূপ যার এককভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার মত কোন বৈশিষ্ট্য নেই। হিমাংশুকুমারের সুর কাব্যসঙ্গীতেরই উপযুক্ত একান্তভাবে। দিলীপকুমার রায় বিস্তর তান প্রয়োগ করেছেন তাঁর রচনায় কিন্তু তাকেও রাগাশ্রয়ী বলবনা কেননা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কাব্যসঙ্গীতের বৈচিত্র্য সম্পাদন। কাব্যসঙ্গীতের মোড় ফিরে যায় দিলীপকুমার, হিমাংশুকুমার এবং নজরুলের হাতে। এ'দের বর্তমান কাব্যসঙ্গীতের প্রথম যুগের সঙ্গে যুক্ত করাই সমীচীন বলে আমাদের ধারণা। অতএব রাগ-সঙ্গীতের অলঙ্কার এবং রাগসঙ্গীতের তানও যে আধুনিক কাব্যসঙ্গীতে নতুনভাবে যোজিত হয়েছে তার অনেক প্রমাণ মেলে।

হাল আমলের বাংলা গানে ছন্দ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। এর আগে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ছন্দপ্রধান অনেক গান রচনা করেছেন—নাটকেও ছন্দ-প্রধান গানের সংখ্যা অল্প নয়; কিন্তু এযুগের প্রচেষ্টা সেরকমের নয়—এর চরিত্র আলাদা। আধুনিক সুরকারের উদ্দেশ্য চিত্তকে শব্দের স্পন্দনে দোলা লাগানো নয় ছন্দিত গতির সাহায্যে কাব্যের বক্তব্যকে মর্মঙ্গম করা। অর্থাৎ, ছন্দকে ব্যবহার করা হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে। এ প্রচেষ্টাও ইতিপূর্বে হয়নি। ছন্দ নিয়ে এই পরীক্ষার মূলে আছে প্রকাশোপযোগী নতুন মাধ্যমের আবিষ্কার। অনেক ক্ষেত্রে এর সঙ্গে যন্ত্রসঙ্গীতের মনোহর সহ-যোগিতা চলেছে। বর্তমানে সহযোগী যন্ত্রসঙ্গীত, বাস্তবিক প্রশংসার দাবী করতে পারে। আগেকার গানের সঙ্গে উঁচু পর্দার হার্মোনিয়াম যে কর্ণপীড়ার সঞ্চার করত তার সম্পূর্ণ অবসান হয়েছে এবং তার স্থানে সুমধুর সুরলহরী বহুলাংশে শ্রুতির পরিতৃপ্তি সম্পাদন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে যন্ত্রসঙ্গীত গানকে হুবহু অনুসরণ করেনা অথচ ব্যতিক্রম সত্ত্বেও মূল সুরের ধারার সঙ্গে সমন্বয় অব্যাহত থাকে। এই পরিকল্পনায় যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আর্টের দিক থেকে এর মূল্য কম নয়। যাঁরা সঙ্গীতের প্রয়োগ-শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞ তাঁরা অনুভব করতে পারবেন এই ধরনের সহযোগিতা কত চিন্তা এবং পরিশ্রমের ফল।

আজকাল গাইবার ভঙ্গি বা পরিবেশনের পদ্ধতি সুমার্জিত। এমনকি রাগপ্রধান গানেও উচ্চারণের জড়িমা বা সেকালের ওস্তাদসুলভ শ্লথভঙ্গি কদাচিৎ কানে আসে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মাঝে মাঝে ঠুংরি চালের কিম্বা গজল ঢঙের যে সব গান শুনেছি তাতে তাদেরও প্যাটার্ণ পাল্টেছে বলা যায়। ১৯২৭।২৮ সালের গান-গুলির সঙ্গে এদের তুলনা করলে প্রভেদটা অনায়াসেই বোঝা যায়। তাল নিয়ে বাহাদুরি এ যুগে আর করা হয় না—শিল্পীরা ওপথে আর যেতে চাইছেন না। সুর এবং তালের বৈচিত্র্যকে তাঁরা কাব্য-সঙ্গীতের সহজ বৈচিত্র্যের মধ্যে দেখতে চাইছেন। আসলে ওস্তাদিটাই আজকাল বাংলা গানে বাহুল্য বলে পরিগণিত কেননা কাব্যসঙ্গীতের বিকাশে ও বস্তুর প্রয়োজনীয়তা আর অনুভূত হয় না।

বাংলা গান নিয়ে যেসব পরীক্ষামূলক কাজ চলেছে তা সম্পূর্ণ সার্থক হবে যদি গানগুলি সাহিত্য এবং রসের দিক দিয়ে সুসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এর জন্য চিন্তার প্রয়োজন। যাঁরা আধুনিক গান একেবারে শুনতে নারাজ তাঁদের এতটা ঔদাসীন্য উন্নাসিকতার পরিচায়ক বলে মনে হয়। সমালোচনা করুন, বিরুদ্ধ মন্তব্য করুন—সেটা সঙ্গত হলে শিল্পী, লেখক বা সুরকার মাথা পেতে নেবেন, কিন্তু অবহেলা আধুনিক সঙ্গীতসমাজের গায়ে বাজবে। অনেক গান যোগ্য হয়নি সেটা মানি কিন্তু কিছু গান রসোত্তরণ এবং যোগ্যতার দাবি করতে পারে—এট নিশ্চিত। এই কিছুর মধ্যে এমন একটা প্রয়াস আছে যার নূতনত্বকে অভিনন্দিত করা উচিত। এটা শ্রোতৃসমাজের দাক্ষিণ্য নয় এটা তাঁদের কর্তব্য; নইলে বুঝব নতুনের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকারের পরিচয় ঘটেনি।
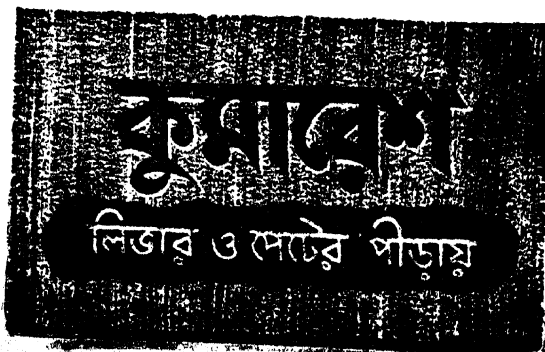
পশ্চিম বার্লিনে একটি বড় হাসপাতালে সম্প্রতি একটি শক্তিশালী তেজস্ক্রীয় যন্ত্র আনানো হয়েছে যার নাম হচ্ছে বেটাট্রন'। ইতালীর মিলান ও আমেরিকার নিউ ইয়র্ক ছাড়া এই যন্ত্র পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই। ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিযুক্ত এই বেটাট্রন যন্ত্রটি অভিজ্ঞ মহলে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

বেটাট্রন অপেক্ষা কম শক্তিশালী ১১কে ইলেকট্রন ভোল্টের যন্ত্র অবিশ্যি পৃথিবীর অনেক দেশেই কিছুকাল ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে, তবে বেটাট্রন তেজস্ক্রিয়তার যেমন গভীরে প্রবেশের শক্তি, ক্ষমতাও তার তেমনি প্রচণ্ড। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে চিকিৎসাদির ব্যাপারে অমিতবিক্রম বেটাট্রন যন্ত্র ব্যবহারের সময় মাত্রাও অনেক কম যা মানব দেহের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অনেক রকম রোগে ব্যবহৃত হলেও দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় বেটাট্রন একটা অমূল্য সম্পদ।

বেটাট্রনের বিশেষত্ব হচ্ছে দ্রুতগামী ইলেকট্রন রশ্মি ছাড়াও প্রচণ্ড তীব্র রঞ্জনরশ্মি পরিবেশন। এই জাতীয় অন্যান্য যন্ত্রের মত বেটাট্রনের ভিতর বিরামহীন তেজস্ক্রীয়তা কেন্দ্র নেই। সেইজন্যে এক চিকিৎসার সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে চিকিৎসক ও রোগীকে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় না। সহজ স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের উপযোগী করে যন্ত্রটিকে ইচ্ছামত চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

বর্তমান মাস থেকে রুডলফ হাস-পাতালে উপরোক্ত বেটাট্রন সরঞ্জামটি চালু করা হয়েছে। এর দাম হচ্ছে প্রায় ৫ লক্ষ (ডি) মার্কেরও বেশী এবং এই টাকা পাওয়া গেছে পশ্চিম বার্লিন লটারীর দান থেকে। যন্ত্রটি তৈরী করেছেন 'ব্রাউন বভয়রী কোং' নামে এক সুইস প্রতিষ্ঠান। এ'দের তৈরী চতুর্থ বেটাট্রন যন্ত্রটি এবছর এ'রা ফ্রান্সকে বিক্রী করবেন—ওটা বসান হবে প্যারিসে।

সারা পৃথিবীর মধ্যে চারটি বেটাট্রন যন্ত্র যার মধ্যে একটি পশ্চিম জার্মানীতে। ক্যানসার অভিযানে সাধারণ তন্ত্রী জার্মানীর প্রচেষ্টা সত্যিই অপূর্ব।

*

পশ্চিম জার্মানীর ওয়েস্ট ফ্যালিয়ায় শুয়োর ছানার মাংস এতই উপাদেয় যে তার সঙ্গে কালোরুটি 'পুম্পার নিকেল' ও কড়া জিন-ব্রান্ডি 'স্টেইনহয়গার' থাকলে ওদেশের

সেতু ছাড়াই ভারি যানবাহন খাদ পার করার নতুন ব্যবস্থা—ইংলণ্ডে ডিভনশায়ারের ট্রিগান্টলে সামরিক বিভাগের স্যাপাররা ইস্পাতের তারের ওপর দিয়ে বিশেষভাবে তৈরী চাকাযুক্ত একটি ল্যান্ডরোভার চালিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে

লোক আর কিছুই চায় না। শুয়োর ছানা উৎপাদন আর প্রতিপালনে ওয়েস্ট ফ্যালিয়ার চাষীরা খুবই যত্ন নিয়ে থাকে। ওয়েস্ট ফ্যালিয়ার সোয়েস্ট শহরের বিরাট জায়গা জুড়ে রয়েছে 'হাউস ডুইসে', যার মধ্যে আছে কৃষি কলেজের সঙ্গে যুক্ত একটি পশু সম্বন্ধীয় গবেষণালয়।

উপরোক্ত গবেষণালয়ের প্রজনন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট আজ বহুলাংশেই সাফল্যমণ্ডিত। এখন ও'দের পরীক্ষা চলছে ওয়েস্ট ফ্যালিয়ার উন্নততর দলজাত ৪০০টি শুয়োর ছানা নিয়ে। এই সমস্ত শুয়োর থেকে ও'রা এখন এমন শুয়োর শিশু উৎপাদন করতে চান ৭ মাসের মধ্যেই যাদের ওজন হয়ে উঠবে ১১০ কিলো—অর্থাৎ একদিকে যেমন এদের থেকে সবচেয়ে বেশী মাংস এবং অতি উৎকৃষ্ট মাংস পাওয়া যায় অন্যদিকে আবার এই মাংস হবে পাতলা, কেননা অন্যান্য দেশের মত জার্মানীতেও এখন আর চর্বিওলা মাংসের প্রচলন নেই। একটি শুয়োর বেচে পশ্চিম জার্মানীর চাষীরা এখন লাভ করে মাত্র ৩০ (ডি) মার্ক। শুয়োর শাবক কিনতে লাগে ৫০।৬০ মার্ক। প্রতিপালন খরচা ১৯০।২০০ মার্ক-এর মধ্যে আছে খাদ্য সামগ্রীর দাম, লোকজনের মাইনে, চিকিৎসা ব্যয় ও যন্ত্র সরঞ্জামের খরচ। একটি শুয়োর বেচে পাওয়া যায় ২৭৫ (ডি) মার্ক। কাজে কাজেই লাভের অংশ বাড়াতে গেলেই খরচ কমান দরকার—তাই গবেষণালয়টিতে চেষ্টা হচ্ছে এমন খাদ্য উদ্ভাবন যা সবচেয়ে কম খাইয়েও উদ্দেশ্য অনুযায়ী ফল পাওয়া যাবে।

গবেষণাকারী সংস্থাটির আবহাওয়া ও ব্যবস্থা এতই পরিচ্ছন্ন যে কে বলবে ওটা একটা শুয়োরের খোঁয়াড়। বাইরে থেকে অন্য শুয়োরদের প্রথমেই নিয়ে যাওয়া হয় গবেষণালয়টির সংক্রামক-ব্যাধি নিবারণাগারে। ওখানে ভাল করে পরীক্ষা করে টিকে দেওয়ার পর বেশ করে ঘষে ওদের স্নান করিয়ে দেওয়া হয়। এরপর পরিষ্কার ধবধবে শুয়োরগুলিকে স্থানান্তরিত করা হয় শীততাপনিয়ন্ত্রিত বাসগৃহে—ওদের গায়ে লাগান হয় উত্তাপ নিবারক ফলক। বাস, নিদ্রা ও মলমূত্র ত্যাগের জন্য প্রত্যেক শুয়োরের তিন-ভাগে-বিভক্ত একটি বাক্স নির্দিষ্ট থাকে। আশ্চর্যের বিষয় যে পশুরাও ক্রমে ক্রমে এই পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায় এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে কালক্রমে বাক্সের তিনটি বিভাগই যথার্থ সদ্ব্যবহৃত হয়—এমন কি তৃষ্ণার্ত হলেও স্বয়ংক্রিয় জলের-পাম্পও এই পশুরাই চালিয়ে থাকে।

গবেষণালয়টিতে নানা জাতের শুয়োর থাকলেও তাদের বাসস্থানের আবহাওয়া অভিন্ন—কেবল জাত ও ওজন হিসেবে ওদের খাদ্যের ব্যবস্থা ও পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়। মনে খাদ্যের উৎকর্ষসাধনে ওয়েস্ট ফ্যালিয়ার ইনস্টিটিউটটির কাজ খুবই প্রশংসনীয়।

॥ উনচল্লিশ ॥
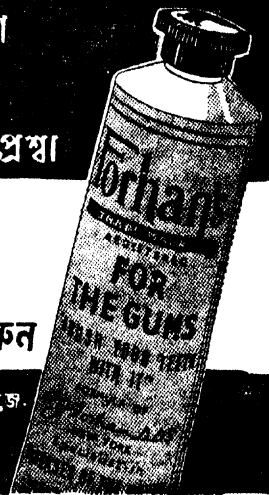
অ্যাডভান্স বেস্ থেকে নেমে, নদীর বুকে দাঁড়িয়ে দিলীপ একবার পিছনে ফিরে চাইল। না, তাঁবুগুলো আর দেখা যায় না। সামনের ঢিবিটা আড়াল রচনা করেছে। একটা মাত্র নিদর্শন দিলীপের চোখে পড়ল, লাল টকটকে একটা পতাকা, যা বলে দিচ্ছে ঐ উঁচু ঢিবিটার অন্তরালে গোটাকতক মানুষ অস্থায়ী এক আস্তানা গেড়েছে। এত জিনিসের মধ্যে শুধু ঐ লাল পতাকাটাই দিলীপের নজরে পড়ল। ওটা "বনমালী বাবুর বাড়ির" ধ্বজা। দিলীপ মনে মনে হাসল। ঘড়ি দেখল। ৩টে বাজে। বেশ আকাশ। বেশ রোদ।

বেশ দ্রুতই নেমে চলেছে ওরা।

দা তেম্বা হঠাৎ বলল, "সাব্, আউর জলদি চল। বরফ গিরেগা। 'স্নো-ফল' হোগা।"

দিলীপ আকাশের দিকে চাইল। ছেঁড়া ছেঁড়া কতকগুলো হাল্কা মেঘ ভেসে ভেসে আসছে। ধীরে ধীরে জমাট বেঁধে উঠছে। একটু শীত শীত করছে যেন।

দিলীপ সুকুমারকে বলল, "জোরে চল রায়। দা তেম্বা বলছে তুষারপাত হতে পারে।"

সুকুমার মুখ তুলে আকাশের চেহারাটা দেখে নিল। এরই মধ্যে বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। সুকুমার মনে মনে বললে, ভোগাবে দেখছি।

ওরা আরও দ্রুত নেমে যেতে লাগল। এইটাই একমাত্র আশার কথা যে, পথটা বেশির ভাগই এখন উৎরাই। তাপমাত্রা দ্রুত নেমে যাচ্ছে। কনকনে ঠান্ডা চোখে-মুখে লাগছে। তুষার গাঁইতির ইস্পাতের ফলাটায় আর হাত রাখা যাচ্ছে না, এমনই ছ্যাঁক ছ্যাঁক করছে ঠান্ডায়। আরও মুশকিল এই যে, আজ ওরা উইন্ডপ্রুফ জ্যাকেটটা পর্যন্ত সঙ্গে আনেনি।

প্রায় ছুটতে ছুটতেই ওরা আভালান্সটার কাছে গিয়ে পৌঁছাল। এতক্ষণ নেমে আসছিল পথটা। এবার খানিকটা চড়াই। ওরা হাঁফাতে হাঁফাতে উঠতে লাগল চড়াই ভেঙে। আকাশ ততক্ষণে ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করেছে। জমাট মেঘ হাওয়ার প্রশ্রয় পেয়ে কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে নেমে আসছে। দিলীপের মনে হল, ওগুলো যেন ছোঁ মেরে ঠোকরাতে আসছে। হাঁফাতে হাঁফাতে চড়াইটার মাথায় উঠতেই ওদের দম বেরিয়ে গেল। ওরা ধপ ধপ করে সেখানেই বসে পড়ল।

আকাশ বুঝি এতক্ষণ এই সুযোগই খুঁজছিল। ওরা শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে সে এখন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের উপর। ওরা অসহায়ভাবে চেয়ে দেখল তুষারবর্ষণ শুরু হয়ে গেল। ওদের ব্যগ্র চোখগুলো আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ হল। একটা গুহা, একটা বড় পাথরের আড়াল কি একটা ফাটল—কোথাও কিছু নেই। শুধু ন্যাড়া পাহাড়।

তুষারপাত শুরু হল। প্রথমে ছোট ছোট দানা, দুধের মত সাদা, কেউ যেন ঝুড়ি ঝুড়ি, কোটি কোটি সাদা সাদা এলাচদানা আকাশ থেকে ঢেলে দিচ্ছে। হাওয়ায় এদিক ওদিক উড়ে চলেছে। গায়ে পড়ছে, পায়ে পড়ছে, মাথায় পড়ছে। পাহাড়ে পাথরে ছিটকে ছিটকে পড়ছে। দেখতে দেখতে দানাগুলো আকারে বড় হতে লাগল। যেন
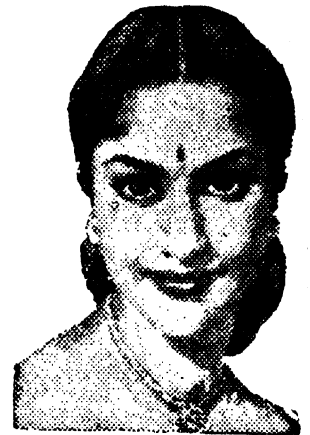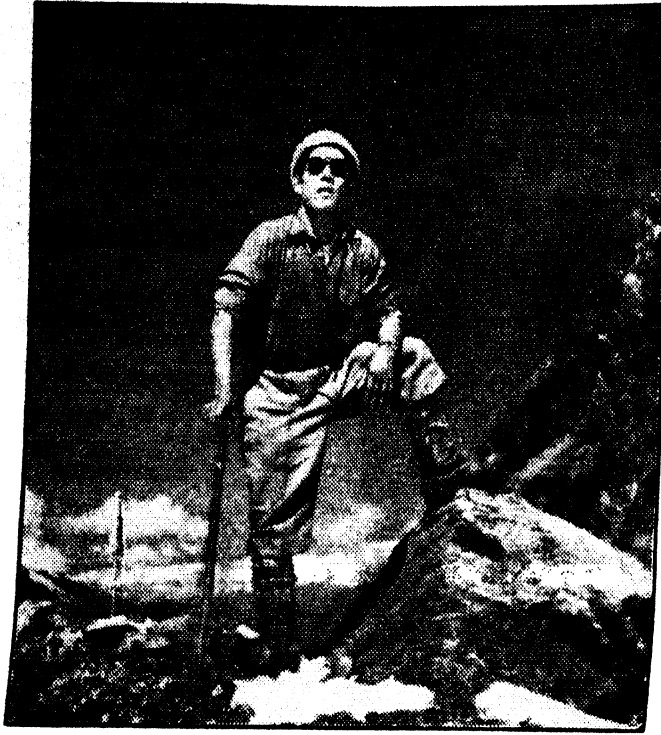
শেরপা টাসী

মেসিনগানের গুলী। মুখে মাথায় হাতে নাকে যেখানে লাগে মনে হয় বুঝি ফুটো হয়ে যাবে।

ওরা উঠে পড়ল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে লাগল। এমন কি এ কথাও ভুলে গেল, ওরা পাহাড়ে এসেছে, পাহাড়ের পথ, বিশেষ করে এই পথটুকু ভয়ানক বিপদে ভরা। ভুলে গেল, পা যদি একবার হড়কে যায়, সংগে সংগে হাজার ফুট নিচে গিয়ে আছাড় খেতে হবে। এ জীবনে আর সাবধান হবার সুযোগ মিলবে না।

সেসব কোন কিছুই ভাবছে না ওরা। ওরা এখন প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন তুষার-পাত ওদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিয়েছে, ওরা পথ দেখতে পাচ্ছে না। ভিজে নেয়ে উঠেছে। ঠান্ডায় হাত-পা জমে আসছে। ওরা শুধু ছুটছে। একটা মাত্র লক্ষ্য—বেস ক্যাম্প। বেস ক্যাম্প। সেখানে আশ্রয় আছে। বেস ক্যাম্প। সেখানে উষ্ণতা আছে, শুকনো পোশাক আছে।

লেখকের দিনলিপি থেকেঃ

বীরেনদার নাক ডাকতে শুরু করেছে। এখন বেলা ৪॥টার বেশী হবে না। সমানে তুষারপাত হয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে তাঁবুর কাপড় আর্তনাদ করে উঠছে। কারোর কোন সাড়া নেই। নিমাই, ধ্রুব, ডাক্তার কি করছে কে জানে? দিলীপ, সুকুমারের ফিরে আসার কথা। কি করছে কে জানে? হঠাৎ অনেকগুলো পায়ের শব্দ একসংগে বেজে উঠল। বীরেনদার নাকের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। এবারে ঢাকের আওয়াজ বেজে উঠল। নিশ্চিন্ত মনে ধরা গলায় বীরেনদা আওয়াজ ছাড়লেন, "বল বাবা বদ্রী বিশালজী কী—" অন্যান্য তাঁবু প্রকম্পিত করে সাড়া জাগল, "জয়!" সংগে সংগে ডাকে হাঁকে সেই নিস্তব্ধ বেস ক্যাম্প মুখরিত হয়ে উঠল।

দিলীপরা ভিজে পোশাক বদলে শুকনো পোশাক পরল। আগুনে হাত পা সেঁকলে আরাম পেত। কিন্তু আগুন নেই। তাই সবাই একে একে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ল। আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সব চুপচাপ হয়ে গেল। ঝিমিয়ে পড়ল বেস ক্যাম্প।

সন্ধ্যের মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। মেঘ নেই, তুষারপাত নেই, হাওয়া নেই। তবু কী কনকনে ঠান্ডা। গরম পোশাক ভেদ করে শীত যেন মেরুদণ্ডের উপর ঠান্ডা আঙুলে বুলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তবু, আকাশে তারা দেখে মনটা হাল্কা হয়ে উঠল।

৭টা। ৭॥টায় আমরা খাওয়াদাওয়া সেরে নিলাম। দা তেম্বা শেরপা স্টাইলে স্টু
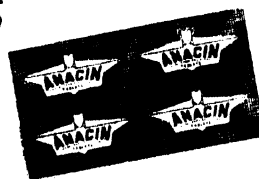
রেঁধেছিল। স্টু মানে মাংসের সঙ্গে আটার পুলি তৈরি করে তার লপসি। মাংস শক্ত শক্ত, পুলিগুলো কাঁচা কাঁচা। আমাশার পথ্য হিসেবে এর বোধ হয় জুড়ি নেই। পেটের অবস্থা কাল যা দাঁড়াবে তা মনশ্চক্ষে দেখে নিয়ে চমৎকৃত হলাম। জয় গুরু বলে সেই স্টুই খানিকটা খেয়ে নিলাম। খাওয়ার সময় সুকুমার জানাল, আগে যে প্ল্যান ছকা হয়েছিল সে তার একটু পরিবর্তন করতে চায়। তার ইচ্ছে, আগামীকাল শুধু শেরপারাই উপরে যাবে। মাল পেঁছে দিয়ে আসবে। অন্য সবাই বিশ্রাম নেবে। দিলীপ, নিমাই, ধ্রুব পরামর্শ দিল, শুধু শেরপাদের না পাঠিয়ে, ঐ সঙ্গে ওদের একজনকেও পাঠানো হোক। শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সুকুমার আর দিলীপ বিশ্রাম নেবে, আর নিমাই শেরপাদের সঙ্গে যাবে। দিলীপের অবশ্য বিশ্রাম নেবার দরকার ছিল না, সে চায়ও নি। কিন্তু নেতার নির্দেশে তাকে নিরস্ত হতে হল।

বিশ্বদেবের দিনলিপি থেকে ঃ

অ্যাডভান্স বেস্। প্রায় আধ ঘণ্টা মুষলধারে তুষারপাত হল। দেখলাম ৬।৭ ইঞ্চি তুষারপাত হয়েছে। ত্রিপলের উপর, তাঁবুর কাপড়ে বরফ জমে আছে। সেই বরফ চেঁছে নিয়ে, তাই আগুনে গালিয়ে জল তৈরি করা হল।

তুষারপাতের পর প্রচণ্ড শীত পড়ল। সকাল সকাল খেয়ে নিলাম। আঙ শেরিং চমৎকার মাংস পোলাও রেঁধেছিল। খেতে খুব ভাল লাগল। ঠিক হল, কাল সকাল ৯টার সময়ই আমরা ১নং শিবিরের জায়গা দেখতে বের হব। সঙ্গে কি কি নেওয়া হবে? আঙ শেরিং বললে, প্রথম দিন আমাদের রাস্তা তৈরি করতে হবে। কাজেই খুব বেশী মাল নেওয়া চলবে না। রেশন নেব, দড়ি নেব, পিটন নেব আর নেব পার্সন্যাল কিট্। আঙ শেরিং বললে, আমাদের তাঁবু কম আছে। কাজেই ক্যাম্পগুলো বেশ তফাতে তফাতে স্থাপন করতে হবে। সর্দারের ইচ্ছে, ১নং শিবিরটা অন্তত মাইল পাঁচেক দূরে হয়।

আমরা সকাল সকাল শুয়ে পড়লাম। তাঁবুর কাপড়ের ভিতর দিয়ে জল চুঁইয়ে বিছানা ভিজিয়ে দিয়েছে। উপায় কি, ঐ ঠাণ্ডায় সেই ভিজে ভিজে স্লিপিং ব্যাগেই ঢুকতে হল। আমাদের ক্যাম্পে, কিচেনে পেট্রোম্যাক্সের আলোটা জ্বলছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া দিচ্ছে। হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি লাগছে।

তুষারপাতের পর থেকেই মনে হচ্ছিল, আজ যেন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এমনকি কথা বলতে গিয়েও দেখি, একটুতেই হাঁফিয়ে পড়ছি। শুয়ে শুয়ে অস্বস্তি লাগছে। ঘুম আসছে না।

আমাদের টেন্ট-লণ্ঠন ছিল না। আমরা

ঘরের মধ্যে মোমবাতি জ্বালালাম। আমি লিখছি। মদন বাতি ধরে আছে। আর মনে মনে আমার মুণ্ডপাত করছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। দূরে কোথাও ঝরনা আছে নিশ্চয়ই, তার একটানা জল পড়ার শব্দ কানে এসে বাজছে। মধ্যে মধ্যে ভীষণ শব্দ করে অ্যাভলান্স নামছে।......

॥ চল্লিশ ॥

বিশ্বদেবের দিনলিপি থেকেঃ

অ্যাডভান্স বেস। ১২ই অক্টোবর। ঘুম ভাঙল হরি সিং-এর "সাব্ চা, সাব্ চা" ডাকে। ঘড়িতে দেখি ৮॥টা। হাত বাড়িয়ে চা নিলাম। উঃ, কী শীত! চা খেতে লাগলাম। এই প্রথম চায়ের সঙ্গে মাল্টি ভিটামিন ট্যাবলেটের অভাব অনুভব করলাম। কারণ, আজ আর আণ্ড ফুতার নেই। চা খেয়ে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিলাম। জোরে হাওয়া বইতে আরম্ভ করল। একে শীতে রক্ষে নেই, হাওয়া তার দোসর। কাঁপতে কাঁপতে কিচেনে গিয়ে ঢুকলাম। হরি সিং ব্রেকফাস্ট বানাচ্ছে।
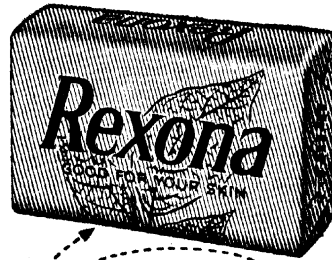
ব্রেকফাস্ট মানে চাপাটি আর চা। সেখানে এসে তাই খাচ্ছি আর আগুন পোয়াচ্ছি।

সেখান থেকে খানিক পরে বেরুতেই চারদিকে দৃষ্টি পড়ল। সব কিছু বরফে ঢেকে গিয়েছে। যেদিকে চাই সাদা, শুধু সাদা। তবে একেবারে নিষ্কলঙ্ক নয়। তারই মাঝে উঁচু উঁচু পাথরগুলো কালো কালো মাথা জাগিয়ে বসে আছে।

কাল ঠিক করেছিলাম, আজ ৯টায় মার্চ শুরু করব। কিন্তু বেরুতে বেরুতে একটি ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। রোদই উঠল ৯টায়। যেন প্রাণ এল ধড়ে। একটু গরম হয়ে, তাড়াতাড়ি রুকস্যাক গুছিয়ে নিলাম।

আগের দিন যদিও সর্দার বলেছিল, বোঝা বেশী নেব না, তবু দেখা গেল তার ওজন ৩৫।৩৬ পাউণ্ডের কম হল না। সবই আবশ্যকীয় জিনিস, কোনটাই বাদ দেওয়া যায় না। যাত্রা করার আগে আমি আর মদন সব জিনিস পরীক্ষা করে নিলাম। জল, চা, বিস্কুট, উইণ্ডপ্রুফ জ্যাকেট নেওয়া হয়েছে কি না, দেখে নিলাম। উইণ্ডপ্রুফ ট্রাউজার্সটি পরেই নিয়েছি।

আজ আমরা মাত্র চারজন। আমি, মদন আঙ শেরিং আর টাসী। আঙ শেরিং সকলের আগে আছে। প্রথম মিনিট কুড়ি আমরা পাথরের উপর দিয়ে চললাম। চলেছি দক্ষিণে। এই পাথরের উপরকার রাস্তাটুকু খুব বেগ দিল। কাল বরফ পড়েছে। পাথরগুলো পিছল হয়ে আছে। কোন কোনটাতে পা দেওয়ামাত্র হড়কে যাচ্ছে। কখনো দুটো পাথরের ফাঁকে পা ঢুকে পড়ছে। যে কোন মুহূর্তে পাটা মচকে যেতে পারে। কোন কোন পাথর আবার এত আলগা যে পা রাখা মাত্র সেটা খসে পড়ছে। আবার কোনটা একেবারে নড়বড়ে। পা দেওয়া মাত্র হুমড়ি খেয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এইসব পাথর সাবধানে এড়িয়ে এগোতে হচ্ছে।

আকাশ আজ একেবারে পরিষ্কার। চলতে চলতে বেশ গরম লাগছে। বাতাসও কমে এসেছে। আমরা মোরেন থেকে এগিয়েই হিমবাহের উপরে গিয়ে হাজির হলাম। সামনেই এক চড়াই। বেশ খাড়া। বরফের সেই চড়াইটার মাথায় উঠতে আমাদের বেশ কষ্ট হতে লাগল। উপরে উঠে আমরা বিশ্রাম না নিয়ে পারলাম না।

আঙ শেরিং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে নিল। তারপর আমাদের বলল, আমি আর টাসী এগিয়ে যাচ্ছি। তোমরা আমাদের পিছনে পিছনে এস। আমরা যেখানে যেখানে পা দিয়ে যাব, তোমরাও সেখানে সেখানে পা দেবে। খবরদার অন্যখানে পা দিও না।

খানিকটা এগোবার পর আমাদের দড়ি বের করতে হল। দড়ি আমরা কোমরে বাঁধলাম না বটে, তবে হাতে নিয়ে রাখতে হল।

এবারে টাসী এগিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। আঙ শেরিং দড়ি হাতে সদা-প্রস্তুত ভাবে টাসীর পিছনে পিছনে যেতে লাগল।

আমরা প্রায় পা টিপে টিপে চলছিলাম। আশেপাশে অজস্র বরফের ফাটল। কোনটা বড়, কোনটা ছোট। কোন কোনটা আবার চৌবাচ্চার মত।

যে ফাটল প্রকাশ্য, চোখে দেখা যায়, তাকে কায়দা করা সোজা। পা টিপে টিপে এড়িয়ে যাও, ঘুরে ঘুরে সেটা পার হও। তাতে সময় বেশী লাগবে, পরিশ্রম বেশী হবে, কিন্তু বিপদে পড়ার কোন আশঙ্কা থাকবে না। কিন্তু চোরা ফাটলের চেয়ে বড় শত্রু আর বুঝি কিছু নেই। এ ফাটল চোখে দেখা যায় না, বরফের নিচে লুকিয়ে থাকে। চোরা ফাটলে পা পড়ামাত্র কোথায় তলিয়ে যাবে, কেউ বলতে পারে না। বরফের রাজ্যে বাইরের চেহারা দেখে ধরার উপায় নেই, কোথায় চোরা ফাটল আছে। অন্তত বিশ্বদেব আর মদন তা বুঝতে পারছিল না।

বুঝতে পারছিল আঙ শেরিং আর টাসী। আমরা যেমন সহজে বই-এর পাতায় চোখ বুলিয়েই তার মর্ম গ্রহণ করে যাই, শেরপারা তেমনি অক্লেশে বরফের উপর চোখ বুলিয়েই ধরে ফেলে, কোথায় কি আছে। মরুভূমিতে

অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পের কাছে রণ্টি হিমবাহ। ছোট-বড় ফাটলে ভর্তি।

উট ছাড়া যেমন গতি নেই, পাহাড়ে তেমনি শেরপা ছাড়া এক পাও চলা যায় না।

আঙ শেরিং ওদের নির্দেশ দিচ্ছিল—"সাব্, সিধা নেহি, আভি দাহিনা যাও, আভি বাঁয়া ঘুমো সাব্, কারভিজ্ (ক্রিভাস অর্থাৎ ফাটল) হ্যায়"—আর মদন আর বিশ্বদেব সেই নির্দেশ নতমস্তকে মেনে যাচ্ছিল।

আজ ওদের এত ধীরে যেতে হচ্ছে, এত ঘুরতে হচ্ছে যে ওরা খুব বেশী এগুতে পারছে না। বরফ এত আলগা যে প্রতি পদক্ষেপে ওদের হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। ঐভাবে এক পা এক পা করে এগিয়ে যেতে ওদের প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল।

মদন আর বিশ্বদেব ধুঁকতে ধুঁকতে এগোচ্ছিল। হঠাৎ বিশ্বদেব আছাড় খেল। একটু গড়িয়ে গেল নিচের দিকে। অকস্মাৎ এইভাবে পড়ে যাওয়ায় বিশ্ব হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে সে নিজেকে সামলে নিল। দু পায়ে ভর দিয়ে যেখানে দেহভার সামলে নেবার চেষ্টা করল, দেখল সেখানে পায়ের তলায় ভর দেবার মত কিছু নেই। বিশ্ব ক্রমশ বরফস্তূপের ভিতর ঢুকে যেতে লাগল। যতই বিশ্ব আঁকুপাকু করে উঠতে চেষ্টা করে, ততই সে ভিতরে ঢুকে যায়। ক্রমে ক্রমে বিশ্ব এক কোমর পর্যন্ত ঢুকে গেল।

মদন প্রথমে বুঝতে পারেনি। বিশ্বদেবের হাবভাবে তার মজাই লাগছিল। সে হাসছিল খিলখিল করে। একটু পরেই সে বিশ্বদেবের বিপদটা বুঝে ফেলল। তাড়াতাড়ি পথ ছেড়ে কয়েক কদম এগিয়ে এসে বিশ্বদেবের দিকে সে নিজের তুষার-গাঁইতিটা বাড়িয়ে দিল। এতক্ষণে বিশ্বদেব যেন একটা বড় রকমের অবলম্বন পেল। জোর করে সে মদনের তুষার-গাঁইতিটা চেপে ধরল।

মদন তার গাঁইতিটাতে টান দিতেই নিজেও আলগা বরফের মধ্যে খানিকটা ঢুকে গেল। বিশ্বদেবের টানে ক্রমশ সেও তলিয়ে যেতে লাগল সেই চোরা বরফের মধ্যে। এবার বিশ্বদেব সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। মদন বিব্রত বোধ করতে লাগল। নিজেকে মুক্ত করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। ক্রমশই বুঝতে পারল, সে চেষ্টা অসম্ভব।

আঙ শেরিং আর টাসী একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে। একটু একটু করে ওরা দূরে সরে যাচ্ছে। যদি একেবারে আড়ালে চলে যায়। যদি ওরা একবারও পিছনে না তাকায়?

মদনের ভয় হল। তা হলে ওরা উঠবে কি করে? কে ওদের উদ্ধার করবে?

মদন কালবিলম্ব না করে হাঁক ছাড়ল, "দাজু!"

মদনের গলা শুকিয়ে ছিল। আওয়াজটা হয়ত পৌঁছাল না। আঙ শেরিং আর টাসী ফিরেও চাইল না। বেশ অনেকটা দূরে চলে গিয়েছে ওরা। একটা ঢিবির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। ঢিবিটার ওপাশে নেমে গেলেই ওরা আর দেখতে পাবে না এদেরকে।

"দাজু—"

মদন আবার হাঁক ছাড়ল

"দা—জু!"

বিশ্বদেব হাঁক ছাড়ল।

"দাজু, দাজু—"

ওরা দ্‌জনে সমানে পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগল।

দাজ্‌—দাজ্‌—দাজ্‌—দাজ্‌—ওদের ডাকটা পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ঘ্‌রে ঘ্‌রে বেড়াতে লাগল।

এতক্ষণে আঙ শেরিং আর টাসী ফিরে দাঁড়াল। ওদের বিপদটা ব্‌ঝতে পেরে আঙ শেরিং ত্বরিত গতিতে ফিরে এল। তারপর নিজে একটা শক্ত জায়গা বেছে নিয়ে, সেখানে দাঁড়িয়ে দড়ি এগিয়ে দিল। সেই দড়ি ধরে ওরা অতি কষ্টে উঠে এল। আঙ শেরিং ওদের বকাবকি করতে লাগল। এত করে সাবধান করা সত্ত্বেও কেন ওরা পথ ছেড়ে বাইরে গিয়েছে। মদন মাথা চুলকাতে লাগল। ভুলটা সেই করেছে। এত তড়বড় না করে ভেবেচিন্তে বিশ্বকে উদ্ধারের চেষ্টা করলেই পারত। খ্‌ব শিক্ষা হল বটে।

ওরা একটা চড়াইয়ের মাথায় উঠে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতে লাগল। একট্‌ দ্‌রে আরেকটা বরফের ঢিবি নজরে পড়ল। সোজা গেলে, দ্‌রত্ব ৩০।৪০ ফ্‌টের বেশী হবে না। মদন আর বিশ্বদেব লজেন্স চুষতে চুষতে দেখল আঙ শেরিং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দ্‌রের ঢিবিটার দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে কি যেন ভাবছে। মাঝে মাঝে টাসীর সঙ্গে কি সব পরামর্শ করছে।

মদন জিজ্ঞাসা করল, "কি দাজ্‌, কি ব্যাপার?"

আঙ শেরিং বলল, "রাস্তা দেখ রহা হ্যায়।"

মদন বলল, "কেন, সামনে এগোতে বাধা কি?"

আঙ শেরিং বলল, "উধার আচ্ছা নেহি, কার্বাভিজ হ্যায়।"

আবার সে চারদিকে আঙ্গ্‌লে দেখিয়ে দেখিয়ে টাসীর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল।

বলল, "সাব্‌ তুমলোগ ইঁহা ঠাহ্‌র যাও। যব্‌ বোলেগা তব্‌ যায়েগা।"

তারপর আঙ শেরিং আর টাসী নেমে গেল। ওরা সোজা গেল না। এক পাশ দিয়ে ঘ্‌রে যেতে লাগল। আর আশ্চর্য, যেদিক দিয়ে ওরা নেমে গেল, সেদিকটা বেশ খারাপ। উপর থেকে দেখে মদন আর বিশ্বর সেই ধারণাই হল। এদিককার বরফও আলগা, খ্‌ব ভস্‌ভসে।

খানিকটা এগিয়ে যাবার পর আঙ শেরিং ইশারায় ওদের ডাক দিল। ওরা দ্‌জনে আঙ শেরিং-এর পথ ধরেই এগিয়ে চলল। আঙ শেরিং আর মদনের কাছে পথ-নিশানি লাল পতাকা ছিল। সে জায়গায় জায়গায় পতাকা প্‌ঁতে প্‌ঁতে এগিয়ে চলল। ধবধবে বরফের উপর লাল টকটকে পতাকাগ্‌লো উড়ছে। স্‌ন্দর দেখাচ্ছে।

সেই ভসভসে বরফের উপর দিয়ে ওরা হাঁফাতে হাঁফাতে, একট্‌-গিয়েই-বিশ্রাম নিতে নিতে ক্রমাগত এগোতে লাগল। চড়াই আর উৎরাই, চড়াই আর উৎরাই। একবার কষ্ট করে ওঠো, নামো, আবার ওঠো। এই একমাত্র কাজ। পরিষ্কার আকাশ থেকে স্‌র্যের আলো মহাতেজে বরফের উপর এসে সোজা আছড়ে পড়ছে। কী তীক্ষ্ম প্রতিফলন! আয়নার গায়ে ঠিকরে পড়া আলোর মত তা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ভাগ্যিস, চোখে কালো কালো চশমার ঠ্‌লি ছিল, তাই রক্ষে, নইলে চোখ কানা হয়ে যেত। ম্‌খের, গালের অনাবৃত অংশগ্‌লোতে জ্বল্‌নি ধরছে। প্রচন্ড ঘাম হচ্ছে। প্রবল পিপাসা। ওরা একে একে সোয়েটার খ্‌লে ফেলল। বারবার চা খেতে লাগল।

বেলা সাড়ে বার। বিশ্বদেব ঘড়ি দেখল। চশমায় বেশ অস্‌বিধে হচ্ছে। জিনিসগ্‌লো ভাল নয়। নড়বড়ে বস্তাপচা মাল। বড়-বাজারের প্‌রনো মাল বিক্রির দোকান থেকে কিনেছে। বিশ্বদেবের নাকে বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে। চশমার ব্রিজটা চেপে বসেছে। রোদের তাতে, ঘামে বেশ জ্বলছে নাকটা। চশমা আর নাকে রাখতে পারছে না বিশ্বদেব। শেষ পর্যন্ত সে খ্‌লেই ফেলল। আঙ শেরিং ব্‌ঝল। সে টয়লেট কাগজ বের করে তাই দিয়ে বিশ্বদেবের নাকে একটা প্যাড করে দিল। এতক্ষণে সে একট্‌ আরাম পেল।

আবার ওরা চলতে শ্‌র্‌ করল। আজকের রাস্তা এত খারাপ, বরফ এমনই নরম যে, যে-সব ধাপ ওরা কাটছে, তা একজন দ্‌জনের বেশী আর কারো ভর সইতে পারছে না। ভেঙ্গে যাচ্ছে। কাজেই আবার নতুন করে ধাপ কাটতে হচ্ছে। দ্বিগ্‌ণ পরিশ্রম করতে হচ্ছে। ওরা সকলেই প্রায় কাহিল হয়ে পড়েছে।

বেলা দ্‌টো বাজতে বিশ মিনিট বাকি। টাসী বলল, সাব্‌, আর এগোবে নাকি? এখনও অনেকটা রাস্তা বাকি।

এখনও বাকি আছে রাস্তার! অনেকটা বাকি! বিশ্বদেব কর্‌ণ চোখে দিগন্তে চাইল। আজ টাসী, অস্‌রের বল যার গায়ে সেও জানতে চাইছে আর এগোনো হবে কি না! এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। আজকের

পথ যে কত দুর্গম, তা টাসীর কথাতেই ওরা বুঝতে পারল।

বিশ্বদেব বলল, "এক কাজ কর, চল সামনের ঐ উঁচু ঢিবিটা পর্যন্ত আজ যাই। দুটো পর্যন্ত চলি। তারপর ফিরব।"

আঙ শেরিং রাজী হল। বলল, ঠিক আছে। তাই চল। পিঠের বোঝা আমরা ওখানেই ফেলে রেখে ফিরে যাব।

ঠিক দুটোর মধ্যেই ওরা চড়াইটার উপর উঠল। মাল নামিয়ে রাখল। তারপর বসে পড়ল। বিশ্রাম নিয়ে, লাঞ্চ খেয়ে, ওরা যখন উঠব উঠব করছে, সেই সময় সূর্যটা পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল। রোদের তেজ কমে এল। হাওয়া বইতে লাগল। অমনি শীত করতে লাগল। ওরা তাড়াতাড়ি সোয়েটার গায়ে চাপিয়ে দিল।

আঙ শেরিং বলে উঠল, উইন্ডপ্রুফ পরো। উইন্ডপ্রুফ পরো।

দেখতে দেখতে এত ঠান্ডা পড়ল যে, মদনের অনাবৃত হাতে টাস ধরে এল। নিজের রকস্যাক খুলে উইন্ডপ্রুফ বের করতে পারল না। বিশ্বদেব সেটা বের করে দিল। আঙ শেরিং আর টাসী তাড়াতাড়ি করে মদনের দু হাতে দুটো দস্তানা পরিয়ে দিলে।

আঙ শেরিং বলল, অনবরত হাত মুঠো করো আর খোলো। ঠিক হয়ে যাবে।

মদনের হাত একটু পরে গরম হয়ে উঠল বটে কিন্তু পা ক্রমশ ঠান্ডা হতে লাগল। কোমর পর্যন্ত বরফে ডুবে যাওয়ায় ওদের মোজা ভিজে গিয়েছে। জুতোর মধ্যে পর্যন্ত বরফ ঢুকেছে। "শু-কভার" থাকলে এ অঘটন ঘটত না। "গেটার" নেই, পট্টির কথাও মনে পড়েনি। এখন তার প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

আঙ শেরিং বলল, বরফে জোরে জোরে লাথি মারতে মারতে চলো। পা গরম হয়ে উঠবে। মদনের পা ক্রমেই আড়ষ্ট হয়ে আসছে। ঠিক নিরিখে পা ফেলতে পারছে না। মালিশ করলে হত। কিন্তু সে ত তাঁবুতে না ফিরে আর হবে না। ওরা আর বিলম্ব না করে রওনা দিল অ্যাডভান্স বেসের দিকে।

আঙ শেরিং বলল, "জলদি চলো, জোরসে চলো। ঠিক হো যায়েগা।"

লেখকের দিনলিপি থেকে:

বেস ক্যাম্প, ১২ই অক্টোবর। নিমাই অ্যাডভান্স বেস থেকে যে খবর নিয়ে ফিরল তাতে আমরা সবাই আশঙ্কিত হয়ে উঠলাম। মদনরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও ১নং শিবিরের জায়গা ঠিক করে আসতে পারেনি। ১৪০০০ ফুট পর্যন্ত উঠতে পেরেছে ওরা। মদন আর বিশ্বর পোশাক মোজা সব ভিজে গেছে। বাড়তি কিছুই নেই। ওরা সেই পোশাক পরেই রাত কাটাচ্ছে। মদনের পা ঠান্ডা হয়ে এসেছিল। ও শিবিরে ফিরেই তাড়াতাড়ি করে আগুনে পা সেঁকতে যাচ্ছিল। টাসীর নজরে পড়ায় বেঁচে গেছে। বরফে জমা পা আগুনে সেঁকতে নিষেধ করেছে সর্দার। অল্প গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখতে বলেছে।

আমরা সবাই চিন্তিত। ভিজে পোশাকে থাকতে হলে ওদের আজ বাঁচতে হবে না। পরামর্শ সভায় ঠিক হল, আমার আর ধ্রুবর পোশাক উপরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমাদের বরফে ওঠার বারটা বেজে গেল! কম্বল ছিল কয়েকটা। সেগুলো ছিঁড়ে দরকার মত পট্টি বানাবার নির্দেশ দেওয়া হল। কাল খুব ভোরেই গোরা সিং আমাদের পোশাক আর নির্দেশ বয়ে নিয়ে অ্যাডভান্স বেসে পৌঁছবে। ওরা রওনা হবার আগেই যাতে এগুলো পায়, তার ব্যবস্থা এইভাবে করা হল। আমি ভাবছি, গোরা সিং যদি ওদের ধরতে না পারে তা হলে?

(ক্রমশ)

মেয়ে বোবা নয় মোটেই, বরং যদি একটু বাচালই বলা হয় তো খুব অন্যায় হয় না। তা না হলে কলেজে নাম লেখাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক প্রিয়তোষকে প্রথম সাক্ষাতেই ওভাবে তর্কে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করতে পারত না। মফস্বল স্কুল থেকে পাস করা একটা দ্বিতীয় বার্ষিকের মেয়ে এই সবে দ্বিতীয় বর্ষে পৌঁছেছে; ওদিকে একজন ষষ্ঠবার্ষিক এম-এর ছাত্র, একবার ফেল ক'রে সপ্তম বর্ষ চলছে তার। সম্পাদকের গাম্ভীর্য বজায় রাখবার জন্য গোঁফদাড়িও রেখেছে এ বয়সে যতটা সম্ভব। একটা প্রবন্ধ নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

"এটা আপনাকে ছাপতে হবে।"

একা নয়, আর একটি মেয়ে তৃষাকে সঙ্গে নিয়েছে গোপা; বোধ হয় পারবে না বলে সংশয় প্রকাশ করেছিল।

একটু বিস্মিতভাবেই চোখ তুলে চাইল প্রিয়তোষ, তারপর অবশ্য হেসেই বলল—"ছাপবার উপযুক্ত কিনা বিচার করে দেখবার একটা স্বাধীনতা আছে আমার।"

"কথাটা শুনে আশা আনন্দ দুই হলো, কেননা দেখছি স্বাধীনতার মর্যাদা আপনি বোঝেন।" জবাব দিল গোপা। বলল—"স্বাধীনতার একটা দিক নিয়েই আমার প্রবন্ধটা।"

এতদিন ধরে সম্পাদনার অভিজ্ঞতায় নিশ্চয় নূতন, প্রিয়তোষ আশ্রয়ের জন্য একটা যেন কোণ-কাণই খুঁজতে লাগল। প্রবন্ধের প্রথম পাতার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল—"তা বেশ, রেখে যান। দেখি।"

গোপা বলল—"ওটা সম্পাদকদের অবাঞ্ছিত বিদায়ের ভাষা শুনেছি। ক'খানাই বা পাতা, আপনি দেখেই নিন না। আমরা দাঁড়িয়েই আছি, কষ্ট হবে না।"

বেশ একটু সূক্ষ্ম খোঁচা আছে। হঠাৎ আক্রমণে একটু ধাঁধা খেয়ে ভুলটা হয়ে গেছে প্রিয়তোষের, লজ্জিত হয়ে একটু ব্যগ্রভাবেই বলল—"না, না, বসুন চেয়ার দুখানায় দুজনে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?...বেশ, এখুনি দেখে আমার মতামতটা জানাচ্ছি।"

পড়তে পড়তে মুখের ভাব বদলে বদলে যাচ্ছে, বেশ রাঙাও হয়ে উঠল বার কয়েক। দুই বন্ধুতে একটু গা টেপাটেপি করল। শেষ ক'রে প্রিয়তোষ মুখটা তুলে গোপার সপ্রশ্ন দৃষ্টির ওপর রাখল। একটি অপ্রতিভ হাসি মুখে। একটু চুপচাপ, তারপর প্রশ্ন করল—"ছাপতেই হবে?"

"আমার স্বাধীনতা আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে?"

"তা নয়।"—সেইভাবেই হেসে বলল প্রিয়তোষ। "বলছিলাম বড্ড যেন—কী যে বলে—স্পষ্ট; একটু রেখে ঢেকে বলা যায় না? দেখুন না নিয়ে গিয়ে একটু চেষ্টা ক'রে।"

এটা আপনাকে ছাপতে হবে,

"স্বাধীনতা জিনিসটাই তো স্পষ্ট, নয় কি? যা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখছি, যা সত্যি বলে অনুভব করছি মাত্র তাই তো লিখেছি। একটাও যে কপোল-কল্পনা নয় এটুকু তো স্বীকার করবেন?"

"একশ'বার। তবু এত—কী যে বলে... আর একজন মেয়ের হাত থেকে..."

"মেয়ের কথা মেয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি বলবে এটা তার স্বাধীনতা নয়?"

ক্রমাগত পুনরুক্ত হ'তে হ'তে স্বাধীনতা কথাটা একটা সুড়সুড়িও দিচ্ছিল মনে, প্রিয়তোষ হো হো করে হেসে উঠল, বলল—"নাঃ, দেখছি আমার স্বাধীনতা আপনার স্বাধীনতার কাছে পরাভব মানল; বেশ, রেখে যান, ছাপব।"

ছেপে বেরুলে বেশ একটু গুঞ্জরন উঠে কলেজের আবহাওয়াটা সরগরম হয়ে রইল কিছুদিন। সবার দৃষ্টির লক্ষ্যস্থল হয়ে রইল গোপা। বেশ মানিয়ে রইলও। গটগট করে সিধা চলে, টপটপ করে সোজা জবাব। স্বাধীনতার একটি জয়পতাকা।

তারপর বছর দুই কেটে গেছে। এর মধ্যে অনেক জল হাওড়ার পুলের নীচে দিয়ে ব'য়ে গেছে, অনেক কিছু পরিবর্তন ঘটেছে সংসারে। তার মধ্যে একজন যে স্বাধীনতা হারিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরতে যাচ্ছে তার কথাই বলি। গোপার বিবাহের কথাবার্তা হচ্ছে।

দেখতে এসেছে পাত্র নিজে আর তার এক বন্ধু। এ ব্যবস্থাটুকুতে গোপার নিজের একটু হাত আছে। এর আগে আর একবার এ হাঙ্গাম হয়ে গেছে। সেবার প্রথমে দেখতে এলেন ছেলের অভিভাবকরা; বাবা, মামা, বড় বোন। পছন্দ করেই গেলেন, তারপর পাত্র নিজে দেখতে এল, সঙ্গে এই রকম একজন বন্ধু। বন্ধু গানের ফরমাশ করল।

কলেজ-ম্যাগাজিনের সে উগ্র যুগ হলে কি করত বলা যায় না, তা ভিন্ন বর্ন্ড আর কলেজে তো প্রভেদও আছে, গোপা চোখের কোণ তুলে তৃষার দিকে চাইল। দুই সখীতে ব্যবস্থা করাই ছিল, তৃষা এগিয়ে আসতে কানে-কানে কি বলল। তৃষা পাত্রের বন্ধুকে বলল—"জিগ্যেস করছে আপনারা কী গান শুনতে চান। দুজনের কথাই জিগ্যেস করছে।"

গোপার একটু চোখ পাকিয়ে ওর দিকে চাওয়ায় বোঝা গেল, একটু বাড়িয়েই বলেছে তৃষা, দুজনকে টেনে বলে নি গোপা।...এ মেয়েটা আবার দু বছরে গোপাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

বন্ধু পাত্রের দিকে চাইল। সে কানের

কাছে মুখ নিয়ে এসে কি বলতে তৃষাকে জানাল—আশাবরী শুনতে চায় ওরা।

গোপার ঠোঁটে খুব ক্ষীণ একটু বিদ্যুৎ খেলে গেল। বন্ধুর দৃষ্টির সংকেতে তৃষা তার মুখের কাছে কানটা নিয়ে গিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বলল—"ও বলছে জোর করেন তো গায়। সন্ধ্যায় ভোরের আশাবরী—সে তো নেহাত অপছন্দ হওয়ার ভয়েই গাওয়া।"

একটু বেশী চোখ পাকিয়েই চেয়েছিল গোপা, বোঝা গেল এর অর্ধেকও ওর কথা নয়।

কিন্তু ভেঙে গেল সম্বন্ধটা। তাই এবার ঠিক হয়েছে পাত্রই আগে দেখে যাবে। এবার পরিবেশটাও একটু অন্যরকম।

প্রথমত তৃষা নেই। আসতেই চায়নি বাড়ি থেকে। গোপাকে বলেছে—"সেটা যেন কি রকম ছিল, ভাগিয়ে দিলাম তাই। এটিকে তোর কাছ থেকে ভাগিয়ে নিজেই নিতে ইচ্ছে করছে আমার। থাক, আর লোভ বাড়াতে চাই না।"

দ্বিতীয় কথা, আজ অকুস্থলে স্বয়ং গোপার কাকা রয়েছেন; ওর অভিভাবক। বরের সংগে তার বন্ধু দেখতে আসছে, একটু সংকোচ বোধ করতে পারে প্রশ্নাদি করতে, তাই সেবার অনুপস্থিত ছিলেন। ফলটা ভালো হয়নি দেখে আরও সম্ভাবনার পথ খোলা না রেখে নিজেও উপস্থিত আছেন, ও'র বন্ধু, পাড়া সম্পর্কে গোপার আর এক কাকাকেও ডেকে নিয়েছেন। আসরটা বেশ একটু গমগম করছে।

দুখানি কার্পেটের আসনে পাত্র আর তার বন্ধু বসে আছে, গোপা দরজার কাছে এসে একটু চোখ তুলেই এমন থমকে দাঁড়াল, মনে হলো যেন ফিরে যেতে চায়।
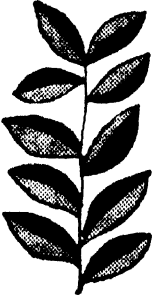
কাকা বললেন—"কি হলো? আয়, বোস এসে।"

দৃষ্টিটা আবার নত হয়ে গেছে, এবার আরও বেশীই, গোপা আস্তে আস্তে এসে সামনের গালিচাটার ওপর জড়োসড়ো হয়ে বসল। বাঁ দিকে সে বসে আছে—পাত্রের বন্ধু, পাকা মেয়ে দেখিয়ের মতো মোটা ফ্রেমের চশমার ভেতর থেকে বেশ খুঁটিয়ে দেখল একটু। তারপর অনুমোদনের ভঙ্গিতেই বলল—"বেশ, বেশ। আপনার নাম?"

এত মুরুব্বিয়ানা ক'রে বলবার বয়স নয়, যদিচ চেহারাটা সাধ্যমতো মুরুব্বি গোছের ক'রে রেখেছে: চোখে মোটা ফ্রেমের গগলস, মুখে দাড়ি-গোঁফ, কোন্ একটা নাম-করা মাসিক-পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে নাকি রয়েছে।

প্রশ্নে একবার চোখ তুলে আবার নামিয়ে নিল গোপা, এবার ঘাড়টাও নীচু হয়ে গেছে। উত্তর কিছু দিল না, বা দিতেই পারল না।

সমস্ত ঘরটা থমথম করছে। একটু অপেক্ষা করে যুবক আবার বলল—"বলুন; সংকোচ কিসের?"

উত্তর নেই। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেছে। কলেজে করে কি লিখেছিল না জানুক, বেশ সপ্রতিভ মেয়ে বলেই তো জানে সবাই। কাকা বললেন—"বল না নামটা।"

তারপর হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় ওর সংকোচটুকুকেই কাজে লাগালেন, একটু লঘুভাবে হেসে বললেন—"বড্ড লাজুক মেয়ে। ওর নাম গোপা।"

"আমার ধৃষ্টতা মাফ করবেন।" হাত জোড় করেই বলল যুবক—"মেয়ে দেখতে এসেছি, নামটা আর জানব না? তবে কিনা..."

"তা বই কি, ওর মুখ দিয়ে শোনা দরকার তো।" কাকার বন্ধু বললেন। গোপার দিকে চেয়ে বললেন—"বলো মা, নাম বলবে তাতে লজ্জা কি?"

ফল হলো না। একটি মেয়ে ট্রে ক'রে দু' কাপ চা আর দু' প্লেট খাবার রেখে গেল দুজনের সামনে।

কাকার বন্ধু বললেন—"একটু মিষ্টি-মুখ করে নিন। ততক্ষণ একটু সামলে উঠুক। আজকালকার মেয়েদের মতন তো নয়—মুখে খই ফুটছে একেবারে!... ভীষণ লাজুক যে!"

"ধৃষ্টতা মাফ করবেন আমার। একটা দায়িত্ব নিয়ে এসেছি, তাঁদের গিয়ে সঠিক রিপোর্ট দিতে হবে। এক পেট খেয়েই বসে থাকব আগে—এটা যেন কেমন মনে হয় না? খাওয়া মানেই তো মুখ বন্ধ করে ফেলা।"

তারপর একাল থেকে নিজেকে সম্পাদকীয় সেকালেই নিয়ে গিয়ে সেকালের উপযোগী করে বলল—"আমাদের বিপদ কি জানেন? একালের ছেলেরা আবার

এইখানটা পড়ুন

একালের মতন মেয়েই চায়—ঐ যে আপনি বললেন মুখে খই ফুটবে, এরা যদি পুরুষের অধিকার নিয়ে কিছু বলতে যায়, ওরা নারী অধিকার নিয়ে দু' পর্দা চড়িয়ে বলবে।...চায় এ রকম, আপনি আমি কি করতে পারি বলুন।...কি হে বলো না, ভুল বলছি?"

পাত্রের দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করতে সে মুখটা নীচু করে নিয়ে একটু লজ্জিতভাবে হাসল।

"ভুল বলবই বা কেন? কাগজটা চালাতে তো দেখতে পাচ্ছি নিজেই। ছেলেদের একটু নরম করে লিখতে বললে তবু শোনে। মেয়েদের?—রামঃ, একটি অক্ষর বাদ দিতে বলুন তো..."

ছেড়ে দিয়ে বলল—"যাক গে দুঃখের কথা। আচ্ছা, নাম থাক্; কি পড়াশোনা করছেন আপনি?"

...ত্তর নেই। শুধু ঘাড়টা আরও ...মে গেছে। ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। ওঁরা ...নে গোপার ব্যবহারে কি যুবকের ...পোমিতে রুদ্ধবাক হয়ে গেছেন বলা শক্ত।

"বেশ থাক, আপনি না হয় এটা থেকে একটু প'ড়েই শোনান।"

পাঞ্জাবির ওপর বাপ্তি, তার ওপর একটা র‍্যাপার জড়ানো, তার ভেতর থেকে একটা মাসিক পত্রিকা বের করল যুবক। বলল—"এ তো আর কিছু বলা নয়, যা লেখা রয়েছে লাইন ধ'রে পড়ে যাওয়া।"

একটা জায়গা খুলে সামনে ধ'রে দিয়ে বলল—"এইখানটা পড়ুন।"

বছর দুয়েক আগের গোপার লেখা সেই প্রবন্ধ। এই মেয়ে দেখা নিয়েই। লেখা আছে—একটা বর্বর প্রথা পুরুষরা আরণ্য যুগ থেকে যে আদিম হিংস্র দাম্ভিকতা বহন ক'রে এনেছে তাদের ধমনীর রক্তে, সে অত্যাচারের উত্তরাধিকার এই মেয়ে দেখা তার একটা বড় দৃষ্টান্ত। এই যাচাই করে নেওয়া, যেমন সে যুগে যাচাই করে নিত শিকার-করা হরিণের সেরা অংশটা তার ভাগে পড়ল কিনা। লেখা আছে—যাচাই আমাদেরও করে নিতে হবে এবার—বদ্ধপরিকর হয়ে দাঁড়াতে হবে...

এই ধরনের আরও।

এক জায়গাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছে গোপা। কাকা বললেন, কাকার বন্ধু বললেন, ফল হলো না। যুবক তাঁদের বলে যাচ্ছে—"আসতে আসতে প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিঙে পুরনো বইয়ের সঙ্গে দেখলাম পত্রিকাখানা। একটা প্রবন্ধে নজর পড়ে যেতে দেখি খুব জোর লেখা—বোবার মুখেও কথা ফুটিয়ে ছাড়বে, নিয়ে নিলাম।"

একটু হাসল। ওর কথাটা ধরেই কাকা বললেন—"ও কিন্তু বোবা নয় মোটেই, এখন হঠাৎ কি রকম হ'য়ে গেছে। আপনারা একটু খেয়ে নিন, চাটা হয়তো জুড়িয়েও গেল। বোবা যে নয় তার যথেষ্ট প্রমাণ পাবেন।"

"বড় ধৃষ্টতা করে ফেলছি আজ, ক্ষমা করবেন।"—আবার সেই রকম জোড়হস্তেই বলল যুবক—"খাওয়া মানেই তো মেনে নেওয়া যে পছন্দ হয়ে গেছে। সেটা আর একটু না দেখে—মস্ত বড় একটা দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছি তো...ও কি হে!!"

পান্ন একটা নিমকি তুলে নিয়ে মুখে দিয়েছে, মচ করে শব্দ হতে ঘুরে দেখে যেন হাল ছেড়ে দিল যুবক, একটু নিরাশ-ভাবেই কাকার দিকে চেয়ে বলল—"ঐ নিন, তা হলে আর আমার গরজটা কিসের বলুন? ঠিকই আছে।"

গোপার সামনে থেকে পত্রিকাটা সরিয়ে নিয়ে বলল—"আপনি তা হলে যান। মিছিমিছি এই শীতে ঘেমে সারা হন কেন। ...প্রমাণ দেওয়ার যথেষ্ট সময় পাবেন।"

শেষের কথাগুলো অবশ্য মাত্র দু'জনেই শুনতে পেল, পান্ন আর গোপা।

চিত্রগ্রীব

অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে মিলু বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাদাস চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় এবং অনীতা রায়-চৌধুরী এই চারজন শিল্পীর চিত্রকলার একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় গত সপ্তাহে। এই চারজনের মধ্যে অনীতা রায়চৌধুরীর ছবি আমাদের এর আগেই দেখার সুযোগ হয়েছে। অনীতা গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফটস-এর একজন কৃতী
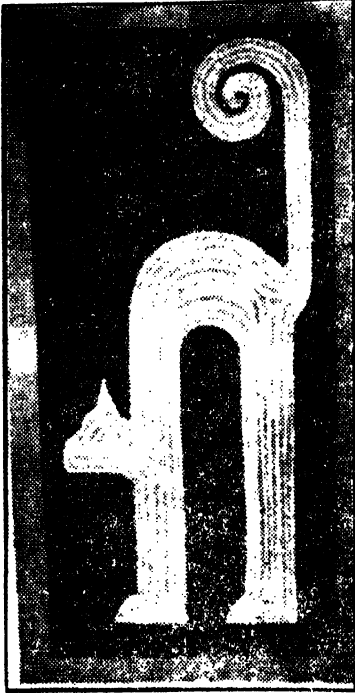
ঘুমের পরে তারাদাস চট্টোপাধ্যায়

ছাত্রী। ১৯৬০ সালে সুকুমার শিল্পে ডিপ্লোমা লাভ করেছেন। ছাত্রী অবস্থায় বহু পুরস্কার লাভ করেছেন। সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদর্শনীতে এ'র রচনা স্থান পেয়েছে। তৈলচিত্র এবং গ্রাফিক রচনায় ইনি বিশেষ পারদর্শিনী। বর্তমানে প্যাস্টেলেও যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। অরুণ-কুমার মুখোপাধ্যায়ও গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফট-এর প্রাক্তন ছাত্র। ১৯৫৭ সালে পাস করেছেন এবং বিভিন্ন চিত্রকলা প্রদর্শনীতে এ'র রচনা স্থান পেয়েছে। প্রধানত ইনি গ্রাফিক আর্টিস্ট। তারাদাস চট্টোপাধ্যায় কোনও শিক্ষাকেন্দ্র অথবা নাম-করা শিল্পীর কাছ থেকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেননি। বর্তমানে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর স্কেচ ক্লাবের সভ্য। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছেন। মিলু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্রবিদ্যায় হাতেখড়ি হয় তিন বছর আগে। মাত্র তিন বছরের মধ্যেই রীতিমত ঝানু শিল্পীর মত ড্রইং-এ হাত পাকিয়ে ফেলেছেন। ইনি আইন-এর ছাত্র। লণ্ডনে থাকাকালে বেশ কিছু পেইণ্টিং এবং ড্রইং করেছিলেন। সেই সব কাজেরই কিছু এখানে প্রদর্শন করা হয়েছিল।

প্রদর্শনীতে ছবি আছে মোট ৩২টি—প্রত্যেকের আটটি করে। ছবি নির্বাচন সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা আপত্তি আছে। আরও সতর্কভাবে নির্বাচন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। দলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী মনে হয়েছে শ্রীমতী অনীতা রায়চৌধুরীকে। এ'র বিশেষভাবে আকর্ষণীয় রচনা 'বাহার' স্কেচটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অরুণ-কুমার মুখোপাধ্যায়ের গ্রাফিক কাজগুলিও প্রশংসনীয়—বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'পিলার অব আর্কিটেক্ট'। তারাদাস চট্টোপাধ্যায়ের 'আফটার স্লীপ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিলু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ড্রইংগুলি বাস্তবিকই বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

*

১ নম্বর চৌরঙ্গী টেরাস-এ চিত্ত সিংহের চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় গত সপ্তাহে। চিত্ত সিংহ যে ছবিও আঁকেন তা জানা ছিল না। চিত্ত সিংহ রচিত কবিতা এবং গল্প চোখে পড়েছে কিন্তু এ'র চিত্র-কলা এই প্রথম দেখবার সুযোগ পেলাম। ছবি আঁকা ইনি শেখেননি কখনও। ছবি দেখে মনে হয়, ছবি আঁকার ব্যাকরণ ইনি

চিত্ত সিংহ অংকিত একটি চিত্র

জানেন না। বিশুদ্ধ ব্যাকরণ না থাকলেও ছবিগুলির মধ্যে ভাব আছে। কিছু ছবি রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা মনে করিয়ে দেয়। এটা না হলেই ভাল হত। তবুও চিত্ত সিংহের বাহাদুরি আছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে। অনেকে সমালোচনা করছেন চিত্ত সিংহের রচনায় ড্রইং নেই, কম্পোজিশন নেই, অ্যানাটমী নেই। তা নেই সে কথা ঠিক তবে আর্টিস্ট হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন এমন অনেক আধুনিক শিল্পীরই কাজে আজকাল এসব দোষ লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তাদের ছবির ভূয়সী প্রশংসা করতে কুণ্ঠা করেন না এসব সমালোচকেরা। আমরা অন্তত চিত্ত সিংহকে নিরুৎসাহ করব না।

। পত্রাবলী ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

। নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত

॥ ১৭৯ ॥

ওঁ
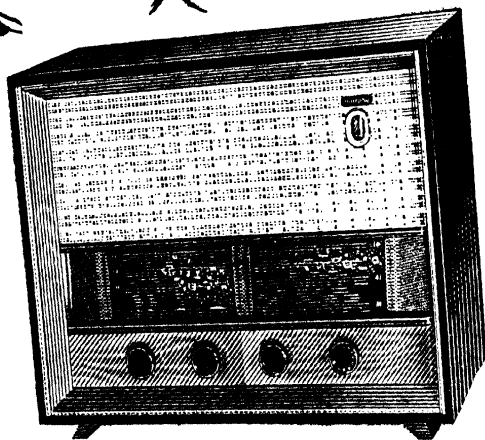
কল্যাণীয়াসু

অনেককাল দেশে চিঠিপত্র লিখিনি। মনে হচ্চে যেন পরলোকে এসেছি, অথচ লোকেরা যে খুব পর তা নয়। এটুকু প্রতিদিন বুঝতে পারি যে, যারা আমাকে সত্য করে স্বীকার করে নেয় তারাই আমার যথার্থ স্বকীয়। সেই স্বীকারের জোরে এখানে আমার আত্মীয়তার অভাব ঘটে না। কত লোকে আমাকে ডেকে বলচে, এসো, বোসো, থাকো—কেউ তো বলে না, তোমার সময় হয়ে গেছে এখন একটু সরে দাঁড়াও। সংসারে আমাকেও প্রয়োজন আছে এই কথাটা এখানে যেমন গভীর করে উপলব্ধি করি এমন তো আর কোথাও করি না। এতে করে নিজের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ে। এই শ্রদ্ধার জোরে এমন একটা বড়ো জায়গা মেলে যেখানে মন বড়ো হয়ে উঠতে বাধা পায় না। এখানে নিরাসক্ত হয়ে আছি বটে কিন্তু একটা বৃহৎ ক্ষেত্রের অধিকার পেয়েছি — আঁকড়ে ধরার অধিকার নয়, সঞ্চরণ করার অধিকার।

ছবির কথা পূর্বেই শুনেছ। কিন্তু সব কথা ঠিক মতো শুনতে পাও নি। যারা সমজদার তারা যখন একটা কিছুকে ভালো বলে বা মন্দ বলে তার কারণ হচ্চে সেটা তাদের শিক্ষা ও উপভোগের অভিজ্ঞতার অনুকূল অথবা প্রতিকূল। কিন্তু আমার ছবিগুলোকে তারা কোনো পক্ষভুক্ত করতে পারচে না। তাদের মনে ভালো মন্দর যে আদর্শ আছে এগুলো তার সদৃশও নয় বিসদৃশও নয়, অসদৃশ। অর্থাৎ সনাতন আলেখ্যরীতির সঙ্গে মিলচে না অথচ চিরন্তন আলেখ্যতত্ত্বের সঙ্গে বিরোধ বাধচে না। যারা যাচনদার তাদের পক্ষে এ একটা মুশকিল— কেননা ভালো কিংবা মন্দ বলেই তারা খালাস পায় না—সেই সঙ্গে তাদের মেল-বন্ধন করে দিতে হবে। যাই হোক আমার চিত্রলীলার দিগন্ত এই পশ্চিম উপকূলেই—অস্তগমনকালের শেষ বর্ণবিকাশ। স্বদেশে একটু তার আভাসমাত্রেই যে রকম শব্দভেদী বাণের টঙ্কার শোনা গেল তাতে বুঝলুম এই চিত্রগুলির উপলক্ষ্যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রূপের বৈচিত্র্য ঘটবে মাত্র। তবু তো সাহিত্যক্ষেত্রে সেখানে আমার সহায় আছে কিন্তু আমার চিত্রের চৈতালি ফসলের পরে যখন এরা যমের মহিষ চরাতে লাগিয়ে দেবে তখন আমি দোহাই পাড়ব কার? বিশেষত আজকাল অধ্যাপক মহলে আমাদের দেশে অকস্মাৎ চিত্রকলাবিদের প্রাদুর্ভাব হয়েচে—তাঁরা এখানে অধ্যয়নের অবকাশে য়ুরোপের কলাভাণ্ডারে কটাক্ষপাতের সঙ্গে সঙ্গে ক্যাটালগের গবেষণায় পারদর্শী, আমাদের দেশে তাঁরা ভারতীয় কলাবিভাগে মোড়লদের পদ অধিকার করে বসে আছেন—এই সব হঠাৎ-পণ্ডিতদের কাছে কারো মানসম্ভ্রম থাকবে না। আমি তাই মনে মনে সংকল্প করে এসেচি আমার এই ছবিগুলির একটিও দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাব না—সমুদ্রের এই ঘাটেই বোঝাই খালি করে দিয়ে চলে যাব।

সম্প্রতি "—" আমাকে পত্রযোগে অস্থির করে তুলেচে। তুমি তো জানোই আমার অনেকগুলো আলাপ-আলোচনা আমেরিকায় ছাপাবার ব্যবস্থা করেচে। কুগ্রহের প্ররোচনায় ওকে আমি অনেকগুলো চিঠিও মাঝে মাঝে লিখিছি। তাতে নিশ্চিন্ত মনে আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও আধুনিক জগতের সমাজনীতির সম্বন্ধে বাগবিস্তার করেচি। আলোচ্য বিষয়গুলো আপদজনক এই কারণে সদরে তার আলোচনা করতে সাবধানে সব কথা খোলসা করে বলা দরকার। কথা না বুঝে লোকে রাগ করে সেও ভালো কিন্তু ভুল বুঝে খুশী হলেও বিপদ। তাই আমার চিঠিপত্রগুলোকে যেমন তেমন করে হাটে বের করতে ওকে আমি নিষেধ করেছিলেম। কিন্তু মুশকিল এই, হাটে মুনাফা যা হবে তা সমস্তই ওর, আর লোকসান যা কিছু সে আমার। এই লেখা নিয়ে আমাকে বিস্তর খাটতে হয়েচে। কিন্তু এখনো ওর বিশ্বাস এই যে ও যে-ভাবে এইগুলো খাড়া করেছিল তাতে ছিল যথার্থ আলাপের চেহারা, আর আমি যা দাঁড় করিয়েছি তাতে সেটা নিছক আলোচনা হয়ে উঠেচে। এ কথা ওর পক্ষে বোঝা শক্ত যে ও আমার সব কথা বোঝেনি এবং ওর ভাষায় আমার মুখের কথা তেরেবেঁকে অষ্টাবক্র হয়ে উঠেছিল। আলাপের চেহারা আছে বলেই অপলাপকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। বিপদ হচ্চে ওর মনে অর্থের লোভ ষোলো আনা অথচ সে জন্যে খাটিয়ে নিচ্চে বিশ্বসুদ্ধ সবাইকে, মূলধন ওর নিজের নেই বললেই হয়। এই বইয়ের মধ্যে অরবিন্দ রম্যাঁ রলাঁ ও বার্ট্রাণ্ড রাসেলের দুটো একটা বাক্যালাপ আছে কিন্তু বারো আনা আমারই—সেটা মুখে বলে খালাস পাই নি, নিজের মনের দায়ে পুরোপুরি লিখেচি—এমন কি ওর প্রশ্ন অংশও অনেকটা আমার ভাষায় এবং কিছু কিছু আমারই। তার পরে তর্জমা করেচে, সুরেন, ইন্দিরা, ক্ষিতীশ সেন। আমি তাতে আপত্তি করিনে কিন্তু যতটুকু ওকে নিষেধ করচি সে জন্যে ও উত্তেজিত হয়ে উঠেচে এবং মনে মনে আমারই ভীরুতাকে নিন্দা করচে।

এবারে য়ুরোপে আসবার সময় জাহাজ পণ্ডিচেরীতে থেমেছিল। "—" ও ঝুনু সমস্ত দিন জাহাজে কাটিয়ে গেল—বেশ লাগল। "—" তার নূতন সাধনার কথা অনেক খোলসা করে বললে। এসব অভিজ্ঞতার কথা একজনের কাছ থেকে আর একজন তুলে নিতে পারে না। যা আমরা নিজের জানা সত্যের সঙ্গে অনেকটা মিলিয়ে নিতে না পারি তাকে বিশ্বাস করতে যে বাধা ঘটে সেটা বৈজ্ঞানিক বাধা নয়। তার মধ্যে খানিকটা হয়ত অহমিকার বাধাও আছে। অর্থাৎ আমি জানলুম না তুমি জেনেছ এ কথাটা মেনে নেওয়ার চেয়ে বলা সহজ যে তুমি নির্বোধের মতো ভুল বুঝচ। যাকে প্রমাণ করা যায় না তাকে ধাঁ করে বিশ্বাস করার বিপদ আছে। এ রকম যে কোনো পদার্থকেই যদি বিনা আপত্তিতে মেনে নেওয়া যায় তবে তাতে করে আমাদের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের কিছু না কিছু রূপান্তর ঘটে,—সেটা ঠেকানো দরকার, নইলে বাঁধানো রাস্তার মাঝখানে গর্ত কাটার মুশকিল বাধে। অথচ যে-মানুষ নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ একটা কিছু উপলব্ধি করেচে তাকে সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা করবার অধিকার আমাদের নেই। অতএব হাঁ এবং না দুটোকেই পাশ কাটিয়ে নীরব থাকা ভালো। কিন্তু আমরা ঠিক মাঝখানটাতে থাকি নে, প্রকৃতিভেদে আমাদের মন হয় হাঁ ঘেঁষে থাকে নয় না ঘেঁষে। এক মানুষের সঙ্গে আর এক মানুষের মূলগত প্রভেদ এইখানেই অর্থাৎ আমার মানসিক না-এর মেরু বা হাঁ-এর মেরুমণ্ডলের সীমানার সঙ্গে অন্য লোকের মনের

সীমানাঘটিত সম্বন্ধটা কি তাই নিয়েই আমাদের বুদ্ধিগত জাতির পার্থক্য।

কিন্তু আটটা বেজে প্রায় বিশ মিনিট হোলো। রৌদ্রে আকাশ প্লাবিত, পাখির ডাকে কানন মুখরিত। কিন্তু সেটা প্রধান খবর নয়—পাশের ঘর থেকে ভাজা বেকনের গন্ধে বাতাস সমাক্রান্ত। যাকে বলে উপবাস ভঞ্জন তারই নীরব ঘোষণা। অতএব ইতি ২৪ জুন ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

॥ ১৭২ ॥

ওঁ

বার্লিনের এমেরিকান এক্সপ্রেস

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, এই Mitropa অর্থাৎ মাধ্যোরূপায় যেখানেই যাই রাণী নাম্নী একটি ভারতীয় ভদ্রমহিলার কথা সকলেই বলে। যাকে বলে নাম রেখে যাওয়া। ব্যাপারটা দেখে একটা কথা মনে উদয় হয়। রবীন্দ্র ঠাকুর প্রায় যাট বছর ধরে বাণীর সাধনা করেচে, শান্তিনিকেতনে কর্মের সাধনায় প্রায় ত্রিশ বৎসর কাটলো—এই করতে করতে ধনে প্রাণে ফতুর হয়ে এসে তবেই এসব দেশে নিজের নাম জারী করতে পারল—নতুবা কেউ তাকে চেয়ে দেখত না। আর রাণী দেবী চুল বাঁধা, রঙীন সাড়ি পরা, উচ্চস্বরে হাস্য করা আর বিবাহের এক উদ্যোগপর্বকেই আঠারো পর্বের সমতুল্য করে তোলা ছাড়া আজ পর্যন্ত আর একটি মাত্র স্মরণযোগ্য কাজ করেন নি। অথচ সবাই বলে চমৎকার লোক। সাধে উক্ত রাণী দেবী পুনঃ পুনঃ নারীজন্ম লাভ করতেই উৎসুক! কিন্তু জোর করেই বলব রবি ঠাকুর এক সস্তা সমাদর লাভ করতে চান না। অতএব পুরুষ হয়ে জন্মানো ছাড়া রবি ঠাকুরের আর উপায় নেই। কাল য়ুনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দিয়েছিলুম—সমাদরের প্রকাণ্ড পুঞ্জীভূত নিবিড়তা কাকে বলে চক্ষে দেখলে রাণী দেবীকে স্বীকার করতে হত যে নারীকণ্ঠের কলভাষণ ও মধু হাসনের দৌড় অত দূর পৌঁছত না। তোমরা অতি সামান্য দামেই অনেক জিনিস পেয়েচ কিন্তু অহঙ্কার কোরো না—কেবলমাত্র হেসে খেলেই যে জিনিস পাওয়া যায় না তার মূল্য স্বীকার কোরো।

এবারকার বার্লিন তোমাদের বার্লিন নয়—দেশ একই বটে কিন্তু কাল ও পাত্র সম্পূর্ণ আলাদা। মোটের উপর যত্ন আদর পূর্বের চেয়ে বেশি বই কম নয়। ভারতবাসী প্রবাসীরা দেখে স্তম্ভিত হয়, রবি ঠাকুরের উপর ধাঁ করে শ্রদ্ধা অত্যন্ত বেড়ে ওঠে তার পরে এই বিড়ালই যখন বনে ফিরে গিয়ে বনবিড়াল হন তখন মূর্তি আর এক ধরনের হয়ে চমক লাগিয়ে দেয়। যাই হোক একটা প্রতিজ্ঞা আমার মনে আছে আমার ছবিগুলোকে স্বদেশে কদাচ নিয়ে যাব না—পশ্চিম সাগরের পারে সমস্ত উজাড় করে দিয়ে তবে ফিরব। এখানকার এক্জিবিশন কাল আরম্ভ হবে, তার পরে ড্রেসডেন, ম্যুনিক্। এই সব শহরগুলো কি মনে পড়ে? এবার আমার সহচররূপে তারাচাঁদও থাকবে না, লাল রইল ইংলণ্ডে, তোমরা রইলে ভারতে। সঙ্গে থাকবে এরিয়াম ও অমিয়। অমিয় আছে বলেই রক্ষা। ও যে কত কাজের লোক তা সকলে জানে না, বিশ্বাস করতে পারবে না। বার্মিংহ্যামে আয়র্লণ্ডে খুব সমাদর লাভ করেচে। স্বদেশের ঔদাসীন্যের হাওয়ায় ওর শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল, এখানে তার প্রকাশ অবারিত দেখে খুবই খুশী হয়েচি। গ্রহণ করবার শক্তি ওর যথেষ্ট আছে এবং দান করবার। ইতি ১৫ জুন ১৯৩০

শ্রীরবি ঠাকুর

॥ ১৭৩ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, তোমাকে চিঠি লিখ্‌চি কোপেন্‌হেগেন থেকে, পড়েচি ঘূর্ণির মধ্যে। কোথাও একদণ্ড থামতে দিলে না। অপরিচিতের পরিচয় কুড়োতে কুড়োতে চলেচি কিন্তু সে পরিচয় সঞ্চয় করে রাখবার মতো সময় নেই। তাছাড়া আমার ভোলা মন, আমার স্মরণের ভাণ্ডারে তালাচাবি নেই—একটা কিছু যেই মজুদ হয়েচে অমনি আর একটা কিছু এসে তাকে সরিয়ে ফেলে। কিছু তলিয়ে যায়, কিছু দুমড়ে যায়, অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটাকে সম্পূর্ণ লোকসান বলে আক্ষেপ করব না, বর্জন করতে না পারলে অর্জন করা যায় না, জমাতে গেলে জমিয়ে বসতে হয়, নড়া-চড়া বন্ধ। আমার মনোরথটাকে বহুকাল থেকে কেবলি চালিয়ে এসেছি, এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তায়—গ্যারেজে বন্ধ করে রাখবার সময়ই জুটল না। সঞ্চয়শালার দ্বারের সামনে গদিয়ান হয়ে বসতে যদি পারতুম তাহলে নামের বদলে বস্তু পাওয়া যেত বিস্তর। সামান্য কথাটা ভেবে দেখ না, মনে রাখবার মতো বুদ্ধি যদি থাকত তাহলে অন্তত পরীক্ষা পাসের পালা শেষ পর্যন্ত চুকিয়ে সংসারটাকে সেলাম ঠুকে এবং সেলাম কুড়িয়ে বুক ফুলিয়ে চলে যেতে পারতুম। একটা কিছু বলতে যদি চাই তার রেফারেন্স দিতে পারিনে, পণ্ডিত সভায় বোকার মতো কেবল নিজের বকুনি দিয়েই বিদ্যের অভাব চাপা দিয়ে রাখি। কাব্যালোচনা সভায় প্যারাফ্রেজ ও প্যারালাল প্যাসেজ মাথায় জোটে না বলে কবিতা রচনা করে মান রাখি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি তুমি পড়ে যাচ্চ আর হাস্‌চ মনে মনে এবং প্রকাশ্যে। বলচ এটা হল ফাঁকা বিনয়, অহঙ্কারের বস্তা। উপায় নেই—সমাজরীতি অনুসারে সত্যের খাতিরে অন্যকে প্রশংসা করতে পারি, নিজেকে নয়। আত্মস্তুতি মনে মনেই করতে হয় তাতে পাপ বাড়ে বই কমে না। আসল কথা, স্বদেশ থেকে বিদেশে এলে আত্মগৌরব অত্যন্ত বেড়ে ওঠে। যার কপালে ঠাণ্ডা জলও জোটে না সে হঠাৎ পায় শ্যাম্পেন। তখন তোমাদের অধ্যাপকমণ্ডলীকে ডাক দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, ওগো মাস্টারমশায়রা, আমাকে তোমাদের ছাত্র বলে হঠাৎ ভ্রম কোরো না, আমি যে পেপারগুলো লিখেচি তাতে তোমাদের এক্জামিনেশন পেপার-মার্কা দিয়ো না, কেননা সেগুলো তোমাদের এখানকার অধ্যাপকেরা দাবী করেন। তুমি জানো আমি স্বভাবত বিনয়ী, স্বদেশী মাস্টাররা মেরে মেরে আমাকে অহঙ্কারী করে তুললে। এ জন্যে মনে মনে প্রায়ই লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু সত্যি কথা বলি তোমাকে, খ্যাতি সম্মান পেয়েছি প্রচুর, তবু মন ভারত সমুদ্রের পারের দিকে তাকিয়ে থাকে। শান্তিনিকেতন থেকে খুকু লিখেচে, 'কাল খুব ঝমাঝম বৃষ্টি গেছে, আজ সকালে উঠেচে কাঁচা সোনার মতো রোদ।'—ঐ কথা কটা যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিলে, মন ধড়ফড় করে উঠ্‌ল, বললে, আচ্ছা, তাই সই, যাব সেই অধ্যাপকবর্গে, তারা যদি আমাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দেয় তবু খোলা জানলা দিয়ে কাঁচা সোনার মতো রোদ পড়বে আমার ললাটে, সেই হবে আমার বরমাল্য। ইতিমধ্যে ভানুসিংহের পত্রাবলী নতুন ছাপা হয়ে পড়ল আমার হাতে এসে। শান্তিনিকেতনের বর্ষার মেঘ ও শরতের রৌদ্রে পরিপূর্ণ সেই চিঠিগুলি। দূরে দেশে এসে সেই চিঠিগুলি পড়চি বলে সেগুলো এত পরিস্ফুট হয়ে উঠল। ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গেলুম কোথায় আছি। এত তফাত! এখানকার ভালো আর সেখানকার ভালোয় প্রভেদটা এখানকার সংগীত আর সেখানকার সংগীতের মতো। য়ুরোপের সংগীত প্রকাণ্ড এবং প্রবল এবং বিচিত্র, মানুষের বিজয়রথের উপর থেকে বেজে উঠেচে।

ধ্বনিটা দিগ্‌দিগন্তের বক্ষস্থল কাঁপিয়ে তুলচে। বলে উঠতেই হয়, বাহবা। কিন্তু আমাদের রাখালী বাঁশিতে যে রাগিণী বাজচে, সে আমার একলা মনকে ডাক দেয় একলার দিকে, সেই পথ দিয়ে যে পথে পড়েচে বাঁশবনের ছায়া, চলেচে জলভরা কলসী নিয়ে গ্রামের মেয়ে, ঘুঘু ডাকচে আম গাছের ডালে—আর দূরে থেকে শোনা যাচ্চে মাঝিদের সারিগান—মন উতলা করে দেয়, চোখটা ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে একটুখানি অকারণ চোখের জলে। অত্যন্ত সাদাসিধে, সেই জন্যে অত্যন্ত সহজে মনের আঙিনায় এসে আঁচল পেতে বসে। আমার নিজের সেদিনকার চিঠি যেন আমার আজকে এই দিনকে লেখা। কিন্তু জবাব ফিরিয়ে দেবার জো নেই, সেদিনকার ডাকঘর বন্ধ। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চিঠি বন্ধ করা যাক্‌। সামনে আছে যাকে বলে এন্‌গেজমেণ্ট—আর আছে ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতি ৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

॥ ১৭৪ ॥

ওঁ

জার্মানী

কল্যাণীয়াসু

রাণী, বাংলা ভাষায় একটা শব্দ প্রচলিত হয়েচে, 'সাময়িক পত্র'। কিন্তু পত্রপুটে সময়কে ধরবার এবং পাঠাবার উপায় নেই। জর্মানিতে যখন আমার ছবির আসর জমেছিল তার সংবাদ পৌঁচেচে কবে জানিনে—অথচ আজ তোমার চিঠিতে আমি যখন জানলুম ছবির খবর তোমরা পাওনি তখন সেই খবরের সময়ও নিশ্চয় পেরিয়ে গেছে। এদিকে আজ আমার জর্মানির পালা সাঙ্গ হোলো—কাল যাব জেনিভায়। এ পত্র পাবার অনেক আগেই জানতে পেরেছ যে জর্মানিতে আমার ছবির আদর যথেষ্ট হয়েচে। বার্লিন ন্যাশানাল গ্যালারি থেকে আমার পাঁচখানা ছবি নিয়েচে। এই খবরটার দৌড় কতটা, আশা করি তোমরা বোঝো। ইন্দ্রদেব যদি হঠাৎ তাঁর উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া পাঠিয়ে দিতেন আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্যে তা হলে আমার নিজের ছবির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতুম। কিন্তু এসব কথা আমার আলোচনা করবার উৎসাহ হয় না—কে জানে কেন বোধ হয় আমার মনের ভিতরে একটা বৈরাগ্য আছে—আমার দেশের সঙ্গে আমার চিত্রভারতীর সম্বন্ধ নেই বলে মনে হয়। কবিতা যখন লিখি তখন বাংলার বাণীর সঙ্গে তার ভাবের যোগ আপনি জেগে ওঠে। ছবি যখন আঁকি তখন রেখা বলো রং বলো কোনো বিশেষ প্রদেশের পরিচয় নিয়ে আসে না। অতএব এ জিনিসটা যারা পছন্দ করে তাদেরই—আমি বাঙালী বলেই এটা আপন হতে বাঙালীর জিনিস নয়। এই জন্যে স্বতই এই ছবিগুলিকে আমি পশ্চিমের হাতে দান করেচি। আমার দেশের লোক বোধ হয় একটা জিনিস জানতে পেরেচে যে আমি কোনো বিশেষ জাতের মানুষ নই—এই জন্যেই ভিতরে ভিতরে তারা আমার প্রতি বিমুখ—আমাকে কটূক্তি করতে তাদের একটুও বাধে না। আমি যে শতকরা এক শো হারে বাঙালী নই—আমি যে সমান পরিমাণে য়ুরোপেরও এই কথাটিরই প্রমাণ হোক আমার ছবি দিয়ে।

অনেক পূর্বপরিচিত জায়গা দিয়ে ঘুরে এলুম, তেমনি করে বক্তৃতাও দিয়েচি। কিন্তু এই যাত্রায় আগের বারের চেয়ে জর্মানির অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে আমার প্রবেশাধিকার ঘটেচে। ওদের কাছাকাছি এসেচি। এদের মধ্যে যে যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্বজাতীয়তা আছে তা নয় য়ুরোপের অন্য সকল জাতের হাতে ঠেলা খেয়ে এরা ভিতরে ভিতরে খুব কঠোরভাবেই ন্যাশানালিস্ট হয়ে উঠচে। অথচ আমার উপরে এদের একটা বিশেষ প্রীতি কেন আছে ঠিক জেনে পাইনে। আর যাই হোক অসামান্য এদের শক্তি—প্রকাণ্ড এদের বুদ্ধি—তা ছাড়া সব জিনিসকে সমষ্টীকরণের ক্ষমতা এদের আশ্চর্য। আমার তো মনে হয় য়ুরোপের কোনো জাতেরই সকল বিষয়েই এত বেশী জোর নেই। জর্মানির বিভীষিকা ফ্রান্সের মনে কিছুতেই যে ঘুচতে চায় না তার মানে বুঝতে পারি। এরা ভয়ঙ্কর একরোখা-দারিদ্র্যের ঠেলা খেয়েই এদের শক্তি আরো যেন দুর্দম হয়ে উঠচে।

বিশ্বজাতীয়তার উদ্যম সঙ্ঘীভূত হয়ে উঠচে জেনেভায়। লীগ্ অফ্ নেশনে ঠিক সুর বাজেনি—হয়তো বাজবেও না—কিন্তু আপনা আপনিই ওই শহর সমস্ত জগতের মহান নগরী হয়ে উঠচে। যাদের প্রকৃতি বিশ্বপ্রাণ তারা আপনা আপনি ঐখানে এসে মিলবে। ঐ ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের একটা মস্ত কল্যাণশক্তির উদ্বোধন ঘটবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই মনে মনে ঠিক করে রেখেচি জেনিভায় আমাকে একটা আসন পাততে হবে—শান্তিনিকেতনের চেয়ে ঐ জায়গাতেই আমার সঙ্কল্প অনেক বেশী সফল হতে পারবে—কেননা এখানে যাদের সঙ্গে মিলন হবে তারা দুর্বলবিশ্বাস ও দীনশক্তির লোক নয়—তারা সাধক। ইতি ১৮ আগস্ট ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভীপ্সা

শান্তিকুমার ঘোষ

বেশী নয়, চেয়েছিলে এই শুধু:
বিকেলের সরোবরে স্বপ্নের সৌগন্ধভার,
উল্লম্ব সরলতরু জলের উপরে নত শাখার চুম্বন।
কোলাহল নিবে এলে
গভীর আয়ত চোখ একেকটি দ্বার খুলে
অনায়াসে নিয়ে যাবে কুঞ্জের গোপনে।
বিস্রস্ত আঁচলে ঢেউ উদ্দাম সঙ্গমে দ্যুতি,
মধু ওষ্ঠাধরে।

রূপময় ভারত

প্রায় ছয় হাজার ফিটের ঊর্ধ্বে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের মনোরম শৈলাবাস মুসৌরী ভারতের একটি আকর্ষণীয় স্থান। দেরাদুন থেকে ২২ মাইল দূরে পাহাড়ের উপর বিস্তৃত এই শৈল-শহর আজ দূর-দূরান্তের ভ্রমণবিলাসীদের কাছে নানাভাবে লোভনীয় হয়ে আছে। (১) সর্পিলভঙ্গিতে সাজান দেরাদুন থেকে মুসৌরীর পথ, (২) লন্ডোর-বাজার থেকে শৈলশহরের একাংশ, (৩) শহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকে পর্বত-রাজির দৃশ্য, (৪) মুসৌরীর প্রাণকেন্দ্র লাইব্রেরী বাজারে সারিবদ্ধ যানবাহন, (৫) ভ্রমণবিলাসীদের জন্য উত্তর প্রদেশ-খ্যাত নক্সাদার ছড়ি, (৬) লাইব্রেরী-বাজারের পথ।

আলোকচিত্রশিল্পী:
নীরোদ রায়

২

৩
৪
৫
৬

অযাত্রায় জয়যাত্রা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১২)
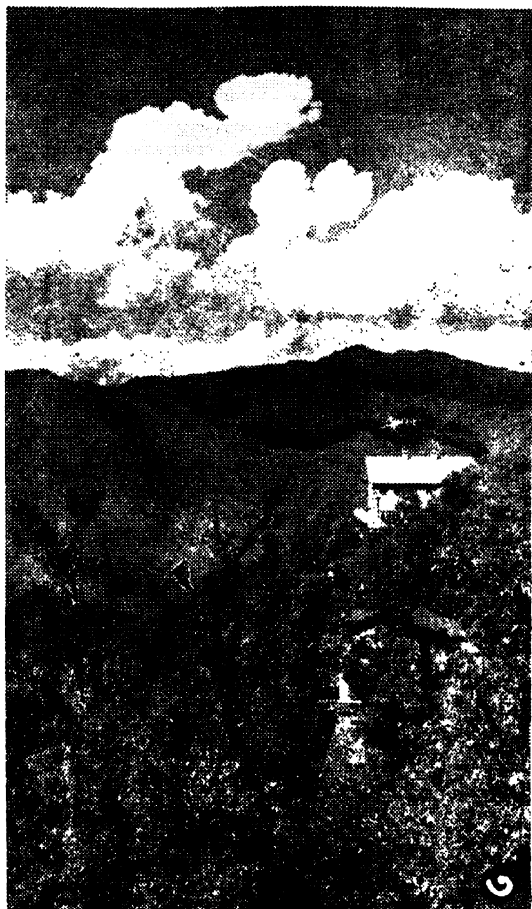
সত্যই বিশেষ ক্লান্ত, সমস্ত দিনের হিসেবটা তো রয়েছেই আমার কাছে; ভান করতে করতে কখন সত্যিকার ঘুমেই এসে গেছে, গাঢ় ঘুমেই, ওঠানামার হৈচৈয়ে হঠাৎ গেল ভেঙে। গাড়িটা ভগবানপুর স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পাশে কিন্তু আমার রামসিংহাসন নেই। তার জায়গায় অন্য একজন রয়েছেন বসে। সামনের ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলাম—"আর উনি—নেমে গেলেন এখানে?"

"উনি তো অনেক আগেই নেমে গেলেন দেখলুম...কুড়ুজামি স্টেশনেই। অথচ বললেন সোনপুরে যাবেন।"

বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। অথচ একটা প্রবল কুণ্ঠাও রয়েছে তবু, তার মধ্যেই যতটা পারা গেল সন্তর্পণে, একটু আড়মোড়া ভাঙবার ছুতো করে ওপরটা দেখে নিলাম। না, মোটঘাটগুলো ঠিকই আছে।

কিন্তু গেল কোথায় লোকটা!

শরীরটা বেশ ঝরঝরে হয়ে যাওয়ায় মনটাও অনেকটা হাল্কা হয়ে এসেছে। অনেক কিছুই তো নির্ভর করে মনের অবস্থার ওপর, সেই সন্দিগ্ধ ভাবটা—শুধুই একটা অবিশ্বাস একটা আশঙ্কা, শুধু মন্দ দিকটাই ধরে থাকা সেটা গেছে কেটে। একটা অনুতাপের ভাবও মনটাকে ধীরে ধীরে অধিকার করে নিচ্ছে। বিরূপতাই করে এসেছি—হয়তো সত্যিই কোন ভাল কথাই বলবার ছিল বেচারীর—দুজনের পক্ষেই ভালো—না হয়, শুধু ওর প্রয়োজন হলেও ঠিক এমনভাবে অবহেলা আর বিরক্তির ভাবটার পোষণ করা ঠিক হয়নি আমার।

একটা অনুকম্পাও আসছে; গাব্দা গোব্দা, হাঁদা-হাঁদা চেহারাটা—আহা!—আর ভালোই তো ক'রে এল বরাবর...

"আরে, ঐ তো রয়েছেন উনি। ঐ যে, উনিই না?"

বক্তার তর্জনী অনুসরণ ক'রে দেখি রামসিংহাসনই· মাথায় সেই পাগড়ি, গলায় সেই আস্ত গরদের থান, হাতে সেই পিতল-বাঁধানো লাঠি। চেহারাটাও দেখলাম। খানিকটা দূরে একটা লোকের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, এই সময় গাড়িটা ছেড়ে যেতে, ঘুরে একবার আমাদের কামরাটার দিকে চাইল, আমি জেগে আছি দেখে একটু যেন থমকেও পড়ল, তারপর পা চালিয়ে সামনের থার্ড ক্লাসটাতে উঠে পড়ল।

ভদ্রলোক একটু মুখ টিপে হেসে আমায় প্রশ্ন করলেন—"বুঝলেন ব্যাপারটা?"

"না তো।"—উত্তর করলাম।

"থার্ডের টিকিট, ইন্টারে এসে বসেছিল। পাশের কামরায় টিকিট চেকারকে উঠতে দেখলো তো তখন...গাড়ি এসে থামতেই নেমে গেল। এই তো চলছে নিত্যি এদিকে।"

"কিংবা হয়ত 'ডবলু-টি' (W. T. অর্থাৎ টিকিট-রহিত)—একজন মন্তব্য করলেন। —একটু হাসির সঙ্গে ঐ আলোচনাই চলল অতঃপর। টিকিট-বিহীন যাত্রীর বাড়াবাড়ির জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের চেকিঙের (magisterial checking) বিশেষ ব্যবস্থা। তার বিরুদ্ধে—তাতেও ফাঁকি দেওয়ার বিশেষ বিশেষ কৌশল। এই আলোচনার মধ্যেই গাড়িটা এসে পরের স্টেশন সরাই-এ পৌঁছাল এবং —যেন পাদানিতে দাঁড়িয়েই এসেছে এতক্ষণ, ভালো ক'রে থামতে না থামতেই হন হন ক'রে নেমে এসে আমাদের গাড়ির দোরটা খুলে উঠে পড়ল রামসিংহাসন। তারপর এগিয়ে এসেই আমার সামনের বেঞ্চের একেবারে ও-কোণের একজনকে প্রশ্ন—একটু

যেন একান্তেই—"চিকিন্ হো গইল বা?" —অর্থাৎ টিকেট চেকিং হয়ে গেছে?

এদিককার চারখানা বেঞ্চ জুড়ে হো-হো করে একটা হাসি উঠল। ঐ আলোচনাই তো চলছিল, বিশেষ করে ওকে কেন্দ্র করেই।

"হাসিটা কিসের!"—সিধা হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত কামরাটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল রামসিংহাসন, অপ্রতিভ হয়েই পড়েছে, তবে বিশেষ তেমন কিছু নয়।

"আপনি বুঝি সেই ভয়েই নেমে গিয়ে ছিলেন?"—একজন প্রশ্ন করলেন।

"ভয়! কেন, টিকিট নেই আমার মনে করছেন?"

কুর্তার পকেটে হাত ঢুকিয়েই ছিল, একটা থার্ড ক্লাসের টিকিট বের ক'রে তুলে ধরল, প্রশ্ন করল—"এটা কি টিকিট নয়?"

"ও টিকিট নিয়ে এ-ক্লাসে বসলে কি ভয়ের কিছু নেই মনে করেন?"

অত ভারী শরীর অথচ এক দিক দিয়ে এরকম নিরীহ প্রকৃতি, অনেকটা যেন বোকাই—এ ধরনের লোক পেলে ঠাট্টার প্রবৃত্তিটা বেড়েই যায় মানুষের। হাসিই চলছিল, একজন প্রশ্ন করল—"তবে আপনি নেমে গেলেন কেন অমন ক'রে?"

"এসেই জিগ্যেসই বা করলেন কেন—চেকিং হয়ে গেছে কিনা?"

—নকল করার একটা ঝোঁক এসে গেছে, হাসিটা গড়িয়েই চলেছে।

"বাঃ বঃ হাসির মাথামুণ্ডু নেই, হাসি কাজ ছিল। ঐ হুকারটাও যে এসেছিল কৈ তখন তো হাসি ছিল না কারুর মুখে!"

"ও!"—এমনভাবে বলল ভদ্রলোক, তাইতে হুকারের সঙ্গে সন্দেশটা এত স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আবার একটা ঘর-ফাটানো হাসি উঠল।

"হাসুন যত পারেন হেসে নিন।"—বলে রামসিংহাসন এগিয়ে এল আমার দিকে। বলল "নমস্তে, ঘুমটা হলো আপনার ভালোরকম? তাহলে আমাদের কাজের কথাটা হয়ে যেত।"

গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে; উল্টো দিক থেকে নাকি একটা গাড়ি আসছে। কাজের কথাই হচ্ছে কি? কিন্তু রামসিংহাসন এমনভাবে বলল—যেন অনেক আগে আরম্ভই হয়ে গিয়েছিল কথা, মাঝখানে আবার বিরতি ছিল, আমার ঘুমের জন্যেই নিশ্চয়।...কেমন একটা মায়া এসে গেছে লোকটার ওপর। জোচ্চোর বলেই মনে হচ্ছে যেন, কিন্তু হয়ই যদি তো উগ্ররকমের কিছু নয় নিশ্চয়, এই যেমন থার্ডের টিকিট করে সেকেণ্ডে যতক্ষণ সম্ভব বসে থাকা—এই ধরনেরই। তা ভিন্ন যতই গায়ে না মাখুক, সবার বিদ্রূপের মধ্যে একা পড়ে গিয়ে খানিকটা বিপর্যস্ত তো হয়েই পড়েছে, আমি আর ওটা বাড়তে দিলাম না, বললাম—"ঠিক, শেষ করেই ফেলি আসুন। হাঁ ঘুমিয়েছি মন্দ নয়। এই যে এইখানেই বসুন আপনি।"

পাশের লোকটিকে বললাম—"আপনি দয়া করে একটু সরে যাবেন?"

সাফল্য যে এত সুলভ হবে, নিশ্চয় আশা করতে পারেনি রামসিংহাসন। একটু যেন সন্দিগ্ধভাবে চাইল আমার মুখের পানে, তারপর আমার পাশে বসে পড়ে বলল—"আমার ছেলে নিশ্চয় আপনাকে বলেছে—আমাদের একটা চুনের কারবার আছে।"

ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হলো কতকটা। রামবুঝাওনটা তাহলে করেইনি বিশ্বাস যে, চুনের ট্রাকটা আমার নয়। একে বিশ্বাস করানো যে আরও শক্ত, একেবারে অসম্ভবই হবে সেটা অনুভব করে ইতিকর্তব্যের কথা ভাবছি, রামসিংহাসন মুখের দিকে মুখটা বেশ ভালোভাবে ঘুরিয়ে একটু ঘুরেও বসে বলল—"বাইরে থেকে আমদানি করে শহরে সাপ্লাই দিই। সবরকম পাটি আছে—গবর্মিণ্ট, পরাপিট্ (গবর্মেণ্ট, প্রাইভেট)।"

এখনও উত্তর ঠিক ক'রে উঠতে না পেরে অনির্দিষ্টভাবে বললাম—"ও!"

"বড় বড় চুনের কারবারির সঙ্গে আমার লেনদেন—যারা তোয়ের করে, যেমন ধরুন..."

কয়েকটা নাম করে গেল।

সংক্ষিপ্তভাবেই বললাম—"তাই নাকি?"

"বহুত পুরনো কারবার আমার। শুরু করেছি পি-সি রায়ের হুকুমে..."

"পি-সি রায়টা কে?"

"সেই যে আমার ছেলে যখন আপনার কাছে পড়ত..."

"ও বুঝেছি।"

—অর্থাৎ আচার্য পি সি রায়। ছেলেটা এতদূর পর্যন্ত তালিম দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে পেছনে!

"হ্জুরের ফাক্টরি কোথায়? না, শুধু কিনে এনে ইস্টাক্ (স্টক্) করেন?"

মঝঃফরপুর আর মাতিহারি জেলায় বুড়ি গণ্ডকীতে 'কঙকড়' বলে একরকম পাথরের মত বস্তু পাওয়া যায়, তা থেকে চুন হোত জানতাম। ঝিনুকেরও চুন হোত, দৈবযোগে দু'একটা জায়গার নাম শোনা ছিল। পেছুবার উপায় নেই, এগিয়েই গেলাম; বললাম—"না কিনে আনি না; নিজেরই ফ্যাক্টরি আছে।"

একটা জায়গার নাম করে দিলাম।

একেবারে ঘুরে বসে ডান হাতটা দু'হাতে ধরে ফেলল।

"আমি জানি হুজুর আপনি ছোটখাটো ব্যবসা করবার লোক নন—রামবুঝাওন তাই বলছিল—পিস্কি...মানে, অতবড় একজন মানুষের সাকরেদ আপনি, খুচর-কারবারের লোক যে নয়, আগেই বুঝে নিয়েছি। বলেইছি হুজুর, আমি মোটা নফা ছেড়ে দিই ফ্যাক্টরির জন্যে; আমার নিজের কিছু বাঁচুক অর নাই বাঁচুক। তার ওপর আপনি

আমার ছেলের গুরু, মোটা নফা থাকবে আপনার। কি রেট হুজুর আপনার টন্ পিছু?"

"কি রেটে নেন আপনি?"

আমি বেশ খানিকটা কমিয়েই বললাম, ওর অনেক সুবিধে করে দিয়ে। কে আবার অত দরকষাকষির মধ্যে যায়? তা ভিন্ন ও কথাটাও তো রয়েছে। গেরস্থ গয়লানীর দুধের দাম কাটতে কাটতে একেবারে শেষ করে আনার পরও গয়লানী নাকি বলেছিল —"এখনও দুধে হাত পড়েনি।" তার ছিল জলের ব্যবসা আমার তো তাও নয়, নিতান্তই হাওয়ার; নিক না কত লাভ নেবে।

হাতটা চেপেই রয়েছে, মুখের ওপর আকুল দৃষ্টি ফেলে রেখে। হঠাৎ একটা হাত সরিয়ে নিজের বুক পকেটে সাঁদ করিয়ে দিল--

"তা হলে হুজুর সামান্য আগাম নিয়ে রাখুন।"

সর্বনাশ! রসিকতা এতদূর এগুবে কে জানত? আমি সভয়ে বলে উঠলাম—"না, না, কোথায় কি ঠিক নেই—আগাম ওরকম নিই না আমি। আমি ফিরে আসি—কথা-বার্তা আরও পাকা হোক, তারপর..."

প্রবল আপত্তির সঙ্গে হাতটা টেনে নেবার চেষ্টা করেছি, একটি একশ টাকার নোট টেনে বের করল—

"না, শুনব না—সগুন (শুভ বৌনি) হিসাবে নিতেই হবে—আপনার শিষ্য রাম-বুঝাওনের প্রণামী হিসাবে..."

কি বলচ?—হাতিয়ে নিয়ে রসিকতাটুকু একটা final বা চরম পরিণতিতে এনে ফেললেই ভালো হোত? তারপর না হয় বাড়ি গিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া যেত টাকাটা—সব কথা জানিয়—কি ক'রে বাধ্য হয়ে চুনের কারখানার মালিক হয়ে পড়তে হয়েছিল। কি বলো—এই তো?

আমি বলি, তার ওপরে গেলেও অন্যায় হতো না, অর্থাৎ টাকাটা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করলেও। কেন, তা বলছি—

টাকা নিয়ে ঐরকম ধস্তাধস্তি চলছে, এমন সময় নাটামঞ্চে আর একজনের প্রবেশ। গাড়িতে উঠে ঐদিকেই বসতে যাচ্ছিলেন, এদিকে চোখ পড়তে হন হন ক'রে এগিয়ে এলেন—

"আরে, রামসিংহাসনবাবু না!"

ঘুরে দেখেই মুখটা শুকিয়ে গেল রাম-সিংহাসনের, সামলে নিয়ে আমতা আমতা ক'রে বলল—"হ্যাঁ, এই যে, নমস্তে..."

ঠিক এই সময় গাড়িটা চলতে আরম্ভ করল এবং রামসিংহাসন ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে বলল, আমায়ই বলল—"তাহলে আমি আসছি—হাজীপুরে আবার..."

"চললেন যে! বিশেষ কথা আছে আপনার সঙ্গে।"—নবাগত যেন একটা পথ আটকাবারই ভাব করে বললেন। রাম-সিংহাসনও একটু যেন জোর করেই বেরিয়ে গেল, আমায় দেখিয়ে বলল—"ঐ যে, ওঁ'র সঙ্গে কাজ শেষ হয়নি—আসছি আবার পরের স্টেশনে।"

তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

ভদ্রলোক আমার পাশের জায়গাটাতে বসলেন। ওঁ'র কাছেই সব শুনলাম—

রামসিংহাসনের ঐ পদ্ধতি। কাজ শুরু করবার সময় খুব খাতির, খুব উদার। মাস চার পাঁচ বিলের সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাতে টাকা। ঐ করে একটা বিশ্বাস জমিয়ে নেবে। তার জোরে টাকা কামিয়ে এনে কয়েক মাস, তারপর টাকা বন্ধ করে আরও ক'মাস চালিয়ে নেবে। তারপরে আর টিকি দেখা যাবে না। বাইরের কাজ করত। জামসেদপুরে, তারপর ডালটনগঞ্জ, তারপর বালিয়া—এই তিনটে জায়গা শেষ করে কয়েক বছর মজঃফরপুরে এসে বসেছে।

এ ভদ্রলোকের প্রায় হাজার দুই টাকা পড়ে গেছে—যেমন বললেন। মজঃফরপুর-ছাপরা-মোতিহারীর প্রায় সব নামই তো 'রাম' দিয়ে, সেকালে আরও বেশি ছিল - রামখেলাওন, রামবৃচ্ছ (অর্থাৎ বৃক্ষ), রাম-সরোবর—তাদের ভিড়ে গুলিয়ে ফেলছিলাম, পদ্ধতিটা জেনে এবার মনে পড়ছে। হ্যাঁ, রামবুঝাওনই, ঐ করে বিশ্বাস কায়েম করে নিয়ে—গরীব গৃহশিক্ষক, কত আর মারবে? তবু ক'মাসে প্রায় একশ'-সোওয়াশ' টাকার ঘা দিয়েছিল। আরও মনে পড়ছে—আমাদের মেসের রঞ্জনবাবু ছিলেন রসিক মানুষ—একটা কথাই দিন-কতক চালিয়ে দিয়েছিলেন—"রামবুঝাওন একেবারে রাম বোঝানো বুঝিয়ে দিয়েছে বিভূতিবাবুকে।"...মনে পড়েছে।

তাই বলছিলাম তোমায়। অবশ্য পুরানো পাওনা ওভাবে শুধিয়ে নেওয়ার প্রশ্নই আসে না, তবুও নিলে হয়তো যিনি এভাবে পুষিয়ে দেওয়ার যোগাড় করে দিয়েছিলেন অন্তত তাঁর কাছে অপরাধী হতাম না।

দাঁড়াও আরও আছে।

গাড়ি বেশ জোরে ছেড়ে দিয়েছে। ভদ্র-লোক (সাজগোছে একটু ভদ্রগোছেরই) আমার গায়ে একটু ঘেঁষে ডাকলেন—

"এ হুজুর!"

"বলুন"—উত্তর করলাম।

"উনি ফিরে আসবেন মনে করেন?"

"আপনি মনে করেন?"

কি ভাবতে লাগলেন চুপ করে। তারপর আবার—

"এ হুজুর।"

"বলুন।"

"এলে আপনি দয়া করে ঐ টাকাটা নিয়ে নেবেন।...না, আপনাকে নিতেই বলছি না, নিয়ে আমায় দিয়ে দেবেন।"

"কি ক'রে হয় তা?"

"আমি সঙ্গে সঙ্গেই ওর সঙ্গে বোঝা-পড়া ক'রে নোব। আজ সাত মাস একটা পয়সা ঠেকান নি।"

চুপ করেই আছি।

"আর, শুনুন।"

"বলুন।"

"সঙ্গে সঙ্গে ও টাকাটা আবার আমি

আপনাকে দিয়ে দোব।...হ্যাঁ, ওর হাতে যাবেন না, ভীষণ বেইমান, আপনি আমার সংগে বন্দোবস্ত করুন, ঐ টাকা আগাম ক'রে।"—ওরই মত দু'হাতে ডান হাতটা চেপে ধরেছেন।

পেট ফুলে মরছি ভেতরে ভেতরে।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, নিতেই হবে। আমার ফারম্ হলো—'বাবুলাল শিউসরণ'—একটা সুরকির কলও আছে। নিশ্চয় নাম শুনেছেন?"

কেন জানি না, প্রশ্নটা ক'রে বেশ একটু যেন উদ্বেগের সংগেই আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আজকের দিনটা তো মিথ্যাকেই উৎসর্গ করা, বললাম—"খুব খুব শুনেছি। আপনিই তাহলে..."

খপ করে একটু সরে এসে চাপা গলায় বললেন—"যদি কিছু অন্যরকম শুনে থাকেন, একেবারে কান দেবেন না—একেবারে নয়—অনেক শত্রু আছে তো বাজারে—ভালো দেখতে পারে না—আমার কাছে আপনার একটি পয়সা ডুববে না...এ হুজুর!"

আর চাপতে পারা গেল না—সমস্ত দুনিয়াটায় কি তাহলে এইরকম জোঁকের ওপর জোঁক বসে রয়েছে?—ইনি যে আবার ওর ওপরেই যান! বাজারে এত বদনাম যে তা নিয়ে আগে থাকতেই সাবধান হয়ে যাচ্ছেন!—হো হো ক'রে হেসে উঠেছি, ও'র হাতটা আলগা হয়ে গেল। অন্য কয়েকজনও প্রশ্ন করে উঠলেন—"কি হলো বাঙালী-বাবু?...হঠাৎ ওরকম ক'রে হেসে উঠলেন যে?"

জোঁক নিয়েই হাসি আমার, তবে সেটা তো বলা যায় না। আসল কথাটাই এনে ফেললাম, এরকম করে সারাপথ তো চালানও যায় না। ও'রই সম্ভাষণ ও'কে ফিরিয়ে দিয়ে হাতজোড় ক'রে বললাম—"এ হুজুর, মাফ করবেন, আমি হচ্ছি রাজ্যবিহীন রাজা, আমার কাছে কিছু আশা নেই।"

"তার মানে!"—বেশ বিস্মিত হয়ে চাইলেন। আরও কয়েকজন ঐ প্রশ্নটাই করলেন, হাসিটা হঠাৎ কৌতূহল উদ্রেক করেছে তো সবার।

"আমার চুনের ফাকটারি, কি নুনের আড়ত—কোন কারবারই নেই।"

"তা হলে! বাবু রামসিংহাসনকে যে বললেন?"

"কি করব?—পথ চলা দায় করে তুলে-ছিলেন যে! তাও চলেছি প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুমের ভান ক'রে পড়ে থাকবার পরও রেহাই না পেয়ে!...ও'দের জিগ্যেস করুন না।"

চোখ বড় বড় ক'রে শুনছিলেন সবাই, এক সংগে ফুকরে হেসে উঠলেন। অবশ্য আমার নতুন খদ্দের বাদে, তিনি যে একটু চুপসেই যাবেন এটা তো বলাই বাহুল্য।

রামসিংহাসনও যে আর উঠলেন না, একথা বলাও বাহুল্যই।

হাজীপুরটা হচ্ছে বেহারের চন্দননগর, এখানে কলার কারবার। না, আমার মত 'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের' নয়, সত্যিকার কলাই; চন্দননগরে চাঁপা, এখানে কাঁটালি। অবশ্য "বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ" যে একেবারে অনুপস্থিত তাই বা কেমন ক'রে বলি? মিনিট তিন থেকে মিনিট পাঁচেক থামবার কথা টাইম্ টেবিলে—এর মধ্যেই কারবার শেষ প্ল্যাট-ফরম আর গাড়ির মাঝখানে। কত খদ্দের ব্যাপারীকে দেখাচ্ছে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, কত ব্যাপারী খদ্দেরকে।

সদ্য সদ্য একটা নমুনা তো পাওয়াই গেল। হ্যাঁ, আমাদের কামরাতেই। আর, বেচারী শিউসরণবাবুর ওপর দিয়েই। বেচারীর গ্রহবৈগুণ্যটা দ্যাখো একবার!

ভদ্রলোক বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছেন। ওটা চাপা দেওয়ার জন্যেই হোক, বা সত্যিকার শখ কিংবা প্রয়োজনেই হোক, ডজন দশেক কলা কিনলেন। ব্যবসায়ীর মাল কেনা বেশ হিসেব করেই কিনলেন—টানাটানি করে দরদস্তুর ঠিক করে মাল গুনে-গেঁথে দাম হয়েছে তিন টাকা কয়েক আনা। সব হিসেবই ঠিক রইল, শুধু আসলটাই বাদ। ট্রেন বিশ্রীরকম লেট্; পাঁচ মিনিটের তিন মিনিটও বোধহয় দাঁড়াল না। নোটটি হস্তান্তর হয়েছে, সংগে সংগে ছেড়ে দিল। এবং সংগে সংগে গতিবেগ দিয়ে দিল।

"আর চেঞ্জ! চেঞ্জ! আমার চেঞ্জ ফেরত দে!"

—আর চেঞ্জ ফেরত! ওরা এসব তাক্ বোঝে। চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, একটিবারও তাগাদা করেনি টাকার জন্য, এখন চেঞ্জ ফেরতের তাগাদায় কান দিয়ে বসে গেছে। দেখলুম খুব মাথা ঝাঁকিয়ে পয়সা গোনার ভান করল একটু, তারপর দলে ভিড়ে গেল। আবার চেন টানার ভয়ও তো রয়েছে।

সবাই চাপবারই চেষ্টা করল হাসিটা। শিউসরণ অপ্রস্তুত হয়েই ছিলেন, তাঁর ওপর এই লোকসান, সহানুভূতিই তো আসে। কিন্তু কী যে একটা হাসির বদ হাওয়া জমাট হয়ে রয়েছে গাড়িটাতে, আর কোথায় যে একটা সুড়সুড়ি দেয় এ ধরনের বোকাদণ্ড, বুঝেছি অসম্ভব হয়ে পড়ছে সবার হাসি চেপে রাখা। একটু "খুক্ খুক্" এখানে ওখানে, তারপর যেন চেপে রাখবার চেষ্টা করবার জন্যেই একবারে তোড়ে বেরিয়ে পড়ল হাসিটা। এবার একেবারে ছাত-ফাটানো।

—সেই জোঁকের ওপর জোঁক বসা তো।

শিউসরণ একটু লজ্জিত হাসি হেসে মন্দকণ্ঠে বললেন—"যানে দিজিয়ে শালে কো। নোট ভি ওয়েসেহি থা।"

নোটটা হয়তো ছেঁড়া বা তেলচিটে, তাই যতটুকু সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

হাসিতে বিদ্রূপে কেমন মুখ আলগা হয়ে গেলে সবার। একজন ছোট্ট টিপ্পনী করল—"কিন্তু আসল ছিল তো বাবু-সায়েব?"

—আবার একটা তুমুল হাসি।

(ক্রমশ)

(২৯)

মলিনা দাসের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে সৌরেন এটুকু বুঝেছে যে, মলিনা দাস বরাবরই পুরুষের কাছে ধাঁধার মতো রয়ে যাবে। তার ভেতরের সঙ্গে বাইরের সামঞ্জস্যের এত অভাব যে, কোনটি তার আসল রূপ ত বোঝা একরকম অসম্ভব বলেই মনে হয়। মলিনা দাসের রূপের এর বিচিত্র আকর্ষণ আছে। এ রূপশিখা যে কোন পুরুষকে মুগ্ধ করে, মোহতে আচ্ছন্ন করে, কিন্তু কখনও তাকে দগ্ধ করে না। যে কোন জায়গায়, যে কোন পরিবেশে মলিনা দাসকে সহজ ও স্বাভাবিক বলে মনে হয়। তাকে দেখে বাঙালীর ঘরের লক্ষ্মীমন্ত বধূরূপে কল্পনা করতেও যেমন অসুবিধা হয় না, তেমনি অসুবিধা হয় না কল্পনা করতে নাইট্ ক্লাবের প্রগল্ভা নারীর রূপসজ্জায়।

মলিনা দাস যে বিচিত্ররূপিণী সে কথা আরও বেশী প্রতীয়মান হল পরের দিন সন্ধ্যেবেলা সৌরেন যখন গেল তার সঙ্গে দেখা করতে। আজ যেন মলিনা দাসকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে, আগের চেয়েও রঙ্ ফরসা হয়েছে, কচি কলাপাতার রঙের ব্লাউজের সঙ্গে মেটে লাল পাড় ঘন সবুজ শাড়ি চমৎকার মানিয়েছে। কপালে সবুজ রঙের বড় টিপ, আর উপর থেকে সাদা সিঁথি চুলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে। শান্ত, সংযত চেহারা অথচ চোখ দুটি কৌতুকময়ী।

সৌরেন না বলে পারল না, তোমাকে যে আরও ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে মলিদি।

এ কথার মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই, প্রায় সকলের কাছেই মলিনা দাস এই ধরনের উক্তি শোনে। তবু হেসে প্রশ্ন করল, সত্যি? তোর এলিজাবেথের চেয়েও ছোট মনে হচ্ছে?

—ও বেচারীকে আর এ ব্যাপারের মধ্যে টানছ কেন? লিজি যে তোমার মত সুন্দরী নয় সে তো তুমি ভালো করেই জানো। একটু থেমে বলে, আজকের সাজটা বড় সুন্দর হয়েছে।

মলিনা দাস আড়চোখে আয়নায় নিজের মুখটা দেখে নেয়, তুই আসবি বলে ইচ্ছে করেই বুক পিঠ, হাত কাটা জামা পরিনি, পাছে আবার সেদিনের মত ভয় পেয়ে পালিয়ে যাস।

ওর কথার ধরনে সৌরেন হাসল, না, এখন আর সে ভয় নেই।

—তাই নাকি? তারপর লণ্ডনের সব কি খবর বল। প্রায় চার সপ্তাহ বাদে ফিরলাম তো।

সৌরেন সোফার উপর গা এলিয়ে দিয়ে মোটামুটি খবর জানাল তার বন্ধুবান্ধবীদের। মীনাক্ষী, পীয়েরের বেলজিয়ামে চলে যাওয়া কিংবা প্রমীলার অসুখের কথায় বিশেষ কান দিল না মলিনা দাস, কিন্তু লিণ্ডসে হোপের হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটা রসিয়ে রসিয়ে শুনল। বলল, এলিজাবেথের কাকা, তার মানে বেশ রসিক লোক ছিলেন। আহা, বেঁচে থাকতে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হল না।

—হলে কি লাভ হত?

—দেখতাম সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হলে তার কি ফল হয়। বলা যায় না, হয়ত দেখতিস্ তোর মলিদি হোপস্ ফ্যাশান হাউসের মালিকান হয়ে বসেছে।

আর একজনের কথা মলিনা দাস মন দিয়ে শুনল সে হল লরা। বলল হুঁ, তোর দেখছি অনেক উন্নতি হয়েছে। মেয়ে পার্টনারের সঙ্গে যখন নাচতে পেরেছিস্ আমাকে আর ভয় করবি কেন?

সৌরেন বিজ্ঞের মত হাসল।

মলিনা দাসের চোখে দুষ্টুমি উথলে ওঠে, আমাকে একদিন নিয়ে চল্ না ওদের আড্ডায়।

—ধ্যাৎ, তুমি সেখানে কি করে যাবে?

—কেন, যেতে পারি না?

সৌরেন মাথা নাড়ে। তোমার ভাল লাগবে না। ওরা একেবারে নীচের তলার মানুষ—

মলিনা দাস থামিয়ে দেয়, তবু মানুষ তো।

—তাতে কি হলো?

—তোর বন্ধু রজত যে জন্তুটার কথা বলে তাকে নিয়ে খেলা করতে এক এক সময় আমার বেশ ভাল লাগে। একদিন সুবিধে মত চল, দুজনে মিলে ঘুরে আসব।

মলিনা দাসের গলায় এ একেবারে অন্য সুর শুনে সৌরেন শুধু যে চমকে উঠল তাই নয়, বিস্মিত হল। কিন্তু সেও বেশীক্ষণের জন্য নয়, মলিনা দাস নিজেকে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করে, তুই কি ঠিক করলি? এলিজাবেথকে বিয়ে করছিস?

সৌরেন হ্যাঁ না কিছুই বলে না।

মলিনা দাস হাসে, বুঝতে পারছি, তোর মনে ইচ্ছে অথচ বুকে সাহস নেই। তাই না?
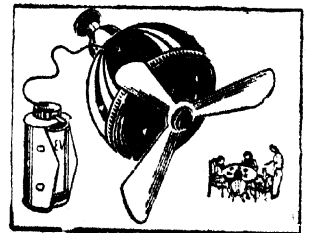
সৌরেন চোখ তুলে বলে, সত্যি তাই, বাড়িতে যে এখনও জানাতে পারছি না। মা যা সেণ্টিমেণ্টাল, মেম্ বিয়ে করছি শুনলে একেবারে না ভেঙে পড়েন।

—তবে এ হ্যাংগামায় যাচ্ছিস কেন?

সৌরেন স্পষ্ট উত্তর দেয়, এলিজাবেথকে যে আমি ভালবাসি। ও মেয়েটা যে কি সরল, উদার তা আমি তোমায় বোঝাতে পারব না। আমার ভাল মন্দ সব কিছুকে সে ভালবেসেছে, সম্পূর্ণরূপে আমাকে গ্রহণ করেছে। এমন একটি মেয়ের ভালবাসা আমি পাব তা আগে ভাবতে পারি নি।

মলিনা দাস এক মনে সৌরেনের কথা শুনছিল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, না, তোরাই সুখী। ভালবাসা খুব শক্ত, কিন্তু সত্যিই যদি ভালবাসা যায় তাতে বড় আনন্দ।

মলিনা দাসের মুখ থেকে এ ধরনের কথা সৌরেন কখনও শোনেনি, তাই প্রশ্ন বলল, তুমি কাউকে ভালবাসো নি মলিদি?
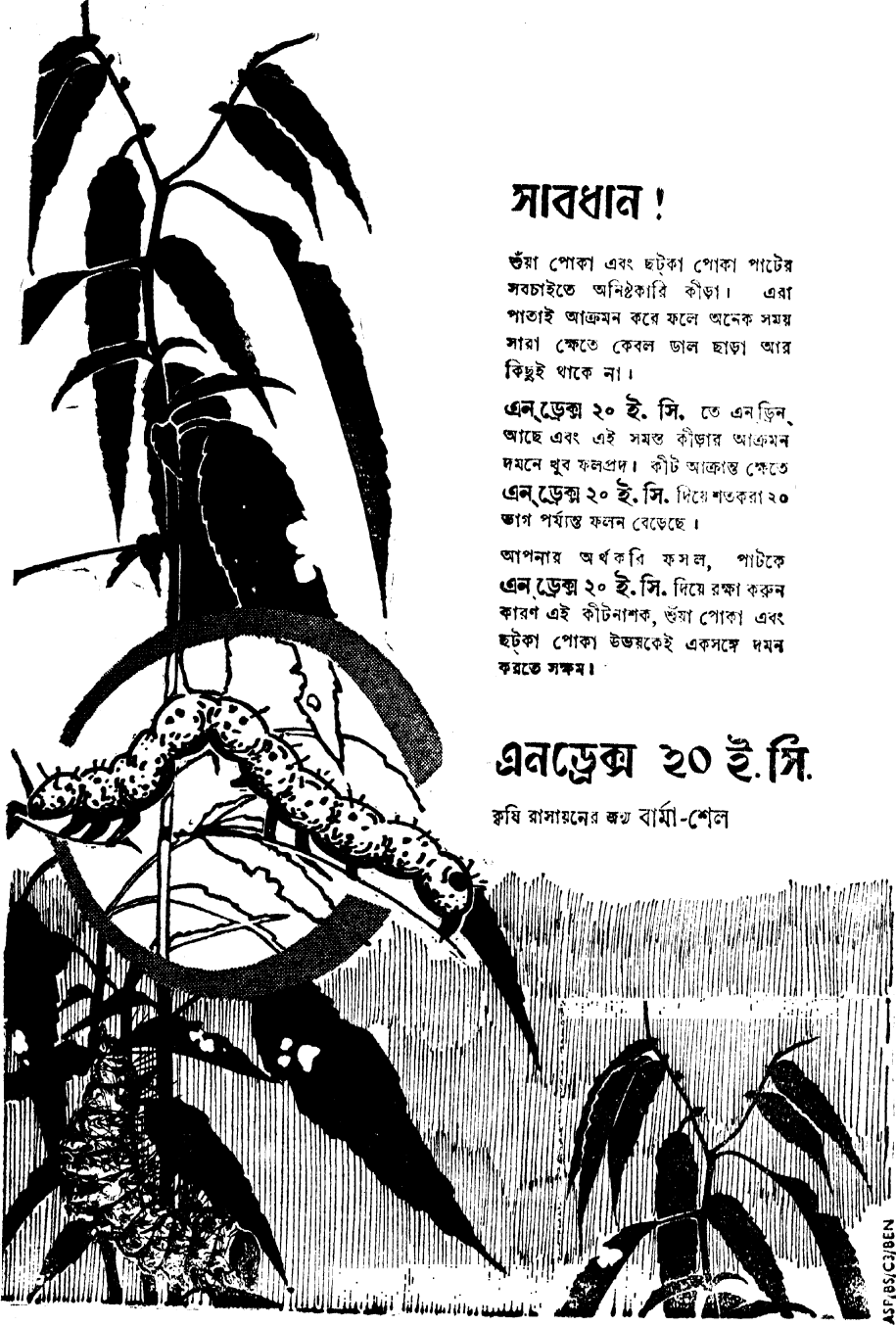
মলিনা দাস প্রথমটা চুপ করে থেকে পরে উত্তর দেয়, ভাল বোধ হয় বেসেছিলাম একজনকে কিন্তু এমনই বরাত, মানুষটা বেরল একেবারে কিম্ভূত। বয়েসে সে অবশ্য আমার চেয়ে অনেক বড় ছিল। আমরা থাকতাম পাশাপাশি ফ্ল্যাটে।

পাছে কথা বলায় বাধা পড়ে তাই সৌরেন চুপ করে শোনে।

মলিনা দাস যেন ফেলে আসা দিনগুলোর মধ্যে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে, বলে, সে মানুষটাকে ভাল না বেসে পারা যায় না। একেবারে আত্মভোলা লোক, সারাদিন পড়াশুনো নিয়ে থাকত। তার সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারতাম আমাদের কোন জ্ঞানই হয়নি, অথচ এতটুকু অহঙ্কার তার ছিল না। প্রায়ই নিউটনের মত বলত, জ্ঞান-সমুদ্রের বেলায় আমরা নুড়ি কুড়োচ্ছি মাত্র। তখন আমার বয়েস অল্প, মানুষটাকে যে কি গভীরভাবে ভালবেসেছিলাম অথচ—

মলিনা দাসকে থামতে দেখে সৌরেন প্রশ্ন করে, কি হলো?

—সে আমাকে বুঝতে পারল না। ও'র স্ত্রী যখন মারা গেল—

সৌরেন বিস্মিত হয়, তার মানে, তিনি বিবাহিত।

—হ্যাঁ, একটি মেয়ে রেখে তাঁর স্ত্রী মারা যায়। জানতাম একলা মেয়েকে মানুষ করতে সে পারবে না। তাই আমি চেয়েছিলাম তাকে বিয়ে করতে, তাদের সব দায়িত্ব নিতে। কিন্তু সে আমাকে ফিরিয়ে দিল। বলল, দোজবরকে বিয়ে করে কোনদিন তুমি সুখী হবে না মিলি। আমাকে তুমি শ্রদ্ধা কর, তার সঙ্গে মিলেছে তোমার সহানুভূতি, কিন্তু তুমি আমায় ভালবাসো না। কিছুতেই তাকে আমি বোঝাতে পারলাম না।

—তারপর কি হলো?

মলিনা দাস করুণ হাসে, হবে আর কি। কিছুদিন বাদে ভদ্রলোক আবার বিয়ে করলেন, একেবারে একটি গাঁইয়া মেয়েকে, একবার ভেবেছিলাম জিজ্ঞেস করব, তার মধ্যে কোন্ ভালবাসার সন্ধান সে পেয়েছিল?

সৌরেন প্রশ্ন করে, ভদ্রলোক সুখী হয়েছেন?

—জানি না। তবে এখন বাংলাদেশের তিনি একজন নামকরা লোক। তোরা সবাই তাঁকে চিনিস্। আমাকে প্রত্যাখান করে তিনি যে কি গভীর আঘাত আমায় করেছিলেন তা বোধ হয় বুঝতে পারেন নি। জীবনের প্রথম প্রেম ব্যর্থ হবার অভিশাপ বড় নির্মম। ঐ ঘটনাটা না ঘটলে আমি হয়ত আজকের এই মলিনা দাসে পরিণত হতাম না। কেন জানি না সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমাকে যে ভালবাসবে, তাকেও আমি অমনি করে আঘাত করব, ফিরিয়ে দেবো। দিয়েওছিলাম।

—কাকে?

মলিনা দাস আবার অতীতের সমুদ্রে ডুব দিল, ছেলেটি আমাদের চেয়ে দু' বছরের সিনিয়র। আমি যখন বি এ পড়ি, সে তখন এম এ পাশ করে বেরল। প্রফেসাররা তাকে খুব স্নেহ করতেন, বলতেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন সে।

এই পর্যন্ত বলে মলিনা দাস হাসতে শুরু করে, তখন আমার ভাগ্য প্রসন্ন। সেই রত্নটি আমার প্রেমে মজে হাবুডুবু খেতে শুরু করলেন। রিসার্চ করা তার মাথায় উঠল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি রেখে আমার আশেপাশে চার পাশে ঘুরত, আর মেহের আলির মত বলত, সব ঝুটা হ্যায়।

সৌরেন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

—জীবনটা তার মিথ্যেই হয়ে গেল। সব জেনে শুনেও আমি তাকে নির্মমভাবে প্রত্যাখান করলাম। অথচ তার কোন অপরাধ ছিল না। অপরাধ এইটুকুই, সে ছিল পুরুষ মানুষ।

সৌরেন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, প্রশ্ন করে, সে ভদ্রলোক এখন কোথায়?

মলিনা দাসের মুখে রহস্যময়ীর হাসি, সে কথা জেনে কি লাভ?

—তিনি বিয়ে করেছেন?

—না। বললাম যে, মেহের আলি হয়ে গেছে।

এমন সময় দরজায় ঘণ্টি বেজে উঠল। মলিনা দাস দরজা খোলার জন্যে উঠে দাঁড়ায়।

সৌরেন জিজ্ঞেস করে, কারুর আসবার কথা আছে নাকি?

—হ্যাঁ। সোমসাহেবের ভাইকে ডেকেছি।

—আমি তা হলে এখন যাই।

মলিনা দাস বাধা দেয়, না, না, ওর সঙ্গে আমার বেশী কিছু বলার নেই, আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগবে না, তুই আমার শোবার ঘরে গিয়ে অপেক্ষা কর, আমি ততক্ষণে হারীন সোমকে বিদায় করছি। তারপর দু'জনে কোথাও খেতে যাওয়া যাবে, কি বল?

আজ সন্ধ্যায় সৌরেনের বিশেষ কিছু করার ছিল না তাই সে সহজেই মলিনা দাসের প্রস্তাবে রাজী হল। পাশের ঘরে চলে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিল ভালো করে।

এই সেই ঘর যেখানে মলিনা দাস ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ সমেত সৌরেন কতদিন আড্ডা মেরেছে, কত সময় পরিশ্রান্ত হয়ে খাটের উপর জিরিয়ে নিয়েছে, আবার এই ঘর থেকেই একদিন ভয় পেয়ে বিবর্ণ মুখে মলিনা দাসের আহ্বানকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে গেছে। আজ অবশ্য এ ঘরে একলা বসে থাকতে তার ভয় করল না। কেন

জানা নেই, তার মনে হল, মলিনা দাসের লুকোনো ব্যথার স্থানটুকু সে খুঁজে পেয়েছে, বুঝতে পেরেছে কেন এই মেয়েটি অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও অস্বাভাবিক পথে চলতে চায়। এতদিন পর্যন্ত যে মলিদিকে সে ধাঁধার সঙ্গে তুলনা করত, আজ তার অতীত জীবনের কথা শুনে মনে হল, আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতই সে চেয়েছিল সংসার পাততে ভালবেসে বিয়ে করতে। না পাওয়ার কান্নাটাই তার হৃদয়ের মূলে সুর, জীবনে তার বিচিত্র প্রকাশ। মলিদির জন্যে তার মন করুণায় ভরে গেল।

বাইরের ঘরে হারীন সোম মলিনা দাসের সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ সৌরেনের কানে গেল উঁচু পর্দার কথাবার্তা। কৌতূহলী হল সৌরেন, চাবির ফুটো দিয়ে তাকিয়ে দেখল হারীন সোমের চোখ মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে, দরজায় কান পেতে শুনল, হারীন সোম সরোষে বলছে, কেন আপনি আমাকে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছেন।

খুব সংযত কণ্ঠে মলিনা দাস উত্তর দিল, আপনাকে তো ভয় দেখাইনি, শুধু বলেছি আমি কি করব। আপনার দাদা আমাকে যে চিঠিপত্রগুলো লিখেছেন সেগুলো পাঠিয়ে দেবো আপনার বউদির কাছে।

—তার মানে আমাদের পরিবারে আপনি একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চান।

মলিনা দাস খিলখিল করে হাসে।

হারীন সোম ধমকে ওঠে, থাক আর আদিখ্যেতা করে হাসতে হবে না। শুনে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।

মলিনা দাস কপট বিস্ময়ের সুরে বলে, সে কি, আমার এই হাসি শোনার জন্যে আপনার দাদা তো উদগ্রীব হয়ে থাকত। শুধু লণ্ডনে এক সঙ্গে ঘুরে তার মন ভরল না বলে আমায় জোর করে নিয়ে গেল প্যারিসে। জানেন তো সেখানে আমরা স্বামী-স্ত্রীর মতো এক হোটেলেই থাকতাম।

— আঃ, চুপ করুন।

—মিথ্যে আপনি রেগে যাচ্ছেন। আমার কাছে হোটেলের বিল আছে। রেলের রিজার্ভেশান আছে, মিঃ অ্যান্ড মিসেস সোম বলে।

হারীন সোম বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ে, আপনার যা ইচ্ছে তাই করবেন, তার জন্যে আমাকে ডেকেছেন কেন?

মলিনা দাস মিষ্টি মিষ্টি হাসে, ভাবলাম আপনাকে জানিয়ে রাখা ভাল, যদি দাদা বউদিদির মধ্যে একটা ঝগড়াই বাধে তাতে হয়ত আপনার সুবিধেই হতে পারে কি বলুন?

—তার মানে, কি বলতে চান আপনি?

—অবশ্য জানি না কথাটা কতদূর সত্যি। সোমসাহেবের মুখ থেকেই শোনা তো।

হারীন সোম তীব্রদৃষ্টিতে তাকায়, কি শুনেছেন?

মলিনা দাস কৌতুক করে, মানে ঐ 'নেটনীড়ের'র ব্যাপার আর কি। সোমসাহেব বোধ হয় আপনার সংগে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কটা খুব ভাল চোখে দেখেন নি।

হারীন সোমের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়, বলে, আমি চললাম। আপনার সংগে কথা বলার আর আমার কোন প্রবৃত্তি নেই।

মলিনা দাস স্বাভাবিকভাবে বলে, মাথা গরম করছেন কেন, ইচ্ছে করলে সব ঝামেলাই তো আপনি কাটিয়ে ফেলতে পারেন।

—কি করে?

—চিঠিগুলো কিনে ফেলুন।

হারীন সোমের মুখে বিদ্রুপ ফুটে ওঠে, ও এই বুঝি আপনার ব্যবসা। তাহলে বলে রাখি, খুব ভুল লোক ধরেছেন। আমি ওসবের মধ্যে নেই।

—বেশ তো, তবে যদি মত বদলান, আমাকে টেলিফোন করতে দ্বিধা করবেন না। নম্বর তো আপনাকে দেওয়াই আছে। আর না হয় চিঠিগুলো দু দিন বাদেই পাঠাবো।

হারীন সোম আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সোরেন তাড়াতাড়ি দরজার কাছ থেকে সরে এসে ড্রেসিং টেবিলের পাশে রাখা চেয়ারে বসে ছবির বই-এর পাতা ওলটাতে লাগল যেন বাইরের ঘরের কোন কথাই সে শুনতে পায় নি।

একটু বাদেই হাসতে হাসতে মলিনা দাস ঘরে ঢুকল, চল সোরেন কোথাও খেতে যাওয়া যাক, বড্ড খিদে পেয়েছে।

সোরেন ইচ্ছে করে প্রশ্ন করল, হারীন সোম কি বলতে এসেছিল?

মলিনা দাস একটা চোখ ছোট করে বলে, সোমসাহেবের ভাই তো, নতুন কথা, আর কি বলবে। কদিন আমাকে নিয়ে ঘুরতে চায়, এই আর কি।

মলিনা দাসের মুখে এই নির্জলা মিথ্যে কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল সোরেন। তার সম্বন্ধে যে এতদিন খুব একটা ভালো ধারণা ছিল তা কিছু নয়, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় বসে তার প্রথম জীবনের ব্যর্থতার কথা জেনে মনে যে সহানুভূতির উদ্রেক হয়েছিল, পাশের ঘরে হারীন সোমের সংগে ঐ ধরনের আলোচনা শুনে ও সব শেষে মিথ্যা ভাষণে সোরেনের মন বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। যদিও সে সন্ধ্যায় মলিনা দাসের সংগেই তাকে বেরুতে হয়েছিল, খেতে হয়েছিল রেস্তরাঁয়, কিন্তু একবারও সে মলিদির সংগে ভালো করে কথা বলতে পারেনি, চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। সব সময় মনে হয়েছে, রজত বোধ হয় এই মলিনা দাসদের কথাই বলতে চায়, যাদের স্বরূপ কেউই বুঝতে পারে না। হয়ত কোন একদিন এরা নিষ্পাপ ছিল, কিন্তু আজ যে পঙ্কিলতার মধ্যে তলিয়ে গেছে সেখান থেকে আর তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না। এদের জন্যে করুণা প্রকাশ করেও কোন লাভ নেই। এর সমাজের অভিশাপ।

রেস্তরাঁয় খাওয়ার পর মলিনা দাস সোরেনকে ডেকেছিল তার ফ্ল্যাটে যাওয়ার জন্যে, কফি খাওয়ার অছিলায়। কিন্তু সোরেন তাতে রাজী হয়নি। শরীরের দোহাই দিয়ে মলিদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসে।

টিউব ট্রেনে উঠে সোরেন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কলকাতায় থাকতে মলিনা দাসদের সংগে তার কোন পরিচয় ছিল না, এখানে এসেও পরিচয় না হলেই বোধ হয় ভাল হত। বাঙালী মেয়েদের সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধা ও গর্বের ভাব তার মধ্যে সঞ্চিত ছিল মলিনা দাসের সংগে দেখা হওয়ার পর থেকে তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এই সুন্দরী মেয়েটির অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার ছবি দেখে মনে মনে সে এতখানি শঙ্কিত হয়ে পড়েছে যে এদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে পারলেই যেন সে বাঁচে। কিন্তু সেই সংগে আর একটি মেয়ের মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল, কি স্নিগ্ধ, শান্ত জীবন। এ এলিজাবেথ। এখন তাকে একবারও বিদেশী বলে মনে হয় না। ভারতকে সে ভালবেসেছে, সেই সংগে তার দর্শন আর সেখানকার অধিবাসীদের। নিজেকে ভারতীয় করে গড়ে তোলার কি প্রাণপণ চেষ্টা। এই ক মাসের পরিচয়ের মধ্যেই এলিজাবেথ যে সোরেনকে শুধু কাছেই টেনে নিয়েছে তা নয় তার উপর নির্ভর করতে শুরু করেছে। এলিজাবেথ সেই

জাতের মেয়ে যাকে দেখলে বোঝা যায় এরা সেই চিরন্তন নারী; যে নারী নিজে কষ্ট পেলে অপরের মনে দুঃখ দিতে চায় না।

মলিনা দাসের সঙ্গে এলিজাবেথের কোন তুলনা করতে যাওয়াই ভুল, নারীত্ব ছাড়া আর কোন মিল তাদের দুজনের মধ্যে নেই। মলিনা দাসের রূপ পুরুষের মনে মোহ জাগায় কিন্তু এলিজাবেথের রূপ তাকে সমীহ করে চলতে শেখায়। মলিনা দাসের সঙ্গে কিছু দিন আলাপের পর মন বিতৃষ্ণায় ভরে যায় অথচ এলিজাবেথের সংস্পর্শে এসে মন পবিত্র হয়ে ওঠে। মলিনা দাসের সঙ্গে যাদের পরিচয় গভীর অফিসের কাজকর্ম করতে তাদের মন ওঠে না, অথচ সৌরেন নিজেই অনুভব করেছে এলিজাবেথ শুধু অফিস কেন আরও পাঁচ রকম কাজ করতে তাকে প্রেরণা যোগায়।

এলিজাবেথের সঙ্গে এখনই দেখা করার জন্য তার মন উন্মুখ হয়ে উঠল। বড় নিরীহ, ভালমানুষ মেয়ে, সত্যিই তাকে পেলে অনেকখানি যেন নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

ট্রেনের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সৌরেন আজ চিন্তা করছে। ভাবছে কতজনের কথা। মনে পড়ল মীনাক্ষীকে, সেও ভাল, সেও সুন্দরী, কিন্তু বড় বেশী যুক্তি ওর মধ্যে। কথায়, কাজে, ব্যবহারে সব সময় যুক্তির অবতারণা করে। অত বাঁধাধরা ছক-কাটা জীবন সৌরেনের ভাল লাগে না। মীনাক্ষীর সঙ্গে এতদিন আলাপ করে সৌরেন বুঝেছে সে তার মনকে স্বাধীন-ভাবে চলতে ফিরতে দেয় না, সব সময় যুক্তির চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখে। কিন্তু সে জায়গায় এলিজাবেথ অনেক খোলা-মেলা, অনেক সহজ। ভাবের আবেগকে সে স্বীকার করে, তার আহ্বানে সে সাড়া দেয় এলিজাবেথের সঙ্গে সৌরেনের যত-খানি মিল মীনাক্ষীর সঙ্গে সে মিল তার ছিল না।

লীলা আর প্রমীলাকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ সৌরেন পেয়েছিল। কিন্তু কোনদিনই তাদের ভাল লাগেনি। সৌরেনের বরাবর মনে হয়েছে ওরাও যেন সৃষ্টিছাড়া, উদ্ভট। ওদের জীবনের মূল অর্কিডের মত হাওয়ায় ভাসে, মাটির সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। এরাও সুন্দর হয়ত ভাল, কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্র কেমন করে যেন হারিয়ে ফেলেছে। এদের তুলনায় এলিজাবেথ রক্তমাংসের গড়া মানুষ, স্বাভাবিক সুখ দুঃখ হাসি কান্না দিয়ে গড়া তার জীবন। সৌরেন তাকে অনেক বেশী বুঝতে পারে।

অবশ্য বিদেশী মেয়েদের সঙ্গে মেশবার বিশেষ সুযোগ পায়নি সৌরেন। ডোরিয়ার মধ্যে সে কোন আকর্ষণ খুঁজে পায়নি। কেন যে জিতের তাকে পছন্দ হল সৌরেন

তা আজও বুঝতে পারে না। মারিয়াকে তার ভাল লাগা তো দূরের কথা মলিনা দাসের মত তাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে। নারীর প্রগল্‌ভতা তার কাছে অসহ্য। ঠিক এই সময় লরার মুখখানা একবার মনের মধ্যে উঁকি মারল। নিজের মনেই হেসে উঠল সোরেন। কি আশ্চর্য, একেবারে মেয়ে পকেটমারের পাল্লায় গিয়ে পড়েছিল, ভাগ্যিস সে এদের ফাঁদে পা দেয়নি।

টিউব ট্রেন খুব জোরে চলছে অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে। গাড়ির আলো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। হঠাৎ সোরেনের মনে হল তার চোখের সামনে নিমেষের জন্যে সব কিছু অন্ধকারের মধ্যে ঢেকে গেল, এতক্ষণ যাদের কথা সে ভাবছিল তলিয়ে গেল সেই অন্ধকারের মধ্যে। অতি দূর থেকে পাতলা আলো এগিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ল সেই অন্ধকার তরঙ্গের উপর। ফেনার মত সাদা সাদা হাসি উত্তাল তরঙ্গ তুলে সোরেনকে সম্মোহিত করে দিল। যেখান থেকে সেই আলোর ধারা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, সেই দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল সোরেন, দেখল এক সম্মোহিনী মূর্তি। সোরেন চিনতে পারল—সে আর কেউ নয়, এলিজাবেথ।

কখন ট্রেন গিয়ে স্টেশনে থেমেছে, কিভাবে স্টেশন অতিক্রম করে রাস্তায় হাঁটতে শুরু করেছে সোরেন, কিছুই তার খেয়াল ছিল না। চমক ভাঙ্গল একেবারে বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে। দরজা খোলাই ছিল, পকেট থেকে চাবি বার করতে হল না। এক দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে সে উপরে উঠে গেল। বুঝতে পারল এলিজাবেথ ঘরে আছে, আলো জ্বলছে ভেতরে। বুকের স্পন্দন তার বেড়ে গেল, মৃদু করাঘাত করল তার দরজায়।

—ভেতরে এসো। ডাকল এলিজাবেথ।

সোরেন ঘরে ঢুকে দেখল ফিকে নীল রঙের জামা পরে সোফায় আরাম করে বসে এলিজাবেথ আলোর তলায় বই পড়ছে। আজ যেন আরও মিষ্টি দেখাচ্ছে তাকে। হেসে জিজ্ঞেস করল, এত দেরি হল কেন সোরেন? আমি ভেবেছিলাম তুমি আগেই ফিরবে।

সোরেন পাল্টা প্রশ্ন করল, বাঃ, তুমি যে বলেছিলে কোন বান্ধবীর কাছে যাবে।

—গিয়েছিলাম, কিন্তু ভাল লাগল না সেখানে, তাই তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম।

আজ এলিজাবেথের যাবার কথা ছিল তার এক পুরনো বান্ধবীর কাছে, এক গ্রামের মেয়ে তারা। লন্ডনে এসেছে চাকরি করতে। সোরেন সামনের চেয়ারে বসলে এলিজাবেথ সেই মেয়েটিরই গল্প বলতে থাকে। আগে তাদের সম্পর্ক কত গভীর ছিল, কিভাবে তারা দিন কাটাত তার খুঁটিনাটি গল্প, কেমন করে আগের সম্বন্ধ শিথিল হয়ে এলো তার বিবরণ। বলা বাহুল্য, সোরেন একটা কথাও শুনছিল না, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল এলিজাবেথের দিকে, দেখছিল তার ঢলঢলে মুখখানা, কথার মধ্যে কতখানি আন্তরিকতা। এলিজাবেথ বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল তার কথা শোনায় সোরেনের মন নেই। জিজ্ঞেস করল, কি ভাবছ সোরেন?

সোরেন গভীর গলায় বলল, কিছু না তো।

—অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?

—তোমাকে দেখছিলাম।

—আমাকে! হাসবার চেষ্টা করল এলিজাবেথ।

সোরেন উঠে এসে এলিজাবেথের পাশে বসল, হাত দুটো টেনে নিয়ে বলে, একটা কথা তোমাকে বলবার জন্যে ক'দিন থেকে আমি ছটফট করছি, কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারছি না।

এলিজাবেথের ফরসা গাল দুটোতে যেন আবীর ছড়িয়ে পড়ল, কি কথা, বল সোরেন।

সোরেন ইতস্তত করে বলে, তুমি আমাকে গ্রহণ কর লিজি। বলতে গিয়ে আবেগে সোরেনের গলা কেঁপে উঠল, সেই সঙ্গে হাত দুটোও।

এলিজাবেথের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, মৃদুস্বরে বলল, আমি অপেক্ষা করে ছিলাম কবে তুমি একথা বলবে তাই শোনবার জন্য।

সোরেন সোচ্ছ্বাসে বললে, তুমি ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না। আমি তোমাকে সম্পূর্ণ আমার করে পেতে চাই।

সোরেন এলিজাবেথকে কাছে টেনে নিল, এলিজাবেথ এতটুকু বাধা দিল না। নিশ্চিন্ত মনে নিজেকে সমর্পণ করল সোরেনের কাছে।

(ক্রমশ)
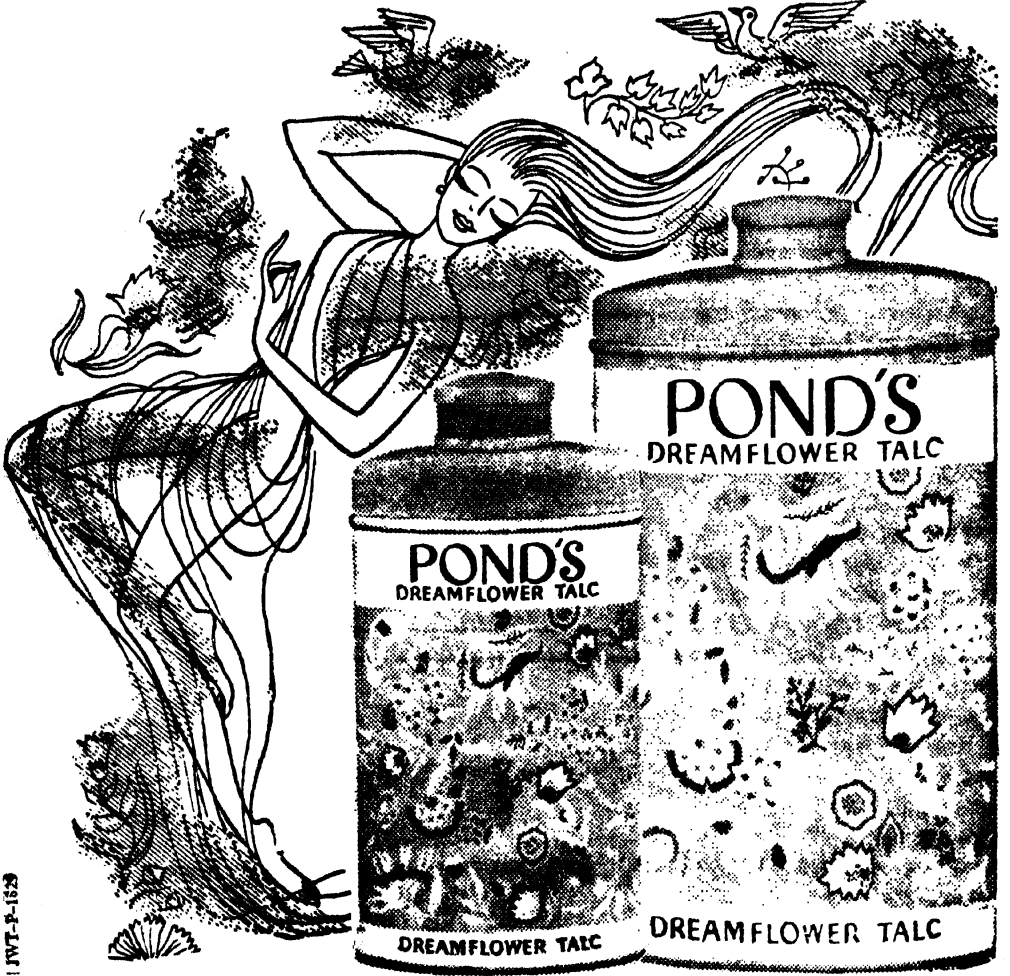
এককালে আমি খুব সিগারেট খেতুম। এখন খুব কম খাই। এখন আমি নস্যি ধরেছি। কিন্তু আমার টেবিলের উপরে, প্রায় সর্বদাই, এক প্যাকেট সিগারেট থাকে। তার কারণ, আমার বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা অল্প নয়, এবং তাঁদের প্রত্যেকেই এক-একটি পাকা ধূমপায়ী। তাঁরা আসেন; প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে তাতে আগুন ধরান; ভলকে ভলকে ধোঁয়া ছাড়েন; রিং বানান; গল্পগুজব করেন; তারপর বিদায় নেন। প্যাকেট ফুরিয়ে গেলে আমি আবার নতুন প্যাকেট আনিয়ে রাখি।

এই নিয়ে সেদিন হেমেন্দ্র কিছু উপদেশ দিয়ে গেল। হেমেন্দ্রও আমার বন্ধু। কিন্তু সে আদপেই সিগারেট খায় না। সে যখন আসে, ঘরের মধ্যে তখন তুমুল তর্ক চলছিল। "লেডি চ্যাটার্লি'জ লাভার" অশ্লীল বই কিনা। বঙ্কু বলছিল, ভীষণ অশ্লীল। অটল বলছিল, আদৌ না। কিন্তু, সাহিত্য-ব্যাপারে প্রবল বিরোধ সত্ত্বেও, একটা ব্যাপারে তাদের মধ্যে মিল দেখা গেল। তারা দুজনেই খুব সিগারেট খাচ্ছিল। বঙ্কু এবং অটল চলে যাবার পর আমি আবার নতুন এক প্যাকেট সিগারেট আনিয়ে আমার টেবিলের উপরে রেখে দিলাম।

তখন হেমেন্দ্র বলল, "তুই টেবিলের উপরে সিগারেট রাখিস কেন রে?"

বললুম, "তবে কোথায় রাখব?"

"পকেটে।"

"কেন?"

"বঙ্কু আর অটলকে আমি লক্ষ্য করছিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ওরা তোর পুরো এক প্যাকেট সিগারেট খেয়েছে।"

আমি বললাম, "তুই অবাক করলি হেম। তোর এত নজর! আচ্ছা, এখন থেকে আর আমি টেবিলের উপরে সিগারেট রাখব না।"

হেমেন্দ্র বলল, "রাখিসনে। সিগারেট সবসময়ে পকেটে রাখবি। যখন একা থাকবি, তখন একটা-দুটো খাবি। বাস্। মোট কথা, তোর খরচের হাত খুব বেড়ে গেছে। এটা ভাল নয়। সংসারী মানুষ তুই, বন্ধুবান্ধবদের অত সিগারেট খাওয়াতে হলে তুই ফতুর হয়ে যাবি। আর হ্যাঁ, ভাল কথা, আমার সেই ভাগ্নেটার কী হল?"

বললাম, "চেষ্টায় ত আছি। দেখি কী হয়।"

হেমেন্দ্র চলে যাবার পরে আমি এখন অন্য কথা ভাবছি। অতীত-জীবনের কোনও ঘটনার দ্বারা উত্তরজীবন প্রভাবিত হয় কিনা, এই নিয়ে আজ আমাকে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। যাঁরা বলেন, হয়, তাঁরা কি ঠিক কথা বলেন? কী জানি।

অনুকূলের কথা মনে পড়ল। অনুকূল আমার বাল্যকালের বন্ধু। তার বাবা ছিলেন পাঁড় মাতাল। মত্তাবস্থায় বাড়িতে ফিরে প্রায়ই তিনি অনুকূলকে ধরে খুব ঠ্যাঙাতেন। এসব কথা আমি অনুকূলের কাছেই শুনেছি। অনুকূল একদিন আমাকে বলেছিল, "কী জানিস, এমনিতে আমার বাবা খুব ভালমানুষ; কিন্তু মদ খেলেই যেন কেমন হয়ে যান। আমি কখনও মদ খাব না।"

কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের কাছে যা শুনতে পাই, তাতে মনে হয়, অনুকূলের বাল্যজীবন তার ভবিষ্যৎকে বিশেষ প্রভাবিত করেনি। অনুকূল নাকি এখন মদের মধ্যেই ডুবে থাকে। ছেলেকে ধরে ঠ্যাঙায় কিনা, তা অবশ্য জানিনে।

কিংবা ষষ্ঠীচরণের কথাই ধরা যাক। ষষ্ঠী আর আমি একসঙ্গে পড়তুম। আমার মনে আছে, বাল্যকালে ষষ্ঠী একবার একটা চড়ুই পাখি মেরেছিল, এবং তার জন্যে খুব অনুতপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তার উত্তরজীবনে যে সেই অনুতাপের ছায়া পড়েছে, এমন মনে হয় না। কেননা, ষষ্ঠী এখন ঘিয়ের কারবার করে এবং ঘিয়ের মধ্যে চর্বি মেশায়। অর্থাৎ চড়ুইয়ের বদলে সে এখন মানুষ মারে।

তবে?

বিনুর কথাও মনে পড়ছে। বিনুরা

আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত। ওর মা ছিলেন খুব গরিব-ঘরের মেয়ে; রঙও ছিল ভীষণ কালো। শুনেছি, এই নিয়ে নাকি বিনুর ঠাকুমা তাঁকে খুব খোঁটা দিতেন। আমাদের বয়স তখন অল্প। কিন্তু বড়রা ত বিশেষ সাবধান ছিলেন না। তাই তাঁদের টুকরো-টাকরা কথাবার্তা থেকে আমরা এমন অনেক ব্যাপারের আন্দাজ পেয়ে যেতুম, শিশুদের যা জানবার কথা নয়। একদিন দেখলুম, আমার মা আর পিসিমার মধ্যে বিনুর মাকে নিয়ে কথা হচ্ছে। পিসিমা বলছিল, "জানো বৌদি, বিনুর মা আজ খুব কাঁদছিল। বিনুর বাবা নাকি আবার বিয়ে করবে।"

খেলার মাঠে বিনুকে সেদিন খুব ভারিক্কী চালে জিজ্ঞেস করলুম, "হ্যাঁরে বিনু, তোর বাবা নাকি আবার বিয়ে করবে?"

বিনু বলল, "কাশী থেকে আমার ঠাকুমা আমাকে একটা লাঠি এনে দিয়েছে, দেখেছিস?"

বিয়ের প্রসঙ্গে যে কেন লাঠির কথা উঠল, বুঝলুম না। বললুম, "দেখেছি।"

"বাবা যদি আবার বিয়ে করে ত ওই লাঠি দিয়ে আমি তার মাথা ফাটাব।"

বিনুর বাবা অবশ্য দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেননি। কিন্তু বিনুর কাছে তার মায়ের দুঃখ মোটেই অজানা ছিল না। খেলার মাঠেই বিনু আমাকে বলেছিল, "দ্যাখ, আমি যদি কখনও বিয়ে করি, তাহলে এমন মেয়েকে বিয়ে করব, যার গায়ের রং খুব কালো, আর যার বাবা খুব গরিব।"

বিনুর বিয়েতে সেদিন নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম। কনেকে দেখলাম। গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা। কনের বাপও শুনলাম মস্ত বড়লোক। যুদ্ধের সময় মাংস সাপ্লাই দিয়ে অনেক টাকা করেছে। বিনু ত ডাক্তার। শুনছি, তার শ্বশুর নাকি তাকে একটা ডিস্পেনসারি খুলে দেবে। তার আগে "ফরেনে"ও পাঠাতে পারে।

তবে?

কিংবা আমার নিজের কথাই বলি। আমার বাল্যকাল খুব কষ্টে কেটেছে। অর্থকষ্টে নয়, মনঃকষ্টে। আমার কোনো কথাই কেউ শুনতে চাইত না; আমাকে বুঝতে চাইত না। নেহাতই অকারণে আমাকে অনেক সময় মার খেতে হত। আমাদের এক মাস্টারমশায় একদিন আমাকে বেদম পিটলেন। প্রহারের কারণ, ক্লাসরুমের মধ্যে তিনি যখন পায়চারি করছিলেন, তখন পিছন থেকে আমি নাকি তাঁর পাঞ্জাবির উপরে কালি ছিটিয়ে দিয়েছি এবং তিনি নাকি তা স্বচক্ষে দেখেছেন। কী ভীষণ মার যে সেদিন খেতে হল। অথচ আজ ত আমার অনেক বয়স হয়েছে; বাল্যকালে যদি একটা দুষ্টুমি করেই থাকি, তবে আজ ত তা আমি অনায়াসেই স্বীকার করতে পারি। স্বীকার করায় ত কোনও লজ্জা নেই, বরং এক হিসেবে সে ত একটা মজার ব্যাপারই হবে।

কিন্তু আমার সবচাইতে বড় লজ্জার ব্যাপার এই যে, বাল্যকালের সেই দুষ্টুমির কথাটা আজও আমার পক্ষে স্বীকার করা সম্ভব নয়। এই বয়সেও নয়। তার কারণ, সত্যিই আমি অমন-কিছু করিনি। মাস্টারমশায়ের পাঞ্জাবিতে আমি কালি ছিটিয়ে দিইনি। সে-কথা আমি অনেকবার তাঁকে বলতে চেয়েছিলাম। তিনি কিন্তু একবারও শুনতে চাইলেন না। মারতে মারতে তিনি আমার রক্ত বার করে ছাড়লেন।

বাড়িতেও সেদিন কেউ বিশ্বাস করেনি আমাকে। বাবা সারাক্ষণ গম্ভীর হয়ে ছিলেন এবং মায়ের মুখখানা যেন থমথম
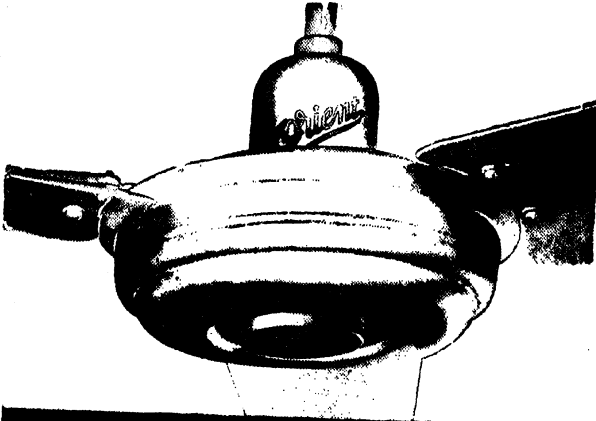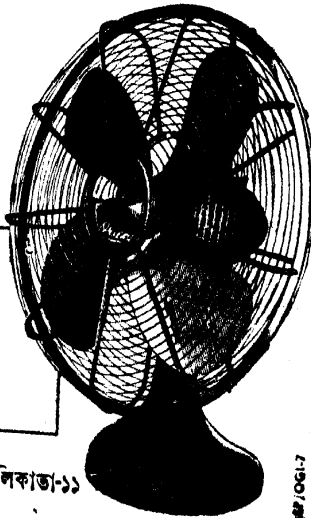
করেছিল। তাঁদের কাছে যাব, এমন সাহস ছিল না। কাকাকে বলতে গিয়েছিলাম, "কাকা, বিশ্বাস করো, আমি দোষ করিনি।" কাকা কিছু শুনলেন না। মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মনে হল, আমার মুখ দেখলেও তাঁর পাপ হবে। দিদিকে বলতে গিয়েছিলাম। দিদি আমাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে বলল, "অর্থাৎ তুই বলতে চাস যে, মাস্টারমশাই তোকে মিছিমিছি মেরেছেন? কত বড় পাজী ছেলে রে তুই, অ্যাঁ! একে ত দোষ করেছিস, তার উপরে আবার মিথ্যে বলতেও তোর আটকাচ্ছে না। তুই-ই আমাদের বংশের নাম ডোবাবি দেখছি। বেরো হতভাগা...বেরো!"

ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন, মনে আছে। অসহ্য, বোবা একটা কষ্টে আমার গলা বারবার আটকে যাচ্ছিল। এমন কষ্ট, যা কাউকে কখনও বলে বোঝানো যাবে না।

আমার মনে পড়ে, সেইদিনই রাত্রে আমি একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। "ঈশ্বর, তুমি সাক্ষী রইলে, অকারণে আমি আজ মার খেয়েছি। আমার সত্যিকথাও কেউ আজ বিশ্বাস করেনি। কিন্তু আমি কখনও কাউকে অকারণে মারব না। কক্ষনো না। কিছুতেই না।"

অথচ, সত্যিকথাটা এই যে, এই ঘটনাটির দ্বারা আমার ভবিষ্যৎ-জীবন সত্যিই প্রভাবিত হয়নি। আজই সকালে আমার ছেলেটাকে আমি অকারণে মেরেছি। আমার ধারণা, সে দোষ করেছিল। তার ধারণা, করেনি। এক্ষেত্রে তার সমস্ত কথা আমার শোনা উচিত ছিল। কিন্তু শুনব যে, এমন ধৈর্য আমার কোথায়। আসলে, আমিও ত আমার সেই মাস্টারমশায়েরই ছাত্র কিনা, তাই সমস্ত কথা শুনবার আগেই আমার ছেলেটাকে আমি একটা চড় কষিয়ে দিলাম।

বাল্যকালের কথা ভাবতে গিয়ে আজ কত কথাই যে মনে পড়ছে। মনে পড়ছে হাবলু, শেখর আর সিতাংশুর কথা। কলেজের হস্টেলে আমরা একই ঘরে থাকতুম। একসঙ্গে খেতুম, একসঙ্গে আড্ডা দিতুম, একসঙ্গে ময়দানে যেতুম, একসঙ্গে সিনেমা দেখতুম। নাইট-শোয়ে সিনেমা দেখে তারপর একই সঙ্গে আবার পাঁচিল টপকে আমরা হস্টেলে ঢুকতুম।

হাবলু আমাকে সিগারেট খেতে শিখিয়েছিল। সে ছিল যুক্তিবাদী লোক। তার প্রত্যেকটি কথাতেই কার্যকারণের সূত্র থাকত। হাবলু একদিন বলল, "দ্যাখ, পড়াশুনো যা করেছিস, তাতে ত মনে হয়, প্রত্যেকেই তোরা গাড্ডু মারবি। অথচ গাড্ডু মারলে যে তোদের বাড়ির লোকেরা খুব খুশী হবে, এমন আমার মনে হয় না। বাড়ির লোকদের যদি খুশী করতে হয়, তবে পাশ করা দরকার। পাশ করবার জন্যে পড়াশুনো করা দরকার। পড়াশুনো করবার জন্যে রাত জাগা দরকার। এবং রাত জাগবার জন্যে সিগারেট খাওয়া দরকার।"

অকাট্য যুক্তি। আমরা সবাই ভেবে দেখলুম, হাবলুটা যদিও মহা চালিয়াত, তবু কথাটা নেহাত মন্দ বলেনি। সেইদিনই আমরা সিগারেট ধরলুম। তার ফলে রাত জাগা কতখানি সম্ভব হয়েছিল, তা আর বলে কাজ নেই। তবে সিগারেটের নেশাটা ক্রমে পাকা হয়ে দাঁড়াল।

সিগারেটের কথায় মনে পড়ল, আমাদের কারও ত বিশেষ পয়সাকড়ি ছিল না, তাই অন্যকে যাতে সিগারেট খাওয়াতে না হয়, তার জন্যে অনেক ফন্দি-ফিকির করতে হত। পকেটে সিগারেট থাকলেও অনেক সময় অম্লানবদনে আমরা বলে দিতুম, "না ভাই, সিগারেট নেই।" পরে দেখলুম, তাতে বিশেষ কাজ হয় না। কেননা, বন্ধুরা অনেক সময় মুখের কথায় বিশ্বাস না করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিত, এবং সিগারেটের প্যাকেট টেনে বার করত। ভীষণ হাসাহাসি পড়ে যেত তখন।

শেষ পর্যন্ত আমরা একটা মোক্ষম ফন্দি বার করলুম। কাউকে আসতে দেখলেই আমরা প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে নিয়ে তারপর আস্ত প্যাকেটটাকে রাস্তায় ফেলে দিতুম। (একালের ছেলেরাও নিশ্চয় এরকম চালাকি করে থাকে।) এতে খুব কাজ হত। বন্ধুরা ভাবত, প্যাকেটটায় কিছু নেই, তাই ফেলে দিয়েছি। বলা বাহুল্য, তারা চলে যাবার খানিক বাদেই আবার প্যাকেটটাকে আমরা কুড়িয়ে নিতুম।

একদিন কিন্তু একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে গেল। লিজার পিরিয়ডে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি। ভাবছি, এইবারে একটা সিগারেট
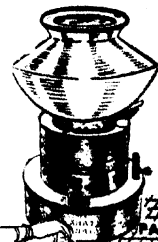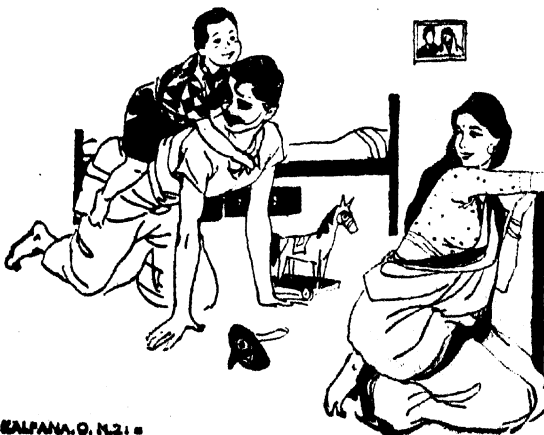
ধরালে মন্দ হয় না। এমন সময় দেখলুম, অজয় আসছে। অজয় ভীষণ সিগারেট খেত; কিন্তু কক্ষনো কিনে খেত না। অজয়কে দেখে, প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে নিয়ে, তাই আস্ত প্যাকেটটাকে আমি রাস্তায় ফেলে দিলুম। আর, আশ্চর্য, তক্ষুনি একটা মিলিটারী ট্রাক এসে সেই আস্ত প্যাকেটটার উপর দিয়ে চলে গেল। ট্রাকটা চলে যাবার পরে দেখি, প্যাকেটটাকে একেবারে পিষে দিয়ে গিয়েছে।

প্যাকেটটার মধ্যে আটটা সিগারেট ছিল। তার মানে প্রায় পুরো এক প্যাকেট সিগারেট। এক প্যাকেট ক্যাপস্টানের দাম তখন পাঁচ আনা। এখনকার হিসেবে তুচ্ছ মনে হচ্ছে, কিন্তু আজ থেকে কুড়ি-বাইশ বছর আগে পাঁচ আনার মূল্য আমার কাছে কম ছিল না।

আমি তাই যদি 'হাঁহাঁ' করে চেঁচিয়ে উঠে থাকি, তবে মোটেই অস্বাভাবিক কিছু করিনি। সত্যিই আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, এবং অজয়—যেহেতু সে কিছুই জানত না—তাতে ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিল।

অজয় বলল, "কী রে, তুই অমন চেঁচিয়ে উঠলি কেন?"

পিষ্ট প্যাকেটটার দিক থেকে চোখ না-ফিরিয়ে আমি জবাব দিলুম, "তুই তার কী বুঝবি? তোকে ত আর পয়সা দিয়ে সিগারেট কিনতে হয় না।"

বলেই বুঝলাম, ভীষণ ভুল করেছি। কিন্তু তখন আর কোনও উপায় নেই। অজয় তৎক্ষণে সব বুঝে ফেলেছে। বুঝেছে যে, তাকে পাছে সিগারেট খাওয়াতে হয়, তাই প্যাকেটের মধ্যে সিগারেট থাকা সত্ত্বেও আমি সেটাকে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলাম।

দেখলাম, দুঃখে গ্লানিতে অপমানে ঘৃণায় তার মুখখানা নিমেষে কালো হয়ে গেল।

"তুই...তুই বন্ধুদেরও ঠকাস? তুই এত খারাপ? এত খারাপ?"

আমার সামনে থেকে সরে যাবার আগে, অনেক কষ্টে, মাত্র এই কটা কথাই অজয় সেদিন বলতে পেরেছিল।

তা দেখুন, এমন একটা ঘটনাতেও কি আমার জীবন বিশেষ প্রভাবিত হল? সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতে হবে যে, মিথ্যে বলতে আমার আটকায় না। স্বীকার করতে হবে যে, অজয়ের সেই অত বড় ধিক্কারও আমার বর্তমান জীবনের উপরে মোটেই ছায়া ফেলতে পারেনি। শত্রুদের ঠকানো ত খুব শক্ত ব্যাপার; তাই সুযোগ পেলেই আমার বন্ধুবান্ধবদের আমি ঠকিয়ে থাকি।

যে হেমেন্দ্র আমার এত বড় শুভানুধ্যায়ী, আমার সিগারেট অন্যে খেলে যার প্রাণে বড় ব্যথা বাজে, সেই হেমেন্দ্রকেও আমি ঠকাচ্ছি। হেমেন্দ্র অবশ্য তা জানে না। ওর বেকার ভাগ্নেটাকে আমি একটা চাকরি করে দেব, এই আশ্বাস দিয়ে সম্প্রতি ওদের মধুপুরের বাড়িটাকে আমি খুব অল্প টাকায় বাগিয়ে নিয়েছি। অথচ, ঈশ্বর জানেন, চাকরি দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

তবে?

ভাবছি, অতীত-জীবনের ঘটনার দ্বারা উত্তরজীবন অনেক সময়ে প্রভাবিত হয়, এমন অদ্ভুত বিশ্বাস যাঁরা লালন করেন, আমার প্রবন্ধটায় তাঁদের খুব ঠুকে দেব।

আমার প্যাকেটটা ইতিমধ্যে পুনর্বার নিঃশেষ হয়েছে। বেয়ারাকে ডেকে বললাম, "যাও, এক প্যাকেট ক্যাপস্টান নিয়ে এস।"

সিগারেট এল। প্যাকেটটাকে আমার টেবিলের উপরে রেখে, এক টিপ নস্যি নিয়ে, আমি এখন সেই প্রবন্ধ লিখতে বসেছি।

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৭৫)

এমন এক-একটা ঘটনা জীবনে ঘটে, যখন মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা, যুক্তি-বিচার সমস্ত কিছু গোলমাল হয়ে যায় হঠাৎ। সমস্ত আইন, সমস্ত বিশ্বাস ধূলিসাৎ হয়ে যায় এক নিমেষে। যদি তা না হতো তাহলে মানুষ এমন অনিশ্চিতের দিকেও দৌড়তো না, বাধা পেলে সেই বাধাকেই শাশ্বত বলে স্বীকার করে নিয়ে নিস্পৃহ হয়ে বসে থাকতো। হয়ত এই বাধা আছে বলেই বাধা থেকে মুক্তি পাবার এত আনন্দ। হতাশা আছে বলেই হয়ত মানুষ আশা করতে এত ভালবাসে। বেদনাই হয়ত আনন্দের পরমায়ু।

সেই বেদনাই দীপঙ্করকে এত পথ চালিয়ে নিয়ে এসেছে। সেই ঈশ্বর গাঙুলী লেন থেকে এই গড়িয়াহাট লেভেল্ ক্রসিং পর্যন্ত। এই দীর্ঘ পথের যাত্রায় শুধু আনন্দের পাথেয় পেলে কি তার এতদূরে আসার ধৈর্য থাকতো! প্রতি পদে পদে বাধার বেদনাই তো তার আনন্দের পরমায়ু বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই কালিঘাটের অন্ধকার অস্বাস্থ্যই তো তাকে কেবল আলোর দিকে ঠেলে নিয়ে এসেছে। আরো আনন্দ চাই, আরো আলো, আরো মুক্তি।

ছোটবেলায় মা যে-আনন্দের আশায় দীপঙ্করের ভবিষ্যৎকে নিষ্কণ্টক করতে চেয়েছিল, সেই আনন্দ না-পাক্ দীপঙ্কর, কিন্তু তার এক আনন্দ তো পেয়েছে। আর এক মুক্তি, আর এক স্বাতন্ত্র্য।

দীপঙ্করের মনে হতো—এই যে আমি, এতবড় জগতের ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকেও এই যে স্বতন্ত্র আমি, এ আমি কার? আমি সতীর, না আমি লক্ষ্মীদির? আমি কিরণের না মা'র? আমি প্রাণমথবাবুর না ছিটে ফোঁটার? আমি পৃথিবীর না পৃথিবীর বাইরের অন্য কোনও অদৃশ্য শক্তির? দীপঙ্করের মনে হতো—কেন আমি এত ব্যথা পাই, কেন আমি আবার এত আনন্দও পাই? কেন আমি জন্মেছি, কেন আমি সংগ্রাম করছি? এই আমার অস্তিত্বের সংগ্রাম দিয়ে কার কোন্ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হচ্ছে? সংসারের কার কোন্ উপকারটা সাধিত হচ্ছে?

সেদিন অফিসের করিডোরে যখন নানা মানুষের ভিড় উদ্দাম হয়ে উঠেছিল, যখন সেক্শানে-সেক্শানে কুৎসিত আলোচনার অন্ত ছিল না, ক্লার্কদের মুখে-মুখে যখন হীন-নীচ প্রসঙ্গের খোলাখুলি আলাপ চলছিল, তখন দীপঙ্করের মনে হচ্ছিল, এই সমস্তর পেছনেও যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তির কোনও অজ্ঞাত এক সংকেত লুকিয়ে আছে।

ক্রফোর্ড সাহেব নিজেও এসেছিল সঙ্গে। দীপঙ্কর নিজে মিস্টার ঘোষালের চেয়ারে বসলো। কাগজ-পত্র, ফাইল, চিঠি, ইণ্ডেন্ট, এস্টাব্লিশমেন্ট, সব কিছুই দীপঙ্করের জানা কাজ। মিস্টার ঘোষালের মুখটা কিছু গম্ভীর। কী সব অনেকগুলো কাগজ-পত্র নিয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগলো দীপঙ্করকে। কারো কোনও কথাই কানে গেল না। কোনও দিকেই যেন খেয়াল নেই দীপঙ্করের। এই অফিসেই একদিন তেত্রিশ টাকার সামান্য ক্লার্কের চাকরি নিয়ে ঢুকেছিল দীপঙ্কর, আবার এই অফিসেরই সর্বোচ্চ চেয়ারটাতে এসে বসলো। সেদিন এখানে মনে ক্ষোভ আর বুকে ঘৃণা নিয়েই ঢুকেছিল সে, আর আজ এই চেয়ারটাতে বসেও তার সে-ঘৃণা আর ক্ষোভের যেন এতটুকু লাঘব হলো না। এই চেয়ারটাতেও যেন সংসারের সব পাপ আর সব কলঙ্ক চিরস্থায়ী হয়ে লেগে আছে। দীপঙ্করের মনে হলো সে-ও যেন হঠাৎ মিস্টার ঘোষালের সব অপরাধের অংশ-ভাগী হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে।

মিস্টার ঘোষালের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। একটা চুরুট নতুন করে ধরালো আবার মিস্টার ঘোষাল।

মিস্টার ঘোষাল অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করলে—ইজ্ দ্যাট্ অল্‌রাইট সেন? সমস্ত ঠিক আছে?

আজ দীপঙ্করের অনুমতি নিয়ে মিস্টার ঘোষালকে যেতে হচ্ছে। একটু আগেই জামিনে খালাস পাওয়া মানুষটা যেন পেলে

সমস্ত বিশ্ব-সংসারটাকে কামড়ে চিঁষয়ে নিঃশেষ করে ফেলে দেবে। যেন হাঁফাচ্ছে মিস্টার ঘোষাল। জীবনে এই-ই বোধহয় প্রথম আঘাত, প্রথম পরাজয়। সেই লন্ডন অফিসের রেলের ধর্মঘট থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে অগাধ উন্নতির শিখরে উঠতে উঠতে এই প্রথম পিছুলে যাওয়া।

—আমি দেখে নেব সেন, তুমি দেখে নিও, আই শ্যাল ফাইট ইট আউট,. আই শ্যাল—

দীপঙ্কর কিছু কথা বললে না। ক্রফোর্ড সাহেব তখন নিজের ঘরে চলে গিয়েছে। মিস্টার ঘোষাল আবার গর্জন করে উঠলো—আমি প্রমাণ করবো আমাকে ম্যালিসাস্‌লি ধরা হয়েছে, আমি সকলকে ওয়াগন দিতে পারিনি। ডিসগ্রান্টল্‌ড্ পার্টির এটা কাজ—আই শ্যাল প্রুভ্ ইট্—আই শ্যাল্—

এক-তরফা কথা বেশিক্ষণ হয় না। তবু দীপঙ্করের কাছে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্যে মিস্টার ঘোষালের যেন আগ্রহের অন্ত ছিল না সেদিন। বললে—ডু ইউ নো সেন, আমি সকলকে চিনি—আমি পুলিস কমিশনারকে চিনি, আমি গভর্নর স্যার জন হার্বার্টকে চিনি, উই আর ফ্রেন্ড্‌স্, দরকার হলে আমি ফজলুল হক্‌কে বলবো আই উইল মুভ্ হেভেন্ য়্যান্ড আর্থ সেন—একজন ইনোসেন্ট গভর্নমেন্ট অফিসারকে এই হ্যারাস্‌মেন্ট্ করা—

মিস্টার ঘোষাল ঘরের মধ্যে চুরুট টানতে টানতে খাঁচার বাঘের মত এধার-ওধার করতে লাগলো। যেন পারলে দীপঙ্করকেই কামড়ে ছিঁড়ে খাবে। তারপর আরো কত কী বলেছিল মিস্টার ঘোষাল—সমস্ত মনে আছে দীপঙ্করের। যথারীতি টেপ্টেড্ মানি দিয়ে ধরেছিল স্পেশ্যাল পুলিস। কোনও ফাঁক রাখেনি তারা। পুলিসের এস-পি ছিল, ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট ছিল—আর ছিল ইন্‌ডেন্ট্ ফর্ম নিয়ে পার্টি। মাড়োয়ারী নয় গুজরাটি নয়, সিন্ধী নয়, বাঙালী। খাস বাঙলা দেশের খাঁটি বাঙালী। ওয়াগনের জন্যে অনেকদিন ধরে আসা-যাওয়া করেছে, অনেক সাধ্য-সাধনা করেছে, অনেক খোসামোদ করেছে। দ্বিজপদকে বখশিশ দিয়েছে। কিন্তু মিস্টার ঘোষালকে খুশী করতে পারেনি। মিস্টার ঘোষাল দশখানা ওয়াগনের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছিল। পাঁচটি হাজার টাকা ঘুষ। পাঁচ হাজার টাকা দিলেও আরো পাঁচ হাজার টাকা প্রফিট থাকতো পার্টির। কিন্তু তখন স্পেশ্যাল পুলিস তৈরি হয়েছে। চারদিকে অফিসের দেয়ালের গায়ে পোস্টার পড়ে গেছে—'ঘুষ দিবেন না। ঘুষ দেওয়া এবং ঘুষ নেওয়া, উভয়ই অপরাধ।' শেষে বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোক হাজির হয়েছিল গিয়ে পুলিসের অফিসে।

মিস্টার ঘোষাল অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—ডু ইউ বিলিভ্ ইট সেন? এ তুমি বিশ্বাস করো? আমি ঘুষ নিতে পারি?

দীপঙ্কর কী বলবে বুঝতে পারেনি তখন।

মিস্টার ঘোষাল আবার জিজ্ঞেস করেছিল—এ তুমি বিশ্বাস করতে পারো? আমার দ্বারা ঘুষ নেওয়া সম্ভব? তুমি আমাকে এতদিন দেখে আসছো! মিস্টার রবিনসন্ আমাকে চিনতো! আমি এ-কাজ করতে পারি? দিস্ ইজ্ ক্রিমিন্যাল—ডু ইউ বিলিভ্ ইট্ রিয়্যালি?

দীপঙ্কর বিশ্বাস করুক আর না-করুক, তাতে কারো কিছু এসে যায় না। পৃথিবীও থেমে থাকে না তার জন্যে। টাকায় টাকা তখন গড়িয়ে চলেছে এদেশ থেকে ওদেশে। সেই টাকা! টাকা তখন অনেক জমে গেছে সিন্দুকে। অঘোরদাদুর সিন্দুকের মত আমেরিকার সিন্দুকে অনেক টাকা জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে। ব্রিটেনের সিন্দুকেও টাকার পাহাড়। নিজের খাওয়া-পরার সমস্যা মিটে গেছে। কিন্তু ঘরে টাকা রেখেও শান্তি নেই অঘোরদাদুদের। কারবারী যারা, যারা ব্যাঙ্কার, তাদের কাছে টাকা থাকাটাই সব নয়। টাকা খাটানোটাই

বড় কথা। তখন কাদের দেশে সোনা আছে, কোন্ জঙ্গলে তামা লোহা টিন আছে খোঁজো। কাদের চা-বাগানে মূলধন দরকার, কাদের রবার ক্ষেতে ক্যাপিট্যাল চাই সন্ধান নাও। কোন্ দেশে রেল-লাইন তৈরি হচ্ছে না টাকার অভাবে, পৃথিবীর কোন্ কোণে হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক প্ল্যান্ট্ বানাবার পয়সা নেই, খুঁজে বার করো। তারপর সেখানে টাকা ধার দিয়ে সুদ নাও, সেই সুদ আবার খাটাও ক্যাপিট্যাল হিসেবে। তারপর সেই মূলধন চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে বেড়ে আরো বড়লোক হও। আরো বড় মহাজন। তখন টাকা পাহারা দেবার জন্যে আর্মি রাখো, নেভি করো, পরের দেশে লগ্নী মূলধনের খাতিরে বেশ কড়া করে আইন বানাও। তারপর পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে আয়েস করে প্যালেস-কোর্টের ফ্ল্যাটের ভেতরে সতীদের নিয়ে এসে দিন কাটাও। কোথাও কোনও অশান্তি নেই, কোথাও কোনও অভাব নেই, কোথাও

কোনও অস্বস্তি নেই, খাও দাও ফূর্তি করো—গড্ ইজ্ ইন্ দি চার্চ।

কিন্তু, তা তো হবার নয়। প্রেমের মত টাকারও বড় বিচিত্র গতি। আমেরিকাও মহাজন, ব্রিটেনও মহাজন। জার্মানী, ইটালী, ফ্রান্স—তারাও বড় বড় সব মহাজন। সবাই টাকা খাটাচ্ছে পৃথিবীর মার্কেটে। একদিন সেই মার্কেটই বন্ধ হয়ে গেল। কেউ আর মাল কিনতে আসে না বাজারে। সবারই দেনা হয়ে গেছে। আফ্রিকার দেনা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার দেনা হয়েছে, ইজিপ্ট, পার্শিয়া, টার্কি—সকলে দেনাগ্রস্থ। মাল দরকার বটে কিন্তু দেনা আর বাড়াতে চাই না। মহাজনরা বললে—তা হোক। দেনার জন্যে তোমাদের ভাবনা নেই, ধার নাও। ধার দিচ্ছি। ইচ্ছে হয় শোধ করো কিংবা শোধ করো না। কিন্তু টাকা তোমরা নাও বাপু। টাকা না খাটালে আমাদের ঘুম আসবে না। টাকা না খাটাতে পারলে আমাদের ভাত হজম হবে না। তা তাই হলো। কেউ ধার নিলে, কেউ নিলে না। যারা ধার নিলে, তারা দেনদার স্টেট্। দেনদার হয়েই রইল চিরকাল। সে-ধার আর শোধ হবার নয় ইহকালে। তখন দেনদারদের ওপর পাওনাদারদের পীড়ন চলতে আরম্ভ করলো। তাতেও কিছু সুরাহা হলো না। এল ট্রেড্-ডিপ্রেশন। কিন্তু ততদিনে সমস্ত পৃথিবীটাই মহাজনদের কবলে চলে গেছে। একদলের আছে, আর একদলের নেই। সেই নেই আর আছের মধ্যে বিরোধ বাধলো। জার্মানী বললে—তোমার যখন আছে, আমারই বা থাকবে না কেন? আমারও চাই স্বাস্থ্য, আমারও চাই আলো, আমারও চাই বাতাস। তোমাদের মত আমারও আরাম করবার অধিকার আছে—। আর তারপরেই এল উনিশশো উনচল্লিশ সাল। আর তারপরেই এল ডিবচারি, ব্রাইব্ অ্যাডালট্রি। তারপরেই এল স্পেশাল পুলিস। আর তারপরেই অ্যারেস্ট হলো মিস্টার এন্-কে-ঘোষাল!

কিন্তু এর পরে এল আর এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। কিন্তু সে-কথা এখন থাক্।

প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের সমস্ত বাড়িটার ভেতরে তখন যেন তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। সনাতনবাবুর তখনও খাওয়া-দাওয়া হয়নি। সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল। ব্যাঙ্কে কয়েকবার ফোন্ করেছিলেন সনাতনবাবু। মা-মণি নিজেও আর স্থির থাকতে পারেন নি। আসলে কিন্তু তিনি স্থির থাকবারই লোক। সহজে বিচলিত হলে তাঁর চলে না। বিচলিত হলে এতদিন চালাতেও পারতেন না। শেষকালের দিকে যখন সনাতনবাবুর সঙ্গেও মিটমাট হয়নি, তখনই এসেছিল নির্মল পালিত! ক্যাথিড্রাল মিশনারি স্কুলের ফার্স্ট বয় নির্মল পালিত। ব্যারিস্টার পালিত ভবিষ্যতের দিকে চেয়েই তাকে কালীঘাট স্কুল থেকে ছাড়িয়ে ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন ছেলে মানুষ হবে। মানুষই হয়েছিল সে। কোনও রকম নেশা করেনি, কোনও রকম বদ্‌খেয়াল ছিল না তার। শুধু চিনেছিল টাকা। সযত্নে টাকা উপায় করতে শিখেছিল। কোর্টে টাকা উপায় করা শক্ত হলে কি হবে? ইচ্ছে থাকলে টাকা উপায় করার অনেক পথ আছে। কতরকম ভাবে টাকা উপায় করা যায়। টাকা উপায়ের ব্যাপারে সং-অসং ভাবতে নেই। টাকা হলো লক্ষ্মী। লক্ষ্মী রাস্তার নর্দমায় পড়ে থাকলেও অপবিত্র হয় না। সেখান থেকে লক্ষ্মীকে কুড়িয়ে এনে সিন্দুকে পুরতে হয়। ব্যারিস্টার পালিত সত্যি-সত্যিই ছেলেকে সং-স্কুলে পড়িয়ে প্রকৃত সং শিক্ষাই দিয়ে গিয়েছিলেন।

সকাল বেলাই ব্যাংক থেকে লোক এসে গিয়েছিল। থানার পুলিসও এসে গিয়েছিল।

সনাতনবাবু বললেন—দেখুন, টাকা-কড়ির ব্যাপার আমি তো কিছুই দেখতাম না—আমার মা-মণিই সব করতেন—

—কিন্তু চেক তো আপনিই কাটতেন?

সনাতনবাবু বললেন—আমি আগে কাটতাম পরে মা-মণি পাওয়ার-অব অ্যাটর্নি দিয়েছিলেন নির্মল পালিতবাবুকে—তিনিই আমাদের প্রপার্টির ব্যাপারটা দেখতেন—

—কিন্তু তিনি তো আউট-সাইডার, তাঁকে প্রপার্টির ব্যাপারে কেন এত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল?

এ-কথার উত্তর দিতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। অনেক অতীত ইতিহাস। বলতে হয় সনাতনবাবুর বিয়ের কাহিনী। বলতে হয় সতীর কাহিনী। বলতে হয় সতীর বোন লক্ষ্মীর কথা। আরো বলতে হয় ট্রেড-ডিপ্রেশনের কথা, মা-মণির বিধবা হওয়ার কথা। বলতে হয় টাকার বিচিত্র গতির কথা। বলতে হয় সমস্তই। এই শিবরীর ঘোষের হঠাৎ পাওয়া টাকার উৎপত্তির সেই বিচিত্র কাহিনীটাও বলতে হয়। সেই টাকার গন্ধে কেমন করে নির্মল পালিত আকৃষ্ট হলো, তাও বলতে হয়। সনাতনবাবুর সঙ্গে মা-মণির সঙ্গে সম্পর্কের বিচিত্র দিকটার কথাও বলতে হয়। অত বলতে পারবে কে? সনাতনবাবু ও-সব নিয়ে মাথাও ঘামাননি কখনও। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার নিজের কাজ-কর্ম সেরে এক সময়ে চলে গেলেন। তখন রইল পুলিসের ইন্সপেক্টর। ভবানীপুর থানার দারোগা।

ইন্সপেক্টর বললেন—নির্মল পালিত সম্বন্ধেও আমি ইনকোয়ারী করেছি কেউ জানে না তিনি কোথায় গেছেন—আমরা বম্বে ম্যাড্রাস, দিল্লি সব জায়গায় ওয়্যার করে দিয়েছি—

মা-মণি বললেন—পাঁচ লক্ষ টাকার আমি কোনও হদিস পাচ্ছি না, কলকাতার স্থাবর প্রপার্টির একটা-টাকাও আমার ব্যাঙ্কে জমা হয়নি দেখছি—

—কিন্তু আপনার ছেলে থাকতে,—আর এতবড় উপযুক্ত ছেলে থাকতে, তাকে পাওয়ার-অব অ্যাটর্নী দিলেন না কেন?

মা-মণি বললেন—সে অনেক দুঃখের কথা, আমার নিজের পেটের ছেলে হলে কী হবে—ছেলে যে আমার বাধ্য নয়—

—আপনি নিজের ছেলেকেও বিশ্বাস করেন না?

সনাতনবাবু পাশেই বসেছিলেন। বললেন—এ-সব জানলে কি আপনার এন্‌কোয়ারীতে সুবিধে হবে?

মা-মণি ধমকে দিলেন। বললেন—তুমি থামো খোকা, আমাকে বলতে দাও—

ইনস্‌পেক্টর বললেন—না না, আপনিই বলুন মিস্টার ঘোষ, আমি আপনার কাছেই শুনতে চাই—বড় অদ্ভুত তো আপনাদের রিলেশন্‌স্—এক বাড়িতে ছেলে-মা'র এ-রকম রিলেশন্ বড় কুইয়ার!

মা-মণি বললেন—আসলে, বাবা, আমার ছেলেও এর জন্যে দায়ী নয়, দায়ী আমার কপাল। এই ছেলেকে আমি কী করে যে মানুষ করেছি তা আমিই জানি। টাকা থাকলেও ছেলে মানুষ করা যায় না। আমি কারোর সঙ্গে ছেলেকে মিশতে দিইনি। ছোটবেলা থেকে কোনও বদ্-সঙ্গীদের ছোঁয়াচ লাগতে দিইনি ছেলের গায়ে, বাড়িতে এসে মাস্টার পড়িয়ে গেছে, ইস্কুলে পর্যন্ত পড়তে দিইনি, পাছে ছেলে খারাপ হয়ে যায়। বাড়িতেই সারাদিন কাটিয়েছে, দিনরাত আমার নিজের কাছেই রেখেছি ওকে। রাত্রে আমার পাশেই শুয়েছে। সেই ছেলেকে আজকে পর করে নিলে আমার বউ।

—কোথায়? আপনার পুত্রবধূ কোথায়?

সনাতনবাবু থামিয়ে দিলেন। বললেন—তুমি থামো না মা-মণি—ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা হচ্ছে, সেই কথাটাই বলো আগে—

মা-মণিও গলা বাড়িয়ে দিলেন। বললেন—কেন? কেন ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা হলো? কেন তুমি থাকতে আমার এমন সর্বনাশ হলো সেটাই আমাকে আগে বলতে দাও—! টাকা আমি কার জন্যে রেখে-ছিলুম? টাকা আমার সঙ্গে যাবে? টাকা নিয়ে আমি স্বর্গে যাবো? টাকা আমার পরকালে মুক্তি দেবে? টাকা লোকে কীসের জন্যে চায়? ছেলে-মেয়ে-বউ-জামাই, এদের জন্যেই তো টাকা! আর কীসের জন্যে? তুমি আমার পেটের ছেলে হয়ে সেই সুখ দিয়েছ? বুকে হাত দিয়ে বলো তো তুমি? দিয়েছ?

সনাতনবাবু কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। পুলিসের ইন্‌স্‌পেক্টরের সামনে

এ-সব কথা হওয়া পছন্দ হচ্ছিল না তাঁর।

মা-মণি কাঁদতে লাগলেন—যা আমি জীবনে কখনও কল্পনা করিনি, আমার কপালে শেষে তাই ঘটলো! আমার আর কী? আমি আর ক'দিন? আমি তো গঙ্গা-মুখো পা করেই আছি। আমার তো আজ-কালের ব্যাপার। কিন্তু তোমার জন্যেই তো টাকা রাখতে চেয়েছিলাম। তোমার যাতে কোনও কষ্ট না হয়, সেই জন্যেই তো এই বাড়ি, গাড়ি, সম্পত্তি সব করা। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে তিন কুলে?

সনাতনবাবুর আর বেশিক্ষণ সহ্য হলো না। তিনি ইনস্পেক্টরের দিকে ফিরে বললেন—ও-সব কথা থাক্, মিস্টার পালিতকে অ্যারেস্ট করার জন্যে আপনারা আর কী স্টেপ্ নিয়েছেন?

ইন্‌স্পেক্টর বললেন—এখন ইন্‌ভেস্টি-গেশন চলছে, আশা করছি বেশি দিন লাগবে না—তিনি মিসেস পালিতকে নিয়ে গেছেন—

—মিসেস পালিত?

—হ্যা মিসেস পালিতকে তিনি বিয়ে করেছিলেন প্রচুর টাকা নিয়ে। তাঁর শ্বশুর-বাড়িতে গিয়েও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। কেউ জানে না তাঁদের মুভমেণ্ট্।

—তাঁদের ছেলে-মেয়ে?

ইন্‌স্পেক্টর বললেন—ছেলে - মেয়ে কিছুই হয়নি তাঁদের এখনও—

—কিন্তু কোথায় যেতে পারেন তাঁরা? কোথায়ই বা যাওয়া সম্ভব?

সেটা জানলে কি আর নির্মল পালিতকে পুলিস ধরতে পারতো না এখনও? নির্মল পালিত ক্লেভার লোক। তার ওপর ক্লেভার ব্যারিস্টার। কোর্টে কিছু না-হলেও টাকার যুগের প্রতিভূ। টাকা উপায় করতেও জানে সে, টাকা সরাতেও জানে। সারা জীবনে সে যে-টাকা উপায় করতে পারতো, সেই সমস্ত টাকাটাই সে এই ঘোষ-বাড়ি থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। কত যে নিয়ে গেছে আর কত যে নেয়নি—তারও হিসেব নেই হয়ত নয়ন-রঞ্জিনী দাসীর। নয়ন-রঞ্জিনী দাসী নিজে তন্ন তন্ন করে ব্যাংকের কাগজপত্র, স্থাবর সম্পত্তির দলিল-দস্তাবেজ সব বার করে-ছেন। কিছুই তিনি বুঝতে পারেন নি। কোন্ দলিলটা কখন নির্মল পালিত চেয়েছিল, আবার কখন ফিরিয়ে দিয়েছিল, তারও তো তিনি হিসেব রাখতেন না। কখন কোনটাতে সই করতে বলেছিল, তারও খেয়াল নেই তাঁর।

—তা সবসুদ্ধ কত টাকার মত হবে মনে হচ্ছে আপনার?

মা-মণি বললেন—তা বিশ-তিরিশ লাখ টাকার মত হবে বলে মনে হচ্ছে, ক্যাস টাকা কিছুই তো আর নেই আমার—বাকি যা আছে তা জুয়েলারী আর এই বাড়ি, তা এই বাড়িটার দলিলও খুঁজে পাচ্ছি না—এ-বাড়িটার যে কী হয়েছে তাও জানি না।

—আর জমি-জমা?

—জমি-জমা সুন্দরবন অঞ্চলে যা ছিল, সব তো-আগেই বিক্রী করে ক্যাস করে নিয়েছিলাম। জমি-জমা তো আর কিছু ছিল না। আমার নিজের সিন্দুকে আমার কয়েকশো ভরি গয়না আর ছেলের-বউএর গয়নাই এখন আমার ভরসা—

সনাতনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ইনভেস্টি-গেশন শেষ হতে কত দিন লাগবে আন্দাজ?

ইন্‌স্পেক্টর বললেন—তা কি বলা যায়! মিস্টার পালিত তো বোকা লোক নন, চারদিক আট-ঘাট বেঁধেই কাজ করেছেন তিনি—আমরা তাঁর হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ির সামনেও ওয়াচ্ রেখেছি—

—বাড়িতে তাঁর কে আছে আর?

ইন্‌স্পেক্টর বললেন—বাড়িতে কেউ-ই নেই, এক বোন ছিল, ব্যারিস্টার পালিত তার বিয়ে আগেই দিয়ে গিয়েছিল, এখন বাড়িতে থাকবার মধ্যে কেবল হাজব্যান্ড আর ওয়াইফ—তা তারা দুজনেই মিসিং—। এখানে যে ব্যাংকে তাঁর একাউণ্ট্ ছিল, তাও ক্লোজ করে দিয়ে গেছেন—

সমস্ত লেখা-পড়া শেষ করে ইনস্পেক্টর উঠলেন। মা-মণি বললেন—তা আমার টাকা আমি ফেরত পাবো তো?

—নিশ্চয় পাবেন! এত টাকা তো এত তাড়াতাড়ি আর তছ্-নছ্ করে ফেলতে পারবে না। কালপ্রিট্ ধরা পড়লে কন্-ভিকশন হলেই সব উসুল করা হবে। আর টাকা যদি নষ্টও করে ফেলে তো পালিতের বাড়ি তো রয়েছে। বাড়ির প্রপার্টিও তো বিক্রী করে টাকা উসুল করা যেতে পারে। আপনি কিছু ভাববেন না। এখনও তো ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের রাজত্ব—

মা-মণি বললেন—তা ব্রিটিশ গভর্ন-মেণ্টই কি আর বেশি দিন থাকবে বাবা? আমার তো বড় ভয় করে!

—থাকবে না মানে! আপনি বলছেন কী? ওই গান্ধী আর নেহরুর কথা ছেড়ে দিন, জাপান জার্মানীর বড় বড় মহারথীরাই কাবু করতে পারছে না। পেছনে আমে-রিকার প্রেজেডেন্ট রয়েছে কী করতে?

হঠাৎ সরকারবাবু দৌড়তে দৌড়তে এল। বললে—টেলিফোন এসেছে মা-মণি!

মা-মণি বললেন—টেলিফোন? কার টেলিফোন? ব্যাংক থেকে?

ইন্‌স্পেক্টর বললেন—ও আমার টেলি-ফোন, থানা থেকে আসছে হয়ত—

নিজে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন ইন্‌স্-পেক্টর। তারপর ফিরে বললেন—না, আমার নয়, সনাতনবাবুর—

মা-মণি একটু আশ্চর্য হলেন। বললেন —খোকাকে আবার কে টেলিফোন করছে—?

সনাতনবাবু নিজেও বুঝতে পারলেন না।

তাঁকে আবার কে টেলিফোন করবে। তাঁর তো পৃথিবীর কারো সাথেই কোনও সম্পর্ক নেই। তাড়াতাড়ি রিসিভারটা ধরলেন। বললেন—কে?

ওধার থেকে উত্তর এল—আমি দীপংকর, আপনাকে বিপদে পড়েই টেলিফোন করছি, আপনি একবার শিগ্গি এখানে চলে আসতে পারেন? সতী হঠাৎ পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে—এখন হস্‌পিটালে রয়েছে, আপনি এলে একবার ভাল হয়—

মা-মণি বাধা দিয়ে বললেন—কার সঙ্গে কথা বলছো খোকা! কে টেলিফোন করছে?

সনাতনবাবু সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললেন—কেন? হঠাৎ পড়ে গেল কেন? কোনও সিরীয়াস অসুখ হলো নাকি? ব্লাড-প্রেশার? এখন কেমন আছে? আপনি বলুন আমি এখখুনি যাচ্ছি—কোথায় আপনার অফিসটা?

অনেক কথাই বলে যাচ্ছিলেন সনাতনবাবু। মা-মণি আবার বাধা দিয়ে বললেন—

কে? কার সঙ্গে কথা বলছো? কে অজ্ঞান হয়ে গেছে শুনি? কার আপিস!

সনাতনবাবু টেলিফোনটা ছেড়ে দিয়ে বললেন—আমি এখুনি যাচ্ছি, ওদিকে সর্বনাশ হয়ে গেছে—

—কী হয়েছে আগে তাই বলো না? অজ্ঞান হয়েছে? বৌমা? বৌমাকে আনতে যাচ্ছো তুমি?

সনাতনবাবু বললেন—হ্যাঁ—

—কেন আনছো তাকে? পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে বলে তাকে বাড়িতে আনতে হবে? আবদার তো মন্দ নয়! কীসের দায় আমাদের তাকে আনবার জন্যে? কে টেলিফোন করছিল এখন?

সনাতনাবু বললেন— দীপঙ্করবাবু, তিনি বড় ভয় পেয়ে গেছেন কি না—

—তা দীপঙ্করবাবুর যদি অত জ্বালা তো তিনি নিজেই তো সামলাতে পারতেন। তোমাকে আবার সোহাগ করে টেলিফোন করা কেন? অমরা কি ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাইয়ে ভালো করে তুলবো ভেবেছে? এত কানে-কানে ফুস-মন্তর দিয়েও আশা মিটলো না, এখন টেলিফোনে ফুস-মন্তর দেওয়া হচ্ছে আবার! না আনতে হবে না—

সনাতনবাবু বললেন—মা, তার যে শরীর খারাপ, অজ্ঞান হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে, দেখবার কেউ নেই।

—আছে আছে দেখবার লোক যথেষ্ট আছে। ও-সব মেয়েদের সেবা করবার লোকের অভাব হয় না। খবরদার বলছি এখানে ও-মেয়েকে আনতে পারবে না।

সনাতনবাবু কিছুক্ষণ কী ভাবলেন। বললেন—কিন্তু মা, আমি আনতে যাবোই।

—এনে কোথায় তুলবে?

—আমাদের এই বাড়িতে!

মা-মণি বললেন—তবে যাও, কিন্তু আমিও বলে রাখছি তাহলে আমার এ-মুখ আর দেখতে পাবে না—

সনাতনবাবু বললেন—তবু আমি আনবো—

বলে সনাতনবাবু আর দাঁড়ালেন না। শম্ভু তাড়াতাড়ি পেছন নিলে। কোথায় রাস্তা, কোথায় ট্যাক্সি পাওয়া যায়, কোন্‌দিকে হাসপাতাল, কোন্‌দিকে দীপঙ্করবাবুর অফিস, কিছুই তার জানা নেই। দীপঙ্কর সব বলে দিয়েছিল টেলিফোনে। তবু মানুষটাকে একা ছাড়া উচিত নয়।

তখন সমস্ত অফিসের মধ্যে সকালবেলার জের চলছে। কোথাও কারো কাজ করার নাম নেই। সেই মিস্টার এন কে ঘোষাল। বহু লোকের অপমান আর অত্যাচার জমে পাহাড় হয়ে উঠেছিল ঘোষাল সাহেবের জন্যে। সেই ঘোষাল সাহেবের চূড়ান্ত শাস্তিতে উল্লাস হবে বৈ কি! উল্লাসের চোটে টিফিন রুমেই ডজন-ডজন সিঙাড়া-চপ্-কাটলেট উড়তে লাগলো। কেউ আর কারো সীটে-এ বসে নাই। দু'জনে দেখা হলেই ওই এক কথা। শালা শুয়োরের বাচ্ছার ব্যাপার শুনেছো তো?

—আর সেই মেয়েটা কোথায়? তার কী হলো মশাই?

শুধু হেড-অফিসেই নয়। সর্বত্র। শেয়ালদ'র কণ্ট্রোল-রুমে, বালিগঞ্জ স্টেশন-মাস্টারের ঘরে। সাউথ-কেবিন, নর্থ-কেবিনে। এমন কি গড়িয়াহাটা লেভেল-ক্রসিংএর গেটম্যানরা পর্যন্ত। এতদিন পরে একটা মুখরোচক খবর পেয়ে সকলের জিভ্ দিয়ে টস্ টস্ করে লালা পড়ছে। এমন খবর শুনেও আনন্দ, শুনিয়েও আনন্দ। সমস্ত লাইনময় খবর চলাচল হতে লাগলো। শুয়োরের বাচ্ছা এখন কী করছে? বাবা মাথার উপর দর্পহারী মধুসূদন আছে একজন। তাঁর নজর এড়াতে পারবে না কেউ।

—মনে আছে তো কালীবাবু সেই অপমানের কথা? গেট-আউট্ বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল আমাদের?

—মনে নেই আবার। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে মশাই। বাতাসে নড়ে। হাত দিয়ে নাড়াতে হয় না।

ঘরের মধ্যে বসে দীপঙ্করের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হচ্ছিল। পৃথিবীর সমস্ত লজ্জা যেন গ্রাস করে ফেলছিল তাকে। সতীর লজ্জা যেন তরই লজ্জা। সতীর আঘাত যেন তারই আঘাত! বার বার অনেকবার তাকে টেলিফোন ধরতে হয়েছে আজ সকাল থেকে। কেউ কনগ্র্যাচুলেট করছে। কেউ আসল ঘটনাটা জানতে চাইছে। কে ট্রাফিকের অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার হবে, কে তার খালি চেয়ারটায় বসবে, এই নিয়ে উঁচু মহলে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। এর সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে মিস্টার ক্রফোর্ডের ওপর।

হঠাৎ হুড়্মুড়্ করে সনাতনবাবু ঘরে ঢুকলেন। মধ্যে বাধাও তিনি শোনেন নি।

—এসেছেন? চলুন।

সনাতনবাবু বললেন—এখন কেমন আছেন তিনি দীপঙ্করবাবু?

দীপঙ্কর সনাতনবাবুর চেহারার দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গেল। বললে—আপনি খাওয়া-দাওয়া করেন নি এখনও?

সনাতনবাবু বললেন—সে পরে বলছি, এখন কেমন আছেন তিনি, বলুন আগে!

দীপঙ্কর বললে—ঘণ্টা খানিক আগে আমি টেলিফান করেছিলাম আমাদের হস্পিট্যালে তখনও আনকন্‌শাস ছিল, এখন একটু আগে আবার করেছিলাম, শুনলাম জ্ঞান হয়েছে—কিন্তু খুব উইক্—

—আপনি নিজে একবার যাননি দেখতে?

দীপঙ্কর বললে—আমি দেখা করতে চাই না সনাতনবাবু, আমাকে দেখলে হয়ত অসুখ আরো বেড়ে যেতে পারে। তাই আপনাকে ডেকেছি। আপনাকে আমি হস্পিট্যালে নিয়ে যাচ্ছি, চলুন—

সনাতনবাবু বললেন—চলুন—

দীপঙ্কর কাগজ-পত্র গুছোতে গুছোতে বললে—দেখুন না, আমার কী ব্যাপার, আমি এদিকে ময়মনসিং-এ ট্র্যানস্‌ফার হবার জন্যে তৈরি হচ্ছি হঠাৎ আমাকে মিস্টার ঘোষালের কাছ থেকে চার্জ বুঝে নিতে হলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই এস্ট্যাব্‌লিশমেণ্ট সেক্‌শানের সুধীরবাবু হঠাৎ ঘরে ঢুকলো। কী সুধীরবাবু? কিছু চাই?

সুধীরবাবুর হাতে ফাইল ছিল একটা। বললে—সেই ভেকেন্সিটার কথাই বলতে এসেছিলাম — জার্নাল সেক্‌শ্যানের ভেকেন্সি—

—ভেকেন্সি? জার্নাল সেকশ্যানে আবার ভেকেন্সি কোত্থেকে হলো?

—আজ্ঞে, স্যার, বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র সরকার তো গাঙ্গুলীবাবুর লিভ্‌ ভেকেন্সিতে কাজ করছিল, সেই গাঙ্গুলীবাবু আর আসবেন না—

—আসবেন না মানে? এতদিন হলো কাশ্মীরে গেছেন, এখনও কোনও খবর দিচ্ছেন না, তাঁর পাশের অ্যাভলেবিলিটি পিরিয়ড্‌ও তো শেষ হয়ে গেছে। একটা চিঠি লিখুন আপনারা? এখনও কেন ডিউটি রিজিউম্‌ করছেন না—তার খবর নিন—

—খবর নিয়েছিলুম স্যার। তাঁর উইডো চিঠি লিখেছেন—

—উইডো? উইডো মানে?

—আজ্ঞে তিনি সুইসাইড্‌ করেছেন!

দীপঙ্কর আকাশ থেকে পড়লো। বললে—বলছেন কী আপনি? কবে সুইসাইড্‌ করেছেন? কোথায় সুইসাইড্‌ করেছেন?

সুধীরবাবু বললে — মোগল-সরাই স্টেশনে। মোগল-সরাই স্টেশনের ওয়েটিং রুমের পাশে—
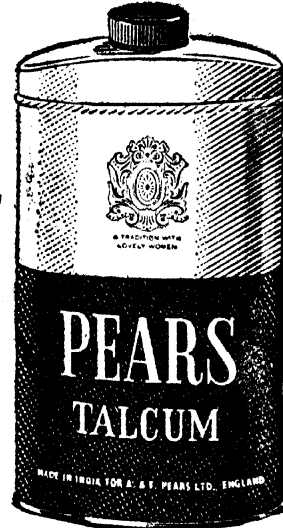
(ক্রমশ)

কবিতা

যৌবনবাউল—অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। সুরভি প্রকাশনী, ১, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। তিন টাকা।

এই শতাব্দীর পঞ্চম দশকে যে তরুণ কবিরা দেখা দিয়েছিলেন, তাঁদের কবিতায় এযুগের মানসিক যন্ত্রণা, হতাশা, বিতৃষ্ণা এবং উন্নাসিকতা বিকীর্ণ হতে দেখা গিয়েছে। যে রাজনৈতিক আতসবাজির খেলা বারুদের গন্ধ এবং ছাই একই সঙ্গে বাতাসকে ভারি করে রেখে গিয়েছে, তার বধির বিষণ্ণতা এযুগের নিয়তি। এই সময়ের পরিধির মধ্যে অলোকরঞ্জনের কবিতাবলীর জন্ম, একথা ভাবতে বিস্মিত হতে হয়।

কালের একটি নির্দিষ্ট ভূগোল ইতিহাসের মধ্যে বাস করেও তাঁর কবিতা এক দিক থেকে সমস্ত সাময়িকতাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর আত্মা যেন অন্য এক আকাশের নিচে, তাঁর চেতনা অন্য বাতাসে প্রবাহিত, এমন মনে হয়েছে। তাঁর প্রকৃতিস্থ প্রেম, নগর-জীবনের মধ্যে এক বিচিত্র স্বাদ এনে দিয়েছে। তাঁর ভালোবাসায় এখনও অবিশ্বাস আসেনি, তিনি এযুগের প্রায় শেষ রোমাণ্টিক কবি। তাঁর চেয়ে দেখার মধ্যে এখনও অন্তর্দ্বন্দ্ব-হীন রূপের আবিষ্কার আছে। অলোকরঞ্জন কেবল যে বিশুদ্ধ জীবনবোধে বিশ্বাসী তাই নয়, তাঁর আস্তিক চেতনায় মিস্টিক কবিসুলভ গভীর আত্মস্থতা আছে। 'যৌবনবাউল' কেবল তাঁর গ্রন্থের নাম নয়, তাঁর সমগ্র কবিসত্তার এবং কবিতার চরিত্রের নামকরণ।

'যৌবনবাউল' বর্তমান কবির প্রথম এবং প্রামাণ্য কাব্যগ্রন্থ। তাঁর দীর্ঘকালীন কাব্যচর্চার প্রায় আদ্যন্ত নিরীখ আছে এই একশ-আটটি হ্রস্ব-দীর্ঘ কবিতার সংগ্রহে। এতগুলি কবিতা একত্রে কোনো একজন তরুণ কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থে কখনো পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম কাব্যগ্রন্থে কবির চরিত্র উদ্ভাসিত হলেও পরিণাম অজ্ঞাত থেকে গেছে। কিন্তু যৌবনবাউল-এ দুটি জিনিসই চোখে পড়ে—প্রচ্ছদপট এবং পশ্চাদপট। তাঁর কাব্যচর্চার সম্পূর্ণ ক্রমপথ যেন বর্তমান গ্রন্থে নির্বাচিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর সূচনা এবং উপসংহার একত্রে।

এবং এই কারণেই এই একশ আটটি কবিতা একটিই মৌল সুরের বৃত্তে আবদ্ধ। ছন্দে এবং শব্দে কবির আশ্চর্য দখল সত্ত্বেও বিষয় এবং আঙ্গিক যেন অদ্বৈতবাদী হয়ে দেখা দিয়েছে। কবির যন্ত্রণা, উপলব্ধি এবং বিশ্বাস ঊর্ধ্বচেতন। এই নাগরিক যৌবন কেন তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করতে পারেনি, অন্য এক অপাপবিদ্ধ আধ্যাত্মিকতা তাঁর সমস্ত বেদনাকে বিস্ময়ে এবং অমৃতে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। সামান্য কয়েকটি কবিতা বাদ দিলে যৌবন বাউলের অধিকাংশ কবিতাই

নিখুঁত, সম্পূর্ণ এবং সুন্দর হয়েছে। গাঢ় গভীর এবং প্রবাহিত বক্তব্যমালা কখনই বক্তৃতামালা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তথাপি তাঁর প্রেম, তাঁর যৌবনের বেদনা যেন মসৃণ হয়ে এসেছে; আত্মঘাতী যন্ত্রণা, শিল্পের এবং যৌবনের যন্ত্রণা, তৃপ্তি দিলে তা অতৃপ্তিরই কারণ হয়।

আর এই শরীরের আলাদা গড়ন
যন্ত্রণা দেবে না, আমি বিচ্ছেদের
কোনো যন্ত্রণার
কণ্ঠ তো পাবো না, শুধু স্পর্ধাঋজু
ধূপের মতন
তর্জনী আঙুলটাকে সূর্যে রেখে
আনন্দে পোড়াবো॥

বর্তমান বাঙলা কবিতার ইতিহাসে যৌবনবাউলের নাম স্বাতন্ত্র্যগুণে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে বিশ্বাস করি।

২০১।৬০

উপন্যাস

বনে যদি ফুটলো কুসুম—প্রতিভা বসু। গ্রন্থম, ২১।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

প্রতিভা বসু আধুনিক কালের সাহিত্যিকাদের মধ্যে অন্যতমা—গল্পে একটি আশ্চর্য রোমান্টিক পরিবেশ রচনায় ও চরিত্র বিশ্লেষণেই তাঁর সমধিক কৃতিত্ব। কিন্তু প্রতিভা বসুর মনের ময়ূর, মধ্যরাতের তারা, সমুদ্রহৃদয় প্রভৃতি যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁদের কাছে লেখিকার এই নবতম উপন্যাসটি কতদূর উৎসাহ সঞ্চার করতে সক্ষম হবে জানি না। নেহাত একটা কিছু লিখতে হয় অতএব সেই চিরাচরিত একটি কৃপণ পরিবারের তিন পুরুষের উত্থান-পতনের কাহিনী লিখেছেন লেখিকা। কাহিনীর মধ্যে সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু অতি দ্রুততার সঙ্গে কাহিনী পল্লবিত হওয়াতে উপন্যাসটি বিশেষ দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। তবু বিগত দিনের দক্ষিণ কলিকাতার কিঞ্চিৎ বিবরণী পাঠককে আনন্দ দিতে পারবে। ছাপা, বাঁধাই সাধারণ স্তরের। ১৮৩।৬১.

মরু-মায়া—অমলা দেবী। কল্লোল প্রকাশনী, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২। তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

অমলা দেবী সাহিত্যপাঠক মহলে অপরিচিতা নন। বলিষ্ঠ লেখনীর সুষ্ঠু প্রকাশে লেখিকার সাম্প্রতিক উপন্যাস 'মরু-মায়া' পাঠককে নতুনভাবে আকর্ষণ করবে।

মেয়েটির নাম রাধা। সমস্ত পরিবেশ, দুনিয়া তার বিপক্ষে—যেখানেই সে যায়, আর যেখানেই তার আশ্রয় জোটে, আশ্চর্য, সেখানে শুধু তার নয়, আশ্রয়দাতারও জোটে এক অদ্ভুত দুর্ভাগ্য। সব কিছু যেন ভেঙে যেতে চায়। তবু রাধা জীবনের আস্বাদ নিতে চায়—রাধা বাঁচতে চায়। দরদী লেখনী রাধাকে টেনে তুলেছে অত্যন্ত নীচ অবস্থা থেকে—রাধা মাথা উঁচু করে বাঁচতে চেয়েছে—একাত্ম হতে চেয়েছে পাঠকের সঙ্গে; লেখিকা সহৃদয়তার সঙ্গে রাধাকে আঁকবার চেষ্টা করেছেন, কাহিনীর সম্ভাব্যতাও সেজন্য [illegible]

পাই, রাধার সঙ্গে পাঠকের দৃষ্টিও চলে যায় দূরে—মাঠের শেষে যদি গোরদাসকে দেখা যায়।

'মরু-মায়া'র গ্রন্থসজ্জা মনোরম।

১৪৯।৬১

আকর্ষণ—শচী মুখোপাধ্যায়। দি বুক সাপ্লাই এজেন্সী, ১২।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—দু' টাকা।

বন্যার পটভূমিকায় আকর্ষণ উপন্যাসটি লিখিত। এই উপন্যাসের জীবন-সংগ্রামের কাহিনীর সঙ্গে জীবনের নানা দ্বিধা-সংশয়, উদ্বেগ-আকুলতার কথা বলা হয়েছে। একমাত্র সর্বাণীর চরিত্রে স্বচ্ছ রয়েছে। অনুশীলা, কল্যাণী, প্রিয়ব্রত চরিত্র মামুলি ধরনের। বর্ণাশুদ্ধিও পাঠ-ভ্রান্তি ঘটায়। ৩৯৩।৬০

রবীন্দ্র শতবর্ষ সংখ্যা

ঘরে-বাইরে। সম্পাদিকাঃ কনক মুখোপাধ্যায়। ১৮৮।২, বহুবাজার স্ট্রীট; কলকাতা—১২। দাম—এক টাকা।

এই মাসিক পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য, এটি মেয়েদের পত্রিকা। অর্থাৎ, এতে সাধারণত মেয়েদের লেখাই প্রকাশিত হয়। আলোচ্য সংখ্যাটিতেও এ'দের সেই বৈশিষ্ট্য বর্তমান (যদিও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি রচনার পুনর্মুদ্রণ এই সংখ্যাটিতে স্থান পেয়েছে)। আমাদের সকল-মহিলা-সাহিত্যিক-দুর্লভ দেশে এ ধরনের পত্রিকার মান কত উঁচু স্তরে উঠতে পারে, স্বভাবতই তা বলা বাহুল্য মাত্র।

ফসল। সম্পাদকঃ যামিনীকান্ত মাইতি। ২২, রামচরণ নস্কর লেন; হাওড়া। দাম—৩১ নঃ পয়সা।

অসংখ্য সাময়িক পত্র-পত্রিকাকীর্ণ বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্যহীন একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার এই সংখ্যাটিতে আছে কতিপয় সাহিত্য-যশঃপ্রার্থীর অক্ষম কয়েকটি রচনা।

রবি-তর্পণ। সম্পাদকঃ শৈবালকান্তি সেনগুপ্ত। রাণাঘাট রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটি, রাণাঘাট। দাম—এক টাকা।

রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে রাণাঘাট রবীন্দ্র শতবার্ষিকী কমিটি প্রকাশিত এটি একটি চমৎকার সংকলন। সুন্দর প্রচ্ছদ, কয়েকটি আর্ট প্লেট, এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের লেখা দুটি চিঠির প্রতিলিপি এই সংকলনটিকে একটি বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে।

প্রান্তিক। সম্পাদকঃ রামপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অনিল রায়, ব্রতীশ ঘোষ ও অশোক রায়। টাকী রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, টাকী।

টাকী রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় পত্রিকার এই রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যাটি সুসম্পাদিত। এই সংখ্যাটির শেষাংশে "পুষ্পপাত্র" নামক অংশটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অংশে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরযুক্ত প্রথম রচনা, রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা, কবিগুরুর শেষ কবিতা, বংশ-পরিচয়, রবীন্দ্র সমকালীন কবি ও সাহিত্যিক এবং রবীন্দ্রনাথের বাংলা গ্রন্থপঞ্জী মুদ্রিত হয়েছে।

প্রাপ্তি-স্বীকার

কোষ্ঠী দেখা—জ্যোতি বাচস্পতি।
কবিগুরু স্মরণে—শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার ঘোষ।
বহ্নিনায়ক—পুষ্পিতনাথ চট্টোপাধ্যায়।
রবীন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী প্রবন্ধ সংকলন—গোপাল হালদার।
রবি-কাহিনী—শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত।
রূপস্নান—রাজসিংহ।
স্বদেশী আন্দোলন ও নবযুগ—হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়।
যৌবনের জানালায়—প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।
সোনাবিবি—দীনেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
অহিংস সমাজের পথে—মোঃ কঃ গান্ধী। অনুবাদক—ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
জলবিম্ব—চিত্ত সিংহ।

ট্রামেবাসে

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উদ্ভট খেয়াল প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—উত্তরপত্র দেখার ব্যাপারে এমন সব অদ্ভুত নির্দেশ নাকি দেওয়া হইয়াছে যে, পরীক্ষক মহলের মতে উহা "শিক্ষা-নায়কদের মতিভ্রম"

ছাড়া অন্য কিছু নহে। খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু এটা যে মতিভ্রম তা-ই বা তাঁরা কী করে জানলেন; স্বপ্ন হতে পারে, মায়া হতেও তো আপত্তি নেই।"

সংবাদে জানিলাম বাংলার গজদন্ত শিল্প নাকি চরম অন্তর্ধানের সম্মুখীন হইয়াছে। —"শুধু হাতী কা দাঁত নয়, মরদ কা বাৎ-ও বহু আগেই বাংলা থেকে পাততাড়ি গুটিয়েছে।"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

কলিকাতা চিড়িয়াখানায় সম্প্রতি একটি গণ্ডার জননী একটি বাচ্চা প্রসব করিয়াছেন। সংবাদে বলা হইয়াছে যে ১৯২৫ সালের পর এই প্রথম চিড়িয়াখানায় গণ্ডারের বাচ্চা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। —"কর্তৃপক্ষ টেনে মা ষষ্ঠীর ষোড়শোপচার পুজোর ব্যবস্থা করুন। গণ্ডারের চামড়ার অভাব হলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

গত অক্টোবর মাসের বন্যার সময় লক্ষ্ণৌ চিড়িয়াখানা হইতে একটি হরিণ পলাইয়া গিয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাকে ধরা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, হরিণটি নাকি নিজে নিজেই আবার ফিরিয়া আসিয়া ধরা দিয়াছে। চিড়িয়াখানার অধ্যক্ষ বলেন, হরিণটির প্রেমিকা চিড়িয়াখানাতেই ছিল। সে হয়ত স্বাধীনতার বিনিময়ে প্রেমকেই অধিক মূল্য দিয়াছে। আমাদের অন্য সহযাত্রী বলিলেন—"অবিকল মানুষের মতোই কাজ করেছে এই হরিণটি। এমনি করে মানুষ খাঁচায় ধরা দেয় বলেই তো এই সংসারের অন্য নাম আজব চিড়িয়াখানা!!"

উড়িষ্যার নির্বাচন প্রসঙ্গে এক সংবাদে শুনিলাম, কাশীপুরের জমিদারের বড় বউ শ্রীমতী নবকুমারী গণতন্ত্রের পক্ষ হইতে জমিদার মহাশয়ের কংগ্রেসী ছোট বউ শ্রীমতী বীণাপাণি দেবীকে ভোট যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন। —"ভোট রণাঙ্গনে দুই সতীনের লড়াই হয়ত এই প্রথম। তা ছাড়া আগে যে লড়াইটা হতো সেটা গণতন্ত্রেরও নয়, কংগ্রেসেরও নয়।—সেটা ছিল স্বামিতন্ত্রের। অবশ্য মারাত্মকতায় তা আণবিক যুদ্ধেরই সমান ছিল।—বলে আমাদের শ্যামলাল।

পরিকল্পনা কমিশনের উপদেষ্টা ডঃ বালসারা বলিয়াছেন যে কলিকাতা হইল পুরুষপ্রধান নগরী। এখানে প্রতি এক হাজার যেখানে মেয়ে, সেখানে পুরুষের সংখ্যা এক হাজার সাত শত চুয়ান্ন। —"মৃত নগরী এবং মিছিল নগরীর পক্ষে এটা কনসোলেশন প্রাইজ হতে পারত। কিন্তু সংখ্যায় বড় হয়েও আঁশফল চিরকালই আমের নীচে। এখানে প্রতি একটি মেয়ে ক'জন পুরুষের সমান তার হিসেব করা হয়নি, মেট্রিক পদ্ধতিতেও নয়।" —মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

বিলাতে সম্প্রতি বানান পরীক্ষা হইয়াছে। চারি হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র চারিজন সব শুদ্ধ উত্তর দিয়েছেন। ভুলের নমুনায় বলা হইয়াছে—কেহ কেহ Psychic লিখিতে লিখিয়াছেন Sidekick; efficiency লিখিতে effershunsee, Courteous হইয়াছে Courteyus. আমাদের জনৈক সহযাত্রী পূর্ববঙ্গের জনৈক মৌলভি সাহেবের বানানের কথায় বলিলেন—"তিনি "কিন্তু" অর্থে But লিখলেন ডবল টি দিয়ে (Butt)। জিজ্ঞেস করায় বললেন—'একটা টি-তেও হয়, দুইটায়ও হয়। দুইটায় একটু পোক্ত হয়'!!"

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের কথা লিখিতে গিয়া সংবাদদাতা বলিতেছেন—নানা নামে, নানা আভরণে 'নিপুণিকা' 'চতুরিকা'ও আছে—'আছে। নেই শুধু নানা নামের সেরা নাম গাঙ্গেয় ইলিশ, সোনা

মুগের ডাল, গোলাপ সরু আতপ। মেঘদূত ছেড়ে এই তিনটি নিয়েই আমাদের কাব্য জগত। 'এখন সব গেছে। আছে শুধু ঠেলার খেলা—তার পারানী কণ্ঠের গান নয়, পকেটের চারটে পয়সা'—বলেন অন্য সহযাত্রী।

বিশুখুড়ো বলিলেন—"হালে আর এক সমস্যা নিয়ে ট্রামে-বাসে হট্টগোলের অন্ত নেই:—প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করে

পাঁচ গোলে জেতা বাহাদুরী, না আগাগোড়া খেলিয়ে খেলিয়ে শেষ রাতে ওস্তাদের মারে এক গোলে জেতার কেরামতি বেশী। এ সমস্যার শেষ নেই। গোল যতটাই হোক আর যেমনই হোক কেরামতির গোলমাল থাকলেই, উই গো অন্ ফর্ এভার।"

চন্দ্রশেখর

শিশু চলচ্চিত্র সমিতির প্রচেষ্টা

কেবলমাত্র ছোটদের জন্যে ছবি তোলবার প্রচেষ্টা এ দেশে অভূতপূর্ব না হলেও নিশ্চয়ই দুর্লভ ঘটনা। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য-পুষ্ট দিল্লির চিলড্রেন্‌স্ ফিল্ম সোসাইটি হিন্দীতে কয়েকটি শিশুচিত্র নির্মাণ করে এ বিষয়ে প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পাঞ্জাব, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে অনুরূপ প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে ঐ সব জায়গায় আঞ্চলিক ভাষায়। বেসরকারী উদ্যোগে বাংলায় কয়েকখানি ছোটদের ছবি তোলা হলেও সাধারণের সহানুভূতির অভাবে এই প্রচেষ্টা স্থায়িত্বলাভ করে নি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে এই ব্যাপারে এইবার খানিকটা সুরাহা হবার সম্ভাবনা ঘটেছে। বিশেষভাবে ছোটদের উপযোগী চলচ্চিত্র তোলবার উদ্দেশ্য নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ শিশু চলচ্চিত্র সমিতির নামে একটি সংস্থা এখানে গঠিত হয়েছে সরকারী উদ্যোগে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও মুখ্য-মন্ত্রী পদাধিকারবলে এই সংস্থার পৃষ্ঠ-পোষক। লীলা মজুমদার ও চিদানন্দ দাশগুপ্ত যথাক্রমে এর কার্যকরী সমিতির সভানেত্রী ও সাধারণ সম্পাদক। যুগ্ম-সম্পাদক দুজন—মেরি সুর ও চিত্রনির্মাণের ব্যাপারে মজুমদে।

পশ্চিমবঙ্গ শিশু চলচ্চিত্র সমিতির পক্ষে লিটল সিনেমা সংস্থা প্রথম চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছেন। ছবিটি তোলা হচ্ছে অচিন্ত্য-কুমার সেনগুপ্তের অ্যাডভেঞ্চারধর্মী কাহিনী "ডাকাতের হাতে" অবলম্বনে। শান্তি-প্রসাদ চৌধুরী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন। ছবির অধিকাংশ শিল্পীই নতুন —অবশ্য দু একজন বাদে। বিখ্যাত পল্লী-গীতি-গায়ক নির্মলেন্দু চৌধুরী এর সুরকার।

লিট্‌ল্ সিনেমার তোলা শিশু-চলচ্চিত্র "ডাকাতের হাতে"-র ছোট্ট নায়িকা রীতা সেনগুপ্ত।

ছবির কাজ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। ছবিটি যদিও ছোটদের জন্যে তোলা হচ্ছে, তবুও যাতে এ সকল বয়সের ও সকল শ্রেণীর দর্শকদের আনন্দ দিতে পারে সে বিষয়ে এর নির্মাতারা যথেষ্ট যত্ন নিচ্ছেন। যদিও সরকারী আর্থিক সাহায্যে ছবিটি নির্মিত হচ্ছে, প্রযোজকরা আশা করেন যে সরকারী ঋণ শোধ করেও লাভের উদ্বৃত্ত অংশ থেকে পশ্চিমবঙ্গ শিশু চলচ্চিত্র সমিতির নিজস্ব একটি অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী ইতিপূর্বে "বিসা অ্যান্ড দি ম্যাজিক ডল" এবং "রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতন" ছবি দুটি তুলে দর্শক-সমাজের সমাদর লাভ করেছেন। প্রথমোক্ত ছবিটির মত "ডাকাতের হাতে"-ও পুরোপুরি তোলা হচ্ছে প্রকৃতির কোলে—স্টুডিও পরি-বেশের বাইরে।

পাঁচমিশেলী মেলোড্রামা

মামুলী "মেলোড্রামা"র বহুব্যবহৃত নাট্যোপকরণ এবং জনপ্রিয় বিদেশী কাহিনীর অনুল্লেখিত অক্ষম অনুকরণের যোগবিভ্রাটে তৈরী বিশ্বভারতী চিত্রমন্দিরের "পঙ্কতিলক" ছবিটি।

রাসবিহারী লাল রচিত এ-ছবির বহুশাখা সংবলিত আখ্যানভাগে কিছুকাল আগে মুক্তিপ্রাপ্ত "মানিক" তথা "অলিভার টুইস্ট"-এর পাপ-চক্র এবং সেখানে এক অপহৃত বালকের প্রাণান্তকর বন্দীদশা ও চক্রের নৃত্যগীতচঞ্চলা মক্ষিরানী কর্তৃক তার উদ্ধারের উপাখ্যান সংযোজিত। এই আখ্যান-অধ্যায়ে দয়াহীন পৃথিবীর নির্মমতার বিরুদ্ধে এক শিশু-প্রাণের দুশ্চর সংগ্রাম এবং মানবতায় পুণ্যধারায় এক প্রাণীরী

বহুরূপী

• সম্পাদক ॥ গঙ্গাপদ বসু •

॥ লেখকসূচী ॥

দাম—এক টাকা

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে

রমণীর মুক্তিস্নানকে কেন্দ্র করে যে সুন্দর বলিষ্ঠ নাট্যরস দানা বাঁধতে পারত ছবিতে তার একটি অস্পষ্ট আভাস মাত্র পাওয়া যায় —তার বেশী কিছু নয়। তার পরিবর্তে যেটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হল হিন্দী "ক্রাইম" ছবি-সুলভ হাল্কা প্রমোদ-সম্ভার।

জাল ঔষধ তৈরির কাজে ব্যাপৃত এক অর্থলোভী "কেমিস্ট"-এর পাপাচার ও খলতাকে কেন্দ্র করে ছবিতে আরও একটি উপকাহিনী রয়েছে। যথাসময়ে চিরাচরিত উপায়েই এই খলনায়কের বিনাশ ঘটে।

যে ব্যবসায়ীর সঙ্গে যুক্ত থেকে কেমিস্ট তার পাপকার্য চালায় তার শিক্ষিত বোন ও এক আদর্শবাদী শিক্ষকের মধ্যে অনুরাগ ছবির অন্যতম রসকেন্দ্র। আদর্শবাদী শিক্ষক পরার্থে দুর্নাম ও কারাবরণ করে কি ভাবে তার প্রণয়িনী ও অন্যান্য সকলের কাছে মহৎ হয়ে ওঠে তা নিয়ে ছবির চিত্রনাট্যে মানবিক ভাবাবেগ সঞ্চারের চেষ্টা ক[রা] হয়েছে। কাহিনীর ওই অংশে এক দম্প[তি] শিক্ষক-দম্পতির জীবনের "ট্র্যাজেডি" নি[য়ে] ছবিতে একটি স্থূলে আবেগের "মেলোড্রামা" গড়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত শিক্ষক তা[র] প্রণয়িনীর হাত ধরে জনহিতকর কাজে বি[শেষ] ভাবে আত্মনিয়োগ করে এবং পূর্বোল্লিখিত পাপ-চক্র থেকে উদ্ধার-পাওয়া তার হারানো ছেলের সঙ্গে কেমনভাবে মিলিত হয় তা নিয়েই চিত্রনাট্যের যবনিকা।

তিনটি অকালমৃত্যু ও একটি কষ্টকল্পিত আত্মহত্যার ঘটনাকে উপলক্ষ করে করুণ রস বিস্তারের আয়োজনও ছবিতে উপেক্ষিত নয়।

এই বিরস কক্ষচ্যুত কাহিনীর বিন্যাসে পরিচালক-চিত্রনাট্যের একটি বহু উপাদান-বিশিষ্ট চিত্রনাট্যের ভগ্নাংশগুলিকেই বিচ্ছিন্ন ভাবে ছবিতে সাজিয়ে তুলেছেন। রসের আবেদনের দিক থেকে সামগ্রিকভাবে ছবিটি তাই দর্শকের মনকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করে না। তবে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন নাট্যমুহূর্ত রচনায় ও কয়েকটি দৃশ্য উপস্থাপনে পরিচালক প্রশংসনীয় প্রয়োগ-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। এই সব মুহূর্ত ও দৃশ্য ছবির কোন অন্তর্লীন অবিচ্ছিন্ন নাট্যরসধারার অঙ্গীভূত হয়ে উঠতে পারেনি বলে এ-গুলির আবেদন ক্ষণিকের জন্য দর্শকমনকে নাড়া দিয়েই আবার মিলিয়ে যায়।

তবে দেহের পঙ্গুতা, মৃত্যু ও আত্মহত্যা জনিত করুণ রস, মমতা, বন্ধুত্ব ও আত্মত্যাগের আবেগ, পাপ-উপাদানের রোমাঞ্চ এবং ঘাগরা-পরা মেয়ের নাচ-গানের আবেদন যাদের কাছে এখনও অক্ষয় হয়ে আছে তারা ছবিটিতে আমাদের খোরাক খুঁজে পাবেন। ছবিতে পাপ-চক্রের বিনাশ ও পাপিষ্ঠদের শাস্তিবিধানের কোন অবশ্যম্ভাবী ঘটনা নেই। শুধু খলচরিত্র কেমিস্টকেই পুলিসের হাতে ধরা পড়তে দেখা গেল। ছায়াছবির নীতির সদাসতর্ক বিচার থেকে পাপ ও পাপী কী করে রেহাই পেল সেটা ভাবতে অবাক লাগে।

ছবিতে শ্রেষ্ঠ অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন এক ব্যবসায়ীর চরিত্রে বিকাশ রায়, চরিত্রটিতে তিনি সুন্দর ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন, এবং পুত্রশোকের মুহূর্তে অত্যাশ্চর্য অভিনয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন।

কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছায়া দেবী এক শিক্ষক-দম্পতির ভূমিকায় আবেগ সঞ্চারের বিরল অভিনয়-কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আদর্শবাদী শিক্ষকের চরিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় মনোগ্রাহী। তার প্রণয়িনীর চরিত্রে সবিতা বসুর অভিনয় স্বচ্ছন্দ ও সংবেদনশীল।

খলতা ও দূরভিসন্ধি নৈপুণ্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

পাপ-চক্রের এক দুর্বৃত্তের রূপসজ্জায় তরুণকুমার চরিত্রটির কড়ি-কোমল রূপ তাঁর সাবলীল অভিনয়ে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। পাপ-চক্রের মক্ষিরানীর সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় সন্ধ্যা রায় চরিত্রটির চাপল্য ও চটুলতা যথাযথভাবে ফুটিয়েছেন। কিন্তু চরিত্রটির নাট্য-দাবি পালন করতে তিনি অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নৃত্যাংশও হাস্যকর।

ছবির বিভিন্ন পার্শ্বচরিত্রে যাঁরা প্রশংসনীয় অভিনয়-দক্ষতা দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তরুণ মিত্র, উৎপল দত্ত ও জহর রায়। অন্যান্য চরিত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করেছেন নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, বুবু গঙ্গোপাধ্যায়, কামু, পার্থপ্রতিম ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়। দুটি শিশুচরিত্রে দীপক ও পল্লবের অভিনয় স্মরণীয়।

ছবির কয়েকটি সুখশ্রাব্য সুরারোপ করেছেন সংগীত পরিচালক সুধীন দাসগুপ্ত। তাঁর রচিত আবহ-সংগীত পরিবেশানুগ। ছবির বিশেষ নাট্যমুহূর্তের ভাবোদ্দীপক গানগুলির কথা আরও স্পষ্ট ও অর্থপূর্ণ হলে দর্শকের মন আবেগের স্পর্শ পেতে পারত।

অজয় মিত্রর আলোকচিত্রগ্রহণ ছবির বহিরংগ রূপসম্পদ বাড়িয়েছে। সুনীল

লণ্ডনের ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে "ভগিনী নিবেদিতা"-র বহির্দৃশ্য গ্রহণের পূর্বে পরিচালক বিজয় বসু লাইট মিটারের সাহায্যে আলোকের উপযোগিতা পরীক্ষা করছেন। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যামেরাম্যান টেলর।

সরকারের শিল্পনির্দেশ প্রশংসার দাবি রাখে। কলাকৌশল ও আংগিকগঠনের বিভিন্ন দিক অভিনন্দনীয়।

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে বাংলা ছবির ক্ষেত্রে অজন্মা। তবে মুক্তি-তালিকায় দুটি হিন্দী ছবির নাম আছে—"ছোটে নবাব" ও "ডার্ক স্ট্রীট"।

মমতাজ ফিল্মসের "ছোটে নবাব" বোম্বাই চিত্রজগতের তরুণ-গোষ্ঠীর ছবি। এর প্রযোজক ও প্রধান তারকা মেহমুদ। পরিচালকের নাম আকবর, এবং এইটিই তাঁর প্রথম ছবি। সুরকারও নবাগত—রাহুল বর্মণ। শচীন দেব বর্মণের পুত্র)। নায়িকার ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করেছেন অমিতা। নাজির হোসেন ও জনি ওয়াকারকে দুটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে।

"ডার্ক স্ট্রীট" শংকর মুভিজের ছবি। শ্রেষ্ঠাংশে আছেন অশোককুমার। তাঁর বিপরীতে যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে নিশি, কে এন সিং ও অনুপকুমারের নাম উল্লেখযোগ্য। পরিচালনা ও সুরসৃষ্টির দায়িত্ব যথাক্রমে বহন করেছেন নরেশ সায়গল ও দত্তারাম।

* * *

কথাচিত্রমের "দিল্লি থেকে কোলকাতা" অচিরেই মুক্তিলাভ করবে। অতি-আধুনিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে একটি রসালো অথচ বাস্তবধর্মী কাহিনী এর মধ্যে রূপায়িত

হয়েছে। গল্প লিখেছেন বীরেশ মুখোপাধ্যায় এবং ছবির পর্দায় তার রূপ দিয়েছেন "প্রবেশ নিষেধ"-খ্যাত পরিচালক সুশীল ঘোষ। জহর রায়, তরুণকুমার, অনুভা গুপ্তা, তপতী ঘোষ, উৎপল দত্ত, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, মিতা চট্টোপাধ্যায় ও আরো অনেককে এই ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে। প্রথম মহিলা সংগীত-পরিচালিকা হিসাবে বাঁশরী লাহিড়ী এই ছবিতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করবেন। এ ব্যাপারে ছবিটি নিশ্চয়ই বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে।

আরো একটি বাংলা কৌতুক-চিত্র দ্রুত সমাপ্তির পথে। ছবিটির নাম "ভিজে বেড়াল", তুলছেন "তাসের ঘর" ও "শিকার"-খ্যাত প্রযোজক গোবিন্দ বর্মণ। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি ব্যঙ্গরসাত্মক কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে তোলা হচ্ছে। পরিচালনা করছেন রতন চট্টোপাধ্যায়। ভূমিকালিপির পুরোভাগে আছেন তন্দ্রা বর্মণ, অনুপকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, শ্যাম লাহা, মণি শ্রীমানী, পদ্মা দেবী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি। কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় এতে সুর-সংযোজনা করছেন।

* * *

তারাশঙ্করের সুবিখ্যাত উপন্যাস "কান্না"-র চিত্ররূপ দিচ্ছেন অগ্রগামী পরিচালক-গোষ্ঠী। "ডাক হরকরা" ও "হেড মাস্টার" চিত্রে এই তরুণ দলটি যে বিরল খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন, "কান্না" সেই খ্যাতিকেই বিস্তৃততর করে তুলবে বলে প্রকাশ। "কান্না" জীবনের ট্র্যাজেডির বহিঃপ্রকাশ। সে ট্র্যাজেডি শূন্যগর্ভ নয়, সংগীতের মূর্ছনায় হৃদয়ের কানায় কানায় তার অনুরণন শোনা যাবে। এর প্রধান চরিত্র দৃষ্টিশক্তিহীন এক প্রায়-অন্ধ। উত্তমকুমারের প্রতিভা স্পর্শে এই চরিত্রটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে—স্টুডিও মহলের তাই রিপোর্ট। নবাগতা নন্দিতা বসু প্রধান নারী-চরিত্রে রূপদান করছেন।

* * *

চলচ্চিত্রালয়ের প্রথম নিবেদন "আজ কাল পরশু" মুক্তির অপেক্ষা করছে। বাস্তব জীবনের এক মর্মন্তুদ কাহিনী এর আখ্যান অবলম্বন। নির্মল সর্বজ্ঞ একাধারে এর লেখক, চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক। প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপ দিয়েছেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, মাধবী মুখোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, তুলসী চক্রবর্তী, অপর্ণা দেবী, জহর রায় প্রভৃতি। একটি বিশিষ্ট চরিত্রে প্রখ্যাত পরিচালক সুশীল মজুমদার চিত্রাবতরণ করেছেন। ছবিটি "তিন কন্যা"-র পরই রূপবাণী, ভারতী ও অরুণাতে মুক্তি পাবে।

আলোছায়া প্রোডাকশন্সের "সপ্তপদী"-র মুক্তি নির্ধারিত হয়েছে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে। দীর্ঘদিন ধরে তোলা এই বহু-প্রতীক্ষিত ছবিতে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের দুটি ভূমিকায় উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেনকে আবার একসঙ্গে দেখা যাবে। অজয় কর ছবিটি পরিচালনা করেছেন।

• • •

"শুভ বিবাহ" ও "মানিক"-এর নির্মাতা চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থা এই মাসের শেষের দিকে তাঁদের তৃতীয় ছবির কাজ শুরু করবেন। শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের যুগ্ম-প্রযোজনায় ছবিটি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে তোলা হবে।

নব প্রযোজক সংস্থা চিত্রস্থানের প্রথম ছবি তোলা হবে নীহাররঞ্জন গুপ্তের "কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী" অবলম্বনে। অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

মণিপুরী নাচের ভঙ্গিতে কুমারী কাজল দাশগুপ্ত।

নাট্যাভিনয়
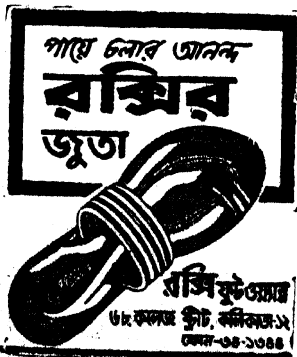
বিশ্বরূপায় "সেতু" নাটকের চার শততম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছে গত রবিবার ১৮ই জুন। সেই উপলক্ষে আগামী রবিবার বেলা আড়াইটাতে উক্ত মঞ্চে একটি স্মারক উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এই আনন্দ-অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন যথাক্রমে অলংকৃত করবেন ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। "সেতু" নাটকের সাফল্যের মূলে যেসব শিল্পী, কলাকুশলী ও কর্মীদের অনলস শ্রম ও সাধনা অনস্বীকার্য, তাঁদের সকলকেই যথোপযুক্ত পুরস্কারদানে সম্মানিত করবার ব্যবস্থা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ করেছেন। উৎসব-শেষে "সেতু" নাটকের ৪০৫ অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে।

• • •

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে সাধারণত বৃহস্পতি, শনি ও রবিবার নতুন নাটকের অভিনয় হয়। ফলে এক সম্প্রদায়ের অভিনয় অন্য সম্প্রদায়ের শিল্পী ও কলাকুশলীদের দেখা সম্ভব হয়ে ওঠে না ইচ্ছা থাকলেও। এই অসুবিধা দূর করতে লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ ঐ তিন দিনের বাইরে অন্য একটি বারে তাঁদের বহু-খ্যাত "অঙ্গার"-এর অভিনয়-ব্যবস্থা করে মঞ্চ-সংশ্লিষ্ট সকলকার ধন্যবাদভাজন হয়েছিলেন। এবারেও উক্ত সংস্থা তাঁদের চলতি নাটক "ফেরারী ফৌজ" দেখবার অনুরূপ ব্যবস্থা করেছেন। আগামী সোমবার (২৬শে জুন) মিনার্ভা থিয়েটারে এই বিশেষ অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে। কলকাতার প্রত্যেক পেশাদারী মঞ্চের অভিনেতা, অভিনেত্রী, নেপথ্য-শিল্পী, কর্মী ও পরিচালকদের এই অভিনয়-আসরে উপস্থিত থাকবার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

ওড়িশী নৃত্যের একটি মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে ইন্দ্রাণী রেহমান। নিউ এম্পায়ারে অনুষ্ঠিত কয়েকটি নাচের আসরে তাঁকে দেখা যাবে।

লিট্‌ল্‌ থিয়েটার গ্রুপের এই সৌভ্রাত্যপূর্ণ আয়োজনের আমরা সাফল্য কামনা করি।

• • •

গত ৯ই জুন রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের প্রেক্ষাগারে একটি মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই আসরে কুমারী কাজল দাশগুপ্ত আড়াই ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন মণিপুরী নৃত্যে অসামান্য পারদর্শিতা দেখিয়ে উপস্থিত সুধীমণ্ডলীকে চমৎকৃত করেন। কুমারী দাশগুপ্ত চালি নৃত্য, বসন্ত রাস, পরেং অচোবা, কৃষ্ণ তাণ্ডব, গোষ্ঠ ভঙ্গী, মালা তাণ্ডব, ও কবুই নাগা—এই সাতটি বিশেষ মণিপুরী নৃত্য প্রদর্শন করেন। শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কয়েকজন নৃত্য ও সংগীত বিশারদ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়-শেষে তাঁরা কুমারী কাজল দাশগুপ্তকে "নৃত্য-ভারতী" উপাধিতে ভূষিত করেন।

• • •

গত ১২ই জুন রঙমহলে মাহিলাড়া সমিতি সলিল সেন রচিত "মৌচোর" নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। এই জনপ্রিয় নাটকটি পরিচালনা করেন পুরনো দিনের প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেতা সতু রায়। পরিচালক শ্রী রায় নাটকের বিশিষ্ট চরিত্র বাউলি সর্দারের রূপসজ্জায় অবতরণ করেন, এবং তাঁর অনবদ্য অভিনয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখেন।

বহু অভিনীত ও বহু অভিনন্দিত "মৌচোর" নাটকটির মূলে রস ও রূপ সেদিনকার নাট্যাভিনয়ে অক্ষুণ্ণ ছিল। এই কৃতিত্বের জন্য সতু রায় দর্শকদের সাধুবাদ পাবেন।

নাটকের অন্যান্য প্রধান চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন নির্মল চক্রবর্তী, সরোজ রায়, সুজিত রায়, শিখা ভট্টাচার্য, কুমুদ ঘোষ, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, হীরেন সেন, সত্যচরণ ধর, সুখময় দাসগুপ্ত, সুজয় চক্রবর্তী, নির্মল দাসগুপ্ত ও ননী সেনগুপ্ত।

সুষ্ঠু মঞ্চসজ্জা সকলকার অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে।

বাংলার বাইরে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব

বাঙ্গালোরে ইলেকট্রনিক্‌স্‌ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলাপমেণ্ট এস্ট্যাবলিশমেণ্টের ফাইন আর্টস্‌ সোসাইটির উদ্যোগে গত ৯ই ও ১০ই জুন ওখানকার টাউন হলে মহা-সমারোহে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য উপর্যুপরি দু দিন অভিনীত হয়। বাঙ্গালোরে "চণ্ডালিকা"-র এই প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মহীশূরের অস্থায়ী রাজ্যপাল শ্রীমঙ্গলদাস পাকোয়াসা, দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাঙ্গালোরের মেয়র শ্রী বি নানাজপ্পা। দুজনেই অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানান।

* * *

দানাপুর বাঙালী তরুণ সংঘ লাইব্রেরীর উদ্যোগে গত ৯ই ও ১০ই জুন দানাপুর ক্যান্টনমেণ্টের মিলিটারী স্কুল ভবনে সুরুচিসম্মতভাবে রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় বি এস কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপরমাকান্ত চৌধুরী, বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীলালু প্রসাদ, ও লাইব্রেরীর সভাপতি ডাঃ অমলেন্দু গুপ্ত প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা, মানবিকতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। তারপর "অভিসার" কবিতাটি আবৃত্তি ও মূকাভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। "তাসের দেশ"-এর সাফল্যপূর্ণ অভিনয় প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে যবনিকা পাত করে।

দ্বিতীয় দিন "চিরকুমার সভা" সাফল্যের যবনিকাপাত করে।

দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন লাইব্রেরীর সভাপতি ডাঃ অমলেন্দু গুপ্ত ও সম্পাদক শ্রীশৈলেশ বসু। সাধারণভাবে দানাপুরের প্রত্যেকটি অধিবাসী এবং বিশেষ-ভাবে সৈন্যবিভাগের স্থানীয় কম্যাণ্ডার ও অন্যান্য অফিসারদের আন্তরিক সহযোগিতা ও উৎসাহে দুই দিনের এই অনুষ্ঠান সব দিক দিয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

* * *

পুরীতে গত ২১শে থেকে ২৭শে মে পর্যন্ত সাত দিন ধরে পুরী হোটেল প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী ডাঃ কালিদাস নাগ, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্নদাশংকর রায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নবেন্দু দত্তমজুমদার, ইউ এন

বাংগালোরে ফাইন আর্টস সোসাইটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত "চণ্ডালিকা"-র একটি দৃশ্যে (বাঁ দিক থেকে) সুস্মিতা মৈত্র, ভারতী সাহা, সিপ্রা সাহা, সিলভা দেশাই, লক্ষ্মী বিশ্বাস, মঞ্জুলিকা বিশ্বাস ও লতা শ্রীনিবাসন।

পট্টনায়ক, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর প্রভৃতি। বেতার-শিল্পী শ্রীমতী জ্যোৎস্না দাশ এই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনে তাঁর সুললিত কণ্ঠের সুর-মূর্ছনায় সকলকে তৃপ্ত ও মুগ্ধ করেন।

ভাগলপুরে গত ২৩শে মে থেকে এগারো দিন ব্যাপী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় বংগীয় সাহিত্য পরিষদের পরিচালনায়। এই উৎসবে শহরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা "ভানুসিংহের পদাবলী", "রাজা ও রানী", "তপতী", "ডাকঘর", "শেষরক্ষা", "শারদ উৎসব", "বিসর্জন", "শোধবোধ", "রক্তকরবী" ইত্যাদি অভিনয় করেন। বনফুল ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

রবীন্দ্র-জীবনী

মহাশয়,—

শ্রীযুত সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আপনার মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি। তাই আশা করেছিলাম, তাঁর কবি-সত্তার ক্রমবিকাশের ধারা তাঁর জীবনী-চিত্রে অগ্রাধিকার পাবে। কিন্তু চিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে মানবদরদী রবীন্দ্রনাথ (Humanist) কবি-রবীন্দ্রনাথকে কতকটা আচ্ছন্ন করে (অবশ্য রবীন্দ্র-জীবনের এদিকটাও মহনীয়)। পালোয়ানের কাছে ছোটবেলায় কুস্তি শেখার কাহিনী দেখানো হয়েছে, দেখানো হয়নি রাত্রির প্রায়ান্ধকারে বিছানায় শুয়ে পরিচারিকার কাছ থেকে রূপকথা শোনার কাহিনী—উত্তরকালের কবি-প্রতিভার বীজ যখন থেকে উপ্ত হল। সিন্দু-মনে। তা ছাড়া মানবদরদী রবীন্দ্রনাথও সত্যজিৎবাবুর হাতে অসম্পূর্ণ।

চীনের ওপর জাপানের বর্বর আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে জাপানী-কবি নোগুচিকে লেখা তাঁর চিঠি মানবদরদী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক দলিল। মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথের চরিত্র-চিত্রায়ণে এর অনুল্লেখ মনে হয় একটি উল্লেখযোগ্য বিস্মৃতি।

কবির আর এক বৈশিষ্ট্য, তিনি বিশ্ব-নাগরিকও। দেশ-দেশান্তর তাঁর চারণ-ক্ষেত্র। শান্তি ও সংস্কৃতির সেই বিশ্ব-দূতের শুধু ইউরোপ-ভ্রমণ ছবিটিতে স্থান পেয়েছে। স্থান পায়নি তাঁর চীন, জাপান, আমেরিকা (এখানে তিনি পাঁচবার গিয়েছিলেন) ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণ। বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্য-ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথের জীবনে নানা-দিক দিয়ে এক নতুন অভিজ্ঞতা। ছবিতে এদের অনুপস্থিতি বিশ্বনাগরিকের পূর্ণ পরিচয়কে খণ্ডিত করেছে বলে মনে হয়।

কিন্তু কবির জীবন-চরিতে কিভাবে তাঁর কাব্যগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তী বাদ পড়লেন, কিভাবেই বা তৎকালীন বাংলা-সাহিত্যের আর দুই দিকপাল সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিস্মৃত হলেন, সে এক পরম বিস্ময়। 'দেশনায়ক' বলে যে সুভাষচন্দ্রকে কবি একদা অভিনন্দিত করেছিলেন, তাঁকে অমন দায়সারাভাবে দেখাবার পেছনে কি দুর্জ্ঞেয় রহস্য আছে জানি না। তাঁর নিত্য-সহচর বনমালীও বোধ হয় উল্লেখের দাবি রাখে। ছবিতে এ'দের অনুল্লেখ বা অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র-জীবনী-চিত্রের একটি প্রধান বিচ্যুতি। স্থানাভাব এর জন্য আংশিক দায়ী হয়ত, পুরোপুরি নয়। প্রথম দিকে কবির বংশ-পরিচয়কে অতটা দীর্ঘায়িত করার কোনও প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না, বিশেষ করে পরিধি যেখানে সীমায়িত অথচ উপাদান প্রচুর। কলকাতার পত্তন, সহমরণ, দিদিমার অন্তর্জলী প্রভৃতি ঘটনাবলী রবীন্দ্র-চরিত্র রূপায়ণে কতদূর সাহায্য করেছে, তা প্রশ্নাধীন।

ছবিটির অসম্পূর্ণতা ছাড়াও এর অসংলগ্নতা মনকে পীড়া দেয়। সত্যজিৎ-বাবুর কাছ থেকে আরও অনেক নিখুঁত treatment আশা করেছিলাম। ইতি,—শৈলেন সেন, কলিকাতা—৪০।
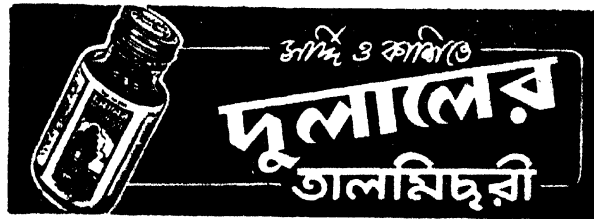
একলব্য

বার্মিংহামের এজবাসটন মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হয়েছে। ২২ তারিখ থেকে বিশ্ব ক্রিকেটের পীঠভূমি 'লর্ডসে' আরম্ভ হচ্ছে দুই দেশের দ্বিতীয় টেস্ট।

নীল হার্ভে

দুই দেশের অধিনায়ক চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এজবাসটন টেস্টে অন্তত সে প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেননি। অবশ্য অস্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। ব্যাটিংএ তাঁরা এক রকম ফুলঝুরিই দেখিয়েছেন, কিন্তু প্রথম থেকে কোণঠাসা হয়ে পড়ায় ইংলণ্ডের ব্যাটিংএ এসেছে সেই চিরাচরিত মন্থরতা। এর জন্য আবহাওয়াও অনেকাংশে দায়ী। তবুও তলায় পড়ে ইংলণ্ড যে তলিয়ে যায়নি এটা তাঁদের ক্রিকেট ঐতিহ্যেরই পরিচয়।

ইংলণ্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে টসে বিজয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ পেলেও ভিজে মাঠে প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ড মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। প্রথম দিন ১৮০ রান তুলতে তাঁদের ৮টি উইকেট পড়ে যায়। অবস্থা হয়তো আরও শোচনীয় হত যদি ওপেনিং ব্যাটসম্যান রমন সুব্বারাও কিছুটা দৃঢ়তার পরিচয় না দিতেন। প্রথম দিন বৃষ্টির জন্য তিনবার খেলা বাধা পায়। লাঞ্চের আগে দু'বার আর পরে একবার সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ থাকে। চা-এর বিরতিও হয় আধ ঘণ্টা আগে। প্রথম দিনের খেলায় সবচেয়ে কৃতিত্বের অধিকারী হন অস্ট্রেলিয়ার বোলার কেন ম্যাকে। এক সময়ে তিনি কোনো রান না দিয়ে ৪টি বলে ইংলণ্ডের ৩টি উইকেট দখল করেন। যেখানে ইংলণ্ডের অবস্থা ছিল ৩ উইকেটে ১২১ সেখানে ৬ উইকেটে ১২২ রান এসে দাঁড়ায়। অধিনায়ক রিচি বেনোও তাঁর কাঁধের ব্যথা নিয়ে বোলিং করে ১১ ওভারের মধ্যে মাত্র ৪টি রান দিয়ে ২টি উইকেট ও ৭টি 'মেডেন' পান।

দ্বিতীয় দিন মাত্র ২১ মিনিটে ইংলণ্ডের বাকী ২টি উইকেট পড়ে যায়। ১৯৫ রানে শেষ হয় ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস। এর পর অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের শুভ সূচনা করে। মাত্র ৪৫ মিনিটে ৪৭ রান সংগৃহীত হবার পর পড়ে প্রথম উইকেট। নীল হার্ভে খেলতে এসে তাঁর স্বভাবসুলভ ব্যাটিং নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। পরে ও'নীলের ব্যাটেও রানের বান ডাকে। নীল-ও'নীলের খেলা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া সংগ্রহ করে ৫ উইকেটে ৩৫৯ রান। হার্ভে করেন জীবনের বিংশতিতম টেস্ট সেঞ্চুরী, ও'নীল ৮২ রান করে আউট হন। ওপেনিং ব্যাটসম্যান বিল লরি, যিনি সারে, এম সি সি ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আগেই সেঞ্চুরী করেছিলেন, তিনি জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় করেন ৫৭ রান।

টেড ডেক্সটার

দ্বিতীয় দিনের খেলার অবস্থা ৪ বছর আগে এই মাঠেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ইংলণ্ডের খেলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে খেলায় ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস ১৮৬ রানে শেষ হবার পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করে ৪৭৪ রান। কিন্তু পিটার মে ও কলিন কাউড্রের অপূর্ব ব্যাটিং নৈপুণ্য ইংলণ্ডকে শুধু পরাজয়ের হাত থেকেই রক্ষা করে না— দেখায় জয়লাভের রঙীন আশার হাতছানি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কোনভাবে হার থেকে বেঁচে যায়। মে ও কাউড্রের সহযোগিতায় হয় ৪১১ রান। মে ২৮৫ রানে নট আউট থাকেন, কাউড্রে করেন ১৫৪ রান। ইংলণ্ডের ক্রিকেট রসিকদের ঐটুকুই ভরসা। যদি এবারও ইংলণ্ড সেই অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে!

তৃতীয় দিনের কয়েক পশলা বৃষ্টি দিনের অর্ধেক খেলা পণ্ড করে দেয়। ৯ উইকেটে ৫১৬ রান করে রিচি বেনো যখন প্রথম ইনিংসের 'সমাপ্তি' ঘোষণা করেন তখন খেলার বাকী ৫০ মিনিট। কিন্তু বৃষ্টির জন্য দু ওভারের বেশী খেলা হয় না। কোন উইকেট না হারিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ডের ৫ রান হয়। বিরতি দিনের আগে অস্ট্রেলিয়া ৩১৬ রানে এগিয়ে থাকে।

এক দিন বিরতির পর ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসে আবার ব্যাটিং আরম্ভ করে। পরাজয় এড়াবার জন্য মনে তাঁদের অনমনীয় দৃঢ়তা। দুই ন্যাটা ওপেনিং ব্যাটসম্যান সুব্বারাও ও পুলার ধীর-স্থির ও অবিচল। অস্ট্রেলিয়ার বোলিং-এর ধার কমে গেছে। সঙ্গে দেখা দিয়েছে বরুণ দেবের করুণা। বৃষ্টি ২ ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় কাটছাঁট করে দেওয়ায় ইংলণ্ডের উঠল ১ উইকেটে ১০৬ রান। সুব্বারাও বৃষ্টি-ভেজা উইকেটে ৬৮ রান করেও নট আউট রইলেন। ইংলণ্ড এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। আর একটা দিন এইভাবে কাটলে হয়। হাতে এখনো ৯টি অটুট উইকেট।

পঞ্চম ও শেষ দিনের খেলা। মাঠে প্রবল উত্তেজনা। আগের দিনের 'হীরো' সুব্বারাও ডেক্সটারকে সঙ্গে নিয়ে যখন ব্যাট করতে এলেন তখনও ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ইংলণ্ডের ২১৫ রানের প্রয়োজন। দুজনের চোখে মুখে একই দৃঢ়তার চিহ্ন। কিন্তু অনিশ্চিত ক্রিকেট। সদাই কি হয়, কি হয় চিন্তা। নিজেদের উপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখে সুব্বারাও এবং ডেক্সটার ব্যাট চালাতে আরম্ভ করলেন। দুজনের সহযোগিতায়

দ্বিতীয় উইকেটে ১০৯ রান যোগ হবার পর সুব্বারাও আউট হলেন ১১২ রান করে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলার প্রথম সুযোগে সুব্বারাওয়ের এ সেঞ্চুরী তাঁর ক্রিকেট জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। এরিক ডেক্সটারও পেছনে পড়ে রইলেন না। তিনি 'হীরো' হলেন এক, আট ও জীরোর রানের অঙ্কে। অর্থাৎ ১৮০ রান করে। ১৯৪৮ সালের পর ইংলণ্ডের কোন খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এত বেশী রান করতে পারেনি। ১৯৪৮ সালে ডেনিস কম্পটন নটিংহাম টেস্টে ১৮৪ রান করেছিলেন। তা ছাড়া ডেক্সটার ইংলণ্ডের বাইরে তিনবার টেস্ট সেঞ্চুরী করলেও ইংলণ্ডের মাটিতে এটা তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী। ইংলণ্ডের বিপদত্রাতা ডেক্সটারের ইনিংসকে মারমুখী ও মাধুর্যময় ইনিংস বলে অভিহিত করা যায়। ১৮০ রানের মধ্যে ১২৪ রান করেন তিনি বাউণ্ডারী মেরে। ডেক্সটার আউট হবার পর কেন ব্যারিংটনের নট আউট থেকে ৪৮ রান করার ঘটনাও উল্লেখের দাবি রাখে। কিন্তু সুব্বারাও ৪ ঘণ্টা এবং ডেক্সটার দীর্ঘ পৌনে ৬ ঘণ্টা ধরে যদি দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে না পারতেন তবে ইংলণ্ড প্রথম টেস্টে পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেত কিনা বলা শক্ত।

সুব্বারাও এবং ডেক্সটারের দৃঢ়তাপূর্ণ এবং অনবদ্য ব্যাটিংএর ভঙ্গী দেখে অস্ট্রেলিয়া জয়ের আশা আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। বোলিংএর ধারও কমে গিয়েছিল তাঁদের। বেনোর কাঁধে ব্যথা। ডেভিডসন, ম্যাকে এবং মিশনের বলও ভাল পড়েনি। তাই ম্যাচ ক্রমেই হাতছাড়া হয়ে গেল। দিনের শেষে ইংলণ্ডের ৪ উইকেটে ৪০১ রান উঠল। প্রথম টেস্টের ফলাফল রইল অমীমাংসিত।

এজবাসটনে দু' দেশের একজন করে খেলোয়াড় নতুন 'টেস্ট ক্যাপ' পেয়েছেন। মিডলসেক্সের উইকেট কিপার জন মারে, যিনি গত পাঁচ বছরের মধ্যে ৪ বার বার্ষিক উইকেট কিপিং-এর ট্রফি পেয়েছেন, তিনি নতুন উইকেট কিপার হিসাবে ইংলণ্ড দলে স্থান পান। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে প্রথম টেস্ট খেলেন উঠতি ওপেনিং ব্যাটসম্যান বিল লরি।

এজবাসটনে যে ইংলণ্ড হারেনি তার জন্য তাঁদের ভাগ্য এবং ঐতিহ্য দুই কার্য-কারণ। বরুণ দেবের করুণায় পুরো সময় খেলা হয়নি। ভাগ্যও তাঁদের বঞ্চনা করেনি। ভাগ্যবান অধিনায়ক হিসাবে কলিন কাউড্রের সুনাম আছে। গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টেই তিনি 'টসে' বিজয়ী হয়েছেন। তা ছাড়া 'এজবাসটন' মাঠও তো কোনদিন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ঐতিহ্যের লড়াইয়ে ইংলণ্ডের পরাজয় ডেকে আনেনি। এ মাঠে এর আগে মাত্র দুবার অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান

রমন সুব্বারাও

টেস্টের আসর বসেছে। ১৯০২ সালে খেলার ফলাফল অমীমাংসিত ছিল, কিন্তু অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে করেছিল মাত্র ৩৬ রান। টেস্ট ইতিহাসে ঐটাই তাদের সর্ব-নিম্ন ইনিংস। ১৯০৯ সালের টেস্টে ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জিতেছিল ১০ উইকেটে।

দুই দেশের টেস্ট খেলার ইতিহাসে এটি ১৭৯তম টেস্ট। এ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ৭৪টি টেস্টে, ইংলণ্ড ৬২টি খেলায়। এ খেলা নিয়ে দুই দেশের ৪৩টি টেস্ট খেলার ফলাফল অমীমাংসিত রইল:—

প্রথম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড:—

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—১৯৫ (রমন সুব্বারাও ৫৯, কেন ব্যারিংটন ২১, ফ্রেডি ট্রুম্যান ২০; কেন ম্যাকে ৫৭ রানে ৪ উইকেট, রিচি বেনো ১৫ রানে ৩ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—(৯ উইঃ ডিক্লেঃ) ৫১৬ (নীল হার্ভে ১১৪, নর্মান ও'নীল ৮২, ববি সিম্পসন ৭৬, কেন ম্যাকে ৬৪, বিল লরি ৫৭, পিটার বার্জ ২৫, রিচি বেনো নট আউট ৩৬; ব্রায়ান স্ট্যাথাম ১৪৭ রানে ৩ উইকেট, ডেভ এলেন ৮৮ রানে ২ উইকেট, রে ইলিংওয়ার্থ ১১০ রানে ২ উইকেট, ফ্রেডি ট্রুম্যান ১৩৬ রানে ২ উইকেট)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস (৪ উইকেট) ৪০১ (টেড ডেক্সটার ১৮০, রমন সুব্বারাও ১১২, কেন ব্যারিংটন নট আউট ৪৮, জিওফ পুলার ২৮; ফ্রাংক মিশন ৮২ রানে ১ উইকেট)।

[খেলা অমীমাংসিত।]

ইংলণ্ড দলে খেলেছেন—পুলার, সুব্বারাও, ডেক্সটার, কাউড্রে (অধিনায়ক), ব্যারিংটন, স্মিথ, ইলিংওয়ার্থ, মারে (উইকেট-কিপার), এলেন, ট্রুম্যান ও স্ট্যাথাম।

অস্ট্রেলিয়া দলে খেলেছেন—লরি, ম্যাকডোনাল্ড, হার্ভে, ও'নীল, বার্জ, সিম্পসন, ডেভিডসন ম্যাকে, বেনো (অধিনায়ক), গ্রাউট (উইকেট কিপার) ও মিশন।

আম্পায়ার্স—এফ এস লী ও জে এস বলার।

খেলার তারিখ—৮ই, ৯ই, ১০ই ১২ই ও ১৩ই জুন, ১৯৬১ সাল।

॥

—মুকুল—

অর্পিতা দাশ (ঘোষ)

ঊনিশ কুড়ি বছর পেছনে ফিরতে গিয়ে মুশকিলে পড়েছি। সবাই যদি স্বল্পবাক হয়, তবে তাঁদের জীবনী লিখি কি করে?

এককালের টেবল-টেনিস-পটিয়সী অর্পিতা দাশ, বর্তমানে খ্যাতিমান টেবল টেনিস খেলোয়াড় কুমার ঘোষের সহধর্মিণী অর্পিতা ঘোষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখি নিজের ঢাকে কাঠি দিতে শ্রীঅর্পিতারও আপত্তি। মুখ খুলে যদি কেউ কিছু না বলে তবে আমাদের কলম খোলে কিভাবে?

জীবনী লেখার উপকরণ দুটি। প্রথম উপকরণ কিছু কিছু রেকর্ড বই যাতে হারজিতের যোগ-বিয়োগের হদিস মেলে, কিন্তু মেলে না খেলোয়াড় জীবনের সামগ্রিক যোগফল। ওতে অনেক কিছুই লেখা থাকে, লেখা থাকে না খেলার রূপ, রস ও রঙের ছবি।

দ্বিতীয় উপকরণ স্মৃতি ও শ্রুতি। কিন্তু স্মৃতি প্রায় বিস্মৃতির অন্তরালে। শ্রুতিও বিলুপ্তির মুখে। ক্রমেই ঝাপসা হয়ে আসছে।

কারণ অর্পিতা দাশ সে যুগের মেয়ে, যে যুগে মেয়েরা খেলাধুলায় বেশী নামেনি। আর একটু বড়বড় ও ডাগরডোগর বাঙালী মেয়ের মাঠে নামা অনেকের কাছেই অপরাধ বা বেয়াদপি বলে মনে হয়েছে।

কিন্তু অর্পিতা দাশরা অন্য আবহাওয়া ও অন্য পরিবেশে মানুষ। যে পরিবেশ মধ্যবিত্ত সমাজের ভ্রূকুটির ধার ধারে না। তাই খেলাধুলায় সে যুগের বাঙালী মেয়েদের মধ্যে অর্পিতা অনন্যা। আমি বলছি তৃতীয় দশকের শেষ এবং চতুর্থ দশকের প্রথম দিকের কথা। তখন ব্যাড-মিণ্টনে তিনবার অর্পিতার কলেজ চ্যাম্পিয়ন-শিপ, বাঙলার টেবল টেনিসে তিনবার বিজয়িনীর সম্মান। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, পার্শী, পাঞ্জাবী ও খাসিয়া মেয়েদের মধ্যে অদ্বিতীয়া, ভারত প্রাধান্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়া। দুবার রানার্সের সম্মান। এক অর্পিতা দাশ ছাড়া জাতীয় টেবল টেনিসে আর কোন বাঙালী মেয়ে আজও এ সম্মানের অধিকারিণী হয়নি।

অর্পিতা দাশের বাবা রজনীকান্ত দাশ শিব ও সত্যের পূজারী। ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। পরম শান্তিবাদী পুরুষ। কোন কিছুর মধ্যেই তিনি দোষ দেখেন না। নিজে কোনদিন খেলাধুলো করেননি। তাই বলে ছেলেমেয়েরা খেলা-ধুলো করবে না? কোনদিনই ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলায় তিনি বাধা দেননি। বরং উৎসাহ দিয়েছেন সব সময়। ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলায় আগ্রহের আর একটি কারণ। পিতৃকুল ও রসে বঞ্চিত হলেও মাতৃকুল সম্পদশালী। ৪ মামাই পাকাপোক্ত ফুটবল খেলোয়াড়। এর মধ্যে ছোট মামা প্রশান্ত বর্ধনের দেশ জোড়া নামডাক। লেফট আউট হিসাবে যাকে শিবদাস ভাদুড়ী, সামাদ ও নাইটের পরের পর্যায় ফেলা যায়। খেলার নেশা বর্ধন পরিবার থেকে সংক্রামিত হল দাশ পরিবারে। দু ভাই ও পাঁচ বোন সবাই খেলাধুলায় মেতে উঠল।

অর্পিতা দাশদের আদিবাড়ি ময়মনসিং জেলার ভবখালী গ্রামে। কিন্তু গ্রামের বাড়ির সঙ্গে কোনদিন যোগাযোগ ঘটেনি। বাবা ছিলেন শিলং-এ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অ্যাকাউণ্টস অফিসার। জন্ম থেকে ৮ বছর পর্যন্ত কেটেছে শিলংএ। তারপর কলকাতায়।

কল্যাণ আর অর্পিতা পিঠোপিঠি ভাই-বোন। দেড় বছরের পার্থক্য। দুজনেই ডানপিঠে, খেলাধুলায় দুজনেই বড় হতে চায়। কল্যাণ খেলে ক্লাবে। কিন্তু অর্পিতার সুযোগ কম। নিজেদের ও বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে ভাইবোন ও বন্ধুবান্ধবের সাথে শুধু খেলাধুলার ঘরোয়া অনুশীলন। দৌড় ঝাঁপ, সাইকেল, এমন কি ক্রিকেটও।

সাইকেল চালনায় অর্পিতার আগ্রহের একটু কারণও ছিল। বাঙলার বিখ্যাত সাইকেল চালক বিমল মুখার্জি, যিনি দীর্ঘ ১০ বছর ধরে সাইকেলে বিশ্ব পরিক্রমা করে ফিরে এসেছেন তিনি অর্পিতার এক ভগ্নিপতি। অর্পিতা দাশের ছোট বোনের স্বামী মোহনবাগানের এ দেবও (কানি দেব) চৌকস খেলোয়াড়। ফুটবল, হকি, ক্রিকেট তিনটি খেলাতেই মোহনবাগান ক্লাবে খেলে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু অর্পিতার সঙ্গে এ দেবের সম্পর্ক অনেক পরে। ছোট বোনের সঙ্গে কানির বিয়ের অনেক আগে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অর্পিতার খ্যাতি।

অর্পিতা দাশ যখন 'লরেটোর' ছাত্রী তখনও খেলাধুলায় তাঁর নাম নেই। আশুতোষ কলেজে ভর্তি হবার পর প্রথম বছরের স্পোর্টসেই তাঁর কৃতিত্বের প্রথম পরিচয়। কয়েকটি দৌড়ে সাফল্যের পর যে পয়েণ্ট হল তাতে 'ইণ্ডিভিজুয়াল' চ্যাম্পিয়নশিপ প্রায় হাতের মুঠোয়, বাকী মাত্র দুই তিনটি পয়েণ্ট। এমন সময় বর্শা নিক্ষেপে অর্পিতা হলেন ফার্স্ট। চ্যাম্পিয়নশিপ আর যায় কোথায়?

কিন্তু ইণ্ডিভিজুয়াল চ্যাম্পিয়নশিপ পেলেন না অর্পিতা দাশ। কারণ বিচারকদের সিদ্ধান্তে তাঁর জ্যাভেলিন থ্রো 'নো থ্রো' হয়েছিল। সার্কেল থেকে পা একটু বেরিয়ে গিয়েছিল। তা যাক। যা পেলেন তাতেই সন্তুষ্ট।

ছোড়দা কল্যাণ দাশ এখন মোহনবাগান ক্লাবের দ্বিতীয় টিমের হকি ও ক্রিকেট খেলোয়াড়। বাড়িতে সব সময় খেলার আলোচনা। অর্পিতা দাশও আস্তে আস্তে নাম কিনছেন। লাহাদের লাল বাড়িতে কি একটা ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় অর্পিতা যোগ দিলেন প্রথম বাঙালী মেয়ে হিসাবে। ব্যাডমিণ্টনে পর পর তিন বছর পেলেন কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপ। টান এলো টেবল টেনিসেও। কিন্তু উপকরণের অভাব। ব্যাটবল জোগাড় করা কষ্ট নয়, কিন্তু কোথায় টেবিল? কোথায় বড় হল ঘর? ইচ্ছে থাকলে কোন বাধাই যে বাধা নয় তার প্রমাণ দিলেন অর্পিতা বাড়িতে ডাইনিং টেবিলে খেলা আরম্ভ করে। নেট নেই। তাতে ক্ষতি কি? পড়ার বইই সই। আড়াআড়িভাবে টেবিলের মাঝখানে বই সাজিয়ে নেটের প্রয়োজন মেটানো হল। ভাই-বোনদের সঙ্গে চলল খেলা। কি একটা ছুটি উপভোগ করতে ওরা সপরিবারে কুমিল্লা গেলেন। সেখানে টেবল টেনিসের এক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হল। ডাইনিং টেবিলের বদলে উঁচু তক্তাপোষ জোগাড় হল, নেটের বদলে বই ঠিকই রইল। অর্পিতা দাশ ছেলেমেয়ে সকলকে হারিয়ে হলেন বিজয়িনী। সবাই বলল—'তোর তো চমৎকার মারের হাত, টেবল টেনিসে নাম দিস না কেন?'

ওখান থেকে প্রতিযোগিতায় খেলার অনুপ্রেরণা। কলকাতায় এসে বড় প্রতি-যোগিতায় আনাগোনা। ১৯৪০ সালে যেবার আশুতোষ কলেজ থেকে অর্পিতা বি এ ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়ে এলেন সেবারই ফাইন্যালে আর এক বাঙালী মেয়ে রমলা নাগকে হারিয়ে পেলেন টেবল টেনিসের বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ। কলেজের খেলা-ধুলোয় ছেদ পড়ল, কিন্তু সামনে খোলা রইল বিশাল ভারতের বিস্তীর্ণ ক্রীড়াক্ষেত্র। এই বছরই মাদ্রাজে জাতীয় টেবল টেনিসে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য বাঙলা দলে তাঁর ডাক পড়ল। ফাইন্যালে উঠে বোম্বের পার্শী মেয়ে পেরিন ম্যাডানের কাছে হারলেন পাঁচ সেটের খেলায়। খুবই ভাল খেলেছিলেন অর্পিতা দাশ। পঞ্চম সেটে তিনি প্রায় জেতার মুখে। শুধু টেবিলে বল রাখলে পরের ভুলে তিনি জিতে যান, কিন্তু মারতে গিয়ে তাঁকে হারতে হল। দর্শক চোখের কষ্টদায়ক মন্থর খেলা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। এরপর দুবার বোম্বেতে, একবার করে মাদ্রাজ হায়দরাবাদ ও কলকাতায় অর্পিতা দাশ জাতীয় টেবল টেনিসে বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

অর্পিতা দাশ (ঘোষ)

১৯৪৫-৪৬ সাল অর্পিতা দাশের গর্বের বছর। প্রতিভাদীপ্ত খেলোয়াড়-জীবনে এ বছর তিনি ছিলেন গৌরবের উচ্চ শিখরে। ফাইন্যালে পাঞ্জাবের পোক্ত খেলোয়াড় কুমারী হীরা ঠাকুরকে হারিয়ে মেয়েদের মধ্যে তিনি পেলেন বাঙলার চ্যাম্পিয়নশিপ, পুরুষদের বিভাগে তার ভাবী স্বামী কুমার ঘোষ। দুজনের দ্বৈত খেলায় অর্থাৎ মিক্সড ডাবলসেও বিজয়ীর সম্মান। দুজনের মাথায় তিনটি মুকুট। অর্পিতা দাশ শেষবার বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন-শিপ পেয়েছেন ১৯৪৭-৪৮ সালে ফাইন্যালে গ্লোরিয়া গ্রীনকে হারিয়ে।

কুমার ঘোষ ও অর্পিতা দাশ বাঙলার টেবল টেনিসের 'আদম' ও 'ইভ'। যখনকার কথা বলছি কুমার তখন টেবল টেনিসের নবকুমার, আর অর্পিতা রূপ কুমারী। দুজনের যেমন রূপ তেমন গুণ। হকির ধ্যানচাঁদ আর টেবল টেনিসের বার্ণার বিশ্বে জুড়ি নেই। কিন্তু কুমারের ব্যাক হ্যান্ডে দেখেছি বার্ণার প্রতিভা। সে এক অপূর্ব মার, যা সাধনা করেও আয়ত্ত করা যায় না। 'আপনাতে আপনি বিকশি' সে মারের অপরূপ রূপ সৃষ্টি। সবটুকুর মধ্যেই ক্লাসিক টাচ।

ক্লাসিকের পূজারী ছিলেন অর্পিতাও। ওপার থেকে বল আসবে, এপার থেকে কোনভাবে সে বল ফিরিয়ে দেব—অর্পিতা এমন খেলাকে কোনদিন প্রশ্রয় দেননি। তাঁর কোমল হাতে শক্ত শক্ত মার ছিল। 'ব্যাক হ্যান্ড ফ্লিক' এবং দুদিকের চপ ডিফেন্সিভ মারে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। টেবল টেনিসের বিজ্ঞানসম্মত নানা স্ট্রোকের মধ্যে দুটিই কঠিন স্ট্রোক। পুরুষ খেলোয়াড়ের পক্ষেও আয়ত্ত করা শক্ত। কিন্তু মেয়ে হয়েও এ মার আয়ত্বের জন্য অর্পিতাকে বেশী মেহনত করতে হয়নি। এটা ছিল তাঁর খেলার স্বভাবধর্ম।

জহুরী জহর চেনে। আমার বেশ মনে আছে স্বর্গীয় রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি যক্ষ্মা আরোগ্যোত্তর উপনিবেশ স্থাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাজভবনে সারা ভারতের সংগীত শিল্পীদের নিয়ে এক জলসার আয়োজন করেছিলেন। সেখানে বড়ে গোলাম আলীর খেয়াল গানের পর লতা মুঙ্গেশ-করকে গান গাইতে অনুরোধ করা হলে লতা বলেছিলেন—'অমৃতে অরুচি'? 'রসগোল্লার পর কাচালঙ্কা'? লতা ক্লাসিকের কদর জানেন। তাই ও কথা বলেছিলেন।

এখানে ক্লাসিক খেলার কদর জানতেন অর্পিতা দাশও। তাই কুমার ঘোষ তাঁর চাইতে বয়সে কিছু ছোট জেনেও চিরদিনই তিনি কুমারের অনুরক্তা। প্রথমে খেলার পার্টনার। পরে জীবনের পার্টনার। একটু বয়সের হেরফের? ওতে কি আসে যায়? অন্য পরে কা কথা। মহাত্মা গান্ধীর চেয়েও তো কস্তুরবা কমাসের বড় ছিলেন। আর কুমার ঘোষকে কিছু ছোটই দেখায়। ১২ বছর হল কুমার ও অর্পিতা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। কুমার ঘোষ যদি আজও কুমার থাকতেন আর একটি সোমত্ত মেয়ের সংগে তাঁর বিয়ে হত তাহলেও বোধহয় কনের ঘাড়ে অপবাদ পড়ত বেশী বয়স বলে। যাক সে কথা।

অর্পিতা দাশের শখ ছিল পাইলট হবেন। ছোড়দা কল্যাণ দাশ এয়ার ফোর্সে চাকরী নেবার সময় কানে কানে সে কথা বলেও গিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় এলাহাবাদের এয়ারক্র্যাসে ফ্লাইট লেফ্‌ট্যান্যান্ট কল্যাণ দাশ ইহলোক ত্যাগ করায় অর্পিতার আশা পূর্ণ হয়নি। বি এ পাশ করার পর গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন থেকে তিনি ডিপ্লোমা নিয়ে কিছুদিনের জন্য স্কটিশ চার্চ কলেজের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকট্রেস হন। এখন হিন্দী হাইস্কুলের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকট্রেস। খেলাধুলোর চর্চা নিয়েই আছেন। মাঝে কিছুদিন স্বামীর সংগে বিলেত ঘুরে এসেছেন। শাড়ী পরে দু একটি ম্যাচও খেলেছেন ওখানে।

সে এক মজার ঘটনা। বার্মিংহাম চ্যাম্পিয়নশিপে কুমার ঘোষ খেলতে ইচ্ছুক। কিন্তু বিলেতের খ্যাতনাম্নী টেনিস ও টেবল টেনিস খেলোয়াড় অ্যান হেডেনের বাবা এড্রিয়ান হেডেন বার্মিংহামের সেক্রেটারী। তিনি কালো আদমীকে পাত্তা দিতে চান না, যদিও কুমার বা অর্পিতার গায়ের রং কালো নয়। শেষ পর্যন্ত কুমার যখন ওখানকার চ্যাম্পিয়ন হলেন তখন আদরের বহর দেখে কে? খেলা দেখে সবাই পাগল। যখন শুনলো অর্পিতাও খেলোয়াড় তখন আব্দার হল 'আমরা শাড়ী পরা অবস্থায় খেলা দেখতে চাই।' খেলা তখন অর্পিতার পড়ে গেছে, তবু অনুরোধ রেখে-ছিলেন।

কুমার ও অর্পিতা ঘোষের বুক জুড়ে আছে একমাত্র মেয়ে অনুরাধা। বয়স ৯ বছর। লরেটোর ছাত্রী। কেবল সাঁতার শিখছে। অন্য কোন খেলাধুলো এখনো আরম্ভ করেনি।

দেশী সংবাদ

১২ই জুন—আজ সন্ধ্যায় শিলচরে শিলচর, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি এই তিনটি কংগ্রেস কমিটি এবং কাছাড় জেলা ভাষা আন্দোলন কমিটির এক যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে শাস্ত্রী সূত্র অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

অদ্য মাত্র দুই ঘণ্টার ব্যবধানে লিলুয়া ও কোন্নগর স্টেশন প্ল্যাটফর্মে চারজনের বৈদ্যুতিক ট্রেনে কাটা পড়িয়া মৃত্যু হয় বলিয়া এক মর্মান্তিক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১৩ই জুন—নিজের জন্মভূমিতে জীবন ও জীবিকার সন্ধানে ব্যর্থকাম হইয়া শত শত ভারতীয় তরুণ জন্মের মত আপন দেশ ত্যাগ করিয়া প্রতি বৎসর বিদেশে চলিয়া যাইতেছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করিয়া ইউ সি সি কাউন্সিলারদের এলাকাগুলিতে উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হইয়া যাওয়ার অভিযোগে ইউ সি সি সদস্যগণ 'কর দেওয়া বন্ধ' আন্দোলন শুরু করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। যে ৩১টি কেন্দ্র হইতে ইউ সি সি সদস্যগণ নির্বাচিত হইয়াছেন, প্রথমে সেই সকল কেন্দ্রেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকিবে বলিয়া প্রকাশ।

১৪ই জুন—শিলচর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে আগামী ১৯শে জুন হইতে সমগ্র কাছাড় জেলায় 'কর বন্ধ' আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে এবং প্রথম পর্যায়ে চৌকিদারী কর বন্ধ করিয়া আসাম সরকারের উপর আঘাত হানা হইবে।

মধ্য কলিকাতায় জনবহুল মির্জাপুর স্ট্রীটের উপর অদ্য সকাল এগারোটায় একদল পুলিস এবং গুণ্ডা বলিয়া অভিহিত তিনজন সহস্র ব্যক্তির মধ্যে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল স্থায়ী এক সংঘর্ষ হয়।

গতকাল অপরাহ্নে হাইলাকান্দিতে শান্তিপূর্ণ নিরুপদ্রব পথচারীদের উপর সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর কতিপয় সদস্য কর্তৃক নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে আজ শিলচর শহরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল বয়সের প্রায় ১২ হাজার লোকের এক শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে।

১৫ই জুন—যেমন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ তেমনি তাহার পরীক্ষা বোর্ড। একেবারে হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী। এবারের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার বিভিন্ন প্রশ্নপত্রে বিভ্রাট সৃষ্টি করিয়াই পর্ষদ ক্ষান্ত হন নাই। উত্তরপত্র দেখার ব্যাপারে এমন সব অদ্ভুত নির্দেশ নাকি দেওয়া হইয়াছে যে, পরীক্ষক মহলের মতে উহা "শিক্ষা-নায়কদের মতিভ্রম" ছাড়া অন্য কিছু নহে।

কলিকাতার বাজারে যে ঘি বিক্রয় হয়, তাহার শতকরা ৯০ ভাগই ভেজাল—এ কথা স্বয়ং ভারত সরকারের কৃষি ও বাজার উপদেষ্টা শ্রী এন পি চ্যাটার্জিও বলেন। তিনি আরও বলেন, আমাদের ব্যবসায়ীরা নানাপ্রকার দুর্নীতিমূলক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

১৬ই জুন—অদ্য অধিক রাত্রে শিলচর হইতে টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে সমগ্র কাছাড়ের ঐক্যবদ্ধ ঐতিহাসিক আন্দোলনের নিকট কেন্দ্রীয় সরকার অবশেষে অনেকাংশে নতি স্বীকার করিয়াছেন।

১৭ই জুন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত সিনেট নির্বাচনে ভুয়া ভোটপত্র ব্যবহারের অভিযোগ সম্পর্কে গতকল্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানায় তদন্ত চালাইয়া পুলিস নাকি এইরূপ কয়েকটি তথ্য পাইয়াছে, যাহাতে ভুয়া ভোটপত্রগুলি ঐ ছাপাখানাতেই ছাপা হওয়ার সন্দেহ দৃঢ়তর হইয়াছে।

কাছাড়বাসীর সম্মিলিত দাবি স্বীকার করিয়া অদ্য কাছাড় জেলার তিনটি জেল হইতে ভাষা আন্দোলনে ধৃত সমস্ত বন্দীকে বিনা শর্তে মুক্তি দেওয়া হয় বলিয়া শিলচর হইতে সংবাদ পাওয়া যায়।

১৮ই জুন—ভারতীয় পর্বত অভিযাত্রী শ্রী ও পি শর্মা দুইজন শেরপাকে সঙ্গে লইয়া গত মঙ্গলবার ২১,৬৪০ ফুট উচ্চ নীলকণ্ঠ শীর্ষে আরোহণ করেন। মধ্য হিমালয়ের এই শিখরটি স্পর্শ করিতে গিয়া গত ২৫ বৎসরে ৭টি অভিযাত্রী দল বারবারই ব্যর্থ হইয়াছে।

ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের নিমিত্ত সোভিয়েট রাশিয়া ও উহার কয়েকটি মিত্র রাষ্ট্র এবং যুগোস্লাভিয়াও ভারতকে উল্লেখযোগ্য সাহায্য দান করিতেছেন। উল্লিখিত দেশগুলির সাহায্য দানের শর্তাবলী প্রায় একইরূপ।

বিদেশী সংবাদ

১২ই জুন—মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীডীন রাস্ক বলেন যে, আপাতদৃষ্টিতে বুঝা যাইতেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বার্লিন সম্পর্কে সোভিয়েট রাশিয়ার স্মারকপত্রের সহিত একমত হইতে পারেন নাই।

যে সমস্ত আফগান যাযাবর সময় সময় পাকিস্তানে আসে, আগামী বৎসর হইতে তাহাদের অবাধ অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করার যে সিদ্ধান্ত পাকিস্তান সরকার করিয়াছেন, তাহাতে প্রতিবেশী মুসলমানদের সম্পর্কে পাকিস্তানের নূতন 'কঠোর নীতির'ই আভাস পাওয়া যায় বলিয়া করাচীর পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন।

১৩ই জুন—গতকল্য রেঙ্গুনের দৈনিক 'দি নেশন'-এ এক সংবাদে বলা হইয়াছে, মণিপুর (ভারত) ও চিন স্পেশ্যাল ডিভিসনের (ব্রহ্ম) মধ্যে যে সমস্ত সীমানাচিহ্নিত স্তম্ভ আছে, চিন-এর আন্দোলনকারিগণ তাহার অধিকাংশই ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। চিন স্পেশ্যাল ডিভিসন ব্রহ্মদেশে একটি নূতন সংখ্যালঘু রাজ্য।

রাষ্ট্রপুঞ্জে সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ দাগ হ্যামারশীল্ড অদ্য বলেন যে, অভূতপূর্ব কোন ঘটনা না ঘটিলে কঙ্গো সঙ্কট অতিক্রান্ত হইয়াছে।

১৪ই জুন—অদ্য প্রায় এক হাজার মুসলমান বিক্ষোভকারী আলজিয়ার্সের বেলকোর্ট মহল্লায় বিক্ষোভ প্রকাশ করে। তাহারা পাথর ছুঁড়িতে থাকে, গাড়ি উল্টাইয়া দেয় এবং তাহাতে অগ্নিসংযোগ করে। তাহারা ইউরোপীয়দেরও আক্রমণ করে।

১৫ই জুন—গত ৯ই মে ঢাকা, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, নোয়াখালি, খুলনা এবং বরিশাল জেলার বন্যা এবং ঘূর্ণিবাত্যায় ১৪৭৩ জন নিহত এবং ১১ জন নিখোঁজ হইয়াছে। বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমায় ৭৪২ জন এবং খুলনায় ৪২৬ জন নিহত হইয়াছে।

আজ রাত্রিতে ভিয়েনায় প্রাপ্ত এক অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, বুলগেরিয়ার কম্যুনিস্ট গবর্নমেন্টের উচ্ছেদ সাধনের একটি চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। চারজন সেনাপতি ছিলেন এই বিদ্রোহের নায়ক।

১৬ই জুন—কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করিয়াছেন যে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র তাঁহারা উদ্ঘাটন করিয়াছেন। ইহার পিছনে একটি বৈদেশিক দূতাবাসের কার্যকলাপ আছে বলিয়াও তাঁহারা অভিযোগ করেন। দূতাবাসটির নাম বলা হয় নাই।

পাকিস্তান সরকার অদ্য পাকিস্তানের বিশিষ্ট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তানের পরিচালন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

১৭ই জুন—আমেরিকা আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ—২১০০ পাউণ্ড ওজনের পঞ্চদশ "ডিসকভারার"কে কক্ষপথে স্থাপন করিয়াছে। ইহা প্রতি ৯১ মিনিটে একবার করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে।

বৃটিশ উপনিবেশ দপ্তর আজ লণ্ডনে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৬২ সালের ৩১শে মে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। স্বাধীনতা ঘোষণার নির্ধারিত তারিখ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আইনসভার অনুমোদনসাপেক্ষ।

১৮ই জুন—আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধ করিবার প্রশ্নটি সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে একত্র আলোচনার জন্য সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেফ যে প্রস্তাব করিয়াছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট শ্রীকেনেডী তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

পেশোয়ারের এক সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ, আফগান বিমানবাহিনীর একখানা হালকা জেট বোমারু বিমান আজ পেশোয়ারের বিমানঘাটিতে অবতরণ করিয়াছে। বিমানে তিনজন আরোহী ছিলেন। বিমানখানা সোভিয়েটের আই এল—২৮ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে আর কোন সংবাদ প্রকাশ করা হয় নাই।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০,, ষান্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বলে : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষান্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

DESH 40 Naye Paise.
SATURDAY, 1ST JULY, 1961

২৮ বর্ষ ॥ ৩৫ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৬ আষাঢ়, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

শেষ কোথায়?

ভারতবর্ষে অনেকের মনেই বর্তমানে সংশয়বিজড়িত শঙ্কাদীর্ণ সকাতর প্রশ্ন—শেষ কোথায়? স্বাধীনতা প্রাপ্তির শর্ত হিসেবে দেশ বিভক্ত হল সাম্প্রদায়িক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। জাতীয় নেতারা আশ্বাস দিলেন, বিদ্বেষ ও বিরোধের এখানেই শেষ! শেষ যে কোথায় স্বাধীনতার পরবর্তী কালে গত চৌদ্দ বৎসরে নেতারা তার সন্ধান দিতে পারেন নি। ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত ভারতে জাতীয় ঐক্য-বিরোধী যে-সমস্ত শক্তি সক্রিয় ছিল তার একটিও বিলুপ্ত হয়নি। বরঞ্চ প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের চাইতে বর্তমানে এই-সমস্ত ঐক্য-বিধ্বংসী শক্তির অনিষ্টকর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদ এক সময়ে দেশের অভ্যন্তরে পরিপুষ্ট হয়েছিল। এখন তার ঘাটি দেশের ভিতরে ও বাইরেও। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের দ্বিমুখী অভিযানের সুযোগ বিস্তৃত এবং পরিবেশ সম্প্রসারিত হয়েছে স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে। তার মানে স্বাধীনতা লাভ ও সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠার আশায় দেশ ভাগ করে যে চড়া দাম দিতে হয়েছে এখন দেখা যাচ্ছে তার সবটাই লোকসান। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়নি, কোনকালেই হবে মনে হয় না। আর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের আদর্শের প্রতি অনুরক্ত এক শ্রেণীর ভারতীয় মুসলমান নাগরিক আমাদের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের স্বচ্ছন্দ অগ্রগতির বিষম প্রতিবাদী দেখা যাচ্ছে।

কথায় বলে, দুঃখের রাত্রিরও অবসান হয়। ব্রিটিশ শাসন অবসানের সময় আশা হয়েছিল ভারতবর্ষের আকাশ অন্ধকার-মুক্ত হতে আর বিলম্ব নেই। দরিদ্র দেশ, কোটি কোটি মানুষের আহার বাসস্থান ও জীবিকা সংস্থানের জাতীয় উদ্যোগ স্বাধীন ভারতে সর্বময় স্বীকৃতি ও প্রাধান্য লাভ করবে, এই ছিল দেশপ্রেমীদের একান্ত কামনা। কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের প্রথম পর্বেই ভারতবর্ষের জনজীবন বিপর্যস্ত হল রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততায়; লক্ষ লক্ষ গৃহচ্যুত, ছিন্নমূল নরনারীর অপরিসীম দুর্গতিতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশের অন্ধকার আরও ঘনীভূত হল। চৌদ্দ বৎসরেও ভারতবর্ষের জনজীবন এই গুরুভার ক্ষয়ক্ষতির দুর্ভোগমুক্ত হতে পারে নি, দেশবিভাগের ক্ষতও এখন পর্যন্ত নিরাময় হয় নি। ভারতবর্ষ লিখিতপঠিতভাবে লোকায়ত্ত জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্র এবং সে হিসাবে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তার পা মিলিয়ে চলবার কথা। অথচ অবস্থাচক্রে একদিকে আমাদের জাতীয় বৈষয়িক উন্নয়নের সংকল্প এবং উদ্যোগ, আর অন্যদিকে আমাদের রাষ্ট্রিক জীবনে নানা রকম বিরোধ ও বিভেদমূলক প্রবণতা ও উপদ্রব। এই মৌল অসামঞ্জস্য বর্তমানে এমনি প্রকট যে, বলা কঠিন, ভারতবর্ষ বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে, না ধীরে ধীরে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে!

দেশবিভাগ দ্বারা সাম্প্রদায়িকতা বিদ্বেষ বিরোধের জড় উচ্ছেদ করা যায় নি, ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের মূল নীতি যথাসাধ্য অনুসরণ করে ভাষাবিরোধের সমাধান করা যায় নি। আসামের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এদিক দিয়ে আরও উদ্বেগজনক এবং স্বাধীন ভারতের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে নিঃসন্দেহে অনর্থসূচক। বহুভাষী রাজ্য আসামে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বৃহৎ দায়িত্ব। কিন্তু আসামের ভাষা সমস্যাকে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যেভাবে বিপজ্জনক পথে ঠেলে দিয়েছে তাতে ভাষার প্রশ্নটা বর্তমানে প্রায় গৌণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সমস্যা আসামে সঙ্গীন হলেও, সমস্যাটা মূলত সারা ভারতের। এই সমস্যার সমাধান দুরূহ হলেও ভাষা-বিরোধ আর যাই করুক আমাদের লোকায়ত্ত রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করে নি। হাইলাকান্দি ও শিলচরে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যে রণদুর্মদ ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছে তার লক্ষ্যস্থল ভারতবর্ষের লোকায়ত্ত রাষ্ট্রসত্তা। অসমীয়া, বাঙ্গালী এবং পার্বত্য জাতিদের ভাষাগত অধিকার নিয়ে মতভেদ ও বিরোধের রূপটা এযাবৎকাল মোটের উপর পরিচ্ছন্ন ছিল। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ভাষা-বিরোধে কোথায়ও প্রাধান্য পায় নি। হাইলাকান্দি ও শিলচরে বাংলাভাষী হিন্দুদের উপর মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের আক্রমণ মর্মান্তিকভাবে এবং নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমাদের এই লোকায়ত্ত রাষ্ট্রের ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে মিলনসূত্রটা পলকা সুতোর চাইতেও ক্ষীণজীবী।

রাজ্য, জাতি, বর্ণ, গোষ্ঠী, ভাষা, সম্প্রদায় ইত্যাদির লক্ষণ ও চিহ্ন ধরে আলাদা আলাদা ভাগ করলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই শেষ পর্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। য়ুরোপে এককালে হয়েছিল তাই। য়ুরোপ শেষ পর্যন্ত স্বস্থ, আত্মস্থ হতে পেরেছে রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য তথা "নেশন স্টেটে'র ভিত্তিতে। জেলা, মহকুমা, কাউন্টি নয়, কোন ভাষার একচ্ছত্র প্রাধান্য নয়, কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় নয়, এই 'নেশন স্টেটে'র প্রতি চূড়ান্ত অবিচলিত আনুগত্যই য়ুরোপের নাগরিকের মনোভঙ্গী ও আচরণের দিগ্‌দর্শন। ভারতবর্ষও 'নেশন স্টেটে'র আদর্শে গঠিত। কিন্তু ভারতীয় নাগরিকের আনুগত্য ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক সত্তায় সর্বসমর্পিত নয়, ছোট বড় নানা ভাগে বিভক্ত এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষের একটি সম্প্রদায়ের অনেকেরই মনোভঙ্গী ও আচরণ লোকায়ত্ত রাষ্ট্রবিরোধী, প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের অনুগামী। এই পরিস্থিতি অস্বাভাবিক। ভাষা সমস্যা সমাধানের চেয়েও জরুরী প্রশ্ন ভারত রাষ্ট্রের প্রতি নির্বিশেষ ও নিঃশর্ত আনুগত্যের সুদৃঢ় ঐতিহ্য রচনা। নতুবা অসংখ্য পরস্পরবিরোধী, প্রতিদ্বন্দ্বী আনুগত্যের আড়াআড়ি ও সংঘর্ষে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক ঐক্য ছিন্নভিন্ন, বিপর্যস্ত হওয়া রোধ করা অসম্ভব।

যশস্বী বিজ্ঞানী কৃষ্ণান

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

যে যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা ভারতরত্ন 'বিজ্ঞানাচার্য' চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন বিশ্বের মনীষাস্বীকৃতির সর্বোচ্চ সম্মান 'নোবেল পুরস্কার' লাভ করেন সেই 'রমন-বিকিরণ' আবিষ্কারে তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী কারিয়ামানিক্কাম শ্রীনিবাস কৃষ্ণান। তাই রমন-বিকিরণের কথা উল্লেখ করতে গেলে সি ভি রমনের নামের সঙ্গে কে এস কৃষ্ণানের নামও সমোচ্চারিত হয়ে থাকে।

ভারতের অগ্রগণ্য এই দুই বিজ্ঞানীর জন্ম ও শিক্ষা দক্ষিণ ভারতে, কিন্তু তাঁরা দুজনেই বাংলা দেশের এই কলিকাতা মহানগরীতে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানমন্দিরে গবেষণা করেই বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৯৮ সালে মাদ্রাজ রাজ্যের শ্রীভিল্লিপুত্তুরে কৃষ্ণান জন্মগ্রহণ করেন। জন্মভূমি শহরে বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করার পর তিনি মাদুরার আমেরিকান কলেজে, মাদ্রাজের খ্রিশ্চিয়ান কলেজে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট হবার পর

ডঃ কে এস কৃষ্ণান

১৯২৩ সালে তিনি কলকাতায় এসে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা সমিতিতে (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স) ডক্টর সি ভি রমনের অধীনে গবেষক ছাত্ররূপে যোগদান করেন এবং ১৯২৮ পর্যন্ত এখানে গবেষণারত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই বিশ্ববিখ্যাত 'রমন-বিকিরণ' আবিষ্কৃত হয়।

১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে স্টকহলম শহরে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষে অধ্যাপক রমন সুইডেন বিজ্ঞান পরিষদের বিশিষ্ট সভায় যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের এক মনোরম বিবরণ প্রদান করেন—'নিস্তরঙ্গ সাগরবক্ষের কৃষ্ণনীল অতল রূপ সম্ভবত সর্বজনপরিচিত নয়। ১৯২১ সালের গ্রীষ্মাবকাশে আমি যখন ইউরোপযাত্রী, তখন শান্ত ভূমধ্যসাগরের অত্যাশ্চর্য নীলোচ্ছ্বাস আমার প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটে। ঐ রূপ দর্শনের ফলে আমার ধারণা হয়, সূর্যকিরণে বায়ুকণার দীপ্তিহেতু যেরূপ আকাশের বর্ণশোভা, সেইরূপ রবিদীপ্ত বারিকণাজনিত সমুদ্র বক্ষের নীলোচ্ছ্বাস। অতঃপর পর্যটন শেষে সেপ্টেম্বরে কলিকাতায় ঐ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি অনুরূপ গবেষণায়, অর্থাৎ তরল পদার্থসমূহের অণু কর্তৃক আলোকরশ্মির বিকিরণ ধর্ম সবিশেষ নির্ধারণে প্রবৃত্ত হই। এই গবেষণায় একাধিক কর্মী আমার সহযোগিতা করেন। ...এই গবেষণাসমূহে মূলত আলোকের তরঙ্গরূপ ও তড়িৎ-চুম্বকীয় আলোকতত্ত্ব স্বীকৃত ও প্রযুক্ত হয়েছিল। তথাপি আলোকের নবাবিষ্কৃত জ্যোতিকণা-রূপ কখনও আমাদের স্মৃতি-বহির্ভূত হয় নি। আমাদের কর্মধারার প্রারম্ভ থেকেই কয়েকটি পরীক্ষাফল সনাতন তড়িৎ-চুম্বন তত্ত্বের যুক্তিধারার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করছিল না। ঐ সকল ফলাফল ভ্রান্ত জ্ঞানে সেগুলিকে বহু যত্নে বার বার পরীক্ষা করে দেখা হয়। এরই ফলে অবশেষে আবিষ্কৃত হয় যে, অণু-বিকীর্ণ আলোকরশ্মির মধ্যে সনাতন র‍্যালে-আইনস্টাইন অভিন্ন জ্যোতি ব্যতীত এক অদৃষ্টপূর্ব ক্ষীণতর নতুন আলোকের উদ্ভব হয়েছে, যার দীপ্তি র‍্যালে-রশ্মির কয়েক শতাংশের বেশী নয়, কিন্তু যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য উদ্ভাসী আলোক থেকে পৃথক। ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে জল ও সুবাসার দ্বারা বিকীর্ণ আলোক এই বিশেষত্ব প্রথম রামনাথনের মনোযোগ আকর্ষণ করে। পরবর্তী সালে একাধিক তরল পদার্থের বিকিরণে কৃষ্ণন এবং বরফ ও অতিস্বচ্ছ কাচখণ্ডে আমি অনুরূপ বিশেষত্ব স্পষ্টতররূপে লক্ষ্য করি। ১৯২৭ সালে কৃষ্ণান পুনরায় এর পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন এবং ঐ সময়ে অতিসান্দ্র তরল পদার্থসমূহের পরীক্ষা আরম্ভ হয়। ভেঙ্কটেশ্বরন গ্লিসারিনের পরীক্ষায় উজ্জ্বল হরিৎবর্ণ নবদীপ্তি সর্বজনগোচর করেন, যার দ্বারা অচিরে আমি নিঃসন্দেহ হই যে,

১৯২৩ যাবৎ যে সনাতনবিধিবিরুদ্ধ নবনীতি আমাদের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে দৃশ্য আলোক-রাজ্যে রঞ্জনরশ্মির কম্পটন-প্রদর্শনের অনুরূপ ঘটনা, যেখানে বিকিরণ প্রক্রিয়ার ফলে জ্যোতিঃতরঙ্গের দৈর্ঘ্যগ্রংশ ঘটেছে।'

কৃষ্ণান প্রমুখ কৃতী গবেষকদের সহযোগিতায় অধ্যাপক রমন ১৯২১ সাল থেকে আলোক-বিকিরণের যাবতীয় তথ্য অনুশীলন, অধ্যয়ন ও অন্বেষণের যে একাগ্র সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন তা পরিপূর্ণতা লাভ করে ১৯২৮ সালে। সে বছর ২৮শে ফেব্রুয়ারীর স্মরণীয় দিনে অধ্যাপক রমন এক নতুন আলোকরশ্মির সন্ধান পান এবং অবিলম্বে ঐ নতুন পরীক্ষাফলের অভিনবত্ব ও গুরুত্ব বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলের কাছে প্রদর্শন করেন। তাঁর নামানুসারে এই নতুন রশ্মি 'রমন বিকিরণ' নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে এবং এই অনন্যসাধারণ আবিষ্কারের জন্যে ১৯৩০ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

কিন্তু শুধু রমনের সহযোগী হিসাবে নয়, নিজস্ব মৌলিক গবেষণার দ্বারাও কৃষ্ণান বিশ্বের বিজ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি কলকাতা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার রীডাররূপে চলে আসেন। এবং ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত এখানে অধ্যাপনা করেন। ঢাকায় থাকাকালীন তিনি কেলাসের চুম্বকধর্ম সম্বন্ধে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গবেষণা আরম্ভ করেন। তাঁর এই গবেষণাসমূহের গুরুত্ব অচিরেই স্বীকৃতি লাভ করে এবং লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ট্রানজাকশনে সেগুলি প্রকাশিত হয়। তার পর থেকেই আলোক বিকিরণ, চুম্বকত্ব ও কেলাসের গঠন সংক্রান্ত তাঁর গবেষণাসমূহ বিশ্বের বিজ্ঞানী মহলে সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে ১৯৪০ সালে কৃষ্ণানকে রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত করা হয়।

১৯৩৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডঃ কৃষ্ণান আবার কলকাতায় ফিরে আসেন এবং ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা সমিতিতে মহেন্দ্রলাল সরকার গবেষক-অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারপর তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ওখানেই ছিলেন।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে একের পর এক জাতীয় গবেষণাগার স্থাপিত হয়। এর প্রথমটি জাতীয় পদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপিত হয় নয়াদিল্লীতে। এই গবেষণাগারের পরিচালন-দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে ডঃ কে এস কৃষ্ণানকে আহ্বান জানানো হয় এবং

মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন ছিলেন।

১৯৫৮ সালে ভারত সরকার ডঃ কৃষ্ণানকে জাতীয় অধ্যাপকরূপে মনোনীত করে তাঁর জীবনের সর্বোত্তম ব্রত গবেষণাকার্য চালিয়ে যাবার সুযোগ দান করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে বিশ্ব-বিদ্যালয় বরাদ্দ কমিশনের সদস্য নির্বাচিত করা হয়। ভারতের পরমাণুশক্তি কমিশনেরও তিনি সদস্য ছিলেন। এছাড়া, জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় বিভিন্ন বিজ্ঞান ও .... বৃত হন।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য কৃষ্ণান স্বদেশে ও বিদেশে বিশেষভাবে সম্মানিত হয়েছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি এবং ১৯৪৯ সালে মূল সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। ভারতের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রীতে ভূষিত করেন এবং বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি স্মৃতি বক্তৃতা ও সমাবর্তন ভাষণ প্রদান করেন। ১৯৫৪ সালে তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়। এবং এই বছর গত মার্চ মাসে তাঁকে বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য প্রথম 'ভাটনগর পুরস্কার' প্রদান করা হয়।

ডঃ কৃষ্ণান বহু আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং একাধিকবার ইউরোপ ও আমেরিকা পরি-ভ্রমণ করেন। ১৯৩৬ সালে ওয়ারশতে অনুষ্ঠিত আলোকদীপ্তি সংক্রান্ত আন্ত-র্জাতিক সম্মেলনে তিনি আমন্ত্রিত হন। পরের বছর তিনি কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিশ গবেষণাগারে, লন্ডনের রয়েল ইনস্টিটিউশনে এবং লিগে-র পদার্থবিজ্ঞান মন্দিরে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা করেন। শেষোক্ত স্থানে তাঁকে লিগে বিশ্ববিদ্যালয় পদকে ভূষিত করা হয়। ১৯৩৯ সালে ষ্ট্রাশবার্গে অনুষ্ঠিত চুম্বকতত্ত্ব সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিশ্বজ্ঞন সহযোগিতা সম্মেলনে তিনি আমন্ত্রিত হন। ১৯৫৬ সালে তিনি ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স-এর বিদেশী সহযোগী এবং ১৯৫৯ সালে আন্তর্জাতিক তার সংযোগ ইউনিয়নে সম্মানীয় অতিথিরূপে নির্বাচিত হন। এ ছাড়া ইউনেস্কোর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বর্ষের ভারতীয় জাতীয় কমিটির সভাপতিপদেও তিনি আসীন ছিলেন।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ডঃ কৃষ্ণান বিজ্ঞান-সাধনায় নিরত ছিলেন। মাত্র কিছুদিন আগেও তিনি ডালহৌসী পর্বতে গ্রীষ্মকালীন পদার্থবিদ্যা শিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। তামিল ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর মধ্যে বিজ্ঞান ও ধর্মের এক অপরূপ সমন্বয় ঘটেছিল। দিল্লীর বহু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর ও বন্ধুবৎসল। ভারতের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কৃষ্ণানের শূন্যস্থান সহজে পূর্ণ হবার নয়।

বৈদেশিকী

পশ্চিমা অথবা কম্যুনিস্ট কোনো জোটের সংগেই যুক্ত নয়, এই রকম রাষ্ট্রগুলির প্রধানদের যে সম্মেলনের আয়োজন হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকের মনে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা এখনো নেই। এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা হচ্ছেন সংযুক্ত আরব রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট নাসের এবং যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট টিটো। সম্মেলন যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে ১লা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে স্থির হয়েছে। সম্প্রতি কয়েকদিন ধরে কাইরোতে সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির বৈঠক হয়ে গেছে। তার বিবরণ সংবাদপত্রে যেটুকু প্রকাশ হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, সম্মেলনে কোন্ কোন্ রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ জানানো হবে, তাই নিয়ে যথেষ্ট বাগ্‌বিতণ্ডা এবং মতানৈক্য ছিল। তার অর্থ এই যে, "কোনো জোটের সংগেই যুক্ত নয়" এরূপ বলতে কী বুঝায়, তাই নিয়েই মতভেদ রয়েছে। তাছাড়া, সুপ্রতিষ্ঠিত নয় অথচ কারো কারো দ্বারা স্বীকৃত, এমন কয়েকটি গভর্নমেণ্টকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রশ্ন নিয়েও মতভেদ ঘটে। ভারত সরকারের পক্ষে পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী-জেনারেল শ্রী আর কে নেহরু কায়রোর বৈঠকে যোগদান করেন। সেখানে কোনো কোনো দিক থেকে ভারতীয় প্রতিনিধির মতের প্রবল বিরুদ্ধতা করা হয়। বিশেষ করে দু-একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কর্তৃক ভারতীয় মতের তীব্র বিরোধিতা খুবই লক্ষণীয় ব্যাপার ছিল। যাঁরা ভারতীয় মতের তীব্র বিরোধিতা করেন, তাঁদের মধ্যে সিংহলের প্রতিনিধি ছিলেন। সিংহল ক্ষুদ্র এবং ভারতের প্রতিবেশী বলেই বোধ হয় এই বিরোধী ভাবের প্রকাশটা এত বেশী উৎকট হয়েছিল।

সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভারত সরকারের দ্বিধার ভাব প্রধান উদ্যোক্তাগণের অজ্ঞাত ছিল না। তাঁরা এটাও জানেন যে, ভারত যোগ না দিলে এই ধরনের "নিরপেক্ষ" রাষ্ট্রনায়ক সম্মেলনের মর্যাদা খুবই অল্প হবে এবং ভারত যোগ না দিলে আরো অনেক রাষ্ট্র যোগ দিতে ইতস্তত করবে। তা সত্ত্বেও ভারতীয় মতকে আমল না দেওয়ার দিকে কাইরোর বৈঠকে কোনো কোনো দেশের প্রতিনিধির বিশেষ একটা ঝোঁক দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে শ্রী আর কে নেহরু প্রথম যেসব প্রস্তাব করেন, সেগুলি তিনি প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

ভারতীয় প্রতিনিধি নিজেকে যে অবস্থায় ফেলেন, তাতে ভারত সরকারের সম্মান বা তাঁর নিজের কর্মদক্ষতার গৌরব কোনোটাই বৃদ্ধি হয়নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমন্ত্রণের ব্যাপারটা যেখানে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাতে বিশেষ বাচ-বিচার কিছু থাকছে না—সাক্ষাৎভাবে পশ্চিমা "ন্যাটো, সিয়াটো এবং সেন্টো" তথা কম্যুনিস্ট "ওয়ার্সা-প্যাক্টে"র অন্তর্ভুক্ত যারা নয়, তাদের ছাড়া সকলেই দেখা যাচ্ছে আমন্ত্রণ পাবে।

এই সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভারত সরকারের দ্বিধার কথা অনেক প্রচার হয়েছে। কিন্তু এই দ্বিধার ভাব ভারত সরকারের সামগ্রিক মনোভাব অথবা ইহা দ্বারা এই ব্যাপার সম্পর্কে ভারত সরকারের ভিতরের একটা মতদ্বৈধ প্রতিফলিত হয়েছে, তা ঠিক স্পষ্ট নয়। এরূপ শোনা যায় যে, এই ব্যাপারে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের মধ্যে একটা মতের দ্বন্দ্ব চলে আসছে। আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলন মাত্রের প্রতিই পণ্ডিত নেহরুর নিজের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাই বলে শোনা মাত্রই সম্মতি প্রকাশ করবেন এবং যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করবেন এবং প্রেসিডেন্ট নাসের এবং প্রেসিডেন্ট টিটোর কাছ থেকে ভালো করে সব জেনে নেবার অপেক্ষা রাখবেন না শ্রী নেহরুর পক্ষে এরূপ করা সম্ভব নয়। সুতরাং শ্রী আর কে নেহরুকে কাইরোতে পাঠানোর পূর্বে প্রেসিডেন্ট নাসের এবং প্রেসিডেন্ট টিটোর সংগে পত্রালাপ করা শ্রী নেহরুর পক্ষে স্বাভাবিক এবং অনিবার্য ছিল। প্রস্তাবিত সম্মেলনে তিনি যোগ দিতে অনিচ্ছুক, এই ধরনের কোনো ভাব কোনো সময়ে শ্রী নেহরুর কোনো পত্রে প্রকাশ হয়েছিল, এরূপ মনে করার কোনো সংগত কারণ নেই। তা সত্ত্বেও নূতন দিল্লীর দ্বিধার ভাবটা কিছুদিন বেশ একটু ভালো করেই প্রচার হয়। তার কারণ—অনেকের ধারণা এই যে, শ্রী নেহরুর মনোভাব যাই থাক, তাঁর দপ্তর এবং উপদেষ্টাগণের মধ্যে এই বিষয়ে একটা মতের দ্বন্দ্ব আছে। একদল নাকি আছেন, যাঁরা আপাতত এই রকম কোনো সম্মেলনের পক্ষপাতী নন।

পশ্চিমা অথবা কম্যুনিস্ট কোনো জোটই যে এই সম্মেলনের আয়োজনকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখছে, তা নয়। তবে মনে হয়, পশ্চিমাদের চেয়ে কম্যুনিস্টদের কাছে এই সম্মেলন একটু বেশী অপ্রীতিকর ঠেকছে। তার কারণ এ নয় যে, সম্মেলনের আলোচনা একপেশে হবার ভয় আছে অথবা 'নিরপেক্ষ'দের মধ্যে যাদের প্রতি কম্যুনিস্ট ব্লক একটু বেশী সদয়, তাদের কোণঠাসা হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। কাইরোর বৈঠকে এই শেষোক্ত শ্রেণীর মুখরতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এই সম্মেলনে সাক্ষাৎভাবে পশ্চিমাদের কিছু লাভ হবে কম্যুনিস্ট ব্লকের এরূপ ভয় করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু অন্য কারণ আছে যার জন্য কম্যুনিস্ট ব্লক, বিশেষ করে সোভিয়েট ইউনিয়ন, এই সম্মেলনের প্রতি বিরূপ হতে পারে। সে কারণ হচ্ছে এই যে, এই সম্মেলনের দ্বারা এর প্রধান দুই উদ্যোক্তা প্রেসিডেন্ট নাসের এবং প্রেসিডেন্ট টিটোর যে মর্যাদা এবং প্রভাব বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে সেটা সোভিয়েট ইউনিয়নের একেবারেই কাম্য নয়। প্রেসিডেন্ট টিটোর প্রতি কম্যুনিস্ট ব্লকের ক্রোধের কারণ নূতন করে বর্ণনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। কম্যুনিস্ট ব্লক থেকে বেরিয়ে এসেও নিজেদের যুগপৎ কম্যুনিস্ট এবং "নিরপেক্ষ" বলে জাহির করার বিপজ্জনক অপরাধ মস্কো এবং পিকিং কখনো ক্ষমা করতে পারে না। যদিও ঠিক এই ভাষায় আর উচ্চারিত হয় না তাহলেও টিটোর ধ্বংস যে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট নীতির অন্যতম লক্ষ্য এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সম্প্রতি নাসের সরকারের উপরও কম্যুনিস্ট ব্লকের বিষনজর পড়েছে দেখা যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে "নিরপেক্ষ" নীতির অনুসরণ এবং পশ্চিমা শক্তিদের প্রভাব থেকে মুক্তিলাভের জন্য সোভিয়েট ব্লকের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র এবং আর্থিক সাহায্য গ্রহণের অনুপম ক্ষমতা প্রদর্শনের সংগে সংগে নাসের গবর্নমেণ্ট দেশের অভ্যন্তরে নিরংকুশ কম্যুনিস্ট-বিরোধী নীতি চালিয়ে এসেছেন। মিশরে এবং সিরিয়ায় কম্যুনিস্ট পার্টিকে দমন করার জন্য নাসের গবর্নমেণ্টের দিক থেকে কোনো ব্যবস্থারই ত্রুটি নেই। কম্যুনিস্ট বলে বহু লোক কারাগারে বন্দী রয়েছে। পশ্চিমাদের সংগে বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন নাসের গবর্নমেণ্টকে সাহায্যদান করে এসেছে, নাসের গবর্নমেণ্টের কম্যুনিস্ট-বিরোধী অভ্যন্তর নীতির কোনো প্রকাশ্য সমালোচনা করেনি। কম্যুনিস্ট ব্লকের আন্তর্জাতিক "স্ট্র্যাটেজি"র খাতিরে স্থানীয় কম্যুনিস্টদের তাদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট প্রেসিডেন্ট নাসেরের উপর আর সন্তুষ্ট নন। যে কারণেই হোক, সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট মনে করেছেন যে, সংযুক্ত আরব রিপাবলিক এবং পশ্চিমাদের মধ্যে যতখানি ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তার চেয়ে আর বেশী করা যাবে না, বরঞ্চ সেটা কিছু কমতে পারে এমন সম্ভাবনাই দেখা দিয়েছে। কেবল সোভিয়েট ব্লকের সাহায্য সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়, এ কথা গোপন রাখতে প্রেসিডেন্ট নাসের কিংবা সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চফ কেউই পারলেন না। সুতরাং এ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট নাসের বহিরাগত সাহায্য গ্রহণের দিক থেকে যতদূর সম্ভব এবং সত্যসত্যই নিরপেক্ষ হতে চাইবেন সেটা স্বাভাবিক। সেটা যে সোভিয়েট ইউনিয়নের ভালো লাগবে না তা-ও স্বাভাবিক। ফলে এতদিন নাসের গবর্নমেণ্টের আভ্যন্তর কম্যুনিস্ট-বিরোধী নীতির প্রতি সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট যে-চোখ বন্ধ করে ছিলেন সে-চোখ কিছুদিন হলো খুলেছেন এবং সংগে সংগে মুখও খুলেছেন। তার পাল্টা জবাবে কাইরো অভিযোগ করছে যে, সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট সংযুক্ত আরব রিপাবলিকের আভ্যন্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছেন। "নিরপেক্ষ" শব্দটি সোভিয়েটের কানে আর আগের মতো মধু বর্ষণ করে না, শ্রীক্রুশ্চফ সম্প্রতি একদিন বলেছেন প্রকৃতপক্ষে কেউই যে "নিরপেক্ষ" থাকতে পারে না।

এই অবস্থায় বেলগ্রেডে "নিরপেক্ষ"দের মেলা সোভিয়েট সরকারের আনন্দবর্ধক হবে এরূপ মনে করা যায় না। যাতে সোভিয়েট ইউনিয়নের সন্তোষ নেই এরূপ কোনো আন্তর্জাতিক ব্যাপারের সংগে সংযুক্ত হওয়া ভারতের পক্ষে উচিত নয় এই মতের লোক যাঁরা ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরে আছেন তাঁরা প্রস্তাবিত কনফারেন্সের প্রতি ভারত কর্তৃক অনাগ্রহ প্রদর্শনের পক্ষপাতী হবেন। পণ্ডিত নেহরু অবশ্য কনফারেন্সে যোগ দিবেন, কিন্তু তাঁর দপ্তরের ভিতরে দ্বন্দ্ব থাকায় এ ব্যাপারে নয়াদিল্লির কথাবার্তা, চালচলনে মাঝে মাঝে এলোমেলো হবার সম্ভাবনা আছে।

২৪।৬।৬১

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

ভবঘুরে (১৪)

এ কবিতার অনুবাদ যত কাঁচা জর্মানে যে কেউ করুক না কেন, মা-হারা কচি হৃদয়কে নাড়া দেবেই দেবে। হয়তো এ কবিতাটি মারিয়ানাকে শোনানো আমার উচিত হয়নি, কিন্তু ইয়োরোপীয় সাহিত্যে মাকে নিয়ে কবিতা এত কম, এবং আমার দেশের কবির এত সুন্দর একটি কবিতা—এ প্রলোভন আমি সংবরণ করতে পারিনি বললে ভুল বলা হবে—আমি কেমন যেন আপন অজানাতেই কবিতাটি আবৃত্তি করে ফেলেছি।

রবীন্দ্রনাথ 'পলাতকা' লেখার পর প্রায় চার বছর কোনো কবিতাই লেখেননি কিংবা অতি অল্পই লিখেছিলেন। তারপর কয়েকদিনের ভিতর অনেকগুলি কবিতা লিখে আমাদের ডেকে পাঠিয়ে সেগুলি পড়ে শোনালেন। 'মাকে আমার পড়ে না মনে' তারই একটি। এ কবিতাটি শুনে আমরা সবাই যেন অবশ হয়ে গিয়েছিলুম। শেষটায় কে একজন যেন গুরুদেবকে শুধালে, ঠিক এই ধরনের কবিতা তিনি আরো রচনা করেন না কেন? তিনি বললেন, মা-হারা শিশু তাঁর কাছে এমনই ট্র্যাজেডি বলে মনে হয় যে, ঐ নিয়ে কবিতা লিখতে তাঁর মন যায় না।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ যদি সেদিন মারিয়ানার মুখচ্ছবি দেখতেন তবে তিনি এ-কবিতাটি তাঁর কাব্য থেকে সরিয়ে ফেলতেন, এবং আমাদের উপর হুকুম করতেন, আমরা যেন কখনো আর এটি আবৃত্তি না করি।

ভেজা চোখেই মারিয়ানা শুধালো, 'তোমার নিশ্চয়ই মা আছে, আর তুমি তাকে খুব ভালোবাসো?'

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, 'তুমি কি করে জানলে?'

বললে, 'এ কবিতাটি তারই হৃদয় খুব স্পর্শ করবে যার মা নেই, আর যে মাকে খুব ভালোবাসে। আর আমার মনে হচ্ছিল, তোমার মা না থাকলে তুমি এ কবিতাটি আমাকে শোনাতে না।'

আমি বিস্ময়ে হতবাক। এইটুকু মেয়ে কি করে এতখানি বুঝলো। এতখানি হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারলো। তখন আবার নূতন করে আমি সচেতন হলুম, ছোটদের আমরা যতখানি ছোট মনে করি ওরা অতখানি ছোট নয়। বিশেষ করে অনুভূতির ক্ষেত্রে। এবং সেখানেও যদি বাচ্চাটি মা-হারা হয় তবে তার বেদনাকাতরতা এতই বৃদ্ধি পায় যে তার সঙ্গে কথা কইতে হয় বেশ ভেবে-চিন্তে।

এবারে শুধোলো শেষ মোক্ষম প্রশ্নঃ 'তুমি যে এত দূরে বিদেশে চলে এসেছো তাই নিয়ে তোমার মা কিছু বলে না? এই যে ঠাকুমা সমস্ত দিনরাত ঐ দোরের পাশের চেয়ারটায় বসে থাকতে চান কেন জানো? বাবা ঠিক সেটারই পাশের দরজা দিয়ে সব সময় বাড়ি ঢুকত—সদর দরজা দিয়ে নয়—অবশ্য আমার শোনা কথা। বাবা যেন সর্বপ্রথম ঠাকুমাকে দেখতে পায়, ঠাকুমাই যেন বাবাকে দেখতে পায়। লড়াইয়ের সময়েই সেটা আরম্ভ হল। বাবা যে কখন ছুটি পাবে, কখন বাড়ি পৌঁছবে তার ঠিক-ঠিকানা ছিল না বলে ঠাকুমা দিবারাত্তির ঐ চেয়ারটার উপর কাটাতো। এখনো সে অভ্যাস ছাড়তে পারে না।'

আমি মিনতি করে বললুম, 'আর থাক, মারিয়ানা।'

কান্না-হাসি হেসে বললে, 'আচ্ছা, তবে এ দিকটা থাক। এখন আমার কথার উত্তর দাও। তোমার মা কি বলে?'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'মাকে ফেলে দূরে চলে আসাটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাপ। কিন্তু কি করবো বলো। ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া করেছি, তার ইস্কুল-কলেজে পড়বো না—অবশ্য গাঁধীর আদেশে। বিদেশে না গিয়ে উপায় কি? কিন্তু মা কি সেটা বোঝে?'

এবারে মারিয়ানা হেসে উঠলো। বললে, 'তুমি ভারী বোকা। মারা সব বোঝে, সব মাপ করে দেয়।'

এর কথাই ঠিক। এ তো একদিন মা হবে।

আবার বললে, 'তোমার কিচ্ছুটি ভাববার নেই। দাঁড়াও, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই হল শেষ প্লেট। এটে পুঁছে নিয়ে বেশ করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নাও। এই যে বোতলে তরল সাবান আছে তাতে নেবুর খুশবাই মাখানো আছে। তোমাকে একটা কবিতা পড়ে শোনাবো—তুমি তোমারটা শোনালে না?'

আমি হাত ধুয়ে ঠাকুরমার মুখোমুখি দেয়ালের চেয়ারে এসে বসলুম।

রান্নাঘরের এপ্রন্ খুলতে খুলতে মারিয়ানা বললে, 'কই, দাও তোমার বইখানা। ঐ যাতে হাইনের কবিতা আছে। আশ্চর্য এই যোগাযোগ। মাত্র কয়েকদিন আগে আমরা ক্লাশে কবিতাটি পড়েছি।'

এক ঝটকায় কবিতাটি বের করে বেশ সুন্দর গলায়, সুস্পষ্ট উচ্চারণে পড়তে আরম্ভ করলো,

"আন্ মাইনে মুটার"—মাতার উদ্দেশে

'ইষ বিন্স্ গেভোন্ট্—'

সমস্ত কবিতাটি পড়ে শেষের কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করলে একাধিকবারঃ—

'আজ ফিরিয়াছে মন ভবনে আপন,
যেথা মা গো, তুমি মোরে ডাকিছ সদাই।
আজ দেখিলাম যাহা দৃষ্টিতে তোমার,
সেই তো মমতা,—চির আরাধ্য আমার।'[১]

আমি অস্বীকার করবো না, কবিতাটি আমার মনে অপূর্ব শান্তি এনে দিল। অন্য পরিবেশে হয়তো কবিতাটি আমার হৃদয়ের এতটা গভীরে প্রবেশ করতো না। বিশেষ করে ছাপাতে পড়া এক জিনিস আর একটি বারো তেরো বছরের মেয়ে—অবশ্য তার কবিতা পাঠ, তার রসবোধ দেখে তার হৃদয়-মনের বয়েস ষোল সতেরো বলতে কোনো আপত্তি নেই—তার 'মায়ের উদ্দেশে' কবিতা সুন্দর উচ্চারণে, দরদ দিয়ে পড়ে শোনাচ্ছে, সে একেবারে ভিন্ন জিনিস।

ঠাকুরমার গলা শোনা গেল। ক্ষীণ কণ্ঠে আমার উদ্দেশে বলছেন, 'তুমি কোনো চিন্তা করো না। তুমি তো কোনো অন্যায় করোনি। আর অন্যায় করলেও মা সব সময়েই মাপ করে দেয়। ছেলের অন্যায় করার শক্তি যতখানি, মায়ের মাপ করার শক্তি তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। আর তুমি তোমার মাকে ভালোবাসো সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা। কাছে থেকে না-ভালোবাসার চেয়ে কি দূরে থেকে ভালোবাসা বেশী কাম্য নয়? এই যে মারিয়ানার বাপ আমার আগে চলে গেল। আমার একটি মাত্র ছেলে। কিন্তু আমি জানি, সে মা-মেরির চরণতলে আশ্রয় পেয়েও এই মায়ের জন্য সে প্রতীক্ষা করছে। আমিও অনেক আগেই চলে যেতুম, কিন্তু এই তো রয়েছে আমার মারিয়ানা। আমি কি তার ঠাকুরমা? আমি তার মা। এ প্রথম মা হোক, তারপর আমি হেসে হেসে চলে যাবো। তুমি কোনো চিন্তা করো না। আপন কর্তব্য করে যাও।' ঠাকুরমা কথাগুলি বললেন অতিশয় ক্ষীণ কণ্ঠে কিন্তু তাঁর বাক্যে বিশ্বাসের কী কঠিন দার্ঢ্য।

আমি উঠে গিয়ে ঠাকুরমার হাত দুটিতে চুমো খেলুম। ফিরে এসে মারিয়ানার মস্তকাঘ্রাণ করলুম।

---

১ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ। পূর্বোল্লিখিত 'হাইনের শ্রেষ্ঠ কবিতা', পৃ ১৬ দ্রষ্টব্য।

জর্মান ভাষার নবীন সাধকদের এ স্থলে একটু সাবধান করে দি। ১৭ পৃষ্ঠায় মূল জর্মনে পঞ্চম ছত্র হবে চতুর্থ ছত্র, আর চতুর্থ ছত্র হবে পঞ্চম ছত্র।
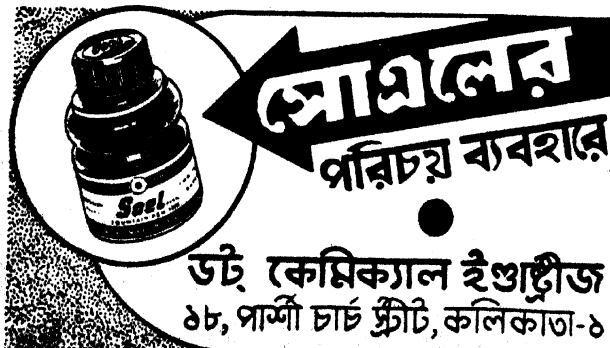
কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৭৬)

সেই গাঙ্গুলীবাবু! একটা অস্পৃশ্য ইলেক্‌ট্রিক্‌ শক্‌ যেন সমস্ত শরীরটাকে আচম্‌কা নাড়া দিয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। সেই গাঙ্গুলীবাবু! অফিসে আসার প্রথম দিনটি থেকে যার সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগ ছিল, সেই গাঙ্গুলীবাবু!

—কী হয়েছিল তাঁর? হঠাৎ সুইসাইড্‌ করতে গেলেন কেন?

দীপঙ্করের মনে হলো আকাশ যেন আর তার মাথার ওপর নেই, মাটি যেন পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে, বাতাস থেমে গিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিচ্ছে। সব সুখ, সব দুঃখ, সব বেদনা, সব আনন্দ, সব অনুভূতি যেন এক নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। এক অভূতপূর্ব নিশ্চেতনা ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করে ফেলবে! চোখের ওপর ভেসে গেল সেই চেহারাটা। সেই সংসার, বৌবাজারের গলির মধ্যেকার সেই অসুখী স্ত্রীটি। কত পরিপাটি যত্নে টেবিলের ওপরে সাজানো এমব্রয়ডারি করা ঢাকনি। দেয়ালে কত সযত্নে টাঙানো ফ্রেমে আঁটা নাড়ু-গোপালের কার্পেট। আর সেই স্ত্রী। স্ত্রী বলতো—যে নিজের স্ত্রীকে শাড়ি গয়না দিতে পারে না, তার গলায় দড়ি, গলায় দড়ি, গলায় দড়ি—

—কী হয়েছিল তাঁর? সুইসাইড্‌ করলেন কী ভাবে?

তিন বার করে গলায় দড়ি কথাটা উচ্চারণ করতো গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রী! দীপঙ্করের সামনেই তো সেদিন বলেছিল। কী করুণ কী ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল গাঙ্গুলীবাবুর মুখটা। গাঙ্গুলীবাবু কি সেদিন স্বপ্নেও কল্পনা করতে পেরেছিল এই মর্মান্তিক পরিণতির কথা! না কি গাঙ্গুলীবাবু সেই তখনি সিদ্ধান্ত পাকা করে ফেলেছিল! পলে পলে তিলে তিলে মৃত্যুর অপবাদ সইতে সইতে হয়ত অবধারিত মৃত্যুর সামনে এসে আর দ্বিধা করতে পারেনি। মৃত্যু বুঝি এমনি করেই আসে। আর মৃত্যুও তো নয় ঠিক এটা। এ যে অপমৃত্যু! অপমৃত্যুর হয়ত এই-ই নিয়ম!

—না স্যার, কেন যে সুইসাইড্‌ করলেন তিনি, তা কেউ জানে না। তিনি নিজে একটা চিঠি নাকি লিখে রেখে গিয়েছেন—লিখে গেছেন—তাঁর মৃত্যুর জন্যে আর কেউ দায়ী নয়—

—মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা!

দীপঙ্কর চিৎকার করে উঠলো। চিৎকার করা স্বভাব নয় বড় একটা দীপঙ্করের। কিন্তু হঠাৎ গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হলো। মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা! সবাই দায়ী, সবাই দায়ী এই মৃত্যুর জন্যে! আপনি দায়ী, আমি দায়ী, মিস্টার ঘোষাল দায়ী, মিস্টার ক্রফোর্ড দায়ী। জেনারেল ম্যানেজার দায়ী। রেলওয়ে বোর্ড দায়ী। আর শুধু আমরা কেন, এই যুদ্ধই বা কেন, আমরা যারা পৃথিবীতে এখনও বেঁচে আছি, সবাই-ই গাঙ্গুলীবাবুর মৃত্যুর জন্যে দায়ী! আমরা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছি, আমরা স্বার্থপর হয়ে উঠেছি, আমরা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দাবি করেছি, আমরা অমানুষ হয়ে গিয়েছি বলে গাঙ্গুলী বাবুরা অপঘাত-মৃত্যু বরণ করে।

—তিনি নিজের হাতে লিখে গেছেন স্যার, তাঁর উইডো লিখেছেন।

—তা হোক! আপনি আমার চেয়ে বেশি চেনেন গাঙ্গুলীবাবুকে?

সুধীরবাবু হকচকিয়ে গেলেন। বিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইলেন সেন-সাহেবের দিকে!

দীপঙ্কর বললে—আনুন, গাঙ্গুলীবাবুর পার্সোন্যাল্‌ ফাইলটা আনুন—মিস্টার ক্রফোর্ড নিজে স্যাংশন দিয়েছে তাঁর গ্রেড্‌, আনুন ফাইলটা—শিগ্‌গির আনুন আমার কাছে—

সুধীরবাবু তাড়াতাড়ি ফাইলটা নিয়ে এলেন। দীপঙ্কর ফাইলটা নিজের হাতে টেনে নিয়ে বললে—এই দেখুন, এই জায়গাটা দেখুন—একটা লোক চোদ্দ বছর একটা জার্নাল সেকশানে বসে পচছে। আপনাদের খেয়াল নেই—! একে প্রমোশন্‌ দেওয়া হয়েছে, আপনি জানেন না?

সুধীরবাবু সেন-সাহেবকে আগে এমন রাগতে দেখে নি কখনও। বললে—তিনি ফিরে এলেই তো খবরটা পেতেন—

—তা এ ক'মাস মাইনে নিচ্ছেন না দেখেও আপনাদের সন্দেহ হয়নি? আশ্চর্য!

আশ্চর্যই বটে! দীপঙ্করের চোখের সামনে যেন দৃশ্যটা ভেসে উঠলো। মোগল-সরাই স্টেশন। রাত্রে এসে ট্রেনটা থেমেছে। ট্রেন থেকে যথারীতি নেমেছে গাঙ্গুলীবাবু। স্ত্রী-কন্যা-পরিবার নিয়েই নেমেছে। স্ত্রীর

গায়ে দামী শাড়ি, দামী গয়না, পায়ে দামী জুতো!

—দিদিকে জামাইবাবু ফেরবার পথে কাশীটা দেখিয়েছিল, আমাকে কাশী দেখাবে না?

গাঙ্গুলীবাবু হয়ত বলেছিল—তাই জন্যেই তো নামছি এখানে।

স্ত্রী বললে— তাহলে এ-শাড়িটা বদলে নিই, কী বলো? একটা খারাপ শাড়ি পরলে লোকে কী বলবে?

—তা পরো।

কোনও কিছুতেই আপত্তি করেনি গাঙ্গুলীবাবু। কোনও কিছুতেই আর বিরাগ নেই গাঙ্গুলীবাবুর। বিরাগও নেই, অনুরাগও নেই। গাঙ্গুলীবাবু স্ত্রীর সব আবদার সব অনুরোধ পালন করে এসেছে সারা রাস্তা। স্ত্রী যা চেয়েছে তাই দিয়েছে। কাশ্মীরে গিয়ে শাল কিনেছে দিদিদের মতন, শাড়ি কিনেছে, ভেলভেটের জুতো কিনেছে। আইভরির চুড়ি কিনেছে। স্ত্রীর কোনও সাধই অপূর্ণ রাখেনি গাঙ্গুলীবাবু। নিঃশব্দে সমস্ত কর্তব্য পালন করে এসেছে। জামাইবাবুরা যা যা কিনেছে, যা যা খরচ করেছে, সব তেমনি করেই করেছে। টাকা আছে কি নেই, সে প্রশ্ন তোলেনি গাঙ্গুলীবাবুর স্ত্রী। গাঙ্গুলীবাবু দু'হাতে বিলিয়ে দিয়েছে নিজের আত্মাকে। তারপর দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে এসেছে মোগলসরাই স্টেশনে। যেন অনেক বছর জার্নাল সেকশানে একই চেয়ারে একই গ্রেডে চাকরি করে আসার পর, প্রথম প্রমোশনের আশায় উজ্জীবিত হবার লগ্ন এসেছে।

—আর কিছু কিনবে তুমি?

—আর কী কিনবো বলো?

—আর কোনও শাল, আর কোনও শাড়ি, আর কোনও শৌখীন জিনিস?

—কিনবো? তোমার আরো টাকা আছে?

গাঙ্গুলীবাবু উত্তর দিয়েছে—টাকার জন্যে তুমি ভেবো না, সেনবাবু আমাকে অনেক টাকা দিয়েছে খরচ করবার জন্যে, অনেক অনেক টাকা,—আরো টাকা দরকার হলে আরো পাঠাবে আমাকে—

স্ত্রীর মুখটা আনন্দে উপ্‌চে পড়তে লাগলো। বললে—সত্যি বলছো?

—সত্যি! আমার জন্যে প্রমোশনের ব্যবস্থাও করে দেবে সেনবাবু। কোনও ভাবনা নেই আর তোমার। তুমি আর কী কিনবে বলো না—

স্ত্রী বললে— তাহলে একটা বেনারসী কিনবো আমি, একটা খাঁটি কড়িয়াল বেনারসী—আমার বড়দির মতন, সাড়ে তিনশো টাকা তার দাম কলকাতাতে—

—তা তাই কিনো তুমি। আর কিছু কিনবে?

—আরো দেবে?

গাঙ্গুলীবাবু বলেছে—হ্যাঁ, তুমি যা ইচ্ছে কিনবে, আমার টাকার কথা ভেবো না—

—তাহলে, দেখ, আর একটা সস্তার বনারসী কিনবো, এই দেড়শো টাকার মতন দামে, যেটা এই বিয়ে-বাড়িতে পরে টরে যাওয়া যায়, আর সাড়ে তিনশো টাকারটা পুজোর সময় ঠাকুর দেখতে যাবার সময় পরবো, কী বলো?

গাঙ্গুলীবাবু বলেছে—সস্তা কেনবার দরকার কী? দুটোই দামী কেনো না।

—দুটোই দামী কিনবো? তাহলে বড়দিও চমকে উঠবে, দুজনেরই খুব হিংসে হবে জানো—আমার শাড়ি দেখে—

—তা তিনখানা কেন না। তিনখানা ইচ্ছে হলে তিনখানাও কিনতে পারো।

স্ত্রী বললে—না, তুমি ঠাট্টা করছো—

গাঙ্গুলীবাবু বললে—না ঠাট্টা নয়, তোমার কোনও সাধই আর অপূর্ণ রাখবো না—

সেই ওয়েটিংরুমের অন্ধকারে স্ত্রী গাঙ্গুলীবাবুর বুকের ওপর মাথাটা হেলিয়ে দিলে। চোখ দুটো বুজিয়ে বললে—ওগো, সত্যিই তুমি এত ভালো! তুমি আমার বড় জামাইবাবুর চেয়েও ভালো—! কেন তুমি আগে অমন ছিলে বলো তো! এখন কেমন তোমায় ভালো লাগছে আমার—

তারপর একটু থেমে বললে—ওগো, তাহলে এক কাজ করবো, পুজোর সময় কড়িয়ালটা পরবো, আর বড়দিদির মেয়ের বিয়ের সময় অন্য কড়িয়ালটা পরবো। খুব ভালো হবে, না গো? কথা বলছো না কেন, কথা বলো তুমি? সকলে কেমন চমকে যাবে না গো?

তারপর অনেকক্ষণ তেমনি করে বুকে

মাথা হেলিয়ে রেখে বলতে লাগলো—কিন্তু দেখ, কলকাতায় এবার ফিরে গিয়ে একটা মান্‌তাসা গড়িয়ে দিও আমাকে—

—তা দেব!

—আর গয়না গড়িয়ে রাখলে তো তোমার কিছু লোকসান নেই, খুকুর বিয়ের সময় আর তোমাকে সোনা কিনতে হবে না তখন।

তারপর আরো রাত হলো। ঘণ্টায় ঘণ্টায় অনুরাগের ডিভিডেন্ডের অঙ্ক বাড়তে লাগলো। জার্মান আর্মি তখন আরো অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে। সেবার শীতে পৌঁছিয়ে এসেছিল জার্মান-আর্মি, এবার এপ্রিল মাসেই গ্রাস করে নেবে সমস্ত রাশিয়া। ককেশাস্ চাই হিটলারের। ককেশাসের তেল বড় দরকারী। তেল না হলে ট্যাঙ্ক চলবে না, এরোপ্লেন চলবে না। মহাজনদের টাকা আট্‌কে থাকবে। আরো চালিয়ে নিয়ে যাওয়া চাই যুদ্ধটা। যুদ্ধ চললে সুধাংশু আরো প্রমোশন পাবে, চৌধুরীর আরো অ্যালাওয়েন্স্ বাড়বে, লক্ষ্মীদির আরো টাকা জমবে ব্যাঙ্কে। মানস সাধারণের মত রেলের কেরানী হবে না। সে গাড়ি চড়বে, সে বড় হবে, মানুষ হবে মহামানব হবে। আর নির্মল পালিত আরো বড়, আরো টাকার মালিক হবে। আরো ধনী, আরো ক্ষমতার অধিকারী। আরো নয়ন রঞ্জিনী দাসীর প্রপার্টি গ্রাস করতে হবে। আমেরিকা টাকা খাটিয়েছে পার্শিয়ার অয়েল-মাইনে, ব্রিটেন টাকা ইনভেস্ট্ করেছে ইজিপ্টে, ইণ্ডিয়ায়, আফ্রিকায়। ফ্রান্স টাকা খাটিয়েছে ইস্ট এশিয়ায়, জার্মানী ইটালী-কেও টাকা ইন্‌ভেস্ট্ করতে দিতে হবে। তাদের স্ত্রীদেরও কাশ্মীরে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে, তাদের স্ত্রীদেরও কড়িয়াল শাড়ি কিনে দিতে হবে। তাদের স্ত্রীদেরও মান্‌তাসা কিনে দিতে হবে। লোভের সিংহাসনে সবাই সম্রাট হয়ে বসবে। আর কোনও উদ্দেশ্য নেই, আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই কারো—

গাঙ্গুলীবাবুরও আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। গাঙ্গুলীবাবুরও আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই। গাঙ্গুলীবাবু উঠলো ইজি-চেয়ারটা ছেড়ে। মোগল-সরাই স্টেশন তখন শান্ত হয়ে এসেছে। বিরাট ইয়ার্ডের কোন্ কোণে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তখন শান্টিং-ইঞ্জিন গাড়ি কাটছে আর গাড়ি জুড়ছে। প্ল্যাটফরমের ওপর ফালতু কয়েকটা লোক ঘুমিয়ে আছে অকাতরে। কোন্ ঘাটের লোক তারা, কোথায় এসে কোন্ ঘাটে নৌকো ভিড়িয়েছে জীবনের।

গাঙ্গুলীবাবু একটু নড়তেই স্ত্রী বললে—কোথায় যাচ্ছো?

—এই দেখে আসি, কখন ট্রেন আসবে!

ওধারে পাহাড় জমে আছে গুঁড়ো কয়লার। ওয়াটারিং স্টেশন। মাথার ওপর কলের জলের ওভার-হেড্ পাইপ্। কয়েকটা পোকা লাইট-পোস্ট ঘিরে বাতিটার তলায় খেলা করছে। চাদরটা গলায় ছিল, সেটা গলা থেকে নামিয়ে নিলে গাঙ্গুলীবাবু। কড়িয়াল শাড়ি, সোনার মান্‌তাসা, বড় জামাইবাবু, খুকু, খুকুর বিয়ে, কাবুলি-ওয়ালা, কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক, সব ঝাপ্‌সা হয়ে এল! পাশেই একটা গাছ। কী গাছ ভগবান জানে। ঠিক হাতের একটু ওপরেই একটা মোটা ডাল। গাঙ্গুলীবাবু ডালটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। এম-এ পাশ করেছে গাঙ্গুলীবাবু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি থেকে। রেলের জার্নাল সেকশানের এ-বি গ্রেডের ক্লার্ক। ডিভিডেণ্ডের রেসে আমি লাস্ট্ হর্স। আমায় আপনি ঘৃণা করবেন না। পারেন তো আমায় ক্ষমা করবেন।

আর চেষ্টা করবেন আমায় ভুলে যেতে। যেমন আমি ভুলে গিয়েছি এখন। আমার স্ত্রী-কন্যা সকলের কথা ভুলে গিয়েছি। মনে করবেন সমাজে গাঙ্গুলীবাবু নামে একটা জাস্ট্‌বিন্ ছিল, এই সভ্যতার সুইপার এসে তাকে লাথি মেরে দূর করে দিয়েছে।

—তারপর?

মোগল-সরাই স্টেশনে সেদিন একজন স্ত্রীলোক আর একটা শিশুর কান্নায় ট্রেন-চলাচল কিছুক্ষণের জন্যে ব্যাহত হয়েছিল কিনা তার বিবরণ কোথাও লেখা নেই। এক্স্-ক্লার্ক গাঙ্গুলীবাবুর পার্সোন্যাল ফাইলেও লেখা থাকার কথা নয়। তবু দীপঙ্কর কল্পনা করে নিতে পারে। যথারীতি বেনারসের ট্রেনটা এল। ওয়েটিং-রুমের একটি বিধবা-পরিবার সেদিন সেই সেখানেই কাড়িয়াল শাড়ি আর সোনার মান্‌তাসার শোকে অধীর হয়ে উঠেছিল, কিন্তু লোকে বললে—বড় প্যাথেটিক্ সীন্ মশাই—! সত্যিই, কী নিষ্ঠুর হাসব্যাণ্ডটা! স্ত্রী আর

মেয়েকে ওয়েটিং-রুমের মধ্যে রেখে নিজে কি না সুইসাইড করলো গলায় দড়ি দিয়ে! স্ত্রীর দিকটা একটু ভেবেও দেখলো না মশাই—এমন পাষণ্ড স্বামী!

দীপঙ্কর বললে—যাক্, আপনার হাতে এস্ট্যাব্লিশ্মেন্টের ভার দেওয়া হয়েছে, শুধু আইন মেনটেন্ করবার জন্যে নয় সুধীরবাবু, সুবিচার করবার জন্যে। আপনারাই দেখবেন কোথায় ইন্জাস্টিস্ হচ্ছে—

সুধীরবাবু বললে—স্যার, আমি তো এর জন্যে দায়ী নই—

—আপনাকে বলছি না আমি সুধীরবাবু, আমি নিজেকেও বলছি। আপনি আমি সবাই দায়ী এ-জন্যে। গাঙ্গুলীবাবু কি একটা আছে সুধীরবাবু আমাদের অফিসে? আমি জানি না আমি চিনি না এমন অনেক গাঙ্গুলীবাবু আছে সেকশানে-সেকশানে! আজ তারা হয়ত মোগল-সরাই স্টেশনে গিয়ে আত্মহত্যা করে নিজেদের দুঃখের জ্বালা জুড়োয়, কিন্তু দলে যেদিন তারা ভারি হবে, সেদিন আর তা করবে না, সেদিন এই আফিসের ভিত পর্যন্ত টলিয়ে দেবে—যান্ আপনি—

সুধীরবাবু ছাড়া পেয়ে বাঁচলো। দরজার বাইরে চলে গেল।

পেছন থেকে দীপঙ্কর আবার ডাকলে—সুধীরবাবু, শুনুন—

সুধীরবাবু আবার ঘরে ঢুকতেই দীপঙ্কর বললে—গাঙ্গুলীবাবুর ডেকে-ন্সিতে বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র সরকার এখনও কাজ করছে তো?

—হ্যাঁ স্যার।

—তাহলে ওখানে লক্ষ্মণবাবুকে অ্যাব্সর্ব্ করে নেবেন—যান্—

সনাতনবাবু এতক্ষণে কথা বললেন। বললেন—আপনাদের তো অনেক কাজ এখানে দীপঙ্করবাবু?

দীপঙ্কর বললে—কাজ তত নয় সনাতন-বাবু, যতটা কাজের আড়ম্বর। কাজ যদি সবাই করে, তাহলে কাজের চাপও কমে যায়। কিন্তু সে থাক্, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, চলুন—আপনার এখনও খাওয়া হয়নি—

তারপরে টেলিফোন্টা তুলতে গিয়েও রেখে দিলে। বললে—আর টেলিফোন্ করবো না, আপনাকে হঠাৎ দেখে খুব অবাক হয়ে যাবে সতী। আপনি আসবেন ভাবতেই পারবে না—বড় খুশী হবে—

—কিন্তু হঠাৎ অজ্ঞানই বা হলেন কেন দীপঙ্করবাবু? শরীর খারাপ নাকি? আর তা ছাড়া অভ্যেস তো নেই, অফিসের এত খাটুনি সহ্য হবে কেন?

তারপর যেন নিজের মনেই কী ভেবে নিয়ে বললেন—অথচ দেখুন, এ-চাকরি করার কোনও দরকার ছিল না, সামান্য অর্থের জন্যে এ কী পরিশ্রম বলুন তো। স্ত্রীলোকদের কি এসব হ্যাঙ্গাম সহ্য হয়?

দীপঙ্কর বললে—আপনি যদি একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান তো ওর ভাল হয়—আপনি জানেন না সনাতনবাবু, আপনাদের কাছে থাকতে ওর কত লোভ। মনে প্রাণে সতী তো স্ত্রীই হতে চায়, গৃহিণীই হতে চায়, ওর নিজের জায়গায় ওর আসল আসনটাই পাততে চায় কিন্তু ভাগ্যচক্রে সেটাই সতী পেলে না—

—হ্যাঁ ভাল কথা। আমার চিঠিটা পেয়ে কী বললেন তিনি?

দীপঙ্কর সব কথাই খুলে বুঝিয়ে বললে। কেমন করে তার ময়মনসিং-এ বদলির অর্ডার অপ্রত্যাশিত ভাবে রদ্ হয়ে গেছে। সকাল বেলা অফিসে এসে চিঠিটা সতীকে পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকলেও কেন দেওয়া সম্ভব হয়নি, সবই বললে। বললে—মিস্টার ঘোষাল ধরা পড়ে ভালো হলো কি মন্দ হলো জানি না—তবে মনে হলো এই সুযোগে হয়ত সতী আপনাদের কাছেই যেতে চাইবে। এখন তার সমস্ত আশ্রয়ই ভেঙে গেছে এখন এক আপনি ছাড়া তার কেউই নেই বলতে গেলে—

সনাতনবাবু সব শুনলেন। বললেন—রাগ করে অনেক মানুষ নিজের পায়ে কুড়ুল মারে দীপঙ্করবাবু, কিন্তু আমরা কুড়ুলটা মারাটাই তার দেখি, রাগটা আর দেখি না—।

দীপঙ্কর বললে—আজ কি আপনি তার রাগটাই বড় করে দেখবেন সনাতনবাবু?

সনাতনবাবু বললেন—আমি কোনটাই দেখি না দীপঙ্করবাবু, আমি মানুষটাকেই দেখি। আমি তাকে চিনেছি বলেই আপনার টেলিফোন্ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি। আপনি তাকে হয়ত বেশি চেনেন, কিন্তু আমিও তো তাকে কম চিনি না—

—আপনার মা'কে এবার একটু বুঝিয়ে বলবেন সনাতনবাবু। অনেক দিন আগে একবার সতীকে অনেক বুঝিয়ে আপনার মা'র কাছে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন যে-শাস্তি সে পেয়েছিল, তারপর তাকে আর কোনও অনুরোধ করার সাহসই আমার নেই—। এবার কোনও উপায় না পেয়ে শেষবারের মত তাই আপনাকেই ডেকেছি—

সনাতনবাবু বললেন—আমার মা'কে আপনি ঠিক চেনেন নি দীপঙ্করবাবু!

—কিন্তু এত অত্যাচার তিনি সতীর ওপর কেন করেন? সতীও তো মানুষ! সতীও তো একদিন আবার মা হবে, একদিন আবার শাশুড়ি হবে, সেদিন এমনি করেই যদি সে তার পুত্রবধূর ওপর পীড়ন করে?

সনাতনবাবু হাসতে লাগলেন। বললেন

—আমার মা তো মা বলেই পীড়ন করে, আর সতী সতী বলেই বিদ্রোহ করে, আমি বাধা দিতে গেলেও তারা যে তাই-ই করবে—

—কিন্তু অন্যায়ের বিপক্ষে আপনি বাধা দেবেন না?

—কিন্তু কাকে আপনি অন্যায় বলছেন দীপঙ্করবাবু?

—সতীকে অত্যাচার করাটাও অন্যায় নয় বলতে চান আপনি? কী অন্যায় করেছে সে? আপনাদের কতটুকু ক্ষতি করেছে সে যার জন্যে আজ আপনাদের বাড়ির বউ হয়ে এত বড় অসামাজিক কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। জানেন, আর একটু হলে সে আপনাদের বাড়ির সামনের বাড়িটা ভাড়া করে আপনাদের চোখের সামনে অসামাজিক জীবন-যাপন করতো? তাতেও সে পেছ্‌পাও হয়নি! তার এই অধঃপতনের জন্যে কে দায়ী? সে, না আপনারা?

সনাতনবাবু বললেন—আপনি তো খুব উত্তেজিত হতে পারেন দীপঙ্করবাবু?

—উত্তেজিত হবো না? সতীকে আপনারা কোথা থেকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে এসেছেন জানেন? আপনি তো আপনার মা'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন নি কোনওদিন! চোখের সামনে অন্যায় দেখেও তো কোনও প্রতিকার করেন নি তার?

সনাতনবাবু প্রশান্ত দৃষ্টিতে দীপঙ্করের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন।

বললেন—আপনি দীপঙ্করবাবু সত্যিই উত্তেজিত হয়ে পড়েন সহজে—

—কিন্তু এমন করে এড়িয়ে যেতে পারবেন না সনাতনবাবু! আপনাকে আজ জবাব দিতেই হবে। বলতেই হবে কেন আপনি এত সহজ? কেন এত নির্বিরোধী? কার ভয়ে কীসের স্বার্থে আপনি একটা কথাও জোর গলায় বলতে পারেন না?

সনাতনবাবু হাসতে লাগলেন আবার। বললেন—প্রতিবাদ করলেই কি প্রতিকার হয় দীপঙ্করবাবু?

—কিন্তু অন্যায় সহ্য করাও তো আর এক রকমের পাপ!

সনাতনবাবু বললেন—প্রতিবাদ করলেই কি পূবের সূর্য পশ্চিমে ওঠে?

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু পূব দিকে সূর্য ওঠা তো অন্যায় নয় সনাতনবাবু। তার প্রতিবাদ করতে তো কেউ আপনাকে বলছে না?

সনাতনবাবু বলেন—আপনি হয়ত বলছেন না, কিন্তু কেউ কেউ তো বলে! আমার মা তো বলে। আমার মা বলে পূব দিকে সূর্য ওঠাটা নাকি ঠিক নয়,—

দীপঙ্কর বললে—কিন্তু আপনি তো জানেন সেটা ভুল। সুতরাং সেটার প্রতিবাদ করা আপনার উচিত ছিল—! তখন বোঝা উচিত ছিল সতী যেটা বলে সেইটেই ঠিক।

সনাতনবাবু আরো হাসতে লাগলেন। বললেন—না, তাই-ই বা কী করে বলি দীপঙ্করবাবু? ওদিকে সতী যে বলে পশ্চিম দিকে সূর্য ডোবাটাও বেঠিক—! এখন আমি কার প্রতিবাদ করি, বলুন? যা যখন নির্মল পালিতবাবুকে বিশ্বাস করেছিল, তখনও তাই আমি প্রতিবাদ করিনি, সতী যখন বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তখনও তাই প্রতিবাদ করিনি। তাতে লাভ-লোকসান কার কী হলো জানি না, কারণ লাভ ক্ষতি দিয়ে তা আমি জীবনকে বিচার করি না—,সে বিচার করবে মারোয়াড়ীরা, সে বিচার তো হিসেব-নবিস বিচার—

দীপঙ্কর খানিকক্ষণ সনাতনবাবুর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এ-মানুষটাকে যেন আজ নতুন করে চিনতে পারলে দীপঙ্কর। একটা লাজুক, মুখচোরা ভীরু, মেরুদণ্ডহীন লোক বলেই এতদিন ধারণা হয়েছিল সনাতনবাবুকে। কিন্তু আজ যেন দীপঙ্কর নিজের সামনে নতুন এক সনাতনবাবুকে দেখতে পেলে।

হঠাৎ দীপঙ্কর বললে—তা হলে সতীর জন্যে আপনি কোনও অভাব অনুভব করেন না, বলুন?

—কে বললে, করি না? সতীর সঙ্গে কি আমার লাভ-লোকসানের সম্পর্ক যে তার অভাব বোধ করবো না আমি? আকাশে মেঘ করলে সূর্যের অভাব বোধ করবো না, আমাকে কি আপনি এতই নিষ্প্রাণ মনে করেন? যেদিন পড়ে গিয়ে মা'র পা মচ্‌কে গেল, সেদিন রাত্রে আমার ঘুম আসেনি, সে

কি মা'র সংগে আমার লাভ-লোকসানের সম্পর্ক থাকলে সম্ভব হতো ?

এ এক বিচিত্র মানুষ সনাতনবাবু! এ এক বিচিত্র ছেলে, এ এক বিচিত্র স্বামী! দীপংকর তখনও অবাক হয়ে চেয়ে আছে সনাতনবাবুর দিকে! সনাতনবাবু হঠাৎ বললেন—চলুন দীপংকরবাবু, আর দেরি নয়, আপনার একটু কাজের ক্ষতি করেও চলুন—

মনে আছে সেদিন দীপংকর আফিস থেকে বেরিয়ে হাসপাতালে যাবার সমস্ত, রাস্তা-টাতে বার বার অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছিল সনাতনবাবুর দিকে। এতদিন তবে কোন সনাতনবাবুকে দেখে এসেছে? কোন্ সনাতনবাবুকে চিনে এসেছে? এতদিনের সব চেনা কি তার ভুল চেনা? এতদিনের সব দেখা কি তবে ভুল দেখা?

দীপংকর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা সনাতনবাবু, এতদিন সতী যে মিস্টার ঘোষালের ফ্ল্যাটে ছিল, তাতে আপনার কোনও কষ্ট হয়নি ?

সনাতনবাবু যেন চমকে উঠলেন। বললেন —মিস্টার ঘোষালের ফ্ল্যাটে মানে ?

দীপংকর বললে—মিস্টার ঘোষালের ফ্ল্যাটে ঠিক নয় অবশ্য, কিন্তু পাশা-পাশি ফ্ল্যাটে তো ছিল! তা শুনেও আপনার কষ্ট হয় নি?

সনাতনবাবু বললেন—কে বললে কষ্ট হয়নি ? কষ্ট হয়েছে বলেই তো আজ তাঁর বিপদের কথা শুনে এখুনি তাকে দেখতে যাচ্ছি—

—আর তখন কি সুখে ছিল বলেই দেখতে যাননি ?

সনাতনবাবু বললেন—সুখে তিনি কোনওদিন ছিলেন না দীপংকবাবু, তিনি সুখে থাকতে পারেন না। সুখ তাঁর জন্যে নয়—

—কেন ? তারও কি সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকতে নেই ? তারও কি অন্য আর পাঁচজন মেয়ের মত স্ত্রী হয়ে স্বামীর সংসার করতে ইচ্ছে হয় না, মনে করেন ?

সনাতনবাবু বললেন—সুখ কথাটা বড় গোলমেলে দীপংকরবাবু। সুখের জন্যেই আমরা সবাই চেঁচাই, কিন্তু সুখই কি আমরা সবাই চাই ? সতীর কথা ছেড়ে দিন, আমার মা-মণিই কি সুখ চেয়েছিল ? আমার মা-মণি সুখ চাইলে সুখই পেত, সতীও সুখ চাইলে সুখ পেত।

—সুখ চায়নি তো কী চেয়েছিল ?

সনাতনবাবু বললেন—আমার মা--মণি চেয়েছিল টাকা—

—আর সতী ? সতী কী চেয়েছিল ?

সনাতনবাবু বললেন—তার সংগে আমার শুধু বিয়েই হয়েছিল,—তিনি তখন নিজেই জানতেন না তিনি কী চান !

—তারপর ? তারপর বিয়ের পরে কী চেয়েছিল ?

সনাতনবাবু বললেন—তিনি চেয়েছিলেন স্বামীকে, তিনি চেয়েছিলেন আমাকে। তিনি সুখ চাননি। তিনি জানতেন না যে কোনও কিছুকে অবলম্বন করে সুখ চাইতে গেলে, অবলম্বনটাও যায়, সুখও আসে না—

—কিন্তু এত জেনেও তাকে আপনি কেন এত কষ্ট দিয়েছেন সনাতনবাবু?

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু জেনেও তো আমি অসহায় ছিলাম দীপংকরবাবু। আমি যে আমার নিজেকে দিয়েও তাঁকে সুখী করতে পারতাম না। কারণ তাঁর চাওয়াটাই ছিল ভুল—

দীপংকর এবার দৃঢ় হয়ে উঠলো। বললে —সনাতনবাবু, আমার একটা অনুরোধ আপনি রাখুন, আমার একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতে অনুরোধ করছি—রাখবেন?

তখন গাড়ি গড়িয়ে চলছে তীর বেগে। রেলের আফিসের সেই বন্ধন থেকে দীপংকর তখন বেরিয়ে এসেছে। রাস্তায় একটা প্রোসেসন চলেছে। সামনে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ নিয়ে একজন সকলকে সামলে চলেছেন। বেশ ফরসা চেহারা। খদ্দরের পোশাক পরা। হৃষ্টপুষ্ট মুখখানা। পেছনে অসংখ্য ছেলে। গান্ধী টুপি মাথায় পরা। হঠাৎ নজরে পড়লো প্রাণমথবাবুকে। সেই গোড়ালী চাপা সু-জুতো। সেই পান-খাওয়া মুখ। সেই দৃঢ় বলিষ্ঠ মুখশ্রী। সকলকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। সেই ঠিক আগেকার মত। ঠিক সেই ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল স্কুলের সময় যেমন করতেন। খাঁ খাঁ করছে রোদ। আর ঠিক তাঁর পাশেই ফোঁটা। ফোঁটার গায়ে আরো সাদা খদ্দর। আরো পাতলা খদ্দর। ফোঁটারই যেন উৎসাহটা বেশি। সমস্ত কলকাতাটা যেন আজ কংগ্রেসের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। শুধু কি ফোঁটার মুখের দিকে ? শুধু কি ছিটের মুখের দিকে ? শুধু কি প্রাণমথবাবুর মুখের দিকে। সমস্ত ইণ্ডিয়া তখন আরো উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছে মহাত্মা গান্ধীর মুখের দিকে, জওহরলাল নেহরুর মুখের দিকে, বল্লভভাই প্যাটেলের মুখের দিকে। আর কার দিকেই বা চাইবে ? সুভাষ বোস যে নেই, সি আর দাশ যে নেই। কুইট্ ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়া থেকে চলে যাও। আমরা আমাদের দেশ নিজেরা চালাবো। হরিজন পত্রিকায় গান্ধী লিখেছেন—

Whatever the consequences, therefore, to India, her real safety and Britain's too lie in orderly and timely withdrawal from India.

সমস্ত পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে গেছে কংগ্রেসের প্রস্তাব শুনে। এ বিদ্রোহ! এ বিপ্লব। বেয়নেট-এর মুখে এর জবাব দিয়ে দাও। চার্চিল সাহেব মুখে চুরোট পুরে দিয়ে হেসেছে শুধু। ইণ্ডিয়া তো আর শুধু কংগ্রেসের নয়। ইণ্ডিয়া তো আর শুধু মিস্টার গান্ধীর নয়।

মধুসূদনদের রোয়াকে হয়ত তখনও সেই আড্ডা চলে। সেই আগেকার মত। দীপঙ্কর আর যায়নি সেখানে। হয়ত দুনিকাকা আরো বুড়ো হয়ে গেছে। হয়ত পঞ্চাদাও সেই আগেকার মত তর্ক করে খবরের কাগজ নিয়ে।

—আরে বাবা, কংগ্রেসই তো আর সর্বেসর্বা নয়?

পঞ্চাদা হয়ত বলেছে—তা কংগ্রেস সর্বেসর্বা নয় তো, কে সর্বেসর্বা শুনি? তোমার চার্চিল?
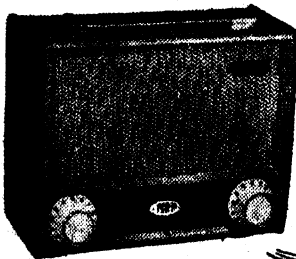
চার্চিলের নাম শুনে সবাই হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ে। কোথায় রইল চার্চিল। রুজভেল্ট না এলে কোথায় থাকতো চার্চিল বাছাধন!

চার্চিল সাহেব বলেছে—ইণ্ডিয়ায় কি শুধু হিন্দু আছে? মুসলমান নেই? মহম্মদ আলি জিন্নাও তো একজন লীডার। তারপর সিডিউলড্ ক্লাশ আছে, আম্বেদকর আছে—। কংগ্রেসকে মানবো কেন শুনি? কংগ্রেস কে?

পঞ্চাদা বলেছে—তা তুমি কেন বাধা দিচ্ছ দুনিকাকা? স্বরাজ হলে তুমিও তো বেনিফিট্‌টা পাবে? চাল সস্তা হবে, ডাল সস্তা হবে, দুধ সস্তা হবে—

দুনিকাকা বলেছেন—ছাই হবে, ছাই হবে, এই কাঁচকলাটা হবে—

মধুসূদনের বড়দা বলেছে—এই তোমাদের মত সব লোকের জন্যেই স্বরাজ আটকে যাচ্ছে দুনিকাকা, নইলে অ্যাদ্দিনে কবে এসে যেত—

দুনিকাকা ক্ষেপে যেত—আরে আমার কথা ছেড়ে দে, আমি তো ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের খয়ের খাঁ,—জিন্নাকে কথাটা বোঝাগে যা না। ওই আম্বেদকরকে বোঝা না গিয়ে তোরা, তার বেলায় তো পেটে ইংরিজী বিদ্যে নেই—বোঝাগে যা—

সত্যিই তো। নাইন্‌টি মিলিয়ন মুসলিম আছে, ফিফ্‌টি মিলিয়ন ডিপ্রেসড্ ক্লাশ আছে, নেটিভ স্টেটে নাইন্‌টি ফাইভ মিলিয়ন প্রজারা আছে—টোট্যাল তিনশো নব্বুই মিলিয়ন লোকের মধ্যে দুশো পঞ্চান্ন মিলিয়ন তো তারাই। তাদের বোঝাগে যা! তারা তোদের গান্ধীর কথা শুনবে? তারা গান্ধীকে মানে?

তারপর একটু থেমে দুনিকাকা বললে—আর তোরা কেউ তো কারো কথা বুঝিস না, দেশে হাজারটা ভাষা, বিহারীদের বলিস মেড়ো, মুসলমানদের বলিস নেড়ে—তোরা তো বলিস, ইণ্ডিয়া—ইণ্ডিয়া—তোদের নিজেদের মধ্যেই কী মিলটা আছে শুনি? স্বরাজ হলে সামলাতে পারবি এত ঝঞ্ঝাট?

রাগে ঘেন্নায় কথাটা বলে দুনিকাকা যেন নিঃশব্দে একটা ছি ছি করে ওঠে।

সামনে প্রাণমথবাবুকে দেখে তবু দীপঙ্করের যেন একটু আশা হলো। কোথাও কোনও বিরোধ নেই মানুষটার মধ্যে! সেই নাইন্‌টি মিলিয়ন হিন্দুর প্রতিনিধি সেজেও তো আজ বেরিয়েছেন রাস্তায়। এই একই প্রশ্ন যদি করা যায় প্রাণমথবাবুকে তো প্রাণমথবাবু কী জবাব দেবেন? প্রাণমথবাবু তো বিরোধে বিশ্বাস করেন না, অবিশ্বাসে বিশ্বাস করেন না, তাহলে প্রাণমথবাবু এ-কথার কী জবাব দেবেন?

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আমেদাবাদে বলেছেন—

Anarchy is always preferable to slavery, as there is hope of independence arising out of anarchy. The movement will not collapse if the leaders are rounded up.

প্রসেসনটা আস্তে আস্তে সরে যেতেই গাড়িটা আবার ছেড়ে দিলে। দীপঙ্কর পাশের দিকে চেয়ে দেখলে। সনাতনবাবু তখনও সেই মিছিলের দিকে চেয়ে আছেন।

রেলের হস্‌পিট্যাল। দীপঙ্কর আগে নিজে নেমে বললে—আসুন—

সনাতনবাবু নেমে দাঁড়িয়ে বললেন—আমি বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছি দীপঙ্করবাবু—

—কেন? চঞ্চল হচ্ছেন কেন? এমন কিছু তো হয়নি সতীর, এমনি আনকন্‌সাস্ হয়ে পড়েছে।

সনাতনবাবু বললেন—না সেবার ডাক্তার বলেছিলেন কিনা, নার্ভটা তাঁর খুব শ্যাটার্ড হয়ে গেছে। কখনও শান্তি তো পাননি—

দীপঙ্কর বললে—সুখ দেওয়া যখন আপনার ক্ষমতার বাইরে, তখন শান্তি তো আপনি একটু দিতে পারেন সতীকে—

সনাতনবাবু বললেন—হ্যাঁ, আমি শান্তি তো দিতেই পারি, আমার সাধ্যে যেটুকু কুলোয়, সেইটুকু শান্তি তো আমি দিতেই পারি—সেটাও তো আমার কর্তব্য!

তারপর খুঁজে খুঁজে কেবিন্ নম্বর বার করে দীপঙ্কর বললে—এই কেবিনেই আছে সতী—

সনাতনবাবু বললেন—চলুন, আপনিও চলুন ভেতরে—

দুজনে একসঙ্গেই কেবিনে ঢুকলো। দীপঙ্কর দেখলে। সনাতনবাবুও দেখলেন। মিস্টার ঘোষাল সতীর মাথার কাছে বসে তার মাথার কোঁকড়ানো চুলগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আর সতী চেয়ে আছে তার মুখের দিকে।

(ক্রমশ)

তাড়াতাড়ি তার পাঠাতে হলে বড় বড় পোস্টাপিসে যাওয়া নিছক বাড়াবাড়ি ছাড়া কিছু নয়।

বাড়িয়ে বলছি না একটুও, কাছাকাছি তেমন একটা পোস্টাপিসে তার করতে গিয়ে টেলিগ্রাম মাথায় থাক, আমার নিজেরই হারিয়ে যাবার মত হয়েছিল। ইংরেজি 'Q' হরফের ন্যায় প্রায় সাতটা প্যাঁচালো লাইন পড়েছিল সেই পোস্টাপিসে। সাতটাই হবে মনে হয়, তবে সাতাত্তরটা হলেও আমি অবাক হব না। অনেক ভেবে চিন্তে তাদের একটাকে বেছে নিয়ে সারির সব পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

তারপর এক পা এক পা করে এগোচ্ছি। চলেছি তো চলেইছি। জরুরী টেলিগ্রামের গরজ যেন একা আমারই, আর কারোই যেন সে রকমের কোন তাড়া নেই। অনন্তকাল ধরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে শেষটায় কাউণ্টারের সামনে গিয়ে পৌঁছলাম।

তখন জানা গেল, সেটা টেলিগ্রামের লাইন নয়, ডাকটিকিটের এলাকা। আবার ফিরে এসে আরেক লাইনে খাড়া হতে হল, আবার সেই শম্বুক যাত্রা, যাত্রার শেষে জানলাম সেটা হচ্ছে মনিঅর্ডারের লাইন। এমনি করে সাত লাইনে সাত পাক ঘুরে রেজেস্ট্রিকে ছাড়িয়ে, পার্শেল টার্শেলের পারাবার পার হয়ে অনেক ধাক্কা খেয়ে অনেক ধকল সয়ে ঘণ্টা তিনেক বাদে, অবশেষে ঠিক জায়গায়, টেলিগ্রাফ ক্লার্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পেরেছি।

জরুরী তার। তাড়াতাড়ি পাঠাবার গরজ।

টেলিগ্রাফ ক্লার্ক কথাগুলো গুণে বলে দিলেন—তিন টাকা বারো আনা লাগবে। টিকিট কিনে এনে লাগিয়ে দিন আপনার টেলিগ্রামে।

টিকিট কিনতে আবার সেই টিকিটের লাইনে গিয়ে খাড়া হতে হল—সববের পেছনে।

টিকিট কিনে তারের কাগজে লাগিয়ে টেলিগ্রাম ক্লার্কের সামনে যাব। বাধা পেলাম প্রথম চোটেই।

'আরে মশাই, কিউ রয়েছে দেখছেন না? সবাইকে ডিঙিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন যে? লাইনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ান।'

প্রায় অর্ধচন্দ্রের মতই একখানা খেলাম। ফের সেই লাইনের পেছনে! জীবনে ধিক্কার এসে গেল—ধুত্তোর টেলিগ্রাম! ধুত্তোর বড় পোস্টাপিস!

একটা এঁদো গলির মধ্যে আমার জানা একটা ছোট পোস্টাপিস ছিল। সেখানে তিন ঘণ্টাতেও একজন পোস্টকার্ড কিনতে আসে কিনা সন্দেহ। পাঁচ হপ্তায় একটা মনিঅর্ডার কি রেজেস্টারি হয়ে থাকে। সেখানে কোনো ভিড় নেই, লাইন পড়ে না। সেইখানেই যাওয়া যাক।

টেলিগ্রামটা তো চেক করা হয়েছে, উপযুক্ত ডাকমাশুলও লাগানো রয়েছে। এখন মিনিট কয়েক টরে-টক্কা করে হেড আপিসে ডেসপ্যাচ করে দেবার ওয়াস্তা মাত্র! তা, সেখানকার অবকাশবহুল খুদে পোস্ট-মাস্টার বা তাঁর সহকারী পত্রপাঠ সেটা করে দিতে পারবেন।

গেলাম সেখানে।

ছোট্ট আপিস-ঘরে দুটি মাত্র লোক, একজন প্রৌঢ় আর একটি যুবক নিজেদের খোশগল্পে মশগুল।

একজন আমাকে লক্ষ্যই করল না,

ধুত্তোর টেলিগ্রাম!

আরেকজন একটু তাকিয়ে দেখল মাত্র।

টেলিগ্রাম ফর্মখানা হাতে নিয়ে আমি তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। খানিক অপেক্ষা করলাম, উসখুস করলাম খানিক, তারপর কাশলাম একটুখানি।

কারো ভ্রূক্ষেপ নেই।

'আমার একটা তার করবার ছিল' জানালাম আমি: 'খুব জরুরী তার।'

প্রৌঢ়টি আমার কথায় কানই দিল না। যুবকটি রুদ্ধনেত্রে তাকাল একবার।

'টেলিগ্রাম ঐ ধারে। ঐ কোণে।' অন্য একটা কাউণ্টার দেখিয়ে দিল যুবক।

'দেখেছি। কিন্তু সেখানে তো কেউ নেই।'

একথার কোন জবাব না দিয়ে তারা আবার নিজেদের গল্পে মজল।

একটু ভেবে নিয়ে আমি আরেকখানা টেলিগ্রাম ফর্ম নিলাম। তাতে আবার লিখলাম নতুন করে।

'টেলিগ্রামখানা দেখবেন একটু? এটা সেটা নয়, এটা আরেকটা, বেশ মজার। আপনাদের গল্পের চেয়েও মজাদার।'

যুবকটি অবজ্ঞাভরে হাত বাড়িয়ে ফর্মখানা নিল। নিয়ে ফর্মটার ওপর চোখ বুলিয়ে চিত্রার্পিতের মত হয়ে গেল যেন।

টেলিগ্রামটা ছিল এই ধরনের—

'পোস্টমাস্টার জেনারেল, কলিকাতা। স্থানীয় ডাকঘরের কেরানীরা আদৌ আমার তার নিতে চাইছে না। জরুরী তার আমার। তার বিহিত করুন।'

'না। এ-তার আমি পাঠাতে পারি না।' যুবকটি ফোঁস করে উঠল।

'মানে, আপনি বলতে চাইছেন যে, পাঠাতে পারেন, কিন্তু আপনি পাঠাবেন না?'

'হ্যাঁ তাই। সেই কথাই বলছি। এ-তার আমি পাঠাব না। এ-তার কখনো পাঠানো যায় না'।

'মানে, আপনি নিতে চাইছেন না আমার টেলিগ্রাম?'

'হ্যাঁ তাই।'

'মানে, এর ভাষাটা আপনার পছন্দ হচ্ছে না, এই তো?'

'ঠিক তাই।'

'এর ভাবখানাও আপনার মনের মত নয়?'

'নিশ্চয়।'

'বেশ। আমি তাহলে নতুন করে লিখে দিচ্ছি—'

নতুন করে লিখলাম এবার:

'পোস্টমাস্টার জেনারেল, কলকাতা। স্থানীয় পোস্টাপিসের কেরানী আপনার কাছে পাঠানো তারও আমার নিতে চাইছে

না। এর যথোচিত ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা হয়।'

টেলিগ্রামখানা নিয়ে যুবকটি প্রৌঢ়কে গিয়ে দেখাল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন এবার—

'দেখি আপনার প্রথমবারের তারটা। আমাকে দিন আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি এখুনি।'

আমার গোড়াকার জরুরী তারখানা দিলাম তখন।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেটার টরে-টক্কা করে সম্পাদিত করলেন। তারপর মধুর একটুখানি হেসে আমার দিকে তাকালেন।

তাঁর মধুর হাসিতে আপ্যায়িত হয়ে আমি বললামঃ 'দেখুন, আমি সত্যিই কিছু আপনাদের নামে রিপোর্ট করতে চাইছিনে। আর সত্যি কথা বলতে কি, গল্প-গুজব করে সময় কাটানোর চেয়ে আরামের আর কিছুই নেই। আপনাদের সেই আরামে ব্যাঘাত ঘটিয়ে যথার্থই আমি বাধিত, কিন্তু কি করব, আমার ভায়ের কাছে করবার এটা একটা জরুরী তার ছিল কি না! তাই নিতান্ত বাধ্য হয়েই আমাকে......'

'তাহলে আমিও আপনাকে একটা কথা বলি।' বললেন সেই খুদে পোস্টাপিসের খোদ পোস্টমাস্টার। —'আপনার উপকারের জন্যই জানাই।'

উপকৃত হবার জন্য উদগ্রীব হই। —'বলুন'

'আপনি এতগুলো পয়সা খরচা করে এই জরুরী তারটা করলেন। সকলেই করে থাকেন। ফলে আমাদের সরকারের আয় বাড়ে: লাভ হয়। কথাটা আপনাকে বলা আমাদের উচিত নয়। তবে আমরা লাইনের লোক বলেই জানি কিনা......'

পাঁচ নয়া পয়সার—

'বলুন, বলুন। যা বলবার বলতে পারেন আমায় অসংকোচে।'

'মানে, আপনি পি এম জি'র কাছে কমপ্লেনটা করলেন না তো, সেই জন্যেই ...মানে, তার বিনিময়েই, এই টিপস্‌টা আপনাকে দিচ্ছি। জরুরী তার পাঠানোর ফর্ম হচ্ছে একেবারে আলাদা।'

'কি রকম? আর্জেন্ট টেলিগ্রামের আবার আলাদা কোনো ফর্ম আছে নাকি? এ ছাড়াও অন্য রকম কিছু?'

'না-না। টেলিগ্রামের ছাপানো ফর্ম এই একরকমই। তবে তারের খবরটা যাতে তাড়াতাড়ি পৌঁছয়, তার জন্য এ ছাড়াও, মানে এই সঙ্গেই, আরো একটা ব্যবস্থা করার দরকার। যাতে করে খবরটা এই তারবার্তার আগেই গিয়ে পৌঁছয়......'

ঘুষঘাষের কথা বলছে নাকি লোকটা? আমার সন্দেহ হয়। আমার তো ধারণা ছিল পোস্টাপিস ঘুষের আর থানা-পুলিস ঘুষির ঊর্ধ্বে। ডাকওয়ালাকে ঘুষ আর পাহাড়াওলাকে ঘুষি খাওয়াতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। তার মতন বিড়ম্বনা আর হয় না। আমার সন্দেহভঞ্জনে এগোই—

'মানে, আপনি বলতে চাইছেন, কেবল শুধু এই টেলিগ্রাম করে কোনো লাভ নেই?

'না-না। তা বলব কেন? লাভ আছে বইকি। ডাক বিভাগের মোটা উপায় হয়ে থাকে এর থেকে। আমাদের তো লাভই হয়। টেলিগ্রাম তো করবেনই, ডবল খর্চা দিয়ে জরুরী তারই পাঠাবেন। তবে তার সাথে সেই খবরটা আরেকটা অন্য রকমের ফর্মে লিখে সেই সঙ্গে ছাড়বেন। সেইটাই আপনার টেলিগ্রামের ঢের আগে গিয়ে পৌঁছবে।'

'সেই ফর্মটা কি শুনি? তাতে কি খুব বেশি খরচা?'

'আজ্ঞে না। একখানা পোস্টকার্ডে লিখবেন তারের খবরটা। সামান্য একটা পোস্টকার্ড। পাঁচ নয়া পয়সার।'
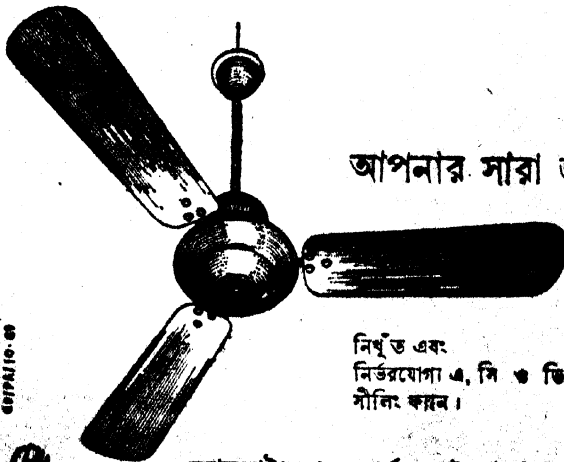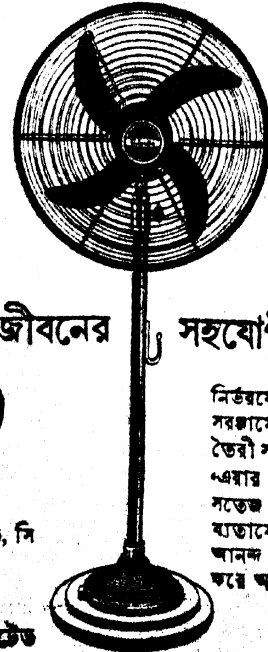
॥ একচল্লিশ ॥

বিশ্বদেবের দিনলিপি থেকে ঃ

অ্যাডভান্স বেস, ১৩ই অক্টোবর। আজ সকাল ৮॥টাতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু তার আগেই বেস থেকে লোক এসে গেল। ওরা বাড়তি পোশাক কিছু এনেছে। আমাদের কাছে এ এক রীতিমত বিস্ময়। ভাবিইনি, সত্যিই ভাবতে পারিনি, আমাদের কপালে আজ শুকনো পোশাক, শুকনো মোজা জুটবে। আমরা স্যাঁতসেতে পোশাক ছেড়ে শরীরটাকে শুকনো পোশাক দিয়ে মুড়তে মুড়তে অজস্র ধন্যবাদ দিলাম তাদের, যারা নিজেদের বঞ্চিত করে আমাদের জন্য তাদের পোশাক পাঠিয়ে দিয়েছে। অনেক অভিজ্ঞ লোকের মুখে শুনেছি পড়েওছি, পাহাড়ে এসে লোকে নাকি স্বার্থপর হয়ে যায়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আমাদের কিন্তু উল্টো অভিজ্ঞতাই হয়েছে। ধ্রুবর কথা বারবার মনে পড়ছে। পাহাড় বলতে পাগল। এই অভিযানের জন্য সে কী না করেছে। ওর সাধ ছিল, অনেক উপরে ওঠার। আমি জানি, তার জীবনের প্রথম সুযোগ সে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিল। এই যে মোজা জোড়া আমি আজ পরে রয়েছি, এ মোজা ধ্রুবর। এই উইন্ডপ্রুফও ধ্রুবর। গৌরদার পোশাক মোজা মদনের ব্যবহারে লাগল। শুধু তাই নয়, সুকুমারের নির্দেশে কম্বল ছিঁড়ে আমরা পট্টিও বানালাম। কাজেই কালকের চেয়ে আজ অনেক আটঘাট বাঁধা হল। মনে বেশ ফূর্তি এসে গেল।

আজ আমরা সাতজন। আমরা চারজন ত আছিই, আর আছে নরবু, গুনদিন আর দা তেম্বা। আজ তাড়াতাড়িতে ব্রেকফাস্ট তৈরি হয়নি। আমরা চায়ের মগে "সাম্পা" (তিব্বতী ছাতু) ঢেলে হাপুস হুপুস তাই খেয়ে নিলাম। লাঞ্চের জন্য বিস্কুট আর চা নেওয়া হল।

আমরা চারজন নিচ থেকে কম মাল নিলাম, উপরে ফেলে আসা মালগুলো বইতে হবে। নরবু, গুনদিন আর দা তেম্বার ঘাড়ে পুরো বোঝা চাপানো হল। আঙ শেরিং আর টাসী প্রথমে রওনা দিল। তার পনের মিনিট পরে আমরা সবাই।

আমি আর মদন বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিলাম। আমাদের দুজনের ঘাড়ে ছিল দড়ি আর পিটনের বোঝা। কাল যেখানে মাল ফেলে গিয়েছিলাম, সেখানে পৌঁছতে ১২॥টা বাজল। ঘেমে নেয়ে উঠেছি। তেষ্টায় বুক শুকিয়ে গিয়েছে। জলের বোতল, চায়ের ফ্লাস্ক কিছুই আমাদের কাছে নেই। লাঞ্চও না। ওসব আজ টাসী আর দা তেম্বার কাছে।

আমরা পৌঁছে দেখি, ওরা কেউ নেই। এগিয়ে চলে গিয়েছে। বুকের তেষ্টা বুকে চেপে আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। কিছুটা হাঁটতেই দেখলাম, দূরে ওরা সব তাঁবু খাটাতে লেগেছে। বেশ দূর। মিনিট পনের চলার পর দেখি পথটা সাংঘাতিক রকমের বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। দুটো চড়াইয়ের মাঝখানে একটা যোজক (এরেট) খুব সরু। যোজকের দু ধারে পাহাড়ের ঢালু বহু দূর পর্যন্ত নেমে গিয়েছে। ঐ যোজকের উপর দিয়ে হাঁটা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর এই সূক্ষ্ম যোজকের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া আর ধারাল তলোয়ারের উপর দিয়ে হাঁটা একই কথা। আমরা কেউই তারের উপর দিয়ে হাঁটা কেন অভ্যাস করিনি, এখন তার জন্য বড় আফসোস হতে লাগল।

বৃথা হা-হুতাশে লাভ নেই জেনে ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করে সেই "ক্ষুরস্য ধারা"র উপর পা চাপিয়ে দিলাম। আর সুদক্ষ সার্কাস খেলোয়াড়ের মত অত্যাশ্চর্য ব্যালান্সের খেলা দেখাতে দেখাতে পথটুকু নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেলাম। সে পথের দৈর্ঘ্য ২৫ ফুটের বেশী হবে না। কিন্তু মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ।

ধুঁকতে ধুঁকতে যখন ওদের কাছে পৌঁছালাম, তখন ওদের লাঞ্চ খাওয়া সারা। জল নিঃশেষ। চা এক ফোঁটাও নেই। ওরা

১নং ক্যাম্প

ভেবেছে আমাদের চা জল বুঝি আমাদের সংগেই আছে। এই নিদারুণ সংবাদ শোনার পর আমাদের চোখে "সরিষা পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল এবং আমরা হা হতোস্মি উচ্চারণ করতঃ ভূতলে পতিত হইলাম।"

আঙ শেরিং আমাদের ব্যাপারটা বুঝল। সে খুব দুঃখ প্রকাশ করল। বারে বারে বলতে লাগল সাব্, বরফ খাও। থোড়া বরফ খেয়ে নেও।

আমাদের জিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মুখের লালা ঘন জমাট বেঁধে গেছে। কথা বলতে পারছিনে। বলব, সে শক্তি নেই।

"সাব, থোড়া থোড়া বরফ খা লেও।"

আঙ শেরিং-এর পরামর্শে প্রচুর প্রলোভন। তবু আমরা ওর পরামর্শ গ্রহণ করছিনে। ট্রেনিং-এর সময় জেনেছি বরফ খাওয়া নিষেধ। মৃত্যুতুল্য। না, বরফ খাব না।

"সাব্, খা লেও, থোড়া থোড়া বরফ খা লেও।"

অতি কষ্টে বললাম, "না সর্দার, বরফ খাব না।"

"কিঁউ বিশ্বাস সাব?"

ঘড়ঘড় করে আমার গলা দিয়ে শুকনো আওয়াজ বেরুল, "মর যায়েগা।"

মরে যাবে? বরফ খেলে মরে যাবে! আঙ শেরিং হেসে উঠল। তবে আমি কি মরে গেছি? তবে আমি কি ভূত হয়ে গেছি?

"সাত রোজ, শুনো সাব সাত রোজ, সিরফ বরফ খায়া থা। না খানা থা, না পিনা থা, খালি বরফ থা, এইসা বরফ।" আঙ শেরিং চারদিকের বরফ দেখিয়ে দিলে।

আঙ শেরিং সেইখানে বসে বসে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাল। ১৯৩৪ সালের নাংগা পর্বত অভিযানের কাহিনী। মার্কেল সাহেবের নেতৃত্বে এক জার্মান দল এই অভিযানে এসেছিল। অ্যাসল্ট পার্টিতে যারা ছিল, সেই ১১ জন অভিযাত্রীর মধ্যে ৪ জন জার্মান আর ৬ জন শেরপা উপরেই মারা যায়। প্রাণ নিয়ে একজন মাত্র নিচে আসতে পেরেছিল। ফিরেছিল শুধু আঙ শেরিং। এই আঙ শেরিং।

আঙ শেরিং বলতে লাগল :

...৬ই জুলাই সকালে সাহেবরা যখন অন্যান্য মালবাহকদের সংগে পাহাড়ের একটা খাঁজের (এখানেই আমরা খোলা আকাশের নীচে রাত কাটিয়েছি) নীচে থেকে যাত্রা করলেন তখন গেলে, দক্শী আর আমি ওদের পিছনে পড়ে রইলাম। আমরা খুবই পরিশ্রান্ত। বরফ থেকে ঠিকরে-আসা আলোর খোঁচায় আমাদের চোখে ধাঁধা লেগে-ছিল। দুটো মাত্র ঘুমনোর থলি আমাদের ছিল। খোলা জায়গায় থাকতে থাকতে ১১ তারিখে দক্শীর মৃত্যু হল। পরদিন সকালে গেলে আর আমি সপ্তম শিবিরের দিকে নেমে চললাম। যাবার পথে দেখতে পেলাম উইল্যান্ড সাহেব মরে পড়ে আছেন। তাঁর তাঁবু থেকে মাত্র ত্রিশ পা দূরে। সপ্তম শিবিরে মার্কেল সাহেব আর ওয়েল জেনবাক সাহেব ছিলেন। তাঁবুটা তুষারে ভর্তি হয়ে গেছে। বড় সাহেব আমাকে দেখে সেটা পরিষ্কার করতে বললেন। একটা ঘুমনোর থলি ছিল, গেলের আর আমার দুজনেরই ওই থলিতে ঘুমোবার কথা ছিল। কিন্তু থলিটা এমনভাবেই বরফ চাপা পড়েছিল যে, গেলে ছাড়া তার ভেতরে আর কারুরই জায়গা হল না। সাহেবরা রবারের ফেনা দিয়ে তৈরী ম্যাট্রেসের উপর ঘুমলেন। আমাদের খাবার ফুরিয়ে গিয়েছিল। পরদিন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাই আমি নেমে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বড় সাহেব অপেক্ষা করতে বললেন। বললেন, চতুর্থ ও পঞ্চম

শিবিরে যেসব লোক আমরা দেখতে পেয়েছিলাম তারা হয়ত আমাদের জন্যে রসদ নিয়ে আসছে। ওয়েল জেনবাক সাহেব ১৩ই জুলাই রাত্রে মারা গেলেন। আমরা তাঁকে তাঁবুর মধ্যেই রেখে ষষ্ঠ শিবিরের দিকে ভোরবেলায় রওনা হলাম। মার্কেলকে দুখানা 'তুষার-গাইতি'র উপর দেহের সমস্ত ভার চাপিয়ে এগিয়ে চলতে হচ্ছিল। মুরস্ হেডের উপর আমরা উঠতে পারলাম না। নীচেতে বরফের একটা গুহা বানিয়ে নিলাম। বড়সাহেব আর গেলে একই রবার ম্যাট্রেসের উপর শুয়ে একখানা কম্বলই দুজনে ভাগাভাগি করে গায়ে দিলেন। আমার শুধু একখানা কম্বলই সম্বল, শোবার আর কিছু ছিল না। ১৪ই আমি বেরিয়ে এসে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে লাগলাম। চতুর্থ শিবিরে কাউকেই আমরা দেখতে পেলাম না তাই আমি বড় সাহেবকে বললাম, আমাদের নীচে যাওয়াই ভাল। তিনি রাজী হলেন। কিন্তু তিনি আর গেলে এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, সেই তুষার-গুহা থেকে দু পাও যেতে পারলেন না।...

আঙ শেরিং চুপ করল। সে হঠাৎ কেমন উদাস হয়ে গেল। আমার মনটাও খারাপ হল। চেয়ে দেখি টাসী, দা তেম্বা আর গুনেদিন আর নরবু তাঁবুগুলো খাটিয়ে ফেলেছে। মালগুলো যাতে না ভেজে তার ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

আঙ শেরিং বলল, বড়া সাব আর গেলেকে সেখানে রেখে আমি নীচে যাত্রা করলাম। আমি বলেছিলাম, আমি তোমার কাছে থাকি সাব, গেলে নীচে চলে যাক। বড়া সাব বললেন, তাই হোক। কিন্তু গেলে বলল, সে চলতে পারছে না। তখন বড়া সাব বললেন, তবে তুমিই নীচে যাও আঙ শেরিং। জলদি যাও, বহোৎ জলদি। কিন্তু আমিও চলতে পারছিলাম না। আমার পা অসাড় হয়ে গিয়েছে, আমি হামাগুড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। আমার হাত অসাড় হয়ে এল, হাঁটু ঠাণ্ডায় জমে কাঠ হয়ে গেল। তবু আমি পরোয়া করলাম না। আমার শুধু এক চিন্তা, এক ধ্যান। আমাকে বাঁচতে হবে। নীচে যেতে হবে, আমাকে বাঁচতে হবে, বড়া সাবকে বাঁচাতে হবে। নীচে যেতে হবে। আমাকে বাঁচতে হবে, বড়া সাবকে বাঁচাতে হবে, গেলে, আমার বন্ধু গেলেকে বাঁচাতে হবে। আমাকে নীচে যেতে হবে। আমাকে বাঁচতে হবে, নীচে যেতে হবে, খবর দিতে হবে উপরে বড়া সাব আছে, গেলে আছে, তারা এখনও বেঁচে আছে, তাদের নামিয়ে আনতে হবে, আঙ শেরিং জলদি যাও, বহোৎ জলদি...

আঙ শেরিং বলল, আমি নামতে লাগলাম। আর হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে পারলাম না। হাতে বল নেই, হাঁটুতে বল নেই। একটা উঁচু চড়াই-এ যখন উঠলাম, আমার হামাগুড়ি দেবার ক্ষমতা তখন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। আমি তখন তুষার গাইতিটাকে দু হাতে শক্ত করে হালের মত চেপে ধরলাম। তারপর শরীরটাকে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিয়ে গিয়ে সেই পাহাড়ের ঢালুতে ছেড়ে দিলাম। বরফের ঘষা লেগে পাছার চামড়া ছিঁড়ে যেতে লাগল। পাথরের গুঁড়োয় শরীর থেঁতলে গেল। অবশেষে প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় চতুর্থ শিবিরে পেঁ'ছে গেলাম। আমার এইটুকু মনে আছে, আমার চীৎকার শুনে লোকজন ছুটে এসেছিল।

"ইয়ে ভি ইয়াদ থা, হাম বোলা থা জলদি উপর যাও, বড়া সাব জিন্দা হ্যায়, গেলে জিন্দা হ্যায়। [illegible] বাদ্‌সে হাম শুনা, কোই নেহি উপর গিয়া।"

আঙ শেরিং খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। ধীরে ধীরে ওর ঠোঁটে [illegible] এক হাসির রেখা ফুটে উঠল।

বলল, "হাম বাচ গিয়া। তিন [illegible] হাসপাতালমে থা। লেকিন [illegible] দোনোকো বাচানে নেহি শকা।"

হঠাৎ আঙ শেরিং আমার দিকে চাইল। মুহূর্তে ওর চোখ-মুখের ভাব বদলে গেল। এই সেই আঙ শেরিং, যে আমাদের সঙ্গে এসেছে, এ যেন আর সেই একটুও আগের আঙ শেরিং নয়।

১নং ক্যাম্পে বরফ গলান হচ্ছে

"তো?" আঙ শেরিং-এর গলায় একটু ব্যঙ্গের সুর। বলল, "হাম তো আভি জিন্দা হ্যায়। সাত রোজ সিরফ্ বরফ খাকে ভি জিন্দা হ্যায়। তুম ভি জিন্দা রহেগা সাব্, থোড়া বরফ খা লেও।"

অগত্যা আমরা বরফ খেয়েই তৃষ্ণা মিটালাম। তবু ক্ষিধে মিটল না। প্রচন্ড ক্ষিধে পেয়েছে। আঙ শেরিং উঠে দাঁড়াল। চারদিক চেয়ে একদিকে আঙ্গুলে দেখিয়ে বলল, ঐ দ্যাখ, নন্দাঘুণ্টি। আমার রক্ত ছলাত করে উঠল। মুহূর্তে সেই প্রচন্ড ক্ষিধেও ভুলে গেলাম। কী প্রবল উত্তেজনা! দেখলাম, মদনের মুখও চকচক করছে।

দেখলাম, পাহাড়টা ধীরে ধীরে উঠে গেছে। একেবারে সাদা ধপধপ করছে। চূড়াটাকে দেখে মনে হল, অনেকটা গম্বুজের আকৃতি। বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকলাম।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আজ আরো বিস্ময় বাকি ছিল। আঙ শেরিং চারদিকে চাইতে চাইতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মনে হল সে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

মদনকে বললে, "মণ্ডল সাব্, এক হাজার রুপেয়া লাও। ইনাম। প্রাইজ দো। ঐ দেখ, ইটি কা ট্র্যাক।"

ইয়েতি! আবার ইয়েতির পায়ের ছাপ! ভাল দেখতে পারছিলাম না, তাই দিলীপের ভাঙ্গা দূরবীনে চোখ রাখলাম। দেখলাম বটে, বহু দূরে সাদা বরফের উপর একটা সারি নেমে এসেছে। আর কিছু বোঝা গেল না। ইয়েতির পদচিহ্ন? ঐ কি সেই রহস্যময় তুষার-মানবের পায়ের ছাপ?

॥ বিয়াল্লিশ ॥

বীরেন সিংহের দিনলিপি থেকে ঃ

১৩ই অক্টোবর। আজ বেলা ১১টা নাগাদ রায়, দিলীপ, নিমাই, আমি, নরবু আর আঙ ফুতার অ্যাড্ভান্স বেস ক্যাম্প রওনা হলাম। বেস ক্যাম্পে থাকল ধ্রুব, ডাক্তার, গোর আর আজীবা।

বেলা ২টো নাগাদ অ্যাড্ভান্স বেসে পৌঁছে গেলাম। অ্যাড্ভান্স বেস ১৩১০০ ফুট উঁচু। একটু জিরিয়ে, সকলে মিলে আরও তিনটে তাঁবু খাটাল। আমরা লাঞ্চ খেয়ে, তাঁবুর মধ্যে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে, বের হলাম। বেলা ৪টে নাগাদ বিশ্বাস, মদন, আঙ শেরিং প্রভৃতি —যারা ১নং শিবির স্থাপন করতে গিয়েছিল —ফিরে এল। নেতা রায়, নিমাই ওরা চা বিস্কুট নিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ওদের অভ্যর্থনা করে আনল। বিশ্বাসরা এসে বলল, ১নং শিবির যেখানে হয়েছে তার ঠিক সামনেই নন্দাঘুণ্টি। ওরা প্রায় ১৫০০০ ফুট উপরে ১নং শিবির স্থাপন করেছে।

এখানে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি যা তৈরী হল তাতে জানা গেল, আগামীকাল (১৪ই) আঙ শেরিং, টাসী, বিশ্বাস ও মদনের বিশ্রাম। সত্যিই ওদের বিশ্রামের খুব প্রয়োজন ছিল। ওরা গত দু দিন অসাধারণ পরিশ্রম করে ১নং শিবির স্থাপন করেছে। রায়, দিলীপ আর দা তেম্বা ১নং শিবিরে যাবে। সেখানে থাকবে। পরদিন (১৫ই) ওরা যাবে ২নং শিবির স্থাপন করতে। নিমাই, বিশ্বদেব, আঙ শেরিং আর টাসী যাবে ১নং শিবিরে। আমি থাকব অ্যাড্ভান্স বেসে।

১৪ই অক্টোবর। ১নং শিবির থেকে রায় বিশ্বদেবকে চিঠি পাঠাল। ওদের সঙ্গে আমাকেও নিয়ে যেতে বলেছে। একথা শুনে আনন্দ হল। উপরে সাধারণ মালবাহকেরা উঠবে না। মাল বইবে শেরপারা। আমি জানি, আমি উপরে উঠতে চাইলে আমার আর আমার ক্যামেরা ইত্যাদি বইবার জন্য অন্তত দুজন শেরপা লাগবে। কিন্তু তার চাইতেও জরুরী অভিযানের মাল উপরে পাঠানো। তাই আমি জোর করে কিছু বলতেও পারছিলাম না। সুকুমারের চিঠি পেয়ে আমার চিন্তা দূর হল।

১৫ই অক্টোবর। সকাল ১০টায় আমরা ১নং শিবিরের দিকে রওনা হলাম। মদন আর গুনদিন অ্যাড্ভান্স বেসে থাকল। আজ ডাক্তারেরও এখানে আসবার কথা। শেরপা টাসীকে আমার সঙ্গে দেওয়া হল। চারজন সাধারণ মালবাহককেও আমরা উপর নিয়ে চলেছি। ওদেরকে আমাদের জঙ্গল বুট, মোজা, চশমা ইত্যাদি দিয়েছি। টাসী আমার ক্যামেরার বোঝা নিয়েছে। দরকার মত আমাকেও সামলাবে। গোরা সিং আমাদের গাইড, আমার রুকস্যাক কিট্-ব্যাগ প্রভৃতি বইছে। প্রায় ১টার সময় আমরা ১নং শিবিরে পৌঁছলাম। রায়, দিলীপ, দা তেম্বা তখনও ২নং শিবিরের জায়গা দেখে ফিরে আসেনি।

সামনেই একটা পাহাড়। বিশ্বাস নিমাইকে বলল, ঐ দ্যাখ নন্দাঘুণ্টি।

নন্দাঘুণ্টি? নিমাই-এর মুখে সংশয়ের রেখা ফুটে উঠল। এটা নন্দাঘুণ্টি কে বলল? নিমাই তৎক্ষণাৎ মানচিত্র খুলে, কম্পাস বের করে হিসেব করতে বসল। কিছুক্ষণ বাদে বলল, এটা নন্দাঘুণ্টি নয়। ওটা বেথারতলি হিমালয়েরই একটা অংশ। আরও দক্ষিণে যে ছোট্ট চূড়াটা দেখা যাচ্ছে, তারও দক্ষিণে হবে নন্দাঘুণ্টি। এখান থেকে সেটা নজরে পড়বে না।

এমন সময় দূরে, বেশ খানিকটা দূরে রায়, দিলীপ আর দা তেম্বাকে দেখা গেল। ওরা নন্দাঘুণ্টি মনে করে বেথারতলির দিকেই এগোচ্ছে। নিমাইয়ের নির্দেশে আঙ শেরিং চেঁচিয়ে, নানা রকম ইশারা করে, ওদের ফিরতে বলল। প্রায় তিনটের সময় ওরা ফিরে এল। নিমাই মানচিত্র দেখিয়ে ভুলটা ধরে দিল। ঠিক হল, কাল

(১৩ই) নিমাই, রায়, আশু শোরিং আর টাসী রাবে ২নং শিবিরের জায়গা দেখতে।

বেলা তিনটের সময় সূর্যদেব পাহাড়ের আড়ালে তলিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঠান্ডা যেন চিতাবাঘের মত আমাদের উপর লাফিয়ে পড়ল। কী নিদারুণ শীত! আমরা সব গুটিসুটি মেরে রান্নার জায়গায় বসে আছি। ঘন ঘন চা খাচ্ছি। তবু যেন ভিতরটা অবধি জমে বরফ হয়ে যাবে। নানা আলোচনা হচ্ছে। ২নং শিবির স্থাপনের প্ল্যান ছকা হচ্ছে। এমন সময় জানা গেল, রসদ আনা হয়নি। রাত্রে খাবার কি হবে?

আমার জন্য দুজন লোক আটকে পড়াতেই এই কাণ্ড ঘটেছে। আমি খুব লজ্জিত হয়ে পড়লাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম লোকের যখন এত অভাব, তখন আমার পক্ষে আরও উপরে যাবার চেষ্টা ঠিক সমীচীন হবে না। ক্লান্ত শরীরে ছেবে, বিষন্ন মনে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে গেলাম। পাশের তাঁবুতে রায়, বিশ্বাস, নিমাই আর দিলীপের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। কিছু কিছু অসুবিধার কথা আমার কানেও এসে ঢুকছে। আমি রায়কে ডেকে বললাম, আমি আর উপরে যাব না, কাল অ্যাড্‌ভান্স বেসে নেমে যাব। রায় বলল, বীরেনদা তা হবে না। আপনাকে আমরা উপরে নিয়ে যাব। বললাম, রায়, এটা ছেলেখেলা নয়, একটা জরুরী কর্তব্য তোমরা কাঁধে নিয়েছ, সেটা সফল করাই প্রথম কাজ। আমি যদি দুজন শেরপা আটকে ফেলি তবে আসল কাজেই বাধা সৃষ্টি হবে। রায় বলল, আপনি ওসব ভাববেন না, আমাদের নন্দাঘুণ্টিতে ওঠা যেমন প্রয়োজন, আপনাকে সঙ্গে নেওয়ার তেমনি দরকার। তবু আমার মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল।

লেখকের দিনলিপি থেকেঃ

১৫ই অক্টোবর। অ্যাড্‌ভান্স বেসে আমি ডাক্তারকে পৌঁছে দিতে এসেছিলাম। রানার কেদার সিং আমাদের সঙ্গে ছিল। ও গতকাল ফিরেছে। উপর থেকে খবর আসছে না। আমি রিপোর্ট পাঠাতে পারছিনে। তাই অ্যাড্‌ভান্স বেসে এসেছি, যদি কিছু খবর নিয়ে যেতে পারি। মদন অ্যাড্‌ভান্স বেসে আছে। অন্য নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ওকে অ্যাড্‌ভান্স বেস থেকে পুরি অথবা চাপাটি আর মাংস রেঁধে ১নং শিবিরে পাঠাতে হবে। মদনই জানাল, আজকের পার্টি রসদ ফেলে গিয়েছে। উপরে ওরা কি খাবে কে জানে? মদনই জানাল, ওরা ১নং শিবির থেকে নন্দাঘুণ্টি দেখতে পেয়েছে। শুনে আনন্দ হল। ভাবলাম, এই খবরটাই পাঠিয়ে দেব।

যেসব শেরপার ফিরে আসার কথা তারা দেরি করছে। চঞ্চল হয়ে উঠলাম। আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব? এর পরে ফেরার পথে তুষারপাত হয় যদি? এখন প্রায়ই বিকেলের দিকে আকাশে মেঘ জমছে। সকালে আকাশ পরিষ্কার।

না, আর দেরি করা যায় না। এবার উঠতেই হয়। কিচেনে বসে চা পান শেষ করলাম। তারপর সেখান থেকে বেই বেরিয়েছি অমনি "সাব্‌, মোটা সাব্‌, গুড্‌ মর্নিং"। চমকে চেয়ে দেখি আশু ফুতার লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে। এক গাল হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। নরবুও এসে হ্যান্ড শেক করল। গোরা সিং, আক্কেল, পল্টু সিংও নেমে এল।

বললাম, চিঠিপত্র আছে কিছু? আশু ফুতার খান কতক চিঠি বের করে দিল।

Camp I হইতে Camp IIতে যাবার পথে মদন মণ্ডল। প্রতি পদক্ষেপে নরম বরফের বাধা। ফটো—দিলীপ ব্যানার্জী

আমি কালবিলম্ব না করে বেস ক্যাম্পে রওনা দিলাম। হাঁফাতে হাঁফাতে যখন বেস ক্যাম্পে এসে পৌঁছালাম, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে।

ধ্রুব ছটফট করছিল। আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলে, "কোন খবর?"

বললাম, "মদন বললে, ওরা নন্দাঘুণ্টির শিখর দেখতে পেয়েছে।"

ধ্রুব ত আনন্দে প্রায় লাফিয়ে ওঠে। "হুররে" বলে বিজাতীয় আওয়াজ ছাড়ল।

বললাম, "উপর থেকে গোটাকতক চিঠি এসেছে। পড়ার সময় পাইনি—"

ধ্রুব বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু তার আগে আপনার একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার। চা খান। একটুখানি রম খাবেন?

একটু সুস্থ হয়ে, কফি খেতে খেতে চিঠিগুলো পড়তে শুরু করলাম।

প্রথমেই বিশ্বদেবের চিঠি :

১নং শিবির (১৫০০০ ফুট), ১৫-১০-৬০।

গৌরদা,

বীরেনদা আর নিমাইদার সঙ্গে ১নং শিবিরে পৌঁচেছি। পৌঁছেই রায় ও দিলীপের চিঠি পেলাম। এই সঙ্গেই পাঠালাম। প্রথম দিন আমরা যে ইয়েতির পায়ের ছাপ দেখেছিলাম, আজ সকালে দা তেম্বা, রায় আর দিলীপ তার কাছে যায়। কাছ থেকে দেখে ওরা নিঃসন্দেহ হয়, এগুলো ইয়েতিরই পদচিহ্ন। দিলীপ ছবি তোলে। সেই রোলও পাঠালাম।

নন্দাঘুণ্টি শিখর দেখা যাচ্ছে বলে যদি কোন খবর পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন, তবে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে তা ছাপতে নিষেধ করে দিন। নিমাইদা বললে, ওটা নন্দাঘুণ্টি নয়। সবাই ভাল। বিশ্বদেব।

সুকুমারের চিঠি :

১নং শিবির, ১৫ই অক্টোবর, ৬০।

প্রিয় ধ্রুব,

নিচু থেকে মাংস, আটা, কাঠ, দেশলাই আর আলু প্রচুর পরিমাণে উপরে পাঠাও। বেস ক্যাম্পে মাংসের প্রয়োজন হলে আরও দু একটা ভেড়া কেনারও ব্যবস্থা করবে। সুকুমার রায়।

দিলীপ তার চিঠিতে কোন ফিল্‌ম্ রোলে ইয়েতির পায়ের ছাপ আছে, তাই জানিয়ে দিয়েছে।

চিঠিগুলো পড়ে বেশ ঘাবড়েই গেলাম। সত্যি বলতে কি, প্রথমটায় আমার মাথার মধ্যে কিছুই ঢুকল না। ওরা যে ইয়েতির পায়ের ছাপ দেখেছে, নন্দাঘুণ্টি শিখর দেখেছে, সে কথা আমরা জানতাম না। আজই মদনের মুখে প্রথম শুনলাম যে, ওরা নন্দাঘুণ্টি শিখর দেখছে। ভাগ্যিস খবরটা আজই পেলাম। না হলে সেই ভুল খবরটাই পাঠিয়ে দিতে হত। ইয়েতি সম্পর্কেও বিস্তারিত কেউ কিছুই লেখেনি। বড় বিরক্ত বোধ করলাম। ধ্রুবর মনটাও খানিকটা খারাপ হয়ে গেল।

১৬ই অক্টোবর। আজ তবু খানিকটা খবর পাওয়া গেল। ১নং শিবিরের কাছে রণ্টির গিরিশিরাটি নেমে এসেছে। শিবিরটা একটু উঁচু জায়গায়। রণ্টিরই গা ঘেঁষে। হিমবাহটা বাঁ দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে বেশ খানিকটা প্রায়-সমতল সৃষ্টি করেছে। তারপর বেথারতলির গায়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এইখানেই ইয়েতির পায়ের ছাপগুলো দেখা গেছে। বেথারতলির উঁচু সাদা তুষার-শরীর মাড়িয়ে এই রহস্যময় পায়ের ছাপ সেই সমতলে নেমে এসেছে। সেখান থেকে এগিয়ে এসেছে ১নং শিবিরের দিকে। ৫০০ গজ দূরে এসেই যেন থমকে দাঁড়িয়েছে, তারপর হঠাৎ অন্য দিকে মোড় নিয়ে হিমবাহের উৎরাই অনুসরণ করে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। চলে গেছে দক্ষিণে।

পায়ের ছাপগুলো একই সারিতে চলেছে। সন্দেহ নেই, এইসব পায়ের ছাপ যেসব ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার তাঁরা দুই পায়েই হাঁটেন। জুতো পায়ে দেন না। পায়ের ছাপ কিঞ্চিৎ গোলাকৃতি। লম্বায় ৮ ইঞ্চি। গভীরতা ১ ইঞ্চি। গোড়ালির কাছটা গভীরতর। একটা পায়ের থেকে অন্য পায়ের দূরত্ব প্রায় ৩০ ইঞ্চি। প্রায় একটা প্রমাণ সাইজ মানুষের মতই।

কাল বিলম্ব না করে আমি খবর আর ছবি কলকাতায় পাঠালাম।

(ক্রমশঃ)

। পত্রাবলী ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১৭৫ ॥

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, স্থান রাশিয়া। দৃশ্য, মস্কোয়ের উপনগরীতে একটি প্রাসাদ ভবন। জানলার ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখি, দিক্‌প্রান্ত পর্যন্ত অরণ্যভূমি, সবুজ রঙের ঢেউ উঠেছে, ঘন সবুজ, ফিকে সবুজ, বেগনির সঙ্গে মেশামেশি সবুজ, হলদের আমেজ দেওয়া সবুজ। বনের শেষ সীমায় বহু দূরে গ্রামের কুটীরশ্রেণী। বেলা প্রায় দশটা, আকাশে স্তরে স্তরে মেঘ করেছে, অবৃষ্টিসংরম্ভ সমারোহ, বাতাসে ঋজুকায়া পপ্‌লার গাছের শিখরগুলি দোদুল্যমান। মস্কোতে কয়দিন যে হোটেলে ছিলুম, তার নাম গ্র্যান্ড হোটেল, বাড়িটা মস্ত কিন্তু অবস্থা অতি দরিদ্র। যেন ধনীর ছেলে দেউলে হয়ে গেছে। সাবেক কালের সাজসজ্জা কতক গেছে বিকিয়ে, কতক গেছে ছিঁড়ে, তালি দেওয়ারও সঙ্গতি নেই, ময়লা হয়ে আছে, ধোবার বাড়ির সম্পর্ক বন্ধ। সমস্ত শহরেরই অবস্থা এই রকম— একান্ত অপরিচ্ছন্নতার ভিতর দিয়েও নবাবী আমলের চেহারা দেখা যাচ্চে, যেন ছেঁড়া জামাতেও সোনার বোতাম লাগানো যেন ঢাকাই ধুতি রিফু করা। আহারে ব্যবহারে এমন সর্বব্যাপী নির্ধনতা য়ুরোপের আর কোথাও দেখা যায় না। তার প্রধান কারণ, আর আর সব জায়গায় ধনী দরিদ্রের প্রভেদ থাকাতে ধনের পুঞ্জীভূত রূপ সব চেয়ে বড়ো করে চোখে পড়ে —সেখানে দারিদ্র্য থাকে যবনিকার আড়ালে নেপথ্যে; সেই নেপথ্যে সব এলোমেলো নোংরা অস্বাস্থ্যকর দুঃখে দুর্দশায় দুষ্কর্মে নিবিড় অন্ধকার। কিন্তু বাইরে থেকে গিয়ে আমরা যেখানে বাসা পাই সেখানকার জানলা দিয়ে যা কিছু দেখতে পাই, সমস্তই সুভদ্র, শোভন সুপরিপুষ্ট। এই সমৃদ্ধি যদি সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেত তা হলে তখনি ধরা পড়ত, দেশের ধন এত কিছু বেশী নয় যাতে সকলেরই ভাত কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে জোটে। এখানে ভেদ নেই বলেই, ধনের চেহারা গেছে ঘুচে, দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা। দেশজোড়া এই অধন আর কোথাও দেখি নে বলেই প্রথমেই এটা আমাদের চোখে খুব পড়ে। অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে তারাই একমাত্র। মস্কৌয়ের রাস্তা দিয়ে নানা লোক চলেচে, কেউ ফিটফাট নয়, দেখলেই বোঝা যায় অবকাশভোগীর দল একেবারে অন্তর্ধান করেচে, সকলকেই স্বহস্তে কাজকর্ম করে দিনপাত করতে হয়। বাবু-গিরির পালিশ কোনো জায়গাতেই নেই। ডাক্তার পেট্রভ বলে এক ভদ্রলোকের বাড়ি যেতে হয়েছিল, তিনি এখানকার একজন সম্মানী লোক, উচ্চপদস্থ কর্মচারী। যে বাড়িতে তাঁর আপিস সেটা সেকেলের একজন বড়োলোকের বাড়ি, কিন্তু ঘরে আসবাব অতি সামান্য, পারিপাট্যের কোন লক্ষণ নেই— নিষ্কার্পেট মেঝের এক কোণে যেমন-তেমন একখানা টেবিল; সবসুদ্ধ, পিতৃবিয়োগে ধোপানাপিত বর্জিত অশৌচ দশার মতো শয্যাসনশূন্যে ভাব, যেন বাইরের লোকের কাছে সামাজিকতা রক্ষার কোনো দায় নেই। আমার বাসায় আহারাদির যে ব্যবস্থা তা গ্র্যান্ড হোটেল নামধারী পান্থাবাসের পক্ষে নিতান্তই অসংগত। কিন্তু এ জন্যে কোনো কুণ্ঠা নেই —কেননা সকলেরই এক দশা। আমাদের বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। তখনকার জীবনযাত্রা ও তার আয়োজন এখানকার তুলনায় কতই অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সে জন্যে আমাদের কারো মনে কিছুমাত্র সংকোচ ছিল না, তার কারণ তখন সংসারযাত্রার আদর্শে অত্যন্ত বেশী উঁচু নীচু ছিল না—সকলেরই ঘরে একটা মোটামুটি রকমের চালচলন ছিল—তফাত যা ছিল তা বৈদগ্ধ্যের—অর্থাৎ গান বাজনা পড়াশুনো ইত্যাদি নিয়ে। তা ছাড়া ছিল কৌলিক রীতির পার্থক্য, অর্থাৎ ভাষা ভাব ভঙ্গী আচার বিচারগত বিশেষত্ব। কিন্তু তখন আমাদের আহার বিহার সকল প্রকার উপকরণ যা ছিল তা দেখলে এখনকার সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকদের মনেও অবজ্ঞা জাগতে পারে। ধনগত বৈষম্যের বড়াই আমাদের দেশে এসেচে পশ্চিম মহাদেশ থেকে। একসময়ে আমাদের দেশে যখন হাল আমলের আপিস-বিহারী ও ব্যবসাদারদের ঘরে নতুন টাকার আমদানি হল, তখন তারা বিলিতী বাবুগিরির চলন শুরু করে দিল। তখন থেকে আসবাবের মাপেই ভদ্রতার পরিমাপ আরম্ভ হয়েচে। তাই আমাদের দেশেও আজকাল কুলশীল রীতিনীতি বুদ্ধিবিদ্যা সমস্ত ছাপিয়ে চোখে পড়ে ধনের বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতার গৌরবই মানুষের পক্ষে সবচেয়ে অগৌরব। এরই ইতরতা যাতে মজ্জার মধ্যে প্রবেশ না করে সে জন্যে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। এখানে এসে সবচেয়ে যেটা আমার চোখে ভালো লেগেচে সে হচ্চে এই ধনগরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব। কেবলমাত্র এই কারণেই এ দেশে জন-সাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে। চাষা-ভুষো সকলেই আজ অসম্মানের বোঝা ঝেড়ে ফেলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেচে এইটে দেখে আমি যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হয়েচি। মানুষে মানুষে ব্যবহার কী আশ্চর্য সহজ হয়ে গেছে। অনেক কথা বলবার আছে, বলবার চেষ্টা করব —কিন্তু এই মুহূর্তে আপাতত বিশ্রাম করবার দরকার হয়েচে। অতএব জানলার সামনে লম্বা কেদারার উপর হেলান দিয়ে বসব, পায়ের উপর একটা কম্বল টেনে দেব—তারপরে চোখ যদি বুজে আসতে চায় জোর করে টেনে রাখতে চেষ্টা করব না। ইতি ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

॥ ১৭৬ ॥

ওঁ

বার্লিন

মেণ্ডেল-ভবন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, মস্কৌ থাকতে তোমাকে আর প্রশান্তকে সোভিয়েট ব্যবস্থা সম্বন্ধে দুটো বড়ো বড়ো চিঠি লিখেছিলুম। আমার সংকল্প ছিল বার্লিনে ফিরে এসে সে চিঠি বায়ুদূত যোগে পাঠিয়ে দেব। এখানে এসে জানতে পারলুম অমিয় সেখান থেকেই রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়ে দিয়েচে। সে চিঠি কবে পাবে এবং পাবে কিনা কি জানি।

বার্লিনে এসে একসঙ্গে তোমার দুখানা চিঠি পাওয়া

গেল। ঘন বর্ষার চিঠি। শান্তিনিকেতনের আকাশে শালবনের উপরে মেঘের ছায়া এবং জলের ধারায় শ্রাবণ ঘনিয়ে উঠেচে সেই ছবি মনে জাগলে আমার চিত্ত কি রকম উৎসুক হয়ে ওঠে সে তোমাকে বলা বাহুল্য। কিন্তু এবারে রাশিয়া ঘুরে এসে সেই সৌন্দর্যের ছবি আমার মন থেকে মুছে গেছে। কেবলি ভাবচি আমাদের দেশজোড়া চাষীদের দুঃখের কথা। আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট-পরিচয় হয়েচে। তখন চাষীদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখাশোনা—ওদের সব নালিশ উঠেচে আমার কানে। আমি জানি ওদের মতো নিঃসহায় জীব অল্পই আছে। ওরা সমাজের যে-তলায় তলিয়ে আছে সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পৌঁছয়, প্রাণের হাওয়া বয় না বললেই হয়। তখনকার দিনে দেশের পলিটিক্স নিয়ে যাঁরা আসর জমিয়ে ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না যাঁরা এদের সবাইকে দেশের লোক বলে অনুভব করতেন। আমার মনে আছে পাবনা কন্‌ফারেন্সের সময় আমি তখনকার খুব বড়ো একজন রাষ্ট্র-নেতাকে বলেছিলুম আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য করতে চাই তা হলে সব আগে সমাজের এই তলার লোকদের মানুষ করতে হবে। তিনি সে কথাটাকে এতই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিলেন যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, আমাদের দেশাত্মবোধীরা দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেচেন, দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন না। এই রকম মনোবৃত্তির সুবিধে হচ্চে এই যে, আমাদের দেশ আছে বিদেশীর হাতে এই কথা নিয়ে আক্ষেপ করা, উত্তেজিত হওয়া, কবিতা লেখা, খবরের কাগজ চালানো সহজ, কিন্তু দেশের লোক আমাদের আপন লোক এ কথা বলবামাত্র তার দায়িত্ব তখন থেকেই স্বীকার করে নিতে হয়, কাজ শুরু হয় সেই মুহূর্তে। সেদিনকার পরেও অনেকদিন চলে গেল। সেই পাবনা কন্‌-ফারেন্সে পল্লী সম্বন্ধে যা বলেছিলুম তার প্রতিধ্বনি অনেক-বার শুনেছি—শুধু শব্দ নয় পল্লীর হিতকল্পে অর্থও সংগ্রহ হয়েচে—কিন্তু দেশের যে উপরিতলায় শব্দের আবৃত্তি হয় সেইখানটাতেই সেই অর্থও আবর্তিত হয়ে বিলুপ্ত হয়েচে, সমাজের যে গভীর তলায় পল্লী তলিয়ে আছে সেখানে তার কিছুই পৌঁছল না। একদা আমি পদ্মার চরে বোট বেঁধে সাহিত্য চর্চা করছিলুম। মনে ধারণা ছিল লেখনী দিয়ে ভাবের খনি খনন করব এই আমার একমাত্র কাজ, আর কোনো কাজের আমি যোগাই নই। কিন্তু যখন এ কথা কাউকে বলে কয়ে বোঝাতে পারলুম না যে আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্চে কৃষিপল্লীতে, তার চর্চা আজ থেকেই শুরু করা চাই, তখন কিছুক্ষণের জন্যে কলম কানে গুঁজে এ কথা আমাকে বলতে হোলো আচ্ছা, আমিই এ কাজে লাগব। এই সংকল্পে আমার সহায়তা করবার জন্যে সেদিন একটিমাত্র লোক পেয়েছিলুম, সে হচ্চে কালীমোহন।(১) শরীর তার রোগে জীর্ণ, দু বেলা তার জ্বর আসে, তার উপরে পুলিসের খাতায় তার নাম উঠেচে। তার পর থেকে দুর্গম বন্ধুর পথে সামান্য পাথেয় নিয়ে চলেছে সেই ইতিহাস। চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েচে—জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর—দ্বিতীয়ত সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আল-বাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা। কিন্তু এই দুটো পন্থাই দুরূহ। প্রথমত চাষীকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পর-মুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বই কমবে না। কৃষিক্ষেত্র একত্রীকরণের কথা আমি নিজে একদিন চাষীদের ডেকে আলোচনা করেছিলুম। শিলাইদহে আমি যে বাড়িতে থাকতুম তার বারান্দা থেকে দেখা যায় ক্ষেতের পর ক্ষেত নিরন্তর চলে গেছে দিগন্ত পেরিয়ে। ভোর-বেলা থেকে হাল লাঙল এবং গোরু নিয়ে একটি একটি করে চাষী আসে, আপন টুকরো ক্ষেতটুকু ঘুরে ঘুরে চাষ করে চলে যায়। এইরকম ভাগ করা শক্তির যে কতটা অপচয় ঘটে প্রতিদিন সে আমি স্বচক্ষে দেখেচি। চাষীদের ডেকে যখন সমস্ত জমি একত্র করে কলের লাঙলে চাষ করার সুবিধের কথা বুঝিয়ে বললুম তারা তখনি সমস্ত মেনে নিলে। কিন্তু বললে, আমরা নির্বোধ, এত বড়ো ব্যাপার করে তুলতে পারব কি করে। আমি যদি বলতে পারতুম এ ভার আমিই নেব তা হলে তখনি মিটে যেতে পারত। কিন্তু আমার সাধ্য কি। এমন কাজের চালনাভার নেবার দায়িত্ব আমার পক্ষে অসম্ভব। —সে শিক্ষা, সে শক্তি আমার নেই। কিন্তু এ কথাটা বরাবর আমার মনে জেগেছিল। যখন বোলপুরের কো-অপারেটিভের ব্যবস্থা বিশ্বভারতীর হাতে এল তখন আবার একদিন আশা হয়েছিল এইবার বুঝি সুযোগ হতে পারবে। যাদের হাতে আফিসের ভার তাদের বয়স অল্প, আমার চেয়ে তাদের হিসাবী বুদ্ধি এবং শিক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু আমাদের যুবকেরা ইস্কুলে পড়া ছেলে, তাদের বই মুখস্থ করার মন। যে যে শিক্ষা আমাদের দেশে প্রচলিত তাতে করে আমাদের চিন্তা করার সাহস, কর্ম করার দক্ষতা থাকে না, পুঁথির বুলি পুনরাবৃত্তি করার পরেই ছাত্রদের পরিত্রাণ নির্ভর করে। বুদ্ধির এই পল্লবগ্রাহিতা ছাড়া আমাদের আর একটা বিপদ ঘটে। ইস্কুলে যারা পড়া মুখস্থ করেচে আর ইস্কুলের বাইরে পড়ে থেকে যারা পড়া মুখস্থ করে নি তাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ঘটে গেছে, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত। ইস্কুলে পড়া মনের আত্মীয়তাবোধ পুঁথি-পোড়োদের পাড়ার বাইরে পৌঁছতে পারে না। যাদের আমরা বলি চাষাভুষো, পুঁথির পাতার পর্দা ভেদ করে তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পৌঁছয় না, তারা আমাদের কাছে অস্পষ্ট। এই জন্যেই ওরা আমাদের সকল প্রচেষ্টা থেকে স্বভাবতই বাদ পড়ে যায়। তাই কো-অপারে-টিভের যোগে অন্য দেশে যখন সমাজের নীচের তলায় একটা সৃষ্টির কাজ চলচে, আমাদের দেশে টিপে টিপে টাকা ধার দেওয়ার বেশী কিছু এগোয় না। —কেননা ধার দেওয়া, তার সুদ কষা, এবং দেনার টাকা আদায় করা অত্যন্ত ভীরু মনের পক্ষেও সহজ কাজ, এমন কি, ভীরু মনের পক্ষেই সহজ, তাতে যদি নামতার ভুল না ঘটে তা হলে কোনো বিপদ নেই। বুদ্ধির সাহস এবং জনসাধারণের প্রতি দরদ বোধ এই উভয়ের অভাব ঘটাতেই দুঃখীর দুঃখ আমাদের দেশে ঘোচানো এত কঠিন হয়েচে। কিন্তু এই অভাবের জন্যে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। কেননা কেরানী তৈরি করার কারখানা বসাবার জন্যেই একদা আমাদের দেশে বণিক রাজত্বে ইস্কুলের পত্তন হয়েছিল। ডেস্ক-লোকে মনিবের সঙ্গে সাযুজ্য লাভই আমাদের সদ্‌গতি। সেই জন্যে উমেদারিতে অকৃতকার্য হলেই আমাদের বিদ্যাশিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়। এই জন্যেই আমাদের দেশে প্রধানত দেশের কাজ কংগ্রেসের প্যান্ডালে এবং খবরের কাগজের প্রবন্ধশালায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেদনা উদ্‌ঘোষণের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমাদের কলমে বাঁধা হাত দেশকে গড়ে তোলবার কাজে এগোতেই পারলে না।

ঐ দেশের হাওয়াতেই আমিও তো মানুষ, সেই জন্যেই জোরের সঙ্গে মনে করতে সাহস হয় নি যে, বহু কোটি জন-

(১) স্বর্গত কালীমোহন ঘোষ

সাধারণের বুকের উপর থেকে অশিক্ষা এবং অসামর্থ্যের জগদ্দল পাথর ঠেলে নাবানো সম্ভব। অল্প স্বল্প কিছু করতে পারা যায় কিনা এতদিন এই কথাই ভেবেছি। মনে করেছিলুম সমাজের একটা চিরবাধাগ্রস্ত তলা আছে, সেখানে কোনো কালেই সূর্যের আলো সম্পূর্ণ প্রবেশ করানো চলবে না, সেই জন্যেই সেখানে অন্তত তেলের বাতি জ্বালাবার জন্যে উঠে পড়ে লাগা উচিত। কিন্তু সাধারণত সেটুকু কর্তব্যবোধও লোকের মনে যথেষ্ট জোরের সঙ্গে ধাক্কা মারতে চায় না—কারণ, যাদের আমরা অন্ধকারে দেখতেই পাইনে তাদের জন্যে যে কিছুই করা যেতে পারে এ কথা স্পষ্ট করে মনে আসে না।

এই রকম স্বল্পসাহস মন নিয়েই রাশিয়াতে এসেছিলুম। শুনেছিলুম এখানে চাষী কর্মিকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পরিমাণ অনেক বেড়ে চলেচে। ভেবেছিলুম, তার মানে ওখানে পল্লীর পাঠশালায় শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ, বড়ো জোর দ্বিতীয় ভাগ পড়ানোর কাজ সংখ্যায় আমাদের চেয়ে বেশী হয়েচে। ভেবেছিলুম ওদের তথ্য তালিকা নেড়ে চেড়ে দেখতে পাব ওদের ক'জন চাষী নাম সই করতে পারে আর ক'জন চাষীর নামতা দশের কোঠা পর্যন্ত এগিয়েছে।

মনে রেখো এখানে যে-বিপ্লবে জারের শাসন লয় পেলে সেটা ঘটেচে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। অর্থাৎ তেরো বছর পার হোলো মাত্র। ইতিমধ্যে ঘরে বাইরে এদের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতার সঙ্গে লড়ে চলতে হয়েচে। এরা একা, অত্যন্ত ভাঙাচোরা একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার বোঝা নিয়ে।—পথ পূর্বতন দুঃশাসনের প্রভূত আবর্জনায় দুর্গম। যে-আত্মবিপ্লবের প্রবল ঝড়ের মুখে এরা নবযুগের ঘাটে পাড়ি দিলে সেই বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন এবং প্রকাশ্য সহায় ছিল ইংলণ্ড এবং আমেরিকা। অর্থসম্বল এদের সামান্য—বিদেশের মহাজনী গদিতে এদের ক্রেডিট নেই, দেশের মধ্যে কলকারখানা যথেষ্ট পরিমাণে না থাকাতে এদের অর্থ উৎপাদনের শক্তি ক্ষীণ। এই জন্যে কোনোমতে পেটের ভাত বিক্রি করে চলচে এদের উদ্যোগপর্ব। অথচ রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকলের চেয়ে যে-অনুৎপাদক বিভাগ সৈনিক বিভাগ তাকে সম্পূর্ণ পরিমাণে সুদক্ষ রাখার অপব্যয় এদের পক্ষে অনিবার্য। কেননা আধুনিক মহাজনী যুগের সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি এদের শত্রুপক্ষ এবং তারা সকলেই আপন আপন অস্ত্রশালা কানায় কানায় ভরে তুলচে। মনে আছে এরাই লীগ অফ্ নেশনসে অস্ত্র বর্জনের প্রস্তাব পাঠিয়ে কপটশান্তিকামীদের মনে চমক লাগিয়ে দিয়েছিল। কেননা নিজেদের প্রতাপ বর্ধন বা রক্ষণ সোভিয়েটদের লক্ষ্য নয়—এদের সাধনা হচ্ছে জনসাধারণের শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্নসম্বলের উপায় উপকরণকে প্রকৃষ্ট প্রণালীতে ব্যাপক করে গড়ে তোলা, এদেরই পক্ষে নিরুপদ্রব শান্তির দরকার সবচেয়ে বেশী। কিন্তু তুমি তো জান, লীগ অফ্ নেশনসে সকল পালোয়ানই গুণ্ডাগিরির বহুবিস্তৃত উদ্যোগ কিছুতেই বন্ধ করতে চায় না কিন্তু শান্তি চাই বলে সকলে মিলে হাঁক পাড়ে। এই জন্যে সকল সাম্রাজিক দেশেই অস্ত্রশস্ত্রের কাঁটা বনের চাষ অন্নের চাষকে ছাপিয়ে বেড়ে চলেচে। এর মধ্যে আবার কিছুকাল ধরে রাশিয়ায় অতি ভীষণ দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল—কত লোক মরেচে তার ঠিক নেই। তার ধাক্কা কাটিয়ে সবেমাত্র আট বছর এরা নূতন যুগকে গড়ে তোলবার কাজে লাগাতে পেরেছে, বাইরের উপকরণের অভাব সত্ত্বেও। কাজ সামান্য নয়—য়ুরোপ এসিয়া জুড়ে প্রকাণ্ড এদের রাষ্ট্রক্ষেত্র। প্রজামণ্ডলীর মধ্যে যত বিভিন্ন জাতের মানুষ আছে ভারতবর্ষেও এত নেই। তাদের ভূপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতির পার্থক্যও অত্যন্ত বেশী। বস্তুত এদের সমস্যা বহুবিচিত্র জাতি সমাকীর্ণ বহুবিচিত্র অবস্থাসংকুল বিশ্বপৃথিবী সমস্যারই সংক্ষিপ্ত রূপ।

তোমাকে পূর্বেই লিখেছি বাহির থেকে মস্কৌ শহরে যখন চোখ পড়ল দেখলুম য়ুরোপের অন্য সমস্ত ধনী শহরের তুলনায় অত্যন্ত মলিন। রাস্তায় যারা চলেচে তারা একজনও শৌখিন নয়, সমস্ত শহর আটপৌরে কাপড় পরা। আটপৌরে কাপড়ে শ্রেণীভেদ থাকে না, শ্রেণীভেদ পোশাকী কাপড়ে। এখানে সাজে পরিচ্ছদে সবাই এক। সবটা মিলেই শ্রমিকদের পাড়া—যেখানে দৃষ্টি পড়ে সেখানেই ওরা। এখানে শ্রমিকদের কষাণদের কি রকম বদল হয়েচে তা দেখবার জন্যে লাইব্রেরিতে গিয়ে বই খুলতে, অথবা গাঁয়ে কিংবা বস্তিতে গিয়ে নোট নিতে হয় না। যাদের আমরা "ভদ্দর লোক" বলে থাকি তারা কোথায় সেইটেই জিজ্ঞাস্য।

এখানকার জনসাধারণ ভদ্রলোকের আওতায় একটুও ছায়া ঢাকা পড়ে নেই—যারা যুগে যুগে নেপথ্যে ছিল তারা আজ সম্পূর্ণ প্রকাশ্যে। এরা যে প্রথম ভাগ শিশুশিক্ষা পড়ে কেবলমাত্র ছাপার অক্ষরে হাৎড়ে বেড়াতে শিখেচে এ ভুল ভাঙতে একটুও দেরি হোলো না। এরা মানুষ হয়ে উঠেছে এই ক'টা বছরেই। নিজের দেশের চাষীদের মজুরদের মনে পড়ল। মনে হল আরব্য উপন্যাসের জাদুকরের কীর্তি! বছর দশেক আগেই এরা ঠিক আমাদেরই দেশের জনমজুরদের মতই নিরক্ষর নিঃসহায় নিরন্ন ছিল, তাদেরই মত অন্ধ সংস্কার এবং মূঢ় ধার্মিকতা। দুঃখে বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়েছে, পরলোকের ভয়ে পাণ্ডা পুরুতদের হাতে এদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুরুষ মহাজন ও জমিদারদের হাতে, যারা এদের জুতো পেটা করত তাদের সেই জুতো সাফ করা এদের কাজ ছিল। হাজার বছর থেকে এদের প্রথা পদ্ধতির বদল হয় নি,—যানবাহন চরকা ঘানি সমস্ত প্রপিতামহের আমলের, হালের হাতিয়ারে হাত লাগাতে বললে বেঁকে বসত। আমাদের দেশের ত্রিশ কোটির পিঠের উপরে যেমন চেপে বসেছে ভূত কালের, চেপে ধরেচে তাদের দুই চোখ—এদেরও ঠিক তেমনিই ছিল। ক'টা বছরের মধ্যে এই মূঢ়তার অক্ষমতার অভ্রভেদী পাহাড় নড়িয়ে দিলে যে কি করে সে কথা এই হতভাগ্য ভারতবাসীকে যেমন একান্ত বিস্মিত করেচে এমন আর কাকে করবে বল? অথচ যে সময়ের মধ্যে এই পরিবর্তন চলছিল সে সময়ে এ দেশে আমাদের দেশের বহুপ্রশংসিত law and order ছিল না।

তোমাকে পূর্বেই বলেছি এদের জনসাধারণের শিক্ষার চেহারা দেখবার জন্যে আমাকে দূরে যেতে হয় নি কিংবা ইস্কুলের ইন্‌স্পেক্টরের মতো এদের বানান তদন্ত করবার সময় দেখতে হয় নি কান-এ "সোনা"য় এরা মূর্ধন্য ণ লাগায় কিনা। একদিন সন্ধ্যাবেলায় মস্কৌ শহরে একটা বাড়িতে গিয়েছিলুম, সেটা চাষীদের বাসা। গ্রাম থেকে কোনো উপলক্ষ্যে যখন তারা শহরে আসে তখন সস্তায় ঐ বাড়িতে কিছুদিনের মতো থাকতে পায়। তাদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছিল। সে রকম কথাবার্তা যেদিন আমাদের দেশের চাষীদের সঙ্গে হবে সেদিন সাইমন্ কমিশনের জবাব দিতে পারব। আর কিছু নয় এটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েচি সবই হতে পারত কিন্তু হয়নি—না হোক্ আমরা পেয়েছি Law and order। আমাদের ওখানে সাম্প্রদায়িক লড়াই ঘটে বলে একটা অখ্যাতি বিশেষ ঝোঁক দিয়ে রটনা হয়ে থাকে—এখানেও য়িহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে খৃস্টান সম্প্রদায়ের লড়াই আমাদের দেশেরই আধুনিক উপসর্গের মতো অতি কুৎসিত অতি বর্বরভাবেই ঘটত—শিক্ষায় এবং শাসনে একেবারে তার মূলে উৎপাটিত হয়েচে। কতবার আমি ভেবেছি আমাদের দেশে সাইমন কমিশন যাবার আগে একবার রাশিয়ায় তার ঘুরে যাওয়া উচিত ছিল।

তোমার মতো ভদ্রমহিলাকে সাধারণ ভদ্রগোছের চিঠি না

লিখে এ রকম চিঠি যে কেন লিখলুম তার কারণ চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে দেশের দশা আমার মনের মধ্যে কি রকম তোলপাড় করচে। জালিয়ানবাগের উপদ্রবের পর একবার আমার মনে এই রকম অশান্তি জেগেছিল। এবার ঢাকার উপদ্রবের পর আবার সেই রকম দুঃখ পাচ্ছি। সে ঘটনার উপর সরকারী চুনকামের কাজ হয়েচে কিন্তু এ রকম সরকারী চুনকামের যে কি মূল্য তা রাষ্ট্রনীতিবিৎ সবাই জানে। এই রকম ঘটনা যদি সোভিয়েট রাশিয়ায় ঘটত তা হলে কোনো চুনকামেই তার কলঙ্ক ঢাকা পড়ত না। সুধীন্দ্র, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যার কোনো শ্রদ্ধা কোনোদিন ছিল না, সেও এবারে আমাকে এমন চিঠি লিখেছে যাতে বোঝা যাচ্চে সরকারী ধর্ম-নীতির প্রতি ধিক্কার আজ আমাদের দেশে কত দূর পর্যন্ত পৌঁছেছে। যা হোক তোমার চিঠি অসমাপ্ত রইল—কাগজ এবং সময় ফুরিয়ে এসেচে—এবার প্রশান্তর চিঠিতে এ চিঠির অসম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ করব। ইতি সেপ্টেম্বর ২৮ ১৯৩০

রবীন্দ্রনাথ

ক য়ে ক টি ক বি তা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

॥ ১ ॥

তোমাদের কর্মকোলাহলে
নর্ম জলধারা
ঝরুক তা হলে।
আমি কিন্তু অলস মন্থর
এক গ্রীষ্ম-কায়
নিয়ে স্থির পণ, অভিপ্রায়
জেগে থাকি, দিনরাত্রি হয়ে যায় সারা-
নিষ্কম্প অন্তর।

॥ ২ ॥

করে আজ শ্রেষ্ঠ আয়োজন
চৈত্র-চেতনায় জাগা মন
চায় এই পরম প্রতীতি
বৈশাখের ক্রূর ঝড়ো ভীতি
জয় করে যেন চলে যায়।
তবে আর ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষায়
দীর্ণ কেন আর
তোমার আমার
এই শীর্ণ ক্ষণ?

॥ ৩ ॥

সহজ বিস্ময় দাও প্রাণে।
তোমার আমার দীর্ঘ সজাগ অঘ্রানে
আসে কি অমৃত-ঝরা প্রাণ জিজীবিষা!
অমা-অন্ধকারে যেন শেষ করে তৃষা
পৃথিবীর পরমায়ু হতে নিয়ে ছোঁওয়া
শীতান্তের হাওয়া
পায় নাম বসন্তের গানে।

শুধুই সন্ধানে
শেষ হয় জীবনের রতি।
আমার তোমার প্রতি
বিধাতার সে ক্রূর ইঙ্গিত
উর্ধ্বে তুলে শেষ করে যেন দীর্ঘ শীত।

॥ ৪ ॥

দুপুরের মতো
নির্মম সতত
নেই আর কিছু।
নেই যাওয়া এ শয্যার থেকে
কারো পিছু পিছু
এঁকে আর বেঁকে
রাস্তা অনুসারী
জীবনের মতন জুয়াড়ি
আছে আর যদি
সে তোমার স্মৃতি নিরবধি।

রবীন্দ্রনাথ ও সারস্বত সমাজ

গোপালচন্দ্র রায়

১২৮৯ সালে বাংলা দেশের তৎকালীন প্রায় সকল বিখ্যাত সাহিত্যসেবীকে নিয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে একটি সাহিত্যিক সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল। এই সংস্থাটির নাম ছিল কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন বা সারস্বত সমাজ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বপ্রকারে উন্নতি সাধন করাই ছিল এই প্রতিষ্ঠানটির প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে প্রথমে একটি অনুষ্ঠানপত্র প্রচারিত হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানপত্রে সংস্থার উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী ও সভ্যদের নাম প্রকাশিত হয়।

আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির একটি অনুষ্ঠান-পত্র দেখেছি। এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমভবনের একাংশে স্থাপিত ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় আছে। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র শতঞ্জীবচন্দ্র এটি ঋষি বঙ্কিম সংগ্রহ-শালায় দান করেছেন। অনুষ্ঠানপত্রটি সামান্য কীটদষ্ট। তা হলেও আসল কথা-গুলি সমস্তই রয়েছে। আমরা এখানে ঐ অনুষ্ঠানপত্রটির একটি প্রতিলিপি মুদ্রিত করলাম। অনুষ্ঠানপত্রের আলোকচিত্র ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার সৌজন্যে প্রাপ্ত। এই অনুষ্ঠানপত্রটিতে দেখা যাচ্ছে যে, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিম-চন্দ্র প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেকেই এই সাহিত্যিক সংস্থার সভ্য হয়েছিলেন। এইসব মহা মহা পণ্ডিত ও সাহিত্যরথীদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তখন সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর বয়স তখন ছিল মাত্র ২২ বছর।

এই সারস্বত সম্মিলন স্থাপনের কল্পনা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখে গেছেন—"বাঙ্গলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।"

১২৮৯ সালের ২রা শ্রাবণ কলিকাতা সারস্বত সম্মিলনের প্রথম সভা হয়। সভ্যদের নিকট প্রেরিত ঐ প্রথম সভার একটি আমন্ত্রণ-পত্রও আমরা দেখেছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন ঐ সভার আহ্বায়ক। এখানে সেই আমন্ত্রণ-পত্রটিরও প্রতিলিপি মুদ্রিত করা গেল। এটির আলোকচিত্রও ঋষি বঙ্কিম সংগ্রহ-শালার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

কলিকাতা সারস্বত সম্মিলনের প্রথম

কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন।

১লা শ্রাবণ রবিবারে সারস্বত সম্মিলন সভার অধিবেশন হইবে।

অতএব মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক অপরাহ্ণ ৪।।. ঘটিকার সময়ে ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেনে ... করিয়া সভার কার্য্য সমাধা করিলে বাধিত হইব।

১২৮৯ সাল

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রস্তাবক।

সভায় সভার কার্যবিবরণীগুলি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্রনাথের লেখা সেই পাণ্ডুলিপিটি রক্ষিত আছে। রবীন্দ্রনাথের সেই পাণ্ডুলিপিটি থেকে সেদিনের সভার কার্যবিবরণীগুলি জানা যায়। পাণ্ডুলিপিতে এই কথাগুলি লেখা আছে—

সারস্বত সমাজ

১২৮৯ সালের শ্রাবণ মাসের প্রথম রবিবার ২রা তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি ৬ নম্বর ভবনে সারস্বত সমাজের প্রথম অধিবেশন হয়।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সারস্বত সমাজ স্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে সভাপতি মহাশয় এক বক্তৃতা দেন। বঙ্গভাষার সাহায্য করিতে হইলে কী কী কার্যে সমাজের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হইবে, তাহা তিনি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমত বানানের উন্নতি সাধন। বাংগলা বর্ণমালায় অনাবশ্যক অক্ষর আছে কিনা এবং শব্দ-বিশেষ উচ্চারণের জন্য অক্ষরবিশেষ উপযোগী কিনা, এই সমাজের সভাগণ তাহা আলোচনা করিয়া স্থির করিবেন। কাহারো কাহারো মতে আমাদের বর্ণমালায় স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ নাই, এ তর্কটিও আমাদের সমাজের আলোচ্য। এতদ্ব্যতীত ঐতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক নামসকল বাংগালায় কিরূপ বানান করিতে হইবে, তাহা স্থির করা আবশ্যক। আমাদের সম্রাজ্ঞীর নামকে অনেকে 'ভিক্টোরিয়া' বানান করিয়া থাকেন, অথচ ইংরেজী V অক্ষর স্থলে অন্তঃস্থ 'ব' সহজেই হইতে পারে। ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের অনুবাদ লইয়া বাংগালায় বিস্তর গোল-যোগ ঘটিয়া থাকে—এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সমাজের কর্তব্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়—ইংরেজী isthmus শব্দ কেহ বা 'ডমরুমধ্য' কেহ বা যোজক বলিয়া অনুবাদ করেন। উহাদের মধ্যে কোনটিই হয়ত সার্থক হয় নাই। অতএব এই সকল শব্দ নির্বাচন ও উদ্ভাবন করা সমাজের প্রধান কার্য। উপসংহারে সভাপতি কহিলেন—এই সকল এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য নানাবিধ আলোচ্য বিষয় সমাজে উপস্থিত হইবে, যদি সভাগণ মনের সহিত অধ্যবসায়সহকারে সমাজের কার্যে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সমাজের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

পরে সভাপতি মহাশয় সমাজের নিয়মাবলী পর্যালোচনা করিবার জন্য সভায় প্রস্তাব করেন—

স্থির হইল বিদ্যার উন্নতি সাধন করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য।

তৎপরে তিন চারটি নামের মধ্য হইতে অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে সভার নাম স্থির হইল—সারস্বত সমাজ।

সমাজের দ্বিতীয় নিয়ম নিম্নলিখিত মতে পরিবর্তিত হইল—যাঁহারা বংগসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বাংগলা ভাষার উন্নতি সাধনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন।

সমাজের তৃতীয় নিয়ম কাটা হইল।

সমাজের চতুর্থ নিয়ম নিম্নলিখিত মতে রূপান্তরিত হইল—

সমাজের মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যের মধ্যে অধিকাংশের ঐকমত্যে নূতন

সভ্য গৃহীত হইবেন। সভ্যগ্রহণ কার্যে গোপনে সভাপতিকে মত জ্ঞাত করা হইবে।

সমাজের চতুর্বিংশ নিয়ম নিম্নলিখিত মতে রূপান্তরিত হইল—সভ্যদিগের বার্ষিক ৬ টাকা আগামী চাঁদা দিতে হইবে। যে সভ্য এককালে ১০০৲ টাকা চাঁদা দিবেন, তাঁহাকে ওই বার্ষিক চাঁদা দিতে হইবে না।

অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে বর্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমাজের কর্মচারীরূপে নির্বাচিত হইলেন—

সভাপতি—ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

সহযোগী সভাপতি—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

(জীবন-স্মৃতি—নূতন সংস্করণ)

এই 'সারস্বত সমাজ' স্থাপিত হলে এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন—"সভার স্থায়িত্বের প্রতি এখন একটি মাত্র সংশয় আছে। আমাদের সাহিত্য-সংসারে অনেকগুলি দলপতি, প্রায় সকল দলপতিই এক স্থানে সমবেত হইয়াছেন। এক্ষণে যদি তাঁহারা ক্ষুদ্র দলাদলির ভাব ত্যাগ করিয়া, নিজের ক্ষুদ্র অভিমান বিসর্জন করিয়া, উৎসাহের সহিত এক হৃদয়ে সরস্বতীর সেবায় নিযুক্ত হন, তবেই সারস্বত সম্মিলনের পক্ষে মঙ্গল নচেৎ যে আয়োজন করা হইতেছে—সে কেবল বাঙ্গলায় আর একটি কলঙ্কধ্বজা স্থাপনের নিমিত্ত।"—প্রবন্ধমঞ্জরী।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সন্দেহ অমূলক হয় নি। কেননা সত্যই এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত সভাটি বেশী দিন স্থায়ী হতে পারে নি। সভার এই অল্পায়ু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখেছেন—"যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই সভায় আহ্বান করিবার জন্য গেলাম, তখন সভার উদ্দেশ্য ও সভ্যদের নাম শুনিয়া তিনি বলিলেন—'আমি পরামর্শ দিতেছি, আমাদের মতো লোককে পরিত্যাগ করো—'হোমরা-চোমরা'দের লইয়া কোন কাজ হইবে না। কাহারও সঙ্গে কাহারো মতে মিলিবে না।' এই বলিয়া তিনি এ সভায় যোগ দিতে রাজী হইলেন না। বঙ্কিমবাবু সভ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে যে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না।

বলিতে গেলে, যে কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন।......

বিদ্যাসাগরের কথা ফলিল। হোমরা-চোমরাদের একত্র করিয়া কোন কাজে লাগানো সম্ভবপর হইল না। সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হইয়াই শুকাইয়া গেল।"

কিন্তু তবুও সভা যতদিন জীবিত ছিল, সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজ কর্তব্যে কখনো অবহেলা করেন নি। বরং তিনি তখন তাঁর অন্য অনেক কাজ ত্যাগ করে এই সভার কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। এ সম্বন্ধে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা ক মাস পরের রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র থেকে তা বেশ বোঝা যায়। সে পত্রটি এই:—

প্রিয়বরেষু,

আমি কিছুদিন থেকে 'সারস্বত সমাজের' হাঙ্গামা নিয়ে ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম—এখনো অল্প অল্প চলবে—তাই আর আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ প্রভৃতি হয়ে ওঠে নি।......

(আশ্বিন—১২৯৮)।

সারস্বত সমাজ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি সত্য, কিন্তু যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই সমাজ একদা স্থাপিত হয়েছিল, তার উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়নি। কারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কালে তাঁর দীর্ঘজীবনের সুকঠোর সাধনার দ্বারা বঙ্গ-ভারতীর সেই সকল অভাব বহুলাংশেই পূরণ করে গেছেন।

রূপময় ভারত

পশ্চিম ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়ে মহারাষ্ট্রের ওরলি অঞ্চলের অধিবাসীরা। আধুনিক সভ্যতার স্পর্শ এদের মধ্যে লাগলেও ভারতের অন্যান্য বহু অঞ্চলের আদিবাসীদের মতো ওরলি আদিবাসীরাও বহু ব্যাপারে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলেছে। বেশভূষা, চাষবাসের পদ্ধতি এবং সামাজিক আচার-আচরণ ব্যাপারে ওরলি আদিবাসীদের একটা নিজস্বতা আছে। স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেও ওদের বৈচিত্র্য স্পষ্ট জীবনের প্রতি পদে। প্রাকৃতিক পরিবেশে এই ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে ১। পাহাড়ের ওপর কাজের ফাঁকে বিশ্রামরত ওরলি পুরুষ দল; ২। ওরলিদের মেয়েরা; ৩। জ্বালানি নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনরতা ওরলি মেয়ে; ৪। ওরলিদের গ্রামের মোড়ল—পিছনে দেয়ালের গায়ে আঁকা চিত্র; ৫। শুকনো পাতা কুড়ানোয় ব্যস্ত ওরলি পুরুষেরা।

আলোকচিত্রশিল্পী:

সুনীল জানা

৪

৫

সম্প্রতি উত্তর জার্মানীর বিশ্ববিখ্যাত বন্দর হামবুর্গে রন্ধন-শিক্ষানবিশদের একটা রন্ধন-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ বছর বয়স্ক শিক্ষানবিশ বের্নার মার্টিনস্ এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। এই তরুণ এখন ওদেশে পৃথিবীর সেরা পাচক বলে পরিচিত এবং এখন সে সোনার চাটুতে ডিম ভাজবার অধিকার লাভ করেছে।

জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের রাজধানী বনে "পাচক-সমিতি" নামক একটা সমিতি আছে। কর্মচারী, কেরানী, উকিল, ব্যারিস্টার প্রভৃতি অনেকেই এই পাচক-সমিতির সদস্য। অনেক বিদেশীও এই সমিতিতে আছেন। পুরুষরাও যে ভালো রাঁধতে পারে তাদের স্ত্রীদের কাছে সেকথা তারা প্রমাণ করতে চায়। কোন সদস্য কি রকম রাঁধতে পারে, তা তাদের মাথার টুপি দেখেই বুঝতে পারা যায়। পাচক-সমিতির নতুন পাচকরা পরে ১৭ সেণ্টিমিটার উঁচু টুপি, আর যারা সবচাইতে ভালো রাঁধতে পারে, তারা ৫২ সেণ্টিমিটার উঁচু টুপি পরবার অধিকার লাভ করে। জার্মান ফেডারেল সেনাবাহিনীর মেজর রাইনহার্ড হাউশীল্ড এই পাচক-সমিতির উদ্যোক্তা। বনের প্রতিরক্ষ-মন্ত্রণালয়ের প্রেস-ডিপার্ট-মেণ্টের সংগে তিনি সংশ্লিষ্ট। সারা জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রে বর্তমানে আটটা পাচক-সমিতি গড়ে উঠেছে, এবং অদূর ভবিষ্যতে বনের পাচক-সমিতি আর জার্মানীর অন্যান্য পাচক-সমিতির মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায় কি না, মেজর রাইনহার্ড হাউশীল্ড সেকথা চিন্তা করে দেখছেন।

*

খনির বিরাট উত্তোলক যন্ত্রটি প্রতি সেকেণ্ডে ৩৫ ফুট গতিতে ২৫০০ ফুট নীচে নেমে গেলো। এইখানেই শুরু হলো যন্ত্রবিজ্ঞানের আশ্চর্য কৃতিত্ব। একটি বিপুল বিস্তৃত দ্বিতল গ্যালারি তার দু দিকে ধূসর বর্ণের পাথরের দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে নিওন আলোতে আলোকিত সাদা ধবধবে রাস্তা চলে গেছে। সাদা পোশাক এবং সবুজ, লাল ও হলুদে রঙের শিরস্ত্রাণ পরে কর্মীরা সাইকেলে ও মোটর সাইকেলে যাতায়াত করছে। এরা ভূনিম্নের এই প্রথম আধুনিক শহরটির নাগরিক। উত্তর জার্মানীর হ্যানোভার ও গটিংজেন শহর দুটির মাঝামাঝি হিনডেনবার্গের কাছে কোনিগ্‌হলে আছে পটাসিয়ামের একটি খনি এবং এটি হল জার্মানীর প্রথম স্বয়ংচালিত খনি। এই খনিটিতে বিজ্ঞান ও কাহিনী যেন এক সংগে রূপ পেয়েছে। ২ কোটি ডলার ব্যয়ে খনিটিকে সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংচালিত করা হয়েছে, এবং এখন মানুষে প্রায় কোন সাহায্য ছাড়াই এখানে কাজ হচ্ছে। প্রত্যেক সিফ্‌টে বর্তমানে মাত্র ১৪০ জন খনিকর্মীর প্রয়োজন হয়, কিন্তু এর পূর্বে এই খনিতে কয়েক হাজার কর্মীর প্রয়োজন হতো। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই এখন যন্ত্রপাতিগুলি তদারক করে অথবা সেগুলি চালায়। যে বিরাট আকারের ড্রিলিং মেসিনটি পটাসিয়াম স্তর কাটে, সেটি চালাতে মাত্র একজন মেসিন-চালকের প্রয়োজন হয়। এক দল শ্রমিক হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যে কাজ করতো, এখন একটি মেসিনে তার চাইতে অনেক কম সময়ে সে সাজ হয়।

পটাসিয়ামযুক্ত প্রস্তরগুলি পরিবহণ ও চূর্ণ করার জন্য এখানে বিস্তৃত রেল-পথ ও চূর্ণ করার যন্ত্রাদি রয়েছে। অথচ কোথাও কোন মানুষ নেই, সব কাজ যেন যাদুমন্ত্রে আপনা থেকেই হয়ে যাচ্ছে।

এই যাদুর খেলার পরিচালক কিন্তু একজন মাত্র খনিকর্মী। ৭২৫ ফুট ভূনিম্নে সেই কর্মীটি একটি সুইচ বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে রঙীন বাতিগুলি পর্যবেক্ষণ ও তদারক করে এবং রঙীন বোতাম টিপে মেসিনটি দিয়ে কাজ করিয়ে যায়। ভূনিম্নের এই সাম্রাজ্যটি আট ঘণ্টার জন্য তারই শাসনাধীনে থাকে। সামান্য একটি বোতাম টিপলেই ইস্পাতের তৈরী বিরাট একটি হাতা প্রকাণ্ড এক খণ্ড প্রস্তর তুলে রেল-পথের ওপর অপেক্ষমাণ গাড়িতে আস্তে আস্তে রেখে দেয়। একটি লীভার টানলেই একটি ক্রেন চালু হয়ে যায়। ১০০ মিটার উঁচুতে কর্তব্যরত ইঞ্জিনীয়ার দুটি টেলি-ভিশন সেটের দিকে লক্ষ্য রাখেন এবং সেই সেট দুটির মাধ্যমে তিনি সমগ্র খনিটির কাজ তদারক করতে পারেন। সমস্ত পরিবহণকারী বেল্ট ও ক্রেনগুলি এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

মানুষের জীবন বিপন্ন না করে যাতে পটাশিয়াম সংগ্রহ করা যায় সেইজন্য যন্ত্র-চালিত এই শহরটি তৈরী করা হয়েছে। খনিটি সম্পূর্ণভাবে স্বয়ংচালিত বলে এটির কাজ চালানোর ব্যয়ও অনেক কম। এই খনি থেকে প্রতিদিন গড়পড়তা দুই হাজার দুইশত টন পটাশিয়াম তোলা হয়। এই ধাতুটি জার্মানী, ফ্রান্স ও স্পেনে বিক্রী হয়।

খনি কর্মিগণ এই খনিতে আগে সব সময়ে যে বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে কাজ করতে তা এখন অতীতের বস্তু। যন্ত্র মানুষের কাজের ভার নিয়েছে। আজকাল খনি কর্মীর কাজ শুধু হলো এইসব যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা। কর্মীদের নিরাপত্তামূলক শিরস্ত্রানের রং দেখে তারা কে কোন বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে আছে তা বোঝা যায়। ভূনিম্নের এই শিল্প নগরীর রাস্তা দিয়ে বাস বোঝাই কর্মী ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে যাওয়া-আস করের বিভিন্ন উচ্চতায় ১৩ ফিট প্রশস্ত প্রায় ১৫ মাইল লম্বা দুটি রাস্তা আছে এবং তাতে ট্রাফিক পর্যন্ত রয়েছে।
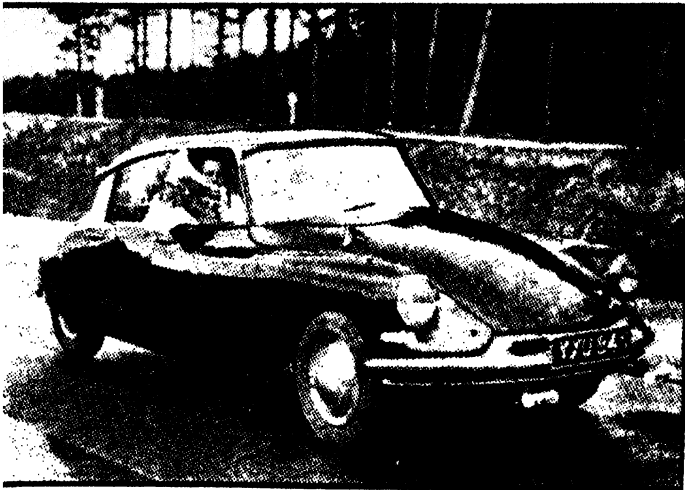
সামনের বাম্পারে একটি ইলেকট্রনিক ডিটেক্টর লাগানো গাড়ি যেটি চালাতে স্টিয়ারিং করার দরকার হয়না—গাড়ি চলার সময় চালক নির্বিঘ্নে কাগজ পড়ে যেতে পারে। ইংলণ্ডের রোড রিসার্চ লেবরেটরি পরীক্ষামূলকভাবে রাস্তার নিচে এমনভাবে তার বসিয়ে নিয়েছে যা ইলেকট্রনিক ডিটেক্টরে কম্পন সৃষ্টি করে গাড়ি ঠিক মতো স্টিয়ারিং করে নিয়ে যায়

সাত ছিদ্রের কলসী / প্রবোধবন্ধু অধিকারী
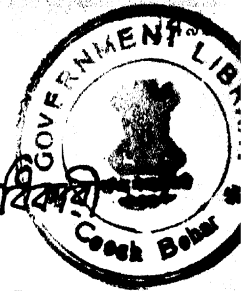
আবার তুমি কলম তুলেছ কল্প; কতকাল ধরে এই খেলা তুমি খেলবে? তার চেয়ে কলম রাখো, তোমার সামনের সাদা পাতাটি চাপা দাও, মন-ছুঁয়ে-থাকা বন্ধ চোখ মেলে তাকাও কল্প; দেখ, আকাশে ঘন ছায়া নেমেছে; দূরে, শহর ছাড়িয়ে আকাশ-ছোঁয়া তালগাছের মাথায় আধ-খাওয়া পাণ্ডুর চাঁদ ধোঁয়ার মতন লঘু, মেঘের পেছনে মুখ তুলেছে। কল্প, ভাবনার ঘুম থেকে জাগো, মনের গভীরে ফেলা ভাবনার নোঙরটি টানো; তোমার সামনের জানলা যদিও ছোট, ঘুলঘুলির চাইতে দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সামান্য বড়, বিশাল আকাশ আর বাইরের প্রকৃতি উপভোগ করার মতন নয়; তবু, কল্প, চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ, ছোট এই গবাক্ষ উন্মুক্ত; তোমার দৃষ্টিকে সে আড়াল করেনি, বাধা দেয়নি; এই ছোট পথে পৃথিবী দেখার জন্যে সে তার কাঠের পাখা দু'টি সর্বদা খুলে রেখেছে। পৃথিবী দেখার এই ছোট পথটি যদি তোমার মনের মতো না হয় তো, দরজা খোলা আছে, কল্প, তুমি বাইরে এসো, নিস্তব্ধ ফাঁকা উঠোনে দাঁড়াও অথবা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসো ছাদে; দেখ, কামিনীর ঝাড় ছাড়িয়ে, মালোপাড়ার বস্তীর ওপারে, ফাঁকা মাঠে শান্ত শিমুলের ডালে অন্ধকার ঝুলছে।

এই ছোট ঘরে তুমি তোমার রাজত্ব পেয়েছ (ঘরের বাইরের পৃথিবী এখন অন্ধ); তুমি তোমার ছোট মন ছুঁয়ে যে বিশাল সীমানা তৈরী করেছ, কল্প, সে-রাজত্ব ত্রিলোকের সীমাকেও হার মানায়। এত বড় ঘরে, ফাঁকা, শূন্য নির্জনতায়, কল্প, তুমি হতাশ; ভীষণ বিষণ্ণ। তুমি একা। কিন্তু দেখ, বাইরের আকাশ, বাতাস, মাটি এবং গাছের গন্ধ অন্য জগতের কথা বলে; সে তোমাকে লালন করে, সোহাগ দেয়, সিক্ত কপালে হাওয়ার আদর বুলোয়। কল্প, তোমার ছোট ঘরের বিশাল জগৎ আর বাইরের আসল পৃথিবীর দূরত্বটি সহস্র ক্রোশের নয়। ওই যে বলেছি, সামনের সাদা পাতাটি চাপা দিয়ে যদি তাকাও, দেখবে ছোট গবাক্ষ আছে; উন্মুক্ত। কিংবা এ-ঘরের দরজার পাল্লো দু'টিও তোমাকে ঘরে বন্দী করেনি।

তুমি বলবে, 'পারি না, পারছি না'—এই না-পারার যন্ত্রণা তোমাকে যে আলাদা ঘরের মালিক করেছে বস্তুত সেই মালিকানার শর্ত তোমার অজানা। পারার আনন্দ একটি মাত্র ঘরের সুখ দেয়, না-পারার যন্ত্রণা অনেক ঘরের কথা স্মরণ করায়। তোমার চিঠিটি যদি গোড়া থেকে আবার পড় তো, দেখবে, তুমি লিখেছ : 'রোজ আমার মনে পড়ে, সুধাদি; রোজ। তোমার কথা, আশা, মায়া, প্রীতি, নীলিমা—তোমার আমার চারপাশে যারা ছিল, সকলের কথাই। চৈত্রের দুপুরে যখন বাইরের মাঠ রোদে অন্ধ, আকাশের রঙ পরিমাণ জ্ঞানশূন্য কোনো অপটু হাতে সদ্য-কাচা শাড়ির খোলে নীল দেওয়ার মতন, দূরে দূরে মাথা তোলা দীর্ঘ নারকেল গাছের ধুলোটে প্রায়-বুড়ো পাতা নিস্তব্ধ নিথর—সেই প্রখর মধ্যাহ্নে তোমার চোখে ঘুমের ঢুলুনি দেখেছি। আশপাশে যারা ছিল, তারাও কাতর। কেবল আমি, একাকী অনলস চোখে পুরনো নীলাম্বরী আকাশে চোখ রেখে খররৌদ্রে পীড়িত চিলের কান্না শুনেছি। সেই কাতর কান্না আমাকে উদাস করেছে। কেন জানি না, সুধাদি, এই কান্না শুনতে শুনতে আমার মনে হত, আমাদের ঘরের সকল আত্মা চিলের গলা চুরি করে নিয়ে করুণ কান্না কাঁদছে।

'কত দুপুর যে আমার এমনি কেটেছে, আমি আমার শয্যায় বসে দুপুরের প্রহর গুনতে গুনতে ক্লান্ত। রোদ-জ্বলা মাঠ, মধ্যাহ্নের পক্ষিহীন তপ্ত আকাশ এক সময় চোখে শ্রান্তির বোঝা তুলেছে। বাইরের তপ্ততা, রুক্ষতা আর নির্বাধ শূন্যতাকে আমি ভয় পেয়েছি। পেয়ে নিমগাছের হালকা সবুজে চোখ রেখেছি। কিন্তু কিছুই ভাল লাগেনি আমার, কিছু না। অতীতের স্মৃতি আর ভবিষ্যতের ছবি আমাকে চঞ্চল করেছে......।'

কল্প, তোমার খোলা কলমের

মুখটি ঢাকো। রাখো। উঠে এসো। দেখ, অন্ধকারের ধূসরতা কাকের পাখায় ডুব দিয়েছে। মালোপাড়ার ওপারের মাঠে শিমুল-কলা-ফাটা তুলোর রাশি আর নেই, অন্ধকারের জলে বাতাস তাদের ডুবিয়ে দেল। কল্প, বন্ধ চোখের অন্ধকার জগতে তুমি যে তারাটি খ‍ুঁজছ, সে-তারা নকল। আসল নয়। তার চেয়ে উজ্জ্বল তারকা আকাশে আছে। এই ছোট ঘরের দেওয়াল-বন্ধ-সীমাকে যদি অতিক্রম করতে পারো, দাঁড়াতে পারো উন্মুক্ত আকাশের তলায়, দেখবে, এই আঁধিয়া চিরস্থায়ী নয়; ক্ষণকালের। অধৈর্য আর অসহিষ্ণুতা যদি তোমার ধৈর্যকে পীড়ন না করে তো, দেখবে উত্তরের দিগন্তে ধ্রুবতারা ফুটবে।

'তোমার মনে আছে কি, সুধাদি, কোনো কোনো দুপুরে তুমিও ঘুমুতে চাওনি। হয়তো আজও চাও না। তোমার শয্যার ডান পাশে বুকে সবুজ-টিয়েপাখি-ধরা কিশোর-কৃষ্ণের ছবিঅলা যে ক্যালেণ্ডারটি ছিল তার কিছু লাল তারিখ আমি দেখেছি। কোনো লাল তারিখে কালো কালি দিয়ে তুমি কাটা-দেওয়া চিহ্ন এ'কেছ। অনেকদিন ভেবেছি শুধোই, কিন্তু পারিনি। সংকোচে। পরে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, লাল তারিখ-গুলোর বিশেষ কটি কাটা-চিহ্নের দিন তোমার সুখের তারিখ।

'শুধু তুমি কেন সুধাদি, আমাদের ওই ঘরে আরও অনেকের এক একটি বিশেষ সুখের দিন চিহ্নিত থাকত। সেদিন তোমরা আনমনা হতে, দুপুর গড়াবার আগ থেকেই চঞ্চল মন নিয়ে ছোটো আরশিতে নিজের মুখ দেখতে, আর দেখতে সেই তারিখ, যা একাধিক কালো দাগে কলঙ্কিত। কেন দেখতে? আমার মনে হয়েছে, সত্য এবং ধ্রুবকে সহজভাবে জেনেও মনের সংশয় থেকে আমরা মুক্ত নই।

'সুধাদি, সেই কালো কালির কাটা দেওয়া লাল তারিখের সুখের দিনে আমি প্রায় নিঃসঙ্গ থাকতাম। তোমরা, যাদের সি'থিতে সি'দুর উঠেছে তারা, রোদ-মরা বিকেলে মাঠে নামতে। পার্কে, পার্ক ছাড়িয়ে কেউ মাঠে, বাবলার ঘন ঝোপের পাশে বসতে, যেন সারা সপ্তাহের তৃষ্ণার্ত চাতক এক ফোঁটা বারির চেয়ে গোটা জলা ঠোঁটের কাছে পেয়েছে। স্বামীসঙ্গে তোমরা সব ভুলেছ। আমার কথাও। তবু সুধাদি, সেদিনের মনের অবস্থা তোমাকে বলি। সেদিন আমার সারা বিকেল কাটত জি রকের দোতলা বারান্দায়। আমি জুটি গুনতে বসতাম। ওপর থেকে বিকেলের আলোয় তোমাদের মুখের অস্পষ্ট খুশীর ভাব কুড়োতাম, অভিমান দেখতাম। দেখতে দেখতে আমার মনে হত, আমিও মানুষ; কারো চোখের চশমা, কি দামী ড্রেসিং টেবিলের আয়না আমি নই।

'আমি একলা বসে, তোমরা আসছ না। আলো মরে ধূসর সন্ধ্যা নামল, তোমরা আসছ না, তোমরা আসছ না—গোটা জি ব্লক নির্জন, স্তব্ধ। অল্প আলো আর ছেড়া মেঘের আনাগোনায় আকাশ ধূসর রঙের গাটাপার্চার হয়েছে। পরে তারা ফুটল একটি দু'টি। আমি বাকি তারা ফোটার অপেক্ষায় আকাশে চোখ রেখেছি...'

কলম রাখো, তোমার সামনের সাদা পাতাটি চাপা দাও। দেখ, কল্প, মালো-পাড়ার মাঠে কয়েকটি লণ্ঠনের আলো পথ খ‍ুঁজছে। আকাশে তারা জাগবে। এখনি। চাঁদও উঠবে। তুমি ভেবে নাও, খোলা জানলা দিয়ে কোথায় রাখবে তোমার চোখ, অথবা খোলা দরজা পেরিয়ে তুমি ছাদে উঠবে না উঠোনে দাঁড়াবে।

'অনেক বিকেলের কথা আমার মনে আছে,

সুধাদি। যেদিন তোমরা স্বামী-সাহচর্য পেতে সেদিনের কথা যেমন, তেমনি এমন অনেক দিনের কথা, যে লাল তারিখ কালো। কালির দাগে কলঙ্কিত নয়। সুধাদি, সারা বছর কেন বসন্তের বিকেল নয়, অথবা গ্রীষ্মের প্রখর মধ্যাহ্ন পার হলে বিকেলের মলয় বাতাসের মত সারা বছরের বিকেল-গুলো কেন উষ্ণতা পায় না—এ তোমাদের ভাবনা; আমার ভাবনা বর্ষা ঋতুর বাদলা ঘন হয়ে আসা লগ্নকে অতিক্রম করে না। তাই বসন্ত কি গ্রীষ্ম অথবা হেমন্ত—আমার ভাবনার ঋতুতে বৈচিত্র্য নেই। বর্ষা কি শীতের সকাল ছুঁয়ে চোখ চেয়ে ঘুমের আমেজ পেতে তাই আমি অভ্যস্ত। তবু এমন অনেক দিনের কথা আমার মনে আছে, যেদিন জি ব্লকের সকলে এক হতে পেরেছি। আমরা আমাদের সিঁথির দিকে চোখ ফিরিয়ে, লাল তারিখের স্মৃতি মুছে, সময়কে অতি হেলায় পার করেছি— যেহেতু নির্জন দক্ষিণের বারান্দায় অন্ধকারের মত ছায়া ছিল। তাহ'লে একটি গল্প শোনা—

'সুধাদি, মমতার কথা নিশ্চয় তুমি ভোলনি। সেই চঞ্চল বউটি, দু' বছর ঘর করার আনন্দ যার বুক ঝাঁঝরা করেছে। মমতা ছাদ ভালবাসত, তুমি নির্জন মাঠে ফাঁকা জায়গা মায়াদি গাছের তলা; আর আমি দক্ষিণের বারান্দার একটি কোণ। মায়াদি বলত, গাছ আমাদের বিষাক্ত নিশ্বাস নেয়; গাছের পবিত্র ও শুদ্ধ নিশ্বাস আমাদের ফুসফুসকে সজীব করে। তাই আমরা ওই একটি ঘরের কটি প্রাণী নানা জায়গায় জড়ো হয়েছি। গোল হয়ে বসেছি, অতীতের গল্পে মশগুল হ'তে পেরেছি। গল্প করতে করতে আমরা সকলে বার বার যা দেখেছি, সেই স্মৃতি আজও অম্লান, সুধাদি। দূরে রিফিউজি ক্যাম্পের লাল ছোটো আলোটা কোনোদিন আমরা হারাইনি; মাঠে বসে নয়, ছাদের অন্ধকারে নয়, দক্ষিণের বারান্দা কিংবা বাবলার ঝোপের কাছে বসেও নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য দেখ, ঐ আলোর গল্প করার অবকাশ কোনোদিন আমরা পাইনি। তা হ'লে সুধাদি, একটি গল্প তোমায় বলি...'

কল্প, তোমার কলম তোলো, সাদা পাতাটি চাপা দাও; মনকে অমন করে ছিঁড়ো না ছিঁড়ো না; কল্প, কান পেতে শোনো, শব্দ বাজছে। হাওয়ার শব্দ। জেগে থাকা পৃথিবীর শব্দ। নিঝুমে মানুষের কলরব। এবং শোনো, পাশের ঘরে তোমার কনিষ্ঠ ভাইটি প্রচণ্ড খিদেয় হা-ভাতের মত কাঁদছে। নিষ্ঠুর গরমে তোমার মা তাল-পাখার হাওয়া তুলছে, শিথিল হাত তার চলে না, চলে না—থপ করে পাখা খসে পড়ছে, চমকে জেগে উঠে আবার সে খুঁজছে। পাখা...

'সুধাদি, সুধাদি আমরা অতীতের গল্প বলতাম; সুধাদি সুধাদি, কত কথা তোমাকে যে লিখব...তোমরা সকলে নিজের কথা বলতে; সংসারের কথা, স্বামী সোহাগের কাহিনী—অনেক কিছু; আমি সেই রেল-লাইনের ওপারের রিফিউজি ক্যাম্পের লাল আলোটার দিকে তাকিয়ে ভাবতাম, এত সুখের উত্তাপ কেন যে বুকের অতলে ক্ষয়ের জন্ম দেয়!'

তোমার আঁচল কাঁপছে। কপালের ঘামে মৃদু বাতাসের পরশ পেয়েছ। কল্প, জাগো, চোখ খোল, কান পেতে শোনো বাতাস কথা বলছে। শিরীষের ডালে, আমের পাতায় এবং ফাঁকা উঠোনে শুকনো পাতার মাটি-ঘষা শব্দ। মৃদু। আরও ভাল করে যদি কান পাত তো, শুনতে পাবে, পাশের ঘরে তোমার চতুর্থ বোনটি ককায়। তার জ্বর। সকালে শটির দানা...

'হ্যাঁ, একটা গল্প, একটা গল্পই তোমাকে বলি, সুধাদি। সুধাদি, সে এক বিকেলের কথা। না, বিকেল নয়; সন্ধ্যা...সুধাদি, তোমার জন্মের ইতিহাস আমার জানা নেই। কেমন ঘরে জন্মেছিলে, সুখে না দুঃখে—সংসারে কত অভাব ছিল সব আমার অজানা। আমি কিন্তু জন্মের পর চোখ মেলে অভাব দেখিনি। অভাব দেখলাম আরও পরে। তখন সামনে আমার পরীক্ষা। পাশ করে কলেজে পড়ব। কটা মাসের মাত্র ব্যবধান। ঠিক তখন দেখলাম আমাদের সংসার ধুঁকছে, জ্বর-কাতুরে রোগীর মতন। আমার মা সর্বময়ী তখন আঁতুড়ে; পঞ্চম বোনটি মাত্র কদিন আগে পৃথিবীর মুখ দেখেছে। এমন দিনে বাবা চোখ বুঁজে-ছিলেন।

'তোমার নিশ্চয় মনে আছে, সুধাদি,

একদিন সকালে দুধের গ্লাসটি মুখে তুলে তুমি শুধোলে, হ্যাঁরে কল্প, তোর মাকে আর দেখি না, ভাইবোনরা সব ভাল তো? আমি সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুলিনি। খুলতে পারিনি। অনেক পরে এমন ভঙ্গি করেছি, যেন তারা সব ভালই আছে। আজ বলি, সুধাদি, কী ভয়ানক কষ্টে সেদিন তোমার কাছে সব গোপন করে গিয়েছি।

'বিকেলে, ভিজিটার্স আওয়ারের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হাসপাতাল মুখর হ'য়ে এসেছে। কত লোক বাইরে ছিল, তারা আসে, যার যার আত্মীয় বন্ধু পরিজনের শয্যার পাশে দাঁড়ায়, হাসে, কথা বলে, গল্প—কিন্তু আমি একলাই। তোমরা কোনদিন আমার শয্যার পাশে একটি মুখও দেখনি। তুমি বুঝবে না সুধাদি, বুঝবে না কী ভয়ানক কষ্ট নিয়ে সেই কলরবের ঘর থেকে কত আস্তে পা ফেলে, সকলের চোখ এড়িয়ে আমি দক্ষিণের বারান্দায় নিজেকে লুকোতাম। কতদিন যে আমি কেঁদেছি, একা একা: আমার মনে হয়েছে, এ পৃথিবীতে আমি নিঃস্ব, অসহায়; আমার কেউ নেই, কেউ না, কেউ না—

'তোমার কি খুব খারাপ লাগছে, সুধাদি?

এই দেখ, একটি কথাই কিন্তু তোমাকে লিখব বলে অনেক দিন থেকে ভাবছি। শুধুমাত্র একটি কথা। সেই কথাটি যতবার গুছোই, সুন্দর করে বলব বলে সাজাই, লিখতে বসে দেখি আসলে সে কথাটি আমার কলমে নেই। অন্য সব কথা, যা ভাবি না, বলি না—তাই আসে, আমার চিঠির পাতায় বসে, যেন ওই একটি কথা ছাড়া আর সব সত্য; কেবল মিথ্যা সে, যে-কথাটি তোমাকে বলব। এবার, ঠিক এবার, আমার সেই গল্পটি তোমাকে বলছি, শোনো। আচ্ছা সুধাদি,...'

বাইরে বাতাস জোর হয়ে উঠেছে। অন্ধকার আরও ঘন, বেশী গাঢ় হয়ে মালোপাড়া ঢাকল, লাউ-মাচানে হাওয়ার দাপট লেগেছে: কল্প, তোমার সামনের সাদা পাতাটি চাপা দিয়ে তাকাও, দেখ, মালো-পাড়ার মাঠের আলোরা আরও দূরে সরে গেছে। আকাশে জ্বলছে উজ্জ্বল কটি তারা, পশ্চিম আকাশের খানিকটা গোল মতন জায়গা স্বর্গীয় আলোর পরশ পেল, এখন সকলের আশা, চাঁদ উঠবে। উঠবে উঠুক, না ওঠে এই কালো মুক্ত পৃথিবীই বা কম কিসে। কল্প, কলম রাখো, ক্লান্তির জড়তা কেটে জানলায় চোখ রাখো, পাতাল ছুঁয়ে থাকা হিমের ঘর থেকে আলোর এবং মুক্তির বন্দনা করো—দেখবে, তোমার চোখ-বন্ধ জগতটার আয়ু কত ক্ষণিকের।

কল্প, নিজেকে আর ঢেকো না, বাসনাকে চাপা দিয়ে কল্পিত সুখের ঘরের পৈঠা রচনা বৃথা। তুমি যাকে লিখছ, সে, তুমি এবং সকলে—সকলের সমন্বয়ে মানুষ। ওই যে তুমি লিখেছ: কী আশ্চর্য, দেখ, সুধাদি, শুধুই আমার কথাটি বলতে গিয়ে দেখি, সেখানে আমি নেই। স্বর্গত বাবা, বিধবা মা, নিরন্ন ভাই-বোন, বাইরের প্রকৃতি, আমাদের বারো টাকা ভাড়ার পোড়ো বাড়ি, লাউ-মাচান, কুয়োতলা—সব আছে, তবু ভাবি কী যেন নেই, কী যেন নেই এর মধ্যে।...' আছে কল্প, তুমি যা পেতে চাও সেটি আছে, কেবল খুঁজে নেওয়ার নিকষ ধৈর্যকে বাসনার পাথরে ঘষে নেওয়ার অপেক্ষা। খুঁজে দেখ, এ-সবের মধ্যে তুমি আছ, এরা না থাকলে তোমার অস্তিত্ব অনুপস্থিত।

'কী আশ্চর্য মানুষের মন, দেখ সুধাদি: এখানে ফিরে আসার জন্য আমার যে ব্যাকুলতা, যে আগ্রহ—সেই উৎসাহ আমাকে নিয়ত দুঃখের আগুনে পোড়ায়। আমি আসব, সকাল থেকে মন উদাস, বাড়ির ছবিটি আমাকে উতলা করছিল; ক্ষয়ের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি, অতএব তোমরা সকলে হাসছ, বিদায় দিচ্ছ: যেন তোমরা চেয়েছিলে আমি ফিরে যাই, সুস্থ জীবনে পা দিয়ে আমার মুখে আবার হাসি ফুটে উঠুক। কিন্তু সুধাদি, ফিরে এসে আজ আমার মনে হচ্ছে, তোমাদের সেদিনের হাসি সবটাই খাঁটি নয়। এ-হাসির আড়ালে কান্না ছিল। পুরনো কান্না। আর আমি যেন তোমাদের সকলের বাসনা চুরি করে একলা সুস্থ হয়ে ফিরে এলাম।

'সুধাদি, বাবা চোখ বুজল, আমরা ভাই-বোন স্তব্ধ। আঁতুড় থেকে ছোটবোনের কান্নার গলা শুনে মা ছুটে এল। ঝড়ের মতন। মার বেশবাস, পরনের কাপড় আলুথালু। বাবার শিয়রে দাঁড়িয়ে মা কাঠ। যেন মা তার জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা বাসনা সুখের শবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের সংকটের ছবিটি দেখতে পেয়েছিল। পরে মা বাবার মাথার কাছে এল, মুখের দিকে তাকাল, এবং হঠাৎ পাগলের মত বাবার শবের কাঁধটি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলছিল, 'ওঠো, জাগো, তুমি কোথায় আমায় রেখে গেলে, কোথায়?' আর কথা বলেনি মা। শোকে দুঃখে ভীষণ অসহায়তায় বাবার শক্ত বুকে, মুখে, নাকে মা নিজের মুখ ঘষে এক সময় লাল চোখ নিয়ে উঠল।

'তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে, সুধাদি? খুব কষ্ট? তা হলে তোমাকে অন্য কথাই বলি। আমার সেই গল্পটি: যা তোমাকে বার বার বলতে চাই, বলতে গিয়ে পারি না; সেই গল্পই শোনাই। শোনো...'

কল্প, পূবে আকাশের যে গোল-মতন জায়গাটি স্বর্গীয় আলোর পরশে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, মেঘ কেটে গেলে, সেখানে চাঁদের মুখ ফুটেছে। চাঁদ উঠেছে কল্প, চাঁদ। তোমার জানলায় বাতাস কাঁদছে, অন্ধকারে হলুদ গোলা জলের বন্যা এল, মালোপাড়ার মাঠে নিবু নিবু লণ্ঠনের আলো হারিয়ে গেছে, কামিনীর ঝোপে এখন নীলাভ আলো। কল্প, ভুরুর তলা থেকে খোলা কলমের ডগাটি তোলো, চেয়ে দেখ, প্রাচীন পৃথিবী নতুন সাজে সেজেছে।

কতদিন, আর কতকাল এই খেলা তুমি খেলবে, কল্প? দৃশ্যমান কলমটি আজ তোমার হাতে এসেছে, কিন্তু জন্মের পর থেকেই অদৃশ্য কলম তোমার অধিকারে। ঈশ্বরের এই দানকে আমরা না চিনতে ভালবাসি। নকল কলম হাতে নিয়ে, মানুষ আসল কলমের গর্ব করে। কল্প, তোমার আসল কলম চলছে, নিয়ত, নিরন্তর —নকল কলমের মোহটি আর কেন? তার চেয়ে ওঠো, চোখ মেলে দেখ, তোমার সামনের জানলাটি খোলা, উন্মুক্ত; তোমার দৃষ্টিকে সে আড়াল করেনি; এই ছোট পথে পৃথিবী দেখার জন্যে সে তার কাঠের পাখা দুটি সর্বদা মেলে রেখেছে। পৃথিবী দেখার এই ছোট পথটি যদি তোমার মনের মত না হয় তো দরজা খোলা আছে, কল্প, তুমি বাইরে এসো, নিস্তব্ধ ফাঁকা উঠোনে দাঁড়াও অথবা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসো ছাদে। দেখ, তোমার সামনের সাদা পাতায় এতটুকু জায়গা নেই, সব লেখা, সকল লেখা, অনাদি
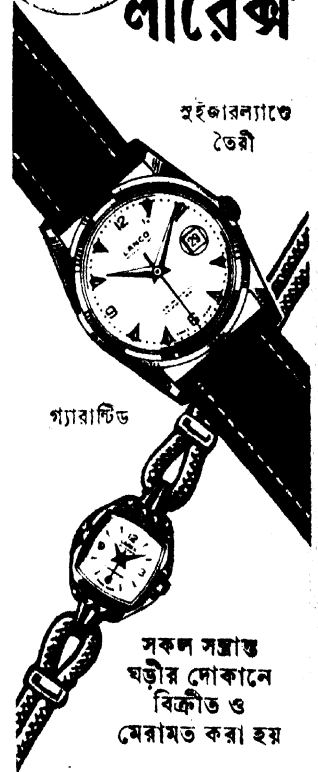
অনন্ত লেখার রেখায় সেই পাতা কলঙ্কিত।

'বাবা মারা গেল। মা আমার কাঁধে হাত রেখে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচল। সুধাদি, সেই হাত আজও আমার কাঁধে। আমি পারি না, পারছি না—সব কিছু আমার কাছে এক অসহ যন্ত্রণার মতন। কৈশোর পার হলে আমার জীবনের মন্ত্র হ'ল, বাঁচা। বেঁচে থাকা। বাবার শবের সামনে দাঁড়িয়ে আমার মা তার জীবনের সকল উত্তাপ, আশা এবং আকাঙ্ক্ষা চিরকালের মত লুকিয়ে নিল। কিন্তু তাঁর চোখটি ছিল আমাদের দিকে। সে দৃষ্টি অত্যন্ত সতর্ক, অতিশয় স্বার্থপর। আমার কাঁধের ওপর থেকে মার সেই হাত আর নামল না। মাঝে মাঝে সে-হাত শক্ত হত, মা শক্ত হত, মুখ চোখ কঠিন করে আমায় পিষে ফেলতে চাইত। মা কাঁদতে চাইত, স্বস্তির কান্না। আমার মনে হত, আমার মার গলার স্বর তার দেহ থেকে, মন থেকে যেন সামান্য দূরে দূরে আছে। সুধাদি, আমার ভয় ছিল। ভয় করত। মাকে। যেন ওই শক্ত হাতটি কোনোদিন আমার গলায় বসবে এ-কথা আমি ভাবতে পারতাম।

'সেই আমার ঘুম গেল, বসার আনন্দ গেল, সুন্দর কোনো স্বপ্ন কোনোদিন আর দেখি নি। আমি বসিনি, দুদণ্ড গল্প করার অবকাশ পাইনি, পথের নতুন গাছটির সবুজ পাতায় চোখ রাখার মত মন আমার ছিল না। সুধাদি, সকালে বইয়ের পাতার অক্ষর, দুপুরে আপিস, বিকেলে ছাত্রী পড়ানো, রাত্রে কলেজ—আমি জানতাম এর বাইরে আমার কেউ নেই, এ-ছাড়া যে জগৎ তা মিথ্যা; অবাস্তব।

'সুধাদি, তোমার কি কান্না পাচ্ছে? না, এ কান্নার কথা নয়। কল্পর জীবনের ইতিহাস। তবু যদি কান্না আসে, তাকে আড়াল করো। আর কাঁদাব না তোমায়। এবার তোমাকে সেই গল্পটি বলব, সুধাদি, মন দিয়ে তুমি শোনো...'

দেখ দেখ কল্প, রাতের নির্জনতায় বাইরের আকাশ কী সৌন্দর্য পেয়েছে। কানা পাখির ডাক ভাসছে। শুনতে পাচ্ছ, কল্প, রাতের প্রহর বাড়ছে, বাড়ছে—চাঁদ পুবের আকাশ থেকে উঠে এল, অনেক এসেছে; এবার ওঠো, হাতের কলম রাখ, তোমার সামনের সাদা পাতাটি চাপা দাও, দেখ, গোটা পৃথিবীতে ঈশ্বরের অপার মহিমার নিঃশব্দ কীর্তন।

পৃথিবী গোল, সামনের সাদা পাতাটি দৃশ্যমান জগতে চিরকাল সাদা। এর লেখা, অক্ষর, কালির দাগ পরিদৃশ্যমান নয়। তোমার ভাবনা অন্ধ-পৃথিবীর মতন। তুমি এই জগতের প্রাণী, অতএব তোমার ভাবনা তোমার বর্তমান জগত, চোখ-বন্ধ অন্ধকারের সুখের ঘরটি বস্তুত গোলাকৃতি। সেই মনের গভীরের ঘরের তারাটি আসল তারার মতন জ্বললেও ওটি আগুন, কল্প, তোমার মন ওকে তারার আকার দিয়েছে।

'তোমাদের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, সারা পথ আমি ভেবেছি। জানতাম, ক্ষয়ের ঘর থেকে মুক্তি পেয়ে সুখের ঘরের দিকে আবার আমার যাত্রা। পথ পথ, রাস্তা, সবুজ পৃথিবী, নীল আকাশ, মাটির গন্ধ, বুনো ফুল, ছায়ার গাছে পাখির ডাক—সুধাদি, এই পৃথিবী আমাকে নতুন করে জন্ম দিল। একটি শীতল ঘরে আমি অতীতকে ক্ষয় করে নতুন জীবনে পা দিলাম। ভাবলাম, অনেক কথা আমার প্রকাশ করার আছে; আমি মানুষ, আমি নারী এই পরিচয় আজ আমাকে জানাতে হবে। কিন্তু জানাতে গিয়ে দেখছি, ক্ষয় আমার মনের বাঁচা। শীতল ঘর আমার একমাত্র উত্তাপের ঘর। সুধাদি, মা কাঁদে; সংসার অচল। ভাইবোন কাঁদে, মাথা কোটে; তাদের পেটে তীব্র খিদে—পৃথিবী অত্যন্ত রুক্ষ, শুষ্ক। সুধাদি, আমি বাঁচতে চাই, মার সেই কঠিন হাতের বোঝা থেকে আমি মুক্তি চাই; মুক্তি।

'আগেও আমার মনে মুক্তি-কামনা ছিল কি ছিল না স্মরণ নেই। বইয়ের পাতার কালো অক্ষর, গুমোট সকাল, উত্তপ্ত দিন—আমার জীবন একটি সচল ঘড়ির ডায়ালে সূক্ষ্ম কাঁটার নির্দেশের মতন কেটেছে। সংসার চেয়েছে। মার হাত শক্ত হয়ে বলেছে, 'আরও চাই, আরও।' সেই আরও অধিক খিদে মেটাতে গিয়ে আমি নিজেকে চিনবার অবকাশ পর্যন্ত পাইনি।

'একদিন মাঝরাতে দেখলাম আমার মুখে রক্ত। গা পুড়ছিল, কণ্ঠার ভেতরে বিড়াল-আঁচরের জ্বালা। বুক বাথায় ভারী। মুখ বুজে রক্ত বন্ধ করতে চেয়েছি, কিন্তু বুকের তলার ক্ষতটি সম্ভবত এত রক্ত তুলছিল যে, মুখ বুজে আমি তার তোড় বন্ধ করতে পারিনি।...না, আর কষ্ট তোমায় দেব না সুধাদি, দেব না। তার চেয়ে বরং সেই গল্পটিই বলি। যা বলব বলে এই চিঠির আয়োজন।...'

শোনো কল্প, বলি বলি করেও এমন অনেক কথা আছে যা বলা যায় না। মানুষ সমাজের দাস, পরিবেশের ভৃত্য; ধর্ম, শাস্ত্র, আইন, নীতি এবং সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে লক্ষ্মণের সীতার মতন। এর বাইরে তার কিছু বলার নেই; অনুভব করার আছে, কল্পনা করারও—কিন্তু তা প্রকাশ করতে গিয়ে সমাজের চোখে মানুষ পাগল হতে নারাজ। ভেবে দেখ, কল্প, ঘড়ির ডায়ালের মধ্যেও তোমার মন বৈচিত্র্য চেয়েছে। তুমি কিছু বলতে চেয়েছ। কিন্তু কাকে? সম্ভবত মানুষকে, সমাজকে—মানুষ তোমার

অচেনা; সমাজে তার কঠিন নিয়মের নিগড়ে বেঁধেও অপাংক্তেয় করে রেখেছে তোমায়। তোমার বলার কথা কাকে তুমি বলবে? অতএব সাদা পাতাটি খুলেছ, কলম নিয়েছ; কাব্য করার বাসনা উঁকি দিয়েছে তোমার মনে। কিন্তু কল্প, তুমি কি মনের কথাটি বলতে পেরেছ? বরং বলার আগে মনের মতন আবরণ খুঁজেছ, যে আবরণে বাসনা, কামনা ও আকাঙ্ক্ষাকে মুড়ে রাখার দিকে মানুষের প্রচন্ড লোভ।

যে গল্পটি তুমি বলতে চাও, বলো, শেষ কর; তারপর তাকিয়ে দেখ, কল্প, আকাশ আলোর রঙে সাজল। মালোপাড়ার যে-মাঠে খানিক আগে অন্ধকার ছিল, পথ খুঁজছিল কয়েকটি কানা লণ্ঠন; সে-মাঠে হাল্কা ছায়ার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। দেখ দেখ কল্প, কামিনীর ঝাড়ে বাতাস উতলা, কানকুয়ার ডাক থেমে গেছে, অন্ধকারে জেগে থাকার শেষ শেষ আলোটিও নিভল; এবার ওঠো, বন্ধ চোখের অন্ধকার থেকে নিজেকে মুক্ত করে তাকাও, দেখ, সারা আকাশে ছোপ ছোপ হাল্কা মেঘের চিহ্ন। চাঁদ উঠেছে কল্প, চাঁদ। আকাশে চাঁদ, শ্যামল মাঠে জ্যোৎস্নার বন্যা, পৃথিবীর শেষ কলরবও থামল—তোমার পাশের ঘরে, পুরনো নড়বড়ে কড়িকাঠের তলায় নিরন্ন কটি অর্ধনগ্ন মানুষও ঘুমের ঘোরে পেটের খিদে ভুলেছে। তবু যদি কান পাত, একান্ত আগ্রহ নিয়ে এই সুন্দর প্রকৃতির কোনো সত্তাকে গ্রহণ করতে চাও তো শুনবে, তোমার চতুর্থ বোনটি ঘুমের ঘোরে শটির কান্না কাঁদে, পাখা-খসে-পড়া হাতে সর্বময়ী মেঝে হাতড়ায়, ঘুমের ঘোরেও তার কথার শেষ নেই; সে বলে, রাত কাটুক বাছা, কাল সকালে রোদ উঠলে...

'সুধাদি সুধাদি, এবার আমার গল্প শোনো। এবার তোমায় শোনাই।...তার আগে বলে নি, যে-ফেরার চিন্তা আমাকে আনন্দ দিচ্ছিল, কোনোদিন ভাবিনি এই আনন্দ আসলে একটি সুন্দর দুঃখের মতন। দূর থেকে তার সৌন্দর্য আমাকে পাগল করে, কাছে এসে দেখি, এখানে আমার মায়ের হাতটি থাবা উঁচু করে আছে! ওই কথাটি ভেবে ভয়ে আমার কাঁধ অনড় শীতল এবং পঙ্গু হয়ে আসছে। সত্যি কথা তোমায় বলি সুধাদি, আমি পারি না, পারি না, পারছি না—তার চেয়ে বুকের ক্ষতে আবার কেন রক্ত উথলে ওঠে না।'

সুন্দর আবরণের তলায় বলার ইচ্ছাকে আড়াল করে সুখ নেই। শোনো কল্প, আত্মগোপনের মোহ থেকে মুক্ত হও, তাকাও; দেখ, তোমার সামনের ছোট জানলাটি তার কাঠের পাখা দুটি সর্বদা মেলে রেখেছে।

মানুষ কল্প, সাত ছিদ্রের কলসী। একটি ছিদ্রের পথ চাপা দিয়ে তার বাঁচার সার্থকতা নেই। এই ছিদ্রপথে অনর্গল নির্গত জল ধরে রাখার নয়। তবু কেন আর মিছে রাখা-ঢাকা? কল্প, তোমার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা আর বাসনা নিয়ে চোখবন্ধ অন্ধকার জগতের আয়ু ক্ষণকাল। তার চেয়ে বলার কথাটি বলো, গল্পটি শোনাও, তারপর তাকিয়ে দেখ, আসল পৃথিবীতে ফুলের গন্ধ আছে; গাছ, পাখি, শ্যামল মাঠের সুন্দর গন্ধও তোমার মনে খুশীর পরশ দেবে।

এই গল্প, কল্প, বলার নয়। যেহেতু তুমি চোখবন্ধ অন্ধকার জগতের সঙ্গে মিশেও সমাজের শাসন থেকে মুক্ত নও। এই গল্প তুমি বলতে পারবে না কল্প, পারবে না। না পারার এই দুঃসহ যন্ত্রণায় তোমার যে চিঠির অবতারণা, চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ, জন্মের পর থেকে অদৃশ্যভাবে সে-কাহিনী বহুবার লেখা সত্ত্বেও তোমার সামনের পাতাটি পরিদৃশ্যমান জগতে সাদা, অলিখিত, কিন্তু আসলে এই পাতাটি অদৃশ্য কালির অসংখ্য লেখায় কলঙ্কিত।

তবে বলি, শোনো কল্প, তোমার গল্প আমার জানা। কারণ আমি একটি ছোট ছিদ্র। তুমি আমায় অন্ধকার ঘরে ঘুমন্ত ভাবলেও সকল সময় আমি নিদ্রিত নই; সদা-জাগ্রত। প্রেম তোমায় অন্ধ করেছে কল্প, সে তোমাকে ভিন্নতর জগতের স্বাদ দিয়েছে। চোখবন্ধ অন্ধকার জগতের সম্রাজ্ঞী করেছে। ক্ষয়ের ঘরে তুমি তরুণের স্পর্শ পেয়েছে। তোমার শরীর, মন এমন কিছু চায়, যা তুমি পাওনি। তরুণ চিকিৎসক; সে তোমায় রোজ ছুঁয়েছে, পরীক্ষা করেছে, আশা দিয়েছে, কখনও-বা সঙ্গ। কল্প, তুমি সাতপাড়ার ক্ষয়ের হাসপাতালে নিজেকে চিনেছ। জেনেছ, তুমি নারী।

রবিবারের সন্ধ্যায় প্রথম তরুণকে তুমি প্রেম দিলে।

সেদিন রবিবার। তোমার সঙ্গীরা সবাই ছড়িয়ে পড়েছে। মনে আছে কল্প, ঘন সন্ধ্যায় দক্ষিণের বারান্দায় তুমি একাকী বসে ওপরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলে, এই গাঢ় আঁধিয়ায় বিজলী বাতির একটি পাখি যদি উড়ে যেতে পারত, তার ঔজ্জ্বল্যের ধাঁধায় চোখ রেখে তোমার খানিক সময় কাটত। আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। মাঠ অস্পষ্ট—তুমি তখন ভাবছিলে কোথায় রাখবে তোমার চোখ। এমন সময় সে এল। কল্প, তোমার না-বলা গল্পের শুরুটি......

'হঠাৎ চমকে উঠলাম। অনুভব করতে পারছিলাম এই নির্জন বারান্দার কোণে আমার পাশে কেউ এসেছে। তার গায়ের গন্ধটি ঘ্রাণে ধরতে পাচ্ছিলাম আমি। কে! চমকে তাকাতে গিয়ে তাকে দেখলাম। সে নিঃশব্দে আমার পাশটিতে দাঁড়িয়েছে। তাকাতে গিয়ে আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

সে নিশ্বাস ফেলল। 'একলা?' সম্ভবত আরও কিছু কথা তার বলার ছিল।

জবাব না দিয়ে আমি হেঁটমাথা হলাম।

'জি ব্লক থেকে অন্ধকারেও আমি তোমাকে...' আরও এগিয়ে এসে সে আমার ডানপাশের রেলিঙ ধরল। 'এখানে, অন্ধকারে একলা থাকা ভাল না......'

আমি ঘামছিলাম। তার উপস্থিতি বাসনাকে ঘষে আমায় সলজ্জ করেছে। সংকোচ অনুভব করছি, কিন্তু তার মধ্যেও এক ধরনের পুলকের গন্ধ যেন পাচ্ছিলাম। তাই কি বলছি, কেন বলছি, সে-জ্ঞান হারিয়ে আমি শুধোলাম, 'কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে সে কিছু বলল না। খানিক সময় আমাকে দেখল। ঘরের জ্বলা আলোয় দরজার একটি উজ্জ্বল ছবি বারান্দার মসৃণ চাতালে পড়েছিল। আমি তার চোখে তাকালাম...

আবছা সেই আলোর বারান্দায় আমরা দুজন মাত্র। ঘরের চড়া আলোর সামান্য আভা বারান্দার অন্ধকারকে তরল করেছে। খুব স্পষ্ট না হলেও আমি তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। সে আমার পাশে ঘন হয়ে দাঁড়াবার মতন এগিয়েছে। যেন সময় থেমে গেছে। আমার মন ভয়, সংশয়, সংকোচ আর আনন্দের ঘোলা জল ছুঁয়ে চুপ; নিথর। সুধাদি, ওর নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি; জানিনা আমার কাঁপা নিশ্বাসের শব্দটি এই মানুষটিকে ধরে রেখেছে কিনা......'

মনের সঙ্গে মিছেই এই রেষারেষি কল্প; এই বিরোধ মিটবে না, মেটার নয়। যে-কল্পনা তোমাকে আলাদা পৃথিবীর স্বাদ দিয়েছে কল্প, সেখানে যে-প্রেম, যে তরুণ—সে একটি মশাল। নিবন্ত মশাল। তার

আলো নেই আগুন নেই; ঔজ্জ্বল্য নেই। কল্প, এই মশালের আলোর আগুনটি তোমার মন। তোমার মনের আগুনে সে জ্বলে, অন্যথায় এ-মশাল অকেজো, নিষ্প্রভ, মিথ্যা—বাসনাকে ঘষে এ-মশালে আগুন নাই-বা জ্বালালে কল্প। তার চেয়ে কলম রাখো, তোমার সামনের সাদা পাতাটি চাপা দাও, মন-ছুঁয়ে-থাকা বন্ধ চোখ মেলে তাকাও, কল্প দেখ, জ্যোৎস্না মলিন হয়ে আসছে, পূব আকাশে আলো জাগবে, প্রভাত হবে; কল্প, রাত ভোর হয়ে আসছে।........তোমার সামনের জানলাটি যদিও ছোট, ঘুলঘুলির চাইতে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সামান্য বড়ো, বিশাল আকাশ আর বাইরের প্রকৃতি উপভোগ করার মতন নয়; তবু কল্প, চোখ মেলে তাকিয়ে দেখ, এই ছোট গবাক্ষ উন্মুক্ত; তোমার দৃষ্টিকে সে আড়াল করেনি, বাধা দেয়নি, এই ছোট পথে পৃথিবী দেখার জন্য সে তার কাঠের পাখা দুটি সর্বদা মেলে রেখেছে। পৃথিবী দেখার এই ছোট পথটি যদি তোমার মনের মত না হয় তো দরজা খোলা আছে, কল্প, সামনের সাদা পাতাটি চাপা দাও......

(৩০)

জ্যাক ব্রেন্টের আশংকা মিথ্যে নয়। এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই লন্ডনের বুকে দাঙ্গা বেধে গেল, বর্ণবৈষম্য নিয়ে।

এ এক আশ্চর্য ঘটনা, কালো সাদা গায়ের রঙের পার্থক্য নিয়ে যে কখনও ইংলন্ডের মত সুসভ্য দেশে দাঙ্গা বাধা সম্ভব তা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি। বেশ কিছুদিন থেকেই সাম্রাজ্যবাদী দলের নেতারা বক্তৃতা করছিলেন ইংলন্ডকে সাদা রাখার জন্যে। তাঁদের অভিমত কালো চামড়ার লোকেদের আর এখানে ঢুকতে না দেওয়াই উচিত। গরম গরম বক্তৃতা ছাপা হতে লাগল কাগজে। তার বিষময় ফল ফলতেও দেরি হল না, ছোটখাট বিষয় নিয়ে ঝগড়া লেগে গেল বিভিন্ন শহরতলিতে ইংরাজ আর নিগ্রোদের মধ্যে। সে আগুন ছড়িয়ে পড়লো। লন্ডনের নটিং হিল গেটের অধিবাসীরা সবিস্ময়ে দেখল রাতের অন্ধকারে বেশ কিছু সংখ্যক ইংরেজ আক্রমণ করেছে একটি জ্যামেইকান নাইট ক্লাব। চেঁচামেচি, হইহই, আর্তনাদ পুলিস এসে তা থামিয়ে দিল বটে কিন্তু এই হল দাঙ্গার সূত্রপাত।

নটিং হিল গেট থেকে এই ঝগড়া শুরু হবার কারণ আছে। এ অঞ্চলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বহু অধিবাসী বাস করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর অনেক ইংরেজ ইংলন্ড ছেড়ে বিভিন্ন কলোনীতে বাস করার জন্যে চলে গিয়েছিল, কারণ সেখানে তাদের ভবিষ্যৎ ছিল উজ্জ্বল। ফলে ইংলন্ডে কায়িক পরিশ্রম করার লোকের সংখ্যা কমে গেল। উনিশ শ' তিপ্পান্ন থেকে তিন বছর পর্যন্ত অর্থনৈতিক দিক থেকে ইংলন্ডের সবচেয়ে ভাল সময়। কমনওয়েলথ-এর বিভিন্ন দেশে তারা তৈরী মাল রপ্তানি করেছে, সেই অনুপাতে কলকারখানায় কাজ চলেছে পুরোদমে, উৎপাদনী শক্তি বাড়াবার জন্যে তিন শিফটে কাজ করতেও ইতস্তত করেন নি মিল-মালিকরা।

কিন্তু এজন্যে চাই শ্রমিক, দেশে তখন লোকসংখ্যা কম, অগত্যা ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে হাজারে হাজারে মজুর আনা হল কাজ করবার জন্যে। লন্ডনের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা বসবাস করতে শুরু করল, বিশেষ করে নটিং হিল গেটে তাদের বিরাট আস্তানা।

বিপদ হল ১৯৫৭ সালের পর। পৃথিবীর সব দেশেই ব্যবসায় মন্দা পড়ল, ইংলন্ডও উৎপাদন কমাতে বাধ্য হল। ফলে কাজ কমল, কিন্তু লোক বেশী। শুরু হল ছাঁটাই করা, যোগ্যতা হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানরা কারুর চেয়ে কম নয়, বরং অনেক বিষয়ে ভাল। তা তাদের কাজ থেকে সরানো গেল না। হিংসে জেগে উঠল ইংরেজ ছেলেদের মনে। তারা যখন কাজ পাচ্ছে না, বেকার হয়ে বসে আছে, তাদেরই দেশে এসে মুখের রুটি কেড়ে নিচ্ছে কালো চামড়ার লোক-গুলো। অতএব ওদের বিদায় করো, সেই সঙ্গে ইন্ধন যুগিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী নেতা-দের বক্তৃতা, Keep the Britain White.

অবশ্য ঝগড়া যখন বাধে তার কারণ দেখানো হল অন্য। এই অর্থনৈতিক পরি-স্থিতির কথা উল্লেখ না করে সাদা চামড়ার লোকেরা বলতে শুরু করল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে যারা এসেছে তাদের মধ্যে জ্যামেইকানরা অত্যন্ত অভদ্র। বড় বেশী মাত্রায় পান করে, যেখানে সেখানে হল্লা করে বেড়ায়। নাইট ক্লাব খুলে মেয়েদের পাপ-ব্যবসায় লিপ্ত করে। এই অজুহাত দেখিয়ে শুরু হল মারামারি। ক'দিন ধরে চলল এর তান্ডব নৃত্য, পুলিস এসে এক জায়গায় গোলমাল চাপা দেয়, অমনি আর এক দিকে শুরু হয়ে যায়। নটিং হিল গেট থেকে এজ্‌ওয়ার রোড, প্যাডিংটন এমনকি মার্বেল আর্চ পর্যন্ত এই দাঙ্গার জের ছড়িয়ে পড়ল। হ্যাম্পস্টেড রেহাই পেলেও কিলবার্ন হাই রোডে খুনখারাপি হয়েছে যথেষ্ট, এই গোলমালের সুযোগ নিয়ে টেডী বয়েজরাও কম লুঠতরাজ করল না।

বেশ কিছুদিন ধরেই লন্ডনে বেশ আতঙ্ক দেখা দিল, বিশেষ করে কালো চামড়ার

লোকেদের মধ্যে। এমন কি ভারতীয়রাও ভয়ে ভয়ে চলত, কে বলতে পারে হঠাৎ তাদের ওপর কোন আক্রমণ হয় কিনা। ইতিমধ্যে খবরও পাওয়া গেছে দুটি ভারতীয় ছেলেকে ছুরি মারা হয়েছে। যদিও বোঝা যায়নি কারা তাদের আক্রমণ করেছিল। টাকার লোভে টেডী বয়েজরা, না, বর্ণবৈষম্যের নীতি মেনে নেওয়া ইংরাজ যুবক?

সোরেন অফিস থেকে সোজা ফিরে আসত বাড়িতে। তারপর আর বেরত না। এলিজাবেথ হয়ত দু-একদিন বলেছে, এ পাড়ায় তো কোন গণ্ডগোল নেই, চল না কোথাও খেয়ে আসি।

সোরেন আপত্তি করেছে, না থাক, কখন কোথায় গণ্ডগোল হয় কে বলতে পারে।

—আমি তো তোমার সঙ্গে থাকব—

—সেই জন্যেই তো আরও ভয়। এমনিতে হয়ত আমাকে কিছু বলবে না, কিন্তু যেই দেখবে তোমার মত একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে আমি ঘুরছি অমনি ওদের হিংসে বেড়ে যাবে।

এলিজাবেথ নিজের মনে মাথা নাড়ে, বিশ্রী ব্যাপার। ইংলণ্ডে যে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে আমি ভাবতে পারছি না। সত্যি,

আমার লজ্জা করছে সৌরেন, মনে হচ্ছে দিন দিন আমরা অসভ্য হয়ে পড়ছি।

সৌরেন ইচ্ছে করে বলল, আমি অবশ্য মোটেই অবাক হইনি, কারণ আমাদের দেশে সেদিন পর্যন্ত হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা লাগত। দেশ ভাগ হয়ে গিয়ে তবে সেটা থেমেছে। এলিজাবেথ তখনও কি ভাবছিল, বলল, ছোটবেলায় কি ভাবতাম জান, ইংলন্ডকে ছেড়ে আমি কোথাও থাকতে পারব না। অন্য সব দেশের খবর পেতাম, মনে হত আমাদের তুলনায় তারা কত অসভ্য, কিন্তু আজ এখুনি এই মুহূর্তে তুমি যদি আমায় ভারতে যেতে বল আমি আর কোন রকম চিন্তা না করে চলে যাব। আর এখানে থাকতে আমার ভাল লাগছে না।

সৌরেন এলিজাবেথকে সান্ত্বনা দিয়েছে, নানা রকম গল্প করেছে, শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে বলেছে, এই দাঙ্গার ফলে আমাদের কিছু লোকসান হয়নি।

এলিজাবেথ প্রশ্ন করেছে, কেন?

—দেখ না অফিস ছাড়া সকালসন্ধ্যে সব সময়টুকু আমরা দুজনে দুজনের কাছে থাকি, আমার কাছে এইটাই তো পরম লাভ।

এলিজাবেথও হেসে ফেলে, বলে, ভারী দুষ্টু তুমি।

সৌরেন কিন্তু মিথ্যে বলেনি, সত্যিই এই ক'টা দিন তারা এত কাছাকাছি থেকেছে যে কখন কোন দিক দিয়ে সময় কেটে গেছে বুঝতে পারেনি। নিজেদের আনন্দে তারা বিভোর হয়ে ছিল। দেহের মাদকতা তাদের ভুলিয়ে রেখেছিল বর্তমান পরিস্থিতির নোংরামি থেকে।

হঠাৎ একদিন টেলিফোন এল কোন এক হাসপাতাল থেকে।

—আপনার নাম সৌরেন লাহিড়ী?

—হ্যাঁ, বলুন।

—আপনার বন্ধু রজত বোস সাম্প্রতিক দাঙ্গায় আহত হয়ে এই হাসপাতালে এসেছিলেন, এখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তিনি বাড়ি ফিরে যেতে চান, আপনাকে খবর দিতে বললেন।

রজত যে এ দাঙ্গায় আহত হয়েছে তা সৌরেন জানত না বলেই অবাক হল খুব বেশী। বললে, আমি আজই যাব দেখা করতে।

সৌরেন ভেবেছিল এলিজাবেথকে নিয়েই যাবে কিন্তু এলিজাবেথের অফিসে বেশী কাজ থাকায় আজ তার পক্ষে বেরনো সম্ভব হবে না জানাল।

হাসপাতালের রিসেপ্‌শনে গিয়ে নাম বলতেই সৌরেনকে তারা পাঠিয়ে দিল রজতের কাছে। রজত বিছানার ওপর বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে ছিল, মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ, দাড়িটা বেড়ে গেছে। কিন্তু চোখে সেই আগের মত উজ্জ্বল হাসি, সৌরেনকে দেখে সে সত্যিই খুশী হল। প্রথম কথাই বলল, তুই এসেছিস, বাঁচা গেছে, আর এখানে ভাল লাগছে না। ইংরেজ নার্স আর ডাক্তারদের ভণ্ডামি আমার কাছে অসহ্য।

সৌরেন অল্প হাসল, এদের উপর রাগ করছিস কেন?

—বলেছি না, এ জাতটাই বুজরুক। রাস্তায় দেখলে ডাণ্ডা মারছে তার পরেই হাসপাতালে ঢুকিয়ে সেবা, আহা কি উদারতার মহিমা। আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল।

—কবে তুই হাসপাতালে এসেছিস, কি হয়েছিল, খুলে বল।

রজত মাথা নাড়ে, সে দীর্ঘ ইতিহাস, পাঁচ মিনিটে তো আর বলা যাবে না। আগে বাড়িতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর।

অগত্যা সৌরেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে গিয়ে জানাল, রজত বাড়ি যেতে চায়। তারা আপত্তি করলেন না, বললেন, এখন আর কোন ভয়ের কারণ নেই। একটু সাবধানে থাকলে খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে।

সৌরেন আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারে না, প্রশ্ন করে, কি হয়েছিল ওর?

—পেছন থেকে কেউ ছুরি মেরেছিল, কিন্তু সেটা বেশীদূর ঢোকেনি। বেশী আঘাত পেয়েছেন উনি মাথায়। মনে হয় লোহার ডাণ্ডা দিয়ে কেউ ঘা মেরেছে।

—সত্যি?

—দু দিন প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন, তারপর ক্রমশ ভাল হয়ে উঠেছেন। ডিলিরিয়ামের ঝোঁকে একটি মেয়ের নাম উনি প্রায়ই বলতেন।

—কি নাম বলুন তো?

—মারিয়া।

সৌরেন যেন এই নামটাই শুনতে চেয়েছিল, বললে, আমিও তাই ভেবেছিলাম।

—আপনার নামও মাঝে মাঝে করতেন। তাই আপনাকেই খবর দিয়েছি।

সৌরেন সৌজন্য প্রকাশ করে বলে, আপনাদের অনেক ধন্যবাদ, এখন ওকে কি করে নিয়ে যেতে পারি বলুন।

—আমরা অ্যাম্বুলেন্সের গাড়িতে পাঠিয়ে দেব, স্ট্রেচারে করে একেবারে উপরে তুলে দিয়ে আসবে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সৌরেন রজতকে নিয়ে গিয়ে ইস্ট এণ্ডে তার ফ্ল্যাটের বিছানায় শুইয়ে দিলে। ঘর দোর খুব অপরিষ্কার না হলেও ঝাড়পোঁছ করার প্রয়োজন আছে বইকি। প্রায় দিন দশেক বন্ধ হয়ে পড়ে ছিল। রজতের কোন আপত্তি না শুনে সৌরেন কোটটা খুলে রেখে কাজে লেগে গেল। টেবিলচেয়ারগুলো মোটামুটি ডাস্টার দিয়ে ঝেড়ে ফেলে রান্নাঘরে জল ফুটতে দিয়ে ভাঁড়ারে কি আছে নেড়েচেড়ে দেখে নিল। কয়েকটা সুপের টিন, কনডেন্সড মিল্ক, চা, খানিকটা চাল, ডাল ছাড়া বিশেষ কিছু নেই।

দু' কাপ চা তৈরি করে এনে সৌরেন

বললে, গরম গরম খেয়ে নাও, ভাল লাগবে।

রজত হেসে বলল, এমনিতে আমার ভাল লাগছে, নিজের ঘরে এসে শুয়ে আছি। পাশে আমার ভারতীয় বন্ধু, আর কি চাই।

—সিগারেট খাবে নাকি?

—দাও। এখন তো পাইপ খেতে পারছি না।

সৌরেন কাছে গিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেয়, প্রশ্ন করে, কবে এ দুর্ঘটনা ঘটল?

—তা প্রায় দু সপ্তাহ হল বইকি। এই দাঙ্গার অন্যতম প্রধান বলি বোধ হয় আমি। সেদিন পর্যন্ত লণ্ডনে কোনরকম গোলমালের খবর ছিল না, আমি নটিং হিল টিউব স্টেশন থেকে বেরিয়ে সদর রাস্তা ধরে পূর্বদিকে এগুচ্ছি, রাস্তায় বিশেষ লোক ছিল না। হঠাৎ পেছন থেকে একটা চীৎকার শুনলাম, দেখি এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা প্রাণভয়ে ঊর্ধশ্বাসে ছুটে আসছেন। তাঁদের পেছনে তাড়া করে ছুটে আসছে একদল লোক। প্রথমটা আমি বুঝতে পারিনি। হকচকিয়ে গিয়ে রাস্তার এক দিকে সরে দাঁড়ালাম, কিন্তু পরক্ষণেই মনে সন্দেহ জাগল এও বর্ণবৈষম্যের বিষক্রিয়া কিনা। কারণ দেখলাম যাঁরা পালাচ্ছেন, তাঁদের গায়ের রঙ কালো, যারা তাড়া করে আসছে তারা সাদা। ভদ্রলোকটি চীৎকার করতে করতে ছুটছেন, "আমাদের বাঁচাও, ওরা মেরে ফেলবে।" আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, দরজা জানালা খুলে অনেকে মুখ বাড়াচ্ছে কিন্তু কেউ বেরিয়ে এল না। লোকটি আমার কাছ পর্যন্ত এসে ব্যাকুল সুরে বলল, তুমি ভারতীয়, দয়া করে আমার স্ত্রীকে বাঁচাও, ও অন্তঃসত্ত্বা। বিশ্বাস কর সৌরেন, ঐ মানুষটার কাতর উক্তি এখনও আমার কানে বাজছে, আর কোন কথা চিন্তা না করে পাশের একটা মুদীর দোকান ঠেলে খুলে ফেলে ভদ্রমহিলাকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। ততক্ষণে পেছনের দল তাড়া করে এসেছে, নির্দয় ভাবে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে জ্যামেইকান ভদ্রলোকটির উপর। আমি কিন্তু আর কালবিলম্ব না করে ছুটলাম সামনের টেলিফোন বুথ লক্ষ্য করে। ভাগ্য ভাল, পুলিসকে খবরটা আমি দিয়ে দিতে পেরেছিলাম, হিংস্র ইংরেজ ছেলেরা আমাকে টেলিফোন বুথ থেকে টেনে বার করলে, তারপর কি হল আমার মনে নেই। মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই। জ্ঞান ফিরে পেলাম একেবারে হাসপাতালে, তবে পরে খবর পেয়েছি মেয়েটিকে ওরা কিছু করতে পারেনি, মুদীর দোকান তাকে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় দিয়েছিল। ভদ্রলোকটি আমারই মত অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে যায়, তবে এখন ভাল আছে।

সৌরেন দুঃখ করে বলে, ছি, ছি, একটি অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে তারা এই ভাবে তাড়া করল। মনুষ্যত্ব বলে কি কোন জিনিস নেই?

—মনুষ্যত্ব! রজত হা হা করে হাসলে। মানুষ থাকলে তবে তো মনুষ্যত্বের কথা ওঠে।

সৌরেন বুঝতে না পেরে মুখ তুলে তাকায়।

—কেন, একদিন কাগজে পড়নি, নারীর অবমাননা, শিশুহত্যা, কোন জিনিসটা এরা বাদ দিয়েছে? সভ্যতার বড়াই আর যেন ইংরেজ না করে।

—কিন্তু এরকম হল কেন?

রজত গম্ভীর গলায় বলে, আমি তো আগেই বলেছিলাম, জমিদার-বাড়ির যখন বোলবোলা থাকে, তখন সেখানে কত
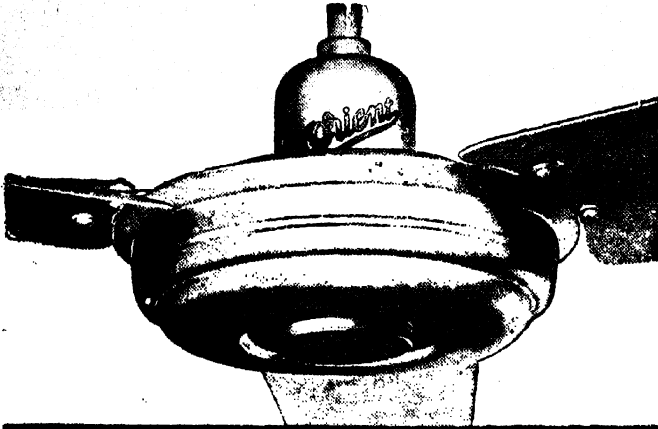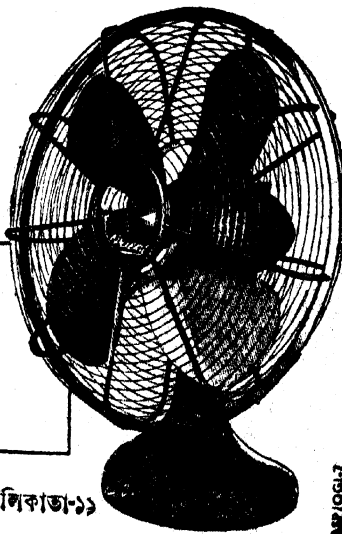
আনন্দ, হইচই, হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, আত্মীয়স্বজন, দাসদাসীর অভাব নেই। কত দান ধ্যান, বার মাসে তের পার্বণ লেগেই থাকে। কিন্তু সেই জমিদারি যখন চলে যায়, দেখেছ তখন সেই লক্ষ্মীছাড়ার বাড়ির কি অবস্থা হয়? ভূতুড়ে প্রাসাদের মত অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, পঞ্চাশটা শরিকে মিলে বাড়িখানা ভাগ করে নেয়। তখন তাদের মধ্যে দেখা দেয় ঈর্ষা, দ্বেষ, মনের সংকীর্ণতা।

রজত চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করে, এখন ইংলণ্ডের কথা ভাবলে আমার মনে হয় ঐ জমিদারির কথা। একে একে আলো নিবে যাচ্ছে, সাম্রাজ্য গেছে, কমনওয়েল্থ্-এর মুখোশও খুলে পড়বে। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে এই ছোট্ট দ্বীপখানা। চারদিকে দেখা দেবে অভাব, অনটন। তারই সূত্রপাত এখন আমরা দেখছি। অভাবের মধ্যে বোধ হয় মানুষকে ঠিক যাচিয়ে দেখা যায়। প্রাচুর্যের মধ্যে সে উদারতার অভিনয় করে মাত্র। আমার কি মনে হয় জান সৌরেন, আর ক' বছরের মধ্যে দেখবে ইংলণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্স আর ইটালীর কোন তফাত নেই। আভিজাত্য তারা হারাবে না, কিন্তু তার পাশাপাশি দেখা যাবে মনের সংকীর্ণতা। যা দেখেছ আমাদের দেশেও।

সৌরেন চায়ের পেয়ালাগুলো ধুতে নিয়ে যাবে বলে উঠে দাঁড়িয়েছিল, রজত বলল, দেশে ফিরে যা সৌরেন। গিয়ে সবাইকে বল আর যেন কেউ এ দেশে না আসে। ইংলণ্ডের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কন্টিনেন্টও শেষ হয়ে গেছে। যদি কেউ বাইরে যেতে চায় যাক তারা আমেরিকা, কিংবা রাশিয়া যারা এখনও বড় হবার স্বপ্ন দেখছে, যারা এখনও সংকীর্ণ হয়ে যায় নি।

সৌরেন ইচ্ছে করেই পাশের ঘরে চলে যায়, বোঝে বেশী কথা বললে রজত উত্তেজিত হয়ে পড়বে, তার চেয়ে ওকে শুতে দেওয়া ভাল।

কাপ দুটো ধুয়ে রেখে বাজারের প্লাস্টিক ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এল সৌরেন, বলল, তুমি একটু শুয়ে নাও, আমি চট্ করে কয়েকটা দরকারী জিনিস বাজার করে আনছি।

রজত বলল, তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম সৌরেন।

সৌরেন হাসল, তুমি তো সেন্টিমেন্টাল নও।

—তা নই। তবে আমার জন্যে কেউ খাটছে দেখলে খারাপ লাগে। দেখ ত ঐ ড্রয়ারে কিছু টাকা ছিল, নিয়ে যাও।

সৌরেন বলল, তার দরকার হবে না, আমার কাছে টাকা আছে।

মোড়ের মাথায় প্রথম যে দোকানটা খোলা পেল সেখানেই ঢুকে পড়ল সৌরেন, রুটি মাখন কয়েকটা ডিম, পাশের দোকান থেকে আলু কলা নিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে বাড়িতে ফিরে এল। দরজা খুলে দেখে রজত ঘুমিয়ে পড়েছে। নিঃশব্দে সৌরেন চলে গেল রান্নাঘরে। চাল আর ডাল মিশিয়ে অল্প করে খিচুড়ি বসিয়ে দিল, তার সঙ্গে খাবার সময়ে দুটো ডিম ভেজে নিলেই চলবে। কিন্তু একটা চিন্তা তার মাথায় ঘুরতে থাকল, রজত একলা এ বাড়িতে থাকবে কি করে? তার যা শরীরের অবস্থা, খুব বেশী ঘোরাঘুরি করা উচিত নয়, রান্না করা তো একরকম অসম্ভবই বলতে হবে। এক হয় লাঞ্চের সময় সৌরেন যদি খাবার কিনে নিয়ে এখানে চলে আসে, দুজনে মিলে খায় আবার বিকেলে অফিস ছুটি হয়ে যাবার পর এখানে এসে রান্না করে ফেলে। এলিজাবেথকে বললে সে অবশ্য সানন্দে বিকেলে এখানে আসতে পারে, রান্নাবাড়া করে তিনজনে খাওয়াদাওয়া সেরে রজতকে ঘুম পাড়িয়ে ওরা 'প্রায়রি' রোডে ফিরে যাবে। কিন্তু ভয় হয়, রজত এলিজাবেথকে পছন্দ করবে কি না। ওর যা ইংরেজবিদ্বেষ, হঠাৎ যদি রাগের মাথায় কিছু বলে ফেলে, এলিজাবেথ মনে কষ্ট পাবে।

সৌরেনের মনে হল রজত কার সঙ্গে কথা বলছে। ঘরে কেউ এল নাকি? কিন্তু কি করে আসবে, দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ করা। একটু অবাক হয়েই সৌরেন পাশের ঘরে বেরিয়ে এল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলছে রজত। খুব পরিষ্কার নয়, জড়ানো উচ্চারণ, কাছে এসে কান না পাতলে শোনা যায় না।

সৌরেন খুব সাবধানে খাটের কাছে এগিয়ে গেল, মাথা নীচু করে শুনল রজত বলছে, আমাকে বিশ্বাস কর, আমি বড় একা। আর আমি পারছি না। এ পরীক্ষার মধ্যে না পড়লে হয়ত কোনদিন বুঝতে পারতাম না আমি তোমাকে এতখানি ভালবাসি।

চুপ করে গেল রজত।

সৌরেন আবার রান্নাঘরে ফিরে গেল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কার সঙ্গে কথা বলছিল

রজত, নিশ্চয় মারিয়া। নয়া বলে মনে হয় না। মারিয়া এখন কোথায়? রজত কি তার ঠিকানা জানে?

একটু পরে রজতের ঘুম ভাঙল। সৌরেন জিজ্ঞেস করল, এখন কিরকম লাগছে?

—অনেক ভাল।

—আমি খিচুড়ি বসিয়ে দিয়েছি।

রজত উৎফুল্ল স্বরে বলে, খিচুড়ি! সত্যি সৌরেন, তুমি বড় ভাল ছেলে। কতদিন খিচুড়ি খাইনি।

সৌরেন অন্যমনস্ক স্বরে জিজ্ঞেস করে, মারিয়া এখন কোথায়? ওর কোন চিঠি পেয়েছ?

রজত মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করে, ঐ মেয়েটার কথা এখনও ভোলনি দেখছি। তোকে খুব যাদু করেছিল, না?

—হঠাৎ এ কথা কেন?

রজত চোখ মুখ কঠিন করে বলে, ওর মত স্বার্থপর, ওর মত নিষ্ঠুর মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি, নিজেরটুকু ছাড়া দুনিয়ার
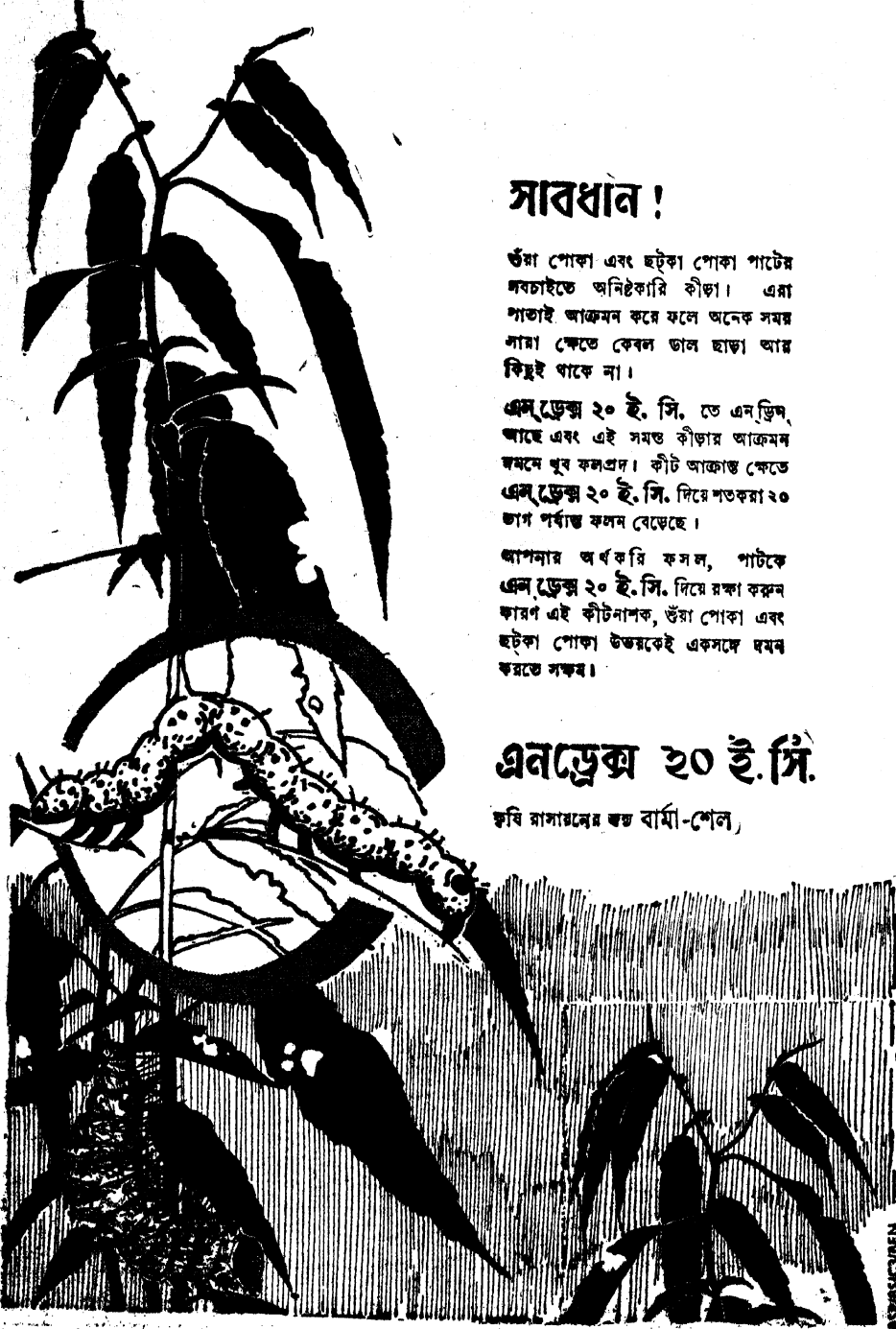
সে আর কিছু বোঝে না। নাচের প্রোগ্রাম তার শেষ হয়ে গেছে, নাম হয়েছে খুব। এতদিন বাদে মাতৃভূমির কথা মনে পড়েছে। নেপ্‌ল্‌স্‌-এ গিয়ে বসে আছে।

—তাই নাকি, তোমায় চিঠি দিয়েছে বুঝি?

রজত বিদ্রূপ করে হাসে, শুধু তাই, সেখানে এক সুদর্শন ছেলে বন্ধু হয়েছে। ইটালীয়ান ছেলে, নাম রোবার্টো। ভাল পিয়ানো বাজায়। তিন পাতা ধরে তার রূপ-গুণের ব্যাখ্যা করেছে। ঐটেই তার শেষ চিঠি। বলা বাহুল্য আমি কোনও উত্তর দিই নি।

সৌরেন চুপ করে থেকে বলে, তোমার অসুখের খবরটা বোধ হয় একবার মারিয়াকে জানানো দরকার।

রজত চেঁচিয়ে ওঠে, মোটেই না। আমি মরি বাঁচি তাতে মারিয়ার কি এসে যায়? কোন খবর আমি তাকে দেব না। আমি তো ভাবছি লরাকে বলব ক'দিন এসে এখানে থাকতে। মারিয়া যদি ফিরে আসে, অন্য কোথাও তাকে বাড়ি ভাড়া নিতে হবে।

এ নিয়ে আর কথা বলল না সৌরেন, কিন্তু রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর শুভরাত্রি জানিয়ে বাড়ি ফিরে আসার সময় গোপনে মারিয়ার ঠিকানাটা লিখে নিয়ে এল কাগজে।

সৌরেন বাড়ি ফিরে দেখে এলিজাবেথ তখনও শুতে যায় নি, তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে আছে। সৌরেনকে দেখে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার বন্ধু কিরকম আছে সৌরেন?

সৌরেন হাসবার চেষ্টা করে, বলে, অনেকটা ভাল। ওকে ওর বাড়িতে রেখে এসেছি।

—একলা থাকবার কোন অসুবিধে হবে না?

—সকাল বিকেল আমাকে যেতে হবে আর কি।

ঘরে ঢুকে জামা ছাড়তে ছাড়তে সৌরেন আজকের ঘটনা আদ্যোপান্ত বিবৃত করে। এমন কি প্রথম দিন নটিং হিল গেটে কি ভাবে রজত আক্রান্ত হয় সে কথা জানাতেও ভোলে না।

এলিজাবেথ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সব কথা শুনছিল, অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল, ছি ছি, কি লজ্জার কথা বল ত! নির্দোষ মানুষকে এই ভাবে বিপদগ্রস্ত করা। যারা এসব গোল-যোগ করছে সরকারের উচিত তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া।

সৌরেন ড্রেসিং গাউনটা পরে সোফায় বসে স্বস্তির নিঃশ্বাসে ফেলে। এলিজাবেথ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, আজ তোমার ওপর দিয়ে খুব ধকল গেছে, তাই না? বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

সৌরেন কোন উত্তর না দিয়ে মিষ্টি করে হাসল।

এলিজাবেথ তার কাছে উঠে এসে বলে, কাল থেকে তোমায় আর এত ভাবতে হবে না। আমিও যাব রজতের ফ্ল্যাটে তোমাকে সাহায্য করতে। আহা বেচারী! রান্না করে মুখখানা শুকিয়ে গেছে।

সৌরেন এই ভয়ই পাচ্ছিল, জানত সব কথা শুনলে এলিজাবেথ তার সঙ্গে যেতে চাইবে, অথচ রজতের কাছে তাকে নিয়ে যাওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বলল, না, না, তোমায় কষ্ট করতে হবে না লিজি, আমি করে নিতে পারব।

এলিজাবেথ মধুর হাসে, এতে আবার কষ্ট কি? অফিসের পর দুজনে একসঙ্গে থাকা যাবে সেই তো ভাল।

সৌরেন বিব্রত বোধ করে, বলে, ঠিক সে জন্যে নয়, মানে রজত কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের ছেলে।

—তাতে কি হল?

সৌরেন বোঝাবার চেষ্টা করে, আমার ভয় করে যদি উল্টোপাল্টা কিছু বলে বসে তুমি মনে কষ্ট পাবে।

এলিজাবেথ কথা শুনে হাসে, তুমি কি আমাকে কচি খুকি ভেবেছ সৌরেন। রজত এখন অসুস্থ, যদি সে কিছু বলেই আমি তা নিয়ে মন খারাপ করতে যাব কেন? তা ছাড়া আমার বিরুদ্ধে ওর কি অভিযোগই বা থাকতে পারে?

—কি করে তোমাকে বোঝাব লিজি, রজতের রাগ গোটা ইংরেজ জাতটার ওপর। অন্যায়ভাবে মার খেয়ে রাগটা তার আরও বেড়ে গেছে। তোমাকে সামনে পেলে তার সব রাগটা গিয়ে পড়বে তোমার উপর।

এলিজাবেথ তবুও বুঝতে চায় না, মাথা নাড়ে, বলে, সেইজন্যই তো আমার আরও বেশী যাওয়া দরকার। তার মনের মধ্যে যে ভুল ধারণা রয়েছে তা দূর করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। সে যদি মনে করে এই গুণ্ডামি, মারধোর করাকে ইংলণ্ডের জন-সাধারণ সমর্থন করছে তবে ভুল করবে,

আমি ইংরেজ মেয়ে হিসেবে বলছি এ অন্যায়। তুমি দেখবে কোর্টে প্রত্যেকটি অপরাধীর বিচার হবে, তারা শাস্তি পাবে। ইংরেজের অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু এটুকু আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এখানকার মত নিরপেক্ষ বিচার পৃথিবীর আর কোন দেশে পাবে না।

কথা বলতে বলতে এলিজাবেথের চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। সোরেন তাকে শান্ত করার চেষ্টায় বলে, তুমি বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েছ লিজি। ক'দিন বাদে রজতের ভুল আপনা থেকেই ভেঙে যাবে। তখন আলাপ করো। এ ক'টা দিন থাক না।

এলিজাবেথ আর কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়াল, বেশ, তুমি যখন বলছ, যাব না। রজত তোমার বন্ধু, তুমি নিশ্চয় তাকে আমার চেয়ে ভাল চেনো। কাল সকাল-সকাল আমায় অফিসে বেরতে হবে, যাই শুয়ে পড়ি। গুড্ নাইট্।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে এলিজাবেথ ফিরে তাকাল, বলল, আমার মনে হয় মারিয়াকে তোমার চিঠি লিখে দেওয়া উচিত, অবশ্য সেটা তুমি ভাল বুঝবে।

এলিজাবেথ বেরিয়ে চলে গেল।

সোরেন চুপ করে বসে রইল। বুঝল এলিজাবেথের অভিমান হয়েছে। কিন্তু কিই বা তার করার আছে। রজতকে তো সে চেনে না। তবু এলিজাবেথের কথামত রাত্রে বসে বসে মারিয়াকে সে এক দীর্ঘ চিঠি লিখল, কালকে অফিস থেকে পোস্ট করে দেবে।

পরদিন সকালে উঠতে অন্য দিনের চেয়ে সোরেনের দেরি হল। ব্রেকফাস্ট খাবার সময় মিসেস্ হেরিং জানাল এলিজাবেথ ইতিমধ্যেই অফিসে চলে গেছে। সোরেন মনে মনে ঠিক করল, অফিস থেকে এলিজাবেথকে ফোন করবে। কাল বেচারী নিশ্চয় মনে কষ্ট পেয়েছে।

সেদিনও অফিসে জ্যাক্ ব্রেন্ট এল দেরি করে। সোরেন ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করল, আজকাল যে এত ঘন ঘন দেরি হচ্ছে জ্যাক্, বুড়ো বয়েসে কারুর প্রেমে পড়লে না তো?

জ্যাক ম্লান হেসে উত্তর দিল, আর দেরি হবে না, সব ঝামেলা মিটে গেছে।

—আবার কিসের ঝামেলা?

—ঝামেলা একটাই, আমার সেই ভাই রবার্ট বলেছিলাম দাঙ্গা করার জন্যে পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, আজকে তার বিচারের রায় বেরুল।

জ্যাক একটু থেমে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, ছ' মাসের সশ্রম কারাদণ্ড, এক শ' পাউণ্ড জরিমানা। টাকা দিতে না পারলে আরও ছ' মাস কারাবাস।

সোরেন চুপ করে কথাগুলো শুনলো, তুমি এখন কি করবে?

—করবার তো কিছু নেই। এক শ' পাউণ্ড দেবার আমার সামর্থ্য কোথায়? আর থাকলেও বোধ হয় দিতাম না। এক বছর জেলে থেকে যদি নিজের ভুল বুঝতে পারে, কিছুটা মানুষের মত হয়, তা হলেই বাঁচি।

সোরেনের কিছু বলার ছিল না, জ্যাককে আর সান্ত্বনা দেবার কি আছে? চুপচাপ নিজের কাজ করে গেল বাকী সময়টা। মনে পড়ল এলিজাবেথের কথা। সে ঠিক বলেছে, বিচারে সত্যি সত্যি কঠিন শাস্তি হয়েছে অপরাধীদের। জজেরা অন্তত চামড়ার রঙের কোন পার্থক্য করেনি।

এলিজাবেথের অফিসে বার দুই ফোন করেও সোরেন ধরতে পারল না, বোধ হয় লাঞ্চে বেরিয়েছে। সাড়ে বারটা নাগাদ কিছু স্যাণ্ডউইচ্, আর বড় বড় দু টুকরো মাছ ভাজা কাগজে মুড়ে নিয়ে সে হাজির হল রজতের ফ্ল্যাটে। সোরেনকে দেখে রজতের মুখ খুশীতে ঝলমল করে ওঠে। বলে, ঠিক সময় এসে পড়েছিস সোরেন, পেটে আমার ইঁদুরে ডন মারছে।

কথা না বাড়িয়ে দুজনে খেতে বসল। সোরেন এক সময় জানাল জ্যাক ব্রেন্টের ভাইয়ের কথা, বলল, আর যাই হোক, ইংলিশ কোর্ট ন্যায্য বিচার করেছে।

সঙ্গে সঙ্গে রজতের মুখের চেহারা বদলে গেল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, তুই ওদের বিচারের প্রহসনকে বিশ্বাস করিস? লোক দেখিয়ে দু'-তিনটে ইংরেজকে ওরা শাস্তি দেবে, আর অন্য দিকে সব ক'টি চাবি বন্ধ করে দেবে, যাতে না কালো লোকরা আর ইংলণ্ডে আসতে পারে, আর না এখানে চাকরি পায়। শয়তানের অনুচরদের কথা যে আমরা বইতে পড়েছিলাম না, তাদেরই জীবন্ত রূপ হচ্ছে ইংরেজ। সাবধান করে দিচ্ছি, ওদের মায়ায় ভুল না বন্ধু।

(ক্রমশ)

অযাত্রায় জয়যাত্রা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১৩)

গুম্ গুম্ গুম্ করে একটা শব্দ উঠল, মুখ বাড়িয়ে দেখি আমরা হাজীপুরের পুলের ওপর এসে গেছি; ইঞ্জিন আর ক'টা গাড়ি উঠেই গেছে ওপরে। গতিবেগও কমে গেছে গাড়িটার।

পুলটা হচ্ছে গণ্ডকীর ওপর। ভুল করো না যেন, এ গণ্ডকী সমস্তিপুরের গণ্ডকী নয়, তার নামটাও হচ্ছে বুড়ি-গণ্ডকী। এই হলো আসল গণ্ডকী, উত্তর বেহারের তিনটি যে বড় বড় নদী তার অন্যতম। আর দুটি হলো একদিকে কুশী, যেটা দ্বারভাঙ্গা সহর্ষা আর পুর্ণিয়া জেলা হয়ে গেছে, অন্যদিকে সরযূ, যেটা উত্তর প্রদেশ হয়ে নেমে এসে শেষের দিকে ছাপরা জেলা হয়ে গঙ্গায় পড়েছে। গণ্ডকী হলো মাঝখানে, মোতিহারী, ছাপরা আর মজঃফরপুর জেলা হয়ে পাটনার সামনে এসে গঙ্গায় পড়েছে। তিনটেই হলো গঙ্গার উপনদী। তিনটেই খুব বড় নদী, বাংলার ভাগীরথী রূপনারায়ণের অনুরূপ।

গণ্ডকীর আরও দুটি নাম আছে; নারায়ণী আর শালগ্রামী এবং এ দুটি নামের তাৎপর্যও আছে। এই নদীটি যেখানে হিমালয় থেকে বেরিয়েছে সেটা শালগ্রাম বা নারায়ণ-শিলার জায়গা। ডিম্বাকৃতি এই সুমসৃণ শিলাকেই আমরা নারায়ণ রূপে পুজো করি, জানো। যিনি অসীম, অনন্ত তিনি এই সান্ত, শুদ্ধ আধারে অধিষ্ঠান ক'রে আমার পুজো গ্রহণ করুন; হিন্দুর প্রতীক বা আধার পুজোর যা পদ্ধতি। প্রমেয় আর অপ্রমেয়র মধ্যে যোগসাধনের পন্থাও আবিষ্কারের চেষ্টা করেছে হিন্দু; মনটা অনন্তে লীন ক'রে দেওয়া একেবারে, কোন আধার ব্যতিরেকেই, অর্থাৎ নিরাধারকে নিরাধাররূপেই পাওয়ার চেষ্টা, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থ, যাকে স্থূলে জীবন ধারণের নানা সমস্যা মিটাতেই দিনের প্রায় সমস্তটুকু সময় দিতে হবে, সাধারণভাবে তার সেই পন্থা হতে পারে না, সেটা নাকি হলো যাঁরা নিতান্তই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু তাঁদের জন্যেই। তাই এই গ্রাম, শালগ্রাম, এই শিবলিঙ্গ, এক হিসাবে কোন আকারই নেই; কিংবা কল্পনাটাকে আরও খানিকটা মূর্ত করে নিয়ে মূর্তিপুজো—লক্ষ্মী-নারায়ণ, শিবদুর্গা; তোমার মনের বৃত্তি বা অভিরুচি মতো। এই পথেও আমার সাধক মূর্ত থেকে অমূর্তে চলে যাচ্ছেন।

জগতের শ্রেষ্ঠ আর পুরানোতম ধর্ম, কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কত বিচিত্র উপলব্ধির সমাবেশ যে এর মধ্যে। হিন্দু ধর্মটাকে আরণ্যক ধর্মও বলা হয়। "বুনো" অর্থে নয়, ব্রহ্মচিন্তা নিয়েই যাঁরা দিনাতিপাত করতেন সেই অরণ্যবাসী মুনি-ঋষিদের চিন্তাপ্রসূত বলেই। তবে আমার মনে হয় অন্য এক অর্থেও একে আরণ্যক ধর্ম বেশ বলা চলে। এত চিন্তার বৈচিত্র্য, এত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এত সাধন পদ্ধতির বিভিন্নতা বহু ক্ষেত্রে মনে হয় যেন পরস্পর-বিরোধীই—যে, এও যেন এক পাহাড়, পর্বত - গুহা - কন্দর - নদী - হ্রদ-তড়াগ-পাদপ-গুল্ম দিয়ে রচা অতি বিচিত্র অরণ্যই। তোমার যেখানে অভিরুচি মনের আশ্রয় রচনা করে সাধনে ব'সে যেতে পার। হিন্দু ধর্মের উৎকর্ষও এইখানেই, যদি বিপদ বা অপকর্ষই বলো তো তাও। অর্থাৎ চিন্তার রাজ্যে (ধর্ম-চিন্তার রাজ্যেই বলি) সমতা নেই। তবে সেটা আপাতদৃষ্টিতেই। একটু ভেবে দেখলে কি বোঝা যায় না যে একখানি বই বা একটি মতবাদকে আশ্রয় করে যে ধর্ম, তা কি নানা মনোবৃত্তিকে একত্র ক'রে এক ধরনের আপসই? আমার মনে হয় এই আপস চিরসঞ্চরণশীল চির-প্রগতিশীল মানবমনের পক্ষে বেশ স্বাভাবিক নয়। তাই এই রকম বহু ধর্মেই—বহু বলি কেন, হাজার আড়াই-তিনের মধ্যে রচিত সব ধর্মেই চিন্তার বৈচিত্র্য ঢুকে পড়ছে; আমার এই নূতন অর্থে

"অ্যারণ্যক" হয়ে পড়বার লক্ষণ দিয়েছে দেখা। আমার তো নিজের মনে হয় একটা খুব সুস্থ লক্ষণই। চিন্তার স্বাধীনতা (অবশ্য একটা কেন্দ্রকে অবলম্বন করেই) চিন্তার এই প্রসার, এই ক্রমে ঔদার্য এনে দেবে। ধর্মের নামে হানাহানি, যেটা নাকি "বুনো" অর্থে আরণ্যক যুগেরই একটা বর্বর উত্তরাধিকার মানুষের, তা যাবে লুপ্ত হয়ে। যা ছিল (বা এখনও হয়ে রয়েছে) মানব-সভ্যতার সবচেয়ে বড় অন্তরায়। যার জন্যে—যেন এই বর্বরতায় ক্লান্ত হয়েই এক অংশের চিন্তানায়কেরা আজ বলছেন—ধর্মের পাটই উঠিয়ে দিয়ে দেখা যাক না ফলটা কি রকম দাঁড়ায়। মতে না মিলুক, খুব দোষও দিই না তাঁদের।

পুলের মাঝামাঝি উঠে এসেছি আমরা। আমার ডাইনে নারায়ণী একেবারে সেই দিক-রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। বাঁয়ে যেখানে গিয়ে গঙ্গায় পড়েছে, এখান থেকে বোধ হয় মাইল চারেক দূরে, সে পর্যন্ত দেখা যায়, তারপরে একটা অস্পষ্টতা, তারপরে আরও কতদূরে পাটনা শহরের দীপাবলী—আট দশ মাইলের একটা রেখা, দূরত্বের জন্য মাইলখানেকের মধ্যে সংকুচিত হয়ে পড়েছে।
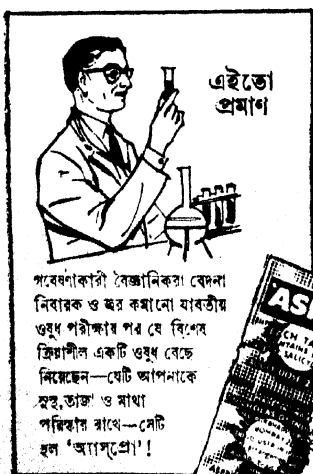
অন্ধকারের গায়ে চিকচিক করছে আলোর টিপগুলো। আর এই বিরাট বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ নদী-তীর-নগরী, দূর-আসন্ন—সমস্তটুকুর ওপর অনুপচিত কোজাগর-চন্দ্রের জ্যোৎস্না; কী করে তোমায় বোঝাই সে কী জিনিস!

শুধু তো তাই নয়। আমি এখন ভারতের অন্যতম এক মহাতীর্থে। সামনে শোনপুরের তীরে ঐ হরিহর-ক্ষেত্র। কবে তাঁরা মিলিত হয়েছিলেন তার জন্যে আমায় পুরাণেতিহাসের পাতা ওলটাতে বলো না। ওটা বিশ্বাসে গ্রহণ করে নিতে দাও, ওই দূরে তাঁদের মন্দির, তীরলগ্ন একটি শ্বেত-বিন্দু। আলিঙ্গনবদ্ধ এই দুই দেবতাকে আমার প্রণাম পাঠিয়ে দিলাম কোন্ সেই শুভলগ্নে কোন্ অতীত যুগে কালের সেই একটি শ্বেতবিন্দুতে।

তারপর এই তো দেখছিও। মহাব্যোম সমাবৃত ক'রে চন্দ্রমৌলী, ব্যোমকেশ দেবাদিদেব শঙ্কর, আর তাঁরই পাশে—নগরী-বনানী-নদী-প্রান্তর পরিব্যাপ্ত ক'রে সৃষ্টিরূপী নারায়ণ।

মনে মনে বলছি—আমার পথের সমস্ত গ্লানি মুছিয়ে দিয়েছ দেব, তোমাদের কোটি প্রণাম। তোমাদের কোটি ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ নিজেকেও। কালের স্রোতে যে এই অকিঞ্চন জলবিন্দু—এই ক্ষণায়ু বুদ্বুদ—সেও আজ ধন্য এই মহামিলনের প্রতিভাস বক্ষে ধারণ ক'রে।

পুল পেরিয়ে আমরা শোনপুরের কূলে এসে পৌঁছলাম। পূর্ণিমা উপলক্ষে এইখানে প্রতি বৎসর একটি মেলা বসে হরি আর হরের মহামিলনের স্মারকরূপে। মেলাটি নাকি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা; প্রথমটি হচ্ছে রাশিয়ার নিজনি-নভগোরোডে। অত বুঝি না, তবে এত বড় বিপুলায়তন মেলা যে পৃথিবীতে খুব বেশী সম্ভব নয়, একবার দেখলে এটা বেশ বোঝা যায়। বিশেষ করে সব রকম পশু পক্ষী বিক্রির এত বড় হাট। হাতির পাড়ায় ঢুকলে তা কাতারে-কাতারে হাতিই আছে দাঁড়িয়ে, ঘোড়ার পাড়ায় ঢুকলে তো ঘোড়াই, গোরুর পাড়ায় গোরুই। যত রকম হতে পারে ভারতের সমস্ত দেশের প্রতিনিধি, সব বয়সের। সে এক এলাহি কাণ্ড, দেখোনি কখনও। এদিকে, যা জিনিস চাও। যা নেই ভারতে, তা নেই ভারতে; তেমনি শোনপুরের মেলা সম্বন্ধেও হয়তো বলা যায়, যা এখানে পাবে না, তা ভারতের কুত্রাপি পাবে না। নারায়ণীর (বা গণ্ডকীর) ধারে ধারে সাত আট মাইল ধ'রে মেলা বসে, প্রায় মাইল তিনেক ভেতর পর্যন্ত। রাজ্য সরকারের দিক থেকে রাস্তাঘাট প্রস্তুত, আলো জল সরবরাহ এবং সব রকম স্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যবস্থা করা হয়। এক মাস ধরে মেলা স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের দম নেওয়ার ফুরসত থাকে না।

অবশ্য কমতে কমতে ক্রমে ঢের কমে এসেছে। যানবাহনের সুবিধার জন্যে এখন সব জিনিসই সব জায়গায় অনায়াসলভ্য হয়ে পড়েছে; এদিকে হাতি-ঘোড়ার রেওয়াজ গেছে একেবারেই কমে, মেলার যুগই তো নয় এটা। তবু সম্ভব হলে কখনও দেখে যেও এসে। একটা অভিজ্ঞতা হবে, তুমি ইতিহাসের ছাত্র, বিহার এক সময় সমস্ত ভারতের যে কত বড় মিলন-ক্ষেত্র ছিল তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাবে।

শুধু ক্রেতা বিক্রেতা মহাজনদের সমাবেশই তো নয়। কত পণ্ডিত, কত সাধু, কত রাজনীতিক বা সমাজসেবক দল' কত রাজ-রাজড়া, জমিদার-তালুকদারদের ক্যাম্প পড়ে (এগুলো আর অবশ্য এ নামে আজকাল নয়); দুজনের মিলন সারা ভারতের মিলনে গিয়ে দাঁড়ায়। শুধু কেনবারই নয়, কিছু করবার, কিছু শোনা-বার, এত বিভিন্ন প্রকৃতির এত বড় জন-সমাবেশ তো সুলভ নয়।

"পরশুরাম"-বর্ণিত সেই কাক-মার্গ এই-খানেই প্রচারিত হয়েছিল। মনে পড়ছে নিশ্চয়, ভোলবার নয় তো।

আমি একবার গিয়েছিলাম; অবশ্য কাক-মার্গে আকৃষ্ট হয়েই নয়।

আমি তখন মহারাজের প্রাইভেট

সেক্রেটারী, বর্তমান মহারাজের পিতার। স্টেটেরই পুরো খেতাব মহারাজাধিরাজ)। প্রতি বৎসর হাতি-ঘোড়া প্রভৃতি কেনার জন্য রাজের ক্যাম্প পড়ত। তাঁর আবার অন্যরকম প্রয়োজনও ছিল। তিনি ছিলেন "ভারত ধর্মমহামণ্ডল"-এর আজীবন সভাপতি। ক্ষেত্রের মেলায় যে বিপুল সাধু সমাগম হতো তার সুযোগে তিনি মহামণ্ডলের কাজ অনেকখানি এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

আমায় যেতে হয়েছিল তাঁর সংগে। খরিদ-বিক্রির কাজ ছিল অন্যদের হাতে; মহারাজের অন্যান্য ব্যক্তিগত দপ্তরের সংগে মহামণ্ডলের নথিপত্র ছিল আমারই হাতে।

সেই আমার শোনপুরের মেলার অভিজ্ঞতা। হলোও তো আজ প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর। হাতি-ঘোড়ার যুগ তখন অব্যাহতই চলছে; মেলাও পুরোদমে।

কী অভিজ্ঞতা? সেদিক দিয়ে যদি প্রশ্ন কর তো একটা মেলায় কি আর এমন অভিজ্ঞতা হবে? উপদ্রব, বিপ্লব, বা ঐ জাতীয় কোন বড় ঐতিহাসিক ঘটনা তো নয়। দুটি কথায় বলা যায়—বৈচিত্র্য আর বিপুলতা; কিংবা ঐ দুটো কথাই উল্টে-পাল্টে, বৈচিত্র্যের বিপুলতা বা বিপুলতার বৈচিত্র্য।

একটা বিপুলতা হচ্ছে—অমন বিরাট সন্ন্যাসী সমাবেশ আমি তার আগে কখনও দেখিনি, তারপরেও নয়। কী একটা তখন বড় ব্যাপার চলছে—বোধ হয় ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপ, যেমন বিবাহের বয়স নির্ণয় বা ঐ জাতীয় কিছু। একটা বিরাট মণ্ডপের নীচে সে প্রায় এ-কূলে ও-কূলে দেখা যায় না—যত রকম সাধুসন্ন্যাসীদের সম্মেলন। সে এক অরণ্যই যেন। একেবারেই নাগা বা উলংগ সন্ন্যাসী আমি প্রথম সেইখানেই দেখি, কোমরে দড়িটুকু পর্যন্ত নেই। একটা দৃশ্য মনে খুব দাগ দিয়েছিল। এখনও যেন চোখের সামনে দেখছি। মহারাজই ছিলেন সভাপতি। তাঁরই বা অন্য কারুর একটু গরম গরম অভিভাষণে ঐ রকম একজন সন্ন্যাসী হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে তাঁকে ঠাণ্ডা করাই যেন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। দীর্ঘচ্ছন্দ বিশাল শরীর, খতকটা রুক্ষাভই দেহের বর্ণ, মাথায় জটা, হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে শুধু ক্রুদ্ধ অংগ সঞ্চালন আর হুংকার। তার মধ্যে কোন ভাষা নেই। শুধু নিষ্পেষিত দন্তের মধ্যে দিয়ে একটা "হুম্ হুম্" গর্জন, চোখে আগুন ঠিকরে পড়ছে, ঐ রকম আয়তনেরই কয়েকজন সন্ন্যাসী উঠে সামাল দিতে পারছেন না; বেশ খানিকক্ষণ ধরে সে এক কাণ্ড।

অবশ্য যখন ঠাণ্ডা ক'রে দেওয়া হলো, ব'সে পড়লেন, তখন একেবারে জল। একটি যেন শিশুই ব'সে আছে; সামনে চেয়ে। কিছুই জানে না, কিছুই বোঝে না, মুক্ত, আত্মলীন।

কিছু বোঝা যায় না এ'দের।

একেবারে খাঁটি?...একেবারেই কিছু নয়?

খাঁটি তো, হিন্দুর এত দুর্দশা কেন আজ? কিছুই নয় তো থেকে ফল কি?

আর একটা বিপুলতার কথা মনে পড়ে। ভাবলে চোখ দুটো যেন এখনও ভয়ে আপনা হতে বুজে যায়। ধোঁয়া!

অমন ধোঁয়ার সৃষ্টি আমি কুত্রাপি দেখিনি আর। হবেই তো, বুঝে দেখো না।

সন্ধ্যার আগে থেকে অত লোকের "দক্ষিণ-হস্তের" আয়োজন শুরু হয়েছে, লক্ষ লক্ষ লোক, তাদের হাজার হাজার চুল্লি! দুটি জিনিস মনে স্পষ্ট হয়ে আছে আমার। আমাদের ক্যাম্পটা অবশ্য পড়েছিল মেলা থেকে অনেকখানি হটে, স্টেশনের প্রায় কাছে। সম্মেলনের মণ্ডপ থেকে সেখান পর্যন্ত প্রায় তিন-চার মাইল পথ আমি একটা ফিটনে বসে একেবারে চোখে রুমাল দিয়ে এসেছিলাম। এবং আশ্চর্য হয়েছিলাম যারা রয়েছে এর মধ্যে তারা রয়েছে কি ক'রে। সব রকম কাজকর্মই তো হচ্ছে।

আর একটা অভিজ্ঞতা আছে। তবে তার মেলার সংগে কোন সম্পর্ক নেই, যে কোন জায়গায় ঘটতে পারত। তবে ঐ দিনটারই ঘটনা বলে এইখানেই উল্লেখ করা চলে। একটু রগড় আছে।

আমাদের সংগে দুই কুমারও গিয়েছিলেন। বর্তমান যিনি মহারাজ আর তাঁর ছোট ভাই, পরে রাজাবাহাদুর খেতাব পান। তখন তো ছেলেমানুষই, ছাত্রাবস্থা চলছে। দুষ্টু বুদ্ধিটুকু বেশ পুরোমাত্রায় রয়েছে।

আরও একটু ভূমিকা দরকার। এ'দের সংগে আমার সম্বন্ধটা নিছক রাজে চাকরি করা নিয়েই ছিল না। আমার এক জ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি-ভ্রাতা (গোষ্ঠবাবুর পরিচয় তুমি জান) দুই ভাইয়ের তখন গৃহশিক্ষক। সেই সূত্রে একেবারেই ছেলেবেলা থেকে ও'দের দুজনের সংগে যথেষ্ট মেলামেশা ছিল আমাদের। কর্মচারী হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই এবং ও সম্বন্ধের সংগে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক একটা হৃদ্যতা ছিল। তার মধ্যে হাসি-তামাশা এসে পড়তেও বাধা ছিল না।

সেদিন সকাল বেলার কথা। মহারাজ ক্যাম্পে থাকলে কাজকর্ম আমার খুব কমই থাকত। অতিথি অভ্যাগতদের জন্য একটা আলাদা শামিয়ানা ছিল, গালিচা চেয়ার প্রভৃতি দিয়ে সাজানো। কে আর কত আসছে? ঐখানেই বেশির ভাগ কাটত আমাদের—ও'রা দুজন, মহারাজের খাস আফিসের আমরা দুজন বাঙালী কর্মচারী, ওদিককার কিছু কিছু দরবারী; কখনও মজলিস হালকা, কখন ভারি।

আফিসে যেটুকু কাজ ছিল সেরে শামিয়ানায় গিয়ে দেখি, মজলিস ষোলকলায় পূর্ণ একেবারে। একজন গনৎকার কোথা থেকে এসে জুটেছে, তাকে ঘেরে-ঘরে দাঁড়িয়েছে সবাই, ও'রা দুজনেও আছেন, হাতের ওপর হাত সামনে গিয়ে পড়ছে, প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন। মুখরোচক করে বলছে লোকটা, সত্যি যা তা সাধ্যমতো খোঁজ নিয়েই এসেছে, মিথ্যাকেও সামলে-সুমলে এগুবার ক্ষমতা তো অর্জনই করা। জ্যোতিষ বিদ্যা যাই হোক, এদের বিদ্যাটা তো একটা সুপরিকল্পিত আলাদা আর্টই।

আমি গিয়ে উপস্থিত হতে বড় ভাই চোখ তুলে একটু অদ্ভুত দৃষ্টিতে চাইলেন আমার দিকে। একটু যেন অনামনস্ক মুখে একটু যেন দুষ্টুমির হাসি ফুটি-ফুটি করছে (চিনি তো); প্রশ্ন করলাম—"কি ব্যাপার মহারাজকুমার?"

গনৎকারের চারিদিকে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে ঘিরে ফেলেছে। উনি আমায় ইশারায় ডেকে একটু অন্যদিকে নিয়ে গেলেন। বললেন—"আপনাকে হাত দেখাতে হবে বিভূতিবাবু।"

হেসে বললাম—"আমি তো ওসব বিশ্বাসই করি না, হুজুর, ভালো বললে মিথ্যা আশা, মন্দ বললে সত্যিকার ভয়।"

"আমিই যেন কত করি! বলি, পরীক্ষা করতে হবে তো লোকটাকে, না সবাইকে বোকা বুঝিয়ে দক্ষিণে নিয়ে চলে যাবে? না, অমত করবেন না। আপনি হচ্ছেন পরীক্ষার একেবারে যোগ্যতম লোক।"

বললাম—"কিছু যে জানি না ও সম্বন্ধে!"

"কিছু জানতে হবে না আপনাকে। আপনি শুধু হাতটা বাড়িয়ে বসে থাকবেন, সওয়াল যা করবার আমিই করব।...আর, বেশ গম্ভীর হয়ে থাকবেন। স্কুলের হেড-মাস্টারি আপনাকে করেই দিয়েছে গম্ভীর; শুধু মনে মনে ভাববেন—আমার মতন এক-ক্লাস শান্ত-শিষ্ট ছেলে নিয়ে চেয়ারে বসে আছেন। আসুন।"

এগিয়ে গিয়ে বললেন—"সরো, সরো তোমরা। বিভূতিবাবু এসেছেন। ভয়ানক বিশ্বাস ও'র, দেখিয়ে নিতে চান। আবার এক্ষুনি হয়তো বাবার ডাক পড়বে, হবেই না আর।"

সবাই সরে গেল। আমি একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম।

(ক্রমশ)

ট্রামেবাসে

শ্রী বিজয়ানন্দ পট্টনায়ক বলিয়াছেন যে, তাঁরা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবেন। —"ঢাল-তরোয়াল প্রভৃতির অভাবে অতঃপর নখ গজাতে হবে কি না, তা অবশ্য তিনি বলেন নি।"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

মুসলমানরা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' জিগীর তুলিয়া উদ্বাস্তু কলোনী আক্রমণ করিয়াছে। —"ভাষার প্রশ্নে এইটি

হলো একমাত্র ভদ্রলোকের এক কথার ভাষা, না বুঝে উপায় নেই, বলে—না বুঝবি তো মগজে তোর গজাল মেরে গোঁজাব।"—শ্যামলাল তার মন্তব্যটা কবিতায় শেষ করে।

এই প্রসঙ্গে অন্য এক সংবাদে পাঠ করিলাম, শ্রী চালিহা নাকি আস্ফালন করিয়া বলিয়াছেন যে, বেড়া দিয়া পাকিস্তানীদের রুখিতে হইবে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"তাঁর এই আস্ফালনের উত্তরে পাকিস্তানীরা শুনলাম হাসতে হাসতে গান ধরেছে—বেড়া দিলে কবে তুমি তোমার ফুলবাগানে।"

অন্নপূর্ণা বিজয়ী লেঃ কোহলি নাকি বলিয়াছেন যে, এভারেস্ট আরোহণ না করিয়া তিনি বিবাহ করিবেন না। —"না করুন। তাতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু কোন কুমারী যদি পণ করেন যে, এভারেস্ট বিজয়ী বর না পেলে সে বিয়ে করবে না, তা হলেই শঙ্কার কথা।"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

অসমীয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধির সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পাকিস্তান হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান নাকি আসামে অনুপ্রবেশ করিয়াছে।

উন্মীলনে কি সমস্যার সমাধান হবে? সরাসরি ব্যাপারটা উপলব্ধি করাতে সংবাদদাতা লিখিতেছেন—'ভারত সরকারের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত।' আমাদের জনৈক সহযোগী বলিলেন—"শুধু জ্ঞানচক্ষু আক্কেল দাঁত ওঠার যে এখনও অনেক বাকী!!"

বিবাহে যৌতুক গ্রহণ নিষিদ্ধ করিয়া আইন পাশ করা হইয়াছে। উহা নাকি ১লা জুলাই হইতে কার্যকরী হইবে। সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জম্মু-কাশ্মীর এই যৌতুক আইনের আওতায় পড়িবে না। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আশা করি, জম্মু-কাশ্মীরকে যৌতুক দেওয়ার পরিকল্পনা এর পেছনে নেই!!"

মেজর গাগারিনকে ভারতে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে। —"কিন্তু পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনা ক'রে তিনি ভারতে পদার্পণ করবেন তো? দেমাকেই অনেকের পা মাটিতে পড়ে না: এঁ'র তো সত্যিসত্যি আকাশে পা।"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

জাপানে নাকি মাছের নানারকম শব্দ রেকর্ড করা হইতেছে। তাদের প্রণয়ের আহ্বান দিয়াই মৎস্যী না হোক, মৎস্য জালে ধরা যাইবে বলিয়া উদ্যোক্তাদের বিশ্বাস। —"আমরাও শব্দ রেকর্ড করছি। কিন্তু সেটা মাছের নয়, মেছো হাটের।"—বলেন খুড়ো।

সংবাদপত্রে দেখিলাম আবার সেই প্রশ্ন—"নেহরুর পর কে?" —"কিন্তু জবাব তো কতবার দিয়েছি;

বিশ্বাস করেন না কেন? আবার বলি, নেহরুর পর, রাম, শ্যাম, আপনি, আমি। পাট হাতী ছেড়ে দিয়ে বরং এলেমটা যাচাই করে দেখুন।"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

বিলেতে বেরি নাইটকে দ্বিতীয় টেস্টে দলভুক্ত করার কথা ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। কিন্তু নাইট একটি কাউন্টির খেলাতে ৮৫ মিনিটে সেঞ্চুরি করিয়াছেন। —"তা যতই করুন, সামন্ত যুগের নাইটদের আর আমরা দলে নিচ্ছিনে।"—বলেন জনৈক ক্রীড়ারসিক সহযাত্রী।

অভিধান

রবীন্দ্র অভিধান (১ম খণ্ড)—সোমেন্দ্রনাথ বসু। বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা—৬। ছয় টাকা।

বিশদ অভিনন্দনযোগ্য এই গ্রন্থটির 'সমালোচনা' নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কিছু-কিছু বই থাকে, যার আবেদন সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছেই অনস্বীকার্য; এবং বিশেষত বিশুদ্ধ কর্মপ্রেরণা কিংবা উপকার সাধনের ইচ্ছা যদি সে-সব গ্রন্থের প্রারম্ভিক পটভূমি রচনা করে, তাহলে সমালোচনার পরিবর্তে স্বাগত-সম্ভাষণই তাদের কাম্য। 'রবীন্দ্র অভিধান', ব্যক্তিগত-ভাবে আমার মনে হয়, শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত বিবিধ ও বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রচেষ্টা। এ দেশে অন্তত এই ধরনের বই আগে লক্ষ্য করা যায়নি (প্রকাশিত হয়নি বলেই); এবং যে ব্যক্তি এই বৃহৎ ও পরিশ্রমসাপেক্ষ কর্ম-সম্পাদনে উৎসাহী হয়েছেন, আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য। প্রথম খণ্ডটি পড়েই এ কথা মনে হয়েছে; উদ্যম স্থায়ী হলে খুশী হব।

আত্মম্ভরিতাশূন্য, নিরহংকারী গ্রন্থকার শ্রীযুত সোমেন্দ্রনাথ বসু অপ্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রমাণে বিরত থেকে—যা পোশাকী অধ্যাপকদের সামান্য লক্ষণ—গ্রন্থের 'কথামুখে' সোজাসুজি কয়েকটি কথা নিবেদন করেছেন: 'এই কথাই মনে হয়েছে, এমন কিছু করা আমার দরকার, যাতে পাঠকেরা রবীন্দ্রনাথ পড়তে সাহায্য পান। ......অভিধানের কাজ অর্থ পরিস্ফুট করা—সমালোচনা নয়। তাঁর বিভিন্ন রচনার অর্থ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। আশা করেছি, প্রবেশপথে এই সাহায্যটুকু পেলে পাঠকদের নিজের মনের মত অর্থ ও রসগ্রহণে সুবিধা হবে। সমালোচকদের মতামত যেখানেই প্রয়োজন, সেখানেই উদ্ধৃত করেছি—পূর্বসূরীদের আলোচনা উদ্ধৃতিচিহ্ন বর্জন করে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করিনি।' গ্রন্থটির বস্তুমূল্য সম্পর্কে প্রাগুক্তিতিই যথেষ্ট মনে করি। সংক্ষেপে, একটি অনিবার্য, সংরক্ষণযোগ্য গ্রন্থ, রবীন্দ্রানুরাগীদের হাতে-হাতে ঘুরে বেড়ানোর পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত।

শ্রীযুত বসু যথাসাধ্য তাঁর উদ্দেশ্য-সাধনের চেষ্টা করেছেন; এবং, পরবর্তী কথা, পাঠকদের সংগে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেননি; তাঁর শ্রমসিদ্ধির ছাপ এ গ্রন্থের সর্বত্র সুপরিব্যাপ্ত। শতবার্ষিকী উপলক্ষে আর-কিছু না-হোক, কিছু অক্ষর-অধ্যাপক, অর্থাৎ যাঁরা সর্বসাহিত্যিক-বিশারদ, কিছু গ্রন্থকার ও ব্যবসায়ী নিজেদের সঞ্চয় বৃদ্ধি করেছেন; ভেবে দুঃখবোধ করছিলুম, নিরীহ পাঠক তাঁদের নিয়মিত শিকার হবেন। শ্রীযুত বসুর বইটি পড়ে আশা হলো; মনে হচ্ছে, পাঠকের সঞ্চয়ও কিছু বৃদ্ধি পাবে। উপরন্তু, বইটির লাইনো-মুদ্রণ এবং অংগসজ্জাও যথন লোভনীয়। ২০৪।৬১

সমালোচনা সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতি-কবিতা। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। জিজ্ঞাসা। ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। মূল্য আট টাকা।

অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ইতিপূর্বে একটি বৃহৎকায় গীতি-কবিতা সংকলন প্রকাশ করেছিলেন। মূলত সেই সংকলনটি অবলম্বন করেই বর্তমান গ্রন্থটি রচিত। দু'খানা বই মিলিয়ে পড়তে পারলে আধুনিক বাংলা গীতি-কবিতার

রবীন্দ্র-পূর্ব যুগ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। সত্যি কথা বলতে কি, রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলার গীতি-কবিদের সম্পর্কে একালের পাঠকদের ধারণা স্পষ্টও নয়, অনুকূলও নয়। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথ সেন বা অক্ষয়কুমার বড়ালের মত কবিরা সুপরিচিত। কিন্তু এ'রা ছাড়া বাংলায় যে আরও কত কবি ছিলেন, তাঁদের কথা আজকের দিনে খুব কম পাঠকই জানেন। এ'দের মধ্যে অধিকাংশই আসলে রবীন্দ্র-সমসাময়িক। দু-চার বছরের ছোট-বড়ো হলেও রবীন্দ্রনাথের সমকালেই তাঁরা কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করে অনেক আগেই বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-স্থাপিত আদর্শের অনুসরণ তাঁদের করতে হয়নি বলেই রবীন্দ্র-পূর্ব নামে তাঁরা অভিহিত হয়েছেন। রবীন্দ্র-পূর্ব কবিরা সম্পূর্ণ অন্য আদর্শের পথিক ছিলেন, যে-পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। অরুণবাবু বলছেন, রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যধারা থেকেই প্রেরণা পেয়েছিলেন। এই গ্রন্থের সংলিখিত শেষ অধ্যায়টি—'ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ'—থেকে পাঠক এ বিষয়ে একটা নির্ভরযোগ্য ধারণা করে নিতে পারবেন। কিন্তু এই প্রসংগে একটা বিষয় আলোচিতব্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে 'মানসীর' আগের রচনাকে কাব্যমূল্য দিতে চাননি। বিহারীলালের প্রভাবকেও কাটিয়ে উঠেছেন বলে ঘোষণা করেছেন হেমচন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য কবিদের তো কথাই নেই। হেমচন্দ্র প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝতে পারেন না। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উপর পূর্বসূরীদের প্রভাবের সত্যকার তাৎপর্য কি? এর মধ্যে কতখানি অনুকরণ ও স্বীকরণ আছে?

বস্তুত অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতি-কবিতার যে বিষয়গুলি ভাগ করে দেখিয়েছেন, তার অনেকগুলি একালের কবিতারও বিষয়। তবু সেকালের কবিতা সম্পর্কে একালের ঔৎসুক্য-হীনতার কারণ কি? কারণ কি এই নয় যে, এগুলি মূলেই দুর্বল? অর্থাৎ সেকালের কবিরা মহাকাব্যের ভাষাকে যদিবা আয়ত্ত করেছিলেন ধরে নেওয়া যায়, গীতি-কাব্যের ভাষাকে তাঁরা পাননি। কথা-কাব্যের ভাষা দিয়ে তাঁরা গীতি-কাব্য রচনা করতে গিয়েছিলেন। প্রকাশ-রীতি এবং প্রকাশ-ভাষার ক্ষেত্রেই তাঁদের ছিল অসাফল্য। অরুণবাবুর বইতে এ-দিকটা তেমন আলোচিত হলে সুখী হতাম। কিন্তু বিষয়ানুগত আলোচনায় গ্রন্থকারের নৈপুণ্য গবেষণাজাতীয় সমালোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে। বিষয়ানুসারে অধ্যায় ভাগের জন্য একই কবি বিভিন্ন স্থলে আলোচিত হয়েছেন। পাঠকেরা বহু অল্পখ্যাত কবির বিচিত্র কবিতার স্বাদ পেয়ে বিস্মিত হবেন। সকলের কবিতা সমান উৎকৃষ্ট নয়। লেখক অনুসন্ধান করে অল্প মূল্যের কবিতাকেও গণ্য করেছেন। এতে তাঁর আলোচনা যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়েছে। 'প্রাগাধুনিক বাংলা গীতি-কাব্য' এবং 'রেনেশাঁস ও গীতি-কবিতার বিলম্বিত আবির্ভাব' অধ্যায় দুটি প্রথমে যুক্ত হয়ে মূল আলোচনার পূর্বসূত্র রচনা করেছে।

বইটি ছাত্রদের তো কাজে লাগবেই, এই শ্রেণীর অন্য বইয়ের অভাবে অন্যান্য পাঠকদেরও রসপিপাসা চরিতার্থ করবে।

১১।৬১

উপন্যাস

দেবলোকে। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

গুটিকয়েক ভিন্ন চরিত্রের স্ত্রী-পুরুষ ঘটনাক্রমে একই প্লেনের যাত্রী। 'পাকা-চুল, কাঁচপোকা, দাড়ি, রোগা খর্বকায়' অধ্যাপক কস্টেলো, তাঁর স্ত্রী উদ্ধতযৌবনা মাদাম পামেলা কস্টেলো, প্রৌঢ় এক ডাক্তার, উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশযাত্রিনী এবং প্রফেসর কস্টেলোর অনুরাগিনী ছাত্রী রীটা, পাদ্রী নিকলসন, কলাবতী পলি। এদের সবার জীবনেই অতীত এমন কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে যার প্রতিবিম্ব, স্বাভাবিক অবস্থায়, কেউ আয়নায় দেখতে রাজী নয়। কারও অতীতে আছে লজ্জা, কারও অস্বস্তি।

দৈব দুর্বিপাকে এই অতীতের মুখোমুখি আবার সবাইকে দাঁড়াতে হলো। প্রকৃতির প্রতিকূলতায় যাত্রীবাহী প্লেন নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি। মৃত্যু শিয়রে হাত রেখেছে সকল যাত্রী। পাদ্রী নিকলসন উঠে এলেন সবার পাপের স্বীকারোক্তি নিতে। সব দ্বিধা, সব সঙ্কোচের বাইরে যাবার আগে সবাই একে একে এসে দাঁড়াল অতীতের সেই অস্বস্তিকর আয়নার সামনে। পাদ্রী নিজেও ব্যতিক্রম নন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্যক্রমে, উড়োজাহাজটি বেঁচে গেল। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে জীবনের অন্তরঙ্গভূমিতে পা দিয়ে নতুন এক অস্বস্তির মুখোমুখি দাঁড়াল মানুষগুলি।

নিরাভরণ অন্তরঙ্গ মেজাজে বলা কাহিনীর গতি সর্বত্র স্বচ্ছন্দ। কাহিনীর শেষ অঙ্কে নাটকীয় পরিবেশ চমকপ্রদ। মূলত এ কাহিনীর প্রথমাংশ এই নাটকীয় মুহূর্তেরই প্রস্তুতিপর্ব। এই প্রস্তুতি-পর্বে পলি এবং পাদ্রী নিকলসনের কাহিনী কখনও কখনও দীর্ঘ মনে হতে পারে; তবে কাহিনীর শেষ এবং নাটকীয় অংশে যে চমক পাঠকের জন্য অপেক্ষা করছে সেখানে পৌঁছে খুব কম পাঠকেরই সে কথা মনে থাকবে।

ঘটনাকেন্দ্রিক এ উপন্যাসের চরিত্রগুলি স্বল্প পরিসরে মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে শেষ পর্যন্ত পামেলা পাঠকের মনে সহানুভূতির দীপ জ্বালিয়ে রাখে।

৮৪।৬১

মিত্রা—সুলেখা দাশগুপ্ত। প্রকাশক—টি এস বি প্রকাশন, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—চার টাকা।

বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে সুলেখা দাশগুপ্তর পদক্ষেপ যে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ, এই উপন্যাসটিই তার নিঃসংশয় প্রমাণ। উপন্যাসের কাহিনীতে মানবজীবনের বুদ্ধিদীপ্ত ভূয়োদর্শনের জটিলতা নেই, ঘটনার ঘনঘটাও এতে অনুপস্থিত। জীবনের মিছিলে এক নারীর বেদনাহত পথ-পরিক্রমা ও বিশুদ্ধ প্রেমের প্রাপ্তিকে তার সার্থক উত্তরণের এক রসস্নিগ্ধ কাহিনী এই উপন্যাসে উদ্ঘাটিত। মিত্রা এই কাহিনীর নায়িকা। তার জীবন-উপাখ্যানের স্তরে স্তরে কাহিনীকার যে সারি সারি অশ্রুবিন্দু সাজিয়ে তুলেছেন এবং এক আকাঙ্ক্ষিত আনন্দে যেভাবে তাদের রসপরিণতি ঘটিয়েছেন পাঠকদের তা আপ্লুত করে রাখবে।

লেখিকার ঝরঝরে ভাষা ও সুন্দর রচনা-শৈলীর জন্যও উপন্যাসটি সুখপাঠ্য।

৪৩।৬১

সাময়িক পত্র

সংসদ। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৬৮। প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীকালীপদ সেন। দমদম সংস্কৃতি পরিষদ, ১৩, রাষ্ট্রগুরু অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৮।

এই সংখ্যাটির অধিকাংশ রচনাই সুলিখিত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ডক্টর বিনোদবিহারী দত্ত লিখিত 'রবীন্দ্রনাথ ও বর্তমান শিক্ষা'। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের ব্যাখ্যান করিতে গিয়া অনেকে নানারূপ সুগভীর তাত্ত্বিক আলোচনায় নিবিষ্ট হন। লেখক মহাশয় তাহা করেন নাই; রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত বিশেষ কতকগুলি প্রস্তাব উল্লেখ করিয়া, জাতীয় সরকারের আমলে তাঁহার 'উত্তরাধিকারী'র হাতে, সে সকল প্রস্তাবের কি পরিণতি হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে লিখিয়াছেন—আলোচনা সহজ

সরল আন্তরিকতাপূর্ণ, তাই পাঠকের মনেও সাড়া জাগায়, রবীন্দ্র শিক্ষাদর্শের কয়েকটি প্রধান কথা সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণা সুপরিস্ফুট হয়।

ভ্রম সংশোধন

গত ৬-৫-৬১ তারিখের "দেশ"-এর ৬২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গ্রন্থগৃহের বিজ্ঞাপনের ঠিকানা ৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ পড়িতে হইবে।

প্রাপ্তিস্বীকার

অভিনয় শিল্প ও নাট্য প্রযোজনা—শ্রীঅশোক সেন।
অতল জলের আহ্বান—প্রতিভা বসু।
পথের টানে—বিভা সরকার।
লহ প্রণাম—বিভা সরকার।
সাহিত্য-চর্চা—বুদ্ধদেব বসু।
রাতের গাড়ি—আগাথা ক্রিস্টি। অনুবাদক—অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
এই যা দেখা—লীলা মজুমদার।
বৈষ্ণব পদাবলী—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।
দুরান্তের ডাক—সূর্য মিত্র।
ল্যাম্পোস্টের বেলুন—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মিঠাইপুরের রাজা—বিশ্বনাথ দে।
কানু কহে রাই—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।
ইলিশমারির চর—আবদুল জব্বার।
নব্য তুর্কী সভ্য গ্রীস—কুমারেশ ঘোষ।
উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ—হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়।
ময়ূরী—নরেন্দ্রনাথ মিত্র।
কল্কি অথবা সভ্যতার ভবিষ্যৎ—এস রাধাকৃষ্ণন। অনুবাদ—মীনাক্ষী দত্ত।
কবিতাঞ্জলি—কমলাকান্ত বসু।
শতাব্দীর সূর্য—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
অচিন্ত্যকুমারের কিশোর সঞ্চয়ন—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।
বুদ্ধদেব বসুর কিশোর সঞ্চয়ন—বুদ্ধদেব বসু।
বারো মাসের বারো রাজা—মিলাডা গঙ্গোপাধ্যায়।
ভক্তমালের ভক্তচরিত (২য় খণ্ড)—স্বামী সত্যানন্দ।
শবশিবা রহস্য—শ্রীশ্রীস্বামী নির্মলানন্দ।
Castro's Cuba—an Assessment—K. K. Sinha.
Multipurpose School and other Educational Essays—Anath Nath Basu.
Rabindranath Tagore—His Life and Work—Dr. Edward J. Thompson.
Rabindranath Tagore and Universal Humanism—Saumyendranath Tagore.
স্মৃতির সমাধি—প্রবোধ সরকার।
পিনকুর ডাইরি—শ্রীসরলাবালা সরকার।
নমশূদ্র সম্প্রদায় ও বাংলা দেশ—নরেশচন্দ্র দাস।
শূন্যে পাড়ি—দেবব্রত রেজ।
সেনী গীতিমালা (৫ম ভাগ)—ওস্তাদ শওকত আলি খান।
শ্রীরামকৃষ্ণ গীতামৃত—ডাঃ প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী।
মুক্তিসাধনায় রবীন্দ্রনাথ—শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ-রায়।
এ কি অপরূপ—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।
শতবর্ষের শত গল্প ২য় খণ্ড (১৮৯৮-১৯২৩)—সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত।
পলাতকা—প্রশান্ত চৌধুরী।

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

নবদিগন্তের সন্ধান

ভারতীয় চলচ্চিত্রের মান উন্নত করতে হলে সবার আগে দরকার, যাঁরা ছবি দেখেন তাঁদের রুচি ও রসগ্রহণ ক্ষমতার উন্নতি সাধন। প্রকৃত রসবেত্তার সংখ্যা বৃদ্ধি না পেলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তোলা ছবির মূল আবেদন স্থূলেই থেকে যাবে। কারণ এই ধরনের ছবি অল্প কয়েকজনের সন্তুষ্টির জন্যে তোলা হয় না, তার প্রধান লক্ষ্য থাকে বহুর মনস্তুষ্টি-সাধন করা।

জনসাধারণের রুচি পরিবর্তনে সহায়তা করে শিক্ষাবিস্তার ও দেশী-বিদেশী ভালো-ভালো ছবির নিয়মিত প্রদর্শন ব্যবস্থা। একটি ভালো ছবি এই ব্যাপারে যতখানি সাহায্য করতে পারে, তার অর্ধেক সাফল্যও অন্য-কিছুর মাধ্যমে অর্জন করা শক্ত। তাই বার বার দেখা গেছে, শিল্পজগতে কোন বড় প্রতিভার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের রুচি ও প্রবৃত্তিরও মোড় ঘুরে গেছে। বাংলা ছবির জগতে তার সফলতম নিদর্শন সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা। "পথের পাঁচালী" যে পথের নিশানা দিয়েছে, বাংলা ছবির জয়যাত্রা আজ সেই পথ বেয়েই অগ্রসর হচ্ছে।

কিন্তু শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে পথ একটাই নয়। বহু প্রতিভার বিভিন্ন সৃষ্টির বৈচিত্র্যে তা নানা দিকে প্রসারিত। ভারতীয় ছবির দিগন্ত বিস্তারে যাঁরা ব্রতী, তাঁদের কর্তব্য এই সব নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার ও তাঁদের শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। দেশের ও বিদেশের বাছাই-করা সেরা ছবিগুলির সঙ্গে চিত্র-রসিকদের পরিচয় সাধন করিয়ে দেওয়া তাই একটি অবশ্যকরণীয় কর্তব্য।

এই কর্তব্য সাধনে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

পোলিশ ছবি "কানাল"-এর নায়িকা।

এ দেশে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি এ বিষয়ে পথিকৃতের মর্যাদা দাবি করতে পারেন। তাঁদের উদ্যোগে এই অঞ্চলের প্রগতিপন্থী চিত্ররসিকরা নানা দেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এবং এই সব চলচ্চিত্র যে এ দেশের দর্শক-রুচির উন্নতি সাধনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে, তা বিনা দ্বিধায় বলা চলে।

অনুরূপ আদর্শ নিয়ে সম্প্রতি আর-একটি নতুন সংস্থা কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করেছেন। এই নতুন সংস্থার নাম সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা। গত ২৪শে জুন জ্যোতি সিনেমায় আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ সুবোধ মিত্র এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। পোল্যাণ্ডের কনসাল আর কইনস্কি প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, শুধু পোল্যাণ্ডেই একশো কুড়িটি এই ধরনের সংস্থা নিয়মিতভাবে কাজ করে চলেছে। অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য উদ্যোক্তাদের পক্ষে সকলকে স্বাগত জানিয়ে সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটার মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।

পোল্যাণ্ডের বিখ্যাত ছবি "কানাল" অনুষ্ঠান শেষে প্রদর্শিত হয়। এই ছবিটি নাৎসী-বিরোধী পোলিশ প্রতিরোধ-

বাহিনীর অপরিসীম বীরত্বের এক আশ্চর্য অধ্যায় পৃথিবীর সামনে উদ্ঘাটিত করেছে! সংগে সংগে এর পরিচালক আন্দ্রেজ ওয়াজদাকে দিয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিচালকদের সংগে এক সারিতে স্থান।

সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা প্রতি মাসেই এমনিধারা এক-একটি বিশ্ববিখ্যাত ছবির প্রদর্শন ব্যবস্থা করবেন বলে জানিয়েছেন। পোল্যাণ্ডের ও পূর্ব জার্মানীর শ্রেষ্ঠ কয়েকটি চিত্রের দুটি আলাদা উৎসবের আয়োজন করবার সংকল্পও এ'দের আছে। আমরা এই নব প্রতিষ্ঠানের সর্বাংগীণ সাফল্য কামনা করছি।

সাফল্যের জয়মাল্য

অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে কলকাতার দুটি পেশাদারী মঞ্চে দুটি নাটকের সাফল্যকে কেন্দ্র করে দুটি অনুষ্ঠান হয়ে গেল। স্টার থিয়েটারে "শ্রেয়সী"র দ্বিশততম অভিনয় উপলক্ষে গত ২০শে জুন এবং বিশ্বরূপায় "সেতু" নাটকের ৪০০ অভিনয় পূর্তি উপলক্ষে গত ২৫শে জুন দুটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুটি অনুষ্ঠানই বহু জ্ঞানী-গুণী ও নাট্য-রসিক দর্শকের উপস্থিতিতে সাফল্য-মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

দুই রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষই এই উপলক্ষে নিজের নিজের সম্প্রদায়ভুক্ত শিল্পী, কলা-কুশলী ও সকল শ্রেণীর কর্মীদের বহুমূল্য অলংকার ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উপহার দিয়ে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন। উৎসবের এই অংশটুকুই সব দিক দিয়ে সমর্থনযোগ্য।

কিন্তু এই উপলক্ষে যে-সব জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সভাপতি, প্রধান অতিথি ও অনুরূপ সম্মানিত পদে তাঁরা বরণ করেন, নিজের নিজের ক্ষেত্রে তাঁরা বরণীয় হলেও থিয়েটারের বিষয়ে তাঁদের প্রগাঢ় অজ্ঞতা নাট্যামোদীদের মনে কৌতুক সৃষ্টিই করে। যেমন, হাল আমলে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অন্তত দুটি নাটক পাঁচ শত রজনীর বেশী ও একটি নাটক ৪৮৪ রাত্রি অভিনয়ের গৌরব অর্জন করা সত্ত্বেও "সেতু"র ৪০০ রাত্রির অভিনয়কে "অভূতপূর্ব" ও "শ্রেয়সী"র ২০০ রাত্রির অভিনয়কে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে বর্ণনা করেন জনৈক সুপণ্ডিত বক্তা। একটি সভায় বলা হয় যে, দর্শকের রুচির সংগে নাটকের রসের সমন্বয়ে উন্নত মানের নাটক রচনার পথ প্রশস্ততর হচ্ছে। অন্য এক বক্তা দ্বিতীয় সভায় শোনান ইংলণ্ডে চার বৎসর একাদিক্রমে অভিনীত হবার গৌরবের অধিকারী হয়েও বিলিতী মিউজিক্যাল কমেডি "চু চিন চৌ" দেখে তিনি ইংরেজদের রুচি সম্বন্ধে কীরকম হতাশ হয়েছিলেন। সেই বক্তাই বিশ্বরূপাকে অভিনন্দন জানান রবীন্দ্রনাথের "রক্ত-করবী"র অপূর্ব অভিনয়ের জন্যে!

সংবাদপত্রসেবী হিসাবে এই ধরনের একাধিক সভায় আমাদের উপস্থিত থাকতে হয় এবং প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই এই ধরনের অশ্রদ্ধেয় ও অজ্ঞতাপ্রসূত উক্তি শুনতে হয়। তা ছাড়া নতুন কথা প্রায় কেউই বলেন না, অধিকাংশই চর্বিতচর্বণ বিষয়েরই পুনরুক্তি মাত্র এবং অতি-ভাষণে ভারাক্রান্ত।

মিনার্ভায় "ফেরারী ফৌজ"

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বাংলার রক্তক্ষরা মুক্তি-সংগ্রামের যে অধ্যায়টি "অগ্নিযুগ" বলে চিহ্নিত, মিনার্ভা থিয়েটারে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের নতুন
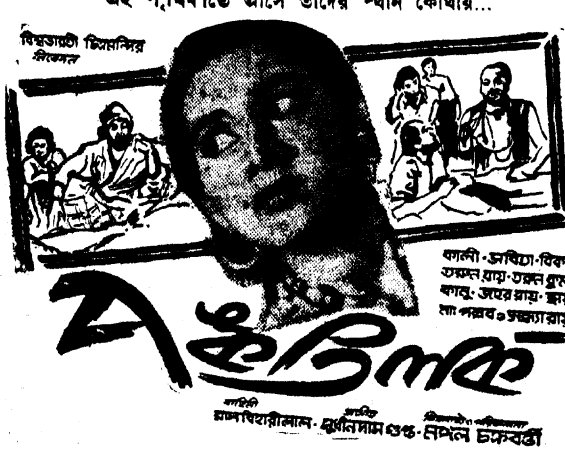
চলচ্চিত্রালয়ের "আজ কাল পরশু"-র একটি দৃশ্যে নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ও তুলসী চক্রবর্তী।

নাট্যোপহার "ফেরারী ফৌজ" তারই পটভূমিতে রচিত।

পূর্ব বাংলার এক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলের দুশ্চর সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কাহিনী এই নাটকের বিষয়বস্তু। বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম বিপ্লব তখন পূর্ব বাংলার শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাসবাদের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে। নানা জায়গায় গড়ে উঠেছে সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতি।

এই নাটকের বিপ্লবীরা এমনি এক গুপ্ত সমিতির সভ্য। বারবনিতা রাধার ঘরে তাদের গোপন আস্তানা। অদৃশ্য নেতার গোপন নির্দেশে তারা কাজ করে চলে। বিপ্লবী শান্তি রায় তাদের নেতা। শুধুই নেতা নয়, দেবতা। সকল কাজে তারা অনুভব করে শান্তি রায়ের অশরীরী উপস্থিতি। কিন্তু তাকে কেউ চোখে দেখেনি। দেখেছে শুধু রাধা। পরে সবাই দেখতে পেল, জানতে পারল তাদের নেতাকে। পুলিসের বিদেশী বড়কর্তার প্রাণনাশের একটি সন্ত্রাসবাদী পরিকল্পনার নেতা শান্তি রায় কেমনভাবে তার দলের প্রধান বিপ্লবীদের সংগে পুলিসের গুলীতে প্রাণ হারায়, তা নিয়েই নাটকের যবনিকা।

বিশ্বাসঘাতকতার মিথ্যা কলংক জনৈক তরুণ বিপ্লবীর জীবনে কেমন করে নির্মম অভিশাপের মত নেমে আসে, তা নিয়ে একটি ছোট উপাখ্যান গড়ে উঠেছে নাটকটিতে। এ বাদে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে দুই পুলিশ কর্মচারীর নিহত হওয়া এবং ভুলক্রমে এক শ্বেতাঙ্গ ধর্মযাজকের প্রাণনাশের উপকাহিনীও নাটকে সংযোজিত। বারবনিতা রাধাকে ঘিরেও একটি ছোট চরিত্র-কাহিনী নাটকটিতে রূপ নিয়েছে।

উৎপল দত্ত রচিত ও পরিচালিত এই নাটকে সন্ত্রাসবাদীর মনে নিজের মত ও পথ নিয়ে বিশ্বাস ও সংশয়ের দ্বন্দ্ব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। ফলে নাটকটিতে একটি বক্তব্য রূপ নিয়েছে। নাট্যদ্বন্দ্বের সুরও ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। চিন্তাশীল দর্শকরা নাটকের এই ভাবরূপটি উপেক্ষা করতে পারবেন না বরঞ্চ উপভোগ করবেন।

এই বিশেষ গুণের দিকটি বাদ দিলে

ফিল্ম এণ্টারপ্রাইজার্সের "দুই ভাই"-এর একটি দৃশ্যে উত্তমকুমার ও সুলতা চৌধুরী।

নাটকটিতে আর যা রয়েছে, তা হল অসঙ্গতি ও বৈসাদৃশ্যের স্তূপভার, বাহুল্যের জঞ্জাল। নাটকের প্রায় সব ক'টি প্রধান চরিত্রই বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবে নিষ্প্রাণ ও নিষ্প্রভ। বিপ্লবী নেতার চরিত্রটি এই দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমন একজন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী পুলিসের হাতের ক্রীড়নক ও গুপ্তচর হয়ে দিনের পর দিন কীভাবে আত্মগোপন করে থাকতে পারেন, সেটা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। আমাদের দেশের অগ্নিযুগের ইতিহাসে এইরূপ দীর্ঘকাল-ব্যাপী অবিশ্বাস্য ছদ্ম-পরিচয়ের নজির নেই। দ্বিতীয়ত, পুলিসের বিশ্বাস বিপ্লবী নেতা অর্জন করলেন কীরূপে? পুলিসকে বিপ্লবী দলের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ দেওয়া তো তার পক্ষে সম্ভব নয়! তৃতীয়ত, দর্শকের এমন মনে হওয়া খুবই অস্বাভাবিক যে, কাহিনী-স্থলে বিপ্লবী নেতা সবে নতুন এসেছেন। বরঞ্চ তার বিপরীত স্পষ্ট আভাসই রয়েছে নাটকে। এবং তা না হলে পুলিসের পক্ষেও তাকে বিশ্বাস করা সহজ হত না। অথচ সন্ত্রাসবাদী দলের সভ্যারা তাদের নেতার পরিচয় দীর্ঘকাল একই জায়গায় থেকেও কেন পেল না এবং বিশেষ কারণ না থাকা সত্ত্বেও বা কেন একদিন হঠাৎ করে তার পরিচয় পেল, তার সব কিছুই দুর্বোধ্য।

তবে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, একটি বিশেষ 'স্টাণ্ট'-এর প্রয়োজনেই এই অবাস্তব অস্বাভাবিক ঘটনাটি নাটকে সংযোজিত। যে 'স্টাণ্ট' গোয়েন্দা-চরিত্র-সুলভ হয়ে 'ক্রাইম' নাটকে শোভা পায়, জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের নাটকে তা পীড়াকর ও নিন্দনীয়। বারবনিতা কর্তৃক পুলিস কর্মচারীকে বিষ খাইয়ে মারার দৃশ্যেও এই ধরনের 'সাসপেন্স' সৃষ্টির প্রয়াস রয়েছে। তা না হলে বারবনিতা নিরর্থক পুলিস কর্মচারীকে বিপ্লবীদের নাম ও পরিকল্পনার কথা ফাঁস করত না—বিশেষত যখন সে তাকে হত্যা করবে বলেই মনস্থ করেছে। বাংলার অগ্নিযুগের পট-ভূমিতে বিপ্লবী জীবন ও বিপ্লবী কর্মধারা নিয়ে রচিত নাটকে এই ধরনের সস্তা রহস্য-উপাদান বিষয়বস্তুর সম্ভ্রমকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এ বাদেও নাটকটিতে রোমাঞ্চ-রস ও উত্তেজনা সৃষ্টির দিকে অতিমাত্রায় ঝোঁক প্রকাশ পেয়েছে। যে কারণে নাটকটিতে রূপ নিয়েছে নির্মম পুলিসী অত্যাচারের একটি দীর্ঘ সূচীপত্র—যা দর্শকের চেতনাকে অনর্থক ক্লিষ্ট করে। যে কারণে ফাঁসির মঞ্চে যাদের জীবনের জয়গান গেয়ে যাওয়ার কথা, তাদের "ক্রিমিন্যাল"-এর মত খণ্ডযুদ্ধে পুলিসের গুলীতে প্রাণ হারাতে হয়—"অ্যাকশন্ থ্রিলার" জাতীয় ছবিতে যা প্রায়ই দেখা যায়। পুলিসের অমানুষিক অত্যাচারকে ফলাও করে দেখাতে গিয়ে নাট্যকার-পরিচালক যে শুধু পরিমিতি-বোধের অভাবের পরিচয়ই দিয়েছেন তা নয়, নাটকটিকে নারকীয় আস্বাদে অনেকখানি ভরে তুলেছেন।

নাটকটি যে দর্শকের মনে সামগ্রিকভাবে রেখাপাত করে না তার কারণ সামান্য নয়, বহুবিধ। নাটকে দর্শকের মনে আগে থেকেই একজন দেবতুল্য অসামান্য বিপ্লবী পুরুষের ধারণা জন্মানো হয়েছে। এই বিপ্লবীকে দর্শকরা যখন দেখতে পান তখন তিনি যে দর্শকের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করেন না এর প্রধান কারণ তাঁর পূর্বেকার অবিশ্বাস্য অবাস্তব ছদ্মপরিচয়ই শুধু নয়, তাঁর পরবর্তী অতি সাধারণ চরিত্রও বটে। বিপ্লবী যতক্ষণ তাঁর দলের সভ্য ও দর্শকের কাছে অপরিচিত ছিলেন ততক্ষণ তিনি শুধু ছদ্ম-পরিচয়ধারীই ছিলেন না, একটি "টাইপ" চরিত্র হিসাবে বিরাজ করছিলেন। এই ভাঁড়-সদৃশ "টাইপ"-চরিত্রটিকে পরে মহাবিপ্লবী-রূপে ভেবে নিতে দর্শকের বেগ পেতে হয়। এবং যে বিপ্লবী নেতাকে দর্শকরা প্রখর-বুদ্ধিসম্পন্ন বলে ভেবে এসেছেন তিনি পুলিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখেও বুঝতে পারেননি সমিতির যে সভ্যকে বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে আসলে সে তা নয়। তদুপরি বিপ্লবী নেতার আচরণ—সমিতির মুমূর্ষু সভ্যের প্রতি যিনি উদাসীন—এবং কথাবার্তা চরিত্রটির প্রতি দর্শকের অশ্রদ্ধা আরও বাড়িয়ে দেয়। ইংরেজী "Conceive" শব্দটি নিয়ে তাঁর মুখের একটি সংলাপ অশালীন। সংলাপ-রচনায় এই ধরনের কুরুচির পরিচয় নাট্যা-মোদীদের পক্ষে সহজে ক্ষমা করা সম্ভব নয়।

বিপ্লবী নেতা বাদেও নাটকের আরও যে কয়টি চরিত্র অবাস্তব তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য অশোক নামে জনৈক বিপ্লবী ও তাঁর পিতা। অশোকের মত বিপ্লবী, মৃত্যুভয়কে যে জয় করেছে, পুলিসের দেওয়া বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ককে মুহূর্তের জন্যও কী করে মেনে নেয় এবং হাত-পা বাঁধা না থাকা সত্ত্বেও নিজের বাড়িতে ও বিপ্লবীদের আস্তানায় পুলিস পাহারায় এসে উপস্থিত হয় সেটা দর্শকের কাছে স্বাভাবিক মনে হয় না। অশোকের পিতার অত্যধিক বিপ্লব-ভক্তিও কৃত্রিম, এবং চরিত্রটিও অসঙ্গতিপূর্ণ। বিশ্বাসঘাতক বলে অশোকের প্রতি তাঁর বাবা-মা প্রথম যে কঠোরতা দেখিয়েছেন তাও অবিশ্বাস্য। বাবা-মার মনে আদর্শপ্রীতি ও সন্তান-স্নেহের দ্বন্দ্বটি দেখা যাবে বলে আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু সে আশা অপূর্ণই থেকে যায়। অশোকের সঙ্গে পুলিসকে দেখে স্ত্রীর অটল বিশ্বাস টলে যাওয়ার ঘটনাটিও অস্বাভাবিক। মোট কথা, "মেলোড্রামা"র প্রয়োজনে নাট্যকার-পরিচালক অশোকের পারিবারিক উপাখ্যানে এবং নাটকের অন্যান্য মুহূর্তে পরিমিতি ও সংযমকে অনেকখানি বিসর্জন দিয়েছেন।

নাটকে এমনিরূপে বহু কষ্টকল্পনাই স্তরে স্তরে জমে উঠেছে। এবং বহু বিসদৃশ ব্যাপারের মধ্যে প্রথমেই দর্শকের নজরে পড়বে এত ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পেয়েও বিপ্লবী নেতাকে পুলিসের পক্ষে চিনতে না পারা! এগারো বছর যিনি "ডিটেনশন ক্যাম্প"-এ ছিলেন এবং এতকালে ডেটিনিউ হয়ে থাকার মত বড় বিপ্লবী যিনি তাঁর কোন প্রতিকৃতি পুলিসের কাছে নেই তা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। নাটকের কাহিনীকাল বিবেচনায় একটি ছোট শিশুর মুখে "ইনক্লাব জিন্দাবাদ", বিপ্লবীর মুখে "কমরেড" এবং কোন কোন বিপ্লবীর নাস্তিকতা বাস্তবতাসম্মত নয়।

নাটকটির গতি স্বচ্ছন্দ, এবং দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে এর গতিপথে দর্শকের কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করে তোলার প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন উৎপল দত্ত। নাটকের বহিরঙ্গ শিল্পবৈভবের মধ্যে একটি সেতুর দৃশ্য এবং রোমাঞ্চকর শেষ দৃশ্যটি দর্শকের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই দুটি দৃশ্যে তাপস সেনের বিশেষ কলাকৌশল ও আলোকসম্পাতের চমৎকারিত্ব উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে।

লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের পূর্বের নাটক-গুলির মত এই নাটক অভিনয়-সম্পদে তত-খানি সমৃদ্ধ নয়। তবুও যে ক'জন শিল্পী সর্বাগ্রে দর্শকের প্রশংসা পাবেন তাঁরা হলেন হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন ও সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এক খলপ্রকৃতি, অত্যাচারী পুলিস ইন্সপেক্টর-এর চরিত্রটিকে অপূর্ব অভিনয়-কুশলতায় বাস্তব করে তুলেছেন

লণ্ডনে "ভগিনী নিবেদিতা"-র চিত্রগ্রহণকালে তার পরিচালক বিজয় বসু (বামে) ও ছবিটির অন্যতম প্রযোজক অরুণ বসু-র সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন বি-বি-সি'র তরফে বিনয় রায়।

হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। শোভা সেন এক বিপ্লবী যুবকের তেজস্বিনী ও স্নেহময়ী জননীর চরিত্রে সংবেদনশীল ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনয়ের পরিচয় দিয়েছেন। সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কৌতুকপ্রিয় বিপ্লবী চরিত্রে সুন্দরভাবে প্রাণ সঞ্চার করে দর্শককে আনন্দ দিয়েছেন। বিপ্লবী অশোকের চরিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় মনে রেখাপাত করে। বারবনিতা রাধার রূপসজ্জায় নীলিমা দাসের অভিনয় স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর। বিপ্লবী নেতা শান্তি রায়ের পরিচয়ে উৎপল দত্ত দর্শকের মনে মোটেই দাগ কাটতে পারেননি। তবে নীলমণির বেশে তাঁর অভিনয় খুবই উপভোগ্য। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন তপতী ঘোষ, অরুণ রায়, সুনীল রায়, নির্মল গুহ রায়, কমল মুখোপাধ্যায়, সমর নাগ ও ভোলা দত্ত।

রবিশংকরের সুরসৃষ্টি নাটকের বিভিন্ন মুহূর্তের মর্মরসটি বাঙময় করে তোলে এবং দর্শকের মনকে অভিভূত করে।

নির্মল গুহ রায়ের দৃশ্যসজ্জা প্রশংসনীয়।

নাট্যাভিনয়

আগামী ৬ই জুলাই থেকে থিয়েটার সেণ্টারে মুখোশের প্রযোজনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত প্রহসন "অলীকবাবু"র নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে লেখা এই প্রহসনে মূর্খ অলীকের মিথ্যা ভাষণ ও নায়িকা হেমাঙ্গিনীর রোমান্স-প্রিয়তাকে কেন্দ্র করে যে অনাবিল কৌতুকের সৃষ্টি হয় বাংলা নাট্য সাহিত্যে আজও তার তুলনা বিরল। সাজপোশাক ও মঞ্চসজ্জার দিক দিয়ে যাতে উনবিংশ শতাব্দীর পরিবেশ যথাযথ রক্ষিত হয় সে বিষয়ে মুখোশ সম্প্রদায় বিশেষ যত্ন নিচ্ছেন। অলীকবাবুর ভূমিকায় তরুণ মিত্র ইতিপূর্বেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি সম্প্রতি মুখোশ দলে যোগ দিয়েছেন এবং নাম-ভূমিকায় অভিনয় করা ছাড়াও প্রহসনটি পরিচালনা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলি এইভাবে বিতরিত হয়েছে : গদাধর—পিকলু নিয়োগী, সত্যসিন্ধু—অমরেশ দাশগুপ্ত, প্রসন্ন—কৃষ্ণা রায়, হেমাঙ্গিনী—রুবি মিত্র, মাতাল—স্নিগ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত "আর হবে না দেরী" ও "রজনীগন্ধা"র পর থিয়েটার সেণ্টারের নিয়মিত অভিনয় আসরে "অলীকবাবু" মুখোশের তৃতীয় অবদান।

* * *

গত ২৩শে জুন মিনার্ভা থিয়েটারে সুখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা শিল্পশ্রী নৃত্য-গীত, আলোচনা ও নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব পালন করেন। কুমারী আলপনা মুখোপাধ্যায়ের উদ্বোধন সঙ্গীত ও পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রীর স্বস্তি-বাচনের পর নাট্যকার সন্তোষ সেন রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ঐ আলোচনারই পরিপূরক হিসাবে তাঁর ভাষণ দেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত সহযোগে নৃত্য পরিবেশন করেন কুমারী বুলবুল ঘটক ও কেয়া রায় এবং গৌরীপদ মজুমদার।

সন্তোষ সেন কর্তৃক নাট্যরূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথের "সম্পত্তি সমর্পণ" তারপর অভিনীত হয়। কৃপণ যজ্ঞনাথের ভূমিকায় সুধীর মুস্তাফি সহজেই সকলকার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অন্যান্য ভূমিকায় শংকর মল্লিক, বেবি মুখোপাধ্যায়, শাশ্বতী রায়, অমর দে, কার্তিক মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অসিত রায় গীত রবীন্দ্রসঙ্গীত দুটি খুবই উপভোগ্য হয়। সুষ্ঠু পরিচালনার কৃতিত্ব সুধীর রায়চৌধুরীর প্রাপ্য।

* * *

"বহুজন"—এই নামে একটি নতুন নাট্য-দল গত ২৫শে জুন নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট মঞ্চে "চিরকুমার সভা" অভিনয় করে যাত্রা শুরু করলেন। চন্দ্রবাবু ও রসিকের ভূমিকায় যথাক্রমে পরিতোষ দত্ত ও ব্রজেন চট্টোপাধ্যায় প্রশংসনীয় অভিনয়-কৃতিত্বের পরিচয় দেন। পূর্ণ চরিত্রে প্রণব মজুমদারের অভিনয় প্রথম দিকে আড়ষ্ট বোধ হলেও শেষের দিকে সে দোষ কাটিয়ে ওঠে। স্ত্রী চরিত্রগুলি রূপায়িত করেন

বসু, ভট্টাচার্য, মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা ঘোষ ও স্মৃতি মিত্র। নাটকটি পরিচালনা করেন অচিন্ত্যকুমার বিশ্বাস।

* * *

রবীন্দ্র জন্মের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সারা দেশ জুড়ে যে উৎসব আয়োজন হয়েছে এবং হচ্ছে তা সংখ্যাতীত বললে অত্যুক্তি হবে না। বহু প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমরা এই সব উৎসবের বিবরণ পাই, কিন্তু তার অধিকাংশই অপ্রকাশিত থাকে স্থানাভাবে।

এই সম্পর্কে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত সমাচার এইখানে দেওয়া হল ঃ

বেহালার অনামী সঙ্ঘ গত ২৩শে জুন সঙ্ঘ-প্রাঙ্গণে "শেষরক্ষা" মঞ্চস্থ করেন।

গত ২৯শে জুন মহাজাতি সদনে পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তরের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পরিষদ আয়োজিত উৎসবের উদ্বোধন হয়। এই উপলক্ষে অনাদিপ্রসাদ ও তাঁর সম্প্রদায় "বর্ষামঙ্গল" পরিবেশন করেন।

কথাচিত্রমের 'দিল্লি থেকে কোলকাতা'-র একটি দৃশ্যে তপতী ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ ও তরুণকুমার।

গত ১৭ই জুন নর্দার্ন পার্ক স্কাউট হলে আলোকচক্রের পরিচালনায় "পোস্টমাস্টার" অভিনীত হয়। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা, আবৃত্তি ও সঙ্গীত ইত্যাদিও পরিবেশন করা হয়।

গত ৯ই জুন রবীন্দ্রভারতী ভবনে পুবালী কর্তৃক "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়।

গত ৩রা জুন বেলেঘাটা রাসবিহারী ম্যানসনে পূর্ববঙ্গের উদ্যোগে "দালিয়া" নাটক ও "পেটে ও পিঠে" নামক হাস্যকৌতুক পরিবেশিত হয়।

রায়ের পরিচালনায় কবিগুরুর "তাসের দেশ" অভিনীত হয়। সঙ্গীত পরিচালনা করেন হৃষীকেশ সেন ও নৃত্যপরিকল্পনায় ছিলেন ব্রজ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুমধুর নেপথ্য সঙ্গীতে নৃত্য-নাট্যটিকে চিত্তাকর্ষক করে তোলেন চিত্ত মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণা বসু, হৃষীকেশ সেন, নন্দিতা মুখোপাধ্যায়, রমা দত্ত, প্রতিমা পাল, দীপ্তি সেন প্রভৃতি। অভিনয়ে দর্শকের প্রশংসা অর্জন করেন দেবিকা গঙ্গোপাধ্যায়, স্নিগ্ধা রায়চৌধুরী, রুনু সেনগুপ্ত প্রভৃতি।

বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ১৮ই জুন হেম কর লেন স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী হলে রবীন্দ্র জন্মশতাব্দী উৎসব পালিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সুসাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্য। শ্রীমিত্র তাঁর ভাষণে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে আশাবাদ নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। শ্রীভট্টাচার্য রবীন্দ্র-জীবনের স্মরণীয় কয়েকটি ঘটনা ও তাঁর অলৌকিক প্রতিভার কথা উল্লেখ করে অবশেষে রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

অনুষ্ঠানে যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন ভি বালসারা ও তাঁর সম্প্রদায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, ঊর্মি রায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

গত ১৪ই জুন থেকে ১৮ই জুন পর্যন্ত আশুতোষ কলেজ হলে বাণী বিদ্যাবীথির পাঁচদিনব্যাপী রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী ও সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্র শতাব্দী জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক প্রণব

একলব্য

বিল লরী

বার্মিংহামের 'এজবাসটন' মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর ক্রিকেটের পীঠভূমি 'লর্ডস্'-এর দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ৫ উইকেটে ইংলণ্ডকে হারিয়ে দিয়েছে। চতুর্থ দিনের মাঝামাঝি সময়ে পাঁচদিনব্যাপী টেস্ট খেলার উপর যবনিকা পড়েছে। একটি খেলার জয়ে অস্ট্রেলিয়া এখন উপরে থেকে 'অ্যাশেস' অধিকারে রাখার জন্য সংগ্রাম করবে। অপর দিকে 'অ্যাশেস' পুনরুদ্ধারের জন্য ইংলণ্ডকে লড়তে হবে কোণঠাসা হয়ে।

চিরাচরিত প্রথামত লর্ডসে দুই দলই প্রচুর রান তুলবে বলে ক্রিকেট পণ্ডিতরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে 'পীচ'ও ব্যাটসম্যানের সহায়ক হবে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তা হয়নি। ফাস্ট বোলারদের বল অনেক সময় বিশ্রীভাবে লাফিয়ে উঠে ব্যাটসম্যানের বিপদ ডেকে এনেছে।

কাঁধের ব্যথার জন্য অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো এ টেস্টে খেলতে না পারায় সহ-অধিনায়ক নীল হার্ভের উপর অধিনায়কত্বের ভার পড়ে। আর অস্ট্রেলিয়া দলের সবতরুণ খেলোয়াড় ফাস্ট বোলার গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি লর্ডসেই জীবনের সর্বপ্রথম টেস্ট খেলেন। ইংলণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং পরম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় পিটার মে প্রথম টেস্টে খেলতে না পারলেও এ টেস্টে কাউড্রের অধীনে খেলতে রাজী হন। দু বছর পরে ন্যাটা স্পিন বোলার টনি লককে ইংলণ্ড দলে পুনরায় স্থান দেওয়া হয়। লর্ডসে লকের সুনামই বোধ হয় এই অন্তর্ভুক্তির কারণ।

ইংলণ্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রে, যিনি গতবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টেই 'টসে' বিজয়ী হয়েছেন, আগের টেস্টেও টসে পরাজিত করেছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ককে, তিনি লর্ডসেও টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পান। এ টেস্ট নিয়ে ইংলণ্ড পর পর ১২টি টেস্টের টসে জেতে—কাউড্রে ৯টিতে, মে ৩টিতে। যাই হোক, রানী এলিজাবেথের সঙ্গে দুই দলের খেলোয়াড়দের পরিচয়ের পর মেঘাবৃত আকাশের নীচে খেলা আরম্ভ হয়।

প্রথম দিন ২০৬ রানে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর অস্ট্রেলিয়া দিনের শেষে ২ উইকেট হারিয়ে ৪৮ রান তোলে। প্রথম দিনের খেলার উল্লেখ করবার মত ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার ন্যাটা ফাস্ট বোলার ডেভিডসনের মারাত্মক বোলিং এবং ইংলণ্ডের ওপেনিং ব্যাটসম্যান রমন সুব্বা-রাওয়ের পতনমুখে দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং। ডেভিডসন প্রথম টেস্টে তাঁর খ্যাতি অনুযায়ী বল করতে পারেননি। কিন্তু এ টেস্টে তাঁর প্রশংসনীয় বোলিংই ক্রিকেট পণ্ডিতদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে দেয়। মিশন এবং ম্যাকেও ভাল বল করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের অন্তত তিনজন খেলোয়াড়—পুলার, ডেক্সটার ও ব্যারিংটন যেভাবে আউট হন তার কৈফিয়ত নেই। তিনজনই বাজে বল মারতে গিয়ে আউট হয়েছেন। মে এবং কাউড্রেও তাঁদের স্বভাবসুলভ খেলা খেলতে পারেননি। একমাত্র সুব্বারাওয়ের দৃঢ়তাপূর্ণ ৪৮ রান এবং শেষ উইকেটে দুই ফাস্ট বোলার স্ট্যাথাম ও ট্রুম্যানের সহ-যোগিতায় ৩১ রান যোগই প্রথম দিনে ইংলণ্ডের ব্যাটিং-এর যা কিছু উল্লেখ করবার মত ঘটনা। অবশ্য সূচনায় অস্ট্রেলিয়ারও বিপদ দেখা দেয়। মাত্র ৬ রানের মধ্যে আউট হয়ে যান ম্যাকডোনাল্ড ও সিম্পসন। কিন্তু পরম নির্ভরযোগ্য ওপেনিং ব্যাটসম্যান বিল লরী অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে ৩২ রান করে নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিনও অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং-এ তেমন আশার আলো দেখা যায় না। ৮৮ রানের মধ্যে ৪টি উইকেট পড়ে যায় কিন্তু লরী ধীরস্থির। তাঁর ব্যাটও জীবন্ত। সেখানে রানের স্বতঃপ্রবাহিত স্রোত। প্রথম দিকে অধিনায়ক নীল হার্ভের সহায়তায় এবং মাঝখানে পিটার বার্জের ব্যাট চালনার গুণে লরী অস্ট্রেলিয়ার রানকে টেনে নিতে আরম্ভ করেন। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া সংগ্রহ করে ৮ উইকেটে ২৮৬ রান। লরী ক্রিকেটের পীঠ-ভূমিতে প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী করে ১৩০ রানের মাথায় আউট হন।

যে সমস্ত খেলোয়াড় ইংলণ্ড সফরে আসেন তাঁদের প্রত্যেকেরই লক্ষ্য থাকে লর্ডসে নিজেকে প্রকাশ করা। লর্ডসে সুনাম অর্জন করা। এই দিক দিয়ে খুব কম খেলোয়াড়ই লরীকে অতিক্রম করতে পেরেছেন। ইংলণ্ড সফরে অস্ট্রেলিয়ার ২৪ বছর বয়সের ন্যাটা খেলোয়াড় বিল লরীর এটা চতুর্থ সেঞ্চুরী। লর্ডসেই তিনি দুবার সেঞ্চুরী করেন। প্রথমবার এম সি সির বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়বার দ্বিতীয় টেস্টে। ১০৬ রানের মাথায় ইংলণ্ড সফরে তাঁর হাজার রানও পূর্ণ হয়ে যায়। বিপর্যয়ের মুখে লরীর তেজোদৃপ্ত অথচ সাবলীল ব্যাটিং ক্রিকেট অনুরাগীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করে। মনঃসংযোগ, সাবলীল ভঙ্গী এবং অনমনীয়তার জন্য লরীর এ ইনিংস অনন্য।

অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ২৮৬ রান করায় দ্বিতীয় দিনের শেষেই ৮০ রানে এগিয়ে থাকে হাতে থাকে ২টি উইকেট।

তৃতীয় দিন ৩৪০ রানে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর ইংলণ্ডের দ্বিতীয়
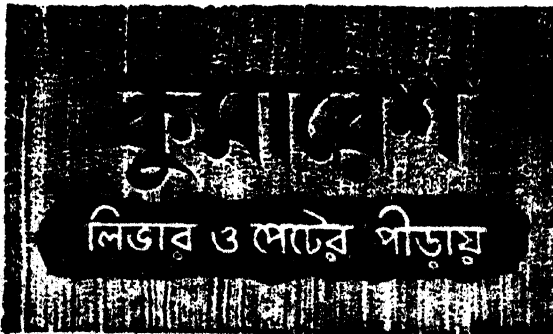
ইনিংসে আবার ব্যর্থতা দেখা যায়। ১৭৮ রান উঠতেই তাদের পড়ে যায় ৬টি উইকেট।

এদিন অস্ট্রেলিয়া ইনিংসের লেজের দুটি উইকেট পতনের পরিপ্রেক্ষিতে ১২০ রান যোগ এবং ইংলন্ডের ওপেনিং ব্যাটসম্যান পুলারের ৪২ এবং ব্যারিংটনের নট আউট থেকে ৫৯ রান করার কথাই উল্লেখ করবার মত। এদিন পুলার যখন ২৪ রানের মাথায় পৌঁছান তখন টেস্ট-জীবনের হাজার রান পূরে যায়। এটি ছিল পুলারের ত্রয়োদশ টেস্ট খেলা।

ক্রিকেটের অবস্থার কত পরিবর্তন। আগের দিনে 'লেজে'র দিকের ব্যাটসম্যানরা এসে দু-একটি বাউন্ডারী বা ছক্কা মেরে বিদায় নিতেন। কিন্তু এখন 'টেল এণ্ডারার' ব্যাটিং-এর সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ইংলন্ড এবং অস্ট্রেলিয়া—দুই দলেরই প্রথম ইনিংসে এর পরিচয় পাওয়া গেল।

দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলন্ডের ৬ উইকেটে ১৭৮ রান সংগ্রহের অর্থ তাদের হাতে মাত্র ৪৪ রান। সুতরাং অবস্থা অস্ট্রেলিয়ার অনুকূলে। পরের দিন খেলার বিরতি।

একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিনের খেলা আরম্ভ হলে ২০২ রানে ইংলন্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গেল। জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন রইল মাত্র ৬৯ রান। কিন্তু অনিশ্চিত ক্রিকেট এই অনুকূল অবস্থার মধ্যেও অস্ট্রেলিয়ার জয় সম্পর্কে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলে। এবং বেশ কিছুক্ষণ ধরেই তাদের ড্রেসিং রুমে একটা ভীতি বিরাজ করে। কারণ? ১৯ রানের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার ৪ মহারথী বিদায় গ্রহণ করেন। ১৯ রানের মধ্যে বললেও ভুল হয়, কারণ ১৫ রান থেকে ১৯ রান যোগ হতে অর্থাৎ মাত্র ৪ রানের মধ্যে ৪ জন ব্যাটসম্যান, ম্যাকডোনাল্ড, লরী, হার্ভে, ও'নীল আউট হয়ে যান। কিন্তু পিটার বার্জের দৃঢ়তায় আর একটি উইকেট হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া জয়-লাভের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে। ক্রিকেটের পীঠভূমিতে তারা পাঁচ উইকেটে বিজয়ী হয়।

টেস্টের দীর্ঘ ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়া লর্ডসে হেরেছে মাত্র একবার, ১৯৩৪ সালে। ১৯৫৬ সালে যেবার অস্ট্রেলিয়া দল রীতিমত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল সেবারেও 'লর্ডস'-এ ইংলন্ডকে হারিয়েছিল ১০ উইকেটে।

দ্বিতীয় টেস্টের স্কোর বোর্ড ও খেলোয়াড়দের নামঃ—

ইংলন্ড—প্রথম ইনিংস—২০৬ (রমন সুব্বারাও ৪৮, এরিক ডেক্সটার ২৭, ফ্রেডি ট্রুম্যান ২৫; অ্যালান ডেভিডসন ৪২ রানে ৫ উইকেট, কেন ম্যাকে ৩৪ রানে ২ উইকেট, ফ্রাঙ্ক মিশন ৪৮ রানে ২ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—৩৪০ (বিল লরী ১৩০, কেন ম্যাকে ৫৪, পিটার বার্জ ৪৬, জি ম্যাকেঞ্জি ৩৪, ফ্রাঙ্ক মিশন নট আউট ২৫, নীল হার্ভে ২৭; ফ্রেডি ট্রুম্যান ১১৮ রানে ৪ উইকেটে, এরিক ডেক্সটার ৫৬ রানে ৩ উইকেট, ব্রায়ান স্ট্যাথাম ৮৯ রানে ২ উইকেট)।

ইংলন্ড দ্বিতীয় ইনিংস—২০২ (কেন ব্যারিংটন ৬৬, জিওফ পুলার ৪২, জন মারে ২৫; জি ম্যাকেঞ্জি ৩৭ রানে ৫ উইকেটে, অ্যালান ডেভিডসন ৫০ রানে ২ উইকেট, ফ্রাঙ্ক মিশন ৬৬ রানে ২ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস—(৫ উইকেটে) ৭১ (পিটার বার্জ নট আউট ৩৭; স্ট্যাথাম ৩১ রানে ৩ উইকেট, ট্রুম্যান ৪০ রানে ২ উইকেট)।

[অস্ট্রেলিয়া ৫ উইকেটে বিজয়ী]

অস্ট্রেলিয়া দলে খেলেছেন—হার্ভে (অধিনায়ক), ম্যাকডোনাল্ড, লরী, ও'নীল, বার্জ, সিম্পসন, ম্যাকে, ডেভিডসন, ম্যাকেঞ্জি, গ্রাউট (উইকেট কিপার) ও মিশন; দ্বাদশ খেলোয়াড়—কুথ।

ইংলন্ড দলে খেলেছেন—কাউড্রে (অধিনায়ক), পুলার, সুব্বারাও, ডেক্সটার, মে, ব্যারিংটন, ইলিংওয়ার্থ, মারে (উইকেট কিপার), লক, ট্রুম্যান ও স্ট্যাথাম; দ্বাদশ খেলোয়াড়—স্মিথ।

খেলার তারিখ—২২শে, ২৩শে, ২৪শে ও ২৬শে জুন।

—মুকুল—

বাণী ঘোষ (বসু)

লক্ষ্য ছিল অলিম্পিক। স্বপ্ন ছিল দুরতিক্রম্য ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা। দুবারই সোরগোল উঠল। দুবারই তাল-গোল পাকিয়ে গেল।

প্রথম ১৯৩৬ সাল। বাঙালী মেয়ে যাবে বার্লিন অলিম্পিকে। খেলাধূলা মহলে কি হইচই। কত বড় সম্মানের কথা! অলিম্পিক অঙ্গনের অঠাই-পাথারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ঐ পনেরো বছরের ছোট্ট মেয়ে? বাঙালী মেয়ের অবলার অপবাদ বুঝি অপসারিত হয়। সবই প্রায় ঠিকঠাক। কিন্তু অর্থের অভাবে সেটেল্ড ফ্যাক্ট আনসেটেল্ড হয়ে গেল।

দ্বিতীয়বার ১৯৩৮ সালে। সবুজ রঙের একখানা 'হাডসন টেরাপ্লেন' শহরের বুকে সগর্বে ঘুরে বেড়ায়। তার পেছন দিকে পোস্টার আঁটা। কি? না, "প্রফুল্ল ঘোষ ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ন সুইমার অন ওয়ে টু ক্রসিং ইংলিশ চ্যানেল উইথ কুমারী বাণী ঘোষ"। ইণ্ডিয়া থেকে ফ্রান্সে চ্যানেল উপকূল পর্যন্ত তাঁদের মোটর যাত্রার পাসপোর্ট। পেছনে সুভাষ বোস থেকে আরম্ভ করে সারা বাঙলার শুভেচ্ছা। অশুভ দিনে অভিযান শুরু। তাই অযাত্রায় জয়যাত্রা সফল হল না। এবারও অর্থের অভাবে ভারতের পশ্চিম প্রান্ত থেকে গাড়ি ফিরে এল। বাঙলার সপ্ত কোটি সুসন্তানের হাতের বিজয় মালা হাতেই শুকিয়ে গেল।

তাই বলে বাণী ঘোষ কি জীবনে জয়ের মালা পাননি? পেয়েছেন, প্রচুরভাবেই পেয়েছেন। খেলাধূলায়, বিশেষ করে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, অসি চালনা, যুযুৎসুর ছলাকলা আর সাঁতারের অসামান্য সাফল্যে তিনি পেয়েছেন অজস্র জয়ের মালা আর সর্বত্রই সম্মানের রাশি রাশি বরন-ডালা। শুধু অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গেই নয়, পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা—এক কথায় কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতের প্রায় সমস্ত যায়গায় তিনি তুলেছেন জলের বুকে কলতান। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত বাণী ছিলেন ভারতীয় সাঁতারের রানী।

বাণী ঘোষের প্রথম অনুরাগ লাঠি ছুরি খেলায়। পরে সাঁতারে। যখনকার কথা বলছি বাঙলার ঘরে ঘরে তখন জাতীয় ভাব-ধারার বন্যা। সংঘ সমিতি গড়ে উঠছে। সভাসমিতি ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে হচ্ছে জাতীয়তার উন্মেষ। দেশনায়করা শরীর চর্চায় ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দিচ্ছেন। বাবা দেবেশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন বেঙ্গল ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার কোরের মেজর। দশাসই চেহারার বিরাট পুরুষ। বিরাট গোঁফ, হাতে জওহরলালী বেঁটে লাঠি। খাঁকি খদ্দরের সামরিক পোশাক-পরা স্বদেশী সৈনিক। সুভাষ বসুর অনুরাগী, উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবী। দেবেশবাবুর উৎসাহেই খেলাধূলার ক্ষেত্রে বাণী ঘোষের এত প্রতিষ্ঠা।

বাণী ঘোষ গঙ্গার কূলে লালিতা পালিতা। দেবেশবাবুর তখনকার বাড়ি ছিল কুমারটুলী অঞ্চলে। বাণী ও জগদীশ দেবেশবাবুর দুই পিঠোপিঠি সন্তান। বাণীর বয়স আট নয়, আর জগদীশের পাঁচ ছয় তখন তিনি রোজ ছেলেমেয়েকে নিয়ে যেতেন গঙ্গার ঘাটে। স্নান করতেই গঙ্গার উজান-ভাটিতে চলত ভাইবোনের সাঁতার শেখা। শুধু জলে না ডোবার জন্য সাঁতার। ইতি-মধ্যে দেবেশবাবু বাণীকে বাগবাজার এপোলো ক্লাবে ভর্তি করে দিয়েছেন। সেখানেই বাণীর লাঠি ও ছোরা খেলার প্রথম হাতেখড়ি হল। পরে বাগবাজার জাতীয় সংঘে গিয়ে ভালভাবে হাত খুলল। পণ্ডু বল্লভের কাছ থেকে লাঠি, এস মিত্রের কাছ থেকে অসি এবং এস রায়ের কাছ থেকে ছোরা খেলার ছলাকলা শিখে বাণী যথেষ্ট সুনাম অর্জন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাঁতারেরও শিক্ষা আরম্ভ হল। অ্যাথ-লেটিকসেও কিছুটা নাম। সাবিত্রী শিক্ষালয়ের দৌড়পটু মেয়ে হিসাবে তাঁকে সবাই চেনে।

'বাঃ, হাত পা চালানোর চমৎকার ভঙ্গি তো'! গঙ্গার ঘাটেই তাঁর উপর নজর পড়ল নলিন মালিকের। লস এঞ্জেলস অলিম্পিকের ভারতীয় সাঁতারু নলিন মালিক। গঙ্গাতেই তিনি বাণীকে সাঁতারের কিছু কিছু সায়েন্স শেখালেন। কিন্তু বাবার অনুমতি পেয়ে বাণী ঘোষকে ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাবে এনে ভর্তি করলেন বিমল দে, বর্তমানে যিনি ঢাকুরিয়া লেকে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের সাঁতার-কোচ।

১৯৩২ সালে হেদোর প্রথম প্রতি-যোগিতায় বাণীর ব্যর্থতা। ৫৫ গজ ফ্রি স্টাইলে মাত্র ষষ্ঠ স্থান। কিন্তু ১৯৩৩ থেকে ব্যাক, ব্রেস্ট ও ফ্রি স্টাইলে বরাবর প্রথম। কচিৎ কদাচিৎ দ্বিতীয় স্থান। লীলা ভড়, রমা সেনগুপ্তা, নিরুপমা শীল, সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়াল, লীলা চ্যাটার্জি, ইংরেজ তরুণী লুসি ইয়াপ, সাঁতারে কেউ আর বাণীর সমকক্ষ নয়। গঙ্গার বুকে ৭ মাইল সাঁতারে ২৭ জন ছেলেমেয়ের মধ্যে বাণীর দশম স্থান। কাগজে কাগজে বাণীর ছবি, বাণীর প্রশংসা।

১৯৩৫ সালে বিমল দের সঙ্গে সঙ্গে ক্লাব বদল। হেদোর গোলপুকুর থেকে কলেজ স্কোয়ারের গোলদীঘি। এখন বাণী ঘোষ শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাবের সভ্যা। এবার ছেলেদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমন্ত্রণ পেয়ে এই বছর লাহোর গভর্নমেণ্ট কলেজের ছাত্ররা এসেছিল কলকাতায়। তাঁদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেয়ে ১১০ গজ ব্যাক স্ট্রোকে বাণী ঘোষ দখল করলেন তৃতীয় স্থান। এরপর কলেজ স্কোয়ার ট্যাঙ্কে ১৬ ঘণ্টা অবস্থান। বাঙালী মেয়ের প্রথম অবিরাম সাঁতার।

রাজ্যের সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপের নাম ছিল তখন অলিম্পিক সাঁতার। বেঙ্গল অলিম্পিক ও ভারতীয় অলিম্পিকের ব্যাক, ব্রেস্ট ও ফ্রি স্টাইল সব বিষয়েই বাণী ঘোষ প্রথম স্থান দখল করে অশেষ খ্যাতি অর্জন করলেন।

এদিকে লাঠি ছোরা খেলায় বাণীর দেশ-জোড়া নাম ডাক। সভাসমিতি ও প্রদর্শনীতে তাঁর সাদর আহ্বান। চন্দননগরে প্রবর্তক সংঘের অক্ষয় তৃতীয়ার মেলা ও প্রদর্শনী। সেখানে বাণী ঘোষের লাঠি, ছোরা ও যুযুৎসুর কলাকৌশল। এলবার্ট হলে 'মাতৃ সদনের' সাহায্যে চ্যারিটি শো। সেখানেও বাণীর ডাক। উত্তর কলকাতা কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে বাণীর লাঠি ছোরা অসি খেলা। এমনি সব অনুষ্ঠানেই বাণীর ডাক। বাণীর আকর্ষণ।

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে এবার এই মেয়েটি সম্পর্কে উচ্চাশা। দেশনায়কদের উচ্চ প্রশংসা। প্রবর্তক, প্রবাসী, বিচিত্রা, বসুমতী, ধ্রুব, দীপালী, অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, অ্যাডভান্স, এলাহাবাদের লীডার, স্টেটসম্যান প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় বাণী ঘোষ সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছিল এবং স্যার হরিশঙ্কর পাল, এ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার অশোক রায়, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র, মেয়র নলিনীরঞ্জন সরকার প্রভৃতি এই মেয়েটি সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা এখানে তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবু এক আধটি কথা তুলে দিচ্ছি।

ডাঃ জে এন মৈত্র বললেন—"এমন মেয়ে বাঙলার ঘরে ঘরে বিরাজ করুক। তাহলে দুর্বৃত্তগণের হাত থেকে বাঙলার মেয়েরা চিরদিন মুক্ত থাকবে,—পাশবিক অত্যাচার পাপ আচরণ ও নারী হরণের কথা আর শুনতে হবে না।"

কিন্তু বাণীর মনে শান্তি নেই। অর্থ তাঁর অলিম্পিকে যাবার অন্তরায় হল। এখানেও কোন সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, যাঁর সঙ্গে পাল্লা দেবেন। তাই বাণী ঘোষ সাঁতারবীর প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে মনস্থ করলেন। প্রস্তুতি হিসাবে বাঙলায় ও ভারতের নানা যায়গায় আরম্ভ হল প্রদর্শনী সাঁতার। নৈহাটি থেকে নাটোর, কটক থেকে কালিম্পং,

শ্রীমতী বাণী ঘোষ (বসু)

বলাই ভাল। এলো পাঁচ ছয়জন নুলিয়া। সমুদ্রেই যাঁদের ঘরবাড়ি। একটি ১৫ বছরে মেয়ের সংগে নুলিয়াদের প্রতিযোগিতা! লাট সাহেব ব্যাপারটি ভাল চোখে দেখলেন না। লাট পত্নীও ভ্রূকুটি মেশানো চোখে চাইলেন মহারাজার দিকে। বাণী ঘোষ যখন নুলিয়াদের হারিয়ে প্রথম স্থান দখল করলেন তখন ভাবাবেগে লাট-পত্নী জলে নেমে বাণীকে কোলে টেনে নিলেন। এরপর পুরীর সমুদ্র বুকে স্বর্গদ্বার থেকে বি এন আর হোটেল পর্যন্ত ৩ মাইল সাঁতারের পাল্লায় একজন নুলিয়ার কাছে বাণী হলেন পরাজিত। সমুদ্রের ঢেউ-এর সংগে পরিচয় ছিল না, তবু ৬ জন নুলিয়ার মধ্যে বাণীর দ্বিতীয় স্থান। সারা ভারত থেকে বহু সোনার মেডেল সংগৃহীত হয়েছিল, তার একখানা শুধু খরচ হল এখানে। ৪ খানা আবার ফিরে এল কটক মিউনিসিপ্যাল ট্যাঙ্কে ৮০ পাক সাঁতারে জয়ের পর। তবু মন ফাঁকা। বাণীর স্বপ্ন সফল হল না।

১৯৪১ সালে বাণী ঘোষ যখন বেথুন কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী তখন চাঁদপুরের জননায়ক কৈলাসচন্দ্র বসুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র বসুর সংগে তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। নাম গোত্র বদলে গেল। বাণী ঘোষ এখন থেকে হলেন বাণী বসু। সৌকালীন থেকে গৌতম গোত্র। সাধনা ও স্বপ্ন সব রইল পেছনে পড়ে। এককালে যিনি লাঠি খেলায় মাটির বুকে ধূলি উড়িয়েছেন, সাঁতারে জলের বুকে তুফান তুলেছেন তিনি এখন কল্যাণী বধূ। কল্যাণী মূর্তি অবশ্য বাণী ঘোষের চিরদিনই। খেলার অঙ্গনে অশান্ত, কিন্তু গৃহ প্রাঙ্গণে, স্কুলে কলেজের ক্লাশে, ক্লাব চত্বরে চিরদিনই শান্ত,—শালীনতার প্রতিমূর্তি।

বাণী বসু এখন ছোট্ট ঘর, শান্তির পরিবেশে ঘেরা ছোট্ট সংসারের গৃহকর্ত্রী। ১।১০ পাইকপাড়া সেকেণ্ড রোডে তিনটি প্রাণীর সংসার। ক্রীড়ানুরাগী স্বামী, শাশুড়ী আর নিজে। আর একটি প্রাণীও আছে ওদের সংসারে। সেটা ইরশ্যানাল এ্যানিম্যাল—বাণী বসুর এ্যালসেশিয়ান 'জিমি'। সংসারের কাজ ছাড়া বাণী বসুর অন্য কাজ এখন সমাজ-সেবা। রামকৃষ্ণ মিশন উইমেনস ওয়েল-ফেয়ার সেণ্টারের তিনি একজন বিশিষ্টা কর্মী।

'স্বপ্ন যদি মধুর এমন হ'ক সে মিছে কল্পনা।' বাণী ঘোষের ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার স্বপ্ন মিথ্যে হয়েছে। কিন্তু একদিন তিনি মধুর স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেই বিশ একুশ বছর পরে আর এক বাঙালী মেয়ে আরতি সাহা সে স্বপ্ন সফল করেছেন। যদিও ইংলিশ চ্যানেল পার হবার প্রথম কৃতিত্ব ছিল বাণী ঘোষেরই প্রাপ্য।

গৌহাটি, ধুবড়ী, রাঁচী, পুরী, গয়া, পাটনা, এলাহাবাদ, হায়দরাবাদ সব যায়গাতেই সফর। সব যায়গাতেই অভিনন্দন।

বাণী ঘোষ প্রফুল্ল ঘোষের কাছ থেকে ইতিমধ্যে দূর পাল্লার কষ্টসাধ্য সাঁতারের উন্নত শিক্ষায় আরও পটু হয়ে উঠেছেন। প্রফুল্ল ঘোষ, বাণী ঘোষ আর বাণীর বাবা দেবেশ ঘোষ—তিনজনের সফর। গৌহাটি পুলিস রিজার্ভ ট্যাঙ্কে প্রদর্শনী সাঁতারের পর ওখানকার জনসাধারণ আব্দার ধরে বসল—ও সাঁতার সফলতার নয়। ব্রহ্মপুত্র নদী সাঁতার কেটে পার হতে পারলে তাকেই বলব সাঁতার। জলের মধ্যে প্রফুল্লর গা দিয়ে আগুন বেরোল। গর্বভরে বললেন—'ব্রহ্মপুত্রকে আমি আদি গংগার অতিরিক্ত মনে করি না। আমি কেন? আমার ছাত্রী বাণীও নদী পার হবে।' কথা শুনে দেবেশবাবু তাঁর বড় গোঁফে মোলায়েমভাবে হাত বুলোতে আরম্ভ করলেন।

খরস্রোত ব্রহ্মপুত্র। কারেণ্ট ও আণ্ডার কারেণ্টে ভয়াবহ রূপ তার। জল হিম-শীতল। গৌহাটির উপকূলে 'উমানন্দ' পাহাড় যেখানে মাথা খাড়া করে উঠে উন্নত জলরাশিকে দুভাগে ভাগ করে দিয়েছে সেখানকার রূপ আরও ভয়ংকর। তোড়ের মুখে পড়ে ভাটির দিকে কামরূপ কামাখ্যায় চালান হবার জোগাড়। সেই ভয়ংকর যায়গাতেই ব্রহ্মপুত্রে পাড়ি দিলেন বাণী ঘোষ। কড়া হাতে দেবেশবাবু এবার গোঁফে তা দিলেন উপরের দিকে। সাঁতার কেটে ভয়াবহ ব্রহ্মপুত্র পার হবার এটাই প্রথম ঘটনা। এরপর আর কোন ছেলে বা মেয়ে সাঁতার কেটে ব্রহ্মপুত্র পার হয়েছেন কিনা আমার জানা নেই।

বাণী ঘোষরা যেখানেই যেতেন সেখানেই পোস্টারে প্রফুল্ল ঘোষের চ্যালেঞ্জ থাকত—যে কেউ বাণীকে হারাতে পারবে তাকে একটি সোনার মেডেল দেওয়া হবে। ১৯৩৭ সালে পুরীতে এক মজার ব্যাপার ঘটল। পুরীর মহারাজ বিখ্যাত চন্দনপুকুরে এক সাঁতারের আয়োজন করলেন। উড়িষ্যার লাট সাহেব থেকে আরম্ভ করে গণ্যমান্যরা সেখানে নিমন্ত্রিত। বাণী ঘোষের সংগে ওখানকার সাঁতারুদের পাল্লা। কিন্তু সাঁতার আরম্ভের সময় যাঁরা এসে পৌছল তাঁদের সাঁতারু না বলে সামুদ্রিক জলজীব

দেশী সংবাদ

১৯শে জুন—আসামের কাছাড় জেলায় বঙ্গভাষা স্বীকৃতির দাবিতে যে আন্দোলন চলিতেছিল তাহাকে বানচাল করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধাইবার নিমিত্ত গোপন চক্রান্ত আজ মারাত্মক আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এ সম্পর্কে কলিকাতায় প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, কাছাড়ের এক বিরাট মুসলমান জনতা হাইলাকান্দি শহরের বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট আক্রমণ করে এবং ঐগুলিতে বিশেষত উদ্বাস্তু কলোনীগুলিতে ব্যাপক অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ ও উৎপীড়ন চালায়।

সাম্প্রতিক লোকগণনার বিবরণে জানা গিয়াছে যে, গত দশ বৎসরে পূর্ববঙ্গ হইতে মুসলমানগণ ব্যাপকভাবে আসামে বসবাস করিবার জন্য আসিয়াছে। ছয় লক্ষ মুসলমানের এই দেশান্তরে আসিয়া বসবাস সুপরিকল্পিত বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। এই ঘটনায় নয়াদিল্লিতে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে।

২০শে জুন—কাছাড় হইতে প্রাপ্ত সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়াছে, হাইলাকান্দিতে গতকল্যকার হাঙ্গামায় মোট ১০ জন নিহত হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচজন পুলিসের গুলীতে ও অবশিষ্ট পাঁচজন অন্য অস্ত্রের আঘাতে মারা যায়। আসামের রাজ্যপাল হাইলাকান্দি মহকুমাকে ১৯শে জুন হইতে দুই মাসের জন্য 'উপদ্রুত এলাকা' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

গেজেট অব ইণ্ডিয়ার অদ্যকার সংখ্যায় প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, আগামী ১লা জুলাই হইতে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত ভারতের সর্বত্র পণপ্রথা নিবারণ আইন বলবৎ হইবে। গত ২০শে মে বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে।

২১শে জুন—ভারতে পথঘাটের উন্নতিবিধানের জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সমিতি বিনা সুদে ভারতকে ২৯ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন। ৫০ বছরে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে এবং ১৯৭১ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে প্রথম দফায় ঋণ পরিশোধ আরম্ভ হইবে।

গতকল্য রাত্রি প্রায় ১১।১১৷৷টায় আসামের কৃষিমন্ত্রী শ্রীমৈনুল হক চৌধুরীর স্বগ্রাম সোনাবাড়িঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া শিলচুরি পর্যন্ত মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের ৪।৫ শত দুর্বৃত্ত বন্দুক ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া 'আল্লা হো আকবর', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ইত্যাদি ধ্বনি করিতে করিতে শিলচুরির সন্নিকটবর্তী পানিভরা (পিতল বিল) উদ্বাস্তু কলোনী আক্রমণ করে।

২২শে জুন—কাছাড়ে মুসলমানদের গোপন সভা হইতেছে। গত পরশ্ব নেহেরপুরে মন্ত্রী শ্রীমৈনুল হক চৌধুরীর নিকট-আত্মীয় শ্রীগোলাম জিলানী চৌধুরীর গৃহে অনুষ্ঠিত এক সভায় কাছাড় কল্যাণ সমিতি গঠিত হইয়াছে।

ভারতীয় সৈনাবাহিনী ভুটানের প্রতিরক্ষাভার গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, বহু ভারতীয় সৈন্য ইতিমধ্যেই ভুটান-তিব্বত সীমান্ত এলাকায় গিয়া পৌঁছিয়াছে এবং আরও অনেক সৈন্য ভুটান অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

২৩শে জুন—আজ আসামের রাজ্যপাল জেনারেল শ্রীনাগেশ ১৯৫৫ সালের আসাম উপদ্রুত এলাকা আইনের তিন নং ধারা অনুসারে আজ হইতে তিন মাসের জন্য সমগ্র কাছাড় জেলাকে "উপদ্রুত এলাকা"রূপে ঘোষণা করিয়াছেন।

উড়িষ্যায় প্রায় চার মাসকালব্যাপী রাষ্ট্রপতির শাসনের অবসান হইবার পর শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়কের নেতৃত্বে সাতজন সদস্য লইয়া গঠিত উড়িষ্যার নূতন মন্ত্রিসভা আজ কার্যভার গ্রহণ করেন।

২৪শে জুন—উড়িষ্যার নূতন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের অব্যবহিত পরেই মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়ক ঘোষণা করেন যে, তাঁহার সরকার প্রাক্তন শাসকদের আশ্রিতদের ভাতা প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

গত সপ্তাহে প্রবল বারিপাতের ফলে বন্যায় গৃহাদি ধসিয়া যাওয়ায় বিহারের সাতটি জেলায় অন্ততপক্ষে ২০ জনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

অদ্য বাঙ্গালোরে ভারতে প্রস্তুত প্রথম "সুপারসোনিক" (শব্দ অপেক্ষাও দ্রুতগতিসম্পন্ন) জঙ্গী বিমান—এইচ এফ-২৪-এর পরীক্ষাকার্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এই সাফল্যের ফলে ভারত পৃথিবীর আর পাঁচটি দেশের সমপর্যায়ভুক্ত হইবার গৌরব অর্জন করিল। এই পাঁচটি দেশ হইল—রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স এবং সুইডেন।

২৫শে জুন—তসলিম আলি নামে এক পাকিস্তানী মুসলমানকে আরঙ্গাবাদে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। করিমগঞ্জে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এক বিবৃতিতে সে বলে যে, ৪ মাস পূর্বে বিনা পাসপোর্টে ভারতে প্রবেশ করিয়া সে মন্ত্রী মৈনুল হকের গৃহে কাজ করিতেছিল।

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত এক অভিযোগে প্রকাশ, হাইলাকান্দিতে অনুষ্ঠিত ১৯শে জুনের তাণ্ডবের পরস্পরবিরোধী সরকারী বিবৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য হাইলাকান্দি থানার ঐ দিনকার ডায়েরিতে তথ্যের অদলবদল করার চেষ্টা গোপনে গোপনে চলিতেছে।

বিদেশী সংবাদ

১৯শে জুন—লাওসের তিনজন প্রিন্স অদ্য জুরিকে এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হইয়া ভবিষ্যৎ কোয়ালিশন সরকারের আভ্যন্তরীণ নীতি সম্পর্কে পৌনে দুইঘণ্টাকাল আলোচনা করেন।

২০শে জুন—আদালতের সম্মুখে প্রথম সাক্ষ্য দিতে উঠিয়া অ্যাডলফ আইখম্যান আজ বলেন, যে সকল ইস্রায়েলী গুপ্তচর আমাকে আর্জেন্টিনায় বন্দী করিয়াছিল, তাহারাই আমাকে এ কথাটি লিখিয়া দিতে বাধ্য করে যে, আমি স্বেচ্ছায় ইস্রাইলের আদালতে হাজির হইতে প্রস্তুত আছি। ইহুদি নিধন যজ্ঞের প্রধান হোতা ছিলেন বলিয়া আইখম্যানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়, আদালতের সম্মুখে তাহা আইখম্যান আজ পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করেন।

২১শে জুন—পর্তুগীজ সংবাদ সংস্থা "লুসিতানা" জানাইতেছেন, বিপ্লবীরা বিপুল ক্ষতি সত্ত্বেও উত্তর অ্যাঙ্গোলার অ্যাম্ব্রিজ শহর পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। ঘন কুয়াশার মধ্যে আক্রমণ চালাইয়া তিন শতাধিক বিপ্লবী অ্যাম্ব্রিজের রাজপথে ঢুকিয়া পড়ে—সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দল সেখানকার বিমানবন্দরের উপর আক্রমণ চালাইতে শুরু করে।

কাতাঙ্গা বেতারের রিপোর্টার শ্রীচার্লস কাসাদি অদ্য বলেন যে, কাতাঙ্গার প্রেসিডেন্ট টিশোম্বেকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় কঙ্গোলী সরকারের নির্দেশে গত এপ্রিল মাস হইতে প্রেসিডেন্ট টিশোম্বেকে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল।

২২শে জুন—কাতাঙ্গার প্রেসিডেন্ট শ্রীটিশোম্বে আজ কারামুক্তির পর এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, পূর্বতন বেলজিয়ান কঙ্গোকে একটি 'সুমহান দেশে' পরিণত করার জন্য বন্ধুবর্গের সহিত একযোগে কাজ করিতে আমি সম্মত হইয়াছি।

২৩শে জুন—ওয়াকিবহাল মহলের মতে—প্রেসিডেন্ট দ্য-গল আলজিরীয় বিদ্রোহীদের আপসের পথে আসার আরও একবার সুযোগ দিবেন, তারপর তাহাদের বাদ দিয়াই স্বাধীন আলজিরিয়া গঠনের পথে অগ্রসর হইবেন।

অ্যাঙ্গোলায় পর্তুগীজ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী নেতা শ্রীগ্যেটস্কেলের এক প্রশ্নের জবাবে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী শ্রীম্যাকমিলান আজ বলেন, পর্তুগালকে দুইটি যুদ্ধজাহাজ বিক্রয়ের কণ্ট্রাক্ট বাতিল করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না বলিয়া তিনি মনে করেন।

২৪শে জুন—শ্রীক্রুশ্চেফ আজ বলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নীচে একটি দাগ টানিয়া দিবার জন্য তিনি শীঘ্রই একটি জার্মান শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন।

প্রেসিডেন্ট কেনেডী মস্কোস্থ মার্কিন দূতের মারফত সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চফের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া বার্লিনের ব্যাপারে তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক করিয়া দিবেন বলিয়া মনে হয়।

যুগোস্লাভ পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র আজ বলেন যে, ১লা সেপ্টেম্বর বেলগ্রেডে নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন আরম্ভ হইবে। কায়রোতে রাষ্ট্রদূত কমিটির যে বৈঠক হইতেছে সেই বৈঠকেই ঠিক হইবে কোন্ কোন্ দেশ আমন্ত্রিত হইবেন।

২৫শে জুন—করাচীর সংবাদে প্রকাশ—পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততা দূর করিবার জন্য পাক-আফগান শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা "ক্ষীণ" বলিয়া কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ মনে করেন।

নিরপেক্ষ লাওসিয়ান নেতা প্রিন্স সুভানা ফুমা আজ জেনেভায় বলেন, তিনি আশা করেন যে, জুলাই মাসে লাওসিয়ান কোয়ালিশন সরকার গঠিত হইবে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
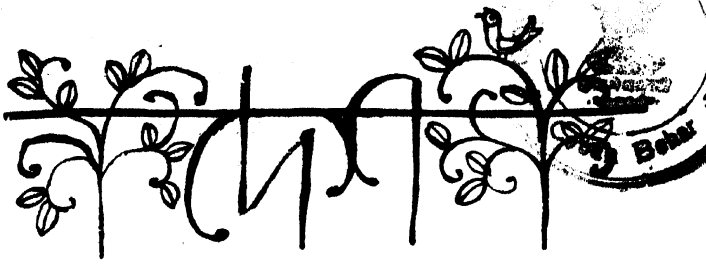
DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 8th July, 1961.

২৮ বর্ষ ॥ ৩৬ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৩ আষাঢ়, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

শিষ্টাচারের মেল বন্ধন

জাতিভেদের মত আমাদের শিষ্টাচারের রীতিনীতিও কম আটসাঁট, কম থাকবন্দী নয়। বর্ণাশ্রমের বাঁধন ক্রমে ক্রমে শিথিল হচ্ছে, অস্পৃশ্যতা বিদায় নিতে এখনও বিস্তর সময় নেবে সন্দেহ নেই, তবে আইনের নির্দেশে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর সব বর্ণের মানুষকেই সমান বলে স্বীকার করতে হয়েছে। রাষ্ট্রিক-ক্ষেত্রে সর্বজনীন ভোটাধিকারের কল্যাণে ব্রাহ্মণ এবং হরিজনে তফাৎ নেই, তফাৎ নেই তেমনি সাবেকী অভিধার বড়লোক এবং ছোটলোকে, বড় মানুষ ও গরীব মানুষে এবং স্ত্রীলোক ও পুরুষে। রাষ্ট্রিকক্ষেত্রে ইতর-ভদ্র-নির্বিশেষে সব নাগরিকই এইভাবে সমান গণতান্ত্রিক মর্যাদা লাভ করেছে। য়ুরোপে অনেক আগেই করেছিল, আমাদের দেশে সম্প্রতি। সামাজিক ক্ষেত্রে অবশ্য এদেশে আচার-বিচারের এমন সব দুস্তর বাধা ও ব্যবধান রয়েছে যা য়ুরোপ ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী যুগেই অপসারিত হয়েছিল। রাজনীতি ব্যাপারে সব নাগরিককে সমান অধিকার বা সুযোগ দেওয়া যতটা সহজ সামাজিক ব্যাপারে আদৌ ততটা সহজ নয়। এদিক দিয়ে আমাদের এখনও অনেক কিছু ভাববার ও করবার আছে।

যে-প্রসঙ্গে এই আলোচনার অবতারণা তার উল্লেখ করি। বাংলায় "আপনি-তুমি-তুই"এর ব্যবহারবিধি গণতান্ত্রিক আদর্শসম্মত কি না এই প্রশ্নের সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব উপেক্ষাযোগ্য নয়। সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের উদ্যোগে একটি সমিতি গঠিত হয়েছে যার সংকল্প হল ইতর-ভদ্রনির্বিশেষে মধ্যম পুরুষে "আপনি"র সর্বজনীন ব্যবহার প্রচলন করা। সংকল্প প্রশংসনীয়, তবে কেবল বাংলা ভাষার মধ্যমপুরুষের ব্যবহারে এই পরিবর্তন প্রয়োজন নয়। হিন্দী এবং যতদূর অনুমান করি ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাতেও "আপনি, "তুমি", "তুই"এর গণ্ডীভেদ আছে। সর্বনামের প্রয়োগক্ষেত্রে অধিকারভেদ অনেক কালের; ইন্দোয়ুরোপীয় গোষ্ঠীর সব ভাষাতেই মধ্যম পুরুষের পরিচয় ও সম্বোধনসূচক শব্দগুলির ইতর-ভদ্র ভাগ ছিল অথবা এখনও স্বল্প প্রচলিত অবস্থায় আছে। বাংলায় কেবল মধ্যমপুরুষে "আপনি-তুমি-তুই"এ মান-মর্যাদা বা ঘনিষ্ঠতার মাত্রাভেদ নয়, প্রথম পুরুষের 'সে' ও 'তিনি'ও সামাজিক অথবা পারিবারিক উঁচুনীচু, ছোট-বড়র পার্থক্যসূচক। হিন্দীতেও তাই। না মেনে উপায় নেই যে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা "আপনি, তুমি, তুই", "সে" ও "তিনি" ব্যবহার করে থাকি পোশাক, পদমর্যাদা, পদবী এবং এমনকি জাত-কুলের উপর নজর রেখে। দীর্ঘকাল অভ্যস্ত এই রীতিই শিষ্টাচারসম্মত মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। তবে কথা কি, পরিণত বয়স্ক অপরিচিত, স্বল্প পরিচিত বা আগন্তুক কাউকে "তুমি" বা "তুই" বলে সম্বোধন করার রীতি দীর্ঘকাল প্রচলিত হলেও তার মধ্যে অনুচ্চারিত অবজ্ঞার ভাব কিছুটা আছেই, কিম্বা সচেতনভাবে না থাকলেও যাঁকে সম্বোধন করে 'তুমি' বা 'তুই' ব্যবহার করা হল তিনি যে কিছুটা সঙ্কুচিত, কিছুটা হীনতা বা দীনতা বোধ করেন সে-বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না।

পারিবারিক পরিবেশে, অন্তরঙ্গ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে 'আপনি', 'তুমি', 'তুই', 'সে' ও 'তিনি' ব্যবহারের পদ্ধতিতে শিষ্টাচারের একটা পরিচ্ছন্ন যুক্তিগ্রাহ্য রূপ অবশ্য পাওয়া যায়। বয়সে ছোট যারা তারা বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনস্থানীয়দের 'আপনি' বলে সম্বোধন করে থাকে, কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক কালে 'তুমি', বিশেষভাবে মাকে। পরিবারের গণ্ডীতে ছোটদের 'তুমি' কিম্বা 'তুই'। সতীর্থ, বন্ধু অথবা কর্মক্ষেত্রে সহযোগীকে 'তুমি' বা 'তুই' বলাই রেওয়াজ। এসব ক্ষেত্রে শিষ্টাচারের বাঁধাধরা নিয়মের প্রশ্ন ওঠে না। আপন জনের বেলায় আপন আপন রুচিমত, অনুরাগের উত্তাপের কমবেশী অনুযায়ী মধ্যম পুরুষ ও প্রথম পুরুষের যদিচ্ছা প্রয়োগ-বৈচিত্র্যে ক্ষতি নেই। সমাজের বৃহত্তর পরিধিতে অনাত্মীয়, অপরিচিত, স্বল্প পরিচিত যে সব লোকের সঙ্গে দৈনন্দিন যোগাযোগ তাদের বেলাতেই শিষ্টাচার এবং সমদর্শিতার তালমান বজায় রাখা নিয়ে সমস্যা। কারণ এখানেই দীর্ঘকালের অভ্যাসবশত "তুই-তুমি" ও "আপনি"র ইতর-ভদ্র বিচার ও ভেদ আঁটসাঁট, ছককাটা।

ইংরেজী 'য়ু্য'র মান-অপমান নেই। প্রয়োগবিধিতে ইতরভদ্র সকলের বেলাতেই সম-মূল্য, সমমর্যাদাসূচক। মধ্যম পুরুষে 'ঈ' কিম্বা 'দাউ'এর অবজ্ঞা অথবা অন্তরঙ্গতাসূচক ব্যবহার কয়েকটি মাত্র অঞ্চলে এবং দু একটি শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। আলাপচারীতে, পরস্পর কথোপকথনে ইতর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র, বড়লোক এবং ছোটলোক ইংরেজের মধ্যে কোন সর্বনামগত ভেদ নেই। সামাজিক শিষ্টাচারের সর্বজনীন প্রয়োগবিধি হিসেব এইটাই সুস্থ গণতান্ত্রিক রীতি। ফ্রান্সে বুর্বোঁ বাদশাহীর আমলে চাষী মজুর দোকানদার, দরজী শ্রেণীর লোককে উপরওয়ালা মহলের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা 'তুই', 'তুমি'র অনুকল্প 'ত্যু' ব্যবহার করতেন। বিপ্লবের পর তার পাল্টা প্রতিশোধ হিসেবে বেশ কিছুকাল ফরাসী ভাষায় মধ্যম পুরুষে 'তুই-তোকারী' চালু হয়েছিল। সে-ও অবশ্য একজাতীয় বিকার যার উদ্দেশ্য ছিল স্পর্ধিত অভদ্রতা দ্বারা অহঙ্কৃত ভদ্রতার সংকীর্ণতা ধূলিসাৎ করা। এখানে যে সমস্যা আলোচিত হচ্ছে তার উদ্দেশ্য অন্যপ্রকার।

ভদ্রতা ও শিষ্টাচারকে ধূলিসাৎ করা নয়, তার পরিধিকে, প্রয়োগবিধিকে সম্প্রসারিত করে সর্বশ্রেণীর নাগরিককে সমান মর্যাদার স্বীকৃতি দিতে চেষ্টা করাই বর্তমানে অভীপ্সিত। এককালে এই বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশে ইতর-ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকই পরস্পরকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করত, এই রীতি শিষ্টাচারবহির্ভূত গণ্য হয়নি, সমাজের নেতৃস্থানীয়দের কাছেও অসম্মানসূচক মনে হয়নি। যতদূর জানি এখনও বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় গ্রামাঞ্চলে ইতর-ভদ্র-নির্বিশেষে 'তুমি'র প্রচলন

বেশী। তবে শিষ্টাচারসম্মত সম্বোধনের প্রচলিত প্রথা বজায় রেখে সকল শ্রেণীর লোকের মর্যাদাকে সমস্তরে উন্নীত করার পক্ষে ইতর-ভদ্র-নির্বিশেষে 'আপনি'র ব্যবহার বিস্তৃত করাই শ্রেয়। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় এ-বিষয়ে যে সংকল্প প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন তা কী পরিমাণে এবং কতদিনে সফল হবে বলা শক্ত। স্পষ্ট বিরোধিতা না হোক, অভ্যাসের জড়তা এবং চিন্তার সংকীর্ণতা সামাজিক শিষ্টাচারপদ্ধতি সংস্কারের চেষ্টায় বাধা ঘটাবে এবং তথাকথিত 'ইতর' জনকে 'আপনি' সম্বোধন নিয়ে পরিহাসও সম্ভবত কম হবে না। তবু নাগরিক জীবনের সর্বস্তরে শিষ্টাচারবিধির সমদর্শিতা প্রয়োগের এই চেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য মনে করি।

ভিয়েনাতে কেনেডি-ক্রুশ্চভ সাক্ষাৎকারের পর থেকে দু পক্ষের কথার সুর যেন ক্রমশ চড়েই চলেছে। শ্রীক্রুশ্চভ নিজে কী বিশ্বাস করতেন তিনিই জানেন, তবে গত বছর মে মাসে চতুঃশক্তির শীর্ষ সম্মেলন ভেঙে দেবার সময়ে তিনি পৃথিবীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, আমেরিকায় নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলে তাঁর সঙ্গে কারবার করা সোভিয়েটের পক্ষে সুবিধা হবে বলে শ্রীক্রুশ্চভ আশা করেন। সেদিক দিয়ে বৃদ্ধ আইজেনহাওয়ারের স্থলাভিষিক্ত যুবক কেনেডি যে শ্রীক্রুশ্চভের সেই "পাবলিক" আশা পূর্ণ করেছেন তা বলা যায় না। পিকিং এবং মস্কোর মত সব বিষয়ে এক নয়, বিশেষ করে পশ্চিমা শক্তিদের সঙ্গে আপোসের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে দুই কম্যুনিস্ট রাজধানীর মধ্যে মতের পার্থক্য সুবিদিত। তবে এই পার্থক্যের অর্থ বিচার করা সহজ নয় এবং সেইজন্য বোধ হয় বর্তমানে এই বিষয়ের গবেষণা কিছুসংখ্যক "বিশেষজ্ঞে"র জীবন এবং জীবিকার অবলম্বন হয়েছে।

যাই হোক, সম্প্রতি কম্যুনিস্ট চীনের প্রেসিডেণ্ট মার্কিন রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের সম্বন্ধে যে মন্তব্যটি করেছেন সে বিষয়ে শ্রীক্রুশ্চভের মত কী জানতে কৌতূহল হয়। চৈনিক নেতার মতে শ্রীকেনেডি শ্রীআইজেনহাওয়ারের চেয়েও বেশী বিপজ্জনক। কারণ শ্রীকেনেডি নাকি "পীস্ ট্যাকটিক্স" এবং যুদ্ধবাজের পলিসি দুইই এক সঙ্গে চালাচ্ছেন। এটা যদি সত্য হয় তা হলে তো কারো কারো রাগ হতেই পারে, কারণ কেউ কেউ হয়ত ভেবেছিলেন যে ওটা তাঁদের একচেটিয়া কারবার।

আবার অন্য এক দল আছেন যাঁরা কম্যুনিজম আরো বাড়ে তা চান না, কিন্তু কম্যুনিস্টদের সঙ্গে আপোস চান, তাঁরা শ্রীকেনেডি সম্পর্কে অনেক আশা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরাও একটু দমে গেছেন। কিউবার ব্যাপারের জন্য তাঁদের কাছে শ্রীকেনেডি নাম খারাপ করে ফেলেছেন। তাঁরা কি ভেবেছিলেন যে, শ্রীকেনেডি এসে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন নীতির ধারা একেবারে উল্টে দেবেন?

এই দলের মতে ডালেস-আইজেনহাওয়ার নীতি কম্যুনিস্ট ব্লকের পক্ষে সুবিধাই করে দিচ্ছিল। সামরিক শক্তির উপর জোর দিয়ে কম্যুনিজম-এর অগ্রগতি বন্ধ করা যায় না, কম্যুনিজমকে ঠেকাতে হলে অর্থনৈতিক অস্ত্রের উপর জোর দিতে হবে—এইটাই হচ্ছে এ'দের মূল বক্তব্য। বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলিকে কম্যুনিজম-এর টান থেকে বাঁচাবার জন্য অর্থনৈতিক অস্ত্রের অর্থাৎ সাহায্যদানের গুরুত্বের কথা সর্বদাই এ'দের মুখে লেগে আছে। ডালেস-আইজেনহাওয়ারের আমলে অনুন্নত দেশগুলিতে মার্কিন সাহায্য যে যাচ্ছিল না তা নয়, কিন্তু সেটা পর্যাপ্ত ছিল না। বিশেষ করে সেটার বেশীর ভাগই অপচয়ে পর্যবসিত হয়েছে এবং দেখা গেছে যে প্রায় সর্বত্র প্রতিক্রিয়াশীল সরকার এবং সমাজব্যবস্থা খাড়া করে রাখাই মার্কিন টাকার কাজ হয়েছে, ফলে কোথাও গণতান্ত্রিকতার ভিত্তি দৃঢ় হয়নি, বরঞ্চ তলে তলে কম্যুনিস্ট প্রভাব বিস্তারের সুবিধা হচ্ছে। এই হলো মোটামুটি এ'দের কথা।

ধরে নেওয়া যাক যে, কম্যুনিজম্-এর বিস্তার প্রতিরোধ করার দিক দিয়ে ডালেস-আইজেনহাওয়ার নীতি ফলপ্রদ হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য এই, যাঁরা আশা করেন যে এই নীতির পরিবর্তন করে শ্রীকেনেডি তাঁকে ফলপ্রসূ করবেন তাঁরাই সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার এও আশা করেন যে, কম্যুনিস্ট ব্লকের সঙ্গে আপোস-আলোচনার ব্যাপারে শ্রীআইজেনহাওয়ারের চেয়ে শ্রীকেনেডিকে শ্রীক্রুশ্চভ বেশী পছন্দ করবেন। যে কম্যুনিজম-এর বিস্তার শ্রীক্রুশ্চভের একান্ত কাম্য তার প্রতিরোধক হিসাবে যদি শ্রীকেনেডি শ্রীআইজেনহাওয়ারের চেয়ে বেশী দক্ষতা দেখাতে চান বা পারেন তবে সেটা শ্রীক্রুশ্চভের আহ্লাদের কারণ হতে পারে না। শ্রীকেনেডির সঙ্গে কারবার করতে সুবিধা হবে এই ধারণা যদি সোভিয়েট নেতার থাকত তবে প্রথম দর্শনেই তিনি তাঁর কাছে কম্যুনিজম-এর বিশ্বজয়ের প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করতেন না। ছোকরার (শ্রীকেনেডি শ্রীক্রুশ্চভের চেয়ে বয়সে ২৫ বছরের ছোটো) "রি-অ্যাক্শান" কী রকম দেখবার জন্য তিনি এরকম উক্তি করেছেন তা সম্ভব নয়। শ্রীক্রুশ্চভ যা বলেছেন তা তিনি বিশ্বাস করেন, কিন্তু যা বিশ্বাস করেন তাই তিনি সব সময়ে বলেন এমন নয়। যাই হোক, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই যে, দুই ব্লকের মধ্যে দ্বন্দ্বের সুরটা শ্রীক্রুশ্চফ আপাতত চড়া করে রাখতে চান। সেটা খানিকটা পিকিং-এর খাতিরে হতে পারে, কিন্তু সোভিয়েটের নিজের গরজও নিশ্চয়ই কিছু আছে।

কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে শ্রীক্রুশ্চভের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সোভিয়েট শক্তির প্রাপ্য আদায় করা। সামরিক শক্তিতে রাশিয়া যে আমেরিকার সমকক্ষ হয়েছে এর রাজনৈতিক স্বীকৃতি সে চায়। সেইজন্যই ইউ এন কর্তৃত্বে সোভিয়েট মৌল পরিবর্তন চাচ্ছে, সেইজন্যই বার্লিন সম্পর্কে হুমকি। নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ বন্ধ না করলে মনুষ্যজাতি গেল, এই বলে এক সময়ে কত না হইচই হয়েছিল, এখন সোভিয়েট গভর্নমেণ্টই বলছেন, চুক্তি করাটা এমন কিছু জরুরী নয়, তবে আলোচনা এখন সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার সঙ্গে করলেও চলবে। এর ফলে আমেরিকা নিউক্লিয়ার অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ আবার

আরম্ভ করতে পারে বলে ঘোষণা করেছে। (সোভিয়েট ইউনিয়নে তলে তলে অস্ত্র পরীক্ষামূলক নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ হচ্ছে এরূপ সন্দেহ শ্রীকেনেডি প্রকাশ করেছেন) এবং হয়ত অদূরে ভবিষ্যতে আমেরিকাতে খোলাখুলিভাবে অস্ত্র পরীক্ষামূলক নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ পুনরায় আরম্ভ হবে। শ্রীক্রুশ্চভের উদ্দেশ্য যাই থাক, তিনি যে শ্রীকেনেডিকে অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধির দিকে অধিকতর মনোযোগী করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আইজেনহাওয়ারের মার্কিন শাসনকালের আট বছরের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন সামরিক অস্ত্রশক্তিতে আমেরিকার সমকক্ষ হয়েছে এবং কোনো কোনো অস্ত্রে আমেরিকাকে ছাড়িয়েও গেছে। সামরিক শক্তির নিয়মই হচ্ছে এই যে নিজের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। রাশিয়ার সামরিক শক্তি যদি আমেরিকার সমান হয়ে থাকে তবে তার স্বীকৃতি এবং সেই স্বীকৃতির নিদর্শনও সে দাবী করবে। অন্য কালে হলে হয়ত এতদিনে বড়ো যুদ্ধ লেগে যেতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে বড়ো যুদ্ধ হলে সেটা নিউক্লিয়ার যুদ্ধে পরিণত হবার সম্ভাবনা আছে। সেই ভয় যদি কেবল যুদ্ধের প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করত তবে কথা ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই ভয়ের দ্বারা তাড়িত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিগণ স্ব স্ব অস্ত্রশক্তি বাড়িয়ে চলেছেন। নিরস্ত্রীকরণের কথা যখন ওঠে তখন নানারকম পরিকল্পনার কথা শুনা যায়, কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে, যে যার শক্তি বৃদ্ধি করেই চলেছে।

কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, এ ব্যাপারে যেন কারো আত্মকর্তৃত্ব নেই। এমন কি মিত্রের প্রভাবও সামান্য। যে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সে হচ্ছে বিরুদ্ধ পক্ষ। কারণ বিরুদ্ধ পক্ষ যা করছে তার সমান করা এবং তাকে ছাড়িয়ে যাওয়াই হলো লক্ষ্য।

এই দৌড় কবে এবং কেমন করে যে থামবে কেউ জানে না, যদিও শুনা যায় যে দুই প্রধান বিপক্ষের হাতেই এত পরিমাণ মারাত্মক শক্তি মজুত আছে যে, যুদ্ধ লাগলে কোনো পক্ষেরই জয়ের আশা নেই, উভয়পক্ষই মরবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বাকী পৃথিবীর জাতগুলোও মরবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে নিউক্লিয়ার অস্ত্রের মালিক দেশগুলির রাজনৈতিক কর্তারা তাঁদের আন্তর্জাতিক ভাষণে যাই বলুন না কেন, সামরিক কর্তারা এবং তাঁদের আজ্ঞাবাহী বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ঠিক তা নয়। যদি নিউক্লিয়ার যুদ্ধের মানেই হয় আত্মহত্যা এবং যদি তার জন্য যথেষ্ট উপকরণ মজুত হয়ে গিয়ে থাকে তবে সেটা তো একটা অন্ধ গলি। কিন্তু সকলে তা মনে করে না। যেমন চীনারা মনে করে যে, নিউক্লিয়ার যুদ্ধের পরেও যথেষ্ট সংখ্যক চীনা পৃথিবীতে থাকবে, এমন কি তার ফলে পরবর্তী যুগে অন্যের তুলনায় চীনাদের সুবিধাও হয়ে যেতে পারে! কিন্তু এর চেয়েও কঠিন সমস্যা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিওয়ালাদের নিয়ে যাঁরা নিউক্লিয়ার যুদ্ধ যাতে আত্মঘাতী না হয় তার উপায় বার করার চেষ্টায় আছেন।

এমন অস্ত্র বার করা যায় কিনা যাতে বিপক্ষের দ্বারা প্রত্যাঘাতের সম্ভাবনা পর্যন্ত থাকবে না, এখন সেই চেষ্টা চলছে। থিওরী হিসাবে মনে করা যায় যে, সেই রকম অস্ত্র যারা আবিষ্কার করতে পারবে তাদের কাছে বিনা যুদ্ধেই বাকী দুনিয়া নতি স্বীকার করবে। সেই রকম অস্ত্র যদি আবিষ্কৃতও হয়, তাহলে কার্যত তার ফল কিন্তু অন্যরকম হবার সম্ভাবনা। আবিষ্কার এবং যথেষ্ট পরিমাণে নির্মাণের মধ্যে কিছুটা সময় যায়। সেই সময়ের মধ্যে যদি বিপক্ষ সন্ধান পায় (যার জন্য আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাগিরির এত প্রাদুর্ভাব) তবে তখন হয়ত আর ভাববার সময় থাকবে না, মরীয়া হয়ে কেউ যুদ্ধ লাগিয়ে দেবে।

১।৭।৬১

প্রেমেন্দ্র মিত্র

শুদ্ধি

ঝড়ে ও নীল নোংরা হ'ল? হয় কি!
আকাশ কই মাখে না মুখে কালি
নগ্নতায়। তখনো নেই লজ্জা।
মেঘের ঢাকা দিলেই নাগরালি
তুফানে মাতে, ঘোচায় তপোচর্যা।
উর্বশীই মুকুরে উমা নয় কি?

এই যে ঝড় শূন্যেতারই শুদ্ধি
আবিল মেঘে ধুলোতে আর গ্লানিতে।
শুধুই বুঝি কালিমা ভাবো ধোয়া যায়!
শুভ্রতাও শোধন খোঁজে শোণিতে।
শোণিতে ঝড় প্রাণের ব্যাস বাড়ায়।
কে পরাশর হৃদে না হতবুদ্ধি!

খি ড় কি

চিলের ছাদে চিল বসে না
বেতার-ত্রিশূল শূন্য শুধু খোঁচায়।
কি পায়? কি চায়?

শূন্য আরো সংক্ষিপ্ত হ'ল।
দেয়াল ছাদে ঢাকা
বুক তবুও ফাঁকা।
দেশান্তরের ডাকাডাকি
শুনেও না পায় পাখা।

মেঘ ছাড়ালাম
বেগ বাড়ালাম
ও মন, তবু যে সব ফাঁকি।
চোর-কুঠুরি হাতড়ে দেখি
শুধুই ভাঙা টুকিটাকি।
আসল সদরে খিল।

সদর খোলা পাই বা না পাই
খিড়কি নিয়েই থাকি।
তারা ধরার নাই বাসনা
পাই যদি জোনাকি।
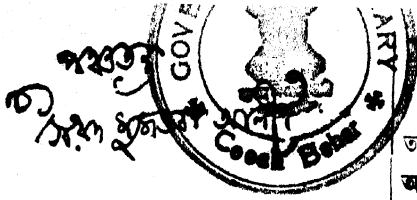
ভবঘুরে (১৫)

বিদায় নেওয়াটা খুব সহজ হয়নি। অল্পক্ষণের পরিচয়ের বন্ধু আর বহুকালের পরিচিত বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নেবার ভিতর পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু অনেক সময় অল্প পরিচয়ের লোকও সেই স্বল্প-সময়ের মধ্যেই এতখানি মোহাচ্ছন্ন করে দেয় যে, তার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মনে ক্ষোভ থেকে যায় যে, এর সঙ্গে দীর্ঘতর পরিচয় হলে কত না নূতন নূতন বাঁকে বাঁকে নূতন নূতন ভুবন দেখতে পেতাম।

দু বছরের বাচ্চা মারা গেলে মার যে শোক হয় সে কি পঞ্চাশ বছরের ছেলে মরে যাওয়ার চেয়ে কম? আমার একটি ভাই দুই বছর বয়সে চলে যায়, কিন্তু থাক সে কথা—

* * *

এ-দেশে গ্রীষ্মের দিন যে কত দীর্ঘ হতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের মনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকলেও তার অভিজ্ঞতা না হওয়া পর্যন্ত সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয় না। তুলনা দিয়ে বলতে পারি পূর্ণচন্দ্র অমাবস্যায় কি পার্থক্য সেটা গ্রামের লোক যতখানি জানে চৌরঙ্গীর লোক কি ততখানি বোঝে? আমিও এ-দেশের শহুরে; গ্রামে এসে এই প্রথম 'নিদাঘের দীর্ঘদিন' কি সেটা প্রত্যক্ষ হৃদয়ঙ্গম হল।

সূর্য তখনো অস্ত যায়নি। হঠাৎ বেখেয়ালে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি রাত আটটা! কিন্তু 'রাত আটটা' কি ঠিক বলা হ'ল? আটটার সময় যদি দিবালোক থাকে তবে তো সেটা এ-দেশে সকালের আটটা, দিনের আটটা। তা সে যাক্। শেক্স্পীয়র ঠিকই বলেছেন, 'নামেতে কি করে? সূর্যেরে যে নামে ডাকো আলোক বিতরে!'

মধুময় সে আলো। অনেকটা আমাদের কনে দেখার আলোর মত। কোনো-কোনো গাছে, ক্ষেতে ইতিমধ্যেই পাক ধরেছে। তাদের পাতা দেখে মনে হয়, সমস্ত দিনের সোনালী রোদ খেয়ে খেয়ে সোনালী হয়ে গিয়ে এখন তারাও যেন সোনালী আলো বিকিরণ করছে। কীট্স্ না কার যেন কবিতায় পড়েছিলুম, পাকা আঙুরগুলো সূর্যরশ্মির স্বর্ণসুধা পান করে করে টইটম্বুর হয়েই যাচ্ছে, হয়েই যাচ্ছে, আর তাদের মনে হচ্ছে এই নিদাঘ রৌদ্রের যেন আর অবসান নেই। আমিও এগোচ্ছি আর ভাবছি, এ-দিনের বুঝি আর শেষ নেই। এতক্ষণে বুঝতে পারলুম মারিয়ানা যখন

আমাকে তাদের বাড়িতে রাতটা কাটাবার জন্য অনুরোধ করছিল তখন নানা আপত্তি দেখানো সত্ত্বেও এটা কেন বলেনি, রাতের অন্ধকারে আমি যাবো কি করে? আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলেও যেমন অতিথিকে ঠেকাবার জন্য শরৎ-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় এ অজুহাত তোলা চলে না, রাতের অন্ধকারে পথ দেখবেন কি করে?

গ্রামের শেষ বাড়িটার চেহারা দেখে আমার কেমন যেন মনে হল এ-বাড়িটার বর্ণনা কে যেন আমায় দিয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমার যাত্রারম্ভের সেই প্রথম পরিচয়ের—কি যেন নাম, হ্যাঁ, টেরমের, হ্যাঁ, এটা সেই টেরমের, যার বউ নাকি খাণ্ডার, এটা তারই বাড়ি বটে নিশ্চয়।

সাদা রঙের বুক অবধি উঁচু ফালি ফালি কাঠের গেটের উপর দুই কনুই রেখে আবার একটি রমণী। কই, খাণ্ডারের মত চেহারা তো ঠিক নয়। আর এই অসময়ে এখানে দাঁড়িয়েই বা কেন? তবে কি টেরমের এখনো বাড়ি ফেরেনি?

আমার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলল। দেখিই না পরখ করে। সত্যি খাণ্ডার, না, পথে যে সেই লড়াই-ফেরতা বলেছিল, একটু হিংসিবী এই যা। খাণ্ডার হোক্ আর যাই হোক্, আমাকে তো আর চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারবে না। আর খেলেও হজম করতে হবে না। এ-দেশে ভেজাল নেই। আমি নির্ভেজাল ভেজাল। ফুড-পইজনিঙে যা কাৎরাতে কাৎরাতে মরবে সে আর দেখতে হবে না। সখা টেরমেরও নয়া শাদি করে সুখী হবেন, কিংবা—কিংবা আকছারই যা হয়, যাদু টেবিটি পাবেন, পয়লা বউটি কত না লক্ষ্মী মেয়ে ছিল—খাণ্ডার তো নয়, ছিল যেন গ্রীষ্মের তৃষ্ণায় কচি শশাটি। অবশ্য ইতিমধ্যে যদি আমার ভ্রাতা ইব্বল এখানে এসে ডাক ছাড়ে, "হে বাতাপে! তুমি নিষ্ক্রান্ত হও।" তা হলে তো আর কথাই নেই। আমিও—মহাভারতের ভাষাতেই বলি—খাণ্ডারিনীর "পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করে সহাস্য-আস্যে নিষ্ক্রান্ত হব।"

ইতিমধ্যে আমি আমার লাইন অব্ অ্যাক্শন্ অর্থাৎ ব্যূহ নির্মাণ করে ফেলেছি।

কাছে এসে আমার সেই ছাতা হ্যাট হাতে নিয়ে প্রায় মাটি ছুঁইয়ে, বাঁ হাত বুকের উপর রেখে, কোমরে দু ভাঁজ হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে অর্থাৎ গভীরতম 'বাও' করে মধ্যযুগীয় কায়দায় বিশুদ্ধতম উচ্চারণে বললুম, 'গুটেন আবেন্ড, গ্নেডিগে ফ্রাউ' অর্থাৎ 'আপনার সন্ধ্যা শুভ হোক, সম্মানিতা মহিলা।'

এই 'সম্মানিতা মহিলা' বলাটা কবে উঠে গিয়েছে ভগবান জানেন। আজ যদি আমি কলকাতার শহরে কোনো মহিলাকে 'ভদ্রে' বলে সম্বোধন করি, কিংবা গৃহিণীকে 'মুগ্ধে' বলে কোনো কথা বোঝাতে যাই তা হলে যেরকম শোনাবে অনেকটা সেই রকমই শোনালো।

তাঁর গলা থেকে কি একটা শব্দ বেরুতে না বেরুতেই আমি শুধালুম, 'আপনি কি দয়া করে বলতে পারেন মেলেম গ্রামটি কোথায়?

অবাক হয়ে বললে, 'সে তো অন্তত ছ মাইল!'

আমি বললুম, 'তাই তো! তবে আমি নিশ্চয়ই পথ ভুল করে বসে আছি। তা সে যাকগে। আমি ম্যাপটা বের করে একটু-খানি দেখে নিই। এই হাইকিঙের কর্মে আজ সকালে মাত্র হাতেখড়ি কিনা।'

আমি ইচ্ছে করেই বাচালের মত হেসে হেসে কথাই কয়ে যেতে লাগলুম, 'থাকি বন্ শহরে। গরমের কলেজের ছুটিতে যে যার গেছে আপন বাড়ি। আমি কি করে যাই সেই দূর-দরাজের ইণ্ডিয়ায়? এই তো ম্যাপটা পেয়েছি। ঐযুযা টর্চটা আনিনি! বললুম তো হাতেখড়ি। তা সে—'

এতক্ষণে রমণী অবাক হয়ে সেই পুরনো—এই নিয়ে চারবারের বার—ইণ্ডার-ইণ্ডিয়ানার বুলেট পাকালে। সেটার আর পুনরাবৃত্তি করে কোনো লাভ নেই।

আমি বললুম, 'তা হলে আসি, মাদাম (যেন আমার পালাবার কতই না তাড়া!)। আপনি শুধু মোটামুটি দিকটা বাংলে দিন।'

কিন্তু ইতিমধ্যে দাওয়াই ধরেছে। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'চলুন। ঘরের আলোতে ম্যাপটা ভালো করে দেখে নেবেন।'

আমি আমতা আমতা করে বললুম, 'হ্যাঁ, মাদাম, তা মাদাম, কিন্তু মাদাম—'

অথচ ওদিকে দিব্য খোলা গেট দিয়ে তাঁর পিছন পিছন মারিয়ানার কার্লের মত নির্ভয়ে এগিয়ে চললুম। মনে মনে এক গাল হেসে বললুম, 'ট্রয়ের ঘোড়া ঢুকছে, হুঁশিয়ার।'

তবু বলতে হবে সাবধানী মেয়ে। রান্নাঘরে না নিয়ে গিয়ে, গেল ড্রইংরুমে।

পাঠক আমাকে বোকা ঠাউরে বলবেন, ঐতেই তো আমাকে সম্মান দেখানো হলো বেশী; কিন্তু আমি তা পূর্বেই নিবেদন করেছি এ-দেশের গ্রামাঞ্চলে হৃদ্যতা দেখাতে হলে কিচেন, লৌকিকতা করতে হলে ড্রইংরুম।

আমাদের পূর্ব বাঙলায় যেরকম 'আত্তি' করতে হলে রাত্রিবেলা লুচি, আপন জন হলে ভাত॥

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

আজকাল আমাদের যন্ত্রসংগীত যে উন্নত পর্যায়ে পেঁৗছেছে তাতে নানারকম বৈচিত্র্যের প্রচেষ্টায় অকুতোভয়েই তৎপর হওয়া চলে। হার্মনি নিয়ে ছোট খাটো পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে; ফল মন্দ হয়নি। এ চেষ্টা আরো ব্যাপকভাবে হলে প্রগতির একটা পথ খুলে যাবে। তবে, আমাদের নিজেদের বৈশিষ্ট যাতে বজায় থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। এশিয়ার কয়েকটি দেশে হার্মনি এমনভাবে প্রচলিত যে সন্দেহ হয় সে সংগীত আদৌ সে দেশের কিনা। তারা ইচ্ছে করেই নিজেদের বৈশিষ্টকে বিলুপ্ত করেছে যেমন বর্জন করেছে তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার। আমরা সে ইচ্ছা করি না কেননা তাতে আর্টের দিক থেকে আমরা অধিকতর লাভবান হবনা। হার্মনিকে মানানসই ভাবে নিতে পারলেই আমাদের সংগীতে সৃষ্টির বৈচিত্র্য আসবে। এই প্রসংগে রবীন্দ্রনাথের পারস্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা মনে আসে। তেহেরানে কবি একটা কনসার্ট শুনেছিলেন তাতে ছিল একটি তারের বাজনা, একটি বাঁশি এবং অনেকগুলি বেহালা। প্রধান শিল্পী কবিকে জানিয়েছিলেন যে তাঁরা তাঁদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে হার্মনি সম্পাদন করতে চান। কবি এই প্রচেষ্টায় উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। এ সম্পর্কে কবির উক্তি উদ্ধৃত করি—

"এশিয়ার প্রায় সকল দেশেই আজ পাশ্চাত্য ভাবের সঙ্গে প্রাচ্য ভাবের মিশ্রণ চলেছে। এই মিশ্রণে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা। এই মিলনের প্রথম অবস্থায় দুই ধারার রঙের তফাৎটা থেকে যায় অনুকরণের জেরটা মরে না। কিন্তু আন্তরিক মিলন ক্রমে ঘটে যদি সে মিলনে প্রাণশক্তি থাকে, কলমের গাছের মতো নূতনে পুরাতনে ভেদ লুপ্ত হয়ে ফলের মধ্যে রসের বিশিষ্টতা জন্মে। আমাদের আধুনিক সাহিত্যে এটা ঘটেছে, সংগীতে কেন ঘটবে না বুঝিনে। যে-চিত্তের মধ্যে দিয়ে এই মিলন সম্ভবপর হয় আমরা সেই চিত্তের অপেক্ষা করছি, য়ুরোপীয় সাহিত্য-চর্চা প্রাচ্য শিক্ষিত সমাজে যে পরিমাণে অনেকদিন ধরে অনেকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছে য়ুরোপীয় সংগীতচর্চাও যদি তেমন হত তাহলে নিঃসন্দেহেই প্রাচ্য সংগীতে রসপ্রকাশের একটি নূতন শক্তি সঞ্চার হত। য়ুরোপের আধুনিক চিত্রকলায় প্রাচ্য-

চিত্রকলার প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে এতো দেখা গেছে; এতে তার আত্মতা পরাভূত হয় না, বিচিত্রতর প্রবলতর হয়।"

ভারতবর্ষে হার্মনি প্রয়োগের যথেষ্ট সুবিধা আছে কারণ ভারতীয়দের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা ভারতীয় এবং পাশ্চাত্তা উভয়সংগীতে পারদর্শী। কতটুকু পাশ্চাত্ত্য সংগীত থেকে নিতে হবে এবং কি ভাবে তাকে আমাদের সংগীতের সংগে মিলিয়ে দিতে হবে সে সম্বন্ধ তাঁদের ধারণা স্পষ্ট। অতএব হিসেব করে হার্মনি যোজনা করলে প্রকাশের দিক থেকে একটা সুযোগ্য মাধ্যম পাওয়া যাবে। মেলডিতেও বৈচিত্র্য আছে, তবে মূল একটি সেণ্টিমেণ্টকে কেন্দ্র করেই তার প্রকাশ ঘটে। হার্মনির ক্ষেত্রে বিবিধ ঠাটে বিবিধ যন্ত্রের ব্যবহার হওয়াতে বিচিত্র ভাবগুলি নানা রূপে, বর্ণে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কোনও একটা থীম বা আখ্যানভাগকে অবলম্বন করে সংগীতরচনা করলেও হার্মনির যথেষ্ট সুবিধা পাওয়া যায়। এই রকম সংগীতপ্রচেষ্টা (হার্মনির সংযোগে বা অসংযোগে) আমাদের দেশে কিছু কিছু হয়েছে। এক সময় তিমির-বরণ এই চেষ্টা করেছিলেন। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" নিয়ে রবিশংকর যে সংগীত রচনা করেছেন সেটি সম্প্রতি বেতারে প্রচারিত হয়েছে। কয়েক বৎসর ধরে এই রকম আরও কিছু উদ্যমের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সব মিলিয়ে এর সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলেই মনে হয়। আমাদের আশার কারণ এই যে এই ধরণের সংগীত আমাদের জীবনের সুখ-দুঃখের বিচিত্র ধারার সংগে একটা প্রত্যক্ষ যোগ রাখতে সমর্থ হবে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তারও একটা বড় কারণ এই যে নৃত্যনাট্যে এমন একটা বিষয় বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় যা আমাদের প্রত্যক্ষ জীবন-ধারার সংগ সম্পৃক্ত। উপন্যাসে যেমন কাহিনী আমাদের চিত্তবিনোদন করে এবং লেখার আর্ট আমাদের সৌন্দর্য পিপাসু মনকে পরিতৃপ্ত করে নৃত্যনাট্যগুলিও সেই রকম কাহিনী এবং আর্ট—দুদিক থেকেই আমাদের মনের তৃপ্তিসাধন করছে। যন্ত্র-সংগীতও যদি এইভাবে রচিত হয়—তাহলে তা উভয়দিক দিয়ে তৃপ্তিপ্রদায়ক হবে। আমাদের সগীত অতিমাত্রায় ভাব-প্রধান। এটা একদিকে মস্ত গুণ হলেও অপরদিকে দোষও বটে কেননা এক্ষেত্রে বাস্তবকে সযত্নে এড়িয়ে আসা হয়। কিছু বাস্তবের স্পর্শ না পেলে আমরা যেন তৃপ্তি পাই না। আমাদের সংগীতে এই অভাব পূরণ করবার সময় এসেছে। বাস্তব এবং বাস্তবাতীত ভাব এই দুইটির সমন্বয় হলে এমন একটি সংগীত সৃষ্ট হবে যার পরি-কল্পনা ইতিপূর্বে হয়নি। তবে, একটা বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে বাস্তব অতিবাস্তবে পর্যবসিত না হয়। আধুনিক বাংলা গানে বাস্তবধর্মী সংগীত আজও উৎকৃষ্ট আর্টের স্তরে পৌঁছোতে পারেনি এই কারণে। আধুনিক সুরকার-গণ যে পরিমাণ বাস্তবকে তুলে ধরেছেন সেই পরিমাণে সাজেস্টিভ হতে পারেননি। অর্থাৎ, ব্যঞ্জকতার গুণ তাঁদের সংগীতে অনেকটাই কম। অথচ সংগীত যেহেতু আর্ট সেহেতু বর্ণনার বাহুল্যকে সংযত করা দরকার এবং সেক্ষেত্রে এমন প্রয়োগ-শিল্পের প্রয়োজন যা ইঙ্গিতে নির্দিষ্ট বস্তুকে বোঝাতে সমর্থ। মেলডি এবং হার্মনি এই দুটি রীতির মিশ্রণ এবিষয়ে আমাদের শিল্পীদের নবতর বিচিত্র রচনায় সার্থকতা প্রদান করবে—এ আশা দুরাশা নয়।

(৩১)

ট্র্যাভেল এজেন্টের অফিস থেকে নেমে এল লীলা চৌধুরী। সঙ্গে তার অমিতাভ। লীলা চৌধুরী আগের চেয়েও যেন রোগা হয়েছে' ফিকে সবুজ রঙের সিল্ক শাড়ীতে বেশ মানিয়েছে তাকে। দেখলেই বোঝা যায় মোটেই যত্ন করে সে প্রসাধন করেনি, কোনরকমে মুখে খানিকটা পাউডার মেখে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এসেছে। এমন কি চোখের কোলগুলোতেও পেন্সিল টানেনি। তবু তাকে দেখতে ভাল লাগছে। রোল করে টানা চুলের সামনে ঢলঢলে মুখ-খানা পরিষ্কার হয়ে ফুটে রয়েছে।

লীলা চৌধুরী আজ অফিস যায়নি। আজ একবার ট্র্যাভেল এজেন্সিতে আসবার কথা ছিল বটে, কিন্তু সেজন্যে অফিস কামাই করার প্রয়োজন ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি সকাল থেকে লীলা চৌধুরীকে আলস্যে ধরছে। বিছানার উপর গড়িমসি করে উঠে মুখ ধুয়ে ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে সাড়ে ন'টা বেজে গেল। এর পর আর অফিস যাবার কোন মানে হয় না। অমিতাভকে বলা ছিল সাড়ে এগারটার সময় ট্র্যাভেল এজেন্সির সামনে অপেক্ষা করতে, তাই শাড়ী বদলে সোজা এখানে চলে এসেছে।

এখানে অবশ্য বেশীক্ষণ সময় লাগেনি, মাস দেড়েক বাদে 'স্ট্র্যাথমোর' জাহাজ সাউদামটন থেকে বোম্বাই যাবে, লীলা চৌধুরীর জন্যে ঐ জাহাজে বার্থ পাওয়া গেছে, সেই কথা জানাতেই লীলাকে তারা ডেকে পাঠিয়েছিল। এত তাড়াতাড়ি বার্থ পাওয়া যাবে লীলা আশা করেনি, হঠাৎ কয়েকজনের রিজার্ভেশান ক্যানসেল হওয়ায় জায়গা খালি হয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে লীলা বলল, আমার কিন্তু বড্ড খিদে পেয়েছে অমিত, চল যেখানে হোক ঢুকে পড়ি।

অমিতাভ আপত্তি করল না, পিকাডেলীতেই যখন এসে পড়েছি, চল লায়ন্স্ কর্নার হাউসে যাওয়া যাক।

একটু বাদে বলল, সত্যিই তা হলে তুমি চললে।

লীলা হাসে, অনেকদিন তো হ'ল, আর এখানে পড়ে থেকে কি হবে বল?

অমিতাভর চোখ ছলছল করে ওঠে, সবাই চলে যাবে, একলা আমি পড়ে থাকব। কি যে করব কিছুই বুঝতে পারি না।

—পড়াশুনো করছিস, ভালই তো।

অমিতাভ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, সকলেরই বুঝি পড়াশুনো হয় দিদি!

লায়ন্স্-এর দোকানে পৌঁছে ওরা উপরে উঠে গেল। দুজনে দু'খানা ট্রে হাতে নিয়ে রেলিং-এর ধার দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। পাশে সাজান রয়েছে নানারকমের খাবার। প্রত্যেকটি পদের উপর দাম লেখা। নিজেদের পছন্দ মত ট্রেতে খাবার সাজিয়ে নিয়ে লীলারা বেরিয়ে এল বড় ঘরে। সামনে কাউন্টার, টাকা দিল লীলা। পাশের ডেস্ক থেকে প্রয়োজন মত কাঁটা চামচ তুলে নিয়ে বসল টেবিলে।

বেশ বড় ঘর, অনেকে খাচ্ছে। ইচ্ছে মত স্বচ্ছন্দ আরামে এখানে খাওয়া যায়। খেতে খেতে অমিতাভ বলল, তুমি কিন্তু লণ্ডনকে খুব মিস করবে।

লীলা চোখ তুলে তাকাল, অমিতাভর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতে মৃদু হাসল সে, বলল, প্রথম প্রথম মিস করব বইকি। এত-গুলো দিন তোদের সঙ্গে কাটালাম। বিশেষ করে তোর কথা খুব মনে পড়বে।

—সত্যি বলছ?

—কেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

কথা বলতে গিয়ে অমিতাভর গলা ধরে আসে, বিশ্বাস কর, আমি তো ভাবতেই পারছি না তুমি চলে গেলে আমি একলা থাকব কি করে। তুমি তো জান জীবনে ভালবাসতে আমি কাউকে পারিনি, বোধ হয় কারুর কাছে ভালবাসা পাইনি বলেই। তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে আমার জীবনটা বদলে গেছে। তুমি যে

আমার কাছে কি তা বোধ হয় মুখে বলে কোনদিন বোঝাতে পারব না।

অমিতাভর প্রত্যেকটি কথা এত সত্য যে সহজেই লীলার মন স্পর্শ করল। যতদূর সম্ভব নরম গলায়-সে বলল, আমি বুঝতে পারি রে অমিত।

—তুমি কিছুই বুঝতে পার না। অমিতাভর চোখের দৃষ্টি বদলে যায়, নিজের বয়েসকে অতিক্রম করে সে কথা বলে, একদিন তোমার সংগে দেখা না হলে বড় কষ্ট হয়। কেন জানি না আমার ভয় হয় তুমি চলে গেলে আমি বোধ হয় অসুস্থ হয়ে পড়ব।

কথাটা লীলার কানে অদ্ভুত শোনাল, এ কথা ভাবছিস কেন?

—আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না দিদি, এক এক সময় নিজেকে আমি ঘেন্না করি, মনে হয় আমার মত অপদার্থের এ পৃথিবীতে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। আমরা সমাজের জঞ্জাল।

লীলা বাধা দেয়, কি আবোলতাবোল বকছিস্।

অমিতাভ চোখ নীচু করে থেকে অপরাধীর মত বলে, একটা কথা কাউকে বলতে পারিনি। যদি তুমি আমার ওপর রাগ না কর তো বলি।

অমিতাভর কথার ধরনে লীলা শঙ্কিত হয়, প্রশ্ন করে, কি কথা রে?

—আমি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছি।

—সেকি, কবে থেকে?

—প্রায় দু' মাস হলো। ভয়ে তোমায় বলিনি।

—কিন্তু ছেড়ে দিলি কেন?

অমিতাভ মাথা ঝাঁকুনি দেয়, লেখাপড়া করতে পারছিলাম না। বই নিয়ে বসি যখন মন কোথায় চলে যায়। একটা একজামিনে আমি পাশ করতে পারিনি। অন্য ছেলেদের কাছে নিজেকে হাস্যাস্পদ বলে মনে করি। প্রথম প্রথম স্কুল কামাই করতাম, তারপর আস্তে আস্তে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম। এখন ওরা আমার নাম কেটে দিয়েছে।

লীলা চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করে, মাকে এ কথা জানিয়েছিস?

—না। মা জানতে পারলে মনে খুব কষ্ট পাবেন। একটু চুপ করে থেকে অমিতাভ অধীর স্বরে বলে, সেইজন্যে তো আর এখানে আমার ভাল লাগছে না। তোমার সংগে আমাকে নিয়ে চল, আমি কলকাতায় ফিরে যাব। এবার তাই ভেবেছি মাকে সব কথা খুলে লিখব। কাঁড়ি কাঁড়ি পয়সা নষ্ট করে এখানে পড়ে থেকে কোন লাভ নেই। আমার দ্বারা লেখাপড়া হবে না।

ইচ্ছে করেই লীলা আর কথা বলল না। সে ভেবেছিল আজ হাতে খানিকটা ফালতু সময় আছে, লাঞ্চের পর অমিতাভকে নিয়ে দু-চারটে দোকানে বেড়াতে যাবে। কিন্তু অমিতাভর কথাগুলো শোনার পর আর ভালো লাগলো না। নীরস গলায় বলল, চল, বাড়ি ফিরে যাই।

এই ভাল-না-লাগার কারণ লীলাও যে খুব পরিষ্কার করে বুঝতে পেরেছিল তা নয়, কেন জানা নেই নিজেকে তার অপরাধী মনে হচ্ছিল। অমিতাভর সংগে এভাবে দিনের পর দিন গল্প করা, তাকে নিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়ানো, বোধহয় লীলার উচিত হয়নি। অমিতাভ ছেলেমানুষ, সে লেখাপড়া করছে কিনা, কাজে মন দিচ্ছে কিনা এসব বিষয়ে তার নজর রাখা উচিত ছিল। যদি অমিতাভর মা আজ লীলার কাছে এসব বিষয়ের জবাবদিহি চান সে তার কি উত্তর দেবে? যদিও জবাবদিহি করার কোন কথা ওঠে না, অমিতাভর মা তাকে কতটুকুই বা চেনেন, চিঠিপত্রেই যা আলাপ। তবু লীলার মনে হল সে অপয়া, তার সংস্পর্শে যে আসে তারই ক্ষতি হয়। তা না হলে লণ্ডনে আসার পর সরোজদার সংগে যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এভাবে তা নষ্ট হয়ে গেল কেন! নিজের বোন প্রমীলাকে সে অসুখী করেছে, স্বেচ্ছায় সে নির্বাসন দণ্ড নিয়ে চলে গেছে কার্ডিফে, তারপর এই অমিতাভ। পরম স্নেহে এই ছেলেটিকে সে কাছে টেনে নিয়েছিল, কিন্তু এই তার পরিণাম। অনুতপ্ত অমিতাভর মলিন মুখখানি দেখে লীলা মনে মনে যারপরনাই দুঃখ অনুভব করল।

এই দুঃখবোধ আরও গভীরভাবে প্রকাশ পেল বাড়িতে পৌঁছবার পর। পরিচারিকা এসে লীলার হাতে রেজিস্ট্রি-পোস্টে আসা একখানা জরুরী চিঠি দিল। কার চিঠি হতে পারে প্রথমটা লীলা বুঝতে পারেনি, পোস্ট অফিসের ছাপ লক্ষ করে দেখল কার্ডিফের চিঠি। অজানা আশঙ্কার

বুক কেঁপে উঠল লীলার। চিঠি পড়ে অতিমাত্রায় বিচলিত হল সে।

অমিতাভ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, কি লিখেছে চিঠিতে?

লীলা থেমে থেমে উত্তর দিল, প্রমীলার শরীর খুব খারাপ, হাসপাতাল থেকে জানিয়েছে অপারেশন করতে হবে।

—অপারেশন!

—হ্যাঁ। গ্যাস্ট্রিক আলসার ফরম করেছে। একটু থেমে লীলা চেঁচিয়ে ওঠে, এসব আমার জন্যে হচ্ছে, আমি অপয়া, আমি যাদের ভালবাসি সবাই কষ্ট পায়।

অমিতাভ বুঝিয়ে বলে, কি সব আবোল-তাবোল ভাবছ।

লীলা সজল কণ্ঠে বলে, তা না হলে প্রমীলার এরকম হ'ল কেন,

—সে ভাবলে তো চলে না, এখন কি করতে হবে তাই বল। চিঠির একটা জবাব দিতে হবে তো।

লীলা ভেঙে পড়ে, আমি আর কি বলব। সরোজদাকে একবার ফোনে দেখ।

অমিতাভ সরোজের অফিসে টেলিফোন করে হাসপাতালের চিঠির কথা জানাল।

সরোজ একটু ভেবে উত্তর দিল, লীলাকে বল তৈরী হয়ে নিতে, আমাদের কার্ডিফে যেতে হবে।

—কখন?

—আমি অফিসে ছুটির কথা বলছি, তুই লীলাকে নিয়ে চারটে নাগাদ পিকাডেলী স্টেশনে আয়। ঐখানে কথা হবে।

লীলা আর অমিতাভ চারটের আগেই গিয়ে পোঁছল পিকাডেলীতে, এখনও অফিস ফেরত যাত্রীদের ভিড় শুরু হয়নি। তা হলেও লোকচলাচলের কমতি নেই। আন্তর্জাতিক ঘড়ির সামনে লীলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। অমিতাভ গেছে সিগারেট কিনতে।

দূর থেকে হাসতে হাসতে কে যেন এগিয়ে আসছে। লীলা প্রথমটা বুঝতে না পারলেও পরে চিনতে পারল, সৌরেন। লীলার কাছে এসে হেসে কথা বলল, কতদিন তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়নি লীলা। কেমন আছ সব?

লীলা ছোট্ট উত্তর দিল, ভাল।

—কই, মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না।

লীলা অপ্রস্তুত হয়ে বলে, মানে প্রমীলার জন্যে একটু চিন্তিত আছি।

—প্রমীলা? কি হয়েছে ওর?

লীলা যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব প্রমীলার অসুখের কথা বলল। জানাল আজকের চিঠির কথা।

সৌরেন উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করে, তোমরা কবে যাচ্ছ কার্ডিফ?

—বোধ হয় আজ রাত্রে, কিংবা কাল সকালে।

সৌরেন ইতস্তত করে বলে, যদি আপত্তি না থাকে, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

লীলা সাগ্রহে বলল, বেশ তো, চল না। তোমাদের দেখলে প্রমীলা খুব খুশী হবে।

—বেশ, আমি তা হলে সরোজদাকে টেলিফোনে জিজ্ঞেস করে নেব কখন তোমরা যাচ্ছ। ছটা নাগাদ ওকে বাড়িতে পাব আশা করি?

ইচ্ছে থাকলেও সৌরেন আর দাঁড়াতে পারল না, আধঘণ্টার মধ্যে তাকে পোঁছতে হবে 'সোহো'র সেই পুরনো রেস্তরাঁয়। আগে থেকে কথা দেওয়া আছে। টিউব স্টেশন থেকে বেরিয়ে সৌরেন ঢুকল স্যাফটস্‌বেরী এভেনিউতে। প্রমীলার মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। দু বিনুনি করা ঢলঢলে মুখখানার উপর বড় বড় চোখ দুটো দেখলে মনে হত কেমন যেন বিষন্নতার ছাপ আছে সেখানে। প্রমীলা হাসত, কিন্তু হাসির অন্তরালে যে বেদনা লুকোনো আছে তা প্রকাশ পেত চোখের চাহনিতে।

প্রমীলার সঙ্গে দেখাও হয়নি অনেকদিন। এখন সে অসুস্থ, একবার তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করা সৌরেনের কর্তব্য বলে মনে হল। সেই জন্যে সে লীলাকে কথা দিয়ে এল কার্ডিফে যাবে বলে।

দু দিন আগে হলেও অবশ্য এ কথা দেওয়া

সোরেনের পক্ষে সম্ভব হত না। প্রতিদিন দ্পুরে বিকেলে যেতে হত তাকে রজতের কাছে, দ্' বেলাই তাকে খাওয়াতে হত। প্রথম প্রথম ভাল লাগলেও শেষের দিকে সোরেন যেত শ্ধ্ কর্তব্যের খাতিরে, বিশেষ করে রজতের একঘেয়ে কথাগ্লো শ্নতে আর ভালো লাগতো না। তা ছাড়া, নিজের জীবনেও ক্রমশ অশান্তি দেখা দিচ্ছিল। সোরেন সন্ধ্যেবেলাটা রজতের কাছে আটকে থাকত বলে এলিজাবেথ পড়ে যেত একেবারে একা। সে সব সময় চাইত, সোরেনকে সাহায্য করতে, রজতের ফ্ল্যাটে যেতে, কিন্তু সোরেনই তাতে বাধা দিয়েছে। ফলে মাঝে মাঝে এলিজাবেথ বিরক্ত না হয়ে পারেনি। হয়ত বলেছে, কি জানি সোরেন, মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার কাজের মধ্যে কোন যুক্তি নেই। রজতকে তোমার এত ভয় কিসের?

সৌরেন উত্তর দিয়েছে, তুমি বুঝতে পারবে না লিজি, ও একটা বিদ্‌ঘুটে লোক।

—যদি ভালো না লাগে তার সংগে মিশো না।

সৌরেন মুখ নীচু করে উত্তর দিয়েছে, কি করব বল। রজত আমার বন্ধু। তার উপর সে অসুস্থ।

এলিজাবেথ স্থির গলায় প্রশ্ন করে, তুমি কেন আমায় ওর কাছে নিয়ে যেতে চাও না?

—আমার ভয় হয় পাছে রজত তোমায় অপমান করে।

—আমার অপরাধ?

—তুমি ইংরেজ।

বিরক্তিতে এলিজাবেথ উঠে পায়চারি করে, যদি তোমার বন্ধু আমাকে ভালভাবে নিতে না পারে আমার মনে হয় তোমার উচিত তাকে পরিত্যাগ করা।

সৌরেন নরম সুরে বলে, এ ধরনের কথা তোমার মুখে শোভা পায় না লিজি। একবার রজতের কথা ভাবো, জীবনে সে কি পেয়েছে? Completely frustrated একটা লোক। তাকে যদি আমিও দূরে সরিয়ে দিই, সে বাঁচবে কি করে বলতে পারো?

এলিজাবেথ প্রথমটা কোন উত্তর দেয় না, পরে বলে, আমি জানি তোমার মনটা খুব নরম সৌরেন। অন্যের দুঃখ কষ্ট বড় সহজে তোমাকে কাতর করে, কিন্তু এর বিপদ কি জানো? অন্যদের দুঃখের কথা ভাবতে গিয়ে নিজেকে না অসুখী করে ফেলো।

—এ কথা বলছ কেন লিজি?

এলিজাবেথ উদাস কণ্ঠে বলে, ঐখানেই বোধ হয় তোমার সংগে আমার তফাত। মোটেও ভেবো না আমি তোমাকে স্বার্থপর হতে বলছি। স্বার্থপরতাকে আমি মনে-প্রাণে ঘৃণা করি। কিন্তু তাই বলে নিজের জীবন সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া যায় না। সেটাও মহাপাপ।

এলিজাবেথ এ প্রসংগ নিয়ে আর বেশী কথা বলেনি। কিন্তু সৌরেন লক্ষ করেছে সেইদিন থেকে কেমন যেন সে আনমনা হয়ে গেছে। যেটুকু সময় দেখা হয় দু-চারটে মামুলী কথা ছাড়া আর কিছু বলে না, আগের মত কখন রাত্রে সৌরেন বাড়ি ফিরবে বলে জেগে বসে থাকে না। বেশীর ভাগ সময় কাজকর্ম নিয়ে মেতে থাকে।

দু দিন আগে জানাল, সৌরেন এই শনি-রবিবার আমি বাবার কাছে যাচ্ছি।

এলিজাবেথের বাড়ি যাবার কথা সৌরেন আগে শোনেনি, তাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, হঠাৎ, কি ব্যাপার?

—যাই, ঘুরে আসি। অনেকদিন দেখা হয়নি তো।

—সোমবার ফিরে আসছ তো?

এলিজাবেথ হাসল, ইচ্ছে তো তাই, তা ছাড়া আফিসও আছে।

সৌরেন দুষ্টুমি করে বলে, শুধু অফিস, আর আমি নেই।

এলিজাবেথ সৌরেনের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হ্যাঁ, তুমিও আছ। বড় বেশী আছ।

—তার মানে?

এলিজাবেথ হাসবার চেষ্টা করল, না, এমনি বললাম।

আজ শুক্রবার। অফিস থেকে এলিজাবেথ আর বাড়ি ফিরবে না, সোজা চলে যাবে দেশের বাড়িতে। বেচারা মনে দুঃখ পেয়েছে, কিন্তু সৌরেনের কি করবার ছিল। দু দিন বাদে দেশ থেকে ফিরে এসে এলিজাবেথ নিশ্চয় সব বুঝতে পারবে। এ কথা আরও সে ভাবতে পারছে এই জন্যে, আজ থেকে আর তাকে রজতের কাছে আগের মত যেতে হবে না। সে ছুটি পেয়েছে।

আজ দুপুরবেলা লাঞ্চে বেরবার আগে রজত ফোন করল, গলায় খুশী উপছে পড়ছে, সৌরেন, আজ থেকে তোর ছুটি।

— সে কি রে, আমি তো এখুনি স্যান্ড-উইচ নিয়ে তোর বাড়ি যাচ্ছিলাম।

রজত বলল, আর শুকনো স্যান্ডউইচ নয়, গরম মাংস খাব। নাকে তার গন্ধ আসছে।

—বলিস কি, রাতারাতি এ ভাগ্য পরিবর্তন?

—এই নে, কথা বল।

একটু পরেই অন্য দিক থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এল, হ্যালো সৌরেন, কেমন আছ?

অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। সৌরেন খুশী হয়ে প্রশ্ন করল, মারিয়া না? কবে এলে? কোন খবর দাওনি কেন?

মারিয়া তরল গলায় উত্তর দেয়, আজ সকালে এসে পৌঁছেছি। দেখা হলে সব বলব।

—কখন তোমার সংগে দেখা হবে? রাত্রে যাব?

—নিশ্চয় আসবে। তবে বিকেলে সাড়ে চারটে নাগাদ, আমি থাকব সোহোতে। যদি সময় পাও তো এসো না, দরকার আছে।

—বেশ তো, যাব। সেই পুরনো রেস্তরাঁয়?

—হ্যাঁ। মারিয়া জোর দিয়ে বলল, ঠিক এসো কিন্তু।

সৌরেন এখন সোহোতেই যাচ্ছে মারিয়ার সংগে দেখা করার জন্যে। মারিয়া যখন এসে গেছে, রজতের ভাবনা আর তাকে করতে হবে না। এলিজাবেথও দু দিন লন্ডনে থাকবে না, অতএব এর মধ্যে কার্ডিফে গিয়ে যদি প্রমীলার সংগে দেখা করে আসা যায়, মন্দ কি। (ক্রমশ)

(সি ৫৮৭৮)

তপন আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রশ্ন করল : তোমার ধারণা—তুমি সাহিত্যিক? কথাটা মর্মে গিয়ে বিঁধল। গোটা কয়েক গল্প লিখে নিজের সম্বন্ধে ধারণাটা জন্মাতে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি একজন সমালোচক আমার লেখার ওপর আড়াই লাইন মন্তব্য করে জানিয়ে দিয়েছেন যে কলম ধরাটাই নাকি আমার পক্ষে অনধিকার-চর্চা। তারপর থেকে—

কাতর হয়ে বললুম, না ভাই, না। আমি ওসব উঁচুদরের জীব নই।

তপন একমত হল। বললে, নও যে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তুমি এক নম্বরের অপদার্থ আর আড্ডাবাজ। আসল কথা হচ্ছে, কাল সারাদিন তুমি তাস খেলবে আর সন্ধ্যেবেলা নিশ্চয় হিন্দী ফিলিম দেখতে যাবে। তোমার যদি এতটুকুও ইম্যাজিনেশন থাকত, তা হলে এমন সুযোগ তুমি কিছুতেই ছাড়তে না। পাহাড়ের কোলের ভেতরে একটি ছোট বাংলো—পাশ দিয়ে তার ঝিরিঝিরি ঝরনা—বনের মধ্য থেকে অচিন পাখির ডাক—

কলেজের পড়বার সময় তপনের তোৎলামো ছিল। ক্রিকেটকে বলত : 'ক্-ক্-কঃ-রিকেট্', কিন্তু ব্যাঙ্কে একটা ভালো চাকরি পাওয়ার পর ভাষার ওপর ওর বেশ দখল এসেছে দেখা গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, অচিন পাখিরাই বুঝি ডাকাডাকি করে ওখানে? চেনা পাখিদের বোধ হয় ডাকতে নেই?

তপন চটে গেল।

—ইয়ার্কি করতে হবে না। ইচ্ছে হয় চলো—নইলে আমি একাই যাব। ওখানে প্রচুর বনমুরগী আছে শুনেছি, নিকুঞ্জদার বন্দুকও রয়েছে—

এইবারে আমি আকর্ষণ বোধ করলুম।

—অনেক বনমুরগী আছে বুঝি? সেগুলো খেতেও নিশ্চয়—

—অদ্ভুত। কিন্তু তোমার তো ওসবে ইণ্টারেস্ট নেই। তুমি পোস্টমাস্টারের ওখানে গিয়ে সারা দুপুর তাসই খেলো। আমি একাই বেরিয়ে পড়ব ভোরের বাসে।

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, না-না—একটু ঠাট্টা করছিলুম। আমিও যাব। সত্যি বলছি ভাই, পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটি বাংলো—ঝিরিঝিরি ঝরনা, আর কী বলে—ওই অচিন পাখির ডাক—ওসব আমার ভালোই লাগে।

এইখানে ব্যাপারটা একটু খুলে বলি।

বছরখানেক হল, হিমালয়ের কোলের কাছে এই ছোট শহরটিতে বদলি হয়ে এসেছি। এবং যেমন হয়ে থাকে— কিছু-দিনের ভেতরেই পাহাড়-জঙ্গলের ওপরে অরুচি ধরে গেছে। অফিসে ছ'টা দিন গাধার খাটুনি—রবিবারের দুপুরে পোস্ট মাস্টারের ওখানে তাসের আড্ডাটার জন্যে মনটা আকুল হয়ে থাকে।

তপন এই শহরেরই ছেলে। কলকাতার কলেজে সহপাঠী ছিল, এখানে এসে আবার দেখা হয়ে গেছে। কোনোদিন কবিতা লেখেনি বলে বরাবরই বেশ গভীর ধরনের কবি। বিকেলবেলা গড়ের মাঠে ওর সঙ্গে বেড়াতে গেলে ফিরে আসা শক্ত হয়ে দাঁড়াত। বলত : 'এই সুন্দর সবুজ ঘাস ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না।' আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'এখনো বুঝি তোমার পেট ভরেনি?' তারপর হপ্তা দুয়েক কথাবার্তা বন্ধ ছিল।

কিন্তু চিরকাল এই বনজঙ্গলের দেশে কাটিয়েও অচিন পাখির ডাকে মন উদাস হয়ে যায়—ও যে এত বড় মহাকবি আমার তা জানা ছিল না। ক'দিন ধরেই বলছিল, ওর মামাতো ভাই নিকুঞ্জদা নাকি এক আশ্চর্য প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করেন। ও সেখানে কখনো যায়নি, তবে শুনেছে তার চারদিকে ঘন বন, নীল পাহাড়ের মায়া, গান গাওয়া ঝরনা—ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে কোন একটা রবিবারে ও সেখানে যেতে চায় এবং যেহেতু আমি কখনো কখনো দুটো একটা গল্প লিখে থাকি, সুতরাং—

মাসখানেক ধরে নানাভাবে আমি ওকে ঠেকিয়ে রেখেছিলুম। শেষ পর্যন্ত আর পারা গেল না। অচিন পাখির ডাক নয়—বনমুরগীর সম্ভাবনাই আমাকে উদাস করল। মুরগীর অসম্ভব দাম এখানে—গত তিন মাসের ভেতরে রসনার সঙ্গে

তাদের সম্পর্ক ঘটেনি। তপন যত খুশি প্রকৃতির শোভা দেখুক, আমি অন্যদিক থেকে পুষিয়ে নেব।

অতএব পরদিন বেরিয়ে পড়া গেল।

বাসে ঘণ্টা দেড়েকের রাস্তা। নামিয়ে দিলে মাঠের মাঝখানে। খবর নিয়ে জানা গেল, প্রায় মাইল দুয়েক হাঁটতে হবে।

—বলো কি তপন, দু মাইল!

তপন বললে, তাতে কী! গান গাইতে গাইতে চলে যাব।

তার মানে এই নয় যে তপন খুব ভালো গাইয়ে। প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক ক্ষমতায় সে গান গেয়ে থাকে এবং তার এ ক্ষেত্রে একটা আশ্চর্য মৌলিকতা আছে। এক সুরে এক গান সে দুবার গেয়েছে, পরম নিন্দুকেও তার সে অপবাদ দিতে পারবে না।

বললুম, থাক—থাক, গানের দরকার নেই। মানুষের আর্টিফিশিয়াল গানে এমন ন্যাচারাল অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ারটা মাটি হয়ে যাবে। তার চাইতে জোর পায়ে এগোনো যাক।

তপন একবার সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকালো। তারপর হাঁটা শুরু করলুম দুজনে।

আধ মাইলটাক যেতেই পায়ে চলা পথের দু ধারে ঘন হয়ে নুয়ে পড়ল শ্যাম লতা আর ঘাসের বন। নীল পাহাড় ছিল বটে, কিন্তু দশ মাইলের এদিকে নয়। বুক সমান জঙ্গল ঠেলে এগোতে এগোতে আমি শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে পড়লুম।

—এই রাস্তা?

—এই রাস্তা।

চুলকোতে শুরু করল

—কিন্তু এ পথ দিয়ে তো মানুষ যায় মনে হয় না। বাঘ-ভালুকের মুখে নিয়ে যাচ্ছ নাকি?

তপন ভ্রূকুটি করে বললে, শহুরে চাল ছাড়ো। গ্রামের রাস্তা এই রকমই হয়ে থাকে। এই শ্যামল বনানী—পাখির ডাক—এই নিবিড় ঘাস—উঃ!

অগত্যা আমিও বলতে যাচ্ছি—

'আহা—আঃ'—হঠাৎ দেখি নিদারুণভাবে পা চুলকোতে শুরু করেছে তপন।

—কী হল?

—তোমার কাছে তেল-নুন কিছু আছে হে সুকুমার?

তেল-নুন! আমি আকাশ থেকে পড়লুম।

—তেল-নুন কোথায় পাব? আমি কি পকেটে করে রান্নাঘর নিয়ে বেড়াচ্ছি নাকি?

তপন একটু অপ্রতিভ হল: না—না, তা নয়—মানে বিছুটি লাগল কি না। বড্ড চুলকোচ্ছে।

বললুম, ওটা যে প্রকৃতির স্নেহের পরশ ভাই। আঘাত সে যে পরশ তব—

—থামো—থামো!—তপন এগিয়ে চলল গোঁজ হয়ে—মাঝে মাঝে নুয়ে পড়ে পা চুলকোতে লাগল। আমিও হুঁশিয়ার হয়ে গেছি—পায়ে চলা পথটায় চোখ রেখে এগোচ্ছি সাবধানে।

—তোমার নিকুঞ্জদা এই জঙ্গলে কী করেন হে?

তপন বিকৃত মুখে বললে, ব্যবসা!

—এই বনের ভেতরে কিসের ব্যবসা? কার সঙ্গেই বা ব্যবসা? বাঘের সঙ্গে নাকি?—এবার আমার মনে একটা কূট সন্দেহ উঁকি দিতে লাগল: আমরা তাঁর দোকানের মাল হতে যাচ্ছি না তো?

—ফাজলেমি ভালো লাগছে না সুকুমার। ভীষণ জ্বালা করছে পায়ে।

—তোমার নিকুঞ্জদা যদি বাঘের কাছে

আমাকে......নিয়েই পড়ল

আমাদের রিক্রি করেন তা হলে যে আরো খারাপ লাগবে।

—আঃ—থামো না!—তপনের গলার আওয়াজেও এবার অস্বস্তি ফুটে বেরুল। মনে হল, সন্দেহটা যে তারও না জেগেছে এমন নয়।

বললুম, ফিরে গেলে কেমন হয়?

—ফিরব কেন? ওই তো দেখা যাচ্ছে।

তাই বটে। খানিক দূরে গোটা কয়েক টিনের চালা চোখে পড়ল। আর টিনের চালা যখন—তখন দোকানে বাঘ ছাড়া অন্য খদ্দেরও থাকতে পারে। বেশ ক্ষিদেও পাচ্ছিল, একটু তাড়াতাড়িই পা চালালুম দুজনে।

বনটা খানিক পরিষ্কার হয়ে এসেছে। সামনেই হাত সাতেক চওড়া একটা পাহাড়ী নালা। নুড়ির ওপর দিয়ে তিরতির করে নীলচে জল চলেছে।

তপন বললে, এ দেশে এগুলোকে জম্পই বলে।

—জম্পই? এর ভেতরে ঝম্প দিতে হয় বোধ করি?

—না—না, ঝম্প দিতে হবে কেন? এক হাটু জলও হবে না। এই দ্যাখো না—

জুতো হাতে নিয়ে তপন নামল, আমিও নামলুম। তিন চার পা এগিয়েই এক প্রচণ্ড লাফ তপনের।

—উঃ, গেছি-গেছি। বিছুটিতে জল লেগে—

বলেই জলের মধ্যে এক অপরূপ ভৈরব নৃত্য! বেশীক্ষণ নয়, একটু পরেই পিছল নুড়িতে পদস্খলন। শুধু ঝপাত করে নিজেই যে পড়ল তা নয়—পড়বার আগে আমাকেও জাপটে ধরল—নিয়েই পড়ল!

জম্পই থেকে ঝম্পই দিয়ে দুজনে যখন উঠে এলুম, তখনকার কথা না বলাই ভালো। তপন খোঁড়াচ্ছে এবং দ্বিগুণ বেগে পা চুলকোচ্ছে। চোট আমারও একটু লেগেছিল, তার চাইতেও নিদারুণ মনোব্যথায় ভাবছিলুম শখের নতুন জুতো জোড়া আমার গেল!

চারদিকে নানারকম অচিন পাখি ডাকছিল তখন। কিন্তু তপনকে বিশেষ উৎসাহিত মনে হল না।

নিকুঞ্জদা বাংলোয় থাকেন না—থাকেন দুখানি টিনের ঘর নিয়ে। আর ব্যবসাটাও বোঝা গেল এইবারে। সাইনবোর্ডে পরিষ্কার বাংলায় লেখা: লাইসেন্সপ্রাপ্ত গাঁজার দোকান! ভেণ্ডার শ্রীনিকুঞ্জবিহারী রায়।

বললুম, এদিককার বাঘেরা বুঝি গাঁজা খায়?

তপন এবার খিঁচিয়ে উঠল: বাঘে গাঁজা খাবে কেন? দূরে দূরে বস্তি দেখছ না? ওরাই কেনে।

—অঃ!

কিন্তু কুক্ষণেই বেরিয়ে পড়া গিয়েছিল। দোকানে নিকুঞ্জদাকে পাওয়া গেল না। একমুখ হেসে তাঁর পুরোনো চাকর রামজী অভ্যর্থনা করল তপনকে।

—খোবোর না দিয়ে কেন আসিয়েসেন? বাবু তো সবেরে গেলো ময়নাগুড়ির হাট, ফিরতে সাঁঝ হোবে।

—সাঁঝ হবে কি রে? বিকেলে আমরা চলে যাব যে! কাল অফিস।

রামজী বললে, হাঁ, সাঁঝ হোবে। তো বৈঠেন। চা-পানি করিয়ে দিই, খানা পাকাই।

নিকুঞ্জদার ঘরের চাবি রামজীর কাছেই ছিল, খুলে বসতে দিলে। নীচু টিনের ঘর, ময়লা ইজিচেয়ার একখানা, একটা ক্যাম্প খাট, লণ্ঠন, গোটা দুই-তিন ট্রাঙ্ক আর সুটকেস, খাতাপত্র, পঞ্জিকা, কয়েকটা মাসিক পত্র, এক কোণে লম্বা একটা গাদা বন্দুক। ভিজে জামা কাপড় ছেড়ে—নিকুঞ্জদার দুটো ময়লা লুঙ্গি পরে বসলুম দুজনে।

আমি ইজিচেয়ারে, তপন ক্যাম্প খাটে।

বললুম, পরিবেশটি ভারী মনোরম—কী বলো?

—হুঁ!—তপন হঠাৎ তড়াক করে নেমে পড়ল: ইঃ, পা-টা আবার চুলকে উঠল। যাই—রান্নাঘর থেকে একটু নুন-তেল লাগিয়ে আসি।

তপন বেরিয়ে গেল, আমি পঞ্জিকাটা টেনে নিয়ে অতি বৃহৎ লাল মুলো আর ড্রামহেড বাঁধাকপির (জলদি) সচিত্র বিজ্ঞাপন পড়তে লাগলুম। একটু পরেই রামজী দু কাপ চা আর খান চারেক নেতিয়ে পড়া বিস্কুট এনে হাজির করল।

পাকা শিকারীর মত হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

বললে। আভি খানা পাকিয়ে দিচ্ছি।

পায়ের পরিচর্যা করে তপন ফিরে এল। বললে, কী খাওয়াবি বল তো?

—ডাল হোবে, ভাত হোবে, আলুর চোখা হোবে!

আঁ! দেড় ঘণ্টা বাস জার্নি করে—দু মাইল জংগল ভেঙে—আছাড় খেয়ে, ভাত-ডাল-আলুর তরকারি!

তপন বললে, দূর! মুরগী রান্না কর।

—মুরগী আভি মিলবে না। বিকালমে লিয়ে আসব।

—বিকেল পর্যন্ত এই ধ্যাধ্যেড়ে জংগলে পড়ে থাকতে বয়ে গেছে!—বিকট মুখে অকৃপণ স্বীকারোক্তি করল তপন : এই তো বন্দুক রয়েছে। বনমুরগী মেরে নিয়ে আয়!

রামজী হাসল : আরে, উ বহুৎ ঝঞ্ঝাট। তামাম দিনমান ঢুঁড়লে এক আধঠো মিলতে পারে। জংগলমে ঘুমতে হোবে।

তপন প্রায় চিৎকার করে উঠল।

—তুই একটা রাবিশ! চারদিকে এত জংগল—বনমুরগী মিলবে না? আলবৎ মিলবে! চল সুকুমার, চা খেয়েই আমরা বেরোচ্ছি। মুরগী না খেয়ে এখান থেকে ফিরব না।

উৎসাহ দিয়ে বললুম ঠিক। একেই বলে পৌরুষ!

সেই বিরাট গাদা বন্দুক পুরে নিয়ে শিকারে বেরুনো গেল।

গায়ে গেঞ্জি, পরনে ময়লা লুংগি, পায়ে সপসপে ভিজে জুতো—আদর্শ শিকারীর চেহারা। শ্যামলতা আর ঘাসবন ঠেলে, ছোট ছোট বস্তি পাশে রেখে মুরগী শিকারে চলেছি। অচিন পাখির ডাক কানে এল, দু চারটে নেড়ী কুকুর চোখে পড়ল, নালার পাশ থেকে বক উড়ে গেল—কিন্তু কোথায় বনমুরগী! একটা ঘুঘু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

ঘণ্টাখানেক হাঁটাহাঁটি করে বললুম, ব্রাদার, এবার ফেরো। বেলা বারোটা বাজে—কপালে ডাল আর আলুর চোখাই নাচছে আজ। বনমুরগী আর একবার হবে।

ফস করে তপন একবার পা-টা চুলকে নিলে। তারপর কঠিন মুখে বললে, কভি নেহি। মুরগী মেরে তবে ফিরব।

—বেশ তো, প্রতিজ্ঞা পালন কালকেও করা যেতে পারে। গোটা চারেক টাকা আমায় দিয়ো—বাজার থেকে বড় দেখে একটা কিনে এনে দেব। তারপর নির্মমভাবে তুমি সেটাকে—

—স্টপ!—তপন আমার ঘাড়ে একটা থাবড়া দিলে : লুক!

তাই তো—মুরগীই বটে। মানে, বেশ বড়ো সাইজের মোরগ একটি। জংগলের ধারে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

তপন পাকা শিকারীর মতো হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। চোখ বুজে বন্দুক বাগিয়ে—ওয়ান, টু—থ্রী—ধ্রাম্!

সংগে সংগে কাঁধে কুঁদোর গুঁতো খেয়ে তপনও ধ্রাম্! ভাগ্যিস মাটিতে বসে পড়েছিল—নইলে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত।

তপনকে টেনে তুললুম।

—এই গাদা বন্দুকগুলো থার্ড ক্লাস! এমন ধাক্কা মারে! একটু হলেই কলার বোন ভেঙে যেত।

—তা হোক—তা হোক। বড় শিকারীরাও কুঁদোর ঘায়ে পড়ে যায়। জিম করবেটও উল্টে পড়েছিলেন। ম্যান ইটার্স অফ কুমায়ুন পড়ে দেখো।

—ধুত্তোর কুমায়ুন! মোরগটার কী হল?

আমি বললুম, অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। পড়েছে।

—পড়েছে? লা-লা-লা।—তপন নেচে উঠল, দৌড়ে গিয়ে কুড়িয়ে আনল রক্তাক্ত মোরগটাকে।

—ঈস্, পাক্কা দু সের! খাওয়াটা কেমন হবে বল দিকি?

ব্যাপারটা এইখানে শেষ হলে বেশ মনোরম হতে পারত। কিন্তু উপসংহার আছে।

মোরগ নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে দশ পনেরোটি বস্তির লোক এসে হাজির হল। প্রচণ্ড চিৎকার তাদের গলায়—এবং কারো কারো হাতে প্রকাণ্ড লাঠি!

বনমোরগ নয়—পোষা মোরগ। অনেক মুরগীর গোষ্ঠীপতি সে—অনেক নাবালক মোরগের সে পিতা এবং বহু অনাগত ডিমের ভাবী স্রষ্টা। এ হেন মোরগকে যে মেরেছে, তার সংগে ওরা একটা বোঝাপড়া করে নিতে চায়।

বোঝাপড়া হল। কুড়ি টাকা দাবি করেছিল, জোড় হাতে রামজী দশ টাকায় রাজী করাল। আর দশটা টাকা দিতে হল তপনকেই। অথচ, শহরে ওটা টাকা চারেকেই কিনতে পাওয়া যায়।

তবু বনে চরে বেড়ায়—অতএব বন-মুরগী। আর এমন প্রাকৃতিক পরিবেশে, নীল পাহাড়ের কোলে, ঝিরঝির ঝরনার গানের মধ্যে যাকে শিকার করা হল, তার দাম একটু বেশীই তো দিতে হবে।

অন্তত তপনকে সেইটেই আমি বোঝাতে চেয়েছিলুম। বুঝল কিনা জানি না, কিন্তু মোরগের মাংসে ওর এত অরুচি এর আগে আমি কখনো দেখিনি।

অনৈক প্রবীণ রাজনীতিক নাকি বলিয়াছেন, প্রথম পাকিস্তান হইয়াছিল শ্রীনেহরুর ক্ষমতায় আসীন হইবার সময়। তাঁহার চলিয়া যাইবার আগে হতভাগ্য

ভারতবর্ষে আর একটি পাকিস্তান জন্মগ্রহণ করিবে।—"পরিবার পরিকল্পনা তা হলে নিঃসন্দেহে বানচাল হয়ে গেল।"—বলেন বিশুখুড়ো।

এক সংবাদে জানা গেল, পাকিস্তানে অন্ধের সংখ্যা নাকি তিন লক্ষ। শ্যামলাল বলিল—"রকমসকম দেখে তো মনে হয় আরো বেশী হবে। পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছে তো!!"

১৯৬৩ সাল হইতে সরকারী চাকুরি-প্রার্থীরা ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর ইংরেজী বা

হিন্দীতে দিতে পারিবে। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"কণ্ঠলেংগটি আর বালডাকিনীর-ই জয় জয়কার,—জয় হিন্দ্।"

কোন এক ব্যবসায়ী তেলের নাম করিয়া রেলে হুইস্কির বোতল পাঠাইতে গিয়া ধরা পড়িয়া যান। সংবাদদাতা সংবাদের শিরোনামা দিয়াছেন—'শেষ রক্ষা হ'ল না'। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"শেষ রক্ষা যখন হলো না, তখন ব্যবসায়ী ভদ্রলোক নিশ্চয়ই 'মুক্তির উপায়'-এর মহলা দিচ্ছেন।"

কাছাড়ের ভাষা সমস্যা লইয়া গোল-টেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করিবার কথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চিন্তা করিতেছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"বড় পুরনো ধাঁজের টেবিল, আজকাল একেবারেই অচল। তার চেয়ে নূতন নূতন ফার্নিচারের দোকানগুলি ঘুরে দেখে এলে হতো না!!"

কলিকাতা আয়কর অফিসে সেদিন হঠাৎ কোথা হইতে একটা বনবিড়াল আসিয়া ঢুকিয়া পড়ে।—"সাহস তো কম নয়! সিংহ বাঘেরা যে আয়কর অফিস থেকে

সহস্র হস্ত দূরে থাকেন, সেখানে বনবিড়াল!!"

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংসার খরচ সংক্রান্ত রাজ্যব্যাপী সমীক্ষার ফলে জানা গেল যে, এখানে শিক্ষা ও চিকিৎসার খরচ অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে অনেক বেশী—"সিনেমার খরচটা কোন্ প্রদেশে কত তা বলা হয়নি, অথচ ঘর-সংসারে এটি একটি অনিবার্য খরচ।"—বলে শ্যামলাল।

লস এঞ্জেলসে একটি কিশোরকে ত্রুটি-পূর্ণ ঔষধের টিকা দেওয়ায় সে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়ে। ঔষধ কোম্পানী এক মামলার ফলে কিশোরকে ৬৭৫০০০ ডলার খেসারত দিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"রাজ-টিকার কথাটা বইতে পড়েছিলাম। এখন কিশোরটির টিকা নেওয়ার সংবাদে তা বুঝলাম।"

চাঁদে যাতায়াতের খরচ শুনিলাম এক শ' কোটি পাউণ্ড।—"বাধ্য হয়ে আমাদের বিনা টিকিটে ভ্রমণকারীর দলে ভিড়ে যেতে হবে, তখন দোষ দিতে পারবে না, হ্যাঁ।"—বলে শ্যামলাল।

পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন অলিম্পিক স্টেডিয়ামটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রীক-দের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, এইটি মাটির তলায় আবিষ্কার করেন জনৈক পুরাতাত্ত্বিক।—"একজন ইতালীয় স্থপতি আমাদের হাত তুলে দেবেন পৃথিবীর সবচেয়ে নূতন, পরম আশ্চর্যও বটে, স্টেডিয়াম। আমরা হাত পেতেই আছি।"—বলেন বিশুখুড়ো।
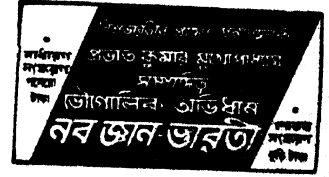
চিত্রগ্রীব

প্রথমে ১নং চৌরঙ্গী টেরাস-এ দশদিন পরে প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে নিউ হোরাইজন কিণ্ডার গার্টেন স্কুলে দশদিন দিলীপ রায়ের চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় গত মাসে। বছর ৩।৪ আগে দিলীপ রায় প্রথম একক প্রদর্শনী করেন। সে সময় তিনি সবে চিত্রচর্চা শুরু করেছেন। প্রথম তুলি ধরতে শিখে এক বছরে যা উৎপাদন হয়, তাই সে সময় দিলীপ রায় প্রদর্শন করেন। এই তিন চার বছরে দিলীপবাবুর রচনা যে কিছুটা পরিণত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। রচনাগুলিকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয় নাম তালিকায়—যেমন প্রতিকৃতি চিত্র, নৈসর্গিক চিত্র, পশু চিত্র, অ্যাবস্ট্র্যাক্ট চিত্র, পুষ্প চিত্র, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতি। অ্যাবস্ট্রাক্ট চিত্রগুলির মধ্যে ড্রইং-এর কোনও বালাই নেই—ছিটে কিংবা ফোটা লাগিয়ে না হয় এলোমেলো টানটোনে অসংখ্যরকম বর্ণ ব্যবহার করেছেন শিল্পী খেয়ালখুশিমত। এ ধরনের রচনা দু একজন মার্কিন চিত্রকরকেও করতে দেখা যায়। রচনাগুলি দেখে অবশ্যই আনন্দ পাওয়া যায়; কারণ এগুলির মধ্যে যেন বর্ণের স্পন্দন অনুভব করা যায়। ফুলের ছবিগুলি কিছুটা 'ইমপ্রেশনিস্টিক' ধরনের হওয়ার ফলে বিশুদ্ধ ড্রইং-এর আবশ্যকতা খুব বেশী অনুভব করা যায়নি। কিন্তু যখনই শিল্পী কিছু আকৃতি আঁকতে গেছেন তখনই অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে অকৃতকার্য হয়েছেন। প্রতিকৃতি চিত্রণ, পশুচিত্র প্রভৃতি রচনাগুলিতে ড্রইং-এ বৈলক্ষণ্য অসম্ভবরকম চোখে পড়েছে। অনেক সময় বাস্তবিকই কোনও শিশুর রচনা বলে ভ্রম হয়েছে। এটা পাশ্চাত্ত্য মডার্নিস্টদের মত ইচ্ছাকৃত 'সরলতা' নয়, দিলীপবাবুর দুর্বলতা। আমরা এ প্রদর্শনীতে দিলীপবাবুর আরও পরিণত ড্রইং দেখতে পাব আশা করেছিলাম। শিশু-চিত্রকরদের মত এঁর রচনাতেও লক্ষ্য করা যায় রেখার বৈলক্ষণ্য, বর্ণের অপচয় প্রভৃতি। যেখানেই ইনি সাদৃশ্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন সেখানেই আপন দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছেন। কয়েকটি কুকুটের ছবি অবশ্য বেশ আনন্দ দেয়।

সুরেলা আকাশ — -অমিতা ঘোষাল

* * *

অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে শ্রীমতী অমিতা ঘোষালের চিত্রকলা এবং কারুশিল্পের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয় গত সপ্তাহে। শ্রীমতী ঘোষাল কখনও কোনও স্কুলে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেননি এবং ছবি আঁকা এঁর পেশাও নয় সুতরাং পেশাদার ধুরন্ধর শিল্পীদের রচনা সমালোচনা করবার চোখ নিয়ে এঁর রচনার সমালোচনা করা সমীচীন নয়। তা হলেও শিল্পী যে-মানের শিল্পকর্ম এ প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত করেছিলেন তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। শ্রীমতী ঘোষালের গৃহকর্মের ফাঁকে ফাঁকে চলে শিল্পচর্চা। মেহের আলি রোডে নিজের বাড়িতে একটি স্কুলও পরিচালনা করেন। এই শিক্ষালয়ে ছবি আঁকা, কারুশিল্প, নাচ গান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীরও সংখ্যা নেহাত কম নয়। শুধু শিশুদেরই এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় না, শিশুদের দাদা, দিদি এবং মায়েদের মধ্যেও অনেকে এখানে শিল্পকর্ম শিখতে আসেন।

শ্রীমতী ঘোষালের কারুশিল্পগুলিই আমাকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছে। ফেলে দেওয়া জঞ্জাল ব্যবহার করেও যে কত সুন্দর কারুশিল্পের সৃষ্টি হতে পারে তার প্রমাণ দিয়েছেন শ্রীমতী ঘোষাল। নারকলের মালার পুতুল, পশমের পুতুল, মরা পাখির পালক দিয়ে তৈরী পুতুল, কাদামাটির কাজ, চামড়ার কাজ, লেস বোনা প্রভৃতি কারু-শিল্পগুলি যথার্থই মনোরম। বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাদুরের ওপর লাগান পশমের পুতুলটি।

ছবি এঁকেছেন শ্রীমতী ঘোষাল বিভিন্ন মাধ্যমে—তেল রঙ, জল রঙ, প্যাস্টেল ইত্যাদি। লক্ষ্য করলাম নৈসর্গিক দৃশ্য রচনাতেই শিল্পী বেশী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন। পাহাড়ের স্টাডীগুলি বেশ চমৎকার। এছাড়া, 'ড্রীমী', 'মিউজিকাল স্কাই', 'নিউ হার্ভেস্ট' এবং 'গ্যাঞ্জেস সাইড' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিল্পীর মন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ; প্রত্যেক রচনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এঁর চিত্রধারা প্রথাগত। শারীরস্থান, কম্পোজিশন প্রভৃতি ব্যাকরণে শিল্পী অবশ্যই খুব পটু নন, তবুও ভাবের দ্বারা প্রত্যেক রচনাই অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

বহুকাল পর শ্রীমতী ঘোষালের একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। ১৯৪৮ সালে এঁর একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় নেতাজী ভবনে সুভাষচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে। তার পরে আরও দু একবার আর্টিস্ট্রী হাউস-এ ইনি প্রদর্শনী করেন। সে সময় অবশ্য ইনি খ্যাত ছিলেন টুনু ঘোষাল নামে। শ্রীমতী ঘোষাল প্রখ্যাত শিল্পী চিত্ত প্রসাদের ভগ্নী।

প্রদর্শনীটি চলে এক সপ্তাহকাল ধরে।

অযাত্রায় জয়যাত্রা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১৪)

একটু পরিচয় দিয়ে দিলেন উনি। দিয়ে বললেন, "বুঝছেনই তো, বাবার খাস আফিসের মালিক, ও'র বিশ্বাস জন্মাতে পারলেই বাবা পর্যন্ত পেঁৗছে যাওয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেখা-সাক্ষাৎ করানো ও'রই হাতে। দেওয়াথোওয়া সেও উনিই ঠিক করে দেন, কেমন লোক, কি বৃত্তান্ত সেসব বুঝে। একটু ধীরে-সুস্থে রেখা-বিচার ক'রে দেখুন।"

ছোট ভাই একটু বেশী চঞ্চল, বিশ্বাসের দিকটা আরও কমই এবং দুষ্টবুদ্ধি বা নাকাল করার প্রবৃত্তিটা স্বভাবতই আরও একটু বেশী। "ভাইয়া" যে কিছু-একটা মতলব এ'টেই পাশে নিয়ে গিয়েছিলেন আমায় সেটা আন্দাজই করেছেন; দুজনের একটু চতুর দৃষ্টিবিনিময় হয়ে গেল। বড় ইশারা করে দিলেন, উনি যেন কিছু না বলেন।

গনৎকার এদিকে আমার হাত নিয়ে পড়েছে। ডান হাত চিত ক'রে ধরে বেশ চাড় দিয়ে দিয়ে রেখাগুলো জাগিয়ে তুলল, বার দুই বেশ চেপে চেপে মুছে নিল, তারপর একবার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে বলল—"আপনি তো বাঙালী দেখছি।"

সময় নিচ্ছে। ওটা তো নামেই ধরেছে, চেহারাতেও কিছু আছেই লেখা। মাথা নেড়ে জানালাম—"হ্যাঁ।"

"দীর্ঘায়ু আপনি—এখন যতটা জানা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে প্রায় আশির কাছে পর্যন্ত উঠে গেছে রেখা।"

"সেটা তো বোধ হয় আমরা কেউ..."—ছোট শুরু করেছিলেন।

"বাবুজী, তুমি চুপ করো!"—ব'লে একটু কৃত্রিম ধমক দিয়েই উঠলেন বড়, বললেন—"বাধা পেলে ওর গণনায় ভুল হয়ে যেতে পারে তো? তোমার অংক কষার সময় বহীনদাই এসে টুকে দিলে কেমন হয়? বকুনি খাও তো মাস্টার সাহেবের কাছে।"

যে-ভাবেই হোক কালক্ষেপ তো দরকারই, গনৎকার মুখ তুলে হেসে বলল—"না হুজুর, উনি বলুন না। ছেলেমানুষ, তাতেই যদি আনন্দ পান। আমার গণনা কি তাতে একটুও এদিক হতে পারে? তা হলে ছেড়েই দেব না এ ব্যবসা একেবারে?"

ঝুকে পড়ল হাতের ওপর।

"একটা খুব বড় ফাঁড়া গেছে...ছেলেবেলায়......এই—দাঁড়ান দেখি......এই আট বছরের মাথায়।"

"কি বিভূতিবাবু?"—বড় প্রশ্ন করলেন।

ধরেছে ঠিক। তার একটা নিশানা রয়েছে আমার শরীরে। খুব সূক্ষ্মই, তবে ওদের চতুর সন্ধানী দৃষ্টিতে না পড়বার মতো নয় একেবারে। বয়সটা ধরেছে আন্দাজেই, এই কাজই তো করছে। তবে লেগে গেছে মোটামুটি ঠিকই; যে ধরনের চিহ্ন সে ধরনের ফাঁড়ার ত বয়সও যে ঐটেই।

বললাম—"ঠিক বলেছেন হুজুর।"

"কী ধরনের ফাঁড়া?"—সঠিক উত্তর তো মুখরোচক হওয়ার কথা নয়। আমায়ই প্রশ্ন করলেন উনি।

"বাঃ, সে তো আমিই বলব!"—গনৎকার একটু দম্ভের সঙ্গেই বলে উঠল। "তবে কোষ্ঠীটা থাকলে যেমন নির্দিষ্ট করে বলে দিতে পারতুম, এখন তা পারব না। এখন শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, ফাঁড়াটা বাম অঙ্গের ওপর দিয়ে গিয়েছিল কোথাও।"

কথাটা বুঝছ না? সূক্ষ্ম চিহ্নটা প্রকাশ করে দিলেও তো সব মাটি। "কী বিভূতিবাবু?"

বললাম—"ঠিকই হুজুর।"

আমারও তো রহস্য ভেদ করবার সময় আসেনি। জানি ও'দের হাতে হরতনের টেক্কা, বাজি মাত হবেই, চলুক না যতক্ষণ চলে ছুটির আসর।

একটু যেন দমেই গেছেন মহারাজকুমার! জমায়েতের মধ্যে এক পাশে কানে গেল, একজন দরবারী অন্য একজনকে মৈথিল ভাষায় ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলছে—"হে, জোন্নক মোট বকশিশ আব!"

অর্থাৎ এবার করলে আদায় মোটা বকশিশ।

"বেশ, তারপর?"—ওকেই প্রশ্ন করলাম।

"ভবিষ্যৎ, না, অতীত?"

নিজেই বলল—"বেশ আয়ুর কথা উঠল তো সেইটেই আগে সেরে নিই—একেবারে শেষের দিকে গিয়ে আর একটা বড় ফাঁড়া আছে।"

"আশি বছরে—যেদিন মারা যাবেন?"—ছোট আর থাকতে পারলেন না। অনেকেই হাসি চেপে আছে; একটু ছলকে উঠল। বড় ধমক দিয়ে উঠলেন—"আবার ভাইজী!"

"আর ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল—চাকরির দিক দিয়ে এই দরবারেই একটার পর একটা বড় চাকরি করে যাবেন।"

আর একটা আন্দাজই, এ'দের সংগে ঘনিষ্ঠতাটুকু দেখে। মহারাজকুমার এবার নিজেই মাথা দুলিয়ে গম্ভীরভাবে বলে উঠলেন—"আমি তো গদিতে উঠেই ডিস্‌-মিস্‌ করে দেব ও'কে। বড় ফাঁকিবাজ!"

বেশ একটু হাসি উঠল এবার। হাসিই আসছে এগিয়ে ক্রমে, উনিও আর সামলাতে পারছেন না। পারবেনও না যে আর বেশীক্ষণ সেটুকু উপলব্ধি করে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন—"থাক ওসব কথা, কোথায় চাকরি করবেন, কবে যাবেন সবার মায়া কাটিয়ে এটা ও'র কাছে তেমন বড় কথা নয় নিশ্চয়। বর্তমানে ও'র সবচেয়ে যা বড় সমস্যা তাই নিয়েই আপনি বরং বলুন কিছু। জেনে নিয়ে দেখা যাক কিছু তুকতাক যদি চলে। নানারকম সাধু-মহাত্মার আমদানি তো হয়েছে মেলায়। কি বলেন বিভূতিবাবু?"

বললাম—"তা হলে তো খুবই ভালো হয়।"

"তা হলে বলুন ও'কে সমস্যাটা কি। অন্তত কি ধরনের।"—সংগে সংগে চোখের খুব সূক্ষ্ম একটু টিপ আমার দিকে চেয়ে।

তার দরকার নেই; বুঝেই তো গেছি উদ্দেশ্যটা; একেবারে গোড়াতেই। কিন্তু বাধছে যেন, একেবারে অতটা হালকা হয়ে যেতে। একটু হেসে বললাম—"সেও তো উনিই হাত দেখে বলবেন।"

"ঐ নিন। তা হলে আপনিই বলুন—সমস্যাটা কি।"—গনৎকারকে বললেন।

"সমস্যা..."

কথাটা টেনে ছেড়ে দিয়ে আমার মুখের পানে চাইল গনৎকার, বলল—"সমস্যা তো ও'র এখন অনেকগুলি একসংগে রয়েছে দেখছি..."

"কোন্‌টা বড় তার মধ্যে?"

"বড়......"

"ওটা ও'রই সমস্যায় দাঁড়িয়েছে এখন।"—ছোটর ছোট্ট মন্তব্যটিতে আবার একটু হাসি উঠেছে, মহারাজকুমার বলে উঠলেন—"থাক, অত-বম্‌-বখেড়া। এই তো আমার মনে পড়ে গেছে। আপনার সবচেয়ে বড় সমস্যা তো এখন ছেলেদের পড়া আর মেয়ের বিবাহ—বলেছিলেন তো সেদিন..."

ইশারাটুকু সেরে নিয়ে গনৎকারের দিকে চেয়ে বললেন—"পড়ার ভাবনা তো আছেই।

আপনি মেয়ের বিয়ের কথাটাই আগে বলুন—কবে নাগাদ রেহাই পাবেন বেচারী।"

হাসি চেপে সবাই হাঁ করে আছে দাঁড়িয়ে।

হাতটা খুব উলটে পালটে দেখল—বেশ হেঁট হয়ে, তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে এবার কিসের আন্দাজ করে বলল—"তা বাবুজী বছরখানেক আপনার চিন্তা লেগে থাকবে।...তবে জামাই পাবেন খুব ভালো।"

মহারাজ গেছেন বাইরে, মন্দিরেই পুজো আজ। হো-হো ক'রে যে তুমুল হাসি উঠল তাতে মনে হলো সমস্ত শামিয়ানাটা দেবে উড়িয়ে।

সহজে হটলে তো চলে না ওদের।—"কি হলো? হয়ে গেছে বিয়ে? দেখি তো হাতটা আর একবার—যা গোলমাল!"

"বিয়েই করেননি তো মেয়ে—মেয়েই নেই তো তার বিয়ে আর ভালো জামাই!"

দরবারীদের মাঝেই কে বলে উঠল—ঐ হাসির মধ্যেই—আরও বাড়িয়ে দিয়ে। হয়ই তো একটু আলগা মুখ ওদের।

ওকে নিয়েই পড়বে এবার, জানি তো দরবারীদের কাণ্ড। মহারাজকুমারের মুখের দিকে একটু আপীলের নজরে চেয়ে ইশারা করলাম এবার আমিই—অর্থাৎ—"হলো তো, আর কেন?"

"আচ্ছা, এবার তোমরা সব যাও—খালি করো শামিয়ানা।" একজনকে গোটা পাঁচিশেক টাকা এনে দিয়ে দিতে আদেশ করে, ছোটকে টেনে নিয়ে হাসতে হাসতে ভেতরে চলে গেলেন।

আমাদের গাড়িটা মেলার জমির ওপর দিয়ে চলেছে। নদীর পুলটা শেষ হলে তারই সমতলে রেললাইনটা কতকগুলো ইঁটের খিলানের ওপর বহু দূর পর্যন্ত চলে গেছে, তা প্রায় মাইল খানেকের কাছাকাছি। দু দিকে মেলা প্রাঙ্গণ, আমের বাগান, মাঝে মাঝে খালি জমিও, খিলানের ভেতর দিয়ে দু দিকে যাতায়াত করে লোকে। জল-সরবরাহের জন্য একটা স্থায়ী জলের ট্যাঙ্ক রয়েছে কয়েকটা উঁচু কংক্রিটের থামের ওপর, একটা পাকা বাড়িও, সম্ভবত মেলার সময় আফিস হয়।

খিলানগুলো শেষ হয়ে একটু পরেই আমরা শোনপুরে স্টেশনের ইয়ার্ডে প্রবেশ করলাম; গাড়ি এসে প্ল্যাটফর্মের পাশে দাঁড়াল।

শোনপুর নাকি দুটো জিনিসে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গার সঙ্গে টেক্কা দেয়, এক তো মেলার কথা বললামই, দ্বিতীয় হচ্ছে এর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। এটা নাকি আবার দৈর্ঘ্যে সারা পৃথিবীতে অদ্বিতীয়।

কিন্তু খুব কি বাহাদুরি একটা?

আগেই বলেছি বি এন ডরিউর হিসাবের কড়াক্কড়ির কথা। এখন অবশ্য (এন ই রেলওয়ে নামে) এটা ভারত সরকারের সম্পত্তি; আর সব রেলের মতোই এক আইন, এক পলিসি বা কর্মপদ্ধতি, কিন্তু কোম্পানীর আমলে অন্যরকম ব্যাপার ছিল। অত্যন্ত হিসেবী, অত্যন্ত কিপ্টে। আমদানির দিকে খুব কড়া দৃষ্টি, কিন্তু যাদের কাছ থেকে আমদানি—যাত্রীসমাজ—তাদের সুখ-সুবিধার বিষয়ে একেবারে অন্ধ। সেই যে কথায় বলে না—"নেবো লাল দেবো না রাম"—কোম্পানী হুবহু তাই। আগে একবার তোমায় বলেছি—এ কোম্পানীর একজন বড় অংশীদার ছিলেন নাকি স্বয়ং ইংলণ্ডের রাজা। জাতটা বেনিয়া, তাদের রাজা, বুঝতেই পার।

দীর্ঘতম হওয়ার যশ নিক, কিন্তু প্ল্যাটফর্মটা ঐ পলিসিরই জ্বলন্ত নিদর্শন একটা।

প্ল্যাটফর্ম থাকবে পাশাপাশি, ওপরে টানা পুল, টুপ করে পেরিয়ে পেঁৗছে যাবে যাত্রী, এক নম্বর থেকে যদি পাঁচ নম্বরেও যেতে হয় তো কুছ পরোয়া নেই। শোনপুরের পৃথিবীর লম্বতম প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে হলে, যাকে বলা যায় রীতিমত চাল-চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে যেতে হয় যাত্রীদের। গাড়ি প্রায়ই লেট। তাই না হয় এ গাড়ির জন্যে ও গাড়িটাও একটু দাঁড়িয়ে থাক। তা তো নয়, গিয়ে হয়তো দেখলে—প্ল্যাটফর্মের ও প্রান্ত ফরসা, এ ঢুকেছে খবর পেতে যেটুকু দেরি, তারপর ও সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছে। যেন ভাসুর-ভাদ্দরবউ, মুখ দেখাদেখি নেই। পাশাপাশি থাকলে লোকে ছুটে গিয়ে আপদ্-ধর্মে "কোথা যাও মা?" বলে ভাদ্দর-বউয়ের আঁচলটা চেপেও একটু থামাতে পারে, চেনটা তো রয়েছে, এ একবারে উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু; সম্ভব তো নয়।

"নেবো লাল দেবো না রামের" আরও কীর্তি আছে। শোনপুরের মেলার যেটুকু ধারণা পেয়েছ তা থেকে এই সময়ে কোম্পানীর আয়ের বহরটা যে কি হতে পারে তার একটা আন্দাজ করে নিতে পারবে। কিন্তু, আশ্চর্য হবে, পৃথিবীর এই দ্বিতীয় মহামেলা সামলাবার জন্যে কতকগুলো টিকিটের ঘর বাড়ানো ভিন্ন আর কোন বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল না। মনে রাখতে হবে, ওটা হচ্ছে নিছক আমদানির দিক।

স্পেশ্যাল ট্রেন কি বস্তু লোকের কোন ধারণাই ছিল না, অর্থাৎ স্পেশ্যাল প্যাসেঞ্জার বা যাত্রীবাহী ট্রেন। মালগাড়িতে যত চড়বে চড়ো না—ঢালোয়া ব্যবস্থা। হ্যাঁ, সাধারণ মালগাড়ি, আদি, অকৃত্রিম। গরু, ঘোড়া, ছাগলের মতোই বোঝাই হয়ে যাত্রীরা আসছে, যাচ্ছে। জায়গা না পাও, ওদের সঙ্গেও যেতে পার, বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই কোম্পানীর।

এক হিসাবে খোদ রাজার দৃষ্টিও প্রজাদের ওপব যখন এই রকম ছিল, নীলকর বা চা-করদের অত দূষলে চলবে কেন?

কমিয়ে-বাড়িয়ে, কমিয়ে-বাড়িয়ে গাড়ি প্রায় ঘণ্টা দুয়েক দেরি ক'রে ফেলল, পেঁৗছবার কথা আটটায়, পেঁৗছল দশটার পরে। যাক, শেষ হয়ে এসেছে কোনরকম করে। এর পর পালেজা ঘাটে গঙ্গার স্টীমার, তারপরে পাটনা, অবশ্য একা নদী বিশ কোশ—এই যা একটু চিন্তা। দশটার সময় বাসায় পেঁৗছুবার কথা, তার জায়গায় বারোটারও পরে পেঁৗছাচ্ছি; খাওয়ার পাট এইখানেই চুকিয়ে নিতে হবে।

শোনপুর একটা বড় জংশনও, চারটে লাইন এসে মিশেছে এখানে—মজঃফরপুর, শাহপুর পটোরি, ছাপরা আর পালেজা ঘাট। মজঃফরপুর আর শাহপুর পটোরির লাইন দুটো অবশ্য আগের স্টেশন হাজিপুরেই মিলে গেছে, তবে সে মাত্র একটা স্টেশন আগে। ফলে জটিলতা বড্ড বেশী। আমাদের গাড়ির কথাই ধরা যাক, এতে ওঠানামা করতে—ছাপরা সেকশনে ছাপরা নিয়ে তিনটে বড় বড় সেকশনের লোক; ছাপরা, বারাণসী, গোরক্ষপুর; পাটোরি টানবে কাটিহার সেকশনের লোক, তারপর সামনে তো পাটনা রয়েছেই। গাড়ি আসার পর খানিকটা পর্যন্ত জায়গা আগলে মোটমাটের দিকে নজর রেখে বসে থাকতে হল। বেশ থিতিয়ে জিরিয়ে গেলে উদরের ফিকিরে বেরিয়ে পড়লাম।

স্টেশন হোটেলের ওয়েটারদের পথ চেয়ে আছি প্ল্যাটফর্মে নেমে। কখনও কখনও এমন হয় যে, হাজিপুর থেকেও সঙ্গ নেয়, আজ যখন এত দরকার, একজনও যে চোখে পড়ে না। গাড়ি ছেড়ে যেতে সাহস হয় না। অবশ্য প্যাসেঞ্জার যাদের নামবার নেমে গেছে; যাদের ওঠবার, তারা গুছিয়ে-গাছিয়ে বসেছে। তবু হালকা হয়ে উঠে ভারি হয়ে নামবার মতলবে কেউ ওঠেনি, এ কথাও তো বলা যায় না।

(ক্রমশ)

। পত্রাবলী ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১৭৭ ॥

ওঁ

আমেরিকা

কল্যাণীয়াসু

রাণী, মনে পড়চে কিছুদিন আগে প্রশান্তকে একটা খিট্‌খিটে মেজাজে চিঠি লিখেছিলুম। তার প্রধান কারণ শরীর বিগড়ে গিয়েছিল। ডাক্তারকে ভাবিয়ে দিয়েছিলুম। আমার ভয় হয় নি কিন্তু দুঃখ হয়েছিল, সে দুঃখ রাগের কাছ-ঘেঁষা। এই সমুদ্রপারে এসে এদের যখন বলি কিছু করতে হবে তখন অন্তত একদল বিদেশী কোমর বেঁধে দাঁড়ায়, --কমিটি করে, বাড়ি বাড়ি ফেরে, উঠে পড়ে লেগে যায়, যা হোক কিছু একটা করে তোলে। আইডিয়ার দোহাই দিয়ে এখানে অনেক লোককে বিচলিত করা যায়। এই রকম অবস্থায় যখন নাড়ী ছাড়বার উপক্রম হয় তখন মনে পড়ে দেশ আমাকে কি ফাঁকিই দিয়েচে--অথচ--দূর হোক্‌গে। নালিশ করবার মতো লজ্জা নেই। ইদানীং আমার শরীর যতই দুর্বল হচ্চে ততই নালিশের সুর চড়ে যাচ্চে। আগে আমার এ বালাই প্রায় ছিল না। আমার স্বভাব বদলে গেছে। এখন পরের উপরে দাবি করার অভ্যাস হয়ে এল। আগে অত্যন্ত স্বতন্ত্র ছিলুম --কেউ সঙ্গ দিতে, সহায়তা করতে এলে বিপদ গনতুম--একেবারেই সেবাগ্রহণ বিমুখ ছিলাম। এখন লোকালয়ের উপর ভর করতে আরম্ভ করচি। সেই জন্যেই কি দিলুম আর কি পেলুম তার হিসেব গণনা মনকে পেয়ে বসে। এই দীনতা থেকে কি করলে উদ্ধার পাই সে কথা রোজই ভাবি। কতবার মনে মনে কল্পনা করি আগেকার মতো নির্জনবাসী হব। অন্তত মনের চারদিকে নির্জনতার বেড়া তুলে দেব, মেজাজ বলে কোনো বালাই থাকবে না। কিছু চাইনে, কিছু চাইনে, কিছু চাইনে এই মন্ত্র জপ করতে হবে। আজকাল মুশকিল হয়েছে কাজের খাতিরে লোকজনের সঙ্গে সর্বদা জড়িয়ে পড়তে হয়েচে--নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার সময়ই পাইনে। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে, হাল ছেড়ে দিলে চলবে না--কেননা পরের ঔদাসীন্য সহ্য করা সহজ, কিন্তু অন্তরে অন্তরে আপন অসম্মান জমতে দেওয়ার মতো বোঝা আর নেই।

ভেবেছিলুম পৌষের মধ্যে দেশে ফিরব। মেয়াদ বাড়াতে হোলো। কিছু হাতে করে নিয়ে যেতেই হবে। নইলে ভঙ্গুর শরীর একেবারেই ভাঙবে। ফাঁকা তহবিল শুকনো নদীর মতো--তার তীরে বাস অস্বাস্থ্যকর। ইদানীং কিছু দ্রুত-বেগে আমার আয়ুক্ষয় হয়েচে শুধু এই জন্যেই। ফিরে যেতে হয়তো ফাল্গুন হতে পারে কী জানি। প্রবাসবাসে আরাম পাবার বয়স আমার চলে গেছে। খোঁড়া পায়ে চলার মতো--প্রত্যেক পদক্ষেপই কঠিন। মনে হয় আশ্রয়দণ্ড ফেলে দিয়ে চিত হয়ে পড়তে পারলে বাঁচি। কিন্তু ভালো লাগচে না বলে সংকল্পকে পঙ্গু রেখে যদি ছুটি নিই তবে চিরদিন মনে লজ্জা থেকে যাবে। অতএব শেষ পর্যন্তই দেখব। আমার কপাল-দোষে লক্ষ্মী এবার লক্ষ্মীছাড়া--আমেরিকার ভাণ্ডারে এমন রিক্তদশা বহুকাল হয় নি। তবুও এখানকার অলক্ষ্মীর ভাঙা কুলোতেও যা ক্ষুদ কুঁড়ো লেগে থাকে আমাদের পেট ভরাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

মহুয়া সংশোধনের জন্যে আমাকে পাঠিয়েচে কিন্তু সংশোধিত মহুয়া তো এক কপি তোমাকে দিয়ে এসেছিলুম--আরো অনেকের কাছেই আছে। তপতী আমি ফিরে গিয়ে ছাপার বন্দোবস্ত করব। ইতি ১১ নবেম্বর ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

॥ ১৭৮ ॥

কল্যাণীয়াসু

রাণী, অনেকদিন পরে তোমার একখানি চিঠি পেলুম। তবু এখনো আমার অনেক পাওনা বাকি আছে। কিন্তু তুমি জানো দেনা পাওনার হিসেব রেখে আমি চিঠি লিখিনে। মেঘের মধ্যে জল যথেষ্ট জমে উঠলে আপনি বৃষ্টি পড়ে, তেমনি চিঠির সামগ্রী যখন সহজে মনের মধ্যে সচেতন হয়ে ওঠে তখন লাগামে একটুখানি ঝাঁকানি দেবামাত্র কলম আপনি দৌড়তে থাকে। কিন্তু অনেকদিন চিঠি লেখা মনের কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি। চিঠি লেখা মন হচ্চে বাজে কথার মন। ছুটির ঘণ্টা বাজলে পরে তবে সে হাজির হয়। অনেকদিন ছুটি মেলে নি। তার মানে এ নয় কেবলি কাজ করছিলুম, অনেক সময় যথেষ্ট অবকাশ ছিল কিন্তু সে অবকাশের মধ্যে যথেষ্ট ছুটি ছিল না--মন যদিবা ছাড়া পেয়েছিল তবু স্বাধীনতা পায় নি--অর্থাৎ মাঝে মাঝে ফাঁকা আকাশে এসেছে কিন্তু সে আকাশ ছিল ঘন কুয়াশায় ঢাকা। একটা কালো বাধা, তাতে আলো নষ্ট করে নি, কিন্তু আলো ঘুলিয়ে দিয়েছে। মোটের উপর, ভালো লাগছিল না। হায় রে দুরাশা--দুঃখও পাই কিন্তু আশার বন্ধনও কাটাতে পারিনে। আমার যা সম্বল ছিল তাতে আমি বিনা মূল্যেই দিন যাপন করতে পারতুম। অর্থাৎ চিরদিন ছেলেমানুষি করবার মতো আয়োজন নিয়েই পৃথিবীতে এসেছিলুম হঠাৎ বুড়োমানুষি করবার শখ আমাকে পেয়ে বসল কেন? এই বুড়োটা আমাকে না-হক্ খাটিয়ে মারচে। যে মজুরি দিচ্চে তাতে জাত যায় কিন্তু পেট ভরে না। অথচ ওকে যে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দৌড় দেবে সে সাহস নেই। ওর বয়স প্রায় হোলো সত্তর, আমার চেয়ে অনেক বড়ো।

সেদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক এক ভদ্রলোকের লেখা Letters to a friend নামক বইখানা পড়ছিলুম। মনে পড়ল একদিন ওকে চিনতুম--কিন্তু চৌমাথার এক মোড়ে ওকে ফেলে রেখে আমি আর এক রাস্তায় চলে এসেচি। অনেকদিন ওর আর খোঁজই পাইনি। মনে মনে ভাবছিলুম এমনটা হোলো কি করে। সে মানুষটা কে জানো? শান্তিনিকেতনের ছাদে বসে যে গীতাঞ্জলি লিখেছে, যে লিখেছিল ডাকঘর। ছেলেবেলায় আমার ভাগ্নী ইরু আমাকে লোভ দেখিয়ে বল্‌ত সে রাজার বাড়ি গিয়েছিল। সেই রাজার বাড়ির কোনো ঠিকানা কোথাও না পেয়ে আমার মন খারাপ হয়ে যেত। আমি সেদিন সেই রাজার বাড়িতে গিয়েই পৌঁছেছিলুম। মহল থেকে মহলে ঘুরেচি। তার আনাচেকানাচে ঝাপসা আলো আবার এক এক জানলা দিয়ে দেখি আলোর ঝরনা ঝরে পড়চে। সব

শেষের ঘরের চাবি অন্তরের কোনো এক কুলুঙ্গিতে আছে বলে ভরসা ছিল। হেনকালে কোন্ এক সময়ে বাইরের মহলে কাজ বেড়ে গেল। সেখানে লোকের ভিড়, গোলমাল, টানা-হেঁচড়া, দাবিদাওয়ার অন্ত নেই। সবাই বললে, বড়ো কাজ,— আমিও ভাবলুম মস্ত কাজ। মস্ত কাজের মস্ত লোভ, মস্ত গৌরব। মস্ত কাজের ধ্বজা উড়িয়ে বেরিয়ে পড়লুম বাইরের রাস্তায়। কত হিসেবপত্র, তর্কবিতর্ক, মতামত, ঝগড়াঝাঁটি। এ জায়গায় আসবাব চাই অনেক, তার বিল আসে লম্বা অঙ্কের, ভিক্ষে নইলে চলে না, ভিক্ষে মেলেও না। পরিশ্রান্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করি তোমার রাজার বাড়ি গেল কোথায় হে! অনেক দূরে। লোভের তাগিদে দশের তাগিদে এসে পড়েচি মস্ত কাজের হট্টগোলে। কাজ যখন ছিল আপন সহজ সীমায় তখন ভিতর মহলে বাহির মহলে ছিল মিল। সব সুদ্ধ তখন রাজমহলে ছিলুম, এখন এসেচি অরাজকের ভিড়ে। তখনকার মানুষকে চেনা সহজ ছিল, এখনকার মানুষকে চেনা শক্ত। কেননা এর চেহারা পাঁচজনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার ছাপ পড়েচে এর মুখে। এই জন্যেই এত অত্যন্ত বেশী ক্লান্তি আসে—ডাক্তারও বলে আমি মরতে বসেচি সেই বোঝার চাপে যে-বোঝা আমার নিজের নয়। সবচেয়ে দরকার হয়েচে অন্দরের সঙ্গে সদরকে আর একবার মিলিয়ে নেওয়া। কিন্তু গোলেমালে সেই কথাটা বার বার ভুলে যাই। দেখা যাক্ মরবার আগে চাবি খুঁজে পাই কিনা। ২২ নবেম্বর ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৭৯ ॥

ওঁ

লণ্ডন
২৭ ডিসেম্বর ১৯৩০

কল্যাণীয়াসু,

যাই যাই করতে করতে এতদিন পরে যাবার সময় কাছে এল। প্রায় এক বৎসর কাটবে। যতদিন য়ুরোপে ছিলুম লাগছিল ভালো—আমেরিকায় গিয়ে মনটা যেন চাপা পড়ল, শরীরেও খুব একটা ধাক্কা লেগেছিল। আমেরিকায় বাইরে বলে পদার্থটা বড়ো বেশী উগ্র এবং চঞ্চল, কিছুদিন নিরন্তর নাড়া খাওয়ার পরে ভারি একটা বৈরাগ্য আসে। আমি সেই অবস্থায় আছি—অন্তরের মধ্যে আশ্রয় পাবার জন্যে কিছুকাল থেকে একটা ব্যাকুলতা লেগে আছে। নানান্ কাণ্ডকারখানা নিয়ে চিত্ত আমার বহির্মুখ হয়ে পড়েছিল, নিজের সত্য যেখানে, সেখানকার তালাচাবিতে মরচে পড়ে আসছিল এমন সময়ে আমেরিকায় এসে চোখে পড়ল মানুষ কতই অনাবশ্যক ব্যর্থতায় সমাজকে একঝোঁকা করে তুলেচে, আবর্জনাকে ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে সাজিয়েচে, আর তারি পিছনে দিনরাত্রি নিযুক্ত হয়ে আছে - পৃথিবীর বুকের উপর কি অভ্রভেদী বোঝা চাপিয়েচে—এই সমস্ত জবড়জঙ্গের বিষম ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রাণ যখন অস্থির হয়ে ওঠে তখন ভিতরকার মানুষের চিরন্তনের দাবি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সন্ধ্যাবেলায় ধেনুকে গোষ্ঠে ফেরাবার মতো নিজের ছড়িয়ে-পড়া আপনকে আপনার গভীরের মধ্যে প্রত্যাহরণ করে আমার জন্যে ডাক দিচ্ছি। হয়তো জীবনের অপরাহ্ণের উপর প্রদোষের ছায়া নেবেচে, মনের যে শক্তি নিজের উদ্যমকে বাইরের নানা কাজে নানা দিকে চালান করে দিয়েছিল তার মেয়াদ শেষ হয়ে এল—দেউড়ির দ্বারী সদর দরজা বন্ধ করবে বলে ঘণ্টা দিয়েচে, অন্দর মহলে দীপ না জ্বালালে আর চলবে না।

অনেকদিন কিছু লিখিনি—লিখতে ইচ্ছেই করে না— তার মানে প্রকাশ করবার শক্তি পরিশিষ্টে এসেচে; তার তহবিলে বাড়তির অংশ নেই বলেই সহজেই সে বাইরের বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েচে—অথচ সেটা খারাপ লাগচে না—ভিতরে ফল যদি ধরে তবে ফুলের পাপড়ি ঝরলে লোকসান নেই।

আগামী ৯ই জানুয়ারীতে নার্কণ্ডা জাহাজে (P & O) যাত্রা করব, মাসের শেষে পৌঁছব দেশে। ইতি ২৯ ডিসেম্বর ১৯৩০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

॥ ১৮০ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

শরীর ভালো নেই। এখানে কিছু না কিছু কাজের উপদ্রব চলচে—সে আমার সয় না। বেশ বুঝতে পারচি সম্পূর্ণ হাত গুটিয়ে বসা আমার পক্ষে একমাত্র সৎপরামর্শ। লোকে কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না যে আমার কর্মের দিন ফুরিয়েচে।

ব্যালাটন ফ্যুরেডের ছবির কথা তোমাকে বলার পরে সে দুটো অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না। যেটা পেয়েছি তোমাকে পাঠালুম কিন্তু এটাতে তোমার নিজমূর্তির কোনো চিহ্ন নেই —অতএব তোমার পছন্দ হবে কি না সন্দেহ করি। কয়দিন ঘোরতর বৃষ্টি বাদল হয়ে আজ বিশ্রাম। ভেবেছিলুম এইবার কাজকর্ম আবার শুরু করে দেব—কিন্তু দেখচি দেহমন সায় দিচ্চে না—তাই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি, ছবিও আঁকচি নে। ডেস্কে বসে লিখতে গেলে বুকের মধ্যে একটা যেন খাঁচার পাখির ধড়ফড়ানি আরম্ভ হয়—পিঠেও করে ব্যথা। দিনটা কিন্তু ভালো—স্নিগ্ধ শান্ত আলোকপ্লাবিত। ইতি ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৩১।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

॥ ১৮১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, হঠাৎ খবর পাওয়া গেল বুলার মৃত্যু হয়েচে। এই সেদিন কলকাতায় তাকে দেখেচি। সেই চির অতৃপ্তির ব্যাকুলতা তার মুখে ছিল। যে-মানুষ জলে ডুবচে সে যেমন শূন্যকে আঁকড়িয়ে ধরবার জন্যে হাত বাড়িয়ে মুঠো বাঁধে, ওর মন তেমনি করেই বৃথা আক্ষেপে কেবলি হাত বাড়িয়েচে যা ধরা যায় না তাকে ধরবার জন্যে। আমরা এই চঞ্চলতাকে খুব হাল্কা করেই দেখচি। অনেক সময়ে এটাকে আমরা অবাস্তব অতিকৃত বলে উপেক্ষা করে উড়িয়ে দিয়েচি। এইটেই হচ্চে মস্ত ট্র্যাজেডি। ঠিক জিনিসকে ঠিকমত করে যে চাইতে জানে না তার চাওয়ার আগ্রহকে আমরা অবজ্ঞা করি—কেবলমাত্র পরিতৃপ্তিতে সে যে বঞ্চিত হয় তা নয়, তার ইচ্ছাটা যে সত্য এ কথাটাও সে সম্পূর্ণ পরিমাণে প্রতীতিগম্য করতে পারে না। মানুষের অনুকম্পার সম্পদ এত স্বল্পপরিমিত যে, উড়ো কামনার বেদনাকে সে দাম দিতে চায় না, এ কথা ভালো করে স্বীকার করিনে যে, স্বপ্ন সত্য নয় কিন্তু স্বপ্নের দুঃখ তীব্রভাবে সত্য। মানুষ যতক্ষণ বেঁচে থাকে ততক্ষণ তার সঙ্গে ব্যবহারের যোগ থাকে বলেই অবিশ্বাসের আড়ালে তার অনেক দাবিকে ঠেকিয়ে রাখি। আজ বুলা বেঁচে নেই বলেই সেই

অবিশ্বাসের সেই অবিচারের বেড়াটা তুলে নেওয়া এত সহজ হয়েচে। আজ তার সুখ দুঃখকে সংসারের প্রচলিত দর যাচাই থেকে দূরে রেখে তার স্বকীয় মূল্য নিরূপণ করতে পারচি।

আমার প্রাণের ক্লান্তি প্রতিদিন স্পষ্ট করে অনুভব করচি। কিন্তু সে জন্যে মনের মধ্যে কোনো নালিশ নেই। অত্যন্ত সহজসাধ্য কাজও করতে একান্ত অনিচ্ছা বোধ হয়—আগে হলে এই কথাটা নিয়ে মনের মধ্যে লড়াই বেধে যেত। কিন্তু বাইরে যখন গোধূলিতে আলো ম্লান হয়ে আসে তখন আপিসের কাজ করচিনে বলে যে ব্যক্তি আক্ষেপ করে সে কাজ-ক্ষ্যাপা, আমি তা নই—ছুটিটা যখন সত্য তখন তাকে সম্পূর্ণ করে স্বীকার করতে আমার বাধে না। আমার মনে এ অহংকার নেই যে আমি রাশ ছেড়ে দিলে সংসারের কোনো রথ অচল হবে। আমরা স্রোতের ঢেউয়ের মতোই—যথাসময়ে মাথা তুলচি, ধাক্কা মেরেচি, প্রবাহরক্ষায় সেই পরিমাণ কাজ করেচি, কিন্তু সরে গেলেও পিছনে পিছনে ছোটো বড়ো, অন্য ঢেউ আমার জায়গা নেবে। অতএব বিনা অহংকারে সরে যাওয়া সম্পূর্ণ সহজ হওয়াই ভালো। এমন কি নাম রাখব কিংবা কিছুই রেখে যাব এ কথা নিয়ে মনের মধ্যে যখন স্বভাবতই একটুখানি আঁকুবাকু চলতে থাকে তখন অনতিকালের মধ্যে আমার লজ্জা বোধ হয়। চৌকি ছেড়েও যাব অথচ তার উপরে রিজার্ভের টিকিট আটকিয়ে রাখব—কেন রে বাপু! কোন্ ছায়াটার জন্যে!

তোমাকে সেদিন যে ছবির কথা বলেছিলুম খুঁজে পাইনি—হঠাৎ আজ পকেট থেকে তাকে উদ্ধার করেচি। আর একটু হলেই ধোবা তাকে ক্ষালন করে তুরীয় চৈতন্যের মতো অতীব বিশুদ্ধ করে দিত। ইতিমধ্যে কলকাতায় যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এখানে দোল উৎসবে তোমরা আসতে পারবে বলে আশা করবার কোনো বাধা অনুমান করচিনে। অবশ্য ইচ্ছা থাকাটা সর্বাগ্রে দরকার।

এখানে আমার স্থিতিবিধির আবার বদল হয়েছে, যদি আসো তো দেখতে পাবে। ইতি ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩১।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

॥১৮২॥

ঁ

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, তোমাদের হালের খবর পাবার জন্য কিশোরীর আসার অপেক্ষায় ছিলুম। দেরি করতে করতে কাল সন্ধ্যাবেলায় মধুভাণ্ড হাতে সে এসে উপস্থিত। সমস্ত বিবরণ শুনে বুঝতে পারচি কয়দিন তোমার উপর দিয়ে খুব একটা দুর্গ্রহের উপদ্রব চলে গেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ বললাভ করবার পূর্বেই প্রশান্ত কলেজে যাতায়াত শুরু করেচে এটা ভালো খবর নয়। কারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যামোটা বিলিতী দিনের মতো—দিন অবসান হলেও তার প্রদোষ লেগে থাকে অনেকক্ষণ। কিন্তু কারো শরীরচর্যা সম্বন্ধে সাবধানসূচক পরামর্শ দিতে আমি সংকোচ বোধ করি। কারণ সাবধান যে হতে পারে সে পরামর্শের অপেক্ষা রাখে না—সাবধান হওয়া যার ধাতে নেই সে পরামর্শকে উপেক্ষা করে—তা ছাড়া এরকম পরামর্শে অসাধারণ বুদ্ধি বা গবেষণার প্রয়োজন হয় না—এগুলো অত্যন্ত বাহুল্য এবং সস্তা। এরকম পরামর্শ সর্বদাই আমার কাছে এসে থাকে তাতে করে আমার জীবনীশক্তির কিছুমাত্র বৃদ্ধি ঘটচে বলে আমি অনুমান করিনে। অতএব প্রশান্ত যদি রোগ-শয্যা থেকে উঠেই কলেজে যাতায়াত আরম্ভ করে থাকে তবে সৎপরামর্শের দল তার পিছন পিছন ছুটবে কিন্তু তার মোটর গাড়ি তাদের মুখে ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে চলে যাবে। কিন্তু তোমাদের সকলের চেয়ে বড়ো উৎপাতটা যে কি তা বেশ বুঝতে পারচি। লোকে তোমাদের বাস নির্বাচন সম্বন্ধে তোমাদের সুবুদ্ধির উপর নিশ্চয় প্রকাশ্যে দোষারোপ করতে আরম্ভ করেচে—আর তোমরা অস্বাভাবিক উত্তেজনার সঙ্গে বলবার চেষ্টা করচ যে প্রশান্তর পীড়াটা আকস্মিক, ওটা কদাচই বরাহনাগরিক নয়। এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে ইচ্ছা করিনে—কেবল একটা কথা বলবই যে, গিরিডি তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী যেহেতু জায়গাটা শুকনো—বরানগর তার উলটো, অত্যন্ত সরস। কোনো বৃথা পরামর্শ দেবার জন্য বলচিনে, নিজের চিন্তাশীলতার পরিচয় দেবার জন্যেই বলা।

এদিকে বসন্ত উৎসবের উপর বর্ষা এসে চেপে পড়েচে—ঝড়বৃষ্টি বজ্রবিদ্যুৎ কিছুরই কমতি নেই—বসন্ত উৎসবের প্রতি বর্ষামঙ্গলের স্পষ্টই ঈর্ষা প্রকাশ পাচ্ছে—কবি শ্রাবণকে লঙ্ঘন করে ফাগুনের প্রতি পক্ষপাত করাতেই এটি ঘটল। কিছুতেই ক্ষমা করতে পারচে না। এমন অবস্থায় ইন্দ্রদেবের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে দক্ষিণ বাতাসের জয়সংগীত গাইতে বসা হাস্যকর হয়ে উঠবে। তাই বোধ হচ্ছে এবারকার উৎসবটাকে দেবতার নির্দেশ অনুসারে পিছিয়ে দেওয়া যাবে। হয়তো সে সময়ে তোমাদেরও সমাগম অসম্ভব হবে না। ইতি ৪ মার্চ ১৯৩১।

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

সংশয়

মনীশ ঘটক

আজকে আকাশ ঘন নীল, ঘোর নীল,
আজকে বাতাস এলোমেলো বেগে ধায়—
উধাও শূন্যে প্রলয়ের শাঁখচিল,
উদ্যত রোষে নীল মেঘ গরজায়।

সপ্তসাগরে নীল তরঙ্গ দোলে,
ক্লান্তা পৃথিবী নীল বনরাজি ঘেরা,
শান্তি কোথায়? গ্রহান্তরের কোলে?
তাই কি মাটির বাঁধন হতেছে ছেঁড়া?

নীল হয়ে আসে আমার চোখের আগে
ছায়াপথচারী যারা ঝিকিমিকি জাগে।
মহাকাশ ছেড়ে আরো মহা, মহাকাশে
যাবার বেলায় মন ভরে কী হতাশে—

ফিরলে কি পাবো মাটির নীল আঁচল
করুণাবিহ্বল সাগরের নীল জল?

রূপময় ভারত

আসামের খাসিয়ারা শিক্ষায় ও সভ্যতায় ভারতীয় উপজাতিদের মধ্যে বেশ প্রগতিভাবাপন্ন। তাহলেও সমাজ ব্যবস্থায় আজো মেয়েদের স্থান সবার ওপরে এবং সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনে খাসিয়া রমণীদের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

১। সদা হাস্যময়ী খাসিয়া রমণী; ২। বাজারে পণ্যবস্তুর বিক্রেতা খাসিয়া রমণী; ৩। বার্ষিক 'ননক্রেম' নৃত্য উৎসবে বিচিত্র ভূষায় মেয়ের দল; ৪। লাবণ্যময়ী দুই বোন; ৫। জীবনের শেষপ্রান্তে খাসিয়া রমণী।

আলোকচিত্রশিল্পী:

বরুণ পালিত

৬। বাজারের পথে বস্তারের মুরিয়া যুবতী; ৭। পণ্য বিক্রয়-রতা মুরিয়া বালিকা; ৮। পথের ধারে বিশ্রামরত; ৯। হাট থেকে ফেরার পথে মুরিয়া রমণী।

আলোকচিত্রশিল্পী:

সুনীল জানা
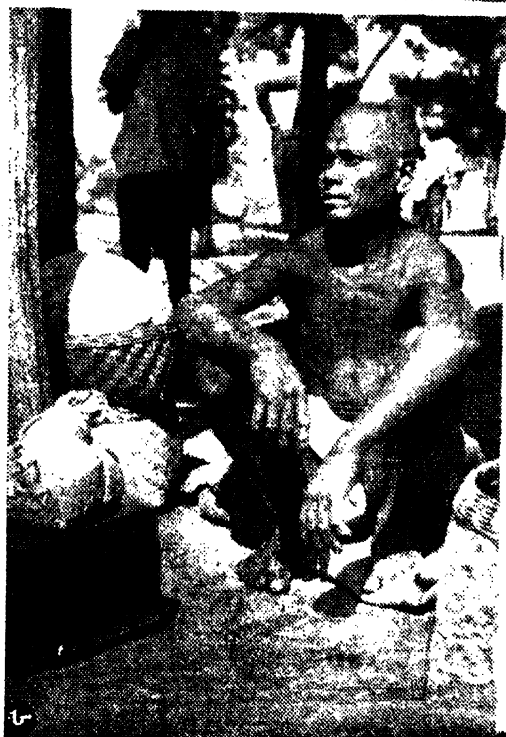
৬
৭
৮
৯

ব্রিটানিয়া ক্রীম ক্র্যাকার

ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ

সুজান্ কার্পেলেস্

লেখিকা মাদ্‌মোয়াজেল সুজান্ কার্পেলেস: পারীতে ইনি রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারি ছিলেন। ইনি এবং এঁর দিদি আঁদ্রে শৈশবেই ভারতে আসেন। সেই থেকে এঁর জীবনের বহুলাংশ অতিবাহিত হয়েছে ভারতে এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে। ইনি একজন খ্যাতনামা Indologist। এঁর দিদি আঁদ্রেই রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে শান্তি-নিকেতনে কলাভবনের নারী-বিভাগ উদ্বোধন করেন। শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর আঁদ্রে-র প্রিয় ছাত্রী ছিলেন, এবং রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা উভয়েই কার্পেলেস-ভগ্নীদ্বয়ের নিবিড়তম বন্ধু। তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় ফ্রান্সে এঁদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন; তার বিবরণ তপনবাবু কিছুকাল আগে 'দেশ'এ প্রকাশ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার আগে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানত ফরাসীরা? হঠাৎ-বাবুদের এবং ধনী-সম্প্রদায়ের চোখে ভারতবর্ষ ছিল রাজা-রাজড়ার ভারতবর্ষ, সাপুড়েদের নিবাস-স্থল, কল্পনায় গড়া দেশ। আর, ফরাসী অনুরাগী এক রাজার কল্যাণেই, এ-সব সম্প্রদায়ের মুষ্টিমেয় কয়েকজন আসতে পারতেন ভারতবর্ষে, হাতির পিঠে চেপে বাঘ শিকারে যেতেন, অংশ গ্রহণ করতে পারতেন তথাকথিত আরব্য-উপন্যাসের দেশের অভিজাত আচার-অনুষ্ঠানে। কিন্তু ভারত-বর্ষ বলতে কী বুঝতেন তাঁরা? ট্যুরিস্ট-অধ্যুষিত এক জঙ্গল মাত্র, আর পুরাকালের সম্পদেরই শোচনীয় প্যারডি!

আর, সে যুগের পণ্ডিতদের এবং ভারত-বিশেষজ্ঞদের চোখে ভারতবর্ষ ছিল সাধারণের অগম্য এক জগৎ, এবং বিশাল এই মহাদেশের সংস্কৃতিকে যে দৃষ্টিবিন্দু থেকে তাঁরা অধ্যয়ন করতেন, সচরাচর তাতে আধ্যাত্মিক অনুভূতির নাম-গন্ধও থাকত না। আর ফরাসী মধ্যবিত্তেরা ভারতকে জানতেন কিপলিঙের চোখে, যাঁর বইয়ের সুন্দর ফরাসী অনুবাদ তখন সুলভ ছিল। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে পাল-পার্বণে 'জাংগল বুক' গোছের সচিত্র কিপলিং রচনা উপহার দেবার রেওয়াজ ছিল। আর পরিবারের বয়স্ক লোকেরা একাধিকবার পড়তেন 'কিম' ও ভারত সম্বন্ধে কিপলিঙের অন্যান্য বই। এই সূত্রেই ভারতস্থ ইউরোপীয় জীবনের কথা আর ইংরেজদের চাকুরেদের কথা তাঁরা জানতে পারেন। আর, ফরাসী-সমাজের অন্যান্য স্তরে? ভারত সম্বন্ধে ইস্কুলে যতটুকু শেখানো হত, ততটুকুই জানা ছিল, অর্থাৎ কিনা ভারত-অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি ফরাসী ছিটমহলের কথা, যার থেকে কেবল পঁদিশেরির কথাই মনে থাকত তাঁদের।

প্রথম মহাযুদ্ধ বাধল যখন, তখন আমাদের নৈতিক অবস্থা কী? সমগ্র ফ্রান্সের চোখে ভীষণ এক অগ্নি-পরীক্ষা বলেই মনে হয়েছিল এই যুদ্ধকে, কেবল মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণার জন্যই নয়, তাঁদের অনেকেরই দৃষ্টির সামনে ধূলিসাৎ হয়ে গেল তাঁদের যাবতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শ, ধ্রুব-সত্য বলে যা তাঁরা জানতেন, তারই পরাজয় হল। দিশাহারা হয়ে পড়লেন তাঁরা। কোন্ পথে যাবেন, কার কাছে চাইবেন সমাধান, কার কাছে হাত পাতবেন সাহায্যের জন্য?

এমনি এক পরিস্থিতির মাঝে এলেন এক কবি, এলেন এক নবী—অসংকোচে খুলে দিলেন তিনি ভারতের স্বর্লোকের দ্বার; অবাধ আমন্ত্রণ জানালেন তিনি বিশ্ব-বাসীকে। জাতি-বর্ণনির্বিশেষে বিশ্ববাসীকে দিলেন তিনি শাশ্বত ভারতের আধ্যাত্মিক উৎস-মুখের অমৃত-আস্বাদনের অধিকার। এই কবি-ই—আজ আর অবিদিত নয়—ইনিই রবীন্দ্রনাথ। রাতারাতি, কতকটা নোবেল পুরস্কারের কল্যাণেই, তাঁর নবী-সুলভ কণ্ঠোচ্চারিত বাণী ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ইউরোপে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে। অগণিত নির্যাতিত প্রাণ অধীর প্রতীক্ষায় ছিল এই স্নেহ-স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। যার সাহায্যে তারা ফিরে পেতে পারে তাদের নৈতিক আধ্যাত্মিক ভারসাম্য। আবার অনেকের কাছে এক বিধিদত্ত প্রত্যাদেশ ব'লেই পরিগণিত হল এই বাণী। এশিয়া এগিয়ে এসেছে ইউরোপের সাহায্যকল্পে।

রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর সঙ্গে লেখিকার অগ্রজা আঁদ্রে কার্পেলেস

কেবল আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যসম্ভারই নয়, ভারত এগিয়ে এসেছে উদার সতীর্থের মত প্রসারিত হস্তে। তাঁদের চোখে রবীন্দ্রনাথ হলেন ভবিষ্যতের প্রতীক, প্রতিশ্রুতিপূর্ণ, আশাসমৃদ্ধ এক ভবিষ্যৎ।

তাঁর ব্যক্তিত্বের কথা মুখে মুখে চাউর হ'য়ে গেল : অভিজাত এক স্বদেশপ্রেমী তিনি, ভাগ্যদেবীর অকুণ্ঠ প্রসাদে ধন্য। যেমন সুন্দর, তেমনি বিশিষ্ট সুসঙ্গতি-পূর্ণ তিনি চলনে, বলনে, তাঁর অসাধারণ দৃষ্টিতে। কবি তিনি, বরাভয়দাতা, নবী—সমাজের যে-কোন স্তরের সঙ্গে তিনি সমপ্রাণ; বাংলার প্রতি ঘরই মুখরিত তাঁর কবিতায়, তাঁর গানে।

দেখতে দেখতে আমাদের শ্রেষ্ঠ লেখক ও কবিরা তর্জমা করে ফেললেন তাঁর যাবতীয় ইংরেজী রচনা; পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল তাঁর রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবনের অসংখ্য বিবরণ, তাঁর গভীর প্রভাবের কথা। এইভাবেই, সে যুগে ফরাসী জনসাধারণ বুঝে নিল, আধুনিক ভারতের এই বহুমুখী প্রতিভায় ভাস্বর সুসন্তানই তাদের একমাত্র গতি, এবং এ থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, মহানগরী পারীতে তিনি আসামাত্রই কেন ওই বিপুল স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন তাঁকে জানানো হয়। পারীর মুজে গীমে-র (Musee Guimet) আমি এখনও 'প্রাচ্য বান্ধব সমিতি'র সম্পাদিকা। অর্থাৎ ১৯২০ থেকে ১৯২৫ সালের কথা। আমার দিদি আঁদ্রে, কয়েকজন বন্ধু ও আমি—সবাই মিলে রাজধানীর সালঁতে কলকাতার আর্ট স্কুলের চিত্রশিল্পী-দের একটি চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলাম, এবং অভাবনীয় সাফল্যমণ্ডিত হল আমাদের এই প্রচেষ্টা। কিন্তু আমাদের উদ্যোগের খবর পেয়ে ইংরেজ সরকার আমাদের চিঠি লিখলেন যে, ফ্রান্সে এ প্রদর্শনীর অনুমতি তাঁরা দিতে পারেন, লণ্ডনে যদি আমরা আগে দেখাই, তবেই। অথচ ইতিপূর্বে কস্মিনকালে এ'রা স্বপ্নেও ভাবেননি কলকাতার শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানাবার কথা। পারীতে তখন আমাদের আয়োজন সম্পূর্ণ, চিত্রগুলি টাঙানো হ'য়ে গিয়েছে, কলা-সমালোচকদের টনক নড়েছে। অগত্যা, বর্তমান ভারতের চিত্রশিল্পীদের ইউরোপে পরিচিত ক'রে দেবার দ্বিতীয় কৃতিত্ব নিয়েই লণ্ডনকে সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল, প্রথম অধিকার আমাদেরই রইল; একমাত্র রবিবর্মাই ইতি-পূর্বে পাশ্চাত্ত্যে পরিচিত ছিলেন। নতুন এই শিল্পীগোষ্ঠীর প্রেরণার মূলে ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম ও শিল্প-দর্শন। এ ঘটনার উল্লেখ করলাম, কারণ এ থেকেই বোঝা যাবে আমাদের পররাষ্ট্র দপ্তর রবীন্দ্রনাথকে পারীতে সংবর্ধিত করবার জন্য বৃটিশ সরকারের মুখাপেক্ষী না হ'য়ে কেন আমাদের হাতেই ছেড়ে দিলেন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্বকবির যোগ্য-সংবর্ধনার ভার, যাতে করে রবীন্দ্রনাথ সত্যিকারের ফরাসী দিকপালদের সম্যক পরিচয় পেতে পারেন। সে যুগের দুটো মাত্র দৃশ্য আমার চোখের সামনে আজও ভাসে। অন্তহীন জনস্রোত এসে আমাদের উত্ত্যক্ত করে তুলছে, ঝুলোঝুলি করছে সংবর্ধনা-সভার আমন্ত্রণ-পত্র পাবার জন্য। এমনকি, অনেকে আমাদের মন নরম করবার অভিপ্রায়ে আমাদের হাতে গুঁজে দিয়েছে খাম-ভরতি থোকা থোকা ব্যাংকের নোট। কিন্তু ফ্রান্সের বাড়িগুলোর দেয়াল আদৌ সম্প্রসারণশীল নয় ব'লে তাদের বিমুখ করতে আমরা বাধ্য হলাম। সেই যুগেই আমরা পারীর সমস্ত বড় বড় প্রকাশকের কাছে আবেদন পাঠিয়ে-ছিলাম, যাতে ক'রে শান্তিনিকেতনে একটা ফরাসী গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে তাঁরা সাহায্য করেন। আজও আমার মনে আছে, এই আবেদনে প্রকাশকেরাই শুধু ব্যগ্রচিত্তে এ আহ্বানে সাড়া দেননি, ফ্রান্সের অসংখ্য লেখকও স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ-প্রণোদিত হ'য়ে দীর্ঘ উৎসর্গ-পত্র লিখে-লিখে অর্পণ ক'রে গিয়েছেন তাঁদের বই কবির উদ্দেশে যিনি তাঁদের পরিচিত করিয়ে দিয়েছেন অবিমিশ্র ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে।

পারীতে দ্বিতীয়বার আমি গুরুদেবের সান্নিধ্য লাভ করি এক গ্রীষ্মের সময়। তরুণ এক বাঙালী ভদ্রলোক লণ্ডন থেকে কবিকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন পারীতে; আমি গিয়ে ও'দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম সাঁ-লাজার স্টেশনে। ট্যাক্সিওয়ালাকে আমি বুঝিয়ে দিলাম যে, সাঁ-ক্লুতে আমরা 'কান'-এর বাগানে গিয়ে উঠব; আর সঙ্গের বাঙালী ভদ্রলোক (নামটা তাঁর আজ ভুলে গিয়েছি) গুরুদেবকে তাঁর অজস্র মালপত্র সমেত

চাপিয়ে দিয়ে গেলেন ট্যাক্সিতে। স্যাঁ-ক্লুতে পে'ছেই আমি টুপ ক'রে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লাম ট্যাক্সিওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দেব বলে। ট্যাক্সিওয়ালা মিটার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হিসেব করে নিচ্ছে কত তার প্রাপ্য। টিং টিং ক'রে ওর মিটার বেজে চলল। এতটা পথ আসা, এত মালপত্র, তার ওপর প্যারীর এলাকার বাইরে আসবার ট্যাক্সি বাবদ বেশ মোটা রকম একটা অংকই দিতে হবে, আমি তা জানতাম। হঠাৎ মিটারের টিং টিং আওয়াজ থেমে গেল। মিটার থেকে চোখ ফিরিয়ে ট্যাক্সিওয়ালার মুখের দিকে তাকালাম। গুরুদেব ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে এসেছেন। আমাদের পেছনেই এসে দাঁড়িয়েছেন। চকিতে ট্যাক্সিওয়ালা আমায় ডেকে নিয়ে গেল এক পাশে, তার ওভার-কোটের লম্বা পকেট থেকে বার করল টাটকা খবরের কাগজ কাগজটা মেলে ধরতেই দেখলাম আমাদের উগ্র বামপন্থী দলের বিখ্যাত দৈনিক "ল্যুমানিতে"র (L'Humanite) প্রথম পৃষ্ঠাতেই রবীন্দ্রনাথের ছবি। আর তাঁর বিভিন্ন রচনাবলী থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি। আমার হাত ধরে ট্যাক্সিওয়ালা জানতে চাইল, ইনি সত্যিই 'উনি' কিনা। 'হ্যাঁ,—আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম। 'আর তা সত্ত্বেও আমি ভাড়া নেব, আপনি কী ভেবেছেন?' ট্যাক্সিওয়ালা চেঁচিয়ে উঠল।

কৌতূহলী রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন, কী ব্যাপার জানবার জন্য। সব কথাই আমি খুলে বললাম। উনি জানতে চাইলেন কী কর্তব্য। "ফরাসী কায়দায় ওর সঙ্গে করমর্দন করা!" —আমি বলে দিলাম ইংরেজীতে। আর গুরুদেব তাঁর সুন্দর অভিজাত হাতখানি মেলে ধরেছেন কি ধরেননি এমন সময় ট্যাক্সিওয়ালা সাগ্রহে জড়িয়ে ধরল হাতটা, পরম আনন্দে কবির হাতটা দোলাতে লাগল যেন প্রভাতী ঘণ্টা বাজাচ্ছে লোকটা। অবিস্মরণীয়, বিশ্বকবির সেই হাসি আর প্যারীর ট্যাক্সিচালকের আনন্দ।

সকালবেলা রোজই আমার প্রথম কাজ ছিল সেদিনের ডাক খুলে উল্লেখযোগ্য চিঠি-গুলো পড়ে কবিকে শোনানো। এমনি এক-দিন ও'কে শোনাবার সৌভাগ্য হ'ল ফরাসীতে লেখা চমৎকার একটা চিঠি (ফরাসী উনি খুব ভালই বুঝতেন) যার হাতের লেখায় ও লেখবার শৈলীতেই স্পষ্ট ধরা পড়ে লেখিকার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এক ক্যাথলিক রাজবংশ-সম্ভূতা তিনি। প্রথম মহাযুদ্ধ-প্রসূত যে বিভীষিকার কথা খানিক আগে আমি বলেছি, সেই প্রসঙ্গই আলোচিত হয় চিঠিটায় এবং লেখিকা বলেছেন যে গীতাঞ্জলি পড়ামাত্র তাঁর মনে হয় যে মহান এই কবির কাছে তাঁর চিঠি লেখা একান্তই প্রয়োজন। তিনি আরও লিখেছেন, গীতাঞ্জলি পড়ে কী উপলব্ধি তিনি পেয়েছেন। বেশ পুরু চিঠিটা, আজও আমার মনে পড়ে, এবং তার মধ্যে সে যুগের বর্ণ-বৈষম্যের আলোচনাও ছিল। সাধারণত গুরুদেব ফরাসী চিঠিগুলো আমাকে দিয়েই লেখাতেন এবং নিজে কেবল সই করে দিতেন। কিন্তু এ চিঠিটা পড়ে তিনি বললেন তিনি নিজেই এর জবাব লিখবেন, যেহেতু পত্রলেখিকা নিশ্চয়ই ইংরেজী জানেন; ফলত রবীন্দ্রনাথের সুন্দর একটি চিঠির রসাস্বাদন থেকে আমি বঞ্চিতা হলাম।

আর একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার ছিল টেলিফোন ধরা। ইতিপূর্বেই বলেছি, ফ্রান্সে

তখন গ্রীষ্মের ছুটি। পারী তখন জনশূন্য থাকবার কথা। কিন্তু টেলিফোনের বহর দেখে আমার তো তা মনে হল না। অপরিচিত কত-শত লোক যে ঘন-ঘন টেলিফোনে তাগিদ দিচ্ছে, তার লেখাজোখা নেই। সবারই খুব জরুরী দরকার। আমিও টেলিফোনে একটানা জবাব দিয়ে যাচ্ছি যে গুরুদেবকে তাঁদের কথা বলব এবং তাঁর অবকাশ অনুসারে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করব। কিন্তু এমন 'না-ছুঁই পানি' আশ্বাসে কেউ কেউ আদৌ তৃপ্ত হল না। এ'দেরই একজন একদিন বেলা দুটোর সময় এসে জুটলেন একমাথা পাকা-চুল এক বৃদ্ধা, সন্ধ্যার পোশাকে। অত্যন্ত উদারভাবে বুক-কাটা জামা পরে হাজির। গরম তখন সত্যিই ছিল। কবি বিশ্রাম নিচ্ছেন। কড়া নির্দেশ, বাড়িতে কাকপক্ষীও যেন না ঢোকে সেই সময়। তবে এই মহিলা এতদূর এসে হাজির হলেন কী করে? আজব কাণ্ড।

যে ঘরটার আমি বসে কাজ করতাম তার পাশেই কবির ঘর। মাঝখানে পুরু একটা ভেলভেটের পর্দা। ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে আমার সংগে কথা জুড়ে দিলেন। যত আমি আকারে-ইঙ্গিতে তাঁকে চুপ করতে বলি, ততই তাঁর গলা চড়ে। উনি ছুটির সময় নাকি বাইরে গিয়েছিলেন, কিন্তু পড়ি-মরি করে পারীতে ফিরেই এলেন তাঁর অত যত্নে বাঁধানো গীতাঞ্জলিতে স্বাক্ষর নেবার জন্য। কবির সংগে দেখা না-করে তিনি একপা নড়বেন না। কত করে আমি বললাম যে আপাতত তা অসম্ভব, কিন্তু মহিলা সে কথায় কান দেবার পাত্রী নন। দু চোখ তাঁর নিবদ্ধ ওই পর্দার উপর, সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন আর কি। এমন সময়, অকস্মাৎ, হালকা ঢেউ উঠল পর্দার ভেলভেটের গায়ে। সামান্য ফাঁক হয়ে গেল পর্দাটা আর, দুটো আঙুলের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল দুষ্টুমি-ভরা একটা চোখ। আর, রূপকথার মতই, উঠে গেল পর্দাটা ভোজবাজিতে, কবি আবির্ভূত হলেন আমাদের সামনে, দেদীপ্যমান। কোনমতে গীতাঞ্জলিটা আর একটা কলম বাড়িয়ে ধরে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে মহিলা উপস্থিত হলেন রবীন্দ্রনাথের সামনে, অনুনয় করলেন শুধু মাত্র একটা সই করে দিতে। বৃদ্ধা চলে গেলে, (ট্যাক্সিচালকের মতই হৃষ্টচিত্তে চলে গেলেন তিনি) রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন যে যেটুকু তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন তাতে তাঁর ধারণা যে বইটার সাদা পাতায় স্বাক্ষর দিলেন সে বইটা গীতাঞ্জলি অন্তত নয়।

অবশেষে একদিন আমাদের স্বনামধন্য মহিলা কবি আনা দ্য নোয়াই তাঁর উপস্থিতি ঘোষণা করলেন। অপূর্ব সুন্দরী তিনি, তেমনি রুচিপূর্ণ তাঁর বেশভূষা। মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত চেহারা তাঁর, আবাল-বৃদ্ধ সমস্ত পুরুষই প্রথম দর্শনে তাঁর প্রেমে পড়ত, হাবুডুবু খেত, লুটিয়ে পড়ত তাঁর পদতলে। সেইজন্যেই বিজয়িনীর মত এসেছিলেন তিনি নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত কবির কাছে, গোটা ভারতকে তাঁর অংকশায়িত দেখবার স্বপ্নে মশগুল হয়ে।

অবিস্মরণীয় এক নাটকীয় দৃশ্যের সাক্ষী রইলাম আমি। রবীন্দ্রনাথ যতই ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে তুলে নিচ্ছেন নিজেকে, আনা দ্য নোয়াই-এর ততই রোখ চেপে যাচ্ছে তাঁকে বশে আনবার। কিন্তু, ব্যর্থ প্রয়াস! কয়েক মিনিট বাদে রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তাঁরা দুজনেই কবি এবং তাঁদের এই সাক্ষাৎকারের তাৎপর্যটুকু বিস্মৃত হওয়া অন্যায়। তখন অত্যন্ত সাদা গলায় আনা দ্য নোয়াই রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন স্বরচিত কিছু কবিতা শোনাতে; তারপর এল আনার স্বরচিত কবিতা পড়বার পালা। আনাই অবশেষে পরাজিত হয়ে ফিরে গেলেন। ফলে পারীতে রবীন্দ্রনাথের একক চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্যোগই শুধু তিনি করেননি, যতদূর মনে পড়ে এই প্রদর্শনীর ক্যাটালগে তিনিই লিখে দিয়েছিলেন সুন্দর এক মুখবন্ধ।

বিচ্ছিন্ন এই স্মৃতির মুখ বন্ধ করবার আগে, আমার দিদি আঁদ্রে কার্পেলেস্ রচিত গুরুদেবের প্রশস্তিটা আমি মূলে ইংরেজীতে উদ্ধার করছি, যা আমার দিদি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে Golden Book-এর জন্য:

In the mould of his limitless genius all different arts become one :
He paints with words and plays with colours;
He draws with rhythm and dances with thought;
His lines are philosophy, his ideas sculptures:
He builds with dreams and teaches with silence.
Unveiled by him, Death's mysterious image reveals her misunderstood beauty.

(Andree Karpeles)

[মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ :
পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

॥ তেতাল্লিশ ॥

একে ঠাণ্ডা তায় স্টোভটা যথেষ্ট বেগ দিচ্ছে, চা করতে বিলক্ষণ দেরি হল। টাসী সকালে উঠেই বরফ কুড়িয়ে এনে স্টোভে চাপিয়ে দিয়েছে। বরফ গলিয়ে জল তৈরি করে নিতে হবে। তারপরে চা হবে সেই জলে। স্টোভে কিছু গোলমাল হয়েছে। ভাল আঁচ হচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত অনেক কসরত করার পর চা তৈরি হল। ততক্ষণে ১নং শিবিরে রোদ এসে গিয়েছে। ওরা কেউ এক মুহূর্তও আর দেরি করল না। বেরিয়ে পড়ল ব্রেকফাস্ট সেরে। বেলা তখন ৯টা।

২নং শিবির কোথায় করা যাবে, সেইটে দেখতেই ওরা বের হল। আগের রাতে ঠিক হয়েছিল নিমাই, টাসী আর আঙ শেরিং যাবে ক্যাম্প-সাইট দেখতে। সুকুমার বীরেন সিংহকে নিয়ে যাবেন ইয়েতির পদচিহ্ন দেখাতে। কিন্তু যাত্রাকালে দেখা গেল, প্ল্যানটা বদল হয়েছে। সুকুমারও ক্যাম্প-সাইট দেখতে চলল। বীরেন সিংহ নিজের রোলিফ্লেক্স ক্যামেরাটা নিমাইয়ের কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে, কি করে ফটো তুলতে হয়, সেটা বুঝিয়ে দিলেন।

শনশন করে হাওয়া বইছে। কনকনে হিমেল হাওয়া। গালের চামড়া যেন খুবলে নিয়ে যাবে। নিমাই একবার ক্রীম মাখতে চেষ্টা করেছিল। ক্রীমের কৌটো খুলে দেখে, জমে সেটা শক্ত ইঁট হয়ে গিয়েছে।

নিমাইয়ের ধারণা, যতক্ষণ না তারা রণ্টি পাহাড়ের গিরিশিরাটি সম্পূর্ণ ঘুরে যেতে পারছে, ততক্ষণ তারা নন্দাঘুণ্টি পর্বতের শিখরটি দেখতে পাবে না। মানচিত্রে নন্দাঘুণ্টি পর্বতের অবস্থান যেখানে উল্লেখ করা আছে, সেটা দেখে নিমাই এই সিদ্ধান্তে না এসে পারল না। রণ্টি গিরিশিরার গা এখানে খুব খাড়া। বরফ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকায় অনেক উঁচু উঁচু ঢিবির সৃষ্টি হয়েছে। এই ঢিবি-গুলো ঘুরে ঘুরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই, নিমাই সে কথা বুঝতে পারল। শুধু বুঝতে পারছিল না, কতটা পথ তাদের এইভাবে ঘুরতে হবে। দূর থেকে দেখে সে আন্দাজ করল ঐ গিরিশিরাটাই বোধ হয় শেষ। তারপর ওদের বোধ হয় ডান দিকে মোড় নিতে হবে। নিমাই নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারল না। এটা তার আন্দাজ মাত্র। আর কে না জানে, পাহাড়ের পথে আন্দাজের কোন মানে নেই। এখান থেকে যে গিরিশিরাটাকে শেষ বলে মনে হচ্ছে, কাছে গিয়ে দেখা যাবে, তার পিছনে আরও এক বা একাধিক গিরিশিরা ওদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

নিমাই বেশ খোশমেজাজে এগিয়ে চলেছে। সকাল বেলাকার খাওয়াটা মন্দ হয়নি। রোস্ট, রুটি আর জ্যাম। আর কফি। সঙ্গে আছে বিস্কুট আর চা। ওর হাসি পাচ্ছিল ক্যামেরাগুলো দেখে। বীরেনদার ক্যামেরা ছাড়াও দিলীপ আর বিশ্বর ক্যামেরাও ওর গলায় ঝুলছে। অথচ ও ফটো তুলতে জানে না। তবু ওরা যখন একের পর এক ক্যামেরা ওর গলায় ঝুলিয়ে দিলে, তখন নিমাই আপত্তি করল না। মেক-আপটা যে ভাল হল, নিমাই এতেই খুশী। ক্যামেরা ছাড়া ওর কাছে আর ছিল দূরবীন। আর কম্পাস আর ম্যাপ।

১নং শিবিরের বাঁ দিকে, যে ছোট হিমবাহটি মূল রণ্টি হিমবাহের সঙ্গে এসে মিশেছে ওরা সেই দিকেই অগ্রসর হতে লাগল। তারপর সেখান থেকে দক্ষিণ মুখে এগোতে থাকল। নিমাইদের দৃষ্টি মাঝে মাঝে পড়ছিল বেধারতলির উপর। সেখানে একের পর এক তুষারধস নামছে। নিমাইয়ের দৃষ্টির সামনেই

১নং ক্যাম্প থেকে ২নং ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে যাত্রার আগে সকলে প্রাতঃকালীন আহার সম্পন্ন করছেন

পাহাড়ের তুষারপ্রাচীর ভেঙে ভেঙে পড়ছে। কী ভয়াবহ দৃশ্য! কী প্রচণ্ড শব্দ। নিমাই সব ক'টা ক্যামেরার শাটার এলোপাতাড়ি টিপে গেল। আর এতক্ষণে নিজেকে ভারি ফটোগ্রাফার ফটোগ্রাফার মনে হতে লাগল।

একটু এগিয়ে যাওয়ার পর ওদের নজরে সেই ইয়েতির পায়ের ছাপের সারি ভেসে উঠল। নিমাই আবার ফটাফট শাটার টিপল।

তারপর আরও কিছুটা এগিয়ে ওরা এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল। এ জায়গাটা কিছুটা সমতল। ডান পাশে বেশ উঁচু একটা বরফের ঢিবি। বাঁ পাশে হিমবাহের ক্রমশ নিচু ঢালুটা। সেটা ক্রমাগত নেমে গিয়ে বেথারতলির গায়ে মিশে গেছে। সামনে বেথারতলি আর নন্দাঘুণ্টি পর্বত-মালা দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের ফাঁক দিয়ে রণ্টি হিমবাহ এঁকে-বেঁকে পথ করে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে গেছে। বীরেনদা বলেছিল, নিমাইয়ের মনে পড়ল, বিশ্বনাথের গলি। বীরেনদার বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে।

নিমাই সেখানে বসে পড়ে ম্যাপটা বিছিয়ে নিল। কম্পাস বের করে রিডিং নিল। দেখল, ওদের আর দক্ষিণে যাবার দরকার নেই। এবারে পশ্চিম দিকে মোড় নিতে হবে। এখানে এসেও নন্দাঘুণ্টির চূড়াটা দেখতে পাওয়া গেল না। আশ্চর্য! নন্দাঘুণ্টির চূড়াটা যেন ওদের সঙ্গে সোনার হরিণের ছলনা শুরু করেছে। নন্দাঘুণ্টি পাহাড়টা এবার নিজেই আড়াল রচনা করে ঢেকে রেখেছে তার চূড়াটাকে।

রণ্টি গিরিশিরাও ক্রমশ শেষ হয়ে এল। ওটা ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে এসেছে এবং বরফের ছোট-বড় ঢিবির অরণ্যে নিজেকে যেন নিঃশেষে মিশিয়ে দিয়েছে। এবার নন্দাঘুণ্টির গিরিশিরা ওদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। ওটা এখনও বেশ দূর। তবু নিমাই বেশ স্পষ্টই দেখতে পেল একেবারে খাড়া উঠে গেছে গিরিশিরাটা। ঘন ছাই রঙের শরীর। দেহে অজস্র ভাঁজ। প্রথম দিকটা এত খাড়া যে, গায়ে বরফ পর্যন্ত জমতে পায়নি। পাথর নগ্নভাবে বেরিয়ে আছে। সেই সব পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বরফ জমে আছে। পিছনের অংশটা এমন ভয়ংকর খাড়া নয় বলেই নিমাইয়ের ধারণা হল। ওদিকটা একেবারে সাদা। বরফে ঢাকা।

ওরা এবার ক্রমাগত পশ্চিম দিকে চলতে লাগল। একটার পর একটা বরফের ঢিবি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ওরা চলেছে। বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা বাজল। ১নং শিবির থেকে মাইল দেড়েক আসতে পেরেছে। সূর্য খানিকটা হেলে গিয়েছে। তবু রোদ বড় কড়া। বাতাস আছে, তাই ঘাম হচ্ছে না। চড়াইয়ে উঠতে বেশ দম বেরিয়ে যাচ্ছে। এবার একটানা চড়াই শুরু হল। শুধুই চড়াই। বেলা আড়াইটা পর্যন্ত ওরা অবিরাম উঠে গেল। ওরা এবার এমন একটা কোণে এসে পড়ল, যেখান থেকে নন্দাঘুণ্টির অনেকখানি অংশ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। এখন প্রতি মুহূর্তে ওরা ভাবছে, এই বুঝি নন্দাঘুণ্টির শিখরটা ভেসে উঠবে ওদের চোখে। কিন্তু হায়,

কোথায় সেই চূড়া। এখনও তার টিকিরও দেখা নেই। প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে ওদের। তৃষ্ণায় বুক ফাট-ফাট। পরিশ্রান্ত দেহ আর চলে না। শরীর বিশ্রাম চাইছে।

কিন্তু নিমাইয়ের কেমন রোখ চেপে গেল। নন্দাঘুণ্টির চূড়া সে আজ দেখে তবে ফিরবে। নিমাই আবার কম্পাস দেখল। ওরা ঠিক দিকেই এগুচ্ছে। তবে এবারে আরও উঁচুতে উঠতে হবে, না হলে চূড়াটা নজরে আসবে না।

এদিকের বরফ বেশ শক্ত। পায়ের গোড়ালির বেশী ডুবছে না। শেষ চড়াইটাও ওরা উঠল। কিন্তু কি আশ্চর্য, তবু চূড়াটা নজরে পড়ল না। ব্যাপার কি? নিমাই একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। সুকুমার, আঙ শেরিং আর টাসী বসে পড়ল। আঙ শেরিং হাঁটুতে একটু চোট খেয়েছে। ওরা বিশ্রাম নিতে লাগল। নিমাই তখনও বসল না। ওর মনে দারুন উত্তেজনা। আজ এসপার কি ওসপার।

নিমাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকটা ভেবে নিল। ও বুঝল, ওর সামনে এখন দুটো পথ। হয় পশ্চিম দিকে ওকে আরও খানিকটা উঠতে হবে, নয়ত দিক-পরিবর্তন করে উত্তর দিকে এগোতে হবে। নিমাই উত্তরেই মোড় নিল। কিছুটা যেতেই একটা বড় ঢিবি। নিমাইয়ের মন বলল, ঐ ঢিবি, ঐ ঢিবিতে উঠলেই কার্যসিদ্ধি। নিমাই শেষ শক্তি একত্র করে তারই জোরে চড়াইটাতে উঠতে লাগল। ধীরে ধীরে টলতে টলতে এক সময় চড়াইটার মাথায় সে উঠে পড়ল। সে পশ্চিম দিকে চাইল।

ঐ যে! নিমাইয়ের বুকের রক্ত লাফ দিয়ে উঠল। ঐ যে নন্দাঘুণ্টির শিখর! বিস্ময়ে আনন্দে নিমাই বুঝি ফেটে পড়বে। ঠিক পশ্চিমে নন্দাঘুণ্টির কল্ প্রসারিত। কলের বাঁ দিকে (দক্ষিণে) দুটো বড় বড় কুঞ্জ। সেই কুঞ্জের আড়াল থেকে চূড়াটা উঁকি মারছে। নিমাই স্তব্ধ বিস্ময়ে দু চোখ ভরে দেখতে লাগল। ওর মনে হল, নন্দাঘুণ্টির চূড়ার মাথায় একটা ছোট্ট চাতাল আছে বোধ হয়। সাদা সাদা বরফের ধোঁয়া তার পিছন থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছে। সূর্যটা ঠিক যেন সেই চাতালটার উপরে গিয়ে বসেছে।

নিমাই উত্তেজনার ধাক্কায় অধীর হয়ে সেই মুহূর্তে ক্ষিধে-তেষ্টা ভুলে গেল। এতক্ষণ পরে তার দেহে যেন বল এসেছে। আগের মুহূর্তের ক্লান্তি নিঃশেষে দূর হয়ে গিয়েছে।

নিমাই আনন্দে চেঁচাতে লাগল, "পিক্, পিক্! সুকুমার, সুকুমার, নন্দাঘুণ্টি, নন্দাঘুণ্টির পিক্! ঐ যে নন্দাঘুণ্টির চূড়া! এসো, এসো, দেখো এসে।"

নিমাই আর দাঁড়াতে পারল না।

১নং ক্যাম্পে চলেছেন অভিযাত্রীদল। সামনেই দেখা যাচ্ছে একটি ছোট বরফের ফাটল। আগে চলেছে বিশ্বদেব। পিঠে মালের বোঝা

উত্তেজনার প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পরই অবসাদ এসে গ্রাস করল তাকে। সেই বরফের উপরই নিমাই ধপ করে বসে পড়ল।

সুকুমার, আঙ শেরিং আর টাসী, একটু দূরে, আরেকটা ঢিবির মাথায় বসে লাঞ্চ খাচ্ছিল, বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমন সময় নিমাইয়ের চিৎকার ওদের কানে গেল।

"পিক পিক ... সুকুমার, সুকুমার...... নন্দাঘুণ্টি......নন্দাঘুণ্টি পিক্......"

নন্দাঘুণ্টির চূড়া! ওরা চমকে উঠল। নন্দাঘুণ্টির চূড়া? সত্যি? সত্যিই তার দর্শন মিলল তবে! ওরা লাফিয়ে উঠল। দ্রুত চড়াই বেয়ে আসতে লাগল নিমাইয়ের কাছে। প্রথমে পৌঁছাল টাসী, তারপর সুকুমার, তারপর আঙ শেরিং। দেখল ওরা। নিমাই ছবি তুলতে চেষ্টা করল। কিন্তু সূর্য বাদী, 'এগেনস্ট লাইট', তাই ছবি তুলতে পারল না।

নিমাই ম্যাপ বিছিয়ে বসে পড়ল। কম্পাসের রিডিং নিয়ে হিসেব কষল। না, কোন ভুল নেই। ঐ চূড়াই নন্দাঘুণ্টির চূড়া। সে সুকুমারকে বুঝিয়ে বলল।

বেলা পড়ে আসছে। আর নয়, এবার ফিরতে হয়। ওরা ১নং শিবিরের দিকে রওনা হল। যে পথে এসেছিল, ওরা ঠিক সে পথে ফিরল না। আসবার সময় যেসব বরফের ঢিবি ওরা এড়িয়ে এসেছিল, ফেরার পথে সেই সব ঢিবি মাড়িয়েই ওরা যেতে লাগল। ওরা যেতে লাগল উত্তর-পূর্বে। একটা করে ঢিবি ওরা পার হচ্ছে,
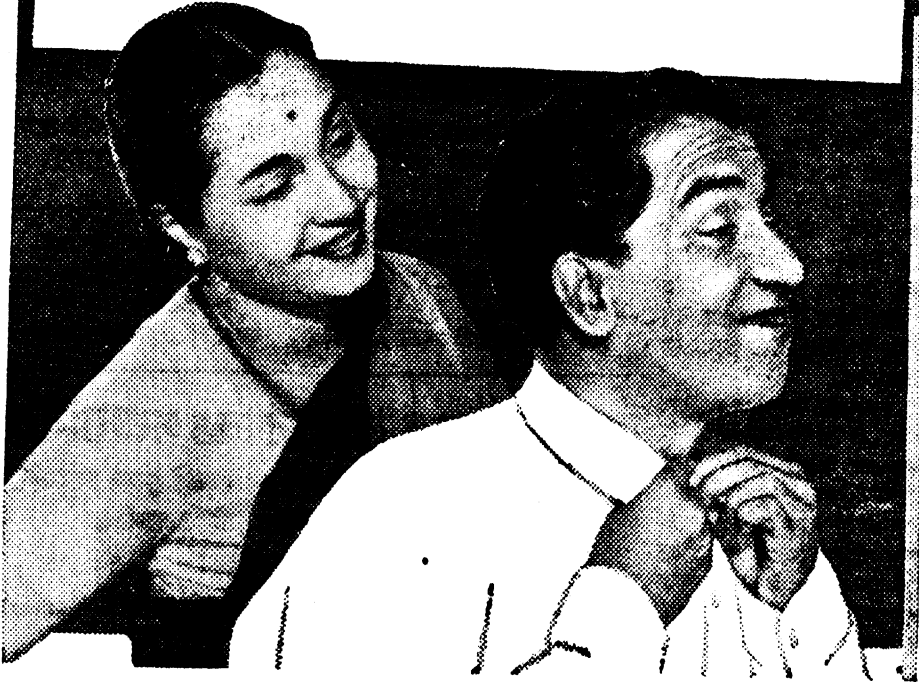
সঙ্গে সঙ্গে সামনে আরেকটা ঢিবি হাজির হচ্ছে। এর যেন আর শেষ নেই। উপমা দিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, উত্তাল এক তরঙ্গসংকুল সমুদ্র এখানে হঠাৎ যেন ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছে। ঢেউগুলো জমে বরফের ঢিবিতে পরিণত হয়েছে।

এইভাবে ক্রমাগত উঠতে-নামতে, উঠতে-নামতে, প্রায় চারটে নাগাদ ওরা একটা বড় চড়াইয়ের মাথায় গিয়ে উঠল। খানিক দূরে, অনেক নিচে ১নং শিবিরটা দেখা গেল। শিবিরে এরই মধ্যে ছায়া পড়ে গিয়েছে। তাঁবুগুলো কত ছোট ছোট দেখাচ্ছে। মানুষগুলো বিন্দুবৎ। সাদা বরফের পট-ভূমিতে গাঢ় সবুজ রঙের একটা তাঁবু—যেন একটি সবুজ পান্না। ভারি সুন্দর দেখতে লাগছে। এ পথের প্রকৃতিরও পরিবর্তন হয়েছে। কোন কোন জায়গায় বরফের আস্তরণ ছিঁড়ে গেছে। সেই জায়গাটুকুতে কে যেন শ্যাওলার গালিচা বিছিয়ে দিয়ে গিয়েছে। ক'দিন ধরে চোখ শুধুই সাদা দেখছিল। একঘেয়ে দৃশ্যে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। এখন এই হলদে-সবুজ মেশানো রঙের বাহারী শ্যাওলার গালিচাটায় নজর পড়ামাত্র চোখের ক্লান্তি দূর হল। নিমাইয়ের মনে হল, মানুষ কত অল্পে তুষ্ট হতে পারে!

বরফের প্রকৃতিও বদলাতে শুরু করেছে। যাবার সময় ওরা যে পথে গিয়েছিল, সে পথের বেশির ভাগ জায়গাতেই নিচে শক্ত বরফ ছিল। উপরে সামান্য পরিমাণ বরফের গুঁড়ো ছিটানো ছিল। পায়ের পাতার বেশী ডোবেনি। বড় জোর গোড়ালিটা ডুবেছে। এখন ওরা আবার নরম ভসভসে বরফের মধ্যে এসে পড়ল। কখনও কখনও হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। ওরা অতি সাবধানে চলতে লাগল। একদম ছায়া পড়ে এসেছে। শীত করছে বেজায়। ওরা উইন্ড-প্রুফ গায়ে চাপাল। গগলস চোখে রাখলে পথ দেখা যায় না। নিমাই গগলসটা কপালে তুলে দিল।

এবারে খাড়া উৎরাই। টাসী আর হেঁটে হেঁটে নামল না। তুষার-গাঁইতিতে ভারসাম্য রক্ষা করে স্লিপ খেয়ে সড় সড় করে নেমে গেল। দেখাদেখি নিমাইও। সামনে ছোট্ট চড়াই। সেটা পার হয়েই ১নং শিবির। ওরা যখন পৌঁছাল, তখন বেলা পাঁচটা।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

১৭ই অক্টোবর সকালে ১নং শিবির থেকে ওরা আবার যাত্রা করল। কাল ওরা ২নং শিবির যেখানে করবে, সেখানে পৌঁছাতে পারেনি। তারই কাছাকাছি এক জায়গায় মাল রেখে চলে এসেছিল। আজ ওরা আরও মাল নিয়ে চলেছে। ২নং শিবিরও স্থাপন করে আসবে।

আজ সুকুমার আর নিমাই ১নং শিবিরে বিশ্রাম নিল। ওদের বদলে চলল বিশ্ব আর দিলীপ। দিলীপ আর বিশ্ব রসদের বোঝা পিঠে তুলে নিল। এই রসদ ৩নং আর ৪নং শিবিরের জন্য মার্কা করা ছিল। শেরপারা—আঙ শেরিং, টাসী, গুনদিন আর দা তেম্বা—নিল তাঁবু, পিটন, দড়ি ইত্যাদি।

কাল সুকুমাররা যে পথে ১নং শিবিরে ফিরে এসেছিল, আজ বিশ্বরা সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলল। এ পথ কষ্টসাধ্য, কিন্তু দূরত্ব কিছু কম। শিবির থেকে বেরিয়ে একটু এগোলেই ছোট একটা হিমানী-যোজক আর তার পরেই উঠে গেছে প্রায় ৮০০ ফুট একটা কঠিন চড়াই। আজ মালের ওজন বেশ ভালই আছে। প্রায় ৫০ পাউন্ডের বোঝা এক-একজনের পিঠে চেপেছে। শেরপারা যে পরিমাণ বোঝা বইছে, দিলীপ আর বিশ্বর কাঁধেও তাই। দিলীপ, বিশ্ব আর মদন বোঝা বইতে পারে খুব।

তবে আজ বোঝার ভার ওদের বেশ কাহিল করে তুলেছে। ১৫০ ফুট উঠতেই ওরা এত হাঁফিয়ে উঠল যে, বিশ্রাম নিতে বাধ্য হল। গরম লাগছে। ঘাম হচ্ছে। ওরা সোয়েটার খুলে ফেলল। লেমন-পানি খেয়ে তৃষ্ণা মেটালো। এতদিন লেমন-বার্লি খেয়েছে। সে জিনিস ফুরিয়ে গেছে। এখন ওরা জলের সঙ্গে লেমন পাউডার গুলে তাই পান করল।

ওরা কিছুটা পথ উঠছে হাঁফিয়ে পড়ছে, বিশ্রাম নিচ্ছে, লেমন-পানি খেয়ে ক্লান্তি দূর করছে, আবার উঠছে। এমনি-ভাবে ওরা এগুতে থাকল। উপরে উঠতে আর ফুট পঞ্চাশেক বাকি। এমন সময় ওরা দেখতে পেল প্রচণ্ড শব্দে চারিদিক কাঁপিয়ে বেখেয়ালি পাহাড় থেকে তুষারের ধস ভেঙে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা। আবার একটা। ওরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল। গতকাল ঐদিকের রাস্তা ধরেই সুকুমাররা এগিয়ে গিয়েছিল। কী সাংঘাতিক দৃশ্য! দিলীপ ক্যামেরার শাটার টিপতে টিপতে মনে মনে বলল। কী মারাত্মক পাহাড় রে বাবা! ওর বুক তখনও ধক ধক করছে।

অনেকখানি এগিয়ে এসেছে ওরা। রাণ্টি পাহাড়টা থেকে একটা হিমবাহ নেমে এসে এখানে রণ্টি হিমবাহের সঙ্গে মিশেছে। রণ্টি পাহাড় থেকে যে হিমবাহটা নেমেছে, তার কোন নাম ম্যাপে নেই। ত্রিশূল পাহাড় থেকে যে সুদীর্ঘ হিমবাহটা এদিকে নেমেছে, মানচিত্রে তারই নাম রণ্টি

হিমবাহ। রণ্টি হিমবাহ উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত। এরই সঙ্গে পূব--পশ্চিমে প্রসারিত নন্দাঘুণ্টি হিমবাহ এসে যুক্ত হয়েছে। আর দিলীপদের সামনে এখন যে হিমবাহটা দেখা যাচ্ছে, রণ্টি পাহাড়ের কাছ থেকে সেটাও পূর্ব-পশ্চিমে নেমে এসেছে। এই অনামী হিমবাহটা নন্দাঘুণ্টি হিমবাহেরই সমান্তরাল। এই দুটো হিমবাহের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে নন্দাঘুণ্টি পাহাড়। দিলীপ ছবি তুলল। আঙ শেরিংকে জিজ্ঞাসা করল চূড়াটা কখন দেখা যাবে। আঙ শেরিং জানাল, আরও একটুখানি উঠতে হবে। ওরা এবার যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি উঠতে চেষ্টা করল।

একটা চড়াই ওদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ছিল। তার মাথায় উঠতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। সামনেই নন্দাঘুণ্টির সুতীক্ষ্ন গিরিশিরা। তার গা এত খাড়া যে, বরফ পর্যন্ত জমতে পারেনি। কালো, পাথুরে পাহাড়। নিমাই যে বর্ণনা দিয়েছে তার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। এই গিরিশিরাটার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে নন্দাঘুণ্টির চূড়া। এখান থেকে মনে হচ্ছে বরফের উপর কে বুঝি একটা ছোট্ট ঢিবি বসিয়ে রেখেছে। দিলীপ ছবি তুলল।

সে দেখতে পেল ঢিবিটার পিছন থেকে সাদা সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে লেগেছে।

আঙ শেরিং বলল, "সাব্, দেখো দেখো, ধূপ জ্বলা দিয়া।"

গিরিশিরাটার আড়ালে থাকায় নন্দাঘুণ্টির চূড়ার দক্ষিণে কি আছে, দেখা যাচ্ছে না। উত্তর দিকটা পরিষ্কার। ঢালু গায়ের উপর দু-দুটো কুঁজ বেরিয়ে আছে। দুটোর ব্যবধান এখান থেকে দিলীপের আন্দাজে প্রায় ১০০০ ফুট হবে। এখান থেকে নন্দাঘুণ্টির উত্তর "কল"টাও দেখা যাচ্ছে। দিলীপের মনে হল, চূড়ায় ওঠার পথ পাওয়া অসম্ভব হবে না। মনে হল, প্রথম কুঁজটাই যা কিছু কষ্টের কারণ হবে। দিলীপ আর বিশ্ব এ সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনা করল।

তারপর ওরা রণ্টি গিরিশিরার গা ঘেঁষে, সেই অনামী হিমবাহ ধরে, নন্দাঘুণ্টি "কল"-এর দিকে এগোতে লাগল। ফটো তোলার জন্য ওরা দেরি করছিল। তাই আঙ শেরিংরা এগিয়ে গেল। দিলীপ আর বিশ্ব ওদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে লাগল। দিলীপের শরীরটা ভাল নেই। তেমন জুত পাচ্ছে না। দুর্বল-দুর্বল লাগছে। হাঁফ ধরছে ঘন ঘন। শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এদিকের বরফ খুব নরম। হাঁটতে গেলে ভস্ ভস্ করে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। পা টেনে তুলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে দিলীপের। একবার পা ভস্ করে বসে গেলে সে হুমড়ি খেয়েই পড়ে থাকছে কিছুক্ষণ। একবার তার পা ভস্ করে অনেকখানি বসে গেল। চোরা পাথরে চোট খেয়ে তার পায়ের পাতা মচকে গেল। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল দিলীপ।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে এগিয়ে চলল। একবার ডাক্তারের উপদেশ মনে পড়ল তার: পায়ের ব্যথা পায়ে সেরে যাওয়াই সব থেকে ভাল। চমৎকার দাওয়াই ডাক্তারের! দিলীপ নিরুপায়ভাবে মুখ বুজে সেই উপদেশই পালন করতে লাগল।

এবার কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর দিলীপ দেখল আরও একসার পায়ের ছাপ ওদের পথে এসে মিশেছে। পথ-নিশানী পতাকা দেখে বুঝল, ওগুলো নিমাইদের পায়ের দাগ। কাল ওরা এই পথেই এসেছিল। এ পথটা এগিয়ে গেছে নন্দাঘুণ্টি গিরিশিরার দিকে। দিলীপরা যাবে
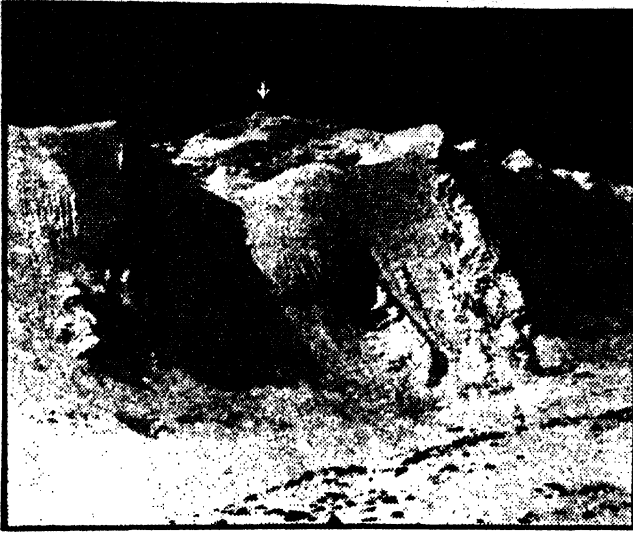
দূর থেকে নন্দাঘুণ্টি। তীর চিহ্নিত স্থানে শিখরের গম্বুজটি দেখা যাচ্ছে। বাঁয়ে তুষার ধস নামছে, ভয়াবহ বেগে —ফটো—দিলীপ ব্যানার্জি

"কল"-এর দিকে। ওরা সে পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরল।

প্রায় ২০।২৫ মিনিট এগিয়ে যাবার পর দিলীপ দেখল, আঙ শেরিংরা বসে বিশ্রাম নিচ্ছে। ওরাও বসে পড়ল। আঙ শেরিং বলল, আবহাওয়া যদি ভাল থাকে, বেয়াড়া ফাটল যদি না থাকে, তাহলে চূড়ায় ওঠা সম্ভব হবে। শেরপারা গাইগ'ুই করতে লাগল, আজ মাল বড় বেশি চাপানো হয়েছে। ২নং শিবির স্থাপন করবার একটা পছন্দমত জায়গাও বের করা হল। ওরা এবার সেদিকেই এগ্তে লাগল। এতক্ষণ ওরা রণ্টির একেবারে গা ঘেঁষে চলছিল। এবার চলতে লাগল রণ্টি আর নন্দাঘুণ্টির মাঝামাঝি পথ ধরে। এই দুটো পাহাড়ের ব্যবধান ক্রমেই কমে আসছে। হিমবাহটা ক্রমশই সরু হয়ে আসছে। বরফের উপর প্রচুর বড় বড় পাথর ছড়িয়ে আছে। এই মালের বোঝা নিয়ে চলতে মেজাজও তিরিক্ষে হয়ে উঠছে। দিলীপের বিরক্তি ধরে এল। রাগ হতে লাগল। নিজের উপর, সুকুমারের উপর, সকলের উপর। খুব ধীর গতিতে চলতে লাগল ওরা। পথটা কখন শেষ হবে? পথ শেষ হলে দিলীপ যেন বাঁচে।

বেলা আড়াইটা নাগাদ ওরা প্রায় ১৬৩০০ ফুট উপরে উঠল। তারপর সবাই বিশ্রাম নিতে বসল। আঙ শেরিং বলল, ৩নং শিবির যখন করতেই হবে, তখন ২নং শিবিরটা অনর্থক আর এগিয়ে নিয়ে লাভ কি? এই জায়গাটাই ২নং-এর পক্ষে বেশ ভাল হবে। আঙ শেরিং-এর কথায় ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বোঝা নামিয়ে হালকা হল। প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে। লাঞ্চ সারতে মন দিল। চা আর কোলে বিস্কুট—এই ছিল লাঞ্চ। তাই যেন অমৃত।

৩টের সময় ওরা ১নং শিবিরের দিকে ফিরে চলল। এতক্ষণে হাওয়া ছেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হাড়কাঁপুনে শীত। সোয়েটার, উইণ্ড-প্রুফ সব পরে ফেলা হল। দ্রুত চলে সেই উ'চু চড়াইয়ের মাথায় ওরা যখন পেঁাছাল, তখন সূর্যটা নন্দাঘুণ্টির চূড়ার সেই ছোট্ট ঢিবির উপর এসে পড়েছে। ওদের মনে হল, ওটা বুঝি সূর্যের বসবার জায়গা। ওদের গায়ে রোদ, নিচে—বেশ খানিকটা নিচে ১নং শিবির, সেখানে তখন ছায়া। ওরা রোদ পোয়াতে বসে গেল।

১৮ই অক্টোবর, সকাল সাড়ে নটার মধ্যেই ওরা ২নং শিবির স্থাপন করতে ১নং শিবির থেকে বেরিয়ে পড়ল। গত দু দিনের চেষ্টায় ওরা কিছু মাল উপরে তুলতে পেরেছে বটে, কিন্তু শিবির স্থাপন করতে পারেনি। আজ দিলীপ আর বিশ্বকে বিশ্রাম দেওয়া হল। সুকুমার আর নিমাই শেরপাদের—আঙ শেরিং, টাসী, গুনদিন আর দা তেম্বা—সঙ্গে গেল।

ওরা মাল কিছু কম নিল। ৩০।৩৫ পাউন্ড। তাই অপেক্ষাকৃত দ্রুততর বেগে এগোতে পারছিল। দিলীপরা কাল যে পথে এগিয়েছিল, এরাও সে পথ ধরল। কাল দিলীপরা যে পর্যন্ত এসেছিল, ওরা আজ সেখানে প্রায় সওয়া দুটোর মধ্যেই পেঁাছে গেল। পথিমধ্যেই ওরা লাঞ্চ সেরে নিয়েছিল।

শেরপারা এখানে কিছু মাল নামিয়ে রেখে বাকি মাল নিয়ে আঙ শেরিং-এর নির্দেশমত এগিয়ে গেল আরও। নিমাই আর সুকুমার বসে বসে বিশ্রাম নিতে লাগল। শেরপারা কিছু দূর গিয়ে রণ্টির দিকে একটা বরফের পাঁচিলের আড়ালে নেমে পড়ল। ওদের আর দেখা গেল না। ওরা একটু আশ্চর্য হল। শেরপারা ওদিকে গেল কোথায়?

নিমাই হাঁক ছাড়ল। কিছুক্ষণ পরে ওদের সাড়া পাওয়া গেল। সুকুমাররা সেদিকে এগিয়ে গেল। পাঁচিলটায় উঠে ওরা দেখে নিচেয়, প্রায় ২০ ফুট নিচের একটা খোঁড়ল আছে। শেরপারা সেখানেই ২নং শিবির স্থাপন করছে। ওরা যেতেই আঙ শেরিং বলল, এই হচ্ছে ভাল জায়গা। পাথর পড়বে না, ধস নামবে না, হাওয়াও লাগবে না।

ছোট্ট অপরিসর জায়গা। কোনক্রমে গোটা তিনেক তাঁবু খাটানো গেল। একটাতে শেরপারা ক'জন, একটাতে আঙ শেরিং আর অন্যটাতে নিমাই আর সুকুমার। জায়গাটা একটা বড় গামলার মত। ভিতর থেকেই নন্দাঘুণ্টির চূড়া দেখা যায়। কানায় উঠলে দেখা যায় "কল"টি।
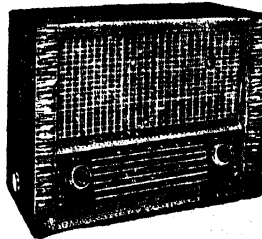
বীরেন সিংহের দিনলিপি থেকে:

অ্যাডভান্স বেস, ১৮ই অক্টোবর। আমি দুপুরে এখানে নেমে এসেছি। মন খুবই খারাপ। নিজের ব্যর্থতার জন্য নিজেকেই ধিক্কার দিচ্ছি। কোথায় উপরে উঠব, এই আশায় বুক বেঁধেছিলাম, আর কোথায় এখন বসে আছি। এই জায়গাটা আমার কাছে বিষের মত লাগছে। হয়ত উপরে যেতে পারতাম। কিন্তু যেতে হত সকলের পরে। ফটোগ্রাফার হিসেবে সে যাওয়ার মূল্য কি? বিয়ে ফুরোলে বাজনা।

কাল যখন আলোচনা হল, তখনই বুঝলাম, আমার নেমে যাওয়াই ভাল। কাল লীডার জানাল, দিলীপ, বিশ্বাস ও আমাকে ১নং-এই থাকতে হবে। তা না হলে উপরে খাওয়ার জিনিস, তাঁবু, অন্যান্য সরঞ্জাম, কিছুই পাঠানো যাবে না। আমার জন্য দুটো শেরপা দরকার। আর আমি দুটো শেরপা নিলে এদের মাল যায় না। কাজেই নেমে আসা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর কি?

আমি এখানে বরফ-ঢাকা পাহাড় দেখতে আসিনি। ১৮০০০ ফুট আরোহণের কৃতিত্ব নিতেও আসিনি। আমার উদ্দেশ্য ছিল, বাঙালীর ছেলেদের পর্বত আরোহণের একখানি চমকপ্রদ ও সম্পূর্ণ চলচ্চিত্র তোলা। এই জন্যই আমার প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে আমি অনেক টাকার জিনিস কিনে এনেছি। আমার কর্তব্যকর্মের অসাফল্যের দুঃখ ও লজ্জা আমাকে যে কী পরিমাণ পীড়া দিচ্ছে তা প্রকাশ করা অসম্ভব। (ক্রমশ)

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৭৭)

মনে আছে সেদিন সমস্ত দিনটা দীপঙ্করের কেটেছিল একটা অভূতপূর্ব মগ্ন-চৈতন্যের মধ্যে দিয়ে। জীবনের কি এইটেই চরম অর্থ? এই ভেতর থেকে বাইরে আসা? না কি বাইরে থেকে ভেতরে আসাটাই আসল! জীবন থেকে যত বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিল দীপঙ্কর, ততই যেন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছিল সে।

পরে সনাতনবাবু বলেছিলেন—যত পুষ্টি হবে ফলের, ততই সে আলগা হবে বোঁটায়—

কিন্তু তাই-ই যদি হবে, তাহলে কেন মানুষ সমাজে আধিপত্য করতে চায়? কেন লক্ষ্মীকে সিন্দুকে পুরে মানুষ সৌভাগ্যকে চিরস্থায়ী করতে চায়? কেন শত্রুদের জয় করে অমিতবীর্য হতে চায় মানুষ? কেন মানুষ পদ আর পদবী পেতে চায় সব আত্ম-সম্মান বিসর্জন দিয়ে?

সনাতনবাবু বলেছিলেন—যারা তা চায়, তারা নগদ-বিদায়টাকেই যে বড় করে দেখে দীপঙ্করবাবু, কিন্তু যা হাতের মুঠোয় পাওয়া গেল তাতে তো তাদের সুখ নেই—তখন বলে আরো চাই—

—তাহলে কীসে সুখ?

হাসপাতাল থেকে ফেরার সময় সনাতনবাবু বলেছিলেন—আগে বলুন কোন্ সুখটা চান? দেহের, না মনের, না আত্মার?

কোথা থেকে কোথায় কথা গড়িয়ে গেল, দীপঙ্কর বুঝতে পারলে না। এতদিন এত মানুষের মুখোমুখি হয়েছে দীপঙ্কর, কিন্তু এমন অদ্ভুত মানুষের সংশ্রবে কখনও আসেনি। সেই আশুতোষ কলেজের অমলবাবু, সেই প্রাণমথবাবু, কেউই এমন করে এই দিক থেকে জীবনকে দেখেননি। সনাতনবাবু দীপঙ্করের কাছে শুধু যেন ব্যক্তিই নয়, যেন একটা তত্ত্ব।

সেই সেদিনকার হাসপাতালের ঘটনাতেই সনাতনবাবু যেন আরো রহস্যময় হয়ে উঠলেন। এমন হবে তা তো ভাবতে পারেনি দীপঙ্কর।

দীপঙ্কর ভেতরে ঢুকতেই মিস্টার ঘোষাল একটু ফণা তুলে উঠেছিল। হয়ত কিছু কটু কথা শোনাতো দীপঙ্করকে। কিন্তু পাশে সনাতনবাবুকে দেখে যেন একটু সংকুচিত হয়ে উঠেছিল। হয়ত সন্দেহও করেছিল।

পরিচয়টা দীপঙ্করই করিয়ে দিলে। বললে—ইনিই মিস্টার ঘোষ, মিসেস ঘোষের হাজব্যান্ড—মিসেস ঘোষের অসুখের খবর শুনে দেখতে এসেছেন—

তাড়াতাড়ি মিস্টার ঘোষাল সনাতনবাবুর একটা হাত নিজের হাতে টেনে নিলেন। বললেন—ভারি খুশী হলাম আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মিস্টার ঘোষ, এই দেখুন না, মিসেস ঘোষের অসুখে আমিও অফিস থেকে আজ বাড়ি যেতে পারিনি—আপনি এলেন, আমি একটু নিশ্চিন্ত হলুম—এখন আপনি দেখুন—আমি যাই—

সতী এতক্ষণ কথাগুলো শুনছিল। বললে—না—তুমি যেও না—

মিস্টার ঘোষাল, দীপঙ্কর, এমন কি সনাতনবাবু পর্যন্ত সতীর এই এতটুকু কথাতে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। তারপরই সনাতনবাবু সতীর দিকে এগিয়ে গেলেন। বললেন—কেমন আছো সতী, তুমি? তোমার কী হয়েছে? হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেই বা কেন? তুমি তো জানো, তোমার শরীর দুর্বল, অফিসের পরিশ্রম তোমার সহ্য হবে না—

সতী চুপ করে চেয়ে রইল সনাতনবাবুর দিকে। কিছু কথা বেরোল না তার মুখ দিয়ে।

সতীর মাথার চুলের ওপর হাত বোলাতে লাগলেন সনাতনবাবু। তারপর নিচু হয়ে বসলেন মাথার কাছে। বললেন—নিজের ওপর আর কত অত্যাচার করবে তুমি বলো তো?

সনাতনবাবু যেন ভুলে গেছেন, ঘরে আরো অনেক লোক আছে। সারাদিন মানুষটার খাওয়া হয়নি, বিশ্রাম হয়নি। যে মানুষ সব সহ্য করেন মুখ বুজে, সেই মানুষটা বুঝি আজ আরো অনেক সহ্য করবার জন্যেই এখানে এসেছে। মনে হলো যেন আরো অনেক ব্যথার আঘাত সইবার পণ নিয়েই তিনি আজ তৈরি করেছেন নিজেকে।

—অনেক তুমি সহ্য করেছ সতী, অনেক তুমি আঘাতও করেছ। যত আঘাত তুমি নিজে পেয়েছ, তার অনেক বেশী আঘাত
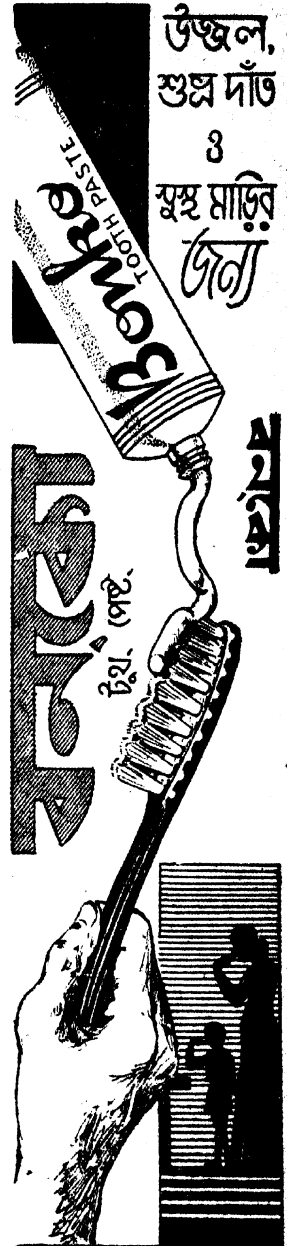
তুমি দিতে চেয়েছ। কিন্তু এখন তুমি তো বুঝলে আঘাত করতে চাইলেই আঘাত করা যায় না—

সতী তবু কিছু কথা বললে না। এক-দৃষ্টে সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে রইল।

সনাতনবাবু বলতে লাগলেন—তুমি আমার স্ত্রী, আবার আমাদের বাড়ির বউও বটে, তোমার লজ্জা যে আমারও লজ্জা, আমাদের বাড়িরও লজ্জা। তোমার অপমান, যে আমারও অপমান, আমাদের বাড়িরও অপমান সতী। তোমাকে বাদ দিয়ে তো আমার নিজের আলাদা অস্তিত্বের কোনও মূল্য নেই!

এতক্ষণে সতী কথা বললে। বললে—আর তোমার মা?

সনাতনবাবু বললেন—মা'মণির কথা বলছো? তুমি যেমন আমার স্ত্রী, মা-মণি তেমনি যে আমার মা। মা যদি তোমার মত বাড়ি ত্যাগ করে চলে যেতো তো, মা'কেও আমি এমনি করেই বলতাম! সংসারে বাস করতে গেলে কাউকেই যে ছাড়া যায় না! তুমি আমাকে ভুল বুঝো না সতী!

সতী বললে—তুমি কি এই কথা বলতেই এখানে এসেছ?

সনাতনবাবু বললেন—তোমার অসুখের কথা শুনেই এসেছি, কোনও বিশেষ কথা বলতে তো আসিনি! আর তোমার বিপদের দিনেও যদি না আসি তো আর কখন আসবো, বলো?

সতী বললে—আমাকে দেখতেই যদি এসে থাকো তো আমাকে দেখা তো হলো, এবার যাও—

সনাতনবাবু বললেন—কিন্তু তোমাকে শুধু তো দেখতে আসিনি, তোমাকে নিয়ে যাবো বলেই যে এসেছিলাম—

—কোথায় নিয়ে যাবে?

মিস্টার ঘোষাল এতক্ষণে কথা কইলে। বললে—এর পরেও আপনি আপনার বাড়িতে নিয়ে যাবার কথা বলতে পারছেন মিস্টার
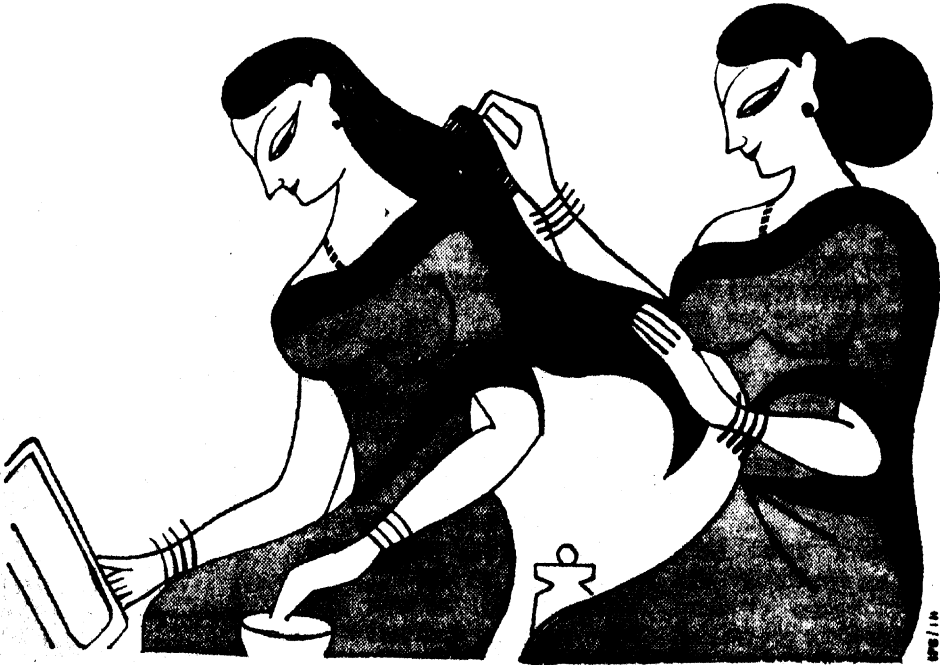
ঘোষ? এত ঘটনার পরেও মিসেস ঘোষ আপনাদের বাড়িতে যেতে কি রাজি হবেন?

দীপঙ্কর হঠাৎ বাধা দিলে। বললে—মিস্টার ঘোষাল, চলুন, আমরা দুজনে বাইরে যাই—মনে হয় এখন এখানে আমাদের আর থাকা উচিত নয়—

—হোয়াই? এখানে আমাদের থাকতে দোষ কী?

সনাতনবাবু কিন্তু সে-সব কথায় কান না দিয়ে তেমনি করেই বলতে লাগলেন—তোমার চোখে হয়ত আমি অন্যায় করেছি সতী, তোমার চোখে আমি হয়ত দোষীই কিন্তু সুস্থ মন নিয়ে কখনও যদি ভেবে দেখো তো দেখবে আমার কোনও অন্যায়ই হয়নি, আমি কোনও দোষই করিনি—আমি নিরুপায়—

একটু থেমে সতীর মুখের কাছে মুখ এনে আবার বলতে লাগলেন—মানুষের জীবনে একাধারে অনেকগুলো কর্তব্য পালন করতে হয়! কখনও সে ছেলে, কখনও সে স্বামী, আবার কখনও সে গৃহকর্তা, সামাজিক মানুষ। এক সঙ্গে এতগুলো কর্তব্য পালন করতে গিয়ে সকলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে তার ভুলও হয় আবার কখনও ভ্রান্তিও হয়, কিন্তু তার জন্যে কি এতখানি শাস্তি দিতে হয় তাকে?

—শাস্তি?

সতী যেন নিজের মনেই নীরবে নিজের প্রতিবাদ করে উঠলো। বললে—শাস্তি আবার আমি তোমাদের কখন দিলাম? সব শাস্তি তো তোমরাই আমার মাথায় তুলে দিলে!

সনাতনবাবু বললে—আর সেই জন্যেই কি এতখানি শাস্তি নিজের মাথায় তুলে নিতে হয়?

সতী বললে—আমি যদি এ-শাস্তি নিজের মাথায় তুলে নিয়েই থাকি, তাতে তোমাদের কী ক্ষতি বলো তো? তাতে তোমাদের রাতের ঘুমের তো কিছু ব্যাঘাত হয়নি, তাতে তোমাদের বাড়ির দেয়াল থেকে আধখানা ইঁটও তো কই খসে পড়েনি—তা যদি পড়তো তো আজ আমার এই দুর্দশা হয়! তোমরা যদি আমার কষ্টের কথা এতটুকু ভাবতে তো আমিই কি আজ তোমাকে ছেড়ে এই রসাতলে এসে নামি? তুমি যদি আমার কথা একটু বুঝতে তো আমি এমন করে এই নরকে এসে ডুবি?

সনাতনবাবু সতীর মাথায় আরো জোরে জোরে হাত বুলোতে লাগলেন। দীপঙ্করের মনে হলো সনাতনবাবু যেন পারলে সতীর মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিতেন। একদৃষ্টে তিনি চেয়ে আছেন সতীর মুখের দিকে। আশ্চর্য, এমন স্বামীকেও সতী ভুল বুঝতে পারলো! এমন স্বামীকে ছেড়েও কোনও স্ত্রী বাড়ি থেকে চলে আসতে পারে! মিস্টার ঘোষালের মুখের দিকেও চেয়ে দেখলে দীপঙ্কর। মিস্টার ঘোষালও একদৃষ্টে চেয়ে আছে সতীর দিকে। স্বামীর সঙ্গে সতী কথা বলছে, আর মিস্টার ঘোষাল কান পেতে প্রত্যেকটি কথা শুনছে, প্রত্যেকটি ভাব-ভঙ্গী গিলছে।

দীপঙ্কর মিস্টার ঘোষালের দিকে ইঙ্গিত করে চুপি চুপি বললে—চলুন, মিস্টার ঘোষাল, আমরা বাইরে গিয়ে দাঁড়াই—

—কেন?

—ওদের প্রাইভেট কথা আমরা নাই বা শুনলাম, ও শোনা কি ভালো?

সতী আবার বলতে লাগলে,—অথচ তোমরা জানো না, ছোটবেলা থেকে আমি কতদিন শিবপুজো করেছি, কতদিন কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে মনের মত স্বামী-সৌভাগ্য কামনা করেছি। তোমরা জানো না, কিন্তু ওই দীপু দাঁড়িয়ে আছে, ও জানে। সোনার কার্তিকের ঘাটে গিয়ে পুরো বোশেখ মাসটা গঙ্গায় স্নান করেছি। কেন জানো? তোমার মত স্বামী পাবার জন্যে। বিশ্বাস করো, শুধু তোমার মত স্বামী পাবার জন্যেই! সেদিন আমি তোমার মত স্বামীই চেয়েছিলুম ঠাকুরের কাছে—তা তুমি জানো?

বলতে বলতে সতীর দুচোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। মিস্টার ঘোষাল তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বার করে সতীর চোখ দুটো মুছিয়ে দিলে।

—কিন্তু তার বদলে আমি কী পেলুম? কী পেলুম আমি বলো তো? তোমরা আমায় তার বদলে কী দিলে? কী দিলে

আর বদলে? আমি চেয়েছিলুম স্বামী, তোমরা দিলে অপমান, সকলের সামনে আমাকে তোমরা রেপ করলে—। তোমাদের বাড়ির বউ-এর আউটরেজ তোমাদের বাড়ির ঝি-চাকর সবাই মিলে চোখ মেলে দেখলে, এর চেয়ে আর বড় কিছু অপমান আমার আগে আর কোনও হিন্দু ঘরের বৌ ভাবতে পেরেছে? কল্পনাও করতে পেরেছে?

তারপর একটু থেমে আবার বলতে লাগলো—এত অপমানও আমি মুখ বুজে সইতে পারতুম, যদি তুমি একটু মুখ তুলে চাইতে, যদি তুমি একটু আদর করতে, যদি তুমি আমার কথা একটু বুঝতে—!

সনাতনবাবু বললেন—তোমার যা বলবার আছে, আজ বলো তুমি, আমি শুনি—

—তোমরা বললে আমার বাবার এত টাকা আছে জানলে, আরো টাকা চাইতে। অর্থাৎ বাবা আরো টাকা দিতে পারতেন মেয়ের বিয়েতে! তারপর তোমরা বললে আমার দিদি যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তা আগে জানলে আমাকে বাড়ির বউ করতে না। তারপর.........

বলতে বলতে সতী আরো যেন মুষড়ে পড়লো। কিন্তু তখনি নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলতে লাগলো—নিজে মা হয়েও মা হতে পারলাম না, এর চেবে বড় দুঃখ মেয়েমানুষের জীবনে আর কী আছে বলো তো? তবু সেইজন্যেও আবার তোমরা আমাকেই খোঁটা দিলে—যেন মা হয়ে আমিই আমার নিজের ছেলেকে মেরে ফেলেছি—!

এবার সতী নিজেই নিজের মুখটা আঁচল দিয়ে ঢাকলে। তারপর হঠাৎ আবার মুখ তুলে বললে—কিন্তু আমি কী দোষ করেছিলুম বলো তো তোমাদের, যে তোমারা এমন করে আমার জীবনটা নষ্ট করে দিলে? আমি তোমাদের কী ক্ষতিটা করেছিলুম যে তোমরা সবাই মিলে আমায় এমন শাস্তি দিলে? তোমরা আমার কাছে কী চেয়েছিলে, সত্যি বলো তো? আজ তো তুমি আমার সামনে একলা বসে আছো, আজ তো তোমার বলতে আর কোনও বাধা নেই। বলো তুমি, আমি তোমাদের কী ক্ষতিটা করেছিলুম সত্যি সত্যি?

সনাতনবাবু তবু কিছু বললেন না।

সতী বললে—জানি এসব কথার উত্তর তুমি কখনও দাওনি, আজো দেবে না। উত্তরই যদি তুমি দিতে পারবে তো আমার এ অধঃপতন হবে কেন? কেন তোমাদের বাড়ির বউ হয়ে আমাকে আজ রাস্তার ফুটপাথে নামতে হবে? কিম্বা ফুটপাথও হয়ত এর চেয়ে ঢের ভালো ছিল। এবার হয়ত সেখানেই নামবো। একদিন হয়ত সেই ফুটপাথেই আমাকে শেষ পর্যন্ত নামতে হবে! এও হয়ত আমার কপালে আছে—

মিস্টার ঘোষাল অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বললে—মিস্টার ঘোষ, কাইন্ডলি আপনি একটু চুপ করুন, মিসেস ঘোষ এখন অসুস্থ, আপনার সঙ্গে কথা বললে আরো অসুস্থ হয়ে পড়বেন—

সনাতনবাবু মাথা তুললেন। এতক্ষণে যেন খেয়াল হলো ঘরে অন্য লোকও আছে। বললেন—কী বললেন? আমি বাইরে যাবো!

—হ্যাঁ, দেখছেন না কত এমোশন্যাল হয়ে উঠছেন মিসেস ঘোষ?

সতী হঠাৎ বললে—না, তোমাকে বাইরে যেতে হবে না—

তারপর বললে—কতদিন পরে তোমাকে আমার কাছে পেয়েছি, সব তোমাকে শোনাবো আজকে, আর যদি কখনও এ-সুযোগ না পাই?

দীপংকর মিস্টার ঘোষালের দিকে ফিরে বললে—মিস্টার ঘোষাল, আসুন আমরাই বাইরে গিয়ে দাঁড়াই, ওদের হাজব্যান্ড-ওয়াইফের একটু বোঝাপড়া হতে দিন—আসুন—

—কেন? কেন বাইরে যাবো? আমরা কি ও'দের কোনও বাধা দিচ্ছি?

দীপংকর বললে—বাধা দেবার কথা হচ্ছে না, ও'দের মধ্যে একটা মিটমাট হয়ে গেলেই তো ভালো!

মিস্টার ঘোষাল যেন বিরক্ত হলো। বললে—দরকার থাকে তুমি যাও সেন, আমি কেন যাবো?

—কিন্তু আপনার সামনে কি ও'রা ফ্রী-লি কথা বলতে পারবেন?

সতী বলতে লাগলো—ওগো, প্রথম-

প্রথম নিজেকে আমি বড় অপরাধী মনে করতাম, জানো! এক-একবার মনে হতো, আমারই দোষে হয়ত এমন হলো! হয়ত আমিই একলা এর জন্যে দায়ী! এত মেয়েই তো শ্বশুর-বাড়ির সংসার করছে. শাশুড়ি স্বামীর লাথি ঝাঁটা খাচ্ছে, কিন্তু আর কোনও বউ তো এমন করে আমার মত বাইরে বেরিয়ে আসে না, বাইরে বেরিয়ে এসে ঘর ভাড়া করে পরের আশ্রয়ে থাকে না! আর কোনও বউ তো আমার নিজের বাবার অগাধ টাকা থাকা সত্ত্বেও এমন করে পুরুষদের অফিসে চাকরি করে না! কিন্তু তখনি আবার মনে হতো আর কোনও বউই তো স্বামীর কাছে এমন ব্যবহারও পায় না। এক-একবার ভাবতাম তুমি যদি অমানুষ হতে মাতাল হতে তাও বুঝি এর চেয়ে ঢের ভালো হতো। তুমি যদি গরীব-কেরানী হতে, আর টাকার অভাবে কাবলীওয়ালার কাছে টাকা ধার করতে, তাও বুঝি এর চেয়ে শতগুণে ভাল ছিল। কিন্তু তুমি কেন অন্য রকম হলে? কেন তুমি শিক্ষিত স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোক হলে? কেন তুমি ছোটলোকদের মত আমাকে মারো না, তাতেও বুঝি আমি তৃপ্তি পেতাম—। কিন্তু এও হয়ত আমার কপাল—এও আমার কপালের ফের ছাড়া আর কী বলবো, বলো?

সনাতনবাবু চুপ করেই সব শুনছিলেন। হঠাৎ বললেন—এখন তুমি যেতে পারবে?

—কোথায়?

—আমার সঙ্গে?

—তোমাদের বাড়িতে?

সনাতনবাবু বললেন—হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে যাবো বলেই এসেছিলাম। সকাল থেকে আজ আমার খাওয়া-দাওয়াই হয়নি।

—কেন? খাওনি কেন? আমার জন্যে?

সনাতনবাবু বললেন—সকাল থেকে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে বাড়িতে। পুলিস এসেছিল, ব্যাঙ্ক থেকে লোক এসেছিল—সেই তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই দেরি হয়ে গেল, তারপর দীপঙ্করবাবু টেলিফোনে তোমার অসুখের খবর জানালেন। তুমি চলো সতী, তুমি নিজে যে শাস্তি পাচ্ছ, তার চেয়ে অনেক বেশী শাস্তি পাচ্ছি আমরা—

সতী যেন আরো করুণ হয়ে উঠলো। বললে—ওগো, তুমি সত্যি বলছো? আমার যে বিশ্বাস হচ্ছে না—

মিস্টার ঘোষাল হঠাৎ বাধা দিয়ে বললে—কিন্তু মিস্টার ঘোষ, আপনি যে মিসেস ঘোষকে বাড়িতে যেতে বলছেন, তারপর যদি আবার সেই অত্যাচার হয়, আবার যদি রিপীট হয় সমস্ত?

দীপঙ্কর বললে—মিস্টার ঘোষাল, আপনি চুপ করুন, আপনি কেন ও'দের কথার মধ্যে কথা বলছেন?

মিস্টার ঘোষাল রেগে গেল, বললে—হোয়াই? আমার এভরি রাইট আছে বলবার, আমি মিসেস ঘোষের ওয়েল-উইশার! মিসেস ঘোষ, আপনি শ্বশুর-বাড়িতে যাবার আগে ভাল করে ভেবে নেবেন, এবারে যেন আর সেই সেম-মিস্টেক করবেন না!

তারপর সনাতনবাবুর দিকে ফিরে বললেন—আপনি আপনার মা'র পারমিশন নিয়েছেন?

সনাতনবাবু বললেন—মা'কে বলে এসেছি সতীকে নিয়ে যাবো।

—তিনি মত দিয়েছেন?

—না!

মিস্টার ঘোষাল বললেন—তাহলে? আপনি কি চান মিসেস ঘোষ আবার ইনসাল্টেড হোন? আপনি কি মিসেস ঘোষের লাইফ আবার মিজারেবল করে তুলতে চান? তাহলে কেন আপনি নিয়ে যেতে চাচ্ছেন সেখানে এসব জেনেও?

সনাতনবাবু বললেন—সতী আমার স্ত্রী, আমি তার ভালোমন্দ বুঝতে পারি বলেই নিয়ে যাচ্ছি!

—কিন্তু আপনিই কি হাজব্যাণ্ডের ডিউটি এতদিন প্রপারলি করতে পেরেছেন?

এবার দীপঙ্কর এগিয়ে গেল। বললে—মিস্টার ঘোষাল, আপনি চুপ করুন, আপনি আর কথা বলবেন না দয়া করে—

—হোয়াট?

মিস্টার ঘোষালের চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠলো। বললে—কী বললে? আর একবার বলো?

দীপঙ্কর ধীর-স্থিরভাবে বললে—যা

কিছু বলবার থাকে, আপনি বাইরে গিয়ে বলুন। এখানে চেঁচাবেন না আপনি।

মিস্টার ঘোষাল রাগে ফুলতে লাগলো। অভ্যাস মত একবার পকেটে হাত দিলে। কিন্তু যা খুঁজছিল তা না পেয়ে ক্ষেপে উঠলো যেন। বললে—আটার ইট সেকেন্ড টাইম? আর একবার বলো কথাটা, আই শ্যাল সী—

দীপংকর আবার স্পষ্ট ভাষায় বললে—এখানে গোলমাল করবেন না, আপনি বাইরে যান—

—আই—শ্যাল—নট্!

—ইউ মাস্ট!

হঠাৎ যেন দীপংকরেরও কেমন রোখ চেপে গেল। বললে—আপনাকে বাইরে যেতেই হবে—

—তুমি ভেবেছ কী সেন? তুমি ভেবেছ আমি য়্যারেস্টেড হয়েছি বলে ভয় পাবো তোমার কথায়? তুমি ভুলে গেছ কে তোমায় ক্লার্ক থেকে প্রমোশন দিয়ে অফিসার করেছে? তুমি জানো গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট আমার ফ্রেন্ড। ফজলুল হককে আমি এখনি রিং করে তোমায় শিক্ষা দিতে পারি? ইউ নো, হোয়াট আই য়্যাম?

দীপংকর বললে—আপনি আর একটা কথাও বলবেন না, ইউ ডু গেট আউট প্লিজ—

হঠাৎ ঘোষালের মূর্তি আরো ভয়াবহ উঠলো যেন। নিজের ফ্ল্যাটে হলে এতক্ষণ হয়ত অন্য কান্ড করে বসতো। রাগে ফুলতে ফুলতে বললে—তুমি জানো তুমি ক্লাশ-ওয়ান গভর্নমেণ্ট অফিসারের সঙ্গে কথা বলছো!

দীপংকর বললে—জানি আমি কথা বলছি একজন মিথ্যেবাদীর সঙ্গে—

—আর তুমি কী, আমি জানি না ভেবেছ? আমি জানি না ভেবেছ মিস মাইকেলের সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক ছিল? কেন আফটার অফিস-আওয়ার্স তুমি সেখানে যেতে?

দীপংকরও হুংকার দিয়ে উঠলো—স্টপ দ্যাট—

—কেন থামবো? ডু ইউ নো, আমি সব জানি। আমি জানি তোমার সঙ্গে মিসেস ঘোষের কীসের সম্পর্ক! মিসেস ঘোষের সামনেই বলছি, মিসেস ঘোষের জন্যে তোমার এত ইনটাররেস্ট কেন, বলবো?

হঠাৎ দীপংকর আর সামলাতে পারলে না। সেইখানে, সেই হাসপাতালের কেবিনের ভেতরে সতী আর সনাতনবাবুর সামনেই প্রচন্ড একটা ঘুঁষি বসিয়ে দিলে মিস্টার ঘোষালের চোয়ালের ওপর। স্কাউণ্ড্রেল, বিস্ট, এই সব জঘন্য লোকের সামনে মায়া দয়া অহিংসার কোনও দাম নেই। এরা মানুষ পদবাচ্যও নয়, জন্তু পদবাচ্যও নয়। এই এদের জন্যেই রেল-ওয়ের এত বদনাম। এই এদের জন্যেই ইন্ডিয়ানদের এত কলংক। এই এদের জন্যেই বাঙালীর এত নিন্দে। এরা থাকলেই বা কী, আর মরলেই বা কী! দরকার বুঝে এরা একবার বাঙালী সাজে, আবার কখনও সাউথ-ইন্ডিয়ানও সাজে। এরা পেস্টস্ অব দি সোসাইটি।

মিস্টার ঘোষাল কিন্তু তখন হঠাৎ আচমকা একটা আঘাত পেয়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। দীপংকরের ঘুষির

আঘাত খেয়ে চোখে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছে। পাশেই ছিল একটা চেয়ার। সেই চেয়ারের কোণটা মাথায় লেগে দিক-ভ্রম হয়ে গেছে একেবারে। দীপঙ্কর তখনও চিৎকার করছে—স্কাউন্ড্রেল, বীস্ট...

এক মুহূর্তের মধ্যে কী কাণ্ড একটা ঘটে গেল। সনাতনবাবু সমস্ত দেখেশুনে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। আর সতী! সতীও প্রথমটায় হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। তারপর মিস্টার ঘোষালকে মাটিতে পড়ে গিয়ে ছটফট্ করতে দেখেই চিৎকার করে উঠেছে—এ কী করলে তুমি? এ কী করলে তুমি দীপু—

দীপঙ্কর বললে—শয়তানের একটা শিক্ষা পাওয়া দরকার ছিল সতী—ও বুঝুক, ভদ্রলোকের সঙ্গে কী ভাষায় কথা বলতে হয়—

—তা বলে তুমি ওকে মারবে? তাবলে ওকে মেরে ফেলবে তুমি?

দীপঙ্কর বললে—না, তোমার ভয় নেই সতী, অত সহজে ওরা মরে না—কিন্তু ওকে মেরে ফেললেই হয়ত ভালো হতো—

সতী নিজেই অসুস্থ শরীর নিয়ে উঠে ধরতে যাচ্ছিল, সনাতনবাবু ধরে শুইয়ে দিলেন। সতী বললে—ছাড়ো, ছাড়ো তুমি আমাকে, আমার চোখের সামনে তোমরা ওকে মারবে! তোমরা এত নীচ, এত হীন!...

মিস্টার ঘোষাল কিন্তু ততক্ষণে প্রথম চোটটা সামলে নিয়েছে। মাটি আঁকড়ে ধরে ওঠবার চেষ্টা করলে। তারপর দীপঙ্করের দিকে চাইতেই দীপঙ্কর আবার শাসালে—আর এগিয়ে এলে আবার মারবো তোমায়, এবার খুন করে ফেলবো—

সতী চিৎকার করে উঠলো—দীপু, তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও—

ভেতরের এই গোলমালের শব্দে তখন বাইরে থেকে ডাক্তার, নার্স সবাই ঢুকে পড়েছে। দীপঙ্কর তাদের দেখে বললে—এখান থেকে মিস্টার ঘোষালকে বাইরে নিয়ে যানতো আপনারা—দরকার হলে ফার্স্ট এইড দিনগে—

—কী হয়েছে স্যার?

দীপঙ্কর বললে—দিস্ ইজ মিস্টার ঘোষাল, জামীনে ছাড়া পাওয়া আসামী, এক্স-ডি-টি-এস—ইউ নো এভরিথিং অ্যাবাউট্ হিম—

মিস্টার ঘোষাল আর কথা বললে না। একটা ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে দীপঙ্করের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে নিজেই টলতে টলতে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল। আর ফিরলো না।

সনাতনবাবু তখনও হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দীপঙ্কর সতীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বললে—সতী, কিছু মনে কোর না—

কিন্তু সতী বোমার মত হঠাৎ ফেটে তোমরা ভেবেছ আমার সামনে অপমান করবে ওকে? বেরিয়ে যাও, তোমরা সবাই বেরিয়ে যাও। কে আসতে বলেছিল তোমাদের এখানে? কেন এসেছিলে তোমরা? আমাকে এত অপমান করেও তোমাদের আশ মেটেনি? আরো অপমান করতে চাও? আরও অত্যাচার করতে চাও? কী ভেবেছ তোমরা?

দীপঙ্কর আরো সামনে এগিয়ে গেল। বললে—সতী, শোন, শোন—

সতী তবু শুনবে না। বললে—না, না আমি কিছু শুনতে চাই না, আমি তোমাদের কোনও কথা শুনতে চাই না, তোমরা আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও বলছি—

সতীর মুখের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন সনাতনবাবু। বললেন—চলুন, দীপঙ্করবাবু, আমরা চলে যাই—

দীপঙ্কর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সতীর মুখের দিকে চেয়ে। কিন্তু তখন সতী চাদর দিয়ে নিজের মুখখানা ঢেকে ফেলেছে। কোনও অনুনয়-বিনয়েই আর কাজ হবে না বোঝা গেল। দীপঙ্কর শেষবারের মত ডাকলে—সতী, একটা কথা শোন আমার—

—না না, তোমরা দূর হয়ে যাও ঘর থেকে—চলে যাও, তোমাদের মুখ দেখতে চাই না আমি—যাও—

দীপঙ্কর বাইরে বেরিয়ে এল। সনাতনবাবুও বেরিয়ে এলেন। শম্ভু হাসপাতালের দরজার সামনে দাদাবাবুর জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। কোথা দিয়ে কী ঘটে গেল, যেন কিছুই কিনারা করা গেল না।

দীপঙ্কর বললে—শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দিলাম সনাতনবাবু—

—কষ্ট? আমার কষ্ট কীসের?

—আপনি যাকে বলে এসেছিলেন আজকে বাড়ি নিয়ে যাবেন সতীকে। সতী হয়ত যেত, কিন্তু আমার জন্যেই সব গোলমাল হয়ে গেল।

সনাতনবাবু হাসলেন। বললেন—আমি কিন্তু হতাশ হইনি দীপঙ্করবাবু, আমি এত সহজে হতাশ হই না।

দীপঙ্কর বললে—অথচ কেন যে আমি অমন করে ধৈর্য হারালুম, কে জানে! মানুষের অন্যায়, মানুষের নীচতা আমাকে বড় সহজে পীড়া দেয়, তাই হয়ত আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলি অত সহজে। আমি বুঝতে পারি না কেন মানুষ সহজ ভদ্রতাটুকু ভুলে যায়, কেন মানুষ এমন নীচ এমন হীন হতে পারে—

—কিন্তু আমি ওতে বিচলিত হই না দীপঙ্করবাবু, বিচলিত হলে লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না।

সত্যিই সেদিন সমস্ত দিনটা একটা অদ্ভুতপূর্ব মগ্ন-চৈতন্যের মধ্যে দিয়ে কেটেছিল দীপঙ্করের। জীবনের কি বাইরে আসা? না কি বাইরে থেকে ভেতরে আসাটাই আসল? জীবন থেকে যত বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিল দীপঙ্কর, ততই যেন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছিল সে!

সনাতনবাবু বলেছিলেন—যত পুষ্টি হবে ফলের, ততই সে আল্‌গা হবে বোঁটায়—

কিন্তু তাই-ই যদি হবে, তবে কেন সমস্ত মানুষ সমাজে আধিপত্য চায়? কেন লক্ষ্মীকে সিঁদুরকে পুরে সৌভাগ্যকে চিরস্থায়ী করতে চায়? কেন শত্রুদের জয় করে অমিতবীর্য হতে চায় মানুষ? কেন

মানুষ পদ আর পদবী পেতে চায় সব আত্ম-সম্মানের বিনিময়ে?

সনাতনবাবু বলেছিলেন—যারা তা চায়, তারা যে নগদ-বিদায়টাকেই বড় করে দেখে দীপঙ্করবাবু। কিন্তু তারা জানে না যে যা হাতের মুঠোয় পাওয়া গেল তাতে তাদের সুখ নেই—তখন বলে আরো চাই—

—তাহলে কীসে সুখ?

সনাতনবাবু বলেছিলেন—আগে বলুন কোন্ সুখটা চান? দেহের, না মনের, না আত্মার?

কিন্তু অত দূরে তখনও পৌঁছোতে পারেনি দীপঙ্কর। সারাদিন সনাতনবাবুর খাওয়া-দাওয়া হয়নি। দীপঙ্করেরও তখন অত আলোচনা করবার সময় নেই। অফিসেও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। দীপঙ্কর বললে—আপনি কিছু ভাববেন না সনাতনবাবু, আমি কালকে আবার আসবো সতীর কাছে। আপনাকে খবর দেব সতী কেমন থাকে—

(ক্রমশ)

সিতাংশু যে কোনদিন কাউকে পুরোপুরি ভালবাসতে পারবে সে নিজেই বিশ্বাস করেনি। কোনকিছুকে পুরোপুরি ভালবাসা তার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। বছরের এই ঋতুটা আমার সবচেয়ে ভাল লাগে, সবচেয়ে উপভোগ্য মনে হয়, এ কথা সে বলতে পারত না। গ্রীষ্মের বিকেলের টালমাটাল ঝড়, শীতের দুপুরে রোদ্দুর, বসন্তের এলোমেলো হাওয়া, শরতের উজ্জ্বল সকাল, বর্ষার নির্জন রাত্রিতে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টির শব্দ, হেমন্তের কুয়াশা-ঢাকা মাঠ—এই সমস্ত তার ভাল লাগত। কোনটা কার চেয়ে বেশী ভাল তার পক্ষে বলা দুরূহ। বস্তুত এই সব ক'টি মুহূর্তই তার এত ভাল লাগত যে যদি কোন যন্ত্রণাহীন, নিঃশব্দ, নীরব মৃত্যু থাকত তা হলে এই সব মুহূর্তে সে মরে যেতে রাজী ছিল।

এবং মৃত্যু। মৃত্যুকে আমার মতো অহরহ এমনভাবে কেউ অনুভব করেছে কি? কোন চব্বিশ বছরের মানুষের পক্ষে বোধ হয় সম্ভব নয়—সিতাংশু চব্বিশ বছরের যুবক ভাবতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে মনে মনে মানুষ শব্দটাই ব্যবহার করে মাথার পাতলা চুলে আঙুলে চালাল। আসলে যৌবন বলতে কী বোঝায় সে জানে না। যন্ত্রণাদায়ী মৃত্যুর কথা সে এ পর্যন্ত নানাভাবে ভেবেছে। ছোটবেলা থেকেই তার নিজেকে বাহুল্য মনে হত। সে যদি আদৌ না হত, পৃথিবীতে না আসত, না থাকত তা হলে তার স্বল্প-বিত্তের পিতার পক্ষে ভাল হত, তাঁদের দুজনের সংসার আর একটু সচ্ছল হত, এই ভেবে তার নিজের অস্তিত্বের জন্য সে কুণ্ঠা অনুভব করেছে। যদিও তাঁরা—বাবা মা—প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী ভাল ব্যবহার করেছেন। মনে আছে তখন তারা রেল লাইনের ধারে থাকত আর প্রতিদিন সকালে তাকে লাইন পেরিয়ে বাজার করতে যেতে হত। অনেকদিন এমন হয়েছে যে সে বাজার নিয়ে ফিরছে সেই সময় কোন গাড়ি লাইনের উপর দিয়ে চলেছে। লাইনের থেকে দু-তিন হাত তফাতে থেকে সে অপেক্ষা করত। গাড়িটা যাচ্ছে, যাচ্ছে যাচ্ছেই, লাইন কাঁপছে, আশেপাশের জমি কাঁপছে, আর সেই সংগে তার শরীরটাও কাঁপছে, মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করত, সেই সময় তার ইচ্ছে হত, প্রচণ্ড ইচ্ছে হত লাইনে শুয়ে পড়তে। যদি শোয়, হঠাৎ শুয়ে পড়ে, ইচ্ছে করলেই পারে—কিন্তু কিছুই না করে সে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থেকে থলে থেকে দু-একটা কাঁচা আনাজ বের করে লাইনে ছুঁড়ে দিত। শেষে এমন হল যে সে হিসেব করে বাসা থেকে বেরয় যেন ঠিক সময়ে গাড়িটার জন্য দাঁড়াতে পারে। কেমন নেশা হয়ে গেল। গাড়িটা কোন কারণে দেরি হলে সে অপেক্ষা করত, বাজার নিয়ে ফিরতে দেরি হবে জেনেও। কিন্তু কোনদিন পারল না, মৃত্যুকে দু-তিন হাত দূরে রেখেই সে শৈশব কাটাল।

বড় হয়ে সে একবার দিল্লি গিয়েছিল। কুতুব-মিনারের শীর্ষে উঠে নিচের দিকে তাকিয়ে কালো কালো পতংগের মতো মানুষ, সুন্দর সবুজ লনের ছবি, জ্যামিতিক রেখার মতো রাস্তা দেখতে দেখতে হঠাৎ তার ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু কিছুই না করে সে সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইয়ের কাঠিটা নিচে ছুঁড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সেটা হাওয়ায় ভেসে নেমে গেলে সে সিগারেটটা শেষ করে নেমে এসেছিল।

জামসেদপুরে লোহার কারখানা দেখতে গিয়ে দূর থেকে আগুনের দিকে তাকিয়েছিল সিতাংশু। অনেকক্ষণ আগুনের দিকে একভাবে তাকিয়ে প্রথমে লাল থেকে নানা রকম রঙ দেখতে দেখতে সিতাংশুর মনে হল সে এক্ষুনি ছুটে গিয়ে ঐ আগুনের সংগে নিঃশব্দে মিশে যেতে পারে, তার আর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না। ভাবতে ভাবতে সিতাংশু তার আত্মীয়ের হাত, যে সেখানকার কর্মচারী এবং তাকে সংগে করে নিয়ে গিয়েছিল, এত জোরে চেপে ধরল যেন সেই তার শেষ ভরসা। এইভাবে আগুনের দিকে চেয়ে থাকলে চোখ খারাপ হয়ে যাবে (আত্মীয়ের গলা) শোনামাত্র সে চোখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে
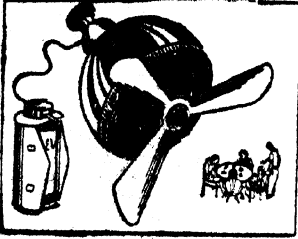
এসেছিল। প্রায় দৌড়ে পালিয়ে এসেছিল। তখন কেউ তাকে দেখে থাকলে নিশ্চয় মনে মনে হেসেছে।

যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর কথাও সে ভেবেছে। কতদিন শুতে গিয়ে ভেবেছে কাল সকালে যদি না উঠি, যদি না উঠি, যদি—। আহা, সেই ভাল। আর কোন সূর্য দেখব না।

কিংবা সকালে অল্প জ্বর হতেই মনে হল সন্ধেবেলায় তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। মনে মনে সে প্রায় প্রস্তুত হয়ে থাকত, মাঝে মাঝে কাউকে ডেকে বলে দিতে ইচ্ছে হত তখন যেন কেউ হই-চই না করে, চিৎকার না করে, তাকে যেন নিঃশব্দে নিয়ে যাওয়া হয়। এই রকম খণ্ড খণ্ড, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্তভাবে সে ভেবেছে।

মেয়েদের যে তার ভাল লাগেনি, তাও নয়। সেই ভাল লাগাটাও বিচ্ছিন্ন, টুকরো টুকরো। কারো চুলের সমুদ্র, কারো ভ্রূ, চোখ, চিবুক, জানলায় আটকানো আকাশের মতো ছোট্ট কপাল, পুডিংয়ের মতো অল্প-ভেজা ঠোঁট, উজ্জ্বল ধাতুর মতো পেটের অনাবৃত অংশ, নগ্ন হাত, শীর্ণ আঙ্গুল, শাণিত বর্শা-ফলার মতো গলা, বুক, সিল্কের সায়ার ওপর স্বচ্ছ কাপড়ের মধ্যে ঈষৎ ভারী উরুর আভাস, শুয়োরের মাংসের ওপর চর্বির আস্তরণের মতো পাতলা লালচে হঠাৎ-দেখতে-পাওয়া পায়ের ডিম—এই সমস্ত তার ভাল লেগেছে। কিন্তু কাউকে পুরোপুরি মনে নেই, সবাই সবুজ পাতার ছায়ার মতো আবছা স্মৃতি।

তাই সিতাংশু মনে করতে পারল না। কবে প্রথম এই মেয়েটিকে বিকেল পাঁচটার সময় ট্রামের জন্য অপেক্ষা করতে দেখেছিল। মেয়েটির সে রকম চুল, ভ্রূ, চোখ, ঠোঁট, গলা, বুক, হাত, নিতম্ব, উরু অথবা পায়ের ডিম কোনোটাই সে লক্ষ্য করেনি এবং কোনোটাই হয়ত বিচ্ছিন্নভাবে আকর্ষণীয় নয়। যতদূর মনে পড়ল, এর আগে ওর সংগে এক ভদ্রলোক আসতেন, এখন আর আসেন না। তিনি বোধ হয় অন্য কোথাও চলে গেছেন, এই ভেবে সিতাংশু মেয়েটির দিকে তাকাল। আশ্চর্য, মেয়েটির দেহের কোন অংশই অন্ততত যা দেখা যাচ্ছে, সে রকম নয়। কিন্তু কেমন একটা স্মৃতির মতো স্বচ্ছ, ভারহীন দেহ। যদি কোন মেয়ের শরীরে সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন অংশ জোড়া দেওয়া যায় তা হলে কেমন হবে সিতাংশু ভাবতে পারল না। কিন্তু এই মেয়েটি যাদুকরী, ইচ্ছে করলেই থলের ভিতর থেকে সেই সব বুক, উরু, গলা, হাত, পায়ের ডিম উন্মুক্ত করে দেখাতে পারে। মেয়েটি ট্রামে উঠল, সিতাংশু ইচ্ছে করেই সেই ট্রাম ধরল না। মেয়েটি অবাক হয়ে ট্রাম থেকে তাকাল, এই ট্রামেই সিতাংশুর যাবার কথা ছিল।

আজ যদি আবার ট্রাম স্টপেজে দেখা হয়, তা হলে আলাপ করব, পরের দিন সিতাংশু ভাবল। কিন্তু সেদিন মেয়েটির সংগে অন্য এক ভদ্রলোককে দেখে সিতাংশু বাস ধরল এবং দেখল মেয়েটি আজও তাকে লক্ষ করেছে। বাসে উঠে সিতাংশু ভাবল, বাস ধরার কোন দরকার ছিল না, বাসে এলে আমাকে বেশী হাঁটতে হয়। ওর সংগে কেউ থাকুক অথবা না থাকুক তাতে আমার কি? আমি কাল থেকে ট্রামেই ফিরব।

তারপর দিন সিতাংশু ট্রাম ধরতে গিয়ে আবার মেয়েটিকে দেখল, সংগে গতদিনের সেই ভদ্রলোক। তার পরদিনও তাই। তার পরদিন দেখল না। তারপর আবার দেখল দুজনকে। কিছুদিন দুজনকে দেখল। তারপর মেয়েটিকে একা দেখল। সিতাংশুর মনে হল ওদের একটা মৌন পরিচয় হয়ে গেছে।

এখন অফিস ছাড়ার সময় ছেলেবেলাকার সেই ট্রেনের কথা মনে পড়ে। এও সেই রকম অপেক্ষা, সিতাংশু ভাবল, লাইন কাঁপলে মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করে কেন? আজ যদি একা থাকে তা হলে আলাপ করবই।

মেয়েটি একা। সিতাংশু নিঃশব্দে ট্রাম ধরল। মেয়েটিও। ওর দু-তিন স্টপ আগে মেয়েটি নেমে গেল। এখানেই নামে। সিতাংশু একা চলল।

তার পরদিনও তাই।

তার পরদিনও সেইরকমই হল।

তার পরদিন সিতাংশু নির্ঘাত কথা বলবে বলে ঠিক করল। অফিস ছাড়ার আগে অসহ্য গরম বোধ হওয়াতে মুখে চোখে জল দিয়ে এল।

মেয়েটি একা।

সিতাংশু এত স্থিরভাবে তার দিকে তাকিয়েছিল যে সে অবাক হল। আশে-পাশের লোক অবাক হল। সিতাংশু কারো দিকে তাকাল না। অকম্পিত পায়ে এগিয়ে গেল। কার সঙ্গে ধাক্কা লাগল। সিতাংশু দেখল না।

—কেমন আছেন? সিতাংশু প্রশ্ন করল, যেন অনেকদিন পরে দেখা।

মেয়েটি একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করল, তারপর ঘাড় নাড়ল।

—বড্ড ভিড়, চলুন একটু এগিয়ে যাই। এ কথাটাও, সিতাংশু ভাবল, বোকার মতো হল। ভিড় আজ নতুন কিছু না, মেয়েটি আসবে না। সিতাংশু ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মেয়েটি পা বাড়িয়েছে। খানিক দূরে এগিয়ে এসে মেয়েটি স্বগতোক্তির মতো উচ্চারণ করল, 'আজকের বিকেলটা বেশ।'

—বাউলের মত। সিতাংশু আকাশের দিকে তাকাল।

মেয়েটি তাকে দেখল। কিছু পথ এক সঙ্গে হেঁটে গিয়ে ট্রাম ধরল। যে যার নির্দিষ্ট স্থানে নিঃশব্দে নেমে গেল। পরের দিনে ট্রাম স্টপেজে সে মেয়েটিকে খুঁজে পেল না। আমি কাল বোকার মতো, কিশোরের মতো ব্যবহার করেছি, সেইজন্য সে আজ আসেনি, আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে, হয়ত ইচ্ছে করে আগে চলে গেছে, সিতাংশু ভাবল, 'আর আমি কী বোকা, তার নাম পর্যন্ত জেনে নিইনি। ঠিকানা ত দূরের কথা।' সিতাংশুর নিজের ওপর রাগ হল।

তৃতীয় দিনে আবার তারা একসাথে ট্রামে উঠল। মেয়েটির সঙ্গে সে ট্রাম থেকে নামল, যেন সেই রকমই কথা ছিল।

—কাল আসেন নি কেন? সিতাংশু জিজ্ঞেস করে ভাবল উচিত হল না। কৈফিয়ত চাওয়ার কী দরকার?

—অন্য কাজে আটকা পড়েছিলুম।

—সেদিন আপনার নামটা পর্যন্ত জানতে পারিনি, কী যে খারাপ লাগছিল!

—বাঃ, বেশ নাম। ফুলের নাম, আপনাকে মানায়। কিন্তু আমি ভাবছিলুম স্মৃতি।

—স্মৃতি কেন?

—কেন জানি না। সিতাংশুর আবার খারাপ লাগল, কিন্তু হতে পারত, হলে অবাক হতুম না।

—স্মৃতি খুব ভাল বুঝি?

—না, না। স্মৃতিকে আমিও ভয় করি, কেননা, সুখের স্মৃতি বলে কিছু থাকে না। কিছুই না।

—আমি এইখানে থাকি। মল্লিকা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। সিতাংশু তার সামনে একটা ছোট অন্ধকার বাড়ি দেখে তাড়াতাড়ি ফিরল।

—কি, আসবেন না? মল্লিকা প্রশ্ন-চিহ্নের মতো দাঁড়াল।

—না, হঠাৎ কেউ অবাক হবে। সিতাংশু আজই ঠিকানা জানার জন্য প্রস্তুত ছিল না, অন্য একদিন।

—কেউ অবাক হত না, অবাক হবার কেউ নেই।

সিতাংশু হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরল। শৈশবে সে আকাশে হেঁটে বেড়ানোর স্বপ্ন দেখত। প্রায়ই দেখত। এমন হয়েছিল যে একা শুয়ে থাকতে থাকতে জাগ্রত অবস্থায় সে এই রকম অনুভব করত। নিজের দেহের কোন চেতনা থাকত না। কোথায় যেন চলে যেত। আশেপাশের ঘটনার সঙ্গে কোন যোগ থাকত না। বড় হয়ে তার আর কোন-দিন এমন হয়নি। শুধু ফিরতে ফিরতে অনেকটা সেই রকম অনুভব করল।

ঘরে ফিরে সিতাংশু আলো জ্বালল। উল্টোদিকের দেওয়ালে একটা অস্বাভাবিক মোটা ছায়া পড়ল। সিতাংশুর হাসি পেল, এই নাকি তার চেহারা! তোমার সুখী চেহারা, সুখের শরীর, কেউ যেন তার কানে কানে বলল। এই যদি সুখের চেহারা হয়, সিতাংশু মনে মনে বলল, তা হলে সুখকে

আমি ঘৃণা করি। আসলে, সুখ বলতে কী বোঝায় জানি না। সিতাংশু আলো নেবাল।

—বসুন। মল্লিকা বলল, সেদিন যে ভাবে গেলেন, ভাবলুম আর বোধ হয় কোনদিন আসবেন না।

—না, সে রকম কিছু নয়।

—বসুন, চা করে আনি। পালাবেন না যেন।

সিতাংশু বসে বসে পুরনো পত্রিকার পাতা ওলটাতে লাগল। একা। অপরিসর ঘর, অস্বাস্থ্যকর। দুটো ছোট জানালা। দেওয়ালে কোন ছবি নেই, না ঈশ্বরের প্রতিভূর, না মনীষীর। সিতাংশুর এটা ভালই লাগল। শুধু একটা বিবর্ণ ক্যালেণ্ডার। ঘরটা বহুদিন চুনকাম করা হয়নি। আলোটাও নিষ্প্রভ, তবু মনে হল ঘরটা স্যাঁতসেঁতে। বাড়িতে আর কেউ নেই নাকি? তার অস্বস্তি লাগল। সংলগ্ন একটা ছোট ঘর, কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকার থাকায় অনেক কষ্ট করেও সিতাংশু কিছু দেখতে পেল না।

—কোথাও জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। সিতাংশু বলল।

—জলের শব্দ কিন্তু জল নয়, মল্লিকা চা দিল, দূরে তাত চলে।

—জলের শব্দ অথচ জল নয়, জলের শব্দ কিন্তু জল নেই। সিতাংশু বিড়বিড় করল, ড্রিপ ড্রপ ড্রিপ ড্রপ ড্রপ ড্রপ ড্রপ বাট দেয়ার ইজ নো ওয়াটার।

মল্লিকা এক হাত দূরে বসেছে। চায়ে ভেজা ঠোঁট দুটো তরলিত স্বাদের আশ্বাস দিল। একটা মৃদু গন্ধ, চুলের হতে পারে, সিতাংশু ভাবল, কিংবা অফিস থেকে ফিরে হয়ত গা ধুয়েছে তার গন্ধ। সিতাংশুর শরীর কাঁপল। পাশের অন্ধকার ঘরে, সে হঠাৎ দেখতে পেল, দুটো চোখ অস্বাভাবিক হিংস্রভাবে জ্বলছে। জামসেদপুরের ফার্নেসের কথা মনে পড়ল। সে আগুনটাকে দারুণভাবে ঘৃণা করল।

—আচ্ছা, চলি। সিতাংশু উঠল।

পাশের ঘর থেকে একটানা কাশির আওয়াজ। লোকটা বোধ হয় দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে।

—আমার বাবা। মল্লিকা বলল।

আলো জ্বালাতেই সিতাংশুর ঘরে প্রচণ্ড লম্বা, অস্বাভাবিক রোগা একটা ছায়া দেওয়ালে কাঁপল। সিতাংশু ভয় পেল, এই নাকি আমার চেহারা? হ্যাঁ, তোমার, কেউ কানে কানে বলল, হতাশার, বিষাদের, সন্দেহের, নিঃসঙ্গতার। আমি বিশ্বাস করি না, সিতাংশু দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। ছায়াটা ছোট হয়ে খানিকটা স্বাভাবিকত্ব পেল। সিতাংশু দেওয়াল থেকে ভাঙ্গা আয়নাটা পাড়ল। দু ভাগ হয়ে আয়নায় তার পরিচিত ছায়াটা আটকে রইল। সিতাংশু ঘাড় নাড়ল, এও নয়। এটা শুধু আমার ব্যক্তিত্ব আর বহিরঙ্গ বয়ে নিয়ে বেড়াবার শকট মাত্র। সে আয়নাটা পেরেকে টাঙিয়ে রাখল।

—চল আজ কোথাও যাই। সিতাংশু বলল।

—কোথায়?

—সিনেমায়, রেস্তোরাঁয়, যেখানে খুশি কিংবা ট্যাক্সিতে এমনি ঘুরে বেড়াই। সিতাংশু পকেটে হাত রেখে ভাবল, গত কাল মাইনে পাওয়া গেছে, আজ অন্তত যেখানে খুশি ঘুরি।

—সবই বড্ড পুরনো, তার চেয়ে, মল্লিকা বলল, চল আপাতত হাঁটি, পরে ঠিক করা যাবে।

অনেক পথ হেঁটে সিতাংশুর খেয়াল হল চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। কখন সন্ধে নাবল, সে ভাবল।

—এসো এইখানে বসি। মল্লিকা মাঠের মাঝে পা ছড়িয়ে বসল। দূরে আলো জ্বলছে। অল্প শব্দ করে অজস্র গাড়ি রাস্তা দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। অন্ধকারে নৌকোর মতো লাগছে দূরের গাড়িগুলো। অল্প আলোয় মল্লিকার নগ্ন হাতটা একটা গোপন, নিষিদ্ধ অস্ত্রের মতো শাণিত, উজ্জ্বল দেখাল। সিতাংশু অন্ধকারে এই অস্ত্রটা তুলে নেবে কিনা ভাবল। গলার কাছে পিপাসা একটা দলা পাকিয়ে অনেকক্ষণ আটকে রইল। সে কিছু বলতে পারল না। তালু, জিব শুকিয়ে গেছে বলে মনে হল। মল্লিকার উন্মুক্ত হাতটা ছোঁবে বলে সিতাংশু হাত বাড়িয়ে আবার গুটিয়ে নিল।

—চল ওঠা যাক। শুকনো গলায় সিতাংশু বলল। মল্লিকা অবাক।

ট্যাক্সিতে উঠে সিতাংশু নিজের ঘরের ঠিকানা বলল, মল্লিকা তাকাল কিন্তু প্রতিবাদ করল না। ট্যাক্সির এক কোণে মল্লিকার থেকে দূরে সে বসে রইল।

ঘরে ঢুকে সিতাংশু দরজা বন্ধ করল। মল্লিকার মুখে না সন্দেহ, না সংশয়, না প্রশ্ন, না উদ্বেগ অথচ কোন আশার ছাপও নেই। শুধু একটা কৌতুকের হাসি। মল্লিকা সিতাংশুর খাটে পা ঝুলিয়ে বসল। সিতাংশু কয়েকটা বহুব্যবহৃত বই, পত্রিকা এগিয়ে দিল। পত্রিকা দিতে গিয়ে আঙুলে ছোঁয়া লাগল। মৃতের মতো শীর্ণ, ঠাণ্ডা আঙুল। সিতাংশু দূরে বসল। মল্লিকা কিছুই না পড়ে যন্ত্রের মতো একটার পর একটা পাতা ওলটাতে লাগল। কিসের অপেক্ষা করছে। অসহ্য গরম, সিতাংশুর মনে হল, কান ঝাঁ ঝাঁ করছে, নাক দিয়ে গরম নিশ্বাস পড়ছে, জ্বরের ঘোরের মতো। সিতাংশু বুঝতে পারল তার চোখ খুব লাল হয়েছে, জ্বালা করছে। ঘড়িতে এগারটা।
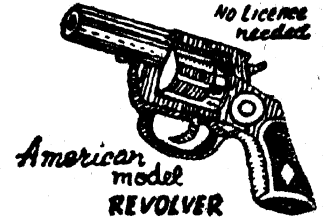
মল্লিকা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে উঠে এল।

—তোমার বোধ হয় শরীর খারাপ। এই বলে সিতাংশুর কপালে হাত রাখল, মৃতের কি ঘাম দেয়, সিতাংশু ভাবল।

—তোমার জ্বর হয়েছে। আবার বলে মল্লিকা দরজাটা খুলল।

—শোনো। রূঢ় স্বরে সিতাংশু বলল, তার গলাটা এত বিকৃত, মোটা, কর্কশ হয়ে গেল যে সিতাংশু নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিল না।

মল্লিকা দরজার ফ্রেমে আটকানো ছবি হয়ে দাঁড়াল।

—না, কিছু না। সিতাংশু বসে পড়ল। তাকে ক্লান্ত, বিষণ্ণ, পরাজিত দেখাল।

—আর শোনো। মল্লিকা মুখ নিচু করে ডাকাতে সিতাংশু উঠে গেল। আবার ডেকে নেবে কিনা ভেবে সিতাংশু কপালের ঘাম মুছল।

—আমাকে কিছু টাকা দিতে পার? মল্লিকা করুণ।

সিতাংশু পকেট থেকে সমস্ত টাকা বের করে তার হাতে তুলে দিল।

—এত দরকার নেই।

—না, নাও। সিতাংশু দৃঢ়। ঘরের আলোটা নিবিয়ে বাইরে এল।

—এত না হলেও হত। তোমার কাছে এত নেওয়ার আমার ইচ্ছে ছিল না, মল্লিকা ইতস্তত করে বলল, কিন্তু প্রতিদিন ফিরতে দেরি হচ্ছে, কিছু না নিয়ে ফিরলে বাবার কাছে অনেক কৈফিয়ত দিতে হত।

জামসেদপুরের ফার্নেস। সিতাংশু এই মুহূর্তে ঘৃণা করে ঘরে ফিরল। কিন্তু দেয়ালে কোন ছায়া নেই কেন? আমি কি অশরীরী, নিরবয়ব কোন মূর্তি হয়ে গেছি? এই কি আমার আসল রূপ? একটা অজানা ভয়ে তার শরীর সিরসির করল, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সব অন্ধকার, ঘরে কি কিছুই ছিল না, নাকি সব হারিয়ে গেল? আলোটা জ্বালা হয়নি বুঝতে পেরে সে আলো জ্বালল। দেওয়ালে তার ছায়া দেখে আশ্বস্ত হল, আর অন্ধকার থেকে আলোয় এসে তার ঘরের আসবাবপত্র, বই সব সব পরিচিত চেহারা ফিরে পেল।

এ আমি কোথায় এসেছি, কোন উত্তুঙ্গ শীর্ষে? কী ঠান্ডা হাওয়া! এই নাকি কুতুব! হ্যাঁ, এই ত। কিন্তু এখানে কেমন করে এলাম, কি করে? যাই হোক, এইবার ঝাঁপ দেয়া যাবে। আঃ, এইবার। নিচের লন সেই রকম সবুজ, সুন্দর, জ্যামিতিক রেখায় মতো পথ কিন্তু কোন লোক নেই, কালো কালো পতঙ্গের কোন চিহ্ন নেই। সিতাংশু সিগারেট ধরাল, দেশলাইয়ের কাঠিটা ছুঁড়তে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। নিচের লোকেরা কেমন করে উঠে এসেছে, সবই তার সমান্তরাল রেখায় হাওয়ায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাসমান বেলুন, না ফানুস। অজস্র, কিন্তু কোন পুরুষ নেই। সব মেয়ে, অপরিচিত। না, অপরিচিত কোথায়? আমি ত সবাইকে চিনি। এরা সব বিচ্ছিন্ন অংশের সুন্দরী। সব চুল, চোখ, ভ্রূ চিবুক, গলা, বুক, হাত, পায়ের ডিম, নিতম্ব সম্বল করে দাঁড়িয়েছে। সবার পুরোভাগে মল্লিকা। মল্লিকা, তুমি এখানে কেন? তোমার কী আছে? এরা ইঙ্গিত করলেই যে যার অংশ উন্মুক্ত করে দেখাতে পারে। তুমি—? কিন্তু কিছু বলার আগেই মল্লিকা তার শরীরটা মোচড়াতে শুরু করল। তার দেহ থেকে হাত, পা, মুখ, গলা, বুক সব আলাদা হয়ে ওদের সঙ্গে মিলে যেতে লাগল। মল্লিকাকে আর চেনা গেল না। এই ভাল, সিতাংশু বলল, সবার বিচ্ছিন্ন অংশ আমিই জোড়া লাগিয়েছিলাম, সেগুলো সব খুলে গেল, শিথিল হয়ে ঝরে পড়ল। সিতাংশু দেশলাইয়ের কাঠিটা ছুঁড়ে দিল, এইবার ঝাঁপ দেব। পোড়া দেশলাইয়ের কাঠিটা সেই মেয়েদের মধ্যে হারিয়ে গেল। সিতাংশু অবাক হয়ে দেখল, সুন্দরীরা অজস্র পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি হয়ে হাওয়ায় ভেসে ভেসে নিচে নামতে লাগল।

ঘুম ভেঙ্গে চিৎকার করে সে বিছানায় উঠে বসল।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। আর অল্প পরেই সকাল হবে। সিতাংশু আবার বিছানায় শুল। সকালে উঠে দাঁত মেজে দাড়ি কামিয়ে চা খেতে খেতে কাগজ পড়ে স্নান করে খেয়ে দেয়ে ফিটফাট সেজে অফিস যাব, বিকেলে সিনেমায়, রেস্তোরাঁয়, ঘরে ফিরে বই ওলটাতে ওলটাতে ঘুমিয়ে পড়ব। কালকেও সেই রকম হবে। তার পরদিনও অবিকল সেই রকম। তার পরদিন। তার পরদিনও। অবিকল, একঘেয়ে, ক্লান্তিকর। একটা দিনের সঙ্গে আর এক দিনের কোন তফাত থাকবে না। একটা শব্দহীন, যন্ত্রণাহীন, গোপন, নীরব মৃত্যু আমাকে গ্রাস করছে। মিশরের সেই অত্যাশ্চর্য রাসায়নিক আরকে না ভিজেই একটা পরিপাটি মামী হয়ে যন্ত্রের মতো জীবনের ব্যবহার করব। সিতাংশু চোখ তুলল।

সকালে উঠে দাঁত মেজে দাড়ি কামিয়ে খবরের কাগজ খুলে চায়ে চুমুক দিতে দিতে সিতাংশু সিগারেট ধরাল।

উপন্যাস

তীরভূমি। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'তীরভূমি'র মূল সুর একটি জীবনের ট্র্যাজেডি। জীবনের প্রথমে জীবিকা-নির্বাচন থেকে শুরু করে জীবনের শেষ অঙ্ক পর্যন্ত একটি অসহায়, অথচ ব্যবহারিক জীবনে কৃতী, মানুষের বিড়ম্বিত জীবনের প্রায়-অনুচ্চারিত দীর্ঘশ্বাস শ্রবণের অনুভূতি সঞ্চারিত হয় উপন্যাসের পাঠশেষে।

কাহিনীর নায়ক মিঃ মুখার্জি সারা জীবন কেবল অন্যের ইচ্ছাকেই বহন করেছেন। জীবিকা এবং জীবন-সঙ্গিনী নির্বাচনের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বিলেতে যে মেয়েটিকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, সে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে রাজী হয়নি। মিঃ মুখার্জির সামাজিক জীবনে ঝড় উঠবে, এই ছিল তার ভয়। শেষ পর্যন্ত যে মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হলো তাঁর সঙ্গে আত্মিক মিলন না হলেও তাঁর ইচ্ছাকেই মেনে নিয়ে নিজেকে সংসার থেকে নির্লিপ্ত করে রাখলেন। কর্মজীবনের শেষ প্রান্তে হঠাৎ সাংসারিক জীবনে ঝড় উঠল। তাঁর প্রায়-বিস্মৃত জীবনের পর্দা সরিয়ে রঙ্গভূমিতে এলো একটি মেয়ে, সোমা। মিঃ মুখার্জিরই আত্মজা। যৌবনে যাঁকে ভালোবেসেছিলেন, সেই ইংরেজ মেয়ের সন্তান।

উপন্যাসের বাকী অংশ এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী। ঘটনা এবং মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন চরিত্র সুপরিস্ফুট। স্পর্শকাতর অসহায় চরিত্র হিসেবে মিঃ মুখার্জি সহজেই পাঠকের মনে ছায়া ফেলেন। কিন্তু মিঃ মুখার্জির সকল অশান্তির কারণ তাঁর স্ত্রী সোসাইটি-পাগল নীলিমার জন্যও শেষ পর্যন্ত পাঠকের মনে সহানুভূতির অভাব হয় না। কখনও স্বল্প, কখনও বিস্তৃত পরিসরে অন্যান্য চরিত্রগুলিও পূর্ণাবয়ব পেয়েছে।

স্বচ্ছন্দগতি এই উপন্যাসটি কাহিনীপ্রিয় পাঠকের কাছে নিঃসন্দেহ সমাদৃত হবে।

৭১।৬১

পথের বাঁকে—নির্মলনলিনী ঘোষ। পরিবেশক গ্রন্থ-বিহার। ৫০-বি, হালদার-পাড়া রোড, কলিকাতা—২৬। দাম দুই টাকা।

বাঙালী নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের অভাব-অভিযোগ এবং সুখ-দুঃখের কাহিনী আলোচ্য গ্রন্থখানির উপজীব্য। মুখ্য চরিত্রে নীলিমা, নীলিমার মা এবং বাবা মনোহর ভট্টাচার্যের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। পারিবারিক অসচ্ছল অবস্থার দরুন নীলিমা অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার জন্য মামার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে; কিন্তু মামীমার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া মামার আশ্রয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং জনৈক অপরিচিত এবং অনাত্মীয় বৃদ্ধ ভদ্রলোকের আশ্রয় লাভ করে। এখানেই সে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পায়। ইতিমধ্যে তার বাবার মৃত্যু হয়। নীলিমার মা শান্তি দেবী নীলিমার কোন সন্ধান করিতে না পারিয়া কাশীতে চলিয়া যান। শিক্ষা-দীক্ষা শেষ করিয়া নীলিমা মা-বাবার সন্ধান করিতে যায় এবং কাশীতে মায়ের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটে।

বাঙালী সমাজের নিখুঁত চরিত্র আঁকিতে গিয়া লেখিকা স্থানে স্থানে অস্বাভাবিকতা

ও অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

৫৭৮।৬০

ছোট গল্প

রক্তগোলাপ। সন্তোষকুমার দে। কথাকলি, ১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলকাতা ৯। তিন টাকা।

মোট সতেরোটি গল্পের সংকলন। প্রেম, দাম্পত্য-জীবন, দেশ-বিভাগ, দাঙ্গা, ধর্মঘট প্রভৃতি যাবতীয় সমস্যা এই গল্পগুলির বিষয়বস্তু। মামুলি স্কেচ টাইপের চরিত্র লইয়া নিছক কাহিনীর বিন্যাস মাত্র। যাহাতে এই গ্রন্থ পাঠের পর আর কোনো সমস্যাই তেমন করিয়া মনে রেখাপাত করে না। এবং বিষয়ের বিভিন্নতা সত্ত্বেও রচনাগুলিতে চেহারাগত কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত নহে। লেখকের ভাষা বর্ণনাভঙ্গী প্রায় ক্ষেত্রেই মেজাজকে ক্লান্ত করে। সে-কারণে একটি চরিত্রও তাহার সৃষ্ট পরিমন্ডলের উর্ধ্বে বাহির হইয়া আসিতে পারে নাই। আশা রাখি ভবিষ্যতে লেখক এ-বিষয়ে আরো নজর দিবেন।

(১২৭।৬১)

কবিতা

সাগর-আকাশ—অনিলকুমার ভ ট্টা চা র্য। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—দু' টাকা।

মোট একত্রিশটি কবিতা উপরোক্ত কাব্য-গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের অন্য কাব্যগ্রন্থও এর আগে প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া তিনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় লিখে থাকেন। তাই তাঁর কাব্যপাঠের সময় রসাস্বাদের সংগে কবি-জীবনের পরিণতির কথাও আলোচ্য। কেননা, তরুণ কবিরা এই পরিণতির দিকটি নিজেরাই উপেক্ষা করেছেন। অনিলবাবু তাঁর এই কাব্যগ্রন্থে সাধারণ জীবনের ব্যথা-বেদনা-আর্তির কথাই প্রকাশ করেছেন। কাব্যের আনন্দ কখনো বা জিজ্ঞাসার দ্বারা সমাহিত—এ কথাও বহু পংক্তিতে অনুরণিত হয়েছে। কিন্তু 'সাধারণীকরণ' অনেক স্থলেই অনুপস্থিত। অবশ্য ইমেজকে পাঠকের সামনে উদ্ভাসিত করে প্রতীকের ব্যবহার-নৈপুণ্যে অনিল-বাবু সিদ্ধিলাভ করেছেন যা, বর্তমান কালের কবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'জোনাকি, ঝড়, সাগর-আকাশ' প্রভৃতি কবিতায় সেই লক্ষণ কবি-মর্জির সংগে মিশ্রিত হয়ে কবি-পরিণতিটিকে লক্ষণীয় করে তুলেছে। সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার অনেক সময় ধৈর্যের বিচ্যুতি ঘটিয়েছে। এ বিষয়ে কবিকে সতর্ক হতে অনুরোধ করি।

১৭৫।৬১

বিবিধ

Historical Relics Etc. in the Bangiya Sahitya Parisad Museum —by Monoranjan Gupta.

এই গ্রন্থটি অনুসন্ধিৎসু এবং বিশেষজ্ঞ-দের জন্যই রচিত। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে" সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক এবং অন্যান্য মনীষীদের যে পান্ডুলিপি ও ব্যবহৃত জিনিসপত্র রয়েছে—তার খুঁটি-নাটি বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। তা ছাড়া বহু ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত ও রক্ষিত বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ও লিপির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই গ্রন্থে রয়েছে। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস এই গ্রন্থের ভূমিকায় "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" গঠনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং ভূমিকাটিও বিশেষ মূল্যবান।

১৮৭।৬১

ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশের ভূমিকা—প্রিয়তোষ মৈত্রেয়, গ্রন্থজগৎ, ৬, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪।

ধনতান্ত্রিক বিকাশের মূল সূত্রটি লেখক স্বল্প পরিসরে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। অষ্টাদশ শতকে সমাজ ও সংস্কৃতির যে রূপ ও তার গুণগত এবং পরিমাণগত যে পরিবর্তন ধনতান্ত্রিক ক্রম-বিকাশে সম্ভব হয়েছে লেখক তা বিভিন্ন প্রমাণসহযোগে প্রমাণ করেছেন। লেখকের তথ্যনিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থাকলেও বিশ্লেষণ-ভঙ্গিতে সহজ বোধ্যতার ত্রুটি আছে। আলোচনাগুলি বিস্তারিতভাবে লিখিত হলে এ ত্রুটি দূর হবে।

৩১৫/৬০

ঋগ্বেদ—ডঃ মতিলাল দাশ। ভারত সংস্কৃতি পরিষদ; ব্লক কে প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৩৩। মূল্য ৫ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থটি ঋগ্বেদের (প্রথম অষ্টকের) অনুবাদ, এবং পদ্যানুবাদ। শ্রী দাশ মহাশয় বহুদিন হইতে ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয় গবেষণা ও আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, নিষ্ঠাভরে তিনি ঋগ্বেদের যে পদ্যানুবাদ করিয়াছেন তাহা বাঙালী সাধারণ পাঠকের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থটি বেদ-অভিজ্ঞ পাঠকের জন্য লিখিত নয়, কাজেই অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে ঠিক যে উপায়ে বেদের সূক্ত-গুলি পড়িলে হৃদয়ঙ্গম কঠিন হইবে না, শ্রী দাশ সেইভাবে অনুবাদ কর্ম করিয়াছেন। অধ্যায় পরিচয়গুলিও ভাল হইয়াছে।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় পুস্তক পরিচয় বিভাগে প্রকাশিত শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসটির নাম মুদ্রণ প্রমাদ বশত দেবলোকে ছাপা হইয়াছে, উহা **মেঘলোকে** পড়িতে হইবে।

গত ৩৪ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় ৬৮৪ পৃষ্ঠায় 'তরুণ রবি' পুস্তকের দাম ৪·০০ পড়িতে হইবে।

প্রাপ্তি-স্বীকার

একুশ বছর—জরাসন্ধ।

ঠাকুরবাড়ি আঙিনায়—জসীমউদ্দীন।

ডম্বরু, ডাক্তার ও রায়রায়ান—মনোজ বসু।

প্রণয় গোস্বামীর গল্প—প্রণয় গোস্বামী।

ছায়া-হরিণ—সন্তোষকুমার ঘোষ।

অচেনা—শুদ্ধসত্ত্ব বসু।

দেশ দেশান্তে—নগেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য।

বালক রামকৃষ্ণ—নির্মল দত্ত।

তোমায় কী দিয়ে বরণ করি—শান্তশীল দাশ।

আলু বোখারা—ইব্রাহিম খাঁ।

শ্রীশ্রী স্বামী নির্মলানন্দ—শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্তী।

নিজেকে জান (১ম খণ্ড)—স্বামী প্রজ্ঞা-চৈতন্য ভারতী।

দ্বিতীয় পৃথিবী—সুরজিৎ দাশগুপ্ত।

কন্যাকুমারী—আব্দুর রাজ্জাক।

বাংলার উপনিষৎ (১ম খণ্ড)—শ্রীপ্রফুল্ল-কান্ত বসু (অনুবাদক ও সম্পাদক)।

এক যে ছিল রাজা—দীপক চৌধুরী।

মোনা লিসা—আলেকজাণ্ডার লারনেট-হলেনিয়া। অনুবাদক বাণী রায়।

রবীন্দ্রসাহিত্যের অভিধান—হীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল।

যে নামে ডাকো—শংকর গুপ্ত।

বিদেশী ভারত-সাধক—সোমেন্দ্রনাথ বসু।

২৫শে বৈশাখ—অরুণ সরকার।

রিয়ালিস্ট রবীন্দ্রনাথ — বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়।

আমাদের দেহে রক্ত জমাট বাঁধিয়ে দেওয়ার একটা স্বাভাবিক শক্তি কাজ করে চলে। তা না হলে দেহাংশে কোথাও কেটে গেলে সেখানকার রক্ত আর বন্ধ হত না। হেমোফিলিয়া-আক্রান্ত রোগীর দেহে এই রক্ত জমাট বাঁধানোর শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। তাই অতি বিন্দুমাত্র কাটার ফলেও তার ক্ষতস্থানের রক্ত বন্ধ হতে চায় না।

থ্রমবোসিস ও হৃদ-অনুতন্ত্র রোগে যারা ভুগছেন, এই রক্ত জমাট বাঁধানোর শক্তিই আবার তাদের দেহে এমন মারাত্মক প্রবলভাবে কাজ করতে থাকে যে, শিরা ধমনীর রক্ত চলাচল হয় ব্যাহত, নির্ভরশীল কোষসমূহ হয়ে যায় নষ্ট এবং অবস্থা চরমে দাঁড়ায় জমে যাওয়ার দরুন যখন রক্তপ্রবাহ আর হৃদ-প্রকোষ্ঠতে গিয়ে পৌঁছুতে পারে না—হৃদযন্ত্র হয়ে ওঠে কঠিন ও অনড় এবং তার ক্রিয়া হয়ে যায় বন্ধ। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা তাই উঠে পড়ে লেগেছেন এমন একটা ওষুধ আবিষ্কার করতে যা এই সমস্ত রোগে রুগীদের রক্ত জমাট বাঁধানোর শক্তি নিষ্ক্রিয় করে দেবে।

দেহের মধ্যে অসময়ে মারাত্মক ভাবে এই রক্ত জমে যাওয়ার প্রতিকারের জন্য অধ্যাপক এইচ-ই-শুলভজেরের পরিচালনায় গভীর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন পশ্চিম জার্মানীর মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। বুনজেন বার্ণারের আবিষ্কারক রবার্ট বুনসেন, সংক্রামক ও ডিফথেরিয়া সিরামের উন্নতিসাধক এমিলফন্ বেহরিং এবং আরও অনেক চিকিৎসা বিজ্ঞানীই এই মারবুর্গে কাজ করে গেছেন বলে বহুদিন থেকে মারবুর্গ চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গবেষণার একটি কেন্দ্রস্বরূপ বলে গণ্য হয়ে আসছে।

বহু কঠোর প্রচেষ্টার পর মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এমন একটি নতুন ধরনের সিরাম বার করেছেন যা থ্রমবোসিস ও হৃদ-অনুতন্ত্র রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। এর আগে অবশ্য মানুষের শরীর থেকেই 'ফাইব্রিনোলিসিন' নামে একটি পদার্থের আবিষ্কার হয়েছিল যা রক্ত জমাটকারী পদার্থ 'ফইব্রিন'-বিনাশক। পরে দেখা গেল পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে 'ফাইব্রিনোলিসিন' আর তেমন কাজ করে না এবং শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

উপরোক্ত জার্মান চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আরো অনুসন্ধানের ফলে জেনেছেন স্ট্রেপ্টোকক্কাস ও ষ্ট্যাফিলোকক্কাস জীবাণু মানব দেহে ঢুকিয়ে দিলে তার প্রতিক্রিয়া 'ফ্রাইব্রিনোলিসিন' পদার্থের চেয়েও আরো বেশী সুফলপ্রদ হয়। অবশ্য জীবাণু থেকে তৈরী ওষুধের কোনরকম বিষময় বিপত্তি যাতে না হয় তার জন্য জার্মান চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে। তা না হলে এই ওষুধ প্রয়োগে হয়ত দেখা দিত দেহের কাঁপুনি, পেশীর ব্যথা কিংবা রক্তের চাপ যেত কমে অথবা দেহ হয়ে উঠত শক্ত। এই জার্মান উদ্ভাবিত 'স্ট্রেপ্টোকক্কাই'-ফার্মেণ্ট ওষুধ এখন থ্রমবোসিস ও হৃদ-অনুতন্ত্র রোগে স্বচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করা চলবে।

আমেরিকার পরীক্ষামূলক অনুশীলন-বিমান এক্স-১৫ গত ২৩শে জুন ঘণ্টায় ৩,৬৯০ মাইল গতিতে আকাশে উড়ে পৃথিবীর এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। এক্স-১৫ বিমানটি একটি বি-৫২ জেট বিমান থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়

*

পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট-অন-মেনের বাতেল ইনস্টিটিউটের উপর ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বহু দেশ নানান গবেষণামূলক ও অনুসন্ধানকারী কাজের ভার চাপিয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে রয়েছে ৫৬৭ জন বিজ্ঞানী ও যন্ত্রাভিজ্ঞের একটি দল।

বহু বৎসর যাবৎ বাতেল ইনস্টিটিউট পৃথিবীর নানা দেশের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গবেষণামূলক ও উন্নতিশীল কাজের পরিকল্পনার ভার পেয়ে আসছে। ইরানের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ওরা পেয়েছে তাদের লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখা ও উন্নতিমূলক ব্যবস্থার প্রস্তাবাদি দেওয়ার ভার। অ-ইউরোপীয় উন্নতিশীল আর একটি দেশ এদের কাছ থেকে চেয়েছে উপদেশ—তাদের দেশে চিনামাটি শিল্পের প্রবর্তন করা সম্ভব কিনা। জার্মানীর ভেতর ও বাইরে থেকে যাঁকিছু অর্ডার এরা পায় তার বেশীর ভাগই হলো শিল্প-বিজ্ঞানীর সমস্যা সমাধানের জন্যে। গত কয়েক বছরের মধ্যে যে সব কাজ এরা করেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল যাহার-দার অঞ্চলের টানা লেকের কূলবর্তী এথিওপিয়ার নতুন রাজধানীর অর্থনৈতিক ও শিল্প পরিকল্পনা।

গবেষনা, পরীক্ষা ও পরিকল্পনার কাজের জন্য ইনস্টিটিউটের একটি প্রধান বিভাগ আছে। যতকিছু আধুনিক যন্ত্রপাতি সবই রয়েছে সেখানে। ওদের কাজ হলো ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতুতত্ত্ব নিয়ে। বিশেষ কাজের জন্য প্রত্যেক বিভাগেই আবার কতকগুলি গোষ্ঠী রয়েছে। ১৯৫৮ সাল থেকে ইনস্টিটিউটের একটি বিভাগ "মহাকাশ বিচরণ ও মহাজাগতিক তথ্য" সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯২৯ সালে আমেরিকার ওহিও রাজ্যের কলোম্বাস শহরে পৃথিবী বিখ্যাত গবেষণাকারী এই প্রতিষ্ঠানটির কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন বাতেল পরিবার। ১৯৫৩ সাল থেকে কাজের গুরুত্ব স্থানান্তরিত করা হয় ইনস্টিটিউটের ফ্রাঙ্কফুর্ট-অন-মেনের কেন্দ্রস্থলে। বাতেল ইনস্টিটিউটের দুইটি ছোট শাখা রয়েছে জেনেভা ও সুইজারল্যান্ডে—তাছাড়া প্যারিস, মিলান, ম্যাড্রিড ও লণ্ডনে রয়েছে এদের শিল্প বিজ্ঞানীর কার্যালয়। ফ্রাঙ্কফুর্ট-অন-মেনের বাতেল ইনস্টিটিউটের রেমিংটন রাণ্ডের ১৯ টন ওজনের একটি ইলেকট্রনিক হিসাব যন্ত্র আছে যাঁর দাম হল ৭০ লক্ষ মার্ক। এই যন্ত্রটির জন্য জায়গা লাগে প্রায় দশ হাজার বর্গফুট।

চন্দ্রশেখর

শুভবুদ্ধির আবেদন

গত সপ্তাহে (১লা জুলাই থেকে) সিনেমা দর্শকরা বিভিন্ন চিত্রগৃহের কর্মীদের বুকে একটি দাবি-ব্যাজ দেখে নিশ্চয়ই কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়িয়েছেন। এই ব্যাজে কর্মীরা রাজ্য-সরকার ঘোষিত নিম্নতম বেতন প্রবর্তনের দাবি এবং দাবি অপূরণে "প্রত্যক্ষ সংগ্রামে"র সংকল্প জানিয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে চিত্রগৃহের সামনে ও আশে-পাশে হাতে-লেখা প্রাচীন-পত্রে সিনেমা-কর্মচারীরা দর্শকবন্ধুদের সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রার্থনা করেছেন। সিনেমা কর্মচারী ও দর্শকদের মধ্যে এক ধরনের স্বাভাবিক আত্মীয়তা রয়েছে। সুতরাং সিনেমা-কর্মীদের জীবনসংগ্রামে দর্শকদের আন্তরিক সহানুভূতির অভাব নিশ্চয়ই হবে না।

নিম্নতম বেতন প্রবর্তনের দাবি শুধু চিত্রগৃহের কর্মচারীদেরই নয়, সিনেমা শিল্পে নিযুক্ত সকল কর্মীর। তবে সিনেমা-শিল্পের অন্যান্য বিভাগে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা খুবই অল্প। স্টুডিওতে এবং চিত্র-প্রযোজনার অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মী ও কলা-কুশলীদের চুক্তির ভিত্তিতেই জীবিকা অর্জন করতে হয় এবং তাঁরা থাকেন সাধারণের দৃষ্টির আড়ালে। তাই চিত্রগৃহের কর্মীদের আন্দোলনের ভেতর দিয়েই দর্শকবৃন্দ তথা জনসাধারণ সিনেমা শিল্পের এই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হয়েছেন।

ডি এম এন প্রোডাকসন্সের "নেকলেস"-এর নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় উত্তমকুমার ও সুনীতা।

রাজ্য সরকার ১৯৬০ সালের ১৮ই মে সিনেমা-শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের জন্য বেতনের যে নিম্নতম হার ধার্য করেন তার প্রবর্তনের পথে বাৎসরাধিক কাল যাবৎ সিনেমা মালিকরা প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে এসেছেন। সিনেমা মালিকরা কলকাতা হাইকোর্টে আরজি পেশ করে রাজ্য-সরকার ঘোষিত এই নিম্নতম বেতন প্রবর্তনের ওপর অন্তবর্তী কালীন "ইনজাংশন" জারি করিয়েছিলেন। ফলে সিনেমা-কর্মীরা তাঁদের প্রাপ্য থেকে এতকাল বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু সিনেমা মালিকরা সম্প্রতি এই "ইনজাংশন"-এর অযৌক্তিকতা অনুভব করে এটিকে প্রত্যাহারের জন্য গত ৯ই জুন মাননীয় বিচারপতি ডি এন সিংহের এজলাসে আবেদনপত্র পেশ করেন এবং যথারীতি "ইনজাংশন"টি প্রত্যাহৃত হয়। এই "ইনজাংশন" প্রত্যাহারের ফলে সিনেমা-কর্মচারীরা রাজ্য-সরকার ঘোষিত নূন্যতম বেতন পাবার অধিকারী হয়েছেন।

সিনেমা-কর্মচারীদের নিম্নতম বেতন প্রবর্তনকে এক বছর ধরে প্রতিরোধ করেও শেষ পর্যন্ত সিনেমা মালিকরা "ইনজাংশন"টি প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়ে যে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিলেন তার জন্য

তাঁরা জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হবেন। কোন দাবি উত্থাপন ও তার প্রতিরোধ—এর উভয়ের সপক্ষে যুক্তি থাকে। কিন্তু মানুষের স্বচ্ছন্দ জীবনধারণের দাবিকে কোন যুক্তি দিয়েই দাবিয়ে রাখা উচিত নয়, যদি সে দাবি পূর্ণ করার ক্ষমতা প্রতিপক্ষের থাকে। এ-ক্ষেত্রে সিনেমা-কর্মীদের দাবি ন্যায্য বিবেচনায় রাজ্য সরকারই মেনে নিয়েছেন। এবং রাজ্য-সরকার সিনেমা-কর্মচারীদের জন্য যে নিম্নতম বেতন ধার্য করেছেন তা সিনেমা মালিকদের সাধ্যাতীত এমন মনে করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। সরকার সিনেমা মালিক পক্ষকে রসাতলে ভাসিয়ে কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ করেছেন এ-কথা কেউই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে করবেন না। কর্মচারীদের নিম্নতম বেতনের দাবি এবং সরকার কর্তৃক তার সমর্থন সিনেমা মালিকদের যে কোন সমস্যাতেই ফেলেনি এ-কথা আমরা বলছি না। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান তাঁদের সাধ্যবহির্ভূত এ-কথাও আমরা ভাবতে পারছি না। এবং এই নতুন সমস্যায় চলচ্চিত্র শিল্পের স্বার্থের দিক ভেবে তাঁরা শুভ-বুদ্ধি ও মানবিকতা দ্বারা পরিচালিত হবেন আমরা এই আশাই করছি।

এই প্রসঙ্গে সিনেমা-কর্মচারীদেরও কিছু বলবার আছে। সাধারণত দেখা যায় যে, কোন দাবির আন্দোলন বা সংগ্রামে উত্তেজনা ও বিদ্বেষ আন্দোলনকারীদের শুধু লক্ষ্যচ্যুতই করে না, বৃহত্তর ক্ষেত্রে অনেক সময় মহতী বিনষ্টিকেও ডেকে আনে—যার ফলে সংগ্রামী এবং তাদের প্রতিপক্ষ দল উভয়েই বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সংযম, সম্প্রীতি ও ধৈর্যের সঙ্গে নিজেদের ন্যায়সংগত দাবি আদায় করে নেবার মধ্যে যে মনুষ্যত্ব ও কল্যাণবোধের পরিচয় মেলে তা থেকে সিনেমা-কর্মচারীরা যাতে বিচ্যুত না হন আমরা সে আশাই করব। মালিক-কর্মচারীর বিরোধে প্রায় সব ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক স্বার্থপ্রণোদিত কোন এক অদৃশ্য "তৃতীয় পক্ষ" অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে লালায়িত হয়ে ওঠে। রাজনীতির কুটিল পথে উত্তেজনা ও অশান্তির ভেতর দিয়ে তারা আন্দোলনকারীদের পরিচালনা করবার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। আমরা সিনেমা-কর্মচারীদের এই সর্বনাশা পথ এবং বন্ধু-বেশী শত্রুদের পরিহার করে চলবার জন্য অনুরোধ করি।

সিনেমা-কর্মীদের স্মরণ রাখা কর্তব্য, বাংলা সিনেমা শিল্প বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত, নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। ধর্মঘট অথবা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বাংলা সিনেমা শিল্পকে শুধু আরও একটি গুরুতর সংকটের দিকেই এগিয়ে দেবে। ধর্মঘট অথবা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম যে দাবি আদায়ের একমাত্র পথ নয় এবং এই পথ যে সর্বথা পরিত্যাজ্য, এই সত্যটি সিনেমা-কর্মচারীদের অনুধাবন করার জন্য অনুরোধ করি। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বহিরাগত স্বার্থান্ধদের দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে সিনেমা-কর্মীরা যদি তাদের দাবি পূরণের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যান তবে তাঁরা জনসাধারণের শুভেচ্ছা অতি সহজেই অর্জন করতে পারবেন। এবং সিনেমা মালিকরাও যদি তাঁদের কর্মচারীদের দাবি ন্যায়সংগত ও অপরিহার্যরূপে মেনে নেন তবে তাঁরাও জনসাধারণের অকুণ্ঠ সাধুবাদ পাবেন।

সেন্সর ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে

বিখ্যাত পোলিশ ছবি "অ্যাশেজ অ্যান্ড ডায়মন্ডস" যাঁরা আগে দেখেছেন, ছবিটির প্রদর্শন সম্প্রতি এ-দেশে নিষিদ্ধ হয়েছে জেনে তাঁরা মর্মাহত হবেন।

শিল্পমানের বিচারে ছবিটি নিয়ে বিতর্কের অবকাশ হয়তো আছে, কিন্তু শালীনতার দিক থেকে ছবিটির বিরুদ্ধে পৃথিবীর কোন সভ্য দেশেই কোন কথা এ পর্যন্ত শোনা যায়নি। বরঞ্চ ইদানীং কালে এ-ছবিটি নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যত আলোচনা হয়েছে তার তুলনা সাম্প্রতিক কালে বিরল বললে অত্যুক্তি হবে না।

বিশ্বের সুধীবৃন্দ ও বিদগ্ধ চিত্র-সমালোচকরা এই ছবি সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করেছেন তার সারাংশ নীচের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবেঃ

"ছবিটির গুণাগুণ সম্পর্কে মতদ্বৈধ থাকলেও "অ্যাশেজ অ্যান্ড ডায়মন্ডস্" পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির পঙ্‌ক্তিতে স্থান পাবার উপযুক্ত। অনেকের মতে ছবিটিকে "পোলিশ পোটেমকিন" বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। "অ্যাশেজ অ্যান্ড ডায়মন্ডস" ছায়াছবির ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত বিস্তার করেছে। গৃহযুদ্ধের ওপর যেসব আখ্যান লেখা হয়েছে তার যদি কোন সংকলন তৈরি করা হয় তবে "অ্যাশেজ অ্যান্ড ডায়মন্ডস" তার শীর্ষদেশে স্থান পাবে। এমনকি হেমিংওয়ের "ফর হুম দি বেল টোলস"-এর মধ্যেও অনুভূতির এমন ব্যাপ্তি দেখা যায়নি।"

ইংরেজ সমালোচক উইলিয়ম হোয়াইটবেট বলেছেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটিই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি।

ঐ দেশেরই আর একজন সমা-লোচক পিটার জন ডায়ার বলেছেন, "ছবিটিতে রাজনীতিক গোঁড়ামি ও গৃহযুদ্ধে আদর্শ-প্রাপ্তির একটি নির্মম স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। "টাইম" পত্রিকা বলেছেন, পরিচালক আন্দ্রেজ ওয়াজদা ছবিটিতে মতবাদের চেয়ে মানুষকেই বড় করে দেখিয়েছেন নীতির চেয়ে আবেগকে।

সত্যজিৎ রায়ের ছবির বিদেশ-জয়ের পর আমাদের দেশের দর্শকরাও যে সাগরপারের শ্রেষ্ঠ ছবি দেখার জন্য আগ্রহান্বিত হবেন তা খুবই স্বাভাবিক। তাঁদের আগ্রহ মেটানোর জন্য আমাদের দেশের ফিল্ম সোসাইটি ও সিনে ক্লাবগুলি গত পাঁচ বছর ধরে নানা বিদেশী ছবির প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে আসছেন। কিন্তু "অ্যাশেজ অ্যান্ড ডায়মন্ডস"-এর মত ছবির প্রদর্শন যদি নিষিদ্ধ হয় তবে ডেনমার্কের রাজকুমারকে বাদ দিয়ে "হ্যামলেট" অভিনয় করার মতই নিরর্থক হয়ে উঠবে তাঁদের সকল চেষ্টা।

বিদেশী ছবির ফেস্টিভ্যালে ভারতের প্রধান চারটি শহরের দর্শকরা মাঝে মাঝে

শ্রেষ্ঠ চিত্র দেখবার দুর্লভ সুযোগ পান। ভালো বিদেশী ছবি দেখার সুযোগ আমাদের দেশের দর্শকদের যখন এতই অল্প, তখন বিদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র সম্বন্ধে সেন্সরের এত কড়াকড়ি মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়।

আগামী শরৎকালে ভারতের বিভিন্ন শহরে যে পোলিশ ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হবার কথা আছে, সেই ফেস্টিভ্যালের জন্যে নির্বাচিত এই ছবির প্রদর্শন নিষিদ্ধ করার যৌক্তিকতা বিচারের জন্যে আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ ও লোকসভার সদস্যদের ছবিটি দেখবার অনুরোধ জানাই।

গত এপ্রিল মাসে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ডাঃ কেশকার লোকসভায় জানিয়েছিলেন যে, চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্যে আনীত বিদেশী ছবির ক্ষেত্রে সেন্সরের সাধারণ নিয়ম ও সতর্ক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে কিনা তা সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। "অ্যাশেজ অ্যান্ড ডায়মন্ডস"কে প্রদর্শনের ছাড়পত্র না দিয়ে সেন্সর বোর্ড মন্ত্রী মহোদয়ের এই আশ্বাস-বাক্য ভুয়ো প্রতিপন্ন করলেন।

চিত্রালোচনা
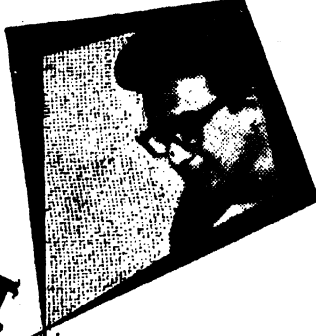
এ সপ্তাহে একসংগে চারখানি নতুন ছবি মুক্তি পাচ্ছে। যাঁরা নতুন ছবির সংখ্যাল্পতায় গত কয়েক সপ্তাহ ম্রিয়মান হয়ে ছিলেন তাঁদের কাছে রীতিমত সুসংবাদ এটি। বিশেষ করে বাংলা ছবির অনুরাগীদের কাছে। একেই নানা দিক দিয়ে বাংলা ছবি কোনঠাসা হয়ে পড়েছে, তার ওপর প্রদর্শন-গৃহের অভাবে খাস কলকাতাতেই যদি আশানুরূপ সংখ্যায় বাংলা ছবি মুক্তি না পায় তা হলে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? যাই হোক, এ সপ্তাহে বাংলা ছবির মুখরক্ষা হয়েছে এক সংগে দুটি ছবির মুক্তি ব্যবস্থায়। বাকী দুটি হিন্দী ছবি।

বাংলা ছবি দুটির নাম "নেকলেস" ও "দিল্লি থেকে কোলকাতা"। প্রথমটি তোলা হয়েছে গী দ্য মোপাসাঁর মধুর-করুণ রসের একটি জগদ্বিখ্যাত কাহিনী অবলম্বনে। দ্বিতীয়টি—অতি-আধুনিক তরুণ সমাজের একটি ব্যঙ্গাত্মক সরস চিত্র।

• • •

"নেকলেস" ভি এম এন প্রোডাকশন্সের প্রথম ছবি। পরিচালনা করেছেন দিলীপ নাগ। উত্তমকুমার এ-ছবির নায়ক। তাঁর বিপরীতে যিনি অভিনয় করেছেন তিনি চিত্রজগতে নবাগতা এবং এখনও পড়ুয়া, অবশ্য স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে। নাম সুনীতা। অন্যান্য মুখ্য চরিত্রে যাঁরা রূপদান করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন রুমা দেবী, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, ভারতী, তরুণ-কুমার, পদ্মা, দীপক ও মলিনা দেবী। ওস্তাদ আলী আকবর খাঁয়ের সুর ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ।

অতি-আধুনিকতার নামে যাঁরা অবিমৃষ্য-কারিতাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, কথাচিত্রমের নিবেদন "দিল্লি থেকে কোলকাতা"-র তাঁরাই লক্ষ্যস্থল। বীরেশ মুখোপাধ্যায়ের লেখা কাহিনীকে ছবির পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছেন তরুণ পরিচালক সুশীল ঘোষ। বিভিন্ন চরিত্রে চিত্রাবতরণ করেছেন জহর রায়, তরুণকুমার, অনুভা গুপ্তা, তপতী ঘোষ, উৎপল দত্ত, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, মিতা

চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এই ছবিতে সুরযোজনা করে বাঁশরী লাহিড়ী প্রথম মহিলা সঙ্গীত পরিচালিকা হিসাবে বাংলা চিত্রজগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

• • •

হিন্দী ছবি দুটির নাম—"প্যার কি দস্তান" ও "আনারবালা"। পুষ্প পিকচার্স প্রথমটির নির্মাতা। দ্বিতীয়টি তুলেছেন ইউনিটি প্রোডাকশন্স।

"প্যার কি দস্তান"-এর নায়ক ভাগ্যের ফেরে যাকে বিয়ে করলো তার ছোট বোনই হ'ল তার প্রণয়িনী। কাহিনীটি গড়ে উঠেছে নায়কের এই সংকটকে কেন্দ্র করে। প্রধান ভূমিকাগুলিতে চিত্রাবতরণ করেছেন অমিতা, সুদেশকুমার, শুভা খোটে, মির্জা মুসারফ ও জওহর কাউল। পরিচালনা ও সুরযোজনার দায়িত্ব বহন করেছেন যথাক্রমে পি এল সন্তোষী ও নাসাদ।

"আনারবালা" রূপকথা-ঘেঁষা ছবি। প্রধান ভূমিকাগুলিতে আছেন মারুতি, কৃষ্ণকুমারী, নীলোফার, দলজিৎ ও তেওয়ারী। রাজা যাজ্ঞিক ছবিটির পরিচালক। সুরসৃষ্টি করেছেন বুলো সি রানী।

• • •

রবীন্দ্রনাথের "নিশীথে" অবলম্বনে অগ্রগামী প্রযোজক গোষ্ঠী বর্তমানে যে ছবিটি তুলছেন তার বহির্দৃশ্য গ্রহণ করতে সম্প্রতি তাঁরা আজিমগঞ্জে গেছেন। কবিগুরুর এই বিখ্যাত গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নদীতে বোটের ওপর ও নদীর পারে এক বিস্তীর্ণ জনমানবহীন চরের নিঃসঙ্গ পরিবেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। প্রধান চরিত্র দুটির মনোবিশ্লেষণে প্রকৃতির বিচিত্র ভূমিকা রূপ পাবে এই বহির্দৃশ্যগুলির মধ্যে। উত্তমকুমার ও নবাগতা অভিনেত্রী নন্দিতা বসু প্রধান চরিত্র দুটিকে রূপায়িত করছেন। ছবিটি যুগ্মভাবে পরিচালনা করছেন সন্তোষ গাঙ্গুলী ও জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। সুধীন দাশগুপ্ত সুরসৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

"নিশীথে"-র সঙ্গে সঙ্গেই অগ্রগামী গোষ্ঠী তাঁদের নিজেদের পরিচালনায় "কান্না"-র কাজও প্রায় শেষ করে এনেছেন। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে তারাশঙ্করের এই বহুপঠিত কাহিনীর চিত্ররূপ বাংলা ছবির দিগন্ত প্রসারিত করবে—এ আশা অনায়াসেই করা যায়। উত্তমকুমার ও নন্দিতা বসু এ-ছবিরও নায়ক-নায়িকা। অন্যান্য মুখ্য ভূমিকায় আছেন রাধামোহন ভট্টাচার্য, শ্যামল ঘোষাল ও শোভা সেন।

* * *

সুধীর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ফিল্ম এন্টারপ্রাইজার্সের "দুই ভাই"-এর কাজও সমাপ্তপ্রায়। ছবিটি টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে তোলা হচ্ছে। একটি সাঁওতালী নৃত্যদৃশ্য তুলতে এঁরা জসিদিতে গেছলেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের একটি অন্তমধ্যুর

শিমলা বঙ্গীয় সম্মিলনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "চিত্রা" নাটকের একটি দৃশ্যে (বাঁ দিক থেকে) অনিতা ড্যানিয়েল, কৃষ্ণা মিত্র ও রিনি দাশগুপ্তা।

কাহিনী ছবিটির আখ্যান অবলম্বন। উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ, সুলতা চৌধুরী ও তরুণকুমারকে নিয়ে এর প্রধান ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। হেমন্ত-কুমার মুখোপাধ্যায় "দুই ভাই"য়ের সুরকার।

স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটির টালিগঞ্জস্থ স্টুডিওতে চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার তৃতীয় ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ গত ৩০শে জুন থেকে আরম্ভ হয়েছে। শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র এর যুগ্ম প্রযোজক, লেখক ও চিত্রনাট্যকার। কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্র, সবিতাব্রত দত্ত, গঙ্গাপদ বসু, অমর গাঙ্গুলী ও শম্ভু মিত্রকে দেখা যাবে।

প্রামাণ্য চিত্রের ক্ষেত্রে আশিস মুখোপাধ্যায় কয়েকটি অনন্যসাধারণ ছবি উপহার দিয়ে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সম্প্রতি তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তিনটি নতুন ডকুমেণ্টারি তোলবার ভার পেয়েছেন। তার মধ্যে একটি হবে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু সম্বন্ধে। বাঙলার কীর্তন গান ও সেভিংস ব্যাঙ্ক হবে অপর দুটি ছবির বিষয়বস্তু।

নাট্যাভিনয়

গত রবিবার (২রা জুলাই) রঙমহলে "অনর্থ" নাটকের শততম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত তাঁর প্রথম নাটকে যুগোপযোগী একটি বলিষ্ঠ কাহিনী উপহার দিয়ে রসিক সমাজের সমাদর লাভ করেছেন। শিল্পীদের সমষ্টিগত দক্ষতা এই নাটকের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করে যাঁরা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে নীতীশ মুখোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, কালী সরকার, হরিধন মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, কেতকী দত্ত, কবিতা রায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপিকা দাশ, কুন্তলা চট্টোপাধ্যায় ও শিপ্রা মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় নাটকটি যে আরো দীর্ঘায়ু হবে সে আশা অনায়াসেই করা যায়।

• • •

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কয়েকটি অভিনয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হলঃ

সুদূর সিমলায় প্রবাসী বাঙালীরা কবির স্মৃতিপূজা করতে ভোলেননি। ওখানকার বঙ্গীয় সম্মিলনীর উদ্যোগে এক সপ্তাহ-ব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে "বৈকুণ্ঠের খাতা", "বিসর্জন", "কাবুলিওয়ালা" ইত্যাদি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। কবিগুরুর "চিত্রা" বাঙালী অবাঙালী নির্বিশেষে সবাই আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেন।

গত ১৯শে ও ২০শে জুন মহাজাতি সদনে অঙ্গন-গোষ্ঠীর রবীন্দ্র উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। "ডাকঘর"-এ কল্যাণ দাশগুপ্ত (অমল), "শাস্তি"-তে চিন্ময় চক্রবর্তী (ছিদাম), অমল দাশগুপ্ত (দুখীরাম) এবং রিক্তা সরকার (বড় বউ) প্রশংসনীয় অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। "চিত্রাঙ্গদা"-য় অর্জুনের ভূমিকায় কেতকী মুখোপাধ্যায়ের নৃত্যাংশও উপভোগ্য হয়।

গত ২৬শে জুন বজবজ আঞ্চলিক রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সমিতি আয়োজিত উৎসব মণ্ডপে নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ছাত্রীবৃন্দ "চণ্ডালিকা" নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেন। বেদানা রায়চৌধুরী (প্রকৃতি), ছন্দা চক্রবর্তী (মা), আলো বাগচী (আনন্দ) ও সাথী গুপ্তা (চুড়িওয়ালী) নৃত্যকলায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখান।

• • •

শনিবার ৮ই জুলাই পশ্চিমবঙ্গ শাখার বিশেষ পুলিস সংস্থার কর্মীবৃন্দ রবীন্দ্র-ভারতী ভবনে কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন করেছেন।

একলব্য

দীর্ঘ ১০ বছর পরে পালা বদল। এবার শ্রী এম দত্ত রায় ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি। শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত সহ-সভাপতি। এতদিন ছিলেন শ্রী গুপ্ত সভাপতি, শ্রী দত্ত রায় সহ-সভাপতি। দুজনই ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠাবান পরিচালক, পরস্পর পরস্পরের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। শ্রী গুপ্ত ও শ্রী দত্ত রায় কিসে নেই? ঝোলে, ঝালে, অম্বলে—সব জায়গাতেই এই দুই যুগলমূর্তি। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি—এবং অন্যান্য খেলা-ধুলো সব ক্ষেত্রেই এদের অধিষ্ঠান। তবু এই পরিবর্তন কেন?

লোকে বলে, পরিবর্তন প্রয়োজন। কেন? না, পঙ্কজ গুপ্ত ১০ বছর ধরে সভাপতির পদ আঁকড়ে রয়েছেন।

কিন্তু কোন্ পদ কে আঁকড়ে রাখেননি শুনি? ফেডারেশনের অন্যান্য কর্মকর্তারাও তো একইভাবে ৮।১০ বছর ধরে নিজ নিজ পদে বহাল রয়েছেন। সে ক্ষেত্রে পরিবর্তন হল না কেন? পরিবর্তনের যদি সত্যই প্রয়োজন ছিল তবে অন্য দু' এক ক্ষেত্রেও তার পরিচয় পেতাম। কিন্তু বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সবাই তো পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। শুধু পঙ্কজ গুপ্তের বেলায় দোষ?

আমার এ মন্তব্যে কেউ যেন মনে না করেন আমি পঙ্কজ গুপ্তর সমর্থক। পরিবর্তন আমিও চাই এবং সর্বক্ষেত্রে একই নীতি আমার কাম্য। বিশেষ করে যাঁরা ক্রিকেটে আছেন তাঁরা ক্রিকেট নিয়ে থাকুন, যাঁরা হকি নিয়ে আছেন তাঁরা হকিতে, ফুটবলের কর্মকর্তারা ফুটবল নিয়েই মাথা ঘামান—এটা সবারই অভিপ্রেত। তাতে ফল ভাল হয়। পৃথক পৃথক খেলাধুলো পৃথক পৃথক কর্মকর্তাদের আয়ত্তাধীন থাকলে তার উন্নতি সম্বন্ধে চিন্তা করার অবকাশ মেলে, অপেক্ষাকৃত শৃঙ্খলার সঙ্গে খেলাধুলো পরিচালনা করা যায়। সর্বঘটের কাঁঠালী কলাদের সে সুযোগ কোথায়?

শ্রী এম দত্ত রায়ের কথাই ধরা যাক্। তিনি এশিয়ার সর্ববৃহৎ ফুটবল সংস্থা আই এফ এ-র বেতনভুক সম্পাদক, ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান, ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতির সদস্য, বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য, ছোট বড় আরও কত ক্রীড়াসংস্থার সঙ্গে জড়িত তার ঠিকঠিকানা নেই। এর পর আবার তিনি ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি হয়েছেন। কোন্ সংস্থার প্রতি তিনি সুবিচার করবেন? তাঁর সময় কোথায়? ক্ষমতার লোভে তবু তাঁর বিভিন্ন পদ আঁকড়ে ধরে বসে থাকতে হবে। এক ভারতে ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এ বিধান আছে কিনা জানি না। খেলাধুলোর বেতনভুক কর্মীর পক্ষে অ্যামেচার সংস্থার সর্বপ্রধানের পদ গ্রহণ কাজটা হয়তো আইনগ্রাহ্যও নয়।

* * *

শ্রীপঙ্কজ গুপ্তকে ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি পদ থেকে অপসারণের কারণ হয়তো অন্য। কু-লোকের কু-কথায় কান না দেওয়া শাস্ত্রের বিধান। তবু যা রটে তার কিছু বটে—একটা কথা আছে। লোকে বলে শ্রী গুপ্ত ও শ্রী দত্ত রায়ের মধ্যেকার অন্তরঙ্গতা অনেকদিনই লোপ পেয়েছে। তারপর রোম অলিম্পিকের অলিম্পিক গ্রামে শ্রী দত্ত রায়ের অবৈধ অনুপ্রবেশ শ্রী গুপ্ত শুধু ভাল চোখেই দেখেন নি, তা নয়, এ নিয়ে বেশ বেগও দিয়েছেন পুরনো বন্ধুকে। এবারকার ফেডারেশনের ইলেক্শনে পালা বদল তারই পরিণতি।

রাজ্যাভিষেকের সময় রাজা যেমন উত্তরাধিকারীর মাথায় নিজ হাতে রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে তাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন, ফুটবল ফেডারেশনের বার্ষিক সভায় সভাপতি শ্রীপঙ্কজ গুপ্তও তেমন শ্রী দত্ত রায়ের নাম সভাপতি হিসাবে প্রস্তাব করে তাঁর মাথায় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন। আর নিজে সহ-সভাপতির পদ গ্রহণ করার সময় বলেছেন—'যে কোন পদ গ্রহণ করে, এমন কি মালী হিসাবেও তিনি ভারতীয় ফুটবলের সেবা করতে প্রস্তুত।'

কেউ বলে পঙ্কজ গুপ্তর এটা মহত্ত্ব, কেউ বলে হ্যাংলামোপনা। জন্ম থেকে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সঙ্গে শ্রী গুপ্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফুটবল ফেডারেশন সৃষ্টির মূলে তাঁর দান যে সর্বাধিক এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু তাই বলে তিনি চিরদিন সভাপতির পদ আঁকড়ে থাকবেন এটাও

মোহনবাগান ও ইস্টবেংগল ক্লাবের লীগের চ্যারিটি খেলায় মোহনবাগান গোলরক্ষক এ স শেঠ মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি বিপজ্জনক শট বাঁচাচ্ছেন। খেলায় ইস্টবেংগল ১—০ গোলে বিজয়ী হয় ফটো—দেশ

সমর্থনীয় নয়। শ্রী দত্ত রায়ের মত তিনিও আর পাঁচটা ক্রীড়াসংস্থার সংগে জড়িত। এ বছর আবার ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। সুতরাং ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি পদ থেকে তাঁর অপসারণকে অন্যায় বলব না। অন্যায় বলব সভাপতি হিসাবে আর একজনের আগমন, যিনি আর পাঁচটা খেলাধুলো নিয়ে সদাই ব্যস্ত।

*　　*　　*

ফুটবল ফেডারেশনের বার্ষিক সভায় কর্মকর্তা নির্বাচন ছাড়া অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। চারটি প্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা শেষ করার সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে, বোম্বাই নির্বাচিত হয়েছে এ বছরের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানক্ষেত্র।

বর্তমান ব্যবস্থামত সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখের মধ্যে আই এফ এ শীল্ডের খেলা শেষ করতে হবে। দিল্লি ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতা পয়লা অক্টোবরের মধ্যে শেষ হবে। অক্টোবরের ১৬ তারিখ থেকে নবেম্বরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত ডুরাণ্ডের জন্য নির্ধারিত। আর রোভার্সের খেলার সময় ২০শে নবেম্বর থেকে ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত।

সন্তোষ ট্রফি বা জাতীয় ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতা ডিসেম্বর মাসের ১১ তারিখ থেকে বোম্বাইতে আরম্ভ হবে বলে ঠিক হয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক লীগ খেলা নবেম্বরের ১৫ তারিখের মধ্যে শেষ করতে হবে বলে নির্দেশ আছে। গতবারের বিজয়ী সার্ভিসেস দল এবং মূল প্রতিযোগিতার আয়োজনকারী রাজ্য সরাসরি মূল প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পাবে। মূল প্রতিযোগিতার বাকী ৬টি দল আসবে ভারতের ১৫টি রাজ্যের আঞ্চলিক লীগ খেলা থেকে, গ্রুপ লীগের বিজয়ী ও রানার্স হিসাবে। ১৫টি রাজ্য দলকে আঞ্চলিক প্রথায় তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।

'ক' গ্রুপে আছে—পশ্চিম বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশ।

'খ' গ্রুপে আছে—পাঞ্জাব, দিল্লি, মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান ও রেলওয়েজ।

'গ' গ্রুপে আছে—অন্ধ্র, মহীশূর, মাদ্রাজ, কেরল ও গুজরাট।

পশ্চিম বাংলা, রেলওয়েজ ও মাদ্রাজ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে এই তিনটি গ্রুপের লীগ খেলার বিধিব্যবস্থার ভার দেওয়া হয়েছে। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশের সংগে বাংলার লীগ খেলাগুলি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির আছে।

এখন আই এফ এ শীল্ড, ডি সি এম এবং রোভার্স, ডুরাণ্ড ও জাতীয় ফুটবলের সমস্ত খেলা ঠিক সময় মত হয়ে উঠলে হয়। এর পর আবার আছে আগস্ট মাসে কোয়ালালামপুরে মার্ডেকা কাপের খেলা। রোম অলিম্পিকের ১৫ জন খেলোয়াড়ের সংগে আর ৫ জন যোগ করে ইতিমধ্যেই ২০ জন খেলোয়াড় নিয়ে মার্ডেকা কাপের জন্য প্রাথমিকভাবে ভারতের দল গড়া হয়েছে। নির্বাচিত খেলোয়াড়রা আগামী ১২ই জুলাই থেকে কলকাতায় দু' সপ্তাহের এক শিক্ষাকেন্দ্রে মিলিত হচ্ছেন।

*　　*　　*

কলকাতার ফুটবল লীগে এখন দুটি মাথাই উঁচু হয়ে আছে। আর সবারই মাথা হেঁট। বেশ নিচুর দিকে। বলা বাহুল্য, উঁচু দুটি মাথা দুই প্রধানের। ইস্টবেংগল মোহনবাগানের সংগে সমান ম্যাচ খেলে ২ পয়েণ্টে এগিয়ে আছে, মোহনবাগান ধরি ধরি করে পিছু তাড়া করে চলেছে। গত সপ্তাহে দুই দলের মর্যাদার লড়াইয়ে মোহনবাগানের ১—০ গোলে পরাজয় স্বীকারের ফলেই এই অবস্থা। চ্যারিটি ম্যাচে মোহনবাগান তাদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ইস্টবেংগলের সংগে মোটেই ভাল খেলতে পারেনি। সত্যি কথা বলতে কি, বহুদিনের মধ্যে মোহনবাগান এত খারাপ খেলেছে বলে মনে পড়ে না। মোহনবাগানের অধিনায়ক এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় চুনী গোস্বামীর পায়ে চোট থাকায় ইস্টবেংগলের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি। কিন্তু একা চুনীর অভাবে মোহনবাগানের এই ব্যর্থতার কৈফিয়ত নেই। ইস্টবেংগল যোগ্য দল হিসাবেই বিজয়ী হয়েছে। খেলার ধারা অনুযায়ী তাদের বেশী গোলেই জেতা উচিত ছিল।

যাই হোক, ইস্টবেংগল এবং মোহনবাগান ছাড়া অন্য কোন ক্লাবের যে আর লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের সম্ভাবনা নেই—এ কথা এখন দিনের আলোর মতই স্পষ্ট।

কিন্তু কোন্ দলকে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ডিভিসনে নামতে হবে তা বলা শক্ত। ভয় আছে পাঁচ ছয়টি ক্লাবের। অবস্থা যা তাতে খেলার আগে মাঠের বাইরেই খেলার ফলাফল 'গড়াপেটা' হবার সর্বাধিক সম্ভাবনা। লীগের আকর্ষণ এবার নিচের দিকেও কম নয়।

উইম্বলডন টেনিস

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা উইম্বলডনের আলোচনা আগামী সপ্তাহের জন্য মুলতুবি রেখে এ সপ্তাহে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উইম্বলডনের খুঁটিনাটি বিষয়ের অবতারণা করছি। অনেক ঘটনা পাঠকদের কৌতূহল মেটাতে পারবে বলে আশা রাখি।

প্রশ্ন ?

(১) পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো টেনিস প্রতিযোগিতা উইম্বলডন কোন সালে আরম্ভ হয়? উইম্বলডন কোথায় অবস্থিত?

(২) উইম্বলডনের সর্বকনিষ্ঠ চ্যাম্পিয়নের নাম কি?

(৩) বয়োজ্যেষ্ঠ চ্যাম্পিয়ন কে?

(৪) যুদ্ধের পর কোন কোন চ্যাম্পিয়ন উইম্বলডনে পরাজয় স্বীকার করেননি।

(৫) ১৯২৭ সালে ফ্রান্সের কোশের উইম্বলডন জয় এত স্মরণীয় কেন?

(৬) কোনো গেম না হেরে কোন্ মহিলা উইম্বলডন জয় করেছেন?

(৭) দুই বোনের উইম্বলডন ফাইন্যাল খেলার নজীর কোন্‌টি?

(৮) গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কোন সেট না হেরে কে উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

(৯) কোন্ রাজা উইম্বলডনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন?

(১০) সবচেয়ে বেশী বছর ধরে উইম্বলডনে খেলেছেন কে?

(১১) গ্রেট ব্রিটেনের বাইরের কোন্ খেলোয়াড় প্রথম উইম্বলডন জিতেছেন?

(১২) গ্রেট ব্রিটেনের বাইরের কোন মহিলা?

(১৩) উইম্বলডনের সবচেয়ে দীর্ঘ গেমের খেলা কোন্‌টি?

(১৪) সিংগলসের দীর্ঘ খেলা কোনটি?

(১৫) সবচেয়ে বেশীবার উইম্বলডন জিতেছেন কে?

(১৬) মেয়েদের মধ্যে কে বেশীবার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন?

(১৭) সমস্ত খেলা নিয়ে উইম্বলডনে কার জয় বেশী?

(১৮) একই বছরে অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, উইম্বলডন ও ফরেস্ট হিল (আমেরিকা)—এই চারটি বড় প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কে?

(১৯) এই চারটি বড় প্রতিযোগিতা এক বছরে জিতেছেন কোন্ মহিলা?

(২০) ১৯২২ সালে উইম্বলডন থেকে চ্যালেঞ্জ প্রথা উঠে যাবার পর কোন খেলোয়াড় সবচেয়ে কম গেম হেরে উইম্বলডন জিতেছেন?

(২১) দম্পতির উইম্বলডন জয়ের নজীর কোন্‌টি?

(২২) ১৭ বছরে উইম্বলডনের বিজয়িনী হয়ে উপর্যুপরি তিনবার চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছেন, কিন্তু কোনদিন উইম্বলডনে হার স্বীকার করেননি। কে তিনি?

(২৩) উইম্বলডনের কোন দুই চ্যাম্পিয়ন সংগীতশিল্পী হিসাবে বিশ্বে পরিচিত।

(২৪) কোন্ কোন্ ন্যাটা খেলোয়াড় উইম্বলডনের চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন?

(২৫) উপর্যুপরি ৫ বার উইম্বলডনের চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছেন কোন্ মহিলা?

(২৬) এর আগে উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইন্যালে খেলেছেন ভারতের কোন্ কোন্ খেলোয়াড়?

(২৭) এ বছর উইম্বলডনের সেন্টার কোর্টে খেলা দেখবার জন্য টিকিটের টাকা জমা দিয়েছিলেন কিন্তু ব্যালটে নাম না ওঠায় কর্তৃপক্ষ যাদের টাকা ফেরত দিয়েছেন—সে টাকার পরিমাণ কি?

উত্তর !!

(১) ১৮৭৭ সালে। উইম্বলডন লন্ডনের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকণ্ঠে অবস্থিত।

(২) উইলফ্রেড ব্যাডেলে। ১৮৯১ সালে ১৯ বছর ৫ মাস ২৩ দিন বয়সে ইনি উইম্বলডনের চ্যাম্পিয়ন হন।

(৩) আর্থার ওয়েন্টওয়ার্থ গোরে। ১৯০৯ সালে ইনি যখন তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হন তখন এ'র বয়স ৪১ বছর ৬ মাস।

(৪) টেড স্রোডার, পলিন বেজ ও মোরিন কনোলী।

(৫) কারণ তিনি কোয়ার্টার ফাইন্যালে এফ টি হাণ্টারের কাছে প্রথম দুটি সেট হারেন, সেমি-ফাইন্যালে প্রথম দুটি সেট হারেন টিলডেনের কাছে আর ফাইন্যালে প্রথম দুটি সেট হারেন জিন বরোত্রার কাছে।

(৬) মিসেস ল্যাম্বার্ট চেম্বারস ১৯১১ সালে।

(৭) ১৮৮৪ সালে মাউড ওয়াটসন ও লিলিয়ান ওয়াটসন।

(৮) ১৯৩৮ সালে ডোনাল্ড বাজ।

(৯) পরলোকগত ষষ্ঠ জর্জ। ১৯২৬ সালে তিনি যখন ইয়র্কের ডিউক ছিলেন তখন স্যার লুই গ্রেগকে জুটি হিসাবে নিয়ে ডাবলসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

(১০) আর্থার ওয়েন্টওয়ার্থ গোরে ১৮৮৮ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত একটানা ৩৬ বছর ধরে।

(১১) ১৯০৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার ন্যাটা খেলোয়াড় এন ই ব্রুকস।

(১২) ১৯০৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার মিস মে সাটন।

(১৩) ১৯৫০ সালে ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইন্যালে জে প্যাটি ও এম ট্রাবার্ট ৬-৪, ৩১-২৯, ৭-৯ ও ৬-২ গেমে সেজম্যান ও ম্যাগ্রেগরকে পরাজিত করেন। মোট ৯৪টি গেম খেলা হয়।

(১৪) ১৯৫৩ সালে জে ড্রবনী তৃতীয় রাউন্ডে জে প্যাটিকে ৮-৬, ১৬-১৮, ৩-৬, ৮-৬ ও ১২-১০ গেমে পরাজিত করেন। মোট ৯৩টি গেমে সওয়া চার ঘন্টা সময় লাগে।

(১৫) উইলিয়াম রেনশ। মোট ৮ বার—এর মধ্যে উপর্যুপরি ৬ বার। অবশ্য চ্যালেঞ্জ রাউন্ড প্রথার খেলায়।

(১৬) মিসেস এফ এস মুডি, কুমারী জীবনে যিনি হেলেন উইলস নামে খেলেছেন। মোট ৮ বার।

(১৭) মিস এলিজাবেথ রায়ানের। মোট ১৯ বার ডাবলসে বিজয়িনীর সম্মান।

(১৮) ১৯৩৮ সালে একমাত্র আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ।

(১৯) ১৯৫৩ সালে একমাত্র আমেরিকার মোরিন কনোলী।

(২০) ১৯৪৭ সালে জ্যাক ক্র্যামার।

(২১) ১৯২৬ সালে মিঃ ও মিসেস এল এ গডফ্রির মিক্সড ডাবলস চ্যাম্পিয়নশিপ।

(২২) মোরিন কনোলী।

(২৩) মিস এলিস মার্বেল ও মিস এলথিয়া গিবসন।

(২৪) নর্মান ব্রুকস, জারোশ্লাভ ড্রবনী ও নীল ফ্রেজার।

(২৫) ফ্রান্সের সুজানে লেংলেন।

(২৬) কোয়ার্টার ফাইন্যাল খেলেছেন গউস মহম্মদ, সেমিফাইন্যাল রমানাথন কৃষ্ণন।

(২৭) প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা।

—মুকুল—

অরুণা দাশগুপ্ত

চার বছরের মা-মরা মেয়েটিকে নিয়ে মহামুশকিলে পড়লেন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর শ্রীঅতীন দাশগুপ্ত। পুতুল খেলার বয়স মেয়েটির। কিন্তু খেলে কার সঙ্গে? বাবা আর মেয়ে। সংসারে দ্বিতীয় লোক নেই। কি করা যায় মেয়েটিকে নিয়ে? কেমন করে তাকে মানুষ করবেন, কিভাবে তাকে সঙ্গ দেবেন এই ভাবনায় অতীনবাবু অস্থির। এমন সময় অতীনবাবুর মাথায় এল পুতুল খেলতে না দিয়ে ওকেই পুতুল বানালে কেমন হয়? ঠিক পুতুলের মত করে গড়ে তোলা যায় না ওকে? কেমন পুতুল? না, মোমের পুতুল। মোমের মত নরম। মোমের মত দেহটাকে যেভাবে ইচ্ছে ঘোরানো যাবে, ওল্টানো যাবে, বাঁকানো যাবে,—ওকে দিয়ে দেখানো যাবে জিমন্যাস্টিকসের যে কোন কষ্টসাধ্য 'ফিগার'। অতীনবাবু ঠিক করলেন ওকে জিমন্যাস্টিকসের 'বোনলেস' অ্যাক্টিভিটি শেখাবেন। তার মধ্যেই আনন্দ পাবে, তার মধ্যেই ডুবে থাকবে মেয়েটি।

অতীন দাশগুপ্ত নিজে ছেলেদের খেলা-ধুলো ও শরীরচর্চার ট্রেনার। তাঁর শিরায় শিরায় খেলার নেশা। মেয়ে অরুণার রক্তের সঙ্গেও খেলার খেয়াল মিশে আছে। শুধু রেওয়াজের অপেক্ষা। তাই ৪ বছর বয়সে বাবার কাছে ও জিমন্যাস্টিকসের প্রথম পাঠ আরম্ভ করতেই, আস্তে আস্তে জিমন্যাস্টিকসে ওর নেশা ধরে গেল। নেশা থেকে ব্যাধি। সব সময়ই ওই চিন্তা।

সকাল সন্ধ্যায় অনুশীলন, আর যেখানে জিমন্যাস্টিকস প্রদর্শনীর আয়োজন সেখানেই ভ্রমণ—এই হল অরুণার ব্যাধি সম্বন্ধে তার ট্রেনার বাবার দু বছরের প্রেসক্রিপশন।

১৯৫৬ সালে রাশিয়ান জিমন্যাস্টরা ভারতে আসবেন কথাটা প্রচার হয়ে গেল। সোভিয়েট রাশিয়ার তখনকার প্রধানমন্ত্রী মঃ বুলগানিন এবং সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান সচিব মঃ ক্রুশ্চেভ এসেছিলেন ভারত সফরে। রাশিয়ান জিমন্যাস্টদের বিশ্বখ্যাতি এবং তাদের অপরূপ কলা-কৌশলের কথা শুনে বুলগানিন ও ক্রুশ্চেফের কাছেই অনুরোধ করেছিলেন ভারতের তখনকার ক্রীড়ানুরাগী স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর একদল রাশিয়ান জিমন্যাস্টকে ভারতে পাঠাতে। সেই ব্যবস্থা মত যৌবনের দ্যুতিতে ভরপুর, অপরূপ দেহশ্রী নিয়ে ১৯৫৬-র মার্চ মাসে রাশিয়ান জিমন্যাস্টরা এসে পৌঁছলেন ভারতে।

অরুণা দাশগুপ্ত চোখভরে দেখল তাদের জিমন্যাস্টিকসের ছলা-কলা। সত্যিই অপরূপ রূপ সৃষ্টি। শিল্পীর লোভ সৃষ্টিকারী নব নব জীবন্ত মডেল—নতুন নতুন ফিগার।

অরুণার শিশুমনে তখন রঙীন কল্পনা। অমনটি হওয়া যায় না? ওই নীনা বোচারভার মত। ওই জিনাইদা রুদিওভার মত। বাঃ, মোরিয়া গোরখোভস্কায়ার কি চমৎকার বীম ব্যালান্সের খেলা! জুগেলী আর পোলিনা ডেনিলোভাই বা কম কিসে? ওরা তো আমার মতই মেয়ে। না হয় একটু বয়স বেশী। তা আমি যদি ওদের মত দিনরাত সাধনা করি তবে আমি ওদের মত হতে পারব না?

জিমন্যাস্টিকসে পটু হবার জন্য তখন থেকে অরুণার সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হল। ১৯৫৭ সালে রণজি স্টেডিয়ামের যুব উৎসবে মেয়েটির জিমন্যাস্টিকসের ছলা-কলা দেখে উৎসবের উদ্যোক্তারা ওকে মস্কো নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু কি কারণে ওর যাওয়া হয়ে উঠল না। দুর্ভাগ্যক্রমে সফর বাতিল হল। কিন্তু অরুণা শরীরচর্চাবিদ মনোতোষ রায়ের সঙ্গে কলম্বো ঘুরে এল। কলম্বোতেও পেল দর্শকদের সংবর্ধনা আর সমঝদার কাগজের প্রশংসা।

অরুণা দাশগুপ্ত

রাশিয়ানদের নিয়ে আবার সোরগোল উঠল। ময়দানে ক্যালকাটা মাঠের পেছনে রাশিয়ান সার্কাসের ছাউনিতে একটি মেয়ে আছে যার দেহে নাকি হাড়গোড় নেই, শিরা উপশিরাগুলি রবারের, আর শরীর নাকি শোলার মত হালকা। পিঠের দিক দিয়ে পা দুখানি মাথায় মিশিয়ে দুখানি হাত দু দিকে প্রসারিত করে সে নাকি টেবিলের উপর রাখা একটি ছোট দণ্ড দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে 'বায়ুভূত নিরাশ্রয়ী'র মত শূন্যে মিনিট-খানেক ঝুলে থাকে। ও বিদ্যার নাম 'প্লাস্টিকস স্কেচ'। সবাই দেখে তাজ্জব বনে যায়। ভাবে এও কি সম্ভব?

এ যে সম্ভব তার প্রমাণ দিল কুমারী অরুণা আট বছর বয়সে 'প্লাস্টিকস স্কেচ' করে। কিন্তু চোখ জুড়ানো দেহের ভেলকিই তো জিমন্যাস্টিকসের মূল কথা নয়। তাই ১৯৫৮ সালে ও জিমন্যাস্টিকস ফেডারেশনের অনুমোদিত কোচ নরেন গুলের কাছে আন্তর্জাতিক জিমন্যাস্টিকস শিখতে আরম্ভ করল। ১৯৫৯ সালে শুধু বাঙলার চ্যাম্পিয়নশিপই নয়, পুনায় ভারতের জাতীয় জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়ন-শিপেও ও পেল বিজয়িনীর সম্মান। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬০ সালে বীম ব্যালান্স ও গ্রাউন্ড জিমন্যাস্টিকসে একই সম্মানের পুনরাবৃত্তি।

এই সময় রাজকুমারী অমৃত কাউরের শিক্ষা পরিকল্পনামত রাশিয়ার জিম-ন্যাস্টিকস 'কোচ' মলোডস্কি এসেছিলেন ভারতে। তাঁর কাছ থেকে উন্নত শিক্ষা গ্রহণ করে আরও পটু হয়ে উঠল অরুণা। মলোডস্কি বললেন, রোম অলিম্পিকে মেয়েটি খুব খারাপ করবে না। জিম-ন্যাস্টিকস ফেডারেশন রোম অলিম্পিকে অরুণাকে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করলেন। কিন্তু অল ইন্ডিয়া স্পোর্টস কাউন্সিলের সভায় বাতিল হয়ে গেল জিমন্যাস্টিকস টীমের রোম সফর। অলিম্পিকে প্রতিযোগিতা করার অরুণার অরুণ আশা মলিন হয়ে গেল।

তবে আশায় বুক বেঁধে আছে এই ছোট্ট মেয়েটি। বয়স এখনো বারো পার হয়নি। সামনে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আর অনুশীলনের অফুরন্ত সময়। অতীন-বাবুরও দৃঢ় বিশ্বাস ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিক পর্যন্ত জিমন্যাস্টিকসের উন্নত ছলা-কলায় আরও পটু হয়ে তাঁর মোমের পুতুল দর্শকচোখে আরও খানিকটা মোহ ছড়াতে পারবে।

দেশী সংবাদ

২৬শে জুন—অদ্য অপরাহ্নে ২৪ পরগনার ঘাগুইআটির নিকট বাগজোলা উদ্বাস্তু শিবিরে অবস্থানরত উদ্বাস্তু ও পুলিসের মধ্যে এক গুরুতর হাঙ্গামার ফলে ঘটনাস্থলে চারিজন উদ্বাস্তু নিহত হন এবং অন্যূন ৩০ জন নরনারী আহত হন। এক অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ যে, পরে আহত একটি শিশুরও ঐ স্থানে মৃত্যু হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনার আমলে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ৬ হইতে ১১ বৎসর পর্যন্ত দেশের যাবতীয় শিশুর শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

২৭শে জুন—বাগজোলা ক্যাম্পে পুলিসের গুলীতে নিহত চারজন উদ্বাস্তুর মৃতদেহ অদ্য সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ দমদমে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড এবং যশোহর রোডের সংযোগস্থলের নিকট পুলিসের হাতে সমর্পণ করা হয়। তৎপূর্বে হিন্দু সৎকার সমিতির একটি গাড়িতে মৃতদেহ কয়টি লইয়া একটি শোক-মিছিল বাহির করা হয়।

২৮শে জুন—কাছাড় ও আসামের অন্যান্য স্থানে পাকিস্তানী মুসলমানদের অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধকল্পে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের একজন বিশ্বস্ত উচ্চপদস্থ অফিসারকে শীঘ্রই আসামে পাঠাইতে পারেন বলিয়া বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে। তাহা ছাড়া আসামে কার্যরত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগকেও নাকি ঢালিয়া সাজাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

গত রবিবার সমস্তিপুরের অন্তর্গত বাজিদপুর গ্রামের নিকট গণ্ডক নদীতে একখানি নৌকা উলটাইয়া যাওয়ার ফলে ৩৫ জন আরোহী সলিলসমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া আশংকা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই নারী ও শিশু। এ পর্যন্ত ছয়টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে। অবশিষ্ট নরনারী স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

২৯শে জুন—কাছাড়ের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া বার বার উপরওয়ালাদের ফতোয়া অগ্রাহ্য করার 'অপরাধে' আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কাছাড়ে 'অ্যাড হক' কংগ্রেস কমিটি গঠনের তোড়জোড় করিতেছেন বলিয়া কলিকাতায় বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে।

কাশ্মীরের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং কাশ্মীর ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী শেখ মহম্মদ আবদুল্লা অদ্য তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, রাজ্য গবর্নমেন্টের পতন ঘটাইয়া তিনি কাশ্মীরকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন বলিয়া যে অভিযোগ করা হয় ইহা সত্য নয়।

৩০শে জুন—আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, পাক সৈন্যবাহিনী কাশ্মীরের অধিকৃত অঞ্চল ছাড়িয়া না যাওয়া পর্যন্ত তিনি এ বিষয়ে কোন আলোচনা করিতেই প্রস্তুত নহেন। কারণ নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী প্রথম বিষয় যথা, পাক সৈন্য সরাইয়া লওয়াই যখন হয় নাই, তখন কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনার কথা তোলা নিতান্তই লজ্জা ও অপমানজনক।

১লা জুলাই—কাছাড় জেলা সংগ্রাম পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারী এবং ১১ জন লোক লইয়া গঠিত কাছাড় প্রতিনিধি দলের অন্যতম নেতা শ্রীনলিনীকান্ত দাস গতকাল এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, আসামের সমস্যা সমাধানে পরিষদ অত্যন্ত আগ্রহশীল। শ্রীদাস বলেন যে, শাস্ত্রী-সূত্র সংশোধিত আকারেও সংগ্রাম পরিষদের নিকট গ্রহণযোগ্য নহে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু গতকাল নয়াদিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে আসামের মন্ত্রী শ্রীমৈনুল হককে বে-কসুর খালাস দিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নিজস্ব গোয়েন্দা রিপোর্টের বিরোধী।

গতকাল রাত্রি প্রায় ১টা ৩৫ মিনিটে দুর্গাপুর ও ওয়ারিয়ার মাঝামাঝি একটি স্থানে কয়েকজন দুর্বৃত্ত মোগলসরাই-হাওড়া প্যাসেঞ্জার ডাউন ট্রেনের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় হানা দিয়া একজন যাত্রীকে ছুরিকাঘাতে আহত করে এবং তাহার জিনিসপত্র ও টাকাকড়ি কাড়িয়া লইয়া চম্পট দেয়।

২রা জুলাই—কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সহিত ১৬ জন সদস্যবিশিষ্ট কাছাড় সংগ্রাম পরিষদের আলোচনা সুফলপ্রসূ হয় নাই। প্রতিনিধিগণের মতে, আসাম সরকার ভাষাগত সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচ সংক্রান্ত ১৯৫৬ সালের স্মারকলিপি কার্যকর করিবেন বলিয়া কথা দিতে না পারাতেই আলোচনা কার্যত ব্যর্থ হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৬শে জুন—লাওসের নিরপেক্ষতা ও সেখানকার আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ইতিকর্তব্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে ফ্রান্স ও আমেরিকা যুক্তভাবে যে খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে চীন আজ তাহা প্রত্যাখ্যান করে।

মার্কিন নৌ-বিভাগ হইতে গতকল্য প্রকাশ করা হয় যে, পোলারিস ক্ষেপণাস্ত্রসজ্জিত আমেরিকার আণবিক সাব-মেরিনসমূহ ওয়াশিংটন হইতে নির্দেশ পাওয়ামাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের অভ্যন্তরস্থ সামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত থাকিয়া গত ছয় মাস যাবৎ উত্তর অতলান্তিকে টহল দিয়া বেড়াইতেছে। মার্কিন সাব-মেরিনবহরের অধ্যক্ষ আজ এই সংবাদটি প্রকাশ করেন।

ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মেজর জেনারেল আবদুল করিম কাশেম গত রাত্রিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, পারস্য উপসাগরের শেখ শাসিত ও তৈলসমৃদ্ধ কুয়াইত ইরাকেরই অবিভাজ্য অংশ। কিন্তু মজা এই যে, গত সপ্তাহে বৃটেন কুয়াইতের সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করিয়া উহাকে পুরোপুরি স্বাধীন দেশ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এতদ্দ্বারা ইরাকের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার উপর এক ভয়ঙ্কর আঘাত করা হইয়াছে।

২৭শে জুন—কাতাঙ্গা প্রেসিডেন্ট টিশোম্বে আবার কঙ্গোর রাজনৈতিক অবস্থা ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছেন এবং মাত্র দুই দিন পূর্বে লিওপোল্ডভিলের যে-সকল নেতার তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাদেরই তিনি তীব্র সমালোচনা করেন।

ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ, প্রয়োজনবোধে কুয়াইতকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগরস্থ বৃটিশ যুদ্ধজাহাজবহরকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

২৮শে জুন—মার্কিন প্রেসিডেন্ট শ্রীকেনেডী ওয়াশিংটনে এবং সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চফ মস্কোতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা জার্মানী এবং বার্লিনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একে অপরের হুমকিতে নতি স্বীকার করিবে না।

২৯শে জুন—সংবাদপত্র "আহরাম" আজ জানাইয়াছেন : পুরোপুরি অস্ত্রসজ্জিত দুই ব্রিগেড ইরাকী সেনা গতকল্য কুয়াইত সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সরকারী মহলের উক্তি উল্লেখ করিয়া এই সংবাদ প্রচার করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজ একটিমাত্র রকেটের সহায়তায় যুগপৎ তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ কক্ষপথে স্থাপন করিয়াছে। একটি উপগ্রহে অক্সিলিয়ারী আণবিক ব্যাটারী রহিয়াছে।

বার্লিন লইয়া কোন সংকট দেখা দিলে কিভাবে তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে, সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট কেনেডী আজ মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের এক জরুরী বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন।

৩০শে জুন—আজ টোকিওতে প্রাপ্ত প্রাথমিক সংবাদে প্রকাশ, প্রায় এক মাইল উচ্চ একটি পর্বতের একাংশ ধসিয়া যাওয়ায় গতকাল মধ্য জাপানের একটি গ্রামের একাংশ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। আজ সকালে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২৩৭ জন, আহত হইয়াছে ২৬৫ জন এবং নিখোঁজ হইয়াছে ১৭৭ জন।

১লা জুলাই—কুয়াইত সুপ্রীম কাউন্সিলের সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়া আজ একদল ইংরেজ সৈন্য ১২০° তাপমাত্রায় হাজারটনী সৈন্যবাহী জাহাজ হইতে তীরে অবতরণ করে। কুয়াইতের সরকারী মহল ইরাক সীমান্ত বন্ধ করিয়া দেওয়ার সংবাদ ঘোষণা করিয়াছে।

২রা জুলাই—কুয়াইত সংক্রান্ত পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য অদ্য অপরাহ্নে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। বৃটেন নিরাপত্তা পরিষদকে জানায় যে, কুয়াইতের গবর্নমেন্টের অনুরোধে গতকল্য সেখানে সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। আক্রমণের কোন উদ্দেশ্য নাই।

বিখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে আজ একটি বন্দুক পরিষ্কার করিবার সময় অকস্মাৎ সেই বন্দুক হইতে নিক্ষিপ্ত গুলীতে নিহত হন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
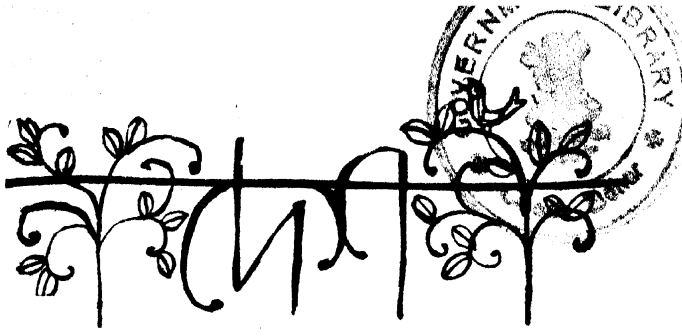
DESH 40 Naye Paise.
SATURDAY, 15TH JULY, 1961

২৮ বর্ষ ॥ ৩৭ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৩০ আষাঢ়, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

অবিভাজ্য সম্পদ

ব্রিটিশরাজকে বিদায়কল্পে দেশ দ্বিখণ্ডিত হলেও জাতীয় নেতারা তাজমহল, কুতবমিনার এবং অন্যান্য পুরাকীর্তি ও ঐতিহাসিক নিদর্শনের শরিকানা ভাগ-বাঁটোয়ারায় উদ্যোগী হননি, এইটাই পরম সৌভাগ্য বলতে হয়। অবিভক্ত ভারতের রাষ্ট্রিক অধিকারভুক্ত স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, রেলগাড়ি, এঞ্জিন, জাহাজ, অস্ত্রশস্ত্র এবং সঞ্চিত অর্থ ইত্যাদি সবই পাকিস্তানের সঙ্গে কড়ায় গণ্ডায় ভাগাভাগি হয়েছে। এমন কী, খালের জলের স্বত্ব স্বামিত্বের দায়-ভাগ যেমন করে হোক সাব্যস্ত করতে হয়েছে। সাব্যস্ত হয় নি কেবল বহু-শতাব্দীসঞ্চিত ভারতেতিহাসের অমূল্য উপকরণরাজির স্বত্বস্বামিত্ব। ইতিহাসের এই এক বিচিত্র পরিহাস। ক্লাইভ-হেস্টিংসের আমল থেকে ভারতবর্ষের বিপুল ধনরত্নসম্ভার যেমন ব্রিটেনে চালান হয়েছে তেমনি ভারতীয় পুরাকীর্তির অসংখ্য নিদর্শন, প্রাচীন পুঁথি-পত্র, ঐতিহাসিক দলিল ইত্যাদিও ব্রিটেনে প্রাচ্যবিদ্যার ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে। ভারতবর্ষ ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছে, ফিরে পায়নি তার ঐতিহাসিক উপকরণ ভাণ্ডার।

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ভারতেতিহাসের এই অমূল্য উপকরণরাজির বৃহত্তম সংগ্রহশালা। প্রাচ্যবিদ্যার অতুলনীয় সম্পদ সঞ্চিত এই সংগ্রহ-শালায়। এই লাইব্রেরীতে সংগৃহীত নানা ভাষায় লেখা গ্রন্থের সংখ্যা আড়াই লক্ষ, বাংলা বই চব্বিশহাজার, সংস্কৃত কুড়ি হাজার। হিন্দী, গুজরাতী, মারাঠি, উর্দু, ফার্সী, তামিল তেলেগু, পাঞ্জাবী এবং এশিয়ার আরও সব ভাষায় লেখা গ্রন্থের সংখ্যাও বহু সহস্র। এর পর আছে পুঁথিপত্র, ভূর্জপত্রে রচিত কাষ্ঠ-ফলকে খোদিত প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ। প্রাচ্য বিদ্যাসংক্রান্ত পাণ্ডু-লিপির সংখ্যাও কুড়ি হাজারের কম নয়। ভারতীয় শিল্পকলা সংগ্রহ, এশিয়ার পশুপাখি জীবজন্তুর চিত্রাবলী, নানা পুরাকীর্তির আলোকচিত্র সংকলন ইত্যাদি সব মিলিয়ে ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরী ভারতের এবং প্রতিবেশী দেশগুলির বিচিত্র ইতিহাস সম্পদের বৃহত্তম সংগ্রহশালা। দেশ স্বাধীন হওয়ার চৌদ্দ বৎসর পরেও এই অমূল্য সম্পদের স্বত্বস্বামিত্ব বৃটেনের চৌহদ্দিভুক্ত।

কথায় বলে, সম্পত্তি যার দখলে আইনের দশদফার মধ্যে নয় দফায় তারই জিত। কাজেই ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর বর্তমান দখলীকার ব্রিটিশ সরকারকে দখল ছাড়তে বাধ্য করার সোজাসুজি কোনই উপায় নেই। একমাত্র উপায় ব্রিটিশ কমনওয়েলথ মন্ত্রী দপ্তরের নিকট আবেদন নিবেদন। লাইব্রেরীটির রক্ষণা-বেক্ষণের ভার এই দপ্তরের। লাইব্রেরীটি কমনওয়েলথ দপ্তরের দখলে গেছে কারণ সাবেককালের ইণ্ডিয়া লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের ইতিহাস-বিশ্রুত ইণ্ডিয়া হাউসও বিলুপ্ত হয়েছে। এখানেও ইতিহাসের এক পরিহাস এই যে, সাবেককালের ইণ্ডিয়ার উত্তরাধি-কারত্বের দাবিদার দুইজন—১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে জন্মসূত্রে সাবেকী ইণ্ডিয়ার স্থলে আধুনিক ভারত ও পাকিস্তান। দেশ যখন দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, দেশের ঐতিহাসিক দলিলপত্র নিদর্শন ইত্যাদিই বা তাহলে ভাগ হবে না কেন? এই হল পাকিস্তানের যুক্তি। এর সমুচিত উত্তর অবশ্য আছে। ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত আইন অনুসারে ভারতই সাবেকী ইণ্ডিয়ার স্থলাভি-ষিক্ত। সে-বিধানে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে পাকিস্তানের কোন শরিকানা স্বত্ব থাকার কথা নয়। কিন্তু আইনের কূটতর্ক এক্ষেত্রে নিষ্ফল কারণ তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকার বর্তমানে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ভোগ-দখল করছেন। নিয়মমাফিক আদালতেই হোক কিম্বা আদালতের বাহিরেই হোক যে মামলায় তৃতীয় পক্ষ থাকে তার নিষ্পত্তি অপর দুপক্ষের কারুরই মনোমত বড় একটা হতে দেখা যায় না। দেশ ভাগের ইতিহাসেও তৃতীয় পক্ষ ব্রিটিশ রাজ ছিলেন দখলীস্বত্বের জোরে দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্যনিয়ন্তা। এক্ষেত্রেও পরিস্থিতি ঠিক সেইরকম। ভারতবর্ষের তরফ থেকে লাইব্রেরী হস্তান্তরের দাবি উত্থাপিত হলে ব্রিটিশ সরকার সবিনয়ে জানাচ্ছেন পাকিস্তানও আর এক দাবীদার এবং অতএব দখল বজায় রইল ব্রিটিশ সরকারের।

সমস্যা জটিল। কারণ দেশের ঐতিহাসিক সম্পদ অবিভাজ্য। প্রাচীন ঐতিহাসিক দলিলপত্র, পুঁথি, পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন শিল্পকলা সংগ্রহ সম্ভার অন্য পাঁচরকম স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মত ভাগবাঁটোয়ারা করা সম্ভব নয়; করলে ভারতেতিহাস ও প্রাচ্যবিদ্যাসংক্রান্ত এই অমূল্য সংগ্রহরাজি সতীদেহের মত খণ্ড খণ্ড ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হবে যার ফলে বিদ্যানুরাগী গবেষকগণ পুরাতত্ত্ব অনু-শীলনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী হস্তচ্যুত করায় ব্রিটেনের আপত্তি অথবা অনিচ্ছার কারণ অনুমান করা দুষ্কর নয়। লাইব্রেরীটি ব্রিটেনে তথা য়ুরোপে প্রাচ্যবিদ্যা অনু-শীলনের বিশেষ আকর্ষণীয় কেন্দ্র। দ্বিতীয়ত, ব্রিটেনের পক্ষে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর উপর পাকিস্তানের শরিকানা স্বত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করাও সম্ভব নয়। সম্প্রতি নাকি প্রস্তাবিত হয়েছে যে, তিনপক্ষের অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান ও ব্রিটেনের সম্মতিক্রমে লাইব্রেরীর স্বত্ব-স্বামিত্বের দাবি নিরূপণের ভার কমন-ওয়েলথের কতিপয় গণ্যমান্য আইন-শাস্ত্রীর উপর দেওয়া হোক। ভারত সরকার এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন কিনা জানা যায় নি।

মুশকিল এই যে, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর অমূল্য সম্পদ ভারতবর্ষের আয়ত্তের বাইরে। স্বত্বস্বামিত্বের দাবি নিষ্পত্তির জন্য কমনওয়েলথ আইন-শাস্ত্রীদের শরণাপন্ন হওয়ার অর্থ অনিশ্চিত ফলাফলের ঝুঁকি নেওয়া; আবার যে দাবি গত চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে আপোষে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি অনিশ্চিতকাল ধরে তার নিষ্পত্তির প্রতীক্ষা করাও লাভজনক নয়। বর্তমান দখলীকার তৃতীয়পক্ষ ব্রিটিশ সরকারকে অধিকারচ্যুত করা ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তান উভয়েরই সাধ্যাতীত। এই উভয় সংকট থেকে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীকে উদ্ধারকল্পে ভারত সরকার কোনও ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব বিবেচনা করছেন কি না জানা প্রয়োজন।

গ্রীষ্মনিসর্গ

বিষ্ণু দে

দুদিকে বর্তুল চৈত্য,
প্রাকৃত বিজ্ঞানে গড়া পাথরে মাটিতে।
আর অন্যদিকে করজোরু সমান-লম্বিত দুই দীর্ঘ শিলা।
নেমে আসি সবুজ গালিচা কিংবা সবুজ পাটিতে, থাকে থাকে
যেখানে হঠাৎ রুক্ষ ডাঙা পৃথিবী রঙ্গিলা।
জানি না সে কোন্ চাষী দৈব পরিশ্রমে
কেটেছিল মাটি আর তুলেছিল বাঁধ, মাটির পাহাড়
জমির সৃষ্টিতে বহুদিন ধরে পেশীর বিক্রমে,
তারপরে হয়তো বা লেঠেল সেধেছে বাদ অথবা আইন-
কারণ জমি যে রচনা করে জমি নয় তার।

নেমে আসি সেইখানে।
প্রবীণ কী কোমলতা এখানে সূর্যের,
স্নেহ ঝরে শিশিরে বৃষ্টিতে, মানবীর প্রেমে যেন,
দেবতার ছায়াময় গানে যেন
বাঁশিতে মেদুর হয়ে ওঠে বুঝি তীব্রস্বর বৈশাখী তূর্যের।

সে কীর্তনে জেগে থাকে বৃক্ষহীন সদ্য শষ্পভূমি,
আর দুটিমাত্র খঞ্জনায় বিষাদের আখর ডোবায়:
আর শফরীউন্মুখ স্বচ্ছ বাপীটুকু, প্রায় মানুষের মতো
গ্রীষ্মজয়ী আকাশমুকুরে মরুর বিস্ময়,
যেন বা পৃথিবী দেহ মেলে দিয়ে গড়ে তোলে, দুর্গম রক্ষায়
ঢাকে জলাশয়:
আর, উপরে সূর্যের হাসি প্রতীক্ষায় স্মিত, নিঃসংশয়:
আর, দুটি বনফুল ফুটে থাকে নির্বিঘ্নের শালীন শোভায়।

স্নিগ্ধ ঘাসে মাথা রাখি, আকাশে বিছাই চোখকান।
কোথায় যে তুমি!

নিরন্ন

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

ভেবেছিলাম নিয়মমতো শান্ত হবো।
অশ্রু-ফোঁটার স্ফটিকে ফের ধীরে-ধীরে
স্পষ্ট হবে উঁচু আকাশ বাষ্পহীন,
লতায়-ঘেরা বাড়ির চূড়ো ঝলোমলো।

শিরার রেখাচিত্র হলুদ একটি হাত।
শীর্ণ চাঁদ নিরন্ন এক বাউণ্ডুলে;
নীল পুকুর, ঠাণ্ডা শিশির—শান্তি নেই,
পাখি ফেরে; শূন্য পাশে ডেকচেয়ার।

বৈদেশিকী

কুওয়াইত নিয়ে খুব হইচই চলছে। এই ক্ষুদ্র শেখ-রাজ্যটির তৈলসম্পদ প্রচুর। সেই জন্যই এত গোলমাল, তা না হলে এর নামই শোনা যেত না। কুয়াইতের তেলের খনির ইজারা অনেক কাল ধরেই বৃটিশদের করায়ত্ত, সুতরাং কুওয়াইত বৃটেনের রক্ষণাধীন—'প্রোটেকটরেট্' ছিল। কিছু দিন হলো কুওয়াইতকে আর বৃটেনের 'রক্ষণাধীন' বলা হচ্ছে না। কুওয়াইতের আমীর এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্টের মধ্যে যে সন্ধিপত্র সম্পাদিত হয়েছে তার দ্বারা কুওয়াইত এখন 'স্বাধীন'। কুওয়াইতের পক্ষ থেকে আরব লীগ এবং ইউনাইটেড নেশনস্-এর সভ্যপদের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

কিন্তু ইতিমধ্যে ইরাক একটা ভারি গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছে। জেনারেল কাসেম দাবি করে বলেছেন যে, কুওয়াইতের উপর ইরাকের সার্বভৌমত্বের অধিকার আছে। এই অধিকার বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইরাক গভর্নমেণ্ট প্রস্তুত হচ্ছেন বলে সংবাদ প্রচারিত হয়। শোনা যায়, এই উদ্দেশ্যে বাদড়াতে ইরাকী সৈন্য সমাবেশ আরম্ভ হয়। ইরাক গভর্নমেণ্ট বলপ্রয়োগের পথে সত্যি সত্যি কতটা অগ্রসর হতে যাচ্ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সঠিক ধারণা করা কঠিন। তবে ইরাক গভর্নমেণ্ট বলপ্রয়োগের দিকে পা বাড়াচ্ছেন এই ধারণার উপর কুওয়াইত এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্ট চলেছেন।

কুওয়াইত 'স্বাধীন' হবার পরে বৃটিশ সৈন্য কুওয়াইত থেকে সরে আসে। কিন্তু বৃটেন ও কুয়াইতের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে তাতে একটি শর্ত আছে এই যে, কুওয়াইতের গভর্নমেণ্ট যদি নিজেকে বিপন্ন বোধ করে বৃটেনের নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করে তবে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কুওয়াইতের রক্ষার জন্য বৃটিশ সৈন্য পাঠাতে পারবেন। এই শর্ত অনুসারে বহু বৃটিশ সৈন্য এবং অস্ত্র-শস্ত্র কুওয়াইতে পৌঁছে গেছে।

এই ব্যাপার নিয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তার একটা কৌতুকজনক দিক আছে। কুওয়াইতে বৃটিশ সৈন্য আমদানি করার বিরুদ্ধে যাঁরা অত্যন্ত মুখর তাঁরা যে ইরাকের দাবি সমর্থন করেন তা নয়। বরঞ্চ তাঁরা ইরাকের দাবির বিরুদ্ধে। কুওয়াইতকে ইরাকের অংশ বলে দাবি করার পক্ষে যুক্তি সবল নয়। একদা কুওয়াইত এবং যে-সব অঞ্চল নিয়ে বর্তমান ইরাক গঠিত (তথা মিশর, সিরিয়া ইত্যাদি) সবই তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, তবে গত

শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে কেবল নামে। কারণ, অনেক অঞ্চলেই আসল ক্ষমতা কোনো না কোনো পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী 'কলোনিয়াল' শক্তির হাতে চলে গিয়েছিল। কুওয়াইতের শেখ রাজ্য বর্তমান শতাব্দী আরম্ভ হবার আগেই বৃটিশের প্রভাবশীল হয়ে গিয়েছিল। ইরাক বলে তখন কোনো আলাদা রাষ্ট্রই ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বিধ্বস্ত তুর্কী সাম্রাজ্য যখন ভাগাভাগি হয় অথবা তার প্রদেশগুলি যখন 'স্বাধীন' করা হয় তখন ইরাক রাষ্ট্র তৈরী হয়। তারও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মেসোপটেমিয়ার তেলের খনিগুলির উপর বৃটিশ প্রভুত্ব সংরক্ষিত করা। নুরি পাশার কর্তৃত্বকাল পর্যন্ত সেদিক থেকে ইরাকে বৃটিশ প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। অবশ্য ইতিমধ্যে তৈল-জগতে বৃটেনের স্থান আর পূর্বের মত উঁচুতে নেই, অনেক নেমে গেছে। সে যাই হোক, কুওয়াইতকে ইরাকের অংশ বলে দাবি করার পক্ষে বিশেষ কোনো যুক্তি দেখা যায় না।

কুওয়াইতকে হাতের মধ্যে পেলে অবশ্য ইরাকের খুবই সুবিধা হয়। কারণ কুওয়াইত যতদিন বৃটেনের প্রভাবের মধ্যে থাকবে ততদিন ইরাকস্থ বৃটিশ তৈলমালিকদের সম্পূর্ণ বশে আনা কঠিন। কারণ ইচ্ছা করলে ইরাকের তেলের উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েও কুওয়াইতের তেল দিয়ে কাজ চালানো এবং বাজার ঠিক রাখা একেবারে অসম্ভব নয়। সুতরাং স্বদেশের তেলের উপর কর্তৃত্ব বিস্তারের দিক থেকে কুওয়াইতকে করায়ত্ত করার আগ্রহ ইরাকের কর্তাদের মনে উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

তবে সোজাসুজি বলপ্রয়োগের দ্বারা কুওয়াইত অধিকার করার কথা বাগদাদের মনে কতটা আছে বা ছিল সেটা বলা কঠিন। কুওয়াইতের বর্তমান আমীর বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর পরে কে গদি দখল করবেন তা নিয়ে নাকি দ্বন্দ্ব আছে। কারো কারো ধারণা যে কুওয়াইতের গদির প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে একজনকে ইরাকী গভর্নমেণ্ট সমর্থন করছেন। যথোচিত সময়ে তাঁর পক্ষে কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগের সংকল্প ইরাক গভর্নমেণ্টের থেকেও থাকতে পারে।

যাই হোক, কুওয়াইতকে কুক্ষিগত করে নেওয়ার ইরাকী মতলবকে প্রতিবেশী অন্য আরব রাষ্ট্রগুলি সমর্থন করে না। কুওয়াইত আরব লীগের সদস্যপদের জন্য আবেদন করেছে। সংযুক্ত আরব রিপাবলিক এবং সৌদি আরবের গভর্নমেণ্ট এই আবেদন গ্রাহ্য করে কুওয়াইতকে আরব লীগের সদস্য করে নেওয়ার পক্ষপাতী বলে জানা গিয়েছিল। ইউনাইটেড নেশন্স্-এর সদস্যপদের জন্য কুওয়াইতের আবেদন তাঁরা সমর্থন করবেন এটাও স্থির বলে জানা গিয়েছিল।

কিন্তু এখন সব ব্যাপারটাই গোলমাল হয়ে উঠল। কুওয়াইতকে আরব লীগ এবং ইউনাইটেড নেশন্স্-এর সদস্যশ্রেণীভুক্ত করার ব্যাপারে যে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক অথবা অন্য আরব রাষ্ট্রগুলির মত পরিবর্তন হয়েছে তা নয়। অবশ্য ইরাকের কথা আলাদা। কারণ ইরাক যখন কুওয়াইতকে ইরাকের অংশ বলে দাবি করছে তখন ইরাক কুওয়াইতের আরব লীগ বা ইউনাইটেড নেশন্স-এর সদস্যপদের জন্য আবেদন সমর্থন নিশ্চয়ই করে না এবং আরব লীগ সম্পর্কে ইরাক 'ভেটো' প্রয়োগ করে কুওয়াইতের আরব লীগে প্রবেশ বন্ধ করতে পারে। বৃটিশ সৈন্য জমায়েতের ফলে অন্যদের পক্ষেও ব্যাপারটা একটু আলাদা চেহারা নিয়েছে, বিশেষত ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের চোখে। সৌদি আরব কুওয়াইতে বৃটিশ সৈন্যের আগমনে তেমন আপত্তিকর কিছু দেখছে বলে মনে হয় না। কুওয়াইতকে রক্ষা করার জন্য সৌদি আরব যথাসাধ্য স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করবে বলে প্রকাশ্য ঘোষণা করেছে। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট নাসের কোনো আরব রাষ্ট্রে কোনো বিদেশী পূর্বতন 'কালোনিয়াল' শক্তির সৈন্যের উপস্থিতি সহ্য করতে রাজী নন। প্রেসিডেণ্ট নাসের জেনারেল কাসেমের কুওয়াইতের উপর দাবি স্বীকার করেন না, কিন্তু জেনারেল কাসেম যখন বলেছেন যে বলপ্রয়োগ দ্বারা ইরাক তার দাবি সাব্যস্ত করতে চায় না তখন সেই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে কুওয়াইতের উচিত অবিলম্বে বৃটিশ সৈন্যদের কুওয়াইত ত্যাগ করতে বলা। বৃটিশ সৈন্য কুওয়াইতে থাকা পর্যন্ত কুওয়াইতকে স্বাধীন বলে স্বীকার করতেই প্রেসিডেণ্ট নাসের বাধা বোধ করেন।

জেনারেল কাসেম যে ঘোষণা করেছেন, সৌদি আরব সরকার কিন্তু সেটাকে যথেষ্ট বলে মনে করেন না। তাঁরা বলেন যে, জেনারেল কাসেম যদি কুওয়াইত সম্পর্কে ইরাকের কোনো দাবি নেই বলে স্পষ্ট ঘোষণা করেন তবেই কুওয়াইত থেকে বৃটিশ সৈন্য সরিয়ে দেবার জন্য বলা যেতে পারে। বোধ হয় এই আশংকা যে, ইরাক যদি স্পষ্টভাবে তার দাবি পরিত্যাগ না করে তবে সোজাসুজি বলপ্রয়োগ না করলেও কুওয়াইতের আভ্যন্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ সে খুঁজবে।

কিন্তু সাক্ষাৎভাবে বলপ্রয়োগের আশংকা যদি না থাকে তবে ইরাক কুওয়াইতের আভ্যন্তর ব্যাপারে কৌশলে হস্তক্ষেপ করতে পারে কেবল এই অজুহাতে কুওয়াইতে বৃটিশ সৈন্য জমায়েত করে রাখার যৌক্তিকতা অনেকেই স্বীকার করবেন না। ব্যাপারটা সিকিউরিটি কাউন্সিলেও উঠেছে। কুওয়াইতের পক্ষ থেকেই নালিশ করা হয়েছিল। বৃটেন কুওয়াইতে সৈন্য পাঠিয়েছে বলে সোভিয়েট ইউনিয়ন বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন অবশ্য কোনো পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলার সুযোগ পেলে তা ছাড়বে না। ইরাকের দাবির ন্যায্যতা সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ না করেই সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট বৃটিশ গভর্নমেণ্টের কার্যের নিন্দা করতে পেরেছেন। কিন্তু যাঁরা ইরাকের দাবির ন্যায্যতা আদৌ স্বীকার করেন না তাঁদেরও অনেকে মনে করেন যে, ব্যাপারটা এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে কুওয়াইত থেকে সৈন্য সরিয়ে আনা উচিত, কুওয়াইতের আপাতত আক্রান্ত হবার কোনো আশংকা নেই। অ্যাফ্রো-এশিয়ান রাষ্ট্রদের মধ্যে আবার কেউ কেউ ভাবছেন যে যদি কুওয়াইতের নিরাপত্তার জন্য বাইরে থেকে সৈন্য পাঠাতেই হয় তবে সেটা আন্তর্জাতিক দায়িত্বে হওয়া উচিত।

৮।৭।৬১

ভবঘুরে (১৬)

হিটলারের পিতা যখন তাঁর মাতাকে বিয়ে করতে চান, তখন বিশেষ কোনো কারণে চার্চের অনুমতির প্রয়োজন হয়েছিল। দরখাস্তে বিবাহের পক্ষে নানা সদ্‌যুক্তি দেখানোর পর সর্বশেষে বলা হয়, 'তদুপরি বধূ অর্থ-সামর্থ্যহীন; অতএব সে যে এ-রকম উত্তম বিবাহের সুযোগ পুনরায় এ-জীবনে পাবে সে আশা করা যায় না।'(১)

পণ-প্রথা তোলার চেষ্টা করুন আর না-ই করুন, এ জিনিসটা সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে আমি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখেছি। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে।

চাষার বাড়ির ড্রইংরুম প্রায় একই প্যাটার্নের। এ বাড়িতে কিন্তু দেখি, শেলফে বইয়ের সংখ্যা সচরাচর যা হয় তার চেয়ে অনেক বেশী, অপ্রত্যাশিত রকমের বেশী। তদুপরি দেখি, দেয়ালে বেশ কিছু অত্যুত্তম ছবির ভালো ভালো প্রিন্ট, সুন্দর সুন্দর ফ্রেমে বাঁধা। আমার মুখে বোধ হয় বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। মাদামই বললেন, 'বিয়ের পূর্বে আমি কিছুদিন বন্‌ শহরে এক প্রকাশকের ওখানে কাজ করেছিলুম।'

অ। সেই কথা। অর্থাৎ এ-দেশে যা আকছারই হয়ে থাকে। কনের বিত্তসামর্থ্য না থাকলে সে চাকরি করে পয়সা কামিয়ে 'যৌতুক' কেনে। 'যৌতুক' কথাটা ঠিক হল না। 'স্ত্রী-ধন' কথাটার সঙ্গে তাল রেখে ওটাকে 'বর-ধন' বলা যেতে পারে।

এ-দেশের নিয়ম কনেকে রান্নাঘরের বাসন-বর্তন, হাঁড়িকুড়ি, মায় সিন্‌ক—রান্নাঘরের তাবৎ সাজ সরঞ্জাম, যার বর্ণনা পূর্বের এক অনুচ্ছেদে দিয়েছি—শোবার ঘরের খাট-গদি- বালিশ- চাদর- ওয়াড়- আলমারি, বসবার ঘরের সোফা-চেয়ার ইত্যাদি সব-কিছু সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়। শহরাঞ্চলে বর শুধু একখানি ফ্ল্যাট ভাড়া করেই খালাস। বিয়ের কয়েক দিন আগে তিনি শুধু ফ্ল্যাটের চাবিটি কনের হাতে গুঁজে দেন। কনে বেচারী সতেরো আঠারো বছর বয়েস থেকে গা-গতর খাটিয়ে যে পয়সা কামিয়েছে তাই দিয়ে এ-মাসে কিনেছে এটা, ও-মাসে কিনেছে সেটা—বছরখানেক ধরে, দাঁও বুঝে—এখন কয়েকদিন ধরে আস্তে আস্তে সেগুলো সরানো হবে

---

(১) আউগুস্ট কুবিৎসেক্ কর্তৃক 'ইয়াং হিটলার', ১৯৫৪, পৃঃ ২৮। হিটলারের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এ রকম উপাদেয় গ্রন্থ আর নেই।

ঘরের ফ্ল্যাটে। বিয়ের পর বর কনে কখনো বা সোজা চলে যায় হানিমুনে, আর কখনো বা ফ্ল্যাটে দু' চার দিন কাটিয়ে। কিন্তু একটা কথা খাঁটি; এর পর আর মেয়েকে ঘর-কন্না চালাবার জন্য অন্য-কিছু দিতে হয় না—জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব-ফত্ত্ব এ-দেশে নেই।

আর 'ট্রুসোর' কথাটা পাঠিকারা নিশ্চয়ই এ'চে নিয়েছেন। সেও আরম্ভ হয়ে যায় ঐ ষোল সতেরো বছর বয়স থেকে। জামা-কাপড় ফ্রক-গাউনের এম্‌ব্রয়ডারি আরম্ভ হয়ে যায় ঐ সময়ের থেকেই—মায়ের সাহায্যে— এবং পরে কোনো পরিবারে চাকুরি নিলে সে বাড়ির গিন্নীমা অবসর সময়ে কখনো বা এমব্রয়ডারির কাজ দেখিয়ে দেন, কখনো বা নিজেই খানিকটা করে দেন। শুনেছি, বাড়ন্ত মেয়েরা টাইট-ফিটের জামা গাউন-গুলোর সব-কিছু তৈরি করে রাখে— বিয়ের কয়েকদিন আগে দরজীর দোকানে গিয়ে কিংবা মা-মাসী সাহসিনী হলে তাঁদের সাহায্যে নিজেই কেটে সেলাই করে নেয়।

ব্যাপারটা দীর্ঘ দিন ধরে চলে বলে এতে একটা আনন্দও আছে। আমার এক বন্ধু পরীক্ষা পাস করে চলে যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিল তার ফিয়াঁসেকে যেন মাঝে মধ্যে একটুখানি বেড়াতে নিয়ে যাই। বেচারী নিতান্ত একা পড়ে যাবে বলে, এবং আমার কোনো ফিয়াঁসে এমন কি বান্ধবী পর্যন্ত নেই বলে।

রাস্তায় নেমে আমি হয়তো বললুম, 'বাসন-কোসনের আলমারি হয়েছে, উনুন হয়েছে, এইবারে সিন্‌ক্—না?'

বললে, 'হ্যাঁ, গোটা তিনেক এদিক ওদিক দেখেছি। আমার কিন্তু একটা ভারী পছন্দ হয়েছে। শহরের ঐ প্রান্তে।'

আমি বললুম, 'আহা, চলই না, দেখে আসা যাক্ কি রকম।'

'তুমি না বলেছিলে, রাইনের ওপারে যাবে?'

'কী জ্বালা! রাইন তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না।'

ছোট্ট শহর বন্। ডাইনে ম্যুনস্টার গির্জে রেখে, রেমিগিউস স্ট্রীট ধরে, ফের ডাইনেই য়ুনিভার্সিটি পেরিয়ে ঢুকলুম মার্কেট প্লেসে। বাঁ দিকে কাফে মনোপোল, ডান দিকে মুনিসিপ্যাল আপিস। মার্গারেট বললে, 'দাঁড়াও। এদিকেই যদি এলে তবে চলো ঐ গলিটার ভিতর। রীডিং ল্যাম্পের সেল হচ্ছে—সস্তায় পাওয়া যাবে। আমার যদিও খুব পছন্দ হয়নি।'

দেখেই আমি বললুম, 'ছ্যাঃ!'

মার্গারেট হেসে বললে, 'আমিও তাই বলছিলুম।'

ক'রে ক'রে, অনেকক্ষণ এটা সেটা দেখে দেখে—সবই রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, দোকানে ঢোকা নদারদ, এখনো পাকাপাকি কেনার কোনো কথাই ওঠে না, মার্গারেটের মা দেখবে, পিসি দেখবে, তবে তো— পৌঁছলুম সেই সিনকের সামনে। আমি পাকা জউরির মত অনেকক্ষণ ধরে ডাইনে ঘাড় নাড়ালুম, বাঁয়ে ঘাড় নাড়ালুম, তার পর বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে ডান কানের উপরটা চুলকোতে চুলকোতে বললুম, 'হ্যাঁ, উত্তমই বটে। শেপটি চমৎকার, সাইজটিও বঢ়িয়া—দুজন লোকের বাসন-কোশনই বা ক'খানা, তবে, হ্যাঁ, পরিবার বাড়লে—' মার্গারেট কি একটা বলছিল; আমি কান না দিয়ে বললুম, 'তবে কি না বড্ড ধবধবে সাদা। এটিকে পরিষ্কার রাখতে জান বেরিয়ে যাবে। একটুখানি নীল ঘেঁষা হলে কিংবা ক্রেজি চাইনার মত হলে—' মার্গারেট বললে, 'সেই ঘষে ঘষে সাফ যদি করতেই হয় তবে ধবধবে সাদাই ভালো। মেহন্নত করবো, উনি নীলচেই থেকে যাবেন, লোকে ভাববে হাড়-আলসে বলে নীল রঙের কিনেছি— কী দরকার!'

আহা, সে-সব স্লো টেম্পোর ঢিমে তেতালের দিনগুলো সব গেল কোথায়? এখন সকালে বিয়ে ঠিক, সন্ধ্যের ভিতরই ডেকরেটররা এসে সব-কিছু ছিমছাম ফিট-ফাট করে দিলে। তবে হ্যাঁ, তখন বাড়ি পাওয়া যেত সহজেই; এখন আর সে সুখটি নেই। কিছুদিন পূর্বেই ইয়োরোপের কোন্ এক দেশে নাকি কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে-ছিল:—

> পাত্রী চাই! পাত্রী চাই!! পাত্রী চাই!!!
> আপন নিজস্ব সর্বস্বত্বসংরক্ষিত বাড়ি যার আছে এমন পাত্রী চাই। বাড়ির ফোটোগ্রাফ পাঠান।

*

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম! ট্রাম্পকে নিয়ে এই তো বিপদ। সে যে রকম সোজা রাস্তায় নাক-বরাবর চলতে জানে না, তার কাহিনীও ঠিক তেমনি পারলেই সদর রাস্তা ছেড়ে এর খিড়কির দরজা দিয়ে তাকায়, ঝোপের আড়াল থেকে ওর পিছনের পুকুরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

আমি আমার ম্যাপ খুলে অনেকক্ষণ ধরে সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার ভান করলুম। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ, মাদাম। আপনাকে অযথা বিরক্ত করলুম।'

এই বারে 'মাদামে'র অগ্নিপরীক্ষা।...... মাদাম পাস! টেরমের ফেল্।

অবশ্য কিছুটা কিন্তু কিন্তু করেই বলেছিল—কিন্তু বলেছিল তো ঠিকই— 'এখন তো রাত ন'টা। ভিন গাঁয়ে পৌঁছতে—'

আমি বাধা দিয়ে এক গাল হেসে বললুম, 'আদপেই না, মাদাম! আপনাকে সব-কিছু খুলে কই।'

'বসুন না।' মাদাম শুধু পাস না; একেবারে ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট।

'আমি শুনেছি, আপনাদের দেশে গরমের সময়ে দিনগুলো এত লম্বা হয় যে একটা দিনের সন্ধে নাকি পরের দিনের ভোরকে 'গুড্ মর্নিং' বলার সুযোগ পায়। ঠিক মত অন্ধকার নাকি আদপেই হয় না। এখানে আমি থাকি শহরে। ছ'টা সাতটা বাজতে না বাজতেই সব কড়া কড়া বিজলি বাতি দেয় জ্বালিয়ে। কিচ্ছুটি বোঝবার উপায় নেই, আলো, না অন্ধকার। ফিকে অন্ধকার, তরল অন্ধকার, ঘোরঘুট্টি অন্ধকার—শুনেছি মিড্-সামারে নাকি গ্রামাঞ্চলে এর সব ক'টাই দেখা যায়। আমি হাঁটতে হাঁটতে দিব্য এগুতে থাকবো আর অন্ধকারের গোড়াপত্তন থেকে তার নিরুচি পর্যন্ত রসিয়ে রসিয়ে চেখে চেখে যাবো। এবং—'

'কিন্তু আপনার আহারাদি?'

কে বলে এ রমণী খাণ্ডার!!

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

বিমল কর

খ্যাতনামাদের মৃত্যু প্রীতিকর সংবাদ নয়; সংবাদপত্রের শোকরেখা সম্ভবত কালের দরবারে এই সব মৃত্যুকে তাই স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে চায়। শোক-গাথা রচনার দিন আপাতত ফুরিয়ে গেছে, ভাবপ্রবণতা দোষাবহ এবং হাস্যকর, ফলে কবরে ফুল নিয়ে আসার মতন আমাদের শোকজ্ঞাপন সংক্ষিপ্ত সৌজন্যসুলভ।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এ-দেশে ঠিক খ্যাতনামা ছিলেন না, কিছুটা বেশী, অতি-খ্যাত। জীবিত আমেরিকান লেখকদের মধ্যে এক এরস্কিন কলড্‌ওয়েল ছাড়া ভারতীয় সাধারণ পাঠকের কাছে হেমিংওয়ের তুল্য প্রতিপত্তি আর কেউ বিস্তার করতে পারেন নি। সাধারণভাবে এই বিশিষ্ট লেখকের মৃত্যু তাই সাহিত্য অনুরাগীদের মধ্যেই কেবল আলোচ্য বিষয় নয়, সর্ব-শ্রেণীর সাহিত্য-পাঠকেরও আগ্রহের বিষয়। বিশেষত, হেমিংওয়ে তাঁর জীবনের অফুরন্ত অভিজ্ঞতা এবং রোমাঞ্চকর চরিত্রের জন্যে যখন একটি পুরাকাহিনীর মতন সমাদৃত; আর তাঁর মৃত্যু-সংবাদের মধ্যে স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতার একটি রহস্য যখন থেকে গেল।

ইলিনয়ে, ওক পার্কে, ১৮৯৯ সালে হেমিংওয়ের জন্ম (২১শে জুলাই)। বাবা ছিলেন ডাক্তার। বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলে ডাক্তারি পড়ুক, মা'র বাসনা ছিল 'সেলিস্ট' হোক। ছেলের অবশ্য কোনোটাই পছন্দ ছিল না; ক্যানসাস সিটি স্টার পত্রিকার সংবাদদাতা হিসেবে তাঁর জীবনারম্ভ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি অ্যাম্বুলেন্স ইউনিটের সঙ্গে ফ্রান্সে ছিলেন, পরে ইটালীর সৈন্যদলে বদলি হয়ে আসেন, এবং যুদ্ধে আহত হন। ১৯২১-এ তিনি প্যারী-প্রবাসী, ভবঘুরে জীবনের মাদকতায় আচ্ছন্ন।

যুদ্ধোত্তর প্যারীতে তাঁর সঙ্গে এজরা পাউন্ড এবং গেরট্রুড স্টেইনের মতন প্রতিভার সঙ্গে পরিচয়, এঁদের উৎসাহ দ্বারা তাঁর প্রাথমিক সাহিত্য-জীবন লালিত। ১৯২৩ থেকে তাঁর সাহিত্য-জীবনের আরম্ভ এবং সাফল্য ১৯২৬-এ 'দি সান অলসো রাইজেস' প্রকাশিত হবার পর। 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' আরও তিন বছর পরে প্রকাশিত হয়,

সাফল্যের খ্যাতিটিও এতে পোক্ত হয়েছিল, কিন্তু দীর্ঘ এক দশকেরও পরে ১৯৪০-এ 'ফর হুম দি বেল টোলস' প্রকাশের পূর্বে এই খ্যাতিতে চিড় ধরে আসছিল। অসাধারণ কয়েকটি ছোট গল্প তাঁকে—বা তাঁর সুনামকে এ-সময় জিইয়ে রেখেছিল। ১৯৫২ সালে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সী' প্রকাশিত হয়। তার ঠিক দু' বছর আগেই তাঁর সবচেয়ে নিকৃষ্ট লেখা 'অ্যাক্রস দি রিভার অ্যান্ড ইনটু দি ট্রিজ' বেরোয় যার আবির্ভাব সমালোচকদের গলা প্রায় কাঠ করে এনেছিল। ফিলিপ র‍্যাভ অত্যন্ত দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, বইটা বদমেজাজের অবস্থায় লেখা, ঠিক নিষ্ঠাহীনতায় হয়ত নয়। 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সী'র আবির্ভাব শিল্পী হেমিংওয়েকে উদ্ধার করেছে বটে, আমাদের কাছে এই বইয়ের যথেষ্ট সমাদর, তবু কোনো কোনো সমালোচকের মতে, হাজার ঢাক পেটানো সত্ত্বেও এই গ্রন্থটি হেমিংওয়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, এ-কথা বলা যায় না! "দো দি মেরিট অফ দিস্ নিউ স্টোরি ইজ ইনকনটেসটেবল, সো আর ইটস লিমিটেশনস।" ১৯৫২-র পর এযাবৎ তাঁর নতুন কোনো রচনা সম্পূর্ণাঙ্গ-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলে জানি না।

হেমিংওয়ের জীবন-অভিজ্ঞতা বিচিত্র, বলিষ্ঠ। যুদ্ধ, শিকার, মাছ-ধরা, ষাঁড়ের লড়াই কি বক্সিং শিল্পের পক্ষে সুগম এমন কথা বিশ্বাস করার হেতু বাংলা দেশে আছে। অন্যত্র এর কদর কতখানি, তার বিচার লেখার ওপর, লেখকের থলিভরা অভিজ্ঞতার ওপর নয়। শিল্পের কাজ ডকুমেন্টেশান নয়। নয় বলেই হেমিংওয়ের সম্পর্কে বিদেশী সমালোচকদের শ্রদ্ধা এবং মমতা সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা আক্ষেপ ছিল। অথচ হেমিংওয়ে তথাকথিতভাবে তাঁর জীবনের এই সব অভিজ্ঞতার কাহিনীকার নন। যাঁরা মনে করেন—যুদ্ধের, ষাঁড়ের লড়াইয়ের গল্প বলে আর মদের ছত্র খুলে দিয়ে হেমিংওয়ে প্রথম যুদ্ধোত্তর মার্কিন প্রবাসী মনের নৈরাশ্য আর উদ্দামতা দেখিয়ে বাজিমাৎ করেছেন, তাঁরা ভুল করেন। হেমিংওয়ের শিল্পের সঙ্গে তাঁর জীবনের সম্পর্ক এভাবে কদাচ যুক্ত নয়।

হেমিংওয়ের শিল্প-বিচার ঈষৎ বিস্তৃত হলে তাঁকে বোঝবার সুবিধে হয়, এমন কি, আমেরিকার প্রথম যুদ্ধোত্তর সাহিত্য বিচারেরও। গোড়ায় বলে নেওয়া উচিত, আমেরিকায় হেমিংওয়ের প্রভাব অপরিমেয়। বিশ সালের ছোকরারা হেমিংওয়েকে নকল করে লিখতে চেয়েছিল একথা যেমন সত্য, তেমনি

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (১৮৯৯-১৯৬১)

হেমিংওয়ের নায়ক-নায়িকার মতন তারা লেখায় এবং জীবনে মদের পিপে শেষ করত, অপ্রসন্নতা এবং বিষাদের কণ্টকর চর্চা করত, হেমিংওয়ের কথোপকথন ভঙ্গিতে কথা বলত। এতটা নকলনবিশির কারণ কি? তিরিশ চল্লিশ সালে শুধু আমেরিকায় নয়, অন্যত্রও তরুণ লেখকদের কাছে হেমিংওয়ে মোটামুটি আদর্শ হিসেবে খাড়া হয়ে ছিলেন। এতদসত্ত্বেও আজ হেমিংওয়ের অনুগামীরা প্রায়শ ব্যর্থ, কেননা, হেমিংওয়ের বাস্তব যে অর্থে তাঁর সাহিত্যে ব্যবহৃত, সে-অর্থ অন্যের মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গীর আয়ত্তে আসেনি।

আমেরিকার বিশ শতকীয় সাহিত্যের সার্থক উদাহরণ হেমিংওয়ে। ফিলিপ র‍্যাভ তাঁর সুন্দর একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন—আমেরিকার সাহিত্য দুই মেরুতে আটকে আছে। একটি মেরুর তিনি নাম করেছিলেন 'পেলফেস' (বাংলায় বলি 'পাণ্ডুরানন'), অন্যটি 'রেডস্কিন' (যার বাংলা করা যাক 'লাল চামড়া')। পাণ্ডুরানন-দের উনিশ শতকে যথেষ্ট আধিপত্য ছিল, তার শোধ নিয়েছে লাল চামড়ারা বিশ শতকে। লাল চামড়ারা হচ্ছে আমেরিকার প্রভূত ধনোপার্জনের পরবর্তী প্রতিক্রিয়া, ভোগবাদের মেজাজদারী লেখক, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং ভোগের ক্ষমতার প্রতি এদের আত্মসমর্পণ প্রায় অবিশ্বাস্য। পাণ্ডুরানন-দের ভাব বা দর্শন কি বুদ্ধিআশ্রিত লেখা জীবনের সঠিক প্রতিচ্ছবি নয়—এই অজুহাতে তারা কোণঠাসা।

হেমিংওয়েকে 'লাল চামড়া'দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান শিল্পী বলতে দোষ দেখি না। ভাব-জগতের প্রতি হেমিংওয়ের অনুরাগ প্রবল, এমন কথা বলা মুশকিল, এমন কি, বুদ্ধিবাদের প্রতি তাঁর আনুগত্য সমর্থন করা কষ্টকর। অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব তাঁর রচনার প্রাথমিক শর্ত, নকল-অভিজ্ঞতায় তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণা। বুদ্ধিবাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন উপহাস—আমাদের এ-কথা না মনে করিয়ে শান্তি দেয় না যে, পাণ্ডুরানন হবার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না। কিন্তু অভিজ্ঞতা আর বাস্তব বলতে প্রচলিত অর্থে যা ধরা হয়, হেমিংওয়ের বাস্তব তা নয়। আমরা যাকে সত্য বলতে অভ্যস্ত—সেই সত্য বা বাস্তবকে নাগালে ধরবার স্পৃহা নিশ্চয় তাঁর ছিল—তবে এই বাস্তবের অপরিহার্যতা মূলত ঘটনা ও বৃত্তি-বিন্যাস দ্বারা যে মানবিক প্রক্ষোভ সৃষ্টি হয়, তাকে ব্যবহার করবার জন্যে।

হেমিংওয়ের রচনা-রীতি তাঁর পরবর্তী-দের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। এই রীতির বৈশিষ্ট্য, ভাষা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জোরালো, অকৃত্রিম, সংযত এবং দৃঢ়। হেমিংওয়ের নিজের কথা ছিল—সমুদ্রে ভাসমান আইসবার্গের মতন এ-রীতির গাম্ভীর্য এবং মহিমা। দশ ভাগের আট ভাগ লুকোনো থাক তলায়, মাত্র অবশিষ্টটুকু চোখে পড়ুক, তাতে শিল্পের গৌরব বাড়বে বই কমবে না। বলা বাহুল্য, হেমিংওয়ের স্বল্পবাক্ রীতির দ্বারা পাঠক নিশ্চয় পীড়িত হন না, কিন্তু বহুক্ষেত্রে যার ব্যবহার প্রতীকী অর্থে, বহু পাঠকের চোখে সেই তাৎপর্য হারিয়ে যায়। অপর দুই সমালোচক ব্রুক সাহেব এবং রবার্ট পেন ওয়ারেন এবিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন, সেটিও উল্লেখযোগ্য। তাঁরা বলেছেন, হেমিংওয়ের রীতি আমাদের কাছে এই অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন জগতের (dislocated and ununited world) কথা মনে করিয়ে দিতে চায়।

বুদ্ধিবাদের প্রতি বিশ্বাস অথবা আস্থা না থাকা সত্ত্বেও হেমিংওয়ের সাহিত্য যে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য, তার একমাত্র কারণ বোধ হয় এই, জীবন সম্পর্কে শেষাবধি তাঁর ধারণা রহস্যাবৃত নয়। এবং প্রেম, হতাশা, সংগ্রামের গৌরব, দৈহিক ক্ষুধা মানবিক নীতির প্রতি তাঁর আস্থা অবিচল। সম্ভবত তাঁর সাহিত্যের সার একটি কথায় এই হতে পারে যে, মানুষ মাত্রেরই মৃত্যু আছে, কিন্তু পরাজয় নেই। পরাজয় মানুষের আচরণের ওপর নির্ভর করে, ভাগ্যের বা মৃত্যুর ওপর নয়।

সতীপতি চোখ তুলে তাকালেন। লোকটাকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

'একবার একটা মামলা নিয়ে এসেছিলাম আপনার কাছে।' হীরালাল বললে হাতজোড় করে। 'আবার আরেকটা এনেছি।'

কাগজপত্রে এক পলক চোখ বুলিয়েই সতীপতি বললেন, 'এ মামলা আমার কাছে কেন? আমি তো উপরের কোর্ট।'

চোখ-মুখ অসহায় করল হীরালাল। বললে, 'আপনাকে ছাড়া আর কাউকে চিনি না।'

'এ মামলা হবে কোর্ট অফ ফার্স্ট ইনস্ট্যান্সে।'

সেটা আবার কী! হীরালাল হাঁ হয়ে রইল।

'মানে নিম্ন আদালতে।' সতীপতি হাসলেন: 'তারপর সেখানে হেস্তনেস্ত হবার পর আমার পালা।'

'এত টাকার দাবি, তবু নিচুতে যেতে হবে?' অপমানের মত লাগল বুঝি হীরালালের।

'আমার আপনার ইচ্ছেয় তো হবে না।' বললেন সতীপতি, 'আইন টেনে এলাকা ভাগ করে দিয়েছে। বিবাদীর সঙ্গে চুক্তি যেখানে, বিবাদী যেখানে নিয়ত বাস করে সেইখানকার নিম্নতম কোর্টে মামলা হবে—'

'তবে দয়া কোরে একজন নিচু উকিল ঠিক কোরে দিন।' কাতর চোখে তাকাল হীরালাল।

'নিচু মানে লোয়ার কোর্টের উকিল—'

'হ্যাঁ, তাই। কথাটা ছোট করে বলা আর কি।'

'সংক্ষেপ করে।' হাসলেন সতীপতি: 'যেমন ক্রিমিন্যাল উকিল।' বলতে বলতেই ফোন তুললেন। কাকে কী বললেন গুনগুন করে। পরে লক্ষ করলেন হীরালালকে: 'যান, বলে দিলাম। প্রভাংশুর কাছে যান।' ঠিকানা বলে দিলেন।

'প্রভাংশুবাবু লোক কেমন?'

'লোক কেমন মানে?' বিরক্ত হলেন সতীপতি।

'মানে, ভালো লোক?'

'আপনার উকিল দরকার। আপনার প্রশ্ন হবে উকিল ভালো কিনা। ভালো লোক কিনা সে-প্রশ্ন উঠবে জজের বেলায়। তখন প্রশ্ন, ভালো জজ কি না, ভালো লোক কি না। মানে মা-গোঁসাই কি না—'

কাগজপত্র কুড়িয়ে নিয়ে হীরালাল প্রভাংশুর চেম্বারে এল।

বললে, 'সতীপদবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, টেলিফোন পেলাম।' প্রভাংশু গম্ভীরমুখে বললে, 'কিন্তু ও'র নাম সতীপদ নয়, সতীপতি।'

'সেটা একই কথা।' একটু বুঝি হাসল হীরালাল: 'পদ-তে আর পতি-তে তফাত নেই।'

কাগজপত্র দেখতে বেশী সময় নিল না প্রভাংশু। গম্ভীরতর মুখে বললে, 'এ মামলা নিতে পারব না।'

'সে কী?' হীরালাল প্রায় গাড়িচাপা পড়ল: 'পারবেন না নিতে?'

'না। এ মামলায় কিছু নেই। কিচ্ছু হবে না।'

'হোবে না?'

'ফল হবে না। হেরে যাব।' কাগজপত্রে ফিতে বাঁধল প্রভাংশু।

হীরালাল ফিরে এল সতীপতির কাছে।

বললে, 'অন্য উকিল ঠিক কোরে দিন। যার কাছে পাঠিয়েছিলেন তিনি বললেন, কিসসু হবে না।'

'বটে? আচ্ছা, কাগজ রেখে যান। আমি দেখছি। কাল আসবেন।' পরে হীরালাল চলে যেতেই টেলিফোনে প্রভাংশুকে ডাকলেন সতীপতি।

'মামলাটা নিলে না যে?'

'মামলাটা মিথ্যে।' ওপার থেকে বললে প্রভাংশু।

'মিথ্যে না সত্যি তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার কী দরকার?' সতীপতি ধমকে উঠলেন।

'মনে হচ্ছে চুক্তিটা ভুয়ো, দলিলটা জাল।'

'তুমি কি ওকালতি করতে বসেছ, না বোকালতি?' সতীপতি ঝাঁজিয়ে উঠলেন।

'কিন্তু যাই বলুন,' প্রভাংশু গলার স্বরটাকে বুঝি একটু তরল করল: 'এ মামলাতে কিচ্ছু হবে না।'

'হবে না আবার কী!' সতীপতি প্রায় আকাশ থেকে পড়লেন: 'উকিলের অভিধানে হবে না বলে কোনো কথা নেই। তোমার হবে, আমার হবে, আর মক্কেলের যা হবার তা হবে।'

'নতুন উকিল, গোড়াতেই যদি হেরে যাই—' প্রভাংশু ঘাড় চুলকোল।

'তুমি আগাগোড়াই হারবে।' রাগ করে রিসিভার রেখে দিলেন সতীপতি।

ছি ছি ছি। নাক-কান মলে জিভ কাটল হীরালাল

অগত্যা প্রভাংশু মামলা নিল।

কিন্তু মনে তার সুখ নেই। কাজে-কর্মে সত্যের স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছে না।

'আপনি ঘাবড়াবেন না।' হীরালালই আশ্বাস দেয়। বলে, 'ঠিক মত তদবির করতে পারলে ঠিক জিতে যাব মামলা।'

তদবির! এ আবার কী! প্রভাংশু লাফিয়ে উঠল।

এতে লাফাবার কিছু নেই। দেবতাকে তুষ্ট করতে চাওয়াকে কেউ অপরাধ বলে না। কিন্তু দেবতা কী রকম তার একটু খোঁজ নেওয়া দরকার। দেবতা কি আশুতোষ, না, শনিঠাকুর? যেমন দেবতা তেমনি নৈবেদ্য।

'কী বলতে চান আপনি?' চোখমুখ তীক্ষ্ণ করল প্রভাংশু।

চেয়ারটা একটু কাছে টানল হীরালাল। বললে, 'যে এখন মামলাটা ধরেছে সে হাকিমটি কেমন?'

'যেমন হাকিমের হওয়া উচিত, ভীষণ কড়া।' প্রভাংশু মুখিয়ে এল: 'কিন্তু আপনার হাকিম দিয়ে কী কাজ! বলি আপনার মামলাটি কেমন তার খোঁজ নিন।'

'সব মামলাই তো গোলমাল।' হীরালাল আরো কাছে ঝুঁকল: 'রায় নিয়ে কথা। যিনি রায় দেবেন তিনি কিসে খুশী হবেন সেটুকু দেখতে দোষ কী।'

'আপনি হাকিমকে ঘুষ দিতে চান?'

'ছি ছি ছি।' নাক-কান মলে জিভ কাটল হীরালাল: 'ঘুষ বলছেন কেন? ঘুষ নয় খুশ। মানে যাতে দেওতা খুশী হন। এ আদালতে এমন কোনো উকিল নেই যে হাকিমের আত্মীয় কি প্রিয়পাত্র? জামাই কি শালা কি ভায়রাভাই? যাকে দেখলে মনটা তুলতুল করে?'

'আপনি খোঁজ নিনগে।'

'তা নিচ্ছি।' বিনয়ে গলে গেল হীরালাল: 'যদি তেমন কাউকে পাই, ওকালতনামায় শামিল কোরে নিই। আপনি তো আছেনই, অধিকন্তু—'

'তেমন কাউকে যদি প্রত্যক্ষ শামিল করে নেন,' প্রভাংশু বললে, 'হাকিম নিজের ফাইলে রাখবে না মামলা। অন্য কোর্টে চালান করে দেবে।'

'আহাহা, প্রত্যক্ষে রাখব কেন? সূক্ষ্ম রাখব।' একটু বুঝি সূক্ষ্ম করেই হাসল হীরালাল: 'আপনিই সব করবেন, সে মাঝে-মাঝে আপনার পাশ ঘেঁষে এসে বসে যাবে, ইঙ্গিতে বোঝাবে যে সে আপনারই লোক—'

'তেমন যদি পান তাকে দিয়েই করান।' সামনের টেবিলের থেকে হাত সরিয়ে নিল প্রভাংশু।

'আহাহা, চটেন কেন?' হীরালাল ভ্যাবাচাকা মুখ করল: 'ভাবছি তদবিরটা কত সরু করা যায়। আচ্ছা, আপনি অঘোর শিমলাইকে চেনেন?'

'সে কে?'

'ইস্কুলে নাকি হাকিম সাহেবের হেড-পণ্ডিত ছিলেন। তাঁকে নাকি হাকিম খুব মানে, রাস্তায় দেখা হলে গড় হয়ে প্রণাম করে। সে পণ্ডিত মশাই যদি বলেন একটু আমার হয়ে—'
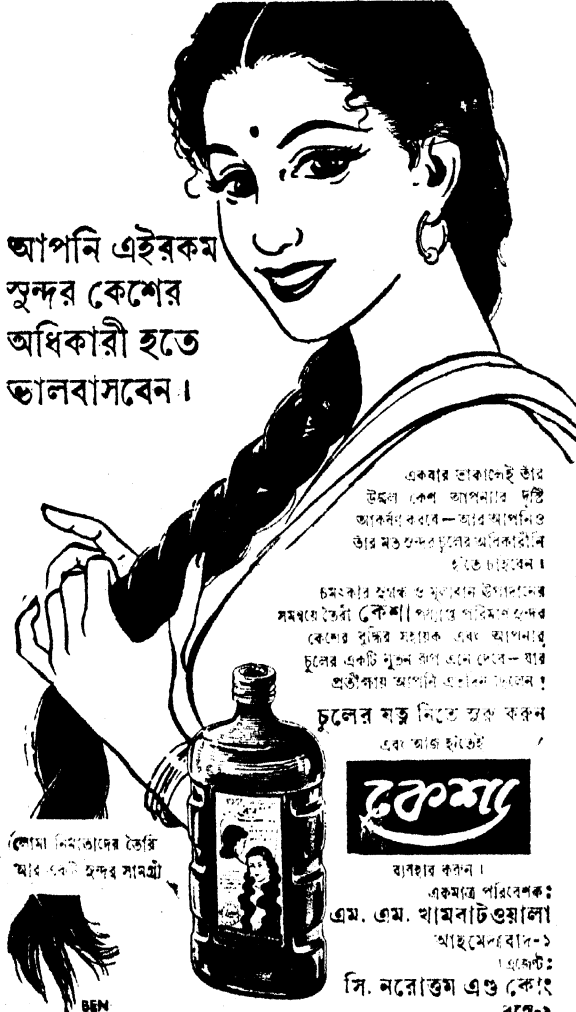
'ওসবের মধ্যে আমি নেই মশাই।'

'আহাহা, আপনি থাকবেন কেন? আমি ওসব দেখছি।' হীরালাল কাশল: 'আচ্ছা, আপনি রোবীন্দ্রনাথ জানেন?'

'রবীন্দ্রনাথ!' প্রভাংশু থ হয়ে রইল।

'চারদিকে এখন তো রোবীন্দ্রজয়ন্তী চলেছে—'

'তাতে কী?'

'তাতে কিসু না। খোঁজ নিয়ে জেনেছি হাকিম খুব রোবীন্দ্রভক্ত।'

'খোঁজ নিয়ে জেনেছেন?'

'ঘোড়া ধরতে হলে খোঁজ নিতে হয় না?' বোকা-বোকা মুখ করল হীরালাল: 'তেমনি একটু ওয়াকিবহাল হওয়া। শুনেছি বাড়িতে রোবীন্দ্রজয়ন্তী করেছেন।'

'রবীন্দ্রজয়ন্তী করলে রবীন্দ্রভক্ত হতে হবে? কিন্তু, কেন, আপনি বলতে চাচ্ছেন কী?' প্রভাংশু অস্থির হয়ে উঠল।

'বলতে চাচ্ছি আপনার আর্গুমেণ্টে যদি কিছু রোবীন্দ্রনাথ কোট করেন!'

'রবীন্দ্রনাথ কোট করব? সঙ্গে উইকলি নোটস না নিয়ে সঞ্চয়িতা নিয়ে যাব?' এক মুহূর্ত কী চিন্তা করল প্রভাংশু। বললে, 'আচ্ছা, করব। একটা মাত্রই তো কোট করা চলে। তাই করব'খন।'

'সেটা কী?'

'সেটা হিং টিং ছট। বলব, এ মামলা বিশুদ্ধ হিং টিং ছটের মামলা। দু' পক্ষের দু' উকিল আর হাকিম এই তিন শক্তি, তিন স্বরূপে। বলব চেঁচিয়ে, ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট। সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট।'

'আপনি চোটছেন।' মৃদু হাসল হীরালাল: 'কিন্তু রুগীর যখন সঙিন অবস্থা তখন সে তো কেবল ডাক্তার-কবরেজই দেখায় না, টোটকা-টাটকি করে—কী বলেন, করে কিনা—তাকতুক ঝাড়ফুঁক কিসুতেই আপত্তি করে না। এমনকি ফকিরফোকরারও পায়ে ধরে—'

'আপনি ধরুন গে। আমার মশাই স্ট্রেট ড্রাইভ।' চেয়ারে পিঠ ছেড়ে দিল প্রভাংশু: 'হয় আউট, নয় বাউন্ডারি।'

'কিন্তু মোশায়, লেগ-প্লান্সও তো আছে।' হীরালাল তাকাল মিহি করে।

'দেখুন, সব অদৃষ্ট।' আপোষের স্বরে বললে প্রভাংশু, 'অদৃষ্টে যদি থাকে তো হবে।'

'সেটাই তো কথা।' উৎসাহিত হল হীরালাল: 'নইলে আমি আপনি হাকিম সব নিমিত্তমাত্র। তারই জন্যে তো ভোগ চড়াচ্ছি মা-কালীর মন্দিরে। নবগ্রহের আখড়ায়। মানত করছি এখানে-সেখানে। ঢিল বাঁধছি। চেরাগ জ্বালাচ্ছি। সবরকমই করে রাখা দরকার। যেমন অ্যাকসিডেন্টের ঠাকুর আছে তেমনি আছে মামলামোকদ্দমার ঠাকুর। গভর্নমেণ্টকে কোর্ট ফি দিতে হয়, ঠাকুর-দেরও কিছু দিতে হয় ডাব-চিনি—'

'তাই দিন না যত খুশি। তাতে আর কী আপত্তি!'

আর্গুমেন্ট হয়ে গিয়েছে। সাত দিন পরে রায় বেরুবে। হীরালালও বুঝেছে হালে প্যানি নেই। কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

এসে বললে চুপিচুপি, 'দেখুন, স্লেট ড্রাইভই ঠিক করলাম।'

প্রভাংশু হাঁ হয়ে রইল।

'দেখুন, আঁচলে জিনিস থাকতে কেন গাঁচিলে খোঁজ করি!' হীরালাল কপালের ঘাম মুছল: 'ভাবছি হাকিমের বাড়িতেই সিধে ডালি পাঠিয়ে দি একটা।'

'ডালি পাঠাবেন?' প্রভাংশু আঁতকে উঠল। বললে, 'সিধে জেল হয়ে যাবে আপনার।'

'নির্দোষ ডালি মোশাই, ফ্রুটস অ্যান্ড ফ্লাওয়ার্স। এতে আর আপত্তি কী!'

'সাংঘাতিক আপত্তি। খবরদার, ওসব করতে যাবেন না। মামলা ডিসমিস হয়ে যাবে।' প্রভাংশু টিপ্পনী কাটল: 'তা ছাড়া হাকিমের নামও পুণ্যব্রত।'

কে জওলাপ্রসাদ?

'তবে একটা উপায় তো কিছু করতে হয়। বেতর্দাবিরে মামলা ভেসে যেতে দেব?' প্রায় কাঁদ-কাঁদ মুখ করল হীরালাল।

সন্ধের পর বাড়ি ফিরেছে পুণ্যব্রত। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেল দোর-গোড়ায় একটা ঝুড়ি।

'এ ঝুড়ি কে রেখে গেল?'

চাকর ছুটে এল। গিন্নি ছুটে এলেন। ছুটে এল ছেলেমেয়ের দল।

'কই, কেউ দেখিনি তো।'

আনারস তো দেখাই যাচ্ছে, তারপরে আম। আরো গভীরে দই, সন্দেশের বাক্স—ও কি, মুরগি নাকি?'

'চাপা দাও, চাপা দাও,' আর্তনাদ করে উঠল পুণ্য: 'বাইরে ফেলে দিয়ে এসো।'

বাইরে ফেললেই বা নিস্তার কোথায়? বাইরে ফেললে তো আরো জানাজানি! আরো কেলেঙ্কারি!

বাঘে ছুঁয়েছে কী আঠারো ঘা।

যখন হাত দিয়েছেন গিন্নী, আরো গভীরে যাবেন। শেষ পর্যন্ত বার করলেন একটা কার্ড। তাতে প্রেরকের নাম লেখা। প্রেরকের নাম জওলাপ্রসাদ।

কে জওলাপ্রসাদ?

পুণ্যব্রতর চট করে মনে পড়ল। আজই একটা মামলার রায় লিখছিল যার বিবাদী জওলাপ্রসাদ। হীরালাল বনাম জওলাপ্রসাদ। সেই জওলাপ্রসাদের এই কাণ্ড!

দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। ডালি দেওয়া বার করছি।

রায়টা ডিসমিসের দিকে যাচ্ছিল। পৃষ্ঠা-গুলি ছিঁড়ে ফেলল পুণ্যব্রত, পুড়িয়ে ফেলল। নতুন করে লিখল আবার রায়। ডিক্রি করে দিল।

খুশিতে ফুটতে ফুটতে ছুটতে ছুটতে হীরালাল ঢুকল প্রভাংশুর চেম্বারে।

'কেমন আপনাকে জিতিয়ে দিলাম দেখুন।' ফি-এর বাকি বলে মোটা করে দিল কিছু বকশিশ।

'আমাকে জিতিয়ে দিলেন?' অবাক মানল প্রভাংশু।

'তা ছাড়া আর কী! এর পরে তো আপিল আছে। সেখানে কী হয় কে জানে। কিন্তু আপনার তো শুধু এই কোর্টেই প্র্যাকটিস, আপনার জয়ই অক্ষয় হয়ে রইল।'

জওলাপ্রসাদ আপিল করেছে। হীরা-লালের হয়ে দাঁড়িয়েছেন সতীপতি।

ফোন এসেছে প্রভাংশুর। সতীপতি বলছেন ওপার থেকে, 'কী হে, হবে না বলছিলে না? আলবত হবে। তোমার হবে, আমার হবে, আর মক্কেলের যা হবার তাই হবে।'

। পত্রাবলী ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১৮৩ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

রাণী, তুমি ভাবচ আমার হোলো কি। আমাকে বসন্তে পেয়েচে, আলগা হয়ে গেছে সমস্ত কর্মের বন্ধন—মনটা ভেসে বেড়াচ্ছে সুরের হাওয়ায়। কিছু দিন আগে ঠিক করে বসেছিলুম আমার গানের পালা ফুরিয়ে গেছে—কিন্তু হঠাৎ দেখি দেখতে দেখতে সুরের রঙে মন ছেয়ে যাচ্ছে, কাশ্মীরে ফুলন্ত জাফ্‌রানের ক্ষেতের মতো। আমার এই জানলাটুকুর বাইরে কোথাও আর নড়নচড়ন নেই কিন্তু মনে হচ্ছে আছি কোনো একটি পঞ্চদশ শতাব্দীর পারস্যের গোলাপের বাগানে—বয়স যে সত্তরের কাছে এসে ঠেকল সে কথা মনে করিয়ে দেবার মতো পাঁজিকাখানা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ঐ দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে শালতালের বন—ওদের মতো আমার মধ্যে চিকনপাতার ঝিকিমিকি লেগে গেছে—ভদ্র সমাজে যে রবীন্দ্রনাথ অবস্থান করচেন একরাশ প্রতিপত্তি জড়ো করে, তাঁর সংগে আমার কোনো মিল পাওয়া গেল না।

আমার এই বহুযুগের বাতায়নলোক থেকে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের কলকাতা শহরে শীঘ্র যেতে হবে—বোধ হয় শনিবার সায়াহ্নে—বিশ্বভারতীর উদরান্নের সংস্থান করতে। আশা করি এই বাতায়নে আবার ফিরে আসবার পথ হারিয়ে যাবে না। কলকাতাটাকে যে কোন্‌ তফাতে মনে হচ্ছে তার ঠিকানা নেই। যাক গে। তোমার হাল ঠিকানাটা ভুলে গেছি—সংখ্যাটা ঠিক আসচে না মনে। চিঠিখানা কোনো একটা বাক্সে আছে খোঁজ করে দেখি গে। ইতি ১১ মার্চ ১৯৩১।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

॥ ১৮৪ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

আমার অন্যমনস্ক হবার বয়স হয়েচে। অর্থাৎ যদি কর্তব্যে মন দিতে না পারি, ভুলে যাই কাজ, কেউ দোষ দিতে পারবে না। এই অধিকারটি লাভ করবার গুণে আজকাল দিব্যি আলুথালু হয়ে বসে আছি। মনকে কোনো কিছুতেই তাড়া লাগাচ্চি নে। কিন্তু কথাটা ভুল হোলো, মনই তাড়া লাগায়, ঐটে ওর বিশ্রী স্বভাব,—না মানলে শাস্তি দেয়, অনুশোচনার ঠেলা মেরে। সত্তর বছর বয়সে মনকে বলবার সময় এসেচে, বাড়াবাড়ি কোরো না, ধীরে সুস্থে চলো, যথোচিত পরিমাণে ভুলতে শুরু করো, যাতে সময়ের মধ্যে অনেকটা করে ফাঁক পাওয়া যায়। বয়স যখন অল্প ছিলো তখন এইরকম ফাঁকের অভাব ছিল না—তখন যথেচ্ছাচারের ব্রজধামে বালগোপালের লীলা ছিল—মাঝখানে মথুরার পালা, কর্তব্যের রাজাসনে। আবার ফিরেচি সেই সাবেক খেলার ক্ষেত্রে—পদে পদে সব-তাতে ভুল হয়ে যাচ্চে—এমন কি বানানেও—সেটাও বালক-পনা। যোগাযোগ লেখা উচিত ছিল কিন্তু খামকা মাঝে ছবি লিখতে বসে গেলুম—মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে অমিয় হতাশ হয়ে ফিরে যায়। কি কি কাজ বাকি আছে পাছে সেটা ভুলি অমিয় তার একটা ফর্দ টেবিলের উপর বিছিয়ে রেখে গেছে। কিন্তু ফর্দটাই দেখতে ভুলি, টেবিলে এসে বসাই হয় না। এইরকম অবস্থা। গরম পড়ে গেছে অত্যন্ত এ কথাটাও মনে আসতে পারত। উঃ আঃ, পাখা কই রে, শরবত লে আও, দার্জিলিঙের টাইম্‌ টেবিলটা কোথায় ইত্যাদি, কিন্তু দেখি তাতেও মন নেই। বেলা দ্বিপ্রহর, আকাশ ঝাঁঝাঁ করচে, মাঠ ধুধু করচে, তপ্ত বালি হুহু করে উড়ে যায়, কিছুই খেয়াল হয় না। বনমালী মনে করে দরজা বন্ধ করা ভদ্র প্রথা—দিই তাকে এক ধমক—পশ্চিমের শার্সির ভিতর দিয়ে রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়ে পায়ের কাছে। বেলা চারটে যখন, কখনো কখনো কেউ কেউ এসে জিজ্ঞাসা করে চিঠি আছে, হাত উলটিয়ে দিয়ে বলি, নাঃ। ক্ষণকালের জন্য মনে হয়, হয়তো চিঠি লেখবার আছে—সেই ক্ষণকালটুকু মুহূর্তে উত্তীর্ণ হয়ে যায়, ডাকের সময়ও তার পিছনে পিছনে তিরোধান করে। এদিকে বাগানের পথপ্রান্তে বেলফুলের অট্টহাসি, টগর গন্ধরাজের পুঁজি ফুরোতে চায় না, কাঞ্চন, কুড়চি, মধু-মঞ্জরী, বনপুলক, কনকগৌরী, এরা ঘাটে জটলা-করা বধূদের মত পরস্পর সম্ভাষণে আমার কুঞ্জবনটি মাতিয়ে তুলেচে, আর কোকিল এমন করুণ ক্লান্তভাবে ডাকচে যে মনে হচ্চে যে, ডেকে কিছুই ফল হচ্চে না অথচ আশা ছাড়তেও পারচে না; যাক, এ হোলো কবিত্ব। কিন্তু তোমার শরীরের খবরটা এই বসন্তের প্রচুর প্রফুল্লতার সংগে মানাচ্চে না। হয়ত আমি ওখানে অবস্থানকালে আমার পাচক যে পথ্য রচনা করেছিল সেটা তোমার পাচনশক্তির অতীত ছিল। সেই আইস্‌ক্রীম নিয়ে একদিন স্পর্ধা প্রকাশ করেছিলুম সে কথাটাও ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়চে। তা হোক, তবুও আইস্‌ক্রীম খাইয়েছিলুম এ নিয়ে পরিতাপ করব না—মানবজন্ম বারবার পাওয়া যায় না, এমন অবস্থায় আইস্‌ক্রীম নিষিদ্ধ হলে বড়ো বিড়ম্বনা। ইন্দ্রলোকে অমৃত আছে, আইস্‌ক্রীম নেই—তা ছাড়া ইন্দ্রলোকে তোমার গতি হবে কিনা নিশ্চিত বলা যায় না—অতএব মাঝে মাঝে আইস্‌ক্রীম খেয়ে তারপরে ডাক্তার ডাকলে ক্ষতি নেই। আশ্রমের অধিবাসীরা ২৫ বৈশাখটাকে বর্জন করতে অনিচ্ছুক, অতএব সেদিনটাকে এরা মন্থন করবার আয়োজন করচে। ইতি ২৭ চৈত্র ১৩৩৭। জীবনের কথা ভুলব না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

॥ ১৮৫ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু

রাণী, নববর্ষের আশীর্বাদ উভয়কে। জীবনের কাছে তোমাদের গতবর্ষের সংবাদ পাওয়া গেল। নববর্ষে দেহযাত্রায় উন্নতি প্রত্যাশা করি। আহার সম্বন্ধে লোভ সংবরণ কোরো, পল্লীপরিভ্রমণে বিরত হয়ো, আইস্‌ক্রীম যদিও খাও তার থেকে ডিমটা বাদ দিও এবং ক্রীমটাও, তা ছাড়া আইস্‌টাও বর্জন করে বাকিটুকু যদি উপভোগ করো—অবশ্য অতি অল্প পরিমাণে, তা হলে খুব বেশী ক্ষতি হবে না। ওতে আধ চামচ পিপুল গুঁড়ো মেশাতে পারলে পরিপাকের আনুকূল্য হবে।

একটা কাজের কথা বলি। আকস্মিক মতিভ্রংশের শোচনীয়

অবস্থায় আমার সেই চিত্রবিচিত্রিত খাতাখানি করুণার হাতে দিয়েছিলুম। তার পর থেকে অনুশোচনায় দিন কাটচে। আমার স্বপ্রদেশীয়দের সম্বন্ধে আমার খুব বেশী শ্রদ্ধা নেই—আমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধাও সেই অনুপাতে। খাতাখানা অবিলম্বে উদ্ধার করবার প্রয়োজন আছে। ওর মধ্যে আমার অনেকগুলো ছোটো ছোটো ইংরেজী কাব্যিকা আছে। নূতন সংস্করণ গ্রন্থাবলীর জন্য ম্যাকমিলান সেগুলি সংগ্রহ করে অনতিবিলম্বে পাঠাতে বলেচে। খাতাটা তার স্বত্বাধিকারীকে ফেরত দেবার সুব্যবস্থা তুমি ছাড়া আর কারো দ্বারা হতেই পারবে না; তোমার স্তুতি তোমার মুখের উপরেই করলুম বলে কথাটার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহ কোরো না। তোমার অনেক গুণ আছে, প্রয়োজন হলেই সেগুলো আমি ঘোষণা করতে ত্রুটি করি নে—এমন কি তোমাকে কখনও বুদ্ধিমতী বলতেও মুখে বাধে না, আশা করি ক্ষমা করবে। মোদ্দা কথা, খাতাটা অতি শীঘ্র চাই।

খুস্কির জর্মান ওষুধ পাঠাই—অতি অল্প পরিমাণ চুলের গোড়ায় ঘষে দিও, দুই-চারবার দিলেই আর দরকার হবে না। ইতি ১ বৈশাখ ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ

॥ ১৮৬ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

হঠাৎ এক সময়ে অকারণে, মনে হোলো কাজটা ভালো হয় নি। আমাদের দেশে মন্দাক্রান্তা ছন্দে কাজের ধারা কি রকম চলে সেই দুশ্চিন্তাটা ফস্ করে এসে পড়ল মনের মধ্যে—সন্ধ্যাপ্রদীপের উপরে উচ্চিংড়ে যেমন অকস্মাৎ কোথা থেকে এসে লাফিয়ে পড়ে ধড়ফড় করতে থাকে, কতকটা সেইরকম। কল্পনায় দেখতে পেলুম ছ মাস যায় ন মাস যায় খাতাটা আর ফেরেই না। ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল ম্যাক্‌মিলানের উপরোধ। সেটা মনে আসতোই না যদি না এই বাধাটা ঘটত। এই অবস্থায় চিন্তা করতে লাগলুম বিঘ্নসমুদ্র পার হয়ে খাতা উদ্ধার করব কার সাহায্যে। শ্রীরামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্যে একদা এই-রকম উৎকণ্ঠার সঙ্গেই সহায় সন্ধান করেছিলেন। বরাহপুরীর নারিকেলবনবাসিনী তোমারই নামটা সর্বাগ্রে মনে এল। যখন তুমি ভার নিয়েছ তখন সময়ের জন্যে তাগিদ আমার মনে রইল না। ওটা প্রত্যাহরণের একটা সেতু নির্মিত হয়েচে বলেই এখন নিশ্চিন্ত রয়েছি। বস্তুত আমি তোমাকে লিখতে যাচ্ছিলাম ২৫শে বৈশাখের কোনো যাত্রীর হাতে ওটা যদি জিম্মে করে দাও তা হলে ওটা অক্ষত অবস্থায় আমার হাতে এসে পৌঁছতে পারবে। এই পরামর্শটাই ভালো।

এখন বেলা আড়াইটা। বিছানা থেকে উঠে এসে বসেচি। গায়ে একটা রক্তবর্ণের রেশমের উত্তরচ্ছদ। শশীভূষণ ভিলায় যদি এটা ব্যবহার করতুম তা হলে মনে হোতো সর্বাঙ্গে বৈশাখের জলসত্র বসানো হয়েচে কিন্তু এখানে এটা আগাগোড়া নীরস রয়েচে। যদি উপযুক্ত উপমা দিতে হয় তবে বলা যায় যে, সেটা হতো উড়িষ্যার প্লাবন, আর এটা হচ্চে তারি স্ট্যাটিস্টিক্‌স্। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩৩৮।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার উপদেশমতো পথ্য করচ কিনা লিখো। আমরা এখানে আইসক্রীম খাচ্চি তুমি যদি সেই কথাটা স্মরণ করে সেই স্মৃতির সঙ্গে পিপুলের গুঁড়ো ও কাঁচা পেঁপের আটা মিশিয়ে সেবন করো তা হলে অজীর্ণের সম্ভাবনা থাকবে না।

॥ ১৮৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

অতিমাত্রা কিছু ভাল নয়। যাঁরা অনুষ্টুভ ছন্দে সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক লিখতেন তাঁরা বলে গেছেন সর্বসত্যন্ত গর্হিতং। মেয়েরা বড়ো অতিমাত্রিক—তারা তাল মানে না, কেবল সুর চড়ায়। ফীলিং পদার্থটার ঐ বিপদ, নিজের আতিশয্যে সে যেন মেতে ওঠে। দেখো না, মেয়েরা যখন শোক করতে বসে পাড়ার লোকের নিদ্রা থাকে না। টেম্পেরেচার আটানব্বইয়ের উপর চার ফোঁটা উঠলে সেই সংবাদে কোনো ভদ্র পুরুষ দাপাদাপি করে না—কিন্তু ভদ্রমহিলাদের স্বভাব অন্যরকম। তাই জীবনকে বলেছিলুম সংসারে স্ত্রীকণ্ঠের কলরব বৃদ্ধি কোরো না। ভুলে গিয়েছিলুম এখানেও স্ত্রীকণ্ঠ বিরল নয়। একদা কুক্ষণে প্রাতঃকালে তাপমান যন্ত্রে আমার দেহতাপ সাড়ে সাতানব্বই অঙ্কে এসে দাঁড়িয়েছিল—বান্ধবীদের চোখে যখন পড়ল তাঁরা কেউ বললেন না এইটেই সাবনর্মাল। পাছে আটানব্বইয়ে পারদ সাক্ষী অঙ্গুলি নির্দেশ করলে হাহুতাশ করবার আনন্দ থেকে তাঁরা বঞ্চিত হন। সেই অবধি আটানব্বই অঙ্কের কথাটা কেবলি গোপন করে যাচ্চি। নাড়ি যখন ছাড়বে তখন নর্মাল তাপে পৌঁছব, সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করচি। ইতিমধ্যে তাপমান যন্ত্রটাকে বিদায়। তুমি তীব্র সনুচ্চসুরে যে কটা পরামর্শ দিয়েচ কোনোটাই দুঃসাধ্য নয়—হয় দার্জিলিং নয় কালিম্পং, নয় আবু, নয় শিলং, নয় কুনুর, নয় কেড়োই কানাল, নয় য়ুরোপ—বোধ হয় অল্প কিছুক্ষণ চিন্তা করলে আমার বুদ্ধিতেও আসত। পরামর্শটা স্মরণপটে মুদ্রিত রইল—দেহতাপের উচ্চতা যখন ৯৯ পর্যন্ত চড়বে তখন পৃথিবীতে যতরকম ভৌগোলিক উচ্চতা আছে সমস্ত চিন্তা করে দেখব—এখনকার মতো শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ইতি ১২ বৈশাখ ১৩৩৮।

৯৮ তাপতপ্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবির এই সময়ে রোজ বিকেলের দিকে অল্প একটু করে জ্বর হচ্ছিল। সে জন্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলাম বলে এই পরিহাস।

॥ ১৮৮ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণী, একটা খবর শুনে অত্যন্ত মুখর হয়ে উঠবে বলে আশঙ্কা করচি কিন্তু গোপন করা উচিত নয়। দেহতাপ ৯৮ ডিগ্রিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। ভাবচি কুইনীন খাব এবং কম্বল মুড়ি দিয়ে অজস্র ঘামব যে পর্যন্ত না ৯৫তে নামে। কিন্তু তার পূর্বে আর একটা কর্তব্য আছে। সেটা বিস্তারিত করে বলি। পারস্যরাজের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ এসেছে, গ্রহণও করেচি। তাঁদের ইচ্ছা, যাতে অবিলম্বে যাওয়া হয়। কারণ এখন সেখানে রমণীয় বসন্তকাল—বুলবুল ও গোলাপের উৎসব—রাজদূতেরা আমাকে বহন করে নিয়ে যাবার সমস্ত ব্যবস্থা করবেন। পাছে দশের পরামর্শে মতান্তর ঘটে এই জন্যে তাড়াতাড়ি স্বীকার করেচি।

আমার প্রকৃতিতে ভারি একটা দৈধ আছে, ঠিক এই পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতিরই মতো। একদিকে আমার একান্ত ইচ্ছা, কোনো ছায়াময় আমবাগানে বই নিয়ে

লেখা নিয়ে গান নিয়ে দিনগুলি অত্যন্ত সহজে কাটাই—গঙ্গার ধারে দাক্ষিণের হাওয়ায় ঘুঘুর ডাকে ঝাউশাখার মর্মরে। আবার আর একদিকে বাইরের জগতের টান সেও সামলাতে পারিনে। বাংলাদেশের মানুষটির সঙ্গে বিশ্বপৃথিবীর মানুষের দ্বন্দ্ব কিছুতেই আর ঘুচল না। যেমনি নারকেলগাছতলায় মাদুর পেতে বসি, শাখার আড়াল থেকে সন্ধ্যাতারাটি দেখা দেয় অমনি ডংকা বেজে ওঠে, সমুদ্রের ঘাটে খেয়াতরী চঞ্চল—ট্রাঙ্ক বের করো, কাপড়ের ছেঁড়া বোতামগুলো সেলাই করাও, ঠাসাঠুসি করে দরকারী অদরকারী জিনিসের পিণ্ড পাকাও, চলো হাওড়া স্টেশনে, তারপর সোজা দৌড়। ঠাণ্ডা হয়ে বসে আরাম করবার মতো সুযোগ এ জন্মে ঘটল না। অথচ আমি জনতাকে ভয় করি, খ্যাতির আলোড়ন আমাকে একান্ত ক্লান্ত করে। যতবার মনে করি এইবার শেষ, আর নয় ততবারই সমুদ্রমুখী ঢেউ ডাঙ্গার দিক থেকে টেনে নিয়ে যায়। এবারে স্থির করেছিলুম একেবারে নেপথ্যে অন্তর্ধান করব কিন্তু প্রথম দফাতেই এলো ভিক্ষের তাগিদ—শান্তিনিকেতনের তহবিল শূন্য—রাজাদের দ্বারে ঝুলি ফেরাবার মতলব করচি হেন কালে পারস্যের নিমন্ত্রণ। আর কতদিনই বা আয়ু আছে, কবেই বা কয়েকটা দিনের জন্যে একটু স্থির হয়ে বসে সর্বদায়মুক্তভাবে আরাম করে নেব? নালিশ করে কোন লাভ নেই—নিজের মধ্যেই আছে বিরোধের কেন্দ্র, মুশকিলের আড্ডা। আমার স্বভাবে এপিঠে ওপিঠে মিলল না। অতএব চললুম পারস্যের অভিমুখে, ৯৮ ডিগ্রী তাপে তপ্ত দেহ নিয়ে। তৎপূর্বে জন্মোৎসবের একটা হাঙ্গামা আছে—মৃত্যুর পূর্বে এটাকে কাটাবার জো নেই। যাঁরা উৎসব করতে কৃতসংকল্প তাঁদেরই দুঃখের কথা স্মরণ করে আমার বাঁচবার উৎসাহ একেবারে দূর হয়ে যায়। স্টেশনে আত্মীয়রা বিদায় দিতে আসে, গাড়ি কিছুতেই নড়ে না, পাঁচ মিনিট পঞ্চাশ মিনিট মনে হয়, আমার সেই দশা—ফি বারে মনে করি এইবার শেষ জন্মদিন তারপরে দেখি আবার দিন আসে। বন্ধুদের কাছে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়। ইতি ১৮ বৈশাখ ১৩৩৮।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পারস্য যাবার প্রস্তাবটা শুনেই ডাক্তাররা কবিকে ভাল করে পরীক্ষা করে সেবারে যাওয়া বন্ধ করেন।

॥ ১৮৯ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রাণী, পরে পরে দু দিন তোমাকে দুখানি চিঠি লিখেছি এমন সময় আজ সকালে হঠাৎ চমকে উঠে মনে পড়ল ২০২ নম্বর না দিয়ে ১০৪ নম্বরে তোমার চিঠি রওনা করেচি। যদিও শশিভূষণ ভিলা লিখতে ভুলিনি। আমাদের দেশের ডাকঘর এই ত্রুটিটুকু অতিক্রম করে ঠিক জায়গায় চিঠি পৌঁছিয়ে দেবে এমন আশা করিনে এবং যে ভুল লোকের হাতে চিঠি পড়বে সেও যে পথভ্রান্ত চিঠির সদ্গতি করবার চেষ্টামাত্র করবে এমন আশাও নেই, অতএব মনে মনে সে দুটি চিঠির অন্তিম সৎকার করে মনকে শান্ত করাই শ্রেয়। আমার চিঠির ঠিকানাগুলি সমস্তই অমিয়র হাত দিয়ে যায়, তার সতর্কতার উপর একান্ত বিশ্বাস রাখি বলেই অনবধানতা করতে কিছুই বাধা পাই নে, এমনি করে অভ্যাস খারাপ হয়ে যায়, এর ফল ইতিপূর্বে বোধ হয় আরো অনেকবার ভুগতে হয়েছে, সেটা ধরা পড়েনি। কুঁড়ে মানুষের মেহনতের দাম বেশী, সেইজন্যেই মনে আক্ষেপ জন্মায়, নইলে দুই একখানি চিঠি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে সেটাতে অত্যন্ত ক্ষতি বলে কল্পনা করা অহঙ্কার। —আমার দেহতাপ ৯৮ ডিগ্রীতেই লগ্ন হয়ে আছে এ ছাড়া আরও একটা সংবাদ এর মধ্যে প্রধান হয়ে উঠেচে। পারস্যরাজের কাছ থেকে হঠাৎ আমি নিমন্ত্রণ পেয়েছি—তখনই সে নিমন্ত্রণ স্বীকার করেও নিয়েছি। দুই একটা শেষ ডীটেল আছে, তারই মীমাংসা হলেই দৌড় দিতে হবে। বিলম্ব করা হবে না কারণ এই সময়টাই পারস্যের রাজধানী তিহিরানে সকলের চেয়ে অনুকূল সময়। এখন সেখানে বসন্ত, এবং সেখানকার বসন্তে টেম্পেরেচারের প্রখরতা নেই। বোধ হচ্চে জন্মোৎসবের উপদ্রব চুকলেই যাত্রা করে বেরতে হবে। এখান থেকে বোম্বাইটা আরামজনক পথ নয়—স্থির করচি রাত্রিযোগে যাব, দিনের বেলায় যাত্রা ভঙ্গ করা যাবে। —ইতিমধ্যে আরও একটা কৃত্য আছে। ২৬শে বৈশাখ নটুর সঙ্গে সুরেন করের বিবাহ। সেইটে শেষ হলে আমার ছুটি। এই বিবাহে তোমার বিবাহের মতোই বাধা বিস্তর, সমাজধর্মের সঙ্গে মানবধর্মের লড়াই। লড়াইটা চালাতে হচ্চে প্রধানত আমাকেই। বিধিবিধান কীরকম হবে তা নিয়ে তর্ক কিছু না কিছু বাকি থেকে যাচ্চে। মানুষকে এতও কৃত্রিম জঞ্জাল ঠেলতে হয়, তা নিয়ে এত সময় ও শক্তির অপব্যয় ঘটে।

আমার সামনে জন্মদিন বলে একটা কাণ্ড আছে। এড়িয়ে পালাতুম কিন্তু যাঁরা এর উদ্যোগকর্তা তাঁদের অকৃত্রিম মমত্বকে উপেক্ষা করতে পারিনে। আমি বিশেষভাবে এঁদের আপন এই আনন্দটিকে বিশেষভাবে প্রকাশ করবার জন্যেই এঁদের এত আয়োজন—এর মধ্যে ক্ষতিও আছে, তাপও আছে, শ্রমও আছে, চিন্তাও আছে—সুতরাং আমার জন্মদিনকে এঁরা মূল্যবান করে তুলেছেন, আমার পক্ষে নিতান্তই স্পর্ধা হবে যদি একে অস্বীকার করি।

দিনের মধ্যাহ্নে এখানে গ্রীষ্ম ঋতু, সন্ধ্যা থেকে বসন্তকাল, দুঃখ বোধ হয় না। দিনরাত পাখা চালাবার একটা যন্ত্র আনিয়েছিলুম আজ পর্যন্ত একদিনও ব্যবহার করিনি। তোমার ওখানে শশিভূষণ ভিলা আমার এখানে রবিভূষণ ভিলা, কিন্তু তপ্ত প্রহরের দৈর্ঘ্য এখানে অপেক্ষাকৃত অল্প বলেই মনে করি। সায়াহ্ন থেকে বেলা প্রায় ১১টা পর্যন্ত বাতাস সুখস্পর্শ। কিছু কিছু ছবি এঁকেছি—কিছু কিছু কাব্যও চলে অত্রসহ তার প্রমাণ পাঠাই। ইতি ২০ বৈশাখ ১৩৩৮

তোমাদের **শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

রূপময় ভারত
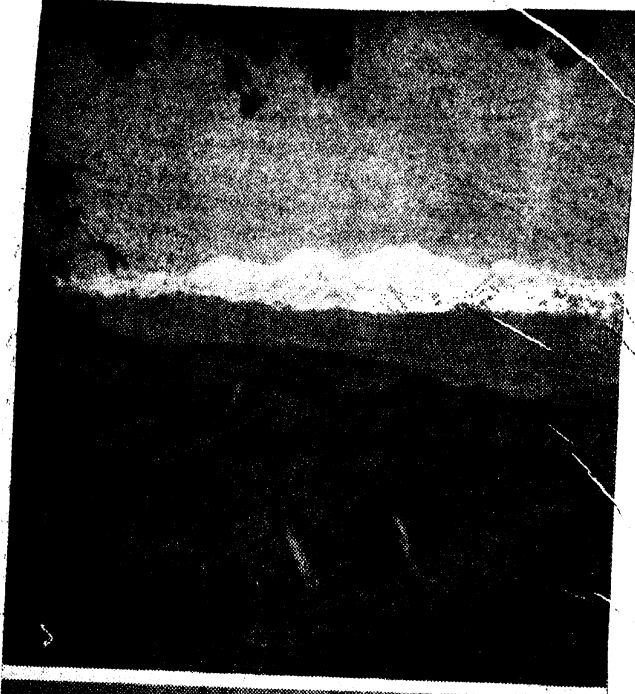
পশ্চিম বঙ্গের শৈল-শহর দার্জিলিঙ্ আজ ভারতের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান। সাত হাজার ফিট উর্ধ্বে প্রকৃতির সৌন্দর্যে মণ্ডিত এই শহর একদিকে লেপ্চা, ভুটিয়া, তিব্বতী ও নেপালী-দের সমাবেশকেন্দ্র হয়ে আছে, অন্যদিকে —নয়নমুগ্ধকর রূপ নিয়ে শুভ্রতুষার মুকুটে সজ্জিত কাঞ্চনজঙ্ঘা। (১) দার্জিলিঙ শহর থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ; (২) তুষারাবৃত পাহাড় পরিবেষ্টিত দার্জিলিঙ, (৩) দীপাবলীর মালায় সজ্জিত, (৪) স্থানীয় অধিবাসীদের পবিত্র মন্দির—ধীরধাম, (৫) রাজভবন, (৬) শহরের ঘনবসতিস্থল, (৭) ফল-সব্জি নিয়ে বাজারের পথে, (৮) বাজারে ফল-সব্জি বিক্রয়।

আলোকচিত্রশিল্পী

নীরোদ রায়

৩
৪
৫
৬
৭
৮

ট্রামেবাসে
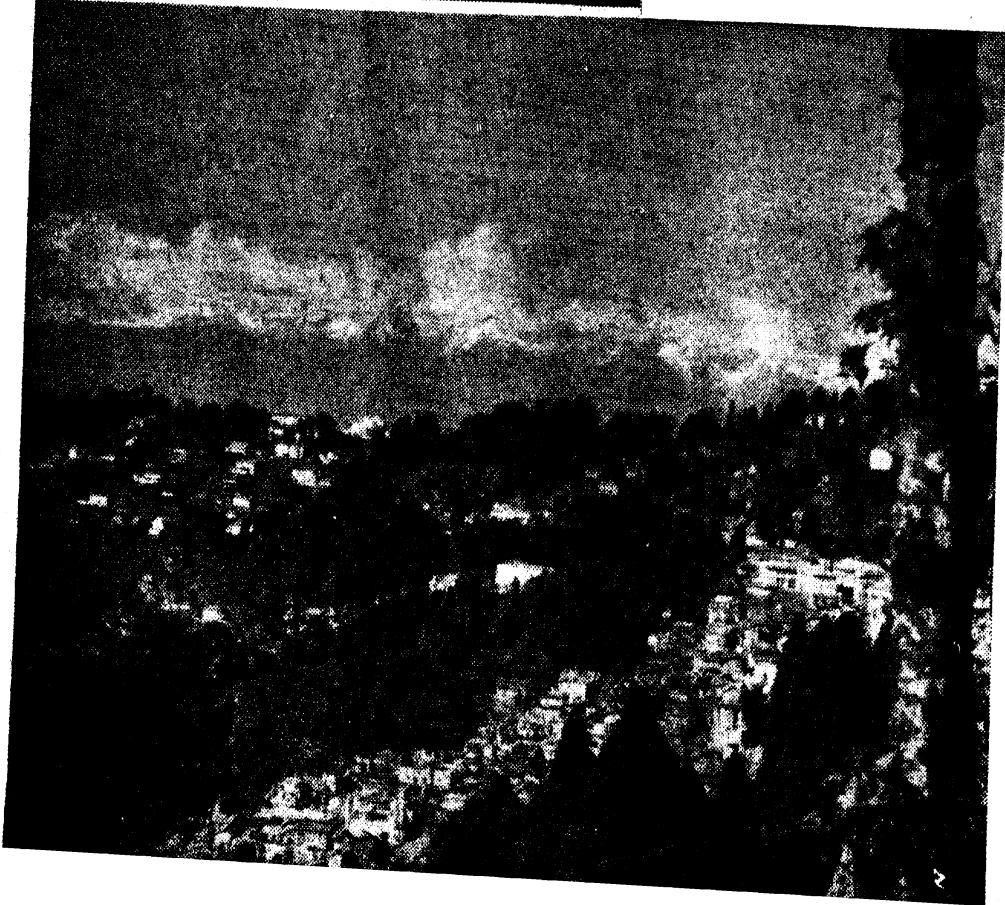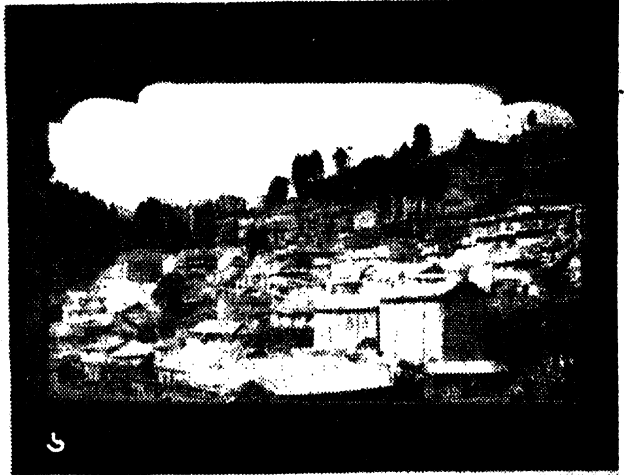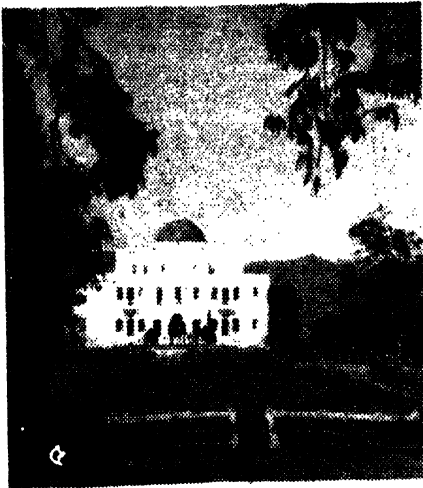
কানপুর হইতে প্রেরিত সংবাদে বলা হইয়াছে—শোনা যায় শহরে মুসলিম লীগের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আশা করি, পুনর্জীবন লাভ

খোদার কুদরতেই সম্ভব হয়েছে, রাম-রাজ্যেরই হনুমানরা নিশ্চয়ই গন্ধমাদন সমেত বিশল্যকরণী এনে দেননি!!"

তৃতীয় যোজনায় শিক্ষাখাতের ৫৭০ কোটি টাকার মধ্যে ১৭৫ কোটি টাকা মেয়েদের শিক্ষার ব্যয়বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। —"নিশ্চয়ই আনন্দের কথা। কিন্তু এতগুলি টাকা লাগবে কি? আমরা যে শুনে আসছি, কিঞ্চিৎ লিখনং বিবাহের কারণং!"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

পুলিস কমিশনার শ্রীউপানন্দ মুখার্জি মহাশয়ের আদেশে লালবাজার থানা এলাকার "রাম ক্যানটিন"টি উঠিয়া যাইতেছে। —"ভালোই হবে। কিন্তু কথা হলো, রাম ক্যানটিনের অভাবে পুলিসের মুখের লাল জেল্লা যে একদম উবে যাবে।" —বলেন জনৈক সহযাত্রী।

রাজভবনে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীদের শয়নকক্ষ শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"কলকাতা উন্নয়নের প্রথম ধাপ!"

এক সংবাদে শুনিলাম, বিশ্বের সকল জীবজন্তুর শ্রেণীবিভাগের কাজ শেষ করিতে বিজ্ঞানীদের আরও আট শত বৎসর লাগিবে। —"কীটপতঙ্গ জন্তু-জানোয়ার সবারই শ্রেণীবিভাগ হবে, কিন্তু হবে না বোধ হয় মানুষের: —হায়েনার হাসি, কুমীরের কান্না, গণ্ডারের চামড়া, বাদুড়ের দলনীতি নিয়ে এই যে বিচিত্র জীব পৃথিবীতে বিচরণ করছে—তার যথার্থ শ্রেণীবিভাগ তো আমাদের সাধারণের চোখে অসম্ভব বলেই মনে হয়"—মন্তব্য করেন খুড়ো।

কোন একটি মহিলা পত্রিকায় শ্রীমতী অ্যানে নামে একটি বিলাতের তরুণী এক প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, নারীরা পুরুষের চেয়ে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। তিনি শ্রেষ্ঠতার যে-সব কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি হইল—মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অধিক কষ্টসহিষ্ণু। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"হয়ত তাই। কিন্তু ট্রামে-বাসে যাতায়াতের বেলা মনে হয় এ'রা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছো যান, গাড়িতে ঢুকতে-না-ঢুকতেই লেডীস সীট ছেড়ে দিতে হয়, একটু দাঁড়ালে পা বুঝি ঝিনঝিন করে!"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি মাত্র রকেটের সাহায্যে তিনটি উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"ত্রিদোষ ক্ষেত্র না হলে আসর জমবে কী করে!"

জনৈক ইতালীয় বিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে, বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক ঝড় আসন্ন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন

—"সমাসন্ন মানবিক ঝড়ের দিন গুনে গুনে দিন কাটছে, মোরা কি ডরাই সখি, সামুদ্রিক ঝড়ে।"

নিকিতা ক্রুশ্চফ মাও-সে-তুঙের বিরুদ্ধে আনুগত্যের অভাবের অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—
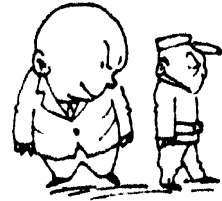
"চায়না সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার জন্যে একটি ইংরেজী প্রবাদ আছে। বড্ড ঠুনকো কিনা!!"

অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত পঙ্কজ গুপ্ত। অনেক বৎসর সভাপতিত্বের পর তাঁর এই প্রথম সহ-সভাপতিত্ব। শ্রীগুপ্ত এই নির্বাচনের পর বলিয়াছেন যে, তিনি যে-কোন পদে আসীন থাকিয়াই ফুটবল পরিচালনার কাজ করিতে রাজী। "কিন্তু ধরুন যদি এমন নিয়ম হয় যে, সহ-সভাপতি আর এখন থেকে খেলা দেখার কমপ্লিমেণ্টারি টিকিট পাবেন না, তাতেও কি তিনি রাজি? প্রশ্ন করেন জনৈক ক্রীড়ামোদী।

অযাত্রায় জয়যাত্রা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১৫)

মুশকিলে পড়েছি গাড়ি লেট। কখন বা দেয় ছেড়ে। এদিকে ক্ষিধেয় যেন নাড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে আসছে। সেই কোন্ সকালে এক মুঠো ভাত মুখে দিয়ে বেরুনো গেছে তো।

এখানে ইঞ্জিন বদলায়। ভারি ইঞ্জিন, যেটা এতক্ষণ টেনে নিয়ে এল গাড়িটাকে সেটা তো আর এগুতে পারবে না, মাইল দু-তিন গিয়েই বালির চড়ার ওপর দিয়ে লাইন।

গাড়িতে সামনের দিক দিয়ে একটা ধাক্কা লাগল; হালকা ইঞ্জিনটা এসে জুড়ল। চঞ্চল হয়ে উঠেছি।

মনে হলো যেন গার্ড সাহেব যাচ্ছেন সামনে দিয়ে। এই গাড়িরই কি? একটু ধোঁকা হওয়ার কারণ আছে। একটা গাড়ি, লেট যাচ্ছে, ছাড়বার জন্যে তোড়জোড় সব ঠিক, তার গার্ডের যেমন একটু ক্ষিপ্রতা আশা করা যায়, অন্তত ইংরাজের আমল থেকে যেমন আমরা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, সেরকম কিছুই নয়। ভদ্রলোকের বয়সও হয়েছে। একটু ঝুঁকে চিন্তিতভাবে আস্তে আস্তে ইঞ্জিনের দিক থেকে নিজের গাড়ির দিকে চলেছেন। অবশ্য যদি হনই গার্ড। যাই হোক, সন্দেহ থাকলেও একটু এগিয়ে গিয়ে ডাকলাম—"এ জনাব, জরা শুনিয়ে তো।"

দাঁড়িয়ে পড়ে একবার ঘাড় ফিরিয়ে আমার মুখের দিকে চাইলেন; একটু যেন দেখে নেওয়ার ভাব, তারপর ভালো করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন—"জনাব নয়, বাঙালী, কি বলবেন বলুন।"

গম্ভীর একটু যেন বিরক্তও। একটু খোশামোদের হাসি হেসে বললাম—"বাঃ, বেশ ভালোই হলো। জিগ্যেস করছিলুম, গাড়ি ছাড়তে আর কতটা সময় আছে।"

"একেবারে নেই। থাকা উচিত নয়।"

উত্তরের ভাবটা দেখে একটু ধাঁধায়ই পড়ে যেতে হলো। আমতা আমতা করে বললাম—"ওঃ! থাক, তা হলে আর হলো না। মিছিমিছি আপনাকে দাঁড় করালাম, মাফ করবেন।"

দু পা এগিয়ে এসে বললেন—"মাফ করবার কোন কথা নয়; যা অবস্থা দাঁড় করিয়েছে তাই বললাম। সময় দরকার আপনার? তা কতটা? দশ মিনিট—আধ ঘণ্টা?"

ডান হাতে একটা ঝোঁক দিয়ে বললেন—"এক ঘণ্টা?"

"আপনি এই গাড়ির গার্ড তো?" একটু কুণ্ঠিতভাবে করতেই হলো প্রশ্নটা। কথাবার্তার ভাবে যায় না একটু সন্দেহ ধরে?

"এবং এই গাড়িরই ইঞ্জিন থেকে আসছি। তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়েছিলাম; ল্যাজ মুখে করে ফিরে আসছি।"

"ব্যাপারখানা কি? ছাড়বে না গাড়ি আজ?"

"ভগবানও বলতে পারেন না। একমাত্র পারেন বেহাই ...."

অপলক হয়ে চেয়ে থাকতে দেখে আর এক পা এগিয়ে এসে আমার বুকের মাঝখানে চারটে আঙুল চেপে প্রশ্ন করলেন—"মশায়, আপনিও বাঙালী আমিও বাঙালী, বয়সও হয়েছে আপনার, এমন কাণ্ড কখনও দেখেছেন? যদি জিগ্যেস করেন—আপনারও তো বয়েস

হয়েছে, আপনি দেখেছেন কি না, তো—মিথ্যে কথা তো বলতে পারব না, দেখেছি, ঢের দেখেছি, দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে, না মরি তো আরও কিছুদিন দেখতে হবে; এখনও পাঁচ বছর......"

"ব্যাপারখানা কি?" অধৈর্যই হয়ে পড়েছি। প্রশ্নটা অবশ্য মন যুগিয়ে একটু হেসেই করবার চেষ্টা করলাম।

"কি নয়, তাই বরং জিগ্যেস করুন। দু ঘণ্টা লেট যাচ্ছে গাড়ি (বুক পকেট থেকে পুরনো আমলের একটা বড় ঘড়ি বের করে দেখে নিয়ে)—এখন ঠিক দু' ঘণ্টা সাত মিনিট। লাইন ক্লিয়ার লিখিয়ে-টিখিয়ে নিজের হাতে করে গাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ইঞ্জিনটি এসে জুড়বে, হুইসিল দিয়ে স্টার্ট করিয়ে দেব। এলেনও ইঞ্জিন, কাপলিং (Coupling) লাগানোও হলো, লাইন ক্লিয়ার তুলে দিয়েছি ড্রাইভার সাহেবের হাতে, উনি উদিকে হুইসিলের তারে হাত দিয়েছেন, টানতে যাবেন, এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে একটা বছর দশ-বারোর ছোকরা এসে হাজির। নীল হাফপ্যাণ্ট পরা, গায়ে একটা গেঞ্জি—পরিত্রাহি ছুটে এসেছে, মুখটা রাঙা হয়ে গেছে, কথা বেরুচ্ছে না মুখে..."

কী মনে হতে প্রশ্ন করলাম—"অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান?"

"কোথায় আছেন আপনি স্যার?"—ভ্রূ দুটো যতটা সম্ভব কুঁচকে নিয়ে প্রশ্ন করলেন গার্ড সাহেব—"অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ও বালাই আছে—বেহাই? তা হলে অমন ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করতে পারত? ছেলে বেরিয়ে গেল, এদিক থেকে মেয়ে বেরিয়ে এল, হাত ধরাধরি করে মাঠে-ঘাটে, যেখানে সুবিধে পেলে লভ্ করলে, গির্জেয় গিয়ে বিয়ে করলে, ল্যাঠা চুকে গেল; বাপ-ব্যাটারা নিজের নিজের ধান্ধা নিয়ে থাকে। কে তাদের পুঁছছে মশাই? ও ঝঞ্ঝাট ওরা এর মধ্যে আনে? আচ্ছা এই তো—কনের ইংরিজী বলুন।"

গার্ড সাহেবই সংগে, নিশ্চিন্ত আছি গাড়ির সম্বন্ধে, তবু ধৈর্য ধরে রাখাও তো শক্ত। তাগাদা দিলেন—"বলুন না দাদা।"

বললাম—"ব্রাইড।"

"বর?"

"ব্রাইডগ্রুম।"

"স্বামী?"

"হাসব্যাণ্ড্।"

"স্ত্রী?"

"ওয়াইফ।"

"বেহাই?"

"ব্রাইডগ্রুমস......" উদ্দেশ্যটা বুঝে একটু থতমত খেয়েই আরম্ভ করেছি, উনি বাধা দিয়ে বললেন—"ব্রাইডগ্রুমস ফাদার এই তো বলবেন? কিন্তু কেন মশাই এ অবিচার? এক কথায় বলতে হবে। ব্রাইডগ্রুমস ফাদার—সে তো ব্রাইডের শ্বশুরেও, এদিকে তাদের ভাই-বোনেদের তাউই মশায়ও। তাকে ছেঁটে-ছুটে শুধু যে বেহাইটিই করে রাখবেন—কী অধিকারটা আপনার? ......বলুন।"

"হ্যাঁ, তা তো দেখছি।" —মাথা চুলকে বললাম।

"পথে আসুন। তা হলেই দাঁড়াচ্ছে—ও বালাই নেই বলেই তার ভাষাও নেই। আমি আরও সোজা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, দূরেও যেতে হবে না। এই যে ইঞ্জিনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার বাংলাটা কি? বলুন। ......বলুন না।"

সাবধানেই এগুচ্ছিলাম, হাত নেড়ে বললেন—"গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার...... হলো না, ও হলো না! বুঝেছি, বলবেন গাড়ি টেনে নিয়ে যাওয়ার বাষ্পীয় কল। আজ্ঞে না, মানব কেন? এক কথায় বলতে হবে। পারবেন না, রাষ্ট্রীয় ভাষা পর্যন্ত সাহস করেনি—গলায় বাঁধবার টাইকে 'কণ্ঠ-লঙ্গোটি' করেছে। আস্পদ্দাটা দেখুন, লঙ্গোটি কোথাকার জিনিস, তাকে টেনে গলায় তুলেছে! কিন্তু এ বাছাধনকে ঘাঁটাবার চেষ্টা করেনি, যে ইঞ্জিন, সেই ইঞ্জিনই চলছে এখনও। কি প্রমাণ হয় বলুন না এ থেকে?"

বললাম—"জিনিসটা ছিল না আমাদের দেশে।"

"হলো তো? 'বেহাই'-ও তাই। ওদের ও হ্যাঙ্গামটাই নেই; কথা কোথা থেকে আসবে বলুন। ......আর থাকলে কখনও এত বড় রাজ্যটা শাসন করতে পারত মশায়? বেহাই-বেহাইনের হেফাজত নিয়ে পড়ে থাকতে হতো।"

তক্তাটা পরিষ্কার করে দিয়ে মুখের দিকে একটু হাসি নিয়ে চেয়ে রইলেন। মনে করিয়ে দিলাম—"একটা ছোকরা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে দাঁড়াল।"

"বাবুজী, সমুধি আইল বাড়ন!" চোখ বড় বড় করে বললেন উনি—"সমুধি মানে হচ্ছে বেহাই, স্যার। বাবার বেহাই এসেছে—ভাই কিংবা বোনের শ্বশুর আর কি, খবর দিতে এসেছে বাপকে। প্রায় টেনে দিয়েছিল হুইসিলের তারটা, হাতটা সরিয়ে নিলে যেন ইলেকট্রিকের শক্ লেগেছে মশায়, এই গঙ্গামুখো দাঁড়িয়ে রয়েছি, একটুও বাড়িয়ে বলছি না আপনাকে। ছেড়ে দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইল। জানি তো ব্যাপারটা কি, এই করছি সেই কোম্পানীর আমল থেকে। বললুম—'না ড্রাইভার সায়েব, দু' ঘণ্টা লেট—স্টীমারের সঙ্গে কনেকশন, কোনমতেই আর আমি দেরি করতে পারিনে।' নেমে এসে হাতটা চেপে ধরলে—পাঁচ মিনিট, ঠিক পাঁচ মিনিটই গার্ড সায়েব। দুটো খাতিরের কথা বলেই চলে আসছি। ...কোন-মতেই রাজী হব না, শেষে হাত ছেড়ে দাড়ি—'বেইজ্জত হয়ে যাব গার্ড সায়েব।' গাড়ি লেট আছেই, আরও নয় পাঁচ মিনিট। ......মর গে যা—বলে এই হাল ছেড়ে দিয়ে চলে আসছি। কি কাজ আপনার?"

"যেতে দিলেন আপনি?" নিজের কথা ভুলেই বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলাম।

"দিন! যেতে দেওয়ার মালিক যেন আমি! ও যাবেই, আবহমান কাল থেকে এইরকম গিয়ে আসছে। আজ না-হয় কড়াক্কড়ি, কিন্তু অভ্যেসটা তো যাবার নয়। আর এই নিয়ে গার্ড-ড্রাইভারে তো একটা কেলেঙ্কারি করা চলে না। পাবলিক রয়েছে হাঁ করে; ওদিকে কাগজ-ওয়ালারা রয়েছে, তারপর কাউন্সিল রয়েছে। ঘরের কেচ্ছা কে বের করতে চায় তা বলুন?"

"কিন্তু দেখলেই তো পাবলিক।"

"গাড়িতে ইঞ্জিন জুড়ে গেছে, লেট গাড়ি এইবার হুইসিল দিয়ে ছাড়বে, যে যার জায়গায় উঠে চেপে বসেছে। কই, দেখান প্ল্যাটফর্মে একটা লোক, এক আপনি ছাড়া।"

এমুড়ো ওমুড়ো চেয়ে নিলেন, ও'র সঙ্গে আমিও। বললেন—"এর ওপর ওদিকটা তো প্ল্যাটফর্মের শেষই, একটু অন্ধকার। তারপর ইঞ্জিনের পর একটা মালগাড়ি, তারপর ব্রেকভ্যান, তারপর তো আপনার পাবলিক। আর, তার পরেও কারচুপি নেই? এই তো আপনিও পাবলিক একজন। যান না দেখে আসুন গিয়ে, নালিশ আপনার ধোপে টেঁকবে কি টেঁকবে না, যাচাই করেই আসুন না। ......আসুনই না-হয় আমার সঙ্গে, এই তো ক' পা-ই বা।"

এগিয়েছেন আমি থামিয়ে বললাম—"থাক গিয়ে আর ফল কি? কারচুপিটা কি, না-হয় আপনার কাছেই শুনে নিই।"

"পকেট থেকে নোটবুক বের করে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে দেখবেন, ফায়ারম্যান বেটা নেমে এটা ঠুকছে, ওটা ঠুকছে, এখানে স্ক্রু কষছে, ওখানে ঢিলে করছে। জিগ্যেস করলেন ড্রাইভার কোথায়? ......ড্রাইভার লোকো শেডে গেছে মশায়—ইঞ্জিন বিগড়েছে, যন্ত্রপাতি আনতে গেছে। নিন্, কি নোট করবেন করুন। আপনি হয়ত উকিল, না-হয় ডাক্তার, না-হয় ডেপুটিই একজন, ইঞ্জিনের কোন্‌টা বিগড়ুলে কি যন্ত্রপাতি

লাগবে, তার কি বোঝেন স্যার? বাকি পাবলিক?" "চ্যু"—করে জিহ্বা-তালুতে একটা শব্দ করে মুখের দিকে চেয়ে রইলেন আমার। রাগও নয়, বিরক্তিও নয়। মুখে যে হাসিটা আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে, সেটা বিজয়ের। এখন যেন ও'রা রেলের সব এক ধারে; আমরা পাবলিক এক ধারে। আবহমান কাল থেকে কি করে আমাদের বোকা বানিয়ে আসছেন, তার একটা নমুনা ঝেড়ে দিয়ে, "আচ্ছা, নমস্কার" বলে আগের চেয়ে বেশ একটু উৎসাহের সঙ্গেই ঘুরে পা বাড়ালেন। বিজয় উৎসাহই বলি না।

ভ্যাবাচ্যাকাই খেয়ে গেছি। কয়েক পা গেলে হুঁশ হলো, হেসে বললাম—"শুনেছেন? তা হলে আমি হয়ে আসি একটু? পাব তো সময়?"

"অন্তত দু ছিলিম তামাক পুড়বে, তার সঙ্গে ভালো-মন্দ খোঁজখবর নেওয়া আছে, কোন না একটু ফস্টি-নস্টিও, বেহাই-ই তো রসের সম্বন্ধ। কোথায় আছেন আপনি? আর এসেই যদি পড়ে তো এবার তো আমার পালা। বললুম না? কত সময় চান—আধ ঘণ্টা—পুরোপুরি এক?" সেই চতুর হাসি মুখে নিয়েই ঘুরতে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন, প্রশ্ন করলেন—"তা দরকারটা কি?"

"একবার রিফ্রেশমেণ্ট রুমে গিয়ে এক প্লেট খাবার দিয়ে যেতে বলব।"

"খাবার? আজকে। আপনি কি দিনক্ষণ দেখে বেরুননি মশায়? যাত্রা-অযাত্রা মানেন না? বয়স তো হয়েছে; তুড়িতে উড়িয়ে দেওয়ার মতন তরুণ নয় তো আর......" এগিয়েই আসছিলেন, হঠাৎ কি ভেবে আবার থেমে গিয়ে বললেন—"যান, দেখুন স্বচক্ষে, আমি বলে পাপের ভাগী হই কেন? .....আচ্ছা নমস্কার।"

ও'র সঙ্গে, কেন জানি না, একটা 'উঃ' করে শব্দ করে ঘুরে চলে গেলেন।

অযাত্রা আবার নতুন কি দেখাবে?

তবে অত ভাববার সময় নেই। ক্ষিদেটা আরও একটু বেড়েই উঠেছে তো। এতক্ষণ অনামনস্ক ছিলাম, মনে পড়তে আরও যেন অসহ্য হয়ে উঠছে, তার ওপর আবার এই এক অশুভ ইঙ্গিত।

আগে গিয়ে মাছ-মাংসের ঘরটাতেই ঢুকলাম।

কেউ নেই। ডাকাডাকি করতে একটা লোক বেরিয়ে এল। ওয়েটার নয়, মাজাঘষা করবার চাকর ব'লে মনে হল।

বললাম—"কেউ নেই দেখছি। আমার এক প্লেট পরোটা, এক প্লেট মাংস আর এক প্লেট....."

"কুছ্ নেহি হ্যায়।"—বাধা দিয়ে জানাল লোকটা।

"একটু টোস্ট-বিস্কুট—অমলেটের জন্যে আণ্ডা......" —কথাগুলো উচ্চারণ করতেও এত মিষ্টি লাগছে!

"কুছ্ নেহি হ্যায়।"—এবার হাতটা একটু ঘুরিয়েই জানাল। কেমন যেন একটা নির্বিকার ভাব। অন্যায় হলেও (বেচারী চাকরই তো) একটু রাগ হয়ে গেল ওর ঐ নির্লিপ্ততায়।

প্রশ্ন করলাম—"ম্যানেজার সাহেব কোথায়?"

একটু যেন চাপতে চাইল বলে মনে হল। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করতে বলল—"শাকাহারমে।"

ওটা নিরামিষের নূতন পরিভাষা হয়েছে। পাশেই। দোরটা খুলে প্রবেশ করলাম।

"কি চাই?"

আফিস টেবিলটার দু' পাশে দু'জন ব'সে চেয়ারে ঘাড় উলটে সিগারেট ফুঁক-ছিলেন, যিনি সামনাসামনি তিনিই প্রশ্ন করলেন আমায় দেখে।

বললাম—"আমিষ সেকশনের ম্যানেজার আছেন এখানে?"

"এই যে ইনি।"

আমার দিকে পেছন ফিরে বসে ছিলেন, এতক্ষণে ঘাড়টা ওলটালেন উনি।
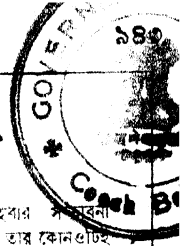
"কি দরকার?"

"আমি এক প্লেট......"

"ও বেটা আপনাকে কিছু বলেনি? তবে বসিয়ে এলাম কি করতে?"

"কোন ওয়েটার নেই। একটা চাকর......" কথা এগুতে দিচ্ছেন না। বললেন—"কি করতে থাকবে বলুন? ডিশ্ সার্ভ (Dish serve) করবে, এই তো কাজ ওদের? ডিশ্ আছে, ছেড়ে গেছে তারা. কিন্তু সার্ভ করবার একটু খুদ-কুঁড়োও নেই।"

খুব আস্তে আস্তে আর সংযতভাবে কথাবার্তা, ভেতরে খুব বেশীরকম রাগ বা বিরক্তি থাকলে যেমন হয়।

বললাম—"নেহাত একজনের মতো—সামান্য মাংস বা দু'টো ডিমই......"

চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিলেন আমার দিকে, বললেন—"মাংস নেহাত যদি না ছাড়েন, কোম্পানী দোকান পেতেছে লাইসেন্স নিয়ে. দিতেই হবে খেতে—তা হলে দিতে পারি, হাত পা কেটে। ডিম তো পাড়তে পারব না, আমিও নয়, কোন বেটা ওয়েটারও নয়।"

হাতের সিগারেটটা মাটিতে আছড়ে উঠে পড়লেন। দোরের কাছে গিয়ে ঘুরে বললেন "আব্ পাগল বন্ জাউঙ্গা সাহেব।" (এবার পাগল হয়ে যাব মশায়)। আমাকে নয়, সঙ্গীকেই।

বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলাম—"বাৎ কেয়া হ্যায় সাহেব?"

"বৈঠিয়ে।"—সিগারেট চাপা আঙুলে দিয়ে চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন সঙ্গী-ভদ্রলোক বললেন—"ভোজপুরী বারাৎ উৎরি থি।" (অর্থাৎ ভোজপুরী বরযাত্রী নেমেছিল)।

একটু সময় দিয়ে আবার প্রশ্ন করলেন—"কুছ সমঝে?" (কিছু বুঝতে পারলেন?)

বুঝেছি বইকি খানকটা। ভোজপুরী বরযাত্রী, এদিকে শূন্য ভাণ্ডার—একটা মানে তো দাঁড়াচ্ছেই। প্রশ্ন করলাম "আপনার এখানেও ঢুকেছিল?"

"কেন ঢুকবে না বলুন?—পাব্লিক প্লেস।"

"এখানেও কিছু......"

"কেন মিছিমিছি আর লজ্জা দিচ্ছেন? থাকলে নিজে হতেই বলতাম না? যখনই ওঁর খোঁজ করেছেন এসে তখনই বুঝে গেছি। তা ভিন্ন আপনার চেহারাতেও তো লেখা রয়েছে, কীরকম দরকার আপনার। কিন্তু কি করব? নিতান্ত নিরুপায় আমি।"

সত্যই নিতান্ত দীন অসহায় ভাব। হঠাৎ চেয়ারটা ঠেলে উঠে পড়লেন, বললেন—"না বিশ্বাস হয় দেখেই যান বরং।"

"না, অবিশ্বাস করব কেন? কি স্বার্থ মিছে কথা বলবার আপনার?"

"তবুও উঠুন একবার।"

ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে হাতটা বাড়াচ্ছিলেন। আমিই উঠে পড়লাম। আলমারি, ভাঁড়ার দেখিয়ে রান্নাঘরে নিয়ে

গেলেন; সব শূন্য আর কেমন একটা ছন্নছাড়া ভাব। বিশেষ করে রান্নাঘরটায়। উনুন দুটো নেবানো, বাসনগুলো যেখানে-সেখানে যা তা ভাবে ছড়ানো, ঢুকতে একটা কাত করা বড় ডেকচি পায়ে ঠেকতে এক লাথিতে সেটাকে ঘরের ওদিকে পাঠিয়ে দিয়ে হাত দুটো চিত করে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—"দেখুন।"

"ঢুকে লুটপাট করে নিয়েছে নাকি?"—আমি প্রশ্ন করলাম।

একটু ম্লান হেসে বললেন—"তা কখনও পারে? দেশে আইন রয়েছে তো। তেমনি ওদের দিকেও তো আইন রয়েছে।"

"কি?"—ভোজপুরী বরযাত্রীর জন্য বিশেষ কোন আইন মনে করেই প্রশ্ন করলাম আমি।

"লাইসেন্‌স্‌ড্ হোটেল, খেতে চাইলে খেতে দিতে হবে পয়সা দিলে।......আসুন শ্মশানদৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ দেখবেন? পেটে কিছে নিয়ে?"

বললাম—"হ্যাঁ, যাই একবার দেখি প্ল্যাটফর্মের দোকান বা ভেন্ডারগুলোর কাছে যদি......" —বেরুতে বেরুতেই বলছিলাম, উনি দাঁড়িয়ে প'ড়ে প্রশ্ন করলেন—"দেখেছেন নাকি কোন ভেন্ডার প্ল্যাটফর্মে!"

বেশ একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন। আমি একটু চোখ তুলে মনে ক'রে নিয়ে বললাম—"অবশ্য দেখেছি বলে মনে পড়ছে না, তবে খোঁজও তো করিনি।"

"কাজ নেই—এই কাহিল শরীরের ওপর আর বৃথা মেহনত ক'রে। প্ল্যাটফর্মও তো একটুখানি নয়—Longest in the world। ও ভুল আর করতে যাবেন না। প্ল্যাটফর্মের সব জিনিস খেয়েছে—খাবারের দোকানগুলোর সব খাবার খেয়েছে; চিনেবাদাম, ছোলাভাজা, চিঁড়েভাজা, ঘুঘনি, হারা চানা (কাঁচা ছোলা), বেগুনি, ফুলুরি, গরম দুধ, মালাই, খোওয়া, রামদানাকা লাড্ডু; এদিকে চা, বিস্কুট, পাঁউরুটি সব বেবাক খেয়ে গিয়েছে, অবিশ্যি কিনেই। স্টেশনে একটি পান কি সিগারেট পর্যন্ত পাবেন না। This is the last smoke I am enjoying. (এই শেষ ধূমপান আমার আজ)......আসুন, বসুন।"

বসবার কথা নয়, কিন্তু কেমন যেন সব গুলিয়ে ফেলে, অন্যমনস্ক হয়েই বসে পড়লাম। যেন কিছু কূলকিনারা পাওয়া যাচ্ছে না; আমার অবস্থার কথা বলছি না, সেটা তো সব কূলকিনারার বাইরেই, মনও নেই ওদিকে আর, বলছি ভোজপুরী বরিয়াতির কথা। কী কাণ্ড!

প্রশ্ন করলাম—"ক'জন ছিলেন?"

এক শ' সাতচল্লিশজন। একটা সিক্স-হুইলার গাড়ি রিজার্ভ করে ঘাট থেকে এল, সব চেটেপুটে খেয়ে নিয়ে এই কয়েক মিনিট আগে গাড়িটা দ্বারভাঙ্গার দিকের ট্রেনে জুড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল।"

"দ্বারভাঙ্গার দিকে!"

"চমকে উঠলেন কেন?"

ততক্ষণে সামলে উঠেছি। অন্যমনস্ক হয়ে শুনছিলাম ব'লে একটু ঐ রকম হয়ে গেল। দ্বারভাঙ্গায় এমনিই মাছ নেই; ঘি নেই, দুধ নেই, চাল-গম রেশন। অবশ্য অত বড় শহর, "একটা বরযাত্রী গিয়ে আর কি ইতর-বিশেষ হবে?"—ঘরটার বাতাসে একটা আতঙ্ক ছেয়ে রয়েছে বলেই কথাটা অমনভাবে বেরিয়ে পড়ল। সামলে নিয়ে সহজভাবে একটু হেসে বললাম—"না, চমকাবার কি আছে? এমনি জিগ্যেস করলাম। দ্বারভাঙ্গা থেকেই আসছি তো, অত বড় বরযাত্রী কার ওখানে আসছে—শুনে আসিনি তো, তাই জিগ্যেস করছি।"

বললেন—"অবিশ্যি, দ্বারভাঙ্গা শহরে নয়। শুনলাম আরও ওদিকে পাড়াগাঁয়ে কোন্ এক রাজপুত জমিদারের বরিয়াতি।...সমস্ত জেলাটাতেই তো শুনেছি একটা দুর্ভিক্ষের অবস্থা চলেছে, পাটনার কাগজগুলোয় তো প্রায়ই লিখছে..."

লজ্জিত হয়ে পড়েছি একটু। মনের হঠাৎ আতঙ্কটা ধরা পড়ে গেছে। হাসিটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—"না, সে ভয় নেই। জমিদারের বাড়িই তো, থাক না কত খাবে।"

"থাক না কত খাবে?" কী বলছেন আপনি!"—এতক্ষণ যেন মিইয়ে ছিলেন, হঠাৎ, কেন জানি না একটু যেন উষ্ণ হয়ে উঠলেন। "হাজীপুরে লোক পাঠিয়েছিলাম মশাই, অত কলা, একটি খোসা পড়ে নেই। অথচ কতটুকুই বা পথ বলুন এখান থেকে—পুলটুকু পেরুলেই গাড়ি গিয়ে ঢুকবে ওখানে। আপনি বলছেন—থাক না কত খাবে? ধুলো পায়ে তো বিদায় করতে পারবে না মশায় তারা..."

লাস্ট স্মোকের টুকরোটুকু একবার দেখে নিয়ে নীচে ফেলে পা দিয়ে চেপে পিষে দিলেন—রাগের ইলেকট্রিসিটি খানিকটা যেন আর্থ (Earth) করে দিয়ে। প্রশ্ন করলেন "টিড্ডি কাকে বলে জানেন?"

—টিড্ডি হচ্ছে পঙ্গপাল। যেখান দিয়ে যাবে নিঃশেষ করতে করতে যাবে। উঠে পড়লাম, সান্ত্বনাচ্ছলে একটু হেসেই বললাম —"কি আর করবেন? আচ্ছা আসি।"

"সত্যিই তো, কি আর করতে পারি? বাজারে লোক পাঠিয়েছি—এত রাত্রে চালডাল মসলাটা পেতে পারে। আসুক, রাঁধিয়ে রাখছি ডালভাত—থাক কে কত খাবে..."

শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য ভোজনার্থীদের ওপর দিয়েই যেন গায়ের জ্বালাটা মিটিয়ে নিয়ে বললেন—"ঐ রেট কিন্তু আমার মশাই, এক পয়সা কম করব না। দোষটা আমার? বলুন।"

বেরিয়ে এলাম।

(ক্রমশ)

শিলাইদহের কুঠিবাড়ি

নজরুল হক

শিলাইদহ—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনার অন্যতম লীলাভূমি। কুষ্টিয়া শহর থেকে তিন মাইল উত্তরে এই ঐতিহাসিক গ্রামখানি বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ মনীষীর অমর স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে ধন্য হয়েছে।

পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতির সঙ্গে শিলাইদহের গভীর সম্পর্ক রয়েছে বলে এই স্মরণীয় তীর্থ-ভূমিটি দর্শনের আকুল বাসনা নিয়ে কুষ্টিয়া শহর থেকে একদিন শিলাইদহের পথে যাত্রা করলাম। যাত্রার পূর্বক্ষণে এ কথা ভাবতে পারিনি, আজ বিশ্ব যে অদ্বিতীয় অসাধারণ প্রতিভার প্রতি অযুত-করে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন, সেই মহা-মনীষীর জীবনের এক নব অধ্যায়, এক নবদিগন্তের আবরণ উন্মোচিত হয়েছে এই শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে।

কুষ্টিয়ার গড়াই নদী পাড়ি দিয়ে জেলা বোর্ডের কাঁচা সড়ক বয়ে সাইকেলে আমরা দ্রুত এগিয়ে চললাম। প্রায় সাড়ে তিন মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এক পথচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আচ্ছা ভাই, শিলাইদহ আর কদ্দূর?"

—"আপনারা কুঠিবাড়ি দেখতে যাবেন বুঝি? সামনের মোড়টা পেরিয়ে বাম দিকে দেখতে পাবেন ঠাকুরবাড়ি।"

আমাদের গতি দ্রুততর হয়ে উঠল। মোড় ফিরেই চোখে পড়ল বাঁ দিকে মাঠের মধ্যে নিঃসঙ্গ একটি বাড়ি—জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তা থেকে একটা পাকা সড়ক সোজা গিয়ে বাড়িটার ফটকে শেষ হয়েছে। আমরা পাকা সড়ক বেয়ে এগিয়ে চললাম। রাস্তার দুই পাশে সারবন্দী ঝাউগাছ—যেন ধ্যানী তপস্বী এরা! ঝোড়ো হাওয়া এদের শাখা প্রশাখার ভেতর দিয়ে একটানা দীর্ঘশ্বাসের মত বয়ে যাচ্ছে। মনের কোনখানে একটা না-বলা ব্যথা টনটন্ করে ওঠে, চারিদিকের গাম্ভীর্য এনে দেয় একটা শ্রদ্ধার ভাব। চির-না-পাওয়ার বেদনা যেন এইখানে এসে ঝাউ-এর সারিতে বাঁধা পড়েছে। আমরা নীরবে এগিয়ে চললাম। বাড়ির ফটকে এসে পথের বিরতি হল। গেটের দু পাশে কটা ঘর—পাহারাদারদের বাসস্থান। প্রশস্ত আঙিনার মাঝখানে উঁচু বেদীর মত সিমেন্টের বাঁধানো চত্বর।

আমাদের সাইকেলের ঘণ্টি শুনে একজন পাহারাদার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। বলল—"সাহেবরা কি সরকার থেকে এসেছেন?"

—"না ভাই, আমরা সরকারী অফিসার নই। বিশ্বকবির সম্বন্ধে কিছু জানতে এসেছি।"

পাহারাদার লোকটি আশ্বস্ত হয়ে বলল—"ও, তাই বলুন। তা ঠাকুরের কথা যদি শুনতে চান, তবে নন্দীবাবুর মুখে শুনবেন। তিনি ছিলেন ঠাকুর এস্টেটের তহসিলদার। তিনি ঠাকুরের সব কথা জানেন। আপনারা ঐখানটায় বসুন। আমি নন্দীবাবুকে গিয়ে ডেকে আনি।"

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে পাহারাদার ফিরে এল। সঙ্গে এক পক্ককেশ মাঝারি গড়নের ভদ্রলোক—মুখে শান্ত কমনীয়তা। যথা-রীতি অভিভাষণ বিনিময় করে ভদ্রলোক আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আগমনের হেতু শুনে তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বৃদ্ধ আতিথেয়তার ত্রুটি করলেন না। আমরা তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে তিনি সংক্ষেপে বললেন—"আমার নাম শ্রীরমণীমোহন নন্দী। বয়েস পঁচাত্তর পার হয়েছে। সারা জীবন ঠাকুর এস্টেটে তহসিল-দার ছিলাম। পুরুষানুক্রমে আমরা এই কাজে বহাল ছিলাম।"
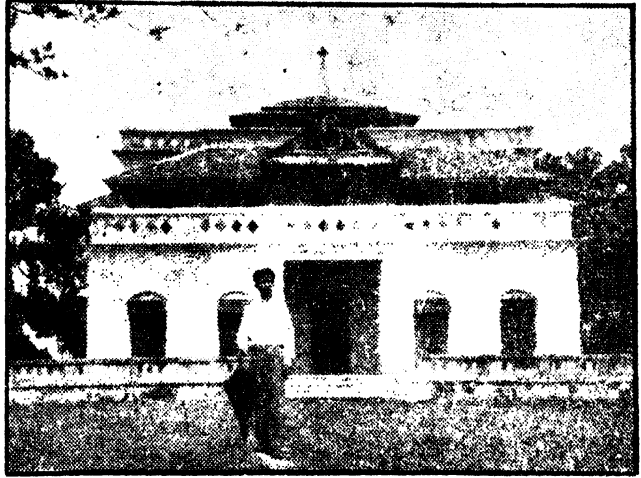
ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছেড়ে আমরা কবিগুরুর সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলতে শুরু করলেন—"এই বাড়িটার নাম 'কুঠিবাড়ি'। বছরে অন্তত ছ' মাস ঠাকুর এই কুঠিবাড়িতে থাকতেন।"

আঙিনার চত্বর দেখিয়ে বললেন—"এই-খানটায় ঠাকুর স্নান করতেন আর বিকালের দিকে চেয়ার পেতে বসতেন।"

বৃদ্ধ কথা বলতে বলতে বাড়ির ডান দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন—দেখা গেল একটা প্রকাণ্ড পুকুর। শানবাঁধানো ঘাটের ধারে একটা বকুলগাছ। নন্দীবাবু গাছটা দেখিয়ে বললেন—"এই বকুলগাছের তলায় প্রায়ই সন্ধ্যার সময় ঠাকুর বসতেন, কবিতা লিখতেন।"

কয়েকটা বকুলফুল পড়ে ছিল শানের ওপর। আমাদের সঙ্গী এক ছাত্র ফুলগুলো কুড়িয়ে নিল—কি ভেবে সে ফুলগুলো রুমালে বেঁধে নিল। বৃদ্ধ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—"ঠাকুরের কথা বললে ফুরায় না। জমিদারি তদারকের নাম করে আসতেন সত্যি; কিন্তু আসলে তেমন কিছুই করতেন না। তাঁর খেয়ালেই তিনি বিভোর হয়ে থাকতেন। বৈষয়িক ব্যাপারে কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে তখন হয়ত বলতেন—'এটা কর, কি ওটা কর'—ব্যস্, ঐ পর্যন্তই।"

কুঠিবাড়ি

বাড়ির একটা কামরায় দুটি পালকি দেখিয়ে নন্দীবাবু বললেন—"এতে চেপে ঠাকুর যাতায়াত করতেন।" একটা হাতল-ওয়ালা চৌকি দেখিয়ে তিনি বললেন—"এই চৌকিটায় করে ঠাকুরকে ছাতে নিয়ে যাওয়া হত। বৃদ্ধ বয়েসে তিনি সিঁড়ি ভাঙতে পারতেন না। তাই এই চৌকির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।"

নন্দীবাবুর সঙ্গে এবার আমরা সিঁড়ি বেয়ে ছাতে গেলাম। সম্মুখে আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাবলা, তাল ও আম-কাঁঠালের গাছের সমারোহ। বাড়ির দক্ষিণে বেশ কিছু দূরে মাঠ।
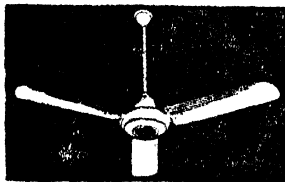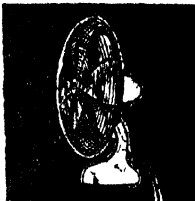
তারপরে শুভ্র বালুকারাশি গিয়ে মিশেছে দুরন্ত পদ্মার কোলে। পরপারের সীমা-রেখা গভীর সবুজের বুকে লীন হয়ে গেছে—দিগন্তের শেষ সীমায় যেন 'ঘোমটা পরা কালো ছায়া'—হাতছানি দিয়ে ডাকছে!

অল্প দূরে বাড়ির পূবে দিকে একটা গ্রাম। বৃদ্ধ নন্দীবাবু আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন—"ঐ যে গ্রামটা, খোরশেদপুর। ঐ দেখুন, গোপীনাথ মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা দীঘি আছে ঐ গ্রামটায়। দীঘির পূবে পাড়ে পীর খোরশেদ মুলুক-এর মাজার আর দক্ষিণ পাড়ে গোপীনাথের মন্দির। রানী ভবানীর সময় এই মন্দিরটা তৈরী হয়েছিল। পরে আমাদের ঠাকুর ওটাকে সংস্কার করিয়ে দেন। মন্দিরের পূবে রয়েছে রথখোলা। প্রতি বছর রথযাত্রার সময় মেলা বসে—লোক আসতো দেশদেশান্তর থেকে। আজ আর মেলা তেমন জমে না। মন্দিরের সে জৌলুস আর নেই।"

আমরা প্রশ্ন করলাম—"পীরের মাজারটা কতদিনের? পীরের নামেই বুঝি গ্রামের নাম হয়েছে?"

—"হ্যাঁ। পীর খোরশেদ মুলুকের মাজারটা প্রায় পাঁচ শ' বছরের। বাবা-ঠাকুরদার মুখে শুনে আসছি, মুলুক শাহ নাকি খুব বড় সাধক ছিলেন। বহুকাল আগে পদ্মা নদী বয়ে যেত পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ থেকে যশোহরের শৈলকুপা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। একদিন খোরশেদ মুলুক পাবনা থেকে নদী পাড়ি দিচ্ছিলেন। মাঝ-নদীতে এসে মাঝি পারানির পয়সা চাইল। দরবেশ বললেন—বাবা! আমি ফকির, পয়সা পাব কোথায়? মাঝিও ছাড়বার পাত্র নয়। শেষটা মাঝি তাঁকে জোর করে মাঝ-নদীতে নামিয়ে দিল। ভগবানের লীলা! ফকির মাঝ-নদীতে নামলেন সত্যি কিন্তু ডুবলেন না—পায়ের খড়ম তাঁকে ভাসিয়ে রাখল। তারপর রাতারাতি পদ্মা সরে গেল উত্তরে—মুলুক শাহ যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানে পড়ল এক বিরাট চর। চরের ওপর লোকবসতি হল—খোরশেদ মুলুকের মাজার হল এখানেই। এসব কথা লোক-মুখে চলে আসছে পাঁচ শ' বছর ধরে।"

আমরা প্রশ্ন করলাম—"শিলাইদহ নামটা এলো কোত্থেকে?"

বৃদ্ধ তাঁর স্মৃতির ঝুলি খুলে দিলেন—"সে অনেক কথা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এল এক সাহেব। পদ্মার পাড়ে খোরশেদপুরের কাছে জমি ইজারা নিয়ে নীল চাষ শুরু করল। সাহেবের নাম শেলী। শেলীর অত্যাচারে এ অঞ্চলের চাষীরা গ্রাম ছেড়ে পালাল। পদ্মা ভীষণা মূর্তি ধারণ করল, ভেঙে নিয়ে গেল শেলীর নীল ক্ষেত ও কুঠি। তারপর বছর না পেরুতেই পদ্মার বুকে মমতা জাগল।

চর পড়তে শুরু হল—সৃষ্টি হল এক দহ বা খাড়ির। লোকে সেই থেকে এই অঞ্চলকে শেলীর দহ বলেই ডাকতো। কালে শেলীর দহ রূপান্তরিত হয়ে শিলাইদহ হয়েছে।"

আমরা প্রশ্ন করলাম—"শুনেছি কবির সংগে লালন ফকিরের প্রায়ই দেখা হত?"

বৃদ্ধ এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন—"ওঃ, সে একদিন গেছে। লালন শাহ না থাকলে ঠাকুর এত ঘন ঘন শিলাইদহ আসতেন কিনা সন্দেহ। আমার মনে হয়, লালন শাহ ছিলেন ঠাকুরের খুবই অন্তরঙ্গ—তাঁকে বেশ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। জোড়াসাঁকো থেকে আসবার ক'দিন আগে ঠাকুর ফকিরকে চিঠি দিতেন। আমাদের কাছে লিখতেন—ফকির আসলে যেন তাঁর যত্নের ত্রুটি না হয়। একদিনের কথা মনে পড়ে। লালন শাহ হঠাৎ একদিন এসে হাজির, জিজ্ঞেস করলেন—ঠাকুর আসেনি? আমরা বললাম—কই, না ত! কোন পত্র ত আসেনি। ফকির হাসতে হাসতে বললেন—পাবে হে পাবে—বলেই ফকির গুনগুন করে গান ধরলেন—পিরিতির রীতি বোঝা দায়, (ও সে) বিনা তারে মনের খবর পায়।"

এই পর্যন্ত বলে বৃদ্ধ নন্দী দম নিলেন। কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন ভাবের রাজ্যে। ক্ষণিক পরে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বৃদ্ধ বললেন—"বুড়ো ত হলাম; আর দু'দিন বাদে চিতায় উঠব। কিন্তু মহামায়ার মায়া কিছু বুঝলাম না। এই ফকির আর আমাদের ঠাকুরের মধ্যে কি যে গভীর সম্পর্ক ছিল তা আজও ভেবে পাইনে। ঠাকুর জমিদার, বিশ্বজোড়া নাম আর ফকির লালন শাহ পথের ভিখারী বই ত নয়! তবু দুজনের মনের কি গভীর সম্পর্ক আর কি যে আন্তরিকতা ছিল তাঁদের দুজনের মধ্যে—ভাবলে চোখে জল আসে।"

বৃদ্ধ ক্ষণিক থেমে আবার বলতে শুরু করেন—"লালন শাহ ঐ মুলুক শাহের মাজারে বাউল গান করতেন রাতের পর রাত। আমাদের ঠাকুরও খোরশেদপুরে যেতেন। মুলুক শাহর মাজারে আর গোপীনাথের মন্দিরে গানের জলসা বসত। ঠাকুর আধরাত বসে বসে গান শুনতেন। লালন শাহ, গোপীনাথ শাহ আর শিবনাথ শাহ—এই তিন গুরু-শিষ্য মিলে আসর উঠত জমে। আরও কত বাউল ফকিরের আমদানী হত। আমাদের ঠাকুর আসরের মধ্য-মণি হয়ে আসর জমিয়ে তুলতেন। কুঠিবাড়িতেও গানের জলসা বসত। কোন কোনদিন ফকির আর ঠাকুর দুজনের মধ্যে আধ্যাত্মিক আলোচনা হত। নানা তত্ত্ব-কথা নিয়ে তাঁরা দুজন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনায় বুঁদ হয়ে থাকতেন। তখন আমার কাঁচা বয়েস। কিছু কিছু বুঝতাম, তবে বেশির ভাগ দুর্বোধ্য ঠেকত।"

সংগী ছাত্রটি প্রশ্ন করল—"শুনেছি কবি
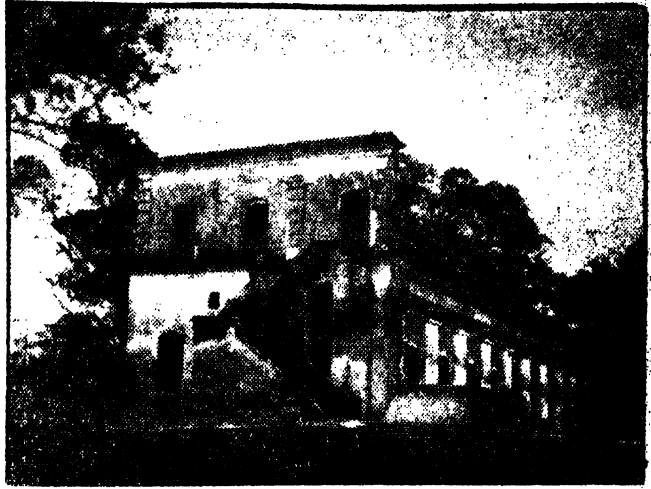
মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়

পদ্মায় নৌকাবিহারে যেতেন। পদ্মার বুকে বসে অনেক কবিতা লিখেছেন?"

বৃদ্ধের মুখে উৎসাহের ছাপ পড়ে। বললেন—"সে একদিন গেছে ভাই। ঠাকুরের ছিল তিনটি বজরাঃ (১) পদ্মা, (২) নাগর, (৩) লালদীঘি। 'পদ্মা'য় চড়তেন ঠাকুর নিজে আর তাঁর সংগে কখনও কখনও লালন শাহর দল। নাগরে থাকতাম আমরা আর লাঠিয়াল দল। কারণ সে সময় পদ্মা-মেঘনা অঞ্চলে দিন-দুপুরে ডাকাতি হত। লালদীঘিতে থাকত রসদপত্র। দিনের পর দিন পদ্মায় কাটাত—ঘাট থেকে ঘাটে, পাড় থেকে পাড়ে। লালন শাহর গান পদ্মার বুকে মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি হত—পৃথিবী এই পঙ্কিলতার ঊর্ধ্বে স্বর্গলোকে বাসিন্দা হয়ে যেতাম আমরা। ঠাকুর তন্ময় হয়ে গান শুনতেন। কখনও কখনও নিজের লেখা গান লালন শাহর কণ্ঠে শুনতেন। এমনি করে দিন গড়িয়ে যেত মাসের কোলে। কখনও ঠাকুর একা যেতেন—সংগে কাউকে নিতেন না, আবার কখনও পরিবারের লোকজন সংগে নিতেন। পদ্মায় ঘুরে
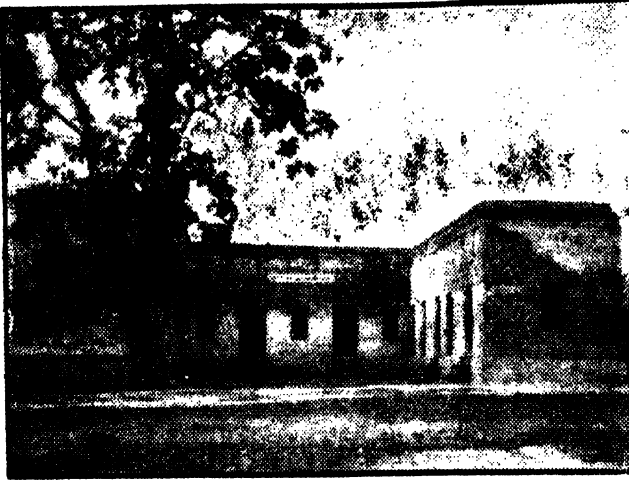
কাছারি বাড়ি।

বেড়ানোটা ছিল ঠাকুরের সবচেয়ে প্রিয় নেশা। বুড়ো হয়েছি, সব কথা কি আর মনে থাকে ভাই!"

বৃদ্ধ নন্দীবাবু নীরব হলেন। সূর্য পশ্চিমের দিগন্তে হামাগুড়ি দিচ্ছে। খণ্ড খণ্ড মেঘের ফাঁকে রক্তিম রবিচ্ছটা তীরের মত আকাশের বুকে ঠিকরে পড়ছে।

নন্দীবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—"চলুন দাদুরা! সন্ধ্যে হয়ে এল, এবার ঠাকুরের ঘরগুলো দেখাই।"

আমরা সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতলে নামলাম। দ্বিতলে তিনটি বড় কামরা। কবি যে কামরায় থাকতেন, সেটার সামনে গিয়ে বৃদ্ধ বললেন—"এই ঘরে থাকত ঠাকুরের কাগজপত্র।" একটা দেওয়াল আলমারী দেখিয়ে তিনি বললেন—"এটার মধ্যে এখনও অনেক কাগজপত্র রয়েছে। বোধ হয় দলিলই বেশী। তবে ঠাকুরের লেখা কবিতা বা অন্য কোন বইয়ের পাণ্ডুলিপিও হয়ত আছে। আমি ঠিক বলতে পারব না। কারণ এ ঘরে তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্র থাকত—আমাদের ধরবার হুকুম ছিল না।"

প্রশ্ন করলাম—"তালা দেওয়া রয়েছে দেখছি। কিন্তু চাবি কোথায়?"

বৃদ্ধ বললেন—"এর চাবি সরকারের হেফাজতে রয়েছে। আগে আমাদের কাছে ছিল। শুনেছিলাম, সরকার নাকি এর ভেতরের কাগজপত্রগুলো মিউজিয়ামে রাখার সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু আজও সেইভাবে তালাচাবি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। উলু ধরলো কিনা, কে জানে!"

এর পর নন্দীবাবু আরও তিনটি ঘর দেখালেন—কবির বাসঘর এগুলো। সব ক'টা ঘরই শূন্য।

বারান্দায় একটা ভাঙা আরাম-কেদারা দেখিয়ে বৃদ্ধ বললেন—"এটায় শুয়ে ঠাকুর পড়াশুনো করতেন। এখন ভেঙে এই দশা হয়েছে। আরও কত তৈজসপত্র ছিল, কিন্তু......।"

—"সেগুলো সব গেল কোথায়?"

বৃদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—"ছিল সবই। জমিদার-বাড়ির জিনিসপত্রের কি আর কমতি ছিল! কিন্তু আজ আর কিছু নেই। কোথা দিয়ে কিভাবে গায়েব হয়ে গেল তার কিছুই জানিনে। আর জেনেই বা লাভ কি?"

বৃদ্ধের মর্মবেদনা না বাড়িয়ে আমরা এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করলাম। নীচের তলায় তিনটি বড় বড় ড্রইং রুম। এখন কোনটিতেই কোন জিনিসের নামগন্ধ নেই।

কুঠিবাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা পথে নামলাম। কিছু দূর আসার পর চোখে পড়ল, মাঠের মাঝখানে আমকাঠালের একটা বাগান। নন্দীবাবু বাগানটা দেখিয়ে বললেন —"এই বাগানটার সাথে ঠাকুরের জীবনের একটি করুণ ইতিহাস জড়িত রয়েছে। ঐ দু' বিঘা জমির মালিক ছিল উপেন্দ্র—ঠাকুরের সমবয়েসী, এই গ্রামের ছেলে। ঠাকুরের নিত্য সঙ্গী ছিল উপেন, তারপর একবার ঠাকুরের খেয়াল চাপল ঐ দু বিঘা বাগানটায় তপোবনের আদর্শে একটা ইস্কুল করতে হবে। উপেন তখন ঠাকুর এস্টেটে চাকুরি করত। ঠাকুর উপেনকে তাঁর ইচ্ছার কথা জানালেন। কিন্তু উপেন জমি দিতে রাজী হল না। উভয়েরই তখন কাঁচা বয়েস, ঠাকুর ঝোঁকের মাথায় উপেনকে দিলেন তাড়িয়ে। চাকুরি থেকে বরখাস্ত হয়ে উপেন কিছুদিনের জন্য গা ঢাকা দিল। কাঁচা বয়েসের ঝোঁক দু'দিন বাদ উবে গেল। তিনি উপেনের খোঁজ করলেন চাকুরি দেবেন বলে, কিন্তু উপেন আর এল না। এর পর ঐ বাগানটার একটি গাছও কেউ কাটতে পারেনি।"

বৃদ্ধের বর্ণনা শুনে আমরা বিস্ময়ে হতবাক। কবির "দুই বিঘা জমি" কবিতাটির আসল রহস্য এত দিনে ধরা পড়ল। আমাদের সঙ্গী ছাত্রটি "দুই বিঘা জমি" আবৃত্তি করতে শুরু করল। নন্দীবাবু হেসে বললেন—"আমার ধারণা, কাঁচা বয়েসের সেই ছেলেমানুষির খেসারত দিয়েছেন ঠাকুর তাঁর "দুই বিঘা জমিতে।"

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আমরা পাকা সড়ক বেয়ে জেলা বোর্ডের রাস্তায় উঠলাম। অন্তরে অনাস্বাদিত তৃপ্তি, একটু ব্যথা, একটু গর্ব নিয়ে ফিরে এলাম—বাঙালীর সন্তান বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। এই মাটি, এই প্রকৃতির কোলে বসে সেই শ্রেষ্ঠত্ব পরিপুষ্ট হয়েছে, তাই এই মাটি ধন্য—ধন্য হলাম আমরা ক'টি প্রাণী।

[প্রবন্ধের ফটোগ্রাফ আজমল হক্ কর্তৃক গৃহীত]

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকেঃ

বেস ক্যাম্প, ১৯শে অক্টোবর। আজ আজীবা নেই। গতকাল তাকে উপরে পাঠিয়ে দিয়েছি। একটু পরেই সন্ধ্যে হবে। মালবাহকেরা রসদ নিতে উপর থেকে নেমে আসবে। আজীবা যতদিন ছিল, ভাবনা ছিল না, মালবাহকদের হ্যাপা সেই সামলেছে। কাল যাবার আগে ভাঁড়ারের ভার আমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছে। ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে, ক মণ আটা মালবাহকদের দিতে হবে। কতখানি নুন, ক'টা করে সিগারেট?

বেচারী আজীবা! এতদিন বেস ক্যাম্পে পড়ে ছিল, যেন জেলখানায় ছিল। সব শেরপা উপরে চলে গিয়েছে। একমাত্র আজীবা পড়ে আছে বেস ক্যাম্পে। প্রথম দিকে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। একটু কাহিল হয়ে পড়েছিল। তাই ওকে এতদিন উপরে পাঠানো হয়নি। ডাক্তার ওকে বিশ্রাম দিয়েছিল। আজীবা কোন কথা বলেনি। কিন্তু অস্বাভাবিক রকম চুপ মেরে গিয়েছে। আমাকে একদিন বললে, মোটা সাব্, তোমাদের অনেক টাকা লোকসান করিয়ে দিলাম। কেনই বা এলাম! আজীবার স্বরে হতাশা ফুটে উঠল। বললে, মোটা সাব্, মেরা নসিব বহোৎ খারাপ হ্যায়। এই একটি শান্ত বিবৃতির মধ্য দিয়ে আমার কানে ব্যর্থতার এক বুকফাটা হাহাকার বেজে উঠল। কতবার সান্ত্বনা দিয়েছি আজীবাকে। বলেছি, আজীবা, কোন চিন্তা নেই, তুমি ভাল হয়ে গেছ। শরীরে বল এলেই তোমাকে উপরে নিয়ে যাওয়া হবে। শুনে আজীবা হেসেছে। ম্লান হাসিতেই সে জানিয়ে দিয়েছে, আমার স্তোকবাক্যে সে বিশেষ আশান্বিত হতে পারেনি।

ডাক্তার উপরে যাবার আগে আজীবাকে ভাল করে পরীক্ষা করলেন। বললেন, আজীবা, তুমি ফিট। এবার উপরে যেতে পারো। আজীবার চোখ খুশিতে চকচক করে উঠেছিল, দেখেছিলাম। বলেছিলাম, কী আজীবা, হল ত! আমার কথা ফলল কিনা? আজীবা সে কথার জবাব দিল না। শুধু হাসল। খুশির হাসি ওর পোড় খাওয়া মুখখানাকে রাঙিয়ে দিল।

এই আজীবা অন্নপূর্ণা অভিযানে ছিল। ১৯৫০ সালে এক ফরাসী দল অন্নপূর্ণা শিখরে (১নং) অভিযান চালান। মরিস হারজগ ছিলেন নেতা। হারজগ আর তাঁর সঙ্গী লিসকাস্টে শিখরে উঠতে পেরেছিলেন। এভারেস্ট জয়ের আগে এরাই সব থেকে উঁচু শিখরে আরোহণের গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু ওঠাটা যত নির্বিঘ্নে সমাধা করেছিলেন এঁরা, নামাটা তত সহজে হয়নি। সঙ্গে শেরপা ছিল না। শেরপাদের রেখে গিয়েছিলেন নিচের দিকের শিবিরে। আর এই ভুলের মাসুল তাঁদের ভাল রকমই দিতে হয়েছিল। নামবার সময় পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। ফলে একটা রাত উন্মুক্ত এক বরফের খোঁড়লে কাটাতে হয়। যে চারজন উপরে উঠেছিলেন, দুজন শিখরে আর দুজন পঞ্চম শিবির পর্যন্ত, তাঁদের কেউই অক্ষত দেহে ফিরতে পারেন নি। তিনজনের হাতে পায়ে তুষারক্ষত হয়েছিল, (নেতা হারজগের হাত আর পায়ের আঙুল কেটে বাদ দিতে হয়) আর একজন সাময়িকভাবে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পরদিন কোনক্রমে তাঁরা চতুর্থ শিবিরে এসে পৌঁছান। তখন আর কারও চলবার শক্তি নেই, বিশেষ করে নেতা হারজগের। সেই সময় আজীবা নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে হারজগকে শিঠে

২নং থেকে ৩নং শিবিরের পথে এক হাঁটু বরফ। আগে আজীবা, মধ্যে সুকুমার, পিছনে টাসী ফটো—দিলীপ ব্যানার্জি

নিয়ে অতি দুঃসাধ্য পথ অতিক্রম করে নিরাপদ জায়গায় নামিয়ে আনে।

এই সেই আজীবা। দুর্ধর্ষ পর্বতারোহী-দের অন্যতম। এখন উপরে যাবার জন্য ছটফট করছে। পরশুদিন পর্যন্তও তার সে কী ছটফটানি! খালি বলেছে, হাম ত ফিট হ্যায়, হামকো উপর ভেজো সাব্। আমি আর ধ্রুব আজীবার ব্যথা বুঝতে পারছি। হামকো উপর ভেজো সাব, হামারা কাম উপরমে হ্যায়। তাও আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু নেতার আদেশ ছাড়া ওকে উপরে আমরা পাঠাতে পারিনে। রোজই আশা করছি উপর থেকে সুকুমার ওকে ডেকে পাঠাবে। কিন্তু সে নির্দেশ আসতে যত দেরি হচ্ছে, এই শান্ত গম্ভীর মানুষটির অস্থিরতা ততই বেড়ে উঠছে।

শেষ পর্যন্ত আমরাও ওর অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে উঠলাম। তাই পরামর্শ করে ঠিক করা হল, সুকুমারের কাছে আমরা এক চিঠি পাঠাব। সে চিঠি নিয়ে যাবে আজীবা। সুকুমার যদি তাকে থাকতে বলে, সে থাকবে। না হলে খবর নিয়ে পরদিন সে নেমে আসবে বেস ক্যাম্পে।

সুকুমারকে আমরা এই সময় বিরক্ত করতে চাইনি। কিন্তু ওকে না জানিয়েও পারলাম না যে, আমাদের রসদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে এসেছে। আর পাঁচ ছয় দিন কোন মতে টেনেটুনে চলতে পারে। টাকা যা আছে তাতে যদি আমরা আমাদের আগেকার কর্মসূচি মেনে চলতে পারি অর্থাৎ ২৫শে অক্টোবর বেস ক্যাম্প তুলে নিচে রওনা হতে পারি তবেই মালবাহকদের পাওনা পরিশোধ করতে পারব। কিন্তু আর টাকা না পেলে শেরপাদের টাকা মেটাতে পারব না বা ফিরতেও পারব না।

ধ্রুব এ কথা লিখে দিল। আজীবা সেই চিঠি নিয়ে কাল ভোরে চলে গিয়েছে। রসদের অবস্থা আমাদের বড় ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। আটা, সামান্য ডাল, আরও সামান্য চিনি, গোটা কয় আলু আর পেঁয়াজ, এই-মাত্র এখন সম্বল। নুনও পর্যাপ্ত নেই। আধ বস্তা ছাতু আছে মাত্র। মালবাহকদের রসদ দিচ্ছি শুধু আটা, সেরেফ আটা। ওরা ডাল চাইছে, আলু পেঁয়াজ চাইছে, নুন চাইছে, লংকা চাইছে। আমরা দিতে পারছিনে। ওরা ক্রমেই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠছে।

আমাদের যা কিছু ভাল খাবার ছিল, সব উপরে পাঠিয়ে দিয়েছি। বেস ক্যাম্পে আমরা খেয়ে চলেছি চাপাটি আর আলু-পেঁয়াজের তরকারি আর না হয় ভাত আর ডাল অথবা খিচুড়ি। একঘেয়ে খাবার খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে। খেতে আর ইচ্ছে করে না। আমি ঠিক দেড় চামচ ভাত অথবা এক-খানা চাপাটি গিলতে পারছি। তাও যথেষ্ট জোর করে।

অথচ একটি ভেড়া তার দিব্যি নধর দেহটি নিয়ে চোখের সামনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নজর দেবার উপায় নেই। ওটি নন্দাদেবীর মানতের ভেড়া। ওর গায়ে হাত দেবার উপায় নেই। মূর্খামি আর কাকে বলে!

মালবাহকরা আজ শুধু আটা নিতে চাইল না। অন্তত একটা করে আলু

চাইল। আমি আলুর বদলে এক প্যাকেট করে সিগারেট দিয়ে ওদের আজকের মত "ম্যানেজ" করলাম। কিন্তু কাল কি দিয়ে ঠেকাব? যদি ওরা বেঁকে বসে, যদি ওরা খেপে যায়, তাহলে আমরা বিপদে পড়ে যাব।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি গজাল। আমি লালুকে তাড়াতাড়ি করে খাবার তৈরি করতে বললাম। তারপর রান্নার আগুনের পাশে মালবাহকদের ডেকে নিয়ে গল্প করতে বসলাম। একটুক্ষণের মধ্যেই দিব্যি আড্ডা জমে গেল। লালু তাড়াতাড়ি খাবার বানিয়ে দিল। চাপাটি আর আলুর তরকারি। আমরা খেতে খেতেই গল্প করছি। একজন বলে উঠল, সাব্, তুমলোগ ভি এইসা খাতা হ্যায়? সিরফ্ চাপাটি আর আলু? আমি বললাম, সাবলোগ আংরেজীমে ইসকো ডিনার কহ্তা হ্যায় বেওকুফ। সাব্‌লোগ ডিনার খাতা হ্যায়, চাপাতি আর আলু নেহি। ওরা হো হো করে হেসে উঠল। একেবারে পরিষ্কার আবহাওয়া। লালু বলল, সাব্‌লোগ এইসা ডিনার বরাবর খাতা হ্যায়। ওরা আবার হেসে উঠল। আমি বললাম, তুমলোগোকো ভি ডিনার খানা হোগা। লালু আলু কা বস্তা লে আও। দেখো কিত্‌না আলু হ্যায়।

লালু আলুর বস্তা বের করে নিয়ে এল। সের দশ পনের আলু আছে আর।

বললাম, এক এক আলু সব কোই কো দে দো।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা চেঁচিয়ে উঠল, নেহি, নেহি, সাব্। উয়ো তুমহারা ওয়াস্তে রাখ দো। হামকো ডিনার নেহি চাহিয়ে। চাপাটি সে কাম চল জায়েগা।

এতটা আমি আশা করিনি। ভেবেছিলাম, আমাদের খাওয়া দেখলে ওরা বুঝবে, আমরা ওদের থেকে খুব ভাল কিছু খেতে পাচ্ছিনে। তখন এক একটা আলু দিলে ওরা খুশী হয়েই নিয়ে নেবে। কিন্তু এ কী! এতটা আমি আশা করিনি।

ওরা একটু পরে "রাম রাম সাব্, গুড মর্নিং সাব্" বলে চলে গেল। আমি আর ধ্রুব স্তব্ধ হয়ে বসে আছি। আলুর বস্তা লালুর পাশে পড়ে আছে। আগুনের শিখা লকলক করে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেই আলোয় দেখলাম, বিস্ময়ে আনন্দে ধ্রুবর মুখ চকচক করে উঠেছে। ওর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল।

ধরা গলায় ধ্রুব বলল, "এরা কী-মানুষ, গোরদা?"

মনে হল বলি, "আমার দেশের মানুষ, সোনার মানুষ।" বলতে গেলাম। মনের আবেগ ঢেলা পাকিয়ে কথা আটকে দিল।

ধ্রুব আপন মনেই বলতে লাগল, "এই ধোটিয়াল মালবাহকদের বিরুদ্ধে কত কথাই না লিখেছে সাহেবরা। সেই সব বই পড়ে আমার এদের সম্পর্কে কি খারাপ ধারণাই না হয়েছিল! কী ভুল! কী ভুল!"

॥ ছেচল্লিশ ॥

১৯শে অক্টোবর। ২নং শিবির। সকালে ঘুম ভাঙতেই নিমাই দেখল তার অস্বস্তি লাগছে। পেট পরিষ্কার না থাকলে যে ধরনের অস্বস্তি হয়, মাথা টিপ-টিপ করে, গা ম্যাজম্যাজ করে, অসুস্থতা বোধ হয়, নিমাই দেখল, ওর সেই রকমই লাগছে। আজ আর গোঁয়ার্তুমি করল না নিমাই, কোন রকম ঝুঁকি নিল না। সুকুমারকে জানাল, তার শরীর খারাপ হয়েছে। সুকুমার তাকে বিশ্রাম দিল। টাসীর পায়ে চোট লেগেছে। তাকে শিবিরে বিশ্রাম নিতে বলা হল।

৩নং শিবিরের জায়গা দেখতে ওরা আজ ন'টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল। ২নং শিবিরটা এমন জায়গাতেই করা হয়েছে যে ৬টা বাজতে না বাজতেই রোদ এসে যায়। আজ ওরা চার-জন। সুকুমার, আঙ শেরিং, দা তেন্বা আর গুনীদিন।

২নং শিবির থেকে বের হয়ে ওরা প্রথমে নন্দঘুণ্টি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। বরফ খুবই নরম। তার উপর ফাটলের বাধা। অজস্র ফাটল সর্বত্র হাঁ করে রয়েছে। অনবরত ঘুরে ঘুরে যেতে হচ্ছে। সুকুমার বারবার একটা মইয়ের অভাব বোধ করছে। আহা, একটা অ্যালুমিনিয়মের মই যদি যোগাড় করতে পারত ওরা! তা হলে ওদের আর এত ঘুরতে হত না। ফাটলের উপর মইখানা ফেলে দিয়ে সোজাসুজি পার হয়ে যেতে পারত। আগে আগে যে যাচ্ছে, দু এক পা চলার পর তুষার-গাঁইতি দিয়ে সে বরফ ঠুকে ঠুকে দেখছে, তলায় ফাটল আছে কিনা। নিঃসন্দেহ হলে তবে সে-পথে ওরা পা বাড়াচ্ছে। ফলে ওরা খুব ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। মাঝে মাঝে তুষার-গাঁইতি

...শ্পপ্রটা বরফের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। ওদের পা বসে যাচ্ছে। ওরা এখনও দাঁড় ব্যবহার করেনি। বরফ নরম, অতএব ক্ল্যাম্পনও না।

কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর ওদের পক্ষে আর নন্দাঘুণ্টির ধার ঘেঁষে যাওয়া সম্ভব হল না। এত ভয়ংকর ফাটল সেদিকে। এবার ওরা আরও ডান দিকে সরে এল। এখন ওরা হিমবাহের ঠিক মাঝখান দিয়ে চলতে লাগল। কিছু দূর গেল। আবার সেই ফাটলের বাধা। বিরাট এক ফাটল মুখ-ব্যাদান করে পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। সুকুমারের মনে হল, এ যেন পুরাণের সেই অঘাসুরের হাঁ। একটু অসতর্ক হলেই টপ করে ওদের গিলে ফেলবে।

ওরা ঘুরতে ঘুরতে নাজেহাল হয়ে পড়ল। সোজাসুজি যেতে পারলে যেখানে পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছুতে পারত, ঘুরে ঘুরে সেখানে দেড় ঘণ্টাতেও পৌঁছুতে পারছে না। আবার ওদের পথ বদল করতে হল। আরও ডান দিকে সরে এল। এখন ওরা রণ্টি পাহাড়ের ধার ঘেঁষে চলেছে। ওরা

ধীরে ধীরে চড়াই বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে ছোটখাট যেসব ফাটল পড়ছিল, সেগ্লো ওরা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পার হয়ে গেল। রুটির উপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ছে। ওরা এইজন্যেই এ পথে প্রথমে যেতে চায়নি। এখন আর উপায় কিছু নেই, কাজেই বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও ওদেরকে এই পথেই এগিয়ে চলতে হল। কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর সুকুমার দেখল, অনেকখানি জায়গা জুড়ে অজস্র বরফের খোঁচা খোঁচা শীষ দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক অবিকল যেন বরফ দিয়ে তৈরি একটা শরগাছের বন। সুকুমার মুগ্ধ হয়ে গেল। শীষগুলো বেশ শক্ত। লাথি মারলে পট্‌পট্‌ করে ভেঙে যায়। ওরা লাথি মেরে মেরে ওগুলো ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলল। এপাশে ফাটল, ওপাশে ফাটল। সে-সব পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে একবার নামল খানিক। বেশী দূরে নামতে পারল না। সামনে ফাটল। ওরা একটু ঘুরে গিয়ে আরেকটা চড়াই পেল। চড়াই বেয়ে খানিকটা উঠল। আর এগুতে পারল না। ফাটল। বেশ বড় ফাটল। আবার ওরা ঘুরে গিয়ে এক উৎরাই বেয়ে নামতে লাগল। ২০।৩০ ফুট নেমেছে কি আবার ফাটল। ফাটলের এই গোলকধাঁধা ওদের যেন কিছুতেই আর এগোতে দেবে না। পরিশ্রান্ত হয়ে, হয়রান হয়ে ওরা সেখানেই বসে পড়ল বিশ্রাম নিতে।

প্রায় দু মাইল এসেছে ওরা। বেলা দুটো বেজে গেছে। দু মাইল পথ আসতে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগল। পাঁচ ঘণ্টা! সুকুমার বিরক্ত হল। সামনে, বেশ খানিকটা দূরে, নন্দাঘুণ্টি "কল্"। দূরে হলেও বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে সুকুমার। 'কল্'টার আকার অনেকটা ইংরাজী "ইউ" অক্ষরের মত। রুন্টির দিকে যে বাহুটা, সেটা অপেক্ষাকৃত ছোট। নন্দাঘুণ্টির দিকের বাহুটা বড়। খুব হাওয়া দিচ্ছে। হাওয়ার তোড়ে তুষারকণিকা উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। হিমবাহটা এখান থেকে বেশ কিছু দূরে ক্রমাগত নেমে গিয়েছে, তারপর ধীরে ধীরে আবার উঠতে শুরু করেছে। উঠতে উঠতে ক্রমে "কলে"র সঙ্গে মিশে গিয়েছে। সুকুমাররা আর এগোল না। চারিদিক চেয়ে দেখল, কাছাকাছি শিবির করবার মত জায়গা নেই। বুঝতে পারল "কলে"র কাছেই কোথাও শিবিরটা করতে হবে। তবু আর এগোল না। ফাটলের এই জটিল ধাঁধার ভেতর দিয়ে পথ করেই ফিরতে হবে। ওরা আর দেরি করা যুক্তিযুক্ত মনে করল না। ওখানেই মাল নামিয়ে রেখে ফিরে চলল ২নং শিবিরে।

প্রায় ৫॥টায় ফিরে এল ওরা। সুকুমার দেখল ১নং থেকে দিলীপ, বিশ্ব, নরবু আর

৩নং শিবির ফটো—দিলীপ ব্যানার্জি

ফুতার এসেছে। অ্যাডভান্স থেকে এসেছে মদন। আর কি তাজ্জব, আজীবা আজ সকালে সেই বেস ক্যাম্প থেকে যাত্রা করে, এরই মধ্যে একেবারে ২নং শিবির পর্যন্ত চলে এসেছে! নরবু আর ফুতার মাল রেখে ১ নম্বরে নেমে গেল।

২নং শিবির আজ লোকে লোকারণ্য। সব সমেত ওরা দশজন। একটা তাঁবুতে সুকুমার আর নিমাই, একটা তাঁবুর মধ্যে দিলীপ, বিশ্ব আর মদন, বড় তাঁবুটাতে আঙ শেরিং, গুন্দিন, টাসী আর দা তেম্বা। আজীবার কোন তাঁবুতেই জায়গা হল না। সে বাইরেই শুয়ে থাকল।

সুকুমার ফিরে এসে দেখল, নিমাইয়ের শরীর আরও খারাপ হয়ে পড়েছে। কয়েকবার বমিও করেছে। কিছুই খায়নি।

রাতে ঠিক হল, কাল আজীবা শেরপাদের সঙ্গে রাস্তা দেখতে যাবে। দুটো অ্যাসল্ট পার্টি করা হবে, এটাও সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। প্রথম পার্টি যদি সফল না হয় তবে দ্বিতীয় পার্টি পরের দিনই চূড়ার দিকে অভিযান চালাবে। এও ঠিক হল নিমাইয়ের যদি শরীর ভাল হয়ে যায়, তা হলে দিলীপ আর নিমাই প্রথম পার্টিতে থাকবে। দ্বিতীয় পার্টি সুকুমার, বিশ্ব আর মদনের মধ্যে থেকে ঠিক করা হবে।

২০শে অক্টোবর। ২নং শিবির। আবহাওয়া এখনও ভাল। আকাশে মেঘ নেই। পরিষ্কার রোদ। সকাল ৮॥টার মধ্যেই শেরপারা মাল নিয়ে বেরিয়ে গেল ৩নং শিবির স্থাপন করার জন্য। ২নং শিবিরে বিশ্রাম নিল সুকুমার, বিশ্ব, দিলীপ, মদন আর নিমাই। নিমাই ভেঙ্গে পড়েছে। আরো কয়েকবার বমি করেছে। ওর মাথায় যন্ত্রণা।

আঙ শেরিং, আজীবা, গুর্নদিন, টাসী আর দা তেম্বা সন্ধ্যার সময় ফিরে এল। ওরা এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, এসে কথা পর্যন্ত বলতে পারল না। চুপচাপ বিশ্রাম নিতে লাগল। অনেকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, চা খেয়ে, তারপর সুস্থ হল।

আজীবা বলল, আগের দিকে রাস্তা আরও খারাপ। ফাটলের সংখ্যা, যতই এগোনো যায়, ততই বাড়তে থাকে। একটা চড়াইয়ের মুখে এমন ভয়ঙ্কর ফাটল যে পড়ে যাবার ভয়ে ওদের পাহাড়ের গায়ে পিটন পুঁতে দড়ি টাঙিয়ে রাস্তা করতে হয়েছে।

আঙ শেরিং বলল, আমরা ৩নং বানাতে পারিনি। জায়গা খুঁজতেই দম বেরিয়ে গেছে। সবাই ৩নং শিবিরে একসঙ্গে যেতে পারবে না। অত তাঁবু ফেলার জায়গা পাওয়া যাবে না। আর ওদিকে যে রকম হাওয়া তাতে আর্কটিক তাঁবুগুলো কাজে লাগবে না। হাই অল্‌টিচুড ডবল তাঁবু যেটা আছে, সেইটে নিয়ে যেতে হবে। ৪নং শিবির বানাতে পারা যাবে কিনা, বোঝা যাচ্ছে না। বোধ হয় সম্ভব হবে না।

৩নং আর ৪নং শিবিরের জন্য যে খাবার আছে, যদি ২।১ দিন বিলম্ব হয়, তাতে কুলোবে কিনা সন্দেহ। এই খবর পাওয়ার পর সুকুমার বলল, যত শীঘ্র সম্ভব, চূড়ায় অভিযান করতে হবে। নিমাই অসুস্থ, অতএব "অ্যাসল্ট পার্টি" আবার নতুন করে ঠিক করতে হবে।

আবার পরামর্শ হল। আঙ শেরিং বলল, যে-রকম রাস্তা দেখছি, আমার মনে হয়, প্রথম দলে চারজন শেরপা আর দুজন সাব্ থাকুক। দ্বিতীয় দলে থাকবে দুজন সাব্ আর তিনজন শেরপা। প্রথম দলে আমি যাব আর যাবে আজীবা, নরবু আর

টাসী। এখন তোমরা ঠিক কর, প্রথম দলে কাকে কাকে পাঠাবে।

সুকুমার দেখল ওরা চারজনই "ফিট" আছে। নিমাই শুধু অসুস্থ। ও ভাবতে লাগল। দিলীপ বলল, এ ব্যাপারে লটারি করাই ভাল। যার নাম উঠবে, সেই ভাগ্যবান। এ-কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মদন আর বিশ্ব বলে উঠল, লটারি-ফটারিতে আমরা নেই। সুকুমার দলের নেতা, বিজয়ের গৌরব করায়ত্ব করার সুযোগ ওকেই প্রথমে দেওয়া হোক, আর দিলীপের নাম ত আগেই ঠিক হয়েছে। দ্বিতীয় দলে আমরা থাকছি।

সুকুমার দ্বিরুক্তি না করে এই পরামর্শ গ্রহণ করল। ঠিক হল, কাল সকালেই প্রথম দল তৃতীয় শিবিরের দিকে যাত্রা করবে। শিবির স্থাপন করবে। ২২শে অক্টোবর চূড়ায় অভিযান চালাবে। দ্বিতীয় দল ২৩শে অক্টোবর সকালে ৩নং শিবিরে যাবে।

রাত্রে ওদের মনে পড়ল, আজ কালিপুজো ওরা খানিকক্ষণ হইহুল্লোড় করল, তারপর শুতে গেল।

রুণ্ট পাহাড়ের পাথুরে শরীর ফটো—দিলীপ ব্যানার্জি

২১শে অক্টোবর সকাল ৯॥টায় সুকুমার, দিলীপ আর সাতজন শেরপা ২নং শিবির থেকে ৩নং শিবিরের দিকে যাত্রা করল। মদন আর বিশ্বদেব ওদের এগিয়ে দেবার জন্য পাঁচিলের উপর উঠে এল। সুকুমার আকাশের দিকে চাইল। পরিষ্কার, গাঢ় নীল, ঝকঝকে আকাশ। সুকুমারের মন প্রসন্ন হয়ে উঠল। হে ঈশ্বর, সে মনে মনে প্রার্থনা জানাল, হে বিশ্বনাথ, নন্দাদেবি! আর বড় জোর তিনটে দিন এমন আবহাওয়া রাখ, তিনটে দিন, তা হলেই আমাদের সকল পরিশ্রম সার্থক হবে।

সুকুমার সোজা দক্ষিণে চাইল। ঐ যে দূরে নন্দাঘুণ্টির চূড়া। তার মনে হল, প্রসন্নবদনে যেন তাদের দিকে চেয়ে আছে। পিছনে চাইল সুকুমার। বিশ্বদেব আর মদন দাঁড়িয়ে আছে ২নং শিবিরের বরফের পাঁচিলের উপর। আরে, আরে! থমকে দাঁড়াল সুকুমার। দিলীপ কয়েক পা এগিয়ে গেল। কিন্তু তার আগেই বিশ্ব আর মদন ধরে ফেলেছে নিমাইকে। অসুস্থ শরীর নিয়ে টলতে টলতে পাঁচিলের উপর উঠে এসেছে নিমাই। এসেছে প্রথম শিখর-অভিযাত্রীদের অভিনন্দন জানাতে। সব কষ্ট হজম করে প্রবল চেষ্টায় নিমাই মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল।

বলল, "জয়যাত্রায় যাও গো, ফিরে এসো জয়রথে, নিরাপদে।"

বিশ্বদেব আর মদনও তার সঙ্গে গলা মিলাল।

সুকুমার, দিলীপ আর সাতজন শেরপা সাবধানে নেমে গেল প্রথম উৎরাইটা। তারপর একটা চড়াইয়ের উপর ওদের দেহ ক'টা একবার ভেসে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা একে একে হারিয়ে গেল আরেকটা উৎরাইয়ের অন্তরালে। আর তাদের দেখা গেল না।
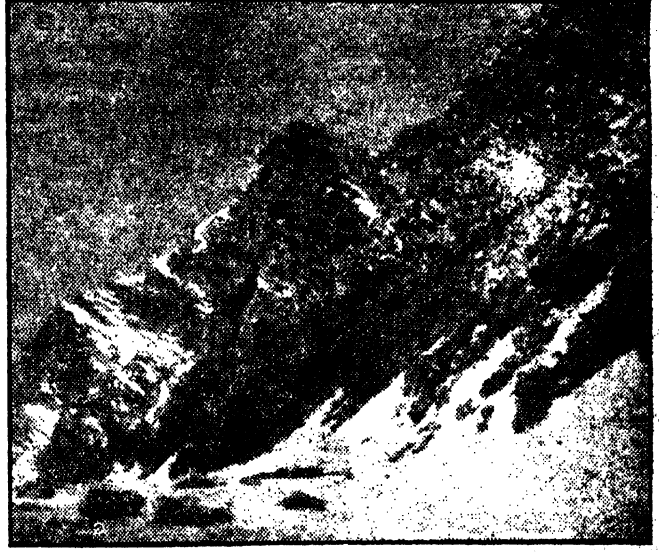
বিশ্বাস, মদন আর নিমাই ফিরে গেল তাঁবুতে।

বীরেন সিংহের দিনলিপি থেকেঃ

২১শে অক্টোবর। অ্যাডভান্স বেস্। আজ আর কিছুই ভাল লাগছে না। বাইরে যে বসার জায়গা করা হয়েছে, সেখানে বসে তাস খেলছি। দুপুরে প্রায় ১২টা নাগাদ ধ্রুব নিচ থেকে এল। তাস রেখে গল্প-গুজব শুরু হল। ধ্রুবকে আমার নেমে আসার ঘটনা বললাম। বেলা ১॥টায় খেতে বসলাম। আজও কিছু মাংস ছিল। সেটা রান্না হল। খাওয়া-দাওয়া সেরে ধ্রুবর ফিরে যাবার কথা। কিন্তু সে অপেক্ষা করতে লাগল। আক্কেল বাহাদুর উপরে গিয়েছে। যদি কিছু খবর আনে। আক্কেল বাহাদুরও উপরে যাচ্ছে! এরা বরফকে যমের মত ভয় করত! এরাই আনন্দধুরো অতিক্রম করতে আপত্তি জানিয়েছিল! আমাদের পাল্লায় পড়ে এখন হাই-অল্টিচ্যুড পোর্টার বনে গেল এরা।

বারে বারে উপরের দিকে চাইছি। কারো দেখা নেই। ধ্রুব অধৈর্য হয়ে উঠেছে। ওর দেরি হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। কফি তৈরি হল। কফি খেয়ে ধ্রুব আর বিলম্ব করতে চাইল না। বেলা সাড়ে চারটা বেজে গেল। ও উঠবে উঠবে করছে, এমন সময় উপরে দুজন লোককে দেখা গেল। এখনও চেনা যাচ্ছে না, আরেকজন কে?

...বে একজনের পিঠে বেশ বোঝা আছে মনে হল। নিশ্চয়ই কেউ নেমে আসছে। সন্দেহ হল, কেউ হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ধ্রুব নিদারুণ ঝুঁকি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রায় পাঁচটা। এই ওরা নেমে এল। নিমাই নেমে এসেছে আঙ্কেলের সঙ্গে। অসুস্থ। পথশ্রমে কাতর। ডাক্তার তক্ষুনি তাকে পরীক্ষা করল। জানাল, ভয়ের কিছু নেই। কোষ্ঠকাঠিন্যের দরুনই ওর শরীরটা খারাপ হয়েছে। ধ্রুব নিচে নেমে গেল। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে।

নিমাই জানাল, রায়, দিলীপ আর সাতজন শেরপা ৩নং শিবিরে আজ সকালেই যাত্রা করেছে। ওরা কাল "কলে"র উপর ৪নং শিবির স্থাপন করবার চেষ্টা করবে। কিংবা চূড়াতেও অভিযান চালাতে পারে।

(ক্রমশ)

নিউ ইয়র্ক নিউ ইয়র্ক—প্যারী প্যারী। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও নিউ ইয়র্কের সেণ্ট্রাল পার্কের ধারে সারি সারি খোলা কাফে এবারেও বসান সম্ভব হল না। অথচ সেণ্ট্রাল পার্কের মত এমন সুন্দর মাঠের ধারে এত সুন্দর খোলা কাফে সচরাচর আর কোন শহরের কপালে জোটে। সেণ্ট্রাল পার্কের কাছে হাইড পার্ক—যাক, তুলনা নাই করলুম। এমন সুন্দর পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও নিউ ইয়র্কে প্যারীর অনুরূপে খোলা কাফে কেন চলবে না? অজুহাতটা হল, ওসব খোলা কাফে-টাফে আর যেখানেই চলুক, নিউ ইয়র্কে চলবে না, চলতে পারে না। কার অত অখণ্ড সময় আছে যে, সব কাজ হেলায় ফেলে কফির কাপে চুমুক দিয়ে দু দণ্ডের মধ্যে বিশ্ব-সংসার ভুলে রাজপথের অকারণ দার্শনিক বনে যাবে! তার চেয়ে আমেরিকায় যা খুললে চলবে—শুধু চলবে—তরতর করে চলবে—তাই খোলা ভাল। শুনবেন সে বস্তুটা কি? কার্নিভাল!

আমেরিকায় কফি-খাইয়ের অভাব আছে, এ কথা কস্মিনকালে বলতে চাইছি না (পরন্তু আমেরিকার মত ভাল কফি পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় কিনা তাই ভাবছি)। বলতে চাইছি যে খোলা মাথার নীচে টেবিলের সঙ্গীর কাছে ঘন হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মশগুল হয়ে বসে থাকার নেশা আমেরিকানদের নেই। এলে আর গরম কফি গিললে, যাই বলে দুম করে চলে গেলে, তাতে আর যাই হোক খোলা কফির আড্ডা জমে না। এমন অকারণে কালহরণ করার পাত্র এরা নয়। এদের কানের কাছে ডলারের মৌমাছি সব সময়ে গুনগুনিয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেঃ Time is money, money is time..

ডলারের মৌমাছি

নিউ ইয়র্কের যে অংশটি প্যারীর হাওয়া-লাগা সেই গ্রীনিচ ভিলেজ-এর এক অখ্যাত রেস্তরাঁয় দশ মিনিট আগে বন্ধু হিসেবে পাওয়া সেই ফরাসী জীবটির মন্তব্যটি আপনাদের কাছে পেশ করা যাক: খবর কি রাম, আমেরিকান মেয়েদের জুতোর হিলে '707 jet'-এর ইনজিনের গতিবেগ জড়ানো। অর্থাৎ আমেরিকান মহিলারা দারুণ fast।

—জুতো তো উল্টে দেখিনি, তবে ফ্রেঞ্চ মেয়েদেরে চেয়েও তারা fast চলবে?

—অন্য বিষয়ের তুলনা রাখ, তবে চলার, অর্থাৎ ফুটপাতের ঘোড়দৌড়ে আলবাত হ্যাঁ।

যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা। কিন্তু রোজমারীর ধারণা অন্যরকম। রোজমারীর নামে এই মার্কিন মহিলাটি রকফেলার ইনস্টিটিউটে ছিলেন, আমাদের সঙ্গে প্রায়ই লাঞ্চ নিয়ে বসতেন। তাঁর

লাবণ্যের তরঙ্গভঙ্গ
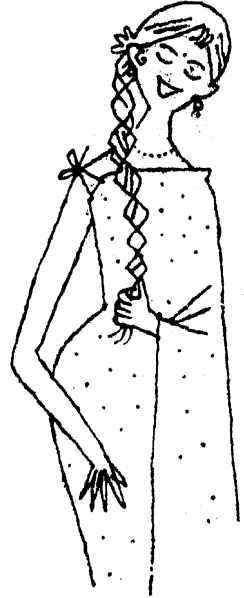
আমাদের টেবিলে বসার কৌতূহল যে ছিল, তা ধরে ফেলতে বেশীদিন লাগে না। উনি কি বলতেন, সে প্রসঙ্গ শুনতে পেলে আপনারাও বুঝতে পারবেন। তাঁ সখেদে আক্ষেপ করে প্রায়ই শোনাতেন যে আমেরিকান মেয়েরা আর যাই পারুক তাঁরা ফুটপাতে চলতে জানেন না। তাঁর মতে, ভারতীয় মেয়েরাই নাকি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে গ্রেসফুল ভাবে চলেন। রোজমারীর বিস্ময়ের অবধি থাকত না কেমন করে এই শাড়ি-পরা বন্দী অবস্থা

আমাদের মেয়েরা এত অপরূপ ভঙ্গিমায় ফুটপাথে লাবণ্যের তরঙ্গ ভঙ্গ করেন। তাঁর ধারণা, আমাদের মেয়েরা ছোটবেলা থেকে শেখার মত নিশ্চয়ই কোন আর্ট স্কুলে গিয়ে চলতে শিখে আসে। আমি অবশ্য তাঁর ভুল ভাঙতে "ইকোন দ মাসী-পিসির" ঠিকানা কবুল করিনি। যার যা ধারণা, তা নিজের কাছে থাকাই ভাল। শুধু যা ন্যায়সঙ্গত হত, তা হল ওই ফরাসী বন্ধুটির সঙ্গে যদি এই মার্কিন মহিলাটির একটিবার যোগাযোগ করে দেওয়া যেত, তা হলে এঁদের দুজনের চার চোখের দু রকম দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে পথে চলে যাওয়ায় মায়াজাল ছড়ান গরিমাকে এক করবার সুযোগ হয়ত মিলত।

নিউ ইয়র্কে তিরিশ বছরের উপর হার্লেমে মাংস-ভাত বিক্রি করে প্রচুর ডলার জমিয়েছেন নূরুল মিঁয়া। এখন চোখে আগেকার মত সব কিছুই অত স্পষ্ট করে ঠাওর হয় না। তবু ডলার গুণতে কিম্বা রঙিন স্কার্ট-পরা কেউ হেলেদুলে কুতূহলে চোখের সামনে দিয়ে চলে গেলে ঠাওর করতে পারা একেবারে অসম্ভব হয় না। মিঁয়ার দোকানে খেতে গেলে 'পারসি' মাছের ঝাল আর ভাতের প্লেট সামনে ধরে জানলার দিকে ফিরে মিঁয়া মনে মনে বকবক করে প্রায়ই বলত, এনারা বাড়িতে পান্ত চড়িয়ে পথে নামেন তাই এমন হনহনিয়া। রেস্তরাঁর কাচের

চোখের ঠাহর

জানলার দিকে আপনি ফিরে তাকাতে না তাকাতে হয়তো দেখতে পেলেন ত্বরিত-গতিতে কোন এক অপসৃয়মাণ ব্লাউজের একাংশ চকিতে মিলিয়ে গেল। মিঁয়া-সাহেব প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লম্ফ দিয়ে বোমা-পড়া জাহাজ থেকে উধাও হয়ে যায়। তারপর সাঁতার দিয়ে কূলে মিলল ফরাসী উপকূলে। সেখান থেকে ফেরারী ফৌজের আগমন নিউ ইয়র্কে। সেখানে গিয়ে মাংস-ভাতের কারবারে হয়ে উঠলেন লাল। আবার বিয়ে-সাদি হল একজন পুয়েটোরিকান হনহনিয়ার সঙ্গে—তার কল্যাণে পুত্র-কন্যায় ভরে উঠল সংসার। তবু মিঁয়ার মন হনহনিয়া ঘরে এনেও দেশের ছেড়ে-আসা সংসারের কথা কখনও ভুলল না। সেই আসল সংসারের খোদজনাটির কথা নিউ ইয়র্কে সন্ধ্যা হলে মনে হত. কেমন তিনি আশমানী রঙের শাড়ি পরে এমন সাঁজের বেলা পুকুর পাড় থেকে কাঁকালে জলভর্তি কলসী নিয়ে মন্থরগতিতে বাড়ির দিকে চলেছেন। স্বপ্ন হলেও এসব কথা সত্যি—দূরের সত্যি। দিনের আকাশে যেমন সব তারাই থাকে লুকোনো।

অনেক উচ্চ আশা নিয়ে এসেছিল নিত্যানন্দ পারেখ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী করবে অদৃশ্য ইলেকট্রনরা কি করে নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে হনহন করে। মিঁয়ার হোটেলে নিত্যানন্দ ভালমানুষের মত আসত—এসে গোগ্রাসে মাছ ভাত গিলত আর কান দিয়ে ওই হনহনিয়াদের গল্প শুনত আড়চোখে চেয়ে। তারপর দেখা গেল, নিত্যানন্দকে আর ল্যাবরেটরীর চতুঃসীমার মাঝে বসিয়ে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথায় কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় আর কোথায় ফিল্ম এভেনু। নিত্যানন্দ ডাগর-ডোগর সুবেশা মার্কিন মহিলার চোখের চতুরতায় আর তাঁর মিঠে চরণের বুলিতে ভুলে পড়ি কি মরি করে পেলেন ড্রেসে ডিটেকটিভের কাজ নিয়ে বসল। বিনা বাক্যব্যয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা

এমনি কোন ছাতি বগলে সুঠাম তন্বীর পিছু নিয়ে চলল তো চলল। ফিফথ এভেনু ধরে 42 street-এ। সেখানে এসে মেসি নামক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস-এ। মেসি একটি প্রকাণ্ড বিস্ময়—সেখানে মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসের সমাবেশ। মহিলার দৃষ্টি এ সব কিছুকে পলে পলে তিলে তিলে লেহন করে চলে—নিত্যানন্দের দৃষ্টির সামনে ওই মহিলা একখানি আলেয়ার মত কেবল পিছিয়ে পিছিয়ে চলেন। তিনশো কাউণ্টারে দু'শ জিনিস নামিয়ে না কিনে মহিলা রাস্তায় নামলেন দেড় ঘণ্টা বাদে। মেসি থেকে গিম্বলস। গিম্বলস আর একটি প্রসিদ্ধ ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরস। সেখান থেকে স্যাকস। এমনি করে সারা দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেলে গিয়ে পেণছল তখন মহিলাটি রাস্তা ছেড়ে সাবওয়েতে ট্রেন ধরতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। নিত্যানন্দ দেখলে রাস্তায় নামলেই মহিলাদের পায়ে পাল্কী বহার স্পীড এসে পড়ে। এতক্ষণ এত ঘুরে কিছু না কিনে শুধুমাত্র দৃষ্টির প্রসন্নতা অর্জন করে মহিলাটি যখন হঠাৎ সাবওয়ের গর্তের মধ্যে প্রবেশ করলেন তখন আপনা থেকেই মিয়ার কথা মনে পড়ে যায়—নিশ্চয়ই এতক্ষণে বিবির মনে পড়েছে বাড়িতে পাকত ঘুটিতে শুরু করেছে। শুভবুদ্ধির উদয় হয় কিন্তু নিত্যানন্দের মনে—তাই ক্যলিফর্নিয়া রিসার্চ ছেড়ে আবার ভালমানুষের মত ফিজিক্সে মনোনিবেশ করে।

আমেরিকান মহিলারা যদি রাজপথে এত নাটকীয় না হতেন তাহলে মার্কিন দেশের এবং দশের জীবনের অনেক নাটকই ঘটত না। তাঁরা ছোটেন তাই তো তাঁদের পিছু পিছু দৃষ্টিও ছোটে। নিত্যানন্দ পারের তাহলে দোষটা কোথায় করল? নিত্যানন্দ সেদিন দলে ছিল না—এ কথাটা বলেই শুরু করা যাক। আমরা কজন সেণ্ট্রাল পার্কের ধারে একটি বেঞ্চে জমিয়ে বসেছি এবং গরম গরম কাঠবাদাম ভাজা সদ্ব্যবহার করছি। সেদিনটি ছিল তুষারপাতের পরের দিন। সারা সেণ্ট্রাল পার্ক, পথঘাট সবকিছুর উপর বরফের সাদা আস্তরণ বিছানো রয়েছে। একজন মাঝবয়সী মহিলা বেঞ্চের ওপাশটায় এসে স্কার্ফ থেকে বার করলেন বিস্কুটের টুকরো—সন্ধ্যাসকাল শীত গ্রীষ্মের বাসিন্দে এখানকার হল নানারঙের পায়রাগুলো। বিস্কুট বিতরণের পর পরমানন্দে পায়রারা বকবকম করে বিস্কুটের টুকরো বরফের উপর থেকে তুলে খাচ্ছে। নিউইয়র্কে যেখানে সবকিছু ছুটেছে রকেটের গতিবেগে, সেখানে এইরকম একটি অবসরের মনোরম দৃশ্য দেখে আমরা চমকে উঠেছি এবং মনে মনে এই মহিলার দু' দণ্ড সময় অপব্যবহারের প্রশংসায় মোহিত হয়ে উঠেছি। এই পারাবত-দরদী মহিলাটি
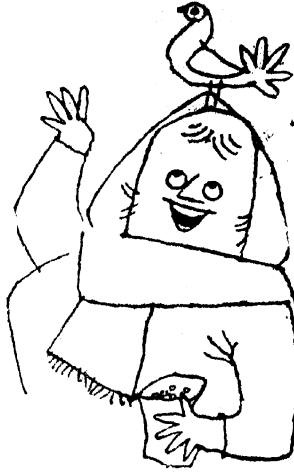
পারাবত-দরদী

সুন্দর বরফের উপরে পারাবতের বকবকম ছবি নেবার জন্যে চৌধুরী ক্যামেরা উঁচিয়ে ওদিকে হানা দিল। চৌধুরী গিয়ে পেণছতে না পেণছতে শুনতে পেল মহিলাটি দু গলের আমার পায়রাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করছেন। চৌধুরীর ছবি নেওয়ার পর মহিলা ফরাসী সুরে মাখানো ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বললেন—দেখ না, আমার প্যারী ছাড়ার পর থেকে এরাই এখানে আমার রোজকার পুষ্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের না খাইয়ে আমার কি গত্যন্তর আছে?

চৌধুরী এসে ঘোষণা করল—আমেরিকান না ছাই, এ যে একেবারে ফ্রেঞ্চ বাবা।

মিত্তির বললে—'বাবা নয়, বল

'মা।'

আমেরিকার কালেন্ডারে পৃথিবীর সব দেশের মত সপ্তাহটা সাতদিনের থাকলেও দেখা যায়, বস্তুত তা পাঁচদি হ্রস করে নিঃশেষ হয়ে গেছে। শনিবা উইকেন্ড-সপ্তাহের মধ্যে ধর্তব্য নয়। বলতে সোম-মঙ্গল-বুধ-বৃহস্পতি-শু পর্যন্ত। সোমের আগে রোব আর পরে শনি কাজের দিন নয়। শুক্রবার থেকেই সবাই উইকেন্ডের স্বপন দে শুরু করে—লাঞ্চ হতে না হতে অনে উইকেন্ড শুরু হয়ে যায়। তখন কে কো তার হিসাব কে রাখে। সারা সপ্তা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর তখন উর্ধ্বশ্বা সবাই শহরের বাইরে দূরে অন্য কো চলে যেতে ব্যস্ত। মুঠোর মধ্যে এক হা উইকেন্ডের ব্যাগ অন্য হাতে প্রিয়বান্ধব আঙ্গুলে। কখনও কখনও যখন শ রবিবারের সঙ্গে আগে বা পিছনে একটা ছুটির দিন এসে যুক্ত হয়, তখন কাকে পায়? তখন কত দূর যে হয় নিকট মোটরের এক্সেলারেটারের কৃপায় কহতব্য নয়।

এদের রক্তে দূরের নেশা। তাড়নার হা

এরা পুতুল। জৈবজীবনের অন্ধ উদ্দীপনায় এরা ভরপুর। কিসের ভাবোম্মাদনায় উৎস এদের মনে প্রাণে এত ছুট লাগিয়ে দিয়েছে। তার হিসাব মিলান সহজ নয়। সেদিনটা উইকেণ্ড ছিল না। চারটে না বাজতে বাজতেই আমাদের হাতের কাজ ফুরল। অথচ এত সকালে বাড়ি-ফেরা? অভাবনীয়। কারণ প্রত্যেকের অপরপক্ষরা তখনও তাঁদের কাজে মগ্ন—৬টার এক চুল আগে তাঁদের পাত্তা পাওয়া যাবে না—তাই শূন্য এপার্ট-মেণ্টে ফিরে গিয়ে বসে থেকে কি হবে?

এলবার্ট প্রস্তাব করলে—তার চেয়ে চল একটু কফি খেতে খেতে সময়ের মাথা খাওয়া যাক। সাগ্রহে রাজি হয়ে বললুম—বেশ তো, নীচের রেস্তরাঁয় গিয়ে কফি নিয়েই বসা যাক। বাধা দিয়ে এলবার্ট বললে—না, না, নীচে নয়, তার চেয়ে চল আমি জানি একটা রেস্তরাঁ আছে এখান থেকে এই একটু দূরে।

গাড়িতে গিয়ে উঠে বসা গেল। উঠে শুনলুম, 'এই একটু দূরে' যা উনি বল-ছিলেন সেটা নিউ ইয়র্ক থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে। মার্কিন দূরত্বে হয়তো এটা কিছুই নয়—কিন্তু আমাদের পক্ষে? কলকাতা থেকে প্রায় বর্ধমানের কাছাকাছি গিয়ে গলা কফিতে ভিজিয়ে আবার পরমুহূর্তে ফিরে আসা! যেখানে ছোট টেবিলের ধার, আন্তরিক সঙ্গ আর মিষ্টি কফি বা চা

ইণ্ডিয়ানা প্রেম

পেলেই ক্লান্ত হতে রাজি, সেখানে এদের কাছে ত্বরা করাটাই আনন্দ। বলা বাহুল্য, সেদিন এলবার্ট আমাদের কফি খাইয়ে আবার প্রায় যথাসময়েই বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল।

সারা আমেরিকা গতির নেশায় পাগল। অনন্ত কৌতুক, অন্তহীন উদ্দীপনা এদের রক্তে রক্তে। পেট্রোলের রসে এরা এমনি করেই ছুটে বা উড়েই বাড়ায়। নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটানে জন্মাল। বড় হয়ে উঠল বালটিমুরে, কলেজে গেল ক্যালিফোর্নিয়াতে। ইণ্ডিয়ানাতে গিয়ে প্রথম প্রেমে পড়ল। তারপর সিকাগোতে আর একাকো এবং সেইহেতু ঘরবাঁধা। পরে কর্মজীবন গড়ে উঠল ফিলাডেলফিয়াতে। পরে বসটনে গিয়েও মন বসতে চাইল না—নতুন করে আরও কত কি ঘটবার সম্ভাবনা আমৃত্যু অপেক্ষা করে বসে আছে তার সব হিসাব দেওয়া কারও সম্ভব নয়। সারা আমেরিকায় তাদের ঘর ছড়িয়ে আছে। গতির ঘূর্ণি-পাকে ঘুরে ঘুরেই ওদের প্রাণান্ত।

এই দারুণ ছোটাছুটির রাজত্বে আমে-রিকার গ্রামগুলো শহরের তুলনায় গতির অদ্ভুত একটা সমতা এনেছে। নিউ ইয়র্কের আকাশে সিং ঢোকান বাড়ির রণসজ্জা ছেড়ে একটু দূরে গেলেই ছবির মত সুন্দর গ্রামের চেহারা নজরে পড়ে। নিউ ইয়র্কে একটা সেণ্ট্রাল পার্ক। শহরের বাইরে এমন সবুজে মোড়া অগুনতি পার্কের মেলা। আমেরিকার গ্রাম ভারি সুন্দর। গ্রাম বলতে আমরা যা বুঝি এসব গ্রাম তেমনটি নয়। এ যেন শহরের অপভ্রংশ। আমেরিকান চাষীমশাই আমাদের আপ্যায়িত করে তাঁর পুরোনো স্টাইলের বাড়িতে সাগ্রহে আহ্বান করেন। বাড়িতে কুয়ো থেকে পাম্প উঠেছে, ছায়াঘন বারান্দায় রকিং চেয়ারে বসে বাইরে মাঠে দেখা যায় ওই ট্রাকটার মাঠে পড়ে আছে যার জমি চাষের ক্ষমতার কাছে মানুষের হিম্মত কত খাটো। ভ্যান-গগের তুলিতে আঁকা যেন সব এখানকার ঘরবাড়ি। ভাল ডেকনের স্যুটপরা, মুখে পাইপ, ঘরে টেলিভিসন, গ্যারেজে গাড়ি, ব্যাঙ্কে ডলার নিয়ে এখানকার চাষী বাস করছেন শহরের ব্যস্ততার বাইরে। যদিচ গাড়িতে চেপে বসলেই শহরে গিয়ে সিনেমা দেখে আসা যায়। আর গ্রাম যাকে বলছি সেখানেও বিজলী বাতি, পাকা রাস্তা আর রোজকার ব্যবহার্য যাবতীয় সবকিছুই এখানকার স্টোরস্-এ পাওয়া যায়। আমাদের দুঃস্থ কৃষকের সঙ্গে এদের কৃষকের প্রভেদ যে কত!

গতির টাগ-অব-ওয়ারে পড়ে ম্যানহাটানের আকাশ-ছোঁওয়া বাড়ির বহু বাসিন্দে উইকেণ্ডে তাই গ্রামের ছোঁওয়া পেতে শহর ছেড়ে চলে আসে। নিউ ইয়র্কে আশৈশব কাটিয়েছেন এমন এক মার্কিন বন্ধু এইসব প্রসঙ্গ উঠলেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, নিউ ইয়র্ক হল wonderful place to visit and a great place to do business. কিন্তু বার মাস থাকার পক্ষে.........। শখ করে যারা দু'দিনের তরে থাকতে চায় এখানে তাদের কাছে উৎসবের পসরা হাতে রূপসী নিউ ইয়র্ক হল তুলনাহীনা, সে অনন্যা।

(৩২)

কফি বারের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মারিয়া মালিকানের সংগে গল্প করছিল, সৌরেনকে ঢুকতে দেখে সোচ্ছ্বাসে তার করমর্দন করে বলল, ঠিক সময় মত তুমি আমায় চিঠিটা লিখেছিলে সৌরেন। তোমার কাছে আমি যে কতখানি কৃতজ্ঞ!

সৌরেন ইচ্ছে করে অন্য কথা তুলল, ওসব formality ছাড়ো, কিন্তু তোমাকে দেখে আমি তো একেবারে অবাক হয়ে গেছি।

—কেন?

—এই ক' মাসে বছর দশেক বয়স কমিয়ে ফেলেছ যে।

মারিয়া খিলখিল করে হাসল, এই কথাটা তোমার বন্ধুটিকে বল না?

—কাকে, রজতকে?

মারিয়া হাসল, ওর মতে আমাকে বুড়ীর মত দেখাচ্ছে, আর পয়সা খরচ করে আমার নাচ দেখতে কেউ আসবে না। বরং পচা টোমাটো ছুঁড়ে নাচ থামিয়ে দিতে পারে।

কথা শুনে সৌরেনও হাসল, চল কোথাও বসা যাক।

মারিয়া তাকে নিয়ে গেল নীচে বেসমেণ্টে। পাশাপাশি বসে কফির অর্ডার দিল।

সৌরেন বললে, রজত যখন তোমার চেহারার এত নিন্দে করেছে, বুঝতে হবে তোমার রূপে ও মুগ্ধ হয়েছে। কারণ রজত যা ভাবে, মুখে বলে ঠিক তার উল্টো কথা।

মারিয়া সজোরে হাসল, এতদিনে দেখছি তোমার বন্ধুটিকে ঠিক চিনতে পেরেছ।

মারিয়া আজ সৌরেনকে এখানে ডেকে এনেছিল তার কাছে জানবার জন্যে কী হয়েছিল রজতের। কতদিন হাসপাতালে ছিল, বিশেষ করে ডাক্তাররা কোন বিষয় সাবধান হতে বলেছিলেন কিনা?

সৌরেন একে একে সব কথা বলে গেল।

মারিয়া সজল কণ্ঠে বলে, সত্যি সৌরেন, তুমি না থাকলে রজতের কী হত বলা যায় না। এভাবে আবার হয়তো তাকে ফিরে পেতাম না।

—তুমি এখন লণ্ডনেই থাকবে তো?

—আর কি রজতকে একলা ফেলে রাখা যায়। বেচারী রুগ্ন মানুষ। তা ছাড়া যথেষ্ট শিক্ষাও হয়েছে ওর।

সৌরেন কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না, প্রশ্ন করল, তার মানে?

মারিয়া ম্লান হাসে, আমি চেয়েছিলাম রজত বুঝুক কতগুলো থিয়োরী দিয়ে জীবনটাকে চালানো যায় না; থিয়োরী আর প্র্যাকটিসে অনেক তফাত। আমি জানি রজত কোনদিন একলা থাকতে পারবে না। অথচ ও কোনদিন সে কথা স্বীকার করতো না, বলতো একলা থাকার মধ্যেই নাকি সবচেয়ে বেশী আনন্দ। সেইজন্যে ইচ্ছে করে আমি কণ্টিনেণ্টে চলে গিয়েছিলাম। দেখছিলাম রজত একলা থাকতে পারে কিনা? না, ও পারেনি, হেরে গেছে।

—রজত সে কথা স্বীকার করেছে?

—স্বীকার তো রজত কোনদিন মুখে করবে না।

সৌরেনের হঠাৎ কী মনে হওয়ায় প্রশ্ন করলো, রজত তোমায় চিঠি লিখতো?

—এই ক মাসে একখানা চিঠি লিখেছিল। তাতে জানিয়েছিল লণ্ডনে সে দিব্যি আছে। সকাল থেকে উঠে পান করছে। রাত পর্যন্ত হল্লা করে বেড়ায়। রাত্রে মাঝে মাঝে লয়ার কাছে যায়। আমার কথা সে প্রায় ভুলতে বসেছে। মারিয়া একটু থেমে বলে, আমি অবশ্য পনেরো দিন অন্তর ঠিক একখানা করে চিঠি দিয়ে যেতাম। বলা বাহুল্য, কোন উত্তর পেতাম না রজতের কাছ থেকে।

—তুমি ফিরে আসায় রজত নিশ্চয় খুব খুশী হয়েছে?

মারিয়া মাথা নাড়লো, অন্তত মুখে তা প্রকাশ করেনি। আমাকে দেখে বললো, আরে কী আশ্চর্য, শেষ পর্যন্ত ঘরে ফিরে এলে? জিগ্যেস করলাম, কেন তুমি কি ভেবেছিলে আমি ফিরবো না?

রজত বললো, হাজার হোক দেশের মাটিতে, দেশের ছেলের সংগে পরিচয় হয়েছে। হঠাৎ সেসব ছেড়ে আসবে কেন? অবশ্য তুমি আসায় আমার বড় উপকার হয়েছে।

—কি রকম?

—শরীরটা খারাপ, নিজে রান্না করতে পারি না, তুমি অন্তত ক' দিন গরম গরম রেঁধে খাওয়াতে পারবে।

মারিয়া সৌরেনের হাতের উপর চাপ দিয়ে বললো, ভাবো দেখি, এতদিন বাদে দেখা হবার পর কি মধুর অভ্যর্থনা করল তোমার বন্ধু। আমি রজতকে বলিনি ওর অসুখের কথা জানিয়ে তুমি আমায় চিঠি লিখেছিলে। ওর কথাবার্তা শুনে সত্যিই আমার সন্দেহ হচ্ছিল তুমি যা লিখেছ তা সত্যি কিনা। স্বপ্নের ঘোরেও কি সে আমার কথা ভেবেছিল? চেয়েছিল আমি তার কাছে আসি? তোমার সঙ্গে যখন টেলিফোনে সকালবেলা কথা বলি, তখনও এ সন্দেহের নিরসন হয়নি। সেইজন্যেই চেয়েছিলাম তোমার সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে। অবশ্য এখন আমার মনে আর কোন রকম সন্দেহ নেই।

কথা বলতে বলতে মারিয়ার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সৌরেন তার অর্থ বুঝতে না পেরে, সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, তারপর বুঝি রজতের সঙ্গে আর কোন কথা হয়েছে?

—না, হয়নি।

—তা হলে?

—রজত যখন বাথরুমে চান করতে গেল, ওর বিছানা ঠিক করতে গিয়ে দেখলাম ম্যাট্রেসের তলায় কালো রঙের মোটা খাতাটা রয়েছে। ও খাতাটা আমার অতি পরিচিত। রজত কখনও ডায়েরী লেখে না, কিন্তু মাঝে মাঝে খেয়াল চাপলে তারিখ দিয়ে মনের কথা লিখে রাখে ঐ খাতাটায়। কেমন যেন কৌতূহল হল, তাড়াতাড়ি উল্টে-পাল্টে খাতাটা দেখলাম। একটা পাতার উপর নজর পড়তে অবাক হয়ে গেলাম। বার বার পড়লাম ওর লেখা।

সৌরেন উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করে, কি লিখেছে রজত?

মারিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে উত্তর দেয়, লাইনগুলো প্রায় আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে নিজের ফ্ল্যাটে বসে এই কথাগুলো সে লেখে, আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না। যারা বিশ্বাসী তারা বলবে তিনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন, তা না হলে এই রকম অপ্রত্যাশিতভাবে আমি আহত হলাম কেন? শুনেছি দরিদ্রের কাছে ভগবান আসেন রুটির রূপে নিয়ে, আমার কাছে কি তিনি এলেন এই আঘাতের রূপে? আমি জানি আমার এই অসুখের কথা শুনলে মারিয়া যেখানে থাক, কিছুতেই স্থির থাকতে পারবে না। সে আসবে।

কথাগুলো বলতে বলতে মারিয়ার চোখ জলে ভরে এলো, রজত যে এ ধরনের কথা লিখতে পারে আমি কখনও ভাবিনি। আমার মনে হয় এখন থেকে ও অনেকখানি বদলে যাবে।

ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে চোখ দুটো শুকনো করে নিয়ে বলল, সৌরেন, তোমার কাছে আমি সারা জীবন কৃতজ্ঞ রইলাম। রজতকে তুমি আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছ।

মারিয়ার ভাবাবেগ সৌরেনের মন স্পর্শ করে, সে গাঢ় গলায় বলে, প্রার্থনা করি তোমরা সুখী হও মারিয়া।

—ধন্যবাদ। মারিয়া উঠে পড়ে। বলে, রজত অনেকক্ষণ একলা আছে।

সৌরেন বলল, বলতে পারছি না আজ সন্ধ্যেবেলা তোমাদের বাড়ি যেতে পারব কিনা।

—কেন, তুমি যে ফোনে বললে!

—তারপর খবর পেলাম প্রমীলা খুব অসুস্থ, হয়ত কার্ডিফে যেতে হবে। সরোজদাকে আমি এখুনি টেলিফোন করব।

মারিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করে, কি হয়েছে প্রমীলার?

প্রমীলার অসুখের কথা বলতে বলতে সৌরেন মারিয়াকে নিয়ে কফি বার থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চলে পিকাডেলী সার্কাসের দিকে। যতদূর সৌরেনের জানা ছিল সব কথাই সে একে একে বলে যায়।

টিউব স্টেশন থেকে সে ফোন করল সরোজকে, সরোজদা, আমি সৌরেন কথা বলছি।

গম্ভীর গলা ভেসে এলো সরোজ রায়ের

কাল সকাল সাতটার ট্রেনে আমরা কার্ডিফ যাব।

—সকাল সাতটায়?

—হ্যাঁ, স্টেশনে চলে আসিস্।

মারিয়ার কাছে ফিরে এসে সৌরেন বলল, চল রজতের সংগে দেখা করে আসি। আমরা কার্ডিফ যাব কাল সকালে।

অনেকক্ষণ সকাল হয়ে গেছে। নার্সরা জানালার পর্দা দিয়েছে সরিয়ে। তবু প্রমীলার মনে হল অন্য দিনের তুলনায় ঘরের মধ্যে কম আলো। উঃ, পেটের মধ্যে একটা আড়ষ্ট যন্ত্রণা। শুধু পেটে নয়, ঐ যন্ত্রণাটা যেন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। হাত, পা, পিঠ, বুক প্রত্যেকটি অংগে ঐ আড়ষ্টতা। ডাক্তার বলেছে কাল তারা অপারেশান করবে। তারপর হয়ত এ যন্ত্রণার লাঘব হবে। অবশ্য অনেক কিছু নির্ভর করছে লীলাদের উপর। ওরা আজ আসে তবে তো! আর যদি না আসে?

প্রমীলা নিজেই বিস্মিত হল। এ কথা সে ভাবতে পারল কি করে? তার অসুখের কথা শুনেও লীলা না এসে চুপ করে লণ্ডনে বসে থাকবে, এও কি সম্ভব? না, লীলা আসবে। সংগে থাকবে অমিতাভ। ও ছেলেটা ভাল। কিন্তু বড্ড যেন মেয়েলী ধরনের। প্রমীলা বোঝে লীলাকে দিদি ডাকলেও অমিতাভ সব সময় তাকে দিদি হিসেবে দেখে না। সম্পর্কটা বোধ হয় একটু ঘোলাটে ধরনের। যদিও প্রমীলা এ নিয়ে কখনও কথা বলেনি। লীলার দিক থেকে যখন কোন গণ্ডগোল নেই, এ নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজনই বা কি?

কিন্তু ওদের সংগে কি সরোজ আসবে? চোখের সামনে সরোজের মুখখানা ভেসে আসতেই আনন্দে অধীর হয়ে উঠল প্রমীলা। বড় ভালো লোক। এই দূর বিদেশে সত্যিই এমন একটি লোক পাওয়া দুর্লভ ভাগ্য। ওদের দুই বোনকে আপনার জনের মত সে কাছে টেনে নিয়েছিল। এদের জন্যে অকাতরে সে কাজ করে গেছে। কিন্তু প্রতিদানে কোনদিন কিছুই চায়নি। এই অসুখটা না হলে বোধ হয় প্রমীলা বুঝতে পারত না সে সরোজকে কতখানি ভালবেসেছে। লণ্ডন ছেড়ে চলে আসার পর থেকে এমন একটি দিন কাটেনি যেদিন সে সরোজের অভাব অনুভব করেনি। সরোজের হাসিঠাট্টা, মেলামেশার টুকরো ছবি যে শুধু মনে পড়ত তাই নয়, সারা দিনের কাজের পর অবসন্ন দেহে কোথাও একলা বসলেই কানে ভেসে আসত সরোজের কণ্ঠের গানগুলো। এক একদিন তার মনে হত স্পষ্ট সে শুনতে পাচ্ছে সরোজদার খাদের গলা, ঠিক যেন তারই পাশে অন্ধকারে বসে সে গান করছে। এ অনুভূতি মিথ্যে নয়। কারণ সেই শোনা গানের সংগে সুর মিলিয়ে কতদিন সে গান করেছে, দ্বৈত সংগীত, গাইতে গাইতে চোখে জল এসেছে। আনন্দে বিভোর হয়েছে, তন্ময় হয়ে সেই সুরের রাজ্যে নিজেকে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে।

নার্স এসে হাসতে হাসতে জানাল প্রমীলার সংগে দেখা করার জন্যে লণ্ডন থেকে 'ভিজিটার্স' এসেছে। প্রমীলা শুনে খুশী হল, কিন্তু বালিশে ভর দিয়েও উঠে বসতে পারল না। বড় ক্লান্ত লাগছে। নার্সরা দু' দিক থেকে স্ক্রীন এনে প্রমীলার বিছানা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে দিল। পেতে দিল খানকয়েক চেয়ার। প্রমীলা অন্যমনস্কভাবে বাঁ হাত দিয়ে কপালের ছোট ছোট চুলগুলো গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করে।

একটু পরেই তার কাছে এল লীলা। পেছনে অমিতাভ, তারপরে সৌরেন। প্রমীলার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল, তবে কি সরোজ আসেনি? না, এসেছে, সকলের পেছনে দাঁড়িয়ে। বেঁটে মানুষ, তাই প্রথমটা নজরে পড়েনি। খুশিতে ঝলমল করে উঠল প্রমীলার মুখ। হাসল, হাসতে গিয়ে চোখ ছলছল করে উঠল। লীলা তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে গিয়ে বিছানার উপর ঝুঁকে পড়ে সস্নেহে প্রমীলার কপালে চুমু খেল। রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দিল ওর চোখের জল।

জিজ্ঞেস করল, কেমন আছিস্ রে প্রমী?

প্রমীলা লীলার মুখের উপর হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, পেটের যন্ত্রণাটা বড় বেড়েছে।

—কি করে যে এত বেড়ে গেল!

প্রমীলা করুণ সুরে বলে, হ্যাঁ, বড্ড বেড়ে গেছে। এখন ওরা অপারেশান করে ফেললে বাঁচি।

লীলা চিন্তিত স্বরে বলে, মাকে না জানিয়ে অপারেশান করানো কি ঠিক হবে? আমি বরং আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি। উত্তর এলে তারপর—

প্রমীলা অধীর গলায় বলে, না, না, আর

আমি পারছি না। এখনও যদি ওরা অপারেশান না করে আমি মরে যাব। তোমরা বুঝতে পারছ না, চব্বিশ ঘণ্টা কি অসহ্য যন্ত্রণা!

কথা বলল সরোজ, ঠিক আছে, অপারেশান নিয়ে অত মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আমি এখনি ডাক্তারের সঙ্গে গিয়ে কথা বলছি। আমার মনে হয় এ মাইনর ব্যাপার।

প্রমীলা বলল, হ্যাঁ, ডাক্তার আমাকেও তাই বলেছে। এসব অপারেশান হাসপাতালে হামেশাই হচ্ছে।

এরপর খুব বেশীক্ষণ কথা হলো না, প্রমীলাকে বড় দুর্বল মনে হচ্ছিল। তারই মধ্যে সে অমিতাভর দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করল, ভাল আছিস তো অমিত? সৌরেনকে জানাল, এত কষ্ট করে আপনি এসেছেন বড় খুশী হলাম। লীলাকে বুঝিয়ে বলল, আমার জন্যে তুই ভাবিস না। ঠিক সেরে উঠব। শুধু বিশেষ করে কোন কথা বলল না সরোজকে। কিন্তু তাকিয়ে রইল ব্যাকুল চোখে, যে ব্যাকুলতার অর্থ, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, তুমি একবার একলা এসো আমার সঙ্গে দেখা করতে।
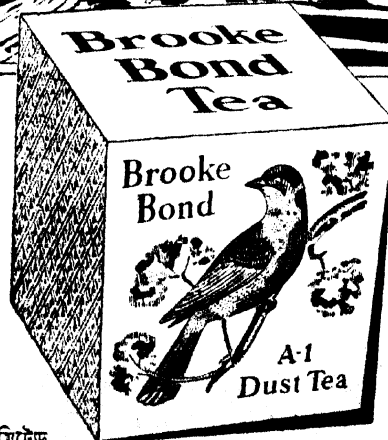
প্রমীলার সংগে দেখা সেরে সরোজ গেল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার চিন্তিত মুখে বললেন, মিস্ চৌধুরীর মত মেয়ের চিকিৎসা করা শক্ত। এরা মনে যা ভাবে মুখে তা কোনদিন প্রকাশ করে না। এত তাড়াতাড়ি যে গ্যাস্ট্রিক আলসার ফরম্ করবে বুঝতে পারিনি।

সরোজ জিজ্ঞেস করেছে, কেন এরকম হলো?

—এ রোগটা তরুণীদের মধ্যেই বেশী প্রকাশ পায়। এর একটা প্রধান কারণ অবশ্য স্নায়বিক দুর্বলতা। যাই হোক, ভাবনার কিছু নেই। অপারেশান হয়ে গেলে দু' সপ্তাহের মধ্যেই সেরে উঠবে, তারপর না হয় কিছু দিনের জন্য লণ্ডনে নিয়ে যান।

তবু সরোজ দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলে, মানে, দেখুন প্রমীলার মা, দাদা, সবাই আছেন কলকাতায়, যদি অপারেশান করতে গিয়ে—

ডাক্তার হাসলেন, আমি বুঝতে পারছি কেন আপনারা এত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। যে কোন অপারেশান করতে গেলে কিছু রিসক্ আছে নিশ্চয়। কারণ আমরা ডাক্তার, ভগবান নই। তবে ডাক্তার হিসেবে এইটুকু বলতে পারি বিপদের কোন রকম আশংকাই নেই।

সরোজ ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়ল, বেশ, প্রমীলারও যখন ইচ্ছে, কাল আপনারা অপারেশান করে ফেলুন। আমরা এ দু'দিন এখানে হোটেলেই থাকব।

ডাক্তার বললেন, তা হলে তো খুবই ভাল হয়, আপনারা কার্ডিফে আছেন শুনলে রুগী মনে বেশ জোর পাবে।

—আর একটা অনুরোধ করব, আমি আজ আর একবার প্রমীলার সংগে দেখা করতে চাই।

—বেশ। আমি নার্সদের বলে রাখব। বিকেলে চারটের সময় এসে দেখা করবেন।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সরোজরা একটা ছোট হোটেল ঠিক করল। যেখানে অন্তত দুটো রাত তারা কাটাতে পারবে। বেশী দূরে নয়, মিনিট পনের হাঁটলেই সে হোটেলে পৌঁছনো যায়। কারুরেই মনের অবস্থা ভাল নেই। লীলা টেবিলে বসে বসে মাকে দীর্ঘ চিঠি লিখল, অপারেশানের কথা জানিয়ে। অমিতাভ আর সৌরেন সিগারেট কেনার জন্যে বাইরে বেরিয়েছিল, সেই অজুহাতে চারদিকটা ঘুরে একবার দেখে এল।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর লীলা শুয়ে পড়েছিল বিছানায়। সৌরেনরা বই পড়ছে দেখে সরোজ উঠে পড়ল, বললে, আমি একটু ঘুরে আসছি রে। লীলা উঠলে বলিস আমি ফেরবার পথে হাসপাতালের খবর নিয়ে আসব। ডাক্তার বলেছিল এই সময় একবার যেতে।

ঠিক চারটের সময় হাসপাতালে গিয়ে নার্সদের কাছে বলতেই তারা সরোজকে নিয়ে গেল প্রমীলার কাছে। সকালের চেয়ে প্রমীলাকে এখন অনেক সুস্থ দেখাচ্ছে। বালিশে ঠেস দিয়ে সে উঠে বসেছে। চুলগুলো ভাল করে আঁচড়ে দুটো বিনুনি বাঁধা, চোখে উজ্জ্বল হাসি। পর্দা দিয়ে ওদের ঢেকে দিয়ে যেতেই প্রমীলা সানন্দে বলল, আমি জানতাম আপনি আসবেন।

সরোজ চেয়ারটা টেনে নিয়ে প্রমীলার কাছে বসতে বসতে বলল, হ্যাঁ, আমি ডাক্তারকে বলে গিয়েছিলাম।

প্রমীলা একদৃষ্টে সরোজের দিকে তাকিয়ে থাকে. সরোজ জিজ্ঞেস করে, অমন করে কি দেখছ প্রমীলা?

—দেখছি আপনাকে। দেখছি যে-সরোজ রায়ের ছবি আমার মনের মধ্যে আঁকা রয়েছে, তার সংগে আপনার কতখানি মিল।

সরোজ হাসল, কোন মিলই খুঁজে পাচ্ছ না বুঝি?

প্রমীলা স্থির গলায় বলল, ঠিক তার উল্টো। হুবহু মিল, প্রত্যেকটি দিনই তো আমি আপনার কথা ভাবি, ভাবি আপনার উপদেশগুলো।

সরোজ ইচ্ছে করেই তরল কণ্ঠে বলে, ঐসব ভেবেই বুঝি শরীর খারাপ করেছ?

—সে জন্যে শরীর খারাপ হয়নি সরোজদা। এখন আমি বুঝতে পেরেছি কোথায় আমার ভুল হয়েছে।

—কি ভুল?

প্রমীলা সজল চোখে বলে, আমার কার্ডিফে আসাই উচিত হয়নি। লণ্ডনে থাকলে আমার শরীর খারাপ হতো না। যা সত্য কেন আমি তা স্বীকার করতে পারলাম না? কেন আমি পালিয়ে এলাম?

সরোজ প্রমীলাকে সান্ত্বনা দেয়, ওসব কথা এখন ভেবো না। অপারেশান হয়ে যাক, তোমাকে আর কি এখানে ফেলে রাখব? তুমি না চাইলেও আমি জোর করে লণ্ডনে নিয়ে যাব।

প্রমীলার ঠোঁট দুটো কাঁপে, সত্যি বলছেন সরোজদা?

সরোজ প্রমীলার বাঁ হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলে, কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?

প্রমীলার দু' চোখ বেয়ে নীরব জলের ধারা নেমে আসে, আর আমার কোন ভাবনা নেই। লণ্ডনে গিয়ে থাকলেই আমি সুস্থ হয়ে উঠব। রোজ আপনার সংগে দেখা হবে। একটু হেসে বলে, জানেন, এই কথাগুলো বলবার জন্যে আমার প্রাণ ছটফট করত। অথচ লজ্জার মাথা খেয়ে আপনাকে চিঠি লিখতে পারতাম না। আঃ, আমার বুকের ওপর থেকে যেন একটা পাষাণের

তার নেমে গেল। আমার যা বলবার তা বলে ফেলেছি, এখন আপনার যা করবার তা করবেন।

সরোজ আবেগের সঙ্গে বলে, আমি সব বুঝতে পেরেছি প্রমীলা। আর কিছু তোমায় ভাবতে হবে না, এর পর থেকে তোমার সব দায়িত্বই আমি নিলাম।

প্রমীলার দুর্বল শরীর উত্তেজনায় কেঁপে উঠল, সরোজের মুখের উপর হাত রেখে কাঁপা গলায় বলল, আজ আমার সব চেয়ে আনন্দের দিন। ঠাকুর আমার মনের কথা শুনেছেন।

এর পর কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা, কেউ কোন কথা বলতে পারল না। শুধু চোখের ভাষা, স্পর্শসুখ কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্ত রচনা করল।

বিদায় নেবার পালা যখন এল প্রমীলা জিজ্ঞেস করলে, কাল সকালে একবার আসবেন তো।

সরোজ জানাল, আমি তো সব সময় আসতে প্রস্তুত, কিন্তু অপারেশানের আগে দেখা করতে দেবে না।

—তা হলে অপারেশানের পর জ্ঞান যখন ফিরে আসবে চোখ খুলে যেন আপনাকেই দেখতে পাই।

সরোজ হেসে বলল, তখন তো নিশ্চয় আসব।

প্রমীলা চাপা গলায় বলে, এখনকার মত একলা আসবেন, দলবল নিয়ে নয়।

—বেশ। একলাই আসব।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হোটেলের দিকে এগিয়ে চলল সরোজ, কত কথা আজ মনে পড়ছে। প্রমীলা মেয়েটা যে এত চাপা সত্যিই আগে বোঝা যায়নি। জানলে সরোজ কিছুতেই তাকে কার্ডিফে পড়তে আসতে দিত না। প্রকৃত ভালবাসা জীবনে সহজে আসে না, যদি আসে তাকে প্রত্যাখ্যান করা অন্যায়, ভুল। এই বিরাট পৃথিবীতে যে যার পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। সরোজও তো পথ খুঁজছে। যদি তাকে এই খোঁজার কাজে কেউ সাহায্য করে, যদি তাকে আলো দেখায়, তাকে স্বীকার না করে নিলে সে নিজেই যে ঠকবে। জীবনের সব চেয়ে বড় সম্পদ প্রীতি প্রেম আর ভালবাসা। সঞ্চয়ের তহবিলে ঐগুলোই জমা হয়। খ্যাতি, যশ, প্রতিপত্তির জলুস থাকতে পারে কিন্তু তা শুধু যোগান দেয় ঈর্ষার, মনে শান্তি দিতে পারে না। সে জন নেহাতই হতভাগা যে চোখ রাঙিয়ে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে। তাকে সবাই ভয় পায়, কিন্তু ভক্তি করে না।

আজ সরোজের সামনে যে ভালবাসার ডালি নিয়ে প্রমীলা উপস্থিত হয়েছে তা সানন্দে গ্রহণ করতে না পারলে সরোজ শুধু যে তার নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিত তাই নয়, জীবনের বেচাকেনায় নিঃসম্বল ব্যাপারীর মত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকত দিনান্তের নির্জন হাটের মধ্যে।

সরোজ হোটেলে ফিরল। প্রমীলা যে আগের চেয়ে ভাল আছে সে কথা জানাল সকলের কাছে, কিছুক্ষণের জন্যে গল্প করল, এক সঙ্গে হেঁটে বেড়িয়ে এল চারদিক। কিন্তু সারাক্ষণই সে ছিল অন্যমনস্ক। বার বার তার মনে হয়েছে একলা বিছানায় শুয়ে প্রমীলা বোধ হয় তারই কথা ভাবছে। রাত্রে সরোজের ভাল করে ঘুমও হলো না। সোফায় বসে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে গেল।

পরের দিন দশটার সময় লীলাকে নিয়ে সরোজ গেল হাসপাতালে। খবর পেল প্রমীলাকে নিয়ে গেছে অপারেশান থিয়েটারে। মেডিক্যাল রিপোর্টে দেখছে শরীর ভালই আছে, ভাবনার কিছু নেই। যদিও সরোজদের করবার কিছু ছিল না তবু তারা খবরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল বসবার ঘরে।

কতক্ষণ এভাবে সময় কেটে গেছে খেয়াল নেই। হঠাৎ একজন নার্স এসে খবর দিল ডাক্তার সরোজদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

লীলা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, অপারেশান হয়ে গেছে?

নার্স বলল, আমি বাইরে কাজ করি, ভেতরের খবর তো জানি না। ডাক্তার নিজেই আপনাদের বলবেন।

সরোজ আর লীলা ডাক্তারের ঘরে ঢুকতেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন, মুখ গম্ভীর, বললেন, মিস্ চৌধুরীর অপারেশান করা যায়নি।

—কেন?

—সকালে আমরা রুগীকে পরীক্ষা করেছিলাম, হার্ট, লাংস্ কিছুতেই গোলমাল ছিল না, কিন্তু আশ্চর্য, অপারেশন টেবিলে শুইয়ে অ্যানাস্থেসিয়া দেবার সঙ্গে সঙ্গে রুগীর 'হার্ট অ্যাটাক' করে। সাধারণত
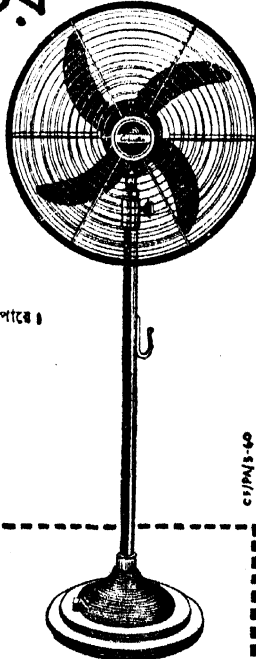
অ্যানাস্থেসিয়া দেবার সময় সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করি। কিন্তু মাঝে মাঝে এক-আধজন অ্যানাস্থেসিয়া সহ্য করতে পারে না। তাদের শরীরে প্রতিক্রিয়া হয়। যদিও তাদের সংখ্যা হয়ত শতকরা ·০১ পারসেণ্টও নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মিস্ চৌধুরী ঐ মাইনরিটির মধ্যেই পড়েছেন।

সরোজ শঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করে, তারপর কি হলো?

ডাক্তার জলদগম্ভীর গলায় বলে, কার্ডিয়াক অ্যাটাকের সংগে সংগে আমরা ম্যাসাজের ব্যবস্থা করি। আস্তে আস্তে ওর জ্ঞান ফিরে আসতে থাকে। যদি আমার শুনতে ভুল না হয়ে থাকে দু' একবার যেন 'সরোজ' বলে ডাকে, কিছু কথাও বলে।

লীলা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, প্রমীলা আছে কিরকম?

—এখনও খুব দুর্বল, যতক্ষণ না পুরো-পুরি জ্ঞান ফিরে আসছে কিছু বলা মুশকিল। তবে মনে হয় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—ভয়ের কিছু নেই তো?

—একেবারে অভয়ই বা কি করে দেব বলুন! হাজার হোক 'হার্ট অ্যাটাক্' তো!

ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন, আমি এখন ওরই কাছে যাচ্ছি।

—আমরা এখানে অপেক্ষা করব তো?

—তার দরকার নেই, হোটেলে ফিরে যান। যদি কোন খবর দেবার থাকে আমরা জানাব।

ডাক্তার চলে যেতে সরোজ আর লীলা চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপরে সরোজ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু স্বরে বলল, চল লীলা, হোটেলে যাই।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে লীলা উঠে দাঁড়াল। বলল, চল।

অস্বস্তিকর কয়েক ঘণ্টা। কারুর মনে এতটুকু শান্তি নেই। উন্মুখ হয়ে বসে আছে প্রমীলার খবরের আশায়।

খবর এল। কাল খবর। সবে ওরা খাওয়া-দাওয়া সেরে এসে বসেছে, হাস-পাতাল থেকে জানাল হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় প্রমীলা মারা গেছে।

এই আকস্মিক দুঃসংবাদে প্রথমটা সকলেই কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। প্রমীলা নেই, আর তার সংগে দেখা হবে না। এ কথা চিন্তা করাই যে কঠিন।

লীলার শরীর থরথর করে কাঁপছিল, সোফার উপরে লুটিয়ে পড়ে সে ছেলে-মানুষের মত কেঁদে উঠল।

—এ আমি কি করলাম সরোজদা, কি করে আমি মাকে জানাব? প্রমী আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। কেন আমি ওর অপারেশান করতে দিলাম?

শোকাতুরা লীলার করুণ বিলাপ অন্ত তিনজনাকে আরও বিচলিত করল। প্রমীলার অকালমৃত্যু তাদেরও তো সমধিক শোকাচ্ছন্ন করেছে। বিশেষ করে সরোজ এ মৃত্যুর জন্যে লীলার চেয়েও নিজেকে অপরাধী মনে করছে বেশী। কেন সে অপারেশান করবার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিল? কে কাকে, সান্ত্বনা দেবে, কারুর মুখে কোন ভাষাই তো যোগাল না।

অথচ কর্তব্য অনেক। হাসপাতালে তাদের যেতে হল, পড়তে হল মৃত্যুর কারণ। ডাক্তার তাদের বললেন, যদি প্রমীলার চিকিৎসা সম্বন্ধে কোনরকম সন্দেহ জেগে থাকে, মনে হয়ে থাকে ঠিক মত চিকিৎসা হয়নি বলে মৃত্যু ঘটেছে তা হলে তদন্তের জন্য করোনারের কাছে লীলারা আবেদন করতে পারে।

কান্না ভেজা গলায় লীলা জিজ্ঞেস করল, তাতে লাভ?

ডাক্তার বোঝালেন, অন্ততঃ মনের শান্তি যে আপনার বোন আমাদের অবহেলার জন্যে মারা যান নি। একে আকস্মিক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কোন আখ্যাই দেওয়া চলে না। অ্যানাস্থেসিয়া দিতে গিয়ে কার্ডিয়াক্ অ্যাটাক্ এবং সেই থেকে মৃত্যু এই হাস-পাতালে ঘটল অনেক বছর বাদে। তা হলেও আমার মনে হয় করোনারের কাছে আপনারা আপীল করুন।

লীলা অতি ধীরে মাথা নাড়ল, ওসব হাঙ্গামায় কি লাভ! প্রমীকে তো আর ফিরে পাব না। তারা হয়ত আবার ওর দেহটাকে নিয়ে কাটাকাটি করবে। বলতে গিয়েই লীলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

ডাক্তারও নিজের চোখ মুছলেন, আমার নিজেরই এত খারাপ লাগছে! মিস্ চৌধুরীর আমার উপর এতখানি বিশ্বাস আর আস্থা ছিল, অথচ কি হয়ে গেল।

সরোজ গলা পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করলে, এখন আমাদের কি কর্তব্য?

ডাক্তার জানালেন, যদি তাদের হাসপাতালের বিরুদ্ধে প্রমীলার চিকিৎসা সম্বন্ধে কোন অভিযোগ না থাকে তা হলে সেই মর্মে কাগজে সই করে দিতে হবে। যদি তারা মৃতদেহ দেখতে চায়, হাসপাতাল থেকে মর্গে প্রমীলার দেহ স্থানান্তরিত করা হয়েছে, সেখানে তারা যেতে পারে। তারপর খবর দিতে হবে 'ফিউনারাল' এজেন্টদের, তারা মৃতদেহ পোড়াবার ব্যবস্থা করবে।

মর্গে যেতে রাজী হল না লীলা। বলল, ঐ অবস্থায় প্রমীকে আমি কিছুতেই দেখতে পারব না। যদি তোমরা চাও, মর্গ ঘুরে এসো।

সরোজ বলল, আমি যাব। তোমরা থাক লীলার কাছে।

হাসপাতালের লাগোয়া বাগানের মধ্যেই একতলা বড় ঘর। পরের পর টেবিল সাজানো। হাসপাতালে কেউ মারা গেলে তার দেহ এখানেই স্থানান্তরিত করে রাখা হয়। যদি করোনারের কোর্টে মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্তের জন্যে কেস্ ওঠে তা হলে সে ক'দিন মৃতদেহ এখানেই থাকে।

সরোজ একলা এসে মর্গে ঢুকল। সঙ্গে একজন ওয়ার্ডেন, সে তাকে নিয়ে গেল ঘরের দক্ষিণ দিকে রাখা উঁচু টেবিলের দিকে। অন্য দিকে আরও দুটি মৃতদেহ রয়েছে, সাদা কাগড় দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢাকা।

সরোজ যখন নির্দিষ্ট টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল, বুকের স্পন্দন তার বেড়ে গেছে। কোন এক অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা থরথর করে কাঁপছে।

ওয়ার্ডেন মৃতদেহের মুখ থেকে কাপড়টা সরিয়ে দিল। সাদা ফ্যাকাশে প্রমীলার মুখ। মুখে কিন্তু কোন যন্ত্রণার চিহ্ন নেই, চোখ দুটি বন্ধ। মাথার চুল টান করে আঁচড়ানো, পিছনে বিনুনির খোঁপা বাঁধা।

ওয়ার্ডেন বোধ হয় ইচ্ছে করেই সরোজকে একলা রেখে দূরে সরে গেল। সেই বিরাট নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে সরোজের মনে হল প্রমীলার সঙ্গে সে দেখা করতে এসেছে, প্রমীলা ঘুমচ্ছে, এখুনি হয়ত সে চোখ খুলবে, তাকে দেখে হাসবে।

পরমুহূর্তে মনে হল এ কি যুক্তিহীন কথা সে ভাবছে! তার আর প্রমীলার মাঝখানে আজ মৃত্যুর ব্যবধান। তবু তার অবুঝ মন যেন সজোরে বলে উঠল, আমি কথা রেখেছি প্রমীলা, তোমার সঙ্গে একলা দেখা করতে এসেছি।

সরোজের চোখ দিয়ে টসটস্ করে জল গড়িয়ে পড়ল। তাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবেসে একটি মেয়ে তার জীবন বিসর্জন দিল। এ অমূল্য প্রেমের কি প্রতিদান সে দিতে পারবে? প্রমীলার মহত্ত্বের কাছে আজ নিজেকে বড় ছোট মনে হল সরোজের। মনে হল এই স্বর্গীয় প্রেমের কোন মূল্যই সে দিতে পারবে না। কতক্ষণ তার এভাবে কেটেছে খেয়াল ছিল না। একটু পরে তার পাশে এসে দাঁড়াল সৌরেন। মৃদু স্বরে বলল, লীলা বড় কান্নাকাটি করছে, এখন চলুন।

সরোজ অন্যমনস্ক স্বরে জিজ্ঞেস করে, কান্নাকাটি করছে, কেন?

সৌরেন বুঝতে পারে সরোজের মন এ রাজ্যে নেই। সে এগিয়ে গিয়ে প্রমীলার মুখখানা ভাল করে দেখল।

পেছন থেকে সরোজ বললে, দেখছ সৌরেন, মৃত্যুর মধ্যেও প্রমীলার মুখে কি প্রশান্তি। তোমার কি মনে হয় ও সুখী হয়েছিল, জীবনে যা চেয়েছিল তা পেয়েছে?

—এসব কি বলছেন সরোজদা?

—না, আমারই ভুল, চল যাই।

প্রমীলার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার কপালের উপর হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ঘুমিয়ে পড় প্রমী, আর কোন ভাবনা নেই।

আস্তে আস্তে চাদর দিয়ে প্রমীলার মুখখানা ঢেকে মাথা নীচু করে বেরিয়ে এল সরোজ। তার পেছনে সৌরেন।

(ক্রমশ)

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৭৮)

অফিসের ভেতরে সেদিন তখনও সেই আলোচনা চলছে। সেই মিস্টার ঘোষালের কীর্তি-কাহিনী। এতদিন ভয়ে কারো মুখ ফোটেনি। সবাই ভেবেছিল মিস্টার ঘোষাল শুধু দেবতা নয়, শয়তানেরও নাগালের বাইরে। এতদিন সবাই মিস্টার ঘোষালকে সামনে সেলাম করেছে, সামনে খোসামোদ করেছে, সামনে স্বার্থ-সিদ্ধির একটা মহা-অস্ত্র হিসেবে দেখেছে। আর আজ এক মুহূর্তে সেই দেবতাই বাঁদরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এক মুহূর্তে সব শাসনের বাঁধ ভেঙে গেছে। সবাই বলছে—বাবা, কলিযুগ হলে কি হবে, এতগুলো লোকের শাপ ওমনি যায় কখনও?

পুলিনবাবু টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে বললে—আমি বলে দিচ্ছি ও কিস্যু হবে না—

—কিচ্ছু হবে না মানে?

—কিচ্ছু হবে না মানে, দেখবেন, ও ঠিক ছাড়া পেয়ে যাবে!

—কখখনো ছাড়া পাবে না, ছাড়া যদি পায় তো ব্রিটিশ-রাজত্ব উল্টে যাবে মশাই, দেখে নেবেন!

ওপাশ থেকে কাঞ্চনবাবু বললে—উল্টোতে আর বাকিটা কী আছে মশাই? ব্রিটিশ-রাজত্ব এমনিতেও উল্টাবে, ওমনিতেও উল্টাবে! আজকের কাগজ দেখেছেন?

এমনি প্রত্যেক সেকশনে। প্রতিটি কোণে কোণে প্রকাশ্যে আলোচনা চলেছে। টিফিন-রুমেই সবচেয়ে বেশি। সিঁড়িতে, কোরি-ডোরে সর্বত্র। কেবিনে কেবিনে, কন্ট্রোল-রুমে। খবরটা রেলের ডিভিসনে-ডিভিসনে ছড়িয়ে গেছে। টরে-টক্কায় সেদিন কে কত অক্ষর এক ডিভিসন থেকে আর এক ডিভিসনে পাঠানো হলো, তার কোনও হিসেবই রইল না রেলের খরচের খাতায়।

মিস্টার ক্রফোর্ড বললে—এবার থেকে ওয়াগন্ অ্যালট্মেন্টের কাজ আর তোমায় করতে হবে না সেন—জেনারেল ম্যানেজার দিল্লিতে কথা বলেছে, নতুন প্রায়রিটি-অফিস খোলা হবে—যদ্দিন না খোলা হয়, ততদিন আমি দেখবো—

দীপঙ্কর চুপ করে সামনে বসে ছিল। বললে—ভালোই হয়েছে, আমি তাতে দুঃখিত নই—

ক্রফোর্ড সাহেব আবার বললে—মিস্টার রবিনসন্ আমাকে মিস্টার ঘোষাল সম্বন্ধে খুব হাইলি বলেছিল। তোমার কী মনে হয় সেন, মিস্টার ঘোষাল এ-কাজ করতে পারে?

সাহেবের প্রিয়পাত্র হবার জন্যে যে-লোক বাঙালী হয়েও নিজেকে সাউথ-ইণ্ডিয়ান বলে প্রচার করতে পারে তার দ্বারা কী যে অসম্ভব, তা দীপঙ্কর কল্পনাও করতে পারে না। মিস্টার ক্রফোর্ডকে এ সব কথা বলেও বোঝানো যাবে না। নৃপেনবাবুর ফেয়ার-ওয়েলের সময়ও কি সত্যি-কথা কেউ মিটিং-এ দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছিল? আসলে আমরা কেউ-ই অপ্রিয় হতে চাই না। মানুষের কাছে অপ্রিয় হবার ভয়ে অনেক ঘা-ই তো আমরা ফরসা ধুতি-পাঞ্জাবি দিয়ে ঢেকে রাখি। আমরা আমাদের দারিদ্র্য ঢেকে রাখি, লজ্জা ঢেকে রাখি, দীনতা-নীচতা সমস্ত কিছু ঢেকে রাখি। কিন্তু আমরা জানতেও পারি না, সেই ঘা-ই একদিন সাইনাস্ হয়ে আমাদের মেরুদণ্ড আক্রমণ
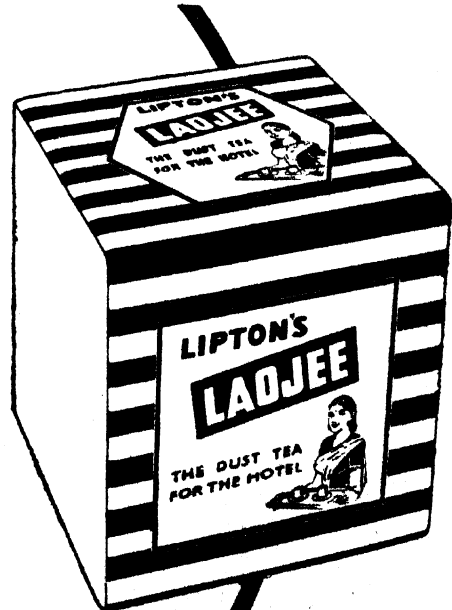
করবে, মস্তিষ্ক আক্রমণ করবে। সেই ঘা-ই একদিন সমস্ত জাতির মেরুদণ্ডে গিয়ে তার বিস্ফোরণ ঘটাবে। মিস্টার ঘোষাল কি শুধু একলা নিজের ক্ষতি করলে? আর কারো নয়? শুধু কি সতীরই সর্বনাশ ডেকে আনলে? আর কোনও মেয়ের নয়? চেঙ্গিস খাঁ কি শুধু নিজেরই সর্বনাশ করেছিল নিজের হাতে? আর কারো সর্বনাশ করেনি? একজন চৈতন্যদেবের কি একজন রামমোহন রায়ের পুণ্যের ফল যদি কোটি-কোটি মানুষের কাজে আসে, তাহলে একজন কালাপাহাড়ের পাপও সমস্ত মানুষ-জাতকে স্পর্শ করতে বাধ্য। পুণ্যের ফলের মত পাপের ফলও যে ভাগাভাগি করে ভোগ করতে হয়।

—আমায় ডেকেছিলেন?

দীপংকর তাকিয়ে দেখলে লক্ষ্মণ সরকার। বললে—তোমার সংগে কথা ছিল একটা, বোস—

তবু লক্ষ্মণ সরকার বসতে একটু দ্বিধা করতে লাগলো। কবে একদিন একসংগে পড়েছিল একই স্কুলে। সেদিন অপমানের চূড়ান্ত করেছে। আজ তারই দয়ায় চাকরি পেয়েছে। তারই দয়ায় একটা ভদ্র পরিচয় পেয়েছে।

লক্ষ্মণ সসংকোচে বসলো সামনের একটা চেয়ারে। দীপংকর বললে—কেমন চাকরি চলছে তোমার?

লক্ষ্মণ বললে—কোনও অসুবিধে হচ্ছে না, তোমার দয়ায় আমি বেঁচে গেছি ভাই—দু'বেলা খেতে পাচ্ছি—

—সংসারে কে-কে আছে তোমার?

লক্ষ্মণ বললে—ছিল সবাই, কিন্তু কেউই নেই এখন।

—তাহলে কোথায় থাকো?

লক্ষ্মণ বললে—একটা মেসে—

—চিরকাল কি মেসেই থাকবে?

লক্ষ্মণ বললে—আমাদের জীবনে তাছাড়া আর কী আছে?

সেন-সাহেবের সামনে কথাগুলো বলতে পেরেই যেন ধন্য হয়ে গিয়েছিল লক্ষ্মণ সরকার। অনেক কথাই জিজ্ঞেস করলে দীপংকর। হাতে কত মাইনে পায় লক্ষ্মণ। মেসে কত টাকা খরচ হয়। অনেক কথা। এতক্ষণ সামনে বসিয়ে সেন-সাহেব কথা বলছে, এটা লক্ষ্মণ সরকার কল্পনা করতেই পারেনি। তারপর দীপংকর হঠাৎ বললে—আচ্ছা তুমি যাও, কে-জি-দাশবাবুকে পাঠিয়ে দাও তো একবার—

কে-জি-দাশবাবু এল। বললে—আমায় ডাকছিলেন স্যার?

দীপংকর জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা কে-জি-দাশবাবু, আপনার সেকশানে ওই যে নতুন ক্লার্ক দিয়েছি, লক্ষ্মণ সরকার, ও কেমন কাজ করছে—?

কে-জি-দাশবাবু বললে—কিছছু জানে না স্যার, ড্র্যাফ্‌ট্‌ পর্যন্ত লিখতে শেখেনি এখনও, ইংরিজির বানান ভুল করে বড্ড, আমাকে সব দেখে-শুনে তবে আপনার কাছে পাঠাতে হয়—
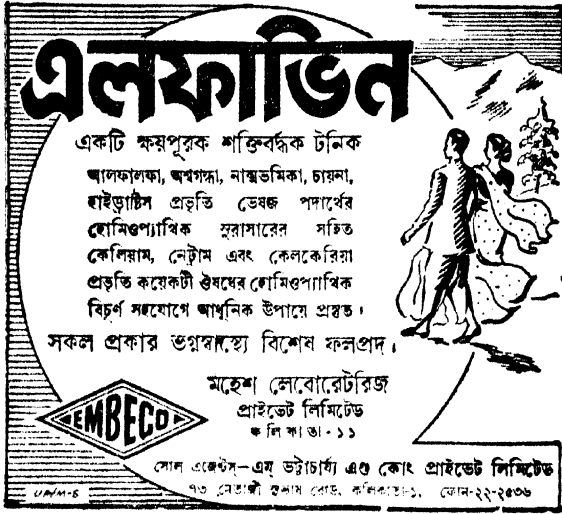
—নতুন তো এখন, কিছুদিন থাকতে-থাকতেই সব শিখে নিতে পারবে বোধহয়—

কে-জি-দাশবাবু বললে—স্যার, আপনারা ছিলেন অন্যরকম, আপনাদের শেখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এরা তেমন নয়, লেখাপড়াটাও জানে না তেমন, আর সকলেরই যদি বুদ্ধি থাকবে তাহলে তো আর কথাই ছিল না—

দীপংকর বললে—আপনি একটু দেখে দেবেন, তাহলেই শিখে যাবে—ছেলেটা অত্যন্ত গরীব, খেতে পায় না এমন অবস্থা—

—আপনি যখন বলছেন, তখন দেখবো বৈকি নিশ্চয়ই দেখবো—বলে কে-জি-দাশবাবু চলে গেল। সেকশানে যেতেই সবাই উন্মুখ হয়ে ছিল। সবাই একসংগে জিজ্ঞেস করলে—কী হলো কে-জি-দাশবাবু, সেন-সাহেব ডেকেছিল কেন?

কে-জি-দাশবাবু গায়ের কোট খুলতে

খলেতে বললে—লক্ষ্মণবাবুর ওপর সাহেব খুব চটে গেছে,—

—কেন? কেন?

—আর কেন? ইংরিজীর ভুল। ছি ছি ড্রাফট্ পাঠালেন সাহেবের কাছে ,আর আমাকে একবার দেখালেন না পর্যন্ত। ফাইলের নিচে অস্বর্ণ সাহেবের নোট ছিল, সেটা দেখে টুকে দিতেও আলিস্যি হলো?

—তারপর কী হলো?

কে-জি-দাশবাবু চেয়ারের ওপর বসে পড়েছে তখন। বললে—উঃ, সেন-সাহেব যা রেগে গেছে লক্ষ্মণবাবুর ওপর, বললে, ও'কে আমি ডিস্চার্জ করে দেব। তা আমি খুব বুঝিয়ে বললুম, গরীব লোক, কেন চাকরিটা খাবেন, চাকরি দেওয়া শক্ত, চাকরি কেন খাবেন তার?

—তারপর?

কে-জি-দাশবাবু বললে—তোমরা তো বিশ্বাস করবে না, তোমরা ভাবো সাহেবদের কাছে আমি তোমাদের এগেনস্টেই বলি কেবল—

লক্ষ্মণ সরকর নিজের সীটের ওপর বসে ভয়ে ভয়ে কাঁপছিল। মুখ দিয়ে কিছু কথ বেরোল না। আজ অভাবে পড়ে সমস্তই মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হয় তাকে। একদিন অকারণে সবাইকে অপমান করে বেড়িয়েছে সে। অকারণে বন্ধুদের মাথায় চাঁটি মেরে বেড়িয়েছে। কিন্তু সেদিন আর নেই। দীপু যদি আজ তার চাকরি খতম্ করেও দেয়, তাতেই বা তার বলবার মুখ কোথায়? পৃথিবীটাকে একদিন সে-ই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার স্বপ্ন দেখেছিল। আর আজ তাকেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাইছে পৃথিবীটা। মেসের চার্জ দিন দিন বাড়ছে। চালের দাম চার টাকা থেকে পাঁচ টাকায় উঠেছে, একদিন হয়ত এই চালের দামই ছ' টাকা মণ দাঁড়াবে। তখন? তখন চাকরি না-থাকলে খাবে কী? দীপঙ্কর যখন অফিসে আসে, গুর্খা দরোয়ান থেকে শুরু করে যে সামনে পড়ে, সেই-ই সেলাম করে। দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মণ সব লক্ষ্য করে। সেই ধর্মদাস ট্রাস্ট মডেল স্কুলের নিরীহ লাজুক মুখচোরা ছেলেটা কেমন করে এই পোস্টে উঠলো সেইটেই লক্ষ্মণের কাছে এক বিচিত্র ব্যাপার বলে মনে হয়। কত সুখে আছে দীপু। ঝি-এর ছেলে—ওর মা পরের বাড়িতে রাঁধুনি-বামুনের কাজ করতো। একেই বলে কপাল মশাই। আর যত ফাটাকপাল আমাদের বেলায়!

—আপনি সেন-সাহেবকে চিনতেন নাকি আগে?

—চিনতাম মানে? ছোটবেলায় এক স্কুলে একসঙ্গে একই ক্লাশে পড়েছি। কী গো-বেচারা মানুষ ছিল তখন, সাত চড়ে রা বেরোত না মুখে—তখন ওর মাথায় কত চাঁটি মেরেছি, জানেন—

এমনি অবাকই লাগে বটে। পৃথিবীর হাল-চাল নিয়ম-কানুন দেখে এমনি অবাকই হয়ে যায় লক্ষ্মণ সরকারের দল। এমনি কপালের ওপর দোষারোপ করে সান্ত্বনার সস্তা-সহজ আশ্রয়টিতে সবাই মুখ লুকোয়। কিন্তু ওরা যদি জানতো দীপঙ্করের মনের গোপন কক্ষটিতে দিনরাত কত দ্বন্দ্বের আন্দোলন চলেছে। সেই ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনের সরু গলি থেকে শুরু করে আজ এই ডি-টি-এস'এর চেয়ারে এসেও কেন যে সেই যন্ত্রণার জানোয়ারটা তাকে দিনরাত কামড়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে ছারখার করে দিচ্ছে—তা যদি জানতো। শুধু নিজের একান্ত আপন ইচ্ছেটি নিয়ে থাকলে সে তো বেঁচে

যেত। কিন্তু তা তো হয় না। মনে হয়, এই কলকাতাই শুধু নয়, সমস্ত পৃথিবীর সব সমস্যাগুলো যেন তার মাথায় ভার হয়ে বোঝা হয়ে চেপে' বসে থাকে। নিজের উন্নতির বিড়ম্বনা তাকে যে দিনের পর দিন অশান্তির আগুনে পুড়িয়ে মারে।

—জানেন, আপনি এখন যে-চেয়ারে বসছেন, এই চেয়ারেই গাঙ্গুলীবাবু বলে এক ভদ্রলোক বসতো। তার কাছেই শুনেছি আমরা, ওই সেন-সাহেব একদিন তেত্রিশ টাকা ঘুষ দিয়ে এই রেলের চাকরিতে ঢোকে!

—সে কি? কে বললে আপনাকে?

—জানি মশাই, সব জানি। নৃপেনবাবু বলে আগে যে সুপারভাইজার ছিল, তাকেই ঘুষ দিয়েছিল। ঘুষ দিতে আর ঘুষ নিতে না পারলে আজকের পৃথিবীতে কেউ বড় হতে পারবে না। এ আর সত্যযুগ নয়। দেখলেন না আজ মিস্টার ঘোষালের কী হলো? ভালোমানুষ হয়ে মুখ বুঁজে থাকুন, জীবনে আপনার চাকরিতে প্রমোশন হবে না! ওই সেন-সাহেব ঘোষাল-সাহেবদের মত তোখোড় ধড়িবাজ হতে হবে—এটা ধড়িবাজদেরই যুগ যে মশাই—

—কিন্তু ঘোষাল-সাহেবকে তো অ্যারেস্ট করেছে পুলিস, এবার তো জেল হয়ে যাবে।

—রাখুন মশাই, বড়লোকরা অত সহজে জেলে যায় না। জজ্ ম্যাজিস্ট্রেটরাও ঘুষ খায় না ভেবেছেন? আপনি আছেন কোথায়? পৃথিবী যে চোরের রাজ্যি—যে চুরি-ডাকাতি করতে পারবে এখানে, তারই পোয়া বারো! আর সৎপথে থাকুন, তাহলে ওই গাঙ্গুলীবাবুর মত গলায় দড়ি দিয়ে মনের জ্বালা জুড়োতে হবে! কোন্‌টা করবেন বলুন এখন!

সত্যি, দীপঙ্করও অনেকদিন নিজের মনে ভেবেছে সে কাদের দলে? তার আগেকার চেয়ারটাতে এসে বসেছে অভয়ঙ্কর। সেই চেয়ারে বসার পর থেকেই যেন অন্যরকম হয়ে গেল রাতারাতি। তারও মত বদলে গেল এক মুহূর্তে। সে-ও বললে—ক্লার্কদের বেশি প্রশ্রয় দিলে তারা মাথায় ওঠে সেন—তাহলে আর ওরা তোমায় রেসপেক্ট করবে না—

দীপঙ্কর বলেছিল—রেসপেক্ট্ বড়ো না কাজটা বড়ো?

—কিন্তু রেসপেক্ট্ না করলে যে কাজও করবে না ওরা!

দীপঙ্কর বলেছিল—ভুল তোমার ধারণা অভয়ঙ্কর, আমিও একদিন ক্লার্ক ছিলাম, আমিও ক্লার্কদের ব্যথাটা বুঝি, ওদের একবার ভালবেসে দেখো তুমি, ওরা ডবল্ কাজ করবে—

অভয়ঙ্কর তাই বলতো—তুমি বড় ভীতু সেন, অত ভয় করে কেন চলো ওদের? অত ভীতু বলেই ওরা অত কাজে ফাঁকি দেয় তোমার কাছে—।

কথাটা শুনে দীপঙ্কর হেসেছিল। সত্যিই কি দীপঙ্কর ভীতু! ভয় পায় বলেই কি এত সহানুভূতি ওদের ওপর! কিন্তু যখন ছেঁড়া জামা, ময়লা কাপড়, এক মুখ দাড়ি দেখে ওদের, তখন কেমন করে কোন্ প্রাণে ওদের শাস্তি দেয়? ওদের মধ্যেই যে দীপঙ্কর নিজের ছায়াকে দেখতে পায়। ওরাই যেন হাজার-হাজার দীপঙ্কর হয়ে সেকশানে সেকশানে ধুঁকছে। ওদের সামনে ফরসা কোট-প্যান্ট্ পরতেও লজ্জা হয় দীপঙ্করের। ওদের জন্যেই কিরণ নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আর দীপঙ্কর ওদেরই একজন হয়ে আজ এই ওদের মাথায় বসে হুকুম চালাচ্ছে।

হাসপাতাল থেকে ঘরে ঢুকতেই মধু সেলাম করে সুইং-ডোরটা খুলে দাঁড়াল। কিন্তু ঘরে ঢুকতে গিয়েই একটা চেনা-মুখের সঙ্গে আটকে গেল দৃষ্টিটা।

—আরে কী খবর? তুমি এখানে?

ছিটেও অবাক হয়ে গেছে। বহুদিন ধরে বহুভাবে দেখে দেখে ছিটে-ফোঁটাদের সম্বন্ধে আর অবাক হবার কিছু ছিল না। এখন আর চেনা যায় না দু'জনকেই। সেই যেদিন থেকে নতুন অ্যাক্ট চালু হয়েছে দেশে, সেইদিন থেকেই ছিটে-ফোঁটার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। অবস্থা ভাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাল-চলনেও কেমন একটা গাম্ভীর্য আসে। অতীতের দারিদ্র্য, অতীতের হীনতা, নীচতা, ভণ্ডামি, গুণ্ডামি সব কিছুই বুঝি ঢাকা পড়ে যায়। সেই কালিঘাটের বস্তির দুটো গুণ্ডাকে আজ এই খদ্দর-পরা চেহারার মধ্যে কে খুঁজে বার করতে পারবে!

ছিটে এসে চেয়ারে বসে চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। বললে—তুই এখানে? ঘোষাল সাহেব কোথায়?

দীপংকরও অবাক হয়ে গেল। বললে—ঘোষাল সাহেবকে তুমি চিনতে নাকি?

—সেকি রে, ঘোষাল-সাহেবকে চিনবো না? কত দহরম-মহরম করেছি একসঙ্গে। প্যালেস-কোর্টে কতদিন রাত কাটিয়েছি। আর শুধু রাত কেন, দিনও কাটিয়েছি একসঙ্গে। ছুটিতে বুঝি ঘোষাল সাহেব?

—না।—দীপংকর সমস্ত ঘটনাটাই খুলে বললে।

—তাহলে ওয়াগন অ্যালটমেন্ট কে করবে? তুই?

দীপংকর বললে—না, নতুন প্রায়রিটি অফিস হচ্ছে—সব, অ্যালটমেন্ট সেখান থেকেই হবে। কিন্তু তুমিও কি ব্যবসা করছো নাকি? তোমরা তো ব্যবসা করতে না আগে? তোমরা তো কংগ্রেসে ঢুকেছিলে!

ছিটে হেসে উঠলো। বললে—ব্যবসার সুবিধে হবে বলেই তো কংগ্রেসে ঢুকেছি—

দীপংকরের মনে পড়লো সেই হাজরা পার্কের মিটিং-এর দৃশ্যটা। সেই বক্তৃতার কথাগুলোও ভেসে উঠলো কানে। বললে—কিন্তু কংগ্রেস করলে ব্যবসা করবে কখন? এই তো শুনেছি কংগ্রেসকেই ব্যান্ করে দেবে, তখন তো সব কংগ্রেস-লীডারদের ধরবে। তখন ব্যবসা করবে কী করে?

ছিটে বললে—আরে, আমি তো কংগ্রেসের কেউ নই, কংগ্রেস করছে ফোঁটা। ফোঁটা পারমিট্ বার করে দেয় আমার নামে, আর আমি ব্যবসাটা দেখি। দুজনে জেলে গেলে কখনও চলে? ফোঁটা যদি জেলেও যায়, আমি তো আছি—অঘোরদাদু তো বেশি টাকা রেখে যায়নি—সিন্দুক ভেঙে মাত্র দশ লাখ টাকা পেয়েছিলুম—আর কিছু গয়না, কিন্তু তাতে তো পোষায় না—

—কেন পোষায় না?

—পোষাবে কী করে? এখন তো তুই আর যাস্‌নি বাড়িতে। সে-বাড়ি তো ঢেলে-সেজে নতুন করে ফেলেছি, বাড়িটা সারতেই তো হাজার ষাটেক টাকা বেরিয়ে গেল। তারপর গাড়ি কিনলাম দুজনে দুটো। প্রথমে গাড়ি তো কিনতে চাইনি। কিন্তু দেখলাম কংগ্রেসই করি আর যাই করি, গাড়ি না থাকলে কেউ মানতে চায় না—তার ওপর আবার ড্রাইভার পুষতে হচ্ছে—আর সংসার তো বেড়েই চলেছে দিন-দিন, জিনিসপত্তরের দাম যে কী হচ্ছে, তা দেখছিস তো—

উনিশ শো বিয়াল্লিশের সেই বাঙলা দেশ। বাঙলা দেশ শুধু নয়, সমস্ত ভারতবর্ষ। সমস্ত ভারতবর্ষ। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন ভূমিকম্পের আঘাতে টল্‌মল্ করছে। একদিন ইন্ডিয়া থেকে আয়রন-ওর নিয়ে গিয়েছিল জাপান তখন নগদ দাম পেয়ে গভর্নমেন্ট মাল বেচেছে তাকে। কিন্তু তখন কি জানতো সেই আয়রন-ওরই আবার বোমা হয়ে ফিরে আসবে ব্রিটিশ এম্পায়ারের সেকেন্ড সিটি

এই কলকাতার বুকে!' আর ঠিক সময় বুঝেই মহাত্মা গান্ধী আরম্ভ করে দিয়েছে তাঁর আন্দোলন। ' এই কলকাতা! এই কলকাতাই হলো ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় ইনডাস্ট্রিয়েল স্ট্রংহোল্ড্। এই এখানকার ইণ্ডিয়ান ব্যবসাদাররাই চাঁদা দিয়েছে কংগ্রেসকে। নিউ ইয়র্ক টাইমস্ লিখেছে—Birla brothers of Bombay finance the All India Congress. Mr. Birla is out openly to oust the British and he subsides the Congress heavily. Mr. Birla, Sir Badridas Goenka, Mr. J. C. Mahindra and others are not afraid that Jawaharlal Nehru's socialistic ideal will gain the ascendency. Even if he runs the show, the Indians believe that he will be 'sensible'.

ছিটে বললে—আমিই তো কংগ্রেস ফাণ্ডে চাঁদা দিয়েছি বিশ হাজার টাকা—একলা—

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—তুমিও দিয়েছ?

—শুধু কি আমি? সবাই দিয়েছে। বিড়লা দিয়েছে, টাটা দিয়েছে, গোয়েঙ্কা দিয়েছে। আমি কি ওমনি-ওমনি দিচ্ছি ভেবেছিস? এর চার ডবল তুলে নেব না পরে! তখন তো ফোঁটাই কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হয়ে যাচ্ছে—

মনে আছে সেদিন ছিটের কথা শুনে প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। প্রাণমথবাবু থাকতে ফোঁটা হবে প্রেসিডেণ্ট!' শুধু দীপঙ্কর কেন, কেউ-ই বিশ্বাস করেনি। কেউ-ই বিশ্বাস করেনি, মিস্টার চার্চিলও বিশ্বাস করেনি, এত কষ্টে গড়া ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার এত শীঘ্র চার্চিলের হাত-ছাড়া হয়ে যাবে। ধর্ম দিয়ে যখন ইণ্ডিয়া জয় করেনি ব্রিটিশ, তখন ধর্ম আশ্রয় করে তাকে ধরে রাখতেও পারা যাবে না। ইণ্ডিয়াকে কে রুখবে: একদিকে মহাত্মা গান্ধী আর একদিকে মিস্টার বিড়লা। একদিকে বাইবেল আর একদিকে গীতা। বাইবেলের সংগে রুজভেল্ট্ আছে। গীতার সংগেও আছে বিড়লা। দেখা যাক্ কার শক্তি বেশি!

—এ ক'দিন কাজ চালাবে কে?

দীপঙ্কর বললে—ক্রফোর্ড সাহেব নিজে!

—সাহেব কত ঘুষ নেবে?

দীপঙ্কর বললে—তা আমি জানি না। নেবে কিনা তাও জানি না।

ছিটে হেসে উঠলো। বললে—দূর, ঘুষ নেয় না এমন মানুষ আছে নাকি দুনিয়ায়? কত বড়-বড় মহারথীকে দেখলুম, তাদের সাহেব তো কোন্ ছার। তাদের জেনারেল ম্যানেজারকে পর্যন্ত ঘুষ দিতে পারি। বাজি রাখ্। সব শালা ঘুষ নেয়। ঘুষ না নিলে বড়লোক হওয়া যায়? আমি নিজেই ঘুষ দিই পারমিট্ বার করবার জন্যে—ঘুষটা নিস্ বুঝলি? যদি দু'পয়সা করতে চাস্ তো বড় ভাই-এর মত উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি তোকে—ঘুষটা নিস্। তোর এই চাকরিতে কিছুছু হবে না। হাজার মন দিয়ে কাজ করলেও কিছু হবে না—

আশ্চর্য, ছিটে সেই ছিটেই আছে। বাইরেই শুধু খদ্দর পরেছে, সভ্য হয়েছে, কংগ্রেসের মেম্বর হয়েছে।

আজ প্রথম ডি-টি-এস্'এর চাকরি। ছিটের মত বহু লোক এসে এসে ফিরে গেল। বহু গুজরাটি, মারোয়াড়ী, ভাটিয়া, বাঙালী সবাই। সকলেরই ওয়াগন চাই। সকলেরই প্রফিট্ চাই, সকলেরই ডিভিডেণ্ড্ চাই। ঘোষাল সাহেব ধরা পড়াতে কেউ খুশী নয়। আস্তে আস্তে অফিস পাত্‌লা হয়ে এল। নিঃশব্দ হয়ে এল। দীপঙ্করের মনে হলো ছিটে-ফোঁটাকে দোষ দিয়েই বা লাভ কী? একলা ছিটে-ফোঁটাদেরই বা কী দোষ? সারা পৃথিবীটাই যেন ছিটে-ফোঁটাতে ভরে গেছে। ওই চার্চিল, রুজভেল্ট, হিটলার, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, ছিটে-ফোঁটা সব একাকার হয়ে গেছে এই যুদ্ধে! কেউ আফ্রিকা চায়, কেউ ডান্‌জিগ্ চায়, কেউ সিংগাপুর চায়, কেউ ওয়াগন চায়, কেউ আবার ইণ্ডিয়ার ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ চায়। সবারই সেই এক লক্ষ্য—ইণ্টারেস্ট্, প্রফিট্, ডিভিডেণ্ড্!

—কে?

টেলিফোন্‌টা বাজতেই দীপঙ্কর রিসিভারটা তুলে নিলে। মেয়েলি গলা। মিহি মিষ্টি সুর। লক্ষ্মীদির অবস্থা ভালো হওয়ার সংগে সংগে গলাটাও যেন আরো মিষ্টি হয়ে গেছে।

—অনেকদিন আসিস্ নি। কী খবর?

দীপঙ্কর বললে—খুব ব্যস্ত ছিলাম লক্ষ্মীদি, একদিন তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম, তুমি তখন ঘুমোচ্ছিলে। তোমার বাবার খবরটা দিতে গিয়েছিলুম। তুমি শুনেছ বোধহয় সব! বর্মা থেকে চলে আসবার সময় বোমা পড়ে জাহাজটা ডুবে গিয়েছিল।

লক্ষ্মীদি একটু দুঃখ পাবে মনে হয়েছিল। কিন্তু সে-সব কিছুই বললে না। শুধু বললে—শুনেছি, কিন্তু বাবার প্রপার্টি টাকা-কড়ি, সে-সব কোথায় গেল, তুই জানিস্ কিছু? কলকাতার ব্যাঙ্কে বাবার টাকা কিছু ছিল নাকি?

আশ্চর্য, এ-কথাটা তো দীপঙ্করের মনে আসেনি। লক্ষ্মীদি বললে—এখানকার ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে দেখবো?

দীপঙ্কর বললে—তা দেখতে পারো।

—আর সেখানকার প্রপার্টি যা-কিছু ছিল, তা কি আর পাওয়ার কিছু আশা আছে বলতে পারিস? সে-সব তো জাপানীরাই নিয়ে নেবে বোধহয় শেষকালে—না কি? আর এখানকার ব্যাঙ্কের টাকা নিতে গেলেও সাক্‌সেসান্ সার্টিফিকেট চাই! আমি আর সতী—এই দুজনেই তো পাবো! সতী কি বলছে?

দীপঙ্কর বললে—সতী এখনও খবরটা

জানে না—সতীকে খবরটা বলবার এখনও সময় পাইনি—

লক্ষ্মীদি বললে—তাহলে তো খুব মুশ্‌কিল হলো, আমি যে আবার কাল দিল্লি চলে যাচ্ছি—সুধাংশু প্রমোশন পেয়ে ট্র্যান্স্‌ফার হয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে আমরাও যাচ্ছি। সেই খবরটা বলতেই তো তোকে টেলিফোনটা করা—

দীপঙ্কর বললে—তোমার এ-বাড়িতে কে থাকবে তাহলে?

লক্ষ্মীদি বললে—কে আর থাকবে? কেউ না। যদি কখনও আসি তো এখানেই এসে উঠবো।

—তাহলে একটা কাজ করবে লক্ষ্মীদি! বাড়িটা তো তোমাদের পড়েই থাকছে—একজনকে থাকতে দেবে?

—কে?

দীপঙ্কর বললে—সতী!

লক্ষ্মীদি অবাক হয়ে গেল। বললে—কেন? সতী থাকবে কেন? এতদিন সতী কোথায় ছিল? সে তো তোদের অফিসে চাকরিতে ঢুকেছিল বলেছিলি—হঠাৎ তার থাকবার জায়গার অভাব হলো কেন? তার কী হয়েছে?

দীপঙ্কর বললে—সে অনেক কথা। সব কথা পরে শুনো। তুমি শুধু বলো তাকে থাকতে দেবে কিনা।

—আরে, থাকতে দেব না কেন? সে থাকলে তো ভালোই। বাড়িটা তো এমনি পড়েই থাকবে, তবু সে থাকলে একটু দেখা-শোনা করতে পারবে। বাড়িটাও ভালো থাকবে। আমি তো ঠিক করেছিলাম বাড়িটায় তালা-চাবি বন্ধ করে চলে যাবো। কিন্তু আমরা তো কাল সকালের প্লেনেই যাবো, আমার প্লেন্‌ ছাড়বে সকাল সাড়ে ছ'টায়—

দীপঙ্কর বললে—আমি যদি আজ এখনি সতীকে নিয়ে তোমার বাড়িতে যাই?

—নিয়ে আয় না, তুই নিয়ে আয় তাকে, যাবার আগে দেখা হলে তো ভালোই হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ওই কথাটাও হয়ে যাবে!

—কোন্‌ কথাটা?

—ওই ব্যাঙ্কে বাবার টাকার কথাটা। বাবার টাকাটা তো আধাআধি দুভাগ হবে!

সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে দীপঙ্কর বললে—তাহলে আমি সতীকে নিয়ে এখনি যাচ্ছি তোমার বাড়িতে—

—সে কোথায় আছে এখন?

—হাসপাতালে।

—হাসপাতালে কেন?

দীপঙ্কর বললে—সে অনেক কথা। তোমার বাড়িতে গিয়ে বলবো সব। এ ক'দিনে অনেক কান্ড ঘটে গেছে—

তাড়াতাড়ি রিসিভারটা রেখেই উঠলো দীপঙ্কর। মধু ঘরে এল। মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজপদও নেই। দ্বিজপদকেও সাস্‌পেন্ড করে দিয়েছে মিস্টার ক্রফোর্ড। মধু বললে—আপনি উঠছেন হুজুর?

দীপঙ্করের কথা বলবারও সময় ছিল না তখন আর। সময় থাকার সময় তখন ফুরিয়ে যেতে আরম্ভ করেছে পৃথিবীতে। আগে সময় ছিল মানুষের। ধীরে সুস্থে আস্তে আস্তে ঘুরতো পৃথিবীটা। আস্তে আস্তে সূর্য উঠতো, আস্তে আস্তে সূর্য ডুবতো। একটা ওয়াগন পেতে যদি একদিন দেরি হয়ে যায় তো এক হাজার টাকার লোকসান। এক হাজার টাকার লোকসান হলে—তার ইনটারেস্ট কত হিসেব করো? লাভ-লোকসান কষে ব্যালেন্স শীট তৈরি করো—দেখবে সেই এক হাজার টাকা দশ বছরে দশ হাজার গিয়ে দাঁড়াবে! তখন ইনটারেস্ট কম্পাউন্ড-ইনটারেস্ট কষে দেখলে জীবনটাই ফাঁকা মনে হবে। মনে হবে বহু লোকসান হয়ে গেছে জীবনে। সে বুঝি ১৫৪৩ সালের কথা। পোলান্ডের এক গ্রামে কেপারনিকাস বলে একটি ছেলে জন্মে ছিল। সেই ছেলেটিই বড় হলো একদিন। বড় হয়ে বললে—পৃথিবীটা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। তারপর সেই কথাটাই নতুন করে বললে আবার জোহানেস কেপলার। তারপর একশ বছর পরে ১৬৪২ সালে গ্যালিলিও গ্যালিলি আবার সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করলে। আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যস্ততা বেড়ে গেল। সূর্য উঠতে শুরু করলো তাড়াতাড়ি, সূর্য ডুবতেও লাগলো তাড়াতাড়ি। সেই বেগ বাড়তে বাড়তে ঘন্টায় চল্লিশ মাইল স্পীড বাড়লো লোকো-মোটিভের। ফর্টি পাউন্ড থেকে নাইনটি পাউন্ড হলো রেল-লাইন। শেষকালে নাইনটি থেকে হান্ড্রেড য়্যান্ড টুয়েন্টি পাউন্ড। দিল্লি মেল সিক্সটি মাইলস্‌ পার আওয়ার করে চলবে সেই ভাবনা ভাবছে রেলওয়ে বোর্ড—আর এদিকে মিস্টার ঘোষালরা সেই ওয়াগন নিয়েই জুয়া খেলতে শুরু করেছে উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের কলকাতায় বসে।

—সেন-সাহেব চলে গেছে, মধু?

মধু তখন ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করছিল। পেছন ফিরে দেখলে লক্ষ্মণবাবু। লক্ষ্মণ সরকার সকাল থেকেই সেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করছিল। সুবিধে পায়নি। ভেবেছিল সকলের ছুটি হয়ে গেলে দেখা করবে। হঠাৎ তার চাকরিটা যদি চলে যায় তাহলে কত অসুবিধে হবে তার, সেই কথাগুলোই বুঝিয়ে বলবার দরকার ছিল। কিন্তু হলো না।

মধু বললে—সাহেবের মুখটা খুব ভার-ভার দেখলুম। একটা টেলিফোন আসার পরেই তাড়াতাড়ি চলে গেলেন—

—কোথায় গেলেন? বাড়িতে?

মধু বললে—তা বলতে পারবো না—

ভিজিটিং আওয়ার্স তখন শেষ হয়ে গেছে। তবু গাড়ি থেকে নেমেই সিঁড়ি

বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলো দীপঙ্কর। যারা ভেতরে এসেছিল, তারা চলে গেছে সবাই। শুধু একজন নার্স তখন এদিক থেকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করছে। হাতে থার্মোমিটার। সাদা অ্যাপ্রন পরা মেট্রন। সোজা সতীর কেবিনের দিকে যেতেই কে একজন নার্স বেরিয়ে এল বাইরে।

—মিসেস ঘোষ কেমন আছেন, নার্স?

নার্স বললে—এখন ভাল আছেন, কাল সকালে রিলিজ করে দেবে ডি-এম-ও—

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে দরজাটা খুললে। ছোট ফাঁক দিয়ে প্রথমে কিছু দেখা গেল না। তারপর আর একটু ফাঁক করলে। সতীর ফরসা পা'দুটো দেখা গেল বিছানার ওপর। দীপঙ্কর ঘরের ভেতরে ঢুকলো। সতী বোধহয় ঘুমোচ্ছিল। আস্তে আস্তে মাথার কাছে গিয়ে বসলো দীপঙ্কর। আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস পড়ছে সতীর। এত কাছে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে কখনও দীপঙ্কর এমন করে আগে সতীর মুখের দিকে চেয়ে দেখেনি। একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে দেখতে দীপঙ্করের মনে হলো সতী বোধহয় জেগেই আছে। চোখ বুজিয়ে যেন কী ভাবছে।

দীপঙ্কর আস্তে আস্তে সতীর কপালে হাতটা রাখলে।

সঙ্গে সঙ্গে সতী জেগে উঠেছে। চোখ মেলে সামনে দীপঙ্করকে দেখেই বললে—এ্যাকি, দীপু?

—আঁ, আমি সতী! আমি!

সতী বললে—কেন এলে তুমি আবার? আমি তো তোমাদের তাড়িয়েই দিয়েছিলাম—তাহলে কেন আবার এলে?

তারপর একটু থেমে বললে—উনি কোথায়? বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন বুঝি?

দীপঙ্কর বললে—সনাতনবাবুর কথা বলছো? তিনি তো চলে গেছেন!

সতী আর কোনও কথা বললে না। হঠাৎ সতী নিজের মুখটা আড়াল করতে চেষ্টা করলে। তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। কিন্তু কান্নাটাও আর গোপন করতে পারলে না। বললে—তুমি যাও দীপু, তুমি চলে যাও—

দীপঙ্কর বললে—আমি না-হয় চলেই যাচ্ছি, কিন্তু তুমি কোথায় যাবে ভেবেছ? সেই প্যালেস কোর্টেই ফিরে যাবে?

সতী বললে—আমি যেখানেই যাই, আমার কথা তোমরা না-ই বা ভাবলে! আমাকে কি তোমরা শান্তিতে মরতেও দেবে না? আমি তোমাদের কী করেছি বলো তো? কেন তোমরা আমাকে একটু একলা থাকতে দিচ্ছ না? আমি মরে যাবো এইটেই কি তোমরা চাও? আমি তো তোমাদের সকলকে মুক্তি দিয়েছিলুম, তোমাদের সকলের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলুম—কিন্তু কেন আমি মরলুম না বলতে পারো? কোথায় গেলে কী করলে মুক্তি পাবো বলতে পারো তুমি?

—আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি সতী!

সতী চোখ বড়-বড় করে চেয়ে দেখলে দীপঙ্করের দিকে। যেন কথাটা ভাল করে বুঝতে পারেনি। তারপর দরজার দিকেও চেয়ে দেখলে। বললে—তুমি আমার কাছে লুকোচ্ছ বুঝি? ওঁকে ঘরের ভেতরে ডাকো না এবার আমি কিছু বলবো না। সত্যি বলছি বিশ্বাস করো দীপু, আমার যে মাঝে মাঝে কী হয়, আমার খুব রাগ হয়ে যায় তোমাদের ওপর, তখন আর কিছু জ্ঞান থাকে না—তুমি ডাকো ওঁকে দীপু, ওঁকে ভেতরে ডেকে নিয়ে এসো—আমি কিছু বলবো না—উনি আমার ওপর খুব রাগ করেছেন, না?

—না রাগ করবেন কেন? রাগ করেননি!

—রাগ করেন নি?

সতী যেন আঘাত পেল কথাটা শুনে। হঠাৎ যেন সতীর হাতটা শিথিল হয়ে এল। রাগ করেন নি? তার ওপর সামান্য একটু রাগও করতে পারলেন না?

—তাহলে তুমি কেন এলে? কেন এলে মিছিমিছি? আমি কোথাও যাবো না। আমি এখানেই থাকবো, আমি এখানেই মরে পড়ে থাকবো—

দীপঙ্কর বললে—তোমায় একটা খবর বলা হয়নি সতী, তুমি বোধহয় শোননি, তোমার বাবা মারা গেছেন—

সতী হঠাৎ আবার মুখ ফিরিয়ে দেখলে দীপঙ্করের দিকে। একটা অদ্ভুত আতঙ্কে তার মুখের চেহারাটা আমূল বদলে গেল।

—আমি বার্মা ইভ্যাকুয়ীজ অফিস থেকে নিজে জেনে এসেছি। সেই কথাটা বলবো বলেই এসেছি এখন। এর পরেও কি তুমি প্যালেস-কোর্টে গিয়ে উঠতে পারবে?

হঠাৎ কী যে হলো, সতী যেন হঠাৎ এক আর্তনাদ করে দীপঙ্করের বুকে নিজের মুখটা লুকোবার চেষ্টা করলে। তারপর দুই হাতে দীপঙ্করকে সজোরে আঁকড়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো। আর দীপঙ্কর সেই অবস্থাতেই আস্তে আস্তে নিজের হাতটা সতীর মাথায় বুলিয়ে দিতে লাগলো। যতটুকু সান্ত্বনা পায় সতী, সেইটুকুই ভালো। হয়ত কান্নারই প্রয়োজন ছিল সতীর এই সময়ে। হয়ত কাঁদলেই সতী শান্ত হবে। কাঁদলেই সতী সান্ত্বনা পাবে। দীপঙ্কর চুপ করে রইল—এতটুকু একটি সামান্য কথাও বলতে চেষ্টা করলে না। সতী তখনও দীপঙ্করের বুকের আশ্রয়ের তলায় ফুলে ফুলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছে বারবার। আর দীপঙ্কর নিঃশব্দে তার কোঁকড়ানো চুলের ওপর হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

বাইরের রাস্তায় হঠাৎ চিৎকার উঠলো—টেলিগ্রাফ—টেলিগ্রাফ—

খবরের কাগজের হকাররা ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে খবর ফিরি করতে বেরিয়েছে কলকাতার পথে। হয়ত যুদ্ধের কোনও খবর। হয়ত জাপান ঢুকে পড়েছে ইণ্ডিয়ায়। নয়ত মস্কো দখল করে নিয়েছে জার্মানী। কিন্তু না, তা নয়।

—গান্ধীজী গ্রেফ্তার, গান্ধীজী গ্রেফতার—

শুধু মহাত্মা গান্ধীই নয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সরোজিনী নাইডু—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সব মেম্বারদের ধরে বোম্বাই থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনে করে পুণায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পাটনাতে ডাক্তার রাজেন্দ্র প্রসাদকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। (ক্রমশ)

আমাদের দেশ খনিজ সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ। কয়লা থেকে হীরা এবং সোনা থেকে খনিজ তেলের মতো 'তরল সোনা' ইত্যাদি নানারকমের মূল্যবান জিনিস আমরা ধরণীর উদর থেকে আহরণ করি। কিন্তু যারা খনিতে নেমে এইসব মূল্যবান জিনিস সংগ্রহ করে তাঁরা যে প্রতিদিন কতরকম অসুবিধের সম্মুখীন হচ্ছে, সেকথা আমরা ক'জন চিন্তা করি? হাজার হাজার ফিট গভীর খনিতে প্রতিদিন তাদের যে কি ভীষণ গরমের মধ্যে কাজ করতে হয় তা আমরা অনেকেই জানি না। এইরকম গরম তাদের মনের ওপর কতখানি চাপ দেয় তা আমরা ভেবে দেখি না অথবা এই তাপকে কি করে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করি না। হীরা, সোনা মূল্যবান তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যারা আমাদের জন্য এগুলি সংগ্রহ করে আনে তাঁরা আরও বেশি মূল্যবান।

পশ্চিম জার্মানির রুর অঞ্চলের কয়লা-খনিগুলিতে প্রায় ৫০,০০০ খনিকর্মী গড়পড়তা ৩০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উত্তাপের মধ্যে প্রতিদিন কাজ করে। তাদের কিরকম মানসিক চাপ সহ্য করতে হয়, সে সম্পর্কে ডর্টমুণ্ডের ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের গবেষক ডাঃ লেহম্যান চিন্তা করতে শুরু করেন। মানুষের কর্মক্ষমতার ওপর উত্তাপের প্রভাব কতটা সে সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করতে আরম্ভ করেন। তিনি দেখলেন, অফিসের সহজ কাজের জন্য ২০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড আদর্শ উত্তাপ, সাধারণ শারীরিক পরিশ্রমের কাজের পক্ষে ৫ থেকে ৮ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড এবং কঠোর পরিশ্রমের কাজের পক্ষে শূন্য ডিগ্রীর চাইতে কয়েক ডিগ্রী বেশি উত্তাপ সবচাইতে ভাল।

এই ফলগুলিকে আপাত দৃষ্টিতে অত্যন্ত সহজ বলে মনে হয়। কিন্তু কার্য-ক্ষেত্রে এইরকম কাজ অনুযায়ী উত্তাপ পাওয়া খুবই কঠিন। নানারকম যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়ে এই সম্পর্কে কতকগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ফল পাওয়া গেছে। কতকগুলি বিশেষ যন্ত্র বসিয়ে তা দিয়ে বিভিন্ন উত্তাপ সৃষ্টি করে, বায়ুতে বিভিন্ন হারে জলীয় অংশ উৎপাদন করে উত্তাপ বিকীরণ এবং বায়ু চলাচল সৃষ্টি করে পরীক্ষা চালানো হয়। ডর্টমুণ্ডের

যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লোরিডা রাজ্যে জ্যাকসনভিলার কাছে সেণ্ট জন নদী থেকে ভেসে ওঠা ছ' ফিট দীর্ঘ অতিকায় সামুদ্রিক কচ্ছপ। আকৃতির সঠিক পরিমাপ বোঝাতে আলোক-চিত্রশিল্পী ক্যামেরায় বিলম্বিত-ক্রিয়া এক্সপোজার খাটিয়ে নিজেই কচ্ছপটির পাশে গিয়ে বসেন।

ম্যাক্স প্ল্যাংক প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনীয়রগণ একটি বিশেষ যন্ত্র তৈরী করে তার নাম দিয়েছেন 'আবহাওয়া গৃহ', যা থেকে এইসব বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনগুলি মেটানো যায়।

একটি বোতাম টিপে দিয়ে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের উত্তাপ থেকে মরুভূমির জ্বলন্ত উত্তাপ পর্যন্ত যে কোন আবহাওয়া তৈরী করা যায়। এই চেম্বারে নিয়ে গিয়ে যাদের ওপর পরীক্ষা চালানো হয় তাদের পক্ষে পরীক্ষাটা খুব সুখের ব্যাপার নয়। চেম্বারটির ভেতরের দিক ধাতুর পাত দিয়ে মোড়া এবং চুপচাপ বসে থেকে তারা ভেতরের ভীষণ উত্তাপ বা শীত সহ্য করে না। চেম্বারের মধ্যে একধরনের বেল্ট তৈরী করা হয়েছে, তার ওপর দিয়ে তাদের হাঁটতে হয়। যাদের ওপর পরীক্ষা চালানো হয়, তারা সার্ট, জুতো মোজা পরে এর ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে এবং নানারকমের যন্ত্র, সংগে সংগে নির্ভুল তথ্য নিতে থাকে। কানের মধ্যে লাগানো ফটো ইলেকট্রিক সেল ধমনীর স্পন্দন নেয়, চুল শুকোবার টুপীর মতো দেখতে একটি যন্ত্র প্রশ্বাসের পরিমাণ নির্ণয় করে এবং অতি সূক্ষ্ম একটি তৌলযন্ত্র ওজন হ্রাসের পরিমাণ নির্ণয় করে। এছাড়া চেম্বারের ছাদে, ভেণ্টিলেটার এবং উত্তাপ ও শৈত্য সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন যন্ত্র বসানো আছে। এগুলি দিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ ইচ্ছানুযায়ী চেম্বারের আবহাওয়া পরিবর্তন করতে পারেন।

যার ওপর পরীক্ষা চালানো হয়, এক ঘণ্টার মধ্যেই তার গা থেকে ঘামের মাধ্যমে গড়পড়তা এক লীটার তরল পদার্থ বেরিয়ে যায়। বিশেষ করে ৪৫ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উত্তাপে এবং বায়ুর উচ্চ আর্দ্রতায়, মানুষের সহ্যের সীমা পর্যন্ত পরীক্ষা চালানো হয় এবং তারপরই মোট শারীরিক পরিশ্রমের মাত্রা নির্ণয় করে যায়। এরা অবশ্য স্বেচ্ছায় এই পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে এবং এদের মধ্যে বেশির ভাগই বৈজ্ঞানিক। অত্যধিক উত্তাপ ও শীত যে মানুষের দেহে মনে অবসাদ নিয়ে আসে তা এই পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে এবং পরীক্ষার জন্য যায় সার্থক হয়েছে। যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে, তাতে বিশ্বের সর্বত্র মেহনতি মানুষেরা উপকৃত হবে।

*

বিশ্বের বৃহত্তম বুটটি এখন বনে এসে পৌঁছেছে। 'ব্যাভেরিয়ার ক্রীড়া সরঞ্জাম' নাম দিয়ে ব্যাভেরিয়া প্রদেশের বন শহরের অধিবাসীরা ছোটখাটো একটা বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে তার জন্য বিশেষ আকর্ষণীয় কিছু একটা তৈরী করতে চায়। তারই ফলে এই বিপুল বুটটি তৈরী হয়েছে। এটি তৈরী করতে যে সব জিনিস লেগেছে তার বিবরণ শুনলে এটির আকার সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। এটির ওজন ৪ হন্দর, তার মধ্যে চামড়া ও কৃত্রিম চামড়ার ওজন ৩ হন্দর এবং লোহা ইত্যাদির ওজন এক হন্দর। এটি দৈর্ঘ্যে ২·২০ মীটার। পর্বতারোহীগণ পর্বতে আরোহণ করার জন্য যে দড়ি ব্যবহার করেন, সোল সেই ধরনের ৪০ মিটার দড়ি দিয়ে সেলাই করা হয়েছে, বুট লেসের দৈর্ঘ্য হলো ৪·৩ মিটার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, এই বুট পায়ে লাগে এমন কোন লোক এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

*

জেনারেল জার্মান অটোমোবিল ক্লাব জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের বিভিন্ন রাস্তায় সম্প্রতি বিশেষ পাহারার বন্দোবস্ত করেছে। জার্মানির অটোবানে এবং অন্যান্য রাস্তায় অনেক প্রহরা-স্টেশন স্থাপিত হয়েছে এবং এইসব স্টেশন থেকে জার্মান অটোমোবিল ক্লাবের লোকজন মোটর সাইকেলে চড়ে রাতদিন রাস্তায় রাস্তায় টহল দিয়ে বেড়ায়। তাদের মোটর সাইকেলের সংগে একটা করে সাইড-কার সংলগ্ন থাকে এবং এইসব সাইড-কারে রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ অচল হয়ে যাওয়া মোটরগাড়ির জন্যে প্রাথমিক সাহায্যের যাবতীয় জিনিস-পত্র সব সময়ই মজুদ রাখা হয়। ১৯৬০ সালে রাস্তার এই বিশেষ প্রহরীরা ৩,০০,০০০ মোটরচালককে সাহায্য করে। পাহারা-প্রতিষ্ঠানের জন্মের পর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত পনেরো লক্ষেরও বেশী নারী-পুরুষ এদের প্রহরীদের কাছ থেকে নানা ধরনের সাহায্য পেয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের সর্বাংগীণ উন্নতি সাধনের ব্যাপারে জেনারেল জার্মান অটোমোবিল ক্লাবের চেষ্টার অন্ত নেই। ১৯৬১ সালে আরও কয়েকটা প্রহরা-স্টেশন স্থাপন ও পাহারা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্প্রসারণের জন্যে জার্মান অটোমোবিল ক্লাব ৫,০০,০০০ মার্ক বরাদ্দ করেছে।

সমিধ্

শংকর চট্টোপাধ্যায়

ডাক শুনে মুখ ফেরাতেই অন্ধকারে কে যেন খপ্ করে হাত ধরে ফেললো সুবলের। পিঠটা এতক্ষণ দূরের ল্যাম্পপোস্টের আলোটাকে আড়াল করে ছিল, ঘাড় ফেরাতেই ঝাপসা মতন আলো পড়ল মুখে। কাঁচপোকার টিপ কপালে, চোখে কাজল, পরনে ডুরে শাড়ি, মুখটা বিশ্রী সাদাটে। এ কে? সুবল অবাক, যদিও সে জানে ব্রণর জন্যেই কৌটোয় শাঁখের গুঁড়ো জমানো আছে। সে শুনেছিল যারা খারাপ তাদেরই মুখে ব্রণ হয়। যমুনার মুখে দু' একটা ব্রণ ছিল।

সুবল একবার চেষ্টা করল হাত ছাড়িয়ে নেবার।

হাত ছাড়ে না যমুনা। কাজলে ডোবানো চোখটা তরল করে বলে, 'যা ভাই লক্ষ্মীটি, মোড়ের বুধুয়ার কাছ থেকে দু খিলি পান নিয়ে আয়।'

হাতের শক্ত মুঠোয় জোর করে দুটো পয়সা গুঁজে দিল যমুনা।

সুবল খানিক গুম হয়ে বারান্দায় বসে রইল, তারপর উঠে সামনের বড় নালাটা লাফ দিয়ে পেরিয়ে খানিক দূর হেঁটে যায়, এক পলক পেছনে ফিরে তাকিয়ে নেয় তাদের বাড়িটার দিকে, পেছনের ধোঁয়া ধুলোয় ঝাপসা মতন জমাট অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে নিজেদের বাড়িটাকে খুঁজতে গিয়ে কিছুটা সময় রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার আকাশটাকে দেখে, দূরের রায়বাড়ির ভাঙা মন্দিরটা দেখে, আর আস্তে আস্তে পা ফেলে, যেন অনেক আঁক কষে, বিচার বিবেচনা করে সে এখন পা ফেলছে, কারণ যত দেরি হবে তার, দিদিটা ভীষণ চটে যাবে। ধীরে ধীরে পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে বিকেলের কানমলার জন্য দিদির উপর প্রতিশোধ নিতে পেরে সুবলের মনটা একটু খুশী হল।

পান কিনে ফিরে বারান্দায় পা রাখতেই, সে যমুনার চিল-চিৎকার শুনতে পেল।

—সুবল, সুবল রে।

প্রথম ডাকেই সাড়া দিল না সুবল, অন্ধকারে দরজার পাশে, আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, দরজার ফাঁকে চোখ রেখে। ঘরে কাচফাটা ময়লা লণ্ঠনটা জ্বলছে, দিদির খোঁপার ছায়াটা বিশাল হয়ে দেওয়ালে। ঘরের কোনায় দেওয়ালের সঙ্গে মিশে চেঁচাচ্ছে দিদি।

এবার সুবল ঘরের ভেতর পা রাখল আর সঙ্গে সঙ্গে একছুটে যমুনা এসে জড়িয়ে ধরল তাকে।

—সুবল রে, এই এত বড় একটা।

—ভীতু, ভীতু কোথাকার।

—ভীতু-ই তো, গায়ের উপর লাফিয়ে উঠেছিল।

—কোনদিন দেখবি, তোকেই দাঁতে কেটে ফর্সা করে দেবে।

গলা খুলে হেসে উঠল সুবল। যমুনা সরে গিয়ে ততক্ষণে দূরে দাঁড়িয়েছে, সুবল হাসছিল, কিন্তু নিঃশ্বাসে তার কোমল একটা সুন্দর গন্ধ এসে লাগছিল। গন্ধটা আসছে দিদির গা থেকে, ঐ মস্ত মৌচাকের মত খোঁপাটা থেকে, ফুল-তেলের গন্ধ। এক-পলক দিদির চুলের দিকে তাকাল সে। অন্য দিন কেমন রুক্ষু রুক্ষু লালচে ধুলোপড়া দেখায় চুলগুলো, আজ তেলে জলে চকচকে, বাতাসে গন্ধ ছড়াচ্ছে। হঠাৎ হাসিটা থামিয়ে বলে ফেলল সুবল ফিস্‌ফিস্ করে, 'গন্ধ তেল পেলি কোথায় রে দিদি?'

যমুনা একটু চমকাল, এক পলকের জন্য কেমন বিমূঢ় আর বিচলিত দেখাল তাকে, বলল, 'ফুলির কাছ থেকে। তেল, শাড়ি, আট গণ্ডা পয়সাও নিলাম।

—দিল?

—কেন দেবে না, ওকে যে আমি সব দু গুণ ফিরিয়ে দেব বলেছি।

সুবল তাকালো, লণ্ঠনের মরা ঝাপসা ঝাপসা আলোয় দিদির চোখের কাজল, কপালের টিপ বুঝি ধুয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। কৃশ করুণ কতকগুলো ভাঙাচোরা রেখা শীর্ণ অস্থিসর্বস্ব একটা মুখকে ফুটিয়ে তুলছে, এই আলোয়, ঘরে।

সুবল অন্য দিকে চোখ ফেরাল। মনে পড়ল অন্য কথা, ভীষণ ভীতু দিদিটা, ই'দুরকে বড় ভয় করে, একটা বাচ্চা ই'দুরও ওর কাছে জন্তু-জানোয়ারের সমান। ও যেন নিঃশ্বাসে ই'দুরের গায়ের গন্ধ পায়, আর ভয়ে দেওয়ালের কোনায় সরে গিয়ে কাঁপতে থাকে। যেন ই'দুরের হাত থেকে ঐ দেওয়ালটা ওকে বাঁচাবে। ভয় পাওয়া দিদির বোকা চেহারাটা দেখলে তাই ভীষণ হাসি পায় সুবলের। আর ও ঘরের ই'দুরগুলোও এক একটা মস্ত মস্ত, যা পাবে তাই দাঁতে কাটবে। তার পরনের প্যান্ট, দিদির শাড়ি, মার বিছানা। চৌকির তলার অন্ধকার ঘুপচিতে টিনের ভাঙা বাক্স আর কাঠের সিন্দুকটার ভেতর ওদের বাসা। মাঝে মাঝে বেশ টের পায় সুবল ওদের ঘরকন্নার শব্দ। কতদিন এ ঘরের মেঝেতে যখন খেতে বসেছে, দেখেছে সুবল, চৌকির তলার অন্ধকারে কেমন একটা নাড়াচাড়া পড়ে গেছে। সে বেশ স্পষ্টই যেন দেখতে পেয়েছে কয়েক জোড়া ঘোলাটে দৃষ্টি অন্ধকার থেকে তার দিকে, থালার খাদ্যবস্তুর দিকে স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে।

আজ সকালে স্নান করবার আগে সুবল হরিদের বাড়ি থেকে ই'দুরমারা কলটা নিয়ে পেতে রেখে এসেছে ঐ ভাঙা টিনের বাক্সটার পাশে। নির্ঘাত আজ ওদের একটা ধরা পড়বে। যদি রোজ একটা করে ধরা পড়ে, তাহলে দিন কয়েকের মধ্যে ঘরটা ই'দুরশূন্য হয়ে যাবে। যমুনাকে আর সতর্ক পা ফেলে ফেলে হাঁটতে হবে না। নির্ভাবনায় চলাফেরা করতে পারবে দিদি। দিদির ভয়টা থাকবে না, হঠাৎ চে'চিয়ে ওঠাটা থাকবে না, আর বুঝি দিদির ভয়-পাওয়া চেহারাটা দেখে সুবলের খুশী হওয়াটাও না।

হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়ে গেল তার আর জিজ্ঞেস করল, 'ফুলদিকে কি করে তুই সব জিনিস দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দিবি দিদি?'

সুবলের প্রশ্নটায় যমুনা বুঝি এক পলকের জন্য একটু আড়ষ্ট হল, দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল, তারপর একটা অদ্ভুত রহস্যময় হাসিতে তার ঠোঁট ভরে উঠল।

—দেখবি, সময় হলে দেখবি।

যমুনার কথাটা শেষ হল না ভালো করে, ভারী পা ফেলে ফেলে সামনের অন্ধকার ঘরটা পেরিয়ে এই আলো-জ্বলা ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল একজন। ঝাপসা মতন লণ্ঠনের আলোয় সুবল চিনতে পারল। মোড়ের ডিস্পেন্সারীর কম্পাউন্ডার গোরাবাবু। নামেই ডিস্পেন্সারী; দুটো মোটে আলমারি। একটার প্রায় সবগুলো কাঁচই ভাঙা। ঘরের মধ্যে বিশ্রী শব্দ করে একটা পাখা ঘোরে সব সময়। লাল ময়লা ঝুলভর্তি আলোর ডোমটা দোল খায়। টেবিলটায় মনে হয় অনেক বছরের ধুলো জমে আছে, আঙুলটা ভুল করে রেখে সুবল দেখেছে, আঙুলের ছাপ পড়েছে টেবিলে। দুপুরে দিদির আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা চিঠিটা নিয়ে গিয়ে সব দেখে এসেছে সুবল। ভয়ে ভয়ে সে লোকটাকে দেখছিল। কুচকুচে কালো রং, প্রকান্ড মাথা, চুল নেই, পাকা তালের মত চকচক করছে। ভীষণ নোংরা দাঁত, সারা দিন পান চিবোয় বোধ হয়। দিদির চিঠিটা পড়তে পড়তে লোকটা হাসছিল। ওপরের পাটির এক দিকে তিনটে দাঁত নেই। কেন জানি লোকটাকে দেখেই সুবলের ভীষণ খারাপ লেগেছিল। সবচেয়ে তার খারাপ লেগেছিল কালো পুরু দুটো ঠোঁট নাচিয়ে নাচিয়ে গোরাবাবু যখন হেসে হেসে কথা বলছিল। তার সব কথাতেই লোকটা হাসছিল। যেন খুব ফুর্তিতে আছে। আর কী বিশ্রী চোখের রঙ, লাল গোলা চোখ,

অনর্গল বিড়ি টানছিল ভাঙা চেয়ারটার উপর উবু হয়ে বসে।

—তা তোমার মার হাঁপানির টানটা বেশ পুরনোই, কী বল। ক'দিন খুব বেড়েছে।

লোকটা হাসছিল। 'তা আমার কথা দিদি তোমায় কী বলে দিয়েছে?' প্রশ্নটা বার তিনেক আওড়েছিল লোকটা। ভীষণ রাগ হচ্ছিল সুবলের লোকটার উপর, দিদিটার উপর। লোকটার মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করছিল না তার।

—নামটা যেন কি বললে, না সুবোল টুবোল নয়। তোমাকে এখন থেকে শালা-বাবু বলে ডাকলে কেমন হয়?

ভাঙা আলমারিটার সামনে দাঁড়িয়ে শিশি-বোতলগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে লোকটা বলছিল, আর হাসছিল। সুবলের ইচ্ছে করছিল আঙুল দিয়ে সে তার কানের ছিদ্র দুটো বন্ধ করে রাখে কিংবা একটা ঘুঁষি মেরে লোকটার নাকটা থেঁতলে দেয়, হাসি থামিয়ে দেয়। কিন্তু চুপ করে, মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া কি আর তার করবার ছিল।

—নাও হে, দিদিকে বলো, মালিশটা যেন মার বুকে ভালো করে লাগিয়ে দেয়।

কালো রঙের শিশিটা সুবলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে লোকটা নোংরা দাঁতগুলো মেলে সুবলকে দেখছিল। শিশিটা হাতে নিয়েই সুবল দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

—আরে দাঁড়াও হে শালাবাবু, এত তাড়া-তাড়ি কিসের। শালা বলায় লজ্জা হল নাকি: হা, হা। ময়লা ছিটের ফতুয়ার পকেট থেকে কাপড়ের থলিটা বের করতে করতে লোকটা হাসছিল। তারপর গুনে গুনে তিনটে তেলচিটে নোট সুবলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দিল।

—ওষুধ যখন দিলাম, পথ্যির বন্দো-বস্তটাও করে দি।

সুবল নোট তিনটে হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সেই বিশ্রী হাসিটা শুনতে পেয়েছিল।

এখন আবার লোকটার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুপুরের সেই কদাকার অনুভূতিটা বুকের মধ্যে ভরে গেল। সুবল মুখ ফিরিয়ে নিল। অন্য দিকে চোখ সরিয়ে নিয়েও বেশ বুঝতে পারল, গোরাবাবুর পা দুটো বেসামালভাবে ঘরের মেঝের উপর পড়ছে: আর কটু একটা গন্ধ ঘরের বাতাসে।

—কি হে শালাবাবু, তখন অমন পালিয়ে এলে কেন?

—কি সব যা তা বলছেন গোরাবাবু। যা তুই সুবল।

দিদির গলাটা শুনতে পেল সুবল। আর দিদির একটা হাত যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সুবলকে ধাক্কা দিয়ে চৌকাঠের বাইরে ঠেলে দিল অন্য হাতটা সুবলের হাতের মুঠোয় কী একটা গুঁজে দিল।

—মোড়ের সাধুর দোকান থেকে গরম তেলেভাজা খেয়ে আয়।

দিদির ফিসফিস গলা কানের কাছে শুনতে পেল সুবল আর দরজা বন্ধ হবার শব্দও।

তারপর অনেকক্ষণ হল সুবল বন্ধ দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে। সেই মুহূর্তটা গেছে যখন সুবলের হাতের মুঠোয় দিদির হাতটা চকিতে এক পলক ধরা দিয়েছিল, ফলে সে বুঝতে পেরেছিল দিদির হাতে যে স্বাভাবিক উষ্ণতাটুকু থাকে তা নেই আর হাতটা কাঁপছিল। এই দারুণ গ্রীষ্মেও দিদির হাতটা যেন শীতকালের ভোরে জল-ভর্তি বাসনমাজা হাতের মত কেমন হিম হিম, মরা মানুষের হাত যেন। আর সুবলের হাতের মুঠোয় দু'আনিটা ধরা আছে এখনও। ভাগ্যে এখন অন্ধকার, সুবলদের সংসারের একমাত্র ময়লা কাচফাটা লণ্ঠনটা এখন দিদির ঘরে, দরজাটা বন্ধ, তাই সে যেন এক ভীষণ দুর্বোধ্য লজ্জার বোঝা কাঁধে নিয়ে নিরাপদে অন্ধকারে এ ঘরে দাঁড়িয়ে। যেন সুবলের শরীরটা জ্বলছে, দৃষ্টিটা অন্ধ, অন্ধকারটা থকথকে কাদার মত। ভেতরে কী যেন একটা

দপ্‌দপ্‌ করছে, খিদে না অন্য কোন যন্ত্রণা সে নিজেই জানে না। তবু ভীষণ চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে যেন কিছু একটাকে আঘাত করতে ইচ্ছে করছে, কিংবা এসব কিছুই নয়, শুধু মুখে হাত চেপে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলার অনুভূতিটা বারো বছরের অকাল-প্রৌঢ় সুবলের ভেতরে ঘোলাটে আবহাওয়া সৃষ্টি করে দম চেপে আছে। আর সুবল ঘরের মধ্যে নিঃশ্বাস দিয়ে যেন বাতাস খুঁজছিল, অথচ বাতাস ছিল না। গুমোট। এই ঘরটা, সুবলদের সংসারটা যেন ও গলির করিমচাচার গোস্তারুটির দোকানের এক-মানুষ উঁচু চুল্লিটা হয়ে আছে সব সময়, সারা দিন ধরে তরিয়ে তরিয়ে যেন তাদের সবাইকে পোড়াচ্ছে।

সুবল বুঝল সে ঘামছে। ঘরের মধ্যে এক ফোঁটা হাওয়া নেই, আর ঘরময় মার গা থেকে ওঠা মালিশের উগ্র ঝাঁঝাল গন্ধ। দু দিন ধরে যে হাঁপানির টানটা মার বুকের মধ্যে ফুঁসছিল, গজরাচ্ছিল আর বিশ্রী একটা শব্দ করে ঘরময় দাপাদাপি করছিল সেটা এখন ওষুধ পড়ায় শান্ত। মা ঘুমচ্ছে, দিদির ঘরের দরজাটা বন্ধ। আর সুবল শুধু বন্ধ দরজার পাল্লায় কান পেতে হাতের মুঠোয় দু'আনিটার ধাতব স্পর্শ জন্তুর মত উপভোগ করতে করতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। হাতের মুঠোয় দুআনিটা যেন একটু এক টুকরো অন্ধকারের মত গলে গলে তরল হয়ে যাচ্ছে। অথচ অনেক আগেই হাতে পয়সাটা পাওয়া মাত্র তার ছুটে যাওয়া উচিত ছিল, সাধুর গরম তেলেভাজার দোকানে কিংবা হরিনাথের স্টলে। কিন্তু না, সুবল এই অন্ধকারে, হাওয়া নেই গুমোট ঘরে, বাড়ির পেছনের খাটালের না-ঢাকা নর্দমাটার দম চাপা গন্ধে, মার গায়ের মালিশের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে।

হঠাৎ বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে একটা শব্দ শুনতে পেল সুবল। চমকে উঠল। সুবলের বুকের মধ্যে ধক করে ভয় লাফিয়ে পড়ল। যদি বন্ধ ঘরে মাতালটা দিদিকে মারধোর করে। আর কোনরকম শব্দ আসছে না। ঘরটা বুঝি অন্ধকার আর থমথমে অসাড় স্তব্ধ। সুবলের বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্‌, একটানা দ্রুত। আচমকা সুবল যেন অস্পষ্ট কয়েকটা নরম পায়ের চলার শব্দ শুনতে পেল। শুনতে পেল সাদা ঝকঝকে ধারালো দাঁত গোপনে নরম কিছুকে কাটছে। যেন সুবল দেখতে পাচ্ছিল রেখাবহুল শরীরটা নর্দমার গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো, দাঁতে বুঝি তখনও ময়লা, অন্ধকারে এসে দাঁড়াল, খুব ধীরে ধীরে তার প্রৌঢ় নরম পায়ের নখগুলো অন্ধকারে ঘষে নিল। ভাঙা পুরনো টিনের বাক্সটা পাশে রেখে কাঠের সিন্দুকটাকে পেছনে দাঁড় করিয়ে, কাচফাটা লণ্ঠনটার ঝাপসা মতন আলোর সামনে দিয়ে দ্রুত ছুটে গেল ঘরের কোনার ময়লা কাপড়ের স্তূপটার দিকে। জটিল আরও সব বিচিত্র অনুভব তাকে অস্থির করে তুলল, খোঁচা দিল, ঠেলতে লাগল বাইরের দিকে। অস্থিরতায় বেহুঁশ হয়ে সুবল অন্ধকারে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে তা

খেয়াল করেনি। সুবলকে দেখে হরিনাথের চায়ের দোকানের গোবরা মুখ টিপে হাসল। রোজ হাসে। তারপর হরিনাথের হাতে মার খেয়ে মুখ গোঁজ করে চা দিতে থাকে। হরিনাথের চায়ের দোকানে সকাল সন্ধ্যে অনেকে বসে থাকে। ছোটখাট মাল ফিরি করা ব্যাপারী, সামনের বাস-গুমটির নকুলেশ্বর ক্লিনার, কনডাকটার মদন, বাজারের মিষ্টির দোকানের মালিক শিবু চক্রবর্তী, স্যাতসেঁতে কাপড়ে জড়ানো ছোট কলকেটা এ হাত ও হাত ঘোরে। কটুগন্ধ ধোঁয়ায় চায়ের স্টলটা আড়ষ্ট হয়ে থাকে। গোবরা তালপাতার পাখা ঠকঠকায় উনুনের মুখের কাছে। মালিক কাঠের ক্যাশ-বাক্সট'র সামনে পা-ভাঙা টিনের চেয়ারে বসে বিড়বিড় করে, সকাল সন্ধ্যে হরিনাথের কপালে রক্তচন্দনের টিপটা জ্বলজ্বল করে। সুবল এসে স্টলটার থেকে দূরে বড় পাকুড় গাছটার আড়ালে দাঁড়ায়, গোবরা মুখ টিপে হাসে, আর মালিকের চোখ ফাঁকি দিয়ে এক সময় বেরিয়ে আসে।

সুবলকে আসতে দেখে গোবরা চোখ টিপল, হাসল দাঁত বার করে। কী করে গোবরাটার মুখে অত হাসি আসে বুঝতে পারে না সুবল। তার জীবনের গল্প শুনেছে সে। তার একটা অতীত আছে, অতীতে বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই। কেবল একটা মা মা। মাটা একটা রাক্ষুসী। একটা অভাব আর খিদে রাত্রি দিন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারত তাদের। তাই খাবারের দোকানের আশেপাশে, গৃহস্থবাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরঘুর করত কুকুরের মতন। তারপর মা-টা কোথায় হারিয়ে গেল, আর খুঁজে পেলো না গোবরা। তারপর এ-দেশ সে-দেশ। শেষ পর্যন্ত হরিনাথের চায়ের স্টলে। ছ-টাকা মাস মাইনে, খাওয়া পরা, হরিনাথ যখন তখন মারে।

—দেখবি, ঠিক একদিন পালিয়ে যাবো। মা মাগীটা যে কোথায় গেল।

বলে আর হাসে গোবরা, বিড়ি খাওয়া কালো ঠোঁটটা দুমড়ে ছোপধরা হলদে দাঁত-গুলো বের করে।

সুবল জানে গোবরার কত কষ্ট। সুবল জানে তার কত কষ্ট। বড় ক্লান্ত, বড় নিঃশেষ, যেন মেলায় ঐ দম-ফুরোনো কলের নাগরদোলাটার মত। ভেতর থেকে একটা যন্ত্রণা কেন যে পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠে, সুবল জানে না।

আজ সন্ধ্যায় সুবল আর পাকুড় গাছটার আড়ালে দাঁড়াল না, সোজা হরিনাথের চায়ের স্টলটার সামনে পাতা নড়বড়ে বেঞ্চিটার এক পাশে বসল। নকুলেশ্বর তার বড় বড় লাল চোখ দুটো তুলে একবার সুবলকে দেখে নিয়ে বলল, শালা লায়েক হয়েছে রে, নতুন চিড়িয়া।'

মদন বড় গেলাস থেকে চুমুক দিয়ে চা খেতে খেতে সুবলের দিকে না তাকিয়েই বলে, 'হইবে না, চিড়িয়ার খাঁচাখানি একবার দেখছ।'

বলে চোখ কুঁচকে রহস্যময় হাসল। সুবল কথাগুলো যেন শুনেও শোনে না। এক গেলাস চা এনে ঠক্ করে বেঞ্চিটার উপর রাখে গোবরা। হরিনাথ বিড়বিড় করে ক্যাশ-বাক্সের সামনে বসে।

—হালার দিনকালের নিশানা পাই না।

মদনের গলাটা ভেঙে দুমড়ে কদাকার হয়ে যায়, নকুলেশ্বর তার লাল বিশাল চোখটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাস্তার লোকজন দেখে, শ্রীনাথ ব্যাপারী বিড়ি টানে আর গোবরা হাসে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সাঁঝসন্ধ্যার আসর শেষ হয়ে ফাঁকা হয়ে যায়। গোবরা এক সময় আঙুল দিয়ে একটা ঠেলা দেয় সুবলের গায়ে, ফিসফিস করে বলে, 'এই সুবল, ওঠ।'

একটু দূরে পাকুড় গাছটার অন্ধকারে, ইটের পাঁজাটার উপর বসে গোবরা।

—কিরে বল না।

—কি বলব?

—সান্ঝে থেকে কী হয়েছে তোর?

—কী হবে?

গোবরা হাই তুলল, হাত আর পায়ের আঙুল মটকাল। তারপর একটা বিড়ি ধরাল।

—চলবে নাকি? রাম রাম—তুই তো ভাল ছেলে রে।

হাসতে থাকল গোবরা। সুবল কিছু শুনল না যেন, কোন দিকে তাকালে না যেন। হঠাৎ গোবরার মুখ থেকে বিড়িটা টেনে নিল নিজের ঠোঁটের উপর। একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল, বিস্বাদ, মাথাটা যেন ঘুরে গেল একটু। মুখটা বিশ্রী, দলা পাকিয়ে থুথু ফেলল মাটিতে।

—বলি, কি ব্যাপার রে তোর, অ্যাঁ! একেবারে রাতারাতি লায়েক বনে গেলি।

সুবল গম্ভীর। বড় বড় তিনটে টানে বিড়িটা শেষ করে পাশের নালায় ছুঁড়ে ফেলল। আর হঠাৎ গোবরা আঙুল দিয়ে সুবলের থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বলল, 'চাঁদু আমার' বলে খিক্‌খিক্ করে হেসে উঠল।

—আমায় একটা চাকরি জুটিয়ে দিবি গোবরা?

এতক্ষণে সুবল যেন একটা কথা বলতে পারল।

—ঐ শিবু চক্রবর্তীই তো ওর দোকানের জন্য একজন বিশ্বাসী ছেলে খুঁজছিল। কাল থেকে লেগে যা না।

ওরা দুজন তারপর উঠল, গোবরা ঢুকে গেল চায়ের স্টলের ভেতর, সুবল এসে বসল বেঞ্চিটায়। সুবল দেখল গোবরা হরিনাথের সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করছে। কথা শেষ করে গোবরা এল।

—বসে যা একটু, শিবুবাবু এক্ষুনি আসবে, মালিক তোর জন্যে বলবে বলল। এক কাপ চা খা বসে।

ঠক্ করে বেঞ্চিটার উপর চায়ের গেলাসটা রাখল গোবরা।

হরিনাথের কথায় শিবু চক্রবর্তী মাথা দোলালেন।

—তা তুমি যখন বলছ ছেলেটা বিশ্বাসী, একটু আধটু লেখাপড়াও জানে, তা কাল থেকে না হয় আরম্ভ করুক।

গোবরা হাত নেড়ে সুবলকে ডাকল।

—শোন হে ছোকরা, মন দিয়ে কাজ করবে, কাঁচা পয়সার কারবার। আসল কথাটা বলি, টাকা পনেরোর বেশী কিন্তু আমি দেবো না আর খাওয়া থাকা পাবে। বল তে কাল দোকানে বেরুনোর পথে তোমাকে ডেকে নিয়ে যাব।

কোন কথা যেন ভাল করে শুনতে পাচ্ছে না সুবল। বুকের ভেতরটা তার দুবদুব করছে, জ্বলছে একটা আনন্দে, সুখে। সে ঢিপ করে শিবু চক্রবর্তীর পায়ে একটা প্রণাম করে বসল।

—আহা, এসব আবার কেন!

শিবু চক্রবর্তী মাথা দোলাতে লাগলেন। হাওয়াটা মিষ্টি লাগছে, জলো জলো হাওয়া, যেন রাস্তার ধোঁয়াটাও কমেছে।

দুটো মেয়ে আর বুড়োটে চেহারার হ্যাংলা মতন এক ছোকরা চায়ের দোকানে ঢুকল। দিদির মত দেখতে নয় ওদের একজনকেও। কেমন টসটসে ঠোঁট, ফোলা ফোলা গাল। চোখ দুটো ঘুরছে অনবরত। সুবল ওদের কথা শুনেছে গোবরার মুখে, থিয়েটার করে, ওপাশের বস্তিতে থাকে। বেশ দু পয়সা রোজগার। ওদের চা খাওয়া হয়ে যেতে ওরা উঠে দাঁড়াল, ছোকরাটা একটা সিগারেট ধরাল, বড় মতন মেয়েটা কাপড়ের থলিটা খুলে হরিনাথের কাঠের বাক্সটার উপর পয়সা রাখল গুনে গুনে। অন্য মেয়েটা একটা হাই তুলল, পানের রসে লাল দাঁত বের করে। রাস্তায় নেমে ছেলেটা বড় মেয়েটার কানের কাছে মুখ নিয়ে কী বলল। মাইরি, মেয়ে দুটো হেসে উঠল এক সঙ্গে। হাসিটা সুবলের কানে বাজল। আঃ, দিদিটা কতদিন অমনি করে হাসে না। দিদিটার ভারী কষ্ট। দিদিটা ওদের থেকে বেশী সুন্দর, গায়ের রঙ কেমন ফর্সা।

সুবল হাঁটতে লাগল। নীল রঙের দোতলা বাড়িটার সামনের ঘর থেকে ঘড়ির ঘণ্টা শোনা গেল। সুবল মন দিয়ে ঘণ্টাগুলো গুনতে লাগল। দশটা।

বাড়ির সামনের একচিলতে বারান্দায় অন্ধকারে কে যেন বসে। কেমন ক্লান্ত, ভাঙা শরীর এলিয়ে বসে রয়েছে অন্ধকারে। কাছে গিয়ে চিনতে পারে সুবল।

—এই দিদি, কী করছিস?

যেন একটা মাটির পুতুল দু আধখানা হয়ে ভেঙে গেছে, দিদির চেহারাটা তেমনি দেখায়।

—সুবল এলি! এত রাত করলি কেন? গিয়েছিলি কোথায়?

গলাটা কেমন ভাঙা ভাঙা সুবল শোনে, অনেকক্ষণ কান্নাকাটি করবার পর মানুষের গলা যেমন হয়, ঠিক তেমনি।

—এই দিদি, তুই কাঁদছিলি?

বারো বছরের সুবলের গলাটা যেন কেমন করল।

—মিছিমিছি কাঁদতে যাব কেন?

যমুনা একটা হাসিকে গলার মধ্যে টেনে আনল।

—চল খাবি চল।

ঘুমে ভরা শরীরটা টানতে টানতে কোনরকমে গিয়ে পিঁড়িতে বসে সুবল। ঘরে কুপি জ্বলে, দিদির মুখের অর্ধেকটাতে আলো পড়েছে, অন্য দিকটা অন্ধকার। দিদি ভাই পাশাপাশি খেতে বসে। লঙ্কালাল কুঁচো চিংড়ির তরকারি

আর গলা ভাত। খেতে খেতে যমুনা বলে, 'তোকে ঘুমে ধরেছে রে সুবল। আমি ভাতটা মেখে দি।'

সন্ধ্যার ফুলের তেলের গন্ধটা অনেক ফিকে হয়ে গেছে, ডুরে শাড়িটা দলা পাকিয়ে ন্যাতার মত, চোখের কাজল গলে গলে গালের উপর কালো কালো দাগ টেনে ভেসে গেছে যেন কোন স্রোতে, কপালটা শূন্য। একবার ভাসানের পর চড়ায় ভেসে ওঠা মাটিখসা, খড়কুটো আর বাঁশের কাঠামো বের করা একটা দুর্গাপ্রতিমা দেখেছিল সুবল, দিদিটাকে এখন ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। সে ঝাপসা চোখে দিদিকে দেখতে লাগল।

—নে, ভাল করে চিবিয়ে চিবিয়ে খা।

হঠাৎ এক সময় জরুরী কথাটা মনে পড়ে গেল সুবলের। ঠোঁটটা পুরোপুরি মেলে তাকাল।

—কাল খুব ভোরে তুলে দিবি কিন্তু। শিবু চক্রবর্তী আমাকে ডাকতে আসবে।

—কেন রে, ও বুড়োটার সঙ্গে তোর কী কাজ?

—বারে, কাল থেকে যে আমি ওর দোকানে কাজ করতে যাবো।

—তুই কাজ করতে যাবি?

যেন অনেক কষ্টে কথা ক'টা উচ্চারণ করল যমুনা।

—আজ সন্ধ্যেবেলা যে সব ঠিক হয়ে গেল। মাস গেলে পনেরো টাকা মাইনে দেবে, দু বেলা খাওয়া দেবে, দেখিস না তোকে কত মিষ্টি এনে খাওয়াই...।

উৎসাহে সুবলের গলাটা কাঁপতে লাগল আর দিদির মুখের দিকে চোখ পড়তেই সে দেখল একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দিদি, ঠোঁটটা কাঁপছে, চোখের পাতাটাও। দিদির দিকে তাকিয়ে যেন ভয় করতে লাগল সুবলের। বড় কষ্ট দিদির, বড় কষ্ট এই সংসারটার।

—এই দিদি, কী হ'ল রে তোর?

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ক্ষীণ চিৎকারটা এলো খাটের তলার অন্ধকার থেকে। সুবল হতভম্ব। যমুনা চমকাল। চিৎকারটা বাড়তে থাকল এক সময়, সুবল যমুনার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে উঠল।

—কলে ধরা পড়েছে রে।

আর কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পিঁড় ছেড়ে লাফিয়ে উঠল সুবল, জল ভর্তি ঘটিটা কোন রকমে উল্টে হাতে মুখে জল দিল, তারপর কুপিটা তুলে খাটের তলায় উঁকি দিল, ধূসর রঙের হৃষ্টপুষ্ট একটা ইঁদুর কাঠের খাঁচাটার ভেতর দাপাদাপি করছে, যেন প্রচণ্ড গলায় অভিশাপ দিচ্ছে, চিৎকার করছে আর ক্ষুদ্র শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়ে রণক্ষেত্রে নেমেছে।

—ও দিদি রে!

আনন্দে চিৎকার করে উঠল সুবল, ততক্ষণে সুবলের পাশে হামাগুড়ি দিয়ে যমুনাও মুখ বাড়িয়েছে খাটের তলার স্বল্প-আলোকিত অন্ধকারে।

কাঠের খাঁচাটা আস্তে আস্তে বের করে আনল সুবল, ঝাপসা এক জোড়া চোখ সুবলের দিকে ক্রূর হিংসা নিয়ে তাকাল যেন।

—তুই ডান্ডাটা নিয়ে রাস্তায় আয়।

সুবল এক ছুটে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। কোমরে কাপড়টা গুঁজতে গুঁজতে ডান্ডাটা হাতে নিয়ে যমুনাও সুবলের পেছন পেছন এলো। সুবল মাঝরাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। রাত নিশুতি, নির্জন রাস্তায় প্রবল জ্যোৎস্না ঝলসাচ্ছে।

—আমি দরজাটা খুলে দেবো কায়দা করে, তুই ডান্ডাটা বসিয়ে দিবি সঙ্গে সঙ্গে, যেন পালাতে না পারে।

রাস্তার উপর ইঁদুরধরা কলটা আগলে উবু হয়ে বসল সুবল।

—ঠিক করে ডান্ডাটা ধর। ফসকে যেন না যায়। খুব সাবধান।

প্রবল জ্যোৎস্নায় ফর্সা চারিদিক। সুবল তাকাল যমুনার দিকে। এই মুহূর্তে যেন কেমন অচেনা অচেনা লাগছে দিদিটাকে। মৌচাকের মত খোঁপাটা ভেঙে পিঠের উপর নেমেছে, হাওয়ায় কপালের উপর চুল উড়ছে, জড়ানো আর রোগা ফর্সা হাত, ডান্ডাটা মুঠোয় নিয়ে জ্যোৎস্নার ভেতর আকাশের দিকে উঁচু হয়ে আছে। কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে দিদিটাকে, ভয়ংকর আর ভীষণ সাহসী।

আঙুলের ছোঁয়ায় দরজাটা খুলে গেল এক সময়। ধূসর রঙের একটা বিদ্যুৎ ছুটে বেরিয়ে এল, জ্যোৎস্নায় উত্তোলিত বর্শা-ফলকের মত যমুনার রোগা ফর্সা হাতটা নেমে এলো অমোঘ ঘাতকের খড়্গের মত, রাস্তার উপর লোহার ডান্ডাটার ধাতব শব্দ হ'ল।

—ধুৎ, ফসকে গেল।

ক্লিষ্ট একটা হাসি যমুনার ঠোঁটের উপর ভেঙেচুরে গেল।

—রোজ রোজ কী আর ফসকাবে! দেখবি কাল নির্ঘাত মেরে দেবো।

যেন একটা নিষাদের গলা গম্‌গম্ করে উঠল মধ্যরাত্রির জ্যোৎস্নায়।

স্মৃতির এক পৃষ্ঠা

নলিনীকান্ত গুপ্ত

সুভাষ-ওটেন সংবাদ বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে। বহুজন বহুবার বিবৃত করেছেন কি রকমে সুভাষচন্দ্র তাঁদের প্রফেসর ওটেন (Oaten) সাহেবকে জুতোপেটা করেছিলেন। কিন্তু সাধারণে প্রায় ভুলে গিয়েছে যে, এ-ঘটনাটি ঠিক অনুরূপ আর একটি অনুষ্ঠানের প্রতিচ্ছবি বা অনুকৃতি। সুভাষ নূতন কিছু প্রবর্তনা করেন নাই—তিনি পূর্বসূরীদের (পূর্বশূরদের বলা উচিত) অনুগমন করেছিলেন মাত্র। সেই আদি কাহিনীটি আজ বলতে চাই।

১৯০৫ সাল, স্বদেশীর জোয়ার ছুটেছে দেশকে ভাসিয়ে মাতিয়ে, বিশেষত ছাত্রকুলকে। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজ? তা হল ভালো ছেলেদের আর বড়লোকের ছেলেদের প্রতিষ্ঠান—অর্থাৎ যাদের পরিচয় হল, তখন বলা হত—they who have a stake in the country, যাদের হারাবার মতো জিনিস আছে—তাদের কাছে সে ঢেউ কতখানি পেঁৗছেছিল? পেঁৗছেছিল যাদের কাছে তাদের দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ নাম দিতে পারি।

১৯০৫ সালে আমার দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী। আমার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন উত্তরকালে সুবিখ্যাত নরেন্দ্রনাথ লাহা এবং বোধ হয় ভূপতিমোহন সেন* (যিনি পরে হয়েছিলেন প্রিন্সিপাল বি এম সেন)। আরো ছিলেন সীতাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, পরে যিনি ঈশান-বৃত্তি লাভ করেছিলেন বি এ-তে এবং পরিণামে হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সীতাপতি মহারাজ বা স্বামী রাঘবানন্দ। এঁরা মোটের উপর ভালো ছেলেদের দলে। দামাল ছেলেদের মধ্যে ছিলেন ইন্দুনাথ নন্দী—কর্নেল নন্দী আই এম এস-এর পুত্র। এঁর কীর্তি কিছু বিবৃত করি। মানিকতলা বাগানের বারীন ঘোষের সহকর্মী ইনি, আত্মোন্নতি সমিতির সভ্য—এ আখড়াটি বিপ্লবী আহরণ করবার ও তৈরি করবার প্রতিষ্ঠান। এই সমিতির আমিও ছিলাম এক ক্ষুদে সভ্য। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীও ছিলেন একজন ওস্তাদদের মধ্যে। বিদেশী খেলা বলে ফুটবল ছেড়ে দিয়ে লাঠি-ছোরা চালাতে শিখছি। এবং এসব কসরতে এমন বিশারদ হয়ে উঠেছিলাম যে, একদিন শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী মহাশয়ার শুভাগমনে তাঁর সম্মুখে আমাকে লাঠিখেলা দেখাতে হয়েছিল। যা হোক, ইন্দু নন্দী আরো গুরুতর ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন—বোমা তৈরির প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন—এবং শেষে পরীক্ষা করতে গিয়ে বিস্ফোরকে তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলি উড়ে যায় এবং এই ঠুঁটো অবস্থায় ধৃত হয়ে তিনি আলিপুর বোমার মামলায় আসামী হয়েছিলেন। তবে তাঁর দণ্ড কিছু হয় নাই—কৌঁসিলীদের কারসাজিতে প্রমাণ হয়েছিল যে, একটা লোহার সিন্দুকের তলায় চাপা পড়ে তাঁর হাতের ওই অবস্থা হয়।*

এই সম্পর্কে তা হলে আমার কলেজ-জীবনের একটি কীর্তি ঘোষণা করি। ওই একই ১৯০৫ সালে। বঙ্গভঙ্গের জন্য প্রতিবাদ উঠেছে তুমুল, সেজন্য একটা অনুষ্ঠান হবে—অরন্ধন বা রাখীবন্ধনের মত কিছু। আমি আমার প্রতিবাদ জানালাম কী রকমে? আমি কলেজে গেলাম, যেন আমার গুরুদেশা এমন পরিধানে—অর্থাৎ খালি পা, জামা নেই, শুধু চাদর গায়ে। ক্লাসে যখন ঢুকলাম, সবাই একরকম হতবাক—প্রফেসর মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে দেখেন, কিছু বলেন না যদিও। অনেকে নিশ্চয় আমার কাজটি unconventional শুধু নয়, incorrect মনে করেছিলেন—তবে অনেকে যে প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখেছেন তাও বুঝেছিলাম।

সে-যুগে ঠিক আমার উপরের ক্লাসে ছিলেন চারু বিশ্বাস, তার উপরের ক্লাসে ছিলেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, তাঁরও উপরের ক্লাসে ছিলেন বিনয় সরকার ও অতুল গুপ্ত। আমার নীচের ক্লাসে হয়ত ছিলেন রমেশ মজুমদার।

এখন তবে বলি আমার আসল বক্তব্য। ফরাসীরা বলে Revenons a nos moutons।

এ হেনযুগে আকাশ যখন লাল হয়ে উঠেছে, বাতাস উত্তপ্ত—লোকের মন, যুবকদের প্রাণ বিক্ষুব্ধ—তখন আমাদের ইংরেজ প্রফেসর (লজিক ও দর্শনের) রাসেল-এর (Russel) দুর্বুদ্ধি হল, কি এক অনুষ্ঠানে বেফাঁস কিছু বলে ফেললেন বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে। বারুদের স্তূপে আগুনের ফুলকি। ছাত্রমহলে আবেগ উত্তেজনা চলল। এর কি প্রতিকার নাই? সাদা চামড়া কি এমনই নিরঙ্কুশ? কিন্তু দিন এল—আকাশ ভেঙ্গে বজ্রপাত। কি ব্যাপার? আমাদের একটি ক্লাস ছুটি হয়েছে, বারান্দা দিয়ে আমরা সব এক ক্লাসে চলেছি—এমন সময়ে হঠাৎ চারদিক উদ্বেলিত মুখরিত করে শতকণ্ঠে বিরাট ধ্বনি উঠল 'বন্দেমাতরম্', 'বন্দেমাতরম্'। সবাই ছুটল এদিক-ওদিক—কী হল, কী হল?—Russelকে জুতো মেরেছে—কে? কে?

প্রিন্সিপাল উপস্থিত—Dr P. K. Roy প্রেসিডেন্সী কলেজের সেই প্রথম বাঙ্গালী প্রিন্সিপাল, তাও অস্থায়ী,—সবাই আমরা ক্লাসে চলে এলাম। আমাদের ক্লাসেই (ঘটনার ঠিক পাশেই ঘরটি ছিল বলে) প্রথম তিনি প্রবেশ করলেন Russel সমভিব্যাহারে। রাসেলের মুখ ক্ষোভে লজ্জায় আরক্ত—তাকিয়ে দেখলেন উপস্থিত সব ছাত্রদের দিকে—বললেন কাউকে তিনি চিনতে পারছেন না। ক্লাস হয়ে গেলে আমরা গেলাম Physics Theatre-এ—Physics-এর ক্লাস তখন। সেখানেও আবার ঢুকলেন প্রিন্সিপাল সাহেব, জলদগম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন—I see Bande Mataram has become a war-cry! কিন্তু সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ নিবাতনিষ্কম্প—আগে যে তুমুল আলোড়ন উত্তেজনাপূর্ণ
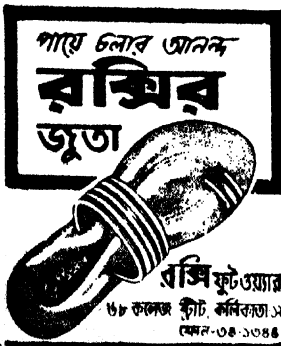
* ভূপতিমোহন প্রথম বর্ষ থেকেই প্রেসিডেন্সীতে ছিলেন কি পরে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে এসে যোগ দিয়েছিলেন Scottish Churches College (তখন General Assembly's Institution) থেকে—আমার ঠিক মনে নেই।

* তবে গুজব ছিল কর্নেল নন্দী সরকারের সঙ্গে রফা করেছিলেন এই কথা দিয়ে যে অতঃপর তাঁর ছেলে ভালো ছেলেটি হয়ে থাকবে।

জনতা ছিল এখন সব প্রশান্ত মূক স্থাণু। সব সুশীল সুবোধ ছেলে!

কিন্তু কে এই কাণ্ড করেছিল? উল্লাসকর দত্ত—আমাদের সহপাঠী। সে থাকত ইডেন হিন্দু হোস্টেলে। এক পাটি চটি খবরের কাগজে মুড়ে সে কলেজে এসেছিল এবং সুযোগ পাওয়া মাত্র তার সদ্ব্যবহার করেছিল। এই উল্লাসকরের জীবন-কাহিনী একখানি ড্রামা—যদিও পরিণতি কারুণ্য-পূর্ণ। এই ঘটনার পরে সে বারীন ঘোষের সংগে মানিকতলায় যোগ দেয়—এবং তার সমস্ত বুদ্ধি ও শক্তি নিয়োগ করে বোমার আবিষ্কারে। বোমার ব পর্যন্ত তার জানা ছিল না। সেই কেমিস্ট্রি বই পড়ে, নানা পুস্তক থেকে আহরণ করে, explosives-তত্ত্ব আয়ত্ত করে—কেউ তাকে শেখায় নি। তার বাবা দ্বিজদাস দত্ত শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসর ছিলেন—তাঁর বাসায় একটা ছোট ল্যাবরেটরির মত ছিল—উল্লাসকর গোপনে সেখানে হাত মক্স করত। এ কাজে কতদূর সফল হয়েছিল তার প্রমাণ তার তৈরী প্রথম বোমায় আমাদের নিজেদেরই একজনকে শহীদ হতে হল (প্রফুল্ল চক্রবর্তী)—এ-কাজে সহকর্মীদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন।

উল্লাসকর সার্থকনামা পুরুষ ছিলেন—সত্য সত্য উল্লাসের অফুরন্ত আকর। জেল থেকে আমাদের যখন Prison Van-এ করে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হত তখন সারাটি পথ গান গেয়ে দিক ফাটিয়ে আমরা চলে যেতাম—উল্লাসকর তার পাণ্ডা ছিলেন, মুখ্য গায়েন আর আমরা সব দোহারি। 'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'মেরা সোনেকী হিন্দুস্থান' প্রভৃতি গান এখনো কানে বাজে, এখনো কণ্ঠস্থ। সে কলধ্বনি হঠাৎ শুনলে মনে হবে স্বদেশী প্রশাসন চলেছে, কে বলবে কয়েদীর দল। সে-সংগীত এমন প্রাণমন-মাতোয়ারা ছিল যে, আমাদের পুলিস-প্রহরী বা গাড়ী-চালক কোনোদিন কোনো আপত্তি তোলেনি।

শুনেছি উল্লাস আজও জীবিত—কিন্তু জীবন্মৃত। দশ বারো বৎসর আন্দামানের কারাজীবন তাঁর দেহকে মস্তিষ্ককে বিকল করে দেয়। কিন্তু যজ্ঞের এই তো নিয়ম—বারীনদা যেমন বলতেন, এ বিবাহের এই মন্ত্র।

কারণ, সে-উৎসাহ সে-উজ্জীবন লাভক্ষতি অণুমাত্র গণনা করে নি—সে চলে যায় আপন বেগের নিভৃত সার্থকতায় নিজে—তাই তো সবাই চোখ মেলে দেখেছে, গলা খুলে সবাই গেয়েছে—

এসেছে সে এক দিন
লক্ষ পরাণে শংকা না জানে
না রাখে কাহারো ঋণ,
জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন।

সহজে শিখুন বিজ্ঞান

বব ব্রাউন
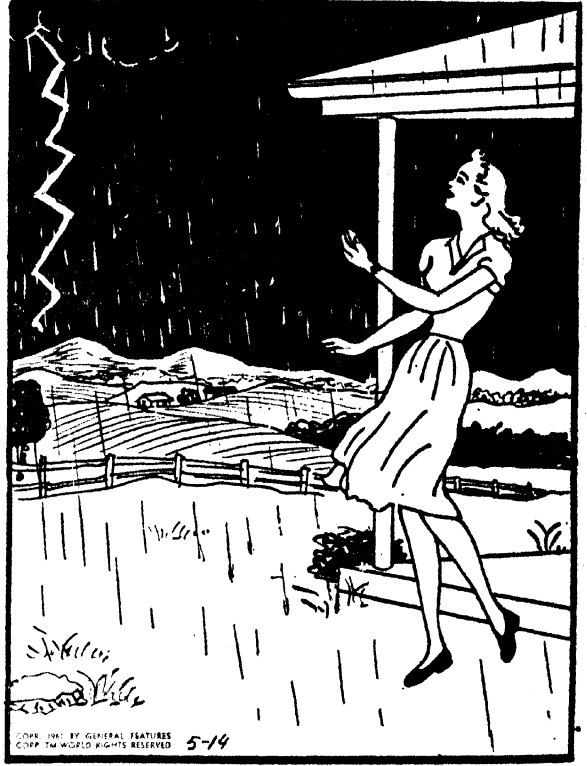
ঝড় হচ্ছে কত দূরে?

দূরে কোথাও যখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে একটা স্টপওয়াচ নিয়ে দাঁড়ান।

যেই বিদ্যুৎ চমকালো অমনি স্টপওয়াচটি চালিয়ে দিন। মেঘডাকার আওয়াজ যেই কানে এল স্টপওয়াচ তখনি বন্ধ করুন। এই সময়টুকু বলে দেবে কত দূরে ঝড় হচ্ছে।

শব্দের গতি সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট। মেঘ ডাকার আওয়াজ কানে আসতে যদি ৫ সেকেণ্ড লেগে থাকে তাহলে ৫৫০০ ফুট অর্থাৎ এক মাইলের কিছু বেশি দূরে ঝড় হচ্ছে। আলোর গতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল, তাই বিদ্যুৎটা আগে দেখি।

যদি স্টপওয়াচ না থাকে তাহলে মনে মনে 'হাজার এক', 'হাজার দুই', 'হাজার তিন' ইত্যাদি গুনতে থাকবেন যে পর্যন্ত না মেঘডাকা শুনতে পাচ্ছেন। 'হাজার এক' গুনতেই এক সেকেণ্ড পার হবে। স্টপওয়াচের বদলে এইভাবে সময় গুনে ঝড়ের দূরত্ব ঠিক করতে পারবেন।

চিত্র প্রদর্শনী

চিত্রগ্রীব

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আশুতোষ মিউজিয়াম-এর কিউরেটর অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ ইন্দোনেশীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে বলী এবং যবদ্বীপ পরিভ্রমণে যান। সেখানে ছয় সপ্তাহকাল পরিভ্রমণ করার পর অধ্যাপক ঘোষ প্রচুর অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে কিছু দর্শনীয় শিল্পসামগ্রীও সংগ্রহ করে দেশে ফিরেছেন। যবদ্বীপ ও বলীদ্বীপ সুকুমার শিল্প এবং কারুশিল্পে যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ তা বিদগ্ধ রসিকজনের কাছে অবিদিত নয়। সেখানকার সভ্যতার ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই মিল লক্ষ্য করা যায়। ইন্দোনেশীয় স্থাপত্যশিল্প ও সুকুমার শিল্পের উৎস অনেক ক্ষেত্রেই যে ভারতবর্ষ তা ইতিহাস পাঠ করলেও জানা যায়। তাই ভারতবাসীর কাছে সেখানকার শিল্পকলার আবেদন যতটা অন্য কোনও দেশবাসীর কাছে বোধ করি ততটা নয়। ইন্দোনেশীয় জনসাধারণের কাছে শিল্প ও সৌন্দর্য জীবনধারণ ব্যাপারে অপরিহার্য। এরা বিশ্বাস করে সুস্থ এবং সবল শরীরে থাকতে হলে যেমন পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি আত্মাকে সুস্থ এবং সবল রাখতে হলে প্রয়োজন সৌন্দর্য চয়নের। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছাড়াও দরকার হয় মানুষের গড়া সৌন্দর্য যা থেকে পাওয়া যায় নন্দনতত্ত্বের আস্বাদ। তাই সেখানে শিল্পী এবং শিল্পকর্মের সমাদর যথেষ্ট। পাশ্চাত্ত্যের সমকালীন শিল্পকলার ঢেউ ইন্দোনেশিয়ার কূলে এসেও লেগেছে একথা অস্বীকার করা যায় না; তা হলেও সেখানে পাশ্চাত্ত্য আধুনিকতার পাশে পাশে প্রথাগত ধারারও চর্চা পুরোদমে হয়ে চলেছে। বিশেষ করে লোকশিল্পে পাশ্চাত্ত্যের প্রভাব একেবারেই নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। অধ্যাপক ঘোষ যে সব শিল্পসামগ্রী সেখান থেকে এনেছেন তা সবই লোকশিল্পের নিদর্শন।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে বর্তমানে যে বাড়িতে অস্থায়ীভাবে আশুতোষ মিউজিয়াম স্থানান্তরিত হয়েছে সেই বাড়ির তিন তলায় শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ কৃত বলী ও যবদ্বীপের নতুন সংগ্রহগুলির একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় গত সপ্তাহে। প্রায় ৫০ রকম ইন্দোনেশীয় লোকশিল্পের নমুনা এ প্রদর্শনীতে আমরা দেখবার সুযোগ পেলাম। এর মধ্যে ছিল পশ্চিম যবদ্বীপের কাঠের ওপর রঙকরা 'ওয়েয়াং' পুতুল, ওয়েয়াং ছবি এবং কাঁথার কাজ, মধ্য যবদ্বীপের বাটিক, চামড়ার কাজ, রুপার কাজ, খসখসের পাখা, কচ্ছপের খোলার পুতুল, চামড়ার ওপর রঙ করা 'ওয়েয়াং কুলিত' প্রভৃতি, পূর্ব যবদ্বীপের

কার্তবীর্যার্জুন—যবদ্বীপ

কাগজের ওয়েয়াং মূর্তি, বলী দ্বীপের নারকল খোলার মালা, কাঠের মুখোশ, হাড়ের কাজ, কাঠের কাজ, তালপাতার ওপর লেখার সঙ্গে ছবি, তালপাতার পুতুল, তালপাতার বোনা পাখা, রুপার কাজ, চিত্রবিচিত্র স্কার্ফ প্রভৃতি, বোর্নিওর তালপাতার পাত্র এবং সেলিবিসের স্কার্ফ। বাস্তবিকই নিদর্শনগুলি কৌতূহলোদ্দীপক। বাটিক জিনিসটি আমাদের দেশেও বেশ প্রচলিত হয়েছে আজকাল, কিন্তু যবদ্বীপের বাটিকের মত অত উৎকৃষ্ট কোনও নমুনা চোখে পড়ে না। টেকনিকের মারপ্যাঁচ এমন অনেক কিছুই আছে যা এখানকার শিল্পীরা আয়ত্ত করতে পারেন নি। ওয়েয়াং পুতুল এবং ছবির মধ্যে অলংকরণে যবদ্বীপের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা

ঘটোৎকচ—যবদ্বীপ

গেলেও এগুলি ভারতের বিশেষ কয়েক অঞ্চলের লোকশিল্পকে স্মরণ করিয়ে দেয়। চরিত্রগুলিও সবই প্রায় ভারতীয় পৌরাণিকের— অর্জুন, ঘটোৎকচ, সুভদ্রা, বিষ্ণু, গরুড় প্রভৃতি। এ থেকে এটা বেশ পরিষ্কারভাবেই অনুভব করা যায় যে, সেখানকার অধিবাসীরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেও সনাতন ভারতের প্রভাব এখনও ইন্দোনেশিয়াতে অত্যন্ত প্রবল। অবশ্য কতদিন যে এ প্রভাব থাকবে বলা যায় না, কারণ মিশর ও মধ্য প্রাচ্যের মুসলমান ধর্ম-যাজকেরা ভীষণভাবে ইসলাম নীতি প্রচার করে চলেছেন সারা ইন্দোনেশিয়াতে। অধ্যাপক ঘোষের মতে ভারতবর্ষ থেকেও মাঝে মাঝে দলবল সেখানে গিয়ে যদি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে তা হলে ভারত এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে কৃষ্টিগত যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে।

নিদর্শনগুলির মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে ওয়েরাং পুতুল 'অর্জুন' এবং ঘটোৎকচ, বালীর কাঠের মুখোশ, বিষ্ণু, কাঠের তৈরী ১২টি মূর্তি (গামেলান) এবং মধ্য যবদ্বীপের বাটিকের কাজ। প্রদর্শনীটি বাস্তবিকই উপভোগ করার মত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ

কীর্তিমুখ—বালী

প্রদর্শনীতে দর্শক সমাগম হয় অত্যন্ত কম। এর প্রধান কারণ—অনেকেই জানে না বর্তমানে আশুতোষ মিউজিয়াম কোথায়? আমার মনে হয় কোনও জনপ্রিয় প্রদর্শনী কক্ষে এই প্রদর্শনীর পুনরাবৃত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। এমন একটি চমৎকার সংগ্রহ প্রত্যেক শিল্পরসিকেরই দেখা দরকার। ইন্দোনেশীয় সরকারের সহযোগিতায় আশুতোষ মিউজিয়াম ভবিষ্যতে যদি আরও ব্যাপকভাবে ইন্দোনেশীয় চারু ও কারুশিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে তাঁরা যথার্থই রসিকদের ধন্যবাদার্হ হবেন।

পরিশেষে আশুতোষ মিউজিয়াম-এর বর্তমান অবস্থার কথা, আমরা যা দেখেছি, না বলে পারলাম না। যে বাড়িতে আশুতোষ মিউজিয়াম বসেছে তা আদৌ সংগ্রহশালা হবার উপযুক্ত নয় এবং স্থানও সেখানে খুব কম, ফলে অত্যন্ত মূল্যবান বহু শিল্প-কর্মকেই খুব খারাপ অবস্থায় ফেলে রাখতে হয়েছে। কিছু কিছু জিনিস এমন ভাবে আছে তা দৃষ্টিগোচরে আনা খুব কঠিন। তিন তলায় দালানের দেওয়ালে যে সব প্রাচীন চিত্র—লিথোগ্রাফ, পট প্রভৃতি টানানো আছে, ঐভাবে আরও কিছুদিন থাকলে ওগুলির অবস্থা যে কি দাঁড়াবে তা বলা মুশকিল। যে রকম ফাটল দেখা গেল স্থানে স্থানে তাতে মনে হয় বর্ষাকালে ছাদ দিয়ে জল পড়ে। আশুতোষ মিউজিয়াম-এর সংগ্রহ যে অত্যন্ত মূল্যবান সে বিষয় কোনই সন্দেহ নেই আমাদের। কয়েক বিষয়ে এখানকার সংগ্রহ ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—একথাও বলা চলে জোর গলায়, কিন্তু অস্থায়ীভাবে হলেও যে অবস্থায় শিল্পসামগ্রীগুলি পড়ে আছে তা দেখলে সত্যিই সংশয়ান্বিত হতে হয়। যাইহোক ইন্দোনেশীয় শিল্পকলার এই সংগ্রহটি ক্ষুদ্র হলেও মূল্যবান এবং এটি জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করে অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ অবশ্যই রসিক-জনের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়কে মানপত্র ও সোনার স্টেথেস্কোপ উপহার

গত শনিবার রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের পৌরোহিত্যে মহাজাতি সদনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অশীতিতম জন্মদিনের উৎসবসভায় সাধনা ঔষধালয়ের স্বত্বাধিকারী ও ডাঃ রায়ের ছাত্র শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ ডাঃ রায়ের হস্তে মানপত্র ও রৌপ্যাধারে একটি সোনার স্টেথেস্কোপ উপহার দেন। ছবিতে ডাঃ রায়কে উহা গ্রহণ করিতে দেখা যাইতেছে।

রবীন্দ্রচর্চা

মুক্তিসাধনায় রবীন্দ্রনাথ। শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহ-রায়। ভারতী বুক স্টল, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য তিন টাকা।

এই গ্রন্থের পাঁচটি অধ্যায়, জীবনের বিভিন্ন পর্বে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-সাধনার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও রবীন্দ্র-রচনা হইতে যে প্রভূত উদ্ধৃতি আছে, তাহা হইতে কর্মব্যস্ত 'সাধারণ' পাঠক রবীন্দ্রনাথের দেশচর্যা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারিবেন।

রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ পাঠকেরও আনন্দিত হইবার উপকরণ ইহাতে আছে।

স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রচারক, অধুনালুপ্ত সঞ্জীবনী পত্রিকা হইতে বহু শ্রমে সংগ্রহ করিয়া লেখক মহাশয় রবীন্দ্রনাথ ও স্বদেশী আন্দোলন প্রসঙ্গে চিত্তাকর্ষক কোনো কোনো সমসাময়িক বিবরণ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। ইহার একটি উল্লেখ করিতেছি।

স্বদেশী আন্দোলনে বিলাতী বর্জন ও দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিকার কথা সকলেই জানেন। যে সকল নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য এ-দেশে প্রস্তুত হয় না, তাহা লইয়া সমস্যা। এ-সমস্যার সমাধান সেদিন নানাভাবে হইয়াছে। কলমের নিব এইরূপ একটি জিনিস, যাহা বিলাসিতার বস্তু নয়। রবীন্দ্রনাথ সহজেই সমস্যার সমাধান করিয়াছিলেন খাগড়ার কলম ব্যবহার করিয়া। স্বদেশী আন্দোলনের একজন প্রবীণ নায়ক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার এই বিষয়ে একখানি চিঠি গ্রন্থকার মহাশয় সঞ্জীবনী (২৯শে ভাদ্র, ১৩১২) হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন—

"অনেকের এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে, লোহার কলমেই লেখা ভাল হয়। এই কুসংস্কার দূর করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্রখানি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। রবিবাবু লিখিয়াছেন—

"'যখন সাধ্যমত দেশী জিনিস ব্যবহারের সংকল্প আমার মনকে অধিকার করিল, তখন কলম লইয়া মনে খটকা বাধিল। চিরদিন নিবওয়ালা কলমে লেখা অভ্যাস, অথচ নিব এ-দেশে প্রস্তুত হয় না। মনে করিলাম, যদি সংকল্পের খাতিরে লেখা ব্যাপারে আমি অসুবিধা স্বীকার করি, তবে সেটা আমার পক্ষে সাধনাস্বরূপ হইবে। এই মনে করিয়া আমি খাগড়ার কলমে লিখিব স্থির করিলাম। খাগড়ার কলম আনাইয়া এক লাইন লিখিতেই দেখিলাম, ইহার মধ্যে কৃচ্ছ্রসাধন লেশমাত্র নাই, বিলাতী কলমে এমন আরামে কোনদিন লিখি নাই। এই কলম কাগজের উপর এমন মোলায়েমভাবে সরে যে, লিখিয়া সুখ হয়। কাহারো ধারণা আছে, ইহাতে ইংরাজী লেখা ভাল হয় না, আমি তো তাহার প্রমাণ পাই নাই।'"

সে কালটাই এমন ছিল যে, কবির বিজ্ঞানী বন্ধু ইহাকে যন্ত্রযুগের অনুপযোগী কবির খেয়াল বলিয়া গণ্য না করিয়া নিজেই উৎসাহী হইয়া উঠিলেন—

"ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আমার কলম-দর্শন হইতে এই কলমে লিখিয়া এত প্রীত হইয়াছিলেন যে, সে-কলমটি বাজেয়াপ্ত করিয়া তিনি বাড়ি লইয়া গেলেন। এই কলমের আর-একটি গুণ এই যে, এরূপ দস্যুবৃত্তিতে গৃহস্থ ব্যক্তির বিশেষ ক্লেশের কারণ হয় না—ইহার মূল্য এতই সামান্য। এরূপ কলমের ব্যবহার যে দেশ হইতে লোপ পাইল, ইহা নিতান্ত অনুকরণের ফলে।'"

বলা বাহুল্য, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতাও পশ্চাৎপদ হইয়া থাকেন নাই—

"মহাজন যেন গতঃ স পন্থা ভাবিয়া জগদীশচন্দ্রের অনুকরণে আমিও রবীন্দ্রনাথের একটি কলম অপহরণ (অবশ্য

বলিয়া কহিয়া) করিলাম। খাগের কলমে লিখিয়া বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, বস্তুত এরূপ আরামে অনেকদিন লিখি নাই।"

৩০১।৬১

বিদেশী সাহিত্য

The Transposed Heads and The Black Swan. Thomas Mann. Rupa & Co., Calcutta-12. Rs 3.50 np.

টমাস মানের গুণগ্রাহী পাঠকদের মনে এই লেখকের সম্পর্কে বিভিন্ন উৎসাহ লক্ষ করা যায়; এবং তার কারণও বহুবিধ। একজন লেখক, যিনি প্রচণ্ড 'জাতীয়তাবাদী' হিসেবে সাহিত্যকর্মের সূচনায় দেখা দিয়েছিলেন, জর্মান ঐতিহ্যের বাইরে অন্য কিছু প্রথম-দিকে যাঁর দৃষ্টিগোচর হয়নি, ক্রমে য়োরোপীয় সংস্কৃতি ও আরো পরে সমগ্র বিশ্ব-সংস্কৃতিকে তিনি আত্মস্থ করেছেন। একটি সর্বত্রব্যাপ্ত দৃষ্টি, যার তুলনা জর্মান সাহিত্যের 'পিতা' গ্যেটে ছাড়া তদ্দেশীয় আর কোন সাহিত্যিকের মধ্যে মেলে না। স্পষ্টত, একটি ভারতীয় পৌরাণিক আখ্যানকে শিল্প-স্বকীয়তায় টমাস মান কিভাবে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, গ্রন্থবদ্ধ প্রথম উপন্যাস 'দি ট্রান্সপোস্‌ড্‌ হেড্‌স'-এ তার পরিচয় মিলবে।

কাহিনীটি এবং একটি বহুকথিত কাহিনী—বেতাল পঞ্চবিংশতির অন্তর্ভুক্ত (বিদ্যাসাগরকৃত অনুবাদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাওয়া যাবে); সংক্ষেপে, জীবন ও আত্মার বৈপরীত্যে—এক রমণীর, যে সৌন্দর্য ও জাগতিক আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, মানসিক দ্বন্দ্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেহ-সর্বস্ব নন্দ ও বুদ্ধি-সর্বস্ব শ্রীদমন—উভয়কে একই আধারে পেতে চেয়েছিল সীতা; একজনের বর্তমানে সে অন্যের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতায় একাধিক পুরুষের, কিংবা স্বামীর সংসর্গে বাস করা সম্ভব নয়; সুতরাং সীতার দ্বন্দ্বের নিবৃত্তি নেই। পরিণাম মৃত্যু। শেষ দৃশ্যে, সুতরাং নন্দ ও শ্রীদমনের চিতাশয্যায়, উভয়ের মাঝখানে সীতাকেও মৃত্যুবরণ করতে হয়।

ভারতীয় দর্শনে সুপণ্ডিত হাইনরিখ্‌ ৎসিমারকে উৎসর্গীকৃত এই উপন্যাসে বেতাল-পঞ্চবিংশতির মূলে গল্পটিকে মান্‌ সাহিত্যিক আত্মবীক্ষায় রসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। এটা স্পষ্ট যে, ৎসিমরের উৎসাহ এ-গ্রন্থ রচনায় তাঁকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের প্রতিপাদ্য এখানে অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে, ফ্রয়েডীয় মন-স্তরকে মান্‌ অনেক বেশী প্রশ্রয় দিয়েছেন, সীতার মানসিক দ্বন্দ্ব যে-ভাবে উপস্থাপিত, তাতে এ-মন্তব্য অতিশয়োক্তি হবে না বলেই বর্তমান সমালোচকের বিশ্বাস। সম্ভবত এই কারণেই উপন্যাসটির ইংরিজী সংস্করণ প্রকাশিত হবার পরও বেশ কিছুকাল ভারতে প্রচার নিষিদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় উপন্যাস, 'দি ব্ল্যাক সোয়ান' সম্পর্কে বলার মতো প্রচুর কথা পাওয়া যাবে। মানের ছোট উপন্যাস-গুলির মধ্যে বহুপঠিত এই কাহিনীটি, সম্ভবত প্রথমটির চেয়ে বেশী বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারে। নাতিদীর্ঘ এই কাহিনীতে মানের প্রতিভার বিভিন্ন প্রখ্যাত দিকগুলি তাদের সার্বিক পরিপূর্ণতা নিয়ে বর্তেছে, অন্তত, তুলনামূলক বিচারে, তন্নিষ্ঠ পাঠক এই উপন্যাসেই বেশী রসাস্বাদন করবেন। আগাগোড়া মনোনির্ভর, 'দি ব্ল্যাক সোয়ান্‌' রোজাইল নামে এক পঞ্চাশোর্ধ বিধবার করুণ পরিচয়বাহী, প্রায় বার্ধক্যে পেঁছে যে পুত্র এড্‌য়ার্ডের ইংরিজী শিক্ষক কেন্‌ কিটন নামে এক যুবকের প্রতি অদম্য আকর্ষণ বোধ করে; এবং শরীরে রোগের সূচনাকে যৌন-প্রেরণা ভেবে, প্রণয় নিবেদনেও কুণ্ঠা-বোধ করে না। নিষ্ঠুর ও কৌতুহলোদ্দীপক আকর্ষণীয় অথচ মন্থরগতি, বেদনাবিহ্বল এই 'কালো দাঁসের'র গল্প 'চন্দন-চিত্ত' পাঠক দের চোখে অশালীন মনে হতে পারে; কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য যে, যে অসাধারণ জীবনবোধ থাকলে এ-জাতীয় কাহিনী মহৎ শিল্পের সংজ্ঞায় উত্তীর্ণ হতে পারে, টমাস মান্‌ তার দৃষ্টান্তস্বরূপ। ১৭৮।৬১

ছোট গল্প

রমেশচন্দ্র সেনের শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রকাশক: কতকথা, ১।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম: পাঁচ টাকা।

একদা কাজল এবং কুরপালা উপন্যাস দুটি বাংলা সাহিত্যে যে লেখকটিকে চিহ্নিত করেছিল তার নাম রমেশচন্দ্র সেন। সদ্য প্রকাশিত এই শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলনটি বাংলা সাহিত্য পাঠককে আবার নতুন করে

একজন শক্তিমান গল্প লেখকের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিল। এবং এই পরিচয়ে বিস্ময়ের অবকাশ আছে। ঔপন্যাসিকের সেই পরিব্যাপ্ত দৃষ্টি সংকুচিত হয়ে এসেছে ছোট গল্পের আঙ্গিকের দাবিতে। এ যেন আর সেই বিশাল পটভূমিকার অজস্র মানুষের গল্প নয়, সীমিত গণ্ডিতে কয়েকটিমাত্র চরিত্রের চকিত আভাস, একটি বক্তব্য, একটি রিক্ত চিত্র এবং একটি সুতীক্ষ্ম পরিণতি। এত নতুন নতুন রাজ্যে লেখকের বিচরণ যে পাঠককুলকে তিনি বিচলিত করে তোলেন। তারা তিনজন গল্পের সেই নদীর মোহনায় দিক্‌ভ্রান্ত হারিয়ে যাওয়া মাঝি ও গ্রামের হাবা কৈলাস, জলাভূমির শ্মশান আগলানো ডোমের চিতার নায়কদ্বয় কিংবা সাকীর প্রথম রাত্রির সেই বিভ্রান্ত নায়িকা বারিবালা, সারিবদ্ধ মিছিল নয়, বিশৃঙ্খল জনতা। অভিজ্ঞ লেখকের রচনায় এরা তাই স্পষ্ট প্রকাশিত। বিচিত্র চরিত্র এবং বিচিত্রতর তাদের পটভূমি। একদিকে জীবনের তিক্ত মর্মন্তুদ প্রতিলিপি অন্যদিকে জীবনের বক্র অথচ সরস সংকেত লটারি টিকিট বা জেণ্টলম্যান অ্যাণ্ড কোং গল্প দুটিতে। জীবনের এই মহৎ সত্য-দর্শন কেবলমাত্র শক্তিমান লেখকের রচনাতেই সম্ভব।

এই সংকলনের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্পটির নাম ডোমের চিতা। জীবনের পতিত একটি অংশের দুটি চরিত্রের মর্মান্তিক জীবনচিত্র। বুঝি এমন একটি গল্পের জন্য রমেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্য পাঠকের কাছে দীর্ঘ-কাল জীবিত থাকবেন।

এই সংকলন গ্রন্থের ভূমিকা রচনা করেছেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রচ্ছদ চিত্রটি এঁকেছেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রচ্ছদ চিত্রটি সবিশেষ উল্লেখের।

(১৩০।৬১)

শেষ বসন্ত—সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়। ১৩।৬, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। দাম—দুই টাকা।

"শেষ বসন্ত" গ্রন্থটিকে দেখার বা কেনার সময় উপন্যাস বলে ভ্রম হতে পারে। "শেষ বসন্ত" নামটি ছাড়া অন্য দশটি নাম বেশ কিছুটা আত্মগোপন করে আছে। গল্পগুলিতে বিবাহিত জীবনের বেদনা, মিলনের আনন্দ এবং মধ্যবিত্ত চাকুরে জীবনের সুখ ও দুঃখই অধিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মৃদুলা, কণিকা, অনুপম, শেখরেশ প্রভৃতি সকলেই যেন অতি সাধারণভাবে চেনা। কিন্তু তাদের চিনিয়ে দেবার মতো কৌশল বা মুন্সিয়ানা গল্পটিতে নেই। ১৪৬।৬১

উপন্যাস

মেখলা পরা মেয়ে—শ্রীযুধাজিৎ। পরিবেশক: নবভারতী, ৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য—পাঁচ টাকা।

উপন্যাসের ছকে ছদ্মনামের আড়ালে লেখক রাষ্ট্রীয় জীবনে যে বিপর্যয় চলেছে তারই ঘটনা বিবৃত করেছেন। এই উপন্যাসের পটভূমিকা রচিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনকেই উপলক্ষ্য করে।

লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও 'মেখলা পরা মেয়ে'কে বিবৃতিধর্মী কাহিনী ছাড়া অন্য কিছুই বলা যায় না। এই গ্রন্থটিতে সমসাময়িক ইতিহাসের মর্যাদা কিছুটা রক্ষিত হয়েছে। ৪২।৬১

ধর্ম ও দর্শন

শ্রীশ্রীনিবাস চরিতামৃত—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাশগুপ্ত। প্রকাশক শ্রীনবনীরোদ দাশ গুপ্ত। নূতনগঞ্জ, বাঁকুড়া। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাশ্রিত এবং চৈতনদাস নামে খ্যাত গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের পুত্র শ্রীনিবাস। গঙ্গাধরের বিশুদ্ধ প্রেমই যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া কাটোয়ার নিকটে ভাগীরথী তীরে চাকন্দী গ্রামে শ্রীনিবাসের আবির্ভাব। নিতাই ছিলেন শ্রীনিবাসের ধর্মগুরু এবং প্রেরণাদাতা। শ্রীনিবাসের নীলাচল গমন, প্রভু দর্শনের জন্য তাঁহার ভক্তিরসাপ্লুত কামনা, স্বপ্নে প্রভু-দর্শন এবং তাঁহার অহৈতুকী কৃপালাভ এবং শ্রীশচী দেবীর দর্শনলাভ প্রভৃতি বহু তথ্য এবং তত্ত্বকথাসমন্বিত আলোচ্য পুস্তক লেখকের একখানি ভক্তিরসাশ্রিত ধর্মগ্রন্থ। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির এবং তদীয় পত্নী সুলক্ষণা শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন। শ্রীনিবাস ৮৪ বৎসর বয়সে ইহলীলা সম্বরণ করিয়া পরম লীলায় প্রবিষ্ট হন। প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত এই ভক্তিমূলক বৈষ্ণব গ্রন্থখানি প্রেমভক্তি রসপিপাসু পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়।

৪৪৭।৬০

শব-শিবা রহস্য—স্বামী নির্মলানন্দ প্রণীত। শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক ব্রহ্মময়ী ঔষধালয়, দশাশ্বমেধ ঘাট, বারাণসী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা।

গ্রন্থকার ভক্ত এবং সাধক পুরুষ। আলোচ্য পুস্তকে দক্ষিণা কালিকার ধ্যান এবং তাহার সহজ, সরল, স্থূল এবং আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। বারাণসীর দেবনাথপুরায় সংকটনাশিনী শব-শিবাকালী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। এই দেবীর বন্দনাসূত্রেই গ্রন্থকার কর্তৃক মন্ত্রার্থ বিনিশ্চিত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শবশিবাস্বরূপিণী জননীর লীলা-রহস্য অত্যন্ত নিগূঢ়। গ্রন্থকার তাঁহার ব্যাখ্যার নিগূঢ় সেই রহস্যের রাজ্যে অনুপ্রবেশোপযোগী সংবেদনটি সহজ ভাষায় আমাদের অন্তরে জাগাইয়া দিয়াছেন। তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য পরিভাষার জটিলতায় আমাদিগকে পড়িতে হয় না, অথচ তত্ত্বের মর্মগত মাধুর্যটি আমরা অন্তরে একান্ত করিয়া পাই। প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীত ইহা সম্ভব নয়। তাঁহার ব্যাখ্যার সার্থকতা এইখানে। পুস্তকখানি পাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন।

২৯২।৬১

ভক্তমালের ভক্তচরিত—দ্বিতীয় খণ্ড। স্বামী সত্যানন্দ প্রণীত। শ্রীজিতেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক ৩১নং শ্যামপুকুর স্ট্রীট, কলিকাতা—৪ হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

শ্রীলালজকৃত ভক্তমাল বৈষ্ণব ভক্ত সমাজে সমাদৃত অতি প্রাচীন গ্রন্থ। গ্রন্থকার সরস এবং প্রাঞ্জল ভাষায় উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত ভক্তচরিত জনসমাজে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ভক্তচরিত্র স্বভাবতই মধুর। গ্রন্থকার স্বয়ং পরম ভক্ত এবং সাধক পুরুষ, তাঁহার লেখনীমুখে চরিত্রগুলি মধুর হইতে মধুর হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠে ভক্তিরসপিপাসু নরনারী মাত্রেই উপকৃত হইবেন এবং আনন্দ লাভ করিবেন।

২৯১।৬১

রবীন্দ্র শতবর্ষ সংখ্যা

ইন্দ্রপ্রস্থ। সম্পাদক : আদিত্য সেন, অমল সরকার ও জ্যোতির্ময় দাশ। বি ১।৪১ হাউজ খাস এনক্লেভ; নয়াদিল্লী ১৬। দাম—দেড় টাকা।

দিল্লী থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। আলোচ্য সংখ্যাটিও আশা করা যায়, এর সেই সুনাম অধিকতর বর্ধিত করবে। সুন্দর প্রচ্ছদ, রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি চিঠির প্রতিলিপি এবং সর্বোপরি কয়েকটি সুলিখিত রচনা এই সংখ্যাটির সম্পদ।

শিক্ষক। সম্পাদক : মহীতোষ রায়-চৌধুরী। ৬১, বালিগঞ্জ প্লেস: কলিকাতা ১৯। দাম—তিপ্পান্ন নয়া পয়সা।

"শিক্ষক"-এর এই সংখ্যাটি কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। তন্মধ্যে অধ্যাপক বিভুরঞ্জন গুহ ও মধুসূদন চক্রবর্তীর রচনা দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীময়ী। সম্পাদক : অঞ্জলি বসু ও নির্মল ভাই। পি ৬০৫, ব্লক "ও" নিউ আলিপুর; কলিকাতা-৩৩। দাম—পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

"শ্রীময়ী"র এটি প্রথম সংখ্যা, এবং একটি বিশেষ সংখ্যা। কিন্তু বিশেষ সংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও এই সংখ্যাটির মধ্যে এমন কিছু পাওয়া গেল না, যাতে এর পরবর্তী সংখ্যাগুলি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আশান্বিত হওয়া যেতে পারে।

চলন্তিকা। সম্পাদক : দুর্গাপদ মান্না। চলন্তিকা সাহিত্য বাসর; আকুনী, হুগলী।

এই পত্রিকাটিতে অন্তত ত্রিশটি রচনা থাকা সত্ত্বেও, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এমন একটিও রচনা এতে নেই যাতে অত্যন্ত কাঁচা হাতের ছাপ প্রকট হয়ে ওঠেনি। রচনা একটা মোটামুটি মানে না পৌঁছনো পর্যন্ত তা প্রকাশ না করাই বাঞ্ছনীয়।

কল্যাণী। সম্পাদক : শঙ্কর সেনগুপ্ত। ৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট; কলিকাতা ১। দাম—পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সুখদর্শন এই পত্রিকাটির সুপাঠ্যও বটে। বিশেষ করে প্রণবরঞ্জন ঘোষ এবং অমলেন্দু ঘোষের রচনা দুটি। সজনীকান্ত দাসের "আমার রবীন্দ্র সংগ্রহ হইতে" পুনর্মুদ্রণ হলেও উল্লেখযোগ্য।

ভ্রম সংশোধন

২৮ বর্ষ ৩৬ সংখ্যায় 'রূপময় ভারত' পর্যায়ে ৮৬৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ছবিগুলির আলোকচিত্রশিল্পীর নাম ভুলক্রমে সুনীল জানা বলে মুদ্রিত হয়েছে। ছবিগুলির আলোকচিত্রশিল্পী শ্রীহীরেন্দ্র সিংহ।

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

সিনেমা ব্যবসায়ের সংকট

রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিম্নতম বেতন প্রবর্তনের দাবিতে সিনেমা কর্মচারীরা সম্প্রতি যে আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে বেঙ্গল মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন গত সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। বি-এম-পি-এ'র মুখপাত্র তাঁর বিবৃতিতে বলেন, বি-এম-পি-এ এই পরিস্থিতিতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাতে সিনেমা-কর্মচারীদের ন্যায্য বেতনের দাবিকে অস্বীকার করা হয়নি। বি-এম-পি-এ'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেসব চিত্রপ্রদর্শক-সংস্থার নিম্নতম বেতন দানের ক্ষমতা আছে অর্থাৎ যেসব সংস্থার টিকিট-ঘরের সাপ্তাহিক মূল আয়ের পরিমাণ কমপক্ষে ৬,৫০০, টাকা অথবা প্রতি সপ্তাহের "হাউস প্রোটেকশান" ৩,২৫০, টাকা তাঁরা এই ন্যূনতম বেতন তখনই প্রবর্তন করবেন যখন সিনেমা-কর্মচারী য়ুনিয়ন এবং বেঙ্গল মোশান পিকচার অ্যাসোসিয়েশন একমত হয়ে অন্যান্য সিনেমা হাউসগুলির ক্ষমতা অনুযায়ী কর্মচারীদের বেতনের হার নির্ধারণ করতে পারবেন, যার ফলে নিম্নতম বেতন সংক্রান্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তি সংশোধনের জন্যে রাজ্য সরকারের নিকট যুক্ত আবেদন পেশ করা সম্ভব হবে।

বি-এম-পি-এ'র দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, যেহেতু নিম্নতম বেতন সংক্রান্ত সরকারী বিজ্ঞপ্তি চিত্রগৃহগুলিকে নতুন সংকটের সম্মুখীন করবে, যার ফলে অনেক চিত্রগৃহ বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা, সেই হেতু এই আইন রদ করার জন্য সকল প্রকার আইনগত ও নিয়মতান্ত্রিক উপায় গ্রহণ করা হবে। তৃতীয় সিদ্ধান্তে এ কথা বলা হয়েছে যে, সিনেমা-মালিক ও কর্মচারী বিরোধের অবসানকল্পে ১৯৪৮ সালেই কর্মচারী য়ুনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করে বি-এম-পি-এ শহর ও শহরতলির সিনেমা-কর্মচারীদের জন্য ন্যায্য বেতনের হার নির্ধারণ করেছিলেন। ১৯৫৬ সালে এই চুক্তিকে কর্মচারীদের নানাবিধ সুবিধাদানের উদ্দেশ্যে নতুন করে পরিবর্ধিত করা হয়। এই পরিবর্ধিত চুক্তি অনুযায়ী কর্মচারীদের জন্য বোনাস, গ্র্যাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর ব্যবস্থা করা হয়। তা সত্ত্বেও বি-এম-পি-এ নীতির দিক থেকে সিনেমা-কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম বেতনের প্রবর্তন স্বীকার করে নিয়েছেন।

রূপভারতী ফিল্মসের "কাঞ্চন মূল্য"-এর একটি দৃশ্যে রাজলক্ষ্মী, ছবি বিশ্বাস, শ্রীমান গৌতম ও বাসবী নন্দী।

এই সকল তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বি-এম-পি-এ'র মুখপাত্র বলেন, বাংলা চিত্রজগতের বহুবিধ সংকটের কথা উল্লেখ করে কর্মচারী নিয়োগের সমস্যাবলী অনুসন্ধানের জন্য অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের লেবার কমিশনারও যথাযথ তথ্যানুসন্ধানের ওপর নির্ভর না করে এবং সিনেমা-মালিক পক্ষের প্রতিনিধিদের বক্তব্য অনুধাবন না করেই কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম বেতনের হার নির্দিষ্ট করেছেন বলে বি-এম-পি-এ'র মুখপাত্র অভিযোগ করেন।

বি-এম-পি-এ'র মুখপাত্র আরও বলেন যে, রাজ্য সরকার অনুমোদিত নিম্নতম বেতন প্রবর্তনের ক্ষমতা শহরের কতকাংশ চিত্রগৃহের থাকলেও, পশ্চিমবঙ্গের মোট ৪০৩টি চিত্রগৃহের মধ্যে ২০৫টি চিত্রগৃহের এই বেতন দেবার ক্ষমতা নেই। এইসব চিত্রগৃহগুলিকে যদি কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন দানে বাধ্য করা হয় তবে সেগুলি অচিরেই বন্ধ হয়ে যাবে। এ বাদে

পশ্চিমবঙ্গে আরও ৬৮টি চিত্রগৃহ রয়েছে যেগুলিতে নিম্নতম বেতন প্রবর্তন আদৌ সম্ভব নয়। কারণ তা হলে এই চিত্রগৃহগুলির আয় বলতে কিছুই থাকবে না। আরও এমন ৬৪টি নিম্ন আয়ের চিত্রগৃহ রয়েছে যেগুলিতে নিম্নতম বেতন প্রবর্তিত হলে আর্থিক সংকটের সীমা থাকবে না। সুতরাং সরকার-নির্ধারিত নিম্নতম বেতন প্রবর্তন যদি বাধ্যতামূলক করা হয় তবে প্রায় ৩০০টি চিত্রগৃহ বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তার ফলে যে ব্যবসায়ে ৫ কোটি টাকা খাটছে তা এবং সেই ব্যবসায়ে নিযুক্ত ৭ হাজার কর্মীর জীবিকা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

বাংলা চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের পক্ষে নিম্নতম বেতন প্রবর্তনের প্রতিক্রিয়া আর্থিক দিক থেকে যে কতদূর নিদারুণ হতে পারে তার তথ্যাভাস দিয়ে বি-এম-পি-এ'র মুখপাত্র বলেন যে, নিম্নতম বেতনহারের পুনর্বিবেচনা আজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং এর জন্য একটি নতুন বোর্ড গঠনের প্রয়োজন। চলচ্চিত্র শিল্পের নানা দিকের সমস্যা অনুসন্ধান ও বিবেচনা করে এই বোর্ড সিনেমা-কর্মচারীদের জন্য ন্যায্য বেতন নির্ধারণ করবেন। এই লক্ষ্যটিকে কাজে পরিণত করার জন্য বি-এম-পি-এ মালিক পক্ষের প্রতিনিধিগণকে সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুযায়ী হাইকোর্টে আবেদন করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরে এই আবেদন প্রত্যাহার করা হয় টেকনিক্যাল কারণে। এই ব্যাপারে নতুন করে আদালতে মামলা পেশ করা হবে এই মর্মে রাজ্য সরকারকে নোটিস দেওয়া হয়েছে।

নিম্নতম বেতন প্রবর্তনের সমস্যা নিয়ে এক দিকে বি-এম-পি-এ'র স্থির সিদ্ধান্ত এবং অপর দিকে সিনেমা-কর্মচারীদের অনমনীয় মনোভাব বাংলা চিত্রশিল্পকে যে এক নতুন সঙ্কটের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই পরিস্থিতিতে উভয় পক্ষের শুভবুদ্ধি ও পরস্পরের সমস্যা অনুধাবনের সৎ প্রয়াস ও ধৈর্য দ্বারাই শুধু আসন্ন সংকট পরিহার করা যেতে পারে। আমরা সিনেমা-কর্মচারীদের আবার অনুরোধ করি শুধু একটি কথা বিশেষ করে ভাবতে যে, যে বাংলা চিত্রশিল্প তাঁদের জীবিকার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে, ক্ষণিক উত্তেজনা বা উষ্মার বশে ধর্মঘট বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সর্বনাশা পথ অনুসরণ করে তাঁরা যেন সেই শিল্পের প্রাণমূলে কুঠারাঘাত না করেন। এবং এই সঙ্গে অনুরোধ জানাই বাংলা চিত্রশিল্পের কর্ণধার ও সিনেমা-মালিকদের, তাঁরাও যেন সহৃদয়তা ও অনুকম্পার সঙ্গে সিনেমা-কর্মচারীদের জীবনধারণের সমস্যা সুষ্ঠু ও সুন্দর একটি আশু সমাধানের ব্যবস্থায় অগ্রণী হয়ে আসেন। আসন্ন সংকট থেকে ত্রাণলাভের আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

মহাশ্বেতা চলচ্চিত্রমের "ন্যায়দণ্ড"-এর একটি দৃশ্যে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও রাধা-মোহন ভট্টাচার্য।

চিত্রালোচনা

রূপভারতী ফিল্মসের প্রথম নিবেদন "কাঞ্চনমূল্য" এই সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের যে অনবদ্য কাহিনীর চিত্ররূপ এটি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া শরৎ স্মৃতি-পুরস্কারের বিজয় টীকা তার ললাটে। আইনের অনুমোদন সত্ত্বেও যে যুগে বিধবা বিবাহ গ্রাম্য সমাজের স্বীকৃতি পায়নি, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এর কৌতুকোজ্জ্বল কাহিনীর বিস্তার।

পরিচালক নির্মল মিত্রের এটি দ্বিতীয় ছবি। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্বও তিনি বহন করেছেন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, অনিল চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপ-কুমার, তুলসী চক্রবর্তী, বাসবী নন্দী, গীতা দে, অপর্ণা দেবী, রাজলক্ষ্মী, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। তরজা, কথকতা, লোকসংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রাম্য পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছবিতে সুর-সংযোজন করেছেন নির্মলেন্দু চৌধুরী। ছবিটির প্রযোজক ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অসিত মণ্ডল।

* * *

এ সপ্তাহের মুক্তি-তালিকায় দু'খানি হিন্দী ছবিও আছে। প্রথমটি আগরওয়াল প্রোডাকশন্সের "অমৃত মন্থন"। দ্বিতীয়টির নাম "এলিফ্যাণ্ট কুইন" এবং রজনী চিত্র তার নির্মাতা।

সবাক চিত্রের প্রথম যুগে পুনার প্রভাত ফিল্ম কোম্পানী শান্তারামের পরিচালনায় "অমৃত মন্থন" নামে একটি স্মরণীয় ছবি তুলেছিলেন। নামের সাদৃশ্য ছাড়া এ যুগের ছবির সঙ্গে সে যুগের ছবির মিল না থাকাই স্বাভাবিক। তবে জাঁকজমকের দিক দিয়ে এ সপ্তাহের ছবিটিও চোখে পড়বার মত। ঊষা কিরণ ও মনোহর দেশাই এর প্রধান দুই তারকা।

"এলিফ্যাণ্ট কুইন" সাধারণভাবে একটি আমুদে ছবি। এর ভূমিকালিপিতে আছেন হেলেন, আজাদ, নিম্মো, সুন্দর, টুনটুন ও শাকিলা বানু ভূপালী। পরিচালকের নাম রাজেন্দ্র। সুরেশ ও তলোয়ার এর যুগ্ম সুরকার।

* * *

চলচ্চিত্রালয়ের "আজ কাল পরশু" আগামী সপ্তাহে সিনেমার রজতপটে আত্মপ্রকাশ করবে। সাধারণ মানুষের নিত্যকার জীবনযাত্রার সহজ আলেখ্য তুলে ধরা হয়েছে এই ছবিতে। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়,

অনুপকুমার, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, তপতী ঘোষ, সবিতাব্রত দত্ত, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল সেন, উমানাথ ভট্টাচার্য, তুলসী চক্রবর্তী, রাজলক্ষ্মী, মণি শ্রীমানী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, জহর রায় ও সুশীল মজুমদারকে এর বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে। পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন নির্মল সর্বজ্ঞ। অপরেশ লাহিড়ী সংগীতে সুরারোপ করেছেন। আবহ সংগীত রচনার কৃতিত্ব শৈলেশ রায়ের।

* * *

জরাসন্ধের "ন্যায়দণ্ড" ছবিতে রূপায়িত করছেন মহাশ্বেতা চলচ্চিত্রম্ নামক একটি নতুন প্রতিষ্ঠান। মঙ্গল চক্রবর্তীর পরিচালনায় এর নিয়মিত চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে অগ্রসর হচ্ছে। তারকা সমাবেশের দিক দিয়ে ছবিটি সহজেই চিত্রপ্রিয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ভূমিকালিপির পুরোভাগে আছেন উত্তমকুমার, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, রাধামোহন ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলী, সবিতা বসু, মঞ্জুলা সরকার, কল্যাণী ঘোষ, ছায়া দেবী, তরুণকুমার, মমতাজ আমেদ, রবি ঘোষ, জহর রায় প্রভৃতি। ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ সুরসৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

কনক প্রোডাকশন্সের "আশায় বাঁধিনু ঘর"-এর শেষ পর্যায়ের শুটিং ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে পুর্ণোদ্যমে চলছে। এর ভূমিকালিপিতেও বহু জনপ্রিয় শিল্পীর দেখা মিলবে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সন্ধ্যারানী, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, অসিতবরণ, বিশ্বজিৎ, কমল মিত্র, তরুণকুমার ও তপতী ঘোষের নাম। কনক মুখোপাধ্যায় একাধারে এর কাহিনীকার, প্রযোজক ও পরিচালক। সংগীত পরিচালনা করছেন ভি বালসারা।

* * *

বিমল ঘোষ প্রোডাকশন্সের প্রথম নিবেদন "বধূ"-র শুভ মহরত রথযাত্রার দিন রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হবার কথা। শৈলেশ দে "বধূ"-র কাহিনীকার।

বীরবল নামে খ্যাত স্বর্গত প্রমথ চৌধুরীর সংগীত ও সংঘাতময় এক বিচিত্র কাহিনী "বীণাবাই"। শ্রীতারাশংকর সম্প্রতি এর চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন। অচিরেই শুটিং আরম্ভ হবে। চলচ্চিত্রপটে প্রমথ চৌধুরীর কাহিনীকে রূপ দেবার এই প্রচেষ্টা সব দিক দিয়েই অভিনন্দনযোগ্য।

প্রযোজক সুখেন্দু বসু অনেক দিন পরে আবার নতুন ছবির কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। নাট্যকার পঞ্চানন দাসের "অন্তরাগ" অবলম্বনে তাঁর পরবর্তী ছবি তোলা হবে। পরিচালনা করবেন সুনীলরঞ্জন দাশগুপ্ত।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "সঞ্চারিণী"-র চিত্ররূপ দেবেন প্রখ্যাত পরিচালক সুশীল মজুমদার। মুভিমায়ার প্রযোজনায় ছবিটি নির্মিত হবে। এই মাসের শেষের দিকে শুটিং শুরু হবার কথা। মুখ্যাংশে বসন্ত চৌধুরী ও কণিকা মজুমদার নির্বাচিত হয়েছেন।

আসল নকল

নকল হীরার চকমকিতে আসল-নকলের সত্য ও নগ্ন রূপটি প্রকাশ হয়ে পড়ার এক অসাধারণ উপাখ্যান মোপাসাঁর "নেকলেস"। ভি-এম-এন প্রোডকশন্সের "নেকলেস" বিখ্যাত ফরাসী লেখকের এই রসোত্তীর্ণ গল্পেরই রমণীয় চিত্ররূপ।

বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের পরিবেশ ও পটভূমিতে মোপাসাঁর গল্পটিকে আংশিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ভেতর দিয়ে উপস্থিত করা হয়েছে এই ছবিতে।

একটি নকল হীরার কণ্ঠহারকে ঘিরেই মূল চিত্রকাহিনীর বিস্তার। এক বান্ধবীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে হারটি গলায় পরেছে এক অধ্যাপক-গৃহিণী। উন্নাসিক অভিজাত গৃহে এই হার চাঞ্চল্য এনেছে, অর্থ-কৌলীন্যের মোহগ্রস্ত পরিবেশে অস্বস্তির সঞ্চার করেছে।

কিন্তু নকল তার পুরো মূল্যটি তখনও আদায় করে নেয়নি। ঘটনার দুর্বিপাকে ধনীগৃহ থেকে যখন হারটি চুরি হয়ে গেল তখন চোখে অন্ধকার দেখলেন অধ্যাপক ও তাঁর স্ত্রী। যার হার তার কাছে মুখ দেখাবে ওরা কী করে? তাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আত্মমর্যাদা দিশেহারা হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত হারানো হারটির মতই দেখতে আসল হীরার একটি অনেক দামী হার দোকানে অগ্রিম টাকা দিয়ে বায়না করে এল তারা। এই হারের পুরো দাম শোধ করতে গিয়ে একটি সুখী দম্পতি জীবনের বেদনা ও বিড়ম্বনার অসহ্য অভিশাপ কেমন করে তিলে তিলে সয়ে নিল তা নিয়েই ছবির নাট্যোপাখ্যান রচিত।

টাস ফিল্মসের "কানামাছি"-র একটি দৃশ্যে অনুপকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

এ বাদে চিত্রনাট্যের বাঁকে বাঁকে উচ্ছল হয়ে উঠেছে প্রণয়ের মধুমুহূর্ত ও হৃদয়-সংঘাতের বেদনা-প্রবাহ। এবং সেই সঙ্গে রয়েছে বাৎসল্য ও বন্ধুত্বের স্নেহ-প্রেম, মায়া-মমতায় ঘেরা বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের এক মধুর প্রতিচ্ছবি।

চিত্র পরিচালক দিলীপ নাগ ছবিটিকে এক সুন্দর প্রয়োগ সিদ্ধিতে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। ছবির শুরু থেকেই দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চিত্রনাট্যের গতি ও পরিণতির পথে পরিচালক তাঁর পরিমিত-জ্ঞান ও রসবোধ দিয়ে এমন কয়েকটি রসমধুর ও শিল্পশোভন মুহূর্ত গড়ে তুলেছেন যা নিমেষেই দর্শকদের আবিষ্ট ও উদ্দীপ্ত করে রাখে। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা ও সুরের মাধুর্যে দিয়ে মধুময় প্রণয়-মুহূর্ত রচনায়, বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের অতি বাস্তব ও চিত্তাকর্ষক ঘটনার বিন্যাসে, ব্যঞ্জনাত্মক প্রয়োগ-কর্মের কারুকৃতিতে এবং সর্বোপরি চিত্রনাট্যটিকে বেগ ও আবেগে মণ্ডিত করে তোলার কাজে পরিচালক যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা রসিকজনের অকুণ্ঠ সাধুবাদ অর্জন করবে। একটি অসামান্য বিদেশী গল্পকে রসে ও স্বাদে সামগ্রিকভাবে চিত্তগ্রাহী ও রুচিস্নিগ্ধ করে পরিবেশন

করার এই কৃতিত্ব অভিনন্দনযোগ্য। এবং এই সাফল্যের মূলে চিত্রনাট্যকার ও সংলাপ-কর্তা মিহির সেনের দানও সামান্য নয়।

ছবির সর্বাংগীণ রসমাধুর্য গভীর হলেও এর সূক্ষ্ম শিল্পসুন্দর ভাবরূপটিকে চিত্রনাট্যের শেষার্ধে স্থলে আবেগের "মেলোড্রামা" অনেকাংশে গ্রাস করে ফেলেছে। অধ্যাপক-দম্পতির জীবনে ভুল বোঝাবুঝির পর্ব এবং অধ্যাপকের ধৈর্য-চ্যুতি ও স্ত্রীর প্রতি কর্কশ বাক্যপ্রয়োগ, এবং অধ্যাপক-গৃহিণীর লালসালিপ্ত ব্যক্তির কবলে পড়া এবং তা থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে গিয়ে তার নিদারুণ দুর্ঘটনায় আহত হওয়া প্রভৃতি ঘটনাগুলি মামুলী চিত্র-কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত, অতি নাটকীয় এবং বহুব্যবহৃত। মোপাসাঁর অসামান্য গল্পে এই সব স্থলে ঘটনার অনুপ্রবেশ রসহানিকর। তবে সুষ্ঠু, পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্মত প্রয়োগ-ধারার গুণে এই সব ঘটনারাজি দর্শকমনকে ততটা পীড়িত করে না।

ছবির নায়ক-চরিত্রে উত্তমকুমারের অনন্য-সুন্দর অভিনয় এই শক্তিমান নটের প্রতি দর্শকদের আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট করে তুলবে। একটি অধ্যাপক-চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, বৈষয়িক ব্যাপারে তার নিরাসক্তি এবং সর্বোপরি চরিত্রটির সংশয় ও বেদনা এবং প্রণয়ী রূপে উত্তমকুমার তাঁর অননুকরণীয় অভিনয়-দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

অধ্যাপক-গৃহিণীর ভূমিকায় নবাগতা সুনীতা বাঙালী গৃহবধূর চরিত্ররূপটি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর অভিনয় অনাড়ষ্ট, এবং বিশেষ নাট্যমুহূর্তে সংবেদনশীল। নায়কের পিসিমার ভূমিকায় মলিনা দেবীর আবেগধর্মী অভিনয় দর্শক-মনে দাগ রেখে যায়। নায়িকার বান্ধবী চরিত্রে রুমা গুহঠাকুরতার অভিনয় সংযত ও মনোজ্ঞ। নায়কের বন্ধুর বেশে তরুণকুমার চরিত্রানুগ অভিনয়ের পরিচয় দিয়েছেন।

বিশেষ কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রে অভিনয়-কৃতিত্বের জন্য প্রশংসা পাবেন ছবি বিশ্বাস, পদ্মা দেবী, জীবেন বসু, ভারতী দেবী ও পাহাড়ী সান্যাল। অন্যান্য চরিত্রে উল্লেখ-যোগ্য দক্ষতা দেখিয়েছেন দীপক মুখোপাধ্যায়, শিশির বটব্যাল, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বাণী গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীর বসু, বুবু গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল দাস প্রভৃতি।

ছবির চারখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত দরদ-ভরা কণ্ঠে গেয়েছেন সুচিত্রা মিত্র। এবং এই গানগুলি দিয়ে নাট্যমুহূর্ত রচনার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন পরিচালক।

ছবির আবহ-সংগীত রচনায় ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। আবহ-সুরের মূর্ছনায় তিনি ছবির বিভিন্ন মুহূর্তের নাট্যমর্মটি অপূর্ব-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

দীনেন গুপ্তর চিত্রগ্রহণ ছবির এক বিশেষ সম্পদ। তাঁর ক্যামেরা ছবিতে যে শুধু আলো-আঁধারির মায়াজালই সৃষ্টি করেছে তা নয়, বিভিন্ন দৃশ্যের নাটকীয় "মুড"টি অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। সম্পাদনায় অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শব্দগ্রহণ ও শিল্প-নির্দেশ মোটামুটি সন্তোষজনক।

কৌতুকের কসরত

"কমেডি" ছবিতে কৌতুকের প্রয়োজনে বাস্তব-বর্জন দোষের নয়। কিন্তু বাস্তবের অন্তর্ধানের সঙ্গে ছবিতে যদি প্রত্যাশিত কৌতুকেরও সন্ধান না মেলে তবে দর্শককে
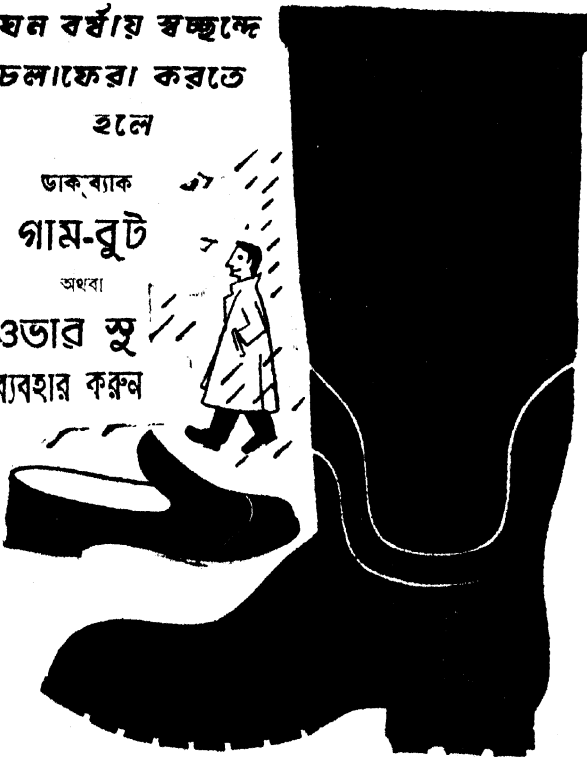
শুধু নিরাশই হতে হয়। কথাচিত্রম-এর "দিল্লী থেকে কলকাতা" চিত্রামোদীদের কাছে এই আশাভঙ্গের আস্বাদই বুঝি বয়ে নিয়ে এসেছে।

নকল পরিচয়ের বিভ্রাটকে কেন্দ্র করেই এ ছবির কৌতুক-উপকরণ সাজানো হয়েছে। চিত্রজগতের একজন সাধারণ "এক্সট্রা সাপ্লায়ার"-এর স্ত্রী তার বড়লোক বান্ধবীকে চালিয়াতি করে বলে যে জনৈক সুপ্রসিদ্ধ চিত্রপরিচালক তার স্বামী। আসলে তার স্বামী ও চিত্রপরিচালকের নামেরই শুধু মিল।

বড়লোক বান্ধবীর অনেক দিনের সাধ ছবিতে অভিনয় করার। সুতরাং এই সুযোগ সে ছাড়তে পারে না। বান্ধবীর চিত্রপরিচালক স্বামীর সঙ্গে সে দেখা করতে চায়, এবং তাকে মিথ্যা কথা বলে এই আশ্বাস দেয় যে সেও বিয়ে করেছে। এবং তার স্বামীও ধনী ব্যবসায়ী।

তারপর দুই বান্ধবীর যখন দেখা হয় তখন উভয়েই নকল স্বামীর নকল স্ত্রী সেজেছে। এই প্রহসনের শুরু ও শেষ কিভাবে রূপ নিল তারই মধ্যে চিত্রকাহিনী বিস্তারিত।

কৌতুক-উপাদানের প্রয়োজনে কাহিনীতে বিভিন্ন অবাস্তব চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। এবং বিনা প্রস্তুতিতে একটি পরিণয়েরও সূচনা দেখা দিয়েছে।

একটি ছোট কৌতুক-নকশা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরি করতে গিয়ে চিত্রপরিচালক সুশীল ঘোষ যে রীতিমত হিমসিম খেয়েছেন ছবিটি দেখলেই তা বোঝা যায়। এবং সংকটে পড়ে তিনি ছবিতে—বিশেষত প্রথমার্ধে—এমন সব অপ্রয়োজনীয় ও সূত্রহীন ঘটনার জঞ্জাল বাড়িয়ে তুলেছেন যেগুলিকে নানাভাবে নিংড়েও তিনি দর্শককে বিন্দুমাত্র কৌতুক-রস পরিবেশন করতে পারেননি। ছবির মূলে প্রহসন-অংশও নিপুণ বিন্যাসের অভাবে দর্শককে আশানুরূপ আনন্দ দিতে পারে না।

তবে ছবির কয়েকজন প্রধান শিল্পীর অভিনয়ের গুণে দর্শক মাঝে মাঝে হাসির খোরাক পান। তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য অনুভা গুপ্ত, উৎপল দত্ত, জহর রায় ও বঙ্কিম ঘোষ। এ'রা তাঁদের সুন্দর কৌতুকাভিনয়ে ছবিটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে তরুণকুমার, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ ও রথীন ঘোষের অভিনয়ও প্রশংসনীয়।

বাংলা ছবির প্রথম মহিলা সঙ্গীত পরিচালক বাঁশরী লাহিড়ী এই ছবির আবহ-সুর ও "এফেক্ট মিউজিক" রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। তবে তাঁর নিজের গাওয়া একটি গান ও তার সুরারোপ চিত্তাকর্ষক।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ ও সর্বাঙ্গীণ আঙ্গিক গঠন মোটামুটি পরিচ্ছন্ন।

বিবিধ সংবাদ

সদ্যসমাপ্ত বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ইতালীর ছবি "লা নোত" শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে গোল্ডেন বেয়ার ট্রফি লাভ করেছে। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন পিটার ফিন্চ্ ও আনা কারিনা যথাক্রমে "নো লভ ফর জনি" (বৃটেন) ও "ইউন ফাম এতিউন ফাম" (ফ্রান্স) ছবি দুটিতে অভিনয় করবার জন্যে।

পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবির বিভাগে মোট পঁচিশটি ছবি উৎসবে প্রদর্শিত হয়। তার মধ্যে হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত হিন্দী ছবি "অনুরাধা" অন্যতম। উৎসবের শুরুতেই ছবিটি দেখানো হয়। একটি অনাড়ম্বর পারিবারিক কাহিনীর সহজ সরল রূপায়ণ হিসাবে ছবিটি ও দেশের কিছু সংখ্যক সমালোচকদের প্রশংসা লাভ করেছে। ছবির নায়িকা লীলা নাইডুরও সুখ্যাতি হয়েছে। একজন সমালোচক লিখেছেন, "অবশেষে ছবির পর্দায় একটি সুন্দর নতুন মুখ দেখা গেল।"

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত আর দু'খানি হিন্দী ছবিও—"আনাড়ি" ও "মেমদিদি"—বার্লিনে প্রদর্শিত হয়েছে। অবশ্য ফেস্টিভ্যালে নয়, ফেস্টিভ্যালে সমাগত ইউরোপীয়ান চিত্র পরিবেশকদের সামনে। উদ্দেশ্য ওদেশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ছবি দুটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

ইণ্ডিয়ান ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে গত ১০ই জুলাই "অনুরাধা" লণ্ডনে প্রদর্শিত হয়। এই প্রদর্শনীতে ছবিটির পরিচালক নায়িকা-অভিনেত্রী ও কাহিনীকার উপস্থিত ছিলেন।

* * *

নিউইয়র্কের এশিয়া সোসাইটি আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের শিল্পী-বিনিময়ের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তদনুযায়ী ১৯৬১-৬২ সালে এশিয়ার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী আমেরিকায় গিয়ে নিজেদের গুণপনা প্রকাশ করবার সুযোগ পাবেন। প্রথম দফায় ভারতবর্ষ থেকে যাবেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর ও ইন্দ্রাণী রেহমানের নাচের দল। সিংহলের একটি নৃত্য সম্প্রদায়ও এই উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়েছেন।

* * *

নবগঠিত নাট্য প্রতিষ্ঠান মঞ্চতীর্থের প্রযোজনায় আগামী ১৯শে জুলাই রঙমহলে রবীন্দ্রনাথের "দুই বোন" অভিনীত হবে। সন্তোষ সেন গল্পটিকে নাটকাকারে গ্রথিত করেছেন। নির্দেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন সুদক্ষ অভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়।

একলব্য

অস্ট্রেলিয়ার ২২ বছরের ন্যাটা খেলোয়াড় রড লেভার এবার উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিশ্ব টেনিসের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েছেন। উইম্বলডনের মহিলাদের সিংগলসে বিজয়িনী হয়েছেন গ্রেট ব্রিটেনের মিস এঞ্জেলা মর্টিমোর।

কথায় বলে বার বার তিনবার। লেভারের ক্ষেত্রে দেখছি কথাটা ফলে গেছে। ১৯৫৯ সালে লেভার ফাইনালে হারেন পেরুর এলেক্স অলমেডোর কাছে। ১৯৬০ সালে তাঁর দেশেরই খেলোয়াড় নীল ফ্রেজারের কাছে। গত দু' বছরের রানার্স লেভার তৃতীয়বারে অ্যামেচার টেনিসের শ্রেষ্ঠ সম্মান পেয়েছেন। উইম্বলডনের ৭৫ বছরের ইতিহাসে রড লেভার চতুর্থ ন্যাটা খেলোয়াড়, যিনি চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। এর আগে আর যে তিনজন ন্যাটা খেলোয়াড় উইম্বলডন বিজয়ী হয়েছেন তাঁরা হলেন অস্ট্রেলিয়ার নর্মান ব্রুকস ও নীল ফ্রেজার এবং মিশরের জারোস্লাভ ড্রবনী।

এ বছরের 'সিডিং' অর্থাৎ সম্ভাব্য বিজয়ীর বাছাই তালিকায় লেভারের স্থান ছিল দ্বিতীয়। গত বারের বিজয়ী নীল ফ্রেজার এবার খুব ভাল খেলছিলেন না। তবুও প্রথমত তিনি সিডিং-এ পেয়েছিলেন প্রথম স্থান। কিন্তু চতুর্থ রাউণ্ডে অপ্রত্যাশিতভাবে ফ্রেজারকে ব্রিটেনের 'আনসিডেড' খেলোয়াড় ববি উইলসনের কাছে হার স্বীকার করতে হয়। শুধু ফ্রেজারই অপ্রত্যাশিতভাবে হার স্বীকার করেননি। এবার বহু ক্ষেত্রেই অপ্রত্যাশিত ফলাফল হয়েছে। সিডিং-এ তৃতীয় স্থানের অধিকারী ইটালীর নিকোলা পেত্রাঙ্গলী তৃতীয় রাউণ্ডে হেরেছেন আমেরিকার নামগোত্রহীন ক্রিস ক্রফোর্ডের কাছে। চতুর্থ সিড অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা খেলোয়াড় রয় এমারসনকে কোয়ার্টার ফাইন্যালে হারিয়েছেন সপ্তম 'সিডেড' খেলোয়াড় ভারতের রমানাথন কৃষ্ণন। স্পেনের এম সান্তানা বাছাই তালিকায় পঞ্চম স্থান পেয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার এ সেগলের কাছে হার স্বীকার করে দ্বিতীয় রাউণ্ডেই তাঁকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়। বাছাই তালিকার ষষ্ঠ খেলোয়াড় চিলির লুই আয়েলা কোয়ার্টার ফাইন্যালে লেভারের কাছে পরাজিত হন। ভারতের আর কৃষ্ণনকে সেমি-ফাইন্যালে হারান লেভার। আমেরিকার উঠতি খেলোয়াড় চাক ম্যাককিনলে অষ্টম স্থানের অধিকারী হয়েও ফাইন্যালে ওঠেন। উইম্বলডনে ম্যাককিনলের এই দ্বিতীয় বারের প্রতিযোগিতা। গত বছর তিনি প্রথম খেলতে এসেছিলেন।

উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন রড লেভার

মেয়েদের ক্ষেত্রেও অপ্রত্যাশিত ফলাফলের ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। গ্রেট ব্রিটেনের এঞ্জেলা মর্টিমোর, যিনি বাছাই তালিকায় পেয়েছিলেন সপ্তম স্থান তিনিই ফাইন্যালে ষষ্ঠ স্থানের অধিকারিণী নিজ দেশেরই মেয়ে মিস ক্রিস্টিন ট্রুম্যানকে হারিয়ে উইম্বলডন বিজয়িনী হয়েছেন। গত বারের মহিলা চ্যাম্পিয়ন ব্রেজিলের মেরিয়া বুনো অসুস্থতার জন্য এবার খেলায় অংশ গ্রহণ করেননি। ফলে গতবারের রানার্স দক্ষিণ আফ্রিকার স্যান্ড্রা রেনল্ডসকে বাছাই তালিকায় প্রথম স্থান দেওয়া হয়।

সারা ভারত এবার আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে রমানাথন কৃষ্ণনের দিকে চেয়ে ছিল। কৃষ্ণন বাছাই তালিকায় সপ্তম স্থান পেলেও নাম-করা খেলোয়াড়দের মধ্যে ইতালীর অরল্যাণ্ডো সিরোলা এবং অস্ট্রেলিয়ার রয় এমারসনকে হারিয়ে সেমি-ফাইন্যালে উঠেছিলেন। কিন্তু ওখানেই লেভারের কাছে তাঁকে হার স্বীকার করতে হয়। দীর্ঘদেহী খেলোয়াড় সিরোলা, যাঁর দেহের উচ্চতা ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি তাঁকে এবং অস্ট্রেলিয়ান চ্যাম্পিয়ন রয় এমারসনকে পরাজিত করা কৃষ্ণনের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। অদৃষ্টের পরিহাসে পর পর তিন বছর কৃষ্ণন যাঁদের কাছে হার স্বীকার করেছেন শেষ পর্যন্ত তাঁরাই হয়েছেন উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন। ১৯৫৯ সালে তৃতীয় রাউণ্ডে তিনি হারলেন অলমেডোর কাছে। গতবার সেমি-ফাইন্যালে ফ্রেজারের কাছে, এবার লেভারের কাছে। অথচ উইম্বলডনের আগে ও পরে অলমেডোকে কৃষ্ণন পরাজিত করে-ছিলেন। এবারও উইম্বলডনের পরে রড লেভারকে পরাজিত করেছেন।

ক' বছর ধরে উইম্বলডনে অস্ট্রেলিয়ারই জয়-জয়কার চলছে। গত পাঁচ বছরের মধ্যে বিজয়ীর কাপ ৪ বারই অস্ট্রেলিয়ার ঘরে গেল। তা ছাড়া এ বছর ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসের পুরস্কারও পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়। শুধু তাই নয়, সিঙ্গলসের শেষ ১৬ জন খেলোয়াড় যাঁরা সেন্টার কোর্টে খেলেছেন তাঁদের ১০ জনই অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। ডাবলসের সেমি-ফাইন্যালের ৮ জনের মধ্যেও আর কোন দেশের খেলোয়াড় নাক গলাতে পারেননি। এর আগে অন্য কোন দেশ উইম্বলডনে এমন আধিপত্যের পরিচয় দিয়েছে কি না সন্দেহ।

গ্রেট ব্রিটেনের খেলোয়াড়রাও এ বছর আশাতিরিক্ত সাফল্য অর্জন করেছেন। **দীর্ঘ ২৩ বছরের মধ্যে** ব্রিটেনের কোন খেলোয়াড় উইম্বলডনে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করতে পারেননি। শুধু তাই নয়, পুরুষদের মধ্যে কেউ সেমি-ফাইন্যালেও ওঠেন। ১৯৫৮ সালের রানার্স মিস মর্টিমোর এবার মহিলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, আর পুরুষ বিভাগে ববি উইলসন কোয়ার্টার ফাইন্যালে এবং মাইকেল স্যাংস্টার সেমি-ফাইন্যালে উঠে হেরে গেছেন।

ভারত থেকে যাঁরা এবার উইম্বলডনে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণনের কথা আগেই বলা হয়েছে। ডাবলসে কৃষ্ণনের জুটি ছিলেন চিলির লুই আয়েলা। কোয়ার্টার ফাইন্যালে অস্ট্রেলিয়ার বব হিউইট ও ফ্রেড স্টোলীর কাছে এ'দের হার স্বীকার করতে হয়। প্রেমজিত লাল ও জয়দীপ মুখার্জি তৃতীয় রাউণ্ডে হারেন ব্রিটেনের জে পিকার্ড ও মাইকেল স্যাংস্টারের কাছে। নরেশ কুমার এবং আখতার আলী তৃতীয় রাউণ্ডের উপরে উঠতে পারেন না। সিংগলসের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ফ্রেড স্টোলী প্রথম রাউণ্ডে জয়দীপ মুখার্জিকে এবং ব্রিটেনের বিলি নাইট দ্বিতীয় রাউণ্ডে প্রেমজিত লালকে পরাজিত করেন। মিক্সড ডাবলসে নরেশ কুমার ও মিসেস হপম্যানকে তৃতীয় রাউণ্ডে বিদায় গ্রহণ করতে হয়।

নীচে উইম্বলডনের সমস্ত বিষয়ের ফাইন্যাল খেলার ফলাফল দেওয়া হল:—

পুরুষদের সিংগলস ফাইন্যাল—রড লেভার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৬-১ ও ৬-৪ গেমে চার্লস ম্যাককিনলেকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ফাইন্যাল—মিস এঞ্জেলা মর্টিমোর (গ্রেট ব্রিটেন) ৪-৬, ৬-৪ ও ৭-৫ গেমে মিস ক্রিস্টিন ট্রুম্যানকে (গ্রেট ব্রিটেন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল—রয় এমার্সন ও নীল ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৮, ৬-৪, ৬-৮ ও ৮-৬ গেমে বব হিউইট ও ফ্রেড স্টোলীকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস ফাইন্যাল—কারেন হ্যান্জ ও বিলি জিন মফিৎ (আমেরিকা) ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে জান লেহানে ও মার্গারেট স্মিথকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যাল—ফ্রেড স্টোলী ও লেসলী টার্নার (অস্ট্রেলিয়া) ১১-৯ ও ৬-২ গেমে বব হো (অস্ট্রেলিয়া) ও ই বাডিংকে (জার্মানী) পরাজিত করেন।

বয়েজ সিংগলস ফাইন্যাল—সি ই গ্রেবনার (আমেরিকা) ৬-৩ ও ৯-৭ গেমে ই ব্লাংককে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

গার্লস সিংগলস ফাইন্যাল—জি কাবস-কিভা (রাশিয়া) ৬-৪ ও ৮-৬ গেমে কে ডি চ্যাবোটকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

* * *

লীডসের হেডিংলে মাঠে অস্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের তৃতীয় টেস্ট খেলায় ইংলণ্ড ৮ উইকেটে বিজয়ী হয়েছে। বার্মিংহামে দুই দলের প্রথম টেস্ট খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থাকে। ক্রিকেটের পীঠভূমি লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী হয় ৫ উইকেটে। সুতরাং দুই দলই একটি করে টেস্ট জেতার ফলে বাকী দুটি টেস্টের আকর্ষণ আরও বেড়ে গেছে। এই দুটি খেলার ওপরই নির্ভর করছে ইংলণ্ডের অ্যাশেস পুনরুদ্ধারে প্রশ্ন। জুলাইয়ের ২৭ তারিখ থেকে ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে আরম্ভ হচ্ছে দুই দলের চতুর্থ টেস্ট খেলা।

বার্মিংহামে পুরো ৫ দিন খেলার পরও জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। লর্ডসে ইংলণ্ডকে হারাতে অস্ট্রেলিয়ার পুরো ৪ দিনও সময় লাগেনি। লীডসে ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে তিন দিন সময়ের মধ্যে। এ খেলায় ইংলণ্ডের জয়ের মূলে ফ্রেডি ট্রুম্যানের কৃতিত্বের কথাই সব চেয়ে আগে উল্লেখ করতে হয়। হেডিংলে মাঠ কোনদিনই ফাস্ট বোলারের সহায়ক নয়। কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অসীম দক্ষতার সংগে বোলিং করে ট্রুম্যান প্রথম ইনিংসে ৫৮ রানে ৫টি আর দ্বিতীয় ইনিংসে ৩০ রানে ৬টি উইকেট পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ৮৮ রানে পেয়েছেন মোট ১১টি উইকেট। এখানেই ট্রুম্যানের সব কৃতিত্বের পরিচয় নয়। দ্বিতীয় ইনিংসে এক সময় ৪৫টি বলের মধ্যে মাত্র ৪ রান দিয়ে ৬টি উইকেট পান এবং ৫টি উইকেটের মধ্যে কোনই রান দেন না। টেস্ট খেলায় এ ঘটনা আগে ঘটেছে কিনা আমার জানা নেই। এক নীল হার্ভে ছাড়া কেউই ট্রুম্যানের বল খেলতে পারেননি। ট্রুম্যানের অগ্নিবর্ষী বলের জন্যেই দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ২ উইকেটে যারা ৯৯ রান করেছিল ১২০ রানের মধ্যে তাঁদের ইনিংস শেষ হয়ে যায়। অস্ট্রেলিয়ার ৮টি উইকেট পড়ে মাত্র ২১ রানের মধ্যে। এই কারণেই লীডস টেস্ট ট্রুম্যানের টেস্ট নামে অভিহিত হয়েছে। এ টেস্টে কেউই সেঞ্চুরী করতে পারেননি। মাত্র ৭ রানের জন্য ইংলণ্ডের কলিন কাউড্রে শতরান লাভের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড:—

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—২৩৭ (নীল হার্ভে ৭৩, কলিন ম্যাকডোনাল্ড ৫৪, বিল লরী ২৮, নর্মান ও'নীল ২৭, এলান ডেভিডসন ২২; ফ্রেডি ট্রুম্যান ৫৮ রানে ৫ উইকেট, জ্যাকসন ৫৭ রানে ২ উইকেট, টনি লক ৬৮ রানে ২ উইকেট)।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—২৯৯ (কলিন কাউড্রে ৯৩, জিওফ পুলার ৫৩, রমন সুব্বারাও ৩৫, টনি লক ৩০, টেড ডেক্সটার ২৮, পিটার মে ২৬; এলান ডেভিডসন ৬৩ রানে ৫ উইকেট, গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ৬৪ রানে ৩ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস—১২০ (নীল হার্ভে ৫৩, বিল লরী ২৮; ফ্রেডি ট্রুম্যান ৩০ রানে ৬ উইকেট, জ্যাকসন ২৬ রানে ২ উইকেট, ডেভ এলেন ৩০ রানে ২ উইকেট)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস (২ উইকেটে ৬২ (জিওফ পুলার নট আউট ২৬, কলিন কাউড্রে ২২)।

ইংলণ্ড ৮ উইকেটে বিজয়ী।

ইংলণ্ডের পক্ষে খেলেন—পিটার মে (অধিনায়ক), পুলার, সুব্বারাও, ডেক্সটার কাউড্রে, ব্যারিংটন, মারে (উইকেট কিপার), এলেন, লক, ট্রুম্যান ও জ্যাকসন।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলেন—রিচি বেনো (অধিনায়ক), ম্যাকডোনাল্ড, লরী, হার্ভে, ও'নীল, বার্জ, সিম্পসন, ডেভিডসন, ম্যাকে, গ্রাউট (উইকেট কিপার) ও ম্যাকেঞ্জি।

আম্পায়ার্স—জে এস বুলার ও জে ল্যাংরিজ।

খেলার তারিখ—৬ই, ৭ই ও ৮ই জুলাই।

কুমারী শকুন্তলা দত্ত

টেবল্ টেনিস পটিয়সী শকুন্তলা দত্তর জীবনী সম্বন্ধে আলোচনার অনুমতি চাইতেই ওর বাবা শ্রীসুধীন দত্ত বললেন—'এখন ওর কথা লেখা কি ঠিক হবে? ও তো এমন কিছু করতে পারেনি।'

সাফল্যের খতিয়ান খতিয়ে দেখতে গেলে হয়তো সুধীনবাবুর সঙ্গে আরো অনেকে একমত হবেন। শকুন্তলা এখনো বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ পায়নি। ভারত প্রাধান্য প্রতিযোগিতায়ও কোনবার প্রি-কোয়ার্টার-ফাইন্যালের উপরে ওঠেনি, যদিও বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন ঊষা আয়েঙ্গারকে একাধিক প্রতিযোগিতায় শকুন্তলার হাতে হার স্বীকার করতে হয়েছে, ভারতের বহু নামকরা মেয়েও হেরেছেন বাঙলার এই উঠতি মেয়েটির কাছে, তবুও দেশের প্রধান প্রতিযোগিতায় সম্মানের শিখরে আরোহণ শকুন্তলার পক্ষে এখনো সম্ভব হয়নি। বাংলার টেবল টেনিস র‍্যাঙ্কিং অর্থাৎ ক্রমপর্যায় তালিকায় শকুন্তলা দুই নম্বর মেয়ে—ভারতের ক্রমপর্যায়ে ওর পঞ্চম স্থান। এই সম্মানই বা ক'টি বাঙালী মেয়ের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হয়েছে?

কিন্তু এখানেই শকুন্তলার বিশেষত্ব ও কৃতিত্বের পরিচয় নয়। বিশেষত্ব ও কৃতিত্ব অন্য কারণে।

প্রথমত—অনুশীলন, অধ্যবসায় ও সাধনার গুণে অতি অল্প সময়ে এই মেয়েটি যে বিদ্যা আয়ত্ব করেছে তার তুলনা কম। কম্পিটিশন খেলতে আরম্ভ করেছে শকুন্তলা ১৯৫৭ সালের শেষভাগ থেকে। এর মধ্যে পর পর তিন বছর রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে ওঠা, আর তিন বছরই ভারতের জাতীয় টেবল টেনিসে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করে প্রশংসা কুড়ানো কম কথা নয়। শুধু তাই নয়, মারমুখী 'অ্যাগ্রেসিভ' খেলায় ওর জুড়ি ভারতে বিরল। এ মন্তব্য আমার নয়। টেবল টেনিসের পণ্ডিতদের। আর শকুন্তলার শিক্ষা-গুরু সমীর চ্যাটার্জি তো ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাঙলার প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন এবং টেবল টেনিসের সঙ্গে বিশ কুড়ি বছর ধরে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সমীর চ্যাটার্জি, যিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে বহু কৃতী খেলোয়াড় তৈরী করেছেন, তিনি বলেন—'অপূর্ব শকুন্তলার ফোরহ্যান্ডের মা'র, আর অনলস ওর সাধনা। খেলাকে এমন হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে আমি কোনো মেয়ে কেন, কোনো ছেলেকেও দেখিনি।'

শকুন্তলার বিশেষত্বের দ্বিতীয় কারণ। ও হচ্ছে পরিবারের ব্যতিক্রম। ও যে পরিবারের মেয়ে সে পরিবারে খেলাধুলার রেওয়াজ নেই। লেখাপড়া, সঙ্গীত, শিল্প ও সাহিত্যেরই সেখানে কদর। বাবা মা দুজনই শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ায় মানুষ। বড় ভাই সমীন্দ্র মূক-বধির হওয়া

—মুকুল—

সত্ত্বেও নিপুণ শিল্পী, আর্টিস্ট। মেজ ভাই অরুণের নেশা লেখাপড়া। স্কলারশিপ তাকে পেতেই হবে। পেয়েছেও ম্যাট্রিক এবং আই এ-তে। ছোট বোন অনসূয়াও স্কুলের ফার্স্ট-গার্ল। কিন্তু শকুন্তলা? শকুন্তলা পড়াতেও পেছপাও নয়, খেলাতেও অগ্রণী। এ বছরই বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে আশুতোষ কলেজ থেকে। তবে ও যেন পড়ার উপরে স্থান দিয়েছে খেলাকে। আর তার উৎসাহ পেয়েছে মায়ের কাছ থেকে। মা কালীপ্রভা দত্ত নৃত্য-গীত এবং খেলাধুলো পটিয়সী হিসাবে শান্তিনিকেতনে ছিলেন সু-পরিচিতা। অবশ্য বাবা শ্রীসুধীন দত্তের উৎসাহ থেকেও শকুন্তলা বঞ্চিতা হয়নি। তবুও পরিবারের ব্যতিক্রম বৈকি! একটু বাধাও এসেছিল খেলোয়াড় জীবনে। বৃদ্ধ পিতামহ বললেন—'ও যদি খেলা খেলা করেই আমেদাবাদ, বোম্বাই, হায়দরাবাদ ঘুরে বেড়ায় আর র‍্যাকেট নিয়ে চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ-তে সব সময় ঠুকঠাক করে তবে পড়বে কখন? বাবা সুধীন্দ্রনাথ ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের রিপোর্টখানা বৃদ্ধ পিতার সামনে মেলে ধরলেন। সেখানে লেখা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের লেখা পড়ার মতই খেলাধুলো শিখতে হবে। শরীর চর্চা ও খেলাধুলোকে পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে দিতে হবে সমান মর্যাদা। এর পর আর কোন বাধা আসেনি।

শকুন্তলার খেলাধুলোর পাঠ গ্রহণের প্রথম জীবনে আর একটি কারণেও বাধা এসেছিল। কারণ কিশোরগঞ্জের কায়স্থকুলের দত্ত-পরিবার শুদ্ধ সংস্কৃতির জন্যই বিখ্যাত নন। এরা ছিলেন বাংলার স্বনামধন্য শিল্পপতি। ব্যাংক বীমা, কাপড়ের কল প্রভৃতি নানা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। ঘরে ছিল লক্ষ্মী-সরস্বতী বাঁধা। কিন্তু লক্ষ্মী মুখ ফেরালেন। দৈব দুর্বিপাকে পরিবারের উপর দিয়ে মহা প্রলয় বয়ে গেল। এই প্রলয়ের মধ্যেই শকুন্তলা আরম্ভ করল খেলাধুলো। মনের অদম্য আগ্রহ ছাড়া এটা সম্ভব নয়।

যাই হক। আর পাঁচজনের মতই শকুন্তলার প্রথম অনুরাগ অ্যাথলেটিক স্পোর্টসে। ও যখন ডায়োসেশানের ছাত্রী তখন পেল গেমটিচার আরতি মুখার্জি ও অধ্যক্ষা চারুবালা দাশের উৎসাহ। স্কুল স্পোর্টসে দৌড়, লাফ, বর্শা ছোড়া প্রভৃতিতে প্রথম দ্বিতীয় স্থান পেতে আরম্ভ করল।

শিশু মনের চাপল্যে বই দিয়ে নেট বানিয়ে বইকেই টেবল টেনিস ব্যাট করে খেলা খেলা টেব্‌ল টেনিস ছাড়া আগে কোনদিন সত্যিকার টেব্‌ল টেনিস খেলেনি। ১৯৫৬ সালে রাজকুমারী অমৃত কুমারীর শিক্ষা পরিকল্পনামত টেবল টেনিসের ভ্রাম্যমান 'কোচ' শিবরামন এলেন ওদের স্কুলে। ঊষা আয়েঙ্গারও তখন ডায়োসেশানের ছাত্রী। ১৫ দিনের জন্য এক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হল। সেখানেই সত্যিকারের টেব্‌ল টেনিস ব্যাট হাতে পেল শকুন্তলা। কিন্তু ছাত্রী ভাগা-ভাগি, সময় ভাগাভাগি, ব্যাট টেবলের ভাগা-ভাগি। অত ভাগাভাগির মধ্যে শেখার সুযোগ বা সময় কোথায়? তবু নেশা ধরল ওখান থেকেই।

১৯৫৭ সালে ম্যাট্রিক পাশ করবার পর ওর আগ্রহ দেখে মা নিয়ে গেলেন ওয়াই ডবিউ সি এ-তে খেলা শেখাবার জন্য। বয়স কম বলে ওরা শকুন্তলাকে মেম্বার করতে রাজী হলেন না। এক দরজা বন্ধ তো আর এক দরজা খোলা। চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ শকুন্তলাকে মেম্বার করে নিল। কিন্তু সেখানেও পাত পড়ে না। হরিহরছত্রের মেলা। একই রকম ভাগাভাগি। খেলে ওর আশা মেটে না। একটি দুটি গেম খেলে ছল ছল চোখে বসে থাকে অধীর প্রতীক্ষায় আর একটি গেম খেলবার জন্য। তখন শকুন্তলা টেবল টেনিসের 'নভিস' মেয়ে। লম্বা দোহারা চেহারা বটে, ফোরহ্যান্ডের মার অবশ্য ভাল। কিন্তু আড়ষ্ট 'স্টিফ' শরীর। খেলায় সাবলীলতা নেই। 'বাঁকা মেয়ে' বলে কেউ বা ঠাট্টা করে। তবে ওর আগ্রহ দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়।

এই অবস্থায় এগিয়ে আসেন সমীর চ্যাটার্জি। ব্যাট ধরার ত্রুটি শুধরে দিয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রথায় খেলা শেখাতে আরম্ভ করেন শকুন্তলাকে। চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ হয়ে ওঠে শকুন্তলার কণ্ব মুনির আশ্রম। অনসূয়া প্রিয়ংবদা, শার্ঙ্গরব শারদ্বতদের সঙ্গে ওখানেই কাটে তার বেশী সময়।

শিক্ষার ফল ফলতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না। ১৯৫৭ সালেই ওর হাত খুলে যায়। ১৯৫৮-তে কটকে পায় ইস্ট ইণ্ডিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ। জীবনের প্রথম বড় সাফল্য। এ বছরে আর আর ছোট বড় সাফল্যের মধ্যে ওর কলেজ চ্যাম্পিয়নশিপ আর রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্সের সম্মান। 'ওয়াই এম সি এ কলেজ স্ট্রীট চম্পিয়নশিপের সেমিফাইন্যালে বাংলার দুই নম্বর মেয়ে মিসেস চমন কাপুরের সঙ্গে খুবই ভাল খেলে এ বছর শকুন্তলা হেরে গিয়েছিল। শকুন্তলার শিক্ষা-গুরু সমীর চ্যাটার্জি তখন চমনকে বলেছিলেন—"দেখেছো শকুন্তলা অল্পদিনে কতখানি উন্নতি করেছে।" উত্তরে চমন বলেছিলেন—'যতই উন্নতি করুক

আমাকে হারাতে ওর পাঁচ সাল লাগবে'। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস দু' মাসের মধ্যেই বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপে চমন কাপুরকে হার স্বীকার করতে হল শকুন্তলার কাছে।

১৯৫৯ সালে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য টেব্‌ল টেনিসের আসর। সারা ভারতের খ্যাতনামা মেয়ে পুরুষ কলকাতায় সমাগত। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা—তিন বেলা খেলা। সবার মুখে শকুন্তলার প্রশংসা। প্রধানত শকুন্তলার কৃতিত্বে বাংলার মেয়েদের টিম সর্বপ্রথম হারালো মাদ্রাজ ও বোম্বাইকে। হায়দরাবাদের এক নম্বর মেয়ে মীরা জনার্দন, কেরল-শ্রেষ্ঠ সীতা আয়ার, মাদ্রাজের কুমারী রুক্মিণী, বোম্বের সরোজ মীরকার একে একে হার স্বীকার করলেন শকুন্তলার কাছে। 'স্টেটসম্যান' লিখল:—

In the Bengals women's 3-0 win over Hyderabad and Kerala, Shakuntala Dutta played five aggressive games to beat Mira Janardhan, Hyderabad's No. 1 and Sita Ayer Keral's No. 1.

বোম্বের 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'য় লেখা হল:—

The deciding tie between Bengal and Bombay had a thrilling finish, Shakuntala Dutta beating Saroj Mirkar by two games to one....... Miss Dutta's sweeping forehand had the last say in the games.

জাতীয় প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউণ্ডে তীব্র প্রতিযোগিতার পর শকুন্তলা হারল প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন রাসেল জনের কাছে।

১৯৬০ সালে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন উষা আয়েঙ্গারকে দু'বার হার স্বীকার করতে হল দু' বছর আগের সেই বাঁকা মেয়ের কাছে। প্রথম ওয়াই এম সি এ-র কলেজ স্ট্রীটের ফাইন্যালে। পরে সাঁত্রাগাছিতে বাণী নিকেতন টেব্‌ল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে। কিন্তু রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে এবারও শকুন্তলা উষার কাছে হেরে গেল।

তবে এই বছরের একটি খেলার কথা শকুন্তলা জীবনে ভুলতে পারবে না। শকুন্তলা কেন? টেব্‌ল টেনিসের অনুরাগী মাত্রেরই এ খেলার কথা চিরদিন মনে থাকবে। ওয়াই ডব্লিউ সি-এ হলে ওদের চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইন্যাল খেলা। হলে তিল ধারাবার যায়গা নেই। এক দিকে ভারতের দুই নম্বর মেয়ে উষা সুন্দররাজ অপরদিকে বাংলার মারমুখী মেয়ে শকুন্তলা দত্ত। উষা সুন্দররাজ, যাকে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন রিচার্ড বার্গম্যানের সঙ্গে তুলনা করে ভারতের মেয়ে বার্গম্যান বলা হয়, তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। এদিকে শকুন্তলারও উঠতি সুনাম। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সুতীব্র উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দুজনে দুটি করে সেট পেল। পঞ্চম সেটে খেলার মীমাংসা। একবার শকুন্তলা, একবার উষা-

কুমারী শকুন্তলা দত্ত

সুন্দররাজ অগ্রগামী। শেষদিকে সুন্দররাজ এগিয়ে গেল ১৮—১২ পয়েন্টে। খেলায় জয় অনিবার্য। বাংলার সমর্থকরা হাল ছেড়ে দিলেন। কিন্তু শকুন্তলা টেবলের উপর মারের তুফান ছুটিয়ে পরপর ৮টি পয়েন্ট পেল। এবার শকুন্তলার স্বপক্ষে ২০—১৮ পয়েন্ট। দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। শকুন্তলার অসম্ভব জোরের তিনটি ফোরহ্যাণ্ড ড্রাইভ অবিশ্বাস্যভাবে তুলে দিয়ে উষা সুন্দররাজ শেষ পর্যন্ত গেম পেল ২২—২০ পয়েন্টে।

এমনিভাবে একটু অভিজ্ঞতার অভাব, একটু চিত্তচাঞ্চল্য এবং একটুখানি আত্মরক্ষার দুর্বলতায় শকুন্তলাকে অনেক খেলায় হার স্বীকার করতে হয়েছে। অথচ তার হাতে যে মার আছে অনেক নামকরা পুরুষ খেলোয়াড়ের হাতেও সে মার নেই।

এ বছর উষা সুন্দররাজ ও শকুন্তলার খেলা সম্পর্কে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের মন্তব্য:

Shakuntala rose to greater heights in the deciding 5th game in which she kept usha at bay with a torrent of sizzling forehand killers.

শকুন্তলা চিরদিনই খেলে শক্ত রবার মোড়া ব্যাটে। কিন্তু উষা সুন্দররাজের কাছে পরাজয়ের পর তার 'স্যাণ্ডউইচড' ব্যাটে খেলবার বাসনা হয়। গুরু সমীর চ্যাটার্জিকে এ অভিপ্রায় জানাতেই বার্ণার স্কুলের ছাত্র সমীর আপত্তি করেন। ফলে ওখানেই গুরু-শিষ্যের সম্পর্কে হাত পড়ে। কিন্তু নিয়তির পরিহাসে শকুন্তলার আর 'স্যাণ্ড-উইচড' ব্যাটে খেলা হয়ে ওঠে না। ভারতীয় টেব্‌ল টেনিস ফেডারেশন আগস্ট মাসে থেকে 'স্যাণ্ডউইচড' ব্যাটের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন।

শকুন্তলা এখন নিজেই নিজের শিক্ষা-গুরু। অনুশীলনের ত্রুটি নেই। চৌরঙ্গীর ওয়াই এম সি এ আর ওয়েলেসলীর মুসলিম ইন্সটিটিউট তার অনুশীলন ক্ষেত্র। বয়স মাত্র কুড়ি। মনে তার উচ্চ আশা, সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

দেশী সংবাদ

৩রা জুলাই—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের স্নাতক কেন্দ্রের নির্বাচনে প্রথমবারের ভোট গ্রহণকালে জাল ভোটের যে কেলেঙ্কারির প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা কি পুলিসী তদন্তের মধ্য দিয়া ধামাচাপা পড়িতে চলিয়াছে? অথবা ঐ কেলেঙ্কারির পূর্ণ রহস্য উদ্ঘাটনে কি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, কি ঊর্ধ্বতন পুলিস কর্তৃপক্ষ কোন পক্ষই কি আর তেমন আগ্রহান্বিত নহেন?

৪ঠা জুলাই—বিশ্বস্ত সূত্র হইতে যেসব সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে, মে মাসের শেষ সপ্তাহে কানপুরে তিন দিনব্যাপী গোপন খাকসার আন্দোলনের সারা ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শাসনব্যবস্থায় হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার করা হয় এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গবর্নমেণ্টসমূহের বিরুদ্ধে নিয়মিত প্রচারকার্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৫ই জুলাই—দক্ষিণ ভারতে প্রলয়ংকর বন্যা দেখা দিয়াছে। কেরল, মাদ্রাজ ও মহীশূরে সর্বত্র এক অবস্থা। তবে কেরলের ক্ষতিই সর্বাধিক। ত্রিচুর জেলাতেই দশ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে। আট্টাপাত্তি উপত্যকায় ধসের ফলে ৭৩ জন লোক মারা গিয়াছে।

আসাম মন্ত্রিসভা আসামে আইন ও শৃংখলা রক্ষা করিতে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আসাম মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে কেন্দ্র হইতে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় স্বতন্ত্র পার্টির প্রেসিডেণ্ট অধ্যাপক এন জি রংগ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

৬ই জুলাই—শিলিগুড়িতে এই মর্মে গুজব রটিয়াছে যে, নেপাল দার্জিলিং-এর কিছুটা অংশ নেপালের সহিত যুক্ত করিয়া "মহানেপাল" গঠনের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

অদ্য কলিকাতায় কাছাড় কংগ্রেস প্রতিনিধি দলের মুখপাত্র দৃঢ়তার সহিত এই অভিমত পোষণ করেন যে, হাইলাকান্দির হাঙ্গামা সুপরিকল্পিত এবং রাজ্য সরকারের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত কয়েকজন এই ঘটনার জন্য দায়ী।

উদ্বাস্তু ভারতীয় ব্যাংকগুলিকে অনুদ্বাস্তু প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষণা করিতে এবং উদ্বাস্তুদের ব্যাঙ্কের হিসাব ও গচ্ছিত অর্থ স্থানান্তরের ব্যাপারে ব্যবস্থা করিতে পাকিস্তান সরকার সম্মত হইয়াছেন। তবে এই স্থানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইহার ফলাফল পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না।

৭ই জুলাই—জম্মু হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, গত সপ্তাহে পাকিস্তানী সৈন্যরা মাঝে মাঝে যুদ্ধবিরতি সীমারেখার ভারতীয় দিকে মেনধার এলাকায় অবস্থিত ভারতীয় সীমান্ত পুলিসকে লক্ষ্য করিয়া রাইফেল ও মেসিনগান হইতে কয়েক হাজার রাউণ্ড গুলী ছুঁড়িয়াছে।

বিশ্বব্যাঙ্ক কলিকাতা বন্দরের উন্নয়নের জন্য ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার ঋণ মঞ্জুরের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ছয়টি বৃহৎ ড্রেজার সমেত কুড়িটি অতিরিক্ত জলযান ক্রয়ের জন্য এই অর্থের অধিকাংশ ব্যয় করা হইবে।

৮ই জুলাই—বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, আসামের অভ্যন্তরে পাকিস্তানীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করার জন্য সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষীদলের শক্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইবে।

অনুগ্রহ-বিতরণে উদার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক শৈথিল্যের কল্যাণে ইদানীং নূতন নিয়োগ, প্রমোশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনিয়মই যেন নিয়মে দাঁড়াইয়াছে। এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্বের দাবি করিতে পারেন রাজ্যের শিল্প-অধিকার। প্রীতিভাজন ব্যক্তিদের লইয়া পরিপাটি "কুটীরশিল্প" প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত অন্য কোন দপ্তরে আছে কিনা জানা নাই।

৯ই জুলাই—খুন, চুরি, রাহাজানি প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক অপরাধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে নাকি আর একরূপ 'উচ্চমানের' অপরাধের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। পুলিস এই ধরনের অপরাধের নামকরণ করিয়াছে 'হোয়াইট কলার ক্রাইম' বা 'ভদ্রলোকদের দ্বারা ঘটিত অপরাধ।' এই ধরনের অপরাধ যাহারা করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই 'ভদ্র', উচ্চশিক্ষিত ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে এই ধরনের অপরাধের হার ক্রমশ বাড়িয়া চলিয়াছে বলিয়া পুলিস রিপোর্ট হইতে জানা যাইতেছে।

ডি ভি সির মাথাভারী প্রশাসনিক শাসনযন্ত্র 'গৌরী সেনের' টাকা কিভাবে অপচয় করিতেছে, তাহার এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া যায়। একদিকে হাজার হাজার কর্মী ছাঁটাই, অপরদিকে কর্মী নিয়োগ বিভাগে অফিসার বৃদ্ধি। বর্তমান কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীপনায় সংশ্লিষ্ট মহল স্তম্ভিত।

নূতন বিপদের আশঙ্কায় শিলচর হইতে হাইলাকান্দি পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৩০ মাইল পথে মিলিটারী দ্রুত টহল দিয়া বেড়াইতেছে। শিলচরে সান্ধ্য আইনের কড়াকড়ি করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৩রা জুলাই — ৩৮ বৎসর বয়স্ক দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী জেনারেল দো ইয়ং চাং আজ জঙ্গী নেতা ও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পদত্যাগ করিয়াছেন। এই কাজে যথোপযুক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা না থাকায় তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া জানান। গত মে মাসে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

সানডে টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, রাশিয়া এবং চীনের মধ্যে নূতন গুরুত্বপূর্ণ বিরোধ দেখা দিয়াছে। শ্রীক্রুশ্চেফ শ্রীমাও সে-তুং-এর বিরুদ্ধে আনুগত্যের অভাব, অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ এবং যুদ্ধের জন্য উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ আনিয়াছেন।

৪ঠা জুলাই—কুয়াইতের আঞ্চলিক জলসীমার মধ্যে পাঁচখানি মার্কিন রণতরী প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া গতকাল রাত্রিতে মস্কো বেতারের এক সংবাদে বলা হইয়াছে। কোন্ সূত্র হইতে এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, মস্কো বেতার তাহা প্রকাশ করে নাই।

সম্প্রতি লণ্ডনে এক কপি "ইসপের গল্প"—তাহাও অসম্পূর্ণ—৮ হাজার স্টার্লিং পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। বইখানি ১৪৭৬-৭৭ সালে জার্মানীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

৫ই জুলাই — ইতালীর বিজ্ঞানী রাফায়েল বেনদান্দী ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, সূর্যে বড় রকমের কলঙ্ক দেখা দেওয়ায় উহার পরিণামে এই মাসের শেষ দিকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ঘটিবে।

আলজিরিয়া বিভাগের প্রতিবাদকল্পে আলজিরিয়ার মুসলমানগণ ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন আরম্ভ করিলে আজ আলজিরিয়ায় যে সমস্ত সংঘর্ষ হয়, তাহার ফলে ৭৫ জন নিহত ও দুই শতাধিক লোক আহত হইয়াছে বলিয়া অদ্য সরকারী মুখপাত্র জানাইয়াছেন।

৬ই জুলাই—মস্কো বেতারে প্রকাশ, সোভিয়েট কাচ-শিল্পের জন্য কাঁচা মাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উত্তর ককেশাসের একটি পর্বত উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। "শান্তিপূর্ণ প্রয়োজনে" এই অমিতশক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটাইবার ব্যবস্থা করিতেই ছয় মাস লাগিয়াছে।

৭ই জুলাই —মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার গত রাত্রিতে এই সংবাদ সমর্থন করেন যে, তাঁহারা কম্যুনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে গ্রহণের প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন। এই প্রস্তাব অনুসারে সাধারণ পরিষদে কুওমিণ্টাং চীনের আসন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম স্থায়ী সদস্যরূপে তাহার স্থান বজায় থাকিবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে সোভিয়েট প্রতিনিধি গতকল্য নিরাপত্তা পরিষদে কুয়াইত সম্পর্কে বৃটেনের খসড়া প্রস্তাবটি গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন, অবিলম্বে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে প্রস্তাবে কিছু বলা হয় নাই অথচ বর্তমান পরিস্থিতিতে উহার প্রয়োজনই সর্বাধিক।

৮ই জুলাই—প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আয়ুব খাঁ আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে করাচীতে জনৈক মার্কিন সাংবাদিকের নিকট এই আভাস দেন যে, আসন্ন কেনেডী-আয়ুব আলোচনাকালে কাশ্মীর লইয়া ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধের ব্যাপারে আমেরিকা যদি পাকিস্তানকে পুরাপুরি সমর্থন না করে, তবে পাকিস্তান হয়ত পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সামরিক আঁতাত হইতে বাহির হইয়া যাইবে।

৯ই জুলাই — আজ সোভিয়েটের সামরি বিমানশক্তির বৃহত্তম ও অভূতপূর্ব সমাবে নূতন ধরনের শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্রবাহী জ ও বোমারু বিমানবহরকে উড়িয়া যাইতে দেখা যায়। উহাদের মধ্যে প্রায় এমন এক শত বিমান ছিল, যেগুলি পশ্চিমীরা আজ প্রথম দেখিতে পাইলেন।

"ডেইলী টেলিগ্রাফ" পত্রিকায় প্রকাশ, উত্তর অ্যাঙ্গোলায় বিপ্লবীরা এখন "পোড়ামাটি নীতি" গ্রহণ করিয়াছে এবং একটির পর একটি খামার পোড়াইয়া দিতেছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

DESH 40 Naye Paise.
SATURDAY, 22ND JULY, 1961

২৮ বর্ষ ॥ ৩৮ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৬ শ্রাবণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

পাশ-ফেল-ভর্তি

শিক্ষাপ্রকল্পটা নিশ্চয়ই এমন বস্তু নয় যাতে কেবল কর্মেই অধিকার, 'মা ফলেষু কদাচন'। স্কুলকলেজে শিক্ষার পরিণতি ও পরিণাম কী হচ্ছে তার পরিচয় বৎসর বৎসর পরীক্ষার ফলাফল। স্কুল ফাইনাল, ইণ্টারমিডিয়েট, ও প্রাক বিশ্ববিদ্যালয়, বৃহদায়তন এই পরীক্ষাগুলিতে গড়-পড়তায় শতকরা পঞ্চাশের বেশী পাশ করে না; পাশ যারা করে তাদের মধ্যেও অধিকাংশ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিভাগে অর্থাৎ এই অধিকাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা এমন স্তরের যাকে শিক্ষা-বিধায়কগণও পারতপক্ষে স্বীকৃতি দিতে চান না। দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ পাশ করা ছাত্রছাত্রীর (দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগের) বিদ্যাবত্তা অনিশ্চিত এবং তাদের ভবিষ্যৎ ততোধিক অনিশ্চিত। এরপর ভাববার বিষয় শতকরা গড়পড়তা যে পঞ্চাশজন ফেল হচ্ছে তাদের কথা।

আমরা অনেকেই ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছি যে দিন রাত্রি, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত এবং জোয়ার ভাঁটার মতই পরীক্ষায় পাশ এবং ফেলের নিয়মটা অবধারিত। পরীক্ষায় যারা ফেল করছে তাদের ফেল করাই যেন ভবিতব্য। ধারণাটা ভুল এবং ক্ষতিকর। এই পর্যন্ত বলা যুক্তিসংগত যে, উপরোক্ত পরীক্ষা-গুলি যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী দিয়ে থাকে তাদের অনেকেরই শিক্ষাগত প্রস্তুতির অভাব। এদের মেধা, সামর্থ্য এবং যোগ্যতার প্রশ্নও অবশ্য বিবেচ্য। কিন্তু সব চেয়ে লক্ষণীয় হল স্কুল কলেজে নির্দিষ্ট সময়কাল শিক্ষালাভ করা সত্ত্বেও শতকরা গড়পড়তা পঞ্চাশজন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় ফেল করে। মেধা, সামর্থ্য, এবং অধ্যবসায়ে তারতম্য থাকে ঠিকই, কিন্তু শতকরা পঞ্চাশজন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা-পাশের অযোগ্য এমনটি অন্য কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় দেখা যায় না।

ডঃ কোঠারী অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত সহযোগে দেখিয়েছেন শতকরা পঁচাশিজন পরীক্ষায় পাশ করাই হল স্বাভাবিক নিয়ম। এর বেশী ফেল করাটা নিয়মের ব্যতিক্রম এবং ফেলের হার বেশী হলে নিঃসন্দেহে ধরা হয় যে শিক্ষাব্যবস্থাতেই গুরুতর গলদ ঘটেছে। আমাদের অভ্যস্ত ধারণা হল বেশী ফেল করাটা পরীক্ষার উঁচু মান রক্ষার সুলক্ষণ। আসলে, শিক্ষার মানহানি, কারণ যে-শিক্ষা ব্যবস্থায় গড়পড়তা শতকরা পঞ্চাশজন ছাত্রছাত্রী পাশ করবার যোগ্যতা অর্জনে অক্ষম সে-শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকবৃন্দ কারোই শ্রদ্ধা পায় না।

পাশ-ফেল-ভর্তির হরণ পূরণের বিচিত্র নিয়মে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এই যে গভীর সংকট দেখা দিয়েছে তার প্রতিকার কী? যদি শতকরা গড়পড়তা পঞ্চাশের জায়গায় অন্য দেশের মত শতকরা পঁচাশি জন পাশ করত তাহলে শিক্ষা সংকট চরমে পৌঁছুত, একথা বলা নিষ্প্রয়োজন। এখনই হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী কলেজে ঠাঁই পাচ্ছে না, মামুলী আর্টস এবং বিজ্ঞান কোর্সের কলেজগুলির বাইরে বিবিধপ্রকারের বৃত্তিকরী যোগ্যতা অর্জনের সুযোগও যৎসামান্য। যদি পাশের হার স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় তাহলে এই পশ্চিম বাংলাতেই লক্ষাধিক তরুণ তরুণীকে উচ্চতর শিক্ষায় কিম্বা জীবিকা অর্জনের জন্য শিক্ষানবীসিতে নিযুক্ত করা অত্যন্ত দুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। আপাতত অবশ্য সমস্যা অন্য-রকম। পরীক্ষায় যারা ফেল এবং কর্মক্ষেত্রে যারা বেকার অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের সুযোগ-বঞ্চিত এদের হতাশা এবং বিড়ম্বনায় বেদনাবোধ করা ছাড়া আপাতত আর কোন উপায় দেখা যায় না।

মামুলী ধরনের কলেজী শিক্ষা লাভের জন্য ব্যগ্রতা উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে সংকট-সৃষ্টির একটা কারণ সন্দেহ নেই। কলেজী শিক্ষার মোহ অনেক তরুণ বয়স্কের সময়, সামর্থ্য এবং অর্থের অপচয় ঘটাচ্ছে, একথা নীতিগতভাবে সকলেই স্বীকার করেন ধরে নেওয়া যায়। উচ্চশিক্ষার সুযোগ ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতা বিচার করে দেওয়াই শ্রেয়; সে কারণে কলেজের ছাত্র সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের যে চেষ্টা শুরু হয়েছে তা অসংগত মনে করি না। কিন্তু সমস্যার একটা দিকের উপর মনোনিবেশ করলে অন্যদিকে সংকট ঘনীভূত হয়। বর্তমানে তাই হয়েছে দেখা যাচ্ছে। কলেজে ছাত্র-সংখ্যা সীমাবদ্ধ করার ফলে প্রবেশার্থীর যোগ্যতাবিচারে আগের তুলনায় কড়া-কড়ি হচ্ছে। কিন্তু মামুলী ধরনের উচ্চশিক্ষার সুযোগ যারা পাচ্ছে না বা পাবে না তাদের কী উপায় হবে তাও সংগে সংগে বিবেচনা করা অবশ্য কর্তব্য। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিভাগে যারা পাশ করছে তারা অনেকেই উচ্চশিক্ষালাভের অযোগ্য এবং অতএব কলেজে তাদের ঠাঁই হবে না, এই সিদ্ধান্ত নির্বিচারে অনু-সরণ করলে শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণ তাঁদের সমূহ দায়িত্বভ্রষ্ট হবেন। গুণাগুণ ও যোগ্যতা অযোগ্যতা যাচাই করে উচ্চ-শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হোক, ভাল কথা। কিন্তু কলেজী শিক্ষার সুযোগ যারা পাবে না বা পেতে পারে না সেই হাজার হাজার তরুণবয়স্কদের জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিস্তৃত সুযোগদান শিক্ষাব্যবস্থাপকগণের এবং রাজ্য সরকারের একান্ত জরুরী দায়িত্ব।

পাশ-ফেল-ভর্তির সমস্যা মন্ত্রবলে এক লহমায় কিম্বা কতকগুলি নিয়মের কড়া-কড়ি দ্বারা সমাধান অসম্ভব। কলেজী শিক্ষার বিকল্প ব্যবস্থা বিস্তৃত হওয়া দরকার। স্কুল ফাইনাল পাশের পর সকলেই বা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী কলেজের দরজায় ধরণা দেয় কতকটা দীর্ঘকাল লালিত উচ্চশিক্ষার মোহে আর অনেক পরিমাণে বিকল্প শিক্ষা এবং বৃত্তিকরী যোগ্যতা অর্জনের সুযোগের অভাবে নিরুপায় হয়ে। ব্রিটেনে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষা-শেষে ১৫-১৬ বৎসর বয়স্কদের অধিকাংশই জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে ঠাঁই পায়, কলেজের দরজায় ধরণা দেয় না। উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার যোগ্যতা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সাধারণ স্তরের তরুণবয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয় না কারণ "Those who are not selected are also given the chance to make the best use of their ability"

আমাদের দেশেও এত অসন্তোষ ও আক্ষেপ ঘটবে না যদি সাধারণ স্তরের তরুণ বয়স্কদের স্কুলের শিক্ষাশেষে তাদের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী জীবন ও জীবিকাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিস্তৃত সুযোগ দেওয়া হয়।

প্রেমবিহীন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভয়ঙ্কর স্থির সত্যে ডুবে যাব, সুরম্য বিজয়া,
ধৃষ্ট বাঞ্ছা মুছে গেলে পার্থিব ললাটে, ওষ্ঠে, চুলে
রুপালী আগুন থেকে কে বাঁচাবে? বৃক্ষসম দয়া
সবুজ আঁচলে ঢেকে, জয়া, তুমি এসেছিলে মায়াবী আঙুলে—

বিশ্ব চরাচর ছুঁয়ে দিতে, যেন, বিশ্বাসের গোপন সৌন্দর্যে,
প্রতিভায়
বিখ্যাত শান্তিকে পাবে, যেন আমি পৃথিবীর
সবটুকু খনিজ গন্ধক
চুরি করে হেসে উঠব হা-হা শব্দে, অস্ত্রহীন রাত্রির বিভায়
আমাকে সাজাতে বুঝি চেয়েছিলে, দয়াময়ী,
সভ্যতার শেষ বিদূষক।

পৃথিবীকে ভালবাসব, এতখানি ভালবাসা এই বুকে নেই
গভীরে প্রতিষ্ঠাবান আয়ুহীন কীর্তির পাতাল;
মুহূর্তে জীবন শিল্প চূর্ণ হয়, প্লানিহীন, পরমুহূর্তেই
ঝলসে ওঠে স্মৃতিমূর্তি, গ্লানি-হীন, রুপালী আগুনে চিরকাল।

ভয়ঙ্কর স্থির সত্যে ডুবে যাব খর চক্ষে, অটুট শরীরে
অভিলাষ গুপ্ত ক'রে কৃষ্ণকায় হীরকের মত,
এক জীবনের শোক বহু রূপান্তর স্রোতে আসে ফিরে ফিরে
জয়ী, তোর প্রেম পেলে উরুদ্বয় শক্তিমান হ'ত।

সাজানো বাগান

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

শিলার আড়ালে জানি তোমার ওই সাজানো বাগানে
এখন আর কেউ নেই একটিও কুসুম কোনখানে
স্মৃতিচিহ্ন নেই, শুধু হাওয়ায় ধুলোর ঘূর্ণি ওড়ে,
শুধু রুক্ষ মাটি শুধু শুকনো ডালপালা ঃ
আর হা-হা করে শূন্য চতুর্দিকে দুঃসহ নিরালা।

তুমি আজ দীপ্ত জানি জ্যামিতিক শহরে শহরে।
যদি অগোচরে মন পোড়ে,
কেন সেই দুর্বলতা সকলের অলক্ষ্যে না রেখে
তুমি ফিরে এলে তুমি কান্নার আবেগে
কেঁপে উঠলে! তোমার ওই শব্দের প্রাচীর বহুদিন
জীর্ণ হ'য়ে গেছে, আর সঙ্গিনী তোমার
সে আরও কৌতুকে আজ অন্ধকারে মিশে অন্ধকার।
তোমার বাগানে আজ ওড়ে শুধু বুভুক্ষু ফড়িঙ!

বৈদেশিকী

প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর মার্কিন সফরের দ্বারা পাকিস্তানের কী ফললাভ হলো বা হতে পারে সে বিষয়ে ভারতের পক্ষে ইচ্ছা করলেও উদাসীন থাকা যে সম্ভব নয়, এই নিদারুণ ঐতিহাসিক দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে পাকিস্তানী কর্তারা নিজেরাই সকলকে সচেতন করে রাখার জন্য সচেষ্ট। যে অবস্থায় এই দ্বিধাবিভক্ত দেশের দুই অংশের হিত পরস্পরবিরোধী বলে প্রতিভাত হয়—যাকে আমরা দুর্ভাগ্য বলছি সেটা অবশ্য শ্রীআয়ুব খাঁ দুর্ভাগ্য ব . বিবেচনা করেন না। সেই জন্য পাকিস্তানের উপকারী সাজতে যে চায় তাকে ভারতের অপকার করতে সম্মত হতে হবে—এই দাবি করতে পাকিস্তানী প্রেসিডেন্টের কোনো দ্বিধাবোধ নেই। আমেরিকা যাত্রার পূর্বে এবং আমেরিকায় গিয়ে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে যে-সব উক্তি করেছেন সেগুলির মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। অবশ্য প্রেসিডেন্ট কেনেডি ও অন্যান্য মার্কিন রাজপুরুষদের সঙ্গে নিভৃতে তাঁর যে-সব আলাপ আলোচনা হয়েছে তাতে তিনি ঠিক কী সুরে কথা বলেছেন তা আমরা জানি না।

ভারতের বিরুদ্ধে শ্রীআয়ুব খাঁ প্রকাশ্যে যে-সব উক্তি করেছেন সেগুলিকে অথবা তার কোনোটাকে শ্রীকেনেডি পুরোপুরি স্বীকার করে নেবেন পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট এরূপ আশা করেছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু এই ধরনের উক্তি দ্বারা মার্কিন জনমত কিছুমাত্র প্রভাবান্বিত হয় না এবং তার স্পর্শ সরকারী নীতিতে আদৌ লাগে না এরূপ মনে করাও উচিত না। কেনেডি-আয়ুব আলোচনার পরে যে সরকারী যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছে তার সঙ্গে আয়ুব খাঁর ভাষণাদি মিলিয়ে পড়ে কেউ যদি মনে করেন যে আয়ুব খাঁর কেনেডি দর্শন নিষ্ফল হয়েছে তবে তিনি ভুল করবেন। প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর বক্তৃতাদি অনেকখানি ছিল প্রোপাগান্ডা-মূলক। প্রোপাগান্ডায় যা দাবি করা হয় তার সবটাই পাব ধরে করা হয় না, দাবির অনুকূল ভাব খানিকটা সৃষ্টি করতে পারলেই প্রোপাগান্ডা সফল হয়েছে বলা যায়।

পাকিস্তানের মন রাখার জন্য আমেরিকা ভারতের প্রতি বন্ধুত্বভাব ত্যাগ করবে এবং ভারতের উন্নতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে এরূপ আশা পাকিস্তানী কর্তারা নিশ্চয়ই করেন নি। ভারতের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, এটা পাকিস্তান একেবারেই চায় না। বিদেশে সামরিক সাহায্যদান সম্পর্কিত

মার্কিন আইন সম্প্রতি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়েছে। তাই থেকে একটা কথা রটে যে ঐ পরিবর্তনের ফলে আমেরিকা ভারতকে—ভারতের 'নিরপেক্ষ' নীতি থাকা সত্ত্বেও—সামরিক সাহায্য দিতে পারবে। এমনকি এমন গুজবও রটে যে ভারতকে সামরিক সাহায্য দেবার উদ্দেশ্যেই আইন পরিবর্তন করা হয়েছে। বস্তুত 'নিরপেক্ষ' নীতি অনুসরণকারী বিদেশী রাষ্ট্রকে সামরিক সাহায্যদানের জন্য আইন পরিবর্তন আবশ্যক ছিল না। তা না হলে যুগোশ্লাভিয়াকে কেমন করে মার্কিন সামরিক সাহায্যদান সম্ভব হয়েছিল? যাই হোক, ভারতবর্ষকে মার্কিন সামরিক সাহায্যদানের সম্ভাবনার গুজবটা যে কারণেই হোক রটে। সেই সম্ভাবনাকে রোধ করতে পাকিস্তান চায়। সে কাজ ভারত সরকার নিজেই হালকা করে দিয়েছেন। ভারত নিতে চাইলেও মার্কিন সরকার ভারতকে সামরিক সাহায্য দেবেন না, পাকিস্তানের কথায় এরূপ শর্ত স্বীকার করা মার্কিন সরকারের পক্ষে সম্ভব হত না। বস্তুত অতীতে মার্কিন সরকার ভারত সরকারকে সামরিক সাহায্য দিতে চেয়েছেন কিন্তু স্বীয় নীতির বিরোধী বলে ভারত সরকার আমেরিকার সামরিক সাহায্যদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। যে কারণেই হোক পাকিস্তানের মনে এই ধারণা হয়েছিল যে ভারত সরকারের এ বিষয়ে মত পরিবর্তন হয়েছে বা হতে চলেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে ভারতের মার্কিন সামরিক সাহায্য গ্রহণের সম্ভাবনা আছে। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ তখন ভারতবর্ষের সামরিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি অলীক উক্তি করলেন। এমন কি ভারত আমেরিকার কাছ থেকে ইতিমধ্যেই সামরিক সাহায্য নিতে আরম্ভ করেছে এমন অভিযোগও করলেন। এই কৌশল ব্যর্থ হয় নি। প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের অভিযোগ অস্বীকার করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ মেনন ঘোষণা করলেন যে ভারতের পক্ষে মার্কিন সামরিক সাহায্য গ্রহণের কথা উঠেই না, কারণ ভারত সরকারের নীতি পূর্ববৎ বিদেশী সামরিক সাহায্য গ্রহণের বিরোধীই রয়েছে। এ বিষয়ে ভারত সরকারের অভ্যন্তরে কোনো নূতন চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল কিনা ঈশ্বর জানেন, হয়ে থাকলেও তা চাপা পড়ল। সুতরাং প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো।

ভারতের সামরিক শক্তি অবশ্য পাকিস্তানের চেয়ে বেশী, কিন্তু উভয়ের শক্তির মধ্যে যে অনুপাত সেটা মার্কিন সাহায্য পেয়ে পাকিস্তান অনায়াসে ঠিক রেখে যেতে পারছে অর্থাৎ ভারতের সামরিক মোট শক্তির বৃদ্ধি হলেও পাকিস্তানের মোট শক্তির সঙ্গে তার অনুপাত বৃদ্ধি হচ্ছে না, বরঞ্চ কার্যকারিতা বা এফেক্‌টিভ্‌নেসের দিক দিয়ে কমতেও পারে।

আমেরিকা পাকিস্তানকে যে-সব অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছে সেগুলি ভারত আক্রমণে প্রযুক্ত হবে না, এই আশ্বাস মার্কিন সরকার ভারত সরকারকে দিয়েছেন। এটা কিছু নূতন কথা নয়। পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্যদানের চুক্তি প্রথম যখন হয় তখন থেকেই মার্কিন সরকার ভারতকে এই আশ্বাস দিয়েছেন যদিও পাকিস্তানী কর্তারা পাকিস্তানের জনসাধারণকে বরাবর বুঝিয়ে আসছেন যে, মার্কিন সাহায্য নিয়ে যে সামরিক শক্তি তাঁরা গড়ে তুলছেন সেটা কাশ্মীরের উদ্ধারকার্যে প্রয়োগের জন্য। যুদ্ধ করে কাশ্মীর দখল করার কথা অবশ্য পাকিস্তান আমেরিকাকে বলে না। সেখানে বলা হয়—শক্তি চাই আত্মরক্ষার জন্য, বিশেষ করে সম্ভাব্য ভারতীয় আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং কম্যুনিজম্ রোধ করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তির প্রধান কাজ হচ্ছে কাশ্মীর সম্পর্কে একটা চাপ সৃষ্টি করা। আমেরিকাকে গ্রাহ্য না করে পাকিস্তান যুদ্ধে নেমে যেতে পারে, মার্কিন সরকার হয়ত এটা বিশ্বাস করেন না; কিন্তু মার্কিন সাহায্যপুষ্ট পাকিস্তানী বাহিনী যে কাশ্মীর সম্পর্কে একটা চাপ সৃষ্টি করছে এটা মার্কিন সরকারের নিশ্চয়ই অজানা নেই।

"কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের" জন্য আমেরিকা ভারত সরকারের উপর চাপ দিক, শ্রীআয়ুব খাঁ বার বার এই দাবি উচ্চারণ করেছেন। আমেরিকা ভারতকে প্রভূত অর্থনৈতিক সাহায্য দিচ্ছে, সুতরাং শ্রীআয়ুব খাঁর মতে আমেরিকা ভারত সরকারের উপর অনায়াসে চাপ দিতে পারে। (প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ প্রেসিডেণ্ট কেনেডির কাছ থেকে পাকিস্তানের জন্য মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধির যে আশ্বাস পেয়েছেন সেটা এখানে উল্লেখযোগ্য।) কিন্তু আমেরিকা জানে যে ভারতের উপর এইরকম সরাসরি চাপ দেওয়ার চেষ্টা করলে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক ঘোলাটে হয়ে উঠবে। মার্কিন সরকার তা চাইবেন না। তবে যুক্ত ইস্তাহারে কাশ্মীর সম্পর্কে যে উল্লেখটি রয়েছে সেটাও পাকিস্তানের পক্ষে একটি মস্ত লাভ। কারণ এই উল্লেখের দ্বারা আমেরিকা এ কথা স্বীকার করল যে, কাশ্মীর সম্পর্কে পাকিস্তানের অভিযোগ শ্রবণযোগ্য এবং 'সমস্যাটা'র আশু সমাধান আবশ্যক। এর দ্বারা ভারতবর্ষকে 'ডিফেন্‌সিব্'-এ ফেলা হলো। আপাতত শ্রীআয়ুব খাঁ হয়ত এর চেয়ে বেশী আশাও করেন নি। মোটের উপর কথা এই যে, শ্রীআয়ুব খাঁ যা চেয়েছিলেন তার কিছুই পান নি এই ধারণা নিয়ে ভারত সরকারের নীতি এবং তার পরিচালকদের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়।

১৭।৭।৬১

পঞ্চতন্ত্র
সৈয়দ মুজতবা আলী

ভবঘুরে (১৭)

মারিয়ানার ঠাকুরমাই তাকে বলেছিল, 'দেখ দিদিকিনি, ও যে হাইকিঙে বেরিয়েছে, সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ আছে কি না।' আমার কোনো আপত্তি না শুনে মারিয়ানা আমার আধা-বাসী সাদামাটা স্যাণ্ডউইচগুলো তুলে নিয়ে আমার ব্যাগটা ভরতি করে দিয়েছিল গাদা-গাদা রকম-বেরকমের স্যাণ্ডউইচে। সঙ্গে আবার টুথপেস্ট টুবের মত একটা টুবও দিয়েছিল ওর ভিতরে নাকি মাস্টার্ড আছে। বলেছিল, 'স্যাণ্ডউইচে মাস্টার্ড মাখিয়ে দিলে ওগুলো খুব তাড়াতাড়ি মিইয়ে যায়। যখন খাবে, তখন রাইটা মাখিয়ে নিয়ো।' আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, 'তোমারগুলো কাল সকালে আমি খাব।'

তাই আমার ব্যাগটাকে আদর করতে করতে তাড়াতাড়ি বললুম, 'কি আর বলবো, মাদাম, আমার সঙ্গে যা স্যাণ্ডউইচ আছে, তার জোরে আমি আপনাকে পর্যন্ত রুপোলী বোর্ডারওলা সোনালী চিঠি ছাপিয়ে নিমন্ত্রণ করতে পারি। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আমি খাই অনেক দেরিতে। রাত এগারোটার সময়।'

বললে, 'সে তো ঠাণ্ডা। গরম সুপ আছে।'

আমি অনেক-কিছু এক ঝটকায় বুঝে গেলুম। সখা টেরমের প্রতি রাত্রে না হোক রববার রাত্রে ইয়ার-দোস্তের সঙ্গে 'পাবে' (মদের দোকান, ক্লাব এবং আড্ডার সমন্বয়) গুলতানী করে বাড়ি ফেরেন অনেক রাত্রিতে। পৃথিবীর কোনো জায়গাতেই গিন্নী-মারা এ অভ্যাসটি নেকনজরে দেখেন না। তাই সৃষ্টির আদিম যুগ থেকে একটা ভীষণ লড়াই চলেছে খরবেগে। এক দিকে 'পাব'-ওয়ালা, অন্য দিকে গৃহিণীর দল। গ্রামের কোনো কোনো 'পাবে' তাই দেখেছি, পাব-ওয়ালা বেশ পয়সা খর্চা করে বড় বড় হরপে দেয়ালে নিম্নোক্ত কবিতাটি, পেণ্ট করে নিয়েছে,

ফ্রাগে নিষট্ ডী উর ডী স্পেট এস সাই
ডাইনে ফ্রাউ শিমফট্ উম ৎসেন
গেনাও ডী উম ড্রাই॥

ঘড়িটাকে শুধিয়ো না, কটা বেজেছে।
তোমার বউ তোমাকে দশটার সময় সেই বকাই বকবে, যেটা তিনটের সময় বকে।

মানুষ করেই বা কি? জর্মানরা কারো বাড়িতে বসে আড্ডা জমানোটা আদপেই পছন্দ করে না। ডিনার লাঞ্চে নিমন্ত্রণ

করলে অবশ্য অন্য কথা—কিন্তু সে তো সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। এ-দেশেও একরকম লোক আছে, যাদের পেতে হলে চায়ের দোকানে যেতে হয়। পরের বাড়িতে যায় না, নিজের বাড়িতেও থাকে না।

এ অবস্থায় মেয়েরা কি করে?

কাচ্চা-বাচ্চা সামলায়। খামখা তিনবার বাচ্চাটার ফ্রক বদলিয়ে দেয়, চারবার পাউডার মাখায়, হাতের কাজ ক্ষান্ত দিয়ে ঘড়ি ঘড়ি ঢু মেরে যায়—বাচ্চা ঠিকমত ঘুমুচ্ছে কি না।

সেইখানে, যেখানে থাকবার কথা, ভরা গাঙের তরতর স্রোত, যার উপর দিয়ে কলরব রবে ধেয়ে চলবে ভরা পাল তুলে টেরমের গিন্নীর যৌবনতরী—হায়, সেখানে বালুচড়া। নৌকাটি যে মোক্ষম আটকা আটকেছে, তার থেকে আর নিষ্কৃতি নেই—কি করে জানিনে, কথায় কথায় বেরিয়ে গিয়েছে, বেচারী সন্তানহীনা।

সমস্ত পৃথিবীটা নিষ্ফল সাহারায় পরিণত হোক, কিন্তু একটি রমণীও যেন সন্তানহীনা না হয়, মা হওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়।

তাই কি এ রমণীর হৃদয় থেকে সর্বরস বাষ্প হয়ে নক্ষত্রলোকে চলে গিয়েছে? —কেউ বলে খাণ্ডার, কেউ বলে হিংসিবী? কিন্তু কই, ঠিক জায়গায় সামান্যতম খোঁচা লাগামাত্রই তো তার নৌকা চলুক আর না চলুক, পালে তো হাওয়া লাগল—স্বামীর জন্য তৈরী স্যুপ বাউণ্ডুলের সামনে তুলে ধরতে চায়।

আমি এসেছিলুম মজা করতে, বাজিয়ে দেখতে খাণ্ডার কি না, এখন কেঁচো খুঁড়তে সাপ।

ঘরের আসবাবপত্র, ছবি, বই—এসব টেরমের-বউ যোগাড় করেছিল যৌতুকের টাকা জমাবার সময়—কেমন যেন আমার কাছে হঠাৎ অত্যন্ত নিরানন্দ, নিঃসঙ্গ নীরস বলে মনে হতে লাগল। এরই ভিতর একা-একা দিন কাটায় এ রমণী। টেরমের লোক নিশ্চয়ই খারাপ নয়—যে দু-চারটে কথা বলেছিলুম, তার থেকে আমার মনে অতি দৃঢ় ঐ প্রত্যয় হয়েছিল—এবং এখন আমার মনে হল, দুজনার ভিতরে ভালোবাসাও আছে যথেষ্ট, কিন্তু একজনকে ভালোবাসা দেওয়া এক জিনিস, আর সঙ্গ দেওয়া অন্য জিনিস। এ-মেয়ে শান্ত গম্ভীর। খুব সম্ভব, স্বামী বাচ্চা নিয়ে নির্জনে থাকতে চায়, আর ওদিকে টেরমের ইয়ার-দোস্তের সঙ্গে বসে পাঁচ-জনের পাঁচ রকমের সুখ-দুঃখের কথা না শুনলে, না বললে, তার মনে হয় তার জীবনটা যেন সর্বক্ষণ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

এসব বলা বৃথা, টেরমের গিন্নী কি অন্য কিছু দিয়ে জীবন ভরে তুলতে পারে না? কেউ কেউ পারে, কিন্তু অনেকেই পারে না। এ মেয়ে যেন গ্রামোফোন রেকর্ডের কাটা লাইনের ভিতরে পড়ে গিয়েছে সাউণ্ড বক্সটা—আছে ঠায় দাঁড়িয়ে, রেকর্ড ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে, সে কিন্তু আর এগুতে পারছে না। আমার অনেক সময় মনে হয়, এই একঘেয়ে নীরস জীবনের চেয়ে অনটনের জীবন, সঙ্কটের জীবন কাম্যতর। সেখানে অন্তত সেই অনটন, সেই সঙ্কটের দিকে সর্বক্ষণ মনঃসংযোগ করতে হয় বলে মনটা কিছু-না-কিছু একটা নিয়ে থাকে। বেদনার শেষ আছে, কিন্তু শূন্যতার তো নেই।

আমার বড় লজ্জা বোধ হল। ঠাট্টাচ্ছলে, মস্করা করতে এখানে এসেছিলুম বলে। স্থির করলুম, সব কথা খুলে বলবো, নিদেন এটা বলবো যে, তার স্বামীকে আমি চিনি, সে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে চেয়েছিল।

আমি ভয়ে ভয়ে আরম্ভ করলুম, 'আপনার স্বামী—'

আমার কথা আর শেষ করতে হ'ল না। এই শান্ত—এমনকি, গুরুগম্ভীরও বলা যেতে পারে—মেয়ে হঠাৎ হো-হো করে অট্টহাস্য হেসে উঠলো। কিন্তু ভারী মধুর। বিশেষ করে ঝকঝকে সাদা দু পাটি দাঁত আর চোখ দুটি যা জ্বলজ্বল করে উঠলো, সে যেন অন্ধকার রাত্রে আকাশের কোণে বিদ্যুল্লেখা। কতদিন পরে এ-রমণী এভাবে প্রাণ খুলে হাসলে ,কে জানে। কত তপ্ত নিদাঘ দিনের পর নামলো এ-বারি-ধারা। তাই হঠাৎ যেন চতুর্দিকের শুষ্ক-ভূমি হয়ে গেল সবুজ। দেয়ালের ছবি-গুলোর গুমড়ো কাচের মুখের উপর দিয়ে যেন খেলে গেল এক পশলা আলোর ঝলমলানি।

'আমার স্বামী—' বার বার হাসে আর বলে 'আমার স্বামী—'। শেষটায় কোনো গতিকে হাসি চেপে বললে, 'আমার স্বামী আপনাকে পেলে হাল্লেলুইয়া রব ছেড়ে আপনাকে ধরে নাচতে আরম্ভ করতো। এ-গ্রামের যে-কোনো একজনকে পেলেই তার ক্রিসমাস। আপনি কত দূর দেশের লোক। আপনাকে পেলে এখ্খুনি নিয়ে যেত 'পাবে'।' আবার হাসতে হাসতে বললে, 'আপনি বুঝি ভয় পেয়েছেন, ও যদি হঠাৎ বাড়ি ফিরে দেখে আমি একটা ট্র্যাম্পকে—অবশ্য আপনি ট্র্যাম্প নন—যত্ন করে স্যুপ খাওয়াচ্ছি তা হলে সে চটে গিয়ে তুল-কালাম কাণ্ড করবে! হোলি মেরি! যান না আপনি একবার 'পাবে'। ও গিয়েছিল শহরে। এতক্ষণে ফিরেছে নিশ্চয়ই, এবং বাড়ি না এসে গেছে সোজা 'পাবে'। শহরে কি কি দেখে এল তার গরমাগরম একটা রগরগে বর্ণনা তো দেওয়া চাই। যান না একবার সেখানে। নরক গুলজার।' তারপর আবার হাসি। শেষটায় বললে, 'আমি যদি ওকে বলি যে, সে যখন শহরে কিংবা 'পাবে', তখন এক বিদেশী—তাও সেই সুদূর ইণ্ডিয়া থেকে, ফ্রান্স কিংবা পর্তুগাল থেকে নয়—আমাদের বাড়িতে এসেছিল তা হলে সে দুঃখে ক্ষোভে বোধ হয় দেয়ালে মাথা ঠুকবে। তাই বলছি, যান একবার 'পাবে'। খর্চার কথা ভাবছেন? আমার স্বামী যতক্ষণ ওখানে রয়েছে!'

আমি ইচ্ছে করেই বেশ শান্ত কণ্ঠে বললুম, 'আমি তো শুনেছি, আপনি চান না, আপনার স্বামী বেশী লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করুক।'

হঠাৎ তার মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। আমার মনে দুঃখ হল। কিন্তু যখন মনঃস্থির করেছি, সব কথা বলবোই তখন আর উপায় কি? গোড়ার থেকে সব-কিছু বলে গেলুম, অবশ্য তাঁর স্বামীর ভাষাটাকে একটু মোলায়েম করে, এবং লড়াই-ফেরতা চাষা কি বলেছিল তার অভিমতও।

নাঃ! বিধাতা আমার প্রতি সুপ্রসন্ন। টেরমেরিনীর মুখে ফের মৃদু হাস্য দেখা দিল। তা হলে বোধ হয়, একবার গাম্ভীর্যের বাঁধন ভাঙলে সেটাকে আর চট করে মেরামত করা যায় না। হাসিমুখেই বললে, 'সে এক দীর্ঘ কাহিনী। আপনি বরঞ্চ 'পাবে' যান।' আমি বললুম, 'আপনি যদি সঙ্গে চলেন, তবে যেতে রাজী আছি।' স্তম্ভিত হয়ে বললে, 'আমি? আমি যাবো 'পাবে'?' আমি বললুম, 'দোষটা কি? আপনার স্বামী যখন সেখানে রয়েছেন।' তাড়াতাড়ি বললে, 'না, না। সে হয় না।' তারপর আমাকে যেন খুশী করার জন্য বললে, 'আরেক দিন যাব।'

আমি বললুম, 'সেই ভালো, মাদাম। ফেরার মুখে যখন এ গাঁ দিয়ে যাবো তখন তিনজনাতে এক সঙ্গে যাবো।'

রাস্তায় নেমে শেষ কথা বললুম, 'ঐ কথাই রইল।'

আলোচনা

রবীন্দ্র-রচনাবলী

'দেশ'-সম্পাদক সমীপেষু,

আজ অনেকদিন হ'ল পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। আমরা, যাঁরা বাংলা দেশের বাইরে থাকি, প্রত্যাশা করেছিলাম যে, আমরাও সময়মতো অতি-আকাঙ্ক্ষিত রবীন্দ্র-রচনাবলী পাবো।

টাকা পাঠিয়েছি অনেকদিন হ'ল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আমরা মূলতই রবীন্দ্র-রচনাবলী পাবো কী পাবো না, তার কোনো নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাদের জানান নি। প্রথম ইনস্টলমেণ্টের টাকা দেবার পর একটি কার্ড পেয়েছি, কিন্তু পরের ইনস্টলমেণ্টগুলোর কোনো প্রাপ্তিস্বীকার নেই। হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে দেখতে পেলাম যে, মফঃস্বলের গ্রাহকদের জন্য 'স্টেট ব্যাঙ্ক'র মারফত রচনাবলী বিলি করা হবে, এবং তার জন্য একটি ক'রে কুপনই দেওয়া হবে। সরকার জানেন যে, প্রতি মহকুমাতে মাত্র একটি ক'রে স্টেট ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন করা হয়েছে। মহকুমা শহরের স্টেট ব্যাঙ্ক শাখা থেকে অনেক গ্রাহকই তিরিশ থেকে ষাট মাইল দূরে থাকেন। অনেক গ্রাহক না থাকতে পারেন, অন্তত আমি এবং আমার দু-চারজন বন্ধু আছেন—এটা আমি জানি। কাজেই স্টেট ব্যাঙ্ক শাখা থেকে রচনাবলী আনতে গিয়ে যাওয়া-আসার খরচে একজন গ্রাহকের কী পরিমাণে টাকা লাগতে পারে, সরকার কী তা ভেবেছেন? আর জেলা স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে আনতে গেলে ত পুরো দুটো দিনই আমাদের লাগবে, এবং এই দু দিনের জন্য হোটেল খরচ ইত্যাদি ত আছেই। এই সব প্রশ্ন উঠত না, যদি আমরা কোনো মহকুমা বা জেলা শহরে বাস করতাম। সরকারী চাকুরি নিয়ে অনেক দূরে একটি গ্রামে বাস করছি বলেই এ-সব প্রশ্ন তুলতে বাধ্য হচ্ছি। আমার মত আরো যে অনেক রবীন্দ্র-রচনাবলীর গ্রাহক নেই, সেটা আমি বিশ্বাস করি না। টাকার প্রশ্ন ত আছেই, তার উপর আছে 'ছুটি'। সরকারী চাকুরিয়াদের ছুটি খুব মূল্যবান এবং দুর্লভ। কাজেই স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে রবীন্দ্র-রচনাবলী সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে কত অসুবিধার—পশ্চিমবঙ্গ সরকার আশা করি বিবেচনা ক'রে দেখবেন। রবীন্দ্র-রচনাবলী ফর্মে দেওয়া ঠিকানায় ডাকে পাঠালে আমরা বিশেষ উপকৃত হব এবং সরকার এই ব্যবস্থা করবেন বলে বিশ্বাস আছে। নমস্কার সহ

অরুণ ভট্টাচার্য,
পাথারকান্দি, কাছাড়, আসাম।

মনস্তত্ত্ব ও রঙের প্রভাব

সবিনয় নিবেদন,

২রা আষাঢ়ের দেশ পত্রিকায় শ্রীশৈলেন্দ্র-কুমার দত্ত "মনস্তত্ত্ব ও রঙের প্রভাব" নামে একটি সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটির একটি বক্তব্য সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা নিবেদন করব।

লাল ও হলদে রঙ সম্বন্ধে লেখক লিখেছেন, "কয়েক শত বছর আগেও এগুলির ব্যবহার ছিল না। এদের এই স্বাভাবিক আকর্ষণ আর মানব-ইতিহাসে অল্প আয়ুর জন্যেই এরা এই উত্তেজনা সৃষ্টি করে।"

আমার মনে হয়, লেখক কথাটা খুব

ভেবে বলেন নি। কারণ মানব-ইতিহাসে প্রাচীন রঙ হচ্ছে লাল ও হলদে। যে-কোনো দেশের চিত্রকলার ইতিহাসে এর উল্লেখ পাওয়া যাবে। আদিম যুগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগেও বহুল ব্যবহৃত রঙ হচ্ছে এই দুটোই—ইজিপ্টে, অজন্তায় ও অন্যত্র। ললিতকলা ছাড়াও নিত্যব্যবহার্য জিনিস, যেমন—প্রাচীন মৃৎপাত্রের গায়েও যে নকশা আঁকা পাওয়া গেছে, তাতেও লাল রঙের প্রাধান্য।

এ দুটো রঙের আকর্ষণী শক্তি এদের ব্যবহারের একটি কারণ সন্দেহ নেই—আর-একটি বিশেষ কারণ হচ্ছে, এই দুটো রঙ মাটি থেকেই চিরকাল পাওয়া গেছে।

'অল্প আয়ু' বলতে লেখক "অপেক্ষাকৃত নবাগত" বুঝিয়েছেন। ব্যবহারের কথা ছাড়াও হলদে ও লাল রঙ মানব-ইতিহাসে নবাগত নয়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের রঙে, আগুনের রঙে, ফল, ফুল, লতা, পাতা, জীবজন্তু ও পাখির রঙে লাল ও হলদে রঙ আদিম। রক্তের রঙ লাল—এ-ও প্রাচীন।

প্রবন্ধটি সুলিখিত। উপরোক্ত কথাগুলি সেজন্যই খুব কুণ্ঠার সঙ্গে নিবেদন করলাম।

বিনীত—

সুমঙ্গল সেন, অধ্যাপক, বেসিক ট্রেনিং কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা।

বাবা বুড়োরাজ

সবিনয় নিবেদন,

গত ২০শে জ্যৈষ্ঠের দেশ পত্রিকায় নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত 'বাবা বুড়োরাজ' প্রবন্ধটি পাঠ করিলাম। প্রবন্ধের এক স্থলে তরুবালার পরিচয় প্রসঙ্গে লেখক স্বনামধন্য পাঁচালীকার তথা লোক-সাহিত্যিক দাশরথী রায়ের জন্মভূমি (তরুবালার শ্বশুরবাড়ি) পিলা গ্রামে বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু লেখক যদি একটু ক্লেশ স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান করিতেন, তাহা হইলে বিখ্যাত পাঁচালীকার দাশরথী রায়ের জন্মভূমি সম্পর্কে এরূপ ভুল তথ্য প্রদান করিতে পারিতেন না। কারণ আমি যতদূর জানি (এবং তাহা সঠিকভাবেই জানি) দাশরথী রায়ের জন্মভূমি কাটোয়া হইতে মাইল ছয়েক দূরে বাঁধমুড় গ্রামে এবং এখনও তাঁহার বাসভূমির চিহ্ন সেখানে বর্তমান রহিয়াছে। যদিও ঐ তথ্য মূল প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর কোন রূপ ন্যূনতা ঘটায় না, তথাপি কোনো মনীষী সম্পর্কে কিছু লিখিবার সময় তাহার সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুধাবন করিয়া লেখা উচিত নয় কি?

নিবেদন ইতি—

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আসানসোল।

শিষ্টাচারের মেল বন্ধন

সবিনয় নিবেদন,

'শিষ্টাচারের মেল বন্ধন' (দেশ, ২৩শে আষাঢ়, ১৩৬৮) নিবন্ধটির বক্তব্যে যথেষ্ট নূতনত্ব থাকলেও আপনাদের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। আজকাল এমন ঘটনা প্রচুর দেখা যায় যে, তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিরা তাঁদের হিসেব অনুযায়ী 'অবজ্ঞেয়' ব্যক্তিদের 'আপনি' বলে সম্বোধন করছেন নাসিকা কুঞ্চিত করে। এই ধরনের সম্ভাষণের অন্তরালে গণতান্ত্রিক মর্যাদা ও সমদর্শিতার বুলি অনুপস্থিত নেই, কিন্তু উপস্থিতির অভাব আছে প্রকৃত শিষ্টাচার বোধের। অন্যত্রও গণতন্ত্রের অজুহাতে সকল প্রকার শিষ্টতাবোধ ও শোভন আচরণ যে কিভাবে বিসর্জন দেওয়া হয়ে থাকে, তারও প্রচুর প্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি আমাদের নির্বাচিত একাধিক প্রতিনিধিমণ্ডলীর কার্যাবলীতে এবং প্রশাসনিক পদ্ধতিতে। এজন্য মনে হয়, যেখানে প্রকৃত শিষ্টাচার বোধ নেই, সেখানে 'শিষ্টাচারবিধির সমদর্শিতা প্রয়োগের জন্য শুধু সম্বোধন বা সম্ভাষণ রীতির পরিবর্তন সাধনই যথেষ্ট নয়। শিষ্টাচার বোধের উৎস সম্পর্কে অবহিত না হয়ে সমিতি গঠনের দ্বারা সকলকে 'আপনি' বলে সম্ভাষণ করবার জন্য ভাষণ দিলেই যে অভদ্রতার জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান হবে, এমন কথা ভাববার মত দুঃসাহস পাচ্ছি না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দেশবাসীর যে বিরাট অংশকে দারিদ্র্যের অভিশাপে সর্বদাই অভুক্ত কিংবা অর্ধভুক্ত অবস্থায় অশিক্ষাগ্রস্ত হয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে, শিষ্টাচারের মেল বন্ধন ঘটাবার জন্য, যদি তাঁদের 'আপনি' বলে সম্বোধন করা হয়, তা হলে তাঁদের 'ইতরতা' দূর হলেও খিদের কাতরতা অদৃশ্য হয়ে শিষ্টাচারের সুবিচারের গুণে তাঁদের মধ্যে সমদর্শন করবার মর্যাদাপূর্ণ দর্শনশক্তি দেখা দেবে কি? নমস্কারান্তে, ইতি—

আভা দাশ, বানারহাট, জলপাইগুড়ি।

ব্যাপারটা যেদিন ঘটল, সেই দিনই তার আরম্ভ নয়। ঘটল প্রায় দু' বছরের চেষ্টার পর। আমি কিছু সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, তাই নিজে পরীক্ষা না ক'রে কিছুই করি না।

খুঁজছিলাম একটি নতুন বাড়ি। এ-কাজে আমার প্রধান ভরসা হারু। হারু পাড়ার একটি ছেলে, আমার পরম ভক্ত, এবং তার অসাধ্য কোনো কাজ নেই। হারুই এত-দিনের চেষ্টায় কলকাতা কর্পোরেশনের উত্তর সীমান্তে একটি বাড়ির সন্ধান এনে দিল একদিন। বলল, "চমৎকার বাড়ি।"

যে বাড়িতে ছিলাম, সেটি আমার কর্মস্থলের কাছে। আমার বন্ধুরা সেখানে সহজে আসতে পারতেন। আমার দরকারী যাবতীয় জিনিসও খুব কাছে পাওয়া যেত।

কিন্তু সহজ বলেই বরাবর একটা সন্দেহ মনকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। সব সময় মনে প্রশ্ন জাগত—'এত সহজ কেন? তা হলে নিশ্চয় জায়গাটা ভাল নয়।' অনেকদিন ধরে চলছিল এটা।

কিন্তু আর নয়। এবারে অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে। বয়স বাড়ছে, ধৈর্য কমছে। অতএব এতদিন যা সহ্য করেছি, এখন আর তা পারছি না। হারুই সব-কিছুর দায়িত্ব নিয়ে আমাকে অনেকখানি নিশ্চিন্ত করল।

আমি বাড়ি থেকে কম বেরুই। যে সময় কর্মস্থলে যাই, সে সময় ট্রামে ভিড় নেই বললেই চলে। নিশ্চিন্ত মনে ব'সে যাই এবং ব'সে ফিরি। এই অবস্থাটাও আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছিল। যাত্রি-বিরলতার একঘেয়েমি মনকে পীড়া দিচ্ছিল। তাই হারুকে জিজ্ঞাসা করলাম, "নতুন বাড়ি থেকে যাতায়াতের পথ কেমন?"

হারু উত্তেজিত সুরে এবং কিছু গর্বিতভাবে বলল, "ঠিক যেমনটি চান।"

"বল কি? ঠাট্টা নয় তো?"

প্রশ্নটি হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। কারণ মাত্র দু' বছরের চেষ্টায় আমার মনের মতো কোনো জিনিস পাব, শুনলেও বিশ্বাস হতে চায় না।

বললাম, "আজই নিয়ে চল সেখানে। পথ যদি পছন্দ হয়, তা হলে বাড়িতে আটকাবে না।"

হারু কিছু ক্ষুণ্ণ হয় আমার কথায়। ও কি ক'রে জানবে আমার জীবন-দর্শনের কথা। আমার মনে যে গান বাজছে, তা যে ওকে খুলে বলাও যায় না।

"পথের হাওয়ায় কী সুর বাজে
বাজে আমার বুকের মাঝে
বাজে বেদনায়।"

লক্ষ্য আমার কাছে বড় নয়। কারণ লক্ষ্য মানে তো মৃত্যু। সব তো সেখানে ফুরিয়ে যায়। তা যত বড়ই হোক, যত ভালই হোক, তা স্থির বস্তু, তা প্রাণহীন, তার স্বাদ দু দিনে চলে যায়। জীবনেরও লক্ষ্য মৃত্যু। কিন্তু আমি তো সে-লক্ষ্যের কল্পনায় খুব স্ফূর্তি অনুভব করি না। কেই বা পারে? তাই পথই আমার কাছে বড়। সে সচল, সে বিচিত্র। কিন্তু এসব কথা হারুকে বোঝাতে যাওয়া মানে অকারণ খানিকটা সময় নষ্ট করা।

সন্ধ্যাবেলা হারুর পরিচালনায় রওনা হয়ে গেলাম নতুন বাড়ির পথে। একই সঙ্গে পথ দেখা আর বাড়ি দেখা—যদিও আমার কাছে প্রথমটাই প্রধান।

যেতে হবে '৩০-এ' বাসে। তার ছাড়বার জায়গায় দেখি প্রায় দু শ লোক দাঁড়িয়ে আছে। হারু চুপে চুপে বলল, "বাস এলে একটু গুঁতোগুঁতি ক'রে উঠতে হবে।"

আমি বললাম, "এটাই তো চাই, এতদিন বলনি কেন এ-কথা? ওঠার আর কি কি প্রক্রিয়া আছে, বল।"

"এখন আর বলবার সময় নেই, ঐ যে বাস আসছে। সংক্ষেপে বলি, "ফলো দি ক্রাউড"—সবাই যা করে তাই করে যান, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

কিন্তু উঠতে গিয়ে অনভ্যাসবশত বুঝতে পারলাম না, কোন্ ক্রাউড ফলো করব—দুটি ছোট্ট দরজার প্রত্যেকটির মুখে দু দিক থেকে দুটি দল ঠেলে উপরে উঠছে, আর ভিতর থেকে একটি দল বেরিয়ে আসছে ঐ দুটি দলের মাঝখান দিয়ে। দু দিকের চাপ এমন নিরেট এবং নিখুঁত

যে, তার মধ্যে একবার পড়তে পারলে সেই চাপেই ওঠা বা নামা যথা-প্রয়োজন ঘটে যায়। সে এমন চাপ যে, মানুষ নিতান্তই কয়লা হলে অনেক হীরে জন্মে যেত ঐ ভিড়ের মধ্যে। কিন্তু হারুর কি আশ্চর্য নির্দেশ, আমি বিনা আয়াসে শুধু ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আমি বাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি।

কোনো দিকে কিছু দেখবার উপায় ছিল না, কিন্তু অনুভব করছিলাম হারুও উঠেছে। কানে আসছিল পাঞ্জাবী কনডাক্টরের চিৎকার, "সিঁথি—সিঁথি।"

মন আনন্দে অভিভূত, হারুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত। মাঝে মাঝে তাকে ডেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু খুশী মন হঠাৎ একটা কারণে উত্তেজিত হয়ে উঠল। প্রেসের প্রুফ দেখে দেখে ভুল কোনো লেখা দেখলেই বিরক্তিতে মন ভরে ওঠে। অদৃশ্য হারুকে চেঁচিয়ে বললাম, —"বাসে যাত্রি-সংখ্যার নির্দেশ কে লিখেছে? আর এই ভুল সংখ্যা লিখে যাত্রীদের ঠকাবার ব্যবস্থা কে করেছে?"

হারু বলল, "কি হয়েছে বুঝতে পারছি না তো?"

"কেন, বাসে মাত্র ষোলজন দাঁড়াবে লেখা আছে কেন? ওটা নিশ্চয় ১১৬ জন হবে। বিবেকবান অনেক যাত্রী '১৬ জন দাঁড়াবে' দেখে কাজের ক্ষতি করেও নেমে যেতে পারে, তার ক্ষতির জন্য দায়ী হবে কে?"

"মশায়, পিঠে ঠেলছেন কেন?"

বাসের অন্যান্য যাত্রীরা আমাকে সমর্থন করে বললেন, "ঠিক বলেছেন, মশায়।"

কথাটা আর বেশী দূরে এগোল না। কারণ বাস এতক্ষণ দশ ঘণ্টায় এক মাইল বেগে চলছিল, হঠাৎ এবারে গতি দ্রুত হল। ঝড়ের বেগে ছুটে চলল, লাফিয়ে, বেঁকে, কাত হয়ে, কেঁপে, ঝনঝন খটখট শব্দ করে ছুটে চলল।

এর মধ্যেও কত বৈচিত্র্য। একজন যাত্রী চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর কি সর্বনাশ হল, সবাই জানতে উৎসুক। জানা গেল, তাঁর সমস্ত কটিদেশ বেষ্টন করে পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। এর কারণ, তিনি বুক পকেটে কিছু মিষ্টি আনছিলেন, বাসের জন্য নিচে অপেক্ষা করার সময় দু-তিন শ পিঁপড়ে তাঁর পা বেয়ে বুক পকেটে উঠছিল, অগ্রগামী দল পকেটে পেঁছে গেছে, কিন্তু ইতিমধ্যে ভদ্রলোক বাসের ভিড়ে আটকা পড়াতে বাকি পিঁপড়েরা উঠতে না পেরে পথের দাবিতে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। রাইট অভ ওয়ে—সবারই আছে।

এ ব্যাপারের কোনো মীমাংসা হবার আগেই আর-এক ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন, "মশায়, পিঠে ঠেলছেন কেন?"

পিছনের ভদ্রলোক লজ্জিতভাবে বললেন, "ঠেলছি না, নিশ্বাস নিচ্ছি।"

"বললেই হল? আপনি বার বার ঠেলছেন এবং তালে তালে ঠেলছেন।"

গোলমাল বেধে ওঠে—এমন সময় আর এক যাত্রী ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন, "দেখছেন তো ভদ্রলোক একটু মোটা, তাই নিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর ভুঁড়ি বার বার ফুলে ওঠায় আপনার কোমরে লাগছে।"

মেয়ে যাত্রীরা একসঙ্গে হেসে উঠল কথাটা শুনে।

আগে লক্ষ্য করিনি, এখন হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, যে-সব যাত্রী (পুরুষ বা মেয়ে) বসে যাচ্ছে, তাদের অনেকেরই নাক প্রায় নেই বললেই হয়। আমাকে সে দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে নাকহীন এক যাত্রী বলল, "দেখছেন কি, ক দিন বসে যাতায়াত করুন না, দেখবেন, আপনারও নাকের এই অবস্থা হবে।"

"কেন, বুঝতে পারছি না তো।"

"যারা সন্ধ্যাবেলা শ্যামবাজার থেকে বাজার সেরে থলে হাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যায়, তাদের থলের ঘষা লেগে বসা যাত্রীদের নাক ক্ষয়ে যায়। উপায় তো নেই। বসার আরামের জন্য সামান্য একজোড়া নাক দেওয়া আর এমন বেশী কথা কি—প্রাণটা তো যায় না।"

রাজা মণীন্দ্র রোডের মোড় ঘুরতে হঠাৎ ঝপঝপ শব্দ হল কয়েকটা। কোনো বিপদ আশংকা করে মাথাটা ঠেলে দেখবার চেষ্টা করতেই একজন যাত্রী বললেন, "তিনজন পড়ে গেল বাস থেকে।"

"পড়ে গেল? তবু বাস থামল না?"

"এরকম তো সব সময় হচ্ছে, ওদের তুলতে গেলে বাস লেট হয়ে যাবে। এ-বেলা-ও-বেলা পড়ছে, নতুন কিছু নয়।"

কণ্ডাক্টরকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওদের তুললে না কেন?"

সে বলল, ওদের কাছে টিকিট বিক্রি করা হয়ে গেছে, ওদের প্রতি আর তার টান নেই। বলল, "সেজন্য বাসে ওঠামাত্র আগে টিকিট বিক্রি করা হয়। তারপরের দায়িত্ব যাত্রীর নিজের।"

শুনে মন পুলকিত হয়ে উঠল। এইটে আশা করেই তো এ পথে এসেছি, এবং আশাতীতও বটে। এর উল্টোটো হলে তো অন্য পথ ছিল। হাতের খুব কাছে থাকলে কণ্ডাক্টরকে জড়িয়ে ধরতাম, এত আনন্দ হচ্ছিল শুনে।

হঠাৎ এক জোর ঝাঁকানি দিয়ে গাড়ি থেমে গেল একটা জায়গায়। কণ্ডাক্টরের শ্যেন-দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায় না। চার পাঁচ জন হিন্দুস্তানী স্ত্রীপুরুষ পথের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা শুধু একবার বাসের দিকে তাকিয়েছিল। হাত তুলে থামতে বলেনি, তবু তাকাল কেন? এইটি ভাবতে কণ্ডাক্টরের এক সেকেণ্ড দেরি হওয়াতে বাস কয়েক গজ এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাস থামিয়ে কণ্ডাক্টর ছুটে গেল তাদের কাছে, তাদের ধরে আনতে। কিন্তু তারা এলো না। বাসে ওঠবার কোনো মতলবই তাদের ছিল না, কিন্তু যাত্রী হবার কোনো সম্ভাবনাকেই এরা পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয় না, এটি প্রত্যক্ষ করে খুবই ভাল লাগল। অদৃশ্য হারুকে ডেকে আবার ধন্যবাদ জানালাম।

বাস আবার ছুটতে লাগল, ইতিমধ্যে আমার মাথা কি করে দুটি মাথার মধ্যবর্তী স্থান দখল করেছে বুঝতে পারিনি, তাতে সুবিধা হল এই যে, বাইরের কিছু অংশও দেখতে পাচ্ছিলাম যা এতক্ষণ পাইনি।

হঠাৎ দেখি চার পাঁচটি মোষ পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে বাসের দিকে চেয়ে। খুব উল্লসিত হয়ে উঠছিলাম এই ভেবে যে, কণ্ডাক্টর এদেরও একবার বাসে তুলতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তা না করাতে মনটা দমে গেল। অতগুলো মোষ আমাদের সহযাত্রী হলে এ পথের অনন্ত সম্ভাবনা আমাকে দিশাহারা করত সন্দেহ নেই। তাই ওরা না ওঠাতে একদিক দিয়ে হয়তো ভালই হল, যদিও মনটা খারাপ হয়ে রইল।

এইবার সাউথ সিঁথি। দু তিনজন যাত্রী কি করে যে ঠেলে নেমে গেল, আমার কাছে তা বড়ই দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল সে সময়, কিন্তু এই নামা উপলক্ষে এমন একটি অলৌকিক উপলব্ধি আমার ঘটল যার জন্য হারুকে আমি হাজার হাজার ধন্যবাদ না জানিয়ে পারিনি।

আমার দু পাশে একটুখানি ফাঁকা হওয়াতে চারদিক থেকে চেপে রাখা

দেহটা শিথিল হয়ে পড়ল, আর সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভিতর থেকে একটা অপার্থিব ঝঙ্কার বেজে উঠল। হঠাৎ চমকে উঠেছিলাম সে শব্দ শুনে। এ যে স্বপ্নেরও অতীত ঘটনা। এমন মধুর ধ্বনি আমারই দেহ থেকে বেরোচ্ছে, এ কি

আমাকে হাসপাতালে নেবার আগে বাড়িটা নিয়ে নাও

স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম? আমি কি তবে একটি মিউজিক্যাল বক্সে পরিণত হলাম?

একজন যাত্রী আমার বিভ্রান্ত অবস্থা দেখে বললেন, "ভয় নেই, আপনি বোধ হয় এ পথে নতুন, তাই ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। বাসের ঝাঁকানিতে আপনার সমস্ত হাড়ের জোড় খুলে গেছে, তাই একটু নড়তে-চড়তে ঝনঝন করে বেজে উঠছে। আপনি ভয় পাবেন না, কিছুদিনের মধ্যেই আবার জুড়ে যাবে, আমাদেরও গেছে।"
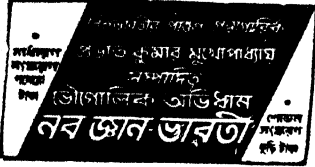
আমি ভীষণ চটে গেলাম তাঁর কথা শুনে, বললাম, "ভয়! মশায় মনে করেছেন আমি ভয় পেয়েছি? মশায়, সমস্ত জীবন সাধনা করে যা পাওয়া যায় না সেই দুর্লভ জিনিস আমি পেয়ে ভয় পাব? কণ্ঠ-সাধনা করে যে সঙ্গীত পাইনি তা আজ হাড়ের মধ্যে পেলাম, এ যে কি আনন্দ, তা আপনার মতো নির্বোধ চেহারার লোককে কি করে বোঝাই?"

হঠাৎ খেয়াল হল, আমার এমন আনন্দের দিনে এমন উত্তেজিত হওয়া ঠিক হয়নি। তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোকের কাছে মাপ চেয়ে নিলাম। তিনি সিঁথির মোড়েই নামলেন, এ জন্যই হোক অথবা আমার চেয়ে গায়ের জোর কম বলেই হোক, আমাকে ক্ষমা করলেন।

আমারও গন্তব্য স্থান প্রায় এসে গেল, হারু বলল। সিঁথির মোড় থেকে '৩০-এ' বাসে মাত্র দুটো স্টপ। ভিড় ঠেলে নামতে চেষ্টা করতেই আবার সেই সঙ্গীত। আমারই অস্থি-সঙ্গীত—ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্। মশগুল হয়ে গেলাম দেহসঙ্গীতে। সেই চিত্তহারা বিমূঢ় সঙ্গীতে মোহগ্রস্ত অবস্থায় বাস থেকে নামতে গিয়ে শূন্য স্থানকে মাটি মনে করে ভুল করলাম। ট্রামের পা-দানি ও মাটির মধ্যে যে দূরত্ব, তারই অভ্যস্ত দূরত্বে বাসের পা-দানি ও মাটির দূরত্ব একাকার করে ফেলেছিলাম।

দেখতে দেখতে মাথাটা ঘুরে গেল, চোখে অন্ধকার দেখলাম। সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা হবার আগে হারুকে ডাকলাম। বললাম, "আমাকে হাসপাতালে নেবার আগে বাড়িটা নিয়ে নাও।"

হারু বলল, "বাড়ি দেখলেন না?"

আমি কোনোরকমে উচ্চারণ করলাম, "দরকার নেই, পথটা দেখেছি।"

তারপর সব অন্ধকার।
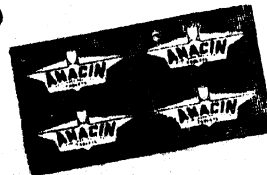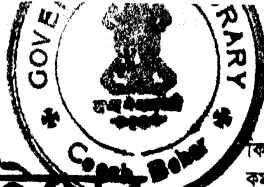
রবীন্দ্রনাথের বইয়ের কাটতি

কাঞ্চনকুমার সেন

"আপনি বলেন আপনার বই লোকে পড়ে না। এই হিসেবটা শুনুন!—গত বছর আপনার বই বিক্রির পরিমাণ ছিল প'য়তাল্লিশ হাজার, এবার তা দাঁড়িয়েছে প'চাত্তরে।"

"সেবার আপনি বলেছিলেন—সরদা আইন পাস হবার জন্যে ফাল্গুন মাসে হঠাৎ চার হাজার গীতাঞ্জলি বিক্রি হয়েছিল।"

"বলেছিলুম তো। ১লা এপ্রিল থেকে সরদা আইন চালু হবে, তা যত খোকাখুকি ছিল তাদের সব বিয়ে হয়ে গেল ফাল্গুনে। বিস্তর প্রীতি-উপহারের প্রয়োজন হল।"

"সমঝদার পাঠক বটে! তা, এবার কি সেই রকমের কিছু ঘটেছে?"

"না, এবার সত্যি-সত্যি পড়বার জন্যে লোকে আপনার বই কিনেছে।"

"দাঁড়ান, মনে পড়েছে। আপনি রচনাবলী প্রকাশ করেছেন বলে ওটা হয়েছে।"

"লেখা তো আপনারই। রামহরি শারখেল বা ভজহরি পাকড়াশির রচনাবলী প্রকাশ করলে কি এ রকমটা হত?"

"যাক, আর তর্ক করে কি হবে। পঞ্চাশ-পঞ্চাশ পারসেণ্ট কৃতিত্বটা রইল।"

এই রকম কথা-কাটাকাটি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনা প্রকাশের ব্যবস্থাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের মধ্যে, ১৯৪০ সালে, রবীন্দ্রতিরোধানের এক বছর আগে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ের চাহিদার চূড়ান্ত পরিমাণ ঐ পর্যন্ত দেখে গিয়েছেন—বছরে প'চাত্তর হাজার। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর থেকে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের চাহিদা ক্রমশ বাড়তে আরম্ভ করে—এ-বছর সেই অঙ্ক পোঁছেছে পোনে চোদ্দ লক্ষ টাকায়। এ হিসাব কিন্তু জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশেষ সুবিধা দিয়ে বিক্রির অঙ্ক বাদ দিয়ে। সে-অঙ্ক? সে অঙ্ক হচ্ছে এক মাসে সাড়ে সাত লক্ষের মত।

আমরা খোঁজ নিয়ে যতটা খবর সংগ্রহ করতে পেরেছি তার ভিত্তিতেই এসব বলছি। ১৯২৩ সালে বিশ্বভারতী-প্রতিষ্ঠার পর থেকে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ যখন বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশ আরম্ভ হল তখন সারা বছরে বিক্রির পরিমাণ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ছিল না। এমন অনেক বই ছিল যার সংস্করণ হতে দশ-বারো বছর লেগেছে। নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত একজন কবির পক্ষে এটা বিশেষ স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয় না। তবে কি সে সময়ে বই-পড়ার রেওয়াজ সর্বসাধারণের মধ্যে কম ছিল বলে ধরে নিতে পারা যাবে? কিন্তু তাও বুঝি ধরা চলে না। কেননা, তখনকার অন্য লেখকের এমন সব বইয়ের নাম আমরা করতে পারি যার সংস্করণের পর সংস্করণ হয়েছে অবাধে। অবশ্য, সেসব বইয়ের প্রায় সবগুলিই উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথের বই তেমন বিক্রি না হবার অন্যতম কারণ সম্ভবত প্রচারের অভাব। আমাদের মনে পড়ে, বহু দিন আগে এক গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম, বাংলা দেশেরই অতি নিভৃতের একটা গ্রাম। সেখানে দেখেছি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম সকলে জানে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নামের সংগে পরিচয় কম। এতে আশ্চর্য লেগেছিল। অথচ ভেবে দেখলে আশ্চর্য হবার বুঝি তেমন সংগত কারণ নেই। রবীন্দ্রনাথ কবি। কবিকে সকলে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু কবির কবিতা সকলে পড়ে না। যে-জিনিস তেমন পড়ার জিনিস বলে গণ্য নয়, সেই সব জিনিস একত্র করে যে বই হয়, সে বইও পড়ার বই তবে নয়। বই যদি পাঠ্য না হল, তবে পাঠাগারে তার স্থানই বা হবে কেন। হোক-না সে-পাঠাগার শহুরে, অথবা হোক-না তা গ্রাম্য। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবস্থা বিপরীত, ব্যবস্থাও তাই আলাদা। এই জন্যেই পাঠাগারে স্থান ছিল উপন্যাসের, পাঠক ছিল উপন্যাসের, বিক্রিও তাই ছিল উপন্যাসেরই। এবং নামের প্রচার ছিল ঔপন্যাসিকের।

রবীন্দ্রনাথও অবশ্য উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু সে ঔপন্যাসিকের উপন্যাস নয়, কবির লেখা উপন্যাস। তাই তাকে মাথায় করে রাখা যায়, কিন্তু মাথার বালিশের নীচে রাখা যায় না—এমন ধারণা থাকা বিচিত্র নয়। সেইজন্যে ঘরে ঘরে পোঁছে যায় নি ঘরে-বাইরে, চোখে চোখে ঘুরে বেড়ায় নি চোখের বালি।

কিন্তু দিনকাল ক্রমে বদলালো। কবির কদর ছিলই, এবার কবির লেখার কদর বাড়তে আরম্ভ করল। এ-ঘটনা ঘটতে শুরু করল তাঁর তিরোধানের পর। তাঁর লেখা

কেউ পড়ে না বলে যে আক্ষেপ তাঁর ছিল, তিনি সে আক্ষেপ সংগে নিয়েই গত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পরই, অর্থাৎ সেই বছরেই, ১৯৪১ সালে, রবীন্দ্রনাথের অলক্ষ্যে তাঁর বই বিক্রির অংক এক লক্ষ টাকার উপরে উঠে গেল। এও হয়তো রচনাবলীর কল্যাণেই—তাঁর বইয়ের চাহিদা বৃদ্ধির যে কারণ তিনি নিজে বলেছিলেন, সম্ভবত সেই কারণেই।

অচলিত দুই খণ্ড বাদ দিয়ে মোট ছাব্বিশ খণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলী বিশ্বভারতী থেকে বেরিয়েছে। তার উপর আছে সঞ্চয়িতা—এর বিক্রিও বছরে কম না। এসব মিলিয়ে বিক্রি ক্রমে প্রায় তিন লক্ষে এসে পৌঁছয় দেশ স্বাধীন হবার বছরে। ক্রমে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ছে, দেশের লোকের হাতে টাকাও সম্ভবত কিছু বেড়েছে—জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান দেখে অন্তত এই আন্দাজ করা যায়, লাইব্রেরির সংখ্যা বাড়ছে, উপহার হিসেবে বই দেওয়ার রেওয়াজ চালু হয়েছে। সব মিলিয়ে বই

বিক্রি আগের চেয়ে বেড়েছে। বাঙালীর এই সব বাড়ীতর মুখে রবীন্দ্ররচনার আবৃত্তি কিছু শোনা যাচ্ছে—সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বই লোকে কিনছে।

এই সংগে আর-একটা কারণও হয়তো আছে। বাড়ির তাকে রবীন্দ্ররচনার সেট সাজানো থাকলে বাড়ির চেহারা খোলতাই হয় বলে অনেকের ধারণা আছে—আসবাবের একটা অংশ হিসেবেও অনেকে রবীন্দ্রগ্রন্থ তাই কিনে থাকেন। আবার, কেউ কেউ ভাবেন, ঘরে রবীন্দ্রনাথের বই থাকলে বাড়ির মালিক সমঝদার ও সংস্কৃতিবান বলে সমাজে গ্রাহ্য হন। এ লোভ অনেকে ছাড়তে পারেন না বলে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের মালিক হতে চান। বিক্রির অংকের কতটা অংশ এ'রা অধিকার করেন তা বলা অবশ্য শক্ত।

যাই হোক, যাঁর বই এক কালে বছরে ষোলো থেকে কুড়ি হাজারের মধ্যে কাটত, তাঁরই বই—ভাবতে আনন্দ লাগে—এ বছর বিক্রি হয়েছে চোদ্দ লক্ষের কাছাকাছি।

অথচ কবি-পক্ষ (এ বছর অবশ্য কবি-মাস) উপলক্ষ্যে বিক্রির অংক ওর মধ্যে নেই। সে অংক, আগেই বলেছি, সাড়ে সাত লাখ।

রবীন্দ্রজন্মশতপূর্তি-উৎসব তাই সার্থক বলে মনে হচ্ছে। কেবল উপহার দেবার আর ঘর সাজানোর জন্যেই এত বই কাটে নি। এর মধ্যের একটা মোটা অংশ নিশ্চয় গিয়ে পৌঁছেছে পাঠকের হাতে।

কিন্তু আমাদের একটা আশংকা যে ছিল, সে কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। পশ্চিম-বঙ্গ সরকার স্বল্পমূল্যে রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশের ও প্রচারের ব্যবস্থা করায়, আমরা ভেবেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য বইয়ের বিক্রি এবার কম হবে অথচ গত বছরের থেকে বিক্রি বেড়ে গেছে প্রায় চার লক্ষ। এবং সেই সংগে অন্য হিসেবটাও ধরা যেতে পারে। পশ্চিমবংগ সরকার যে পঞ্চাশ হাজার সেট রচনাবলী বিক্রি করছেন, তার মোট দামও এর সংগে ধরা যায়। প্রতি সেট প'চাত্তর টাকা হিসেবে পঞ্চাশ হাজার সেটের দাম হয় সাড়ে সাঁইত্রিশ লক্ষ টাকা।

সব যোগ করে দেখিয়ে দরকার নেই। দেশের লোক রবীন্দ্ররচনার জন্যে এ বছর কত টাকা নিয়োগ করেছেন তার একটা মোটা অংকের আভাস সহজেই পাওয়া যাচ্ছে।

এই সংগে আর-একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বছর জন্মশতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা সংবলিত অনেক সংকলন বইও বেরিয়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছে। ধরে নেওয়া যায় যে, এসব পত্রপত্রিকা এবং সংকলনের বইও বিক্রি হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনা সংবলিত বই এবং রবীন্দ্রনাথের পাঠক—এই দুইয়ের মধ্যে এই সব সংকলনের বই একটু বাধার সৃষ্টি করেই। মানুষের অর্থ ও সময় অপর্যাপ্ত নয়। যাঁরা সংকলনের বই কিনেছেন তাঁদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ কিনতে পারেননি, বা কম কিনেছেন। রবীন্দ্রভাষ্য পাঠ করতে গিয়ে অনেককে রবীন্দ্রভাষার থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছেই।

এসব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রচার যে বেড়েছে ও বাড়ছে—তাতে সকলেরই আনন্দিত হওয়ার কথা। রবীন্দ্রনাথের ভাষা যদি সাধারণের মধ্যে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়ে পড়ে তা হলে দেশের মানুষের রুচির কিছু উন্নতি ঘটবে বলে আমাদের বিশ্বাস আছে। এবং এই সংগে এ বিশ্বাসও আছে যে, যে-মানুষটি দেশের ও দশের যাবতীয় সমস্যা অসীম যোগ্যতার সংগে আলোচনা করেছেন, সেসব আলোচনা পাঠ করলে দেশের মানুষের মনের মধ্যে মলিনতা যদি কিছু জমে থাকে তবে তাও দূর হবে।

রাজনীতি ধর্মনীতি অর্থনীতি সমাজ সাহিত্য শিল্প সংগীত তাঁর দীর্ঘজীবনের বিবিধ পর্বে রবীন্দ্রনাথ সব বিষয়েই তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। কবির কলম থেকে সেসব উৎসারিত, কিন্তু সেসব কেবল কল্পনার দান নয়, মননের উপঢৌকন। সুতরাং আমাদের উচিত—সে সবের সংগে নিজেদের গভীর ভাবে পরিচিত করে নেওয়া।

টাকার অংক দিয়েই কথা বলছি বটে, কিন্তু তা কেবল পরিমাণ বোঝাবার জন্যে। একটি বছরের মধ্যে যে-দেশের মানুষ একজন লেখকের বই কেনার জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারে, সে দেশের মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা আশা পোষণ করব। আশা এই জন্যে যে, ভবিষ্যতে এ বইয়ের এই তৃষ্ণা ব্যাপক ভাবে হয়তো বিস্তৃত হয়ে পড়বে।

এটা জন্মশতবার্ষিকীর বছর। অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে এবার দেশে এবং বিদেশে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্যের ও গীতের ও নাটকের আয়োজনই বেশি থাকে। সুতরাং তার যোগান দেবার জন্যে অন্যান্য বছরে কবি-পক্ষের বিক্রির তুলনায় এ-বছর রবীন্দ্রনাথের নাটকের ও স্বরলিপি-গ্রন্থ স্বরবিতানের চাহিদা হয়েছিল নাকি খুব বেশী; এবং সেই সংগে গানের বই গীতবিতানের।

এ ছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বাইরে, রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠকেরা সবচেয়ে বেশী কিনেছেন—এই সব বই—সঞ্চয়িতা জীবন-স্মৃতি গল্পগুচ্ছ। স্বল্পমূল্যে প্রচারিত বিচিত্রা বই আর সুলভ সংস্করণ গীতাঞ্জলির চাহিদার কথা এর মধ্যে ধরা হচ্ছে না—এই বই দুটির চাহিদার যোগান দেওয়া একটা সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে আমরা জানতে পেরেছি।

এবার, পরিশেষে, কবি-পক্ষের কথা বলি। পনেরো দিনে পৌনে দুই লাখ বিক্রি হয়েছিল ১৯৫৬ সালে; পর পর বছরে এই অংক ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে, ১৯৬০ সালে এই অংক বেড়ে এসে দাঁড়ায় পাঁচ লাখের উপর। আর এ বছরে? ১৯৬১ সালে? আগেই বলেছি, পুনরায় বলি—সাড়ে সাত লাখ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ ছিল তাঁর বই কেউ পড়ে না। তার কারণও ছিল। তাঁর বইয়ের তেমন চাহিদা তিনি দেখতে পান নি। কিন্তু চাহিদা যে বেড়েছে এখন সে-বিষয়ে আর সন্দেহ করার কিছু নেই।
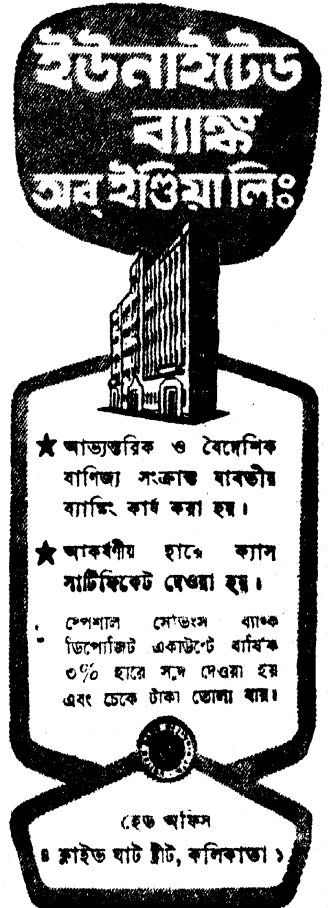
রূপময় ভারত

ভারতের পূর্বাঞ্চলে আকর্ষণীয় শৈল-শহর শিলং ১৮৮৭ সাল থেকেই আসামের রাজধানী হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। যদিও স্থানটি উচ্চতায় অনধিক ৫০০০ ফুট, তবুও সাজানো-গোছানো-ভাবে বহুদূর বিস্তৃত হয়ে এই শহর ভ্রমণবিলাসীদের কাছে চিত্তাকর্ষক হয়ে আছে। (১) পাইনগাছ আর মেঘের সৌন্দর্য, (২) ভ্রমণবিলাসীদের প্রধান আকর্ষণ ওয়ার্ডস-লেক, (৩) গ্রামাঞ্চলে খাসী-রমণী, (৪) পাইন বনের নির্জন পথ, (৫) গলফ ক্রীড়ামোদীদের আকর্ষণ শিলং-এর গলফ ক্লাব, (৬) মরশুমের সব্জি নিয়ে বাজারে খাসী-রমণী, (৭) শিলং-এর বিখ্যাত এলিফেন্ট-জলপ্রপাত।

আলোকচিত্রশিল্পী

নীরোদ রায়

৩
৪
৫
৬

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
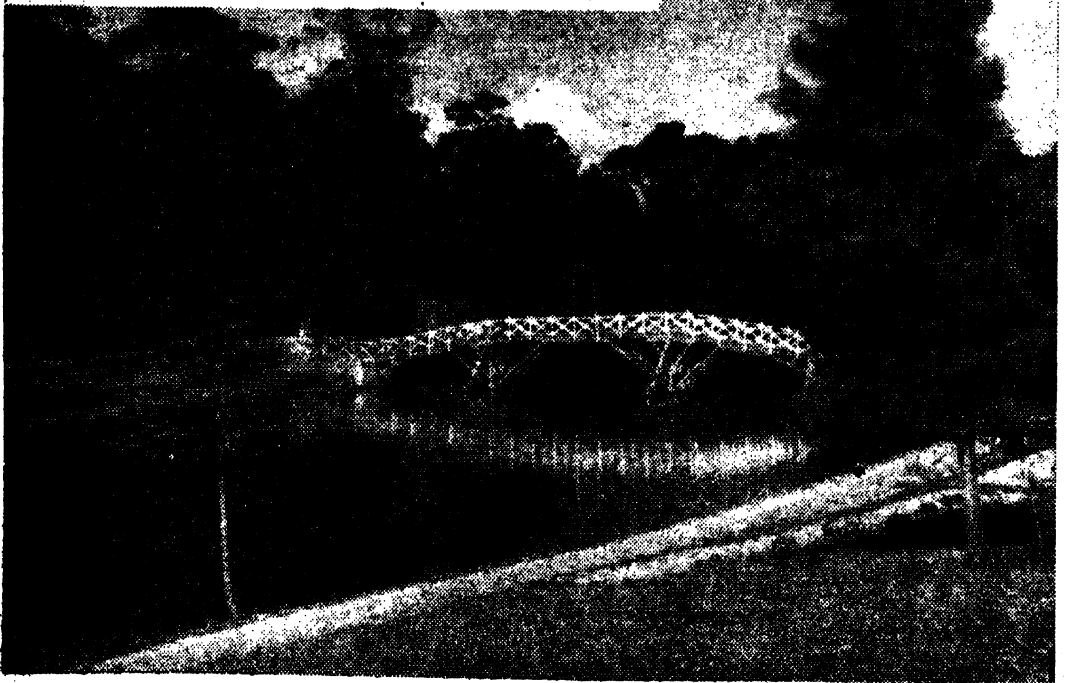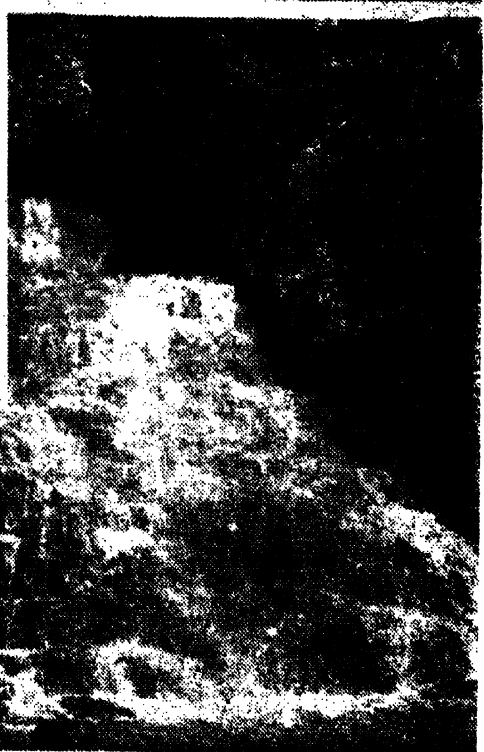
[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১৯০ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তুমি যে আসতেও পারো এবং সে ইচ্ছা মনে পোষণ করো এতে আমি আনন্দিত এবং বিস্মিত। কিন্তু এক এক সময়ে মনে সন্দেহ হয় ওটা না আসবারই হয়তো ভদ্র রকমের ভূমিকা। এর পরে সুন্দর করে বল্‌তে পারবে—দেখুন আমিতো যাবো বলেই একান্ত পণ করেছিলুম কিন্তু ইত্যাদি। মানুষকে ভোলাবার জন্যেও যখন আয়োজন করা হয় তখন সেটাতেও করুণা প্রকাশ পায়। ঐ দেখ, করুণা শব্দটা ব্যবহার করবামাত্র সেই খাতাটার কথা মনে জাগ্‌ল। ওটা সম্বন্ধে একদা লিখেছিলে যে জন্মোৎসবের পূর্বেই আমার হস্তগত করে দেবে—এক্ষেত্রেও বল্‌তে পারবে—দেখুন খাতাটা উদ্ধার করব বলে আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল কিন্তু ইত্যাদি।

একটা ঝড় আসবার সূচনা হচ্চে এই বেলা চিঠি রওনা করে দিই।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

এ চিঠিতে তারিখ দিতে ভুলে গেছেন।

॥ ১৯১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

কাল তো তুমি চলে গেলে—তোমার স্মৃতি পুরাতন হতে না হতে আজ তোমার নামে একটা কলঙ্ক রটনা হয়েচে সেটা তোমার কাছে গোপন করা আমি অকর্তব্য মনে করি। বিষয়টা এই:—

আমার পায়ে একজোড়া ইজিপ্টিয় চটি অনেকেই লক্ষ্য করেচে। দিনে দিনে সেই উপানতের (অভিধান খুলে দেখো) চেয়ে পা জোড়াই বেশি পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হচ্চে। আজ যখন আহার কালে রাণুর মা আমার সপাদুক চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলেন তখন আমার পদ মর্যাদায় যে-ছিদ্র দেখা দিয়েছে সেই অগৌরবটা মনে আন্দোলিত হোলো। বনমালীকে বললেম, "নীলমণি, আমার অন্য ভালো নূতন চটিসম্প্রদায়ের অন্য কোন্ শ্রীগুরুর শ্রীচরণে গতি হয়েচে, দেখতে পাইনে কেন?—সে মাথা চুলকিয়ে বল্‌লে—"রাণী বৌমা যখন আপনার সঙ্গে বিলাতে যান সেই সময়ে তদ্বৎ এক জোড়া ভালো চটিও আপনার সাহচর্যে প্রেরিত হয়েছিল। তার মধ্যে একপাটি ফিরে এসেচে, আর এক পাটি"—তার মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল। আমি এক ধমক দিয়ে বললুম, বাস, চুপ কর।—সেখানে আরো অন্য অনেক লোক ছিল।

চটিজুতা হরণ করাটা হীন কার্য—কিন্তু মানুষের দুর্বল মন—লোভে পড়ে এ-রকম কাজ করে থাকে—ঈশ্বর নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু এক পাটি জুতো সরানোর কথা শুনে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। অপহরণ কাজে অনেক সময়ে বুদ্ধির পরিচয় প্রকাশ পায়, তখন ব্যাপারটার গ্লানি কিছু পরিমাণে দূর হয়। কিন্তু এক পাটি চটি———!!!

কে এ কাজ করেচে, যতটা পারি তার নাম আমি সুকৌশলে উহ্য রেখেচি, সে যদি তার স্বভাবসিদ্ধ মুখরতার সঙ্গে এই নিয়ে অনর্থক চেঁচামেচি করতে যায় তাহলে কথাটা আরো অনেক বেশি ঘাঁটাঘাঁটি হয়ে যাবে। চটি দিয়ে চটাচটি করা সেইখানেই খাটে যেখানে মন খাঁটি আছে—নইলে কণ্ঠস্বর যতই উচ্চ সপ্তকে ওঠে ততই অপরাধ উচ্চতর রূপে সপ্রমাণ হয়। বনমালীর মতো নিন্দুকের মুখ বন্ধ করবার একটিমাত্র উপায় বড়ো বহরের এক জোড়া সম্পূর্ণ চটি। যেমন আস্পর্ধা!

এই জনরবেই যে উত্তাপের সৃষ্টি হয়েচে, তা ছাড়া বাইরের হাওয়ায় উত্তাপের অন্য উপসর্গ কিছু নেই। ৩০শে বৈশাখ ১৩৩৮।

সৎপরামর্শদাতা হিতৈষী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ১৯২ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, পারস্যে চল্লুম। মঙ্গলবার বর্ধমান থেকে বম্বাইমুখী গাড়িতে যাত্রা করব। আমার বিশ্বাস মাস দুয়েকের মধ্যে ফিরে আসব তখন এই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য বোঝাপড়া করব—ততদিনে জীবন দত্ত পিপুলের গুঁড়োয় তোমার কণ্ঠস্বরের উন্নতি হবে। যদি জিজ্ঞাসা করো এর পূর্বে খবর দিই নি কেন তার সদুত্তর হচ্চে আজকের দিনের পূর্বে খবরটা যে কেবল অস্পষ্ট ছিল তা নয়—যাব না বলেই স্থির ছিল। বিশ্বভারতীর জন্যে অনেক দুঃখ মেনেছি—সত্তর বছরের পর তার উপরে আর একটা দুঃখ যোগ করব।

আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পার কলকাতা হয়ে গেলেন না কেন: দুঃখের পরিমাণ অল্প মাত্রও লাঘব করবার জন্যে। কলকাতায় নানাবিধ ঘূর্ণির মধ্যে পড়তে হত তাছাড়া রেলযাত্রা আছে।

সেই এক পাটি বিধবা চটি সম্বন্ধে ভালো মীমাংসা কিছুই হোলো না। পারস্যে চটির গবেষণা করব বলে ঠিক করেছি। ইতি ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

মণিকার জন্যে উদ্বেগ নিয়েই যাত্রা করলুম। তাকে আমার সর্বান্তঃকরণের প্রীতি ও আশীর্বাদ জানিয়ো।

তুমি অত্যন্ত অহঙ্কার করে লিখেচ ঠিকানা সংক্ষেপ করলেও চিঠি তোমার হাতে পৌঁছয়—যদিও এ দেশ মাধ্য য়ুরোপ নয়, এই কথা শুনে বিনয় রক্ষা অসম্ভব হোল—আরো খানিকটা গলা চড়িয়ে বলতে বাধ্য হলুম যে বিনা ঠিকানায় আমি চিঠি পাই।

এ চিঠিতে যদিও লিখেচেন পারস্যে চল্লুম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হোলো না। আমরা সকলে মিলে বাধা দিয়েছিলাম ওঁর শরীরের অবস্থার জন্যে। পারস্যের বদলে দার্জিলিংএ চেলে যান তখন।

॥ ১৯৩ ॥

ওঁ

আসানটুলি দার্জিলিং

কল্যাণীয়াসু,

রাণী, থর্মামিটারটা ব্যবহারে লাগাইনি—কৌতূহলী কেউ

নেই। কলমটাও থর্মমিটারের সঙ্গ ধরেচে, লেখা বন্ধ। ছবি আঁকার কাগজ, গুটানো অবস্থায়, টেবিলের প্রান্তে বিশ্রামে লম্বমান। আমার নিজের দশাও ওদেরি মতো। দিনগুলো কর্মহীন কিন্তু জনহীন নয়। এখানকার শৈলসংলগ্ন মেঘগুলোও আমারি মতো,—তারা দল বেঁধে আছে, কিন্তু বেকার ভাবে—নিতান্ত একটা ছেলেখেলায় দিন কাটাচ্চে,—একবার করে রৌদ্র দিচ্চে ঢাকা আবার দিচ্চে খুলে।

অমল হোম একটা করুণ চিঠি লিখেচে বরাহনগরের অন্নের প্রত্যাশায় বুভুক্ষু। তার উপযুক্ত অভ্যর্থনার জন্যে ফরাসী দেশ থেকে পাচকের আমদানী যদিবা নাও করো তবুও তাকে ডাক দিলেই সে প্রস্তুত। তার এই দরবার নিয়ে আমাকে কেন যে সে মোক্তার নিযুক্ত করলে জানিনে—নিজের জবানীতে দরখাস্তর জোর কিছুই কম হোত না।

আমার মস্তিষ্কটার দশা এখানকার হিমাচলের শৃঙ্গেরই মতো—প্রায়ই ঘুমের হিমে ঢাকা পড়চে—বুদ্ধিটা অত্যন্ত জবড়জঙ্গ হয়ে আছে।

ওদিকে পুপের শরীর ভালো নয়। বৌমা প্রায় শয্যাগত। রথী ভালোই আছে—কমল পথে ঘাটে বন্ধুসংগ্রহে নিযুক্ত। এখানে আর সমস্ত খবর চাপা। এইমাত্র অপূর্ব এল। অতএব বিদায়।

তোমাদের
কবি

॥ ১৯৪ ॥

চিঠিখানা কাল লেখা হয়েছিল।

কালকের চিঠি ডাকে দিচ্চি—অতএব সেই বাসি চিঠির সঙ্গে আজকের বাণী কিছু যোগ করে দেওয়া ভালো। কেমন উদাসীনভাবে আছি। বোধ করি তার একটা কারণ হচ্চে এই; সমতলবাসী মন পাহাড়ের মধ্যে এসে আটকা পড়েচে। একে আকাশটা গিরিশৃঙ্গের কঠিন পাহারায় বন্দী, তাতে মেঘে তাকে খানখান করে চাপা দিয়েছে—মনটা বেরিয়ে পড়বার যথেষ্ট জায়গা পাচ্চে না। তার ফল হয়েচে এই যে মনটা বাহিরকে হারিয়ে নিজের ভিতরের দিকে অতলকে খুঁজচে। উপরি-তলার নানা পরিচয় নিয়ে যে রবীন্দ্রনাথ ঘুরে ঘুরে বেড়াত তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রায় বন্ধ হয়ে এসেচে। নির্জনের মানুষটা গভীরের সঙ্গে আপন নিবিড় সম্বন্ধ উপলব্ধি করতে প্রবৃত্ত। এই উপলব্ধি যদি পাকা হতে পারে তাহলে হাজার হাজার খণ্ডতা ক্ষণিকতার ভিড় থেকে খালাস পাওয়া যায়। যাকে খণ্ডতা ক্ষণিকতা বলচি তাদের দোষ দেই নে—তাদের উপেক্ষা করা ভুল—কিন্তু মন তাদের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হলে তাদের সত্যকে পায় না। গভীরের মধ্যে তাদের সামঞ্জস্য আছে—ঢেউয়ের সামঞ্জস্য যেমন তলার সমুদ্রে। সেই তলার সমুদ্রে হালটাকে নাবিয়ে দিয়ে তবেই হাজারখানা ঢেউয়ের উপর দিয়ে পাড়ি জমালে ভাবনা থাকে না। কাজকর্ম বন্ধ রেখে, উপরকার ঢেউয়ের ঝাপটা খাওয়া থেকে তরীকে বাঁচাবার কথাটা বসে বসে ভাবচি। ইতি ১লা জুন ১৯৩১

কবি

উপরের দুখানা চিঠি এক সঙ্গে এসেছিল। আমি শান্তিনিকেতনে গিয়ে রোজ নিয়মিত টেম্পারেচার নিতাম বিকেল বেলা সেইজন্যে ঠাট্টা করেছেন "কৌতুহলী কেউ নেই" বলে।

॥ ১৯৫ ॥

ওঁ

আসানটুলি দার্জিলিং

কল্যাণীয়াসু,

এখনো চুপচাপ ভাবটা মনের মধ্যে গিরিশৃঙ্গের মেঘের মত ঘনিয়ে আছে। তবুও নিজেকে ঝাঁকানি দিয়ে হিন্দু মুসলমান বলে একটা প্রবন্ধ লিখতে বসেচি। খানিকটা লিখি, খানিকটা পাতা জুড়ে আঁচড় কাটি, খানিকটা মনকে দৌড় করে দিই একটা লক্ষ্যবিহীন উড়ো ভাবনার পিঠে চড়িয়ে। মাঝে মাঝে দুর্দিনের দুশ্চিন্তা মনকে পেয়ে বসে—মজ্জমান মুমূর্ষু জলের থেকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে যেমন আকাশ আঁকড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করে তেমনি করেই মনটা উপায়ের ব্যর্থ আশায় শূন্যে হাতড়িয়ে বেড়ায়—এমন কি, ছবি বিক্রি হবার মরীচিকাও দুরাশার দিগন্তে ভাসতে থাকে, তার সঙ্গে সঙ্গে মুকুলের স্থূল পরিপুষ্ট দেহের প্রতিচ্ছায়া। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে মনে মনে শান্তি মন্ত্র জপ করতে থাকি—জ্যোতি এসে পরীক্ষা করে বলে নাড়ীটা ৮০।৮২র ছন্দে তরঙ্গিত। দেহযাত্রায় যাত্রার অংশটা প্রায় নেই। কখনো ঘরে বসি, কখনো সামনের আঙ্গিনায়, এই নিয়ে আমার ঘরে-বাইরে। হাঁ, ভালো কথা মনে পড়ল। তোমার উপর একটা কাজের ভার দেওয়া যাক। দক্ষবালা দেবী বলে যে মেয়েটি আমাকে চিঠি লিখে থাকেন, যিনি আর্থিক টানাটানিতে পীড়িত, অথচ আমার জন্মদিনে কষ্ট সঞ্চিত অর্থে আমাকে গরদের জোড় পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে আমার কতকগুলি বই পাঠাতে চাই। বোধ করি প্রথম দিককার বই তিনি সংগ্রহ করতে পেরেচেন। শান্তিনিকেতন চেয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগা শান্তিনিকেতন অসম্পূর্ণ আছে বলেই কোনো কালে তার সম্পূর্ণ হবার আশা নেই। ওটা ফাটলধরা নৌকোর মতো চিরদিন ডাঙায় তোলা রইল। ও'কে পাশ্চাৎলিখিত বইগুলি দিতে বোলোঃ—পূরবী, বলাকা, মহুয়া, প্রবাহিনী, ঘরে-বাইরে, গল্পসপ্তক, চতুরঙ্গ, রাশিয়ার পত্র, ভানুসিংহের পত্রাবলী, তপতী, (নূতন যে-সংস্করণটা বেরিয়েচে)। রোসো, ঠিকানাটা পরে নির্ধারণ করে তোমাকে জানাবো। —এইমাত্র হঠাৎ তোমার একখানা পত্র পাওয়া গেল। এর থেকে বুঝবে এ পত্রটা ঋণশোধ নয়। বিনা তাগিদে স্বতোলিখিত।

এ বাড়িতে একটা কাচাবগুণ্ঠিত বারান্দা ও তার সমনেই একটা খোলা আঙিনা। সাধারণত এই দুটো জায়গাতেই খেয়ালমতো চৌকি নিয়ে বসি। আর সবই ভালো—আকাশের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন মিলন ঘটে, গাছপালার সঙ্গে মোকাবিলায় পরিচয় হয়—কিন্তু মুশকিল এই, রাস্তার সঙ্গে এর সংযোগ অবারিত। পথিকেরা আমাকে পড়ে-পাওয়া জিনিসের মতোই পেয়ে বসে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় একই কুশল সংবাদের দশ পনেরো সংস্করণ হয়ে যায়। ঢাকা ঘর ভালো যদি কাজ কর্ম করবার মন থাকত, অনাবৃত আকাশতল ভালো যদি নিভৃতে থাকবার সুযোগ থাকত—আমার হয়েচে ঘরে কাজ নেই, আকাশে নিরালা নেই।

আমি আসা অবধি বৃষ্টি ছিল না, আজ সকাল থেকে বর্ষণ শুরু হয়েচে, মনে হচ্চে এটা ক্ষণিকের অতিথি নয়। তা হোক্, এই ঘষা পয়সার মতো চেহারা-হারা ঝাপসা জগৎটাকে মন্দ লাগচে না। মনে হচ্চে মেঘদূতের যক্ষ ঐ রাস্তার বাঁকের কাছে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে। কবিদের কাব্য পড়ে মনে হয় ভাত কাপড়ের ভাবনাটাই মায়া, আর মনটাকে মন্দাক্রান্তার লম্বাসুতোয় বেঁধে অলক্ষ্য অলকাপুরীর দিকে ঘুড়ি ওড়ানোটাই একমাত্র জরুরি ব্যাপার। এইবার আমার কুনো ঘরের কোণে আরাম কেদারায় লীন হয়ে ধারাপতনের অবিরাম শব্দের তলায় তলিয়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকা যাক। ইতি ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

কবি

দক্ষবালার ঠিকানা

C|o. Sj. Sripati Bose,
17, Rajendralal Street,
Calcutta.

রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী

বুদ্ধদেব বসু

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর একটি প্রবন্ধ কারও কারও তীব্র উষ্মার কারণ হয়েছে। সেই প্রবন্ধটি সম্পর্কে যদিও অনেকের অনেক কথা এ-যাবৎ শোনা গিয়েছে, স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্য শুনবার সুযোগ এই প্রথম পাওয়া গেল। প্রবন্ধটিতে আসলে কী বলা হয়েছিল, এ-লেখা পড়লেই এ-দেশের পাঠক-সমাজ তা বুঝতে পারবেন। নতুন করে এ-বিষয়ে কোনও আলোচনার সূত্রপাতে আমরা ইচ্ছুক নই। —সম্পাদক।

ভূমিকা

[সম্প্রতি আমাকে দেশের বাইরে যেতে হয়েছিলো। নূ্য ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, তাছাড়া জাপান, হনলুলু, আমেরিকা ও য়োরোপের কোনো-কোনো শিক্ষায়তন বা প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করারও আহ্বান ছিলো। এই নিমন্ত্রণগুলো আমার কাছে এসেছিলো প্রত্যক্ষভাবে, সরাসরি আহ্বানকারী-দের তরফ থেকে, ভারত-সরকারের আয়োজনে বা মধ্যস্থতায় নয়। আমাদের রাষ্ট্রপতির নামাঙ্কিত একটি পাসপোর্ট ছাড়া, আমার এই বিদেশ-যাত্রার সঙ্গে ভারত-সরকারের আর কোনো সম্বন্ধ ছিলো না। কথাটা উল্লেখ করতে হলো এইজন্যে যে এ-বিষয়ে কারো-কারো ভ্রান্ত ধারণা আছে ব'লে শুনতে পেয়েছি।

ছ-মাস পরে ফিরে এসে দেখি, আমাকে নিয়ে ছাপার অক্ষরে তাণ্ডব চলছে। দেশের মধ্যে আমার অনুরাগী পাঠক যখন আছেন তখন নিন্দুকেরও অভাব হবে না, এই কথাটি আমি বহুকাল আগে বুঝে নিয়েছিলুম; আজ প'য়তাল্লিশ বছরের নিবিড় অভ্যাসের ফলে আমি নিন্দার প্রতি উদাসীনতা উপার্জন করেছি। কিন্তু এবারে কিঞ্চিৎ কৌতুক অনুভব করছি এইজন্যে যে এই উত্তেজনার লক্ষ্য বা উপলক্ষ আমার একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ, এবং সেই প্রবন্ধের সঙ্গে এই অপোচ্ছ্বাসের প্রায় কোনো সম্বন্ধই নেই।

আলোচ্য প্রবন্ধের ভাষা ইংরেজি, বিষয় —'রবীন্দ্রনাথে পাশ্চাত্য প্রভাব'। গত বৎসর কলকাতার অল ইণ্ডিয়া রেডিও একটি ইংরেজি বক্তৃতাপর্যায়ের আয়োজন করেন, তার শিরোনামা 'Western Influence on Bengali Literature'। এই পর্যায়ের দ্বিতীয় বক্তৃতা দেবার জন্য আহূত হ'য়ে, আমি নিবন্ধটি রচনা করি; বেতারের পরিভাষায় তার শিরোনামা ছিলো—'Western Influence on Bengali Literature : Rabindranath'। কলকাতার বেতার-কেন্দ্রে এটি সম্প্রচারিত হয় ১৯৬০ সালের ৯ মার্চ তারিখে, পড়তে হয়েছিলো অবশ্য আমাকেই। একই বছরের ৩ জুলাই তারিখের 'আকাশবাণী'তে (পূর্ব নাম, 'The Indian Listener') লেখাটি প্রথম ছাপা হয়; কিন্তু মূল রচনার প্রথম অনুচ্ছেদ ও শেষ অনুচ্ছেদের অর্ধাংশ 'আকাশবাণী' বর্জন করেন—কেন, তা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কিছুদিন পরে পুরো লেখাটি ছাপা হ'লো প্যারিসের 'Two Cities' নামক ইঙ্গ-ফরাশি পত্রিকার হেমন্ত-সংখ্যায়; এবং প্রায় একই সময়ে, কিছুটা বন্ধুদের পরামর্শে এবং কিছুটা সম্পাদকের অনুরোধ এড়াতে না-পেরে, লেখাটার একটা বাংলা প্রকরণ আমি দাঁড় করালাম; 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী' নামে পুজো-বার্ষিকী 'অভিসারে' তার স্থান হ'লো। বাংলা লেখাটাকে 'প্রকরণ' বলছি এইজন্য যে তা ইংরেজির আক্ষরিক অনুবাদ নয়; ইংরেজিতে যা আছে তার সমস্তটাই ঐ প্রবন্ধে দিয়েছি, কিন্তু বাংলার সবগুলি অংশ ইংরেজিতে নেই; অর্থাৎ বাংলায় এমন কিছু বাক্য ও মন্তব্য যোগ করেছি যা আমার ধারণায় আমার বক্তব্যকে আরো সবল করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে গত ৭ জুন তারিখে প্যারিসে সর্বন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত ভারতীয়-সভ্যতা-বিভাগে আমি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে যে-বক্তৃতা করেছিলাম, এই প্রবন্ধ তার একেবারে অনাত্মীয়। কোনোরকম লিখিত প্রবন্ধই আমি সেখানে পড়িনি, আমার বক্তৃতা মৌখিকভাবে রচিত হয়েছিলো, এবং শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন ভারত-ভক্ত বা রবীন্দ্র-ভক্ত ফরাশি, রবীন্দ্র-ভক্ত বা বাংলা-সাহিত্যপ্রেমিক পশ্চিম- ও পূর্ব-বাঙালি, এবং কলকাতার দু-জন বিশিষ্ট সাংবাদিক।

প্রবাসকালে আমি জানতাম না যে এর পরেও লেখাটার আরো দু-বার পুনর্মুদ্রণ হয়েছে: দিল্লির 'Thought' পত্রিকায় ইংরেজিতে (৬ মে, ১৯৬১), আর কলকাতার 'বেতার জগতে' বাংলায় (২২ এপ্রিল, ১৯৬১)। কেউ-কেউ হয়তো ধ'রে নিয়েছেন যে 'বেতার জগতে'র অনুবাদটা আমারই করা, যদিও আমার রচনাদির সঙ্গে পরিচয় থাকলে এই ধারণা সম্ভব ব'লে বোধ হয় না। 'বেতার জগতে'ও মূল প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদ ও শেষ অনুচ্ছেদের অর্ধাংশ বাদ পড়েছে; তাঁরা 'আকাশবাণী'র হুবহু অনুসরণ করেছেন, হয়তো অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর মুখপত্র হিশেবে সেটাই তাঁদের প্রচল। বলা বাহুল্য, এই বর্জনটুকু আমার পরামর্শমতো, বা অনুমতিক্রমে, অথবা জ্ঞাতসারেও করা হয়নি: পরামর্শ নেবার ইচ্ছে তাঁদের থাকলেও আমি হাতের কাছে ছিলুম না। 'বেতার জগতে'র অনুবাদ কে করেছেন তাও আমি জানি না, তবে এ-কথা আমি বলতে বাধ্য যে তিনি মোটের উপর আমার প্রতি অবিচার করেননি; কয়েকটা বাক্য বাদ প'ড়ে থাকলেও তিনি আমার মূল বক্তব্য যথাযথভাবে প্রকাশ করেছেন।

অধিকতর কৌতুকের বিষয় এই যে, যে-লেখাটা ষোলো মাস আগে রেডিওতে সম্প্রচারিত হয়, এবং যার ভাগ্যে দশ মাসের মধ্যে ইংরেজিতে ও বাংলায়, দেশে ও বিদেশে, খণ্ডিত, পূর্ণ ও পরিবর্ধিতরূপে পাঁচ বার প্রকাশলাভ ঘটে, তাকে নিয়ে অকস্মাৎ এক উত্তেজনা পঙ্কিল হ'য়ে উঠলো। এমন অনুমান করলে অন্যায় হয় না যে এর আগে বহু সহস্র ব্যক্তি লেখাটি শুনেছেন বা পড়েছেন; তাঁদের মধ্যে একজনও কোনো বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ব'লে আমার জানা নেই। আমি প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের কয়েকদিন আগে হঠাৎ ধরা পড়লো যে ঐ লেখাটা ধিক্কারযোগ্য।

কিন্তু কোনো-কিছুকে ধিক্কার দেবার আগে অন্ততপক্ষে জেনে নেয়া বোধহয় উচিত যে জিনিশটা কী। আমার 'Two Cities'-এর প্রবন্ধের 'অনুবাদ' হিশেবে সম্প্রতি যা কোনো এক পত্রিকায় প্রচারিত হয়েছে তা আমার মূল প্রবন্ধের বিকৃতি পর্যন্ত নয়, অনেকাংশে স্বাধীন রচনা। কোনো লেখকের জীবৎকালে, তাঁকে ঘুণাক্ষরে কিছু জানতে না-দিয়ে, তাঁরই নামে কতগুলো স্বকপোলকল্পিত বাক্য প্রকাশ করা যায়, এমন উক্তিসহকারে যা তাঁর পক্ষে অচিন্তনীয়, এমন ভাষায় ও ভঙ্গিতে যা তাঁর পক্ষে সম্ভবপরতার পরপারে—আমার মাতৃভূমি বিষয়ে এই আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা হ'লো। এটা সম্ভব হয় এইজন্যেই যে আমাদের পাঠক-

সাধারণের প্রতারিত হবার উন্মুখতা এখনো অপরিসীম। 'বেতার জগতে'র অনুবাদে আমার বক্তব্য প্রাঞ্জলভাবে ঘোষিত, অথচ অনেকেই এমনভাবে লিখেছেন যেন তার অস্তিত্বই নেই। তবু 'বেতার জগৎ' মাঝে-মাঝে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু আমার 'অভিসারে'র লেখাটা যে কখনো কারো চোখে পড়েছিলো, বাদানুবাদের কলেবর-বৃদ্ধি সত্ত্বেও এখনো তার প্রমাণ পাইনি। সেইজন্যে, 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়ের ইচ্ছা অনুসারে, সেটা এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

'Two Cities'-এর সংখ্যা আমাদের দেশে হয়তো সহজলভ্য হবে না; বা হ'লেও অধিকাংশ বাঙালি পাঠকের পক্ষে ইংরেজি ভাষার সাহিত্যিক প্রবন্ধ দুর্গম হবে। 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী' লেখাটা মূলে ইংরেজির তুলনায় কিছু বিশদ ও বিস্তারিত; এবং আমি যে-বাংলা লিখি তা অত্যন্ত বেশি সরল না-হ'লেও শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের বোধগম্য হবে ব'লে আশা করা যায়। 'সত্য' ব'লে একটা বহু পুরোনো কথা আছে—সেটা দুই-যুদ্ধ-পেরোনো বিশ শতকে প্রায় অব্যবহার্য; কিন্তু 'তথ্য' কথাটার প্রতিপত্তি এখন বিপুল; সেই নিরঞ্জন তথ্যের তাগিদেই লেখাটা এখানে পুনশ্চ পরিবেষিত হ'লো।]

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় প্রথম য়োরোপীয় সাহিত্য লেখেন।' সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই উক্তিতে অতিরঞ্জন থাকতে পারে, কিন্তু এই অতিরঞ্জন ঠিক সেই ধরনের, যা বিদ্যুতের মতো সত্যকে উদ্ভাসিত ক'রে আমাদের স্বাধীন চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে। রবীন্দ্র-ভক্তদের মধ্যে যাঁদের বলা যায় আদিসমাজ-ভুক্ত, তাঁরা এই কথাটা পছন্দ করবেন না, এবং যে-তরুণের দল আজকের দিনে 'ঘরে ফিরতে' সচেষ্ট, যাঁরা এমনকি বাংলা মঙ্গলকাব্যেই বাংলা উপন্যাসের উৎস খুঁজে পাচ্ছেন, তাঁদের কাছেও কথাটা অগ্রাহ্য হবে। এর বিরুদ্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেই সাক্ষীরূপে দাঁড় করানো সম্ভব; কেননা প্রতীচীতে তাঁর পরিচয় ছিলো প্রাচ্যদেশের ঋষিরূপে; পাশ্চাত্ত্য গতিধর্মের উত্তরে শান্তির বাণী তাঁর অবদান, সত্য শিব ও সুন্দর তাঁর জপ-মন্ত্র। আমাদের মানতেই হবে যে তাঁর বিষয়ে পশ্চিমের এই ধারণাতে রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করেননি, বরং সর্বতোভাবে তার পুষ্টিসাধন করেছিলেন। তবু—য়োরোপীয় সাহিত্য বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা থাকলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে সুধীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্যে একটি সত্যের বীজ প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে।

বিশ্ববিদ্যালয়িক মহলে 'প্রভাব' শব্দটি যান্ত্রিক অর্থে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে; ইবসেনের 'প্রেত' নাটক প'ড়ে বর্নার্ড শ লিখলেন 'বিপত্নীকের গৃহ', এলিয়ট ভগবদ্গীতার ভাবানুবাদ ও ভাষ্য রচনা ক'রে হিন্দু মানসের কাছে ঋণ স্বীকার করলেন। এই রকম প্রত্যক্ষ প্রভাব বা ঋণগ্রহণ সাহিত্যের ইতিহাসে অনবরত দেখা যায়, এবং যাঁরা বিধিবদ্ধভাবে গবেষণা ক'রে থাকেন তাঁদের পক্ষে এই সম্বন্ধগুলোই খনিস্বরূপ। কিন্তু অন্য এক রকমের প্রভাব আছে যা গোপন বা লুক্কায়িত, যার বিষয়ে কবি নিজেও স্পষ্টত সচেতন নন; যা সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অর্ধালোক থেকে বাইরে ভেসে ওঠে না কখনো, বা উঠলেও, ডক্টরেট-ডিগ্রিপ্রার্থীদের পরিশ্রমী মুষ্টিকে ফাঁকি দেয়। এবং এই সব গোপন প্রভাবই সবচেয়ে স্থায়ী ও গভীর। রবীন্দ্রনাথের সেই ভূতলবর্তী মনোলোক, তাঁর কবিসত্তার যা ভিত্তিভূমি—আমি বলতে চাই তার বড়ো একটি অংশ য়োরোপের অন্তর্ভূত।

জানি, তথ্যের দ্বারা এই কথাটা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য; বস্তুত রবীন্দ্রনাথের তথ্যনির্ভর সমালোচনা এখনো সম্ভব নয়। যদিও তিনি আধুনিক যুগের কবি, বলতে গেলে আমাদেরই সমকালীন, তবু তাঁর জীবনী-সংক্রান্ত সাহিত্যিক উপাদান এতদিনেও কিছুই প্রায় জ'মে ওঠেনি। আমরা এটুকু পর্যন্ত জানি না তিনি দীর্ঘ জীবন ভ'রে কোন-কোন বিষয়ে এবং কী পরিমাণ পুস্তক পাঠ করেছিলেন : কোন-কোন বইয়ের শুধু পাতা উল্টিয়ে গেছেন, কোন-গুলি তাঁর প্রীতিসাধন করেছে, আর কোন-গুলিকে শোষণ ক'রে নিয়েছেন নিজের মধ্যে। তাঁর আত্মজৈবনিক ও অন্যান্য গদ্য রচনার পরিমাণ বিপুল, অথচ অন্যের প্রণীত পুস্তকের উল্লেখ তিনি কদাচ করেছেন, বা ক'রে থাকলেও নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন মহাভারত, রামায়ণ, উপনিষদ, কালিদাস ও বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে। ওঅর্ডস্বার্থ, শেলি, কীটস—এই ইংরেজ

রোমাণ্টিকত্রয় মাঝে-মাঝে দেখা দেন তাঁর রচনায়—প্রাচীন ও ভারতীয় সাহিত্যের বাইরে এই তিনজন মাত্র; য়োরোপীয় কবিতার যে-একটি পংক্তি তিনি ক্লান্তি-হীনভাবে উদ্ধৃত করেন তা আশ্চর্যের বিষয়—কীটসের—'Beauty is truth, truth beauty' আর সেও কাব্যের খাতিরে নয়, নন্দনতত্ত্বের একটি ফলদ সূত্র হিশেবে। 'শেষের কবিতা'য় ও 'চার অধ্যায়ে', জন ডান ও ইবসেনের উল্লেখ আছে, কিন্তু সেটা খুব সম্ভব তৎকালীন তরুণ গোষ্ঠীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ আনুকূল্যের নিদর্শন-মাত্র। প্রায় একই সময়ে 'আধুনিক কাব্য' নামে যে-প্রবন্ধ লিখেছেন তা প'ড়েই বোঝা যায় যে পশ্চিমী নব্যসাধকদের প্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগ দেননি—বা মনোযোগের যোগ্য ব'লেই ভাবেননি তাঁদের। রবীন্দ্র-নাথের যে-সব কবিতায় প্রত্যক্ষ আহরণ সুস্পষ্ট, তাদের কথা কারোরই এতদিনে জানতে বাকি নেই; 'বর্ষশেষে'র সঙ্গে 'Ode to the West Wind' ও 'মানস সুন্দরী'র সঙ্গে 'Hymn to Intellectual Beauty'র তুলনা বাঙালি সমালোচকেরা দুই পুরুষ ধ'রে ক'রে আসছেন। কিন্তু আগেই বলেছি, প্রত্যক্ষ আহরণ ও গভীরতর প্রভাব এক কথা নয়; রবীন্দ্রনাথের সত্যকার উত্তমর্ণ পাশ্চাত্ত্য কবিদের মধ্যে কারা, এই অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক কথাটি এখনো আমাদের আবিষ্কারসাপেক্ষ।

কিন্তু এমন হ'তেই পারে না যে রবীন্দ্র-নাথের পাঠাভ্যাস উপরোক্ত গ্রন্থ ক-টিতেই সীমিত ছিলো; নিশ্চয়ই তিনি নানা ধরনের অসংখ্য পুস্তক পড়েছিলেন, কিন্তু আধুনিক পশ্চিমী কবিরা সাধারণত যা ক'রে থাকেন, সেই আত্মোদ্ঘাটন তাঁর স্বভাবের বহির্ভূত ছিলো ব'লে, তাঁর আহরণের সত্য ইতিহাস তিনি সযত্নে লুকিয়ে রেখে গেছেন। পত্ররচনায় অমিতব্যয়ী হ'য়েও তাঁর কোনো বিশেষ কাব্যের বিশেষ প্রেরণার উৎস বিষয়ে তিনি আশ্চর্যরকম নীরব। আমরা জানি, জ্যোতি-র্বিজ্ঞান, কীটবিজ্ঞান, ঔপনিবেশিক রাজ-নীতি—এই ধরনের পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নানা বিষয়ে তাঁর ঔৎসুক্য ছিলো; 'এমিয়েলস জর্নাল' নামক অধুনা প্রায় অপঠিত পুস্তকের তিনি অনুরাগী ছিলেন; গোতিয়ে-র 'মাদমোয়াজেল দ্য মোপ্যাঁ' তিনি সহ্য করতে পারেননি, যদিও ইংরেজি ভাষার ভিক্টরীয় উপন্যাসের প্রতি তাঁর অনীহা ছিলো না। উত্তরজীবনে এজ্রা পাউণ্ড ও এমি লোয়েলের উদ্দেশে বক্রোক্তি ক'রে, আমাদের মনোযোগের জন্য তুলে ধরেছিলেন স্টার্জ মুরকে। যদি রবীন্দ্রনাথের স্বীয় উক্তিগুলিকেই প্রমাণস্বরূপ ধরতে হয়, তাহ'লে এমনকি তাঁর সাহিত্যিক রুচি বিষয়ে নিশ্চিত হবার উপায় নেই আমাদের। তাঁর সমকালীন ও তাঁর সন্নিকট অগ্রজ ও অনুজদের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য জগতে সত্যকার কবি ও সত্যকার নতুন কবি যাঁরা ছিলেন, যাঁরা জগতের কাছে তৎকালীন প্রতীচীর বাণীমূর্তি, আমরা ব্যথিত বিস্ময়ে দেখতে পাই যে তাঁদের বিষয়ে অণুমাত্র উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ কখনো করেন না। বোদলেয়ার বা সুইনবার্ন, ভেরলেন বা মালার্মে, রিলকে বা ভালেরি—কেউ তাঁর কৃপালাভে কৃতকার্য হ'লো না; উনিশ শতকী রুশ উপন্যাস, ফরাশি চিত্রকলা, জর্মান সংগীত—পশ্চিমী সভ্যতার এই প্রোজ্জ্বল স্তম্ভগুলিকে তিনি অম্লানভাবে উপেক্ষা ক'রে গেলেন। ইয়েটস বিষয়ে একবার যে-ক্ষুদ্র নিবন্ধটি লেখেন, তাতে ইয়েটস-এর কবিতার বিষয়ে যথার্থ গুণগ্রাহিতার কোনো পরিচয় নেই। ঐ নিবন্ধটি যেমন বন্ধুকৃত্য, তেমনি 'Journey of the Magi'-এর অনুবাদটিও কর্তব্যবোধে বা ঘটনাচক্রে সাধিত। আর এই রবীন্দ্রনাথেরই প্রতীচীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিলো নিরন্তর, বিদেশযাত্রায় ক্লান্তিহীন তিনি, য়োরোপের শ্রেষ্ঠ কোনো-কোনো সমকালীন লেখক তাঁর সঙ্গে অনুবাদ, সম্পাদনা ও বন্ধুতার সূত্রে আবদ্ধ!

আশ্চর্য স্বতোবিরোধ, প্রায় অবিশ্বাস্য। সংবেদনশীলতায় অতুলনীয় এই কবি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—তিনি কেমন ক'রে তাঁর সমকালীন সাহিত্যের প্রধান ধারাগুলির প্রতি এমন অবিচলভাবে উদাসীন থাকতে পেরেছিলেন? যদি বলা যায় যে তিনি আসলে ছিলেন য়োরোপীয় বা ইংরেজি হিশেবে রোমান্টিক-ভিক্টরীয় কবি, ওঅর্ডস্বার্থ-টেনিসনের সগোত্র, অতএব রুশ উপন্যাস বা ফরাশি প্রতীকীদের প্রতি অনুকম্পা তাঁর কাছে আশা করাই আমাদের অন্যায়, তাহ'লে প্রশ্নটিকে শুধু এড়িয়ে যাওয়া হয়, এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতিও সুবিচার হয় না। এ-কথা তো সত্য যে তিনি ১৯৪১ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন—এবং সার্থকভাবে বেঁচেছিলেন : উপরন্তু তাঁর প্রতিভার উন্মেষ ও বিকিরণের অধ্যায়টিকে ১৮৮০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে ফেলা যেতে পারে—অর্থাৎ যে-অর্ধশতক ভ'রে তাঁর উদ্যম পূর্ণতেজে নিঃসৃত হচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই প্রতীচীর সাহিত্য নূতন প্রেরণায় উন্মুখর। এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যেখানে-যেখানে পুনরুক্তির বদলে সৃষ্টি-শীলতা দেখা দিয়েছে, গতানুগতির বদলে মৌলিক প্রতিভা—আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক সেই-সেই অংশ আমাদের কবিগুরুকে কখনোই যেন স্পর্শ করেনি। প্রথম যৌবনে যে-সব কবি তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো, প্রবীণ বয়সেও উত্তম কবির নিদর্শনরূপে তাঁদেরই তিনি স্মরণ করেছেন। এই নিশ্চলতা কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো, তা ভেবে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। এ কি তাঁর চরিত্রের অনাক্রমণীয় অবৈকল্যের প্রমাণ, না কি তাঁর এই লক্ষণ আমাদের এ-কথা বলার অধিকার দিচ্ছে যে তাঁর প্রতিভার প্রবণতা শুধু সম্প্রসারণের দিকে, পরিণতির সম্ভাবনা তাতে ছিলো না?

উত্তর দিতে গিয়ে দ্বিধান্বিত হ'তে হয় আমাদের; রবীন্দ্রনাথ আয়তনে এমনই সার্বভৌম যে তাঁর সম্পর্কে যে-কোনো বিষয়েই মনস্থির করা দুরূহ। এই যাকে বলছি সমকালীন পশ্চিমী সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনীহা, আমরা কি নিঃসংশয়ে ধ'রে নিতে পারি যে সেটা তাঁর ছদ্মবেশ নয়? অন্তত এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, পশ্চিমের প্রতি তাঁর মনোভাব ছিলো উভমুখী; এক-দিকে প্রবল ও দুর্বার আকর্ষণ, অন্য দিকে অবমানিত পরাধীন স্বজাতির জন্য তাঁর বেদনাবোধ। যেমন পরিণত বয়সে বিলেতি বেশবাস ধারণ করতে তাঁর স্বমর্যাদাবোধ এতদূর পর্যন্ত আহত হয়েছে যে তার বদলে তিনি রচনা ক'রে নিয়েছিলেন এক বিচিত্র পরিচ্ছদ, যা আধুনিক কালে পৃথিবীর কোনো দেশেই প্রচলিত নেই, এবং যা এক ও অনন্য রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য সকলের পক্ষেই অব্যবহার্য—তেমনি তিনি আপ্রাণ চেষ্টা

করেছেন যাতে তাঁর রচনার মধ্যে পশ্চিম-প্রীতি প্রকাশ না পায়, যেহেতু ভারতের বর্তমান শোষক ও উৎপীড়কগণ সেই ভূখণ্ডের অধিবাসী। তাঁর ভ্রমণকালীন দিনলিপির পাতায়-পাতায় এই সচেতন বিমুখতার আমরা প্রমাণ পাই। ফরাশি বিপ্লবের পরবর্তী যে-প্রতীচীতে দেখা দিয়েছিলো ধর্মীয় সহনশীলতা, গণতন্ত্র, ও সর্বমানবের মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি, তার প্রতি কখনো-কখনো শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না-করা যদিও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো, তবু ঐ দিনলিপিগুলিতে তিনি নিরন্তর ব্যক্ত করেছেন পাশ্চাত্ত্য দ্রুতি ও ব্যস্ততার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা, নিরন্তর ইচ্ছা করেছেন তাঁর বাংলার অখ্যাত নিস্তরঙ্গ গৃহকোণে ফিরে যেতে। 'কী ভালো হ'তো—যদি বিদেশীরা ভারতবর্ষের সন্ধানই না পেতো কখনো!'—এই রকম একটা অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষাও একবার তিনি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু যদি তা-ই হ'তো, যদি বিদেশীরা না আসতো, তাহ'লে আমাদের আকাশে রবীন্দ্রনাথ নামক জ্যোতিষ্কেরও উদয় হ'তো না। আর তিনি তা নিজে জানতেন না তাও নয়।

প্রচ্ছদ সরিয়ে অন্তরে তাকালে আমরা দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথ আজীবন এক কুটিল সংগ্রামে বিক্ষুব্ধ : একদিকে কবি, অন্য দিকে নবাভারতীয় জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র; একদিকে শিল্পী ও মরমী, অন্য-দিকে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারক; একদিকে সৌন্দর্যপ্রেমিক, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিশ্রুত শত্রু। ভারতীয় ইতিহাসের যে-লগ্নে তিনি জন্মেছিলেন, তাতে এই আত্মবিভেদের অধীন না-হ'য়ে তাঁর উপায় ছিলো না—এই কথাটি মনে রাখলেই আমরা বুঝতে পারি, কেন তাঁর জীবন ও সাহিত্য এমন অদ্ভুত স্ববিরোধে আক্রান্ত। যাকে আজকাল আমরা আর্ট বলি, তার ধারণাটি বাংলা সাহিত্যের উনিশ শতকে স্পষ্ট হয়নি; আমাদের সে-কালের মনীষীরা, ইংরেজ-ফরাশি যুক্তিবাদ ও উপযোগবাদের প্রভাবে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলতে বুঝেছিলেন লোকশিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন; এবং রবীন্দ্রনাথ—যাঁর অর্ধেক আয়ুষ্কাল উনিশ শতকের অন্তর্ভূত, তাঁর পক্ষে সেই ঐতিহ্য-রক্ষা অনিবারণীয় ছিলো। তবে বঙ্কিমের মতো লেখকের চরিত্রে আমরা অন্ততপক্ষে অখণ্ডতা দেখতে পাই, মনোরঞ্জনজনিত লোকশিক্ষার সূত্রকে তিনি অন্তত সর্বান্তঃকরণে মানতে পেরেছিলেন : কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সেই অন্য এক আদর্শের সন্ধান পেয়ে, সারা জীবনে তার আহ্বান ভুলতে পারেননি। তাই তিনি নিজেকে স্পষ্টত দুই অংশে বিভক্ত ক'রে নিলেন : তার একটিকে আমরা বলতে পারি পোশাকি, সরকারি, গণসম্মত, অন্যটি তাঁর আপন ও গোপন, তাঁর অন্তঃসার। 'রবীন্দ্রনাথ' বলতে যে-ধারণাটি ধীরে-ধীরে লোকচিত্তে গ'ড়ে উঠেছিলো, তার সঙ্গে বাইরের দিক থেকে নিজেকে তিনি আক্ষরিকভাবে মিলিয়ে নিয়েছিলেন; সেখানে তিনি সুস্মিত ও করুণাশীল ঋষি, ঔপনিষদিক ঐতিহ্যে লালিত, শিব ও শান্তির প্রবক্তা। কিন্তু ভিতরের দিকে তিনি অস্থির ও সংরক্ত, সেখানে অন্ধকারে ঢেউ তুলছে বেদনা, দিগন্তেও নিশ্চয়তা নেই—অর্থাৎ অন্য দিকে তিনি অবিকল একজন আধুনিক য়োরোপীয় কবি, উনিশ-শতকী পশ্চিমী রোমান্টিকতার এক শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। যেমন পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সংযোগ নিবিড়, তেমনি এও সত্য যে তাঁর কোনো-কোনো কাব্যের অপূর্বতা বাংলার অথবা ভারতের সীমান্তকে লঙ্ঘন ক'রে গেছে। বেশি আর কথা কী, শুধু 'মানসী'র কথা চিন্তা করলেই আমরা তাঁর অভারতীয় নূতনত্ব উপলব্ধি করতে পারি। এই কাব্য-গ্রন্থ—যাকে বলতে পারি তাঁর সমগ্র কাব্যের একটি অণুবিশ্ব—প্রাক্-রবীন্দ্র সমগ্র ভারতীয় সাহিত্য তন্নতন্ন ক'রে খুঁজলেও তার সঙ্গে তুলনীয় আমরা কিছুই পাবো না। ঐ গ্রন্থে, এবং প্রথম ঐ গ্রন্থে, উচ্চারিত হ'লো বিশ্ববিষাদ, অকারণ বেদনা, বেদনাময় পুলক, ব্যক্তিগত ও মানবিক আকাঙ্ক্ষার রহস্য;—এবং এই সবই, আমরা জানি, য়োরোপীয় মানসের প্রসূন, এবং আজকের দিনে আমাদের চৈতন্যের অন্তর্ভূত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই অন্তরতম সত্তা যে-সব কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলিও এমন আপাতপ্রসন্ন, এমন প্রতারকরূপে সরল, যে আমরা অনেক সময় তাদের তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারি না।

একবার, কোনো এক আনুষ্ঠানিক উপলক্ষে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর পশ্চিমী সাহিত্য-পাঠের একটি বিবরণ দিয়েছিলেন। দান্তে ও গ্যোটে পড়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু

ভাষান্তরিত কাব্য বিষয়ে অরুচি, ও ভাষা-শিক্ষায় চেষ্টাহীনতার ফলে, অগ্রসর হ'তে পারলেন না। এক জর্মান মহিলার সহযোগে কিছু হাইনে পড়েছিলেন, কিন্তু অচিরেই ধৈর্য অবসিত হ'লো। শেক্সপীয়র প'ড়ে থাকলেও, সন্তুষ্ট হননি। 'জীবন-স্মৃতির' সেই অংশ স্মর্তব্য, যেখানে ওথেলোর 'ঈর্ষানল' ও লিয়রের 'অক্ষম পরিতাপে'র উল্লেখ ক'রে তিনি বলছেন যে তাঁর যৌবনকালীন বাঙালিরা ইংরেজি সাহিত্যে যা পেয়েছিলো তা 'খাদ্য' নয়, 'মাদক'; উপরন্তু, শেক্সপীরীয় ধরনে মানবস্বভাবের 'তলাকার পাঁক' উন্মথিত করা 'সাহিত্যকলার ঠিক লক্ষ্য' কিনা, সে-বিষয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন। য়োরোপীয় সাহিত্যের যে-সব অংশে 'শান্তরস' প্রকাশ পেয়েছে, তার সঙ্গে পরিচয়-সাধনের পরামর্শে উক্ত অনুচ্ছেদের সমাপ্তি।

অর্থাৎ, তত্ত্বের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ সেই রোমান্টিকতার বিরোধী, যা পশ্চিমী সাহিত্যের বিশিষ্টতম চরিত্রলক্ষণ। এ-বিষয়ে তাঁর নিজের ঘোষণা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না, কিন্তু দেখা যাক তাঁর সাহিত্যকৃতি কী-রকম সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাঁর প্রথম যৌবনের অন্যতম প্রবন্ধের নাম 'গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ.' এবং হাইনে একমাত্র অনিংরেজ য়োরোপীয় কবি, যাঁর সংক্রাম তাঁর রচনায় সুস্পষ্ট; এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এক চপলমতি প্যারিসপ্রেমিক জর্মান ইহুদির সঙ্গে মিলন না-ঘটলে 'ক্ষণিকা'র শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি উৎপন্ন হ'তে পারতো না। শেক্সপীয়রের পক্ষপাতী নন রবীন্দ্রনাথ; অথচ 'চিরকুমার সভা' ও 'শেষ রক্ষা'য় শেক্সপীরীয় কমেডির বহু কৌশল তিনি ব্যবহার করেছেন, এবং 'বিসর্জন' ও 'চিত্রাঙ্গদা'র অমিত্রাক্ষরও শেক্সপীয়র থেকে আহরিত, মিল্টন-মধুসূদনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই। শেষ জীবনে দান্তের যে-প্রতিকৃতি এঁকে-ছিলেন, তাতে একটি কৃশ, ম্লান ইটালিয়ান মুখে আমরা যাঁকে দেখতে পাই তিনি 'নরকের' কবি, 'দ্যুলোকে'র নন। এবং নিজের যে-সব প্রতিকৃতি তিনি চিত্রিত ক'রে গেছেন সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে বিস্মিত না-হ'য়ে উপায় থাকে না আমাদের; যে-রবীন্দ্রনাথ আমাদের ও জগতের পরিচিত, তাঁর কোনো লক্ষণই সেখানে নেই, কোনো চিহ্ন নেই শান্তি বা সৌম্যতার; সেখানে এক দুঃখী মানুষের মুখ কোনো এক শঙ্কাময় অজানার আভাস দিচ্ছে। এই ছবিগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তর্কাতীতভাবে 'ধরা প'ড়ে' যান; আমাদের মনে প'ড়ে যায় দেবতাপ্রতিম গ্যেটের অন্তিম ও ভীষণ স্বীকারোক্তি : 'জীবনে একদিনের জন্য আমি সুখী হ'তে পারিনি।'

বলা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথকে যে বৃদ্ধ-বয়সে ছবি আঁকতে হ'লো, তা এইজন্যেই; তাঁর সত্তার যে-অংশটিকে তাঁর অতিপ্রজ লেখনী সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন করতে পারেনি, তার জন্য একটি নির্গমনপথ সায়াহ্নকালে তিনি রচনা ক'রে নিলেন। অনতিক্রম্য কুণ্ঠাবশত বুদ্ধিনির্ভর ভাষার দ্বারা যা বলা গেলো না, তা প্রকাশ করলেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রেখাবর্ণের বিন্যাস ঘটিয়ে; যেন এক দুঃসহ তাপ নিবারণের জন্য শরণ নিলেন সেই শিল্পের, যা তর্ক করে না, শুধু তাকিয়ে থাকে। তা-ই মনে হয় আমাদের, যখন লক্ষ করি যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা যদিও 'সুন্দর', অর্থাৎ সুষম ও মসৃণ, অমিত রায়ের ভাষায় 'গোল বা তরঙ্গরেখা'র ধরনে, তাঁর ছবিতে ভিড় ক'রে আসে 'কড়া লাইনের, খাড়া লাইনে'র রচনা, 'খোঁচাওআলা, কোণ-ওআলা, কাঁটার মতো'; অদ্ভুত ও বিকৃত মুখের মেলা ব'সে গেছে সেখানে, ভেসে উঠেছে প্রাগৈতিহাসিক জন্তু, স্বপ্ন থেকে ছেঁকে-তোলা অতিপ্রাকৃত দৃশ্য, শোণিতের তীব্র রক্তিমা যেন সংযমের বাঁধ ভেঙে উপচে পড়ছে। অঙ্কনবিদ্যায় অপটুতার জন্যই ছবিগুলিতে এই বিকৃতি ঘটেছে, এমন একটি মত উপস্থিত করা অসম্ভব নয়; কিন্তু এ-কথাও আমরা মানতে বাধ্য যে তাঁর পরিবার বা গোষ্ঠীভুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দ-লাল বসুর মতো ছবি আঁকার কোনো চেষ্টা অথবা ইচ্ছেও আমরা তাঁর মধ্যে খুঁজে পাই না; একমাত্র য়োরোপীয় এক্সপ্রেশনিস্টদের সঙ্গেই তাঁর কিছু সাদৃশ্য ধরা পড়ে।

এমনও নয় যে ছবিতে তাঁর যে-অংশটি ব্যক্ত হয়েছে, কবিতায় তা একেবারেই প্রচ্ছন্ন। বরং বলা যায় যে ছবিতে যা প্রত্যক্ষ ও প্রকট, কবিতায় তা অন্তর্লীনভাবে আবহমান। তাঁর যে-সব কবিতা অনুষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানে জনপ্রিয়, তাদের বিষয়ে কিছু বলতে চাই না; কিন্তু তাঁর কবিতা যেখানে সত্য (এবং 'গীতাঞ্জলি'কেও তার অন্তর্ভুক্ত করতে চাই), সেখানে ছন্দ, মিল ও স্তবকবিন্যাসের মায়াজালের অন্তরালে আমরা অনুভব করি এক বিরামহীন দ্বন্দ্ব ও বেদনা, এক নামহীন তিমিরস্পর্শের সংস্পর্শ;—সে-সব কবিতা স্মরণ করলে রবীন্দ্রনাথকে সেই সব পশ্চিমী কবিদেরই পাশে বসাতে ইচ্ছে করে, যাঁদের তিনি সরকারিভাবে 'অপছন্দ' করেছিলেন, অথবা কখনো যাঁদের নাম উচ্চারণ করেননি। আমি অবশ্য বলতে চাচ্ছি না যে পশ্চিমী কবিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো, এ-বিষয়ে তাঁর নিজের উক্তি সম্পূর্ণ মেনে নিতে কোনো আপত্তি নেই আমার; কিন্তু কথাটা এই যে ছাত্র বা অধ্যাপকের ধরনে 'ঘনিষ্ঠ' পরিচয়ের কোনো প্রয়োজনই তাঁর ছিলো না। তাঁর যৌবনের বাতাসে ছিলো রোমান্টিকতা; তিনি, প্রতিভাবান, তাঁর কবিসত্তার শিকড় পর্যন্ত সেটা শোষণ ক'রে নিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এক কবির উপর অন্য কবির যে-প্রভাব ঘটে, সেটা অধ্যয়নের ব্যাপার নয়, অতি লঘু ও ক্ষণিক পরিচয়ের ফলেও সেটা সম্ভব হ'তে পারে। শেক্সপীয়র, শুধু জনরব শুনে, সমগ্র পাশ্চাত্ত্য পুরাকালকে আত্মসাৎ ক'রে নিয়ে-ছিলেন। আমরা কি জানি যে আধুনিক প্রতীচী বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনেও অনুরূপ অভিঘাত ঘটেনি? তাঁর ব্যক্তিস্বগঠনে ও সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় তাঁর দ্বারা নিন্দিত বা অনুল্লিখিত কবিরা কোনো অংশ নেননি, এমন কথা ধ'রে নেবার অধিকার কিছুতেই আমরা দিতে পারি না নিজেদের; কিছুতেই নিশ্চিত হ'তে পারি না যে তাঁর যৌবন-কালে ফরাশি দেশের যে-সব কবিরা কাব্য-কলাকে নতুন ক'রে তুলছিলেন, তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একেবারেই সম্পর্করহিত। সেই তরুণ ও নতুন কবিদের কোনো লেখাই কি পড়েননি তিনি? হয়তো অনুবাদে, হয়তো আকস্মিক ও বিচ্ছিন্নভাবে, হয়তো কোনো সংবাদপত্রের উদ্ধৃতির সূত্রে—কিন্তু তাতে কি কিছু এসে যায়? আমরা তো জানি যে প্রতিভার প্রজ্বলনের পক্ষে একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গই যথেষ্ট। অন্ততপক্ষে, তাঁর 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' দুটি ফরাশি কবিতার সঙ্গে এক আশ্চর্য আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ, যদি তিনি বোদলেয়ারের 'ভ্রমণ' বা র‍্যাঁবোর 'মাতাল তরণী' না-ও প'ড়ে থাকেন, তবু মানতেই হবে যে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'য় এমন কিছু আছে যা তাঁর দ্বারা প্রকাশ্যভাবে সম্মানিত কোনো ভারতীয় কাব্যে আমরা খুঁজে পাবো না। উপরন্তু স্মর্তব্য যে, ঐ কবিতায় তরণীটি পশ্চিমগামী, ও রহস্যময়ী নায়িকাটি বিদেশিনী। স্বদেশীয় ঐতিহ্যের কাছে ঋণগ্রহণে ও ঋণস্বীকারে রবীন্দ্রনাথ অবিরলভাবে নিষ্কুণ্ঠ ছিলেন, কিন্তু প্রতীচীর কাছে ঋণের এই অবগুণ্ঠিত স্বীকৃতি—অবগুণ্ঠিত ব'লেই—দূরতর ও গভীরতর ইঙ্গিতময়।

॥ সাতচল্লিশ ॥

এদিকের বরফ তত নরম, ততটা ভসভসে নয়। তবুও ওরা তেমন দ্রুত এগিয়ে যেতে পারছিল না। এদিকের বাধা ফাটল। এই ফাটল এড়িয়ে চলতে হচ্ছে, তাই ওরা ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। কখনও বাঁয়ে, কখনও ডাইনে, কখনও এগিয়ে, কখনও পিছিয়ে যেতে হচ্ছে বলে পথ হাঁটতে হচ্ছে প্রচুর, কিন্তু লক্ষ্যের দিকে তেমন এগুতে পারছে না। সুকুমারের মনে হল, এ যেন ছেলেবেলার সেই "সাপ-সিঁড়ি" লুডো খেলা।

ওরা কখনও নন্দাঘুন্টি কখনও বা রণ্টি পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে। দিলীপ আর সুকুমার ক্রমাগত নন্দাঘুন্টির দিকে চাইছে। ওদের মনে উদ্বেগ। কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর ওদের নজর পড়ল রণ্টি গিরিশিরার দিকে। হঠাৎ দেখলে চমকে উঠতে হয়। অবিকল যেন পুরনো আমলের একটা বাদশাহী কেল্লা দাঁড়িয়ে আছে। কালো স্লেটের মত রঙ। সারা গা ফাটা-ফাটা। ওরা কিছুক্ষণ পাহাড়টার দিকে চেয়ে রইল। তারপর আবার চলতে শুরু করল।

কিছু দূর এগিয়েছে, এমন সময় দেখল বরফের উপর দড়ি, পিটন ইত্যাদির বোঝা পড়ে আছে। আগের দিন যারা এসেছিল, তারাই এসব রেখে গিয়েছে। এখানে এমন ভয়ঙ্কর ফাটল যে, ওরা পরস্পর দড়ি বেঁধে নিল। শরীরটাকে হালকা করে, একে একে পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছে। তার পিছনের লোকটি তুষার-গাঁইতির ব্রেক তৈয়ারি করে সদা-প্রস্তুত দাঁড়িয়ে আছে। পা ফসকে আগের লোকটি পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যাতে পরের লোকটি দড়ি ধরে তাকে সামাল দিতে পারে। নন্দাঘুন্টি যে কী সাংঘাতিক পাহাড়, কেন যে বাঘা-বাঘা পর্বতারোহীরা একে "টেকনিক্যালি" সুকঠিন, দুঃসাধ্য পর্বত বলেছেন, এখন তার মর্ম ওরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে লাগল।

অতিশয় সতর্ক হয়ে ওরা খুবই মন্থর গতিতে সেই ভয়ংকর জায়গাটি অতিক্রম করল। এবারে সামনেই এক উঁচু চড়াই। এতক্ষণ ওরা নন্দাঘুন্টির "কল"টা বেশ দেখতে পাচ্ছিল। সামনে চড়াইটা পড়ে যাওয়ায় "কল"টা তার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। চড়াইটাও ফাটলে ভরতি। কেউ যেন ফাটল দিয়ে দিয়ে নানা রকম নকশা কেটে রেখেছে।

গুনোদিন, টাসী আর আঙ ফুতার চড়াইয়ের মাথায় উঠে গেল। খানিক পরে দিলীপ আর সুকুমার দেখল, ওরা তিনজনে উপরে তাঁবু খাটাতে লেগেছে। আঙ শেরিং সুকুমারদের একটু আগে আগে যাচ্ছিল। সে নিচ থেকেই চেঁচিয়ে ওদের তাঁবু খাটাতে বারণ করল। আরও পিছিয়ে যেতে বলল জবাবে ওরা কি বলল, সুকুমার বুঝতে পারল না।

সুকুমার আর দিলীপ এবার চড়াই বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। কিছু দূরে ওঠার পর ওরা দেখল, ওদের সামনে বিরাট এক ফাটল। ফাটলের কিনার ধরে বরফে দড়ি খাটিয়ে রাস্তা বানানো আছে। ওরা বুঝতে পারল, শেরপারা কাল এই পর্যন্তই আসতে পেরেছিল। দড়ি খাটিয়ে এখানে রাস্তা করেই ওরা ফিরে গিয়েছিল। বরফের উপরকার ছাপ দেখে বুঝল, এখানে মালও ফেলে রেখে গিয়েছিল। চড়াইটা বেশ খাড়া। প্রায় ১০০ ফুট উঁচু হবে। ওরা যখন উপরে উঠল, বেলা তখন ২॥টা। প্রায় ২০০ গজ দূরে "কল"। ওরা সেখানেই বিশ্রাম নিতে লাগল।

আজীবা, দা তেম্বা আর নরবুকে ওরা দেখতে পেল না। শুনল, ওরা আরও এগিয়ে গিয়েছে। প্রথম কুঁজটা পর্যন্ত ওরা যাবে। রাস্তা তৈরি করে রেখে আসবে।

দিলীপ ছবি তুলতে লাগল। স্থির-ছবি তুলল। চলচ্ছবি তুলল ওর আট মিলি-মিটারের সিনে ক্যামেরায়। এমন সময় সে দেখতে পেল, দূরে আজীবা সেই কুঁজটার উপর উঠছে।

"কল"টার পুবে, ঢালু পাহাড়ের গায়ে ওদের ৩নং শিবির স্থাপন করা হল। প্রায় দশ ফুট বরফ সরিয়ে কয়েকটা বড় বড় খোঁড়ল তৈরি করা হল। সেইসব খোঁড়লের মধ্যে দুটো মাত্র তাঁবু খাটানো হল। একটা পুরনো আর্কটিক টেন্ট—দুজনের মত। আরেকটা হাই অলটিচিউড ডবল টেন্ট—চারজনের মত।

"কল"-এর দক্ষিণে নন্দাঘুণ্টি, উত্তরে রণ্টি। পূবে-পশ্চিমে লম্বা এই "কল"টার পশ্চিম দিকটা একেবারে ফাঁকা। রণ্টি আর নন্দাঘুণ্টির ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। কত নিচুতে আকাশ। দিলীপের মনে হল হাত বাড়ালেই আকাশ ছোঁয়া যায়! ১৮০০০ ফুট উপরে ওরা ৩নং শিবির স্থাপন করতে পেরেছে। আর মাত্র ২৭০০ ফুট বাকি।

আবহাওয়া এতক্ষণ সুন্দর ছিল। আকাশ নির্মেঘ। বেশ রোদ। হঠাৎ বেলা তিনটে থেকে হাওয়া বইতে শুরু করল। ধীরে ধীরে হাওয়ার বেগ বেড়ে উঠল। আজীবা, দা তেম্বো আর নরবু হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরে এল। দা তেম্বা, গুর্নাদিন আর আঙ ফুতার আর মুহূর্তমাত্রও বিলম্ব করল না। অতি দ্রুত ২নং শিবিরের দিকে যাত্রা করল।
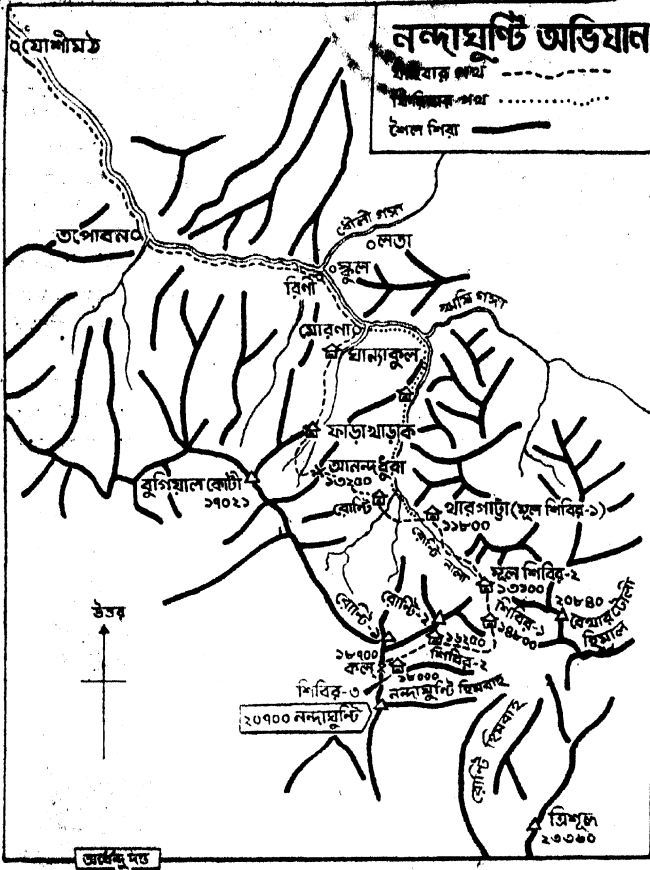
আকাশে মেঘ ছড়িয়ে পড়ল। আকাশ ক্রমশ ক্রুদ্ধ, কুটিল, ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করল। হাওয়ার বেগ বৃদ্ধি পেল। সাংঘাতিক শীত পড়ল। অভিযাত্রীদের হাড়ে হাড়ে যেন করাত চলছে। ওরা তাঁবুর ভিতর ঢুকে পড়ল। সুকুমারের দুর্ভাবনা বেড়ে গেল। মনে মনে ঠিক করল, আর দেরি করা নয়। যদি সুযোগ পায়, কাল, হ্যাঁ, কালকেই অভিযান চালাবে চূড়ায়।

"কল"-এর উপরে কোন আশ্রয় নেই। সতত বেগে হাওয়া বইছে। ওদের সংগে যে তাঁবু আছে, তা এত জীর্ণ যে, উপরে খাটাতে পারা যাবে না। হাওয়া, এই প্রচণ্ড হাওয়ার বেগ সহ্য করার ক্ষমতা এই তাঁবুগুলোর নেই। অতএব ৪নং শিবির স্থাপনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা ছাড়া গতি নেই। দিলীপ সুকুমারকে সমর্থন করল। আঙ শেরিংও।

এতক্ষণ শুধু হাওয়াই দিচ্ছিল। এবারে শুরু হল ব্লিজার্ড। হা হা করে খ্যাপা হাওয়া ছুটে এসে তাঁবু দুটোর গায়ে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা মারতে লাগল। সংগে সংগে তুষারের ঝাপটা। তাপমাত্রা হুহু করে নেমে আসতে লাগল।

সুকুমার আর দিলীপ আর্কটিক তাঁবুতে আর শেরপারা ডবল তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছে। ডবল তাঁবুটা তবু নতুন। ওর সহ্যক্ষমতাও বেশী। সুকুমারদের পুরনো তাঁবুর ফাঁক-ফোকর দিয়ে তুষার-কণা ঢুকে পড়ছে। ওরা প্রাণপণে গাঁজি মেরে মেরে ফাঁক বন্ধ করার চেষ্টা করছে। এমন সময় ঝড়ের প্রচণ্ড এক ঝাপটায় তাঁবুটা থরথর করে কেঁপে উঠল। এই বুঝি উড়ে যায়। দিলীপ আর সুকুমার রুকস্যাক, কিটব্যাগ তাঁবুর দেওয়ালে চাপা দিয়ে সে যাত্রা সামাল দিল। পরমুহূর্তেই তুষারঝড়ের আরেকটি প্রচণ্ড থাবায় তাঁবুর গোটাকতক দাঁড় পটপট ছিঁড়ে গেল। তাঁবু হেলে পড়ল। এই বুঝি উড়ে যায়। বিদ্যুৎ-গতিতে বিপদটা বুঝতে পেরে ওরা দুজনে তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল। হাওয়ার প্রচণ্ড গতির জন্য ওরা দাঁড়াতে পারল না। হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে তাঁবুর খুঁটোয় ছেঁড়া দড়িগুলো আবার শক্ত করে বেঁধে দিল। তুষারের গুঁড়োয় ওদের গা মাথা ঢেকে গেল। ঠাণ্ডায় বেশীক্ষণ বাইরে থাকতে পারল না। তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আবার তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ভাগ্য ভাল, অল্পক্ষণের মধ্যেই আবহাওয়া শান্ত হয়ে এল। ৫টার সময় টাসী খাবার তৈরি করে দিল। টিনের মাছ আর পোলাও। ওরা খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ল।

কিন্তু কারো চোখে ঘুম এল না। ও তাঁবুতে আঙ শেরিং সারা রাত ধরে গুন গুন করে প্রার্থনা করল। এ তাঁবুতে সুকুমার আর দিলীপ মোমবাতি জ্বালিয়ে খানিকক্ষণ গান গাইল। বীরেনদার গান—"জয় শিব শঙ্কর, জয় ত্রিপুরারি—"। জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখল কালকের জন্য। একটা তালিকা তৈরি করল নামের। যারা এই অভিযানে এসেছে, যাঁরা সাহায্য করেছেন, সমর্থন করেছেন,

তাঁদের নাম একখানা কাগজে লিখে ফেলল। যদি চূড়ায় উঠতে পারে, সেখানে রেখে আসবে এই নামের তালিকা।

সুরানার কথা মনে পড়ল। শেখরকিরণ সুরানা। এই উৎসাহী ছেলেটিকে ওরা দলে জায়গা দিতে পারেনি শেষ পর্যন্ত। মনে মনে সে ওদের সঙ্গেই আছে। লেখ ওর নাম। অমিতাভ আসতে পারেনি। ওর তুষার-গাঁইতি, স্লিপিং ব্যাগ, রুকস্যাক এসেছে। লেখ ওর নাম। ওরা লিখে চলল, অশোক-কুমার সরকার, উমাপ্রসাদ মুখার্জি, প্রবোধ-কুমার সান্যাল। সুবলদা, গোষ্ঠিপতি। মণি সেন। হিলারি। লেখ লেখ ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং, তেনজিং। না কারোর সঙ্গেই কোন বিরোধ নেই আমাদের। লেখ, যার নাম মনে আসে লেখ। সেই গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে, সেই প্রকম্পিত মোমের আলোয় নামের তালিকা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে লাগল। এক একটি মুখ ওদের চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। সবাই স্মিতহাস্যে যেন ওদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন, আশীর্বাদ করছেন... হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে, হে নির্ভয়...

ওদের মন থেকে সব ভয়, সব আশঙ্কা তিরোহিত হল। আর কিছু ভাবছে না ওরা। কিছু না, কিছু না, কিছু না।

"সাব, চা।"

ওরা চমকে উঠল। আরে, এ যে সকাল হয়ে এসেছে।

॥ আটচল্লিশ ॥

লেখকের দিনলিপি থেকেঃ

বেস ক্যাম্প, ২২শে অক্টোবর। সুন্দর আবহাওয়া। কালকের দুর্যোগের পর আজ এত সহজেই রোদ উঠবে ভাবিনি। সেই হিমালয়ের ঈগলটি আজ নানা কায়দায় খেলা দেখাচ্ছে। তন্ময় হয়ে তাই দেখছিলম। হঠাৎ এক আর্ত চীৎকার দিয়ে সে পালিয়ে গেল। ওর এমন তালভঙ্গ হল কেন? ও বাবা, আকাশের চেহারা যে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। তাই কি, ঈগলটা নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেল! দেখতে দেখতে দিনের আলো মৃতের মত বিবর্ণ হয়ে গেল। প্রচণ্ড শীত পড়ল। আকাশে সর্বনাশের ইঙ্গিত। তাঁবুর ভিতরে ঢুকে গেলাম। তাঁবু মানে ত্রিপলের ছাউনি। বেলা ১২॥টাও না। কিন্তু কী সাংঘাতিক শীত! স্লিপিং ব্যাগে ঢুকেছি। তাও কাঁপছি। উপরে ওরা কি করছে এখন? কিছু খবর আসছে না উপর থেকে।......

বীরেন সিংহের দিনলিপি থেকেঃ

অ্যাডভান্স বেস, ২২শে অক্টোবর। আঙ্কেল, পল্টন, গোরা সিং সকালেই ২নং শিবিরে বেরিয়ে গিয়েছে কাঠ, কেরোসিন তেল, চিনি, পিঁয়াজ নিয়ে। আমি, ডাক্তার আর নিমাই তাস পিটছি। ১১টা থেকে একটু একটু করে মেঘ জমতে শুরু করল। খাওয়া-দাওয়া সারার পর বরফ পড়তে শুরু করল। ভীষণ ঠান্ডা। ৩টা নাগাত মুষলধারে তুষার-পাত আরম্ভ হল। আমরা রান্নাঘরে আগুনের পাশে আশ্রয় নিলাম।......

গোরা সিং-এর বিবরণঃ

১নং শিবির। ২২শে অক্টোবর। ১নং শিবির পরিত্যক্ত। কেউ নেই। আমরা ভূতের বাড়ির মত এই জনশূন্য শিবিরের পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে গেলাম। ২নং শিবিরে। ১নংএ শুধু বরফ, বরফ আর বরফ।......

২নং শিবির। ২২শে অক্টোবর। বেলা ১১॥টা। মদন আর বিশ্ব সকাল থেকে পাঁচিলের উপর বসে আছে নন্দাঘুণ্টির দিকে চোখ রেখে। ওরা বলেছিল, আজ উঠবে চূড়ায়। দেখা যাক ওদের দেখা যায় কিনা? আবহাওয়া এতক্ষণ বেশ পরিষ্কার ছিল। নন্দাঘুণ্টির চূড়া ভালই দেখা যাচ্ছে। কোন পথ ধরে উঠবে ওরা?

বেলা ১২টা। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। এখনও নন্দাঘুণ্টির শরীরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কোন অভিযাত্রীরই দেখা নেই। বরফ পড়তে শুরু করল। প্রবল হাওয়া। বিশ্ব আর মদন ক্ষুণ্ণ মনে শিবিরে ফিরে এল। তুষার-ঝড় চলল কিছুক্ষণ। তার-পর আবার আবহাওয়া শান্ত হয়ে এল। কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হল না। জমাট মেঘে অন্ধ হয়ে থাকল আকাশ। তুষার-ঝড় থামতেই বিশ্ব আর মদন আবার ২নং শিবিরের সেই পাঁচিলটায় উঠে বসল।

বেলা ১॥টা। নন্দাঘুণ্টি পাহাড় মেঘে ঢেকে আছে। এখান থেকে কিছু দেখা যায় না। আর কতক্ষণ বসে থাকবে মদন আর

নন্দাঘুণ্টির উত্তর গিরিশিরা হইতে বেথারতলি হিমালের পশ্চাতে নন্দাদেবীর চূড়া
ফটো : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্ব? শীতে ওরা জমে যাচ্ছে। উদ্বেগে অস্থির হয়ে উঠেছে। ওরা কি আজ চূড়ায় অভিযান চালিয়েছে, নাকি এই দুর্যোগে বের হয়নি? আর যদি বেরিয়ে থাকে?......

এতক্ষণ মেঘ নন্দাঘুণ্টির গায়ে যেন জমাট বেঁধে ছিল। এখন, ওরা দেখল, মেঘ সচল হয়ে উঠেছে। বাতাসের ধাক্কায় মেঘ উঠছে, নামছে, কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। হঠাৎ মেঘের আবরণ এক জায়গায় ছিঁড়ে গেল। ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে নন্দাঘুণ্টির চূড়ার নিচেকার অনেকখানি জায়গা বিশ্ব আর মদনের চোখে ভেসে উঠল। সাদা বরফ আর তার গায়ে—

আরে ও কি? ওগুলো কি? ঐ কালো কালো বিন্দুগুলো? বিশ্বদেব দেখল। মদন দেখল। বিশ্ব চেঁচিয়ে উঠল। মদন চেঁচাল। দেখ দেখ, ঐ যে ওরা উঠছে। ওরা চূড়ার খুব কাছে গিয়ে পড়েছে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়। ছয়টা বিন্দু। নড়ছে। উঠছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভারি এক মেঘের যবনিকা ঝপ করে কে যেন ফেলে দিল। সে পর্দা আর উঠল না। নন্দাঘুণ্টি দৃষ্টির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। আর কিছু দেখা গেল না। কাউকে না।

বেলা ২৷৷টা। কিচ্ছু দেখা গেল না। শুধু মেঘ।

বেলা ৩৷৷টা। শুধু মেঘের কুণ্ডলী। আলো বিবর্ণ হয়ে আসছে।

বেলা ৪টা। নন্দাঘুণ্টি পূর্ববৎ অদৃশ্য। মেঘেরা ক্রুদ্ধ মল্লের মত পাঁয়তারা কষছে।

বেলা ৪৷৷টা। দৃশ্যের কোন পরিবর্তন নেই। কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না।

বেলা ৫৷৷টা। অন্ধকার নেমে এল। আর কিচ্ছু দেখার আশা করা বাতুলতা।

একরাশ উদ্বেগ নিয়ে মদন আর বিশ্বদেব তাঁবুতে গিয়ে ঢুকল।

৩নং শিবির। ২২শে অক্টোবর। সুকুমার চা খেয়ে জুতোর মধ্যে পা গলিয়ে দিল। আজ শু-কভারও পরল সে। তারপর তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। আঙ শেরিং, আজীবা, টাসী আর নরবু প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দিলীপ তখনও তাঁবুর ভিতরে। দুটো মোজা পরে বাঁ পায়ে জুতো গলাতে পারছে না। পা কষে ধরছে। নানাভাবে চেষ্টা করল দিলীপ। জুতোকে জুত করতে পারল না।

"দিলীপ, আয়।" সুকুমার ডাকল। "দেরি করছিস কেন?"

দিলীপ এবার অধৈর্য হয়ে উঠল। তারপর ধুত্তোর বলে নিতান্ত গোঁয়ারের মত এক কাজ করে বসল। একটানে একটা মোজা বাঁ পা থেকে খুলে ফেলল। তারপর একটা মোজা পরেই জুতোর মধ্যে বাঁ পা গলিয়ে দিল। সু-কভার বাঁধল। ক্যামেরা ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। ওরা আজ ক্র্যাম্পনও পরেছে।

বেশ সুন্দর আবহাওয়া। আকাশ একেবারে পরিষ্কার। রোদ ফুটেছে। সুকুমারের মনটা খুশিতে নেচে উঠল। টাসী, আজীবা আর নরবু আগে বেরিয়ে গেল। আজ কারো কাছেই বিশেষ বোঝা নেই। প্রথম দলটা "কল"-এর উপর উঠল, তারপর এদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

এবার সুকুমাররা যাত্রা করল। প্রথমে আঙ শেরিং, তারপর সুকুমার, পিছনে দিলীপ। দশ মিনিটের মধ্যেই ওরা "কল"-এর উপরে পেঁছে গেল। হাওয়া নেই। চলতে ফুর্তিই লাগছে। "কল"-এর পশ্চিম দিকটা একেবারে ফাঁকা। ওদিকে যে-সব পাহাড় আছে, তাদের কারোরই চূড়া "কল"-এর উপরে ওঠেনি। পাহাড়গুলোকে কত ছোট ছোট দেখাচ্ছে। "কল"টা এত উঁচু যে, নিচু দিকে চাইলে মাথা ঘুরে যায়। অনেক দূরে পাহাড়পর্বতের ফাঁক দিয়ে একটা হ্রদ দেখা যাচ্ছে। ওদের মনে হল, কেউ যেন এক কাপ জল রেখে দিয়েছে।

দক্ষিণে নন্দাঘুণ্টির গিরিশিরা। টাসী, আজীবা আর নরবুকে দেখা গেল। ওরা পাহাড়ের গায়ে গজাল পুঁতে তার সঙ্গে দড়ি খাটিয়ে খাটিয়ে পথ বানিয়ে চলেছে। আজ শুরু থেকেই ওরা দড়ি বেঁধে চলেছে। এক দড়িতে টাসী, আজীবা আর নরবু, অন্য দড়িতে আঙ শেরিং, সুকুমার আর দিলীপ। দিলীপকে ছবি তুলতে হচ্ছে, তাই সে আছে সবার পিছে।

ওরা নন্দাঘুণ্টির উত্তর গিরিশিরার পূব দিকের পথ ধরে উঠতে আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে প্রথম কুঁজটার নিচে এসে পেঁছাল। পথটা এত খাড়া, এক দিকে আবার অতল-স্পর্শ খাদ যে, টাসীরা এ পথে দড়ি খাটিয়ে অর্থাৎ "ফিক্সড রোপ" করে গিয়েছে।

সুকুমাররা নিজের নিজের দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে সেই ফাঁসের সঙ্গে ক্যারাবিনা দিয়ে ফিক্সড রোপ যুক্ত করে দিলে। তারপর বাঁ হাতে ক্যারাবিনা ধরে ধীরে ধীরে সেই ভয়াবহ খাড়া কুঁজের গা বেয়ে উঠতে লাগল। ওদের আন্দাজ সেই কুঁজটার উচ্চতা ৭০০ ফুট হবে। চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে। একেবারে সরাসরি উঠতে দম বেশী লাগে। তাই ওরা

একটু এ'কেবে'কে চলতে লাগল। চলার গতি ক্রমশই মন্থর হয়ে আসছে। হাঁফ ধরছে বেজায়। তৃষ্ণা পাচ্ছে। গলা বুক শুকিয়ে আসছে।

ধীরে ধীরে ওরা এই কুঁজটার উপরে উঠল। দেখল আজীবা, টাসী আর নরবুও পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়েছে। ওরাও বসে পড়ল। এই ৭০০ ফুট চড়াইটা উঠতে ওদের সময় লাগল পুরো আড়াই ঘণ্টা। অনেকক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর ওরা যখন আবার উঠতে শুরু করল, তখন ধীরে ধীরে আকাশে মেঘ জমতে আরম্ভ হয়েছে। ওরা সেদিকে চাইল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না। আরও ৪০০ ফুট উঠল। বেলা তখন ১২টা।

সামনে, দূরে, বেথারতলির পিছন দিয়ে নন্দাদেবীর সূচীতীক্ষ্ম শিখর একটু একটু করে প্রকট হয়ে উঠছে। নন্দাদেবীর মাথায় মেঘ জমছে। দিলীপ ফটো নিল। উত্তর দিকে রণ্টি পাহাড় দেখা যাচ্ছে। রণ্টি হিমবাহটাকে মনে হচ্ছে বরফের নদী। দুধের নদীও বলা যায়। পূব দিকে এর আগে বিশেষ কিছু দেখা যায়নি। এবারে বিরাট এক ফাটল দেখা গেল। নিমাই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, এমন জায়গাতে বিরাট বড় এক ফাটলের দেখা মিলবে। কি আশ্চর্য, তার কথা হুবহু মিলে গেল। দিলীপ থেমে থেমে ফটো তুলছে। আঙ শেরিং বারবার ওকে তাড়া লাগাচ্ছে। এত দেরি করলে পৌঁছাতে পারা যাবে না।

আবার ওরা ভসভসে নরম বরফে এসে পড়ল। এতক্ষণ দুটো দড়ি আলাদা আলাদা যাচ্ছিল, এখান থেকে ওরা দুটো দড়ি এক-সঙ্গে জুড়ে নিল। এবার ওরা ছয়জন এক-সঙ্গেই চলতে লাগল। প্রথমে যাচ্ছে টাসী, তারপর আজীবা, তারপর যথাক্রমে নরবু, আঙ শেরিং, সুকুমার আর দিলীপ। আজীবা টাসীর পিছনে থাকলেও সেই প্রকৃতপক্ষে আজ পথ দেখাচ্ছে। আজীবার মত এত ভাল আর বুঝি কেউ বরফ চেনে না। আজীবার নির্দেশেই টাসী পথ বানিয়ে চলেছে।

ওরা আবার বিশ্রাম নিতে বসল। দিলীপ একাগ্র মনে ফটো তুলতে লাগল। সে নিচের দিকে চেয়ে ২নং শিবির দেখতে পেল না বটে, তবে আশেপাশের জায়গাগুলো চিনতে পারল।

আপন মনে ছবি তুলে যাচ্ছিল দিলীপ। অন্য সবাই বিশ্রাম নিচ্ছিল। এমন সময় কান-ফাটানো প্রচণ্ড এক শব্দ শূন্য আকাশ থেকে ওদের মাথায় ভেঙে পড়ল। দিলীপের পিলে চমকে গেল। হাত থেকে ক্যামেরা ছিটকে গেল। ভাগ্যিস, ক্যামেরাটা গলায় ঝোলানো ছিল, না হলে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যেত।

ধক-ধক বুকে হাত চেপে দিলীপ নিজেকে সামলে নিল। তারপর আকাশের দিকে চাইল। ততক্ষণে অন্য সকলেও আকাশে চোখ তুলেছে। ওরা মুহূর্তের মধ্যে দেখল, ভারতীয় বিমানবাহিনীর একখানা জঙ্গী জেট বিমান ছোঁ মেরে ওদের দেখে নিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। ওরা কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলারও অবকাশ পেল না। সঙ্গে সঙ্গে এক রাশ ধোঁয়া, জেট বিমানের ধোঁয়া, তার পিছনে কুটিল কালো মেঘের দল, তার পিছনে তীব্র গতি তুষার-ঝটিকা সবেগে ওদের আঘাত করল। এই তীব্র, হিংস্র, অপ্রত্যাশিত আক্রমণে অভিযাত্রীরা কয়েক মুহূর্তের জন্য বিমূঢ়, বিহ্বল হয়ে পড়ল। আত্মরক্ষার কথাও যেন ভুলে গেল সব।

রণ্টি পর্বত — ফটো : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

অবশেষে সংবিৎ ফিরে আসতেই সুকুমার নির্দেশ দিল, "শুয়ে পড়, শুয়ে পড়, বরফে মুখ গুঁজে শুয়ে পড় সব, জলদি।"

মুহূর্তমাত্রও বিলম্ব না করে সকলে নেতার নির্দেশ পালন করল। তারপর পনের মিনিট ধরে চলল তুষার-ঝড়ের অবর্ণনীয় তাণ্ডব। সুকুমারের মনে হল, নরক বুঝি জেগে উঠেছে। নিস্তার পাওয়া শক্ত। তাপ-মাত্রা হুহু করে নেমে যাচ্ছে। শরীরের অস্থিমজ্জায় শীত যেন ঢুকে পড়ছে। চোখ-মুখে তুষারঝড়ের হিংস্রতম ঝাপটা এসে লাগছে। মুখের গালের অনাবৃত অংশের চামড়া বুঝি ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে!

পনের মিনিটের মধ্যেই হাওয়ার বেগ কমে এল। শুরু হল তুষারপাত। দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে এল। ২০।২৫ ফুটের বেশী আর দৃষ্টি চলে না। ওরা এবার উঠে বসল। সুকুমার বোধ করল, তার পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সে গ্রাহ্য করল না।

আজীবা আর আঙ শেরিং দুজনেই পোড়-খাওয়া শেরপা। ওদের চোখে আশঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে এল। আবহাওয়ার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল। বাহাৎ খতরনাক হ্যায়। হিসেব করে দেখল এখনও ১৬০০ ফুট উঠতে হবে তারপর ২৭০০ ফুট নামতে হবে। এই দুর্যোগে। সাবুরা নতুন লোক। যদি ফিরতে না পারে? তা হলে অবধারিত মৃত্যু। মৃত্যু যদি নাও হয়, বড় রকমের ক্ষতি হতে পারে। অতএব—

আঙ শেরিং পরামর্শ দিল, ফিরে যাওয়াই ভাল।

আজীবা পরামর্শ দিল, ফিরে চল সাব।

নরবু এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। প্রৌঢ় শেরপা পেম্বা নরবু। সে বরাবরই চুপ করে থাকে। এতদিনের মধ্যে একটা কথাও তার মুখ থেকে কেউ শোনেনি। হঠাৎ সে মুখ খুলল।

বলল, "শুনো সাব, বাঙালকা ইজ্জৎ তুমহারা হাত মে হ্যায়। উঠো, চলো উপর, আগ্‌ বাঢ়। বাঙালকা ইজ্জৎ বচানেকে লিয়ে হামলোগ জান দেনে কে লিয়ে তৈয়ার হ্যায়।"

সুকুমারের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল। সে দ্বিরুক্তি না করে উঠে দাঁড়াল।

বলল, "উপরে চল।"

দিলীপের বুক ফেটে যাচ্ছে, সুকুমারের বুক ফেটে যাচ্ছে। আজীবা, আঙ শেরিং, টাসী, এমন কি নরবুও কাহিল হয়ে পড়েছে। জল চাই এখন, এক ফোঁটা জল। না হলে দিলীপ বুঝি মরেই যাবে। অনেকখানি উঠে এসেছে ওরা। প্রায় ২॥টা বাজে। দিলীপ দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর একটা পায়ের আঙুলে যন্ত্রণা হচ্ছে। না, এবার একটু জল খাবে সে। দিলীপ চট করে জলের বোতল খুলে গলায় উপুড় করে ঢেলে দিল। কিন্তু এ কী, এক ফোঁটা জলও তার গলায় পড়ল না। অথচ বোতলে জল ভর্তি। দিলীপ দেখল বোতলের জল ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে গিয়েছে।

(আগামীবারে সমাপ্য)
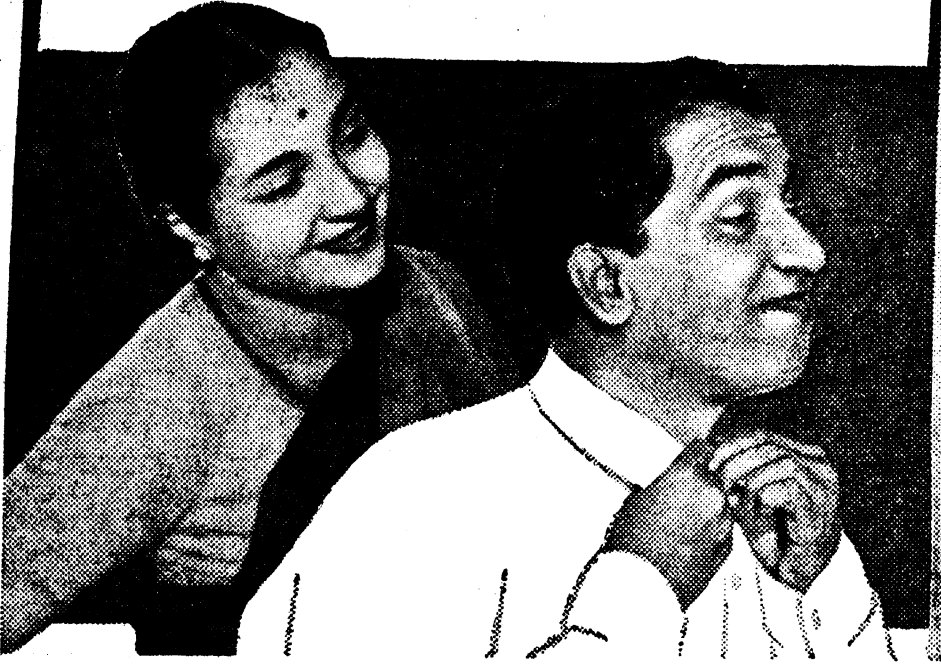
(৩৩)

সেই যে মর্গ থেকে বেরিয়ে এল সরোজ তারপর থেকে সারাক্ষণ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, বিশেষ কারুর সঙ্গে কথা বলে না। লীলার মনের অবস্থা আরও খারাপ, বার বার সে নিজের উপর দোষারোপ করছে আর কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে বসে আছে। ইতিমধ্যে বার দুই সে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল। অগত্যা ওদের দুজনের কাছে অমিতাভকে রেখে সোরেনকেই বেরুতে হল অন্য সব কাজ সারার জন্যে। হাসপাতাল থেকেই ফিউনারাল এজেন্টের ঠিকানা বলে দিয়েছিল। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে তারা মর্গ থেকে মৃতদেহ নিয়ে চলে গেল নিজেদের অফিসে। কিন্তু জানাল ক্রিমেটোরিয়ামে জায়গা পাওয়ার অসুবিধা আছে। তার জন্য দু' তিন দিন সময় লেগে যায়। সে ক'দিন অবশ্য মৃতদেহ তাদের জিম্মায় থাকবে।

সোরেন তাদের বিশেষ করে অনুরোধ করল যাতে তাড়াতাড়ি পোড়ানোর ব্যবস্থা করা যায়। জানাল যে ভারতীয় হাই কমিশনারের লোক, বিদেশে এসে এই বিপদে পড়েছে, তাদের কথা যেন বিশেষ করে চিন্তা করা হয়।

সোরেনের চেষ্টায় ঠিক হলো পরের দিন দুপুর বেলা ক্রিমেটোরিয়ামে প্রমীলার শেষ-কৃত্য সম্পন্ন হবে। নির্ধারিত সময়ের কিছু আগে তারা চারজনে গিয়ে হাজির হলো ক্রিমেটোরিয়ামের দরজায়। ট্যাক্সি থেকে নেমে গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ে ছোট একটা গির্জে। তখন সেখানে অন্য কোন মৃতের সংকারের জন্য খৃস্টান মতে মন্ত্রপাঠ হচ্ছিল।

পাশের দালানে থরে থরে ফুল সাজানো রয়েছে। সম্প্রতি যারা মারা গেছে, যাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ফুল পাঠিয়েছে, নাম লিখে লিখে সাজিয়ে রাখা হয় এখানে।

একটু পরে এলেন হাসপাতালের ডাক্তার। পরনে তাঁর স্ট্রাইপড্ ট্রাউজার, কালো টেল কোট, কালো টুপি, কালো টাই। শোকের বেশ।

ফিউনারাল এজেন্টের লোক এসে জানালো এবার তাদের গির্জার ভেতরে যেতে হবে। নিঃশব্দে তারা হলের মধ্যে ঢুকলো। কয়েক সারি বেঞ্চি পাতা। একেবারে সামনের সারিতে তারা গিয়ে দাঁড়ালো। খানিকটা জায়গা ছেড়ে একটা বেদী, তার উপরে উঁচু টেবিল, সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। ডান দিকে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা প্ল্যাটফরম যেখানে ধর্মযাজকরা এসে দাঁড়ান।

দেওয়ালের দরজা আপনা হতে খুলে গেল, সেখান থেকে সোজা বেরিয়ে এলো একটা কফিন। রইল বেদীর উপরের সেই উঁচু টেবিলেতে। ক্রিমেটোরিয়ামের কালো পোশাক পরা কর্মচারী খুলে দিলে কফিনের ডালা। প্রমীলা শুয়ে রয়েছে। সাদা ফুল দিয়ে সাজানো, মুখখানা শুধু দেখা যাচ্ছে।

পাশের প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালেন হিন্দু ধর্মযাজক। ইনি ভারতীয় কিন্তু অবাঙালী। প্রমীলার আত্মার সদ্গতির জন্য বৈদিক মন্ত্রপাঠ করলেন। লীলাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করলো।

পুরোহিত একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে লীলার হাতে দিলেন। সে প্রমীলার মুখের কাছে প্রদীপের আলো দেখিয়ে তাকে প্রদক্ষিণ করে নেমে এলো। কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা। সকলেই মনে মনে প্রার্থনা করলো।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ায় কফিনের ডালা বন্ধ করে দেওয়া হল। আপনা হতে তা চলে গেল পাশের ঘরে। উপর থেকে দরজা নেমে এলো।

আর কিছু করার ছিল না। ভারাক্রান্ত মনে সকলে হোটেলে ফিরে এলো। তখন অপরাহ্ন অতিক্রম করতে চলেছে।

আরও একটি বিনিদ্র রজনী কাটলো হোটেলে।

পরদিন সকালে সোরেনকে আবার যেতে হলো ক্রিমেটোরিয়ামে। ছাই আনতে। পুরো ছাই নিয়ে নিলে পয়সা লাগে না। তবে অল্প একটু নিলে বাকি ছাইটার গতি করার জন্য মূল্য ধরে দিতে হয়।

একটা বাক্স করে ছাই নিয়ে সোরেন ফিরে এল।

দুপুরে ওরা লণ্ডনের গাড়ি ধরলো।

কেউ কারো সংগে কথা বলছে না। সকলের মনেও আজ এক চিন্তা, মাত্র ক'দিন আগে প্রমীলার জন্যে দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে তারা কার্ডিফে এসেছিল, কিন্তু মনে আশা ছিল তাকে সুস্থ দেখে ফিরবে, ভেবেছিল ক'দিন বাদে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু আজ সবরকম চিন্তাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা ফিরছে। প্রমীলা একলা চলে এসেছিল কার্ডিফে, একলাই সে এখানে রয়ে গেল। আর কোনদিন ফিরে আসবে না। ভাগ নেবে না তাদের হাসিকান্নার, সুখ-দুঃখের।

সরোজের মনে পড়ল প্রমীলা বলত, এ পৃথিবীতে সে সম্পূর্ণ একা। তার আপনার বলতে কেউ নেই।

প্রশ্ন জাগল, মৃত্যুর পরেও কি সে ঐ একই কথা ভাববে?

সোরেনের হাতে ছাইয়ের বাক্স। প্রমীলার নশ্বর দেহের অবশিষ্ট। চিরন্তন দার্শনিক চিন্তা সোরেনকে আচ্ছন্ন করে ফেললো, এই তো জীবনের পরিণতি। মানুষের এত দম্ভ, এত অহংকার সব একদিন এইভাবে শেষ হয়ে যায়। নিজের অজান্তে আশ্রয় নেয় স্মৃতির পাতায়। তবে কি সত্যিই জগৎ মিথ্যা, জীবন মায়া?

কে এ প্রশ্নের উত্তর দেবে?

দ্রুতগতিতে ট্রেন তখন এগিয়ে চলেছে লণ্ডনের দিকে।

নদীর বুকে ঝড় ওঠার সম্ভাবনা দেখলে মাঝিরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, পাল নামিয়ে ফেলে। নৌকাকে টেনে নিয়ে যায় পারের দিকে। কিন্তু যে মাঝি পাল খুলে দেবার সুযোগ পায় না, মাঝ-নদীতে খরস্রোতের মধ্যে পড়ে যায়, অতি দ্রুত গতিতে ছুটতে ছুটতে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে কোথায় সে চলে যায় কে তার খবর রাখে।

কার্ডিফ থেকে ফেরার পর সোরেনও ঠিক ওইরকম পথ-হারানো পথিকের মত নিরুদ্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। নৈরাশ্যবাদের তীব্র স্রোত তার অজান্তে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল হতাশার কিনারায়। চিরন্তন প্রশ্নগুলি নতুন করে সোরেনকে নাড়া দিল। এ জীবনের অর্থ কি? মানুষের গড়া সমাজ সংসার কি মিথ্যা নয়? যে প্রেম ও প্রীতির আমরা এত বড়াই করি তার কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে? মৃত্যুর সংগে সংগেই জীবনের শেষ হয়ে গেল? পরলোক এবং আত্মার অবিনশ্বরতায় কি বিশ্বাস করা সম্ভব? তা হলে কি জন্মান্তরবাদ সত্য?

এসব চিন্তার কোন খেই পেল না সোরেন। একটা থেকে আর একটা অসংলগ্ন চিন্তা। কিন্তু আর যেন লণ্ডনের আগের জীবনের সংগে সোরেন কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারল না।

প্রথম দিন তার চোখ মুখ দেখেই এলিজাবেথ বিস্মিত হয়েছিল। প্রশ্ন করেছিল, কি হয়েছে সোরেন? তোমাকে একেবারে বিবর্ণ দেখাচ্ছে।

উত্তর দিতে গিয়ে সৌরেন কেঁদে ফেলেছে, প্রমীলা মারা গেছে লিজি।

সৌরেন যে প্রমীলার সঙ্গে দেখা করতে গেছে এ কথা এলিজাবেথের জানা ছিল না। গ্রাম থেকে ফিরে এসে মিসেস হেরিং-এর কাছে খবর পেয়েছিল, সৌরেন কোথাও বাইরে গেছে এই পর্যন্ত মাত্র। তাই হঠাৎ প্রমীলার মৃত্যুসংবাদে এলিজাবেথও কম বিচলিত হয়নি। চেঁচিয়ে উঠেছে, না, না, তা কি করে সম্ভব?

সৌরেনের মুখে সব কথা শুনে প্রমীলার জন্যে সে দুঃখ পেয়েছে, লীলার জন্যে সমবেদনা প্রকাশ করেছে, সৌরেনকে সান্ত্বনা দিয়েছে।

কিন্তু কয়েকদিন যাবার পর সৌরেনের আচরণ কেমন যেন তার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হতে লাগল। এতখানি দুর্বলতা একজন পুরুষমানুষের শোভা পায় না। সৌরেন আজকাল ঘুম থেকে ওঠে দেরিতে, অফিস যায়, কিন্তু কাজ করে না। টেবিলের উপর স্তূপীকৃত ফাইল জমা হয়েছে। তারই সামনে চুপচাপ বসে থাকে। ছুটির পর গ্রীন পার্কে গিয়ে খানিকটা হাঁটে, বেশীর ভাগ দিন একলা। প্রথম প্রথম তার মন ভাল রাখার জন্যে এলিজাবেথ ওর অফিসে এসেছে, একসঙ্গে দুজনে বেড়াতে বেরিয়েছে, কিন্তু সৌরেন বিশেষ কথা বলত না, চুপচাপ হাঁটত। পার্কের বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে এলিজাবেথ একদিন না বলে পারেনি, তুমি যে এতখানি সেণ্টিমেণ্টাল, আমি জানতাম না সৌরেন।

সৌরেন দার্শনিকের মত উত্তর দিয়েছে, মানুষ তো কতগুলো সেণ্টিমেণ্টের সমষ্টি বই আর কিছু নয় লিজি।

—তাই বলে ভাবপ্রবণতার বশে তুমি জীবনকে উপেক্ষা করবে?

—কোনটা জীবন আর কোনটা জীবন নয় তাই তো বোঝবার চেষ্টা করছি।

এলিজাবেথ আবেগভরা গলায় বলেছে, তুমি কি বুঝতে পারছ না তোমার চিন্তার সূত্রগুলোয় জট পাকিয়ে যাচ্ছে?

সৌরেন মৃদু হেসেছে, তুমি যেটাকে ভাবছ জট-পাকানো চিন্তা, কে বলতে পারে সেইটেই চিন্তারাজ্যের প্রথম সোপান কিনা? এতদিন যা ভেবেছি সবই হয়ত ভুল, এখন যা ভাবছি সেইটাই ঠিক।

হতাশ হয়ে এলিজাবেথ নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। সৌরেনকে সে এখন একলা ছেড়ে দেয়, সে জানে অফিসের পর সৌরেন একলা কিছুক্ষণ মাঠে বেড়ায়, তারপর চলে যায় লীলার ফ্ল্যাটে। সেখানে আসে সরোজ, আসে অমিতাভ, চারজনে চুপচাপ বসে থাকে। বিশেষ যে কথা হয় তা নয়, কিন্তু চারজনই অনুভব করে তারা একই ব্যথার ব্যথী। তাদের অন্তরের বেদনার কথা অন্যেরা বুঝতে পারবে না। তাই সকলের কাছ থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র করে নিয়ে এই প্রায়-অন্ধকার ঘরে তারা সন্ধ্যেটা কাটায়।

এই সময়টির জন্যে সৌরেনরা যেন সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে। কেন জানা নেই তাদের মনে হয় প্রমীলার আত্মাও তাদের কাছে আসে। এই ঘরে প্রমীলা কতদিন কাটিয়েছে, তার স্মৃতিতে ভরা এই ফ্ল্যাট। তার ব্যবহৃত জিনিসপত্র চারদিকে ছড়ানো, ওদের মনে হয় তাদের বসিয়ে রেখে প্রমীলা যেন পাশের ঘরে গেছে, যেন চায়ের জল বসিয়ে গুনগুন করে গান করছে, একটু বাদেই যেন প্রসাধন সেরে হাসিমুখে এসে ঢুকবে।

প্রতিটি সন্ধ্যা তারা প্রমীলার অস্তিত্ব অনুভব করে, প্রতিটি সন্ধ্যা তার জন্যে প্রতীক্ষা করে বসে থাকে। তারপর এক সময় ঐ ফ্ল্যাটেই খাওয়া পর্ব চুকিয়ে যে যার বাড়ি ফিরে যায়।

একদিন রাত্রে লীলার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরছিল সৌরেন আর সরোজ। অন্ধকার রাস্তা, পাশাপাশি তারা হাঁটছে। সৌরেন ইতস্তত করে বলে, সরোজদা, একটা কথা বলব?

সরোজ চলতে চলতে জিজ্ঞেস করল, কি কথা সৌরেন?

—আমি ভাবছিলাম একদিন প্ল্যানচেটে বসলে হয় না?

সরোজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ওসবে আমার কোন বিশ্বাস নেই।

—তবু দেখতে দোষ কি? যদি প্রমীলার কিছু বলবার থাকে!

—না সৌরেন, ও থেকে আবার নতুন কোন বিপত্তি দাঁড়ায় কে বলতে পারে? আমার তো লীলার জন্যে ভয় করছে, বেচারী একলা থাকে ঐ ফ্ল্যাটে। ভালয় ভালয় জাহাজে তুলে দিতে পারলে বাঁচি।

সৌরেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, তা হলে থাক।

দিন দুই পরের ঘটনা। সবে তখন এলিজাবেথের তন্দ্রার ভাব এসেছে, এক বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ সেরে বাড়ি ফিরতে তার রাতই হয়েছিল, একটা আর্ত চিৎকারে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হল পাশের ঘরে সৌরেন যেন চেঁচাল। ধড়মড় করে উঠে পড়ে গায়ে ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে করিডোরে বেরিয়ে এসে, সৌরেনের দরজায় টোকা মারল। চাপা গলায় ডাকল, সৌরেন, দরজা খোল।

সৌরেন দরজা খুলতে তার ফ্যাকাশে চোখ মুখ দেখে ভয় পেল এলিজাবেথ।

—শরীর খারাপ লাগছে নাকি? কি হয়েছে?

সৌরেন তখনও আতঙ্কগ্রস্ত, চেয়ারের উপর বসে পড়ে বলল, আমি ঠিক বুঝতে

পারছি না এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম, না নিজের চোখে—

—কি দেখেছ সৌরেন?

সৌরেনের কণ্ঠস্বর অন্যরকম শোনায়, আমার মনে হল প্রমীলা এই ঘরে এসেছে।

—প্রমীলা? এলিজাবেথ বিস্মিত না হয়ে পারে না, কি বলছ সৌরেন?

—বিশ্বাস কর লিজি, ঠিক তুমি যে রকম আমার সামনে বসে রয়েছে, মনে হল প্রমীলাও সেইরকম আমার কাছে এসেছে।

—কি বলল সে?

সৌরেন ভাববার চেষ্টা করে বলে, আমি ঠিক শুনতে পাইনি। কিন্তু বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। মার্বেলের স্ট্যাচুর মত সাদা, ঠাণ্ডা, পবিত্র।

এলিজাবেথ সৌরেনের কাছে এসে বুঝিয়ে বলে, তুমি স্বপ্ন দেখছিলে সৌরেন।

সৌরেন অন্যমনস্ক গলায় বলে, স্বপ্ন? হয়ত তাই। কিন্তু জান লিজি, আমরা বিশ্বাস করি মৃত্যুর পরও আত্মা বেঁচে থাকে। তার সুখ দুঃখ সব থাকে।

—ওসব কথা ভেবে কি লাভ সৌরেন? জন্ম আর মৃত্যু জীবনের এই দুটো মাত্রা, একটা শুরু আর একটা শেষ, এর আগে-পরের কথা নাই বা আমরা ভাবলাম।

সৌরেন ঘন ঘন মাথা নাড়ে, আমি কিন্তু মনে শান্তি পাচ্ছি না। বড় কষ্ট হয়, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ হয়ে যাবে।

এলিজাবেথ এবার দৃঢ়স্বরে বলে, এবার তোমাকে শক্ত হতেই হবে সৌরেন। তুমি যে ক্রমশ চোরাবালির উপর পা দিয়ে হাঁটবার চেষ্টা করছ। বুঝতে পারছ না কোথায় তলিয়ে যাবে। এখন তোমাকে নিজের কথা ভাবতে হবে, আমার কথাও খানিকটা ভাবতে হবে বইকি। নতুন করে আমরা সংসার পাততে যাচ্ছি, সুখদুঃখ হাসিকান্না আমাদের জীবনেও আসবে। যাই আসুক, ভয় পেলে তো চলবে না।

সৌরেন বিহ্বলভাবে এলিজাবেথের কথাগুলো শুনছিল, অন্যমনস্ক স্বরে উত্তর দিল, তোমাকে আমি ভালবাসি লিজি।

এলিজাবেথ হেসে বলে, তা তো আমি জানি। কিন্তু এবারে আমাদের প্ল্যান করা দরকার।

সৌরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল, প্ল্যানের কি দরকার আছে? তুমি যা বলবে তাই হবে।

এ শুধু একদিনের ঘটনা নয়, দিনের পর দিন দুজনের মধ্যে এই ধরনের কথা চলতে লাগল। যুক্তিবাদী এলিজাবেথ কিছুতেই বুঝতে পারল না কেন সৌরেন অসহায়ভাবে স্রোতের মুখে পড়া খড়কুটোর মত ভাবপ্রবণতার বেগে ভেসে চলেছে। কেন সে চেষ্টা করেও নিজেকে সংযত করতে পারছে না।

প্রায় সপ্তাহখানেক সৌরেনের সংগে এলিজাবেথের আর দেখা হয়নি। কখন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, কখন ফেরে, কোন হদিসই পাওয়া যায় না। এমন কি শনি রবিবার দুটো ছুটির দিনও সৌরেন বাইরে কাটালো। অবশ্য খবর করলে তাকে নিশ্চয় পাওয়া যেত লীলা বা সরোজের ফ্ল্যাটে, কিন্তু এলিজাবেথের সে ইচ্ছা করলো না।

সারা সপ্তাহটা এলিজাবেথ অফিসের পর বাড়িতে বসে কাটিয়েছে, অপেক্ষা করেছে সৌরেনের জন্যে, কিন্তু দেখা পায়নি। শনিবার সকাল বেলাতেও যখন সৌরেন তার সংগে দেখা না করে বেরিয়ে গেল এলিজাবেথ মনে মনে বিরক্ত না হয়ে পারলো না।

এগারটা নাগাদ সেজেগুজে এলিজাবেথ খেতে বেরল। আজ সে সৌরেনের উপর রেগে গিয়ে শাড়ি পরেনি, অনেকদিন বাদে পরল ইউরোপীয়ান ড্রেস। আয়নার সামনে নিজেকে দেখে তার অন্যরকম মনে হল। এলিজাবেথ মনে মনে ঠিক করেছিল 'সেল্‌ফ্রিজে'র দোকানে যাবে। ঐ বিরাট দোকানটায় ঘুরে বেড়াতে তার ভাল লাগে। নানারকম জিনিস দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যেন সময় কেটে যায়।

'সেলফ্রিজে'র দোকানে ঢুকে এলিজাবেথ সোজা চলে গেল রান্না করার সাজ-সরঞ্জাম যেখানে পাওয়া যায় সেই ডিপার্টমেন্টে। তরকারি কাটার সুবিধের জন্যে নিত্য নতুন ধরনের কল বেরয়, এখানকার কাউন্টারে তা সাজানো থাকে, এলিজাবেথ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেগুলো দেখছিল।

হঠাৎ তার নজর পড়ল একেবারে ডান দিকের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা একটি দীর্ঘাঙ্গী মেয়ের উপর। টুপির জন্যে তার মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, তবু এলিজাবেথের মনে হল মেয়েটি তার পরিচিত। অন্যমনস্কভাবে এগিয়ে যেতে যেতে এক সময় মেয়েটির বেশ কাছাকাছি গিয়ে হাজির হল এলিজাবেথ। মেয়েটি পিছন ফিরে দোকানীর সংগে আলাপ করছিল, তাই বোধ হয় এতক্ষণ এলিজাবেথকে দেখতে পায়নি। এলিজাবেথ আরও ভাল করে দেখবার চেষ্টা করল। আশ্চর্য, হুবহু। হঠাৎ লণ্ডনে আসবে কি করে? এ নিশ্চয়ই অন্য কেউ।

মেয়েটি একবার ফিরে তাকাল। কিন্তু এলিজাবেথকে চেনে বলে মনে হল না। দোকানের সংগে কথা শেষ করে অন্য দিকে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল।

কয়েকটা ছোটখাট জিনিস কিনে এলিজাবেথ 'এস্‌কেলিটার' ধরে ওপরে উঠে গেল। 'সেল্‌ফ্রিজে' এলে একবার করে অন্তত বাচ্চাদের খেলনা সাজানো ঘরটা ঘুরে যায়। কত দামী খেলনা, কি নিখুঁত, কি সুন্দর। খেলনা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিল এলিজাবেথ। হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বরে সে ঘাড় ফিরে তাকাল। অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে নীচের ঘরে দেখা সেই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি। এলিজাবেথ সোজা তার দিকে এগিয়ে গেল। চোখাচোখি হতে মনে হল মেয়েটি কেমন যেন বিব্রত বোধ করছে। চট করে ঘর থেকে সরে যাবার চেষ্টা করল। কৌতূহল বেড়ে গেল এলিজাবেথের, সেও পেছন পেছন চলল। একটা নির্জন করিডোরে দুজনের দেখা হতেই এলিজাবেথ প্রশ্ন করল, ডোরিয়া না?

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়ে কঠিন স্বরে বলল, কেন তুমি আমাকে বিরক্ত করছ?

এলিজাবেথ থতমত খেয়ে যায়, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম আমার এক বান্ধবী, ডোরিয়া।

মেয়েটি আগের মতই বলল, আমার নাম ডোরিয়া।

এলিজাবেথ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে,
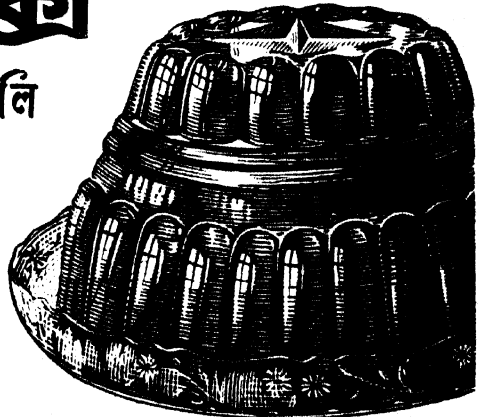
তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি এলিজাবেথ!

ডোরিয়া অপেক্ষাকৃত নরম গলায় বলল, তুমি যে ডোরিয়ার কথা ভাবছ, সে ডোরিয়া আমি নই।

—তার মানে?

—কেন, দেখে মনে হচ্ছে না, আমি অন্য লোক?

এলিজাবেথ অবশ্য লক্ষ্য করেছিল ডোরিয়ার সাজপোশাক আগের মত নেই, সে আজকালকার ফ্যাশানের ঘননীল রঙের ব্লাউজ আর স্কার্ট পরেছে। চুলেও কায়দা করেছে যথেষ্ট। আগে তার সাজপোশাক ছিল একেবারে মামুলী ধরনের।

এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করে, লণ্ডনে তুমি কবে ফিরছ?

—প্রায় এক সপ্তাহ হল।

—জয় কোথায়?

—সে আসেনি।

কথাগুলো কেমন যেন গোলমেলে মনে হল এলিজাবেথের, আর কিছু প্রশ্ন করা উচিত হবে বলে মনে হল না। কিন্তু ডোরিয়া নিজে থেকেই কথা বলল, আমাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

এলিজাবেথের কাছে খবরটা এতই অপ্রত্যাশিত যে, কি বলবে ভেবে পেল না। ডোরিয়া বলে গেল, আট মাস বাদে দেশে ফিরে অনেকটা ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে আমি বেঁচে আছি।

—ভারতবর্ষ কি তোমার ভাল লাগল না?

—সে অনেক কথা। এখানে দাঁড়িয়ে তা বলা যায় না।

এলিজাবেথ আমন্ত্রণ জানাল, যদি আপত্তি না থাকে, চল না আমার সংগে লাঞ্চ খাবে।

ডোরিয়া বুঝল এলিজাবেথ তার কথা শুনতে চায়। প্রথমটা ভাবল, এড়িয়ে যাওয়া ভাল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে বলল, চল।

তারা গিয়ে বসল একটি ছোট্ট রেস্তরাঁয়। একেবারে পেছনের দিকের টেবিলে। ডোরিয়া অনর্গল বলে গেল কথা, যা গুছিয়ে নিলে এই দাঁড়ায়: প্রথম প্রথম কলকাতায় পেশছে ডোরিয়ার ভালই লেগেছিল। যদিও নোংরা শহর, জীবনধারণের নানারকম অব্যবস্থা, তবু ডোরিয়ার মনে হয়েছিল এখানকার মানুষগুলোকে জানতে পারলে, তাদের সংগে আলাপ হলে সে সানন্দে থাকতে পারবে। জয় ওকে বরাবর বুঝিয়েছিল বাইরের চাকচিক্য না থাকলেও ভেতরটা এদের সম্পদে ভরা। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ডোরিয়া বুঝতে পারল, ও দেশে শুধু মিথ্যেরই জয়জয়কার। বাবা, মা, ভাই, বোন সবাই মিলে এক সংসারে তারা থাকে কিন্তু এতটুকু মিল নেই তাদের মধ্যে। কেউ কাউকে দেখতে পারে না। সব সময় খাওয়া-খাওয়ি করছে। অথচ বাইরে বড়াই করে বলবে যৌথ পরিবারে থাকার কত সুবিধে। এদের সমাজের লোক নানারকম সংস্কার মেনে চলে অথচ এতটুকু প্রাণ নেই তার মধ্যে। অন্তত ডোরিয়ার মনে হয়েছে ওগুলো নিছক প্রহসন। রাষ্ট্রীয় জীবনে গণতন্ত্রের প্রচণ্ড তামাশা। শতকরা আশী ভাগ নিরক্ষর লোককে নিয়ে ওরা ভোটের রঙ্গ দেখে। ইউনিভার্সিটিতে ওখানে লেখাপড়া হয় না, শুধু রাজনীতি চলে। ক্রিকেট ফুটবল খেলার কমতি নেই, কিন্তু কোথায় সেখানে স্পোর্টসম্যানশিপ, শুধু নোংরামি। ডোরিয়া যত এসব দেখেছে ততই সে ভেতরে ভেতরে শুকিয়ে গেছে। তবু সহ্য করছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর পারল না, যখন সে বুঝতে পারল ও দেশে
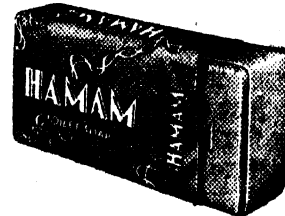
মেয়েদের কোন স্থান নেই। তারা শুধু পুতুলের মত বসে থাকে, খায় দায়, সাজে-গোজে, পিতা বা স্বামীর মন যুগিয়ে চলে।

বলতে বলতে ডোরিয়ার চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে, আমার কাছে মনে হল ঐ রকম পুতুল হয়ে বে'চে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল। জয়ের মা তাঁর ইচ্ছে মত আমাকে সাজিছে গুজিয়ে বসিয়ে রাখতেন, পাঁচ বাড়ির লোক এসে আমায় দেখে যেত। প্রথম প্রথম আমার খারাপ লাগেনি, সে কথা আমি চিঠিতেও লিখেছিলাম। নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে হত। ভাবতাম আমি যেন হিন্দু দেবী হয়ে গেছি। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলাম ও দেশে থাকতে হলে ঐভাবেই আমায় সারাটা জীবন কাটাতে হবে, ভয়ে শুকিয়ে গেলাম। আমি এখন বুঝতে পেরেছি কেন ভারতীয়েরা জীবনকে এড়িয়ে চলতে চায়, কেন দর্শনের বড় বড় বুলি আউড়ে ওরা আমাদের ভাঁওতা দিতে চায়। কারণ ওরা শুধু খেলা করতেই ভালবাসে, পুতুল আর প্রতিমা নিয়ে খেলা করে। উঃ, এই আট মাসের দুঃস্বপ্ন আমার কেটেছে।

এলিজাবেথ একাগ্র মনে কথাগুলো শুনছিল, প্রশ্ন করল, জয়ের সঙ্গে এ নিয়ে তোমার কোন কথা হয়নি?

ডোরিয়া বিদ্রূপ করে হাসল, হয়েছে, কিন্তু তাতে কি ফল হবে? সবচেয়ে বড় কথা কি জান, এখানে যেসব ভারতীয় ছেলেদের আমরা দেখি, দেশে ফিরে যাবার পর তারা একেবারে অন্যরকম হয়ে যায়, নিজের মতামত বলতে কিছু থাকে না। জয়কে আমি যখন যে কথা বলতে গেছি, সে বলেছে বাবার কাছে যাও, নয় ত মার কাছে। তোমাকে আমি বলে বোঝাতে পারব না যে, জয়কে এখানে দেখে আমি ভাবতাম চালাক-চতুর, দেশে গিয়ে ক'মাস থাকার পর দেখলাম সে এক বুড়ো খোকায় পরিণত হয়েছে।

এলিজাবেথ বিড়বিড় করে বলল, আশ্চর্য, এও কি সম্ভব?

ডোরিয়া ক্লান্ত সুরে বলে, একেবারে হতাশ হয়েছিলাম আমি কি দেখে জান? জীবনে যখন কোন সমস্যা আসে ওরা তার মীমাংসা করতে পারে না। জয়ের মত যুবক সমাধানের জন্য তাকায় প্রৌঢ়দের দিকে, প্রৌঢ়রা ডাকেন বৃদ্ধদের সভা। কিন্তু বিশ্বাস কর এলিজাবেথ, কোন সিদ্ধান্তে তারা পৌঁছুতে পারে না, শেষ পর্যন্ত ভগবানের দোহাই দিয়ে বসে থাকে। তুমিই বল এ অবস্থার মধ্যে কি আমাদের মত কারুর পক্ষে বাস করা সম্ভব, যাদের এতটুকু ব্যক্তি-স্বাধীনতা আছে?

আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর তারা রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে এল। বিদায় নেবার আগে ডোরিয়া অনুরোধ করে বলে, এলিজাবেথ, আমি যে লন্ডনে ফিরে এসেছি একথা এখানকার ভারতীয় মহলের ছেলে-মেয়েরা না জানতে পারে, তাদের কারুর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই না।

এলিজাবেথ কথা দিল, বেশ, আমি কাউকে বলব না। তবে যদি আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই?

ডোরিয়া তার টেলিফোন নম্বরটা লিখিয়ে দিল।

সারা রাস্তা এলিজাবেথ ডোরিয়ার কথা-গুলো ভেবেছে। সে যা বলল তা বোধ হয় মিথ্যে নয়, কারণ সৌরেনের সাম্প্রতিক আচরণে সে বিস্মিত না হয়ে পারেনি। প্রমীলার মৃত্যুর পর থেকে একেবারে মানুষটা বদলে গেছে, তাও তো প্রমীলা তার আপনার কেউ নয়। শোক তাপ দুঃখ কষ্ট সহ্য করবার যদি তার এটুকু শক্তি না থাকে তাহলে এলিজাবেথ কোন ভরসায় তাকে নিয়ে জীবন সংগ্রামে নামবে? ভারত সম্বন্ধে যে মোহ এলিজাবেথের মনে ছিল ডোরিয়ার কথা শোনার পর সে মোহও কাটতে শুরু করেছে। ডোরিয়া যা বলেছে হয়ত কিছুটা অতিরঞ্জিত, হয়ত নিজের মন দিয়ে বিচার করতে গিয়ে কিছুটা সে ভুল করেছে, কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করতেই হয় একেবারে অসহ্য না হলে ডোরিয়া জয়কে ফেলে রেখে এখানে চলে আসত না। কারণ জয়কে সে যে ভালবেসেছিল, তার গুণে মুগ্ধ হয়েছিল, এ তো এলিজাবেথ লন্ডনে থাকতে নিজের চোখেই দেখেছে। এত সহজে সেই প্রেম তিক্ততার পর্যায়ে নেমে এল কি করে?

যাই হোক আর ফেলে রাখলে চলবে না, আজই সে সৌরেনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবে, যা হোক একটা নিষ্পত্তি করে ফেলবে। যদি মনে হয় মিলের চেয়ে অমিলটা তাদের মধ্যে বড় হয়ে উঠছে তাহলে বোধহয় এখুনি একটা পূর্ণচ্ছেদ টানা দরকার। আর যদি সৌরেন সব কিছু বিসর্জন দিয়ে এলিজাবেথকেই গ্রহণ করতে চায়, তাহলে আর বিলম্ব করার প্রয়োজন নেই, এখুনি বিয়ে করে সংসার পাতা উচিত।

যা হোক একটা মীমাংসা তাকে আজ করতেই হবে।

অমিতাভ মায়ের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছে, দেশে ফিরে যাবার তিনি অনুমতি দিয়েছেন। অনেক চেষ্টা করে অমিতাভ লীলা যে জাহাজে ফিরছে সেই জাহাজেই প্যাসেজ বুক করেছে। এ ব্যাপারে খুশী হয়েছে সকলে। লীলাকে একলা যেতে হবে না, তবু তাকে দেখাশোনা করার একটা লোক হল। তাছাড়া অমিতাভরও লন্ডনে থাকার কোন লোভ নেই। লেখাপড়া যখন সে করছে না মিছিমিছি এখানে থেকে পয়সা নষ্ট করে কি হবে?

ঐ কথা আলোচনা করতে করতেই সৌরেন আর অমিতাভ বাড়ি ফিরছিল, সৌরেন বলল, দেশের জন্যে আমারও বড় মন কেমন করছে রে অমিত।

অমিতাভ বলে, তুমিও চল না সৌরেনদা।

—যাব বললেই কি যাওয়া যায়? তবে যদি কোন সুযোগ পাই।

—কোন সুযোগের কথা ভাবছ?

সৌরেন হাসল, তুই বুঝতে পারবি না। এখানে সামান্য চাকরি করি, ক'টা টাকাই বা জমেছে। ফিরতে গেলেও তো শ'খানেক পাউন্ড দরকার।

অমিতাভ ইতস্তত করে বলে, যদি কিছু মনে না কর তো একটা কথা বলি। আমার কাছে কিছু টাকা বেশী আছে, যদি তোমার দরকার থাকে তো আমি ধার দিতে পারি।

কথাটা শুনেই সৌরেনের চোখ দুটো ঝলমল করে উঠল, সত্যি বলছিস, ধর যদি আমার চল্লিশ পাউন্ড দরকার হয় তুই ধার দিতে পারবি?

—হ্যাঁ, পারব।

সৌরেন নিজের মনে বিড়বিড় করে, তাহলে একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়। সত্যি আর এখানে ভাল লাগছে না। অন্তত কিছুদিনের জন্যে যদি ঘুরেও আসতে পারি, অফিসের কাছে আমার ছুটি পাওনা আছে অনেক, অন্তত দু'মাসের জন্য, আবেদন করলে নিশ্চয় মঞ্জুর হবে।

অমিতাভ উৎসাহ দেয়, তাহলে আর দেরি ক'রো না। কালই ঠিক করে ফেল। ঐ একই জাহাজে তোমারও প্যাসেজ বুক করে দেব।

—কাল তোকে জানাব।

টিউব স্টেশন থেকে দুজনে দুদিকে চলে গেল। দম বন্ধ করা সাম্প্রতিক লণ্ডন জীবনে থেকে মুক্তি পাবার ক্ষীণ আলো দেখতে পেল সৌরেন। অন্তত কয়েকটা মাস যদি ঘুরে আসতে পারে। ঝলমলে রোদ ভরা কলকাতার কথা মনে পড়তেই মন তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই অতি পরিচিত কলকাতায় কতদিন বাদে আবার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হবে। দেশ ছাড়ার পর থেকে সৌরেন কি অনেক বদলে গেছে? তা মনে হয় না। এ সময় বাড়ি ফিরলে মা খুব খুশী হবেন। বিশেষ করে বাড়িতে এখন ভাইয়ের বিয়ের আয়োজন চলছে, সৌরেনকে যাবার জন্যে সকলেই লিখেছে, সে অবশ্য জানিয়ে দিয়েছিল যেতে পারবে না। এখন হঠাৎ আসছে শুনলে সবাই বড় আনন্দ পাবে।

টাকার মুশকিল নিশ্চয় ছিল, সে মুশকিল আসান করতে প্রস্তুত অমিতাভ। কিন্তু এলিজাবেথকে সে কি বোঝাবে? বড় ভাল মেয়ে। এ কথা সত্যি, সৌরেন কিছু-দিনের জন্যে দেশে ঘুরে আসতে চায় জানলে সে মোটেই বাধা দেবে না। কিন্তু তবু বড় একলা পড়ে যাবে। তা হলেও সৌরেনের মনে হল একবার ওকে বুঝিয়ে বলা ভাল, সব মানুষেরই তো চেঞ্জের দরকার হয়। সৌরেনের বোধ হয় ঠিক তাই হয়েছে। তা না হলে হঠাৎ এভাবে দেশের জন্যে তার মন কেঁদে উঠল কেন? মায়ের সঙ্গে দেখা হবার কথা ভাবতেই চোখে তার জল আসছে। অবশ্য সৌরেন যদি ঠান্ডা মাথায় একটু তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করত তা হলে বুঝত এই দেশে ফেরার মূলেও রয়েছে প্রমীলার মৃত্যু। প্রমীলা যে মৃত্যুর আগে তার মা, বাবা, ভাই, বোন কারুর সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করতে পারল না, এই চিন্তাই সৌরেনকে দেশে ফেরার জন্যে ব্যস্ত করে তুলেছে।

বাড়ি ফিরে সৌরেন দেখল তখনও এলিজাবেথের ঘরে আলো জ্বলছে। সৌরেনের মনে হল এইবেলা কথাটা তাকে বলে ফেলা ভাল। যদি সে তাকে কলকাতায় ফেরার অনুমতি দেয় তা হলে কাল সকালেই অমিতাভর সঙ্গে যোগাযোগ করে প্যাসেজের চেষ্টা করবে।

দরজায় টোকা মেরে সৌরেন জিজ্ঞেস করল, আমি ভেতরে আসতে পারি?

ভেতর থেকে উত্তর এল, এসো।

সৌরেন ঘরে ঢুকে দেখে, এলিজাবেথ টেবিল চেয়ারে বসে চিঠি লিখছে। সৌরেন কাছে গিয়ে তার কপালে চুমু খেল।

এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করে, এত রাত হল ফিরতে?

সৌরেন শুকনো উত্তর দেয়, লীলাদের ফ্ল্যাটে ছিলাম।

—তা তো জানি। আমি ভেবেছিলাম আজ ছুটির দিন, অন্তত সকালবেলা তুমি আমার সঙ্গে একবার দেখা করবে।

সৌরেন ভাববার চেষ্টা করে, কেন দেখা হলো না বল ত? আমি বোধ হয় এসে-ছিলাম তোমার ঘরে। ঘরটা কি বন্ধ ছিল? ভাবলাম তুমি বোধ হয় বেরিয়ে গেছ, ঠিক মনে পড়ছে না। আজকাল আমার মাথাটা—

পদ পূরণ করে দিল এলিজাবেথ, আমিও তো সেই কথাই বলতে চাইছি। আজকাল তুমি এত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছ যে, মনে হয় তুমি জীবন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

—ঠিক তা নয় লিজি।

এলিজাবেথ অভিমানের সুরে বলে, না হলেই ভাল। কিন্তু একবার ভেবে দেখেছ সৌরেন, কার্ডিফ থেকে ফেরার পর ক'টা সন্ধ্যা তুমি আমার সঙ্গে কাটিয়েছ? সারাক্ষণ থমথমে মুখ করে বসে থাক; সারা দিনে একবারও আমার কথা ভাবো বলে তো মনে হয় না।

—এ তুমি কি বলছ লিজি? তুমি কি বুঝতে পার না, সারাক্ষণই তো আমি তোমার কথা ভাবি! এ শুধু একটা সাম-য়িক দুঃখ, কেমন যেন আমাকে—

এলিজাবেথ থামিয়ে দিয়ে বলে, আশ্চর্য লাগছে এই জন্যে, তুমি বুঝলেও না আমি কত একা। অথচ এই সময় তোমাকে আমার সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। সব কথাই কি আমায় খুলে বলতে হবে?

এলিজাবেথের কথার অর্থ বুঝতে না পেরে সৌরেন তার কাছে এগিয়ে গিয়ে হাত দুটো তুলে নিয়ে বলে, হঠাৎ এ কথা কেন বললে লিজি?

এলিজাবেথ নীরস কণ্ঠে বলে, আমি তো আর একলা নই।

এতক্ষণে সৌরেন বুঝতে পারে, তার মানে—

—আমি মা হতে চলেছি।

(ক্রমশ)
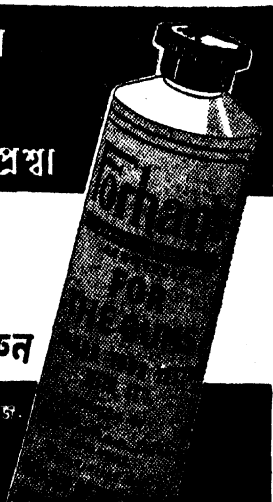
অযাত্রায় জয়যাত্রা

শ্রীবিভূতিভূষণ-মুখোপাধ্যায়

(১৬)

কোথায় গাড়ি.

প্ল্যাটফর্ম একেবারে ভোঁ-ভাঁ; এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত সোনপুরের সেই দীর্ঘতম প্ল্যাটফর্ম। গাড়ি নেই, ভেন্ডার নেই, যাত্রী নেই।

একটা কথা খুব সত্যি, তোমাদের আধুনিক মনোবিজ্ঞানকেও মানতে হবে এটা। হয়তো মানেই, আমি জানিনে। কোন একটা অনুভূতি যখন কোন কারণে একেবারে চরমে ঠেলে উঠেছে, ভয়-জাতীয়ই বলো বা ভক্তি-বিশ্বাস-জাতীয়ই বলো, তখন সেই অংগের যে-কোন জিনিসই যেন সত্য রূপ ধরে ওঠে। বহু ক্ষেত্রেই লৌকিকের স্তরে অলৌকিকের আমদানি হয় এই করে। ভূত-প্রেত-মির‍্যাক্‌ল্‌, যাই ধরো না কেন। রাগ করলে উপায় নেই—ধর্মক্ষেত্রের অনেক উপলব্ধিও এই ধরনের।

বলবে, গোড়ায় আমি উল্টো ধরনের কথা বলে আরম্ভ করেছি—অলৌকিকের স্বপক্ষে ওকালতি করেই। বলেছি অনেক জিনিসই বিজ্ঞান-সূত্রে ধরা পড়ছে না। সে কথাও আবার ঠিক, আমি তো আমাদের সব উপলব্ধির কথা বলছি না। সীমার ওদিকে একটা অসীম রয়েছেই, থাকবেই চিরকাল।

চাঁদে রকেট পাঠিয়ে আমরা তার হাড়-হদ্দ জেনে নিচ্ছি, শুনছি নাকি জমি কেনবারও (আর সুধা নয়) হিড়িক পড়ে গেছে। কিন্তু অসীমের তুলনায় চাঁদ তো এ-পাড়া ও-পাড়া। বলবে, জানবেই মানুষে একদিন—ধরবেই অসীমকে তার সীমিত জ্ঞানের বেড়া-জালে। প্রশ্ন করব—শেষ পর্যন্ত কবে? তার আয়ুও তো অসীম কালের মধ্যে দু'দিন। না, তোমার-আমার আয়ুর কথা বলছি না, দুটো বুদ্‌বুদ্‌, হতে না হতেই নিশ্চিহ্ন, তার আবার আয়ু! আমি বলছি সমগ্র মানব-জাতিটার কথাই। কত-দিনই বা?

বলছে সৌরপতি সূর্যই থাকবেন না তো মানুষ!

থাক এসব বড় বড় কথা। রহস্য-ভেদও হবে, আবার ভেদ হতে হতে থেকেও যাবে বহুত।

আমি বলছিলাম অনুভূতির চূড়ান্ত অবস্থার কথা, মনটা যখন খুবই High tension-এ, একেবারে চরম পর্যায়ে বাঁধা। নৈরাশ্য, সদ্যঃশ্রুত কাহিনী—প্রায় অলৌকিকের কাছাকাছি, তারপর গাড়িটার হঠাৎই অন্তর্ধান—সব মিলে সত্যিই মনে হলো একটা কিছু মির‍্যাক্‌ল্‌ বা ভোজবাজি হয়ে গেছে—ঐ এক গুণ বরযাত্রী দশ গুণ, হাজার গুণ হয়ে গিয়ে যাত্রী-গাড়ি-ইঞ্জিন, সব...

অবশ্য নিতান্ত দু-চার মুহূর্তই—মনের বিভীষিকা বাইরে রূপ নিয়ে ওঠা; সংগে সংগেই মনটা কঠিন বাস্তবে ফিরে এল। ভোজবাজি এত সহজ নয়, তার চেয়ে ঢের সহজ গাড়ির কাউকে কিছু না বলে চলে যাওয়া, বেহাইয়ের কাছ থেকে ড্রাইভার সাহেবের ছুটি পাওয়ার সংগে সংগে। বাঁশী কানে যায়নি? কিন্তু কান বা শুনেছিল তাতে কোথায় একটু বাঁশী বাজল কি না বাজল সে খবর নেওয়ার মতো কি অবস্থা ছিল তার?

ভোজবাজি নয়। কঠিন, রূঢ় সত্য—গাড়ি ছেড়ে গেছে এবং তাতে আমার যাবতীয় মালপত্র, মায় পয়সাকড়িরও প্রায় সবটুকু। কি উপায়?

উদ্‌ভ্রান্তের মতো হয়ে গেছি। একটা কুলি আসছিল, তাকে বললাম— "এখানে ঘাটের গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল, দেখেছ?"

লোকটা নেশা করেছে, চোখ নিচু করে প্ল্যাটফর্মের ধারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—"কোথায়?"

যেন একটা নয়া পয়সা পড়ে গেছে, খুঁজে দিতে বলেছি।

প্ল্যাটফর্মের অন্য ধার দিয়ে একজন রেলের কর্মচারী যাচ্ছিলেন, তাড়াতাড়ি গিয়ে ধরতে বললেন—ঠিক জানেন না, ছয় নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে আসছেন।

আমাদেরটা হচ্ছে এক নম্বর। চলেই যাচ্ছিলেন, বললাম—"আমি বড় একটা বিপদে পড়েছি। আপনি তো স্টেশনের লোক দেখছি, একটু সাহায্য করতে হবে আমার।"

সব কথা বললাম, যেতে যেতেই শুনে-ছিলেন, দাঁড়িয়ে পড়ে আমায় একবার নীচে থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বললেন—"আপনি আসুন আমার সঙ্গে।"

এ-মুড়ো ও-মুড়ো দু দিকে লম্বা বারান্দার মাঝখানে স্টেশনের অফিসঘরগুলো, তার একটাতে নিয়ে গেলেন আমায়। বাইরের বোর্ডে লেখা দেখে বুঝলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টারের ঘর। তাঁর চেয়ারটা কিন্তু খালি। পাশে বসে আর একজন কাজ কর-ছিলেন, তাঁকেই আমার কথাটা বলতে তিনি ও'কে ঘাট স্টেশনে ফোন ক'রে জানিয়ে দিতে বললেন। একটু ব্যস্তই আছেন ভদ্রলোক। ফোনে ওদিক থেকে খবর এল—গাড়ি এখনও পৌঁছায়নি।

ভদ্রলোক কলম থামিয়ে একটু বিস্মিত-ভাবেই বললেন—"সে কি! টু-সেভেনটিন আপ্ (217 up) তো অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছে, প্রায় আধ ঘণ্টা হলো। রান্ (Run) তো মাত্র বারো মিনিটের এখন।"

আমি বললাম—"অত আগে ছাড়েনি।"

"ছাড়েনি কি? আমি গার্ড সাহেবকে নিজে লাইন ক্লিয়ার নিয়ে যেতে দেখলাম! হালদারবাবুর তো ডিউটি যাচ্ছে।"

"সে সময় ছাড়েনি।"—আমি বললাম।

"ছাড়েনি মানে?"

বৈবাহিক দুর্যোগের কথাটাই মুখে এসেছিল, বাদ দিয়ে বললাম—"ইঞ্জিনে কি একটা খুঁত এসে পড়েছিল..."

"ব্যস ইঞ্জিন ট্রাবল! কলমসুদ্ধ হাতটা চিতিয়ে বললেন—"লোকোর এ-দোষ আর যাবে না! অথচ ও'রাই সেকশানের বরপুত্র হ'য়ে ব'সে আছেন!..."

লোকো আর ট্রাফিকের চিরন্তন মনান্তর, জো পেয়ে ভদ্রলোক কলম থামিয়ে ঝাল ঝাড়তে শুরু করতে আমি বললাম—"তা হলে?"

"তাহলে আর কি? চুপ করে ব'সে থাকা ভিন্ন আর উপায় নেই। বুঝতেই তো

পারছেন—খোঁড়া-নুলো ইঞ্জিন, আবার হাত-পা নিয়ে পড়েছে, ব্যাণ্ডেজ-পট্টি বেঁধে তবে তো আবার এগুবার চেষ্টা করবে।"

এমন নিগ্রহে মানুষ পড়ে? অতি দুঃখে আমাদের মুখে যে কথাটা বেরিয়ে পড়ে সেটা যেন আপনিই পড়ল বেরিয়ে—"কী যাত্রা করেই যে বেরিয়েছিলাম!"

আর এটা তো অবচেতন মনে সবচেয়ে বড় কথা আজ থেকে থেকে মারছেই উঁকি।

"আচ্ছা, কোন অ্যাক্সিডেন্ট তো হয়নি?"—আমিই প্রশ্ন করলাম।

"তাহলে তো আপনার যাত্রা শুভই বলতে হবে, নয় কি?"—উনিই একটু হেসে বললেন। যিনি সংগে করে নিয়ে এসেছিলেন তিনি চলে গেছেন নিজের কাজে।

একটু হেসেই বললাম—"তা ঠিক, যদিও এমন শুভযাত্রা কামনা করবার নয়। সে কথা নয়, আমি বলছিলাম—যদি তেমন কিছু হতো তাহলে না হয় চলে যেতাম—জিনিস-পত্রগুলোও যদি—না হয় দেখিই এগিয়ে।"

খেয়াল হতেই মনের চঞ্চলতায় উঠেই পড়েছি. উনি লিখতে লিখতেই কথা কইছিলেন, কলমটা থামিয়ে বললেন—"আপনি বসুন স্থির হ'য়ে। অ্যাক্সিডেন্ট নিশ্চয় নয়; যতক্ষণ গেছে গাড়িটা, সে রকম কিছু হলে এতক্ষণে কেউ না কেউ এসেই পড়ত খবরটা নিয়ে।"

ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—"হ্যালো…পেঁাছেছে?"

উত্তর হলো—পেঁাছায়নি এখনও।

উনি আমার দিকে ফিরে বললেন—"ঐ হয়েছে, ইঞ্জিন ট্রাবল মাঝপথে।" আবার একটু হেসে বললেন—"অ্যাক্সিডেন্ট কি এত সস্তা মনে করেছেন?"

মনে মনে বললাম—কী যে মাগ্গি আপনাদের লাইনে তাতো বুঝি না।

—"আচ্ছা, অন্য লাইনে চলে যায়নি তো গাড়ি?"

এ প্রশ্নটাও যেন আপনিই বের হয়ে গেল মুখ দিয়ে। আতঙ্কই তো ঘুরপাক খাচ্ছে মনে। ভদ্রলোক এবার ঘাড় উল্টেই হেসে উঠলেন, হাত থেকে কলমটাও পড়ল খসে. বললেন—"বাবু সাহেব, ইঞ্জিন নিতান্তই সাদা জলই খায়, মদও নয়, গাঁজাও নয়।" হাসতে হাসতে কলমটা তুলে নিয়ে লিখতে লিখতে বললেন—"একটু স্থির হয়ে বসুন, এক্ষুনি এসে যাবে খবর।"

পারে কখনও লোকে? এত বড় একটা গোলমাল, একেবারে নিশ্চিন্ত, তার ওপর বিদ্রূপ—কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে। অধৈর্যের সঙ্গে বিরক্তি এসে পড়ে। উঠেই পড়েছি, একজন খালাসী কী একটা কাগজ নিয়ে এসে ঢুকল, পানি পাঁড়ে, কি ঐ ধরনের কেউ।

প্রশ্ন করলেন—"টু-সেভেনটিন আপটা কখন ছেড়ে গেছে জানিস?"

"ছাড়েনি তো এখনও।"

"ছাড়েনি!…ছাড়েনি কি?"—দুজনেই এক সংগে প্রশ্ন ক'রে উঠলাম।

"না, ঐ তো রয়েছে দাঁড়িয়ে।"

"কোথায়?"

"যেখানে থাকে—এক নম্বরে।"

ভদ্রলোক নিঃসংকোচ কৌতূহলের দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাইলেন একবার; যেন দেখে নিলেন, ইঞ্জিন যা পরিহার ক'রে চলে সে রকম কোন জিনিস সেবন করার কোন নিশানা আমার চোখে-মুখে আছে কিনা।

চেয়ার ঠেলে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে এসে দেখি, সত্যিই গাড়িটা রয়েছে দাঁড়িয়ে, হ্যাঁ, যেখানে দেখে গিয়েছিলাম সেখানেই। সত্যিই মাথার কিছু ওলট-পালট হয়ে গিয়েছিল নাকি? ভেবে ভেবে মাথাটা যেন আরও গেছে গুলিয়ে। যেতে যেতেই খেয়াল হলো হয়তো অন্য কোন গাড়ি ইতিমধ্যে এসে পড়েছে। ততক্ষণে গার্ডের গাড়ির কাছে এসে পড়েছি, দেখি সেই তিনিই আস্তে আস্তে পা-দানি থেকে নামছেন।

একটু থেমেই পড়লাম আমি; যদি ছেড়েও দেয় তো অন্তত ছুটে ও'র গাড়িতেও উঠে পড়তে পারব এবার। আসল কথা চারিদিকে যে রকম ঠোক্কর খাচ্ছি, মনটা গুছিয়ে নিতে হবে। দাঁড়িয়ে বুকের নিশ্বাসটাও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনলাম, তারপর বেশ সহজ—অনেকটা যেন নিরুদ্বেগ চালেই এগিয়ে গিয়ে বললাম—"তাহলে রেখেছিলেন ধরে? থ্যাংক্স!"

"এই যে এসে গেছেন। ধরে রাখা মানে! কর্মলি ছাড়বে তবে তো যাব।"

"ছাড়েনি বেহাই এখনও?"—হেসেই বললাম।

"তিনি ছেড়েছেন বইকি, নইলে সেকেণ্ড লাইনে এল কে?"

একেবারেই খেয়াল হয়নি ওদিকটা; একে রাত্রি, তায় গঙ্গার ওপারের মতো লাইনও চওড়া নয়, চোখে পড়েনি, মনের অবস্থাও তো সেইরকমই। উনি বলতে লক্ষ করে দেখে বুঝতে পারলাম আমার মাথাও ঠিক ছিল এবং কোন ভোজবাজিও হয়নি, গাড়িটা প্ল্যাটফর্মের ধার থেকে সরে পাশেই দ্বিতীয় লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু ব্যাপারখানা কি!

বিমূঢ় ভাবটা লক্ষ করে বললেন—"বুঝলেন না— গরীব গেরস্তর সংসার যে, ফালতু ব্যবস্থা তো নেই।"

আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন—"আপনার বাড়িতে চারখানি ঘর—একটি রান্নার, একটি ভাঁড়ার আর ঠাকুরের, দুটি শোবার; একটিতে স্ত্রী-পুরুষে শোন, একটিতে ছেলেমেয়েরা। হঠাৎ কুটুম্ব এল—যেমন ড্রাইভার সাহেবের বেহাই এসেছে আজ, কিংবা ধরুন কোন অতিথি; কি করবেন?"

বললাম—"ভাঁড়ারে নিজেদের ব্যবস্থা করে একটা ঘর ছেড়ে দিতে হবে।"

"এও তাই! গেরস্ত রেল, ঠিক মাপা-জোকা ব্যবস্থা, যদি একটা ফালতু গাড়ি এল কিংবা যেগুলো রোজকার সেগুলোরও টাইম একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেল—আর নিত্যিই তো হচ্ছে—তা হলেই চক্ষু চড়ক গাছ!...বেহাইয়ের আদর অভ্যর্থনা সেরে ড্রাইভার সাহেব এসে গিয়ে ইঞ্জিনের বাঁশি বাজিয়েছে, আমিও মুখে হুইসিল দিয়ে আপনার কথা মনে পড়ে একটু থমকে গেছি, এমন সময় হাত তুলে ছুটতে ছুটতে একজন এসে উপস্থিত—'এখন গাড়ি ছাড়বে না!'...'কি ব্যাপার?' না। 'ইসপিশাল আতা হ্যায়'।...গোরক্ষপুর থেকে হোমরা-চোমরাদের একটা স্পেশ্যাল ঘাটের দিকে গিয়েছিল—জল ক'মে আসছে, গঙ্গা ট্রাবল দিচ্ছে তো সেই তদারকে; সেইটে ফিরছে। 'যথা-আজ্ঞা' ব'লে গাড়িতে উঠে নিশ্চিন্দি হয়ে বসেছি; লুকবো না স্যার, একটু তন্দ্রাও এসে গেছে, চমকে ধড়মড়িয়ে উঠে

পড়লাম। গাড়ি চলছে!...কি ব্যাপার মশাই। না, পাশে সেকেন্ড লাইনে নিয়ে যাচ্ছে গাড়ি; আর লাইন খালি নেই। বুঝলেন না? অন্য লাইনের গাড়ি সব এসে পড়ছে তো, কোন কোনটা গেছেও এসে। বাপ-মা মরা ঘাটের গাড়ি; ঝোঁকটা তার ওপর এসেই পড়বে তো...তারপর? রিফ্রেশমেন্ট রুমের কি খবর? জুটল কিছু কপালে?"

মালপত্রগুলোর দিকে মনটা গিয়ে পড়েছে, আর কথা না বাড়িয়ে বললাম—"সে একরকম না জোটার মতই, পৈত্রিকক্ষাটা হলো কোন রকমে।...আচ্ছা আসি।" পা চালিয়ে দিলাম তাড়াতাড়ি।

হে'কে বললেন—"এবার থেকে পাঁজিটা দেখে বের হবেন দয়া ক'রে। মনের জোর আমিও দেখিয়েছি এক সময়—কিছু নয় স্যার! শুধু ও'দের চটিয়ে তোলা।"

সত্যিই যেন চটিয়ে তুলেছি।

"স্টীমারটা ছেড়ে গেছে?"—ঘাটে পৌঁছেই আমার নিতান্ত উদ্বিগ্ন প্রশ্নটার উত্তরে কুলি সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলল —"এখনও আসেইনি স্টীমার।"

—"আসেনি কি! গাড়িই তো প্রায় তিন ঘণ্টা লেট। কখন আসবে?"

মোট নামিয়ে গুছিয়ে-গাছিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল—"বোলিয়ে।"

ঘাট-কুলিদের মুখের বুলি ওটা, অর্থ—কত দেবেন আগে বলুন। খুব দাঁওয়ে পায় তো যাত্রীদের। আর ঐ পদ্ধতি। ঐ যে ছু'য়ে দিল তোমার মোট, অন্য কুলি আর ধরেও চাইবে না। অলিখিত ট্রেড ইউনিয়নিজম, কিন্তু সাধ্য কি কোন কুলি খেলাপ করে।

একটু বচসা হয়ই, কিন্তু আজ সে উৎসাহ একেবারেই নেই। কিন্তু জানই তো যেখানে একেবারে নিরুপায়, মন সেখানে অন্তত আক্রোশ মিটিয়ে নেওয়ার একটা পথ না বের করে স্বস্তি পায় না; তা যতই দুর্বল বা নিরীহ হোক। সাহিত্যিক মানুষ, আমি আমাদের যা সবচেয়ে বড় অস্ত্র অর্থাৎ আমরা যেমন মনে করি, সেই শ্লেষের আশ্রয় নিলাম, প্রশ্ন করলাম, "কত চাস তুই?—চার টাকা—ছ টাকা—না, তাও কম হচ্ছে?"

কেন জানি না, হেসে ফেলল। তারপর হাত জোড় করে বলল—"রাগ করছেন! আমরা গরীব, আপনি হচ্ছেন রাজা আদমি ...ছ টাকা কেন, আট টাকা দিলেও আপনাদের—"

কড়ির সংগে কোমলও মেলায় কখনও কখনও।

প্রশ্ন করলাম—"কত চাস তুই বলবি তো?"

তর্জনীটা তুলে ধরে বলল—"এই বড়বাবু, পুরোপুরি। আপনি মেহনতটা দেখে ইচ্ছে হয় দেবেন, না হয় একটা লাথি ঝেড়ে বলবেন—বেরো ব্যাটা, কিচ্ছু পাবি না।... একবার ভিড়টা দেখে নিন।...নিন, একটু আলগে দিন।"

আশ্চর্য হচ্ছ নিশ্চয়, এই হঠাৎ আমূল পরিবর্তনে। আমিও হয়েছিলাম, রহস্যটা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেল সদ্য সদ্য। মোটটা তুলে দিতে যাব, ও পাশের মাটি থেকে একটা পরিষ্কার ইস্ত্রির করা গান্ধী টুপি তুলে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল, বলল—"নিন, হুজুর, আপনার টুপিটা পড়ে গেছে নীচে।"

কার টুপি, নামবার সময় ঠেলাঠেলিতে পড়ে গেছে, টের পায়নি। আমারও নজরে পড়েনি। আমাদের গাড়িটার পাশেই একটা লম্বা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। যার জন্যে জায়গাটা একটা অন্ধকার গলির মতো হয়ে গেছে। তার ওপর চাপ ভিড়।

কিন্তু তুমি যা হয়ত ভাবছ তা নয়। গান্ধী টুপি দেখেই লোকটা সংগে সংগে অহিংস হয়ে গেছে মনে করছ তো? মোটেই নয়।

কাউন্সিল ব'লে একটা বস্তু আছে জান নিশ্চয়। রাজ্যের ঊর্ধ্বতন নিয়ামক। এমনি সাড়া যদি নাই পাও তো যখন তর্কবিতর্কের হিংস্রতায়, চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়িতে সেখানে গান্ধীজীরও টনক নড়ে তখন খানিকটা আওয়াজ তোমার কানেও নিশ্চয় পৌঁছায়ই। কাউন্সিলে কথা ওঠাটা ইংরেজদের আমলে ইংরেজরাও ভয় করত; এখনও ধারা-বাহিকতাটা চলে আসছে; বিশেষ করে যাদের গলদ বেশী তাদের মধ্যে। রেলের স্থান এ বিষয়ে তো একরকম বলতে গেলে সর্বাগ্রে; ভয় পায় একেবারে ওপরের মাতব্বরের দল থেকে নীচের কুলি-পয়েন্টসম্যান পর্যন্ত সবাই।

কোনও কাউন্সিলারের মাথা থেকেই যে খ'সে পড়েছে এমন কোন স্থিরতা নেই; তবু ভয় করে, সাবধানই থাকে, বিশেষ করে এই ধরনের পাতলা শৌখীন ছাটের টুপি দেখলে। এখন নাকি আবার কাউন্সিলের বৈঠক চলছে, আনাগোনা চলছে সদস্যদের।

নিয়ে নিলাম হাতে কিছু না বলে। মহাপুরুষের প্রতীকটুকু অবলম্বন ক'রে যদি এই দুরতিক্রম্য যাত্রাপথ শেষ করা যায় তো মন্দ কি? তারপর গংগার জলে বিসর্জন দিয়ে দিলেই হবে।

না, ওর মর্যাদা রক্ষা করবার লোক যে একেবারে নেই দেশে এ কথা বলছি না। তবু মনে হয় এবার মিনিস্ট্রির গংগাপ্রাপ্তি হলেই যেন ভালো। অল্প প্রভাব যেটুকু এখনও রয়েছে তাতে বরং বলতে পারব সজ্ঞানেই গংগালাভ হয়েছে। এতবার পারাপার করেছি গংগা, এখানেও আবার কলকাতা যাওয়ার পথে মোকামাঘাটেও, কিন্তু এরকম চাপ ভিড়ের মধ্যে পড়িনি। হবে না কেন, স্টীমার অসম্ভব রকম লেট, দু'খানা গাড়ির লোক জড়ো হয়েছে, তার ওপর পূর্ণিমার স্নানার্থী রয়েছে। তুমি বলবে কোজাগরী পূর্ণিমা তো স্নানের পূর্ণিমা নয়। তুমি বোধ হয়

জান না পুণ্যার্থীদের দু' শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক যারা তিথির জোরে দেব-দেবীদের কাছ থেকে পুণ্য আদায় করে। অমুক তিথিতে অমুক যোগ রয়েছে, অমুক ধরনের কাজ করলে এত পুণ্য হবে—যেমন ধরো অক্ষয় স্বর্গ বা চুরি-বাটপাড়ি, ব্রহ্মহত্যা-গোহত্যা জাতীয় পাপের জন্য যতখানি দরকার হয় আমি সেই তিথিতে সেই কাজ করলাম, সুতরাং খাতায় আমার নামে সেই পরিমাণ পুণ্য যেন জমা থাকে। খোশামোদ নয়, এক ধরনের লাঠির জোরে পুণ্য আদায় বলতে পারো। দ্বিতীয় শ্রেণীর পুণ্যার্থী করে স্পেকুলেশন (Speculation)। রাতটি মা-লক্ষ্মীর নামে, তার ওপর পূর্ণিমাই তো, তুমিও মা গঙ্গা, দুটো ডুব দিয়ে দিচ্ছি, স্নান-যোগ থাক বা না থাক, দিও কিছু হাত তুলে। স্পেকুলেশন মানেই তো দৈব-নির্ভর, এও তাই। ওদিকে গিয়ে কি হলো, শেষ পর্যন্ত কারা বাজিমাত করল, কে আর দেখতে যাচ্ছে বলো?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)
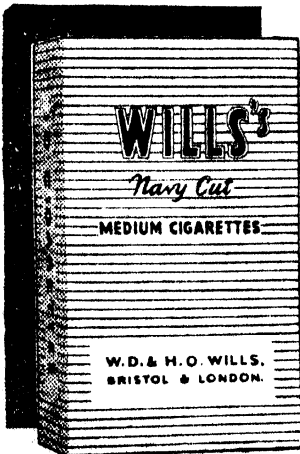
আশ্চর্য, বুকটা এখনো ঢিপঢিপ করছে। অথচ কিছুই তো নয়। একটিমাত্র ফুল। একটি গোলাপ---একজনের হাত থেকে পাওয়া। টেবিলের ওপর ফুলটিকে রেখে রিনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তার সতের বছরের জীবনে অনাত্মীয় একজন পুরুষের হাত থেকে এমন পুষ্পার্ঘ সে প্রথম পেল। দেওয়ার সময় তাঁর হাত কাঁপছিল কিনা, রিনি লক্ষ করেনি, কিন্তু নিতে গিয়ে নিজের হাত কাঁপছিল, বুক কাঁপছিল, চোখের পাতা নেমে এসেছিল। তাই ভালো করে তাঁকে দেখতে পারেনি। তাঁর পরনে ছাই রঙের ট্রাউজার ছিল, গায়ে ছিল সাদা শার্ট, এই-টুকু শুধু মনে আছে। কিন্তু এ তো তাঁর উৎসবের সাজ নয়, এ তো তাঁর আটপৌরে বেশ। এই পরেই তো তিনি এ-বাড়িতে আসেন। তবু কেন তাঁকে আজ নতুন মানুষ বলে মনে হচ্ছিল? তিনি এই ফুলটি দিয়েছেন বলে? দেবার ইচ্ছা তাঁর অনেকক্ষণ আগেই মনে এসেছিল বলে? অনেকক্ষণ, না অনেকদিন? কে জানে? এর আগে রিনি তো তাঁকে এমন করে দেখেনি। এর আগে রিনি তাঁকে দেখতেই পারত না। সেই ভালো ছিল। সেই না-দেখতে পারাই ঢের ভালো ছিল। এই ফুলটিকে নিয়ে এখন সে কী করবে? কোথায় রাখবে এই ফুল? বিনুনি খুলে ফেলে খোঁপা বাঁধবে? খোঁপার মধ্যে গুঁজে রাখবে? মা যদি ভবানীপুর থেকে ফিরে এসে দেখতে পান? দেখতে পেলেও তিনি বুঝতে পারবেন না, এ-ফুল তাকে কে দিয়েছে। যতক্ষণ না সে মুখ ফুটে বলে। কিন্তু রিনি কিছুতেই বলবে না। তবু দরকার নেই খোঁপায় পরে। পরতে কিসের একটা অস্বস্তি হচ্ছে, ভয় হচ্ছে রিনির। দরকার নেই পরে। তবে কি জানলা দিয়ে ফেলে দেবে? যেমন তাঁর দেওয়া আরো জিনিস আগে ফেলে দিয়েছে? কিন্তু ফেলতে ইচ্ছা করছে না। আজ এমন বস্তু সে পেয়েছে যা তার পক্ষে ফেলে দেওয়াও কঠিন, রেখে দেওয়াও কঠিন। অবশ্য এক্ষুনি কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে—তার কোন মানে নেই। বাবা আপিস থেকে ফিরতে ফিরতে রাত আটটা। চিনি আর বিনুকে নিয়ে মা পিসীমার বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। তাঁরও আসতে দেরি আছে। ও-ঘরে ভজু চাকর রান্না করছে। ঠিক এই মুহূর্তে কেউ আর এ-ঘরে আসবে না। কিন্তু রিনির মনে হচ্ছে কেউ আসুক, কেউ এসে পড়ুক। এই একাকিত্বও রিনির কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। পড়তে ভালো লাগছে না। লিখবে নাকি? বসে বসে ডায়েরি লিখে সময় কাটাবে? কিন্তু লিখতে গেলে আজকের বিকেলের ঘটনাটুকুই তো ঘুরে ঘুরে আসবে। দরকার নেই। কে কোত্থেকে দেখে ফেলবে। একবার মা জোর করে তার ডায়েরি কেড়ে নিয়ে পড়েছিলেন। পড়ে সে কী হাসি। তবু রক্ষা, সেদিনের পাতায় [illegible] কোন কথা ছিল না। শুধু মেঘ-বৃষ্টির বর্ণনা ছিল।

কী করবে রিনি। সেদিন যে সত্যি[illegible]

বৃষ্টি হচ্ছিল। কলকাতা শহরের এই সরু গলির পুরনো ফ্ল্যাট-বাড়িটার জানলা দিয়েও আকাশের মেঘ দেখা যাচ্ছিল; হাত বাড়িয়ে বৃষ্টি ধরা যাচ্ছিল, জলের ছাটে চোখ-মুখ ভিজিয়ে নিতে পারছিল, বাতাসের ঝাপটায় এলোমেলো উচ্ছৃঙ্খল কাগজপত্রের সঙ্গে নিজের মনকে ওর দূর-দূরান্তরে উড়িয়ে দেওয়ার সাধ হচ্ছিল। আর ঠিক সেই সময় সেই বৃষ্টিঝরা, বৃষ্টিভরা সন্ধ্যায় ভদ্রলোক তাদের বাড়িতে এসেছিলেন। প্রথমে গেলেন বারান্দায়, তারপরে পাশের ঘরে গিয়ে গল্প করছিলেন মার সঙ্গে। রিনি অবশ্য তার ডায়েরিতে দুজনের সেই গল্পের কথা লেখেনি। শুধু বর্ষা-বৃষ্টির কথাই লিখেছিল। তাই পড়েই মা হেসে অস্থির। কী করবে রিনি, ভাষা যদি তার সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে কী করতে পারে। মনে মনে সে যা ভাবে, তার যা লিখতে সাধ হয়, তা তো আর কাঁচা নয়, শুধু ভাষাটাই কাঁচা। তার লেখা পড়ে কলেজের বন্ধুরা হাসে, ঠাট্টা করে। তারা লেখাটাই দেখে। সে যে কী লিখতে চেয়েছিল, তা তো আর দেখে না।

সেদিন সেই ভদ্রলোককে মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কি ঝড়বৃষ্টি মাথায় না করে আসতে পার না? কেমন ভিজে গেছ দেখ দেখি।'

ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'কী করব বলো, মেঘ দেখলেই যে তোমার কথা মনে পড়ে।'

মা চোখের ইশারায় রিনিকে দেখিয়ে দিতেই ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলেন। কিন্তু রিনি ঠিকই শুনে ফেলেছে। পাছে আরো বেশি না শুনতে হয় ঠিক তক্ষুনি সে ঘরের মধ্যে সরেও এসেছে। যেটুকু শুনেছে তাই কি কম? সেই একবার মাত্র শোনা কথা রিনির কানের কাছে বোলতার মত বারবার শব্দ করেছে। সত্যি মনে মনে সেদিন খুবই রাগ হয়েছিল রিনির। কেন অমন কথা তিনি তার মাকে বলবেন? তিনি তো তাদের আত্মীয়-স্বজন কেউ নন। কাকা নন, মেসোমশাই, পিসেমশাইদের কেউ নন। অমন কথা বলবার অধিকার তাঁকে কে দিল? বাবা ছাড়া ও কথা কারো মুখেই কি মানায়?

ভদ্রলোক ভিন্নজাতের মানুষ। রিনিরা কায়েত, তিনি বামুন। অবশ্য আজকাল বামুন কায়েতের মধ্যেও আত্মীয়তা কুটুম্বিতা হয়। কিন্তু বিয়ে না হলে তো আর তা হয়না। বিয়ে না হলে হয় বন্ধুত্ব। জিতেশবাবু কি মায়ের বন্ধু? কথাটা শুনতেও যেন কেমন লাগে। রিনি বাবার বন্ধুর কথা শুনেছে বান্ধবীর কথা শুনেছে, ছোট কাকা তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন দেখেছে স্বচক্ষে। দেখতে খারাপ লাগেনি। কিন্তু

মার বন্ধু কথাটা বলতে ভালো লাগে না, শুনতেও যেন কেমন কেমন। তিন বছর আগেও এ শব্দ রিনির কাছে অশ্রুতপূর্ব ছিল। তখন মা'র মুখে তাঁর বাপের বাড়ির মামার বাড়ির আত্মীয়-স্বজনের কথাই শুনেছে। কোন বন্ধুর কথা শোনেনি। এমন কি কোন মেয়ে বন্ধুর কথাও না। মা'র আত্মীয়রা নামে মাত্র ছিলেন, বন্ধুদের কোন নামগন্ধও ছিল না। এতদিন বাদে তিনি এলেন। মা অবশ্য বাবার কাছে বন্ধু বলে প্রথমে এ'র পরিচয় দেননি. বলেছিলেন, 'আমাদের জিতেশদা। বালুর-ঘাটে আমরা পাশাপাশি থাকতাম।'

ব্যস, বাবার কাছে মা ওইটুকু বলেই খালাস। বাবাও তেমনি। কৌতূহল বলে যেন কোন বস্তু নেই মানুষটির মধ্যে। একবারও জিজ্ঞেস করলেন না পাশাপাশি থেকে তোমরা কী করতে। লুডো, ক্যারাম খেলতে না গল্প করতে? এতদিন এই জিতেশদা কোথায় ছিলেন? কেন আসেননি, খোঁজ খবর নেননি, এতকাল বাদে কী করেই বা তিনি মার ঠিকানা পেলেন কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। বাবা ওই রকমই। সব সময় নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। অফিসের কাজ, সংসারের হিসেব-পত্র, টালীগঞ্জে তিনকাঠা জমি কিনেছেন, সেখানে কবে কী ভাবে বাড়ি তুলতে পারবেন তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা, ব্যয়-সংক্ষেপ নিয়ে রোজ দু'বেলা লেকচার আর ঝগড়া অথচ নিজেই অপব্যয়ের এক চূড়ান্ত উদাহরণ। নিজের অফিস আর নিজের সংসার ছাড়া বাবার আর কারো সম্বন্ধে কোন কৌতূহল নেই।

কিন্তু এই বাবাই আজকাল মাঝে মাঝে মাকে বেশ ঠাট্টা করেন, 'জিতেশবাবু বুঝি আজও এসেছিলেন? যাক এতকাল বাদে তোমার একজন বন্ধু জুটেছে।' মা বলেছিলেন, 'নতুন করে জুটেছে নাকি? আমার অনেকদিনেরই জোটা বন্ধু।'

সেদিন রবিবারের বিকেলে সবাইয়ের জন্যে চা করতে করতে বাবা মা'র দাম্পত্য আলাপ শুনতে পেয়েছিল রিনি। মার মুখে কোন পুরুষের সম্বন্ধে বন্ধু কথাটা সেই প্রথম শুনেছিল। ভালো লাগেনি। কেমন যেন 'অসভ্য অসভ্য' লেগেছিল। আড়াল থেকে মার হাসিখুশী মুখখানাও কেমন যেন অসভ্য অসভ্য দেখাচ্ছিল।

ওই ভদ্রলোক আসবার পর থেকে মা এরই মধ্যে বেশ একটু আধুনিকা হয়েছেন। না, সাজসজ্জায় নয়, কথাবার্তায় খোঁজখবর রাখায়। মা আজকাল নিয়মিত খবরের কাগজ পড়েন, মাসিক সাপ্তাহিকের শুধু গল্পগুলি নয়, প্রবন্ধগুলিরও পাতা ওলটান। মাঝে মাঝে রিনির কলেজের বইগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। শুধু সাহিত্য সংকলন নয়, গ্রীক ইতিহাস আর নগরবিদ্যা তাতেও মার উৎসাহ এসেছে। সবই তো বাংলায়। তাই পড়তে অন্তত নাড়াচাড়া করতে কোন অসুবিধে হয় না। কেন কে জানে। ভদ্রলোক তো কোন কলেজের প্রফেসর নন। কি একটা বিদেশী মেডিক্যাল ফার্মের রিপ্রেজেনটেটিভ। মানে একটু উঁচু দরের হকার। ওষুধের স্যাম্পল নিয়ে দেশবিদেশে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। তার জন্যে মার কেন এত বিদুষী হবার সখ। মা রিনির সঙ্গে আজকাল তার কলেজের গল্প করতে বেশি ভালোবাসেন। প্রফেসররা কি রকম। ছেলেরা কি রকম। ছেলেরা কি রকম তা রিনি কী করে জানবে। সে কি ছেলেদের সঙ্গে মেশে না তাদের সঙ্গে পড়ে? রিনিরা যখন কলেজ থেকে বেরোয় ছেলেরা কলেজে ঢোকে। তবু এই সন্ধিক্ষণেও যে কোন কোন ছেলের সঙ্গে রিনিদের ক্লাসের কোন কোন মেয়ের যে একটু আধটু কথাবার্তা আলাপ পরিচয় হয়না তা নয় কিন্তু রিনি ওসবের মধ্যে থাকে না। রিনির লজ্জা করে। তা ছাড়া যে সব ছেলে গায়ে পড়ে আলাপ করতে আসে, মেয়েদের কাছে কাছে ঘেঁষে দাঁড়ায়, পিছু পিছু ঘোরে তাদের ভারি হ্যাংলা মনে হয় রিনির। চালচলনে ওদের চ্যাংড়ামি তার মোটেই সহ্য হয় না। মাঝে মাঝে সে ক্লাসের বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করে, 'ওই ছেলেটার মধ্যে তোরা কী পেলি বলতো অতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করবার মত কী আছে।'

মঞ্জু হাসে। দীপা বলে, 'তুই তার কী বুঝবি।'

ওরা দুজনেই রিনির চেয়ে দেড় বছর দু'বছরের বড়। সেই অধিকারে ওরা রিনিকে খুকু বলে ক্ষেপায়। রিনি গোটা ফার্স্ট ইয়ার সালোয়ার পরে ক্লাস করেছে। তাই নিয়ে ওদের কী হাসি। প্রায়ই বলত, 'ফ্রক পরে আসিসনে কেন?' দীপা বলত, 'মা ঝিনুক বাটি দিয়ে দেয়নি

...ন্দে?' আর একদিন ওই দীপাই তার নাক টিপে ধরে বলেছিল, 'দেখি দুধ গলে নাকি।'

মঞ্জু বলেছিল, 'ছেড়ে দে ভাই। তুই দেখছি কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবি।'

দীপা বলেছিল, 'আহাহা, পাকতে কিছু বাকি আছে কিনা। অমন মেনি বেড়ালের মত থাকলে কী হবে, ও মেয়ে হাড়ে হাড়ে বজ্জাত।'

আসলে বজ্জাত ওরা নিজেরা। তবু ওদের সঙ্গ ছাড়া রিনি আর কারো সঙ্গে মিশতে পারেনি। তাই ওদের সঙ্গ ছাড়তেও পারেনি। সেই থার্ড ক্লাস থেকে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব। কত ঝগড়াঝাঁটি মান-অভিমানের পরেও তা টি'কে আছে। কত মাসের পর মাস কথা বন্ধ করে থাকবার পরও ফের একজন আর-একজনের কাছে মুখ খুলেছে, মন খুলেছে। মনের কথা বলবার মত সত্যিই একজন কাউকে না কাউকে দরকার। মার কি এতদিন কেউ ছিল না? এখন

আর তেমন কেউ আসেন না, কিন্তু আগে আগে তো বাবার কত বন্ধুরা এসেছেন, কাকারা এসেছেন, মার সংগে কথাবার্তা হাসিঠাট্টাও করেছেন কত, কিন্তু কই, ওই ভদ্রলোকের সংগে মা যেমন জমিয়ে গল্প করেন তেমন তো আর কারো সংগেই রিনি করতে দেখেনি, অথচ জিতেশবাবুর মধ্যে এমন কীই বা আছে? বাবার মত বিদ্বান নন, বুদ্ধিমান নন, পদস্থ অফিসারের গুরু দায়িত্ব ওঁকে বইতে হয় না, নিতান্তই একজন সাধারণ ক্যানভাসার। রূপে কি স্বাস্থ্যেও যে বাবার চেয়ে ভালো তা নয়। শুধু বয়সই যা দু-চার বছর কম। চল্লিশ বিয়াল্লিশ। রোগা, ঢ্যাঙা চেহারা। গায়ের রং একটু ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে, মুখখানা গোলও নয় লম্বাও নয়, বরং একটু যেন চোকো। প্রথম দিন দেখেই রিনি তো চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। এ আবার কি রকম মুখ রে বাবা। এর চেয়ে রিনির বাবার মুখ দেখতে অনেক ভালো। একটু লম্বাটে, নাক চোখ ঠোঁট ঠিক পরিমাণমত। রূপে গুণে সত্যি জিতেশবাবু বাবার ধারে-কাছেও যেতে পারেন না। তবু যে এ বাড়িতে ওঁর এত আদর তার কারণ উনি বাবা ছাড়া অন্য কেউ বলে। অন্য বলেই অনন্য।

প্রথম প্রথম ভদ্রলোককে বেশী পছন্দই করতে পারেনি রিনি। তিনি এ বাড়িতে এলেই মা একেবারে উচ্ছল হয়ে ওঠেন। খাবার আনতে দেন, চা করেন, তারপর মুখোমুখি বসে গল্প। কখনো খাটের ওপর পাশাপাশি বসে, কখনো বারান্দায় চেয়ার পেতে বেতের টেবিলটা মাঝখানে আর ঝুলন্ত ফুলের টবগুলি চোখের সামনে রেখে। কথা বলতে বলতে কথা শুনতে শুনতে মা ঘরকন্নার কথা ভুলে যান। রিনিরা যদি এসে পাশে দাঁড়ায় ভ্রূক্ষেপই নেই। যেন টেরই পান না মা। তোমাদের মধ্যে সিন্ধুক ভরা কী এত কথা জমে রয়েছে বাপু যে, উজাড় করে ঢেলে না দিলে চলে না, আর ঢেলে দিতে না দিতেই ভরে ওঠে, সাত দিন যেতে না যেতেই আবার সেই কথার মণিমুক্তা সোনার সিন্ধুক ছাপিয়ে উপচে পড়ে? ভদ্রলোক এলেই মা যেন আত্মহারা হন, আত্মীয়-স্বজন স্বামী ছেলেমেয়েদের হারিয়ে ফেলতেও ওঁর যেন কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু রিনির ভারি কষ্ট হয়, দুঃখ হয়, রাগ হয়। মনে মনে। কেন? কেন? কেন মা তাদের ভুলে যাবেন? অন্তত আধ ঘণ্টার জন্যে গেলেও ভুলে যাবেন? এই ঘর-সংসারের জন্যে যাঁর এত মায়া, ধোয়ামোছা, সাজানো-গোছানো সেরে বেলা দেড়টার আগে যিনি খেতে বসতে পারেন না, রাত্রেও খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে শুতে যাঁর বারোটা, সেই মাকে আধ ঘণ্টার জন্যেও মমতাহীন দেখতে ভালো লাগে না রিনির। গা জ্বালা করে, নাকি মন জ্বালা করে। কে জানে মনটা কী বস্তু। প্রফেসর পি সি এস বলেছিলেন সূক্ষ্ম দেহ। দেহের মধ্যেই কি আর একটা দেহ? স্থূলে আর সূক্ষ্মে দুই দেহেই অস্বস্তি বোধ করে রিনি। চিনি আর বিনু অনেক ছোট। ওরা কিচ্ছু বোঝে না। বাবার অ্যাবসেন্সে এ বাড়িতে কে এল না এল তা নিয়ে ওদের মাথাব্যথা নেই। ওরা নিজেদের খেলা নিয়েই মত্ত। বাড়িতে বসে খেলে, বাড়ির পাশের ছোট চিলড্রেন্স পার্কটায় গিয়ে খেলে। কিন্তু রিনির ওসব ভালো লাগে না। এখনো মাঝে মাঝে ফ্রক পরলে কি হবে, সে শিশুও নয়, বালিকাও নয়। সে সব বোঝে। রিনি জানে সে বাবার প্রতিনিধি। এ বাড়ির মান মর্যাদা রক্ষার ভার তার ওপর। এই জন্যেই মার উপর তিনি যতটা নির্ভর না করেন, রিনির ওপর তার চেয়ে ভরসা করেন অনেক বেশী। রিনি অহংকার করে না। মা লেখাপড়া কম জানলেও অনেক বুদ্ধি রাখেন। বাইরের কেউ আলাপ পরিচয় করতে এসে সহজে কেউ মার কম বিদ্যার কথা ধরতে পারে না, যেমন পারে না বেশী বয়সের কথা আন্দাজ করতে। মার এখনো বেশ আঁটসাঁট শরীর। নিমন্ত্রণে-টিমন্ত্রণে যাবার সময় একটু সাজসজ্জা করে যখন বেরোন মনে হয় যেন রিনির বড়দিদি। কিন্তু তা হলে কি হবে, বাবা রিনিকে যত পছন্দ করেন মাকে তেমন করেন না। মার সঙ্গে তাঁর যেমন রোজ খিটিমিটি লাগে রিনির সংগে একদিনও তেমন লাগে না। মা কি সেই শোধ নিচ্ছেন? জিতেশবাবুর সামনে গা এলিয়ে বসে তাঁর সংগে প্রাণ ঢেলে গল্প করে মা কি এই কথাটা বলতে চান তাঁর দলেও লোক আছে, তাঁকে ভালবাসবারও মানুষ আছে? ছেলেবেলায় নিজের লজেন্স-গুলি জমিয়ে রেখে রিনি যেমন চিনিকে দেখিয়ে দেখিয়ে খেত, মাও কি তেমনি রিনিকে শুনিয়ে শুনিয়ে গল্প করেন, দেখিয়ে দেখিয়ে বন্ধুত্ব করেন ভালো-

রাখেন? জিতেশবাবু কি মার সেই অনেক কালের লুকিয়ে রাখা লজেন্স?

প্রথম প্রথম মা বলতেন, 'কি যে ঘরের মধ্যে ঘুটঘুট করিস। যা না রিনি, ওদের নিয়ে একটু পার্কে যা না। ঘুরে আয় না খানিকক্ষণ।'

রিনি শোনা যায় কি যায় না এমনি গলায় বলত, 'আমার কাজ আছে মা।'

কাজের কি অভাব আছে? রিনি কাপড় তুলত, ঘর ঝাঁট দিত, টেবিল গুছোত। কিন্তু কোন কাজই ওর বেশী দূরে গিয়ে নয়। যেখানে মা আর জিতেশবাবু বসে গল্প করছেন তারই কাছাকাছি থেকে, তাঁদের দিকে চোখ রেখে, তাঁদের কথায় কান রেখে।

জিতেশবাবু হেসে বলতেন, 'লীলা, তোমার মেয়ে কিন্তু তোমারই মত হয়েছে।'

মা রিনিকে চটাবার জন্যেই বলতেন, 'ইস্, আমার চেয়ে ও ঢের কালো।'

জিতেশবাবু বলতেন, 'তা হোক, তোমার চেয়ে ও ঢের কাজের আর ঢের চালাক।'

রিনি বেশ বুঝতে পারত জিতেশবাবু ওকে দলে টানবার জন্যে খোশামোদ করছেন। মন ভেজাবার জন্যে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলছেন। আসলে রিনিও ও'কে পছন্দ করে না, তিনিও ওকে পছন্দ করছেন না। বয়ে গেছে রিনির। ও'র পছন্দ আর অপছন্দে যেন তার এসে যায়।

মা বলতেন, 'ও মা, তা হবে না! ওরা যে কলকাতা শহরের আজকালকার মেয়ে। আমার মত পাড়াগেঁয়ে ভূত তো আর নয়। সত্যি, মাঝে মাঝে ভারি দুঃখ লাগে জানো?'

জিতেশবাবু বলতেন, 'কিসের দুঃখ?'

মা বলতেন, 'এ জীবনে কিছু হল না।'

মায়ের নিজের হাতে পরিষ্কার করা মাজা মোছা (কে জানে আঁচল দিয়ে কিনা) চিনেমাটির সুন্দর ছাইদানির মধ্যে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে জিতেশবাবু মিষ্টি মিষ্টি হাসতেন, 'মানব জমিন রইল পতিত? কিন্তু লীলা, তোমার জমিতে তো সোনা ফলেছে। ছেলে মেয়ে স্বামী সংসার, দু হাত ভরা চতুর্বর্গ ফল। আর কী চাও?'

রিনি কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। তবু যেন ও'দের ভ্রূক্ষেপ নেই। সমানে চলেছে ও'দের আলাপ।

মা বলেছেন, 'দেখ, আমি আমার মেয়ের মত একেলে না হতে পারি কিন্তু দিদিমা ঠাকুরমার মত অত সেকেলেও তো নই। মেয়েদের বুঝি ঘর সংসার ছাড়া আর কিছু চাইতে নেই? তাদের বুঝি হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতেই জীবন যাবে?'

মার মনে যে আরো চাওয়ার বস্তু আছে তা কে জানত? অসাবধানে সংসারের একটি কাঁচের গ্লাস কি চায়ের কাপ রিনিরা যদি ভেঙে ফেলে মার যেন বুক ফেটে চৌচির হয়ে যায়, এমন চেঁচামেচি করেন। সেই সংসার এখন ও'র কাছে শুধু হাঁড়ি ঠেলা? এত অবহেলা নিজের ঘর সংসারে? কেন, ওই একজন মানুষ আধ ঘণ্টার জন্যে এসেছেন বলে? উনি কোন স্বর্গের সিঁড়ি হাতে করে নিয়ে এসেছেন শুনি?

জিতেশবাবু যেন মায়ের মন বোঝবার জন্যেই বলেন, 'আহা, মেয়েদের সত্যিকারের সুখ তো আসলে—।'

মা প্রতিবাদ করে ওঠেন, 'থাক, থাক। আসল সুখের সন্ধান তোমাকে আর দিতে হবে না। আমাদের যে কিসে সুখ তা আমরাই জানি। নিজের বৌটিকে তো দিব্যি চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছ। আমার বেলায় বুঝি শুধু—।'

জিতেশবাবু হাসতে হাসতে বলেন, 'কী করব বলো? তার শুধু গৃহস্বামীতে মন ভরছিল না, অফিস-স্বামীও চাই। আমি বললাম, তথাস্তু। গৃহে একবচন, সেখানে বহুবচন। দ্রৌপদী মাত্র পাঁচজনের কথাই ভাবতে পেরেছিলেন। ওর অন্তত—' জিতেশবাবু দু হাত তুলে আঙুলগুলি দেখান।

মাও হাসেন, 'দাঁড়াও আমি বউদিকে গিয়ে সব বলে দেব। তুমি তাঁর এইরকম সুনাম গেয়ে বেড়াও।'

এ ধরনের বাজে রসিকতা দুজনেই বেশ উপভোগ করেন। কিন্তু রিনির ভারি লজ্জা হয়। অস্বস্তি লাগে। ছি ছি ছি। ভদ্রলোক দেখি চ্যাংড়ামিতে কমবয়সী ছেলেদেরও ছাড়িয়ে গেলেন। নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে কী করে ও ধরনের বদ ইয়ারকি করতে পারলেন ভদ্রলোক? আশ্চর্য!

রিনির ইচ্ছা হচ্ছিল তক্ষুনি জায়গা ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু যেতে পারল না। সে চলে গেলে ও'রা আরও খারাপ খারাপ কথা বলবেন। ঠাট্টা ইয়ারকির আর সীমা থাকবে না।

মা বললেন, 'তুমি যাই বলো, তোমার স্ত্রীকে তুমি অনেক স্বাধীনতা দিয়েছ। অবশ্য তাঁর যোগ্যতাও আছে। আমার মত মুখ্যু-সুখ্যু তো আর নয়। আমার কিন্তু ইচ্ছে করে ফের পড়াশুনো করি।'

জিতেশবাবু বলেন, 'বেশ তো, শুরু করে দাও না।'

মা বলেন, 'দিতে পারি, তুমি যদি একটু দেখিয়ে-টেখিয়ে দাও। দেবে? আসবে? রোজ এসে পড়াবে আমাকে?'

আহ্লাদে সোহাগে মা যেন উথলে ওঠেন। উনি যেন রিনির মা নন, রিনিরই বয়সী কি তার চেয়েও ছোট। ভঙ্গি দেখে গায়ে জ্বালা ধরে রিনির। যদি পড়তেই হয়, বাইরের ভদ্রলোকের কাছে অমন আবদার করা কেন, বাবাকে বললেই হয়। বাবার কি বিদ্যাবুদ্ধি কারো চেয়ে কিছু কম? তিনিই তো মাকে পড়াতে পারেন। যদি তেমন সময় না পান, রিনিদের জন্যে যেমন টিউটর রেখে দিয়েছেন মার জন্যেও তেমনি টিউটর রেখে দিতে পারেন। হ্যাঁ, মার জন্যেও বুড়ো টিউটরই রাখা দরকার। যাঁকে কিছুতেই দাদা-টাদা বলা যায় না, মুখ থেকে আপনিই দাদু শব্দটা বেরিয়ে আসে। মাও অবশ্য নতুন করে আর পড়াশুনো আরম্ভ করেন না, জিতেশবাবুও ও'কে পড়াতে আসেন না। কিন্তু সত্যিকারের কাজটাই কি সব? কথার জোর তার চেয়ে অনেক বেশী। কথা যেন অন্তরীপের মত ভবিষ্যতের মধ্যে অনেকখানি ঢুকে যায়। রিনি বেশ দেখতে পেয়েছিল মা সেজেগুজে চুল বেঁধে কমবয়সী ছাত্রী সেজে রোজ বই খাতা কলম নিয়ে পড়তে বসেন আর ওই ভদ্রলোক সন্ধ্যার পর রোজ এসে হাজির হন। 'কই গো লীলা, পড়াশুনো কতদূর কি করেছ নিয়ে এসো দেখি।' ওষুধের ক্যানভাসার একজনের সাধের জোরে কলেজের প্রফেসর হয়ে ওঠেন। কারো বাড়ি রোজ তো আর আসা যায় না, এমন কি সপ্তাহে একদিন এলেও বাড়াবাড়ি লাগে, কিন্তু পড়াতে রোজ আসা যায়, আধ ঘণ্টার জায়গায় দু ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেও কারো কিছু বলবার জো থাকে না। যখন পড়বার কথাটা তুলেছিলেন তখন মাও কি এইসব ভাবেননি? এমন একটি মধুর ছবি দেখেননি? এমন একটি ছাত্রী হয়ে ওঠেননি যার পড়া কোনদিন ফুরোবে না? এমন অসংখ্য সাধ্যমিলনের কল্পনা করেননি যা সারা জীবন ধরে আসবে?

আর একদিন উঠেছিল ও'দের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা। সেদিনও চা দিতে দিতে খানিকটা সামনে থেকে আবার ঘরে গিয়ে বই গুছোবার অছিলায় খানিকটা আড়াল থেকে ও'দের সব কথা শুনেছিল রিনি।

মা বলছিলেন, 'সত্যি, আর ভালো লাগে না এই একঘেয়ে জীবন। দাও না একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে। দিব্যি বাবু সেজে পান মুখে দিয়ে অফিসে যাব আসব। সংসারের কোন ঝামেলা ঝক্কিই আর পোহাতে হবে না।'

জিতেশবাবু হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'আগেকার মেয়েরা শাড়ি চাইত, গয়না চাইত। আমাদের যার যেটুকু সাধ্যে কুলো তো দিতাম। এখন তোমরা দল বেঁধে চাকরি চাইতে শুরু করেছ। কিন্তু চাকরিও যা আকাশের চাঁদও তাই। পরের চাকরি করে কী হবে বরং নিজে কিছু একটা গড়ে তোল। নিজের হাতে গড়া জিনিসের মধ্যে যে সুখ পরের কাজে কি আর তো মেলে?'

মা বললেন, 'তুমি ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা

বলছ? কিন্তু তাতে তো টাকা লাগে। গরীব মানুষ, অত টাকা কোথায় পাব? আমাদের মূলধনের মধ্যে তো দুখানি হাত।'

জিতেশবাবু হেসে বললেন, 'আর একখানি মুখ।'

মা মধুর ভঙ্গিতে হাসলেন, 'যাও।' তারপর বললেন, 'সবাই তোমার মত কিনা। সবই মুখে মুখে। জিভ সর্বস্ব।'

জিতেশবাবু বললেন, 'যা বলেছ। জিভেই এখন আমার জীবনের শেষ লক্ষণটুকু আছে। আর সব অসাড়। সত্যি, আমিও মাঝে মাঝে ভাবি ঘাটে ঘাটে ঘুরবো না আর, নিজেই একটা কিছু গড়ে তুলব। ছোটমত একটা ওষুধের কারখানা-টারখানা যদি দিতে পারতাম। কিন্তু একার সাধ্যে কুলোবে না। তুমি আসবে আমার সঙ্গে? পার্টনার হবে?'

রিনির কানে খচ করে বিঁধেছিল কথাটা। কী অসভ্য! কী অসভ্য! অভদ্রতার একশেষ। পার্টনার কথাটার যে আরো মানে আছে, রিনি তা জানে না উনি ভেবেছেন বুঝি?

মা কিন্তু বলে চললেন, 'কেন হব না?' তুমি যদি ডাকো আমি নিশ্চয়ই আসব। আমার হাতে অবশ্য নগদ টাকা কিছু নেই। কিন্তু বাবার দেওয়া গয়না তো আছে, তাই ধরে দেব। তবু তুমি একটা কিছু গড়ে তোল। আর আমাকে সেখানে যে কোন একটা কাজে লাগিয়ে দাও। আর কিছু না হোক, তোমার কারখানার ওষুধ মোড়ক করবার কাজও কি আমাকে দিয়ে হবে না?'

উৎসাহে উল্লাসে উত্তেজনায় জিতেশবাবু সোজা হয়ে বসেছিলেন, 'কী বলছ তুমি? মোড়ক করবার কাজ মানে? তার জন্যে আমরা অন্য লোক রাখব। কত দুঃস্থ দুঃখী গরীব মেয়ে আছে, তাদের নেব। যদি তেমন কিছু একটা গড়ে তুলতেই পারি, আমি হব ম্যানেজিং ডিরেক্টার আর তুমি হবে জেনারেল ম্যানেজার। তার চেয়ে কোন নিচু পদ তুমি বিনয় করে নিতে চাইলেও তোমাকে দিতে পারব না।'

মা বলেছিলেন, 'কিন্তু আমার কি তেমন বিদ্যের জোর আছে?'

জিতেশবাবু বলেছিলেন, 'বিদ্যে! বিদ্যে দিয়ে কি হবে? বিদ্যে যারা তোমার কাছে চাকরিপ্রার্থী হয়ে আসবে তাদের দরকার। হাজার হাজার অ্যাপ্লিকেশন পড়বে। বি এ, এম এ, বি এস সি, এম এস সি। কারো কারো বা বিদেশী ডিগ্রী। ইংল্যান্ড ফ্রান্স, জার্মানী ফেরত সব বাঙালী যুবক, তোমার কাছে চাকরিপ্রার্থী হয়ে হাত কচলাবে। যাকে যোগ্য মনে কর তাকে চাকরি দেবে। একটু একটু পক্ষপাত যদি করো, আমি কথা বলব না। আমি সব সময়ই তোমার পক্ষে। আমি আর তুমি পাশাপাশি ঘরে থাকব। তবু যখন তখন দেখা হবে না, কিন্তু শোনা হবে। দুজনের টেবিলে দুটি ফোন আছে। ফোনে ফোনে কথা বলব। একসঙ্গে লাঞ্চ খাব। সন্ধ্যায় একসঙ্গে অফিস থেকে বেরোব। উঁহু, তাই বলে এক গাড়িতে নয়। উঁহু, এক গাড়িতে নয়। তাতে নানা জনে কানাঘুষো করতে পারে। কোম্পানী আমাদের দুজনকে আলাদা করে দুখানা গাড়ি দেবে। দুজনের গাড়ি পাশাপাশি চলবে। যে রাস্তা অনুদার অপ্রশস্ত সেখানে তুমি আগে আমি পিছে।'

রিনি বুঝতে পারে সমস্ত ব্যাপারটাই ঠাট্টা। মাও শেষ পর্যন্ত হেসে ওঠেন। কিন্তু যতক্ষণ ভদ্রলোকের কথা শেষ হচ্ছিল মা অপলকে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন রিনি তা লক্ষ্য করেছে। যেন ব্রতকথা শুনছিলেন মা, রূপকথা শুনছিলেন। ভদ্রলোকের মুখে রূপ না থাকলে কি হবে, কথায় রূপ আছে।

ঠাট্টা ছাড়া কিছু নয়। তবু এই ঠাট্টার মধ্যেও দুজনের মনের চেহারা কি দেখতে পায়নি রিনি? জিতেশবাবুর অত বড় কারখানায় অত প্রাসাদের মত অফিসে রিনির জায়গা হল না, রিনির বাবার জায়গা হল না, শুধু তার মা আর উনি! কী সাহস মানুষটির! কত বড় স্পর্ধা তাই দেখ। এ কথা ভাবতে পারলেন কী করে, বলতে পারলেন কী করে? আর মাই বা কিরকম? যেই বলা অমনি রাজী হয়ে গেলেন ভদ্রলোকের কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার হতে। একবার ভাবলেন না লোকে কী বলবে, রিনিরা কী মনে করবে। সব আক্কেল বুদ্ধি কি মার ধুয়ে মুছে গেছে?

আর একদিন উঠেছিল পথের কথা। সেদিন প্রাইভেট পড়ানোও নয়, কারখানা আর অফিস বাড়িও নয়। ভদ্রলোক ওষুধের নমুনা নিয়ে নর্থ বেঙ্গলে গিয়েছিলেন। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং হয়ে গ্যাংটক পর্যন্ত। সেই পথের কথা, বিপদ আপদের কথা, অ্যাডভেঞ্চারের কথা। আজকাল লোক কথায় কথায় ইংল্যান্ডে যাচ্ছে, জার্মানীতে যাচ্ছে, আমেরিকায় যাচ্ছে, আর ও'র দৌড় ওই গ্যাংটক পর্যন্ত। তার আবার গল্প।

'সে যে কী পথ তুমি ভাবতেও পার না লীলা!'

মা অমনি অভিমানের ভঙ্গিতে মুখ ভার করে বললেন, 'চাইনে ভাবতে। কী স্বার্থপর মানুষ। একা একা ঘুরছ তো ঘুরছই। মাস দেড়েকের ওপর হয়ে গেল সেই যে গেছ তো গেছই। একটা খবর

বার্তা নেই। একখানা চিঠি পর্যন্ত নেই। এই তো তোমার মায়ামমতা!'

ভদ্রলোক হাসি দিয়ে মায়ের মন একেবারে ভিজিয়ে দিয়েছেন, 'দেখ, চিঠি ঠিক লিখে উঠতে পারিনি, কিন্তু রোজ লিখি লিখি করেছি। এমন দিন যায়নি তোমার কথা মনে পড়েনি। এমন জায়গায় যাইনি যেখানে মনে না হয়েছে তুমি সঙ্গে থাকলে বেশ হত।'

শুনতে শুনতে মার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। রিনির অন্তর রাগে জ্বলে গেছে। কী স্পর্ধা ভদ্রলোকের, কী সাহস! প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে মা ও'কে কতখানি এগোতে দিয়েছেন।

মা বলেছেন, 'তোমার যত সব বানানো কথা! তোমার মত মহা মিথ্যুক আর নেই।'

'আচ্ছা, একবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোব।'

মা বলেছেন, 'হুঃ, তুমি আবার বেরোবে। তুমি একদিন একটা সিনেমা পর্যন্ত আমাকে দেখালে না। একদিন সঙ্গে করে ওই পার্কটা পর্যন্ত যাবে তাই তুমি পারলে না!'

জিতেশবাবু ভরসা দিয়েছেন, 'যাব, যাব। যেদিন যাব সেদিন একেবারে লম্বা পাড়ি দেব। তারপর শোন, গ্যাংটকের যে হোটেলটায় এবার উঠেছিলাম—।'

মা অমনি গালে হাত দিয়ে হোটেলের গল্প শুনতে বসেন। ভদ্রলোক মাকে সঙ্গে করে সিনেমায় রেস্টুরেন্টে, পার্কে কি লেকে না নিয়ে গেলে কি হবে, নিজের ভ্রমণবৃত্তান্তের ভিতর দিয়ে তাঁকে না নিয়ে যান এমন পথ নেই, যানবাহন নেই, শহর বন্দর নেই। আর সেই সব কল্পধামে গল্পের জগতে মা নিশ্চয়ই একা একা ও'র সঙ্গে বেড়ান। সেসব জায়গা হয় বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বতের মত নির্জন, আর শহর বন্দর হলে এমন সব লোকজন আছে যাঁরা সব অচেনা। অচেনা লোকজনও যা, গাছপালাও তা। তাদের কাছে আবার চক্ষুলজ্জা!

ভদ্রলোক প্রথম প্রথম একেবারে খালি হাতে আসতেন, তারপর বোধ হয় ভাবলেন, ছেলেপুলের বাড়ি একেবারে শূন্য হাতে যাওয়াটা সব দিন ভালো দেখায় না। তাই মাঝে মাঝে কিছু কিছু জিনিসও আনতে লাগলেন। দামী জিনিস কিছু নয়। হয়তো এক শিশি লজেন্স, এক কৌটো বিস্কুট, কি খাবার জন্যে এক পাউন্ড দার্জিলিং-এর চা। কি বিজয়ার পরে বড় জোর এক টাকার সন্দেশ। আর উপহারের মধ্যে যত ওষুধের খালি শিশি, কৌটো—যার দাম নেই, শুধু দেখতে সুন্দর আর রঙীন। শুধু চিনু আর বিনু নয়, মাও সেই খেলনাগুলি পেয়ে কী খুশীই না হয়েছেন! হেসে বলেছেন,

'বাঃ, কী সুন্দর তোমার এই বিস্কুটের টিনটা। আমি এর মধ্যে ডাল রাখব।'

শুধু ডাল নয়, সেই খালি শিশি আর কৌটোগুলি মা যেন মনের খুশী দিয়ে ভরে তুলেছেন, ভদ্রলোক কোন বার আনতে ভুলে গেলে চেয়ে নিয়েছেন। ছি ছি ছি, কী হ্যাংলামি, কী কাঙালপনা। রিনি কিন্তু ওর হাত থেকে কোন উপহার নেয়নি, ও'র আনা কোন খাবার খায়নি। জোর করে হাতের মধ্যে গুঁজে দিলেও লুকিয়ে হয় ফেলে দিয়েছে, না হয় চিনু কি বিনুকে দিয়েছে।

আজ কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম হল। ভদ্রলোক আজ যখন বিকেল বেলায় এলেন, মা বাড়ি ছিলেন না, চিনু আর বিনুকে নিয়ে ভবানীপুরে পিসিমার বাড়িতে গিয়েছিলেন। রিনিরও যাবার কথা ছিল কিন্তু মাথাটা ধরেছিল বলে যায়নি, কলেজও কামাই করেছে। বিকেল বেলায় গা ধুয়ে, চুলের বিনুনি করে মারই হালকা সবুজ রঙের মাদ্রাজী শাড়িখানা পরেছিল রিনি। তারপর বারান্দায় রেলিং-এর ধারে চেয়ারটা টেনে নিয়ে চুপ করে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। বাড়ির পর বাড়ি, ছাদের পর ছাদ, তারই ফাঁকে এক চিলতে আকাশ। সেই আকাশে অদ্ভুত একটু রঙ—লাল নয়, সবুজ নয়, হলদে নয়, বেগুনী নয়, সে রঙের নাম জানে না রিনি। কিন্তু দেখতে ভালো লাগছিল।

রিনির হঠাৎ মনে হল কে যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ফিরে দেখল ঠিকই। সেই ভদ্রলোক, মায়ের বন্ধু জিতেশবাবু। কিসের একটা অস্বস্তি ভয় লজ্জা আর আশঙ্কায় বুক ভরে উঠল রিনির। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল, কথা না বলে চলে যাচ্ছিল—ও'র সঙ্গে পারতপক্ষে সে কোন কথা বলে না। জিতেশবাবু বললেন, 'ইয়ে তোমার মা কোথায়।'

রিনি বলল, 'ভবানীপুরে গেছেন। ফিরতে দেরি হবে।'

পাছে মনে করেন, অভদ্রভাবে তাঁকে বিদায় করে দিতে চাইছেন, তাই বলেছিল, 'আপনি বসুন।'

তিনি বললেন, 'না, আর বসব না। আমারও কাজ আছে।'

'এক কাপ চা খেয়ে যাবেন না?' নিতান্তই ভদ্রতা করে বলেছিল, রিনি।

তিনি হেসে বললেন, 'না। বসবও না. চা-ও খাব না। তুমি তো আমাকে পছন্দ করো না।'

পছন্দ করে না ঠিকই। কিন্তু মুখের ওপর যদি কেউ ওকথা বলে বসেন, তা কি স্বীকার করা যায়!

রিনি তাই বলেছিল, 'কে বললে আপনাকে।'

তিনি বলেছিলেন, 'কে আবার বলবে। এই ধরো, যদি বলি, তুমি আমাকে এই গলির মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসো, যাবে?'

রিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল, 'হুঁ'।

এটুকুও সাধারণ ভদ্রতা। যে ভদ্রলোক একটু বসলেন না, চা খেলেন না, কিছুই নিলেন না, তাঁকে কি এটুকুও দিতে নেই? একটু এগিয়ে দিতে নেই?

চাকরকে ঘরদোর দেখতে বলে রিনি সঙ্গে সঙ্গে বেরোবার জন্যে তৈরি হয়। তৈরি
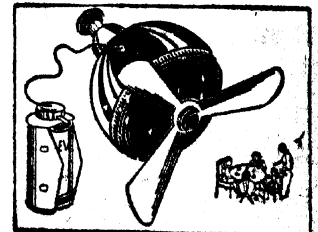
হওয়া আর কি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আর একবার পাউডারের পাফটি মুখে বুলিয়ে নেওয়া আর নতুন কেনা নীলরঙের স্যান্ডালটার মধ্যে পা গলিয়ে দেওয়া। তারপর ও'র পিছনে পিছনে চলতে লাগল। রোজ বার কয়েক করে যে সিঁড়ি বেয়ে ওঠে নামে রিনি সেই পুরনো বাড়ির সরু সিঁড়ি বেয়েই নামল, কিন্তু মনে হল যেন পাহাড় থেকে নামছে। সদর পেরিয়ে সেই অতিচেনা গলি। একদিকে বস্তি, আর একদিকে মুড়ি-মুড়কির দোকান, যোতনদার জয়লক্ষ্মী স্টোর্স, রমেশ দাসের সস্তা সেলুন। তবু রিনির মনে হল যেন অদেখা অচেনা গ্যাংটক শহরের কোন রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। মোড়ে পৌঁছতে দু মিনিটের বেশি লাগল না। একটা ফুলের দোকান আছে এখানে। গরীব একটা মালী বসে। যেমন তার চেহারা তেমনি ফুলগুলির ছিরি। যারা এই রাস্তা দিয়ে শিবমন্দিরে পুজো দিতে যায়, তারাই এখানে ফুল বেলপাতা কেনে।

কিন্তু জিতেশবাবু হঠাৎ এই ফুলের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

রিনি বলল, 'কী হল?'

তিনি বললেন, 'কিছু ফুল কিনি।'

রিনি বাধা দিল না। দিলেই কি তিনি শুনতেন? তাছাড়া ভেবেছিল উনি নিজের জন্যেই কিনছেন।

কিন্তু অবাক কাণ্ড। তিনি এক ডজন রজনীগন্ধা কিনে তার হাতে দিলেন। আর কিনলেন একটি লাল টুকটুকে গোলাপ। হেসে বললেন, 'তোমার জন্যে।'

রিনি বাধা দিতে পারল না, প্রতিবাদ করতে পারল না, কোন একটি কথামাত্র বলতে পারল না।

তিনি রিনির দিকে তাকিয়ে আর একটু হাসলেন। তারপর রাস্তা পার হয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন। ট্রামে উঠলেন কি বাসে উঠলেন রিনি লক্ষ্যই করতে পারল না।

ফিরতি পথটুকুতে কিছুই কি সে লক্ষ্য করেছে?

সিঁড়ি বেয়ে কোন রকমে উপরে উঠে এসেছে রিনি। আশ্চর্য আজ কিছুতেই পারল না ফুলগুলি ফেলে দিতে। যেমন ফেলে দিয়েছিল তার ভাগের লজেনস, তুচ্ছ শিশি কৌটোর উপহার।

রজনীগন্ধার ডাঁটাগুলি খাটো করে কেটে ফুলদানিতে সাজিয়ে রেখেছে রিনি। কিন্তু গোলাপটিকে রাখতে পারেনি। এই গোলাপটি হয় ফেলে দেবে, না হয় দেরাজের মধ্যে চাবি বন্ধ করে লুকিয়ে রাখবে। আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে। তাকে ফুল বলে আর চেনা যাবে না। কিন্তু মা যতক্ষণ এসে না পৌঁছন, ততক্ষণ ফুলটিকে টেবিলের ওপর রাখতে ক্ষতি কি?

কিন্তু এ ফুল উনি কেন দিলেন, কাকে দিলেন? কেন রিনিকে সঙ্গে করে ডেকে নিয়ে গেলেন? ও'র কি আরো দূরে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল? ভয়ে পারলেন না? কার ভয়ে? ও'র কি এখানে আরো অপেক্ষা করবার ইচ্ছা ছিল? ভয়ে পারলেন না, কার ভয়ে? কিন্তু এমন যদি হয় রিনিকে তার মার শাড়ি পরে থাকতে দেখে তিনি ওকে তার মা বলেই ভুল করেছিলেন। তাই যদি হবে, ভুল ভাঙবার পরেও কেন অমন হাসি-ভরা চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন? রিনি কারো চোখের দিকে তাকায় না বলেই কি কোন্ দৃষ্টির কী মানে তা বুঝতে পারে না? মানুষের মন যত দুর্বোধ্যই হোক, তার দুটি চোখ, দুখানি নোট বই। জিতেশবাবু যার সঙ্গে কথা বলতে আসেন, কিন্তু দেখতে আসেন তাকে, তা রিনি অনেক দিন দেখেছে। তিনি বার বার তাকে কাছে ডেকেছেন, রিনি যায়নি, কথা বলতে চেয়েছেন, রিনি বলেনি। রিনির কোন সন্দেহ নেই, সে ও'কেই জয় করে নিয়েছে। যেমন একদিন বাবাকে করেছিল। আদরে সোহাগে সেবায় শুশ্রূষায় বাবাকে সে একেবারে বাধ্য করে ফেলেছে। এবার মায়ের বন্ধুর পালা। কিন্তু এ'র বেলায় আর এক অস্ত্র। অনাদর, অনাগ্রহ, বিতৃষ্ণা, বিরূপতা। রিনি হঠাৎ নিজের মনে অদ্ভুত এক উল্লাস বোধ করল। সে জয় করেছে, কেড়ে নিয়েছে, ছিনিয়ে নিয়েছে। এই রক্তগোলাপ তার সাক্ষী। এই রক্তগোলাপ দিগ্বিজয়িনীর লুঠ করা মণিমাণিক্য: বল্লমের মুখে তুলে আনা পরম শত্রুর রক্তাক্ত হৃৎপিণ্ড।

রিনি দুটি আঙুলে ফুলটিকে নিজের চোখের সামনে তুলে ধরল। তার বিজয়-কেতন, তার গৌরবপতাকা। বেচারা মা, তোমার একমাত্র বন্ধুটিও গেল। কিন্তু মায়ের বন্ধু! কী বিশ্রী শুনতে, মায়ের বন্ধু। তার চেয়ে বয়সে বড়, ঢের বড়। মায়ের চেয়েও বড়। শেষ পর্যন্ত এক বুড়ো বাঘ শিকার করে রিনির এত গর্ব। ছি ছি ছি। রিনি মঞ্জু আর দীপার বন্ধুদের কিছুই করতে পারল না শেষ পর্যন্ত কিনা মায়ের বন্ধুকে—ছি ছি ছি। কিন্তু ভদ্রলোকের মুগ্ধ চোখ দুটি বড় সুন্দর, তাঁর দেওয়া গোলাপটির রঙ এত টুকটুকে লাল, আর তাঁর মুখের সব কথাই তো রূপকথা। কিন্ত—কিন্তু তিনি কেন সর্বদিক থেকে রূপকথার রাজপুত্র হলেন না!
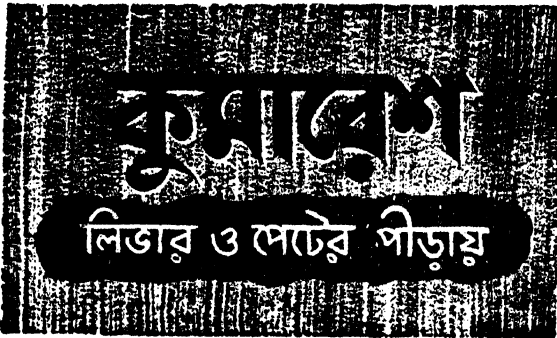
সম্প্রতি বৃটিশ কলাম্বিয়ার ডউখোবোর সম্প্রদায় বসন্তোৎসব পালন করে উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তায় মিছিল করে বেড়িয়ে এবং নিজেদের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে। এই দৃশ্যে রয়াল ক্যানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিস বা রাস্তার দুপাশের দর্শকদের কেউই বিস্মিত হয়নি। কারণ ডউখোবোররা হচ্ছে একটি ধর্ম সম্প্রদায় এবং বাষট্টি বছর পূর্বে রাশিয়া থেকে এসে বসবাস আরম্ভ করার পর প্রতি বৎসরই এইভাবে বসন্তোৎসব পালন করে আসছে।

মুখ্যত এদের উলঙ্গ মিছিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে যাওয়া এবং কর আদায় আইনের প্রতিবাদ জ্ঞাপন। কিন্তু ওদের এইভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনে কানাডা গভর্নমেণ্টের আর্থিক ব্যয় কম হয় না। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে গত ত্রিশ বছরে ডউখোবোররা তাদের নিজেদের সম্পত্তি সমেত প্রায় সাত কোটি টাকার সম্পত্তির ক্ষতি করেছে।

প্রতিবাদ জানাতে এ পর্যন্ত একশটি বিদ্যালয় ওরা ধ্বংস করেছে—কিংবা সেতু বা রেল লাইন উড়িয়ে দেওয়াটা ওরা কোন ক্ষতিই মনে করে না। আদালতে ওদের ধরে নিয়ে এলে অভিযুক্তদের পুরুষ ও নারী আত্মীয়স্বজন উলঙ্গ অবস্থায় উপস্থিত হয়ে কর্তৃপক্ষকে বড়ো বিব্রত অবস্থায় ফেলে।

বিক্ষোভ প্রকাশে সাধারণ্যে পরিচ্ছদ ত্যাগ করার ওদের এই অভ্যাসটির উৎপত্তি হয়েছে এক ধর্মগত প্রথা থেকে। বিশেষ ক্ষেত্রে ওরা "ঈশ্বরের সামনে নগ্নভাবে" বিনয় প্রকাশের লক্ষণ হিসেবে গির্জায় পরিচ্ছদ ত্যাগ করে।

সম্পত্তির ক্ষতি করার প্রবল বাতিক থাকলেও ডউখোবোররা স্বেচ্ছাকৃতভাবে অহিংসধর্মী এবং কোন প্রাণীরই ক্ষতি করতে চায় না। ওরা সাধারণত এমন স্থলে বোমা স্থাপন করে যেখান থেকে কোন ব্যক্তি বা প্রাণীর মৃত্যু বা আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না।

ডউখোবোর ধর্মের উৎপত্তি হয় রাশিয়াতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই সম্প্রদায়ের প্রথম সদস্য হয় জারের দায়বদ্ধ শ্রমিক ও কৃষকরা। গোঁড়া খৃস্টধর্মীরা ওদের দুচোখে দেখতে পারতো না এবং গির্জার কর্তৃপক্ষই ওদের এই নাম দেয়। "ডউখোবোর"এর অর্থ নীতিবিদ্বেষী। এই নাম দেওয়া হয় ওরা ভগবানের নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে বলে।

ডউখোবোররা কর দিতে রাজী না হওয়ায় প্রহার এবং কয়েদের সাজা ভোগ করতো অবিরত এবং ১৮৯৫ সালে জারের সৈন্যবাহিনীতে যোগদানে রাজী না হওয়ায় ওদের ওপর পীড়ন চরমে ওঠে। শেষে প্রচণ্ড চাপে পড়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগদানে বাধ্য হতে ওরা ওদের হাতে দেওয়া অস্ত্রসামগ্রী পুড়িয়ে ফেলে।

চার বছর পর কানাডার গভর্নমেণ্ট পনের হাজার ডউখোবোরকে জনবিরল ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও সাসকাচুয়ানে এসে বসবাস করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। জার খুশীই হলেন ওদের চলে যেতে দিতে।

কিন্তু রুশিয়ার মতো কানাডাতেও মানুষের তৈরী আইন মেনে নেওয়া ওদের পক্ষে কঠিন হলো। আইন মানতে বাধ্য করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করতে ওদের মধ্যে থেকে তিন হাজার জন মিলে "স্বাধীনতার সন্তান" দল গঠন করে প্রাচীন ডউখোবোর জীবনধারা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে। বিশেষ করে ওরা আপত্তি জানায় ওদের সন্তানদের বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে এবং ওদের বিশ্বাস যে বিদ্যা সামরিকতা শেখায়। ওরা রুশ ভাষায় মুখে মুখে ওদের ছেলেদের কাঠের কাজ, চাষ আবাদ এবং বনপালনবিদ্যা শেখায়।

তিনশ তেত্রিশ বছর আগে স্টকহলম বন্দরে সুইডেনের যুদ্ধজাহাজ ভাসা নিমজ্জিত হয়। সম্প্রতি জাহাজটি জলের তলা থেকে উদ্ধার করার পর তার প্রকোষ্ঠগুলিতে বহুবিধ সামগ্রীর মধ্যে পাওয়া যায় এই মাখনের তাল—এত বছর পার হলেও চিনতে কোন অসুবিধা হয় না তবে স্বাদটা এখন কেমন আছে জানা যায়নি

এবং মেয়েদের শেখায় গৃহস্থালীর কাজকর্ম ও রান্না।

স্কুলে হাজির তদারককারি এক অফিসার ডউখোবোরদের গ্রামে গেলে ডজন কয়েক উলঙ্গ মাতা তাকে ঘিরে ধরে ডিম ও কাদা ছুঁড়ে ভাগিয়ে দেয়।

নগ্ন ডউখোবোরদের মিছিল রয়াল কানাডিয়ান মাউণ্টেড পুলিসের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেবার দুটি উপায় ওরা কাজে লাগায়। হয় হোসপাইপের সাহায্যে তোড়ে জল ছাড়ে আর না হয় তো ওদের ভিড়ের মাঝে এক-প্রকার চুনকালির পাউডার ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মিছিল কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর। পুলিসের দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওরা বাড়ি এবং রেললাইন ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয় বলে।

গত এপ্রিল মাসে দক্ষিণ পশ্চিম কানাডায় ওদের বসতির নিকটবর্তী এক গির্জায় একটি বোমা পাওয়া যায়।

মাঝে মাঝে ওরা ঘোষণা করে যে, কানাডা ত্যাগ করে যেখানে বিনা প্রতি-বন্ধকে নিজেদের ধর্মপালন করতে পারবে এমন কোন দেশে চলে যাবে। ১৯৫৮ সালে দীর্ঘকাল ধরে কানাডার গভর্নমেণ্টকে ওদের জন্য যে দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে সে কথা বিবেচনা করে ওরা রুশিয়াতে ফিরে যাবার তোড়জোড় করে। পরে কিন্তু এ সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়। কিন্তু যদি কোনদিন তারা চলে যেতে চায় তাহলে তাদের গাড়িভাড়া লাগবে না। কানাডার গভর্নমেণ্ট খুশী হয়েই সে ভার বহন করবে।

•

গত দশ বছরে সাধারণতন্ত্রী ফেডারেল জার্মানী সমাজ-কল্যাণের জন্য মোট ২১৪,০০০ মিলিয়ন মার্ক ব্যয় করেছে। টাকার হিসেবে তা হলো প্রায় ২৫,০০০ কোটি টাকা। বৃদ্ধকালীন পেনসন, যুদ্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ভরণপোষণ এবং যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর সমস্যার ফলে বিপন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য দান এই ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। কেউ যদি এই বিপুল অর্থকে মার্ক মুদ্রায় পাশাপাশি সাজান, তা হলে রুপোর একটি শেকলে অন্ততপক্ষে দশবার বিষুব রেখা পরিবেষ্টন করতে পারেন। এত অর্থব্যয় সত্ত্বেও যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর সমস্যা মানুষের জীবনে যে দুঃখ দুর্দশা নিয়ে এসেছে, তার সম্পূর্ণ সমাধান হয়নি এবং স্বদেশ থেকে বিতাড়িত উদ্বাস্তুদের সমস্যা এখন পর্যন্ত মেটেনি। এখনও ফেডারেল সাধারণতন্ত্রীতে ৬০।৭০ হাজার উদ্বাস্তু রয়েছেন। এ'দের মধ্যে বেশীর ভাগই হলেন সোভিয়েট এলাকার অধিবাসী এবং এ'রা এখনও ছোট ছোট ঘরে, তাঁবুতেও জরুরী পরিস্থিতিতে তৈরী কোয়ার্টারে বাস করছেন।

•

নিয়ত ক্রমবর্ধমান মোট চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পশ্চিম জার্মানীর বন্দর শহর ব্রেমেনে এক নতুন ধরনের পরীক্ষা শুরু করা হয়েছে। শহরের কেন্দ্রস্থলটিতে যান-বাহনের ভিড় অত্যন্ত বেশী এবং সেজন্য এই জায়গাটিকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ টাউন হলের কাছাকাছি জায়গাটিকে পদব্রজে যাত্রীদের জন্য বিশেষ সংরক্ষিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে এবং এখানে কোন মোটর গাড়িকে আসতে দেওয়া হয় না। শহরের কেন্দ্রস্থলের বাকি অংশটা চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যাঁদের মোটর গাড়ি নেই, তাঁরাও যাতে স্বচ্ছন্দে যাওয়া আসা করতে পারেন, সেজন্য এই অঞ্চলগুলির মধ্যেও রাস্তা রাখা হয়েছে। মোটর গাড়ির ড্রাইভার একবারে শুধু এর একটি অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারেন। বাকি তিনটি অঞ্চলের অন্য কোনটিতে যদি তিনি যেতে চান তা হলে তাঁকে শহরের কেন্দ্রস্থল ত্যাগ করে বহিঃসীমায় গিয়ে তারপর অন্য অঞ্চলে যেতে হবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ব্রেমেনের এই পরীক্ষাকে সফল বলে মনে করেন।

•

জলরঙের, তেলরঙের ছবি, পেনসিলের নক্সা, কাঠখোদাই, এবং অন্যান্য শিল্প যেমন, কার্পেট, পুতুল ও বিভিন্ন জিনিস দিয়ে তৈরি নানারকম শিল্পকর্মে প্রদর্শনী কক্ষটি পরিপূর্ণ, বিরাট আকারের জানলা-গুলি দিয়ে সূর্যের আলো এসে কক্ষটি সজীব করে তুলেছে। যাঁরা এইসব শিল্প সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা সকলেই বহু বৎসর যাবৎ পঙ্গু বা চলৎশক্তিহীন। কিন্তু প্রদর্শনী কক্ষটির এই বিচিত্র সম্ভারে কোন হতাশা বা গ্লানির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। শরীরের মাংসতন্তুর কাঠিন্যের ফলে যে রোগ দেখা দেয়, প্রদর্শনী কক্ষের চিত্রগুলি সেই রকম রোগগ্রস্ত পুরুষ ও নারীদেরই সৃষ্টি।

মাংসতন্তুর কাঠিন্যের রোগে ভুগছেন সেই রকম রোগীদের পুনর্বাসন সম্পর্কিত জার্মান সমিতি এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন। এই রোগীরা বহু বছর যাবৎ

শয্যাগত হয়ে আছেন অথবা হুইল চেয়ারে বসে নড়াচড়া করেন। প্রায়ই এঁদের বিপুল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে এই সব হাতের কাজ করতে হয়। এঁরা যাতে নিজেদের জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণ হয়ে না পড়েন, তাঁদের বেঁচে থাকারও একটা অর্থ খুঁজে পান এবং সমাজে তাঁদেরও প্রয়োজন আছে, এই মনোভাব যাতে তাঁদের মধ্যে জেগে উঠতে পারে, সেইজন্যই তাঁদের এই রকম শিল্প-সৃষ্টিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। অনেক রোগীর হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত। এঁদের মধ্যে একজন মহিলা শিল্পী আছেন, যাঁর হাতটি অবশ, কাজেই কোন চিত্রাংকন আরম্ভ করার আগে তাঁর হাতে কোন রকমে তুলিটি ধরিয়ে দিতে হয়। আর একজন মহিলা শিশুদের জন্য পোশাক তৈরি করেন. কিন্তু সেলাই কলের হাতলটি তাঁর হাঁটুর সঙ্গে বেঁধে দিতে হয়। অনেককে সোজা করে বসিয়ে রাখতে হয়। এই রকম ভীষণ অসুবিধে সত্ত্বেও তাঁরা অত্যন্ত ধৈর্য, নিষ্ঠা ও উৎসাহের সঙ্গে নানা রকম শিল্প সৃষ্টি করে চলেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে উচ্চস্তরের শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁদের মনের সুপ্ত আনন্দ ও সৌন্দর্যজ্ঞান এই শিল্পগুলিতে প্রাণ পায়। দর্শক, শিল্পবস্তুগুলির উজ্জ্বল রং দেখে মুগ্ধ হন। কিন্তু কাপড়, কাগজ বা অন্যান্য জিনিস দিয়ে যাঁরা এইসব সুন্দর জিনিস তৈরি করেছেন তাঁরা হলেন সবচাইতে করুণার পাত্র।

চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ ও রোগীদের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে জার্মানীর এই সমিতিটি ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির প্রধান কর্তব্য হলো, সাধারণতন্ত্রী ফেডারেল জার্মানীর এই রকম রোগগ্রস্ত ৭০০০ রোগীকে পুনর্বাসন করানো। এই সমিতি রোগীদের প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে, রোগীদের দেখাশুনা করে। হস্ত-শিল্পের জন্য যখন কোন মূল্যবান জিনিসের প্রয়োজন হয় এবং রোগীদের পক্ষে তা কেনা সম্ভবপর না হয়, এই সমিতি তাঁদের আর্থিক সাহায্য করে।

মাংসতন্তুর এই কাঠিন্য রোগ কি করে হয় এবং তার প্রতিকার কী সে সম্পর্কে চিকিৎসাশাস্ত্রে এখনও কোন রকম আলোকপাত করতে পারেনি এবং এই সম্পর্কে বিগত কয়েক বছর যাবৎ অনুসন্ধান চলেছে। এই ভীষণ রোগ, স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ করে এবং তার ফলে পক্ষাঘাত দেখা দেয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, অতি শৈশবে এই রোগটি তার আক্রমণ শুরু করে এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়াও বাড়তে থাকে। রোগটি সম্পর্কে কোনো গবেষণাই এখন পর্যন্ত ফলপ্রদ হয়নি এবং রোগের কারণও এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে গেছে।

সহজে শিখুন বিজ্ঞান

ৰব ব্রাউন

কী করণীয় : বায়ুর চাপে দুটি কাচের গ্লাস আটকে দিতে হবে।

কী চাই : কানাওয়ালা দুটি কাচের গ্লাস, ব্লটিং কাগজ, জল, খানিকটা পুরোনো খবরের কাগজ আর দেশলাই যোগাড় করুন।

কি করে হল : ব্লটিং কাগজটা থেকে গ্লাসের কানার মাপে গোল চাকতি কেটে একটা গ্লাসের কানার উপর বসিয়ে নিয়ে জলে ভিজিয়ে দিন। উপরে বাঁ দিকের ছবি দেখুন। এইবার কাগজের টুকরোটা
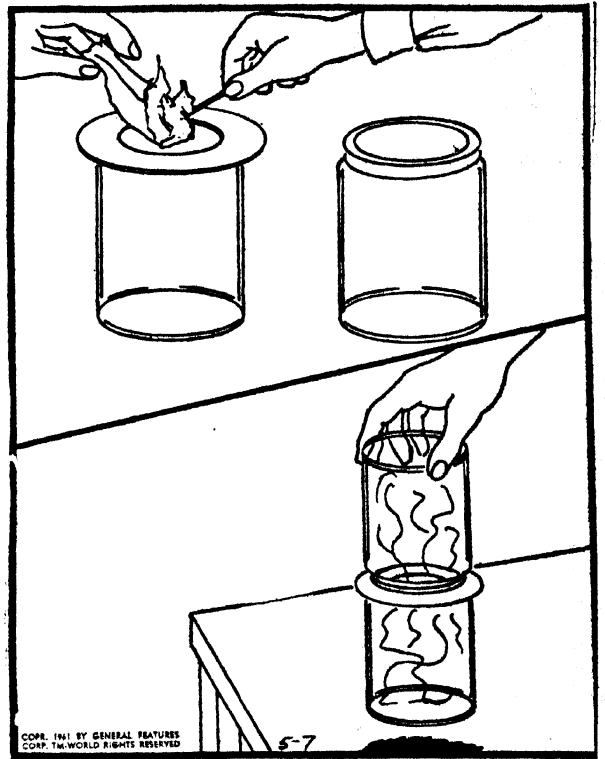
দেশলাই কাঠি জেলে ধরিয়ে গ্লাসের মধ্যে ফেলে দিন, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় গ্লাসটা প্রথম গ্লাসের ওপর ঠিক মাপে মাপে উপুড় করে চেপে বসিয়ে দিন। কাগজটা নিবে গেলে শুধু উপরের গ্লাসটা ধরে তুললেই নীচের গ্লাসটাও উঠে আসবে।

কেন হল : জ্বলন্ত কাগজের তাপে গ্লাসের ভিতরের বাতাস বাড়তে বাড়তে অনেকটা বেরিয়ে যায়। আগুন নিবে গেলে অবশিষ্ট বাতাসটুকুও ঠাণ্ডা হয়ে সংকুচিত হয়ে যায়। গ্লাস দুটি উত্তমরূপে জোড়া থাকলে বাইরের বাতাস আর ভিতরে ঢুকতে পায় না। বাইরের বাতাসের চাপ গ্লাসের ভিতরের বাতাসের চাপ অপেক্ষা তখন অনেক বেশী। বাইরের এই চাপের জন্যে গ্লাস দুটি বিচ্ছিন্ন হয় না।

ট্রামেবাসে

আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে আটটি বামপন্থী দল একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করিয়াছেন—সংবাদ-দাতা ইহার নাম দিয়াছেন অষ্টবজ্র

সম্মেলন। —"সংকট মোচনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসী দল অষ্টধাতুর আংটি নির্মাণের ফরমাশ দিয়াছেন কিনা, সে সংবাদ পাইনি।" —মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

শ্রী নেহরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে স্বপ্নের ভারত গড়িয়া তুলিবার পরামর্শ দিয়াছেন। —"এ-পরামর্শ অনেক-বারই দিয়েছেন এবং আমরাও অনেকবারই বলেছি, স্বপ্ন আর নেই, যা আছে, তা হলো দেয়ালা।'—বলেন বিশু খুড়ো।

বিহার আইনসভা সদস্যদের মধ্যে যাঁরা রাজস্ব বিভাগ হইতে টাকা ধার লইয়াছিলেন, তাঁরা নাকি বারবার তাগিদ সত্ত্বেও একটা নয়া পয়সাও শোধ দেন নাই। —"নিশ্চয় তাঁরা বাংলা ছড়া পড়েছেন—কার কড়ি কে ধারে।"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

প্রিন্স মনোলুলু নামক আশি বছরের এক বৃদ্ধ অদ্ভুত রংচঙে পোশাক পরিয়া মস্কোর রাস্তায় ঘুরিতেছেন আর বলিয়া বেড়াইতেছেন যে, শান্তির একমাত্র পথ হইল ঘোড়দৌড়। তাঁর কথায় কেউ অবশ্য আমল দিতেছেন না। "কিন্তু ভদ্রলোক কথাটা নেহাত মিথ্যে বলেন নি। কলকাতায় গ্রেট কিলিং-এর সময় কত জায়গায় কত মারামারি, কাটাকাটি হলো কিন্তু ঘোড়দৌড়ের মাঠে কেউ কারু গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত কাটেনি। সুতরাং শান্তির পথ হলো ঘোড়দৌড়—Q E D।"। —মন্তব্য করিলেন জনৈক ঘোড়দৌড়-রসিক সহযাত্রী।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িল, কলিকাতার জ্যোতিষীবর্গ নাকি ঘোষণা করিয়া-ছেন যে, আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে মকর

রাশিতে অষ্টগ্রহের সমন্বয়ের ফলে মহাপ্রলয় হইবে। —"এই গ্রহদের সঙ্গে আশা করি আটটি বাম-আচারী সমন্বয়ের কোন সম্বন্ধ নেই।"—বলে শ্যামলাল।

"**স**ম্মানের আসনে কীটপতঙ্গ"—একটি প্রবন্ধের শিরোনামা। শ্যামলাল বলিল—"শুধু প্রবন্ধ নয়, অতি সত্য কথা। কীট নয় শুধু, কীটাণুকীটকেও দেখি সম্মানের আসনে সুখাসীন!!"

প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ নাকি আমেরিকা গিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁর সঙ্গে জর্জ ওয়াশিংটনের জীবনের

কিছুটা মিল আছে। —"হলিউড থেকে মেক্-আপ্ নিয়ে গিয়ে কথাটা বলেছেন কি না, তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

দেশলাই-এর কথা বলিতে গিয়া, তার বাজার-দরের নানা অসামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন "আনন্দবাজার পত্রিকা"র প্রতিনিধি। উপসংহারে বলিয়াছেন—'বাধ্য হয়েই তাই সরকার বাহাদুরের কাছে জিজ্ঞাসা: ব্যাপার কি?' আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"সরকার বাহাদুর কী বলবেন জানিনে। আমরা জানি, কিন্তু বলব না।"

লক্ষ্ণৌর খবরে জানা গেল, সেখানে জল্লাদেরা মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানাইয়াছে। সরকার রাজী হন নাই। —"কলিকাতার জনসাধারণ কিন্তু লক্ষ্ণৌ সরকারের চেয়ে অনেক দরদী। মাছ, তরি-তরকারি, মাংস, ডিম, যে-কোন বাজার ঘরে এলেই বুঝবেন, গলাকাটাদের আমরা দরাজ হাতে দান করি।"—বলে শ্যামলাল।

গুজরাট কংগ্রেস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন—দশ বছর পর অবসর গ্রহণ করতে হইবে। —"আমরা মৌরসী পাট্টায় বিশ্বাসী; দশসালা চুকেবুকে গেছে।"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৭৯)

প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের বাড়িতে মা-মণি নিজের বিছানায় শুয়েও শান্তি পাচ্ছিলেন না। একবার উঠে দাঁড়িয়ে বাইরের বারান্দায় এলেন। চারদিকে চেয়ে দেখলেন। দুপুর গড়িয়ে গেল। নিচেয় রান্নাবাড়ির উঠোনে তখন বাসন-মাজার ঘষ্-ঘষ্ শব্দ হচ্ছে। এখনও ফিরে এল না। এখনও শব্দ হলো না গাড়ির। তারপর আবার বিছানায় গিয়ে বসলেন। কিন্তু শুতে গিয়েও শুতে পারলেন না।

রান্নাবাড়িতে বাতাসীর মা বললে—মাগীর এখন হয়েচে কী, সবে তো কলির সন্ধ্যে, এখন বউ এসে শাশুড়ীর মুখে ঝামা ঘষবে, তখন শিক্ষা হবে! ওলো সেই কথায় আছে না—ভালো দেখে বউ আনলাম ঘরে, বাঁশ দেখে বউ বাজি করে—

কৈলাস বললে—দাদাবাবু বৌদিমণিকে আনতেই তো গেচে বাতাসীর মা। তা বুঝি জানো না—

বাতাসীর মা বললে—জানি রে জানি, জানতে কিছু বাকি থাকে না বাতাসীর মা'র —মাগীর হেনস্থা দেখবো বলেই তো বসে আছি এখনও এ-বাড়িতে, নইলে কবে চলে যেতুম—

ওপর থেকে চিৎকার এল—হ্যাঁরে, রান্নাঘরে অমন চেঁচায় কে রে? তোরা একটু জিরোতে দিবিনে আমাকে—

কথাটা কানে যেতেই সবাই চুপ করে গেল। বাতাসীর মা দাঁতে দাঁত চেপে বললে—তোর বুড়ীর হয়েছে কী এখন? হামান-দিস্তে দিয়ে ওই বউ এসে তোর দাঁতের গোড়া ভাঙবে, তবে জিরোতে দেব। একেবারে ক্যাওড়াতলার শ্মশানে গিয়ে তবে জিরোবি তুই—

সমস্ত বাড়িতেই এই রকম চলছিল কয়েকদিন ধরে। দিনের পর দিন এমনি আলোচনাই চলে রান্নাবাড়িতে। একদিন এই বাড়িরই জলুস ছিল কত। সব তারা দেখেছে। একদিন এই বাড়ির জাঁক-জমক দেখে তারা অবাক হয়ে গেছে। প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের অন্য দশটা বাড়ির ঝি-চাকর-দের সঙ্গে কথা হয়েছে এই নিয়ে।

তারা বলেছে—তোদের কী বাছা, তোরা মনিব পেয়েছিস্ ভালো, তোদের চাকরি করেও সুখ—

আর পাঁচটা বাড়ির চেয়ে ঘোষ-বাড়িতে মাইনে বেশি। ইজ্জত বেশি। বছরে দু'খানা কাপড়, একখানা গামছা। তারপর তেল দোক্তা পান তামাক, সবই আছে। সকালবেলা জলখাবারে রুটি-আখের গুড়। সন্ধ্যেয় মুড়ি। আর দু' গেলাস চা দু'বেলা।

পাড়ার লোকে বলতো—ঘোষ-বাড়ির ঝি-চাকর আমাদের বাড়ি চলবে না বাছা, ওরা হলো গিয়ে জমিদার, আর আমরা গেরস্ত-পোষা মানুষ, তুমি অন্য বাড়িতে চেষ্টা দেখ বাছা—

সেই বাড়িরই আজ এই হেনস্থা। ভূতির-মা কাজের চেষ্টায় এদিক-ওদিক ঘোরে। একবার কাজের ফাঁকে কালিঘাটটা ঘুরে আসে। চড়কডাঙার বাবুদের বাড়িটাতেও খোঁজ নিয়ে আসে।

তারা বলে—তা ওরা ছাড়িয়ে দিচ্ছে কেন গা?

ভূতির মা বলে—ওদের লোকের আর দরকার নেই মা—

—তা হঠাৎ দরকার নেই-ই বা কেন শুনি?

—কী জানি মা, মনিবদের ভেতরের কথায় তো আমরা থাকিনে। তবে শুনেছি নাকি, ব্যাংকের টাকা চুরি হয়ে গেচে বাবুদের।

ব্যাংকের টাকা-চুরির কথাটা কেউ বিশ্বাস করে না। তাই নাকি আবার হয়। তারপর আসল কথাটা বেরিয়ে পড়ে। বলে—হ্যাঁগা বাছা, তোমাদের বউ ফিরেছে?

ভূতির মা বলে—না মা, ফেরেনি—

—তা কোন্ পাড়ায় ঘর ভাড়া নিয়েছে তোমাদের বউ, সোনাগাছি না রামবাগান? শুনেছ কিছু?

তারপর হতাশ হয়ে বলে—আর ফিরেছে! অমন শাশুড়ির কাছেও যখন ঘর করতে পারলে না, তখন আর ফিরেছে সে বউ!

শুধু চড়কডাঙা নয়। ওই চাউলপটি, লখার মাঠ, সব পাড়ার লোকই জানে ঘোষ-বাড়ির বউ-এর কীর্তি। এসব পাড়ার বনেদি বাড়ির মধ্যে আসা-যাওয়া না থাকলেও পরস্পরের হাঁড়ির খবর পরস্পরে রাখে। আর সেসব খবর এই ভূতির-মা বাতাসীর-মারাই বয়ে নিয়ে যায়। এই বৌদিমণির বিয়ের সময়ই সমস্ত ভবানীপুর ঝেঁটিয়ে লোক এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে। এ-বাড়ির ঐশ্বর্য তারা দেখেছে নিজের চোখে। দেখে হিংসে হয়েছে, বুকে জ্বালা হয়েছে। আজ এ-বাড়ির পতনের খবর

পেয়েও তাই তারা উল্লসিত হয়, আনন্দ পায়।

বাতাসীর-মা রেগে ওঠে। বললে—তা তুই কেন বললিনে, আমরা খাই ভাতারের ভাত, তোদের কেন গালে হাত?

কৈলাশ বলে—পড়শীরা অমন বলবেই বাতাসীর-মা, পড়শীর কথায় কান দিলে চলে?

ভূতির-মা বলে—আমারও যেমন হয়েছে পেটের জ্বালা, কবে সরকারবাবু ছাড়িয়ে দেবে, তখন হা-ভাত হা-ভাত করে ঘুরে বেড়াবো—

তা হা-ভাত হা-ভাত করে ঘুরে বেড়ানোর দশাই বটে। বছর খানেকও কাটেনি, কলকাতার লোক পিল্ পিল্ করে সব পালিয়ে গিয়েছিল কলকাতা ছেড়ে, আবার সবাই ফিরে এসেছে। আবার রাস্তা ঘাটে মানুষের ভিড়। আবার দোকান-পাটে খদ্দের আনা-গোনা করছে।

সবে তখন খাওয়া-দাওয়া চুকেছে। বাতাসীর-মা কলকাতায় দাঁড়িয়ে কুলকুচো করছে, এমন সময় বাইরের গেটে গাড়ি এসে দাঁড়ালো।

—কে এল রে কৈলাস?

কৈলাস ছিল নিচেয়। ডাক শুনেই দৌড়ে গেল। বললে—আমায় ডাকছেন মা-মণি?

—তোর মুখ দেখতে ডেকেছি নাকি হতচ্ছাড়া? বাইরে কার গাড়ি এল দেখবি তো? তোকে বলে রেখেছিলুম না—

—এই যাচ্ছি মা-মণি—

কৈলাস চলেই যাচ্ছিল নিচেয়। মা-মণি আবার ডাকলেন। অস্থির হয়ে এতক্ষণ পায়চারি করছিলেন তিনি। একবার ঘর, আর একবার বার। কখন যে এসে পড়ে তার ঠিক নেই। হাসপাতাল থেকে সোজা হয়ত এখানেই নিয়ে আসবে খোকা। দরকার নেই, কাউকে দরকার নেই। সমস্ত পুড়ে-ঝুড়ে থাক। শ্বশুরের এই সম্পত্তি সব নষ্ট হয়ে যাক। কার জন্যে আর সংসার করা। আমি মরি-বাঁচি করে না-খেয়ে না-পরে এতদিন ধরে কার জন্যে এই সংসার আগলে আছি? রাত্রে আমার ঘুম নেই, দিনে আমার সোয়াস্তি নেই, সব সেই পোড়ারমুখীর জন্যে!

—আয়, শুনে যা, যদি কেউ ঢোকে এ-বাড়িতে তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

কৈলাস কেমন থতমত খেয়ে গেল। বললে—আজ্ঞে, দাদাবাবু যে আজকে খায়নি এখনও—

—দাদাবাবু হোক, আর যেই হোক, কাউকে ঢুকতে দিবিনে, এ আমার বাড়ি। আমি যদি কাউকে ঢুকতে না দিই তো কা'র কী? যা—

—আজ্ঞে, শম্ভুও গেছে দাদাবাবুর সঙ্গে, দাদাবাবু বৌদিমণিকে নিয়ে আসবে বলেছে—

—চোপরাও হারামজাদ! আমার কথার ওপর আবার কথা!

এবার আর দাঁড়াবার ভরসা হলো না কৈলাসের। তরতর করে নেমে এল নিচেয়। তারপর একেবারে সদর গেটের কাছে যাবার আগেই গাড়িটা ঢুকে পড়েছে ভেতরে। ইঁট বাঁধানো রাস্তাটার ওপর গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। ভেতরে কে একজন সাহেব-পানা লোক। অনেকটা ব্যারিস্টারবাবুর মত দেখতে।

কৈলাস কাছে যেতেই সাহেব বললে—বাড়িতে কে আছে?

কৈলাস বললে—হুজুর, আপনি ভেতরে গাড়ি ঢুকিয়েছেন কেন? গাড়ি বাইরে নিয়ে যান, বাইরে নিয়ে যান—

মিস্টার ঘোষাল এত সহজে পেছপাও হবার লোক নয়। আবার জিজ্ঞেস করলে—বাড়িতে কে আছে তোমাদের?

কৈলাসও কম নয়। বললে—আজ্ঞে যেই থাকুক, দেখা হবে না—গাড়ি আপনার বাইরে নিয়ে যান—

মিস্টার ঘোষাল বললে—মিসেস ঘোষ ভেতরে আছেন? আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করবো—

কৈলাস বললে—দেখা করবার হুকুম নেই সাহেব, বাড়ির ভেতরে গাড়ি ঢোকবার হুকুম নেই মা-মণির—

—তোমার মা-মণির সঙ্গে একবার দেখা হবে না? তোমার মা-মণিকে গিয়ে বলো না মিস্টার ঘোষাল এসেছেন, একবার দেখা করতে চান—

—আপনি তো ভারি বে-আক্কেলে লোক দেখছি, আমি তো হুকুমের চাকর, আমার ওপর তম্বি করেন কেন? বলছি হুকুম নেই! এ-বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেবার হুকুম নেই—

মিস্টার ঘোষাল এবার কী করবে বুঝতে পারলে না। বললে—বাড়িতে আর কেউ নেই?

—আর কে থাকবে? দাদাবাবু ছিল, তা সেই দাদাবাবুও তো বেরিয়েছেন। বৌদিমণিকে হাসপাতাল থেকে আনতে গেছেন—

—আর কেউ? কোনও পুরুষ মানুষ! যে কেউ হলেই চলবে। আমার জরুরী কাজ ছিল একটা।

—আপনি অন্য সময় আসবেন। এখন বাইরে যান দিকি, আমি গেট বন্ধ করে দিই—

মিস্টার ঘোষাল কী করবে বুঝতে পারলে না। তারপর বললে—ঠিক আছে, পরে আমি আসবো—

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই ভাল, পরে আসবেন। গাড়িটা ঘুরলো এবার। ঘুরে রাস্তায়

গিয়ে পড়লো। সামনেই সেই বাড়িটা। বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিল ঘোষাল। বাড়ির সামনে গিয়ে দরজার কড়া নাড়তে লাগলো জোরে জোরে।

—মিস্টার মিত্র আছেন?

একটা চাকর বেরিয়ে এল। বললে—বাবু তো মধুপুরে গিয়েছেন, এখনও আসেননি—

মিস্টার ঘোষাল বললে—কবে আসবেন?

—আজ্ঞে তা আমি জানি না।

মিস্টার ঘোষাল বললে—এ-বাড়ি আমার নামে ভাড়া নেওয়া আছে, দু' মাসের অ্যাডভান্স দিয়ে গেছি আমি তোমার বাবুকে।

—আজ্ঞে, সে বাবু সব জানেন। আমি জানি না। মা-বাবু-দাদাবাবু-দিদিমণি সবাই মধুপুরে, আমি কিছুই জানি না।

—তা বাড়ি যেন আর কাউকে ভাড়া না দেওয়া হয়, তুমি তোমার বাবুকে জানিয়ে দেবে।

—আপনি কবে থেকে আসবেন বাবু?

মিস্টার ঘোষাল বললে—সে আমার সুবিধে হলেই আসবো। আর আমি আসি আর না-আসি তাতে তোমার বাবুর কী? আমি ভাড়া দিলেই তো হলো?

চাকরটা মিস্টার ঘোষালের কাছে ধমক খেয়ে থেমে গেল। আর কিছু বললে না। মিস্টার ঘোষালও আবার গাড়িতে এসে উঠলো। মিস্টার ঘোষালের কাছে সারা পৃথিবীটাই যেন রেলের অফিস। এ যেন তারই জমিদারী। তার নিজের ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্ট। ট্রাফিক ডিপার্টমেণ্টের সবাই তার আণ্ডারে। এই প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের সমস্ত বাসিন্দারাই যেন তার ক্লার্ক। মিস্টার ঘোষালের একটা কলমের খোঁচায় এই ক্লার্কদের যেন এক মুহূর্তে প্রমোশন হয়ে যেতে পারে। পুওর ক্লার্কস। দে আর বর্ণ টু বি ক্লার্কস! পুওর সোলস্!

সকাল থেকেই মিস্টার ঘোষালকে যেন কেউ তার জমিদারী থেকে উৎখাত করেছে। তাড়িয়ে দিয়েছে। ক্লাশ ওয়ান গভর্নমেণ্ট অফিসার মিস্টার ঘোষাল! হাজরা রোডের মোড়ে গাড়িটা দাঁড়াতেই একটা ভিখিরি জানালায় হাত বাড়াল।

—সায়েব, একটা পয়সা সাহেব, একটা পয়সা—

মিস্টার ঘোষালের ডি-টি-এস মনটা চিৎকার করে উঠলো—গেট আউট—গেট আউট—

তবু ভিখিরিটা নড়ে না। একটা পয়সা সাহেব, গরীব আদমী. একটা পয়সা—

—ইউ সিলি বীচ, গেট আউট ফ্রম হিয়ার, গেট আউট—

পুলিসের হাত নামতেই গাড়িটা ছেড়ে দিলে। তারপর ট্রাম-লাইন ধরে সোজা রাস্তা। তারই ডান দিকে হরিশ মুখার্জি রোড। নাম্বারটা মনে আছে মিস্টার পালিতের। দ্যাট শ্রুড্ ল-ইয়ার। মিস্টার ঘোষালের বার-অ্যাট-ল।

তখন নতুন এক সমাজ গড়ে উঠছে পৃথিবীতে। ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর আমলে যে নতুন দল উঠেছিল, এরা তারা নয়। এরা আর এক নতুন দল। আর এক নতুন সমাজ। এরা একদিন রাস্তার লোক ছিল। এরা কেউ স্কুল-মাস্টার, কেউ ক্লার্ক, কেউ দোকানদার, কেউ সেলসম্যান। কেউ গেজেটেড অফিসার। এরা ধুলো-মুঠো ধরছে আর সোনা-মুঠো করছে। এরা কুইনাইন কিনছে তিন টাকায়, বেচছে তিন

শো টাকায়। ধান, চাল, ওষুধ,—যা কিছু ইচ্ছে ধরতে পারো, হোর্ড করতে পারো, তারপর একমাস পরে বেচলেও লাভ। রাতারাতি নতুন সমাজ গড়ে উঠলো তাদের নিয়েই এই কলকাতা শহরের বুকে। তাদের দলে নতুন নাম লিখিয়েছে মিস্টার ঘোষাল।

উনিশশো বিয়াল্লিশের নতুন প্রোডাক্ট। বংশ গৌরব থাকার আর দরকার নেই এখন। কানেকশন থাকারও দরকার নেই। টাকা থাকলেই প্রেস্টিজ। তোমার টাকা আছে, তাহলেই তুমি আমাদের দলে। তোমাকে তাহলেই আমরা দলে টেনে নেব। সেই ফিউড্যালিসম-এর নবাবিআনার দিন চলে গেছে। এখন নিও-অ্যারিস্টোক্রাসির ঢেউ এসেছে। আমরা নিও-অ্যারিস্টোক্র্যাট। লেটেস্ট মডেলের গাড়ি আছে তোমার? ফরেন-এডুকেশন আছে? তা-থাক, তোমার টাকা আছে জানলেই আমরা আমাদের সমাজে তোমাকে ঠাঁই দেব। চুরি করেই হোক আর ডাকাতি করেই হোক, কিম্বা ঘুষ নিয়েই হোক আর ব্ল্যাক-মার্কেট করেই হোক—অনেক টাকা তোমার থাকা চাই-ই।

অঘোরদাদুরও টাকা ছিল। কিন্তু সে টাকা দিয়ে চলবে না। সে টাকা সিন্দুক বন্দী করা টাকা। তার ইউটিলিটি নেই। সে স্থাণুর মত সমাজে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। তাকে আমরা দলে নেব না। নয়নরঞ্জিনী-দাসীরও টাকা ছিল। কিন্তু সে তো বংশানুক্রমিক টাকা। উত্তরাধিকারী-সূত্রে পাওয়া। সঞ্চয়ী-বৃত্তি থেকে তার উৎপত্তি। সে টাকা পরের ঘাড় ভেঙে উপায় করা। সে টাকাও বাতিল। কিন্তু আমাদের টাকা অন্যরকম। আমরা মিস্টার ঘোষাল, আমরা সুধাংশু, আমরা লক্ষ্মীদির দল। এতদিন আমাদের অস্তিত্ব ছিল না। চোর ছিল, ডাকাত ছিল, খুনী ছিল দেশে। কিন্তু বড়লোক চোর ডাকাত খুনী ছিল না। এরা কথায়-কথায় মিনিস্টার, গভর্নর দেখাতে লাগলো। এরা অফিসের পর লক্ষ্মীদিদের বাড়িতে গিয়ে ফ্লাশ খেলার জুয়ায় রিক্রিয়েশন খোঁজে। এরা প্যালেস-কোর্ট থেকে বেরিয়ে মিস মাইকেলদের ফ্ল্যাটে যায়। এরা নেশা করে, কিন্তু হুঁশিয়ার হয়ে করে। এরা ফ্ল্যাশ খেলে, কিন্তু সজ্ঞানে খেলে। কলকাতার বুকে তখন এই এদেরই রাজত্ব। এদেরই প্রতিপত্তি। এদেরই প্রবল প্রতাপ। মিস্টার ঘোষালদের ভিড়ে তখন কলকাতা ভরে গেছে। সুধাংশুদের প্রভাবে তখন কলকাতা ডুবে গেছে। যুদ্ধের শুরু থেকেই তারা প্রভাবে, প্রতিষ্ঠায়, প্রতিপত্তিতে, সংখ্যায় কেবল বেড়ে চলেছে।

—ইজ মিস্টার পালিত ইন?

কয়েকটা পুলিস তখন পাহারা দিচ্ছে নির্মল পালিতের বাড়ির সামনের পৈঁটের ওপর বসে। টবের ওপর গাছগুলো শুকিয়ে গেছে। খাঁচাটা ঝুলছে শুধু, পাখী নেই। কিন্তু কুকুরটা তখনও জিভ বার করে নিঃশ্বাস টানছে।

—ইজ মিস্টার পালিত ইন?

কে আর উত্তর দেবে এ কথার? মিস্টার ঘোষাল নাম্বারটা মিলিয়ে দেখেছিল। কোনও ভুল নেই। গেটের বাইরে এন-কে-পালিত-বার-য়্যাট-ল লেখা ট্যাবলেটটা তখনও আঁটা।

—কোঠিমে কোই নেই হুজুর।

মিস্টার ঘোষাল অবাক হয়ে গিয়েছিল আগেই। এবার আরো অবাক হয়ে গেল। কেন? বাড়িতে নেই কেন? সামথিং রং ইন দি স্টেট অব ডেনমার্ক?

পুলিস দুটো মিস্টার ঘোষালের চেহারা দেখে একটু সমীহ করে কথা বললে। মিস্টার ঘোষাল সবটা শুনে কেমন হয়ে গেল যেন! হলো কী তাহলে? ভদ্রলোকের পক্ষে ক্যালকাটা সিটিতে কি আর থাকা চলবে না! ও হেল! পুলিস কমিশনার তাহলে আছে কী করতে? সার জন হারবার্টকে আজকেই বলতে হবে। ফজলুল হককেও রিং করতে হবে! কোনও জেণ্টেলম্যানের পক্ষে দেখছি আর এখানে থাকা সম্ভব নয়—এই ক্যালকাটা সিটিতে!

—ও হেল্!

আর একবার 'ও হেল্' বলে মিস্টার ঘোষাল গাড়িতে উঠলো। সমস্ত দিনটাই আজ তার বাজে নষ্ট হলো। গাড়িতে ওঠবার মুখেই হঠাৎ একটা চিৎকার কানে গেল। হকাররা চিৎকার করতে করতে দৌড়ে আসছে—টেলিগ্রাফ—টেলিগ্রাফ—

হকারটা কাছে আসতেই মিস্টার ঘোষাল একটা কাগজ কিনলে। দু'পয়সা দামের একস্ট্রা-অর্ডিনারি ইসু।

—গান্ধীজী গ্রেপ্তার—গান্ধীজী গ্রেপ্তার—

গাড়ির ভেতরে বসেই মিস্টার ঘোষাল পড়তে লাগলো—মহাত্মা গান্ধী, আবুল কালাম আজাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মিসেস সরোজিনী নাইডু সবাই অ্যারেস্টেড। বোম্বাই থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনে করে তাদের পুণায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

রাইটলি সার্ভড। রাইটলি সার্ভড।

মিস্টার জিন্না স্টেটমেণ্ট দিয়েছে—
I deeply regret that the Congress has finally declared war and has launched a most dangerous mass movement in spite of numerous warnings and advice from various individuals, parties and organisations in this country.

পড়তে পড়তে মিস্টার ঘোষাল যেন এতক্ষণে একটু শান্ত হলো। সারাদিনের ব্যর্থতা আর অপমানের যেন প্রতিশোধ নিতে পেরেছে এতক্ষণে।

রাইটলি সার্ভড। রাইটলি সার্ভড—

অনেক রাত্রে ডি-এম-ও এলেন। ভারি অমায়িক ভদ্রলোক। দীপঙ্করই ডাকিয়ে আনালে। বললে—আপনি যদি মিসেস ঘোষকে রিলিজ করে দেন তো আমি আজকেই এঁকে নিয়ে যেতে পারি—

রেলের হাসপাতাল। হাসপাতাল বটে,

এ হাসপাতালের নিয়ম-কানুনও অন্য হাসপাতালেরই মত। তবু একটু যেন ঢিলে-ঢালা গতি। ডি-এম-ও তা জানেন। বললেন—আপনি নিয়ে যেতে পারেন মিস্টার সেন, আমার কোনও আপত্তি নেই—আমি রিলিজ করে দিচ্ছি—

সতী বললে—একলা সে বাড়িতে আমি কেমন করে থাকবো দীপু—

দীপঙ্কর বললে—না থাকতে পারো প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে শ্বশুর-বাড়িতে চলে এসো—সে পথ তো খোলাই রইল—

—সেখানে আর আমার যাওয়া চলে না দীপু!

—এখনও তোমার রাগ গেল না সতী! জানো সে বাড়ির কী অবস্থা! আজ সে বাড়িতে গেলে তুমিই চিনতে পারবে না আর। সেই বাগান নেই, সেই মালী নেই, সেই দরোয়ান নেই—সমস্ত বাড়িটার চেহারাই এখন বদলে গেছে। তুমি চলে আসবার সংগে সংগে বাড়ির লক্ষ্মীশ্রীও চলে গেছে।—আজ তোমার শাশুড়ি বুঝতে পেরেছে তুমিই ছিলে বাড়ির লক্ষ্মী—

সতী চুপ করে রইল। দীপঙ্কর বলতে লাগলো—আমি আজো ঠিক বুঝতে পারি নি কেন এমন হলো!

সত্যিই দীপঙ্কর সারাজীবন ধরে ভেবেছে কেন এমন হয়। কোন্ পথ ধরে চলেছে এই জীবন! কোন্ দিকে এর গতি! সেই ইতিহাসের আদিযুগ থেকে আজ পর্যন্ত কোন্ নিয়মে এর কাজ চলছে! সত্যিই যদি কোনও নিয়ম থাকবে তবে সে-নিয়মের নিয়ন্তা কে? আর নিয়মই যদি থাকবে একটা, তাহলে এত ব্যতিক্রমই বা হবে কেন! ইতিহাসে এক-একটা যুগ এসেছে, আর সব নিয়ম ভেঙে চুরে একাকার হয়ে গেছে একেবারে। একজন চৈতন্যদেব যা গড়ে, আর একজন শংকরাচার্য তা ভাঙে কেন? একজন বিসমার্ক যা তৈরি করে, আর একজন হিটলার তা ধ্বংস করে কেন! তাতে কার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়?

সেদিন কিরণ এসে সেই কথাই বলেছিল।

হঠাৎ কিরণ আবার একদিন এসেছিল। সেই একদিন অনেক রাত্রে কিরণ এসে কী একটা প্যাকেট দিয়ে গিয়েছিল, সে প্যাকেটটা ট্রাংকের মধ্যেই পড়ে ছিল। তা খুলেও দেখেনি দীপঙ্কর। খুলে দেখবার আগ্রহ হলেও খুলে দেখেনি। তারপর তারই খোঁজে পুলিস এসেছিল বাড়িতে। ডিফেন্স-অব-ইণ্ডিয়া য়্যাক্টে ধরতে এসেছিল কিরণকে। তারপর চলে গিয়েছিল, আর আসেনি।

সেদিন আবার চুপি চুপি এসে হাজির হয়েছিল কিরণ।

প্রথমটায় অবাক হয়ে গিয়েছিল। কাশী বলেছিল—একজন সাহেব এসেছে দাদাবাবু।

—সাহেব? সাহেব আবার কে রে?

—হ্যাঁ দাদাবাবু, আপনার নাম করে ডাকছেন। ইংরিজি কথা আমি বুঝিনে।

তারপরে নিজে নিচের নেমে যেতেই দেখে আর কেউ নয়, কিরণ! তাড়াতাড়ি কিরণকে নিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে এনে বসিয়েছিল সেদিন দীপঙ্কর।

—তুই কেমন আছিস?

মুখ দেখেই বুঝেছিল দীপঙ্কর ভালো নেই সে। বড় উদ্বিগ্ন, উস্কোখুস্কো চেহারা। সেই ফরসা লাল টকটকে রং আবার তামাটে হয়ে গেছে। আবার মুখে-চোখে অনিদ্রা আর অনাহারের ছাপ। দরজা বন্ধ করে দোতলার ঘরের ভেতর বসিয়েছিল কিরণকে। এ কিরণকে যেন চেনাই যাচ্ছিল না। এ যেন সেই কালিঘাট বয়েজ লাইব্রেরীর সেক্রেটারী আর নয়। এ যেন সেই ম্যাট্রিকে ফেল করা কিরণও আর নয়। সেই সেদিনকার রাস্তার ডাব কুড়িয়ে খাওয়া কিরণকে যেন এ-কিরণ আর চিনতেই পারবে না।

কিরণ বললে—অনেকের কাছেই গেলুম এ ক'দিন, কিন্তু কিছুই হলো না—

দীপঙ্কর একবার জিজ্ঞেস করলে—তোর সেই ভজুদা কোথায় রে? সেই বারোটা ল্যাংগোয়েজ জানতো?

কিরণ বললে—কী জানি। কে যে সব কোথায় ছড়িয়ে আছে, বুঝতেই পারছি না। এ দেশে এসে আমাদের দলটাকে আবার গড়বার চেষ্টা করছিলুম, কিন্তু সবাই বদলে গেছে ভাই, এখানে এসে সব দেখে শুনে তাজ্জব হয়ে গেছি—

—কেন? কী দেখলি?

—আমাদের দলে যারা ছিল আগে, তাদের মধ্যে অনেকেই বিয়ে করেছে।

—বিয়ে করেছে? কাকে?

—কাকে আবার? নিজেকে, কাঞ্চিকে। সবাই নিজের নিজের লাভ-লোকসান নিয়ে মেতে আছে। এদিকে কংগ্রেসের মধ্যেও মতের মিল নেই, রাজাগোপালাচারী তো কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে মিনিস্টার হবার তালে আছে, আর কেউ-কেউ আবার এই সুযোগে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সংগে হাত মেলাচ্ছে। কংগ্রেসের কী কান্ড জানিস?

দীপঙ্কর বললে—আমি কী করে জানবো?

—আরে তোরা যদি না জানিস তো জানবে কে? এই যে আজকে 'কুইট ইণ্ডিয়া' করছে গান্ধীজী, একমাস আগেই তো এটা করবার কথা ছিল, একমাস পেছিয়ে দিলে কেন, জানিস?

দীপঙ্কর কিছু কথা বললে না।

কিরণ বলতে লাগলো—বিড়লার সুবিধের জন্যে। শেয়ার মার্কেটে সব শেয়ারের দাম পড়ে গেল। কিন্তু যে তারিখে হবার কথা ছিল, তা হলো না, একমাস পিছিয়ে গেল। শেয়ারের দাম আবার হু-হু করে চড়ে গেল রাতারাতি। বিড়লা, গোয়েংকা আর মাহীন্দ্র কোম্পানী এই সুযোগে শেয়ারগুলো বেচে দিলে, তারপর শেয়ারের দাম কমে যেতেই তারা আবার কিনে নিলে। কংগ্রেস তো মারোয়াড়ীদেরই সুবিধে করে দিলে এই

করে। প্রায় তিনশো কোটি টাকা প্রফিট হয়ে গেল একমাসের মধ্যে! তা কাকে আর কী বলবো?

কিরণ নিজের মনেই অনেক কথা বলে গেল। জার্মানীতে যখন ছিলুম, ভেবেছিলুম ইণ্ডিয়ায় এখন খুব কাজ হচ্ছে। আর এই তো অপারচুনিটি। এ অপারচুনিটি কেউ নিলে না দেখে এত কষ্ট হচ্ছে মনে—

তারপর হঠাৎ বললে—দে, আমার জিনিসটা দে, আমি চলে যাই—

—কোথায় যাবি এত রাত্রে?

কিরণ বলেছিল—রাত্রেই তো আমার সুবিধে। বড় পেছনে লেগেছে পুলিস। এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে দিচ্ছে না আমাকে। কোনও কাজ হচ্ছে না, শুধু শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে ভাই বসে বসে, তাই মনে বড় কষ্ট হচ্ছে। এতদিন এখানে এসেছি অথচ কিছুই কাজ করতে পারলুম না। জানিস তো সুভাষ বোস জার্মানীতে?

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। বললে—সত্যি কথা? অনেকে বলছে বটে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি—

—একটা খাঁটি মানুষ দেখলাম। পাগল একেবারে। আমার সঙ্গে দেখা

হয়েছিল একঘণ্টার জন্যে। সুভাষ বোসই তো আমার এখানে আসার সব ব্যবস্থা করে দিলেন। হিটলারও খুব সাহায্য করবে বলছে। শেষে যদি হিটলারও কিছু না করে তো অন্য কারও সাহায্য নিতে হবে। জাপানে যাবারও কথা আছে। দেখা যাক। তাই তো বলছিলুম এ অপারচুনিটি কেউ নিলে না দেখে বড় দুঃখ হচ্ছে ভাই—

কিরণের কথাগুলো শুনে দীপঙ্করের মনে হচ্ছিল—কিরণের মনের ভেতরটা যেন কিছু করবার জন্যে ছটফট করছে। যা হোক একটা কিছু করতেই হবে। এ সময়ে জেলে গিয়ে কিছু লাভ হবে না। জেলে গিয়ে নাম-কেনা ছাড়া আর কিছু হবে না। আরে, ওয়ার তো পৃথিবীতে রোজ-রোজ হয় না!

দীপঙ্করের আজও মনে আছে সেই রাতটার কথা। সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে কিরণ যখন কথা বলছিল মনে হচ্ছিল যেন দীপঙ্কর হেরে গেছে তার কাছে। বড় দুঃখ হয়েছিল মনে। বড় অনুতাপ হয়েছিল। কোথায় সেই বার্লিন, আর কোথায় এই কলকাতা। কোথায় সেই জাপান, আর কোথায় এই স্টেশন রোড। সেই ক'দিনে ইন্ডিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত চষে বেড়িয়েছে কিরণ। কতদিন খাওয়া হয়নি, কতদিন ধরা পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেছে। কতদিন অনাহারে অনিদ্রায় কেটেছে। কাছে টাকা নেই, পেটে ভাত নেই। আপনারা কিছু করুন, কিছু করুন আপনারা। হিটলার আমাদের সাইডে আছে, মুসোলিনী আমাদের সাইডে আছে, টোজোও আমাদের সাইডে। এ ওয়ারে হিটলার জিতবেই, এই আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি। আপনারা কমিউনিস্টই হোন, আর মুসলিম লীগই হোন, কিম্বা হিন্দু মহাসভার লোক হোন—কিছু করুন। পার্টির কথা না ভেবে, সুভাষ বোসের মত দয়া করে দেশের কথা ভাবুন! চার্চিল থাকতে স্বাধীনতা আপনারা পাবেন না। আমেরী থাকতেও পাবেন না। কেউ স্বাধীনতা কাউকে দেয় না—স্বাধীনতা জোর করে কেড়ে নিতে হয়। দেখুন, আমি বেশি লেখাপড়া শিখিনি। আমি ম্যাট্রিক ফেল, আমি পয়সার জন্যে লেখাপড়া চালাতে পারিনি। আমার বাবা কুষ্ঠ রোগে মারা গেছে। বাবার সেবা করিনি। মা এখনও খেতে পায় কিনা, বেঁচে আছে কি না, তার খবরও রাখি না। আমি বার্লিন থেকে এসেছি আপনাদের পায়ে ধরতে। আপনারা কিছু করুন।

বলতে বলতে গলা বুজে এসেছিল কিরণের। শেষকালে প্যাকেটটা নিলে।

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করলে—এটা কী রে?

কিরণ বললে—ওয়্যারলেস্ সেট—জার্মান গভর্নমেণ্ট দিয়েছে আমাদের—এবার যাই, আবার কবে দেখা হবে জানি না ভাই—

দীপঙ্কর বললে—আমি তো তোর কিছুই করতে পারলুম না—

কিরণ বললে—তোর দ্বারা কিছুই হবে না, আমি জানতুম, তুই ওই চাকরি করবি আর সংসার করবি কেবল—মানুষের জীবনে টাকা উপায় করা আর সংসার করাটা বড় জিনিস নয়—এটা তুই জেনে রাখিস—

—তবু তুই কিছু টাকা নে!

—টাকা? টাকারই তো ভীষণ দরকার রে আমার। টাকা দিবি, দে না। যত দিবি তত নেব—

দীপঙ্কর উঠলো। কিরণ বলতে লাগলো—আমি এখানে এসে সব দেখে অবাক হয়ে গেলুম, সবাই দু'হাতে টাকা লুটতে শুরু করেছে ভাই। দেশের কাজেও টাকা, ঠাকুরের মন্দির করে দিয়েও টাকা। টাকা উপায়ের জন্যেই যেন সবাই বেঁচে আছে। এ রকম তো ছিল না ভাই আগে। এই ক'বছরই যা এখানে ছিলাম না, কিন্তু আগে তো ছিলাম। তখন তো এমন ছিল না। তখন তো আমাদের লোকে চাঁদা দিয়েছে কোনও উদ্দেশ্য না নিয়েই। আমাকে গরীব দেখে কত লোক চাঁদা দিয়েছে, সাহায্য করেছে, কিন্তু প্রফিটের কথা তো তারা ভাবেনি। এখন দেখছি জেল খাটতে গিয়েও লোকে আগে মনিটারি বেনিফিটের কথাটা ভাবে। টাকা দিয়েই প্যাট্রিঅটিজম্-এর বিচার হয়। আশ্চর্য, যে-সি-আর-দাশ কংগ্রেস গড়লে, আর একজন তাকে ভাঙতেই কত কষ্ট করছে—

তাড়াতাড়ি বাক্সর মধ্যে হাত পুরে দিয়ে দীপঙ্কর যে ক'টা টাকা পেলে, সব তুলে দিলে কিরণের হাতে। একবার গুণেও দেখলে না। কিরণও টাকাগুলো নিয়ে পকেটে পুরে ফেললে। কত টাকা, কীসের টাকা, তাও জিজ্ঞেস করলে না।

দীপঙ্কর বললে—তোর মা'র জন্যে ভাবিসনি তুই, আমি আছি—

—আমি যাই।

কিরণ চলে যাচ্ছিল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে সদর-দরজা পর্যন্ত এসে একবার থমকে দাঁড়াল। তারপর বাইরে দু'দিকে একবার দেখে নিয়ে ঘাড়ের দিকে কোটের কলারটা উঁচু করে দিলে। দীপঙ্কর বললে—তোর জন্যে খুব ভয় করে ভাই, একটু সাবধানে থাকিস্—

তারপর অন্ধকার ব্ল্যাক-আউটের মধ্যে সেদিন মিলিয়ে গিয়েছিল কিরণ। আর আসেনি।

ট্যাক্সির মধ্যে সতী চুপ করে বসেছিল। সার্কুলার রোড, ল্যান্সডাউন রোড পেরিয়ে হাজরা রোড। সতী যেন হাজরা রোডটা চিনতে পেরেছে। এই হাজরা রোডের পশ্চিম প্রান্তেই প্রিয়নাথ মল্লিক রোড। বড় ঘন হয়ে বসেছে সতী। বাইরে অন্ধকার, জোলো হাওয়া। মাঝে মাঝে আকাশে এরোপ্লেনের পরিক্রমা আর ট্যাক্সির ভেতরে নীরব সান্নিধ্য। সতী হঠাৎ কথা বললে—এটা কোন্ রাস্তা দীপু? হাজরা রোড, না?

দীপঙ্কর শুধু বললে—হ্যাঁ—

হাসপাতাল থেকেই ট্যাক্সি করে নিয়েছিল। সতীর দুর্বল স্বাস্থ্য যেন এই একদিনেই আরো দুর্বল হয়ে গেছে। দীপঙ্কর নিজে হাত ধরে তুলে নিয়েছিল। বড় দুর্বল, বড় পাতলা হাত দু'টো সতীর। এই ক'দিন চাকরি করেই এত দুর্বল হয়ে গেছে ভাবতে পারা যায় না। প্রথমটায় অনেকক্ষণ কোনও কথাই বলেনি সতী। বাবার মৃত্যুর খবরটা দিতেই সতী যেন শিশুর মত কাতর হয়ে উঠেছিল। তারপর বলেছিল—ও'কে তুমি নিজে বাড়ি পাঠিয়ে দিলে নাকি দীপু?

—কাকে?

প্রশ্নটা করেই দীপঙ্কর বুঝতে পেরেছিল। বলেছিল—সনাতনবাবুর কথা বলছো? তিনি হতাশ হননি। তিনি হতাশ হন না কখনও—

—আচ্ছা সত্যি বলো তো দীপু, উনি অমন কেন?
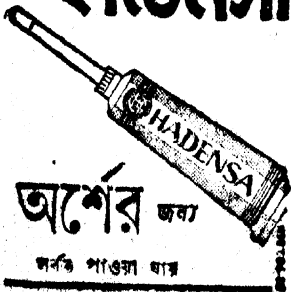
—কী রকম?

—আচ্ছা, তুমিই বলো তো, একটু সাধারণ হতে পারেন না উনি? অত অসাধারণ স্বামী হলে মেয়েমানুষের ভাল লাগে, তুমিই বলো? একটু হাসি-ঠাট্টা-গল্প এসব কি করতে পারেন না কখনও? একটু কি আমার সঙ্গে বসে সাধারণ রসিকতাও করতে পারেন না? আমি কি ও'র তুলনায় এতই ছোট?

দীপঙ্কর বললে—তা বলে সনাতনবাবুকে তুমি ভুল বুঝো না সতী!

—কিন্তু এত লোক তো পৃথিবীতে আছে, আর কেউই তো ও'র মত নয়। মুখটা সব সময় গম্ভীর-গম্ভীর, যেন অনেক উঁচু জগতে বাস করেন উনি, অনেক উঁচু স্তরের মানুষ, আমার কথা ভাববারই যেন সময় নেই ও'র—

দীপঙ্কর সান্ত্বনা দিয়েছিল। বলেছিল—ও তোমার নিজের মনের ভুল! ও'কে বাইরে থেকে দেখে বিচার করতে যেও না তুমি—

—কিন্তু বাইরেটাই কি মিথ্যে হলো দীপু? বাইরেটাই কি মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারে মানুষ?

তারপর সেই কথার জের টেনেই সতী বলে যেতে লাগলো—আমি নিজে তো একজন সাধারণ মেয়েমানুষ, তাই আমি একজন সাধারণ স্বামীই চেয়েছিলুম দীপু, আমি তো শো-কেসে সাজিয়ে রাখবার জন্যে বিয়ে করিনি—আমি চেয়েছিলুম আমার স্বামীকে আমি ভালবাসবো, স্বামী নিয়ে নাড়বো-চাড়বো, তাঁকে নিয়ে হাসবো-কাঁদবো, স্বামী হবে আমার রোজকার ব্যবহারের সামগ্রী—

দীপঙ্কর বললে—তুমি জানো না সতী, তোমার স্বামী সেই সাধারণ মানুষই, অসাধারণ নয়। তোমার জন্যে তাঁরও দুঃখ হয়, তোমার জন্যে তাঁরও ভাবনা হয়, তোমার জন্যে তাঁরও মনে অশান্তি হয়—

—কিন্তু কই, আমি বকলে তিনি তো রাগ করেন না?

—রাগ করা তো সহজ সতী, রাগ তো সবাই করতে পারে।

—সেই সবাই যা পারে তা উনি পারেন না কেন? কেন উনি অন্য সকলের মত হতে পারেন না? যেমন আর পাঁচজন। কেন উনি আলাদা?

দীপঙ্কর এ কথার জবাব দিতে পারলে না। সতী আবার বললে—তুমিও তো একজন পুরুষ-মানুষ দীপু, কেন উনি তোমার মতও হতে পারলেন না?

দীপঙ্কর বললে—আমার কথা ছেড়ে দাও সতী, আমি কেউ না—

এরপরই হঠাৎ হাজরা রোডটা আসতে সতী জিজ্ঞেস করলে—এটা হাজরা রোড, না?

দীপঙ্কর বললে — হ্যাঁ — এইদিকেই সনাতনবাবুর বাড়ি, যাবে তুমি?

সতী বললে—না, প্রার্থনা করো দীপু, যেন এ জীবনে আর কখনও ও-বাড়িতে না যেতে হয়—যেন ও'দের মুখ দেখতে না হয় কখনও—

গাড়িটা ল্যান্সডাউন রোড পেরিয়ে রাসবেহারী অ্যাভিনিউতে পড়লো। সতী একবার দীপঙ্করের দিকে চেয়ে দেখলে। বললে—কথা বলছো না যে দীপু? কী ভাবছো?

দীপঙ্কর বললে—ভাবছি আমার এক বন্ধুর কথা—তুমি তাকে চেনো—

—কে?

—কিরণ। সনাতনবাবুর মত তাকেও কেউ চিনলে না। তাকেও বাইরে থেকে দেখে সবাই বিচার করেছে। তার বাবা চিনতে পারেনি, তার মা চিনতে পারেনি। পাড়ার লোকেরাও কেউ চিনতে পারেনি। তোমরাও তাকে ঘেন্না করেছ। কাকাবাবুও তাকে দেখতে পারতেন না। অথচ আমি তো জানি সে কী! সে গরীব, সে লেখাপড়া জানে না ভালো, ম্যাট্রিকও পাশ করেনি। অথচ দেখো, আমাদের বাড়িতে সেই ছিটে-ফোঁটা থাকতো—তারাই আজ দেশের মস্ত গণ্যমান্য লোক হয়ে উঠেছে—! মানুষকে বাইরে থেকে বিচার করার মত ভুল আর নেই, এইটেই আমি সারা-জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি—

সতী কিছু কথা বললে না। অন্ধকার ব্ল্যাক-আউট ভেদ করে গাড়িটা গড়িয়ে চলেছে। গড়িয়াহাট লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে আসতেই সতী বললে—তার চেয়ে তোমার বাড়িতেই নিয়ে চলো আমাকে দীপু—আমি তোমার কাছেই আরামে থাকবো—

দীপঙ্কর কিছু প্রতিবাদ করলে না। শুধু মুখে বললে—ছি—

তারপর হঠাৎ একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই সতী অবাক হয়ে গেল। কোন্ বাড়িটা? এইটে নাকি?

বাড়িটার বাইরে আলো নেই। ব্ল্যাক-আউটের গরজে বাইরে থেকে অন্ধকার। তবু বোঝা যায় নতুন ডিজাইনের ফ্যাশানেবল বাড়ি। জানালা, দরজা, গ্রিল, পেণ্টিং, এলিভেশন সবই চমৎকার। সতী অবাক হয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো! এত বড় বাড়ি? এত বড় বাড়ি লক্ষ্মীদির? এ কেমন করে হলো? কার টাকায় হলো? লক্ষ্মীদির এত টাকা? এত টাকা কী করে উপায় করলে লক্ষ্মীদি? কীসের ব্যবসা?

দীপঙ্কর বললে—নেমে এসো সতী—

সতী তখনও চেয়ে চেয়ে দেখছে অবাক হয়ে। বললে—এত টাকা লক্ষ্মীদির কী করে হলো দীপু?

দীপঙ্কর বললে—পরে বলবো, তুমি এসো—

(ক্রমশ)

রামকেলি

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

আশ্চর্য এক রোমাঞ্চে কেঁপে উঠল কৃষ্ণগোবিন্দ দাসের সর্বদেহ। ধুলো-কাদা ভরা শানের উপর লুটিয়ে পড়ে ব্যাকুল দু হাত বাড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে। হাত দিয়ে স্পর্শ করেও আশ মেটে না, টেনে আনতে ইচ্ছা করে একেবারে বুকের মধ্যে। কম্পমান আঙুলগুলি পাথরের বুকে কী যেন হাতড়াতে লাগল কিছুক্ষণ। খুঁজে পেল বাঞ্ছিত ধন,—এবার শিলার উপর তালু দুটি চেপে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন বৃদ্ধ বৈষ্ণব। নির্বাক স্তব্ধ মূর্তি—ঠোঁট দুটি কেবল মৃদু মৃদু কাঁপছে। দু চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।

কয়েক মিনিট পরে সংবিৎ ফিরল। আমার দিকে ফিরে বললেন—'কই, কাছে আসুন, শ্রীচৈতন্যের এই পদচিহ্ন ভালো করে স্পর্শ করুন। জয় গৌর, জয় নদীয়াবিনোদ!'

বাম পাশে কেলিকদম্ব বৃক্ষ, পিছনে কৃষ্ণ-তমাল। কত কালের পুরানো এ দুটি গাছ—কেউ জানে না। বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রিয় এই যুগল বৃক্ষের মূলে রয়েছে নবদ্বীপচন্দ্রের যুগল চরণচিহ্ন। সাড়ে চার শো বছর হতে চলল, এতদিনেও মুছে যায়নি। ছায়া-শীতল মাটির বুকে চিহ্ন পড়েছিল। সেই মাটি অক্ষয় পাথরে রূপান্তরিত হয়েছে। সাড়ে চার শো বছর ধরে সারা ভারত ঝেঁটিয়ে অগণিত ভক্ত এই চৈতন্যচরণ স্পর্শ লাভের অকুতি নিয়ে এখানে এসেছে। আজও আসছে। এ আসার বিরাম কবে হবে কেউ জানে না।

মধ্যযুগের বাংলার গৌরবমণ্ডিত রাজ-ধানী গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দক্ষিণে। প্রাচীন গৌড়ের গায়েই এই রামকেলি—

শ্রীচৈতন্য কৃপানিধি আসিয়া আপনে।
আত্মসাথ কৈল হেথা রূপ সনাতনে॥

শ্রীচৈতন্যদেব যেদিন এই রামকেলি গ্রামকে ধন্য করেন, সেদিন ছিল জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি। ইংরেজী ১৫১৫ সাল। শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্ম-বিজয়ের ইতিহাসে মহা স্মরণীয় এই দিন। সারা ভারতের বৈষ্ণবরা এই দিন ও এই ঘটনাটিকে প্রতি বৎসর স্মরণ করে আসছেন জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির দিনে। এই রামকেলির মেলায়।

আমাদের দলটি ভালোই। তিনপাহাড় থেকে জমতে জমতে মেলার মুখে বেশ পরি-পুষ্ট হয়েছে। রাইগঞ্জের নিতাই সন্ন্যাসী, দেনুড়ের রসরাজ সাহা, পাকুড়ের মান্না-মশাই। রাজমহল থেকে মানিকচক ঘাটের ফেরী স্টীমারে চলে এসেছেন কৃষ্ণগোবিন্দ দাস। ইনি বহুদূরের যাত্রী। কামরূপ থেকে আসছেন। বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি হবে। দীর্ঘ দৃঢ় দেহ, মাথায় পাকা চুলের বাবরি, তীক্ষ্ণ অথচ ভাবুক চোখ। বিনয় সদাচার ও মিষ্ট-ভাষিতায় এই বৃদ্ধ আদর্শ বৈষ্ণব। গোঁসাই মন, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী। ভক্তির সঙ্গে বিদ্যার সমন্বয়। কৃষ্ণগোবিন্দই দলের মধ্যমণি। খুব জমিয়ে রেখেছেন। তাঁকে ঘিরে আমরা আছি। জটাজুটধারী এক প্রৌঢ় বাঙালী সাধু মালদহ বাস স্ট্যান্ড থেকে সঙ্গ নিয়েছেন। নিতাই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আছে তার আদরিনী সন্ন্যাসিনী। মান্নামশাই এক নারী বাহিনীর অধিনায়ক। অনেক চেষ্টা করে মালদহে এক বাসেই আমরা সদলবলে উঠেছি। যাত্রার এই শেষ দশ মাইল বাসে বসে দাঁড়িয়ে ঠাসাঠাসি করে একসঙ্গে কাটল। এবার মেলার ভিড়ে হারিয়ে যাবার পালা। শ্রীচৈতন্যচরণ মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দলবলের কথা আর মনে থাকছে না। ভক্তের প্রাণে শুধু বাজছে—

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ
গৌরাঙ্গ নাম রে।

২

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ। গৌড়ের রাজা তখন হুসেন শাহ। প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। যেমনি নিষ্ঠুর, তেমনি উদার। সিংহাসনে আরোহণ করার পর নবদ্বীপে হিন্দু ব্রাহ্মণ রাজা হবেন এই দৈববাণীতে চিন্তিত হয়ে নবদ্বীপ ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিলেন। আবার করুণাপরবশ হয়ে আত্ম-

শ্রীচৈতন্য চরণমন্দির
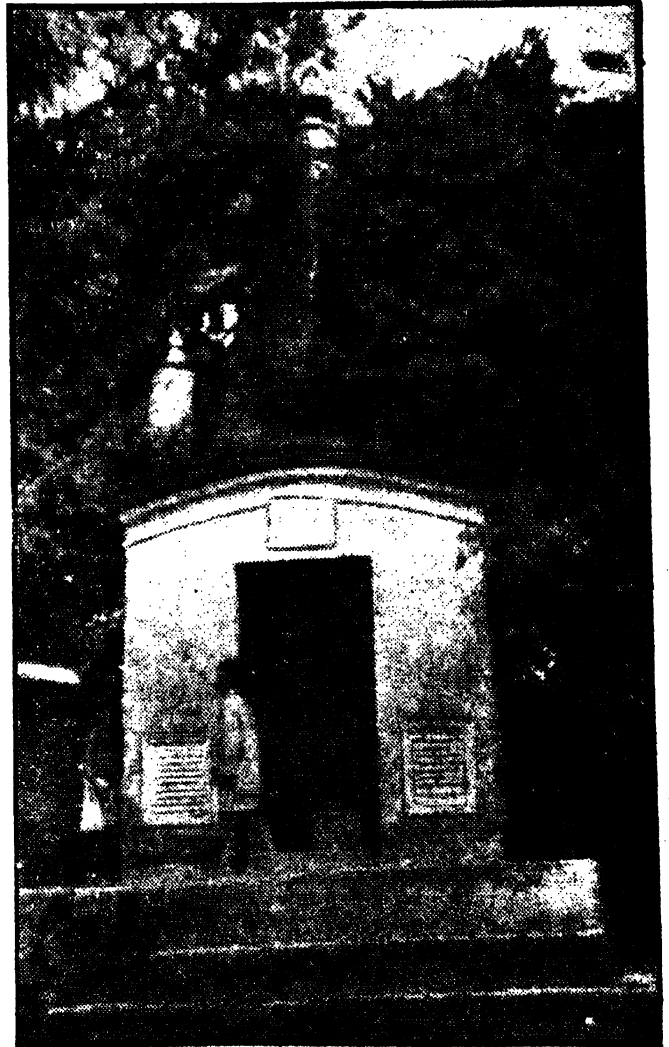
সংবরণও করেছিলেন। হিন্দু মন্দির ধ্বংস করলেও হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তাঁর অমাত্য ও প্রধান কর্মচারীদের মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দু ছিলেন প্রচুর। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সনাতন ও রূপ।

রূপ সনাতন যজুর্বেদীয় ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পূর্বপুরুষ কর্ণাটদেশীয়। গত কয়েক পুরুষ ধরে রূপসনাতনের পূর্বপুরুষেরা বাংলায় এসে এখানকার পাঠান নৃপতিদের অধীনে সরকারী কাজে লিপ্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেও রূপ-সনাতন আচারে ব্যবহারে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। মুসলমান উপাধি তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। সনাতন ছিলেন রাজা হুসেন শাহর প্রধানমন্ত্রী দবির খাশ। রূপ রাজস্ব সচিব—সাকর মল্লিক। রাজধানী গৌড়ের পরিখার ঠিক উত্তর দিকে রামকেলি। পিতামহ মুকুন্দদেব প্রথম এই রামকেলিতে বসবাস শুরু করেন। রূপ এবং সনাতন—উভয়েরই রামকেলিতে বিশাল প্রাসাদ, প্রাসাদের সংগে সংলগ্ন মনোরম উদ্যান ও সুশীতল দীর্ঘিকা। রাজার শ্রেষ্ঠ অমাত্য দুই ভাই, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের সীমা পরিসীমা নেই। রাজার নিচেই তাঁদের নামসম্মান।

নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের দ্বিতীয় পুত্র বিশ্বম্ভর নবীন যৌবনে মস্তক মুণ্ডন করে সন্ন্যাসী হয়েছেন। এ এক আশ্চর্য বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। কৃষ্ণব্যাকুলতায় বিহ্বল, মুখে সদা কৃষ্ণনাম, চক্ষে কৃষ্ণপ্রেমাশ্রুধারা, বরদেহে ক্ষণে ক্ষণে কৃষ্ণবিরহশিহরন। গৌরাঙ্গের প্রেম-বন্যায় সারা নদীয়া ভাসছে, অসংখ্য আকুল বৈষ্ণবপ্রাণ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ছুটে চলেছে কৃষ্ণসন্ধানের অভিসারে। শ্রীকৃষ্ণ-মিলনের অভীপ্সায় শ্রীচৈতন্য চলেছেন বৃন্দাবনে। চলেছেন নাম গান করতে করতে, পিছনে সহস্র ভক্ত। গৌড় রাজধানীর সম্মুখে এই রামকেলিতে রূপ এবং সনাতনের সাক্ষাৎ হল। খামখেয়ালী হুসেন শাহ রাজধানীর মধ্যে চৈতন্যভক্তদের উপর অত্যাচার করতে পারেন, প্রধানমন্ত্রী সনাতনের এই পরামর্শে চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাত্রা এবার স্থগিত রাখলেন। তিনি দিক পরিবর্তন করে পুরীধামে যাত্রা করলেন।

রূপসনাতনের সংগে এই ক্ষণিক মিলন শ্রীচৈতন্যের সমগ্র ভারতব্যাপী ধর্মবিজয়ের সূচনা। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমধর্ম বিকাশের এ এক মহামাহেন্দ্রক্ষণ। প্রেমময় সংসার ও বিপুল বৈভবময় প্রতিষ্ঠা ধূলায় পরিত্যাগ করে সেইদিন রাত্রেই দিব্যোন্মাদ রূপ রামকেলি থেকে বিদায় নিলেন। নীলাচলে পৌঁছে সর্বত্যাগী জীবনকে সমর্পণ করলেন প্রভুর চরণে। গৌড়ের প্রধানমন্ত্রী সনাতনের পক্ষে সেই দিনই সংসার ত্যাগ সম্ভব হল না। কিন্তু রাজকার্যে আর তিনি গেলেন না। প্রভু তাঁর অন্ধ আঁখিতে নূতন দৃষ্টি দিয়েছেন, চোখে প্রাণেশ্বর মদনমোহন ছাড়া আর কিছু দেখেন না। সারা দিনরাত কাটে মদনমোহনের উপাসনায়। সনাতনকে বন্দী করলেন হুসেন শাহ। বন্দীশালার রক্ষীকে প্রচুর উৎকোচে বশীভূত করে গভীর রাত্রে পলায়ন করলেন সনাতন। অঙ্গের বস্ত্র পরিত্যাগ করে কৌপীনধারীর ছদ্মবেশে করলেন প্রভুর সন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রা। বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী কৌপীনমাত্র পরিহিত নিঃসঙ্গ ভিখারী। কোনো বন্ধন নেই, আর কোনো বাসনা নেই। অরণ্যপথে রিক্তপদে নিষ্ঠুর কণ্টকের আমন্ত্রণ, অশ্রুবিগলিত আঁখিতে শুধু চৈতন্যচরণের সন্ধান। মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ সনাতন পেলেন কাশীধামে। শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করে বললেন, 'প্রভু, বড়ো দেরি কি করে ফেলেছি? আমার অর্ঘ্য কি নেবে না?'

এ মাটির দেহ আর এ ছার জীবন।
তোমাতেই করি সমর্পণ॥

৩

চৈতন্যচরণ মন্দিরের কৃষ্ণতমালের কালো রূপ আরো গভীর হয়েছে। সারা আকাশ জুড়ে কালো মেঘ। সেই মেঘের আড়ালে প্রভাতসূর্য। কেলিকদম্ব বৃক্ষের নিচে কে যেন বাঁশি বাজাচ্ছে। ভোরের রামকেলিতে শুরু হয়েছিল বংশীরব। এখন বাজছে ভৈরবী। রূপসনাতনের উৎসবে এই রামকেলির মেলায় সারা দিনরাত বাঁশি বাজে। দিবসরজনীর যে কোনো প্রহরই হোক, কানে বংশীধ্বনি আসবেই। দ্বাপরের ঐ বংশীধ্বনির সংগে কলির হরিনাম রামকেলিতে এসে মিশেছে। দিনে রাতে হরিধ্বনিরও বিরাম নেই।

ছোটখাটো সাদা রঙের মন্দিরটি। ভিতরে একটি প্রস্তরবেদী। বেদীর মাঝখানে পদচিহ্ন। কয়েক বৎসর পূর্বেও এই পদচিহ্ন কদম্বমূলেই পড়ে থাকত। গত আঠারো বছর হল মন্দির নির্মিত হয়েছে ও প্রভুপদচিহ্ন মন্দিরে রক্ষিত হয়েছে। ডান দিকে একটু এগোলেই মদনমোহন জিউ-এর মন্দির। এইখানেই একদা ছিল বড় বাড়ি বা সনাতনের প্রাসাদ। অদূরে সনাতন সাগর দীর্ঘিকা। সনাতন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত এই মদনমোহন মন্দির গত ১৩৪৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে পুনর্নির্মিত হয়েছে। বর্তমান মন্দিরটি অতি সুন্দর। সু-উচ্চ শ্বেতচূড়া, সম্মুখের দেওয়ালে বিচিত্র বর্ণের পুষ্পালিম্পন, উঁচু চাতাল পরিচ্ছন্ন প্রস্তরতল। মন্দির মধ্যে বিরাজ করছেন সনাতন গোস্বামীর পরমারাধ্য মদনমোহন ও শ্রীরাধা। তাঁদের এক দিকে বলরাম ও রেবতী। অন্য দিকে শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের তিনটি মূর্তি। মূর্তিগুলি আধুনিক তবে নয়নাভিরাম। মন্দিরের সামনে পাকা প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে সুপ্রশস্ত নাটমন্দির, তিন দিক জুড়ে পাকা আখড়াবাড়ি।

দক্ষিণগামী মাইলব্যাপী সোজা পথ বর্তমান রামকেলি গ্রামের মাঝখান দিয়ে গিয়ে গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের সংগে মিশেছে এই পথের দু ধারে মেলা। অর্ধেকটা পথ গেলে ডান দিকে রূপসাগর। বিশাল দীর্ঘিকা। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রূপ এই দীর্ঘিকার প্রতিষ্ঠা করেন। বিপরীত তীরে ছিল রূপের প্রাসাদ,এখন সে প্রাসাদের চিহ্নমাত্র নেই। বাংলা ১৩৩৫ সালে এই দীর্ঘিকাটির পঙ্কোদ্ধার করে সংস্কারসাধন করা হয়। উত্তর ও পশ্চিম তীরে দুটি সুন্দর প্রশস্ত বাঁধা ঘাট নির্মিত হয়। এই পঙ্কোদ্ধারের পূর্বে এই দীঘি নাকি কুমিরে পূর্ণ ছিল। এখন এই রূপসাগর যাত্রীদের মহা আরামের কেন্দ্র। টলটলে জলে অবগাহন স্নান, ঘাটের ধারে শান্ত বিশ্রাম। এই রূপসাগরের উত্তর তীরে একটি বৃহৎ যাত্রীশালা পাকা সিমেন্টের মেঝে, পাকা রেলিং, অ্যাস

বেস্টসের ছাদ। রামকেলির বর্তমান সংস্কার ও জনহিতকর ব্যবস্থাবলীর জন্যে এ যুগে যিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ও চেষ্টায় সফলকাম হয়েছিলেন, তাঁর নাম 'কৃষ্ণশশী গোস্বামী। ১৩৩২ সালে ইনি রামকেলি সংস্কার সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। রূপসাগর সংস্কার যাত্রীশালা নির্মাণ প্রভৃতি কাজ এই রামকেলি সংস্কার সমিতির উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হয়। মদনমোহন জিউ-এর শেষ ব্যক্তিগত অধিকারী ছিলেন 'যতীন্দ্রমোহন মৈত্র গোস্বামী। ইনি সনাতন গোস্বামীর বংশধর। সুষ্ঠুভাবে মন্দির পরিচালনার জন্য তিনি তাঁর ব্যক্তিগত স্বত্ব একটি নির্ভরযোগ্য ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে তুলে দেন। এই পরিচালক সমিতিতে স্থানীয় জ্ঞানী গুণী ও বিত্তবান লোকেরা আছেন।

রামকেলির পথ শেষ হল প্রাচীন গৌড়ের বিখ্যাত বারো-দুয়ারী বড়ো সোনা মসজিদের ধ্বংসাবশেষের সামনে এসে। এই মসজিদ নির্মাণ করেন বাংলার পাঠান রাজা হুসেন শাহর পুত্র রাজা নশরৎ শাহ। তাঁরই রাজত্বকালে দিল্লীর রাজতক্ত থেকে শেষ পাঠান সম্রাট ইব্রাহিম লোদী অপসৃত হন। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন বাবুর।

বারো-দুয়ারীর পিছনে পরিত্যক্ত গৌড়। কিছুটা উত্তরপূর্বে গেলে গৌড়ের পরিখা। পরিখার ওপারে অরণ্য। এই অরণ্যে মাথা উঁচু করে আছে বরবক শাহ নির্মিত শালামী দরওয়াজা ও ফিরোজ শাহ নির্মিত ফিরোজ মিনার। চারদিকে প্রাচীন আম ও পিটুলি গাছ। আর কত ঝোপঝাড় বনাগুল্মের ছড়াছড়ি। মাঝে মাঝে পায়ে-চলার শীর্ণ বনপথ। ফিরোজ মিনারের উচ্চতা চুরাশি ফুট, সিঁড়ির ধাপ তিয়াত্তরটি। এই ফিরোজ মিনারকে ঘিরে কত ধ্বংসাবশেষ, কত স্মৃতিবিস্মৃতি। কোন্ এক বিরহ-কাহিনীকে অদূরের গ্রামবাসিনীরা আজও মনে রেখেছে, তাই এই জনবিহীন স্তম্ভ-শিখরে প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ জেলে যায়। প্রাচীন গৌড়ের অর্ধেকের বেশী গ্রাস করেছে পাকিস্তান। সে-অংশের খবর জানিনে। এ অংশের অরণ্যভূমি আম ও অজানা বন-কুসুমের বিষণ্ন সুরভিতে মন্থর। জনমানব নেই, শুধু মৌমাছিদের মহোৎসব। শুধু কালো মেঘের নিচে কালো ছায়ার নিবিড়তা।

রামকেলির মেলায় সারা দিনরাত বাঁশি বাজে। বাঁশি বাজায় বাঁশুরিয়ারা আর বাঁশি-ওয়ালারা। এতো বাদ্যযন্ত্রের কেনাবেচা এ মেলায় যে চোখে না পড়ে উপায় নেই। বাঁশি বিক্রেতার সংখ্যা গুনে ওঠা যায় না। কয়েক পা পরে পরেই রাস্তার কোণে কোনো এক-জন ঝুলি ভরতি নানা প্রকারের বাঁশের বাঁশি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউ-না-কেউ বাঁশির মুখে ফুঁ দিয়েছেই, একটি মুহূর্তের বিরাম নেই। এ ছাড়া প্রধান বাদ্যযন্ত্র খোল, ঢোলক ও বাঁয়া তবলা। বাদ্যযন্ত্রের অন্তত দশ বারোটি বড়ো বড়ো
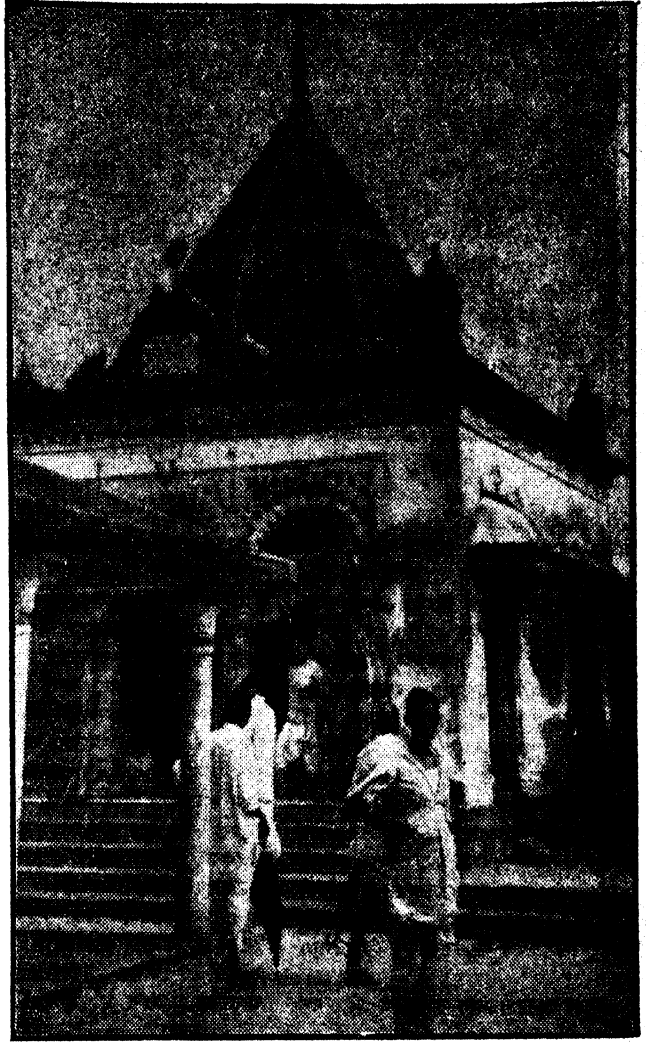
মদনমোহন মন্দির

দোকান, ক্রেতারা ভিড় করেছে যন্ত্র পরখ করে নেবার জন্যে। আর দর্শনীয় রূপসাগরের ধারের শঙ্খের দোকানগুলি। মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার বাজিতপুর, জিতপুর, বেলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান থেকে শঙ্খ ব্যবসায়ীরা এসেছে। নূতন শাঁখা হাতে পরে গৃহস্থবধূদের আনন্দের সীমা নেই। আর লক্ষণীয় বস্তু কম্বল। পশমের মোটা কম্বল। যেমনি গরম, তেমনি নরম। বাংলার নিজস্ব শিল্প। মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর, ধুলিয়ানের আমদানী। জ্যৈষ্ঠ শেষের এই আম-পাকানো গরমে শীতের সঞ্চয় এই কম্বলের কেনাবেচা কৌতুকাবহ। মেদিনীপুর থেকে পাটি ও মাদুর যথেষ্ট আমদানী হয়। তবে সবচেয়ে চোখে পড়বার মতো তাঁতশিল্পের অভাব। তাঁতের সাধারণ ধুতি শাড়ি পর্যন্ত এ মেলায় বিরল, যদিও প্ল্যাস্টিক ও টিনের সস্তা খেলনা ও নানা মনোহারী দ্রব্যের সঙ্গে হাওড়া হাটের কাটা কাপড়ের পোশাকের দোকান অনেকগুলি।

'এ মেলা আর সে মেলা নেই'। সব প্রবীণদের মুখে একই কথা। প্রৌঢ় এক শঙ্খ ব্যবসায়ী বললেন, 'সেকালে মশাই উদয়াস্ত বউঝিদের হাতে শাঁখা পরিয়ে পরিয়ে দম ফেলবার সময় পেতুম না। আর এখন দেখুন না, বসে বসে শুধু নিজের হাতই কচলাচ্ছি।'

এ মেলার ভাগ্যে সবচেয়ে বড়ো আঘাত হেনেছে বঙ্গবিভাগ। কয়েক মাইল দূরেই পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা। পূর্ব বাংলার যাত্রিস্রোত বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের ফলে চিরকালের মতো রুদ্ধ হয়ে গেছে।

আরো কারণ আছে। মালদহ শহর থেকে এই রামকেলির দূরত্ব দশ মাইল। বর্তমানে পাকা পিচের রাস্তা। সেই রাস্তায় সারা বছর মোটর চলে, টাঙ্গা চলে। মেলার সময় মিনিটে

রূপসাগর

মিনিটে বাস ছাড়ছে। সুন্দর মন্দির, দুটি বৃহৎ পাকা যাত্রিনিবাস, কয়েকটি বড়ো বহু-নলবিশিষ্ট টিউবওয়েল ট্যাংক। মেলার সময় বারো-দুয়ারীর কোটরে কোটরে পুলিসের, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের ক্যাম্প। মসজিদের চত্বরে একরাশ পেট্রো-ম্যাক্স আলো সরকারী খরচে সারা রাত্রি জ্বলছে। গমনাগমনের এত সুবিধা ও যাত্রীদের জন্যে এত সুব্যবস্থা সত্ত্বেও এ মেলা আর সে মেলা নেই। সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে মেলায় পঞ্চাশ হাজার লোক হয়েছে এবার। বাসের ভিড় দেখলে সত্যিই মনে হবে। এদের মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগ হুজুগের যাত্রী। দিনে আসে দিনে যায়। ফালতু ভিড়। ভক্ত নয়, পূজার্থী নয়, ক্রেতাও নয়।

একদা মালদহ থেকে রামকেলি এই দশ মাইল জুড়ে ছিল ঘন অরণ্য। মাঝে মাঝে আম্রকানন-ঘেরা কয়েকটি গ্রাম। মেঠো পথ। গ্রামাঞ্চল থেকে গরুর গাড়িতে মহোৎসবের পসরা সাজিয়ে যাত্রীরা আসত। ভোগ প্রসাদ দিয়ে ত্রিরাত্রি অন্তত অতিবাহিত করত। দূর দূর থেকে আসত বহু সাধু বৈরাগীরা। বৈষ্ণব যাত্রিদলের আখড়ায় আখড়ায় তারা অন্নপ্রসাদ পেত। উৎসবের আগে ও পরে বেশ কিছু দিন ধরে দূরাগত সাধুসন্ন্যাসীরা গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াত, গ্রামবাসীরা তাদের ভিক্ষা দিয়ে পুণ্য অর্জন করত। পরিব্রাজকরা জানত রামকেলিতে অভাব নেই, আছে দানের অকুণ্ঠ আমন্ত্রণ।

এ মেলা আর সে মেলা নেই। দ্বিতীয় দিনেই ডাউন-বাসে ঝুলোঝুলি, আপ-বাস ফাঁকা। এই মেলায় যাদের প্রাণের টান, অন্তরের আকর্ষণ, তারাই আজ বিলুপ্তির পথে চলেছে। ঐ বাউল, বৈরাগী, সহজিয়া সাধক সম্প্রদায়। ঐ জাত-বৈষ্ণব আর নেড়া-নেড়ীর দল, ঐ রাজবংশী পোলিয়া উপ-জাতি।

(৪)

মেঘলা অপরাহ্নে বারো-দুয়ারীর চাতালের উপর বসে আছি। অন্য সংগীরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, শুধু পাশে আছেন বৃদ্ধ কৃষ্ণগোবিন্দ দাস। বারো-দুয়ারীর চাতালে ও কোটরে কয়েকটি দূরাগত বৈষ্ণবদল আশ্রয় নিয়েছেন। এ'রা তেরাত্তির পালনের মানসিক নিয়ে এসেছেন। সামান্য ভোগপ্রসাদের আয়োজন সংগে। তবে সংগে খোল মন্দিরা আছে। কণ্ঠে আছে গান, প্রাণে আছে ভক্তি। এ'দের কাছাকাছি আছি। আশা আছে রাত্রে এ'দের মধ্যেই মিলবে আশ্রয়।

ভক্তির কথা ভাবছিলাম আর মনে পড়ছিল সনাতন গোস্বামীর কথা। মহাপ্রভুর সংগে সাক্ষাৎমানসে একবার সনাতন চলেছেন শ্রীক্ষেত্রে। পথে ছোটনাগপুরের অরণ্যভূমিতে এক বিষাক্ত জলপূর্ণ ডোবায় স্নান করে তাঁর দেহের রক্ত বিষময় হয়ে গেল। পুরীধামে যখন পে'ছিলেন, তখন সর্বাংগে ফোড়া, দূষিত রক্তপুঞ্জে টসটস করছে। বিস্ফোটক-কলুষিত সনাতনকে চৈতন্যদেব পরম আনন্দে আলিংগন করলেন। সনাতনের দেহের রক্তপুঞ্জে গোরাংগের বরতনু কলংকিত হল। সমস্ত অন্তর ছি-ছি করে উঠল সনাতনের। অন্য পার্ষদরাও সনাতনকে ছি-ছি করলেন। সনাতন ভাবলেন, প্রভুর সম্মুখীন আর তিনি হবেন না। কিন্তু প্রভু প্রতিদিন তাঁকে ডাকেন। কতদিন তিনি আত্মগোপন করে থাকবেন? শেষ পর্যন্ত পরম ভক্ত সনাতন স্থির করলেন, এই গ্লানিময় দেহকে তিনি চিরতরে প্রভুর দৃষ্টির সামনে থেকে সরাবেন, আসন্ন রথযাত্রার দিনে জগন্নাথের রথের নিচে পড়ে আত্মহত্যা করবেন। চৈতন্যদেবের কানে কীভাবে জানি এই কথা পে'ছিল। তিনি ছুটে এলেন সনাতনের গোপন আশ্রয়ে। সনাতনকে পুনর্বার বক্ষো-লগ্ন করে বললেন, 'সনাতন, তুমি না বলে-ছিলে এ দেহ প্রাণ তোমার নয়, আমার? তা হলে আত্মহত্যার অধিকার তোমার কোথায়?'

সনাতন বললেন—'প্রভু, আমি হীন, আমি গ্লানিকলুষময়, আমার দেহস্পর্শে আপনার শ্রীঅংগও অপবিত্র হয়, আত্মহত্যা ছাড়া আমার উপায় কী?'

উদার হাসি হেসে মহাপ্রভু বললেন—'ভক্ত হৃদয়ের প্রেমচন্দনে আমার হৃদয়কে তুমি নিষিক্ত করেছ সনাতন, আমার বিরহব্যাকুল অন্তরকে শীতল করেছ তুমি!'

সনাতনের দেহে নবশক্তি সঞ্চার করে মহা-

প্রভু তাঁকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থগরিমা উদ্ধার করেন সনাতন। অম্বররাজ মানসিংহ সনাতনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও তাঁর নির্দেশে বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠা করেন গোবিন্দজীর মন্দির। সনাতনের সঙ্গে আলাপে সম্রাট আকবর মুগ্ধ হন। কথিত আছে সনাতন বৃন্দাবনে স্পর্শমণি লাভ করেন ও তুচ্ছ লোষ্ট্রজ্ঞানে যমুনার বালুকাবেলায় পরিত্যাগ করেন।

বারো-দুয়ারীর পশ্চিম দিকে ঘন অরণ্য-শিখরে অস্তসূর্যের স্পর্শ। এ-পারের আকাশের মেঘে কনে দেখানো আভা। টিন-বাঁধানো ছোট্ট একটি আরশির দিকে আনত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আভা-রঙিন মুখে সযত্নে সান্ধ্য-প্রসাধন আঁকছে একটি অল্পবয়সী বৈষ্ণবী যাত্রিণী। গুনগুন করে গান করছে :

হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও।
বাহু পশারিয়া গৌরাচান্দেরে ফিরাও॥
কি শেল হিয়ায় হায় কী শেল হিয়ায়।
নয়ান পুতুলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায়॥

কৃষ্ণগোবিন্দ দাস হঠাৎ বললেন—'জানেন গোঁসাই, গৌরচন্দ্র যখন সংসার ত্যাগ করেছিলেন তখন শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে সমস্ত নবদ্বীপ অঝোরে কেঁদেছিল। ঘরে ঘরে উপবাস, সারা দেশবাসী শোকে আকুল। বিশ্বপ্রকৃতিও মুহ্যমান। কাননে কুসুমকলি ফোটে না, গান গায় না পাখিরা, ধেনুগণ যায় না গোষ্ঠে। গৌরাঙ্গ-বিরহ নিয়ে মহাজনপদের শেষ নেই। কিন্তু এই রামকেলির দুই বিরাট রাজপুরুষ সনাতন ও শ্রীরূপ গোস্বামী যেদিন গৃহত্যাগ করেন সেদিন কে কেঁদেছিল? সেই সন্ন্যাসকে কোনো পদকর্তাই তো স্মরণ করেননি!'

আমি একটু ভেবে বললাম—'একটু ভুল বোধ হয় আপনি করছেন। গৌরাঙ্গ যখন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করে গেলেন তখন তাঁর ভক্তগণের শোক মথুরাপ্রবাসী বৃন্দাবন-চন্দ্রের জন্য গোপাঙ্গনাদের বিরহবেদনার প্রতিরূপ। পদকর্তাদের রচনায় যেখানে শ্রীকৃষ্ণরাধিকা, সেখানেই চৈতন্য, আবার যেখানে মহাপ্রভু সেইখানেই তাঁর প্রতিটি ভক্তের আত্মহারা প্রেমোন্মাদনা। তা ছাড়া বৈষ্ণব দার্শনিকরা সনাতনকে শীর্ষস্থান দিয়েছেন। চৈতন্যচরিতামৃতের অর্ধেকটাই তো সনাতনকে নিয়ে লেখা।'

'তা বলতে পারেন। তবু আমার কি মনে হয় জানেন?'

'বলুন।'

'গত চার শতাব্দী ধরে সনাতনের স্মৃতি এই রামকেলিই বুকে পুষে রেখেছে। চৈতন্যদেব গোস্বামীদের মহাপ্রভু। গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষের, অবমানিত উপেক্ষিত অন্ত্যজ দরিদ্র মানুষের অবতার রামকেলির এই আধা-মুসলমান সনাতন আর একচক্রার ঐ আধা-সংসারী অবধূত নিত্যানন্দ।

কৃষ্ণগোবিন্দ দাসের এই অভিমানের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। আচণ্ডালে দিবে কোল—সমসাময়িক বাংলা সমাজে মহাপ্রভুর এই পরম মানবতাময় বাণীকে সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সনাতন। বৌদ্ধধর্মের তখন গ্লানিময় অবসান। এদিকে বল্লালী প্রেরণায় হিন্দু সমাজে কঠোর উচ্চ-নীচ ভেদ, নিম্ন বর্ণের প্রতি উচ্চ বর্ণের বীভৎস ঘৃণা। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা সমাজভ্রষ্ট, আচারভ্রষ্ট, হিন্দু সমাজের চোখে তারা ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য, বিধর্মী। ব্রাহ্মণ্যদলনের অত্যাচারে পূর্ববঙ্গের বহু বৌদ্ধ ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু দলে দলে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। রাঢ়ের সহজযানী বৌদ্ধদের আশ্রয় দেন সনাতন। তাঁর আশ্রয়ছায়ায় জাতিহীন কুলহীন হয়েও এরা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে রক্ষা পায়। এরাই বাংলার জাত বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবী। এদেরই সমাজ বাংলার সহজিয়া সাধনার জন্মভূমি। যে সাধনায় বৈষ্ণব রাধা-কৃষ্ণবাদের সঙ্গে সহজিয়া প্রকৃতি-পুরুষ-বাদের সমন্বয়।

সূর্য অস্ত গেল। কৃষ্ণগোবিন্দ দাস আবার বললেন—'আপনাকে আমি গোঁসাই ডেকেছি কেন জানেন? কারণ আপনি গোত্রাধিকারী ব্রাহ্মণ, আমার কিন্তু কোনো জাত নেই, কোনো কুল নেই, গোত্র নেই। আমি জাত বৈষ্ণব। এই উত্তর বাংলাতেই আমি জন্মেছি। আমার কোনো জাতিবর্ণহীন ব্রাত্য পূর্বপুরুষকে একদিন সনাতনই উদ্ধার করেছিলেন। তাই নবদ্বীপ নয়, বৃন্দাবন নয়, এই রামকেলিই আমার শ্রেষ্ঠ তীর্থ।'

শার্ঙ্গদেব

সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই ধরা যাক। সামগ উদ্গাতা যে গান করতেন তা ঠিক সংগীতের পর্যায়ে পড়ে না অথচ তাতে সুর ছিল। তাকে আলাদা করে বলা হয়েছে স্তোত্র বা স্তোম। সুললিত সংগীতে বন্ধনার এমন গম্ভীর ভঙ্গি হয়ত ফুটত না। অনুদাত্ত, স্বরিত এবং উদাত্ত এগুলি স্তোত্রপাঠের গতি নির্দেশ করে। অথচ এই বৈদিক যুগেও সাতটি স্বর ছিল—এমন কি ষড়্জাদির ব্যবহারও ছিল। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে তার উল্লেখও আছে। পরবর্তী বৈদিক যুগে ঋক, গাথা এবং সাম সম্পূর্ণ গীতরূপে পরিগ্রহ করেছিল যার বর্ণনা সংগীত শাস্ত্রে আছে। কিন্তু সংগীত আর সুর সহযোগে আবৃত্তি এই দুটি বস্তু বরাবরই ভিন্ন রয়ে গেছে কেননা একটিতে আর একটির কাজ হয় না।

পরবর্তীকালে এল মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং নাটকের যুগ। বহুতর ছন্দের উৎপত্তি হল। এই ছন্দগুলি সুরে আবৃত্তি করা হত। এছাড়া সংস্কৃত গদ্য নানাভাবে সুরে পাঠ করা হত। এর বিভিন্ন উদাহরণও সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে আছে। কয়েক প্রকার গদ্যরূপে ছিল যাদের "গদ্য গান" আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

মধ্যযুগে যখন ভারতে ফার্সী সাহিত্যের বিস্তৃতি ঘটতে আরম্ভ করল তখন থেকে পাঠ্য বস্তুতে সুরের নতুন উপাদান পাওয়া গেল। সুর সহযোগে ফার্সী কবিতা পাঠ শ্রোতব্য বস্তু। আধুনিককালে গজল গানে যে "শের" অংশ থাকে তাতে তাল রাখা হয় না—এই অংশ সুর সহযোগে আবৃত্তি করা হয়। আসলে এই শের বস্তুটি হচ্ছে নিছক কবিতা যাকে সংগীতের সংগে এক করে দেওয়া হয়নি। এর আবেদন কাব্যের আবেদন। এই অংশটুকু অনুষ্ঠিত হলেই নির্দিষ্ট সুরে তালে সংগীত ঝলসে উঠে। আমীর খস্রু যে কাওয়ালীর পরিকল্পনা করেছিলেন তাতেও এই রকম আবৃত্তির বহু সুযোগ ছিল। আজ পর্যন্ত কাওয়ালী অনেকখানি আবৃত্তিধর্মী। আকবরের সভায় খ্যাতনামা পাঠক ছিলেন যাঁরা সুর করে আবৃত্তি করতেন। এ'দের বলা হত "খানান্দা" যাকে ইংরেজিতে বলে chanters।

ধীরে ধীরে প্রাদেশিক সাহিত্য এবং সংগীত গড়ে উঠতে লাগল। এর মধ্যেও অনেক বস্তু ছিল যা সুর সহযোগে আবৃত্তিতে বিচিত্র হয়ে প্রকাশ পেত। বর্তমানে ভজন উৎকৃষ্ট সংগীত কিন্তু ভজন এক সময় আবৃত্তিরই স্তরে ছিল। এখনও দেহাতিদের কণ্ঠে যাঁরা ভজন শুনবেন তাঁরা বুঝতে পারবেন আসল ভজনের স্বরূপ কি। বাংলার কীর্তনে সুর সহযোগে কথার আর্ট উচ্চস্তরে পৌঁছেছে। আখরগুলি সুরে আবৃত্তি মাত্র, কিন্তু তার মধ্যে কত বড় আবেদন প্রকাশ পাচ্ছে। আখরগুলি যদি কবিতার মত ছন্দোবন্ধ হত এবং সংগীতের সৌষ্ঠবসমন্বিত হত তাহলে শ্রোতৃচিত্তে এমনভাবে আবেদন পৌঁছোতো না। পালাকীর্তনে পদাবলী সংগীতের সংগে কথ্যাংশের বিরতি রয়েছে। এই কথ্যাংশ অনেকটাই সুর সহযোগে সম্পাদিত হয়। এই সুরে পালাকীর্তনের নাট্যগত উপাদান এমন একটা গুরুত্ব লাভ করে যা সুসম্বন্ধ গীতরূপেও সুলভ নয়।

আরো পরবর্তীকালে রামায়ণ গান, পাঁচালী প্রবন্ধ, কথকতা প্রভৃতিতে সুর প্রয়োগের আর্ট বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল। এসব আর্টের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। বছর কয়েক পূর্বে কলকাতার বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে অপূর্ব রামায়ণ গান শ্রবণের সৌভাগ্য হয়েছিল। রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন উপাখ্যানটি সুরযুক্ত কথিকায় ঠিক ছবির মতো বৈচিত্র্য নিয়ে ফুটে উঠেছিল। কথকতা আর একটি সুমার্জিত আর্ট। গত শতাব্দীর প্রথমদিকে ভাল ভাল কাব্যসংগীতও কথকতার সংগে যুক্ত হয়েছে। পূর্বকালের পাঁচালী গায়ন আজ আর নেই তবে পাঁচালীগুলি পড়বার সময় বোঝা যায় সুরেলা আবৃত্তিতে অনুপ্রাস যমকাদি সহ কথ্যবস্তু কীভাবে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠত।

পাঠ্যবস্তু বা কথ্যবস্তুতে সুর আরোপের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে নাটকীয় বৈচিত্র্যের রূপায়ণ। এই বৈচিত্র্য সুরহীন আবৃত্তিতে নিশ্চয়ই সম্ভব কিন্তু সেক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ নাটক। সুরপ্রয়োগের ফলে এই আবৃত্তিতে একটা স্বতন্ত্র মানবিকতার পরিচয় পাওয়া যায় যা নিছক নাট্যে কোনক্রমেই লভ্য নয়। এই কারণেই গদ্যে সুরপ্রয়োগ বাহুল্যবোধে কোনকালেই বর্জিত হয়নি।

তবে যা সংগীত বলে নির্দিষ্ট তা যদি গদ্য গানের আকার ধারণ করে তবে সেটা হবে রচয়িতার অপারগতার প্রমাণ। এই ধরনের অপটুতা বর্তমান বাংলা গানে প্রায়ই লক্ষিত হচ্ছে। গানের একটা গীতধর্ম আছে যা প্রস্ফুটিত না হলে সংগীতের রসহানি ঘটে। গদ্যেরও তেমনি একটা স্বতন্ত্র রূপ আছে যা সুরপ্রয়োগে পঠিত হলে সম্যকভাবে শ্রীমণ্ডিত হয়ে থাকে।

গদ্য ও সুর—

সুর হচ্ছে সংগীতের প্রাণ; কিন্তু কথ্য বা পাঠ্যবস্তুর প্রকাশেও সুরের প্রভাব কম নয়। একটা বিষয়কে বর্ণনা করবার সময় সুরের সাহায্য গ্রহণ করা বা পড়বার সময় সুর সংযোগ করা, এ বহুকালের প্রথা। এর আর্ট স্বতন্ত্র কিন্তু বহু যুগ ধরে এই দুটি রীতির বিশেষ চর্চা হয়ে এসেছে। বর্তমান যুগেও রবীন্দ্রনাথ গীতিনাট্য এবং নৃত্যনাট্যে কথ্যবস্তুর ওপর সুরপ্রয়োগ করেছেন। শাপমোচন-এর একটি অংশ উদ্ধৃত করছি—এটি সুললিত সুরে পঠিত হতে শুনেছি ঃ—

"অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহ্বান। সূর্যরশ্মি কালো মেঘের ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু, তার লজ্জাকে সান্ত্বনা দেবার তরে। মর্ত্যের অভিশাপে স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনি তো সুন্দরের আবির্ভাব। প্রিয়তমে, সেই করুণাই কি তোমার হৃদয়কে কাল মধুর করেনি।"

নৃত্যনাট্যগুলির বহু অংশ গানের আকারে রচিত নয়—এগুলি সুরসহযোগে আবৃত্তির উপযোগী। এর এমনি একটি স্বকীয় রূপ এবং আবেদন আছে যা স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগীতে নেই। এই প্রভেদ আছে বলেই বহু শতাব্দী ধরে সংগীত এবং গীতাকারে আবৃত্তি—এ দুটি স্বতন্ত্রধারা পাশাপাশি চলেছে।

রবীন্দ্রচর্চা

Tagore's Asian Outlook: Sakti Das Gupta. Nava Bharati, 8 Shyama Charan Dey Street. Cal—12. Rs. 10

কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিকী উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত রবীন্দ্র জীবনী সাহিত্য কাব্য বিষয়ক গ্রন্থের অসদ্ভাব নেই। শতবার্ষিকী উৎসবলগ্নের অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে নানা প্রকার রবীন্দ্রায়ণ প্রসঙ্গ গ্রন্থ, রবীন্দ্র-সংকলন ইত্যাদিও প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত শক্তি দাশগুপ্তের আলোচ্য গ্রন্থটি প্রথাসিদ্ধ রবীন্দ্রালোচনা বা কেবল-মাত্র সংকলন পর্যায়ভুক্ত নয়, এবং যেহেতু রবীন্দ্রনাথের একটি অন্যতর মানবিক দিক আবিষ্কারে প্রশংসনীয় উদ্যম ও সৎ-প্রচেষ্টার পরিচয়বাহক সেইহেতু গ্রন্থটি রবীন্দ্রানু-রাগী, রবীন্দ্র-গবেষক এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হবে। রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিক দৃষ্টি-ভঙ্গী, বিশ্বমানবতাবাদের কথা সর্বজন-বিদিত—বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর বিশ্বমৈত্রী, আন্তর্জাতিকতা ইত্যাদি বহু আধারেই ইতিপূর্বে বিচিত্রভাবে পরিবেশিত। কিন্তু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কবিগুরুর এশিয়া সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী, মানসিকতা, অনুচিন্তা বা সমাজ ও জীবন-বিচার, আশা পোষণ ইত্যাদিকে নিপুণ সংগ্রাহকের মতো এর আগে তুলে ধরবার আন্তরিক প্রচেষ্টা বিশেষ হয় নি এবং সেসব বস্তুত পৃথক গবেষণার বিষয়।

সুখের কথা, 'Tagore's Asian Outlook'-এ গ্রন্থকার সেই বিশেষ দিকটি পরিপূরণে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন। এশিয়ায় ভারতের প্রতিবেশী-স্থানীয় দেশগুলির সাথে রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক আত্মীয়তা এবং সেই সূত্রে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচ্যের নবজাগরণ, ঐতিহ্যবোধ, ইতিহাসচেতনা, মৈত্রী সংস্থাপনা এবং মানবিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য দৃষ্টিভঙ্গীর এক অকৃত্রিম পরিচয় বর্তমান গ্রন্থের কয়েকটি পর্বে বিধৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের উত্তরাধিকারের প্রতি আজন্ম আশ্চর্য শ্রদ্ধা লালন করেছেন, দেশে বিদেশে প্রাচ্যের আশ্রয়ে আদর্শবাণী প্রচারে মৈত্রীদূতের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন ও সেই পটভূমিকায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নৈকট্য আবিষ্কারের মাধ্যমে আধুনিক প্রাচ্যের হৃদয়কে অধিকার করেছেন বিশ্বের সম্মিলিত সভায় তার অন্যতম প্রতিষ্ঠায়। গ্রন্থটি চারটি পর্যায়ে মূলত বিভক্ত: **Time to Awake: A Poet's warning: Tagore's conception of History; Message to Asia and Africa: The toilers for Peace.**

এ ছাড়া বর্তমান গ্রন্থের অন্যতম আরো একটি আকর্ষণ বিদ্যমান। সেটি হলো ১৯২৭ সালের অক্টোবরে রবীন্দ্রনাথের শ্যামদেশ পরিভ্রমণের অপ্রকাশিত বিবরণী। ১৯২৭-এ কবিগুরু তাঁর ছেষট্টি বৎসর বয়সে নবমবার বিদেশ যাত্রা করেন—এবারে তিনি পরিভ্রমণ করেন থাইল্যান্ড। সেখানে তিনি বিভিন্ন আসরে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা প্রদান করেন এবং এশিয়ার মর্ম-বাণীকে নতুন সুরে ব্যক্ত করেন।

বর্তমান গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের সেই ঐতিহাসিক পরিভ্রমণের বিশদ বিবরণ এবং তৎকালীন শ্যামদেশীয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাংশ, তৎসহ সেই বিশেষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সংবাদ-পত্রাদির সম্পাদকীয় মন্তব্য ইত্যাদি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সংগ্রহ করেছেন যার মধ্য দিয়ে সমগ্র এশিয়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল মনোভাব সবিশেষ পরিস্ফুট হয়েছে। শ্রীযুক্ত শক্তি দাশগুপ্তের আলোচনায় স্বচ্ছন্দ প্রবাহ বর্তমান; তাঁর বক্তব্যের মধ্যে স্বকীয় চিন্তাধারার বিস্তার এবং রবীন্দ্র অনুধ্যানের আন্তরিক স্পর্শ পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-গবেষক ও উৎসাহী মহলের নিকট 'টেগোরস এশিয়ান আউটলুক' গ্রন্থখানি সমাদৃত হবে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা সুরুচিসম্পন্ন। **২১২।৬১**

রবীন্দ্রস্মৃতি—সম্পাদনায় শ্রীবিশ্বনাথ দে। ক্যালকাটা বুক হাউস। ১/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩·৫০।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম জানাই সব জানা নয়; অন্তত বাংলা দেশের ছেলে-মেয়েদের এ ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব আছে। তারা রবীন্দ্রনাথকে জানবে, তাঁর আদর্শ অনুশীলন করবে। তাঁর লেখা এবং রেখার সংগে প্রকৃষ্টরূপে পরিচিত হয়ে তাঁরই সুমহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবে। বাল্যকাল থেকে যদি কবির ধ্যান-ধারণা, তাঁর ঘরোয়া জীবন, সাধারণ মানুষ হিসেবে তাঁর পরিচয় ছেলেমেয়েদের মনে মুদ্রিত হয়, তা হলে আমাদের দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করাও অসম্ভব নয়। উপযুক্ত গ্রন্থটির সম্পাদনার কাজে এই উদ্দেশ্য নিহিত আছে বলে মনে হয়। তাই, এই গ্রন্থে শুধু কবি রবীন্দ্রনাথ নয়, ঘরোয়া রবীন্দ্রনাথ, নিতান্তই সাধারণ মানুষ রবীন্দ্রনাথকে জানবার মতো লেখাও সংকলিত হয়েছে। শান্তিনিকেতনকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা হ'লে মুখ্য এক অংশ বাকী থেকে যায়—সুতরাং শান্তিনিকেতনেরও আলোচনা এ-গ্রন্থে আছে। গ্রন্থটির রচনা-সজ্জা চমৎকার না হলেও, মন্দ হয়নি। কেউ লিখেছেন 'স্মৃতিকথা', কেউ জীবন কথা, কেউ-বা সুজনী কথা। কিন্তু বিদেশীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ কিংবা বৈজ্ঞানিক রবীন্দ্রনাথকে এই গ্রন্থে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত করা হয়নি। সত্তরটি সংকলিত রচনার মধ্যে মাত্র দু-একজনের লেখা উল্লেখ্য না হতে পারে, কিন্তু অন্যান্য-গুলির আস্বাদ অনন্য। এবং অধিকাংশ সংকলিত রচনাগুলি পড়লে মূল গ্রন্থ পাঠের আগ্রহ জন্মে, এজন্য সম্পাদক কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। ২৪২।৬১

নাটক

জয়ঢাক—সুধীর সরকার। প্রান্তিক পাবলিশার্স। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৫০ নঃ পঃ।

উপরোক্ত সংকলনটিতে চারটি একাঙ্কিকা রয়েছে। জীবনের অসঙ্গতি, বেদনা-বিধুর, মিষ্টি-মধুর কাহিনীই নাটিকাগুলিতে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করেছে। শ্রীযুক্ত সরকারের প্রায় প্রত্যেক নাটিকাতে এমন একটি চরিত্র থাকে, যে চরিত্র কারিতকর্মা নয়; সে শুধু কথাসরিৎশর্মা। এই যে চারিত্রিক বৈষম্য এর মূলে কারণ জানবার বা জানাবার আগ্রহ নাট্যকারের নেই। এমন কি পাঠকেরাও পরিহাস-রসে এমনভাবে আপ্লুত হয়ে পড়ে যে, তাঁরাও কোনোরকম প্রশ্ন করা অবান্তর মনে করেন। ললিতার পাঠাভ্যাসের বৈতনিক শিক্ষক জয়গোপাল পরাজিত হয় অবৈতনিক গানের শিক্ষক সৌমেনের কাছে। ললিতা সৌমেনকেই জয়মাল্য দান করে। তবু সৌমেনের লালিতাটা ফলের খোসার উপরিভাগের মতো ছাড়া আর কিছু নয়। তাই জয়গোপাল পরিহাসের পাত্র হলেও, সৌমেনের জন্যই 'জয়ঢাক' প্রহসনটি রসাত্মক হয়ে উঠেছে। এই নাটিকায় জয়গোপাল একটা ট্রাজেডি মাত্র। 'এলোমেলো', 'চন্দ্রচূড়' নকলনবীশ নাটিকাগুলির নামকরণের মধ্যেই ঘটনার ইঙ্গিত উপলব্ধি করা যায়।

নাটিকাগুলি অভিনীত হলে সহজ সাফল্য লাভ করবে, এ কথা অনায়াসে বলা যায়। ৬২১।৬০

উপন্যাস

পাথরের নারায়ণ। শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। কল্পলোক। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ।

উপন্যাসটির ভূমিকা-পৃষ্ঠায় লেখকের যৎসামান্য 'বক্তব্য' আছে। তিনি জানিয়েছেন, "...'ভবিতব্য' উপন্যাসখানি যথেষ্ট পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে এখন 'পাথরের নারায়ণ' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল।" উননব্বই পৃষ্ঠার এই বর্ধিতাকার 'পাথরের নারায়ণ' কি সত্যই উপন্যাসধর্মী? কবি কমল শিক্ষিতা বারাঙ্গনা নীতার কাছে যায়। দুজন দুজনকে ভালবাসে। কিন্তু কমল ঘটনাচক্রে নীতাকে ভুল বোঝে। নীতা সেই দুঃখে গৃহত্যাগ করে চলে যায় এবং সন্ন্যাসিনী হয়। পাথরের নারায়ণ—পুরুষ কমলের প্রেমের পরিবর্তে নীতা প্রেমাবতার নারায়ণকে লাভ করার পথে এগিয়ে যায়। লেখক এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, নীতা সাধারণ মহিলা কিংবা রমণী নয়, সে হচ্ছে অনন্যসাধারণ। এই মামুলী রসশূন্য গল্পটুকু জেনে আনন্দের পরিবর্তে অতৃপ্ত হয়েছি।

পাথরের নারায়ণের ওজন বৃদ্ধির জন্যই হয়তো গ্রন্থশেষে তিনটি গল্প জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ৫৯।৬১

ব্রহ্মপুত্রের পারে। কল্যাণী ঘোষ। বলাকা প্রকাশনী। ৫৩, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। দাম ৩·২৫ নঃ পঃ।

ময়মনসিংহ জেলার উত্তরাঞ্চলে ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী চৌলী সম্প্রদায়ের এক পরিবারের জীবন, একটি গ্রাম আর কিছু জেলেদের কেন্দ্র করিয়া এই উপন্যাস। ইহাদের কথোপকথন আঞ্চলিক ভাষাতেই রচিত। আদ্যোপান্ত পাঠে হিন্দু-মুসলমান ধর্মের সংমিশ্রণে গঠিত তেমন কোনো সমাজের মূল চেহারা নজরে আসে না, তৎসত্ত্বেও সরলতার কারণে এই গ্রন্থখানি পড়িতে ভালই লাগে। একটি নিটোল ভালবাসা সহজেই পাঠকমন স্পর্শ করে। শেষাবধি কয়েকটি চরিত্রও মনে দাগ কাটিতে সক্ষম; যেমন : জমিলা সুন্দরী পরী ও করুণা ডাক্তার। করুণা ডাক্তার ভিন্ন অন্য পুরুষ চরিত্র নারীচরিত্রের পাশাপাশি কিছু নিষ্প্রভ মনে হয়।

বর্তমান গ্রন্থের লেখিকা নূতন। তাঁহার প্রথম দিককার রচনা হিসাবে গ্রন্থটি আন্তরিক। কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহার আরো ব্যাপক গভীর জীবন অনুসন্ধানে ব্রতী হওয়া উচিত। প্রচ্ছদ মুদ্রণ বাঁধাই মামুলী। ১৩২।৬১

গোড়ার কবিতা—সুভাষ সরকার। মিত্রালয়, ১২, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলি-১২। সাড়ে পাঁচ টাকা।

'গোড়ার কবিতা' শিথিল বাঁধুনীর একটি উপন্যাস। গ্রন্থকারের উপস্থাপনা বা বক্তব্যে অভিনবত্ব বিশেষ নেই। রবীন্দ্র-নাথের 'শেষের কবিতা'র অনুসরণে 'গোড়ার কবিতা' রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়—তবে এই ধরনের রচনা প্রকাশ করবার পূর্বে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে লেখকের আর একটু সচেতন হওয়া প্রয়োজন ছিল। কাহিনীর মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে—সেগুলি সুপ্রযুক্ত। ৬০৮।৬০

ছোট গল্প

মধুপর্ণ : শ্রীতারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায় : আভেনির। ২৩৮বি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৯। দু' টাকা।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে প্রতিদিন এত বেশী বই প্রকাশিত হচ্ছে যে, একজন নতুন ছোটগল্প লেখকের পক্ষে পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা রীতিমতো কঠিন।

কিন্তু সুখের বিষয় মধুপর্ণের লেখক

তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের সুস্পষ্ট প্রভাব থাকলেও লেখক আধুনিক বাংলা গল্পের বহুমুখী শাখা-প্রশাখার বিস্তৃতি বিষয়ে সচেতন এবং সেই কারণেই তাঁর গল্পগুলি পাঠককে নিরাশ করে না। মোট পনেরোটি গল্পের মধ্যে "নোঙর" শ্রেষ্ঠ হলেও আরও কয়েকটি গল্পে লেখক প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে কাহিনী বিন্যাসের রীতিও তাঁর আয়ত্তে। জ্বালা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কিংবা আক্রমণ নয়, নরনারীর চরিত্র বিশ্লেষণে মাঝে মাঝে লেখকের মধুর সমাজবোধের পরিচয় পাওয়া যায় বলেই মনে হয় তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ। ৫৯৮।৬০

যমুনা বহে উজান—শ্রীরণজিৎ ভট্টাচার্য। ফ্রেন্ডস বুক ক্লাব—১৩৫-এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা—৭। মূল্য দুই টাকা।

বর্তমান গল্প-গ্রন্থখানি পূর্বে ভারতবর্ষ, এশিয়া, কথাবার্তা, জিগীষা প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত ১১টি গল্পের সংকলন। গল্পগুলির মধ্যে যমুনা বহে উজান, বোবা, মেম ও আবিষ্কার-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে আবিষ্কার গল্পটিতে আদর্শবাদের বাড়াবাড়ি একটু দৃষ্টিকটু। অন্যান্য গল্পগুলি চলনসই। গল্পের নায়ক-নায়িকার মনের গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার কৌশল লেখকের আয়ত্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সহজ এবং সরল ভাষায় রচিত লেখকের গল্পগুলি মোটের উপর সুখপাঠ্য হইয়াছে। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদপট মনোরম। ৬২৫।৬০

কবিতা

হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য—শক্তি চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থজগৎ। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ২.২৫ নঃ পঃ।

পরিচিত তরুণ কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ। পৃষ্ঠাসংখ্যা চৌষট্টি। তার মধ্যে বহু কবিতা যেন জোর করে ঠেসে দেওয়া হয়েছে, ফলে অবস্থা দাঁড়িয়েছে উদ্বাস্তু শিবিরের মত। প্রচ্ছদপটে কোন প্রসাধন নেই, একরাশ অন্ধকার সেখানে লেপা। কিন্তু কাব্যগ্রন্থটির বাইরের যদৃচ্ছতা আভ্যন্তরীণ ভাণ্ডারের সৌন্দর্যে পুষিয়ে যায়। নক্ত-আলোকে কবিতাগুলি আগাগোড়া পড়ার পর বুঝলাম সম্প্রতি অন্য কোন তরুণের কাব্যগ্রন্থে মনের ওপর এতখানি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়নি। কবির শক্তিতে চমৎকৃত হয়েছি। বহু উত্থান-পতনের পর আবার একজন তরুণ কবি বাংলা-কাব্যে যে নতুন সুর ও স্বাদ আমদানি করতে পারলেন এতে আশান্বিত না হয়ে উপায় নেই।

প্রথমেই বলি এই সাবালক কাব্যগ্রন্থটিতে সভ্যতার তথাকথিত পরিমার্জনা বিরল। বিকল্প প্রাচীন আদিমতায়, প্রকৃতির নিষ্পাপ অনাবৃত সৌন্দর্যে কবির নির্লজ্জ লোভ। নষ্ট-ভ্রষ্ট, কুশ্রী, বীভৎস এদেরই সৌন্দর্যের শিরোস্ত্রাণ পরাতে তিনি প্রয়াসী। শব্দ নির্বাচন, উপমা অলংকার এমন কি ছন্দ-তরঙ্গ সৃষ্টিতেও তিনি পূর্বপ্রচলন প্রায় সর্বত্রই লংঘন করেছেন। তাঁর কবিতা-গুলিতে ক্রমাগত শব্দের বিস্ফোরণ ঘটেছে। অনভ্যস্ত উপকরণের চিত্রকল্পে আমোদিত হয়েছি। জন্ম-মৃত্যু, প্রণয়-পরিকল্পনার রক্তাক্ত চেহারায় হৃদয় আলোড়িত হয়েছে। কিন্তু অন্যত্র কবির রীতিবিরুদ্ধ ইচ্ছার তাণ্ডবে, কবিত্বে দূষিত-চিন্তার দস্যুতায় প্রীত হইনি।

'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য'র কবির শক্তি অবিসংবাদিত। তবে শক্তিবাবু সৃষ্টির ক্ষেত্রে অন্যমনস্ক হবেন এ আশা করি না। ছন্দ সম্পর্কে কানে অনেক স্থলে আপত্তি আছে, সাধু ও চলতি ক্রিয়াপদের অমন অন্যান্য মিতালি কি প্রশ্রয়ের? ভ্রূণ অবস্থার কবিতা-ছত্রগুলিকে বাদ দিলে কি ভাল হতনা? এসব সত্ত্বেও এই দুঃসাহসী কাব্যগ্রন্থ কাব্যব্রতী প্রত্যেকের পাঠ করা উচিত। কিছুকাল পরে হৃদয়ে শিকড়সুদ্ধ আবার নাড়া পড়ল, রক্তে শুরু হল মধু-বিষের প্রতিক্রিয়া। কবিকে ধন্যবাদ। ১২৫।৬১

বিবিধ

শ্রীশ্রীস্বামী নির্মলানন্দ। শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্তী প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক ব্রহ্মময়ী ঔষধালয়, দশাশ্বমেধঘাট, বারাণসী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৶০ আনা।

গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত তাঁহার শ্রীগুরু-দেবের জীবনী। জীবনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত জীবনীর অনুধ্যান-সূত্রে আমরা মহৎ-জীবনের প্রজ্ঞানময় উদ্দীপ্তি অন্তরে অনুভব করি। জীবন-ব্যাপী দুষ্কর সাধনা, তাঁহার অনন্যসাধারণ ত্যাগ এবং বৈরাগ্য আমাদিগকে মহদাদর্শে অনুপ্রাণিত করে। এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ৩১৫।৬১

শ্রীম-দর্শন—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ। প্রকাশক —প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। দাম—পাঁচ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় বেদব্যাসের স্থানটি যিনি পূর্ণ করে তুলেছিলেন, "রামকৃষ্ণ-কথামৃত" রচয়িতা সেই "শ্রীম"র মুখ-নিঃসৃত অনেক কথা ও বাণী গ্রন্থকার এই পুস্তকে সযত্নে লিপিবদ্ধ করেছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম লীলাসঙ্গী ও মহাযোগী শ্রীম বা মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত এই কথামৃত-চয়ন ভক্তপ্রাণ পাঠকদের কাছে আধ্যাত্মিক প্রেরণার উৎস হিসাবে শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হবে। এই মূল্যবান পুস্তকের মাধ্যমে পাঠকরা এক পবিত্র সৎসঙ্গের আস্বাদ পাবেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর

দিব্যলীলার দেবগৃহ্য স্বরূপের আভাসও শ্রীমর কথামৃতে ফুটে উঠেছে। তাই বিশেষ করে রামকৃষ্ণ-ভক্তদের কাছে এই পুস্তকের আবেদন অনস্বীকার্য। ৩৩৫।৬০

স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ। প্রকাশক—উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩। দাম—চার টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম ত্যাগী শিষ্য ও অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দের এই জীবনীগ্রন্থ শুধুই তথ্যপূর্ণ নয়, ভক্তি-রসেও সমৃদ্ধ। স্বামী অখণ্ডানন্দের জন্ম ও বাল্যকাল, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সান্নিধানে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ, মানব-সেবায় উৎসর্গীকৃত তাঁর কর্মবহুল জীবনের বহু ঘটনা, স্বামীজী ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণের সংগে তাঁর মধুর অলোকিক প্রেম-সম্বন্ধ এবং তাঁর উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনের কথা ও কাহিনী লেখক এই পুস্তকে ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই জীবনীগ্রন্থ পাঠকদের কাছে নিঃসন্দেহে আদরণীয় হবে। ৪৮৯।৬০

ছবিতে পৃথিবী (প্রস্তর যুগ)। শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ—৩২-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

ছোট ছেলেমেয়েদের পাঠোপযোগী আলোচ্য পুস্তিকাখানি পৃথিবীর ক্রম-বিবর্তনের পথে প্রস্তর যুগের লোকেদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণে পূর্ণ। তৎকালীন লোকেদের এবং তাহাদের ব্যবহৃত প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র ও তৈজসপত্রাদির বহু চিত্র সহযোগে সহজ ও সরল ভাষায় রচিত পুস্তিকাখানি শিশুদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। লেখক ও চিত্রশিল্পী উভয়েই প্রশংসার যোগ্য। ১১০।৬০

The First Indian War of Independence 1857-1859—K. Marx & F. Engels. Distributors: National Book Agency (Private) Ltd., 12, Bankim Chatterjee St., Cal.-12. Price—Rs. 1.12 nP.

কিছুকাল আগে আমাদের দেশে সিপাহী বিদ্রোহ, বা মতান্তরে, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রামের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। ভারত বর্তমানে স্বাধীন এবং আন্ত-র্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের গৌরব ক্রমবর্ধমান। ভারত সম্পর্কে মার্কস্ ও এঙ্গেলসের ভবিষ্যদ্বাণী এখন অনেকাংশে সফল হয়েছে। যাই হোক, সিপাহী বিদ্রোহের মূল্যায়ন নিয়ে কিন্তু এখনও ভারতীয় ঐতিহাসিক-দের মধ্যে তীব্র মতদ্বৈধ আছে। এমন অবস্থায় সিপাহী বিদ্রোহের সমকালে নিউ ইয়র্ক ডেলী, ট্রিবিউন পত্রিকায় প্রকাশিত মার্কসের প্রবন্ধগুলি, যা বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে, নিশ্চয়ই ইতিহাসের ছাত্র-দের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য। (১২৬।৬০)

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ সংখ্যা

সৈকত। সম্পাদক : অরবিন্দ কর। শিলিগুড়ি। দাম—পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এই ছোট্ট পত্রিকাটিতে গুটি কয়েক মাত্র প্রবন্ধ এবং কবিতা থাকলেও রচনাগুলি মোটামুটি ভালো।

খেয়ালী। সম্পাদিকা : মীরা দেবী। ১৩১।১এ, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট; কলি-কাতা-৪। দাম—পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

"খেয়ালী"র এই সুমুদ্রিত সংখ্যাটির বৈশিষ্ট এই যে, একটি ব্যতীত এর সব কটি রচনাই প্রবন্ধ এবং প্রবন্ধগুলি অপাঠ্য নয় বরং কয়েকটি উল্লেখযোগ্য। নিজ যোগ্যতায় সংখ্যাটি সাহিত্য-রসিকদের সমাদর লাভ করবে আশা করা যায়।

যষ্টি-মধু (রবীন্দ্র রঙ্গ সংখ্যা)। সম্পাদক : কুমারেশ ঘোষ। ৪৫এ, গড়পার রোড; কলিকাতা ৯। দাম—এক টাকা।

আলোচ্য পত্রিকাটি রঙ্গরচনার পত্রিকা হিসাবে গত কয় বছরে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। এই সুসম্পাদিত সংখ্যাটি পূর্বার্জিত সেই খ্যাতিকে ম্লান তো করবেই না, উপরন্তু উজ্জ্বলতর করতে পারে—বিশেষ করে এর ব্যঙ্গচিত্রগুলি।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় দেশ পত্রিকায় ৯৩১ পৃষ্ঠায় ক্যালকাটা পাবলিশার্সের বিজ্ঞাপনে "আলোক লগ্ন" মিহির সেন এবং "নতুন স্বাদ" স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় পড়িতে হইবে।

প্রাপ্তিস্বীকার

শিল্পজিজ্ঞাসায় শিল্পদীপঙ্কর নন্দ-লাল—বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী।

মরুপথের নদী—সুধাকর।

একটি নির্জন তারা—সুনীলকুমার চট্টো-পাধ্যায়।

পশ্চিম দিগন্তে—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর।

এই ভুবনে—রঞ্জন বিশ্বাস।

স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি—বররুচি।

মৃত্যুহীন প্রাণ—বিমল মিত্র।

ফানুস ফাটাই—শিবরাম চক্রবর্তী।

দক্ষিণের বারান্দা—মোহনলাল গঙ্গো-পাধ্যায়।

মহাভারত—শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস।

সেই চেনা ছেলেটি—বাণী রায়।

সদাশিবের হৈ হৈ কাণ্ড—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত।

রবীন্দ্র রচনা কোষ (১ম খণ্ড ১ম পর্ব)—শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ও বাসুদেব মাইতি।

নবযুগের সাম্যবাদ সমন্বয়—শ্রীগোরাচাঁদ গিরি।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—শ্রীবলাই দেব শর্মা।

চাঁদের হাট—শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।

অনেক ক্ষতের চিহ্ন—রমাপ্রসাদ দে।

তোমাকে দিলাম—শ্রীনরেন্দ্র গুপ্ত।

গোরাচাঁদ—শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত।

বিচ্ছেদ—শ্রীসুধীন্দ্রকুমার দেব।

আমাদের পরিচয়—ডঃ সুধীরকুমার দাশ-গুপ্ত।

বিশ্বের আলো শ্রীরামকৃষ্ণ—উমাপদ মুখো-পাধ্যায়।

রবীন্দ্র-সমীক্ষা — অরুণকুমার মুখো-পাধ্যায়।

নারী ও সামাজিক অবিচার—মো. ক. গান্ধী। শ্রীউপেন্দ্রকুমার রায় অনূদিত।

কাঞ্চনমালা—শামসুদ্দীন আবুল কালাম।

রোবাইয়াৎ-ই-ওমরখৈয়াম — কান্তিচন্দ্র ঘোষ।

অনেক মানুষ একটি মন—রমেন দাস।

রবির আলো—রমেন দাস।

রাবীন্দ্রিকী—বীরানন্দ ঠাকুর।

দুলারীবাঈ—বারীন্দ্রনাথ দাশ।

রাগ-লক্ষণ গীত-মঞ্জরী—গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

আমার ছোট বোনটি—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বরাট সেনগুপ্ত।

একটি ছেলের কাহিনী—শ্রীনির্মলকুমার রায়।

হিন্দুর বউ—শ্রীচরণদাস ঘোষ।

কানামাছি—শৈলেশ দে।

চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র—ভবতোষ দত্ত।

স্বপ্ন—কালীপদ দে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—মণি গঙ্গোপাধ্যায়।

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

অন্তর্ঘাতী দ্বন্দ্ব

সিনেমা কর্মচারীদের নিম্নতম বেতন ধার্য করা নিয়ে মালিক পক্ষের সংগে কর্মী সংঘের যে সংঘর্ষ বেধেছে তা বর্তমানে গুরুতর আকার ধারণ করেছে। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপারটির সুষ্ঠু সমাধান সম্বন্ধে আমরা যে আশা পোষণ করেছিলুম তা সফল হয়নি। লেখার সময় পর্যন্ত অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে।

সরকার-নির্ধারিত নিম্নতম বেতন যাতে সিনেমা ব্যবসায়ের সকল স্তরে চালু হয় সেই উদ্দেশ্যে কর্মচারী সংঘের পক্ষ থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হুমকি দেওয়া হয়। কলকাতা ও বিভিন্ন শহরের কয়েকটি নির্দিষ্ট চিত্রগৃহের সামনে অনশনব্রতের মাধ্যমে সিনেমা কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয় গত ১৪ই জুলাই থেকে। তারপর কর্মচারী সংঘ গত রবিবার এক দিনের জন্যে সমস্ত সিনেমাগৃহে ধর্মঘট পালন করা হবে বলে ঘোষণা করেন। মালিকদের প্রতিষ্ঠান বি এম পি এ-র তরফ থেকে তখন প্রস্তাব করা হয় যে যে-সব চিত্রগৃহের সরকার-নির্ধারিত নিম্নতম বেতন দেবার সঙ্গতি আছে তারা তা দিতে পারে। অপারগ সিনেমাগুলি সম্বন্ধে সরকার পুনর্বিবেচনা করবেন— শ্রমমন্ত্রীর কাছ থেকে এই মর্মে মালিক-পক্ষ পূর্বাহ্ণেই আশ্বাস পেয়েছিলেন। বি এম পি এ দাবি করেন যে, সঙ্গতিশীল সিনেমাগুলি বর্ধিত হারে বেতন দিতে যখন স্বীকৃত হয়েছে তখন কর্মীদেরও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আন্দোলন প্রত্যাহার করতে হবে। কিন্তু তাঁরা তা করতে রাজী হন না। শুধু যে-সিনেমাগুলি সরকার-নির্দিষ্ট বেতনের হার মেনে নেবার প্রতিশ্রুতি দেয় তাদের ধর্মঘটের আওতার বাইরে রাখা হয়। ফলে গত রবিবার শহরের প্রায় অর্ধেক চিত্রগৃহ বন্ধ থাকে ধর্মঘটের জন্যে।

মালিকদের পক্ষ থেকে বি এম পি এ আগেই জানিয়েছিলেন যে, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রত্যাহৃত না হলে সিনেমাগৃহগুলি ও তাদের যন্ত্রপাতির নিরাপত্তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি চিত্রগৃহ বন্ধ রাখবার নির্দেশ দেওয়া হবে। দিলেনও তাই। ফলে গত সোমবার থেকে এ রাজ্যের চার শতাধিক সিনেমার দ্বার বন্ধ। এ ধরনের ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনও ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই।

এই অভূতপূর্ব ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির শেষ কোথায় তা অনুমান করা কঠিন। সিনেমা-শিল্পের এই সংকটমুহূর্তে পরস্পরের প্রতি দোষারোপে কোন ফল হবে বলে আমরা মনে করি না। আজ প্রয়োজন এমন এক দৃষ্টিভঙ্গীর যা ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে সিনেমা-শিল্পের বৃহত্তর স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করবে না। বাংলার চিত্রশিল্প এমনিতেই আজ কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। মালিক-কর্মচারীর এই অন্তর্ঘাতী বিরোধে
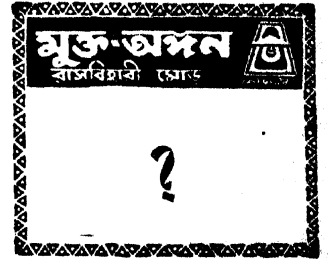
সিকিম সীমান্তের এক দুর্গম অঞ্চলের মনোরম পটভূমিতে চিত্ররূপ নিবেদিত "কাচের স্বর্গ"-এর একটি দৃশ্যে অনিল চট্টোপাধ্যায় ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রালয়ের "আজ কাল পরশুর" নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায়

গোবিন্দ বর্মণ প্রযোজিত 'ভিজে বেড়াল' চিত্রের একটি দৃশ্যে হাসির মজলিস বসিয়েছেন তুলসী চক্রবর্তী, শ্যাম শ্রীমানী ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত তাকেই না বলি হতে হয়। সে পরিণতি নিশ্চয়ই কারুর পক্ষেই সুখকর হবে না।

বিদ্যাসাগরের বাংলায়

রূপ-ভারতী ফিল্মস্-এর প্রথম চিত্রোপহার 'কাঞ্চন-মূল্য' বিগত যুগের পল্লী-বাংলার কয়েকজন সাধারণ নর-নারীর অশ্রু-হাসির কাহিনী দর্শকদের সামনে এনে উপস্থিত করেছে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের যে উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি তৈরী তার পটভূমি ঊনবিংশ শতকের বাংলার একটি সুদূর গ্রাম। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন তখনকার বাংলার গ্রামাঞ্চলেও আলোড়ন এনেছে। নতুন যুগের নবীনের দল বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সমর্থক, প্রাচীনেরা এই আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। নতুন ও পুরাতনের এই সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং তার বিধবা শ্যালিকা (স্ত্রীর অগ্রজা) ও তার বিবাহযোগ্যা কন্যার উপাখ্যান ছবিটির প্রধান আখ্যান-অবলম্বন।

উত্তমর্ণের সব উদারতার শর্ত যে তার অধম গাঁজাখোর পুত্রের সংগে নিজের কন্যার বিয়ে দেওয়া ব্রাহ্মণের তা জানা ছিল না। যখন জানলেন, তখন এই শর্ত মেনে নেওয়া ছাড়া তার কোন উপায়ান্তর রইল না।

কিন্তু এই বিয়ে পন্ড করলেন ব্রাহ্মণের বিধবা শ্যালিকা। গ্রামের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের পুরোধা এবং বিধবার পাণিগ্রহণে দৃঢ়চিত্ত যুবক জমিদারের সংগেই ভগিনী-কন্যার বিয়ে দিলেন তিনি।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁকে বিয়ে করবার জন্যই তাঁর শ্যালিকা গ্রামে এসে উপস্থিত হয়েছে—ব্রাহ্মণের আতঙ্ক নিয়ে ছবিতে একটি ছোট প্রহসন ছবির শেষার্ধে অনেকখানি জায়গা জুড়ে নিয়েছে। ব্রাহ্মণের বাড়ির ভৃত্য-বালককে নিয়েও ছবিতে অনেক ঘটনা গড়ে উঠেছে।

পরিচালক নির্মল মিত্র চিত্রকাহিনীর বিন্যাসে সামগ্রিকভাবে সংযম ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। ছবিটিকে উপভোগ্য করে তোলার জন্য পরিচালক কাহিনীর কৌতুক-উপকরণ এবং এক ব্রাহ্মণ-পরিবারের উপকাহিনীর দারিদ্র্য-সঞ্জাত অতিনাটকীয়তার আশ্রয়ই বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন। কৌতুক-উপাদানরাজির উপস্থাপনে পরিচালক এক বর্ষীয়সী বিধবার বিক্রম'কে কাজে লাগিয়েছেন। মহিলার দৈহিক স্থূলত্বও হাস্যরসের এক বিশেষ উপকরণ হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, এই উপকরণ খুবই স্থূল এবং মামুলী। এক গাঁজাখোর ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে ছবিতে যে কৌতুক-রস রয়েছে তা-ও পৌনঃপুনিকতার দোষে দুষ্ট।

ছবির প্রথমার্ধ বেশ স্বচ্ছন্দগতি ও কৌতুকপ্রদ। কিন্তু পরে ছবির গতি অনেকখানি মন্থর হয়ে আসে এবং অনেক দৃশ্যই নাট্যপ্রয়োজনরহিত ও রসবর্জিত হয়ে ওঠে।

বিধবা-বিবাহ আন্দোলন পল্লী-বাংলার সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে যে আলোড়ন এনেছিল তা নিয়ে ছবিতে চমকপ্রদ ও ভিন্নধর্মী ঘটনা ও পরিবেশ রচনার সুযোগটি পরিচালক পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেননি। বিধবা শ্যালিকার কৌতুক ও বিধবা-বিবাহে আতঙ্কগ্রস্ত বিপত্নীক ভগিনীপতির মানসিক দুরবস্থার প্রহসনটিতে পরিচালক আশানুরূপ কৌতুক-রস সিঞ্চন করতে পারেননি। ব্রাহ্মণের বাড়ির বালক-ভৃত্যকে চিত্রকাহিনীর নাট্যঘটনাস্রোতে প্রয়োজনের অতিরিক্তভাবেই অনেক দৃশ্যে উপস্থিত করা হয়েছে। অথচ ছবির প্রারম্ভে চরিত্রটিকে বৃদ্ধ বয়সে নাট্যকাহিনীর একজন নির্লিপ্ত সাক্ষীরূপেই দেখানো হয়েছে—যার অতীত স্মৃতি মন্থনের সূত্র ধরে ফ্ল্যাশ-ব্যাকে চিত্রকাহিনীর শুরু। ছবিতে বালক-ভৃত্য চরিত্রের নাট্য-প্রাধান্যের সংগে তার পরবর্তী জীবনের সাক্ষী-সুলভ নির্লিপ্ততা খুবই বেমানান লেগেছে।

পরিচালক ছবিতে পল্লী-পরিবেশ ও পটভূমি সুন্দর ও মনোরম দৃশ্যরাজির ভেতর দিয়ে রূপায়িত করে তুলেছেন। এই সব দৃশ্য ছবির দৃষ্টিবাহিত শিল্পসৌন্দর্য বাড়িয়েছে।

ছবির প্রধান চরিত্রের অভিনয়ে যাঁরা প্রশংসনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য রাজলক্ষ্মী, বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং শিশু-অভিনেতা গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজলক্ষ্মী বর্ষীয়সী বিধবার ভূমিকায় চরিত্রটিকে সুন্দরভাবে কৌতুকপ্রদ করে তুলেছেন এবং চরিত্রটির নাট্যমর্মটিও একাধিক দৃশ্যে

ডেভিড মেকার্লের 'হারানো প্রেম'-এর এই দৃশ্যটি তোলা হয় আগ্রা ফোর্টের অভ্যন্তরে। নায়িকার ভূমিকায় সুপ্রিয়া চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে

সংবেদনশীল অভিনয়ে দর্শকের মর্মে পেৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

এক গ্রাম্য মহাজনের চরিত্রের অভিসন্ধি ও চতুরতা বিকাশ রায় তাঁর স্বভাবসুলভ অভিনয়-নৈপুণ্যে অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অনিল চট্টোপাধ্যায় যুবক জমিদার চরিত্রের আদর্শবাদী 'রোমাণ্টিসিজম' ও সহৃদয়তা তাঁর অনবদ্য অভিনয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। বালক-ভৃত্য চরিত্রে গোতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্রতিভ ও সংবেদনশীল অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে।

ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্র এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের রূপসজ্জায় ছবি বিশ্বাসের অভিনয় মনোগ্রাহী। তাঁর কন্যার ভূমিকায় বাসবী নন্দীর অভিনয় সংযত, প্রাণধর্মী এবং সাবলীল। এক অকর্মণ্য গঞ্জিকাসেবীর সফল চরিত্রচিত্রণে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৌতুক-সঞ্চার দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়।

ব্রাহ্মণ-পত্নীর চরিত্রে অপর্ণা দেবীর মরমী অভিনয় দর্শকমনে রেখাপাত করে। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে অভিনয়-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন কমল মিত্র, অনুপকুমার, পারিজাত বসু ও গীতা দে।

ছবির সংগীত-পরিচালনায় নির্মলেন্দু চৌধুরীর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। ছবির 'টাইটেল'-সংগীত রচনায় শ্রীচৌধুরী রাগাশ্রয়ী ও লোকসংগীতের সুন্দর সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন—যা সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকের শ্রুতিকে আকৃষ্ট করে। সর্বাঙ্গীণভাবে ছবির আবহ-সুর রচনায় সংগীত - পরিচালক বিভিন্ন দৃশ্যের নাট্যভাবটিকে প্রকাশ করে তুলেছেন। তাঁর সুরারোপিত ছবির লোকসংগীত ও কথকতা চিত্তাকর্ষক। ছবির আবহ-সংগীতে বাহাদুর খাঁর স্বরোদ প্রাণসঞ্চার করেছে।

রামানন্দ সেনগুপ্তের সুষ্ঠু ও শিল্পশোভন চিত্রগ্রহণ ছবির এক বিশেষ সম্পদ। কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজে শব্দগ্রহণে মৃণাল গুহঠাকুরতা, সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও সুজিত সরকার এবং সম্পাদনায় অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ছবির শিল্পনির্দেশে সুনীল সরকার পল্লীপরিবেশের বাস্তব-চিত্রটি অদ্ভুত দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

নাট্যাভিনয়

থিয়েটার সেণ্টারের "অলীকবাবু"

থিয়েটার সেণ্টারে 'মুখোশ'-এর নতুন নাট্যানিবেদন 'অলীকবাবু' নাট্যামোদীদের কাছে বিরল আমোদের প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বিখ্যাত প্রহসনের পরিচালনা ও নাম-ভূমিকায় রয়ে-

মিনার্ভা থিয়েটারের বর্তমান আকর্ষণ "ফেরারী ফৌজ"-এর এই দৃশ্যে পুলিস ইন্সপেক্টরের রূপসজ্জায় হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ও একটি মুখ্য চরিত্রে নাট্যকার-পরিচালক উৎপল দত্তকে দেখা যাচ্ছে
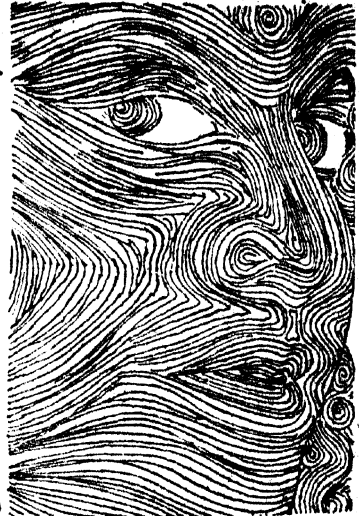
ছেন প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেতা তরুণ মিত্র। 'অলীকবাবু'-র গল্পাংশ নাট্যামোদী মাত্রেরই সুপরিচিত। এর মূলে হাস্যরস এক অকর্মণ্য উন্নাসিক যুবকের চালিয়াতি ও স্বতঃস্ফূর্ত মিথ্যাভাষণ এবং নভেল-পড়া এক প্রেমাহত নব্য যুবতীর অন্ধ প্রণয়াভিলাষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

অভিনয়ের গুণে প্রহসনটির এই কৌতুক-রস উচ্ছল হয়ে উঠেছে। এবং তার মূলে রয়েছে তরুণ মিত্রের সুচারু প্রয়োগ-নৈপুণ্য। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নাটকটির গতি কৌতূহলোদ্দীপক এবং স্বচ্ছন্দ। এই গতির বাঁকে বাঁকে এবং পরিণতির প্রান্তিকে প্রহসনটির রস সুন্দরভাবে দানা বেঁধে ওঠে এবং দর্শকদের উদ্দীপ্ত করে রাখে।

নাম-ভূমিকায় তরুণ মিত্র অনিন্দ্যসুন্দর অভিনয় নাটকটির প্রধান আকর্ষণ। চরিত্রটির স্বচ্ছন্দ মিথ্যাভাষণের অভ্যাস, মিথ্যা কথা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে চরিত্রটির অস্বস্তি এবং সর্বোপরি প্রাণোচ্ছলতা শ্রীমিত্র অপূর্ব অভিনয়-কুশলতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

গদাধরের ভূমিকায় পিকলু নিয়োগীর কৌতুকাভিনয় প্রেক্ষাগৃহে হাসির ঝড় বইয়ে দেয়। প্রসন্ন ঝিয়ের রূপসজ্জায় কৃষ্ণা রায়ের অভিনয় খুবই মনোগ্রাহী। নায়কের প্রণয়াভিলাষিণীর চরিত্রে রুবি মিত্র চরিত্রোচিত অভিনয় দর্শকের প্রশংসা অর্জন করে।

ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর সুরসৃষ্টি নাটকের মূলে সুর ও রসটি বাঙ্ময় করে তোলে।

নাটকের মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতও প্রশংসার দাবি রাখে।

অনুষ্ঠান সংবাদ

মঞ্চ ও চিত্রশিল্পীদের সমন্বয়ে গঠিত সুপ্রসিদ্ধ নাট্যসংস্থা শিল্পী-মৈত্রী-সংসদ আগামী ৪ঠা আগস্ট মহাজাতি সদনে রবীন্দ্রনাথের "গোরা" অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। কবিগুরুর মূল উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র। বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করবেন, তাঁদের মধ্যে আছেন নরেশ মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, মিহির ভট্টাচার্য, জীবেন বসু, দীপক মুখোপাধ্যায়, আশিসকুমার, জহর রায়, যমুনা সিংহ, কুন্তলা চট্টোপাধ্যায় ও সরযূবালা। মিহির ভট্টাচার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবে রবীন্দ্রনাথের "নষ্ট-নীড়" সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করে শিল্পী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান অভিনেতৃ সংঘ সুধীজনের সাধুবাদ পেয়েছেন। এবারে এঁরা "তপতী" অভিনয়ের আয়োজন করছেন। সেপ্টেম্বরের গোড়ায় এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান ভূমিকাগুলি রূপায়িত করবেন ছবি বিশ্বাস, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী ও বাসবী নন্দী। সংঘের সভাপতি সুশীল মজুমদার ও প্রধান কর্মসচিব ছবি বিশ্বাস এই নাটকাভিনয়ের তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করবেন।

রবীন্দ্রনাথের "বৈকুণ্ঠের খাতা" অভিনয় করে সম্প্রতি দুটি সংস্থা কবিগুরুর জন্ম-শতবার্ষিকী পালন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ শাখার "বিশেষ পুলিস সংস্থা"র কর্মিবৃন্দ রবীন্দ্র-ভারতী ভবনে গত ৮ই জুলাই "বৈকুণ্ঠের খাতা" বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করেন। শিল্পীদের সমষ্টিগত অভিনয়-সৌকর্য সকলকে আনন্দ দান করে। এই অনুষ্ঠানে সুবাস মিত্র ও তৃপ্তি মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিশেষ উপভোগ্য হয়।

পূর্ব রেলওয়ের সি এম ও অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব গত ৭ই জুলাই কবি-গুরুর ঐ কৌতুক-নাটিকাটাই নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটে মঞ্চস্থ করেন। তিনকড়ি ও বিপিনের ভূমিকায় যথাক্রমে সন্তোষকুমার রায় ও পিনাকী চক্রবর্তী উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

গত ২৮শে জুন কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের কর্মিবৃন্দ বিশ্ব-রূপায় "চিরকুমার সভা" অভিনয়ের মাধ্যমে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। প্রদ্যোৎকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রসিক ও প্রতিমা পালের নীরবালা দর্শকদের প্রচুর প্রশংসা লাভ করে।

গত ১৪ই জুলাই শিল্পীনাট্যম রবীন্দ্র-নাথের "দেনা-পাওনা" গল্পটি নাট্যাকারে মিনার্ভা থিয়েটারে পরিবেশন করেন। নাট্যরূপ দেন অধীর আচার্য।

থিয়েটার সেণ্টার আয়োজিত ড্রামা ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সংগীত নাটক আকাদামীর অন্যতমা নেত্রী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়

অভিনয় শিক্ষার ব্যবস্থা

কিছুদিন আগে পর্যন্ত এ-দেশে অভিনয়-শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে নাট্যশালার সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে দেশের কর্তৃপক্ষস্থানীয়েরা যেমন সচেতন হয়েছেন, জনসাধারণের নাট্য-প্রীতিও তেমনি বেড়েছে অভূতপূর্বভাবে। এই দ্বিবিধ উৎসাহের ফলে নাট্যশালার নানা বিভাগে শিক্ষাদানেরও কিছু-কিছু ব্যবস্থা হয়েছে প্রায় প্রতিটি রাজ্যে। এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছে বিভিন্ন রাজ্যের সংগীত-নৃত্য-নাটক আকাদামিগুলি।

পশ্চিম বাংলায় রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠিত আকাদামি ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। তা ছাড়া কয়েকটি নামকরা নাট্য-প্রতিষ্ঠানও শিক্ষাদান ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছে। থিয়েটার সেণ্টার প্রবর্তিত তিন মাসের ড্রামা কোর্স এই প্রচেষ্টারই অন্তর্ভুক্ত।

গত এপ্রিল মাসে এই কোর্স অনুযায়ী শিক্ষাদান শুরু হয়। তিন মাসের মধ্যে যাতে শিক্ষার্থীরা প্রযোজনা, অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, আলোকসম্পাত ও নাট্য-ইতিহাস সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠক্রম রচনা করা হয়। যাঁরা শিক্ষাদান করেন, তাঁদের সকলেই নিজের নিজের বিভাগে প্রখ্যাত। অধ্যাপকমণ্ডলীতে ছিলেন রণেন রায় (অধ্যক্ষ), তরুণ রায়, তাপস সেন, খালেদ চৌধুরী, গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, রাধা বসু ও অশোক সেন।

তিন মাসের কোর্সে ৫৭ জন ছাত্রছাত্রী যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ২৯ জন। গত ৩রা জুলাই থিয়েটার সেণ্টারে অনুষ্ঠিত একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী-দের অভিজ্ঞানপত্র দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কেন্দ্রীয় সংগীত-নৃত্য-নাটক আকাদামির সহ-সভাপতি ও ভারতীয় নাট্যসংঘের অন্যতমা নেত্রী শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, থিয়েটার সেণ্টারের নাট্য বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামাতে প্রবেশাধিকার পাবেন। তিনি আরও জানান যে, ইউনেস্কোর নাটক সংক্রান্ত স্কলারশিপ-এর জন্যে আবেদন করতে হলে থিয়েটার সেণ্টারের এই সার্টিফিকেট কাজে লাগবে।

অধ্যক্ষ রণেন রায় থিয়েটার সেণ্টার প্রবর্তিত প্রথম ত্রৈমাসিক পাঠক্রমের একটি বিবরণ সভায় পেশ করেন। সম্পাদক বি এম সিংহী জানান যে, নাট্য বিদ্যালয়ের

অনুপম চিত্রের আগামী আকর্ষণ "প্যার কি পিয়াস"-এর একটি দৃশ্যে জননী-রোশনী মিশ্র

রূপদীপা চিত্রমন্দিরের "কালচক্র" চিত্রের একটি দৃশ্যে আশীষকুমার ও তপতী ঘোষ। ছবিটি বর্তমানে গঠনপথে

এইটিই প্রথম সোপান। পরে বিভিন্ন ধরনের ছোট-বড় কোর্স চালু করবার পরিকল্পনা থিয়েটার সেণ্টারের আছে।

আগামী অক্টোবরে আবার একটি ত্রৈমাসিক কোর্স আরম্ভ হবে বলে জানা যায়।

অভিনব প্রচার প্রতিযোগিতা

একটি নতুন তামিল ছবির জনপ্রিয়তা বাড়াবার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজের এ ভি এম স্টুডিওজ্ সম্প্রতি একটি প্রতিযোগিতা ঘোষণা করেন। ছবির আটখানি গান গুণানুক্রমে সাজাবার প্রতিযোগিতা। বিচারকমণ্ডলীর তালিকার সঙ্গে যাঁর তালিকা মিলবে তাঁরই হবে জয়। প্রথম পুরস্কার চার হাজার টাকা। যাঁদের তালিকা পুরোপুরি মিলবে না তাঁদের জন্যেও তিন হাজার টাকা কনসোলেশন প্রাইজের ব্যবস্থা।

প্রতিযোগিতার ফলাফল অনুমান করতে পারেন কি? প্রতিযোগীদের প্রেরিত তালিকার সংখ্যা চার লক্ষেরও ওপর। এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার খামের মধ্যে এই বিরাট সংখ্যক তালিকা এ ভি এম স্টুডিওতে আসে। ভানুমতী নামে এক মহিলা একাই পাঠান ১৬,৩০০ তালিকা। পাঁচটি মোটা খাতার পাতায় ঠাসা তালিকার গন্ধমাদন! তিনি এই বিরাট বহরের তালিকা পাঠাতে সাড়ে দশ টাকার ডাক-টিকিট ব্যবহার করেন। তিনি অবশ্য প্রতি-যোগিতায় জিতেছেন। কিন্তু কত টাকা পেয়েছেন জানেন কি? মাত্র দু' টাকা। কারণ বিচারকমণ্ডলীর তালিকার সঙ্গে প্রতিযোগীদের পাঠানো দু' হাজার তালিকা মিলে গেছে। সুতরাং বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়লেও মোট প্রাপ্তির পরিমাণ দু' টাকা!

কনসোলেশন প্রাইজ বিজেতাদেরও অনুরূপ অবস্থা। তাঁদের ভাগ্যে পুরো-পুরি দুই টঙ্কাও জোটেনি। তাঁরা প্রত্যেকে পেয়েছেন দেড় টাকা।

এই প্রতিযোগিতার ফলে সত্যিই যদি কেউ লাভবান হয়ে থাকে তো ভারত সরকারের ডাক বিভাগ। কারণ শুধু এই বাবদে তিরিশ হাজার টাকার ডাকটিকিট বিক্রি হয়েছে।

অবশ্য ছবির মালিকদের লাভও কম নয়। প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করতে কত লোক যে ছবিটি দেখেছে—এবং হয়তো বার বার—তা সহজেই অনুমান করা যায়।

চিঠিপত্র

জার্মানীতে "অনুরাধা"

মহাশয়,

গত ২রা বৈশাখ ১৩৬৮ সনের "দেশ" পত্রিকায় রঙ্গজগৎ বিভাগে "অনুরাধা" চিত্রটির রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা পড়লাম। চিত্রটি এ বৎসর বার্লিনের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়।

এখানকার সুবিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র "ডী ভেল্ট" (Die Welt) এ সম্বন্ধে যে সমালোচনা প্রকাশ করে তার হুবহু অনুবাদ আপনাদের জ্ঞাতার্থে পাঠাচ্ছি :

"অনুরাধার প্রেম (Love of Anuradha) চিত্রটি সম্বন্ধে দর্শকদের দু জায়গায় মনে হয় একটা পরমাশ্চর্য কিছু ঘটবে—প্রথমে যখন পরিচালক শ্রীমুখার্জি একটি ছোট্ট গ্রামের নিদারুণ দারিদ্র্য মর্মস্পর্শী বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত করতে শুরু করেন, এবং দ্বিতীয়বারে যখন চিত্রের পারম্পর্য হঠাৎ সংগীতের দোদুল ছন্দে দোলায়িত হতে থাকে। কিন্তু দর্শকদের আশা পূর্ণ হয় না। কারণ সব কিছুই চিরাচরিত গতানুগতিকতার মধ্যে হারিয়ে যায়। একটি ভারতীয় সাময়িক পত্রিকার কাহিনীকে অত্যন্ত বিবর্ণভাবে চিত্রিত করা হয়েছে এর মধ্যে।...ছবিটি দেখে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়, ভারতীয় চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কিছুই না।"

অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে বিদেশের সমালোচকরা যে ছবিটি সম্বন্ধে এ ধরনের মন্তব্য করেছেন সেইটিই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র। ইতি—

সবিতা রায়,
হামবুর্গ, পশ্চিম জার্মানী।

ঝিন্দের বন্দী

মহাশয়,

তপন সিংহ পরিচালিত 'ঝিন্দের বন্দী' দেখিলাম। বাংলা দেশের মাটিতে যে অ্যাডভেঞ্চার সম্ভব নহে তাহা এই ছবিটি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল। তবুও পরিচালক যখন সুটিং-এর জন্য সুদূর রাজপুতনায় ছুটিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে কিছুটা আশাও হইয়াছিল যে এই দেশেই প্রথম একটি দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারাস ছবি নির্মিত হইবে।

আমার চিত্রনাট্য, সম্পর্কে কিছু বক্তব্য আছে। নাট্যাংশের শেষে ছবিটিকে একটি সাধারণ বিয়োগান্ত কাহিনীতে পরিণত করিয়া চিত্রনাট্যকার কী সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছেন তাহা সম্যক উপলব্ধি হয় না। বাংলা দেশের ছবিতে সাধারণ বিয়োগান্ত

কাহিনীর অভাব নাই, কিন্তু চিত্রনাট্যকার এই ছবিটিকে ট্র্যাজেডিতে পরিণত করিতে যাইয়া যেভাবে উহার রস নষ্ট করিয়াছেন তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন। একটি মদ্যপ, অকর্মণ্য রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া তিনি কি সার্থকতা লাভ করিয়াছেন? রুদ্ররূপের চরিত্রটিকে এভাবে বিকৃত করারও কোন অর্থ হয় না। সংযত, দৃঢ়চেতা রুদ্ররূপের পরিবর্তে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এক চপলমতি যুবকের।

এই ধরনের ছবি করিতে যাইয়া পরিচালক ছবিটিতে রোমাঞ্চ কিংবা বীররসের প্রতি এত কৃপণতা প্রকাশ করিলেন কেন? ইতি—

নির্মলেন্দু পাহাড়ী
কলিকাতা—৯।

"মধ্যরাতের তারা" সম্বন্ধে

মহাশয়,

'মধ্যরাতের তারা' চিত্রটি দেখলাম। ছবির নায়কের চরিত্র অংকনে একটি অসংগতি লক্ষ্য করলাম যেটি ঠিক সহজভাবে মেনে নিতে পারলাম না। ছায়াছবিতে নায়ক-নায়িকার প্রেম যে কোনো সূত্রেই হতে পারে, অবশ্য বাস্তবের সংগে সম্পর্ক রেখে। এ ক্ষেত্রেও সে রকম কোন সূত্রে অমু সুতপাকে এবং পরে সুতপা অমুকে ভালবেসেছে। প্রণয়ই চিত্রটির মূল কেন্দ্রবিন্দু। অন্য কথায়, প্রেম থেকে নিবিড়তম হৃদ্যতা এবং তা থেকে অপূর্ব জীবনরসের সৃষ্টি হওয়ার চিরন্তন সত্যটি এই চিত্রে প্রকাশ পেতে চেয়েছে। কিন্তু নায়ক-চরিত্রের একটি আপাতবৈষম্য সেই প্রেমকেই পংগু করতে সহায়তা করেছে। সুতপার অসহায়তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার প্রতি অমুর সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠার এবং তারই মধ্যে তাকে প্রেম নিবেদন করার হয়তো সংগত কারণ আছে। কিন্তু এই সহৃদয় নায়ককে দিয়ে সেই অসহায়তারই সুযোগ গ্রহণ করিয়ে সুতপার প্রতি তার যে পাশবিক আচরণ বিশ্লেষিত হয়েছে, তার যৌক্তিকতা খুঁজতে গেলে নিঃসন্দেহে প্রেমের মহান গুণকে অস্বীকার করতে হয়। ইতি—

গৌরাঙ্গলাল কুণ্ডু,
কলিকাতা-১৪।

জোয়ালা প্রোডাকসন্সের রবীন্দ্র-কাহিনী অবলম্বনে গঠিত "সন্ধ্যারাগ"-এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় নির্মলকুমার

রবীন্দ্রজীবনী

মহাশয়,

শ্রীযুত সত্যজিৎ রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' সম্বন্ধে শ্রীশৈলেন সেনের যে চিঠিটি গত ৯ই আষাঢ়ের দেশে প্রকাশিত হয়েছে তার বক্তব্যের সংগে আমরা সম্পূর্ণ একমত। তবে আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথের জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণ বোধ হয় ছবিটিতে দেখানো হয়েছে; 'বোধ হয়' বলছি, কারণ commentaryর অভাবে বোঝা দুষ্কর, কোথাকার ছবি দেখানো হচ্ছে—আমেরিকার, ফ্রান্সের, না জার্মানীর। এটা নিশ্চয়ই পরিচালনগত ত্রুটি।

শৈলেনবাবু ছবিটিকে বলেছেন অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন। আমাদের মতে ছবিটি একদেশদর্শিতা দোষেও দুষ্ট।

ছবিটিতে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে যেন গত মহাযুদ্ধে অক্ষশক্তির, বিশেষ করে হিটলারের সর্বগ্রাসী লোভ ও অমানুষিকতাই কবিকে প্ররোচিত করেছিল 'সভ্যতার সংকট' লিখতে। অথচ প্রবন্ধটি পাঠ করলেই জানা যায়, সাধারণভাবে পশ্চিমের সভ্যতাগর্বী রাষ্ট্রগুলি বিশেষত ইংরেজ সম্বন্ধে মোহভংগ ও বীতশ্রদ্ধ হয়েই কবি 'সভ্যতার সংকট' সম্পর্কে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ করে সত্যজিৎবাবু তাঁর এই হিটলার তথা অক্ষশক্তি-বিদ্বেষ এভাবে প্রচার না করলেই পারতেন। তাতে অন্তত ইতিহাস অবিকৃত থাকতো এবং ছবিটি ডকুমেন্টারীর ধর্ম থেকে বিচ্যুত হত না।

আমাদের আরও মনে হয়, দেশনায়ক সুভাষচন্দ্রকে অমন দায়সারাভাবে (cavalier manner) দেখবার পেছনেও সত্যজিৎবাবুর এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীটিই কাজ করেছে। তা না হলে অরোরা ফিল্মসের কাছে আরও অনেক ভাল ছবি থাকা সত্ত্বেও তিনি দেখে শুনে এই অংশটুকু বেছে নিলেন কেন? এতে তাঁর অভীষ্ট কতদূর সিদ্ধ হয়েছে জানি না, তবে আমরা যারা রবীন্দ্রভক্ত এবং সত্যজিৎ-অনুরাগীও বটে, তারা দুঃখ পেয়েছি। এমন সম্ভাবনাময় একটি সৃষ্টি যে সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি তার অন্যতম কারণ পরিচালক তাঁর বিস্ময়কর প্রতিভা সত্ত্বেও একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণে আবদ্ধ হয়ে রইলেন বলে। ইতি—

রেবা রায় ও মঞ্জু রায়, কলিকাতা-২৬।

একলব্য

'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী'! রামচন্দ্রের উদ্দেশে বলেছিলেন দশানন। কলকাতার প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগে ১৫টি টীমের বদলে ২০টি টীম করার প্রস্তাবকে বার বার আসতে দেখে এখানকার ফুটবল ক্রীড়ামোদীরাও দশাননের মত বলতে আরম্ভ করেছেন। বার বার কেন? বছর বছর এবং বার বার বলাই ভাল। প্রস্তাবটি বহুকালের। এ বছরও ফুটবল মরসুম আরম্ভের আগে একই প্রস্তাব আই এফ এ'র পরিচালকমণ্ডলীর সভায় পেশ করা হয়েছিল। সদস্যদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হওয়ায় পাস হয়নি। মরসুমের মাঝ-পথে আবারও প্রস্তাব উঠেছে। এবং এ প্রস্তাব আলোচনার তারিখ ২৮শে জুলাই। অবস্থা যা দেখছি, তাতে প্রস্তাবটি এবার পাস হলেও হতে পারে। কারণ কলকাতার এবং ভারতীয় ফুটবলের যিনি হর্তাকর্তা ভাগ্যবিধাতা, সেই এম দত্ত-রায় স্বয়ং প্রস্তাবের সমর্থক। তার কারণও আছে।

কে না জানে, স্পোর্টিং ইউনিয়ন এম দত্ত-রায়ের নিজের ক্লাব। তিনি নিজে ক্লাবের কার্যকরী সমিতির সদস্য, মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেসের চার আনার সদস্যের মত। এম দত্ত-রায়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর জে দত্ত-রায় স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক। যেহেতু 'প্রোমোশন ও রেলিগেশনে'র প্রশ্নে স্পোর্টিং ইউনিয়ন দ্বিতীয় ডিভিসনে অবতরণের সম্মুখীন, সেহেতু প্রথম ডিভিসনে টীম বাড়ানোরও প্রয়োজন। অতীতে একই কারণে প্রথম ডিভিসনে টীম বেড়েছে। সেবার তিনটি ক্লাব—জর্জ টেলিগ্রাফ, স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও উয়াড়ী লীগ কোঠার সর্বনিম্নে সমান পয়েণ্ট অধিকার করায় কে দ্বিতীয় ডিভিসনে নামবে, তার মীমাংসার জন্য তিনটি ক্লাবের মধ্যে লীগ প্রথার খেলার আয়োজন করা হয়। কিন্তু স্পোর্টিং ইউনিয়নের অবতরণের আশংকা থাকায় একটি খেলার পর আর কোন খেলার ব্যবস্থা করা হয় না। ফলে তিনটি ক্লাবই প্রথম ডিভিসনে টিঁকে থাকে। দ্বিতীয় ডিভিসনের চ্যাম্পিয়ন টীমের প্রমোশনে প্রথম ডিভিসনে একটি ক্লাব বেড়ে যায়।

এবার একটি নয়। স্পোর্টিং ইউনিয়নকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে আই এফ এ'র সম্পাদক শ্রী এম দত্ত-রায় সাঙ্গোপাঙ্গদের আরও পাঁচটি ক্লাবকে প্রথম ডিভিসনে আনবার জন্য আদাজল খেয়ে নেমেছেন। প্রস্তাব আছে, প্রথম ডিভিসনের কুড়িটি ক্লাবকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে লীগ খেলা পরিচালনা করা হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডিভিসনে ১৬টি করে টীমের বদলে ২৪টি করে টীম হবে। চতুর্থ ডিভিসনের হবে বিলোপ সাধন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ডিভিসনেও থাকবে দুটি গ্রুপের ব্যবস্থা। এতে নাকি খেলার সংখ্যা কমে যাবে। খেলোয়াড়রা বেশী খেলার হাত থেকে রেহাই পাবে।

অস্বীকার করি না। কিন্তু বেশী খেলার হাত থেকে খেলোয়াড়দের রেহাই দিতে হলে দল বাড়াতে হবে কেন? বর্তমান অবস্থায় দুটি করে গ্রুপ করলে তো খেলার সংখ্যা আরও কমে যায়! তা না করে খেলোয়াড়-দরদী হয়ে এঁরা দল বাড়াতে চাইছেন কেন? যে ক্ষেত্রে খেলার উন্নতির জন্য প্রথম ডিভিসন থেকে ক্লাবের সংখ্যা কমানো একান্ত প্রয়োজন, সে ক্ষেত্রে ক্লাবের সংখ্যা বাড়ানোর অর্থ, নিজেদের স্বার্থ। এই স্বার্থের পেছনেই এখন আই এফ এ সম্পাদকের কর্মতৎপরতা।

স্পোর্টিং ইউনিয়নকে অবতরণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আই এফ এ সম্পাদকের অন্য চেষ্টারও ত্রুটি নেই। দ্বিতীয় ডিভিসনে অবতরণের সমস্যার জড়িত অন্যান্য ক্লাব যেখানে ২০টি কি ২১টি গেম খেলেছে, সেখানে স্পোর্টিং ইউনিয়ন খেলেছে মাত্র ১৬টি গেম। হয়তো উদ্দেশ্যঃ অন্য ক্লাব কত পয়েণ্ট সংগ্রহ করে দেখে নিয়ে পরে পয়েণ্টের জন্য 'ভিক্ষাপাত্র' হাতে ক্লাবে ক্লাবে ধরনা দেওয়া। আই এফ এ সম্পাদকই খেলার তালিকা রচনা করে থাকেন। সুতরাং তাঁর ক্লাব যদি অন্যান্য ক্লাবের চেয়ে কম ম্যাচ খেলে, তবে এ ধারণা অমূলক নয়।

[illegible] উপর স্পোর্টিং ইউনিয়নকে

কলকাতার ফুটবল লীগে মহমেডান স্পোর্টিং ও ইস্টার্ন রেলের খেলায় রেল গোল-

বাঁচাবার জন্য সব রকমের চেষ্টা হচ্ছে। ফুটবল ক্ষেত্রে এম দত্ত-রায়ের যে প্রতিপত্তি, তাতে বাঁচবে বলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তবে আর যেভাবেই বাঁচুক, প্রথম ডিভিসনে যেন দলের সংখ্যা বাড়ানো না হয়, সদস্যদের কাছে এই আবেদন।

অবশ্য রাবণের মৃত্যুবাণের মত এই প্রস্তাবের মৃত্যুবাণও রয়েছে মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল—দুই প্রধান ক্লাবের হাতে। এ দুটি ক্লাব রাজী হয়নি বলেই এতদিন প্রথম ডিভিসনে দল বাড়াবার প্রস্তাব পাস হয়নি। এ'দের অমতে তো আই এফ এ কিছু করতে পারে না। কারণ এ'রাই যে আই এফ এ'র কামধেনু। ২৮শে জুলাই প্রস্তাব পাস হলেও প্রস্তাবের মৃত্যুবাণ থাকবে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের হাতে। এ'দের মতামতের উপরই নির্ভর করবে ফুটবলের 'রাবণে'র মরা-বাঁচার প্রশ্ন।

* * *

খেলার সময় চোট-লাগা খেলোয়াড় পরিবর্তন সম্পর্কীয় ফুটবলের নতুন আইন এখন এক প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

আইনের উদ্দেশ্য ছিল, খেলার প্রথম ভাগে কোন খেলোয়াড় চোট খেলে সেই খেলোয়াড়ের দল যাতে একজন খেলোয়াড় কম নিয়ে খেলে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। তাই আইন করা হয়েছিল, প্রথমার্ধে যদি কোন খেলোয়াড় আহত হন এবং রেফারীর মতে তার আঘাত গুরুতর হয়, তবে সে ক্ষেত্রে আহত খেলোয়াড়ের বদলে অন্য খেলোয়াড় মাঠে নামতে পারবেন। আর গোলরক্ষক গুরুতর আঘাত পেলে যে-কোন সময়েই তার জায়গায় বদলী গোলরক্ষক নেওয়া যাবে।

কিন্তু যেহেতু সমস্ত রেফারী ডাক্তার নন, সেহেতু খেলোয়াড়ের আঘাত গুরু কি লঘু তা বোঝবারও তাঁরা অধিকারী নন, সেহেতু আন্তর্জাতিক রেফারী বোর্ড তাঁদের আইন সংস্কার করে প্রথমার্ধে একজন বদলী খেলোয়াড় গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। এতে যদি কোন খেলোয়াড় আঘাত না পেয়েও বলেন, তিনি আর খেলতে অসমর্থ, তা হলে বিশ্রাম সময়ের মধ্যে তার জায়গায় বদলী খেলোয়াড় হিসাবে আর একজন খেলোয়াড়কে নেওয়া চলবে।

এই আইন সংস্কারের পর খেলোয়াড়রা তার পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছেন। এমনও দেখা গেছে—বিশ্রামের অব্যবহিত পূর্বে বিনা কারণে একজন দল থেকে বিশ্রাম নিয়েছেন, তার জায়গায় এসেছেন আর একজন নতুন খেলোয়াড়। যদিও প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলই আইনের সুযোগ গ্রহণের অধিকারী, তবুও এভাবে খেলোয়াড় পরিবর্তনের অর্থ—পরিশ্রান্ত খেলোয়াড়ের জায়গায় একজন নতুন খেলোয়াড়ের খেলার সুযোগ করে দেওয়া। কিন্তু আইন রচনার সময় আইন রচয়িতাদের এ উদ্দেশ্য ছিল না। খেলোয়াড় পরিবর্তনের বর্তমান আইন এখন এক প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

মোহনবাগান ও এরিয়ানের লীগের খেলায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়ের পা চালাবার দৃশ্য ফটো—দেশ

* * *

স্টকহোমে আন্তর্জাতিক লন টেনিস ফেডারেশনের সভায় পৃথিবীর নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রতিযোগিতাকে পরীক্ষামূলকভাবে পেশাদার খেলোয়াড়দের জন্য উন্মুক্ত করবার নীতি স্বীকৃত হয়েছে। তবে এ বিষয়ের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো আগামীবার ফেডারেশনের সভায় চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবে। তার আগে নয়। এর অর্থ ১৯৬৩ সালের আগে অ্যামেচার ও প্রোফেশনাল টেনিস খেলোয়াড়দের একত্রে খেলার কোন সুযোগ নেই।

টেনিস খেলায় তিনটি অগ্রণী দেশ গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ব্রিটেন ও আমেরিকা 'মিশ্র' টেনিসের সপক্ষে ভোট দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া গতবার এই প্রস্তাবের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু এবার ভোট দিয়েছে বিপক্ষে।

যাই হোক, অ্যামেচার ও প্রোফেশনাল টেনিস খেলোয়াড়দের একত্রে খেলার প্রশ্ন বহুদিন থেকে জিইয়ে আছে। অ্যামেচার খেলোয়াড়রা বিপুল অর্থের প্রয়োজনে একে একে পেশাদারবৃত্তি অবলম্বন করায় অ্যামে-

চার টেনিসের আকর্ষণও বিশেষভাবে কমে গেছে। তারপর বহু দিন থেকে দুই রকমের খেলোয়াড়দের মিশ্র প্রতিযোগিতার আয়োজনের সংবাদ অ্যামেচার টেনিস সম্পর্কে টেনিস ক্রীড়ামোদীদের আরও উম্নাসিক করে তুলেছে। এই অবস্থায় অ্যামেচার ও প্রোফেশনাল খেলোয়াড়দের আর পৃথক করে রাখার অর্থ হয় না। আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশন যখন নীতিগতভাবে মিশ্র প্রতিযোগিতা মেনেই নিলেন তবে এ বছর বা আগামী বছর থেকে মানলেন না কেন? একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এভাবে ঝুলিয়ে রাখার উদ্দেশ্য কি?

অ্যামেচার টেনিসের কর্মকর্তাদের ভাবসাব অনেকের কাছেই রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে। এদের গড়িমসিতে প্রোফেশনাল টেনিসের প্রবর্তক জ্যাক ক্রামারও বেশ চটে গেছেন বলে মনে হয়। তিনি এখন বলতে আরম্ভ করেছেন অ্যামেচার প্রতিযোগিতার মূল্য কি? ওখানে খেলার জন্য আমাদের মোটেই গরজ নেই।

বিশ্ব টেনিসের পীঠভূমি উইম্বলডনের কর্মকর্তারাও ব্যাপারটি ভাল চোখে দেখেন নি। তাঁরা ১৯৬২ সালেই উইম্বলডনে মিশ্র প্রতিযোগিতার আসর বসাতে আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে। দেখা যাক কি হয়।

—মুকুল—

'পদ্মশ্রী—' আরতি সাহা (গুপ্ত)

আরতি সাহা। নামটি কারোরেই অজানা নয়। প্রথমে বাংলায়, পরে ভারতে, এখন সারা এশিয়ার সাঁতারে অদ্বিতীয়া আরতি সাহা। শুধু এশিয়ায় কেন? আরতির সাঁতারের সুনাম সাগর-পারেও সুবিস্তৃত। ঘর-কুনো বাঙালীর বীর মেয়ে আরতি। ভয়াবহ এবং দুরধিগম্য ইংলিশ চ্যানেল বিজয়িনী আরতি আমাদের গর্বের পাত্রী। তাই বাংলার ঘরে-ঘরে আজ দুরন্ত মেয়ের দুর্জয় অভিযানের জয়গান।

ঐকান্তিক আগ্রহ, অটুট মনোবল এবং দুর্জয় সংকল্প থাকলে একটি সাধারণ ঘরের বাঙালী মেয়ের পক্ষে খেলাধুলোর ক্ষেত্রে কতখানি সাফল্য, কতটা প্রতিষ্ঠা এবং কি পরিমাণ সম্মান লাভ করা সম্ভব, আরতি সাহা (গুপ্ত) তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, খেলাধুলোয় যারা পটু, বিশ্ব অলিম্পিকে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা তাদের খেলোয়াড়-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান। ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে আরতি সাহা সে সম্মান তো পেয়েছেনই, তারপর দুরন্ত ও দুরতিক্রম্য ইংলিশ চ্যানেল জয় করে তিনি পেয়েছেন বীর নারীর দুর্লভ সম্মান, যে-সম্মান আজ পর্যন্ত এশিয়ার অন্য কোন মেয়ে লাভ করতে পারেননি।

সুনামের সোপান বেয়ে আরতি সম্মানের মিনারে আরোহণ করেছেন। তাঁর জীবনী নিয়ে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, সাঁতারকে খেলাধুলোর প্রিয় বিষয় হিসাবে বেছে নিলেও প্রথম জীবনে লাঠি খেলা, ছোরা খেলা এবং অসিচালনাতেও আরতির হাত ভাল ছিল। হাটখোলা ব্যায়াম সমিতির তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সভ্যা।

গঙ্গার কোলে লালিতা পালিতা আরতির সাঁতার শুরু গঙ্গাতেই। শোভাবাজার অঞ্চলের ১৪।৪, বলরাম মজুমদার স্ট্রীটের বাড়ি থেকে কাকা বিশ্বনাথ সাহা মা-মরা ভাইঝি আরতিকে নিয়ে রোজ গঙ্গায় নাইতে যেতেন আর একটু একটু করে সাঁতার শেখাতেন। মেয়েটির হাত-পা ছোঁড়ার ভঙ্গি দেখে ও'র উপর নজর পড়ে হাটখোলা ক্লাবের অন্যতম পরিচালক সাঁতার-পাগল বিজিতেন বসুর। বিজিতেন-বাবুই আরতির বাবা পাঁচুগোপাল সাহার অনুমতি নিয়ে আরতিকে এনে ভরতি করেন হাটখোলা ক্লাবে। পরে আরতিকে সাঁতারে সুপটু করে তোলেন শচীন নাগ ও লণ্ডন অলিম্পিকে ভারতীয় সাঁতারু দলের অধিনায়ক যামিনী দাশ। বিজিতেন-বাবুর জন্য দুঃখ হয়। তিনি আর ইহজগতে নেই। বিজিতেন বসু সত্যিই ছিলেন সাঁতার-পাগল। বিদ্যা, ধর্ম, হৃদি, মর্ম সবই ছিল তাঁর সাঁতার। ক্লাবের ছেলে-মেয়েরা ছিল প্রাণের প্রিয়। প্রিয় ছাত্রী আরতি চ্যানেল জয়ের গৌরব অর্জনের আগেই বিজিতেন বসু ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত একমাত্র এক শ' মিটার ফ্রি স্টাইল ছাড়া মেয়েদের সাঁতারের সমস্ত বিষয়েই আরতি ছিলেন রাজ্য রেকর্ডের অধিকারিণী। এই কৃতিত্বই তাঁকে ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এনে দেয়। তারপর আরতি ও ভারতী—দুই বোন চার হাত দিয়ে সাঁতারের রাশি রাশি পুরস্কার ঘরে তুলতে আরম্ভ করেন।

১৯৫৯ সালে আরতি সাহা যখন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের সংকল্প করেন, তখন তাঁর গৌরবের দিন অস্তমিত। কিছুকাল আগে থেকেই তিনি সাঁতার ছেড়ে দিয়ে-

'পদ্মশ্রী' খেতাবের সনদ হাতে প্রধান মন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে আরতি গুপ্ত

ছিলেন। তবু মিহির সেন ও ব্রজেন দাশের চ্যানেল অতিক্রমের খবর তাঁর মনে সাফল্যের অনুপ্রেরণা এনে দেয়। বহু বাধাবিপত্তি কাটিয়ে, বহু চেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করে ১৯৫৯-এর জুলাই মাসে ক্রীড়ানুরাগী অরুণ গুপ্তকে ম্যানেজার হিসাবে সঙ্গে নিয়ে তিনি যাত্রা করেন অজানার উদ্দেশ্যে।

উত্তরে ইংলন্ড, দক্ষিণে ফ্রান্স, মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত দুস্তর পারাবার ইংলিশ চ্যানেল। দুরন্ত, দুরতিক্রম্য ও দুরধিগম্য ইংলিশ চ্যানেল—কুড়ি-একুশ মাইল যার প্রস্থ—জল যার হিমশীতল—যার জঠর নানা জানা-অজানা সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল, সেই ইংলিশ চ্যানেল। জল শুধু হিম-শীতলই নয়, খল জল ছল-ভরা—ইংলিশ চ্যানেল। একটু বাতাস হলেই যার উত্তাল উদ্দাম ভয়ংকর রূপ। আবহাওয়া খারাপ হলে তো কথাই নেই। তখন ইংলিশ চ্যানেল লক্ষ ফণা তুলে গর্জন আরম্ভ করে, আপনার রুদ্র-নৃত্যে লক্ষ হাতে করতালি বাজায়।

তা ছাড়া ফ্রান্সের 'কেপ গ্রিজ নেজ' থেকে ইংলন্ডের ডোভার উপকূল পর্যন্ত আড়াআড়ি পথে চ্যানেলের প্রস্থ কুড়ি-একুশ মাইলের মত হলেও প্রবল স্রোতের টানে এঁকেবেঁকে সাঁতার কেটে চ্যানেল পার হতে হলে প্রায় দ্বিগুণ পথ অতিক্রম করতে হয়। শুধু প্রবল স্রোতের টান আর পথের দূরত্বই সাফল্যের পথের প্রধান অন্তরায় নয়। বহু রকমের বিপদের আশংকা আর বাধাবিপত্তির আকর হচ্ছে ইংলিশ চ্যানেল দরিয়া। বরফ-গলা ঠান্ডা জলে বেশীক্ষণ থাকা যেমন অসম্ভব, তেমন লোনা জল চোখে ঢোকার, আর 'জেলী' ফিশের হুল এবং 'গ্রানাইটের' আলিঙ্গনের আশংকাও নিরন্তর। সাঁতার কেটে এ হেন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা অসাধ্য সাধনেরই নামান্তর। জীবন-মৃত্যুকে যারা পায়ের ভৃত্য মনে করে, দুর্গম গিরি, কান্তার মরু আর দুস্তর পারাবারকে তুচ্ছ জ্ঞান করে—যাদের মনে আছে অসাধ্য সাধনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, অজানাকে জানবার অনিবার আগ্রহ, তাদের পক্ষেই ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করা সম্ভব।

শুধু সাঁতার কেটে কেন? বিমানে চড়ে সর্বপ্রথম যে পাইলট হাওয়াই পথে ভয়াবহ ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়েছিলেন, তিনিও অমর হয়ে আছেন। ডোভার বন্দরের উপর চ্যানেল অতিক্রমকারী প্রথম সাঁতারু ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েবের মর্মরমূর্তির অদূরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মর্মর-মূর্তি।

ইংলিশ চ্যানেলের কূলে সাঁতার পটীয়সী আরতি সাহা (গুপ্ত)

দুঃসাহসী ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব সর্বপ্রথম সাঁতার কেটে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন ১৮৭৫ সালে। দ্বিতীয় সাঁতারুর চ্যানেল অতিক্রম করতে ৩৬ বছর পার হয়ে যায়। আরও ১১ বছর পরে তৃতীয় সাঁতারু চ্যানেল পাড়ি দেন। তারপর অনেকেই চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন, আবার চ্যানেলের কোলে লালিত পালিত অনেকে জীবনভোর চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি। তাই বহুজনের সাফল্য সত্ত্বেও ভয়াবহ ও দুরতিক্রম্য ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের গৌরব ও কৃতিত্ব আজও অসাধ্য সাধনের শামিল।

ইংলিশ চ্যানেল বিজয়িনী আমাদের প্রথম দুঃসাহসী মেয়ে আরতির মর্মর-মূর্তি আমাদের কল্পনার চোখে। তাঁর মৃন্ময়ী মূর্তি আমাদের দেশের ক্রীড়ানু-রাগীদের মনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত।

জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ভয়াল সুন্দর রূপের মধ্যে আরতি যেভাবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেছেন তার তুলনা কম। দৈব দুর্যোগ ও পথ-প্রদর্শকের ভুল নিশানায় প্রথম অভিযানে ব্যর্থতার পর ১৯৫৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের 'কেপ গ্রিজ নেজ' থেকে তিনি আবার জলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েন। একটু পরেই সমুদ্র রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে আরতি অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করেন। সম্মুখে পাইলট বোটে উড্ডীয়মান ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা তাঁর মনে এনে দেয় দুর্জয়কে জয় করার অসীম শক্তি। ১৬ ঘণ্টা ২০ মিনিট প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি চ্যানেল জয় করেন। প্রথমবারের ব্যর্থতায় যিনি কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন, তাঁর মুখে ফুটে ওঠে প্রশান্ত আনন্দের হাসি।

তারপর ডোভারের 'আন হ্যাথওয়ে' হোটেলের ৬ নম্বর ঘর অভিনন্দন-বার্তায় ভরে ওঠে। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী নেহরু, কংগ্রেস সভানেত্রী ইন্দিরা গান্ধী, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় থেকে আরম্ভ করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মন্ত্রীদের প্রায় শ' দেড়েক টেলিগ্রাম ঐ ঘরে দু দিনে বিলি করে ডোভারের পোস্টম্যান। ইন্ডিয়া হাউসে সংবর্ধনা জানান ভারতীয় হাই কমিশনার বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। লন্ডনে আরও বহু সংবর্ধনার আয়োজন হয়। দেশে ফেরবার পর সংবর্ধনার সংবর্ধনায় হাঁপিয়ে ওঠে আরতি সাহা আর তাঁর ম্যানেজার অরুণ গুপ্ত। কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসাবে জয়ের মালার সঙ্গে আসে নানা পুরস্কার। রূপোর থালা, সোনার হার, কলম, ঘড়ি, অর্থ ও নানা পুরস্কারে ঘর ভরে যায়। ভারত সরকার তাঁকে দান করেন 'পদ্মশ্রী' খেতাব।

১৯৬০ সালের পয়লা মার্চ অরুণ গুপ্তর সঙ্গে আরতি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। অরুণ গুপ্তর পিতামহের নামাঙ্কিত রাস্তা দর্জিপাড়ার অবিনাশ কবিরাজ স্ট্রীট সংলগ্ন ১৬।১, তারক চ্যাটার্জি স্ট্রীটে আরতি গুপ্তের এখন শান্তির সংসার। সংসারের বাইরে সাউথ ইস্টার্ন রেলের লেডি ওয়েলফেয়ার অফিসার। জলের বুকে আরতি বন্যার দুরন্ত ঘূর্ণি, কিন্তু সংসারের কোলে চিরদিনই কমনীয়তা ও নারীত্বের মর্মছোঁয়া আবেদন।

দেশী সংবাদ

১০ই জুলাই—পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা অস্বাভাবিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার ফলে রাজ্য সরকার চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। বেকারির এই বিপুল চাপ রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে এক গভীর আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। শ্রমমন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তারের মতে, এই পরিস্থিতি দস্তুরমত বিস্ফোরক দ্রব্যের ন্যায় ভয়াবহ।

জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার আলু ব্যবসায়িদিগকে ব্রহ্মদেশ হইতে আলুবীজ আমদানি লাইসেন্স দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বীজ আমদানি বন্ধ হওয়ার ফলে পশ্চিমবঙ্গের আলু উৎপাদন অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

১১ই জুলাই—হীরাকুদ জলাধারে জলস্ফীতি সাফল্যের সঙ্গে রোধ করায় এবং মহানদী ও কাঠজুরির জল প্রত্যাশা অনুযায়ী বিপদসীমা অতিক্রমের পর ধীরে ধীরে বাড়িয়া চলায় অদ্য উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাসের সুরে বলেন, "কটক এক্ষণে নিরাপদ এবং সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত"।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃপক্ষের সহিত শিক্ষক প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে এ বৎসর ১৯৫৮ সালের সিলেবাস অনুসারে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় যাহারা ফেল করিয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্রে পুনরায় ঐ কোর্সে পরীক্ষার সুযোগদান সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। আগামী বৎসর হইতে '৫৮ সালের সিলেবাসে আর পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে না।

১২ই জুলাই—"টেবিল চাপড়াইয়া কিছুই হইবে না—চাবুক মার।"—অদ্য কলিকাতা পৌরসভার শুরুতেই বিরোধী পক্ষের একজন কাউন্সিলার ব্যাগ হইতে সদ্যোক্রীত একটি চাবুক বাহির করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে উপর্যুক্ত মন্তব্য করিতে থাকিলে উপস্থিত সকলে স্তম্ভিত হইয়া যান। মহানগরীর জঞ্জালাদি পরিষ্কার করিতে হইলে এরূপ অস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া উক্ত কাউন্সিলার মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'এক শ্রেণীর পদস্থ অফিসারকে প্রকাশ্যভাবে চাবুক দিয়া না চাবকাইলে কোনদিন জঞ্জালাদি পরিষ্কারের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলিবে না।' এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি ঐ চাবুকটি মেয়রকে উপহার দিতে চাহিতেছেন।

১৩ই জুলাই—কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি অদ্য নয়াদিল্লিতে বলেন, আইনসভার সদস্যদের ১০ বৎসর সদস্য থাকার পর ১৯৬২ সালে অবসর লইতেই হইবে—কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটি ঐরূপ কোন বাঁধাধরা নিয়ম করেন নাই বা প্রদেশ নির্বাচন কমিটিগুলির নিকট আইনসভা সদস্যদের বা মন্ত্রীদের অবসর গ্রহণ সম্পর্কে ঐরূপ কোন নির্দেশ প্রেরণ করেন নাই।

পশ্চিমবঙ্গের শিবিরে অবস্থানরত উদ্বাস্তুদের উপর ৬০ দিনের মধ্যে শিবির ত্যাগ করিবার নোটিশ জারি করা হয়। উদ্বাস্তুরা দণ্ডকারণ্যে যাইবে, না শিবির ত্যাগ করিবে—ঐ সময়ের মধ্যে তাহা স্থির করিতে হইবে। পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের শিবিরে অবস্থানরত উদ্বাস্তুদের ঐ ৬০ দিনের পরে আরও ৯০ দিন সময় দিয়াছেন।

১৪ই জুলাই—অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় কাউন্সিলর ডাঃ কে পি ঘোষ অভিযোগ করেন যে, বিদেশে ভেজাল খাদ্যদ্রব্যাদি রপ্তানি করিবার ব্যাপারে বিশেষ কোন বাধানিষেধ না থাকার দরুন বিদেশের বাজারে কোন কোন ভারতীয় দ্রব্যাদির চাহিদা কমিয়া যাইতেছে।

এখন হইতে কর্পোরেশনের সভায় কোন কাউন্সিলার যদি বার বার মেয়রের নির্দেশ অমান্য করেন বা অশোভন আচরণ করেন, তাহা হইলে মেয়র তাঁহাকে পৌরসভার সার্জেন্টের সাহায্যে সভাকক্ষ হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতে পারিবেন।

১৫ই জুলাই—পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি জেলায়, বিশেষ করিয়া পাকিস্তান সীমান্তবর্তী দেশগুলিতে এক শ্রেণীর মুসলমান নেতা ইদানীং যে উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচারকার্য চালাইতেছিলেন তাহাতে ভাটা তো পড়েই নাই, উপরন্তু ঐ সাম্প্রদায়িক তীব্রতা এক্ষণে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে বলিয়া নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়।

পুনর্বাসন দপ্তরের তরফ হইতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্যাম্পে উদ্বাস্তু কৃষিজীবী পরিবারদের উপর ক্যাম্প ছাড়িবার নোটিস দেওয়া শেষ হইয়াছে বলিয়া অদ্য রাজ্য সরকারের জনৈক মুখপাত্র জানান। ১৫ই জুলাই নোটিস দিবার শেষ তারিখ ছিল।

১৬ই জুলাই—কলিকাতা ও বৃহত্তর কলিকাতায় যেসব সিনেমা কর্তৃপক্ষ সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী কর্মচারীদের ন্যূনতম বেতন দিতে সম্মত হইয়াছেন, সেসব চিত্রগৃহ ছাড়া অপরাপর চিত্রগৃহের কর্মচারিগণ অদ্য পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতীক সাধারণ ধর্মঘট পালন করেন।

বেঙ্গল মোশন পিকচার অ্যাসোসিয়েশন অদ্য এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সিনেমা কর্মচারীদের ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে সমিতির অন্তর্ভুক্ত ৪০৫টি চিত্রগৃহ অবিলম্বে (সোমবার হইতে) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

বিদেশী সংবাদ

১০ই জুলাই—গতকাল 'সেভ' নামে একটি পর্তুগীজ যাত্রিবাহী জাহাজ মোজাম্বিকের নিকটে সমুদ্রের চড়ায় আটক পড়ে এবং অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণের ফলে উহা ধ্বংস হয়। এক অসমর্থিত সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, এই দুর্ঘটনার ফলে প্রায় ২৫০ জনের জীবনান্ত ঘটিয়াছে। সরকারীভাবে এ সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই।

১১ই জুলাই—সাতাশ বৎসর বয়স্ক সোভিয়েট মহাকাশচারী মেজর ইউরি গাগারিন আজ বিমানযোগে লন্ডনে উপনীত হইলে তাঁহাকে বীরোচিত সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

মার্কিন রাষ্ট্রসচিব শ্রীডীন রাস্ক আমেরিকানদের এই বলিয়া হুঁশিয়ার করিয়া দেন যে, তাঁহারা যেন তথাকথিত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে হুট করিয়া কোন রায় দিয়া না বসেন।

১২ই জুলাই—গতকল্য ওয়াশিংটনে ভারতীয় দূতাবাস কর্তৃক প্রচারিত এক পুস্তিকায় বলা হইয়াছে যে, কাশ্মীর রাজ্যটি বিনা শর্তে সম্পূর্ণরূপে ভারতের সহিত যোগ দেওয়ায় কাশ্মীরের উপর ভারতের সার্বভৌম অধিকার জন্মায়। আইনসম্মতভাবেই যে কাশ্মীর ভারতের সহিত যুক্ত হইয়াছে পাকিস্তান তাহা জানে এবং এই কারণেই পাকিস্তান আন্তর্জাতিক আদালতের সম্মুখে ঐ বিষয়টি চ্যালেঞ্জ করে নাই। তাহা ছাড়া, কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পর্কে কদাপি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই।

১৩ই জুলাই—প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ ওয়াশিংটন হইতে পাকিস্তানে ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে শব্দের গতি অপেক্ষা দ্বিগুণ গতিসম্পন্ন এফ ১০৪ জঙ্গী বিমান সরবরাহ করিতে আরম্ভ করিবে। অদ্য করাচীর দৈনিক সংবাদপত্র 'মর্নিং নিউজ' এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে।

১৪ই জুলাই—গতকল্য হোয়াইট হাউস হইতে প্রকাশিত এক যুক্ত ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্রেসিডেন্ট কেনেডী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ এই বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে, দক্ষিণ এশিয়া আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের একটি প্রাথমিক লক্ষ্যস্থল এবং বর্তমানে নিশ্চিত সমস্যাসমূহের সমাধান করার সুস্পষ্ট প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

১৫ই জুলাই—আজ ওয়াশিংটনে মার্কিনী মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে যে বিরোধ আছে, সেই বিরোধের মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে কেনেডী সরকার সম্ভবত নীরবে যবনিকার অন্তরালে কাজ চালাইয়া যাইবেন।

আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার ভারতকে তাহার ক্ষীয়মাণ বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বৃদ্ধিকল্পে ছয়টি দেশের বৈদেশিক মুদ্রায় মোট ১১৯ কোটি ৪ লক্ষ টাকা (২৫ লক্ষ ডলার) সরাসরি ঋণ দিতে সম্মত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় কমিয়া ১১০ কোটিতে আসিয়া দাঁড়ায়।

১৬ই জুলাই—প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান ওয়াশিংটনে বলেন যে, প্রেসিডেন্ট কেনেডী ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুকে কাশ্মীর বিরোধ মিটাইবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝাইবেন, ইহাতে তিনি সম্মত হইয়াছেন। এ সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কেনেডী অনেক কিছু করিতে পারেন বলিয়া তিনি বলেন। প্রেসিডেন্ট আয়ুব সাংবাদিকদের সম্মুখে টেলিভিশনে বক্তৃতা করেন।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার   সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।

দেশ
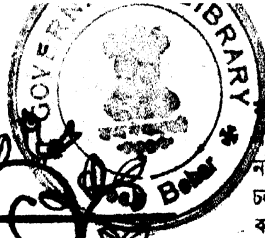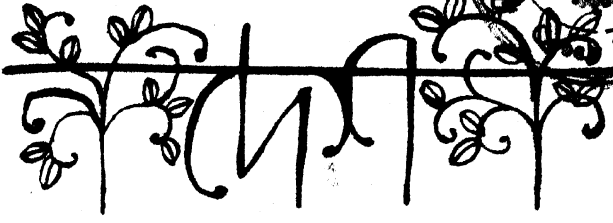
DESH 40 Naye Paise.
Saturday, 29th July, 1961.

২৮ বর্ষ ॥ ৩৯ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৩ শ্রাবণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

মিউনিসিপ্যাল স্বরাজ

ভারতবর্ষে লোকাল সেল্ফ গভর্নমেণ্ট' অর্থাৎ পৌর স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার পত্তন হয় ব্রিটিশ আমলে লর্ড রিপনের সময়কালে। কলকাতার পৌরব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্ব নাগরিকদের নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর হস্তে অর্পিত হয় আরও অনেক পরে, 'ডায়ার্কি'র যুগে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। এ-দেশে পৌর স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার কোনও ইতিহাস রচিত হয়েছে কি না জানা নেই। তবে এ কথা সকলেই জানেন যে, দেশের কোন একটি পৌর প্রতিষ্ঠানেরও কাজকর্ম পরিচ্ছন্ন ও সুপরিচালিত নয়। যেমন মহানগরীগুলি, তেমনি মফস্বলের জেলা শহর, মহকুমা শহর। স্বায়ত্তশাসনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আমাদের পৌরপ্রতিনিধিরা, পৌরপরিচালকেরা হয় ফেল, নয়ত বড়-জোর তৃতীয় কিম্বা দ্বিতীয় বিভাগে পাশ। পরিহাস মন্দ নয়—পলিটিক্যাল স্বরাজ আমাদের করায়ত্ত, অথচ মিউনিসিপ্যাল স্বরাজের বেলায় প্রায় পুরোদস্তুর অরাজকতা।

পৌর স্বায়ত্তশাসনের কেন এই হাল তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। বর্তমানে অনেকের ধারণা, পৌরপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলাদলির ফলেই পৌর স্বায়ত্তশাসনে এই চূড়ান্ত অব্যবস্থা। রাজনৈতিক দল ভাগ এবং পরস্পর বিরোধিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজ্যের বিধানমণ্ডলীতে আছে, কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টেও আছে। রাজ্যের কিম্বা কেন্দ্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় কলকাতা কর্পোরেশন এবং অন্য অনেক মিউনিসিপ্যালিটির মত অনাসৃষ্টি অবস্থা কোথায়ও দেখা যায় না। এর একটি কারণ রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থা এবং বর্তমান পৌর শাসনব্যবস্থার মধ্যে মূল পদ্ধতিগত পার্থক্য। [illegible] [illegible] সংগঠনেও। রাজ্যের অথবা কেন্দ্রের শাসনভার মন্ত্রিমণ্ডলীর। সরকারী নীতি নির্ধারণ এবং কাজকর্ম পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব মন্ত্রিমণ্ডলীর।

অপরপক্ষে পৌরশাসনব্যবস্থার সংগঠন এবং পদ্ধতি এমন যেন পৌরপিতারা একাধারে মন্ত্রিমণ্ডলী এবং বিধানমণ্ডলী অথবা পার্লামেণ্ট। পৌরপিতারা তাঁদের পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কাজকর্মের পরিকল্পনা, প্রস্তাবনা, প্রযোজনা এবং সম্পাদনার সব কয়টি পর্যায়েই প্রায় সর্বেসর্বা। তাঁরাই গড়েন এবং তাঁরাই ভাঙেন। গড়ার গরজ নামেমাত্র, তার কারণ মন্ত্রিমণ্ডলীকে যেমন বিধানমণ্ডলীর অথবা পার্লামেণ্টের কাছে তাঁদের সংকল্পিত বা কৃত কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হয়, পৌরপিতাদের সে দায় নেই। পৌরসভার অধিবেশনে তাঁরা বহুরূপী—তাঁরাই প্রস্তাবক এবং তাঁরাই সমালোচক, একাধারে প্রবক্তা ও শ্রোতা! মন্ত্রীরা তাঁদের নিজ নিজ বিভাগের কৃতকর্মের দায় কর্মচারিবৃন্দের ঘাড়ে চাপিয়ে সাধু সাজবার সুযোগ পান না, পৌরপিতারা সে-সুযোগ পান এবং সে-সুযোগের সুবিধা নিয়ে পৌরশাসনে অব্যবস্থার জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের প্রতি দোষারোপ করেন। সে-বেলায় পৌরপিতারা বিধানমণ্ডলীর সদস্যের ভূমিকা গ্রহণ করেন, যেন পরিচালনার দায়িত্বটা তাঁদের নিজেদের মোটেই নয়।

পৌরপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলাদলির চেয়েও মনে হয়, এই সাংগঠনিক অসঙ্গতি এবং দায়িত্বগত অনিশ্চয়তা পৌরশাসন পরিচালনায় বেশী অনর্থকর। রাজ্যের ও কেন্দ্রের শাসন পরিচালনার দায়িত্বও দলনির্ভর। বিধানসভায় অথবা পার্লামেণ্টে বিরোধী দলের সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের বিতর্ক-বিবাদ যথেষ্ট হয়ে থাকে, মন্ত্রীদের কখন কখন তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তাতে গভর্নমেণ্টের দৈনন্দিন কাজকর্ম ব্যাহত হয় না; আর অনাস্থার প্রশ্নে মন্ত্রিমণ্ডলী নিয়মতান্ত্রিকভাবে পদচ্যুত না হওয়া পর্যন্ত গভর্নমেণ্টের নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী কাজকর্ম যথারীতি চলতে থাকে। পৌরসভা এবং পৌরশাসনব্যবস্থা পরিচালনার রীতিটা এদিকে দায়িত্বহীন, সর্বকর্ম পণ্ডে পটু। পৌরপিতারা ক্ষমতাধর, অথচ মন্ত্রিমণ্ডলীর মত কোন যৌথ দায়িত্ব তাঁরা মেনে চলতে বাধ্য নন। নাচের সঙ্গী যেমন ঘড়ি-ঘড়ি বদলান যায়, তেমনি পৌরসভার এক-একটি অধিবেশনে সদস্যদের এক এক-রকম জোট-বন্ধন, জোট-ভাঙন; একবার প্রস্তাব পাশ, পরের বার সেই প্রস্তাবই বাতিল! সপ্তাহে সপ্তাহে এই রকম ওলটপালট চলার ফলে পৌর-স্বাচ্ছন্দ্যবিধান সম্পর্কে কোন সুদৃঢ় নীতি, কোন পরিচ্ছন্ন সংকল্প ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত কর্মচারিমণ্ডলীর মুণ্ডপাত করে পৌরপিতারা সৃষ্টি করেন আরও বেশী বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রান্তি।

পৌরব্যবস্থা পরিচালনার দায়ভাগের মূলে এই গলদ: কেবল নির্বাচনের সময় মুষ্টিমেয় ভোটারের কাছে ছাড়া পৌরপিতারা তাঁদের কৃতকর্মের জন্য কারো কাছে দায়ী নন, জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। বর্তমান পৌরশাসনব্যবস্থায় এর কোন প্রতিকার দেখা যায় না। পৌরপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভাল-মন্দ সম্পর্কে মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রীজন কেনেথ গলব্রেথ সম্প্রতি কলকাতায় তাঁর উপস্থিতিকালে একটি সরস সূত্রের সন্ধান দিয়েছেন। সূত্রটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শ্রী গলব্রেথ তাঁর স্বদেশে যে শহরের বাসিন্দা সে শহরটির পৌর-পরিচালনব্যবস্থা নাকি খুব উঁচুদরের নয়, যদিও শহরটি শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বিদ্যাবত্তায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় শীর্ষস্থানীয়। মার্কিন রাষ্ট্রদূত তাঁর নিজ শহরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সূত্রাকার সিদ্ধান্ত করেছেন, "যে শহরের লোক যত বেশী বুদ্ধিমান, সেই শহরের পৌরব্যবস্থা তত বেশী খারাপ।" সূত্রটি যথার্থ গণ্য হলে কলকাতার নাগরিকবৃন্দের বুদ্ধিগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং পৌরব্যবস্থার নিকৃষ্টতা, দুই-ই পরস্পর-নির্ভর বলে মানতে হয়। তবে কথা কী, লণ্ডনের নাগরিকবৃন্দের বুদ্ধি নিশ্চয়ই নিতান্ত কম নয়; সেখানকার পৌর পরিচালনায় রাজনৈতিক দলের অধিকারও সুপ্রতিষ্ঠিত, সুপরিচিত; অথচ পৌর-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে না আছে লণ্ডনবাসীদের বুদ্ধির বিকার, না দেখা যায় দলীয় রাজনীতির ব্যভিচার। তবে কি গলব্রেথ সূত্রের সত্যতার প্রমাণ হিসাবেই লণ্ডনে নিয়মের এই ব্যতিক্রম?

কবিতা

তারিখ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

তারিখ কত? পাঁচুই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।
পাঁজির ছাপা ভুল!
মন ত জানে দমকা হাওয়ার
দামাল এক সকাল
মেঘের কুচি ছিঁড়ে ছিঁড়ে
ভাসাতে মশগুল।

ইতিহাসের পাতায় ছাপা থাকবে অনেক দিন
কীর্তি খ্যাতির ঘনঘটায় ভারী
একটা তারিখ পালিয়ে এসে
উধাও নিষ্ফলতায়
দেয় যদি দিক পাড়ি।

বনের ঝরা পাতা ওড়াক,
সাজানো মন হেলায় ছড়াক,
পাক দিয়ে সব ভাবনাগুলোয়
অকারণে খুশি জড়াক।
দমকা হাওয়ার সকাল, তুমি কার?
নয় ইতিহাস নয়ক পঞ্জিকার।
হারিয়ে গিয়েই পায় নিজেকে
শুধুই বুঝি তার।

শিল্পী

মানস রায় চৌধুরী

বাড়ি চলে যেতে যেতে সব মনে পড়বে ছেলেটার।
পানাপুকুরের পাশে নির্জন ফেরার পথ সমস্ত দেখাবে,
স্মৃতিচিত্র খুলে যাবে নীলিমায়, সন্ধ্যা জ্যোৎস্নালাগা........
কেমন অদ্ভুত দেখ। এসব চায়নি শুধু লোভ তার এক,
অন্ধকারে।

দোয়াত উপুড় করে কাগজের পূর্ণ শুভ্রতায়
সারাক্ষণ সে খুঁজেছে সারা রাত্রি অথবা
মাটির নিচে লুপ্ত শবাধার।
বাড়ি যেতে মনে পড়বে কেন অত নির্যাতন মেনে
সে চেয়েছে সকালবেলাকে ঢাকতে মধ্যরজনীর
বিশাল মেঘার্দ্র চুলে। এলোমেলো অনুষঙ্গে যেন বা উন্মাদ
লাগে তার নিজেকেও, বুকের অতল খাদ স্পষ্ট তাকে টানে।
—'উঠোনে কুয়োর জলে কী গভীর হাতছানি, মাঝরাতে চাঁদ
যেদিন উঠবে না আমি সেইদিন ওর ডাকে সাড়া দেবো ঠিক'
এইসব কথা ভেবে ছেলেটি অনেক রাতে বাড়ি ফিরে মাকে
বলবে, মাগো শীগ্গির এসো। ভালো লাগছে না আর একা—

আশ্চর্য, বাড়ির মধ্যে কেউ নেই, কিছু নেই হাওয়ার ভিতরে।

অ্যাফ্রো-এশীয় গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র তিউনিসিয়ার গভর্নমেণ্টই নানা ঝড়ঝাপ্টার ভিতরেও পশ্চিমা ব্লকের প্রতি মোটের উপর বন্ধুভাব রক্ষা করে আসছিলেন। তার জন্য তিউনিসিয়ার প্রেসিডেণ্ট বুরগুইবাকে অনেক গঞ্জনাও শুনতে হয়েছে। যদিও আলজেরিয়ার স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীদের যথাসাধ্য সাহায্য তিউনিসিয়া করে আসছে। বলা বাহুল্য, তিউনিসিয়ার জনসাধারণের সহানুভূতি সম্পূর্ণরূপে আলজেরিয়ার স্বাধীনতার যোদ্ধাদের দিকে। নানাভাবে প্রতিবেশী তিউনিসিয়া এবং তিউনিসিয়াবাসীদের আনুকূল্য না পেলে আলজেরিয়ার এফ্-এল্-এন্-এর পক্ষে এতদিন ধরে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো কিনা বলা যায় না। অন্যদিকে প্রেসিডেণ্ট বুরগুইবা চেয়েছেন যে, ফ্রান্স আলজেরিয়ার স্বাধীনতার দাবি মেনে নিয়ে স্বাধীন আলজেরিয়ার সঙ্গে বন্ধুতার সম্পর্ক স্থাপন করুক। আলজেরিয়ার যুদ্ধ তিউনিসিয়ার পক্ষেও নানা সমস্যা সৃষ্টি করেছে যার চাপে প্রেসিডেণ্ট বুরগুইবাকে দারুণ অস্বস্তি এবং অনেক সময়ে খুবই বেকায়দায় পড়তে হয়েছে, এমন কি স্বদেশে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাও বিপন্ন পর্যন্ত হয়েছে। তা হলেও তিনি নানা সংকটের মধ্যে দু দিক রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন এই আশায় যে, ফ্রান্সের সুবুদ্ধি হবে এবং ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত দেশগুলির সঙ্গে ফ্রান্স একদিন সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হবে। বিশেষ করে প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের উপর শ্রীবুরগুইবার খুবই ভরসা ছিল। সেইজন্য বারবার আশাভঙ্গের কারণ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও প্রেসিডেণ্ট বুরগুইবা হাল ছাড়েন নি।

কিন্তু বিজের্তা নিয়ে ফরাসীরা যে কাণ্ড করল তাতে কেবল ফ্রান্স নয়, গোটা পশ্চিমা ব্লকের প্রতি তিউনিসিয়া বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে উঠবে এবং সেটা ঠেকানো শ্রীবুরগুইবার পক্ষেও দুঃসাধ্য হবে। স্বাধীন হবার পর থেকেই বিজের্তা থেকে ফরাসী নৌ এবং বিমানঘাটি সরিয়ে নেবার জন্য তিউনিসিয়া ফরাসী গভর্নমেণ্টকে বলে আসছে। আফ্রিকার অন্য যে-সব দেশ নূতন স্বাধীনতা লাভ করেছে তাদের এলাকা থেকে বিদেশী সামরিক ঘাটি সরে গেছে বা যাচ্ছে, কিন্তু যে তিউনিসিয়া অন্যদের তুলনায় ফ্রান্সের প্রতি তথা পশ্চিমা ব্লকের প্রতি যথেষ্ট বন্ধুভাব দেখিয়েছে কেবল তার কথাতেই কোনো কর্ণপাত করা হয়নি। এ বিষয়ে

শ্রীবুরগুইবা আশ্চর্য ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। নৌ এবং বিমানঘাটি হিসাবে বিজের্তার গুরুত্ব এক সময়ে যথেষ্ট ছিল কিন্তু বর্তমান নিউক্লিয়ার অস্ত্রের যুগে ফ্রান্স বা ন্যাটোর পক্ষে বিজের্তার সে গুরুত্ব আর নেই। তা সত্ত্বেও শ্রীবুরগুইবা এমন দাবি কোনোদিন করেন নি যে, সাত দিনের মধ্যে ঘাটি সরিয়ে নিতে হবে। ঘাটি সরিয়ে নেওয়া হবে—এই মূলনীতি স্বীকার করে নিয়ে কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হোক, শ্রীবুরগুইবার এইমাত্র দাবিও যে ফ্রান্স গ্রহণ করবে তারও কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। বরঞ্চ ফ্রান্সের যে বিজের্তা থেকে সরে যাবার কোনো ইচ্ছা নেই তারই প্রমাণ পাওয়া যেতে লাগল।

সম্প্রতি বিজের্তার বিমানঘাটিতে বিমান নামাবার পথ আরো বাড়াবার ব্যবস্থা শুরু করা হয়। তাই থেকে তিউনিসিয়ানরা স্বভাবতই সিদ্ধান্ত করে যে, ফরাসীদের বিজের্তা ছেড়ে যাবার কোনো ইচ্ছা নেই, যদি সেরূপ ইচ্ছা থাকত তবে তারা বিমান-ঘাটিতে এরূপ নূতন খরচপত্র করে কাজ আরম্ভ করত না। সুতরাং ফরাসীদের এই কাজের প্রতিবাদে তিউনিসিয়াতে আন্দোলন এবং কিছুটা বাধা সৃষ্টির চেষ্টা আরম্ভ হলো। এই থেকে সংঘর্ষের সূত্রপাত, যার ফলে ছয় শতাধিক তিউনিসিয়ান হত এবং বোধ হয় কয়েক সহস্র আহত হয়েছে। কারণ ফরাসী সৈন্যরা যে কেবল সামরিক ঘাটির "নিরাপত্তা" রক্ষার জন্য কামান, বন্দুক, বোমা ছুঁড়েছে তা নয়, তারা অসামরিক বিজের্তা শহরের উপর পুরাদমে আক্রমণ চালিয়েছিল। তিউনিসিয়ান গভর্নমেন্টের পক্ষে ফরাসী বাহিনীর এই আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু ফরাসীদের যদি শুভবুদ্ধি থাকত তবে এই সংঘর্ষ ঘটত না বা এরূপ মারাত্মক আকার ধারণ করার অবসর পেত না। কারণ বিবাদের সূচনাতেই শ্রীবুরগুইবা ফরাসী গভর্নমেণ্টকে আলোচনার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। সামরিক ঘাটি সরিয়ে নেওয়া হবে এই মূলনীতি স্বীকার করে ফরাসী গভর্নমেন্ট যদি আলোচনা করতে সম্মতি প্রকাশ করতেন তা হলে ব্যাপারটা বেশী দূর গড়াত না। বিদেশী সামরিক ঘাটি সম্পর্কে তিউনিসিয়ার জনমত এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে যে, ঘাটি সরিয়ে নেওয়া হবে এই মূলনীতির স্বীকৃতি ছাড়া উত্তেজনা প্রশমিত হতো না, হবে না।

কিন্তু ফরাসী গভর্নমেণ্ট প্রেসিডেণ্ট বুরগুইবার আবেদনে কর্ণপাত করলেন না এবং বিজের্তা ঘাটির কর্তারা তিউনিসিয়ানদের একটু শিক্ষা দিয়ে দিতে অগ্রসর হলেন। ফলে ফরাসীদের সদিচ্ছা সম্বন্ধে তিউনিসিয়ানদের সন্দেহ চতুর্গুণ বাড়ল। বিদেশী সামরিক ঘাটির অবস্থিতি দ্বারা তিউনিসিয়ার স্বাধীনতা খণ্ডিত হচ্ছে—তিউনিসিয়ানদের মধ্যে এই বোধ পূর্বে যা ছিল এখন সেটা চতুর্গুণ জোরালো হলো। বিজের্তায় ফরাসীদের ব্যবহার অত্যন্ত উদ্ধত রকমের ছিল। বিদেশী ঘাটি থাকা সত্ত্বেও বিজের্তা সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের অধিকার স্বাধীন তিউনিসিয়ান গভর্নমেণ্টেরই। অর্থাৎ খাতাপত্রে সেরূপ লেখা আছে, কিন্তু কার্যত বিজের্তা শহরে ফরাসীদের হাবভাব, চালচলন এইরকম যে, তারাই যেন তিউনিসিয়ার প্রভু। অর্থাৎ তিউনিসিয়া এবং তিউনিসিয়ানরা যে স্বাধীনতা লাভ করেছে তা ফরাসীদের ব্যবহার থেকে বোঝার উপায় ছিল না। এ অবস্থায় তিউনিসিয়ানরা মনে না করে পারে না যে, যতদিন তিউনিসিয়ার ভূমিতে বিদেশী সামরিক ঘাটি থাকবে ততদিন পর্যন্ত তিউনিসিয়ার প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হবে না, ততদিন ফরাসীরা তিউনিসিয়ানদের স্বাধীন বলে মনে করবে না। ফরাসীদের ব্যবহার যদি অন্যরকম হতো তবে হয়ত তিউনিসিয়ানদের মনে এতটা ক্ষোভ এবং বিরক্তি জন্মাত না, কিন্তু তা হলেও বিদেশী সামরিক ঘাটির অবস্থিতির বিরুদ্ধে আন্দোলন অনিবার্য ছিল। আফ্রিকার অন্য দেশগুলির সামনে আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্যও তিউনিসিয়াকে বিদেশী ঘাটি অপসারণের দাবি করতে হতো, বিশেষত যখন তিউনিসিয়াকে পশ্চিমা-ঘেঁষা বলে লোকে মনে করে।

শ্রীবুরগুইবার অভিযোগ কেবল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নয়, আমেরিকা এবং বৃটেনের প্রতিও তাঁর অসন্তুষ্ট হবার কারণ আছে। সে কারণ হচ্ছে এই যে, এই ব্যাপারে ফ্রান্সের উপর বৃটেন এবং আমেরিকার যে ধরনের চাপ দেওয়া উচিত ছিল বৃটিশ ও মার্কিন গভর্নমেণ্ট তা দেন নি। সংঘর্ষ বাধার সম্ভাবনা বেশ কয়েকদিন পূর্বেই স্পষ্ট দেখা দিয়েছিল, তখন থেকে যদি বৃটিশ ও মার্কিন গভর্নমেণ্ট ফ্রান্সকে শ্রীবুরগুইবার আবেদনে কর্ণপাত করার জন্য চাপ দিতেন তবে ঘটনার গতি হয়ত অন্যরকম হতো। এখনও পশ্চিমা মহলে শ্রীবুরগুইবার সমস্যার ঠিক মতো উপলব্ধি হচ্ছে বলে মনে হয় না। যদি হতো তা হলে সিকিউরিটি কাউন্সিলে আরো স্পষ্টতর প্রস্তাব পাস হতো। সিকিউরিটি কাউন্সিলে যে প্রস্তাব পাস হয়েছে তাতে উভয় পক্ষকে যুদ্ধ থামিয়ে সংঘর্ষের পূর্ববর্তী অবস্থা ফিরিয়ে আনতে বলা হয়েছে। বিজের্তার ঘাটি সরিয়ে আনার বিষয়ে উল্লেখ করে প্রস্তাব পাস করার যে চেষ্টা করা হয় সেটা সফল হয় না। অর্থাৎ বিজের্তার ঘাটি সরিয়ে আনা হোক বা সে সম্পর্কে আলোচনা প্রবর্তিত হোক—এই মর্মে ফ্রান্সের প্রতি কোনো নির্দেশ সিকিউরিটি কাউন্সিল থেকে আসেনি। সিকিউরিটি কাউন্সিল কেবল যুদ্ধ-বিরতির নির্দেশ দিয়েছেন। যুদ্ধ-বিরতি নিশ্চয়ই

আবশ্যক কিন্তু কেবল যুদ্ধ-বিরতি হলেই সমস্যার সমাধান হবে না। তিউনিসিয়া থেকে বিদেশী সামরিক ঘাটির অপসারণই হচ্ছে সমস্যার সমাধান। যদি তিউনিসিয়া দেখে যে, সে বিষয়ে পশ্চিমা ব্লক ফ্রান্সের উপর কোনো চাপ দিতে নারাজ তবে তিউনিসিয়া পশ্চিমা ব্লকের প্রতি উত্তরোত্তর অপ্রসন্ন হয়ে উঠবে এবং তিউনিসিয়াতে বিদেশী ঘাটির অবস্থিতির বিরুদ্ধে আন্দোলন থামবে না, সুতরাং শান্তিও আসবে না।

পশ্চিমা ব্লক যদি তিউনিসিয়াকে শত্রু করতে না চায় তবে বিজের্তা থেকে ফরাসী নৌ ও বিমানঘাটি সরিয়ে আনা হবে এই নীতি অবিলম্বে ঘোষিত হওয়া আবশ্যক এবং তা কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা শুরু হওয়া উচিত। শ্রীবুরগুইবা ইউ-এন-ও'র সেক্রেটারী জেনারেল শ্রীহ্যামারশেল্ডকে তিউনিসিয়াতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শ্রীহ্যামারশেল্ড তিউনিসিয়ায় এসে শ্রীবুরগুইবার সঙ্গে আলোচনা করবেন আশা করা যায়। শ্রীহ্যামারশেল্ড তিউনিসিয়ায় এলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, বিজের্তা থেকে ফরাসী ঘাটি সরিয়ে নেওয়ার কথা ধামাচাপা দিয়ে শান্তি আনার চেষ্টা সফল হবে না। সেরকম চেষ্টায় শ্রীবুরগুইবা সহযোগিতা করবেন এরূপ আশা করাও সংগত নয়, কারণ তার অর্থ হবে শ্রীবুরগুইবার পক্ষে রাজনৈতিক আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হওয়া। আর শ্রীবুরগুইবা যদি একবার ক্ষমতাচ্যুত হন তবে তিউনিসিয়ার পশ্চিম-প্রীতি চিরতরে লুপ্ত হবে।

প্রেসিডেন্ট দ্য গল এ কথা বোঝেন না এমন হতে পারে না। কিন্তু যদি বোঝেন তবে তিনি শ্রীবুরগুইবার সঙ্গে আপসমীমাংসার আলোচনায় আসতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না কেন? অনেকের ধারণা যে, প্রেসিডেন্ট দ্য গল ফরাসী নৌবহরের কর্তাদের চটাতে চান না। আলজেরিয়ার ব্যাপার নিয়ে স্থলসৈন্য এবং বিমানবাহিনীর একাংশ প্রেসিডেন্ট দ্য গলের প্রতি চটে আছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত নৌবাহিনীর আনুগত্য সম্বন্ধে সংশয়বোধের কারণ ঘটেনি। সেইজন্য নৌবাহিনীর মনঃপুত নয় এরকম কোনো কাজ করতে নাকি প্রেসিডেন্ট দ্য গল দ্বিধাবোধ করছেন। কিন্তু এই দ্বিধাবোধ কাটাতে না পারলে ফ্রান্সকে তিউনিসিয়ার সহানুভূতি চিরতরে হারাতে হবে। অবশ্য এই সমস্যার সঙ্গে আরো অনেক ব্যাপার জড়িত আছে—আলজেরিয়ার সমস্যা, সাহারার তৈলসম্পদের ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ত্যাগ করতে না পারলে কোনো প্রশ্নেরই সরল উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

২৩।৭।৬১

ভবঘুরে (১৮)

বিচক্ষণ লোক ঠিক জানে, এই শেষবার, এর পর দোকানী আর ধার দেবে না। হুঁশিয়ার লোক দোকানীর সামান্যতম চোখের পাতার কাঁপন কিংবা তার নিশ্বাসের গতিবেগ থেকে এই তত্ত্বটি জেনে যায়, এবং তারপর আর ও পাড়া মাড়ায় না। নৈসর্গিক পরিবর্তন সম্বন্ধেও সে কিছু কম ওয়াকিফ-হাল নয়। মাঠ দিয়ে যেতে যেতে দিব্য আপনার সঙ্গে নিবিষ্ট মনে কথা বলে যাচ্ছে, যেন অন্য কোনো দিকে তার কোনো খেয়াল নেই, অথচ আকাশের কোন্ কোণে কখন সামান্য এক রত্তি মেঘ জমেছে, কখন একটু-খানি হাওয়া কোন্ দিক থেকে এসে তার টাকের উপর মোলায়েমসে হাত বুলিয়ে গিয়েছে সেটা লক্ষ্য করেছে ঠিকই, এবং হঠাৎ কথা বন্ধ করে বলবে, 'চল দাদা, একটু পা চালিয়ে। ঐ মুদির দোকানে একটুখানি মুড়ি খাবো।' দোকানে ঢোকা মাত্রই কড়কড় করে বাজ আর টিনের ছাতের উপর চচ্চড় করে গামলা-ঢালা বৃষ্টি। তখন আপনার কানেও জল গেল, আপনার হুঁশিয়ার ইয়ার কোন্ মুড়ির সন্ধানে মুদির দোকানে ঢুকেছিলেন।

ট্র্যাম্প মাত্রেরই এ-দুটির কিছু কিছু দরকার। তালেবর ট্র্যাম্পরা তো—কান্টের ভাষায় বলি—মানুষের হৃদয় থেকে আরম্ভ করে আকাশের তারায় গতিনিধি নখাগ্র-দর্পণে ধরে। তারই একজনের সঙ্গে আমার একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল; অনুকূল লগ্নে সে-সব কথা হবে।

ওয়াকিফ-হাল তো নই-ই, দু' ব্যাপারেই আমি বে-খেয়াল। কাজেই কখন যে শান্তা-কাশের আস্যদেশে ভ্রূকুটির কটা ফেটে উঠেছে সেটা মোটেই লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ ঘোরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে গেল—আশ্চর্য! এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না—এবং সঙ্গে সঙ্গে

> কণ্ঠের বরণ যাঁর
> শ্যাম-জলধরোপম,
> গোরী-ভুজলতা যাহে
> রাজে বিদ্যুল্লতা সম,
> নীলকণ্ঠ প্রভু সেই
> করুন সবে রক্ষণ—

আমাকে 'রক্ষণ' না করে রুদ্রের অট্টহাস্য হেসে নামলেন আমার মস্তকে মুষল-ধারে। এরকম হঠাৎ, আচমকা ঘনধার বৃষ্টি আমি আমার আপন দেশেও কখনো দেখিনি।

তবে এটা ঠিক—কালো মেঘের উপর সাদা বিদ্যুৎ খেললে কেন সেটা নীলকণ্ঠের নীল-গলার উপর গৌরীর গোরা হাতের জড়িয়ে ধরার মত দেখায় সেটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হল। বিস্তর বিদ্যুৎ চমকালোও বটে।

আর সে কী অসম্ভব কনকনে সুচীভেদ্য ঠাণ্ডা!

এত দিনে বুঝতে পারলুম, ইয়োরোপীয় লেখকরা ভারত, মালয়, বর্মার মৌসুমী বৃষ্টিতে ভিজে কেন লিখেছেন, ওয়োর্ম ট্রপিকাল রেন্স্। জৈষ্ঠ্যের খরদাহের পর আষাঢ়ের নবধারা নামলে আমরা শীতল হই, সে-বৃষ্টি হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয় না। তাই ইংরেজের কাছে এ বৃষ্টি ওয়োর্ম এবং আনন্দদায়ক। কারণ একে অন্যকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানালে সায়েব বলে, আমি তার কাছ থেকে ওয়োর্ম রিসেপশন পেলুম। আর আমরা যদি বলি, আমাকে দেখেই উনি গরম হয়ে উঠলেন তবে অন্য মানে হয়।

যাক্ এসব আত্মচিন্তা। বাঙলা দেশে মানুষ বহুকাল ধরে তর্ক করেছে, মিষ্টি কথা দিয়ে কোনো জিনিস ভেজানো যায় কি না? কিন্তু উল্টোটা কখনো ভাবেনি—অর্থাৎ মিষ্টি কথা, এ-স্থলে আত্মচিন্তা, দিয়ে 'সেলিকাজেলের' মত ভিজে জিনিস শুকনো করা যায় কি না? আবার এ-বৃষ্টি আসছে চতুর্দিক থেকে, নাগাড়ে এবং ধরণী অবলুপ্ত।

অবশ্য দশ মিনিট যেতে না যেতেই আমার ভিজে যাওয়ার ভাবনা লোপ পেল। অল্প ভেজা থেকে মানুষ আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে কিন্তু ভিজে ঢোল হয়ে যাওয়ার পর তার সে উদ্বেগ কেটে যায়। মড়ার উপর এক মনও মাটি, এক শ' মনও মাটি। কিংবা সেই পুরনো দোঁহা,

> অল্প শোকে কাতর।
> অধিক শোকে পাথর॥

হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলেছি। একটা গাড়ি কিংবা মানুষের সঙ্গেও দেখা হল না। গৌরী ও নীলকণ্ঠও বোধ হয় দ্যু-লোকের পিক্‌নিক্ সমাপন করে কৈলাসে ফিরে গিয়েছেন। বিদ্যুৎ আর চমকাচ্ছে না। ঘোরঘুট্টি অন্ধকার।

অনেকক্ষণ পরে আমার বাঁ দিকে—দিক বলতে পারবো না—অতি দূরের আকাশে একটা আলোর আভা পেলুম। প্রায় হাতড়ে হাতড়ে সামনে বাঁয়ের মোড় নিলুম। আভাটা কখনো দেখতে পাচ্ছি, কখনো না। যখন আলোটা বেশ কিছু পরিষ্কার হয়েছে তখন সামনের কয়েকটা গাছের আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল একটা জোরদার বাড়ির আলো! বাঁচলুম।

কই বাঁচলুম? বাড়ির সামনের সাইন-বোর্ডে আলোতে আলোতে লেখা 'তিন সিংহ'! বলে কি? ঘরে ঢুকে তিনটে সিংহের মুখোমুখি হতে হবে না কি?

নাঃ। অতখানি জার্মান ভাষা আমি জানি। এরা এদের 'বার' হোটেল 'পাব'-এর বিদঘুটে বিদঘুটে নাম দেয়। 'তিন সিংহ', 'সোনালী হাঁস'—আরো কত কী!

দরজা খুলেই দেখি, আমি একটা খাঁচা কিংবা লিফটের মত বাক্সে দাঁড়িয়ে আছি। আমি আমার ভেজা জামা-কাপড় নিয়ে কি করে ঢুকবো সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলুম বলে লক্ষ করলুম, পায়ের তলায় জাফরির ফুটোওলা পুরো রবারের শীট। ভয়ে ভয়ে সামনের দরজা খুলে দেখি বিরাট এক নাচের ঘর প্লাস 'বার্-পাব্'। অথচ একটি মাত্র খদ্দের নেই। এক প্রান্তে 'বার'। পিছনে একটি তরুণী। সাদামাটা কাপড়েই অতি সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি মুখ ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বেশ একটু চেঁচিয়ে বললে, 'ভিতরে আসুন না?' আমি আমার জামা কাপড় দেখিয়ে বললুম, 'আমি যে জলভরা বালটির মত।' বললে, 'তা হোক্।' তার পর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, একটা জাফরির রবারের পর্দা চলে গিয়েছে ঘরের অন্য প্রান্তের বাথরুম অবধি। আমি ঐটে ধরে ধরে বেবাক ঘর না ভিজিয়ে যখন প্রায় বাথরুমের কাছে পেঁৗছেছি তখন মেয়েটি কাউন্টার ঘুরে পার হয়ে আমার কাছে এসে বললে, 'আপনি ভিতরে ঢুকুন। আমি আপনাকে তোয়ালে আর শুকনো কাপড় এনে দিচ্ছি।'

গ্রামাঞ্চলে এরা এসব আকছারই করে থাকে না আমি বিদেশী বলে? কি জানি? শহরে এ রকম ঢোল আপন বাড়ি ছাড়া অন্যত্র কোথাও ঢুকতে কখনো দেখিনি।

শার্ট, সুয়েটার, প্যান্ট আর মোজা দিয়ে গেল। অবশ্য বাহারে নয়। বাহার! হুঃ! আমি তখন গজাসুর বা ব্যাঘ্রচর্ম পরে কৃত্তিবাস হতে রাজী আছি!

চার সাইজের বড় রবারের জুতো টানতে টানতে 'বার'-এর নিকটতম সোফায় এসে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়লুম। মেয়েটি শুধোলে, 'আপনি কি খাবেন?' আমি ক্লান্ত কণ্ঠে বললুম, 'যাচ্ছেতাই।'

এবারে যেন কিঞ্চিৎ দরদ-ভরা সুরে বললে, 'গরম ব্র্যান্ডি খান। আপনি যা ভিজেছেন তাতে অসুখ-বিসুখ করা বিচিত্র নয়। আমার কথা শুনুন। আমি সবাইকে ড্রিংক দি। জানি, কখন কি খেতে হয়।'

আমি তখন ব্রাম্পিণ্ডের অন্নপ্রাশনের দিনেই নিমতলাগমন ঠেকাতে ব্যস্ত। পূর্বোল্লিখিত গজাসুরের গজ-বসাও খেতে প্রস্তুত। বললুম, 'তাই দিন।'

গরম ব্র্যান্ডি টেবিলের উপর রেখে বললে, 'এস্‌সুম্ ভোল জাইন।' এটা এরা সব সময়ই বলে থাকে। অর্থ বোধ হয় অনেকটা 'এটা দ্বারা আপনার মঙ্গল হোক্।'

আমি বললুম, 'ধন্যবাদ। আপনি কিছু একটা নিন।' বললে 'আমার রয়েছে।'

আমি এক চুমুক খাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি 'বার'-এর পিছন থেকে শুধলো, 'আপনি যদি নিতান্ত একা বসে না থাকতে চান তবে আমি সঙ্গ দিতে পারি।' আমি খাড়া হয়ে উঠে বসে বললুম, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। আস্তেজ্জা হোক, বোস্তেজ্জা হোক।' মেয়েটি এসে একটি চেয়ার একটুখানি দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে এক জানুর উপর আরেক জানু তুলে বসলো।

কী সুন্দর সুডৌল পা দুটি!

আপনার ছেলেমেয়েদের সর্দি ও কাশিতে সত্যিকার উপশম দিতে হ'লে

সিরোলিন 'রোশ' খাওয়ান

ছেলেমেয়েদের সর্দিকাশি হ'লে অবহেলা করবেন না—নিরাপদে দ্রুত ও সত্যিকারের উপশমের জন্যে সিরোলিন খেতে দিন। সিরোলিনের চমৎকার স্বাদ ও স্নিগ্ধ আরাম ওদের কাছে ভালো লাগবে। আর আপনার নিজের পক্ষেও সিরোলিন উপকারী। সিরোলিন যে কেবল কাশি বন্ধ করে তাই নয়—কাশির অনিষ্টকর জীবাণুগুলিকেও ধ্বংস করে। সিরোলিন খুব দ্রুত গলা খুসখুসি কমাবে, শ্লেষ্মা দূর করতে সাহায্য করবে ও দুর্দমনীয় কাশিরও উপশম করবে।

বাড়ীতে হাতের কাছে সিরোলিন রাখতে ভুলবেন না।

'রোশ'-এর তৈরী • একমাত্র পরিবেশক : ভোল্টাস লিমিটেড
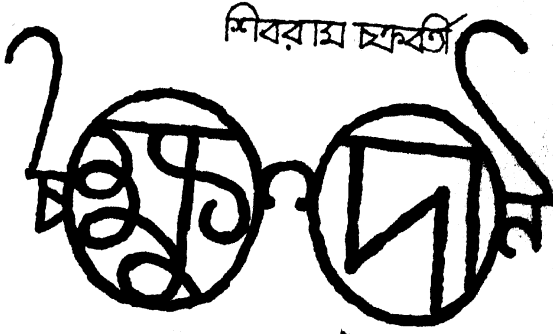
শাল্মাসির মেয়ে ইরাবতীকে নিয়েই হয়েছে মুশকিল।

বেশ চোখা মেয়ে, কিন্তু চোখেই ওর গলদ।

'কে? মেজমামা? এস এস।' সেদিন তাদের বাড়ি যেতেই সাদর অভ্যর্থনা।

'প্রিসিলা নাকি? আমি ভেবেছিলাম বুঝি—' চোখ কচলে আমি বলি।

'ওমা তুমি? আমি ভেবেছিলাম আমাদের নকুড় মামা।' ইরা বলল।

'খুব বুঝি কটাক্ষ খরচ করছিস আজকাল? চোখ খারাপ হয়েছে তোর।' আমি বললাম, 'চোখে ঝাপসা দেখিস নাকি? চশমা নিস না কেন?'

'যা চেহারা! এর ওপর ফের চশমা নিলে আর দেখতে হবে না। ছবি খুলবে আরো।' ও বলেঃ 'আমার তাকানোই সার হবে। কেউ আর আমার দিকে তাকাবে না।'

'ও, বুঝেছি।' আমি বলিঃ 'ছাদনাতলায় চারি চক্ষু মিলনের আগে চশমা নিবিনে?'

'ধরেছ ঠিক। আগে বিয়ে হোক, তারপর ত চশমা। চশমাউলীকে কি কেউ বিয়ে করে? টেকো বরকে কি কেউ সাধ করে চায়? কিন্তু বিয়ের পর টাক পড়লে, কি চশমার দরকার হলে তখন উপায় কি?' ইরা আমাদের বেশ বুদ্ধিমতী। —'বরের খরচায় চশমা কিনব, বাপের টাকায় নয়, বুঝেচ?'

মাসিমার কাছে ইরার চোখের কথাটা পাড়লাম, কিন্তু দেখলাম, ইরার মতই ও'র মত। চশমার চেয়ে বিয়ের দিকেই ও'র নজর বেশি। মানে, ইরার বিয়ের দিকেই।

বললেন, 'ও কিছু না। চোখের একটু দোষ তো? ও বিয়ে হলেই শুধরে যাবে।'

'বিয়ে হলে ঝোঁক সারে বলে শুনেছি, কিন্তু চোখের কথা কি কিছু বলা যায়?'

'ওর ছোট বোন বীরুর বিয়ে হয়ে গেল, অথচ ওর—ওকে নিয়ে যে আমি কী ভাবনাতেই পড়েছি বাবা।'

'ব্রীড়ার মত ওকেও যদি আপনি আমার কথা শুনে গোড়ার থেকেই কো-এডুকেশনের কলেজে দিতেন, তা হলে ওরও বিয়ে হয়ে যেত অ্যাদ্দিন। সামনে খাবার না থাকলে পাখি খুঁটবে কি করে, খুঁটে খেতে শিখবেই বা কি করে?'

'এবার তো দিলাম তোমার কথাতেই।'

'সে তো ওর এই বি-এর বেলায়। ব্রীড়াবতীর মতন ইরাবতীকেও যদি আই-এর সময়েই দিতেন, তা হলে আর এতদিন দেখতে হতো না। কবে বিয়ে হয়ে যেত ইরার।'

'ইরা থাকতে বীরুর বিয়ে হয়ে গেল, ভেবে দ্যাখো, এটা কি ওর প্রাণে বাজে না?'

বাজে বইকি। কথাটা আমায় মানতে হয়। আমাদের প্রাণে ত বাজতই, এমনকি, বাইরের একজনের মনেও বেজেছিল কথাটা।

ব্রীড়ার বরের। সে ত একদিন মুখ ফুটে বলেই ফেলল—কী সব যা তা নাম রেখেছেন মশাই শালীদের? ডেকে সুখ পাই না। যত সব বাজে নাম!'

'কেন, খারাপটা কী রেখেছি, আপনার বৌয়ের নাম কি খারাপ? ব্রীড়াবতী।'

'মরি মরি, কী নাম! উচ্চারণ করতেই দাঁত ভাঙে, ঐ নামে সোহাগ করে কাউকে ডাকা যায়? কেন, নাম কি আর খুঁজে পেলেন না?'

'আমি কী করব? মাসিমা যে বললেন, ইরার পরের মেয়েটির নাম তার সঙ্গে মিলিয়ে রাখতে হবে। তা, অত বড় নামে ডাকতে কষ্ট হয়, আপনি ওকে খাটো করে ডাকতে পারেন।'

'খাটো করে?'

'ক্ষতি কি? স্বামীর কাছে স্ত্রী তো সব বিষয়েই খাটো। লম্বায় চওড়ায়—'

'কী বলে ডাকব?'

'কেন, বীরু বলে। মাসিমা যা বলে ডাকেন।'

'বীরু ত ছেলের নাম। ঐ নামে কি কোনো মেয়েকে ডাকা যায়?' 'সে আমাকে শুধায়ঃ 'ডাকতে মন ওঠে?'

মন ওঠার রহস্য আমি জানিনে, কিন্তু সত্যি বলতে, অতগুলি মেয়ের কোনটারই আমি বদনাম দিইনি। ইরাবতী নামটি মাসিমাই রেখেছিলেন প্রথম মেয়ে হতেই। তার পরেরটি আসতেই তিনি আমার কাছে এলেন—তুই ত কবিতা লিখিস, মেলাতে পারিস বেশ। মেয়েটার একটা ভালো নাম রাখতো। ইরাবতীর সঙ্গে মিলিয়ে যেন হয়।

আমি রাখলাম ব্রীড়াবতী।

তার পরের মেয়েটির বেলাও ফের সেই কথা উঠল। এমনি করে পরম্পরায় মাসিমা মেয়ে আমদানি করতে লাগলেন, আর আমি তাদের নামদানি। মেয়ের সঙ্গে মিলিয়ে নাম আর নামের সঙ্গে মিলিয়ে মেয়ে: মেয়ের নাম আর নামের মেয়ে পরম্পর পাল্লা দিতে দিতে দুজনেই আমরা হিমসিম খেয়ে পড়লাম। আর এই করেই ক্রমে ক্রমে এসে গেল ইরাবতীর পরে ব্রীড়াবতী, ধীরাগতি, মীরাসতী, ক্রীড়ামতি......

'এমনকি, শালীদের নাম ধরেও সুখ নেই।' আমার বোনাইচন্দ্র ফোঁস ফোঁস করেঃ 'কীসব বিদঘুটে নাম!'

'এখনই কী হয়েছে?' আমি বলিঃ 'আরো আছে আমার ইস্টকে......'

হ্যাঁ, আরো আমার ইস্টক রয়েছে। আস্তে আস্তে ছাড়ব—আস্ত একেকখানা। মাসিমার ত মতিগতির স্থির নেই। আরো ভগ্নীরত্ন আমায় উপহার দিতে পারেন। সেজন্য আগের থেকেই আমি প্রস্তুত হয়ে আছি। ইংরেজ সরকারের দশশালার মত আমার শালুমাসি যদি আমার ভগ্নীপতির জন্য দশশালী বন্দোবস্ত করেন, বলা ত যায় না, তার জন্য আমাকে তৈরি থাকতে হয়েছে।

'এর পরের ক্ষেপে আসছে স্থিরাজ্যোতি, হীরামতি, দৃঢ়ারতি...'আমি প্রকাশ করি।

'ছি ছি ছি!' সে ধিক্কার দিয়ে ওঠেঃ 'আপনারা নোংরা লেখেন জানি, কিন্তু তাই বলে কি নামের মধ্যেও রতি যতি এই সব নোংরামো? ছিঃ!'

'কো-এডুকেশনের কলেজে দিতেন'

'শুধু এক রাত্তির তো জ্ঞান আপনাদের?' আমায় ব্যাখ্যা করতে হয়। 'রতি মানে হচ্ছে ভক্তি। দৃঢ়ারতি কিনা, যার ভক্তি হচ্ছে অচলা।' আমার নামাবলী খুলতে থাকে: 'দৃঢ়াবতি, পীড়াক্ষতি...'

'পীড়াক্ষতি? উঃ!' সে আর্তনাদ করে: 'পীড়াক্ষতি—ইস্! ভগবান না করুন?'

'পীড়া হলেই ক্ষতি হয়, কে না জানে? এমনকি, মাসিমার দশমিকার জন্যও আমি তৈরি। সব শেষেরটির নাম হবে চিরাদাধি।'

'কিন্তু মশাই, এটা তো আপনার মিললো না?' এতক্ষণে তার মুখে একটু হাসি ফোটে।

'শেষ জীবনে গরমিল তো হবেই। জানা কথা। তা কী বিবাহিত আর কী অবিবাহিত...জীবনটা শেষকালে বেশ একটু অম্লমধুর নয়কি! বলতে কি, দই-চিড়ের মতই সরেস।'

তা সে যাই হোক, দেখা গেল, অবিবাহিত জীবনের গরমিল কাটিয়ে ইরাবতী বিবাহের রেজেস্টারী-লগ্নে গিয়ে পৌঁছল একদিন।

আমাদের তুমি আশীর্বাদ করো মা

এক সন্ধ্যায় কলেজের এক সহপাঠীকে সঙ্গে করে মাসিমার পায়ে এসে ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম ঠুকল দুজনে—'মা আমাদের তুমি আশীর্বাদ করো মা।'

সেটা বুঝি বোশেখ মাস, বিয়ে হয়ে গেল ইরার। আর বিয়ের পরেই সে চলে গেল শ্বশুরবাড়ি।

যাবার সময় আমি ওর কানে কানে বলেছিলাম—'দ্যাখ, এইবার তোর চশমাটা নিস, কেমন? জানি, চশমার একটা অসুবিধা আছেই। মিষ্টি কিছু খাবার সময় খুলে খেতে হয়......তাহলেও চোখে ঝাপসা দেখাটা তো ভালো না। যথেষ্ট খারাপ হয়েছে আর বাড়াস নে বুঝলি?'

বোশেখে শ্বশুরবাড়ি গেল আর জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠীর দিনে বাপের বাড়ি এল ইরা। একলা নয়, বরকে সাথে করে।

চোখ তুলে দেখলাম, ইরা চশমা নেয়নি তখনো। কিন্তু এই এক মাসেই মুটিয়েছে বেশ। সেই তুলনায় ওর বরকে যেন আরো একটু কাহিল বলে বোধ হল।

মাসিমাও চোখ তুললেন। চোখ তাঁর কপালে উঠল।

তিনি আর দৃকপাত করলেন না। দাঁড়ালেন না এক মিনিট—একটি কথাও বললেন না কাউকে। ইরাকে নয়, তার বরকে নয়। ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

বিনা বাক্যব্যয়ে ছুটলেন তাঁর আলাপী এক চোখের ডাক্তারের কাছে।

'ডাক্তারবাবু, শীগ্‌গির আসুন, আমার সর্বনাশ হয়েছে!'

'কী হল আবার?'

'আমার মেয়ের চোখ দেখতে হবে।'

'এখনই? তার এত তাড়া কিসের? কাল আমার চেম্বারে—'

'না, একটুও দাঁড়াবার সময় নেই। আমার মেয়ের......'

'কোন মেয়েটি বলুন তো?'

'ইরা, সেই যার বিয়ে হয়ে গেল সেদিন।'

'যার বিয়েয় আমরা খুব খেলাম সেই বুঝি? তা, কী হল তার চোখে হঠাৎ?'

'বিয়ের পরে সে শ্বশুরবাড়ি গেছল ত। আজকে ফিরেছে।'

'আজ তো জামাইষষ্ঠী, তাই না? আজই তো বাপের বাড়ি আসার দিন। জামাইকে সাথে করেই এসেছে নিশ্চয়?'

'তা তো এসেছে।' বলে মাসিমা ইঞ্জিনের মতন লম্বা একখানা হাঁফ ছাড়েন: 'কিন্তু যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল......মানে, যাকে বিয়ে করেছিল...মানে...মানে—?' তিনি ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারেন না।

'কেন জামাই আসেনি?'

'জামাই তো এসেছে। জামাই তো বটে। কিন্তু...' তিনি থামেন। একটুখানি ইতস্তত করে বলেন শালুমাসি—'তবে এ-জামাই সে-জামাই নয়।'

'তার মানে?'

'এ আরেক ছোকরা।'

নিষিদ্ধ বই, নিস্পৃহ লেখক

পুরন্দর

মামলা মিটেছে, কিন্তু তার জের মেটেনি। আদালতে বেকসুর খালাস পেলেও লেডি চ্যাটার্লির চরিত্র নিয়ে সংশয় কাটেনি। কাগজে কাগজে এ নিয়ে বিতর্ক এখনও চলছে আর তাতে উত্তাপও কিছু কম সৃষ্টি হচ্ছে না।

ইতিমধ্যে খবর এল, হেনরি মিলারের 'ট্রপিক অব ক্যান্সার'-এর প্রথম আমেরিকান সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রথম মুদ্রণের ত্রিশ সহস্রাধিক কপি প্রায় নিঃশেষিত হয়ে এল।

লেডি চ্যাটার্লির কলঙ্কভঞ্জনের মত 'ট্রপিক অব ক্যান্সার'-এর মার্কিন দেশে আত্মপ্রকাশও সাহিত্যজগতের জোর খবর। কেন-না, শেষোক্ত বইটির ইতিহাস এক হিসাবে লেডি চ্যাটার্লির থেকে চমকপ্রদ।

লেডি চ্যাটার্লির মত এ-বইও প্রথম লেখা হয়েছিল ত্রিশের যুগে। আর হেনরি মিলার যদিও আমেরিকান, এই ত্রিশ বছরের মধ্যে বইটির কোন আমেরিকান সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি।

লরেন্সের মত প্রচার-ভাগ্য নেই মিলারের, নইলে লেডি চ্যাটার্লিকে নিয়ে যে পরিমাণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, 'ট্রপিক অব ক্যান্সার' নিয়ে তার চতুর্গুণ হতে পারত। কথাটা বোধ হয় ঠিক হল না, আসলে মিলার নিজেই কখনও উত্তেজিত আলোচনার কেন্দ্র হতে চাননি।

লাজুক মানুষ মিলার। সর্বদা তিনি ভিড় এড়িয়ে চলেছেন। অত্যন্ত মনোযোগী শ্রোতা। সদালাপী। বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার। তবে সেটা ঘরোয়া পরিবেশে। বক্তা হিসাবে তিনি ব্যর্থ। ভিড়ের মধ্যে তিনি জলের মাছ ডাঙায়।

দীর্ঘকাল দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে দিন কেটেছে তাঁর। এক সময় অবস্থা এমন গিয়েছে যে, সহৃদয় পাঠকদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে কোন এক আমেরিকান পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হয়েছিল তাঁকে। আবেদনের জবাবে সম্পূর্ণ অচেনা মহল থেকে ছোট ছোট অঙ্কের সাহায্য এত পরিমাণে এসেছিল যে, মিলার অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। এখন অবশ্য তাঁর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। গ্রোভ প্রেস 'ট্রপিক অব ক্যান্সার'-এর প্রকাশন-স্বত্বের জন্য ৫০ হাজার ডলার দিতে রাজি থাকা সত্ত্বেও মিলার বইটির আমেরিকান সংস্করণ প্রকাশের অনুমতি দিতে চাননি। সম্মতি আদায় করতে প্রকাশকের তিন বছর সময় লেগেছে।

মিলার নিজে তাঁর এই অনিচ্ছার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন: "আমি আমার বই নিয়ে কোন বিতর্কের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠতে চাই না। রেডিও, টেলিভিসন বা খবরের কাগজে ইণ্টারভিউ দিয়ে আমি আমার লেখার সময় নষ্ট করতে রাজি নই। যাঁদের মতামতের আমি মূল্য দিই, তাঁরা সবাই আমার এই বইটা পড়েছেন। যাঁরা খুঁজে খুঁজে তথাকথিত নোংরা শব্দগুলি বের করে পড়বার জন্য আমার বই কিনতে চান, তাঁদের প্রতি আমার কোন ঔৎসুক্য নেই।"

মিলার 'ট্রপিক অব ক্যান্সার' লিখেছিলেন ১৯৩১ সালে। তিনি তখন ফ্রান্সে। ১৯৩৪ সালে ফ্রান্সেই বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মিলারের বয়স তখন ছিল ৪৩। ১৯৩৯ সালের মধ্যে ফ্রান্সে বইটির পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার পর বহু-

হেনরি মিলার
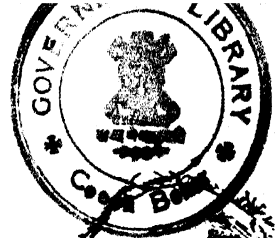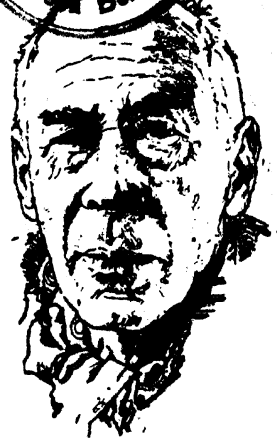
সংখ্যক আমেরিকান সৈন্য ফ্রান্সে আসেন। তাঁরা মিলারের এই বইটি আবিষ্কার করেন। তাঁদের মনে হয়, মিলার যেন যুদ্ধোত্তর যুগের মানুষদের উদ্দেশ করেই বইটি

লিখেছেন। উপন্যাসটি পড়ে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে যান।

ততদিনে মিলার আমেরিকা ফিরে এসেছেন, নিজ দেশে খ্যাতিও অর্জন করেছেন কিছুটা। তিনি তখন কালিফোর্নিয়া উপকূলে একটা বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বাস করতেন। পাহাড়ের গায়ে তাঁর ছোট্ট বাড়িটা এই সময় শত শত গুণমুগ্ধ পাঠকের তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

'ট্রপিক অব ক্যান্সার' তখনও আমেরিকায় প্রকাশিত হয়নি। যাঁরা ফ্রান্সে যেতেন, তাঁরা কেউ কেউ বইটা সংগে করে আনতেন।

আট বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক 'ট্রপিক অব ক্যান্সার' ও তার সহচর বই 'ট্রপিক অব ক্যাপরিকর্ন' ডাকযোগে আমেরিকা পাঠান। ডাক বিভাগ বই দুটি বাজেয়াপ্ত করে। মামলা আদালতে গড়ায়। সানফ্রান্সিসকোর জনৈক ফেডারেল জজ রায় দেন বইটি অশ্লীল।

সাহিত্য সমালোচকেরা অবশ্য এ মতে সায় দেননি। ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিক লরেন্স ডারেল বলেছেন, 'ট্রপিক অব ক্যান্সার'-এর স্থান 'মবি ডিক'-এর পাশেই। আমরা সাধারণত একটা বাঁধাধরা সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে শিল্পের বিষয়বস্তুকে আবদ্ধ করে রাখি। এটি এমন একজন লেখকের বই, যাঁর নিজের প্রতি সততা এই সংকীর্ণ গন্ডীর সীমানাকে অতিক্রম করেছে।' অনেক লেখক এবং সমালোচকই বইটি সম্পর্কে এই মত পোষণ করেন। তাঁরা সকলেই স্বীকার করেন, বইটিকে শিল্পকর্ম হিসাবেই গণ্য করতে হবে। কিন্তু তাই বলে নীতিবাগীশেরা হার মেনেছেন তা নয়।

আমেরিকায় অবশ্য অশ্লীলতা-নিরোধক কোন কেন্দ্রীয় আইন নেই, তবে পুলিসের চোখে যে বই অশ্লীল, তার প্রচার বন্ধ করা এবং সে বইয়ের লেখক, প্রকাশক ও বিক্রেতাকে শায়েস্তা করার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে নানা আইন, অর্ডিন্যান্স ইত্যাদি আছে। কেন্দ্রীয় সরকারও ডাক বিভাগ ও শুল্ক বিভাগের মারফত এ ধরনের বইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। পোস্ট মাস্টার জেনারেলের যদি মনে হয়, বইটি অশ্লীল তা হলে বইটি খুলে তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন (অবশ্য প্রথম শ্রেণীর ডাকা ছাড়া)। পরীক্ষা করে যদি মনে হয় তাঁর সন্দেহ ভিত্তিহীন নয়, তা হলে তিনি আইনগত অভিমত নিয়ে বইটির বিতরণ স্থগিত রাখতে পারেন। একমাত্র উচ্চতর আদালতেই এই অভিমতের বিরুদ্ধে আপীল করা চলে। এবং করা হয়ও। এই ধরনের বই ইত্যাদির জন্য প্রেরিত অর্থ ফেরত দেবার নির্দেশও দিতে পারেন পোস্ট মাস্টার জেনারেল।

গত মাসে 'ট্রপিক অব ক্যান্সার' প্রকাশিত হলে পোস্ট মাস্টার জেনারেল যথারীতি বইটির বিতরণ বন্ধ করার জন্য আইনগত অভিমত চেয়ে পাঠান। কিন্তু এবারে আইন বিভাগ কোন নির্দেশ দেননি। বইটি বিদেশ থেকে আমদানি করা সম্পর্কে আদালতে শুল্ক বিভাগের নির্দেশের বিরুদ্ধে একটি মামলা চলছে। এই মামলার ফলাফলের জন্য তাঁরা অপেক্ষা করে আছেন।

শুল্ক বিভাগ রাজস্ব বিভাগের অধীন। রাজস্ব বিভাগ শুল্ক বিভাগ মারফত বিদেশ থেকে অশ্লীল গ্রন্থাদি আমদানি রোধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। গ্রহণ করেনও। তাঁদেরই কর্মতৎপরতার ফলেই মিলারের 'ট্রপিকস' সিরিজের বইগুলি সাতাশ বছরের মধ্যে প্রকাশ্যে আমেরিকায় আসতে পারেনি।

এবারে আদালত রাজস্ব বিভাগের নির্দেশ নাকচ করে দেবেন—এরূপ আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে। ইদানীং শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে আদালতের মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। 'ট্রপিক অব ক্যান্সার'-এর প্রকাশক গ্রোভ প্রেস 'লেডি চ্যাটার্লি'র' অবর্জিত সংস্করণও প্রকাশ করেছেন। আদালতের রায় অনুসারে গ্রোভ প্রেস এ-বইটি ডাক মারফত বিতরণের অধিকার অর্জন করেছেন।

আশা করা যেতে পারে আদালতের রায়ে 'ট্রপিকস্' সিরিজের গ্রন্থগুলি রাহুমুক্ত হবে। অন্তত তা হলে শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের সুস্থ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাবে।

পত্রাবলী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ১৯৬ ॥

ওঁ

দার্জিলিং

কল্যাণীয়াসু,

ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিবাদল চলচে কিন্তু দাম্পত্যকলহের মতো, রৌদ্র দেখা দিতেও বিলম্ব হয় না। ঐ ওদিকটাতে পাহাড়ের গায়ে কুয়াশা, আবার আমাদের দিকে আগুনভরা রোদ্দুর। আমি আছি সামনের দিকে একটি ছোট্ট কুনো ঘরে জানলা খুলে। আসবাবের মধ্যে একখানা টেবিল ও চৌকি ও একটা বেতের আরাম কেদারা। টেবিলখানা বই, কাগজ, কলম, পেন্সিল, ওষুধের শিশি, কালির বোতল, প্রত্যুত্তরণীয় চিঠি ও স্বাক্ষরণীয় অটোগ্রাফের বই প্রভৃতিতে পরিকীর্ণ। প্যাসেঞ্জারে ঠাসা বারুণীস্নানের দিনে থার্ড ক্লাসের গাড়ির মতো। চিঠি লেখা প্রভৃতি কাজে যখন ব্যবহার করতে যাই তখন ভিড় করা জিনিসগুলো যেন হাঁ হাঁ করে ওঠে, কোনো মতে কনুই ঠেকিয়ে রাখবার একটুখানি জায়গা পাওয়া শক্ত। ক্ষণে ক্ষণে এই জানলাটার উপর পুপে এসে চড়ে বসে, এইটে হচ্চে তার জাহাজ, —আর সমস্ত ঠিক আছে কেবল এঞ্জিনটা চলে না—কাপ্তেন শুনতে পাই কোনো একটা অলক্ষ্য জায়গায় আছে কিন্তু তার অবস্থা আমারই মতো—কোনো কাজ নেই, নড়াচড়া সম্পূর্ণ স্থগিত। এ ছাড়া পুপের একটি ঘোড়া আছে—সে হচ্চে ছোট একটি বেতের মোড়া, একটা দড়িতে বাঁধা। জাহাজের সঙ্গে তার রফাত এই যে, তাকে টান দিলে সে চলে,—পুপের হাতে একটি ছোট কঞ্চির ছড়ি আছে, চালনার জন্যে নয় কেবলমাত্র সমারোহের জন্যে। মাঝে মাঝে তাতে আমাতে মিলে গল্পের ডুয়েট চলে। পাল্লারাম নামক এক ব্যক্তির জীবনী। তার ভবদুঃখ নিবারণের উদ্দেশ্যে আমি তার কাহিনীটাকে নানাপ্রকার দুর্ঘটনার যোগে যতই সমাপ্ত করতে চাই ও আবার নিতান্ত অসম্ভব পথে তার পুনরাবর্তন ঘটায়—ঐ বালিকার উপদ্রবে পাল্লারামের নির্বাণমুক্তি অসম্ভব হয়েচে। যখন দেখি গল্পটার বৈচিত্র্য আর থাকে না তখন পাল্লারামের এক খুড়ো জুটিয়ে আনতে হয়,—তার সত্যতার প্রমাণের জন্যে তার একটা ছবিও এঁকেচি। ফরমাশ হয়েচে পাল্লারামের দিদিরও একটা ছবি চাই—সংসার বেড়ে চলচে। দিদির ছাতিটা গেছে চুরি, তাই নিয়ে আপাতত খুব হাঙ্গামা বেধেছে। পাল্লারাম আমার কাছে এসে চোখ রাঙায়, আমি তাকে একটা ব্যাঙের ছাতা দেব বলে এখনকার মতো ঠেকিয়ে রেখেচি, কিন্তু ব্যাঙের ছাতা পাই কোথায় ঃ ইতিমধ্যে দিদির ওখানে একটা ভোজও হয়ে গেছে—হরলিক্স মিল্ক, লাউ ডাঁটা ও আমসত্ত্ব সহযোগে ভেটকি মাছের ল্যাজা ও কানকা দিয়ে একটা কাঁটাচচ্চড়ি হয়েছিল—পাল্লারাম সেটা ফুর্তি করে খেতে গিয়ে তার গলায় কাঁটা বিঁধে গেল—ভাবলেম এই সুযোগে যদি পাল্লারামের লীলা সাঙ্গ হয় তাহলে একটু ছুটি মিলবে। কিন্তু দয়াময়ী কাঁকড়ার দাঁড়া দিয়ে সেটা তুলে ফেললে। বুঝতে পারবে এর থেকে গল্পটা করুণরসে আগাগোড়া ভরা কিন্তু কোথাও এর যবনিকাপতন নেই।

এই তো গেল পুপে। ওদিকে তোমাদের হেমলতা মাসী আছেন। তিনি ধরেছিলেন বারো দিনে নটীর পূজা করাতে হবে। দুচার দিন রিহার্সাল দেওয়াও গেল, শেষ পর্যন্ত পৌঁছল না। পাল্লারামের মতো অক্ষয় পরমায়ু এর নেই—গোড়ার দিকেই কণ্ঠরোধ হলো, তার পরে আর ডাক্তারি খাটল না।

অপূর্ব (১) এখানকার ক্ষণিক রোদ্দুরের মতো মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়। লাটের মহলে যাতায়াত করে থাকে এমনতরো গুজব। হঠাৎ কোনদিন হয়তো সার উপাধি পাবে—ও উপাধিটা আজকাল খুব দুর্মূল্য ও দুর্লভ নয়।

এইবার স্নান করতে যাই। বেলা হলো, এগারোটা বেজেচে। পাল্লারাম এখন হাটে আম ও জবাকুসুম তৈল এবং শুঁটকি মাছ ও স্বদেশী ফাউন্টেন পেন বিক্রি করতে গেছে, এই অবকাশে আমার প্রাত্যহিক কাজগুলো সেরে নিতে পারি। ইতি ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮।

কবি

১। শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ

॥ ১৯৭ ॥

ওঁ

দার্জিলিং

কল্যাণীয়াসু,

মণ্টুকে (১) চিঠি লিখে তোমারই হাতে সমর্পণ করলুম। তোমাকে মধ্যবর্তিনী করে নিশ্চিত ফল লাভ করব এই বিশ্বাস আছে এবং প্রমাণও পেয়েছি। অতএব আশার বশবর্তী হয়ে আরো একটা নিবেদন করি। ছুটির মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এল, আর অল্পকালের মধ্যেই শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিতে হবে। নিশ্চয় জানো এবার বিশ্বভারতীর নূতন সংস্করণ আসন্ন। অনেকটা নড়চড় হচ্চে—আপিস শান্তিনিকেতনে নতুন বাসা নেবে। কথা ছিল কিশোরীকে (২) আপিসের সঙ্গে সঙ্গেই ওখানে পাওয়া যাবে, তা হলে ধারাবাহিকতার বিচ্ছেদ হবে না। কিশোরীর সঙ্গে মোকাবিলায় এ কথা অনেকবার হয়েচে এবং তার সম্মতি পেয়েচি। চারুবাবুকেও (৩) সানুনয়ে এই প্রস্তাব জানিয়েছি, তিনিও অনুমোদন করে, প্রতিশ্রুতি দিয়েচেন। কিন্তু উভয়ের কাছে চিঠি লিখে এ সম্বন্ধে কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। চিঠির উত্তর দেওয়া সম্বন্ধে আমার নিজের কন্স্যান্স সজাগ বলেই প্রয়োজনীয় চিঠির জবাব না পেলে মনটা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। চারুবাবু হয়ত ছুটিতে গরঠিকানা, অথবা আর কোনো বাধা আছে দূরের থেকে বুঝতে পারচিনে। কিশোরীকে রথী চিঠি লিখেছিলেন, তার ফলাফল সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা নেই। (রথী থাকেন অন্যত্র, প্রায় দেখা হয় না)।—মনে হচ্চে যেন যথাসময়ে উত্তর আসেনি। এ সম্বন্ধে একটা জবাব তুমি যথাস্থান থেকে সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিয়ো। জবাবটাকে অনুকূল করবার পক্ষে যদি যথোচিত আনুকূল্য করো তা হলে পুণ্যলাভ করবে। কারণ, কর্মভার যদি লাঘব না হয় তা হলে পীড়িতের পীড়ার দুঃখ দুঃসহরূপে বেড়ে উঠবে—মানসিক তাপের পরিমাণ নিঃসন্দেহ একশোর কোঠা ছাড়িয়ে যাবে। এই গেল নম্বর এক।

দ্বিতীয় একটা দরবার চারুবাবুকে জানিয়েছিলুম, সেটাও তোমাকে বলি। আমার গ্রন্থভান্ডারটা জোড়াসাঁকোর একতলা থেকে আশু সরাবার সময় হয়েছে। দরিদ্রের প্রয়োজনবশত। এ কথারও আলোচনা পূর্বে হয়ে গেছে। অধিকাংশ বই শান্তিনিকেতনে চালান দেবার কথা ছিল। যদি তা সম্ভব না হয় তবে কলকাতার অন্যত্র কোথাও ব্যবস্থা করতে ত্বরান্বিত হওয়া উচিত হবে। অবশেষে তোমারই শরণাপন্ন হলুম—আর কিছু না হোক খবর একটা কিছু পাবো। তৃতীয় দরবারটা একদা তোমারই কাছে পেশ হয়েছিল। সে হচ্চে আমার কোনো কোনো গ্রন্থের বিক্রয় স্বত্ব সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত সীমানা নির্ণয় নিয়ে। কিশোরীর সঙ্গে মোকাবিলায় আলোচনার প্রতীক্ষায় ছিলুম। দেখা পেলুম না, চারুবাবুকেও লিখেচি, উত্তরের প্রতীক্ষায় আছি। কাজের চিঠি লিখতে সহজে কলম সরে না। নিতান্তই কাজ করতে হবে বলেই এ সমস্ত রসসাহিত্যের বহির্ভূত রচনাতেও অগত্যা জড়িত হতে হয়। অমিয় নেই তাই এখানে এসে বিস্তর বিজনেস্ চিঠি লিখেচি, কুলপ্রদীপ রচনার মতো তেল এক ফোঁটা বাকি রইল না। এখনো বেঁচে আছি, এতে দার্জিলিঙের স্বাস্থ্যকরতার প্রমাণ হয়। ইতি ২ আষাঢ় ১৩৩৮

অধিষ্ঠাতা আচার্য

পুনঃ—মণ্টু রাশিয়ার চিঠি চেয়েছে—তাকে পাঠিয়ে দিতে বোলো।

১। শ্রীদিলীপকুমার রায়, ২। ৺কিশোরীমোহন সাঁতরা, ৩। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

॥ ১৯৮ ॥

ওঁ

দার্জিলিং

কল্যাণীয়াসু,

আজ আষাঢ়ের দ্বিতীয় দিনে বোধ হচ্চে বর্ষা নামল। নিশ্চয় তোমাদের ওখানেও বর্ষণ হয়ে থাকবে। খবর যদি পাই তো নেমে যাব। কারণ, পাহাড়ে বর্ষা একেবারে ঘিরে ফেলে, যেন মাতৃগর্ভের মধ্যে শিশুর মতো নিজেকে আবৃত বোধ হয়, মুক্তভাবে বর্ষার সমগ্র রূপ দেখতে পাইনে। শান্তিনিকেতনে তার প্রকাশ অবারিত, পরিপূর্ণ সমারোহে। গেল বৎসরে ছিলেম প্রবাসে, সজল-জলদ শ্যামকান্তের অভ্যর্থনা থেকে বঞ্চিত হয়েছি, তাই মনটা উৎসুক হয়ে আছে। প্রত্যেক বছরে বর্ষায় বর্ষায় বড়ো বড়ো বনস্পতি আপন জীবনের পরিধি বাড়িয়ে নেয়, তার গুঁড়ির ভিতরকার চক্রচিহ্নে সেই তার পরিণতির ইতিহাস অঙ্কিত থাকে। প্রত্যেক বৎসরের বর্ষার আনন্দ আমাদেরও মনের মজ্জার মধ্যে কিছু রস-সম্পদ যোগ করে দিয়ে যায়—জীবনের পটভূমিকায় প্রত্যেক বারেই কিছু রং নিবিড়তর করে মাখিয়ে দেয়—যে বৎসরে অভাব ঘটে নিশ্চয় সে বৎসরে দৈন্যশীর্ণতার চিহ্ন থেকে যায়। অন্তত আমি এ কথা নিশ্চিত করে বলতে পারি, নিরালায় জানলার কাছে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে আমি যে নিষ্কর্মা প্রহরগুলো কাটিয়েছি তারা আমার প্রাণভান্ডারে কিছু কিছু করে স্থায়ী সম্পদ দিয়ে গেছে। সেই পাওয়ার আনন্দ আমাকে এমন গভীর করে পূর্ণ করে। জীবনের সমগ্রতাকে বিশ্লেষণ করে দেখলে এমন কত শত অনামা মুহূর্তের সঞ্চয় পুঞ্জিত আছে দেখা যেত। বহু বিচিত্রের সমবায়ে এই আমার সমগ্রতাকে নিয়ে যে পরিপূর্ণ পরিচয়, কোনো লোকে কোনো যুগে তার অবগুণ্ঠন উদ্ঘাটিত করে একদিন কি কোনো দিব্য দৃষ্টির সামনে তাকে কেউ দাঁড় করাবে? নইলে এ কি আবার বিশ্লিষ্ট হয়ে ছড়িয়ে যাবে? আমার নিজের কাছেও তো এর সবটা স্পষ্ট করে দেখা দেয়নি, অনেকখানি প্রচ্ছন্ন আছে, বাইরের অন্য দর্শকের কাছে আরো বেশী প্রচ্ছন্ন—এর ব্যক্ত ও অব্যক্ত সবটা নিয়ে এ কারো জ্ঞানগোচর না হয়েই কি অন্তর্ধান করেচে? আমি যে বিরাট মানবের কথা আমার ইংরেজি বইয়ে লিখেছি তাঁর মধ্যে আমার প্রকাশ অবারিত—এমন প্রকাশ যা আমার বর্তমানকে ছাড়িয়ে গেছে, এমন কি, যা আমার বর্তমানের অনেকখানিকে প্রতিবাদ করে। সকালে যখন সকলেই নিদ্রিত আমি একলা বারান্ডায় বসে বসে তাঁরই স্পর্শ অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে অব্যবহিত কালের সুখদুঃখের সীমা অতিক্রম করতে চেষ্টা করি। তা যখন না করতে পারি তখনি বর্তমানের সঙ্গে কেবলি খিটিমিটি বাধে, ভাগ্যের সঙ্গে কলহ প্রবল হয়ে ওঠে, অত্যন্ত ছোট হয়ে যাই। তাং বেদ্যং পুরুষং বেদ।। ইতি ২রা আষাঢ় ১৩৩৮।

কবি

॥ ১৯৯ ॥

ওঁ

জোড়াসাঁকো

কল্যাণীয়াসু,

রানী, ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে বিজ্‌নেস, কয়দিন তারি জালে জড়িত আছি। এই বৈষয়িক দুর্গতির দুঃখ এমন জাতের যে এর পীড়ন একলাই ভোগ করতে হয়। কাল রাত্রে পালা শেষ হবার কথা ছিল। ভেবেছিলাম আজ তোমাদের ওখানে গিয়ে দর্শন দিয়ে ও নিয়ে আসব। আজ বউমারা এসেচেন—তাঁর শরীর বিশেষ খারাপ। উদ্বিগ্ন আছি। আশা করি তোমার অবস্থা অচল নয়।

কবি

কবি এ চিঠিতে তারিখ দেননি কিন্তু আমি তখনি তারিখটা বসিয়ে রেখেছিলাম। এটা ৯ই জুলাই ১৯৩১-এ লেখা।

॥ ২০০ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

রানী, যেদিন পত্র পাবে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে কলকাতায় পৌঁছব—পরদিন ভূপালে যাত্রা। ইতি ৩০শে আষাঢ় ১৩৩৮।

কবি

॥ ২০১ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রানী, বেশ একটু লজ্জিতভাবে এই চিঠি লিখতে বসেচি। কলকাতায় যাব সংকল্প করে তোমাকে একখানা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম। আমার সঙ্গে ছিলেন দুজন বিরহী ও একজন কাজের লোক। বর্ধমানে গাড়ি পৌঁছতেই তাঁরা আমার মালপত্র নামিয়ে আমাকে প্রায় সবলে অবতারণ করলেন। তাঁদের পক্ষে সুযুক্তিও অনেকগুলি ছিল। এবার মনে মনে স্থির করেছিলুম বরাহনগরে আশ্রয় নেব—উপযুক্ত পাচকের অভাবকেও উপেক্ষা করে এমনকি সেখানকার জলবায়ুর অস্বাস্থ্যকরতাকেও গ্রাহ্য না করে। বিধিবিপাকে ঘটল না। আর কোনো একটা উপলক্ষ্য পাওয়া যাবে বলে আশা রইল।

এখানে শ্রাবণের সমারোহ খুব জমেচে। আকাশ মেঘৈর্মেদুর, বনভূমি শ্যামা। বর্ষণমুখর প্রহরগুলি সরস আলস্যে মনকে আবিষ্ট করে ধরেচে। চোখ জুড়িয়ে গেল শ্যামলতায়। তোমাকে আসতে বলি এমন সাহস নেই। অথচ আকাঙ্ক্ষা আছে। এলে খুশি হবে সন্দেহ নেই। আনন্দের আয়োজন জলে স্থলে শূন্যে এবং আশা করি আমাদের ঘরের মধ্যেও উদ্যোগের ত্রুটি না হতে পারে।

ভূপাল ঘুরে এলুম। নগদ বিদায় ঘটেনি, আশ্বাস মিলেচে যথেষ্ট। নিজের গ্রহের উপর বিশ্বাস নেই—উপসংহারে কি দাঁড়াবে বলা যায় না। ইচ্ছা করে সকল দায় ঘাড়ের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে কোনো একটা অজ্ঞাতবাসে অবকাশের ঐশ্বর্য ভোগ করি।—এই প্রসঙ্গে একটা আশার কথা মনে উঠল। বউমার কাছে শুনলুম খড়দহের বাগান তাঁদের পছন্দ হয়েচে। ঐখানে আমাদের দুটো বোট আনিয়ে উভচর হয়ে থাকবার খুব সুবিধে আছে। অনেকদিন থেকে গঙ্গাতীরে নৈষ্কর্মসাধনার অভিলাষ মনে পোষণ করে এসেচি। ইচ্ছা পূর্ণ হবে বলে ভরসা হয়নি। জীবনের গোধূলি বেলায় এই ইচ্ছাটা চুকিয়ে যেতে পারব কি? বউমা বললেন প্রশান্তর উপর ভার দিয়ে এসেচি। আমি বললুম প্রশান্তর সেখানে এসে ঔৎসুক্যের অবসান হয়তো সমাপ্ত হলো। তোমাদের দেখিয়েছে, তোমরা ওর পছন্দকে স্বীকার করেচ—বাস্। তারপরে যেটুকু সেটা অবান্তর। নৈর্ব্যক্তিক পরিকল্পনার পরে আসে ব্যক্তিগত ফলের কথা—কিন্তু সেইখানটাতে গীতার বচন এসে পড়ে মা ফলেষু কদাচন। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে প্রশান্তর বৈজ্ঞানিক বৈরাগ্য নেই বলে আমার বিশ্বাস। তাই তোমার কাছে দরবার করচি ওকে একটু তাগিদ কোরো। শিলাইদহ যদি আমার আয়ত্তের মধ্যে থাকত তা হলে ভাবতুম না, কিন্তু সেখানকার সুযোগটা চলে গেছে। জোড়াসাঁকোয় মন বসে না—শান্তিনিকেতনে কাজের দাবি অন্তহীন, কিন্তু ঠিক নিজের কাজটি জমাতে পারিনে। সেইজন্যে লেখায় এমন শৈথিল্য ঘটচে। তা হোক, অনেক লিখেচি, না লিখলেও চলে, কিন্তু অনুকূল অবকাশে নিজের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে বসতে ভারি ইচ্ছা করে। নিজের উড়ো মনটাকে রঙীন আকাশের মধ্যে উধাও করে বাল্যকালে জীবন শুরু করেচি, মাঝখানে এসেচে কর্মের যুগ, এখন জীবযাত্রা শেষ করতে হবে নিজের বন্ধনহীন মনকে নিয়ে পুনরায় সেই উদার অবকাশে। তাই ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গাকে স্মরণ করি। ছেলেবেলায় একদিন পেনেটির বাগানে আমার মন একরকম মুক্তি পেয়েছিল, সেটা ঘটেছিল সম্পূর্ণ তোমাদের অগোচরে, আজ যদি পেনেটির পরের স্টেশনে খড়দহের বাগানে লাগাম খসিয়ে মনটাকে দৌড় দিতে পারি তা হলে জীবনসঙ্গীতের তান মান লয় সমে এসে থামতে পারে, সেটা তোমাদের চোখের সামনে হয়ে যাক—তারপরে নীরব হবার বীণা মুরজ মন্দিরা—দিগন্তের শেষ মেঘে দিনান্তের শেষ রশ্মির পর্যবসান। ইতি ৯ই শ্রাবণ ১৩৩৮

কবি

এখানে শ্রাবণের পূর্ণিমা আসচে আগামী বুধবারে—এই শ্রাবণী পূর্ণিমার তিথি এখানকার শ্যামল প্রান্তরে বৎসরে একটিবার মাত্র আসে।

কবির জন্যে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর খড়দহে গঙ্গার ধারে একটা বাগানসুদ্ধ বাড়ি ৩ বছরের জন্যে ভাড়া নিয়েছিলেন। কবি অনবরত গঙ্গার ধারে বাস করবার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন বলে আমরা গঙ্গার ধারে কোনো বাড়ি খালি আছে জানতে পারলেই খোঁজ নিয়ে আসতাম। এই বাড়িটা আমাদের দেখে বেশ পছন্দ হয়েছিল বলে রথীবাবু এবং প্রতিমা দেবীকে নিয়ে গিয়ে দেখাই। তাঁদেরও পছন্দ হওয়ায় এই বাড়ি কিছুকালের জন্য তাঁরা ভাড়া নিয়েছিলেন। বাড়িখানা পুরোনো আমলের মস্ত মোটা মোটা থামওয়ালা—গঙ্গার উপরেই একটা চওড়া বারান্দা এবং তার দুপাশে ঘর। কবিরও এ বাড়ি খুব পছন্দ হয়েছিল।

॥ ২০২ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

তোমার স্বাক্ষরিত খামটি দেখে মনে পরিতাপমিশ্রিত আশঙ্কা জন্মেছিল। রাগ করেচ নিশ্চয়, করলেও তোমাকে রাগী বলে নিন্দা করব না। অনুকূল অবকাশে তোমার মনকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করব।

মণ্টু একরাশ পত্র পাঠিয়েছে, রানী মামীকে দেখিয়ে তারপরে আবার তাকে ফেরত পাঠাবার প্রস্তাব চিঠির মধ্যেই আছে। সেই সঙ্গে আরো একটা প্রস্তাব আছে, তোমাকে আমার সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত করা। তার জবাব তুমি নিজেই তাকে জানিয়ো। যদি রাজি থাকো তা হলে ইতিমধ্যে ব্যাকরণে ষত্বণত্ববিধান আলোচনা করে বানান শুদ্ধ করে নিয়ো।

এখানে কবে আসচ আগে থাকতে জানিয়ে রেখো। স্টেশনে গাড়ি পাঠিয়ে দেব—বাসার জন্যে এ বাড়ির সর্বোচ্চশিখরে তোমার স্থান হবে। ইতিমধ্যে আমার হয়েচে স্থানান্তর। অবতরণ করেচি একতলায়। বউমারা গেছেন দ্বিতীয়তলায়। তৃতীয়তলা অপেক্ষা করে আছে অতিথির জন্যে। বাতাস স্নিগ্ধ, ধরণী নবদূর্বাদলশ্যাম, জলভারমন্থর মেঘ দিগন্তশয্যায় অলসিত। ইতি ১০ই শ্রাবণ ১৩৩৮।

কবি

গান্ধীজীর অসহযোগ ও রবীন্দ্রনাথ

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

মহাত্মা গান্ধীর চরকার চক্রচিহ্নিত অসহযোগ আন্দোলনটি রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে সমর্থন করিতে পারেন নাই। এই অসহযোগ আন্দোলন এবং চরকা আন্দোলন লইয়া গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্ব সম্বন্ধে কবির মনে যে একটা হতাশা দেখা দিয়াছিল, কবি তাহা গোপন করিবার কোনও চেষ্টা করেন নাই; প্রকাশ্য ধিক্কারলাভের সকল সম্ভাবনা জানিয়াও সেসব কথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন।

গান্ধীজী সম্বন্ধে কবির নৈরাশ্যের কারণ ছিল, তিনি গান্ধীজীর নিকটে যাহা পাইয়াছিলেন, আশা করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। তথাকথিত ভারত-স্বাধীনতার আদর্শ কবির মনে কোনো দিনই তেমন একটা আগুন ধরাইয়া দেয় নাই। স্বাধীনতার কথা তিনি ভাবিতেন না বা স্বাধীনতা তিনি চাহিতেন না এমন নহে, তাঁহার ধারণা ছিল, আর একটা বড় জিনিসই হইল আমাদের প্রাপ্য; তাহা পাওয়া হইলে স্বাধীনতাকে আর জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া পাইতে হইবে না, যথার্থ অধিকারের বলে তাহা আপনা হইতেই পাওয়া হইয়া যাইবে।

এই বড় জিনিসটি হইল কি? তাহা হইল মুক্তি—চিত্তের সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি। রবীন্দ্রনাথ আশা করিয়াছিলেন, মহাত্মাজী এই পরিপূর্ণ মুক্তির আহ্বানেই দেশবাসীকে জাগ্রত করিয়া তুলিবেন; কিন্তু দেখা গেল, তাঁহার মুক্তির ডাক আসিল অত্যন্ত একটা সংকীর্ণ ক্ষেত্রে, যাহার মধ্যে রাজশক্তি পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু দেশবাসীর পরিপূর্ণ চিত্তমুক্তির সম্ভাবনা নাই। গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশে যখন অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হয় (১৯২০-২১), রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ করিতেছিলেন। বিদেশ হইতেই তিনি চিঠিপত্রে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে কিছু কিছু মতামত প্রকাশ করেন। দেশে ফিরিয়া তিনি বলিলেন—

"প্রেমের ডাকে ভারতবর্ষের হৃদয়ের এই আশ্চর্য উদ্বোধন, এর কিছু সুর সমুদ্রপারে আমার কানে গিয়ে পৌঁছেছিল। তখন বড়ো আনন্দে এই কথা আমার মনে হয়েছিল যে, এইবার এই উদ্বোধনের দরবারে আমাদের সকলেরই ডাক পড়বে, ভারতবাসীর চিত্তে শক্তির যে বিচিত্র রূপ প্রচ্ছন্ন আছে, সমস্তই প্রকাশিত হবে। কারণ, একেই আমি আমার দেশের মুক্তি বলি; প্রকাশই হচ্ছে মুক্তি। ভারতবর্ষে একদিন বুদ্ধদেব সর্বভূতের প্রতি মৈত্রীমন্ত্র নিজের সত্যসাধনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন; তার ফল হয়েছিল এই যে, সেই সত্যের প্রেরণায় ভারতের মনুষ্যত্ব শিল্পকলায় বিজ্ঞানে ঐশ্বর্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রশাসনের দিক থেকে সে দিনও ভারত বারে বারে এক হবার ক্ষণিক প্রয়াসের পর বারে বারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু তার চিত্ত সুপ্তি থেকে, অপ্রকাশ থেকে মুক্তিলাভ করেছিল। এই মুক্তির জোর এত যে, সে আপনাকে দেশের কোনো ক্ষুদ্র সীমায় বদ্ধ করে রাখতে পারেনি, সমুদ্রপারেও দূরদেশকে সে স্পর্শ করেছে, তারই চিত্তের ঐশ্বর্যকে সে উদ্ঘাটন করেছে।"...

রবীন্দ্রনাথ আশা করিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানও বুদ্ধদেবের আহ্বানের মত দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে গিয়া পৌঁছিবে—সে আহ্বান সকল চিত্তকে জড়তাবন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া নিজ নিজ প্রকাশের পথে বিকাশের পথে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিবে, শুধু সুতা কাটিয়া খদ্দরের সৃষ্টির জন্যে নহে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সাহিত্যে-শিল্পে রাজনীতিতে কৃষ্টিতে বাণিজ্যে। সে আহ্বান মানুষের কাছেই মুক্তির আহ্বান হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করিবে। এখানে রবীন্দ্রনাথ নিরাশ হইলেন। 'সত্যের আহ্বানে'র মধ্যে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

"তাই এতকাল অপেক্ষা করে গেছি, দেশের লোককে ডাক দেবার যাঁর সত্য অধিকার আছে, তিনিই সকলকে সকলের আত্মশক্তিতে নিযুক্ত করে দেবেন। একদিন ভারতের তপোবনে আমাদের দীক্ষাগুরু তাঁর সত্যজ্ঞানের অধিকারে দেশের সমস্ত ব্রহ্মচারীদের ডেকে বলেছিলেন—

> যথাপঃ প্রবতায়ন্তি যথা মাসা অহর্জরম।
> এবং মাং ব্রহ্মচারিণো ধাত আয়ন্তু
> সর্বতঃ স্বাহা॥

জলসকল যেমন নিম্নদেশে গমন করে, মাসসকল যেমন সংবৎসরের দিকে ধাবিত হয়, তেমনি সকল দিক থেকে ব্রহ্মচারিগণ আমার নিকটে আসুন, স্বাহা। সেদিনকার সেই সত্যদীক্ষার ফল আজও জগতে অমর হয়ে আছে এবং তার আহ্বান এখনও বিশ্বের কানে বাজে। আজ আমাদের কর্মগুরু তেমনি করেই দেশের সমস্ত কর্মশক্তিকে কেন আহ্বান করবেন না; কেন বলবেন না 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা, তারা সকল দিক থেকে আসুক'? দেশের সকল শক্তির জাগরণেই দেশের জাগরণ, এবং সেই সর্বতোভাবে জাগরণেই মুক্তি। মহাত্মাজীর কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে; অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটিমাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। তিনি বললেন, 'কেবলমাত্র সকলে মিলে সুতো কাটো, কাপড় বোনো।' এই ডাক কি সেই 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'? এই ডাক কি নবযুগের মহাসৃষ্টির ডাক?"

রবীন্দ্রনাথ স্বাধীনতার আদর্শকে যে গভীর এবং ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিতেছেন, আদর্শগতভাবে ইহার সহিত গান্ধীজীরও কিছু বিরোধ নাই। স্বাধীনতার ডাক যে মুক্তির ডাক—ইহা যে 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'র ডাক রবীন্দ্রনাথের এ বাণীকে গান্ধীজী গুরুদেবের বাণী বলিয়াই গ্রহণ করিবেন। আদর্শগত পার্থক্য না থাকিলেও

এখানে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পার্থক্য হইতেছে গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার মৌলিক পার্থক্যের জন্য; একজন মনে প্রাণে মহাকবি, আর একজন মনে প্রাণে মহান কর্মযোগী। কবির নিকটে আদর্শের প্রতি আনুগত্যে যে মানস-প্রীতি, তাহা কোনো অবস্থাতেই আদর্শকে কোথাও এতটুকু খাটো করিয়া পাইতে দিতে চায় না, আদর্শের পরিপূর্ণতাতেও মানস-বিস্তার, মানস-বিস্তারেই পরম-প্রসাদ। কর্মীর প্রেরণা বাস্তব অবস্থার মধ্যে সেই আদর্শের কোন্ অংশটুকুকে প্রাথমিক স্তরে ধরিয়া কিভাবে পরিপূর্ণ আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে সেই দিকে। দেশের সত্যকার মুক্তি সম্ভব করিয়া তুলিতে হইলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা-সাহিত্য সব দিক হইতেই যে নব নব সৃষ্টিতে চিত্তমুক্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে, সে কথা গান্ধীজী অস্বীকার না করিয়াও বলিবেন, কঠোরতম দারিদ্র্য হইতে, হীনতম শোষণের হাত হইতে, ব্যাধি-অনাহারের হাত হইতে দেশের মানুষকে যদি মুক্ত করিবার ব্যবস্থা না করা গেল, তবে অপর ধাপের মুক্তি তাহার কোন্ কাজে লাগিবে? দেশের শতকরা নব্বই জন লোক যে পশু নয়, তাহারাও যে মানুষ—মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার কতকগুলি ন্যূনতম অধিকারে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই বোধে তাহাদিগকে জাগ্রত করিতে না পারিলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্তরে তাঁহাদের চিত্তমুক্তির চেষ্টার মূল্য হইবে কি? অতএব মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের মধ্যে মুক্তির পরিপূর্ণতার আদর্শের প্রতি যতই শ্রদ্ধা থাকুক না কেন, প্রথমে তাঁহাকে ডাক দিতে হইল মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার ন্যূনতম অধিকারের জন্য। অসহযোগ আন্দোলন মুক্তির কোনো আদর্শ নহে, তাহা মুক্তির সময়োচিত এবং অবস্থা-উচিত একটা পথ। স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে গান্ধীজীও যতই অগ্রসর হইয়াছেন, ততই ধ্বংসাত্মক কর্মপন্থার সাময়িক প্রকৃতি এবং প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি নানা দিক হইতে গঠনমূলক দিকেই বেশী করিয়া জোর দিতে আরম্ভ করিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশ-শাসনের ভার নিজেদের হস্তে অধিকৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই গান্ধীজী ধ্বংসমূলক কর্মপন্থার কথা ভুলিয়াই যাইতে বলিলেন, তখন স্বাধীনতার স্থান অধিকার করিল 'সর্বোদয়ের' আদর্শ, 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'র চরম ডাক।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, গান্ধীজীর সর্বোদয়ের আদর্শ এবং রবীন্দ্রনাথের 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'র আদর্শ সর্বতোভাবে এক নহে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ধাতুগত প্রবণতা হইতেই মানস-বিকাশের উপরে যেভাবে জোর দিয়াছেন এবং সেই মানস-বিকাশের পন্থা সম্বন্ধে তাঁহার যে সব ধারণা ছিল, গান্ধীজীর তজ্জাতীয় ধাতুগত প্রবণতাও ছিল না, মানস-বিকাশের পন্থা সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণা অন্যরূপ হইয়াছিল।

অসহযোগ আন্দোলনকে লইয়া এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর ভিতরকার মত-বিরোধটা প্রকাশ্যেই তীব্রাকার ধারণ করিয়াছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, গান্ধীজী প্রথম তাঁহার অহিংস সত্যাগ্রহের বাণী লইয়া ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষেত্রে যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কবি রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁহাকে সানন্দে স্বাগত জানাইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী প্রথম যখন সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রবর্তন করিতে যাইতেছিলেন, তখন ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর প্রতি তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধাসম্ভাষণ জানাইয়া একখানি পত্র লেখেন। গান্ধীজী যে আত্মিক শক্তিকেই সর্বাপেক্ষা বড় বলিয়া মানুষের সামনে আবার তুলিয়া ধরিয়াছেন, প্রেমকেই জীবনে শ্রেষ্ঠ মূল্য দান করিয়াছেন ইহার জন্য গান্ধীজীকে অভিনন্দিত করেন। তিনি তাঁহার পত্রে ইহাও বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব একদিন যেমন আসিয়া মানুষকে ডাক দিয়াছিলেন, 'অক্রোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে'—অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে—সাধুতা দ্বারা জয় করিতে হইবে অসাধুতাকে, গান্ধীজী ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত সেই সত্য বাণীকে

জগতের সম্মুখে আবার নূতন করিয়া উপস্থিত করিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর সেই সত্য ও প্রেমের উপরে প্রতিষ্ঠিত বাণী ১৯২১ সালের কোঠায় গিয়া ভারতব্যাপী এক আইন অমান্য ও অসহযোগের আন্দোলনের রূপে ধারণ করিলে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বরণ করিয়া লইতে ত পারিলেনই না—বরঞ্চ স্পষ্টত বিরূপ হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে উভয়ে যে পত্রিকায়, সাময়িক পত্রেই নিজেদের মতবিরোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাই নহে, এ বিষয়ে সাক্ষাতে তাঁহাদের দীর্ঘ আলোচনাও হইয়াছে। ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ভবনে রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীর প্রায় চারি ঘণ্টা যাবৎ আলোচনা হয়, একমাত্র এণ্ড্রুজ সাহেবই এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন। এই ঐতিহাসিক আলোচনার ফলাফল সম্বন্ধে বাহিরে আর কোনও সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই। বোঝা যায়, কেহই কাঁহাকে স্বমতে আনিতে পারেন নাই, উভয়ে উভয়ের কর্মপন্থা বাছিয়া লইলেন।

গান্ধীজী কিছু দিন পূর্বে ওড়িষ্যার সমুদ্রতীরে এক সভায় মাতৃভাষার উপযোগিতা সম্বন্ধে ভাষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, মাতৃভাষায় যাঁহারা সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের মত প্রচার করিয়াছেন, সেই মহাপুরুষদের তুলনায় ইংরেজী-শিক্ষিত রাজা রামমোহন রায়ও নগণ্য ছিলেন; গান্ধীজী এই প্রসঙ্গে pigmy কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন। সভায় একজন গান্ধীজীর কাছে প্রশ্ন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, লোকমান্য তিলক, রাজা রামমোহন রায় এবং গান্ধীজী নিজে—ইঁহারা সকলেই ত ইংরেজী শিক্ষারই ফলস্বরূপ। উত্তরে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, "রামমোহন, তিলক প্রভৃতির জনতার উপর প্রভুত্ব ছিল না; চৈতন্য, শংকর, কবীর, নানক প্রভৃতির তুলনায় রামমোহন, তিলকও 'পিগমি' ছিলেন। আমার কথা ত ছাড়িয়াই দিন।" মহাত্মাজী পরে ২৭-৪-৩১ তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র এই ভাষণ সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন; তাঁহাতে তিনি বলিয়াছেন, রামমোহন তিলকের প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা প্রকাশ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না; তাঁহার মুখ্য বক্তব্য ছিল এই যে, রামমোহন, তিলক প্রভৃতির মতন প্রতিভাবান লোক যদি ইংরেজীর মাধ্যম গ্রহণ না করিয়া শুধু দেশীয় ভাষাতেই জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে পারিতেন, তবে দেশবাসিগণের উপরে তাঁহারা আরও অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন। কিন্তু মাতৃভাষার মহিমা প্রচার গান্ধীজীর উদ্দিষ্ট থাকিলেও রামমোহন সম্বন্ধে এই pigmy কথাটির ব্যবহারও রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্তভাবে আহত করিয়াছিল। এ বিষয়ে এণ্ড্রুজ সাহেবের নিকট জুরিখ হইতে একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, 'At the same time, I strongly protest against Mahatma Gandhi's depreciation of such great personalities of modern India as Ram Mohun Roy in his zeal for declaiming against our modern education'.

আধুনিক শিক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলিতে গিয়া রামমোহন রায়ের ন্যায় মহাপুরুষকে হেয় করার বিরুদ্ধে কবির এই তীব্র প্রতিবাদ। আমেরিকা হইতে দেশে ফিরিয়াও কবি এ বিষয়ে অন্তরঙ্গদের নিকটে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনও যে অসহযোগ আন্দোলনের ধাক্কায় অনেকখানি ভছনছ হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাও কবিকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এইসব আনুষঙ্গিক ঘটনাই বড় কথা নহে, বড় কথা গান্ধীজীর তৎকালীন চিন্তাধারা ও কর্মপন্থার সহিত রবীন্দ্রনাথের মনের অত্যন্ত অমিল; এই অমিলের মধ্যে সততা ছিল, বিদ্বেষ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের চিন্তাকে তাই অতি স্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাবে দেশবাসীর নিকটে উপস্থিত করা একান্ত কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিদেশ হইতে লিখিত কিছু কিছু পত্রেই তাঁহার বিরূপ মনোভাব জানাইলেন; দেশে পৌঁছিয়া তিনি ভাষণ দিলেন, প্রবন্ধ লিখিলেন। শুধু বাঙলায় নয়, তাঁহার এ বিষয়ে স্পষ্ট মতামত যাহাতে বাঙলার বাহিরে সবাই ভালোভাবে জানিতে পারেন, এই জন্য 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের লেখা বাহির হইল। ১৯২১ সালের যে মাসে বাহির হইল বিদেশ হইতে লিখিত তিনখানি চিঠি এবং অক্টোবর মাসে বাহির হইল 'সত্যের আহ্বান' লেখাটির ইংরেজী রূপ 'Appeal to truth' এই নামে। ইহার ভিতরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের মুখ্য বক্তব্যের আমরা কিছু পূর্বেই আভাস দিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের মতামতকে গান্ধীজী বরাবরই যথেষ্ট মূল্য দেন বলিয়া গান্ধীজী এ বিষয়ে একেবারে উদাসীন থাকিতে পারেন নাই। গান্ধীজীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও 'সত্যের আহ্বান' লেখার স্থানে স্থানে খানিকটা ঝাঁজ প্রকাশ পাইয়াছে এ কথা অস্বীকার করিতে পারি না। গান্ধীজী ১৩-১০-২১ তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'য় ইহার একটি জবাব দেন। জবাবের প্রথমে অবশ্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়াছেন তাঁহার সকল সতর্কবাণী উচ্চারণের জন্য। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজী এ কথাও স্বীকার করিয়াছেন যে, কোনো ক্ষেত্রেই এবং কোনো কারণেই কাহারও ব্যক্তিত্বের কাছে আমাদের বিচারবুদ্ধিকে সমর্পণ করা উচিত নয়; প্রেমবশে যে বিচারবুদ্ধি ত্যাগ তাহা জোর-জবরদস্তির বিচারবুদ্ধি ত্যাগ অপেক্ষা অনিষ্টকর। কিন্তু মুখ্য বিষয়ে গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। সে বিষয়ে তাঁহার নিজের মতও তিনি অতি স্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন—

"আমার চারিদিকের সকলে যখন খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায়, তখন আমি যে একটি মাত্র কর্ম পেশারূপে গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইল ক্ষুধিতকে অন্নদান। ভারতবর্ষ এখন একটি আগুন-লাগা ঘরের মত। ভারতবর্ষ ক্ষুধায় মরিতেছে, কারণ যে কাজের দ্বারা খাদ্য কেনা যাইতে পারে ভারতবর্ষে এমন কোনো কাজ নাই।...প্রতিদিন ভারতবর্ষ আরও বেশী গরীব হইয়া যাইতেছে। তাহার পায়ের পাতার ও পায়ের রক্তচলাচলও প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এখন যদি কোনো যত্ন না লই, তবে সে একেবারেই নিঃসাড় হইয়া পড়িবে।...

"যে জাতি অনশনে শুকাইয়া মরিতেছে—অথচ কর্মহীন, সে জাতির কাছে ভগবান একটি মাত্র গ্রহণীয় রূপে উপস্থিত হইতে সাহসী হন, তাহা হইল কাজের রূপে—আর অন্নের প্রতিশ্রুতিরূপে—যে প্রতিশ্রুতি হইল কাজের মজুরিস্বরূপ। ভগবান মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার খাদ্যের জন্য কাজ করিতে

এবং তিনি বলিয়াছেন যে, যাহারা কাজ না করিয়া খায়, তাহারা চোর। আমাদের আজ সেইসব লক্ষ লক্ষ লোকের কথা ভাবিতে হইবে, যাহারা আজ পশুরও অধম হইয়া আছে, তাহারা আজ মরণের মুখে। ক্ষুধার যুক্তিই ভারতবর্ষকে চরখার কাছে টানিয়া আনিতেছে।

"কবি আগামী কালের জন্য বাঁচিয়া আছেন, আমাদিগকেও তিনি তাহাই করিতে বলেন। তিনি আমাদের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে কতগুলি প্রভাতপাখীর ছবি তুলিয়া ধরিতেছেন—যেগুলি আকাশের উচ্চে উড়িয়া উড়িয়া স্তুতিগান করিতেছে। এ পাখীগুলির সারা দিনের খাবার ছিল; গত রাত্রে এগুলির ধমনীতে নূতন রক্ত প্রবাহিত হইয়াছে, এগুলির ডানা বেশ বিশ্রাম পাইয়াছিল। কিন্তু আমি আমার দৃষ্টির সম্মুখে আর এক রকমের পাখি দেখিতেছি; তাহাদের গায়ে কোনো শক্তি নাই, আদর করিয়াও তাহাদের ডানা মেলানো যাইতেছে না। ভারতবর্ষের আকাশের নীচে যে মানবপাখী আছে, সে সন্ধ্যায় বিশ্রামের ভান করিয়া যখন শুইতে যায়, সকালে উঠিবার সময়ে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দুর্বল হইয়া ওঠে। লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে এ একটা নিত্য জাগরণ অথবা নিত্য সমাধি। আমি দেখিয়াছি কবীরের একটি গানের দ্বারা যন্ত্রণাগ্রস্ত রোগীদের শান্ত করা অসম্ভব।...

"ইহাদের কাজ দিন যাহাতে ইহারা খাইতে পায়। হয়ত প্রশ্ন করা হইতে পারে, আমার ত খাদ্যের জন্য কাজ করার প্রয়োজন নাই, আমি কেন সুতা কাটিব? আমাকেও কাজ করিতে হইবে এই জন্য যে, আমি যাহা খাইতেছি তাহা আমার নয়। আমার দেশ-বাসীকে লুণ্ঠন করিয়া আমি বসিয়া খাইতেছি। আপনার পকেটে যে সব পয়সা আসিতেছে, তাহার প্রত্যেকটির উৎস সন্ধান করুন, তাহা হইলেই আমি যাহা লিখিতেছি, তাহার সত্য অনুধাবন করা যাইবে। প্রত্যেককেই চরখা কাটিতে হইবে। অপর সকলের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও চরখা কাটুন। তিনি তাঁহার বিদেশী পোশাক-পরিচ্ছদ পোড়াইয়া ফেলুন; সেইটাই আজ-কার দিনের কর্তব্য। আগামী কালের কথা ভগবান ভাবিবেন। গীতায় যেমন বলা হইয়াছে—আজকারের যাহা কর্তব্য তাহাই কর।"

রবীন্দ্রনাথের উক্তির উত্তরে গান্ধীজী দীর্ঘ প্রত্যুত্তরই দিয়াছিলেন। কিন্তু এই উক্তি-প্রত্যুক্তির ভিতর দিয়া বেশ বুঝিতে পারি রবীন্দ্রনাথও গান্ধীজীর মনে এ বিষয়ে কোনো গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই, আবার গান্ধীজীর প্রত্যুক্তিও রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ কিছু ফলপ্রসূ মনে হয় নাই। আসলে এই উক্তি-প্রত্যুক্তির ভিতর দিয়া প্রকাশিত যে দুইটি মন আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের প্রবৃত্তি-প্রবণতা অনেকখানি ভিন্ন ভিন্ন দিকে। মৌলিক বিষয়ে যেখানে ধাতুগত অমিল দেখা যায়, সেখানে যুক্তির বহর কোনও ফলই প্রসব করিতে পারে না।

স্বাধীনতার মূল আদর্শে একটা জায়গায় রবীন্দ্রনাথের সহিত গান্ধীজীর মনের একটা গভীর মিল ছিল। ইঁহারা কেহই দেশের স্বাধীনতা বলিতে যেন তেন প্রকারে বিদেশী রাষ্ট্রশক্তির হাত হইতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিনাইয়া লওয়া মনে করিতেন না। এইজন্য যে-কোনো অনুকূল আন্তর্জাতিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশের উপরে চাপ দিবার নীতির গান্ধীজী তখনই পক্ষপাতী ছিলেন না। বামপন্থীদের সহিত গান্ধীজীর এইখানেই অধিকাংশ সময়ে মতবিরোধ ঘটিত। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী উভয়েই মনে করিতেন, স্বাধীনতা কোন দেশ বা জাতি কখনও অপর কোন দেশ বা জাতির নিকট হইতে পায় না; নিজেদের ইহার যথার্থ অধিকারী করিয়া তুলিয়া তবে ইহাকে নিজেদেই লাভ করিতে হয়। সুতরাং দেশ-বাসীকে সব দিক হইতে অধিকারী করিয়া গড়িয়া তোলাই হইল আসল কথা; একবার দেশ গড়িয়া উঠিলে স্বাধীনতা আপনিই আসিতে বাধ্য।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য বামপন্থীরা মনে করিতেন, বিদেশী শক্তির বন্ধন সমস্ত জাতিকে আষ্টে-পৃষ্ঠে এমন করিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে যে, যেন তেন প্রকারে এই বন্ধনকে প্রথমে দূর করিয়া লইতেই হইবে, নতুবা অন্য কোনো দিক হইতে জাতির কোনো মঙ্গলসাধন করিবার আর উপায়ই নাই। গান্ধীজীর যাহা নীতি ছিল, তাহাতে প্রতিরোধের দ্বারা এই বিদেশী বন্ধন দূর করিবার জন্য সকল কার্য-ক্রমের সঙ্গে সঙ্গেই সমভাবে গঠনাত্মক কাজের দ্বারা দেশকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। গান্ধীজী গঠনাত্মক কাজের উপরে সব সময়ে খুব জোর দিলেও 'ইংরেজ ভারত ত্যাগ কর', নতুবা 'করব না হয় মরব' এই সংকল্প লইয়াও দেশবাসীকে ডাক দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বিদেশী শক্তির হাত হইতে মুক্ত হইবার কথা বলিয়াছেন, ইংরাজের দুর্নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, সংগ্রামিগণকেও অভিনন্দন জানাইয়াছেন, কিন্তু নিজে 'ইংরেজ ভারত ছাড়' জিনিসটিকে ফলান্বিত করিয়া তুলিবার জন্য দুর্নিবার তাগিদ অনুভব করেন নাই। এইজন্য স্বদেশী-আমলে সেই যে একবার নিজেকে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে নিজেকে একবার প্রত্যাহৃত করিয়া আর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কর্মের সঙ্গে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে কোনো দিনই যুক্ত করিয়া ফেলিতে চাহেন নাই।

মূল আদর্শ ব্যতীত খুঁটিনাটিতেও গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের নানাভাবে একটা বিরূপতা ছিল। অসহযোগ আন্দোলনের ধাক্কা আসিয়া শান্তিনিকেতনের শান্তি-ভঙ্গের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক কর্মী এই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন; জিনিসটি স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগে নাই। বিদেশ হইতে তিনি বার
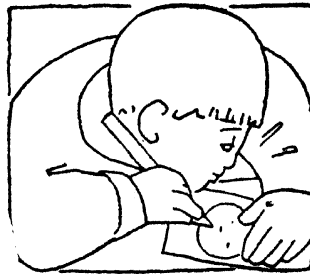
ছার মহামতি এণ্ড্রুজ সাহেবকে চিঠি দিতেছিলেন এই রাজনৈতিক ঝড়ঝাপটা হইতে শান্তিনিকেতনকে রক্ষা করিয়া রাখিতে। অসহযোগের আদর্শটা মূলেই রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগে নাই; কারণ তাঁহার মনে আশঙ্কা ছিল, বিদেশীর সহিত এই অসহযোগের মনোভাব দেশবাসীর মনে বর্ধিত হইয়া উঠিলে দেশবাসী আবার তাহাদের পূর্বগণ্ডীর মধ্যে বাধা পড়িবে, কূপমণ্ডূকতা এবং অকারণ আত্মাভিমান আমাদের মানস-প্রগতির পরিপন্থী হইয়া উঠিবে। আমাদের কল্যাণের জন্যই আমাদের স্থাবর চিত্তের সহিত ইউরোপের জঙ্গম চিত্তের শিক্ষায় সাহিত্যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে নানাভাবে সহযোগ ঘটুক, ইহাই ছিল কবির কাম্য।

আসলে সমগ্র বিশ্বের সহিত ভারতবর্ষের একটা মানসিক এবং আত্মিক সহযোগিতা গড়িয়া উঠিবে শান্তিনিকেতনের বিবর্তনের ভিতর দিয়া এই আদর্শটিও কবির মনে বিবর্তিত হইয়া এক বিশেষ রূপ লাভ করিতেছিল। একখানি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—"ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোল বিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণ মুছে যাক—সেইখানেই সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক, সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন।...শান্তিনিকেতনের আকাশ আজকের দিনের বিশ্বব্যাপী আঁধির আক্রমণে যেন নিরালোক হয়ে না ওঠে।" (শ্রীসুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত চিঠি, রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ডে উদ্ধৃত।) অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম ধাক্কায় এই শান্তিনিকেতনের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠিল—ইহা হইতে অবাঞ্ছিত ঘটনা কবির নিকট আর কি হইতে পারে? ইহা ছাড়া কবিও এই সময়ে ইউরোপ-আমেরিকায় দীর্ঘ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, দীর্ঘ ভ্রমণে দীর্ঘ ভাষণও দিয়াছেন, সেই ভাষণে তিনি মানবের ঐক্য এবং পারস্পরিক সহযোগিতার কথাকেই বড় করিয়া বলিয়া আসিয়াছেন। এই সময়ে তাঁহার যে ইউরোপ এবং আমেরিকায় ভ্রমণ, তাহা নিছক ভ্রমণ ছিল না; কবির উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার 'বিশ্বভারতী'র আদর্শকে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্যাপকভাবে প্রচার করেন এবং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর প্রতি তিনি বিশ্ববাসীর সোৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যেসব ভাষণ দিয়াছেন, তাহার সর্বত্রই হইল ঐক্যের বাণী—এক মানবতাবোধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বাণী। দেশে ফিরিয়াই সম্মুখীন হইলেন একটি প্রচণ্ড অসহযোগ আন্দোলনের। কবির পক্ষে ইহা স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত অস্বস্তিকর ছিল। এই অসহযোগ আন্দোলনকে তাঁহার মনে হইল একটি আধ্যাত্মিক আত্মঘাত বলিয়া। এণ্ড্রুজের নিকটে একখানি পত্রে তিনি বলিয়াছেন—

"আমাদের সমগ্র হৃদয়মনকে পাশ্চাত্যের প্রতি বিদ্বিষ্ট করিয়া তুলিবার এই যে বর্তমান সংগ্রাম, ইহা একটি আধ্যাত্মিক আত্মঘাতের চেষ্টা মাত্র। আমাদের দম্ভের মোহে আমরা আমাদের গৃহচূড়া হইতে যদি চিৎকার করিয়া বলিতে থাকি যে, মানুষের জন্য অসীম মূল্যবান কোনো কিছুই পশ্চিম উৎপন্ন করিতে পারে নাই তবে প্রাচ্যমনের যাহা কিছু দান, তাহার মূল্য সম্বন্ধেও সন্দেহের বিশেষ কারণ ঘটাইয়া তুলিব।" (রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ডে উদ্ধৃত)

প্যারিস হইতে ১২-৯-২০ তারিখের এণ্ড্রুজের নিকটে একখানি পত্রেও কবি লিখিয়াছেন যে, দেশের ভিতরে সকল বাধা দূরীভূত করিয়া দেশের সকল মানুষের ভিতরে সর্বতোভাবে সহযোগিতার উদ্যম জাগাইয়া তোলা—বাহিরের মানুষের সঙ্গে সর্বপ্রকারের সহযোগিতার প্রেরণা জাগাইয়া দেওয়া, ইহাই হইল দেশের সর্বপ্রধান প্রয়োজন; এই কাজের জন্যই ত মহাত্মা গান্ধীর মত নৈতিক শক্তিশালী পুরুষের সর্বাগ্রে প্রয়োজন—"And for this, all the moral fervour which the life of Mahatma Gandhi represents, and which he, of all men in the world, can call up, is needed."

অসহযোগকে রবীন্দ্রনাথ একটা 'নেগেটিভ' বা ঋণাত্মক কর্মপন্থা মনে করিতেন। ইহার বদলে কবি দেশজোড়া সহানুভূতি ও প্রেমের উদ্বোধের ভিতর দিয়া সেবাকার্যের কর্মপন্থা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। প্যারিস হইতে এণ্ড্রুজের নিকটে ১৮-৯-২০ তারিখের পত্রে তিনি লিখিয়াছেন—

"এ ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধী একজন সত্যকারের নেতা হইয়া উঠুন; তিনি গঠনাত্মক সেবাকার্যের জন্য সকলের নিকটে আহ্বান পাঠান; তিনি সকলকে ত্যাগের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে আহ্বান করুন—যে ত্যাগ পরিণতি লাভ করে প্রেমে এবং সংগঠনে। সেবায় ও প্রেমে তিনি যদি আমাদের দেশের লোকের সহিত সহযোগিতার জন্য আমাকে কোনো আদেশ করেন তবে আমি তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার সেই সব নির্দেশ পালন করিতে রাজী আছি। ক্রোধের আগুন জ্বালাইয়া এবং ঘরে ঘরে সেই আগুন ছড়াইয়া দিয়া আমার মনুষ্যত্বের অপচয় করিতে আমি অস্বীকার করি।

"আমার মাতৃভূমির উপরে যে অবিচার এবং অপমান পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে যে আমি ভিতরে ভিতরে কোনো ক্রোধ অনুভব করি না তাহা নহে; কিন্তু আমার এই ক্রোধকে প্রেমের বহ্নিতে রূপান্তরিত করিতে হইবে—যে প্রেমবহ্নি দ্বারা আমাকে জ্বালাইতে হইবে পূজার দীপ—আমার দেশের ভিতর দিয়া এ-পূজা গিয়া উৎসর্গীকৃত হইবে আমার ভগবানেরই কাছে।"

এই প্রেম ও সহযোগিতার মনোভাব এই সময়ে কবির মধ্যে এমনভাবে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, এণ্ড্রুজের নিকটে পত্রে তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের অত্যাচারও ভুলিয়া যাইতে বলিলেন। এই জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস অত্যাচার একদিন তাঁহাকে এতখানি বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল যে তিনি মহাত্মা গান্ধীর নিকটে একসঙ্গে তখন পাঞ্জাবে যাইবার প্রস্তাব দিয়াছিলেন; কাহারও নিকট হইতে সাড়া না পাইয়া প্রবল অন্তর্দাহে তিনি অগ্নিময়ী ভাষায় তাঁহার রাজকীয় খেতাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

অসহযোগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই আশঙ্কা ও আপত্তি সম্বন্ধে গান্ধীজীর মতামত খুব স্পষ্ট। তিনি বলিয়াছেন যে, অসহযোগের অর্থ ভারতবর্ষের চারিদিকে চিরদিনের জন্য দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলিয়া বাহির হইতে সকল প্রকার আলো-হাওয়ার আগমন বন্ধ করিয়া দিবার চেষ্টা নয়; গান্ধীজী ইহাকে বলিয়াছেন, 'এ রিটায়ারমেণ্ট উইদিন আওয়ারসেল্‌ভ্‌স্‌'—সাময়িকভাবে নিজেদের মধ্যে ফিরিয়া আসা। আমরা নিজেদের ভিতরে নিজেরা অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। এত দুর্বল হইয়াছি যে অপরের সহিত আমাদের সহযোগিতার অর্থ দাসত্ব বরণ করিয়া লওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়—শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক সর্বপ্রকারের দাসত্ব। নিজেদের ভিতরে নিজেরা কিছু দিন ফিরিয়া আসিয়া দৃঢ় ভিত্তিতে নিজেদের গড়িয়া লইতে হইবে—তাহাতে আমরা সমগ্র মানবজাতির সেবা করিবার জন্য দেহে ও মনে যথেষ্ট শক্তি-সঞ্চয় করিয়া লইতে পারি। গান্ধীজী বলিয়াছেন, 'India must learn to live before she can aspire to die for humanity'—"মানবতার জন্য মৃত্যু বরণ করিবার পূর্বে ভারতবর্ষকে আগে বাঁচিতে হইবে।" দেখা যাইতেছে ভারতবর্ষের বাঁচিবার চিন্তা তৎকালে গান্ধীজীকে যেমন করিয়া বিব্রত ও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে রবীন্দ্রনাথকে তেমন করিয়া করে নাই, এই জন্যই সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তাই কবিমনকে তখন অমন করিয়া অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। অসহযোগের অর্থ কি সে সম্বন্ধে গান্ধীজী আরও বিস্তার করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"আমি চাই না যে আমার ঘর চারিদিক হইতে প্রাচীরঘেরা হইয়া উঠুক, আমার জানালাগুলি ঠাসিয়া আঁটা থাক। আমি চাই সব দেশের সংস্কৃতি আমার ঘরে যতটা স্বচ্ছন্দে সম্ভব ততটা স্বচ্ছন্দেই বহিয়া আসুক, ...কিন্তু তাহার কোনোটা আসিয়া আমাকে আমার ঘর হইতেই উড়াইয়া লইয়া যাক ইহা আমি চাহি না। বন্দিশালার ধর্ম আমার ধর্ম নয়। আমার ঘরে ভগবানের সৃষ্ট জীবের মধ্যে ক্ষুদ্রতমের জন্যও স্থান আছে, কিন্তু আমার ঘরকে আমি জাতি ধর্ম ও বর্ণ লইয়া উদ্ধত অপমানকর দম্ভের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য করিয়া চলিতে চাই।" (রোমাঁ

রোলাাঁ লিখিত 'মহাত্মা গান্ধী' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃঃ ১০৪।)

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে, মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত এই অসহযোগ আন্দোলনের রবীন্দ্রনাথের পক্ষ হইতে এতখানি প্রকাশ্য সমালোচনা এবং বিরুদ্ধতা রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাল লাগে নাই। তিনি ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর একান্ত অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে শান্তিনিকেতনের তৎকালীন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জগদানন্দ রায় মহাশয়ের নিকটে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"...সত্য হচ্ছে পরমা গতি, অর্থাৎ এমন গতি যার প্রত্যেক পদক্ষেপেই সার্থকতা। আর মোহ হচ্ছে সেই গতি যার চলায় সার্থকতা আনে না, কেবল নেশা আনে। একটা হচ্ছে ধনাত্মক গতি, আর একটা হচ্ছে ঋণাত্মক গতি। দেশ জুড়ে যখন তোলপাড় ঘটছে তখন ভালো করেই ভাবতে হবে, এই গতির প্রকৃতি কি। যে জলে স্রোত প্রবল কিন্তু তট অবর্তমান সে-ই হচ্ছে বন্যা। বন্যায় ভাঙে, ভাসিয়ে দেয়, ফসল নষ্ট করে। আমাদের দেশে যে আবেগ এসেছে সে যদি একমাত্র ভাঙনেরই বার্তা নিয়ে আসে তা হলে অনাবৃষ্টিতে শুকনো ডাঙার ক্ষেতে অতিবৃষ্টির অগাধ ক্ষতির মধ্যে ডুবে মরতে হবে। আমার অনুরোধ এই যে, মন যখন কোনো মতে জেগেছে, তখন সেই শুভ অবকাশে মনটাকে কষে কাজে লাগিয়ে দাও, অকাজে শক্তির অপব্যয় কোরো না। Non-co-operation অকাজ — তার আবির্ভাব অন্তিমে।..."

জগদানন্দ রায় মহাশয়ের নিকটে লিখিত এই চিঠি দ্বিজেন্দ্রনাথের দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি শান্তিনিকেতন হইতে ১।১২।২০ তারিখে কবির নিকটে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন; পত্রখানি নানা দিক হইতে কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া অনেকটা অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

"তুমি ইংলন্ডের রাজনৈতিক মহলের বিসদৃশ ব্যাপারসকল—রাক্ষুসে কান্ডসকল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আন্ড্রুজ সাহেবকে মনের খেদে চোটের সহিত এই যে গোটা দুই কথা লিখিয়াছিলে—যে, "I am fully convinced that the English people cannot give us anything truly great, and to accept anything from their hand is haram. We should ignore all connection with those people."

ইহা বড় আমার ভাল লাগিয়াছিল, কিন্তু জগদানন্দবাবুকে ঠিক তাহার উল্টা কথা এই যে লিখিয়াছ—যে, " Non-co-operation অকাজ, উহা ঋণাত্মক" ইহা দেখিয়া আমি হাসিব কি কাঁদিব ভাবিয়া পাইলাম না। যে জায়গাটিতে দেশসুদ্ধ আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত লোকের প্রাণ লইয়া টানাটানি—সে জায়গায় মর্মান্তিক গুরুতর বিষয়সকল লইয়া তক্‌রাতক্‌রি এবং কচলাকচলি করিতে আমার মন সরে না আদবেই, কেন না সেরূপ হৃদয় এবং কর্মের সহিত সম্পর্কবর্জিত শুষ্ক জ্ঞানের আন্দোলন অনর্থের মূল—এ বিষয়ে আমার জ্ঞান টন্‌টনে যেহেতু আমি এবারকার রোগী আরবারকার রোজা; অতএব, বন্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং।

তোমাকে বেশী কথা বলা বাহুল্য—তাই দুই একটি কথায় আঁচড় দিয়া মাত্র লেখনী সংবরণ করিতেছি।

প্রথম আঁচড়

কণ্টকাকীর্ণ বনের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে যে-পথিক বেচারীর সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে, সে যদি বন হইতে কণ্টে-সৃষ্টে প্রত্যাবর্তন করিয়া গাত্র হইতে কণ্টকগুলো উন্মোচন করিয়া ফেলিতে তৎপর হয়, তবে তাহার সে কার্যটি কি

...ত্মক বলিয়া নিন্দনীয়? আর যদি ...টকারণ্যের সংস্পর্শে ক্ষতবিক্ষত হইয়াও ...টিল হইতে জটিলতর বনগর্ভে প্রবেশ ...রিয়া নাস্তানাবুদ হইতে থাকে, তবে তাহার ...সে কার্যটি কি ধনাত্মক বলিয়া অভিনন্দনীয়?

দ্বিতীয় আঁচড়

আমরা ক্রমাগতই রাজপুরুষদিগের বিষ-...মিশ্রিত দান গ্রহণ করিয়া ঋণের উপর ঋণ জড়ো করিতেছি। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি আর ঋণ না করিয়া পূর্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিবার মানসে আপনার অধিকারভুক্ত পুরাতন পতিত রত্নখনি-...কলের উদ্ধারকার্যে প্রাণপণ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তাহার সেই মনুষ্যোচিত কার্য হইতে তাহাকে এই বলিয়া নিবৃত করিতে চেষ্টা করিব—যে, "তোমার এ কার্যটা ঋণাত্মক—আরো দান গ্রহণ করা তোমার উচিত, যেহেতু এইরূপ কার্যই ধনাত্মক—অতএব ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

তৃতীয় আঁচড়

তকরাতকরি ছাড়িয়া দিয়া আসল কাজের কথা যদি বলিতে হয়—তবে সে কথা এই যে, ইংরাজ রাজপুরুষদিগের সহিত একত্রে মিলিয়া মিশিয়া কার্য করা আমাদের পক্ষে কি সেইরূপ—সারসের পক্ষে যেমন শৃগালের সহিত একত্রে মিলিয়া একই থাল-পাত্রস্থিত মাংসের জুস ভক্ষণ করা।

চতুর্থ আঁচড়

এ কথা দেশসুদ্ধ লোক সবাই জানে যে, ...হাত্মা গান্ধী কাম ক্রোধ ভয় লোভ মদ ...ৎসর্যের কর্দম হইতে অনেক উচ্চভূমিতে অবস্থান করেন। বিশেষতঃ গান্ধী রণো-...ন্মত্ততার প্রতি নিতান্তই বীতরাগ এবং ...non-violence-এর একান্তই সেবক; তিনি ...নশার ঝোঁকে কোনো কাজে প্রবৃত্ত হন না ...-সর্বানুমোদিত কাজেও না। তাই আমার ...নে হয় যে, গান্ধীর ন্যায় অমন একজন ...হাত্মার মোহমুক্ত বিশুদ্ধ বুদ্ধির অনু-...মোদিত শুভানুষ্ঠানের পদে পদে ছল ধরা ...অপেক্ষা তাহার সাধুজনোচিত সৎকার্যে ...র্বান্তঃকরণের সহিত যোগ দেওয়াই ...আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। আমার এটা ধ্রুব ...বিশ্বাস যে, গান্ধীর ন্যায় সাঁচা সোনা ...(sterling gold) এ ঘোর কলিতে মেলা ...ভার।"

কিছু দিন পরে রবীন্দ্রনাথের পত্র পাইয়া ...৫।২।২১ তারিখে দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-...নাথকে আবার লিখিয়াছিলেন—

"অধর্মপরায়ণদিগের প্রতি (আর সেই ...ন্য—ব্রিটিশ রাজপুরুষদের ন্যায় দিনে-...ডাকাতি-পরায়ণ' কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত দুরাত্মা-...দিগের প্রতি) ঔদাসীন্যের ভাব (অর্থাৎ ...non-co-operation-এর ভাব) ধারণ করাই ...শ্রেয়—অনুমোদনের ভাবও না—বিদ্বেষের ভাবও না।" (উক্ত পত্রই বিশ্বভারতী পত্রিকা, দশম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।)

দেশের সর্বপ্রকারের জনসাধারণকে লইয়া দেশব্যাপী যে রাজনৈতিক আন্দোলন তাহাতে অহিংসার প্রয়োগ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের সংশয় ও দ্বৈমত্য ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, মহাত্মাজীর অহিংসার আহ্বানকে কবি মনে প্রাণেই সমর্থন করিয়াছিলেন। দৈহিক বল বা যান্ত্রিক বলই যে শ্রেষ্ঠ বল নহে, আত্মিক বলই যে মানুষের শ্রেষ্ঠ বল, মহাত্মাজীর অহিংসার বাণীর ভিতর দিয়া এই কথাটাই যে জগতের সম্মুখে আবার নূতন করিয়া উপস্থিত করা হইতেছে ইহাতে রবীন্দ্রনাথের পরম আনন্দ ছিল। কিন্তু গান্ধীজী যখন দেশব্যাপী এই অহিংস আন্দোলনের প্রবর্তন করিলেন তখন দুই কারণে রবীন্দ্রনাথ এখানে সংশয় প্রকাশ করিলেন। প্রথমত রবীন্দ্রনাথের মনে হইয়াছিল যে মহাত্মাজী এই অহিংস আন্দোলনের জন্য দেশবাসীকে যথেষ্টভাবে প্রস্তুত না করিয়াই দেশবাসীকে এই জাতীয় আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িবার একটা উন্মাদনা জাগাইয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, অহিংসা নীতি যত ভাল হোক, কোনও একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি গণ-আন্দোলনে অহিংসার প্রয়োগ সম্ভব কিনা এই বিষয়েই কবির নিজের মনে সংশয় ছিল। তিনি এ বিষয়ে ১৯২২ সনে গুজরাটের বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক নানা লাল দলপতরামকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন (রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ডে উদ্ধৃত) তাহার ভিতরেই তাঁহার মত ব্যক্ত হইয়াছে। সেখানে তিনি বলিয়াছেন—

"সব দেশেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা মুখ্যত নির্ভর করে বাহ্যশক্তির উপরে; এই বাহ্যশক্তির সমবেত বলকে পরাজিত করিয়া দিবার উপায়-স্বরূপে অহিংসার উপযোগিতায় আমি বিশ্বাসী। কিন্তু অন্যান্য সকল নৈতিক শক্তির ন্যায় অহিংসাকেও চিত্তের গভীর হইতে উৎসারিত হইতে হইবে; অহিংসাকে বাহিরের আবেদনের দ্বারা অথবা জরুরী প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের উপরে জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া উচিত হইবে না। জগতের মহাপুরুষগণ প্রেম ক্ষমা ও অহিংসার বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা ইহা করিয়াছেন মুখ্যত অধ্যাত্ম পরিপূর্ণতা লাভের জন্য; কিন্তু কোনও রাজনৈতিক সমূহ-উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অথবা জীবনের সমজাতীয় ক্ষেত্রের কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহা প্রচার করেন নাই।"

এ ক্ষেত্রে গান্ধীজীর মত ও বিশ্বাস ছিল অন্যরূপ। অহিংসাকে যদি আত্মিক শক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায় এবং সে শক্তিকে যদি সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায় তবে তাহার প্রয়োগক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ রাখিব কেন? জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া তবেই ত তাহার সত্যের প্রতিষ্ঠা। তাহা ছাড়া গান্ধীজী জীবনের এই অধ্যাত্ম ভাগ এবং রাজনৈতিক ভাগে বিশ্বাসী ছিলেন না, জীবন একটি সমগ্র জিনিস, জীবনের সেই সমগ্রতার ভিতর দিয়াই চলিবে নিরন্তর সত্যের পরীক্ষা। নতুবা ত রাজনীতিকে অধ্যাত্মজীবন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করিয়া লইতে হয়, জীবন ত তাহা হইলে অখণ্ড না হইয়া টুকরা টুকরা পরস্পরবিচ্ছিন্নভাবে বিভক্ত হইয়া গেল। অহিংসাকে যে জীবনের ছোট বড় (গান্ধীজীর মতে অবশ্য জীবনের মধ্যে আর কোনও ছোট বড় ভাগ বা ভেদ নাই) সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োগ করিতে হইবে। এখানে গান্ধীজী ছিলেন টলস্টয়পন্থী। এ প্রসঙ্গে টলস্টয়ের সহিত তাঁহার আরও একটা বড় মিল দেখিতে পাই। গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে নৈতিক শক্তির ব্যবহার সম্ভব কি না আমরা যখন সেই প্রশ্নটা তুলি তখন আমাদের মধ্যে এই জাতীয় একটা মনোভাবও কাজ করে যে, চাষী শ্রমিক মজুর প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের মধ্যে নৈতিক বোধ এবং নৈতিক শক্তি তথাকথিত উচ্চ সম্প্রদায়ের তুলনায় কম। এই জন্যই যাঁহাদিগকে আমরা জনসাধারণ বলি তাঁহাদের সম্বন্ধে স্বভাবতই আমাদের একটা অবিশ্বাস আছে। টলস্টয় ছিলেন একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত সত্যে বিশ্বাসী। তাঁহার প্রৌঢ় বয়সে তাঁহার ভিতরে এই মত গড়িয়া উঠিয়াছিল যে, মানুষের মধ্যে যাহা কিছু মহৎ তাহা দেখা যায় শুধু কাজ-করা মানুষের মধ্যে; তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর উপরে তাই তাঁহার ছিল না বিন্দুমাত্র বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা। মহাত্মা গান্ধী অবশ্য টলস্টয়ের ন্যায় উচ্চ-শ্রেণীর চরিত্রে অতখানি অবিশ্বাসী ছিলেন না; কিন্তু শ্রমশীল সাধারণ মানুষের উপরে তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল টলস্টয়ের মতনই। তাই দেখিতে পাই, আত্মিক শক্তির প্রয়োগের ক্ষেত্রে জনসাধারণ লইয়া কাজ করিতে তিনি ভয় পাইতেন না।

কিন্তু গান্ধীজীর বিশ্বাস যাহাই থাকুক না, রবীন্দ্রনাথের সংশয় ও সতর্কবাণীর মধ্যে যে কিছু কিছু সত্য ছিল অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে পর পর কতকগুলি ঘটনা তাহা প্রমাণিত করিয়া দিয়াছিল এবং গান্ধীজীকেও আন্দোলন থামাইয়া দিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল, কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধেও পুনর্বিবেচনা করিতে হইয়াছিল। ১৯২১ সালে ভারতব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত হইবার পর মালাবারের মোপ্‌লা-বিদ্রোহ ও বোম্বাইয়ের দাঙ্গা গান্ধীজীকে দারুণ আঘাত করিল। প্রিন্স অব ওয়েলস বোম্বাইতে আসিয়া পদার্পণ করিলে একদল রাজভক্ত (তাহাদের মধ্যে পার্শীর সংখ্যাই ছিল বেশী) রাজপুত্র দর্শনে জমায়েত হয়, ইহা লইয়াই দাঙ্গার সূত্রপাত, ফলে ৫০ জন

লোক নিহত এবং ৪০০ জন আহত হইল; গান্ধীজী নিজে বোম্বাইতে উপস্থিত হইয়াও উত্তেজিত জনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন নাই। গুজরাটের বারদোলী তালুকে কর না দিবার সত্যাগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল এবং গান্ধীজী এই সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বোম্বাইয়ের দুর্ঘটনার পরে তিনি বারদোলীর সত্যাগ্রহ স্থগিত করিয়া দিলেন। কিছু দিন পরে আবার বারদোলীর সত্যাগ্রহের কথা বিঘোষিত হইল, গান্ধীজী নিজে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বড়লাটকে চরমপত্র দান করিলেন; আবার দেখা দিল যুক্তপ্রদেশের চৌরীচৌরার থানার নৃশংস হত্যাকাণ্ড। চরম আঘাত পাইলেন গান্ধীজী। ১৬।২।২২ তারিখের 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন তাঁহার হিমালয়সদৃশ বিরাট ভুলের স্বীকৃতি।—

"ভগবান আমার উপরে অসীম দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তৃতীয়বার আমাকে সাবধান করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে এখনও সত্য এবং অহিংসার এমন আবহাওয়া গড়িয়া ওঠে নাই যাহাকে আদৌ 'শান্ত' বা 'নিরুপদ্রব' বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে। এইজাতীয় একটি নিরুপদ্রব শান্ত আবহাওয়াতেই জনসাধারণের পক্ষেও প্রতিরোধ সম্ভব হইতে পারে। এখানে 'শান্ত' শব্দের অর্থ হইল ভদ্র, সত্যনিষ্ঠ, বিনীত, সচেতন, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত—অথচ প্রেমপূর্ণ; ইহা কোনো সময়ই অপরাধপ্রবণ বা বিদ্বেষপূর্ণ হইতে পারে না। তিনি আমাকে প্রথম সাবধান করিয়াছিলেন ১৯১৯ সালে—যখন রাওলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবর্তিত হইয়াছিল। আমেদাবাদ, বিরামগ্রাম ও খেড়া ভুল পথে গেল। আমি আমার পা ফিরাইয়া লইলাম, ইহাকে একটা হিমালয়সদৃশ ভুল হিসাব বলিয়া স্বীকার করিলাম, ভগবানের নিকটে ও মানুষের নিকটে নিজেকে নোয়াইয়া দিলাম, এবং শুধু যে সর্বসাধারণের 'নিরুপদ্রব প্রতিরোধে'র আন্দোলনই থামাইয়া দিলাম তাহা নহে—নিজের আন্দোলনও স্থগিত করিলাম। দ্বিতীয় বারে বোম্বের ঘটনা দ্বারা ভগবান আমাকে একটি অতি কঠোর সতর্কবাণী জানাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী করিয়া তুলিয়াছিলেন। ...... বারদোলীতে অবিলম্বে যে সর্বজনীন নিরুপদ্রব আইন অমান্য চালু হইবার কথা ছিল আমি তাহা বন্ধ করিয়া অভিপ্রায় জানাইয়া দিলাম। ১৯১৯ সালে আমার যে অপমান হইয়াছিল এবারে তাহা অপেক্ষা অধিক অপমান হইল। কিন্তু ইহা আমার উপকার করিয়াছিল, এবং এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, এই বিরতির দ্বারা সমস্ত জাতিরই লাভ হইয়াছিল। সেই আন্দোলন স্থগিতের দ্বারা ভারতবর্ষ সত্য ও অহিংসারই পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিল।

"কিন্তু ভবিতব্যে সর্বাপেক্ষা অধিক লাঞ্ছনা ও অপমান অপেক্ষা করিতেছিল।... চৌরীচৌরার ভিতর দিয়া ভগবান অতি স্পষ্টভাবে তাঁহার বাণী প্রেরণ করিলেন।"

এই স্বীকৃতির ভিতর দিয়া গান্ধীজীর 'মহাত্মা' চরিত্র যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছে অতি অল্প ঘটনার ভিতর দিয়াই তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের এই নেতারই আদর্শ যেন বিধৃত হইয়াছিল অনেকদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানে যখন তিনি গুরুগোবিন্দ সিংহের মুখ দিয়া বলাইয়াছিলেন, 'বন্ধু তোমরা ফিরে যাও ঘরে এখনও সময় নয়।' রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত নেতা গুরুগোবিন্দ সিংহও বলিলেন, আরও আত্ম-সংহত নিভৃত তপস্যার ভিতর দিয়া নিজেকে বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, নতুবা 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগো রে সকল দেশ' বলিয়া আহ্বান জানাইবার অধিকার আসিবে কোথা হইতে? গান্ধীজীও ঠিক তাহাই করিলেন। সংগ্রামে উৎসুক সহসা-রুদ্ধ-বীর্য দেশবাসী উত্তেজিত হইয়া উঠিল, ডাইনে বাঁয়ে সহকর্মিগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু গান্ধীজী অটল অচল। এত বড় ভ্রান্তির জন্য তাঁহাকে আত্মশুদ্ধির কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। গান্ধীজী বলিলেন—

"নিজেকে আমাকে শুদ্ধ করিতে হইবে। আমার চারিপাশের নৈতিক আবহাওয়ার ভিতরে বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও যাহাতে আমি

লক্ষ করিতে পারি এই রকমের একটি আরও উপযুক্ত যন্ত্ররূপে আমাকে গড়িয়া উঠিতে হইবে। আমার সব প্রার্থনার মধ্যে আরও গভীর সত্য ও বিনম্রতা থাকা দরকার। আমার পক্ষে উপবাসের মতন এমন বিশুদ্ধিকারক আর কিছুই নাই। আরও পরিপূর্ণ আত্ম-প্রকাশের জন্য, দেহের উপরে আত্মার আধিপত্য বিস্তারের জন্য গৃহীত যে উপবাস ইহা মানুষের আত্ম-বিবর্তনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উপাদান।"

মহাত্মা গান্ধী আত্ম-বিশুদ্ধির জন্য এবং অহংকার দূরীভূত করিবার জন্য পাঁচ দিনের উপবাস গ্রহণ করিলেন।

গণ-আন্দোলনে অহিংসার প্রয়োগ বিষয়ে গান্ধীজী একেবারে অবিশ্বাসী কোনোদিনই হইয়া ওঠেন নাই, তথাপি পরবর্তী কালে এ বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সতর্ক হইয়া উঠিয়াছিলেন; পরবর্তী কালে তিনি সত্যাগ্রহ কখনো সুনির্বাচিত কয়েকটি কর্মী দ্বারা—কখনও বা শুধু একজনের দ্বারা পরিচালনা করাইয়াছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিকটায় মহাত্মাজী হিন্দু-মুসলমানের সমস্যাটাকে যেভাবে মিটাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে জিনিসটিও রবীন্দ্রনাথের খুব মনঃপূত ছিল না। হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটা সম্পূর্ণরূপেই খল দুর্জন তৃতীয়পক্ষের উস্কানিজাত একটা জিনিস নয়, জাতীয় জীবনের এই বৃহৎ কলঙ্কের কারণ যে আমাদের নিজেদের সমাজজীবনের মধ্যেই নিহিত আছে রবীন্দ্রনাথ এ কথাটা সরলভাবেই স্বীকার করিতেন এবং এই-জাতীয় একটা কলঙ্ককর সত্যকে জাতীয় জীবনের ভিতর হইতে যত শীঘ্র সম্ভব মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা যে সর্বদাই করণীয় তাহাতে আর দ্বিমত ছিল না। কিন্তু গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে দেশের মুসলমান সম্প্রদায়কেও জড়াইয়া লইবার জন্য আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যেভাবে খিলাফৎ আন্দোলনকে যুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন তাহা রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে, আমাদের গরজের প্রলেপ দিয়া এত বড় একটা মনের ভাঙ্গনকে আমরা কিছুতেই জোড়া দিয়া রাখিতে পারিব না। বঙ্গভঙ্গের সময়কার আন্দোলন লইয়াই রবীন্দ্রনাথের এ বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। তখনকার রাতারাতি একটা জোড়াতাড়া দিবার চেষ্টাকে উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'লোকহিত' প্রবন্ধে (১৩২১) মন্তব্য করিয়াছেন,—

"সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে, ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে তখন কূপ খুঁড়িতে যাওয়ার আয়োজন বৃথা। বঙ্গবিচ্ছেদের দিনে হঠাৎ যখন মুসলমানকে আমাদের দলে টানিবার প্রয়োজন হইল তখন আমরা সেই কূপ খননেরও চেষ্টা করি নাই—আমরা মনে করিয়াছিলাম, মাটির উপরে ঘটি ঠুকিলেই জল আপনি উঠিবে। জল যখন উঠিল না, কেবল ধুলাই উড়িল, তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা রহিল না। আজ পর্যন্ত সেই কূপ খননের কথা ভুলিয়া আছি। আরো বার বার মাটিতে ঘটি ঠুকিতে হইবে, সেই সঙ্গে সেই ঘটি আপনার কপালে ঠুকিব।"

গান্ধীজী অবশ্য কূপ খননের কোনো চেষ্টা না করিয়া শুধু ধুলোর উপরে ঘটি ঠুকিবার চেষ্টা করেন নাই, কূপ খননের ব্যাপক চেষ্টা তিনি সারা জীবন ধরিয়াই করিয়াছেন এবং সেই চেষ্টাতেই শেষ পর্যন্ত জীবন দান করিয়াছেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের যুগে তিনি খিলাফৎ আন্দোলনকে যেভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের সহিত যুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন তাহার যৌক্তিকতা ও সার্থকতা সম্বন্ধে তখনও অনেকে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন, পরবর্তী কালে ফল দেখিয়া আরও বেশী করিয়া অনেকে সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। মহাত্মাজী হয়ত মনে করিয়াছিলেন একটি সাধারণ স্বার্থের ভিতর দিয়া দুই সম্প্রদায়কে যদি একবার ঘনিষ্ঠ করিয়া লওয়া যায় তবে হয়ত ভিতরকার ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য-গুলি আস্তে আস্তে দূরে করিয়া দেওয়া সহজ হইবে। গান্ধীজীর সে আশার মধ্যে আগ্রহ এবং সততা যতই থাক তাহার ভিতরে যে পূর্ণ সত্য ছিল না অনেক প্রচণ্ড প্রচণ্ড আঘাতের ভিতর দিয়া তাহা তাঁহাকে বুঝিতে হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি নিজে শেষ পর্যন্ত ছিলেন একেবারে 'সংশোধনাতীত আশাবাদী'; তাহার ফল সু হইয়াছে কি কু হইয়াছে তাহা লইয়া সারা দেশময় এখনও তর্কের অবসান নাই; কিন্তু নিশ্চিত জানি গান্ধীজী বাঁচিয়া থাকিলে তিনি এখনও হাসিমুখে বলিতেন—'ফল সু-ই হইয়াছে।'

॥ উনপঞ্চাশ ॥

আঙ শেরিং দেখল দিলীপ ওর জলের বোতলটা উপুড় করে ধরে বোকা-বোকা মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবল ওর বোতলে বোধ হয় জল নেই। তাড়াতাড়ি নিজের বোতলটা এগিয়ে দিল। দিলীপ কালবিলম্ব না করে, ছিপি খুলে বোতলটা গলায় উপুড় করে দিল। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। এক ফোঁটা জলও গলায় পড়ল না। আগের মতই ভিতরের জল জমে শক্ত বরফ হয়ে গিয়েছে। বারবার একই বিড়ম্বনা। তবু দিলীপ বিরক্ত হল না, অতি দুঃখে হেসে ফেলল।

আঙ শেরিংকে বোতলটা ফেরত দিয়ে সে উঠতে শুরু করল। বেলা আড়াইটা। আকাশে এখনও মেঘ, তবে আগের মত হিংস্র কুটিল নয়। মাঝে মাঝে মেঘ ছিঁড়ে আকাশ বেরিয়ে পড়ছে। ওদের দৃষ্টির দূরত্বও বেড়ে যাচ্ছে। মাঝখানে এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, ১০।১৫ ফুট দূরে কি আছে, তাও তারা দেখতে পাচ্ছিল না। এখন অবস্থা একটু ভালর দিকে যাচ্ছে। ২০।২৫ ফুট পর্যন্ত ভালই দেখতে পাচ্ছে। তার বেশী না।

দুটো কুঁজ পার হয়ে আসার পর থেকে দিলীপের মনে হচ্ছে, চড়াইটা যেন আর তেমন খামখেয়ালিপনা করছে না। একইভাবে উঠে যাচ্ছে। এ তবুও ভাল। এ যেন চেনা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা। খামখেয়ালি শুরু করেছে বরফ। বরফ কখনও বেশ শক্ত। এমন শক্ত যে, ক্র্যাম্পনের কাঁটা বেঁধে না। ওরা যেই সেইমত, অর্থাৎ পায়ে চাপ দিয়ে দু-চার কদম এগিয়েছে, অমনি ভস্‌ভস্‌—অতর্কিতে নরম বরফের মধ্যে জানু পর্যন্ত তলিয়ে গেল ওদের। মহা ঝামেলা।

ধীরে, অতিশয় মন্থরগতিতে ওরা উঠে চলেছে। সকাল সাড়ে আটটায় ৩নং শিবির থেকে বেরিয়েছিল। ছয় ঘণ্টা অবিরাম উঠেছে। উঠছে। তবু চূড়ার দেখা নেই। "ফিকস্‌ড্‌ রোপ" করতে করতে ওদের দড়ি ফুরিয়ে গেল, তবু রাস্তা ফুরোল না। কখনও কি ফুরোবে? ওরা কি পৌঁছতে পারবে নন্দাঘুন্টির শিখরে? সুকুমার যেন প্রশ্ন করল নিজেকেই।

মাঝে মাঝে এখনও হাওয়া বইছে। হাড়-কাঁপানো হাওয়া। সুকুমার বুঝতে পারছে ওর সহ্যশক্তি আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। প্রবল যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে সুকুমারের। কিন্তু কোথায়? দেহে, না মনে? পায়ের ফোস্‌কায়, না ব্যর্থতার আশঙ্কায়, সুকুমারের শ্রান্ত ক্লান্ত চৈতন্য সেটা কিছুতেই ধরতে পারছে না। মনে-মনে শুধু একটা কথাই আওড়ে চলেছে, ভেঙে প'ড়ো না সুকুমার, পথ এখনও বাকি আছে।

সুকুমার স্বেচ্ছায় আর চলছে না। এক অন্ধ শক্তি, একটা প্রবল ইচ্ছা, স্বয়ংক্রিয় এক তাড়না তাকে যেন ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেছে। ভেঙে পড়ো না সুকুমার, ভেঙে পড়ো না, পথ এখনও বাকি। থেমো না সুকুমার। আগে চল।

কে আমি? আমি সুকুমার, সুকুমার রায়, খিদিরপুরের সুকুমার। এখানে কেন? পর্বত অভিযানে। কোথায় যেন একটা ব্যথা লাগছে? আমার শরীরে কি? আমার গায়ে? আমার পায়ে? নাকি হাতে? নাকি বুকে? ফুসফুসে? হৃৎপিণ্ডে? প্লীহায়, যকৃতে, অন্ত্রে? নাকি মনে? আত্মায়? নাকি জগৎচরাচরে অথবা কোথাও না?

একী, থামলাম কেন? আমি থেমে গেলাম নাকি? ওরাও যে থেমেছে। ওরা? হ্যাঁ, এতক্ষণে মনে পড়ল সুকুমারের, ওর সঙ্গীরাও আছে। সে একা নয়। মনে পড়ল, সঙ্গে দিলীপ আছে। কোথায় দিলীপ? ঐ যে দড়ির শেষ প্রান্তে বাঁধা। দড়ির অগ্রভাগে কে? এতক্ষণ আজীবা ছিল। ঐ যে আজীবা, গুরুতর পরিশ্রমে কাতর আজীবা, দড়ি খুলে ফেলছে। এবারে এগিয়ে গেল কে? টাসী। ঐ যে, আজীবার জায়গায় নিজেকে ঢুকিয়ে নিচ্ছে।

থেমো না, সুকুমার, আগে চল। আবার চলা শুরু হল। আবার উঠতে লাগল ওরা। উঠছে, উঠছে, একজন পিছনে পড়ল, পিছনের লোক তাকে সামাল দিল, উঠছে, উঠছে, একজনের পা ফসকাল, পিছনের লোক ধরে ফেলল, উঠছে, একটু একটু করে উঠছে। থেমো না থেমো না, ওঠো। টাসী উঠছিল সবার আগে। বহু

অভিযাত্রীরা নন্দাঘুণ্টির চূড়ার দিকে উঠছেন ফটো—দিলীপ ব্যানার্জি

অভিযানের পোড়-খাওয়া টাসী। দৈত্যের মত ক্ষমতাধর টাসী। সাতাশ বছরের জোয়ান টাসী। সকলের আগে আগে উঠছিল। চড়াইটা একটা সুষম ঢালুতে অবস্থান করছিল এতক্ষণ। হঠাৎ একটা বেপরোয়া লাফ দিয়ে খাড়াভাবে উঠে গেল। টাসী থমকে দাঁড়াল সেখানে। খাড়াই-এর উচ্চতা বেশী নয়। ফুট ছয়েক হবে। উপরে একটু কার্নিসের মত। গোদের উপর বিষ-ফোড়া। টাসী আজীবার মুখের দিকে চাইল। আজীবা পলকে তার ইঙ্গিত বুঝে নিল। পা ঠুকে ঠুকে বরফের কঠিন ভিত্তি তৈরি করে দুটো পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। তারপর শক্ত মুঠোয় দড়ি ধরে "বিলে" করার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিল। আজীবা চোখ ইশারায় টাসীকে ইঙ্গিত করল, আগু বাড়।

টাসী সেই বিপজ্জনক উচ্চতায় অস্তিত্ব কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে অসাধারণ তৎপরতায় লাফ মেরে বরফের কার্নিস ধরে ঝুলতে লাগল। একটা মুহূর্ত মাত্র। টাসী তার আঙুলের জোর ফিরে পাবার আগেই তাকে কেউ যেন প্রবল ধাক্কায় ফেলে দিল। আজীবা এই মুহূর্তটির জন্যই যেন সতর্ক হয়ে অপেক্ষা করছিল। চোখের পলকে সে দড়ির কেরামতিতে টাসীর টলমলে দেহের ভারসাম্য রক্ষা করল। টাসী শিশুর মত হেসে উঠল। আজীবাও।

আজীবা আবার ইঙ্গিত করল, আগু বাড় টাসী। টাসী আবার এক লাফ মেরে সেই বরফের কার্নিসে ঝুলে পড়ল। কিন্তু সে বরফ এত নরম, এতই পলকা যে, এবার কার্নিসের খানিকটা অংশ ভেঙে নিয়ে টাসী মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আজীবা এবারও তাকে সামাল দিল। বারবার কয়েকবার টাসী লাফ দিয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করল। বারবার সে ব্যর্থ হল। মাঝে মাঝে মেঘ ফাঁক করে আকাশ ওদের ব্যর্থতা

এক ঝলক দেখে নিয়েই আবার চকিতে মেঘের আবডালে লুকিয়ে পড়ছিল।

ওরা বুঝতে পারল, নন্দাঘুণ্টির এইটেই হল শেষ প্রতিরোধ এবং সে সহজে পথ দেবে না। আকাশে আবার মেঘের ঘনঘটা শুরু হল। তুষারবর্ষণও আরম্ভ হয়ে গেল। আবার ওদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল। যেটুকু আলোও এতক্ষণ ছিল, তাও কমে যেতে থাকল।

আজীবা দক্ষ সেনাপতির মত তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল, কোথায় নন্দাঘুণ্টির দুর্বলতা। সে এবারে টাসীকে একটু ডান দিকে সরে গিয়ে, সেখান থেকে আক্রমণ করতে নির্দেশ দিল। টাসী আজীবার নির্দিষ্ট স্থান থেকে এক প্রবল লাফে কার্নিস ধরে ফেলল। তারপর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে শরীরটাকে একটা দোল খাইয়েই উপরে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কার্নিসের একটা বড় অংশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ভীষণ বেগে কোন্ অতলে অদৃশ্য হয়ে গেল। অজস্র তুষার-কণিকা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। টাসী তার আগেই বিদ্যুৎ-গতিতে একটা গড়া মেরে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছে।

এবার টাসী উপর থেকে দড়ি নামিয়ে দিল। আজীবা উঠল। তারপরে নরবু, তারপরে আঙ শেরিং, তারপর সুকুমার, দিলীপ। দিলীপের মুভি ক্যামেরা আঙ শেরিং-এর হাতে। দিলীপ হাত কামড়াতে লাগল।

চড়াইটার উপর একটা চাতাল। প্রায় ৩০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট সমতল। গোটা দুই তাঁবু অনায়াসে টাঙানো যায়। পশ্চিম প্রান্ত ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে।

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরেই ওদের খেয়াল হল, আরে, আর ত ওঠার জায়গা নেই! এই ত চূড়া!

এই তবে চূড়া! চূড়া, চূড়া, নন্দাঘুণ্টির চূড়া!!! হা ঈশ্বর! যাক বাবা, বাঁচা গেল, আর উঠতে হবে না। সুকুমার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। দিলীপের বুকের ভিতরে প্রবল এক বিপ্লব। ব্যথা-বেদনা, আনন্দ, যন্ত্রণা, সব কিছু তালগোল পাকিয়ে ঠেলে ঠেলে উঠছে। একটা আওয়াজ, প্রচণ্ডভাবে একটা চিৎকার করতে চাইছে দিলীপ। তাহলে সে স্বস্তি পাবে। কিন্তু দিলীপের মুখ দিয়ে একটু সামান্য শব্দও বের হল না।

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তারপরেই শেরপারা ঝাঁপিয়ে পড়ল এ ওর বুকে। কোলাকুলির পর কোলাকুলি। কে যে কার সঙ্গে কতবার কোলাকুলি করল, তার হিসেব রাখল না কেউ। এমনি করে আবেগের উত্তাল ঢেউগুলো ধীরে ধীরে কিছুটা শান্ত হয়ে এল। এরই ফাঁকে দিলীপ ঘড়ি দেখে নিয়েছে—৩-৫ মিঃ।

নন্দাঘুণ্টি শিখরে অভিযাত্রীদল ফটো—দিলীপ ব্যানার্জি

এরই মধ্যে দিলীপ অল্টিমিটার দেখে নিয়েছে—২০৮০০ ফুট। ২০৮০০? ওদের অল্টিমিটারে তাই বলল। তবে যে সে পড়েছিল নন্দাঘুণ্টির উচ্চতা ২০৭০০ ফুট। যাক গে। নিমাইকে জিজ্ঞাসা করলেই হবে।

দিলীপ কালবিলম্ব না করে ছবি তুলতে শুরু করল। শেরপারা ততক্ষণে নিয়ম-রীতি পালন করতে লেগেছে। অশোক-কুমার সরকার যে জাতীয় পতাকাটি হাওড়া স্টেশনে সুকুমারের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সুকুমার সেই পতাকাটি নিজের তুষার গাঁইতিতে বেঁধে পুঁতে দিল চূড়ায়। শেরপারা রমের বোতল খুলে খানিকটা রম ঢেলে দিলে। কলকাতা থেকে কারা যেন নারকেল সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। সেগুলো ভেঙে তার জল ঢালতে গিয়ে দেখা গেল, সেই জলও বরফ হয়ে গিয়েছে। দিলীপ আশা করেছিল, নারকেলের জল খেয়ে তেষ্টা মিটাবে। সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। অভাগা যেদিকে চায় সাগরও শুকায়ে যায়।

সে ক্ষুণ্ণ মনে রেলিকর্ড ক্যামেরার ভিউ-ফাইণ্ডার খুলে ছবি নিরিখ করতে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ভিউ-ফাইণ্ডারটি বরফের গুঁড়োয় ভরতি হয়ে গেল। উপায়ান্তর না দেখে সে আন্দাজে সেকেক চোখের নিরিখেই ছবি তুলে গেল।

ওরা এক বাণ্ডিল দড়ি ওখান গোল করে পুঁতে দিল, তার মধ্যে একখানা জাতীয় পতাকা পেতে, তার উপর সকলের নাম লেখা কাগজখানা রেখে তার উপর পিটন চাপা দিয়ে রেখে দিল।

আঙ শেরিং দিলীপকে ডাক দিল। একটা মগ তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "লেও, পিও।"

দিলীপ দেখল তরল পদার্থ। ওর তেষ্টা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই এক চুমুকে সেটা খেয়ে নিল। হায় ভগবান! এ যে রম!

বিজয় পতাকা হাতে দলের নেতা সুকুমার রায়

নির্জলা রম। ওর গলা বুক জ্বলে গেল। মাথা ঘুরে সেখানেই বসে পড়ল। শেরপা-দের সে কি হাসি। দিলীপের মনে হল, সে মরে যাবে। তাড়াতাড়ি সে খানিকটা বমি করল। তারপরে মাথার টুপি খুলে ফেলল। মাথায় খানিকক্ষণ বরফ পড়তেই সে খানিকটা চাঙ্গা হল।

তারপর, ওরা নামতে শুরু করল।

দিলীপ ঘড়ি দেখল। বেলা তখন ৩-৪০ মিঃ। আরোহণ যতটা কষ্টসাধ্য, অবতরণও প্রায় তাই। ওরা উঠবার সময় যে রাস্তা বানিয়ে রেখে গিয়েছিল, নতুন বরফ তা ঢেকে দিয়েছে। আবার নতুন করে পথ বানাতে হল। ফলে গতি খুব শ্লথ হয়ে এল। ওরা যে সময় বড় কুঁজটার উপর এসে পেঁছাল, তখন গাঢ় অন্ধকারে চারিদিক ঢেকে গিয়েছে। কিছু দেখবার উপায় নেই। আর এখান থেকেই শুরু হয়েছে সেই বিপজ্জনক ৭০০ ফুটের খাড়া উৎরাই। বিপদের উপর বিবদ, ওরা যে "ফিক্সড্ রোপ" করে গিয়েছিল, বরফ পড়ায় তার চিহ্নমাত্রও দেখা যাচ্ছে না। আঙ শেরিং এবার সত্যিই ঘাবড়ে গেল। সে বললে, এই অন্ধকারে, এই নিদারুণ বিপজ্জনক পথে নামা ঠিক হবে না। এসো আমরা এখানেই রাতটা কাটিয়ে দিই। কাল সকালে নামব। নরবু বলল, আমাদের সঙ্গে তাঁবু নেই। সাবদের যা পোশাক, তাতে রাত্রে এখানে থাকলে পাষাণ হয়ে যাব। মৃত্যু অবধারিত। নামবার সময়ও মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। আমার মনে হয়, এখানে থেকে তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করার চাইতে নামবার চেষ্টা করাই উচিত। তাতে যদি মৃত্যুও হয়, তাও ভাল।

নরবুর কথাতে সকলে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। খোঁজাখুঁজি করতে করতে "ফিক্সড্ রোপ" পাওয়া গেল। তারপরে শুরু হল এক দুঃসাহসিক অবতরণ। টাসী আগে আগে নামছে। তার হাতে দড়ি, মুখে টর্চবাতি। সে কয়েক ধাপ নেমে একে একে পিছনের লোকেদের নামতে সাহায্য করছে। সুকুমার দেখল, একটা টর্চের আলো তাদের পথ দেখিয়ে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গাঢ় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আকাশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে। হাওয়া নেই। দুর্যোগের চিহ্নমাত্রও নেই। আছে শুধু শীত। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আর আকাশে অজস্র তারা।

দিলীপের অদ্ভুত লাগছিল। কী নিস্তব্ধতা! এই জমাট অন্ধকার রাত্রির মতই ঘন সেই নৈঃশব্দ্য। ওর কানে কেউ ভারি সীসে ঢেলে দিয়েছে। আর এই উজ্জ্বল তারাগুলো কত নিচে ঝুলে আছে। ও যেন ইচ্ছে করলেই একটা তারা ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে পুরে ফেলতে পারে।

আরে, ও কী! দিলীপ চমকে উঠল। ওর দড়িতে ঝাঁকুনি লাগল। একটা টর্চের আলো পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সেটা অতি দ্রুত খাদের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সর্বনাশ! সেই শীতেও দিলীপের গায়ে ঘাম দেখা দিল। টাসী পড়ে গিয়েছে।

"ফিক্‌সড্ রোপ" ধরে নেমে যাচ্ছিল টাসী। হঠাৎ গোটা কয়েক পিটন উপড়ে গেল। নিমেষের মধ্যে সে ২৫।৩০ ফুট নিচে সোঁ করে তলিয়ে গেল। ভাগ্য ভাল, সে দড়ি ছাড়েনি। তাই বেঁচে গেল। ওকে তুলে আনা হল। পিটনগুলো আবার পোঁতা হল ভাল করে। তারপর অতি সাবধানে নামতে নামতে, রাত্রি সাড়ে নটার সময় ৩নং শিবিরে পোঁছে গেল। তের ঘণ্টার অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে সবাই তখন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি করে খানিকটা সুরুয়া গরম করে নিয়ে কোনমতে গিলে ফেলল। তারপরে তলহীন নিদ্রার সুগভীর সমুদ্রে তলিয়ে গেল সবাই।

॥ পঞ্চাশ ॥

বিশ্বদেব না, মদন না—২নং শিবিরে ঘুমুতে ওরা কেউ-ই পারেনি। ২৩শে অক্টোবর, ভোরে, আলোর রেখা ফুটে উঠতেই, চা খাওয়ার তরও কারো সইল না, বিশ্ব আর মদন বেরিয়ে পড়ল ৩নং শিবিরের উদ্দেশ্যে। শেরপাদের বলে গেল, পরে আসতে।

কিছুদূর এগিয়েছে, এমন সময় দূরে দেখল, ওরাও আসছে। সকলের আগে সুকুমার। তার হাতের তুষার-গাঁইতিতে বাঁধা উড্ডীন জাতীয় পতাকা। বিশ্ব আর মদনকে দেখতে পেয়ে সুকুমার তুষার-গাঁইতিটা তুলে ধরল। পতাকা সকালের বাতাসে সতেজে উড়ে সংকেতে জানাল, ওরা সফল হয়েছে। ওদের সব কষ্ট, পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। বিশ্বদেব আর মদন আনন্দে লাফাতে থাকল। সুকুমার কাছে আসতেই বিশ্ব তাকে জড়িয়ে ধরল। ফুর্তির চোটে চোখে জল বেরিয়ে এল দুজনের। দিলীপ তার ক্যামেরা বাগিয়ে এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষা করছিল। সে এই "মহামিলনের" সাক্ষী রেখে দিল তার ফিল্মে। এই সময় সুকুমারের আবার মনে হল, কোথায় যেন তার যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু সে তখন আবেগে অন্ধ। ভ্রূক্ষেপ করল না বিশেষ। মদন দিলীপ আর শেরপাদের সঙ্গে আলিঙ্গনের পালা শেষ করল। তারপরে দ্রুত নেমে চলতে লাগল নিচে। ২নং-এর শেরপাদের বলে এল, তারা যেন ৩নং-এর মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে আজই নেমে আসে।

সেই পরিশ্রান্ত শরীরে ওরা প্রায় ডবল-মার্চ করে, সেইদিনই যখন অ্যাডভান্স

তপোবনে প্রথম অভিনন্দন, গভীর রাত পর্যন্ত উদ্দাম নৃত্য

বেস-এ এসে পৌঁছাল, তখন বেলা সাড়ে চারটে বেজে গিয়েছে। সন্ধ্যে হতে বাকি নেই। বীরেন সিংহ ছুটিয়ে ছবি তুললেন। হই-হুল্লোড় হল। ঘুমুতে যাবার সময় সুকুমার টের পেল যন্ত্রণা হচ্ছে তার পায়ে। আঙ শেরিং, এমনকি, দিলীপও বোধ করল, পা যেন টাটাচ্ছে।

*   *   *

২৭শে অক্টোবর বেলা দশটার মধ্যেই বীরেন সিংহ আর ডাঃ অর্জুন কর বেস-ক্যাম্পে পৌঁছে সুখবরটি দিলেন। আনন্দে সবাই অধীর হয়ে উঠল। ডাঃ কর পারেন রাঁধতে বসে গেলেন। বাকি সবাই প্রায় সাড়ে এগারটার সময় এসে পৌঁছাল। সমস্ত মালবাহককে উপরে পাঠিয়ে দেওয়া হল মাল নামিয়ে আনতে। সুকুমার আর
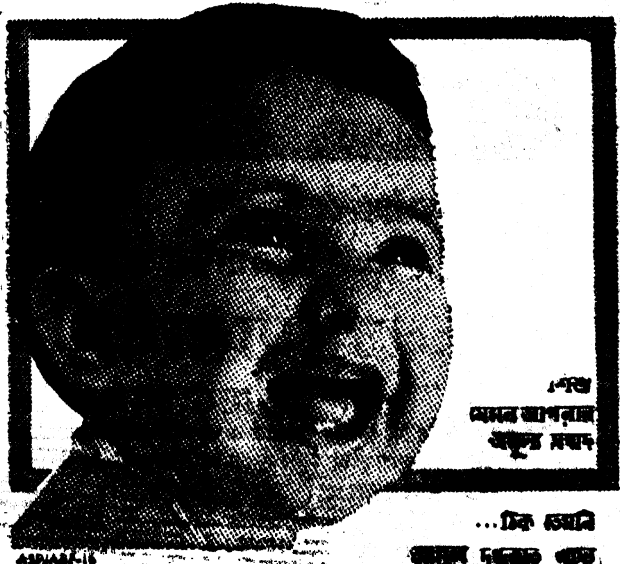
চলতে পারছে না। আঙ শেরিংও না। ওরা পা পাড়তেই পারছে না, এমন টাটানি। ডাক্তার সুকুমারের পা খুলে ফেলল। দু পায়ের আঙুল কটা ফুলে গিয়েছে। ডান পায়ের বুড়ো আঙুল নীলবর্ণ। ডাক্তার মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে সুকুমারকে বললে, কিছুই না, ফোসকা পড়েছে মাত্র। ধ্রুবকে এসে চুপি চুপি বলল, দুজন লোক ঠিক কর। ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আঙ শেরিং-এর পা খুলে দেখা গেল, ওর পায়ের আঙুলগুলো কাটা। পায়ের পাতাই আছে শুধু। ডাক্তার অবাক হয়ে ভাবল, এই লোকটা এই পা নিয়ে এতখানি উঠল কি করে? আঙ শেরিং-এর পা-ও জখম হয়েছে। দিলীপের ফাঁড়া একটা আঙুলের চোটের উপর দিয়েই কেটেছে। ডাক্তার ওদের চিকিৎসায় মন দিল।

* *

লেখকের দিনলিপি থেকে:

বেসক্যাম্প, ২৪শে অক্টোবর। আজ

আমরা ফিরে যাবার গোছগাছে ব্যস্ত। সুকুমার বিষণ্ণ। ওর পা নিয়ে খুব ভাবছে। আমি টেলিগ্রাম লিখে ফেললুম। পরে রিপোর্টটা উনুনের পাশে বসে শেষ করলাম। বিস্তারিত বিবরণ ডাকে পাঠাব। জয়ের সংকেত পাঠাব তারে। কেদার সিংকে আজ ছাড়লাম না। কাল সে আমাদের রাণ্টি নদীর প্রবাহ ধরে, নতুন পথে মোরনা গ্রামের কাছাকাছি পেঁছে দেবে। তারপর তার ডাক নিয়ে ছুটবে যোশীমঠ। পরশুই তাকে টেলিগ্রাম লাগাতে হবে।

নোটবুক খুলে সংকেতটা বারবার করে পড়লাম। তারপর লিখলাম:

Editor tell mother returning twenty second repeat editor tell mother returning twenty second repeat editor tell mother returning twenty second stop Gour

২৬শে অক্টোবর। বেস ক্যাম্প তুলে দিয়ে যাত্রা শুরু হল। আসবার আগে সকলে মিলে পাহাড়ের গা পরিষ্কার করে দিয়ে এলাম। কোন জিনিস, এক ফোঁটা ময়লাও আমরা রাখতে দিলাম না। পর্বতারোহীদের এই দস্তুর। যে পাহাড় পরম সহিষ্ণুতায় আমাদের সব উৎপাত সহ্য করেছে, আজকের প্রার্থনায় তাকে অন্তরের সমস্ত সততা দিয়ে ধন্যবাদ জানানো হল।

* * *

২৭শে অক্টোবর। মোরনার ঠিক নিচে আমরা রাতের শিবির স্থাপন করলাম। গ্রাম থেকে লোক ভেঙে পড়ল। ডগদর সাহেবের জন্য। এরা ডাক্তার ছাড়া আর কাউকে পাত্তাই দিল না।

* * *

২৮শে অক্টোবর। সকাল সাড়ে সাতটায় উঠেই সুকুমার, ধ্রুব, মদন, বিশ্ব, দিলীপ, আশু ফতার আর নরবু লতা গ্রামের দিকে রওনা দিল নন্দাদেবীর মানত শোধ করতে। তাদের সঙ্গে মানতের ভেড়াটাও লাফাতে লাফাতে চলল। একটা ভেড়া নিয়ে পথ চলা কঠিন। গড্ডালিকা ছাড়া ওরা চলতে চায় না। কিন্তু মালবাহকেরা বলেছিল, এই ভেড়া নিয়ে কোন মুশকিলে পড়তে হবে না। মানতের ভেড়া নিজের তাগিদে পথ চলে। সত্যিই, এই ভেড়াটা আমাদের পথ দেখাতে দেখাতে চলে এসেছে। একবারও ঝামেলায় ফেলেনি। আমি, বীরেনদা আর ডাক্তার দশটায় সমস্ত অন্যান্য শেরপাদের সঙ্গে তপোবন যাত্রা করলাম।

•

বীরেন সিংহের দিনলিপি থেকে:

চটির দোতলায় রাতের সংবাদ শোনার জন্য রেডিও খুলে বসে আছি। কাল কেদার সিং দু দিনের পথ এক দিনে দৌড়ে টেলিগ্রাম লাগিয়ে দিয়ে এসেছে। যদি আজ কাগজে খবরটা বেরিয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই রেডিওতে বলবে। সাড়ে সাতটায় খবর বলা শুরু হল। একেবারে শেষের দিকে সংবাদঘোষক নন্দাঘুণ্টি বিজয়ের খবর দিল। তারপর হিন্দী বুলেটিনেও খবরটা প্রচারিত হল। আর সঙ্গে সঙ্গে তপোবনের আবহাওয়া বদলে গেল। দলে দলে লোক ছুটে এল সেই সরু সিঁড়ি দিয়ে। প্রথমে এলেন একজন গাড়োয়াল কবি। তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করে আমাদের অভিনন্দন জানালেন।

"হে বীরপ্রসবিনী ভারতমাতার সন্তানগণ, তোমরা মাতার গলায় গৌরবের এক চন্দ্রহার ঝুলিয়ে দিয়েছ, তোমরা ধন্য। মাতার ললাটে গৌরবের উজ্জ্বল সিতারা (তারকা) লটকে দিলে, তোমরা ধন্য।"

তারপর বাঁধভাঙা বন্যার মত লোক ছুটে এল। আমাদের টেনে নিচে নামাল। শুরু হল সমবেত নৃত্য। রাত দুটো পর্যন্ত নৃত্য চলল। তারপর নেহাত করুণাবশেই—কারণ আমাদের প্রাণ ততক্ষণে ওষ্ঠাগত হয়ে [illegible] আমাদের রেহাই দিল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এরকম সংবর্ধনা আর গোটাকতক কপালে জুটলেই পৈতৃক প্রাণটি যে কলকাতায় ফিরবে না, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হলাম।

* * *

২৯শে অক্টোবর। যোশীমঠ। পথে বড়গাঁওতে শোভাযাত্রা করে স্কুলের ছাত্ররা

সুকুমারের পায়ে চোট লাগায় তাকে কাণ্ডিতে করে বয়ে আনা হচ্ছে

বিদায় সংবর্ধনা জানাল। পোস্ট অফিসে এসে তিনখানা তার পেলাম। অভিনন্দন। ব্যাংক কর্মচারী সমিতি, সুকুমারের ভগিনীপতি আর প্রবোধ সান্যাল অভিনন্দন জানিয়েছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট শ্রীযোগেন সেন টাকাও পাঠিয়েছেন। দুর্ভাবনা গেল। কেদার সিং বিদায় নিল। গোরা সিং আগামীকাল যাবে। এখন একে একে সকলেরই যাবার পালা।

* * *

লেখকের দিনলিপি থেকেঃ

২রা নভেম্বর। যোশীমঠ। আজ বদ্রীনাথ থেকে ফিরেই তিনখানা টেলিগ্রাম পেলাম। দুখানা বার্তা সম্পাদকের, একখানা দিল্লী থেকে আমাদের কাগজের প্রতিনিধি শ্রীঅশ্বিনী গুপ্তের। দিল্লী যাবার আমন্ত্রণ। রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে মোলাকাতের আমন্ত্রণ। সুকুমারের হাতেও টেলিগ্রামের বোঝা। অভিনন্দন, অভিনন্দন, অভিনন্দন। প্রথমে দিল্লী, তারপর দিল্লী থেকে কলকাতা। অভিনন্দন। অভিনন্দন। অভিনন্দন।

৪ঠা নভেম্বর। পিপলকোটি। এক মাস ছয় দিন পরে আবার এখানে ফিরে এলাম। মালবাহকদের দেনা-পাওনা সব চুকিয়ে দেওয়া হল। ওরা ছলছল চোখে বিদায় নিল। অনেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সারা দিন ধরে আমাদের জামা-কাপড় কেচে দিল। বাস ঠিক করা হয়ে গিয়েছে। রাত থাকতেই বাসে উঠতে হবে। প্রথম গেটেই বাস ছাড়বে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর, কফি খাইয়ে, বাসনপত্র মেজে হরি সিং আর লালুও বিদায় নিল। লালুর চোখে জল।

"সাব্।" চমকে উঠলাম। হরি সিং।

"সাব্, মোটা সাব্, আগর কুছ কসুর হুয়া ত মাফ কর দেনা।"

বেস ক্যাম্পে সারা রাত জুয়া খেলে বহু টাকা হেরেছিল হরি সিং। ওকে খুব বকেছিলাম। ওর কি সেই কথা মনে পড়ল?

"হরি সিং!" ডাক্তার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা করতে গেল। পারল না। অ্যাডভান্স বেসে এইটেই ছিল ডাক্তারের প্রচলিত রসিকতা। ডাক্তার নাটুকে সুরে হাঁক পাড়ত, "হরি সিং, উজীর!" হরি সিং হাত জোড় করে জবাব দিত, "হু-জু-র।" ডাক্তার বলত, "তুমকো বরখাস্ত কিয়া গিয়া হ্যায়।" "জী হুজুর।" হরি সিং হাত জোড় করে থাকত। ডাক্তার হাঁকত, "তুম্‌হারা তনখা বাজেয়াপ্ত হো গিয়া হ্যায়।" "জী সরকার।" "লেকিন তুমকো কাম করনে পড়েগা।" "জী সরকার।" "যাও, চা বানাও।" "জী সরকার, আভি লাতা হু।"

ডাক্তার তেমনি করেই হাঁক ছাড়তে গেল। পারল না। ওর গলার স্বর ভারি হয়ে এল।

"হরি সিং! মন্ত্রী!"

"জী সরকার।"

ডাক্তারের চোখে জল। অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে ভাঙা ভাঙা স্বরে বললে, "ভগবান, তেরা ভালা করে, হরি সিং।"•

হরি সিং-এর দু চোখে জলের ধারা নেমেছে। জনে জনে হাতজোড় করে বলে চলেছে, "ইয়াদ রাখ্‌না সরকার, তুমহারা হরি সিংকো ইয়াদ রাখ্‌না।"

সমাপ্ত।

অযাত্রায় জয়যাত্রা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(১৭)

ভীষণ ভিড়। ঘাটের মুখটা দু' শ গজও হবে কি না সন্দেহ, ভিড় চিরে পৌঁছাতে যেন মাইল দুয়েকের মেহনত হয়ে গেল। তাও যে ঠিক মুখের কাছে এসে পড়েছি, এ কথাও তো বলতে পারছি না। কুলি আমায় একটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় এনে হাজির করেছে। স্টীমার জেটিতে থাকলে বোঝা যেত; এখন খালি জেটিটা যে কোথায়, ভিড়ের মধ্যে দিয়ে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মোট নামিয়ে, মাথার পাগড়িটা খুলে মুখ-হাতের ঘাম মুছতে মুছতে বলল,—"দেখুন হুজুর, কিরকম মেহনতের কাজ আমাদের। অথচ আপনারা 'কৌসিলে' হল্লা করবেন, হারামজদার? হারামজাদারা ফাঁকি দিয়ে জবরদস্ত পয়সা আদায় করে; ওপর থেকে হুমকি আসবে, রেট নিয়ে কড়াকড়ি হবে।"

তা হলে দেখছি টুপির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আন্দাজটা আমার ভুল হয়নি।

বললাম—"তোরা বাগে পেলে যে না করিস এমন তো নয়, তুই না-হয় আমার বেলায় না করেছিস। যাক্, সে কথা। তুই এক কাজ কর, একটু স্টেশনের দিকে গিয়ে সন্ধান নেওয়ার চেষ্টা কর, স্টীমার কত দূর, কী ব্যাপার, আজ রাত্তিরে আসবে কিনা। আমি খুঁজে বের করতেও পারব না স্টেশন, পারলেও ফিরে আসা মুশকিল হবে।"

ও চলে গেল। বিপদ আর এক রূপ ধরে এসে দেখা দিল।

আর ফিরে আসে না লোকটা। ঘড়ি দেখতে দেখতে আধ ঘণ্টা হয়ে গেল—চল্লিশ মিনিট, পঁয়তাল্লিশ, দেখা নেই। স্টীমারের ভাবনা লোপ পেয়েছে, উলটে ভয় হচ্ছে এসে না পড়ে। এ মোটঘাট নিয়ে যে এক পা নড়বার উপায় নেই। ভরসা মাত্র কাউন্সিলের টুপি। কিন্তু সেটা ওর না হয় কিছু কিছু ভয়, সত্যি বলতে গেলে আমার তো কোন ভরসাও নয়।

এল শেষ পর্যন্ত। দুটি দুঃসংবাদ বহন করে। স্টীমারের বিশেষ কোন আশা নেই। ব্যাপার গুরুতর। স্টীমার আসতে আসতে মাঝপথে চড়ায় আটকে গেছে। তাকে টেনে নড়াবার জন্যে ওপার থেকে একটা স্টীমার পাঠানো হয়েছে. খবর এখানে এই পর্যন্ত পাওয়া গেছে। তারপর কি অবস্থা কেউ বলতে পারছে না। নানারকম গুজব উঠেছে, কেউ বলছে চড়ায় ফাঁসেনি, ডুবেই গেছে স্টীমারটা। কেউ বলছে টানাটানিতে দু'-আধখানা হয়ে যায় স্টীমারটা, আধ-খানাকেই খানিকদূর টেনে নিয়ে আসবার পর এ স্টীমারের সারেঙের হুঁশ হয়......

"ঠিকই তো কিয়া।"

ঘুরে দেখি কুলির কাহিনীতে কয়েকজন যে এগিয়ে এসেছে তাদের মধ্যে তিলককাটা বড় পাগড়িধারী একজন পন্ডিতের মন্তব্য। একটু ধাঁধায় পড়ে যেতে হল বইকি। স্টীমারের আধখানা টেনে নিয়ে চলে আসছে সারং এটুকু পরিপাক করাই তো যথেষ্ট দুরূহ, সেটাকে আবার অনুমোদন করে কি ভেবে!

প্রশ্ন করতেই হলো—"ও কথা বললেন যে আপনি পন্ডিতজী!"

"সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পন্ডিতঃ।" —হাতে নস্য নিছল, শেষের বিসর্গটায় খুব জোর দিয়ে, নাকে ঠুসে দিয়ে সশব্দে হাত ঝেড়ে বলল—"গীতামে ভগবাননে কহা হ্যায়।"

নস্য-সজল বড় বড় চোখে একবার চেয়ে নিল সবার দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে।......হয়ত কোন স্নানার্থীদলকে পুণ্য অর্জনে সহায়তা করতে এসেছে মন্ত্র-অনুষ্ঠানাদির মধ্যে দিয়ে।

কুলি এসে আর একটি যে দুঃসংবাদ দিল তা এই যে. ইতিমধ্যে ওপারের যাত্রিবাহী আর একখানি গাড়ি সানপুর থেকে উপ-স্থিত হয়েছে। বুঝলাম এই যে এতখানি দেরি হলো ওর, সেটা এইজন্যেই। আরও যাত্রী যরেছে, তাদের মোটঘাটসুদ্ধ কোথাও বসিয়ে এসেছে।

এ আর এক বিপদ। কারুর সর্বনাশ, কারুর পৌষমাস। এরকম দুর্ঘট ওদের কামাবার মরশুম। প্রত্যেক ট্রেন থেকে যাত্রী নামিয়ে বসিয়ে বসিয়ে এসেছে। তিনখানা ট্রেন, আশ্চর্য হব না যদি কোনটা থেকে একাধিক যাত্রী বা যাত্রিদল নামিয়ে বসিয়ে এসে থাকে। তারপর এক এক করে তুলবে, এই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে! আমার পালাটা কখন? আগে একখানা গাড়ি এসে গিয়েছিল। সোজাই পাড়তে হলো কথাটা—"তুই তা হলে এই গাড়ির লোক নামাতে গিয়েছিলি?"

একটু হকচকিয়ে গেল। বলল, "হ্যাঁ হুজুর, মিছে কথা বলব না। দু' পয়সা পাই, একটু মেহনত করি।"

"তাদের মোটও তুলে দিবি তো জাহাজে?"

"এরা স্নান করতে এসেছে হুজুর। ওপারে যাবে না।"

"ঠিক তো?"

"বিলকুল ঠিক হুজুর, মিথ্যে বলতে পারি আপনাকে?" —জিভ কেটে কানে হাত দিল।

"আমার আগেও তো একটা গাড়ি এসেছে।"

আরও থতমত খেয়ে গেল। চেয়ে রইল মুখের দিকে। ধরা পড়ে গেছে।

"তাদের মোট তো আমার আগেই তুলে দিয়ে আসতে যাবি?"

প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে গান্ধী টুপিটাও বের করে ডান হাতে ধরে বাঁ হাতের চেটোটার ওপর আস্তে আস্তে আছড়াতে লাগলাম।

একেবারে আধখানা জিভ বের করে দাঁতে চাপল। বলল—"তা কখনও পারি হুজুর? আপনি হচ্ছেন......"

কি হচ্ছি আমি সেটা আর বলল না। তবে দৃষ্টিটা তেরছা হয়ে টুপিটার ওপর গিয়ে পড়ল।

আমি বললাম, "নম্বরটা দেখা তো?"

পকেট থেকে পেতলের তকমাটা হাতে দিতে আসছিল, বললাম—"নিয়ে করব কি? তুই নড়বিনি এখান থেকে। খবরদার।"

আরও আধ ঘণ্টা কাটল, যার প্রত্যেকটি মিনিট যেন এক একটি কল্প। একটা অবস্থার মধ্যে থিতিয়ে বসতে শরীর তার যত দাবি-দাওয়া এনে একসঙ্গে উপস্থিত করল। অসহ্য ক্ষিদে, তার সঙ্গে অসহ্য ক্লান্তি আর অবসাদে চোখের পাতা যেন বিলক্ষণ ভারী হয়ে এসেছে। পাশেই একটি ছোট যাত্রিদল, মেয়ে-পুরুষ-কাচ-কাচা নিয়ে পাঁচজন। পুঁটুলি খুলে স্ত্রীলোকটি চাটুর মতন বড়, হাতের তেলোর মতন পুরু দু'খানা সাদা ধপধপে মকাইয়ের রুটি বের করেছে। নিশ্চয়ই সবাইয়ের। খানিকটা ধুঁধুলের তরকারি, দু'টো বড় বড় আমের আচার। খানিকটা ভেঙে দেয় না গঙ্গার তীরে দান করে পুণ্য অর্জন করেছে বলে? না, চাইছি না, প্রাণান্তেও চাইব না নিশ্চয়। কিন্তু দিলে না যে বলব না এটাও সমান-ভাবেই নিশ্চয়। আমি চাওয়া আর স্বতঃ-প্রবৃত্ত দানের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আবিষ্কার করে ফেলেছি। চাওয়া ভিক্ষা, না চেয়ে পাওয়া দান। আরও একটা জিনিস—অবশ্য আমার আবিষ্কার নয়, নূতন কথাও নয়—সাম্যবাদ। এ তত্ত্বকে এত প্রত্যক্ষভাবে, এত মনে-প্রাণে পূর্বে কখনও মেনে নিয়েছি বলে মনে পড়ছে না। রাজার দান নিয়েছি, গৌরব মনে করেই। আমি কি একাই? পুরুষানুক্রমে সে দানের গৌরব বহন করে এসেছে আমার ধমনীর রক্ত। ব্রাহ্মণই তো। আজ সাম্যের যুগ। খাদ্যের আর বেশভূষার সামান্যতা দেখে মনে হয়, এরা হয়তো আমার কুলির শ্রেণীরই মানুষ; কিন্তু আমি প্রভেদ সৃষ্টি করতে যাই কেন, এই গঙ্গার তীরে? ভেঙে ভেঙে দিল সবাইকে। রুটি, ধুঁধুলের তরকারি, আচার। পুরুষটাকে আধখানা দিয়ে বলছে—"আরও খানিকটা দিই?" উত্তর হলো না, দরকার নেই।...... কী ক'রে বলতে পারে লোকে এ কথা! কাচ দুটোকে যা দিল তা ওরা খেতেই পারবে না। অন্তত পারা উচিত নয়।

মাগী নিজে গোটা আধখানা রুটি, এক খামচা তরকারি, গোটা একখানা আচার নিয়ে একটু ঘুরে বসল। "মাগী" কথাটাই তখন মনে এসেছিল, কলমের ডগায় তাই আপনিই বেরিয়ে গেল এখন। "মহিলা"-ই মনে আসা উচিত ছিল তো—সাম্যযুগের মন।

মনে পড়ে গেছে! পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা! আমি ক্ষুধায় পতিত আজ। পড়া অর্থাৎ কবলিত অর্থেই "পতিত" নয়, সে তো আছেই। নীচে নেমে যাওয়া অর্থেও 'পতিত' নয় কি? নেমে যায় নি কি মনটা? নইলে ভিক্ষা আর দানের এত সূক্ষ্ম প্রভেদ করলাম কি করে আবিষ্কার?

কুলিটাকে ব্যাগ থেকে ঘটিটা বের [illegible] দিয়ে বললাম—"নদীর ভেতর দিকে খানিকটা চলে গিয়ে এক ঘটি জল নিয়ে [illegible] পারিস? দেখিস্ যেন কাদাবালি না থাকে।"

—থাকলেই বা ক্ষতি কি? জলের সঙ্গে আহার।

লোকটা ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে খেয়াল হলো—অর্থাৎ পালিয়েও তো যেতে পারে। এবার তো উলটে লাভেই থাকবে। ভালো কাঁসার ঘটি, ভাড়ার টাকাটা [illegible] দিয়েও কোন না আরও টাকা পাঁচেক হাতে থাকবে? তকমাটা চেয়ে নেওয়া হলো না।

যাক্, লাভ-বঞ্চনার সব হিসেব যাক চুকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণাও। আমার শুধু একটু নিরা[illegible] জায়গা দাও মা তোমার তীরে। শেষ নিদ্রা হয় তো আরও ভালো।

ফিরেই এল লোকটা। কাঁধ উলটে সমস্ত

...গলায় ঢকঢক করে ঢেলে দিলাম। ...মার গোত্র-পিতা ছিলেন ভরদ্বাজ মুনি; ...মুনির সঙ্গেও কি কোন সম্বন্ধ আছে?

...খালির ওপর বিছানাটা আধ-পাতা করিয়ে ...য়েছি।

...অপরকে সন্তুষ্ট করবার একটা প্রকৃষ্ট ...হচ্ছে নিজের তরফের লোকের নিন্দা ...। তাতে মনে হয় কত না আপন করে ...নিজেকে। আত্মীয়ের চেয়ে ঘর-...সন্ধানে বিভীষণ আবার বেশী আত্মীয় ...।

...আগে জমিটা ঠিক করে নিল, একবার ...জ্ঞেস করল, আমি কোন্ দিকের মানুষ—...ই পাটনা-ছাপরার দিকের, না, দ্বারভাঙ্গা-...কামার দিকের। তারপর আরম্ভ করল—...নেন হুজুর, এই যে চড়ায় জাহাজ ...টকালো, এটা একেবারে বাজে কথা।"

"আটকায়নি! তা হলে! আছে কোথায়?"

"না, আছে তো আটকেই। নিত্যিই ...টকাচ্ছে; কাল প্রায় সমস্ত দিনটা ছিল ...টকে একটা স্টীমার। কিন্তু আপ্সে যে ...টকে যাচ্ছে তা তো নয়। এই গঙ্গাজীই ...কাল রয়েছেন, জল কমে চড়া পড়েছে ...ও আজ নয়, এই সারেঙরাই বহু দিন ...কে কাজ করছে, কোথায় জল কোথায় চড়া ...দের নখদর্পণে—কথায় কথায় জাহাজ ...টকে যাওয়া এত সহজ নয়। ভেতরকার ...টা অন্যরকম......"

চোখ বুজে আসছে, তবু কৌতূহলের আতিশয্যে ঘাড় ফিরিয়ে প্রশ্ন করলাম—"কি রকম?"

"ঐ যে গঙ্গাজীর ওপর পুল বাঁধবার কথা হচ্ছে না? ওটা আপনাদের দিকেই, মানে মোকামাতে হলেই তো ভালো। নেহরুজী, রাষ্ট্রপতি, এঁরাও তাই চান—ওঁদের কাছে যেমন মোকামা তেমনি পাটনা তো—কিন্তু পাটনার লোকেদের ইচ্ছেটা অন্যরকম—তারা চায় পাটনাতেই হোক ওটা, পাটনার লোকে-দেরই বেশী বোলবোলাও তো, পাটনা হলো রাজধানী—কিন্তু শুনছি তা তো আর হচ্ছে না—তাই একটা হইচই করে নিজেদের মকদ্দমাটা 'ইস্ট্রাং' করবার জন্যে সারেঙদের সঙ্গে......"

ভিড়ের শব্দের সঙ্গে এই "মকদ্দমা স্ট্রং" করার কাহিনী মৌমাছির গুনগুনানির মতন কখন মিলিয়ে গেছে কানে, যেন ঠিক তার পরেই আমার কাঁধটা ধরে ওর বেশ ঝাঁকুনি দিয়েই ডাক—"হুজুর, উঠুন উঠুন, জাহাজ দেখা দিয়েছে!"

"জাহাজ!"—ধড়মড়িয়ে একেবারে সোজা হয়ে বসেছি। মাথাটা ঝিমঝিম করছে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গায়, যেন ঘাড়ে এসে পড়ল বুঝি এইভাবে চারিদিকে চেয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলাম—"কোথায়?"

দাঁড়িয়েই ঝুঁকে পড়ে আমায় নাড়া দিয়ে তুলেছে, সোজা হয়ে ডান দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল—"ঐ যে! ...ঐ নিন, বাঁশিও দিচ্ছে।"

দাঁড়িয়ে উঠে তর্জনী সঙ্কেত অনুসরণ করে কিছু তো দেখতে পেলাম না। মনটা গুছিয়ে নিতে পারছি না তো।......তারপর অতি ক্ষীণ একটা বাঁশির আওয়াজ, এক ঝলক আলোয় মনটা যেন আস্তে আস্তে স্বচ্ছ হয়ে এল। হ্যাঁ, এটা একটা আলোক-বিন্দুই তো। স্টীমারের সার্চলাইট না? বাঁশির চেয়ে আরও কত ক্ষীণ কিন্তু!

কিন্তু এ কি ভীষণ দৃশ্য!

কোজাগরী পূর্ণিমার সে আকাশ কোথায়? হাতঘড়িতে দেখলাম দুটো দশ। তার মানে ঘণ্টাখানেকের ওপর ঘুমিয়েছি আমি। চাঁদটা একেবারে নীচে দিকচক্রের কাছাকাছি নেমে গিয়ে হেমন্তের কুয়াশায় চারিদিক গেছে অস্পষ্ট হয়ে। কেমন যেন অস্বস্তিকর; ভয়াবহ বললেও বোধ হয় দোষ হয় না। চাঁদ আর দেখা যাচ্ছে না। হয়তো পুবের ঘনী-ভূত কুয়াশাই, কিংবা হতে পারে একটা খুব পাতলা মেঘের পেছনে তার বৃত্তরেখা বিলুপ্ত। যেন মৃতের স্মৃতির মতন শুধু একটা গোল আভা। দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখি গঙ্গার ওপর সেই আলোটা আরও স্পষ্ট হয়েছে। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে মনে হচ্ছে যেন একটা আগুনের ভাঁটা, একটা দৈত্য যেন, তার একটিমাত্র চক্ষু কপালের মাঝখানে জেলে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে।

আর সেই বাঁশি!

দৃষ্টিটা তীরে চলে এল। একটা বিরাট জনসংঘ। সবাই এখন শুয়ে-বসে: নিদ্রিতই বেশী, তাই তার ঘন-নিবদ্ধ আকারটা
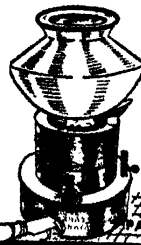
দেখতে পাচ্ছি যেন, তবে কত দূর পর্যন্ত সেটা পরিব্যাপ্ত সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, অন্ধকার-লিপ্ত গাঢ় কুয়াশায় প্রান্তভাগ মুছে মুছে গেছে। বাঁশির স্বর যতই স্পষ্ট হয়ে আসছে, চকিত হয়ে মাথা তুলছে—এখানে, ওখানে। সেদিন প্রায় স্তব্ধ সেই গভীর রাত্রে মুক্ত তট-প্রান্তরে হঠাৎ জেগে ওঠার বিস্ময়ে সে যে এক বিভীষিকা দেখি—ভীষণ-মোহনই বলি—তার জুড়ি আর চোখে পড়েনি জীবনে। মনে হলো জনসংঘ নয়, কার বাঁশির ডাকে এক বিপুল বিরাট সহস্রশীর্ষ ফণীর সুপ্তি যাচ্ছে ভেঙে, একটি দুটি করে ফণা জেগে উঠে বাতাসে দোল খাচ্ছে।

সব জড়িয়ে এক হয়ে গিয়ে অনির্বচনীয় সে যে কী একটা অভিনয় প্রকৃতির উন্মুক্ত নাটমঞ্চে তা কি করে বোঝাই তোমায়?...... অভঙ্গ শান্তি একটি মাত্র ধ্বনি, তাও বাঁশির ধুনান, পূর্ণগঙ্গা, কোজাগরী পূর্ণিমা; তারই সঙ্গে ঘনায়মান, আঁধার-ছোঁওয়া কুহেলী, মাঝখানে ঐ অগ্নিপিণ্ড, ক্রমেই বাড়তে বাড়তে এগিয়ে আসছে; সর্বোপরি এই বৃহদাকায় জনতা-সরীসৃপ।

শুধু সুন্দরই কি মনোহর? যা ভয়ংকর, যা বীভৎস তাও কি নয়? দুটোই যখন এক হয়ে গেছে—সে আবার কী উদ্‌ভ্রান্তির মনোহর একবার ভেবে দেখ না। হতমন আমি নিশ্চল, নির্নিমেষ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

কুলিটা বোধ হয় একবার টুকেছে, সাড়া না পেয়েই আঙুল দিয়ে কাঁধটা একটু চেপে বলল—"হুজুর, দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। ভিড় ঠেলে যতটা সম্ভব এগিয়ে জেটির কাছাকাছি জায়গা নিতে হবে। তিনটে জাহাজের লোক।"

হ্যাঁ, এগিয়ে যেতে হবে বইকি। জীবন তো স্থাণু নয়, একটা ক্লাইমেক্সের দিকে তাকে এগিয়ে যেতেই হবে; সে ক্লাইমেক্স মৃত্যুই।

মৃত্যুই।......আর বইছে না শরীর।

সবটাই শোনাতে হবে?

কিন্তু যখন সব অসাড় হয়ে এসেছে, অনুভূতি প্রায় লুপ্ত, স্মৃতি আচ্ছন্ন তখনকার ইতিহাস কি করে বলি?

এগিয়েছিলাম কি ভিড়ই আমায় এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল শম্বুক গতিতে?

পঞ্চাশ গজও বোধ হয় নয়, যখন দাঁড়িয়ে পড়ি, ঘড়িতে দেখি প্রায় আড়াইটে অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ মিনিট লেগে গেছে। জাহাজ এসে পৌঁছাতে, যাত্রী খালাস হতে লাগল ঘড়ির কাঁটা ধরে আরও দেড় ঘণ্টা। একটা অস্ত্রহীন নীরব যুদ্ধ—ওরা নামবে, জাহাজে আতঙ্কও ধরে গেছে; এরা উঠবে, নিষ্পেষণ করে ফেলতে চাইছে পরস্পরকে। পুলিস? কী করবে? সমুদ্রে পাদ্য-অর্ঘ্য!

......কী করে পৌঁছলাম মনে নেই, শুধু একটা প্রার্থনা মনে আছে—যেন পুলটা ভেঙে গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যাই। অযাত্রায় যাত্রা করে অপরাধ করেছি? এইটেই সে অপরাধের ক্ষমা বলে মনে করব, হে দেব।

জাহাজটা যাত্রিবাহী নয়, প্রকাণ্ড এক মালবাহী জাহাজ, বোধ হয় হোরমিলার কোম্পানীর কাছ থেকে আমদানি করেছে ওরা। এত দূরদর্শিতার কাজ ওরা আর কখনও করে নি। মানুষ নিঃসাড়, নির্জীব মালের গাদাই হয়ে গেছে অযুত সংখ্যায়। ......সেকেণ্ড ক্লাস ওপরে......অসম্ভব ওঠা। কুলি আমায় নিয়ে গিয়ে ধোঁয়া বেরুবার চিমনির কাছে একটা ঘেরাঘুরি জায়গায় বসিয়ে দিলে—মোটঘাট দিয়ে সামনে একটা আগলও করে দিলে কোনরকম বসবার মতন একটু জায়গা রেখে।......বলছে, কাউন-সিলের মেম্বার আমি, প্রথম শ্রেণীর যাত্রী—যেন একটু খাতির রাখে......

মৃত্যুর আগে কি সত্যমিথ্যার অতীত হয়ে যাই আমরা? তীরে মিথ্যাভাসকে প্রশ্রয় দিয়েছি, এখন তা যখন পূর্ণরূপেই আত্মপ্রকাশ করল, তখন একটু প্রতিবাদ করবারও ক্ষমতা নেই।......শেষ মনে পড়ছে—এক টাকাটাকে দু' টাকা করে ওর গঙ্গা-তীরের ঋণ শোধ করে দিতে পেরেছিলাম।

আরও বলতে হবে?

ঘুমিয়েছিলাম, কি জেগে ছিলাম তা তো জানি না। দুঃখ যখন এসে পড়ে চরমে তখন মানুষ থাকে জীবন্মৃত। নিদ্রাজাগৃতির মাঝখানে রহস্যালোকে, তার বর্ণনা যে কেউ দিয়ে যেতে পারে নি। সেই নিষ্করুণ রহস্যলোকের মধ্যে ছিল আমার শেষ যাত্রা।

তারই মধ্যে দিয়ে আমার সমস্ত দেহ-মন অন্তরাত্মা হঠাৎ এ কি এক আনন্দলোকে বিকশিত হয়ে উঠল!

নবোত্থিত পাখিদের কাকলিতে চোখ মেলে দেখি সামনে এক নূতন দিনের সূর্যোদয়! সবেমাত্র এই আরম্ভ হয়েছে। প্রশস্ত গঙ্গার একেবারে শেষ প্রান্তে, ও-পারের নীল আকাশ আর নীচের নীলাভ জলবিস্তারের মাঝখানটিকে একটি অর্ধস্ফুট জ্যোতি[illegible] কমল। কোন্ অদৃশ্য দেবতার চরণে [illegible] এক অদৃশ্য পূজারীর পুষ্পাঞ্জলি। [illegible] সমস্ত দেহে রোমাঞ্চ জাগিয়ে শঙ্খ-ঘণ্টা[illegible] উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্র পাঠ।

সুষুপ্তির আচ্ছন্নতাটুকু লেগে রয়েছে মনে তখনও। তারই কুহেলীর মধ্যে একটি একটি করে সব মনে পড়ছে, বাড়ি থেকে বেরুনো থেকে মালবাহী জাহাজের এই কোণটুকুতে এসে বসা—একটি দিনে সম্পূর্ণ একখানি জীবন—কত বিচিত্র সুখ-দুঃখের নব-নব উপলব্ধি দিয়ে গড়া জীবন। ওপারে ফেলে আসা......কোন্ এক নাকি অশুভ লগ্নে আরম্ভ করা। ...মনটা যেন অতীত আর বাস্তবের মাঝখানে দোল খাচ্ছে। স্টীমার। ঠিকই। তা হলে কিন্তু অত যাত্রী সব কোথায় গেল?
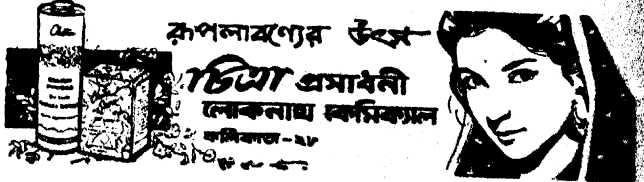
আরও ভালো করে জেগে ওঠবার আগে এগিয়ে যাচ্ছিলাম রেলিঙের ধারে। একটা কুলি সিঁড়িতে আওয়াজ তুলে ছুটে এসে দাঁড়াল বলল—"হুজুর, উঠে পড়েছেন তা হলে? আমি ঠিক করেছিলাম, ঘুমোন ততক্ষণ, আর সবাইকে তুলে দিয়ে [illegible] একেবারে শেষে নিয়ে যাব।"

ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে তীরে উঠছি ধীরে ধীরে। ক্লান্তি আছে, কিন্তু যেন দুঃখকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে উঠে চলেছি। আসিনি কি এমনি করেই পদে পদে ক্লান্তিকে মাড়িয়ে দিয়ে, দুঃখকে জয় করে?
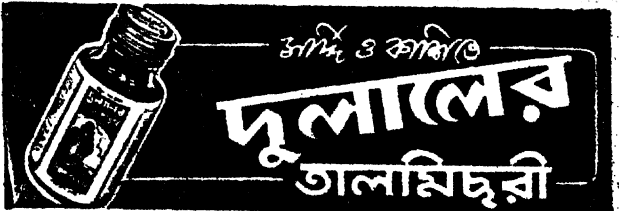
উঠে একবার ঘুরে চাইলাম, ঘাটের মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা-মন্ত্রধ্বনি আরও উচ্চ হয়ে উঠেছে। দিগন্তের সেই জ্যোতিকমল পূর্ণ বিকশিত হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে তার আলো। এ আলো, এ সামগ্রী কালজয়ী যেন, আমার ওপারের জীবনের ওপর পড়েও সমস্ত সুখ-দুঃখকে এক অনির্বচনীয় আনন্দে সার্থক করে তুলেছে।

সমাপ্ত

(৩৪)

এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

সারা রাত ঘুমতে পারল না সৌরেন। অনুশোচনা আর আত্মগ্লানিতে মন তার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, ছি ছি, এ কাজ সে করল কেন? এলিজাবেথকে সে ভালবাসে, তাকে সে আপনার করে পেতে চায়, সব সত্যি, তবু এভাবে বিয়ের আগে অবৈধভাবে জড়িয়ে পড়া তার উচিত হয়নি। এখন সে কি করবে? বিয়ে, হ্যাঁ, বিয়ে তাকে করতেই হবে, কিন্তু তার জন্যেও তো সময় লাগবে কিছু দিন। তারপর নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তখন সে কি কৈফিয়ত দেবে সমাজের কাছে? দেশের আত্মীয়স্বজনদের কথা মনে হতেই সৌরেন আরও সংকুচিত হয়ে পড়ল। মাসীমা পিসীমাদের শান দেওয়া জিভগুলোর কথা চিন্তা করতেই সে ভয় পেল। কিন্তু ব্যথা পাবেন একজন, তিনি সৌরেনের মা। স্নেহময়ী জননীর মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই চোখে জল এল সৌরেনের। এই প্রথম তার মনে হল, সে অন্যায় করেছে। মায়ের প্রতি পুত্রের যে কর্তব্য তা সে পালন করেনি, করলে অন্তত এভাবে সে তাকে আঘাত দিতে পারত না। একে বিদেশিনী পুত্রবধু, তার উপর যদি অবৈধ সন্তান জন্মায়, কিছুতেই তিনি সহ্য করতে পারবেন না।

আর এক হয়—সৌরেন যদি এখন দেশে না ফিরে যায়। অন্তত আরও বছর দুই লণ্ডনেই থাকে। পরে যখন সে স্ত্রী পুত্র নিয়ে দেশে ফিরবে তখন হয়ত এসব প্রসংগ আর উঠবে না। কিন্তু আরও দু' বছর এখানে পড়ে থাকাও যে অত্যন্ত কষ্টকর। কে বলতে পারে বেশী দিন এখানে পড়ে থাকলে আর হয়ত দেশে ফেরার সুযোগই পাবে না। বছরের পর বছর বিদেশে থাকতে হবে।

এ কথা ভাবতে গিয়ে প্রমীলার কথা মনে পড়ল। প্রমীলার মত যদি তাকেও বিদেশে মৃত্যুকে বরণ করতে হয়, মা, দাদা, ভাই, বোন, কারুর সংগে দেখা হবে না, দেশের মাটির স্পর্শটুকু পাবে না, সকলের কাছ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত একদিন হঠাৎ তার জীবনের কাহিনী শেষ হয়ে যাবে।

অথচ উপায় বা কি! সৌরেনের চেয়েও এলিজাবেথের মনের অবস্থা নিশ্চয় আরও খারাপ, সংশয়ের দোলায় তার মন দুলছে। তার নিজের মনের মধ্যে যাই হোক না কেন, এলিজাবেথকে সে ভরসা দেবে—যত শীঘ্র সম্ভব তাকে বিয়ে করবে।

নিজের অজান্তে দীর্ঘশ্বাস পড়ল সৌরেনের। দেশের কথা, আত্মীয়স্বজনের চিন্তা তাকে আস্তে আস্তে ভুলতে হল। নিজেকে তৈরী করে নিতে হবে এ-দেশী কায়দায়, তা না হলে বিবাহিত জীবনে সে সুখী হতে পারবে না। যত এ কথা সৌরেন ভাবতে লাগল, মনকে শক্ত করার চেষ্টা করল, ততই চোখের জল ধারার মত নেমে এসে তাকে দুর্বল করে ফেলল।

এসব কথা চিন্তা করতে করতে সৌরেন কখন ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল ছিল না। ঘুম ভাঙ্গল দেরিতে, তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। মুখ ধুয়েই সে গেল এলিজাবেথের ঘরে। ঘর বন্ধ, এলিজাবেথ বেরিয়ে গেছে। নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখল দরজায় তার নাম লেখা একটা খাম পিন দিয়ে আটকানো রয়েছে। সৌরেন সেটা খুলে নিয়ে পড়ল, এলিজাবেথ দু' লাইনের চিঠি লিখে রেখে গেছে, বিশেষ কাজে মার সংগে দেখা করার জন্যে আজই তাকে দেশের বাড়িতে যেতে হচ্ছে। দু'-একদিনের মধ্যেই সে ফিরবে।

কেন জানা নেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সৌরেন। তবু যা হোক দু' দিন সময় পাওয়া গেল। এখুনি তাকে এলিজাবেথের সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা বলতে হবে না। মনে মনে এলিজাবেথের উপরও সে বিরক্ত হয়েছিল, কেন সে সময় মত সৌরেনকে সাবধান করেনি, কেন তাকে প্রলুব্ধ করেছিল। একটা ক্ষীণ সন্দেহ উঁকি মারল তার মনের কোণে। এলিজাবেথ কি ইচ্ছে করে সৌরেনকে জালের মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছে? এইভাবেই কি এ-দেশের মেয়েরা স্বামী শিকার করে? না না, এলিজাবেথ সম্বন্ধে এ কথা ভাবা তার উচিত হয়নি, মেয়েটা ভাল। সত্যিই সৌরেনকে সে ভালবেসেছে।

টেলিফোন এল সৌরেনের। অপর দিকে নারীকণ্ঠ। প্রথমটা সৌরেন বুঝতে পারেনি কে কথা বলছে। মেয়েটি হাসতে হাসতে প্রশ্ন করল, এরই মধ্যে ভুলে গেলে আমায়?

সৌরেন স্বীকার করল, ঠিক বুঝতে পারছি না।

—আমি মীনাক্ষী।

—মীনাক্ষী! কোথা থেকে কথা বলছ?

—কাল আমরা লণ্ডনে এসেছি, আমি আর [illegible] পীয়ের। খালি থাক তো চলে এস না একবার আমাদের হোটেলে।

সৌরেন খুব উৎসাহ প্রকাশ করল না, বলল, যাব এক সময়।

মীনাক্ষী জোর দিয়ে বলে, না না, এখুনি এস। সঙ্গে এলিজাবেথকেও এনো কিন্তু।

—লিজি লণ্ডনে নেই।

—তা হলে তুমি একলাই এস।

মীনাক্ষী রাসেল [illegible] হোটেলের নাম ঠিকানা বলে দিয়ে রিসিভার রেখে দিল।

আজ যা সৌরেনের মনের অবস্থা, [illegible] নিয়ে কারুর সঙ্গে দেখা না করাই উচিত

...। কিন্তু মনে হল বাড়িতে বসে ... আরও খারাপ লাগবে, তাই সে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়ল মীনাক্ষীর হোটেলের উদ্দেশে। তা ছাড়া কালই মীনাক্ষীরা ফিরে যাচ্ছে ব্রাসেল্‌স-এ, আজ দেখা না করলে হয়ত আরও কতদিন দেখা হবে না। যদিও মীনাক্ষী লণ্ডন ছেড়েছে ... তিনেক, কিন্তু তাদের বিয়ে হয়েছে মাত্র ... মাস। প্রথম দিকে একখানা চিঠিও ... সেখানে লণ্ডনের ভারতীয় মহলে, বিয়ের ... সমুদ্রতীরে হনিমুন করতে গিয়ে সে ... একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখেছিল। বলতে ... সংক্ষেপে গত দু' মাসের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছিল তাতে, কিভাবে পীয়েরের বাবা মা তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। বিয়ের আগে পর্যন্তও নিজেদের বাড়িতে রেখেছিলেন। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সযত্নে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন, সেই সব কথা। বিয়ের সময় বাধা কম পড়েনি মীনাক্ষীর। বার্থ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট না থাকায় গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল বইকি। শেষ পর্যন্ত ওর দাদু জন্মতারিখের কথা অ্যাফিডেভিট করে পাঠান। পীয়েরদের পরিবারের এক বিশেষ বন্ধু মীনাক্ষীর পিতৃগৃহের পক্ষ নিয়ে দাঁড়ান, সম্পূর্ণ নতুনভাবে আনন্দময় পরিবেশে মীনাক্ষী আর পীয়েরের বিবাহ হয়।

এর পর মীনাক্ষী আর কোন চিঠি দেয়নি। যখন ঐ চিঠিটা আসে, সকলেই এক একবার পড়েছিল কিন্তু প্রমীলা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকায় এ নিয়ে সরোজদের মহলে বিশেষ হইচই পড়েনি। তারপর প্রমীলার মৃত্যুর ফলে এ চিঠির কথা সকলে ভুলেই গিয়েছিল একরকম। আজ মীনাক্ষীর টেলিফোন পেয়ে একে একে সব কথা সৌরেনের মনে পড়ল।

ভাগ্যিস সৌরেন তখুনি বেরিয়ে পড়েছিল মীনাক্ষীদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে, তা না হলে পরে আর দেখা হ'ত না। ওদের লাঞ্চের নিমন্ত্রণ বাইরে, সেখান থেকে দেখা করতে যাবে এক বন্ধুর বাড়ি, চা খাবে আর এক জায়গায়। রাত্রের ডিনার বুঝি কোন এক কন্টিনেন্টাল রেস্তরাঁয়। আগে থেকেই সব ঠিক হয়ে আছে। দু'-একদিনের জন্যে কোন পুরনো জায়গায় বেড়াতে এলে যা হয়ে থাকে আর কি।

সৌরেনকে দেখে ওরা দু'জনেই চমকে উঠল, এ কি চেহারা হয়েছে সৌরেন? অসুখবিসুখ করেনি তো? চোখের তলায় কালি, মুখখানা শুকনো, কি হয়েছে?

সৌরেন ম্লান হাসে, নাঃ, শরীর ঠিক আছে।

—তা হলে এরকম চেহারা হয়েছে কেন?

—মানে অনেক ঝামেলা গেল তো। শুনেছ বোধ হয় প্রমীলা—

মীনাক্ষী ব্যথিত গলায় বলে, এখানে এসে তাই শুনলাম। আজ সকালে গিয়েছিলাম লীলার সঙ্গে দেখা করতে, আহা, বেচারী একেবারে মুষড়ে পড়েছে। ও দেশে ফিরে যাচ্ছে, সে একরকম ভালো। আত্মীয়স্বজনদের দেখে তবু খানিকটা শোক ভুলতে পারবে।

প্রমীলার কথা বলতে গিয়ে এখনও সৌরেনের চোখ দুটো ছলছল করে, বলে, প্রমীলার এই অকালমৃত্যু কেমন যেন আমাকে বিহ্বল করে ফেলেছে। বিশ্বাস কর মীনাক্ষী, এক এক সময় ভয় হয় আমি বোধ হয় জীবনের উপর আস্থা হারাচ্ছি।

মীনাক্ষী সহানুভূতি প্রকাশ করে, একে বলে শ্মশানবৈরাগ্য। ও ধরনের চিন্তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ওকে বেশী প্রশ্রয় না দেওয়াই উচিত।

মাঝখান থেকে কথা বলল পীয়ের, প্রমীলার মৃত্যুর জন্যে আমি কিন্তু অনেকখানি দায়ী করব সরোজকে।

সৌরেন কথাটা বুঝতে না পেরে মুখ তুলে তাকাল।

—সরোজ কেন বুঝতে পারল না প্রমীলা তাকে প্রাণ ভরে ভালবাসে। ভালবাসার অভাবই প্রমীলাকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। ...

হবে কিনা জানি না মীনা, ঐ একটা অভাবের জন্যেই তোমার অতুলমামার জীবনের এই ট্র্যাজেডী।

মীনাক্ষী সায় দিয়ে বলে, বেচারী অতুলমামা। ভাবতেও কষ্ট হয়। এই বুড়ো বয়সে এভাবে একলা পড়ে থাকা।

পীয়ের উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলল, আমাকে মাপ করতে হবে সোরেন। চট করে আমি তৈরী হয়ে আসি। ততক্ষণ মীনার সঙ্গে তুমি গল্প কর।

পীয়ের চলে গেল স্নানের ঘরে। মীনাক্ষী বোধ হয় তখনও অতুলমামার কথা ভাবছিল। বললে, তুমি তো আমার অতুলমামার কথা সবই জান সোরেন, ভাবতে পার এই বুড়ো বয়েসে আইলীন মামী তাকে ডিভোর্স করেছে?

সোরেন চমকে উঠল, তাই নাকি?

—একরকম সেই জন্যে আমাদের লণ্ডনে আসা। অতুলমামা জরুরী তার করেছিলেন। যদি শেষ পর্যন্ত এই বিচ্ছেদটা থামানো যায়। পারলাম না। আইলীন মামী একটা কথাও শুনতে চাইলেন না। অসুস্থ অতুলমামাকে নিয়ে সে দিন কাটাতে নারাজ। কুকুর নিয়ে একলা থাকবে। অথচ ঐ অতুলমামা দেশে ফিরে যাবার জন্যে মন ছটফট করলেও কখনও যায়নি। পাছে আইলীন মামীমার সেখানে কষ্ট হয়, বা এখানে একলা থাকতে খারাপ লাগে। অতুলমামা ভুলটা কোথায় করেছিল জান? ভালবাসা তাদের মধ্যে ছিল না, সারা জীবনটাই আপস করে একসঙ্গে থাকবার চেষ্টা করেছে, তারই বিষময় ফল ফলল এই বুড়ো বয়সে। ছেলেমানুষের মত অতুলমামা কাঁদছেন, কিন্তু কি তাকে সান্ত্বনা দেব বলতে পার?

সোরেন জিজ্ঞেস করে, তা হলে এখন কি করবে?

—আমরা বলেছি মাঝে মাঝে আমাদের কাছে এসে থাকবার জন্যে, আর নয় ত দেশে ফিরে যেতে। মীনাক্ষী নিজের মনে কি যেন ভাবল, অন্যমনস্ক সুরে বলল, পীয়েরকে না পেলে ভালবাসা যে কি জিনিস বোধ হয় আমি বুঝতে পারতাম না। আমার জীবনের সমস্ত অভাব সে পূরণ করেছে। আমার দেশ, আমার আত্মীয়স্বজন, সব কিছু ছাপিয়ে যার কথা সারাক্ষণ ভাবি সে পীয়ের। এভাবে যে কাউকে ভালবাসা সম্ভব, আমার ধারণা ছিল না। আজ বুঝতে পেরেছি এ ভালবাসার স্বাদ যে জীবনে পায়নি তার চেয়ে হতভাগ্য আর কেউ নেই।

সোরেন এতক্ষণ মীনাক্ষীকে লক্ষ করছিল, চেহারা তার আগের চেয়েও সুন্দর হয়েছে, কথা বলার ধরন গেছে বদলে। আগে যে রকম মেপে মেপে কথা বলত এখন আর সে রকম নয়, প্রত্যেকটি কথার মধ্যে প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত উজ্জ্বলতা, পাওয়ার আনন্দ। মুখে তার প্রশান্ত হাসি।

সোরেন বলল, তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি তুমি জীবনে সুখী হয়েছ মীনাক্ষী।

মীনাক্ষীর চোখে জল এসে পড়ে, এর গভীরতা তোমায় কথায় বোঝাতে পারব না, দাদুকেও আমি তা লিখেছি। ইচ্ছে আছে দুজনে কলকাতায় বেড়াতে যাব। দাদু খুব খুশী হবেন।

—কবে যাচ্ছ?

—এখনও কোন ঠিক নেই, তবে যাব। এবার মীনাক্ষী সোরেনের কথায় এল, তারপর? এখন তোমাদের কি খবর? এলিজাবেথ কেমন আছে? বিয়ের সব ঠিক করে ফেলেছ তো?

সোরেন অন্যমনস্ক গলায় জবাব দেয়, বিয়ে হ্যাঁ, করতে হবে বইকি।

—ও আবার কি কথার ধরন? এখনও কিছু ঠিক হয়নি বুঝি?

—না, মানে বাড়িতে এখনও জানানো হয়নি তো। তাই একটু চিন্তায় আছি।

মীনাক্ষী স্থির দৃষ্টিতে সোরেনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, ভাবের ঘরে কখনও চুরি ক'রো না সোরেন।

—তার মানে?

—সত্যিই যদি এলিজাবেথকে ভালবেসে থাক, যদি মনে হয় তাকে ছাড়া তোমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে তবেই বিয়ে ক'রো। নরত শুধু দায়সারাভাবে বিয়ে করে ভুল ক'রো না, সারাটা জীবন পস্তাতে হবে আমার ঐ অতুলমামার মত।

সোরেন কোন কথা বলল না, কিই-বা বলবার আছে। চুপ করে পুতুলের মত বসে রইল। পীয়েরের সাজগোজ করে ফিরে আসায় সে মুক্তি পেল এ অসহ্য নীরবতার হাত থেকে।

পীয়ের বলল, মীনা, তুমি ড্রেস করে এস। তা না হলে আমাদের বেরুতে দেরি হয়ে যাবে।

মীনাক্ষী হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল, তুমি যা ব্যস্তবাগীশ! সোরেন, তুমি বসো আমার বেশী সময় লাগবে না, আধ ঘণ্টার মধ্যে হয়ে যাবে।

মীনাক্ষী চলে গেল।

সাদা শার্টের উপর ঘন সবুজ টাই পরে পীয়েরকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। টেবিলের উপর রাখা টিন থেকে সিগারেট বার করে সোরেনের দিকে এগিয়ে দিল। দেশলাই জ্বালাতে জ্বালাতে প্রশ্ন করল, কেমন দেখলে মীনাক্ষীকে?

সোরেন হাসল, খুব ভাল। আমি তো এতক্ষণ মীনাক্ষীকে তাই বলছিলাম। কতখানি বদলে গেছে। আগের মত কথায় কথায় আর তর্ক করে না।

—তাও তো লণ্ডনে এখন দেখলে ওকে বুঝতে পারবে না। এস ব্রাসেলস্‌-এ দেখো

ওর নিজের সংসার। বুঝতে পারবে কি আনন্দে সে সংসার করছে। তখন সত্যি মীনাকে তুমি চিনতে পারবে।

—ওর কথা থেকে আমি খানিকটা আন্দাজ করতে পারছি।

সিগারেটের ধোঁয়া রিং করে উপরে ছেড়ে পাটা ছড়িয়ে, সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে সৌরেন বলে, she is an angel আমাকে মীনা কতখানি বদলে দিয়েছে তুমি ভাবতে পারবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই ক্রমশ আমি মানুষের উপর বিশ্বাস হারাচ্ছিলাম। যখন একেবারে শেষ মাত্রায় এসে পৌঁছেছি, তখন হল মীনার সঙ্গে দেখা। মীনা আমার সেই হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে, এখন আবার মনে হচ্ছে মানুষের মধ্যে অনেক কিছু ভাল আছে। স্বভাবত সে শয়তানের অনুচর নয়। শয়তান তাকে করা হয়, তার জন্যে হয়ত সমাজ দায়ী, হয়ত এ সভ্যতা দায়ী, কিন্তু সে নিজে দায়ী নয়। এ বিশ্বাস ফিরে না পেলে আমি বেঁচে থাকার কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এখন আমি তা পেয়েছি। এখন আমার চোখে উজ্জ্বল আশা। তাই তো মীনাকে নিয়ে সুখের নীড় রচনা করেছি।

সৌরেন ধরা গলায় বলে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমরা সুখী হও, তাঁর করুণা লাভ কর।

পীয়ের বলল, ধন্যবাদ সৌরেন, তোমার এই শুভ কামনার জন্যে। একটু থেমে বলে, যখনই ভাবি আমার জন্যে মীনাক্ষী তার ঘরবাড়ি আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে দিয়েছে তখনই মনে হয় তাকে যেন আমি সুখে রাখতে পারি, তার অভাব যেন পূরণ করতে পারি। কোনদিন ওর চোখে জল দেখলে আমি কিছুতেই শান্ত হতে পারি না, ওর হাসি উজ্জ্বল প্রসন্নতায় আমার মন ভরিয়ে দেয়। ওর আনন্দ, আমাকে কোন এক স্বর্গীয় লোকে নিয়ে যায়, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না সৌরেন।

সৌরেন পীয়েরের হাতের উপর চাপ দিয়ে বলে, তোমাদের দুজনকে আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি পীয়ের।

পীয়ের এবার গলা নামিয়ে, ফিসফিস করে বলে, মীনাক্ষী বোধ হয় লজ্জায় তোমায় বলেনি, আমরা আশা করছি এই বছরেই আমাদের সংসারে নতুনের আবির্ভাব হবে।

সৌরেন হাসবার চেষ্টা করল, সত্যি?

—আমরা দুজনেই খুব খুশী হয়েছি। আমি অবশ্য জানি মীনাক্ষী চায় ছেলে, তবে যদি মেয়ে হয়—

পীয়ের অনেকক্ষণ ধরে তাদের সংসারের কথা বলে গেল, ছেলে হলে কি করবে, মেয়ে হলেই বা তার কি প্ল্যান, বাড়ি ঘর-দোর কিভাবে সাজাবে, কোথায় পাকাপাকি-ভাবে বসবাস করবে আরও নানান গল্প।

তারপর একসময় মীনাক্ষী এল। তারা তিনজনে বেরিয়ে পড়ল হোটেল থেকে, টিউব স্টেশনের দোরগোড়ায় গিয়ে বিদায় চেয়ে নিল সৌরেন।

—খুব আনন্দ হল তোমাদের সঙ্গে আলাপ করে, এখন আমি চলি।

মীনাক্ষী দুষ্টুমি করে হেসে বলল, বিয়ের নেমন্তন্নয় আমাদের বাদ দিও না। কে বলতে পারে খাওয়ার লোভে বেলজিয়াম থেকে হয়ত চলেই আসব।

পীয়ের সৌরেনের করমর্দন করে বলল, এলিজাবেথকে বলো আমাদের সাদর আমন্ত্রণ রইল, যেদিন যখন খুশি তোমরা আমাদের গেস্ট হতে পার।

হেসে ধন্যবাদ জানিয়ে সৌরেন নেমে গেল টিউব স্টেশনে, মীনাক্ষীরা ধরল [illegible]।

(ক্রমশ)
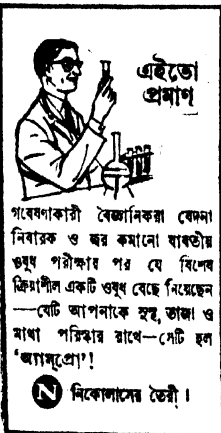
জেট-এর কথা

সুশীল দাস

পুরাকালের কাহিনীতে দেখতে পাই, দেবতারা বিমানে চড়ে গ্রহলোকে যেতেন। অনেকেই হয়ত একে গল্প বলে উড়িয়ে দিতে চাইবেন। কিন্তু আজ মহাকাশে মানুষের সফল অভিযানের পর আমরা সেই গ্রহলোক ভ্রমণকে গল্প অথবা কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে ঠিক পারছি না। সত্যি যদি তখন গ্রহলোকে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল, তা হলে স্বীকার করতেই হয় যে তা সম্ভব হয়েছিল দৈববলে নয়, বিজ্ঞানের যাদুমন্ত্রে। নিশ্চয়ই সেই বিমান চলত বর্তমানের রকেট পদ্ধতিতে। হয়ত কোন উন্নত ধরনের জ্বালানীর ব্যবহার হত সেই পৌরাণিক বিমানে।

আজ বিজ্ঞান যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তাতে গ্রহলোকে যাওয়া খুব দূরে বলে মনে হয় না। পরীক্ষামূলকভাবে মহাকাশ ভ্রমণে ইতিমধ্যেই দু' একটা দেশ কৃতকার্য হয়েছে। মানুষের এই বিরাট সাফল্যের মূলে রয়ে গেছে জেট-পদ্ধতির অভাবনীয় উন্নতি। বস্তুত এটাকে আমরা জেটের যুগ বলতে পারি। শুধু মহাকাশ ভ্রমণেই নয়, যাত্রী-বিমান পরিবহণ, সামরিক পরিবহণ, ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ এসব ক্ষেত্রেই আজকাল জেটের জয়জয়কার। পিস্টন-চালিত পেট্রল ইঞ্জিন অথবা পুরানো প্রপেলার ইঞ্জিনের যুগ ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। তাতে গতি, আরাম, নিরাপত্তা সবই অনেক বেড়ে গেছে। পুরানো দিনের বিমান কেমন ছিল জানি না। তবে আজকের যাত্রিবাহী জেট বিমানে যা স্বাচ্ছন্দ্য তা সত্যি চমৎকার। বোয়িং জেট বিমানের শীতাতপ ও চাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে শুয়ে মেঘ আর ঝড়ঝঞ্ঝার অনেক ওপর দিয়ে ঘণ্টায় সাত শ' মাইল বেগে ভেসে চলতে চলতে পুষ্পক রথের স্বপ্ন দেখা বিচিত্র নয়।

কিন্তু এই স্বচ্ছন্দ গতিবেগের পেছনে রয়ে গেছে অনেক সাধনা, বিজ্ঞানী আর ইঞ্জিনীয়ারদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা।

জেট সম্বন্ধে ভালভাবে জানবার আগে জানা দরকার তার মূল সূত্র। মূলগত পার্থক্য অনুসারে আমরা জেটকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ফেলতে পারি।

(১) বায়ুশোষক জেট (জেট বিমানে ব্যবহৃত)

(২) রকেট

প্রথম শ্রেণীর বায়ুশোষক জেটকে আবার তিন ভাগে ফেলা যায়।

(ক) টার্বো জেট

(খ) প্রপেলার জেট

(গ) র‍্যাম জেট
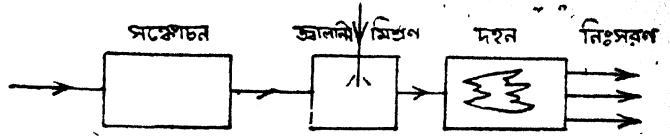
টার্বো জেট, প্রপেলার জেট ও রাম জেটের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করবার আগে সাধারণ বায়ুশোষক জেট ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালীর বিবরণ দেওয়া যেতে পারে।

জেট ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী

প্রথমে ইঞ্জিনের সম্মুখ থেকে মুক্ত বায়ু শোষণ করার পর সংকোচক যন্ত্রে (Compressor) তাকে নির্দিষ্ট চাপমান পর্যন্ত সংকুচিত করা হয়। তারপর দহন প্রকোষ্ঠে (Combustion Chamber) তাতে তরল জ্বালানী মিশিয়ে একই চাপমানে জ্বালানীর দহন সম্পূর্ণ করা হয়। ফলে যে গ্যাস তৈরি হয়, তার তাপ ও আয়তন অসম্ভব রকমে বেড়ে যায়। তখন ইঞ্জিনের পশ্চাদ্ভাগের নিঃসরণ পথে (Exhaust Nozzle) সেই গ্যাস প্রচণ্ড বেগে বের হতে থাকে। এতে ইঞ্জিনে ধাক্কা লাগে উল্টো দিকে (Thrust due to equal and opposite reaction of exhaust gas) তার ফলেই এই প্রচণ্ড গতির সৃষ্টি হয়।

মূল টার্বো জেট ইঞ্জিনে (২নং চিত্র) একটা বহুপর্যায়ের সংকোচক-যন্ত্র (Multistage Compressor) টার্বাইনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। দহনের ফলে যে গ্যাস তৈরি হয়, তার গতিশক্তির কিছুটা ব্যয় হয় টার্বাইন ঘোরানোর জন্য। টার্বাইন ঘুরবার ফলে সংকোচন-যন্ত্রটিও একই বেগে তার সাথে ঘুরে চলে। ফলে বাইরের বাতাস ইঞ্জিনের সামনের মুখ দিয়ে ভিতরে ঢোকে এবং সংকোচক-যন্ত্রও তাকে নির্দিষ্ট চাপে নিয়ে যায়। এইবার তাতে জ্বালানী

জেট ইঞ্জিনের কার্যপ্রণালী

মেশানো হয়। তারপর দহনের পর বিপুল আয়তন নিয়ে প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন গ্যাস বেরিয়ে আসে পেছনের মুখ (Exhaust Nozzle) দিয়ে। এই গ্যাস-জেটের ফলেই সৃষ্টি হয় এই প্রচণ্ড গতির।

সাধারণত জ্বালানী পুড়িয়ে যতটুকু তাপ পাওয়া যায়, তার সবটুকুই আমাদের কাজে লাগে না। তার কারণ নানাভাবে অনেকখানি শক্তির অপচয় ঘটে। ব্যয়িত শক্তির কত ভাগ কাজে লাগে, তা অনেক

টার্বোজেট ইঞ্জিন

কারণ ও অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। সাধারণত টার্বো জেটের বেলায়, প্লেন যত উঁচু দিয়ে চলে, প্রয়োজনীয় শক্তির অনুপাত (Thermal Efficiency) ক্রমশ বেড়ে যায় এ ছাড়া গতি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেও এই অনুপাত বেড়ে চলে এবং তা একটা বিশেষ গতিবেগ পর্যন্ত। কাজেই অনেক উঁচু দিয়ে বেশী গতিবেগ নিয়ে চললে টার্বো জেটে অনেকটা খরচের সাশ্রয় হয়। এই কারণেই আন্তর্মহাদেশীয় দূরপাল্লার বিমানপথে সাধারণত টার্বো জেট ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়।

প্রপেলার জেট ইঞ্জিনকে সাধারণ প্রপেলার ইঞ্জিন ও জেট ইঞ্জিনের একটা
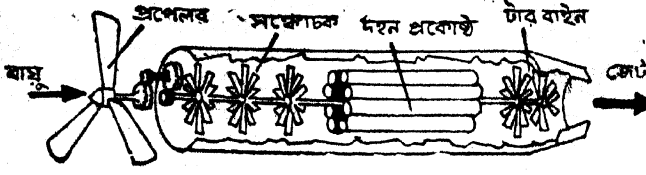
প্রপেলার জেট ইঞ্জিন

সমন্বয় বলা যেতে পারে। সাধারণত উচ্চতা বাড়বার সাথে সাথে প্রপেলারের কার্যক্ষমতা কমে আসে। কারণ ওপরে বাতাস ক্রমশ হালকা। সুতরাং অল্প উচ্চতায় আর মাঝারি গতিবেগে প্রপেলার ইঞ্জিনে কম জ্বালানী লাগে।

প্রপেলার আর জেট, উভয়ের সুবিধাগুলো যাতে পাওয়া যায়, সেজন্য তৈরি করা হয়েছে, প্রপ্‌জেট ইঞ্জিন। এতে টার্বাইনের কাজ শুধু সংকোচক-যন্ত্রকে ঘোরানোই নয়, সামনে লাগানো একটা প্রপেলারকেও ঘোরাতে হয় তাকে। কাজেই প্রপ্‌জেট ইঞ্জিনে জেটের শক্তির একটা বেশ বড় অংশ (শতকরা প্রায় প'চাত্তর ভাগ) ব্যয় হয়ে যায় টার্বাইন ঘোরাতে। অল্প পাল্লার মাঝারি গতিবেগের জন্য প্রপ্‌জেট অত্যন্ত উপযোগী।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মানুষ চায় গতি—আরো গতি। প্রপেলার প্লেন থেকে প্রপ্‌জেট, টার্বো জেট, তাকেও ছাড়িয়ে গেছে র‍্যাম জেটের গতি। শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী আজকালকার 'অনেক সামরিক বিমান চলে র‍্যাম জেট পদ্ধতিতে'

র‍্যাম জেট ইঞ্জিন

র‍্যাম জেটের মূল কথা এই যে, প্লেনের গতি একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে গেলে তখন বায়ুকে সংকুচিত করবার জন্য আর সংকোচক-যন্ত্রের দরকার হয় না। দ্রুতগামী প্লেনের তুলনায়, প্রবেশকারী বাইরের বায়ুর একটা আপেক্ষিক গতি আছে (Relative Entrance Velocity)। বায়ু ইঞ্জিনে ঢোকার পর সেই আপেক্ষিক গতি ক্রমশ চাপে রূপান্তরিত হয়। এই চাপ বায়ুকে প্রয়োজনমত সংকুচিত করে। তার পর টার্বো-জেটেরই মত দহন আর জেট নিঃসরণ।

সুতরাং র‍্যাম জেটে কোন সংকোচক-যন্ত্র না থাকায় তাকে ঘোরানোর জন্য কোন টার্বাইনেরও প্রয়োজন হয় না। মূলত র‍্যাম জেট ইঞ্জিনে কোন জটিলতা নেই। কিন্তু আপেক্ষিক গতিজনিত চাপ (Ramming) যথেষ্ট হওয়ার জন্য চাই প্রচণ্ড গতি। তা ছাড়া র‍্যাম জেট ইঞ্জিন কাজই করবে না। সে কারণে টার্বো জেট অথবা রকেট-ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রথমে বিমানের গতি যথেষ্ট বাড়িয়ে নেওয়া হয় (অন্তত শব্দের গতির সমান)। তারপর সেই টার্বো জেট বা রকেট-ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে র‍্যামজেটকে চালু করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিমানের গতি ক্রমশ বাড়তে থাকে। প্রায় শব্দের আড়াই থেকে তিন গুণ গতিতে পেঁৗছে র‍্যাম জেট স্থিরগতিতে চলতে থাকে। নামবার সময় আবার টার্বো জেট বা রকেটের সাহায্য নিতে হয়।

এবার রকেটের কথায় আসা যাক। এতক্ষণ যেসব জেটের কথা আলোচনা করা হয়েছে, সবগুলোকেই নির্ভর করতে হয় বাইরের বাতাসের ওপর। ইঞ্জিনের মুখ দিয়ে বাতাস টেনে, তাকে সংকুচিত করে, তার সাহায্যে জ্বালানীর দহন সম্পূর্ণ করা হয়। কাজেই অনেক উঁচুতে যেখানে হাওয়া নেই, সেখানে এ ধরনের জেট অচল। সেখানে জ্বালানীর সাথে মজুদ থাকা চাই তরল অক্সিজেন, যাতে বাইরের বাতাস না টেনেও, তরল জ্বালানীর দহনের জন্য অক্সিজেনের চাহিদা মেটানো যায়। এই প্রণালীর ভিত্তিতে চলে রকেট। অবশ্য রকেটের প্রচণ্ড গতি সাধারণ পরিবহণ বিমানের পক্ষে উপযোগী নয়।
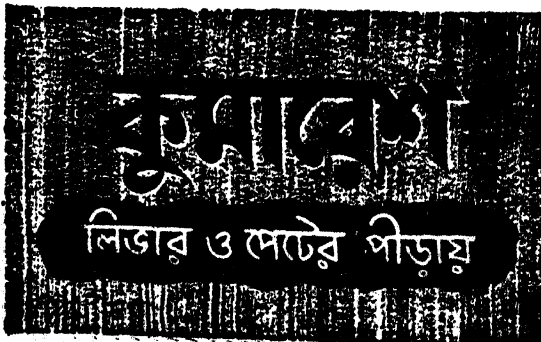
কাজেই দূরপাল্লার যাত্রিবাহী বিমানে র‍্যাম জেটের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। বর্তমানে আন্তর্মহাদেশীয় দূরপাল্লার বিমানগুলো সবই চলছে টার্বোজেট ইঞ্জিনে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটার নাম করা যেতে পারে; যেমন, আমেরিকান বোয়িং ৭০৭ ও বোয়িং ৭২০, বৃটিশ কমেট-৪, ফ্রান্সের ক্যারাভেলী, রাশিয়ার টি-উ ১১৪। আশা করা যাচ্ছে, আগামী পনের বছরের মধ্যেই তাদের বদলে চলবে অতিকায় র‍্যাম জেট বিমান, যাতে চড়ে ভোর বেলায় নিউ ইয়র্ক থেকে লণ্ডন হয়ে, সেদিন দুপুরের আগেই নিউ ইয়র্কে ফিরে আসা যাবে।

কিন্তু মানুষ মহাকাশ জয়ের যে বিরাট পরিকল্পনা করছে, তার সাফল্য নির্ভর করছে রকেটের ওপর। তার জন্য চাই আরো উন্নত ধরনের রকেট—যা একদিন অদূরভবিষ্যতে মানুষকে পেঁৗছে দেবে চাঁদে, মঙ্গল গ্রহে, পুরাকালের বিমান যেমনি যেতো গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে।

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৮০)

মা-মণি তখনও অপেক্ষা করছিলেন নিজের ঘরে। যদি খোকা বৌমাকে নিয়ে এখানেই এসে ওঠে তো তাঁরই একদিন কি ছেলেরই একদিন। নিজের মা কেউ হলো না, যত আপনার জন হলো কিনা বউ। লাথি মেরে অমন বউ-এর দেমাক ভেঙে দেবেন না তিনি। ন'দিদি ঠিকই বলেছিল—আদর দিয়েই তিনি মাথা খারাপ করে দিয়েছেন বউ-এর। আমরাও তো একদিন বউ ছিলাম। আমরাও তো একদিন নতুন-বউ সেজে শ্বশুর-ঘর করতে এসেছিলুম। কই, বলুক দিকি কেউ, শাশুড়ির সামনে কখনও মুখ তুলে কথা বলেছি। একদিনের তরে কখনও দিনের বেলা বরের মুখে মুখ দিয়ে দরজায় হুড়কো দিয়ে শুয়েছি? কর্তা একদিন বলেছিলেন—একটা পান নিয়ে যেও তো বউ খাবার পরে। সে-পান তিনি চাকরের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবু দিনের বেলা মুখ দেখাননি কর্তাকে। এই তো এত বাড়ি রয়েছে ভবানীপুরে। এই চাউলপট্টির চাটুজ্জেরা রয়েছে, চড়কডাঙার মিত্তিররা রয়েছে। তাঁদের বাড়ির ভেতরে গিয়ে মা-মণি দেখেছেন—আহা, কেমন লক্ষ্মী বউ সব। ভেতর-বাড়িতে গেলে শাশুড়ি একে একে ডাকেন সব বউদের। সবাই এসে সামনে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ায়। শাশুড়ি বলে—মাসীমাকে প্রণাম করো বউমা—

শাশুড়ির মুখ থেকে কথা থামতে-না-থামতে বউরা সব পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে।

তারা বলে—দিদি, তোমার বউ পোয়াতি হলো নাকি আবার?

কী সব সুখের সংসার। দেখলেও চোখ জুড়িয়ে যায়। নাতি-পুতি হয়ে ঘর ভরে গেছে। যেমন পোড়াকপাল তাঁর! বউ আসবার পর থেকেই যেন অলক্ষ্মী এসে ঢুকেছে তাঁর সংসারে। গেল বছর বোমার ভয়ে সবাই চলে গিয়েছিল কলকাতা ছেড়ে। চাউলপট্টির ওরা গিয়েছিল মধুপুরে। চড়কডাঙার মিত্তিররা গিয়েছিল গিরিডিতে। ন'দিদিও গিয়েছিল ঘাটশিলায়। যাবার আগে পই-পই করে বলেছিল—চল নয়ন, চল তুই আমাদের সঙ্গে—কার জন্যে সংসার আগলে রয়েছিস তুই?

—কার জন্যে আবার ন'দিদি, সোনার জন্যে!

—তা সোনার বিয়ে দিয়েছিস্, বউ এয়েচে, এখনও তুই তাদের দেখবি? চিরকালটা কি সংসার নিয়েই কেবল থাকবি তুই?

মা-মণি বলেছিল—ছেলে যে আমার কাঁটা ন'দিদি! লোকের মেয়ে-কাঁটা হয়, আমার ছেলে-কাঁটা।

ন'দিদি বলেছিল—সে ছেলের কথা তোর বউ বুঝবে! তুই কেন জড়িয়ে আছিস শুনি? তোর কীসের টান? ধাড়ি ছেলে হলো, এখনও নিজের জিনিস নিজে বুঝে নিতে শিখলে না?

তারপর একটু থেমে ন'দিদি বলেছিল—তা তোর ছেলে-বউই বা আবার এখানে থাকবে কোন্ সুখে? বাড়ি ঘর-দোর সব চাবি দিয়ে চল্—

মা-মণি বলেছিল—এই এতগুলো বাড়ি, এতগুলো ভাড়াটে, আমি চলে গেলে কি চলে ন'দিদি?

—তা তোর সরকারবাবু আছে কী করতে? আমারও তো বাড়ি রয়েছে, ভাড়াটে রয়েছে—বাড়ি গেলে বাড়ি আসবে বাছা, কিন্তু প্রাণ গেলে কি আর আসবে?

তারপর সতীর ঘরে গিয়ে সতীকে ডেকে ন'দিদি বলেছিল—হ্যাগা বৌমা, তোমার এই বুড়ি শাশুড়ি, তার দিকে তোমরা একটু দেখ না বাছা? তুমিও তো একদিন শাশুড়ি হবে, তখন আবার তোমার বেটার-বউ এলে এই হেনস্তা করবে তো? সে-সব কথা একবার মনে পড়ে না তোমাদের বাছা, কী আর বলবো!

সতী কিছুই উত্তর দেয়নি তখন।

ন'দিদি বলেছিল—অনেক তপস্যা করলে লোকে এমন শাশুড়ি পায় বাছা, এইটে জেনে রেখো। এখন বুঝছো না তো, দাঁত থাকতে দাঁতের মূল্য কেউ বোঝে না। বাস হলে তখন আমার কথাটা বুঝবে।

সেই ন'দিদিরাই এতদিন কলকাতায় ছিল না। এতদিন পরে আবার ফিরে এসেছে। চাউলপট্টির চাটুজ্জে গিন্নীরা, চড়কডাঙার মিত্তির-গিন্নীরাও আবার ফিরে এসেছে। এ-সব কথা চাপা থাকে না কখনও। কোথা থেকে কোন্ কান দিয়ে যে কোন্ কানে উঠলো, তাও কেউ বলতে পারে না। মা-মণি কারোর বাড়ি যেতেন না। সকলের বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিলেন। কিন্তু লোকে তবু শুনবে কেন? চাটুজ্জে গিন্নী একদিন এসে খুব মায়া-কান্না কেঁদে গেল। বললে—আহা, শুনলুম সব দিদি, শুনে

বসন্ত মুখে আমার আর ভাত রোচে না, তাই বলছিলুম আমার বেয়ানকে, বলছিলুম, দিদির মত শাশুড়ি পেয়ে যে-বউ ঘর করতে পারলে না, তার কপালে অনেক দুঃখ আছে ভাই—

তারপরেই ঠিক আসল কথাটা বেরোল, মুখ নিচু করে বললে—তা বউ গেল কোথায়, খোঁজ-খবর কিছু পেয়েছ দিদি?

ঘোষ-গিন্নী কিছুই বললেন না।

চাটুজ্জে গিন্নী নিজেই বললে—তা তুমিই বা তা জনবে কেমন করে দিদি? ভাতারকে যাদের মনে ধরে না, তারা কি আর কয়ে যায়?

তারপর নিজেই আবার চাটুজ্জে গিন্নী বললে—শুনলুম নাকি ফিরিঙ্গীদের আপিসে চাকরি নিয়েছে? আমার তো বিশ্বাস হলো না দিদি! চাকরি করতে যাবে কোন্ দুঃখে তুমিই বলো না! সেই কথায় আছে না, বাড়ির বউ ঘর-ভাঙানি—এ তাই নির্ঘ্যাত ভাই—তোমার ছেলেকে একটু চোখে-চোখে রেখো দিদি—। আজকালকার

ছেলে, কিছু বলা যায় না। আমার মা বলতো—জা-জাউলী আপনাউলী ননদ-মাগী পর, শাশুড়ি-মাগী গেলে পরে হবো স্বতন্তর—এও হয়তো তাই দিদি—

চড়কডাঙার মিত্তির-গিন্নীও একদিন এসেছিল। সাধারণত এত আসা-যাওয়া নেই এ-বাড়িতে। ঘোষ-গিন্নী নিজেই কারো বাড়িতে যান না। কিন্তু গরজ বড় বালাই। মিত্তির-গিন্নী এ-কথা সে-কথার পর আসল কথাটাই পাড়লে। বললে—বউকে দেখছিনে যে দিদি—বাপের বাড়ি গেছে বুঝি!

ঘোষ-গিন্নী বললেন—হ্যাঁ—

—তা এই সময়ে যে বাপের বাড়ি পাঠালে? পোয়াতি বুঝি?

এমন অনেক আজে-বাজে কথা সব। শেষকালে কোনও ভাবেই কথা আদায় করতে না পেরে মিত্তির-গিন্নী চলে গেল। কিন্তু ন'দিদি ঘাটশিলা থেকে এসেই একেবারে দৌড়ে এসেছে। বললে—হ্যাঁরে নয়ন, যা শুনছি, সত্যি?

মা-মণি বললে—হ্যাঁ সত্যি! কে বললে তোমাকে?

—এসব কি চাপা থাকে রে? ঢি-ঢি পড়ে গেছে যে কলকাতায়।

—কিন্তু কে ছড়ালে বলো তো?

ন'দিদি বললে—তার লোকের কি অভাব আছে সংসারে? এসব খবর চাপা রাখবিই বা তুই কেমন করে? কিন্তু কেন এমন হলো! তোর একটা বউকে তুই টিট্ করতে পারলি না? আমার পাঁচ-পাঁচটা বউ ঘরে, কেউ একটু টুঁ শব্দ করুক তো! মুখে ঝামা ঘষে দেব না? তা গেছে কোথায়? বাবার কাছে?

নয়ন বললে—আমারই ভুল হয়েছিল ন'দিদি! আমিই আদর দিয়ে বউকে মাথায় তুলেছিলুম—

—সে যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন বেয়াই মশাইকে চিঠি লিখেছিস?

নয়ন বললে—ও চামারদের নাম আর মুখেও আনতে চাই না ন'দিদি! ও-বউ আমার চুলোয় যাক, জাহান্নমে যাক, আমি দেখতেও যাচ্ছিনে তা, শুনতেও যাচ্ছিনে—

—তোর ছেলে কী বলে?

—সোনার কথা ছেড়ে দাও ন'দিদি। সোনাকে আমার চেনো না তুমি!

ন'দিদি বললে—তোর সোনাকে একবার আমার কাছে ডাক দিকি, আমি কথা বলি তার সঙ্গে। এ কী কথা। বাড়ির বউ বেরিয়ে যাবে!

নয়ন বললে—তোমার কাছেই তাহলে বলি ন'দিদি, বউ বাপের কাছেও যায়নি, অন্য কারোর কাছেই যায়নি, গেছে চাকরি করতে—

ন'দিদি কথাটা শুনে গালে হাত দিলে। বললে—তুই যে অবাক করলি নয়ন, ঘোষ-বাড়ির বউ চাকরি করছে?

—তবে আর বলি কি ন'দিদি। আমি লজ্জায় কোথাও বেরোতে পারিনে। ভবানীপুরে আমার মুখ দেখানো বন্ধ হয়ে গেছে সেই থেকে।

—তা চাকরি না-হয় করছে, কিন্তু রাত কাটায় কোথায়?

নয়ন বললে—সেও আবার তোমায় খুলে বলতে হবে ন'দিদি? সাধ করে কি আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। আমি শুনেছি তুমি ফিরে এসেছো! কিন্তু কোন্ মুখে যাই তোমার কাছে বলো তো? আমার যে নিজের গালেই চড় মারতে ইচ্ছে করছে নিজের—

—নু, না, এমন বেবুঝ হলে তো চলবে না। তোর ছেলেকে ডাক্!

—ছেলেকে আর ডেকে কী করবো ন'দিদি! ছেলে বলে সেই বউকে আবার বাড়িতে এনে তুলবে!

ন'দিদি বললে—খবরদার, খবরদার, অমন কাজ করিসনি নয়ন, অমন কাজও করিসনি! বার-মুখো বউকে ঘরে ঠাঁই দিসনি—তার চেয়ে ছেলের তোর আবার বিয়ে দে, আমি তোকে ভাল মেয়ে এনে দেব—

নয়ন বললে—সেবার ব্যারিস্টারের কথায় এক বিয়ে দিয়ে ঠকেছি, আবার ঠকবো নাকি ন'দিদি—

—ঠকবি কেন? বেয়াই বাজিয়ে নিবি, বাপের এক সন্তান হওয়া চাই, দেবে থোবে ভাল, তবে না বিয়ে দেব ছেলের—আমার পাঁচ ছেলের বিয়ে তো আমি দিয়েছি, একটাও ঠকেছি বলতে পারে কেউ?

তারপর আর কথা না বাড়িয়ে ন'দিদি বললে—ডাক তোর ছেলেকে, কোথায় সে? পড়ছে? কী ছাই-ভস্ম পড়ে তোর ছেলে দিনরাত শুনি? ওই বই পড়াই কাল হয়েছে তোর ছেলের। বেটাছেলে অত পড়াশুনো কেন রে? এবার এমন বউ করে দেব তোর ছেলের, দেখবি বউ-এর মুখে মুখ দিয়ে পড়ে থাকবে দিনরাত—

—তা সেটাই কি ভাল ন'দিদি?

—ভালো নয়? তুই বলছিস কী? আমার ছেলেদের দেখিসনি? মা-অন্ত প্রাণ সব, দিনরাত মা তুমি কী খাবে, মা তুমি কী পরবে—কেউ বলতে পারে আমার ছেলেরা মাগ-মুখো? তোর ছেলে কোথায়?

নয়ন বললে—ছেলে তো সেখানেই গেছে—

—কোথায়?

নয়ন বললে—আবার কোথায়? বউ-এর কাছে। আমাকে বলে গেছে, আজ বউকে বাড়িতে এনে তুলবে। তা আমিও বলেছি, বউ যদি তুই আনিস তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন!

—কখন আসবে?

নয়ন বললে— সেই তো বেলা এগারোটায় গেছে, এখনও পর্যন্ত দেখা নেই—চাকরটা হয়েছে আবার তার সোহাগের—সেও সঙ্গে গেছে—

—খাওয়া হয়নি এখনও?

নয়ন বললে—কে জানে! ছেলের সঙ্গে আমার কথা বলতেও মন সরে না। অমন ছেলের মুখ দেখলেও পাপ ন'দিদি—আমার ছেলে যদি আমার বশ্ হতো তো আমার

ভাবনা। ছেলে বশে নেই বলেই তো বউ অত জো পেয়েছে। তোমায় আমি কী বলবো নদিদি, আমার কত টাকা যে কতদিকে নয়-ছয় হয়ে গেল, সেসব ওই ছেলের জন্যে—

—কেন, ছেলে টাকা ওড়ায় নাকি?

—ছেলের যদি ওড়াবার প্রবৃত্তি হতো তো তা-ও বুঝতুম। এ নয়-ছয় হয়ে গেল নদিদি! দশ জনে লুটে পুটে খেলে!

—কী রকম?

আশ্চর্য! হয়ত কথাগুলো বলবার জন্যেই একজন শ্রোতা খুঁজছিলেন নয়নরঞ্জিনী দাসী। যে-হোক কেউ! কাউকে না-বলতে পেরে যেন অসহায় বোধ করছিলেন তিনি। আত্মীয়-স্বজনহীন অবস্থায় গিরীশ দাসের বিধবা স্ত্রী সেদিন বড় অপারগ হয়েই সব বলে ফেললেন। যেন এতদিনের সব কথা বলতে পেরে খানিকটা হাল্কা হতে পারলেন। খানিকটা স্বস্তি।

—তা মামলা কর! পুলিসে খবর দে!

নয়ন বললে—সব হচ্ছে নদিদি! আমি একলা মেয়েমানুষ, আমি নিজে যা করতে পারি, করছি। আমার যে কেউ নেই, একলাই যে আমাকে সব করতে হচ্ছে। একলা ছাড়া দোকলা পাবোই বা কোত্থেকে। কে আমার আছে? আমার ছেলে নেই, আমার বউ নেই, আমার টাকা ছিল, সম্পত্তি ছিল, তাও আজ নেই—কর্তা আমার এ কী অবস্থায় ফেলে গেছেন, সংসার আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে, একলা চলে গেছেন—

নদিদি অনেকক্ষণ ধরে সান্ত্বনা দিলেন। দুজনে ছোটবেলা থেকে এক পরিবারে মানুষ। দুজনেই পরস্পরের দুঃখে সুখে চিরকাল দুজনকে দেখে এসেছে। নদিদি বললে—আচ্ছা, দেখি, তোর ছেলে আসুক, তোর ছেলের সঙ্গে কথা বলে তবে আমি আজ যাবো—

হঠাৎ মা-মণি বললেন—ওই গাড়ির আওয়াজ হলো—ওই এসেছে—

তারপর ডাকলেন—কৈলাস, কৈলাস—

কৈলাস আসতেই বললেন—যদি কেউ আসে তো ঢুকতে দিবিনে বাড়িতে—

নদিদি বললে—কেন রে নয়ন? সোনা এলে ঢুকতে দেবে না? তুই বলছিস কী? তাহলে বউ নিয়ে যাবে ও কোথায়?

নয়ন বললে—না, ও-বউকে নিয়ে এলে এখানে ঠাঁই হবে না, তা সে ছেলেই হোক আর যেই হোক—

কিন্তু কৈলাস খানিক পরেই ফিরে এল। বললে—আজ্ঞে না মা-মণি, ও দাদাবাবু নয়, সাহেবপানা অন্য একজন লোক—

—কে সাহেবপানা লোক? উকীলবাবু?

কৈলাস বললে—না, উকীলবাবুকে তো আমি চিনি, এ অন্য লোক, ঘোষালবাবু না কী যেন নাম বললে, আমি তাড়িয়ে দিয়েছি—বলেছি এখন কেউ নেই, দেখা হবে না—

মা-মণি বললেন—বেশ করেছিস—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সনাতনবাবু যখন এলেন, তখন সন্ধ্যে উতরে গেছে। নদিদির গাড়ি তখনও বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে। কৈলাস গাড়ির আওয়াজ পেয়েই সদর-গেটের দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই ট্যাক্সিটা ভেতরে ঢুকে পড়েছে। শম্ভু সামনে বসে ছিল। আর ভেতরের সীটে সনাতনবাবু হেলান দিয়ে শুয়ে ছিলেন।

ওপর থেকে মা-মণি তখন ডাকছেন—কৈলাস, কৈলাস—

কৈলাস তিন লাফে দৌড়ে গিয়ে হাজির হয়েছে মা-মণির কাছে।

—কে এল রে? বৌদিমণিকে নিয়ে এসেছে দাদাবাবু?

নদিদিও সব শুনছিল। বললে—তুই একটু মাথা ঠাণ্ডা কর নয়ন, হুট্ করে

একটা কিছু করে ফেলিস নে—ছেলে বলে কথা, পেটের ছেলেকে অত অচ্ছেন্দা করতে নেই—

মা-মণি বললেন—না, খবরদার বলছি না! ও বউ-এর আমি মুখ দেখবো না—ও হতভাগী যেখানে ছিল, সেখানেই গিয়ে উঠুক, আমি ছেলের নতুন করে আবার বিয়ে দেব—

ন'দিদি বললে—তা বিয়ে দিস না, কে তোকে বারণ করেছে? কিন্তু তোর পেটের ছেলেকে তো বাড়িতে ঢুকতে দিবি—নইলে শেষকালে যে ছেলে-বউ দুকুল যাবে তোর—

ন'দিদি ঠান্ডা মাথার লোক। কথাটা শুনে শান্ত হলেন মা-মণি।

কৈলাস বললে—বৌদিমণি আসেনি মা-মণি—দাদাবাবু একলা এসেছে—দাদাবাবুর গা দিয়ে রক্ত পড়ছে—

—রক্ত?

ন'দিদি, মা-মণি দুজনেই চমকে উঠলেন। কৈলাস বললে—শম্ভু আছে সঙ্গে, সে বললে মিলিটারি গাড়ির ধাক্কা লেগেছিল রাস্তায়—

সেদিন যখন সনাতনবাবুকে ট্যাক্সি থেকে নামানো হলো, তখনও তিনি বেশ সচেতন। এমন কিছু লাগেনি। সনাতনবাবু বললেন—মিলিটারি লরীর কিছু দোষ ছিল না মা-মণি, আমাদের ট্যাক্সিটারই দোষ ছিল—

ন'দিদি বললে—তুমি চুপ করো বাবা, তুমি এখন কথা বলো না। ডাক্তারকে খবর দিতে বল্ নয়ন—

ন'দিদি ছিল সেদিন, তাই বেশ সামলে নিলে অবস্থাটা। শম্ভুরও লেগেছিল বেশ। তবে সনাতনবাবুর মত নয়। শম্ভু বললে—ধাক্কাটা পেছন দিকে লেগেছিল কিনা, তাই দাদাবাবুরই বেশিটা লেগেছে—

ন'দিদি বললে—কী সব্বনাশ হতো বলো দিকিনি, ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছেন, পোড়ারমুখো গাড়িগুলোর যে কী হয়েছে, দিনরাত রাস্তায় ঘুরে ঘুরে মরে কেবল—

শম্ভু ছিল বলে তাই রক্ষে। শম্ভুই হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে তারা ব্যান্ডেজ করে ছেড়ে দিয়েছে। তারপর আর-একটা ট্যাক্সি করে এখানে এসেছে। একে সারাদিন খাওয়া নেই, তারপর এই অপঘাত—সনাতনবাবুকে বড় কাতর দেখাচ্ছিল। ধরে ধরে সবাই তুললে ওপরে। বিছানায় শুইয়ে রাখা হলো। সনাতনবাবু চারদিকে চেয়ে দেখছিলেন—বললেন—আমার কিছু হয়নি মা-মণি, তোমরা কিছু ভেবো না—

ন'দিদি বললে—তা বললে কি হয় বাছা, মায়ের প্রাণ কি তাই বললে মানতে চায়?

সনাতনবাবু বললেন—মাসীমা, আপনি বাড়ি যান, আমি বলছি, আমার কিছু হয়নি, আমার এই হাতটায় শুধু একটু ব্যথা করছে, এ সেরে যাবে, আপনি বাড়ি যান—

ন'দিদি নয়নকে আড়ালে ডাকলে। ফিস ফিস করে বললে—ছেলেকে যেন এখন কিছু বলিসনে নয়ন—তোকে যা বললুম, তাই করিস—

—কিন্তু ও-বউকে আমি এ-বাড়িতে প্রাণ থাকতে ঢুকতে দেব না, তা আমি বলে রাখছি ন'দিদি—

—সে যখন বউ আসবে, তখন দেখা যাবে! তা সে-বউ এখন কোথায়?

নয়ন বললে—কে জানে ন'দিদি, সে-খোঁজ রাখতে আমার তো ভারি বয়ে গেছে—

ন'দিদি আর বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারলে না। তারও বেটা আছে, বেটার বউ আছে। গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল ন'দিদি।

সমস্ত দিনই খাটুনি গেছে লক্ষ্মীদির। কাজও তো আর কম নয়। সমস্ত সংসারটা উঠিয়ে দিল্লী নিয়ে যাওয়া! দাতারবাবুকে দিয়ে কিছুই হবার নয়। সব লক্ষ্মীদিকে একলাই করতে হয়েছে।

সুধাংশুরও সময় নেই। সুধাংশু অফিস থেকে টেলিফোন করে অর্ধেক কাজ সেরেছে। ভারি ভারি মালগুলো সব গুড্‌স্‌-ট্রেনে যাবে। খাট, আলমারি, টেবল, চেয়ার, ফার্নিচারই কি কম তৈরি করিয়েছিল লক্ষ্মীদি এই ক' বছরে। আর শুধু ওই ফার্নিচারই বা কেন? যে-লক্ষ্মীদির কিছুই ছিল না, একটা ভাঙা তক্তপোশ নিয়ে এই বাড়িতে এসে উঠেছিল অনন্তর সঙ্গে, সেই লক্ষ্মীদিরই ফার্নিচারের স্টক আজ গুণে শেষ করা যায় না। দিনে দিনে শুধু অর্থই জমেনি, পরমার্থও জমেছে লক্ষ্মীদির। সমাজে লক্ষ্মীদির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আজকের কলকাতার উঠতি-সমাজে লক্ষ্মীদির নাম বললে সবাই চিনতে পারে। আজকে লক্ষ্মীদির ব্যাংকার লক্ষ্মীদিকে ওভারড্রাফট্‌ দিতে পারলে কৃতার্থ হয়ে যায়। অথচ এই কিছুদিন আগেও একখানা শাড়ি সাবান দিয়ে কেচে শুকিয়ে নিয়ে বাইরে বেরোতে হয়েছে। ওই একখানা শাড়িই যেদিন সম্বল, সেদিন একা একা চৌরঙ্গীতে দাঁড়িয়ে নিজের ফিগারটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাতে হয়েছে। সেদিনের কথা কেউ জানে না। সেটা না জানাই ভালো। সেদিনকার সব অপবাদ আজ টাকার জলুসে ঢাকা পড়ে গেছে।

জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে লক্ষ্মীদির সব কথা মনে পড়ে গেল।

হঠাৎ টেলিফোন্‌টা বেজে উঠলো। লক্ষ্মীদি বললে—মিসেস দাতার স্পীকিং—হ্যাঁ, কী খবর মিস্টার হন্‌স্‌রাজ?

ওপাশ থেকে উত্তর এল—শুনলুম আপনি দিল্লি চলে যাচ্ছেন? গোয়িং টু দেহ্‌লি—?

—হ্যাঁ, সুধাংশু ছাড়ছে না। ঘুরে আসি দিনকতক! আপনার খবর কী? আজ বিকেলে আসবেন নাকি? আসুন না। অনেকদিন এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া হয়নি। সব তো প্যাক্‌ করা হয়ে গেছে—তবু আজকের জন্যে কিছু স্টক্‌ বাইরে রেখেছি—আসুন, প্লীজ্‌ ডু কাম্‌—

তারপর একটু থেমে বললে—আপনার সেই সিগ্রেটের কী হলো মিস্টার হন্‌স্‌রাজ? আপনি থাকতে কী উপোস করে মরবো বলতে চান?

—সিগ্রেট চাই তা আগে বলেন নি কেন? কোন্‌ ব্র্যান্ড্‌?

—বিলিতি সিগ্রেট, যে-কোনও ব্র্যান্ড্‌। দিশি সিগ্রেট টেনে টেনে যে থ্রোট্‌-ক্যানসার হবার জোগাড়।

সত্যিই, কোনও বিলিতি জিনিসই আর পাওয়া যাচ্ছে না তখন। লক্ষ্মীদিদের বড় কষ্ট হচ্ছে তখন। একে-ওকে ধরে খোসামোদ করে আদায় করতে হয়। মিস্টার হন্‌স্‌রাজ কথা দিলে। তারপর একটা টেলিফোনের পর আর একটা টেলিফোন্‌। মিস্টার মাধো, মিস্টার লালচাঁদ, মিস্টার সিং।

হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়লো লক্ষ্মীদি। বললে—কী যে বলেন মিস্টার সিং, আমি গরীব লোক, আমি কি আপনাকে এন্‌টারটেন করতে পারবো? আমার কি এত সৌভাগ্য হবে?

সব জায়গাতেই খবর চলে গেছে যে, মিসেস দাতার কলকাতা ছেড়ে দিল্লি চলে যাচ্ছে। সব জায়গাতেই সাড়া পড়ে গেছে। মিসেস দাতার কলকাতা ছেড়ে চলে যাওয়া মানে কলকাতা কানা হয়ে যাওয়া। তারপরেই হঠাৎ দীপংকরের কথা মনে পড়লো। দীপংকরকে টেলিফোন করার মাঝখানেই মিস্টার দাতার এসে কাছে দাঁড়ালো।

বললে—শুনছো লক্ষ্মী?

লক্ষ্মীদি তখন টেলিফোনে কথা বলতেই ব্যস্ত। বললে—আঃ, একটু চুপ করো না তুমি—

দাতারবাবু একটু থেমে বললে—দেখো, মানস দুধ খাচ্ছে না—

—তা মানস দুধ খাচ্ছে না, তাও কি আমাকে দেখতে হবে? তুমি কী করছো? কেশব কোথায়? কেশবকে বলতে পারছো না? দেখছো আমি একটা কাজ করছি—

তারপর টেলিফোনটা ছেড়ে দিয়ে এসে ইজি-চেয়ারটায় হেলান দিয়ে পড়লো। বললে—নিজে তো একটা কাজ করতে পারবে না, অন্য লোককেও কাজ করতে দেবে না তুমি। কই? মানস কোথায়? দাও, আমি দুধ খাইয়ে দিচ্ছি—। কাজের সময় একটু সাহায্য করবে কোথায়, তা না, কানের কাছে কেবল ঘ্যান্‌ ঘ্যান্‌ করতে আরম্ভ করেছো—।

দাতারবাবু বললে—মানস চলে গেছে—রঘুর সঙ্গে বেড়াতে গেছে লেকে—

—দুধ না খেয়েই গেল? কেন যেতে দিলে?

দাতারবাবু বললে—না, দুধ খেয়ে গেছে—আমি নিজেই খাইয়ে দিয়েছি—

—তা হলে তো তুমি ইচ্ছে করলেই পারো সব, শুধু শুধু আমাকে বিরক্ত করা। দেখছো কত দিকে তাল সামলাতে হচ্ছে আমাকে একলা। সন্ধ্যেবেলা মিস্টার হনুসরাজ আসছে, মিস্টার মাধো, মিস্টার লালচাঁদ, সবাই আসছে, এই সময়ে তুমি আমাকে বিরক্ত করছো। ওদিকে দীপংকর এখুনি টেলিফোন করছিল—বাবা নাকি নেই—

দাতারবাবু বললে—সে তো দীপুবাবু সেদিন এসে বলে গেল—

—তা কই, তুমি আমাকে বলো নি?

দাতারবাবু বললে—ভুলে গিয়েছিলাম বলতে। তুমি তখন ঘুমোচ্ছিলে। তারপর তোমারও তো এ ক'দিন শোনবার সময় ছিল না, কাজে ব্যস্ত ছিলে তুমি, আর আমিও ভুলে গিয়েছিলাম—

—তা তো ভুলে যাবেই। কোন্ কাজটা তোমাকে দিয়ে হবে? বাবার টাকাগুলোর কথা ভাবতে হবে না? বাবার কি কম টাকা আছে ব্যাঙ্কে? দীপুকে তো তাই বলছিলুম। বর্মার টাকা, সে না-হয় জাপানীরা যা করে করবে, কিন্তু ইণ্ডিয়ার ব্যাঙ্কে যদি কিছু থাকে তো তার তো ওয়ারিশন্ আমরা, আমি আর সতী—দুজনে—। সে-সব কথা ভাবতে হবে না?

সত্যিই, কত লাখ টাকা বাবার আছে কে জানে। একদিন ভুবনেশ্বর মিত্র ভেবেছিলেন মৃত্যুর আগে জামাইদের সব দিয়ে যাবেন। মনের মত জামাই করবেন। তারাই তাঁর কারবার দেখবে। কিন্তু কোনও আশাই পূর্ণ হলো না তাঁর। যখন রেঙ্গুনে বোমা পড়লো তখনই তিনি দেশে চলে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিনকার সেই বর্মার সে-দৃশ্য বোধ হয় কেউ কোনওদিনই ভুলবে না। সেদিন শিয়রে মৃত্যুর ভয়ও তাদের সাদা-কালোর তফাত মুছে ফেলতে পারেনি। সেদিন ইংরেজদের জন্যে ছিল এক রাস্তা আর নেটিভদের জন্যে অন্য রাস্তা। কালো-চামড়াদের সেদিন যে-অত্যাচার সইতে হয়েছে, ইতিহাসে তার রেকর্ড হয়ত একদিন মুছে যাবে, কিন্তু হাতে হাতে নগদ ফল পেয়ে গিয়েছিল সেদিনকার ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। নর্থ বার্মা থেকে মেজর-জেনারেল স্টীলওয়েল নিজে পালিয়ে এসেছিল, কিন্তু সেখানকার বার্মীজদের রক্ষা করার কোনও ব্যবস্থাই করেনি মিস্টার চার্চিল। হাজার-হাজার লোক পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়েছে পথ। সে-পথেও বাধা পেতে হয়েছে বার বার। লোক মরে পড়েছে। এক ফোঁটা জলও পায়নি। পথে কত মরেছে, আর কত মরেছে ইরাবতী নদীতে, কে তার হিসেব রেখেছে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড়ের মধ্যে লক্ষপতি ভুবনেশ্বর মিত্রও ছিলেন কিনা কে জানে। হয়ত ছিলেন, হয়ত ছিলেন না। যদি সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকে তো তাঁকেও আর সকলের মত এক ফোঁটা জলের জন্যে ছটফট্ করতে হয়েছে। সেদিন লক্ষপতি বলে কেউ আর তাঁকে আলাদা খাতির তো করেনি। অঘোরদাদু কড়ি দিয়ে নিজের জীবন কিনতে পারেনি। ভুবনেশ্বর মিত্রের অত টাকা। শেষকালে এক ফোঁটা জলের তেষ্টাও সেই টাকা মেটাতে পারলে না। আশ্চর্য!

সন্ধ্যেবেলা গড়িয়াহাট লেভেল ক্রসিং-এর ধারের বাড়িটা অন্য দিনের মতই আবার উচ্ছল হয়ে উঠলো। বাইরে আবার সার সার গাড়ি দাঁড়িয়ে গেছে। ভেতরে দাতারবাবু কোট-প্যাণ্ট-নেকটাই পরে রোজকার মত টেবিলের ধারে গিয়ে বসেছে। মিস্টার হনুসরাজ এসেছে। মিস্টার মাধো এসেছে। মিস্টার লালচাঁদ এসেছে। মিস্টার সিংও এসেছে। কলকাতার বড় বড় কনট্রাক্টার সব। আর তাদের ইহকালের দেবতা সুধাংশুও। সেই সুধাংশু টেবিলের সামনে সকলের দিকে মুখ করে বসে আছে। সুধাংশুর কলমের একটা আঁচড়ে কনট্রাক্টার-দের ভাগ্য ফিরে যায়। সুধাংশুর একটা হাসির দামই বিশ হাজার টাকা। সুধাংশুকে ধন্য করার জন্যেই সবাই জমা হয়েছে লক্ষ্মীদির বাড়িতে। সেই সুধাংশুই দিল্লি চলে যাচ্ছে। আরো বড় বড় কনট্রাক্টার তাকে খাতির করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে সেখানে। কলকাতার চেয়েও বড় দিল্লি। দিল্লি হলো রাজধানী। ইন্দ্রের নগর দিল্লি। তাই হয়ত তার নাম ইন্দ্রপ্রস্থ।

তা সুধাংশু যদি দিল্লি যায় তো সবাই দিল্লি যেতে প্রস্তুত! মিস্টার হনুসরাজ, মিস্টার মাধো, মিস্টার লালচাঁদ, মিস্টার সিং। সবাই। সুধাংশু দিল্লি চলে গেলে এখানে থেকে তাদের ফয়দা কী?

মিস্টার হনুসরাজ বললে—আমিও দিল্লি যাবো সুধাংশু সাব? আমাকে নিয়ে চলুন—

সুধাংশু বললে—চলুন না, এক সঙ্গে থাকা যাবে—মন্দ কী!

লক্ষ্মীদি বললে—চলুন মিস্টার হনুস-রাজ, আপনিও চলুন, সবাই মিলে দিল্লি গুলজার করে তোলা যাবে'খন—মিস্টার মাধো আপনিও চলুন—

তারপর বাইরের ব্ল্যাক-আউট যত ঘন হয়ে উঠতে লাগলো, ভেতরের আলো তত ফেনিল হতে লাগলো। তত উদ্দাম। বিলিতি হুইস্কির নেশা তত মদির হয়ে উঠলো এ-বাড়ির মেজাজে। কাউকে পরোয়া নেই। কাউকে ভয় নেই। আরো যুদ্ধ চলুক। হিটলার আরো কিছুদিন স্ট্যালিনগ্রাড-টার চার পাশে ঘিরে থাকুক। সুধাংশু আছে, মিস্টার হনুসরাজ আছে, মিস্টার মাধো আছে, মিস্টার লালচাঁদ আছে মিস্টার সিং আছে। কীসের ভাবনা লক্ষ্মীদির?

লক্ষ্মীদির কাঁধ থেকে শাড়িটা টপ্ করে
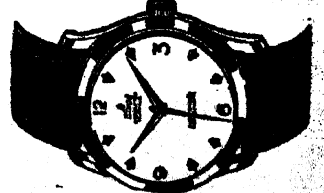
এসে গেল। সেটা সামনে নিয়ে বললে—আর এক পেগ্ দেব তোমার সুধাংশুদা?

হঠাৎ বাইরে আওয়াজ হতেই লক্ষ্মীদি সচেতন হয়ে উঠেছে। কেশব এসে খবর দিলে—দীপুবাবু এসেছে—

লক্ষ্মীদি সোজা হল্-ঘর ছেড়ে বাইরে এল। সতী অবাক হয়ে তখনও দেখছে চারদিকে। এই বাড়ি লক্ষ্মীদির? এত সুন্দর বাড়ি? এসব কেমন করে হলো? লক্ষ্মীদির নিজের বাড়ি? নিজের উপায় করা টাকায়?

বাইরের সিঁড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল দুজনে। দীপঙ্কর সতীকে নিয়ে সদর-দরজার ভেতরে ঢুকতেই একেবারে লক্ষ্মীদির মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। লক্ষ্মীদিকে দেখেও যেন আর চিনতে পারা যায় না। মুখে রুজ। কাঁধ কাটা ব্রোকেডের ব্লাউজ। আলুথালু সিফন্। বব্ করা চুল। ব্লাউজের তলার দিকে পেটের আধখানা দেখা যাচ্ছে। এই সেই লক্ষ্মীদি?

লক্ষ্মীদির মুখেও তখন আর কোনও কথা নেই। একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে সতীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছে।

—তুই এসেছিস ভাই? আমি যে কত খুশী হয়েছি, কী বলবো। উঃ, কতদিন যে দেখিনি তোকে!

তারপর চিবুকটা ধরে সামনে উঁচু করে দেখলে। বললে—আহা, কী হয়েছিল তোর সতী? এমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন?

লক্ষ্মীদির মুখের গন্ধটা নাকে লাগতেই কেমন যেন একটু সচকিত হয়ে উঠেছিল সতী। ভালো করে দেখলে চেয়ে চেয়ে। কিন্তু আজ আর তার মুখ দিয়ে কোনও প্রতিবাদের কথাই বেরোল না।

দীপঙ্কর এতক্ষণ কোনও কথাই বলে নি। এতক্ষণে তার মুখ দিয়ে কথা বেরোল। বললে—সতী রইল লক্ষ্মীদি, আমি তাহলে যাই, অনেক রাত হলো—

—কেন, তুই যাবি কেন? বোস্—

—কিন্তু তোমার বাড়িতে তো এখন অনেক গেস্ট্ এসেছে দেখছি—

লক্ষ্মীদি বললে—ও কিছু না, আমি কাল চলে যাচ্ছি, তাই এসেছে সবাই—সতীকে আমি অন্য ঘরে নিয়ে যাচ্ছি, ওর থাকবার ব্যবস্থা করছি অন্য ঘরে, সেখানে কেউ যাবে না—

—কিন্তু এখন তো তুমি ব্যস্ত!

লক্ষ্মীদি সে-কথার উত্তর না দিয়ে সতীকে ধরে ভেতরে ঢুকলো। হল-ঘর থেকে কথার টুকরো কানে আসছে। সিগ্রেটের ধোঁয়ার গন্ধও ভেসে আসছে টুকরো হাসির সঙ্গে। অনেক হাসি আর অনেক কথার আসর জমেছে ওখানে বোঝা গেল। লক্ষ্মীদি বারান্দা পেরিয়ে দক্ষিণের একখানা ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললো সতীকে। ঘরে খাট আছে, বিছানা আছে। মশারি বালিশ, সব আছে। চেয়ার, টেবিল, ড্রেসিং-ব্যুরো আছে। লক্ষ্মীদি বললে—এই ঘরে তুই থাকবি ভাই, যতদিন ইচ্ছে, ততদিন থাকবি—তোর কোনও অসুবিধে হবে না তো এখানে!

দীপঙ্কর বললে—নাঃ, অসুবিধে হবে কেন? চমৎকার ঘরটা।

লক্ষ্মীদি বললে—আমি কাল ভোরবেলা চলে যাচ্ছি, তোর জন্যে সব ব্যবস্থা করে গেছি। আমার রঘুকে এখানে রেখে যাবো, সে-ই তোর কাজকর্ম করবে! তা তোর শাশুড়ি কী বলছে এখন? শুনলুম তুই দীপুদের অপিসে চাকরি করছিলি—তা হঠাৎ কী হলো তোর? এতদিন কোথায় থাকতিস?

দীপঙ্কর বললে—এখন ওসব কথা থাক লক্ষ্মীদি, সতীর শরীর ভাল নেই—

লক্ষ্মীদি বললে—আর সেই বাবার টাকা? শুনেছিস তো বাবা মারা গেছেন? ...

দরকার। কোথায় কত টাকা আছে, কোন্ কোন্ ব্যাঙ্কে, তারও তো খোঁজ নিতে হবে—আমি তো চলে যাচ্ছি—

দীপঙ্কর বললে—সে-সব তুমি কিছু ভেবো না, আমি তো রইলুম—তুমি সতীকে কিছু খেতে দেবার ব্যবস্থা করো শিগগির, আমি কাল ভোর চারটে-পাঁচটার মধ্যেই আসবো—

লক্ষ্মীদি বললে—আমার যে সাড়ে ছটায় প্লেন রে—

দীপঙ্কর বললে—আমি তার আগেই আসবো, সতী এখন একটু ঘুমোক, খুব ক্লান্ত ও—আমি চলি—

তারপর আর বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি দীপঙ্কর। সেখান থেকেই সোজা সদর দরজা খুলে বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ট্যাক্সিটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। সেইটেতেই উঠে বসলো।

কিন্তু স্টেশন রোডের বাড়ির সামনে আসতেই অনেক লোকের ভিড় দেখে অবাক হয়ে গেছে দীপঙ্কর। এত লোক! এত লোক কেন? রাত অনেক হয়ে গিয়েছে। এ-সময় পাড়া নিস্তব্ধই হয়ে যায় অন্য দিন। অন্ধকার ব্ল্যাক-আউটের মধ্যেও যেন বহু লোকের অস্পষ্ট ছায়া ঘোরাফেরা করছে তারই বাড়ির সামনে।

সামনে যেতেই দীপঙ্কর দেখলে সমস্ত বাড়িটাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে পুলিসে। মিলিটারি পুলিসে জায়গাটা ছেয়ে গেছে। পাড়ার কয়েকজন লোক আশে পাশে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ে ভয়ে।

দীপঙ্কর সামনে যেতেই একজন সার্জেন্ট এগিয়ে এল। বললে—আর ইউ ডি সেন? তুমিই ডি সেন?
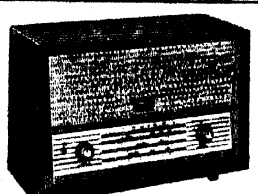
দীপঙ্কর বললে—হ্যাঁ—

—আমরা কিরণ চ্যাটার্জিকে তোমার বাড়ির ভেতর থেকে অ্যারেস্ট করেছি। ডু ইউ নো হিম?

দীপঙ্কর অবাক হয়ে গেল। কিরণ! কিরণ আজ হঠাৎ কোথা থেকে এল। কখন এল? সে কি তার আশাতেই অপেক্ষা করছিল? কিন্তু তার তো এ-সময় আসার কথা নয়। সে তো ওয়্যারলেস সেটটা সেদিন নিয়ে চলে গিয়েছিল! কেন সে এমন বোকামি করলে?

আর সঙ্গে সঙ্গে দুজন সার্জেন্ট হাত-কড়া পরানো কিরণকে এনে সামনে দাঁড় করালো। ফরসা টকটক্ করছে গায়ের রং। নিবাত-নিষ্কম্প দীর্ঘ দেহ। হাসি-হাসি মুখ। দীপঙ্কর কিরণের দিকে চেয়ে নির্বাক হয়ে রইল। একবার কথা বলতে গেল, কিন্তু সার্জেন্ট দুজন থামিয়ে দিলে। বললে—আপনাকেও আমাদের হেড-কোয়ার্টার্সে যেতে হবে মিস্টার সেন। কাম্ অন্—আপনার

গ্রামের নাম নন্দনপুর। নদীর নাম চন্দনা। আর নদীর সঙ্গে মিল রেখেই বোধ হয় মেয়ের নাম হল কঙ্কনা। সবাই বলে কাঁকন।

এ হল ভূমিকা। গল্পের শুরু এখানে নয়। কঙ্কনা যখন কলকাতার বেথুন কলেজের ছাত্রী, তখনও গল্প শুরু হয়নি। নন্দনপুর থেকে আমি অবশ্য অনেক আগেই ওর কাছে এসেছি। ওর বাবা আমায় আনিয়ে নিয়েছিলেন একলা মেয়ের সঙ্গী হিসেবে। এসে দেখলুম, কাঁকনের রূপ সহস্রগুণ বেড়ে গেছে। অপূর্ব সুন্দরী হয়েছে ও।

লক্ষ্মীর রূপের যে ক'টি বর্ণনা সচরাচর পাওয়া যায়, তা থেকে ওর জন্য রাজলক্ষ্মী উপমাটিই বেছে নেওয়া চলে। ওর সৌন্দর্যের মধ্যে এক ধরনের ঐশ্বর্য আছে। মানে ওকে দেখলেই মন উন্মুখ চঞ্চল হয়ে উঠবে।

কলেজে পড়ে কাঁকন। পরীক্ষায় বেশ ভালই করেছে বরাবর। তা বলে রোজ ভোরে উঠে, চোখে মুখে জল দিয়েই যে পড়তে বসবে, এমন মেয়ে নয়। খুব ভোরে স্নান সেরে শিবপুজো করে ও। তারপর পড়ার ঘরে যায়। প্রতি শিবরাত্রিতে নির্জলা উপবাস করে কাঁকন। আট থেকে আঠারো। দশ বছর ধরে এই একাগ্র একনিষ্ঠ শিব-পুজো চলেছে। এক রকম তপস্যা ছাড়া আর কি? ওর ধারণা বোধ হয়, এই অবিচল নিষ্ঠাই ওকে এমন স্বামী পেতে সাহায্য করবে, যার রূপ ও গুণ দেবদুর্লভ।

পায়ে হেঁটে পথ চলে না ও। যদি-বা চলতেই হয়, ওর দৃষ্টি থাকে সম্মুখে। নিরবিচ্ছিন্ন সেই দৃষ্টিতে চারপাশের গাড়ি ঘোড়া ভিড়ের ছায়া পড়ে বলে অন্তত আমার মনে হয় না। ওকে দেখে লোকে যেন কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়েই পথ ছেড়ে দেয়। রকের আড্ডাধারী ছেলেরাও দেখেছি ওর দিকে অশালীন মন্তব্য ছুঁড়ে দিতে ইতস্তত করে। কাঁকন বেশ কিছু দূরে এগিয়ে গেলে ছোঁড়াগুলো জিভ দিয়ে টাকরায় একটা আফসোসের আওয়াজ তোলে শুধু।

কাঁকনের চারিত্রিক দার্ঢ্যের ওপরে আমার শ্রদ্ধা আছে। তবু কখনো কখনো যেন ওকে একটা বেশী রকমের গোঁড়া আর জেদী বলে মনে হয়। দু-একটা ঘটনায় ওর জিদের প্রাবল্য দেখে আমি অবাক হয়েছি, একটু বিরক্তও বটে।

আই-এ পরীক্ষার কিছু আগেই ওর বাবা যে টিউটর রেখেছিলেন, কাঁকন তাকে ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য করল। অল্প বয়স ছেলেটির। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। নাম অপরেশ মিত্র। মাসখানেক ধরেই পড়াতে আসছিল অপরেশ। আসে, পড়ায়, চলে যায়। হঠাৎ একদিন রাফ খাতার পেছনে জড়ানো অক্ষরে লেখা একটি কবিতার লাইন দেখে রাগে লাল হয়ে গেল কাঁকনের মুখ। যেন বিষ-পিঁপড়ে কামড়ে দিয়েছে ওকে। আমি ছুটে এলুম। কি? কি হল? ওর চাঁপার কলির মত আঙুলটা থরথর করে কাঁপছিল খাতার ওপরে। ঝুঁকে পড়ে দেখলুম লেখাটা। আমি কারুর ভালবাসায় জন্ম নিতে চাই। অপরেশ।

বাঃ। সেই মুহূর্তে ওর রাগ রোষ ক্ষোভের কিছুই আমাকে স্পর্শ করল না। অন্যমনস্ক ওই লাইনটিই বারে বারে আউড়ে চলেছি। আমি কারুর ভালবাসায় জন্ম নিতে চাই। বয়সে কাঁকনের চেয়ে আমি পাঁচ বছরের বড়। তবু আমার এই পরান্নে পালিত কালো রোগা শরীরের মধ্যেকার তরুণী-মন লুব্ধ পিপাসুর মত ওই লাইনটির দিকে চেয়ে রইল। আমায় যদি এমন কথা লিখত কেউ।

কারুর কোন কথাই শুনল না কাঁকন। জোর করে, জিদ ধরে, একান্ত গোঁয়ার্তুমির বশেই ছাড়িয়ে দিল টিউটরকে। ওর বাবা গুম্ হয়ে বসে থেকে বললেন সেদিন, তোর আর পড়ে শুনে কাজ নেই।

ওটা অবশ্য রাগের কথা। আই-এ পরীক্ষা দিল ও। পাস করল। তারপর একদিন বি-এ পরীক্ষার শেষ পেপারটা দিয়ে এসে পড়ে পড়ে ঘুমোল সন্ধ্যেবেলা।

আমিও বসে থাকিনি এতদিন। ওর বি-এ পাশের খবর যখন এল, আমি তখন দক্ষ দরজীর মত শার্ট কোট কেটে সেলাই করতে পারি।

কাঁকনের মা নেই। হঠাৎ পোস্টকার্ডে খবর এল দেশের বাড়িতে ওর ঠাকুরমা মারা গেছেন। এই ঠাকুরমার হাতেই ওর শিবপুজোর হাতেখড়ি। ঠাকুরমার শোকেই নাকি পড়াশোনার ঝঞ্ঝাট চুকে গেছে বলেই এর পর কাঁকনের শিবপুজোর মেয়াদ বেড়ে গেল। সকাল আর সন্ধ্যেটা তেতলার ঠাকুরঘরেই কাটিয়ে দেয়। কেন জানি না, পুজো অর্চনা নিয়ে এ-বাড়াবাড়ি আমার ভাল লাগেনি।

পরের ফাল্গুনেই বিয়ে হয়ে গেল কাঁকনের। স্বামীর নাম ইন্দ্রপ্রতাপ। ছোট করে ইন্দ্র। পেটানো লোহার মত শক্ত মজবুত শরীর। রং বেশ কালো। সপ্তপদী পরিক্রমার সময় স্বামীর সম্মুখে কাঁকনকে দেখে মনে হচ্ছিল, একটি সোনার প্রতিমা

পিছনে কষ্টিপাথরের দেওয়াল। কাঁকন চলে যাবার পর আমিও নন্দনপুরে ফিরে এলাম।

নন্দনপুরে এখন শুধু চৈত্রের এলোমেলো হাওয়া। সেই হাওয়ায় শিমুল তুলোর রোঁয়া আর ক্ষুদে ক্ষুদে একরকম কালো পোকার ঝাঁক উড়ে বেড়ায়। পোকাগুলো গায়ে পড়লে রক্ষা নেই। লাল হয়ে ফুলে উঠবে চামড়া, জ্বলুনির চোটে অস্থির।

মজা নদী চন্দনা। আষ্টেপৃষ্ঠে পদ্মলতা জড়ানো একটা দীঘিমাত্র। ডুব দিতে গিয়ে একটু দূরে গেলেই বিপদ। পদ্মলতায় হাত-পা-গলা জড়িয়ে কণ্ঠাগত প্রাণ। সত্যি কথা বলতে কি, এখানে এসে আমার অসহ্য লাগছিল এবারে। সেলাই-এর ডিপ্লোমা পেয়ে গেছি, তাই ক্রমাগত বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত লিখছিলুম। এমন সময় আমার নামে টাকা পাঠাল কাঁকন। মনিঅর্ডারের কুপনে লেখা, শীগগির চলে এসো। তোমার জন্য চাকরি ঠিক করেছি।

আহিরীটোলায় কাঁকনের শ্বশুরবাড়ির চেহারা দেখে থমকে গেলুম। একতলায় অনেকগুলি স্যাঁতসেঁতেপ্রায় অন্ধকার ঘর। কেউ নেই। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। কোণের দিকে এক টুকরো ছাত। কিছু আলো, কিছু হাওয়া আছে। কাঁকনের স্বামী গম্ভীর মুখে অভ্যর্থনা জানাল।

—কোথায় চাকরি ঠিক হয়েছে? কি কাজ? কাঁকনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলুম।

—ওকে আগলানো। গম্ভীর জবাব পেলাম ইন্দ্রর। বুঝতে না পেরে কাঁকনের দিকে চোখ ফেরালাম। স্যাঁতসেঁতে পুরোনো অন্ধকার বাড়িটায় এক খণ্ড হীরের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে জ্বলছে ও। আমি চাইতেই চোখ নামিয়ে নিল।

দু দিন না যেতেই মনে হল, নন্দনপুরের সেই ক্ষুদে ক্ষুদে কালো পোকার কামড়ও সহস্রগুণে ভাল ছিল। আহিরীটোলার মস্ত বাড়িটার আবছা অন্ধকারের ওজন আছে। সেই ভার পাথরের মত বুকে চেপে আছে সকলের। ইন্দ্রকে কখনোই হাসতে দেখিনি। কাঁকনের মুখের হাসিও ঠোঁটে না ভেসে উঠতেই মিলিয়ে যায়।

ইন্দ্র ব্যবসায়ী মানুষ। ব্যবসার খাতিরে প্রায়ই কলকাতার বাইরে যায়। শুনছি, দিন সাতেক পরই আবার যাবে। জৌনপুর না কানপুর, কি নাম বলল যেন। সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সেদিন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। অনেক রাত্রে ঘুমটা ভেঙে গেল হঠাৎ। প্রথমেই সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ নাকে এল। একটু আশ্চর্য বোধ হওয়ায় জানলা দিয়ে উঁকি দিলুম। দোতলার সেই একটুকরো ছাদের রেলিং-এ ভর দিয়ে সিগারেট খাচ্ছে ইন্দ্র, কাঁকন পাশে নেই। সরে এলুম।

অনেকক্ষণ পর কৌতূহলের বশেই আবারও ঝুঁকে দেখলুম। না। কাঁকনকে কোথাও দেখতে পেলুম না। এবারে যেন কেমন একটু বেখাপ্পা লাগল ব্যাপারটা। সারা রাত আমার চোখে ঘুম এল না। সারা রাত টুকরো ছাতে পায়চারি করে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াল ইন্দ্র।

দুপুর বেলা, যখন কাক-চড়ুই-এর ডাকও থেমে গেছে, কাঁকনকে টেনে নিয়ে এলুম তেতলার চিলেকোঠায়।

বৈশাখী রোদের উগ্র উত্তাপ স্তিমিত হয়ে এল ছাতে। বৈকালের তপ্ত হাওয়ায় সন্ধ্যার স্নিগ্ধ স্পর্শ লাগলো একসময়। কাঁকন নীচে নেমে গেল। আমার সমস্ত বেলার সাধ্য-সাধনার ফলে শুধু একবারই কথা বলেছে কাঁকন। একটিই মাত্র কথা। 'আমি কুমারীই থেকে গেছি, সোনাদি।'

সন্ধ্যে উতরে গেছে। হাজারো উনানের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন কলকাতার আকাশে যখন দুটো কি চারটে তারা চোখে পড়ল, ঝি এসে খবর দিল, চা হয়ে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সদরে মোটরের হর্নের আওয়াজ পেলুম। কে যেন বললে, ডাক্তারবাবু এসেছেন। আমি জানতুম না, ইন্দ্র বাড়ি ফিরেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে আমার পাশ কাটিয়ে নীচে নেমে গেল।

আশঙ্কায় মুখ শুকিয়ে গেল আমার। ওই পাথুরে শক্ত চেহারা ভদ্রলোকের। কি অসুখ ও'র? চুপিচুপি একতলায় নেমে এলুম। জানলার ফাঁক দিয়ে একতলার বৈঠকখানা ঘরের কিছুটা দেখা যায়। রোমশ পেশল হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে ইন্দ্র। ডাক্তার ইনজেকশন দিচ্ছেন।

পরদিন বিকেলে ইন্দ্র বেরিয়ে যেতে কাঁকনকে ধরলুম, 'জেনে শুনে ভদ্রলোক তোর এমন সর্বনাশ—।'

'জেনে শুনে নয়। ফুলশয্যার রাতেই প্রথম—।' কাঁকন থেমে গেল। ওর কণ্ঠস্বরে সেই পুরোনো জিদের আভাস।

'বউদি! বউদি কোথায়? শীগগির চলে আসুন এদিকে—।' সিঁড়ির মুখে একরাশ উচ্ছ্বাস ঢেউয়ের মত ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল। চমকে তাকালুম। কে?

'অজয় ঠাকুরপো।' গম্ভীর জবাব দিয়ে ছাতের দিকে চলে গেল কাঁকন। ওর

'চশমা-পরা একখানা হাসিখুশী মুখ। বউদি কোথায়?'

'আসছে। আসুন আপনি।'

বসবার ঘরে এলুম ভদ্রলোককে সঙ্গে করে।

আমি আলাপের সূত্রো খুঁজছি। দরকার হল না। নিজে থেকেই একরাশ কথা বলল অজয়। 'ইন্দ্রদার বিয়েটা আমার বরাতে এমন ফসকে গেল।'

—কেন?

—ও সময় ভিয়েনায় ছিলুম আমি।

এমনভাবে বলল যেন শেয়ালদা কি উল্টোডাঙ্গায় ছিল। বুঝলুম বড়লোক। বুঝলুম চুপ করে থাকাই ভাল।

—দেখুন তো কেমন হয়েছে? বউদির জন্য আনলুম। খুব ছোট্ট একটি রুপোর কৌটো আমার দিকে বাড়িয়ে দিল অজয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছি, বলল, 'খুলুন না! খুলে দেখুন।'

কৌটোর মুখ খুলতেই হেসে উঠল নাকছাবিটা।

'হীরের?'

জবাব না দিয়ে উঠে গেল অজয়। তাক থেকে ইন্দ্রর দাড়ি কামাবার ছোট আরশিটা নিয়ে এল। নাকছাবির পাথরটা জোরে টেনে দিল আরশির কাঁচের ওপরে।

চেয়ে দেখি আগাগোড়া কাঁচটা আড়াআড়ি-ভাবে কেটে গেছে। ছি, ছি, ছি। আমি কড়ে নিতে যাচ্ছিলুম ওটা, ঝি এসে দাঁড়াল। চা খাবার পাঠিয়ে দিয়েছে কাঁকন। এ মেয়ে কোনকালে মানুষ হবে না। নীচে এলুম। জোর করে ওকে রান্নাঘর থেকে ধরে আনলুম। অজয় হাত পায়ে ধরতে বাকী রাখল শুধু। 'নাকছাবিটা পরুন বউদি। একটিবার। না হয় পরে খুলে ফেলবেন।'

'পরব'খন পরে। একটু কাজ আছে। আমি যাই।' মন্থর পায়ে চলে গেল কাঁকন। আমি হতবুদ্ধির মত চায়ের কাপে অকারণ চামচে নেড়ে চলেছি। অজয় চলে গেল একটু পরেই।

বেশ আমুদে আর আলাপী ভদ্রলোক। রাত্রে খেতে বসে প্রশংসা করছিলুম অজয়ের। আরও উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠতেই গালে চড় খেলুম যেন।

'ভাল তো বটেই। আমাদের কিনে রেখেছে।'

'মানে?'

'ব্যবসায়ে লালবাতি জ্বালতে বসেছিলেন উনি। বিশ হাজার টাকা ধার দিয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছে অজয় দস্তিদার।'

'বি—শ হাজার? তা ওর দোষ কি?'

'না, দোষ কারুর নয়।' কাঁকন থালায় জল ঢেলে দিল। আধেক ভাতই খাওয়া হয়নি। কিরকম যেন হয়ে গেছে ও আজকাল। ভাল করে কথা বলে না। বেশীক্ষণ কাছে বসতে চায় না।

এর হপ্তা তিনেক পর হুগলীর কাছাকাছি এক শহরের একটা স্কুলে চাকরি নিয়ে কলকাতা ছাড়লাম আমি। যদিও অচেনা জায়গা, তবু আহিরীটোলার বাড়ির চেয়ে এ ভাল। শেষের দিকে আমার উপস্থিতিতে যেন ইন্দ্র খুশী নয় বলেই মনে হয়েছিল আমার। তা ছাড়া, ভদ্রলোক বোধ হয় বুঝে-ছিলেন কাঁকনের মত মেয়েকে আগলাবার দরকার নেই। আমার চলে আসায় কাঁকনও বাধা দেয়নি।

চুলোয় যেতে হলেও একটা চুলো থাকা দরকার। আমার তা-ও ছিল না। পুজোর ছুটিতে বোর্ডিং বন্ধ হয়ে যেতে আহিরী-টোলার বাড়িতেই আসতে হল আমাকে।

আশ্বিনের শেষ। ট্রেনে আসতে আসতে দেখলুম, আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। কে জানত ভারী জমাট মেঘ আহিরীটোলার বাড়ির অন্ধকার কোণে কানাচে ওত পেতে আছে। কাঁকন এসে দাঁড়াল। রুক্ষ চুল উড়ছে। অন্যমনস্ক, বিষণ্ণ, একটু বা উদ্‌ভ্রান্ত যেন। মুখে কথা যোগাল না। একবার জিজ্ঞাসা করতে চাইলুম, ভাল আছ? মনে হল ঠাট্টার মত শোনাল।

চোরের মত স্নান খাওয়া সেরে নিজের ঘরে চলে এলুম। সন্ধ্যের অন্ধকার নামল। একবারও এল না কাঁকন, ডাকল না একবার। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম, ছুটিছাটায় এবার থেকে নন্দনপুরেই যাব। মিছিমিছি—। প্রচণ্ড ঝনঝন্ আওয়াজ হল সিঁড়ির মুখে। কি হল? কে পড়ে গেল? ছুটে আসতে গিয়ে বাধা পেলুম। সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইন্দ্র। একরাশ চীনেমাটির পেয়ালা পিরিচ টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সিঁড়িময়। যেখানে সেখানে সব— আর একটা লাথি মেরে কেত্তলিটাকেও ছুঁড়ে ফেলে দিল নীচে। দালানের আলোয় স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম ইন্দ্রকে। যেন একটা মত্ত সিংহ রোষে ক্ষোভে ফুলছে। কিন্তু কার বিরুদ্ধে এই ক্ষোভ? এত আক্রোশ?

কলকাতার বাড়িতে ভাড়াটে বসিয়ে কাঁকনের বাবা বৃন্দাবনবাসী হয়েছেন। মেয়ের বিয়ের পর সংসারে ও'র আর কোন বন্ধনই ছিল না। ভাবলুম চিঠি লিখে মেসোমশাইকে জানিয়ে দিই সব কথা। কাঁকনকে সে কথা বলতে স্তব্ধ হয়ে থাকল খানিক। 'বাবাকে—' যেন চোখে জল আসতে চাইল ওর। সামলে নিয়ে বললে, 'তার আগে এটা দাঁড় কিনে দিও সোনাদি।'

এখনও রাত জাগে ইন্দ্র। তবে কিছু উন্নতি হয়েছে। দোতলার সেই টুকরো ছাতে ঘুরে ঘুরে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ায় না। রাত দশটা না বাজতেই আমার ঘরের পাশ দিয়েই তেতলায় উঠে যায়। দু তিনটে বোতল থাকে হাতে। আমার মত কুটুম্বের কাছে যে চক্ষুলজ্জার দায় নেই বোধ হয় এটা বুঝেছে এতদিনে।

সারা রাত ছাদময় পায়চারির শব্দ শুনি। কাঁকনের ঘরের দরজা খোলাই পড়ে থাকে বোধ হয়। কেননা, জোর বাতাসে পাল্লা দুটোর মাথা কোটার আওয়াজ পাই।

সকাল বেলা কি দরকারে কাঁকনের ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালুম। স্নান করে একরাশ চুল এলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঁকন। ইন্দ্র জোর করে অজয়ের দেওয়া নাকছাবিটা পরিয়ে দিয়েছে ওর নাকে। সরে এলাম ওখান থেকে।

খানিক পরে গিয়ে দেখি, ইন্দ্র নেই। একা ঘরে খাটের বিছানায় মুখ ঢেকে কাঁদছে ও। ওর চুলগুলো পাখার হাওয়ায় দুলে দুলে মেঝের ধুলো মাখছে। পা টিপে টিপে নিজের ঘরে চলে এলাম।

সুদীর্ঘ আট মাস পেরিয়ে গ্রীষ্মের ছুটি এল। শেষ পর্যন্ত নন্দনপুরে যাব বলেই মনঃস্থির করে ফেলেছি, হঠাৎ কাঁকনের চিঠি এসে হাজির। ছুটি হলেই এখানে চলে এসো। কবে আসবে জানিও।

বিস্ময়ের পরে বিস্ময়। হাওড়া স্টেশনে গাড়ি থামতেই দেখি ইন্দ্র। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড একটা জীপ্ গাড়ি কিনেছে। ভদ্রলোকের একটু যেন পরিবর্তন হয়েছে কোথায়। একটু নরম, মোলায়েম হয়েছে কথাবার্তার সুর। আহিরীটোলার বাড়ির সদরে গাড়ি এসে থামল। কাঁকন দাঁড়িয়ে ছিল। হাসি-মুখ। মেরামত করা বাড়িটাও চুনকামের চেকনাই নিয়ে সহাস অভ্যর্থনা জানালো আমাকে। অনেক দিন পর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

অনেক পরিবর্তনই চোখে পড়ল এবারে। সবচেয়ে অবাক হয়েছি, যখন বেলা দুটোয় গাড়ি হাঁকিয়ে অজয় এল। মেঝেয় পাতা জাজিমের ওপর ব্রীজ খেলতে বসল ওরা। কাঁকন, ইন্দ্র আর অজয়। খেলা যখন ভাঙল, তখন বেশ রাত হয়েছে।

আর একদিন। প্রচণ্ড গরমে তেতে পুড়ে আকাশে মেঘের চিহ্ন খুঁজছি, দোতলায় অজয়ের গলা শুনলুম: 'না, তা হয় না। তোমাকেও যেতে হবে ইন্দ্রদা, নইলে আমরা কেউই যাব না।' নেমে এলুম। সিনেমার টিকেট নিয়ে জোর বাগ্‌বিতণ্ডা চলেছে ওদের। অজয় তিনখানা টিকেট নিয়ে এসেছে। ইন্দ্র যাবে না। বলছে ওদের দুজনকে যেতে।

'কারুরই যাবার দরকার নেই।' তিনটে টিকেটকে ছয় টুকরো করে মেঝেয় ফেলে দিল অজয়। পাখার হাওয়ায় সেগুলো খানিক ডানা মেলে উড়ে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল এদিকে ওদিকে। কাঁকন হাসছিল। মুখ গম্ভীর হয়ে গেছে ইন্দ্রর। 'তোমরা যাও। আমি টেলিফোনে সিট বুক করে রাখছি।' চাপা রোষকঠিন স্বরে আদেশ দিয়ে চলে গেল ইন্দ্র। অজয় বিরস মুখে দাঁড়িয়ে। একমুখ হাসি নিয়ে কাঁকন গা ধুতে নেমে গেল।

ওদের এই সব হাসি, রাগ, মান, অভিমানের মানে আমার বুদ্ধির গোচর নয়। হতভম্ব হয়ে ভাবছি নানা কথা, সেজেগুজে কাঁকন এল। বলল, 'ও যখন আমায় আনতে যাবে তুমি যেও, সোনাদি।'

'অজয়েরই তো গাড়ি আছে। আনতে যাবে মানে?'

'যেতেও পারে। ওসব তুমি বুঝবে না, সোনাদি।'

'বুঝব না মানে?'

'পাখি উড়ে পালায় কিনা দেখতে হলে

খাঁচার 'দরজা মাঝে মাঝে খুলে দিতে হয়।' বিচিত্র হেসে চলে গেল কাঁকন। আর সত্যি সত্যিই শো ভাঙবার বেশ কিছুক্ষণ আগেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল কাঁকনের স্বামী। কিন্তু আমার ধারণা আবারও ভুল হল। অজয়ের গাড়িতেই কাঁকন এল। ইন্দ্র এল প্রায় আধ ঘণ্টা পরে।

কাঁকনের কাছে পরে শুনলুম এই রকমই চলেছে আজকাল। ওদের দুজনকে একত্রে কোথাও পাঠিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে ওদের পেছনে গোয়েন্দার মত নজর রাখে ইন্দ্র।

'অজয়বাবু টের পায় না? বুঝতে পারে না?' জিজ্ঞেস করলুম আমি।

'চোখ কান খোলা থাকলে তো?' কাঁকন খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠলো।

'কেন? চোখ কানের আবার কি হল?'

'সব তো আমার দিকে।'

শক্ত করে কাঁকনের কাঁধটা চেপে ধরলুম। 'তার মানে?'

'মানে ভালবাসা!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঠোঁট ওলটালো কাঁকন। একটু বিতৃষ্ণার আমেজ ছিল গলায়।

'অজয় ভালবাসে তোকে?'

'অত উঁচুদরের জিনিস আমার জন্যে নয়। তবে ভালবাসার মত-ই আর কি!'

চুপ করে গেলুম। নিঃশব্দ অনেক সময় পার হয়ে গেল। একতলায় একটা বেড়াল বিশ্রী সুরে ডাকছে। বেড়ালটা থামতে বললুম, 'একটা কথা কাঁকন।'

'কি?'

'অজয় যদি সত্যি সত্যিই ভালবাসে তোকে—।' একটু থেমে যোগ করলুম আবার। 'মানে—বলতে গেলে, তুই তো কুমারীই।'

চোখে বিচিত্র হাসি নিয়ে তাকালো কাঁকন। 'সোনাদি, মাস্টারি করে করে তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গেছে।'

আমার রোখ চেপে গেল। তুই অজয়ের মনের কথা জানিস? বাজিয়ে দেখেছিস ওকে?'

হাত তুলে আমাকে নিরস্ত করল কাঁকন। যেন প্রচুর ক্লান্তির ভারে অবসন্ন হয়ে মাথাটা এলিয়ে দিল সোফায়। 'এর আর দেখাদেখির কি আছে? তুমি এত কম বোঝো।' একটা নিঃশ্বাস ফেলে দম নিল। খুব পরিশ্রান্ত তিক্ত গলায় কথা বলছিল কাঁকন। 'পরস্ত্রীর রূপ যৌবন নিয়ে লোফালুফি খেলতে কার না ভাল লাগে? তা বলে ভালবাসা—?' কথা শেষ না করেই হাসল আবার।

অবজ্ঞায় নাক কুঁচকে সোজা হয়ে বসল কাঁকন। 'তবে এটুকু বুঝেছি আমি অ-সাবধান হলেই সুযোগ নিতে পারে ও।'

'তবে মরতে কেন যাস? কেন ঘুরিস ওর সঙ্গে?' প্রচণ্ড রাগে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলুম আমি।

ঠোঁটে আঙুল চেপে আমাকে সতর্ক করল কাঁকন। তারপর ধীর গলায় বলল, 'যাওয়া না যাওয়ার মালিক আমি নই সোনাদি। ঘুড়ির হাতে কবে আর লাটাই থাকে?'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কাঁকন। পাখাটা ঘুরছে। ঝিম্ মেরে বসে রইলুম।

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি কাঁকনের চিঠি পেলুম একটা। ছোট্ট চিঠিঃ "বিষম মুশকিলে পড়েছি। একরকম বিপদও বলতে পারো। তুমি একবার এসো, সোনাদি।"

কি বিপদ? কি হল আবার? অনেকটা উদ্বেগ নিয়েই কলকাতায় চলে এলুম।

খোঁপা থেকে কাঁটাগুলো খুলে রাখতে রাখতে বললুম, 'হঠাৎ ওরকম চিঠি দিলি কেন? কি বিপদ?'

স্ স্ স্। চাপা গর্জনে আমায় থামিয়ে দিল ও। ইন্দ্র আসছে। টেবিলের ড্রয়ার খুলে কি সব কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে গেল কাঁকনের স্বামী। যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে একবার শুধোল, 'মাস্টার-দিদির খবর কি?'

'ভাল।'

ইন্দ্রর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে ফিস্‌ফিস্ বললুম, 'কি হয়েছে বল্!'

'উনি আজকাল অজয়কে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। অজয় বলতে অজ্ঞান।'

'এর মধ্যে বিপদের কি দেখলি তুই?'

'বিপদ নয়? এতদিন পেছনে থেকে

গোয়েন্দাগিরি করতেন আমি নিশ্চিন্ত ছিলুম। এখন—'

'তা বেশ তো, তুই বলে দে অজয় বিশ্বাসযোগ্য নয়।'

'এতদিন পরে—' কেমন একরকম করে হাসল কাঁকন।

'তা এতদিন চুপ করে ছিলিই বা কেন? কেন বলিসনি?'

'কিরকম যেন নেশায় মেতে উঠেছিলুম সোনাদি। ওঁর সর্বক্ষণের যন্ত্রণা আমার সহ্য হত না। যা বলতেন, মেনে নিতুম। যা চাইতেন, করতুম। কিন্তু এখন—।'

'এখন অজয়কে ঠেকানো দুঃসাধ্য হয়েছে এই তো?' একটু হাসলুম। 'তুই অজয়কে একটুও ভালবাসিসনে? সত্যি কথা বল্ কাঁকন।'

'প্রবৃত্তি হয় না।' কাঁকনের নাকছাবিটা কেঁপে উঠল।

'এত ঘেন্না কেন রে তোর? ও তো তোকে চাইছে।'

'ওকে চাওয়া বলে?' যেন দারুণ বিবমিষা চেপে কথা বলল কাঁকন। ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় গলা বুজে এল কাঁকনের। 'ওর কথা তুমি আর তুলো না, সোনাদি।' বারণ করার কথা বলবে, সোনাদি। বারণ করলে বিশ হাজার টাকার দেনা শুধে দিতে বলবে ওঁকে। কোত্থেকে দেবেন বল? এই তো সবে একটু গুছিয়ে বসেছেন—' কথা শেষ করতে পারল না কাঁকন। কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে ওর মুখ। মনে হল টলেই পড়ে যাবে ও।

'ও কি? ওরকম করছিস কেন?'

'না, কিছু না।' আস্তে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল ও। যা কখনো দেখিনি, তুই নজরে পড়ল এখন। চোখের নীচে কালি পড়েছে কাঁকনের। কপালে দুশ্চিন্তার কটি রেখা।

'তোর শরীর খারাপ? এত রোগা হয়ে গেছিস! কি হয়েছে তোর?'

ক্লান্ত অবসন্ন জড়ানো গলা কাঁকনের। বলল, 'রাতে ঘুম হয় না।'

'একটুও ঘুম হয় না?'

'না।'

'ঘুমের ওষুধ-টসুধ জানা আছে নাকি মাস্টারদির?'

ঠিক পেছনেই ইন্দ্রর গলা পেয়ে চমকে উঠেছি দুজনেই। মেঝেয় দাঁড়িয়ে ঝকঝকে সাদা দাঁত মেলে হাসছিল ইন্দ্র।

ফাঁসি যাবে জেনেও কেন যে মানুষ মানুষকে খুন করে, তা সেই মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলুম আমি।

একটা মিলিটারি কনট্রাক্টের ব্যাপারে নিয়ে রাঁচী গেছে ইন্দ্র। বৃহস্পতিবার ফিরবে। বাড়িতে আমি আর কাঁকন। যেন অনেক দিন পর সেই নিশ্চিন্ততা ফিরে পেয়েছি, যা ওর বিয়ের পর আর সুলভ ছিল না।

বুধবার সমস্ত দিন আমরা দুজন ইচ্ছেমত ঘুরেছি, বেড়িয়েছি। বেলা চারটেয় বাড়ি ফিরে স্নান-খাওয়া সেরে বিছানায় একটু গড়িয়ে নিচ্ছি, কাঁকন এসে বসল।

ছাদের কার্নিসে বসা কাকটার ডাক শুনলুম কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ বললাম, 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোর পরিণাম কি দাঁড়াবে, ভেবে দেখেছিস?'

'দেখেছি। যা স্বাভাবিক।'

'কি স্বাভাবিক?' উত্তেজনায় আবেগে উঠে বসলুম আমি। 'কি তুই স্বাভাবিক বলে মনে করিস?'

কাঁকন ডান ভ্রূটা উঁচুতে তুলে আমাকে দেখল একটুক্ষণ। তারপর হাসতে হাসতেই শেষ করল কথাটা, 'কেন? যার গলায় মালা দিয়েছি, তার সঙ্গেই জ্বলে পুড়ে শেষ হব!'

কারুর মুখে কোন কথা নেই। পুরোনো দেওয়ালঘড়ির পেন্ডুলামটা টক্‌টক্ আওয়াজ তুলে দুলছে। টং করে আওয়াজ হল। সাড়ে পাঁচটা।

'সর, একটু শুই। সারা দিন যা ধকল গেছে।'

ও আমায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

আমি নীচে নেমে গেলুম। অজয়বাবুকে টেলিফোনে আসতে বলে যখন ওপরে এলুম, দেখি কাঁকন ঘুমোচ্ছে।

আজও ভাবি, ঘটনার স্রোত অনিবার্যভাবে যেদিকে ছুটে চলেছে, তার মোড় ফেরাবার চেষ্টা সমীচীন নয়। হয়ত হিতে বিপরীত হয়।

অজয়বাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম। তিনি এসেছিলেন। তখন রাত।

না, কাঁকনকে ডেকে তুলিনি। অনেক দিন পর আজ একটু ঘুমিয়েছে ও। ঘুমোক। যা বলবার, করবার, আমিই করব। ওকে ডেকে এনে বিব্রত করা কেন?

'কি ব্যাপার? বউদি কই?' আলতোভাবে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট ধরাল অজয়। তীক্ষ্ণ নজর ফেলে ভদ্রলোককে দেখছি। আজ মনে হল, অসাধারণ টাকার মালিক হলেও লোকটা নিতান্তই সাধারণ। এ লোকের কাছে আর যাই হোক, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি বা ঐ রকমের কিছু আশা করা মূর্খতার নামান্তর।

'কই, বউদি কোথায় গেল? দেখছিনে তো।'

'আসবে। বসুন আপনি।' পুরোনো অর্গ্যানের ওপরে রাখা টাইমপিসটার দিকে চোখ পড়ল। দশটা বেজে দশ। না আর দেরি নয়। বিনা ভূমিকাতেই কথা বলতে হল আমাকে। 'দেখুন, ক'টা কথা বলব বলে ডেকেছি আপনাকে।'

'তাই নাকি?' বেশ কৌতুকের হাসি নিয়ে আমার দিকে তাকাল অজয়। ওর হাসিটা অগ্রাহ্য করেই বলে ফেললুম, 'আপনার

এ-বাড়িতে আসা-যাওয়া বন্ধ করতে হবে।'

'আচ্ছা।' বাহবা দিচ্ছে, এমনই সুরে বলল অজয়, 'তারপর—?'

এই ঠাট্টাটাও উড়িয়ে দিলুম আমি। 'আপনার এই আসা-যাওয়া, এত মেলামেশি ওর পক্ষে অশান্তির কারণ হতে পারে।'

'তেমন কিছু হয়েছে নাকি?' সিগারেটটা মুখ থেকে নামাল অজয়।

'হতে কতক্ষণ?'

'অ! আপনি হাত-টাতও গুনতে পারেন দেখছি।'

বুঝলুম আমার কোন কথাই কোন কাজে লাগবে না। নিষ্ফল ক্ষোভে গ্লানিতে মুখ নীচু করে ভাবছি, কি বলা যায়, শুনলুম অজয় বলছে, 'বউদিকে ডেকে দিন।'

কখন ঝি গিয়ে কাঁকনকে ডেকে তুলেছে জানি না, ঘুম চোখে ও এসে দাঁড়াল আমার পিছনে। 'কি ব্যাপার ঠাকুরপো, রাগ ভাঙলো?'

'কোথায় রাগ দেখলেন আপনি। বসুন, বসুন।' খুব খাতির করে নিজে সরে গিয়ে কাঁকনকে বসতে দিল অজয়।

ঘড়ির দিকে চেয়ে চমকে উঠল কাঁকন। ওমা, এগারটা যে বাজে!

খেয়ে-দেয়ে রাত বারটা আন্দাজ চলে গেল অজয়। আমাকেই নেমে এসে দরজা বন্ধ করতে হল। ঠাকুর চলে গেছে। ঝি শুয়ে পড়েছে।

ভোরবেলা ইন্দ্র এল। সারা মাথা মুখময় ধুলো। চুলগুলো বিশৃঙ্খল, চোখ লাল। কাঁকন চমকে উঠল চেহারা দেখে। 'এক হাত-ফেরতা হলেও জীপখানা বেশ চলে বুঝলে?' হো-হো করে হেসে উঠল ইন্দ্র। রাঁচী থেকে রাত সাতটায় রওনা হয়েছি। এর মধ্যেই পৌঁছে গেলুম। দাঁড়াও, স্নানটা সেরে নিই আগে।' মোটা ভাঙা গলায় একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে চলে গেল নীচে। বোধ হয় কনট্রাক্টটা পেয়ে গেছে।

একসঙ্গেই চা খেতে বসলুম। ঠাকুর চা-খাবার নিয়ে এল। চারটে প্লেটে লুচি, তরকারি, চার কাপ চা।

'একটা বেশী কেন রে?' ইন্দ্র খুশী-খুশী গলায় জিজ্ঞেস করল।

'রাতমে যো বাবু থা, উনকে লিয়ে।' ঠাকুর মাথা চুলকে বলল।

'বাবু তো রাত্রেই চলে গেছে।' আমি একটা ধমক লাগালুম। 'নিয়ে যাও এটা।'

তখনও কিছু বুঝতে পারিনি। এক চুমুক চা খেয়ে চোখ তুলতেই দেখি, স্থির নিশ্চল দৃষ্টিতে ইন্দ্র কাঁকনের দিকে তাকিয়ে আছে। 'কে এসেছিল?' চাপা নীচু গলায় প্রশ্ন।

'কে এসেছিল কাল?'

জবাব দিচ্ছে না কাঁকন। তৃতীয়বার প্রশ্নের উত্তরে, আজ মনে হয়, ইচ্ছে করেই কাঁকন খুব ধীরে চোখ নামিয়ে নিয়ে মাথা হেঁট করল।

'কি, চুপ করে কেন? কে এসেছিল কাল?'

'কাঁকন, এই কাঁকন—' খুব আস্তে করে ডাকতে চাইলুম ওকে। মনে হয় শরীরের সব রক্ত এসে জমা হয়েছে কাঁকনের মুখে। স্থির কঠিন হয়ে বসে আছে ও মাটির দিকে চেয়ে।

আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। থাকতে না পেরে এলোমেলো বলতে শুরু করলুম। 'ও নয়, আমিই কাল ফোনে অজয়বাবুকে আসতে—'

'আপনাকে ওকালতি করতে ডাকেনি কেউ, যান এ-ঘর থেকে।' কঠিন গলায় আমাকে অপমান করল ইন্দ্র। একটু ইতস্তত করছি দেখে ধমকে উঠল আবার। 'হাঁ করে দেখছেন কি? যান এখান থেকে।'

নিজের ঘরের অন্ধকার কোণে তক্তাপোশের ওপরে বসে আছি। এক ঘণ্টা হয়ে গেছে। ও-ঘর থেকে কোন সাড়া-শব্দ নই। কি করব? কি বলব? বলতে হলে সব কথা খুলে বলতে হয়। বিশ্বাস করবে কি? কাঁকনের সেই কথাটাই ফিরে ফিরে মনে হচ্ছে এখন। যা বিশ্বাস করতে ভাল লাগে, তাই বিশ্বাস করে মানুষ। যা সত্যি, তা চোখ চেয়ে দেখবার মত চোখ ক'জনার?

ছায়া পড়লো দরজায়। ইন্দ্র দাঁড়িয়েছে এসে। 'আপনার জিনিসপত্র ঠিক করে নিন। গাড়ি বার করছি আমি।'

'শুনুন, আমার একটা কথা আপনি—আপনি—খুব ভুল—' কান্না-আটকানো গলায় আরও কী সব বলতে যাচ্ছিলুম।

'ওসব মেয়েলী প্যানপ্যানানি শোনবার সময় নেই আমার।' চটির আওয়াজ তুলে নীচে চলে গেল ইন্দ্র।

শাড়িটা, জামাটা কাগজে মুড়ে নিয়ে বাইরে এলুম। কাঁকনের ঘরের দরজার তালার ওপরে চোখ পড়ল।

তালা? তালা দিয়ে রেখেছে ওকে? কি করব আমি? চেঁচামেচি করব? লোক ডাকব? কিন্তু ইন্দ্র যে মানুষ, অনায়াসে এই রাস্তায় যাচ্ছেতাই অপমান করতে পারে। আর তাতে তো মুখ পুড়বে কাঁকনেরই। গাড়িতে উঠতে হল। খুব জোরে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছিলুম বোধ হয়। জিভে নোনতা স্বাদ লাগতে খেয়াল হল।

একেবারে ট্রেন চলতে শুরু করলে গাড়ির কামরা থেকে নেমে গেল ইন্দ্র। কি করব? কি করতে পারি আমি?

স্কুল-মাস্টারি করি। সামান্যই আমার সম্বল। তবু ছুটি নিয়ে, টাকা ধার করে কলকাতায় ফিরে এলুম পরদিনই। প্রথমেই আহিরীটোলায় ছুটে গেলুম। কাঁকন নেই, কেউ নেই। সদরে মস্ত তালা ঝুলছে। পাশের বাড়ির মিত্র-গৃহিণী জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

'কি ব্যাপার? এরা সব কোথায় গেল?' শুধোলুম ও'কেই।

'ঠিক বলতে পারিনে, মধুপুর, না গিরিডি ওদিকে কোথায় গেল আজ। কাল ওদের বাড়িতে যা কাণ্ড!'

'কি কাণ্ড?' বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটার আওয়াজ। কষ্টে নিজেকে সংযত করলুম।

'আর বললেন না।' মহিলা হাসতে লাগলেন।

'সে এক মহা হুলস্থুল কাণ্ড। কে কোত্থেকে থানায় ফোন করেছে, বাড়ির বউকে তালা দিয়ে রেখেছে, জীবন বিপন্ন। দুপুরবেলা। পুলিস এল। পুলিসে-সার্জেণ্টে গলি থই থই। ভিড় জমে গেল বড় রাস্তা অবধি।'

'তারপর?' রুদ্ধনিঃশ্বাসে ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে আছি।

'তারপর আর কি? স্বামী-স্ত্রী দুজনে হাসতে হাসতে সদর গেটে এসে দাঁড়াল। হাসাহাসির ধুম পড়ে গেল পাড়াময়।' মিত্রগৃহিণীর পানঠাসা গালেও হাসি ঝলমলিয়ে উঠল।

'আচ্ছা, আসি।' চলে এলাম। খুব ধোঁকা লাগল আমার। স্বামী-স্ত্রীতে কি একটা বোঝাপড়া হয়েছে? কিছু বুঝতে পারলুম না।

পাঁচ বছর পরে কলকাতার চৌরঙ্গী পাড়ার হোটেলে দেখতে পেলাম কাঁকনকে। তখন রাত দশটা প্রায়।

ওর পোশাক টকটকে লাল। আধখোলা বুকের মাঝখানে চুনীর কাজ-করা লকেট। 'কাঁকন।' অস্ফুট গলায় ডাকলাম ওকে।

ও দেখল না আমাকে। দু পা এগিয়ে আবার ডাকলাম, 'কাঁকন!'

পলকও পড়ল না ওর চোখে। স্থির হেঁটে সম্মুখের দিকে চলে গেল ও। ওর পাশে মেদবহুল বিপুলকায় এক ভদ্রলোক। কোনও দিকে লক্ষ্য নেই কাঁকনের। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

উজ্জ্বল আলো পড়েছে ওর গায়ে। যত দূর দেখা যায়, চেয়ে রইলুম। মনে হল, লাল টকটকে একটা আগুন জড়িয়ে জড়িয়ে পাকে পাকে বেড়ে ধরেছে ওকে। পরম সমাদরে সেই আগুনকেই সর্বাঙ্গে গ্রহণ করছে ও।

আমার ডাকে আর কোনদিনই সাড়া দেবে না কাঁকন।

"রক 'এন' রোল" সংগীত পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই নিন্দিত হলেও ওর দ্বারা মানুষের উপকার লাভ করারও উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। আমেরিকার এলাবামার একটি বিদ্যালয়ের ছাত্র পরীক্ষা করে দেখেছে যে, "রক 'এন' রোল" জাতীয় সংগীত শস্য উৎপাদনে সহায়ক হয়।

ষোল বৎসর বয়স্ক এই ছাত্র জিমি গ্রিফিথ ও তার বন্ধু জন মার্টিন বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করে যে, বাদ্যযন্ত্র বাজানোর তালে তালে ভুট্টার চারাগুলি দুলতে থাকে। ব্যাপারটা কৌতূহল সৃষ্টি করতে ওরা এই নিয়ে পরীক্ষায় ব্রতী হয়। জিমির বাড়ির দুটো রেডিও পূর্ণমাত্রায় দশ ঘণ্টা খুলে দেওয়া হয়। অপরদিকে জনের বাড়ির বাগানে ভুট্টার চারাগুলিকে নিঃশব্দে বাড়তে দেওয়া হয়। দেখা গেল, একই সময়ের মধ্যে জিমির বাড়ির বাগানের চারাগুলি আকারে দাঁড়িয়েছে সাড়ে ছয় থেকে সাড়ে আট ইঞ্চি, আর জনের বাগানের ভুট্টার চারা চার থেকে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি। পরে ওরা জইয়ের বীজ বপন করে দেখে যে, যেগুলিকে "রক 'এন' রোল" দ্বারা প্রভাবিত করা হয় সেগুলি অনেক দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করেছে যদিও ভুট্টার মতো অতোটা নয়।

উচ্চ বিদ্যালয়ের এক বিজ্ঞান মেলায় এই চারাগুলি প্রদর্শিত হয় এবং উদ্ভাবনটি বোঝাতে একটি রেডিও ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘ হতে পারেনি সেই চারাগুলি দ্রুত বাদ্যের তালে সাড়া দিয়ে ওঠে এবং ইতিপূর্বে বাজনার সহায়তায় বর্ধিত চারাগুলির সমান হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষেও এই নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়েছে। আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানী অধ্যাপক টি সি এন সিং গত দু বছর ধরে এই পরীক্ষাকার্য চালিয়ে আসছেন। তিনি দেখেছেন যে, সংগীতের প্রয়োগে শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিলাভ করেছে শতকরা আঠাশ থেকে ষাট ভাগ এবং খড়ের পরিমাণ পঁচাত্তর ভাগ। অধ্যাপক সিং এটাও বলেন যে, ঘণ্টাধ্বনি বীজকে উত্তেজিত করে দ্রুততর অঙ্কুরোদ্গম ঘটায়।

*

আধুনিক পরিকল্পনানুযায়ী গৃহ ও পথ নির্মাণের জন্য প্রাচীন গৃহগুলি ভেঙে ফেলার সংগে মেক্সিকো সিটিতে প্রভূত সংখ্যায় গুপ্ত ধন-দৌলত অন্বেষণকারীর দল দেখা দিয়েছে। কারণ ওখানকার জনসাধারণের বিশ্বাস যে, সারা শহরটি প্রাক্-কলম্বীয় ও কংকুইস্টাডোরদের সম্পদের খনি।

বহুলোক একটা কোন সম্পদ আবিষ্কারের আশায় বাড়ি ধসানোর কাজে স্বেচ্ছায় যোগদান করেছে। অধিবাসীদের অধিকাংশই অত্যন্ত দরিদ্র বলে সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখে এবং দৈনিক গড়পড়তা পাঁচ টাকা আয়ের দারিদ্র্য দশা থেকে পরিত্রাণ পাবার একটা কোন সুযোগের চেষ্টায় থাকে। তাই ওদেশে লটারির বহুল প্রচলন—যদি একবার ভাগ্য খুলে যায়।

সম্প্রতি প্রাচীন ইমারৎগুলির মধ্যে গুপ্তধন আবিষ্কারে ওরা মেতে উঠেছে—যদি কোন মাটির পাত্র, স্পেনীয় স্বর্ণমুদ্রায় ভরা সিন্দুক, অলংকার, মূল্যবান পাথর হঠাৎ ভাগ্যক্রমে আবিষ্কৃত হয়। কিম্বদন্তী আছে যে, প্রাচীন ইমারৎগুলির মধ্যে অশেষ ধন-সম্পদ আছে।

কর্তৃপক্ষ লোকের এই ধারণাকে নিরুৎসাহিত করতে চায় না। কারণ গুপ্তধন পাবার আশা থাকায় শ্রমিকদের কাজে উদ্যম খুব।

বিস্ময়কর পরিমাণ গুপ্তধন প্রাপ্তির কাহিনীও প্রচলিত হয়েছে। দুজন শ্রমিক মিনা স্ট্রীটে একটি বাড়ি ধসিয়ে ফেলার সময়ে মাটির নিচে একটি অত্যন্ত ভারি প্রাচীন সিন্দুক পেয়ে সেটি নিয়ে চলে যায়—আর তারা কাজে ফিরে আসেনি। তাদের সহকর্মীদের কেউ কেউ বলে যে, তারা ঐ দুজনকে দামি পোশাক পরে অতি-আধুনিক মডেলের মোটর হাঁকিয়ে যেতে দেখেছে।

দেওয়াল খুঁড়ে রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা, অলংকার ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী লাভ করার কাহিনীও শোনা যায়। কিন্তু মেক্সিকোতে কেউ কোন গুপ্তধন পেলে সেটা গভর্নমেণ্টের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবার আইন থাকলেও কেউ কিছু জমা দেয় না। মূল্যবান কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটলে গুপ্তধন অন্বেষী ব্যক্তি বাড়ির মালিকের খোঁজ করে তার সংগে আধা-আধি বখরার বন্দোবস্ত করে নেয়। সম্রাট মণ্টেজুমার প্রভূত সম্পদ দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে পেশাদার ও অপেশাদার গুপ্তধন অন্বেষীদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে আসছে। আজটেকদের সেই মহান সম্রাট লোভী কোর্টেজের প্রচেষ্টা যেমন ব্যর্থ করেছে তেমনি আজও গুপ্তধন অন্বেষীদের কাছে তার সম্পদের কোন হদিশ নেই।

*

যাঁরা মানব শরীরের পুষ্টি নিয়ে গবেষণা করেন, সব দেশের সেইসব বিজ্ঞানিগণ, আমাদের এই পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার প্রশ্নটি নিয়ে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিটাই তাঁদের কাছে বড় কথা নয়, খাদ্যের অবাঞ্ছনীয় পচন প্রতিরোধ করার জন্য যে সংগ্রাম চালানো হচ্ছে, তাতে কি উপায়ে অগ্রগতি বজায় রাখা যায়, সেইটেই তাঁদের কাছে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানিগণ জানেন যে, আধুনিক বিশ্বে অর্ধেকেরও
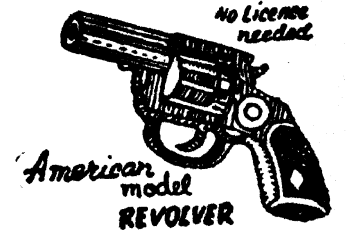
প্রাচীন মিশরের স্থাপত্য ঐশ্বর্য নীল নদ থেকে ১৬৬ মাইল দক্ষিণে আসওয়ানের আবু সিম্বেল মন্দির। আসওয়ানে নীল নদের ওপর বিরাট বাঁধ নির্মাণের ফলে ঐ অমূল্য সম্পদের জলে নিমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় বিরাট মূর্তিগুলিকে ওখান থেকে সরিয়ে পরে বাঁধ তৈরী সমাপ্ত হলে উপযুক্ত স্থানে কংক্রিটের ধাপ তৈরী করে স্থাপন করার ব্যবস্থা হচ্ছে

বেশি মানুষ পুষ্টিকর খাদ্য পায় না, অথচ উদ্বৃত্ত অঞ্চলগুলিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য পচে গিয়ে বিপুল ক্ষতি হয়। খাদ্য সংরক্ষণ কৌশল এখন সম্পূর্ণ আয়ত্তে এসেছে এবং এই কৌশল কাজে লাগিয়ে বর্তমানের পরিস্থিতি আরও উন্নত করা যায় অর্থাৎ পৃথিবীর যেখানেই যখন খাদ্য ঘাটতি দেখা দিক, সেখানকার দুর্ভিক্ষপীড়িতদের খাদ্য সরবরাহ করা যায়।

ইয়োরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং নিষ্ঠুরভাবে দ্বিধাবিভক্ত পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে সম্প্রতি খাদ্য সংরক্ষণ সম্পর্কে যে চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়ে গেল, তাতে অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞানিগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। জার্মান খাদ্যশিল্পের এবং খাদ্য সংরক্ষণ ক্ষেত্রের প্রায় ৪৫০০ জন বিশেষজ্ঞ, ইয়োরোপ এবং অন্যান্য ৩৪টি দেশের প্রতিনিধি সমবেত হয়ে, 'যে গোপন তথ্য বছরের মরশুম-গুলিকে বন্দী করে' এই সম্পর্কে আলোচনা করেন। দেড়শো বছর যাবৎ যে কৌশলে মানুষ খাদ্য সংরক্ষণ করে আসছে বর্তমানেও সেই কৌশলে বায়ুনিরোধক টিনে খাদ্য সংরক্ষণ করে সেই ফল পাওয়া যায়।

প্রাচীনকালে বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শী গৃহিণীগণ, শীতকালে পরিবারের ব্যবহারের জন্য ব্যক্তিগতভাবে যে উপায়ে ফল ও সব্জী সংরক্ষণ করতেন, বর্তমানে সেইটেই আন্ত-র্জাতিক ভিত্তিতে বিরাট শিল্পে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে প্রায় ৩০০ কোটি টিনে জারে অন্ততপক্ষে ১০০০ কোটি ডলার মূল্যের খাদ্য সংরক্ষিত হয়। এই সংরক্ষিত খাদ্যের শতকরা ৬০ ভাগ উৎপাদিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং প্রায় ২০ ভাগ সোভিয়েট ইউনিয়ন বাদে অবশিষ্ট ইয়োরোপে।

সাধারণতন্ত্রী ফেডারেল জার্মানী, সংরক্ষিত খাদ্যের একজন প্রধান খরিদ্দার। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও বিদেশ থেকে জার্মানী এই সংরক্ষিত খাদ্য আমদানি করে। ভারতেও শহরের গৃহিণীদের কাছে, টিনে সংরক্ষিত খাদ্য ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বার্লিন সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধি-গণ প্রধানত মাছ ও মাংস সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন—এই ক্ষেত্রে আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তাছাড়া, সমস্ত টিন, কৌটো ও প্যাকেটের আকারের একটা আন্তর্জাতিক মান স্থির করা সম্পর্কেও সম্মেলনে আলোচনা করা হয়। বৈজ্ঞানিকগণ আর একটি বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন, তা হলো—গৃহিণীদের একটা প্রধান সমস্যা টিন ও কৌটা খোলবার একটা সর্বাংগসুন্দর যন্ত্র। খুলতে সহজ এবং কিছুতেই নষ্ট না হতে পারে, এ রকম 'টিন ওপেনার' শীগ্‌গীরই বাজারে বিক্রী হবে।

*

যাঁরা চিড়িয়াখানায় পশুপাখী দেখতে যান তাঁদের সাহায্য করার জন্য রুঢ় জেলার ডুইসবার্গের চিড়িয়াখানার পরিচালক উচ্চ শক্তির বেতার যন্ত্র বসাচ্ছেন। এই বেতার যন্ত্রগুলি, বিভিন্ন জন্তুর বিবরণী ও তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী বর্ণনা করবে। এই যন্ত্রটি হলো একটি টেপ রেকর্ডিং এবং সামান্য কয়েকটি পয়সার বিনিময়ে এই সুবিধে পাওয়া যাবে। বর্তমানে এইরকম দশটি যন্ত্র বসানো হচ্ছে।

*

"আগামী ২০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বের জনসংখ্যা বেড়ে প্রায় ৬০০ কোটিতে দাঁড়াবে এবং এই জনসমষ্টির জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে এবং পশুভিত্তিক উৎপাদন তিনগুণ করতে হবে।"—সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার একটি বিবরণীতে এই ভীতিজনক ঘোষণাটি করা হয়েছে। অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, বর্তমান বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। কাজেই ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সমস্যা সমাধান করার জন্য বহু দেশেই জন্ম নিয়ন্ত্রণের দিকে ক্রমশ বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

সাধারণতন্ত্রী ফেডারেল জার্মানির গবেষক ও সমাজ-বিজ্ঞানিগণ বহুদিন যাবৎ এই সমস্যাটি পরীক্ষা করে দেখছেন। সাধারণ-তন্ত্রী ফেডারেল জার্মানির ব্যাভেরিয়া রাজ্যের রাজধানী মিউনিকে সম্প্রতি 'রাজ-নীতি, ধর্ম ও চিকিৎসার দিক থেকে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা' সম্পর্কে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বার্লিনের একজন ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞ ডাঃ মারিয়ানে ডুরান্ড-ওয়েন্ডার প্রায় এইরকম একটি চাঞ্চল্যকর ঘোষণা করেন। জার্মানির একদল চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, তাঁরা একটি বিশেষ ধরনের হরমোন তৈরী করেছেন যেগুলি স্ত্রী-হরমোনের ওপর প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং গর্ভ প্রতিরোধ করে। এই ধরনের প্রতিক্রিয়া এবং এগুলি প্রয়োগের যুক্তি-যুক্ততা সম্পর্কে চিকিৎসকগণের মধ্যে অবশ্য মতভেদ আছে। এই ওষুধের নিয়মিত ব্যবহার নাকি, তাঁদের মতে, ক্ষতিকর হতে

পারে। কিন্তু যাঁরা এই জন্মনিরোধক ওষুধটি ব্যবহারের পক্ষে, তাঁরা বলেন যে, এটি নিজে ক্ষতিকর না হলেও, এগুলি ব্যবহার করার সময় অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ডাঃ ডুরান্ড ওয়েভার অবশ্য বলেন যে, এই ওষুধটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এই ওষুধটির ভবিষ্যৎ প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সে সম্পর্কে আরও গবেষণা না করে এগুলি ব্যাপকভাবে বণ্টন ও ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত নয়।

*

যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুকলিন স্টেট হাসপাতালে একদিন এক রোগী এল গোঁড়ালি ফুলে যন্ত্রণা নিয়ে। দৈহিক পরীক্ষা সমাপ্ত করতে করতেই চিকিৎসকরা তার পাকস্থলী থেকে বের করেঃ

ছাব্বিশটি চাবি;
তিন সেট জপের মালা;
ষোলটি ধর্মসম্পর্কীয় মেডেল;
একটি ব্রেসলেট;
তিনটি ধাতব শিকল;
একটি বীয়ারের বোতল-খোলা চাবি;
একটা ছুরির ফলা;
উনচল্লিশটি নখ-ঘসা উকো;
চারটি নোক-কাটা;
আটত্রিশটি নানা রকমের মুদ্রা।

*

যেসব রোমান্টিক গান জনপ্রিয় তার প্রায় সবগুলিই মাকে আঁকড়ে থাকার এবং শিশুকালীন সুখের আমেজ অভিব্যক্ত করে। এটা হচ্ছে শিকাগোর মনোবিজ্ঞানী ডাঃ ফ্রান্সেস হ্যাকেটের অভিমত যিনি ১৯০০ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ১৮০০ গান বিশ্লেষণ করে দেখেছেন।

ডাঃ শ্রীমতী হ্যাকেটের মতে অধিকাংশ গানই স্বার্থপরতা, জোর খাটানো, আত্মদরদ জাতীয় শিশুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসুলভ ভালবাসার প্রতিফলন যা শিশুকালীন প্রবৃত্তিকে অভিব্যক্ত করে।

রোগীদের পরীক্ষা করার সময় তাদের মনে গানের কলি উদয় হতে দেখে ডাঃ হ্যাকেট এই ব্যাপারে অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন।

বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহৃত গানগুলির মধ্যে প্রায় ১৩০০টি ছিল রোমান্টিক শ্রেণীর। কিন্তু ডাঃ হ্যাকেট তার মধ্যে মাত্র ২৪টি গানে পরিণত প্রেমের নিদর্শন পান। গানগুলির জনপ্রিয়তা যৌন আবেদনের দিক থেকে নয়, আবেদন হচ্ছে মাতৃভাব থাকার জন্যে যার কাছ থেকে সুখ ও নির্ভরতার দাবী অব্যাহত থাকে।

এইভাবে দেখা যায় কেউ হয়তো গুণ গুণ করে গায় "স্যালী, আমার সেই প্রাণপ্রিয়া" কিন্তু আসলে সে অবচেতন মনে তার মায়ের কথাই ভাবছে।

সহজে শিখুন বিজ্ঞান

বব ব্রাউন
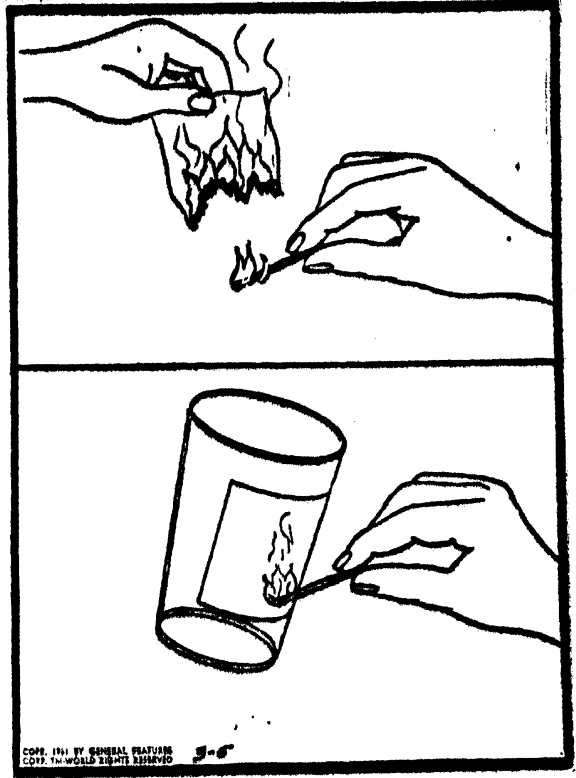
প্রশ্ন :

কাগজ কি 'ফায়ারপ্রুফ'?

কী চাই :

দু'টুকরো কাগজ, দেশলাই আর একটা কাঁচের গ্লাস জোগাড় করুন।

কি করতে হবে :

এক টুকরো কাগজ দেশলাই জেলে ধরিয়ে দিন, দেখুন কত শীগগির কাগজটা পুড়ে গেল। এইবার অপর কাগজটা বেশ করে গ্লাসটার গায়ে সেঁটে দিন, কোথাও যেন ফাঁক না থাকে বা কাগজটা ফুলে ফেঁপে না থাকে। ছবি দেখুন। দেশলাই জেলে কাগজটা পোড়াবার চেষ্টা করুন কিন্তু কাগজ কিছুতেই পুড়বে না।

কেন হল :

কারণটা কি? জ্বলন্ত দেশলাই-কাঠির তাপ কাগজের গায়ে লাগামাত্র কাঁচের গ্লাস তা টেনে নেয়, যে পরিমাণ তাপ পেলে কাগজটার জ্বলে উঠবার কথা সে তাপ কাগজ পায় না।
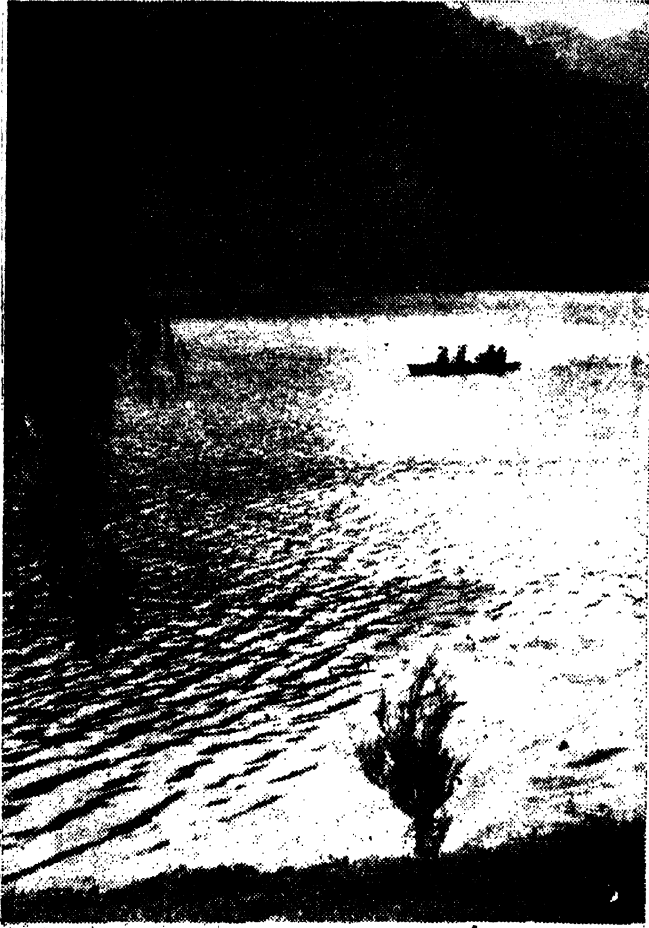
রূপময় ভারত

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসম্পদকে ধরে রাখবার প্রয়াস এবং তাকে নানাভাবে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার দৃষ্টান্ত—উত্তর প্রদেশের নৈনীতাল সরোবর। ৬৩৬০ ফিট উঁচুতে ৯৩ ফিট গভীর এই জলাধার নীল আকাশ আর ধূসর পাহাড় পরিবেষ্টিত হয়ে প্রকৃতির রূপকে ছড়িয়ে রেখেছে নৈনীতাল শহরময়। তাই দূরদেশ থেকেও বহু ভ্রমণবিলাসী ছুটে আসে নৈনীতালে নয়ন-মন সার্থক করতে। (১) প্রভাতে হ্রদের রূপ, (২) হ্রদের পাশেই শহর পাহাড়ের গায় গড়ে উঠেছে, (৩) দুপুরে হ্রদে আলোর ঝিলিমিলি, (৪) ভ্রমণবিলাসীদের আনন্দ হ্রদে নৌবিহার, (৫) পথে ঘুরে বেড়ানর আনন্দ, (৬) শহরের প্রাণকেন্দ্র 'মল'।

আলোকচিত্রশিল্পী
নীরোদ রায়

৪
৫
৬

ট্রামেবাসে
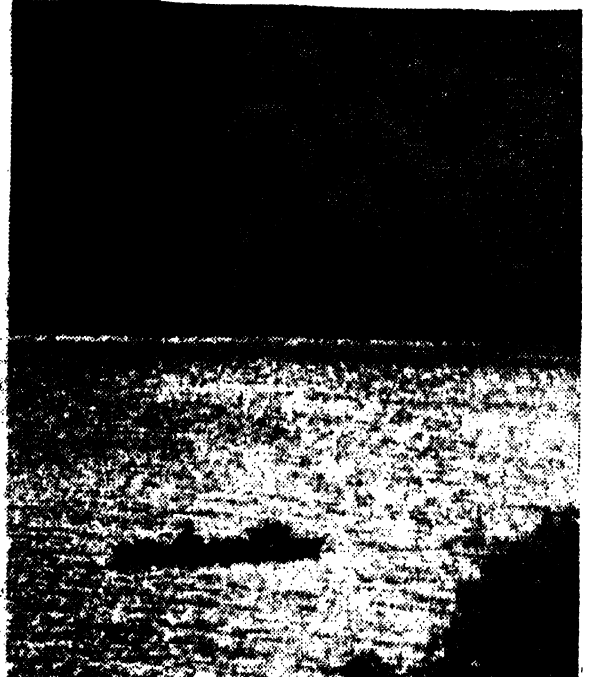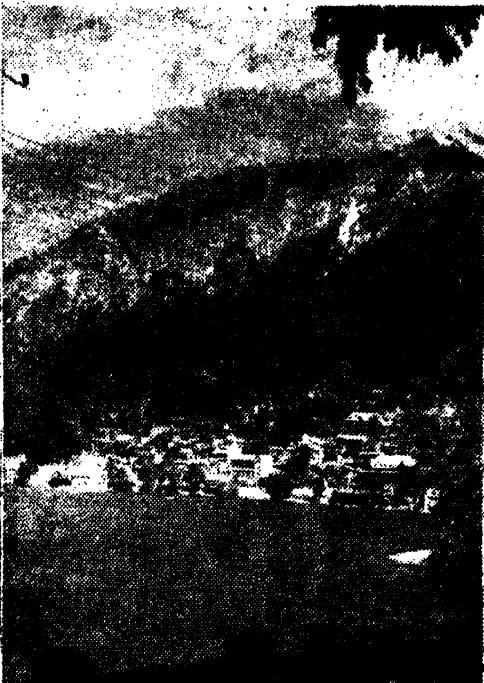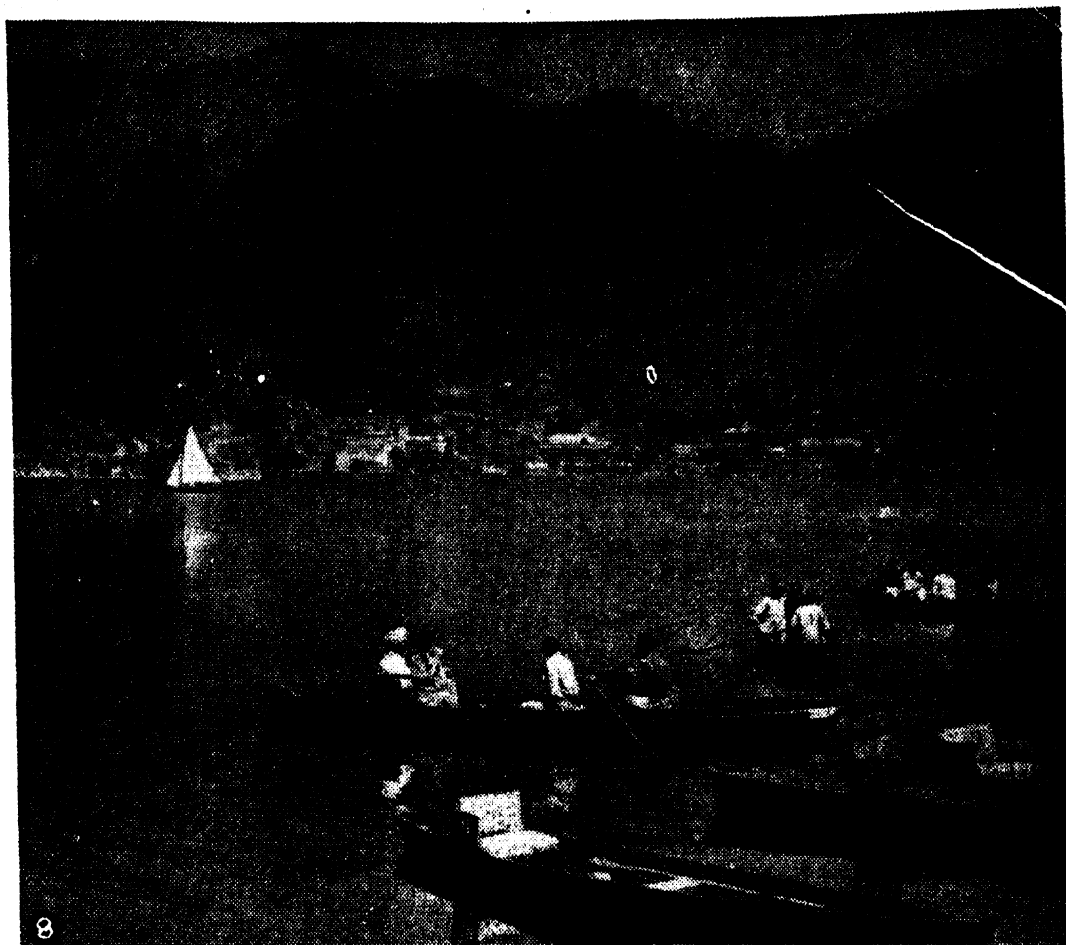
সংবাদে শুনিলাম পাক্ প্রেসিডেণ্ট জনাব আয়ুব খাঁ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টকে পাকিস্তান আগমনের আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন; বলিয়াছেন যে, শীতকালে

আসাই ভালো, তাহা হইলে তিনি আমাদের অর্থাৎ পাকিস্তানীদের সঙ্গে হাঁস শিকার করিতে পারেন। বিশুখুড়ো একটি অসমর্থিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন—"কেনেডি সাহেব বলেছেন, বুনো হাঁসের পেছনে ধাওয়া করার ইচ্ছে তাঁর নেই।"

বোট্ম্যান অ্যাসোসিয়েশনের চার হাজার লোকের ধর্মঘটের জন্য কলিকাতার বন্দরে অবস্থিত জাহাজ হইতে লবণ খালাস করা যাইতেছে না, ফলে লবণের দর বাড়িয়া গিয়াছে। —"ফলে পান্ত আনতে লবণ ফুরায়, লবণ আনতে পান্ত।"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

সংবাদে প্রকাশ আটটি বামাচারী জোটে "বিদেশী হামলা" শব্দ লইয়া মতানৈক্য দেখা দিয়াছে। আমাদের অন্য এক সহযাত্রীও কবিতাতেই তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—"তেলেজলে মিশ খায় শুনেছ তা কেউ কি?"

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম কেন্দ্রীয় প্রত্নতাত্ত্বিক উদ্যান বিভাগ মুর্শিদাবাদে সিরাজের উদ্যানটি পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা করিতেছেন। —"ভালো কথা। তবে এই সঙ্গে পলাশীর আমবাগানটির উন্নতিসাধন করলে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা উপকৃত হত।"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

পশ্চিমবঙ্গে একটি উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ সৃষ্টির সম্ভাবনার সংবাদও পাঠ করিলাম। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আশা করি এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিসের লাইন এতে আরো লম্বা হবে না!"

ট্রামে-বাসে চলিতে চলিতে শুনিলাম, সিনেমা গৃহগুলির দরজা অদ্য হইতে (২১-৭-৬১) আবার খোলা হইবে। শ্যামলাল বলিল—"সেই মল খসালি তবে কেন হাসালি!!"

সাউথ আফ্রিকা কমনওয়েলথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন বলিয়া ভারত, পাকিস্তান ও, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইম্পিরিয়েল ক্রিকেট কনফারেন্সে সাউথ আফ্রিকার অংশ গ্রহণে আপত্তি জানাইয়াছেন। কিন্তু শুনিতেছি খিড়কির পথে তাহাদের পুনঃপ্রবেশের অপচেষ্টা চলিতেছে।—"আমরা শুধু সম্মিলিত আপিল জানাতে পারি—হাউজ দ্যাট্?"

জনাব আয়ুব খাঁ করাচীর সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, ভারত ও পাকিস্তান এক ঠাণ্ডা লড়াইয়ে জড়াইয়া
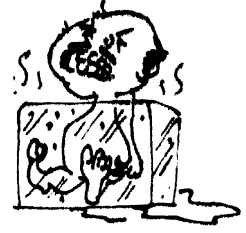
পড়িয়াছে। —"তাপমাত্রার সঠিক পরিমাণ জানিনে, তবু শুনেছি কাশ্মীরে নাকি বেশ শীত, সুতরাং কাজে কাজেই...'—বলে শ্যামলাল।

সংবাদে প্রকাশ, রাজ্য সরকার মাংসের দর হ্রাসের কাজে হাত দিয়াছেন।

'কিসে ছুঁলে নাকে ঘা হয়?'—জনৈক সহযাত্রী প্রশ্ন করেন অন্য এক সহযাত্রীকে।

সংবাদে শুনিলাম, এম সি সি-র সফরে, পিটার মে-র অধিনায়ক হওয়ার সম্ভাবনা। —"কিন্তু মে এলেই বা আমাদের কি? আমরা যে তার আগেই টিকিট কিনতে গিয়ে এপ্রিলফুলে বনে যাবো।"—বলেন জনৈক ক্রিকেটরসিক সহযাত্রী।

ব্রহ্মপুত্রের জল দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া সংবাদ পাঠ করিলাম। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু পরশুরামের কুঠার সে জলে ডুববে বলে কোন আশ্বাস তো পেলাম না!!"

এক পুরোধা সমীক্ষায় প্রকাশ, শরৎকালেই নাকি শিশু অপরাধের সংখ্যা সমধিক হয়। খুড়ো বলিলেন—"পুজোয় জামাকাপড়ের বায়না ধরে পিতাধর্ম, পিতা-

মঞ্চের ওপর জ্বলছিল দু' দুটো ধূলি-ধূসর বাতি; প্রেক্ষাগৃহ তবু অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেই অন্ধকার থেকে ভেসে এল একটি কণ্ঠস্বর, "ওভাবে হবে না,ম'সিয় ফাঁজার, ওভাবে হতে পারে না। আরেকবার হোক।"

ফাঁজার বসে ছিলেন একখানা চেয়ারে। বিরাট প্রাসাদের সোপানশ্রেণীর প্রথম ধাপ একটা চেয়ার—এইটুকু কল্পনা করে নিয়ে রিহার্সাল দিচ্ছিলেন। কণ্ঠস্বর শুনে উঠে এলেন মঞ্চের সামনে। একটা পা তুলে দিলেন ফুটলাইটের ঢাকনার উপর—একটু দেহসৌষ্ঠব দেখাবার লোভ সামলাতে পারেন না ফাঁজার। বললেনঃ

"কি বলছেন স্যার?" কণ্ঠে বিনয়ের অভাব নেই; অথচ কোথায় যেন রয়েছে সামান্য দম্ভ।

নাট্যকার তারস্বরে জবাব দেনঃ

"ঐখানটায় আরো আবেগ চাই, আরো উচ্ছ্বাস, আর একটু ভেঙে-পড়া ভাব।"

"বুঝেছি।" বললেন ফাঁজার, সেই সঙ্গে মাথা ঝুঁকিয়ে অল্প একটু নমস্কার যেন ছুঁড়ে দিয়ে ফিরে গেলেন স্বস্থানে। নাট্যকারের আরো বক্তব্য ছিল; আর একটু বিশদভাবে বলার ইচ্ছে ছিল ষোলো আনা। কিন্তু ফাঁজার ততক্ষণে অভিনেতাদের ডেকে বলেছেনঃ "আর একবার।" এবং পুরো দৃশ্যটা ঠিক যেমন রিহার্সাল দিয়েছিলেন হুবহু তাই দিয়ে গেলেন আবার।

নাট্যকার আর থাকতে পারলেন না। উচ্চস্বরে বলে উঠলেনঃ

"হয়নি, কিস্যু হয়নি। মাদ্‌মোয়াসেল রাভিনা একটা কিছু বলতে এসেছেন। আপনি হাত তুলবেন—থেমে যাবেন মাদ্‌-মোয়াসেল। আপনি বলবেন, 'কি? কি হয়েছে?' মাদ্‌মোয়াসেল জবাব দিতে পারছেন না। একটা ভয়াবহ নিস্তব্ধতা বিরাজ করবে কিছুক্ষণ। সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে আপনি প্রশ্ন করবেন, 'আমার—আমার ছেলে?' মাদ্‌মোয়াসেল জবাব দেবেন না, দেওয়ার দরকার নেই। ম'সিয় ফাঁজার, পুত্রের মৃত্যুসংবাদে কি করা উচিত আপনার? ভাবুন একটু। আমার মনে হয়, প্রথমেই একটা আর্ত রুদ্ধ চীৎকার বেরিয়ে আসবে আপনার গলা চিরে। তারপর পুরো কথাটা কাঁদতে কাঁদতে, কান্নায় ভেঙে পড়ে বলবেন। বুঝলেন কি বলতে চাই? আরেকবার চেষ্টা করা যাক।"

চোখের পলকও পড়ল না ফাঁজারের, শান্ত চিত্তে শুনলেন ভর্ৎসনাটা। তারপর আবার শুরু হলো রিহার্সাল। এবারও ফাঁজারের কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না; গলায় ফুটলো না আবেগ, চোখে এল না জল। দেহটা রইল অনড়, স্থাণু; হাত যদি বা উঠল এক আধবার, কোন অদৃশ্য জালে জড়িয়ে লক্ষ্য ভুলে নেমে এল আবার স্বস্থানে।

পাঁচটা বাজল। পেশাদার নাট্যশালা—অভিনেতারা তৎক্ষণাৎ মঞ্চ ছেড়ে চলে গেলেন। নাট্যকার উঠে এলেন মঞ্চে। উইংস্-এর পেছনে ধরে ফেললেন ফাঁজারকে। তিন ঘণ্টা একাদিক্রমে চীৎকার ক'রে নেচে কুঁদে নাট্যকারের তখন ঘর্মাক্ত কলেবর, ভাঙা গলা। ফাঁজার সাজঘরের দিকে যেতে যেতে শুনলেন তাঁর বক্তব্য। ফাঁজার পুরনো দিনের অভিনেতা, নামডাকও কম নয়; উঠতি লেখকের বায়নাক্কা বেশ ধৈর্য ধরে শুনতেই তিনি চান। লেখকের বায়নাক্কার কারসাজিও বেশ লাগে তাঁর—এক হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলতে থাকেন নাট্যকারঃ

"সীনটা হচ্ছে নাটকের ক্লাইমেক্স, ম'সিয় ফাঁজার! ও দৃশ্য মার খেলে পুরো নাটকটা ধসে যাবে। আবেগ চাই, চাই রাজসিক একটা ভাব, চাই উদ্দাম শোক! নিজেকে ছেড়ে দিন, ম'সিয়, বেঁধে রাখবেন না। একটু চেষ্টা করলেই আমার মনে হয়, দর্শকদের নাকের জলে চোখের জলে কান্না ছেড়ে দিতে পারবেন। বলতে সঙ্কোচ হো

আপনার প্রতিভার যোগ্য সীন সৃষ্টি করতে পেরেছি বলেই মনে হয়।"

ফাঁজার সব লেখককেই যোগ্য মর্যাদা দিতে চেষ্টা করেন। তাই বলেন,

"বুঝেছি, আমি বুঝতে পেরেছি কি বলতে চান। তবে রিহার্সালে আমার অভিনয় তেমন আসে না, বুঝেছেন? আলো, পোশাক, পরিবেশ—এসবের রাজ-যোটক হ'লে তবেই না—। কিছু ভাববেন না, ম'সিয়, অভিনয়ের দিন দেখবেন।"

নাট্যকার তবু ছাড়েন না। পক্ককেশ ফাঁজারের সামনে রুদ্রমূর্তি ধারণ করা অসম্ভব, অথচ না বলেও পারছেন না তিনি। কম্পিত স্বরে মিনতি করেন:

"না, না, ভাবছি না। ভাবব কেন? তবে প্রথম রজনীর আগে একটা রিহার্সালে আমি আপনার আসল অভিনয় দেখতে চাই, ম'সিয়। একটিবার দেখিয়ে দিন কিরকম কল্পনা করেছেন চরিত্রটাকে। আমার অনুরোধ রাখুন, ম'সিয়; আর মাত্র তিন দিন পরেই নাটক নামছে।"

ফাঁজার শুধু বললেন, "ভাববেন না।" বলেই চলে গেলেন কফি খেতে। এমনি সময়ে পরিচালক এসে পড়েন। নাট্যকারকে দেখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি প্রসারিত ক'রে বলেন:

"লাগল কেমন? খুশী তো?"

জ্বলে ওঠেন নাট্যকার।

"খুশী! আমার নাটকের দফা রফা হয়ে গেছে মশাই—বুঝলেন? দফা রফা! মাদ্-মোয়াসেল রাভিনা মন্দ নয়, উৎরে যাবেন। আলোকসম্পাত কুৎসিত। আর ফাঁজার জঘন্য, জঘন্য, জঘন্য!"

পরিচালক ঘাবড়ান না, অবাক হন না। সব নাট্যকারই অমন বলে থাকে, শুনে শুনে কানের পোকা বেরিয়ে গেছে। থিয়েটারে শেষ পর্যন্ত সবই ঠিক হয়ে যায়—এত বছরের অভিজ্ঞতায় এটা তিনি বুঝে ফেলেছেন। তাই গায়ে হাত বুলিয়ে তিনি নাট্যকারকে সান্ত্বনা দেন। ভাবনা কি? ফাঁজার শিল্পী, পার্ট নিয়ে তিনি ছেলে-খেলা করেন না; দু' শো রাত্রি এক চরিত্র ক'রে গেলেও তাঁর মনোযোগ এতটুকু কমে না। কারুর কথা শোনে না? হ্যাঁ, তা একটু ঠ্যাঁটা বইকি। রিহার্সালে গতর তোলে না? হ্যাঁ, তাও স্বীকার। কিন্তু পর্দা উঠে গেলে আলাদা মানুষ; নাট্যকারের কল্পনাকেও অতিক্রম ক'রে এক আশ্চর্য চরিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম ম'সিয় ফাঁজার।

নাট্যকারের সন্দেহ ঘোচে না। মাথা নেড়ে তিনি বিলাপ করতে থাকেন। তখন পাশ্চাত্যুপত ছাড়েন পরিচালক।

"নাটকটা অপূর্ব হয়েছে, ধন্য আপনার লেখনী।"

নাট্যকার খানিকটা গলেন। পরিচালক সেই সুযোগে দ্রুত বলে চলেন:

"দেখবেন—দেখবেন কত বড় হিট হয়। বিশ্বাস রাখুন। আরে মশাই, নাটক উৎরে দেওয়া কি আমারও ইচ্ছে নয়? না চললে আমারও তো সর্বনাশ, নাকি? ভেবে ভেবে হাড়মাস কালি করবেন না। আর দেখুন, ফাঁজারকেও বিরক্ত করবেন না। এখন হয়তো মোটামুটি ভাল করছেন ফাঁজার—"

নাট্যকারের উদ্যত প্রতিবাদকে চেপে দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলে চলেন পরিচালক:

"কিন্তু অভিনয়ের দিন দেখবেন ফাঁজার অতুলনীয়। বলে রাখলাম—হ্যাঁ।"

এল প্রথম রজনী। একটা বক্স-এ বসে-ছিলেন নাট্যকার, পরিচালকের সঙ্গে। প্রথম

...বশেষে। চীৎকার ক'রে উঠলেন নাট্যকারঃ ...এবার তৃপ্তি হয়েছে আপনার? আমার ...টকের সর্বনাশ করেছেন আপনি। স্টেজে ...দেবেন, না? ওসব বলে বড় বড় অ...নেতারা। আপনার মত চুনোপুঁটির

আপনি ভাগ্যবান পুরুষ, তাই পুত্রশোক কাকে বলে জানেন না

এক ঘণ্টা নাট্যকারের মনে হলো কে তার গায়ের মাংস খুবলে নিচ্ছে। দেরি ক'রে ঢুকছিল অনেক দর্শক, ধড়াস ক'রে ফেলছিল সীট, চাপা কথাবার্তা, কাগজের মোড়কের খড়খড়। নাট্যকার স্থির করলেন পুরো মনুষ্যজাতি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। পরিচালক কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে ধারালো কণ্ঠে কানের কাছে বলে যাচ্ছেনঃ

"হিট। হিট কে ঠেকায়।"

প্রথম অঙ্ক শেষ হলো। নাট্যকার উঠে পড়লেন, তাঁর ইচ্ছা নেপথ্যে অভিনেতাদের কয়েকটা প্যাঁচ বাতলে দিয়ে আসেন। পরিচালক তাঁর কোটের ল্যাজ চেপে ধ'রে তাঁকে ফের বসিয়ে দিলেন। বললেনঃ

"দোহাই আপনার, ওদের ছেড়ে দিন, মাপ ক'রে দিন। আমি বলছি—বিরাট হিট হবে এ নাটক।"

দ্বিতীয় অঙ্ক মোটামুটি ভালই চলল। এবার তৃতীয় অঙ্ক—উঠে গেল পর্দা। ফাঁজার ঢুকলেন, নেমে আসছেন প্রাসাদের সোপানশ্রেণী বেয়ে—। ছুটে এলেন মাদ্-মোয়াসেল র‍্যাভিনা। হাত তুলে তাঁকে অর্ধপথে থামিয়ে দিলেন ফাঁজার—ঠিক যেমন নাট্যকার চেয়েছিলেন। "কি? কি হয়েছে?" চাপা অস্ফুটকণ্ঠে বললেন ফাঁজার—নাট্যকার খানিকটা উল্লসিত হয়ে উঠলেন। র‍্যাভিনা জবাব দিলেন না। সত্যিই গড়ে উঠল একটা গম্ভীর থমথমে নিস্তব্ধতা। নাট্যকার প্রায় হাততালি দিয়ে বসেছিলেন এখানটায়। ফাঁজার বললেনঃ "আমার—আমার ছেলে?" ঠিক আছে! অপূর্ব!

কিন্তু তারপর? ফাঁজার ধীরে ধীরে বসে পড়লেন নীচের ধাপে। তারপর ঠিক যেমন রিহার্সাল দিয়েছিলেন তেমনি ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন পুরো সংলাপটা।

ভেলভেটে মোড়া চেয়ারের হাতলটা আঁকড়ে ধরলেন নাট্যকার। দেহটা তাঁর উদ্বেগে উত্তেজনায় দুমড়ে গেল। চাপা গর্জন করতে লাগলেন নাট্যকারঃ "ছেড়ে দিন, নিজেকে ছেড়ে দিন ফাঁজার, বন্ধন ছিঁড়ে নিজেকে মেলে ধরুন।" যেন দর্শকের মাথার ওপর দিয়ে অভিনেতার কাছে পৌঁছে দেবেন তাঁর অন্তরবহ্নির আঁচ!

কিন্তু ফাঁজার একটুও নড়লেন না, একটুও চেঁচালেন না। প্রায় অলস কণ্ঠে শেষ করলেন দৃশ্য। পর্দা পড়ে গেল। প্যারিসের দর্শক ভদ্র, তাই কিছু হাততালি বুদ্বুদের মতন ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। নাট্যকার বেরুলেন বক্স থেকে, ছুটে গেলেন নেপথ্যে। দেখলেন নির্বিকার ফাঁজার মন্থরগতিতে চলেছেন সাজঘরের দিকে। আট দিনের রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়ল
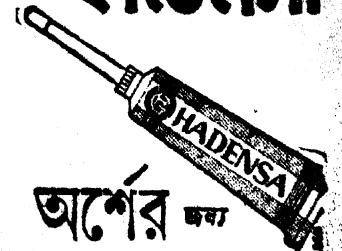
মুখে রাজা উজীর মারা ভাল শোনায় না, বুঝলেন? কি পার্ট পেয়েছিলেন, আর কি অবস্থা করেছেন তার। কি দৃশ্যের কি চ্যাংড়ামি অভিনয়! দর্শকের চোখে বান ডেকে যাওয়ার কথা! পিতার শোক—মাথায় ঢোকে? একমাত্র পুত্র, একমাত্র স্বপ্ন, একমাত্র আলোকে হারিয়ে পিতার কি অবস্থা হয়, বোঝেন? খবর এল ছেলে মরে গেছে, আর উনি যাও বা কথা বলছিলেন আরো ঠাণ্ডা মেরে বোঁদা মেরে গেলেন। এর নাম অভিনয়? লিখতে লিখতে চোখে জল এসেছিল আমার, চেঁচিয়ে বলতাম লাইনগুলো বুকের ভার হালকা করতে।"

একটুও না চ'টে প্রৌঢ় অভিনেতা ফাঁজার পরচুলোটা খুলে ফেললেন, তারপর শান্ত-কণ্ঠে বললেন:

"ভুল করতেন ম'সিয়; পুত্রশোক ওরকম হয় না। আপনি ভাগ্যবান পুরুষ তাই পুত্রশোক কাকে বলে আপনি জানেন না। চার ঘণ্টা আগে খবর পেয়েছি আমার একমাত্র ছেলে ক্রাওন্-এর যুদ্ধে মারা গেছে।"

অনুবাদ: **উৎপল দত্ত**

চিত্রগ্রীব

গত শুক্রবার অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে একটি অভিনব শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন কলকাতার পোলিশ কনসুলেট। পোল্যাণ্ডের জাতীয় মুক্তি দিবস উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। পোল্যাণ্ডের বিশেষ ধরনের লোক-শিল্প কাগজ কাটা নকশা এ প্রদর্শনীর বিষয় বস্তু। কাগজ কেটে নকশা করার রেওয়াজ পোল্যাণ্ডের চাষী পরিবারের মধ্যেই দেখা যায় বেশী। রঙবেরঙের কাগজ কাঁচি দিয়ে কেটে বিভিন্ন রকম নক্সা করে এঁরা ঘরের দেওয়াল কোনও উৎসবে—ইস্টার অথবা ক্রিসমাস উপলক্ষে বিচিত্র করে তোলেন। পোল চাষীদের ঘরে এই কাগজ কাটা নকশার মধ্যে অত্যন্ত চমৎকার চমৎকার মোতিফ দেখতে পাওয়া যায়। পোল্যাণ্ডের কুরপী অঞ্চলে মেয়েরা যা মোতিফ সৃষ্টি করেন তার তুলনা হয় না। নকশাখচিত বৃত্ত, জ্যামিতিক তারকা, গাছপালা এবং সেই সঙ্গে পাখি কিংবা মানুষের সিলোয়েট মূর্তি সত্যিই আনন্দদায়ক। লাউইৎস অঞ্চলের মেয়েরা আবার বেশ বড় বড় কথিকা এই কাগজ কাটা ছবির মাধ্যমে বর্ণিত করেন।
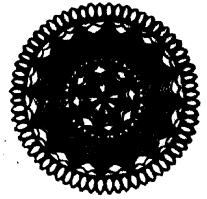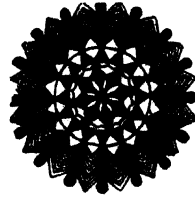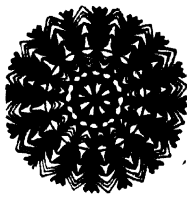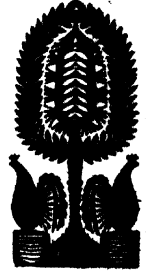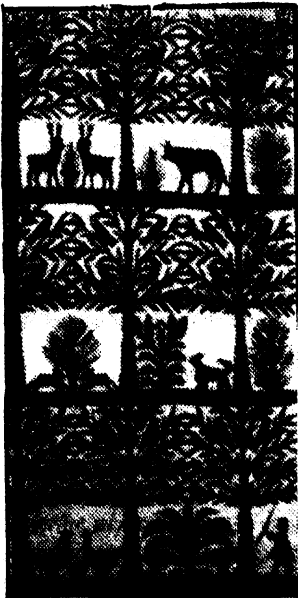
এঁদের ঘরে সিলিং-এ দেখা যায় চাষীদের বিবাহ উৎসব, অর্কেস্ট্রা প্রভৃতির কল্পিত মূর্তি। এসব নকশায় বিভিন্ন বর্ণের কাগজ কেটে এক রঙের কাগজের ওপর আরেক রঙের কাগজ জুড়ে বহুবর্ণ চিত্র সৃষ্টি করা হয়।

নকশাগুলি আমাদের কাছে বাস্তবিকই ভাল লেগেছে। এতটা ভাল লাগার কারণ বোধ করি আমাদের বাংলাদেশের লোকশিল্পের অনেক নকশার সঙ্গে এই পোল্যাণ্ডের কাগজ কাটা কাজের নিকট-সাদৃশ্য। আমাদের দেশের আলপনা, শাড়ির পাড়, কাঁথার নকশা প্রভৃতির মধ্যে অনেক মোতিফ দেখা যায়, যার সঙ্গে এই কাগজ কাটা নকশা অনেক মোতিফ প্রায় হুবহু মিলে যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শহুরে সভ্যতা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরনের হলেও গ্রামের লোক সব দেশেরই সমান। এদের রুচি, এদের শিল্পবোধ, এদের চিন্তাধারা যেন একই সূত্রে গাঁথা। এক দেশের লোকশিল্প অন্য দেশের গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে দেখানোর দরকার হয় না। তারা আপনা থেকেই সে শিল্পের রস গ্রহণ করতে পারে।

এ প্রদর্শনীতে সব সমেত নকশা আছে ৯১টি। এর মধ্যে তিনটি ফটোগ্রাফ রাখা হয়েছে, পোল চাষীরা কিভাবে এই কাগজ কাটা নকশার সাহায্যে ঘর সাজায়, তার কিছুটা ধারণা সৃষ্টির জন্যে। সারা পোল্যাণ্ডের প্রত্যেক অঞ্চলেরই কাগজ কাটা নকশা কিছু কিছু রাখা হয়েছে—অত্যন্ত সহজভাবে কাটা পাখির রূপ থেকে শুরু করে মারাত্মকভাবে জটিল পোলিশ সাজ-পোশাকের রূপ পর্যন্ত। এর আগে আমরা পোলিশ পোস্টার প্রদর্শনী দেখেছি, পোলিশ গ্রাফিক আর্ট প্রদর্শনী দেখেছি—আধুনিকতায় এঁরা যে কোনও দেশের তুলনায় কিছুমাত্র পিছিয়ে নেই—তার প্রমাণ পেয়েছি এই দুটি প্রদর্শনীতে—আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে প্রথাগত শিল্প-কলাও যে সেখানে চর্চা হয়ে থাকে তার প্রমাণ পাওয়া গেল এই প্রদর্শনীতে। ভবিষ্যতে পোলিশ সমকালীন সুকুমার শিল্পকলাও দেখার আশায় রইলাম। প্রদর্শনীটি আমরা বাস্তবিকই উপভোগ করেছি।

কবিজীবনী

কবি মোহিতলাল—হরনাথ পাল। এস ব্যানার্জি অ্যান্ড কোং। ৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

কবি মোহিতলাল মজুমদার বাংলা কাব্যক্ষেত্রে বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই তিনি বাংলা কাব্যে একটি বিশেষ রীতি, এক নব জীবন-বাদ, বিশেষ স্বাদ এনে দিয়েছিলেন। রোমান্টিক এবং ক্লাসিক ধারার বুদ্ধিদীপ্ত সমন্বয় তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি মোহিতলাল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'শুধু বেগের দিক থেকে নয়, বক্তব্য ও বলার ভঙ্গির দিক দিয়েও মোহিতলালের বৈশিষ্ট্য প্রথম থেকেই পরিস্ফুট। ইন্দ্রিয়গোচর অনুভূতির বাইরে কাব্যের উপাদান সংগ্রহে তিনি সহজে সম্মত নন, কিন্তু সেই মৃত্তিকাশ্রয়ী অনুভূতির এমন তীব্র তপ্ত গাঢ় স্বাদ এমন সুনিপুণ হাতে কেউ বুঝি পরিবেশন করেননি।'

বলা যেতে পারে মোহিতলাল বাংলা কাব্যের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় মোহিতলালের কাব্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার উদ্যোগ ইতিপূর্বে বিশেষ দেখা যায়নি। বর্তমান গ্রন্থকার অধ্যাপক হরনাথ পাল মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন এবং আলোচ্য গ্রন্থে তিনি মোহিতলালের সমগ্র কাব্য ও কাব্যভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বর্তমান গ্রন্থে তিনি কবির রূপানুধ্যান, তাঁর প্রকৃতি-প্রীতি, প্রেম ও জীবন সম্পর্কে কবির ধ্যানধারণা, তাঁর দেহাত্মবাদের স্বরূপ ব্যাখ্যান এবং সর্বোপরি যুগের আলোকে কবির শিল্প-সাধন এবং প্রতিভার বিশদ পরিচয় প্রদানে প্রয়াসী হয়েছেন। হরনাথ পাল আলোচ্য গ্রন্থে নিষ্ঠার সঙ্গে কবি মোহিতলালের কাব্যের বলিষ্ঠ ও বিশিষ্ট রূপরীতির মননশীল আলোচনা করেছেন—উৎসাহী কাব্যপাঠক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধিৎসু ছাত্রপাঠকের নিকট গ্রন্থটি সমাদৃত হবে আশা করি। গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক, ভাষা এবং বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রশংসনীয়; তবে তাঁর পরিবেশিত তথ্য এবং তত্ত্ব যে সর্বত্র প্রশ্নাতীত, তা নয়। 'কবি মোহিতলাল'-এর গ্রন্থসজ্জা মনোরম।

৫৮৮।৫৯

গোয়ার মুক্তি সংগ্রাম

সালাজারের জেলে উনিশ মাস—শ্রীত্রিদিব চৌধুরী। প্রকাশক : ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দাম দশ টাকা।

গোয়া প্রভৃতি ভারতের অংশগুলিকে পর্তুগীজ কবলমুক্ত করিবার জন্য সত্যাগ্রহ করিতে যে সকল সত্যাগ্রহীদল গোয়ায় গিয়াছিল তাহারই একটির দলপতি হিসাবে ত্রিদিববাবু গোয়ায় যাইয়া গ্রেপ্তার হন এবং পরে উনিশ মাস কারাবাসের পর মুক্তি পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া এই অমূল্য পুস্তকটি দেশবাসীদের উপহার দেন। পুস্তকটির জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

কারণ গোয়া, এই সত্যাগ্রহের স্বরূপ এবং পর্তুগীজদের চরিত্র সম্পর্কে আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না, ত্রিদিববাবুর সুলিখিত এবং বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করিয়া আমাদের জ্ঞানজগতের সে অভাব দূর হইল। ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে তাঁহার উপর কোন অত্যাচার করা হয় নাই, কিন্তু, পর্তুগীজ জেলের ক্ষুদ্র কক্ষে এবং অব্যবস্থায় তাঁহাকে প্রচুর দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যেই তিনি অসীম ধৈর্যের সহিত গোয়ার অধিবাসী বন্দীদের এবং দোভাষীর সাহায্যে পর্তুগীজ সৈনিকদের সহিত আলোচনার সুযোগ করিয়া লইয়া এবং পর্তুগীজ পত্রিকা হইতে নানা মূল্যবান সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এই

আমরা গোয়া ও পর্তুগাল সম্পর্কে অনেক কিছুই জানিতে পারি।

বন্দী হইবার পূর্বে তিনি যে গোয়ার অধিবাসীদের সম্পর্কে আসিয়াছিলেন তাহাদের ভাবভঙ্গি এবং কথাবার্তা হইতে এ-ধারণা তাঁহার হইয়াছিল যে, পর্তুগালের সর্বময় কর্তা সালাজারের পিটুনী পুলিসের অকথ্য অত্যাচারে তাহাদের মনোবল ভাঙিয়া গেলেও তাহারা দেশকে বিদেশীর কবলমুক্ত করিতে আগ্রহশীল। ভারত হইতে যে-সকল সত্যাগ্রহী গিয়াছিল তাহাদের শরীরের উপর প্রচুর অত্যাচার করিয়া তাহাদের সীমান্তের বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কেবলমাত্র নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে আটক রাখা হইয়াছিল।

পর্তুগীজদের এই বেপরোয়া মারপিটের সামনে ওখানকার লোকেদের বা অল্পসংখ্যক ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের দ্বারা যে গোয়ায় কোনরূপ ফললাভের আশা নাই ইহাই ত্রিদিববাবুর মত। হয় আন্দোলন আরো ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন, নয়ত ভারত গভর্নমেণ্টের তরফ হইতে কার্যকরী চাপ দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আন্তর্জাতিক কারণে ভারত সরকার এখন সেরূপ সক্রিয় ভূমিকা লইতে ইচ্ছুক নন। তাই গোয়ার মুক্তি-সংগ্রাম ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ত্রিদিববাবু লিখিয়াছেন, "ভারত হইতে গোয়ার ভিতরে সত্যাগ্রহী অভিযাত্রীদল পাঠানোর ব্যাপারে জাতীয় কংগ্রেস ভিন্ন এ-দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দল একসময় খুব তোড়জোড় করিয়া উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস দলের তরফ হইতেও এ ব্যাপারে সহানুভূতির অভাব ছিল না। কিন্তু ১৯৫৫ সালের মে হইতে আগস্ট পর্যন্ত মাস চারেকের বেশী গোয়ার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলির সে উৎসাহ বা উদ্যম স্থায়ী হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও, সকল প্রকার দুরূহ বাধা-বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া গোয়ার মুক্তি-সংগ্রাম যে প্রায় তিন বছর কাল চলিতে পারিয়াছিল, সালাজারের ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের সামনে ভাঙিয়া পড়ে নাই বা মাথা নোয়ায় নাই তাহার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব এই সমস্ত অখ্যাত, অজ্ঞাত, নামগোত্রহীন সাধারণ কর্মী ও তরুণ স্বেচ্ছাসৈনিকদের: প্রতিষ্ঠাবান রাজনৈতিক নেতা ও দলপতিদের নয়।"

সালাজারের শাসনের নৃশংসতা সত্ত্বেও পর্তুগালের সাধারণ লোকেদের মধ্য হইতে সংগৃহীত পর্তুগীজ সৈনিকদের ত্রিদিববাবু উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "পুলিসের কথা বাদ দিলে গোয়ার ভিতর জেলে থাকিবার সময় আমরা পর্তুগীজ সৈনিকদের বা সামরিক বিভাগের লোকেদের কাছে যথেষ্টই ভালো ব্যবহার পাইয়াছি এবং নানা ধরনের সাহায্য পাইয়াছি।" অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন, "নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি, পর্তুগীজ সাধারণ লোক যত বেশী ভদ্র, মার্জিত ও বন্ধুভাবাপন্ন হয় বা যত বেশী সহজ হিউমার জ্ঞানসম্পন্ন ফুর্তিবাজ চরিত্রের লোক তাহাদের ভিতর দেখা যায় অন্যান্য ইউরোপীয়দের মধ্যে, বিশেষ করিয়া ইংরেজ বা উত্তর ইউরোপীয়দের মধ্যে সেরূপ কখনো দেখি নাই।"

ত্রিদিববাবুর কাছ থেকে নিরপেক্ষ বর্ণনাই আমরা পাইয়াছি। পুস্তকটি ইতিমধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে, কারণ গোয়ার মুক্তি-সংগ্রামের এটি যে একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ শুধু তাহাই নহে, সে-বিবরণ রসোত্তীর্ণ এবং উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক। খুঁটিনাটি সব কিছুর উপর তীক্ষ্ণ নজর দিবার গুণেই বিবরণটি পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে। রসোত্তীর্ণ হওয়ার জন্য অবশ্য দায়ী লেখকের মুনশীয়ানা।

২২৫।৬০

প্রাচীন কাব্য

পদাবলী-পরিচয়—শ্রী হ রে কৃ ষ্ণ মু খো-পাধ্যায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স। ২০৩-১-১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট; কলিকাতা-৬। মূল্য—চা রি টাকা।

ভগবান শ্রীচৈতন্যের দেশ বাঙলায় বৈষ্ণব পদাবলী এবং তাহার কীর্তন প্রায় সর্বত্র সমাদৃত। বঙ্গভাষার ইতিহাসে পদাবলী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। পদাবলী সাহিত্যের মূল কথা, কীর্তনের

প্রকারভেদ সম্পর্কে যিনি এই গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন তাঁর সম্পর্কে সুনীতিবাবু ভূমিকায় বলেছেন, "ইনি যে কেবল পণ্ডিত, অর্থাৎ গ্রন্থবিলাসী, তাহা নহে, ইনি বহু দিবস ধরিয়া শ্রদ্ধার সহিত প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা করিয়া এই পদাবলী কীর্তনের ধারার মধ্য দিয়াই নিজ পরিচয়ের পথ করিয়া লইয়াছেন। বৈষ্ণব সংস্কৃতির ধারার মধ্য দিয়া নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অতি সহজেই গঠিত করিয়া লইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিও বর্জন করেন নাই—শ্রদ্ধা ও বিচারের এই সমন্বয় ইঁহার পদাবলী আলোচনাকে বিশেষরূপে মার্জিত ও দীপ্তিযুক্ত করিয়াছে।"

এই ক্ষুদ্রপরিসর পুস্তকটি পাঠ করিলে পদাবলী সাহিত্যের ও কীর্তনের ধারার একটা সম্যক উপলব্ধি হয়। তা ছাড়া, এই পুস্তকে লেখক অধুনাদুর্লভ গ্রন্থ শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত "উজ্জ্বল নীলমণি" হইতে রস বিভাগ এবং নায়ক নায়িকা প্রকরণের সম্পূর্ণ চিত্রটি সংক্ষেপে অন্তর্গত করিয়া পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বৈষ্ণব-রসপিপাসু ব্যক্তিগণ ছাড়াও পুস্তকটি বঙ্গসাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের নিকট মূল্যবান।

২১৭।৬০

উপন্যাস

ঝিমঝিম—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ২২, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১। দাম—তিন টাকা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান দীর্ঘকাল আগেই নির্ণীত হয়ে গেছে। কথাকাহিনীর মাধ্যমে যে এক স্বপ্নময় আবহাওয়াকে তিনি অত্যন্ত সহজে পরিবেশন করে থাকেন, আলোচ্য উপন্যাসে তা সম্পূর্ণভাবেই উপস্থিত করা হয়েছে। এ-কাহিনী ঐতিহাসিক নয়, একেবারে আধুনিক এবং ষোলো আনা বাস্তব। কিন্তু এই বাস্তবতাকেও কেমন সহজ-সুন্দর রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন লেখক তা বইটি না পড়লে বোঝা যাবে না। তা ছাড়া, লেখার ভঙ্গিটিও গতানুগতিক নয়। আঙ্গিক নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে আজকাল, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এই ছোট্ট উপন্যাসটিতে যে নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষা করেছেন, আধুনিক লেখকরা তা একবার মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতে পারেন।

১০৮।৬১

প্রাপ্তি স্বীকার

দুরন্ত দীপ্ত দিগন্ত—খালাসী কবি—মুমূর্ষু বাগ সম্পাদিত।

A Modern Incarnation of God—A. C. Das.

শতবার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য।

জলাপাহাড়—হরেন ঘোষ।

মোহন ডাঙার ঝিল : তাঁতি বৌ—সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

অনর্থ—শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায়।

প্র-পূর্বরাগ—বিনয়েন্দ্রনাথ মজুমদার।

অন্তরীণ—জোছন দস্তিদার।

মহামানবের সাগর তীরে—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত।

চন্দ্রিমা—শ্রীবণিক।

মরুঝঞ্ঝা—ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু—শ্রী কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

বিখ্যাত বিচার-কাহিনী—বিশু মুখোপাধ্যায়।

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

চিত্রশিল্পের নিজস্ব স্বার্থে

গত বছর জার্মান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে পশ্চিম জার্মানী থেকে যে চলচ্চিত্র প্রতিনিধিদল ভারত-পরিভ্রমণে এসেছিলেন তাঁরা এ-দেশের সাংবাদিকদের কাছে নিজেদের দেশের চিত্রশিল্প সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য পরিবেশন করেন। কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রতিনিধিদলের জনৈক মুখপাত্র প্রশ্নোত্তরকালে বলেন যে, তাঁদের দেশে শিল্পীদের পারিশ্রমিকের উচ্চতম হার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই নির্দিষ্ট হারের ঊর্ধ্বে কোন শিল্পী—তিনি যতই জনপ্রিয় হোন না কেন—পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবেন না।

শিল্পী-পারিশ্রমিকের এই হার-নির্ধারণে জার্মান চলচ্চিত্র শিল্প যে প্রভূত পরিমাণে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করে চলেছে এই সুসংবাদটিও প্রতিনিধিদল সানন্দে কলকাতার সাংবাদিকদের জানান। এবং এ কথা কোন অনুসন্ধানীর কাছেই অবিদিত নয় যে, যুদ্ধোত্তরকালে পশ্চিম জার্মানীর চিত্রশিল্প আশ্চর্যভাবে প্রসার লাভ করেছে। পশ্চিম জার্মানীর চিত্রশিল্পের এই প্রসার ও বিকাশের মূলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের যে প্রশংসনীয় সুবিবেচনা সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান, বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প তা থেকে নিদারুণভাবে বঞ্চিত। সে-দেশে শিল্পীরা জনপ্রিয়তার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেই পারিশ্রমিকের উচ্চতম হারের অধিকারী হন। চিত্রপ্রযোজক-সংস্থার ক্ষমতার অতীত কোন পারিশ্রমিক-অঙ্কে তাঁদের লোভ নেই। এবং এই লোভকে লালন করে তাঁরা চিত্রশিল্পের বিকাশ ও উন্নতির মূলে নির্মম কুঠারাঘাত করতে রাজী নন। চলচ্চিত্রশিল্প-কর্তাদের যুক্তিসম্মত ও নির্ধারিত হারেই তাঁরা সন্তুষ্ট। কারণ তাঁরা জানেন, তাঁদের অসন্তুষ্টি চিত্রশিল্পকে শুধু আর্থিক অক্ষমতার দিকেই ঠেলে দেবে। যে চিত্রশিল্প তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে বিনাশের পথে টেনে এনে নিজের উপার্জন বাড়াবার অযৌক্তিক ও আত্মঘাতী নীতিতে তাঁরা বিশ্বাসী নন।

কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পীদের স্বপ্ন ও সাধ সর্বনাশা। বাংলা চিত্রশিল্পের শিল্পী-প্রধানদের কথাই ধরা যাক। তাঁরা ছায়াচিত্রে অভিনয় করতে ও "গ্ল্যামার" দেখাতে এসে অন্তহীন অর্থোপার্জনকেই মূলমন্ত্র করে নিয়েছেন। অথচ তাঁরা জানতে চান না যে তাঁদের চাওয়ার অন্ত না থাকলেও চিত্রপ্রযোজকদের আর্থিক ক্ষমতার অন্ত আছে।

বাংলা ছবির জনপ্রিয় শিল্পীদের অযৌক্তিক পারিশ্রমিকের বিষফল কী তা কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না। জনপ্রিয়তার দাবিতেই শিল্পীরা তাঁদের পারিশ্রমিকের হার চড়িয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে চান না যে

[সুশীল মজুমদার প্রোডাকসন্সের সদ্যোমুক্ত "কঠিন মায়া"-র একটি দৃশ্যে আভা মণ্ডল ও বিশ্বজিৎ।

পারিশ্রমিকের হার যদি চিত্রনির্মাতাদের ক্ষমতার অতীত হয় তবে তা তাঁদের জনপ্রিয়তাকে বাঁচিয়ে রাখবার সুযোগও বেশী-কাল পাবে না। কোন চিত্রনির্মাতা হয়ত দুঃসাহস দেখিয়ে অবিশ্বাস্য পারিশ্রমিক দিয়ে কোন শিল্পীকে তাঁর ছবির নায়ক অথবা নায়িকার জন্য চুক্তিবদ্ধ করলেন। কিন্তু এই সুদর্শন নায়ক অথবা নায়িকা অভিনীত ছবি যে চিত্রনির্মাতাকে বক্স-অফিসের জুয়োখেলায় হারিয়ে দেবে না অথবা পথেই বসাবে না তার নিশ্চয়তা কী? এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার তিক্ত অভিজ্ঞতা অনেক চিত্রনির্মাতার ভাগ্যেই ঘটেছে। ভবিষ্যতেও ঘটবে।

সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের নৈতিক সুবিচারের ওপর আমাদের আস্থা নেই। তাঁদের যুক্তির কাছেও আবেদন করে লাভ নেই। কারণ এমন এক অর্থ-লোলুপতায় তাঁরা অন্ধ যা দাতার দেবার ক্ষমতার অপেক্ষা রাখে না এবং এমনকি ভবিষ্যৎ-স্বার্থকেও বাঁচিয়ে রাখতে চায় না। তাই উগ্র নির্বুদ্ধিতা ও নির্লজ্জ লোভের দরবারে সুবিবেচনার জন্য আর্জি পেশ করে কোন লাভ নেই।

কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব যাঁদের ওপর, তাঁদের এ বিষয়ে অবহিত হবার সময় এসেছে। প্রথমে চিত্রপ্রযোজকদের একটি বিষয় ভেবে দেখতে বলি। জনপ্রিয় শিল্পীর অংশ গ্রহণ বাদেও অনেক ভাল ছবি বক্স-অফিসে সাফল্য অর্জন করেছে এবং রসিকজনের প্রশংসা পেয়েছে। সম্প্রতিকালেও এমন ছবির সংখ্যা একাধিক। গল্প যদি ভাল হয়, প্রয়োগ-কর্ম যদি সুষ্ঠু হয় এবং অভিনয় যদি প্রাণবন্ত হয়, তবে ছবি "গ্ল্যামার" শিল্পী বা "স্টার সিস্টেম"-এর অনুগ্রহবঞ্চিত হয়েও ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পারে। অতি আধুনিক কালে বাংলা ছবি শিল্পনিষ্ঠ চিত্রপরিচালকদের হাতে যে গৌরব অর্জন করেছে তার মূলে রয়েছে "স্টার সিস্টেম" বর্জন। বাংলা ছবির এই দুঃসাহসিক নব-উন্মেষকে আজকের অনেক চিত্রনির্মাতা নির্ভয়ে অভিনন্দন জানাতে পারছেন কই?

যে-সব শিল্পী "গ্ল্যামার"-এর দৌলতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, অথচ অভিনয়-কুশলতার নিঃসংশয় প্রমাণ আজও দিতে পারেননি, সেইসব শিল্পীও নাকি আজকের দিনে দুর্মূল্য হয়ে উঠছেন। শুধু তাই নয়, এমনও শোনা যায় যে, তাঁদের অঙ্গুলি-নির্দেশে অথবা সুস্মিত কটাক্ষপাতে কোন কোন চিত্রপরিবেশক সাগ্রহে ও সানন্দে মোটা অঙ্কের টাকা খাটিয়ে ছবির পরিবেশন-স্বত্ব ক্রয় করতে উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন। এবং এই ছবিতে শিল্পীর অযৌক্তিক পারিশ্রমিক মেটাতেও তাঁরা পরম উৎসাহ প্রকাশ করে থাকেন।

আর যে-সব শিল্পী অভিনয় জানেন এবং যাঁদের "গ্ল্যামার"ও আছে, তাঁদের চাহিদার কথা উল্লেখ করে লাভ নেই। তাঁদের পারিশ্রমিকের অঙ্ক যে-কোন বাঙালী চিত্র-নির্মাতার কাছে আতঙ্কের বস্তু। শুনতে পাই, লাখের নীচে তাঁরা নাকি কথাই বলেন না।

এমন আত্মসর্বস্ব, অপরিণামদর্শী শিল্পী যে আজও চিত্রনির্মাতাদের দ্বারা লালিত ও পুষ্ট সেটা বাংলা চিত্রশিল্পের দুর্ভাগ্য। শিল্পীরা ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে চিত্র-শিল্পের স্বার্থকে স্থান দিতে রাজী নন, জানি। বহু সমস্যায় জর্জরিত এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক অঞ্চলে সীমায়িত বাংলা চিত্র-শিল্পের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্য যে আত্মঘাতী সে বিবেচনাও তাঁদের নেই।

কিন্তু এ-বিষয়ে বাংলা চিত্রশিল্পের কর্ণ-ধাররা উদাসীন থাকতে পারেন না। বাংলা চিত্রশিল্প যেখানে নিত্য নতুন সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে, এর ব্যবসায়িক উন্নতি ও

চলচ্চিত্রালয়ের "আজ কাল পরশ্‌্ন"-র দুই মুখ্য চরিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও অনুপ কুমার।

প্রসার যেখানে দিনে দিনে সংকুচিত হয়ে আসছে এবং বাংলা ছবির কলাকুশলী ও কর্মীরা যেখানে জীবিকার সংগ্রামে অবসন্ন হয়ে পড়ছেন, সেখানে চিত্রতারকাদের সর্বগ্রাসী অর্থলোলুপতাকে দিনে দিনে পোষণ ও লালন করে যাওয়ার যে-কোন প্রয়াস ও আগ্রহ অমার্জনীয় অপরাধ। এই অপরাধের অনুষ্ঠান অনেকদিন যাবৎই চলে আসছে। বাংলা চিত্রশিল্পের নিজস্ব স্বার্থে এর কঠোর প্রতিকারের প্রয়োজন আজ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। প্রতিকারের দায়িত্ব নিতে পারেন শুধু চিত্রপ্রযোজকরা। তাঁরা এই নির্ভয় ও নিঃসংকোচ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন যে তাঁরা শিল্পের মৌলিক সব শর্তকেই নিষ্ঠা সহকারে পালন করে যাবেন, কিন্তু প্রশ্রয় দেবেন না শিল্পীর উদগ্র অর্থলোলুপতাকে। চিত্রনির্মাতারা যদি সংকল্পে অবিচল থাকেন, তবে বাংলা চিত্রশিল্প অন্তত একটি দুর্ভাগ্যের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হবে। আর তাঁরা যদি এই সংকল্পপালনে দ্বিধাগ্রস্ত হন, তবে এগিয়ে আসতে হবে বাংলা চিত্রশিল্পের প্রশাসনিক কর্তৃস্থানীয় সংস্থাকে। বাংলা চিত্রশিল্পের স্বার্থরক্ষাকল্পে শিল্পীদের উচ্চতম পারিশ্রমিক-হার অচিরেই নির্ধারণ করার আশু প্রয়োজনীয়তার কথাই আজ ভেবে দেখতে হবে। বাংলা চিত্রশিল্পের যে-কোন কল্যাণকামী এই প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাবেন বলেই আমরা মনে করি।

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে একসঙ্গে দু'খানি বাংলা ছবি মুক্তি পাচ্ছে—সুশীল মজুমদার প্রোডাকশন্সের "কঠিন মায়া" ও চলচ্চিত্রালয়ের "আজ কাল পরশু"।

সুখ্যাত সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের একটি রসোত্তীর্ণ কাহিনী "কঠিন মায়া"-র আখ্যান অবলম্বন। তাকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করেছেন বিনয় চট্টোপাধ্যায়। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় বিশ্বজিৎ ও সন্ধ্যা রায়ের রস-সমৃদ্ধ অভিনয় এ-ছবির বিশেষ আকর্ষণ। পার্শ্বচরিত্রগুলির রূপদান করেছেন জহর গাঙ্গুলী, পাহাড়ী সান্যাল, অনুপকুমার, রবীন মজুমদার, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপিকা দাশ, গীতা দে, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, নবদ্বীপ

হালদার, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা প্রমুখ কুশলী শিল্পীরা। দু'টি নতুন মুখেরও সন্ধান মিলবে এ ছবিতে। একজন হলেন পুলিসের ভূতপূর্ব অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার রাম চৌধুরী, অপরজন অভিনয়-ক্ষেত্রে নবাগতা—গৌরী মজুমদার। পরিচালনা ও সুরযোজনার দায়িত্ব বহন করেছেন যথাক্রমে সুশীল মজুমদার ও কালীপদ সেন।

সাধারণ মানুষের দিন-যাপনের করুণ-মধুর কাহিনী নিয়ে তোলা এ-সপ্তাহের দ্বিতীয় ছবি "আজ কাল পরশু"। নির্মল সর্বজ্ঞ এর পরিচালক ও কাহিনীকার। ভূমিকালিপির পুরোভাগে আছেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, মাধবী মুখোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, তপতী ঘোষ, সবিতাব্রত দত্ত, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী, তুলসী চক্রবর্তী, শ্যামল সেন, মণি শ্রীমানী, উমানাথ ভট্টাচার্য, জহর রায় ও অতিথি শিল্পী হিসাবে সুশীল মজুমদার। সুর-সৃষ্টি করেছেন অপরেশ লাহিড়ী।

* * *

একটি হিন্দী ছবিও এ সপ্তাহের মুক্তি-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ছবিখানির নাম "সম্পূর্ণ রামায়ণ" এবং নামেই এর বিষয়বস্তু প্রকাশ। ছবিটি আগাগোড়া গেভাকলারে রঞ্জিত, তুলেছেন বসন্ত পিকচার্সের পতাকা-তলে হোমি ওয়াদিয়া। রামায়ণে বর্ণিত লোকোত্তর চরিত্রগুলির রূপায়ণ করেছেন অনীতা গুহ, মহীপাল, সুলোচনা, ললিতা পাওয়ার, অচলা সচদেব, কৃষ্ণাকুমারী, রাজকুমার, বদরীপ্রসাদ, অনন্তকুমার, বি এম ব্যাস প্রভৃতি। এই বিরাট ছবিটি পরিচালনা করেছেন বাবুভাই মিস্ত্রী। ভরত ব্যাস লিখিত সংগীতে সুরারোপ করেছেন বসন্ত দেশাই। গোপীকৃষ্ণ ও কানু দেশাই যথাক্রমে নৃত্য পরিচালনা ও শিল্প-নির্দেশনার দায়িত্ব বহন করেছেন।

গত সপ্তাহে প্রায় বিনা নোটিসে আর একটি গেভাকলার রঞ্জিত হিন্দী ছবি মুক্তি পেয়েছে। সেটি হল অনুপম চিত্রের বহু-প্রতীক্ষিত সিনেমাস্কোপ পদ্ধতিতে তোলা "প্যার কি প্যাস"। ভারতীয় চিত্রজগতে এইটিই দ্বিতীয় সিনেমাস্কোপ ছবি। প্রথমটি গুরু দত্ত কৃত "কাগজ কা ফুল"। তবে সেটি তোলা হয় বর্ণের বৈভব ব্যতিরেকেই সাধারণ প্রচলিত ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট-এ। হনি ইরানী, নিশি, শ্রীকান্ত ও মনোমোহন কৃষ্ণ "প্যার কি প্যাস"-এর মুখ্য শিল্পী। মুখরাম শর্মার একটি কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন মহেশ কৌল। এ ছবিরও সুরকার বসন্ত দেশাই।

* * *

পরিচালক তপন সিংহ জালান প্রোডাকশন্সের "হাঁসুলিবাঁকের উপকথা"র চিত্রগ্রহণ শুরু করবার আগেই ছবির কয়েকটি গান রেকর্ড করিয়ে নিয়েছেন। পল্লীগীত রচনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতুল কৃতিত্বের কথা নতুন করে বলবার প্রয়োজন নেই। তাঁর লেখা গানগুলিতে সুর-সংযোগ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গত ১৭ই জুলাই ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে গানগুলি রেকর্ড করা হয়। আগামী ১লা আগস্ট থেকে বীরভূমের লাভপুর অঞ্চলে "হাঁসুলি-বাঁকের উপকথা"-র নিয়মিত শুটিং আরম্ভ হবে। ছবিটির প্রধান ভূমিকাগুলি এইভাবে বিতরিত হয়েছে: লাখি—রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, করালি—দিলীপ রায়, বনোয়ারী—কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালোবউ—অনুভা গুপ্তা। অন্যান্য ভূমিকায় সুলতা চৌধুরী, রবি ঘোষ, নিভাননী, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রশান্তকুমারকে দেখা যাবে।

* * *

তপন সিংহের প্রাক্তন সহকারী পীযূষ বসু এবার পুরোপুরি পরিচালক হলেন। মুভিটেক-এর প্রথম ছবি "শিউলবাড়ী" তাঁর এই নব পরিচয়ের বাহন। গত ২৪শে জুলাই নিউ থিয়েটার্সের দু' নম্বর স্টুডিওতে এর মহরৎ তথা নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। সুবোধ ঘোষের "নাগলতা" অবলম্বনে এর
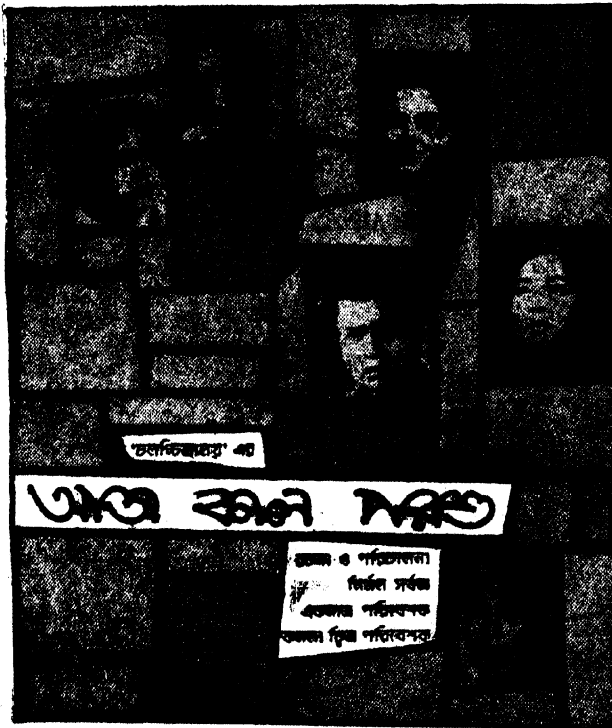
চিত্রনাট্য লিখেছেন তপন সিংহ। বিভিন্ন ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন উত্তমকুমার, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, ছবি বিশ্বাস, জহর রায়, বীরেশ্বর সেন প্রভৃতি। আর একটি ব্যাপারে "শিউলিবাড়ী" দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। এর সুরসৃষ্টির দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের ওপর এবং তাঁর পরিচালনায় গত মঙ্গলবার একটি রবীন্দ্রসংগীত গৃহীত হয়েছে। বাংলা দেশে তাঁকে নিয়ে দুজন মহিলা সংগীত পরিচালিকার আবির্ভাব হল। তবে একাধারে নায়িকা-অভিনেত্রী ও সংগীত পরিচালিকা—এমনিধারা ব্যাপার ইতিপূর্বে অন্য কোথাও ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই।

* * *

শ্রীশংকর পিকচার্সের "জীবন ও স্বপন" এবং শ্রীমান পিকচার্সের "মধুরেণ" আশু মুক্তির প্রতীক্ষা করছে।

সমরেশ বসুর "মদনের স্বপন" অবলম্বনে "জীবন ও স্বপন" তুলেছেন তরুণ পরিচালক তরুণেশ দত্ত। প্রধান চরিত্রগুলি রূপায়িত করেছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, পার্থপ্রতিম, সন্ধ্যা রায়, বাণী গাঙ্গুলী, মণি শ্রীমানী, সুখেন দাস, বাবুয়া প্রভৃতি। বোম্বাইয়ের ডি সি দত্ত এর সংগীত পরিচালনা করেছেন।

"মধুরেণ" এক আশাবাদী যুবকের বৈচিত্র্যময় জীবনের প্রতিচ্ছবি। বিধায়ক ভট্টাচার্য লিখিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যারানী, ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, নবদ্বীপ, তুলসী চক্রবর্তী, পদ্মা দেবী, নিভাননী, কবিতা রায় প্রভৃতি এর শিল্পীবৃন্দ। কালীপদ সেন সুর সংযোজন করেছেন।

ভালবাসার কাঙাল

অনুপম চিত্রের "প্যার কি প্যাস" ছবিতে চিত্রপরিচালক মহেশ কাউল ও কাহিনীকার মুখরাম শর্মার মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন।

কাহিনীকার শ্রীশর্মা এ-ছবিতে যে গল্পটি দর্শকদের উপহার দিয়েছেন তা এক নিঃসন্তান রমণীর অতৃপ্ত মাতৃত্বের বেদনাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ এক মামুলী "মেলোড্রামা"র চিরাচরিত পথটি খুঁজে নিয়েছে। রমণী বন্ধ্যা এবং তার কোনকালেই সন্তান হবে না এই নির্মম সত্যটি ডাক্তার ঘোষণা করেছেন। এই কারণেই এক অনাথ আশ্রমের পরিচালক সন্তানহীনা রমণীর বাঞ্ছিত অনাথ শিশু-কন্যাকে বিনা দ্বিধায় তার হাতে তুলে দিয়েছে।

অনাথ শিশু নিঃসন্তান দম্পতির ক্রোড়ে যেন তার হারানো বাবা-মাকে খুঁজে পায় এবং বন্ধ্যা রমণীর মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করে তোলে। কিন্তু বন্ধ্যা রমণীর জননী তার কন্যার জীবনে এই অনাথ শিশুর আগমনটি মোটেই সুনজরে দেখতে পারে না।

কাহিনীর পরের অধ্যায়টি সহজেই অনুমেয়। বন্ধ্যা রমণী হঠাৎ একদিন সন্তান-সম্ভবা হয়ে ওঠে এবং যথাসময়ে একটি শিশুকন্যা প্রসব করে। দিনে দিনে তার মাতৃস্নেহের পুরোটুকু অধিকার করে বসে তার আত্মজা, আর পালিতা কন্যার কপালে জোটে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা। নায়িকার কুচক্রী জননী এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। অনাদরে ও অবহেলায় পালিত কন্যা দুরন্ত অস্ফুট অভিমানে আবার অনাথ হয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

এই করুণ ঘটনার পর বিবেকের দংশন প্রথম অনুভব করে গৃহকর্তা। আপন তনয়ার স্নেহে অন্ধ এবং মায়ের কুপ্ররোচনায় দিশেহারা গৃহকর্ত্রীর চৈতন্যোদয় ঘটতে কিছুটা বিলম্ব ঘটে। শেষ পর্যন্ত তারা কিভাবে নিরুদ্দিষ্ট অভিমানিনী পালিতা কন্যাকে খুঁজে পায় ও ঘরে নিয়ে আসে তা নিয়েই ঘটে চিত্রকাহিনীর পরিণতি।

পরিচালক মহেশ কাউল কাহিনী বিন্যাসে অতি-নাটকীয়তার রস নিঙড়ে নিঙড়ে দর্শকের অশ্রুপাত ঘটাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এবং এর প্রয়োজনে তিনি বে-সুর

শ্রীশঙ্কর পিকচার্সের "জীবন ও স্বপ্ন"-এর একটি দৃশ্যে নীলিমা দাস ও নিভাননী।

উপকরণের আশ্রয় নিয়েছেন সেগুলি বহু-ব্যবহৃত ও পৌনঃপুনিকতার দোষে দুষ্ট। তবে হালকা প্রণয় ও পাপ-উপাদানের ভয়ে যাঁরা হিন্দী ছবি বর্জন করেন তাঁদের কাছে এই চিত্রটি দর্শনীয়। ছবিটি গেভাকালারে রঞ্জিত ও সিনেমাস্কোপে গৃহীত বলে নয়নাভিরাম।

ছবির শিশুচরিত্রে হানি ইরাণীর অভিনয় যেমন প্রাণবন্ত তেমনি উপভোগ্য। প্রধান স্ত্রীচরিত্রে নিশির সংবেদনশীল অভিনয় মনে দাগ কাটে। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে শ্রীকান্ত গৌরব, মনোমোহন কৃষ্ণ, ডেভিড ও মনোরমার অভিনয় চরিত্রোচিত।

সংগীত পরিচালক বসন্ত দেশাই ছবির গানের সুরারোপে ও আবহ-সুর রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ পরিচ্ছন্ন।

নাট্যাভিনয়

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ২৯শে জুলাই একটি স্মরণীয় তারিখ। ঐদিন মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ "ফেরারী ফৌজ"-এর অভিনয়কে কেন্দ্র করে বাংলার শতাধিক প্রাক্তন বিপ্লবীকে অভিনন্দন জানাবার আয়োজন করেছেন। ঐ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন অগ্নিযুগের অন্যতম প্রধান নায়ক ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। সর্বশ্রী অনন্ত সিং, রবি সেন, নিরঞ্জন সেন, লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী, কল্পনা দত্ত, অমর বসু, বীণা ভৌমিক, হেমন্ত বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা যায়।

* * *

গত ৭ই জুলাই থিয়েটার সেণ্টারে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রূপান্তরী তাঁদের প্রথম বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করেন। জোছন দস্তিদার রচিত "বিংশোত্তরী" নাটকের প্রথম দৃশ্যটি অভিনয় করে রূপান্তরী তাঁদের প্রথম পদক্ষেপের স্মারকচিহ্ন অভ্যাগতদের সামনে তুলে ধরেন। তারপর অভিনীত হয় উক্ত নাট্যকারের নবতম রচনা "স্বর্ণগ্রন্থি"র একটি দৃশ্য—আগামী দিনের কার্যক্রমের পূর্বাভাস হিসাবে। আগামী ১৬ই আগস্ট পূর্ণাঙ্গ নাটকটি বিশ্বরূপা মঞ্চে সর্বপ্রথম অভিনীত হবে। অনুষ্ঠানের তৃতীয় দফাটি যেমন অভিনব তেমনি হৃদয়গ্রাহী। যে নাটক লেখা হয়নি এমনি এক নাটক অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সকলের সামনে মুখে-মুখে রচনা করে অভিনয় করেন। সমষ্টিগত অভিনয়ের সাফল্যে অ-বিরচিত নাটকটি সকলকে মুগ্ধ করে। সবশেষে রূপান্তরী তাঁদের তোলা আট-মিলিমিটারের ছবি "প্রাগৈতিহাসিক" প্রদর্শন করে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

* * *

গত ছয় বৎসর ধরে থিয়েটার সেণ্টার একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছেন। এ যাবৎ প্রায় ২০০ প্রতিষ্ঠান এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এ বৎসর প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির আগ্রহে থিয়েটার সেণ্টার শুধু একাঙ্ক নয়, পূর্ণাঙ্গ নাটকেরও প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করছেন। আগামী আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে এই দুই প্রতিযোগিতাই এক সংগে চলবে। বিশিষ্ট নাট্যরসিক, অভিনেতা ও সমালোচকদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। অন্যান্য বৎসরের মত এবারেও অহীন্দ্র চৌধুরী বিচারকমণ্ডলীর সভাপতিত্ব করবেন। যেসব সংস্থা একাঙ্ক বা পূর্ণাঙ্গ অথবা দুটি প্রতিযোগিতাতেই যোগ দিতে চান তাঁরা থিয়েটার সেণ্টারের সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখে আবেদনপত্র সংগ্রহ করুন। আবেদন পাঠাবার শেষ তারিখ ৭ই আগস্ট।

বিবিধ সংবাদ

আগামী নভেম্বর মাসে সান ফ্রান্সিস্কোতে যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে তার অন্যতম বিচারক মনোনীত হয়েছেন পরিচালক তপন সিংহ। এই বিচারকমণ্ডলীর অন্য দুই সদস্য বিগত যুগের নাম-করা জার্মান পরিচালক জোসেফ ফন স্টার্নবার্গ ও এ যুগের জনপ্রিয় মার্কিন নাট্যকার আর্থার মিলার। তিন সপ্তাহ ধরে এই উৎসব চলবে।

আমেরিকান গভর্নমেণ্টের আমন্ত্রণে তপন সিংহ সেপ্টেম্বরের শেষে ও-দেশের ফিল্ম-

থিয়েটার সেন্টারের বর্তমান আকর্ষণ "অলীকবাবু"-র তিনটি প্রধান চরিত্রে তরুণ মিত্র, রুবি মিত্র ও কৃষ্ণা রায়।

শিল্প ও সাংস্কৃতিক সংস্থাগুলি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে আমেরিকা যাত্রা করবেন।

* * *

সদ্য সমাপ্ত মস্কো চলচ্চিত্রোৎসবে জাপানী ছবি "দি আইল্যান্ড" ও সোভিয়েট ফিল্ম "দি ক্লিয়ার স্কাই" যুগ্মভাবে শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্যে নির্দিষ্ট গ্র্যান্ড প্রাইজ লাভ করেছে। শেষোক্ত ছবির পরিচালক গ্রিগরি চুখরাই—যাঁর নাম এ-দেশের চিত্রামোদীদের কাছেও সুপরিচিত। মস্কো উৎসবে ভারত থেকে পাঠানো হয়েছিল গুরু দত্ত-কৃত হিন্দী ছবি "চৌধভি কি চাঁদ"। প্রযোজক-পরিচালক মেহবুব খাঁ বিচারকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন।

মস্কো উৎসবে সত্যজিৎ রায়ও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে নিমন্ত্রণ রাখতে পারেননি। বার্লিন উৎসবের শেষে তিনি সরাসরি কলকাতায় ফিরে এসেছেন এবং তাঁর নির্মীয়মাণ ছবি "মহানগর"-এর উদ্যোগপর্বে আত্মনিয়োগ করেছেন। তবে মস্কো উৎসবে প্রতিযোগিতার বহির্ভূত চিত্র হিসাবে "পথের পাঁচালী" প্রদর্শিত হয়েছে।

* * *

সত্যজিৎ রায়-কৃত রবীন্দ্রনাথের জীবনী-চিত্রটি গত সপ্তাহে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে টেলিভিসনের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। ছবিটি সম্বন্ধে ও-দেশের সমালোচকরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। টেলিভিসন কর্তৃপক্ষের মতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এত ভাল ছবি এ-দেশে ইতিপূর্বে দেখানো হয়নি।

* * *

ভারত সরকারের ইচ্ছা ছিল আগামী ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিৎ রায়ের "তিন কন্যা" পাঠাবেন। কিন্তু শ্রীরায় ছবিটি পাঠাতে অসম্মত হওয়ায় সরকারী-ভাবে কোন পূর্ণাঙ্গ ছবি ভেনিস উৎসবে প্রেরিত হয়নি। তবে ঐ উৎসবের কর্তৃপক্ষের আহ্বানে দুখানি বাংলা ছবি বেসরকারীভাবে পাঠানো হয়েছে। একটি ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত "কোমল গান্ধার", অপরটি রাজেন তরফদার-কৃত "গঙ্গা"। ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আগামী ২৪শে আগস্ট শুরু হয়ে ৭ই সেপ্টেম্বর শেষ হবে।

একলব্য

আট বছর পরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আবার লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এর আগে লীগবিজয়ী হয়েছে ছ'বার। লীগ অভিযানে এটা তাদের সপ্তম সাফল্য। তিনটি খেলা হাতে রেখে ইস্টবেঙ্গলের লীগ জয় এক দিকে যেমন খুবই সম্মানের বিষয় —প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান ক্লাবকে দুটি খেলায় পরাজিত করা অন্য দিকে তেমন কৃতিত্বের পরিচায়ক। আরও বলবার কথা, ফিরতি লীগের খেলায় গতবারের লীগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানকে হারাবার সঙ্গে সঙ্গে লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের গৌরব তাদের করায়ত্ত হয়।. তাই ঐ বিশেষ দিনটা ইস্টবেঙ্গলের ক্লাব-ইতিহাসে এক গৌরবের দিন।

অবশ্য ভারতীয় ফুটবল ক্ষেত্রে কোনো গৌরবের অধিকারী হতেই ইস্টবেঙ্গলের বাকী নেই। ৭ বার লীগ জয় করা ছাড়া তাঁরা আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হয়েছে পাঁচবার। একবার রোভার্স, চারবার ডুরাণ্ড এবং চারবার ডি সি এম ট্রফিও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তাঁবু ঘুরে গেছে। একসঙ্গে লীগ ও শীল্ড বিজয়ী হয়ে 'ডাবলস' লাভ এবং লীগ, শীল্ড এবং রোভার্স কাপ জয় করে 'ট্রিপল ক্রাউন' লাভের কৃতিত্বও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা। তবু অতীতের কৃতিত্ব নিয়ে তো কোন ক্লাব, বিশেষ করে প্রতিষ্ঠাবান ক্লাব চিরদিন বড়াই করতে পারে না। তার চাই নতুন কৃতিত্ব, নতুন সম্মান, অধিকতর প্রতিষ্ঠা। ৮ বছর পরে লীগ জয় করে সেই প্রতিষ্ঠারই অধিকারী হয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এবারকার লীগ জয় প্রধানত বাঙালী খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-নৈপুণ্যের যোগ্য পুরস্কার। তরুণের জয়গানও বলা যেতে পারে। বেশীর ভাগ বাঙালী এবং তরুণ খেলোয়াড়ের সমাবেশেই এবারকার ইস্টবেঙ্গল টীম গঠিত। টীমের নিয়মিত ১১ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৮ জনই কলকাতা ইউনিভার্সিটির 'ব্লু'। এই ৮ জন হচ্ছেন গোলকিপার অবনী বসু, ব্যাক চিত্ত চন্দ ও বিক্রমজিৎ দেবনাথ, স্টপার অরুণ ঘোষ, হাফব্যাক শ্রীকান্ত ব্যানার্জী এবং ফরোয়ার্ড সুকুমার সমাজপতি, সুনীল নন্দী ও নীলেশ সরকার। সবাই আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এ ছাড়া অতিরিক্ত গোল কিপার এস কাড়ারও ইউনিভার্সিটি ব্লু। লেফট আউট বালুও কলকাতা ইউনিভার্সিটির খেলোয়াড়, তবে ব্লু পাননি। তাই ইস্টবেঙ্গলের এবার লীগ জয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডেরও গর্ব করার কারণ আছে।

* * *

যোগ্য দল হিসাবেই ইস্টবেঙ্গল এবার লীগ জয় করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দলগত শক্তিতে ইস্টবেঙ্গলই এ বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ টীম। গতিবেগও তাদের বেশী। অবশ্য মাঝে মাঝে তাদের খেলায় অসামঞ্জস্য দেখা না গেছে, এমন নয়। যেমন চ্যারিটি খেলায় শক্তিশালী মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ৫—০ গোলে পরাজিত করার পর হীনবল স্পোর্টিং ইউনিয়নের কাছে পরের খেলায় একটি পয়েন্ট নষ্ট বা মোহনবাগানের বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় কৃতিত্বপূর্ণ জয়ের পর উয়াড়ীর সঙ্গে ড্র, এরিয়ানের কাছে হার স্বীকার ইত্যাদি

প্রথম ডিভিশন লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব—বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে—বি দেবনাথ, কানন, এ বাসুভ, কমলাপ্রসাদ, এ বসু, শ্রীকান্ত ব্যানার্জী, এস সমাজপতি ও সি পাল; বেঞ্চে বসে—সুশীল ভট্টাচার্য (কোচ), সি চন্দ, বলরাম, অণ্টু বসু (ফুটবল সম্পাদক), রাম বাহাদুর, অরুণ ঘোষ ও কানকী দাস; মাটিতে বসে—নীলেশ সরকার, এস ঘোষ, বালু ও সুনীল নন্দী

ঘটনা। অবশ্য এরিয়ানের কাছে পরাজয় ক্রীড়াধারার সংগতিসূচক ফলাফল নয়। অনেকটা দুর্ভাগ্যের জন্যই এ খেলায় ইস্ট-বেঙ্গলকে হার স্বীকার করতে হয়। তাই এ ঘটনাকে অদৃষ্টের পরিহাস বলা যেতে পারে। অদৃষ্ট এবং পুরুষকার নিয়েই তো জীবনসংগ্রাম। ক্লাবের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। খেলার মধ্যে এমনও দেখা যায় একটি দল সারাক্ষণ প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে আক্রমণ চালিয়ে কোনো গোল করতে পারল না, প্রতিপক্ষ সারা খেলায় প্রাপ্ত একটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করে খেলায় জিতে গেল। এখানেই অদৃষ্টের প্রশ্ন। তবে ইস্টবেঙ্গলের এবারকার লীগ জয়ে অদৃষ্টের তেমন হাত নেই। পুরুষকারের প্রাধান্যই বেশী করে চোখে পড়েছে।

ক্লাবের সাফল্যের মূলে দু'জন খেলোয়াড়ের কৃতিত্বের কথা না বললে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। ফুটবল দলগত খেলা, ক্রিকেটও দলগত খেলা। তবে ক্রিকেটের একক কৃতিত্বের ওপর অনেক সময় দলের জয়পরাজয়ের প্রশ্ন নির্ভর করে। কিন্তু ফুটবল খেলায় জয়ের ক্ষেত্রে প্রতি খেলোয়াড়েরই কিছু না কিছু দান স্বীকার্য। তবু যাদের দান সবার উপরে তারা সম্মানের পাত্র। লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল টীমে এবার এ সম্মানের অধিকারী দুজন। একজন দলের অধিনায়ক বলরাম। যাকে পুরোভাগের পুরোধা বলা যায়। অপরজন 'স্টপার' অরুণ ঘোষ, যিনি রক্ষণভাগের প্রধান স্তম্ভ হিসাবে পরিচিত। সমাজপতি, শ্রীকান্ত, সুনীল, নীলেশ কাউকেই আমি ছোট করতে চাই না। তবু অরুণ ও বলরামের ক্রীড়া-নৈপুণ্য কৃতিত্বে ভাস্বর।

এমনও দেখা গেছে প্রতিপক্ষের উপর পর্যাপ্ত প্রাধান্য বিস্তার করেও ইস্টবেঙ্গল কোনভাবে গোল করতে পারছে না। সেই সময় গোল করে দলকে বিজয়ীর সম্মান এনে দিয়েছেন অধিনায়ক বলরাম। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানের বিরুদ্ধে দুটি খেলায় বলরামের দুটি গোলই ক্লাবের অভীষ্ট লাভের পথ প্রশস্ত করেছে। দলের নেতা হিসাবে সহ-খেলোয়াড়দের মধ্যে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন বলরাম। সমস্ত ক্লাবের খেলোয়াড়দের মধ্যে গোলদাতার তালিকায়ও বলরাম শীর্ষস্থানের অধিকারী। তিনটি খেলা হাতে রেখেই তাঁর এ কৃতিত্ব।

অরুণ ঘোষ আজ সত্যিই বাঙলা ফুটবলের গর্ব। দিন দিন তাঁর খেলায় উন্নতির সুস্পষ্ট পরিচয়। ব্যাক হিসাবেই অরুণের ফুটবলে প্রতিষ্ঠা। দলের প্রয়োজনে তিনি নিজের জায়গা ছেড়ে 'স্টপার'-এর গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং কৃতিত্বপূর্ণ ক্রীড়াধারায় এখন হয়েছেন দলের প্রধান স্তম্ভ।

* * *

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফিরতি লীগের চ্যারিটি খেলায় মোহনবাগান গোল-রক্ষক এস শেঠ ডাইভ দিয়া একটি অবধারিত গোল বাঁচাচ্ছেন। খেলায় ইস্ট-বেঙ্গল ১—০ গোলে বিজয়ী হয়

ইস্টবেঙ্গলের লীগ জয়ে আজ শত্রুমিত্র সবাই খুশী। চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের পর প্রথম অভিনন্দন এসেছে প্রবল প্রতিপক্ষ মোহনবাগানের কাছ থেকে। মোহনবাগানের অধিনায়ক চুণী গোস্বামী মাঠের মধ্যেই বলরামকে আলিঙ্গন করেছেন। মোহনবাগানের ফুটবল সম্পাদক এস মান্না মাঠে নেমে করমর্দন করেছেন প্রতি খেলোয়াড়ের সঙ্গে। মোহনবাগান ক্লাব এবং সমর্থকরাও অভিনন্দন জানাতে দ্বিধা করেননি। অপরাপর ক্লাব এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষও পাঠিয়েছেন অভিনন্দন-বার্তা। প্রধানত বাঙালী খেলোয়াড়দের সাফল্যের সম্মানে সবাই সুখী।

কথা উঠেছে, বাঙালীরা যখন এত ভাল ফুটবল খেলতে পারে তখন আমরা অন্য রাজ্যের খেলোয়াড়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকব কেন? 'সোনার হরিণে'র পেছনে ছুটে আমাদের কি ফল? প্রধানত বাঙালী খেলোয়াড়দের কৃতিত্বে ইস্টবেঙ্গল আজ লীগ জয় করেছে। ক্লাব প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগেও ইস্টবেঙ্গলে ছিল বাঙালী খেলোয়াড়ের আধিপত্য। গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনার প্রথম স্তরেও বাঙালী খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব স্মরণীয়। কিন্তু মাঝে ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ সোনার হরিণের পেছনে ছুটেছেন এবং বেশী করেই ছুটেছেন। এতে তাঁদের লাভ হয়নি, এ কথা বললে সত্যের অপলাপ হয়। লাভ যথেষ্টই হয়েছে; কিন্তু লোকসানও কম নয়। নৈতিক দিক দিয়ে এ লোকসান। বাঙলার ফুটবল ক্ষেত্রের লোকসান। ক্লাবের অর্থের লোকসান। তাই সবাই ভাবতে আরম্ভ করেছে মাতৃকোষে রতনের রাজি থাকতে আমাদের ভিখারীর দশা কেন?

—মুকুল—

তৃপ্তি মুখার্জি

আজ একটু ভূমিকার প্রয়োজন বোধ করছি। 'দেশ'-এর পাতায় খেলাধূলোয় মেয়েদের কৃতিত্বের কথা লিখতে আরম্ভ করার পর থেকে অনেকগুলো চিঠি আমার হাতে এসে পেঁছেছে। কেউ অভিনন্দন জানিয়েছেন, কেউ প্রশংসা করেছেন, কেউ দিয়েছেন পক্ষপাতদোষের অভিযোগ। কেউ কেউ নতুন নতুন মেয়ের কথা জানতে চেয়েছেন, কেউ রেকর্ডের খুঁটিনাটির প্রতিবাদ করেছেন। আবার বিশ্বক্রীড়াক্ষেত্রের খ্যাতনামা খেলাপটু মেয়েদের কথা যাঁরা চেয়েছেন, তাঁদের সংখ্যাও কম নয়।

নিন্দাসূচক বা নিরুৎসাহব্যঞ্জক কোনো চিঠি আজও আমার হাতে পড়েনি। তবে এক পত্রলেখকের একখানা চিঠি আমাকে মাঝে মাঝে খোঁচা দেয়। পত্রলেখক লিখেছেন :—

"খেলাধূলোয় মহিলা শীর্ষক প্রবন্ধ, যেটা নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে, পড়ে বেশ ভাল লাগে। এদের মধ্যে যাঁরা সত্যিই একদিন অদ্বিতীয়া ছিলেন এবং ক্রীড়ারসিকদের মনে একটি সম্মানের আসন অধিকার করে আছেন, তাঁদের জীবনী যে শুধু ক্রীড়ারসিকদের মনোরঞ্জন করবে, তাই নয়—অনেক উদীয়মানা মেয়ে এ'দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু অল্পবয়সী মেয়েরা, যারা শুরুতেই নিজ নিজ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে এবং বাংলা ও সারা ভারত যাদের কাছে আশা করে আরও বিরাট সম্ভাবনা, তারা নিজেদের এই অসাধারণত্ব ছাপার অক্ষরে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারবে তো? অনেক অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ও জার্নালিজমের 'গ্যাস' পেয়ে অধঃপাতে যায়। ক্রীড়াবিদদের নিজস্ব উন্নতি সাধনায় 'পাবলিসিটি'র অনুপ্রবেশ অত্যন্ত অনিষ্টকর। অল্পবয়সী খেলোয়াড়দের এভাবে অসাধারণের পর্যায়ে পেঁছে দিলে এর উর্ধ্বে কিছু কল্পনা করা তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং বাংলা ও ভারতবর্ষকে যারা খেলাধূলোর কীর্তি দ্বারা ঋণী করে ক্রীড়াজগতের এক স্থিতিশীল শীর্ষে আরোহণ করেছেন, এ আলোচনা তাঁদের নিয়েই সীমাবদ্ধ থাক।"

তৃপ্তি মুখার্জী

লেখকের বক্তব্য পুরোপুরি অস্বীকার করি না। আবার সব যুক্তি মেনেও নিতে পারি না। জার্নালিজম ও পাবলিসিটির গ্যাসে অনেকে অধঃপাতে যায়, আবার অনেকে উৎসাহ পেয়ে অধিকতর প্রতিষ্ঠা অর্জনের সাধনায় ব্রতী হয়। পত্রলেখক সে কথা নিজেও স্বীকার করেছেন। বলেছেন—'অনেক উদীয়মানা মেয়ে এ'দের আদর্শে অনুপ্রাণিতও হবেন।'

প্রকৃতপক্ষে এই উদ্দেশ্যেই 'দেশ' কর্তৃপক্ষের আদেশে খেলাধূলোয় মেয়েদের, বিশেষ করে বাঙালী মেয়েদের কৃতিত্বের কথা প্রচারের প্রচেষ্টা। আশা করি, এতে যাঁদের কথা লেখা হচ্ছে তাঁরা অধিকতর কৃতিত্ব অর্জনের জন্য কঠিন সাধনায় ব্রতী হবেন—এ'দের কথা পড়ে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী মেয়েরা ব্রতী হবে অঙ্কুরিত প্রতিভা প্রকাশের প্রচেষ্টায়।

আমি আগেও লিখেছি, আজও লিখছি। খেলাধূলো এখন আর হেলাফেলার জিনিস নয়! বিলাস ব্যসন তো নয়ই। খেলা এখন জাতীয় ও সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। খেলাধূলো এক দিকে যেমন দেহ-চর্চা এবং দেহ-মনের আনন্দ ও স্ফূর্তি লাভের উপকরণ, অন্য দিকে তেমন দেশ ও জাতির সম্মান ও প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম। বিশ্ব-ক্রীড়াক্ষেত্রে যে দেশের ছেলেমেয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে তার আগে আগে চলে দেশের পরিচয়-পতাকা। জয়ের সঙ্গে বাজানো হয় জাতির জাতীয় সঙ্গীত। ক্রীড়াক্ষেত্রের প্রতিযোগিতা ও সংগ্রাম ছেলেমেয়েদের জীবন-যুদ্ধে কষ্টসহিষ্ণু ও সংগ্রামী করে তোলে। বিজয়ে বিনয়ী হবার এবং পরাজয়ে পশ্চাৎপদ না হবার শিক্ষা দেয়। খেলাধূলো ব্যক্তিগত জীবনেও সাফল্যের সোপান।

* * *

আজ যে মেয়েটির কথা বলছি ঘর-সংসারের কাজ আর বাইরের খেলাধূলো তার কাছে সমান প্রিয়। অ্যাথলেটিকসে এ মেয়েটি ছিল এক সময়ে বাঙলার এক নম্বর মেয়ে—'ফাস্টেস্ট গার্ল অব দি স্টেট'। এখন ফার্স্ট উওম্যান অব দি স্টেট। কারণ সিঁথিতে সিঁদুর পরবার পর আর কোনো মহিলা দৌড়ের প্রতিযোগিতায় পাল্লা টেনেছেন বলে আমার জানা নেই।

বিয়ের পর অনেক মেয়েকে টেবল টেনিস বা ব্যাডমিণ্টন খেলতে দেখেছি। অফিসের

স্পোর্টসে বিবাহিতা চাকুরে মেয়ের শখ করে দৌড়বার নজীরও হয়তো আছে। কিন্তু বিভিন্ন 'ওপেন স্পোর্টসে' এবং স্টেট চ্যাম্পিয়ানশিপে বিবাহিতা মহিলা প্রতিযোগিনী হিসাবে তৃপ্তি মুখার্জীই বাঙলার প্রথম।

উত্তরপাড়ার অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট সিভিল সার্জন ডাঃ মহেন্দ্র ভট্টাচার্যের কন্যা তৃপ্তি। খুব ছোটবেলা থেকেই তৃপ্তির খেলাধুলোয় আগ্রহ। সেই আগ্রহে ইন্ধন যোগান দাদা জিতেন ভট্টাচার্য, এখন যিনি চিত্তরঞ্জন টেকনিক্যাল স্কুলের প্রোফেসার। জিতেনবাবু নিজেও খেলোয়াড় ছিলেন। তাই বোনের খেলাধুলোর আগ্রহে কোনোদিন অন্তরায় সৃষ্টি করেন নি। বরং সব সময়ই উৎসাহ দিয়েছেন। উত্তরপাড়া স্কুলে পড়বার সময় উৎসাহ দিয়েছেন গেম টিচার রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

পাতলা গড়নের ছিপছিপে শ্যামলা মেয়ে তৃপ্তি ভট্টাচার্য। সবুজ ঘাসের বুকে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে উড়ে যায় সবার আগে। বালী-উত্তরপাড়ার ছোট ছোট স্পোর্টসে কোন মেয়েই আর তৃপ্তির নাগাল পায় না। এবার বালী মিল মাঠে নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে দৌড়ের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি শেখাতে আরম্ভ করেন। কিন্তু খেলার সঙ্গে পড়ার বিরোধ বাধে। পড়ার চাপে স্পোর্টস চাপা পড়ে যায়। একটি সম্ভাবনাময় বাঙালী মেয়ের স্পোর্টসের দক্ষতা শুকিয়ে যাচ্ছে দেখে ওর ভার নেন বাঙলার দৌড়পটু অ্যাথলেট অমিয় মুখার্জী। ১৯৫৬ ও ৫৭ সালে রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশিপের এক শ ও দু' শ মিটার দৌড়ে তৃপ্তি পায় তৃতীয় স্থান। ১৯৫৮ সালে এক শ মিটারে দ্বিতীয় দু' শতে প্রথম। পরের বছর দুটোতেই শীর্ষস্থান। শুধু শীর্ষস্থানই নয়। এ বছর নীলিমা ঘোষের রেকর্ড তৃপ্তি স্পর্শ করবার উপক্রম করেছিল। কিন্তু অল্পের জন্য পারল না। এক শ মিটার দৌড়ে নীলিমার রেকর্ড ১৩ সেকেন্ড। তৃপ্তি করল ১৩·১ সেকেন্ড। তবু বাঙলার 'ফাস্টেস্ট গার্ল'। জাতীয় অ্যাথলেটিকসে বাঙলার মেয়ে টীমের অধিনায়িকা তৃপ্তি ভট্টাচার্য।

বাঙলার ফাস্টেস্ট বয় তখন শ্রীরামপুরের অমিয় মুখার্জী। এক শ মিটার দৌড়ে যার ১০·৮ সেকেন্ডের রাজ্য রেকর্ড আজও কেউ ভাঙতে পারেনি। তৃপ্তির বাবা ডাঃ মহেন্দ্র ভট্টাচার্য অমিয়কেই তাঁর যোগ্য জামাতা হিসাবে মনে করলেন। অমিয়র বাবা অধ্যাপক নরেন মুখার্জীও ভাবী বৈবাহিকের ইচ্ছায় বাদ সাধলেন না। উত্তরপাড়া ও শ্রীরামপুরে কিছুদিন কথা চালাচালি হবার পর ১৯৫৯ সালের ২৪শে শ্রাবণের গোধূলি লগ্নে অমিয় ও তৃপ্তির বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর কিছু দিনের বিশ্রাম। তারপর আবার স্বামী-স্ত্রীর যুগ্ম অনুশীলন এবং যথারীতি স্পোর্টসে অংশ গ্রহণ।

সবাই দেখে অবাক হয়ে যায়। মেয়েদের তো কথাই নেই। 'ওমা, ঘরের বউ মদ্দমন্দ-দের সাথে মাঠে ঘাটে দৌড়ে বেড়ায়! কেউ বাধা দেয় না?' কিন্তু তৃপ্তি বা অমিয়র তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। তারা অ্যাথলেটিকসের পূজারী। গার্হস্থ্য ধর্মের মতই তাঁরা স্পোর্টসকে ধর্ম বলে মনে করে। অমিয়দের রক্ষণশীল পরিবারেও কোন কথা ওঠে না। বাবা, মা, দাদা, বউদি বলেন—ওরা স্বামী-স্ত্রী যদি এর মধ্যে আনন্দ পায় আমাদের বলবার কি আছে? ওদের আনন্দতেই আমাদের আনন্দ। বিবাহিত জীবনে তৃপ্তির উৎসাহ আরও বেড়ে যায়।

খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে চা খাবারের ব্যবস্থা করা, ৮টার মধ্যে স্বামী অমিয় মুখার্জীর অফিসের ভাত রেঁধে দেবার পর তৃপ্তির হাতে আর কাজ থাকে না। দুপুরে বিশ্রাম। বিকেলে শ্রীরামপুর কলেজ মাঠে দৌড়ের অনুশীলন ও ব্যায়াম এই হচ্ছে তৃপ্তি মুখার্জীর এখনকার দৈনন্দিন কাজ। বিকেলের রান্নার ভার বড় জায়ের উপর। তৃপ্তির আগ্রহ দেখে কলেজ মাঠে অনুশীলনের অনুমতি দিয়েছেন শ্রীরামপুর কলেজের রেক্টর শ্রীমন্মথনাথ বিশ্বাস।

জাতীয় অ্যাথলেটিকসে তিনবার বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করা ছাড়া তৃপ্তি মুখার্জী আন্তঃ রেল স্পোর্টসে প্রতিযোগিতা করেছেন দুইবার। প্রথম ১৯৫৯ সালে দিল্লিতে। ইস্টার্ন রেলের খেলাপ্রিয় শ্রী কে কে দাশের প্রচেষ্টায় এ বছর লিলুয়ার ডি সি ও এস অফিসে তৃপ্তি এক চাকুরি পেয়েছিলেন। তার ফলেই আন্তঃ রেল স্পোর্টসে এ'র অংশ গ্রহণ এবং এক শ মিটারে দ্বিতীয় এবং দু' শ মিটারে তৃতীয় স্থান। লিলুয়া অফিসে তৃপ্তি ৮ মাসের বেশী কাজ করেন নি।

পরের বছর দিল্লিতে আন্তঃ রেল স্পোর্টসে তৃপ্তির অংশ গ্রহণ স্বামীর দৌলতে। তবে এর পেছনে যাঁর সহৃদয় আন্তরিকতা ছিল তিনি হচ্ছেন সাউথ ইস্টার্ন রেলের সিনিয়র পার্সোনেল অফিসার মিঃ আমেদ। স্বামী অমিয় মুখার্জী সাউথ ইস্টার্ন রেলের সদর অফিসে সিনিয়র পার্সোনাল দপ্তরেরই কর্মী। রেলকর্মীদের যারা পোষ্য তাদের আন্তঃ রেল স্পোর্টসে যোগদানের অধিকার আছে। সেই যোগ্যতায় তৃপ্তি মুখার্জী ১৯৬০ সালে আন্তঃ রেল• স্পোর্টসে অংশ গ্রহণ করে এক শ ও দু' শ মিটার দৌড়ের দুই বিষয়েই দখল করেন দ্বিতীয় স্থান। রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশিপেও এ বছর দুই বিষয়ে তাঁর দ্বিতীয় স্থান বজায় থাকে।

১৯৬১ সালের স্পোর্টস মরসুমে তৃপ্তি আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। আগামীবার তিনি অনেক ভাল করবেন বলে আশা রাখেন।

স্পোর্টস ছাড়া কুমারীজীবনে নৃত্যকলা-পটিয়সী হিসাবেও তৃপ্তির সুনাম ছিল। কিন্তু নাচের চর্চা অনেক দিন আগেই বন্ধ হয়ে গেছে স্পোর্টসের জন্য। নাচের চেয়ে স্পোর্টসের মধ্যে অনেক বেশী আনন্দ তৃপ্তি মুখার্জীর। তাই স্পোর্টসকে ছাড়তে তিনি রাজী নন। কোন অসুবিধাও নেই স্পোর্টসের সাধনায়। বয়স মাত্র ১৯ বছর। স্বামী-স্ত্রী একই পথের পথিক। তুলসী-মঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেবার সময় গৃহদেবতার কাছে সংসারের মঙ্গল কামনার সঙ্গে তৃপ্তি মুখার্জীর আর একটি প্রার্থনা থাকে। সে প্রার্থনা হচ্ছে অ্যাথলেটিকসে স্বামী-স্ত্রীর উন্নতির প্রার্থনা। বাঙলার এক আদর্শ অ্যাথলেটিক দম্পতি অমিয় ও তৃপ্তি মুখার্জী।

দেশী সংবাদ

১৭ই জুলাই—স্বাধীনতার পর দুইটি পাঁচ-সালা পরিকল্পনা অতিক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতে মুষ্টিমেয় ধনী কৃষকের আর্থিক সমৃদ্ধি এবং অবস্থার উন্নতি লক্ষিত হইলেও সাধারণভাবে কৃষক সমাজের দুর্গতি বাড়িয়া চলিয়াছে।

কলিকাতার কলেজসমূহে ছাত্রভর্তি সমস্যা লইয়া এখন ছাত্রমহল হইতে শুরু করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকার, এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। প্রকাশ, কলিকাতার বৃহৎ কলেজগুলির আসন-সংখ্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে ইতিমধ্যেই তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হইয়াছে।

১৮ই জুলাই—ভারতের ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের দুইদিনব্যাপী এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। আগামী ১০ই ও ১১ই আগস্ট নয়াদিল্লিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

কলিকাতা মহানগরীকে "এত্তো জঞ্জালের আস্তাকুড়ে" পরিণত করিবার জন্য স্ট্যাণ্ডিং ওয়ার্কস কমিটিই দায়ী বলিয়া অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় বিভিন্ন কাউন্সিলার অভিযোগ করেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে "অরাজকতা চলার দরুনই" ঐ অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াও কোন কোন কাউন্সিলার মন্তব্য করেন।

১৯শে জুলাই—কলিকাতা ডক লেবার বোর্ডের বিরুদ্ধে শ্রমিক ইউনিয়নের কয়েকজন নেতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট উহার পরিচালন ব্যবস্থার ব্যাপারে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। নাবিক সংগ্রহ, ছুটি মঞ্জুর এবং সরদারদের পদোন্নতির ব্যাপারে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ ইতিমধ্যে সরকারের দরবারে উত্থাপিত হইয়াছে।

এই বছরে মেডিক্যাল কলেজগুলিকে ছাত্রদিগকে ভর্তির ব্যাপারে বেশ একটা সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে। অথচ গত বৎসর কলেজগুলিতে আসনসংখ্যা যেরূপ ছিল, এবারও সেইরূপই আছে। ছাত্রদের এবার ভর্তি হইতে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইতেছে।

২০শে জুলাই—পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বিরোধের ফলে গত পাঁচদিন ধরিয়া চলচ্চিত্র প্রদর্শন ক্ষেত্রে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, বৃহস্পতিবার তাহার অবসান ঘটিয়াছে।

অদ্য এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ সুবোধ মিত্র কলিকাতার কলেজসমূহে ছাত্রভর্তির সমস্যা সম্পর্কে আশু সুরাহার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, সমস্যাটি যতটা অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে করা হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে উহা সেরূপ নয়।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ গতকাল রক্তপিত্ত (হেমাটেমেসিস) রোগে আক্রান্ত হন এবং একবার রক্তবমি করেন। অদ্য রাত্রিতে রাষ্ট্রপতিকে ডক্টর সেনের নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করা হয়।

২১শে জুলাই—ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রীজন কেনেথ গ্যালব্রেথ অদ্য অপরাহ্নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতাদানকালে "বিদেশ হইতে নির্বিচারে মূলধন, কারিগরিজ্ঞান এবং কোম্পানীগত সাহায্যাদি ধার করিবার" ব্যাপারে সতর্ক থাকিতে পরামর্শ দেন।

২২শে জুলাই—প্রকাশ, আগামী নবেম্বর মাসে বেরুবাড়ি ইউনিয়ন হস্তান্তরের সীমারেখা চিহ্নিত করিবার কাজ শুরু হইবে এবং নেহরু-নূন চুক্তির উপঢৌকন হিসাবে ১৯৬২ সালের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী নাগাদ প্রায় সাড়ে চারি বর্গমাইল ভারতীয় এলাকা 'আনুষ্ঠানিকভাবে' পাকিস্তানের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে।

২৩শে জুলাই—অর্থনৈতিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ দ্রব্যাদি পাওয়া যাইতে পারে এমন কোন অঞ্চলের সন্ধানদাতাকে ১০০ টাকা হইতে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন। ঐ সম্পর্কিত সংবাদ কলিকাতাস্থ ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার অধ্যক্ষ অথবা নাগপুরস্থ ভারতীয় খনি সংস্থার অধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

বিদেশী সংবাদ

১৭ই জুলাই—পশ্চিম পাকিস্তানের গবর্নর গতকল্য লাহোরে সাংবাদিকদিগকে বলেন যে, খান আবদুল গফফর খানের মুক্তি এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে বিভিন্ন প্রদেশে পরিণত করার দাবিতে এ পর্যন্ত তিনশত লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন এবং ফ্রান্স আজ পশ্চিম বার্লিন সম্পর্কে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেফের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। শ্রীক্রুশ্চেফ তাঁহার প্রস্তাবে পশ্চিম বার্লিনকে একটি অবাধ নগরীতে পরিণত করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

১৮ই জুলাই—পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান নিউইয়র্কে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, তাঁহার ধারণা, কাশ্মীর প্রশ্ন সম্পর্কে ভারত তাঁহাদের (পাকিস্তানের) সহিত যে মীমাংসায় আসিবার চেষ্টা করিবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহা নিশ্চয়ই সমর্থন করিবে।

অদ্য জাপানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীহায়াতো ইকিদা তাঁহার মন্ত্রিসভার সকল সদস্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন মন্ত্রিদপ্তর পুনর্গঠনের জন্য তিনি যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, উহা তাহার প্রথম ধাপ।

রাষ্ট্রপুঞ্জ দপ্তর হইতে আজ ঘোষণা করা হয় যে, গতকাল নীম্বোতে (পশ্চিম অ্যালবার্টভিল) রাষ্ট্রপুঞ্জের ভারতীয় সৈন্যদের উপর কাতাঙ্গা সরকারের সৈন্যরা গুলী চালায়। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য পালটা গুলী চালাইয়া ভারতীয় সৈন্যরা তাহার জবাব দেয়।

১৯শে জুলাই—বন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘনিষ্ঠ মহল হইতে জানা যায়, সোভিয়েট ও পূর্ব জার্মান সশস্ত্র বাহিনী বার্লিনের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া ফেলিয়া বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সামরিক শক্তির সমাবেশ ঘটাইয়াছে। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের সংবাদে প্রকাশ যে, শহরের চতুষ্পার্শ্বস্থ ৩০ মাইলব্যাপী এলাকায় কম্যুনিস্টগণ ১২০৫টি ট্যাঙ্ক ও ২৯২টি সাঁজোয়া গাড়ি সহ ৬৭,৫০০০ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে।

ফরাসী সরকার অদ্য ঘোষণা করেন যে, বার্লিন সংক্রান্ত জটিল সমস্যা লইয়া আলোচনার উদ্দেশ্যে আগামী ৫ই আগস্ট তিনটি প্রধান পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রিত্রয় প্যারিসে মিলিত হইবেন।

ইরাকী প্রধানমন্ত্রী মেজর জেনারেল কাশেম গতকাল এক বেতার ভাষণে বলেন যে, লণ্ডনের ব্যাঙ্কসমূহ হইতে যদি কুয়াইতের আর্থিক সম্পদ তুলিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে বৃটিশ অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়িবে। তিনি বলেন, কুয়াইতে বৃটেনের দ্রুত হস্তক্ষেপের ইহাই প্রধানতম কারণ।

২০শে জুলাই—ফরাসী বিমান ও নৌঘাঁটি বিজার্তায় আজ পুনরায় ফরাসী ও তিউনিসীয় বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। আজ ভোরে তিউনিসীয় গোলন্দাজ বাহিনী অবরুদ্ধ এই ফরাসী ঘাটির উপর গোলাবর্ষণ করে এবং ফরাসী সৈনাবাহিনীর সহিত গুলীবিনিময় হয়।

২১শে জুলাই—আমেরিকার দ্বিতীয় মহাকাশ-চারী মানব ক্যাপ্টেন ভার্জিল 'গাস' গ্রিসম আজ প্রায় ১৫ মিনিট ধরিয়া মহাকাশ পরিক্রমা করিয়া নিরাপদে মর্তে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

ফরাসী কর্তৃপক্ষ তিউনিসিয়ান গবর্নমেণ্টকে চরমপত্র দিয়াছিলেন যে, বিজার্তা হইতে সৈন্য-বাহিনী অপসারণ করিতে হইবে। এই চরমপত্র প্রত্যাখ্যাত হইবার পরে ফরাসী প্যারাসৈন্য সাঁজোয়া বাহিনী সহ অদ্য প্রত্যুষে বিজার্তা শহরে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

২২শে জুলাই—নিরাপত্তা পরিষদ আজ তিউনিসিয়ায় অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতির আহ্বান জানাইয়াছেন। পরিষদে আজ এই সম্পর্কে লাইবেরিয়ার একটি প্রস্তাব ১০—০ ভোটে গৃহীত হয়। ফ্রান্স ভোটদানে বিরত থাকে।

২৩শে জুলাই—পর্তুগীজ সংবাদ সরবরাহ-কারী প্রতিষ্ঠানের খবরে প্রকাশ যে, এঙ্গোলার মাডি অঞ্চলে পুনরায় সংগ্রাম বাধিয়া উঠিয়াছে। জাতীয়তাবাদী বাহিনী কপার মাইনিং কোম্পানীর দুইটি কারখানার উপর গুলীবর্ষণ করিয়াছে। লুয়াণ্ডারও গোলমাল চলিয়াছে এবং তজ্জন্য উক্ত অঞ্চলে প্রবেশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮০। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

২৮শ বর্ষ

(২৭শ সংখ্যা হইতে ৩৯শ সংখ্যা পর্যন্ত)

DESH 40 Naye Paise.
SATURDAY, 5TH AUGUST, 1961

২৮ বর্ষ ॥ ৪০ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২০ শ্রাবণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী

এক বৃন্তে দুটি ফুল, রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। কবি ও কর্মযোগী, দুজনেরই জীবনের যাত্রারম্ভ শতবর্ষ-পূর্বে। যোগাযোগ কেবল জন্মকালের নয়। জাতীয় মানসের রূপরেখা রচনায় কবি ও কর্মযোগী, রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র, সমধর্মী, সহমর্মী ও সহযাত্রী। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সত্তর বৎসর বয়স পূর্তি উপলক্ষে জয়ন্তী উৎসবকালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "আমরা দুজনে সহযাত্রী। কালের তরীতে আমরা প্রায় এক ঘাটে এসে পৌঁছেচি। কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন। ......বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন কত যুবকের মনোলোকে, ব্যক্ত করেছেন তার গুহাস্থিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচার-শক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়াপ্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন, এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।......আচার্য নিজের জয়কীর্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।" রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন এমন প্রতিভাবান ব্যক্তির অভাব নেই; কিন্তু চারিত্রধর্মে, বহুমুখী প্রতিভাগুণে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের জাতীয় জীবনে যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন তার তুলনা বিরল।

সূর্য যেমন গ্রহমাত্র নয়, সমগ্র সৌর-মণ্ডল নিয়ে এক বিপুল জগতের স্রষ্টা, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও তেমনি সৃষ্টি করেছিলেন বিজ্ঞানসাধনার আলোকদীপ্ত একটি সুবৃহৎ পরিমণ্ডল। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই পুনরায় বলি, "তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহুচিত্তের মধ্যে।" আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনসাধনার বিস্তৃত বিবরণের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আচার্য লোকান্তরিত হয়েছেন মাত্র সতের
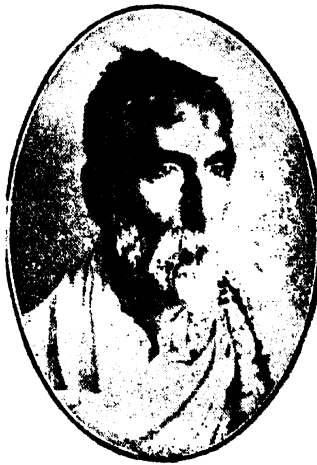
বৎসর পূর্বে, কাজেই তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের সৌভাগ্য হয়েছে এমন বহু লোক এখনও জীবিত। আজীবন কৌমার্যব্রতী, শিশুর মত সরল, নিরহংকার ও অনাড়ম্বর এই অক্লান্ত-কর্মী বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের স্মৃতি এখনও অনেকের চিত্তে জাগরূক আছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন এক বিস্ময়কর বিরাট শক্তির আধার; যে-শক্তি কেবল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায়, গবেষণাগারে তথ্য ও তত্ত্ব অনুসন্ধানে নিঃশেষিত হয়নি। তাঁর জীবন-সাধনা কোন সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না; পরাধীন দেশের অমিততেজা বিজ্ঞানসাধক মনে প্রাণে অনুভব করেছেন সমগ্র দেশ, এবং সমগ্র জাতিই তাঁর সাধনার পীঠভূমি, তাঁর গবেষণার প্রয়োগ-ক্ষেত্র। তাই কর্মে ও সংগঠনের অসংখ্য ক্ষেত্রে তিনি আপনাকে বহুরূপে নিযুক্ত ও প্রকাশিত করেছিলেন।

ভারতবর্ষে নব্য রসায়ন-বিদ্যানুশীলনের প্রবর্তক প্রফুল্লচন্দ্র, বাঙ্গালীর ব্যবসায় বিমুখতার অপবাদ মোচনে অগ্রণী প্রফুল্লচন্দ্র, সমাজ সেবায়, আর্ত-ত্রাণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ প্রফুল্লচন্দ্র, আজিকার পরিবর্তিত পরিবেশে একালের তরুণদের কাছে এ সমস্ত পরিচয়ের মহৎ ও বৃহৎ তাৎপর্য স্পষ্টভাবে প্রতিভাত না হওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রবর্তিত জ্ঞান ও কর্ম সাধনার ঐতিহ্য উপেক্ষিত হলে দেশ ও দেশের যুব সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের পক্ষে তা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় হবে। দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি এবং উন্নতির জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যে আদর্শ অনুসরণ করেছেন, নিরলস জ্ঞান ও কর্ম-সাধনার যে ধারা প্রবর্তন করে গেছেন, জাতীয় জীবনে তার সার্থকতা নিশ্চয়ই এখনও নষ্ট হয়নি।

বাঙ্গালী অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ, এ অভিযোগ অতিরঞ্জিত নয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আচারে আচরণে খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁর বিজ্ঞানসাধনার সঙ্গে ঘটেছিল ভাবুকতার অপূর্ব সম্মিলন। ভাবুকতার সঙ্গে উচ্ছ্বাসপ্রবণ ভাবালুতার অবশ্য আকাশ পাতাল প্রভেদ। শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের হাল-চাল লক্ষ্য করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক", ও তার "অপ-ব্যবহার" সম্পর্কে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যে তীক্ষ্ন বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ এবং আলোচনার অবতারণা করেছিলেন তার সমকালীন যৌক্তিকতা আমরা মেনে নিলেও বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে উদ্যোগী হইনি। বাঙ্গালীর বুদ্ধির অভাব ঘটে নি, অভাব কর্মৈষণার, অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক উদ্যম এবং অধ্যবসায়ের। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন ও মনন থেকে যা শিখবার ও ভাববার, যা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবার তা হলো তাঁর নিরলস কর্মনিষ্ঠা। আচার্যের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রার্থনা করি, বাঙ্গালী যুবশক্তি তাঁর জীবনসাধনার তাৎপর্য শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করে নব নব কর্মসংকল্পে উদ্বুদ্ধ হোক।

রা জ ক ন্যা

আলোক সরকার

তোমরা সব এসে দেখে যাও, আমার ছাদের
গোপন টবেতে আজ গোলাপ ফুটেছে।
সম্পূর্ণ আকাশ, মেঘ ভেসে যায়, ফাল্গুন মাসের
হাওয়া। তোমরা এসে দেখে যাও
দশটি পাপড়ি গাঢ় নির্নিমেষ একাগ্র জেগেছে।

আর কোনো লজ্জা নেই, যেন ভয় হতো তোমাদের
একদিন। আজ সব সংকোচ দারিদ্র্য মুছে গেছে।
কতদিন পালিয়ে এসেছি উৎসবের প্রাঙ্গণ থেকেই
যখনি দেখেছি বড়ো আলো, দুইটি হাতের উষ্ণ, সম্পন্ন ঘরের
রঙিন পর্দার কারুকাজ। সেই অন্ধকার আর নেই।

সিঁড়ির দরজা খোলা আছে। তোমরা এসে দেখে যাও।
কতদিন দরজাই খুলিনি একা ঘরে জানলাও খুলিনি
শুধু সেই গোলাপগাছের ছবি কিশোর উধাও
তেপান্তর, বালির বিস্তৃতি আরো সাতসমুদ্রের
নিমীলতা। ছাদের কার্নিসে হেলান দিয়েছে দেখি
আমি খুব চিনি
প্রণত মহিমা। সারাদিন সপ্রাণ স্বপ্নের মধ্যে মায়ার দেশের
রাজকন্যা, তাকে আমি কতো যে দেখেছি,
এসো তোমরা দেখে যাও।

বি চ্ছে দ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শিহরনে চিরকাল ব'য়ে গেলো মেঘেলা আকাশে
কাত হ'যে শুয়ে থেকে যখন বুলিয়ে দিলো হাত
পাশের কাঁটার ঝোপে: অবসন্ন বেলা প'ড়ে আসে
একেলা খেলে না নিয়ে মেতে ওঠে মুগ্ধ অধঃপাত।

শরীর, সুখের স্বার, অবিরাম চাঁদের আঘাতে
প'ড়ে থাকে জীর্ণ, ম্লান। ঝাপসা জলে ভ'রে যায় চোখ,
শান্ত ঘুমে ঢ'লে পড়ে ঝরা ফুল শেষ অঞ্জলিতে,
মর্মরিত জেগে থাকে বিষাদের অবশ কোরক।

এলানো পিঠের 'পরে আলগোছে হাত রেখে দিলো:
'কেন এত ভালোবাসা? কত রোগা হ'য়ে গেছো তুমি!
কবে এই গ্রীবা ছিলো মশালের উদ্ভাসিত শিখা?'
ভুলে-যাওয়া ধূপদানি সারা রাত চন্দন ছিটালো
চকিত চিবুক ভ'রে। সেই কবে অক্ষয় প্রণামী
সব কিছু ঢেলে দিয়ে রেখেছিলো শুধু শূন্য একা॥

বৈদেশিকী

বিজার্তার ব্যাপারে ইউনাইটেড নেশনসের যে-কেরামতি দেখা গেল তাতে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের, বিশেষ করে পৃথিবীর ক্ষুদ্র দেশগুলির, শ্রদ্ধা এবং আস্থার অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকবে। ২২ জুলাই তারিখে সিকিউরিটি কাউন্সিলে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাতে যুদ্ধ-বিরতির নির্দেশ দেওয়া হয় এবং সংঘর্ষের পূর্বে যে-অবস্থা ছিল সেই অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যও উভয় পক্ষের প্রতি নির্দেশ থাকে। অবশ্য সিকিউরিটি কাউন্সিলের উচিত ছিল সংঘর্ষের মূল কারণ দূর করার সম্বন্ধেও কিছু নির্দেশ দেওয়া। সেই মূল কারণ হচ্ছে বিজার্তায় ফরাসী নৌ এবং বিমান ঘাঁটির অবস্থিতি যেটা তিউনিসিয়ানরা আর বরদাস্ত করতে রাজী নয়। তিউনিসিয়ার ভূমি থেকে ফরাসী সামরিক ঘাঁটি সরিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন সম্পর্কে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ করার প্রয়োজনীয়তার কথাটা অন্তত সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রস্তাবে স্বীকৃত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তা সম্ভব হয়নি। তারপর ২২ জুলাই যে-প্রস্তাব পাস হল তাও ফরাসীরা অগ্রাহ্য করল। সিকিউরিটি কাউন্সিলে প্রস্তাব পাস হওয়ার পরেও ফরাসীদের গোলাগুলি ছোঁড়া চলে এবং সংঘর্ষের পূর্বের অবস্থা ফিরে আসে না, অনেক ক্ষেত্রে ফরাসীদের অনধিকার অবস্থিতি বহাল থাকে।

ইউনাইটেড নেশনসের সেক্রেটারী-জেনারেল শ্রীহ্যামারশীল্ড নিজে এসেও দেখে গেছেন যে ফরাসীরা সিকিউরিটি কাউন্সিলের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে চলেছে। আগাগোড়াই ফরাসী গভর্নমেণ্ট এ ব্যাপারে ইউ-এন-ওকে অগ্রাহ্য করেছেন। ফরাসী সরকার সিকিউরিটি কাউন্সিলের আলোচনা বয়কট করেন এবং সিকিউরিটি কাউন্সিলের প্রস্তাবে ফরাসী গভর্নমেণ্টের সমালোচনামূলক কোনো কথা থাকলে সেই প্রস্তাব ফরাসী গভর্নমেণ্ট 'ভেটো' প্রয়োগের দ্বারা নাকচ করে দেবেন এরূপ কথাও প্রচারিত হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কেউ ভাবেনি যে ইউনাইটেড নেশন্‌সের সেক্রেটারী-জেনারেল যদি সরেজমিনে অবস্থা দেখতে আসেন তা হলে ফরাসী গভর্নমেণ্ট তার সংগে কথা পর্যন্ত বলবেন না। কিন্তু ঘটনা সেইরকমই হয়েছে। প্রকৃত পরিস্থিতি কী, সিকিউরিটি কাউন্সিলের নির্দেশ প্রতিপালিত হচ্ছে কি না, ইত্যাদি দেখার জন্য শ্রীহ্যামারশীল্ড এসেছিলেন। তিউনিসিয়ান গভর্নমেণ্ট যথারীতি তাঁকে তাঁদের দিক থেকে যা দেখাবার

শোনাবার তা দেখান এবং শোনান। কিন্তু ফরাসীদের দিক থেকে—কেবল বিজার্তায় ফরাসী সামরিক কর্তাদের নিকট থেকে নয় প্যারিস সরকারের পক্ষ থেকে, শ্রীহ্যামারশীল্ড যে-ব্যবহার পান তা সত্যই অভাবনীয়। বিজার্তায় তাঁর গাড়ি ফরাসী সৈন্য কর্তৃক আটক ও তল্লাশের খবর এবং প্যারিস কর্তৃপক্ষের তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অসম্মতি প্রকাশের সংবাদ সংবাদপত্র পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন। ইউ-এন-ও'র সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে শ্রীহ্যামারশীল্ড-এর অস্তিত্ব সোভিয়েট সরকার কিছুকাল থেকে স্বীকার না করে চলেছেন। কিন্তু ইউ-এন-ও এবং শ্রীহ্যামারশীল্ডের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের দিক থেকে দ্য গল যা করছেন শ্রীখ্রুশ্চভ তার চেয়ে বেশী কী আর করছেন?

শ্রীহ্যামারশীল্ড স্বচক্ষে তিউনিসিয়ার অবস্থা দেখে এসে বলেছেন যে ফরাসীরা সিকিউরিটি কাউন্সিলের ২২ জুলাই তারিখের প্রস্তাবের নির্দেশ পালন করে নি। ২২ জুলাই-এর প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না তার আলোচনা সিকিউরিটি কাউন্সিলে আবার উপস্থিত করা হয়। যে-ভাবে সেই আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে ইউ-এন-ও'র পক্ষে তার চেয়ে লজ্জাকর আর কিছু হতে পারে না। সিকিউরিটি কাউন্সিলে কোন প্রস্তাবই পাস করা সম্ভব হয় নি। তিনরকম প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ফ্রান্সকে যতদূর সম্ভব বাঁচিয়ে প্রস্তাব রচনার চেষ্টাও করা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো প্রস্তাবই পাস করা যায় নি। কোনো প্রস্তাবের পক্ষে অন্তত সাতটি ভোট না হলে সিকিউরিটি কাউন্সিলে তা পাস হয় না। একটি প্রস্তাবের পক্ষেও সাত ভোট পাওয়া যায় নি। সুতরাং কোনো প্রস্তাব পাশ না করেই সিকিউরিটি কাউন্সিলের অধিবেশন শেষ হয়। জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে প্রশ্নটি উত্থাপনের চেষ্টা হবে কিন্তু তার দ্বারা বিশেষ কোনো ফললাভের আশা নেই।

আসল কথা হচ্ছে যে, ফ্রান্সের ব্যবহারে আমেরিকা এবং বৃটেন কিছুটা অস্বস্তি এবং উদ্বেগ বোধ করলেও ফরাসী গভর্নমেণ্টের পক্ষেই তারা আছে। তিউনিসিয়ার প্রেসিডেণ্ট বুরগুইবা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলেছেন যে, এ ব্যাপারে আমেরিকা ও বৃটেন তিউনিসিয়ার বিপক্ষে গেছে। ফরাসী গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে বলা হচ্ছে যে, 'ন্যাটো'র স্বার্থে বিজার্তায় ফরাসী সামরিক ঘাঁটি থাকা আবশ্যক। আমেরিকা ও বৃটেন যদি এ কথা মেনে নিয়ে থাকে তবে তিউনিসিয়ার সঙ্গে পশ্চিমা ব্লকের সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ততর হয়ে উঠবে। কারণ বিজার্তায় বিদেশী সামরিক ঘাঁটি থাকার বিষয়ে তিউনিসিয়ান জনমত যে-ধারা নিয়েছে তাতে ঐ ঘাঁটি অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত তিউনিসিয়ানদের আন্দোলন বন্ধ হবে না। এই নিয়ে ভবিষ্যতে ফরাসীদের সঙ্গে তিউনিসিয়ানদের আরও সশস্ত্র সংঘর্ষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান নিউক্লিয়ার যুগে 'ন্যাটো'র স্বার্থে বিজার্তায় ফরাসী সামরিক ঘাঁটি রচনা কেন অত্যাবশ্যক তা বোঝা কঠিন। অফ্রিকায় ফরাসী ঔপনিবেশিক প্রভাব জীইয়ে রাখাই বিজার্তায় ঘাঁটি রাখার প্রধান উদ্দেশ্য। এই সন্দেহই স্বাভাবিক। বিশেষত তিউনিসিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়েছে এই বোধ তিউনিসিয়ানদের হতেই পারে না যতদিন তিউনিসিয়ার ভূমিতে বিদেশী সামরিক ঘাটি থাকবে। বিজার্তায় ফরাসীদের ব্যবহার এবং হাবভাব তিউনিসিয়ানদের মনে স্বাধীনতার অপূর্ণতার বোধ খুব বেশি করে জাগিয়ে রেখেছে। সাম্প্রতিক সংঘর্ষের কথা ছাড়াও বিজার্তায় ফরাসীরা এমনভাবে চলাফেরা করে যেন তারা তিউনিসিয়ার মালিক রয়েই গেছে।

সুতরাং এই অবস্থার অবসান না হওয়া পর্যন্ত তিউনিশিয়ানরা শান্ত হবে না। ফরাসী-তিউনিসিয়ান বিরোধ চলল এবং তাতে ফ্রান্সের মিত্রদের সঙ্গেও তিউনিসিয়ার সম্পর্ক কটু হবে। অন্যদিকে যাদের সঙ্গে তিউনিসিয়ার সম্পর্ক খুব ভালো ছিল না তাদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক। অতীতে প্রেসিডেণ্ট নাসের ও প্রেসিডেণ্ট বুরগুইবার সম্পর্ক মোটেই ভালো ছিল না; শ্রীবুরগুইবার রাজনৈতিক শত্রুরা কায়রোতে আশ্রয় পেয়েছেন; ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক ও তিউনিসিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। কিন্তু বিজার্তার ব্যাপারে প্রেসিডেণ্ট নাসের তিউনিসিয়াকে বিনা শর্তে পুরোপুরি সাহায্য দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং ইতিমধ্যেই নাকি ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক থেকে অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যবিধ সাহায্য তিউনিসিয়া অভিমুখে যাত্রা করেছে। যদিও দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক এখনো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নি; অবশ্য অদূর ভবিষ্যতে তা হবে। অন্য যে-সব আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে তিউনিসিয়ার তেমন ভালো ভাব ছিল না তাদের সঙ্গেও সম্পর্কের উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলি পশ্চিমা ব্লকের বিরুদ্ধে এই সুযোগের ব্যবহার করার চেষ্টা অবশ্যই করছে। যেখান থেকেই সহানুভূতি আসুক বর্তমান অবস্থায় তিউনিসিয়া তা সাদরে গ্রহণ করবে কিন্তু কার্যত কম্যুনিস্টদের সঙ্গে মাখামাখি এখনো শ্রীবুরগুইবা কতটা চান বলা যায় না। কার্যত কেবল আরব রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে সহযোগিতা নিতেই বোধহয় তিনি আপাতত প্রস্তুত। তাতে রাজনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হয়ত ততটা হবে না। বরঞ্চ অমিশ্র আরব সহযোগিতার একটা আকর্ষণী দিক আছে এবং তার একটা বিশেষ প্রভাবও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনুভূত হবে। ফ্রান্সের সঙ্গে আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়ার বিবাদে সমগ্র আরব জগৎ একতাবদ্ধ হয়ে সাহায্য করার সুযোগ পেয়েছে। এই সুযোগের ঠিকমতো সদ্ব্যবহার হলে কেবলমাত্র তিউনিসিয়ান এবং আলজেরিয়াই উপকৃত হবে তা নয়, সমগ্র আরব জগতেরই কল্যাণ হবে। পশ্চিমা ব্লকের কর্তাদের দূরদৃষ্টি যদি সম্পূর্ণভাবে লোপ না পেয়ে থাকে তবে এখনো তাঁরা বিজার্তা ঘাঁটির মূল্যায়নে নূতন চিন্তার প্রয়োজন বোধ করবেন। বার্লিন নিয়ে যদি সত্যিই পূর্ব-পশ্চিমে বড়ো রকম একটা বিপদ বাধার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়ে থাকে তাহলে আরব জগতের সহানুভূতি হারানোর চেয়ে দশটা বিজার্তা ঘাঁটি হারানো ঢের কম ক্ষতিকর হবে। বিজার্তা সম্পর্কে পশ্চিমাদের হাবভাব দেখে শ্রীখ্রুশ্চফের পক্ষে একথা মনে করা বোধহয় অযৌক্তিক হবে না যে, বার্লিন নিয়ে শ্রীকেনেডির মুখে যেসব হাঁকডাক শুনা যাচ্ছে সেগুলি শূন্যোগর্ভ ফাঁকা আওয়াজ।

৩১।৭।৬১

পঞ্চতন্ত্র

সৈয়দ মুজতবা আলী

ভবঘুরে (১৯)

হিটলার যখন মস্কোর চৌকাঠে তখন তিনি তাঁর খ্যাতির মধ্যগগনে। ঐ সময় লাঞ্চ-ডিনার খাওয়ার পর তিনি যে-সব বিশ্রম্ভালাপ করতেন সেগুলো তাঁর সেক্রেটারি বরমানের আদেশে লিখে রাখা হয়। তারই একাধিক জায়গায় হিটলার রমণীদের সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, আমরা শহরের রঙ-চঙা সুন্দরীদের দেখে এতই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে, গ্রামের সুন্দরীরা আর আমাদের চোখে পড়ে না। অথচ তাঁর মতে সিনেমাওলাদের সুন্দরীর সন্ধানে বেরতে হলে যাওয়া উচিত গ্রামাঞ্চলে—সৌন্দর্যের খনি সেখানে।

লেখাটি পড়েছি আমি অনেক পরে, কিন্তু সেই অঝোর ঝরার রাতে কোর্টে কির্শনারকে দেখে আমার মনে এই তত্ত্বটিই আবছা-আবছা উদয় হয়েছিল। তার দেহটি তো স্বাস্থ্যে পরিপূর্ণ ছিলই, তদুপরি চোখে ছিল একটি অবর্ণনীয় শান্ত মধুর ভাব। চুল ছিল চেস্‌নাট্‌ ব্লন্ড এবং এমনি অদ্ভুত ঝিলিক মারতো যে মনে হত যেন তেল ঝরে পড়ছে, যদিও জানি ইয়োরোপের মেয়েরা চুলে তেল মাখে না।

আমার টেবিলে আসার সময় সে তার অর্ধসমাপ্ত বিয়ারের গেলাস সঙ্গে এনেছিল। ঢাউস হাফ-লিটারের পুরু কাঁচের মগ। কোর্টের চোখ দুটি ঈষৎ রক্তাভ। সেটা বিয়ার খেয়ে হয়েছে, না, চোখের জল ফেলে হয়েছে বুঝতে পারলুম না। আবার এটাও তো হতে পারে যে কেঁদে কেঁদে যখন সান্ত্বনা পায়নি তখন শোক ভোলার জন্য বিয়ার খেয়েছে। কিন্তু আমিই বা এত সেন্টিমেন্টাল কেন? পৃথিবীটা কি শুধু কান্নাতেই ভরা?

ইতিমধ্যে প্রাথমিক আলাপচারি হয়ে গিয়েছে।

আমি বার দুই বিয়ার মগের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, ময়রা সন্দেশ খায় না।'

কোর্টে হেসে বললে, 'এ-দেশেও মোটামুটি তাই। তবে আমি খাই অন্য কারণে। তাও সমস্ত দিন, এবং জালা জালা।'

এদেশে বিয়ার খাওয়াটা নিন্দনীয় নয়—বরঞ্চ সেইটেই স্বাভাবিক—কিন্তু পিপে পিপে খাওয়াটা নিন্দনীয়, আর মাতলামোটা তো রীতিমত অভদ্র, অন্যায় আচরণ বলে স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের দেশে যে রকম একটু আধটু তাস খেলা লোকে মেনে নেয়

কিন্তু জুয়ো খেলে সর্বস্ব উড়িয়ে দেওয়া পাপ বলে ধরা হয়।

কোটে কেন জালা জালা খায় সেটা যখন নিজের থেকে বললে না, তখন আমিও আর খোঁচাখুঁচি করলুম না। শুধালুম, 'আমি এখানে আসার সময় আকাশে একটা আলোর আঁচা দেখতে পেয়েছিলুম। সেটা কিসের?'

'ও, সে তো রাইন নদীর ঘাট আর জাহাজগুলোর।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আমি কি রাইনের পারে এসে পেঁ'ছে গিয়েছি?'

হেসে বললে, 'যা বৃষ্টি হচ্ছে তাতে আপনি যে আপন অজ্ঞানতে রাইন পেরিয়ে ওপার চলে যাননি সে-ই তো আশ্চর্য! আমাদের 'পাব' থেকে রাইন তো অতি কাছে। আসলে আমাদের খদ্দেরও অধিকাংশ রাইনের মাঝি-মাল্লারা। সন্ধ্যার সময় নোঙর ফেলে এখানে এসে বিয়ার খায়, নাচানাচি করে এবং মাঝে মাঝে মাতলামোও। সেলার কিনা! আজ জোর বৃষ্টি নেমেছে বলে 'পাব' একেবারে ফাঁকা। আমার আজ বড্ড ক্ষতি হ'ল।'

'আপনার ক্ষতি? আমি তো ভেবেছিলুম, আপনি এখানে কাজ করেন।'

ক্ষণতরে শ্রীমতীর মুখ একটু গম্ভীর হল। মুনিবকে চাকর বললে তার যে ভাবপরিবর্তন হওয়ার কথা। তারপর ফের একটু হাসলে। বোধ হয় ভাবল, বিদেশী আর বুঝবেই বা কি? বললে, না। এটা আমার 'পাব'। অর্থাৎ মায়ের 'পাব'। আমরা দুই বোন। ছোট বোন ইস্কুলে যায় আর 'পাব' চালাবার মত গায়ের জোর মা'র নেই। তাই আমি এই জোয়ালে বাঁধা। অবশ্য আমি কাজ করতে ভালোবাসি। কিন্তু সকাল আটটা ন'টা থেকে রাত একটা অবধি কাজ করা চাট্টিখানি কথা নয়। ছোট বোনটা ইস্কুল থেকে ফিরে এসে মাঝে মাঝে আমাকে জোর করে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেয়। অবশ্য একটা ঠিকে আছে। কিন্তু সে বেচারীর আবার শিগগির বাচ্চা হবে।'

কোটে যেভাবে সব কথা নিঃসংকোচে খোলাখুলি বলে যাচ্ছিল তাতে আমি ভরসা

কোটে কির্শনার

পেয়ে হেসে বললুম, 'তা আপনি একটা বিয়ে করলেই পারেন। এত বড় ব্যবসা, তায় আপনি সুন্দরী—'

'চুপ করো—' হঠাৎ কোটে 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে চলে এল। বললে, 'চুপ করো। আমি গাঁয়ে থাকি বলে কি গাঁইয়া? আমি কি জানিনে ইণ্ডিয়ান নর্তকীরা কী অদ্ভুত সুন্দরী হয়? বর্ণটি সুন্দর শ্যাম, মিশমিশে কুচকুচে কালো চুল, লম্বা লম্বা জোড়া চোখ, চমৎকার বাস্ট আর হিপ—'

আমি গলা খাঁকারি দিয়ে বললুম, 'তুমি অত শত জানলে কোত্থেকে?'

বললে, 'এই যে সব মাঝি-মাল্লারা এখানে বিয়ার খেতে আসে তাদের অনেকেই ভাটি রাইনে হলাণ্ড অবধি যায়। সেখানে সমুদ্রের জাহাজে কাজ নিয়ে কেউ কেউ তামাম দুনিয়া ঘুরে বেড়ায়। তাদেরই দু-একজন মাঝে মাঝে আমাকে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ছবির পোস্টকার্ড পাঠায়। বিশেষ করে যারা আমার সংগে প্রেম করতে গিয়ে খানিকটে হতাশ হয়েছে তারা ইণ্ডিয়া, ইজিপ্ট থেকে খাবসুরত মেয়েদের ছবি পাঠিয়ে জানাতে চায়, 'তুমি তো আমাকে পাত্তা দিলে না; এখন দেখ, আমি কি পেয়েছি'।'

আমি রক্তের গন্ধ পেয়ে বললুম, 'সুন্দরী কোটে, তুমি যে বললে, যারা তোমার সংগে প্রেম করতে গিয়ে খানিকটে হতাশ হয়েছে—এ কথাটার প্রকৃত অর্থ আমাকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে বলবে কি?'

কোটে বললে, 'সুন্দরী! বেশ বলেছো। চাঁদ। কিন্তু সে কথা থাক। রাত একটা বেজেছে। পোলিৎসাই স্টুণ্ডে—পুলিস-আওয়ার্স—অর্থাৎ 'পাব' বন্ধ করতে হবে। এই ঝড়-বৃষ্টিতে এখন তুমি যাবে কোথায়? উপরে চলো—'

আমি বাঙলা দেশের ছেলে। অন্য কারণে যা হোক তা হোক, কিন্তু বৃষ্টির ভয়ে আমি কারো বাড়িতে করুণার অতিথি হব—সেটা আমার জাত্যভিমানে জব্বর লাগে। অবশ্য এই পোড়ার দেশে বারান্দা, রক, ভিলিকিনি (ব্যাল্‌কনি) নেই বলে শুকনো নদীর পোলের তলা ছাড়া অন্য কোথাও বৃষ্টির সময় গা বাঁচানো যায় না। বললুম, 'দেখো, ফ্রলাইন কোটে—'

কোটের অল্প নেশা হয়েছে কি না জানিনে—শুনেছি, অল্প নেশাতে নাকি মানুষের সাহস বেড়ে যায়—কিংবা সে টেরমের-গিন্নীর মত তথাকথিতা খাণ্ডারিনী, কিংবা সত্যই প্রেমদায়িনী জানিনে। আমার দিকে কটকট করে তাকিয়ে বললে, 'চুপ!'

তারপর উঠে গিয়ে সব ক'টা জানলার কাঠের রেলিঙ পর্দা নামালে—এতক্ষণ শুধু শার্সিগুলোই বন্ধ ছিল—মেন দরজা আর সেই লিফট-পানা খাঁচার ডবল তালায় ডবল চাবি ঘোরালে, বারের পিছনে গিয়ে দু' মিনিটে ক্যাশ মেলালে, সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে পটপট করে সে ঘরের চোদ্দটা আলো নেবালে, উপরে যাবার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে আমাকে বললে, 'চলো।'

উপরে গিয়ে একটা কামরার দরজা খুলে আলো জ্বালালে। সত্যি সুন্দর ঘর। চমৎকার আসবাবপত্র। এক কোণে সুন্দর কটেজ পিয়ানো। দেয়ালে নানা দেশের তীর-ধনুক ঝোলানো। এক প্রান্তে অতি সূক্ষ্ম ডাচ লেসের কাজওলা বেড-কাভার দিয়ে ঢাকা বিরাট রাজসিক কালো আবলুশ কাঠের পালঙ্ক।

বললে, 'বসো। আমি এখন দুটো গিলবো। এই ঘরেই নিয়ে আসছি। রোজ রাত্রে আমাকে একা খেতে হয়। বড় কষ্ট লাগে। তোমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই। তবে দাঁড়াও, এই সিগরেটটা খাও।' ব'লে সেন্টার টেবিলের উপর থেকে একটি সিগরেট নিয়ে ধরালে। আমার হাতে দিয়ে বললে, 'খাও।' এ রমণী সম্পূর্ণ লৌকিকতা-বর্জিতা।

দশ মিনিট পরে এল বিরাট এক ট্রে হাতে করে। তাতে দু প্লেট সুপ, দু প্লেট সার্ডিন-সসিজ-অলিভ, গুচ্ছের রুটি-মাখন। টেবিলে সাজিয়ে, দুখানা চেয়ার মুখোমুখি বসিয়ে বললে, 'আরম্ভ করো।' আমি মারিয়ানার ঠাকুরমার মত আদেশ করলুম, 'কোটে, ফাঙে মাল আন্—আরম্ভ করো।' অর্থাৎ প্রার্থনা করো। কোটের হাত থেকে ঠং করে চামচ কাঁটা পড়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকালে॥

শার্ঙ্গদেব

সাম্প্রতিক বেতারানুষ্ঠান

বেতার সম্পর্কে অভিযোগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে অথচ কোন সমস্যারই ঠিক সমাধান হচ্ছে না। অভিযোগের সব কিছুই যে সঙ্গত এমন কথা আমরা বলি না। স্বার্থপ্রণোদিত এবং অসূয়াসূচক অভিযোগ অনেক আছে তাও আমরা জানি, কিন্তু সাধারণভাবে অভিযোগগুলি যে সত্য এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে বেতার প্রতিষ্ঠানের ঔদাসীন্য তাঁদের তৎপরতার অভাব সূচিত করে।

বেতার জগতে প্রকাশিত অনুষ্ঠানসূচীর অসম্পূর্ণতা নিয়ে গত কয়েক বছর ধরে লেখালেখি চলেছে। অনেক বক্তা, গায়ক-গায়িকার নাম দৈনিক অনুষ্ঠানের বিবরণীতে ছাপা হয় না; বিশেষ করে কথিকা, বা সাহিত্যের আসরগুলি অত্যন্ত অবহেলিত। এই অসঙ্গত ব্যবহারের কারণ খুঁজে পাওয়া আমাদের সাধ্যাতীত। যদি কাগজের বরাদ্দ কম থাকে তাহলে তাকে বাড়ানো দরকার। কন্ট্রাক্টের ব্যাপারে গোলযোগ থাকলে সেগুলি মিটিয়ে ফেলা উচিত। সকলেই চান পরিচিত ব্যক্তিগণ তাঁদের বেতারানুষ্ঠান শুনবেন—উপযুক্ত প্রচারের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যদি তা না হয় তাহলে তাঁদের পক্ষে ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। এ ছাড়া অনেকের প্রফেশনের দিক থেকেও ক্ষতি হয় এই প্রচারের অভাবে। এর সঙ্গে একটা মস্ত বড় সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে আছে—সেই সেন্টিমেন্টকে আঘাত করা সরকারের পক্ষে নিষ্ঠুরতা।

অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে গতানুগতিকতা ব্যতীত পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না—এও আর একটি অভিযোগ। পল্লীমঙ্গল একটি অনুষ্ঠান যা এক ঘণ্টা ধরে হয়ে থাকে অথচ কাশীনাথের গ্রাম্যতা ছাড়া আর সরস কোন উপাদান এতে যোগ করা না। এই অনুষ্ঠানে বেশিরভাগ সরকারী আমলাদের পুঁথিপড়া এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, এন্টমলজি, ডেয়ারি, ভেটারিনারি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের নোট জাতীয় বক্তৃতা শুনতে হয়। উচ্চারণ এবং বাচনভঙ্গীর কথা না তোলাই ভাল। পরিচালনার সময় কথা বলতে বলতে হঠাৎ গান শোনাবার একটা বাতিকও দেখা যায়। এটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। আপনি আমার বাড়িতে এলে আমি আপনার কুশল প্রশ্নের পরই যদি বলি —আচ্ছা এবারে একটা গান শুনুন এবং মাঝে মাঝেই দুচার কথার পর এ রকম গান

বাজনা শোনাতে চেষ্টা করি তাহলে আপনি আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করবেন। কিন্তু পল্লীমঙ্গল আসরের কথাবার্তা এই অস্বাভাবিক নিয়মেই চলে। তবু পল্লীমঙ্গলে এমন জিনিস শোনবার অবকাশ হয় যা সাধারণত শোনা যায় না। কথকতা, তর্জা, রামায়ণ গান প্রভৃতি কয়েকটি লুপ্ত আর্ট প্রচারের কিছু কিছু ব্যবস্থা এখানে হয়ে থাকে। কিন্তু এই প্রচারগুলির কোন মূল্য দেওয়া হয় না। বেতার জগতে এই একঘণ্টাব্যাপী অনুষ্ঠানের কোন বিবরণীই পাওয়া যায় না। পলিসি ম্যাটার হিসাবে ওটা আছে ওই রকমই থাক—কর্তৃপক্ষের ধারণা বোধ করি এর বেশী কিছু নয়। অসংলগ্নতা পরিহার করে গুছিয়ে প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারলে এটি অনেক বেশী উপভোগ্য অনুষ্ঠানে পরিণত হতে পারে।

নাটক বেতারের একটি প্রধান অনুষ্ঠান। গুরুত্ব সহকারেই এটি প্রচার করা হয় কিন্তু এ সম্বন্ধেও অভিযোগ কম নয়। প্রায়ই দেখা যায় নাটকগুলি সার্থকভাবে পরিবেশিত হয় না। এমন জায়গা নাটকের ছেদ পড়ল যেখানে শ্রোতার কৌতূহল আদৌ নিবৃত্ত হল না। অনেক নাটকের প্লট বোঝা দুঃসাধ্য, সংলাপ এবং ঘটনার বিন্যাস অস্বাভাবিক। আজকাল রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পকে নাট্যে রূপায়িত করবার একটা প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছে। এ চেষ্টার মধ্যে অপটুতা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না এবং এর প্রশ্রয় প্রদান না করাই সংগত। এই-সব নাটককে উপলক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে যথেচ্ছভাবে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত করা হচ্ছে—গল্পগুলির আকৃতি পাল্টে যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে প্রকৃতিও। রবীন্দ্র সাহিত্যকে প্রচার বা ব্যবসার ক্ষেত্রে কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর বিরুদ্ধে সাহিত্য জগতের গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণ কোন অভিমত প্রকাশ করেন নি। বহু নাটকের অভিনয়ও যে আশানুরূপ হয় এমন নয়। অনেকে বোধ হয় তাঁদের ভূমিকা অনুষ্ঠানের আগে পড়েও দেখেন না। অনেকের উচ্চারণের বিকৃতিও অতিশয় পীড়াদায়ক।

বিশেষ অনুষ্ঠানস্বরূপ মাঝে মাঝে সংগীতালেখ্য প্রচার করা হয়। সেই ছড়ার মত কবিতা আর একঘেয়ে সুর। অথচ এই অনুষ্ঠানগুলিতে সংগীত সৃষ্টির যথেষ্ট সুযোগ বর্তমান। এক্ষেত্রেও বেতার কর্তৃপক্ষ ভাল রচনার জন্য তেমন উদ্যোগী নন, কোনও রকমে কর্তব্য পালন করতে উৎসুক। অথচ চেষ্টা করলে এইসব অনুষ্ঠান থেকে নতুন আর্টের সূত্রপাত করা সম্ভব হয়। বেতারের প্রচেষ্টায় কোনও উত্তম সংগীত সৃষ্ট হয়েছে এমন উদাহরণ খুব কম। বেতার প্রতিষ্ঠান তাঁদের সুযোগ অবহেলায় নষ্ট হতে দিচ্ছেন। রবীন্দ্রপরবর্তী যুগের কাব্যসংগীতে নতুন উপাদান যোগ করবার এইটাই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সময় অথচ বেতার প্রতিষ্ঠান এদিকে কোন মনোযোগই আজ পর্যন্ত দিয়েছেন এমন প্রমাণ পাওয়া গেল না। ক্লাসিকাল সংগীত সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহের কথা তাঁরা মাঝে মাঝে ঘোষণা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পার আসরে অবনতির লক্ষণই অধিকতর স্পষ্ট। গানের বন্দেশকে উপেক্ষা করে আচমকা বাহাদুরি করবার প্রলোভন বাড়তির পথে চলেছে। বরঞ্চ বাজনার দিকে কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায়—এ'দের অনেকের প্রকৃতি শিক্ষা এবং নিষ্ঠা আছে। কিন্তু এ'রা বেতারের উৎসাহে তৈরি হয়েছেন এমন অনুমান করা ভুল বরঞ্চ বেতার প্রতিষ্ঠান এ'দের যোগ্যতায় সুযোগ গ্রহণ করেছেন। অনেকের রাগপ্রধান গান শুনে মনে হয় তাঁরা খেয়াল এবং ঠুংরীতে কৃতিত্বের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু শুনেছি বেতার কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে তাঁদের উৎসাহ দিতে নারাজ। কিন্তু এ'দেরই কেউ কেউ যখন দু চারটে কনফারেন্সে গেয়ে নাম করবেন তখন বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাজে লাগাতে দ্বিধা করবেন না।

নিয়মিত সংগীতানুষ্ঠানের মধ্যে রবীন্দ্র সংগীত এবং অতুলপ্রসাদের গান ক্রমেই পুনরাবৃত্তিতে পর্যবসিত হচ্ছে। বাংলা গানকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করা হয়নি এবং বাংলা গানের পরিবেশন সম্পর্কে কোন পরিকল্পনাও বেতার প্রতিষ্ঠানের নেই। এর ফলে রবীন্দ্র সংগীতের মত উত্তম জিনিসও একঘেয়ে হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অতুলপ্রসাদের গান সম্বন্ধে একটু কড়াকড়ি করা ভাল। অতুলপ্রসাদের চাল গলায় আনা শক্ত। সামান্য দু-একজন শিল্পীর গলায় অতুলপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় বাকি স্বরলিপি থেকে তোলা এবং যাঁদের সাহায্যে এই উত্তোলন কার্য সমাধা হয় তাঁরাই মূল আসামী। ডাক্তারদের আগে রোগমুক্ত হওয়া আবশ্যক। অবশ্য, শিল্পীদের নিরুৎসাহ করতে আমরা বলি না, কিন্তু তাঁদের বুঝতে দেওয়া ভাল কোন গানের কোনটা আসল রূপ।

মোট কথা, বেতারের অনুষ্ঠান থেকে এমন প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে না যাতে বিশ্বাস হয় যে সংগীত বা সাংস্কৃতিক ব্যাপারে উন্নতির একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা তাঁদের আছে। এরই ফলে বেতারের সহায়তায় কোনও শিল্প বা শিল্পী তৈরি হতে পারছে না। বেতার প্রতিষ্ঠান জনপ্রিয়তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এটা আমাদের কারুর পক্ষেই গৌরবের বিষয় নয়। রেডিও সেটের চাহিদা অবশ্য বাড়ছে, কিন্তু তার কারণ প্রয়োজনীয়তা। কেনাবেচার হার থেকে জনপ্রিয়তা নির্ণয় করাটা মনকে প্রবোধ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

অবশেষে ক্ষেমেশ ও পরমেশ প্রসিদ্ধ গৌড়ীয় উন্মাদাগারে ভর্তি হয়ে একেবারে ঠিক পাশাপাশি ঘরে স্থান পেল। যারা ওদের ইতিহাস জানতো কপালে হাত ঠেকিয়ে বল্‌ল, একেই বলে নিয়তি। যারা জানতো না কিছুই বুঝতে পারলো না। গল্পটা তাদের জন্যেই লিখত।

ক্ষেমেশ ও পরমেশ এক গাঁয়ের বাসিন্দা, প্রতিবেশী বললেই চলে। যুদ্ধ বেধে উঠতে যখন ইষ্টক খণ্ড থেকে পিষ্টক খণ্ড পর্যন্ত সমস্ত বস্তু ক্রেয় পদার্থ হয়ে উঠল আর দামটাও নাকি শনৈঃ শনৈঃ টাইফয়েড জ্বরের তাপমাত্রার মতো বাড়তে বাড়তে নিরীহ জনসাধারণের সাধ্যের অতীত হয়ে গেল তখন ওরা বল্‌ল, চলো ব্যবসা করা যাক।

ওরা কেবল প্রতিবেশী নয়, বাল্যকাল থেকে এক ডাণ্ডা গুলিতে খেলা করেছে, গুরুমশায়ের কাছে এক বেতে মার খেয়েছে, আর বাল্যকালের এই ঐক্য বাড়তে বাড়তে যথাসময়ে দুজনের এক সঙ্গে গুম্ফ শ্মশ্রুর রেখা দেখা দিয়েছে আর অবশেষে দুইজনে একই পিতার দুই কন্যাকে বিবাহ করে নৈমিত্তিক যোগাযোগকে নিত্য যোগাযোগে পারিণত করে ফেলেছে। তাই যখন তারা এজমালিতে ব্যবসার প্রস্তাব করলো কেউ বিস্মিত বোধ করেনি। তখনো তারা মানে যারা ওদের ইতিহাস জানতো কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেছিল, একেই বলে নিয়তি।

স্থির হল যে ক্ষেমেশ গ্রামে গ্রামে ঘুরে মাল সংগ্রহ করবে আর পরমেশ কলকাতায় বসে বিক্রি করবে। যুদ্ধের কৃপায় এখন কেনাবেচার কাজ অত্যন্ত সহজ। একমাত্র ক্রেতা মিলিটারি বিভাগ, ক্রেতা খুঁজে বার করতে হয় না, সে-ই বিক্রেতাকে খুঁজে বার করে। আর আগেই বলেছি বিধাতা চরাচরে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সমস্তই এখন ক্রয়যোগ্য বস্তু। এহেন যুদ্ধাবস্থাকে মানুষে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবে এমন দুঃস্বপ্ন একমাত্র অব্যবসায়ীরাই দেখে থাকে।

ইতিমধ্যে পরমেশ একটি প্রমাণ সাইজের দাড়ি গজিয়ে ফেলল। এ দাড়ি আধিভৌতিক নয়, আধিদৈবিক। বিবর্তনবাদের যে নিয়মের বশে জিরাফের গলা লম্বা হয়, বাঘ ও জেব্রার গায়ে ডোরা দেখা দেয়, রাজনৈতিকগণের কণ্ঠস্বর উচ্চ ও গতিবুদ্ধি প্রচ্ছন্ন হয় সেই অমোঘ নিয়মের তাড়নাতেই পরমেশের দাড়ি গজালো। মিলিটারির সঙ্গে কারবার করে অল্পদিনেই সে বুঝে ফেলেছে সাহেব লোকের কাছে, বিশেষ মার্কিন সাহেব লোকের কাছে, "হোলি বিয়ার্ডের" বড় মর্যাদা। পরমেশ যখন উচ্চাঙ্গের হাসিতে "হোলি বিয়ার্ড" আলোকিত করে পাঁচ টাকার জিনিসের দাম পঁচিশ টাকা বলতো তিন-তারাওয়ালা মার্কিন জেনারেল বাঁ হাতের

মার্কিন জেনারেল

বুড়ো আঙুলে গুদামঘর দেখিয়ে দিয়ে পাইপ চাপা অধরোষ্ঠে অব্যক্তস্বরে অর্ধোক্ত বলতো—ও.কে হোলি বিয়ার্ড। জঙ্গী সমাজে পরমেশ এখন দি হোলি বিয়ার্ড নামে পরিচিত।

এদিকে পরমেশ দাড়ি গজিয়ে বিক্রির সুবিধে করে নিয়েছে জানতে পেরে ক্ষেমেশ একটি প্রমাণ সাইজের শিখা গজিয়ে ফেলল। তার অভিজ্ঞতা এই গ্রামাঞ্চলে জিনিস খরিদের কাজে শিখা বড় সহায়ক।

দা ঠাকুর এসেছেন বসতে দে বলে যে-চাষী গেরস্ত অভ্যর্থনা করতো, জিনিস বেচবার পরে হিসাব করতে গিয়ে দেখতে পেতো যে দা ঠাকুর তাকেই বসিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। পরমেশের জবাপুষ্প সমন্বিত শিখাগ্র গ্রামে গ্রামে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে ফিরতে লাগলো। মোট কথা অল্প দিনের মধ্যে ভারতীয় সনাতন শ্মশ্রু ও সনাতনী শিখার কৃপায় ওদের ব্যবসা হরিণগেলা অজাগরের পেটের মতো ফুলে উঠল। তখন ওরা পৈত্রিক মাটকোঠার বাড়ি ভেঙে ফেলে দিয়ে ইষ্টকালয়ের পত্তন করলো। বাড়ি দুটোর ভিত যখন কোমর পর্যন্ত উঠেছে তখন কুমারিকা থেকে কাশ্মীর অবধি নড়ে উঠল, গান্ধীজী হাঁক দিয়েছেন "ভারত ছাড়ো।"

এই "ভারত ছাড়ো" হাঁকের সঙ্গে ইংরাজের ও আমাদের গল্পের ভাগ্য অপ্রত্যাশিতভাবে জড়িত। ইংরাজ ভারত ছেড়ে গিয়ে বাঁচলো আর তাদের ভারত ছাড়া করতে গিয়ে আমাদের গল্পের ভরাডুবি ঘটলো। এবারে আরম্ভ করি সেই ভরাডুবির পালা।

॥ ২ ॥

বছর তিনেক পরে ক্ষেমেশ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে (ইংরাজকে ভারত ছাড়াতে সে জেলে গিয়েছিল) গ্রামে ফিরে এসে দেখলো যে তার বাড়ির ভিত তেমনি কোমর অবধি আছে আর পরমেশের বাড়ির তে-তালার ছাদের উপরে পরমেশের দীর্ঘ শ্মশ্রু তাকে কৃষ্ণ পতাকা প্রদর্শন করে বাতাসে মন্দ মন্দ আন্দোলিত হচ্ছে। এসো এসো ভাই ক্ষেমেশ, তুমি আসবে সংবাদ পেয়েই দাঁড়িয়ে আছি।

ক্ষেমেশ বলল—তুমিও জেলে যাবে বলেছিলে শেষে কি হল?

সব ঠিকঠাক, এমন সময়ে বাপুজির এক গোপন দূত এসে বলল, তোমার উপরে হুকুম এ অঞ্চলের আন্দোলন চালাতে হবে, জেলে গেলে তোমাকে চলবে না।

তা আমার বাড়িটা ওঠেনি কেন?

পাগল নাকি? বাড়ি শেষ হলে সরকার নিশ্চয় বাজেয়াপ্ত করে নিতো।

এটুকুও তো নিতে পারতো।

ছেলের হাতের মোয়া আর কি। আমার নামে ট্রান্সফার করে রেখেছি না।

ব্যবসা কেমন চলছে?

ব্যবসা কার সংগে। ঐ সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে! ছিঃ! পরমেশের ঐ সংক্ষিপ্ত ছিঃ শব্দটির মধ্যে স্বাধীনতাকামী ভারতের ধিক্কার ধ্বনিত হয়ে উঠল।

টাকা কড়ি?

একটি বিড়ি বের করতে গিয়ে মন্তব্য করলো, সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি কি না, হাঁ, বলছিলে? টাকা কড়ি? কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব নীচে নামিয়ে বলল, সব স্বাধনীতা সংগ্রামে খরচ হয়ে গিয়েছে। একবার ভেবেছিলাম একটা তালিকা রাখি, কিন্তু পাছে পুলিসের হাতে পড়ে তাই আর সে চেষ্টা করিনি।

তা যা হয়েছে হয়েছে, এখন বাড়িটা আমার নামে ট্রান্সফার করে দাও।

এখনো বিপদ কাটেনি, আগে ইংরেজ ভারত ছাড়ুক।

তা আমার স্ত্রী পুত্র কোথায়?

তাদের মাতুলালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়স্বজনের সংগে সাক্ষাৎ হতেই ক্ষেমেশ প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারলো কিন্তু তখন আর কী করবার আছে। দু'চার দিন পরে সে কলকাতায় চলে এলো।

কলকাতায় আসতেই শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুবান্ধবরা বললো, মামলা করো।

ক্ষেমেশ বললো, আমি কপর্দকহীন।

সে জন্য ভেবো না, আমরা জোগাড় করবো। তখন সে কিছু পুরাতন দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ করে উকীল বাড়িতে হাঁটা-হাঁটি শুরু করে দিল।

পরমেশ আগেই ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে সমস্ত নগদ টাকায় রূপান্তরিত করেছিল আর সে টাকা কিনা দেশের কাজে ব্যয় হয়ে গিয়েছে। কাজেই তাকেও সময়োচিত বেশ পরিবর্তন করতে হল। 'দি হোলি বিয়ার্ডের' সমর্থক গেরুয়া জামা কাপড়, রুদ্রাক্ষের মালা, ললাটে রক্তচন্দন, হাতে কমণ্ডলু—ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত কিছুমাত্র ত্রুটি হল না। শত্রুরা কানাঘুষায় বলতে শুরু করলো যে ক্ষেমেশ যাতে পাগল হয়ে যায় সেই উদ্দেশ্যে তান্ত্রিক অভিচার শুরু করেছে সে। কারণ সে নাকি উকীলের সংগে পরামর্শ করে জেনেছে যে বাদী পাগল প্রতিপন্ন হলে মামলা চালাবার অধিকার হারায়।

তখন বন্ধুরা এসে ক্ষেমেশকে দুঃসংবাদটি দান করলো (এসব কাজে বন্ধুর কখনো অভাব হয় না) ওহে পরমেশ যে তান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে।

আমি করেছি হাইকোর্টে নালিশ।

সেই সংগে তান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করতে আপত্তি কি?

উদ্দেশ্য?

ও তোমাকে উচাটন কিনা পাগল করতে চায়, আমাদেরও সেই ক্রিয়া আরম্ভ করা উচিত যাতে ও পাগল হয়ে যায়।

এসব পরামর্শ বড় অগ্রাহ্য হয় না। কাজেই এ পক্ষ থেকেও অভিচার শুরু হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে একদিন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। পথে দেখা হওয়ায় পরমেশ ও ক্ষেমেশ পরস্পরকে আক্রমণ করে বসল। একজনের হাতের কমণ্ডলু ও অপরের বগলের নথীপত্র ধুলোয় লুটোতে লাগল। পাঁচজনে মিলে ছাড়িয়ে দিলে। দুইজনেই একযোগে থানায় গিয়ে First Information লিখিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। তারপর থেকে তারা আত্মীয়স্বজন কর্তৃক গৃহে অবরুদ্ধ। কাজেই আর মারামারির আশংকা রইলো না। কিন্তু আধিভৌতিক
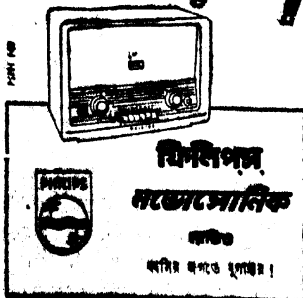
উৎপাতের পথ বন্ধ হলেও আধিদৈবিকের পথ খোলাই রইলো—আর অচিরে ফলও ফলল সেই পথে। প্রথমে ক্ষেমেশ পাগল হয়ে গেল, তার কিছুদিন পরে পরমেশ। যারা আধিদৈবিকে বিশ্বাসী তাঁরা বললেন হতেই হবে, মন্ত্র তো মিথ্যা হতে পারে না। আর যাঁরা আধিভৌতিকেই সন্তুষ্ট তাঁরা বললেন, এর চেয়ে অনেক কম বিপদে লোকে পাগল হয়ে যায়—এ আর এমন নূতন কি?

প্রথমে ক্ষেমেশ গিয়ে ভর্তি হল গোড়ীয় উন্মাদ আশ্রমের ১৩ নম্বর ঘরে, কয়েক দিন পরেই ১৪ নম্বর ঘরে ভর্তি হল পমরেশ। যারা ওদের ইতিহাস জানতো বলল: নিয়তি। যারা জানতো না তাদের জন্যই নেপথ্য বিবরণ প্রকাশ করলাম। পরবর্তী ঘটনা সকলেরই অজ্ঞাত—তা এবারে সবিস্তারে বর্ণনা করছি।

॥ ৩ ॥

পরদিন পরমেশ ও ক্ষেমেশের আত্মীয়-স্বজন হাসপাতালে গিয়ে ওদের ভাবগতিক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

একি ব্যাপার! দু'দিন আগেও যারা পরস্পরকে খুন না করে জলগ্রহণ করবে না প্রতিজ্ঞায় বধ্ধ ছিল; একজন বলতো ওর দুঃশাসনী বুকের রক্তপান করবো—অপর জন বলতো দুর্যোধনের মতো ওকে ভগ্নউরু করবো; আজ তাদের একি অপ্রত্যাশিত সৌভ্রাত্র। সবাই দেখলো ওরা দুজন বারান্দার একপাশে পাশাপাশি চেয়ার টেনে নিয়ে পরম নিশ্চিন্তভাবে বিশ্রম্ভালাপে নিযুক্ত। ওরা আত্মীয়দের দেখেও দেখলো না, বরঞ্চ চেয়ার দু'খানা আরও ঘনিষ্ঠভাবে টেনে নিল।

সবাই গিয়ে রেসিডেণ্ট ডাক্তারকে শুধালো, স্যার ব্যাপার কি?

তিনি বললেন, নইলে আর উন্মাদ রোগ বলছে কেন?

কিন্তু ধরুন হঠাৎ যদি আবার খুন চেপে যায়!

আমরা আছি কেন?

কিন্তু স্যার পীনাল কোড বলেও তো একটা ব্যাপার আছে!

পাগলের আচরণ পীনাল কোডের অধিকারের বাইরে। তা ছাড়া তেমন হওয়ার আশঙ্কা নেই, তবে নিরাময় হয়ে উঠলে কি হয় কে জানে!

ওরা সবাই বলল, না, না, নিরাময় হলে আর এমন হবে কেন। তা স্যার, কতদিন লাগবে?

এখন থাকুক কিছুদিন, ওদের কেস একেবারে হোপলেস নয়।

উন্মাদাগারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিকিৎসা হয়ে থাকে এপর্যন্ত সবাই জানে কিন্তু ঠিক তার প্রকৃতিটা অল্প লোকেরই পরিজ্ঞাত। ব্যাপারটা জানাজানি হলে সংসারে পাগলের সংখ্যা কমতো বই বাড়তো না। এখন রীতিটা বৈজ্ঞানিক হলেও খুব কঠিন নয়। প্রত্যেক রুগীকে একটা করে ঘরে আবদ্ধ করে চার পাঁচজন বলবান ব্যক্তি লাঠি-পেটা করতে থাকে; যতক্ষণ না রুগী একেবারে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ে। অবশ্য প্রকাশ্য অপারেশন থিয়েটারে নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান যন্ত্রপাতি এবং

বিশ্রম্ভালাপে

ঔষধাদি সজ্জিত আছে—সেসব কেবল রুগীর আত্মীয়স্বজনদের অভিভূত করবার উদ্দেশ্যে।

যথাকালে প্রাতঃকালে পাশাপাশি ১৩ নম্বর ও ১৪ নম্বর ঘরে যথাশাস্ত্র চিকিৎসা আরম্ভ হয়ে যায়। তখন উক্ত দুই ঘর থেকে আর্তরব উঠতে থাকে, "কোথায় ভাই পরমেশ বাঁচাও!" "কোথায় ভাই ক্ষেমেশ বাঁচাও।" কিন্তু কে কাকে বাঁচাবে—দুজনেরই সমান অবস্থা। ক্রমে উচ্চকণ্ঠ মৃদু ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে, বোঝা যায় এবেলার মতো Treatment সাঙ্গ হল। আত্মীয়স্বজন এত জানতে পারে না, তারা প্রকাশ্য স্থানে বিচিত্র চিকিৎসা সরঞ্জামগুলো পরস্পরকে ইঙ্গিতে দেখায় আর মুগ্ধ হয়ে ফিরে যায়—রুগী সেরে উঠলো বলে।

সব হাসপাতালেরই চিকিৎসা রীতি প্রায় একই রকমের, তবে কিছু উনিশ বিশ থাকা অসম্ভব নয়। এই জন্যেই হাসপাতালে অভিভাবকের প্রবেশের সময় সংকীর্ণ। তবু যে মাঝে মাঝে আত্মহত্যা ও গুম খুনের সংবাদ পাওয়া যায় সে কেবল ব্যবস্থার ত্রুটিতে।

প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে ওদের আত্মীয়-স্বজন আসে, প্রতিদিন ওদের তন্ময় ঘনিষ্ঠ প্রীতি মুগ্ধ ভাব দেখে—আর বুকভরা সংশয় নিয়ে ফিরে যায়, ভাবে হয়তো তখনই ওরা পাগল ছিল, এখনই প্রকৃতিস্থ।

ওদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে একজন পার্টটাইম রাজনীতিক ছিল, বিশ্বের হিত চিন্তা ছাড়া আর কিছুই তার মাথায় আসে না, সে তো রীতিমতো একটা সিদ্ধান্ত করে বসল। তার সিদ্ধান্ত এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের একমাত্র উপায় কেনেডি, ক্রুশ্চেফ, মাও-সে-তুং প্রভৃতিকে উন্মাদাগারে প্রেরণ। তবে নেহরুকে প্রেরণ করা চলবে না। তিনি গোড়া থেকেই বেজায় প্রকৃতিস্থ। কিন্তু কেমন করে অব্যবসায়িগণ বুঝবে যে এই প্রকৃতিস্থতার মূল কারণ হচ্ছে ডজন-

অনেক দুর্ধর্ষ বলশালী ব্যক্তি, যাদের কখনো কখনো ডন কুস্তি করতে দেখতে পেয়েছে ওরা হাসপাতালের বাগানের মধ্যেই কিন্তু বুঝতে পারেনি তাদের সার্থকতা।

একদিন ওরা হাসপাতালে আসতেই ভিজিটিং সার্জেন মেজর ভোঁসলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হাঁ, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার-যোগ্য ডাক্তার বটে, মুখমণ্ডল যদি বাংলাদেশে হয় তবে উদরটা গুজরাটে। সবসুদ্ধ মিলে একটা বিধাতার বিস্ময়ের হাঁ।

ওরা কেমন আছে, স্যার।

আমার তো মনে হয় ইম্প্রুভমেণ্ট হচ্ছে, আশা করি মাসখানেকের মধ্যে রিলিজ করে দেওয়া সম্ভব হবে!

ওরা উঁকি মেরে দেখলো। এখন আর কাছে যায় না, তাতে নাকি রুগীদের রি-অ্যাকশন খারাপ হয়। পরমেশ ও ক্ষেমেশের মুখ কিছু গম্ভীর, আর চেয়ার দুখানাও তেমন ঘনিষ্ঠ নয়।

মেজর ভোঁসলা

ভালো কোথায়! এ যে পূর্ববৎ হতে চলল।

ডাক্তার বলল, আপনারা বললে তো শুনছি না, আমাদের রিপোর্ট ফেভারেবল।

হবেও বা, ভাবতে ভাবতে ওরা চলে যায়।

রুগী ভালোর দিকে, এখন আর সবদিন আত্মীয়স্বজনরা আসে না, ৪।৫ দিন পরে পরে এসে সংবাদ নিয়ে যায়।

সেদিন এসে দেখলো পরমেশ ও ক্ষেমেশ বারান্দায় দুই বিপরীত প্রান্তে চেয়ার টেনে নিয়ে উপবিষ্ট, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না, কেবল একবার একবার পরস্পরের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। আরও মনে হল এতদিনে যেন ওরা চিনতে পারছে আত্মীয়দের।

তবু সন্দেহ যায় না।

কি ব্যাপার ডাক্তারবাবু, আবার কি রিল্যাপ্স করবে নাকি?

রিল্যাপ্স কোথায়? আমাদের মেশিন ক্রমেই অধিকতর অনুকূল রীডিং দিচ্ছে—ওরা দ্রুত আরোগ্যের পথে।

কিন্তু ওদের ভাবগতিক দেখে—

ভাবগতিক যাই হোক, আমাদের ইলেকট্রো লুন্যাসিগ্রাফ মেশিন তো মিথ্যা বলতে পারে না, ওদের লুন্যাসির কোএফিসিয়েণ্ট প্রায় নরম্যালসির কাছাকাছি এসেছে, এখন যে কোন দিন রিলিজড্ হবে, আপনারা প্রস্তুত থাকবেন।

পরদিন ভোরে ওদের বাড়ীতে এমার্জেন্সী মেসেজ পৌঁছলো, শীঘ্র আসুন, রুগী সম্পূর্ণ নরম্যাল হয়েছে, এখনি নিয়ে যেতে হবে।

ওরা গাড়ী নিয়ে ছুটে গিয়ে উপস্থিত হল। রুগীরা কোথায়?

আফিস ঘরের মধ্যে পরমেশ ও ক্ষেমেশ ৭।৮ জন বলশালী লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দণ্ডায়মান। কাছেই মেজর ভোঁসলা। আত্মীয়স্বজন উপস্থিত হতেই রুগীরা ছাড়া পেলো, আর সেই মুহূর্তেই দুজনে হিংস্র জাগুয়ারের মতো পরস্পরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে পরস্পরকে ভূপাতিত করলো।

আজ শালার দুঃশাসনী রক্তপান করবো।

আজ শালার দুর্যোধনী উরুভঙ্গ করবো।

একি কাণ্ড স্যার?

রুগীরা পারফেক্টলি নরম্যাল হয়েছে, ইলেকট্রো লুন্যাসিগ্রাফের রীডিং।

কিন্তু অবস্থা এযে পূর্ববৎ হ'ল—

তাহলে বুঝতে হবে তখনি ওরা নরম্যাল ছিল।

তবে এতদিন কী অবস্থা চলছিল?

সেটাই এবনরম্যাল, অস্বাভাবিক।

তবে উন্মাদে আর প্রকৃতিস্থে ভেদ কিসের?

দৃষ্টির। আমাদের দৃষ্টিতে ওরা এতদিনে নরম্যাল হয়েছে, এবারে বাড়ী নিয়ে যান।

তখন দুইপক্ষ গর্জমান, লম্ফমান। পরস্পরকে হন্যমান প্রকৃতিস্থ পরমেশ ও ক্ষেমেশকে গাড়ীতে চাপিয়ে আত্মীয়েরা বাড়ী ফিরে চলল।

আগের ভাব ভাষা আচরণ ফিরে পেয়েছে কাজেই ওরা প্রকৃতিস্থ ছাড়া আর কী।

। পত্রাবলী ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ২০৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রানী, যেটা আমার নিত্য কাজ এতদিন পরে দেখচি সেটাতে আমার মন বসচে না। মন চঞ্চল হয়েচে বলেই যে এটা ঘটল তা নয় মন স্তব্ধ হয়েচে বলেই বাহিরের তাড়ায় সে আর আগের মতো সাড়া দিতে চায় না। ডুবো জাহাজ থেকে মাল তোলবার একটা ব্যবসা আছে, সেই কাজের ডুবারির মত অবকাশের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে নিজের সমস্ত ডুবে যাওয়া দামী দিনগুলোকে উদ্ধার করে আনবার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠচে। অন্য সব কাজের পক্ষে যে-উদ্যম আবশ্যক তার তেজ বোধ করি ক্রমেই কমে এল তাই এই গোধূলির আলোয় নিজের অন্তরতর সঙ্গলাভ করবার জন্যে মনটা আজ আত্মনিবিষ্ট হয়ে আছে। এবারে দার্জিলিং গিয়ে কোনো কাজ করিনি সেইখানে এই পূর্ণ অবকাশের স্বাদ পেয়েছিলুম। সেই জন্যেই নরভূপের সঙ্গে পরামর্শ হয়েছিল কার্সিয়ঙে একটা বাসা বাঁধবার। গঙ্গায় যদি বোটে থাকা যায় তা হলেও বোধ হয় ছুটি জমানো সহজ হবে। কিন্তু গিরিনন্দিনী যদি সুলভ না হন তা হলে গিরিরাজ আছেন। একটি বুদ্ধিমান সেবকের দরবার তোমার কাছে জানিয়েছিলুম—পশুপতিকে বাদ দিয়ে আর কারো খবর যদি তোমার জানা থাকে তাহলে চিন্তা করে দেখ। তুমি স্থাবর অস্থাবর মাল যোগাবার জন্যে জেনেরাল এজেন্সি খুলেচ বলে কোনো জনশ্রুতি নেই তবু ক্ষণে ক্ষণে তোমার কাছে দরখাস্ত দাখিল করা ওটা বোধ হয় একটা নিষ্কাম প্রয়াস। অর্থাৎ অভাব ব্যক্ত করবার জন্যেই, ফল পাবার জন্যে নয়।

শরৎকালের মত ভাবগতিক। মেঘও আছে স্তূপে স্তূপে, রৌদ্রও আছে খরতর, দুটোই একসঙ্গে। শ্রাবণ তেড়ে এসে এক একদিন নিজেকে সপ্রমাণ করবার চেষ্টা করে, খুব ঝমাঝম বৃষ্টি পড়ে, মাঠ ভেসে যায়, বড়ো বড়ো গাছগুলো তাদের অচল গাম্ভীর্য ভুলে গিয়ে মাতামাতি করতে থাকে। তারপরেই দেখি পালা শেষ হয়ে যায়, আকাশকে যেন নিকিয়ে দিয়ে গেল, শূন্য আকাশটায় জাজিম বিছিয়ে দিয়ে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ এসে দখল করে। চেয়ে চেয়ে দেখি, আর এক একবার মনের মধ্যে এই কথাটা আসে যে, এই রকম দেখে-নেওয়াটা দুর্লভ।—ভিতর থেকে কে এইসব দেখিয়ে দিলে এই সত্তরটা বছর—কত চলতি মুহূর্তের খেয়ায় বোঝাই-করা কত আশ্চর্য রকমের যোগাযোগ!

তোমরা কি এবারকার হস্তাশেষের রেলপথে এ অঞ্চলে আসচ? একটা জরুরী কাজে প্রশান্তকে ডেকেছিলুম। ইতি ১৮ই শ্রাবণ ১৩৩৮।

কবি

বরানগরে আমাদের বাড়িতে পশুপতি বলে একটি ছেলেকে আমরা রেখেছিলাম। সে দরিদ্র, পড়ার খরচ চালাতে পারে না বলে সাহায্যের জন্যে প্রথম আসে। তাকে বাড়িতে রেখে বুঝেছিলাম পড়ায় তার কিছুই মন নেই, অন্য কাজেও নয়। সে বেশ আরামে খেয়ে ঘুমিয়ে পুকুরে মাছ ধরে দিন কাটাতে লাগলো। একবার কবি যখন সেই সময়ে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন একদিন পশুপতি কোন এক নিভৃত সময়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির। নিজের দুঃখ দুর্দশার কথা বর্ণনা করে কবিকে বলে যে তিনি যদি তাকে কোনো একটা কাজে ভরতি করে নেন তো দরিদ্রের বড় উপকার করা হবে। তিনি কোনো কাজ তাঁর হাতে খালি নেই বলাতে পশুপতি বলে, "কেন? ঐ তো অমিয়বাবু আপনার সেক্রেটারির কাজ করছেন। তাঁকে সরিয়ে দিয়ে সেই কাজটাই তো আমাকে দিতে পারেন।" সেদিন বিকেল বেলা চায়ের টেবিলে আমার সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হোলো খুব হাসতে হাসতে বললেন, "রানী, তোমার ঘরে এই পশুপতি বলে পদার্থটিকে কোথা থেকে সংগ্রহ করেছ?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি তাকে কেমন করে দেখলেন? সে তো কখনও উপরে আসে না।" হেসে বললেন "তুমি যখন আমাকে আমার ঘরে নিরাপদে বিশ্রামের উপদেশ দিয়ে নিজে দিবানিদ্রার লোভে পরিত্যাগ করে চলে যাও তখন তোমার এই পশুপতি প্রভৃতি অনুচরেরা আমাকে নিঃসহায় জেনে এসে আক্রমণ করে। আজ সে এসে প্রস্তাব করলে যে আমি তো অনায়াসেই অমিয়কে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় ওকে নিতে পারি। আমি যখন বললুম অমিয়র কাজটা তুমি পারবে কেন? তাতে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে, সে আর এমন বেশী কি শক্ত কাজ? আমি তো বাংলা লিখতে পড়তে জানি, তাছাড়া ইংরাজীও 5th class পর্যন্ত পড়েছি। বোধ হচ্চে যেন তোমার ঘরে ক্রমাগতই এখন দুপুরবেলা আমার উপর পশুপতির আক্রমণ চলবে শেষ পর্যন্ত অমিয়র চাকরিটা টিকলে হয়।" এর পরে অনেকবার পশুপতিকে নিয়ে আমাদের ঠাট্টা চলেছে।

॥ ২০৪ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

রানী, প্রশান্তর খবর শুনে উদ্বিগ্ন হলুম। কিছু কাল থেকে দেখতে পাচ্চি আমাদের দেশে ব্যামোর সঙ্গে লড়াই শুরু হলে তার যেন অন্ত পাওয়া যায় না। চিকিৎসাও রকম বেরকমের—কিন্তু কিছুতে যেন ব্যামোর জন্তু মরতে চায় না। আমাদের দেশের জল হাওয়ায় জঙ্গল বেড়ে ওঠে, নিড়েনি চালিয়ে চালিয়ে তাকে কাবু করা অসম্ভব—আমাদের দেশে শরীরে রোগের বীজ একবার ঢুকলে আগাছার মতো হুহু করে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় মাঝে মাঝে দেশ থেকে দূরে চলে যাওয়াই শরীরকে নিরাময় রাখবার একমাত্র উপায়। দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে হাওয়া বদল করবার মতো জায়গাও বিরল। এই বর্ষার সময় বোধ হয় কোনো জায়গাই নেই যেখানে আরাম পাওয়া যায়।

মোটের উপর, আমার বিশেষ কোনো রোগ নেই—আছে কেবল হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা। কেদারা হেলান দিয়ে যদি চুপচাপ পড়ে থাকি তা হলে দেহটাকে নিয়ে কোনো প্রকার বোঝাপড়া করবার দরকার থাকে না। কিন্তু দেহটাকে স্তব্ধ যদি রাখতেই

হয় তা হলে তার সঙ্গে মনটাকেও শান্ত করতে পারলে হয় ভালো। আমার পক্ষে বোধ হয় মনের জন্যে হাওয়া বদল করা দরকার। কাজের ভাবনা জমে ওঠে, তাদের পরিষ্কার করে ফেলতে পারিনে। পরিচিত মানুষদের সঙ্গ ও দাবি বেড়ার মতো ঘিরে থাকে, খুচরো দায়িত্বগুলো মনের চারদিকে ভিড় করে আসে। অথচ রীতিমত কাজে নিমগ্ন হওয়ার মধ্যে যে একটা আন্তরিক নিরিবিলি পাওয়া যায় শক্তির অভাবে সেটাও অসাধ্য। আমি কাজও করতে পারি নে, অবকাশও পাইনে। বর্ষাকালের চিৎপুর রোড—পা চালানোও শক্ত, নৌকাও চলে না। এবারে দার্জিলিঙে গিয়ে একেবারে কাজের বাইরে চলে যেতে পেরেছিলুম, নিস্তব্ধতার ডুবজলে। একলা বসে আপন মনে খুব একটা গভীর তৃপ্তি পেতুম। আমার জীবনে বর্তমান যুগে এইটের বিশেষ প্রয়োজন আছে। পিছনে অবসানপ্রায় দিন, সামনে রাত্রি—এর মাঝখানে যে সন্ধ্যা তার যে শান্তি, যে সৌন্দর্য, মনের মধ্যে তার জন্যে একান্ত একটি আকাঙ্ক্ষা রয়েছে।

বর্ষামঙ্গলের তালিম চলচে—অন্য অন্যবারে আমি বিশেষ ঔৎসুক্যের সঙ্গে তাতে যোগ দিতুম। ঔৎসুক্যের কারণ হচ্চে একটা মনোহর জিনিসকে সম্পূর্ণ করে গড়ে তোলবার আনন্দ আছে, ওটা আর্টিস্টের আনন্দ। সেইটেতে টানত। জিনিসটা বেশী কিছু নয়; ক্ষণকালের, তবু তখনকার মতো সেটা সমস্ত মনপ্রাণকে পেয়ে বসত। যেমন পেয়ে বসে ছবি আঁকায়—সে ছবি এঁকে ছিঁড়ে ফেলবার যোগ্য হলেও যতক্ষণ আঁকা যায় ততক্ষণ তার চেয়ে গুরুতর আর কিছুই থাকে না। কিন্তু এবারে বর্ষামঙ্গলের আয়োজনেও আমি নিরাসক্ত। তাই মনে হচ্চে জীবনে আর একটা যুগের আহ্বান এসেচে।

আসচে রবিবারে বর্ষামঙ্গল হবার কথা। প্রশান্ত যদি ভালো থাকে ত এসো। হয়ত এখানে এলে শরীর একটু আরাম পেতেও পারে। ঘোরতর বাদলা চলেচে। হুহু করে পুবে হাওয়া বইচে, আর অবিশ্রাম বৃষ্টি। ইতি ৩০ শ্রাবণ ১৩৩৮

কবি

॥ ২০৫ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

এবার বর্ষামঙ্গলে তোমাদের আসা হোলো না তার থেকে বুঝচি প্রশান্ত এখনো সুস্থ হয় নি। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে কী বললে জানবার জন্যে উৎসুক আছি।

আজ উৎসব। যথেষ্ট রিহার্সালের অভাবে কিছু কাঁচা আছে কিন্তু বৈচিত্র্য যথেষ্ট। লোকের ভালো লাগবে বলেই আশা করি। প্রস্তাব হচ্চে দিন দশেক পরে কলকাতায়, বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যের জন্যে, এটা দেখানো যাবে। যদি ঘটে ওঠে তা হলে তোমাদেরও দেখা হয়ে যাবে।

শরীরটা ভালো নেই—ক্লান্তির উপরে দেখা দিয়েচে লাম্বেগো।

প্রশান্তর খবর দিয়ো। ইতি ৫ ভাদ্র ১৩৩৮

কবি

পুঃ এইমাত্র তোমার চিঠি পেলুম। প্রশান্তকে শাসনে আনতে পারচ না, এটাও তার একটা সম্পূর্ণ নূতন ব্যাধির লক্ষণ। নিজের শরীর নষ্ট করতে বসেচে তার উপরে তোমার খ্যাতি। আমার দেহ সম্বন্ধে আমার ব্যবহার পুরুষোচিত। শরীরটাকে দেখি ঘরের গৃহিণীর মতো—সেই আমাদের সেবাযত্ন করবে এই কথাটাই ধরে নিয়েচি—আমরা যদি তার সেবায় লাগি সেটা দেখায় স্ত্রৈণতার মতো। সে যে কখন খাবে, কখন শোবে, কখন বিশ্রাম করবে তা নিয়ে সর্বদা তম্বির করা আমাদের ধাতে লেখে না। একটু আধটু অসুখ করলেই কাজ বন্ধ করে ঘরে দরজা দিয়ে পড়ে থাকবে এটা সইতে পারিনে। এই নির্মমতা নিয়ে পুপে পর্যন্ত আমাকে ভর্ৎসনা করতে আরম্ভ করেচে। কোমরভাঙা দেহটাকে ডেস্কে নিযুক্ত করে লেখাচ্ছি এই দৃশ্যটা কোমলহৃদয়াদের ভালো লাগচে না। কিন্তু যতদিন ওর পরমায়ু ততদিন ওর নিস্তার নেই।

আমাদের বোট পৌঁছেছে চন্দননগরে—ওটাকে খড়দহে এনে বাঁধতে হবে।

আজ বৃষ্টি হলে বর্ষামঙ্গলের নাম সার্থক হবে কিন্তু কাজ হবে মাটি। ইতি ৫ ভাদ্র ১৩৩৮

কবি

॥ ২০৬ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

প্রশান্তর শরীর সম্বন্ধে তুমি যা লিখেচ সেটা ভালো শোনাচ্চে না। শরীর ভাঙতে আরম্ভ হলে তাকে ঠেকানো শক্ত হয়। প্রশান্তর শরীর এ পর্যন্ত ভালোই ছিল, রোগের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হয় নি—সেইটেই হয়েচে মুশকিল। ব্যামো জিনিসটা ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। তার ফল হয়, একদিন তাকে বিশ্বাস না করে আর চলে না। বিশ্রামের চেয়ে দরকার স্থানান্তর। আর কোথাও যেতে না পারো আমাদের বোটে গিয়ে উঠে পড় না। সেটা বুঝি আছে চন্দননগরে।

বন্যার ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করা যাচ্চে। কলকাতায় কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু ক্লান্তি এত গভীর যে কোনো কাজেই একটুও গা লাগচে না। ছুটির জন্যে মন উৎসুক হয়ে আছে। আগেকার মতো শিলাইদহে পদ্মার চরে গিয়ে বাসা বাঁধতে পারতুম তো বেঁচে যেতুম। সে দিন আর ফিরবে না।

কালিদাস(১) প্রভৃতিরা এখানে উপস্থিত। রবীন্দ্র-জয়ন্তীর কাজে। আমার মন ওর থেকে বিমুখ হয়ে আছে। ১২ ভাদ্র ১৩৩৮

কবি

---

(১) শ্রীকালিদাস নাগ।

॥ ২০৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

কলকাতায় অভিনয় করা স্থির হয়েচে—তাই নিয়ে ব্যস্ত আছি—অথচ শরীরটা বেশ সতেজ নয়—ভিতরে ভিতরে কেবলি ইচ্ছে হয় ছুটি নিতে। ছুটি নেবার মতোই চারদিকের ভাবগতিক। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, প্রায়ই মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্চে। গাছপালা এমন সবুজ আর কখনো দেখেচি মনে পড়ে না। এ বাড়িতে আমারি স্থানান্তর ঘটে, একটা আমার মুশকিল হয়েচে, আমার সেই জানলা গেছে হারিয়ে। উপর থেকে বাইরে তাকিয়ে থাকবার সুখ আমার মারা গেল। একতলায় একমাত্র সুবিধে সিঁড়ি হাঁটতে হয় না। এখানে মাটি পেয়েচি কাছে, কিন্তু আকাশ অনেকখানি লোকসান হয়েচে।

সুভাষ বোস কাল থেকে এখানে। বন্যার চাঁদায় আমার নাম চান। তার চেয়ে বেশী কিছু চান না বলে নিশ্চিন্ত হলুম। আমরা এদিকে বিশ্বভারতীর নামে 'দুর্গত সহায়' কার্য খুলেচি নইলে দলাদলির আবর্তে পড়ে বিপন্ন হতুম।

মাঝে মাঝে মধ্য-য়ুরোপ থেকে অটোগ্রাফ প্রার্থীদের অনুরোধ পাই। সেই সঙ্গে প্রায়ই তারা আমার ফটোগ্রাফ

পাঠায়। সেই ফটোগ্রাফে তুমি আমার পার্শ্ববর্তিনী। ফটোগ্রাফের ঠিক কোন্‌ অংশের প্রতি তাদের লক্ষ্য তা বুঝতে পারি প্রার্থীদের নাম বিচার করে। আজ যে চিঠি এসেচে সেটা এল্‌সা নামধারিণীর কাছ থেকে। সেই জন্যেই উৎসাহ করে বেশ মোটা অক্ষরে নিজের নাম সই করে দিয়েচি।

প্রশান্ত কেমন আছে খবর দিয়ো। ও কি ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগচে? ব্যামোর প্রকৃতি কি ধরতে পেরেচ? আমার তো মনে হয় কিছু দিন আমাদের বোটে গিয়ে যদি থাকো তা হলে উপকার পেতে পার। কলকাতায় গিয়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

রামানন্দবাবু এখানে কিছুকালের জন্যে এসেচেন। পুরাতন ছাত্রদের কুটির ভাড়া নিয়েচেন। তাঁর শরীর ভালো নেই।

দেশের অবস্থা আলোচনা করে মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে আছে। আমাদের বয়সে সমস্ত দায়িত্ব মন থেকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে পারলেই ভালো হয়। কাজ করবার দিন গেছে অথচ ভাবনা করবার দুঃখ কেন বহন করি? এদেশে সবচেয়ে যে কারণে আমার বয়স বাড়িয়ে দেয় সেটা হচ্চে এই যে, বুদ্ধি বলে একটা সচল পদার্থ বিধাতার সৃষ্টিতে কোথাও যে আছে সে কথা এখানে অনুভব করা যায় না। বয়স যখন অল্প ছিল তখন চারদিকের হাওয়ায় চিত্তশক্তির স্পর্শ সর্বদাই পেতুম— আর সাহিত্যচর্চার কি নিরন্তর ঢেউ খেলত। আজকালকার দিনে রাশিয়ান নভেলের তর্জমা ছাড়া আর সাহিত্যই নেই— কবিতার দিন ফুরিয়েছে। এদিকে তো এই, অন্যদিকে কি অশান্তি, কী দৈন্য—অন্তরেও যেমন বাহিরেও তেমনি। খুব দূরে কোথাও পালাতে ইচ্ছা করে যেখানে মন-ওয়ালা মানুষ আছে এবং রস-ওয়ালা কথা। তাপস হয়ে যে অরণ্যে বেরিয়ে যাব সে সম্বন্ধেও একটা গুরুতর অভাব আছে—কৰ্ণিকাটা উল্টে দেখলে বুঝতে পারবে। ইতি ১৮ই ভাদ্র ১৩৩৮

কবি

॥ ২০৮ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

শরৎ ঋতুটা যেন অতি ধীরে ধীরে ছোঁয়, অল্প একটুখানি শিশিরলাগা ঠাণ্ডা দিয়ে। আকাশে ফিকে পাতলা বাষ্পের উপর সূর্যোদয় সূর্যাস্ত নানা রঙের কারচুপি করে— সুরাঙ্গনাদের জন্যে সূক্ষ্ম ঢাকাই মলমলের রঙীন ওড়না তৈরি হচ্চে। রোদ্দুরে আশ্বিনের রঙ লেগেছে, চারদিকে গাছপালা ঘন সবুজ। বেলা এগারোটা পেরিয়ে গেল, বর্ষার আপিস থেকে ছুটি পাওয়া মেঘগুলো কালো চাপকান খুলে ফেলে সাদা চাদর উড়িয়ে কুঁড়েমি করচে। একটা অত্যন্ত হালকা অথচ অতিশয় বৃহৎ কুঁড়েমি সমস্ত বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে— গাছগুলোর পাতায় পাতায় ছুটির নেশা লাগল—কিছু না, কেবলি ঝিলমিল্‌ ঝিলমিল্‌ করচে। শরতের এই ছুটির আসর এখানকার অবারিত আকাশ ও দিগন্তবিস্তৃত মাঠ ছাড়া আর কোথাও ধরে না। মনকে আমার ঘরছাড়া করে দিয়েচে, কোনো কাজকর্ম করতে ইচ্ছে করচে না, সুদূরের পিয়ালায় শূন্যে ছুটে চলচে। গুন্‌গুন্‌ গান করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে নয়, উড়তে উড়তে যেন মৌমাছির পাখা দিয়ে।

কাজ ছাড়ানো খেয়া তরীর দাও উড়িয়ে পালখানা,
ছুটির ঢেউয়ের মাতন বেগে নাকাল করুক হালখানা॥

ইতি ১৮ আশ্বিন ১৩৩৮

কবি

॥ ২০৯ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

এবারে শরীরটা একটু বেশী দুঃখ দিচ্চে—ক্লান্তি ও দুর্বলতা কানায় কানায় ভরে উঠেচে। কতকগুলো কর্তব্যকর্ম ডেস্কের উপর চিত হয়ে পড়ে মুখ তাকিয়ে আছে, আজ হবে কাল হবে করে পাশ কাটিয়ে চলেচি। আমার চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবে ক্লান্ত মনের চিঠি। জাহাজের একটা চাকা ভেঙে গেলে যেমন অনিচ্ছুকভাবে সেটা চলে সেই রকম। মধ্যাহ্নটা বড়ো কেদারায় বড়ো রকম গা এলিয়েই পড়ে থাকি। বিকেল বেলায় কুচো কুচো কাজ, সকাল বেলাও তাই। একটুখানি পায়ে হেঁটে বেড়াবার চেষ্টা করি, বেশীক্ষণ চলে না। গোড়ার দিকে শরৎ ঠাণ্ডা মেজাজে ছিল, লাগছিল ভালো। কিছু কিছু কাজ করবারও উদ্যোগ করেছিলাম। এখন আকাশে গরম ভিজে কম্বলের ফোমেণ্টেশন চলচে, কখনো কখনো এদিকে ওদিকে মেঘ দেখা দেয়, ব্যর্থ আশ্বাসে ধরণীকে পীড়িত করবার উদ্দেশে।

পণ করেছিলুম ছুটিটাকে শিউলিফুলের গন্ধ দিয়ে মজিয়ে নিয়ে এইখানেই কাটাবো। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হোলো। দার্জিলিঙে যাওয়ার তাগিদ আসচে সেটাকে অস্বীকার করতে পারলুম না। পুপে লিখচে দাদামশায় গেলে সে খুশী হবে, ধরে নিচ্চি কথাটা অকৃত্রিম সত্য—মায়াবিনী জানে দাদামশায়ের দুর্বলতাটা কোন্‌খানে।

পরশুদিন এখানকার ছুটি। আজ হবে আনন্দবাজার— কাল হবে ছুটির গায়েহলুদ, অর্থাৎ ছুটির অগ্রিম পাওনা— বাক্স গোছাতে বোঁচকা বাঁধতে দিন কাটবে। ওরা চলে গেলে আরো দু-চার দিন থাকব। তার পরে হিমাচল। আমার বিশ্বাস প্রশান্তর পক্ষে দার্জিলিং গিরিধির চেয়ে উঁচুদরের জায়গা হতো—প্ল্যান পরিবর্তন করবার এখনো সময় আছে। ইতি ২৩ আশ্বিন ১৩৩৮

কবি

রূপময় ভারত

ভারতবর্ষের শৈল-শহরগুলির ভিতর সিমলার একটু বৈচিত্র্য আছে। গ্রীষ্মকালে সাত হাজার ফিটের বেশি উঁচু এই শহর থেকে হিমালয়ের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাদি যেমন দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি শীতকালে এই স্থানে তুষারপাত ঘটে থাকে। বৃটিশ আমলের অতি আকর্ষণীয় স্থান সিমলা আজ পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের রাজধানী। (১) সিমলা শহরের প্রাণকেন্দ্র ম্যাল-এর একাংশ, (২) ও (৩) শহর থেকে উত্তর ও দক্ষিণের পর্বতরাজির দৃশ্য, (৪) ম্যাল-এ বসে বয়স্কদের সকালের রোদ উপভোগ, (৫) কঠোর পরিশ্রমী রিক্সাচালক (৬) বাজার এলাকায় পরিচ্ছন্ন সহজ পথ, (৭) পাহাড় ছাড়িয়ে সিমলা শহর।

আলোকচিত্রশিল্পী

নীরোদ রায়

১

২

৩

জৈন মন্দিরে বিদেশী শিল্প

মৃণাল গুপ্ত
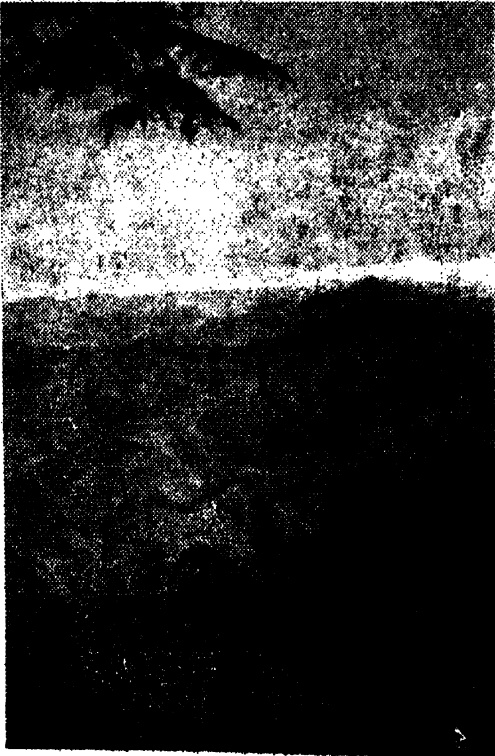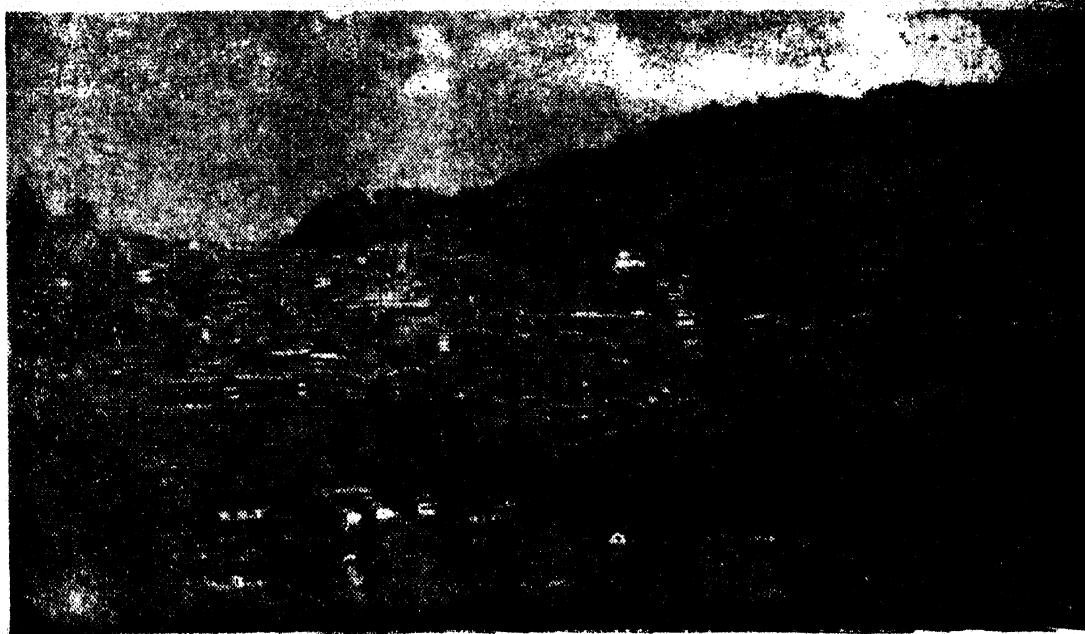
কলকাতা থেকে এক শো পঁচিশ মাইল উত্তরে, শিয়ালদহ-লালগোলাঘাট রেলপথে, নশীপুর রোড একটি ছোট্ট স্টেশন। এই স্টেশনে নেমে অপরিসর রাস্তা ধরে পশ্চিমে সোজা মাইলখানেক হাঁটলে যে জায়গায় পৌঁছানো যায়, তার নাম মহিমাপুর। এর সম্মুখে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী, বাঁ পাশে ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদ শহর আর ডান পাশে রয়েছে জৈন তীর্থ জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ টাউন। মনকে প্রলুব্ধ করতে পারে, এমন কোন ঐতিহাসিক চেহারা আজ আর মহিমাপুরে অবশিষ্ট নেই। অথচ আজ থেকে মাত্র দু' শো বছর আগে মনকে লুব্ধ করার মত কোন সম্পদের অভাবই এই মহিমাপুরে ছিল না। আসমুদ্র হিমাচলের শ্রেষ্ঠ কোটিপতি মুর্শিদাবাদের শেঠ পরিবারের আবাস ছিল এই মহিমাপুর অঞ্চলেই। সেদিন এখানে যেমন আকাশচুম্বী সুরম্য অট্টালিকা ছিল, তেমনি ছিল ধনদৌলত আর হীরা-মাণিক্যের এক বিরাট সম্ভার। জনশ্রুতি

পীটার ব্রুখেলের (১৫২৫-১৫৬৯) অঙ্কিত একটি চিত্র
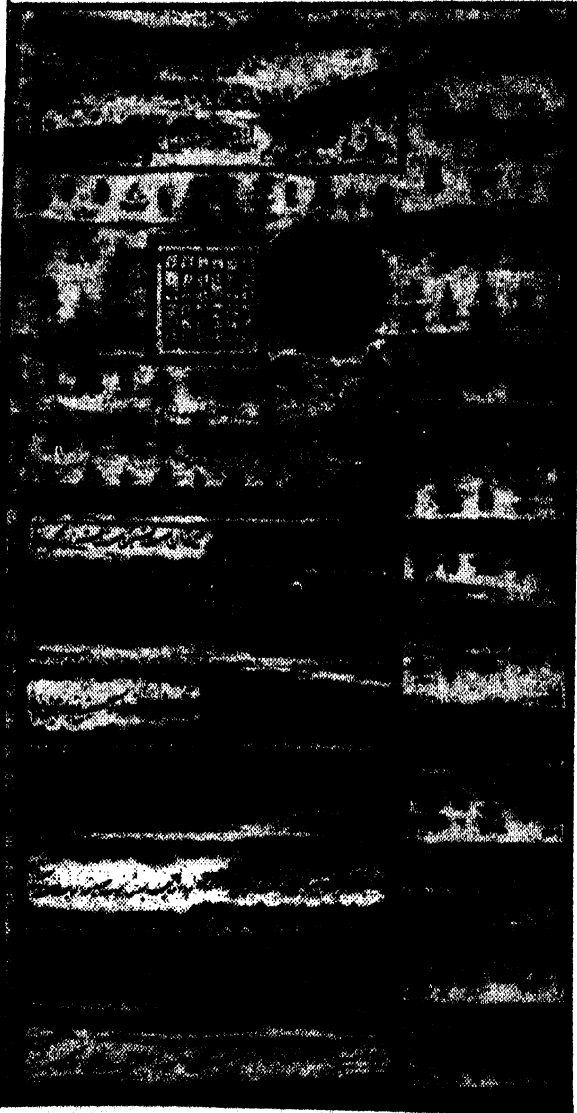
দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক শেঠ পরিবারকে 'জগৎশেঠ' উপাধি দেওয়ার হুকুমনামা.

আছে, এই শেঠ পরিবারের বিপুল অর্থ ভাগীরথীর স্রোতস্বিনী ধারার গতিরোধের স্পর্ধা করত। কিন্তু এগুলো সবই অতীতের কথা। কাল আর ভাগীরথীর নিপুণ ভাঙ্গনে পূর্ব-সমৃদ্ধির খুব সামান্য চিহ্নই আজ এখানে অবশিষ্ট। যা রয়েছে তা শুধু মহিমাপুরের অতীত বৈভবের হৃতসর্বস্ব রূপ। তবু যাদের চোখ রয়েছে তারা আজকের এই হৃত-সর্বস্ব রূপের মধ্য থেকেই বিস্মিত হবার মত বিষয়বস্তু খুঁজে নিতে পারেন। এবং এই বিস্ময়-বস্তুটির সন্ধান মিলবে শেঠ পরিবারের নবনির্মিত জৈন মন্দিরের গাত্র অলংকরণের মধ্যেই। বর্তমান মন্দিরটি খুব প্রাচীন না হলেও, এর নির্মাণ-উপকরণ ও গাত্র অলংকরণের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে, যা আজকের এই নিবন্ধের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

এখন এই মন্দিরের বিস্তারিত প্রসঙ্গে আসার পূর্বে শেঠ পরিবারের সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, শেঠ পরিবার বাংলা দেশের আদি বাসিন্দা নয়। এদের পূর্বপুরুষ শেঠ মানিকচাঁদের সময় থেকেই মুর্শিদাবাদে শেঠ পরিবারের গোড়া পত্তন। মানিকচাঁদের পিতা হীরানন্দ শাও ছিলেন রাজপুতানার নাগরের অধিবাসী। এই হীরানন্দ শাওর আর্থিক অবস্থা প্রথম দিকে ছিল খুবই অসচ্ছল। আর্থিক অনটনে ক্লিষ্ট হীরানন্দ একদিন অরণ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে পরিত্যক্ত এক ভগ্ন অট্টালিকায় একটি মুমূর্ষু বৃদ্ধের সন্ধান পান। হীরানন্দের অক্লান্ত সেবায় তুষ্ট এই বৃদ্ধটি মৃত্যুকালে তাঁর সারা

জীবনের সঞ্চিত ধন হীরানন্দকে প্রদান করেন। সেদিন থেকেই শেঠ পরিবারের গৃহে ভাগ্যলক্ষ্মীর শুভাগমন। হীরানন্দ তাঁর সপ্তপুত্রের হাতে সেই ধন তুলে দিয়ে তাদের ভারতের বিভিন্ন অংশে ব্যবসার্থে প্রেরণ করেন। মানিকচাঁদ ছিলেন এই সপ্তম পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। প্রথমে ঢাকায় ও পরে নবাব মুর্শিদকুলীর একান্ত সহচর হয়ে মানিকচাঁদের মুর্শিদাবাদে আগমন এবং ধীরে ধীরে রাজনৈতিক প্রতিপত্তি লাভ। এই মানিকচাঁদের সময় থেকে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিতে শেঠ পরিবারের ভূমিকা ছিল খুবই সক্রিয়। অগণিত অর্থের মালিকানাই শেঠ পরিবারকে রাজনৈতিক প্রতিপত্তির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। বাংলা দেশে এমন নবাব ছিলেন কিনা সন্দেহ যিনি অর্থের জন্য শেঠ পরিবারের কৃপাপ্রার্থী হননি। শুধু বাংলার নবাব কেন, সময় সময় দিল্লীর সম্রাটকেও এই শেঠ পরিবারের কাছে হাত পাততে হয়েছে। দিল্লী শহরে দারুণ দুর্ভিক্ষে দিল্লীশ্বরকে অগণিত অর্থ দিয়ে সাহায্য করায় সম্রাট মহম্মদ নাসিরুদ্দিন ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে মানিকচাঁদের পুত্র ফতেচাঁদকে প্রথম 'জগৎশেঠ' উপাধি দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। সেদিন থেকেই মুর্শিদাবাদের শেঠ পরিবার এই নয়া খেতাবেই সুপরিচিত। কিন্তু শেঠ পরিবারের এই ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তির বৈভব খুব বেশী দিন ছিল না। পলাশির যুদ্ধে বাংলার ইতিহাসের পট-পরিবর্তনের সংগে সংগে শেঠ পরিবারের ঐশ্বর্যের খ্যাতিও ধীরে ধীরে অস্তমিত হল।

মহিমাপুরে জগৎশেঠদের আদি বাড়ি গংগার ভাংগনে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। তাই পরবর্তী বংশধরেরা আদি বাড়ির পূর্ব দিকে তাঁদের বসতবাটী স্থানান্তরিত করেছেন। বর্তমান বাড়ির বাইরের চত্বরেই আমাদের আলোচ্য মন্দিরটি অবস্থিত। জগৎশেঠেরা জৈনধর্মের শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত এবং মন্দিরটি তাঁদের ত্রয়োবিংশতম ধর্মগুরু পার্শ্বনাথের নামে উৎসর্গীকৃত। গঠনরীতির দিক থেকে মন্দিরের এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই, যা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু মন্দিরের বহির্বারান্দায় প্রবেশ করে এর সম্মুখদেয়ালে চোখ রাখলেই বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। বিদেশী ভাবধারায় চিত্রিত ছোট ছোট অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকে (Tiles) মন্দিরের সম্মুখ দেয়াল সুশোভিত। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। মন্দির-অভ্যন্তরের অধিকাংশ অংশই মূল্যবান কষ্টিপাথর দ্বারা নির্মিত। এবং তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথও কষ্টি-পাথরনির্মিত বর্গাকার সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরের এক শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, বর্তমান মন্দিরটি শেঠ পরিবারের আদি পার্শ্বনাথ মন্দিরের নবসংস্করণ মাত্র। এবং মন্দিরটি আদি মন্দিরের উপকরণ দিয়েই ১৯৭৫ সংবতে (১৯১৮ খৃঃ) জগৎশেঠ গোলাপচাঁদের পুত্র ২য় ফতেচাঁদ কর্তৃক নির্মিত। শেঠ পরিবারের বর্তমান বংশধরদের কাছে আদি মন্দির নির্মাণ সম্পর্কে যতটুকু লিখিত ইতিহাস রয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, আঠারো শতকের শুরুতে নবাব মুর্শিদকুলী গৌড়ের হিন্দু রাজাদের প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে কষ্টিপাথর-নির্মিত দরবারগৃহের বিভিন্ন অংশ উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। তখন শেঠ মানিকচাঁদ হিন্দু রাজাদের পবিত্র স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট উচ্চ মূল্যে নবাব মুর্শিদ-কুলীর কাছ থেকে কষ্টিপাথরের বিভিন্ন অংশগুলো কিনে নেন এবং এই উপকরণ দিয়েই পার্শ্বনাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা

কষ্টিপাথর নির্মিত মন্দির-অভ্যন্তর ভাগ। মধ্যস্থলে উপবিষ্ট তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ

করেন। পরে মানিকচাঁদের পুত্র প্রথম জগৎশেঠ ফতেচাঁদ কাশিমবাজার কুঠির ডাচ্‌দের কাছে প্রাপ্ত অসংখ্য সুচিত্রিত পোড়ামাটির ফলকের সাহায্যে এই মন্দিরের অঙ্গসজ্জা করান। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষের দিকে গঙ্গার গতি পরিবর্তনের জন্য শেঠ পরিবারের আদি বাড়ির এলাকা বিধ্বস্ত হতে শুরু করলে তৎকালীন জগৎশেঠ মন্দিরের কষ্টিপাথর ও চিত্র-ফলকগুলো সহ অন্যান্য মূল্যবান উপকরণ অপসারিত করে নূতনভাবে মন্দির স্থাপনের উদ্যোগ করেন। ঠিক সেই সময় লর্ড কার্জন মহিমাপুরে জগৎশেঠদের বাড়ি পরিদর্শন করতে এসে স্তূপীকৃত কষ্টিপাথর ও সুদৃশ্য চিত্র-ফলকগুলো দেখে সেগুলো কলকাতায় স্থানান্তরণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু জগৎশেঠ ২য় ফতেচাঁদ কার্জনের প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে, সেই কষ্টিপাথরের উপকরণ দিয়েই বর্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আদি মন্দিরের অনুকরণে নবপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরের সম্মুখদেয়ালকেও সুচিত্রিত চিত্র-ফলকে সুশোভিত করান।

এই হচ্ছে মন্দির সম্পর্কীয় ইতিবৃত্ত। এখন এই মন্দিরগাত্রের চিত্র-ফলকগুলোর গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনা করি। পাঁচ ইঞ্চি বর্গ বিশিষ্ট ফলকগুলোর মিনাকৃত মসৃণ আবরণের উপর নীল রঙে অসংখ্য বিদেশী চিত্র চিত্রিত। এবং এই ফলকগুলোর দ্বারাই বর্তমান মন্দিরের সম্মুখদেয়ালের আপাদ-মস্তক আচ্ছাদিত। যে কোন কারণেই হোক আদি মন্দিরের সমস্ত চিত্র-ফলকগুলোকে বর্তমান মন্দিরে বসানো সম্ভব হয়নি। তাই আজও অনেক সুদৃশ্য ফলক শেঠ পরিবারের বর্তমান বংশধরদের হেফাজতে রয়ে গেছে। এই পরিবারের বর্তমান পুরুষেরা বলে থাকেন যে, কাশিমবাজারের ডাচ্ কুঠির কুঠিয়াল তাদের পূর্বপুরুষ জগৎশেঠ ফতেচাঁদকে এই চিত্র-ফলকগুলো দিয়েছিলেন এবং এ ধরনের ফলক নাকি কাশিমবাজারের ডাচ্ কুঠিতেই নির্মিত হতো। তাদের এই বক্তব্যের প্রথম অংশ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে। সপ্তদশ শতকে মুর্শিদাবাদ শহরের অনতিদূরে কাশিমবাজারে যে সমস্ত বিদেশী বণিকেরা কুঠি নির্মাণ করেছিল তাদের মধ্যে ডাচ্‌রা ছিল অন্যতম। (বর্তমানে অবশ্য এক ডাচ্ সিমেট্রি ছাড়া ডাচ্‌দের আর কোন চিহ্নই কাশিমবাজারে অবশিষ্ট নেই।) হান্টারস স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্টস্ অব বেঙ্গল, ভল্যুম ৯ থেকে জানা যায় যে, ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের কিছু আগে থেকেই ডাচ্‌রা কাশিমবাজারে কুঠি নির্মাণ করেছিল। এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে জগৎশেঠ পরিবারের সাথে ডাচ্‌দের টাকাপয়সার লেন-

মিনাকৃত ফলকের উপর অঙ্কিত দুটি উল্লেখযোগ্য চিত্র।

দেন হামেশাই লেগে থাকত। তাই হয়তো উপহারস্বরূপ কিংবা কোন দেনার দায়ে তৎকালীন ডাচ্ বণিকেরা প্রথম জগৎশেঠ ফতেচাঁদের হাতে এই সুদৃশ্য ফলকগুলো তুলে দিয়েছিল। তখন ফতেচাঁদই ডাচ্‌দের তত্ত্বাবধানে মন্দিরের গায়ে চিত্র-ফলকগুলো বসিয়ে তার সদ্ব্যবহার করেছিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ইউরোপীয় বণিকদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে শেঠ পরিবারকে নিশ্চয়ই বেশ কিছুটা গোঁড়ামিমুক্ত হতে হয়েছিল। তাই ফতেচাঁদ এই বিদেশী চিত্র-ফলকগুলোকে (ভিন্নধর্মীয় চিত্র সহ) বিনা দ্বিধাতেই তাঁদের উপাসনাগৃহের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় এ'দের বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে। কাশিম-বাজারে ডাচ্ কুঠিতে এ ধনের ফলক নির্মাণের কোন ইঙ্গিতই জেলার ইতিহাস কিংবা কোন সরকারী নথিপত্রে পাওয়া যায় না। চিত্র-ফলকগুলোর গঠনভঙ্গী, অঙ্কিত বিষয়বস্তু এবং এর চিত্রণ-রীতি দেখে প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, এগুলো সরাসরি হল্যান্ড থেকেই আমদানিকৃত এবং এগুলো বিখ্যাত 'ডেল্‌ফ্‌ট্ টাইলে'-এর সমগোত্রীয়। ডেল্‌ফ্‌ট্ উত্তর হল্যান্ডের একটি শহর। সপ্তদশ শতকের শুরু থেকেই এই ডেল্‌ফ্‌ট্ শহরে নির্মিত সুদৃশ্য চিত্র-ফলক সমগ্র ইউরোপে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নীল রঙে চিত্রিত বর্গাকারের এই ডেল্‌ফ্‌ট্ চিত্র-ফলক ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সাধারণত গৃহের বহ্নি-সেবন স্থান কিংবা পল্লীর পার্শ্ববর্তী স্থানকে আচ্ছাদনের কাজে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু হল্যান্ডে ঘরের দেয়াল আচ্ছাদনের জন্য এই ডেল্‌ফ্‌ট্ চিত্র-ফলক ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন ছিল।

ঠিক একই রীতিতে আমাদের আলোচ্য মন্দিরের গায়ে গায়ে চিত্র-ফলকগুলোকে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এবং ডেল্‌ফ্‌ট্ চিত্র-ফলকের মতই এদের মিনাকৃত মসৃণ আবরণের উপর চিত্রিত রয়েছে সুদৃশ্য ল্যান্ডস্কেপ। কোন কোন ছবিতে ল্যান্ড-স্কেপই প্রাধান্য পেয়েছে। আবার কোনটিতে ল্যান্ডস্কেপ রয়েছে নিতান্তই পটভূমি হিসেবে এবং সেই পটভূমির সম্মুখে বিচিত্র বেশধারী নরনারী ও জীবজন্তুর উপ-স্থাপনের কোন ঘটনাকেই যেন প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে এ ধরনের প্রতিটি চিত্রে শিল্পী ব্যাকগ্রাউন্ড ও ফোরগ্রাউন্ডের মধ্যে এমন এক সুষমতা রক্ষা করেছেন, যার ফলে উভয়ই উভয়েরই পরিপূরক হয়ে উঠেছে। প্রতিটি ফলকেই যেন নতুন নতুন দৃশ্য বা কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে, এমন নয়। কিছু কিছু দৃশ্যের পুনরাবৃত্তিও চোখে পড়ে। কিন্তু শিল্পী সেই পুনরাবৃত্তির মধ্যেও যেন একটু বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেছেন। চিত্রণের প্রতিটি কাজ খুব নিখুঁত নয়; বরং অধিকাংশ

১৯১৮ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত শেঠ পরিবারের নতুন জৈন মন্দির।

ক্ষেত্রেই ছবিগুলো একটু যান্ত্রিক ভাবাপন্ন। মনে হয় শৌল্পিক মানের চেয়ে শিল্পগত পরিশ্রমের দিকেই শিল্পী-মন বেশী সক্রিয় ছিল। ছবিতে যে সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু চোখে পড়ে তা দেখে বাঁধ, বালিয়াড়ি আর জলার দেশ, হল্যান্ড দেশের কথাই মনে পড়ে যায়। সমুদ্রের মাঝে দেয়াল তুলে জায়গা ভরাট করে তবে হল্যান্ড দেশের জন্ম হয়েছে। তাই এ-দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে খানা-ডোবা, খাল-বিল, ছোট ছোট সাঁকো, টিউলিপ ও হায়াসিন্থ ফুল। আর রয়েছে ঘনবসতিপূর্ণ ঘিঞ্জি বাড়ি ও অজস্র হাওয়ায় চলা কল। আমাদের আলোচ্য চিত্র-ফলকের ছবিগুলোতেও উপযুক্ত জিনিসগুলোর ব্যাপক সমাবেশ চোখে পড়ে।
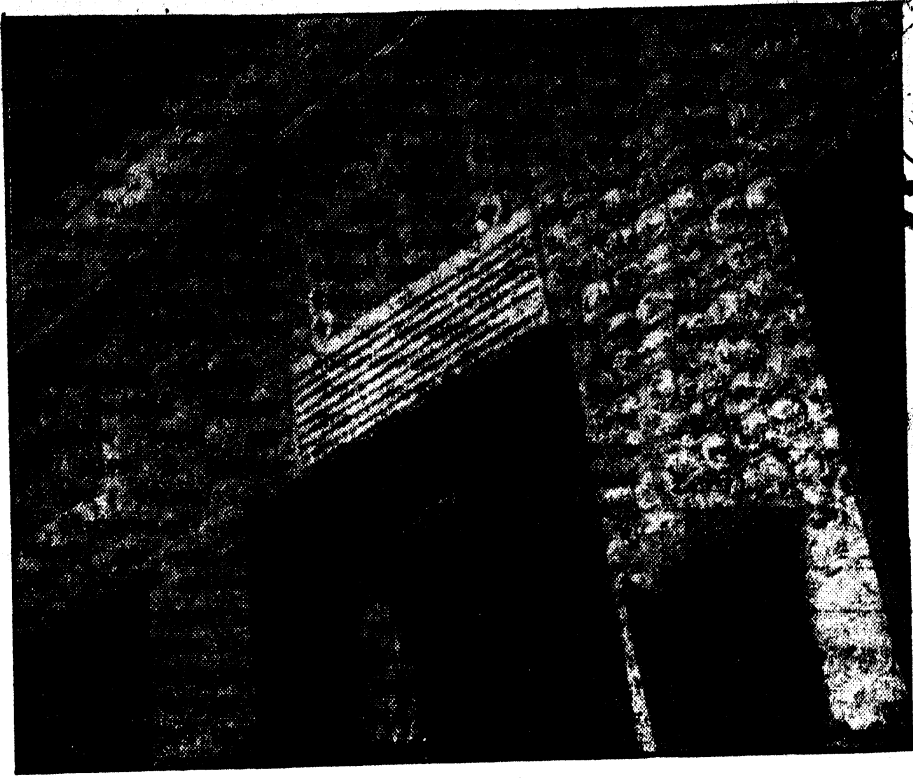
চিত্র-ফলকে আচ্ছাদিত মন্দির গাত্র

ছবিতে কোথাও দেখি দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের উপর পাল-তোলা জাহাজগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে, জাহাজ থেকে নাবিকেরা দল বেঁধে তীরে নামছে, খানা-ডোবার ধার দিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে কেউ বা বোঝা কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, কেউ আবার কাঠের জুতো পড়ে লাঠি হাতে নিয়ে অতি সন্তর্পণে সাঁকো পার হচ্ছে, কিংবা কেউ বালিয়াড়ির উপরে বসে নিঃসঙ্গ অবকাশ যাপন করছে। কোন কোন ছবিতে জলার পাশে রয়েছে দোচালা কিংবা গম্বুজ ঢঙের বাড়ি-ঘর, যার এক পাশ দিয়ে উঁকি দিচ্ছে ধোঁয়া বেরোবার চিমনি। আবার কোন ছবিতে শুধু ধরা পড়েছে উদার আকাশের নীচে উঁচুনীচু বিস্তীর্ণ প্রান্তর, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট উইন্ডমিল। এ ছাড়া কয়েকটি ফলকে ল্যান্ডস্কেপের পটভূমিকায় বাইবেলের কাহিনীকেও রূপ দেওয়া হয়েছে।

এখন এই চিত্র-ফলকগুলোর নির্মাণকাল সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠাটা খুবই প্রাসঙ্গিক। ডাচ বণিকেরা মুর্শিদাবাদে এসেছিল সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝিতে এবং জগৎশেঠ ফতেচাঁদ জীবিত ছিলেন ১৭৪৩ খৃঃ পর্যন্ত। সুতরাং সপ্তদশ শতকের মাঝা-মাঝি থেকে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যেই চিত্র-ফলকগুলোর

চিত্র-ফলকের একটি সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ্.

মসৃণ ফলকের বৃত্ত-সীমায় অঙ্কিত একটি চিত্র। কাঠের জুতো পরা, লাঠি হাতে ভ্রমণকারী

নির্মাণকাল বলেই অনুমান হয়। তা ছাড়া বিষয়বস্তু ও রীতির দিক থেকে সতেরো শতকের ডাচ্ চিত্রকলার সাথে আলোচ্য ফলকের চিত্রগুলোর অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। এই শতকের ডাচ্ চিত্রের মত মিনাকৃত ফলকগুলোর উপর চিত্রিত রয়েছে হল্যাণ্ডের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য ও হল্যাণ্ডবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কিছু কিছু খণ্ড-চিত্র। সতেরো শতকের পূর্বে কিন্তু ডাচ্ চিত্রকলায় এই প্রাকৃতিক দৃশ্য বা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার বিশেষ কোন স্থানই ছিল না। তখন সেখানে ছিল শুধু অসাধারণ মানুষদেরই একচেটিয়া আধিপত্য। অর্থাৎ ফ্লেমিশ চিত্রশিল্পীদের মত ডাচ্ শিল্পীদের চিত্রেও তখন শুধু বাইবেলের দেবদেবী আর রাজারাজড়াদের প্রতিকৃতিই প্রাধান্য পেতো। কিন্তু ষোড়শ শতকের মাঝামাঝিতে ফ্লেমিশ চিত্রশিল্পী পীটার ব্রুখেল প্রথম চিত্রকলাকে বাস্তব জীবন ও জগতে এক বৈপ্লবিক ভাবধারার সৃষ্টি করলেন। এবং সেই ভাবধারাতেই অনুপ্রাণিত হলেন সতেরো শতকের ডাচচিত্রশিল্পীরা। হল্যাণ্ডের বিস্তীর্ণ প্রান্তর, উদার আকাশ, উপকূলবর্তী সমুদ্র ও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা দিক ফুটে উঠল সতেরো শতকীয় ডাচ্ শিল্পীদের চিত্রে। তাই বিষয়বস্তুর দিক থেকে সতেরো শতকীয় ডাচ্ চিত্রকলার সাথেই আমাদের এই চিত্র-ফলকগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে বেশী। তবে এর ল্যাণ্ডস্কেপের পাহাড়, বাঁধ, বালিয়াড়ি, গাছ, আকাশ ও ল্যাণ্ডস্কেপের পটভূমিতে মানুষ উপস্থাপন ও অঙ্কনের যে রীতি বা ভঙ্গী চোখে পড়ে, তা যেন পীটার ব্রুখেলের চিত্র-রীতির কথাই বেশী করে স্মরণ করিয়ে দেয়; যদিও শিল্পগত পরিমাণের খাতিরে ছবিগুলো বেশ একটু যান্ত্রিক ভাবাপন্ন ও রুক্ষ, সরাসরি প্রকৃতি বা জীবন থেকে পীটার ব্রুখেল খুব কমই ছবি এঁকেছেন। প্রকৃতি ও জীবনের বিভিন্ন দিকের নানা খুঁটিনাটি তিনি প্রত্যক্ষ করে মনের মণিকোঠায় তা সযত্নে জমা করেছেন এবং পরে স্বকীয় অনুভূতির সংমিশ্রণে তা মণ্ডল-শিল্পাকারে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর চিত্রপটে। আমাদের আলোচ্য চিত্র-ফলকগুলোর ল্যাণ্ডস্কেপের কম্পোজিশন বা রচনাবিন্যাস দেখেও বেশ অনুভব করা যায় যে, খুব কম ছবিই সরাসরি প্রকৃতি থেকে আঁকা হয়েছে; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছবিগুলো তাদের উপকরণ সংগ্রহ করেছে চিত্রশিল্পীর কল্পনাপ্রবণ মন থেকে। তা ছাড়া ব্রুখেলের ছবির মত চিত্র-ফলকের অনেক ছবির মধ্যেই রয়েছে—কোন ঘটনা বা কাহিনী বর্ণনের একটা সুস্পষ্ট প্রবণতা। তাই মনে হয়, ব্রুখেলের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়তো কোন শিল্পী-গোষ্ঠীর তুলিতে আঁকা হয়েছে আমাদের এই আলোচ্য চিত্র-ফলকের অসংখ্য চিত্রগুলো; এবং সেটা হয়েছে সতেরো শতকের শেষের দিকে কিংবা আঠারো শতকের গোড়াতেই।

নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে 'ডেলফ্‌ট্ টাইলে'-এর কিছু মূল্যবান নিদর্শন সংরক্ষিত হচ্ছে। গঠনভঙ্গী ও অন্যান্য দিক থেকে এই নিদর্শনের সাথে আমাদের আলোচ্য চিত্র-ফলকগুলোর বিস্ময়কর সাদৃশ্য চোখে পড়ে (Encyclopaedia Britannica, Vol—22, 1955, 215A পাতার সম্মুখের চিত্রপৃষ্ঠার ১০নং চিত্রটি দ্রষ্টব্য)। যতদূর জানি বাংলা দেশে ডাচ্ চিত্র-ফলকের নিদর্শন এই প্রথম। তা ছাড়া জৈন ধর্মীয় মন্দিরে গাত্র অলংকরণের জন্য কতগুলো বিদেশী চিত্র-ফলকের (ভিন্ন-ধর্মীয় চিত্র সহ) আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারটাও নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক। তাই এই বিদেশী চিত্র-ফলকগুলো সহ মন্দিরটির সংরক্ষণের কোন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা, এ কথা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগই ভেবে দেখতে পারেন।

(৩৫)

এ সেই মীনাক্ষী যে কলকাতার বাড়িতে ছাদের উপর বসে দূরে আকাশের একলা তারার সঙ্গে নিজেকে তুলনা করত? এ সেই মীনাক্ষী যে লণ্ডনে এসেও নিজেকে সন্তর্পণে আলাদা করে রেখেছিল আমাদের কাছ থেকে? সৌরেনের মনে পড়ছে ফেলে-আসা কতকগুলো বছরের কথা। কত ভাবেই না সে মীনাক্ষীকে দেখেছে, পীয়েরের সঙ্গে তার আলাপ দেখে মনে মনে সৌরেন ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। কারণ, সে ভেবেছিল ও শুধু দু'দিনের আলাপ। সত্যিকারের প্রেম তার মধ্যে ছিল না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছে কতখানি ভুল সে করেছিল। মীনাক্ষী আর পীয়েরকে দেখে তার মনের সব সংশয় দূরে হয়েছে। তাদের সুখের সংসারে নতুন অতিথি আসছে, তার জন্যে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করে বসে আছে ওরা।

এ কথা মনে হতে নিজে কেমন যেন সংকুচিত হয়ে পড়ল সৌরেন। কেন সে ঐ রকম আনন্দ করতে পারছে না? কেন ভরসা দিতে পারছে না এলিজাবেথকে? সঙ্গে সঙ্গে কানে ভেসে এল মীনাক্ষীর কথা, সে তাকে ভাবের ঘরে চুরি করতে বারণ করেছে। এই প্রথম সৌরেনের মনে প্রশ্ন জাগল, সে কি সত্যি এলিজাবেথকে ভালবাসে? সে কি মনে করে এলিজাবেথকে না পেলে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে? কই, মনের দিক থেকে কোন সাড়া তো সে পেল না। অন্ধকার বিরাট গহ্বর মধ্যে দাঁড়িয়ে সে যেন চিৎকার করে প্রশ্ন করল। ফিরে এল তার প্রতিধ্বনি, কিন্তু কোন উত্তর তো এল না। সৌরেন ছাড়া আর কেই বা এ প্রশ্নের জবাব দেবে?

এই প্রসঙ্গে আর একজনের চিন্তা তাকে তাড়া করে ঘুরে বেড়াচ্ছে—সে হলো মীনাক্ষীর অতুলমামা। ভদ্রলোককে সে নিজেও দেখেছে। মীনাক্ষী বরাবর বলত, বিবাহিত জীবনে অতুলমামা সুখী হননি। কিন্তু সেই সুখী না হওয়ার পরিণতি যে এই রকম মারাত্মক হওয়া সম্ভব তা ভাবতেও পারেনি সৌরেন। সর্বজনপরিত্যক্ত অসুস্থ অতুলমামার রিক্ত জীবনের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সৌরেন।

কে বলতে পারে, তার নিজের ভবিষ্যৎ কি! তার জন্যেও হয়ত এমনি করে একজন করুণা প্রকাশ করবে। অপারগ অবস্থায় তাকেও হয়ত কৃপার পাত্র হয়ে পড়ে থাকতে হবে এই দূর বিদেশে। নিজের বোকামির জন্যে তার দুঃখ হলো। কেন সে আগে থেকে সাবধান হলো না? কেন এ ভুল করল, যার জন্যে সারাটা জীবন শুধু অনুশোচনা করে কাটাতে হলো?

সৌরেনের মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে। শরীরটা খারাপ লাগছে নাকি? পিকাডেলী স্টেশনে নেমে পড়ল সৌরেন। উপরে উঠে এল। এখান থেকে বাসে করে বাড়ি ফিরে যাবে, আর ঘুরতে ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকা ভাল।

আন্তর্জাতিক ঘড়ির সামনে এসে অল্প-ক্ষণের জন্যে সৌরেন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। গত ক' বছর লণ্ডনে থাকাকালীন কত লোকের সঙ্গে এইখানে দেখা করেছে। চারদিকে ঝলমলে আলো লাগানো এই টিউব স্টেশনটা তার অতি প্রিয়। একদিকে ব্যস্ত মানুষের ভিড়, আর একদিকে যারা বেড়াতে আসে এরকম কত লোক। বেশ দেখতে লাগে।

হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে সৌরেন ফিরে তাকাল, হাসতে হাসতে মলিনা দাস এই দিকে এগিয়ে আসছে। তার সঙ্গে হারীন সোম। দুজনেই সানন্দে গল্প করছে। সৌরেন শুনতে পেল মলিনা দাস আবদেরে সুরে বলছে, না না, অত দাম দিয়ে তুমি আমার জন্যে কোটটা কিনো না। আমার খারাপ লাগছে।

হারীন সোম নীচু গলায় উত্তর দিল, প্লীজ মলি, তুমি আর আপত্তি ক'রো না। আমি তাদের টাকা দিয়ে ফেলেছি।

—এই ক'দিনে তুমি আমার জন্যে কত টাকা নষ্ট করলে বল তো।

—কোন মেয়ের জন্যে খরচ করে এই প্রথম আনন্দ পেলাম।

—তোমার দাদাও কিন্তু এই কথাই বলত।

—আঃ, দাদার কথা বলে আর আমায় বিরক্ত ক'রো না।

হাসতে হাসতে ওরা দু'জন সৌরেনের সামনে দিয়ে চলে গেল। একবার ফিরেও তাকাল না মলিনা দাস, ভাব দেখাল সে তাকে চেনেও না।

আশ্চর্য হল সৌরেন। এও কি সম্ভব? যে সোম সাহেবকে নিয়ে রাত কাটাত মলিনা দাস, আজ তার ভাইকে নিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি বোকা ঐ হারীন সোম! সে কি বুঝতে পারছে না কতখানি বোকামি করছে সে?

মাথাটা বোধ হয় সৌরেনের ঘুরছিল, চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা বিরাট মাকড়সার জাল। একটা পোকা পড়ে তার উপর ছটফট করছে, আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে মাকড়সা। একটু বাদেই ঐ পোকাটার সমস্ত রস নিংড়ে নিয়ে মেরে ফেলবে মাকড়সা। উঃ, কি নিষ্ঠুর!

পোকাটার জন্যে সৌরেনের অনুকম্পা হ'ল। কিন্তু ঐ পোকাটা কে? হারীন সোম? কেন জানা নেই সৌরেনের বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল, মনে হল ঐ একই প্রশ্ন কে যেন তার দিকে ছুড়ে মারছে, হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করছে তার মাথায়। একঘেয়ে আঘাতের শব্দ। সমস্ত চিন্তা গুলিয়ে গেল।

মনে হল পোকাটা আর কেউ নয়, সে নিজে

এ এক বিচিত্র অনুভূতি।

দু' দিন ধরে সৌরেন অফিস যেতে পারল না। বাড়ি ফিরল না সময় মত, এমনকি লীলাদের ফ্ল্যাটেও গেল না। রাত্রে শোবার সময়টুকু ছাড়া মাঠে ময়দানে সে ঘুরে বেড়িয়েছে।

কেন জানা নেই সৌরেনের সব সময় মনে হয়েছে সে একা নয়, তার সঙ্গে আর একজন কেউ রয়েছে। কিন্তু কে সে, প্রথমটা সৌরেন বুঝতে পারেনি।

রিজেণ্ট পার্কের বেঞ্চিতে সন্ধ্যের পর বসে থাকতে থাকতে সৌরেনের গা ছমছম করে উঠল। মনে হল তার গা ঘেঁষে বসে আছে সেই অন্যজন। যে তাকে দিন নেই রাত নেই ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছে।

সৌরেন সভয়ে প্রশ্ন করল, কে তুমি? কি চাও? কেন আমাকে এভাবে বিরক্ত করছ?

সে উত্তর দিল, আকাশ পাতাল মাথামুণ্ডু এত ভাবছ কি? যা হবার তা হয়ে গেছে, এলিজাবেথকে বিয়ে করে ফেল, সব হাঙ্গামা মিটে যাবে।

সৌরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তুমি আমার বাড়ির কথা জানো না তাই বলছ, আমার মা—

সে থামিয়ে দিয়ে বলল, যখন এলিজাবেথের সঙ্গে মিশতে গিয়েছিলে তখন মনে পড়েনি?

—আমি ভেবেছিলাম মায়ের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিয়ে তারপর বিয়ে করব। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তারপর তো আর অনুমতি চাওয়ার কোন উপায় নেই। বিয়ে আমায় করতেই হবে।

সৌরেনের ম্লান মুখখানা দেখে সে হেসে ফেলল, বলল, তোমার নাম হওয়া উচিত ছিল বুড়ো খোকা। কোনদিন কারুর দায়িত্ব নিতে শেখনি বলে এলিজাবেথের ভার নিতে তোমার এত কষ্ট হচ্ছে। তা ছাড়া এ কথাও সত্যি এলিজাবেথকে তুমি ভালবাস না।

সৌরেন ওর কথার ধরনে বিরক্ত হয়, রুখে উঠে বলে, কে বলে সে-কথা? আমি তিন সত্যি করে বলতে পারি, লিজিকে আমি ভালবাসি, তাকে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সৌরেনের কথাটা সে যেন কানে তুলল না। হোহো করে হেসে উঠে বলল, মিথ্যে কথা বলে বলে তোমার এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে নিজের কাছে মিথ্যে বলতেও তোমার লজ্জা করছে না।

—কি বলছ যা তা?

—আমি ঠিক কথাই বলছি, তুমি ভীতু, তুমি কাপুরুষ।

—তার মানে?

সে চড়া গলায় বলে, যদি সংসাহস থাকে আজই মনস্থির করে ফেল, বিয়ে কর এলিজাবেথকে। আর যদি না বিয়ে করতে চাও স্পষ্ট জানিয়ে দাও সে কথা। দোহাই তোমার, আকাশ পাতাল ভেবে মুখ ভার করে বসে থেকো না।

আর কথা বলতে ইচ্ছে করল না সৌরেনের, বেঞ্চি থেকে উঠে পড়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে। পেছনে পায়ের শব্দ হচ্ছে, সৌরেন বুঝতে পারল সে ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আসছে, এক মিনিটের জন্যেও সৌরেনকে চোখের আড়াল করছে না। কিন্তু কে ও?

এ কি শুধু তার চিন্তার প্রতিধ্বনি? তাও তো সম্ভব নয়, সৌরেনের সঙ্গে তো তার কথার কোন মিল নেই। সৌরেন যা বলছে তাকে উড়িয়ে দিয়ে সে প্রশ্ন করছে নতুন ঢঙে। তবে কি সে বিবেক? তাই বা কি করে সম্ভব? সে তো বলছেই, প্রেম না থাকলে এলিজাবেথকে বিয়ে করার কোন অর্থ হয় না। কারুর বিবেক, এলিজাবেথ অন্তঃসত্ত্বা জেনেও এ ধরনের অন্যায় কথা বলতে পারে না।

তবে কি এ সৌরেনের অবচেতন মন? তাও তো নয়। অবচেতন মনের প্রকাশ বেশীর ভাগ সময় স্বপ্নের মাধ্যমে। আর নয়ত অবচেতন মন যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন সচেতন মন স্তিমিত হয়ে যায়, উৎপত্তি হয় মানসিক বিকারের।

তবে যে তাকে সর্বক্ষণ এভাবে বিরক্ত করছে সে কে? সৌরেনের মনে হচ্ছে সে যেন আর একজন লোক। সে এবং সৌরেন দুজন পৃথক ব্যক্তি, দুজনের পৃথক সত্তা। একজন ভীরু দুর্বল, আর একজন বেপরোয়া যুক্তিবাদী।

রাতের পর রাত ঘুমতে পারেনি সৌরেন, সেই লোকটা তার খাটের কাছে বসে পাহারা দিয়েছে। খিদে পেলেও ভাল করে খেতে পারেনি। সে এসে নজর দিয়েছে তার খাবারে। স্নানের ঘরে ঢুকেও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি, বার বার দরজায় টোকা মেরে জানিয়ে দিয়েছে, সে সৌরেনের জন্যে বাইরেই অপেক্ষা করছে।

এইরকম যখন সৌরেনের মনের অবস্থা, উত্ত্যক্ত, বিরক্ত, সেই পরিমাণে অনুতপ্তও, ঠিক এই সময় হঠাৎ একদিন ফিরে এল এলিজাবেথ। সৌরেনকে দেখে সে প্রথমটা চিনতে পারল না। শুকনো গাল, কোটরগত চোখ, তলায় কালি পড়েছে। এলিজাবেথ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে তোমার সৌরেন?

সৌরেন কোন উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল এলিজাবেথের দিকে।

—কি দেখছ অমন হাঁ করে?

সৌরেন থেমে থেমে বলল, তুমি আমাকে ক্ষমা কর লিজি।

এলিজাবেথ কাছে এসে সৌরেনের কাঁধের উপর হাত রাখে।

সৌরেন বলে যায়, আমার উচিত ছিল তোমাকে দুর্ভাবনার মধ্যে না ফেলে রেখে বিয়ের কথা ঠিক করে ফেলা।

এলিজাবেথের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলে, আমি তো নিশ্চিন্তই আছি সৌরেন।

সৌরেন নিজের মাথায় হাত দিয়ে আঘাত করে, কেন যে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না, কেন যে আমি মার কথা ভাবছি, কেন যে মনে হচ্ছে অতুলমামার মত আমাদের জীবনটাও না নষ্ট হয়ে যায়, কেন যে মনের জোর করতে পারছি না মীনাক্ষীর মত! যদি আর ক'টা মাস আমি সময় পেতাম---

এলিজাবেথ মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে, তা হলে কি করতে?

—আমি একবার দেশে যেতাম, মাকে বুঝিয়ে আসতাম, তা হলে আর কোন হাঙ্গামা থাকত না, দেখতে আমরা কত সুখী হতাম।

—বেশ তো, ঘুরে এস না।

সৌরেন মাথা নাড়ে, তা হয় না। আর দেরি করা আমার উচিত নয়। তাতে আমাদের দুজনেরই বিপদ।

এলিজাবেথ সৌরেনের দিকে স্থির

দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলে, আমি নিজেই যদি যাবার অনুমতি দিই তোমার আপত্তি কিসের?

সৌরেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে; তা হয় না লিজি। তা না হলে তো আমি মোটামুটি একরকম ঠিকই করেছিলাম লীলা আর অমিতাভর সঙ্গে একই জাহাজে কয়েক দিনের জন্য অন্তত দেশে ফিরে যাব।

এলিজাবেথ জোর দিয়ে বলল, বেশ তো, তাই যাও, ঘুরে এস।

—না, এখন তা হয় না।

এলিজাবেথ অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে উঠে দাঁড়ায়, সৌরেন, একটা কথা তোমাকে খুলে বলা দরকার।

সৌরেন ব্যস্ত হয়ে পড়ে, বল লিজি।

—সৌরেন, তোমাকে যে আমি বলেছিলাম আমি অন্তঃসত্ত্বা সেটা মিথ্যে কথা।

সৌরেন চমকে উঠল, কি বলছ লিজি?

এলিজাবেথ ধীর স্বরে বলে, আমি শুধু যাচিয়ে দেখছিলাম এ ধরনের কোন বিপদ জীবনে এসে পড়লে, তুমি তার মুখোমুখি দাঁড়াতে পার কিনা।

সৌরেন সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে, কি দেখলে লিজি?

এলিজাবেথ স্পষ্ট জানায়, কিছু মনে ক'রো না সৌরেন, দেখলাম তুমি নিতান্ত নাবালক, বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াবার মত মনের জোর তোমার নেই।

সৌরেনের আত্মাভিমানে ঘা লাগে, চেঁচিয়ে উঠে বলে, তার মানে তুমি এতদিন আমাকে পরীক্ষা করছিলে?

—একরকম তাই।

—ছি ছি, এরকম ব্যবহার আমি তোমার কাছ থেকে মোটেই আশা করিনি লিজি। তুমি জান এ ক'দিন কিরকম আমি চিন্তা করেছি? একটা মিনিটের জন্যে শান্তি পাইনি। আর তুমি আসলে আমাকে নিয়ে মজা করছিলে?

এলিজাবেথ সংযত অথচ কঠিন সুরে বলল, মজা করিনি সৌরেন, নিজের ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করছিলাম। দেখছিলাম তুমি মুখে যা বল কাজে তা করতে পার কিনা, ভাবছিলাম তোমাকে বিয়ে করা আমার উচিত হবে কিনা।

সৌরেন তিক্ত গলায় প্রশ্ন করে, কি দেখলে ভেবে?

—বিয়ে করলে আমরা ভুল করব। অতুল-মামাদের মতই ট্র্যাজিক পরিণতি হবে আমাদের।

—অতএব তোমার বক্তব্য কি?

এলিজাবেথ নিষ্কম্প কণ্ঠে ঘোষণা করে, let us part as friends।

চেঁচাতে গিয়ে সৌরেনের গলার আওয়াজ বিকৃত শোনাল, এ তুমি কি বলছ লিজি?

—অনেক ভেবে চিন্তে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। বিশ্বাস কর সৌরেন, তোমাকে আমি আজও ভালবাসি। সেই-জন্যেই বুঝতে পেরেছি তোমার দেশ, তোমার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে আমি তোমাকে শুধু অসুখীই করব তাই নয়, সারা জীবনটা তোমার নষ্ট হয়ে যাবে।

সৌরেন কোন কথা বলতে পারল না, তার চোখে জল এল।

এলিজাবেথ বলে যায়, জানি আমার এ কথাগুলো শুনতে খারাপ লাগছে, বুঝি এর জন্যে তুমি দুঃখও পাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখো এর ফল ভালো হবে সৌরেন। তা ছাড়া, এটাকে বিচ্ছেদ বলে নাই-বা ভাবলে। দেশে যাও, মনটা ভাল কর, আবার যদি ফিরে আসতে ইচ্ছে কর নিশ্চয় এস। আমার বন্ধুত্বে তুমি আস্থা রাখতে পার পুরোমাত্রায়।

সৌরেন ধরা গলায় বলে, কিন্তু এলিজাবেথ, আমি যে সত্যিই তোমাকে ভালবাসি।

এলিজাবেথ ম্লান হেসে উত্তর দেয়, সে কথা তো আমি কোনদিন অস্বীকার করিনি সৌরেন।

—তবে এ মিলনে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন?

—বোধ হয় এইজন্যে যে, আমাদের দুজনের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলটা বেশী যা এতদিন ধরা পড়েনি, এখন হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সেইজন্যেই মনে মনে স্থির করেছি এদেশে তোমাকে ধরে রাখব না, পাঠিয়ে দেবো তোমার মার কাছে। আমার বিশ্বাস সেখানে ফিরে গেলে তুমি শান্তি পাবে, সুখী হবে।

(ক্রমশ)

মাকড়সার গৃহশিল্প

অশোক মুখোপাধ্যায়

রেশমী সুতোর ফাঁদ পেতে ক্ষুধার্ত মাকড়সা শিকারের অপেক্ষায় বসে থাকে। তার জালের সূক্ষ্ম কারুকার্য সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু কোন কোন শ্রেণীর মাকড়সা গৃহনির্মাণে আরও কত বিস্ময়কর কারিগরির পরিচয় দেয়, তা অনেকেরই জানা নেই।

ক্যালিফোর্নিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে 'ট্র্যাপ ডোর' (Trap Door) মাকড়সার বাস। এরা আশ্রয় রচনা করে মাটির নিচে গর্ত খুঁড়ে। গর্তের গড়ন অনেকটা লম্বা বোতলের মত (প্রথম ছবি); যার গভীরতা সাধারণত ন' ইঞ্চি অতিক্রম করে না। ঘরের মেঝে এবং চারদিকের খাড়া দেওয়াল তারা ঘন বুনটের রেশমের চাদরে মুড়ে দেয়। ফলে ভেতরে বিন্দুমাত্র জল প্রবেশ করতে পারে না। এ ছাড়া, গৃহের প্রবেশপথও জল-নিরোধক ঢাকনায় বন্ধ থাকে। ঢাকনাটি একটি ফাটল বরাবর দুই পাল্লায় বিভক্ত; উদ্দেশ্য একটি পাল্লাকে কব্জা লাগানো দরজার মত খুলতে এবং বন্ধ হতে সাহায্য করা। ঢাকনা মাটি এবং পাতার উপকরণে তৈরী, কিন্তু চার ধার এবং তলদেশ নিশ্ছিদ্র রেশমে আবৃত। রেশমের আবরণ একে দুই ভাগে পৃথক হতে দেয় না, অথচ বেশ সুন্দরভাবে কব্জার ভূমিকা গ্রহণ করে।

মাটির নিচে 'ট্র্যাপ ডোর' মাকড়সার নিরাপদ আশ্রয়। ঘরের দেওয়াল রেশমের আবরণে আবৃত বলে জল-নিরোধক হয়ে উঠেছে

গৃহের অধিকারী এক দিকের পাল্লা ঈষৎ ফাঁক করে শিকারের জন্য ওত পেতে বসে থাকে। তখন বাইরে থেকে তার কিছুমাত্র অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন পতঙ্গ কাছে আসা মাত্র সে ঢাকনা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং চোখের পলকে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এফ্. ই. বেক্ এবং লি. পাসমোর নামক দুই মার্কিন প্রকৃতিবিজ্ঞানী দীর্ঘকাল ধরে ট্র্যাপ্ ডোর মাকড়সা নিয়ে গবেষণা করেছেন। এই ক্ষুদ্র প্রাণীটি সম্বন্ধে তাঁরা যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে একটি রীতিমত চমকপ্রদ। ওদের গৃহের ঢাকনাটি অত্যন্ত ভারি বলে একবার বন্ধ হলে গর্তের মধ্যে ছিপির মত এঁটে যায়। তখন তাকে আবার খোলা বেশ দুরূহ কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তাই স্ত্রী-মাকড়সা এটাকে সম্পূর্ণ বন্ধ হতে দেয় না। গর্তের মুখের কাছে সে দু ধারের দেয়ালে পা রেখে দাঁড়ায়; তারপর ঢাকনার তলার দিকে শুঁড় ঢুকিয়ে সেটাকে ঈষৎ উঁচু করে তুলে ধরে রাখে। এমনিভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও সে ক্লান্ত হয় না। কেউ যদি বাইরে থেকে মুখটা টেনে খুলতে চেষ্টা করে, সে কাজ খুব সহজ-সাধ্য হয় না। কোন কোন স্ত্রী-মাকড়সাকে নাকি দশ পাউণ্ডের সমান টানও পরাভূত করতে দেখা গেছে! তার ক্ষুদ্র দেহ এবং ভঙ্গুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কথা বিবেচনা করলে ব্যাপারটি বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

অনেকেই হয়তো 'ডাইভিং বেল' (Diving Bell)-এর নাম শুনে থাকবেন। নদীতে সেতু বা বাঁধ তৈরীর জন্য নদী-তলের অভ্যন্তর থেকে ভিত্তি রচনা করতে হয়। তখন জলের নিচে কাজ করার জন্য ডাইভিং বেল-এর প্রয়োজন হয়। এক শ্রেণীর জলচর মাকড়সা রয়েছে, যারা ডাইভিং বেল-এর হুবহু অনুরূপ বস্তু তৈরী করে। এই জলচর মাকড়সাদের বৈজ্ঞানিক নাম Argyroneta Aquatica। এদের ডাইভিং বেল আসলে রেশমের তৈরী নিশ্ছিদ্র থলে। থলের প্রবেশ মুখ থাকে নিচের দিকে। রেশমের সুতোর সাহায্যে এটি জলতলের উদ্ভিদ বা অন্য কোন কিছুর সঙ্গে বাঁধা

মাকড়সার জলমধ্যস্থ 'ডাইভিং বেল' আকৃতিবিশিষ্ট বাসগৃহ। এই বাসগৃহটি রেশমের উপকরণে নির্মিত

থাকে (দ্বিতীয় চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই হল ওদের বাসগৃহ। এখানে বসেই মাকড়সারা জলজ পতঙ্গ শিকার করে খায়। কিন্তু ওদের দেহযন্ত্রের গঠনের সঙ্গে মাছের দেহযন্ত্রের পার্থক্য রয়েছে। অতএব জলের মধ্যে কালযাপন করলেও জল মিশ্রিত অক্সিজেনে ওদের কাজ চলে না; গৃহের মধ্যেই বাতাসের সঞ্চয় মজুদ রাখতে হয়। যে পদ্ধতিতে মাকড়সারা সেই কার্য সমাধা করে, তা প্রখর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচায়ক। জলের ওপর এসে তারা বাতাসের এক একটা বুদ্বুদ সংগ্রহ করে। তারপর তাকে পেছনের দু' পা এবং পেটের তলদেশের অন্তর্গত ঢালু জায়গায় ধারণ করে থলের মুখের কাছে নিয়ে ছেড়ে দেয়। বুদ্বুদটি স্বভাবতই আপন আয়তনের জল অপসৃত করে থলের সর্বোচ্চ অংশে উঠে যায়। মাকড়সারা অসীম ধৈর্য সহকারে বারবার এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে চলে। অবশেষে থলের অভ্যন্তরে অনেকটা বাতাস জমা হয়। সঙ্গে

সংগে সেটা টান টান হয়ে ফুলে ওঠে এবং বাতাসের চাপে জলের ওপর ঠেলে উঠতে চায়। কিন্তু রেশমের সুতোয় বাঁধা থাকে বলে তা সম্ভব হয় না।

অতঃপর মাকড়সা তার জলমধ্যস্থ গৃহে প্রবেশ করে। এখানেই স্ত্রী-মাকড়সা তার প্রিয়তমের সংগে মিলিত হয় এবং উপযুক্ত সময়ে ডিম পেড়ে বংশবৃদ্ধি করে।

উপসংহারে র‍্যাফ্‌ট মাকড়সাদের (Raft Spider) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। র‍্যাফ্‌ট মাকড়সারা নৌকাভ্রমণে আগ্রহী। তারা গাছের পাতা এবং আরও নানা আবর্জনা জড়ো করে। তারপর এগুলোকে আপন দেহ-নিঃসৃত রেশমের মসলায় সংবদ্ধ করে তৈরী ক'রে জল-নিরোধক বজরা। এই বজরার আরোহী হয়ে তারা পুকুরের এক অংশ থেকে অন্য অংশে মহানন্দে ভেসে বেড়ায়।
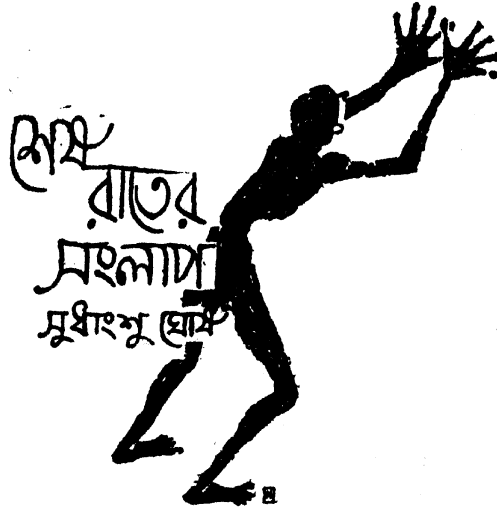
এতক্ষণে নিঃসাড় হয়েছে বাড়িটা। এখন আর ত্রস্ত পায়ে চলাফেরা ওঠানামা নেই, হাঁক-ডাক চাপা কথা গুঞ্জন হাসি গান নেই। কত রাত হবে? তিন ঘরের আলো নিবেছে, সিঁড়ির, ছাতের। সারা বাড়ি অন্ধকার। এত চুপচাপ যে এখন এই খালি মেঝেয় কান পাতলে মাঝে মাঝে আরশোলার মৃদু খসখস, ইঁদুরের সতর্ক সঞ্চরণ অনুভবে ঘা দেয়।

সারাদিনের এক গা ক্লান্তি নিয়ে চারুবালা ভেবেছিলেন, বুঝি ঘুম আসবে। ঘুম এল না। একটুও হাওয়া নেই। ঈষৎ স্বচ্ছ অন্ধকারে ঝোলানো এক ফালি কাপড়ের ছায়ার গভীরতর অন্ধকার একটু তিরতির করেও কাঁপছে না। দুঃসহ গরম। এমন ঘুমহীন একটু একটু জ্বালা করা চোখে মাঝরাত্তিরে এপাশ-ওপাশ করা কী যে যন্ত্রণা! অজস্র বিচিত্র ভাবনা আর স্মৃতি অগুনতি ঢেউয়ের মত এসে আছড়ে পড়ে। কী করে সেই আঘাত থেকে মনকে বাঁচিয়ে ঘুমোয় মানুষ!

বিছানা পাতেন নি, ইচ্ছে হয় নি। ক্লান্তি। হয়ত শুধু ক্লান্তি নয়। আরও কোন নিগূঢ় কারণে তাঁর সব ইচ্ছের মৃত্যু হয়েছে। যেমন তাঁর বাঁ দিকের ঘরে বিকেলের চায়ে মিশিয়ে দেওয়া মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের ওষুধে প্রায় মৃত্যু হয়েছে তিমিরের।

তিনতলায় এক সারিতে তিনখানা ঘর। পশ্চিমে এক চিলতে টানা বারান্দা। বারান্দায় যাবার দরজা দিয়ে তাকালে রাস্তার ওপারে একটা নিঃসঙ্গ আলো। তার ঠিক তলায় একটি নলকূপ। হাতলটায় সবুজ রঙ এক বিন্দু নেই। কাল অমসৃণ ঠাণ্ডা লোহায় আলো চুঁইয়ে পড়েছে। হাতলটা হয়ত সত্যিই খুব ঠাণ্ডা, অন্তত এখান থেকে তাই মনে হয়। আজ এই ঘরের মেঝে এতটুকু ঠাণ্ডা হল না।

তাঁর ডান দিকের ঘরে আজ সমীরের ফুলশয্যা, সমীর আর সবিতার ফুলশয্যা। কোন সাড়া নেই, ফিসফিস কথা কানে আসছে না। এতক্ষণে ওরা নিশ্চয় ঘুমিয়েছে। শুধু আজই ভাড়া করে আনা পাখাটার একটানা শব্দ। ভাড়া করা পাখায় শব্দ হবেই, কিন্তু রজনীগন্ধার ঝাড় এমন কৃপণ কেন? এতটুকু গন্ধ ছড়াচ্ছে না। এ ঘরে পাখা নেই, বাঁ দিকে তিমিরের ঘরে আছে, অনেক দিন আগে কেনা। নিঃশব্দে হাওয়া দেয়। তিমিরের ঘুম কি আর কোনদিন ভাঙবে?

চারুবালার স্বেদসিক্ত শরীর একটু ভারী, বর্ণ শ্যাম। এই ঈষৎ স্বচ্ছ অন্ধকারে এই ঘরের কঠিন মাটিরঙ মেঝে তাঁর চারদিকে প্রসারিত। যদিও ঘরের কোণে কোণে কত কী অগোছাল পড়ে আছে, তাঁর ঠিক দুপাশে অনেকখানি জায়গায় নিখাদ শূন্যতা। তাঁর একটি মেয়ে নেই। বস্তুত তাঁকে তৃতীয়বার মা হতে হয়নি। এই মুহূর্তে অবশ্য মনে হয়, তৃতীয়বার মা হওয়ার সৌভাগ্য তাঁর জীবনে এল না। আজ এখন এই তিমিরাচ্ছন্ন নৈঃসঙ্গ্যে পাশে ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে আলতো করে একটা হাত রাখলে যেন কোন আশ্রয় পেয়ে যাওয়ার স্বাদ মেলে। একটি মেয়ে এ বাড়িতে এসেছে, পরের মেয়ে। সমীরের ঘরে ঘুমিয়ে আছে, কয়েক ঘণ্টা আগের হাসিগান বেসামাল দাপাদাপিতে রজনীগন্ধার পাপড়ি দলিত বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছে। তিমিরের ঘুম কি আর কক্ষনও ভাঙবে?

উঠে বসতে চারুবালা বুঝলেন, অবসন্ন শরীরের ভাঁজে ভাঁজে যন্ত্রণা। বারান্দায় এসে রাস্তার ওপারে নিঃসঙ্গ আলোটার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন একটু, সরে গিয়ে তিমিরের ঘরের খোলা দরজার চৌকাঠে হাত রেখে ভেতরে তাকালেন। খাট নয়, মেঝের বিছানা পাতা। খাট সব সময় নিরাপদ নয়। সেই বিছানায় একটি জ্যামিতিক নকশার মত তিমির ঘুমিয়ে আছে, যেন মরে গেছে। অন্ধকারে বুকের ওঠানামা চোখে পড়ে না। ভয় দেখানো রোগা অথচ সুদীর্ঘ হাত-পা গুটিয়ে এনে কয়েকটা কৌণিক বিন্দু তৈরি করেছে। এই অন্ধকারেও আদুড় পিঠে পাকা ধানের মত রঙ সবটুকু ঢাকা পড়েনি। ঠিক ওর বাবার মত। সেই লোকটা, যে তিমিরের মত খুব ভালভাবে পাস-টাস করেও সারা জীবন স্কুলে মাস্টারি করে গেল। সেকালে কলেজে চাকরি পাওয়া সহজ ছিল না। তারপর একদিন হাতে করে একটা লাল রঙের বলের মত গোল বুমঝুমি নিয়ে বাড়ি এল বিকেলে। এসেই বিছানায় গা এলিয়ে দিল। কার জন্যে এনেছিল ঝুম-

ঝুমঝুমিটা? তিমিরের, না সমীরের জন্যে? সমীর তখন সবে হাঁটতে শিখেছে। একটু পরে হাত থেকে খসে গেল ঝুমঝুমিটা গড়িয়ে গেল জল গলবার ঝাঁজরিটার দিকে। শেষবারের মত আঙুলগুলো শুধু একটু কেঁপেছিল। এখন পাতলা অন্ধকারে প্রায় ঠিক তেমন করে শুয়ে আছে তিমির। ঘরের পশ্চিমের জানলার গায়ে একটা টেবিল, একটা চেয়ার। টেবিল, শেলফ, তাক, আলমারিতে সাজানো বই। নানা আকার, নানা রঙের বইয়ের সুচারু বিন্যাস। কেউ ছোঁয় না। অন্ধকারে কেউ সোজা, কেউ সামান্য কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, অতীতের কটাক্ষের মত। ওই টেবিলের পাশে ওই চেয়ারে তিমির কতকাল বসে না।

নিজের ঘরে ফিরে এলেন। কঠিন মাটি-রঙ মেঝে। আজ দুঃসহ গরম। এখান থেকে গঙ্গা বেশী দূরে নয়। জলের ওপর দিয়েও একটু হাওয়া বইছে না বুঝি। এখন গঙ্গায় স্টীমারের ভেঁপু কী গম্ভীর! জলের অতল অন্ধকারে টেনে নিয়ে যাবার মত স্রোত নেই তাঁর মনে। বিকেলে তিমিরের চায়ে মাত্রাতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেবার সময় চারুবালার হাত কাঁপেনি। সন্ধ্যে থেকে, সন্ধ্যের আগে থেকেই হয়ত, সমীরের সবিতার বন্ধুরা আসতে শুরু করবে। ওই নিষ্ঠুরতার দরকার ছিল। অন্তত নিজেকে পুড়িয়ে শক্ত করার জন্যে, মা হয়েও, ওই নিষ্ঠুরতার দরকার ছিল। অনেক সহ্য হয় চারুবালার। শুধু সহ্য হয় না তিমিরের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনে কারও মুখ করুণায় নরম হবে, বিরক্তিতে কাল হবে। তিমিরকে বিষ দিতে পারেন, তার অপমান অসহ্য।

তিমির চারুবালার প্রথম। পঁয়ত্রিশ বছর আগে তার আসার বার্তা যখন তাঁর শরীরে সঞ্চারিত, একজন তাঁর চোখে সুখের স্বাদ পেয়ে ঠোঁটে মৃদু হাসি বুনতো। আজ বিকেলে চায়ে ঘুমের ওষুধ মেশানো দেখবার জন্যে বেঁচে থাকলে সে নিশ্চয় বলত, এত কূটকৌশল তুমি জান চারু। তুমি বড় কুটিল।

শুধু কুটিলতা নয়, তাঁর কিছুই কেউ আর দেখবে না। চারদিকের করুণা, বিরক্তির দৃষ্টি তাঁর বাঁচবার, তিমিরকে বাঁচাবার, সতর্ক সাধনা কেউ দেখবে না। আজ এখন এই দুঃসহ গরমে যদি এক আশ্চর্য তীক্ষ্ণ শীতের অনুভব মনের অন্ধকার প্রত্যন্ত থেকে উৎসারিত হয়ে সারা গায়ে ছড়িয়ে যায়, যদি দাঁতের চাপে চাপে কাটা কম্পিত ঠোঁটের রক্ত দেখেন, তিনি একাই দেখবেন। আর কেউ নেই যার চোখ সেই দৃশ্যে আহত হবে।

চারুবালা একাই সব দেখেছেন, একাই সব দেখেন। একটু একটু করে চাপ চাপ অন্ধকার তিমিরের মনের মধ্যে কেমন জীবন্ত হয়ে উঠল, কখন সেই জীবন্ত অন্ধকারের অসংখ্য বিপরীতমুখী ঢেউ তিমিরের মনের মধ্যে পরস্পরকে আঘাত করল, সব তিনি দেখেছেন। সেই আঘাত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাওয়ার আগের তিমিরকেও তিনিই দেখেছেন, দু চোখ মেলে দেখেছেন। ভয় পাওয়ার মত রোগা অথচ অত্যন্ত ঋজু, সুদীর্ঘ। সর্বাঙ্গে কী এক কঠোর সংকল্পের টান টান বুনুনি। মাঝে মাঝে কখনও খুশিতে খুব কাছে ঘন হয়ে এলে ওপর দিকে চোখ তুলে তাকাতে হত, মনে হত, সামনেই এক দুরন্ত দুর্লঙ্ঘ্য চড়াই। দলে দলে বন্ধুরা আসত-যেত। অনেক কাল আগে কম ভাড়ায় পাওয়া স্কুল মাস্টারের এই বাড়িতে নির্জনতা দুর্লভ ছিল। কী এক উৎসবে মেতে থাকত দিন-রাত। সেই উৎসবের বৃত্ত নাকি প্রসারিত ছিল সারা দেশে। তিমিরের ছোট একখানা ঘর নাকি চার দেওয়ালের একটি পরিমিত
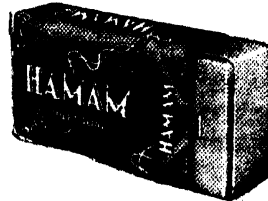
পারিলর ছিল না, অনেক বড় কিছুর অংশ ছিল। বহুকাল থেকে টু'টি চেপে ধরা সাঁড়াশির মত আঙুল সেই উৎসবে নাকি শিথিল হয়ে খসে পড়বে। কখনও কখনও কথা বলতে একেবারে ভুলে যেত তিমির, সোজাসুজি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েও অন্য কিছু, দুর্লংঘ্য কিছু দেখত। আবার এক-একদিন রোদে পুড়ে পুড়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে স্রোতের মত বেয়ে এসে বাড়ি ফিরেও ক্লান্ত হত না, যেন খুশির হাওয়ায় উড়ত।

সেইসব দিনে সাদা থান পরা, ঈষৎ কুঞ্চিত ঘন চুলের ভার থেকে মুক্ত চারুবালা সারাক্ষণ টুকিটাকি কাজে তাঁর প্রায় নিরন্ন সংসারে কত পূর্ণ ছিলেন। হয়ত অনেক রাত করে ফিরেছে তিমির, তখন সমীরের দু ঘণ্টা ঘুম হয়ে গেছে। আজকের মত নিঃসাড় বাড়ি। একা খেতে বসে হঠাৎই বলেছে, আর কিছু রাঁধ নি মা? সামান্য চমকে উঠেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছেন, ভাল লাগছিল না। আমার শরীর ভাল নেই আজ। ততক্ষণে তিমিরও সতর্ক হয়ে গেছে। বাঁ হাতের আঙুল তাঁর ছোট ছোট চুলের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে শব্দ করে হেসে বলেছে, তোমার পাপের ভয় নেই মা? এই বয়েসে মিথ্যাভাষণ! সত্যি কথা বলতে হলে বলতে —তোর বাবার ক'খানা স্কুলপাঠ্য বই আর তোর দু'টো ছাত্রের দক্ষিণায় এর বেশী পারি না। তারপরই মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলেছে, আর বছরখানেক পরে তুমি এমন সব সুখাদ্য সাজিয়ে দেবে যে, এক ঝলক দেখেই জিভে জল এসে যায়। এসব ব্যাপারে আমার ত আবার একটু বনেদী রুচি। তুমি ত সবই জান।

আর কি ঘুম ভাঙবে তিমিরের? কাল সকালে চা চাইবে?

অথচ কত ভাল করে সব পরীক্ষা উতরে-ছিল তিমির। কলেজে চাকরি পাবার কয়েকদিন পরেই এসে বলেছিল, সমুকে বাড়িতে পড়ানোর জন্যে আমাদের কলেজের একজনের সঙ্গে আজ পাকা কথা হল। আমার কাছে পড়লে ওর কিছু হবে না মা। আমাকে মোটেই মানে না। দিনরাত কোথায় কোথায় চরকির মত ঘুরছে, অসভ্য সব সঙ্গী জুটিয়েছে। আর একটু পড়াশুনো না হলে তোমাকে জ্বালাবে।

কঠিন মুঠোয় মনকে পিষে মারতে হয় না এমন সুখ চারুবালার পুরো দু'টো বছরও টেঁকেনি। তিমির এক রাত বাড়ি ফিরল না। সামান্য ইতিউতি করে সমীর নিখাদ ঘুমে ডুবল, আর চারুবালা সারারাত চাপচাপ আতঙ্কের অন্ধকার দু' হাতে সরিয়ে ভোর-বেলা শুনলেন কে যেন দরজার কড়া নাড়ছে। তিমিরের এক বন্ধু। ভূমিকায় সাহস সান্ত্বনা দিয়ে জানিয়ে গেল, গত সন্ধ্যায় এক ক্ষুব্ধ জমায়েতে তিমির আর তার এক সহকর্মী বন্ধু গ্রেপ্তার হয়েছে।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মত কিছু নয়। জীবনের নকশা কুচিকুচি হয়ে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়ে যাবার মত কিছু নয়। এ যেন জানাই ছিল। এর জন্যে হয়ত অজান্তে প্রস্তুতই ছিলেন চারুবালা। বরং তিমিরের কী এক সংকল্প যেন সেই প্রথম একটা অবয়ব পেল। সারা রাতের আতংকের পর ভোরবেলা তিমিরের খবর পেয়ে বিলম্বিত দীর্ঘনিঃশ্বাস নয়, যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কিন্তু প্রায় চার মাস পরে যখন তিমির জেলের হাসপাতাল থেকে বাড়ি এল, বন্ধুরা নিয়ে আসতে হল, তখন থেকেই চারুবালার এই অসুখ, ভাল ঘুম হয় না। চার মাস পরে যে ফিরল সে আর এক তিমির।

ভেসে যেত, সব ভেসে যেত, যদি না এমন অবিশ্বাস্য আকস্মিক পরিবর্তন হত সমীরের। চারুবালা অবাক হয়ে দেখলেন, যেন আবিষ্কার করলেন, তাঁর আর একটি ছেলে আছে। মায়ের আদল পেয়েছে সমীর।

সুগঠিত শরীর, বর্ণ শ্যাম। তিমির হাসপাতাল থেকে ফেরার পর সমীর, তাঁর দ্বিতীয়, দুই বলিষ্ঠ হাত বাড়িয়ে মা আর দাদাকে আঁকড়ে ধরল। কয়েক সপ্তাহের অসাধারণ সাধনায় একটা চাকরিও পেল।

এসবের জন্যে সমীরের প্রতি চারুবালা কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ? ছিঃ! এমন কথা কখনও ভাবতে আছে? অবাধ্য ছোট ছেলেকে ত মায়েরা বেশী ভালবাসেন। চারুবালা কেন অন্য সব মায়ের থেকে আলাদা হবেন? তিনি আলাদা হতে চান না।

কিন্তু সবাই ত সমীর নয়। একটু একটু করে অনিবার্যভাবে তিমিরের দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে তলিয়ে যাওয়া সবার কাছে সমান নয়। তারা কখনও করুণায় নরম হবে, কখনও বিরক্তিতে কাল। এই করুণা আর বিরক্তির দৃষ্টি ধারাল ছুরির মত পরতে পরতে কেটে বসে যায়। দুঃসহ জ্বালায় ঠোঁটের ওপর দাঁতের কঠিন চাপ পড়ে। তখন তিমিরকে বিষ দিতে পারেন চারুবালা। হাত কাঁপে না।

একটি মেয়ে এসেছে এ বাড়িতে, পরের মেয়ে। রজনীগন্ধার পাপড়ি-দলিত বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। ভাল মেয়ে, তার সম্বন্ধে চারুবালার অন্য কোন দ্বিধা নেই। কিন্তু সে কেমন করে তিমিরের প্রতি স্নিগ্ধ হবে? যখন সাপের দল্য ডিমভাঙা শিশুদের মত অজস্র অন্ধকারের ঢেউ তিমিরের মনের মধ্যে ফণা তুলবে, ছোবল মারবে, তখন কেমন করে তার প্রতি স্নিগ্ধ হবে সবিতা?

সব শুনেছিলেন চারুবালা তিমির জেলের হাসপাতাল থেকে ফেরার পর। প্রথম রাত্রিতেই কী এক স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে তিমিরের সর্বাংগ ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে কুপিয়েছে। ভয় পাওয়ার মত রোগা শরীরে হাড়ের প্রকট রেখায় রেখায় ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে কুপিয়েছে। ভাবলে যেন কেমন লাগে, ভাবনা ফতুর হয়ে যায়। শুধু চারুবালার শরীরের ভাঁজে ভাঁজে সেই যন্ত্রণা।

একটু একটু করে তিমিরের হাত-পা প্রায় অসাড় হয়ে গেল। প্রায় ভুলে গেল কথা বলতে। শুয়ে শুয়ে মরা মাছের মত চোখ করে তাকাত। এক এক সময় আবার জ্বলে উঠত সেই চোখ, সোজাসুজি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েও নিরবয়ব অন্য কিছু খুঁজত। কারও ওপর ভর দিয়ে অথবা শক্ত কিছু শিথিল হাতে জড়িয়ে একটুক্ষণ উঠে দাঁড়িয়ে থাকলেই কপালে আর নাসাগ্রে ঘামের বিন্দু জেগে উঠত।

অনেক চেষ্টা হয়েছিল। সমীর তার কৈশোর আর প্রথম যৌবনের সব অপরাধের ক্ষতিপূরণ দিতে চেয়েছিল। তা ছাড়া, তার পাশে ছিল তিমিরের বন্ধুরা। কিছুই ত হল না। বরং নতুন দেখা দিল পেটে এক দুঃসহ যন্ত্রণা। আর তারপরই অন্ধকারের সেই সাপগুলো কিলবিলিয়ে উঠল তিমিরের মাথার মধ্যে, একদিনের আকস্মিক কর্কশ চিৎকারে যার শুরু। সেই থেকে একটু উত্তেজনা পেলেই অসংলগ্ন কর্কশ চিৎকার। শুধু অসংলগ্ন নয়, কখনও কখনও অশ্লীল, অশ্রাব্য।

হাসপাতাল থেকে ফেরার পর প্রথম প্রথম তিমিরের বন্ধুরা ছাত্র জুটিয়ে দিয়েছিল, অনুবাদ করার জন্যে এনে দিয়েছিল বিদেশী বই। একরকম চলছিল প্রথম কয়েক মাস। তারপর আর কিছু বাকী রইল না। তিমির কিছুই ধরে রাখতে পারল না, ধরে রাখবার মত হাতের কাছে কিছু পেলেন না চারুবালা। সেই থেকে দিন মাস বছর তাঁর

একটিই সাধনা। ভোঁতা তলোয়ারের মত প্রতিদিনের অপমানের আঘাত থেকে তিমিরকে বাঁচাবার সাধনা।

আজ সমীরের ফুলশয্যা। সবিতাদের বাড়িতে বিয়ের কোন সামাজিক অনুষ্ঠান হয়নি। সমীর সংগত কারণেই তার ও সবিতার বন্ধুদের আজ এখানে ডেকেছিল। তিনি সমীরের মা, আজ এই বিশেষ সন্ধ্যায় ওদের বন্ধুদের পেয়ে তিনি নিশ্চয়ই খুশী হয়েছেন। খুশী না হওয়া অন্যায়, খুব অন্যায়, অমার্জনীয়। সমীর যদি বলে, তোমার দুঃখ আছে জানি, কিন্তু আমি কী করেছি মা! তুমি মুখ ফিরিয়ে থাকলে আমি কেমন করে আনন্দ করি, কেমন করে বাঁচি? চারুবালা কোন জবাব দিতে পারেন না। কী জবাব আছে?

দুপুরের পরে তিমির শুয়ে শুয়ে ছেলেমানুষি খুশী খুশী গলায় বলেছিল, আজ কত আনন্দের দিন, না মা? আমি কিন্তু অভ্যর্থনায় থাকব। ওদের বন্ধুরা এলে হেসে হেসে বলব, এসো, এসো।

পাশে দাঁড়ানো সমীর কেমন অসহায়ের মত চারুবালার দিকে তাকিয়েছিল। তখনই তিনি বুঝেছিলেন, কী করতে হবে। তাঁর একটুও হাত কাঁপে নি।

রাস্তার ওপারে একটি নিঃসংগ আলো। তার তলায় একটা নলকূপের অমসৃণ হাতলে আলো চুঁইয়ে পড়েছে। পাঁচ বছর আগে একদিন এ বাড়ির দোতলার বউটি ওপরে এসে বলেছিল, কী কষ্টের কথা দিদি! আপনার বড় ছেলের নাকি মাথার দোষ হয়েছে! একটিও কথা না বলে চারুবালা তার বিষণ্ণ মুখের ওপর শব্দ তুলে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পাশের ঘরে যে মেয়েটি ঘুমিয়ে আছে তার মুখের ওপর কেমন করে দরজা বন্ধ করবেন? প্রথম প্রথম সে করুণায় নরম হবে, তারপর বিরক্তিতে কাল। কিছু হয়ত বলবে না, কিন্তু ক্রমে দৃষ্টিতে স্বচ্ছ হবে তিমিরের, তাঁর অপমানের মৃত্যু। একটু একটু করে একদিকে সমীর-সবিতা, আর একদিকে তিমির ও তাঁর মাঝখানে একটি অনিবার্য বিবর্ণ দেওয়াল সবিনয়ে মাথা তুলবে।

এই ঘরখানাই সব থেকে বড়। কোণে কোণে কত কী অগোছাল পড়ে আছে। এই ঘরখানাই সব থেকে অগোছাল। কোণে কোণে নানা পাত্রে অথবা মেঝেয় ছড়ানো ময়দা, মসলা, কলাপাতা, চায়ের পেয়ালা, মিষ্টির হাঁড়ি থেকে চলকে পড়া চিটচিটে রস, পিঁপড়ে, আরশোলা, ইঁদুর; অথচ তাঁর চারদিকে কঠিন মেঝেয় প্রসারিত শূন্যতা। হাওয়া নেই, দুঃসহ গরম। চারুবালার এক গা ক্লান্তি, জ্বালাধরা চোখ, স্বেদসিক্ত দেহের ভাঁজে ভাঁজে যন্ত্রণা। ঘুম আসছে না, তাঁর ঘুম সহজে আসে না, বাকী রাতটুকু এভাবেই কাটবে। আসলে এটাই তাঁর কষ্ট। ঘুম এলে, সহজে ঘুম এলে, এই আপাতনিথর রাত্রির এত বিচিত্র রহস্যময় ধ্বনি অনুভবে ঘা দিত না, এমন অসহ্য ভাবনার ঢেউ আছড়ে পড়ত না মনে।

তিমিরের ঘরে বিশ্রী একটা শব্দ হল। দরজার কপাট দেওয়ালে আছড়ে পড়ার শব্দ। এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে, তিনবার মাত্র পা দিয়ে মেঝে স্পর্শ করে চারুবালা বারান্দায় এলেন। দরজার একটা কপাটের ওপর ক্লান্ত হয়ে ভাঙাচোরা রেখায় তিমির দাঁড়িয়ে আছে, তিমিরের প্রেত যেন। ঈষৎ স্বচ্ছ অন্ধকারে বুজে আসা চোখ জোর করে মেলে রেখে তাঁর দিকে তাকাল। নিজের দেহের ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার প্রাণান্তিক কসরতে, সর্বাংগের কৌণিক খাঁজে খাঁজে একটি তীব্র অভিযোগের করুণ মুদ্রা। চারুবালার পেছনে, তিমিরের সামনে, রাস্তার ওপারে একটা নিঃসংগ আলো। ঘরের মেঝেয়, বিস্রস্ত বিছানায়, তিমিরের অস্পষ্ট ছায়ার পাশে চারুবালার ছায়া দীর্ঘায়িত হল।

গলায় অভিযোগের ঝাঁজ এনে তিমির বলল, আমি কিছু দেখলাম না মা। সমু আর তার বউকে কেমন দেখাচ্ছে আমি দেখলাম না। আলো নিবিয়ে আমার ঘর অন্ধকার করে রেখেছ।

সমীর ঘর থেকে বেরিয়ে এল, সংগে সবিতা। ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে গিয়ে আলো জেবলে, দু'হাত বাড়িয়ে তিমিরের শিথিল দেহের ভার টেনে নিল। অচেতন প্রচেষ্টায় মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে তিমির বলল, ওদের গলায় মালা নেই কেন মা? ওদের বন্ধুরা কোথায়? আমি ত কিছুই দেখলাম না।

প্রত্যেকটি কথায় একটু বেশী জোর দিয়ে সমীর বলল, তুই সব দেখেছিস দাদা। তুই ত সব দেখাশোনা করলি। তুই না থাকলে কি এ বাড়িতে কিছু হতে পারে? নিমন্ত্রিতরা চলে গেছে, এখন রাত প্রায় শেষ। আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আয়, ঘুমো।

সমীরের কথা যেন সত্যি মনে হল তিমিরের। খুশির হাসিতে দু সারি দাঁতের সুচারু বিন্যাস চিকচিক করে উঠল।

টেনে টেনে বিছানায় নিয়ে গিয়ে সমীর তাকে শুইয়ে দিল। আলো নিবিয়ে দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রইল একটুক্ষণ। বাধ্য শিশুর মত তিমির চোখ বুজল, আর সংগে সংগে মনে হল ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিজের ঘরে যাবার সময় মাকে ঘরে পাঠিয়ে সমীর বলে গেল, তুমি শুয়ে পড় মা। ঘুমোতে চেষ্টা কর একটু।

খালি মেঝের প্রসারিত শূন্যতার বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে বসলেন চারুবালা। এর পরও ঘুমের কথা ভাবা বাতুল কল্পনা। আর বেশীক্ষণ অন্ধকারে মুখ ঢেকে রাখা যাবে না। সকাল হবে। অনেক দিন আগে কম ভাড়ায় পাওয়া এই তিন ঘরের সব বিশৃঙ্খলা, সব দৈন্যের ওপর রোদ পড়ে চোখে কাঁটার খোঁচা দেবে। কাল সকালে কেমন করে মুখ দেখাবেন সবিতাকে? এইমাত্র তিমির অশ্লীল কিছু করে নি। তবু আজ এই সময়ে এমন নাটক কেমন লাগবে সবিতার?

ওদের ঘরে আলো নিবেছে। মৃদু গলায় কথা বলছে ওরা। কী কথা বলছে? তিমিরের বিষয়ে কী বলছে ওরা? সবিতা কী বলছে? বারান্দায় যতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, কথা বলেনি। এখন মৃদু গলায় সমীরকে কী বলছে? হয়ত বলছে সবিতা, রাত দুপুরে নাটক ভাল লাগে না! বলে পাশ ফিরে শুয়েছে, আর বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে সমীরের মুখ।

চারুবালা উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। এখান থেকে স্পষ্ট কিছুই শোনা যায় না। অন্য কাউকে শোনাবার জন্যে কথা বলছে না ওরা। ইচ্ছে হল সন্তর্পণে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ান। ছেলের ঘরে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আড়ি পাতবেন? ছিঃ! কিন্তু এই বসে থাকা অসম্ভব মনে হল। মনের অন্ধকার প্রত্যন্ত থেকে এক আশ্চর্য তীক্ষ্ম শীতের অনুভব উৎসারিত হয়ে ছড়িয়ে গেল সারা গায়ে। নিচের ঠোঁটের ওপর কয়েকটা দাঁতের কঠিন চাপ যখন আর কোন যন্ত্রণার অনুভব জাগাল না, পায়ে পায়ে বাইরে এলেন! সমীরের ঘরে তাঁর ছায়া না পড়ে এমন করে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন। ওদের নরম গলার কথা স্পষ্ট হল।

এক আশ্চর্য উত্তাপে গলে গিয়ে সবিতা বলছে, শোন, একটা কথা বলব।

বল।

আমি ত চাকরিটা ছাড়িনি, ছুটি নিয়েছি। ভেবেছিলাম, তুমিও বলেছিলে, আর ফিরে যাব না। শোন, আরও কিছু দিন, অন্তত এক বছর, চাকরিটা করব। জানি দাদার জন্যে তোমরা অনেক চেষ্টা করেছ। এসো দু'জনে মিলে আর একবার, শেষবারের মত, দাদার জন্যে চেষ্টা করে দেখি।

রজনীগন্ধার পাপড়ি দলিত বিছানায় সমীরের খুব কাছে ঘন হয়ে এসে এইসব কথা বলছে সবিতা? চারুবালার জ্বালাধারা চোখে যেন কিসের অসহ্য তাপ লাগল। প্রায় টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

কোথা থেকে যেন একটু ঝিরঝির হাওয়া আসছে, একটু ঠাণ্ডা হয়েছে মেঝেটা। তিমিরকে বাঁচাতে পারবে না সবিতা, তার এই মুহূর্তের সংকল্পের টান টান বুনুনি শিথিল হয়ে যাবে। সব সময় তিমিরের প্রতি এমন স্নিগ্ধ হতে পারবে না সবিতা, পারা যায় না। তবু, সবিতা, তুই আমার মেয়ে। তিমির সমীরের মত তুই আমাকে মা বলে ডাকিস।

ওরা বলে—এসপ্ল্যানেড্। আমরা বলি—চৌরঙ্গী। সেই চৌরঙ্গীরই কার্জন পার্ক। সারা দিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত শরীরটা যখন আর নড়তে চাইছিল না, তখন ওইখানেই আশ্রয় মিলল। ইতিহাসের কার্জন সায়েব বাংলাদেশের অনেক অভিশাপ কুড়িয়েছিলেন। বাংলা দেশটাকে কেটে দু' ভাগ করবার বুদ্ধি যেদিন তাঁর মাথায় এসেছিল, আমাদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস নাকি সেই দিন থেকেই শুরু হয়েছিল। কিন্তু তার অনেক দিন পরে, বিংশ শতকের এই মধ্যাহ্নে মে মাসের রৌদ্র-দগ্ধ কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে আমি তাঁকে প্রণাম করলাম; তাঁর মৃত আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করলাম। আর প্রণাম করলাম রায় হরিরাম গোয়েংকা বাহাদুর কে টি, সি আই ই—কে। তাঁর পায়ের গোড়ায় লেখা—Born 1862, died February 28, 1935.

আমাকে মনে আছে কী? অনেক দিন আগে কাসুন্দের একটি অপরিণতবুদ্ধি বালক বিভূতিদার হাত ধরে রামকেষ্টপুরের ঘাট পেরিয়ে হাইকোর্ট দেখতে এসেছিল। সায়েব ব্যারিস্টারের কাছে চাকরি পেয়েছিল সে। ছোকাদার ভালবাসা পেয়েছিল। ভাল-বাসার সুযোগ নিয়ে প্রাণভরে সে বাবুগিরি করেছিল, আর দুটি বিস্মিত চোখ দিয়ে এক বিচিত্র জগতের রূপ রস গন্ধ উপভোগ করেছিল।

অনেক দুঃখ আর দৈন্যের মরুভূমি পেরিয়ে এক বিশ্বপ্রেমিক বিদেশীর মরু-দ্যানে আশ্রয় পেয়ে, আমার ক্লান্ত প্রাণ হিসেবে ভুল করেছিল। ভেবেছিল, এ আশ্রয় চিরকালের। কিন্তু, সংসারের অডিটররা হিসেবে ভুল ধরার জন্য সর্বদাই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমারও ভুল ভাঙলো শীঘ্রই। সায়েব চোখ বুজলেন। মরুদ্যানের তাঁবু, আমাদের মতো অভাগাদের কল্যাণে, সামান্য ঝড়েই উড়ে বেরিয়ে গেল। 'আবার চলো। ফরওয়ার্ড মার্চ।' বিজয়ী বিধাতার হৃদয়হীন সেনাপতি পরাজিত বন্দীকে হুকুম দিলেন। প্রাণ না চাইলেও, আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মনের বোঝাটাকে ক্লান্ত দেহের ঠেলা গাড়িতে চড়িয়ে আমাকে আবার যাত্রা শুরু করতে হলো। 'Onward, Onward! Don't Look back, সামনে সামনে। পিছনে তাকিও না।'

আমি আবার পথে। হাইকোর্টের বাবুরা এসেছিলেন। চোখের জল ফেলেছিলেন। ছোকাদা বলেছিলেন, "আহা, এই বয়সে স্বামী হারালি! একেবারে কাঁচা বয়েস।"

আমি কিন্তু কাঁদিনি। একটুও কাঁদিনি। বজ্রাঘাতে আমার চোখের সব জল যেন ধোঁয়া হয়ে গিয়েছিল।

ছোকাদা কাছে ডেকে বসিয়েছিলেন। শিখের দোকান থেকে চা আনিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "বুঝি ভাই, সব বুঝি। কিন্তু এই পোড়া পেটটা যে কিছুই বুঝতে চায় না। সামান্য যা হয় কিছু মুখে দে, শরীরে বল পাবি।"

ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে সেই আমার শেষ চা-খাওয়া। ছোকাদা অবশ্য বলেছিলেন, "ভাবিস না, এই পাড়াতেই কিছু একটা জুটে যাবে। তোর মতো বাবুকে কোন্ সায়েবের না রাখতে ইচ্ছে হয় বল্? তবে কিনা এক স্ত্রী থাকতে, অন্য কাউকে নেওয়া...। সবারই তো বাবু রয়েছে।"

জোর করে কথা বলা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। কিন্তু সেদিন চুপ করে থাকতে পারিনি। জোর করেই বলেছিলাম, "ছোকাদা, আমি পারবো না। এ-পাড়ায় আর থাকতে পারবো না।"

ছোকাদা, অর্জুনদা, হারুদা সবাই সেদিন আমার দুঃখে অভিভূত হয়েছিলেন। বিষণ্ণ ছোকাদা বলেছিলেন, 'আমরা তো পারলাম না। যদি পারিস তুই পারবি। পালিয়ে যা, আমরা জানবো এই সর্বনাশা ঘুলঘুলিয়া থেকে অন্তত একজনও বেরিয়ে যেতে পেরেছে।"

ও'দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, আমিও টিফিন কৌটো সমেত কাপড়ের ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। পশ্চিম আকাশের বিষণ্ণ সূর্য সেদিন আমার চোখের সামনেই অস্ত গেলেন।

কিন্তু তারপর? সেদিন কি জানি জানতাম, জীবন এতো নির্মম? পৃথিবী এতো কঠিন, পৃথিবীর মানুষরা এতো হিসেবী?

চাকরি চাই। মানুষের মতো বেঁচে থাকবার

জন্য একটা চাকরি চাই। কিন্তু কোথায় চাকরি?

ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেট হাতে কয়েকজন পরিচিতের সঙ্গে দেখা করেছি। প্রচুর সহানুভূতি দেখিয়েছেন তাঁরা। আমার আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয় তাঁদের প্রাণে যে কত আঘাত দিয়েছে তাও জানিয়েছেন। কিন্তু চাকরির কথাতেই আঁতকে উঠেছেন। বলেছেন, দিনকাল বড়ই খারাপ। কোম্পানির ফাইনান্সিয়াল অবস্থা "হ্যাপি" নয়। তবে ভেকান্সি হলে নিশ্চয়ই খবর পাঠাবেন!

আর এক আপিসে গিয়েছি। ও'দের দত্ত সায়েব এক সময় বিপদে পড়ে আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। আমারই অনুরোধে সায়েব বিনা ফিতে ও'কে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কিন্তু দত্ত সায়েব দেখা করলেন না। স্লিপ হাতে বেয়ারা ফিরে এল। সায়েব আজ বড়ই ব্যস্ত। দেখা করতে না পারার জন্য স্লিপের উপর পেন্সিলে আফসোস প্রকাশ করেছেন। এবং আগামী কয়েক সপ্তাহ তিনি এতোই কর্মব্যস্ত থাকবেন যে যথেষ্ট ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার সুমধুর সান্নিধ্য উপভোগ করতে পারবেন না, তাও জানাতে ভোলেননি।

বেয়ারা বলেছিল, চিঠি লিখিয়ে। লজ্জার মাথা খেয়ে চিঠি লিখেছিলাম। বলা বাহুল্য, উত্তর আসেনি।

আরও অনেক লিখেছি। পরিচিত, অপরিচিত, বক্স নম্বর, অনেকের কাছেই আমার গুণাবলীর সুদীর্ঘ বিবরণ পেশ করে পত্র দিয়েছি। কিন্তু সরকারী পোস্টাপিসের রোজগার বৃদ্ধি ছাড়া তাতে আর কোনও সুফল হয়নি।

হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করিনি কোনোদিন। সামান্য যা পুঁজি ছিল তাও শেষ হয়ে এল। এবার নিশ্চিত উপবাস।

হা ঈশ্বর! কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টারের শেষ বাবুর কপালে এই লেখা ছিল?

ফেরিওয়ালার কাজ পাওয়া গেল অবশেষে। ভদ্রভাষায় নাম সেলসম্যান। ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট বিক্রি করতে হবে আপিসে আপিসে। কোম্পানির নাম শুনলে শ্রদ্ধায় আপনার মাথা নত হয়ে আসবে। ভাববেন, ম্যাকপিল এণ্ড ক্লার্ক, বার্মাশেল বা এণ্ড্রু-ইউলের সমপর্যায়ের কোনো কোম্পানি। কিন্তু এই কোম্পানির কর্ণধার এম সি পিল্লাই নামক মাদ্রাজী ছোকরার দুটো প্যাণ্ট ও একটা নোংরা টাই ছাড়া আর বিশেষ কিছুই ছিল না। ছাতাওয়ালা লেনের এক অন্ধকার বাড়ির এক তলায় তার ফ্যাক্টরি, আপিস, শো-রুম মায় শোবার এবং রান্নার ঘর। এম-সি-পিল্লাই ম্যাকপিল হয়েছেন। আর ক্লার্ক সায়েব? উনি কেউ নন. ম্যাকপিলের ক্লার্ক!

তারের পাকানো ঝুড়িগুলো আমাকে বিক্রি করতে হবে। টাকায় চার আনা কমিশন। প্রতি ঝুড়িতে চার আনা! সে যেন আমার কাছে স্বর্গ।

কিন্তু তাও বিক্রি হয়নি। ঝুড়ি হাতে আপিসে আপিসে ঘুরেছি, আর বাবুদের টেবিলের তলার দিকে তাকিয়েছি। অনেকে সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন, "ওখানে কী দেখছো?"

"আজ্ঞে, আপনার ছেঁড়া কাগজ ফেলবার ঝুড়িটা।"

সেটা জরাজীর্ণ দেখলে কি আনন্দই যে হয়েছে। বলেছি, "আপনার ঝুড়িটার আর কিছুই নেই। একটা নতুন নিন না, স্যর। খুব ভাল জিনিস। একটা কিনলে দশ বছর নিশ্চিন্ত।"

বড়বাবু ঝুড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছেন, "কণ্ডিশন তো বেশ ভালই রয়েছে। এখনও হেসে-খেলে বছরখানেক চলে যাবে।"

বড়বাবুর মুখের দিকে করুণভাবে তাকিয়ে থেকেছি। কিন্তু আমার মনের কথা উনি বুঝতে পারেন নি। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়েছে, 'ঝুড়িটার না হয় হেসে-খেলে আরও বছরখানেক চলে যাবে। কিন্তু আমার? আমার যে আর একদিনও চলতে চাইছে না।'

কিন্তু বলার ইচ্ছে থাকলেই চার্নক সায়েবের এই আজব শহরে সব কিছু বলা যায় না। তাই নীরবে বেরিয়ে এসেছি।

স্যুট-পরা, টাই-বাঁধা বাঙালী সায়েবদের সঙ্গেও দেখা করেছি। জুতোর ডগাটা নাড়তে নাড়তে সায়েব বলেছেন, "ভেরী গুড্। ইয়ং বেঙ্গলীরা যে বিজনেস লাইনে এণ্টার করছে এটা খুবই আশার কথা।"

বলেছি, "আপনাকে তাহলে ক'টা দেবো স্যর?"

স্যর আমার দিকে তাকিয়ে, একটুও দ্বিধা না করে বলেছেন, "আমার ছ'টা দরকার। কিন্তু দেখবেন আমাদের শেয়ারের কথাটা যেন ভুলে যাবেন না।"

ছ'টা ঝুড়ি বিক্রি করে আমার দেড় টাকা লাভ। বিক্রির টাকা পেয়ে, সেই দেড় টাকা হাতে নিয়ে বলেছি, "ছ'টা ঝুড়িতে আমার দেড় টাকা থাকে স্যর। আপনার যা বিচার হয় নিন।"

সিগারেট টানতে টানতে সায়েব বলেছেন, "অন্য কারুর কাছে পারচেজ করলে easily থার্টি পারসেণ্ট পেতাম। তা হাজার হোক আপনি বেঙ্গলী, সুতরাং টোয়েন্টিফাইভই নিলাম।" এই বলে পুরো দেড়টা টাকাই আমার হাত থেকে নিয়ে নিয়েছেন। বলেছেন, "আমাদের জাতের অনেস্টি বলে কিছু নেই। এর মধ্যেই বেশ এক্সপার্ট হয়ে উঠেছেন তো। কী করে বললেন যে ছ'টা ঝুড়িতে আপনার দেড় টাকার বেশী থাকবে না? আমরা কি grass-এ মুখ দিয়ে চরি?"

কোনো উত্তর না দিয়েই সেদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। অবাক হয়ে এই অদ্ভুত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থেকেছি।

আশ্চর্য। এই পৃথিবীকেই একদিন কত সুন্দর বলে মনে হয়েছিল আমার। এই পৃথিবীতেই আমি একদিন মানুষকে শ্রদ্ধা করতাম। বিশ্বাস করতাম, মানুষের মধ্যেই দেবতা বিরাজ করেন। হঠাৎ মনে হলো, আমি একটি গর্দভ। সংসারের এতো আঘাতেও আমার শিক্ষা হয়নি। আমার জ্ঞান-চক্ষু কি কোনোদিন উন্মীলিত হবে না? না না, অসম্ভব। আমাকে চালাক হয়ে উঠতেই হবে।

সত্যিই আমি চালাক হয়ে উঠলাম। এক টাকার ঝুড়ির দাম বাড়িয়ে পাঁচ সিকে বলেছি।

যিনি কিনলেন তাঁকে বিনা দ্বিধায় চার আনা পয়সা দিয়ে বলেছি, "কিছুই থাকে না, স্যর। এ কম্পিটিশনের মার্কেটে টিকে থাকবার জন্যে উইদাউট মার্জিনেই বিজনেস করছি।"

মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে কোনো কষ্ট হয়নি আমার। শুধু মনে হয়েছে, এই স্বার্থান্ধ পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, আমি একা। আমাকে নিজের বুদ্ধি দিয়ে, চালাকি করে বেঁচে থাকতে হবে, পথ তৈরি করতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে। জীবনের সব আনন্দের আয়োজনে আমাকে জোর করেই ভাগ বসাতে হবে।

সেই সময়েই একদিন ডালহৌসি স্কোয়ারের এক আপিসে গিয়েছিলাম।

মে মাসের কলকাতা। রাস্তার পিচ পর্যন্ত টগবগ করে ফুটছে। দুপুরের রাজপথ মধ্যরাতের মতো জনমানবহীন। শুধু আমাদের মতো কিছু হতভাগা তখনও হাঁটছে। তাদের থামলে চলবে না। তারা এ আপিস থেকে ও আপিসে যাচ্ছে, আর ও আপিস থেকে এ আপিসে আসছে, যদি কোথাও কিছু জুটে যায়।

ঘামে গায়ের জামাটা ভিজে উঠেছিল—যেন সবেমাত্র পুকুরে ডুব দিয়ে উঠে এসেছি। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। পথের ধারে ঘোড়াদের জল খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে দেখলাম। কিন্তু আমাদের জন্য কিছু নেই। বেকার ক্লেশ নিবারণ তো আর পশু ক্লেশ নিবারণ সমিতির কাজ নয়, সুতরাং কাউকেই দোষ দিতে পারি নি।

একটা বড়ো বাড়ি দেখে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। সামনেই লিফ্‌ট। লিফ্‌টে উঠে নিশ্বাস নিচ্ছি। গেট বন্ধ
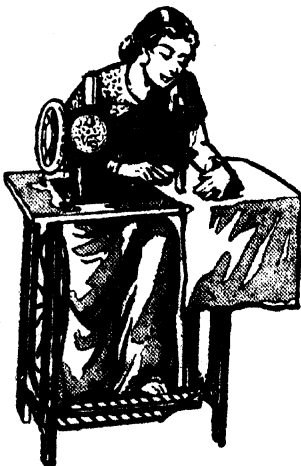
করে লিফ্‌টম্যান হাতল ঘুরিয়ে দিল। হঠাৎ তার নজরে পড়লো আমার হাতে দুটো ঝুড়ি। আমার মুখের দিকে তাকিয়েই অভিজ্ঞ লিফ্‌টম্যানের বুঝতে বাকি রইল না আমি কে। আবার হাতল ঘুরলো, লিফ্‌ট আবার স্বস্থানে ফিরে এল।

আঙুল দিয়ে সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়ে লিফ্‌টম্যান আমাকে বার করে দিল। বার করে দেবার আগে সে বলেছিল, "ভবিষ্যতে মনে রেখো, এই লিফ্‌ট কেবল সায়েব এবং বাবুদের জন্যে। তোমার মতো নবাব বাহাদুরদের সেবা করবার জন্যে কোম্পানি আমাকে চাকরি দিয়ে রাখেনি।"

সত্যিই তো, আমাদের মতো সামান্য ফেরি-ওয়ালার জন্য কেন লিফ্‌ট হতে যাবে? আমাদের জন্য পাকানো সিঁড়ি রয়েছে, হেঁটে হেঁটে উপর-তলায় উঠে যাও।

তাই করেছি। কোনো অভিযোগ করিনি—নিজের অদৃষ্টের কাছেও নয়। ভেবেছি, সংসারের এই নিয়ম। উপরে উঠবার লিফ্‌ট সবার জন্য নয়।
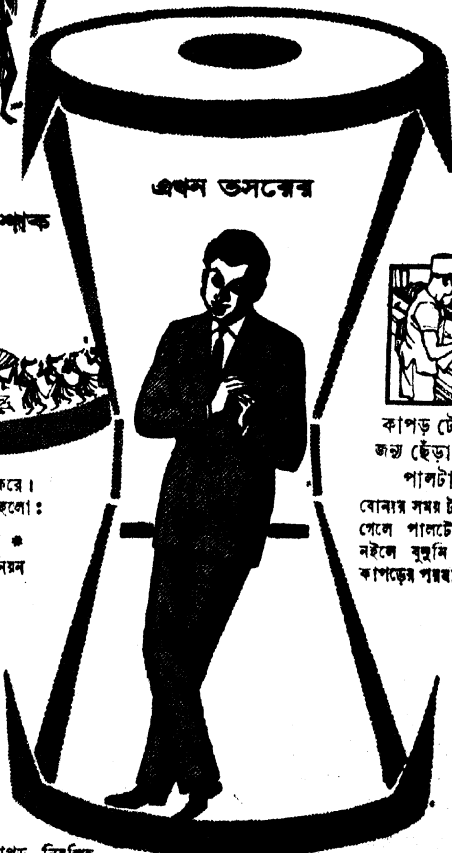
দিনটাই খারাপ আজ। একটাও বিক্রি হয়নি। অথচ তিন আনা খরচ হয়ে গিয়েছে। এক আনা সেকেন্ড ক্লাশের ট্রামভাড়া, এক আনার আলু-কাবলী। তারপর আর লোভ সামলাতে পারিনি। বেপরোয়া হয়ে, এক আনার ফুচকা খেয়ে ফেলেছি। খুব অন্যায় করেছি। ক্ষণেকের দুর্বলতায় এক আনা পয়সা উড়িয়ে দিয়েছি।

আপিসে ঢুকে টেবিলের তলায় তাকিয়েছি। সব টেবিলের তলায় ঘড়ি রয়েছে।

এক মেমসায়েব কাজ করছিলেন। আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাই?"

বললাম, "ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট। ভেরি গুড্ ম্যাডাম। ভেরি স্ট্রং, এন্ড ভেরি ভেরি ডিউরেবল।"

কিন্তু বক্তৃতা কাজে লাগলো না। মেমসায়েব তাড়িয়ে দিলেন। ক্লান্ত পা দুটোকে কোনোরকমে চালিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

আপিসের দরজার সামনে বেঞ্চিতে বসে ইয়া গোঁফওয়ালা এক হিন্দুস্থানী দরোয়ান খৈনি টিপছিলেন। মাথায় তাঁর বিরাট পাগড়ি। পরনে সাদা তকমা। বুকের কাছে ঝক-ঝকে পিতলের পাতে কোম্পানির নাম জ্বল জ্বল করছে।

দারোয়ানজী আমাকে পাকড়াও করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, একটা ঝুড়ি বিক্রি করলে আমার কত থাকে।

বুঝলাম দরোয়ানজীর আগ্রহ আছে। বললাম, "চার আনা লাভ থাকে।"

ঝুড়ির দাম জিজ্ঞাসা করলেন দারোয়ানজী। এবার আর বোকামি করিনি। সোজাসুজি বললাম, "পাঁচ সিকে।"

দারোয়ানজী আমার হাতের ঝুড়িটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। বললাম, "খুব ভাল মাল, একটা কিনলে দশ বছর নিশ্চিন্ত।"

ঝুড়িটা হাতে করে দারোয়ানজী এবার আপিসের ভিতরে ঢুকে গেলেন। মেমসায়েব বললেন, "আমি তো বলে দিয়েছি ঝুড়ির দরকার নেই।"

দারোয়ানজীও ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, "ঘোষবাবুর ঝুড়ি নেই। মিত্তিরবাবুর ঝুড়ি ভেঙে গিয়েছে। বড়োসায়েবের ঝুড়িরও রঙ চটে গিয়েছে। ইস্টক মে ভি দো চারঠো রাখনে কো জরুরৎ রয়েছে।"

মেমসায়েবকে হার মানতে হলো। আমার এক সঙ্গে ছ'টা ঝুড়ির অর্ডার মিললো।

প্রায় লাফাতে লাফাতে ছাতাওয়ালা লেনে ফিরে এসেছি। আধ ডজন তারের ঝুড়ি এক সঙ্গে বেঁধে, মাথায় করে আপিসে চলে এলাম। দারোয়ানজী বাইরেই বসেছিলেন। আমাকে দেখে মৃদু হাসলেন।

ঝুড়িগুলো স্টকে পাঠিয়ে দিয়ে, মেমসায়েব বললেন, "টাকা তো আজ পাওয়া যাবে না। বিল বানাতে হবে।"

ফিরে আসছিলাম। দারোয়ানজী গেটে ধরলেন। "রুপেয়া মিলা?"

বোধ হয় ভেবেছেন, আমি ভাগ না দিয়েই পালাচ্ছি। বললাম, "আজ মিললো না।"

"কাহে?" দারোয়ানজী আবার উঠে পড়লেন। সোজা মেমসায়েবের টেবিল। কথাবার্তায় প্রচুর অভিজ্ঞতা দারোয়ানজীর। বললেন, "মেমসাব, গরীব আদমী। হরেক আপিস মে যানে পড়তা।"

এবার আমার ডাক পড়লো। দারোয়ানজী বীরদর্পে বললেন, "পেমেন্ট করোয়া দিয়া।" একটা ভাউচারের কাগজ এগিয়ে দিয়ে দারোয়ানজী জিজ্ঞাসা করলেন, আমি সই করতে জানি কিনা। সই না জানলে টিপ সই লাগাতে পারি।

আমাকে ইংরিজীতে সই করতে দেখে দারোয়ানজী রসিকতা করলেন, "আরে বাপ্, তুম আংরেজী মে দস্তখত কর্ দিয়া!"

টাকাটা হাতে করে বেরিয়ে এসেছি। দারোয়ানজীদের আমার চেনা আছে। কমিশনের ভাগ দিতে হবে। এবং সে ব্যবস্থা তো আমি আগে থেকেই করে রেখেছি।

দারোয়ানজী আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমিও প্রস্তুত ছিলাম। দেড় টাকা ওঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "এই আমার কমিশন। যা ইচ্ছে হয়..."

এমন যে হতে পারে আমার জানা ছিল না। দারোয়ানজীর সমস্ত মুখে কে যেন হঠাৎ কালি ছিটিয়ে দিল। আমার বেশ মনে আছে, বিশাল বনস্পতির মতো ওঁর দীর্ঘদেহটা হঠাৎ যেন কাঁপতে আরম্ভ করলো। রাগে, অপমানে সমস্ত মুখটা কুঞ্চিত হয়ে উঠলো।

আমি ভাবলাম, বোধ হয় ভাগ পছন্দ হয়নি।

বলতে যাচ্ছিলাম, "বিশ্বাস করুন, দারোয়ানজী, ছ'টা ঝুড়িতে আমার দেড়

টাকার বেশী থাকে না।" কিন্তু আমার ভুল ভাঙলো। শুনতে পেলাম দারোয়ানজী বলছেন, "কেয়া সমঝা তুম?"

দারোয়ানজীকে আমি ভুল বুঝেছি। "কেয়া সমঝা তুম? তুমকো দেখকে হামকো দুখ হুয়া।...তুমি ভেবেছো কি? পয়সার জন্য তোমার ঝুড়ি বিক্রি করে দিয়েছি। রাম রাম!"

সেদিন আর চোখের জল থামিয়ে রাখতে পারিনি। পৃথিবী আজও তা হলে নিঃস্ব হয়নি। দারোয়ানজীর মতো মানুষরা আজও তা হলে বেঁচে আছেন।

দারোয়ানজী আমাকে কাছে বসিয়েছিলেন। ভাঁড়ে করে চা খাইয়েছিলেন। চা খেতে খেতে আমার পিঠে হাত রেখে দারোয়ানজী বলেছিলেন, "খোকাবাবু, ভয় পেও না। স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কার নাম শুনেছো? যাঁর ব্রোঞ্জমূর্তি লাট সায়েবের বাড়ির সামনে রয়েছে? তিনিও তোমার মতো একদিন অনেক দুঃখ পেয়েছিলেন। কলকাতার পথে পথে তিনিও একদিন অনেক কষ্ট করেছিলেন।"

দারোয়ানজী বলেছিলেন, "বাবুজী, তোমার মুখে চোখে আমি সেই আগুন দেখতে পাচ্ছি। তুমিও একদিন বড়ো হবে, স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কার মতো বড়ো।"

দারোয়ানজীর মুখের দিকে আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছি। চোখের জলকে তখনও সংযত করতে পারিনি।

যাবার আগে দারোয়ানজী বলেছিলেন, "হয়তো আমাদের আবার দেখা হোবে, হয়তো আমাদের আর দেখা হোবে না। কিন্তু মনে রেখো, উপরে যিনি রয়েছেন, তিনি সর্বদাই আমাদের দেখছেন। তাঁকে সন্তুষ্ট রেখো। ধর্মকে ভুলো না, সৎ পথে থেকো।"

সে-দিনের কথা ভাবতে গেলে, আজও আমি কেমন হয়ে পড়ি। সংসারের দীর্ঘপথে কত ঐশ্বর্য, কত চাকচিক্যের অন্তহীন সমারোহই তো দেখলাম। খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, সুখ, সম্পদ, স্বাচ্ছন্দ্য, কোনো কিছুই আজ আমার আয়ত্তের বাইরে নয়। সমাজের যাঁরা প্রণম্য, ভাবীকালের জন্য যাঁরা বর্তমানের ইতিহাস সৃষ্টি করছেন, শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্যের মাধ্যমে যাঁরা আমাদের যন্ত্রণাময় ব্যাধি থেকে অনাগত যুগকে মুক্ত রাখবার সাধনা করছেন, তাঁদের অনেকের নিকট সান্নিধ্যলাভের বিরল সৌভাগ্যও আজ আমার করায়ত্ত। কিন্তু ক্লাইভ বিল্ডিঙের এক অখ্যাত আপিসের সেই অখ্যাত দারোয়ানটি আজও আমার আকাশে ধ্রুবতারা হয়ে রইল। সেই দীর্ঘদেহ পশ্চিমা মানুষটির স্মৃতি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না। অনেকদিন পরে দারোয়ানজীর খোঁজে একবার ক্লাইভ বিল্ডিঙ-এ গিয়েছিলাম। কিন্তু সে-কাহিনী এখন কেন?

ও'র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে মনে হলো, দারোয়ানজী আমাকে বিশ্বাস করলেন। অথচ আমি মিথ্যেবাদী, আমি চোর। প্রতিটা ঝুড়ির জন্য আমি চার আনা বেশী নিয়েছি। আমি তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখিনি।

ডালহৌসি থেকে হাঁটতে হাঁটতে সোজা চলে এসেছি চৌরঙ্গীর কার্জন পার্কে। যাদের আপিস নেই, অথচ আপিস যাবার তাগিদ আছে; যাদের আশ্রয় নেই, অথচ আশ্রয়ের প্রয়োজন আছে, সেই সব হতভাগাদের দু' দণ্ডের বিশ্রামস্থল এই কার্জন পার্ক। সময় এখানে যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। এখানে গতি নেই, ব্যস্ততা নেই, উৎকণ্ঠা নেই। সব শান্ত। ঘাসের বিছানায় গাছের ছায়ায় কত ভবঘুরে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। এক জোড়া কাক স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কার কাঁধে চুপচাপ বসে আছে।

যাঁদের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে কার্জন পার্ক তৈরি হয়েছিল, মনে মনে তাঁদের প্রণাম জানালাম, কার্জন সায়েবকেও বাদ দিলাম না।

আর স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা? মনে হলো, তিনি যেন আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

তাঁর পদতলে বসে আমার ঠোঁট দু'টি থর থর করে কেঁপে উঠলো। হাত জোড় করে সভয়ে বললাম, "স্যার হরিরাম, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার কোনো দোষ নেই। ক্লাইভ স্ট্রীটের এক স্বল্পবুদ্ধি নিরক্ষর দারোয়ান আমার মধ্যে আপনার ছায়া দেখেছে। আমার কোনো হাত ছিল না তাতে। বিশ্বাস করুন, আপনাকে অপমান করার কোনো অভিসন্ধিই ছিল না আমার।"

কতক্ষণ একভাবে বসেছিলাম খেয়াল নেই। ছিল না। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম আপিসের ফাঁকিবাজ ছোকরা কেরানীর মতো সূর্যও কখন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিজের দপ্তর গুটিয়ে ফেলে বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছেন শুধু আমি বসে আছি।

আমার কী আছে?

আমি কোথায় যাবো?
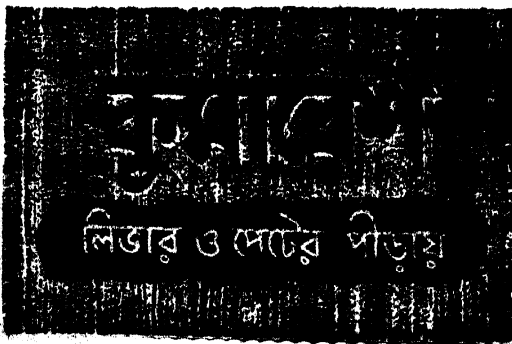
বাইশে শ্রাবণ ও বৃক্ষরোপন উৎসব

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ বৃক্ষকে দেখেছেন প্রাণের আদিম প্রকাশ, 'আদিপ্রাণ' রূপে। সৃষ্টির প্রথমে যখন সবে জল থেকে মাটি মাথা তুলে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করেছে, তখন বৃক্ষই প্রথম আহ্বান করেছে প্রাণকে। তাই সমস্ত প্রাণীর পূর্বপুরুষ বলে গুরুদেব তাঁর বৃক্ষবন্দনায় বৃক্ষ বা উদ্ভিদকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। প্রাণহীন জড়-পৃথিবীকে সবুজ করে তোলার কঠিন কাজ গ্রহণ করেছে উদ্ভিদ্। বৃক্ষরোপণের গানেও দেখা যায় বৃক্ষকে গুরুদেব আহ্বান করেছেন "মরুবিজয়ের কেতন উড়াও" বলে। বৃক্ষবন্দনা মানেই প্রাণের পূজো।

শান্তিনিকেতন এককালে ছিল একটা বিরাট শূন্য মাঠ। মাঝে মাঝে কয়েকটা শাল তাল ছাতিম ছাড়া আর সবই মরুভূমির শামিল। এখন তো সেই মাঠ গাছপালায় ভরে গেছে। দেশব্যাপী জড়ত্বের মরুভূমির মধ্যে শান্তিনিকেতন এনেছিল শিক্ষায় সংস্কৃতিতে নতুন প্রাণ। তারই প্রতিরূপ 'ভুবনডাঙ্গার' বন্ধ্যা মাঠের এই রূপান্তর।

তাই কবির বৃক্ষবন্দনা রূপ নিয়েছে বৃক্ষরোপণ উৎসবে। এই উৎসবের আয়োজনে গুরুদেবের মনে যে ভাবটি কাজ করেছে তা হ'ল: "পৃথিবীর দান গ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্রকে সে জয় করে নিলে। অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হটিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল দগ্ধ করে। তাতে তার বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটির উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব করে। অরণ্যের আশ্রয়হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খরসূর্যতাপে দুঃসহ। এই কথা মনে রেখে * * * আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলুম সে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, অপব্যয়ী সন্তান কর্তৃক মাতৃভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ-উৎসব।" (হলকর্ষণ উৎসবের ভাষণ : ১৯৩৯)।

শান্তিনিকেতনে প্রথম যেদিন বৃক্ষরোপণ উৎসব হয়—সেদিন এক বৈশাখের দিন। আজকালকার মত ২২শে শ্রাবণ তো নয়ই—এমন কি বর্ষাকালও নয়। ১৩৩২ সালে পঁচিশে বৈশাখ সেবার আশ্রমে গুরুদেবের পঞ্চষষ্টিতম জন্মোৎসব হল। সকলের ইচ্ছা এবার গুরুদেবের জন্মদিনে নতুন কিছু একটা হোক। ঠিক হল বৃক্ষরোপণ হবে। তাই সকাল ছ'টায় জন্মোৎসব অনুষ্ঠানের পর সাড়ে সাতটায় গুরুদেব উত্তরায়ণেরও উত্তরে পাঁচটি গাছ (অশ্বত্থ, বট, বিল্ব, অশোক ও আমলকী) রোপণ করলেন। শান্তিনিকেতনে পঞ্চবটীর প্রতিষ্ঠা হল সেদিন। আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন। 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও' গানটি সেবারই প্রথম বৃক্ষরোপণ উপলক্ষে গীত হয়।

তারপর বেশ কিছুকাল বন্ধ ছিল বৃক্ষ-

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন। [illegible]
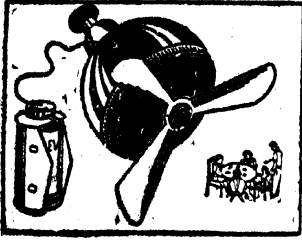
রোপণ উৎসব। আবার নতুন করে উৎসবের সূচনা হল ১৩৩৫ সালে। সেবার আষাঢ়ের শেষের দিকে কবির মনে বৃক্ষরোপণ উৎসবকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার বাসনা হল। ২৯শে আষাঢ় 'বৃক্ষরোপণ' অনুষ্ঠানোপযোগী কয়েকটি কবিতাও লিখলেন।

৫ই শ্রাবণ আয়োজন হল বৃক্ষরোপণ আর বর্ষামঙ্গলের। 'প্রবাসী' পত্রিকায় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে : "এবার বর্ষা-উৎসব উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান হইয়াছিল। অনুষ্ঠানক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী ও দর্শকেরা সমবেত হইবার পর ছাত্রীনিবাস হইতে ছাত্রীরা সুন্দর সুরুচিসঙ্গত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া গান করিতে করিতে সেখানে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে দুজন ছাত্র একটি পত্রপুষ্পে শোভিত ডুলিতে একটি বৃক্ষশিশুকে বহন করিয়া আনিলেন * * *।" প্রতিমাদেবী তখন ইউরোপে। গুরুদেব তাঁকে লিখছেন:—"তোমার টবের বকুল গাছটাকে নিয়ে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান হল। পৃথিবীতে কোনো গাছের এমন সৌভাগ্য কল্পনা করতে পার না। সুন্দরী বালিকারা সুপরিচ্ছন্ন হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতে গাছের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞক্ষেত্রে এল। শাস্ত্রীমহাশয় (বিধুশেখর) সংস্কৃত শ্লোক আওড়ালেন—আমি একে একে ছ'টা কবিতা পড়লুম।" এখনকার শিশু বিভাগের ঠিক সামনেই যে বকুলগাছটি একা দাঁড়িয়ে আছে, ঐ হল সেবারের বৃক্ষশিশু। সেদিনের সেই বৃক্ষশিশু আজ সতেজ হয়ে বছরের পর বছর শিশু বিভাগের ছেলেদের দৌরাত্ম্য আর অত্যাচার হাসিমুখে সয়ে চলেছে।

যা হোক্ এই বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান বর্ষামঙ্গল উৎসবের দিনেই আয়োজিত হয়েছিল। সেবারের উৎসবপত্রে লেখা আছে, "বর্ষা-উৎসব উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান।" গুরুদেবের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ঐ প্রথাই প্রচলিত ছিল—বর্ষামঙ্গল আর বৃক্ষরোপণ উৎসব একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছিল। তবে 'সেকালের বৃক্ষরোপণ উৎসব ছিল আড়ম্বরশূন্য; তখন তো আর আজকের মত এত লোকজন ছিল না—এমন কি নাচও ছিল না। সেদিনের সেই অনাড়ম্বর উৎসবের এক সুন্দর বর্ণনা তুলে দিই : "২৬শে শ্রাবণ, ১৩৩৬—আজ সমস্ত দিন ছুটি ছিল। সকাল থেকেই সুরেনবাবু, নন্দবাবু বৃক্ষরোপণ উৎসবক্ষেত্র সাজাইতেছিলেন। এবার কদমগাছ পোঁতা হবে। আজ সকালেই গুরুদেব একখানি নতুন গান রচনা করেন, তাহা সন্ধ্যায় গীত হয়—'নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জছায়ায়'। বিকাল ২টায় কলাভবনে ছেলেরা সকলে সমবেত হয়। পঞ্চভূতকেও নন্দবাবু সাজাইয়া দেন। মেয়েরা বোর্ডিং হইতে রঙ্গীন কাপড় পরিয়া আসে। কলাভবন হইতে ছেলেমেয়েরা, দিনুবাবু, ক্ষিতিবাবু, প্রায় ৫৫ জন এক সারি দিয়া চলিতে থাকে। সঙ্গে শান্তি মাদল বাজাইয়াছিল। বৃক্ষটি মাসোজী ও আরিয়েমবাবু বহন করেন। গন্তব্যস্থলে পেঁাছাইলে একটি গান হয়। তাহার পর গুরুদেব পঞ্চভূতের একেকটি কবিতা পাঠ করেন। লতিকা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম-এর symbol সম্মুখে রাখিতেছিল। তথা হইতে সেইরূপ সারি দিয়াই সিংহসদনে বর্ষামঙ্গলের জলসাস্থানে যাই। আসরের পশ্চিম পার্শ্বে গুরুদেব, পূর্ব পার্শ্বে অবনীন্দ্রনাথের আসন ছিল। সঙ্গীতের মাঝে উভয়েই স্বরচিত দুইটি লেখা পাঠ করেন। কলিকাতা হইতে পাখি আনা হইয়াছিল। 'হা রে রে রে আমায় ছেড়ে দে রে রে রে' এই গানটির সময় ঐ পাখি-

গুলিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে বলিয়া। কিন্তু পাখিগুলি উড়িতে পারিল না। তাই দুয়েকটি বাদে আর ছাড়া হয় নাই। সন্ধ্যার আরম্ভেই সব আয়োজন শেষ হইয়াছিল।" এই হল সেকালের বৃক্ষরোপণ ও বর্ষামঙ্গল উৎসবের বর্ণনা। তারপর থেকে বছরের পর বছর বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে। এমন কি, গুরুদেবের মৃত্যুর বছরেও উৎসবদ্বয়ের আয়োজন একই দিনে হয়েছিল। সেবার গুরুদেব বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন যে, 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি' এবার তাঁকে ছেড়ে যেতে হবে। তাই বর্ষা শুরু হ'তেই তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বর্ষামঙ্গল উৎসবের জন্যে। "তিনি চান যত তাড়াতাড়ি হোক সংক্ষেপে বর্ষামঙ্গলের আয়োজন করি, কারণ এ অঞ্চলে বর্ষা এ বছর ইতিমধ্যেই বিপুল সমারোহে দেখা দিয়েছিল, তাঁর মনও তাই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। শান্তিনিকেতনে সকলে জড়ো হবার আগেই (গ্রীষ্মের ছুটির পর) বর্ষামঙ্গল করবার অসুবিধা ছিল, তাই মনে করেছিলাম কয়েকদিন অপেক্ষা করে আয়োজন করা যাবে।" (রবীন্দ্র সংগীত—শান্তিদেব ঘোষ)। কিন্তু অপেক্ষা আর করতে হল না। অসুস্থতা দিনের পর দিন বেড়ে চললো। কলকাতা নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে। তারপর আর ফিরলেন না। সে বছরে গুরুদেবের মৃত্যুর মাসখানেক পরে বৃক্ষরোপণ ও বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথই সেবার বৃক্ষরোপণ করেন।

পরের বছর ১৩৪৯ সালে গুরুদেবের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হল বাইশে শ্রাবণ। সেবার ঠিক হল গুরুদেবের মৃত্যুদিনেই শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের আয়োজন হবে। বিশ্বভারতী নিউজ-এর ১৯৪২—সেপ্টেম্বর সংখ্যায় (মৃত্যুবার্ষিকীর পর প্রকাশিত) শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী এক আবেদনে জানালেন যে, গুরুদেব সারা জীবন ধরে স্মৃতিসভা ইত্যাদিতে বিরূপ ছিলেন। সেজন্যে আমরা যেন ২২শে শ্রাবণে স্মৃতিসভা ইত্যাদি করে কালক্ষেপ না করি।

নিউজের ঐ সংখ্যাতেই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে, "২২শে শ্রাবণ উদ্‌যাপন করবার জন্যে ঐদিন বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের ছুটি থাকবে বলে স্থির হয়েছে। আরো স্থির হয়েছে যে আমরা বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গুরুদেবের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করবো। এই উপলক্ষ্যে শান্তিনিকেতনে ও সন্নিকটস্থ গ্রামগুলিতেও বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হবে।" (বিশ্বভারতী নিউজ—সেপ্টেম্বর ১৯৪২, পৃষ্ঠা ৩৭)

ঐ ব্যবস্থা মত ২২শে শ্রাবণে মৃত্যুবার্ষিকী ও বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান দুইয়েরই আয়োজন হল। বৃক্ষরোপণ তার এতকালের সাথী বর্ষামঙ্গলের সঙ্গ ত্যাগ করলো। এবার থেকেই বর্ষামঙ্গল পৃথক দিনে অনুষ্ঠিত হতে লাগলো। তার জন্যে কোনো নির্দিষ্ট দিনও রইল না। যা হোক, সেবারের ২২শে শ্রাবণে সকালে হল উপাসনা। পরিচালনা করলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন। মৃত্যুর মধ্যেই নবজন্মের জয়গান—২২শে শ্রাবণে বৃক্ষরোপণ উৎসবের মধ্যে যেন ঐ ভাবটিই কাজ করেছে। সেদিন উপাসনার ভাষণে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন এই ভাবই ব্যক্ত করেছিলেন। "মহাপুরুষদের পক্ষে মৃত্যু এক বৃহত্তর জীবনের দ্বার। মৃত্যুর পরেও মহাপুরুষেরা অনুরাগীদের হৃদয়ে চিন্ময়রূপে আবির্ভূত হন। ইহাই তাঁহাদের নবতর জন্মগ্রহণ (resurrection. * * * বৈদিক ঋষিরা বলেছেন 'নবো নবো ভবসি জায়মান'। প্রত্যেক মৃত্যুর মধ্যে তুমি নতুন জন্ম লাভ কর। একটি বৎসর মাত্র গত হইয়াছে, কবি আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন * * * আমরা কি তাঁর সাধনাকে জীবনে ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছি? যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে তাঁহার যে আশ্রমে আছি, সেখানে আমাদের ব্যর্থ থাকা। প্রাচীন গুরুরা দেহকে ভূতকায়া বলিতেন এবং তাঁহাদের সাধনাগত বিস্তৃত সত্তাকে ধর্মকায়া বলিতেন। আজ কবির ভূতকায়া তিরোহিত। তাঁহার নিরালম্ব সাধনা আজ ধর্মকায়া খুঁজিতেছে। আমরা যদি সেই কায়া না দিতে পারি, তবে আমাদের জীবনের সবই ব্যর্থ। আমাদের নর্মে কর্মে ও ধর্মে, সব দিকেই তাঁহাকে আমাদের মধ্যে নতুন করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। * * * আজি এই দিনটিকে মৃত্যুতিথি বলিব, কি জন্মতিথি বলিব তাহা ঠিক বলিতে পারি না। জন্মদিন মৃত্যুদিন মুখোমুখি বসিয়াছে, এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা। আজিকার শ্রাদ্ধতিথির অনুষ্ঠানে

তাঁহার জন্মতিথিকে আবাহন করি।" ২২শে শ্রাবণে তাই মৃত্যুদিন জন্মদিন 'দোঁহে' এসে দেখা দিয়েছে। উপাসনার পর ছাতিমতলায় কবি-কন্যা শ্রীমতী মীরা দেবী বৃক্ষরোপণ করেন। আশ্চর্য এই যে বৃক্ষরোপণ উৎসবের সূচনা হয়েছিল গুরুদেবের এক জন্মদিনে আর এখন থেকে তাঁরই মৃত্যুদিনে বছরের পর বছর বৃক্ষ-রোপণ অনুষ্ঠিত হ'তে লাগলো। এবার গুরুদেবের জন্মশতবার্ষিক বছরেও তার ব্যতিক্রম হবে না। ২২শে শ্রাবণেই যথারীতি বৃক্ষরোপণ উৎসব আয়োজিত হবে। আবার ধ্বনিত হবে বৃক্ষরোপণের মাংগলিক—

"রবীন্দ্রের কণ্ঠ হ'তে এ সংগীত
তোমার মংগলে
মিলিল মেঘের মন্দ্রে, মিলিল
কদম্ব-পরিমলে ॥"

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র
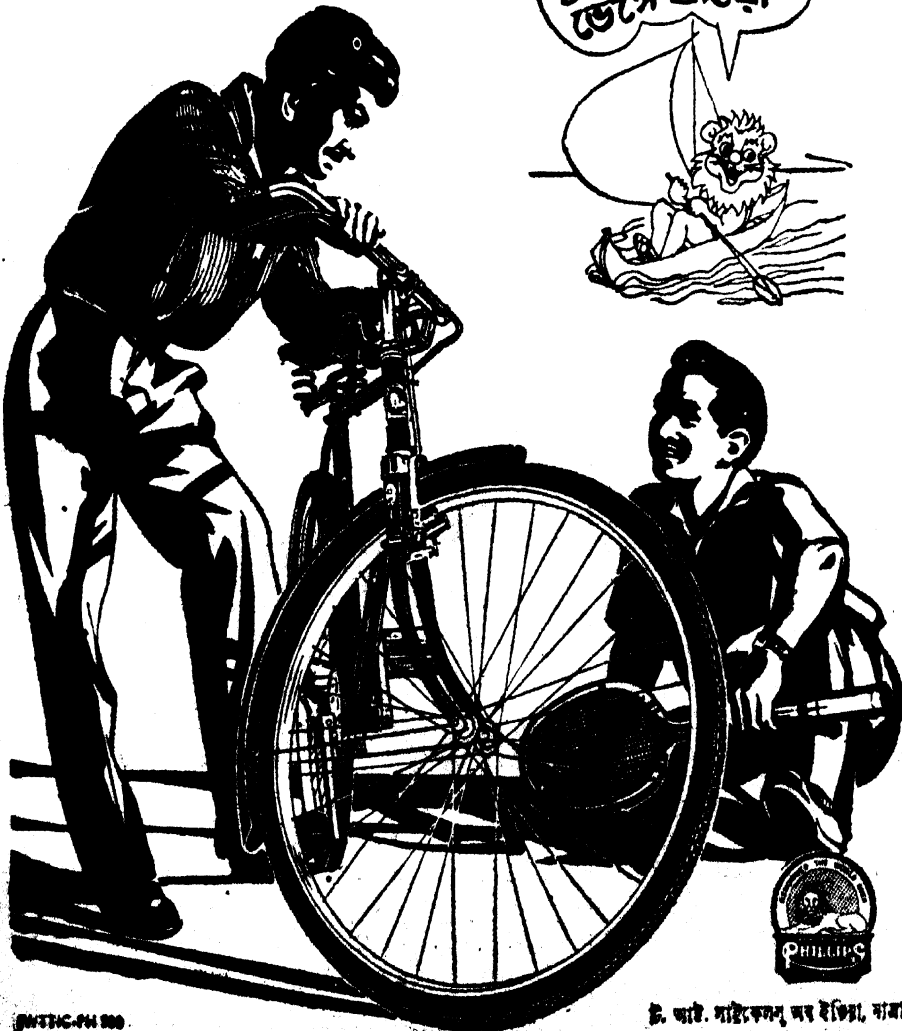
(৮১)

মনে আছে সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত দীপংকরের বাড়ির প্রত্যেকটি ঘর, প্রত্যেকটি খ‍ুটিনাটি, প্রত্যেকটি জিনিসপত্র উল্টে-পাল্টে দেখেছিল তারা। কোনও বাক্স, কোনও আলমারি, কোনও বিছানা খ‍ুজতে বাকি রাখেনি আর। আর কিরণ? কিরণের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল দীপংকর। শোবার ঘর, বারান্দা, উঠোন, রান্নাঘর সমস্ত তাদের দেখা চাই। সেই অন্ধকার মাঝ-রাত্রেই যেন ওয়ার-ফিল্ড্ হয়ে উঠেছিল সে-বাড়িটা।

কিরণ ধীর স্থির দ‍ৃষ্টিতে সমস্ত দেখছিল।

যেন কিছ‍ুই ঘটে নি তার। যেন কোনও বিপর্যয়, কোনও বিপদপাত তার জীবনে ঘটেনি। সে যেন একদিন এই প‍ৃথিবীতে জন্মেছিল আকস্মিকভাবে, আবার আকস্মিকভাবেই তার বিদায় নেবার পালা এসেছে আজ। জন্মগ্রহণের জন্যে যদি আনন্দ হবার কারণ না ঘটে থাকে, তো ম‍ৃত্যুর জন্যেও দ‍ুঃখ করবার যেন প্রয়োজন নেই। জীবন নিয়ে বাড়াবাড়ি যারা করে, তাদেরই যেন মরণ নিয়ে ভয় করবার কথা। লক্ষ লক্ষ বছর আগে একদিন জীব-জগতের স‍ূত্রপাত হয়েছিল প‍ৃথিবীতে। তাই জীবের বিবর্তন হয়েছে, কিন্তু প‍ৃথিবী তো তেমনই আছে। প‍ৃথিবী যেমন ছিল তেমনই থাকবে, আসা-যাওয়ার পালা শ‍ুধ‍ু জীবের বেলায়। তাকে আসতেও হবে আবার যেতেও হবে। কিরণের আগে তো আরো অনেক লোকই চলে গেছে, আরো অনেক মান‍ুষই তো প‍ুলিসের গ‍ুলীতে মরেছে। তাতে কি তারা দ‍ুঃখ পেয়েছিল? ফাঁসির আগে গোপীনাথ সাহার শরীরের ওজন কত পাউন্ড বেড়ে গিয়েছিল প‍ুলিসের খাতায় কি তার রেকর্ড নেই?

কিন্তু কেন এমন বে-হিসেবী হলো কিরণ? কেন এমন অসতর্ক হলো? আর একট‍ু সাবধান হলে পারতো না?

মা'র এত সাধের রান্নাঘর, এত সাধের প‍ুজোর ঘর, সমস্ত তছনছ হয়ে গেল দীপংকরের চোখের সামনে। মা'র প‍ুজোর কোষাকুশি, গঙ্গাজলের তামার ঘড়া, মা-কালীর একখানা পট—প‍ুলিসের আইনে তার যেন কোনও দাম নেই। দ‍ুম্ দাম করে সমস্ত ভেঙে ফেললে তারা। ভারি-ভারি ব‍ুট্ দিয়ে স‍ুট মারতে লাগলো। ছড়িয়ে ছিট্‌কে গেল সেগ‍ুলো ঘরের ভেতরে।

হ্যান্ড্-কাফ্ বাঁধা কিরণ আর স্থির থাকতে পারলে না। চিৎকার করে উঠলো—স্টপ্ দ্যাট্—

হঠাৎ যেন একটা বিস্ফোরণ হলো ঘরের ভেতরে।

আর সঙ্গে সঙ্গে কিরণের মাথায় রিভল-বারের বাঁট্ দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করলে তারা। অশ্লীল একটা গালাগালি বেরোল তাদের ম‍ুখ দিয়ে—ব্লাডি বাস্টার্ড—সান্-অব্-এ বিচ্—

সেই এক আঘাতেই কিরণ তখন মাটিতে পড়ে গেছে। ছট্‌ফট্ করছে, কথা বলবার চেষ্টা করছে, ওঠবার চেষ্টা করছে, নড়বার চেষ্টা করছে—যেন প্রাণপণে বাঁচবার চেষ্টা করছে। মাথার খ‍ুলিটা কেটে ঝর-ঝর করে রক্ত পড়ে ভেসে যাচ্ছে সমস্ত ম‍ুখখানা।

দীপংকর সামনে ঝ‍ুঁকে পড়তে যেতেই একজন সামনে রিভলবার উঁচিয়ে তার দিকে তাক করে বলে উঠলো—হ্যান্ডস্ আপ—

আর তারপর সব পড়ে রইল সেখানেই। সেই তেমনি ছড়ানো ছিটোন। মা'র এত সাধের সংসার। সমস্ত লন্ড ভন্ড হয়ে গেল। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তাতেই গিয়ে তারা তুললো কিরণকে। দীপংকরকেও তাদের মধ্যে গিয়ে উঠতে হলো গাড়িতে। আমেরিকান নতুন জিপ্ - বিপ্লবের স‍ুড়ঙ্গ পথ ধরে মহা-জীবনের রাজধানীর দিকে চললো।

•

বিপ্লবই বটে। একে একে আমেদাবাদ আর বোম্বাই-এর কটন্-মিলগ‍ুলো সব বন্ধ হয়ে গেল। কেউ আর কাজ করতে আসে না। টাটা আয়রন এন্ড্ স্টীল কোম্পানীর কারখানা অচল। ব্ল্যাস্ট্ ফারনেসের আগ‍ুন নিভে গেল আস্তে আস্তে। বাজার বন্ধ। দোকানপাট চলে না।

দুনিকাকার মেজাজ তখন আগুন। বলে—লর্ড লিনলিথগো এবার ঠান্ডা করে দেবে বাছাধনদের—

দুনিকাকার আড্ডা সকালবেলা যা একটু-খানি বসে। বিকেলবেলা সব নিঝ্‌ঝুম। বিকেল থেকেই কালিঘাটের রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে যায়। রাস্তার আলো-গুলো কারা নিভিয়ে দেয়। সমস্ত পাড়া তখন থম্‌ থম্‌ করে। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে একটা মিলিটারির গাড়ি ঢুকে পড়ে গলির মধ্যে। বেয়নেট উঁচিয়ে সোলজাররা বাইরের দিকে তাগ করে থাকে। অন্ধকার হলেই কালি-ঘাটের বস্তি থেকে কয়েকটা ছেলে রাস-বিহারী এভিনিউএর মোড়ে গিয়ে ডাস্ট-বিনগুলো রাস্তার মাঝখানে নিয়ে গিয়ে যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দিয়ে আসে আর মিলিটারি লরিগুলো দৌড়তে দৌড়তে এসে হোঁচট খায়। তখন চারদিক থেকে ঢিল পড়ে তাদের গায়ে। তখন আর জ্ঞান থাকে না কারো। যেদিকে দু'চোখ যায়, যাকে সামনে পায়, তার দিকেই গুলী ছোঁড়ে এলোপাথাড়ি। ঠেলাগাড়ি, ডাস্টবিন, সব কিছু এসে জড়ো হয় রাস্তায়। বিকেল থেকেই ট্রাম বন্ধ হয়ে যায়। যে-যেদিকে থাকে, বাড়িতে এসে ঢোকে বিকেলের পরেই।

মা-মণি ডাকলেন শম্ভুকে। বললেন—কোথায় গিয়েছিলি তুই?

শম্ভু মুখ কাচুমাচু করে সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বললে—আজ্ঞে, দাদাবাবুর কাছে—

—দাদাবাবুর কী হয়েছে?

শম্ভু বললে—কাল থেকে দাদাবাবুর ঘুম হচ্ছে না, আমি মাথাটা টিপে দিচ্ছিলুম—

ঘুম হচ্ছে না! আর বেশী কিছু বললেন না। শম্ভু চলে গেল। মা-মণি আস্তে আস্তে উঠলেন বিছানা থেকে। আজকাল বিছানাতেই বেশিক্ষণ বসে থাকেন মা-মণি। দিনরাত নিজের মধ্যেই তোলপাড় করেন। বুঝতে পারেন আর কিছু নেই। আর কেউ নেই। বুঝতে পারেন তিনি সব হারিয়েছেন। সম্পত্তি হারিয়েছেন, সন্তানও হারিয়েছেন। তবু সে-সব ভুলে থাকতেই চেষ্টা করেন। যখন সন্ধ্যেবেলা সমস্ত অন্ধকার হয়ে আসে, রাস্তার আলোগুলো পর্যন্ত নিভে যায়, মাঝে-মাঝে দুম্‌-দুম্‌ আওয়াজ হয় বোমা ফাটার, তখন খানিক-ক্ষণের জন্যে একটু ভুলে থাকেন। মনে হয় শুধু তাঁর সংসারেই নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই বুঝি আকাল এসেছে। আকাল এসেছে, ভালোই হয়েছে। একলা তাঁর বাড়িতেই বা কেন, সমস্ত কলকাতায়, সকলের সংসারেই বিষ ছড়িয়ে যাক না। সকলের সংসারই ছারখার হয়ে যাক। এখনও ন'দিদির গাড়ি আছে, ছেলে আছে, ছেলের বউ আছে। এখনও চড়কডাঙার মিত্তির গিন্নীর দেমাক আছে, চালপটির চাটুজ্জেদের কারবার আছে। সরকারবাবু যখন এসে বলে—জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, বাজারে মাল পাওয়া যাচ্ছে না, তখন মা-মণির মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। রেগে গিয়ে বলেন—কেন? পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

যেন শিরিষ ঘোষের পুত্রবধূর মেজাজের তোয়াক্কা করেই পৃথিবীর চলা উচিত!

কিন্তু না, তিনি সন্তুষ্ট হন মনে মনে। তিনি যেন খুশী হন। বাজার বন্ধ হয়ে যাক, সংসার ছারখার হয়ে যাক, কিছুই তাঁর এসে যায় না তাতে। আস্তে আস্তে অনেক দ্বিধা করেও তিনি হাঁটতে হাঁটতে বারান্দা পেরিয়ে সোনার ঘরের সামনে আসেন। তারপর বাইরে থেকে ডাকেন—খোকা—

কোনও উত্তর আসে না ভেতর থেকে।

আবার ডাকেন—সোনা—

এবারও কোনও উত্তর নেই। মা-মণি আস্তে আস্তে দরজাটা ফাঁক করে ভেতরে চেয়ে দেখেন। খোকার বিছানা যেমন-তেমনভাবে অগোছালো হয় পড়ে আছে। ঘরটা ঝাঁটও দেওয়া হয় না হয়ত। কতদিন এ-ঘরে আসেন না তিনি। খোকার সেই বিয়ের পর থেকেই আসেন না। কিন্তু গেল কোথায় সোনা? মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল, এর মধ্যেই কি সেরে গেল। তারপর কৈলাসকে জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় গেল রে তোর দাদাবাবু?

কৈলাস বললে—দাদাবাবু তো নিচেয় গেছেন—লাইব্রেরী ঘরে!

আবার লাইব্রেরী ঘরে! মা-মণি বলেন—ওপরে ডেকে নিয়ে আয় তো—বলগে আমি ডাকছি—

কিন্তু বলেই আবার কী মনে হলো। বললেন—না, থাক, আমিই নিচেয় যাচ্ছি—

হঠাৎ সিঁড়ির মুখেই দেখা। সনাতনবাবুর একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলেন। জামা-কাপড় বদলে নিয়েছে। জুতো পরেছে।

—আবার কোথায় যাচ্ছো?

সনাতনবাবু মুখ তুললেন। বললেন—কালকে বড় অসুস্থ দেখে এসেছিলাম তোমার বৌমাকে, তাই আর একবার যাচ্ছি—

মা-মণির চোখ দুটো বড় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো আবার। জিজ্ঞেস করলেন—তাকে দেখতে যাচ্ছো, না আনতে যাচ্ছো?

সনাতনবাবু বললেন—আনতে—

মা-মণির মুখ দিয়ে হঠাৎ কোনও কথা বেরোল না। যেন কোনও রূঢ় কথা বলতে গিয়েও নিজেকে সংবরণ করে নিলেন তিনি। তারপর বললেন—এনে কি এ-বাড়িতেই তুলবে?

সনাতনবাবু বললেন—এ-বাড়ি ছাড়া আর কোনও জায়গা যে নেই তোমার বৌমার।

—কেন? এত জায়গা থাকতে আবার

জায়গা কেন নেই তার? এতদিন কোথায় ছিল?

সনাতনবাবু বললেন—এতদিন যেখানে ছিল সেখানে আর থাকা উচিত নয়—থাকলে তার পক্ষেও খারাপ, আমাদের পক্ষেও খারাপ!

—আমাদের কথাটাও কি তুমি ভাবো?

সনাতনবাবু বললেন—আমাদের কথা ভাবি বলেই তো আনতে যাচ্ছি। তোমার বৌমা আসতে রাজি হয়েছে এবার।

—তার রাজি হওয়াটাই বুঝি বড় কথা হলো—আর আমার রাজি হওয়া-না-হওয়াটা বুঝি কিছুই নয়?

—বাড়ির বউ বাড়িতে আনার ব্যাপারে তোমার রাজি হওয়াই তো উচিত!

মা-মণি বললেন—উচিত-অনুচিতের কথা তো হচ্ছে না, কোনটা উচিত, আর কোনটা অনুচিত, তা আমি ভালো করেই জানি, তোমাকে আর তা শেখাতে হবে না।

সনাতনবাবু বললেন—আমি তো তোমাকে শেখাচ্ছি না, আমি বলছি কর্তব্যের কথা। আমি করছি আমার কর্তব্য। তুমি তোমার কর্তব্য কোর—

মা-মণি আর থাকতে পারলেন না। বললেন—দেখ খোকা, আমি তোমাকে বার-বার করে আগেও বলেছি, এখনও আবার বলছি, এ আমার বাড়ি—

সনাতনবাবু বললেন—আমি তা জানি মা-মণি—

—ছাই জানো! তুমি কতটুকু জানো শুনি? তুমি জানলেই বা কখন, আর শিখলেই বা কী? কেবল তো বই মুখে দিয়ে থাকো! সংসার তুমি কবে করলে যে শিখবে? তুমি তোমার নিজের কর্তব্য করেছো? কর্তব্যের কথা তো বলছো খুব! বউএর ওপর তোমার কর্তব্যের জ্ঞান তো দেখছি খুব টনটনে! আমার ওপর তোমার কর্তব্য নেই কোনও? আমি কেউ না?

সনাতনবাবু বললেন—তোমার ওপর জ্ঞানত কোনও অবহেলা আমি করেছি কোনওদিন?

মা-মণি বললেন—কবে অবহেলা করোনি তাই বলো তো আগে! আমার কোনও কথা তুমি কোনদিন শুনেছো? আমার কোন কথাটা তুমি রেখেছো? দিনের পর দিন বউ আমার অপমান করেছে তোমার সামনে, একটা কথা তুমি তখন শুনিয়েছ বউকে? ঝি-চাকরের বেহদ্দ করেছে আমাকে, কই, তখন তুমি আমার দিকটা একবারও ভেবে দেখেছ? আমি ভাল করতে চেষ্টা করিনি তোমার বউকে? আমি তার ভাল চাইনি? না কি তুমি ভাবো আমি গাল-মন্দই করেছি কেবল দিনরাত! এই এত লোক তো সাক্ষী আছে, কই, কেউ বলুক দিকি আমি বউকে কখনও একটা কড়া কথা শুনিয়েছিলুম! নদিদি কত বলেছে নয়ন, অত আবদার দিসনি বউকে, অত আদিখ্যেতা ভাল নয়, কিন্তু তবু ভেবেছি, আহা, দশটা নয় পাঁচটা নয়, ওই একটা বউ আমার, সাধ-আহ্লাদ তো আমারও আছে, আমারও তো ছেলের বউ নিয়ে পাঁচজনকে দেখিয়ে ঘর-কন্না করতে সাধ যায়! কিন্তু তোমার বউ আমার সে-সাধে বাদ সাধেনি? বুকে হাত দিয়ে বলো তুমি সোনা, বাদ সাধেনি?

একটু হাঁফ ছেড়ে আবার বলতে লাগলেন—আর, কার জন্যে আমার সংসার করা শুনি? ছেলে-বউএর জন্যেই তো! যার ছেলে পর হয়ে গেল, যার বউ মুখের ওপর কথায় কথায় ঝাঁটা মারে, তার সংসার কি সংসার? তাকে তুমি সংসার বলো সোনা? যার নিজের মায়ের পেটের বোনের ঠিক নেই, যার নিজের কোথায় রাত কাটে তার ঠিক নেই, তাকে আবার তুমি ঘরে আনতে চাও? তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি কি এমন করেই লোপ পেতে হয়? এমন করেও পুরুষ-মানুষ বউএর বশ হয়? ছি ছি ছি—

সনাতনবাবু বললেন—আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি আসি—

—তবু তুমি যাবে? এত কথার পরও আমার কথা রাখবে না?

সনাতনবাবু বললেন—আমি আমার জন্যে যাচ্ছি না, তোমার ভালোর জন্যেই যাচ্ছি—

—তার মানে?

সনাতনবাবু বললেন—তার মানে, বিরোধ থেকেই যত অশান্তির উৎপত্তি মা-মণি, আর কাউকে ভালো না-বাসতে পারলেই যত বিরোধের সৃষ্টি! ভালবাসলেই দেখবে সকলের সঙ্গে সব বিরোধ শেষ হয়ে গেছে! তখন দেখবে সকলকে ক্ষমা করতে পারবে, অন্য লোকের দোষগুলো আর দোষ মনে হবে না তখন!

—এসব বুঝি তোমার বইতে লেখা আছে? ওই বইগুলোই হয়েছে যত নষ্টের গোড়া, ওই বইগুলোই আমি একদিন উনুনে পুড়িয়ে ফেলবো তবে আমার নাম? তা বইতে বুঝি মা'কে ভালবাসার কথা লেখা নেই? কেবল বউকে ভালবাসার কথা লেখা থাকে?

সনাতনবাবু বললেন—আর দেরি করবো না মা-মণি, দেরি হলে আর ট্যাক্সি পাওয়া যাব না! খুব গোলমাল চলছে চারদিকে—

শম্ভু পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সনাতনবাবু বললেন—চল্—

মা-মণি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। সোনাকে চলে যেতে দেখে শেষবারের মত বললেন—যাচ্ছো যাও, কিন্তু জেনে রেখো, সেবারে যে অপমান করেছি, তার দশগুণ অপমানের জন্যে যেন তৈরি হয়ে আসে সে—

এ-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে সনাতনবাবু চলেই যাচ্ছিলেন, হঠাৎ বাইরের গেটে একটা ট্যাক্সি এসে থামলো। হর্ন শুনেই শম্ভু দৌড়ে গিয়েছিল। এসে বললে—আপনাকে ডাকছেন দাদাবাবু,—

—কে?

ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে এসেছে মিস্টার ঘোষাল। বললে—কোথাও বেরুচ্ছিলেন নাকি?

—আপনি? মিস্টার ঘোষাল না?

—কালকেও একবার আপনার বাড়িতে এসেছিলাম। আপনি ছিলেন না তখন বাড়িতে।

সনাতনবাবু বললেন—এখন হসপিটালে যাচ্ছি, আমার স্ত্রীকে দেখতে। আজকে আমার স্ত্রীকে বাড়িতে নিয়ে আসবো ঠিক করেছি। চারদিকে যে রকম গোলমাল চলেছে, তাই একটু আগে-আগেই যাচ্ছি—

সামনে সতীর শাশুড়িকে দেখেই চিনতে পেরেছে মিস্টার ঘোষাল। বললে—আপনি বোধহয় মিস্টার ঘোষের মা, আপনি আমারও মা মিসেস ঘোষ—বলে মিস্টার ঘোষাল হাত-জোড় করে প্রণাম করলে।

—এ কে সোনা?

মিস্টার ঘোষাল নিজেই নিজের পরিচয় দিলে। বললে—কী পরিচয় দিলে আপনি আমাকে চিনবেন বুঝতে পারছি না মা। তবে আপনার পুত্রবধূ আমাকে চেনে। মানে সতী।

সনাতনবাবু বললেন—আমার একটু তাড়া আছে মিস্টার ঘোষাল, চলুন না, আপনিও যাবেন আমার সঙ্গে হসপিট্যালে—

মিস্টার ঘোষাল বললে—সেই কথা বলতেই তো আপনার কাছে এসেছি মিস্টার ঘোষ—

মা-মণি বললেন—তুমি আমার বৌমাকে কী করে চিনলে?

—আজ্ঞে, আমি চিনবো না আপনার পুত্রবধূকে? তিনি তো আমার বাড়ির পাশের ফ্ল্যাটটাই ভাড়া নিয়েছেন! শুনেছি নাকি শাশুড়ির অত্যাচারেই তিনি শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছেন—

—কে বললে তোমাকে এ-কথা! বউমা?

মিস্টার ঘোষাল বললে—হ্যাঁ তিনি নিজেই বলেছিলেন আমাকে। তারপর যে-সব কাণ্ড তাঁর দেখলাম, তাতে আমার বড় ঘেন্না হলো মা। আমি কতবার তাকে বললাম এ-কাজ ভাল নয়। এ-সব কাজ কারা করবে? যারা ভদ্রঘরের মেয়ে নয়—তারা। আপনি কেন এভাবে লাইফ লীড করবেন? এটা কী ভালো? কত বুঝিয়ে বললাম তাঁকে।

মা-মণি হঠাৎ বাধা দিলেন। বললেন—সে কীভাবে জীবন কাটাতো সেখানে?

—সে মা, আপনাকে আমি বলতে পারবো না। সে আপনার সামনে আমার মুখে বলতেও লজ্জা করছে। আপনি আর আমার কাছে সে-সব শুনতেও চাইবেন না। কোনও গৃহস্থ বাড়ির বউ সেভাবে কখনও জীবন কাটায়নি!

—তারপর?

মিস্টার ঘোষাল বলতে লাগলো—তারপর কত চেষ্টা করলাম তাকে ফেরাবার জন্যে। তিনি বললেন, আপনাদের এই বাড়ির সামনেই তিনি একটা বাড়ি ভাড়া নেবেন, নিয়ে আপনাদের চোখের সামনেই তিনি কেলেঙ্কারি চালিয়ে যাবেন! তাতেও আমি বাধা দিলাম—

—তারপর?

—তিনি কিন্তু আমার কথা শুনলেন না। তিনি এই সামনেই মিস্টার মিত্র বলে একজন ভদ্রলোকের বাড়ির সামনের পোরশান ভাড়া নিলেন।

—তারপর?

—তারপর যখন দেখলুম কিছুতেই আর তাঁকে বন্ধ করা যাবে না, তখন একটা চাকরি করে দিলাম আমাদের রেলওয়ের অফিসে। ভাবলাম হয়ত শোধরাবে। হয়ত আবার সুস্থ হয়ে উঠবে! কিন্তু শেষকালে দেখলাম একবার যার স্বভাব বিগড়ে যায়, তাকে শোধরানো বড় শক্ত! শেষকালে শরীর আরো খারাপ হলো, হতে হতে একেবারে উইক হয়ে পড়লেন, তখনও একবার শেষ চেষ্টা করলাম। যদি ফেরেন! কিন্তু আর পারলাম না। তখন একদিন অফিসের ভেতরেই ফেন্ট হয়ে পড়লেন—

সনাতনবাবু এতক্ষণে কথা বললেন।

আপনি যদি না যান, তাহলে আমি একলাই যাই মিস্টার ঘোষাল, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—

মা-মণি বললেন—নিজের কানে এত কথা শোনার পরও তোমার সেখানে যেতে প্রবৃত্তি হচ্ছে?

সনাতনবাবু বললেন—এত কথা শোনার পরেই তো বেশি করে যেতে ইচ্ছে করছে—

—তোমার ঘেন্না হওয়া উচিত সোনা। এ জন্মেও তোমার আর আক্কেল হবে না দেখছি—

মিস্টার ঘোষাল বললে—কিন্তু যাচ্ছেনটা আপনি কোথায়?

—হস্‌পিট্যালে। আজকে আমি তাঁকে যেমন করে পারি বুঝিয়ে-সুজিয়ে নিয়ে আসবোই। এর পরে আর চুপ করে থাকা যায় না।

মিস্টার ঘোষাল হেসে উঠলো। বললে—কিন্তু তিনি তো আর হস্‌পিট্যালে নেই!

—নেই?

—না, নেই।

সনাতনবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন—কেন, নেই তো, তাহলে কোথায় গেলেন তিনি?

মিস্টার ঘোষাল এবার খুব জোরে তার চুরোটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লে। বললে—মিস্টার সেন তাঁকে নিয়ে গেছে—

মা-মণি বললে—কে? কার কথা বললে?

মিস্টার ঘোষাল বললে—দীপঙ্কর সেন, আমারই য়্যাসিস্টেণ্ট—

—দীপু?

মিস্টার ঘোষাল বললে—হ্যাঁ, সেই তাকে হস্‌পিট্যাল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে—

সনাতনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় নিয়ে গেছে?

—সে কি আর কাউকে জানিয়ে নিয়ে গেছে ভেবেছেন?

সনাতনবাবু বললেন—তাহলে দীপুবাবুর বাড়িতেই আছে সতী। তাঁর বাড়িতেই যাবো—সেখানে গেলেই পাওয়া যাবে—

—না! মিস্টার সেন তেমন কাঁচা লোক নয়। বাড়িতেও সে নেই।

সনাতনবাবু তবু কিছু বুঝতে পারলেন না। বললেন—বাড়িতে নেই তো কোথায় আছেন?

—সেই কথা বলতেই তো এসেছি আজকে আপনার কাছে। তাকে পুলিস ধরেছে। আজকে অফিসেও আসেনি সে। অফিসে আর আসবেও না সে। কনভিক্‌শন্ হলে চাকরিও আর থাকবে না তার। তাকে অফিস থেকেও সাসপেণ্ড করা হয়েছে—

সনাতনবাবুর তখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না কথাগুলো। যেন সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। শম্ভুও চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ।

মা-মণি বললেন—তাহলে, কী ভাবছো, যাও, আনতেও যাও বউকে—

মিস্টার ঘোষাল বললে—আমাকে আপনি চেনেন না মা, হয়ত ভাবছেন, এত কথা কেন আমি বলতে এলাম আপনাদের কাছে? ভাবছেন আমার কীসের স্বার্থ এতে! কিন্তু পৃথিবীতে স্বার্থটাই কি সব? একটা সংসার ভেঙে-চুরে যাক, সেটা কে চায়? কেউ চায় না, আমিও চাই না। আপনারা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে এসে সুখে ঘর-করনা করুন, সেইটেই আমি চাই—

মা-মণি বললেন—আমার আর সুখ চাই না বাবা, সুখের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে—

সনাতনবাবু বললেন—এ আমি বিশ্বাস করি না মিস্টার ঘোষাল, দীপুবাবুকে আমি চিনি, আর সতীকেও আমি চিনি—

—সে তো সুখের কথা মিস্টার ঘোষ। আপনি মিসেস ঘোষকে এ-বাড়িতে নিয়ে আসুন, সেইটেই তো আমি চাই!

মা-মণি বললেন—না, অমন বউকে জেনে শুনে আমি আর ঘরে ঠাঁই দেব না—আমি বেঁচে থাকতে তো দেব না।

সনাতনবাবু এ-কথার কোনও জবাব দিলেন না। শম্ভু দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে বললেন—চল্—

মা-মণি দেখছিলেন। বললেন—কোথায় যাচ্ছো আবার—

সনাতনবাবু বললেন—দীপঙ্করবাবু বাড়িতে—কিম্বা তাঁর অফিসে—

মিস্টার ঘোষাল বললেন—কিন্তু তিনি তো সাসপেণ্ডেড হয়ে আছেন—

—তাহলে বাড়িতেই যাবো—

—কিন্তু বাড়িতেও তাকে পাবেন না।

—কেন?

মিস্টার ঘোষাল বললে—তাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে কাল রাত্রে—

মা-মণি পর্যন্ত চমকে উঠলেন। বললেন—পুলিসে ধরেছে? কেন? চুরি করেছিল নাকি?

সনাতনবাবুও এতখানির জন্যে যেন ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না। বললেন—সে কি? কেন?

মিস্টার ঘোষাল আবার চুরোটের ধোঁয়া ছাড়লে। বললে—আমার আবার একটা কাজ আছে এদিকে, অনেক কাজ ফেলে এদিকে এসেছিলাম শুধু আপনাদের খবরটা দিতে। জানি না, আপনাদের ভালো করলাম কি মন্দ করলাম। যদি অন্যায় কিছু করে থাকি তো আমাকে আপনারা ক্ষমা করবেন। কারণ এখন মনে হচ্ছে খবরটা না-বললেই হয়ত ভালো করতাম—

মা-মণি বললেন—না বাবা, তুমি আমাদের ভালই করলে, আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীর কাজই করলে! তুমি বাবা এখন চলে যেও না, একটু বোস, কথাগুলো আমার ছেলেকে আর একটু শোনাও, ওর একটু চৈতন্য হোক—

মিস্টার ঘোষাল বললেন—এখন আমাকে মাপ করবেন মা, আপনি আমার মায়ের

তুল্য, আপনার কথা অগ্রাহ্য করি এমন ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু মাথার ওপর আমার অনেক ঝঞ্ঝাট, অনেক ঝামেলা ঝুলেছে। এখন তো আর জেণ্টেলম্যানদের কলকাতায় বাস করা সম্ভব নয়, একটু ভালোমানুষি করেছেন কি সবাই আপনার মাথায় চাঁটি মেরে যাবে, সবাই আপনাকে বিপদে ফেলে দেবে—

মা-মণি বললেন—সে আর বোল না বাবা, আমি তা হাড়ে হাড়ে বুঝছি—

মিস্টার ঘোষাল বললে—এখন আর কতটুকুই বা বুঝছেন, দিন কতক যাক, তখন আরো বুঝবেন. এই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আছে বলে তবু এখনও আমরা ন্যায়-বিচার পাচ্ছি, এর পরে যদি শ্যামাপ্রসাদের রাজত্ব হয় কি গান্ধীর রাজত্ব হয় তো প্রাণ বেরিয়ে যাবে—। আমরা গভর্নমেণ্ট অফিসে চাকরি করি, আমরাই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, আপনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা, আপনি আর কতটুকুই বা তার টের পাবেন?

—খুব পাচ্ছি বাবা, খুব পাচ্ছি। দেখ না, এখনই ভাড়াটেরা নিয়ম করে ভাড়া দেয় না, এর পরে কি আর বাড়িওয়ালাকে তারা মানবে? অত কথা কী, বিশ্বাস করে যার হাতে কাগজ-পত্র সব দিয়েছিলাম, সেই আমার ব্যারিস্টারই সব লুটে-পুটে নিলে বাবা, দু'দিন বাদে আর খেতে পাবো না, এমনি অবস্থা করে দিয়েছে—

মিস্টার ঘোষাল যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—সে কি?

—হ্যাঁ বাবা, ওই আমার ছেলেকেই জিজ্ঞেস করো না, আমি কি তোমার সঙ্গে মিছে কথা বলছি!

—আপনার ব্যারিস্টার আপনাকে ঠকিয়েছে? এ-রকম তো বড় হয় না।

—হয় বাবা, কলিযুগে সবই হয়। কলি-যুগ না হলে হিন্দু বাড়ির বউই কি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া করে কলকাতা শহরের বুকে? কলিযুগ না হলে কি বাড়ির-বউ হয়ে রেলের আপিসে বসে মন্দদের সঙ্গে চাকরি করে? এমন কথা আগে কেউ কখনও শুনেছে? এ যে ঘোর কলিযুগ বাবা—

সনাতনবাবু নিজের মনে তখনও কী যেন ভাবছিলেন। বললেন—এ আমি বিশ্বাস করি না—

—কী বিশ্বাস করো না? মা-মণি সনাতনবাবুর দিকে চেয়ে প্রতিবাদ করে উঠলেন।

মিস্টার ঘোষাল বললে—কিন্তু আমি তো আপনাকে বিশ্বাস করতে বলছি না—আমার কর্তব্য আমি করে গেলুম, এখন আপনাদের ভাল-মন্দ আপনারা বুঝবেন—

—কিন্তু দীপঙ্করবাবুকে কেন পুলিসে ধরেছে?

মা-মণি বললেন—তা চুরি-বাটপাড়ি করে-ছিল বোধহয়—আমি তখনই জানি স্বভাব-চরিত্র ওর ভাল নয়—

মিস্টার ঘোষাল বললে—না, চুরি-বাটপাড়ি করেনি মিস্টার সেন—

—তাহলে কীসের জন্যে ধরেছে?

মিস্টার ঘোষাল শেষবারের মত চুরোটটা টেনে ধোঁয়া ছেড়ে বললে—কীসের জন্যে তা এখনও বুঝতে পারছেন না? পরস্ত্রীকে নিয়ে ইলোপ করবার জন্যে—

কথাটা বলেই মিস্টার ঘোষাল হাত-জোড় করে নমস্কার করে চলে গেল। বললে—আমি আসি মা, পরে আবার একদিন আসবো—

মা-মণি আর সনাতনবাবুর মুখের ওপরেই মুখ ঘুরিয়ে ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলো মিস্টার ঘোষাল।

বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের বাড়িতে আস্তে আস্তে ভোর হলো। আস্তে আস্তে সকালও হলো। ঘর-দোর তছ-নছ করে করে ফেলে গেছে পুলিসরা। এক একটা দৈত্যের মতন চেহারা তাদের। কাশী কিছুই জানতো না। সন্ধেবেলা সবে ব্ল্যাক আউট শুরু হয়েছে পাড়ায়। সেই তখনই দাদা-বাবুর বন্ধু এসে দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল। চেনা চেহারা। আর একদিন রাত্রে এসেছিল। কাশী তাই তেমন কিছু সন্দেহ করেনি। দাদাবাবু নেই শুনে বসতে চেয়েছে ভেতরে। টক টক করছে গায়ের রং। সাহেবী-পোশাক পরা। কিছুই সন্দেহ হয়নি। ওপরের ঘরেই নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল বাবুকে। আর ঠিক তারপরেই যে এত কাণ্ড হবে কে জানতো? সমস্ত পাড়ায় একেবারে হৈ চৈ পড়ে গেছে।

পুলিসরা চলে যেতেই একে একে পাড়ার লোকজন এসে হাজির হলো। কেউ বললে—হ্যাঁ রে, ও কে?

কাশী বললে—আজ্ঞে, তা আমি কী করে জানবো, দাদাবাবুর বন্ধু বলে আমি বাড়িতে ঢুকতে দিয়েছিলুম—

—তা তোর বাবুকেও ধরে নিয়ে গেল কেন? তোর বাবুও কি ওদের দলে?

ঘরের মেঝেতে তখনও রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। দাদাবাবুর বন্ধুর মাথা ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল মেঝের ওপর। বাক্স, বিছানা, আয়না, আলমারি, কিছু আর আস্ত রাখেনি তারা। সমস্ত ওলট-পালট করে ভেঙে চুরে একশা করেছে। কাশীর কান্না পেতে লাগলো। মা থাকলে এমন করে হয়ত নষ্ট করতে পারতো না। মা'র পুজোর বাসন-কোসনও বাদ দেয়নি। কালীঘাটের পটখানার দিকে চেয়ে মা চান করে উঠে রোজ নমস্কার করতো। ধূপ-ধুনো দিত। সেই পটখানাই ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে পাষণ্ডগুলো। একটা ঝাঁটা নিয়ে সেই সমস্ত পরিষ্কার করতে হলো। পরিষ্কার করা কি চারটিখানি কথা?

আর শুধু তো শোবার ঘরই নয়। সমস্ত কিছু ঘেঁটেছে। কয়লার ঝুড়িটা পর্যন্ত। কয়লাগুলো পর্যন্ত উপ্‌ড়ে করে ছড়িয়ে রেখে গেছে উঠোনের মাঝখানে। রান্নাঘরের ভেতরেও বুট পরে ঢুকেছিল। হাঁড়ি-কুঁড়ি সব ভেঙে ছত্রখান করে দিয়েছে। আবার নতুন করে হাঁড়ি কিনতে হবে বাজার থেকে। আবার থালা-বাসন কিনতে হবে। আবার সবই কিনতে হবে বলতে গেলে।

—কাশী!

এতক্ষণে যেন কাশীর মনে পড়লো। এ মানুষটা যেন পৃথিবী থেকেই মুছে গিয়েছিল। তার কথা কারোরই মনে ছিল না। সেই সন্তোষকাকা মারা যাবার পর থেকেই যেন ক্ষীরোদার অস্তিত্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল সংসার থেকে। অথচ প্রতিদিন সংসারের অনেকখানি কাজ তো ক্ষীরোদাই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কাশী ঝাঁটাটা হাতে নিয়েই দৌড়ে এল।

ক্ষীরোদা বললে—ওরা চলে গিয়েছে সবাই?

কাশী বললে—অনেকক্ষণ চলে গেছে দিদিমণি, দাদাবাবুর বন্ধুকে মেরে একেবারে অজ্ঞান করে দিয়েছিল পুলিস—

আর একজনের কথাও জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো, কিন্তু লজ্জায় জিজ্ঞেস করতে পারলে না মুখ ফুটে। যার ওপর নির্ভর করে এ-বাড়িতে থাকা, সেই মানুষটার কথাও বার বার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হলো তার। রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকে সমস্ত অবস্থাটা দেখে ক্ষীরোদার চোখেও জল এল। বললে—কী হবে তাহলে কাশী?

তা কাশীই কি জানে, কী হবে। তবু মুখে অভয় দিলে। বললে—কী আর হবে! তুমি কিছু ভেবো না দিদিমণি—

—যদি আর না আসেন?

কাশী বললে—খাওয়া-দাওয়ার কথা বলছো? আমার কাছে টাকা আছে—

ক্ষীরোদা যেন টাকার কথা ভেবেই অস্থির হচ্ছে। আশ্চর্য!

কাশী বললে—না, চাল ডাল কেনবার কথা ভাবছো তো? সে আমি এখনি কিনে আনছি বাজার থেকে, আমার মাইনের টাকা নেই ভেবেছ?

সত্যিই, কাশী ভেবেছে রান্না-খাওয়ার জন্যেই ক্ষীরোদা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাশী বললে—করে জল এয়েছে, এই বেলা তুমি চান-টান যা করবার করে নাও, আমি বাজার থেকে সমস্ত কিনে আনছি—

ক্ষীরোদার রাগ হলো। রেগে বললে—তোমার যদি খেতে সাধ হয় এত তো তুমি খাও, আমার খিদে নেই।

কাশী সে-কথায় কান দিলে না। তাড়াতাড়ি ঘর-পরিষ্কার করে ঝুড়ি নিয়ে একেবারে তৈরি। বললে—আমি বাজারে চললুম, দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দাও—

ক্ষীরোদা তখনও চুপ করে বসে রইল।

কাশী আবার কাছে এল। বললে—উঠে দরজাটা বন্ধ করে দাও, আমি বাজারে যাচ্ছি—

ক্ষীরোদার চোখ দু'টো বড় করুণ হয়ে উঠলো এবার। বললে—কিন্তু কেন যাচ্ছো কাশী, কে খাবে?

—আমি খাবো, আমি। আমি তোমার মত উপোস করে থাকতে পারবো না। আমি নিজে খাবো। তুমি সদর-দরজাটা আগে বন্ধ করে দাও তো—

ক্ষীরোদার ইচ্ছে ছিল না। তবু অনেক পীড়াপীড়িতে ক্ষীরোদা উঠলো। কাশী বাইরে বেরিয়ে গিয়ে বললে—বেশ ভাল করে এ'টে দরজা বন্ধ করে দাও, কেউ ঠেললেও দরজা খুলবে না, আমি এসে উনুনে আগুন দেব—আমার বেশি দেরি হবে না—

তারপর বাইরে থেকেই দরজাটা ভাল করে ঠেলে দেখলে কাশী ঠিক-ঠিক বন্ধ হয়েছে কিনা। ক্ষীরোদা আবার এসে বসলো বারান্দায়। আবার হারিয়ে গেল নিজের মনের তলায়। সারা রাত ঘুম হয়নি কারো। কাশীও ঘুমোয় নি। বাড়িতে অমন কাণ্ড হলে কেউ ঘুমোতে পারে নাকি? কোথাকার কোন্ রসুলপুর থেকে একদিন এ-সংসারে এসে পড়েছিল ক্ষীরোদা, সেদিন কলকাতা দেখবার কলকাতায় থাকবার একটু আগ্রহ ছিল হয়ত। তারপর সেই একদিন মাসীমার সঙ্গে কাশীতে গিয়েছিল রেলে চড়ে, আর কোথাও যায় নি। আর কিছু দেখবার শোনবার ইচ্ছেও হয়নি ক্ষীরোদার। এ-সংসারে সে কেউ না, কিন্তু এই সংসারই তাকে কেমন করে জড়িয়ে ধরলে, আর তার পালাবারও উপায় রইল না। এখন এখান থেকে তাকে তাড়িয়ে দিলেও সে আর যেতে পারবে না। আর কোথাও যাবার জায়গাও নেই তার।

হঠাৎ দরজার কড়াটা নড়ে উঠলো!

এর মধ্যেই কাশী ফিরে এল নাকি! ক্ষীরোদা দাঁড়িয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি সদর দরজার সামনে গিয়ে বললে—কে? কাশী?

কেউ সাড়া দিলে না বাইরে থেকে।

ক্ষীরোদা বললে—কাশী, ফিরে এলে?

তবু সাড়া নেই।

ক্ষীরোদার কেমন যেন ভয় করতে লাগলো। কে এল হঠাৎ এমন সময়?

—কাশী? কাশী দরজা ঠেলছো? নাম বলো তোমার। কে?

তবু কারো সাড়া পাওয়া গেল না। আরো জোরে-জোরে কড়া নড়তে লাগলো।

এবার যেন আরো ভয় পেয়ে গেল ক্ষীরোদা। দরজা খুলে যদি দেখে অচেনা লোক। যদি আবার পুলিসের লোক আসে? বাড়িতে পুরুষ মানুষ নেই একটা যে কথা বলতে পারবে। কী করবে কিছুই বুঝতে পারলে না ক্ষীরোদা।

তখনও কড়া নাড়ছে।

ক্ষীরোদা আবার বললে—কে? কাশী তুমি?

মনে হলো যেন কাশীই বললে—হ্যাঁ দিদিমণি, দরজা খোল—

দরজাটা খুলতেই কিন্তু ক্ষীরোদা অবাক হয়ে দু'পা পেছিয়ে এসেছে। এ কে? একে তো দেখেনি কখনও। এতদিন এ-বাড়িতে এসেছে এ-চেহারা তো কখনও নজরে পড়েনি!

ভয়ে গলাটা শুকিয়ে এসেছে তখন। তবু একটু সাহস নিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আপনি কে?

—তুমি কে?

ক্ষীরোদা প্রশ্ন শুনে আরো অবাক হয়ে গেল। দুজনেই দুজনের দিকে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

(ক্রমশ)

বরফে ঢাকা, অতি অল্পসংখ্যক এস্কিমো-অধ্যুষিত দুর্গম দেশ গ্রীনল্যান্ড অতি দ্রুত আধুনিক সভ্যতায় উন্নতি লাভ করছে। আট লক্ষ চল্লিশ হাজার বর্গমাইল, ফ্রান্সের চতুর্গুণ, পৃথিবীর বৃহত্তম এই দ্বীপটিতে এখন খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী ঠান্ডাঘরে রাখার ব্যবস্থা, মাছ জমা করে রাখা, নতুন নতুন খনি পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যনিবাস, শিক্ষালয় সারা দেশে গজিয়ে উঠছে।

বিজ্ঞান এই দ্বীপের অধিবাসীদের নতুন এবং অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক জীবন-যাত্রার পথ করে দিচ্ছে। সেকেলে অবৈজ্ঞানিক রীতির পরিবর্তে ক্রিশ্চিয়ানাশবে প্রতিষ্ঠিত কারখানায় স্থানীয় দক্ষ কুশলীদের পরিচালনায় কড মাছের কাঁটা ছাড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে। বরফের তৈরী ওদের বাসা (ইগলু) এবং ঘাসের ছাউনির কুটির অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট শহরে স্বয়ং-সেবক দ্বিতল স্টোর, অতি আধুনিক ধারার স্কুল, টেকনিকাল কাজ শেখার প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, এমনকি আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত রূপ-পরিচর্যা সেলুনও দেখতে পাওয়া যায়।

উপকূলবর্তী বরফাচ্ছন্ন পাহাড়ে ঘেরা এই বিশাল দ্বীপটি মাত্র বত্রিশ হাজার লোককে প্রতিপালন করে। এর মধ্যে শত-করা নব্বইজন গ্রীনল্যান্ডের অধিবাসী, যাদের পূর্বপুরুষ ছিল এস্কিমো, কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপের প্রায় সব জাতিরই লোকের রক্ত এদের মধ্যে এখন প্রবাহিত। কিছু দিন আগে টেরী হুইটফিল্ড নামক অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত এক ইঞ্জিনীয়ারকে বরখাস্ত করা হয় এন উইটালডুক নামক এক এস্কিমো মেয়ের সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে।

গ্রীনল্যান্ডের বৃহত্তম শহর হচ্ছে গডথাব, কিন্তু তার অধিবাসী সংখ্যা মাত্র তের শ। ও-দেশে আয়কর দিতে হয় না তবে সুরা ও তামাক থেকে উৎপাদিত সামগ্রীর ওপর শুল্ক ধার্য করা হয়। এই আয় থেকেই দ্বীপটির উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে গ্রীনল্যান্ডবাসীরা মোটরচালিত মৎস্যশিকার নৌকা ব্যবহার করেও এবং তাদের চিংড়ি শিকার নৌকা-গুলি বেতার-টেলিফোন যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম গ্রীনল্যান্ডের সমুদ্র থেকে ওরা এক-দশমাংশের বেশী মাছ ধরতে পারে না। ফরাসী, স্পেনীয়, পর্তুগীজ, নরউইজীয় ও জার্মান ট্রলারগুলিই বেশী মাছ ধরে।

বিবর্তনের ফলে ওদের প্রাচীন জলযান কায়াকও ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। গ্রীনল্যান্ড পাঁচ শ বছর ধরে ভাইকিংদের উপনিবেশ ছিল। ৯৮৫ সাল থেকে ভাইকিংরা দুটি নিরূট দলে বিভক্ত হয়ে বসবাস করতো এবং ইউরোপে ফার ও সীল মাছের দাঁত রপ্তানি করতো। ওরা গ্রীনল্যান্ডের তিমিজাতীয় নারহোয়াল ধরে তাদের পাকানো পাকানো দাঁত ইউরোপে পাঠাতো প্রাচীন ভারতের অশ্বদেহযুক্ত এক শ্রেণীর প্রাণীর শিং বলে। এর কতক স্থান পায় বিশপদের যাজকীয় দণ্ডে আর বাকিগুলি ঐন্দ্রজালিক-দের যাদুদণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে—যার নাকি রোগ আরোগ্যের ক্ষমতা ছিল।

তারপর পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ হতে মহাদেশের সঙ্গে ভাইকিংদের উপনিবেশের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায় এবং গ্রীনল্যান্ড মূলভূমি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এস্কিমোরা আবার তাদের দশ হাজার বছরের পুরনো স্বদেশের ভার নেয়।

এখন এই দ্বীপটি থেকে নানারকম সম্পদ আহরণ করা হচ্ছে। পূর্ব উপকূলে রয়েছে দস্তা ও সীসার খনি, উত্তর-পশ্চিমে কয়লা এবং ইভিসটাটে পৃথিবীর বৃহত্তম ক্রিয়োলাইট খনি। সোনা, শ্বেতপাথর, রূপা ও নিকেলেরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

যক্ষ্মা রোগ এক সময়ে দ্বীপটিকে জন-শূন্য করে তোলার মতো ব্যাপক ছিল, কিন্তু এখন সে রোগকে জয় করা গিয়েছে। এখন ওরা নতুন নতুন বন্দর তৈরি করছে এবং হেলিকপ্টার, মোটরসাইকেল জাতীয় আধুনিক যানবাহনের প্রচলন হয়েছে।

*

জুন মাসের ৯ তারিখ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কফুর্ট অন মেইন-এ 'একেমা ১৯৬১' নামক রাসায়নিক শিল্পের যে প্রদর্শনী হয়ে গেল তাতে রাইন রুঢ় জেলা থেকে ১০৬ টন উচ্চ চাপের একটি আধুনিক রিঅ্যাক্টার এবং আলট্রা-মাইক্রো নামক অতি সূক্ষ্ম তুলাদণ্ড প্রদর্শিত হয়। এই তুলা-দণ্ডে এক গ্রামের দশ লক্ষ ভাগের ভগ্নাংশও ওজন করা যায়।

এই প্রদর্শনী ক্ষেত্রে বিশ্বের ৫০টি দেশের ইঞ্জিনীয়ার, পদার্থবিজ্ঞানী, রাসায়নিক ও শিল্পপতিগণও কয়েকটি সম্মেলনে মিলিত হন। এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য এবং প্রদর্শনী দেখার জন্য জার্মানী ও বিদেশ থেকে প্রায় ১,০০,০০০ দর্শক যোগ দেন। রসায়নশিল্পে বিভিন্ন ধরনের যেসব যন্ত্র-পাতি ও সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয়, এই প্রদর্শনীতে তা দেখানো হয়। ইয়োরোপ ও এশিয়া, ল্যাটিন-আমেরিকার রাসায়নিক শিল্প সম্পর্কিত ১৬টি বিখ্যাত সংস্থা এতে যোগ দেন।

বৃটেনে উদ্ভাবিত এই নতুন যন্ত্রটি কোন ব্যাঙ্ক বা কোন বাড়িতে থাকাকালে চোর প্রবেশ করলেই সে তার নিজের অজ্ঞাতে একটা অদৃশ্য ও শ্রবণাতীত শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করে যা আপনা থেকেই সংকেত-ঘণ্টা বাজিয়ে সেই গৃহের সমস্ত আলোগুলি জ্বালিয়ে দেয় বা পুলিসকে সতর্ক করে দেয়। অপরাধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যন্ত্রটি বিশেষভাবে সহায়ক।

'একেমা ১৯৬১' প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপক জার্মানীর রসায়নশিল্প ইঞ্জিনীয়ারিং ও সাজসরঞ্জাম সমিতি এই প্রথমবার বিদেশী অতিথিদের এই প্রদর্শনীতে যোগ দেওয়ার সুবিধার জন্য বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করেন। ভারত, তুরস্ক, আরব দেশ ও ল্যাটিন-আমেরিকার দেশসমূহের অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞগণ যাতে এই প্রদর্শনীতে যোগ দিয়ে সমগ্র বিশ্বের বিশেষজ্ঞগণের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারেন, সেই জন্য ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রগণও যাতে 'একেমা ১৯৬১' প্রদর্শনীতে যোগ দিয়ে এখানকার সভা সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেন, সেজন্য তাঁদেরও সাহায্য করা হয়।

প্রস্তুতকারিগণ যেসব যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ করেন, সেগুলির গুণ, ডিজাইন, সঠিক কর্মক্ষমতা ইত্যাদির ওপরেই যে রসায়নশিল্পের উৎপাদন নির্ভর করে, এ কথা সকলেই জানেন। গবেষণাগারে সামান্যতম রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফলও যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের গুণাগুণের ওপর নির্ভর করে। 'একেমা ১৯৬১' প্রদর্শনীতে আধুনিক রাসায়নিক যন্ত্রপাতি এবং সাজ-সরঞ্জামের বিপুল সংগ্রহ প্রদর্শন করা হয়।

যে আলট্রা-মাইক্রো তুলাদণ্ডটি দর্শক-গণের দৃষ্টি সব চাইতে বেশী আকর্ষণ করেছে, সেটি যাতে বাইরের কোন কিছু দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়, সেজন্য তিন সারি কাঁচ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়, এবং যাতে বাইরের কোন নাড়াচাড়া এতে না পৌঁছয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ, বাইরের কোন দর্শকের নিঃশ্বাসও এই তুলাদণ্ডে ওজন হয়ে যাবে।

*

বুলগেরিয়ার স্তারা জাগোরা শহরে একটি আবাস-ভবনের ভিত খুঁড়বার সময় একজন ধনী ক্রীতদাস মালিকের ভবন সহ একটি প্রাচীন রাস্তার কিয়দংশ আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কৃত সম্পদগুলির মধ্যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রোমান শৈলীতে নির্মিত একটি পাথরের কারুকার্যময় প্রাচীর আছে।

এই কারুকার্যময় প্রাচীরটিকে রক্ষা করবার জন্য একটি বিশেষ ভবন নির্মিত হয়েছিল। একটি সরু সিঁড়ি বেয়ে ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে গিয়ে সেই আশ্চর্য সম্পদটিকে দেখতে হয়। তাহার পর রোমান আমলের পাথর-বাঁধানো রাস্তা ধরে একটু অগ্রসর হয়েই এক মিটার দূরে সেই প্রাচীন প্রাচীরটি চোখে পড়ে। তখন পুলক অনুভব না করে পারা যায় না। বিচিত্র কারুকার্য শোভিত মহার্ঘ কম্বলের মতো দেখতে সেই প্রাচীরটির বিচিত্র বর্ণসম্ভার দর্শকের দৃষ্টিকে প্রথমেই আকর্ষণ করে। প্রাচীরের গায়ে মাছ ও সাঁতারুদের ছবিগুলি দেখে মনে হয় তারা যেন সত্য সত্যই স্বচ্ছ নির্মল জলের মধ্যে সাঁতার কাটছে। হরিণী, শশক, বরাহ, কুকুর ও অন্যান্য জীবজন্তুদের চিত্রগুলিও কম চিত্তাকর্ষক নয়।

এই অপূর্ব কারুকার্যখচিত পাথরের প্রাচীরটি নির্মিত হয়েছিল প্রায় ষোল হাজার বৎসর পূর্বে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই প্রাচীন চিত্রকরদের রঙ ও রেখার কাজে নবীনতা. মার্বেল, গ্রানাইট ও অন্যান্য পাথরের ছোট ছোট টুকরাগুলির মধ্যে অটুট হয়ে আছে। যদিও সেকালে সিমেন্টের ব্যবহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল তবু যে-মসলার সাহায্যে পাথরের টুকরাগুলিকে একত্র আটকে রাখা হয়েছে তা এত শক্তিশালী যে প্রাচীরটির উপর দিয়ে কেউ সজোরে হেঁটে গেলেও ওর কোন ক্ষতি হয় না। প্রাচীরটি তৈরী করবার জন্য ১×১ সেণ্টিমিটার মাপের হাজার হাজার পাথরের টুকরা ব্যবহার করা হয়েছিল।

রোমান আমলের এই প্রাচীন পাথরে বাঁধানো রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ধ্বংসপ্রায় রক্ষাভবনের অর্ধভগ্ন প্রাচীরগুলির মধ্য-স্থলে অক্ষত অপূর্ব বর্ণবৈচিত্র্যময় কারু-কার্যখচিত পাথরের প্রাচীরটির পানে দৃষ্টিপাত করলে দর্শকের মন অজ্ঞাতসারে সুদূর অতীতের "ট্রাজানদের অপূর্ব জ্যোতির্ময় শহর" অগাস্টা ট্রাজানার যুগে ফিরে যায়। এককালে অগাস্টা ট্রাজানাই ছিল বর্তমান স্তারা জাগোরা শহরের পূর্ব-পুরুষ।

*

শস্যহানি ও দুর্ভিক্ষ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য বহু দূরবর্তী দেশ থেকে জার্মানীতে সাহায্যের আহ্বান আসে। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট মালবাহী বিমানে শক্তিশালী কীটানু-নাশক নিয়ে সেইসব দেশে সাহায্যকারীর দল গিয়ে হাজির হয়।

বিগত পাঁচ বছর ধরে এই কাজ চলছে। বিভিন্ন বিদেশী সরকার থেকে সাহায্যের জন্য জরুরী খবর আসে আর সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে বিমান চলে যায় সেইসব দেশে—যেমন তাসমানিয়ার কমলা-লেবুর বাগানে "লাল মাকড়সা" মারতে, ভারতের ধানের ক্ষেতে বিষাক্ত পোকা ধ্বংস করতে, অথবা ব্রেজিলের তুলোর ক্ষেতে কিংবা আনাতোলিয়া, ইরাণ ও লেবাননের গ্রামের ক্ষেতে একরকম পাহাড়ী ছারপোকার নিধনে।

মানুষের চিরশত্রু এই পোকামাকড়ের কাছে মানুষ বহুবার পরাজিত হয়েছে। আজ এটি সুবিদিত যে আমেরিকার মায়া সভ্যতা ধ্বংসের মূলে রয়েছে কুখ্যাত এক জাতীয় পিপীলিকা। ঠিক ঘড়ি ধরে, তারিখ ধরে কীটাণু নাশক প্রয়োগ না করলে, এইসব পোকামাকড় ধ্বংস করা সম্ভব নয় কেননা এদের প্রজনন ক্ষমতা এত বেশী যে একদল মরলেও দলে দলে এদের বংশবৃদ্ধি হয়।

অনাবাদী উষর জমিতে এইসব বিধ্বংসী কীটপতঙ্গ বেশী দেখা যায় না। এদের আক্রমণের ক্ষেত্র হচ্ছে ফল, ফুল শাকসব্জী ও শস্যের ক্ষেত। আজকাল একদেশের পোকামাকড় অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, যেমন 'স্পিনারমনইট পোকা ও আফ্রিকার বিলহার্জিয়া শামুক যার ফলে একরকম বিপজ্জনক রোগের সৃষ্টি হয়। বর্তমান দশকে জার্মান শস্যসম্পদ রক্ষাকারী রসায়নের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। নানারকম বিষ আবিষ্কার হয়েছে যার সংস্পর্শে পোকামাকড়ের মৃত্যু ঘটে এবং ধারাবাহিক প্রথায় কীটানুনাশক ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত হয়েছে। বেশীর ভাগ ফলপ্রদ কীটানুনাশক আজকাল জার্মানীতে তৈরী হয়। জার্মান বিজ্ঞানীদের মতে যদিও পোকামাকড়ের সঙ্গে সংগ্রামে মানুষ কোনদিন তাদের সম্পূর্ণ পরাভূত করতে পারবে না, তবে কিছুদিনের জন্যও যদি তাদের জয় করা যায় সেও মানুষের পক্ষে যথেষ্ট লাভ।

•

পশ্চিম জার্মানীতে শ্রমিকের অনটন চলতে থাকায় বহু প্রতিষ্ঠানের মালিকরা লোককে প্রলুব্ধ করার বিবিধ ব্যবস্থা করেছে। একটি প্রতিষ্ঠান ঝাড়ুদারের জন্য বিজ্ঞাপন দেয় এই বলে যে, প্রতি ছ-মাস কাজের পর দশ দিন সবেতন ছুটি দেওয়া হবে রৌদ্র-ঝলমল দক্ষিণাঞ্চলে বেড়িয়ে আসার জন্য। এক ছাপাখানা কম ভাড়ায় শহরতলিতে ফ্ল্যাট দেবে বলে বিজ্ঞাপন দেয়। অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বিশেষ বোনাস দেবার প্রলোভন দেখাচ্ছে। অপরদিকে আবার কেউ যাতে কর্মচারি ভাঙিয়ে না নিয়ে যায়, তার প্রতিরোধে কতক প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের দীর্ঘকাল কাজ করার শর্তে তাদের বীমার প্রিমিয়াম, লাভের অংশ বণ্টন এবং বেশ ক' মাসের বেতনের সমান বোনাস ব্যবস্থা করে রেখেছে।

•

দুনিয়ার সব মেয়েই সুদর্শনা হতে চায়। এটা তাদের একটা চিরন্তন বাসনা। বর্তমানে জার্মান ফেডারেল সাধারণতন্ত্রের মেয়েরা কিভাবে সৌন্দর্যচর্চার দিকে ঝুঁকে পড়েছে, কতকগুলো পরিসংখ্যান থেকে তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। ১৯৫২ সাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত জার্মানীর প্রসাধনসামগ্রী-শিল্প যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে এবং এই শিল্পের উৎপাদন তিন গুণ বেড়ে গেছে। শুধুমাত্র জার্মান মেয়েদের চাহিদার ফলেই জার্মান প্রসাধনসামগ্রী-শিল্পের এই অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব হয়নি। এই কয়েক বছরে জার্মান প্রসাধনসামগ্রীর রপ্তানিও পাঁচ গুণ বেড়ে গেছে। এই সব প্রসাধন সামগ্রীর মধ্যে নানারকম সুগন্ধি আর চুলের তেল, ক্রীম ইত্যাদিই হলো প্রধান।

সহজে শিখুন বিজ্ঞান ‖ বব ব্রাউন
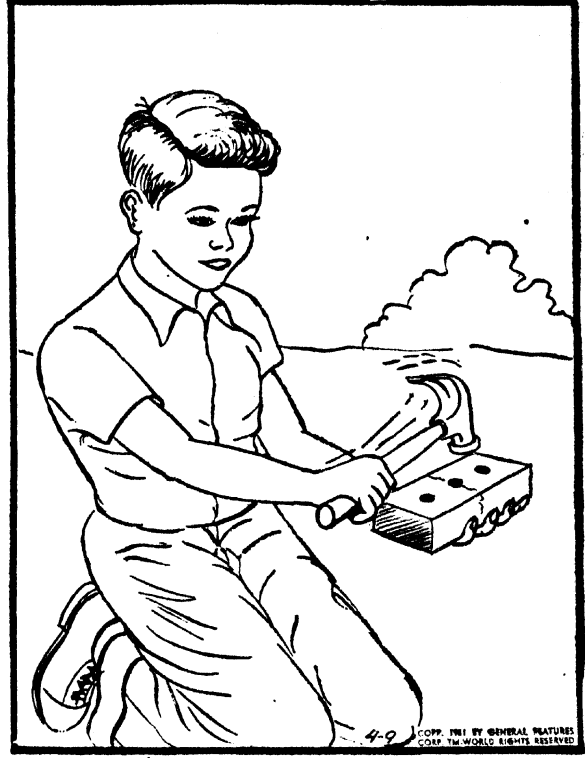
কী করণীয়:

ইটটা হাতের ওপর ভাঙুন।

কী চাই:

একখানা ইট আর হাতুড়ি চাই।

কি করে হল:

ছবি দেখুন। বাঁ হাতে ইটখানা ধরুন। মাঝখানে হাতুড়ি দিয়ে এক ঘা লাগিয়ে দিন। ইটটা ভেঙে দু' টুকরো হয়ে যাবে।

কেন হল:

বাহু আর কাঁধের পেশীগুলির স্থিতিস্থাপকতা আছে। আপনার অজ্ঞাতেই সেগুলি কমে বাড়ে, ওঠানামা করে। হাতুড়ির ঘা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাতটা একটু নামে। ইটটা আছে বিশ্রাম অবস্থায় আর থাকতেও চায় সেই অবস্থায়, কিন্তু হাতুড়ির আঘাত ভঙ্গুর ইটের মাঝখানে দ্রুত যে বেগের সঞ্চার করে তার ফলে ইটের অন্য অংশে বিশ্রামের ব্যাঘাত হওয়ার আগেই ইটখানা দুটি টুকরোতে ভাগ হয়ে যায়, টুকরো টুকরো হবার অবকাশ পায় না। পেশীর স্থিতিস্থাপকতার (ইলাস্টিসিটি) জন্যে হাতেও আঘাত লাগে না।

ট্রামেবাসে

সংবাদে শুনিলাম, জনৈক রুশ জ্যোতির্বিদ পৃথিবী হইতে ১১ কোটি মাইল দূরে একটি নূতন ধূমকেতু আবিষ্কার করিয়াছেন। খুড়ো বলিলেন—"আমেরিকাতেও সম্প্রতি একটি ধূমকেতুর
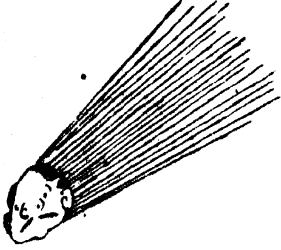
উদয় হয়েছিল। সেখানকার জ্যোতির্বিদেরা একটু ভালো করে নিরীক্ষণ করলেই সেই ধূমকেতুর পুচ্ছ আস্ফালন দেখতে পেতেন!!"

রাশিয়ার জনৈক পদস্থ ব্যক্তি নাকি মন্তব্য করিয়াছেন যে, কেনেডি যুদ্ধ চাহিলে তিনি তা পাইবেন।—"কিন্তু যুদ্ধের বদলে তিনি যদি ভড়্কা চেয়ে বসেন তা হলে তাঁকে তা দেওয়া হবে ত?"—প্রশ্ন করেন জনৈক সহযাত্রী।

মস্কোর অন্য এক সংবাদে শুনিলাম—জুলাই মাসে মস্কোতে প্রচুর বিদেশী এসেছেন। হোটেলে জায়গার অভাব। এ মাসের সবচেয়ে ব্যাপক উৎসব—"বিশ্ব চলচ্চিত্র উৎসব।—"বিনা উৎসবের সিনেমায় কলকাতাতে যে লম্বা 'কিউ' দেখি তাতে মস্কোর ভিড়ের কারণ অনুমান করা কঠিন নয়।"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, সেখানে কোন এক সরকারী অফিসে সন্ধ্যার পর নাকি একটি প্রেতিনীর আবির্ভাব হয়। যাঁরা সন্ধ্যার পর পর্যন্ত অফিসে থাকেন তাঁরাই তা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সংবাদে বলা হইয়াছে, প্রেতিনীর মুখে আগুন জ্বলে। সে হাত বাড়াইয়া উপস্থিত ব্যক্তিদের জড়াইয়া ধরিতে চায়। শ্যামলাল বলিল—"আমরা কলকাতায় সরকারী ও বেসরকারী অফিসে প্রেত ও প্রেতিনীর সংবাদ মাঝে মাঝে পাই। তাদের আগুন মুখে জ্বলে না, জ্বলে বুকে—বিশ্বাস করুন আর নাই করুন!!"

মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রী জন গ্যালব্রেথ কলিকাতা আসিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, যে শহরের লোক যত বুদ্ধিমান সেই শহরে পৌর ব্যবস্থা তত নিকৃষ্ট।—"পরমহংসদেব বলতেন, কাক সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব'লে তার ভাগ্যে সকালে মিলে...।" খুড়ো কদর্য খাদ্যের কথাটা উহ্য রাখিয়াই বক্তব্য শেষ করিলেন।

ইন্দোরে একটি বিবাহের মেয়ে নিলাম হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল।—"নতুন কিছু সংবাদ নয়। গৌরবর্ণা, বিদুষী, গৃহকর্ম-সুনিপুণা, নৃত্যগীত-পটীয়সীদের যে-সব সংবাদ সংবাদপত্রে পাঠ করি তাও এক ধরনের নিলাম বই কি!"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

নেপালের সংবাদে শুনিলাম একটি চাষী রমণী নাকি ২৬টি সন্তানের জন্মদাত্রী হইয়াছেন।"—হারাধনের স্ত্রী বেঁচে থাকলে দশ দশটি ছেলের মা হওয়ার গৌরব বঞ্চিত হয়ে নির্ঘাত আত্মহত্যা করতেন।"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

শ্রী বার্ট্র্যান্ড রাসেল নাকি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—বছর শেষ হওয়ার আগেই হয়ত আমরা সবাই পারমাণবিক যুদ্ধের ফলে মারা যাইতে পারি। তিনি পরামর্শ দিয়াছেন—যেসব মানুষ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা তাদের হৃদয়ে ও মনে যুক্তি ও মানবতার স্ফুলিঙ্গ জ্বালাইয়া তুলুন।—"কিন্তু তাঁরা যে বারুদের ওপর বসে আছেন—স্ফুলিঙ্গ জ্বালাতে গেলেই যে দপ করে সব জ্বলে উঠবে।"—বলেন বিশু খুড়ো।

কলিকাতার বাজারে চশমার যে কাঁচ ব্যবহার করা হয় তা নাকি চশমায় ব্যবহারের উপযোগী কাঁচ নয়।—"হয়ত

সত্যি। আজ কতকদিন ধরে সবার মনেই জাগছে পুরনো গানের সেই কলিটা—চোখের ঐ চশমা জোড়া দেখ না বাবু খুলে।"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

কোন এক স্বামী তাঁর স্ত্রীর নাক কাটিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ফিলাডেল-ফিয়ার কোন এক ডাক্তার নাকি কাটা

নাক আবার স্বস্থানে জুড়িয়া দিয়াছেন।—"যাঁরা অন্যের ব্যাপারে নাক গলান, তাঁদের আর কোন ভয় রইল না।"—বলেন বিশু খুড়ো।
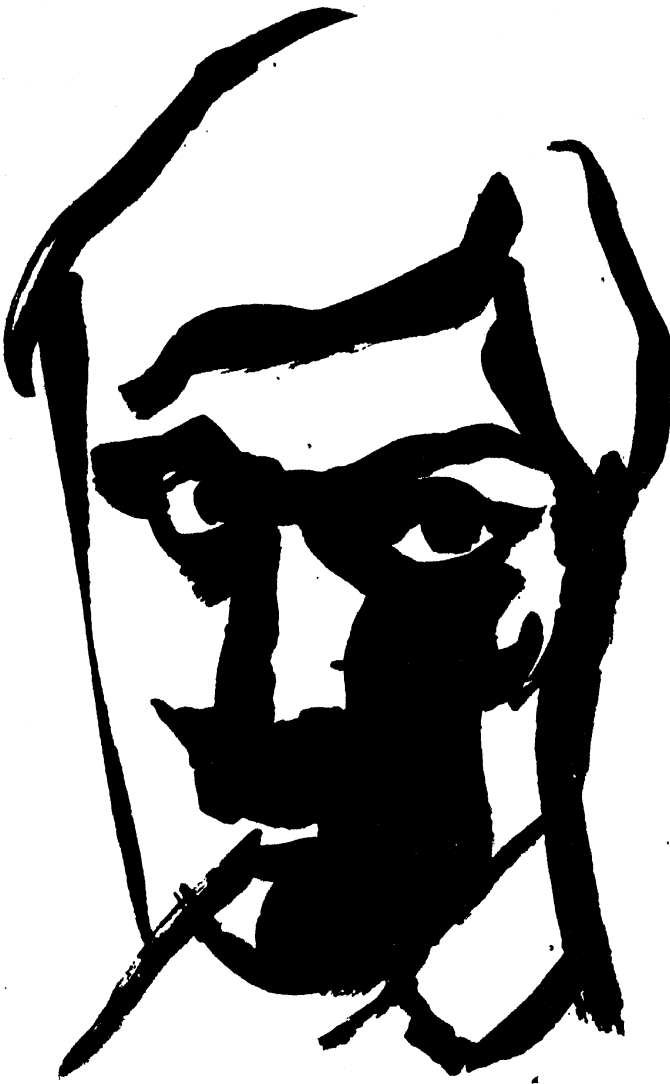
অভিনেতার মুখ

হোজে ফ্রানথেস্ (স্পেন)

স্মারকের হেঁড়ে গলার ডাক থিয়েটারের সর্বত্র প্রতিধ্বনি তোলার ঠিক আগে ম্যানেজার করাঘাত করলেন পাব্‌লো এরেদিয়া-র সাজঘরের দরজায়।

"ভেতরে আসতে পারি?"

"আসুন ডন লুইস!"

বিখ্যাত পরিচালক-অভিনেতা এরেদিয়া আয়না থেকে চোখ ফিরিয়ে ম্যানেজারের ওপর দৃষ্টি স্থাপন করলেন।

"মুখখানা গোমড়া কেন, ডন লুইস? টিকিট বিক্রি সুবিধের হয়নি বুঝি?"

"এভাবে আর চলে না, লোক নেই বললেই চলে ভাই। নতুন নাটকটা—ঐ 'রক্তভৃষা' নাটকটা—হুড়মুড় করে না নামিয়ে দিলে আগামী সোমবার সবাইকে মাইনে দেওয়াই বুঝি অসম্ভব হয়ে পড়ে।"

ম্যানেজার আলমারির সামনের আরাম-কেদারাটায় গা এলিয়ে দেন।

এরেদিয়া জবাব দেন না; আয়নায় মনঃসংযোগ ক'রে হালকা টানে চোখ আঁকতে থাকেন।

একটা দীর্ঘ নীরবতা। পাছে অশোভন কিছু মুখ থেকে ফসকে যায় এই ভয়ে কেউই কিছুক্ষণ কথা বলল না। ম্যানেজারের সব আশা ভরসা আস্থা ছিল ঐ 'রক্তভৃষা' নাটকটার উপর—উৎকট খুনো খুনির গল্প, জমবে ভাল, এরেদিয়া-র হাতে খেলবেও চমৎকার। এরেদিয়াও উল্লসিত হয়েছিলেন নাটকটা পেয়ে, এমন কি ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে বসেছিলেন, এই পার্টটাই হবে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কার্যক্ষেত্রে দেখলেন শেষটা বড় শক্ত। এ দৃশ্যে নায়ক ছুরিকাহত হয়ে পড়ে যাবে নায়িকার পদপ্রান্তে, রক্তক্ষরণের ফলে মুমূর্ষু, জ্ঞানহীন, জীবন ও মৃত্যুর আলো-আঁধারে ঘেরা সন্ধিক্ষণে সে টিঁকে থাকবে বেশ কিছুক্ষণ। রিহার্সালগুলো বুড়ি ছুঁয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলেন এরেদিয়া; কৃত্রিম ঔদাসীন্যে ঢেকে রেখেছিলেন অক্ষমতাকে। কিন্তু ম্যানেজার ও নাট্যকার এটুকু দেখেই লাফিয়ে উঠেছিলেন, সেই অলস ঔদাসীন্যের মধ্যেই তাঁরা দেখতে পেলেন ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ চরিত্রটাকে, বলতে লাগলেন : এবার এরেদিয়া ফাটাবে। কানাকানি হতে হতে শহরময় ছড়িয়ে গেল কথা। নাট্য-সমালোচকরা 'থিয়েটারের টুকিটাকি' স্তম্ভে লিখতে শুরু করলেন এরেদিয়া-র আসন্ন সাফল্যের কাহিনী।

গোড়ায় চারদিকের এই জল্পনা-কল্পনাটা ভালই লেগেছিল এরেদিয়া-র, তারপর চেষ্টা করলেন হেসে উড়িয়ে দিতে, অবশেষে একদিন অনুভব করতে শুরু করলেন নাম-নাজানা একটা আশঙ্কা, একটা অহেতুক আতঙ্ক। শেষ দৃশ্যটাকে তিনি রীতিমত ভয় করতে শুরু করলেন, অগ্নিগর্ভ একটা পরিস্থিতি—যেখানে মুখাভিব্যক্তির মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে হবে একই সঙ্গে প্রেম, ক্রোধ, মৃত্যুযন্ত্রণা, বাঁচবার আগ্রহ, পরাজয়ের গ্লানি! মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসে, যন্ত্রণার অবসান হয়ে গেছে, তবু প্রাণ যায়নি, কি রকম হয় তখন মুখের চেহারা? চোখ হবে কি রকম; ওষ্ঠাধরই কি বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। কণ্ঠস্বরই বা কেমন শোনাবে? দেহ কি কাঁপবে? হাত কাঁপবে? নাকি বিবশ হয়ে, প্রাণহীন হয়ে ঝুলে পড়বে?

প্রশ্ন। ভীষণ জটিল প্রশ্ন। আয়নায় নিজেকে দিনের পর দিন বিশ্লেষণ করেও জবাব পেলেন না এরেদিয়া। রাত্রের ঘুম গেল উবে।

রিহার্সাল চলছে 'রক্তভৃষা'র চলছে তো চলছেই। দু-তিনবার অভিনয়ের দিন ধার্য করেছিলেন কর্তৃপক্ষ, প্রতিবার এরেদিয়া পিছিয়ে দিলেন তারিখ। আর সব অভিনেতারা গড়গড় করে পার্ট বলে যেতেন বলতেন প্রমপ্টারের দরকার নেই

ঝাড়া মুখস্থ। এদিকে এরেদিয়া-র অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনীটা পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁদের মধ্যে; নিজেদের মধ্যে তাঁরা, বড় অভিনেতার প্রতি ঈর্ষা তাঁদের উদ্দেশে ছাড়তেন কশাঘাতের মতন তীব্র এক একখানা মন্তব্য। থিয়েটারের লোক তাঁরা বড় অভিনেতার প্রতি ঈর্ষা তাঁদের মজ্জাগত। এবার সে ঈর্ষা পেয়ে গেল যথেচ্ছ বিচরণের ক্ষেত্র।

এদিকে পুরোনো নাটক লোক টানতে পারছে না, প্রেক্ষাগৃহ শূন্য। নাট্যকার চুল ছিঁড়ছেন, ম্যানেজার প্রতিবাদে মুখর। এরেদিয়া-র খ্যাতি নিয়ে টানাটানি। তবু বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে প্রথম অভিনয়ের দিন।

"পর্দা তুলতে পারি?"

স্মারক মাথা ঢোকায় ঘরে।

"ভেতরে এস।" বললেন ম্যানেজার ডন লুইস।

"বলুন, হুজুর," ভেতরে আসে স্মারক।

"কেমন?" বললেন লুইস।

"খারাপ হুজুর খুব খারাপ। লোক নেই বললেই চলে। যাও বা আছে, মাথা-মোটা দোকানদার কতকগুলো হুজুর, দর্শকের চেয়ে আমরাই সংখ্যায় ভারী।"

এরেদিয়া ঠোঁট কামড়ালেন।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। সবাইকে ডাকো স্টেজে। শুরু করে দাও।"

স্মারক দৌড়ে চলে যায়। থার্ড বেল বাজে তীক্ষ্ণস্বরে। চাপা নির্দেশ শোনা যায়, মঞ্চাধ্যক্ষের, "আরম্ভ হচ্ছে! আলো দাও! হাউস-লাইট কাটো!"

সাজঘরগুলোর দরজা খোলে, বন্ধ হয়, দ্রুত পদশব্দ, ছুটোছুটি, মেয়েদের পোশাকের ত্রস্ত খসখস শব্দ। তারপর থমথমে নিস্তব্ধতা। পর্দা উঠে গেছে।

"এবার বলুন, এরেদিয়া, কি করব? এভাবে চালানো অসম্ভব, আমি তো আর পারছি না। লেখক ভয় দেখাচ্ছে আর দেরি হলে বইটা ফেরত নিয়ে চলে যাবে অন্য থিয়েটারে। বুঝুন, অন্তত একটা তারিখ বলুন।"

এরেদিয়া হাল ছেড়ে দিলেন।

"বেশ, সোমবার।"

"সোমবার? না, এরেদিয়া! সোমবার টোমবার নয়—এই শুক্রবার। তা হলে অন্তত চারটে শো ভাল বিক্রি হবেই, শুক্রবার, শনিবার, আর রবিবার দুটো। তা হলে সোমবার মাইনেগুলো দেয়া যায়, বুঝলেন না?"

"কিন্তু—"

"না, মশাই, আর শুনব না। আজ মঙ্গলবার, পরশু ড্রেস রিহার্সাল করুন। ফটোগ্রাফারকে খবর দেব এসে যাবে। আমি চললাম অফিসে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠাতে আর পোস্টারের ব্যবস্থা করতে। ঠিক আছে তো? ডন পাবলো! বলুন।"

"ঠিক আছে।"

আবার মত পাল্টাবার আগেই ম্যানেজার পলায়ন করেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্মারক এসে সাজঘরে মাথা গলায়, চেঁচায়।

"আসুন, ডন পাবলো! আপনার কিউ এসে গেছে! দেরি হয়ে যাবে যে!"

২

রাত্রি দুটোর সময়ে থিয়েটার থেকে বেরুলেন এরেদিয়া। নাটক ভাঙবার পর নতুন নাটকের নানা খুঁটিনাটির আলোচনায় দেরি হয় গেল।

একা বেরুলেন এরেদিয়া, সঙ্গে যারা চাইছিল আসতে তাদের সঙ্গ প্রত্যাখ্যান করলেন। স্যাঁতসেতে, কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রি। নভেম্বরের শেষ, ছুরির মতন ধারালো বাতাস। কোটের কলার উল্টে নিলেন এরেদিয়া, লক্ষ্যহীন হাঁটতে লাগলেন—চাইছিলেন একাকিত্ব, চিন্তার অবকাশ। থিয়েটারের দম-বন্ধ-করা রুদ্ধ বাতাস থেকে মুক্তি। হঠাৎ ঘনিয়ে আসা প্রথম রজনীর উদ্বেগ থেকে অবসর। নাটক নামাতেই হবে, নইলে যে মাইনে মিলবে না।

দীর্ঘ অনিশ্চয়তার পর হঠাৎ চরম সিদ্ধান্তে এলে মানুষ ভয় পায়, নিজের ওপর রেগে ওঠে। এরেদিয়াও কেমন হতবুদ্ধি, বিভ্রান্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন। শেষ দৃশ্যের ঐ মুহূর্তটা—কি ভেঙ্গিতে উতরে দেবেন ওটাকে? চোখ কি হবে? কণ্ঠস্বরই বা হবে কেমন?

পারিপার্শ্বিক ভুলে তন্দ্রার মধ্যে হাঁটছিলেন এরেদিয়া। কানে ঢুকছিল না কোনো শব্দ, গায়ে যেন লাগছিলই না অঝোর বৃষ্টিধারা, ভ্রূক্ষেপই করলেন না কর্দমাক্ত পিচ্ছিল রাজপথ।

ক্রমশ বড় রাস্তা ছেড়ে এরেদিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে এসে পড়লেন শহরের দরিদ্রতম অংশে—নভেম্বরের অমাবস্যার গভীরে সুপ্ত বস্তি এলাকায়। হলদে বিবর্ণ বাতি কতগুলো। মাঝে মাঝে মদের দোকানের রক্তাভ আলো।

"রক্ত-তৃষা'র রিহার্সাল শুরু হতে না হতেই এটা এরেদিয়া-র অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে চলে আসতেন এই গলিঘুঁজির মধ্যে, হানা দিতেন যত শুঁড়িখানায় আর কফির দোকানে আর গুণ্ডার আড্ডায়। খুঁজে বেড়াতেন সেইসব চরিত্রদের যাদের নিয়ে 'রক্ততৃষা' নাটক।

কিন্তু এই প্রথম এলেন একা। আগে আসতেন বন্ধুবান্ধব নিয়ে [illegible] করতে। আজ নিঃসঙ্গ, চিন্তায় আকুল,

ফার-এর কোটে দেহ ঢাকা আশ্রয়হীন ভবঘুরের মতন।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন এরেদিয়া। চমক ভাঙল। চারদিকে তাকিয়ে বুঝলেন পথ হারিয়েছেন। সংকীর্ণ রাস্তা, বাঁ দিকে অন্ধকারে আবৃত খানিকটা ফাঁকা জমি, ডান দিকে নোংরা উঁচু বাড়ির সারি। বাড়িগুলির সরু সরু প্রবেশপথ।

মানুষের সাড়াশব্দ নেই কোথাও। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দূরে দেখা যাচ্ছে গ্যাসের বাতি এক আধটা।

চট করে ঘুরে দ্রুত হাঁটতে শুরু করেন এরেদিয়া পায়ের জুতো শব্দ তোলে খট-খট। নিজেকে বোঝান, ভয় পাইনি, একটুও না। অদ্ভুত নিস্তব্ধ জায়গাটা, বুকের কাছটা হিম হয়ে আসে।

কোথায় এলাম? হয়তো—

একটা মোড় ঘুরে থমকে দাঁড়ান তিনি। না, এ রাস্তাটাও অচেনা। অদূরে জনা তিনেক স্ত্রীলোক অকথ্য ভাষায় ঝগড়া করছে।

হাঁটা থামে না। যে রাস্তাতেই পড়েন, সেটাই অচেনা, আগে কখনো দেখেছেন বলে মনে পড়ে না। ক্রমশ বেশী গুলিয়ে যাচ্ছে সব। ক্রমশ জেগে উঠছে আতঙ্ক।

গলা শুকিয়ে ওঠে, মাথার ভেতরে দপ-দপ করছে।

আকস্মিকভাবে এসে পড়লেন একটা মদের দোকানের সামনে। কি ভেবে এক ধাক্কায় দরজা খুলে ঢুকে গেলেন ভেতরে। প্রথমেই ভ্যাপসা দুর্গন্ধ এসে লাগল নাকে মুখে।

ছোট্ট ঘর নোংরা। তিনটে টেবিলে লোক ছিল, একটাই দেখা গেল খালি। দোকানের মালিক লাল গোঁফওয়ালা মোটা একটা লোক এক কোণে বসে একটা সস্তা খবরের কাগজ পড়ছে।

এরেদিয়া ঢুকতে রীতিমত চাঞ্চল্য উপস্থিত হলো। এরেদিয়া কোটের বোতাম আলগা করে দিয়ে বসলেন খালি টেবিল-টায়। ফলে আবার এক প্রস্থ ফিসফাস শুরু হলো তাঁকে নিয়ে।

একটা টেবিলে ছিল শতচ্ছিন্ন পোশাক-পরা এক বুড়ি। তার সামনে মস্ত বড় এক গেলাস ব্র্যান্ডি। তাতে সে চুমুক দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

পরের টেবিলটায় এক নারীও এক পুরুষ মৃদু স্বরে কি আলাপ করছে। শেষের টেবিলে দুটি জোয়ান লোক।

মালিক আসে এরেদিয়া-র কাছে।

"কি দেব?"

"যা খুশি। বিয়ার দিন।"

এরেদিয়া-র মনে হলো ভীষণ ভুল করেছেন। দস্তানা খোলাটা উচিত হয়নি। হাত ভরতি আংটি, দামী দামী পাথর। কিন্তু কি আর করা যাবে? বুক দুরুদুরু

শীগগির আয়না নিয়ে এস

করলেও বাইরে প্রাণপণে একটা শান্ত ভাব ফুটিয়ে তুললেন। শঙ্কাহীন উদ্ধত দৃষ্টিতে বিদ্ধ করলেন কোণের লোক দুটিকে।

তারা চোখ ফিরিয়ে নিল চট করে। মলিন পোশাক লোক দুটির। দাগী বলেই মনে হয়।

ধীরে ধীরে ভয়টা কেটে গেল। তার জায়গায় জেগে উঠল অভিনেতার কৌতূহল। ঐ লোক দুটি—ওদের একজনকেই নকল করে হয়তো উতরে দেওয়া যায় "রক্তৃতৃষা"র পার্টটা। ওদের সংকীর্ণ কপাল, ঘন ভুরুর তলায় চোখ বসে গেছে গভীরে। লোমশ হাতে বৃহদাকার নখ—যেন পশুর থাবা। থুতনি বেরিয়ে এসেছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মতন।

লোক দুটো বুঝতে পারল ওদেরকে পর্যবেক্ষণ করছেন এরেদিয়া। তাই মৃদু স্বরে কি বলাবলি ক'রে তারা উঠে গেল ঘর থেকে।

সময় কেটে যায়। বুড়ী ঘুমিয়ে পড়েছে টেবিলে মাথা রেখে। দম্পতী কথা বলছে এখনো। মালিক পড়ছে কাগজ।

এরেদিয়া উঠলেন, দাম চুকিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়।

আবার শীতের রাত্রি কুয়াশার চাদর দিয়ে জড়িয়ে নিল তাঁকে। কোন দিকে পা বাড়াবেন ভাবছেন এরেদিয়া।

কিই বা হবে ভেবে? সব দিক সমান। চারদিক নিস্তব্ধ, জনশূন্য। নিজের পায়ের শব্দেই চমকে উঠছেন এরেদিয়া। একটা চুরুট ধরালেন।

দীর্ঘ, সংকীর্ণ গলি। ছোট্ট সংকীর্ণ গলি।

হঠাৎ প্রশস্ত এক রাজপথ: দু পাশে ন্যাড়া গাছের সারি। ও-মাথায় অস্পষ্ট কালো কারখানার দেয়াল। বুঝলেন রোল্দাসু-পল্লীতে এসে পড়েছেন।

একখানা গাড়ি পাওয়া যায় না? এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন এরেদিয়া।

পেছনে শোনা গেল ক্ষীণ পদশব্দ। মনে হলো কুয়াশার মধ্যে দুটি ছায়ামূর্তি।

কারা ওরা?

হাঁটছেন এরেদিয়া। পেছন থেকে অকস্মাৎ দুটি পেশল বাহু জড়িয়ে ধরল তাঁকে, হেঁচকা টানে ফেলে দিল কাদায়।

বুকে লাগল একটু তীক্ষ্ম আঘাত; ঠাণ্ডা কনকনে ইস্পাতের স্পর্শ। জ্ঞান হারালেন এরেদিয়া।

৩

চোখ খুলে দেখেন তিনি হাসপাতালের বিছানায়। বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। গলা শুকিয়ে গেছে। নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত। কপালে ঘাম জমেছে বিন্দু বিন্দু। আর আশ্চর্য! নাকটা অসম্ভব ঠাণ্ডা! কি রকম একটা অবসাদ, একটা ক্লান্তি তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

মনে পড়ল আবছা আবছা......ছোরা মেরেছিল......মরেননি। সেই সঙ্গে মনে পড়ল শুক্রবার নামছে বই, আর পার্টটা রপ্ত হয়নি এখনো।

হঠাৎ পাগলের মতন উঠে বসলেন এরেদিয়া; চীৎকার ক'রে উঠলেন: "শিগগির! আয়না! আয়না নিয়ে এস! আমি আমার মুখ দেখতে চাই।"

অনুবাদ : উৎপল দত্ত

বেলুড় মন্দির ঃ মহীশূর ॥ অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের ট্যুরিস্ট দপ্তরগুলির কর্তারা যখন বোম্বাই আর জয়পুর, দিল্লী আর দার্জিলিংকে বিদেশী পর্যটকদের কাছে মনোগ্রাহী করবার জন্য অর্থব্যয় করেন, প্রচার-পুস্তিকায় বা খবরের কাগজের বিবৃতিতে যখন সে সংবাদ দেখি, আমার মন তখন একটু দমে যায়। এগুলি যে দর্শনীয় স্থান নয় এ কথা আমি বলছি না। কিন্তু আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এগুলি পীঠস্থান কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমাদের স্থাপত্য-ভাস্কর্য, আমাদের নৃত্য-সংগীত, আমাদের বিবিধ চারুকলার সনাতন কেন্দ্রগুলি যে আধুনিক রেলপথ বা বিমানপথের উপরেই হবে এমন কোন কথা নেই। বিদেশী বণিকেরা একদা তাদের বাণিজ্যের প্রয়োজনে এ দেশে রেলপথ নির্মাণ করেছিল। আর বিমান চলাচলের সড়ক আধুনিক কালের জনবহুল শহরগুলিকে যুক্ত করবার জন্যই সৃষ্ট হয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই আমাদের ঐতিহ্য-কেন্দ্রগুলিকে জনসাধারণের নিকটবর্তী করবার তাগিদ অনুভূত হয়নি। ফলে, কিছুকাল আগেও কোনারক আর খাজুরাহো, অজন্তা আর ইলোরা প্রায় অগম্য ছিল। অধুনা এই স্থানগুলি পরিদর্শন করবার অল্পবিস্তর সুবিধা হয়েছে। কিন্তু বাঘ বা ভারহুত, নাগার্জুনিকোণ্ডা বা বিজয়নগর এখনও পর্যটকদের নাগালের বাইরেই বলা চলে।

অল্প কিছুদিন আগে ইংলণ্ডের রানী ভারত পরিদর্শনে এসেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ-তালিকা নির্ধারিত করবার বিষয়ে আমাদের কর্তাদের নিশ্চয়ই হাত ছিল। বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে রানী কলকাতার ঘোড়দৌড় দেখবার সময় পেলেও শান্তিনিকেতনে যাবার অবকাশ পাননি। দিল্লী, আগ্রা, বোম্বাই, বাঙ্গালোর তাঁকে স্বাগত জানিয়েছে, কিন্তু দিলওয়ারা অথবা সাঁচি, মহাবলীপুরম অথবা হালেবিড় তাঁর পদধূলি পায়নি। ভ্রমণের শেষ দিনে সুসজ্জিত বজরায় কাশীর গঙ্গায় তিনি কিছুক্ষণ কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রাগৈতিহাসিক শহরের কৃষ্টিধারার কতখানি পরিচয় তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তা সহজেই অনুমেয়। জঙ্গী শহর বাঙ্গালোরে তাঁর অনেক সময় কাটলেও, দাক্ষিণী নৃত্য-সংগীতের পীঠস্থান তাঞ্জোরে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার কথা কেউ ভাবেনি। অথচ ভারতীয় জীবন ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটানোই নাকি আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য যে কতখানি সফল হয়েছে সে বিষয়ে তাঁর ভ্রমণতালিকা রচয়িতাদের সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ আছে।

আমি এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধী। বিরোধী এইজন্য যে, বিদেশী পর্যটকদের আমরা এ দেশ সম্বন্ধে সব ক্ষেত্রেই যতটা অজ্ঞ ভাবি তাঁরা তা নন। অন্তত, সব ক্ষেত্রেই যে নন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ত্রিচিনপল্লী থেকে যে রেলপথ উত্তর-পশ্চিমে ম্যাঙ্গালোর অবধি বিস্তৃত, সেই সড়কের মাঝামাঝি জায়গায় শোরনুর নামে এক অখ্যাত রেল স্টেশন আছে। এখানে নেমে হাঁটাপথে ভারতপুরা নদীর সাঁকো পার হলে চেরুথুরুথি গ্রাম। বিখ্যাত মালয়ালী কবি ভল্লটোল এখানে তাঁর প্রিয় প্রতিষ্ঠান কেরল কলামণ্ডলমের স্থাপনা করেছিলেন বহুদিন পূর্বে। কথাকলি নৃত্যের এইটিই এখন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। এই সংস্থায় রক্ষিত একটি "ভিজিটর্স বুকে"র পাতা ওলটাতে ওলটাতে একদা অবাক হয়েছিলাম। মন্তব্যলেখকেরা অধিকাংশই বিদেশীয়—ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন। কি ক'রে তাঁরা এই নিভৃত কৃষ্টিকেন্দ্রটির খবর পেলেন? দুর্গম চেরুথুরুথির দিকে আমাদের প্রচারকর্তাদের দৃষ্টি ত কখনও নিবদ্ধ হয়নি। হ'লে উত্তর ভারতে আমরা

কাম্পে চেন্নিগারায় মন্দিরের দ্বাররক্ষী

অনেকেই এই কলাক্ষেত্রটির কথা জানতাম। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তা জানি না। কিন্তু সেই "ভিজিটর্স বুকে"র প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখেছি যে অনেক বিদেশীর কাছে আমাদের ঐতিহ্যের এই পীঠস্থানটি অজ্ঞাত নয়। যেভাবেই হোক, যেখান থেকেই হোক, আমাদের প্রচারকর্তাদের বিরুদ্ধ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁরা এই অবশ্যদর্শনীয় স্থানটির সংবাদ সংগ্রহ করেছেন; বিদেশীদের জন্য নির্দিষ্ট বাঁধাধরা ভ্রমণপথের বাইরে বহু দূরের এই পল্লীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন কায়ক্লেশে। তারপরে, আমাদের কৃষ্টির অন্যতম রত্ন কথাকলি নৃত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়ের শেষে "ভিজিটর্স বুকে" উচ্ছ্বসিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে বিদায় নিয়েছেন তৃপ্ত কৃতজ্ঞ অন্তরে।

ভারতবর্ষের দূর-দূরান্তরে এই সন্ধানী বিদেশী পথিকদের আমি দেখেছি। দেখে আনন্দে ভরে উঠেছে আমার মন। নেপাল-তরাইয়ের পাদদেশে কুশীনগরে দেখেছি তাদের, তাদের দেখেছি কোনারকে। ছ' হাজার সিঁড়ি ভেঙে গির্নারের গিরচূড়ায় উঠতে উঠতে তাদের মুখোমুখী হয়েছি কখনও, আবার কাছাকাছি এসেছি অর্কিডে-ছাওয়া সিকিমের অরণ্যপথে। স্তব্ধ দুপুরের প্রখর রৌদ্রে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর এই ভারতবন্ধুদের দেখেছি চিতোরের ভগ্নস্তূপের আশেপাশে; আবার তাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি ধুলোর ঘূর্ণি-ওঠা বিজয়নগরের বিজন প্রান্তরে। আমাদের ভারত-দর্শন পদ্ধতিতে যতই কেননা ভুলভ্রান্তি থাকুক এ দেশের মর্মমূলে প্রবেশ করবার মত বিদেশীর যে একেবারে অভাব ঘটেনি আমার এমনই বিশ্বাস। কলকাতার রাস্তায় ভিখিরীর ছবি তুলে বা জ্যোৎস্নারাতে তাজমহলের বাগানে বসে যাঁরা ভারত ভ্রমণ শেষ করেন সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ বিদেশী টুরিস্ট ছাড়াও যে ভারতের অন্তর-সন্ধানী অনেক পর্যটক এখনও অহরহ এ দেশ ভ্রমণে আসেন এ অতিশয় আশার কথা। এ-হেন এক মরমী পর্যটকের সঙ্গে দেখা হল মহীশূরের দূর দেহাতে বেলুড়ে এসে।

আজকের বেলুড় মহীশূর সিটি থেকে প্রায় এক শো মাইল উত্তর-পশ্চিমে এক তালুক বা মহকুমা শহর মাত্র। এ অঞ্চলের এককালীন রাজধানীর কোনো গৌরবই আজ আর বেলুড়ের নেই। বিগত ঐশ্বর্যের স্মারক হিসেবে শুধু অবশিষ্ট আছে একটি অর্ধ-ভগ্ন দেবালয়—চেন্নকেশব বা বিজয়নারায়ণের মন্দির—কালস্রোতে যা এখনও অবলুপ্ত হয়নি। স্থাপত্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য না হলেও মন্দির-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এই ইমারত যে ভারতবর্ষে অতুলনীয় সে বিষয়ে পন্ডিতেরা কিছুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেননি। জাতীয় গ্রন্থাগারের এক কোণে বসে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের সেই সব ভারী ভারী কেতাব ঘেঁটেছি।

কিন্তু অস্ট্রিয়বাসী কার্লো শুয়েলের সেসব তথ্য জানলো কি করে? কি করে খবর পেলো যে প্রস্তরে-বিধৃত ভারতীয় ভাস্কর্যকলার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখতে হলে বেলুড়ে আসতে হবে? এসব জিজ্ঞাসার জবাব পরে পেয়েছিলাম। কিন্তু তার প্রথম আবির্ভাবের সময় এসব বিস্মিত প্রশ্ন স্তব্ধ করে দিয়েছিল শুয়েলের। আলোক-চিত্রের অবকাশে মন্দিরের নাটমন্ডপের ছায়ায় ক্লান্তি বিনোদ করছিলাম কিছুক্ষণ। সামনের গোপুরমের তলা দিয়ে শুয়েলের মন্দিরের চত্বরে এসে ঢুকলো। দীর্ঘ চেহারা; টিকলো নাক; মাথায় এলোমেলো এক রাশ সোনালী চুল। পিঠে একটা বোঁচকা, মুখ-বাঁধা তাকিয়ার খোলের মত। পাথর-বাঁধানো চত্বরটুকু পার হয়ে এসে পুঁটুলিটা নামিয়ে রাখল এক পাশে। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বললে—বড় তৃষ্ণা পেয়েছে, আমাকে জল দিতে পার একটু? সেদিন প্রায় সমস্ত দিনটা শুয়েলেরের সঙ্গে কেটেছিল। অনেক কথা বলেছিল শুয়েলের। বলছিল, এ দেশে এসেই প্রথমে গিয়েছিল কেদার-বদরীর পথে। দেশে থাকতেই শুনেছিল এই পথই ভারতের সনাতন মার্গ, বিষয়-বিরাগীর উত্তরণ-ভূমি। এখন এসেছে দক্ষিণ ভারতে। আধুনিক শহরগুলি সযত্নে পরিহার করে চলে এসেছে বেলুড়ে। শুনেছে, এখানকার ভাস্কর্যের জুড়ি নেই দুনিয়াতে। বিশেষ করে, মন্দিরের দেবতার মূর্তিতে যে সূক্ষ্ম কারুকৌশল দেখানো হয়েছে তেমনটি নাকি মন্দিরের অন্য কোনো মূর্তিতে নেই। অতিথির প্রতি সাধারণ সৌজন্যবোধে তাকে বলেছিলাম, সব কিছু দেখবার বন্দোবস্ত আমি করে দেব। বিদেশী প্রথায় ধন্যবাদ জানিয়েছিল শুয়েলের।

বেলুড় মন্দিরের বর্ণনায় আসবার আগে, এ মন্দিরটি যে স্থাপত্যরীতির চূড়ান্ত নিদর্শন সে সম্বন্ধে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পার্সি ব্রাউন সাহেব তাঁর "ভারতীয় স্থাপত্য" গ্রন্থে বলেছেন যে, খৃষ্টীয় একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী অবধি মহীশূর-প্রান্তে এত অধিক সংখ্যক মন্দির নির্মিত হয়েছে যে এগুলিকে একটি বিশিষ্ট স্থাপত্যশৈলীর অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন। সাধারণভাবে এই রীতিকে চালুক্য হয়সালা স্থাপত্যরীতি বলা উচিত। কর্ণাটক প্রদেশের স্থপতি ও ভাস্করেরা চিরকালই প্রতিভাশালী ছিলেন। প্রথমে চালুক্য ও পরে হয়সালা নৃপতিদের সুদৃঢ় রাজত্বকালে তাঁদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্পকলাটি উৎকর্ষের শীর্ষে পৌঁছয়। পূর্ববর্তী চালুক্য রাজত্বকালে যার সূচনা, তাই কালক্রমে

হয়সালাদের প্রযত্নে চরম উন্নতিলাভ করে।

এই স্থাপত্যরীতির মূল সুরটি বাঁধা ছিল ব্যবহৃত উপকরণের সঙ্গে। উত্তর ভারতের অজস্র ইমারতে আমরা বালি-পাথরের ব্যবহার দেখি। এই মাধ্যমে ভাস্কর্য খুব বেশী দূর অগ্রসর হবার কথা নয়। মুঘল আমলে শ্বেতপাথরের ব্যবহার হয়েছে প্রচুর। এই উপকরণে জালির কাজ প্রভৃতি যথেষ্ট পুষ্টিলাভ করেছিল। চালুক্য-হয়সালা ভাস্করেরা তাঁদের প্রধান ভাস্কর্যগুলির জন্য যে জাতীয় পাথর ব্যবহার করেছেন তা হল কষ্টিপাথরের মত অতি সূক্ষ্ম দানার সবুজ বা কাল পাথর। শোনা যায়, এই জাতীয় উপকরণ বেলুড়ের অদূরে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যেত এবং সংগৃহীত হবার পর কয়েক মাস অবধি এগুলি নাকি অপেক্ষাকৃত নরম অবস্থায় থাকত। সুদক্ষ ভাস্করেরা এই নমনীয় উপকরণে সহজেই যে পরিমাণ কারিগরি দেখাতে পেরেছেন বালিপাথর বা অনুরূপ মাধ্যমে তা সম্ভব ছিল না। চালুক্য-হয়সালা ভাস্কর্য সেজন্য সূক্ষ্মতার দিকে যতদূর প্রবণতা দেখিয়েছে এমনটি আর কোথাও হয়নি। সূক্ষ্ম ভাস্কর্যের আধিপত্যের জন্য এই নির্মাণরীতিতে স্থপতিরা গৌণ স্থান অধিকার করেছেন। বেলুড়, হালেবিড়, সোমনাথপুর প্রভৃতি স্থানের হয়সালা মন্দিরগুলি সেজন্য আকারে এমন কিছু বৃহদায়তন নয়। কিন্তু এই প্রত্যেকটি মন্দিরে ভাস্করেরা যে পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করেছেন সে সম্বন্ধে ফার্গুসন সাহেব বলেছেন যে, পৃথিবীর কুত্রাপি কোন ইমারত নেই যাতে সম-পরিমাণ শ্রম নিয়োজিত হয়ে থাকবে। মোট কথা, চালুক্য-হয়সালা স্থাপত্যরীতি ভাস্কর-নিয়ন্ত্রিত ভাস্কর্যবহুল এক নির্মাণশৈলী যার তুলনা ভারতবর্ষের অন্যত্র কোথাও নেই। পুরীর বা বুদ্ধগয়ার মন্দিরে স্থপতিদেরই প্রাধান্য; ভাস্করদের অবদান সেখানে নেই বললেই চলে। আবার, খাজুরাহো বা কোনারকে স্থপতি ও ভাস্করদের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধিত হয়েছিল যার জন্য উভয়েই প্রায় সম-পরিমাণ কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন। হয়সালা মন্দিরগুলির ক্ষেত্রে, রাশি রাশি ভাস্কর্যের সমারোহে স্থপতিদের কথা আমাদের মনেই পড়ে না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বেলুড় মন্দিরের কথাই ধরা যাক। ইতিহাস বলে ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে হয়সালা নৃপতি প্রথম বল্লাল এখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। ছ' বছর পরে, ১১০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর ভাই বিক্রুবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। হয়সালা রাজন্যবর্গের মধ্যে এই বিক্রুবর্ধন

নৃত্যরতা সুরসুন্দরী : হয়সালা ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

বা বিট্টিদেবের নাম সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। কি সৈন্য পরিচালনায়, কি চারুকলার পৃষ্ঠ-পোষকতায় তাঁর তুল্য নরপতি ভারত-ইতিহাসে বিরল। ১১১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি চোল রাজকুলকে পরাজিত করে সেই বিজয়ের স্মারক হিসাবে অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করেন। ভাস্কর্যের নিপুণতার দিক থেকে বেলুড়ের মন্দিরটি সেগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এই দেবালয়টির প্রতিষ্ঠাকাল ১১১৭ খৃষ্টাব্দ বলে ধরা হলেও এটির রচনায় যে শত শত সুদক্ষ ভাস্করের বহু বৎসরের অধ্যবসায় ব্যয়িত হয়েছে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। মন্দিরের বাইরের দেওয়াল সর্বত্র ভাস্কর্যে আবৃত। এই প্রস্তরচিত্র-গুলি ইমারতের গাঁথুনিতে ব্যবহৃত পাথরের টুকরোগুলির বহির্ভাগে অঙ্কিত নয়; এগুলি রচনার জন্য সূক্ষ্ম দানার শত সহস্র পৃথক প্রস্তরখণ্ড ব্যবহার করা হয়েছে। পরে সেগুলিকে দেওয়ালের সঙ্গে এঁটে দেওয়া হয়েছে সারিবদ্ধভাবে।

বেলুড় মন্দিরের দেওয়াল-সজ্জার জন্য যে রীতিটি অনুসৃত হয়েছে তাতে সর্ব-নিম্ন সারিতে চলেছে সুসজ্জিত হস্তী-যূথের শোভাযাত্রা। শক্তি ও স্থৈর্যের প্রতীক এই প্রাণীটির মন্দিরমূলে স্থান-নির্দেশের মধ্যে হয়ত বিশেষ অর্থ আছে। দ্বিতীয় সারিটি সিংহ-শিরে সজ্জিত।

প্রসংগত এখানে এ কথা বলা যেতে পারে যে, সিংহের সংগে যুদ্ধরত এক বীরের চিত্রকে হয়সালা রাজবংশ তাঁদের কুল-প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সিংহের মূর্তি সেজন্য হয়সালা দেবালয়গুলির যত্রতত্র যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। তৃতীয় সারিটি রচিত হয়েছে চক্রাকারে আবর্তিত অতি সুললিত একটি লতা দিয়ে। আশ্চর্য নিপুণতায় সংগে প্রতিটি চক্রের কেন্দ্রে নরনারীর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে এই সারিতে। চতুর্থ ও পঞ্চম সারিতে অপরূপ ভঙ্গিমায় নানাবিধ রমণীমূর্তি। তাদের কেউ প্রসাধনে, কেউ কবরী রচনায়, কেউ লিপি লিখনে অথবা নৃত্যচর্চায় নিরত। এর উপরের সারিতে রামায়ণ-মহাভারতের প্রধান ঘটনাগুলির শিলালেখা। রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীগুলি যে এ দেশের জনসাধারণের হৃদয়ের গভীরে নিরবধিকালের জন্য স্থান পেয়েছে হয়সালা ভাস্করেরা সে কথা ভালভাবেই জানতেন। দেবালয়গুলিকে জনপ্রিয় করবার জন্য এ জাতীয় কাহিনীচিত্রের ব্যবহার ভারতবর্ষের অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না। আরও অভিনবত্ব আছে বেলুড় মন্দিরের। ছাতের কার্নিসের ঠিক নীচে জাফরির কাজ করা বড় বড় পাতলা পাথরের টুকরো বসানো আছে যাতে ভেতরের নাটমন্দির বা গর্ভগৃহে আলো চলাচলের সুবিধা হয়। হিন্দু ভাস্করেরা জালি বা জাফরির কাজে কখনই বিশেষ প্রবণতা দেখাননি, যার জন্য অধিকাংশ হিন্দু দেবালয়ের নাটমণ্ডপ বা গর্ভগৃহ ঘোর অন্ধকারময়। মুঘল যুগের এ জাতীয় শিল্পকৃতির থেকে সৌকর্যে অনেক হীন হলেও, বেলুড় মন্দিরের এই জালির কাজগুলি বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

কিন্তু বেলুড় মন্দিরের ভাস্কর্যের শেষ কথা হল মদনিকা মূর্তিগুলি। কার্নিসের নীচে ছোট ছোট স্তম্ভের শীর্ষে মন্দির

মন্দির প্রাঙ্গণে বিষ্ণু-বাহন গরুড়ের মূর্তি

প্রদক্ষিণ করে এরকম আটত্রিশটি মূর্তি সাজানো আছে। ভাস্কর্যের নিপুণতায় এগুলি অতুলনীয়। খাজুরাহোর সুরসুন্দরী মূর্তিগুলির প্রশংসা সকলেই করেছেন। সে প্রশংসা অযথা নয়। কিন্তু কি নিপুণ কারিগরিতে, কি রমণীয় লালিত্যের বিকাশে বেলুড়ের মদনিকা মূর্তিগুলি অনন্য। এই নারীমূর্তিগুলির কেশসজ্জা, অংগাভরণ প্রভৃতি এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে দেখানো হয়েছে যে কঠিন শিলার এই রূপান্তর অত্যাশ্চর্য মনে হয়। এত সূক্ষ্ম কাজ হাতির দাঁতের উপকরণে অথবা ধাতুমূর্তিতেই সম্ভব, যেখানে উপকরণের নমনীয়তার জন্য নরুনের মত মিহি হাতিয়ার ব্যবহার করা চলে। আরও আশ্চর্য যে, এই মূর্তিগুলি সর্বত্রই একটি মাত্র পাথরের টুকরো থেকে অপরিসীম ধৈর্যে খোদাই করা হয়েছে। বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গিমায় এই সুরসুন্দরী মূর্তিগুলির কারিগরির সূক্ষ্মতাই প্রধান আকর্ষণ নয়; প্রতিটি মূর্তি যে অপরূপ পেলবতায়, যে কমনীয় লাস্যে বিধৃত তার তুলনা ভূ-ভারতে কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই।

এই মদনিকা মূর্তিগুলির রচনায় যে সেকালের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা নিয়োজিত হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। এগুলির পাদদেশে ভাস্করেরা তাঁদের নাম উৎকীর্ণ করেছেন; দু-এক ছত্রের কবিতায় কোথাও কোথাও নিজেদের সরস্বতীর চরণকমলের মধুলোভী ভ্রমর বলে বর্ণনা করেছেন। বহু যুগের ওপার হতে এই অনন্যকীর্তি ভাস্করদের নাম বর্তমানের তীরে ভেসে এসেছে—মাবা, দাসোজা, জকনাচারী, মাসানা, নাগোজা প্রভৃতি। নারীমূর্তি রচনায় এঁদের তুল্য প্রতিভাধর ভাস্কর ভারত-ইতিহাসে বোধ করি আর কখনও জন্মগ্রহণ করেন নি।

হয়সালা মন্দিরগুলিতে যে ক্ষেত্রমিতি অনুসৃত হয়েছে মূলত তা দ্রাবিড়রীতির অনুরূপ হলেও উল্লেখযোগ্য ভিন্নতাও কম নয়। মন্দিরের সংলগ্ন পাথর-বাঁধানো প্রশস্ত প্রাঙ্গণ উঁচু প্রাচীরে ঘেরা বটে, কিন্তু গোপুরম বা প্রবেশ-চূড়া সাধারণত একটিমাত্র। হয়সালা মন্দিরগুলি সর্বত্রই এক ভিত্তিবেদীর উপর নির্মিত যে বেদী দেবালয়ের আকৃতি অনুসরণ করে চতুর্দিকে ঘুরে এসেছে। মন্দিরের প্রদক্ষিণপথ হিসেবে এই চওড়া বেদীটিকেই ব্যবহার করা হয়। মন্দিরের বা ভিত্তিবেদীর আকার কোন ক্ষেত্রেই চতুষ্কোণ নয়। আগেই বলেছি যে হয়সালা স্থাপত্যরীতি প্রধানত ভাস্কর-নিয়ন্ত্রিত। ভাস্করদের প্রয়োজনই সেখানে প্রধান বলে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁদের শিল্পকৃতিগুলি প্রদর্শনের জন্য মন্দিরের বাইরের দেওয়ালের প্রসার বাড়াতে হয়েছে সকল ক্ষেত্রে। মন্দিরের আকৃতি সেজন্য দাঁড়িয়েছে অনেকটা লুডো বা পাশার ছকের মত। নাটমণ্ডপ ও গর্ভগৃহের প্রয়োজন মিটেছে কেন্দ্রীয় ঘরটিতে কিন্তু বাইরের দেওয়াল বহুগুণে প্রসারিত হওয়ায় হয়সালা ভাস্করেরা তাদের সমস্ত প্রতিভা উজাড় করে ঢেলে দেবার পরিপূর্ণ সুযোগ পেয়েছেন। বেলুড় মন্দিরেই অন্তত কয়েক সহস্র খোদাই-পাথরের ব্যবহার হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। মন্দির-শীর্ষও একদা ভাস্কর্য-বিরল ছিল না, কিন্তু চূড়াটি ভেংগে পড়েছে বহুকাল পূর্বে।

বলা বাহুল্য, মন্দিরের বহিরাভরণে এত শ্রম নিয়োজিত হয়েছে যে, ভিতরের দেওয়ালে অনুরূপ অংগসজ্জার আর অবকাশ হয়নি। কিন্তু সে অভাব পূরণ করেছে নাটমণ্ডপের থামগুলি। এই অনুপম স্তম্ভগুলিতে যে

কারুকলা দেখানো হয়েছে হয়সালার ভাস্কর্যের তাও এক বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পনের কুড়ি ফিট দীর্ঘ স্তম্ভগুলিকে "লেদ" যন্ত্রের অনুরূপ কোন মেসিনের সাহায্যে খোদাই করা হয়েছে। অজন্তা বা ইলোরার স্তম্ভশীর্ষের কারিগরি বিশেষ লক্ষণীয়। কিন্তু ভাস্কর্যের মুনশীয়ানায় হয়সালা শিল্পীদের এই রচনাগুলি সত্যই অপূর্ব।

বেলুড় মন্দিরের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রাঙ্গণের এক ধারে প্রধান মন্দিরটির অনুকরণে নির্মিত আর একটি ছোট দেবালয় আছে। এটির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম কাপ্পে-চেন্নিগারায়। রাজা বিষ্ণুবর্ধনের পত্নী সান্তলাদেবী এটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভাস্কর্যের ঐশ্বর্যে এই দেবায়তনটি বিজয়নারায়ণের মন্দির থেকে কিছুমাত্র হীন নয়।

অজস্র শিলাচিত্রের এই মিউজিয়মটির চারি পাশে সারা দুপুর ঘুরে বেড়িয়েছি আমি আর শুয়েলের। সময়ে সময়ে ফটোগ্রাফীর কথা ভুলে গিয়েছি মুগ্ধ বিস্ময়ে। নানা কথা হয়েছে শুয়েলেরের সঙ্গে। বাইরের ভাস্কর্য তাকে মুগ্ধ করেছে; কিন্তু ঝোঁকটা তার বিজয়নারায়ণের মূর্তির উপরে। কে বুঝি তাকে বলেছে এ বিগ্রহটিই হয়সালা শিল্পকলার শেষ কথা। কিন্তু নাটমণ্ডপের দরজা এখন বন্ধ; দেবতার এখন বিশ্রামের সময়। খবর পেয়েছি, সন্ধ্যারতির আগে দুয়ার খুলবে; ভক্তদের তখন দর্শন দেবেন বিজয়নারায়ণ। প্রধান পুরোহিত উপস্থিত থাকবেন সে সময়। তাঁকে অনুরোধ করলেই বোধ করি দেবদর্শনে কোন বিঘ্ন হবে না। ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখেছে শুয়েলের—কতক্ষণে সন্ধ্যারতির সময় হবে। তাকে ফিরে যেতে হবে আজই রাত্রে। এখানে এর বেশী অপেক্ষা করবার তার আর উপায় নেই।

সমান্তরাল সূর্যের আলোয় কার্নিসের নিচের মদনিকা মূর্তিগুলি যখন উদ্ভাসিত তখন প্রধান পুরোহিত এসে পৌঁছলেন কয়েকটি পার্শ্বচরের সঙ্গে। এঁরা কেউই ইংরেজী জানেন না, বাংলা তো দূরের কথা। হিন্দীতে চেষ্টা করে অচিরেই বিফল হলুম। সহসা ভাঙ্গা ভাঙ্গা সংস্কৃতে বার্তালাপ শুরু করলেন প্রধান পুরোহিত। কন্নড়-আশ্রিত সেই অপরূপ সংস্কৃতর মান আমার বিস্মৃতপ্রায় সংস্কৃতজ্ঞানের থেকে কিছুমাত্র উচ্চাঙ্গের নয়। অতিথিপরায়ণতার খাতিরে অল্পবিস্তর শ্রম স্বীকার সকলকেই করতে হয়। কিন্তু এ নিদর্শন প্রান্তিক। হতভম্বের মত শুয়েলের একবার এ মুখের দিকে তাকায় আর একবার ও মুখের দিকে। যে ভাষাতে কথা চলেছে তা বক্তাদের নিজেদেরই বোধগম্য নয়: জর্মনভাষী অস্ট্রিয়ানের পক্ষে তা যে সম্পূর্ণ অবোধ্য হবে তাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু ভাষার অতীত যে উৎকণ্ঠা, শুয়েলেরের নীলাভ দুই চোখে তার গভীর ছায়া। তাকে আমি কথা দিয়েছি দেবমূর্তি দেখাবার ব্যবস্থা করে দেব।

ভাষায় যতটুকু না বুঝলুম, তাঁর কণ্ঠস্বর ও বাহু-আস্ফালনে বুঝলুম তার বেশী। এই অশুচি বিধর্মী যে মন্দিরের চত্বরে প্রবেশ করেছে এই যথেষ্ট; তাকে ভেতরে যেতে দেবার কথাই ওঠে না। মনে আছে, ভাষার অক্ষমতা বিনম্র ভঙ্গি দিয়ে পূরণ করে প্রধান পুরোহিত ও তাঁর পার্শ্বচরদের করজোড়ে অনুনয় করেছিলুম এই অতিথির প্রতি সুবিচার করতে। বলেছিলুম, সে কেদার-বদরী ঘুরে এসেছে; এ পুণ্যভূমির মর্ম-অনুসন্ধানই তার অভিপ্রায়। বিদ্রূপের হাসি হেসেছিলেন পুরোহিতের দল। অবশেষে, পাছে আমরা জোর করি এই ভেবে, সারি দিয়ে তাঁরা দাঁড়ালেন নাটমণ্ডপের বন্ধ দরজার সামনে। এরূপ ক্ষেত্রে সর্বত্রই যা হয়, কিছু কৌতূহলী জনতাও এসে ভিড় জমালো মন্দির-প্রাঙ্গণে।

শুয়েলেরকে বুঝিয়ে বলতে হল না কিছু, সে সব বুঝেছে। একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে প্রসারিতকরে নীরবে আমার করমর্দন করলে। তারপরে, প্রাঙ্গণের এক পাশে রাখা তার সেই ঝোলাটি কাঁধে ফেলে নীরবে বার হয়ে গেল মন্দির থেকে। গোপুরমের বাইরে সিধা সড়ক কিছু দূরে গিয়ে মোড় নিয়েছে। সেই মোড় ছাড়িয়ে, বাড়িঘরের আড়ালে শুয়েলেরের দীর্ঘ চেহারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে নাটমন্দিরের দরজা খুলেছে। ঘৃতের প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে বিজয়নারায়ণের সামনে। অপূর্ব ভাস্কর্যমণ্ডিত সে মূর্তির দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে আছি। বড় অপরূপ সেই ভাস্কর্য। এত অপরূপ যে সমুদ্রপারের এক অতিথিও তার কথা শুনেছিল। করতাল-মৃদঙ্গের ধ্বনি উদ্দাম হয়ে উঠল এইবার। ধূপের গন্ধে ভারী হয়ে উঠল গর্ভগৃহের বাতাস। পঞ্চপ্রদীপ হাতে পুরোহিত এসে দাঁড়ালেন বিগ্রহের সামনে। সশ্রদ্ধ আরতি হবে দেবতার। ভক্তজনের মনোবাঞ্ছা পৌঁছবে গিয়ে তাঁর চরণে। প্রসন্নবদনে সকলকেই আশীর্বাদ করবেন তিনি যেমন নাকি করেছেন নিরবধিকাল।

বাদ্যরোল পৌঁছল আরও উচ্চগ্রামে। ধূপের গন্ধে আরও মন্থর হল বাতাস। পুরোহিতের হাতের প্রদীপ শ্রদ্ধাভরে অনেক বৃত্ত রচনা করল। অনেক কামনা নিবেদিত হল দেবতার পায়ে। তিনি পূত-পবিত্র, তিনি সর্বজ্ঞ। এক বিধর্মীর কলুষ-স্পর্শ থেকে তাঁকে যে আজ পরম প্রযত্নে রক্ষা করা হয়েছে এ কথা কি তিনি অনায়াসেই বুঝলেন না? প্রদীপের সেই স্তিমিত আলোকে আমি যেন দেখলুম বিজয়নারায়ণের পাষাণ-দৃষ্টি স্থির লক্ষ্যে তাকিয়ে আছে সামনের পথের দিকে, যে পথ দিয়ে কিছুক্ষণ আগেই এক অশুচি বিধর্মী বিদায় নিয়েছে নতমস্তকে। যেন বড় করুণ, বড় অবসন্ন মনে হল বিজয়নারায়ণকে!...

হয়ত এ আমারই দেখার ভুল। ষোড়শোপচার আরতির শেষে ভক্তবৎসল বিজয়নারায়ণ বিষণ্ণ বোধ করবেন কেন?...

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

স্মৃতির এক পাতা

নলিনীকান্ত গুপ্ত

স্থান—দেওঘর।

ঠিক দেওঘর শহর নয়, শহর থেকে মাইল পাঁচেক আগে মেইন রেল-লাইনে যশিডি জংশন, সেখান থেকে মাইলখানেক দূরে রেল-লাইনের কাছে একখানা বাড়ি—একতলা, মোটের উপর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; চারদিকে খোলা মাঠ—বাংলা দেশের সবুজ মাঠ নয়, বিহারের ঊষর লাল মাটির উচ্চনীচ প্রান্তর। তবুও দৃশ্য যে খারাপ তা নয়—শান্ত স্তব্ধ নির্মল পরিবেশ। একটু দূরে আর একখানি বৃহত্তর কুঠি—দোতলা, কোনো বড়লোকের ছুটির অবসরে আরাম-আবাস।

কাল—১৯০৭ সালের শেষ এবং ১৯০৮-এর আরম্ভ। আমার বয়স ১৭।১৮—কলেজী জীবনে সবে ইস্তফা দিয়েছি।

পাত্র—(১) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, (২) উল্লাসকর দত্ত, (৩) প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী, (৪) বিভূতিভূষণ সরকার, (৫) নলিনীকান্ত গুপ্ত।

কর্ম হল—বোমা তৈরি। এ যাবৎ কেবল প্রাথমিক অনুসন্ধান গবেষণা প্রচেষ্টা চলছিল। এখন উল্লাসকর বললেন Eureka—সব ঠিক হয়েছে, এবার পুরোপুরি পাকা পরীক্ষা, একটা গোটা বোমা নিয়ে action-এ দেখাতে হবে।

কিন্তু এখানে বলা উচিত যে বোমা তৈরি আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বটে যখন এই লোকালয়-বহির্ভূত নির্জন স্থান আমরা নির্বাচন করি। কিন্তু আমরা একেবারে পাষণ্ড—অর্থাৎ নাস্তিক একান্ত জড়বাদী ছিলাম না। এই নির্জনে অন্তরের জীবনটিরও কিছু অনুশীলন হয়, তা-ও আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল। মনে আছে সেই শান্ত পরিবেশে ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে, স্থিরাসনে বসে, ভাবমগ্ন হয়ে পরম তৃপ্তিভরে উদাত্ত স্বরে পাঠ করেছি উপনিষদের মন্ত্র—

তিলেষু তৈলংদধনীব সর্পি
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি—

তখন কে বলবে এটা হল বোমার কারখানা—'শান্তরসাস্পদমাশ্রমমিদং' বললে মিথ্যাভাষণ হবে না।

আর ঠিক এই উদ্দেশ্যেই আমাদের সাধনায় শিক্ষায় ও দীক্ষায় জন্য বারীনদা নিয়ে এলেন এখানে লেলে মহারাজকে—যিনি শ্রীঅরবিন্দের বিশেষ সহায় হয়েছিলেন তাঁর একটা বিশেষ সাধন-অবস্থায়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য—একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। লেলে মহারাজ যখন জানলেন আমরা বোমারু, তিনি আপত্তি তুললেন, বোমা আর সাধনা একসঙ্গে চলে না। ওসব হিংস্র রাজসিক বৃত্তি চিত্তশুদ্ধির আদৌ অনুকূল নয়। তা ছাড়া আরো তিনি বললেন, ভারতের স্বাধীনতা কাম্য, সকলেরই কাম্য এবং প্রয়োজনীয়; কিন্তু তা ঘটবে অন্য পন্থায়, তা ঘটে যাবে অব্যর্থভাবে শান্তির ভিতর দিয়েই—রক্তপাতের কোনো প্রয়োজন হবে না। আমরা বিরূপ হয়ে পড়লাম—অবিশ্বাসের, এমন কি উপহাসের হাসি নিয়ে। ইংরেজ নিজে থেকে ভালোমানুষের মতো তল্পিতল্পা বেঁধে ফিরে যাবে কোনো উচ্চবাচ্য না করে! এ তো আষাঢ়ে গল্প—যদি বা পরম নির্বুদ্ধিতার তা না হয়। আমরা বৈষ্ণব উপাসক নই—আমরা তান্ত্রিক, কালীর পূজারী, একেবারে শ্মশানকালী ছিন্নমস্তাই আমাদের ইষ্ট, বীরের ক্ষাত্রপূজা আমাদের—কবে থেকে গর্ব করে বলে এসেছি

বীরগণ জননীরে
রক্ততিলক ললাটে পরাল কি রে—

তারস্বরে মাঠেঘাটে সভায় সমিতিতে এক সময়ে এমন কথাও আমরা ঘোষণা করে এসেছি—

জপতপ আর যোগ আরাধনা
পূজা হোম যাগ প্রতিমা অর্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না—
তূণীর কৃপাণে কর রে পূজা।
এখন সেদিন নাহি রে আর
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার
হবে না হবে না, খোল তরবার,
এসব দৈত্য নহে রে তেমন।

লেলে মহারাজ আমাদের সতর্ক করে শাসিয়ে আরো বললেন—তোমরা যদি এ পথ না ছাড় তবে সফল তো হবেই না, সমূহ ব্যর্থতা ও বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কতখানি সত্য ছিল তার যে প্রমাণ বাস্তব ঘটনাবলি এনে দেয় তা আমরা সকলেই জানি। যা হোক, স্বাধ্যায় হিসাবে কেবল যে শাস্ত্রগ্রন্থই পাঠ করেছি তা নয়—লৌকিক সাহিত্যও কিছু কিছু ছিল সঙ্গে। এই সময়েই আমার হাতের মধ্যে এসেছিল ম্যাথু আর্নল্ডের একখানি কাব্য-সংকলন। বইখানি ছিল শ্রীঅরবিন্দের নিজের—বারীনদা নিশ্চয় সঙ্গে করে এনেছিলেন। বইখানা শ্রীঅরবিন্দ যে পুঙ্খানুপুঙ্খ পড়েছিলেন তার চিহ্নও তিনি রেখে গিয়েছেন তাতে—যেসব স্থান বা পংক্তি তাঁর ভালো লেগেছিল সেগুলির পাশে তিনি লাল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন।

মনে আছে একটি লাইন .লাল চিহ্নের সৌভাগ্য লাভ করেছিল—

Strew on her roses, roses
And never a spray of Yew—

লাইন দুটির সরল ভাবালুতা, নিবিড় কারুণ্য, সুছন্দ সুমধুর গতি আমারও তরুণ মনে বেশ দোলা দিয়েছিল। ম্যাথু আর্নল্ডের সংগে সেই আমার প্রথম পরিচয়—কলেজে রাজকবি টেনিসনের মহিমা সাধারণ ছাত্রদের শ্রুতিগোচর হয়েছে, ম্যাথু আর্নল্ড বা ব্রাউনিং তখনো পরিচিত হয়ে ওঠেন নি।

যা হোক, এসব হল শিবের গীত। এবার ধান ভানতে শুরু করা যাক।

বলেছি বোমা তৈরি হল, পুরোপুরি একটা। উল্লাসকর প্রধান কারিগর, আমরা সহকারী। ঠিক হল রেল-লাইনের ওপারে গুমটি পার হয়ে (গুমটিওয়ালাকে নিয়ে পরে জজের কোর্টে একটা মজাদার ব্যাপার হয় তা বলব আর এক দিন) যে ক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণী তার উপরে উঠে পরীক্ষা করা হবে—খুব প্রকাণ্ড পর্বত কিছু নয়, নাম দীঘারিয়া। একদিন বিকেলের দিকে আমরা চললাম পাঁচজনই। বোমাটি বইবার ভার পড়ল আবার আমার উপর—সন্তর্পণে নিয়ে চলেছি বটে, কিন্তু কি বিপদ যে সংগে নিয়ে চলেছি তা খেয়াল হয় নি। তখন অনভিজ্ঞ অজ্ঞ আমরা, যেভাবে নিয়ে চলেছিলাম তাতে একটা অঘটন যে কেন ঘটে যায় নি তা-ই আশ্চর্য—পরে বুঝতে পেরেছি।

পাহাড়ের বনজঙ্গল ভেদ করে একেবারে মাথায় একটা জায়গা পছন্দ করা হল। একটা প্রকাণ্ড পাথর সেখানে দেখা গেল—এক দিক খাড়া উঁচু, বুক-প্রমাণ হবে, আর একটা দিক ক্রমে ঢালু হয়ে নীচে চলে গিয়েছে বিশ পঁচিশ হাত। প্ল্যান হল প্রফুল্ল ছুঁড়বে খাড়া দিকটির আবডালে পিছনে দাঁড়িয়ে ঢালুটার উপর তাক করে, ছুঁড়েই বসে পড়বে যাতে ফাটার পরে কোনো টুকরো গায়ে না লাগে: বোমা তো ফাটবে ঢালুর গায়ে পাথরের উপর—পড়লে ঘর্ষণের ফলে। উল্লাস থাকবে প্রফুল্লর পাশে সব পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে—আর ছোঁড়বামাত্র দুজনেই ডুব দেবে পাথরটার পিছনে। আমি রইলাম একটু দূরে একটা গাছের উপরে যাতে সব দৃশ্যটা আমার নজরে থাকে। বারীনদা ও বিভূতি এদিক ওদিক স্থান গ্রহণ করলেন। অপেক্ষা করছি—আমি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছি পাথরটার দিকে—হঠাৎ দেখি সেখানে একটা আগুনের ফুলকি জ্বলে উঠল, খানিকটা ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ল, আর সংগে সংগে কি বিকট আওয়াজ! সমস্ত আকাশটা যেন ছিঁড়ে ফুঁড়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেল, শব্দের তরঙ্গ প্রতিধ্বনিত হয়ে গেল এক প্রান্ত থেকে আর প্রান্ত—শত মেঘগর্জন যেন যুগপৎ। এমন আওয়াজ শুনি নি কখনো আর। আমি তো পুলকিত উল্লসিত, সহর্ষে গাছ থেকে নেমে দৌড়ে উপস্থিত হলাম গিয়ে ঘটনাস্থলে—সাক্‌সেসফুল, সাক্‌সেসফুল চেঁচিয়ে বলতে বলতে। কিন্তু এ কি? এ কি বীভৎস দৃশ্য? প্রফুল্লর দেহ এলিয়ে পড়েছে উল্লাসের বুকের উপরে, উল্লাস দু হাতে জড়িয়ে ধরেছে তাকে। আস্তে আস্তে শুইয়ে রাখা হল—দেখা গেল কপালের একটা পাশ চৌচির, তার ভিতর দিয়ে খানিকটা ঘিলু বের হয়ে পড়েছে—চোখে দেখা যায় না। আমরা বসে পড়লাম চার পাশে—সব চুপচাপ। বারীনদা বললেন—সব শেষ, কোনো আশা নেই। নিঃসাড় নিস্পন্দ দেহ। চক্ষু নিমীলিত, প্রশান্ত মুখমণ্ডল।

ব্যাপার যা হয়েছিল তা এই। আমরা মনে করেছিলাম বোমাটা নীচে পড়লে, শক্ত জায়গার সংগে ঘর্ষণ হলে, তবে বিস্ফোরকটায় আগুন জ্বলবে। কিন্তু তা না হয়ে বিস্ফোরকটি এত জোরালো অর্থাৎ সহজে দাহ্য হয়ে উঠেছিল যে আকাশে ছোঁড়া মাত্র, বাতাসের সংগে ঘষা লেগেই তা জ্বলে উঠেছে। আগে আমি যে বলেছি ওটাকে হাতে নিয়ে আমি চলেছিলাম, সামান্য দোলাতেই হয়ত তা জ্বলে উঠে ফেটে যেত—যায় নি যে আমার ভাগ্য।

অতঃপর কি কর্তব্য—সমস্যা তবে। কি করা যায় দেহটিকে নিয়ে—অগ্নিসংকার? কবর? কবর সম্ভব নয়, শক্ত পাথর খুঁড়ে গর্ত করা অসম্ভব। অগ্নি-সংকার? গাছ-পালা তৃণাদির মাঝে আগুন জ্বালানো? লোক এসে পড়তে পারে, পার্শ্ববর্তী গ্রামে জানাজানিও হয়ে যেতে পারে। বারীনদা বললেন, কিছু করবার দরকার নেই—ওভাবেই রেখে চলে যাওয়া যাক। এটা যুদ্ধক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের প্রথম সৈনিক তার দেহ দান করল—আমাদের এই প্রথম casualty। এতক্ষণ সকলের দৃষ্টি মৃতের উপর নিবদ্ধ ছিল, হঠাৎ কে বলে উঠল, উল্লাসও তো

আহত—তার জামার কাপড়ে শত ছিদ্র এবং রক্তের দাগ সব জায়গায়। কাপড়-চোপড় খুলে যথাসম্ভব দেখা হল। বারীনদা বললেন, ওকে এখন দেখা একান্ত প্রয়োজন। যে গিয়েছে সে গিয়েছে—এখন একে বাঁচানো দরকার, সুতরাং তাড়াতাড়ি ফিরতে হয়। মৃতের দেহ নিয়ে কি করা যাবে, তা বিবেচনা করবার সময় নেই। আজই ফিরতে হবে কলকাতায়, ডাক্তার দেখানোর জন্যে। আমাদের, বিপ্লবীদের বিশেষ একজন ডাক্তার ছিলেন—নাম-করা বিখ্যাত ইন্দুমাধব মল্লিক (?)।

পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলাম, স্তব্ধবাক রুদ্ধকণ্ঠ বিমূঢ়চিত্ত সবাই। মনে পড়ল চিত্র—

Not a drum was heard, not a funeral note......

আমি একবার একটু উচ্ছ্বাসভরে বলে উঠলাম, আমরা এসেছিলাম পাঁচজন, ফিরে যাচ্ছি চারজন। বারীনদা আমাকে ধমকে বললেন, No sentimentality, please.

যেতে যেতে আমার মনে হচ্ছিল এত বিকট আওয়াজ চারপাশে লোকের কানে পৌঁছয় নি? অবশ্য যদিও চারপাশে লোকালয়ের মতো বিশেষ কিছু ছিল না—তবে জঙ্গলে এদিক ওদিক থেকে লোক আসত কাঠ কুড়োতে। কিছুই নয়, নির্বিবাদে ফেরা গেল। বারীনদা ও উল্লাস সেই রাত্রিতেই কলকাতায় রওনা হয়ে গেলেন।

পরের দিন ভোরে তাকিয়ে দেখলাম দিঘিরিয়ার দিকে—চিল শকুন উড়ছে কি পাহাড়টার উপরে? সেরকম মনে হল যেন। রাত্রে বা পরের দিন ভোরে উপেনদা এসে পৌঁছলেন বারীনদার সঙ্গে—উল্লাসের খবর ভালো, কিছু আশঙ্কাজনক ক্ষত নাই। উপেনদা জায়গাটা দেখতে চাইলেন। চললাম আমরা আবার সেই পুণ্যতীর্থে—পৌঁছলাম গিয়ে ঘটনাস্থলে। দূর থেকেই দেখলাম —পড়ে আছে দেহটি ঠিক তেমনিভাবে, যেমনটি রেখে গিয়েছিলাম, কাপড়-চোপড় গায়ে ঠিক তেমনি, একটু এদিক-ওদিক হয় নি, গন্ধও কিছু নেই এই তৃতীয় দিনে। যেমন গিয়েছিলাম আবার ফিরে এলাম তেমনি, দেহটিকে তেমনি রেখে।

ঠিক হল এ-পর্ব শেষ। পুলিসে জানাজানি হতে পারে, এখান থেকে আস্তানা ভেঙে সরে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। বোমা-তৈরির সাজসরঞ্জাম যা ছিল সব দু-তিনটি ট্রাঙ্কে ভরে পার করে দেওয়া হল দেওঘর শহরে এক বন্ধুর দোকানঘরে। দোকানের পিছনে গুদামের ভিতরে অন্যান্য জিনিস-পত্তরের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হল। সেসবের কি গতি হয়েছিল পরে জানা নেই।

শেষ বিদায়ের আগে একবার শেষ দেখবার ইচ্ছা হল আমাদের দিঘিরিয়ার পাহাড়—ঘটনার চতুর্থ দিনে। উঠলাম গিয়ে যথাস্থানে। কিন্তু কী আশ্চর্য! কোথায় সে দেহ? চিহ্নমাত্র কোথাও কিছু নেই। এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে তল্লাশ করা হল—একটা টুকরো কাপড় পর্যন্ত পাওয়া গেল না। জন্তু-জানোয়ারে নিয়ে গেল? কিন্তু এতটুকু চিহ্ন না রেখে? জিনিসটা প্রহেলিকা রয়ে গেল।

পরে অনেক রকম গুজব রটে গিয়েছিল—কেউ কেউ নাকি তাকে দেখেছে কলকাতার রাস্তায়। এক সন্ন্যাসী নাকি তার মৃতদেহটা দেখতে পায় এবং বাঁচিয়ে তোলে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সন্দেহ নিরসনের জন্যে আমি একদিন শ্রীঅরবিন্দকে জিজ্ঞাসা করি, এ-সকল কাহিনীর ভিত্তি কিছু আছে কি না, প্রফুল্লর সত্যকার কী খবর। শ্রীঅরবিন্দ বললেন, ওসব গল্পগুজবই, প্রফুল্ল সত্য-সত্যই মারা গিয়েছে।

আর একটি খবর দিয়ে দেওঘর-পর্ব শেষ করি। আমাদের কুঠি থেকে মাইলখানেকের মধ্যে রোহিণী নামে গ্রাম ছিল একটি। সেখানে একটি বাগানবাড়ির মধ্যে—প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় আমরা দেখেছি—থাকতেন তখনও শ্রীঅরবিন্দের মা, স্বর্ণলতা দেবী। বাগানটি নানা রকম গাছ-গাছড়ায় পরিপূর্ণ। কুঠিটি বৃহদাকার আটচালা ঘর (দেওয়াল মেঝে যদিও পাকা)—মনে হয়েছিল সংস্কারের অভাবে কিছু পুরাতন ও জীর্ণ। লোকে বলত 'মেমসাহেবের কোঠি'—শ্রীঅরবিন্দের মাকে মেমসাহেব বলত সবাই: তখন তাঁর মস্তিষ্ক বিকল অবস্থায়, ঘরের থেকে বের হতেন না—বাড়ির পাশ দিয়ে বাগান আমরা অতিক্রম করেছি বার কয়েক কিন্তু তিনি দৃষ্টিগোচর হন নি।

পুণ্যতীর্থ দেওঘরের পুণ্যকথা সম্পূর্ণ হয় না যদি সে-প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের দাদাবাবু ঋষি রাজনারায়ণের নাম উল্লেখ না করি। দেওঘরে তাঁর অধ্যুষিত বাসাখানি আমরা দেখেছি—খানিকটা খোলা জমির মাঝখানে—জমি হয়ত একদিন ফুলবাগান ছিল, সাদা রঙের কোঠাবাড়ি, লোকজন নাই, পড়ে রয়েছে একখানি স্বপ্নের মতো।

রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা

রবীন্দ্রায়ণ (প্রথম খণ্ড)। শ্রীপুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত। বাক সাহিত্য। কলিকাতা-৯। মূল্য—দশ টাকা।

রবীন্দ্র শতবর্ষোৎসব পালনের উচ্ছ্বাসকে স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টায় এবার একাধিক স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত 'রবীন্দ্রায়ণ' একটি মস্ত লাভ। আয়তনের বৃহত্বে বিখ্যাত শিল্পীদের দ্বারা প্রস্তুত এগারোখানি ছবিতে ষোলোটি বহুমূল্য রচনায় চমৎকার মুদ্রণে রমণীয় রুচিসংগত প্রচ্ছদপটে 'রবীন্দ্রায়ণ' প্রথম দৃষ্টিতেই পাঠকের মন কেড়ে নেবে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত সমালোচনা সংকলনে পুলিনবিহারী সেনের চেয়ে যোগ্যতর সম্পাদক দুর্লভ। সম্পাদনা-নৈপুণ্যের চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে 'রবীন্দ্রায়ণ'-এর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

বর্তমান খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার সব দিকের আলোচনা নেই। শুনেছি, 'রবীন্দ্রায়ণ'-এর পরবর্তী খণ্ড আশু প্রকাশ্য। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সমাজ রাজনীতি ইত্যাদি অন্যান্য দিকের আলোচনা থাকবে সেই খণ্ডে। এই খণ্ড শুধু সাহিত্য-প্রবন্ধে পূর্ণ। ভাষা প্রকাশরীতি রবীন্দ্রমানসের নানা ভাব ও চিন্তার উপকরণ, কল্পনার রীতি-প্রকৃতি নিয়ে এই প্রবন্ধগুলি রচিত। প্রতি রচনা সেদিক থেকে মৌলিক শ্রমসিদ্ধ অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ও বিস্তৃত। রচনাগুলির দীর্ঘতাও প্রমাণ করে প্রবন্ধগুলিকে সম্পূর্ণতা দিতে সম্পাদক কোথায়ও বাধা দেননি। লেখক সম্পাদক ও প্রকাশকের পূর্ণ সহযোগিতায় 'রবীন্দ্রায়ণ' বাংলা রবীন্দ্র সমালোচনা-সাহিত্যে একটি স্থায়ী সম্পদে পরিণত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বড়ো, রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহাকবি—এই রকমের নিশ্চিন্ত বাল-ভাষণের দিন যে চলে গিয়েছে এ কথা অন্তিম রচনায় বলে গিয়েছেন মনীষী অতুলচন্দ্র গুপ্ত। এই রচনাটি 'রবীন্দ্রায়ণ'-এর যথার্থ ভূমিকা। যে ভাষায় ও যে সমাজে রবীন্দ্র-নাথের অভ্যুদয় তার প্রতি শ্রদ্ধা অটুট রেখে রবীন্দ্র প্রতিভাকে আমরা বিচার করব। বিদেশী মতামতনির্ভর হীনম্মন্যতাকে আমাদের বর্জন করতে হবে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ তিনটি দেশ এবং ঐতিহ্যের সংগে যুক্ত রবীন্দ্রমানসের ব্যাখ্যা। প্রমথবাবু দেখিয়েছেন (রবীন্দ্র-সাহিত্যের তিন জগৎ) প্রথম জীবনে কলকাতা কবিকে দিয়েছিল প্রকৃতির জন্য ব্যাকুলতা, মধ্যজীবনে শিলাইদহ দিয়েছিল মানুষের সান্নিধ্য এবং পরবর্তী জীবনে শান্তিনিকেতন দিয়েছিল ব্রহ্মের উপলব্ধি। প্রমথবাবুর সুপরিচিত মতামত এবং সমা-লোচনা পদ্ধতিতেও এই রচনাটি আর একটি নতুন দিকের ইঙ্গিত দিল। অধ্যাপক দাশগুপ্তের 'উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ' আমাদের মধ্যে বহু প্রচলিত অস্পষ্ট ধারণায় নির্দিষ্টতা এনে দিয়েছে। উপনিষদের দুটি প্রধান তত্ত্ব—দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ রবীন্দ্রমানসের আদর্শকে কতখানি গঠিত ও সমৃদ্ধ করেছে, এই প্রবন্ধ থেকে পাঠক সে সম্বন্ধে অভাবিতপূর্ব আলো পাবেন। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের 'রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কালিদাস' আর একটি শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। এমন পরিচ্ছন্ন, স্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত প্রবন্ধ সাধারণত চোখে পড়ে না। কালিদাসের কাব্যের সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব আবিষ্কারের জন্য রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সাহিত্যজীবনের জাগ্রত কৌতূহল অধ্যাপক সেন গভীর অন্তর্দৃষ্টির সংগে নির্ণয় করেছেন। ইতিহাস-জ্ঞান ও রসবোধের মিশ্রণে এটি একটি অসাধারণ রচনা।

বর্তমান গ্রন্থে একটি অভিনব শ্রেণীর রচনা অধ্যাপক সুকুমার সেনের 'রবীন্দ্র-নাথের ভাষা ব্যবহার'। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের 'রবীন্দ্রনাথের শব্দ' এবং অধ্যাপক অমলেন্দু বসুর 'সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র: রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা'। শব্দ ও শব্দ-সংগীত নিয়ে আলোচনাকে আমরা অবশ্যই বলব রবীন্দ্র সমালোচনাতে নতুন পথ রচনা। এদের মধ্যে প্রথম দুটি প্রধানত শব্দগত,

তৃতীয়টি কাব্যস্টাইলগত। কাব্যস্টাইলের এ ধরনের আলোচনা ইংরেজী সাহিত্যে থাকলেও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এ ধরনের আলোচনা অধ্যাপক বসুই প্রথম করলেন। ইংরেজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত অধ্যাপক বসু এদিকে যে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করলেন, এতে কাব্যরসিকরা উৎসাহ বোধ করবেন। অধ্যাপক সুকুমার সেন কালিদাস ও জয়দেবের শব্দপ্রয়োগের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল দেখিয়েছেন। এ প্রবন্ধটিও নতুনত্বে সমুজ্জ্বল। কয়েকটি শব্দ-সামান্যকে তেমন উল্লেখযোগ্য মনে না হতে পারে, তবে সুকুমারবাবু এ বিষয়ে যে সম্ভাবনা দেখালেন, তা পরম কৌতূহলজনক। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের রবীন্দ্র ব্যবহৃত শব্দের শ্রেণীভাগ পাঠককে বিস্মিত করবে। শ্রম ধৈর্য ও বিচারবোধের এমন সমন্বয় লজ্জিত করবে আমাদের অনেক সৌখীন সমালোচনা প্রয়াসকে।

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষা' এবং শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্তের 'বাংলা গদ্য ও রবীন্দ্রনাথ' এক শ্রেণীভুক্ত না হলেও পরস্পর সম্পর্কিত। বাংলা ভাষার রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্ব নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথের দানের ইতিহাস ও গভীরতা আলোচিত হয়েছে প্রথম প্রবন্ধটিতে। লেখাটিতে পাণ্ডিত্যের দুর্ভেদ্যতা নেই, আছে মজলিসী অন্তরঙ্গতা। আলোচনা আশাপ্রদরূপে ব্যাপক নয় সত্য, কিন্তু অত্যন্ত সুখপাঠ্য। দ্বিতীয় রচনাটি বাংলা গদ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথেরই উক্তি অবলম্বনে গদ্যের গতিপ্রকৃতি বিচার এবং রবীন্দ্রনাথের নিজের গদ্যসৃষ্টির বিশ্লেষণ।

উপন্যাস ও ছোটগল্প নিয়ে চারটি আলোচনা আছে। শ্রীযুক্ত অজিত দত্ত লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প'। গল্পগুচ্ছে বাস্তবতা ও চিরন্তনতার বাণী তাঁর আলোচ্য। এদের সত্যকার স্বরূপ কি শ্রীযুক্ত অজিত দত্ত সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরীর প্রবন্ধটির নাম 'রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রকৃতি'। বিষয়টি বহুশ্রুত বটে, কিন্তু আলোচনা গতানুগতিক নয়। চরিত্র ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক এই তিন পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে প্রকৃতির ভূমিকা কত মূলগত, এই রচনাটি সে বিষয়ে আমাদের ধারণা সুবিন্যস্ত করেছে। শ্রীযুক্ত অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'উপন্যাসের চরিত্র ও রবীন্দ্রনাথ' রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা নয়। চরিত্র কল্পনা-রীতির সূত্র অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসরীতির বিবর্তন দেখানো হয়েছে দক্ষতার সঙ্গে। বাংলা সাহিত্যের একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র চতুরঙ্গের 'দামিনী' নিয়ে চমৎকার কবিত্বস্নিগ্ধ আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত কানাই সামন্ত।

আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র সরকারের 'আধুনিক বিশ্বকবির আবির্ভাব'। মানব সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথকে লেখক স্থাপিত করেছেন। এই প্রবন্ধটি পাঠকের দৃষ্টি ও মনকে প্রসারিত করে, অচিন্ত্যপূর্ব ভাবনাকে জাগিয়ে দেয়। 'রবীন্দ্রায়ণ'-এ আরও দুটি প্রবন্ধ আছে। শ্রীযুক্ত লীলা মজুমদার লিখেছেন ছোটদের জন্য। শ্রীযুক্ত সোমনাথ মৈত্র লিখেছেন 'রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈচিত্র্য'। রচনা দুটি অবিশেষ (general) ধরনের হলেও ভাষার অপূর্বতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে পাঠকের মনে।

এতে ছবি আছে এগারোটি। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, মণীন্দ্র গুপ্ত, অতুল বসু ও জার্জিয়েফের এতগুলি বহুবর্ণ ও এক রঙা ছবি এই সংকলন গ্রন্থখানিকে অনন্যসাধারণ সৌষ্ঠব দান করেছে।

২১২।৬১

কিশোর-সাহিত্য

পিনকুর ডাইরি—শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য—দুই টাকা।

বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট কিশোর সাহিত্য অঙ্গুলিমেয়। 'পিনকুর ডাইরি' সেই অঙ্গুলিমেয় কয়টির অন্যতম একটি কিশোর তথা সর্বজনীন পাঠ্য গ্রন্থ—তা বলতে পেরে আনন্দ অনুভব করছি। পিনকুর ডাইরিটা কি? আবর্জনার মধ্য থেকে কুড়িয়ে পাওয়া একটা বস্তু যাতে রয়েছে এক একটি গল্প এক একটি মুক্তোকণার মতোই। অথচ প্রতিটি গল্প যেন গল্প বলতে বসে একনাগাড়ে বলা।

'পিনকুর ডাইরি'র পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে কত হাসির হিল্লোল, আর দুঃখের অশ্রু। কখনো কৌতুক, কখনো বা কৌতূহলে ভরা

বিচিত্র ঘটনা। ছোট মন যায় ছোট পিঁপড়ের দিকে। সেই পিঁপড়েদের জন্যে হাসপাতাল খোলার কাহিনী, কাকের কবর ব্যবস্থা এবং তার আত্মার সদ্‌গতির জন্য এমন অদ্ভুত প্রার্থনা কে কবে শুনেছে! কোনোটাই যেন মিথ্যা নয়। 'কানে কাগজ', 'দল আর বেদল' ও 'পাড়াগাঁ আর ম্যালেরিয়া' পড়ে যখন ভূতের কাহিনীতে এসে পৌঁছাই আর রাঙা মামার স্পিরিট দেখি—তখন এক দিকে যেমন গা ছম্‌ছম্‌ করে, তেমনি আবার মনে হয় গল্পটা যেন এখুনি শেষ না হয়ে যায়। আরো অবাক হই 'কৃষ্ণনগরের বাড়ি'র কাহিনী শুনে। ময়নাটা কিন্তু আচ্ছা সেয়ানা! হঠাৎ সে ফাঁস করে দেয় বেফাঁস কাণ্ড! অন্দর মহলকে উপোসী রেখে বাজার সরকার হরিবাবুর চুরিতে রয়েছে আরেক কাণ্ড। ঘোড়াটার টিফিনের টাকা চুরি করে সহিসটা। একদিন জ্যাঠামশায়ের সামনে প্রায়-খালি বালতিটা তুলে আনে সেই অবলা জীব। সহিস ধরা পড়ে। তার চাকরিটা বজায় থাকলো শুধু গৌরীর জন্যে। গৌরীকে ভালোবাসেন জ্যাঠামশায়। শুধু তাকেই অবশ্য নয়, ইতরপ্রাণী, বউ-ঝি, হিন্দু-মুসলমান সবাইকে। লেখিকা জ্যাঠামশায়ের মধ্যে একটা বিরাট ভালোবাসার প্রাণের আবিষ্কার করেছেন। এইভাবে গ্রন্থটিতে শুধু ঘটনা-বিন্যাসই প্রাধান্য লাভ করেনি, পীযূষদাদা, গৌরীদিদি, দাসীমাসী, রাঙামামা, সোনাদা, খুড়ীমা, ঠাকুমা—সবাইকে যেন সামনাসামনি দেখা যায়। গ্রন্থটি নানা চিত্রে শোভিত ও অলংকৃত।

২১৪।৬১

উপন্যাস

রাজায় রাজায়—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—নয় টাকা

'রাজায় রাজায়' উপন্যাসে দুই সামন্ততান্ত্রিক রাজার দ্বন্দ্ব এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী রূপায়িত হয়েছে। অবশ্য বিবাহিতা বিন্ধ্যবাসিনীকে কেন্দ্র করেই এই দ্বন্দ্ব।

উপন্যাসটির ঘটনার পারম্পর্যে চরিত্রাঙ্কনেই ঔপন্যাসিকের অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। মা বিলাসবাসিনী রাজমাতা। তিনি তাঁর দুই পুত্র কালীশঙ্কর ও কাশীশঙ্করকে এবং এক কন্যা বিন্ধ্যবাসিনীকে অসীম স্নেহ দিয়ে এক দিকে স্নেহপ্রবণ মাতারূপে যেমন নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তেমনি রাজধর্ম সম্পর্কে তিনি সচেতন। আবার মন তাঁর ধর্মনিবিষ্ট। জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীশঙ্করের একদা শৌর্যবীর্য ছিল, এখন তিনি অলস ও বিলাসী। কিন্তু ভাইবোনের প্রতি তাঁর ভালবাসার অন্ত

নেই। মাতৃশ্রদ্ধাও উল্লেখযোগ্য। মন অত্যন্ত উদার। তবু তার একাধিক রানী। ব্যভিচারপ্রবণ মন, কিন্তু মাতৃআজ্ঞায় তিনি সদা সংযত। এ'র চরিত্রে এক দিকে যেমন কঠোরতা, অন্য দিকে কোমলতার ফল্গুধারা প্রবাহিত। ছোট কুমার কাশীশঙ্কর যেন বৈশ্যযুগের প্রতীক। তিনি ব্যবসায়ী, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, সাহসী ও সুযোদ্ধা। বিন্ধ্যবাসিনীর অত্যাচারী স্বামী অন্যায়ভাবে অর্থ দিতে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই তার চরিত্রের বাস্তবতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিয়ে করেছিলেন তিনি একজনকেই। নানা দিক দিয়ে বড় ভাই-এর অপেক্ষা এই চরিত্র উজ্জ্বল।

বিন্ধ্যবাসিনীকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাসের দুটি বিপরীত দিক বিধৃত। সে সৎ, নির্ভীক, লাজুক, ও অমায়িক স্বভাব-সম্পন্না। তার স্বামীভক্তি উল্লেখযোগ্য, উপন্যাসের শেষাংশে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ ঐ স্বামীর বিরুদ্ধে একযোগে দুই ভাইয়ের লড়াই। রাজায় রাজায় লড়াই। নিজেও সে কত অত্যাচারিতা স্বামীর কাছে। বন্দী অবস্থায় হঠাৎ ভালবেসে ফেলেছিল চন্দ্রকান্তকে। হয়তো সেটা অবস্থা-দৈন্যে। পরিবেশের পাকচক্রে। তবু সে ভালবাসাও কত মূক এবং মহৎ। অপরকে ভালবেসেও সে সতী। তাই স্বামীর চিতায় অনুপ্রবেশ করে সহজেই। সেইভাবে সে দেহত্যাগ করে এবং রাজায় রাজায় যে দ্বন্দ্ব তার অবসান ঘটে।

পার্শ্বচরিত্রে আনন্দময়ী উল্লেখযোগ্য। সে লাস্যময়ী তবু সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। শিবানী, মহেশ, এরাও উল্লেখযোগ্য।

ঔপন্যাসিকের ভাষা সংযত এবং লিরিক-ধর্মী। ৫২৯।৬০

প্রাপ্তিস্বীকার

শান্তির পাখিরা এবং তুমি—সুধাংশু তুঙ্গ।

রবীন্দ্র প্রণাম—রমেন দাস সম্পাদিত।

স্বপ্নযমুনা—ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য।

আজব শহর কোলকাতা—নরেন সেন।

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

বর্তমানের প্রার্থনা, ভবিষ্যতের উত্তর

আজকের বঞ্চনা ও আগামীকালের ভরসার মধ্যে সেতু রচনার শক্তি কেউ খুঁজে পায়, কেউ বা মাঝ-দরিয়ায় ডুবে মরে। আগামী-দিনের তীরের দেখা যারা পেল এবং যারা পেল না তাদেরই কাহিনী নিয়ে তৈরী চলচ্চিত্রালয়ের "আজ কাল পরশু"।

এক চাকুরিজীবী নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের প্রাত্যহিক অভাব-অশান্তিকে কেন্দ্র করে চিত্রকাহিনীর উদ্ভব। দৈন্যের চাপে ও দেনার দায়ে জর্জরিত গৃহস্বামীর ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত জীবনসংগ্রাম এবং তাঁর সহধর্মিণী ও পুত্র-কন্যাদের বিড়ম্বিত জীবনের যে উপাখ্যানটি ছবিতে মুখ্যত রূপায়িত, তার মধ্যে একটি নিঃসম্বল পরিবারের দৈনন্দিন দুঃখের ঘটনাবলীই প্রধান। দীর্ঘ চাকুরিজীবনের শেষ প্রান্তে এসে গৃহস্বামী যখন কর্মোন্নতির কোন আশাই দেখতে পেলেন না—শুধু তাই নয়, কুচক্রী ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর কুটিলতায় যখন তাঁর চাকুরিটিও গেল, তখন তিনি চারিদিকে শুধু অন্ধকারই দেখলেন। অবসাদ ও বিষাদে ক্ষয়ে-যাওয়া তাঁর জীবন তারপর একদিন ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ল মৃত্যুর কোলে।

এই দুর্ঘটনার আগেই বাড়ির বড় ছেলে পিতার অমতে তার বিবাহযোগ্যা বোনকে সৎপাত্রস্থ করেছে এবং দীর্ঘ সংগ্রামের পর তার বেকারজীবনের অবসান ঘটিয়েছে। কিন্তু চাকুরি পাওয়ার সুসংবাদটি নিয়ে সে যখন বাড়ি পৌঁছেছে তখন তার পিতার মৃতদেহ শ্মশানযাত্রার জন্য তৈরী। দুঃখের পালা শেষ হবার পর এই বাড়িতে আবার ফিরে এসেছে এতদিনের হারিয়ে-যাওয়া আশা। সমস্ত বাড়ি ভরে উঠেছে নবজাতকের প্রাণখোলা হাসিতে।

ছবির এই পারিবারিক কাহিনীর পাশাপাশি রয়েছে একটি সুন্দর মধুর প্রণয়োপাখ্যান। এই উপাখ্যানে প্রেম বাস্তবের বিড়ম্বনাকে জয় করেছে অন্তরের প্রত্যয়ে ও বাসনার সংযমে। দুঃখ থেকে আনন্দে উত্তরণের পথটি খুঁজে নিয়েছে সহজ ছন্দে।

চিত্রকাহিনীর পারিবারিক আখ্যানভাগটি মামুলী। একটি দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারের প্রতিদিনকার অভাব ও হতাশ্বাস দেখাবার প্রয়োজনে যে-সব ঘটনার অবতারণা রয়েছে এই আখ্যান-অধ্যায়ে সেগুলিও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আজকের দিনের কোন ব্যবসা-

এ ভি এম-এর হিন্দী ছবি "ছায়া"-র দুই প্রধান চরিত্রে আশা পারেখ ও সুনীল দত্ত

প্রতিষ্ঠানের পুরনো কর্মচারীর মাইনের অংক সহজেই অনুমেয়। অথচ প্রায় এক বছর ধরে তার বাড়ি-ভাড়া, ছেলের স্কুলের বেতন, মুদির দোকানের টাকা বাকী থাকে এবং তদুপরি কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে তাকে ধার করতে হয়—এই সবকিছুই কষ্টকল্পিত বিশেষত তার বড় ছেলেও গৃহশিক্ষকতা করে কিছুটা সংসার-খরচ চালায় তারও প্রমাণ

রয়েছে ছবিটিতে। তার ওপর বড় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে এক অপদার্থ ও কুচক্রী ঊর্দ্ধতন কর্মচারীর শত্রুতায় গৃহস্বামীর হঠাৎ করে চাকুরী যাওয়ার ঘটনাটিও আজকের দিনে অবিশ্বাস্য। এই সব অবাস্তব ঘটনারাজির সমাবেশে দুঃখ-দারিদ্র্যের যে কাহিনী ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে তার গভীর বিষাদ ও হতাশ্বাসের সুর দর্শকমনে অনেকখানি ক্লেশানুভূতির সঞ্চার করে। তবে সুখের বিষয়, এই আখ্যান-ভাগে কোন সামাজিক উদ্দেশ্য বা বাণী সরবে উচ্চারিত নয়। এবং আখ্যানবস্তুতে মাঝে মাঝে মানবিকতার স্পর্শ মেলে। তদুপরি নৈরাশ্যের সুরে এর অবসান ঘটেনি। তাই এই পারিবারিক আখ্যান নতুনত্ব-বর্জিত হলেও দর্শকদের খুব পীড়া দেয় না।

পরিচালক-কাহিনীকার নির্মল সর্বজ্ঞ তাঁর এই প্রথম স্বাধীন চিত্রপরিচালনায় সর্বাঙ্গীণভাবে যে রুচি, সংযম ও রস-বোধের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। ছবির প্রেমোপাখ্যানের কল্পনায় ও বিন্যাসে তিনি গভীর রসানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন। প্রণয়োপাখ্যানটির মাধুর্যময় গতি ও পরিণতি দর্শকমনে সুখানুভবের সঞ্চার করে।

ছবির মূল চরিত্রে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংবেদনশীল অভিনয় দর্শকমনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। চরিত্রটির বিড়ম্বনা ও হতাশ্বাস তিনি নিপুণ অভিব্যক্তি ও অভি-নয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর বড় ছেলের চরিত্রে অনুপকুমারের অভিনয় প্রাণোচ্ছল ও নাট্যসংবেদনে মর্মস্পর্শী। প্রণয়-জীবনের দ্বন্দ্ব ও আশা এবং দুঃখ-অবসানে প্রাণের উচ্ছ্বাস তিনি অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর প্রণয়িনীর রূপসজ্জায় মাধবী মুখোপাধ্যায় চরিত্রটির অনুচ্চারিত অনুরাগ সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। গৃহকর্ত্রীর ভূমিকায় অপর্ণা দেবীর অভিনয়ও মনে দাগ কাটে।

ছবির অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে যাঁরা অভিনয়-কুশলতা দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তপতী ঘোষ, তুলসী চক্রবর্তী, সুশীল মজুমদার, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও সবিতাব্রত। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে জহর রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল সেন, অশোক, বুলবুল, রাজলক্ষ্মী দেবী, প্রীতি মজুমদার প্রভৃতি চিত্রনাট্যের দাবি আশানুরূপ মিটিয়েছেন।

ছবির দুটি গানে অপরেশ লাহিড়ীর সুরারোপ সুশ্রাব্য। আবহ-সুর রচনায় শৈলেশ রায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কয়েকটি নাট্যমুহূর্ত সুন্দর আবহ-সুর সংযোগে মরমী হয়ে উঠেছে।

ছবির কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজে অজয় মিত্র ও ননী দাস (আলোকচিত্র) ও শিবসাধন ভট্টাচার্য (সম্পাদনা) কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

দেবী প্রোডাকসন্সের "ডাইনী"-র একটি দৃশ্যে দিলীপ রায় ও গীতা দে

হালকা হাসির হিন্দোল

গজেন্দ্র মিত্রর একটি রসমধুর কাহিনী অবলম্বনে তৈরী সুশীল মজুমদার প্রোডাকশন-এর "কঠিন মায়া" দর্শকদের কাছে রঙ্গরসের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

ছবির নায়ক সর্বেশ্বর। সে বিবাহ-বিরোধী। অর্থাৎ বহু সমস্যা-কণ্টকিত মানব-জীবনে বিবাহ যে শুধু দুরপনেয় দুর্বিপাকেরই সৃষ্টি করে এই তত্ত্বটিই সর্বেশ্বর তার অবিবাহিত বন্ধুবর্গকে বোঝাবার চেষ্টা করে। সে নিজেও আজীবন চিরকুমার থাকার ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে।
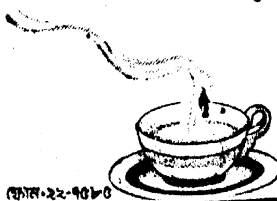
অভিভাবক বলতে সর্বেশ্বরের রয়েছেন একমাত্র বিধবা পিসীমা। তিনি সদ্য বি-কম্ পাস করা ভ্রাতুষ্পুত্রকে অকৃতদার থাকতে দেবেন কেন? তিনি সর্বেশ্বরের জন্যে তাই পাত্রী ঠিক করে রেখেছেন। তাড়াতাড়ি কন্যাকে পাত্রস্থ করবার আগ্রহ অবশ্য পিসীমার চাইতে মেয়ের বাবারই বেশী। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা সর্বেশ্বরের মত সুপাত্র কিছুতেই হাতছাড়া করতে চান না। তাই ভাবী জামাতাকে ধাওয়া করে বেড়ান তিনি। আর সর্বেশ্বর ভাবী শ্বশুরের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে ঘুরে বেড়ায় নানা জায়গায় ও নানা লোকের মাঝে।

তারপর একদিন এই ভ্রাম্যমাণ পলাতক জীবনের শেষ অঙ্কে জড়িয়ে পড়ে এক কঠিন মায়ায়। এক গ্রাম্য বালিকার রূপ ধরে আসে এই মায়া। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা যায় ভেঙে। চিরকৌমার্য ব্রতে দীক্ষিত সর্বেশ্বর পল্লীবালাকে নিয়ে আসে নিজের ঘরনী করে। তার দাম্পত্যজীবন সুখের স্বপ্নে ভরে ওঠে।

কৌতুকের সঙ্গে যুক্তির এবং রঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতির অসহযোগ সম্বন্ধ হাসির ছবিতে বিনা বিতর্কে স্বীকৃত। 'কমেডি' ছবির এই যুক্তি বা সঙ্গতি-নিরপেক্ষতার সদ্ব্যবহার করে প্রযোজক-পরিচালক সুশীল মজুমদার চিত্রনাট্যের বাঁকে বাঁকে রঙ্গরসের নানা উপকরণ থরে থরে সাজিয়ে তুলেছেন। বহুরূপী চরিত্র ও বহু ঘটনার সংযোগ ও সমাবেশে ছবির এই কৌতুক-রস পরিবেশিত।

ছবির এই উপভোগ্যতার পথে কোন কিছু যদি কঠিন বাধার সৃষ্টি করে থাকে তবে তা হল এমন একটি অযথা দীর্ঘায়িত চিত্রনাট্য যার স্তরে স্তরে জড়ো হয়ে উঠেছে বাহুল্যের জঞ্জাল। ছবি দেখার সময় হাসতে হাসতে যদি দর্শকের হাই ওঠে তবে তার জন্য দায়ী এই দীর্ঘ চিত্রনাট্য। এবং এই চিত্রনাট্যের বিন্যাসে পরিচালক বহু ধরনের রসোপকরণ পরিবেশন করতে গিয়ে ছবিটিকে অপ্রয়োজনীয় চরিত্র ও ঘটনায় ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন। কৌতুক-প্রধান এই ছবিতে যখনই সামাজিক সমস্যাজড়িত সংলাপ অথবা ভাব-গম্ভীর নাট্যমুহূর্তের অবতারণা করা হয়েছে, তখনই দর্শকের নির্বাসিত যুক্তিবোধ তাঁর আমোদ-সম্ভোগে এসে বাধার সৃষ্টি করেছে।

ছবির নায়ক-চরিত্রে বিশ্বজিতের অভিনয় প্রাণোচ্ছল। চরিত্রটির কৌতুক-আবেদন তিনি তাঁর অনাড়ম্বর অভিনয়ে দর্শকমনে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। নায়িকার রূপ-সজ্জায় সন্ধ্যা রায় চরিত্রটির প্রতি সুবিচার

করেছেন। পল্লীবালার গ্রাম্যপ্রকৃতি তাঁর আচরণ ও অভিব্যক্তিতে সুপরিস্ফুট।

ছবির অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয়-কৃতিত্ব দেখিয়েছেন রবীন মজুমদার, অনুপ-কুমার, গৌরী মজুমদার, দিলীপ রায়, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক ও জহর গাঙ্গুলী। কৌতুকাভিনয়ে অন্যান্যদের মধ্যে অগ্রগণ্য হলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়। কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রে উল্লেখযোগ্য রাম চৌধুরী, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী দেবী, পাহাড়ী সান্যাল, দীপিকা দাস, আভা মণ্ডল, সুপ্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, সুরুচি মুখো-

পি এল ফিল্মসের "পসারিণী"-র দুই শিশু শিল্পী

পাধ্যায়, চন্দন রায়, আশালতা ও সুখেন দাস।

কালীপদ সেন রচিত ছবির গানের সুর বৈশিষ্ট্যবর্জিত। ছবির বিভিন্ন মুহূর্তের আবহসংগীত মনোরম।

কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিমল মুখোপাধ্যায় (আলোক-চিত্র), সুশীল সরকার (শব্দগ্রহণ), সুনীতি মিত্র (শিল্পনির্দেশ) ও সুবোধ রায় (সম্পাদনা)।

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহের একমাত্র নূতন আকর্ষণ এ-ভি-এম প্রোডাকশন্সের হিন্দী ছবি "ছায়া"।

মাদ্রাজে তোলা বেশীর ভাগ ছবির কাহিনী লেখা হয় ঘরোয়া কোন সমস্যাকে কেন্দ্র করে। এ ছবিতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভাগ্যবিড়ম্বিতা এক নারী ঘটনাচক্রে তার একমাত্র শিশু-সন্তানকে এক ধনীর দ্বারপ্রান্তে রেখে যেতে বাধ্য হয়। সেই থেকে যে নাটকের সূত্রপাত, "ছায়া"-র আখ্যানভাগ তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

কলাকুশলী ও শিল্পী সমাবেশের দিক থেকেও "ছায়া" চিত্রপ্রিয়দের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুনীল দত্ত ও আশা পারেখ। পার্শ্বচরিত্রগুলিতে রূপদান করেছেন নাজির হুসেন, ললিতা পাওয়ার, মোহন চোটি, অসীমকুমার, অচলা সচদেব, ভারতী রায় এবং নিরূপা রায়। একটি তামিল গল্পের ভিত্তিতে চিত্রনাট্য লিখেছেন রাজেন্দ্রকৃষ্ণ। সংলাপ ও গীত রচনাও তাঁরই। সলিল চৌধুরীর সুরারোপে ছবিটি সমৃদ্ধ।

আর যেটা সব চেয়ে বড় খবর, তা হচ্ছে—"ছায়া" পরিচালনা করেছেন রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক-বিজয়ী পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। "মুসাফির", "আনাড়ি", "অনুরাধা" ও "মেমদিদি"-র পর এটি তাঁর পঞ্চম অবদান।

* * *

একদা কলকাতা ছিল চিত্রনির্মাণের অন্যতম কেন্দ্রস্থল। নিউ থিয়েটার্সের খ্যাতি তখন সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত। সাধারণত এন-টি'র প্রত্যেকটি ছবি তোলা হত একই সঙ্গে বাংলা ও হিন্দী এই দু' ভাষাতে। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে তখন সর্ব-ভারতীয় প্রযোজকদের ভিড়। হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী—সব রকম ছবিই তোলা হত সেখানে। তখনও দক্ষিণ ভারতে কোন স্টুডিওর পত্তন হয়নি। তাই তামিল-তেলেগু ছবিগুলির অধিকাংশই তোলা হত কলকাতায়। অরোরা স্টুডিও ও ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিও ছি., এইসব ছবির প্রধান কর্মকেন্দ্র—যদিও সব স্টুডিওতেই দক্ষিণ ভারতীয় ছবি অল্পবিস্তর তোলা হত সে যুগে। তা ছাড়া অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার ছবিও সে সময়ে এখানে নির্মিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে অবস্থা বদলাতে আরম্ভ করে। বর্তমানে কেবলমাত্র বাংলা ছবির মধ্যেই এখানকার স্টুডিওর কাজকর্ম সীমিত। ওড়িয়া ও অসমীয়া ভাষায় কিছু ছবি এখনও এখানে তোলা হলেও, ভবিষ্যতে আর হবে না। কারণ ঐ দুই রাজ্যেই স্টুডিও নির্মাণের তোড়জোড় চলছে। এ অবস্থায় যদি শোনা যায় যে বহিরাগত কোন প্রযোজক কলকাতায় অন্য এক আঞ্চলিক ভাষায় ছবি তুলতে এসেছেন, তা হলে নিশ্চয়ই সেটা বলবার মত খবর।

ঘটনাটি ঘটেছে গত ১লা আগস্ট ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে। সেদিন একটি পাঞ্জাবী ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হল সেখানে। ছবির নাম "পাটোয়ারী"। প্রযোজক সুন্দরলাল থাপরের এটি প্রথম চিত্রনিবেদন। এ এস অরোরা ছবিটির পরিচালক। প্রধান ভূমিকাগুলিতে নির্বাচিত

জ্যোতিরূপা ছায়াচিত্র পরিষদের "পলাতক"-এর এক নাটকীয় মুহূর্তে রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মলকুমার

হয়েছেন রেণুকা মেকার, নূটো ও কে এন সিং। সরদার শার্দুল কোয়াত্রার পরিচালনায় ছবির চারটি গান ইতিমধ্যেই রেকর্ড করা গেছে। গানগুলি গেয়েছেন তালাত মামুদ, আশা ভোঁশলে, মধুবালা জাভেরি ও সামাদ বেগম।

* * *

গত পক্ষকালের মধ্যে অনেকগুলি নতুন বাংলা ছবির কাজ শুরু হয়েছে।

রথের দিন (১৪ই জুলাই) রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে বিমল ঘোষ প্রোডাকশন্সের প্রথম ছবি "বধূ"-র মহরৎ সুসম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে চিত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট বহু গুণীর সমাবেশ হয়। শৈলেশ দে রচিত মূল গল্পের চিত্রনাট্য রচনা করেছেন যশস্বী নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। ভূপেন রায়ের নেতৃত্বে বিশিষ্ট কলাকুশলীদের একটি সম্মিলিত গোষ্ঠী "বধূ" পরিচালনা করবেন। সুর-সৃষ্টির ভার পেয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রধান ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে ছবি বিশ্বাস, বসন্ত চৌধুরী, কমল মিত্র, বিশ্বজিৎ, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অনুভা গুপ্তা, জয়শ্রী সেন, ছায়া দেবী প্রভৃতিকে নিয়ে। এই সপ্তাহ থেকে "বধূ"-র নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু হবার কথা।

বি পি প্রোডাকশন্সের প্রথম চিত্রার্ঘ "বিজিতা"-র শুভ মহরৎ ঐ দিনই ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়। মহরৎ দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করেন এক অর্ধোন্মাদের বিচিত্র রূপসজ্জায় নীতীশ মুখোপাধ্যায়। বিশু চক্রবর্তী প্রমুখ কয়েকজন অভিজ্ঞ কলাকুশলী চিত্ররথী ছদ্মনামে ছবিটির পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেছেন।

গত ২২শে জুলাই ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে বিভা পিকচার্সের প্রথম ছবি "এবার ফিরাও মোরে"র মহরৎ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়। দেবকুমার ঘোষের একটি গল্প অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন "সুরের পিয়াসী"র নির্মাতা বিশু দাশগুপ্ত। সুচিত্রা সেন নায়িকার ভূমিকায় নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর সহ-শিল্পীদের মধ্যে বিকাশ রায়, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, পদ্মা দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এ ছবির সুরকার।

শ্রীতারাশংকরের পরিচালনাধীনে বীরবল লিখিত "বীণাবাঈ"-এর চিত্ররূপ গত ২৩শে জুলাই ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়। সঙ্গীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী ছবির সংগীত পরিচালক হিসাবে এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করবেন। টি কে মারুথাপ্পা পিলাই নৃত্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

* * *

যাত্রিক পরিচালিত চিত্রযুগের প্রথম নিবেদন "কাচের স্বর্গ"-র অর্ধেকের ওপর দৃশ্য তুষার-মৌলি হিমালয়ের চিরসুন্দর পশ্চাৎপটে গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে এর ভিতরকার দৃশ্যগুলির শুটিং চলছে। উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে যে ভাবগত বিরোধ তাকেই কেন্দ্রবিন্দু করে যাত্রিক পরিচালক-গোষ্ঠী এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। বহু জনপ্রিয় শিল্পীর সমাবেশ করা হয়েছে ভূমিকালিপিতে। তাঁদের মধ্যে প্রধান অনিল চট্টোপাধ্যায়, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায় (সরকার), মঞ্জু দে, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, জীবেন বসু, তরুণকুমার, ছায়া দেবী, সবিতাব্রত দত্ত, অমর মল্লিক প্রভৃতি। নায়কের ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করছেন পরিচালক-গোষ্ঠীরই অন্যতম সদস্য—দিলীপ মুখো-

পাধ্যায়। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ছবিটিতে সুর-সংযোজন করছেন।

* * *

গত ৩০শে জুলাই ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে স্বস্তিকা ফিল্মসের প্রথম অর্ঘ্য "পলাশের রং"-এর শুভ মহরৎ সমারোহের সংগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুই শিশু শিল্পী—শ্রীমান তিলক ও কুমারী কৃষ্ণা—মহরৎ দৃশ্যে ক্যামেরার সম্মুখীন হয়। পরিচালক সুশীল ঘোষ এই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এর নিয়মিত চিত্রগ্রহণ শুরু করবেন। অসীমকুমার, মঞ্জুলা সরকার, বিকাশ রায়, মঞ্জু দে, বঙ্কিম ঘোষ, গীতা দে, জহর রায়, অতনু ঘোষ এবং নবাগতা সুতপা মজুমদারকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। ভি বালসারা সংগীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন।

* * *

দেবী প্রোডাকশন্সের প্রথম নিবেদন "ডাইনী" এই মাসেই মুক্তিলাভ করবে। এক রূপহীনার বিড়ম্বিত জীবনের একটি অসাধারণ কাহিনী এর আখ্যান-অবলম্বন। সিনেমার জন্যে বিশেষভাবে লেখা শৈলেশ দে'র এই গল্পটি ছবিতে রূপায়িত করেছেন পরিচালক মনোজ ভট্টাচার্য। নামভূমিকায় প্রাণ সঞ্চার করেছেন গীতা দে। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন ছবি বিশ্বাস, প্রশান্ত-কুমার, গংগাপদ বসু, দিলীপ রায়, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, হরিধন, কেতকী দত্ত, সীতা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। কালোবরন এ ছবির সুরকার।

পি এল ফিল্মসের "পসারিনী"ও আশু মুক্তির প্রতীক্ষা করছে। সমরেশ বসুর গল্প অবলম্বনে ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন জ্যোতির্ময় রায়। প্রধান চরিত্রগুলি রূপায়িত করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, নির্মলকুমার, অনুপকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শোভা সেন, ছায়া দেবী, সুখেন দাস, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি। পরিচালনা ও সুরযোজনার দায়িত্ব বহন করেছেন যথাক্রমে ফণী লাহিড়ী ও প্রবীর মজুমদার।

* * *

ফিল্ম এণ্টারপ্রাইজার্সের "দুই ভাই"-এর চিত্রগ্রহণ শেষ পর্যায়ে এসে পেঁাছেছে। পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় বোম্বাইতে ছবির অনেকগুলি বহির্দৃশ্য তুলে সম্প্রতি কলকাতায় ফিরেছেন। দুই ভাইয়ের ভালবাসাকে কেন্দ্র করে অত্যন্ত মিষ্টি এর কাহিনী। লিখেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। দুই ভাইয়ের ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার ও বিশ্বজিৎ। প্রধান দুটি স্ত্রী-চরিত্রে আছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সুলতা চৌধুরী। হেমন্তকুমারের সুর এর একটি বিশেষ আকর্ষণ।

মহামায়া চিত্রমের প্রথম ছবি "ভাঙন"-এর শুটিংও সমাপ্তির পথে। এক উচ্চাভিলাষী যুবকের জীবন-সংগ্রামের কাহিনী অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে চিত্রায়িত করছেন তরুণ পরিচালক মোহন বিশ্বাস। ভূমিকালিপিতে আছেন অসিতবরন, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, প্রণতি ঘোষ, নমিতা সিংহ, পদ্মা দেবী আশিসকুমার প্রভৃতি। শ্যামল মিত্র ছবির সুরকার।

বিদেশে ভারতীয় সংগীত

গত ২০শে জুলাই ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ বিমানযোগে টোকিও যাত্রা করেন। সেখানে তিনি আলি আকবর কলেজ অফ মিউজিক-এর টোকিও শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। জাপানের অগণিত ভারতীয় সংগীতানুরাগীর সনির্বন্ধ অনুরোধে এই শাখা স্থাপন করা হয়েছে। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে এটি নিশ্চয়ই একটি অভূতপূর্ব ঘটনা।

টোকিও থেকে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ গেছেন কানাডাতে। মণ্ট্রিলের কানাডা কাউন্সিলের আমন্ত্রণে তিনি সেখানে ভারতীয় বাদ্যানুষ্ঠান সহকারে বক্তৃতা করবেন। গত ৩রা আগস্ট থেকে বক্তৃতামালা আরম্ভ হয়েছে। মণ্ট্রিল ইউনিভার্সিটি ও ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির ফ্যাকালটি অফ মিউজিকের তত্ত্বাবধানে এই বক্তৃতামালার আয়োজন হয়েছে।

ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ কানাডায় আরো যেসব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছেন তার মধ্যে "জেউনিসেস মিউজিকেলস্ ডু কানাডা" এবং ইণ্টারন্যাশনাল মিউজিকোলজিক্যাল সোসাইটির অষ্টম কংগ্রেস প্রধান। শেষোক্ত অধিবেশন কর্নেল ইউনিভার্সিটির তত্ত্বাবধানে আগামী ৫ই থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। বিখ্যাত তবলা-বাদক পণ্ডিত চতুরলাল ওস্তাদজীর সহযাত্রী হয়েছেন।

প্রখ্যাত তবলা-বাদক পণ্ডিত মহাপুরুষ মিশ্রও কানাডার ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রণে গত ২৯শে জুলাই বিমানযোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন। কানাডার বেতারকেন্দ্র, টেলিভিসন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থায় যুক্তভাবে ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ ও পণ্ডিত মিশ্র ভারতীয় সংগীত পরিবেশন করবেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ'দের চার মাস থাকবার কথা।

রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র-রচনা

কবিগ্রুর জন্মশতবর্ষপ্রতিকে উপলক্ষ করে এখনও দিকে দিকে রবীন্দ্রনাট্যের অভিনয় আয়োজন চলেছে। কয়েকটি খবর এখানে দেওয়া হল:

আগামী ৭ই আগস্ট ভারত নাট্য পরিষদের প্রযোজনায় 'তপতী' অভিনীত হবে। স্থান রঙমহল, সময় সন্ধ্যা সাতটা। তারাপ্রসাদ মিত্র ও ধীরেন ঘোষ যথাক্রমে এর পরিচালক ও প্রয়োগকর্তা।

আগামী ১৫ই আগস্ট সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এম্পায়ারে খেলাঘর কর্তৃক "চোখের বালি" মঞ্চস্থ হবে। মূল উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন রেজাক চৌধুরী এবং পরিচালনা করবেন বনানী চৌধুরী। ছবি বিশ্বাস এই সম্প্রদায়ের নাট্য-উপদেষ্টা।

গত সপ্তাহে উপর্যুপরি দু দিন "চিরকুমার সভা" অভিনীত হয়। ২৫শে জুলাই স্টার থিয়েটারে এর অভিনয় করেন এঞ্জিনিয়ার্স ক্লাবের সদস্যেরা। ২৪শে জুলাই মাস থিয়েটার্স কর্তৃক কৌতুকনাট্যটি অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস্ হলে অভিনীত হয়। জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় শেষোক্ত অভিনয়ের পরিচালক।

রূপান্তর সম্প্রদায় গত ২৩শে জুলাই নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউট হলে "শেষরক্ষা"র অভিনয় আয়োজন করেন।

শিশুরবির সভাবৃন্দ গত ২২শে জুলাই রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম হলে "রক্তকরবী"-র অভিনয় করেন।

কাটিহারে স্থানীয় সাংস্কৃতিক সংস্থা মঞ্চশ্রী গত ২৯শে ও ৩০শে জুলাই যথাক্রমে "খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন" ও "কাবুলিওয়ালা" গল্প দুটিকে নাটকাকারে গেঁথে অভিনয় করেন। নাট্যরূপ দেন শিশির বসু।

শ্রীমঞ্চের রবীন্দ্র নাট্যোৎসব

তিন দিনে তিনটি রবীন্দ্র নাটকের অভিনয়ায়োজন করে সুখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা শ্রীমঞ্চ কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সুষ্ঠু শিল্পশোভনতার সঙ্গে পালন করেন। ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে জুলাই মিনার্ভা থিয়েটারে এই অভিনয়ের আসর বসে।

প্রথম দিন অভিনীত হয় কবিগুরুর বিখ্যাত রূপকনাট্য "অরূপরতন"। কাহিনীর অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে মানবীয়তার সুরটুকু যে হারিয়ে যায়নি, অভিনেতৃদের সেইটাই প্রধান কৃতিত্ব। বিভিন্ন ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করেন জানকী দত্ত, যতীন চৌধুরী, কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, গণেশ মুখোপাধ্যায়, গীতা দে, মমতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। নেপথ্য রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেন প্রেমাংশু বসু। এঁরা সকলেই প্রশংসার পাত্র।

রবীন্দ্রনাথের "নতুন অবতার" গল্পটির উপভোগ্য নাট্যরূপ দেন সন্তোষ সেন। দ্বিতীয় দিনের সেইটাই প্রধান আকর্ষণ। এর বিভিন্ন ভূমিকায় ডলি মুখোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনোদ চট্টোপাধ্যায়, গণেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হাস্য-কৌতুকে সমস্তক্ষণ দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন।

শেষ দিনে অভিনীত হয় "মালিনী" এবং নিঃসন্দেহে এইটিই এই উৎসবের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। ধর্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠান ও সত্যাশ্রয়ী মানবতাবোধের মধ্যে কোনটি বরণীয়, ক্ষেমংকর ও সুপ্রিয় এই দুই বন্ধুর সংঘাতের মধ্যে তার আভাস সুন্দর নাটকীয়তার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই দুই চরিত্রের রূপায়ণে প্রেমাংশু বসু ও গণেশ মুখোপাধ্যায় উচ্চশ্রেণীর অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। নাম-ভূমিকায় মমতা চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ও মর্মস্পর্শী হয়। অন্যান্য ভূমিকায় কেতকী দত্ত, কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, যতীন চৌধুরী, অরুণ বসু, বিনোদ চট্টোপাধ্যায় ও অরবিন্দ ভট্টাচার্য আশানুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতের মধ্যে এমন একটি সুষ্ঠু সৌন্দর্যের স্পর্শ ছিল যা সহজেই মনকে ভরিয়ে তোলে।

শ্রাবণীর অনুষ্ঠান

শ্রাবণীর সভ্যাগণ গত ১৬ই জুলাই রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম মঞ্চে একটি উপভোগ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের সংগীত সহযোগে "বর্ষাগাথা" নৃত্য এবং অবধূত লিখিত "ক্রীম ক্র্যাকার" নাটকের অভিনয়।

নৃত্যে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মহাশ্বেতা রায়, বিনীতা গুপ্তা, শুক্লা চট্টোপাধ্যায়, মন্দিরা সেনগুপ্তা, লিপি বসু প্রভৃতি। শ্রীতপন গুহরায় পরিচালিত সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন অদিতি সেন, বীণা রায়, রমা চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা চট্টোপাধ্যায়, মীরা সরকার, শিবানী রায়চৌধুরী ও রবীন মুখার্জী।

নাটকটি সুঅভিনীত। মিঃ ব্যাণ্ডোর ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন সর্বাণী রায় এবং অন্যান্য ভূমিকায় সম্প্রদায়ের শিল্পীরা চরিত্রানুগ অভিনয় করেন। পরিশেষে দিলীপ গাঙ্গুলীর একক বেহালা বাদন খুবই সুখশ্রাব্য হয়।

পূজারিণী নিবেদিত "নটীর পূজা"-র শিল্পীবৃন্দ। গত ২২শে জুলাই রবীন্দ্র ভারতী মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে এর অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়

একলব্য

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম ডিভিসন লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ পাবার পর দ্বিতীয় ডিভিসনের চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছেন বাটা স্পোর্টস ক্লাব। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিস ক্লাব হয়েছে তৃতীয় ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ন। চতুর্থ ডিভিসনের এখনো মীমাংসা হয়নি। কয়েকটি ডিভিসনে অবতরণের প্রশ্নেরও মীমাংসা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে তৃতীয় ডিভিসনে অবনমিত হয়েছে অতীতের ঐতিহ্যমণ্ডিত কুমারটুলী ক্লাব। শ্যামবাজার ইউনাইটেড ও গার্ডেন রীচ ক্লাব তৃতীয় ডিভিসন থেকে চতুর্থ ডিভিসনে অবতরণের বিধানে পড়েছে। সুতরাং আই এফ এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত ময়দানে মাসখানেকের জন্য ফুটবলের মন্দাভাব। আকর্ষণের যেটুকু জীইয়ে আছে তা শুধু প্রথম ডিভিসনের অবতরণের প্রশ্নের মধ্যে। অবশ্য খেলার আকর্ষণ বললে ভুল হবে। বলা উচিত 'ম্যানেজ'-এর আকর্ষণ। কে কতখানি 'ম্যানেজ' করে শেষ পর্যন্ত প্রথম ডিভিসনে টি*কে থাকে আর কে দ্বিতীয় ডিভিসনে নেমে যায় সেইটাই দেখবার বিষয়। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে কারোই ভরসা নেই। মাঝামাঝি ধরনের যেসব টীম বেশ কিছু পয়েণ্ট সঞ্চয় করে নিজেদের নিরাপদ বলে মনে করেছিল 'ম্যানেজ'এর গুঁতোয় তাঁরাও এখন বিপদের সম্মুখীন। 'ইনফ্লেশন'-এর মার্কেট কি না তাই অল্প সঞ্চয়ে ঠাঁই পাওয়া শক্ত!

*　　*　　*

দ্বিতীয় ভাগের অর্থাৎ ফিরতি লীগের খেলা আরম্ভের সংগে সংগেই পয়েণ্টের 'ইনফ্লেশন' হতে আরম্ভ করেছে। সব চেয়ে যাঁদের নামবার ভয় ছিল সেই স্পোর্টিং ইউনিয়নের কথাই ধরা যাক। স্পোর্টিং ইউনিয়ন প্রথমবারের ১৪টি খেলায় পেয়েছিল মাত্র ৭ পয়েণ্ট। ফিরতি লীগের ৮টি খেলায় আর ৯ পয়েণ্ট সংগ্রহ করায় এখন তাঁরা প্রায় নিরাপদ। দ্বিতীয় ডিভিসনে নামবার আশঙ্কায় শঙ্কিত আর আর ক্লাবও অপ্রত্যাশিতভাবে পয়েণ্ট সংগ্রহ করে চলেছে, অপ্রত্যাশিতভাবে দুর্বল টীমের কাছে হার স্বীকার করছে শক্তিশালী বড় বড় ক্লাব। খেলা দেখে বুঝতে একটুও অসুবিধে নেই যে এরা ইচ্ছে করেই হেরে যাচ্ছে। খেলার আগেই খেলার ফলাফল গড়াপেটা হচ্ছে। ফুটবল ক্ষেত্রে দুর্নীতি বেড়েই চলেছে। অবশ্য কলকাতার ফুটবলে দুর্নীতি আজকের নয়। বহুদিনের। তবে এবার যেন ফুটবলের মধ্যে দুর্নীতি একটু বেশী করেই শিকড় গেড়েছে। কেউই এই দুর্নীতি থেকে মুক্ত নয়। ঘুষ দেওয়া আর নেওয়া যেমন সমান অপরাধ, এখানে পয়েণ্ট চাওয়া আর সেই পয়েণ্ট 'উপহার' দেওয়াও তেমন সমান অপরাধ। তবু প্রয়োজনের তাগিদে, প্রথম ডিভিসনে টিকে থাকার জন্য যারা পয়েণ্ট চায়, তাদের অপরাধের একটা যুক্তি আছে, কিন্তু ইচ্ছে করে হেরে গিয়ে বা আদৌ না খেলে সেই পয়েণ্ট যারা উপহার দেয় তাদের কোনো যুক্তি নেই। তারা আরও অপরাধী।

এই প্রসংগে প্রধান তিনটি ক্লাব ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহমেডান স্পোর্টিং-এর আচরণ সত্যিই অত্যন্ত দুঃখের। কে বিশ্বাস করবে মোহনবাগান এবার ৭টি খেলায় হারার মত টীম? মহমেডান স্পোর্টিং-এর ৭টি পরাজয় খেলার যুক্তিযুক্ত ফলাফল? লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলের আচরণ আরও বিচিত্র! চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের পর রাজস্থানের বিরুদ্ধে দুর্বল টীম নামিয়ে তাদের পরাজয় স্বীকার আর স্পোর্টিং ইউনিয়নের সংগে না খেলে দুটি পয়েণ্ট উপঢৌকন দেওয়া কি চ্যাম্পিয়ন টীমের যোগ্য কাজ হয়েছে?

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের তরফ থেকে যুক্তি দেওয়া হয়েছে: কুয়ালালামপুরে মার্ডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য নির্বাচিত ভারতীয় দলে তাদের ৫ জন খেলোয়াড় স্থান পেয়েছেন; সুতরাং ভারতীয় ফুটবলের ঐতিহ্য ও সম্মান রক্ষার্থে কুয়ালালামপুর যাত্রার আগে তাঁদের আর কোন খেলায় অংশ গ্রহণ অনুচিত। তাই স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তারা খেলতে নামেনি।

যুক্তি দিলে অনেকভাবেই দেওয়া চলে। যে খুনী তারও খুন করার একটা যুক্তি

কলকাতা ফুটবল লীগের দ্বিতীয় ডিভিসন চ্যাম্পিয়ন বাটা স্পোর্টস ক্লাব। আগামী বছর এরা প্রথম ডিভিসনে খেলবার অধিকার পেয়েছে।

থাকে। আর যারা অচেতন পদার্থ ফুটবলকে 'খুন' করছে তাদের মুক্তি থাকবে না?

* * *

ছোট ছোট ক্লাবের কাছে বড় বড় ক্লাবের অপ্রত্যাশিত ও প্রহসনমূলক পরাজয় দেখে প্রকৃত ক্রীড়ামোদী দর্শকরা বলতে আরম্ভ করেছেন—'খেলা আর খেলা নেই! খেলোয়াড়দের নেই নিজস্ব সত্তা—তারা ক্লাবের হাতের পুতুল। আর ক্লাবগুলো সর্বশক্তিমান আই এফ এ সম্পাদকের অর্ডার সাপ্লাইয়ের কারখানা!!!'

আশ্চর্য এই, আজ যাঁরা দুর্নীতির প্রশ্রয় দিচ্ছেন এবং যাঁদের প্ররোচনায় দুর্নীতি গভীর মাটিতে শিকড় গেড়ে বসেছে, কাল তাঁরাই বলবেন যেহেতু 'প্রোমোশন রেলিগেশন' অর্থাৎ লীগে উঠা নামা থাকায় দুর্নীতি দেখা দিয়েছে সেহেতু উঠা নামা বন্ধ থাক। তা হলে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে। প্রথম ডিভিসনে তাঁদের আসন চিরদিন বহাল থাকবে।

লীগের খেলায় ফলাফলের এই রকম হেরফের হলে অন্য দেশে তক্ষুনি 'এনকোয়ারি কমিটি' বসিয়ে তার কারণ অনুসন্ধান করা হয়। এনকোয়ারি কমিটি অবশ্য এখানেও একটা খাড়া করা হয়েছে। কিন্তু তার সদস্য হয়েছেন তাঁরাই যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। বলিহারি ফুটবলের শাসন ব্যবস্থা! আই এফ এ-র অন্তর্ভুক্ত ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে গড়া এই এনকোয়ারি কমিটির নাম 'অনুসন্ধান কমিটি' না দিয়ে 'আত্মানুসন্ধান কমিটি' দিলেই ঠিক হত।

* * *

বাটা স্পোর্টস ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিসন লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করায় তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। ঐকান্তিক আগ্রহ থাকলে ধীরে ধীরে যে অভীষ্ট সফল হয় তার প্রমাণ বাটা স্পোর্টস ক্লাব।

বাটা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের ভাল ভাল চাকরি দিয়ে চিরদিনই শক্তিশালী করে দল গড়তে চেষ্টা করেছেন। অতীতে বাটা ক্লাব ছিল অফিস লীগের প্রতিষ্ঠাবান ক্লাব। কিন্তু অফিস লীগের অল্প পরিসরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা অর্জনে 'বাটা'র মন ভরেনি। ফুটবলের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার জন্য তারা উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু অফিস টীম তো আর ওপেন টীম হিসাবে খেলতে পারে না। আর ওপেন টীম হিসাবে খেলতে হলে আদি থেকে আরম্ভ করতে হয়। তাই বাটা স্পোর্টস ক্লাব অফিস ক্লাব হিসাবে না খেলে ১৯৫১ সাল থেকে বেঙ্গল সকার লীগে 'ওপেন ক্লাব' হিসাবে খেলতে আরম্ভ করে।

ঐ বছরই বেঙ্গল সকারের চ্যাম্পিয়ন। পরের বছর চতুর্থ ডিভিসনে উন্নয়ন। ১৯৫৩ সালে আবার চতুর্থ ডিভিসনে চ্যাম্পিয়নশিপ। কিন্তু তৃতীয় ডিভিসনে ওঠার পথ অর্গলবন্ধ। 'প্রোমোশন রেলিগেশন' বন্ধ। 'প্রোমোশন রেলিগেশন'-এর প্রবর্তনের সঙ্গে ১৯৫৫ সালে তৃতীয় ডিভিসনে এবং ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় ডিভিসনে উন্নয়ন। অফিস লীগে খেলবার সময় ১৯৪২ সালে রোভার্স কাপ লাভও বাটা দলের ক্লাব ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা।

বাটা স্পোর্টস ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিসন থেকে প্রথম ডিভিসনে খেলার অধিকার পাওয়ায় কিছু উঠতি খেলোয়াড়ের একটা হিল্লে হবার সম্ভাবনা আছে। আশা করা যায় বাটার কর্তৃপক্ষ ভাল ভাল খেলোয়াড়দের চাকরি দিয়ে দলে টানতে চেষ্টা করবেন।

* * *

গত মাসের 'ওয়ার্লড স্পোর্টস'-এ ভারত ও পাকিস্তানের ক্রিকেট সম্পর্কে যে বক্রোক্তি করা হয়েছে তার প্রতিবাদ করেছেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান লালা অমরনাথ।

নিবন্ধ লেখক আর কেউ নন—বিশ্ববিখ্যাত ক্রীড়া পত্রিকা 'ওয়ার্লড স্পোর্টস'-এর সুখ্যাত ক্রীড়া সমালোচক ও সম্পাদক স্বয়ং মিঃ ফিল পিলে। মিঃ পিলে লিখেছেন—"ভারত ও পাকিস্তানের ভদ্রমহোদয়রা ক্রিকেট সম্পর্কে এমন কিছু করেননি যাতে উপলব্ধি করা যায় ক্রিকেট খেলাটি চিত্তাকর্ষক, উত্তেজনামূলক ও আনন্দদায়ক খেলা। গত শীত মরসুমে ভারত ও পাকিস্তানের টেস্ট খেলা হয়েছে। নিষ্প্রাণ ও গতিহীন। পাঁচটি টেস্ট খেলার ফলাফলই অমীমাংসিত থেকে গেছে।"

লালা অমরনাথ মিঃ ফিল পিলের বক্রোক্তির তীব্র প্রতিবাদ করে তাঁকে ১৯৫১-৫২ ও ১৯৫৯-৬০ সালের ঘটনা স্মরণ করতে বলেছেন। আর স্মরণ করতে বলেছেন রণজিৎ সিংজী, দলীপ সিংজী ও পতৌদির নবাবের অনুপম ক্রিকেট খেলার কথা। তা ছাড়া অমরনাথ বলেছেন—সমালোচক কোনোদিন ভারতে আসেননি, ভারতের পিচ সম্পর্কেও তাঁর কোন জ্ঞান নেই। সুতরাং আগামী শীত কালে তিনি এম সি সি-র সঙ্গে ভারতে এসে যেন আমাদের খেলা দেখে তাঁর ভুল ধারণা শুধরে যান।

১৯৫১-৫২ সালে মাদ্রাজে আমরা ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছিলাম। ১৯৫৯-৬০ সালে কানপুরে পরাজিত করেছিলাম অস্ট্রেলিয়া দলকে। কিন্তু শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় এইটুকু কৃতিত্ব ছাড়া দীর্ঘ ৩০ বছরের ক্রিকেট ইতিহাসে আমাদের আর বিশেষ কৃতিত্ব নেই। ১৯৫১-৫২ সালের নাইজেল হাওয়ার্ডের ইংলণ্ড টীমও ছিল বেশ হীন-শক্তিসম্পন্ন।

রণজি, দলীপ ও পাতৌদিকে নিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের—আমাদের কেন, সারা পৃথিবীর গর্ব করার কারণ আছে, যদিও তাঁদের খেলা শেখা ইংলণ্ডের আবহাওয়ায় এবং ইংলণ্ডের মাটিতে। নাইডু, অমরনাথ, মানকড়, পরলোকগত অমর সিং, আজকের আব্বাস আলী ক্রিকেটের নিপুণ শিল্পী হিসাবে বিশ্ববন্দিত। তবুও এ কথা স্বীকার করতে আমাদের দ্বিধা থাকা উচিত নয় যে, ক্রিকেটের স্বর্ণযুগকে অতীতের অন্ধকারে ঢেকে বর্তমানে আমরা নেতিমূলক খেলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। আজ একজন বিদেশী, বিশেষ করে সাহেব সমালোচক আমাদের সম্পর্কে বক্রোক্তি করেছেন বলে আমাদের কটু লাগছে, কিন্তু আমাদের দেশের সমালোচকরা কি পাক-ভারত টেস্টের নিষ্প্রাণ খেলার বিরূপ সমালোচনা করেননি? এখানেও আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন।

—মুকুল—

লীলা ব্যানার্জী

যেসব বাঙালী মহিলা পঁচিশ বিশ কি পনের বছর আগে খেলার জগৎ আলো করেছে, আজ তাঁদের সবাইকে চেষ্টা করে খুঁজে বার করতে হয়। সে যুগের যিনি নিজে থেকে এসে এ যুগে খবরের কাগজের পৃষ্ঠা অধিকার করেছেন তিনি সাঁতার-পটিয়সী লীলা দেবী।

লীলা দেবী বলছি, কারণ বর্তমানের বিবাহিত জীবনে যিনি বন্দ্যোপাধ্যায়, সে যুগে তিনি চট্টোপাধ্যায় ছিলেন।

ভুলেই গিয়েছিল সবাই লীলা চ্যাটার্জিকে, যাঁকে নিয়ে একদিন সজনী দাস কবিতা লিখেছিলেন; অন্তত মনের উপরের স্তরে কোন ঠাঁই ছিল না তাঁর। হঠাৎ একদিন বিস্মৃতির আড়াল থেকে, অন্তঃপুরের প্রাচীর ভেদ করে, হাঁড়িখুন্তি নামিয়ে রেখে তিনি এগিয়ে এলেন. বললেন, ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরাবো। হঠাৎ এ খেয়াল জাগলো কেন সে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন,—

আরতির অসাধারণ কৃতিত্বে আজ বাঙালী মেয়ের সম্মান দুনিয়াময় ছড়িয়ে গেছে, যে বাঙালী মেয়েদের, কোন কাজের নয়, শুধু কাঁদতে জানে বলে দূরে ছাই করেছে ঘরে বাইরে সবাই। আরতি প্রমাণ করেছে বাঙালী মেয়ের অ্যাডভেঞ্চার স্পৃহা। তবু আমাদের বদনাম যায়নি। ওরা বলছে, বয়েসকালে যদি বা কিছু প্রাণশক্তি থাকে, বাঙালী ঘরের ঘরকন্না আর ছেলে-মেয়ের হেস্তনেস্তে কেউটেও কেঁচো মেরে যায়। আমি ঘরকন্না করছি ষোল বছর; সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী গৃহস্থবধূর জীবন, যেখানে শুধু রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা, সারাজীবন এক চাকাতেই বাঁধা, সেখানে তিনটি সন্তানকে কোলে পিঠে করে মানুষ করে বড় করে তুলতে হয়েছে। তা বলে আমার সেই মনের সাহস, অন্তরের অ্যাডভেঞ্চারের স্পৃহা? কই, তা তো মরেনি। অনুজপ্রতিম ডাঃ বিমল চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ৩৭ বছর বয়সের কোন জননী বা গৃহিণী ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরাবার প্রয়াস করেছে, এমন খবর তার জানা নেই। অতএব...

ক'দিন বাদেই একটানা আট ঘণ্টা সাঁতার কেটে প্রমাণ করে দিলেন, দক্ষতা অটুট। চারদিক থেকে সাহায্য ও উৎসাহ আসতে লাগলো। তৈরী হল পাসপোর্ট, ভিসা। ডাঃ বিমল চন্দ্র ছুটি নিয়ে তৈরী, সঙ্গে যাবেন ম্যানেজার হয়ে। ডোভারে ঘর ভাড়া হয়ে গেল, হয়ে গেল প্লেনে প্যাসেজ বুক করা। নিষ্ঠা সহকারে নিয়মিত অনু-শীলনও চলছে। ভারত সরকার থেকে বিদেশী মুদ্রা অনুমোদন এলেই যাত্রা।

অনেক কাঠখড় পোড়ানো সত্ত্বেও সে অনুমোদন গত বছর মেলেনি। এবারের জন্য চেষ্টা চলছে সেই থেকেই। বহু পার্লামেণ্ট সদস্য, মন্ত্রী, বিধানসভা সদস্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। ভারত সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খুঁটিনাটি তথ্য জেনে নিয়েছে, কবে যাত্রা করা দরকার তাও জেনে নিয়েছে। কিন্তু আজও কোন খবর নেই। অথচ ইংলিশ চ্যানেলের সীজন হু হু করে ছুটছে সমাপ্তির দিকে। এবারও কি সরকারী ঔদাসীন্য ব্যর্থ করে দেবে এত বড় একটা অ্যাডভেঞ্চার স্পৃহা?

যদি ব্যর্থ হয়ই, তাহলেও কিন্তু লীলা চ্যাটার্জি মুছে যাবার নয়। সেই সুদূর ১৯৩৩ সালে ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুর থেকে সৌরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁর আট ও দশ বছর বয়সের দুটি মেয়েকে এনে বিজ্ঞানসম্মত সাঁতার শিখবার জন্য পৌঁছে দিয়েছিলেন সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবে,

কুমারী জীবনের লীলা চ্যাটার্জি

সাঁতারের গুরুর গুরু শ্রীযুক্ত শান্তিপ্রিয় পালের কাছে। ছোট বোন লীলা, বড় বোন রানী। প্রতিদিন দু' বোন বারুইপুর থেকে হেদোয় আসে, আর শান্তিদার কঠোর শাসনে প্রাণপণ অনুশীলন করে। এর পর শান্তিদা লীলাকে নিজের বাড়িতে এনে মেয়ের মত পালন করতে লাগলেন, আর তাঁর সঙ্গে চললো সাঁতারের সাধনা।

পরম লগন এলো তিন বছর বাদে ১৯৩৬ সালের ৩রা আগস্ট, যেদিন লীলা তখনকার চ্যাম্পিয়ান বাণী ঘোষকে হারিয়ে, তার রেকর্ডও ম্লান করে দিল। আগের বছর লীলা গঙ্গাবক্ষে এক মাইল সাঁতারে বাণীকে মেরেছিল কিন্তু 'মেট্রিক' সাঁতারে এই প্রথম।

সেদিন থেকে আর লীলা চ্যাটার্জিকে বাংলা দেশে হারতে পারেনি কেউ। তবে হারিয়েছিল পাঁচজন পুরুষ সাঁতারু; যখন দু বছর বাদে তাঁকে গঙ্গার বুকে ত্রিশ মাইল সাঁতারে নামিয়েছিলেন শান্তিদা। হুগলী জুবিলি ব্রিজ থেকে কুমারটুলি ঘাট অবধি এই সাঁতারে সারা ভারতের জন ত্রিশেক প্রতিযোগীর মধ্যে নারী মাত্র এই তের বছরের মেয়েটি। চন্দননগরের পরে প্রবল ঝড় উঠলো। গঙ্গার বুক উন্দাম, নৌকা-গুলি প্রতিযোগীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অর্ধেকের বেশী সাঁতারুকে উঠে পড়তে হল। শেষ সীমায় পৌঁছলো মাত্র বারজন, তার মধ্যে লীলা চ্যাটার্জি ষষ্ঠ, তার সময় লেগেছিল পাঁচ ঘণ্টা চৌত্রিশ মিনিট। অথচ প্রথম দিন গঙ্গায় সাঁতার কাটতে এসে শুশুকের ডিগবাজি দেখে ভয়ে নৌকোয় উঠে পড়েছিল লীলা।

এর পর লীলাদের সংসারে বিপর্যয় এলো সৌরেনবাবুর মৃত্যুতে এবং কিছু দিন বাদেই লীলাকে বিয়ে দেওয়া হল। সাঁতারের পর্বে ছেদ পড়লো।

১৯৪৪ সালে বোম্বাইয়ের একদল সাঁতারু এল কলকাতায়, বাঙলার সাঁতারুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে। যে দলে ছিল ঝানু সাঁতারু বৃটিশ মেয়ে প্যাম ব্যালাণ্টাইন। ব্যালাণ্টাইনের বিরুদ্ধে টক্কর দিয়ে চলতে পারে এমন মেয়ে কই বাঙলায়? লীলা তখন প্রথমজাত পুত্রের বিয়োগে বিহ্বল। তবু ডাক পেয়ে এল বাংলার মুখ রক্ষা করতে। ব্যালাণ্টাইনকে হারাতে পারেনি, তবে এমন তাড়া করেছিল, ব্যালাণ্টাইন তা ভোলেনি কোনদিন। সেবারই লাহোরে জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে প্রতিটি বিষয়ে ব্যালাণ্টাইনের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থান পান লীলা ব্যানার্জি। ব্যালাণ্টাইন অপরাজিত গৌরব নিয়েই ভারত ছাড়ে, আর লীলা ব্যানার্জির সাঁতার-জীবনেও এইখানে যবনিকা পড়ে; তিনি পাকাপাকিভাবে অবসর

গ্রহণ করেন। ডাইভিং-এ তাঁর পারদর্শিতার কথা পুরোনো খবরের কাগজে নথিবন্ধ হয়ে আছে। একাধিকবার ৩০ ফুট বোর্ড থেকে ডাইভিং প্রদর্শনী দিয়েছেন তিনি।

শুধু জলে নয়, সাইকেল চালানোয়, দস্যি-গিরি করাতে, নাচে, গানে, অ্যাথেলেটিকসে লীলা চ্যাটার্জি যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই জয়লাভ করেছেন। বিষ্ণু ঘোষের আখড়ায় নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করেছেন, আবার গভীর নিষ্ঠায় সেতার শিক্ষা করেছেন গুরু কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে। সেতার শুনে মুগ্ধ হয়ে সে যুগের বেতার কর্তা নৃপেন মজুমদার ওঁকে বেতারে বাজাতে ডেকে-ছিলেন, কিন্তু সেদিকে 'উৎসাহী' অভিভাবকের অভাব ছিল বলে শেষ পর্যন্ত বেতারে যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

মুখে কথাটি নেই, সেকালেও ছিল না, আজও নেই। সাঁতার শিখতে শান্তিদার বকুনি ও চড়চাপড় তাও চুপ করে সহ্য করেছে। কিন্তু দস্যিগিরিও কম ছিল না। বালিগঞ্জে জ্যাঠার বাড়িতে রয়েছে কিশোরী লীলা। এক ভদ্রলোক এলেন সেখানে মোটর সাইকেল চড়ে। এমনভাবে মোটর সাইকেলটি খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো যে, ভদ্রলোক সাগ্রহে ওকে চালানোর মূল নীতি শিখিয়ে দিয়ে মোটর সাইকেলটি রেখে ভিতরে যাবার সময় সাবধান করে দিয়ে গেলেন, খবরদার খুকি, হাত দিও না। বরং আমি তোমাকে চড়িয়ে আনবো।

গেল, গেল, সোর উঠলো চারদিকে। একটা কিশোরী মেয়েকে নিয়ে একটা গর্জমান মোটর সাইকেল ছুটে গিয়ে পেঁছিলো বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে একটা পুকুরে। আরোহিণী সাইকেল ছেড়ে জলে ভেসে উঠে সাঁতার কাটতে লাগলো। মোটর সাইকেল রইল ডুবে। লীলা ভাবছিল সেও যদি ডুবে থাকতে পারতো, ধরা পড়তে হত না তবে। ধরা পড়ে ভালই হল। মোটর সাইকেলটার সন্ধান পাওয়া গেল।

আরো আগের কথা। লীলা তখন শান্তিদার বাড়ি থাকে। সন্ধ্যার পর শান্তিদা ওকে সঙ্গে করে ছবিঘরে নিয়ে যান, সেখানে উনি ম্যানেজার। প্রতিদিনের মত সেদিনও দারোয়ান দিয়ে রিক্‌শ করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন লীলাকে। রাত দুপুরে নিজে ফিরে গিয়ে শোনেন, কোথায়, সে মেয়ে বাড়ি আসেনি তো। ছবিঘরে গিয়ে দরোয়ানকে তলব করে জানা গেল, সে বাড়ির দোরগোড়ায় ছেড়ে দিয়ে গেছে। সর্বনাশ! খোঁজ, খোঁজ, থানা পুলিস, এদিক ওদিক কোন হদিস নেই। শেষ পর্যন্ত ছবিঘরে দোতলার বক্স আসনে পাখার নীচে ঘুমন্ত লীলাকে আবিষ্কার করা গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সবাই। লীলাও বক্স আসনে বসে স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলেছিল। পরে কৈফিয়ত দিয়েছিল, অন্ধকারে, কড়া নেড়ে নেড়ে হয়রান, কেউ সাড়া দেয় না, ভীষণ ভয় করছিল যে।

পুত্রকন্যার সঙ্গে লীলা ব্যানার্জি

সেই লীলার খবর বর্তমানে শ্রীযুক্তা লীলা ব্যানার্জিরও বিশেষ স্মরণ নেই। অনেক খবরই শান্তিদার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছে। এখন তার দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে স্কুলের উপরের ক্লাসে পড়ে। স্বামী শ্রীসুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার নাম-করা মার্কেন্টাইল ফার্মে চাকরি করেন। লীলা দেবী সময় পেলেই দেব-মন্দিরে যান ভক্তি নিবেদন করতে ও পুজো দিতে।

সেদিনের সেই দস্যি মেয়ে আজ শান্ত, মাতৃত্বের পূর্ণতায় মহিমান্বিতা। সাঁতার-জীবনে পূর্ণতা লাভের আগেই তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয়েছিল বলেই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, বড় একটা কিছুর জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়েছেন।

খেলার রাজ্যে কৃতিত্বের অধিকারী আর কাউকে নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠিত কবি কবিতা লেখেননি। কোন খেলোয়াড়ের স্থান নেই বাঙলা সাহিত্যে। লীলা চ্যাটার্জিকে নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন সজনীকান্ত দাস। সেদিক দিয়ে তিনি অনন্য, স্বীকৃতিতে নয় যোগ্যতায়।

সজনীকান্ত লিখেছিলেন :

সলিল সাবলীলা কুমারী লীলা সুখে
অগাধ স্রোতে তুমি দাও সাঁতার,
পিছনে পড়ে আছি বাঁধের বাঁধমুখে
মোদের চারদিকে ভীম পাথার।
রাষ্ট্রে সমাজে কি শরীরচর্চায়
ধরার খেলাঘরে আমরা 'দীন'-
দেখ তো পার যদি, তোমার সাধনায়
কালিমা ঘুচে যায় একটি দিন।
সকল পরাজয়ে একটি [illegible]
বিজয়ী হয়ে পারি তুলিতে শির,
গাহিব তব নাম আমরা নিরবধি,
কুমারী লীলা হও সাঁতারে ধীর।
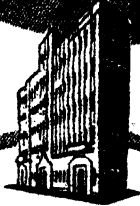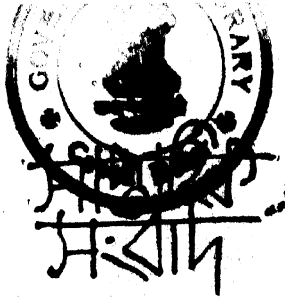
দেশী সংবাদ

২৪শে জুলাই—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেতন কমিটির রিপোর্ট সুনিশ্চিতভাবে জানিতে পারা যায় নাই। তবে ইতিমধ্যে বিশ্বস্ত সূত্রে যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে' তাহাতে বলা যায়, কমিটির সুপারিশে সবচেয়ে লাভবান হইবেন, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিবৃন্দ।

আগস্ট মাসে পশ্চিমবঙ্গের পাটকলসমূহে প্রস্তাবিত তৃতীয় ব্রক ক্লোজারের বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে ভারতীয় পাটকল সমিতি রাজ্য সরকারের নিকট আরও শতকরা ১৮টি তাঁত বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাব দিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। বর্তমানে শতকরা ১২টি তাঁত বন্ধ আছে।

২৫শে জুলাই—ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন আজ অপরাহ্নে সংবিধানের ৬৫(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কার্য সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতার কলেজসমূহে ছাত্র ভরতি সমস্যার আশু সমাধানের দাবিতে ছাত্ররা অদ্য হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা ভবনের একতলায় অবস্থান ধর্মঘট শুরু করিয়াছেন। কয়েকজন ছাত্রী সহ প্রায় এক শত ছাত্র উহাতে যোগ দিয়াছেন।

২৬শে জুলাই—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ জাতিকে এই কথা বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে এবং আগামী ৫।৬ মাসের মধ্যেই পৃথিবী বড় রকমের যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের পাটকলসমূহে আগস্ট মাসে তৃতীয় ব্রক ক্লোজারের বদলে শতকরা আরও ১৮টি তাঁত বন্ধ করার জন্য ভারতীয় পাটকল সমিতি রাজ্য সরকারের নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন রাজ্য সরকার বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের খাতিরে তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

২৭শে জুলাই—আগামী অক্টোবর হইতে ১৯৬২ সালের জুন মাসের ভিতরে "কাজের মরসুমে" পশ্চিমবঙ্গ হইতে আরও ছয় হাজার উদ্বাস্তু পরিবারকে পুনর্বাসনের নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যে প্রেরণের প্রস্তাব হইয়াছে। দণ্ডকারণ্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ঐ সময়ের ভিতরে আরও ৫০ হাজার একর জমি উদ্ধার করিয়া এক শতটি নূতন গ্রাম বসাইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন।

২৮শে জুলাই—আজ তথ্যাভিজ্ঞ মহলের সংবাদে প্রকাশ, বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং হুগলী জেলার ডি ভি সি-র অধীন সেচযোগ্য ৯ লক্ষ একর জমির ভিতরে এ পর্যন্ত মাত্র আড়াই লক্ষ একর জমিতে সেচের জল পৌঁছিয়াছে। অর্থাৎ সেচের জলের অভাবে শতকরা ৪০ ভাগ জমিতেই চাষ-আবাদ বন্ধ হইয়া রহিয়াছে।

অদ্য চতুর্থ দিনেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা ভবনে ছাত্রদের অবস্থান ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। এইদিন পূর্বঘোষণা অনুযায়ী ছাত্র ভরতি সমস্যার সমাধানের দাবিতে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিকাংশ কলেজ ও বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট করে।

২৯শে জুলাই—বর্ধমান হইতে ১৬ মাইল দূরে মেমারি মোবাইল চেক পোস্টের নিকট তাতারপুরে লরি চালকদের এক মারমুখী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য জনৈক পুলিস অফিসার তাঁহার রিভলবার হইতে চার রাউণ্ড গুলী ছোড়েন। গুলীবিদ্ধ হইয়া দুইজন আহত হয়। এই ঘটনার ফলে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ৩।৪ মাইল ধরিয়া ২৬ ঘণ্টা যানবাহন বন্ধ থাকে।

৩০শে জুলাই—কংগ্রেস সভাপতি শ্রী এন সঞ্জীব রেড্ডী আজ রাত্রে সাংবাদিকদের নিকট বলেন, যে সমস্ত মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী ছয় বৎসরের বেশী রাজ্যসভা ও বিধান পরিষদের সদস্য হিসাবে আছেন, তাঁহাদিগকে আগামী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ বেতন কমিটির সম্ভাব্য সুপারিশ সম্পর্কে বিভিন্ন বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া ইঙ্গিত হইতে জানা গিয়াছে যে, ঐ সুপারিশে লোয়ার ডিভিসন কেরানীর নূতন স্কেল ১২৫৲—২০০৲ টাকা হওয়ার সম্ভাবনা এবং চতুর্থ শ্রেণীর পিয়ন ইত্যাদি কর্মীর স্কেল ৬০৲—৭০৲ টাকা হইতে পারে।

বিদেশী সংবাদ

২৪শে জুলাই—লণ্ডনের ডেলি এক্সপ্রেসের ভাষ্যকার আজ লিখিয়াছেন—বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে যেসব খবর আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, পূর্ব জার্মানীতে রুশ-বিরোধী মনোভাব চরমে উঠিয়াছে। কাজেই পূর্ব জার্মানীতে সরকার-বিরোধী সশস্ত্র অভ্যুত্থান বিচিত্র নয়।

জানা গেল, চন্দ্রবিজয়ের পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সপ্তাহে পৃথিবী হইতে পাঁচ লক্ষ মাইলেরও দূরে একটি মহাজাগতিক গবেষণাগার পাঠাইতেছে।

২৫শে জুলাই—গত কাল 'শিকাগো সান-টাইমস' পত্রিকায় বলা হইয়াছে যে, প্রেসিডেণ্ট কেনেডী বার্লিন লইয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত কোরিয়া যুদ্ধের মত সীমাবদ্ধ আকারে যুদ্ধে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

আজ তিউনিসে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রেসিডেণ্ট বরগুইবা বলেন যে, বিজার্তার যুদ্ধ শেষ হইবার পরও ফরাসী সৈন্যরা নিজেদের ঘাটিতে ফিরিয়া যায় নাই। তিনি ঘোষণা করেন, "আমরা নূতন করিয়া সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত—আমরা শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ করিতে সংকল্পবদ্ধ।"

২৬শে জুলাই—প্রেসিডেণ্ট কেনেডী রাশিয়াকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন, "পাশ্চাত্ত্য শক্তিসমূহ নিজে নিজ স্বার্থে মশগুল, তাহারা দুর্বল এবং তাহাদের মধ্যে অনৈক্য এত বেশী যে, তাহারা পররাজ্য আক্রমণে বাধা দিতে আসিবে না বলিয়া যে ধারণা আপনারা মনে পোষণ করিতেছেন, তাহা এ মুহূর্তেই ত্যাগ করুন।"

প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর বার্লিন সংক্রান্ত বেতার বক্তৃতা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' বলেন—বক্তৃতাটিতে মার্কিন অস্ত্রসজ্জার একটি সাফাই দিবার চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে।

২৭শে জুলাই—এক বৎসরকাল ২,৫০,০০০ পর্যন্ত রিজার্ভ সৈন্য প্রস্তুত রাখার এবং বার্লিনকে উপলক্ষ্য করিয়া যুদ্ধ বাধিলে তাহা প্রতিরোধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আরও ৩·৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের ক্ষমতাদানের জন্য প্রেসিডেণ্ট কেনেডী মার্কিন কংগ্রেসকে অনুরোধ করিয়াছেন।

তুর্কী হাইকোর্ট আজ ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে ইস্তাম্বুল ও আঙ্কারায় ছাত্র বিক্ষোভ সংক্রান্ত অভিযোগে পূর্বতন গবর্নমেণ্টের ৬৯ জন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও তাঁহাদের অনুগামীগণকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট সেলাল বেয়ার, ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী শ্রীমেণ্ডার্স, মেণ্ডার্স মন্ত্রি-সভার সদস্যবর্গ এবং ভূতপূর্ব চীফ অব স্টাফ জেঃ আর্দেলহোন।

২৮শে জুলাই—ফ্রান্স অদ্য বিজার্তা সম্পর্কে তিউনিসিয়ার সঙ্গে তাহার বিরোধে রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপ সরকারীভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, একমাত্র ফ্রান্স ও তিউনিসিয়ার মধ্যে সরাসরি আলোচনার দ্বারাই এই বিরোধের মীমাংসা হইতে পারে।

২৯শে জুলাই—ভারতের বৃহত্তম নগরী কলিকাতার উন্নয়ন সমস্যা সমাধানের জন্য ফোর্ড ফাউণ্ডেশন আজ সর্বসাকুল্যে ১৪ লক্ষ ডলার (প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা) মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ফাউণ্ডেশন আরও ঘোষণা করেন যে, কলিকাতার জন্য একটি "মাস্টার প্ল্যান" রচনার কার্যে ৮ লক্ষ ডলার ব্যয়িত হইবে।

সোভিয়েট জ্যোতির্বিদগণ পৃথিবী হইতে ৮০০ আলোকবর্ষ দূরে "শ্বেত বামনবৃন্দ" নামক একটি বৃহৎ নক্ষত্রপুঞ্জ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই নক্ষত্রপুঞ্জটি অতিশয় ঘনসন্নিবিষ্ট, স্বল্পপ্রভ এবং অত্যুত্তপ্ত।

৩০শে জুলাই—আজ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সর্বপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হইবার সম্ভাবনায় তিউনিসিয়াকে সাহায্য করার জন্য সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র অবিলম্বে সেখানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিতেছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ উহার ২০ কোটি দেশবাসীকে এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ১৯৮০ সালের মধ্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করা হইবে এবং জনগণের কোন কোন অংশকে বিনা মূল্যে খাদ্য যোগানো সম্ভবপর হইবে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲ ও ত্রৈমাসিক—৫৲ টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২৲, ষাণ্মাসিক—১১৲ টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫৲ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২০—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
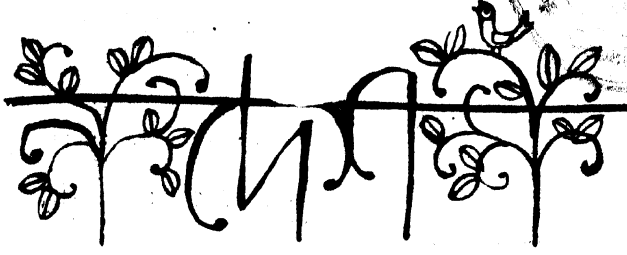
DESH 40 Naye Paise.
SATURDAY, 12TH AUGUST, 1961

২৮ বর্ষ ॥ ৪১ সংখ্যা ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৭ শ্রাবণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

স্বাধীনতা উৎসব

ভারতবর্ষের জাতীয় উৎসব দুটি—পনেরই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস, ছাব্বিশে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস। প্রথমে স্বাধীনতা লাভ, তার পর প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। চৌদ্দ বৎসর পূর্বে পনেরই আগস্টের নবীন প্রভাতে ভারতেতিহাসের নূতন অধ্যায়ের সূচনা। তারপর বৎসরে বৎসরে পনেরই আগস্ট ফিরে আসে, স্মরণ করিয়ে দেয়, চৌদ্দ বৎসর পূর্বে এই দিনটিতে ভারতবর্ষের নব জন্ম; বহু শতাব্দীর স্বপ্ন ও কোটি কোটি দেশবাসীর সংকল্প এই দিনটিতে সার্থক। কালের ধারায় ১৯৪৭ সালের এই দিনটি ক্রমশ দূর থেকে দূরতর অতীতের অংশীভূত হবে, স্বাধীনতা লাভের সেই ঐতিহাসিক ক্ষণটির প্রাণমনমাতানো উন্মাদনা ভাবীকালের কল্পনার সামগ্রীতে পরিণত হবে, কিন্তু বর্ষে বর্ষে পনেরই আগস্টের স্বাধীনতা উৎসবের আনন্দছন্দে তবু ধ্বনিত হতে থাকবে ১৯৪৭ সালের এই দিনটির জীবন্ত স্পন্দন।

পনেরই আগস্ট স্বাধীনতা উৎসব দিবসে আমরা গভীরভাবে অনুভব করি আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের অখণ্ড ঐক্য এবং একাত্মতা। জাতীয় উৎসবের নিগূঢ় তাৎপর্য এই একাত্মবোধ। বিরাট দেশ ভারতবর্ষ, বিপুল তার জনসংখ্যা, বিচিত্র তার বহুভাষী লোকসমষ্টি। তারপর দীর্ঘকাল পরবশতা এবং অনগ্রসরতার অভিশাপ এই বিরাট দেশের জনজীবনের স্তরে স্তরে কত যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কাজেই আমাদের জাতীয় চেতনা এখনও যে সুস্থ, আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারে নি সেকথা দেশপ্রেমিক মাত্রেই অনুভব করেন।

ভারতের অখণ্ড জাতীয় ঐক্যের সমস্যাই বর্তমানে গুরুতর। একদিকে বৈদেশিক শক্তির আক্রমণাত্মক চাপ ভারতের আঞ্চলিক সংহতির উপরে, অন্যদিকে নানাবিধ প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক বিভেদপ্রবণতার প্রবল হওয়ার ফলে জাতীয় একাত্মবোধের প্রসার বাধাপ্রাপ্ত। স্বাধীনতা দিবসের জাতীয় উৎসবের সর্বজনীন কর্তব্য তাই ভারতের অখণ্ড জাতিসত্তার প্রতি আনুগত্য স্বীকার।

ভারতবর্ষ নানা সমস্যা জর্জরিত, একথা বলার অর্থ অবশ্য কখনই স্বাধীনতার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ হতে পারে না। পৃথিবীতে এমন কোন রাষ্ট্র নেই যাকে সকলপ্রকার সমস্যামুক্ত মনে করা সম্ভব। তাছাড়া কোন দেশ বা জাতির স্বাধীন সত্তাকে সেই দেশ বা জাতির রাষ্ট্র পরিচালনার ভালমন্দ, দোষ-ত্রুটি দিয়ে বিচার করা যায় না। স্বাধীনতার অধিকার, গৌরব ও মর্যাদা স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ংসম্পূর্ণ।

দরিদ্রতম দেশে, সবচেয়ে অনগ্রসর জাতি সে-ও তাই স্বাধীনতা কামনা করে, স্বাধীনতা লাভ অথবা রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করে। প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাসের এই অমোঘ সত্য নিয়ত স্মরণ রাখলে অসংখ্য দুঃখ দুর্ভোগ মনস্তাপ এবং ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমরা জাতীয় স্বাধীনতার অমূল্য সম্পদ রক্ষার সর্বাধিক গুরুত্ব সর্বদা মনে প্রাণে অনুভব করতে পারব।

জাতীয় উন্নতির ভিত্তি স্বাধীনতা; স্বাধীনতা রক্ষার দৃঢ় দুর্গ জাতীয় ঐক্য ও একাত্মতা। জাতিবর্ণসম্প্রদায়নির্বিশেষে দেশাত্মবোধ অনুশীলনের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণেই স্বাধীনতা উৎসবের সার্থকতা। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রামের যুগে জাতীয় ঐক্য চেতনা এবং দেশাত্মবোধ যে পরিমাণ শক্তিশালী ছিল আজ যদি তা ক্ষয়িত হতে থাকে নানাভাবে, নানা কারণে তা হলে দেশপ্রেমিক সকলেরই তার প্রতিকারের জন্য চিন্তা করা, চেষ্টিত হওয়া কর্তব্য।

গত মহাযুদ্ধকালে ফ্রান্সের শোচনীয় পরাভবে ব্যথিতচিত্ত চার্চিল বলেছিলেন, ভিতরে ভাঙন না ধরলে কোন দেশই কেবল বাইরের আক্রমণে স্বাধীনতা হারায় না। চার্চিলের এই উক্তি সর্বকালে সর্বদেশের ইতিহাস-সিদ্ধ। ভারতবর্ষও বার বার বৈদেশিক শক্তির পদানত হয়েছে, স্বাধীনতা হারিয়েছে তার অন্তর্নিহিত বিভেদ ও অনৈক্যজনিত দুর্বলতার ফলে। সেই নিদারুণ দুঃখময় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কিছুতেই ঘটতে দেওয়া হবে না, স্বাধীনতা দিবসের শপথ হোক তাই।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কেবল ভারতবর্ষীয়দের সম্পদ নয়, সে-কথাও মনে রাখা দরকার। এশিয়ার স্বাধীনতার প্রাণকেন্দ্র স্বাধীন ভারতবর্ষ চৌদ্দ বৎসর পূর্বে স্বাধীনতা লাভে অগ্রণী, হওয়ার পর এশিয়ার বহু দেশ থেকে একে একে সাম্রাজ্যিক শাসন বন্ধন খসে গেছে। মূল এশিয়া ভূখণ্ড থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অপসৃত হওয়ার সংগে সংগে দুর্বার হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার ফরাসী, ব্রিটিশ এবং ওলন্দাজ শাসিত দেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রাম। ভারতবর্ষের মুক্তিতে এশিয়ার মুক্তিযুগের সূচনা।

বৃহৎ বিশ্বের রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে বৃহত্তম গণতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসাবে স্বাধীন ভারতের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। ধনবলে এবং অস্ত্রবলে বহুগুণ শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিও স্বাধীন ভারতের বন্ধুত্বকামী, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের বিশিষ্ট ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। চৌদ্দ বৎসরে জাতীয় জীবনের বহুবিধ সমস্যার সমাধান সম্ভব না হলেও স্বাধীন ভারত তার আত্মশক্তিতে ধীরে ধীরে বিশ্বাস অর্জন করছে, বহু বাধা ও বিপত্তি সত্ত্বেও উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে, স্বাধীনতা দিবসে অকুণ্ঠ চিত্তে তা স্বীকার করা কর্তব্য।

সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা ইতিহাসের অগ্রগতির বিচারে কোন দেশেরই করায়ত্ত নয়। উপরন্তু স্বাধীনতার সার্থকতা স্বাধীনতাই। ভারতবর্ষ রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে, আর্থিক ও সামাজিক স্বাধীনতা লাভ তার জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টার দৃঢ় লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পথে জাতির, সর্বসাধারণের গতি অব্যাহত, অপ্রতিহত থাকুক—স্বাধীনতা দিবসের শুভদিনে এই সংকল্প যেন আমরা গ্রহণ করি।

স্মরণে

সাত বৎসর পূর্বে তাঁকে আমরা হারিয়েছি। তিনি ছিলেন আমাদের একান্ত আপনজন। আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কর্মজীবনের সঙ্গে আমাদের সকল ভাবনা ধারণা ও প্রয়াস এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত যে তিনি লোকান্তরিত হলেও তাঁর সান্নিধ্য আমরা নিত্য অনুভব করি। মৃত্যুতেই তিনি নিঃশেষিত হন নি, তাঁর সৃজননৈপুণ্যের অব্যাহত ধারা তাঁরই কর্মপ্রতিভার সার্থকতাবাহী।

সুরেশচন্দ্র ছিলেন নিরলস কর্মী ও দেশসেবক। প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্বে তিনি নীরবে অথচ নির্ভীকচিত্তে লাভ ক্ষতি কিছুমাত্র গণনা না করে দেশহিতব্রতে আত্মনিয়োগ করেছেন। বৈদেশিক রাজশক্তির ভ্রূকুটি ও লাঞ্ছনা, বৈষয়িক অসচ্ছলতা ও অনিশ্চয়তা সবকিছুর প্রবল বিরোধিতা পরাজিত করে তিনি আপন আদর্শকে সার্থক রূপ দিয়েছিলেন। বাংলা সংবাদপত্রকে জাগ্রত জনশক্তির ধারক, বাহক ও প্রচারকরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ করার ঐতিহাসিক কৃতিত্ব অনেকাংশে সুরেশচন্দ্রের। নিরহঙ্কার উদার হৃদয় এই সহজ মানুষটি কেবল আনন্দবাজার পত্রিকা প্রতিষ্ঠানের নয় বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির প্রিয় জন ছিলেন। সুরেশচন্দ্রের মৃত্যু তিথিতে তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধের সঙ্গে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

বৈদেশিকী

কংগো-সমস্যা যে মিটে গেছে তা নয়, কিন্তু কংগো নিয়ে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা এখন বেশী নেই। ইতিমধ্যে পৃথিবীতে উত্তেজনাসৃষ্টিকর ব্যাপার আরো অনেক ঘটেছে এবং ঘটছে। তা ছাড়া পূর্ব-পশ্চিম দ্বন্দ্বের যে-বাতাসে আগুন বৃদ্ধি পায় কংগো অঞ্চলে সেটা কিছুকাল থেকে অনেকটা ধীরে বইছে। সেইজনাই বোধ হয় কংগোর বিভিন্ন দলের মধ্যে একটা মিটমাটের চেষ্টার কিছু ফল দেখা যাচ্ছে। ইউ-এন সৈন্যের রক্ষাধীনে ইলেকট্রিক-চার্জযুক্ত কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে কংগো পার্লামেণ্টের অধিবেশন অনেকের মনে করুণ অথবা হাস্যরস উদ্রেক করতে পারে কিন্তু এই উপায়ে পার্লামেণ্টের অনুমোদিত যে নূতন পার্লামেণ্ট গঠিত হচ্ছে সেটা যদি টিকে যায় তবে কংগো ধীরে ধীরে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হতে পারে। লুমুম্বাপন্থী এবং পশ্চিমা ঘেঁষা দলগুলি মিলে যে একটা মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করতে সম্মত এবং সমর্থ হয়েছে এটা খুবই আশার কথা। শ্রীঅ্যাডোলা কংগোর নূতন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন এবং লুমুম্বাপন্থী স্ট্যানলীভিল সরকারের নেতা শ্রীগিজেংগা যিনি এতদিন নিজেকে কংগোর "বৈধ" প্রধানমন্ত্রী বলে জাহির করছিলেন এবং কম্যুনিস্ট দেশগুলি কর্তৃক তাই বলে স্বীকৃত হচ্ছিলেন তিনি উপ-প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। নূতন মন্ত্রিমণ্ডলীতে আরো অনেক লুমুম্বাপন্থী আছেন এবং তাঁদের কেউ কেউ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কর্তৃত্ব পেয়েছেন।

কাতাংগার শ্রীটিশোম্বে এখনো আগড়ুম-বাগড়ুম অনেক কিছু বলছেন। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত কংগো পার্লামেণ্টে কাতাংগার প্রতিনিধিদের পাঠাতে রাজী আছেন বলে ঘোষণা করেছেন। কংগোর নূতন প্রধানমন্ত্রী শ্রীঅ্যাডোলা বলেছেন যে, কাতাংগার কংগো থেকে বিযুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়ে থাকা চলতে পারে না। শ্রীটিশোম্বেও বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন যে, বাকী কংগো যদি একতাবদ্ধ হয়, তবে বিদেশী প্রভাবের আওতায় কাতাংগার স্বাতন্ত্র্য এবং "স্বাধীনতা" বজায় রাখা সম্ভব হবে না। কাসাই-এর যে-অংশ "স্বাধীন" হতে চেয়েছিল তার সম্পর্কে এ কথা আরো বেশী প্রযোজ্য। তবে কংগোর সংবিধান রচনাকালে হয়ত ফেডারেল নীতির কিছুটা প্রাধান্য স্বীকৃত হবে।

যাই হোক, আপাতত কংগোকে অনেক বিষয়েই ইউ-এন-এর অভিভাবকত্ব মুখে না হোক, কার্যত মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে, তা ছাড়া শৃংখলা প্রতিষ্ঠার আর কোনো পথ নেই। ইউ-এন-এর তরফ থেকে যা-কিছু করা হচ্ছে তারও সমালোচনা অবশ্য অনেক হবে, বিশেষ করে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলি শ্রীহ্যামারশীল্ডের কাজের খুঁত ধরার জন্য সর্বদাই ওত পেতে আছে। তবে কংগো থেকে ইউ-এন-কে সরিয়ে দেবার চেষ্টা খোলাখুলি-ভাবেই এখন কেউ করতে সাহসী হবে না।

কংগোর প্রসংগে শ্রীরাজেশ্বর দয়ালের কংগো থেকে চলে আসার ব্যাপারটা উল্লেখযোগ্য যদিও তার কারণ পরিষ্কার বোঝা গেল না বা কর্তৃপক্ষ বুঝতে দিতে চাচ্ছেন না। শ্রীদয়াল শ্রীহ্যামারশীল্ডের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করছিলেন। গুরুতর সংকটের সময়ে তিনি কাজ করেছেন এবং তাঁর প্রতি শ্রীহ্যামারশীল্ডের বিশ্বাসও অনেকবার ঘোষিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও শ্রীদয়ালকে শেষ পর্যন্ত সরে আসতে হলো। শ্রীহ্যামারশীল্ড শ্রীনেহরুকে জানান এবং শ্রীদয়ালও নাকি অনুরোধ জানান যে, কংগোতে থেকে
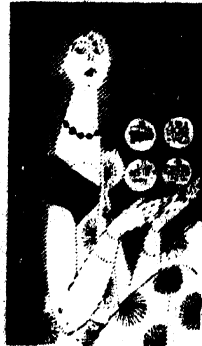
তিনি আর বিশেষ ফলপ্রদ কাজ কিছু করতে পারবেন না।

কঙ্গোলীজ একদল শ্রীদয়ালের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিল, তাতে বিদেশী কূট-নৈতিক প্রতিনিধিদের মধ্যে একদল ইন্ধন যোগাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, ইউ-এন-এর মধ্যেই নাকি শ্রীদয়ালের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলে। কিন্তু শ্রীহ্যামারশীল্ডের যদি শ্রীদয়ালের প্রতি আস্থা থেকে থাকে তবে তিনি শ্রীদয়ালের বিরুদ্ধাচারীদের সংযত করার চেষ্টা না করে শ্রীদয়ালকে ইউ-এন-এর কাজ থেকে বাদ দিলেন কেন? হয়ত সে চেষ্টা করে তিনি কৃতকার্য হননি। অনেক সময়ে অবস্থায় পড়ে পলিটিশিয়ানরা নিজেদের অপ্রিয় কাজও করেন। কিন্তু কঙ্গোর বর্তমান পরিস্থিতিতে শ্রীদয়ালের কর্মোপ-যোগিতা নেই, এ কথা যেন শ্রীনেহরুও মেনে নিয়েছেন। তা হলে এ কথার ঠিক মানে কী সেটা দেশবাসীকে তাঁর জানানো কর্তব্য।

পার্লামেন্ট ডাকা হোক এবং পার্লামেন্টের মাধ্যমে নূতন গবর্নমেন্ট গঠন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা হোক, কঙ্গো সম্পর্কে এটাই একমাত্র কার্যকর নীতি। শ্রীনেহরু এবং ভারত সরকারের মত বহুবার জোরের সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে। সেই নীতি এখন কার্যে পরিণত হচ্ছে আর এখনই শ্রীদয়াল কঙ্গোর কাজের পক্ষে অনুপযুক্ত বিবেচিত হলেন? শ্রীদয়াল অবশ্য ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কঙ্গোতে যাননি, তিনি ইউ-এন-এর কাজে শ্রীহ্যামার-শীল্ডের প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত হয়ে কঙ্গোতে গিয়েছিলেন। তাহলেও কাজের ক্ষেত্র যেখানেই হোক, ভারত সরকারের কোনো স্থায়ী উচ্চপদস্থ কর্মচারী ভারত সরকারের নীতি সম্বন্ধে অচেতন বা উদাসীন হয়ে কাজ করবেন এরূপ মনে করা যায় না। পার্লামেন্ট ডেকে তার অনুমোদন নিয়ে নূতন গবর্নমেন্ট চালু করার নীতি কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থা যখন আরম্ভ হবে তখনই শ্রীদয়ালের "কার্যকারিতা"র দিন ফুরিয়েছে বলার মানে কি এই হয় না যে, শ্রীদয়ালের এই সময়ে কঙ্গোতে থাকা ঐ নীতির সাফল্যের পথে অন্তরায়স্বরূপ হবে?

এই কথা যদি শ্রীনেহরু মেনে নিয়ে থাকেন তবে তার পক্ষে যুক্তিগুলি কী তা সাধারণের জানা দরকার। কারণ এই ব্যাপারের সঙ্গে কঙ্গোতে যে একটা ভারত-বিদ্বেষী আন্দোলন চলছে তার যোগাযোগ কতখানি তা ভালো করে জানা আবশ্যক। কঙ্গোতে নিরাপত্তা এবং শান্তিরক্ষার জন্য, কঙ্গোলীজদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের নিবারণ-কল্পে যারা সবচেয়ে বেশি সৈন্য ইত্যাদি পাঠিয়েছে তাদের মধ্যে ভারতবর্ষ। ভারত সরকার এতদিন ধরে যে-নীতির কথা বলছিলেন দৃশ্যত সেই নীতি অনুসরণ করার ব্যবস্থা হচ্ছে, অথচ যেন ভারতীয় বলেই শ্রীদয়াল কঙ্গোতে থাকতে পারলেন না। এর জন্য কি শ্রীদয়ালের ব্যক্তিগত ব্যবহার দায়ী? অথবা সরকারী বেসরকারী ভারতীয়দের ব্যবহারের সবকিছু মিলে কঙ্গোলীজদের মনে একটা বিরূপতা সৃষ্টি করেছে? অথবা কোনো কোনো শ্রেণীর বিদেশী ভারত-বিদ্বেষীদের প্রচারের ফলে কঙ্গোলীজদের মনে ভারত এবং ভারতীয়দের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে? যদি তাই হয়ে থাকে তবে কোন্ কোন্ ব্যাপার উপলক্ষ করে ভারত-বিদ্বেষীরা অপপ্রচার করার সুযোগ নিচ্ছে? শ্রীদয়ালের কঙ্গোয় থাকা না-থাকাটা বড় কথা নয়, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি কঙ্গোলীজদের ধারণা কী হচ্ছে সেটা মোটেই তুচ্ছ ব্যাপার নয়।

ভারত সরকার "সাম্রাজ্যবাদী" এবং ভারত কঙ্গোকে ভারতীয় কলোনীতে পরিণত করতে চায়—এইরকম অদ্ভুত কথাও নাকি ভারত সম্পর্কে প্রচার করা হয়েছে। কী দেখিয়ে এইরকম উদ্ভট কথা কঙ্গোলীজদের বিশ্বাস করাবার চেষ্টা হয়েছে জানা দরকার। ইউ-এন সৈন্যদের মধ্যে ভারতীয়দের অপেক্ষাকৃত সংখ্যাধিক্যেরই কি এই কদর্থ করা হয়েছে? শুনা যায়, আফ্রিকার কোনো কোনো পূর্বাঞ্চল থেকেও কিছু ভারতীয় কঙ্গোতে গিয়েছে জীবিকার সন্ধানে। এদের সংখ্যা কত? এদের এবং ভারতীয় সৈন্যদের আগমন একসূত্রে গেঁথে কি ভারত-বিদ্বেষীরা অপপ্রচারের কাজে লাগিয়েছে? এই বিষয়ে যাবতীয় তথ্য ভারত সরকারের নিশ্চয়ই জানা আছে, সেগুলি দেশবাসীকেও জানানো আবশ্যক; কারণ তা না হলে ভারত সরকারের কঙ্গো সম্পর্কিত নীতির ফল ভারতের পক্ষে কী হচ্ছে সেটা দেশের লোক বুঝতে পারছে না এবং তাদের পক্ষে ঐ নীতির যথার্থ মূল্যায়নও সম্ভব হচ্ছে না।

৭।৮।৬১

কবিতা

স্বর্গের পুতুল

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কে কতটা নত হব, যেন সব স্থির করা আছে।
যেন প্রত্যেকেই তার উদ্বৃত্ত ভূমিকা অনুযায়ী
উজ্জ্বল আলোর নীচে নত হয়।
সম্রাট, সৈনিক, বেশ্যা, জাদুকর, শিল্পী ও কেরানী,
কবি, অধ্যাপক, কিংবা মাংসের দোকানে
যাকে নির্বিকার মুখে মৃত ছাগলের চামড়া ছাড়াতে দেখেছি,
এবং গর্দানে-রাংয়ে যে তখন মগ্ন হয়ে ছিল,
তারা প্রত্যেকেই আসে উজ্জ্বল আলোর নীচে একবার।
কপালে স্বেদের বিন্দু, সানন্দ সুঠাম ঘুরে গিয়ে
তারা প্রত্যেকেই নত হয়।

কেউ বেশী, কেউ কম, কিন্তু প্রত্যেকেই নত হবে
উজ্জ্বল আলোর নীচে একবার।
না-কেনা না-বেচা পণ্য, স্বর্গের তটিনী
সারাদিন জ্বলে;
এবং সৈনিক, বেশ্যা, কলাবিৎ, ভাড়াটিয়া গুণ্ডা, কারিগর
একবার সেখানে যায়, যে যার ভূমিকা অনুযায়ী
নত হয়; স্বর্গ থেকে প্রলম্বিত আলোর সলিলে
মুখ প্রক্ষালন করে নেয়।

ঘরের বাহিরে জ্বলে দৈব জলধারা;
দ্যাখো আলো জ্বলে, দ্যাখো আলোর তরঙ্গ জ্বলে, আলো—
সকালে দুপুরে সারাদিন।
স্বর্গের তটিনী জ্বলে, আলো জ্বলে, আলো,
যেখানে দাঁড়াও।
কে বড়বাজারে যাবে, দু গজ মার্কিন এনে দিয়ো;
কে যাও পারস্যে, এনো সুন্দর গালিচা;
কে যাও তটিনীতীরে স্বর্গের পুতুল,
কিছুই এনো না, তুমি যাও।

মর্মসহচরী

কমলেশ চক্রবর্তী

চোখ তুললে সমুখে দেখো পদ্মপাতায় জল
অন্তহীন বালুর মতো হৃদয় ম্রিয়মাণ।

বিরহ বলো, তমসা হোক অথবা সন্তাপ,
সমর্পিত তোমার আশা বেদনা সনাতন।

চোখ নেবালে পত্রালিকা ফুল্ল কলস্বরে
মর্মে ঢালে কনক স্মৃতি, স্মৃতির প্রিয় গান।

তনিমা তারে আপন বলে, হৃদয় বলে প্রিয়,
অনল জ্বলে, নিরয়ে ফোটে অতল শুভক্ষণ॥

জবানে (২০)

শ্রীমতী কোটেকে লজ্জা দেবার জন্য যে আমি উপাসনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলুম তা নয়, আসলে আমি এ বাবদে চার্লস ল্যামের শিষ্য। তিনি বলেছেন, খাবার পূর্বের এই প্রার্থনা কেমন যেন বেখাপ্পা। বরঞ্চ ভোর বেলার শান্ত মধুর পরিবেশে বেড়াতে বেরবার পূর্বে, কিংবা চাঁদনী রাতে হেথা-হোথা চলতে চলতে আপন-ভোলা হয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে, কিংবা বন্ধুসমাগমের পূর্বমুহূর্তের প্রতীক্ষা-কালে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার প্রয়োজন। শুধু তাই? মিলটন পঠন আরম্ভ করার সময় বিশেষ প্রার্থনা করা উচিত, শেক্সপীয়রের জন্য অন্য উপাসনা এবং 'ফেয়ারি কুইন' পড়ার পূর্বে অন্য এক বিশেষ উপাসনার প্রয়োজন। ভোজনকর্মের চেয়ে এসব জিনিসের মূল্য আমাদের জীবনে অনেক বেশী। প্রার্থনা যদি করতে হয় তবে এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা প্রার্থনা তৈরি করে রাখার প্রয়োজন।

ল্যামকে আমি শ্রদ্ধা করি অন্য কারণে। এই কার্যারম্ভের উপাসনা সম্বন্ধে বিবৃতি দেবার সময় তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'হায়! শাক-সর্বাঙ্গের জগৎ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি—ওসব আর খেতে ভালো লাগে না, কিন্তু এখনো যখন এস্পেরেগাস সামনে আসে তখন আমার মন মধুর আত্মচিন্তায় নিমগন হয়।' আপ্তবাক্য, আপ্তবাক্য, এ একটা আপ্তবাক্য!

আমার অনুরাগী পাঠকদের বলি, আমার লেখা যে আগের চেয়েও ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে তার প্রধান কারণ, বহুকাল ধরে এসপেরেগাসের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই। তাজাটার কথা হচ্ছে না, তিনি মাথায় থাকুন, টিনেরটার কথাই বলছি। সরকার আমদানি বন্ধ করে দিয়েছেন। সে'কো বিষ না কি এখনো আসে।

খুব অল্প লোকই মুখের লাবণ্য জখম না করে চিবোনো কর্মটি করতে পারে। আমি একটি অপরূপ সুন্দরী অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলাকে চিনতুম। চিবোবার সময় তার দুই চোয়ালের উপরকার ছোট ছোট মাংস-পেশীগুলো এমনই ছোট ছোট দড়ির মত পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতো যে বোধ করি তিনিও সেটা জানতেন, তাই যত দূর সম্ভব মাথা নিচু করে একদম প্লেটের কাছে ঝুকে পড়ে মাংস চিবোতেন। কোটের বেলা দেখলুম, উল্টোটা। খাবার সময় তার মুখের হাসি-

হাসি ভাবটা যেন আরো বেড়ে গেল। অবশ্য সে খেল অল্পই। বিয়ার পান করল প্রচুর। উপরে আসবার সময় ঢাউস এক জাগ বিয়ার সঙ্গে এনেছিল।

আমি বললুম, 'অত বিয়ার খাও কেন? দিনের শেষে, কাজের শেষে না হয় এক আধ গেলাস খেলে। ঐ বিয়ার খেয়ে খেয়ে খিদেটি তো একেবারে গেছে। আমার দেশে অনেকেই চা খেয়ে খেয়ে এ রকম পিত্তি চটায়।'

আশ্চর্য হয়ে শুধালে, 'চা খেয়ে খেয়ে! একজন মানুষ দিনে ক' কাপ চা খেতে পারে?'

আমি বললুম, 'আমার দেশের লোকও ঠিক এই রকম অবাক মেনে শুধোবে, "একজন মানুষ দিনে ক' গেলাস বিয়ার খেতে পারে"।'

বিরক্তির সুরে বললে, 'থাক, ওসব কথা। তুমি আর পাঁচজনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ঐ একই জিগির তুলো না। সমস্ত দিন ভূতের মত খাটি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ঐ বিয়ারই আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। না হলে হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতুম।'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম, 'কিন্তু এর তো একটা সরল সমাধানও আছে। তোমাদের 'পাবে' বিস্তর আমদানি, তুমি দেখতে ভালো, বিয়ে করে একটা ভালো লোক এনে তাকে কাজে ঢুকিয়ে দাও। তোমাদের দেশে তো শুনেছি, এ ব্যবস্থাটা অনেকেরই মনঃপূত।'

কোটের ঐ চড়ুই পাখীর খাওয়া ততক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছে। চেয়ারটা টেবিলের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে, আরেকখানা চেয়ারের উপরে দু পা লম্বা করে দিয়ে ভস্ ভস্ করে সিগারেট টানছিল। হেসে বললে, 'সে এক্সপেরিমেণ্ট হয়ে গিয়েছে।'

আমি অবাক হয়ে শুধালুম, 'এই অল্প বয়সে তোমার আবার বিয়ে হল কি করে?'

'দূর, পাগলা। আমি না। মা করেছিল এক্সপেরিমেণ্টটা। সে তার বাপের একমাত্র মেয়ে। তাই বাবাকে বিয়ে করে এনে সঁপে দিয়েছিল 'পাব'টা তার হাতে।'

আমি শুধালুম, 'তারপর?'

চিন্তা করে বললে, 'সমস্তটা বলা একটু শক্ত। শুনেছি, বাবা কাজ-কারবার ভালোই করতো। এ ঘরের মত আর সব ঘরেও যে-সব ভালো ভালো আসবাব-পত্র আছে সেগুলো ঐ সময়েই কেনা—বাবা লোকটি শৌখীন। তারপর আমার আর আমার ছোট বোনের জন্ম হল। তারপর বাবার বয়েস যখন চল্লিশ—বাবা মা'র একই বয়েস—তখন সে মজে গেল এক চিংড়ি মেয়ের প্রেমে, বয়েস এই উনিশ, বিশ। তারপর কি হয়েছিল জানিনে, আমি কিছু কিছু দেখেছি তবে তখনো বোঝবার মত জ্ঞান-গম্যি হয়নি। শেষটায় একদিন নাকি হঠাৎ মা নিচে এসে 'বারে'র পিছনে দাঁড়াল, 'পাবে'র হিসেব-পত্র নিজেই দেখতে আরম্ভ করলো। তখন বাবা নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।'

আমি শুধালুম, 'ডিভোর্স হয়েছিল?'

বললে, 'না। মা চায়নি, বাবাও চায়নি। কেন চায়নি, জানিনে।'

আমি শুধালুম, 'তারপর কি হল?'

কোটে বললে, 'ঠিক ঠিক জানিনে। তবে শুনেছি, বাবাতে আর ঐ মেয়েতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কার নেশা আগে কেটেছিল বলতে পারবো না। তারপর হয়তো বাবা মা'তে ফের বনিবনা হতে পারতো, কিন্তু হয়নি। বোধ হয় মা-ই চায়নি, অবশ্য আমি সঠিক বলতে পারবো না, কারণ মা আমার নিদারুণ আত্মাভিমানী—এ সব যা বললুম, এর কিছুটা আমার চোখে দেখা, আর কিছুটা পাঁচজনের কাছ থেকে শোনা—মা একদিনের তরে একটি কথাও বলেনি।'

আমি শুধালুম, 'তোমার বাবা—?'

বললে, 'বুঝেছি। মাইল তিনেক দূরে ঐ রাঙ্স্ ডর্ফে থাকে। অবস্থা ভালো নয়, মন্দও নয়। আমার সঙ্গে মাসে ছ' মাসে রাস্তায় দেখা হলে, হ্যাট তুলে আগের থেকেই নমস্কার করে—যেন আমি তার পরিচিতা কতই না সম্মানিতা মহিলা—কাছে এসে কুশলাদিও শুধোয়। বাবার আদব-কায়দা টিপ্‌টপ্। মায়ের সঙ্গে দেখা হলেও তাই। একবার আমি মায়ের সঙ্গে ছিলুম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুজনাতে কথা-বার্তাও হল, তারপর যে যার পথ ধরলো।'

এক মগ পুরো বিয়ার শূন্য করে বললে, 'তোমার বোধ হয় ঘুম পেয়েছে?'

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললুম, 'না না, মোটেই না।' আসলে আমার তখন জ্বর-জ্বর ভাব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে আর সে সময় সব রক্ত মাথায় উঠে গিয়ে ঘুম দেয় চটিয়ে।

কোটে উঠে বললো, 'জল ধরেছে। এবারে জানলাটা খুলে দি। দেখবে, বৃষ্টিশেষের কী অদ্ভুত সুন্দর ভেজা পাইন-বনের গন্ধ আসছে।'

আমি বললুম, 'এই বিয়ার আর সিগারেটের গন্ধে তোমার তো নাক-মুখ ভরতি। এর ভিতরও সেই অতি সামান্য পাইনের খুশবাই পাও?' কোটে জানলা খুলে দিয়ে, দুই কনুই নিচের কাঠের উপর রেখে নিঃশব্দে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম, যেন আমাদের দেশের কোনো সুন্দরী নারীমূর্তি পিছন থেকে দেখছি। 'আমাদের দেশের নারীমূর্তি' ইচ্ছে করেই বললুম, কারণ ইয়োরোপীয় ভাস্কররা তাদের নারীমূর্তির পিছনের দিকটা বড় অযত্নে খোদাই করে। 'নিতম্বিনী'র ইংরিজী প্রতিশব্দ নেই।

ফিরে এসে বললে, 'কিছু মনে করো না, তোমাকে জাগিয়ে রাখছি বলে। তা আমি কি করবো, বলো। কাজ শেষ করে খেতে খেতে দেড়টা বেজে যায়। তখন আমি কার সঙ্গে সোসাইটি করতে যাব? আমার সঙ্গে রসালাপ করার জন্য কেই বা তখন জেগে বসে?'

আমি বললুম, 'সে রকম প্রাণের সখা থাকলে সমস্ত রাত জানলার নিচে দাঁড়িয়ে প্রহর গোনে। পড়োনি বাইবেলে, তরুণী শোক করছে, তার দয়িত সমস্ত রাত হিমে দাঁড়িয়ে মাথার চুল ভিজিয়ে ফেলেছে বলে। অতখানি না হোক; একটা সাদামাটা ইয়াং ম্যানই যোগাড় করো না কেন?'

বুকের কালো জামায় সিগারেটের ছাই পড়েছিল। সেইটে ঠোনা দিয়ে সরাতে সরাতে বললে, 'আমার আছে। না, না, দাঁড়াও, ছিল। কি জানি, ছিল না আছে, কি করে বলবো।'

আমি অবাক হয়ে শুধালুম, 'সে কি? এ আবার কি রকম কথা?'

বললে, 'প্রথম যেদিন তাকে ভালোবেসে-ছিলুম সেদিনকার কথার স্মরণে আজও আমার মনপ্রাণ গভীর শান্তিতে ভরে যায়। আজও যদি তাই থাকতো, তবে এতক্ষণে ছুটে যেতুম না তার বাড়িতে? তাকে ধরে নিয়ে এসে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে? এই রাত তিনটেরও?'

আলোচনা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

'দেশ'-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আপনার পত্রিকার রবীন্দ্র-সংখ্যায় আমার প্রবন্ধ "রাষ্ট্রভাষা ও রবীন্দ্রনাথ" ছাপা হয়েছিল। তার মধ্যে আমি 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে অ-বাঙালী বলেছিলুম। এই উক্তির প্রতিবাদ করেছেন দুটি পাঠক, আপনার পত্রিকায় পত্রযোগে। (২০শে ও ২৭শে জ্যৈষ্ঠ। তদুত্তরে আমার স্বপক্ষে সংক্ষেপে যুক্তি জানাচ্ছি।

প্রায় ৫৭ বৎসর পূর্বে, রামেন্দ্রসুন্দরের জীবদ্দশাতেই, "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" গ্রন্থে (ব্রাহ্মণ কাণ্ড, পঞ্চম অংশে) বিশ্বকোষ-প্রণেতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব 'নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বংশ-পরিচয় বিশেষভাবে আলোচনা করে গেছেন। সে-আলোচনার ভিত্তি ছিল মূলত স্বয়ং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্তৃক প্রকাশিত "পুণ্ডরীককুলকীর্তিপঞ্জিকা" এবং "ফতে-সিংহ জমিদারির ইতিবৃত্ত।" বসু মহাশয় শুধু পণ্ডিত ছিলেন, তা নয়; তিনি ছিলেন ত্রিবেদী-মহাশয়ের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। সুতরাং ঐ আলোচনাকে কোনোক্রমেই আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না।

বসু মহাশয় বলেছেন, রাজা মানসিংহের সংগে সবিতা রায় পশ্চিম দেশ থেকে বাংলা দেশে আসেন বঙ্গ-বিজয়ের উদ্দেশে। এই সবিতা রায় হলেন ফতেসিংহের জিঝোতিয়া-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। বসু মহাশয় আরও বলেছেন : 'সবিতা রায়ের বংশীয়গণের আশ্রয়ে জিঝোতিয়া, কানোজিয়া, মৈথিল, ভূমিহার প্রভৃতি নানা শ্রেণীর অনেকগুলি ব্রাহ্মণ পশ্চিম হইতে আসিয়া ফতেসিংহে উপনিবিষ্ট হইয়াছেন। স্থানীয় সমাজে ইঁহারা সকলেই "পশ্চিমা ব্রাহ্মণ" নামে এবং রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা "বাঙালী ব্রাহ্মণ" নামে পরিচিত।

নগেন্দ্রনাথ নাম-ধাম দিচ্ছেন "ফতে-সিংহের খাঁটি জিঝোতিয়া যে কয়েক ঘর বাস করেন," তাঁদের। তন্মধ্যে দেখা যায়—

বাসস্থান		উপাধি	গোত্র
জেমো মাধুনিয়া কল্যাণপুর	সবিতা রায়ের বংশীয়	দীক্ষিত	পুণ্ডরীক
জেমো টেঁয়া		ত্রিবেদী বা তেওয়ারী	বন্ধুল

এই দুই ঘরের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, যখন বন্ধুল-গোত্রীয় বলভদ্র

পুণ্ডরীক-গোত্রীয়া দয়াময়ীর পাণিগ্রহণ করে টেঁয়া থেকে জেমোয় এসে বাস করেন। দয়াময়ীর পিতামহ নীলকণ্ঠ ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের সমসাময়িক লোক। "বাদশাহ-দত্ত রাজোপাধি লাভ করায় ইনি জেমোর রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা।" বলভদ্রের পিতামহ ছিলেন দয়ারাম। তাঁকে হেস্টিংসের সমকালীন ধরা যায়। বসু মহাশয় বলেছেন যে, দয়ারামের পিতা হৃদয়রাম অথবা তাঁর পিতামহ মনোহররাম ত্রিবেদী "প্রথমে বাংলায় আসিয়া ফতেসিংহ মধ্যে টেঁয়া গ্রামে বাস করেন।" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছিলেন বলভদ্রের প্রপৌত্র। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে তাঁর পূর্বপুরুষ হেস্টিংসের কিছু পূর্বে বাংলায় আসেন, এবং কিছু পরে পুণ্ডরীক-গোত্রীয় রাজ-বংশের সঙ্গে বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে ও'রা জেমোয় এসে বাস করেন। এটা যে খুব প্রাচীন কালের কথা, তা বলা যায় না।

বসু মহাশয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে তাঁর সমসাময়িক—অর্থাৎ রামেন্দ্রসুন্দর যখন জীবিত তখনকার—জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণদের ভাষা ও পরিচ্ছদ বাঙালী ব্রাহ্মণদের মতন, এবং অনেক আচার-ব্যবহারেও বাঙালী প্রভাব বর্তমান। 'কিন্তু অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহে "পশ্চিমা" ব্রাহ্মণের সাহায্য আবশ্যক হয়। কনৌজিয়া ও মৈথিল ব্রাহ্মণেরাই এ স্থলে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হন।' আবার এ কথাও তিনি লিখেছেন: 'পুণ্ডরীক-গোত্রের কুলদেবতাগণের নাম বঙ্গদেশে অপরিচিত।'

স্থানীয় পশ্চিমা ব্রাহ্মণদের তৎকালীন বিবাহ-প্রথা সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার প্রসঙ্গে বসু মহাশয় বলছেন: 'তাহাতেই বুঝা যাইবে বাঙ্গালার ক্ষুদ্র "পশ্চিমা" সমাজ কিরূপে পার্শ্ববর্তী বৃহত্তর "বাঙালী" সমাজ হইতে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে।' কৌতূহলী পাঠক সেই বিবরণ পাঠ করলে দেখতে পাবেন স্বাতন্ত্র্য কোথায়।

পরিশেষে বসু মহাশয় সেখানকার আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে যে-সংবাদ দিচ্ছেন সেটি প্রণিধান-যোগ্য: 'বাঙালীর সহিত পশ্চিমার হুঁকা-ব্যবহার চলিত আছে। ফলাহারে এক পংক্তিতে ভোজন চলে। তবে বাঙালীর হস্তে বা বাঙালীর সহিত এক পংক্তিতে অন্নভোজন চলে না।'

আমার উক্ত প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকেই অ-বাঙালী বলেছি। তাঁর মরণোত্তর-কালের কথা আমার আলোচ্য ছিল না। ঐ ভাবে ও'র নামোল্লেখ করেছিলুম এই উদ্দেশ্যে যে এখনকার অ-বাঙালীরা যেন রামেন্দ্রসুন্দরের মতন বাংলা লেখায় উৎসাহী হন। তাঁরা যদি বাংলা শেখেন ও লেখেন, তাঁদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের মাতৃ-ভাষা সমৃদ্ধ হতে পারে। ইতি ১২ই শ্রাবণ ১৩৬৮।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব।

নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি

সবিনয় নিবেদন,

দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ মহাশয়ের 'নন্দকান্ত নন্দাঘুণ্টি' নামক প্রবন্ধটি পড়ে খুবই আনন্দিত হলাম।

এ প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অশোককুমার সরকার মহাশয় যে সহযোগিতা করেছিলেন তার জন্য সমগ্র বাঙালী জাতির হ'য়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

এই কয়েকটি বঙ্গসন্তান অসীম সাহস, দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা ও ঐকান্তিক মনোবলের যে পরিচয় দিলেন তার জন্য বঙ্গবাসীর মুখ আজ উজ্জ্বল হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে বাঙালী কেবল দূরে থেকে দেখেছে কেমনভাবে বিভিন্ন জাতি একের পর এক হিমালয়ের রহস্যের অবগুণ্ঠন মোচন করার জন্য প্রাণের মূল্যে কীর্তির অক্ষয় সৌধ নির্মাণ করার প্রয়াসী হয়েছে, আর নিজেরা ভীরু, অলস ইত্যাদি কলঙ্কের বোঝা বাড়িয়ে তুলেছে। জাতির জীবনে কলঙ্কের কালো দাগ এতদিনে এই অভিযাত্রী দল মোচন করলো।

সর্বশেষে ঐকান্তিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই অভিযাত্রী দলের প্রতিটি সভ্যকে, আর প্রার্থনা জানাচ্ছি যুগে যুগে বাংলার বুকে এমনই নির্ভীক, দুঃসাহসী সন্তানের জন্ম হোক। এই দৃষ্টান্ত সব বাঙালী তরুণের বুকে যেন বল দেয়।

ধন্যবাদ জানাচ্ছি লেখক গৌরকিশোর ঘোষ মহাশয়কে তাঁর সুন্দর সাবলীল ভাষা ও বর্ণনাচাতুর্যের জন্য যা প্রবন্ধটিকে অত্যন্ত মনোরম ও সুখপাঠ্য করে তুলেছে।

রত্না সেন।
রাঁচী।

গ্যেতের ফাউস্ট

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

Johann Wolfgang von Goethe **যোহান ভোল্‌ফ্‌গাঙ্‌ ফন্‌ গ্যোতে** (খ্রীষ্টাব্দ ১৭৪৯—১৮৩২) একাধারে জরমান ভাষার **সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও কবি**, এবং আধুনিক যুগে ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বের অন্যতম প্রধান মনীষী ও চিন্তানেতা। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের সর্বপ্রধান কৃতিত্ব হইতেছে তাঁহার বিরাট দার্শনিক নাটক "ফাউস্ট"। এই পুস্তককে তাঁহার সমগ্র জীবনের সাহিত্য ও দর্শন সাধনের প্রতীক বলা যায়। কুড়ি বৎসর বয়সে এই নাটক লিখিবার কাজে তিনি অবতীর্ণ হন, এবং ষাট বৎসর ধরিয়া তাঁহার হাতে ইহার রচনাকার্য্য এবং ইহার পরিবর্তন, সংশোধন, পরিবর্ধন ও সংযোজন চলে। আধুনিক যুগের একটি শ্রেষ্ঠ সুসভ্য চিন্তাশীল জাতির মনন ও বিচার, আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং সত্যদর্শন ও আদর্শ হইতে উদ্ভূত এই নাটক, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া সর্ববাদিসম্মতি-ক্রমে স্বীকৃত হইয়াছে। সামগ্রিকভাবে গ্যেতের রচনাবলী পৃথিবীর দশটি মুখ্য রচনা সম্পুট বা বাঙ্ময়-ভাণ্ডারের মধ্যে একটি বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। আমার মনে হয়, এই কয়খানি মহাগ্রন্থ বা গ্রন্থাবলীকে আমরা বিগত তিন হাজার বৎসর ধরিয়া মানবের সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি; এগুলি নিজ-নিজ দেশ, কাল ও জাতির ঊর্ধ্বে উঠিয়া, বিশ্বমানবের পক্ষে চিরন্তন রসের উৎস হইয়া রহিয়াছে—সর্ব দেশের ও সর্ব জাতির মানুষের মধ্যে উচ্চতম আদর্শ, গভীরতম অনুভূতি এবং সর্বগ্রাহী সত্যদর্শনের যে আগ্রহ দেখা যায়, এই-সমস্ত বাঙ্ময়-সম্পুটে তাহার প্রতিফলন, পরিপোষণ এবং আবেদন দেখা যায় বলিয়া, এই সাহিত্য-সর্জনা বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে, এবং মানবের মনের রসায়ন ও উচ্চ অনুভূতির সহায়ক রূপে বিদ্যমান আছে। এগুলি হইতেছে এই:—

১। ভারতবর্ষের প্রাচীন জাতীয় চিত্র ও গণ-আদর্শ, সংস্কৃত পুরাণ-কাব্য মহাভারত।

২। ভারতবর্ষের প্রাচীন ব্যক্তিগত, গার্হস্থ্য ও সামাজিক আদর্শের প্রকাশভূমি রামায়ণ মহাকাব্য।

৩। প্রাচীন গ্রীসের জীবনের ও আদর্শের প্রতীক, একাধারে ইলিয়াদ ও ওদিসি মহাকাব্যদ্বয়, ও তৎসঙ্গে প্রাচীন গ্রীসের জীবন-বেদস্বরূপ তিনজন ট্রাজেডি-রচনাকারী মহাকবি আয়েস্‌খ্যুলস্‌, সোফোক্লেস ও এউরীপিদেসের নাটকাবলী।

৪। প্রাচীন য়িহুদী জাতির পুরাণ-কথা ও ধর্মশাস্ত্র Thorah থোরাহ্‌ ও অন্য গ্রন্থ—সাকল্যে বা মিলিত-ভাবে Hebrew Bible হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেল।

৫। মধ্যযুগের ইউরোপের জীবনের—

মহাকবি গ্যোতে

সভ্যতার, সংস্কৃতির, ধর্মের ও আদর্শের এবং রমন্যাসের ও রসানুভূতির প্রকাশ-ক্ষেত্র, পুরাতন ওয়েল্‌শ্‌, লাতীন, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় রচিত বীর রাজা Arthur আর্থারের ও তাঁহার সঙ্গীদের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে গদ্যপদ্যময় সমগ্র সাহিত্য। আট শত বৎসর ধরিয়া ব্রিটেনের রাজা আর্থরকে কেন্দ্র করিয়া এই উপাখ্যানগুলি রচিত, মধ্যযুগের পশ্চিম-ইউরোপের খ্রীষ্টান সভ্যতা ও আদর্শের মাধ্যমে যে রোমান্স ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহা এখনও মানুষের মনে কার্যকর। ইহার অন্তর্নিহিত খ্রীষ্টান রহস্যবাদও অপূর্ব বস্তু।

৬। ইসলামী আরব জগতের সভ্যতার পরিচায়ক, রম্য-রচনার ভাণ্ডার, উপাখ্যান-সংগ্রহ পুস্তক "আরব্য রজনী" ("অলফ্‌ লয়লহ্‌ ওয় লয়লহ্‌"—অর্থাৎ "সহস্র রজনী ও একটি রজনী")।

৭। ইউরোপের রেনেসাঁস বা পুনর্জাগৃতির যুগের শ্রেষ্ঠ কবি, ইংরেজ নাট্যকার William Shakespeare শেক্‌স্পিয়রের নাটকাবলী।

৮। Goethe গ্যোতের গদ্য-পদ্যময় রচনাবলী।

৯। রুষ লেখক ও দার্শনিক Lyev (Leo) Tolstoy ল্যেভ্‌ (লেও) তল্‌স্তয়ের উপন্যাস ও অন্য গ্রন্থাবলী।

১০। আধুনিক ভারতবর্ষের কবি, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী ও শিল্পী এবং মানব-প্রেমী ও রহস্য-বাদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী।

এই দশ দফা বাঙ্ময়-সম্পুটের প্রত্যেকটির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও মূল্য আছে। এগুলির মধ্যে কতকগুলির বক্তব্য অতি সরল, সহজ-বোধ্য, সর্বজনগ্রাহ্য ও আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই নিকট আনন্দদায়ক। কতকগুলির অন্তর্নিহিত রমন্যাস ও ভাবুকতা সকলকেই আকৃষ্ট করে, মুগ্ধ করে। কতকগুলি আবার প্রত্যেক সহৃদয় পাঠক বা শ্রোতার নিকট নিজ বিশিষ্ট বাণী প্রকাশ করে—গভীর চিন্তার দিকে, অন্তর্মুখিতার দিকে, আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিকে তাহাকে টানিয়া আনে। যেমন, আরব্য-রজনী নিছক রম্য-রচনা, ইহাতে গভীরতর আকর্ষণ বিশেষ কিছু নাই; তথাপি ইহা আমাদের কল্পনা-বৃত্তিকে জাগরিত করে বলিয়াই এই গ্রন্থকে পৃথিবীর তাবৎ দেশের লোকে ছাড়িতে পারে নাই। য়িহুদী বাইবেল গ্রন্থে উপাখ্যানের বৈচিত্র্য আছে, উপরন্তু ধার্মিক উপদেশ, আধ্যাত্মিক সাধনার কথাও প্রচুর আছে। রামায়ণের উপাখ্যান এবং ইহার আদর্শ ভারতবর্ষের তথা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ও ইন্দোনেসিয়ার জনগণকে আকুল করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু মহাভারতের আবেদন আরও বিরাট্‌, আরও ব্যাপক, আরও গভীর—ইহা একদিকে যেমন জীবনের সব অঙ্গ লইয়া, তেমনি আর একদিকে শাশ্বত সত্যের, ধর্মের বা ঋতের সাধনায় ও মানুষের সব প্রশ্নের সার্থক সমাধানের জন্য চেষ্টিত, ও তদ্বিষয়ে কৃতকৃত্য। হোমরের মহাকাব্যদ্বয় ও গ্রীক ট্রাজিক নাটকাবলী, শেক্‌স্পিয়রের নাটকাবলী ও তলস্তয়ের উপন্যাসাবলী, মানুষের জীবন এবং মানুষের মনের সব গোপন কথা যেন খুঁটিয়া প্রকাশ করিয়া দিয়াছে—গ্রীক মহাকাব্য দুইটিতে উপরন্তু উদার ছন্দে মানুষের জীবনের মহান্‌ কৃতিত্বগুলিকে অবিনশ্বর করিয়া দিয়াছে; এবং এউরীপিদেস্‌ ও শেক্‌স্পিয়র, ইঁহারা জীবন যেমন দেখিয়াছেন তেমনি আঁকিয়াছেন, অধিকন্তু জীবনের অর্থ, ইহার আভ্যন্তর শাশ্বত বস্তু লইয়াও সার্থক চিন্তা করিয়াছেন। আর, রবীন্দ্রনাথের কথা কি বলিব—সমগ্র জীবন ইঁহার চোখে যেমন ধরা

দিয়াছে তেমনি অদৃষ্ট শাশ্বত সত্তার অনুভূতি, উপলব্ধি বা দর্শনও তাঁহার ঘটিয়াছে, তাহার জ্যোতিও আমরা তাঁহার লেখায় পাইতেছি—এই জন্যই তিনি এত বড়। যেখানে কবি বা ঋষি সোজাসুজি তাঁহার বক্তব্য জানাইয়াছেন, সেখানে প্রথম পাঠেই বা প্রথম শ্রবণেই তাঁহার কথা আমাদের প্রাণ স্পর্শ করিয়া থাকে। আবার যেখানে তাঁহার কথা রূপকের অলংকারে মণ্ডিত করিয়া তিনি আমাদের গোচরে আনিয়াছেন, সেখানে তাঁহার বলিবার ভঙ্গীতে একটা অদ্ভুত কিছুর সম্বন্ধে আমরা সচেতন হইলেও, উপর-উপর তাহার দ্বারা মুগ্ধ হইলেও, হয়তো তাহার পূর্ণ আশয় আমরা সহজে ধরিতে পারি না। এজন্য আমাদের নিজেদের বোধশক্তি, কল্পনাশক্তি ও বিচারশক্তি হয়তো যথেষ্ট নয়, জ্ঞানী ব্যাখ্যাতা বা তত্ত্বজ্ঞ টীকাকারের সহায়তা এ ক্ষেত্রে অপেক্ষিত
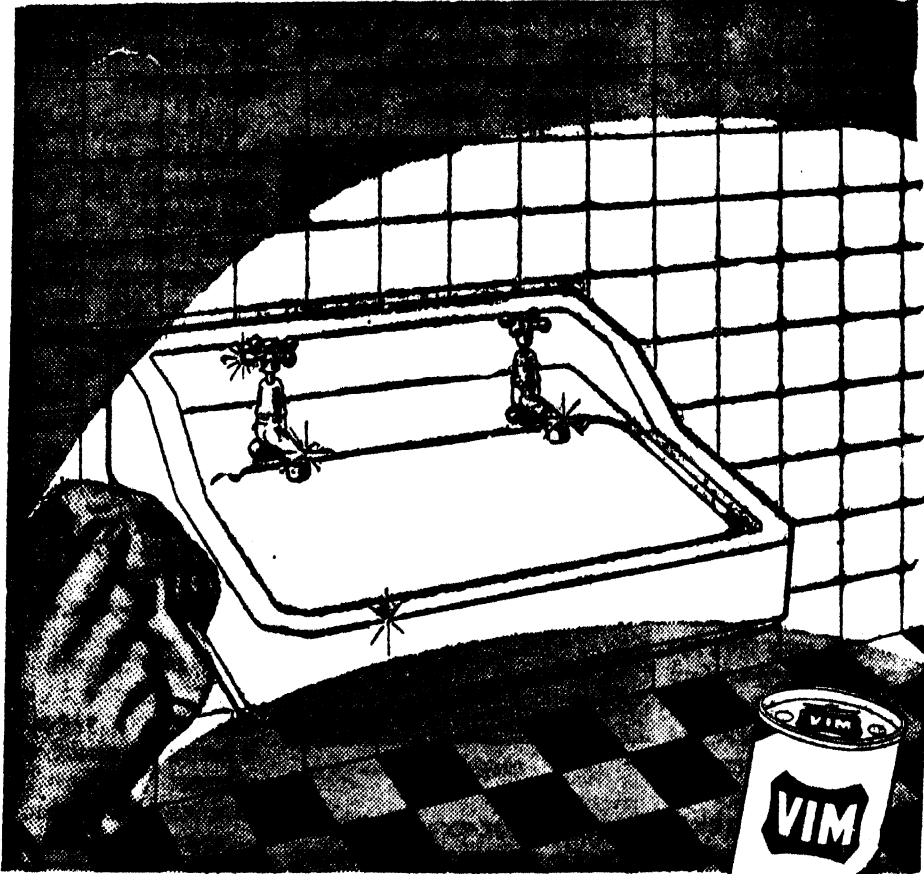
থাকে। কিন্তু রূপকের স্বর্ণজাল ভেদ করিয়া যখন আমরা অন্তর্নিহিত ভাবসমূহের উপলব্ধি করিতে পারি, তখন আমরা নির্মল আনন্দের অধিকারী হই, স্বাভাবিক ও সহজ উপলব্ধির উপর যেন পূর্ণতর, আরও একটু অন্য প্রকারের আধিমানসিক চিত্তপ্রসাদও অনুভব করিয়া থাকি।

গ্যোতের রচনাবলীতে সাধারণতঃ অস্পষ্টতা কিছু নাই—তাঁহার উপন্যাস ও নিবন্ধ এবং তাঁহার অন্য নাটক ও কবিতা, পাঠ-মাত্রেই কানের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া শ্রোতা বা পাঠকের প্রাণকে আকুল করে। কিন্তু তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ রসরচনা "ফাউস্ত" নাটকের সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না, বিশেষতঃ "ফাউস্ত"-এর দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধে। প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, "ফাউস্ত" নাটকখানি একটি-মাত্র প্রধান ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত, সাধারণ ও প্রচলিত পদ্ধতির নাটক নহে—যদিও "ফাউস্ত্"-এর প্রথম খণ্ডে সেইরূপ একটি ঘটনার নাটকীয় প্রযোজনা করা হইয়াছে বটে। "ফাউস্ত্" হইতেছে নাট্যকারের একটি রূপকাশ্রিত দার্শনিক মহাকাব্য। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, দর্শনে, যাহার চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ উন্মেষ হইয়াছে, অথচ জীবনের পুরুষার্থ অথবা উদ্দেশ্য কি, তাহা যে খুঁজিয়া পাইতেছে না, এমন sophisticated বা পণ্ডিতম্মন্য, divine discontent অর্থাৎ অতৃপ্ত দিব্য আকাঙ্ক্ষার দ্বারা অভিভূত, অস্বস্থ-প্রকৃতির একজন আধুনিক মানবের, জীবনের সার সত্য উপলব্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়াসের কথা এই কাব্যময় নাটকে রূপায়িত হইয়াছে। এইরূপ মানবের প্রতীক-রূপে গ্যোতে ইউরোপের মধ্যযুগের কিমিয়া-বিদ্যা বা ফলিত রসায়ন বিদ্যার প্রবীণ অথচ মানুষ-ঠকানো এক পণ্ডিতকে গ্রহণ করেন। ঐ ব্যক্তি জরমানিতে খ্রীষ্টীয় ষোলোর শতকের প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল Doctor Faustus ডক্টর অর্থাৎ পণ্ডিত ফাউস্তস্ বা ফাউস্ত্। কতকগুলি অলৌকিক শক্তি দেখাইয়া, তিনি লোকেদের চমৎকৃত করেন; এবং জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ বিশ্বাস দাঁড়ায় যে, এই-সব শক্তি বা "সিদ্ধাই" তিনি প্রাপ্ত হন ঈশ্বরদ্রোহী পাপপুরুষ শয়তানের নিকট হইতে। শয়তান নরকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহার বিদ্রোহ-হেতু ঈশ্বর অনন্ত কালের জন্য তাহার নরকবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শয়তানের অন্যতম কার্য, সরল নিরীহ মানুষকে পাপপথে প্রলোভিত করিয়া, তাহাদেরও নরকে টানিয়া আনা। ঐতিহাসিক ফাউস্ত্ সম্বন্ধে লোকের এই ধারণা দাঁড়ায় যে, শয়তানের কাছে নিজের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া ফাউস্ত্ নানা অলৌকিক বিভূতির অধিকারী হন। সারা জীবন ধরিয়া নানা কুকার্যে ও ব্যসনে লিপ্ত থাকিয়া ফাউস্ত্ শোচনীয় ভাবে নিহত হন; তাহাতে শয়তানের নিকট তাঁহার আত্মদানের কাহিনী জনসমাজে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। গ্যোতে এই ফাউস্তের চরিত্রের আধারে তাঁহার জ্ঞানী অথচ অস্বস্তিপূর্ণ, সত্যানুসন্ধানী অথচ সংশয়াকুল আধুনিক-মানব নায়কের কল্পনা করেন, এবং ফাউস্তের নামেই তাঁহার নাটকের নামকরণ করেন। ফাউস্তের মূল চরিত্র—পৃথিবীর ঐশ্বর্যের বিনিময়ে পাপপুরুষ শয়তানের কাছে নিজের আত্মার বলিদান ও তদনুসারে অনন্তকাল নরকে অবস্থানকে বরণ করা—ইহা অবলম্বন করিয়া ষোড়শ শতকের ইংলাণ্ডের বিখ্যাত নাট্যকার, শেক্স্পিয়রের সমসাময়িক অথচ তাঁহার চেয়ে কিছু প্রবীণ Christopher Marlowe ক্রিস্টোফর মার্লো, ১৫৮৯ সালে Doctor Faustus "ডক্টর ফস্টস্" নামে এক বিয়োগান্ত নাটক (ট্রাজেডি) রচনা করেন। এই নাটক ইংলাণ্ডে খুবই জনপ্রিয় হয়, ও জরমানিতেও ইহার প্রচার হয়; এবং তাহার ফলে জরমানিতে ফাউস্ত্-সংক্রান্ত কাহিনী আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গ্যোতে এইভাবে একটি পুরাতন লোক-প্রচলিত উপাখ্যানকে গ্রহণ করিয়া, তাহার আধারে নিজের এই অপূর্ব চরিত্র "ফাউস্ত্"-এর সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং ফাউস্ত্‌কে অবলম্বন করিয়া একদিকে সমগ্র ইউরোপ-খণ্ডের মানবমনের প্রগতি, ও সঙ্গে-সঙ্গে শিক্ষিত অথচ আশাহত, উদ্যমশীল অথচ পথভ্রান্ত আধুনিক মানবের অবদান বা বিশিষ্ট চরিত্রও আঁকিয়া গিয়াছেন।

ফাউস্ত্-চরিত্র সরল নহে, বিশেষ জটিল। থিওসফিস্ট্-মতাবলম্বী, পুনর্জন্ম-বাদে একান্ত বিশ্বাসী ফাউস্ত্-ব্যাখ্যাতা, দক্ষিণ-ভারতের পণ্ডিত স্বর্গীয় জিনরাজদাস, ফাউস্ত্-চরিত্রের সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন যে, ফাউস্তের ব্যক্তিত্ব যাহা গ্যোতে অঙ্কিত

করিয়াছেন তাহা কেবল একটি জীবনের মধ্যে সংঘটিত, একজন মাত্র মানবের কাহিনী নহে—বরঞ্চ ফাউস্তের জটিল ব্যক্তিত্বের পিছনে আছে, বহু জন্মে সংঘটিত একই ব্যক্তির বা মানবাত্মার বৈচিত্র্যময় নরলীলা। গ্যোতে ভারতীয় দর্শনের কর্মবাদ, সংসারবাদ ও পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে তখনকার যুগে (যখন ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার সহিত ইউরোপের পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র) কতটা সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না। তবে মনে হয়, এই পুনর্জন্মবাদের অবতারণা এ ক্ষেত্রে অবান্তর ও অবাস্তব। এক-ই ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন ও বিচিত্র প্রকাশ, এক-ই জীবনে দেখা যায়। তবে গ্যোতে বোধ হয় জন্ম হইতে মৃত্যু দ্বারা সীমিত একটি-মাত্র মানবের জীবনকে ধরিয়াই যে তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ "জীবন-বেদ" প্রণয়ন ও প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা বলা চলে। তাঁহার নাটকের দুই খণ্ডে যেন তিনি ইউরোপের মানুষের, বিশেষ করিয়া শিক্ষিত অথচ অস্বস্থ মানুষের, মনের ছবি আঁকিয়া দিয়া গিয়াছেন; এবং এই ছবির পিছনে তাঁহার পৃষ্ঠভূমিকাস্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে—বিশেষতঃ নাটকের জটিলতা-পূর্ণ দ্বিতীয় খণ্ডে—প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরিয়া ইউরোপের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। গ্যোতের "ফাউস্ত্"-এর রস পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে হইলে, সাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা কুলাইবে না—এ বিষয়ে পরিষ্কৃত, মার্জিত বুদ্ধি, ও সেই সঙ্গে গত দুই তিন হাজার বৎসরের ইউরোপীয় Humanities বা মানবিকী বিদ্যার ও Science বা ভৌতিক বিজ্ঞানের সহিত পরিচয়, এই উভয়ের সমাবেশ অপেক্ষিত—সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, জড়বিজ্ঞান, এই-সমস্তের প্রধান-প্রধান তথ্য ও তত্ত্ব "ফাউস্ত্" নাটকের মুখ্য আধার। কিন্তু তাহা বলিয়া "ফাউস্ত্" নাটকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য রস-বস্তুর অভাব নাই।

গ্যোতের পাণ্ডিত্য ও রসানুভূতি ছিল সর্বন্ধর। তিনি কালিদাসের শকুন্তলা-নাটকের স্যর উইলিয়াম জোন্স-কৃত অনুবাদ পড়িয়া মুগ্ধ হন, এই বিষয়ে তাঁহার অনবদ্য শকুন্তলা-প্রশস্তি সাক্ষ্যদান করিতেছে। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনার অনুসরণ তিনি "ফাউস্ত্"-এর প্রারম্ভেই করেন—নাটকের উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ লইয়া কবি, নট ও প্রযোজকের মধ্যে একটি নাতিক্ষুদ্র আলোচনা বা বিচার সন্নিবেশিত করেন; ইহার পরে, সংস্কৃত নাটকের মত, গ্যোতে আখ্যানক বা বিষয়বস্তুর অবতারণা করিয়াছেন। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, উচ্চ-মানসিক-আদর্শযুক্ত মহা-পণ্ডিত, বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ ফাউস্ত্, জীবনের সার সত্য সম্বন্ধে অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাসা লইয়া মানসিক অশান্তি ও

ফাউস্তের আগ্রহ, তাঁহার মানসিক ভাবশুদ্ধি, ঈশ্বরের কাছে অবিদিত নহে। ইতিমধ্যে স্বর্গে ঈশ্বরের দরবারে দেবদূতের আবেষ্টনের মধ্যে Mephistopheles মেফিস্তোফেলেস্ বা শয়তানের আবির্ভাব। শয়তানের সম্বন্ধে খৃষ্টান ধর্মের মধ্যেও নানা ধারণা আছে। কোনও ধারণা অনুসারে, শয়তান একাধারে সর্ববিধ পাপ ও কলুষ ও বীভৎসতার প্রতীক; কোনও মতে, শয়তান শাপভ্রষ্ট দেবদূত বলিয়া তাহার মধ্যে কিছুটা উচ্চভাবের অবশেষ বিদ্যমান ছিল; আবার অন্য মতে শয়তান ছিল পুণ্যের অপর পিঠ, এবং ঈশ্বরের কোনও অজ্ঞাত উদ্দেশ্যের সহায়ক। আমেরিকার কবি H. W. Longfellow লঙ্‌ফেলো এই মত গ্রহণ করিয়া তাঁহার The Golden Legend নামক কাব্যময় নাটকের শেষকথা রূপে বলিয়াছেন—

It is Lucifer,
The Son of Mystery;
And since God suffers him to be,
It is for some good
By us not understood.

গ্যোতে কিন্তু শয়তানকে সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে ঢালিয়াছেন—তাঁহার শয়তান বিচারশীল, কূটনীতিজ্ঞ, শ্লেষপূর্ণ আধুনিক মানব, যে মানবের কাছে ঈশ্বর ও তাঁহার বিধি-নিষেধ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের বস্তু। ঈশ্বরের তথাকথিত সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ, বহু স্থলে যে পশুরও অধম হইয়া পড়িয়াছে, ইহার জন্য শয়তান ঈশ্বরের প্রতি উপহাস প্রকাশ করিতে সাহস করে। ঈশ্বরের নিকট ফাউস্তের কথা শয়তান শুনিল—জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি; কিন্তু শয়তান জানিত যে, ফাউস্তের মনে আছে অতৃপ্তি ও অসম্পূর্ণতা—তাহাই অবলম্বন করিয়া শয়তান ফাউস্তের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পতন ঘটাইতে পারে। তাহার হাতে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষেরও রক্ষা নাই।

তাহার পরে নাটকের সূত্রপাত। জীবনে আশা ও আনন্দের কিছু না পাইয়া, বৃদ্ধ ফাউস্তের আত্মহত্যার চেষ্টা, পরে আত্মহনন হইতে বিরতি, আনন্দোৎসবে উৎফুল্ল নাগরিকদের সঙ্গে মিলন; শেষে ফাউস্তের কক্ষে মেফিস্তোফেলেসের (শয়তানের) আগমন, এবং জীবনে চরম আনন্দের বিনিময়ে—সে আনন্দ হয়তো এতই ক্ষণস্থায়ী যে তাহার সম্বন্ধে চিরকাল ধরিয়া আবেগময় অনুযোগ বা ক্রন্দন উঠিবে—Verweile doch! Du bist so schoen! "একটু দাঁড়াও, তুমি কি সুন্দর!"—এই রকম আনন্দের অনুভূতির বিনিময়ে, ফাউস্ত্ নিজেকে মেফিস্তোফেলেসের দাসরূপে বিকাইয়া দিতে রাজী হইলেন। মৃত্যুর পরে যথাকালে তাঁহার হইবে শয়তানের সঙ্গে অনন্ত নরকবাস। শয়তানের যাদুর প্রভাবে বৃদ্ধ ফাউস্ত্ নবযৌবন পাইলেন।

ইহার পরে, রূপকচ্ছলে প্রদর্শিত কতকগুলি ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, ফাউস্তের সঙ্গে নাটকের নায়িকা সুন্দরী কুমারী মার্গারেতের সাক্ষাৎ ঘটিল। নবতরুণ ফাউস্ত্ ও মার্গারেত পরস্পর প্রেমে পড়িল। বলা বাহুল্য, এ-সবের পিছনে আছে মেফিস্তোফেলেস্। দুইজনের অবাধ মিলনের পরিণতি হইল ট্রাজেডিতে—মার্গারেতের ভ্রাতা ফাউস্ত্‌কে সন্দেহ করিল, ইহার ফলে শয়তান-সহচর ফাউস্তের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মার্গারেতের ভ্রাতার মৃত্যু হইল।

ফাউস্ত্ মার্গারেতের সহিত প্রেমে পড়িয়া ইতিপূর্বে স্বীয় জীবনে এক আনন্দময় অনাস্বাদিত যে ভাবরাজ্যের স্বর্গে বিচরণ করিতেছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার পতন ঘটিল। যে প্রেম এবং কাম উভয়কেই ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, ফাউস্ত্ তাহা ভুলিয়া গেলেন। আবার শুদ্ধ প্রেমানুভূতির

অবলে শুষ্ক জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি আসিয়া তাঁহার চিত্তকে অভিভূত করিল। মেফিস্তোফেলেস্ এই প্রবৃত্তির পরিপূর্তির জন্য ইন্ধন যোগাইল, অরণ্যানী-পরিবৃত পর্বতাঞ্চলে ফাউস্ত্‌কে লইয়া গেল, ডাকিনী ও নানাপ্রকার প্রেতযোনির মেলা দেখাইতে। ইতিমধ্যে কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ফাউস্তের সহিত অবাধ অবৈধ মিলনের ফলে মার্গারেতের একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, এবং দুঃখে ক্ষোভে নৈরাশ্যে পড়িয়া উন্মত্তপ্রায় মার্গারেত সন্তানটিকে জলমগ্ন করিয়া হত্যা করে; এবং এই মর্মন্তুদ অপরাধের শেষ বিচারের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া, মার্গারেত প্রাণদণ্ডের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে।

এই সংবাদ পাইয়া মেফিস্তোফেলেসের সাহায্যে মার্গারেতকে উদ্ধার করিবার জন্য ফাউস্ত্ যাদুবলে কারাগারে প্রবেশ করেন। প্রিয়তমকে পুনরায় কাছে পাইয়া মার্গারেতের সংবিৎ ফিরিয়া আসে, এবং ফাউস্তের সঙ্গে পলায়ন করিতেও রাজী হয়। সাধ্বী মার্গারেতের নারীচেতনা কিন্তু বরাবরই পাপ-পুরুষ মেফিস্তোফেলেস্‌কে ভয় করিত, সন্দেহ করিত। কারাগারে মেফিস্তোফেলেস্‌কে দেখিয়া মার্গারেতের সংবিৎ আবার লুপ্ত হইল—সে যাইতে চাহিল না। এদিকে তখন ভোর হয়-হয়, দিনের আলোয় শয়তানের যাদুর প্রভাব থাকে না, সুতরাং মার্গারেতকে তাহার মৃত্যুদণ্ডের কবলে ফেলিয়া, মেফিস্তোফেলেসের সঙ্গে ফাউস্ত্ কারাগার হইতে অদৃশ্য হইতে বাধ্য হইলেন। নাটকের প্রথম খণ্ড এই হৃদয়বিদারক বিয়োগান্ত দৃশ্যে শেষ হইল—নাটকের এই খণ্ডের শেষ কথা, মার্গারেতের কণ্ঠস্বরে আকুল আবেগে তাহার অন্তর্হিত প্রণয়ীকে নাম ধরিয়া আহ্বান—"হাইন্‌রিশ্! হাইন্‌রিশ্"

এইভাবে ফাউস্তের নৈতিক পতনের কথা লইয়া নাটকের প্রথম খণ্ড। ফাউস্ত্ প্রণয়ের স্বাদ পাইলেন; কিন্তু সেই চরম সৌন্দর্যের বা আনন্দের অনুভূতি বা উপলব্ধি তাঁহার হইল না, যাহার বিনিময়ে তিনি নিজ আত্মাকে নরকস্থ করিতেও প্রস্তুত ছিলেন না, যে অনুভূতির আনন্দের মুহূর্তকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন, "একটু দাঁড়াও, তুমি কি সুন্দর!" নাটকের বৃহত্তর ও মহত্তর দ্বিতীয় খণ্ডে গ্যোতে ফাউস্ত্-চরিত্রের আরও জটিল বিকাশ দেখাইয়াছেন, তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। জরমানিতে ও জরমানির বাহিরে বহু সাহিত্যিক ও

দার্শনিক পণ্ডিত "ফাউস্ত"-এর দ্বিতীয় খণ্ডের টীকা রচনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ইহার আদর্শ ও ঘটনাবলী পরিস্ফুট করিয়া দিবার প্রয়াস করিয়াছেন। আমার নিজের অভিজ্ঞতা, এইরূপ দুই-একটি টীকা না থাকিলে, "ফাউস্ত্" দ্বিতীয় খণ্ডের অর্থ-গ্রহণ করা অতি কঠিন ব্যাপার, সাধারণ পাঠকের পক্ষে অসম্ভব বলাও চলে। দ্বিতীয় খণ্ডে ফাউস্তের আদর্শ—সৌন্দর্যের প্রতীক প্রাচীন গ্রীকজগতের সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা হেলেনের সংগে মিলনের কথা আছে, আরও বহু-বহু বিষয়ের অবতারণা রূপকচ্ছলে আছে। ফাউস্তের শেষ পরিণতি—তিনি কর্ম দ্বারা মানুষের মধ্যে শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধির দ০ না করিলেন, বহু মানবের বসবাসের জন্য সমুদ্র হইতে ভূমি উদ্ধার করিলেন; কিন্তু দুশ্চিন্তা ও অতৃপ্তি তাঁহার গেল না—দুশ্চিন্তার প্রভাবে অতি বৃদ্ধ অবস্থায় তিনি দৃষ্টিশক্তি হারাইলেন। কিন্তু ফাউস্তের সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্তি—পরম আনন্দের ক্ষণিক অনুভূতি তখনই তাঁহার আসিল, যখনই তিনি বুঝিলেন যে, পরের জন্য তাঁহার শ্রম ও চেষ্টা সার্থক হইয়াছে। এইভাবে পরার্থে নিজেকে হারাইয়াই ফাউস্ত্ নিজের আত্মাকে ফিরিয়া পাইলেন। পাপ-পুরুষ মেফিস্তোফেলেসের প্রভাব ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। ফাউস্তের এই আধ্যাত্মিক নবজন্মের পরে, তাঁহার স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকার হইল পাপমুক্ত মার্গারেতের প্রার্থনার ফলে। "ফাউস্ত্" নাটকের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ দুই ছত্র—

> Das Ewige-Weibliche
> Zieha uns hinan—
> "The Ever-Womanly"
> Draws us on high—

"শাশ্বত নারী-মূর্তিই আমাদের ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।" এই নারী-মূর্তি বা রমণী-প্রকৃতিই হইতেছে, রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি অনুসারে, মানুষের "জীবন-দেবতা", — ঋগ্বেদের পুরুরবার উর্বশী, যে উর্বশীর সম্বন্ধে বিরহী পুরুরবার শেষ প্রার্থনা—"উপর ত্বা রাতিঃ সুকৃতস্য তিষ্ঠাৎ; নি বর্তস্ব, হৃদয়ং তপ্যতে মে"—আমার সুকৃত বা সচ্চেষ্টার ফল তোমাতেই পহুঁছাক্; ফিরিয়া আইস, আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যে পরব্রহ্মের সংগে মানবাত্মার সাযুজ্য-সম্বন্ধে "প্রিয়া স্ত্রী"র সহিত আলিঙ্গনের উপমা দেওয়া হইয়াছে, গ্যেতের Ewige-Weibliche এবং রমণী-রূপে কল্পিত রবীন্দ্রনাথের "জীবন-দেবতা" সেই উপমারই যেন পূর্ণতর বিকাশ বা অভিব্যক্তি। এবং ইসলামী সূফী মতবাদে, পরমেশ্বর বা শাশ্বত সত্তা যে বিকশিত বিশ্ব-বাসনা-স্বরূপ মানব-আত্মার প্রেমিকা (মা'শূকা) এক রহস্যময়ী রমণী-রূপে কল্পিত হইয়াছেন, যাঁহার পদে মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গিয়া তপস্যার ফল অর্পণ করে, তাহাও চিন্তনীয়।

এই বিরাট্ কল্পনার নাটক-রূপী মহা-কাব্য গ্যোতের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। নানা ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে। মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য অতি সূক্ষ্ম ধরণের, তাহার ভাষার ঝংকার অন্য ভাষায় আনা কঠিন বা অসম্ভব হইয়া পড়ে। ভাবধারাও সরল নহে। আর তাহার পিছনে আছে প্রবীণ ও প্রৌঢ় ইউরোপের সংস্কৃতির আবেষ্টনী।

শ্রীকানাইলাল গঙ্গোপাধ্যায় অনূদিত ও 'জেনারেল বুকস্' কর্তৃক প্রকাশিতব্য গ্যোতের ফাউস্ত' গ্রন্থের উপক্রমণিকা।

রূপময় ভারত

মরুভূমির দেশ রাজস্থান শৌর্যে, বীর্যে এবং শিল্পকলার ঐতিহ্যে ভারতের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। দেশ স্বাধীন হবার পর আজ এই মরুর দেশেও সুজলা সুফলা এবং ভারতের উন্নততর রাজ্যগুলির অন্যতম। প্রতিপদে প্রকৃতির সংগে সংগ্রাম করে ওদের জীবন-ধারণ করতে হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। ও-দেশের কর্মঠ, বলিষ্ঠ এবং সুন্দর-দেহ অধিবাসীদের বিষয় রূপকথা হয়ে আছে। ওদের গ্রাম্য জীবনের এই ছবি-গুলিতে রয়েছে (বামে) দূরবর্তী কুয়া থেকে জল নিয়ে ঘরের পথে রাজস্থানী প্রৌঢ়া; (নীচে বামদিক থেকে) তরুণী বধূ ও মন্দিরে পূজা দিতে আগত গ্রামবাসী; (পরপৃষ্ঠায় প্রথম সারিতে বামদিক থেকে) বাজারের পথে; গ্রামের প্রবীণ নায়ক; (দ্বিতীয় সারিতে বামদিক থেকে) হাস্যোজ্জ্বল বধূ; মরুর যান উটের পিঠে মাল তোলা; (নীচে বামদিক থেকে) দীর্ঘ কাপড়ের পাগড়ি সহ সুখী গ্রামবাসী; এবং স্বজন-গৃহে যাবার পথে রাজস্থানী রমণীদল।

আলোকচিত্রশিল্পী
বিশ্বরঞ্জন রক্ষিত

। পত্রাবলী ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত]

॥ ২১০ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

রানী, এবারে এসে এখনো ঠিক সুস্থ হয়ে উঠতে পারিনি। মনে করেছিলুম খুচরো নানা রকম লেখবার কাজ এখান থেকে সেরে নেব। কিন্তু দেহ মন দুটোই প্রতিকূল হয়ে বসে আছে। চিঠি নানা শ্রেণীর লিখতে হয়, সেগুলো নিতান্তই বাজে অথচ ঝেড়ে ফেলবার জো নেই। তা ছাড়া এমন দুই একটা ফরমাশ এসে পড়ে যার দাবি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মানতেই হয়। যথা সারনাথে যে বৌদ্ধ বিহার স্থাপিত হচ্চে তার জন্যে কবিতা লিখে দেওয়া এবং সেটা ইংরেজী ভাষায় তর্জমা করা। এ বাড়ির পশ্চিম দিকে যে ছোট্ট কাঁচের ঘর আছে সেইখানেই অধিকাংশ সময় শয়ান অবস্থায় আমার কাটে। সামনে বরফের পাহাড়টাকে মেঘের দল ক্ষণে ক্ষণে নতুন রকমের সাজসজ্জা পরিয়ে তাকে বিচিত্র করে তুলচে। নাতনীদের উপদ্রবের মতো এই ব্যাপারটাকে সেও গম্ভীরভাবে স্বীকার করে নিচ্চে। আর সামনের গাছ-গুলোর উপর কত রকমের যে পাখির মেলা তার ঠিক নেই। ঐ ওদের দলে মিশে গিয়ে চিন্তাহীন মন নিয়ে থাকতে পারলে বেশ হতো। কিন্তু আমাদের পিতামহী পিতামহকে জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাইয়েছেন, সেই অবধি আমাদের মন ও বিশ্বের মাঝখানে চিন্তার আড়াল পড়ে গেল। আমাদের চারদিক থেকে আমরা নির্বাসিত। আগেকার দিনে বড়োমানুষের বউরা যেমন পাল্কির ভিতরে বসে গঙ্গা নাইত আমাদের সেই দশা। ইতি ৯ কার্তিক ১৩৩৮

কবি

এ চিঠিটা দার্জিলিং থেকে লেখা।

॥ ২১১ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

আজ দার্জিলিংএ শেষ দিন, বিকেল বেলায় অধোগমনের মোটর যানে চড়ব। কাল সোমবারে প্রভাতে রাজধানীতে পদার্পণ।

জনশ্রুতি যে তোমরা হাওয়াগাড়িতে পথে পথে ভ্রাম্যমাণ। একটা প্রমাণ এই যে শেষ পত্রটার উত্তর পাই নি। প্রমাণটা যে একেবারে বৈজ্ঞানিকভাবে নিঃসংশয় তা নয়—তবু অন্য যুক্তির চেয়ে এ যুক্তিটা তৃপ্তিকর।

এবং পত্রলেখককে একসঙ্গে পাবারই সম্ভাবনা, সেই রকমই আশা করা যাক। ইতি ১৫ নভেম্বর ১৯৩১

কবি

কবি ভুল করে নভেম্বরের জায়গায় কার্তিক লিখেছিলেন ১৯৩১ সালটাকে ঠিক রেখে। আমি নিজে তারিখটা সংশোধন করেছি।

॥ ২১২ ॥

ওঁ

কল্যাণীয়াসু,

কিছুকাল থেকে জনশ্রুতি শুনচি তোমরা আসচ—অপেক্ষা করচি—কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে সংবাদও নেই রথধ্বনিও শুনি নে। মানুষকে তাগিদ করা উচিত না কিন্তু আসবে, কি আসবে না কিংবা কবে আসবে জানতে স্বাভাবিক ঔৎসুক্য হয়। কাজের ভিড় খুব জমচে।

কবি

৫ ডিসেম্বর ১৯৩১।

এ চিঠিগুলোর সঙ্গে ভুল করে একখানা প্রশান্তর চিঠি এসে গেছে।

॥ ২১৩ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু,

কাল সন্ধ্যের সময় রাজধানী পৌঁছব। আর পরে ভাবীকাল সম্বন্ধে মোকাবিলায় আলোচনা করা যাবে। আপাতত কিছুকাল ধরে চেষ্টা করচি ঝংকারিত সেই মশকঘুরস কেনবার জন্যে। কোথাও পাইনি। যদি এই পত্র পেয়ে জোড়াসাঁকোয় গোপালকে দোকানের সন্ধান ফোন করে বলে দাও তা হলে আশ্বস্ত হব। কোনো এক সময়ে একবার আমাদের খবর নিয়ো। ইতি সোমবার

কবি

এই চিঠি ২৯ মার্চ ১৯৩২ সালে লিখিত

॥ ২১৪ ॥

ওঁ

স্টেট হোটেল
যোধপুর
রাজপুতানা

কল্যাণীয়াসু,

রানী, যোধপুরের রাজবাড়ি থেকে চিঠি লিখচি। এইটে জানাবার জন্যেই লেখা। আমি পৌঁছবার দু দিন পরে পৌঁছবে। পাবার আগে তোমার ব্যবহার কি এবং পরেই বা কি রকম সেইটে পরীক্ষার জন্যে কৌতূহল আছে। আর আর খবর দেখা হলে হবে।

কবি

॥ ২১৫ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

মনের খুব গভীর তলায় একটা ব্যথা সর্বদাই রয়ে গেছে। অনিবার্য দুর্ঘটনার কাছে হাল ছেড়ে দিতে আমার লজ্জা করে। বিশেষত যখন বাইরের লোক মনে করে আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। তাই জীবনযাত্রা আগেকার মতই সম্পূর্ণ সহজ-ভাবেই চালিয়ে যাচ্চি। কখনো বা নীতুর(১) চিঠি পাই, কখনো বা এণ্ড্রুজ মীরাদের কাছ থেকে চিঠি পাই যে ও ভালোর দিকে যাচ্চে—তার আঘাতটা বহন করা বড়ো কঠিন। নীতু তার ——র জবরদস্তিতে বড়ো কষ্ট পেয়েছে—ওকে আমাদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে অস্বাস্থ্যকর কাজে বড়ো নির্মমভাবে প্রবৃত্ত করেছিল—মনে করেছিল একেই বলে পৌরুষের ট্রেনিং। অথচ ও ছিল অত্যন্ত সুকুমার স্পর্শকাতর, ওর মাকে ভালোবাসতো সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে। চিরজীবন স্নেহ থেকে আরাম থেকে বঞ্চিত হয়ে বড়ো গরীবের মতোই কাটিয়ে গেছে। আমি ওকে মনে মনে কতো যে ভালোবাসতুম তা অনেকেই জানে না—কিন্তু এখন সে কথা বলে কী হবে। আমিই তো ওকে নিজে চেষ্টা করে জর্মানিতে পাঠিয়েছিলুম। সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। জীবনে যা কিছুতে মীরা সুখী হতে পারত ওর ভাগ্যে তার সমস্তই হয়ে গেল বিপরীত। বাকি রইল ওর গাছপালা, ওর নিজের মনের অসীম ধৈর্য, আর বুড়ী। সংসারের আসল চেহারাটা যখন প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন মনের মধ্যে কেমন ভয় আসে। কেননা মার খাবার জায়গা তো আরো অনেক আছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে নিজের সুখদুঃখ নিয়ে আন্দোলন করা আমাদের মতো লোকের নয়। এ সমস্তই পেরিয়ে যেতে হবে—সেই পারের দিকেই মনটাকে লাগিয়ে কাজ করে চলেচি। লিখেচি নিতান্ত কম নয়। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তব্যের দায় যখন মনে পড়ে তখন মন বিকল হয়। এরকম উজানে নৌকা ঠেলার কাজ ঠিক মেনে নিতে পারি তেমন পালোয়ানের মতো অন্তরের অবস্থা নয়। সবসুদ্ধ জীবনের আকাশে আলো অনেকখানি কমে গেছে। যে কাজগুলো ঠিক আমারই কাজ তাতে আমার ক্লান্তি নেই, কিন্তু যা কিছু বাজে সেটাকে জঞ্জাল বলে মনে হয়। এরকম অবস্থায় সামাজিকতারও ত্রুটি ঘটতে থাকে। এই ঘটনা ঘটবার অনেকদিন আগে থেকেই মন আর একবার ইস্কুল পালাবার ছুতো খুঁজছিল, হয়ে উঠল উঠল, কর্তব্যের জাল আরো বেশী করে শক্ত করেই গাঁট বাঁধচে। ইতি ২১ আগস্ট ১৯৩২

কবি

---

১ দৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

॥ ২১৬ ॥

ওঁ

নিকেতন

কল্যাণীয়া

রানী, এতদিনে নিশ্চয় ফিরে এসেচ—আমার —খানা চিঠিও পেয়ে থাকবে। তোমার বাবা কেমন আছেন। শুনেছি কোনো আশঙ্কার কারণ নেই। বুলা ঠিক বর্ষামঙ্গলের দিনে এসেছিল। এবার সকলেই বর্ষামঙ্গল বন্ধ রাখবার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত শোকদুঃখের উপলক্ষ্যে নিয়মের উলট পালট করা আমাকে লজ্জা দেয়—যেটা অন্তরের ব্যাপার সেটা অন্তরে থাক, বাহিরের ব্যবহারে তাকে আন্দোলিত করতে একেবারেই ভালো লাগে না। সিমলা কেমন লাগল—শরীরে কিছু আরাম পেয়েছ কি? রথীরা কলকাতায় যাচ্চেন। তোমার এখানে আসা হোলো না।

কবি

---

২৬ অগস্ট ১৯৩২ সালে লিখিত

॥ ২১৭ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রানী, তোমার বাবার অবস্থার কথা শুনে ভালো লাগল না। আমি নিজের থেকে এর বেদনা বুঝতে পারি। কিছুদিন মনে হচ্ছে আমার মনের শক্তিতে ক্ষয় ধরেছে, গর্মিকালে অজয় নদীর স্রোতের মতো। আমাদের মতো লোকের মনটাই হচ্ছে আসল প্রাণ। বেঁচে থাকব অথচ মনটাকে খাটাতে পারব না অন্তত মনটা সম্পূর্ণ হুকুম মানবে না তার চেয়ে দুঃখ আর কিছু নেই। অর্জুন যেদিন গাণ্ডীব তুলতে পারেন নি সেই দিনই তাঁর পালা শেষ হয়েছিল। এই সময়টাতে আমার মন কাজ করেনি তা নয়, কিন্তু মনে হয় যেন সে তার দিনের আলো ক্ষীণ হবার আগেই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি তার আগাম কাজ চুকিয়ে ফেলতে চাচ্চে। এত বেশী পূর্বে কোনোদিন লিখিনি। তা ছাড়া ভালই লিখেচি—নূতন প্রণালীতে লিখেচি। কিন্তু এটা যেন সমাপ্তির তাগিদে লেখা, পর্যাপ্তির উৎসাহে নয়। যাই হোক সকল অবস্থার সঙ্গেই মানুষ আপোস করে নিতে পারে—একদিকে দেউলে হলেও সব দিকেই দেউলে হয় না। সংকট ঘটবার আগে যতটা উদ্বিগ্ন করে ঘটলে ততটা আঘাত দেয় না। তার কারণ মানুষের মধ্যে এত বৈচিত্র্য আছে। গোধূলি বেলাকার আলোতেও তার জীবনের কারবার চলে, এমন কি, নিশীথ রাত্রের অন্ধকারেও। মনকে বাইরে খাটানো যখন চলে না, মনকে তখন ভিতরে খাটানোর কাজ জোরে চলে, অভাব তাতেই পুষিয়ে নেওয়া যায়। সেই জন্যেই মানুষের বার্ধক্য সম্পূর্ণ নেগেটিভ নয় তার একটা পজিটিভ রূপ আছে যা অন্য বয়সে থাকে না। ইতি ৩১ আগস্ট ১৯৩২

কবি

॥ ২১৮ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রানী, আর দু তিন দিনের মধ্যে মীরু বোম্বাই পৌঁছবে। বর্ধমান হয়ে এখানে আসতে টেলিগ্রাফ করেচি।

আজকাল পরে পরে নীতুর খবর ক্রমশতই পাচ্চি। আমার উপর বার বার ঘা পড়চে। ভয় হয় পাছে বাইরের লোকের কাছে সেটা প্রত্যক্ষ হয়। কাজকর্ম করে যাচ্চি।

মীরা যখন এখানে আসবে তুমি যদি থাক খুশী হব। সে তোমাকে ভালোবাসে—তোমার কাছে মন খুলতে তার সঙ্কোচ হবে না। প্রথম আগমনের সময়টা বড়ো বিশ্রী, সংকটের ঝোঁকে পড়তে নিশ্চয় তার খারাপ লাগবে। মানুষের দুঃখের জের শীঘ্র মিটতে চায় না। আমি যাব, বর্ধমান থেকে তাকে নিয়ে আসব। খুব বৃষ্টি হয়ে এখানে যথেষ্ট ঠাণ্ডা পড়েচে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩২

॥ ২১৯ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

গাছপালাগুলো দুলচে—হাওয়া দিয়েছে পশ্চিমের দিক থেকে। রোদ্দুরে সোনার রঙ ধরেচে। এই রঙটাতে মন ভোলায়—অনির্দিষ্ট কোন্ সুদূরের জন্যে মন কেমন করে। মানুষের মন দুর্বাসার পাখি, একটা কাছের বাসা, একটা দূরের। শরৎ কালটা হচ্ছে দূরের কাল—আকাশের আবরণটা উঠে গেছে কি না, আর যে আলোটা সমস্ত ভাবনাকে রাঙিয়ে তোলে, সেটা যেন দিগন্তপারের প্রাসাদবাতায়ন থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে আসচে, আর তারই সঙ্গে ভেসে আসচে একটি অশ্রুত ধ্বনির সানাইয়ের মুলতানের আলাপ। এখন বেলা তিনটে হবে—রথী বউমা পুপে, এই ট্রেনে যাত্রা করেচে দার্জিলিঙের উদ্দেশে। আজ ছুটি-পাওয়া ছেলেমেয়ের দলও চলল বাড়িমুখে। আজ অপরাহ্ণের আকাশে এই যানেওয়ালাদের স্রোতের টান ধরেচে—মনে হচ্চে ঐ শিউলি গাছগুলোও উন্মনা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দুটো একটা চলতি মেঘের দিকে তাকিয়ে। মনকে বোঝাচ্চি, কর্তব্য আছে, কিন্তু আজ এই দিগন্তব্যাপী ছুটির বেলায় কর্তব্যটা উজোনের নৌকো, গুণ টেনে হাঁপিয়ে মরতে হবে—প্রাণটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ছুটির ঘণ্টা বাজবে আমার বুকের মধ্যে, শিরায় শিরায় রব উঠচে, দৌড় দৌড় দৌড়। কিন্তু হায় রে, আমার বয়েস আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধেচে—স্থাবর শক্তিকে নড়াতে গেলে অনেক টানাটানির দরকার, ফস্ করে কোমর বেঁধে বেরিয়ে পড়লেই হোলো না। তাই ডাঙার বট-গাছটার মতো মস্ত ছায়া মেলে তাকিয়ে দেখচি, ঢেউগুলো লাফ দিয়ে দিয়ে চলেছে রৌদ্রে ঝিলমিল্ করতে করতে—তাদের সঙ্গে সুর মেলাতে চায় আমার অন্তরের মর্মরধ্বনি—কিন্তু তাতে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সুর লাগে। আমিও তো যানে-ওয়ালা, কিন্তু আমার যাত্রা একান্তে ডুবে যাওয়ার দিকে, সামনের পথে ছুটে যাওয়ার দিকে নয়। ছুটির এই চঞ্চলতা কাল পরশুর মধ্যেই শান্ত হয়ে যাবে, তখন মনের পালে উদাস হাওয়ার বেগ যাবে কমে, তখন কর্মহীন প্রহরগুলোর স্তব্ধতার মাঝখানে বসে ওই বিলিতী নিমের নিঃশব্দ বীথিকার দিকে চুপ করে চেয়ে থাকবার সময় আসবে।

অভিনয়ের খবর দিতে অনুরোধ করেছিলে তারই ভূমিকাটা লেখা হোলো। অভিনয়টা হয়ে চুকে গেছে এই খবরটাতেই মন আছে ভরে। ওস্তাদজি গান বন্ধ করলেন—এস্রাজের তার দিলে আলগা করে, বন্ধ করে রাখল তাকে ভাণ্ডারে, এতক্ষণে সুরেন রঙ্গমঞ্চের সাজসজ্জা সব খুলে ফেলছে—ছেলেরা প্রায় কেউ নেই, কুকুরগুলো আসন্ন উপবাসের উদ্বেগ মনে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আসল খবরটা দিয়ে ফেলি। ভালই হয়েছিল অভিনয়, দেখলে খুশী হতে। মেয়েরা নাচেনি, নেচেছিল ছেলেরা, সেটা পীড়াজনক হয় নি।

বউমা পুপে বিদায় নিয়ে গেল। হঠাৎ আজ লাল এসে পৌঁচেছে, তাই রথী আজ যেতে পারলে না—কাল যাবে বলে জনরব। তোমার ঘরে সঙ্গের অভাব নেই—মিস্ত্রীদের নিয়ে দিন ভরতি হয়ে আছে। কবে যাবে গিরিডিতে।

কবি

৩ অক্টোবর
১৯৩২

॥ ২২০ ॥

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়াসু

রানী, এখান থেকে শরীর খারাপ করে গিয়েছ এ খবরটাতে কার উপরে রাগ করব ভেবে পাচ্চিনে। একলা বিধাতার দায়িত্ব হলে মনে এতটা ক্ষোভ থাকত না। কিন্তু এখানে এসে কয়দিন তুমি শরীরের অযত্ন করেচ, যথোচিত নিয়ম পালন করো নি সেটাকে সম্মিলিত অপরাধ বলেই গণ্য করতে হবে। ইচ্ছে করচে কিছুদিন তোমাদের শশিভূষণ ভিলাতে গিয়ে তোমাদের পুকুরে ডুব দিয়ে কষে একবার ম্যালেরিয়া করে তোমার শোধ দিই। সেটা দূর দুর্গম এবং দুঃসাধ্য হবে না কারণ আগামী কল্য চলেচি খড়দহে। যদি জিজ্ঞাসা করো কেন চলেচি—তার উত্তর এই যে পিপিসাবীর তাগিদে। লেকচার লিখতে হবে। এখানে লেখা এগোয় না। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না যে এখানে মন বাধা পায়। তার প্রতিবাদস্বরূপে সম্প্রতি একটা গল্প লিখেচি, তার নাম, দুই বোন। খুব ছোট গল্প নয়। ওকে বলা যেতে পারে, ঢ্যাঙা ছোটো গল্প, কিম্বা বেঁটে বড়ো গল্প। যদি বলো, এই বয়সে গল্প লেখা কেন? তার জবাব এই, পেটের দায়ে। বিচিত্রাকে বিক্রি করে শ তিনেক টাকা পেয়েছি। সেই টাকা দিয়ে কোণার্কের পশ্চিম প্রাঙ্গণে একটা এমন ঘর বানাতে চাই যেখানে যথেষ্ট হাওয়া এবং আলো, আরাম এবং অবকাশ পেতে পারি। গল্পটা ভালোই হয়েচে। এ মতটা একলা আমারি তা মনে করো না, ওটা যারা লেখে নি তাদেরও ঐ মত, এমন কি অপূর্বেরও। ওটা না লিখে যোগাযোগটা কেন লিখলুম না যদি জিজ্ঞাসা করো তা হলে তার উত্তর ব্যাখ্যা করে লিখতে হলে এই চিঠির কাগজে যে জায়গাটুকু বাকি আছে কুলোবে না। অতএব বিদায় নিই, বুড়ী বসে আছে সঞ্চয়িতা পড়বার জন্যে। ঘোরতর বর্ষণ হয়ে গিয়ে অপরাহ্ণে রৌদ্র উঠেছে—পশ্চিমাকাশে ঘটা করে সূর্যাস্তের আয়োজন হচ্চে। ইতি ৬ কার্তিক ১৩৩৯

কবি

সপসপে ভেজা একটা মানুষের মূর্তি
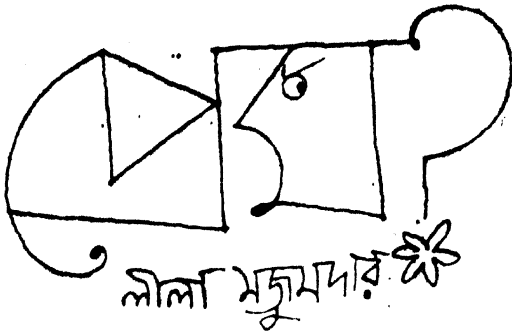
যারা বলে চেরাপুঞ্জিতে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি পড়ে, তারা বাড়িয়ে বলে কিনা কে জানে। ঘোর বর্ষাকালে অজয় নদীর ধারে কোনো শালবনে গেছেন কখনো? সেইখানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী না হোক সবচেয়ে জোরে যে বৃষ্টি পড়ে, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহই নেই। সে কি দারুণ বৃষ্টি, সে ভাবা যায় না। আকাশ থেকে ঝমঝম করে পড়ছে, গাছের ফাঁক দিয়ে ঝরঝর করে পড়ছে, বড় বড় পাতার গা বেয়ে ঝুপঝুপ করে পড়ছে। পথঘাট, গাছ, গাছের মাঝের পথ, সব লেপে পুঁছে একাকার হয়ে যাচ্ছে। এ সময় কোনো ঘটনাকেই বাড়াবাড়ি বলে মনে হয় না।

ঝরঝরে পুরানো একটা ফোর্ড গাড়ি, যত জল বাইরে পড়ছে, তার অর্ধেক জল ভিতরেও পড়ছে, তাই নিয়ে খুব সাবধানে এগুচ্ছি। গাছ গোনার সরকারী কাজে বেরিয়েছি, সেই ধাক্কাতেই পথ ছেড়ে বেপথ ধরেছি।

চোখে ভালো দেখছি না, নিজের হেড লাইটে নিজেই অন্ধ, কাঁচের ওপর দিয়ে নদীর স্রোতের মতো জল নামছে, কাঁচ মোছাটা কোনকালে বন্ধ হয়েছে। এমন সময় সপসপে ভেজা একটা মানুষের মূর্তি গাছ-তলা থেকে এগিয়ে এসে আমার হেড লাইটের আলোতে দাঁড়াল।

গাড়ি থামাতেই নিজেই দরজা খুলে আমার পাশে বসে বলল। "আনারখেতি গাঁটা কোথায় বলতে পারেন?"

আমি বললাম, "নিজে এখন কোথায় আছি, তাই বলতে পারছি না আবার আনারখেতি গাঁ।"

সে তার ভিজে পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, "সেইখানে চলুন। প্রেমের জনাই বেশীর ভাগ খুন হয় তা জানেন?"

বলে একটা বেঁটে বন্দুক বের করল, সেটার গা থেকেও জলের ধারা গড়াচ্ছে। এইবার লোকটার মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলাম। আধাবয়সী, দু-এক দিন দাড়ি কামায়নি, পোশাক-আসাক ভালোই মনে হল, এখন যদিও ভিজে জ্যাবড়া হয়ে রয়েছে। কেমন একটা বিদেশী বিদেশী ভাব।

কর্কশ গলায় সে বললে, "কি? ভালোবাসার জন্যও যে খুন হয় তা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? আপনার বোধ করি ধারণা টাকার জনাই ওসব হয়? ডান দিকে ঘুরুন, এতক্ষণে জায়গাটাকে চিনেছি। কুড়ি বছরের ভালোবাসার ঋণ শোধবার পথ সহজে ভোলা যায় না।"

আমার কাছে তো সব পথই সমান, বরং আনারখেতি পৌঁছুতে পারলে হয়তো শুকনো কাপড় পরবার, পেট ভরে গরম ভাত খাবার একটা সুযোগ পাওয়া যেতে পারে। ডান দিকের পায়ে চলার পথটাই ধরলাম।

লোকটা বন্দুকটাকে পকেটে পুরে বলল, "আমাকে টাকা দেখাবেন না স্যার, আমেরিকার তেলের খনিতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা করেছি, সেইজনা সেডি বলে মেম আমার পেছনে অষ্টপ্রহর ঘুরছে, বয়সটা তার খুব কম না হলেও দেখতে খাসা, আর রাঁধে যা, আহা! কিন্তু সেসব প্রলোভনকে পেছনে ফেলে রেখে এই মশামাছির দেশেই ফিরে এসেছি। এই কুড়ি বছরে মশাগুলো কি সাংঘাতিক বেড়েছে মশাই, কিন্তু পুরোনো ভালোবাসার কাছে পৃথিবীর আর সব জিনিসকেই তুচ্ছ বলে মনে হয়। কি? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?"

"না, না, অবিশ্বাসের কি আছে, তবে ঐ প্রেমের কথাটা কি যেন বলছিলেন?"

কাষ্ঠ হেসে বললে, "বলছিলাম প্রেমের জনাই দুনিয়ার বেশীর ভাগ খুন হয়। এ-দেশেও তাই

দেখেছিলুম ও-দেশেও তাই দেখলুম—ভালোবাসার পথে দুটো একটা প্রাণ কিছুই নয়। কই, শুকনো দেশলাই আছে?"

"পাগল, তাই থাকে কখনো? কিন্তু প্রেমের জন্য খুন এ-দেশে তেমন হয় বলে তো জানিনে। ওদের রং ফর্সা ওদের কথা—"

বাধা দিয়ে কর্কশ গলায় সে বললে, "জানেন না মানে? প্রায় কুড়ি বছর আগে ভালোবাসার জন্য নিজেই খুন হলাম আর আমি জানিনে—ও কি মশায়, অমন করে গাড়ি চালালে যে গাছের ধাক্কায় দুজনেই মরব! আপনাকে লাইসেন্স দিলে কে?"

অনেক কষ্টে সামলে নিলাম। একটা বরফের মতো ঠাণ্ডা হাত দিয়ে আমার কনুই চেপে ধরে উত্তেজিতভাবে সে বললে, "ঐ দেখা যায় আনারখেতি গাঁ, ঐখানে নয়নতারার বাবার বাড়ি।"

বহু দূরে দেখি গাঁয়ের আলো জলের ধারায় হেলছে দুলছে। আঃ, বাঁচা গেল, সকাল থেকে কিছু পেটে পড়েনি।

পাশের লোকটা একেবারে ধুম হয়ে গেছে, শুধু চোখ দুটো অস্বাভাবিকভাবে জ্বলছে। বনের গাছপালা পাতলা হয়ে এসেছে, মনে খানিকটা জোর পেলাম। সে এবার আমার দিকে ফিরে বলল, "ভালোবাসা কাকে বলে আপনি বোধ হয় জানেন না? এমন ভালোবাসা যার জন্য প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, নরহত্যা সব করা যায়? যেমনি করে মণিরাম আর আমি নয়নতারাকে ভালোবাসতাম?"

একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, "ঐখানে নদীর ধারে নয়নতারার বাবার হোটেল।"

চমকে উঠে গাড়িতে একটু স্পিড লাগিয়ে বললাম, "অ্যাঁ? কোন্ দিকে?"

সে যেন শুনতেই পেল না।

"একসঙ্গে মানুষ হয়েছিলাম মণিরাম আর আমি, সত্যি কথা বলতে কি, সে আমার মামাতো ভাই। একসঙ্গে কাঠের কারবার করতাম, একসঙ্গে সারা দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতাম। তারপর সন্ধ্যা নামলেই ঘরে এসে স্নান সেরে, পালা করে নয়নতারার বাবার হোটেলে খেতে যেতাম। একদিন ও যেত, আমি গুদাম পাহারা দিতাম। একদিন আমি যেতাম, ও গুদোম পাহারা দিত।

"যেদিন আমার পালা, সেদিনটা যেন কাটতেই চাইতো না। সারাদিন অপেক্ষা করে থাকতাম কখন সন্ধ্যে হবে, নয়নতারার বাবার হোটেলে যাব, নয়নতারাকে দেখতে পাব।

"আর যেদিন ওর পালা, সেদিন ঝপ করে বেলা কেটে সন্ধ্যে লেগে যেত। সেই এক একটা সন্ধ্যেতে আমি হাজারবার মরে যেতাম।

"দুজনেই ওকে ভালোবাসতাম।

"পঁচিশ বছর বয়সে কাউকে ভালোবেসেছেন কি?"

বললাম, "না—মানে তেইশ না পেরুতেই বাবা ধরে বিয়ে দিয়ে দিলেন কিনা, ভালোবাসবার সময় পেলাম কোথায়?"

সে চেঁচিয়ে বললে, "তাই নিয়ে দুঃখ করবেন না মশায়, আপনি যে কত সুখী, সে আপনি নিজেই জানেন না। সময় পেলেন না বলে বেঁচে গেছেন মশায়, আমার মতো বুকের মধ্যে আগুন পুষে দুনিয়াময় ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে না! জানেন সেডি মামের মেম ছাড়াও মেমি বলে আরেকজন আছে, ওখানকার ইস্কুলে পড়ায়, আঙ্গুরলতার ঢাকা তার ছোট একটা বাড়ি আছে, পোস্টাপিসের খাতা আছে। টেক্সাসের মাটিতে সোনা ফলে তা জানেন, আর ওখানকার মেয়েরা কি রকম ভালো গৃহিণী, সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। তবু দেখুন ভালোবাসার জোরে ফিরে এসেছি। ভালোবাসার জোরে আর প্রতিশোধের লোভে।"

আমি চমকে উঠলাম। ততক্ষণে গাঁয়ের আলো আরো অনেক কাছে এসে গেছে, বৃষ্টির বেগও কমে এসেছে, গাড়ি চালাতে আর অতটা কষ্ট হচ্ছে না। সে বললে, "চমকে উঠলেন যে? জানেন না বোধ হয় যে ভালোবাসার রাজ্যে দুজনের বেশী তিনজনের ঠাঁই হয় না? আস্তে আস্তে আমার প্রাণের বন্ধু মণিরাম হয়ে উঠল আমার পরম শত্রু।"

বন্দুকটার নলের খানিকটা বের করে একবার দেখে নিয়ে সে বলতে লাগল। "আমার যখন পালা আসত, সারা সন্ধ্যেটা নয়নতারার বাবার কাছে মণিরামের নিন্দে করতাম। বানিয়ে বানিয়ে ওর বিষয় এমন সব সাংঘাতিক গল্প করতাম যে, ঘরে ফিরে রাতে ওর পাশের খাটে শুতে আমার নিজেরই ভয় করত। অথচ থাকি একসঙ্গে, ভালো পিরানও দুজনের ঐ একখানাই, যার যেদিন পালা ঐটি পরে সেদিন সে নয়নতারার বাবার হোটেলে যায়।

"অবিশ্যি প্রেমের কথা কিছু আর বলা হত না। রাঁধাবাড়া করতে নয়নতারা বড় ব্যস্ত থাকে। তবে একটু রাত হলে নদীর ঘাটে বাসন ধোয়। বাসন ধোয়া হলে ঘাটের ওপরে চ্যাপটা পাথরে দু দণ্ড বসে। পেছনে নদী বয়ে যায়, হলুদ ডুরে কাপড় পরে, কোঁকড়া চুলে এলোখোঁপা বেঁধে বসে থাকে। তখনো তাকে ঠিক একলা পাওয়া যায় না। পেছনে হোটেলের দোর খোলা থাকে, দড়ির খাটিয়াতে নয়নতারার বাবা বসে থাকে। নদী-পথে যাওয়া-আসার ধারে ওদের হোটেল, যখন তখন লোকের আনাগোনা, নয়নতারা সদাই সজাগ। প্রেম আর দানা বাঁধতে পারে না, মণিরামের নিন্দে করা ছাড়া আর কিছুর সুযোগ হয় না।

একেবারে বর্ষার ভরা নদীতে

"তবু রোজ বুঝতাম এমন রমণীরত্ন আর কোথাও পাওয়া যাবে না, যার ঘরে ও যাবে মা লক্ষ্মী সঙ্গে যাবেন।

"মণিরামটাও আমার বিষয়ে না জানি কত কথাই বানিয়ে বানিয়ে ওদের কাছে বলত। মনে করলে এখনো আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। থাক সে কথা।

"জন্মাষ্টমীর দিন আনারখেতি গাঁয়ে বড় হইচই হয়। নয়নতারার বাবার হোটেলের পায়েস পিঠে খাবার জন্য দূর গাঁ থেকে লোক আসে। অথচ মণিরামের পালা সেদিন।

"বলেছি কি প্রেমের রাজ্যে ন্যায় অন্যায় বিচার নেই? সেদিন দুপুরে খাবার সময় মণিরামের ভাগে দিলাম খানিকটা শিউলি পাতা বেটে। সন্ধ্যের মধ্যে ওর আর নড়বার চড়বার জো থাকল না।

"তখন পিরানটা গায়ে দিয়ে ওর পেটে সেঁক দেবার জন্য বোতলে গরম জল ভরে বললাম, 'যাই ওদের একবার বলে আসি আজ তুমি অসুস্থ।'

"গেলাম হোটেলে, নয়নতারার বাবাকে বললাম, 'মণিরামটা গোল্লায় গেছে, নেশা-টেশা করে একাকার।' ভেবেছিলাম কথাটা আজ নয়নতারার কাছে পেড়ে দেখব। এই মনে করে ঘাটের উঁচু পাথরটাতে গিয়ে যেই না বসেছি, অমনি পাথরের পেছন থেকে মণি-রাম উঠে এসে ঠেলে আমাকে জলে ফেলে দিলে! ঐ উঁচু পাড় থেকে একেবারে বর্ষার ভরা-নদীতে!"

এই বলে লোকটা এতক্ষণ চুপ করে থাকল যে শেষ অবধি বললাম, "ইয়ে মরে-টরে যাননি তো?"

সে বললে, "না, পড়লাম একটা নৌকোতে। পড়েই ভিরমি। যখন জ্ঞান হলো কত দূরে চলে এসেছি। আর গাঁয়ে ফেরা হয়নি। ওরা জাহাজে মজুর যোগাত: ভুলিয়ে-ভালিয়ে দিলে আমাকে আমেরিকা পাঠিয়ে। সেখানে খুব যে খারাপ লেগেছে তাও নয়, তবু কুড়ি বছর পর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা করা সত্ত্বেও দেশে ফিরেছি। নয়ন-তারাকে ভুলতে পারিনি, আহা, হোটেলের রান্না তো ও-ই একলা হাতে করত। তা ছাড়া মণিরামের সঙ্গেও একটা বোঝাপড়া করতে হবে।"

এই বলে বন্দুকটা আরেকবার নেড়ে-চেড়ে দেখে নিল। আমার তো হাত-পা ঠান্ডা। এবার আমরা আনারখেতি গাঁয়ে এসে ঢুকলাম। নদীর ধারে ঘাট, ঘাটের পাশে টিনের ছাদের একতলা ঘর, তার গায়ে সাইন-বোর্ড, হোটেল ডি লন্ডন।

লোকটা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বললে, "এই-খানেই নামতে হবে।"

দোরগোড়ায় ঝাঁকড়াচুল একটা ছেলে দাঁড়িয়ে ছিল, দোরের পাশে একটা দাঁড়ের খাট। লোকটা অবাক হয়ে চারিদিকে চেয়ে বলল, "কিছু বদলায়নি, সেই ঘর, সেই ঘাট, ঘাটের ওপর সেই পাথর, পাথরের নিচে সেই নদী। এখানে একটু পলেস্তারা, ওখানে একটু রং লাগিয়ে নতুন একটা সাইনবোর্ড টাঙাইলেই আর কিছু বদলে যায় না—'এই, বাড়ির মালিককে বল তো অনন্ত এসেছে।'"

ছেলেটা ছোট একটা কৌটো খুলে কি যেন মসলা মুখে ফেলে বললে, "সে নেই। কণ্ট্রোলে গেছে। চাল পারমিটে ভুল আছে।"

হাড়ে বাতাস লাগল। মণি-রামের কপাল ভালো। ঐ ছেলেটাই আমাদের ঘর দেখাল, জল দিল, থালায় করে গরম খিচুড়ি আর মাংস দিল। অমৃতের সঙ্গে তার কোনো তফাত নেই।

ঐ লোকটা কিন্তু একদলা মুখে ফেলেই আঁতকে উঠল, "উঃ, গলা অবধি জ্বলে গেল! নয়নতারাটা দেখছি সব রান্না ভুলে গেছে! তবে কি এতদিন আমি একটা ছায়ার পেছনে ঘুরেছি?"

বললাম, "ঐ নিন, গুড়-নারকেলের গোকুল পিঠে খেয়ে ঝাল তাড়ান।"

তাই মুখে দিয়ে লাফিয়ে উঠল, "উঃ! কি বিশ্রী গন্ধ মশায়। পয়সা দিয়ে লোকে কখনো এ জিনিস খাবে মনে করেছেন? জানেন, সেঁড়ি এই পুরু পুরু গ্রিডল কেক করে, তাতে ঘন রস দিয়ে খেতে হয়। মেমি

আপেল দিয়ে ময়দা দিয়ে পাই যা রাঁধে—কই, আমার ভিজে কোটটা কোথায়? এ রান্নায় আর সেখানে হোটেল চালাতে হচ্ছে না! বেঁচে থাক আমার সেডি, মেমি।"

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একবার বললে, "জানেন, মণিরামের জন্যও দুঃখ হয়।" বলে একবার আকাশের দিকে তাকালে, বৃষ্টি থেমে গেছে, মেঘ সরে গেছে, এক ফালি চাঁদ বেরিয়েছে, ঘাটের নৌকো ছাড়ে-ছাড়ে, তারই ভিড়ের মধ্যে লোকটা একেবারে মিলিয়ে গেল। নৌকো ছেড়ে দিল।

আমি ধীরেসুস্থে আমার থালা শেষ করে ওর ভাগটাকেও চেটেপুটে সাবাড় করলাম। তারপর ছেলেটির হাতে পয়সাকড়ি মিটিয়ে দিয়ে বললাম, "আচ্ছা, এ গাঁটার নাম কি আনারখেতি?"

সে বললে, "আনারখেতি তো ইলেমবাজার পেরিয়ে, এটা হলো শেয়ালপোতা।"

॥ ২ ॥
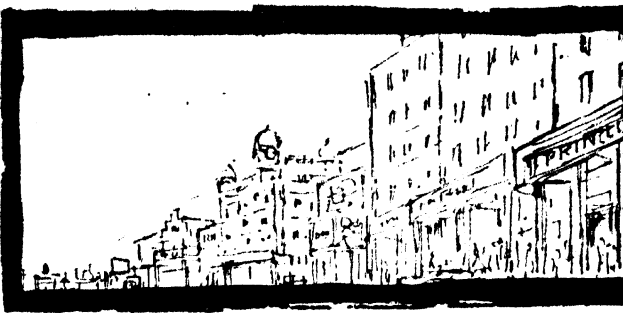
"হ্যাল্লো ইয়ার।" হঠাৎ চমকে উঠলাম।

আমারই সামনে এ্যাটাচি কেস হাতে কোট্-প্যান্ট-পরা এক সায়েব দাঁড়িয়ে রয়েছেন। গায়ের রঙ আমার থেকেও কালো। (মা নিতান্ত স্নেহ বসেই আমাকে উজ্জ্বল শ্যাম বলতেন।)

এ্যাটাচি কেসটা দেখেই চিনেছি। বায়রন সায়েব। পার্কের মধ্যে আমাকে ঘুমোতে দেখে বায়রন সায়েব অবাক হয়ে গিয়েছেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বায়রন সায়েব বললেন, "বাবু।" বায়রন সায়েবের আশ্চর্য হয়ে যাবারই কথা। ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটে আমার প্রতিপত্তি এক সময় উনি তো নিজের চোখেই দেখেছেন।

সেই দিনটার কথা আজও ভুলিনি। বেশ মনে আছে, চেম্বারে বসে টাইপ করছিলাম। এমন সময় এ্যাটাচি কেস্ হাতে এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। আবলুস কাঠের মতো রঙ। কিন্তু সে রঙেরও কেমন একটা জেল্লা আছে —ঠিক যেন ধর্মতলা স্ট্রীটে চার-আনা-দিয়ে-রঙ-করা সু।

সায়েব প্রথমেই আমাকে সুপ্রভাত জানালেন। তারপর আমার বিনা অনুমতিতেই সামনের চেয়ারে এমনভাবে বসে পড়লেন, যেন আমাদের কতদিনের আলাপ। চেয়ারে বসেই পকেটে হাত ঢোকালেন, এবং এমন একটি ব্র্যান্ডের সিগারেট বার করলেন, যার প্রতি প্যাকেট সেই দুর্মূল্যের বাজারেও সাত পয়সায় বিক্রি হতো।

সিগারেটের প্যাকেটটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "একটা ট্রাই করে দেখুন।"

আমি প্রত্যাখ্যান করতেই হা-হা করে হেসে উঠলেন। "এই ব্র্যান্ড বুঝি আপনার পছন্দ হয় না। আপনি বুঝি খুব ফেথফুল্। একবার যাকে ভালবেসে ফেলেন, তাকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারেন না।"

প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, উনি বোধ হয় ঐ সিগারেট কোম্পানীর সেলসম্যান। কিন্তু, আমার মতো অরসিকের কাছে রস নিবেদন করে যে লাভ নেই, এই বক্তব্যটি যখন নিবেদন করতে যাচ্ছিলাম, তখন উনি আবার মুখ খুললেন। বললেন, "কোনো কেস্ আছে নাকি?"

কেস্? আমরাই তো অন্য লোকের কাছ থেকে কেস নিয়ে থাকি। আমাকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে বায়রন সায়েব নিজেই বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, "যে কোন পারিবারিক বা ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে আমাকে পাওয়া যেতে পারে।"

বায়রন সায়েব আরও বলেছিলেন, "এনি কেস। সে কেস্ যতই জটিল এবং রহস্যময় হোক না কেন, আমি তাকে জলের মতো তরল এবং দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ করে দেবো।"

আমি বললাম, "আমার হাতে এখন কোনো কেস্ নেই।"

টুপিটা মাথায় চড়িয়ে বায়রন সায়েব উঠে পড়লেন। "দ্যাটস্ অল্ রাইট। দ্যাটস্ অল্ রাইট। কিন্তু কেউ বলতে পারে না —কবে, কখন আমাকে দরকার পড়বে। তোমার দরকার না পড়ুক, তোমার ফ্রেন্ডস্-দের দরকার পড়তে পারে।"

সেই জন্যই বায়রন সায়েব আমাকে একটা কার্ড দিলেন। ও'র নাম লেখা আছে—B. BYRON your friend in need টেলিফোন নম্বর: তার পাশেই লম্বা দাগ। কিন্তু কোনো নম্বর নেই।

বায়রন সায়েব বললেন, "টেলিফোন এখনও হয় নি। কিন্তু ভবিষ্যতে হবেই। সেই জন্যে জায়গা রেখে দিয়েছি।"

বায়রন সায়েব বলেছিলেন, "হবে, ক্রমশ আমার সব হবে। শুধু টেলিফোন কেন, গাড়ি হবে, বাড়ি হবে, মস্ত আপিস হবে। বাবু, ইউ ডোণ্ট নো, প্রাইভেট ডিটেক্টিভ তেমন ভাবে কাজ করলে কী হতে পারে; তোমাদের চীফ্ জাস্টিসের থেকেও বেশী রোজগার করতে পারে।"

প্রাইভেট ডিটেক্টিভ! এতোদিন তো এ'দের কথা শুধু বইতেই পড়ে এসেছি। বর্ণ-পরিচয়ের পর থেকেই কৈশোরের শেষ দিন পর্যন্ত এই শখের গোয়েন্দাদের অন্তত হাজার খানেক কাহিনী গলাধঃকরণ করেছি। ছাত্র জীবনে যে নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে ব্যোমকেশ, জয়ন্ত-মানিক, সুব্রত-কিরীটী ও ব্লেক-স্মিথের পুজো করেছি, তার অর্ধেকও যদি যাদব চক্রবর্তী, কে পি বসু, আর নেসফিল্ডের সেবায় ব্যয় করতাম, তাহলে আজ আমার এই দুর্দশা হতো না। কিন্তু এতোদিন কেবল আমারই মনোরাজ্যে এই সব সত্যানুসন্ধানী রহস্যভেদীরা বিচরণ করতেন। এই মরজগতে—এই কলকাতা শহরেই—যে তাঁরা সশরীরে ঘোরাফেরা করেন তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

পরম বিস্ময় ও শ্রদ্ধা সহকারে বায়রন সায়েবকে আবার বসতে অনুরোধ করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, চা পানে আপত্তি আছে কি না।

একবার অনুরোধেই উনি রাজী হলেন। চা-এর কাপটা দেড় মিনিটে
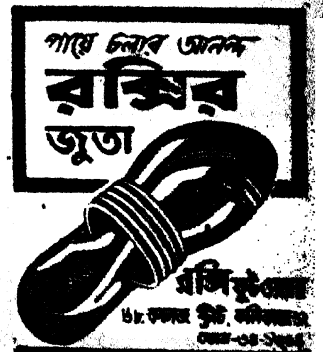
শিগগির করে, বায়রন সায়েব বিদায় নিলেন। বললেন, "আমাকে তা হলে ভুলো না।"

আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গোয়েন্দাদের আবার কাজের জন্য লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে হয় নাকি? আমি তো জানি, গোয়েন্দা যখন ভোরবেলায় টোস্ট এবং ওমলেট সহযোগে চা খেতে খেতে সহকারীর সঙ্গে গল্প করতে থাকেন, তখন হঠাৎ টেলিফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বাজতে আরম্ভ করে। একটু বিরক্ত হয়েই নরম সোফা থেকে উঠে এসে রহস্যভেদী টেলিফোন ধরেন। তখন তাঁকে শিবগড় মার্ডার কেস্ গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। নিহত রাজা-বাহাদুরের বিধবা মহিষী কিংবা একমাত্র কন্যা নিজে রহস্যভেদীকে অনুনয় করেন, 'এই কেস্‌টা আপনাকে নিতেই হবে। টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। আপনি যা চাইবেন তাই দেবো।'

কিংবা, কোনো বর্ষামুখর শ্রাবণ সন্ধ্যায় যখন কলকাতার বুকে দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসে, ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যায়, বাইরে বেরোবার কোনো উপায় থাকে না, তখন আপাদমস্তক রেন্ কোট চাপা দিয়ে কোনো অজ্ঞাতপরিচয় অতিথি রহস্যভেদীর ড্রইং রুমে ঢুকে পড়েন। মোটা অঙ্কের একটা চেক টেবিলের উপর রেখে দিয়ে আগন্তুক তাঁর রহস্যময় অতীতের রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন। একটুও বিচলিত না হয়ে, রহস্যভেদী বার্মা সিগারের ধোঁয়া ছেড়ে ঠান্ডা মাথায় বলেন, 'পুলিসের কাছে গেলেই বোধ হয় আপনার ভালো হতো।'

আগন্তুক তখন চেয়ার থেকে উঠে পড়ে তাঁর হাত দুটি ধরে করুণ কণ্ঠে বলেন, 'প্লিজ, আমাকে নিরাশ করবেন না।'

কিন্তু বায়রন সায়েবের এ কি অবস্থা? নিজেই কাজের সন্ধানে বেরিয়েছেন!

ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের আদালতী কর্মক্ষেত্রে কত বিচিত্র মানুষের আনাগোনা। ভেবেছিলুম বায়রন সায়েবকে সাহায্য করতে পারবো। আমারই অনুরোধে আমারই কোনো পরিচিত জনের কোনো রহস্য ভেদ করে হয়তো বায়রন সায়েব ভারত-জোড়া খ্যাতি অর্জন করবেন। তাই ওঁকে বলে-ছিলাম, "মাঝে মাঝে আসবেন।"

বার্নিশ করা কালো চেহারা নিয়ে বায়রন সায়েব আবার টেম্পল চেম্বারে এসে-ছিলেন। এবার ওঁর হাতে কতকগুলো জীবনবীমার কাগজপত্র। প্রথমে একটু ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলাম। সামান্য কয়েক মাসের চাকরি-জীবনে আমাকে অন্তত দু'ডজন এজেন্টের খপ্পরে পড়তে হয়েছে। আড় চোখে বায়রন সায়েবের কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজের কর্তব্য স্থির করছিলাম। কিন্তু বায়রন সায়েব যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন।

চেয়ারে বসে বললেন, "ভয় নেই তোমাকে ইন্সিওর করতে বলবো না।"

লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। আমাকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়েই বায়রন সায়েব বললেন, "ডিটেকটিভের কাজ করতে গেলে অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। ইন্সিওরের দালালিটাও আমার মেক-আপ।"

বায়রন সায়েবের জন্য চা আনিয়েছি। চা খেয়ে উনি বিদায় নিয়েছেন।

সত্যি আমার লজ্জা লাগতো। যদি ওঁর কোনো উপকার করতে পারতাম তাহলে বিশেষ আনন্দিত হতাম। কিন্তু সাধ থাকলেই সাধ্য হয় না, কোনো কাজই যোগাড় করতে পারি নি। ছোকাদাকে বলেছিলাম,
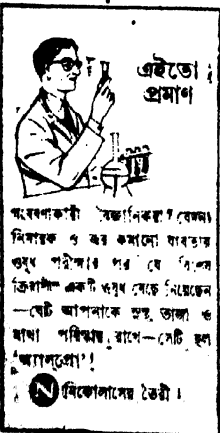
আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছোকাদা বলেছিলেন, "তোমার হাল-চাল তো সুবিধে মনে হচ্ছে না, ছোকরা। ঐ টেঁসো স্যুয়েবের জন্য তোমার এতো দরদ কেন? খুব সাবধান। এলিয়ট রোডের ঐ মালদের পাল্লায় পড়ে কত ছোকরার যে টুয়েলভ-ও-ক্লক বেজে গিয়েছে তা তো জানো না।"

ছোকরার কথায় কান দিই নি। বায়রনকে বলেছি, "আমার লজ্জা লাগে। আপনি কষ্ট করে আসেন অথচ কোনো কাজ দিতে পারি না।"

বায়রন সায়েব আশাবাদী। হা-হা করে হাসতে হাসতে বলেছেন, "কে যে কখন কাকে সাহায্য করতে পারে কিছুই বলা যায় না। অন্তত আমাদের লাইনে কেউ বলতে পারে না।"

এই সামান্য পরিচয়ের জোরেই বায়রন সায়েব কার্জন পার্কে আমার ক্লান্ত অবসন্ন দেহটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। "হ্যাল্লো বাবু! হোয়াট ইজ্ দি ম্যাটার?"

উত্তর না দিয়ে, স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কার মূর্তির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। বায়রন সায়েব কিন্তু ছাড়লেন না। আমার হাত দুটো চেপে ধরলেন। আমাকে না জিজ্ঞাসা করেও বোধ হয় সব বুঝতে পারলেন। বললেন, "দিস্ ইজ ব্যাড্। ভেরী ব্যাড্।"

"মানে?"

"মানে, বি এ সোলজার। সৈন্যের মতো ব্যবহার কর তো। এই আনফ্রেন্ডলি ওয়ার্ল্ড-এ আমাদের সবাইকে লড়াই করে বাঁচতে হবে। ফাইট টু দি লাস্ট।"

বায়রন সায়েবের দেহের দিকে এতোক্ষণে ভাল করে নজর দিলাম। বোধ হয় ও'র দিনকাল একটু ভাল হয়েছে। ধপ ধপে কোট-প্যান্ট পরেছেন। পায়ে চক-চকে জুতো।

জীবনের মূল্য সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ উপদেশ বায়রন সায়েব হুড় হুড় করে বর্ষণ করলেন। হয়তো ভেবেছেন খেয়ালের বশে জীবনটাকে খরচ করে ফেলবার দুষ্ট অভিসন্ধি নিয়েই আমি এখানে বসে রয়েছি। উপদেশ বস্তুটি কোনো দিনই আমার তেমন সহ্য হয় না। ঈষৎ তিক্ত কণ্ঠে বললাম, "পাষাণ-হৃদয় স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা কে-টি, সি-আই ই-র চোখের সামনে ঐ গাছটাতে অনেক অশান্ত প্রাণ চিরদিনের শান্তিলাভ করেছে। খবরের কাগজে নিশ্চয় দেখে থাকবেন। কিন্তু ভয় নেই, মিস্টার বায়রন আমি ওই রকম কিছু একটা করে বসবো না।"

আমার দার্শনিক উত্তরের উপর বায়রন সায়েব কোনো গুরুত্বই আরোপ করলেন না। নিজের মনেই বললেন, "চিয়ার আপ। আরও খারাপ হতে পারতো। আরও অনেক খারাপ হতে পারতো আমাদের।"

দূরে পিতলের ঘড়া থেকে এক হিন্দুস্থানী চা বিক্রি করছিল। বায়রন সায়েব হাঁক দিয়ে চা-ওলাকে ডাকলেন। আমি বারণ করেছিলাম, কিন্তু তিনি শুনলেন না। পকেট থেকে ডাইরি খুলে বললেন, "এক কাপ শোধ করলাম। এখনও বিয়াল্লিশ কাপ পাওনা রইল।"

চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ফর্সা কোট প্যান্ট আছে?"

বললাম, "বাড়িতে আছে।"

বায়রন সায়েব আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। "তাহলে আর ভাববার কিছু নেই। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। না হলে আজই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে কেন?"

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বায়রন সায়েব বললেন, "সবই বুঝবে। সময় হলে সবই বুঝতে পারবে। শাজাহান হোটেলের মেয়েটাকে আমিই কি প্রথমে বুঝতে পেরেছিলাম।"

কথা থামিয়ে বায়রন সায়েব ঘড়ির দিকে তাকালেন। "কতক্ষণ লাগবে? বাড়ি থেকে কোট্ প্যান্ট পরে এখনই ফিরে আসতে হবে।"

"কোথায় যেতে হবে?"

"সে সব পরের কথা। এক ঘণ্টার মধ্যে স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কার স্ট্যাচুর তলায় তোমাকে ফিরে আসতে হবে। পরের প্রশ্ন পরে করবে, এখন হারি আপ—কুইক্।"

চৌরঙ্গী থেকে কি ভাবে সেদিন যে চৌধুরী বাগানে ফিরে এসেছিলাম ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। তাড়াতাড়ির মাথায় চলন্ত বাসে উঠতে গিয়ে অনেকের পা মাড়িয়ে দিয়েছি। বাসের প্যাসেঞ্জাররা হাঁ হাঁ করে উঠেছেন। কিন্তু আমি বেপরোয়া। কিল-চড়-ঘুষি খেয়েও বাসে উঠতে প্রস্তুত-ছিলাম।

দাড়ি কামিয়ে এবং সবেধন নীলমণি স্যুটটি পরে যখন কার্জন পার্কে ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। চৌরঙ্গীর রাত্রি ইতিমধ্যেই মোহিনী রূপ ধারণ করেছে। চোখ ধাঁধানো নিয়ন আলোর ঝলকানিতে কার্জন পার্ককেও যেন আর এক কার্জন পার্ক মনে হচ্ছে। দুপুরে যে কার্জন পার্কের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল সে যেন কোথায় উবে গিয়েছে। বহুদিনের বেকার ছোকরা যেন হঠাৎ হাজার-টাকা-মাইনের-চাকরি পেয়ে বান্ধবীর সঙ্গে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।

কাব্য বা কোটেশন কোনোটিরই ভক্ত নই আমি। কিন্তু অনেকদিন আগে পড়া কয়েকটি কবিতার লাইন তুলে ধরবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। এই কার্জন পার্ক দেখেই সমর সেন বোধ হয় লিখে-ছিলেন:

আজ বহুদিনের তুষার স্তব্ধতার পর
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।
তাই বসন্তের কার্জন পার্কে
বর্ষার সিক্ত পশুর মতো স্তব্ধ বসে
বক্রদেহ নায়কের দল
বিগলিত বিষণ্ণতায় ক্ষুরধার স্বপ্ন দেখে
ময়দানে নষ্টনীড় মানুষের দল।
ফরাসী ছবির আমন্ত্রণে, ফিটনের ইঙ্গিতে
আহ্বানে
খনির আগুনে রক্ত মেঘ সূর্যাস্ত এল।

দেখলাম, মালিশওয়ালা, বাদামওয়ালা, চাওয়ালারা দল বেঁধে পার্কের মধ্যে ঘোরা-ঘুরি করছে। ধোপভাঙা স্যুটে আমাকেও যে আর বেকারের মতো দেখাচ্ছিল না, তার প্রমাণ হাতে নাতে পেলাম। মালিশওয়ালা কাছে এগিয়ে এসে বললে, "মালিশ সাব্।"

"না", বলে এগিয়ে যেতে, মালিশওয়ালা আরও কাছে সরে এসে, চাপা গলায় বললে, "গার্ল ফ্রেন্ড সাব? কলেজ গার্ল—পাঞ্জাবী, বেঙ্গলী, এংলো ইন্ডিয়ান...।" লিস্টি হয়তো আরও দীর্ঘ হতো, কিন্তু আমি তখন বায়রন সায়েবকে ধরবার জন্য উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি। আমার জন্য অপেক্ষা করে করে হয়তো উনি এতোক্ষণে চলে গিয়ে-ছেন। হয়তো চিরদিনের জন্য একটা অমূল্য সুযোগ আমার হাতছাড়া হয়ে গেল।

না। বায়রন সায়েব চলে যান নি। স্যর হরিরাম গোয়েঙ্কার পায়ের তলায় চুপচাপ বসে আছেন। রাতের অন্ধকারের সঙ্গে ওঁর কালো দেহটা যেন একেবারে মিশে গিয়েছে। ওঁর শাদা সার্ট আর প্যান্টটা যেন কোনো অদৃশ্য মানুষের লজ্জা নিবারণ করছে!

আমাকে দেখেই বায়রন সায়েব উঠে পড়লেন। বললেন, "তুমি যাবার পর অন্তত দশটা সিগারেট ধ্বংস করেছি। ধোঁয়া ছেড়েছি আর ভেবেছি। ভালই হলো। তোমারও ভালো হবে, আমারও।"

কার্জন পার্ক থেকে বেরিয়েই শাজাহান হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করেছি। কার্জন পার্কের কোন দিকে আমাদের গন্তব্য স্থল, অনুগ্রহ করে জিজ্ঞাসা করবেন না। ভগবানের তৈরি দশটা দিকের একটা ধরেই আমরা হাঁটতে শুরু করলাম।

হাঁটতে হাঁটতে বায়রন সায়েবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মাথা নিচু হয়ে গিয়েছিল। ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটে তাঁর কোনো উপকারই করতে পারি নি। হঠাৎ মনে হলো, আমি ভালো ভাবে চেষ্টাও করি নি। অনেক এটর্নির সঙ্গেই তো আমার পরিচয় ছিল—সায়েব ব্যারিস্টারের বাবুর অনুরোধ

উপেক্ষা করা তাঁদের পক্ষে বেশ মুশকিল হতো। নিজের প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য সেদিন কারুর কাছে মাথা নত করিনি। আর আজ বায়রন সায়েবই আমার জীবন পথের দিশারী। বায়রন সায়েব বললেন, "তোমার চাকরি হবেই। ওদের ম্যানেজার আমার কথা ঠেলতে পারবে না।"

"ঐ শাজাহান হোটেল"—বায়রন সায়েব দূর থেকে দেখালেন।

কলকাতার হোটেল কুলচূড়ামণি শাজাহান হোটেলকে আমিও দেখলাম। গেটের কাছে খান পঁচিশেক গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আরও গাড়ি আসছে। দারোয়ানজী বুকে আট দশখানা মেডেল ঝুলিয়ে সগর্বে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আর মাঝে মাঝে গাড়ি বারান্দার কাছে এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিচ্ছেন। রাতের পোশাক-পরা এক মেমসায়েব টুপ করে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। তাঁর পিছনে বো-টাই পরা এক সায়েব। লিপস্টিক মাখা ঠোঁটটা সামান্য বেঁকিয়ে ঢেকুর তোলার মতো কায়দায় মেম-সায়েব বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ'। সায়েব এতো-ক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। মেমসায়েব সেটিকে নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। দারোয়ানজী সেই সুযোগে বুটের সঙ্গে বুট ঠুকে সামরিক কায়দায় সেলাম জানালেন। প্রত্যুত্তরে ওঁদের দুজনের মাথাও স্প্রিঙের পুতুলের মতো একটু নড়ে উঠে আবার স্থির হয়ে গেল।

দারোয়ানজী এবার বায়রন সায়েবকে দেখতে পেলেন। এবং বিনয়ে বিগলিত হয়ে একটা ডবল সাইজের সেলাম ঠুকলেন।

ভিতরে পা দিয়েই আমার মানসিক অবস্থা যা হয়েছিল তা ভাবলে আজও আশ্চর্য লাগে। হাইকোর্টে সায়েবের দৌলতে অনেক বিলাস-কেন্দ্রই দেখেছি। হোটেলও দেখেছি কয়েকটা। কিন্তু শাজাহান হোটেলের জাত অন্য। কোনো কিছুর সঙ্গেই যেন তুলনা চলে না।

বাড়ি নয়তো যেন ছোটোখাটো একটি শহর। বারান্দার প্রস্থ কলকাতার অনেক স্ট্রীট, রোড, এমন কি এভিনুকে লজ্জা দিতে পারে। বায়রন সায়েবের পিছন পিছন লিফ্‌টে উঠে পড়লাম। লিফ্‌ট থেকে নেমেও বায়রন সায়েবকে অনুসরণ করলাম। কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। মে মাসের সন্ধ্যায় যেন ডিসেম্বরের শীতের নমুনা পেলাম।

বায়রন সায়েবের পিছনে পিছনে কতবার যে বাঁ দিকে আর ডান দিকে মোড় ফিরে-ছিলাম মনে নেই। সেই গোলকধাঁধা থেকে একলা বেরিয়ে আসা যে আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল তা নিশ্চিত। বায়রন সায়েব অবশেষে একটা দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালেন।

বাইরে তকমা পরা এক বেয়ারা দাঁড়িয়ে-ছিল।... ফিরেছেন। কিচেন ইন্সপেকশন ছিল। ফিরেই গোসল শেষ করলেন। এখন একটু বিশ্রাম করছেন।"

বায়রন সায়েব মোটেই দমলেন না। কোঁকড়া চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। তারপর বেয়ারাকে বললেন, "বলো বায়রন সায়েব।"

মন্ত্রের মতো কাজ হলো। বেয়ারা ভিতরে ঢুকে চার সেকেন্ডের মধ্যে বেরিয়ে এল। বিনয়ে ঝুঁকে পড়ে বললে, "ভিতর যাইয়ে।"

শাজাহান হোটেলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মার্কোপোলো সায়েবকে এই অবস্থায় দেখ-বার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। একটা হাত-কাটা গেঞ্জি আর একটা ছোট্ট আণ্ডার প্যাণ্ট লাল রঙের পুরুষালি দেহটার প্রয়োজনীয় অংশগুলোকে কোনো রকমে ঢেকে রাখবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। বস্ত্রস্বল্পতা সম্বন্ধে ওঁর কিন্তু কোনো খেয়াল নেই, যেন কোনো সুইমিং ক্লাবের চৌবাচ্চার ধারে বসে রয়েছেন।

কিন্তু আমাকে দেখেই মার্কোপোলো সায়েব যেন আঁতকে উঠলেন। "এক্সকিউজ মি, এক্সকিউজ মি," বলতে বলতে উনি তড়াং করে বিছানা থেকে উঠে আলমারির দিকে ছুটে গেলেন। ওয়ারড্রোব খুলে একটা হাফ্‌প্যান্ট বার করে তাড়াতাড়ি পরে ফেললেন। তারপর পায়ে রবারের চটিটা গলিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। দেখলাম সায়েবের গলায় মোটা চেনের হার; হারের লকেটটা কালো রঙের, তাতে কিসব লেখা। বাঁ হাতে বিরাট উল্কি। রোমশ বুকেও নিশ্চয় একটা উল্কি আছে; কারণ তার কিছুটা গেঞ্জির আড়াল থেকে উঁকি মারছে।

ভেবেছিলাম বায়রন সায়েবই প্রথম কথা পাড়বেন। কিন্তু ম্যানেজারই প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোনো খবর আছে নাকি?"

বায়রন সায়েব মাথা নাড়লেন। "এখনও নেই।" একটু থেমে বায়রন সায়েব আবার বললেন, "কলকাতা একটা আজব শহর, মিস্টার মার্কোপোলো। একে যতো বড়ো ভাবো, এ তার থেকে অনেক বড়ো, এবং অনেক আশ্চর্য শহর।"

মার্কোপোলো সায়েবের মুখের দীপ্তি যেন হঠাৎ অর্ধেক হয়ে গেল। বললেন, "এখনও নয়? আর কবে? আর কবে?"

পুরনো সময় থাকলে ওঁর হতাশায় ভরা কণ্ঠ থেকে কোনো রহস্যের গন্ধ পেয়ে কৌতূহলী হয়ে পড়তাম। কিন্তু এখন কোনো কিছুতেই আমার আগ্রহ নেই; সমস্ত কলকাতা রসাতলে গিয়েও যদি আমার একটা চাকরি হয়, তাতেও আমি সন্তুষ্ট।

আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেই বায়রন

দাড়লেন। আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, "একে আপনার হোটেলে ঢুকিয়ে নিতেই হবে। একে আপনার অনেক কাজে লাগবে।"

শাজাহান হোটেলের ম্যানেজার মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বললেন, "কোনো উপায় নেই। ভাড়া দেবার ঘর অনেক খালি আছে, কিন্তু চাকরি দেবার চেয়ার একটাও খালি নেই। স্টাফ বাড়তি।"

এই উত্তরের জন্যই আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছিলাম। বহুবার বহু জায়গায় ঐ একই কথা শুনেছি। এখানে না শুনলেই আশ্চর্য হতাম।

বায়রন সায়েব কিন্তু হাল ছাড়লেন না। চাবির রিঙটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, "কিন্তু আমি জানি তোমার ভেকান্সি হয়েছে।"

"অসম্ভব", ম্যানেজার চিৎকার করে উঠলেন।

"সবই সম্ভব। পোস্ট খালি হয়েছে। আগামী কালই খবর পাবে।"

"মানে?"

"মানে অ্যাডভান্স খবর। অনেক খবরই তো আমাদের কাছে আগাম আসে। তোমার সেক্রেটারী রোজী...।"

ম্যানেজার যেন চমকে উঠলেন—"রোজী? সে তো উপরের ঘরে রয়েছে।"

গোয়েন্দাসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে বায়রন সায়েব বললেন, "বেশ তো, খবর নিয়ে দেখো। ওখানকার বেয়ারাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করো, গতকাল রাত্রে মেমসায়েব নিজের ঘরে ছিলেন কিনা।"

মার্কোপোলো সায়েবেরও গোঁ চেপে গিয়েছে। "Impossible" চিৎকার করে উনি তিয়াত্তর নম্বর বেয়ারাকে ডেকে পাঠালেন।

গত রাত্রে তিয়াত্তর নম্বরের নাইট ডিউটি ছিল। আজও সন্ধ্যা থেকে ডিউটি। সবেমাত্র নিজের টুলে গিয়ে বসেছিল। এমন সময় ম্যানেজার সায়েবের সেলাম। নিশ্চয়ই কোনো দোষ হয়েছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো।

ম্যানেজার সায়েব হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন, কাল সারারাত সে জেগে ছিল কি না।

তিয়াত্তর নম্বর বললে, "ভগবান উপরে আছেন হুজুর, সারারাত জেগে ছিলাম, একটিবারও চোখের দুটো পাতা এক হতে দিইনি।"

মার্কোপোলো সায়েবের প্রশ্নের উত্তরে বেয়ারা স্বীকার করলে, ৩৬২-এ ঘর সারারাতই বাইরে থেকে তালাবন্ধ ছিল। বোর্ডে সারাক্ষণই সে চাবি ঝুলে থাকতে দেখেছে।

মৃদু হেসে বায়রন সায়েব বললেন, "গত রাত্রে ঠিক সেই সময়েই চৌরঙ্গীর অন্য এক হোটেলের বাহাত্তর নম্বর ঘরের চাবি ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।"

"মানে?" মার্কোপোলো সায়েব সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

"মানে, সেই ঘরে শুধু রোজী নয়, আরও একজন ছিল। তিনি আবার আমার বিশেষ পরিচিত। আমারই এক ক্লায়েন্টের স্বামী! এসব অবশ্য আমার জানবার কথা নয়। কিন্তু মিসেস ব্যানার্জি আমাকে ফী দিয়ে লাগিয়ে রেখেছেন। তাঁর স্বামী কতদূর এগিয়েছেন, তার রিপোর্ট আজই দিয়ে এলাম। —No hope। কোনো আশা নেই। আজ সন্ধ্যায় আপনার সহকারিণী এবং ব্যানার্জি দুজনেই ট্রেনে চড়ে পালিয়েছেন। পাখি উড়ে গিয়েছে। সুতরাং এই ছেলেটিকে সেই শূন্য খাঁচায় তুমি ইচ্ছে করলেই রাখতে পারো।"

আমি ও ম্যানেজার দুজনেই স্তম্ভিত। বায়রন সায়েব হা-হা করে হেসে উঠলেন। "তোমাকে খবর দেবার জন্যই আসছিলাম, কিন্তু পথে আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।"

এর পর মার্কোপোলো সায়েব আর না বলতে পারলেন না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানালেন, "রোজী এখনও চাকরি ছাড়েনি, দু'দিন পরে পরে সে যদি আবার ফিরে আসে......"

"তখন তোমার ইচ্ছে হলে একে তাড়িয়ে দিও।" বায়রন সায়েব আমার হয়েই বলে দিলেন।

শাজাহান হোটেলের সর্বেসর্বা রাজী হয়ে গেলেন। আর আমারও চাকরি হলো। আমার ভাগ্যের লেজার খাতায় চিত্রগুপ্ত নিশ্চয়ই এই রকমই লিখে রেখেছিলেন।

(ক্রমশ)

(৩৬)

সৌরেনের পৌরুষ বিদ্রোহ করলো, মনে হল এলিজাবেথ আজ তাকে পুরোপুরি বোকা বানিয়েছে, অপমান করেছে। সে কিছুতেই মুখ বুজে এ অপমান সহ্য করবে না। এলিজাবেথের কোন ওজর আপত্তি সে শুনবে না। তাকে সে বিয়ে করবে। লন্ডনের ভারতীয় মহলে সকলেই জানে সৌরেন ও এলিজাবেথ এনগেজ্‌ড্, কিছু দিনের মধ্যেই তাদের বিয়ে হবে। এখন যদি তারা শুনতে পায় এলিজাবেথ এ বিয়ে ভেঙে দিয়েছে, সকলে হাসাহাসি করবে। না না, সৌরেন কিছুতেই নিজেকে এভাবে তাদের কাছে হাস্যাস্পদ হতে দেবে না।

অনেক রাত পর্যন্ত সৌরেনের চোখে ঘুম এলো না, বহুক্ষণ এপাশ ওপাশ ছটফট করে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। টোকা মারলো এলিজাবেথের দরজায়।

ভেতর থেকে এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করলো —কে?

—আমি সৌরেন, দরজা খোল।

এলিজাবেথের নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর—এত রাতে কি দরকার?

সৌরেন অনুনয় করে, প্লীজ লিজি, দরজা খোল।

অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও দরজা খুলে দিল এলিজাবেথ। সৌরেন এগিয়ে গিয়ে তার হাত দুটি ধরে আবেগভরা গলায় বলে, তুমি এরকম নিষ্ঠুর হয়ো না, লিজি, আমার উপর এতখানি অবিচার ক'রো না।

এলিজাবেথ শুকনো স্বরে উত্তর দিল, এসব কথা আলোচনা করার কি এই সময়?

সৌরেন ব্যাকুল হয়ে বলে, আমি যে আর স্থির থাকতে পারছি না। তুমি কি বুঝতে পারছো না লিজি, এতদূর এগিয়ে যদি তুমি সরে দাঁড়াও, লোকে কী ভাববে! আমি যে কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারবো না।

এলিজাবেথ মৃদু হেসে বললো, আশ্চর্য, লোকে কী বলবে, সেই ভাবনাটাই তোমার কাছে বড় হল। এ বিয়ে সুখের হবে কি হবে না, সে কথা ভাববার দরকারও মনে করলে না?

—তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারছো না, লিজি।

—জানি না সব কথা বুঝতে পেরেছি কিনা। তবে এটুকু নিশ্চয় বুঝেছি জীবন সম্বন্ধে তোমার কতকগুলো বদ্ধমূল ধারণা আছে। এ ধারণাগুলো হয়তো তোমার সহজাত, কিংবা জন্মেছে অনেক দিনের জমানো সংস্কার থেকে। সে যাই হোক, জীবনটাকে তুমি মিলিয়ে দেখতে চাও ঐ ধারণাগুলোর সঙ্গে, যদি মেলে তুমি খুশী হও কিন্তু না মিললেই হতাশ হয়ে পড়। শুধু হতাশ নয়, একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকো।

সৌরেন অসহিষ্ণু হয়ে প্রশ্ন করে, তবে আর মিথ্যে এতদিন আমাকে নিয়ে এভাবে খেলা করার কি দরকার ছিল?

এলিজাবেথ মাথা নেড়ে উত্তর দেয়, খেলা তো করিনি সৌরেন, সত্যিই ভালোবেসেছিলাম। ভালো না বাসলে বুঝতে পারতাম না তোমাকে মুক্তি দেওয়াই আমার কর্তব্য।

—দয়া করে আর মহত্ত্বের ঢাক পিটিও না। কানে বড় বেসুরো লাগছে।

এলিজাবেথ সৌরেনের এ রূঢ়তায় আঘাত

গেল। বলল, গুড নাইট সৌরেন, আর তর্ক করতে ভাল লাগছে না, আমার ঘুম পেয়েছে।

সৌরেন আগের মতই রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করে, তার মানে তোমার কথাই শেষ কথা। আমার দিকটা একবারও ভেবে দেখতে চাও না?

—আমি তো আগেই বলেছি, let us part as friends।

এ কথায় আরও বিরক্ত হল সৌরেন। কোনরকম জবাব না দিয়ে সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলো। আবার গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। কিন্তু ঘুম এলো না।

কতক্ষণ এভাবে সময় কেটেছে খেয়াল নেই, হঠাৎ মনে হল পায়ের কাছে তার খাটের উপর কে যেন এসে বসল।

ভয় পেলো সৌরেন, মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলো, কে ওখানে?

সৌরেন যাকে আশংকা করেছিল, সেই অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো অন্ধকারের মধ্যে থেকে, আর কি ভাবনা, দিব্যি রেহাই পেয়ে গেছ, এবার ভাল ছেলের মত সুড়সুড় করে দেশে ফিরে যাও। মা দেখলে খুশী হবে, রাঙা টুকটুকে বউ আনবে। নির্ঝঞ্ঝাটে ঘর সংসার করবে, কি বল?

সৌরেন বিরক্ত হয়ে বলে, ওভাবে ঠাট্টা ক'রো না, এলিজাবেথ আমাকে অপমান করেছে।

করলেই বা, তুমি তো মুক্তি পেয়েছো।

—এ নিষ্ঠুর রসিকতা আমার কাছে অসহ্য।

সে ধমক দিয়ে উঠলো, বাজে বকর বকর আর নাই-বা করলে। তুমি মনে প্রাণে চেয়েছিলে এ বিবাহবন্ধন থেকে মুক্তি পেতে। এলিজাবেথ স্বেচ্ছায় সে মুক্তি তোমায় দিয়েছে। কোথায় তোমার উচিত তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা, তা নয় যত রাজ্যের লম্বা চওড়া কথা।

সৌরেন ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে, তা হলে এখন আমার কি কর্তব্য?

—অমিতাভর কাছ থেকে টাকা ধার চেয়ে দেশে ফিরে যাও।

—অন্যরা যদি আমায় নিয়ে হাসাহাসি করে?

সে কৌতুক করে হাসলো, তাতে তোমার কী আসে যায়? জানই তো আপনি বাঁচলে পিতার নাম।

সৌরেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, বেশ, তবে তাই হবে।

—এখন নিশ্চিন্ত হয়েছো তো?

—অনেকটা হয়েছি।

সে খুশী হয়ে বলল, আশা করি আর আমার আসবার দরকার হবে না, তোমার কাছ থেকে বিদায় চেয়ে নিচ্ছি।

কথা শেষ করেই সে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। সৌরেন চেষ্টা করেও আর তাকে দেখতে পায়নি। শুধু সেই দিনই নয়, বাকি যে ক'দিন সৌরেন লণ্ডনে ছিল আর সে তার কাছে আসেনি। যখনই অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠত তখনই সে আসতো, কথা বলতো সৌরেনের সঙ্গে, কত সময় তাকে ভর্ৎসনা করতো, প্রয়োজনবোধে তিরস্কার করতেও পেছপা হত না। কিন্তু সে রাতে যখন সৌরেন মনঃস্থির করে ফেললো দেশে ফিরে যাবে বলে, আর সে এসে তাকে বিরক্ত করেনি।

পরদিন সকালে উঠে সৌরেন গেল অমিতাভর কাছে। বলল, যদি তুই আমায় টাকা ধার দিস, অমিত, আমি প্যাসেজ বুক করবো।

আনন্দে লাফিয়ে উঠল অমিতাভ, সত্যিই তুমি দেশে ফিরে যাবে, সৌরীদা?

—হ্যাঁ রে, আর ভালো লাগছে না।

—নিশ্চয় টাকা দেবো। তা হলে চল, চেষ্টা করে দেখা যাক আমাদের জাহাজেই জায়গা পাওয়া যায় কিনা। বড় ভাল হয় তা হলে, তুমি আমি লীলাদি একসঙ্গে যেতে পারি।

প্যাসেজ ঐ জাহাজেই পাওয়া গেল।

সুতরাং সেই অনুযায়ী ছুটির দরখাস্ত করা, জিনিসপত্র গোছানো, বন্ধুবান্ধবের বাড়ি যাওয়া এই নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল সৌরেন। দেশে ফেরার একটা অজুহাত খুঁজে বার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। সৌরেন জানালো কলকাতায় একটা ভালো চাকরি পাবার কথা হয়েছে। নিজে গিয়ে ইন্টারভিউ না দিলে হয়তো ফসকে যাবে। দু একজন যে এলিজাবেথের কথা জিগেস করেনি তা নয়, কিন্তু সৌরেন উত্তরে বলেছে, আগে দেশে ফিরে চাকরিটা পাকা করে নিই। তারপর এলিজাবেথকে নিয়ে গেলেই হবে। বেকার অবস্থায় মেমসাহেব বউ নিয়ে দেশে ফেরাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ বোধ হয় নয়। এ কথা যারা শুনেছে সকলেই তারিফ করেছে সৌরেনের। বলেছে খাসা বুদ্ধিমান ছেলে। খুব বিচক্ষণ, সংসারে কখনো ঠকবে না।

তবে সৌরেন কলকাতায় ফিরে যাচ্ছে বলে যে মনেপ্রাণে খুশী হয়েছে, সে সরোজ। সৌরেনকে নিজের ফ্ল্যাটে ডেকে নিয়ে গিয়ে গাঢ় স্বরে বলেছে, তুমি যে ফিরে যাচ্ছ খুব

ভালো কথা। ক'দিন থেকে লীলার জন্যে বড় ভাবছিলাম, একলা যাবে জাহাজে, একে ঐ মনের অবস্থা, যদি রাস্তায় অসুখবিসুখ করে অমিতাভটা যা বাচ্চা ও কি আর সামলাতে পারবে? তুমি সংগে থাকছো জেনে এখন নিশ্চিন্ত হয়েছি।

আশ্চর্য রকম বদলে গেছে সরোজ রায়, কে বলবে এ সেই সরোজদা যে একলাই এক শ' ছিল লণ্ডনের প্রবাসী বাঙালীদের কাছে। যে গান করে, হেসে গল্প বলে সকলকে মাতিয়ে রাখত। এ যেন অতি বিচক্ষণ। সাবধানী মানুষ।

এক সময় বলল, সৌরেন আর এ-দেশে ফিরে এসো না।

—এ কথা কেন বলছ, সরোজদা?

—যে চাকরির চেষ্টায় কলকাতায় যাচ্ছ, যদি পেয়ে যাও ভালো, না পেলে ও-দেশে থেকেই অন্য কাজের চেষ্টা করো, কিন্তু এ-দেশে আর ফিরে এসো না। সরোজের কথাগুলো বড় করুণ শোনালো, কি হবে এখানে থেকে?

সৌরেন সহানুভূতি ভরা গলায় প্রশ্ন করে, তবে আপনিই বা এখানে রয়েছেন কেন?

—থাকবার আর ইচ্ছে নেই। বিশ্বাস করো সৌরেন, প্রথম সুযোগেই আমি এখান থেকে চলে যাবো।

—কোথায়?

সরোজ উদাস সুরে বলে, দেশে ফিরতে পারলেই সুখী হব সবচেয়ে বেশী, কিন্তু অদৃষ্টে যদি তা না থাকে, চলে যাবো জার্মানী। ওরা একটা ভালো চাকরি দিতে আমায় রাজী আছে। রিসার্চের কাজ। কিন্তু লণ্ডনে আর নয়।

সৌরেন সায় দিয়ে বলল, সত্যি, আগের সে লণ্ডন আর নেই। কোথায় সে হইচই, কোথায় সে আনন্দ! পুরোনো বন্ধু-বান্ধবরা যে যার চলে গেল, এখন রাস্তায় ঘাটে দেখছি নিত্য নতুন মুখ। বেশীর ভাগই অচেনা।

সরোজ অন্যমনস্কভাবে উত্তর দেয়, অচেনাও একদিন চেনা হয়ে যায় সৌরেন, একদিন যে রকম তুমি, লীলা, মীনাক্ষী সকলেই অচেনা ছিলে। আজকের যারা অচেনা তাদেরও চেনা করে নিতে পারতাম যদি আগের মত মনটা থাকতো। সেই মনটা যে আর নেই ভাই।

সৌরেন কোন কথা বলল না, চুপ করে শুনলো।

—আজকাল কি মনে হয় জান, সৌরেন, আর বেশী আলাপ না করাই ভালো। কি হবে মিথ্যে বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা বাড়িয়ে? কিই বা লাভ? সবই তো মায়া।

সরোজের মুখ থেকে এ ধরনের কথা শুনবে ভাবতেও পারেনি সৌরেন, বলল, এ কথা কেন বলছেন সরোজদা? যে প্রীতি স্নেহ ভালবাসা আপনার কাছ থেকে আমরা পেয়েছি তার তো কোন তুলনা নেই। লাভ লোকসানের ওজন করতে বসলে লাভের পাল্লাটাই কি আমাদের অনেক বেশী ভারী হবে না?

সরোজ মৃদু স্বরে বলে, কি জানি ভাই, নিজের উপর আর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। ভেবে তো ছিলাম সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রবাসী জীবনটাকে আনন্দময় করে রাখবো। কিন্তু কোথা থেকে কি যে হয়ে গেল! এক একজনের এমন অভিমান যে, তা ভাঙাবার সুযোগ পর্যন্ত দিল না।

কথা বলতে বলতে সরোজের গলা ধরে এসেছিল, উঠে পড়ে বলল, বস সৌরেন। তোমার জন্যে একটু কফি তৈরি করে আনি। সরোজ উঠে গেল। সৌরেনের বুঝতে বাকি রইলো না কার অভিমানের কথা স্মরণ করে সরোজদা এতখানি কাতর হয়ে পড়েছেন। তাকিয়ে দেখলো সরোজদার টেবিলের উপর প্রমীলার একখানি বড় ছবি। এটি নতুন রাখা হয়েছে। তার পাশেই ধূপদানি।

ছবিতেও প্রমীলার মুখখানা বড় করুণ দেখাচ্ছে। নিষ্পাপ চোখ দুটোয় কথা বলবার কী অসীম আগ্রহ।

সৌরেন টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে মন দিয়ে প্রমীলার ছবিটা দেখছিল, খেয়াল করেনি কখন সরোজ এসে তার পিছনে দাঁড়িয়েছে।

—বড় জীবন্ত ছবি, তাই না?

সরোজের কথায় সৌরেনের চমক ভাঙলো। হ্যাঁ, সরোজদা।

—ঠিক যেভাবে প্রমীলা কথা বলতো, কথায় কথায় আমাকে ঠাট্টা করতো। আশ্চর্য মেয়ে! একটু থেমে সরোজদা নিজের মনেই বলে, ওকে একলা যেতে দেওয়া আমার উচিত হয়নি। শুধু অভিমানে মেয়েটা ঐভাবে লুকিয়ে গেল। আমার দোষ।

—এ আপনি কি বলছেন সরোজদা?

সরোজ তবু অবুঝের মত বলে, আমিই বোধ হয় মেয়েটাকে মেরে ফেললাম।

সেদিন আর বিশেষ কোন কথা হল না। একসময় বিদায় চেয়ে নিয়ে সৌরেন বাড়ি ফিরে এলো। রাস্তায় আসতে আসতে সে সরোজের কথাই ভেবেছে। সত্যি, প্রমীলার মৃত্যু তার জীবনের ধারা বদলে দিয়েছে। পীয়ের ঠিকই ধরেছিল, অনুশোচনার আত্মগ্লানিতে সরোজদা এতটুকু মনে শান্তি পাচ্ছে না।

পীয়েরের কথা ভাবতেই মনে হ'ল এ-দেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে মীনাক্ষীকে একবার জানিয়ে যাওয়া বোধ হয় উচিত।

পরের দিন সৌরেন ফোন করলো ব্রাসেলসে। মীনাক্ষী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো, সে কি, কবে ফিরছো?

—সামনের সপ্তাহে।

—কই, লণ্ডনেও তো সেদিন আমাদের বললে না?

সৌরেন মৃদু হাসলো, তখনও ঠিক ছিল না যে।

মীনাক্ষী খুশী হয়ে বললো, নিশ্চয় তুমি খুব Excited হয়ে আছো? এক মাসের মধ্যে কলকাতায় ফিরবে, মার সঙ্গে দেখা হবে।

—তা একটু হচ্ছি বইকি!

—এলিজাবেথ তা হলে এখন তোমার সঙ্গে যাচ্ছে না?
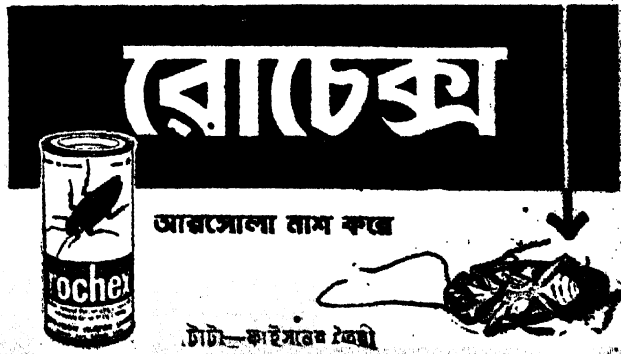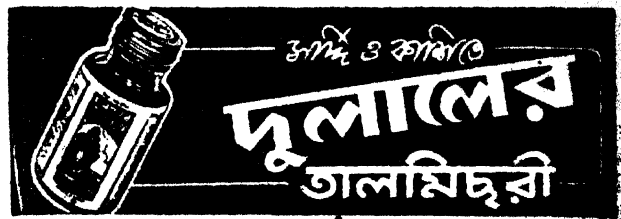
সোরেন এই প্রথম একজনকে স্পষ্ট করে জানালো, এখনও যাচ্ছে না পরেও বোধ হয় যাবে না।

মীনাক্ষী চমকে উঠলো, কেন কি হল তোমার?

—সে কথা পরে তোমাকে চিঠিতে জানাবো। তোমাদের খবর সব ভাল তো?

—ভালো। পীয়ের এখন অফিস গেছে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে পেলে আনন্দ পেত।

তিন মিনিট সময় ফুরিয়ে এসেছিল, তাই সোরেন বলল, পারো তো জাহাজে চিঠি দিও।

মীনাক্ষী সম্মতি জানালো, দেবো।

—কলকাতায় ফিরে তোমার দাদুকে তোমাদের সব কথা জানাবো।

—দাদুর কাছে নিশ্চয় যেও, উনি খুব খুশী হবেন।

সোরেন বলে, সময় হয়ে গেছে। টেলিফোন রেখে দিচ্ছি।

মীনাক্ষী শুভকামনা জানায়। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, তোমার সমুদ্রযাত্রা শুভ হোক। ব' ভোয়াইয়াজ।

(ক্রমশ)

শরৎ-সাহিত্যের 'গারজেন'

গোপালচন্দ্র রায়

১৩৩৭ সালের ২০শে বৈশাখ তারিখে শরৎচন্দ্র কবি রাধারাণী দেবীকে এক পত্রে লিখেছিলেন—

"...আমার মত কুড়ে মানুষ সংসারে আর দ্বিতীয় নেই। একান্ত বাধ্য না হলে কখনো কোন কাজই আমি করতে পারিনে। তবুও এতগুলো বই লিখেছিলাম কি করে? সেই ইতিহাসটাই বলি।

আমার একজন 'গারজেন' ছিলেন।• এ'র পরিচয় জানতে চেও না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, তাঁর মত কড়া তাগাদাদার পৃথিবীতে বিরল। এবং তিনিই ছিলেন আমার লেখার সবচেয়ে কঠোর সমালোচক। তাঁর তীক্ষ্ম তিরস্কারে না ছিল আমার আলস্যের অবকাশ, না ছিল লেখার মধ্যে গোঁজামিলের সাহায্যে ফাঁকি দেবার সুযোগ। এলো-মেলো একটা ছত্রও তাঁর কখনো দৃষ্টি এড়াতো না। কিন্তু এখন তিনি সব ছেড়ে ধর্মকর্ম নিয়েই ব্যস্ত। গীতা-উপনিষদ ছাড়া কিছুই আর তাঁর চোখে পড়ে না। কখনো খোঁজও করেন না এবং আমিও বকুনি ও তাড়া খাওয়া থেকে এ জন্মের মতো নিস্তার পেয়ে বেঁচে গেছি। মাঝে মাঝে বাইরের ধাক্কায় প্রকৃতিগত জড়তা যদি ক্ষণকালের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখনি আবার মনে হয় ঢের ত লিখেছি, আর কেন, এ জীবনের ছুটিটা যদি এই দিক থেকে এমনি করেই দেখা দিলে, তখন মেয়াদের বাকি দু চারটে বছর ভোগ করেই নিই না কেন? কি বল রাধু? এই কি ঠিক নয়? অথচ লেখবার কত বড় বৃহৎ অংশই না অলিখিত রয়ে গেল। পরলোকে বাণীর দেবতা যদি এই ত্রুটির জন্য কৈফিয়ত তলব করেন তো, তখন আর এক-জনকে দেখিয়ে দিতে পারবো, এই আমার সান্ত্বনা।"

১৩৩৮ সালের ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে শরৎ-চন্দ্র রাধারাণী দেবীকে আর একটি পত্রে লেখেন—

"রাধু, তোমার আগেকার চিঠি যথাসময়েই পেয়েছিলাম এবং নূতন বছরের আরম্ভে যে আশীর্বাদ চেয়েছিলে, তা মনে মনে দিতে কোন কৃপণতা করিনি, শুধু প্রকাশ্যে জানানোটা ঘটে ওঠেনি ভাই। 'এই কালই জবাব দেবো' এই একটা প্রতিজ্ঞা প্রত্যহ সকালে উঠেই করেচি এবং করতে করতে মাস দেড়েক কেটে গেলো। এমনি স্বভাব। অথচ তোমাদের আজও জ্ঞান জন্মালো না যে, ভাবো 'দাদাটি তোমাদের স্বর্গে গেছেন,

তাঁকে স্মরণ করাই বা কেন, আর তাঁর আশীর্বাদ চাওয়াই বা কিসের জন্য।' আর কদিনই বা বাকি আছে বোন—একটু আগে থেকেই না হয় ভাবলে। কি এমন ক্ষতি? আরও তো কেউ কেউ এইটাই স্বীকার করে নি? একেবারে নিরুদ্দেশের আড়ালে লুকিয়ে গেছেন। তোমরা পারো না?"

শরৎচন্দ্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন, তার যতদূর সম্ভব সংগ্রহ করতে পেরেছি, সেইসব নিয়ে "শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র" নাম দিয়ে আমি একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছি। এই গ্রন্থে রাধারাণী দেবীকে লেখা শরৎচন্দ্রের চিঠিগুলিও আছে।

এখানে উদ্ধৃত রাধারাণী দেবীকে লেখা শরৎচন্দ্রের পত্রাংশ দুটির মধ্যে প্রথমটিতে "আমার একজন গারজেন ছিলেন, এ'র পরিচয় জানতে চেয়ো না" যে লেখা আছে, রাধারাণী দেবী কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ'র পরিচয়টা জানতে পেরেছিলেন।

"শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র" গ্রন্থটি সম্পাদন কালে শরৎচন্দ্রের উক্ত 'গারজেনের' কথা রাধারাণী দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি আমার কাছে মুখে একজন মহিলা সাহিত্যিকের নাম করলেও গ্রন্থে গারজেনের পাদটীকায় নাম বাদ দিয়ে শুধু "জনৈক মহিলা সাহিত্যিক" এই কথাটি লিখতে বলেছিলেন।

রাধারাণী দেবী ব্যতীত শরৎচন্দ্রের কয়েকজন বন্ধুর কাছ থেকেও পরে উক্ত মহিলা সাহিত্যিক মহোদয়ার নাম আমি জানতে পারি। নানা কারণে এখানে আমি উক্ত ভদ্রমহিলার নামটি গোপন করে রেখে
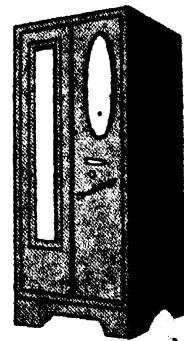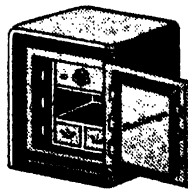
উপরে উদ্ধৃত রাধারাণী দেবীকে লেখা দ্বিতীয় পত্রাংশটিতে যে 'আরও তো কেউ কেউ এইটাই স্বীকার করে নিয়ে একেবারে নিরুদ্দেশের আড়ালে মিলিয়ে গেছেন' আছে, এ সম্বন্ধে রাধারাণী দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি মুখে পূর্বোক্ত মহিলা সাহিত্যিকের নাম বলে ঐ কথাগুলির পাদ-টীকায় যা লিখতে বলেছিলেন, তা হচ্ছে—'শরৎচন্দ্রের জীবনে একটা গোপন বেদনা ছিল। তাঁর এই বেদনার কথা রাধারাণী দেবী জানতেন। তাই রাধারাণী দেবীকে লেখা বহু পত্রেই তাঁর এই বেদনার আভাষ পাওয়া যায়। এখানেও সেই আভাষই ব্যক্ত হয়েছে।

আমার সম্পাদিত 'শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র' গ্রন্থটিতে রাধারাণী দেবীকে লেখা শরৎ-চন্দ্রের উপরোক্ত পত্র দুটির পাদটীকায় রাধা-রাণী দেবী যা লিখতে বলেছিলেন, তাই মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

রাধারাণী দেবীকে লেখা বহু পত্রেই যেমন শরৎচন্দ্রের 'গোপন বেদনার আভাষ' রয়েছে, লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায় নাম্নী এক জন মহিলা লেখিকাকে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি পত্রেও তেমনি তাঁর সেই গোপন বেদনার কথাই পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে। শরৎচন্দ্রের সেই পত্রটি এই—

পরম কল্যাণীয়াসু,

"......আমার মানসিক পরিবর্তন সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন তুমি বহুদিন হইতে করিয়া আসিতেছ এবং বহুদিন হইতেই আমি নীরবে আছি। কিন্তু আমার মত যখন তোমার বয়স হইবে, তখন হয়ত ইহা বুঝিতেও পারিবে যে, জগতে মানুষের এমন কথাও থাকিতে পারে, যাহা কাহারও কাছে ব্যক্ত করা যায় না। গেলেও তাহাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের মাত্রাই বাড়ে। অথচ এই নীরবতার শাস্তি অতিশয় কঠিন।

ভীষ্ম যে একদিন স্তব্ধ হইয়া শরবর্ষণ সহ্য করিয়াছিলেন, সে কথা চিরদিনের মত মহাভারতে লেখা হইয়া গেল, কিন্তু কত অলিখিত মহাভারতে যে এমন কত শরশয্যা নিত্যকাল ধরিয়া নিঃশব্দে রচিত হইয়া আসিতেছে, তাহার একটা ছত্রও কোথাও বিদ্যমান নেই। এমনি করিয়াই সংসার চলিতেছে...

তোমার এই দাদাটির অনেক বয়স হইয়াছে, অনেকের অনেক প্রকারের ঋণ এ নাগাদ শোধ করিতে হইয়াছে। তাহার এই উপদেশটি কখনো বিস্মৃত হইও না যে, পৃথিবীতে কৌতূহল বস্তুটার মূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়া যত বড়ই হোক, তাকে দমন করার পুণ্যও সংসারে অল্প নয়।

যে বেদনার প্রতিকার নাই, নালিশ করিতে গেলে যাহার নীচেকার পঙ্ক জেরায় জেরায় একেবারে উপর পর্যন্ত ঘুলাইয়া উঠিতে পারে, সে যদি থিতাইয়া থাকে তো থাক না। কি সেখানে আছে, নাই বা জানা গেল, কি এমন ক্ষতি?"

শরৎচন্দ্র নাকি জীবনভোরই তাঁর এই বেদনা বয়ে বেড়িয়েছেন। তিনি তাঁর প্রথম যৌবন থেকে শেষ বয়স পর্যন্ত ঐ ভদ্র-মহিলার কথা ভুলতে পারেননি। এসম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় আমাকে ক'টি গল্প বলেছিলেন। তার একটি গল্প এই—

শরৎচন্দ্র কথিত তাঁর গায়কেন ভদ্রমহিলা খ্যাত লেখিকা অনুরূপা দেবীর বান্ধবী ছিলেন। অনুরূপা দেবী তাঁর মাসতুতো ভাই উপরোক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

কাছে এই গল্পটি বলেছিলেন। সৌরীন-বাবু বলেন—

অনুরূপা দিদির ঐ বান্ধবীটি বাল্যকাল থেকেই একটু-আধটু ধর্মকর্ম করতেন। কিন্তু প্রথম যৌবনেই অকস্মাৎ বিধবা হয়ে যাওয়ায় তাঁর এই ধর্মকর্মের মাত্রা আরও অনেক গুণ বেড়ে যায়। বিধবা হয়ে তিনি ভাগলপুরে তাঁর পিতার কাছে থাকতেন। শরৎচন্দ্রও তখন ভাগলপুরে ওঁদের পল্লীতেই থাকতেন।

দিদির বান্ধবী একদিন তাঁদের ঘরের দাওয়ায় বসে বঁটি নিয়ে পুজোর ফল কাটছেন, বাড়ির সকলে কোথায় যেন গেছেন, কেবল একা তিনিই বাড়িতে আছেন। এমন সময় হঠাৎ শরৎচন্দ্র কোথা থেকে এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই বললেন এই যে তোমাকে দেখতে এলাম।

বাড়িতে কেউ নেই, এই অবস্থায় শরৎচন্দ্রকে সামনে দেখে দিদির বান্ধবী একটু সংকুচিত হয়ে পড়লেন এবং তখনই তিনি শরৎচন্দ্রকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বললেন। আর একটু রূঢ়ভাবেই বললেন।

শরৎচন্দ্র অগত্যা আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। শরৎচন্দ্র, দিদির বান্ধবীটির দাদাদের বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি শরৎচন্দ্রের ঐভাবে একাকী বাড়ির ভিতরে যাওয়া এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টাকে ক্ষমা করতে পারলেন না। দাদারা বাড়ি ফিরলে তিনি দাদাদের কাছে নালিশ করে বললেন—তোমাদের বন্ধুটি কি রকম লোক বলত? বাড়িতে কেউ নেই, তবু বাড়িতে ঢুকে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন?

জপতপপরায়ণা, সদাচারিণী, বাল্য-বিধবা ঐ ভদ্রমহিলা শরৎচন্দ্রকে সেদিন এমনিভাবেই বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু তবুও কোনদিনই এঁকে ভুলতে পারেননি।

এই ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের এক-তরফা এই হৃদয়-দৌর্বল্যের কথা এবং এঁকে নিয়ে বিভিন্ন জনের কাছে শরৎচন্দ্রের চিঠি লেখা ও গল্প বলার কথা অনুরূপা দেবী জানতেন। অনুরূপা দেবী তাই একবার এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন:—

"তিনি (অর্থাৎ শরৎচন্দ্র) সুবিধামত অনেকের কাছে নিজের মর্যাদা বাড়াবার জনাই হোক, কিম্বা শুধু কল্পনা-বিলাসের আকাশকুসুম চয়নের জনাই হোক, বা আনন্দলাভের জনাই হোক, অনেক রকম অবান্তর ও অনধিকার রটনা করে বেড়িয়েছেন। যা নিয়ে অন্য কোন সমাজ হলে ডিফামেশান চার্জ দিয়ে মামলা আনাও চলতে পারতো। আমাদের উচ্চ হিন্দু সমাজে ধৃষ্ট ব্যক্তিকে যথাসাধ্য পরিহার করেই চলতে হয়। কাদামাটি ঘেঁটে পাঁক তৈরি করত বলে নয়। যে ভদ্রসমাজের নামজাদা ঘরের সম্মানিতা মহিলাদের সম্বন্ধে কতখানি সংযতভাবে কথা বলা উচিত, আজকের দিনের বহুসম্মানিত, সেদিনকার ছন্নছাড়া, ভবঘুরে লোকটির সে উচ্চশিক্ষা ছিল না। সে আমি, আমার স্বামী এবং এখনও বর্তমান দু-একজন নরনারী প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি। তিনি তাঁর বন্ধুর ছোট বোনকে * বলে উল্লেখ করতে পারেন, সেটা কিছু বিচিত্র নয়, কিন্তু তাই থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, অর্ধশতাব্দী পূর্বে নিতান্ত নিয়মতান্ত্রিক ঘরের বালবিধবার শরৎচন্দ্রের মত চরিত্রের একজন অনাত্মীয় তরুণের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেশামেশা চলতো।"

অনুরূপা দেবী যে বলেছেন—শরৎচন্দ্র শুধু কল্পনাবিলাসের আকাশকুসুম চয়নের জন্যই হোক বা আনন্দ লাভের জন্যই হোক, পূর্বোক্ত মহিলা সাহিত্যিক মহোদয়াকে নিয়ে অনেক রকম অবান্তর ও অনধিকার রটনা করে বেড়িয়েছেন, একথা অনেকাংশেই সত্য বলে আমাদের মনে হয়। কেননা, শরৎচন্দ্র রাধারাণী দেবীকে "এতগুলো বই লিখেছিলেন কি করে? সেই ইতিহাসটা বলি। আমার একজন 'গারজেন' ছিলেন........তাঁর মত কড়া তাগাদাদার পৃথিবীতে বিরল, ইত্যাদি লিখলেও, অন্যত্র তিনি তাঁর 'আত্মকথা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন:—

"আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাইনি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া

* অনুরূপা দেবী এইখানে তাঁর বান্ধবীর ডাকনামটি উল্লেখ করে গেছেন। আমি সে নামটি আর প্রকাশ না করে অনুল্লেখিতই রেখে গেলাম।

ঘুরেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেননি; তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে, সে কথা আজ মনে পড়ে না, কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছেলেবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ করে যাননি, এই বলে কত দুঃখই না করেছি—অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে, ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয়, সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে শুরু করি। কিন্তু কিছুদিন বাদে গল্প রচনা অ-কাজের কাজ মনে করে, আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তারপর অনেক বৎসর চলে গেল। আমি যে কোনকালে একটি লাইনও লিখেছি, সেকথা ভুলে গেলাম।

আঠার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব-দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিকপত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেউই ঐ সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিমরাজী হয়েছিলাম। কোনরকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকার হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য, কোন রকমে একবার রেঙ্গুনে পৌঁছতে পারলে হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্যসত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত 'যমুনা'র জন্য একটি ছোট গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে-না-হতেই বাংলার পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম। তারপর আমি অদ্যাবধি নিয়মিত-ভাবে লিখে আসছি। বাংলা দেশে বোধ হয়, আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান লেখক, যাকে কোনদিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়নি।" (বাতায়ন, শরৎ-স্মৃতি-সংখ্যা ১৩৪৪।

এখানে উদ্ধৃত শরৎচন্দ্রের এই 'আত্মকথা' প্রবন্ধ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর বই লেখার সঙ্গে তাঁর 'গারজেনের' কোনরূপেই সম্বন্ধ নেই।

তবে শরৎচন্দ্র উক্ত মহিলা সাহিত্যিক মহোদয়া সম্বন্ধে যে বলেছেন, তিনি অত্যন্ত ধর্মকর্মপরায়ণা ছিলেন, সেকথা খুবই সত্য। তিনি যে জীবনভোরই ব্রতব্রত ও ধর্মকর্ম নিয়েই ছিলেন, একথা রাধারাণী দেবী, অনুরূপা দেবী ছাড়াও শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা বলে থাকেন।

উক্ত ভদ্রমহিলার আচারনিষ্ঠা সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের বন্ধু এবং অনুরূপা দেবীর মাসতুতো ভাই সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বলেন—

অনুরূপা দিদির বান্ধবী বলে আমি তাঁকে দিদি বলতাম। সেই দিদি একবার আমাদের কলকাতার বাড়িতে এসেছিলেন। আমরা যদিও ব্রাহ্মণের আচারনিষ্ঠা এবং বাচ-বিচার যথাসম্ভব মেনে চলি, তবুও তিনি আমাদের বাড়িতে এসে ধোয়া রান্নাঘর আবার নিজের হাতে গোবর দিয়ে নিকিয়ে নিলেন। বাসনকোসনও আবার নিজের হাতে ধুয়ে, তাতে রান্না করে তবে খেলেন।

কঠোর ব্রহ্মচর্যপরায়ণা, ধর্মশীলা, বাল-বিধবা এই ভদ্রমহিলার সামনে যেতে শরৎচন্দ্র সাহস করতেন না। শরৎচন্দ্রের একতরফা এই হৃদয় দৌর্বল্যের কথা তিনি হয়ত তেমন জানতেনই না।

যাই হোক, তবুও এই ভদ্রমহিলার জন্য শরৎচন্দ্রের একটি মস্ত বড় ত্যাগের কাহিনী যা জানি, সেটিও মোটেই উপেক্ষার নয়। এখানে এখন সেই কাহিনীই বলছি—

উক্ত সাহিত্যিক মহোদয়ার দাদারা শরৎচন্দ্রের বন্ধু ছিলেন। তিনি দাদাদের মারফত শরৎচন্দ্রের 'শুভদা' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটি একবার পড়েছিলেন। ফলে শুভদার প্রভাব তাঁর প্রথম বয়সের লেখা একটি উপন্যাসে বিশেষভাবে পড়ে। পরে ঐ উপন্যাসটি প্রকাশিত হলে শরৎচন্দ্র সেটি পড়ে দেখেন যে, তাতে তাঁর 'শুভদা' উপন্যাসের কাহিনীর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

'শুভদা' প্রকাশিত হলে পাছে ঐ ভদ্র-মহিলা হেয় হয়ে পড়েন, এই ভেবে শরৎচন্দ্র 'শুভদা' উপন্যাসটি আর ছাপালেনই না। তবে পাণ্ডুলিপিটি নষ্ট না করে রেখে দিলেন, এই আশায় যে, অবসর পেলে পরে গল্পটিকে বদল করে আবার নতুন করে লিখবেন। শুভদার পাণ্ডুলিপি দীর্ঘকাল পড়ে রইল, শরৎচন্দ্রের অবসর আর হয়ে উঠল না। তখন শরৎচন্দ্র শেষ বয়সে একদিন ওটিকে না রেখে পুড়িয়ে ফেলাই ঠিক বলে মনস্থ করলেন।

শরৎচন্দ্র ঐ সময় তাঁর হাওড়া জেলায় সামতাবেড়ের বাড়িতে থাকতেন। একদিন তিনি তাঁর সম্পর্কীয় ভাগ্নে (তাঁর দিদি অনিলা দেবীর মেজ জায়ের ছেলে, ইনি শরৎচন্দ্রের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শিখতেন) রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে বহু

পুরাতন কাগজপত্রের সহিত শুভদার পাণ্ডু-লিপিটি পোড়াতে দিলেন।

'শুভদা' বইটি একটি মরক্কো বাঁধাই মোটা খাতায় লেখা ছিল। ঐরূপ একটি সুন্দর খাতায় লেখা পাণ্ডুলিপি দেখে রামকৃষ্ণবাবু শরৎচন্দ্রকে বললেন—এটা কেন পোড়াতে দিচ্ছেন?

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—ওটাকে পুড়িয়ে ফেলতেই হবে। আমার ও বই বেরুলে এক-জন অত্যন্ত হেয় হয়ে পড়বেন।

রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কিন্তু শুভদার পাণ্ডুলিপিটি না পুড়িয়ে কাগজ পোড়াবার সময় এক ফাঁকে সেটিকে সরিয়ে রাখলেন এবং পরে সেটি এনে শরৎচন্দ্রের একটি আলমারির বইয়ের পিছনে লুকিয়ে রাখলেন।

শরৎচন্দ্র এর কিছুই জানতে পারলেন না। তিনি বরং রামকৃষ্ণবাবু কাগজ পুড়িয়ে ফিরলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিরে সেই মোটা খাতাটা পুড়িয়েছিস তো?

উত্তরে রামকৃষ্ণবাবু বলেছিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শরৎচন্দ্রের কাছে যে তাঁর বাল্যরচনা 'শুভদা' নামে একটি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি আছে, একথা তাঁর বন্ধুদের কেউ কেউ জানতেন। শরৎচন্দ্রের বন্ধুরা 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপিটি পড়বার জন্য শরৎচন্দ্রকে খুবই পীড়াপীড়ি করতেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু কাউকেই পাণ্ডুলিপিটি দেখাননি। শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন বন্ধু বাতায়ন সম্পাদক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল এই সময় 'শুভদা'র পাণ্ডুলিপিটি পড়বার জন্য একবার খুব জেদ করেন। শরৎচন্দ্র তখন তাঁকে খানিকটা পোড়া ছাই দেখিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে অবিনাশবাবু লিখেছেন—

"শুভদা' সম্পর্কে আমার সঙ্গে তাঁর যে নাটকীয় ঘটনা ঘটেছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, শুভদার পাণ্ডুলিপি শোনাবার জন্য আমার পীড়াপীড়িতে তিনি শেষ পর্যন্ত আমাকে পড়তে দিতে রাজি হয়ে আমাকে সামতাবেড়ে যাবার জন্যে একটি দিন নির্দেশ করে দেন। নির্দিষ্ট দিন আমি যখন উপস্থিত হলুম, তখন তিনি অতি বিমর্ষভাবে বললেন—অবিনাশ, সব শেষ হয়ে গেছে। তিনি এমনি-ভাবে কথাগুলি বললেন, যেন আমি তাঁর কোন রুগ্ন পুত্রকে দেখতে গেছি, যার মৃত্যু সংবাদটা তিনি আমাকে শোনালেন। এই বলেই তিনি পাশের ঘর থেকে একটা বিস্কুটের টিনে খানিকটা কাগজপোড়া এনে আমাকে বললেন—পাছে তুমি অবিশ্বাস কর, তাই শুভদার পাণ্ডুলিপি পোড়ার ছাই তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি। এরপর আমার আর কি বলবার থাকতে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারটি যে মিথ্যা, তা এখন বেশ বোঝা গেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, কেন 'শুভদা' তিনি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ করেননি, আর কেনই বা এ পাণ্ডুলিপি তিনি কারুকে পড়তে দিতে চাননি। তাঁর নিজের মুখেই শুনেছি হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের (গুরুদাস কোং) শত অনু-রোধেও তিনি এ পাণ্ডুলিপি তাঁকে দেখাননি। কেন? কিসের জন্য শুভদা সম্পর্কে তাঁর এ মনোভাব ছিল? শরৎচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনীকারদের নিকট থেকে এ প্রশ্নের উত্তরের আশায় রইলুম।"

শরৎচন্দ্র 'শুভদা' ছাপানো তো দূরের কথা, পাণ্ডুলিপিটি পর্যন্ত কেন যে কাউকেও পড়তে দিতেন না, আশা করি অবিনাশবাবু এখানে এখন তার উত্তর পেলেন।

শরৎচন্দ্র ঐ সময়েই 'ছোটদের মাধুকরী' নামক একটি পত্রিকায় 'বাল্যস্মৃতি' নাম দিয়ে এক প্রবন্ধে লেখেন—"ছেলেবেলার লেখা কয়েকটা বই আমার নানা কারণে হারাইয়া গিয়াছে। সবগুলোর নাম আমার মনে নাই। একখানা 'অভিমান' মস্ত মোটা খাতায় স্পষ্ট করিয়া লেখা, অনেক বন্ধুবান্ধবের হাতে হাতে ফিরিয়া অবশেষে গিয়া পড়িল বাল্য-কালের সহপাঠী কেদার সিংহের হাতে। কেদার অনেক দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু ফিরিয়া পাওয়া আর গেল না। এখন তিনি এক ঘোরতর তান্ত্রিক সাধুবাবা। বইখানা কি করিলেন, তিনিই জানেন, কিন্তু চাহিতে ভরসা হয় না [illegible] [illegible] ভয় করি। এখন তিনি [illegible] [illegible] সাধুবাবা"

দ্বিতীয় 'শুভদা'। প্রথম যুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই অর্থাৎ বড়দিদি, চন্দ্র-নাথ, দেবদাস প্রভৃতির পরে।" (ছোটদের মাধুকরী, আশ্বিন, ১৩৪৫)

এই লেখার কিছুদিন পরেই কিন্তু শরৎ-চন্দ্র একদিন সামতাবেড়ের বাড়িতে [illegible] আলমারির বই নামাতে গিয়ে হঠাৎ শুভদার পাণ্ডুলিপিটি দেখতে পেলেন। দেখে বুঝলেন, রামকৃষ্ণবাবু সেদিন তাঁর কাছে মিথ্যা কথা বলেছিলেন এবং পাণ্ডুলিপিটি কিছু না করে ঐখানেই লুকিয়ে রাখলেন।

শুভদার পাণ্ডুলিপি পোড়ানোর ব্যাপারে রামকৃষ্ণবাবুর মিথ্যা কথাটি শরৎচন্দ্র জানতে পেরেছেন, এটা রামকৃষ্ণবাবুকে জানাবার জন্যই শরৎচন্দ্র একদিন আলমারির যে জায়গায় পাণ্ডুলিপিটি লুকানো ছিল, সেই-খান থেকে খানকতক বই রামকৃষ্ণবাবুকে নামিয়ে আনতে বললেন।

রামকৃষ্ণবাবু আমায় বলেছিলেন—মামা হঠাৎ আলমারির ঐখান থেকে খানকতক বই আনতে বলায় আমি বুঝতে পারলাম, তিনি নিশ্চয়ই শুভদার পাণ্ডুলিপিখানা ঐখানে দেখেছেন এবং আমি যে মিথ্যা কথা বলেছি, সে বিষয়ে আমাকে শিক্ষা দেবার জন্যই ঐ-রূপ বলছেন। মামার কথা শুনে ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগল। ভয়ে ভয়ে গিয়ে খান-কতক বই নামিয়ে দিয়েই আমি সেখান থেকে সরে পড়লাম। এই ঘটনার পর কয়েক দিন আমি মামার সামনে যেতে সাহস করিনি।

শরৎচন্দ্র কি ভেবে পাণ্ডুলিপিটি আর পোড়ালেন না বা নষ্ট করলেন না। রেখে [illegible] হয়ত ভেবেছিলেন, যখন রাজা

পেয়েই গেছে, তখন থাক। পরে পারি ত নতুন করে লিখবার আবার চেষ্টা করব। কিন্তু সে আর হয়ে ওঠেনি। তাঁর মৃত্যুর পরে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স এ বইটি ছাপেন।

শরৎচন্দ্র শেষ বয়সে কলকাতায় বালিগঞ্জে বাড়ি করেছিলেন, তাঁর বাড়ির অদূরেই ছিল কবি-দম্পতি নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবীর বাড়ি। কলকাতায় থাকার সময় শরৎচন্দ্র প্রায়ই এ'দের বাড়িতে বেড়াতে যেতেন। রাধারাণী দেবী বলেন যে, তাঁদের বাড়িতে কখনও কথা প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত ঐ মহিলা সাহিত্যিক মহোদয়ার কথা উঠলে শরৎচন্দ্র চুপ করে থাকতেন, আর যদিও বা তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতেন তো, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিতই তাঁর নাম উচ্চারণ করতেন। ধর্ম-স্বভাবা; পবিত্র চরিত্রবলসম্পন্না ঐ মহীয়সী মহিলার প্রতি শরৎচন্দ্র শ্রদ্ধা না জানিয়ে থাকতে পারেননি।

কড়ি দিয়ে কিনলাম

বিমল মিত্র

(৮২)

যে জীবন নিয়ে দীপঙ্কর একদিন নিঃসঙ্গ যাত্রা করেছিল, সেদিন অত বছর অতিক্রম করেও সেই জীবনের বুঝি তীর্থসঙ্গমে গিয়ে পৌঁছোবার সময় তখনও হয়নি। আশুতোষ কলেজের সেই প্রফেসার অমলবাবু বলেছিলেন— জীবন দিয়েই তোমার এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে দীপঙ্কর। এ প্রশ্নের সমাধান তুমি তোমার ছাপানো বইতে পাবে না, প্রফেসারের লেকচারের মধ্যেও পাবে না। জীবন দিয়ে সমাধান না খুঁজলে, সে সমাধান সত্যও হবে না, স্থায়ীও হবে না। হয়ত তখনও জীবন দেবার অনেক বাকি ছিল তার। হয়ত এমনি করেই বাধা অতিক্রম করে মহাজীবনের দিকে এগিয়ে চলে মানুষ। এগিয়ে চলতে গিয়ে কেউ ফতুর হয়ে যায়, কেউ উত্তরণ করে। এ জীবনে যত জীবন দেখেছে, তত মৃত্যুও দেখেছে সে। যত আলো দেখেছে, তত অন্ধকারও দেখেছে। সেই সোক্রেটিস্, কনফুসিয়াস, সেই বাইবেলের আগের যুগ থেকে শুরু করে যত মানুষ যত মহামানুষ জন্মেছে, সকলের সব জীবন যেন বিংশ শতাব্দীর কলকাতায় এসে এই দীপঙ্করের মধ্যেই জীবন পেয়েছে। তার অনুভূতির মধ্যে বাসা বেঁধেছে ইতিহাসের মানুষের সমস্ত অনুসন্ধান বৃত্তি। মাঝে মাঝে এই ভাবনাটা আসতো তার মনে, আবার মাঝে মাঝে মিলিয়েও যেত। হঠাৎ দু'দিন তিন দিন যেন বিভোর করে রাখতো তাকে, আবার সে সাধারণ হয়ে যেত। অতি সাধারণ। আবার সে রেলের স্টাফ হয়ে যেত। আবার পারিপার্শ্বিকের আবহাওয়া তাকে ঘড়ির মত সংসারের পঙ্কিলতার মধ্যে নামিয়ে আনতো হঠাৎ। প্রাণমথবাবুর কাছে গেলে, প্রাণমথবাবুর কথা ভাবলে, কিরণ কাছে এলে, কিরণের কথা ভাবলেও যেন আবার এই সব তুচ্ছতার ওপরে উঠে যেত কয়েক-দিনের জন্যে।

আজো মনে আছে সেদিন পুলিসের গাড়িতে কিরণের সেই ব্যবহার। মাথা দিয়ে ঝর-ঝর করে রক্ত পড়ছে। দু'জন সার্জেণ্ট দু'দিক থেকে তাকে রিভলবারের নলের সামনে নির্জীব করে ধরে আছে। কিন্তু নির্জীব থাকবারই কি ছেলে কিরণ। কই, দীপঙ্কর তো সেদিন কিরণের মত বেপরোয়া হতে পারেনি। চোখের সামনে নিজের মার পুজোর জিনিসের অপমান তো নীরবে সহ্য করেছে মুখ বুজে। আর কিরণ? কিরণের নিজের মা'র অপমানের কথা তো কিরণ ভাবেনি। তার নিজের মা কেমন করে সংসার চালায়, তার নিজের মা বেঁচে আছে কিনা, সে-কথা তো সে একবারও জিজ্ঞেস করেনি। তবে কেন সে সেদিন অমন হুংকার করে উঠেছিল নিজের জীবনকে বিপন্ন করে?

কিরণ বলতো—কষ্ট সহ্য করবার অভ্যেস করা ভাল ভাই, শেষকালে যখন পুলিসেরা কষ্ট দেবে তখন আর কোনও কষ্ট হবে না—

ছোটবেলায় কিরণ ইচ্ছে করে গায়ে বিছুটি লাগাতো, ইচ্ছে করে তেতো ওষুধ খেতো, না-খেয়ে দিনের পর দিন থাকতো, সে তো কেবল এই জন্যেই। এই এরই জন্যে এতদিন ধরে নিজেকে তৈরি করিয়ে রেখেছিল সে। এবার বুঝি তার সেই কষ্ট সহ্য করারই পরীক্ষার পালা। এতদিন পরে যেন তাকে পরীক্ষা দিতে যেতে হচ্ছে—

আর আশ্চর্য, কিরণের দিকে চেয়ে দেখছিল দীপঙ্কর আর তার নিজেরও যেন আনন্দ হচ্ছিল। এক অদ্ভুত আনন্দ। যেন কিরণ নয়, যেন দীপঙ্করের নিজের মাথা দিয়েই ঝর-ঝর করে রক্ত পড়ছে। যেন মিলিটারি-পুলিস দীপঙ্করের ওপরেই অত্যাচার করছে। যেন দীপঙ্করই নিজে জার্মানী থেকে পালিয়ে ইণ্ডিয়ায় এসেছে। মারো, আরো মারো তোমরা আমাকে, তাতেও যদি সকলের সব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয়। ছিটে-ফোঁটা, অঘোরদাদু, নয়নরঞ্জিনী দাসী, নির্মল পালিত, মিস্টার ঘোষাল, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, মহীন্দ্র সকলের সব অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে কিরণ। সকলের সমস্ত পাপ সব নিজে আত্মসাৎ করে তোমাদের পবিত্র করবে সে। তোমাদের যত আঘাত সমস্তটুকু কিরণের ওপর পড়ুক, তাতে দীপঙ্করও পরিত্রাণ পাবে। দীপঙ্করও পরিশুদ্ধ হবে।

গাড়িটা গড়াতে গড়াতে গিয়ে উঠলো আবার সেই লোহার গেটের ভেতর। বহুদিন আগে একদিন এখানেই এসেছিল দীপঙ্কর একলা। সেদিন রায় বাহাদুর নলিনী মজুমদারের সামনে যে নাটক অভিনীত
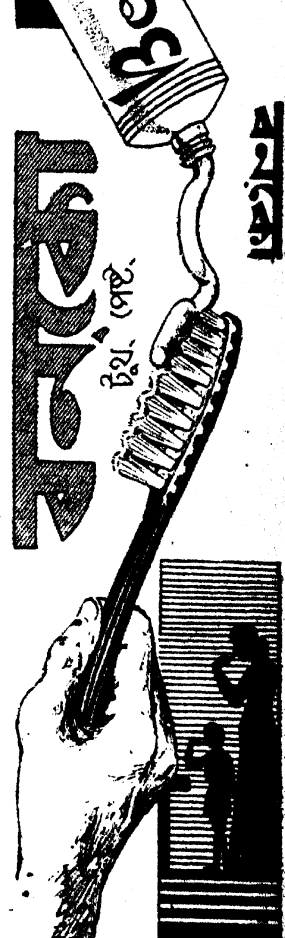
[illegible]য়েছিল, তারই পুনরাবৃত্তি হলো আবার। [illegible]লা কিরণকে নিয়ে কোথায় চলে গেল। আর দীপঙ্কর রইল দাঁড়িয়ে। অন্ধকার কলকাতা, বাইরে নিশ্ছিদ্র ব্ল্যাক-আউট। কিন্তু এখানে এই কর্মব্যস্ত ঘরের ভেতরে [illegible] তখন সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে, [illegible] হয়ে, উন্মাদ হয়ে উঠেছে। কোনও দিকে লক্ষ্য নেই, শুধু খোঁজ কোথায় কে লুকিয়ে লুকিয়ে মানুষের মঙ্গল-চিন্তা করছে। খোঁজ নাও কোথায় কোন্ সৎলোক মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করছে। সন্ধান করো কে কোথায় আছে এমন মানুষ, যে নিজের সংসার দেখেনি, নিজের স্বার্থের কথা ভাবেনি, যে অনাহারে করেছে দিনের পর দিন, আর তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করে দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে, কিম্বা যে জীবনে একদিনের জন্যে মিথ্যে কথা বলেনি, মিথ্যে আচরণ করেনি, মিথ্যে আড়ম্বরে নিজেকে ভূষিত করেনি। খুঁজে বেড়াও সেই সব সোক্রেটিসদের, সেই সব যিশু খৃষ্টদের, আর সেই সব দীপঙ্করদের, সেই সব কিরণদের। তাদের হাতে বিষ তুলে দাও, তাদের ক্রসে বিঁধে মারো। তাদের ধরে আনো লালবাজার পুলিস হেড কেয়াটার্সে।

লোহার একটা দরজা সশব্দে খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক সামনে এসে দাঁড়াল। পুলিস-ইউনিফর্ম পরা চেহারা। বাঙালী।

—এ কি স্যার, আপনি?

দীপঙ্কর চেয়ে দেখলে। চেনা গেল না। লোকটা আবার বললে—চিনতে পারছেন না?

—কে আপনি?

লোকটা বললে—সেই মিস মাইকেলের মার্ডার-কেসে আপনি স্টেটমেণ্ট দিয়েছিলেন ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটে!

দীপঙ্কর বললে—তা হবে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

—কিন্তু আপনি আবার ডিফেন্স-অব-ইণ্ডিয়ার অ্যাক্টে জড়িয়ে পড়লেন কেন? কিরণ চ্যাটার্জি আপনার কে?

দীপঙ্কর বললে—আমার বন্ধু।

—কিন্তু আপনি তো গভর্নমেণ্টের গেজেটেড অফিসার! আপনি এইসব অ্যাণ্টি-ব্রিটিশ কাজের মধ্যে কেন যেতে গেলেন? কিরণ চ্যাটার্জির এগেনস্টে তো সিডিশার চার্জ, তার তো ফাঁসি হবে মশাই, আপনি আবার এ সবের মধ্যে কেন যেতে গেলেন? মহামুশকিলে ফেললেন দেখছি—আপনি এর মধ্যে আছেন, তা তো জানতাম না—

—কিরণের কি ফাঁসিই হবে?

লোকটা বললে—এই ডিপার্টমেণ্টে একলা আমি শুধু বাঙালী মশাই, আর সব ইংরেজ—তাই আপনাকেই আমি বলছি, এরা কিরণ চ্যাটার্জির ফাঁসি না দিয়ে ছাড়বে না, অনেক দিনের পুরোন দাগী, রায় বাহাদুরের আমলের পুরোন ফাইল পাওয়া গেছে।

—কোর্টে মামলা হবে?

লোকটা বললে—কোর্টে মামলা হবে না, এ সব কেস কোর্টে যায় না, এ তো মিলিটারির ব্যাপার—। ইনভেস্টিগেশনও কমপ্লিট হয়ে আছে, এ ফাঁসি না হয়ে যায় না। কিন্তু আমি আপনার কথাটাই ভাবছি...

দীপঙ্কর বললে—আমার কথা থাক, কিরণ চ্যাটার্জির কি ফাঁসি হবেই?

ভদ্রলোক বললে—নির্ঘাৎ, অনেকদিন ধরে খোঁজ চলছিল, লণ্ডন থেকে স্পেশ্যাল কেবল্ এসেছে, চার্চিল থাকতে কোনও আশা নেই—

তারপর একটু থেমে চারদিকে চেয়ে নিয়ে গলা নিচু করে বললে—আপনাকে দেখেই আমি এলুম ঘরে, ভাবলাম আপনি এ সবের মধ্যে কখনও থাকতে পারেন না, তা কিরণ চ্যাটার্জির সঙ্গে আপনার কিসের রিলেশন? ও তো এককালে টেররিস্ট ছিল—

দীপঙ্কর বললে—আপনি নিজে বাঙালী, কিরণের জন্য যদি কিছু পারেন তো করুন না—ফাঁসিটা যে কোনও রকমে বন্ধ করুন না—

—সে কি বলছেন স্যার, তাহলে যে আমার চাকরিটাই চলে যাবে। আগে তো দেখেছেন থানার ইন-চার্জ ছিলুম, এখন প্রমোশন নিয়ে এই ব্র্যাঞ্চে এসেছি, দেড়শো টাকা বেশী পাচ্ছি, এ ব্যাপারে কারো হাত নেই, গভর্নরেরও হাতের বাইরে।

—উকীল ব্যারিস্টার যদি কিছু লাগে আমি তাও লাগাতে পারি। আপনি জানেন না বোধহয় কিরণের কেউ নেই, এক বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই সংসারে। আর তা ছাড়া ও তো সকলের ভালোর জন্যেই এ কাজ করেছিল।

ভদ্রলোক এবার বললে—এ সব কথা থাক স্যার, এ লালবাজার, এখানে দেয়ালেরও কান আছে, আমি চলি—

ভদ্রলোক চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু আবার ফিরলো। বললে—একটা কথা, সেই মিস মাইকেলের মার্ডার কেসটার কথা মনে আছে তো আপনার? শেষ পর্যন্ত একটা ক্লু পাওয়া গিয়েছিল, তা জানেন তো? ওটা আমারই কেস কি না!

দীপঙ্কর কিছু কথা বললে না।

ভদ্রলোক আবার বলতে লাগলো—সেদিন
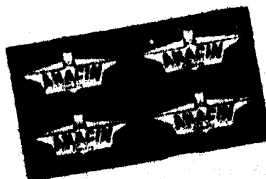
মিছিমিছি আপনাকে ডাউট করেছিলাম, সেও মিস্টার ঘোষালের কথায়—

—মিস্টার ঘোষালের কথায়?

—হ্যাঁ, কিন্তু আশ্চর্য, এতদিন পরে তার একটু ক্লু পাওয়া গেছে, সেই মিস মাইকেলের মার্ডারের পেছনেও মিস্টার ঘোষালের হাত রয়েছে। আমি ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের কাছে শুনেছি—

কথাটা বলে ভদ্রলোক চলেই যাচ্ছিল। ভেবেছিল হয়ত দীপঙ্কর কিছু বলবে। কিন্তু দীপঙ্কর তখনও নির্বাক হয়ে আছে। ভদ্রলোক যাবার সময় বললে—এখন অ্যান্টি-করাপশনের কেসের সঙ্গে সে চার্জটাও এসে পড়বে—

বলে ভদ্রলোক আর দাঁড়াল না।

দীপঙ্কর ডাকলে— আর একটা কথা শুনুন—

—কী বলছেন? আপনার কিছু ভাবনা নেই মশাই, আপনার জন্যে আমি চেষ্টা করবো, ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত এখানে আপনাকে ডিটেন করে রাখা হবে—

—আমার কথা নয়, কিরণ চ্যাটার্জির কথা জিজ্ঞেস করছি। আমাকে রেখে দিয়ে ওর জন্যে বরং আপনি একটু চেষ্টা করুন।

—অসম্ভব! বড় সিরীয়াস চার্জ ওর বিরুদ্ধে। ওর ফাঁসি কেউ আটকাতে পারবে না।

বলেই ভদ্রলোক আবার দরজা খুলে বাইরে চলে গেল। বাইরে লোহার দরজায় চাবির ঝন ঝন শব্দ হলো। বোঝা গেল এ-ঘর থেকে বাইরে যাবার পথ তার বন্ধ।

বাজারের জিনিসপত্রের দাম চড়া। কাশীকে নতুন করে হাঁড়ি-কলসী-বাসন কিনতে হলো আবার। সকাল বেলাটাই যা বাজার বসে। বিকেলের বাজার উঠে গেছে। বিকেল থেকেই দোকান-পাট সব বন্ধ হয়ে যায়। তখন মিলিটারি লরী ঘুরে বেড়ায় রাস্তায়। হাতে ব্রেন-গান উঁচিয়ে ধরে থাকে রাস্তার দিকে। যে কেউ সামনে আসবে তাকে গুলী করে মারবে বেপরোয়া। ছেলে-বুড়ো বাদ নেই। নতুন গাড়ি উঠেছে একরকম। সামনে লম্বা ছিপের মতন একটা লোহার শিক দাঁড় করানো। কোথাও গোলমালের খবর পাওয়া মাত্র ওয়ারলেসে খবর পাঠাবে হেড-কোয়ার্টার্সে। এতটুকু অসতর্ক হলেই ইণ্ডিয়া বেদখল হয়ে যাবে। জাপানীরা যদি এখানে আসেই তো যেন উপোস করে মরে। চাষীদের কাছে ধান চাল যা উদ্বৃত্ত আছে সব কেড়ে নাও। মিলিটারী আর সরকারী অফিসারদের খাবার জোগাবার জন্যে এজেন্ট রাখা হয়েছে। সেই এজেন্টরাই আবার সরকারের তরফে মাল কিনবে। কিনে গুদাম বোঝাই করবে। দরকার হলে সেই মাল চালান যাবে ইরান, ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইনে। এমন কি সোভিয়েট রাশিয়াতেও দরকার হলে চাল গম পাঠাতে হতে পারে। ইণ্ডিয়া সকলকে খাওয়াবে। সকলকে খাইয়ে ইণ্ডিয়ার যদি কিছু পড়ে থাকে তো তখন খাবে ইণ্ডিয়ানরা। শ'ওয়ালেস; ইস্পাহানী এণ্ড কোং, মির্জা আলী আকবর, এইচ এন দত্ত এণ্ড সন্স, স্টীল ব্রাদার্স—এমনি সব কত এজেন্ট। তারা বাজার থেকে ছ' টাকা চার আনা দরে চাল কিনে মিলিটারিকে বেচে এগার টাকা দরে। ফজলুল হক সাহেব তখন পুরো দমে রাজত্ব করে চলেছে। ব্ল্যাক-আউটের তলায় তখন আর এক ব্ল্যাক-আউট চলছে। বাজারে গিয়ে লোকে চোখে সর্ষে ফুল দেখে।

কেউ বলে—এ কি মশাই, পনেরো দিন আগে চাল নিয়ে গেছি ছ'টাকা দরে আর আজ হলো আট টাকা—?

দোকানদার হাসে। বলে—আজ আট টাকায় পাচ্ছেন, কাল হয়ত টাকা দিলেও পাবেন না—

—সে কি মশাই, চাল না পেলে খাবো কী?

—আপনার খাবার জন্যে তো গভর্নমেণ্টের ভারি মাথা-ব্যথা মশাই—। আমরা থাকলেই বা কী, আর মরে গেলেই বা কী!

—কেন মশাই, আমরা ট্যাক্স দিই না? গভর্নমেণ্ট কি অমনি খাওয়াচ্ছে?

দোকানদারের আর কথা জোগায় না। খদ্দেররা বলে—এ শালা গভর্নমেণ্টের বারোটা বেজে এসেছে—

কিন্তু লোকে যাই বলুক, যার টাকা আছে তার কোনও ভাবনাই নেই। চালের দর বারো টাকাই হোক আর চার-বারোং আটচল্লিশ টাকাই হোক, তাদের কী! যত গণ্ডগোল আপনার আর আমার। এই আমরা, যারা গরীব লোক। যারা হিসেব করে মাস চালাই। ইস্পাহানী সাহেবের কীসের ভাবনা? ফজলুল হক সাহেবেরই বা ভাবনা কী! এইচ এন দত্ত কোম্পানীরই বা ভাবনা কী? তারা গাড়ি চালাচ্ছে, সিনেমা দেখছে, রেস খেলছে। চাল কিনতে না-পাওয়া যায়, কেক খাবে তারা!

কাশী কথাগুলো শুনছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মনে পড়লো বাড়ির কথা। মনে পড়তেই বললে—আমাকে তাড়াতাড়ি দিয়ে দেন, আমার কাজ আছে—

—দাঁড়া না বাবা, তোরই কেবল কাজ আছে, আর আমাদের নেই?

কাশী একটু নরম হলো। বললে—আমাদের বাড়িতে কেউ নেই, দিদিমণিকে একলা রেখে এসেছি, এই এখন চাল-ডাল নিয়ে যাবো তবে রান্না চড়বে—

—কোন্ বাড়ি তোমাদের? কোথায় থাকো?

—আজ্ঞে এ স্টেশন রোডে।

এতক্ষণে সবাই চাইলে কাশীর দিকে।

—আরে তোমাদের বাড়িতেই বুঝি কালকে মিলিটারি পুলিস এসেছিল?

[illegible]ম দুজনকে ধরে নিয়ে গেছে? বোমা-টোমা সব পেয়েছে?

কাশী বললে—আমার বাবুকেও ধরে নিয়ে গেছে—বাড়িতে কেউ নেই সকাল থেকে। একলা মেয়েমানুষকে রেখে চলে এসেছি বাজার করতে—সব জিনিসপত্র [illegible] তচ-নচ করে দিয়েছে তারা—

আরো অনেক কিছু খবর শুনতে চেয়েছিল তারা। না-পেয়ে একটু যেন হতাশ হলো। অথচ বাজারে অনেক রকম গুজব রটে গেছে। জাপানীরা আসছে কলকাতায়। এসে পড়লো বলে। তা আসুক মশাই। জাপানী আসুক আর জার্মানীই আসুক আমাদের যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। আমরা যে আঁধারে সেই আঁধারে।

—শুনেছেন, বিহারের কংগ্রেস মিনিস্টার জুগলাল চৌধুরী কি করেছে? সারন জেলায় একটা পুলিসের থানা পুড়িয়ে দিয়ে থানার দারোগাকে থলের ভেতরে পুরে গণ্ডকের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে?

—আর মশাই, যেসব কাণ্ড হচ্ছে তা শুনলে গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে। চাম্পারণ ডিস্ট্রিক্টে কী হয়েছে জানেন? সবাই ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করেছে।

দোকানদার হাতে কাজ করছে আর মুখে কথা বলছে।

—কিন্তু এত টাকা আসছে কোত্থেকে মশাই? কে দিচ্ছে বলুন তো?

একজন বললে—বিড়লারা দিচ্ছে—

—কেন, বিড়লার স্বার্থ কী মশাই? হঠাৎ মাড়োয়ারীরা এত সাধু হয়ে গেল কেন বলুন তো?

—আছে মশাই আছে, মতলব আছে।

কিন্তু তখন কাশীর দেরি হয়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি মালপত্র নিয়ে দু'হাতে ঝুলিয়ে নিলে। বেশী দূর নয়। লাইনটা পেরিয়ে একটু হাঁটলেই বাড়িটা। ভদ্রলোকরা তখনও আলোচনা করতে লাগলো। আজ-কাল এই রকম সারাক্ষণই আলোচনা হয় পথে ঘাটে। দু'তিনজন লোক জড়ো হলেই আলোচনা চলে। জিনিসপত্রের দাম নিয়েই প্রথমে শুরু হয়। তারপর ওঠে যুদ্ধের কথা। তারপর ওঠে কংগ্রেসের কথা। তারপর ওঠে সুভাষ বোসের কথা। সুভাষ বোস নাকি রেডিওতে লেকচার দিয়েছে। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। কিন্তু বিশ্বাস করতেই সকলের ভালো লাগে। এ মিনিস্ট্রি আর সহ্য হয় না মশাই। এরা দু'হাতে টাকা লুঠছে, আর আমাদের বেলায় দেখাচ্ছে মিলিটারি। কেউ বলে—কিন্তু এত চাল কোথায় গেল মশাই?

—সব মিলিটারির পেটে যাচ্ছে—

—আপনি ছাই জানেন। খবরের কাগজ পড়ে আপনি ওই কথা বলছেন। দেখে আসুন গিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে। বিরাট বিরাট সব গো-ডাউন ভর্তি করে চাল জমাচ্ছে—লক্ষ লক্ষ মণ চাল—

—কেন?

—আর কেন, জাপানীদের ভয়ে। জাপানীরা এসে পাছে ধান-চাল পেয়ে যায়, তাই সব জড়ো করে গুদামে রাখছে। যেই তারা এসে পড়বে আর ওমনি সব চাল গঙ্গায় ফেলে দেবে হুড় হুড় করে—

বাড়ির কাছে আসতেই কাশী অবাক হয়ে গেল। ব্যাপার কী? বাড়ির সদর দরজা হাঁ হয়ে রয়েছে। হন হন করে ঘরে ঢুকেই কাশী চেয়ে দেখলে অচেনা এক ভদ্রলোক চুপ করে বসে আছে বাইরের ঘরে।

—কে আপনি? কাকে চাই?

—দীপঙ্করবাবু আছেন?

কাশীর রাগ হয়ে গেল। বললে—আপনি বাড়িতে ঢুকলেন কেন না বলে কয়ে? কে আপনাকে দরজা খুলে দিলে?

—আমি এসেছিলুম দীপঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

—দেখা করতে এসেছেন তো, বাড়িতে কেন? আপিসে যেতে পারেন না? বাড়িতে তো দেখা করেন না আমার বাবু।

কাশী হাতের জিনিসপত্রগুলো মেঝের ওপর রাখলে। বড় ভারি লাগছিল। বললে —আপনি এখন যান, বাবু বাড়িতে নেই—

—কিন্তু বাড়িতে তাঁর সঙ্গে নিরিবিলি একটা কথা বলবার ছিল।

কাশী বলল—আচ্ছা মুশকিল তো, বলছি বাবু বাড়িতে নেই—

—বাড়িতে নেই তো কোথায় গেছেন? আমি তো অফিস থেকেই আসছি। আজকে তো অফিসে যাননি তিনি।

কাশী জিজ্ঞেস করলে—আপনি কি বাবুর আপিসে চাকরি করেন?

—হ্যাঁ, আমার নাম লক্ষ্মণ সরকার। আমার নাম বললেই তোমার বাবু চিনবেন, তুমি গিয়ে বলো আমি একটা বিশেষ কাজে এসেছি—

কাশী বললে—আমি বলছি তো বাবু বাড়িতে নেই—

—কোথায় গেছেন?

কাশী একবার ভাবলে। সব কথা বাইরের লোককে বলা নিরাপদ কি না তাও ভেবে দেখলে। তারপর বললে—তা সব কথাই কি আপনাকে বলতে হবে?

লক্ষ্মণ সরকার বললে—তাহলে তিনি বাড়ি এলে বোল, আমি এসেছিলাম, আমার নাম লক্ষ্মণ সরকার। আমার চাকরি তোমার বাবুই করে দিয়েছিলেন। এখন মুশকিল হয়েছে বড়বাবুরা আমার কাছে
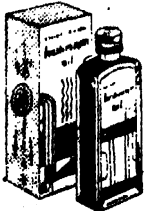
করবার চেষ্টা করছে। কে-জি-দাশবাবু বলে এক ভদ্রলোক আমার বড়বাবু, তিনিই পেছনে লেগেছেন, সেই সব কথাই বলতে এসেছিলাম আর কি!

এতক্ষণে কাশীর যেন বিশ্বাস হলো। বললে—তাহলে আপনাকে খুলেই বলি, বাবুকে পুলিসরা ধরে নিয়ে গেছে—

—সে কী? কেন? বাবু কী করেছিলেন?

কাশী বললে—তা জানি না, শেষ-রাত্তিরের দিকে বাবু চলে গেছেন, একটা টাকা-পয়সা নেই হাতে, হাঁড়ি-কুঁড়ি সব ভেঙে দিয়েছে, তাই এখন এই সব কিনে আনছি, আমি বাড়িতে বলে গিয়েছিলুম কেউ ঠেললেও যেন দরজা না-খোলে—

লক্ষ্মণ সরকার বললে—আমি তো এসব জানতুম না, আমি ঠিকানা নিয়ে বাড়ি খুঁজে এসে দরজার কড়া নেড়েছি। অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর তবে দরজা খুলেছে। বাবুকে পুলিসে ধরলে কেন?

কাশী বললে—তা কী করে জানবো?

—তোমার বাবু তো খুব ভালো লোক। তাকে কেন ধরতে গেল পুলিসে?

কাশী বললে—একজন স্বদেশী লোক আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে ছিল, তাকে ধরেছে, তাই বাবুকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে—বাড়িতে এখন আমি আর দিদিমণি ছাড়া কেউ নেই—

—দিদিমণি?

লক্ষ্মণ সরকার অবাক হয়ে গেল। বললে—দীপঙ্করের তো ভাই-বোন কেউ ছিল না। ও তো মায়ের এক ছেলে ছিল। এ কোন্ দিদিমণি তোমার?

কাশী বললে—আপনি চিনবেন না, বাবুর নিজের কেউ নয়, দেশের একজন আত্মীয়—আমাদের এখানেই থাকেন—

লক্ষ্মণ সরকার বললে—আমি তো বুঝতে পারিনি, ওঁকে কিছু মনে করতে বারণ কোর, আমি এসে দরজা ঠেলতে উনিই খুলে দিলেন, উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—আমি কে, তাই আমিও জিজ্ঞেস করেছিলাম—উনি কে! তারপর হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, আর আমি সেই থেকে চুপ করে বসে আছি। কাকে ডাকবো বুঝতে পারছিলাম না, এমন সময় তুমি এলে—

কাশী বললে—আপনি এখন উঠুন বাবু, আমি এই বাজার করে আনলুম, এখন রান্না-বান্না হবে তবে খাওয়া-দাওয়া করবো আমরা—কাল রাত থেকে আমরা না খেয়ে আছি—

অপরাধীর মতো লক্ষ্মণ সরকার উঠলো। বললে—তাহলে আমি উঠি এখন—

—হ্যাঁ, আপনি যান—

আরো যেন অনেক কথা বলবার ছিল লক্ষ্মণ সরকারের। কিন্তু আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল ঘরের বাইরে। বাইরে আসতেই কাশী সশব্দে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে। লক্ষ্মণ সরকার ট্রামে উঠেও ভাবতে লাগলো দীপঙ্করকে ধরলে কেন পুলিসে! কী কারণ থাকতে পারে! ঘোষাল সাহেবের মত দীপঙ্করও কি ঘুষ নিয়েছিল।

অফিসে ঢুকেই যাকে সামনে পেলে তাকেই বললে—শুনেছেন পুলিনবাবু, আমাদের সেন-সাহেবকে পুলিসে ধরেছে?

পুলিনবাবু টিফিন-রুমের দিকে যাচ্ছিল। বললে—বলেন কী? কে বললে?

লক্ষ্মণ সরকার বললে—এই তো, এখনি শুনে এলাম—

কথাটা রটতে রটতে সারা অফিসে ছড়িয়ে গেল। পুলিনবাবুর কাছ থেকে হরিশ-বাবু। হরিশবাবুর কাছ থেকে গোবিন্দ-বাবু। গোবিন্দবাবুর কাছ থেকে সুধীর-বাবু। এক সেকশন থেকে আর এক সেকশনে। এক অফিস থেকে আর এক অফিসে। ট্রাফিক অফিস থেকে ইঞ্জি-নীয়ারিং-এ। ইঞ্জিনীয়ারিং অফিস থেকে অডিট অফিসে। কোনও অফিস আর বাদ গেল না। কন্ট্রোলার-অব-স্টোরস, টেলি-গ্রাফ, সর্বত্র এক আলোচনা। মিস্টার ঘোষাল অ্যারেস্ট হবার পর যেমন হয়েছিল ঠিক তেমনি। কেউ বললে—তিন হাজার টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়েছে—

গোবিন্দবাবু বললে—তিন হাজার টাকা কে বললে? আমি শুনলাম সাত হাজার—

সাত হাজার শেষে দশ হাজারে গিয়ে পৌঁছুলো।

লক্ষ্মণ সরকার নিজের সেকশনে চুপ করে বসে ছিল। কবে সে একদিন কালিঘাটের পাড়ায় বখাটে ছেলের দলে মিশে নিজেও বখাটে হয়ে গিয়েছিল। আজ সেই পুরোন ক্লাশফ্রেণ্ড দীপঙ্করের দয়াতেই তার চাকরি হয়েছে। কে-জি-দাশবাবু বার বার তাকে অফিসের সকলের সামনে অপদার্থ প্রমাণ করতে চাইছে। এই সময় দীপঙ্করও যদি তার পুরোন অপমানের কথা মনে রেখে তার চাকরি খতম করে দেয়, তখন আর তার কোনও গতিই থাকবে না। সেই কথা বলতেই লক্ষ্মণ সরকার গিয়েছিল দীপঙ্করের বাড়িতে।

কে-জি-দাশবাবু হঠাৎ ডাকলে। বললে—লক্ষ্মণবাবু এদিকে একবার আসুন তো—

লক্ষ্মণ সরকার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বললে—আমাকে ডাকছিলেন?

কে-জি-দাশবাবু বললে—আপনি তো সেন-সাহেবের লোক?

লক্ষ্মণ বললে—হ্যাঁ—

—আপনি শুনেছেন বোধহয় যে সেন-সাহেবকে অ্যান্টি-করাপশন ডিপার্টমেন্ট থেকে ধরে নিয়ে গেছে। মিস্টার ঘোষালের যে গতি হয়েছে, সেন-সাহেবেরও সেই গতি হবে? যদি বিশ্বাস না-হয় তো ট্রানজিট সেকশানের পুলিনবাবুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসুন—

লক্ষ্মণ সরকার কিছু কথা বললে না।

কে-জি-দাশবাবু আবার বলতে লাগলো—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? তা বিশ্বাস হবে কেন? অফিস-সুদ্ধ সবাই সেন-সাহেবের নাম করতে অজ্ঞান—নাকি অমন অনেস্ট সাহেব হয় না। এখন কোথায় রইল অনেস্টি?

লক্ষ্মণ সরকার বললে—তা আমাকে এসব কথা বলছেন কেন?

—তা আপনাদের বলবো না তো কাকে বলবো? আপনারাই তো সব সেন-

সায়েবকে নিয়ে মাথায় তুলেছিলেন, বলতেন, বড় উদ্‌ধফ্‌ল লোক, রেলের অফিসে অমন সং লোক কখনও আসেনি, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। এখন হলো তো? বিশ্বাস না হয় পুলিনবাবুকে জিজ্ঞেস করে আসুন—তিনি নিজের চোখে দেখে এসেছেন, পুলিস ধরে থানায় নিয়ে যাচ্ছে। মার্চেন্টদের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা নগদ ঘুষ নিচ্ছিল—
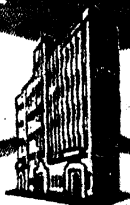
কালিদাসবাবু বললে—সত্যি? দশ হাজার টাকা?

—আরে, এতদিন রেলে কাজ করছি আর রেলের অফিসারদের চিনবো না। এই আপনি যেখানে বসছেন, ওইখানেই তো বসতো সেন সাহেব। নিজে আমি হাতে ধরে কাজ শিখিয়েছি, ড্রাফট লিখতে শিখিয়েছি, এক বর্ণ ইংরিজি জানতো না, তাও লিখতে শিখিয়েছি—আমি চিনবো না সেন সায়েবকে? যান না, পুলিনবাবু অফিসে আসবার সময় নিজের চোখে দেখে এসেছে—তার মুখেই শুনে আসুন গিয়ে, সত্যি বলছি না মিথ্যে বলছি আমি—

লক্ষ্মণ সরকার হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ছোটবেলায় সেও বদমায়েসি করেছে, অতিষ্ঠ করে তুলেছে পাড়ার লোকদের, কিন্তু রেলের অফিসের এ জিনিসের নমুনার সাক্ষাৎ এই-ই তার প্রথম। লক্ষ্মণ সরকার যে লক্ষ্মণ সরকার—সেও নির্বাক হয়ে রইল। একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বেরোল না।

আর বিংশ শতাব্দীর মাঝপথে এসে হঠাৎ যুগটাও যেন বড় জটিল হয়ে উঠলো। এ বিশ্বাসের যুগও বটে, আবার অবিশ্বাসের যুগও বটে। গড়ারও যুগ, আবার ভাঙারও যুগ। ঘর-সংসার-পরিবার-রাষ্ট্র সব ভেঙে চুরে একাকার হবার জোগাড়। আবার ঘর-সংসার-পরিবার-রাষ্ট্র যেন নতুন আকার নেবার জন্যেও অস্থির। নতুন করে যেন সব নবরূপ নেবে, তাই ভাঙার জন্যে এত উন্মুখ। পরিবারের শান্তি নিশ্চিহ্ন হয়েছে, মানুষের সম্পর্কে গ্রন্থি বেঁধেছে, অর্থ-নীতির মানদণ্ডে মনুষ্যত্বের বিচার হচ্ছে। যে স্ত্রী, সে আর স্ত্রী নয়, যে স্বামী সে আর স্বামী নয়, যে মনিব তার মনিবত্ব ঘুচে গেছে, যে মানুষ, সে পশুত্ব বরণ করেছে। বড় জটিল যুগের আবর্তে এরা জড়িয়ে গেল—এই দীপংকর, এই লক্ষ্মীদি, এই মিস্টার ঘোষাল, এই সনাতনবাবু, এই নয়ন-রঞ্জিনী দাসী, এই ছিটে-ফোঁটা, এই সুধাংশু,

এই দাতারবাবু, আর সকলের শেষে এই সতী!

রাত্রে সতীর ঘুম হয়নি। সমস্ত রাত। সেই হাসপাতাল থেকে আসার পরই এ বাড়িতে এসে সমস্ত কিছু দেখে কেমন হতচকিত হয়ে গেছে। সব তার মনে পড়েছে। সেই পুরোন অতীত থেকে আজকের বর্তমান পর্যন্ত সমস্ত। বাইরে থেকে হাসির টুকরো আর সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ ভেসে এসেছে আর একে একে সমস্ত অতীত চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কী চমৎকার ঘর। দামী জানালা-দরজা। দামী ফার্নিচার, দামী পর্দা। সমস্ত কিছু দামী।

লক্ষ্মীদি বলেছিল—তুই একটু ঘুমো এখন, ভোর বেলা দীপু এলে তখন ডাকবো তোকে—

তারপর লক্ষ্মীদি চলে যাবার পর ঘুমোতে চেষ্টাও করেছিল সতী, কিন্তু কোথা থেকে যেন কী এসে সব ঘুম পণ্ড করে দিয়েছিল।

রাত বোধহয় তখন তিনটে, তখনই অনেক গাড়ির শব্দ হলো বাইরে। মিস্টার হনসরাজ এল, মিস্টার মাধো এল, মিস্টার লালচাঁদ এল। মিস্টার সিংও এল। লক্ষ্মীদিও বোধহয় কোথাও বেরিয়েছিল তাদের সঙ্গে—সেও ফিরে এল। কয়েক ঘণ্টার জন্যে বাড়িটা একটু শান্ত হয়েছিল। একটু নিস্তব্ধ। আবার হাসি-কথা-গল্পের আওয়াজ কানে এল। আবার মালপত্র সরানোর শব্দ। শব্দের তরঙ্গের আঘাতে সতীর মনের শান্তি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

রাত চারটের সময় সতীর দরজার কড়া নড়ে উঠলো।—সতী! সতী!!

সতী তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিয়েছে। সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল লক্ষ্মীদি। লক্ষ্মীদিও যেন সারা রাতই ঘুমোয়নি সতীর মত। লক্ষ্মীদির চোখের কাজল তখন যেন আরো কালো হয়েছে। লক্ষ্মীদির ঠোঁটের রং যেন আরো গাঢ় হয়েছে।

—রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো তোর?

সতী বললে—না।

—বুঝতে পেরেছি, নতুন জায়গায় তো ঘুম হবেই না। এখন চারটে বেজেছে, আমরা তৈরি হয়েছি—

সতী বললে—দীপু এসেছে

লক্ষ্মীদি বললে—না, এখনও আসেনি, এইবার বোধহয় এসে পড়বে। তা তুই কিছু ভাবিসনি, আমার তো সব রইল এখানে—এই দ্যাখ,—তুই দেখে যা—

সেই রাত্রেই লক্ষ্মীদি সতীকে বাইরে নিয়ে গিয়ে সব দেখালে। কোথায় রান্নাঘর, কোথায় বাথরুম, কোথায় স্টোর।

—চাল, ডাল, সব কিছু রয়েছে, এখন কয়েকদিন তোকে কিছুই কিনতে হবে না। আর তোর কাছে টাকা আছে তো?

সতী বললে—না—

—তাহলে এই টাকা ক'টা রাখ তোর কাছে, এই নে—

বলে পার্স খুলে কয়েকটা নোট দিলে সতীর হাতে। বললে—বাবার টাকা তো কলকাতার ব্যাঙ্কে রয়েছে, পরে হিসেব করে নেবখন—আর আমি তো আসছিই মাস-খানেক পরে—

—তুমি আবার আসবে?

—আসবো না? তুই বলছিস কী? কলকাতা ছাড়লে আমার চলে? কলকাতাতেও তো আমার বিজনেস রয়েছে রে। তা ছাড়া বাবার সাকসেশন সার্টিফিকেট নিতে হবে না কোর্ট থেকে! সব টাকা তো আমাদের দু' বোনের। দাঁড়া আমি আসছি—

লক্ষ্মীদি বড় ব্যস্ত। বাড়িতে অনেক গেস্ট জড়ো হয়েছে।

তারপর পাঁচটা বাজল ঘড়িতে। বাইরের আকাশ পাতলা হয়ে এল। লক্ষ্মীদির গাড়ি তৈরি। সকলের গাড়িই তৈরি। যাবার আগে লক্ষ্মীদি আবার এল। সতী বললে—দীপু তো এল না—

লক্ষ্মীদি বললে—আসবে আসবে! তার জন্যে তুই অত ভাবছিস কেন? আর রঘু তো রইলই, আমার বহুদিনের পুরোন চাকর। দীপু বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার তো আর ওয়েট করা চলবে না ভাই—দীপু এলে বলিস আমি চলে গেছি, একটা সাকসেসন সার্টিফিকেট যেন জোগাড় করবার ব্যবস্থা করে, আমাকে চিঠি লিখলেই আমি কাগজপত্র সই করে পাঠিয়ে দেব—

তারপর একটু থেমে বললে—যা, তোকে আর বাইরে আসতে হবে না—রঘু দরজা বন্ধ করে দেবে খন—

সকলের সদল-বলে চলে যাবার শব্দটাও কানে এল তারপর। অনেকগুলো গাড়ি এক সঙ্গে স্টার্ট দিলে। ঘরের ভেতর থেকে সতীর কানে এল সমস্ত। এইবার হয়ত দৌড়তে দৌড়তে দীপু আসবে! হয়ত দীপু ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে তো জাগিয়ে দেবার কেউ নেই। হয়ত এসেই দেরি করার জন্যে ক্ষমা চাইবে!

জানালার বাইরে আরো সকাল হলো। ছটা বাজলো। সাড়ে ছ'টা।

বাইরে যেন কোথায় সদরে দরজা খোলার শব্দ হলো একটা। তারপর জুতোর আওয়াজ। তারপর...

তারপর সতীর ঘরের দরজার কড়া নড়ে উঠলো।

ওই দীপু! ওই দীপু এসেছে।

সতী ভেতর থেকে বললে—কে?

তারপর বিছানা ছেড়ে উঠে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলে।

দীপু নয় রঘু। রঘু বললে—চা করে দেব দিদিমণি?

ক্রমশ

জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথ

গত বৈশাখ মাসে পশ্চিম জার্মানির আমন্ত্রণে আমাকে সে-দেশের বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করতে হয়েছিল। কলোন ও বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক প্রবীণ অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনাকালে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে এবং লক্ষ্য করেছি কী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের জার্মানি-পরিদর্শনের স্মৃতি তাঁরা আজো স্মরণ করেন। স্টুটগার্ডে ডঃ কিসেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ভারত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান অপরিসীম, রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা তুলনারহিত। আমি তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের জার্মানি-পরিভ্রমণের কিছু বিবরণী তৎকালীন পত্র-পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে দিতে। সে-অনুরোধ তিনি রেখেছিলেন। তাঁর সহায়তায় ও কলকাতাস্থ পশ্চিম জার্মানির ভাইস কন্সাল ডঃ ফিশারের সক্রিয় সহযোগিতায় যে বিবরণী ও ফটোগ্রাফ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা এই নিবন্ধে বিধৃত হল। —সাগরময় ঘোষ

১৯১৩ সনের ১৩ই নবেম্বর। জার্মানির বিভিন্ন শহরে, প্রভাতী চায়ের টেবিলে, যাঁরা সংবাদপত্রের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন, সাহিত্য-বিষয়ক একটা খবর পড়ে তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন। খবরটা হল এই যে, সাহিত্যের নোবেল-পুরস্কার সেবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে ঘোষণা করা হয়েছে। কে এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর? রবীন্দ্রনাথের নাম তখনও অনেকেই জানত না। আর তা ছাড়া সাহিত্যের নোবেল-পুরস্কার তখনও পর্যন্ত এমন কারও নামে ঘোষিত হয়নি, যিনি কিনা ইউরোপের লেখক নন। বিস্ময়ের পরেই জাগ্রত হল কৌতূহল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার কৌতূহল। যে-বইয়ের জন্য তাঁকে নোবেল-পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, সেই 'গীতাঞ্জলি'র জার্মান অনুবাদ পড়বার জন্য সবাই ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। ইউরোপের সাধারণ মানুষেরা তখন ভারতবর্ষের পরিচয়ও বিশেষ জানত না; 'গীতাঞ্জলি'র মাধ্যমে এবারে নব-ভারতের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটল। তবে, একটা কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। সাধারণ মানুষের ভারত-জ্ঞান যতই সামান্য হক, জার্মান পণ্ডিতেরা কিন্তু ভারতীয় দর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক আগে থাকতেই সচেতন ছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে শোপেনহাওয়ার, ম্যাক্স মূলার আর পল ডয়সেনের নাম করতে পারি। সেক্ষেত্রে অধিকাংশ সাধারণ মানুষেরই ভারত-বিষয়ক ধারণা ছিল নেহাতই ধোঁয়াটে। তারা ভাবত যে, ভারত তখনও অতীত-কালের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আছে; ভাবত যে, বর্তমান কালের সাংস্কৃতিক জীবনে ভারতবর্ষের কোনও ভূমিকা নেই। জার্মানির বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতার তর্জমা প্রকাশিত হতে লাগল, তখন তারা সবিস্ময়ে উপলব্ধি করল যে, সেটা নেহাতই ভ্রান্ত ধারণা। কই, কবি ত এখানে সুদূর অতীত থেকে তাঁর পাঠকদের সঙ্গে কথা কইছেন না। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে তারা নূতন একটি বাণীর সন্ধান পেল। সে-বাণী ভারতেরই বাণী। তবে তার বিষয়বস্তুর আবেদন কোনও বিশেষ দেশ অথবা বিশেষ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। জার্মান পাঠকদের মনে হল, কবি যেন তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে বর্তমান কালের জার্মান জনসাধারণের উদ্দেশেই কথা বলছেন। জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথের যে সমাদর ঘটেছিল, তাকে তাই অকারণ বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জার্মান জনসাধারণের সেই প্রাথমিক পরিচয়ের সামান্য কয়েক মাস বাদেই প্রথম মহাযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল; এবং বাইরের পৃথিবীর সাংস্কৃতিক জীবন থেকে জার্মানি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ১৯১৪ সন থেকে ১৯২১ সনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মোট তেরখানি গ্রন্থ জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে।
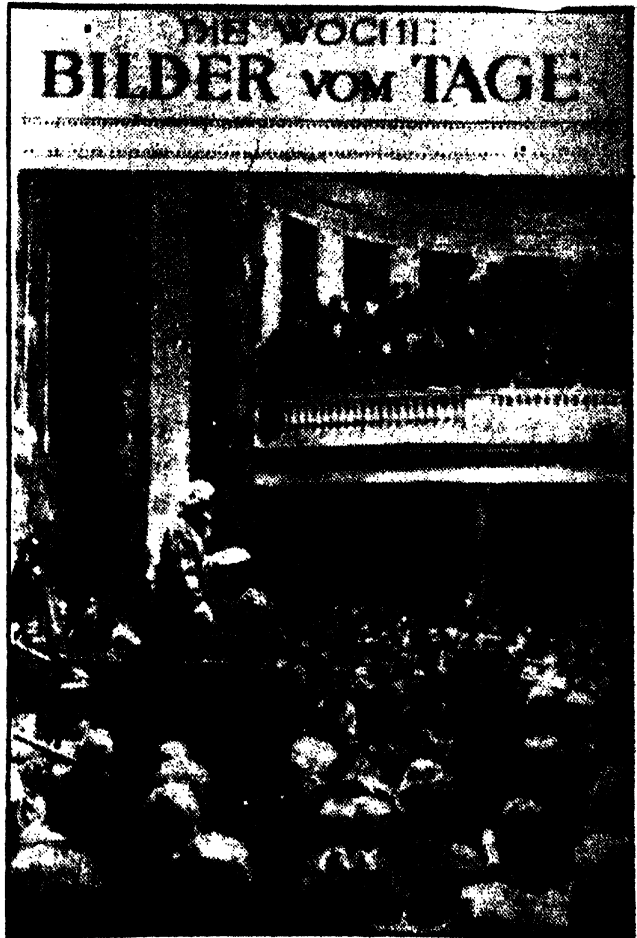
বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ (সেপ্টেম্বর, ১৯২৬)

বার্লিনে রবীন্দ্রনাথ। পাশে শ্রীমতী নির্মল কুমারী মহলানবিশ (সেপ্টেম্বর, ১৯২৬)

জন্মদিনের উপহার—

জার্মানিতে যদিও রবীন্দ্রানুরাগীদের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না, তবু বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের যোগ ঘটল আবার ১৯২১ সনে। কবি তাঁর ৬১তম জন্মদিবসে সুইজারল্যান্ডে ছিলেন। প্যারিসের ভারতীয়েরা তার আগেই স্থির করেছিলেন যে, কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ঐদিনে তাঁরা একটি বিশেষ অভিনন্দন-গ্রন্থ বার করবেন। ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ, এই দুই ভূখণ্ডের লেখকদেরই রচনা তাতে থাকবে। দুর্ভাগ্যবশত পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত বাস্তবে রূপায়িত হতে পারেনি। তার কারণ, জনাকয়েক লেখক জানিয়ে দিলেন যে, গ্রন্থটিতে যদি জার্মান লেখকদের রচনা নেওয়া হয়, তবে তাঁরা সহযোগিতা করবেন না। জার্মান দার্শনিক আর ইউকেন, ধর্ম-শাস্ত্রের অধ্যাপক এ ভি হারনাক, ভারত-সংস্কৃতির অধ্যাপক এইচ জ্যাকবি, নাট্যকার গারহার্ড হফ্টমান, কবি হারমান হেসে এবং অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তখন রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য অন্য একটি উপায় স্থির করলেন। জার্মানির প্রকাশক, লেখক এবং বিশ্বজ্জনদের কাছে তাঁরা আবেদন জানালেন যে, তাঁদের গ্রন্থাবলী যেন তাঁরা শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-শিক্ষায়তনকে উপহার দেন। আবেদনের উত্তরে চার শ বই পাওয়া গেল। সেই গ্রন্থাবলীর সঙ্গে একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠিয়ে তাতে জানানো হল, “শান্তি-নিকেতন পাঠাগারের যিনি স্রষ্টা, তাঁর প্রতি আমাদের অনুরাগের প্রতীক হিসেবেই এই উপহার আমরা দিচ্ছি।...গভীর জ্ঞানের ভূমি ভারতবর্ষ। সেখানে যাঁরা জার্মানি এবং মানবিক জ্ঞান-ভাণ্ডারে জার্মানির অবদান সম্পর্কে কিছু জানতে চান, এই গ্রন্থাবলী তাঁদের সাহায্য করবে।” উপহার পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই তৃপ্ত হয়েছিলেন। উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, “পাশ্চাত্ত্য পৃথিবীর বুদ্ধিবৃদ্ধি এবং আত্মা যে-পথে ভারতবর্ষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেই পথটিকে উন্মুক্ত করে দেবার ব্যাপারে এবং ক্রমে তাকে আরও সুপ্রসর করে তুলবার ব্যাপারে জার্মানি যা করেছে, পৃথিবীর অন্য যে-কোনও দেশের প্রয়াসের চাইতে তার মূল্য অনেক বেশী। জার্মানি তার আপন উদ্যোগে আজ প্রাচ্য-ভূমির এক কবিকে তার অনুরাগ নিবেদন করল। এর ফলে যে ঘনিষ্ঠতার স্পর্শ ঘটল, আমাদের সম্পর্ক তাতে আরও দৃঢ় হয়ে উঠবে।”

স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা-

এরই দিন কয়েক বাদে জার্মানভূমিতে প্রথমবারের জন্য রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ পাওয়া গেল। সুইডেনে যাবার পথে ডার্মস্টাডে তিনি তাঁর অনুরাগী-দের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। জার্মানির সংবাদপত্রে এই বক্তৃতার খবর যে-ভাবে ছাপা হল, তাতেই বুঝতে পারা গেল যে, দু সপ্তাহ বাদে তাঁর যে সফর শুরু হবে, তার সাফল্য অনিবার্য। তা-ই হল। কবির হাতে বিশেষ সময় ছিল না। তাই শহর থেকে শহরে তাঁকে অত্যন্তই দ্রুত ঘুরতে হচ্ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর এই সফর এক আশ্চর্য সাড়া জাগিয়ে দিল। বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিলঃ “বনবাণী এবং ভারতবর্ষ”। বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসেম্বলি-হলে সেদিন তিল ধারণের জায়গা ছিল না। সেদিন সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা তাঁদের আজও মনে আছে। বস্তুত সে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথ বললেন যে, অরণ্যই হল ভারতীয় সংস্কৃতির উৎস; বললেন যে, তিনি নিজেও অরণ্য থেকেই তাঁর প্রেরণা পেয়েছেন। জার্মান জন-সাধারণের পক্ষে এ-কথায় মুগ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। তার কারণ, পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ড সম্পর্কে যদিও রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, মহাসমুদ্রই হল প্রতীচীর জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের স্রষ্টা, জার্মানির ক্ষেত্রে সে-কথা খাটে না। পক্ষান্তরে জার্মান রূপকথা এবং রোমান্টিক-যুগের জার্মান সাহিত্যে অরণ্য-রহস্যের একটি প্রবল ভূমিকা রয়েছে। এখন রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা থেকে বুঝতে পারা গেল, উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান দর্শন এবং কাব্য যে ভারতবর্ষ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছে, সেটা মোটেই অকারণ নয়।

মিউনিক এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়েও রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি কিছু কম সাড়া জাগায়নি। “প্রাচী ও প্রতীচীর সেতুবন্ধ”, “রবীন্দ্রনাথ—বিশ্বকবি”, “ভারতের কবি”—

ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ। পাশে তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী (১৯৩০)

বড়-বড় সংবাদপত্রগুলিতে এই রকমের সব হেডলাইন ছাপা হতে লাগল। মনে হতে লাগল যে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে যেন অকস্মাৎ সবাই ব্যাপকভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে আলোচনা করছে। সচিত্র পত্রিকা এবং মাসিকপত্রগুলিতে তখন ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিস্তর রচনা এবং চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, বহুল-প্রচারিত পত্রিকা "ফ্রাঙ্কফর্টার জাইটুং"-এ তখন পুরো এক সপ্তাহ ধরে আলোচনা চলেছিল, রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথেই পাশ্চাত্ত্য-জগতের পক্ষে তার ব্যক্তিত্ব-বিকাশে উদ্যোগী হওয়া উচিত কিনা। সকলে অবশ্য একমত হননি। কিন্তু একটা কথা সবাই মেনে নিয়েছিলেন। তা এই যে, রবীন্দ্র-বাণীকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

জ্ঞান-ভবনে রবীন্দ্রনাথ–

জার্মানি-সফরের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ ডার্মস্টাডে গিয়ে গ্র্যান্ড ডিউক অব হেস্-এর আতিথ্য নিয়েছিলেন। সফরের শেষ সাতটি দিন তাঁর সেইখানেই কেটেছিল। কাউন্ট হারমান্ কাইজারলিঙের নাম সকলেই জানেন। রবীন্দ্রনাথের তিনি পুরানো বন্ধু। ডার্মস্টাডের গ্র্যান্ড ডিউকের দুর্গে তিনি 'জ্ঞান-ভবন'এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে ঠিক শান্তিনিকেতনের মতই প্রাচী এবং প্রতীচীর আত্মার মধ্যে একটি সমন্বয়ের সূত্র তিনি খুঁজে ফিরতেন। জার্মান জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের যাঁরা প্রতিনিধি, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেখানে তাঁদের পরিচয় ঘটিয়ে দেবার ব্যবস্থা হল। তাঁদের অনেকের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ তখন সাক্ষাৎ করেছেন; নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত, কয়েকটি বিষয়ে তখন ঈষৎ ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছিল। ঠাকুর-সপ্তাহের যাঁরা উদ্যোক্তা, তাঁদের অবশ্য এতে কোনও হাত ছিল না। তাঁরা চেয়েছিলেন, জার্মান সংস্কৃতি এবং জার্মান আত্মা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যেন একটা স্পষ্ট ধারণা নিয়ে ফিরতে পারেন। তাই বাছা-বাছা লোকের সঙ্গে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে করে এই হল যে, অল্প-কিছু পণ্ডিত মানুষের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হল; তখনকার জার্মান ব্যক্তিত্বের যাঁরা প্রতিনিধি-স্থানীয়, তাঁদের সঙ্গেই তাঁর দেখা হল না। অথচ রবীন্দ্রনাথ তা চাননি। তিনি চেয়েছিলেন সত্যিকারের জার্মান জীবনের পরিচয় পেতে। নেহাতই জনাকয় পণ্ডিত-মানুষের আদর্শের সঙ্গে পরিচিত হবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। কার্যত কিন্তু শুধু পণ্ডিত-মানুষদের সঙ্গেই তার কথাবার্তা হল। তাই ১৯২১ সনের ২০শে জুন তারিখে জার্মানি ত্যাগের সময় জার্মানি এবং তার মানুষদের সম্পর্কে যে-ধারণা তিনি নিয়ে গেলেন, তা যতই সুন্দর এবং মধুর হক, সেই অস্থির সময়ের বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার তেমন সঙ্গতি ছিল না। তা সে যা-ই হক, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব এবং বাণী সম্পর্কে জার্মানিতে যে আগ্রহ তখন জেগে উঠেছিল, তা কিন্তু সত্যিকারের আগ্রহ; নিখাদ এবং স্থায়ী।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জার্মান জনসাধারণের এই বিপুল বিস্ময়কর আগ্রহের কারণ কী? প্রথম কারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব, জার্মানিকে যা মুগ্ধ করেছিল। দ্বিতীয় কারণ তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা। যুদ্ধোত্তর জার্মানির জনসাধারণ তাঁর বাণীকে গ্রহণ করবার জন্য যেন

প্রস্তুত হয়েই ছিল। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্রনাথ 'ন্যাশনালিজম্' গ্রন্থখানি জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়। গ্রন্থখানি সেখানে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল। এটা কারও নজর এড়িয়ে যায়নি যে, সারা পৃথিবী যখন জার্মানি এবং জার্মান জনসাধারণের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না-রাখার পক্ষপাতী, রবীন্দ্রনাথের মতন একজন বিশ্ববিখ্যাত মানুষই তখন সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে জানালেন যে, পরাজিত শত্রুর প্রতি সহানুভূতি দেখানো দরকার।

জার্মান জনসাধারণের রবীন্দ্রানুরাগের অবশ্য আরও অনেক কারণ আছে। সবচাইতে বড় কারণ তাঁর কাব্য। ১৯২১ সনের জার্মানি প্রধানত কবি হিসেবেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁর নাটকের দার্শনিক বক্তব্য, বিশেষ করে তার অন্তর্নিহিত প্রত্যয় এবং উপস্থাপনার স্পষ্টতাও সকলকে মুগ্ধ করেছে। তা ছাড়া তাঁর গল্পের মধ্যে মানবতার প্রতি, বিশেষ করে শিশুদের প্রতি তাঁর যে অপরিসীম ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়, অসংখ্য মানুষ তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কবি-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথেরও তাঁরা পরিচয় পেলেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাবলীতে তখন শান্তি, আনন্দ এবং মানবপ্রেমের যে বাণীটি বারেবারে ব্যক্ত হয়েছে, জার্মানির প্রাচীন মরমিয়াবাদ এবং আদর্শবাদের সঙ্গে তার অনেক মিল ছিল। স্বভাবতই সেখানকার মানুষেরা তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতি এক দুর্বার ভালবাসার আকর্ষণ বোধ করেছে। রবীন্দ্রনাথ তখন বলেছিলেন, "এই মহান ভূমি আমাকে স্বজনজ্ঞানে গ্রহণ করেছে; আমার মনে হচ্ছে, এ-দেশের মানুষের হৃদয়ে যেন আমার নবজন্ম ঘটল।"

"কেন ভালবাস?"

আরও দুবার, ১৯২৬ আর ১৯৩০ সনে, ভারতবর্ষের এই মহান প্রতিনিধি গিয়ে জার্মানির আতিথ্য নিয়েছিলেন। প্রভূত সম্মান তখন বর্ষিত হয়েছিল তাঁর উপরে। রাইখ-প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে সরকারীভাবে তাঁর জন্য সংবর্ধনা-সভার আয়োজন করা হয়েছিল। তারপর, বিখ্যাত শিল্পী ও ভাস্কর কাথে কোল্উইৎস-এর উপস্থিতিতে, বার্লিনে রবীন্দ্র-চিত্রাবলীর এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল, এবং রবীন্দ্রানুরাগীরা তাঁদের প্রিয় কবির শিল্প-সত্তার সম্পূর্ণ নূতন একটি দিকের পরিচয় পেলেন। রবীন্দ্রনাথও জার্মানি সম্পর্কে নূতন অনেক ধারণা নিয়ে দেশে ফিরলেন। ১৯৩০ সনের সফরের সময় তিনি ওবেরামেরগাওয়ের প্যাশন-প্লে এবং বিখ্যাত কয়েকটি চিত্রশালা দেখেছিলেন। বেতারে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তা ছাড়া বিভিন্ন হল-এ তাঁর ভাষণদানের ব্যবস্থা হয়েছিল। এবারেও দেখা গেল যে, তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য সকলে অত্যন্তই ব্যগ্র; হল-এ তিলধারণের জায়গা নেই।

কিন্তু, স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এত ব্যগ্রতা সত্ত্বেও জার্মানি তাঁকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেনি। জনসাধারণের অভ্যর্থনায় যতটা ব্যাকুলতা ছিল, তাঁকে উপলব্ধি করবার জন্য সেই পরিমাণে অভিনিবেশ হয়ত ছিল না। তাই যদি না হবে, তবে যে-দেশ তাঁকে এত আকুল হয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, বছর কয়েক বাদেই সে-দেশ তাঁর মিলন-বাণী এবং ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁর অনাসক্তির কথা ভুলে গেল কেন? মনে হয়, জার্মানির আত্মা তখন ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হয়েছিল। সেই মোহ আজ কেটে গিয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথের বাণী হয়ত জার্মান আত্মায় আজ আরও প্রবলভাবে, আরও স্থায়ীভাবে সাড়া জাগাতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথের জার্মানি সফরের সময়ে ছোট্ট একটি মেয়ে তাঁর হাতে একগুচ্ছ ফুল তুলে দিয়ে বলেছিল, "ভারতবর্ষকে আমি ভালবাসি।" রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, "কেন ভালবাস?" উত্তরে সে বলেছিল, "তার কারণ, ঈশ্বরকে আপনারা ভালবাসেন।" মেয়েটির উত্তর শুনে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন, সকল দেশেই তা স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন, "তোমার প্রশংসা যেন সত্য হয়। কেননা, পৃথিবী আজ এমন একটি দেশের জন্যই অপেক্ষায় আছে, নিজের চাইতে যে-দেশ ঈশ্বরকে আরও বেশী ভালবাসে।"

এ. পেত্রভ (রুশ)

তে নেই। প্রতিভা আছে, কিন্তু মোহ-মাদকতা ছাড়া সে প্রতিভা বাঁচে না। তাই সে পিপের পর পিপে মদ গেলে। মদের ঘোরে কি স্বপ্ন কি জগৎ সে দেখতে পায় ওই জানে। কিন্তু এও দেখা গেছে—যেই নেশা কেটেছে অমনি প্রচণ্ড উৎসাহে কাজ শুরু করেছে কস্তোভস্কি, চারদিকে সবাইকে খুঁচিয়ে কাজ আদায় ক'রে অতি অল্প সময়ে দাঁড় করিয়েছে দৃশ্যসজ্জা। কি এক অপার্থিব প্রেরণায় যেন সে কাজ করে। চাকরি তার যায়নি কারণ সীন আঁকায় তার জুড়ি নেই। তার জন্যে থিয়েটারের বদনাম রটেছে চতুর্দিকে, বিশ্রী সব ব্যাপার, মাতালের কাণ্ড। এমন কি তার ছেঁড়া ময়লা পোশাকের জন্যও কোম্পানীর বে-ইজ্জতি ঘটেছে কতবার। তবু তুলি ধরলেই সে শিল্পী, স্রষ্টা—সৃষ্টি করে চলে অপূর্ব—সীনের পর সীন, যা দেখে দর্শকরা হাততালি দিয়েছে, দেখতে চেয়েছে শিল্পীকে—যা দেখে কাগজের সমালোচকরা দু ছত্র না লিখে পারেননি।

অভিনেতারা কস্তোভস্কিকে এড়িয়ে চলত। মদ ওরাও খেত কিন্তু ছোটলোক সীনপেন্টারের সঙ্গে তাদের আকাশ-পাতাল তফাত এই রকম একটা দৃঢ় ধারণা ওদের ছিল। আর সখীর দল আর ব্যালের মেয়েগুলো কস্তোভস্কিকে মনে করত বৃহন্নলা, দেখা হলেই নাক সিঁটকে চলে যেত। কস্তোভস্কিও দূরে দূরেই থাকতে ভালবাসত।

শুধু একটি মেয়েকে ভাল লাগত তার। ব্যালে গার্লদের একটি, জুলিয়া। এই ভাল লাগার মধ্যে শিল্পবোধই ছিল প্রধান, ভাল লাগত জুলিয়ার নাচের ভঙ্গিটা। ভাল লাগত জুলিয়াকে মঞ্চের ওপর, যখন কস্তোভস্কিরই হাতের স্পট লাইটে উদ্ভাসিত উজ্জ্বল হয়ে জুলিয়া নাচত। কস্তোভস্কিও একটি প্রখর আলোয় জুলিয়াকে অন্য নাচিয়েদের থেকে আলাদা ক'রে ভাস্বর ক'রে তুলে আনন্দ পেত। মঞ্চের বাইরে কখনো জুলিয়ার সঙ্গে কথা বলেনি কস্তোভস্কি, জুলিয়াও থাকত উদাসীন।

বন্ধু নেই, ভালবাসার কেউ নেই, কারো সমবেদনা নেই—এ হেন বিচিত্র একাকিত্বে বাস করত কস্তোভস্কি। অথচ ওকে ছাড়াও থিয়েটার চলে না। কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরলে পাজী। অপমান বোধ করত সে। তাই চরম এক একটা মুহূর্তে সে মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে পড়ত। যেমন আজ।

রিহার্সাল হয়ে গেছে। শৃঙ্খলার পরিচালক মঞ্চের ওপর এসে দাঁড়ালেন। মুখে রাগ, উদ্বেগ, দুঃখ। সঙ্গে ম্যানেজার,
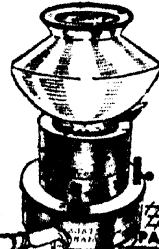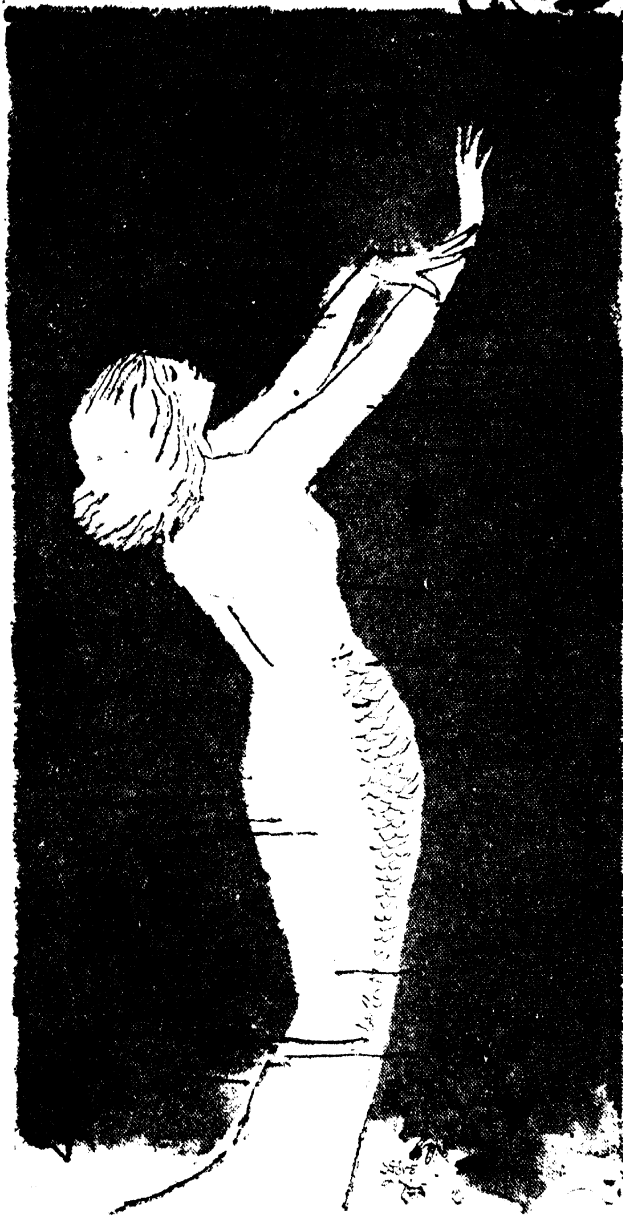
থিয়েটারে যে সীন আঁকে সেই কস্তোভস্কি এক কাণ্ড বাধিয়েছে। এমন একটা সময়ে সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। নতুন নাটকের বিশাল প্রস্তুতি-পর্ব চলছে, আর কে না জানে এ নাটকটার সব কিছু নির্ভর করছে সীন-সীনারির ওপর। সারা শহর পোস্টারে ছেয়ে গেছে। এখন দরকার কোমর বেঁধে আদাজল খেয়ে লাগা। আর ঠিক এই মুহূর্তে মঞ্চাধ্যক্ষ আগাগোড়া যা ভয় করছিলেন তাই হলো। কস্তোভস্কি মদ খেয়ে চুর হয়ে পড়ল।

দেখেছি যখনই কস্তোভস্কিকে সবচেয়ে বেশী দরকার তখনই এই রকমটা ঘটে। মাথায় দুষ্টু সরস্বতী চাপে না কি কে জানে। ঠিক এই সময়েই সুরা তার কাছে আরো লোভনীয় হয়ে ওঠে। অন্যায় করার একটা অদম্য বাসনা জেগে ওঠে, সকলে যা চাইছে তার ঠিক উল্টোটি করতে ইচ্ছে হয়, এমন কি নিজের বারোটা বাজাতেও কস্তোভস্কির আপত্তি নেই। খোদ শয়তানের খপ্পরে পড়ে সে।

আসলে সংযম জিনিসটা কস্তোভস্কির

সুদর্শন, ইহুদীদের মতন মুখের গড়ন, গায়ের রং তামাটে।

"বলুন কি করব?" বললেন পরিচালক; গলা ধরে এসেছে, ঝড় বইছে অন্তরে। "কি করব আপনিই বলুন।"

ভুঁরি চেপে ধরে নিজেকে বাগে আনেন পরিচালক।

"শুয়োরটা!" বললেন ম্যানেজার। "সেবার মনে আছে? জাহাজ থেকে পড়ে গেল জলে। মদ খেয়ে ডেকে পড়েছিল। জাহাজ দুলে উঠতেই গড়িয়ে ঝপাস ক'রে জলে পড়ে গেল। ও মানুষ নয়, ও একটা শুয়োর।"

"হো হো হো!" হাসলেন ম্যানেজার বাঁশির মতন গলায়। "তারপর শুনুন না—আরো মজা আছে। সমুদ্রও সইতে পারলে না ওর ভার—ফিরিয়ে দিয়ে গেল। নেশাটা ভাল করে কাটবার আগেই টেনে তুলল তাকে নাবিকরা। বুঝুন! এমন হারামজাদা যে সমুদ্রও তাকে গিলে হজম করতে পারল না!"

"কিন্তু কোথায় গেল ব্যাটা?" হাসি থামিয়ে বললেন পরিচালক।

"সাজঘরে পড়ে আছে, নেশা কাটছে। সারা শহর খুঁজে অবশেষে তাকে পাওয়া গেল একটা শুঁড়িখানায়, একটা মজুরের সঙ্গে মারামারি করছে। বাছাধনকে সাপটে ধরে এনে ফেলা হলো থিয়েটারে। একটা চোখে কালশিরা পড়ে গেছে ঘুঁষি খেয়ে।"

"শালা! নিয়ে এস হতভাগাকে এখানে!"

ম্যানেজার নিজেই ছুটলেন আনতে। শূন্য থিয়েটারে তাঁর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তুলল, "কস্তোভ্স্কি! এই কস্তোভ্স্কি!" পরক্ষণেই ফিরে এলেন তিনি, চোখ টিপলেন, বললেন পরিচালককে, "আসছে!"

এলোমেলো বেসামাল পদধ্বনি, মঞ্চে এসে দাঁড়ালো এই সমস্ত উত্তেজনার মূলে, সমুদ্রও যাকে গিলতে পারে সেই কস্তোভ্স্কি।

মাঝারি উচ্চতা, পেশল দেহ, চওড়া বুক। ছেঁড়া মোটা কোটটার স্থানে স্থানে রং লেগেছে, প্যান্টেও। উঁচু বুট পরা। দেখে মনে হয় খেটে খাওয়া দিনমজুর। হাত দুখানা বৃহৎ রোমশ, গরিলার মতন। দেখতে ভাল নয়, কিন্তু প্রতিভার বিচ্ছুরণ স্পষ্ট। চোখ আয়ত। মুখে একটা অস্থিরতা, অসংযমের ভাব, চুল অবিন্যস্ত। দেখেই মনে হয়—একে বশ করা কঠিন।

কারুর সঙ্গে করমর্দন করল না সে। একটু মাথা ঝুঁকিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

"কি ব্যাপারখানা কি?" বললেন পরিচালক কঠোর স্বরে। "কাল অভিনয় আরম্ভ! নাটক তুলে নিতে হবে নাকি? আমার মুখে এমন চুনকালি মাখাবার ব্যবস্থা করছ? লজ্জা করে না?"

কস্তোভ্স্কি একবার চুলে হাত চালায়। মুখে জেগে ওঠে একটা অস্বাভাবিক উদ্দীপনা, একটা অস্থিরতা।

"মার্ক লুকিশ," ধরা গলায় বলতে শুরু করে সে, "টেনেছি সত্যি! কিন্তু এখন এইবার কাজ শুরু হবে। সারা দিন সারা রাত কাজ হবে। কাল অভিনয়ের আগেই দেখবেন। আমি—মানে আমার—উঃ ভগবান!"

নিজেকে যেন চেপে রাখতে পারছে না এমনভাবে কাজের নেশা পেয়ে বসেছে তাকে। কাজ দিয়েই যেন সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ছাড়বে।

"কাজটা কি জানো? একটা পুরো নূতন দৃশ্য আঁকতে হবে সে খেয়াল আছে?"

"আঁকছি, এঁকে দিচ্ছি, কিসসু ভাববেন না।" বলল কস্তোভ্স্কি, তারপর আবার চুলে কয়েকবার হাত চালিয়ে চিন্তিত মুখে একটু পায়চারি করল মঞ্চের উপর। "কি রকম কি চাই একটু বুঝিয়ে দেবেন?"

"দ্বিতীয় অঙ্কে দুজন লোক বিরাট তৃণভূমিতে হারিয়ে যাবে—মনে আছে? এই তৃণভূমি, এই বিরাট সীমাহীন তেপান্তরের মাঠটাই আঁকতে হবে। অভিশপ্ত পোড়ো মাঠ, ভুতুড়ে একটা আবহাওয়া দেখেই যাতে দর্শকের লোম খাড়া হয়ে হয়ে ওঠে।"

"আর বলতে হবে না। রাত্রে কাজ করব, সকালেই মাল পেয়ে যাবেন। চট রং সব মজুদ আছে তো?"

"সবই ঠিক আছে, এখন দয়া করে কাজটা করলেই হয়!" পাশ থেকে ম্যানেজার টিপ্পনী কাটেন।

কস্তোভ্স্কিকে ততক্ষণে সৃষ্টির নেশা পেয়ে বসেছে। ম্যানেজার-ট্যানেজারের অস্তিত্বও ভুলে গেল সে এক মুহূর্তে। বলিষ্ঠ কণ্ঠে সে হাঁক পাড়তে শুরু করে:

"পাভেল, কি হচ্ছে? হাত চালা! ভান্কা কোথায়? ওপরে যা, দড়ি ধর। শয়তানের বাচ্চারা গা তোল, পড়েছিস কস্তোভ্স্কির হাতে, খানা খেতে হবে সাথে!"

বিদ্যুৎ খেলে যায় কর্মীদের মধ্যে। পাভেল আর ভান্কা ছুটে যায় স্ব স্ব স্থানে। বিরাট এক খণ্ড চট বিছানো হয় মঞ্চে, এসে পড়ে রং আর গ'দের হাঁড়ি, তুলির রাশি।

"ব্যাটা খেপেছে!" চুপি চুপি বললেন ম্যানেজার। "আর ভাবনা নেই। এবার স্বচ্ছন্দে খাওয়া-দাওয়া করা যেতে পারে। এখন এখানে নাক গলানো মোটেই কাজের কথা নয়।"

সারা রাত মঞ্চের ওপর আলো জ্বলে রইল। শূন্য প্রেক্ষাগৃহে কবরখানার

পাটাতনের ওপর শুধু শোনা গেল কস্তোভস্কির জুতোর মৃদু শব্দ—তুলি হাতে এগিয়ে পৌঁছিয়ে সে পরীক্ষা করছে অর্ধসমাপ্ত দৃশ্যপটটা। চারিদিকে হাঁড়ি আর বালতি, রঙে টইটম্বুর।

দ্রুত স্থূল রেখায় আঁকছে সে। মুখে চোখে রঙের ছোপ লেগেছে, চুল এসে পড়ছে কপালের উপর। সবচেয়ে বড় তুলিটা দিয়ে এলোপাথাড়ি আঁকছে সে উন্মাদ ময়দানবের মতন। চোখে আগুন। সে শিল্পী, সে স্রষ্টা।

সকাল এগারোটায় সবাই এল রিহার্সাল দিতে। স্টেজ-জোড়া দৃশ্যপট দেখে কারুর চোখে আর পলক পড়ে না। অভিনেতারা, গাইয়ে-বাজিয়েরা, ব্যালের মেয়েরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সবাই। দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর। মাঝে মাঝে জেগে আছে উষর শিলাময় স্তূপ। মনে হচ্ছে এখুনি ঘোড়া ছুটিয়ে আসবে রূপকথার নায়ক ইলিয়া মুরোমেৎস, ডাক দিয়ে বলবে, এ প্রান্তরের কোথাও কেউ আছে? মেঘ জমেছে প্রান্তরের ওপর ঝড়ের ইঙ্গিতে ভরা ভীষণ মেঘ। কেন জানি না অমঙ্গল আশংকায় ভরে ওঠে সকলের মন, বুকের ওপর যেন চেপে আসে ছবিটা। যেন কিছু একটা ঘটবে এখানে, একটা ভয়াবহ কিছু! খুব কাছ থেকে দেখলে কিছুই দেখা যায় না—শুধু শুধু হিজিবিজি রেখা আর অর্থহীন রঙের ছোপ। কিন্তু একটু পিছিয়ে গেলেই রূপ নেয় ছবিটা, অলৌকিক ভৌতিক এক রূপ।

"এবার! এবার কি বলবে ওকে?" বলাবলি করে অভিনেতারা। "শালার কি হাত! সত্যিকারের প্রতিভা! যাদু জানে নাকি? এ ছবি নয়, ইন্দ্রজাল!"

কস্তোভস্কি শুনল সব। "ও আর এমন কি!" বললে সে, "আমরা মজুরের বাচ্চা। খাটার সময়ে খাটি। আর ফুরসত পেলে টেনে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকি।"

সবাই হেসে উঠল বটে, কিন্তু সারা দিন সকলের মুখে আর কোনো কথা নেই। এমনটি কস্তোভস্কি নিজেও কোনদিন পারেনি।

কাজের নেশা। কস্তোভস্কি আর একখানা দৃশ্য এঁকে ফেলল সারা দিন ধরে, যদিও দরকার ছিল না পুরোনো সীন দিয়ে চলে যেত স্বচ্ছন্দে। দৃশ্যটা ছিল একটা হিন্দু মন্দিরের। কাজ করতে করতে এক সময়ে খোদ ম্যানেজার এসেছিলেন কি একটা বলতে, তাঁকেই খেঁকিয়ে উঠলো কস্তোভস্কি। তিনি দ্রুত সরে পড়লেন।

এদিকে রিহার্সাল শেষ হয়ে এল। কস্তোভস্কির অবশ্য হুঁশ ছিল না। সে তখন হিন্দু স্থাপত্যকলার ধ্যানে মগ্ন। পেছনে হালকা পদশব্দ শুনে তার চমক [illegible] জুলিয়া।

নাচের পোশাক পরেছে জুলিয়া, অর্থাৎ পোশাক প্রায় নেই বললেই চলে। জামার সীমা লংঘন করে উপচে পড়ছে বক্ষোযুগল। কস্তোভস্কি দেখল তার মায়া মাখানো তন্দ্রালস চোখ। দেখে হাত থেকে তুলিটা খট ক'রে পড়ে গেল।

জুলিয়া হেসে উঠলো সশব্দে। সাদা সাদা দাঁতে বিদ্যুৎ খেলে গেল। হাত বাড়িয়ে দিল সে কস্তোভস্কির দিকে। বলল, "কি খবর, কস্তোভস্কি?"

কয়েক মাস কেটে গেছে। প্রেক্ষাগৃহে আজ প্রচণ্ড ভিড়। যবনিকার পেছনে চলেছে হাড়ভাঙা পরিশ্রম, বকাবকি, ধাক্কা-ধাক্কি, নতুন নাটকের উত্তেজনা। কানে আসে প্রতীক্ষমাণ দর্শকের গুঞ্জন, বাদ্য-বৃন্দের নির্ঘোষ।

মিস্ত্রীরা পাগলের মতন ছুটোছুটি করছে, এখানে ওখানে হাতুড়ি ঠুকছে, অনাবশ্যক পেরেক বার ক'রে ফেলে দিচ্ছে। মঞ্চের ওপরে জট বেঁধে থাকে অন্ধকার—সেখান থেকে যেন ইন্দ্রজালের মতন উঠছে আর নামছে বিরাট বিরাট দৃশ্যপট—মন্দিরের প্রাচীর, গির্জার চুড়ো, বনজঙ্গল, উত্তাল সমুদ্র।

কস্তোভস্কি দাঁড়িয়ে সবটা পরিচালনা করছে। ওকে আর চেনা যায় না। মুখে একটা তারুণ্যের দ্যুতি, চোখে দীপ্তি, পায়ে চকচকে হালফ্যাশানের জুতো, গায়ে আধুনিক ছাঁটের ভেলভেটের কোট। চুল-গুলো এতদিনে বাগ মেনেছে।

"পাতালের দৃশ্যটা দেখি!" বলল সে।

ঘড় ঘড় করে নেমে এল কস্তোভস্কির সর্বাধুনিক সৃষ্টি—সমুদ্রের তলার দৃশ্য। শিল্পী একটু স্নেহের দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় ছবিটার ওপর। চেঁচায় সে, "শোন্ পাভেল! জলপরীদের সীনটা এলে আগে জুলিয়াকে নামিয়ে দিবি, তারপর আমাদের। বুঝেছিস?"

"হবে, হবে!" জবাব আসে ওপর থেকে।

অবশেষে এল জলপরীদের দৃশ্য। কস্তোভস্কি স্বয়ং উঠে এল আলোর মাচায়, হাত দিল স্পটলাইটে। এক সৃক্ষ্ম কবিত্বময় সবুজ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল জলের তলার দৃশ্য। এখানে সূর্যালোকের প্রবেশ নিষেধ। অদূরে গড়ে উঠছে একটা প্রবাল দ্বীপ, গায়ে তার সামুদ্রিক গাছ-গাছড়া, পড়ে আছে নানা রঙের বৃহদাকার ঝিনুক। এক পাশে মুখ-ব্যাদান ক'রে আছে একটা গুহা—তার মধ্যে চোখে পড়ে কোনো জলচর জন্তুর এক জোড়া নিশ্চল অথচ ক্ষুধার্ত চোখ।

এই কালোর জগতে হঠাৎ ভেসে এল এক আলোকপুরীর জলকন্যা। শুভ্র তার দেহ, রাশি রাশি চুল—অর্ধেক [illegible]

অর্ধেক মানবী। এক কলি গানের মতন সে ভেসে বেড়াতে লাগল দর্শকের বিস্ময়াভিভূত চোখের সামনে। তার পেছনে এল এক ঝাঁক জলপরী—ওরই সখীর দল।

কস্তোভ্স্কির হাতের আলোয় তারা হয়ে উঠল অপার্থিব, স্বর্গীয়। কিন্তু সবাইকে ভুলে দর্শকের চোখ এসে নিবদ্ধ হলো জুলিয়ার ওপর। কস্তোভ্স্কির আলোর স্পর্শে জুলিয়া বিলুপ্ত হয়ে গেল, তার জায়গায় ভেসে বেড়াতে লাগল নানা রঙের একটা স্বপ্ন—ক্ষণে ক্ষণে সবার অজান্তে বদলে যাচ্ছে আলোর রং, আর সেই সঙ্গে এক একটা নূতন রূপ বিকিরণ করতে করতে সাঁতরে বেড়াচ্ছে জলপরীদের রানী। একাধিকবার পাগলের মতন করতালি দিয়ে উঠল দর্শকরা। কৃতজ্ঞ চিত্তে জুলিয়া স্বীকার করল কস্তোভ্স্কির কৃতিত্বকে, তার আলোকে, তার প্রেমকে, যা মুহূর্তে মহান ক'রে তুলেছে এক তুচ্ছ নাচিয়ের দেহসঞ্চালনকে। রূপোলী আঁশে ঢাকা পুচ্ছ নেড়ে সে মঞ্চ থেকেই জানালো নীরব অভিবাদন।

স্পটলাইটের পেছন থেকে শূন্যে একটা চুম্বন ছুঁড়ে দিল কস্তোভ্স্কি।

থিয়েটারের সবাই জেনে ফেলেছিল প্রেমের কাহিনীটা। একই হোটেলে থাকত জুলিয়া আর কস্তোভ্স্কি পাশাপাশি ঘরে। প্রতি রাত্রে অভিনয়ের পর দু'জনে এক সঙ্গে বাড়ি ফিরত। সবাই বলত মানুষ হয়ে গেল কস্তোভ্স্কি। আর জুলিয়ারও ভাল লাগত ওর প্রেম নিবেদনের ভঙ্গীটা, বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতন নিজেকে বিলীন করে জুলিয়ার স্তুতিগান করাটা। প্রতি রাত্রে ধৈর্য ধরে মেয়েদের সাজঘরের বন্ধ দরজার সামনে প্রতীক্ষা করত কস্তোভ্স্কি, আর ভেতরে জুলিয়া ধীরে ধীরে মুখের রং তুলত, পোশাক ছাড়তো আর গল্প করত মেয়েদের সঙ্গে।

আজ নাটক ভাঙ্গার পর বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো কস্তোভ্স্কিকে। একের পর একে মেয়েরা শাল মুড়ি দিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এসে নিজের নিজের পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি চলে গেল। কিন্তু জুলিয়ার দেখা নেই।

নানা অজানা ভয়ে দুলতে লাগল কস্তোভ্স্কির অন্তর। তবু জোর করে উদাসীন ভাব ফুটিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল দেয়ালে হেলান দিয়ে। ক্রমশ কম খুলতে লাগল সাজঘরের দরজাটা, কারণ বড় কেউ একটা নেই।

অবশেষে বেরুলো ইহুদী গাইয়ে মেয়েটা, রোজা তার নাম, সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা। কস্তোভ্স্কিকে দেখে সে ভুরু তুলে ফেলল আকাশে, যেন একেবারেই অপ্রত্যাশিত কস্তোভ্স্কির উপস্থিতিটা। বলল, "একি? এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ঘরে আর কেউ নেই। জুলিয়া কোনকালে চলে গেছে! দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে?"

ব্যথায় কস্তোভ্স্কির মুখ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। বজ্রাহতের মতন বলে সে, "চলে গেছে!"

হা-হা করে হেসে ওঠে রোজা। 'হ্যাঁ গো বোকচন্দর! শো শেষ হওয়ার আগেই। নূতন যে পীরিতের নাগরটি জুটেছে তার সঙ্গে। তোমাকে আর মনে ধরছে না গো!"

এক পা পিছিয়ে যায় কস্তোভ্স্কি, সজোরে চেপে ধরে মাথা। বলে, "মিথ্যে কথা!"

"ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!" বলে রোজা। "নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছ, তোমাকে আর কি বলব? জুলিয়া চাইছিল নিজের কাজ হাসিল করতে। আর তুমিও হাঁদার মতন আলো দিয়ে ফোকাস মেরে মেরে ওকে একেবারে সকলের নজরে ফেলে তবে ছেড়েছ। সামনের কয়েক সারির বড়-লোকের বাচ্চাগুলোর চোখ দেখেছ সে সময়ে? জুলিয়ার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, সে এখন নামজাদা নাচিয়ে। তোমাকে আর কিসের দরকার?" বলে রোজা হাসতে হাসতে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে যায়।

অনেকক্ষণ একভাবে শূন্য থিয়েটারে দাঁড়িয়ে রইল কস্তোভ্স্কি। ক্রমশ অনুভব করল বুকের মধ্যে জেগে উঠছে তীব্র একটা বেদনা।

হোটেলে জুলিয়ার ঘরে কস্তোভ্স্কি করাঘাত করল। জুলিয়া ডেকে বসালো তাকে, কিন্তু আন্তরিকতায় যেন বড্ডই

আমি পড়ছি। বসতে হয় বসো, ভাল না লাগলে চলে যাও

অভাব। দৃষ্টিশূন্য চোখে তাকিয়ে রইল সে কন্স্তোভ্স্কির দিকে। পরনের ঢিলে কিমোনোটাতেও যেন নীরব প্রত্যাখ্যান।

কন্স্তোভ্স্কির কণ্ঠস্বর গেল হারিয়ে, বেরিয়ে এল একটা ধারালো উত্তেজিত দীর্ঘশ্বাস: "জুলিয়া!"

জুলিয়া কিছু দেখেও দেখল না। নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল: "কি চাই? সময় নেই, চট্ ক'রে বলো। এটা অতিথি সৎকারের সময় নয়।"

"জুলিয়া!"

জুলিয়া আর কথা না বাড়িয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়, একটা বই খুলে পড়তে শুরু করল।

কন্স্তোভ্স্কির শিরায় শিরায় আগুন ধ'রে যায়। কি দরকার এই অভিনয়ের, এই ভানের? সাফ কথা ব'লে সব চুকিয়ে দিলেই তো হয়। বলে, "অতিথি মানে? অ্যাদ্দিন পর হঠাৎ আমাকে পর করে তুলছ কেন?"

"এ ছাড়া আমাদের কি সম্পর্ক?" কঠোর স্বরে বলে উঠল জুলিয়া, "আমি পড়ছি। বসতে হয় বসো, ভাল না লাগলে চলে যাও।"

তাড়িয়ে দিচ্ছে! খুন চেপে যায় কন্স্তোভ্স্কির। উচ্চস্বরে বলে, "শোনো, কথা আছে। পড়া-টড়া বন্ধ করো, বিলম্ব সইবে না।"

জুলিয়া জবাব দেয় না, বইও ছাড়ে না। বেদনাদায়ক কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যায়। কন্স্তোভ্স্কি অপলক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে তাকে, বালিশে কনুইয়ের ভর দিয়ে বড় লোভনীয় ভঙ্গীতে অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়ে আছে জুলিয়া। পা দুটো যেন দুষ্টুমি করেই সে লুকিয়ে রেখেছে কিমোনোর তলায়, অদৃশ্য থেকেই যেন তারা ব্যঙ্গ করছে কন্স্তোভ্স্কিকে। পাতলা আবরণ ভেদ করে ফুটে বেরুচ্ছে দেহের খাঁজগুলি। ঘৃণায় রী-রী করে ওঠে কন্স্তোভ্স্কির অন্তর, অথচ মনে হয় একবার জড়িয়ে ধরতে পারলে বড় ভালো হতো।

ঘরখানাও দেখে নেয় কন্স্তোভ্স্কি। সস্তা হোটেলের সস্তা ঘর। পোশাক ভরা আলমারি, চেয়ার, টেবিল, আয়না। দরজার কাছে দেয়ালে ঝুলছে জুলিয়ার লোমশ ফার-কোটখানা। কোটটাকে হঠাৎ কুৎসিত বীভৎস ব'লে মনে হয় কন্স্তোভ্স্কির। সেই সঙ্গে মনে পড়ে ঐ কোট পরে কেমন ক'রে জোর ক'রে চেয়ারে বসিয়ে রাখত জুলিয়া, চুলে বুলোতো নরম হাত। বড় ভাল লাগত ওর হাতের স্পর্শ।

হঠাৎ বইখানা ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালো জুলিয়া। মুখ লাল হয়ে গেছে রাগে। বলল, "কোনো কথা নেই, কিছু দরকার নেই! বাজে প্যানপ্যানে প্রেমাভিনয়টা এবার চুকিয়ে ফেলার সময় হয়েছে।"

"কি, কি বলছ জুলিয়া? কি হয়েছে?"

"কিছু হয়নি। হবে আবার কি? তোমার আমার মধ্যে কিছু থাকতে পারে না। আমরা ভিন্ন জগতের মানুষ। তাই এবার সব মিটিয়ে ফেলতে হবে।"

উত্তেজনায় টেবিলটাকে ঈষৎ ধাক্কা মেরে ঘরের কোনায় গিয়ে বসল জুলিয়া, সেখানটা আধা-অন্ধকার, আলো পৌঁছায় না ভাল ক'রে। সেই আবছা অন্ধকার থেকেই স্থ তাকিয়ে রইল কন্স্তোভ্স্কির দিকে। জুলিয়ার চাউনি বদলায় না কখনো। সে চাউনিতে সব সময়ে জেগে থাকে একটা অশ্লীল আমন্ত্রণ, পুরুষকে প্রলুব্ধ করার ফিকির। ক্রোধে আত্মহারা হলেও নিজেরই অজান্তে তার চোখ ডাকতে থাকে কাছে।

কন্স্তোভ্স্কিও এগিয়ে এগিয়ে গেল কাছে। বলল, "বুঝেছি। আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছ! ওরা বলে, তোমার নূতন প্রণয়ী জুটেছে। সামনের সারির বড়লোক দর্শক একজন। বেশ, আমি সরে যাচ্ছি। কিন্তু এসব ঝগড়াঝাঁটির কি প্রয়োজন? জল ঘোলা না ক'রেও তো ছাড়াছাড়ি হ'তে পারে। কারণ আমি চাই একটু স্মৃতি, তোমার স্মৃতি! কিন্তু একটা কথা মনে রেখো জুলিয়া, থিয়েটারের সামনের সীটের বড়লোকরা—ওরা মনে মনে তোমাকে ঘৃণা করে, প্রতি মুহূর্তে তোমাকে অশ্রদ্ধা করে, ওরা চায় তোমার দেহটাকে। আর আমি—আমি তোমাকে—তোমাকে ভালবাসি—। তুমি জাহান্নমে যাবে শয়তান!"

বলতে-বলতে দৃঢ় হাতে জুলিয়াকে ধ'রে হেঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দেয় সে, প্রাণপণে তাকে ঝাঁকুনি দিতে থাকে।

"উঃ, লাগছে! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও হাত ভেঙে যাবে আমার! গুন্ কোথাকার!"

কন্স্তোভ্স্কির রক্তের মধ্যে তখন আগু

ধরে গেছে। ইচ্ছে করছিল জুলিয়াকে ছিন্নভিন্ন ক'রে, দলিতমথিত ক'রে ফেলে। আরো শক্ত হয়ে বসে তার বজ্রমুষ্টি। চোখে সবুজ হত্যার নেশা খেলতে থাকে, দাঁতে দাঁত চেপে সে চাপা গর্জন করতে থাকে। অবশেষে জুলিয়া অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে ওঠে।

সংগে সংগে তার পায়ের কাছে ভেঙে পড়ে কস্তোভস্কি।

"তুমি আমার আলো, আমার চন্দ্রসূর্য, আমার প্রেম, আমার শিল্পসৃষ্টি। আমার সব চিন্তা, সব ভাবনা, সব আনন্দ তোমাতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আমি একটা পশু, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে ছাড়া আমার জীবন অর্থহীন। আবার ফিরে যাব সেই ঘৃণ্য মদ্যপের জীবনে যেখান থেকে তুমি আমায় ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলে। ক্ষমা করো আমাকে। তোমাকে আঘাত করেছি। ক্ষমা চাই।"

দীর্ঘকায় বিরাট মানুষটা মাটিতে পড়ে জুলিয়ার পোশাকের প্রান্তদেশ চুম্বন করতে লাগল, কাঁদতে লাগল অঝোরে।

অবশেষে যখন মাথা তুলল, দেখতে পেল জুলিয়া তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কালো, অশ্রুসিক্ত চোখে ভালবাসা নেই, অনুকম্পা নেই, এমন কি ঘৃণাও নেই। আছে এক ধরনের বিস্মিত কৌতূহল, যা ঘৃণার চেয়ে শত গুণ অপমানকর। আছে বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল যা নিয়ে সে জ্যান্ত খরগোশ ব্যবচ্ছেদ ক'রে ফলাফল নিরীক্ষণ করে, যা নিয়ে সে পোকার গায়ে ছুঁচ বিঁধিয়ে মৃত্যুযন্ত্রণার প্রকৃতি নিরূপণ করে। কস্তোভস্কিও তার কাছে এমনি নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণের বস্তু, আদিম নূতন ধরনের একটা জীব। এই যে পাশবিক ক্রোধ থেকে চট করে কান্নায় উথলে ওঠা, এই যে দুর্বোধ্য কথাবার্তা, রহস্যজনক আচরণ এ সবই বেশ একটা গবেষণার বিষয়।

কস্তোভস্কিরও তৎক্ষণে সেই কৌতূহলী দৃষ্টি দেখে নূতন চেতনা এসে গেছে। সে চিনতে পেরেছে জুলিয়াকে, জুলিয়ার সংগে তার সম্পর্কটাকে। জুলিয়া কোনদিনই তাকে ভালবাসেনি, ভালবাসা সম্ভব নয়। তারা ভিন্ন জাতের, ভিন্ন জগতের মানুষ। সে আর কালাবলম্ব করে না। টুপিটা তুলে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে, হোটেল থেকে।

নিজের অজ্ঞাতেই হাজির হয় সে একটা শুঁড়িখানায়। বহু দিন ছোঁয়নি সে। আজ মনে হলো খেতেই হবে, শুনতেই হবে গেলাসের ঠুনঠুন শব্দ, মাতালের হট্টগোল, শুঁকতে হবে সস্তা ভদকার তীব্র গন্ধ।

একা বসে ছিল সে একটা নড়বড়ে টেবিলে। সামনে ভদকার বোতল আর কিছু দুর্গন্ধময় খাদ্য। টেবিল-ঢাকা চাদরটার এখানে ওখানে ভদকা আর বিয়ারের দাগ। মাথার ওপর জ্বলছে তেলের বাতি। আশে-পাশে মাতালদের ভিড়—সবাই চেঁচাচ্ছে, হাসছে, গেলাস ভাঙছে। ক্লান্ত পরিচারকের দল যন্ত্রবৎ আদেশ পালন ক'রে যাচ্ছে। পাশের ঘরে কারা বিলিয়ার্ড খেলছে—ঠক করে বল-মারার শব্দ আসছে। ওদের একজন থেকে থেকে গেয়ে উঠছে খুব পরিচিত একটা গানের কলি:—

"যেখানে যাই, বিরহের দিন গুনি,
আমার জু—লি—য়া
আমার জু—লি—য়া।"

"শালা!" বলল কস্তোভস্কি, তারপর এক চুমুকে খেয়ে ফেলল পানীয়টা। এই নিয়ে দশ গেলাস হলো। এখানেও জুলিয়ার অত্যাচার থেকে রেহাই নেই? প্রাণপণে সে চাইল নিজেকে বিলীন ক'রে নিতে শুঁড়িখানার শব্দ-গন্ধ-বর্ণে; বহু দিন পূর্বের উদ্দাম স্বাধীন জীবনের স্বাদ ফিরে পেতে চাইল।

কিন্তু নিয়তির মতন ধীরে ধীরে তার মানসচক্ষের সামনে আবার ভেসে উঠলো জুলিয়া, জোঁকের মতন আঁকড়ে রইল তাকে।

জলপরীর বেশে জুলিয়া। রুপোলী পুচ্ছ থেকে নানা রঙের আলো ঠিকরে পড়ছে। ভেসে বেড়াচ্ছে সে, আর মুগ্ধ-করা হাসি হেসে ডাকছে কস্তোভস্কিকে। চলে যাচ্ছে দূরে, বহু দূরে, সাগরের গভীরে। লোকে বলে জলপরীর প্রেমে পড়লে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়। কস্তোভস্কিরও মনে হলো সে তলিয়ে যাচ্ছে অতলে। আর ফিরে পাবে না তার পুরোনো দিনগুলি যখন সে ছিল বলিষ্ঠ, শক্তিমান, বেপরোয়া। তখনো মদ খেত সে কিন্তু সেটা এরকম বিকারগ্রস্ত ব্যর্থ প্রেমের জন্যে নয়। সেটা ছিল তার প্রাণস্পন্দনের প্রকাশ, তার জীবন-শক্তির বলিষ্ঠ ঘোষণা। আর আজ সে এক জলপরীকে, এক স্বপ্নকে, এক অবাস্তব আলেয়ার আলোকে ভালবেসে ফেলেছে—সে শেষ হয়ে গেছে, ফুরিয়ে গেছে।

"শালা!" বলল কস্তোভস্কি। ব'লে আবার খেল ভদকা। আবার এল জুলিয়ার মূর্তি তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিতে—কখনো পরীর পোশাকে, কখনো মানবীর, কখনো আবার জলপরীর। একবার প্রায় কস্তোভস্কির মাথা ছুঁয়ে গেল সে—গায়ে সেই ঢিলে কিমোনোটা। অদৃশ্য এক স্পটলাইটে গোলাপী গাল চক-চক করে উঠল।

"দিনের শেষে ঘুমের দেশেও দেখি শুধু
আমার জু—লি—য়া
আমার জু—লি—য়া"

বিলিয়ার্ড ঘর থেকে গান ভেসে এল। ক্রমশ কস্তোভস্কির চোখে ঘনিয়ে এল রাত্রির অন্ধকার, কুয়াশা—বাতিগুলো নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে কেন? চারিদিকের কোলাহল ক্ষীণ হয়ে দূরাগত সমুদ্রের গর্জন বলে মনে হতে লাগল। ধীরে ধীরে সমুদ্রের ঢেউ এসে গ্রাস করল পুরো দোকানটাকে—চারদিকে জল থইথই করছে। তারই মধ্যে এক জলপরী ডাকছে, ডাকছে, দূর থেকে ডাকছে।

কয়েকদিন গরুখোঁজা করার পর কস্তোভস্কিকে পাওয়া গেল শুঁড়িখানায়। ধরে এনে বসিয়ে দেওয়া হলো মঞ্চের ওপর স্পটলাইটের মাচায়। আজ আবার "জলপরী"র অভিনয়, কস্তোভস্কিকে ছাড়া চলবে না।

কস্তোভস্কি আবার ধরেছে তার রুদ্র রূপ—অবিন্যস্ত চুল, রঙের ছোপ-মারা নোংরা পোশাক, বিশৃংখল পদক্ষেপ।

একটা পাথরের মুঠোয় কে চেপে ধরেছে তার হৃৎপিণ্ডটা। কেমন একটা অবসাদ শরীরে, কেমন একটা আঁধার ঘনিয়ে এসেছে চারদিকে। মঞ্চের লোকগুলোকে মনে হয় নীচ, জঘন্য। কস্তোভস্কি এখন একা, নিঃসংগ।

এল জলপরীরা, সাঁতরে বেড়াচ্ছে মঞ্চের ওপর।

কিন্তু আগের সেই কাব্যময়, গীতিময় আলো আজ নেই। আজ এসে পড়েছে একটা বিবর্ণ, হলুদ, প্রাণহীন আলো—কস্তোভস্কির অন্তরের নিরানন্দের বাহারূপ। সে আলোয় জলপরীদের কতক-গুলি ভাসমান মৃতদেহের মতন দেখাচ্ছে।

আর জুলিয়ার ওপর এসে পড়ল একটা তির্যক নীলাভ আলো। এক মুহূর্তে জুলিয়াকে বীভৎস একটা সরীসৃপে পরিণত ক'রে দিল সে আলো। চোখ দুটোকে মনে হচ্ছে কোটরগত বুভুক্ষু। রুপোলী পুচ্ছ এখন কালো কালো শ্যাওলায় ঢাকা।

দর্শকরা ঘৃণায় ধিক্কার দিয়ে উঠলো। কস্তোভস্কির হাতের আলো উজ্জ্বল ক'রে তুলল সমুদ্রগহ্বরের জলচর সরীসৃপের চোখ দুটোকে। একটা দুঃস্বপ্নের মতন সেই আদিম জন্তুর চারদিকে খেলে বেড়াতে লাগল তারই সহচরী জুলিয়া। ধীরে ধীরে ঐ ভয়ংকর পরিবেশে মিশে গেল জুলিয়া। সেও হয়ে উঠল অতল তলের সরীসৃপ, দুঃস্বপ্নের মূর্ত রূপ।

আলো ধ'রে কস্তোভস্কি দেখছিল তার এই নূতন সৃষ্টি। ভেঙে ফেলেছে, এক লহমায় সে ভেঙে ফেলেছে জুলিয়ার মোহ-পাশ। কি কুৎসিত জুলিয়া! সুন্দরী সে কোনদিনই ছিল না, আজকের রূপই তার আসল রূপ। এতদিন যে মোহিনী রূপ নিয়ে সে বিরাজ করছিল সে শুধু কস্তোভস্কির অন্তরের আলোর কল্পনা।

অনুবাদ : উৎপল দত্ত।

এঙ্গোলার উপজাতি বাণ্টুরা সন্তান উৎপাদনে অক্ষমদের হত্যা করে। আবহাওয়া, অপুষ্টিকর খাদ্য এবং উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ ব্যাধির জন্য পর্তুগীজ পশ্চিম আফ্রিকার এই আদিবাসীদের মধ্যে শিশু জন্মাবার তিন বছরের মধ্যে মৃত্যুহার প্রভূত। জাতি যাতে বেঁচে থাকে তারই উপায় হিসেবে উপজাতি, ওভিমবুন্ডুদের দলপতি বিবাহিত দম্পতিদের সন্তান না হলে তাদের হত্যা করার আইন করে দিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ছেলের মা-ই পুত্রবধুকে বিষ খাইয়ে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে ছেলে অবশ্য দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করে এবং এই বিবাহের ফলে সন্তান লাভ ঘটলে প্রথমা স্ত্রীকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়। তাদের হাতের রান্না ভাল না হলেও ওভিমবুন্ডুদের স্ত্রীদের প্রাণ যেতে পারে।

পুরুষরা তাদের প্রধান খাওয়া সম্পন্ন করে গ্রামের মধ্যে নির্মিত একটি সাম্প্রদায়িক আটচালায়। স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বামী ও পুত্রদের খাদ্য সেখানে নিয়ে যায় এবং সবায়ের খাবার জড়ো করে এমনভাবে ভাগাভাগি করে নেওয়া হয় যাতে অনাথ ও মৃতদাররা অভুক্ত না থাকতে পারে। কোন স্ত্রীর আনা খাদ্য যদি পর পর কয়েক রাত্রি বিস্বাদ বলে অভুক্ত থেকে যায় তাহলে তার স্বামী সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে যায় স্ত্রীকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতে। অনেক ক্ষেত্রে স্বামী একাই তার সেই স্ত্রীকে বিষ দিয়ে হত্যা করে।

প্রাণ থাকতেও কেউ কবরস্থ হলে তার আত্মা পাছে সম্প্রদায়ের ওপর নিদারুণ কোন বিপর্যয় ঘটাবার কারণ হয়, এই আশঙ্কায় ওভিমবুন্ডুরা যথার্থই মৃত্যু হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে নেয়। কেউ মারা গেলে তার বিধবা স্ত্রীকে তিনদিন মৃতদেহের পাশে একই বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়। তিন দিন পার হলে বিধবা জানিয়ে দেয় সত্যিই মৃত্যু হয়েছে কিনা।

দলপতি মারা গেলে তার দেহটা সোজাভাবে বসা অবস্থায় একটা চেয়ারে বেঁধে তিনদিন পাহারা দেওয়া হয়। প্রতিবেশী গ্রামগুলি থেকে প্রবীণরা দেখতে আসে এবং তাদের প্রত্যেকে সজোরে মৃত ব্যক্তির ঘাড়টা একবার করে মোচড় দিয়ে যায়।

স্বাভাবিকভাবেই তৃতীয় রাত্রির মধ্যেই মৃত ব্যক্তির মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তারপর সেই বিচ্ছিন্ন মুণ্ডটি একটি ঝুড়িতে রেখে প্রাক্তন দলপতিদের মুণ্ডের সঙ্গে একত্রে রেখে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হলে তবেই তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তারপর তার দেহটিকে একটি মুণ্ডহীন বলদের দেহের সঙ্গে সেলাই করে এই উপলক্ষে হত্যা করা একটি মোরগ শাবক ও একটি কুকুরের সঙ্গে কবর দেওয়া হয়।

বলদের মুণ্ডটি তখন বিশেষভাবে নির্বাচিত এক বৃদ্ধের মাথায় বেঁধে দেওয়া হয়। সেই বৃদ্ধকে তখনই সেস্থান থেকে পালিয়ে যেতে হবে তা না হলে গ্রামবাসীদের কোপের মুখে পড়তে হবে। কারণ ওদের বিশ্বাস, যে অপ-প্রভাবে দলপতির মৃত্যু হয়েছে সেটা এখন ঐ বৃদ্ধের ওপর ভর করেছে।

সেই পলাতক বৃদ্ধের কোন গ্রামেই আর

আগে মেয়েদের পোশাকে ফলের নির্যাস ছিটিয়ে দিলে তারা রেগে যেতো, কারণ দাগ তোলার উপায় কিছু ছিলনা। সম্প্রতি ফ্রাঙ্কফোর্টে অনুষ্ঠিত "ইণ্টারস্টোফ" প্রদর্শনীতে অগ্‌সবুর্গের এক রাসায়নিক কারখানা কর্তৃক উদ্ভাবিত পোশাকে যে কোন রকম দাগ তোলার এক অব্যর্থ রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষা করে দেখানো হয়। তাই মধ্যস্থলের তরুণী তার দুপাশের বান্ধবী দুজনের কোট ও জ্যাকেটে ফলের নির্যাস ছিটিয়ে দিলেও তারা হাসিমুখেই রয়েছে।

তখন ঠাঁই হবে না এবং জনতার রোষ থেকে পালিয়ে বাঁচলেও অস্পৃশ্য রূপে উন্মাদ হয়ে সে বনে প্রাণ হারায়।

ওভিমবুণ্ডু সম্প্রদায়ের কোন যুবক নিজের হাতে বাড়ি তৈরি করতে সক্ষম হলে অথবা তামাক চাষের বা গৃহপালিত পশুর ব্যবসায়ে দক্ষতা দেখাতে পারলে তবেই সে বিবাহযোগ্য বলে গণ্য হয়।

বিবাহযোগ্য যুবক তখন তার বাপ-মাকে নিজের পছন্দ করা কনের কথা জানালে তারা সম্বন্ধ পাকা করে ফেলে। সম্বন্ধ পাকা হলে সে চার গজ কাপড়, একখানি রুমাল এবং এক বোতল হুইস্কী পাঠায় (আগেকার দিনে এই উপহার ছিল একটা নিড়ানি, মোমের একটা গোলা, এক তাল লবণ এবং ঘরে বোনা একখণ্ড বস্ত্র)।

সে যে বাক্‌দত্তা সেটা বোঝাতে মেয়েটি তখন ঐ বস্ত্রখণ্ড পরিধান করে থাকে। এর পর ইচ্ছে করলে সে তার ভাবি পতীর কুটিরে রাত্রি যাপন করতে পারে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এক বিছানায় শুতে পারবে না। কোন মেয়ে এই নিয়ম ভাঙলে বিবাহের সম্বন্ধ নাকচ হয়ে যায় এবং মেয়েটিকে সারাজীবন মর্যাদাচ্যুত কুমারী রূপেই কাটাতে হয়।

ওভিমবুণ্ডুদের আইনে বিচার পদ্ধতি ভাগ্য পরীক্ষার উপর ন্যস্ত। সম্প্রদায়ের প্রধান নেতাই হচ্ছে সর্বোচ্চ বিচারপতি। দোষী কি নির্দোষ সাব্যস্ত করতে হয়তো তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আগুণে হাত প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে বলবেন এবং তদ্দরুণ ক্ষত আরোগ্যের সময় ধরে দোষ বা নির্দোষিতা নির্ধারণ করবেন।

দুজন লোকে ঝগড়া হলে তারা যদি সাক্ষিশী মানতে না চায় তাহলে দুজনকেই বিষ দেওয়া হয়। মৃত্যু হলে মিথ্যা ওজর বলে ধরা হয় এবং জীবিতকে ধরা হয় সং ব্যক্তি বলে।
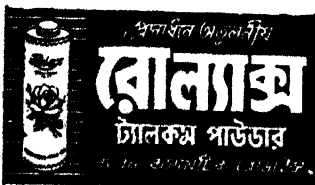
বিবদমান দুজনেরই মৃত্যু এতো বিরল যে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় বিচারক আগে থেকেই মামলা অন্তর্গত দোষগুণ ঠিক করে নেন এবং আদালতের রোজা সেইমতো অনুগৃহীত ব্যক্তির বিষে প্রতিষেধক মিশিয়ে দেয়। ভেষজ দ্রবগুণে এইসব রোজাদের বিস্ময়কর ক্ষমতার জন্য পোর্তুগীজ বৈজ্ঞানিকরাও তাদের সম্মান করে। আদিবাসীদের একজন যক্ষ্মারোগে একেবারে শেষ অবস্থায় পৌঁছেছে মনে হওয়ায় মৃত্যুর পূর্বে তার গ্রামটি দেখার সুযোগ দেবার জন্যে তাকে পোর্তুগীজদের মিসনারি হাসপাতাল থেকে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিন সপ্তাহ পর লোকটি মিসনারিতে ফিরে আসে গ্রামের রোজার দেওয়া ভেষজ ওষুধে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে।

*

বিশ্বের জনসাধারণের জন্য পানীয় জল সরবরাহ করাটা বর্তমানে এক জরুরী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এ কথা বললে অনেকের কাছেই তা প্রথম চোটে অদ্ভুত বলে মনে হবে। অসীম শূন্যে পাড়ি দেওয়ার এবং পরমাণবিক শক্তির যুগে, পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যপ্রদ পানীয় জলের সমস্যাটা কারুর দৃষ্টি বিশেষ আকর্ষণ করতে পারে না। সভ্যতা ও শিল্পের ক্রমোন্নতি ক্রমশঃ এক বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করছে। বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়ার সংগে সংগে জলের চাহিদা বাড়ছে, শিল্প ও কৃষি উৎপাদন বাড়ার সংগে সংগেও জলের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু পৃথিবীর জলসম্পদ খুব বেশী বাড়ানো সম্ভব নয়। এর সংগে আবার শিল্পোন্নতির সংগে সংগে, কলকারখানা নিঃসৃত বিষাক্ত জল, তেল ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ জল দূষিত করছে।

১৪ বছর পূর্বে ১৯৪৭ সালে, বৈজ্ঞানিক, প্রশাসনিক কারিগরি ও আইনের দৃষ্টিভঙ্গীতে সমগ্র বিশ্বের পানীয় জল সরবরাহের সমস্যাগুলি পরীক্ষা করে দেখার জন্য, বিশ্বের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কর্মীসংস্থা গঠিত হয়। গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং নেদারল্যাণ্ডের প্রতিনিধিগণ এই আন্তর্জাতিক জল সরবরাহ সমিতি গঠন করেন এবং বর্তমানে এই আন্তর্জাতিক জল সরবরাহ সমিতিতে অন্ততঃপক্ষে ৩১টি জাতির প্রতিনিধি রয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘের বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায়, প্রতি তিন বছর অন্তর একটি করে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে নানা দেশের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণ এই তিন বছরে নিজ নিজ দেশের জল সরবরাহ সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। এইসব জাতীয় বিবরণীগুলি সম্মেলনে আলোচনা করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমস্ত সমস্যার আলোচনা করা হয়।

কিছুদিন পূর্বে পশ্চিম বার্লিনে এই প্রতিষ্ঠানের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৪০টি দেশ থেকে প্রায় ১৩০০ জন বিশেষজ্ঞ এতে যোগ দেন। তাঁরা যে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করেন তা হলঃ প্রথমত, জল দূষিত হওয়ার বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়; দ্বিতীয়তঃ জল, বীজাণুশূন্য করা এবং মহামারী প্রতিরোধ করা; তৃতীয়ত শিল্পে অনুন্নত দেশগুলিতে জল সরবরাহ করা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, অনুন্নত দেশগুলির জন্য যে বিশ্ব কর্মসূচী তৈরী করেছেন তার লক্ষ্য হল, বিশ্বের প্রতিটি বাসগৃহকে পানীয় জলের পাইপের সংগে সংযুক্ত করতে হবে। এই সম্পর্কে যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার আদর্শ খুবই উঁচু, এখন এর জন্য অর্থ, বিশেষজ্ঞ কর্মী ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতে হবে। এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিশেষজ্ঞগণের জন্য ইয়োরোপে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সম্মেলনের একজন মুখপাত্র বলেন যে, আন্তর্জাতিক জল সরবরাহ ব্যবস্থায় অর্থ বিনিয়োগ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও লাভজনক হবে এবং সমগ্র বিশ্বে স্বাস্থ্যোন্নতির মধ্য দিয়ে সেই লাভটা পাওয়া যাবে।

শিল্পোন্নত দেশগুলির পক্ষে জল দূষিত হওয়াটাই হল সবচাইতে প্রধান সমস্যা। দূষিত জল যার যার দেশের সীমার মধ্যেই সীমিত থাকে না বলে, একটা আন্তর্জাতিক জল আইন তৈরী করতে হবে এবং তা শিল্প নিঃসৃত দূষিত জলের সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তবে এই সম্পর্কে অত্যন্ত আনন্দের কথা হল, বিশ্বের কোন অংশের জলই তেজস্ক্রিয় পদার্থের ফলে বিশেষ দূষিত হয়নি। এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে শেষ যে কথাটি বলা হয়েছে, যা সমগ্র সম্মেলনের আদর্শ হওয়া উচিত, তা হলো, 'জল ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না, এবং বিশুদ্ধ জল ছাড়া সুস্থ জীবন গড়ে উঠতে পারে না।'

ভারতের মতো বিশ্বের যে সব দেশে দূষিত জল পান করার ফলে মহামারী দেখা দেওয়ার বিপদ রয়েছে, সেই সব দেশে নতুন উদ্ভাবিত ভ্রাম্যমান জলের কল, জনগণের কাছে ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে হবে। সাধারণতন্ত্রী ফেডারেল জার্মানীর একটি বড় কারখানা, পানীয় জলের এই নতুন কলটি উদ্ভাবন করেছেন। এই অপূর্ব যন্ত্রটি দিয়ে পুকুর, নদী ইত্যাদি যে কোন জায়গায় জল পরিষ্কার করা যায়, বিশুদ্ধ ও বীজাণুমুক্ত করা যায়। জরুরী অবস্থায়, এই যন্ত্রটিকে তৎক্ষণাৎ

কাজে লাগানো যায়। সেই রকম জরুরী অবস্থায় এটি. ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃপক্ষে ১৮০,০০০ লিটার পানীয় জল সরবরাহ করতে পারে। এর অর্থ হলো, ৩৬,০০০ অধিবাসীর কোন সহরে প্রতিদিন প্রত্যেকের ৫ লিটার জল পাওয়ার পক্ষে এই রকম একটি যন্ত্রই যথেষ্ট।

যে সব দেশে সব সময়েই পানীয় জলের সমস্যা লেগে আছে, সেখানে এই ভ্রাম্যমান জলের কলের প্রয়োজনীয়তা যে খুব বেশি তাতে সন্দেহ নেই। যেখানে জল পাওয়া যায় সেখানেই এটিকে কাজে লাগানো চলে। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে জংগলের মধ্যে পুকুরের দূষিত জলও এই যন্ত্রের সাহায্যে স্বাস্থ্যকর পানীয় জলে পরিণত করা যায়। কাজেই আর্থিক দিক নিয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ যে সব জায়গায় পানীয় জলের অভাবে কোন কাজ করা সম্ভব হয়না, সেই সব জায়গাও এখন কাজে লাগানো সম্ভবপর হবে। যাঁদের দূরে গিয়ে কোন গবেষণার কাজ করতে হয় অথবা সেতুনির্মাণ, ড্রিলিং ইত্যাদির কাজ করতে হয়, তাঁরা যদি এই রকম একটি যন্ত্র সংগে করে নিয়ে যান তাহলে সর্বক্ষণের জন্য টাটকা পানীয় জল পেতে পারেন। অত্যন্ত ঠান্ডা দেশেও এই ভ্রাম্যমান জলের কল ব্যবহার করা যায়। কারণ বরফস্তরের নীচের জল নিয়ে এই যন্ত্রে তা পরিষ্কার করে নেওয়া যায়।

এই নতুন ধরণের ভ্রাম্যমান জলের কলটি উদ্ভাবন করে জার্মানীর কারখনাটি কয়েক বছর ধরে তা পরীক্ষা করে দেখেছেন। রাসায়নিক বস্তু ও ফিল্টার পদ্ধতিতে এই যন্ত্রটিতে কাজ হয়। ক্লোরিন দিয়ে বিপজ্জনক রোগ বীজাণুগুলি মেরে ফেলা হয়। এই যন্ত্রে গ্যাসোলিন ইঞ্জিনে চালিত একটি পাম্প আছে, ইঞ্জিন চালিত এবং বহনযোগ্য একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র বিশেষ ফিল্টার, বিষাক্ত ও দূষিত পদার্থ দূরকারী ফিল্টার রয়েছে। জল টেনে নেওয়ার এবং চাপ সৃষ্টি করার একটি পাইপ এই যন্ত্রে রয়েছে এবং এটি জলে ভাসিয়ে রাখার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। যাতে নদী বা পুকুরের দুই ফিট নীচের জল তোলা যায়।

যন্ত্রপাতিগুলি এমনভাবে সুসংবদ্ধ যে, যে কোন গাড়ীতে তা বসিয়ে নেওয়া যায় এবং তা দেখতে একটি সাধারণ ট্রাকের মতোই মনে হয়। এই ভ্রাম্যমান জলের কল চালাতে মাত্র একজন লোকের প্রয়োজন হয়। জল আপনা থেকেই পরিষ্কৃত ও বীজাণুমুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল হিসেবে বেরিয়ে আসে। এর মধ্যেই ছোট একটি গবেষণাগার তৈরী করা আছে, তাতে যন্ত্রের চালক জলের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করতে পারে।

সহজে শিখুন বিজ্ঞান ‖ বব ব্রাউন
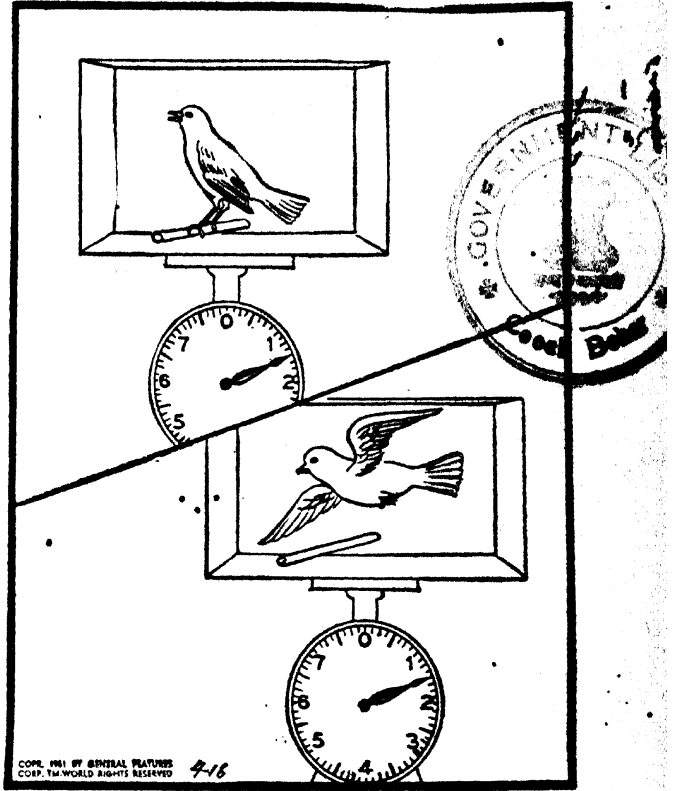
প্রশ্ন:
খাঁচার মধ্যে উড়ন্ত পাখি না খাঁচার দাঁড়ে বসা পাখি, কখন তার ওজনের তফাত হবে?

কী চাই:
পাখীর বসবার জন্যে দাঁড়ওয়ালা একটা কাঠের বাক্স, পাখি, ওজন করবার স্কেল।

কি করতে হবে:
ওজন করবার স্কেলের দিকে লক্ষ্য রাখুন। পাখি যেই দাঁড় থেকে বাক্সের মধ্যেই উড়ে আবার দাঁড়ে এসে বসল তখন স্কেলের কাঁটা এদিক-ওদিক নড়তে থাকবে অর্থাৎ ওজন কমবে বাড়বে কিন্তু গড় ওজনটা ঠিক করুন। বসা পাখি আর উড়ন্ত পাখির ওজন একই হবে।

কেন হল:
পাখি যখন উড়ছে তখন তার ভার রক্ষা করছে খাঁচার মধ্যের বাতাস। ডানার ঝাপটার জন্যে বাতাসের নিম্নমুখী চাপ বাক্সর মেঝেতে ধাক্কা দিচ্ছে। এই উড়ন্ত অবস্থার সময়ে নিক্তির কাঁটা এদিক-ওদিক করবে কিন্তু ওজন কম-বেশির গড় নিলে দেখা যাবে যে দাঁড়ে বসে থাকার সময় তার যে ওজন ছিল, সেই ওজন আর এই উড়ন্ত অবস্থার গড় ওজন এক।

কিন্তু খাঁচা যদি জালের হয় তাহলে অবশ্য দাঁড়ে-বসা-পাখি উড়ন্ত পাখি অপেক্ষা ওজনে ভারী হবে কারণ বাতাসের নিম্নমুখী চাপ জালের খাঁচার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ঝরঝরে ফিল্টার আর নানা
রকমের খাঁটি তামাক মিশিয়ে
তৈরী স্বাদে গন্ধে অপূর্ব
ফিল্টার-স্নিগ্ধ সিমলা।
সিমলা সিগারেট খেয়ে দেখুন,
নিজেই বুঝতে পারবেন
কেন বেশীর ভাগ লোক
অন্য কোন ফিল্টার
সিগারেটের চেয়ে
সিমলাই বেশী
পছন্দ করেন।
ফিল্টার স্নিগ্ধ
তামাকের আসল স্বাদ
SIMLA
A PRODUCT OF THE IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF INDIA LIMITED
20 CIGARETTES
SIMLA
SIMLA
SC-14A BEN

ঘরের পথ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আমার বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। মা গিয়েছিল পাহাড়ে, পাতা কুড়োতে।

কেউই আর ফিরল না।

আমাদের বাড়িটা ছিল মাটির। তাতে ফাটল ধরেছিল। যখন বাতাস বইত তখন সেই ফাটলের মুখে শিস্ দেওয়ার মতো শব্দ হত। যেন বাইরে থেকে কেউ ডাকছে। কখনো কখনো রাত্রিবেলা সেই শব্দে ভয় পেয়ে আমি মাকে জড়িয়ে ধরতাম, মা আমাকে। মাটির দাওয়ায় কিংবা দেয়ালে অশ্বত্থ গাছের চারা দেখলেই মা আমাকে সেটি কেটে ফেলতে বলত। অশ্বত্থ চারা কাটতে কাটতে আমার অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অবসর পেলেই আমি দা হাতে অশ্বত্থ চারা খুঁজে বেড়াতাম।

ঘরের চালে ভাল খড় ছিল না। বর্ষাকালে জল পড়লে আমাদের ভিজতে হত। সারা ঘর যখন জলে থইথই করত তখন মা আমাকে আধখানা আঁচলের আড়ালে রেখে আমাদের আগের দিনের সুখের গল্প বলত। আমাকে আঁচল দিয়ে ঢাকা ছিল মার স্বভাব। শীতে কিংবা বর্ষায় কিংবা ঝড়ে আমি মার আঁচলের আড়ালে চাপা থাকতাম।

আমার বাবার একটা বুড়ো ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটা কোনো কাজ করত না। আমি ঘাস কেটে এনে ওকে খাওয়াতাম। ঘোড়াটাকে বাবা খুব ভালবাসত। আমি বাবাকে দেখিনি। যখন আমি ছোট ছিলাম, তখন বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। তারপর আর ফেরেনি। আমি বাবার ঘোড়াটাকে ভালবাসতাম। ওর গায়ের গন্ধে আমার বাবার কথা মনে পড়তো।

বাবা ফিরল না দেখে মা পাহাড়ে কাঠ-পাতা কুড়োতে যেত। আমাদের গাঁয়ের গরীব মানুষেরা সবাই কাঠ কুড়োত। মা তাদের সঙ্গে খুব ভোরে চলে যেত। ফিরত সন্ধ্যেবেলায়, কখনো কখনো রাত্রি হ'ত। যাওয়ার সময় মা বলত, সারা দিন ঘর পাহারা দিও। ঘোড়াটাকে ঘাসজল দিও। সন্ধ্যেবেলায় শুকনো পাতা জড়ো করে বাইরে একটা আগুন জেলে তার পাশে বসে থেকো। পাহাড় থেকে আগুনটি দেখতে পেলেই আমি বুঝবো তুমি ভাল আছো, ঘরে আছো। তা হলেই আমার ভাবনা থাকবে না।

আমি সারা দিন ঘরে থাকতাম। ঘোড়াটাকে ঘাসজল দিতাম। আর সন্ধ্যে হলেই শুকনো পাতা জড়ো করে বাইরে একটি মস্ত আগুন জ্বালতাম। আগুনের পাশে বসে দেখতাম দূরে বহু দূরে নীল পাহাড় দৈত্যের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার বাঁ দিকে মস্ত মাঠের ওপাশে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পাহাড়টি মেঘ আর কুয়াশার মতো আবছা হয়ে যেত। তবু পাহাড়টি আমার চোখ থেকে কখনো হারিয়ে যায়নি। ছবির মতো হয়ে পাহাড়টা আমার চোখের ওপর স্থির থাকত। আগুন জ্বলতে জ্বলতে নিবে আসত।

পাহাড়টিকে আমার বড়ো ভয়। ঐ পাহাড় পেরিয়েই আমার বাবা চলে গিয়েছিল। আর ফেরেনি। মা কখন ফিরবে ভাবতে ভাবতে আমি কখনো কখনো ঘুমিয়ে পড়ে মা ফিরে আসার স্বপ্ন দেখতাম।

কখনো কখনো মা আমাকে বাবার গল্প বলত। ঐ পাহাড়ের ওপাশে অনেক নদী-নালা খাল-বিল পেরিয়ে বাবা বিদেশে গেছে। সেখানে যেতে হলে কটা নদী কটা পাহাড় পার হতে হয় তা মা জানে না। মা শুধু জানে, একদিন বাবা অনেক রোজগার করে ফিরে আসবে। তখন আমি নতুন জামা জুতো পরে একটা বাচ্চা ঘোড়ার চড়ে বাবার বুড়ো ঘোড়াটার পাশে পাশে টগবগিয়ে কোথাও চলে যাব।

মা কখনো কখনো পাহাড়টাকে অভিশাপ দিত, ওটা গোটা পৃথিবীটাকে আড়াল করে আছে বলে। আবার কাঠ-পাতা কুড়োতে ঐ পাহাড়েই যেত।

একদিন মা আর ফিরল না।

অনেকক্ষণ জ্বলে জ্বলে আগুনটা নিভল। দূরের নীল পাহাড় মেঘ আর কুয়াশার মত আবছা হল। মা ফিরল না।

ভোর হতেই আমি মার খোঁজে বেরোলাম।

যারা কাঠ কুড়োতে গিয়েছিল তারা সবাই ফিরেছে, শুধু আমার মা বাদে।

তাদের মধ্যে একজন বলল, "তোর মা গেছে সুখের খোঁজে। পাহাড়ের ওপারে। তুই ছিলি গলার কাঁটা, তাই তোকে ফেলে গেছে।"

আমার বিশ্বাস হ'ল না। ওরা হাসল প্রাণ খুলে। আমার পিঠে চওড়া হাতের চাপড় মেরে বলল, "তার জন্য ভাবনা কি, তুইও তো জোয়ান মরদ হয়ে উঠবি দু-দিন বাদে। খেটে খেতে পারবি না? চিরকাল কি মায়ের আঁচল-চাপা থাকে কেউ, না কি আমাদের তাই করলে চলে?"

মা আমাকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে ভেবে সারা গাঁ পাতি পাতি করে খুঁজলাম।

ওরা বলল, "খুঁজে কি করবি! তার চেয়ে পাহাড়ে চল। পাতা কুড়োবি।"

আমি পাহাড়ে গেলাম। কিন্তু কাঠ-পাতা কুড়োতে মন গেল না।

ওরা বলল, "তোর মা গেছে সুখের খোঁজে। পাহাড়ের ওপারে। আয়, কাঠ কুড়োবি।"

আমি জেনেছিলাম যে আমি আছি বলেই মার সুখ। সুখ মানেই দুঃখের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি। আমি আছি বলেই মার সেই শক্তি আছে। অনেক বড় হয়ে জেনেছিলাম যে আমিই মা'র দুঃখ, আমি ছিলাম বলেই মা সুখের খোঁজে চলে যেতে পারছিল না। দুঃখ মানেই সুখের পথ আগলে যে দাঁড়ায়।

আমার বাবা গেল পাহাড়ের ওপারে, আমার মাও আর ফিরল না।

রইল শুধু ঘোড়াটি।

সেই ঘোড়াটাও বুড়ো হয়েছে। কাজকর্ম করতে পারে না। কখনো মাঠে চরতে যায়, বেশীর ভাগ সময়েই ঘরে বসে ঝিমোয়। আমি ঘাস কেটে এনে খাওয়াই, জল দিই। যেমন বাপ বুড়ো হলে ছেলে তার কাজকর্ম করে। মাঝে মাঝে ওর প্রকাণ্ড বুড়ো মাথাটি আমার কাঁধে নামিয়ে রাখত। তখন ওর ঘন, গাঢ় দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যেত। সে নিঃশ্বাসে ওর গায়ের চামড়া থরথর করে কাঁপত। ওর মুখে, চোয়ালে, ঘাড়ে শিরাগুলো থাকত ফুলে, ওর ভাঙা-চোরা মুখটা ছিল গাছের কাণ্ডের মত এবড়োখেবড়ো। ওর প্রকাণ্ড ঘাড়টা দু হাতে জড়িয়ে থেকে আমার মনে হত যেন বহুদিনের পুরোনো একটা বটগাছ শাখা-প্রশাখা মেলে আমায় আশ্রয় দিয়েছে।

একদিন ঘোড়াটিকে দেখে গাঁওবুড়ো বলল, "ঘোড়াটাতে চেপে তোর বাপ বিয়ে করতে গিয়েছিল। ঘোড়াটি তোর বাপের মতন। ওকে যত্ন-আত্তি করিস।"

ঘোড়াটিকে নিয়ে ছিলাম মেতে।

বাদবাকি সময়টা কাটতো চুপচাপ দাওয়ায় বসে। সারা দিন বাতাস আমাদের ফাঁকা বাড়িটায় শিস দিয়ে খেলা করত। দেখতাম, গুড়মি শাকের জঙ্গলে চড়াই নেচে বেড়াচ্ছে, ধনে পাতার গন্ধে বাতাস ভারী, সরসর করে গাছের শুকনো পাতায় বাতাস বইছে। কুয়োর পারের মাটিতে ছোট্ট একটু গর্তে জমে থাকা জলে শালিক চান করছে জল ছিটিয়ে। ও চলে গেলে জলের কয়েকটা সরু রেখা থাকতো মাটিতে, কয়েকটা পালক বাতাসে। আমার চকচকে দা'টাতে মরচে পড়ল। সারা বাড়িটায় অশ্বত্থ চারা উঠলো গজিয়ে।

দিন কাটে। সন্ধ্যে হ'লে পাতা জড়ো করে আগুন জেলে চুপ করে শুয়ে থাকি। আগুনটা মরে এলে তার নরম আঁচ অনেকটা মা'র শরীরে তাপের মত মনে হয়। তাই কখন ঘুম আসে শরীর অবশ করে দিয়ে।

যে দাই আমার নাড়ি কেটেছিল সে এসে একদিন বলল, "এমনি করে কি না খেয়ে মরবি? তার চেয়ে আমার কাছে চল। আমার তো ছেলে নেই, একটা মাত্র মেয়ে। দু'জনে বেশ থাকবি।"

"উঁহু। আমি রাতে স্বপ্ন দেখি বাবা ফিরে আসছে।"

"হ্যাঁ, যেমন তোর মা মুখপুড়ী ফিরল। তা খাস কি?"

"শাকপাতা যখন যা হয়।"

বুড়ী গজগজ করে আমাকে বকতে বকতে চলে গেল।

তারপর থেকে দাইমার মেয়ে চন্দ্রা আমার জন্য ভাত আনত। রোজ। ভাতের থালাটা মাটিতে রেখে বেড়ালের মত থাপ পেতে আমার দিকে চেয়ে থাকত চন্দ্রা, যেন শহরের মানুষ দেখছে।

একদিন আমি বললাম, "কি দেখছিস? কি দেখিস রোজ?"

ও বলল, "তোকে। তুই একটা বুড়ো জানোয়ারের সঙ্গে থাকিস কেন?"

"ওকে আমি আমার বাপের মতো ভালবাসি।"

ও খিলখিল করে হাসল। তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে থামল। বলল, "ভালবাসার আর লোক পেলি না! ওটা চড়ে তুই কোন দেশ জয় করতে যাবি?"

আমি ভাবলাম, যাব, একদিন যাব। পুবদিকে যাব—যে দিকে সূর্য ওঠে। একদিন আমি রাজা হয়ে ফিরব, দেখিস।

আমি বললাম, "জানি না রে।"

ও হাত তুলে আমাকে আমার ঘর দেখাল। বলল, "ওই দেখ গাছের শেকড়গুলো সাপের মতো দেয়ালের মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে। তোর চারপাশের দেয়াল আর বেশী দিন থাকবে না, ধসে পড়বে। সময় থাকতে শত্রুরগুলোকে মুড়িয়ে কাট।"

আমি ঠাট্টা করে বললাম, "ওরা আমার মায়ের মত। কেটে ফেললে বাইরে থেকে ডালপালা দেখা যায় না, কিন্তু মনের মধ্যে ওদের শেকড় থাকে।"

শুনে ও রাগ করে চলে গেল। বলে গেল, "তোর মরণ এসেছে ঘনিয়ে। একদিন তুই দেয়ালচাপা হয়ে মরবি।"

আমি ভাবলাম, শেকড়গুলো গর্ত খুঁড়বে, আরো গভীর হবে। মনের দেয়ালে চিড় ধরবে, ফাটল হবে। তারপর একদিন চৌচির হয়ে ভাঙবে। সেদিন আমি আমার বুড়ো ঘোড়ায় চেপে পুবদিকে রওনা দেব। গাঁয়ের লোকেরা দেখবে আমার লাঠির আগায় বাঁধা পুঁটলিটা আস্তে আস্তে দূরে থেকে দূরে পাকা ধানের ক্ষেতের আড়ালে মিলিয়ে গেল। ওরা জানবে, আমি ফিরে আসবো একদিন। রাজা হয়ে।

একদিন চন্দ্রা আমার ভাত নিয়ে এল না। ফার্গলগ্যালের ধরের পাশ দিয়ে মৌরি-

ক্ষেতের কিনারায় কিনারায় যে পথটা ধরে চন্দ্রা আসে, সে দিকে চেয়ে সারা দুপুরে কাটল। চন্দ্রা এল না। তার পরদিনও না। তার পরদিনও না। চন্দ্রা এল না দেখে আমি উঠে খুঁজে পেতে আমার পুরোনো মরচে-ধরা দা'টা বের করে পাথরে শান দিতে বসলাম।

সারাটা দুপুরে পাথরে মুখ ঘষে দা'টা ঝকঝক করে হেসে উঠল। ওর গায়ে আগুন ছুটল। দা'য়ে শান দিয়ে দিয়ে আমার হাতপায়ের মাংসগুলো ফুলে উঠল, শিরায় শিরায় গরম রক্ত ছুটল টগবগিয়ে। কেমন যেন খুশী লাগল, নেশা পেল।

ভেবেছিলাম সূর্য ডোবার আগেই অশ্বত্থের চারাগুলো কেটে ফেলব। এমন সময় চন্দ্রা এল হাতে ভাতের থালা নিয়ে। রোজ যেমন আসত।

আমি বললাম, "এতদিন আসিসনি কেন?"

ও গম্ভীর হয়ে বলে, "একটা বাঘ রোজ আমার পথ আগলে থাকে। বলে, কোথায় যাচ্ছিস? থালা নামিয়ে রাখ আমার সামনে, আর বসে বসে আমার লেজে হাত বুলিয়ে দে। নইলে তোকে যমের বাড়ি পাঠাবো। রোজ এমনি করে বাঘটা তোর ভাত খেয়ে ফেলে।"

আমি বললাম, "জানি। এ গল্প আমি মার কাছে শুনেছি। এক বুড়ী রোজ তার ছেলের কাছে খাবার নিয়ে যেত, আর পথ আগলে থাকত বাঘ।"

"হ্যাঁ, শুনেছিস। তাতে কি? এমন বুঝি হয় না?"

আমি ভেবেছিলাম, বড় হয়ে আমি বাঘটাকে মেরে ফেলব। খিদেকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই, তেষ্টাকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। পথ আগলে যেই থাকবে তাকে সাফ করে দাও।

চন্দ্রা খিলখিল করে হাসল মুখে আঁচল দিয়ে। বলল, "তুই বাঘটাকে মারবি, না ওর লেজে হাত বুলিয়ে দিবি?"

আমি বললাম, "জানি না।"

ও বলল, "মা দেখেছিল তুই খিদের জ্বালায় আমাদের বাড়ি যাস কি না। মা তোকে যাচাই করছিল। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে মা বলেছে, তুই মানুষ নয়। তোর বাপটা ছিল এমনি গোঁয়ার, তাই একমুখো চলে গেছে। ঘরের পথ ফিরে চিনল না। তুইও যাবি, যাবি। কাঁদতে কাঁদতে মা ভাত বেড়ে দিল।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, অনেক ভেবে চন্দ্রা বলল, "কিন্তু আমি জানি তুই যাবি না।"

এই বলে ও চলে গেল। আমি আমার দা'টা হাতে নিলাম। এক এক কোপে অশ্বত্থের মোটা মোটা ডালগুলো খ'সে পড়তে লাগল। আমার শরীর গরম হ'ল, ছলাং-ছল করে রক্ত বইল শিরায় শিরায়। আমি আপন মনে হাসতে লাগলাম। শীতকালে আমাদের বুড়ো ঘোড়াটার গা থেকে ধোঁয়ার মত একটা ভাপ বেরোত। সেই ভাপে ওর রক্তমাংস আর ঘামের গন্ধ পাওয়া যেত। নিজের শরীর থেকে আমি তেমনি এক গন্ধ পেলাম। মদের যেমন স্বাদ নেই, এ গন্ধেরও তেমন ভালমন্দ নেই। এ শুধু আমাকে মাতাল করে।

আমি আপন মনে হাসলাম। যেন আমার নেশা হ'ল। আমার ইচ্ছে হ'ল নিজের শরীরটাকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করি। মাটির দাওয়ায় আমি শরীরটাকে গড়িয়ে দিলাম। আমার শরীরের ঘাম মাটির সঙ্গে মিশল।

শীতের শেষে বসন্তের গোড়ার দিকে আমার কাছে এক বাঁশীওয়ালা এল। তখন বাতাসে টান লেগেছে। শুকনো পাতাগুলো টুপটাপ করে ঝরে ঝরে শেষ হয়েছে। ক্ষেতের মটর শাকে পাক ধরল। যারা শুকনো কাঠ-পাতা কুড়োতে যেত তাদের দিন গেল।

এমনি একদিন শেষ দুপুরে অনেক দূর থেকে বাঁশীওয়ালা এসে আমার দাওয়ায় বসল। তার গায়ে এক শো রঙের এক শো তালি দেওয়া একটা জোব্বা, মাথায় একটা মস্ত পাগড়ি। সেই পাগড়িটা তার কপালটিকে ঢেকে ফেলেছে। রোগা দুটো পা রাঙা ধুলোয় মাখা। আমি কখনো এই বাঁশীওয়ালাকে দেখিনি।

সে বলল, "আমি বাঁশী বিক্রি করি না। বাঁশীর সুর বিক্রি করি।"

এই বলে সে তার বাঁশীতে একটা অদ্ভুত সুর বাজাল।

আমি বললাম, "বাঁশীতে তুমি ওটা কি সুর বাজালে? আমি তার কতক বুঝলাম, কতক বুঝলাম না।"

বাঁশীওয়ালা তার ঘন ভ্রূর নীচে গভীর গর্তের মত চোখ দুটো দিয়ে আমার দেখল। বলল, "এ সুর আমি কোথাও শিখিনি বাবা, কেউ আমাকে শেখায়নি। আমার কোনো গুরু নেই। আমি হাটে মাঠে ঘাটে যা [illegible] তাই বাজিয়ে বেড়াই। কখনো [illegible] নৌকোয় জলের ঢেউ লাগবার সুর, কখনো শীতের শুকনো পাতায় বাতাস লাগবার সুর।"

সে আবার তার বাঁশীতে ফুঁ দিল।

শেষ শীতের শুকনো বাতাসে বাঁশীর টান লাগল। কয়েকটা সুর তীরের মতো আকাশে ছড়িয়ে ছড়িয়ে মিলিয়ে গেল। আমার চোখের সামনে দুপুরটা মাতালের মত টলতে লাগল।

যেন অনেক দূরে পথ! আমাদের এই মৌরি-ক্ষেত ডিঙিয়ে ধানের আবাদের পাশ দিয়ে, পাহাড় পেরিয়ে চলেছে—চলেছে—চলেছে। কত গঞ্জ, কত ব্যাপারীর আস্তানা, কত বন্দর, ঘাট মাঠ পেরিয়ে যাওয়া দেশ। বাঁশীর সুর সেই দূরে-দুরান্তের আভাস মাত্র নিয়ে কোকিলের অস্পষ্ট ডাকের মত নরম, বিবশ হয়ে ফিরে ফিরে আসছে। সেই পথ ধরে অনেক আলো, অনেক অন্ধকার মাড়িয়ে মাড়িয়ে কে যেন আসছে—আসছে—আসছে।

বড় ক্লান্ত পথ! বড় দীর্ঘ পথ!

আমি চোখ বুজে ভাবলাম, সে আমার বাবা। কত দিন গেল, কত রাত গেল। ঘোড়াটা বুড়ো হ'ল। বাবা ফিরল না।

বাঁশীওয়ালা সুর পাল্টে নতুন সুর ধরল।

কখন আমার চোখ ছাপিয়ে কান্না এসেছে। এ কেমন সুর যা দিনের আলোকে অন্ধকার করে দেয়?

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "এর মানে কী? আমাকে বুঝিয়ে দাও।"

বাঁশীওয়ালা থামল না।

যেন এতদিন মাঠটা ছিল রোদে পোড়া, ফাটা ফাটা। একদিন পাহাড়ে মেঘ জমল। বৃষ্টি নামল। অঝোর ধারে বৃষ্টি। মাটির কোষে কোষে জল ঢুকল। বীজধান ফুলে উঠল। বুক ফাটিয়ে শীষ বার করল আকাশে।

বাঁশীওয়ালা থামল। বলল, "এর অর্থ, যেমন করে কুঁড়ি থেকে ফুল হয় আস্তে আস্তে, তোমার চোখের আড়ালে অন্ধকারে যেমন করে আস্তে আস্তে পাপড়িগুলো মেলে দেয়, যেমন করে শীত যায় বসন্ত আসে, যেমন করে শুকনো পাতা ঝরে পড়ে আবার নতুন পাতায় ছেয়ে যায় গাছ—তেমনি
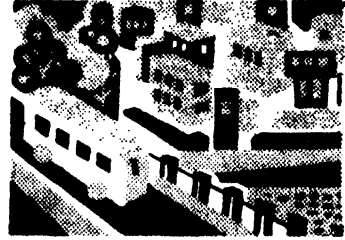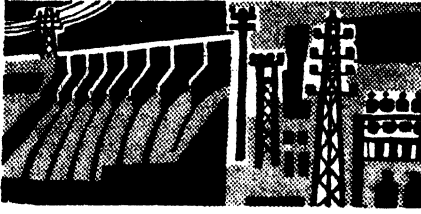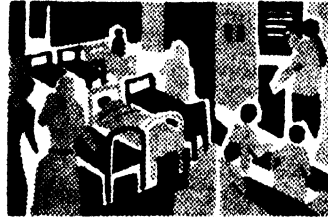
করে তোমার দেহেও একটা ঋতু আসে, আর একটা যায়।"

এই বলে বাঁশীওয়ালা আবার তার বাঁশীতে সুর দিল। যেন বলল, বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ ক'রো না। এক-একটি ঋতু যায়, আর একটি আসে। দুঃখকে সহ্য কর। ক্ষেতে আগুন লাগলে, ফসল ভাল হয়।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, "এ সুর তুমি কোথায় পেলে?"

সে দাঁড়িয়ে উঠে হাসল।

আমি বললাম, "আমাকে এ সুর শিখিয়ে দাও। আমি তোমার মতো জোব্বা পরে বাঁশী বাজিয়ে বেড়াব।"

বাঁশীওয়ালা ফিরে বলল, "তুমি আমাকে অবাক করলে বাবা, এ জোব্বা কি তোমাকে মানায়। আমি যেখানে যখন যেমন পেয়েছি তেমন কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এই কাপড়ের টুকরোগুলো জুড়ে সেলাই করে এই জোব্বা বানিয়েছি। যারা সুখে আছে এ জোব্বা তারা সাধ করে পরে না। আমার মনে রঙ নেই, তাই বাইরে এত রঙের বাহার।"

বাঁশীওয়ালা চলতে লাগল। আমি দেখলাম শীতের ঘন রোদে রোগা দুটো পায়ে রাঙা ধুলো মেখে সে আস্তে আস্তে আমাদের পাড়া ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য ডাকছে না।

শেষ শীতের গরম দুপুরে সেই অদ্ভুত বাঁশীওয়ালা আর তার সুর দূরে থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল।

আমি কাঁদতে কাঁদতে ভাবলাম ঃ এ সুর তুমি কোথায় পেলে বাঁশীওয়ালা? আমার সারাটা দিন যেন টালমাটাল-টালমাটাল। যেন আমি বিনিমদের মাতাল। যেন আমি এক পাগল বাঁশীওয়ালা। শিরা ছিঁড়ে সুর তৈরি করে। সে সুরে আমি সারা দিন গাই। কাঁদি। কেন বাঁশীওয়ালা আমাকে দিল সারা দিন বাজাবার এই বাঁশী? আমি যে একে ছাড়তে পারি না। এ যে আগুনে দিলে পোড়ে না, ঝড়ে ওড়ে না। পোষা কবুতরের মতো নড়ে-চড়ে ঘুরে বেড়ায়। উড়ে যায় না।

উঁচু নীচু পথ। পাথর ছড়ানো। চড়াই উৎরাই ভেঙে বাঁশীওয়ালা চলেছে। শুকনো হাওয়ায় তার চামড়া ফেটেছে, পাথরে তার পা ফেটেছে। তবু তার চলবার শেষ নেই। সে পূব থেকে পশ্চিমে গেল। যেদিকে সূর্য ওঠে সেদিক থেকে যেদিকে সূর্য ডোবে সেদিকে গেল, যে পথে আমার বাবা গেছে তার বুড়ো ঘোড়াকে রেখে, যেদিকে মা গেছে আগুনের পাশে তার ছেলেকে বসিয়ে রেখে।

বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ ক'রো না। ক্ষেতে আগুন দিলে ফসল ভাল হয়। মাটির কোষে কোষে বৃষ্টির জল ঢুকবে, বীজধান কেঁচোর মতো ফুলবে, বুক ফাটিয়ে শীষ বের করবে আকাশে।

আমি জানি বাঁশীওয়ালা আর ফিরবে না। কোনোদিন না।

দাওয়ায় শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন আমার দিন গেল।

একদিন সকালে ঘোড়াটাকে দেখে মনে হল আমার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমার চোখের সামনেই বুড়ো ঘোড়াটা কখন যেন আরো একটু বুড়ো হয়ে গেছে। ওর গায়ে হেলান দিয়ে আমি আমার মাকে ভাবলাম। কিন্তু মার মুখ আমার মনে এল না। রোদ লেগে ঘাসের বুক থেকে শিশির যেমন ভাপ হয়ে মিলিয়ে যায়, তেমনি করে মা'র মুখটা হারিয়ে গেছে। শাড়ির আঁচল, পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকা শান্ত ছায়ায় ঢাকা দীঘির মত সেই চোখ আমি আগের জন্মে দেখেছিলাম।

গাঁওবুড়ো আমায় দেখে চোখ কুঁচকে বলল, "তুই যে আড়েদীঘে রীতিমতো পুরুষমানুষ হয়ে উঠলি! কখন এত ঢ্যাঙা হয়ে উঠলি, বেড়ে উঠলি আমাদের চোখের সামনে, টেরও পেলাম না।"

আমি লজ্জা পেলাম।

গাঁওবুড়ো বলল, "তোর গড়নপেটন হয়েছে তোর বাবার মতন, কিন্তু চোখ দুটো পেয়েছিস মা'র। তা এবার তো জোয়ান হলি, কাজকর্মে লেগে যা। বসে থাকিস না, দিনগুলো চলে যেতে দিস না। বুড়ো ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস, ঘর সামলে রাখিস।"

আমি ভাবলাম গাঁওবুড়োকে বাঁশীওয়ালার কথা বলব।

আমার চোখের দিকে চেয়ে গাঁওবুড়ো হাসল, "জানি রে জানি, তোর কাছে এক বাঁশীওয়ালা এসেছিল। সে মাত্র একবারই আসে। মাত্র একবার।"

গাঁওবুড়ো তার নড়বড়ে মাথাটা দোলাল, "তাই তো বলছি দিনগুলো চলে যেতে দিস না। বসে থাকিস না। ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস। ঘরদোর সামলে রাখিস।"

চন্দ্রা এসে বলল, "তুই নাকি পয়সা দিয়ে বাঁশীর সুর কিনেছিস?"

আমি বলি, "হুঁ।"

চন্দ্রা আমার কাছে এসে বসল, "পাখি কিনেছিস, আর খাঁচা কিনিসনি? সুর কিনেছিস, আর বাঁশী কিনিসনি? তবে তোর ঘরে রইল কি, তোর নিজের বলতে থাকল কি? কিনতে হয় এমন জিনিস কিনবি যা হাত দিয়ে ধরাছোঁয়া যায়, চোখ দিয়ে দেখা যায়, যাকে ধরে ছুঁয়ে দেখে মনের সুখ, ভাল না লাগলে যাকে বেচে দিয়ে আবার পয়সা পাওয়া যায়।"

এই বলে ও হাসল। বলল, "আমি আর কতকাল তোর জন্য ভাত বয়ে আনব? তোরই তো ভাত দেওয়ার বয়স হল। তুই কাজকর্ম করবি, না সারা দিন দাওয়ায় বসে হাঁ করে আকাশ গিলবি?"

আমি বললাম, "জানি না।"

"গাঁওবুড়ো বলছিল ঘরে মেয়ে না দিলে জোয়ানগুলো কাজকর্মে মন দেয় না।"

এই বলে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ও চলে গেল। আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম ওর বাসন্তী রঙের ডুরে শাড়ির আঁচল বাতাসে উড়তে উড়তে ফাগনলালের দাওয়া পেরিয়ে মৌরিক্ষেতের পাশ দিয়ে ওর শরীরের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে চলে গেল। খবে পাতবুটিদার একটা মেঘ রোদের মুখের ওপর দিয়ে সরে গেল। সেই ছায়াটা একটু সময়ের জন্য ওর মুখের ওপর থাকল। বাতাস ওর চারদিকে একটু খেলা করল। ওর চারপাশে উড়ে বেড়াতে লাগল কয়েকটা মৌমাছি।

আমি বাঁশীর সুর কিনেছি বলে গাঁয়ের বুড়োরা আমার নিন্দে করল। দুঃখ করে বলল, আমার ঘরে কিছুই থাকবে না। যেমন করে আমার বাবা থাকল না, মা থাকল না।

গাঁয়ের জোয়ান মরদরা এসে আমার পিঠ চাপড়ে গেলঃ এই তো চাই। বাঁশীর সুর

কিনবি, পাখির ডিম কিনবি। যেমন করে পারিস উড়িয়ে দিবি রোজগারের টাকা। আমরা জোয়ান মরদ, আমাদের রোজগারের ভাবনা কি? দেখছিস্ না বুড়োগুলোর দশা, দু' আঙুলের ফাঁক দিয়ে পুরো আয়ুটা খরচ হয়ে গেল। ওরা আমাদের বেহিসেবী বলে। কিন্তু সামনের শীতে ওরা যখন মরবে তখন তো আমরাই থাকব।

এই শুনে আমি বুড়ো ঘোড়াটার কাছে গেলাম। ও আমার কাঁধে ওর প্রকাণ্ড মাথাটা রাখল।

কখন আমার শরীর দীঘল হয়েছে, হাত পা কোমর হয়েছে সরু, আমার চামড়ায় টান লেগেছে, রুক্ষ হয়েছে মুখ তা আমি নিজেই জানি না। কিন্তু ও যেন টের পেল। আমার কাঁধে মুখ ঘষে শরীর কাঁপিয়ে ওর খুশি জানাল।

আমি ওর গাছের কাণ্ডের মতো এবড়ো-খেবড়ো মুখে আমার গাল রাখলাম। ওর রেশমের মতো কেশর আমার হাতে খেলা করল। আমি বললাম, "বুড়ো, তুই আমার বাপ। কোনো ভাবনা করিস না, আমি তোকে দেখব।"

এই শুনে পাঁজর কাঁপিয়ে ও নিঃশ্বাস ছাড়ল।

ঘোড়াটা বুড়ো হয়েছে বলে দুঃখ ক'রো না। ও বুড়ো হচ্ছে তার মানে তুমি বড়ো হয়েছ। কবে শীত আসবে তার জন্য দুঃখ করে দিনগুলোকে চলে যেতে দিও না। মনে রেখ, দু আঙুলের ফাঁক দিয়ে স্রোতের জল বয়ে যায়। আটকানো যায় না। সামনের শীতে ঘোড়াটা যদি মরে, তুমি থাকবে।

"বুড়ো, তুই আমার বাপ।" আমি বললাম, "কোনো ভাবনা করিস না বুড়ো, আমি তোকে দেখব।"

ঘোড়াটা পুরোনো ঠাণ্ডা শরীর দিয়ে আমার শরীর থেকে তাপ নিল। আমি দু' হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে চোখ বুজে রইলাম। যেন আমি পুরোনো প্রকাণ্ড একটা বটগাছের আশ্রয়ে আছি।

চন্দ্রা এসে বলল, "সারা দিন ঘরে বসে কি বকিস্ একা একা?"

আমি শান্তভাবে ওর দিকে তাকালাম। ওর শরীর ঘামে ভিজে তেল-তেল করছে। দু' চোখে মিটমিটে আলো। এ কেমন আলো? আমি কোনোদিন এমন আলো দেখিনি। ওর শরীর থেকে কেমন একটা মাতাল মাতাল গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। আমি ভাবলাম, বোধ হয় কোনো ফুলের গন্ধ। এ কেমন ফুল? জানি না। কেমন তার রঙ? জানি না।

ও আমার হাত টেনে বলল, "চল্, তোকে আজ একটা নতুন জিনিস দেখাব।"

"কি জিনিস?"

ও ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, "সে একটা রাজার বাড়ি। খুব অদ্ভুত।"

"কোথায় সেটা?"

ও হাসল, "আছে আছে। তোর খুব কাছেই আছে। অথচ তুই দেখিসনি।"

চন্দ্রা ওর বুকের কাপড় সরিয়ে নিল। তারপর কাপড়টা ওকে একা রেখে মাটির ওপর ছড়িয়ে পড়ল। চোখে হাত চেপে ও বলল, "এ এমন রাজা যে দখল নেয় না, দখল ছাড়েও না। আমি সারা দিন সব কাজ ফেলে তার বাড়ি পাহারা দেব কেন?"

ওর বেলেমাটির মতো শরীরের দিকে চেয়ে আমি ভয় পেলাম।

চোখে হাত চেপে ও কাঁদছিল, "আমার সারা দিনের কাজ পড়ে থাকে। আনমনে আমার বেলা বয়ে যায়। তোর বাঁশীওয়ালা কি তোকে এ কথা বলেনি?"

সেই অচেনা ফুলের গন্ধ বাতাসে ভাসছে। এ কেমন ফুল জানি না। কেমন তার গন্ধ জানি না।

আমার বুক ফেটে কান্না এল। আমি ভেবেছিলাম, যে বাঘটি রোজ পথ আগলে থাকে, বড় হয়ে তাকে মেরে ফেলব। কিন্তু ক'টা বাঘকে মারব আমি? গাঁওবুড়ো বলেছিল, ঘরদোর সামলে রাখিস। গাঁয়ের বুড়োরা বলেছিল, বাঁশীর সুর কিনিস না।

চন্দ্রা দু' হাতে আমার মাথাটা টেনে নিল। বলল, "আমি তোকে কতক বুঝি, কতক বুঝি না।"

ওর বুকে ছিঁড়ে-নেওয়া ফুলের বোঁটার মত আমার কপালে, চোখের পাতায় নরম হয়ে লেগে লেগে মুছে গেল।

ও বলল, "একদিন তুই পাহাড়ে যাবি কাঠ কুড়োতে। সেদিন আমি তোর ঘর পাহারা দেব। পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালব বাইরে, যেন তুই পাহাড় থেকে দেখতে পাস।"

বাঁশীওয়ালা তার প্রথম সুরে বলেছিল; ঘর বলতে তোর কোনো কিছুই নেই। কোনোদিন ছিল না। বৃথাই তুই সারা বিকেল আগুন জেলে পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলি। যারা পাহাড়ের ওপারে গেছে তারা আর ফিরবে না।

আমি কাঁদতে লাগলাম।

চন্দ্রা কেঁদে কেঁদে বলল, "তুই যদি আমাকে ছেড়ে না যাস, আমিও যাব না। আমরা ঘর বাঁধব।"

ওর চোখের জলে আমার মাথা ভিজল। আমি ভয় পেয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ও আমাকে ওর বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিল। চুমু খেল আমার ঠোঁটে। জন্মের পর আমরা যেমন ছিলাম, তেমনি হয়ে শুয়ে রইলাম।

বসন্তকাল প্রায় শেষ হয়ে এল। আমার বুড়ো ঘোড়াটা আরো বুড়ো হয়েছে। খুট্‌খুট্ করে সারা দিন ঘাস খায়, কখনো ঝিমোয়।

বাতাসে গরম হলকা ছুটল। বুড়োরা বলল, "এইবার আকাল এল। ঘাট শুকোবে, মাঠ ফাটবে। সেই বর্ষা যতদিন না আসছে।"

কাছাকাছি মাঠের ঘাসগুলো হলদে হয়ে এল। তাই আমি একদিন বুড়ো ঘোড়াটাকে দূরের মাঠে নিয়ে ছেড়ে দিলাম। সন্ধেবেলা ও নিজেই খুট্‌খুট্ করে ঘরে ফিরতে লাগল।

কিন্তু একদিন ও ফিরল না।

সারা সন্ধে আমি দাওয়ায় বসে রইলাম পথের দিকে চেয়ে। দূরের পাহাড় ঝাপসা হয়ে এল। ও এল না।

আকাশে মস্ত বড় চাঁদ উঠলো। জ্যোৎস্নার বান ডাকল দিগন্ত জুড়ে। কিন্তু পেটের নীচে নিজের বাঁকাচোরা বুড়ো ছায়াটা নিয়ে ঠুক্‌ঠুক্ করে ও ফিরল না।

অনেক ভেবে আমি হাতে দড়ির ফাঁস নিলাম। তারপর পথে নামলাম। মনে মনে বললাম: যখন আমি ছোট ছিলাম তখন কেউ কেউ আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু বুড়ো, তোকে আমি চলে যেতে দেব না। আমি তোকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব।

চলতে চলতে আমি ধানক্ষেত ছাড়িয়ে, মরা মটরশাকের ক্ষেতের পাশ দিয়ে, বুড়ো বটের তলায় মহাবীরের থান পেরিয়ে গেলাম।

তারপর দিগন্তজোড়া মাঠ। মাঠে বান-ডাকা সমুদ্রের মত টলটল করছে জ্যোৎস্না। কিন্তু তার কোথাও আমার বুড়োর ছায়া নেই।

আমি পাগলের মতো সারা মাঠ বুড়োকে খুঁজতে লাগলাম। আমার ভাঙা গলার ডাক আমাকে ঘিরেই ঘুরতে লাগল। আমি দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, "বুড়ো, আমি তোকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব।"

আমি মাঠ পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকলাম। আমার চারধারে ঘন গাছ। আলো আর ছায়ার মধ্যে আমি হাঁটতে লাগলাম।

তারপর আমি ভয় পেলাম। আমার মনে হ'ল কেউ যেন আছে। কাছেই—পাশেই। মৃত শুকনো পাতাগুলোতে শব্দ হল। মনে হল, যেন কোনো আত্মা আমার পিছু নিয়েছে।

আমার গায়ে কাঁটা দিল। যেন সেই আত্মা আমার হাত ধরে, তারপর আমাকে আমার চেনা পথ ভুলিয়ে নিয়ে চলল কোথাও। আমি ভাঙা গলায় বুড়োকে ডাকতে লাগলাম।

বন পার হয়ে আমি একটা জলার ধারে এলাম। তাকিয়ে দেখলাম, আমি এর আগে কখনো এখানে আসিনি। এত জ্যোৎস্না আমি কোনোদিন দেখিনি।

জলাটা মস্ত বড়। তার ওপাশে বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ও যেন কিছু শুনছে, কিছু দেখছে। আমি ডাকলাম, "বুড়ো, বুড়ো।"

ও শুনল না। তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আস্তে আস্তে ওর কাছে গেলাম, ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম, "বুড়ো, তোকে আমি পেয়েছি।"

ও ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখল। তারপর ভয় পেয়ে ও সরে গেল। আমি বুঝলাম, ও আমাকে চিনতে পারল না। আমি ওর কাছে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

ও চীৎকার করে আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ছুটতে লাগল। ওর ছায়াটা এবড়ো-খেবড়ো মাঠের ওপর টাল খেতে লাগল। আমি ওর পিছনে ছুটলাম। প্রাণপণে ওকে ডাকলাম। সেই ভীষণ ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্নার মধ্যেও বুড়ো আমাকে চিনতে পারল না।

আমি দড়ির ফাঁসটা মুঠো করে ধরলাম। তারপর শেষবারের মত ওকে ডাকলাম। ও শুনল না। কাকে যেন ও দেখতে পেয়েছে। কে যেন ওকে নিয়ে যাচ্ছে।

আমি ফাঁসটা ছুঁড়ে দিলাম। ও দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার হাত-ধরা দড়িটা থরথর করে কাঁপল। আমি বুঝলাম ফাঁসটা ওর গলায় পড়েছে।

আমি বললাম, "বুড়ো, আমি তোকে চলে যেতে দেব না। দেব না।"

আমি কাছে এগোতেই বুড়ো চীৎকার করে ছুটতে চাইল। ফাঁসের দড়িটা কাঁপতে লাগল থরথর করে।

বুড়ো দড়িটা ছিঁড়ে চলে যেতে চাইল। আমি দড়িটা ছাড়লাম না। বললাম, "বুড়ো, আমি তোকে চলে যেতে দেব না। দেব না।"

ও চীৎকার করে বারবার যেন আমাকে অভিশাপ দিল। আমি বললাম, "বুড়ো, আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই দেব।"

বুড়ো শুনল না। ও ছেড়ে যেতে চাইল। আমি ধরে রইলাম।

কিন্তু বুড়োকে একসময়ে থামতে হ'ল। চারটে পা ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াল বুড়ো। তারপর কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ল।

কাছে গিয়ে দেখলাম ফাঁসটা ওর গলায় আটকে গেছে। ও দম নিতে পারছে না। আমি কপালের ঘাম মুছে বললাম, "বুড়ো, তোকে আমি যেতে দেব না। আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই দিয়েছি।"

এই বলে আমি ওর গলার ফাঁসটা খুলতে চাইলাম। কিন্তু ফাঁসটা খুলল না। নীচু হয়ে দেখলাম দড়ির গায়ে ছোট্ট একটা গিঁটে ফাঁসটা আটকে গেছে, গভীর হয়ে বসেছে বুড়োর গলায়।

আমি প্রাণপণে চেষ্টা করলাম। কপালে বিনবিনে ঘাম ফুটল। কিন্তু ফাঁসটা নড়ল না। বুড়ো ছটফট করতে লাগল। আমি দড়িতে দাঁত দিলাম। দড়িটা লোহার মতো বসেছে। আমার গলার রগ ফুলল, রক্তে ভরে গেল সারাটা মুখ। বুড়ো আমার দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে স্থির হয়ে এল। আমি ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে চীৎকার করে বললাম, "বুড়ো, আমি ফাঁসটা খুলব, খুলব।"

বুড়ো আমার দিকে তাকাল। আমার গা থেকে পিতৃহত্যার সমস্ত পাপ মুছে নিতে চাইল। তারপর সেই ভয়ঙ্কর জ্যোৎস্নার ভেতর ওর দুটো চোখ খোলা হয়ে গেল। আমি বললাম, "বুড়ো, এই ফাঁসটা দিয়ে আমি তোকে ধরতে চেয়েছিলাম।"

আমি দড়িটা ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের পথ

ধরলাম। ভাবলাম—আমার হাত দিয়ে কে তোকে মেরেছে আমি তা জানি না। জানি না।

আমার বাবা গিয়েছিল বিদেশে, রোজগার করতে। আমার মা গিয়েছিল পাহাড়ে, পাতা কুড়োতে। আমাদের ঘোড়াটা গিয়েছিল জলার ধারে, ঘাস খেতে।

কেউই আর ফিরল না।

গাঁওবুড়ো একদিন সবাইকে ডেকে বলল, "শোনো, তোমাদের এক গল্প বলি। গাছের তলায় ধুনী জেলে একটা সাধু বসে থাকত। তাকে মস্ত বড় সাধু ভেবে গৃহস্থরা তার চারধারে হাতজোড় করে থাকত। একদিন একটা লোক এসে বলল, সাধুবাবা, আমার ইচ্ছে তোমাকে কিছু খাওয়াই। সাধু রাজী হ'ল। লোকটি কিছু রুটি কিনে আনল। তারপর আবার বলল, সাধুবাবা, তুমি এই শুকনো রুটি কি করে খাবে? তোমার লোটাটা দাও, দুধ নিয়ে আসি। সাধু খুশী হয়ে লোটা দিল। লোটা নিয়ে লোকটা সেই যে চলে গেল আর ফিরল না।"

সবাই বলল, "তারপর?"

গাঁওবুড়ো বলল, "তারপর লোটার শোকে সাধুর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সে কি কান্না। সবাইকে ডেকে ডেকে বলে, "দেখ দেখ, চোট্টার কান্ড দেখ, আমাকে এক পোয়া রুটি খাইয়ে আমার রুপোর লোটাটা নিয়ে ভেগেছে।"

সবাই বলল, "তারপর?"

গাঁওবুড়ো হাসল, "যার লোটা চুরি যায় সে বোকা। কিন্তু সেই লোটার শোকে যে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে সে আরও বোকা।"

এই বলে শীত আসবার আগেই গাঁও-বুড়ো মরে গেল।

গাঁয়ের বুড়োরা জমায়েত হয়ে বলল, "জন্মের পর মৃত্যু, তারপর আবার জন্ম। ঠিক যেমন ঢেউয়ের পর ঢেউ। চলতে চলতে পড়ে যাওয়া, আবার ওঠা। কে যেন আমাদের নিয়ে দিনরাত এই খেলা খেলছে। এ খেলার শেষ নেই।"

কেউ বলল, "খাঁচাটা পুরোনো হয়েছে।"

শীত আসছে শুনে বুড়োরা ভয় পেল। বলল, "এবার ঘর ছাড়তে হবে।"

কেউ বলল, "ঘর আর কোথায়! ঐ তো নড়বড়ে পাতার ছাউনি, রোদ মানে না, জল মানে না।"

বুড়ো ঘোড়ার মতো খুট্‌খুট্‌ করে শীত এল। তারপর বুড়োদের কাঁধে মাথা রেখে তাদের দেহ থেকে তাপ শুষে নিতে লাগল।

বুড়োরা পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালাল। গোল হয়ে ঘিরে বসল। তারপরে প্রাণপণে বলতে লাগল, "কে যেন জন্মের পর স্রোতে ভাসিয়েছিল। তাই চেয়ে দেখলাম মাথার ওপর ছাদ নেই, চারদিকের দেয়াল নেই।"

কেউ বলল, "অনেকের সঙ্গে মিলেমিশে পথ চলছিলাম কোন ভিনগাঁয়ের সীমানা ডিঙিয়ে। তারপর অন্ধকার হ'ল, যারা ছিল সাথের সাথী তাদের মুখ দেখা যায় না, পাশে কে চলছে জানা যায় না। অন্ধকারকে গাল পাড়ি, কিন্তু ঠাহর করে দেখলে এ অন্ধকারও সুন্দর।"

কেউ বলল, "যাব আর কোথায়, সেই ফিরে আসতেই হয়। অণু অণু হয়ে আমি বাতাসে মাটিতে মিশব। কিন্তু দেখো, তারপর একদিন পাহাড়ে মেঘ জমবে বৃষ্টি আসবে, বাতাস ভিজবে, মাটির কোষে কোষে ঢুকবে জল। তখন আমি ফুল হয়ে ফুটব, নদীর জল হয়ে বয়ে যাব, বাতাস হয়ে খেলব, মেঘ হয়ে ভাসব।"

এইসব শুনে গাঁয়ের জোয়ানগুলো হাসল।

তাই আমি চন্দ্রাকে নিয়ে ঘর বাঁধলাম।

আমার মা বলেছিল, "বাইরে একটি আগুন জেলে রেখো। পাহাড় থেকে আমি যেন দেখতে পাই তুমি ঘরে আছ, তুমি ভাল আছ। ঘর সামলে রেখো, কোথাও যেও না।"

দাইমা বলেছিল: আমার কাছে চল্‌। আমার ছেলে নেই, তোকে ছেলের মত পালব।

বাঁশীওয়ালা বলেছিল: বৃষ্টির জল লেগে বীজধান ফুলবে। বুক ফাটিয়ে শীষ বের করবে আকাশে। বুড়ো ঘোড়াটার জন্য দুঃখ ক'রো না। একটা ঋতু আসে, আর একটা যায়।

গাঁওবুড়ো বলেছিল: ঘরদোর সামলে রাখিস। বুড়ো ঘোড়াটাকে দানাপানি দিস। বসে থাকিস না, দিনগুলো চলে যেতে দিস না। মনে রাখিস বাঁশীওয়ালা মাত্র একবার আসে।

গাঁয়ের বুড়োরা বলেছিল: বাঁশীর সুর কিনিস না। তা হলে তোর ঘরে কিছুই থাকবে না।

আমি বলেছিলাম: বুড়ো, তুই আমার বাপ। কোনো ভাবনা করিস না, আমি তোকে দেখব।

আমি আগুন জেলেছিলাম। ঘর আগলে ছিলাম।

তবু কেন যে আমার বাবা গেল বিদেশে, রোজগার করতে।

আমার মা গেল পাহাড়ে, পাতা কুড়োতে!

আমার ঘোড়াটা গেল জলার ধারে, ঘাস খেতে!

চিত্রগ্রীব

গত সপ্তাহে আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজ-এর ব্যবস্থায় পার্ক ম্যানসন-এ দুটি তরুণ শিল্পীর চিত্রকলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। এঁরা দুজনেই শান্তিনিকেতনের ছাত্র। এঁদের একজনের নাম এ আর নায়েক এবং আরেকজনের নাম এন এম নাগালিংগাম। নায়েক হলেন বম্বের অধিবাসী এবং নাগলিংগাম হলেন মরিসিয়াস-এর অধিবাসী। দুজনেই কুড়িটি করে ছবি পেশ করেন। নায়েক-এর রচনার মাধ্যম জল রঙ এবং নাগালিংগামের প্যাস্টেল। নাগালিংগামের বর্ণ অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল—সম্ভবত প্যাস্টেল মাধ্যমের জন্যে। ইনি প্রকৃতির দৃশ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে থেকেই আঁকার বিষয়বস্তু খুঁজে নিয়েছেন। রচনাগুলি ভাল লাগে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'সুস বোয়া', 'বাতু' এবং 'লা ভু'। নায়েক জল রঙে বেশ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। খুশি-মত জল রঙকে নিয়ন্ত্রণ করা বাস্তবিকই বাহাদুরির কাজ। নায়েক জল রঙে ভালোকম্পোজিশনেই যে দখলের পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এঁর বিষয়বস্তু শান্তিনিকেতনের আশেপাশের গ্রাম—সেখানকার প্রাকৃতিক রূপ এবং গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রা। মেলা বাজার প্রভৃতি দৃশ্যে যথেষ্ট প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়। এঁর স্কেচের ধরনধারন কিছুটা প্রখ্যাত শিল্পী রামকিংকরের মত। ভবিষ্যতে শ্রী নায়েক আরও রসোত্তীর্ণ কিছু দেখাবেন সে বিষয় আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এঁর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা 'ইউর দ্য প্লুই', 'আপ্রে লাভেয়ার্স', 'আ লা ফোয়া' এবং 'সীন দ্য মেলা'। প্রদর্শনীটি আমরা বিশেষভাবে উপভোগ করেছি।

* * *

এ সপ্তাহে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস ভবনে আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতির একটি প্রদর্শনী দেখতে পেলাম। প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস। শিল্পীদের নাম তালিকায় প্রখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে অনেকেরই নাম দেখা গেল, কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ যে এখনও সবার ওপরে আবার তা প্রমাণিত হল এই প্রদর্শনীতে। অনেক প্রখ্যাত শিল্পী, যাঁরা প্রতিকৃতি এঁকেই বিখ্যাত, তাঁদের রচনাও অবনীন্দ্রনাথের এই রচনার পাশে মনে হয় যেন ছাত্রদের কাজ। যাঁরা প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নন, তাঁদের আঁকা প্রতিকৃতিগুলি কোনও মন্তব্যের যোগ্য বলে মনে হয়নি আমার। অবনীন্দ্রনাথ রচিত এই প্রতিকৃতিটি আমার মনে হয়, তাঁর মাস্টারপিসগুলির মধ্যে একটি এবং পৃথিবীর যে-কোনও 'মাস্টার' শিল্পীর রচনার পাশে এটিকে বিনা দ্বিধায় রাখা চলে। অবনীন্দ্রনাথের পরেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা আমি মনে করি, নীরদ মজুমদারের। রচনাটি বাস্তবিকই শিল্পীর ব্যক্তিত্বের রসে বিশিষ্ট। দু-একজন অতিআধুনিক শিল্পীর রচনা আমাদের কাছে সত্যিই ভয়াবহ মনে হয়েছে। যাই হোক, অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর এ-প্রচেষ্টা আমরা সমর্থন করি, তবে শিল্পীদের নামের জাঁকজমকের দিকে লক্ষ্য না দিয়ে রসোত্তীর্ণ রচনার দিকে ঝোঁক দিয়ে যদি এঁরা ছবি সংগ্রহ করতেন, তা হলে আমরা আরও আনন্দিত হতাম।

শিল্পী—এ, আর, নায়েক

শিল্পী—এন, এম, নাগালিংগাম

ট্রামেবাসে

আসাম কংগ্রেস দলের মধ্যে যে ফাটল ধরিয়াছে, তাহা জোড়া লাগাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। —"তবে তা শুধু সিমেন্ট দিয়ে হবে, না, গঙ্গামৃত্তিকা সংযুক্ত

পরিশুদ্ধ সিমেন্টে হবে, সে-কথা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি।"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

পরিবহণ বিভাগের পরিসংখ্যানে প্রকাশ, ১৯৪৮ সালে সরকারী বাস-এর সংখ্যা ছিল ২৮টি মাত্র। বর্তমানে সেই সংখ্যা ৭৫৮। —"১৯৪৮-এর খবর বলতে পারব না,' কিন্তু বর্তমানে শুনেছি, ভারতের জন্মহার দৈনিক ২৮ হাজারের ওপর, সুতরাং..........." —বলে আমাদের শ্যামলাল।

হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড" একটি বস্তির ছবি ছাপিয়াছেন। —"কিন্তু কত গৌরবোজ্জ্বল সপ্তাহের ছবি ছেড়ে এ-ছবি কে দেখবেন! এ যে প্রায় Full house আর Fool house-এর তফাত।"—বলেন অন্য সহযাত্রী।

একটি সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে—পাকিস্তানের জঙ্গী প্রেসিডেণ্ট বিদেশে গিয়া ভারতের বিস্তর নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন। খুড়ো মন্তব্য করিলেন—"সে কহে বিস্তর মিথ্যা যে কহে বিস্তর!!"

সংবাদে শুনিলাম, কলিকাতা নারী পুলিস বাহিনীর পোশাক এখন হইতে হইবে নীল জামা, নীলপাড় শাড়ি ও নীল জুতা। শ্যামলাল উচ্ছ্বসিত হইয়া গান ধরিল—"নীল দিগন্তে ঐ ফুলের আগুন লাগল।"

আলস্য ও লাল ফিতা দেশের শত্রু—বলিয়াছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী। আমাদের জনৈক

সহযাত্রী বলিলেন—"কত ফিতা কেটে কত উদ্বোধনই তো ভি আই পি-রা করলেন, আর এই সামান্য শত্রু লাল ফিতা কাটতে পারলেন না?"

বিলাতে ভিভনশায়ারের এক কৃষক নাকি বলিয়াছেন যে, গান শুনিলে গাই বেশী দুধ দেয়। আমাদের এক সহযাত্রী বলিলেন—"এইজন্যেই 'গাইয়ে' কথাটার উদ্ভব হয়েছে কিনা বলতে পারব না!!"

উত্তর ইতালিতে জনৈক ব্যক্তির পনর বৎসর কয়েদ হইয়াছিল। সে নাকি কয়েদে থাকিয়াই 'পাত্রী চাই' বিজ্ঞাপন দিয়া কয়েদেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। —"মনে হয়, লোকটি কয়েদ ভয়ানক ভালোবাসে। সরকারী কয়েদের কাল ফুরিয়ে গেলে সে পারিবারিক কয়েদে গিয়ে বসবাস করবে।"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

রাশিয়ার বিশসালা পরিকল্পনায় বিনামূল্যে শিক্ষা, চিকিৎসা এবং কতকাংশের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইবে। বাড়ি বা গাড়ির জন্য আর ভাড়া দিতে হইবে না। —"এখন বাকি শুধু একটি দুধের পুকুর আর স্বর্গের একটি সোনার সিঁড়ি"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

স্লিমিং-এর সপক্ষে বক্তৃতা দিতে গিয়া মনস্তত্ত্ববিদ্ শ্রীমাইকেল আর্গল নাকি বলিয়াছেন যে, মোটা লোকের চেয়ে রোগা লোকদের নীতিবুদ্ধি অনেক বেশী। —"সত্য-মিথ্যা যাচাই করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে শ্রীআর্গল অর্গল খুলে যে ধুনো দিলেন, তাতে মা-মনসাদের অবস্থা যে কী হবে, তাই ভাবছি।"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

জলন্ধরের সংবাদে প্রকাশ, একটি গর্দভ নাকি লাইনের উপর শুইয়া থাকিয়া একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন আটকাইয়া দিয়াছিল। খুড়ো বলিলেন—"আমরা ঐ কৃতিত্বের অগ্রাধিকার শুধু জলন্ধরের গর্দভকে দিতে রাজী নই!!!"

প্রাচীন কাব্য

বৈষ্ণব পদাবলী—সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ। ৩২।এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯। পঁচিশ টাকা।

প্রাচীন সাহিত্যে সুপণ্ডিত, বিশেষত বৈষ্ণব সাহিত্যের শিরোমণি সাহিত্যরত্ন শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বর্তমান সংকলন গ্রন্থ 'বৈষ্ণব পদাবলী' আজ পর্যন্ত প্রকাশিত এই বিষয়ে সমগ্র সংকলন-কর্মের মধ্যে তর্কাতীতভাবে শ্রেষ্ঠ; এবং এই মহৎ, উপরন্তু অনায়াসসাধ্য, প্রায় অচিন্তনীয় কর্ম-সম্পাদনে যে সাফল্য তিনি অর্জন করেছেন, তার জন্য পদাবলী সাহিত্যে অনুরাগী এবং সাধারণভাবে বাঙালী সাহিত্য-পাঠকের পৌনঃপুনিক ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য। বলা বাহুল্য, বর্তমান গ্রন্থটি বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম সংকলন নয়; ইতিপূর্বে আরো কয়েকটি প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে বিশিষ্ট দুটি গ্রন্থের নাম করা যায়: 'সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত 'পদকল্পতরু'; এবং শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র সংকলিত 'পদামৃত-মাধুরী'। আপাতদৃষ্টিতে এই সংকলনগুলি নির্ভরযোগ্য হলেও পদাবলী সাহিত্যের ব্যাপকতা ও অনেকানেক প্রকীর্ণ-পদের দুষ্প্রাপ্যতা, উপরন্তু পদকর্তাদের ঐতিহাসিক পরিচয় নির্ণয়ের বিভিন্ন অসুবিধার জন্য প্রারম্ভে গ্রন্থ দুটি সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনি। এক হিসেবে 'বৈষ্ণব পদাবলী' পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের পরিপূরক; এবং যাঁরা ভবিষ্যতে এই বিষয়ে গবেষণার অপেক্ষা রাখেন—তাঁদের কাছে অপরিহার্য। সংকলিত বিপুল সংখ্যক পদ (৩৭৫৬), চৈতন্যপূর্ব যুগের পদকর্তা 'শ্রীগীতগোবিন্দ' রচয়িতা জয়দেব থেকে শুরু করে চৈতন্য-সমসাময়িক রায় রামানন্দ, মুরারি গুপ্ত, এবং চৈতন্য-পরবর্তী জ্ঞানদাস, রায়শেখর প্রমুখ কবির ও অসংখ্য প্রকীর্ণ কবিতায় কবির পদাবলীর পরিচয়—একক, একটিমাত্র গ্রন্থে পাওয়া প্রায় বিস্ময়কর পর্যায়ভুক্ত। স্মরণকালের মধ্যে এমন মূল্যবান, মার্জিত একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে কি না সন্দেহ।

পদাবলী সাহিত্যের পরিচয় সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই জ্ঞাত, বর্তমান পরিসরে তার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগ সর্বদেশেই একটি পালাবদলের ধারাসূচক। বাঙলা সাহিত্যে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ফসল বৈষ্ণব পদাবলী। তৎকালীন মানুষের ধর্মবোধ ও সাহিত্যবোধে অনুপ্রাণিত এইসব গীতি-কবিতায় ভক্তিরস ও প্রেমরসের প্রকৃষ্ট নিদর্শন মেলে। রামায়ণের রাম, মঙ্গলকাব্যের শিব ও বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণতম নরলীলার পরিচয় এবং এই তিনজনই প্রাচীন সাহিত্যের প্রেরণাস্বরূপ, বাঙালীর প্রাণের দেবতা বলে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধা; শ্রীরাধা-

কৃষ্ণের মিলিত রূপে পদাবলী বাঙলার একমাত্র উপাস্য—এই রূপ সর্বমানবিক ভালোবাসার 'গীতিময় বিগ্রহ'। কবি জয়দেবের সময়েই এর সূচনা হয়েছিল, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচয়িতা কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এই ধারাতে অনুকারী; এবং তার পরে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙালীর জাতীয় জীবন 'নবজাগরণের জোয়ারে উদ্বেলিত' হ'য়ে ওঠে। বৈষ্ণব পদাবলী সেই জাগরণের জয়গান: 'মর-জগতের সঙ্গে চিন্ময়ধাম গোলকের সেতুবন্ধ', শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকথার কবিত্বময় উদাহরণ। মঙ্গলকাব্যের স্থবির গতানুগতিকতায় অভূতপূর্ব স্বাতন্ত্র্য ও জঙ্গমতার সুরযোজনা করে বৈষ্ণব পদাবলী। উপনিষদে আছেঃ 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বিদ্যাপতির বক্তব্যও অনুরূপ; এবং লক্ষণীয় যে, পরিণামে উভয়েই সমভাবে বিচলিত, একই বেদনায় অভিভূত, বিরহের অন্তর্দাহে ও হাহাকারে উচ্চারিত। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলিত ধারায় মহাপ্রভুর আবির্ভাব; এবং তাঁরই প্রভাবে পরবর্তী কালে বৈষ্ণব গীতিকবিতার পথ-পরিবর্তন ঘটে।

সংকলন গ্রন্থের প্রথমত শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় একটি সুন্দর তথ্যসমৃদ্ধ ভূমিকা রচনা করেছেন। অনতিদীর্ঘ হ'লেও জ্ঞাতব্য প্রায় সব কিছুই এর মধ্যে পাওয়া যায়। সংকলক ও টীকা-ভাষ্যকার সংকলন-কর্মে 'বৈষ্ণব পদলহরী' প্রণেতা দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের ধারানুসরণে পূর্বরাগ, বিরহ ইত্যাদি পর্ব পৃথকভাবে ভাগ না ক'রে একই পদকর্তার রচনার মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় বিন্যস্ত করেছেন। ফলত, একজন কবির বিভিন্ন পর্যায় অনুসরণের জন্য বারবার পাতা ওল্টানোর প্রয়োজন করে না। এখানে বলা প্রয়োজন যে, এক-একজন কবির বৈশিষ্ট্যদ্যোতক যাবতীয় পদ এই সংগ্রহে সংকলিত হওয়ার ফলে পুনরাবৃত্তির পরিবর্তে বৈচিত্র্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি, প্রয়োজনমতো পাঠকদের সুবিধার জন্য টীকা ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থও সংযুক্ত। সুতরাং ব্যবহারের দিক থেকে এই সংকলন গ্রন্থ ত্রুটিমুক্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় পদাবলী সাহিত্যের ভাবৈশ্বর্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন, এ-কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক পটভূমিকা রচনা করা যায় না কি? কাজটি দুরূহ, সন্দেহ করি না। কিন্তু, অনেক অসম্ভব যখন সম্ভবপর হয়েছে, তখন পরবর্তী সংস্করণে এই বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা করতে, সম্পাদক ও প্রকাশককে অনুরোধ করি।

পরিশেষে, মুদ্রণে ও গ্রন্থনে সর্বাঙ্গসুন্দর এই অসাধারণ গ্রন্থটির বহুল প্রচার ও ব্যাপক সমাদর কামনা করি। ২৭৪।৬১

প্রবন্ধ

ব্রহ্মবান্ধবের চিঠি ও কথা — শ্রীব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দাম ২·৫০ নঃ পঃ।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নামটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসপাঠকের কাছে অজানা নয় কিন্তু তিনি সত্যিই সাধারণ। জনসমাজে বিশেষভাবে পরিচিত নন। অথচ শুধু সাহিত্য ব্যাপারেই নয়, বহুমুখী কর্মধারায় তিনি একদা এই বাংলা দেশে একটি জ্বলন্ত প্রতিভা রূপে প্রতিভাত ছিলেন। এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সহকর্মীরূপেও এক সময় তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকতা করেছেন। অন্য দিকে বাংলা সাময়িক সাহিত্যের অগ্রগতির সঙ্গেও তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। তবু যে তিনি আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট পরিচিত নন, তার একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে তাঁর রচিত বিভিন্ন প্রবন্ধাবলী পাঠকসমাজে প্রকাশ করার দায়িত্ব এতকাল কেউ অনুভব করেননি।

সুতরাং বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশ করে প্রকাশক একটি মহৎ কাজ করেছেন। বইটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—১। বিলাত-যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি, ২। বাংলার পাল-পার্বণ, ৩। আমার ভারত উদ্ধার। প্রথমে অংশ গতানুগতিক ভ্রমণকাহিনী নয়, এ-লেখা থেকে বোঝা যাবে তৎকালীন ইংলণ্ডের ভাবধারা কোন দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছিলো আর তার সঙ্গে ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে তার তফাতটাই বা কি ছিলো। দ্বিতীয় অংশে গ্রথিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ, কিন্তু তার মধ্যেও যে চিন্তার খোরাক আছে তা আজকের পাঠককেও ভাবিত করবে। তৃতীয় অংশ গত শতাব্দীর একটি বিশেষ অধ্যায়কে সংক্ষেপে প্রকাশ করেছে, যা ঐতিহাসিকের জানা একান্ত প্রয়োজন।

১৮।৬১

জীবনী

সারদামণি—শ্রীজয়ন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ। ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। এক টাকা।

সারদামাতার জীবন-কাহিনী পরিবেশণে লেখক একটি সমৃদ্ধ অথচ স্বচ্ছ ভঙ্গি অবলম্বন করেছেন। যে-কবিত্বশক্তি থাকলে সারদামাতার অন্তরঙ্গ পরিচয় বিশ শতকের নিরপেক্ষ পাঠকের কাছে প্রাণময়রূপে প্রতিবিম্বিত করা সম্ভব, তা লেখকের আয়ত্তাধীন। এই কবিত্বশক্তি তথ্যনিষ্ঠ এবং তার ফলে আলোচ্য গ্রন্থে জীবন-সাহিত্যের সর্ববিধ বৈশিষ্ট্যই অক্ষুণ্ণ। বইটির ব্যাপক সমাদর আমাদের কাম্য। প্রচ্ছদপট অপূর্ব। (২৬৯।৫৭)

ছোট গল্প

পঞ্চম রাগ—নরেন্দ্র ঘোষ। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দাম—৩·২৫।

পাঁচটি দীর্ঘ গল্পের সংকলন। নরেন্দ্র ঘোষ ছোটগল্প লেখক হিসেবে বহু দিন আগেই সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং এখনও তাঁর সে সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়নি, তার প্রমাণ এই গল্পগ্রন্থটি। লক্ষ করবার বিষয়, ভাববস্তু, এমন রচনাভঙ্গিতেও প্রত্যেকটি গল্প বিশেষ। তবু মোটামুটি একটি মিল এই যে, প্রায় সবগুলো গল্পের পটভূমিই বাংলাদেশের বাইরেকার এবং চরিত্রগুলোও প্রায়ই অবাঙালী। ফলে, এ কাহিনী কয়টি যে বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে একটা নতুন স্বাদ বহন করে আনবে তাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু তবু এ-গল্পগ্রন্থটি সম্বন্ধে সবচেয়ে জরুরী কথা বোধ হয় এই যে, নরেন্দ্র ঘোষ মানুষের প্রতি সহজ এবং স্বাভাবিক সহানুভূতিটিকে এখনও হারান নি। তাই প্রতিটি রচনাই পাঠকমনকে স্পর্শ করে। বিশেষ করে 'পঞ্চম রাগ', 'অপরাধিনী' এবং 'পথ'—তাঁর সেই সংবেদনশীল হৃদয়ের পরিচায়ক। সার্থক একটি ছোটগল্প হিসেবে 'অপরাধিনী' বহুকাল পর্যন্ত পাঠকমহলে জেগে থাকবে সে-বিশ্বাস রাখা যায়। ১৭।৬১

উপন্যাস

সুর ও বীণা—শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। প্রকাশকঃ দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড। ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯। দাম—৩, টাকা।

উপর্যুক্ত উপন্যাসটিতে আধুনিক ঘটনার বিন্যাস-বিশ্লেষণ আছে বললে ভুল বলা হবে। সামন্ততান্ত্রিক দুই পরিবারকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসের ভিত রচিত হয়েছে। তাই উপন্যাসে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হয়েছে তা বহির্দ্বন্দ্বই; অন্তর্দ্বন্দ্ব বড় হয়ে উঠতে পারেনি।

দুই তরফের জমিদার, বড় তরফ ও ছোট তরফ। দুই তরফের ঝগড়ার অবসান হয় বৈবাহিক কুটুম্বিতার সূত্র-বন্ধনে। কিন্তু বড় তরফের জমিদার সঞ্জীব রায় চাইলেন বিবাহিতা কন্যা বরুণাকে নিজের কাছেই রাখতে। স্বভাবতই মর্যাদার প্রশ্ন জাগলো ছোট তরফের জমিদার ভবশংকর চৌধুরীর মনে। কিন্তু পুত্র শুভেন্দু শ্বশুরালয়ে চলে গেলে পিতা ভবশংকর কিছুটা ক্ষান্ত হন। এমন সময় একদিন এক দুর্ঘটনার বিবাদের আগুন আবার ছড়িয়ে পড়ে।

শুভেন্দু হঠাৎ অনিলের গুলীতে প্রাণ হারায়। আদালতের বিচারে অনিলের ফাঁসির হুকুম হয়। কিন্তু সঞ্জীব রায়ের চেষ্টায় ও বরুণার সাক্ষ্যের জনাই আপীলে জ্যেষ্ঠ জামাতা অনিলের ফাঁসির হুকুম রদ হয়।

বরুণার মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার সুযোগ ছিল, ঔপন্যাসিক তাকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারেন নি। ২১৬।৬১

জীবনজিজ্ঞাসা—মীরাটলাল। টি এস বি প্রকাশন। ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—দু' টাকা।

একটি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে প্রশ্ন মনে জাগা সম্ভব তাকে রূপদান করা নয়, তার পশ্চাৎপট উদ্ঘাটন করাই লেখকের উদ্দেশ্য মনে হয়।

মেধাবী ছেলে সত্যব্রত আশ্রয়চ্যুত অবস্থায় বিধবা মায়ের সঙ্গে তার ধনী মাতুলালয়ে গিয়ে যে অনাদর অবজ্ঞার দ্বারা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকে বরণ করে, তারই কাহিনী বিধৃত হয়েছে 'জীবনজিজ্ঞাসা'য়।

লেখক দরিদ্র এবং ধনী দুটি শ্রেণীকে পরিস্ফুট করে তোলার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই উপন্যাস লিখেছেন—তা নেহাত মামুলী। কোথাও চরিত্রের জটিলতা কিংবা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নেই। গতানুগতিকতা ও সিনেমার প্রভাব কোনোমতেই পাঠককে নতুন জিজ্ঞাসায় উপনীত করতে পারে না। ২০৯।১

পৃথিবী বিশাল—বিশ্বনাথ ঘোষ। চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং। ১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—৩্।

শ্রীযুক্ত ঘোষ 'লেখকের কথা'য় সমালোচকদের উপদেশ দান করেছেন। তবে তাঁর উপদেশ-বাণী এবং আক্রমণ যথোচিত কিনা তা তিনি স্বয়ং বিচার করলেই ভালো হয়। মনে হয়, তাঁর উপন্যাসের একমাত্র বিদগ্ধ সমালোচক তিনি নিজেই। তবে বর্তমান সমালোচক উপন্যাসটি সম্পর্কে কোনোরকম মতামত না দিয়েই শুধু প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করেন, 'পৃথিবী বিশাল' কি উপন্যাস? এতে না আছে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অথবা বিশাল পৃথিবীর জীবন-জিজ্ঞাসা। 'যুবনাশ্ব' গ্রন্থের নায়ক। দু-চারখানি গ্রন্থ পাঠ করে এমন নায়ক সৃষ্টি করা—এমন কি কঠিন কাজ, জানি না। ২১৪।৬১

নীল সমুদ্র—শিশিরকুমার দাশ। দেবদত্ত অ্যান্ড কোং। ৬, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা—১২। চার টাকা।

ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের একটি অতি পরিচিত চিত্র নতুন রূপে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য উপন্যাসে। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা অশোক-করবী, এ ছাড়া অরুণা-অবনী সবাই আমাদের অতি পরিচিত; আমাদের চতুর্দিকের পরিবেশে তাদের আমরা অহরহ দেখছি—অথচ সেই দেখাই যে সব নয়, আরো কিছু—লেখক সে দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন। একটি কথা, আবার শুধু সমাপ্তিতেই কাহিনী পরিণতি লাভ করেনি—তারপরেও আছে কিছু। এ ক্ষেত্রে পাঠকের 'পরে হয়তো কিছুটা অবিচার করা হয়েছে অশোক-করবীর জীবনচক্রে পাঠককেও জড়িয়ে। ৩১৪।৬০

রেখাচিত্র

অফুরন্ত—সুনীল চক্রবর্তী। প্রকাশক—বঙ্গবাণী প্রকাশন। ৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম—তিন টাকা।

একটি কাহিনীর অখণ্ড প্রবাহ নয়, নানা চরিত্র ও ঘটনার বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে এ-গ্রন্থে। একদিকে কৌতুকের ছড়াছড়ি, অন্যদিকে বেদনার ফল্গুধারা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ একটি অনন্য সংযোজন। সমস্ত ঘটনার নির্বিকল্প দ্রষ্টা হিসেবে কাহিনীকার কয়েকটি রেখাচিত্রে একটির পর একটি ঘটনাকে উদ্ঘাটিত করেছেন, আর বিভিন্ন চরিত্র উন্মোচিত হচ্ছে তাদের স্বরূপে। কিন্তু নিছক চরিত্রচিত্রণই লেখকের উদ্দেশ্য নয়। বর্ণনার গুণে ঘটনাগুলোর আবহ হিসেবে সাম্প্রতিক সমাজ-ব্যবস্থার দোষগুণগুলোও যেন পাঠকের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে।

অথচ সচেতন মন নিয়ে লেখকের বক্তব্যকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়! রসিক কাহিনীকার কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্যও আত্মবিস্মৃত নন, তাই করুণ রসের প্রস্রবণও এখানে পাঠকচিত্তকে ভারাক্রান্ত করে না। সর্বক্ষণ একটি আনন্দপ্রবাহ যেন অলক্ষিতে বয়ে চলে পাঠকের মনে। বিভিন্ন বিপরীতধর্মী চরিত্র ও ঘটনার সমন্বয় এমন সার্থকতায় ঘটানো খুব সহজ কাজ নয়, এবং সচরাচর চোখেও পড়ে না। বর্তমান লেখক তা করেছেন, মনে হয়, খুব সহজেই। এবং এইজন্যই স্বীকার করা যেতে পারে, এ-গ্রন্থটি স্বগুণে অসাধারণ। ৫৪৮।৬০

কবিতা

অন্য দিন অনেক সময়—শ্রীমনোরঞ্জন রায়। ১এ, বিজয় মুখার্জি লেন, কলিকাতা-২৫। মূল্য ২·৫০ ন. প.।

মোট চল্লিশটি কবিতার সংকলন। কবিতাগুলি প্রেম প্রকৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রসংগ অবলম্বনে লিখিত। অধিকাংশ কবিতাই কবির হৃদয়সঞ্জাত এবং নৈর্ব্যক্তিক। কোনো কোনো কবিতায় চিত্র-রসও দুর্লভ নয়, যেমন—

> দুধের শিশির জলে ভিজে
> পীতবর্ণ তোমার শরীর
> অপরূপ শাড়ি ও সেমিজে।

অনেক কবিতায় জীবনানন্দীয় মর্জির আভাস নিরীক্ষণ করা যায়। কবি এখনো কোনো বৈশিষ্ট্য অর্জন করেননি, কিন্তু লক্ষ্যে স্থির থাকলে তিনি যে স্বকীয়তা লাভ করবেন, তা বলা যায়। ২০৮।৬১

অন্য এক সমুদ্র—শান্তিকুমার ঘোষ। অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। এ।৯, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা—১২। দু টাকা।

'অন্য এক সমুদ্র' শান্তিকুমার ঘোষের সাম্প্রতিক কাব্যপ্রচেষ্টা। বর্তমান কাব্য গ্রন্থের কবি জীবনের এক অন্যতর পরিবেশে বিচরণ করতে অধিকতর আগ্রহী; তিনি তাঁর কাব্যের ঋতুবদল ঘটাতে চেষ্টা করেছেন দুরান্ত য়ুরোপের পটভূমিকায় দু' চোখের আলোর বিস্তারে বিংশ শতকের গতির সূত্রকে কবি অনুভব করতে চেষ্টা করেছেন স্বাভাবিক ভাবে। 'অনন্তের দিকে গতি আলোর তীরের মুখ পাখির নিয়ত বেগ/অনন্তের দিকে (তুমি আগে চলো): কবি জানেন 'কেমন ছুটেছে সব অথচ কোথায় স্থির অদৃশ্যের কেন্দ্রে। (এস্‌কালেটর) এবং 'সগর সন্তান তবু সমুদ্রকে শোষে/বনস্থলী গ্রাম আঁকে মরুভূমি মুছে। পরমাণু—বিচূর্ণিত মোহ সমুদ্রের আনে বেগ।' (অন্য এক সমুদ্র)

মোট পঁচিশটি কবিতা আলোচ্য সংকলনে স্থান লাভ করেছে। বর্তমান কালের বৈজ্ঞানিক অনুচিন্তা 'অন্য এক সমুদ্রে'র কয়েকটি কবিতায় বিশেষ আস্বাদ বহন করেছে তবে সর্বত্র যে তা সার্থক এবং তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রকাশে সমর্থ হয়েছে তা নয়। অন্য এক সমুদ্র, প্রাণ শিল্প, সমুদ্রতীর্থ, রাত্রিলোক, ওয়াইভ্যালী তুমি আগে চলো পাখি, ডালে বসলে প্রথম প্রভৃতি বর্তমান কাব্যগ্রন্থের সম্পদ। গ্রন্থসজ্জা মনোরম।

৪৫৪।৬০

অনুবাদ সাহিত্য

এক সূত্রে গাঁথা—অনুবাদ : বোম্মান বিশ্বনাথন্‌। প্রকাশক—গ্রন্থবিহার। ৫০বি হালদারপাড়া রোড, কলকাতা—২৬। দাম—তিন টাকা।

বাংলা ভাষায় ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার বারোটি গল্প অনুবাদ করে এই গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে। এ ধরনের অনুবাদ-গ্রন্থের প্রকাশ যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এ-কথা সকলেই স্বীকার করবেন। অন্তত ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় কিরকম সাহিত্য সৃষ্ট হচ্ছে, তার সংবাদ রাখা প্রত্যেকেরই উচিত। সেদিক থেকে অনুবাদক একটি ভালো কাজ করেছেন।

তবু বলবো, গল্প বাছার ব্যাপারে তিনি আরও একটু মনোযোগী হতে পারতেন। কয়েকটি গল্প খুবই ভালো সন্দেহ নেই,

তথাপি এ-কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, ওড়িয়া এবং অসমীয়া ভাষার প্রতিনিধিত্ব করবার মতো যোগ্যতা শুধু অনূদিত এই দুটি গল্পের মধ্যেই আছে। অনুবাদকের ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল। ১১১।৬১

বিবিধ রচনা

ছলনাময়ী ক্লাইভ স্ট্রীট—বিদগ্ধ শর্মা। প্রকাশক—চিনকো। ১৬৭এন, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—১৯। দাম—৪·৫০ নঃ পঃ।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্র ক্রমশ বিস্তৃততর হচ্ছে, এবং যে-সকল বিষয়বস্তু সাহিত্যের অন্তর্গত হতে পারে কি-না, সে-সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহের কারণ, আজ তারাও অবলীলায় সাহিত্যের মধ্যে স্থান করে নিচ্ছে। তার অধুনাতন প্রমাণ বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থটি। এ-বই উপন্যাস নয়, কয়েকটি ছোটগল্পের সমষ্টিও নয়। কিন্তু ক্লাইভ স্ট্রীটে ব্যবসা কেন্দ্রকে উপলক্ষ করে যে রস-কাহিনী পরিবেশন করেছেন লেখক তা উপন্যাস বা ছোটগল্পের চেয়ে কম উপভোগ্য নয়। লেখকের দৃষ্টি আছে, বর্ণনায় সহজ ভঙ্গি আছে, যার যোগফলে নিছক রোজকার চোখে-দেখা বিষয়বস্তুও সাহিত্য হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে। ৩২।৬১

ডাক্তারের ডায়েরী—আর বিশ্বনাথন। ত্রিধারা প্রকাশনী। ৮-এ, দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, কলি-২৫। ২·৭৫ নয়া পয়সা।

নানা কারণেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে ডাক্তারদের পরিচয় ঘটে অত্যন্ত সহজভাবে। ডাক্তার আর বিশ্বনাথন তাঁর কর্মজীবনের রোজনামচায় ধরে রেখেছেন এরকম ছোট ছোট কয়েকটি স্কেচ্। বলা বাহুল্য, কাহিনী এ ক্ষেত্রে একটানা গড়ে উঠতে পারেনি; টুকরো টুকরো কাহিনীতে তবুও গ্রন্থটি রসোত্তীর্ণ; সমাজের স্তরে স্তরে চিন্তার যে আশ্চর্য বিবর্তন—তাদের ব্যাধিতেই তার প্রকাশ ঘটেছে। ডাক্তার হিসাবে ছুরি-কাঁচি-ছুঁচ ছাড়াও কলমেও তাঁর যে দখল আছে—'ডাক্তারের ডায়েরী' তার প্রমাণ। ১৪৮।৬১

প্রাপ্তি স্বীকার

বাংলার লোক-সঙ্গীত (১ম খণ্ড)—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

সেকালের বুখারা—সদরুদ্দীন আইনী।

বর্ণ পরিচয় (বিদ্যাসাগর জীবনী নাটক)—সুনীল দত্ত।

বসন্ত রজনী—সরোজকুমার রায়চৌধুরী।

আনন্দের কথা—মীরা দেবী।

রোদ বৃষ্টি ঝড়—মনোজ বসু।

সোনার পাখি—বিমল ঘোষ।

শতাব্দী শতক—প্রেমেন্দ্র মিত্র ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত সম্পাদিত।

চেকোশ্লোভাক গণতন্ত্রে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের মর্মন্তুদ পরিণাম (১৯৩৮—১৯৪৮)—যোশেফ কোরবেল। অনুবাদক—সনাতন গোস্বামী।

জনসেবায় পারমাণবিক শক্তি—হেনরি এ ডানলাপ ও হ্যান্স এন টুথ। অনুবাদক—উৎফুল্ল মুখোপাধ্যায়।

প্রান্তরে ছোট শহর—লরা ইংগলিস ওয়াইল্ডার। অনুবাদক—শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

শিক্ষা ও স্বাধীনতা—জেমস ব্রায়ান্ট কোনান্ট। অনুবাদক—ফণী দাস।

Letters to Nikita Khruchev and the known—Sarat Haldar.

A study in the Ethics of the Banishment of Sita—Arvind Kumar.

The Modern writer and His World—G. S. Fraser.

Key to Modern Poetry—Lawrence Durrell.

The Setting Sun—Osamu Dazai.

The four Chambered Heart—Anais Nin.

স্তেফান জোয়াইগের গল্প-সংগ্রহ (২য় খণ্ড)—অনুবাদক দীপক চৌধুরী।

স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য—সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

দিন আসবে—নিকোলা ভাপৎসারভ—অনুবাদক—সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

নবীন রবির আলো—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য।

কমল কলি—শ্রীদ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়।

মীনাক্ষী—পুষ্পিতানাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিখ্যাত বিচার ও তদন্ত কাহিনী ১ম খণ্ড ২য় পর্ব—ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল।

আইখম্যান—কওতর।

হারামণি ৫ম খণ্ড—মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা—নরহরি কবিরাজ।

এক নদী বহু তরঙ্গ—অ-কৃ-ব।

তোমার প্রতিমা—তারাপদ রায়।

সুরে কথামৃত ২য় খণ্ড—অজাতশত্রু।

সঙ্গীতায়ন ১ম খণ্ড—সুদীপ্তকুমার ভট্টাচার্য।

স্বাক্ষর—কালকেতু।

অন্ধ পৃথিবী—শৈলেন মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ শতবর্ষ পরে—অরবিন্দ পোদ্দার।

রবীন্দ্রনাথ উত্তরপক্ষ—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

আন্তর্জাতিক উৎসবে ভারতীয় ছবি

বিশ্ব-চলচ্চিত্রের আসরে ভারতীয় ছবি আজ বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই নবলব্ধ গৌরবের মূলে যাঁর অবদান সর্বাধিক তিনি সত্যজিৎ রায়। তাই বলে প্রতি বছরে অনুষ্ঠিত প্রধান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলিতে একই পরিচালকের ছবি পাঠানো সম্ভব নয়। তবুও বিদেশীরা আশা করেন, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের মাধ্যমে তাঁরা ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলীই দেখতে পাবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাগরপারের রসিকজনের এই আশা সম্প্রতি অপূর্ণই থেকে যাচ্ছে।

বর্তমান বছরের তিনটি প্রধান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ভারত সরকার এই তিনটি উৎসবের জন্যই ছবি নির্বাচন করেছিলেন। সে-সব ছবি উৎসবে প্রদর্শিতও হয়েছে। কিন্তু পুরস্কার লাভ কোন ভারতীয় ছবির ভাগ্যে ঘটেনি।

আন্তর্জাতিক উৎসবের পুরস্কার সব প্রতিযোগী দেশেরই কাম্য। এই কামনা প্রতি বছরেই পূর্ণ হয় না। কিন্তু সব দেশই আশা করে যে তাদের ছবি উৎসবে পুরস্কার না পেলেও অন্তত সমবেত বিদগ্ধমণ্ডলীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। যে-দেশের ছবি রসিকজনের প্রশংসা থেকেই শুধু বঞ্চিত হয় না, উপরন্তু সমালোচকের

ছায়া-ধ্বনির হিন্দী ছবি 'চার দিওয়ারী'-র নায়িকা কুমারী নন্দা

কটূক্তির বস্তু হয়ে দাঁড়ায়, আন্তর্জাতিক উৎসব থেকে সে-দেশ শুধু অসম্মানের গ্লানি নিয়েই ফিরে আসে। আমাদের দুর্ভাগ্য, এ-বছরের তিনটি আন্তর্জাতিক উৎসব থেকে ভারতীয় ছবি এই অবাঞ্ছিত ও অসম্মানজনক প্রাপ্যটুকু নিয়েই ফিরে এসেছে।

বিশ্ব-চলচ্চিত্রের দরবারে ভারতীয় ছায়া-ছবির কৌলীন্য আজ যখন স্বীকৃত, তখন আন্তর্জাতিক উৎসবের প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ছবির নির্বাচকমণ্ডলীর দায়িত্বও অনেক বেশী। গভীর পরিতাপের বিষয়, কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত নির্বাচকমণ্ডলী এ বিষয়ে চরম অবিবেচনার ও একান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়ে আসছেন। রসোত্তীর্ণ, গতানুগতিকতা-বর্জিত ছবি এ-দেশে প্রতি বছরেই তৈরি হয়। প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ না হোক, বিশ্বের সুধীমণ্ডলীকে উপহার দেওয়ার মত শিল্পসমৃদ্ধ ছবির অভাব অন্তত বাংলা দেশে এখনও ঘটে নি। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, সে-সব ছবি সরকার মনোনীত নির্বাচকমণ্ডলীর চোখে পড়ে না। তাই সন্দেহ হয় যাঁদের ওপর এই গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত ছবির উৎকর্ষ বিচারে তাঁদের যোগ্যতা সম্বন্ধে।

বিভিন্ন দেশের রুচি ও ছবির প্রগতি সম্বন্ধে ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলী যে একেবারেই অজ্ঞ সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ থাকে না যখন দেখি "চৌধভি কি চাঁদ"-এর মত ছবি তাঁরা পাঠিয়েছেন মস্কোর উৎসবে এবং কান উৎসবের জন্যে মনোনীত করেছিলেন "অনুরাধা"-কে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে না পারায় বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে "অনুরাধা" যায় বার্লিনে। বোম্বাইয়ের একটি খবরে জানা গেল, সত্যজিৎ রায় ভেনিস উৎসবে "তিন কন্যা" পাঠাতে রাজী না হওয়ায় তার বদলে বিমল রায়-কৃত "পরখ" সরকারী মনোনয়ন লাভ করেছে। এ-সবের মধ্যেই সরকারী নির্বাচন-কর্তাদের অক্ষমতার ছাপ সুপরিস্ফুট। জাতীয় সম্মানের দিক থেকে এ অক্ষমতা ক্ষমার্হ নয়।

বিদেশে ভারতীয় ছবির ক্রমবর্ধমান গৌরব যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে হয় তবে আন্তর্জাতিক উৎসবের জন্যে নির্বাচনকারী বিচারকমণ্ডলীকে ঢেলে সাজতে হবে—এমন সব সদস্য নিতে হবে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছবির হালচাল সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল। নতুবা ভারতীয় ছবি বিদেশী রসবেত্তাদের কাছে শুধু অবজ্ঞা ও উপহাসের বস্তুই হয়ে থাকবে। যেমন হয়েছে এ বছরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উৎসবে।

চিত্রালোচনা

পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় একতা প্রোডাকশন্সের "আহ্বান"-এর চিত্রগ্রহণ পর্ব শেষ করেছেন।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কাহিনীর এই চিত্ররূপে রয়েছে পাশাপাশি

দুই জীবনের পট। একটি শহরের—মেকী সভ্যতার নীচে হৃদয় যেখানে ক্ষীণধারা। অপরটি পল্লীবাংলায়—মাটির রসে অভিষিক্ত হৃদয়ের ধারা যেখানে মুক্ত, অনাবিল।

চূর্ণী নদীর তীরে মায়ের কোল-পাতা যে গ্রামটিকে ভালবেসেছে তরুণ অধ্যাপক বিমল, সেখানকার মাটিতেই সে সাক্ষাৎ পেয়েছে এমন এক মাতৃ-চরিত্রের যার স্নেহ-ধারা ধর্ম ও শ্রেণীর বাধা অতিক্রম করে তার মনকে ভরিয়ে দিয়েছে। শহুরে যে মেয়েটি তার বাগ্‌দত্তা, তাকেও সে ক্ষমা করে না, এই মহিয়সী নারীর প্রতি তার অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য যেদিন প্রকট হয়ে ওঠে। প্রসাধিত রূপের অতি-আধুনিক উগ্রতার পাশে এক ভীরু পল্লীবালার সহজ শ্রীটুকু অধ্যাপকের মনে রং লাগায়।

ছবির এই প্রধান চারটি চরিত্রে রূপারোপ করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, হেমাঙ্গিনী দেবী, সন্ধ্যা রায় ও লিলি চক্রবর্তী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন গঙ্গাপদ বসু, অনুপকুমার, প্রেমাংশু বসু, প্রশান্তকুমার, নিভাননী, শোভা সেন, গীতা দে প্রভৃতি।

ছবিটি পূজার মরসুমে মুক্তি পাবে।

* * *

প্রযোজক-পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায় তাঁর নবতম চিত্রার্ঘ্য "আশায় বাঁধিনু ঘর"-ও পূজার আকর্ষণ হিসাবে তৈরি করে ফেলেছেন।

ঘর হচ্ছে মানুষের জীবনসাধনার প্রধান কেন্দ্র। স্নেহ-মমতা, ভুল বোঝা, বিচিত্র ও নানাবিধ অনুভূতির দ্বন্দ্ব নিয়ে মানুষ রচনা করে চলেছে এক মায়ার সৌধ। সেখানে বিশ্বাসে অবিশ্বাসে মেশা, ভালবাসা ও বিরূপতায় জড়ানো, চাওয়া-পাওয়ার অবুঝ দাবিতে ক্ষুব্ধ জীবন সুখ-দুঃখের বিচিত্র নাটক গেঁথে চলেছে।

"আশায় বাঁধিনু ঘর"-এ এমনি এক গহন ঘরের অনুভূতিময় কাহিনী রূপ পেয়েছে। চেনা-জানা মানুষকে ঘিরে এক গভীর নাটক। বিশিষ্ট শিল্পী সমাবেশে এর ভূমিকালিপি সকলকার মনোযোগ আকর্ষণ করবে। শিল্পীদের মধ্যে প্রধান সন্ধ্যারাণী, অসিত-বরণ, বিশ্বজিৎ, রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, হরিধন, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় এবং নবাগত কুনাল ও সংগীতা মুখোপাধ্যায়।

* * *

গত ১লা আগস্ট মুক্তি আর্টের প্রথম ছবি "দুই বন্ধু"-র শুভ মহরৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। ছবির নিয়মিত চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হয় পরের দিন থেকে। প্রথম সেটে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন তুলসী চক্রবর্তী, রাজলক্ষ্মী দেবী, শৈলেন মুখোপাধ্যায় এবং নবাগতা স্নিগ্ধা। বিনয় চৌধুরী একাধারে এর কাহিনীকার, চিত্রনাট্য-রচয়িতা ও পরিচালক। ভি বালসারা সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

গত ২২শে জুলাই ইস্টার্ন টকিজ স্টুডিওতে এস কে পিকচার্সের "কামিনী-কাঞ্চন" চিত্রের শুভ-সূচনা আনুষ্ঠানিক-ভাবে করা হয়। এর মূল তিনটি চরিত্রে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় ও মাধবী মুখো-পাধ্যায় নির্বাচিত হয়েছেন। স্বরচিত গল্প অবলম্বনে সন্তোষ মুখোপাধ্যায় ছবিটির পরিচালনা করবেন।

* * *

এ সপ্তাহে মাত্র একটি নতুন হিন্দী ছবি মুক্তি পাচ্ছে। নাম "মডার্ন গার্ল"।

চটকদার আমুদে ছবির প্রযোজক হিসাবে বি ডি নারাং হিন্দী ছবির জগতে নিজের

তারাশঙ্কর রচিত "বিপাশা"-র চিত্ররূপ দিচ্ছেন অগ্রদূত পরিচালক-গোষ্ঠী। সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার এর প্রধান দুটি ভূমিকায় অভিনয় করছেন

আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। "মডার্ন গার্ল" তাঁরই নবতম নিবেদন, রেনবো মুভিজের পতাকাতলে গঠিত। এর প্রধান চরিত্রগুলিতে রূপদান করেছেন প্রদীপকুমার, সইদা খান, স্মৃতি বিশ্বাস, নলিনী চোংকর, জনি ওয়া-কার, মদনপুরী, হেলেন, লিলিয়ান, শীলা ভাজ প্রভৃতি। আর ভট্টাচার্য ও রবি যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

প্রমোদের সম্ভার

আমোদ-প্রিয় সাধারণ দর্শকের চিত্ত-বিনোদনের প্রয়োজনে চিত্রপরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় অনীহ বৈদগ্ধ্যের সংগে অনেকখানি আপোস করেছেন এ-ভি-এম'এর সর্বাধুনিক হিন্দী চিত্র "ছায়া"-তে।

"ছায়া"-র কাহিনী দুই ধারায় প্রবাহিত। এক দিকে যুবক-যুবতীহৃদয়ের প্রণয়, অপর দিকে বঞ্চিত মাতৃহৃদয়ের বেদনা। উপাখ্যানের এই দুই ধারা যে পরিণতি-বিন্দুতে এসে মিলিত হয়েছে তাতে সংশ্লিষ্ট সকলেই সুখ-সিন্ধুর উৎস খুঁজে পেয়েছে। সকল কাঁটা ধন্য করে প্রণয়ী-যুগলের জীবনে ফুটেছে প্রেমের ফুল। জননীর অশ্রু হাসি হয়ে ঝরে পড়েছে।

কিন্তু যে ঘটনারাজির উপলখণ্ডের উপর দিয়ে গল্পের প্রবাহ বয়ে চলেছে তা আর যাই হোক বাস্তবের কষ্টিপাথর নয়। সুতরাং ছবি দেখার কালে দর্শকের যুক্তি স্বাভাবিক দায়িত্ববোধ থেকে সহজেই মুক্তি পায়। এই মুক্তির ফল হল আমোদ সম্ভোগ।

স্বামীর মৃত্যুর পর সদ্যঃবিধবা নিঃসম্বল জননী তার নবজাতক শিশুকন্যাকে কেমন করে ধনীর দ্বারপ্রান্তে ফেলে রেখে যায় ও দীর্ঘ আঠারো বছর ধনীগৃহে আয়ার কাজ নিয়ে নিজকন্যাকে লালন-পালন করে এবং পরে কী করে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগের পর গর্ভধারিণী পরিচয়ে কন্যাকে ফিরে পায়

একতা প্রোডাকশন্সের "আহ্বান"-এর একটি দৃশ্যে লিলি চক্রবর্তী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা মিত্র ও অনুপকুমার

তা নিয়ে ছবির অন্যতম "মেলোড্রামা" গড়ে উঠেছে।

ছবির প্রণয়োপাখ্যানে কাব্যানুরাগী নায়িকা তার প্রিয় কবিকে চোখে না দেখেই ভালোবেসে ফেলেছে। নায়িকা জানত না যে তার গৃহশিক্ষকই সেই কবি। কবিও নিজেকে ধরা দেয় না। কবি অদৃশ্য থেকে নায়িকাকে কবিতা শোনায়, গান শোনায়। নায়িকা প্রেম-ভাবে বিভোর হয়। তারপর একদিন যথানিয়মে এই লুকোচুরি খেলা শেষ হয়। শুরু হয় মন দেওয়া-নেওয়ার পালা।

অনুরাগের পর বিরহ-পর্ব। নায়িকার পালক-পিতা স্বল্পবিত্ত গৃহশিক্ষকের হাতে নিজকন্যাকে কিছুতেই সমর্পণ করবেন না। কিন্তু কন্দর্পের বিধান রোধ করা কঠিন। শেষ পর্যন্ত নানা নাট্যঘটনার ভেতর দিয়ে অভিভাবকের মনের পরিবর্তন কী-ভাবে ঘটে এবং প্রণয়ীযুগল কী করে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় তা নিয়েই উপাখ্যানের পরিণতি।

দর্শকের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সাধারণ আমাদে হিন্দী ছবিতে স্থূলে আবেগ ও প্রণয় যে "ফরমূলা"য় গড়ে ওঠে, এ-ছবিতেও তা সযত্নে অনুসৃত। তদুপরি ছবির দুটি উপাখ্যানই মামুলী এবং বহুব্যবহৃত উপাদানে ভারাক্রান্ত। এবং নাট্যকাহিনীর গতি ও পরিণতিতে যুক্তি ও সংগতি বহু ক্ষেত্রে বিসর্জিত।

তবুও গতানুগতিক হিন্দী ছবির তুলনায় এ-ছবিটি আমোদপিপাসু দর্শকের কাছে অনেক বেশী আদরণীয় হবে। কারণ পরিচালকের সুষ্ঠু প্রয়োগ-নৈপুণ্য চিত্রকাহিনীর অনেক দুর্বলতাই ঢেকে দেয়। নাট্যমুহূর্ত গঠনে এবং নাচ-গান ও কৌতুকের বিন্যাসেও পরিচালক প্রয়োগ-কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নিছক আমোদ পরিবেশনই যদি এ-ছবির লক্ষ্য হয়, তবে চিত্রপরিচালক যে লক্ষ্যভেদে সমর্থ হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় যথাক্রমে সুনীল দত্ত ও আশা পারেখ লঘু ও নাট্যগম্ভীর মুহূর্তে ছবির আমোদের প্রতিশ্রুতি সুন্দরভাবে পালন করেছেন। নায়িকার জননীর চরিত্রে নিরুপা রায়ের অভিনয় মর্মস্পর্শী। নায়িকার পালক-পিতার চরিত্র-চিত্রণে নাজির হোসেন তাঁর স্বভাবসুলভ অভিনয়-দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। নায়কের দুই বোনের রূপসজ্জায় অচলা সচদেব ও ভারতী রায়ের অভিনয় সাবলীল ও সংযত। ছবির দুটি বিশিষ্ট কৌতুক-চরিত্রে অসীমকুমার ও মোহন চোটি দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। এক নীচমনা প্রৌঢ়ার ভূমিকায় ললিতা পাওয়ারের অভিনয় চরিত্রানুগ।

সংগীত-পরিচালক সলিল চৌধুরী সুরারোপিত ছবির কয়েকটি গান সুখশ্রাব্য। আবহ সুর রচনায় শ্রীচৌধুরী প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ ও সামগ্রিক আঙ্গিক গঠন ভূয়সী প্রশংসার দাবি রাখে। বিশেষ করে আলোকচিত্র ও সম্পাদনার কাজ দর্শককে মুগ্ধ করে।

নাট্যাভিনয়

পরীক্ষামূলক নাট্য সংস্থা "চতুর্মুখ" বিভিন্ন ধরনের নাটক মঞ্চস্থ করে সুধীজনের প্রশংসা পেয়েছেন। এ'দের নবতম নাট্য-প্রচেষ্টা অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের "নির্বোধ" আগামী ১৫ই আগস্ট সকাল সাড়ে নটায়
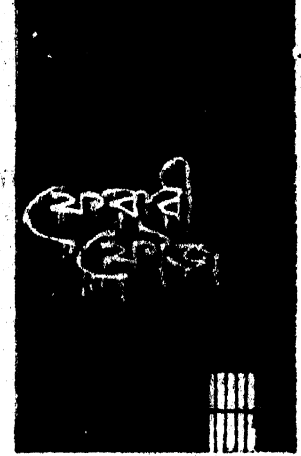
রংমহলে অভিনীত হবে। এই নাটকের মূলে অনুপ্রেরণা ডস্টয়েভস্কির অমর উপন্যাস "দি ইডিয়ট"। শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য নাটকটি পরিচালনা করবেন। সুরারোপে আছেন নির্মল চৌধুরী। নাটকটি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চতুর্মুখ নিয়মিতভাবে অভিনয় করবেন বলে জানা গেল।

* * *

বর্তমান গণনাট্য আন্দোলনে "রূপান্তরী" সম্প্রদায় তাঁদের বাস্তবধর্মী নাটক "বিংশোত্তরী" এবং ৮ মিঃ মিঃ মূক ছায়াছবি "প্রাগৈতিহাসিক" মারফৎ ইতিমধ্যেই বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। আগামী ১৬ই আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে এবার তাঁরা উপস্থাপিত করছেন তাঁদের নতুন নাটক "স্বর্ণগ্রন্থি"। নাটকটি বাংলা তথা ভারতবর্ষের অত্যন্ত অবহেলিত দরজী সম্প্রদায়কে নিয়ে লেখা। রচয়িতা জোছন দস্তিদার।

* * *

সুপরিচিত নাট্য প্রতিষ্ঠান 'অভ্যুদয়' তাঁদের নাটক পাঠাগারের সম্প্রসারণকল্পে আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর মিনার্ভা মঞ্চে যে 'নাটক সমারোহ'-এর আয়োজন করেছেন তাতে তাঁরা কিরণ মৈত্রের 'অন্ধকারায়' ও 'বিশ পঞ্চাশ' এবং বনফুলের 'শিককাবাব' এই তিনটি নাটিকা মঞ্চস্থ করবেন বলে স্থির করেছেন।

* * *

সম্প্রতি মহাজাতি সদনে আঞ্চলিক খাদ্য অধিকর্তা অফিসের কর্মচারী সমিতির ব্যবস্থাপনায় রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক 'নৃত্যবিচিত্রা' ও 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নৃত্যশিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন সমর মিত্র (পরিচালনায়), ভারতীবল্লভ, ছায়া ভাদুড়ী, জয়শ্রী মিত্র, স্বপ্না সেনগুপ্তা ও উমা মিত্র। যন্ত্রসঙ্গীতে অরবিন্দ মিত্র, কেদার নন্দী, কল্যাণপ্রসাদ গুপ্ত, গোপাল মিত্র প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন।

বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনী

বাংলা দেশের শৌখিন নাট্য সম্প্রদায়গুলিকে সংঘবদ্ধ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে গত ডিসেম্বর মাসে বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনী গঠিত হয়। এই অত্যল্পকালের মধ্যে এঁরা যে কর্মোদ্যম ও সংগঠনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা শুধু অভিনন্দনযোগ্য নয়, বিস্ময়করও।

যে দেশে বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি রাখবার প্রথা সুপ্রচলিত, সে দেশে আট মাসের মধ্যে আট শোর ওপর শৌখিন নাট্য সংস্থাকে একই পতাকাতলে সমবেত করা কম কৃতিত্বের কথা নয়। জুলাই মাস পর্যন্ত এদের সদস্যশ্রেণীভুক্ত নাট্যসংস্থার সংখ্যা ৮১৩। শুধু তাই নয়, দূর দূরান্তের সদস্য-সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগ রাখবার জন্যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন শহরে বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর তেরোটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শহরগুলির নাম—কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, ডুয়ার্স, আসানসোল, বার্নপুর, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, বহরমপুর, মগমা (বিহার) ও বাঁকিপুর (পাটনা)।

বিভিন্ন অঞ্চলের নাট্য আন্দোলনকে সুসংবদ্ধ করা, মাঝে মাঝে নাট্যোৎসবের আয়োজন করে আঞ্চলিক সংস্থাগুলিকে
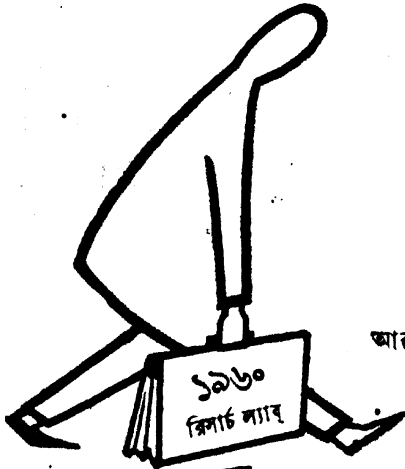
এমকেজি প্রোডাকসন্সের নবতম চিত্রনিবেদন 'মা'-র একটি আবেগময় দৃশ্যে দীপ্তি রায় ও বাবলু বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসাহ দেওয়া, ড্রামা লাইব্রেরী ও পাঠচক্রের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের নাট্যপ্রগতি সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ করা—বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর কর্মসূচীর শীর্ষদেশে এই বিষয়গুলির স্থান।

এই কার্যক্রম অনুসারে নাট্য সংগঠনীর কোচবিহার শাখা স্থানীয় ল্যান্সডাউন হলে গত মাসে সাত দিনব্যাপী একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। পাঁচ দিন বসে নাটকের আসর, দু দিন যাত্রাভিনয়ের। বিভিন্ন সংস্থা ও নাটকের নাম এখানে দেওয়া হল: রবীন্দ্রনাথের "শেষরক্ষা" করেন সাংস্কৃতিক সংঘ (বাণেশ্বর), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বন্ধু" করেন এগ্রিকালচারাল রিক্রিয়েশন ক্লাব (কোচবিহার), নিশিকান্ত বসুরায়ের "পথের শেষে" করেন ক্ল্যাসিকাল ড্রামাটিক ক্লাব, শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রের "কাঞ্চনরঙ্গ" করেন নবারুণ সংঘ (গুড়িয়াহাটি), কিরণ মৈত্রের "বুদ্বুদ" করেন অগ্রণী সাহিত্য চক্র (দিনহাটা), নীরজ বিশ্বাসের "চোরাবালি" করেন তরুণ দল (হাজরাপাড়া), ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত "চাষার ছেলে" করেন মেঘদূত অপেরা পার্টি (কোচবিহার), ও নন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত "কালাপাহাড়" করেন কোচবিহার মদনমোহন থিয়েট্রিকাল পার্টি।

এমনিধারা নাট্যোৎসব প্রত্যেকটি শাখা-কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। তা ছাড়া কলকাতায় মূল কেন্দ্রের উদ্যোগে তিন সপ্তাহব্যাপী যাত্রাভিনয়ের একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন চলছে। এই ধরনের উৎসব—যেখানে একই আসরে এ-দেশের শ্রেষ্ঠ যাত্রাভিনয় দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে—ইতিপূর্বে আর কখনো হয় নি। সেপ্টেম্বরে এই উৎসব শুরু হবে।

বঙ্গীয় নাট্য সংগঠনীর মূল সভাপতি পশ্চিম বাংলার খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। এঁদের প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা ২১।১, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

আমরা এই পথিকৃৎ প্রতিষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জাকার্তা যাত্রার পথে দমদম বিমানঘাটিতে মঞ্জু দে

বিবিধ সংবাদ

ইন্দোনেশিয়াতে ভারতীয় ছবির যথেষ্ট চাহিদা। অবশ্য তামিল ও হিন্দী ছবির দর্শকই সেখানে বেশী ভারতের অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার ছবির তুলনায়। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় সম্প্রতি রপ্তানি বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তদনুসারে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা

ফিল্ম এণ্টারপ্রাইজার্সের "দুই ভাই"-এর একটি নাটকীয় মুহূর্তে বিশ্বজিৎ ও সুলতা চৌধুরী

শহরে আটদিনব্যাপী একটি ভারতীয় চলচ্চিত্রোৎসবের অনুষ্ঠান চলছে। এই উৎসবে প্রেরিত আটখানি ছবির মধ্যে তিনখানি হিন্দী, তিনখানি তামিল এবং দুখানি বাংলা। বাংলা ছবি দুটির নাম—"অপুর সংসার" ও "কাবুলিওয়ালা"। এই উপলক্ষে সাতজন সদস্য-বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দলও জাকার্তায় গেছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন ছবি বিশ্বাস, মঞ্জু দে, নন্দা, সাবিত্রী গণেশ, জেমিনি গণেশ, কে কে কাপুর ও এ এল শ্রীনিবাসন। শেষোক্ত ব্যক্তিই প্রতিনিধি দলের নেতা।

১২ই আগস্ট জাকার্তায় ভারতীয় চলচ্চিত্রোৎসবের অধিবেশন শেষ হবে। তারপর ইন্দোনেশিয়ার আরো তিনটি প্রধান কেন্দ্রে—রেবেহা, মেদান ও বন্দুং—ছবিগুলি দেখান হবে।

* * *

গত পক্ষ কালের মধ্যে দুটি মামলার ফলে চলচ্চিত্র জগতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে।

১৯৫৮ সালে কলিকাতা কর্পোরেশন শহরের সিনেমাগুলির লাইসেন্স ফী অভাবিত হারে বাড়িয়ে দেন। যাঁদের বছরে ৪০০ বা ৮০০ টাকা দিতে হত, নতুন হার অনুসারে তাঁদের দেয় করের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০০০ ও ১৮,০০০ টাকা। স্থানীয় প্রদর্শকদের পক্ষে বেঙ্গল মোশন পিকচার এসোসিয়েশন কর্পোরেশনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করেন। তার ফলে কর্পোরেশনের নতুন লাইসেন্স ফী আইনসিদ্ধ নয় বলে হাইকোর্ট মত প্রকাশ করেছেন।

সিনেমা শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের ন্যূনতম বেতন সম্বন্ধে শ্রমিক ও মালিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যে বোঝাপড়া শ্রম মন্ত্রণালয়ের মধ্যস্থতায় সম্ভব হয়েছিল তা নাকচ করবার জন্যে অনেক চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠান হাইকোর্টে শুনানি সাপেক্ষে একটি ইনজাংসন জারি হয়েছে যার ফলে সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম বেতনের হার চালু করা মামলার নিষ্পত্তি না হলে সম্ভব হবে না।

চিঠিপত্র

"চিত্রশিল্পের নিজস্ব স্বার্থে"

মহাশয়,

আপনাদের "চিত্রশিল্পের নিজস্ব স্বার্থে" শীর্ষক লেখাটি পড়ে খুব আনন্দ পেলাম। বাংলা চিত্রশিল্পের এই দুর্দিনে প্রত্যেক প্রযোজকের উচিত "স্টার সিস্টেম"-এর মূলোচ্ছেদ করা। অবশ্য তাতে সমষ্টিগত চেষ্টার প্রয়োজন।

এ বিষয়ে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা এখানে জানাচ্ছি। "স্টার সিস্টেম" বা "গ্ল্যামার"-এর মোহে না ভুলে আমি একটি ছবি তুলেছি যাতে আগাগোড়া কোন কথা নেই। ছবিটির নাম "ইংগিত"। আর কিছু না হোক, এ ছবি নূতনত্বের দিক থেকে ভারতে প্রথম। আশা করেছিলুম, আমার এই নতুন ধরনের প্রচেষ্টায় সকলের সহযোগিতা পাব। চিত্রটি সম্পূর্ণ হয়ে মুক্তির আশায় আছে, অথচ আমি চিত্রগৃহের দরজায়-দরজায় ধরনা দিয়েও মুক্তির কোন ব্যবস্থা করতে পারছি না।

মৌখিক আশ্বাস অনেকেই দিয়েছেন। কিন্তু চোখের সামনে দেখছি দিনের পর দিন "স্টার" ও "গ্ল্যামার" পূর্ণ ছবিগুলো একটার পর একটা মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। আর আমার ছবি? এখনও আশ্বাসের আবডালে ঝুলছে!

চিত্র-পরিবেশকরা ও চিত্রগৃহের মালিকরা সকলেই চান ছবিতে "গ্ল্যামার" ও "স্টার"-এর সমাবেশ। প্রযোজকরা বাঁচুক বা মরুক তা নিয়ে তাঁদের কোন মাথাব্যথা নেই। তাঁদের তো লাভ হচ্ছে! অথচ তাঁরা জানেন না যে যুগ বদলাচ্ছে, চিত্রশিল্পের মান ক্রমশ উন্নততর হচ্ছে। সুতরাং আজ না হোক, নিকট ভবিষ্যতেই "স্টার সিস্টেম" ও "গ্ল্যামার"-এর মোহ ছাড়তেই হবে। না হলে বাংলার চিত্রশিল্প বাঁচবে না, বাঁচবে না কোনও প্রযোজক।

বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের এই স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রে যে ক'জন প্রযোজক আজও বেঁচে আছেন তাঁদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ তাঁরা যেন এ বিষয়ে সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করেন। না হলে দিনের পর দিন আমার পর্যায়ে কত লোককে পড়তে হবে তার হিসাব দেওয়া যাবে না। ইতি—

তারু মুখোপাধ্যায়,
শালকিয়া, হাওড়া।

রবীন্দ্র-জীবনী

মহাশয়,

কনক প্রোডাকশন্সের "আশায় বাঁধিনু ঘর"-এর একটি দৃশ্যে ছবির প্রধান তিন শিল্পী অসিতবরণ, সন্ধ্যারাণী ও ছবি বিশ্বাস

প্রকাশিত রবীন্দ্র-জীবনী শীর্ষক চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে একজন রবীন্দ্র-ভক্ত ও সত্যজিৎ-অনুরাগী হিসাবে দু-একটি কথা বলতে চাই।

এ কথা অসংকোচে বলা চলে যে সত্যজিৎ রায়ের "রবীন্দ্র-জীবনী" একটি অনুপম সৃষ্টি। কিন্তু এর পরিচালনায় যে-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের চোখে পড়েছে সে ধরনের ত্রুটি আমরা আশা করি নি বলেই এ ছবি সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা হয়েছে। মহাজাতি সদনে নেতাজীর অনুপস্থিতি কিংবা সপ্ততিতম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অভি-নন্দনসভায় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অনুপ-স্থিতি নিঃসন্দেহে পরিচালনাগত ত্রুটি। কিন্তু সব চেয়ে বড় ত্রুটি—কবিগুরু যে "পৃথিবীর কবি" এই পরিচয়টুকু ছবিটিতে বৈশিষ্ট্য লাভ করে নি। ছবিতে কোথায়ও কবিতার আবৃত্তি নেই। কবিগুরুর বহু-মুখী প্রতিভার পরিচয় প্রদানে পরিচালক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু কবি-সার্বভৌমকে আমরা জীবনী-চিত্রে পাই নি—এইটাই আমাদের আক্ষেপ।

প্রসঙ্গত এ-দেশের অন্যতম বিখ্যাত দৈনিক "টাইমস্" রবীন্দ্র-জীবনী সম্বন্ধে যা বলেছে তা এখানে উদ্ধৃত করলাম:

"Satyajit Ray's documentary about Tagore is sonorously reverent and a great waste of a major director's time. The absence of quotation from Tagore's poetry becomes so studious as to suggest that Ray, rather sympathetically, may have some doubts about his subject's literary genius."

অনেকেই "টাইমস্"-এর এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। ইতি—

অজিত সেনগুপ্ত,
লণ্ডন, এন ডব্লিউ ১

"নেকলেস" প্রসঙ্গে

মহাশয়,

"নেকলেস" ছবিটির প্রথমার্ধ অপেক্ষা দ্বিতীয়ার্ধই প্রশংসার্হ। সুন্দর, শিল্প-বোধান্বিত চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মিহির সেন, দীনেন গুপ্ত দেখিয়েছেন চক্ষু পরিতৃপ্তিকর ক্যামেরার কাজ আর সমস্ত ছবিটিকে সরল, সুঠামভাবে পরিবেশন করেছেন দিলীপ নাগ। এ'দের ধন্যবাদ। নবাগত পরিচালকরাও যে প্রথম পদক্ষেপেই উল্লেখযোগ্য শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন "নেকলেস" এই বিশ্বাসকে দৃঢ়মূল করেছে।

এই ছবিতে উত্তমকুমার নিজেকে নতুন করে সৃষ্টি করেছেন। ইদানীং উত্তমকুমার যে ক'টি ছবিতে অভিনয় করেছেন, সব ক'টিতেই তাঁর অভিনয় একঘেয়ে ও মুদ্রা-দোষ-আচ্ছন্ন। কিন্তু এই ছবিতে তিনি উজ্জ্বল তারকার দ্যুতিতে জ্বলে উঠেছেন। 'অনুপমা'র পর তাঁর এত ভাল অভিনয় আর দেখিনি। নবাগতা সুনীতা সিনেমা-গল্পের জোর-করে-সাজা এম এ পড়া মেয়ে নয়। তাঁর চেহারায় রয়েছে প্রকৃত শিক্ষার ঔজ্জ্বল্য। সামান্য প্রাথমিক জড়তা ছাড়া তাঁর অভিনয় অনিন্দ্য। সারা ছবিতে মুঠো মুঠো স্নিগ্ধ সুষমা ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

একটি ত্রুটির উল্লেখ করছি। কলেজে পড়াতে পড়াতে নায়ক হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তারপর দেখা গেল একটি রিকশা-ওয়ালা ছুটে চলেছে। নায়ককে অবশ্য আরোহী হিসাবে দেখানো হয়নি সেই দৃশ্যে, কিন্তু বুঝতে কষ্ট হয় না যে, নায়কই আরোহী। পর দৃশ্যে দেখা গেল, নায়ক রিকশা থেকে নামছেন। কিন্তু আশ্চর্য, প্রথম দৃশ্যে রিকশাওয়ালার যে বেশ ছিল, পরবর্তী দৃশ্যে দেখা গেল তার বেশান্তর ঘটেছে। সামান্য ত্রুটি, কিন্তু চোখে পড়ল।

পরিশেষে পরিচালক দিলীপ নাগ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকুশলীগণকে আবার অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রত্যাশা রইল, এ'রা ভবিষ্যতে আরও পরিচ্ছন্ন, শিল্পসুন্দর ছবি বাংলার দর্শকদের উপহার দেবেন। ইতি—

সুনীল রায়, কলিকাতা-২২

একলব্য

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৫৪ রানে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে অ্যাশেস দখলে রাখার অধিকারী হয়েছে। বার্মিংহামের এজবাসটন মাঠে দুই দেশের প্রথম টেস্টের ফলাফল অমীমাংসিত থাকে। লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী হয় ৫ উইকেটে। লীডসের তৃতীয় টেস্টে ৮ উইকেটে জেতে ইংলণ্ড। সুতরাং দুটি টেস্টের বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার রাবার লাভ সম্পর্কে এখন পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস।

ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠের চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভের অর্থ ইংলণ্ডের 'অ্যাশেস' পুনরুদ্ধারের আশা ধূলিসাৎ। ইংলণ্ড এখন বড় জোর শেষ টেস্ট খেলায় জিতে 'রাবারের' সম্মান সমান সমান রাখতে পারে। আর শেষ টেস্ট ড্র হলে বা ইংলণ্ডের পরাজয় ডেকে আনলে তো কথাই নেই। অস্ট্রেলিয়ার আবার গৌরবজনক রাবার লাভ। ওভাল মাঠে পঞ্চম ও শেষ টেস্ট খেলা আরম্ভের তারিখ ১৭ই আগস্ট।

'গ্লোরিয়াস আনসার্টেনটি' অর্থাৎ মহা অনিশ্চয়তাই যে ক্রিকেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট তার আর-এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে টেস্টে জয়ের সম্ভাবনা ছিল ইংলণ্ডের অনুকূলে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের অনমনীয় দৃঢ়তা আর অধিনায়ক রিচি বেনোর মারাত্মক বোলিং-এ সে টেস্টে জিতে গেল অস্ট্রেলিয়া।

শেষ দিনের খেলায় যে পরিস্থিতি ছিল, এমন পরিস্থিতিতেও টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে বেশী দেখা যায়নি। জয় সম্পর্কে দু দলের সম্মুখেই রঙীন আশার হাতছানি। আবার দু দলের মনেই পরাজয়ের কালো আশঙ্কা। ফলাফল অমীমাংসিত থাকার সম্ভাবনাও ষোলো আনা। এমন পরিস্থিতি সাম্প্রতিক কালের টেস্টে বিরল ঘটনা। তাই দুই দেশের অধিনায়ক রিচি বেনো ও পিটার মে খেলাটিকে একটি স্মরণীয় টেস্ট খেলা হিসাবে অভিহিত করেছেন। বেনো বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হবার সম্মান লাভের পর এটাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় খেলা। ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে-ও বেনোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর মতে, এ টেস্টে রিচির জয় তাঁর জীবনের স্মরণীয় অধ্যায়।

অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান স্যার ডন ব্র্যাডম্যানও খেলাটিকে ক্রিকেট ইতিহাসের এক স্মরণীয় খেলা বলে অভিহিত করে চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করার জন্য দুই অধিনায়ককে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ক্রিকেট যে এখনো মরেনি—তাঁর মতে, এ টেস্ট তার জাজ্বল্য প্রমাণ।

ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্ট খেলায় শেষদিনে দিনের শেষ বলে ট্রুম্যানের ক্যাচ ধরছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো।

সকলেরই জানা আছে, ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠের টেস্ট খেলার ইতিহাস বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবার জন্য কুখ্যাত। একবার ১৮৯০ সালে, আর একবার ১৯৩৮ সালে দু-দুবার একটি বলও না পড়ে দুটি টেস্ট খেলা টেস্ট রেকর্ড থেকে ধুয়ে মুছে গেছে। তা ছাড়া বৃষ্টি খেলার মাঝে বাধার সৃষ্টি করেছে, এমন ঘটনা তো প্রায় প্রতি খেলার সংগেই জড়িয়ে আছে। শুধু মহাযুদ্ধের পর এবারের টেস্ট নিয়ে এ-মাঠে যে ১৬টি টেস্ট খেলা হয়েছে, তাতে বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ থেকেছে মোট ১০৩ ঘণ্টা। এ যেন পর্জন্যদেবের সেঞ্চুরী পূরণ।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে এ-মাঠ শুভও নয়। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে অস্ট্রেলিয়া এর আগে এখানে জিতেছে মাত্র দুবার। প্রথম ১৮৯৬ সালে। দ্বিতীয়বার ১৯০২ সালে। দীর্ঘ ৫৯ বছর পরে ওল্ড ট্রাফোর্ডে অস্ট্রেলিয়ার এটা তৃতীয় জয়। অন্য পরে কা কথা, স্বয়ং ডন ব্র্যাডম্যানের বিজয়-বৈজয়ন্তীও থেমে গিয়েছিল ওল্ড ট্রাফোর্ডে। ১৯৪৮ সালে ব্র্যাডম্যানের দলের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড শুধু এখানেই খেলা ড্র করেছিল। ১৯৫৩ সালে শেষ দিনের খেলায় মাত্র ৩৫ রানের মধ্যে ৮টি উইকেট পড়ে যাবার পর কোনভাবে পরাজয় এড়িয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। আর ১৯৫৬ সালে একা জিম লেকার অস্ট্রেলিয়াকে 'কচুকাটা' করে দুই ইনিংসে দখল করেছিলেন ১৯টি উইকেট। তাই অতীতের মলিন স্মৃতি নিয়েই অস্ট্রেলিয়া খেলা আরম্ভ করেছিল। এবারের অবস্থাও মোটেই অনুকূলে ছিল না। আগেই বলেছি অস্ট্রেলিয়ার পরাজয়ের সম্ভাবনাই ছিল সমধিক। কিন্তু ক্রিকেট যে মহা অনিশ্চয়তার খেলা। তার প্রকৃতি বিচিত্র। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের মত 'কখন ভাগ্যি কখন গাড়ি নাইকো ঠিকানা'।

খেলাটির ধারাবাহিক আলোচনা করলে দেখতে পাই প্রথম দিন অস্ট্রেলিয়া দল টসে জিতে ৪ উইকেটে ১২৪ রান করার পর 'ওল্ড ট্রাফোর্ড'এর আকাশ তার চিরাচরিত চরিত্র বজায় রেখে মুষলধারে ভেঙ্গে পড়ে। মধ্যাহ্ন-ভোজের আধ ঘণ্টা পরে বৃষ্টি নামায় দিনের বেশীর ভাগ খেলাই বন্ধ থাকে।

অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ন্যাটা ব্যাটসম্যান বিল লরীর নট-আউট থেকে ৬৪ রান করা এবং সুনিপুণ ব্যাটসম্যান নর্মান ও'নীলের 'আনাড়ি' খেলোয়াড়ের মত আউট হওয়া প্রথম দিনের খেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উইকেটে মোট ৬২ মিনিটের অবস্থানে ও'নীল ৪ বার বলের আঘাতে আহত হন, ১১ রান করে হিট উইকেট আউট হবার সময় পঞ্চমবার হাতে আঘাত পান। উঠতি খেলোয়াড় বিল লরী ৪৬ রানের মাথায় এক-বার স্লিপে ক্যাচ তোলেন কিন্তু সুব্বারাও

সে ক্যাচ ফেলে দেওয়ার পর লরীকে আর ভুল করতে দেখা যায় না।

দ্বিতীয় দিন বৃষ্টিভেজা উইকেটে অস্ট্রেলিয়া দল ব্যাটিং করতে আরম্ভ করে ৯০ মিনিটের মধ্যে বাকী ৬টি উইকেটে মাত্র ৬৬ রান যোগ করে ১৯০ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। ৭৪ রানের মাথায় লরী আউট হবার পর কেউই আর বেশীক্ষণ ব্যাট ধরে টিকতে পারেন না। ব্রায়ান স্ট্যাথাম ও টেড ডেক্সটারের মারাত্মক বোলিং এই বিপর্যয়ের মুখ্য কারণ। ৫৩ রানে ৫টি উইকেট পেয়ে স্ট্যাথাম অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তার সবচেয়ে ভাল 'অ্যাভারেজ' করেন, টেড ডেক্সটার শেষ তিনটি উইকেট দখল করেন মাত্র ১০ রানে। মধ্যাহ্নভোজের ২০ মিনিট আগে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ইংলণ্ড ৩ উইকেট হারিয়ে দিনের শেষে তোলে ১৮৭ রান। পিটার মে নিপুণ হাতে নব্বই রান করে নট আউট থাকেন। ওপেনিং ব্যাটসম্যান সুব্বারাও আউট হন ৬৩ রান করে। খেলায় ইংলণ্ডের এখন পরিপূর্ণ আধিপত্য। ৬ ঘণ্টা অর্থাৎ ৩৬০ মিনিটের খেলায় দ্বিতীয় দিনে দুই দলের মোট ২৫৩ রান সংগ্রহ নিশ্চয়ই চিত্তাকর্ষক খেলা নয়—অতি সতর্কতার পরিচায়ক।

তৃতীয় দিনের খেলায় নাটকীয়তার অভাব হয় না। ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে, যাঁর সেঞ্চুরী লাভ অবধারিত বলে মনে হয়েছিল ৯৫ রানের মাথায় তাঁর আউট হবার ঘটনা ইংলণ্ড সমর্থকদের মনে কম ব্যথা দেয়নি। মের আউট হবার দৃশ্য সত্যই বিচিত্র। ডেভিডসনের বল এগিয়ে খেলতে গিয়ে মে অত্যন্ত নীচু ক্যাচ তোলেন—উইকেট-কিপার গ্রাউট মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই ক্যাচ চাটি মেরে উপরে তুলে দেন সেখানে সিম্পসন ক্যাচ ধরতে ভুল করেন না। সত্যিই এক আশ্চর্য ক্যাচ।

এইদিন ৩৬৭ রানে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর অস্ট্রেলিয়া দেড় ঘণ্টা ব্যাটিং-এর সময় পেয়ে কোন উইকেট না হারিয়ে ৬৩ রান লাভ করে। বিপর্যয়ের মুখে এই ৬৩ রানকে উপরি পাওনা হিসাবে ধরা যেতে পারে। কারণ পরের দিন পরিপূর্ণ বিশ্রাম। বিশ্রামের পর চতুর্থ দিনের খেলায় নতুন উৎসাহে নতুন করে ইনিংস আরম্ভের সুযোগ পাবে অস্ট্রেলিয়া।

তৃতীয় দিনের খেলায় বব্ সিম্পসনের বোলিং-এও কম নাটকীয়তা দেখা যায়নি। ৭ উইকেটে ইংলণ্ডের ৩৬১ রান উঠেছিল। কিন্তু তার পরের তিনটি উইকেট দখল করেন সিম্পসন মাত্র ২ রান দিয়ে।

অস্ট্রেলিয়ার পরাজয়ের আশঙ্কার মধ্যে বিশ্রামের দিন কেটে যায়। চতুর্থ দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান বিল লরী ও বব্ সিম্পসন পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে ব্যাটিং করতে আরম্ভ করেন। প্রথম ইনিংসের খেলায় ১৭৭ রানের ক্ষতির মধ্যে আগের দিন তারা ৬৩ রান পুষিয়ে নিয়েছেন। এখনও ইনিংস পরাজয় এড়ানোর জন্য ১১৪ রানের প্রয়োজন। ৮টি উইকেট হাতে রেখেই অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের ক্ষতি মিটিয়ে দিল। এইবার সঞ্চয়ের পালা। দিনের শেষে সংগৃহীত হল ৬ উইকেটে ৩৩১ রান। এর অর্থ তাদের দ্বিতীয় ইনিংসের সঞ্চয় ১৫৪ রান। হাতে আরও চারটি উইকেট।

পরম নির্ভরযোগ্য ন্যাটা ব্যাটসম্যান বিল লরী দ্বিতীয় টেস্ট সেঞ্চুরী করে দর্শকদের প্রশংসা কুড়োলেন। ৬৭ রান করে নর্মান ও'নীল শোধ করে দিলেন প্রথম ইনিংসের ব্যর্থতা। সিম্পসনের ৫১ ও হার্ভের ৩৫ রানও ইনিংসের বনিয়াদের পাকা গাঁথুনি। তবু পরাজয়ের আশঙ্কা—শেষ দিনে কি হয়!

বিল লরীর এই দিনের সেঞ্চুরীর সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড সফরে তাঁর অষ্টম সেঞ্চুরী পূর্ণ হয়। ওল্ড ট্রাফোর্ডেই উপর্যুপরি দুবার তিনি সেঞ্চুরী করেন।

পঞ্চম ও শেষ দিনের ক্রিকেট নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ। বিপর্যয় এড়াবার জন্য যে অস্ট্রেলিয়া চারটি উইকেটের উপর নির্ভর করে রাত কাটিয়েছিল খেলা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে মাত্র ৩ রানের মধ্যে তার তিনটি উইকেট পড়ে গেল। আরও আশ্চর্যের কথা, স্পিন বোলার ডেভ এলেন মাত্র ১৬টি বলের মধ্যে একটিও রান না দিয়ে এই তিনটি উইকেট পেলেন। ১৫ মিনিটের মধ্যে এই বিপর্যয়। খেলা বাঁচাবার আশা অস্ট্রেলিয়ার ধূলিসাৎ। কিন্তু শেষ উইকেটে গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জিকে নিয়ে বীরের মত খেলতে লাগলেন অ্যালান ডেভিডসন। তাঁর খেলায় বীরের দর্প, আবার সব সময়ই মৃত্যু-ভয়। ডেভিডসনের হাত খুলতে দেরি হল না। বেপরোয়া ব্যাট চালিয়ে তিনি অতি দ্রুত রান সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন। ডেভিডসন ও গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জির শেষ উইকেট জুটিতে ১০০ মিনিটে ৯৮ রান যোগ হবার পর ম্যাকেঞ্জি আউট হবার সঙ্গে সঙ্গে ৪৩২ রানে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হল। শেষ ২৫ মিনিটে সংগৃহীত হল ৫০ রান। ১০টি বাউণ্ডারী ও ২টি ওভার বাউণ্ডারীর কৃতিত্বে ৭৭ রান করে অ্যালান ডেভিডসন নট আউট রইলেন। অস্ট্রেলিয়ার সঞ্চিত রইল ২৫৫ রান। সুতরাং জয়ের জন্য ইংলণ্ডের ২৫৬ রানের প্রয়োজন। ২৩০ মিনিট সময় হাতে।

২৩০ মিনিটে ২৫৬ রান সংগ্রহ অসম্ভব নয়। বিশেষ করে, অ্যাশেস পুনরুদ্ধারের জন্য যখন এ ম্যাচে জেতা ইংলণ্ডের একান্ত প্রয়োজন তখন সে চেষ্টা না করেও উপায় নেই। সুতরাং ইংলণ্ড জয়ের উদ্দেশ্য নিয়েই খেলা আরম্ভ করল। পুলার, সুব্বারাও মারতে আরম্ভ করলেন। ৪০ রানের মাথায় পুলার আউট হয়ে গেলেন। এলেন টেড-ডেক্সটার, এবার বেপরোয়া মার। ৯২ মিনিটে ১০০ রান পূর্ণ হল। ১৫০ রানের মাথায় পড়ল দ্বিতীয় উইকেট। তার পরই আরম্ভ হল পতন। একে একে নিবিছে দেউটি। যে ইংলণ্ডের এক সময় ১ উইকেটে ১৫০ রান উঠেছিল তাদের বাকী ৯টি উইকেট পড়ল মাত্র ৫১ রানের মধ্যে। আশ্চর্য এবং অবিশ্বাস্য পতন। বেনোর বলের মুখে কেউই দাঁড়াতে পারলেন না। বেনো মারাত্মকভাবে বোলিং করে ৭০ রানে ৬টি উইকেট দখল করলেন। অস্ট্রেলিয়া খেলায় জিতল ৫৪ রানে।

জিততে যেয়েই ইংলণ্ডকে চতুর্থ টেস্ট খেলায় হারতে হয়েছে। তবু তাদের এই বিপর্যয়ের কৈফিয়ত নেই। জেতার প্রচেষ্টায় টেড ডেক্সটারের মারমুখী ব্যাটিং অশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। ১৪ বার বাউণ্ডারী ও একবার ওভার বাউণ্ডারী মেরে তিনি সংগ্রহ করেন ৭৬ রান।

গত জানুয়ারী মাসে এডিলেডে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপদ-ত্রাতার ভূমিকা নিয়েছিলেন কেন ম্যাকে ও লিণ্ডসে ক্লাইন। শেষ জুটিতে ১০৯ মিনিট উইকেটে টিঁকে থেকে তাঁরা ম্যাচ বাঁচিয়েছিলেন। ওল্ড ট্রাফোর্ডের চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন অ্যালান ডেভিডসন। জয়ের সম্মান এনে দিয়েছেন স্বয়ং অধিনায়ক রিচি বেনো। ডেভিডসন অসুস্থ থাকায় এডিলেড টেস্টে নিজ দলকে সাহায্য করতে পারেন নি। সেই ক্ষতি চতুর্গুণে পূর্ণ করে দিয়েছেন ওল্ড ট্রাফোর্ডে।

চতুর্থ টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর-বোর্ড:—

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ১০৯ (বিল লরী ৭৪, বি বুথ ৪৬, নীল হার্ভে ১৯; ব্রায়ান স্ট্যাথাম ৫৩ রানে ৫ উইকেট, টেড ডেক্সটার ১৬ রানে ৩ উইকেট)।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস ৩৬৭ (পিটার মে ৯৫, কেন ব্যারিংটন ৭৮, রমন সুব্বারাও ৬৩, ডেভ এলেন ৪২, ব্রায়ান ক্লোজ ৩৩, জন মারে ২৪; বব সিম্পসন ২৩ রানে ৪ উইকেট, অ্যালান ডেভিডসন ৭০ রানে ৩ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস ৪৩২ (বিল লরী ১০২, অ্যালান ডেভিডসন নট আউট ৭৭, নর্মান ও'নীল ৬৭, বব সিম্পসন ৫১, নীল হার্ভে ৩৫, গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ৩২, পিটার বার্জ ২৩; ডেভ এলেন ৫৮ রানে ৪ উইকেট, টেড ডেক্সটার ৬০ রানে ৩ উইকেট, জে ফ্লাভেল ৬৫ রানে ২ উইকেট)।

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস ২০১ (টেড ডেক্সটার ৭৬, রমন সুব্বারাও ৪৯, জিওফ পুলার ২৬; রিচি বেনো ৭০ রানে ৬ উইকেট, অ্যালান ডেভিডসন ৫০ রানে ২ উইকেট)।

[অস্ট্রেলিয়া ৫৪ রানে বিজয়ী]

খেলাধুলায় মহিলা

—মুকুল—

কুমারী উষা আয়েঙ্গার

ভারতের টেব্‌ল টেনিসে দুই উষা। একজন উষা আয়েঙ্গার আর একজন উষা সুন্দররাজ। ঠিক ক্রিকেটের মত। ক্রিকেটে দুই বিজয়—বিজয় হাজারে আর বিজয় মঞ্জরেকার। তবে ক্রিকেটে একজন অস্তমিত প্রতিভার কোলে আর একজনের উত্থান। মেয়েদের টেব্‌ল টেনিসে দুই উষার একসঙ্গে আলোক দান।

এক বৃন্তে দু'টি ফুলের মত দুজনই মহীশূরের মেয়ে। তবে উষা আয়েঙ্গারের কাছে মহীশূর প্রায় মরুতীর্থের মত। কালেভদ্রে ওখানে যাওয়া ঘটে। বাঙলাই তার একরকম ঘরবাড়ি। জন্ম অবশ্য কোলার গোল্ড ফিল্ডে। কিন্তু জন্মের পর থেকে বাঙলাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস। আচারে-ব্যবহারে, চালচলনে, কথাবার্তায় প্রায় বাঙালী। মুখে পরিষ্কার বাঙলা ভাষা। কণ্ঠে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মিষ্টি সুর। স্বভাবে বাঙালীর নম্রতা, বাঙালীর লজ্জা। বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি মহীশূরের মূর্তিমতী মেয়ে উষা এখন পূর্ণ প্রস্ফুটিতা বাঙালী মেয়ে। উষা আয়েঙ্গারকে বাঙালী বলতে আমার কুণ্ঠা নেই। ভারতীয় টেব্‌ল টেনিসেও বাঙলার মেয়ে হিসাবেই তার পরিচিতি।

বাঙলার টেব্‌ল টেনিস ক্ষেত্রে উষা আয়েঙ্গারের আবির্ভাব 'উষার উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা'। সংকোচের গুণ্ঠন খুলে কম্পিটিশনে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্ম-প্রকাশ। ধাপে ধাপে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ।

১৯৫৫ সাল থেকেই বাঙলার পুরোভাগে তার আসন। সে আসন থেকে কেউ তাকে নামাতে পারেনি। একটানা ছ' বছর বেংগল চ্যাম্পিয়নশিপ। সত্যিই বিস্ময়কর বিজয়-বৈজয়ন্তী। ভারতীয় টেব্‌ল টেনিসে র‍্যাঙ্কিং অর্থাৎ ক্রমপর্যায়ে এই কিশোরী মেয়ের স্থান এখন তৃতীয়। প্রথম স্থান অধিকারিণী কুমারী মীনা পরান্ডে, দ্বিতীয় স্থানে উষার দোসর দ্বিতীয় উষা, যার পুরো নাম উষা সুন্দররাজ।

দুই উষার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কে ছোট আর কে বড়, তার কিন্তু মীমাংসা হয়নি এবং সে ঘটনা বাঙলার টেব্‌ল টেনিসের এক স্মরণীয় ঘটনা হিসাবেই নথিভুক্ত হয়ে আছে। টাইম লিমিটের খেলায় কেউ কাকে হারাতে পারেনি।

১৯৫৪ সালে উষা আয়েঙ্গার যখন 'ডায়োসেশান'-এর ক্লাস সেভেনের ছাত্রী, তখন ওয়াই এম সি এ'র কলেজ ব্রাঞ্চের চ্যাম্পিয়নশিপে তার প্রথম অংশ গ্রহণ এবং একে একে তপতী মিত্র, আর ফার্নান্ডেজ ও ইস্থার মোজেসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ। তপতী তখন টেব্‌ল টেনিসের নাম-করা মেয়ে, ফার্নান্ডেজের নাম আরও বেশী, আর ইহুদী মেয়ে ইস্থার মোজেস তখনকার 'রেনিং চ্যাম্পিয়ন'। ১১ বছরের ছোট্ট মেয়ে উষার পক্ষে প্রথম অভিযানে এদের একে একে পরাভূত করে বিজয়ীর সম্মান লাভ, কম কথা নয়।

এর পর ইডেন গার্ডেনে ইস্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে উষার কাছে ইস্থার মোজেসের আবার পরাজয় এবং উষার আবার চ্যাম্পিয়নশিপ। শুধু সিঙ্গলসেই নয়, মিক্সড ডাবলসেও। বিশ্ব-বিখ্যাত খেলোয়াড় আইভান আন্দ্রিয়াদিস্‌ ও ভ্যাকলাব টেরেবা এসেছিলেন এ বছর ভারত সফরে। ইস্ট ইণ্ডিয়ায় খেলতে এসে আন্দ্রিয়াদিস উষাকেই মিক্সড ডাবলসের সঙ্গী হিসাবে বেছে নিলেন। ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল টেরেবা ও তপতীর সঙ্গে। বলা বাহুল্য, আন্দ্রিয়াদিস ও আয়েঙ্গার পেলেন বিজয়ীর পুরস্কার। উষার মাথায় দ্বি-মুকুট।

খেলার পর পুরস্কার বিতরণের পালা। টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান পংকজ গুপ্ত সভাপতি। পুরস্কার বিতরণের জন্য ফুটফুটে ফর্সা মেয়ে উষার ডাক পড়ল। সলাজ হাসি নিয়ে এগিয়ে গেল উষা। নিজের প্রাপ্য দু'টি পুরস্কার উষা স্মিত-হাস্যে কোলে রাখবার সময় ইনডোর স্টেডিয়ামে আনন্দের হাসি বয়ে গেল। এর পর র‍্যাঙ্কিং-এ উষা পেল প্রথম স্থান। টেব্‌ল টেনিসে বাঙলার এক নম্বর মেয়ে। সেই থেকে আজ অবধি বাঙলা টেব্‌ল টেনিসের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। উপর্যুপরি

কুমারী উষা আয়েঙ্গার

ছবার চ্যাম্পিয়নশিপ। প্রথম দু বছর ফাইন্যালে হারলেন মিসেস চমন কাপুর, পরের বছর তপতী মিত্র, শেষ তিন বছর বিজয়িনী শকুন্তলা দত্তর বিরুদ্ধে।

জাতীয় টেব্‌ল টেনিসে উষার বাঙলার প্রতিনিধিত্বের সুযোগ ১৯৫৬ সাল থেকে। রাজকুমারী অমৃতকুমারীর শিক্ষা-পরিকল্পনায় আইভান আন্দ্রিয়াদিস ও ভি শিবরামনের কোচিং-এ ইতিমধ্যে উষার হাত খুলে গেছে। তার তূণে এখন নানা অস্ত্র। তবুও ১৯৫৬ সালে শাহারানপুরে জাতীয় প্রতিযোগিতায় সিডিং-এ স্থান হল না। কিন্তু আনসিডেড খেলোয়াড় হিসাবেই উষা হারালে সিডিং-এর উঁচু স্থানের মেয়েদের।

ভারতের তখনকার পাঁচ নম্বর মেয়ে প্রিস্‌কা নানসের সঙ্গে উষার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল। কিন্তু নানস উষাকে আমল দিতে চান না। তাঁর চিন্তা পরের রাউন্ড নিয়ে যেখানে তাঁকে খেলতে হবে তখনকার তিন নম্বর মেয়ে উষা সুন্দররাজের সঙ্গে। কিন্তু খেলতে হল না। উল্টে উষা আয়েঙ্গারই খেলল উষা সুন্দররাজের সঙ্গে—প্রি-কোয়ার্টারে প্রিস্‌কাকে হারিয়ে। কোয়ার্টার ফাইন্যালে সুন্দররাজও ঠাঁই পেলেন না। সেমি-ফাইন্যালে উষার হার হল মীনা পরাণ্ডের কাছে। শেষ পর্যন্ত মীনা পরাণ্ডেই পেলেন চ্যাম্পিয়নশিপ।

১৯৫৭ সালে কলম্বোতে জাতীয় টেব্‌ল টেনিসের আসরেও এক অবস্থা। এখানেও সেমি-ফাইন্যালে রাসেল জনের কাছে উষার পরাজয় এবং শেষ পর্যন্ত রাসেল জনের চ্যাম্পিয়নশিপ।

১৯৬০ সালে হায়দরাবাদে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এখানেও সেমি-ফাইন্যালে মীনা পরাণ্ডের কাছে পরাজয় এবং মীনা পরাণ্ডের চ্যাম্পিয়নশিপ। এইভাবে তিন-তিনবার জাতীয় টেব্‌ল টেনিসের সেমি-ফাইন্যাল থেকে উষাকে পিছু হটতে হয়েছে।

এশিয়ান টেব্‌ল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য দু'বার ডাক এসেছে উষার কাছে। প্রথম ১৯৫৯ সালে। কিন্তু অল্প বয়স বলে ম্যানিলায় যাওয়া হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়বার ১৯৬০ সালে বোম্বেতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ ঘটেছে।

খেলোয়াড় হিসাবে উষা প্রধানত ডিফেন্সিভ প্লেয়ার। তাই বলে কি হাতে মার নেই? আছে এবং ভাল মারই আছে। অমন দীর্ঘ তনু যার, তারই তো মারার সুযোগ। কিন্তু সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় মারমুখী খেলা খেলতে কেন যে উষার অনীহা, তা অনেকেরই অজ্ঞাত। অতুলনীয় চপ-ডিফেন্স আর অনমনীয় মনোবলই উষার খেলার প্রধান সম্পদ। খেলার সময় চিরদিনই অচঞ্চল। তার সুন্দর স্নিগ্ধ প্রশান্ত মূর্তি দর্শক চোখের তৃপ্তিদায়ক। কিন্তু সে মূর্তিতে কোন অভিব্যক্তি নেই। জয়লাভে উদাসীন, পরাজয়ে অম্লান সে মুখ। যেন কিছুই হয়নি। হারজিতকে একইভাবে গ্রহণ করতে দেখেছি বাঙলার টেব্‌ল টেনিস সম্রাজ্ঞীকে।

প্রধানত ভি শিবরামন এবং আইভান আন্দ্রিয়াদিসের কোচিং-এ উষা আয়েঙ্গার টেব্‌ল টেনিসের বিজ্ঞানসম্মত উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিতা। টেব্‌ল টেনিসের শুরুর গুরু কিন্তু এক অখ্যাত ব্যক্তি। ওয়াকিবহাল মহলেও যার নাম অজানা।

শিক্ষার স্থান কস্‌মোপলিটান ক্লাব। বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে উষাদের আগের ভাড়াবাড়ির পাশেই কস্‌মোপলিটান ক্লাব। সেখানকার টেনিসের 'বলবয়' নিরুয়ার কাছেই হাতেখড়ি। বাসের মধ্যে একদিন উষার প্রশংসায় কয়েকটি ছেলেকে পঞ্চমুখ হতে দেখে নিরুয়া আত্মপ্রচারের লোভ সংবরণ করতে পারছিল না। আবেগে বলে ফেলেছিল—'ওকে তো আমিই প্রথম খেলা শিখিয়েছি।' জীর্ণ কন্থা, ছিন্নবাস-পরিহিত এই চ্যাংড়া ছেলের ঔদ্ধত্য কেউ সহ্য করতে পারল না; প্রলাপ উক্তি ভেবে উপহাসভরে বলে উঠল—'দ্রোণাচার্যই বটে'। সেদিন মনে বড় ব্যথা পেল নিরুয়া।

হয়তো, সমালোচকদের হয়তো জানা নেই, উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন জারোশ্লাভ ড্রবনীও একদিন 'বলবয়' ছিলেন। ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের ফল্গু মালীও ছিল মারাত্মক বোলার। তার বলের সামনে বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানও ভয়ে বেড়াল হয়ে যেত। গুণের জন্যই গুণীর আদর। পেশা, চেহারা বা ছিন্নবাস গুণকে মলিন করতে পারে না।

শুরুর গুরুকে গৌরব দিতে উষার কিন্তু বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই; বরং গর্বভরেই উষা বলে—নিরুয়া কম্পিটিশনে খেললে সারা ভারতে তার নাম ছড়িয়ে পড়ত। ও দ্রোণাচার্য না হতে পারে, কিন্তু একলব্যের সম্মান ওর প্রাপ্য।

উষার খেলোয়াড়-জীবনে পরিবারের প্রভাব সুস্পষ্ট। বাবা ডাঃ এন কেশব আয়েঙ্গার সেণ্ট্রাল ফোরেনসিক ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর। শুধু একজন ক্রীড়ামোদীই নন, ভাল খেলোয়াড়ও। টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, বিলিয়ার্ড, ব্রীজ, সব খেলাতেই ও'র ভাল হাত। ওল্ড বালীগঞ্জের ১৪ নম্বর আয়রন সাইড রোডে সেণ্ট্রাল গভর্নমেণ্ট কোয়ার্টারের এক নম্বর ফ্ল্যাটে গেলে দেখা যাবে, ক্রীড়াঙ্গন থেকে আহরিত পিতাপুত্রীর আলমারি-ঠাসা পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র। ক্রীড়ামোদী হিসাবে উষার মা বাবার উপরে আর-এক কাঠি। কম্পিটিশনে যেখানেই উষার খেলা, সেখানেই তাঁর উপস্থিতি। মা-বাবার উৎসাহ ও আশীর্বাণীই উষার সাফল্যের অন্যতম সোপান। ভারতীয় টেব্‌ল টেনিসের আর এক নাম-করা মেয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর এইচ ভি আর আয়েঙ্গার দুহিতা ইন্দিরা আয়েঙ্গার উষাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। তাই বলছিলাম, উষার খেলোয়াড়-জীবনে পরিবারের প্রভাব সুস্পষ্ট।

বাড়িতে খেলাধুলো, লেখাপড়া, সঙ্গীত ও শিল্পের সমান চর্চা। আয়েঙ্গার দম্পতির তিন সন্তানের মধ্যে উষা প্রথম। ছোট ছেলে কুমার খেলা পাগল। ছোট মেয়ে সন্ধ্যা সি এল টি'র নৃত্যপটিয়সী। নৃত্য-গীতে উষারও ভাল দখল। কিন্তু যার এক হাতে বি-এ ক্লাসের ইংরেজীর অনার্সের ভারী ভারী বই, আর এক হাতে টেব্‌ল টেনিসের শক্ত ব্যাট—তার আর সময় কোথায়? তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই। খেলায় সুনামের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ায়ও চিরদিন সুনাম পেয়েছে এই মেয়েটি। ডায়োসেশান স্কুল থেকে প্রথম ডিভিসনে ম্যাট্রিক এবং লরেটো থেকে প্রথম ডিভিসনে আই-এ পাশ করবার পর এখন প্রেসিডেন্সী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে ইংরেজীর ১৪টি অনার্স ছাত্রছাত্রীর মধ্যে উষা অন্যতমা। সাংবাদিকতার লোভ আছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি সাময়িকী আগ্রহ করে তার লেখা ছেপেছে।

তবে ভারতীয় টেব্‌ল টেনিসের শ্রেষ্ঠ সম্মানের জন্য উষা সত্যিই উদ্‌গ্রীব। দুর্গমের দুর্গ থেকে সাধনার ধন লাভের জন্য বদ্ধপরিকর। বয়স কেবল ১৮। সুতরাং হাতে অফুরন্ত সময়।

দেশী সংবাদ

৩১শে জ্বলাই—অদ্য কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সাধারণ ধর্মঘটের পর এক বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও এখন পর্যন্ত তিন শত কর্মী হয় বরখাস্ত আছে, নয়ত তাঁহাদের অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সংঘের জাতীয় কর্মপরিষদের সদস্য শ্রীওমপ্রকাশ গুপ্ত উপর্যুক্ত তথ্য পেশ করেন।

ঘৃতে ভেজাল নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার বর্তমানে যেসব নিয়ম করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আগামী ৭ই আগস্ট সোমবার হইতে মাখন ও ঘৃত ব্যবসায়ীগণ অনির্দিষ্ট-কালের জন্য ধর্মঘট করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অনাবৃষ্টির অভিশাপে পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল আজ বিপদগ্রস্ত। এই অভিশাপ হইতে রক্ষা করিবার ভার যাহার উপর ন্যস্ত ছিল সেই ডি ভি সি-ও সময়োচিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছে। আরও প্রকাশ, ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ গত ১৯৫৯-৬০ সালে ১১,১৫৬ একর জমিতে জল সরবরাহের জন্য প্রায় এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকার এক বিল দাখিল করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাব অনুযায়ী ঐ অর্থের পরিমাণ নাকি ৮৯,২০২ টাকার বেশী হইতে পারে না।

১লা আগস্ট—সম্প্রতি দিল্লিতে মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবার পর পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করিয়া এই রাজ্যের সীমান্ত জেলাগুলিতে সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ কিছুটা মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে বলিয়া সরকারী মহল হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

২রা আগস্ট—অদ্য বরাহনগরে ডানলপ ব্রিজের নিকট একটি কারখানার দুই দল শ্রমিকের মধ্যে এক প্রবল সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের ফলে এক ব্যক্তি নিহত ও কারখানার ম্যানেজার সহ ২৬ জন আহত হয়।

সাপ্তাহিক ছুটির দাবিতে কলিকাতা কর্পোরেশনের আলো বিভাগের প্রায় আট শত কর্মী আগামী ১০ই আগস্ট হইতে ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত করায় কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

৩রা আগস্ট—দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনে প্রশাসনিক ব্যর্থতার অন্যতম নিদর্শন চন্দ্রপুরা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। এই প্রকল্পে হাত দেওয়ার আড়াই বছর অতীত হইয়াছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, কয়েক ফুট মাটি কাটা ছাড়া পাওয়ার হাউসের এক তিল কাজও হয় নাই। এদিকে জানা যায়, ইতিমধ্যে খরচ হইয়া গিয়াছে ২ কোটি ৯২ হাজার ৩ শত ৩৫ টাকা ৯৩ নয়া পয়সা।

আগামী ১১ই হইতে ১৩ই আগস্ট পর্যন্ত দিল্লিতে ভারতের মুখ্যমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হইবে, তাহাতে ভাষা সমস্যা ছাড়াও সাম্প্রদায়িক সমস্যা এবং উহার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। সাম্প্রদায়িক দলগুলির নিষিদ্ধকরণের প্রশ্নটিও আলোচনার সম্ভাবনা আছে।

আজকাল সাধারণের ব্যবহার্য যে গুঁড়া লবণ বাজারে বিক্রি হয় উহার রং একটু ময়লা দেখা

যায়। তেল, ঘি, চা, চিনি, গুড় প্রভৃতি খাদ্য-দ্রব্যে তো ভেজাল আছেই, ইদানীং লবণেও ভেজাল ধরা পড়িয়াছে।

৪ঠা আগস্ট—অদ্য দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা অবধি প্রবল বর্ষণের ফলে কলিকাতা এবং শহরতলির রেল বন্ধ, ট্রাম-বাস বন্ধ, মোটরগাড়িও অচল। বিকাল পর্যন্ত বৃষ্টির পরিমাণ ছিল পাঁচ ইঞ্চির মত। সাম্প্রতিক কালে নগরীতে এমন প্রবল বারিপাত হয় নাই। অনেকে বলেন, স্মরণকালের মধ্যে এমন দৃশ্য নাকি দেখা যায় নাই।

গতকল্য রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় কৃষ্ণনগর টাউন রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং-এর নিকটে একখানি বোঝাই লরীর সহিত ৪০৮ নং ডাউন ক্যালকাটা-লালগোলা পার্সেল ট্রেনের সংঘর্ষ হওয়ায় লরীর ৫ জন আরোহীই নিহত হয়।

৫ই আগস্ট—পৃথক পার্বত্য রাজ্যের দাবি জানাইবার জন্য সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ-সম্মেলন আগামী ২৪শে অক্টোবর হইতে আসামের সমস্ত পার্বত্য জেলায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গতকল্য কলিকাতায় প্রবল বর্ষণের ফলে মহানগরীতে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষমহল এক্ষণে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছেন। স্ট্যাণ্ডিং ওয়ার্কস কমিটির সভায় চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য সদস্যগণ নাকি এই মর্মে গুরুতর অভিযোগ করেন যে, অধিকাংশ ডিস্ট্রিক্টের সুপারভাইজার ও সংশ্লিষ্ট কর্মিগণ কাজে অনুপস্থিত থাকার দরুন বহু এলাকায় অস্বাভাবিক পরিমাণে জল জমিয়া যায়।

৬ই আগস্ট—সহকারী মার্কিন রাষ্ট্রসচিব শ্রীচেস্টার বোলস্ আজ নয়াদিল্লিতে ঘোষণা করেন যে, যদি কোন দিক হইতে ভারতের উপর কোনরূপে আক্রমণ হয়, তাহা হইলে আমেরিকা ভারতের পক্ষ সমর্থন করিবে।

পুলিসী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, ১৯৬০ সালে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পুলিস ছেলেধরাদের নিকট হইতে অন্তত ৫৫টি ছেলে-মেয়েকে উদ্ধার করিয়াছে এবং ৬৩ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইহার পূর্বে এ পর্যন্ত এত অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে এই অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

বিদেশী সংবাদ

৩১শে জুলাই—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীহ্যারল্ড ম্যাকমিলান আজ ঘোষণা করেন যে, ইয়োরোপের সাধারণ বাজারে যোগদানের উদ্দেশ্যে আলোচনা চালাইবার জন্য বৃটেন আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন-পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

১লা আগস্ট—সামরিক অ্যাডভেঞ্চার প্রেমিকদের অদ্য শ্রীক্রুশ্চেফ এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, তাঁহারা যেন বিজ্ঞের মত আচরণ করেন এবং যেন স্মরণ রাখেন যে, তাঁহাদের গরম মাথা ঠাণ্ডা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপায়ই আমাদের হাতে আছে।

২রা আগস্ট—বর্তমানে সুন্দরীজাল কারাগারে আটক নেপালের পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শ্রী বি পি কৈরালা অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন এবং বুকে ব্যথা সহ তাঁহার শরীরে হাঁপানির লক্ষণ দেখা দিয়াছে। স্বামীর সাক্ষাৎপ্রার্থিনী শ্রীমতী সুশীলা কৈরালা গত পক্ষকাল এখানে অবস্থান করিতেছেন।

আট আনা দামের সবুজ পাকিস্তানী ডাক-টিকেট সম্বলিত কোন পত্র ভারতীয় ডাক বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হইতেছে না। উক্ত টিকিট-গুলিতে পাকিস্তানের যে মানচিত্র আছে তাহাতে কাশ্মীরকে বিরোধীয় অঞ্চলরূপে দেখানো হইয়াছে।

৩রা আগস্ট—আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কংগোতে কাতাংগার অন্তর্ভুক্তি ঘটানো হইবে বলিয়া কংগোর নূতন প্রধানমন্ত্রী শ্রীসিরিল আদোলা তাঁহার সরকারের অভিপ্রায় ঘোষণা করেন। কংগোর রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান প্রতিনিধি অদ্য বলেন, ঐ ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জ হস্তক্ষেপ করিবেন।

শ্রীক্রুশ্চভ বলেন, এই বৎসর শেষ হইবার পূর্বে পশ্চিমী শক্তিসমূহ যদি জার্মান শান্তি-চুক্তি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে রাজী না হয় তাহা হইলে রাশিয়ার পক্ষে পূর্ব জার্মান সরকারের সহিত একটি শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়োজন দেখা দিবে এবং উহার উপর ভিত্তি করিয়া পশ্চিম বার্লিনের পরিস্থিতি নিয়মাধীন করিবার প্রয়োজনও দেখা দিবে।

৪ঠা আগস্ট—সোভিয়েট ইউনিয়ন অপেক্ষাকৃত নরম ভাষায় লিখিত নোটে পশ্চিমী শক্তিবর্গকে জানাইয়াছে যে, জার্মান সন্ধিচুক্তি সম্পর্কে উহারা পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছে।

মার্কিন রাষ্ট্রসচিব ডীন রাস্ক গতকল্য প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর সহিত এক সাক্ষাৎকারের পরে বলেন, শান্তি এবং স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বার্লিন সংক্রান্ত বর্তমান পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন মানিয়া লইবে না।

৫ই আগস্ট—গত ৩রা আগস্ট পর্যন্ত এক সপ্তাহে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় ১৩০ জন লালকোর্তা ও জাতীয় আওয়ামী দলের কর্মীকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে এবং অনেকের বিষয়সম্পত্তি সমগ্রভাবে অথবা আংশিকভাবে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে।

৬ই আগস্ট—আজ সোভিয়েট রাশিয়া তাহার দ্বিতীয় মহাকাশচারী মানুষ মেজর জার্মান স্টেপানোভিচ টিটভকে পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ কক্ষপথে স্থাপন করিয়াছে। মেজর টিটভ ৮৮·৬ মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তিনি যে কক্ষপথে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছেন পৃথিবী হইতে তাহার দূরত্ব ১১০·৬ মাইল হইতে ১৫৯·৭ মাইলের মধ্যে। পৃথিবীর সহিত তাঁহার বেতার যোগাযোগ রহিয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোকুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০,, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফঃস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২,, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় আনন্দ প্রেস, ৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২৯০৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।